সূচীপত্র

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা-৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

সার্ভে ড্রইং সরঞ্জাম ও
অফিস সংক্রান্ত ষ্টেশনারী
কাগজ বিক্রেতা ও প্রিন্টার্স
বৃহত্তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান
কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
৬৩ ই, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন:
২২-৪২২৩

৩য় বং ২য় খণ্ড

অমৃত

১৬শ সংখ্যা মূল্য ৪০ নঃ পঃ

শুক্রবার, ৬ই ভাদ্র, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
Friday, 23 August, 1963. 40 Naya Paise

স্বাধীনতালাভের ষোড়শবার্ষিকী উদ্‌যাপনে সমগ্র জাতি এ বৎসর সর্বাগ্রে স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। জাতীয় স্বাধীনতার এই সপ্তদশতম জন্মবাসরে অন্যান্য বৎসরের মতই নানা অনুষ্ঠানে এই দিবসের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য জ্ঞাপিত ও ঘোষিত হয়। কিন্তু এইবারের ভাষণগুলিতে—বিশেষে দেশের উচ্চ অধিকারিবর্গ ও প্রবীণগণের বক্তৃতায়—একটা বাস্তবমুখী দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায় যাহা ইতঃপূর্বে কখনও লক্ষিত হয় নাই।

ইহা স্থায়ী মনোভাবের প্রকাশ হইলে অতি শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। রাষ্ট্রপতির ভাষণে পরোক্ষভাবে সরকারকে লক্ষ্য করিয়া সতর্কবাণীর প্রয়োগ রহিয়াছে। তিনি তাঁহার স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে বেতারভাষণে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আছে ঃ—

"আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আমাদের জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়নের অপরিহার্য অস্ত্র বলিয়া গণ্য করিয়াছি। আমরা নূতন মান ও নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য এবং দেশের নূতন রূপদানের জন্য চেষ্টা করিয়াছি। আমরা কিরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছি, ইতিহাসই তাহা বিচার করিবে।

"আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদিগকে এখনও দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের অবশেষ এখনও রহিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে মুষ্টিমেয়র নিকট এখনও ব্যষ্টিকে নতিস্বীকার করিতে হয়। যত দ্রুত সম্ভব এই ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করিতেই হইবে যদি আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সত্যই প্রতিষ্ঠা করিতে চাই।"

এইভাবে তিনি একদিকে রাষ্ট্রের উচ্চতম অধিকারিবর্গকে জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের কৃতিত্বের বিচারক তাঁহারাই নহেন এবং অন্যদিকে বলিয়াছেন যে দেশের জীবনে উন্নতমান ও নূতন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এখনও বহুদূরেই রহিয়াছে—সুতরাং আত্মপ্রশংসার কোনও কারণ নাই। "সামন্ততন্ত্র" রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে এখনও রহিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে কি অনিষ্ট হইতেছে এই বলিয়া তিনি ঐ দুই ক্ষেত্রে যেভাবে এখনও "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" চলিতেছে তাহারই উপর কটাক্ষপাত করিয়া এবং সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক জগতের হাঙ্গরগুলির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপ্লবকে আমরা যদি সার্থক করিতে না পারি, তবে ব্যাহতি ও বৈকল্যবোধ, নৈরাশ্য এবং অবিশ্বাস জন্মাইবে যাহা কোন সমাজের পক্ষেই মঙ্গলকর নহে।"

এই কথাগুলির সমষ্টিগত ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

পণ্ডিত নেহরু তাঁহার স্বাধীনতাদিবসের ভাষণে অতি সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে সীমান্তের যুদ্ধে শুধুমাত্র সৈনাদের চেষ্টায় জয়লাভ সম্ভব নয়, তাহা সম্ভব হইবে সমগ্র জাতির চেষ্টায়। অন্যদিকে তিনি ক্ষোভের সহিত এইকথা বলেন যে, 'চীনাদের আক্রমণের সময় আমাদের দেশে যে অভূতপূর্ব ঐক্য দেখা গিয়াছিল তাহা যেন ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। জনসাধারণ আবার আভ্যন্তরীণ কলহে যোগদানের পুরাতন অভ্যাসে ফিরিয়া যাইতেছে।' এরূপ কেন হইতেছে তাহার কারণবিশ্লেষণের চেষ্টা অবশ্য তিনি করেন নাই

অধিকারিবর্গের নিজেদের কার্যের হিসাব-নিকাশের একমাত্র উল্লেখ আমরা পাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের স্বাধীনতাদিবস উপলক্ষে বেতারভাষণে। দেশবাসীকে ভারতের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের শপথ গ্রহণের আহ্বানের সঙ্গে তিনি সকলের উদ্দেশে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এবং অতি স্পষ্টভাষায় বলেন, ১৫ই অগাষ্ট একদিকে যেমন পরম আনন্দের দিন তেমনই অপরদিকে আত্মানুসন্ধানেরও দিন। তিনি বলেন, এইদিনে স্বাধীন সমৃদ্ধ শান্তিপ্রিয় কল্যাণরাষ্ট্র গঠনের পথে যাত্রারম্ভ হয় ষোল বৎসর পূর্বে। সে পথে আমরা কতটা এগিয়েছি, প্রতিবৎসর এই পুণ্যদিনে আমরা তার একটা হিসাব-নিকাশ করি। আত্মানুসন্ধানের ফলে কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়ে যদি তাহার সংশোধন ও নূতন প্রেরণায় দেশের সেবা ও বিরামহীন প্রয়াসের সংকল্প গ্রহণ করি স্বাধীনতার এই পুণ্যদিবসে।

আমরা আশা করি এবার ঐ হিসাব-নিকাশ করা হইয়াছে বাস্তবের দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং নিরপেক্ষ বিচারে। শ্রীপ্রফুল্ল সেনের নিকট তাহাই আমরা আশা করিতে পারি।

মেরুকন্যার বেণী

দিলীপকুমার সেন

এইখানে বেলা গেলে মূর্তিগুলি ফিরে উঠে আসে
ধীর চলাচলে—অবয়বহীন স্বচ্ছতায় বিপুল সেনানী
সংগোপনে রেখে গেল হাত, শূন্যতায় দীর্ণ দেহযূথ
সহসা প্রান্তরে! যেন সেও দূর অপ্রাকৃতেরে ভালবাসে—
যেন অলক্ষ্যের বলে বজ্র বৃষ্টিধারা ঝরে যায়—
ম্লান দীপে আশ্রয়-সন্ধানী
স্মৃতি ছত্রহীন মুক্তাকাশে স্তব্ধ প্রেতকুল বাসনা-বিচ্যুত
অন্ধকারে—ছুঁয়ে সব প্রস্তরাৎ মেরুকন্যাদের বেণী
অনেক সময় ধরে দেখে নেয়, নির্মমতা কতদূর অবিভবময়!

চিরাচরিত ওষ্ঠাধরে কাঁপে, তারা কাঁপে......অনিদ্র জানলায়
নিঃসংগ রিক্ত অশ্রুমুখ—বলে "হে আয়ুষ্মান
দেখ, এই তারাবলী খসে যাবে......প্রাণ বিন্দু, পাবে পরবাস"
নিপতিত দৃশ্য সব পুচ্ছ ধরে কবরের প্রায়—
চৈত্যের উপরে এসে, কেন কাঁপো—কেন কাঁপো
কেন আজো রয়েছো অম্লান?
উঠে ফের দুরবগ্রাহ্য মমতায় মূর্তিগুলি খলখল হাসে।

যতদূর চলে যাই, ছুঁয়ে সব প্রস্তরাৎ মেরুকন্যার বেণী,
অনেক সময় ধরে দেখা যায়—নির্মমতা আজো কি অ-বিভবময়!

● সম্প্রতি পরলোকগত কবি দিলীপকুমার সেনের শেষ কবিতা

গত সপ্তাহের সবচেয়ে বড় খবর কী? এ প্রশ্নের জবাবে অনেকেই যে অনেক কথা বলবেন তা প্রায় হলপ ক'রে বলা যায়। কিন্তু একটি ব্যাপারে সকলেই আশাকরি একমত হবেন যে, স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপনই ছিল সব থেকে বড় ঘটনা।

তবু, এটা ঠিক খবর নয়, ঘটনা। যে প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাই আমরা, এ খবরের মধ্যে তার তৃপ্তি নেই। স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা ষোল বছর আগে। বহু সংগ্রাম, অনেক আত্মোৎসর্গের পর অর্জিত হ'য়েছে এই স্বাধীনতা। কাজেই প্রতি বছরই সেই দিনটির কথা স্মরণ ক'রে স্বাধীনতাকে অটুট রাখার জন্যে নতুন ক'রে প্রতিজ্ঞা করব, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এটা বলা যায় এক রকম পূর্বনির্ধারিত, স্বাধীন জাতির সব থেকে মহান কর্তব্য। এ দায়িত্ব পালন ক'রে আমরা গর্ব বোধ করি, কিন্তু তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছু নেই। এবং সেই জন্যেই এ খবর পাঠ ক'রে নতুন কিছু আবিষ্কারের বিস্ময়ও নেই।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

হাওড়া ব্রীজের ওপর যে ভিক্ষুকটি গত ১৫ই আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল তার সম্বন্ধে আপনাদের কী ধারণা? লোকটি গুরুতর শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং সহায়-সম্পদহীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার ভিক্ষালব্ধ পয়সা থেকে বাঁচিয়ে জাতীয় পতাকা কিনেছিল, আর অশেষ পরিশ্রমে সেই পতাকা সে উড়িয়েছিল হাওড়া ব্রীজের উচ্চতম চূড়ায়। কেন? কারণ তার ইচ্ছে হ'য়েছিল, এই পবিত্র দিনে সেও তার স্বদেশের জন্যে কিছু করে। কিন্তু একে সে ভিখারী, তার ওপর দৈহিক ভাবে পঙ্গু, তাই তার সমস্ত ইচ্ছেটাকেই সে সংহত করেছিল জাতীয় পতাকার মধ্যে। আর সেই পতাকাকে সে তার চার পাশের সব চেয়ে উঁচু জায়গায় উড়িয়ে বোঝাতে চেয়েছিল, তার আকাঙ্ক্ষার মহত্ত্ব।

গত সপ্তাহের বড় খবর

এটা কি খবর নয়?

আমি তো বরং স্বাধীনতা দিবসের অগণিত বক্তৃতার চেয়ে এ সংবাদকে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করি। এবং

শুধু তাই নয়, এমন খবর কেবল গত এক সপ্তাহের কেন, অনেক সপ্তাহের মধ্যেই হ'য়ে থাকবে আমার কাছে পরম স্মরণীয়।

• • •

আমার কাছে যাই হোক, অনেকের কাছেই দেখছি গত সপ্তাহের সবচেয়ে বড় খবর, কলকাতার শাদা বাঘ।

খবরের কাগজে দেখছি, শাদা বাঘকে দেখার জন্যে ১৫ই আগস্ট চিড়িয়াখানায় যত লোক জমেছিল তা নাকি আগেকার সমস্ত রেকর্ডকেই অতিক্রম করে গেছে। ছ' বছরের চেয়ে বেশি বয়স এমন দর্শকের সংখ্যাই ছিল সতের হাজার। ছ' বছরের কম যাদের বয়স তাদের সংখ্যা ধরলে যে অঙ্কটা অনেক বেশি হবে তা বলাই বাহুল্য।

প্রকৃত প্রস্তাবে লোক যাচ্ছিল আরো আগে থেকেই। ঐ দুটি মহামান্য অতিথির আগমন সংবাদ প্রচারিত হবার পর থেকেই দর্শকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল চিড়িয়াখানায় এবং যতোদিন ওরা থাকবে ততোদিনই বাড়বে।

সত্যি ভেবে দেখুন, যে বাঘের দাম ৯৬,০০০ টাকা, যারা মাংস খায় প্রতিদিন আশি টাকার, তেমন প্রাণী দেখতে কার না সাধ হয়? আমি জানিনে, বাঘদের রসবোধ আছে কিনা—মাংসের রস নয়, রসিকতার রস—তাহলে হয়তো তারা সমবেত দর্শকদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন তুলতে পারত, ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত তোমরা কজন যাবে?

কারণ যতোদূর শুনেছি, এই শাদা বাঘ-জোড়া শেষ পর্যন্ত যাবে ঐ ফ্রেজারগঞ্জেই। এবং সমুদ্র তীরবর্তী সুরম্য স্থান হিসেবে যাতে সেখানে দেশী-বিদেশী টহলদারদের আনাগোনা বাড়ে, সেই জন্যেই থাকবে তারা সেখানে। কিন্তু শুধু বাঘ দেখিয়ে আর কতো বিদেশী মানুষকে টানা যাবে? দেশী মানুষেরা যদি নিয়মিত না যায়, তাহলে সারা বছরই তো হাই তুলতে হবে বাঘদের।

শাদা চোখে শাদা বাঘ

হাই তুলবে, আর মাংস খাবে এবং প্রতিদিন ছয় টাকা সেরের মাছের বাজারে ঘুরে আশি নয়া পয়সারও আমিষ খাওয়ার ক্ষমতা হবে না যাদের, তারা কলকাতার নিরামিষ দুরন্থে বসে বাঘের স্বপ্ন দেখবে—যে বাঘ মাংস খায় রোজ আশি টাকার। এ কি বাঘ, না স্বয়ং দক্ষিণ রায়!

• • •

পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি দুপুরের দিকে প্রায়ই দেখা যায় এক অদ্ভুত দৃশ্য। রঙিন শাড়ি প'রে একদল দেহাতী নারী ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন গ্রাম্য পুরুষের অভিভাবকতায় ময়দানের দিক থেকে চৌরঙ্গী পার হয়ে সামনের একটি প্রাসাদোপম বড় বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। ঐ বাড়িটার নাম যাদুঘর। গ্রামের মানুষেরা কীসের এক দুর্বোধ্য টানে জমায়েৎ হন সেখানে। এবং বিস্ফারিত নয়নে কতকগুলো ফসিল, প্রস্তরমূর্তি, আদিম প্রাণীর কঙ্কাল ইত্যাদি দেখে শ্রান্তদেহে ফিরে যান নিজের বাড়িতে।

কিন্তু যাদুঘর যে সত্যিই কোনো যাদুবিদ্যার জায়গা নয়, সেখানে অবস্থিত আছে সমস্ত এশিয়ার মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা, এ বোধ ঐ গ্রাম্য নরনারীর মনে সঞ্চারিত না হওয়াই স্বাভাবিক। কলকাতায় এলে যে আগ্রহ নিয়ে তাঁরা যান পরেশনাথের মন্দির দেখতে, সেই কৌতূহল নিয়েই তাঁরা আসেন যাদুঘরে বেড়াতে। অতএব সেদিক দিয়ে যাদুঘর দেখা যে তাঁদের কাছে অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যায় তা স্বীকার করতেই হবে।

এ ধরণের সংগ্রহশালার প্রধান উপযোগিতা হ'ল শিক্ষার্থী বালক-বালিকা, শিক্ষিত জনসাধারণ এবং গবেষক ছাত্রদের জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের যাদুঘরে তিন শ্রেণীর দর্শকের সংখ্যাই অত্যন্ত কম। বছরের পর বছর এই কলকাতা শহরে যাদুঘর থাকে পোড়ো বাড়ির মতো অবহেলিত অবস্থায়—জ্ঞানচর্চার এত বড় আয়োজন লাভ করে চরম ব্যর্থতা।

কাজেই প্রকৃতির প্রতিশোধের মতো এক চরম দণ্ডের বিধান নেমে এসেছে কলকাতার শিক্ষিত সাধারণের নিয়তিতে। যাদুঘর আজ এক নতুন যাদুবিদ্যার সম্মোহনে লোপাট হবার দিকে। শোনা যাচ্ছে এর ট্রাস্টি বোর্ড নাকি স্থির করেছেন, এখানকার দুষ্প্রাপ্য প্রত্নবস্তুর অনেকগুলো নিদর্শন এবার বিদেশের কয়েকটি সংগ্রহশালায় উৎসর্গ করে দেবেন তাঁরা। তাছাড়া মহানগরীর অসামরিক প্রতিরক্ষার জন্যে স্থান সংগ্রহ এবং ক্যান্টিন খোলার জন্যেও নাকি কয়েকটি ঘর থেকে এইসব 'অতীতের জঞ্জাল'কে ঝেঁটিয়ে ফেলা হবে।

যাদুঘরের যাদুবিদ্যা

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাঁড়িয়ে এমন কালাপাহাড়ী সংবাদ যে বিনা প্রতিবাদে হজম করা হয়, এ এক পরম বিস্ময় বটে। দেখা যাচ্ছে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা তিল তিল প্রয়াসে যে সম্পদ এবং যে ঐতিহ্য আমাদের জন্যে রেখে গেছেন আমরা তার সম্পূর্ণই অযোগ্য। অতএব যাদুঘরের সংগৃহ-বস্তু বিদেশে [illegible] করে আমরাই যদি এবার অতীত প্রাণীর কঙ্কালের মতো যাদুঘরে স্থান [illegible] তাহলেই বোধ করে যোগ্য কাজ হবে।

কোন অজ্ঞাত কারণে স্বর্গ থেকে শিলপ করে যে সব দেবতা এই মর্ত-ভূমিতে ছিটকে পড়েন, তাঁরাই মিনিষ্টার। এ'রা মর্তবাসীর নমস্য. এ'রা উপাস্য; এ'দের ভজন-ভোজন করানই মনুষ্যকুলের কাজ। একদল চাপরাশী, বেয়ারা, অর্ডালী, হেড জমাদার, পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট, কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক, অ্যাসিসটেন্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী, অ্যাডিসনাল প্রাইভেট সেক্রেটারী ও প্রাইভেট সেক্রেটারীর অলংকার-ভূষণে ভূষিত হয়ে মন্ত্রীপ্রবরদের দেখে আমাদের দেব-দর্শনের পুণ্যলাভ হয়। এম-পি, এম-এল-এরাও কম নন। এ'দের হাঁচি-কাশিতেও নাকি মন্ত্রীদের স্বর্গরাজ্য কে'পে ওঠে; সুতরাং এ'দেরও টাচ করা দায়। একেবারে ফোর ফর্টি ভোল্টস! এ পর্যন্ত হলেও না হয় সহ্য হতো। কিন্তু দিন-কাল এমনই পড়েছে যে, মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের ল্যাজে হাত দেওয়াও অসম্ভব। তিরিশ থেকে চল্লিশ, চল্লিশ থেকে তিতাল্লিশ কোটি হয়েছি আমরা; কিন্তু এই জনারণ্যের মধ্যে সত্যকার মানুষ খুঁজে পাওয়াই দায়। কল-কারখানার মত স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু বিদ্বান কজন? পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার গর্ব করি, গর্ব করি বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের দেশের মানুষ বলে. কিন্তু আচার-ব্যবহার চিন্তায় সত্যকার ভারতীয় আবিষ্কার করতে তো হাঁপিয়ে পড়তে হয়। তাইতো সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ একটি বিস্ময়।

কত নেতাই দেখলাম, কিন্তু এমন নিরহংকার মানুষটি আর পেলাম না। সহজ সরল জীবনযাত্রায় একমাত্র লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ছাড়া এ'র সমকক্ষ আর কেউ নেই, একথা প্রায় হলপ করে বলা যায়।

কিং এডওয়ার্ড রোড ছেড়ে রাষ্ট্র-পতি ভবন যাবার পর দেখি একটা সুন্দর বিছানায় অর্ধশায়িত হয়ে পড়ছেন। দৃশ্যটা অবশ্য সেই একই; বিছানা থেকে শুরু করে চেয়ার-টেবিল, টিপাই, সোফা সর্বত্রই শুধু বই। চারদিক ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে বল্লাম, রাষ্ট্রপতি ভবনে আসার পর আর তো নতুন বিশেষ কিছু নজরে পড়ছে না, তবে বিছানাটা যেন একটু বেশী ঝকঝকে, খাটটা যেন একটু বেশী দামী।

শায়িত অবস্থা থেকে হঠাৎ উঠে বসলেন। বল্লেন, হোয়াট! ইউ ডোন্ট নো দ্যাট আই এ্যাম নাউ প্রেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া! তোমাদের সঙ্গে বেশী

মেলামেশা করিস বলে দাম দাও না, তাই না!

হো হো হেসে উঠলেন। আমিও চাপতে পারলাম না হাসি।

বাহুল্যবর্জিত জীবনযাত্রা সর্বপল্লীর ধর্ম। সেই সাধারণ ধুতি, একটা মামুলি শার্ট। আর দশ-পনের টাকার এক জোড়া পামসু জুতো! সভা-সমিতির জন্য অবশ্য এর উপরেই চড়ান একটা, লম্বা কোট আর সেই সাদা পাগড়ি। কোন বিদেশী অতিথি না এলে ড্রইংরুমের সোফায় বসতে আজ পর্যন্ত দেখিনি। শুনেছি, মিনিষ্টার হবার পর অনেকেই ভেজিটেরিয়ান থেকে নন-ভেজিটেরিয়ান হয়েছেন. চিকেন রোষ্ট না হলে নাকি এ'দের তৃপ্তি হয় না। রাধাকৃষ্ণণ কিন্তু আজও একটু সম্বর, একটু ভাজা, একটু ঘী; মিষ্টি-ফলও না। সরকারী আহার-উৎসবে এরপর একটা ভেজিটেবল চপ। ব্যস, আর কিছু না।

ইদানীংকালে পার্সোনাল ষ্টাফের বহর দেখিয়েই বহু নেতা তাঁদের নিজে-দের প্রেষ্টিজ-প্রতিপত্তি রক্ষা করেন। কিন্তু উপ-রাষ্ট্রপতি হবার পর কোন প্রাইভেট সেক্রেটারী নিয়োগ করলেন না সর্বপল্লী। সরকারী আমলাতন্ত্র থেকে দু-একবার চাপ এসেছিল। রাধাকৃষ্ণণ জানিয়ে দিয়েছিলেন, প্রাইভেট সেক্রেটারী আপয়েন্ট না করেও যদি কাজ চলে যায় তবে তার জন্য অযথা অর্থব্যয় কেন? আর প্রেষ্টিজ! প্রাইভেট সেক্রেটারী দেখিয়ে প্রেষ্টিজ বাড়াবার পাত্র আমি নই। বিনা প্রাইভেট সেক্রেটারীতেই ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ দশ বছর উপ-রাষ্ট্রপতির কাজ চালিয়ে গেছেন।

ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাধাকৃষ্ণণ বহুবার বিদেশ গিয়েছেন। দু-একজন পার্সোনাল ষ্টাফ সঙ্গে নিয়ে যাবার অধিকার তাঁর ছিল; কিন্তু নিতেন না। বলতেন, প্লেন থেকে নামার পরই তো এম্বেসীর লোক পাব. সুতরাং দিল্লী থেকে লোক নিয়ে অযথা সরকারী অর্থ ব্যয় করি কেন? ক বছর আগে এমনি ভাবে একলা একবার বিদেশ গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নেহরু তখন স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, অন্ততঃ একজন পার্সোনাল ষ্টাফ সঙ্গে নিতেই হবে. এরপর বাধ্য হয়ে শেষের দিকে বার দুই একজন পার্সোনাল ষ্টাফ সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

রাধাকৃষ্ণণের বৈশিষ্ট্য বহু। সরকারী সফরে গিয়ে [illegible] থেকে অশোক-মার্কা গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়াবার মোহ প্রায় সব ভি-আই-পির মধ্যেই দেখা যায়। ইদানীংকালে অবশ্য লাটপ্রাসাদের পরিবর্তে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের অতিথি হবার প্রতি মিনিস্টারদের বেশী আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবার পর ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ কলকাতায় গেলে রাজ-ভবনে থাকতে পারবেন না বলে সরকারী দপ্তরে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শরৎ ব্যানার্জী রোডের মজুমদার-গৃহের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের সম্পর্ক। কলকাতায় গিয়ে বন্ধুগৃহের পরিবর্তে লাটপ্রাসাদে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আমলাতন্ত্রের বড় কর্তারা ভ্রূ কুঁচকে ছিলেন; কিন্তু তাতে সর্বপল্লীর মতের পরিবর্তন হয়নি। রাষ্ট্রপতি হবার পর সরকারী নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা প্রোটোকল রক্ষা করতেই হয়। এর নাকি গত্যন্তর হয় না। তবে রাষ্ট্রপতি হবার পর রাষ্ট্রপতি ভবনের স্বরূপও বদলেছে। অফিসারদের হরির লুঠ আজ নাকি বহুলাংশে সংযত। রাষ্ট্রপতি ভবনের মোটরগাড়ী আজ আর দিল্লীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে নজর পড়ে না। গাড়ীর সংখ্যাও অনেক কমে গেছে; উদ্বৃত্ত গাড়ী সরকারী দপ্তরে ব্যবহারের জন্য দিয়ে দিয়েছেন রাধাকৃষ্ণণ।

আরাবল্লী পাহাড়ের লাল পাথরে মোড়া রাষ্ট্রপতি ভবনে থেকেও সারা ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় খবর রাখেন রাধাকৃষ্ণণ। ব্রিটেন-আমেরিকা ঘুরে আসার পর গেছি রাষ্ট্রপতি ভবনে। ঠিক সময় এ-ডি-সি গিয়ে দরজা নক্ করতেই বেরিয়ে এলেন সর্বপল্লী। এ-ডি-সিটি নতুন। তাই জানাল, স্যার, ইউ আর সাপোজড টু রিসিভ এ ভিজিটার নাউ।

ফর্মালিটির বালাই নেই রাধাকৃষ্ণণের। বল্লেন, কাম অ্যালঙ নিমাই, চলো একটু বেড়িয়ে বেড়াই। মুঘল গার্ডেনে ঘুরতে ঘুরতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর? কলকাতার কি খবর? গিয়েছিলে কলকাতা এর মধ্যে?

জানালাম, কলকাতার খবর মানেই তো অসংখ্য সমস্যা; আর বিশেষ কি বলুন?

বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন; বল্লেন, বেল হোয়াট অ্যাবাউট 'আন্ডার ইনভয়োসিং এ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ মিনিস্টার্স উইথ বিগ বিজিনেস'? কলকাতার কাগজ তো আজকাল এই খবরেই ভর্তি।

কাগজ-পত্তর বই পড়ার কোন জাত-বিচার নেই রাধাকৃষ্ণণের। যা পান, তাই পড়েন। ফিলসফি, হিষ্ট্রী, পলিটিক্স, ইণ্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স থেকে শুরু করে মেডিকেল জার্ণাল, ফিল্ম ম্যাগাজিন, এম্বাসী বুলেটিন, চিঠিপত্র, পার্লামেন্টারী ডিবেট, নানা রিপোর্ট ছাড়াও কয়েক ডজন স্বদেশী-বিদেশী সংবাদপত্র ইনি নিয়মিত পড়েন। অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তিও প্রখর। কোনকিছু নজর এড়াবে না। একবার সর্বপল্লীর সঙ্গে নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে এলাম গোহাটি। আসাম সঙ্গীত-নাটক আকাডেমীর কি যেন একটা উৎসবে গেলেন। যাকে বলে 'নেহরু ক্রাউড' তাই হাজির হয়েছিল ও'র বক্তৃতা শোনার জন্য। লক্ষ লোকের মধ্যে একপাশে বসে আছি আমি আর ভাইস-প্রেসিডেণ্টের একজন ব্যক্তিগত কর্মচারী। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উপনিষদের একটা শ্লোকের রেফারেন্স দিতেই আমি ও'র পি-একে বল্লাম, এই শ্লোকটার কথাই কাল রাত্রে আমাকে বলছিলেন। ব্যস, আর কিছু না। অনুষ্ঠান-শেষে ফিরে এলাম সার্কিট হাউস। বিছানার উপর পাগড়ি খুলে রেখেই ডাক দিলেন, 'কাম হিয়ার। আমি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, তখন কথা বলছিলে কেন? যখন অন্যে কথা বলে, তখন কথা না বলাই ভদ্রতা।'

অবাক হয়ে গেলাম। লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যেও খেয়াল রাখলেন কি করে?

আর একবার লক্ষ্ণৌ গিয়েই বল্লেন, একটু বেরুতে হবে। শুনিছি, আমার এক ছাত্র বিশেষ অসুস্থ। তাঁকে দেখতে যাব।

ছাত্রের নাম জানেন; বাড়ীর ঠিকানাটাও ঠিক মনে নেই। তবে বছর পঁচিশেক আগে একবার গিয়েছিলেন ঐ ছাত্রের বাড়ী। স্থানীয় কাউকে সঙ্গে না নিয়েই চল্লেন। এগলি সে গলি ঘুরে ঠিক হাজির হয়েছিলেন অসুস্থ ছাত্রের বাড়ী।

গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপতির সরাসরি কোন ক্ষমতা নেই, একথা সত্য। কিন্তু তবুও কলুষিত সমাজজীবনের মাঝে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয়ই একটি আশার প্রদীপ।

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশ চেতনা

আশিস সান্যাল

বাংলা দেশের সাহিত্যে ও কর্ম-জীবনে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী। সমকালীন কলরবমুখর কর্ম ও সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অনেকটা দূরে ছিল তাঁর অবস্থান;—অনেকটা নির্জনতর প্রদেশে। তবু স্বদেশ-হিতৈষণায় এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর স্মরণীয় ভূমিকার উজ্জ্বল উপস্থিতির কথা সগর্বে ঘোষণা করতে হয়। চিন্তায়, ভাবে, দর্শনে, বিজ্ঞানে তাঁর অবদান জাতীয় জীবনকে বহুদূর প্রসারিত করেছে। জাতির অন্তঃপ্রবাহে দিয়েছে তাঁর বেগধারা। কিন্তু মৃত্যুর পর অতি স্বল্প ব্যবধানের মধ্যেই তাঁর সেই অবদানের কথা বিস্মৃতির পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলীর বিষয়বস্তু বিজ্ঞান, দর্শন বা ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে, হয়ত এর একটা কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। কিন্তু একথাও কি বলা যায় না, জাতীয় জীবনে চিন্তার ক্ষেত্রে খুব বেশী পরিমাণে আমরা লঘু হয়ে পড়েছি? লঘু আনন্দ এখন আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে? সর্বোপরি রামেন্দ্রসুন্দরের দেশপ্রেমের কথা। স্বদেশপ্রেমের বহুল উচ্চারণের মধ্যেও রামেন্দ্রসুন্দরের নাম অবহেলিত দেখে সত্যই বিমর্ষ হতে হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের সা হি ত্য সা ধ না, বিজ্ঞান, দর্শন সম্বন্ধে অনুরাগ বা সমাজচিন্তা প্রভৃতি সমস্ত কর্মের মূলে ছিল তাঁর দেশাত্মবোধ।১ এই স্বাদেশিকতা তিনি লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়—'পিতামহ ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী একজন কাব্যামোদী লোক ছিলেন। 'মাধব সুলোচনা' নামে একখানি গদ্য-পদ্যময় নাটক ও 'স্বর্ণসিন্দুর সিংহ' বা 'গৌরপাল সিং?' নামে একখানি প্রহসন বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন।' অন্যত্র পিতৃদেবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,—'বাবা একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, উপন্যাসের নাম দিয়াছিলেন—বঙ্গবালা।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে রামেন্দ্রসুন্দরের পারিবারিক পরিমণ্ডল প্রথম থেকেই ছিল স্বদেশ-হিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ। তাঁর অন্তরে স্বদেশিকতার পরম উদ্বোধন এই রক্তের অধিকারে। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পট-ভূমিতে রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রায় দেখা যায়নি। এমন কি কোন রাজনৈতিক নেতার সংস্পর্শে আসার ফলে, তাঁর অন্তরে স্বাদেশিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। মূলতঃ তাঁর পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যেই তাঁর এই বিশেষ মনোভাবটি জাগ্রত হয়েছে। পিতৃদেব রচিত বঙ্গবালা উপন্যাসের কয়েক ছত্র উদ্ধৃতি দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যা বলেছেন, তা আলোচ্য অনুধাবনার নিদর্শন হতে পারে। তিনি বলেছেন—'এই উক্তি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছিল। স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষণ ঘটিত। স্বভাবপ্রদত্ত মেঘমন্দ্র স্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টম বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন।'

স্বাভাবিকভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্রে এই দেশাত্মবোধ গড়ে উঠেছিল বলে, তার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। নিষ্কলঙ্ক, সহৃদয় এই স্বদেশপ্রেম। অন্তরে স্বদেশপ্রেমের এই প্রাবল্য থাকা সত্বেও রামেন্দ্রসুন্দর প্রত্যক্ষ আন্দোলনের মধ্যে প্রায় কখনও উপস্থিত হতে পারেননি। এটা যে তাঁর অবচেতন মনের প্রয়াস ছিল, তা নয়। বরং এটাই ছিল তাঁর সচেতন অনুভূতি। এই প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে—'যে রজোগুণের প্রাচুর্য মানুষকে ক্ষণমাত্রও অকর্মকৃৎ থাকতে ও কাজ ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পেতে দেয় না, তাঁর প্রকৃতিতে সেই রজোগুণের অভাব ছিল। ভাব ও চিন্তার জগৎ ছাড়া কাব্যের জগতে তাঁকে বিশেষ আনন্দ দিত না।' অবশ্য কখনও কখনও তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁকে কিছুটা কর্ম-প্রচেষ্টায় অবগাহন করতে দেখা গেছে।

তিনি অনুভব করেছিলেন, এই জাতীয় আন্দোলনের পশ্চাতে মেয়েদেরও সমবেত হতে হবে। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলকে এক করে নিতে হবে এই আন্দোলনের পশ্চাতে। সেই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। বইটি তৎকালীন পুলিশ কমিশনার প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় আছে—

> 'বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্নে জেমো কান্দি গ্রামের অর্ধ সহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃ-দেবীর আহবানে আমাদের বাড়ীর বিষ্ণু মন্দিরের উঠানে সমবেত হইয়াছিলেন; গ্রন্থোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমার কন্যা শ্রীমতী গিরিজা কর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়। বন্ধুবর্গের অনুরোধে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।'

রামেন্দ্রসুন্দর ব্যক্তিগতভাবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থটির রচনা-রীতিও উল্লেখ্য। প্রাঞ্জলতা রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গভীর তত্ত্বাশ্রয়ী বস্তুকেও তিনি অতি সহজভাবে প্রকাশ করেছেন। অথচ কোথাও তা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে লঘু রচনায় পর্যবসিত হয়নি।২ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথায় লক্ষ্য করা যাবে, গ্রামের সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে কত সহজভাবে ভাষাকে প্রাণ-প্রাচুর্য দিতে পারতেন। প্রসঙ্গত গ্রন্থটি থেকে একটি অংশ উল্লেখ করা যাচ্ছে—

> '—লক্ষ্মী চঞ্চলা! চঞ্চল হয়ে বাংলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে চললেন। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠল। তখন সাত কোটি বাঙ্গালী কেঁদে উঠল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে গেল বলে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠল।......লক্ষ্মী দেখলেন, আমি বাঙ্গলার লক্ষ্মী; আর আমার নিতান্তই বাংলায় থাকা চলল না। আমার হিন্দু যেমন, মোছলমান তেমনি। হিন্দু-মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হল, তখন আর আমার বাংলায় থাকা চলল না।'

সহজ সরলভাবে বলার এই বিশেষ বাণীভঙ্গিটি রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তর্গত। যাই হোক, তাঁর স্বাভাবিক প্রকৃতিতে

---

১ কর্মী রামেন্দ্রসুন্দর নীরবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্মজীবনে অনন্য সাধারণ বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনে যে বিশেষত্ব ছিল, সেই বিশেষত্বের প্রভাবেই—তিনি বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিলেন। সে বিশেষত্ব—তাঁহার

২ "সত্যনিষ্ঠার কঠোরকায়, বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, রচনার সরলতায় ও কল্পনার বৈচিত্র্যে আচার্য হাক্সলির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়া এগুলিকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।......তাঁর সজীব ও সরস মন পাণ্ডিত্যকে বহনমাত্র করে নিজেকেই প্রকাশ করেছে। তাই তাঁর সমস্ত রচনা তাঁর সুন্দর হাস্যে উদ্ভাসিত।"

এই সব ইতস্ততঃ ঘটনাবলী ছাড়াও আর একটি প্রবণতা জয়লাভে সমর্থ হয়েছিল। সেটি হচ্ছে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।' এরজন্য রামেন্দ্রসুন্দরের পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। সময় এবং স্বাস্থ্যকে এর জন্য তিনি বিনষ্ট করেছেন। অবশ্য এর মূলেও ছিল তাঁর সেই স্বদেশচেতনা। দেশের যে ভাষা এবং সাহিত্যকে তিনি পূজো করতেন তার আহ্বানে নিজেকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি।

।। দুই ।।

'চরিতকথা' (১৯১৩) গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'তিনি সাধারণ বাঙ্গালী হইতে যেমন পৃথক ছিলেন, তাঁহার চরিত্র ইউরোপীয় চরিত্র হইতে তেমনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল।' মনে হয় অনেকটা এ যেন রামেন্দ্রসুন্দরেরই আত্মদর্শন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও, তিনি নিজেকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করে তুলতে পারেননি। বিদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকেও তিনি স্বদেশীয় চেতনা থেকে বঞ্চিত হননি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁকে ডিরোজিও যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার রূপে বর্ণনা করেছেন। একদিক থেকে অনুধাবনটি খুবই যুক্তিযুক্ত। প্রতীচ্য শিক্ষা তাঁকে প্রাচ্য ভাব এবং প্রাচ্য সংযম থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন রামেন্দ্রসুন্দর প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে মধু আহরণ করেও যথার্থ বাঙ্গালীর মত জীবনযাপনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যে শিক্ষা পেয়ে তৎকালের তরুণ যুবকের প্রতীচ্য ভাবধারায় বিভোর হয়ে উঠতেন রামেন্দ্রসুন্দর সেই শিক্ষাকে আরও অধিকভাবে অর্জন করেও তাঁর স্বদেশীয় ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হননি ডিরোজিও যুগের দেশহিতৈষণা তাঁর অন্তরেও বিকশিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু সে যুগের অসংযমী চরিত্র বা শৃঙ্খলাহীনতা তাঁর চরিত্র বা জীবনকে তো স্পর্শ করতেই পারেনি, এমনকি তাঁর চিন্তায় বা কল্পনায়ও বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি এইদিক থেকে বিদ্যাসাগরের উত্তরসাধক হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দরকে মনে করা যেতে পারে বিদ্যাসাগরের মধ্যে যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ কথিত 'কেনবুলের জিদ' ছিল, তেমনি ছিল মানবাপন্ন। প্রতীচ্য শিক্ষা তাকে বিনষ্ট করতে পারেনি। উত্তরকালে কর্মজীবনে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করবার পর যথারীতি ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন। প্রতীচ্য শিক্ষা গ্রহণ করেও তিনি মোটা ধুতি চাদর ব্যবহার করতেন। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বা জীবনদর্শনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর হৃদয়ে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল, একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। ধর্মকেও তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ না করে মানবতার দিক থেকেই তার বিশ্লেষণ করেছেন হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তিনি যে কিছুটা উদাসীন ছিলেন, তা স্বীকার্য। কিন্তু এর মূলে ছিল বিদ্যাসাগরের জীবননিষ্ঠা। প্রত্যক্ষ জীবনের অজস্র সমস্যায় তিনি এত জড়িত ছিলেন যে, বৈদেহী পরাবিদ্যা বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেননি। এই চেতনা ইউরোপীয় প্রভাবজাত মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। জীবনযাপনে অশনে-বসনে তিনি বাঙ্গালীই ছিলেন শিষ্টাচারের অনুরোধে দু-একবার ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে তিনি কখনও স্বস্তিবোধ করেননি। রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্রেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। প্রতীচ্য শিক্ষাকে আহরণ করেছেন স্বদেশীয় চেতনায়। কিন্তু সে চেতনাও কোন সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। তিনি স্বীয় জীবনে ও জীবনের কর্ম সমবায়ে সেই অনন্যসাধারণ নিজত্বের পরিচয় রেখে গিয়েছেন।৩ এই নিজত্বই রামেন্দ্রসুন্দরের স্বাদেশিকতার অপর বৈশিষ্ট্য। এর পশ্চাতে বুদ্ধিবাদ অবশ্যই আছে। হয়ত কিয়দংশে তা ইউরোপীয় বুদ্ধিবাদের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু তাঁর সহজাত স্বদেশপ্রীতি যে এর পটভূমি রচনা করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টি কেবল সমকালীন ইউরোপের প্রতি নিবদ্ধ ছিল না। এ সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা তিনি বিশেষভাবেই আস্বাদন করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতাগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল সমধিক। সে পরিচয়ে তিনি জেনেছিলেন, মানুষের সভ্যতার বিশালতা এবং তার ইতিহাসের মুখর বৈচিত্র্য। এই কারণে, প্রত্যক্ষ প্রতিভাত বর্তমান, তাঁর কাছে প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি। প্রাচীন ও নবীন, নানা সভ্যতার সঙ্গে তুলনার ফলে তিনি প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন। অথচ এই শ্রদ্ধা বা প্রীতির মধ্যে কোন রকম একদেশদর্শী মনোভাব ছিল না। প্রবহমান বিশাল মানব সভ্যতার মধ্যে হিন্দু-সভ্যতা যে একটি মাত্র অংশ একথা তিনি কখনও বিস্মৃত হতে পারেননি। এই কারণে রামেন্দ্রসুন্দর নিতান্ত সহজে বৈদিক মতের সঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্মের অনুষ্ঠান এবং আদর্শের তুলনা করে, এ দুয়ের মধ্যে গভীর মিল দেখিয়েছেন। অবশ্য এ বিশ্বাসও তাঁর খুব দৃঢ় ছিল যে, অভিজ্ঞতার বিচারে স্বদেশীয় প্রাচীন সভ্যতাকে অন্য কোন সভ্যতার কাছে মস্তক অবনত করে দাঁড়াতে হবে না। রামেন্দ্রসুন্দরের চেতনায় উপনিষদ ও বেদের ভারতবর্ষ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি দেখেছিলেন সেই ভারতবর্ষকে যে ভারতবর্ষ কপিল ও শাক্য মুণিকে জন্ম দিয়েছে। যে ভারতবর্ষের কবি মহাভারত রচনা করেছে। এরই প্রত্যক্ষ ফল 'ঐত রেয় ব্রাহ্মণ' এর অনুবাদ, তার বিচিত্র প্রসঙ্গ তার বিচিত্র যজ্ঞকথা।

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে রামেন্দ্রসুন্দরের সর্বশেষ চিন্তার পরিণততম রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অনুবাদের মাধ্যমে তিনি সর্বপ্রথম বৈদিক সাহিত্যভূমিতে পদক্ষেপ করেন। কেবল অনুবাদ বা অনুসন্ধানের মধ্যেই তাঁর অনুসন্ধিৎসা সীমাবদ্ধ ছিল না। বৈদিক সাহিত্যের গূঢ় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তিনি তার স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নির্দেশক্রমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধগুলি পরে সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধগুলি অনুধাবন করলেই দেখা যাবে, তিনি কত গভীরভাবে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসকে অতিক্রম করে বেদের কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত আলোচনা করবার কথা ছিল, কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁকে সে পথে অগ্রসর হতে দেয়নি।

'যজ্ঞকথা' গ্রন্থে ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য প্রতিভাসিত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে বৈদিক ভারতের এক অপরূপ চিত্র মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের উপসংহারে বলেছেন—

> 'ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বহু সহস্র বর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী বলিয়া জানি। এই ধারণা আমার জীবনযাত্রার ধ্রুবতারা। ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতা নির্মিত রহিয়াছে;

---

৩ "নিজত্বে প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যের মিলন হইলে যাহা হয়, তাহাই রামেন্দ্রসুন্দর। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, ধর্মে ও সাহিত্যে 'গোঁরামীর" স্থান নাই, কিন্তু নিজত্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে, রামেন্দ্রসুন্দর নিজের জীবনে বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষের জন্য এই ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন।" —সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সেই অগ্নির প্রভায় অর্ধ পৃথিবী প্রভাম্বিত হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবিরিয়া পর্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয়তট পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভাম্বিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন; মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। ....চির-কল্যাণময়ী তুমি ধন্যা, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন, কেবল স্থূল দেহের স্থূল অন্ন বিলাইয়া তিনি তৃপ্ত হন নাই, যখনই তিনি আপনার যজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই তিনি ইড়ারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানাম্র লইয়া দেশে-বিদেশে বিচরণ করিয়াছেন। জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণার ধারায় দেশ-বিদেশকে বিধৌত করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছেন।'

এখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের নিজস্ব। প্রতীচ্য চরিত্র থেকে এ যেমন ভিন্ন, প্রাচ্য চরিত্রের সঙ্গেও রয়েছে এর তেমনি প্রভেদ। এই গভীর হৃদয়াবেগমণ্ডিত উক্তির ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতের মহান ধ্বনি আভাসিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে এক মহা-মাতৃকারও বন্দনামন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। সন্দেহ নেই, এ মাতৃমূর্তি তাঁর স্বদেশ-ভূমি, তাঁর স্বপ্নের এবং জাগরণের জপমন্ত্র। রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশ চেতনায় সহৃদয় পাঠক, হয়ত এর ভেতর থেকে অন্য একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। সমসাময়িক দেশের দুঃখ-বেদনায় রামেন্দ্রসুন্দর ব্যথিত হয়েছেন। ফিরে গিয়েছেন অতীত ভূমিতে। সেখানেও কি এই ঘন অন্ধকার বিরাজিত ছিল? কিন্তু সে তো নয়। অতীত ভারতবর্ষ ছিল তাঁর কাছে মহিমামণ্ডিত, অপরূপ। তাহলে আগামীকালের দেশও জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। হয়ত রামেন্দ্রসুন্দরের এই অনুভবকে রেনেসাঁসের আলোকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রেণেসাঁসের বর্ণ বিহ্বল দিনগুলি অতিবাহনে রামেন্দ্রসুন্দরের আবির্ভাব। অর্থাৎ প্রভাতের সূর্য তখন মধ্যাহ্ন আকাশে। রামেন্দ্রসুন্দরের একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র আর একদিকে রবীন্দ্রনাথ। এর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে রামেন্দ্রসুন্দর স্বতন্ত্র এবং অভিনব। প্রতীচ্য সভ্যতায় অবগাহন করেও তিনি তাঁর স্বদেশীয় অনুভবকে বিসর্জন দিতে পারেননি। তাঁর দেশপ্রেমের এটি প্রধানতম উপাদান।

।। তিন ।।

রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য সাধনা এবং বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগের মূলেও ছিল তাঁর সুগভীর দেশাত্মবোধ।৪ নানান দেশে নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?— তাঁর সাহিত্যজীবনে এটাই ছিল মূলমন্ত্র। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ছিল তাঁর কীর্তিস্তম্ভ। পরিষদের জন্য তাঁর নিরলসপ্রয়াস সর্বজনবিদিত। এই পরিষদের মাধ্যমে তিনি বাঙালীর সারস্বত সাধনাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। ১৯১৪ সালের ১৭ই এবং ১৮ই কার্তিক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে অনুষ্ঠিত কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর একটি রচনা পাঠ করেন। কয়েকটি ছত্র তাঁর দেশাত্মবোধ এবং মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> 'যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব।......যেদিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সেদিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধনা পূর্ণ হয় নাই; আমরা সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি সেই চিনিবার উপায় বিধান করিয়া লইতে পারি তাহা হইলেই সাহিত্য সম্মিলন সফল মনে করিব।'৫

মাতৃভাষার প্রতি তাঁর এই অনুরাগ কেবলমাত্র ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনেও, তিনি তা সর্বদা অনুসরণ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ক্লাশে অধ্যাপনা করতেন বাংলা ভাষার মাধ্যমে। তিনি দুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশক রূপে প্রবন্ধ পাঠের জন্য আমন্ত্রিত হয়েও প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ তিনি বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করবার রীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না। তাই তাঁকে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করতে দেওয়া হয়নি। তৃতীয়বার অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে লেখেন—'ইংরাজী রচনায় আমি অভ্যস্ত নহি। বাঙলা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দিলে আমি 'বেদ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি।' তৎকালীন উপাচার্য ডঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী অবশেষে রামেন্দ্রসুন্দরকে সেই অধিকার দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর পূর্বে বাংলা পাঠ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু এই শুভ মুহূর্তের পূর্বে বাংলার কোন উল্লেখ্য স্থান ছিল না।

এতো হচ্ছে অধিকারের প্রশ্ন। কিন্তু এর সঙ্গে বাংলাভাষার প্রাণ-সম্পদকেও তিনি নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, ইতিহাস বা দর্শন বিষয়ে

৪ "দেশাত্মবোধ রামেন্দ্রসুন্দরের মনে কত মর্মান্তিক ছিল, তাঁর লেখার সঙ্গে অল্পমাত্রও পরিচয় যার আছে তিনিই তা জানেন।" —অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

* (৫) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : সাহিত্য-সাধক চরিতমালা।

প্রবন্ধ লেখা যেমন একটি দিক, তেমনি অন্যদিকে বাংলা ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব নিয়েও তাঁর গবেষণার অন্ত ছিল না। 'শব্দকথা' (১৯১৭) গ্রন্থটি থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের সেই প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব ও পরিভাষা নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে কোন ব্যাকরণের আলোচনা না দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন এবং এই অভাববোধকে দূরীভূত করবার জন্যই তাঁর এই প্রচেষ্টা। কতদূর সার্থক হতে পেরেছিলেন, তার বিচার স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁর মতো একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক যে এ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল সুগভীর স্বদেশচেতনা—একথা অস্বীকার করা যায় না। 'শব্দ-কথা' গ্রন্থের 'ধ্বনিবিচার' প্রবন্ধটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"'ধ্বনিবিচার' পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু পাপ আলস্য আসিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এইভাবে আলোচনা করিব বলিয়া একদিন স্থির করিয়াছিলাম, সেইজন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভভাগ পড়িয়া মনে মনে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহার পরে সমস্তটা পড়িয়া দেখিলাম, আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দতত্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম।"৬

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে উচ্ছ্বাস থাকলেও সততার পরিমিতিকে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃপক্ষে—বাংলা কারক, বিভক্তি, ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব পরিভাষা নিয়ে বিভিন্ন ব্যাকরণের পরি-প্রেক্ষিতে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, তা খুবই উল্লেখ-যোগ্য। 'যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গা জলে' উদ্ধৃতিটি দিয়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছিলেন, 'রামেন্দ্রসুন্দরও তেমনি বাংলার উপকরণে, বাংলার পূজা করিতেন, বাংলার ভাবে বাংলার সাধনা করিতেন।' বাংলার সাহিত্য, বাংলার ইতিহাস, বাংলার ভাষা—ইত্যাদি সবই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্যানের বস্তু। এই ধ্যানতন্ময়তা যে তাঁর স্বদেশ চেতনা থেকেই উৎসারিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, এর জন্য রামেন্দ্র-সুন্দরের মনে কোন রকম সংস্কার ছিল না। জীবনে কখনই তিনি কোন রকম সংস্কারের দাসত্ব স্বীকার করে নেননি। বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ইংরাজী ভাষা বা অন্য কোন ভাষার প্রতি তাঁকে বিদ্বেষী করে তুলেনি। 'নানা কথা' (১৯২৪) গ্রন্থে, ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম প্রবন্ধে তিনি এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সুকঠোর যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি নিয়ে তিনি এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি বলেছেন—'ইংরাজী শিক্ষার কেহ দোষ দিবে না; সে কথা যে বলিবে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেল। তবে সম্প্রতি এ দুরবস্থার কারণ কি? কারণ অনু-সন্ধেয়।' অতএব সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের তিনি ছিলেন প্রচণ্ড সমর্থক। বাংলা ভাষার প্রতি এই উদার অনুরাগ তাঁর স্বদেশচেতনারই পরিণতি।

।। চার ।।

আধুনিক প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের কৌতূহল ছিল অপরি-সীম। ডারউইন থেকে আরম্ভ করে বাইসম্যান, ডিভ্রিস এবং নবীন মেণ্ডেলীয় পণ্ডিতেরা প্রাণের যে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করেছেন, রামেন্দ্রসুন্দরের মনে এই সব চিন্তাধারা বিস্ময়ে সাড়া তুলতো। তাঁর সমাজ এবং ধর্মতত্ত্ব বা ইতিহাসের আলোচনা এই জীববিদ্যার প্রভাবে পরিপূর্ণ। প্রাণের বিকাশ এবং বিকারের তত্ত্বের আলোতে মানব সমাজ এবং সভ্যতার পতন অভ্যুদয়ের অন্ধ-কারাচ্ছন্ন পথ কতদূর আলোকিত হয়, তিনি পরম বিস্ময়ে তা অবলোকন করেছেন। এই চিন্তাধারা প্রচ্ছন্নভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশ-চেতনাও তারই আতিথ্যে শক্তি সংগ্রহ করেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল প্রান্তর থেকে তিনি মানুষের অদৃষ্ট ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন হ্রদে অবগাহন করেছেন।

কলেজে ছাত্রাবস্থায় রামেন্দ্র-সুন্দরের বিশেষ পাঠ্যবিষয় ছিল জড়-বিজ্ঞান। প্রথম জীবনে রচিত প্রায় সমস্ত রচনাই বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। সত্য-নিষ্ঠার কঠোরতায়, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিক থেকে তাঁর প্রবন্ধগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানও রামেন্দ্রসুন্দরের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। হেলমহোৎসের মৃত্যুর পর তিনি যে প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন তাতে এর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞান-চর্চা এবং বিজ্ঞান-প্রীতি রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশচেতনাকে এক অপূর্ব যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করেছে।

এই যুক্তিবাদের জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর তথাকথিত স্বদেশী হতে পারেননি। নিজস্ব চিন্তায়, বুদ্ধি এবং অনুধাবনায় যা সত্য বলে মনে হয়েছে, তা পালন করতে দ্বিধা করেননি। রাজনীতিতে তিনি Nationalist দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু দলীয় কোন মতবাদ তাঁর উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। যখন ভারতের মঙ্গল-কামী কর্মী আনি বেসান্তকে সভানেত্রী করা সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিতর্ক চলছিল, তখন তিনি বেসান্তকে সমর্থন জানান এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও সেখানে উপনীত হন।

।। পাঁচ ।।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিটি কর্ম এবং প্রতিটি চেতনার পশ্চাতে ছিল তাঁর স্বাদেশিকতা। স্বদেশ-হিতৈষণাই তাঁর চরিত্রে দিয়েছে বীর্য, কর্মে দিয়েছে ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্বদেশীযুগের প্রারম্ভ থেকেই। রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ সালে সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বর্ধনার জন্য লিখেছিলেন—

"সর্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্র-সুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।"

রামেন্দ্রসুন্দরের হৃদয়, মন এমনি সৌন্দর্যের আকরে গঠিত। তাঁর স্বদেশী ভাবধারাতেও এই সুন্দরের অনুধাবনা। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ "নাইট" উপাধি বর্জন করেন। শনিবার তাঁর পদত্যাগপত্রের অনুবাদ "বসুমতী"র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রসুন্দর এই সংবাদ অবগত হন এবং রবীন্দ্রনাথের পত্রটি পাঠ করে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যাকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলে পাঠান—"আমি উত্থানশক্তি রহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই।" সোমবার সকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তাঁর অনুরোধে পত্রটি পড়ে শোনান। রামেন্দ্র-সুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। তারপর তন্দ্রামগ্ন হন। এই তাঁর শেষ তন্দ্রা। পৃথিবীর সাথে তাঁর শেষ কারবার দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে। বাংলা-দেশের সাহিত্যে, শিল্পে, কর্মে রামেন্দ্র-সুন্দরের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই সঙ্গে তাঁর স্বাদেশিকতাও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরদিন।

---

৬ রামেন্দ্রসুন্দর : আশুতোষ বাজপেয়ী।

নেশা লাগে খুনের স্বাদে

কেঁদে ফেললেন প্রৌঢ়া। বললেন—"আমার দৃঢ়বিশ্বাস সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে আমার ছেলের।"

এ ঘটনা যখন ঘটে, তখন আমি ছিলাম ব্লুমফনটিনের অপরাধী তদন্ত-বিভাগের চীফ। আমারই অফিসঘরে বসে ঝর-ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন প্রৌঢ়া—"দিন তিনেক আগে আমার ভাইয়ের সঙ্গে গাড়ীতে করে কোথায় যায় সে। কোথায় জানি গুপ্ত-ধন খুঁড়ে বার করার মতলব ছিল ওদের। তারপর থেকেই আর কোনো পাত্তা নেই ওদের। বুঝতেই পারছেন আমার মনের অবস্থাটা।"

ভদ্রমহিলা যে কার্ড পাঠিয়েছিলেন, তাতে তাঁর নাম লেখা ছিল মিসেস লুইসা মোলার। বিধবা। ছেলের নাম জন ফ্রেডারিক মোলার। বয়স আটাশ বছর। প্রৌঢ়ার দৃঢ়বিশ্বাস কোনো সাংঘাতিক কারণেই ফ্রেডারিক নাকি নিপাত্তা হয়ে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন, তাতো বুঝলাম না। আপনার ভাইয়ের সঙ্গেই তো রয়েছে আপনার ছেলে, অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে তো নেই। তাছাড়া, কোনো অ্যাকসিডেন্টও হয়নি গাড়ীটার। হলে এতক্ষণে তা জানতে পারতাম। খুব সম্ভব যে গুপ্তধনের সন্ধানে ওদের এই অভিযান, তা নিশ্চয় সহজে খুঁজে পাচ্ছে না ওরা। তাই এই দেরী।"

কিন্তু এ যুক্তিতে সান্ত্বনা পাবার পাত্রী নন মিসেস মোলার। বললেন—"আমার ভাইকে নিশ্চয় আপনি চেনেন না। অপরাধের ইতিহাস আছে তার জীবনে। শেষবার পুলিশের হামলায় জড়িয়ে পড়ার সময়ে কাকে জানি ও বলেছিল আমার ছেলেই নাকি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। যদিও সম্পূর্ণ অসত্য এই অভিযোগ, তবুও ও শাসিয়ে ছিল জেল থেকে একবার খালাস পেলেই জনকে শায়েস্তা করে ছাড়বে সে। মাত্র এক হপ্তা হলো জেলের বাইরে পা দিয়েছে ও।"

মিসেস মোলার বিদায় নেওয়ার পর তাঁর গুণধর ভাইয়ের পুরোনো রেকর্ড ঘাঁটতে বসলাম। ভায়ার নাম স্টিফেনাস লুই ভ্যানউইক। ডোসিয়ারটা বার করতেই তার মধ্যে পেলাম সব তথ্য। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স লোকটার। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের একটা খামারবাড়ীতে অতি-বাহিত হয়েছে তার যৌবন। এরপর এক শহর থেকে আর এক শহরে টো টো করে ঘুরেছে স্টিফেনাস। শয়ন করেছে হট্টমন্দিরে এবং ভোজন জুটিয়েছে উপ-স্থিত বুদ্ধি দিয়ে। প্রথমদিকের অপরাধগুলো ছিল নেহাতই চুরি সম্পর্কিত। কিন্তু সম্প্রতি সে শ্রীঘর গিয়েছিল কয়েক শো পাউণ্ড আত্মসাৎ করার অপরাধে। দীর্ঘ আঠারো মাস ঘানি টানতে হয়েছে বাছাধনকে এ যাত্রা। ধড়িবাজ-শিরোমণি প্রবঞ্চকদের মতই তার যেমন আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল না, তেমনই অভাব ছিল না এন্তার অবিশ্বাস্য গল্পের। এই কারণেই নজরবন্দী রাখা হয়েছিল তাকে একবার। বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে তাকে সুস্থ-মস্তিষ্ক বলা হয়েছিল বটে, সেই সঙ্গে আরও একটি মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়ে-ছিল রিপোর্টের অন্তে। তার প্রতিভার প্রকৃতি দেখে বিশেষজ্ঞের ধারণা মাঝে মাঝে নাকি মানসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে তার প্রকৃতিতে।

যে পুলিশ অফিসারের দায়িত্বে তৈরী হয়েছিল এই ডোসিয়ার, তিনি বিশ্বাস করতেন একদিন না একদিন খুনজখম জাতীয় কোনো গুরু অপরাধ করে বসবে ভ্যানউইক। এজাতীয় সিদ্ধান্তে তিনি এসেছিলেন ভ্যান-উইকের ছেলেবেলার ইতিহাস জানার পর। হামেশাই দুটো বেড়ালের লেজে গিঁট বেঁধে ছেড়ে দিত বালক ভ্যান-উইক। তারপর শুরু হতো চামড়ার

উইলিয়াম বিনী

চাবুক দিয়ে বেধড়ক পিটোনো। তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে শেষনিঃশ্বাস ফেলতো অসহায় জীবগুলো। আর তাই দেখে, তাদের চরম বেদনা সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠত ক্ষুদে ভ্যানউইক।

আরও অনেক তথ্য পাওয়া গেল ডোসিয়ারে। অনর্গল কাঁচা মিথ্যেকথা বলায় তার নাকি জুড়ি নেই। বলার ধরনটিও বড় মার্জিত এবং ভদ্র। এই মহাগুণটি তার ছিল বলেই নাছোড়-বান্দার মত লেগে থেকে শিকারের পকেট হালকা করতে তাকে বেশী বেগ পেতে হতো না।

মিসেস মোলারের কান্নাকাটির পরেই ব্লুমফনটিনের সুপ্রীমকোর্টে মাষ্টারস অফিসে খোঁজ-খবর নিলাম আমি। এই অফিসেই ক্লার্কের কাজ করত তাঁর ছেলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে চারটি প্রদেশ আছে, অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট তাদেরই অন্যতম এবং এই প্রদেশেরই রাজধানী হলো এই ব্লুমফনটিন শহরটি। হীরের খনির সুবিখ্যাত কেন্দ্র কিমবার্লি থেকে প্রায় শখানেক মাইল দূরে ছোট্ট এই শহরটায় সে সময়, ১৯৩০ সালে, শুধু শ্বেতবংগই ছিল প্রায় ৩০,০০০। বৃটেনের সংগে লড়াইয়ে ট্রান্সভালের সংগে বুয়োরস-য়ের রিপাবলিকান গভর্ণ-মেন্ট যোগদান করার পর থেকে উত্তেজনার লেশমাত্রও ছিল না সে শহরে। আইন অনুরাগী নাগরিকদের কেন্দ্র হওয়ার সুখ্যাতি অর্জন করেছিল ব্লুমফনটিন। খুনজখম জাতীয় অপরাধের নামও একরকম ভুলেই গিয়েছিল সবাই।

সুপ্রীমকোর্টের অফিসাররা আমাকে জানালেন যে, দিনকয়েক আগে ভাগ্নের সংগে দেখা করতে গিয়েছিল ভ্যানউইক। আন্তরিকভাবেই কিন্তর আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে। বাইরে থেকে কোনো রকম বিদ্বেষ বা অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায়নি ওদের কথায়-বার্তায় আচরণে। ভ্যানউইক বিদায় নেওয়ার পর দারুণ উত্তেজিত হয়ে এক সহকর্মীর কাছে ফলাও করে গল্প করতে থাকে মোলার যে... নাকি তার মামার সঙ্গে গুপ্তধন খুঁড়তে বেরোবে শীগগিরই। ব্লুমফনটিন থেকে দেড়শো মাইল দূরে ওয়াটারভালে নাকি মাটির নীচে পোঁতা আছে এই সম্পদ।

জুলাই মাসের বারো তারিখে মামাকে নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মোলার। গাড়ীর পেছনে ছিল একটা গাঁইতি আর একটা কোদাল। ওয়াটারভালের খামারবাড়ীতেই মানুষ হয়েছিল ভ্যানউইক। কাজে কাজেই দুজন গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দিলাম তখুনি যদি কোনো হদিশ পাওয়া যায় এই আশায়। ঘন্টা কয়েক পরেই এদেরই একজনের কাছ থেকে টেলিফোন এল। সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে খামারবাড়ী ছেড়ে রওনা হয়েছে ভ্যানউইক আর তার ভাগ্নে। মিসেস সি জে হফম্যান ঐ অঞ্চলেই থাকেন। রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ীতে নাকি ভ্যানউইক এসেছিল। গাড়ী খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। তাই মেরামত করার জন্যে একটা টর্চের দরকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু টর্চ দিয়ে ভ্যান-উইককে সাহায্য করতে পারেন নি মিসেস হফম্যান। বলেছিলেন, রাতটা যদি তার বাড়ীতেই কাটানো মনস্থ করে ভ্যানউইক, তাহলে না হয় একটা শয্যার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন তিনি। ভ্যানউইক কিন্তু রাজী হয় নি। আর দেরী না করে যেমন করেই হোক তখুনি নাকি তার যাত্রা আবার শুরু করা দরকার।

ওয়াটারভালে তল্লাস করার নির্দেশ পাঠালাম ফোন মারফত। তারপর খবরের কাগজের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলাম মোলারের অন্তর্ধান কাহিনী এবং ভ্যান-উইককে অনুরোধ জানালাম সে যেন তদন্তে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে আমাদের পাশে। বহু প্রচলিত এই টোপ যে তাঁকে আকৃষ্ট করবে, এ রকম কোনো দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য! "জোহানেসবার্গ ষ্টারে" খবরটা পড়ামাত্র প্রথম ট্রেন ধরেই সে রওনা হয়েছিল ব্লুমফনটিন অভিমুখে। নিশ্চয় আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছে এবং ওকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি আমরা—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই যে আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছিল ও, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার।

ইতিমধ্যে আমার অনুচরেরা ওয়াটার-ভালে একটা শিয়ালের গর্তের হদিশ পেল। সম্প্রতি খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন ছিল গর্তটার ওপর। তৎক্ষণাৎ মাটি সরিয়ে ফেলে ওরা এবং আবিষ্কার করে মোলারের কুণ্ডলি পাকানো লাশ। জমি থেকে প্রায় আড়াই ফুট নীচে মাটির মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়েছিল দেহটা। জ্যাকেটের পেছনে ছিল একটা ছিদ্র। সে ছিদ্র শরীরের মধ্যেও প্রবেশ করেছে অনেকখানি। তীক্ষ্মাগ্র কোনো হাতিয়ার দিয়ে চোট মারার ফলেই এই ছিদ্রের সৃষ্টি। ট্রাউজারের বোতাম দুটোও ছিঁড়ে গিয়েছিল কি এক অজানা কারণে।

পোষ্টমর্টেমে হাজির থাকার জন্যে মোটর হাঁকিয়ে গেলাম ওয়াটারভালে। মোটামুটি একটা ছাউনির নীচে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লাশটা। মোমের ল্যাম্প জেলে শুরু হলো পরীক্ষা-পর্ব। চোখের সামনে বীভৎস দৃশ্য দেখেও নিজেদের সংযত করার বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয় পুলিশ-অফিসারদের। কিন্তু জন মোলারের সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি কোনোদিনই ভোলবার নয়। ডিমের খোলা ফেটেফুটে গেলে যে রকম দেখতে হয়, ঠিক সেইভাবেই থেঁতো করা হয়েছিল বেচারার মাথার খুলিকে। আর, শিরদাঁড়ার মূলে ঐ আঘাতচিহ্নের সৃষ্টি যদি মোলারের জ্ঞান টনটনে থাকার সময়ে করে থাকে, তাহলে যে কি অসীম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান লোপ পেয়েছে ওর, তা আর না বললেও চলে।

শিয়ালের গর্তে কিন্তু ধ্বস্তাধ্বস্তির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি। কাছাকাছি একটা ডোবার নীচে গাঁইতি আর কোদালটা পাওয়া গিয়েছিল। 'এস ভ্যান ডবলিউ' চিহ্নিত একজোড়া কাদা-মাখা মোজাও খুঁজে পেয়েছিল গোয়েন্দারা। ব্লুমফনটিনে ফিরে এসে দেখলাম, কয়েক ঘন্টা আগেই খবরের কাগজের আবেদন পড়ে পুলিশ-ষ্টেশনে হাজির হয়েছে ভ্যানউইক।

নির্বিকার মুখে ফাঁড়ির ভেতর লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকে ডিউটি-অফিসারকে বলেছিল ভ্যানউইক—"কাগজে পড়লাম আমার সঙ্গে দেখা করতে চান আপনারা। তাই প্রথম ট্রেনেই ফিরে এলাম যদি আপনাদের কোনো কাজে লাগি এই আশায়।'

ভ্যানউইককে এরপর জানানো হলো যে আর তার সাহায্যের দরকার নেই। কেননা, তার ভাগ্নের লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে এবং খুনের অপরাধেই এখন তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ডিউটি-অফিসারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল যথেষ্ট। তাই ভ্যানউইকের কাছ থেকে তখুনি কোনো বিবৃতি নিতে সরাসরি অস্বীকার করলেন তিনি। তার কারণ, সেই মুহূর্তেই যদি বিবৃতি নেওয়া হয় ওর কাছ থেকে, তাহলে পরে হয়ত বল-পূর্বক বিবৃতি আদায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন তিনি এবং এই এক চালেই ফেঁসে যেতে পারে কেসটা।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শোকাবহ শেষ দৃশ্যটার পূর্ণ অভিনয় করার জন্যে ভ্যানউইককে ওয়াটারভালে নিয়ে যাওয়ার আর্জি পেশ করলেন প্রতিবাদী পক্ষের আইনবিদ। বিচারবিভাগও মঞ্জুর করলে সে আর্জি। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে একজন ফটোগ্রাফার আর একজন ডাক্তারও গেলেন এই দলে। শিয়ালের গর্তের কাছে এসে ঠিক কি কি ঘটেছিল সেদিন, তা বলতে শুরু করল ভ্যানউইক।

আগের বছর প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তারের আশংকায় হুঁশিয়ার ভ্যান-উইক একটা বাক্সের মধ্যে তিন হাজার

পাউণ্ডের নোট ঠেসে বাক্সটাকে লুকিয়ে রেখেছিল বিশেষ একটা গোপন স্থানে। ওয়াটারভালের সেই বিশেষ স্থানটিতে ওরা যখন পৌঁছোলো, তখন অমানিশার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে।

"জমির উপরিভাগ থেকে আঠারো ইঞ্চির মধ্যে দুটো গর্ত দেখতে পেলাম আমরা। দুটো গর্তই বুজিয়ে ফেলা হয়েছে মাটি দিয়ে। ঠিক কোন গর্তটিতে যে বাক্সটি লুকিয়েছি তা যখন স্থির করতে পারলাম না, তখন স্থির করলাম দুটোই খুঁড়ে দেখা যাক। বেশ খানিকটা মাটি তুলে ফেলার পর কোদালটা সরিয়ে রেখে গাঁইতি তুললাম। বাক্সর ওপর যে পাথরটা চাপা দিয়ে গিয়েছিলাম, এই পাথরটা চাড় দিয়ে উঠিয়ে ফেলার জন্যেই তুলেছিলাম গাঁইতিটা।

"এই সময়ে মোলার বললে তার বড় তেষ্টা পেয়েছে। জিজ্ঞেস করলে কোথায় জল পাওয়া যাবে। বললাম, খানিক দূরেই একটা জলের কল আছে। কলটা দেখার জন্যেই ও যখন ধপ করে বসে পড়ল গর্তের কিনারায় তখনই আচমকা আমার মনে হলো গাঁইতি তোলার সময়ে হয়তো অজান্তে ওকে জখম করে ফেলেছি আমি। পেছন ফিরে দেখি টলমল করছে ও কিনারার ওপর। গাঁইতি ফেলে ওকে ধরতে গেলাম আমি কিন্তু তার আগেই মাথা নীচের দিকে করে পড়ে গেল ও গর্তের মধ্যে। এবং পড়লো আমারই ওপরে। সামলাতে না পেরে আমিও ছিটকে পড়লাম একদিকে। কানে ভেসে এল শুধু একটা ধপাস শব্দ।

"কান খাড়া করেও যখন আর তার কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না

তখন গর্তের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে খুঁজে পেলাম ওর নেতিয়ে-পড়া দেহ। মাথার নীচেই পড়েছিল গাঁইতিটা। দেখলাম, বড় মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে বেচারী। আর, তার পরেই অন্ধকার হয়ে গেল সব কিছু। এর পরে যে কি হয়েছে, তা এখনও মনে করতে পারছি না আমি। এই শোচনীয় পরিণতির আকস্মিকতার আঘাত বোধহয় সামলাতে পারি নি—তাই লোপ পেয়েছিল চেতনা।"

"এর পর কি কি ঘটনা মনে পড়ে তোমার? প্রশ্ন করেন মিঃ এফ. পি. ডি ওয়েট—কয়েদীর কৌঁসিলী।

"গাড়ীর কাছে আবার ফিরে আসার পরেই চেতনা ফিরে আসে আমার। মাথা ঘুরছিল। ইচ্ছে হয়েছিল গলা ছেড়ে আর্ত চীৎকার করি, ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাই যেন আমাকেও শেষ করে ফেলেন তিনি 'এইভাবে। গাড়ীর মধ্যে উঠে বসেছিলাম তারপর। গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়ার পর ভাবলাম, অনেক... অনেক দূরে চলে যেতে হবে আমার...তা নাহলে শান্তি পাবো না আমি।"

এরপর আবার অভিনয় করে দেখানো হলো সেই শোচনীয় দুর্ঘটনা। গর্তের মধ্যে নেমে গাঁইতি তুললে ভ্যান-উইক। আর, কিনারায় বসে রইল তার কৌঁসিলী নিহত মোলার যে অবস্থায় বসেছিল হুবহু সেইভাবে। ফটোগ্রাফ নেওয়া হলো এই দৃশ্যের এবং দেখা গেল শূন্যে আন্দোলিত গাঁইতির ফলাটা বাস্তবিকই আঘাত হানছে কিনারায় ঝুঁকে-বসা মানুষটার এমন একটা স্থানে যেখানে চোট পাওয়ার পরেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে হতভাগ্য জন মোলার।

আগাগোড়া সমস্ত দৃশ্যটা দেখে ডাক্তারও বললেন যে বাস্তবিকই মোলারের পতন এবং মৃত্যুটি নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া হয়তো আর কিছুই নয়। বললেন—" আমার তো মনে হয় তা খুবই সম্ভব। জ্যাকেট ছেঁদা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক ঐ জায়গাতেই মারাত্মক চোট পেয়েছে মোলার। আর তারপরেই ভ্যান উইক যেভাবে দেখালো, ঠিক ঐভাবেই সে তাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়েছে গর্তের মধ্যে।"

মোজা ফেলে যাওয়া অথবা ডোবার মধ্যে গাঁইতি আর কোদাল রেখে যাওয়ার রহস্য কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারে নি ভ্যানউইক। জিনিসগুলো বলা ওর পক্ষে সম্ভব নয় এই কারণে যে তখনও নাকি ওর মনের আচ্ছন্নতা কাটে নি এবং সে সময়ে কি করেছে না করেছে, তার বিন্দুমাত্র মনে নেই ওর। কিছুদিনের জন্যে মানসিক চিকিৎসা-লয়ে থাকতে হয়েছিল ভ্যানউইককে। কাজেই মোলারের মৃত্যুর রাতেও যে সে স্মৃতিহীনতায় আক্রান্ত হয়েছিল, তা বোঝা গেল ওর কাহিনী থেকে। মনো-সমীক্ষকেরাও সমর্থন জানালেন এ কাহিনী শুনে। তাঁরা বললেন, ঐ রকম অবস্থার মধ্যে পড়লে তার পক্ষে স্মৃতি হারিয়ে ফেলা খুবই সম্ভব।

এ কেস যে শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়ে রাখা যাবে না এবং সাফল্য যে এক রকম অসম্ভব তা প্রতিবাদী পক্ষের বিপুল তোড়জোড় দেখেই বুঝলাম। ১৯৩০ সনের ২১শে অক্টোবর ফ্রি ষ্টেটের বিচারপতি-সভাপতি স্যার ইটিন ডিলি-য়ার্স এবং ব্লুমফনটিন ক্রিমিন্যাল সেসনের জুরীর সামনে হাজির করা হলো ভ্যানউইককে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে সে বললে অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেছে মোলার। বিশেষজ্ঞ সাক্ষীদেরও ডাকা হলো তার এই কাহিনীকে সমর্থন জানানোর জন্যে।

থেকে তোলা হয়েছিল ছবিগুলো। কাজে কাজেই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণিত হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা ধারণাই প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস রয়েছে এসব ছবির মধ্যে। যেভাবে মোলার ঝুঁকে বসেছিল কিনারার ওপর এবং যেভাবে শূন্যে আন্দোলিত গাঁইতিটা এসে পড়েছিল তার পিঠের ওপর—তা কৌশলে তোলা ছবি দিয়ে সত্য চোখের ধাঁধার জন্যেই সম্ভবপর বলে মনে হতে পারে—প্রকৃতপক্ষে তা একে-বারেই অসম্ভব। এ শুধু ক্যামেরার বাহাদুরী ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঘণ্টা তিনেক পরে জুরীরা ফিরে এসে রায় দিলেন 'আসামী নির্দোষ'। বুক ফুলিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে এল ভ্যানউইক। আইনের প্রহসনে এতটুকু আঁচড়ও লাগলো না তার দেহে।

মৃত্যুর ঠিক আগে তার কাছে একটা চিঠি লিখেছিল ভ্যান উইক

অভিযোগ সমর্থন করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাটর্ণী-জেনারেল মিঃ ডারিউ, জি, হোল, কে, সি, বললেন ভ্যানউইকের বর্ণনা মত কিনারায় বসে ঝুঁকে পড়ে জলের কল দেখা মোলারের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। তাছাড়া, কাহিনীর সত্যতা প্রমাণের জন্যে যে ফটোগুলি তোলা হয়েছে সেগুলিও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা, ফটো-গ্রাফার নিজেও স্বীকার করেছে ক্যামেরা একপাশে সরিয়ে বিশেষ এক কোণ

পরের দিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল একজন জুরীর সঙ্গে। আমাকে দেখেই পথের ওপরেই তিনি দাঁড় করালেন আমাকে। তারপর, যেন দারুণ অন্যায় করেছেন, এমনিভাবে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিমায় বললেন—"এ ছাড়া আর কি করার ছিল বলুন? ভেবে দেখলাম, বিচারপতি নিজেই ওকে খালাস দেওয়ার পক্ষপাতী। তাই তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়া সঙ্গত মনে করলাম না আমরা।"

উত্তরে আমি বললাম—"লিখে রাখতে

পারেন, আজ থেকে ছ'মাসের মধ্যে আরও একটা খুনের অপরাধে ভ্যানউইককে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। দ্বিতীয়বার আর পিছলে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। তবে তার আগে আরও একটা প্রাণ নষ্ট হবে, এই যা দুঃখ।"

তিনমাস পরে আর একটা নৃশংস হত্যার খবর এল। নিহত ব্যক্তি জাতিতে বৃটিশ। নাম, সিরিল গ্রিগ টাকার। ট্রান্সভালে প্রিটোরিয়ার কাছে অ্যাপলেডুর্নয়ে একটা খামারবাড়ীর মালিক সে। তারই বাড়ীর কাছে মাটির মধ্যে থেকে উদ্ধার করা হলো তার দেহ। একটা বাক্সের মধ্যে লাশটা ঠেসে পুরে রাখা হয়েছিল একটা বড় ফাটলের মধ্যে। যে হাতুড়ি দিয়ে তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল, রক্তমাখা সেই হাতিয়ারটাও ওয়াগন-হাউসের মধ্যে কাঠের গাদার নীচে পাওয়া গেল।

সন্দেহভাজন হত্যাকারীর চেহারার বিবরণ ছড়িয়ে দেওয়া হলো দেশময় পুলিশের দপ্তরে দপ্তরে। ছোটোখাটো মানুষটি, টাক মাথা, ঝুলে-পড়া গোঁফ। সম্ভবত ফ্রি স্টেটেরই বাসিন্দা সে। টাকারের সঙ্গে খামারবাড়ী কেনা সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল তার।

আমার ভবিষ্যৎবাণী অর্ধ সময়ের মধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। এবার কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতির দোহাই শুনলেন না জুরীরা। পূর্ব-পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হত্যার রায় দিলেন তাঁরা। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলো ভ্যানউইক। শেষ কটা দিন বাইবেল পড়ে এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেই কেটে গেল তার। ১৯৩১ সালের ১২ই জুন ফাঁসির দড়িতে দুদুটো নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করে গেল সে।

কিছুদিন পরেই আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন মিসেস মোলার। মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখেছিল ভ্যানউইক। চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন উনি।

"বোন লুইসা,

ক্ষমা চাওয়ার জন্যে তোমার কাছে যেতে পারছি না আমি। যে শোক তোমায় দিয়েছি, জানি না তার কোনো ক্ষমা আছে কিনা। বোন, আমিই খুন করেছি তোমার ছেলেকে। যিশুর দোহাই, আমাকে ক্ষমা করো।

স্বীকার করছি, অকারণে তার জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছি আমি। যেখানে তাকে খুন করেছিলাম, আমার কোনো টাকাকড়িই পোঁতা ছিল না সেখানে। এই প্রথম আদালতে কেস জিতলাম আমি। আগাগোড়া ডাহা মিথ্যে বলেছি আমি। অন্যান্য কেসে সত্য বলেছিলাম বলেই শাস্তি পেয়েছি বার বার।"

নিছক টাকার লোভেই দ্বিতীয় খুনটা করে ভ্যানউইক। বিক্রয়-দলিল জাল করে টাকারের খামারবাড়ীর মালিক হয়ে বসার মতলবেই ভদ্রলোককে সরিয়ে দেয় পৃথিবী থেকে। লাশটাকে ফাটলের মধ্যে কবর দেওয়ার পর ধারণা ছিল শত চেষ্টা করলেও তা উদ্ধার করা কারোর পক্ষেই সম্ভব হবে না। একটা খুন করে অনায়াসেই যখন বুড়ো আঙুল দেখাতে পেরেছে সে আইনের রক্তচক্ষুকে, তখন আরও একটা করলেই বা ধরছে কে?

ডাগ্নেনিধনের মোটিভ পরিষ্কার হয়ে যায় যদি ধরে নেওয়া যায়—সত্যি সত্যিই সে বিশ্বাস করতো যে মোলার তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আগের চুরির ব্যাপারে। লুকোনো চোরাই টাকা উদ্ধারের অ্যাডভেঞ্চারে একসঙ্গে দুজনের যাওয়া থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আগের চুরির ব্যাপারে মোলারেরও হাত ছিল। শেষ মুহূর্তের অনুতাপের দহনে জ্বলতে জ্বলতে ভ্যানউইক ভাগ্নের নাম মুছে দিয়েছিল এ কলঙ্ক-কাহিনী থেকে। বোনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল, তার ছেলে এমন কোনো জঘন্য কাজ করেনি যে তার জন্যে লজ্জিত হতে হবে পরিবারের আর সবাইকে।

অসুন্দর পথে নোংরা জীবন-পর্বে বোধকরি এইটাই তার একমাত্র সুন্দর কীর্তি। অনুবাদ—আকাশ সেন

হায়, অভাগা
দেশের হইবে কী?
মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয়
মন্ত্রীদের দলসেবার জন্য
গদিত্যাগ প্রসঙ্গ

বিজ্ঞাপনে বৈচিত্র্য

রাখী ঘোষ

বর্তমান শতকের বিশ দশকে ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞাপনের উৎপীড়ন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অন্নদাশংকর বলেছেন, "সুর করে দই নেবে গো, মিষ্টি দই" হাঁকতে হাঁক ত চুড়ি বাজিয়ে যাওয়া সুন্দর, না পিঠে বিজ্ঞাপন এ'টে বোবার মত পায়চারি করা সুন্দর? এদেশে নিরক্ষরতা নেই বলে এদের কানের ক্লেশ কমেছে কিন্তু চোখের জ্বালা? বিজ্ঞাপনওয়ালারা যেন পণ করে বসেছে মানুষের চোখে আঙ্গুল গ'ুজে বোঝাবে যে বিধাতা মানুষকে চোখ দিয়েছেন দোকানদারের ঢাকপেটা চোখ পেতে শুনতে।"

আজ ষাট দশকে বিজ্ঞাপনের দাপট বেড়েছে বৈ কমে নি। দিনের শেষে বাড়ী ফেরার সময় আকাশ-বাতাসে লাল-নীল নিয়ন এবং পোষ্টারে লেখা নির্লজ্জ ঢক্কা-নিনাদ দেখতে দেখতে মন ক্লান্ত হয়ে ওঠে, চোখ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাড়ী ফিরেও নিস্তার নেই। টেলিভিশনের আই টি ভি চ্যানেলে কোন ভাল প্রোগ্রাম থাকলে হয়তো খুললাম। কিন্তু সেরা এবং জমাট প্রোগ্রামগুলির মধ্যেই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। একটি শ্বাসরুদ্ধকারী মুহূর্তে হঠাৎ দেখলেন লিখিত ঘোষণা—আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম অংশ শেষ হল। তারপরেই আরম্ভ হল "ইফ্ ইউ ওয়াণ্ট এ নাইস স্কিন"। অতঃপর চললো একের পর এক প্রসাধন, সিগারেট, খাদ্যদ্রব্য, আসবাব কি নয়। অদৃশ্য কোন শক্তির করুণার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া আপনার আর কোন উপায় নেই। মাঝে মাঝে এই বিজ্ঞাপন প্রদর্শন এতই বিলম্বিত হয়ে পড়ে যে পরবর্তী অনুষ্ঠানের মায়া ত্যাগ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

এ কথা ধ্রুবসত্য যতদিন যাবে বাণিজ্যিক সভ্যতার সঙ্গে তাল রেখে আত্মপ্রচারের প্রতিযোগিতাও বাড়বে। আগে মাধ্যম ছিল শুধুই খবরের কাগজ এবং পোষ্টার। ক্রমে রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা এবং নিয়নের আমদানি হয়েছে। তবে খবরের কাগজের গুরুত্ব বিজ্ঞাপনজগতে এখনও কমে নি। এর কারণ সম্পর্কে অনেকে বলেন যে, সিনেমা বা টেলিভিশনে বা পোষ্টারে লোকের চোখই কাজ করে, মন নয়। তাই ওই সব ক্ষেত্রে লোকের সামনে একটি বলিষ্ঠ 'শ্লোগান' বা চিত্র তুলে ধরাই সম্ভব। কার্য-কারণ সম্পর্কে হেতু—বিশ্লেষণায় নামতে গেলে দরকার অভিনিবিষ্ট পাঠকের। এবং খবরের কাগজই হোল সে ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

আমেরিকার দেড়শো-দুশো পাতার রবিবাসরীয় কাগজের অর্ধেক পাতাই যে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভর্তি সে কথা নিয়ে বৃটেনে যথেষ্ট হাসাহাসি চলে। আমেরিকার রেডিও ও টেলিভিশনে মুহুর্মুহু বিজ্ঞাপনের আধিক্যে নাকি আসল অনুষ্ঠানের খেই হারিয়ে যায়—এ নিয়েও বৃটেনে যথেষ্ট রসিকতা হয়ে থাকে।

কিন্তু আর কিছুদিন পরে বৃটেনের অবস্থাও তাই হয়ে দাঁড়াবে। এখনই বিজ্ঞাপন একটা মস্ত বড় আর্ট বা কলার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। হতে পারে সেটা নিছক ব্যবসাদারীর অঙ্গ কিন্তু তা যে এক অপরিহার্য অঙ্গ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই পর্যন্ত হয়েই যদি তা ক্ষান্ত থাকত তাহলে আর বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু আজ সমগ্র সমাজজীবনে এর যে প্রভাব পড়ছে তা সামগ্রিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত কিনা এবিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষ এখনো বিজ্ঞাপনের যুগে এসে পৌঁছয় নি। আমেরিকার কথা ছেড়েই দিন। বৃটেনের বাজারেও ঘরোয়া ও বিদেশী পণ্যসম্ভারের যে অহরহ প্রতিযোগিতা তার ঢেউ আমাদের দেশে পৌঁছতে দেরী আছে। সুতরাং এদেশের লোককে বিভ্রান্ত করা সহজ নয়। কাজেই বিজ্ঞাপন শিল্প-জগতে একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি মুহূর্তে তার নব নব উদ্ভাবন, নতুন নতুন চিন্তা এবং আঙ্গিকের উৎকর্ষ বিধান।

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার মাহাত্ম্য স্বীকার না করে উপায় নেই। তাই 'গার্ডিয়ানের' মত পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে হরলিক্সের ভারতীয় বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা হয়, দেশের শিক্ষকেরা তরুণ মনে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

সম্প্রতি বিজ্ঞাপনদাতারা তরুণতরুণীদেরই টার্গেট হিসাবে বেছে নিয়েছেন। কারণ তাঁরা জানেন অনভিজ্ঞ অপরিণত অল্পবয়স্কদের বিভ্রান্ত করা সহজ, বিশেষ করে যদি সেই তরুণ

বিশেষ এক প্রসাধনী এনেছে প্রেমিকার ত্বকে সুখস্পর্শ।

●

মনের স্বপ্ন-রঙিন বাসনাকামনার অন্তঃপুরের চাবিকাঠিটি হাতে পাওয়া যায়।

কথার মার-প্যাঁচে বা জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তরুণ মন সাড়া দেবে না। তাই তাঁরা তাঁদের এক স্বপ্নময় মধুর পরিবেশ বিক্রয় করতে চাইছেন। বিজ্ঞাপিত জিনিসটির অস্তিত্ব যেন উপলক্ষ্য মাত্র। ধরুন "প্লেয়ার্সে'র" বহু-আলোচিত বিজ্ঞাপণটির কথা। টেলিভিশানে বা সিনেমায় তো কথাই নেই, পোষ্টারেও গ্রীষ্মের নরম মধুর দিনে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আলো-ছায়ার লুকোচুরি আর ঝর্ণার শুভ্র ঝর-ঝর। তারই মধ্যে এক মুগ্ধ প্রণয়ী-যুগলের স্মিত শান্ত অনুরাগ। তাদের পোষাক বা যুগটা মনে না থাকলে সহজেই বলা যেত "নামিয়া এসেছে অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে"। এই পরিবেশে তরুণ কেন বয়স্ক মনও স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন মনে থাকে না এটি সিগারেটের বিজ্ঞাপন। বয়স্ক মন যদিও বা সিগারেটের আকস্মিক আবির্ভাবে সচকিত হয়ে ওঠে তরুণের মনে ওটা দাগই কাটে না। সে দেখে একটি সম্পূর্ণ চিত্র, 'প্লেয়াস' তাতে সামান্য কিন্তু সুনিশ্চিত স্থান অধিকার করে আছে। রঙীন চিন্তার আলোয় স্নে সবটাকেই সত্যি বলে মেনে নিয়ে সুখী হয়, কৌতূহলবশেই এক প্যাকেট 'প্লেয়ার্স' কিনে ফেলে।

মধ্যে যখন সরকার ধূমপান সম্পর্কে সাধারণকে সচেতন করতে চেষ্টা করছিলেন তখন বহু লোকেই সিগারেট-ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন নিতে এবং সরকারের চেষ্টার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাননি।

সিগারেট কোম্পানীরা অবশ্য সরাসরি এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। এ-দেশের জগৎ তরুণতরুণীদেরই জগৎ, এ-দেশের সমাজ যুগলের সমাজ। বৃদ্ধরা এদেশে অপাংক্তেয়। সমাজের তারা সমস্যা,—আনন্দ নয়। তাই বিজ্ঞা-

●

সচিত্র বিজ্ঞাপন কাহিনীর একটি অংশ। গ্রীষ্মের মধুর দীর্ঘ প্রিয়সঙ্গ শেষ হবে দুজনারই প্রিয় এক বিশেষ ব্র্যাণ্ডের সিগারেট সেবনে।

পন-প্রস্তুতকারীর মনের অবচেতনে তরুণ-তরুণীর চিত্র থাকাটা কিছু অস্বাভাবিক নয় কিন্তু অস্বাভাবিক হল তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও তাঁরা বেছে নিয়েছেন একটি বিশেষ বয়সকে।

বার্ধক্য অবাঞ্ছিত বলেই এদেশে তারুণ্য বহু-বিলম্বিত এবং চেষ্টাকৃত। কিন্তু কে না জানে, যে তারুণ্য প্রণয়-বিহ্বলতায় উন্মুখ, তার পরিসর একান্তই সীমিত! আর প্রণয়? প্রণয়ই একমাত্র বস্তু যা পৃথিবীর জাতি-কাল-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল বয়সের মানুষের মনে এক স্নেহ-কৌতুকজড়িত স্বপ্নের সৃষ্টি করে। সুতরাং বিজ্ঞাপন-দাতাদেরও স্বপক্ষে বলার যুক্তি আছে বৈকি!

তবে বিষয়-বস্তুটি চিরন্তন হলেও তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নতুন করে উপ-স্থাপিত করতে হয় কি কাব্যে কি সাহিত্যে কি বিজ্ঞাপনে। শেষের কথাটি প্রথম দুটির সঙ্গে খাপ না খেলে আমি নাচার।

বিজ্ঞাপনকে শিল্প-কলা বলুন না কেন তার সম্পর্কে সবসময়ই সমাজের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হয়। ধরুন হরলিকসের ভারতীয় বিজ্ঞাপনটির কথা। এক তরুণ-তরুণীর আধুনিক সংসারের

●

ফোর্ডের নবতম মডেল। সন্ধ্যার আলো ছায়ায় গাড়ীটি রূঢ় বাস্তব নয়, প্রেমিক প্রেমিকার আশ্লেষের পটভূমিকায় একটি স্বপ্ন

কোন জাহাজ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন নয়। 'ভিয়েলা' পশমের বিজ্ঞাপন

●

ভ্রান্তিবিনোদনের সমস্যার মধ্যে ভারতীয় দর্শনের মায়া, মোহ ও যুক্তিবাদ কি নিপুণভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদেশে বিজ্ঞাপনের 'লে আউট' বা উপস্থাপনার উৎকর্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা না করে উপায় নেই। কিছুদিন আগে লন্ডনের পথঘাট ও টিউব-ষ্টেশনগুলি "ইয়ার্ডলের" যে বিশেষ বিজ্ঞাপনটিতে ছেয়ে গিয়েছিল তা লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না। বন্দুকের বুলেটের মত চামড়ার কেসে ইয়ার্ডলের নানা রঙের লিপষ্টিক সাজানো। নীচে মেয়েদের উদ্দেশে লেখা 'লাউ শুট্'। পুরো জিনিসটি অংকনে সৌষ্ঠবে অভি-নবত্বে এত জীবন্ত যে স্রষ্টাকে আন্ত-রিক সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই।

শ্লোগানের বেলাতেও তাই। ন্যাশ-নাল মিল্ক বোর্ডের শ্লোগান "ড্রিংকা পিন্টা মিল্কা" তো সর্বজন-প্রশংসিত। ইংরেজি গ্রামারের শিক্ষকরা অবশ্য এই বানানগুলির সমর্থক নন কিন্তু গত

বহুর শ্রমিক দলের নেতা ও উপনেতারা পর্যন্ত এর প্রশংসা করে আগামী নির্বাচনের জন্য অনুরূপ সহজ অথচ সফল শ্লোগান রচনা করতে আহ্বান জানান। এর উত্তরে শ্রমিক দলের বহু সমর্থক বহু শ্লোগান রচনা করেন। ন্যাশনাল মিল্ক বোর্ড ছাড়াও পোস্টারে ও নিয়নে লেখা শ্লোগানগুলির মধ্যে বীয়ার কোম্পানীর বিজ্ঞাপন "গিনেস ইজ গুড ফর ইউ" এবং সিগারেট কোম্পানীর "সিনিয়র সার্ভিস স্যাটিসফাই" এবং "প্লেয়ার্স প্লিজ" সংক্ষিপ্ততায় এবং বলার ভঙ্গিমায় উল্লেখযোগ্য।

সুখ্যাত ক্লিয়পেট্রা ছবিটির প্রস্তুতি যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল তার প্রতিফলন ঘটেছে প্রসাধন-সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে। বিশেষ প্রসাধনটি ত্বকে বা কেশে ক্লিয়পেট্রার মোহ নিয়ে আসবে এই ঘোষণায় ষোড়শীচিত্তে আলোড়ন জাগে নি এ কথা বলা চলে না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের আবার লোকের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হতে হয়। ধরুন মেয়েদের কথা। এদেশের বহু চাকুরীজীবী মেয়েই পরিবারের খাদ্যের জন্য দোকানে প্রস্তুত এবং অর্ধ-প্রস্তুত টিনজাত এবং হিমাগার-রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যের মুখাপেক্ষী। কিন্তু তাতে যেন তাদের কখনো নিজেদের রন্ধনে অপটু বলে না মনে হয়। কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও ভাল রাঁধুনীর "কমপ্লিমেন্ট" বহু মেয়েই চান। সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতা এ-বিষয়ে সজাগ। লায়নস কোম্পানী কফির বিজ্ঞাপনে গৃহিণীকে আশ্বস্ত করে বলেছে "লায়নস মেকস দি কফি গুড্—ইউ মেক ইট বেটার" এবং তার পরেই প্রস্তুত-প্রণালীটি, যেটি গৃহিণীর দক্ষতার উপর নির্ভর করছে।

বিখ্যাত কোম্পানীগুলি যারা বাজারে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে তাদের বিজ্ঞাপন বিরল হলেও আভিজাত্যে এবং অর্থব্যয়ে লোকের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। ইয়ার্ডলের বিজ্ঞাপনটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আমাদের দেশের সঙ্গে এদেশের বিজ্ঞাপনের পার্থক্য লক্ষ্য করে দেখেছি যে এদেশে বিখ্যাত চিত্র-তারকাদের স্বাক্ষর ও প্রতিকৃতি নিয়ে বিশেষ কোন হুড়োহুড়ি নেই। দ্বিতীয়তঃ আত্ম-প্রচার এখানে উচ্চরবে হলেও ঘোষণাটি অনেক মার্জিত এবং পরিশীলিত।

বিজ্ঞাপনের উৎকর্ষ ও নিষ্ঠা আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে সে কথা ছেড়ে দিলেও বিজ্ঞাপন হল এযুগের কর্মযজ্ঞের, প্রতিযোগিতার প্রতীক। বিজ্ঞাপন সবসময় মানুষকে উৎকর্ষ বাড়াতে বলছে, জীবনযাত্রার মান বাড়াতে বলছে, দুনিয়াটাকে আর জীবনটাকে উপভোগ করতে বলছে।

জনচিত্তকে জাগ্রত করতে হলে বিজ্ঞাপন অপরিহার্য। রাশিয়ায় যেখানে কোন ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা নেই সবই রাষ্ট্রায়ত্ত, সেখানেও বিজ্ঞাপন রয়েছে যদিও তার শ্রেণী আলাদা। সরকার সেখানে পণ্য-দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে না, দিচ্ছে নিজেদের আদর্শ ও বিশ্বাসের সপ্রত্যয় ঘোষণা।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞাপন অতিরঞ্জিত হলেও অমূলক নয় কারণ শুধুই মিথ্যার বেসাতি করে পার পাওয়া এ সব দেশে সম্ভব নয়। প্রথমতঃ জনসাধারণও চতুর ও হুঁশিয়ার, দ্বিতীয়তঃ তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে টিঁকে থাকতে গেলেও পণ্যদ্রব্যের একটা নির্দিষ্ট মান থাকা দরকার।

বৃটেনের বর্তমান বিপথগামী তারুণ্যের জন্য দলমত নির্বিশেষে প্রায় সবাই বিজ্ঞাপনকে দায়ী করছেন। অপরিণত বয়স্কদের রোমান্সের জালে ফেলাই বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে তাঁদের ধারণা। এই সব তরুণ-তরুণীদের রোমান্সের এক অলীক জগতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। ফলে মোহ ভেঙ্গে যাচ্ছে, প্রতিক্রিয়া হচ্ছে নিদারুণ। স্বপ্নের জগৎ থেকে তারা তলিয়ে যাচ্ছে সমাজ-জীবনের উচ্ছৃঙ্খল পঙ্ককুণ্ডে যেখানে শুধুই হতাশা আর অন্ধকার।

সম্পূর্ণতঃ সত্যি না হলেও এ কথা আংশিক সত্য। কিন্তু এর প্রতিবিধান ভেবে পাওয়া শক্ত। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য সমাজ-ব্যবস্থা, দ্বিতীয়তঃ তারুণ্য ও প্রণয়ের প্রতি মানবমনের চিরন্তন আকর্ষণের জন্য বিজ্ঞাপন বরাবরই বিশেষ বয়স্কদের জন্য এবং বিশেষ বয়স্কদের নিয়েই তৈরী হবে। তবে তার সীমা কোথায় টানা উচিত সেটিই বিবেচনা-সাপেক্ষ। এক মা সেদিন রেগেমেগে "ডেলি টেলিগ্রাফে" লিখেছেন 'অন্যদের কথা ছেড়েই দিলাম। ন্যাশনাল গ্যাস বোর্ডের বিজ্ঞাপনে তাঁরা ঘর গরম করার আধুনিকতম চুল্লীর সামনে একটি স্বল্প-বসনাচ্ছাদিত দম্পতিকে উপবিষ্ট (সৌভাগ্যক্রমে) দেখিয়েছেন। এর পরের পদক্ষেপ ভাবতেও আমি ভয় পাচ্ছি। এ ধরণের বিজ্ঞাপন হামেশা দেখলে ছেলে-মেয়েরা অকালপক্ক হবে না তো কি হবে?' কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাও তাঁর উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও পারিপার্শ্বিকের বিচারে এমন কোন দোষণীয় কাজ করেন নি। বিজ্ঞাপন অংশতঃ জীবনেরই প্রতিবিম্ব। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার জন্যও বিজ্ঞাপনদাতারা নিশ্চয়ই দায়ী হতে পারেন না এবং কোন বিশেষ আদর্শবাদ নিয়েও তাঁরা বিজ্ঞাপন রচনা করতে বসেন নি। সুতরাং বিজ্ঞাপনে সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি রচনা করবার সময় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য মনে রেখেও কোথায় তাঁরা থামবেন তা এক কথায় সাব্যস্ত করা খুব সহজ নয়।
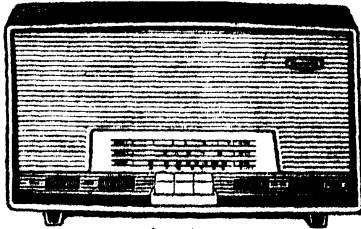
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ঐন্দ্রিলার চলে যাওয়ার খবর কমলারা পেলেন আরও চার পাঁচ দিন পরে। এই কদিন ঘর-সংসার গুছিয়ে নিতেই সময় চলে গেছে কোথা দিয়ে তা যেন টের পাননি ও'রা। কমলারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশী, তাঁর স্তিমিত জীবনে যেন নব উদ্যমের আর আশায় জোয়ার লেগেছে—একা তিনজনের খাটুনি খাটছেন। শরীরটা কলকাতা থেকে আসবার পর আরও খারাপ হয়েছে—আজকাল পেটটা আদৌ ভাল থাকছে না—জ্বরও হচ্ছে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই, তবু খেটে যাচ্ছেন ভূতের মতো। এতদিন পরে এই প্রায় জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও যে অন্তত নিজেদের বাড়ি বলে একটা জায়গা পেয়েছেন—সেখানে এসে পড়তে পেরেছেন এতে তাঁর তৃপ্তির শেষ নেই যেন। প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন বৌকে। বলেন, 'তবু যে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলবার মতো একটা জায়গা হ'ল বৌমা—এতেই শান্তি। উনি বলতেন না, ভাড়াটে বাড়িতে থেকে নিশ্চিন্তে খাবি খাবারও জো নেই, তখনও হয়ত দেখ গে বাড়িওলা এসে ভাড়ার তাগাদা দিচ্ছে।... তারপর যদি বোঝে যে বাড়ির কর্তা গেল, রোজগেরে কেউ নেই—তাহলে আর চোখের জল ফেলবারও সময় দেবে না, অশৌচের মধ্যেই বাড়ি ছাড়বার নোটিশ এসে যাবে!... ঝাঁটা মারো বহু জন্মের পাপ থাকলে তবে লোকে পরের দোরে ঝাড় দেয়!'

অভিজ্ঞতাটা এদের সকলের কাছেই অভিনব। হোক ছোট বাড়ি, মোটে দুখানা ঘর, তবু নিজের। সামান্যই জমি—তবু এরই মধ্যে রাণী রাজ্যের গাছ এনে পুঁতেছে। সব চাই তার—কলা, পিয়ারা, আম, কাঁঠাল, বাতাবি-লেবু—নারকেল সুপুরি ছিলই দুটো দুটো, তাও আবার এনে পুঁতেছে—এদিকে তো ফুলের গাছ যেখানে যত মনে পড়েছে আর পাড়াঘর ঘুরে যত যোগাড় করতে পেরেছে। মল্লিকগিন্নী তো দেখে হেসেই খুন, 'অ আবাগের বেটি, এ করেছিস কি! এত ঘন ঘন বসালে গাছ-গাছালি থাকে কখনও। একটু বড় হ'লেই তো আওতায় আওতায় নষ্ট হয়ে যাবে। এতগুলো গাছ বাঁচাতে হ'লে অন্তত দু বিঘের বাগান চাই। একটা আম গাছ কাঁঠাল গাছ কতটা জায়গা নেয় দেখছিস না?'

সবই দেখছে রাণী, জানেও সব—কারণ তারও পাড়াগাঁয়েই বাপের বাড়ি, তবু আশ মেটে না বলেই তথ্যের দিকে, অভিজ্ঞতার দিকে চোখ বুজে থাকে। মনে হয় হয়ত সবগুলিই লেগে যাবে। এসব গাছ তো চাই-ই, নিজেদের বাড়িতে আম জাম কাঁঠাল গাছ একটা ক'রে না থাকলে চলে!...

এমনি স্বপ্নের মধ্য দিয়েই দিন এবং রাত কাটছিল—তবু তার মধ্যেই একদিন মনে পড়ল, ওবাড়ি থেকে সেই মালপত্র নিয়ে আসার পর থেকে আর একদিনও যাওয়া হয়নি। কাজটা খুবই খারাপ হয়েছে—অপর কেউ এ ব্যবহার করলে তাঁরাও একে বেইমানীই আখ্যা দিতেন। অবশ্য ওরাও কেউ আসতে পারত। গৃহপ্রবেশের পর একটি দিন মাত্র ঐন্দ্রিলা এসেছিল, সেও আর আসে না। কমলা বললেন, 'তুমি একবার যাও মা, দেখে এসো গে। আমার শরীরটা ভাল নেই, কাজও ঢের, আমি বরং মেয়ে দুটোকে সামলাব—তুমি খোকাকে নিয়ে ঘুরে এসো!'

খবরটা অবশ্য যেতে 'যেতেই পাওয়া গেল মল্লিকগিন্নীর কাছে, তিনিও দক্ষিণপাড়ায় বেড়াতে আসছিলেন, বললেন, 'ওমা শোননি? খেঁদী তো চলে গেছে। এখন তো গিন্নী একা। পাগল মেয়ে আর নাৎনী নিয়ে সেই হাবুডুবু শুরু হয়েছে!'

'চলে গেছে? সে কি! অত কাণ্ড ক'রে আমাদের তাড়ালে, নিজে পাকা-পাকি বসবে বলে—আবার কি হ'ল?'

রাণীর যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না কথাটা।

'কিছুই নাকি হয়নি—গিন্নী যা বললেন, একেবারে তলে তলে চাকরী ঠিক ক'রে যাবার সময় বলে গেছে। এই কাছেই নাকি কোথায় আছে, হাওড়ার কোথায়—ঘোষালগিন্নীর কে কুটুমের বাড়ি।... আসলে কি জানো বৌমা, যে লোকগুলো বদ হয় তারা মন্দ করতে চাইলে অনেক সময় ভালো লোকের উপকারই হয়ে যায়। ও অমন ক'রে আদাজল খেয়ে না লাগলে বোধহয় তোমাদের এ বাড়ি কেনার এত চাড় হ'ত না। ও একদিক দিয়ে তোমাদের উপকারই করেছে। বরাতে ছিল বলেই বোধহয় ওর মাথায় ছেমো চেপেছিল।

তা বটে। হয়ত সত্যিই তাই। তবু রাণী যেন ঐন্দ্রিলার মনের তল খুঁজে পায় না। শ্যামার জন্যে মন খারাপ হয় খুব। আহা বেচারী—অসময়ে ওদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এটা তো ঠিক, অনেক-গুলো টাকা তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আবার সেই একা এক হাতে নাটা-ঝামটা খাওয়া!......

শ্যামা রাণীকে দেখে প্রথমটা গম্ভীর হয়েই ছিলেন। ঐন্দ্রিলা চলে যাওয়ার পর আরও যেন বেশী ক'রে রাগটা গিয়ে পড়েছিল এদের ওপর। পড়েছিল কতকটা অবুঝের মতোই; ও'র মনে হচ্ছিল, 'সেই তো চলে গেল সে, মধ্যে তো বেশ ঠাণ্ডাও হয়ে এসেছিল, এত

একেবারে উতলা হবার কী হল! আর যাবে না তো কী, যেতে তো তাকে হ'তোই— সে তো জানা কথাই! মাঝখান থেকে আমারই এখানে বসে বেশ ক'রে গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়ল!'

তিনি জানেন যে তাদের যাওয়া স্থির না জানলে তার রাগারাগি কমত না, উনি জানেন যে তার যাওয়ার স্থিরতা সম্বন্ধে তিনি নিজেও নিশ্চিত ছিলেন না—তবুও রাগ করেন, জোর ক'রেই যেন সত্যগুলোর দিকে চোখ বুজে থাকেন তিনি।

অবশ্য রাগ বেশীক্ষণ রাখতেও পারেন না। রাণী এসে যতটা পারে কাজকর্ম টেনে ক'রে দেয়। তরুকে জোর

"এখন তো গিন্নী একা। পাগলা মেয়ে আর নাৎনী নিয়ে সেই হাবুডুবু শুরু হয়েছে।"

ক'রে ধরে চুলের জট ছাড়িয়ে চুল বেঁধে দেয়, পুকুরে নিয়ে গিয়ে গা ধুইয়ে আনে, ছেলেটাকেও পরিষ্কার ক'রে দেয়। ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে অনেকখানি সুসার ক'রে দেয় শ্যামার। শেষ পর্যন্ত তাঁকেও বলতে হয়, 'তুমি একটু এবার বসো বৌমা, ছেলেটা ধুলোকাদা ঘাঁটছে, ওকে একটু ধরো'। সে এ'স পর্যন্তই তো খাটছ, তোমারও তো শরীর ভাল নয়। আর একদিনে তুমি কতটা আসান করবে মা—ও তো আমার নিরাকার সমিস্যা। আমার কর্মফল আমাকে ভুগতে হবেই—কেউ খণ্ডাতে পারবে না।'

রাণী অবশেষে সত্যিই ক্লান্ত হয়ে ওঁর কাছে এসে একটু বসে পা ছড়িয়ে। ঐন্দ্রিলা যাবার আগের দিন ক্ষুদভাজার নাড়ু ক'রে রেখে গিয়েছিল গোটাকতক,

এখনও সব ফুরোয়নি, শ্যামা তাই দুটো বার ক'রে ওদের দিলেন। বাড়িঘরের কথা, বোন-বোনপোর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, 'আমার তো আর নড়বার পথ রইল না মা, বন্দী একেবারে। রবিবারে কান্তি বাড়ি থাকে বটে, তাও সব রবিবারে নয়, একো একোদিন বেরোতেও হয়—আর তাও, না বেরোলেই বা কি, ও বদ্ধ কালা মানুষ, ওর ভরসায় কি পাগলকে রেখে যেতে পারি!... তোমরাই মধ্যে মধ্যে খবর নিও—মলুম কি বাঁচলুম। এ যা হয়েছে—একটা কারও যদি অসুখ হয়ে পড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাক্তারখানায় যেতে পারব না। কত মাসের যে সুদ পড়ে আছে চারদিকে—তাগাদা করার পথ পর্যন্ত বন্ধ!'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে রাণী বলে, 'একটা কাজ করবেন মাসীমা, আমার সন্ধানে একটি ভাল মেয়ে আছে, কান্তি ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে দেবেন?'

'ওর বিয়ে দেব কি মা, ওর আয় কত যে বিয়ে দেব? ভূতের খাটুনি খেটে—দিন নেই রাত নেই শরীর পাত ক'রে বলতে গেলে লাফিয়ে উন্নতি হয়েছে—তাও কি, না যতদিন পরে হবার কথা ছিল তার আগেই হয়েছে—দশ টাকা মাইনে!... একটা চাকরের মাইনে। ওপর-টাইম হ'লে কিছু বেশী পায় কিন্তু সে তো ঐ মাইনের হিসেবেই। দশ টাকা মাইনে আর দু পয়সা জলখাবার। তার এক পয়সা তো খেতেই চলে যায়, বারো চোদ্দ ঘন্টা পরে বাড়ি আসে, মধ্যে যদি এক পয়সার মুড়িও না খায় তো বাঁচবে কী ক'রে বল? যা পায় তা থেকে মাসিক টিকিটভাড়া দিয়ে দশ এগারো টাকার বেশী হাতে দিতে পারে না। এর মধ্যে বৌ এনে খাওয়াবো কি?'

'সে যা হয় করে হয়েই যাবে মাসীমা', রাণী জেদ করে, 'আপনার ভাত-হাঁড়ির ভাত দুবেলা দুমুঠো খাবে—কেউ টেরও পাবে না! আপনিই তো চালাচ্ছেন, কেউ এসে পড়লে তো দুটো ভাত দিতে কোনদিন আপনাকে কাতর দেখিনি। মনে করবেন যে আপনার সেই মেয়েই এসে আছে। আর আপনি তো বড়লোকের মেয়ে আনবেন না যে রোজ মাছের মুড়ো দিয়ে খেতে দিতে হবে—গরীবের মেয়ে না হ'লে এ পাত্তরে দেবেই বা কেন? আসবে খাটবে খুটবে খাবে। যেমন আপনারা খাচ্ছেন—তেমনিই খাবে।'

তবু শ্যামা মন স্থির করতে পারেন না, বলেন, 'আমার যা বরাত, বৌ এনেই কি সুখ হবে। ঐ তো এক বৌ ছিল, ঘরকন্না সব বুঝেও নিয়েছিল, রইল কি, মুখে লাথি মেরে ভাতারকে নিয়ে সুখ-ভোগ করতে চলে গেল। আজকালকার সব মেয়েই চায় একলা ঘরের গিন্নী হ'তে—মাগটি আর ভাতারটি থাকবে, জোড়ের পায়রার মতো দিনরাত্তির বসে শুধু বকবকুম করবে, আর কেউ থাকবে না মাথার ওপর।'

বলতে বলতেই কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তাঁর, কনক সম্বন্ধে বিষের পাত্র উপুড় হয়ে ওঠে যেন গলাতে।

রাণী একটু চুপ ক'রে থেকে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'সে বৌ গেছে তার বরের কোমরের জোর ছিল ধরুন—একে আনার তো সেই সুবিধে, আপনার তাঁবে থাকতেই হবে তাকে। ঐ আর যার সে তো আর ঘর ভাড়া ক'রে গিয়ে আলাদা থাকতে পারবে না।... আপনি ধরুন মেজ-ঠাকুরঝিকে সব খরচ দিয়ে উলটে মেয়ের জন্যে কটা টাকা দিয়েও আনিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, তারচেয়ে একটা বৌ আনলে কী বেশী খরচ হবে বলুন?'

তা বটে। বড় বৌয়ের কথায় যুক্তি আছে—তা মানতেই হয় শ্যামাকে মনে মনে। এইজন্যই তিনি এত পছন্দ করেন বৌটাকে। রূপেগুণে সমান! তেমনি মিষ্টি স্বভাব। কাজকর্মও যেন হাতে-পায়ে লাগে না। আর এই বুদ্ধি। পরিষ্কার কথাবার্তা কয়—সবদিকে আট-ঘাট বেঁধে। যত দেখছেন বৌটাকে তত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। এ মেয়ের গোবিন্দর চেয়ে ঢের ভাল পাত্রে পড়া উচিত ছিল, তাঁর মনে হয় এক-এক সময়।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'কান্তি কি রাজী হবে?'

'সে ভার আমার মাসীমা, সে আমি তাকে বুঝিয়ে বলে রাজী করাব। নিদেন হতো দিয়ে পড়ে থেকেও—।'

'তা দ্যাখো—' শ্যামা যেন কতকটা অভিভূতের মতোই হয়ে যান, এমন ভাবে কথাগুলো কখনও ভেবে দেখেননি, এখন যত ভাবছেন ততই ভাল লাগছে তাঁর প্রস্তাবটা, কথাটা সেইভাবে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করতে করতেই জবাব দেন, 'তা দ্যাখো না হয় একটা মেয়েটেয়ে, খোঁজে থাকো না হয়!'

'মেয়ে একটি খোঁজে আছে মাসীমা, ঠিক যেন আপনার মাপেই ভগবান যুগিয়ে রেখেছেন!... আমার এক কাকার ভায়রাভাইয়ের ভাইঝি। সে ভাই নেই, বিধবা ঐ মেয়েসুদ্ধ ঐ ভায়রাভাইয়ের ঘাড়ে পড়েছে। তিনি কী এক সামান্য চাকরী করেন কোন্ মারোয়াড়ীর গদীতে, খুবই কম মাইনে—নিহাৎ নিজের বৌদি আর ভাইঝি বলেই ফেলতে পারেন নি, নইলে সেরকম অবস্থা নয়। তার ওপর তাঁর নিজেরও ষেটের চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। সবাইকেই বলে বেড়াচ্ছেন ভদ্রলোক। এখানে আসবার আগে যে একবার বাপের বাড়ী গেছলুম, সে সময়ই কাকা বলেছিলেন, দ্যাখনা তোদের পাড়াঘরে। দিতে তো কিছুই পারবে না—তবে ওদের তেমনি কোন আহিংকেও নেই, দোজবরে তেজবরে পেলেও দিয়ে দেবে।'

'একেবারে কিছু দেবে না?' শ্যামার কণ্ঠে হতাশার সুর, সঙ্গে সঙ্গে যেন ঈষৎ বিরূপতারও।

'না, সে বলতে গেলে কিছুই না। মার নাকি একটি জোড়া বালা আছে ভরি পাঁচেকের মতো—তাই ভেঙ্গে রুলি হার ক'রে দেবে শুনেছি—আর কাকা ভিক্ষে দুঃখু ক'রে, যা দান-সামিগ্গির বরাভরণ না দিলে নয়, তাই দেবে। তার বেশী তার ক্ষমতা নেই। তবে ধরুন—মেয়েকে আমি দেখেছি, মেয়ে দেখতেও খুব ফেল্‌না নয়—হতচ্ছিরি তো নয়ই। এধারেও বেশ গাট্টাগোট্টা আছে, খাটতে পারে নাকি মোষের মতো। ...আপনি বরং একবার দেখুন মাসীমা—একেবারে অমত করবেন না।'

শ্যামার মনে হয় বুড়োর বৌয়ের কথা, মেয়েটা না কাজ ক'রে যেন থাকতে পারে না। আজকাল তো যত ভারী কাজ গিন্নীরা ঐ বৌটাকে দিয়ে করায়। দমাদম বাটনা বাটছে জল তুলছে, টিন টিন ক্ষার কাচছে—সব তো ঐ বৌ। ওরকম হ'লে সত্যিই মন্দ হয় না। টাকা কিছু খরচ হবে, কিন্তু উপায়ই বা কি। ...একে ঐ বদ্ধ কালা ছেলে, তায় এই উপার্জন, শুধু তাঁকে দেখে কে আর পাঁচশ হাজার দিয়ে বিয়ে দেবে ঐ পাত্রে।

সেই কান্তি। তাঁর গর্ভের সেরা সন্তান। আশা ছিল কান্তির রাজার ঘরে বিয়ে হবে।... আর সত্যিই ঐ রূপবান ছেলে—লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হ'লে নিশ্চয়ই বড় বড় জমিদারের ঘর থেকে, রাজার ঘর থেকে সম্বন্ধ আসত, কত হাতী-ঘোড়া এসে দাঁড়াত তাঁর এই কুঁড়েঘরের সামনে। হয়ত সে বৌ এসে তাঁর পুকুর সইত না—তাঁর ঘর করত না, তবু একটা বলবার মতো সম্বন্ধ হ'ত তো! তার জায়গায় এই!!...

একটা অর্ধোদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস কণ্ঠে দমন করেন শ্যামা। অনেকক্ষণ পরে মুখে বলেন শুধু, 'তা দ্যাখো না হয়। সেই মেয়েই কি আর বসে আছে এতদিন?'

দেখা গেল যে সে মেয়ে বসেই ছিল। শ্যামা দেখতে যেতে পারবেন না ব'লে তারাই এসে মেয়ে দেখিয়ে গেল। খুব ফরসা নয়, তবে ময়লাও নয় একেবারে। মাজামাজা রং, গড়নপেটনটা একটু যেন কেমন মদ্দাটে মদ্দাটে গোছের মনে হ'ল শ্যামার, তবে মুখশ্রী মন্দ নয়। মুখে চেহারার দৈন্য মানিয়ে যাবে। যেখানে স্পষ্ট কোন অভিযোগ নেই, ধারণার প্রশ্ন—সেখানে আর ঐ গড়নপেটনের প্রশ্নটা তুলে লাভ নেই। তাছাড়া, শ্যামার মনে হ'ল ওটা হয়ত ছেলেবেলা থেকে খাটাখাটুনির জন্যেই হয়েছে, শারীরিক শক্তি ও কর্মদক্ষতারই পরিচায়ক ওটা। তিনি মেয়ে পছন্দ করলেন। ছেলেও তাদের পছন্দ হয়েছিল, যারা তেজবরেতে পর্যন্ত বিয়ে দিতে প্রস্তুত তাদের পক্ষে আর ছেলে খারাপ কি! এক যা কানে শুনতে পায় না—তা, মেয়ের কাকা বললেন, 'আমাদের মেয়ে ওখানকার মাইনর ইস্কুলের পড়া শেষ করেছে একেবারে ক অক্ষর গোমাংসতো নয়—ও চিঠি লিখে কথা কইতে পারবে!'

তবু শ্যামা ভদ্রতার খাতিরে একবার বললেন, 'মেয়েকে বলে-কয়ে এ কাজ করছেন তো, লুকোচাপা করছেন না তো? শেষে এসে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে না তো?'

'না না—সব বলেই নিয়েছি। এমন সুন্দর বর পাচ্ছে, এ তো ভাগ্যের কথা ওর। এই তো আশার অতীত। আমাদের ঘরে যখন জন্মেছে তখন কী আর রাজপুত্তুর পাবে! আপনারাই একটু দয়া ক'রে মানিয়ে টানিয়ে নেবেন, অনাথ মেয়েটা—'

পাত্রপাত্রী পছন্দর পর দেনাপাওনার প্রশ্ন ওঠে। রাণী অবশ্য বলে রেখেছিল যে ওরা এক পয়সাও দিতে পারবে না—কিন্তু শ্যামা সুকৌশলে বেয়াইকে দিয়ে 'যৎসামান্য' দেবার প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিলেন। সে যৎসামান্যটা কত তা নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করলেন না, রাণীকে আড়ালে বললেন, 'যতই কম দিক, এক'শ টাকার কম তো আর দিতে পারবে না—আমি এখন তাই ধরে রাখছি। যথা লাভ! কিছুই তো আশা ছিল না, সে জায়গায় পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা জোটে তাই ভাল।'

শুধু যৎসামান্য নগদের কথাই নয়—আরও একটি কথা পাকা ক'রে নিলেন, গায়ে হলুদের তত্ত্ব এ'রা করবেন না, শুধু নিয়মরক্ষার মতো মাছ, হলুদ আর মিষ্টি, আর লালপাড় শাড়ি। ও'দেরও ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠাতে হবে না। মেয়ে-জামাইয়ের কাপড়, ক্ষীর-মুড়কি বাটিসুদ্ধ আর ফুল মিষ্টি—এই পাঠালেই চলবে।

কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেল। শুধু এখন হেমের কাছে খবর পাঠানো যা বাকী, তার ছুটি পাবার সময়টা জানতে পারলে এ'রা পাকা দেখা ও বিয়ের দিন ঠিক করবেন, হেমই এসে আশীর্বাদ করবে, সেই সঙ্গেই বিয়ে সেরে চলে যাবে!...

দীর্ঘদিন পরে ছেলেকে বিস্তৃত চিঠি লিখলেন শ্যামা। ভাল মেয়ে পাওয়া গেছে, রাণীর আত্মীয়ই বলতে গেলে, রাণীই জেদ ক'রে এ বিয়ে দেওয়াচ্ছে, সে-ই কথাবার্তা ঠিক করেছে—তারই পেড়াপীড়িতে শ্যামাকে রাজী হ'তে হয়েছে—ইত্যাদি খবর দিয়ে, অর্থাৎ চিঠির মধ্যে 'তোমার বড় বৌদি' শব্দকটি অন্তত চোদ্দ পনেরোবার ব্যবহার ক'রে, 'যৎসামান্য'র কথাই বেমালুম চেপে গিয়ে লিখলেন, 'উহারা একপয়সাও খরচ করিতে পারিবেন না, সে সামর্থ্যও উহাদের নাই। থাকিলে আমার ঐ ছেলেকেই বা মেয়ে দিতে রাজী হইবে কেন? অথচ এধারে সত্যই আমারও আর দিন চলে না। এবম্বিধায় আমাকে রাজী হইতে হইল। নমো নমো করিয়া সারিলেও দুশ আড়াইশটি টাকা খরচ হইবে, কমপক্ষে। অবশ্য আমিও কিছু খরচ করিব, তবে তোমার নিকট হইতে অন্তত একশটি টাকার ভরসা রাখি। আশা করি তোমার অশক্ত অক্ষম ছোট ভাইয়ের জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবে না।' ইত্যাদি—

কান্তিকে রাজী করানো যতটা সমস্যা হবে ভেবেছিলেন শ্যামা, এবার তা আদৌ হ'ল না। হয়ত সে-ও সংসারের সমস্যা ও মায়ের কষ্ট দূর করার একটা উপায় চিন্তা করছিল, বড় বৌদি সেই দোহাই দিয়ে কথাটা পাড়তে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল। এবং রাজী হওয়ার পর থেকে যেন একটু উৎসুকভাবেই সেই অভাবনীয় ঘটনাটার অপেক্ষা করতে লাগল। নিজের

আগ্রহ দেখে তার নিজেরই অবাক লাগত এক একদিন।

অবশ্য বিয়ের বয়স তার হয়েছে। বরং অনেক আগেই সে বয়সে পোঁছে গেছে সে, আরও আগে হওয়াই হয়ত উচিত ছিল। কিন্তু বয়সের প্রশ্ন ছাড়াও অভিজ্ঞতার প্রশ্ন আছে। যে বাঘ নররক্ত পান করেছে সে নররক্তের জন্য অধীর এবং লোলুপ হয়ে উঠবে এইটেই স্বাভাবিক। রতনদিকে আর যেন খুব ভাল ক'রে মনে পড়ে না—একটা বেদনা-বিজড়িত মধুর স্মৃতিতে মাত্র পরিণত হয়েছেন তিনি, এমন কি তাঁর মুখ-চোখের ছবিটাও যেন ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে মনে—তবু সেই সুরনারীদুর্লভ দেবাঙ্কিত বরতনু আলিঙ্গন ও সম্ভোগের স্মৃতি—তার দৈহিক ছবিটা মন থেকে মুছে গেলেও স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন একটা তাড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে আজও, ওর প্রতিটি রক্তকণা সে রভসস্মৃতিতে উন্মত্ত অধীর বুভুক্ষু হয়ে ওঠে। ছবিটা মনে নেই কিন্তু অনুভূতিটা আছে। সেই অনুভূতির পুনরাভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষা ওকে অস্থির ও চঞ্চল ক'রে তোলে। লজ্জায় কাউকে প্রশ্ন করতে না পারলেও ঘটনাটা ঘটতে কত দেরি আছে এখনও—পরোক্ষে সেটার খোঁজ করে। আজকাল প্রায়ই খেতে বসে মাকে প্রশ্ন করে, 'দাদার চিঠিটিটি পাচ্ছ?' এখন যে দাদার ছুটি পাওয়ার ওপরই সবটা নির্ভর করছে—এটুকু সে জানে। আর প্রশ্নটা যে সেই-জন্যই তা শ্যামাও বোঝেন—তিনি মুখ টিপে হাসেন শুধু। পরিতাপও করেন মনে মনে—'কী না পেতে পারত, বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে পায়ে লোটাত এতদিনে— নিজের বুদ্ধির দোষে সব নষ্ট করলে। এখন ঐ হাঘরের ঘরের শাঁকচুন্নীর জন্যেই লালায়িত। হায় রে!'

অবশ্য হেমের ছুটি পেতে খুব দেরি হ'লও না। অনেকদিন ধরেই ছুটির তাগাদা দিচ্ছিল সে। রাণী-বৌদিরা এত কাছে এসেছে—বাড়িতে যতদিন ছিল আসা তো হ'লই না, তবু এখনও খুব দূরে নেই, এপাড়া ওপাড়া —সবাই মিলে একসঙ্গে দিনকতক হৈচৈ করবার জন্যই মনটা উন্মুখ হয়ে রয়েছে কবে থেকে। সেই ছুটির তাগাদাই কাজে লাগল, বড়বাবু এবার ছাড়লেন ওকে। পাঁজি দেখে বিয়ে বৌভাত পাকা দেখার দিন হিসেব ক'রে তেরোদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি এল—রবিবার আর অন্য কী একটা ছুটি মিলিয়ে যাতে ষোল সতেরো দিন পুষিয়ে যায় এইভাবেই ছুটিটা নিলে।

রাণীকে দেখে ওদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। হেমেরও, কনকেরও। কনক খুব পেড়াপীড়ি করতে লাগল, 'আমাদের সঙ্গে জামালপুরে চলুন দিদি, টানের জায়গা, মাসখানেক থাকলেই সেরে যাবেন। চলুন—'

ম্লান হেসে রাণী বলে, 'আর আমার এইসব ডেয়োডাকনা, এরা? এদের কে দেখবে এখানে?'

'ওমা, ওদেরও নিয়ে যাবেন বৈকি। ছেলেমেয়ে ছেড়ে কি যেতে বলছি।'

একটু চুপ করে থেকে রাণী বলে, 'না ভাই, সে হবে না। মারও শরীর খারাপ, ওঁকে ফেলে আমি যদি যাই সে বড় খারাপ দেখাবে, আর ওঁরও কষ্ট হবে খুব। একা একটা বাড়ির পাট করা, ভোরে ভাত দেওয়া, পেরে উঠবেন না।... চারিদিকে দেনা, একটা ঠিকে-ঝিও তো রাখতে পাচ্ছি না, সবই তো করতে হয়।'

'তা আপনিই বা এই শরীরে কত-দিন বইবেন? শয্যাগত হয়ে পড়লে তখন?'

'তখন তুমি আছ। তোমাকে লিখব —এসে সেবা করবে!' বলে কনকের গাল দুটো টিপে দেয় রাণী।

'না দিদি, ও আপনি কথা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। ...একটু ভেবে দেখুন, জল হাওয়া খুব ভাল ওখানকার। জিনিসপত্তরও সস্তা, তিন আনা সের মাছ, চার আনা সের মাংস।...চলুন, আমি বরং মাসীমাকে বুঝিয়ে বলি!

'না না। তাহলে মা ভাববেন যে আমি বলাচ্ছি তোমাকে দিয়ে। বরং মা যদি দিন-কতক থেকে সেরে আসতেন তারপর আমি যেতুম তো ভাল হত।...... তা কি আর মা রাজী হবেন? দেখি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে।'

তারপর একটু হেসে বিচিত্র দৃষ্টিতে কনকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'আমাকে যে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছিস, ভয় করছে না?'

'না দিদি, একটুও না।' স্থির দৃষ্টি রাণীর দৃষ্টির ওপর নিবদ্ধ করেই জবাব দেয় কনক।

'কেন রে, এমনি বিচ্ছিরি হয়ে গেছি বলে? তাই আর ভয় করে না?'

'না দিদি, তা নয়। আপনিও যেমন খোলাখুলি বলছেন আমিও তেমনি খোলাখুলিই জবাব দিচ্ছি, ভয় যখন ছিলও—সে আপনার রূপের জন্যে নয়। আপনাকে যে ভালবাসবে সে রূপগুণ মিলিয়েই ভালবাসবে। আমার মানুষকে আমি চিনে নিয়েছি—সত্যিকার খারাপ চোখে সে কোনদিনই চায়নি আপনার দিকে। আর আপনার কথাও ওঁর মুখ থেকে অনেক শুনেছি, আপনার দ্বারা আমার যাকে অনিষ্ট বলে তা কখনও হবে না—এ জোর খুব আছে মনের মধ্যে!'

চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে রাণীর। সে কনকের দুটি হাত চেপে ধরে বলে, 'বাঁচালি ভাই, এ যে কী দুশ্চিন্তা ছিল, কেবলই ভাবতুম না জানি আমার সম্বন্ধে কত কী খারাপ ভেবে বসে আছিস।...কিন্তু সত্যিই বলছি, এই বামুনের মেয়ে এয়োস্তী তুই—তোকে ছুঁয়ে বলছি, আমার মনে কোন অনিষ্ট চিন্তা কখনও আসেনি।'

'সে আমি জানি দিদি!' হেঁট হয়ে আর একবার পায়ের ধুলো নেয় কনক।

দুটো চোখ মুছে রাণী আবারও কেমন একরকমের গাঢ়কণ্ঠে বলে, 'আমি কিন্তু তোমার ওপর অনেক ভরসা করে বসে আছি বোন, তুমি আমাকে কথা দাও—বিপদের দিনে কোনদিন, যদি সত্যি সত্যিই তোমাকে ডাকি, তুমি চলে এসো ঠিক, আমাকে ত্যাগ করো না!'

'ওমা, তা করব কেন! কিন্তু এসব কথা কেন বলছেন দিদি?' একটু উদ্বিগ্ন-ভাবেই প্রশ্ন করে কনক।

'না, ও কিছু না।' রাণী উড়িয়ে দেয় কথাটা। জোর করে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে, জামালপুরের কথা তোলে।

বসে গল্প করার খুব সময়ও ছিল না অবশ্য। রাণী বিয়ে উপলক্ষে কদিন —রাতটুকু ছাড়া—এ বাড়িতে এসেই ছিল। সংসারের গৃহিণীর যা কিছু করণীয় বলতে গেলে সে-ই একা সব করেছে।

ওকে যত দেখছেন তত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন শ্যামা। সবই করছে কিন্তু খরচ-পত্রের হাত যতদূর সম্ভব টেনে—আর কোন খরচটাই শ্যামাকে না জিজ্ঞাসা করে করছে না। কনকও অবাক হয়ে যাচ্ছে; গুণের মেয়ে তা সে শুনেছিল কিন্তু এতগুণের তা ধারণা ছিল না। এই শরীরে কী খাটুনিটাই না খাটছে, মনে হয় একটা মানুষ চারখানা হয়ে বিয়ে-বাড়ির সর্বত্র একই সময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সবচেয়ে যেটা বিস্ময়ের সেটা হ'ল ওর মেজাজ। এবাড়ির সমস্ত লোক-গুলির ওপর, সমস্ত ঘটনা ও ক্রিয়াকর্মের ওপর ওর মধুর স্বভাবের আশ্চর্য প্রসন্নতা যেন একখানি স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে রেখেছে সর্বদা, আর সে ছায়া একটি অতি মিষ্টি সুরের আমেজ এনে দিয়েছে সকলের মনে, কোথাও কোন তালভঙ্গ হবার অবসর দিচ্ছে না।...খাটছে সবাই, কিন্তু তার পিছনে আবহসঙ্গীতের মতো তার হাসি, ঠাট্টা, তামাসা ও আন্তরিক সহানুভূতি অহরহ প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে।

এমন আর কখনও দেখেনি কনক, কখনও কল্পনা করেনি। হেমের কোন দোষ দেওয়া যায় না—মনে মনে বরং বাহবাই দিল হেমকে, এই মায়া কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলে। অবশ্য তারপরই মনে হ'ল—এই মেয়েই সে মায়া কেটে দিয়েছে। নিজে স্বেচ্ছায় জাল কেটে না দিলে পাখী কোনদিনই উড়তে পারত না, উড়তে চাইতও না। (ক্রমশঃ)

মিসিসিপির শ্রেষ্ঠ সন্তান

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি-বোর্ড এবার উপন্যাসে 'পুলিৎজার পুরস্কার' দিয়েছেন পরলোকগত ঔপন্যাসিক উইলিয়ম ফকনারকে, তাঁর 'দি রীভার্স' উপন্যাসের জন্য। ফকনার ইতিপূর্বে ১৯৫৫ সালে 'এ ফেব্‌ল'-এর জন্য এই পুরস্কারটি পান। শান্তির জন্য মানুষের আন্তরিক কামনাই 'এ ফেব্‌ল'-এর বিষয়বস্তু। অনেকটা রূপকের মধ্য দিয়েই সমস্ত কাহিনী এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যাকে অনেকে দুর্বোধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। বহুস্থানেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবৃতির সমাহার মাত্রাতিরিক্তরূপে প্রকাশ পাওয়ায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে আসল বক্তব্য খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ ফেব্‌ল-কে উপন্যাস না বলে একটি নিখুঁত বক্তব্য-পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক রচনা এবং আলংকারিক সৌন্দর্যের সমাহার বলাই যুক্তিযুক্ত। 'দি রীভার্স'-এ কাহিনীর কালসীমা ১৯০৫—১৯৬২ সালের মধ্যে আবদ্ধ। য়োক্‌নাপাটাফার মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনকথা পরম নিষ্ঠার সংগে চিত্রিত। মোটরগাড়ী করে আশী মাইল পথ পরিক্রমা আর আনুষঙ্গিক ঘটনা-রূপে বহু মানুষের জীবনের কথা এসেছে স্বাভাবিকভাবে। গাড়ীর ড্রাইভার থেকে শুরু করে গাড়ীর মালিক, মালিকের নাতি—সমস্ত চরিত্রগুলি নানাবিধ কাহিনীর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাই লেখকের চোখে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে; কারণ ঐ অভিজ্ঞতাই একমাত্র মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

উইলিয়াম ফকনার

১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় 'সোলজারস পে' এবং ১৯২৭ সালে 'মসকুইটোস'। এর মধ্যে প্রথম বইটিই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'সার্টোরিস'। য়োক্‌নাপাটাফার সার্টোরিস্-পরিবারের বা ফকনার-পরিবারের কাহিনীই বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু। 'সার্টোরিস'-এ ফকনারের লেখকজীবনের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং 'দি সাউণ্ড অ্যাণ্ড দি ফিউরি'তে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা। ১৯৩১ সালে 'স্যাংচুয়ারি' প্রকাশিত হলে মার্কিনী জনসাধারণ এবং সমালোচকদের কাছ থেকে ফকনার উপযুক্ত সমাদর পেলেন না। একটি আশ্চর্যের ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় ফকনার প্যারিসে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। আন্দ্রে স্যালক্স 'স্যাংচুয়ারি'র একটি ভূমিকা লিখে-ছিলেন। ফকনারের রচনাবলী নিয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন জাঁ পল সাত্রে।
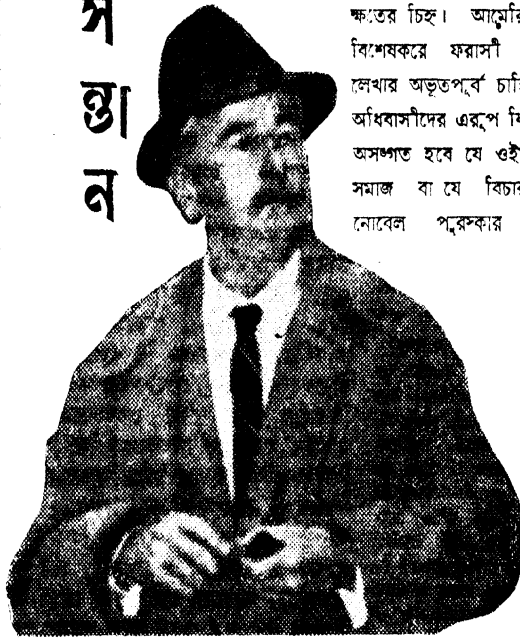
১৯৪৬ সালে ম্যালকম কাওলে যখন 'পোর্টেবেল ফকনার' প্রকাশ করেন তখন ফকনারের বেশীর ভাগ বই বাজারে পাওয়া যায় না। তাঁর সম্পর্কে কোনরকম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধও আমেরিকায় অনুপস্থিত। কিন্তু ১৯৪৬ সাল থেকে প্রায় প্রতিটি সাহিত্য-সম্পর্কিত পত্রিকায় সে সম্পর্কে ভারী ভারী প্রবন্ধের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৫০ সালে ফকনার নোবেল পুরস্কার পান। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর সংবাদ-পত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল : "ফকনারের দৃষ্টি এমন একটি সমাজের দিকে নিবদ্ধ যার কোন সদ্‌গুণ নেই, যে-সমাজ পাপে আর লালসায় ক্লেদাক্ত, অবনতির শেষ ধাপে নেমে গিয়ে যে-সমাজ শুধু বিষ ছড়ায়, যার সর্বাঙ্গে শুধু দুরারোগ্য ক্ষতের চিহ্ন। আমেরিকায়, ইউরোপে বিশেষকরে ফরাসী দেশে ফকনারের লেখার অভূতপূর্ব চাহিদা। আমেরিকার অধিবাসীদের এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা অসঙ্গত হবে যে ওইসব দেশের পাঠক সমাজ বা যে বিচারকমণ্ডলী তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছেন তাঁরা ফকনারের বিকৃতরুচিসম্পন্ন চরিত্রগুলিকে আমেরিকার জীবনযাত্রার যথার্থ চিত্র বলে মনে করেন। তা মনে করে যদি তাঁরা ফক্‌নারের লেখার তারিফ করেন তাহলে মস্ত ভুল করা হবে। নিজের প্রখর কল্পনাশক্তির সাহায্যে ফকনার যে নাগরিক জীবনের কুৎসিত বাস্তব চিত্র গ্রন্থন করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কোনস্থানেই তেমন কুৎসিৎ মনোভাবসম্পন্ন নরনারীর সন্ধান পাওয়া ভার। একজন অসাধারণ কথাশিল্পী হিসাবে ফকনারের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না।"

আর নোবেল কমিটি ফকনারকে পুরস্কার দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "আমেরিকার নবযুগের উপন্যাস সাহিত্যে শক্তিসম্পন্ন এবং স্বাধীন চিন্তাসমৃদ্ধ অবদানের জন্য উইলিয়ম ফকনারকে এই পুরস্কার দেওয়া হল।" 'রিকোয়াইম ফর এ নান (১৯৫২) ফরাসী সংস্করণ করেন আলবার্ট কামু।

ফকনার আমেরিকার জনসাধারণের কাছে আজ বিশেষ সমাদৃত। কিন্তু অনেকে অভিযোগ করেন যে, বাগাড়ম্বর-পূর্ণ দুর্বোধ্যতা এবং দুষ্পাঠ্য হয়ে পড়েছে তাঁর রচনা। কিন্তু ফকনারের সমর্থকরা বলেন যে ফকনারের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন না হলে তাঁর সমস্ত গ্রন্থই যে কোন পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু যে বাগাড়ম্বর, অতিরিক্ত শব্দবাহুল্য বা অলংকারপ্রিয়তার যে অভিযোগ তা অসত্য নয়। ১৯৪৬ সালে একটি প্রবন্ধে রবার্ট পেন ওয়ারেন লিখেছিলেন :

"William Faulkner has written nineteen books which for range of effect, philosophical weight, originality of style, variety of characterization, humor, and tragic intensity, are without equal in our time and country. Let us grant, even so, that there are grave defects in Faulkner's work. Sometimes the tragic intensity becomes mere emotionalism, the technical virtuosity mere complication, the philosophical weight mere confusion of mind. Let us grant that much, for Faulkner is a very uneven writer. The unevenness is, in a way, an index to his vitality, his willingness to take risks, to try for new effects, to make new explorations of material and method."

কয়েকটি বক্তব্যকে সমর্থন করা না গেলেও 'দি সাউণ্ড অ্যাণ্ড দি ফিউরি' বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম। অনেকে মনে করেন এইটি ফকনারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। যাইহোক 'আধুনিক' উপন্যাস হিসাবে 'দি সাউণ্ড অ্যাণ্ড দি ফিউরি' সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হেনরী জেমস, জোসেফ কনরড, স্টীফেন ক্রেন, জেমস জয়েস-এর ঐতিহ্যাশ্রয়ী এই উপন্যাসে লেখক স্বাভাবিকভাবে সে ঐতিহ্য স্বীকার করে নিয়েছেন, সে ঐতিহ্য আরোপিত নয়—তা হল 'জীবন কিছু বলে না, কিন্তু সে আমাদের চিন্তাজগতে ছাপ রেখে যায়'।

য়োক্‌নাপাটাফা-র সৌন্দর্য, ও জীবন, ফকনারের উপন্যাস ও গল্পে বহুভাবে উপস্থিত। 'স্যার্টোরিস' প্রকাশিত হয় ১৯২৯-এ। তার পরবর্তী-কালের অধিকাংশ রচনার কাহিনীর পটভূমিতে আছে য়োক্‌নাপাটাফা সেখানকার জনজীবন—তাদের আপাতরম্য অসত্য অভিজ্ঞতার সমাবেশ—অতীত ইতিহাসের প্রক্ষেপণ ঘটেছে কোথাও কোথাও। কিন্তু দক্ষিণা-ঞ্চলের স্বপ্নে মোহগ্রস্থ মন নিয়ে ফকনার যে চিত্র এঁকেছেন তা বহু-ক্ষেত্রেই স্ববিরোধিতা বা অসংলগ্নতা দোষে দুষ্ট। সঙ্গতিবোধ কাহিনী-সৃষ্টিতে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ফকনারের চরিত্রগুলি জটিলভাবে সংবদ্ধ এবং বর্ণিত। 'দি সাউণ্ড অ্যাণ্ড দি ফিউরি', 'অ্যাজ আই লে ডাইং', 'স্যাংচুয়ারি', 'লাইট ইন অগাস্ট' গ্রন্থের চরিত্রগুলি কখনও পরিকল্পিত, কখনও উদ্দেশ্যহীন অন্ধের মত কাজ করে যায়—সর্বত্রই শান্ত এবং রুদ্র উগ্র এবং নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় সুস্পষ্ট। ফকনারের কল্পনায় য়োক্‌নাপাটাফা বাস্তব ও অবাস্তবতার এক অদ্ভুত স্বপ্নময় জগৎ। এই অঞ্চলের দীর্ঘকালের ইতিহাস নিগ্রো জাতির উপস্থিতি, দম্ভ, যৌনপ্রবণতা এবং ক্রোধাত্মক চিৎপ্রবৃত্তি বহু গ্রন্থে উপস্থিত। অতীতাভিমুখী কাহিনীর ক্ষণকালের আকর্ষণীয় পরিবেশ পাঠকমনে মোহাবিষ্টতার করে। নিগ্রোদের এবং দরিদ্র শ্বেতকায়দের জীবনের মর্মান্তিক বেদনাদায়ক দিকটি নিষ্ঠাবান শিল্পীর মত চিত্রিত করেছেন ফকনার। য়োক্‌নাপাটাফা আমাদের আকৃষ্ট করে : কারণ 'ফকনারের কল্প-দৃষ্টির অসাধারণ জীবনীশক্তি, এর ঘটনাবলী আমাদের মনে যতই কেন বিরক্তির, এমনকি বিতৃষ্ণার সঞ্চার করুক, ফকনার সেগুলিকে এরূপভাবের তীব্রতা ও রূপের অখণ্ডতার সঙ্গে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন যে তাঁর মিসিসিপি প্রদেশ যেন আমাদের সমগ্র মনজগৎ সমাচ্ছন্ন করে ফেলে। জীবিত লেখকদের মধ্যে প্রায় কারও এ শক্তি নেই। ঔপন্যাসিকদের যত দোষ থাকা সম্ভব প্রায় সবই তাঁর আছে—মায় অর্থহীন শব্দাড়ম্বর পর্যন্ত; যত গুণ থাকা সম্ভব তাও প্রায় সবই আছে : এমনকি যে বস্তুটি সমসাময়িক সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ—মহিমার সেই বিশালত্ব তাঁর মধ্যে বিদ্যমান।' অনেকে সে কারণে বলে

থাকেন ফকনার আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। যে স্বচ্ছতা যে সারাল্য তাঁর রচনার বহুক্ষেত্রে প্রকাশিত—তা ঐ মহিমার বিশালত্বেরই অবদান—মহৎ প্রতিভার প্রকাশিত সত্যের অংশবিশেষ কিন্তু হেনরী জেমস, জোসেফ কনরাড বা জেমস জয়েসকে যে অর্থে আমরা বাস্তব জগৎ সচেতনশিল্পী বলে থাকি ফকনারকে তা বলা সম্ভব নয়। বাইবেলের মত ফকনারের কাহিনী হল একাধারে সরল, জটিল এবং কেন্দ্রাতীগ। মোটকথা ফকনারক নিয়ে উত্তেজনার শেষ ছিল না। বিকৃত মানসিকতার প্রলাপ বলে তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন। বলেছে—অসুস্থ বিভৎস বিকৃত জীবনচিত্র অংকন করে সহজে পাঠক আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু যে বিচিত্র জীবন সমস্ত কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। দক্ষিণের মানুষের জীবন তাদের উদারতা ও কুটিলতা, হীংস্র মনোবৃত্তি ও স্বার্থ-পরতা অসামান্য নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত। ফকনার জীবন সম্পর্কে অভি-জ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে এক অসামান্য সৃষ্টিতে মার্কিনী কথা-সাহিত্যের জগৎকে যুগোচিত সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ করে গেছেন। আমেরিকার কথাশিল্পীদের মধ্যে ফকনার প্রকৃতপক্ষে সার্থক উপন্যাসসৃষ্টিতে একটি শিল্প-সুষমাময় কলানৈপুণ্যের পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছিলেন। অন্য কোন মার্কিনী সাহিত্যিক এমনভাবে এতগুলি উল্লেখ-যোগ্য চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেননি। এমন কি একখানি উপন্যাসে বহুমুখী জীবনের পরিচয় তুলে ধরতে হয়ত তাঁরা অনেকেই সক্ষম হননি। ফকনারের অনন্যসাধারণ কল্পনাশক্তিই তাঁকে এই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে। আঙ্গিকের দিক থেকেও ফকনারের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর অলংকারসমৃদ্ধ বাগ্‌ভঙ্গি চরিত্রচিত্রণে সাফল্য এনে দিয়েছে। ফকনার নিজের সম্পর্কে বলেছেন : "আমার মধ্যে প্রতিভা বা মনীষা আছে এমন বড় ধারণা আমার নেই। পড়াশোনাও বেশি করিনা। করবার সময় পাইনা। সাহিত্যের-পত্রিকাও আমার কাছে বিশেষ আসে না। আমি যেসব পত্রিকা পড়ি তাদের মধ্যে থাকে গরু-ঘোড়ার কথা আর শিকার কাহিনী।"

বিজ্ঞানাচার্য শিশির কুমার

কৃষ্ণা দাশগুপ্ত

ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের জীবনাবসানে ভারতীয় বিজ্ঞানাকাশের একটি উজ্জ্বলতর জ্যোতিষ্কের তিরোধান ঘটল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কৃতিত্বে ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের সংগঠনে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ভারতে রেডিও গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ, ভারত সরকারের রেডিও রিসার্চ কমিটি অফ দি কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর প্রতিষ্ঠাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও-ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তক, হরিণঘাটা আয়নোস্ফিয়ার ফীল্ড স্টেশনের স্থাপয়িতা, 'আপার অ্যাটমসফিয়ার'-এর সুবিখ্যাত গ্রন্থকার, পদার্থবিজ্ঞানের জাতীয় গবেষণা-অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র, ডি-এসসি (কলকাতা), ডি-এসসি (সরবোন), এফ-আর-এস, পদ্মভূষণের মৃত্যুর ফলে যে আসনটি শূন্য হল তা শিল্প ও বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর নবীন ভারতের পক্ষে একটি অপূরণীয় জাতীয় ক্ষতি বলে পরিগণিত হবে। বিশেষ করে আজকের দিনে আমাদের দেশের পক্ষে তাঁর মতো উদ্যমী পুরুষের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞানী ও কর্মীর এমন সার্থক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে। বিশেষ করে ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের মৃত্যু আরো শোকাবহ এই কারণে যে এই মৃত্যু একান্তই অকাল মৃত্যু, যদিও তাঁর বয়স হয়েছিল তিয়াত্তর। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, "বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় শিশিরকুমারের দান অসামান্য। তাঁর আরও অনেক কিছু দেবার ছিল, আমাদের দুর্ভাগ্য তা নিয়েই তিনি চলে গেলেন।"

শিশিরকুমারের জীবন কৃতী ছাত্রের, অভিনিবিষ্ট বিজ্ঞানীর ও স্থিরলক্ষ্য কর্মীর। একটি আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্ত হিসেবেও তাঁকে অনন্য বলা চলে।

জন্ম কলকাতায়, ১৮৯০ সালের অকটোবরে। লেখাপড়া প্রথমে ভাগলপুর জেলা স্কুল ও টি-এন-জে কলেজে, তারপরে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এসসি ডিগ্রি ও স্বর্ণপদক লাভ। তারপরে কয়েক বছর বাংলার ও বিহারের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা। ১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবসৃষ্ট স্নাতকোত্তর বিভাগে পদার্থবিদ্যার লেকচারার হিসেবে যোগদান। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এসসি ডিগ্রী লাভ। পরে প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ফেব্রির পরিচালনাধীনে স্পেকট্রোস্কোপিক বিষয়ে গবেষণা ও ১৯২৩ সালে আলট্রা-ভায়োলেট এলাকার বর্ণালী সংক্রান্ত বিষয়ে নিবন্ধের জন্যে ডক্টরেট লাভ।

ডঃ মিত্রের বৈজ্ঞানিক জীবন শুরু হয়েছিল মাদাম কুরীর অধীনে বিশ্ব-বিখ্যাত ইনস্টিটিউট অফ রেডিয়াম-এ। তারপরে তিনি অধ্যাপক গাটানের অধীনে ন্যান্সি-র ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স-এও কাজ করেছিলেন। সেখানে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল রেডিও ভাল্ভ সার্কিট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈজ্ঞানিক জগতে বিষয়টি ছিল একেবারেই নতুন ও অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ।

১৯২৩ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁরই চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এসসি ক্লাশে বেতার-বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিশিরকুমার মিত্র

জন্ম—অক্টোবর : ১৮৯০ মৃত্যু—অগাস্ট : ১৯৬৩

সে-সময়ে ভারতের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে বেতারবিজ্ঞানের বিশেষ পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ছিল না।

১৯৩৫ সালে তিনি পদার্থবিদ্যার স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৬ সালেই তিনি ইংল্যান্ডে যান ও বেতারবিজ্ঞান সম্পর্কে ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীদের গবেষণা-কার্য স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন। ব্রিটেনের রেডিও রিসার্চ বোর্ড সম্পর্কে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং ভারতেও এ-ধরনের একটি সংস্থা গড়ে তোলা সম্পর্কে সে-দেশের অগ্রণী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু ভারতে এধরনের একটি বোর্ড গঠন করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হয়নি। সাত বছর ধরে তাঁকে এ-বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের অধীনে রেডিও রিসার্চ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই কমিটির সভাপতি।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ প্ল্যানিং কমিটির সদস্য হিসেবে ১৯৪৪-৪৫ সালে শিশিরকুমার ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতারবিজ্ঞান পঠনপাঠনের ব্যবস্থা। উৎসাহিত হয়ে তিনি দেশে ফিরলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক একটি রেডিও গবেষণা বিভাগ সৃষ্টির জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন। এক্ষেত্রেও সাফল্য সঙ্গে সঙ্গে আসেনি। ইন্সটিটিউট অফ রেডিও-ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। তিনিই এই সংস্থার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৩৫ সালে ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস-এর আমন্ত্রণে তিনি আয়োনোস্ফিয়ার বিষয়ক একটি আলোচনা-সভার উদ্বোধন করেছিলেন। তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতাটি পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীমহল এই পুস্তিকাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই বক্তৃতার সূত্র ধরেই পরে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' (রুশ ভাষায় অনূদিত)।

● 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য শিশিরকুমার মিত্রের গবেষণা বিষয়ে অতি সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমারের গবেষণা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

"......এই সময়ে শ্রীশিশিরকুমার মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এসসি উপাধি লাভ করে প্যারিসে এসেছেন। বিজ্ঞানের এই দিকটা (বেতারবিজ্ঞান) তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠাবার ও তা ধরবার সমস্ত কৌশল তিনি আয়ত্ত করে নিলেন। তারপর দেশে ফিরে এসে কলকাতা বিজ্ঞান-কলেজে তিনি এক পরীক্ষাগার স্থাপন করলেন। গবেষণা চলতে লাগল। সহকর্মীরূপে পেলেন কয়েকজন বিজ্ঞানীকে যাঁদের দানও অসামান্য।

অ্যাপেলটন দেখিয়েছিলেন, উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের যে অংশ আয়নিত হয় তাতে দুটি পৃথক পৃথক স্তর আছে, যেখানে আয়নেরা বেশিরকম সঞ্চিত হচ্ছে। এই দুই স্তরের নাম দেওয়া হল E ও F-স্তর। E-স্তর প্রায় ১০০ কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থিত, আর F-স্তর আছে ২০০ থেকে ২৫০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে। শিশিরকুমার মিত্র E-স্তরের নীচে, ভূপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৬০ কিলোমিটার উঁচুতে, আর-একটি স্তরের সন্ধান পেলেন। সাধারণ পদ্ধতিতে তা ধরা যায় না; এর জন্য শিশিরকুমারকে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হল। শিশিরকুমার লক্ষ্য করলেন, এই স্তর বিশেষভাবে শোষকের কাজ করে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড় হলে এই স্তরে তা প্রতিফলিত হয়, মাঝারি বা ছোট হলে প্রতিফলন হয় না। এই স্তর কেবলমাত্র দিবালোকে গঠিত হয়, রাত্রে এ বিলুপ্ত হয়ে যায়। শিশিরকুমারের এ গবেষণা পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে স্বীকৃতি পেল, অ্যাপেলটন এই স্তরের নাম দিলেন D-স্তর। তা হলে শেষ অবধি এই দাঁড়াল, বায়ুমণ্ডলের আয়নিত অংশে মোটামুটি তিনটি স্তর আছে—D, E ও F। তারপর এও দেখা গেল, F স্তরটি দিবাভাগে F-1 ও F-2 দুটি পৃথক স্তরে বিভক্ত হয়, রাত্রে তারা আবার জোড়া লাগে। কোন্ স্তরে বায়ুর কোন্ উপাদান আয়নিত হচ্ছে শিশিরকুমার সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে প্রকৃতির বিরাট পরীক্ষাগারে দিনে রাত্রে যেসব ঘটনা ঘটছে, তার সম্পর্কে রহস্য আজও অনুদ্ঘাটিত রয়েছে। কিন্তু যেসব বিজ্ঞানী ধীরে ধীরে সেই যবনিকা উন্মোচন করছেন, শিশিরকুমার মিত্র তাঁদের অন্যতম।

উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণা খুব বেশি দিনের নয়। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর বহু স্থানের বহু বিজ্ঞানী অনেক তথ্য আহরণ করেছেন। শিশিরকুমার মিত্র সেসমস্ত সংগ্রহ করে The Upper Atmosphere নামে এক বৃহৎ প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। রাশিয়া সমগ্র পুস্তকখানি নিজ ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছে। এর আগে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বলিত কোনো পুস্তক এত সমাদর লাভ করে নি।"

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ১৯৩৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে হয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি। অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন (১৯৪২ সালে কলকাতা রোটারি ক্লাবের সভাপতি, ১৯৫১-৫৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, ১৯৫৯ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের সভাপতি, ইত্যাদি)। ১৯৫৬ সালে তিনি পশ্চিম বাংলা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হন এবং ১৯৬২ সালে পদার্থবিদ্যার জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব পালন করেন।

রয়াল সোসাইটির সভাপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুও এই সম্মান লাভ করেন একই বছরে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের পূর্বে যেসব ভারতীয় বিজ্ঞানীকে রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচন করে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে :

এ কার্সেটজি	১৮৪১
শ্রীনিবাস রামানুজন	১৯১৮
জগদীশচন্দ্র বসু	১৯২০
শ্রীচন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ	১৯২৪
মেঘনাদ সাহা	১৯২৭
বীরবল সাহানী	১৯৩৬
কে এস কৃষ্ণান	১৯৪০
হোমি জে ভাবা	১৯৪১
শান্তিস্বরূপ ভাটনগর	১৯৪৩
এস চন্দ্রশেখর	১৯৪৪
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ	১৯৪৫
ডি এন ওয়াদিয়া	১৯৫৭

ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, "ডঃ মিত্র দেশে গবেষকমণ্ডলী তৈরি করে গিয়েছেন। তাঁরা আজ অধ্যাপনা ও গবেষণার দ্বারা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করছেন। দেশের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলি গড়বার কাজে তিনি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ও অধ্যাপক ডি এম বসুর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের পঠনপাঠন সম্ভব।"

ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের অমর স্মৃতির উদ্দেশে আমরাও প্রণাম জানাই।

হিমাদ্রি-নীলাদ্রি কথা

গত ১৪ই আগস্ট বুধবার চিড়িয়াখানায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু দুটি নতুন অতিথি পরিদর্শনে এলেন। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বিরল সম্পদ দুটি শাদা বাঘই এই আগমনের কারণ। এদের নাম দিয়েছেন রাজ্যপাল হিমাদ্রি আর নীলাদ্রি। চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রী আর. কে. লাহিড়ী স্বয়ং রেওয়া গিয়ে তিন বছর বয়স্ক নয় ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা এই দুই শার্দুলপুঙ্গবকে গোবিন্দগড় প্রাসাদ থেকে সঙ্গে নিয়ে গত সোমবার কলকাতায় এসে পৌঁছন। এদের জন্যে বিশেষ যত্ন করে খাঁচা তৈরী হয়েছে। খাঁচার সামনে এদের বংশতালিকা যত্নে রক্ষিত আছে। রাজ্যপাল তার ওপরেই এদের নাম স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন।

উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের কাছে রেওয়া রাজ্য হল ভারতের সবচেয়ে দুর্লভ প্রাণী শ্বেত ব্যাঘ্রের বাস। সেখানে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিকারীরা রেওয়ার জঙ্গলে নাকি মাত্র নয়টি শাদা বাঘ দেখতে পেয়েছেন।

১৯৫১ সালে রেওয়ার মহারাজা প্রায় নয় মাস বয়সের একটি শাদা বাঘ ধরেন। রেওয়ার গোবিন্দগড় প্রাসাদে একে রাখা হয়। এই বাঘ (মোহন) এবং একটি সাধারণ হলদে বাঘিনীর চারটি বাচ্চা হয়। একটি সাধারণ হলদে বাঘিনী (রাধা) আর তিনটি বাঘ। মোহন আর রাধার তিনবার যে বাচ্চা হয় সেগুলি হল ১৯৫৮তে তিনটি শাদা বাঘিনী এবং একটি শাদা বাঘ। এদের মধ্যে একটি শাদা বাঘিনী (মোহিনী) এখন আমেরিকায়। ১৯৬০ সালে এদের দুটি শাদা বাঘ ও একটি হলদে বাঘিনী জন্মায়। এই দুটিই হল কলকাতার হিমাদ্রি আর নীলাদ্রি। ১৯৬২তে এদের আর একবার বাচ্চা হয়েছে—দুটি শাদা বাঘ আর একটি শাদা বাঘিনী।

১৫ই আগস্ট থেকে এই শাদা বাঘ দুটি জনসাধারণ দেখতে পাচ্ছেন। পরে এদের [illegible] পাঠান হবে। সকলেই জানেন যে এই জায়গাটি ভ্রমণকারীদের পক্ষে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছেন।

মোহন ও রাধার দ্বিতীয়বারের সন্তান যে স্বাভাবিক রঙের বাঘিনী সেটিকেও কিছুদিন বাদে এই বাঘের সঙ্গিনী হিসেবে আনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

দেশবিভাগের পরে রেওয়ার মহারাজার পক্ষে দুটি রাজপ্রাসাদ রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। মহারাজা স্বয়ং থাকেন রেওয়ায় আর সেখান থেকে কিছু দূরে হল একশো কুড়ি কামরার গোবিন্দগড় প্রাসাদ—যেখানে এই শ্বেত ব্যাঘ্রগুলিকে সযত্নে রাখা হত। এদের ভরণপোষণ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠায় একবার কথা হয়েছিল বাঘগুলি আবার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন নানাদিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে যে গৃহপালিত ব্যাঘ্র জঙ্গলে ছেড়ে দিলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য এবং ভারতবর্ষের একটি দুর্লভ এবং অতি বিরল প্রাণীর বিলোপ ঘটবে। এখন বিভিন্ন রাজ্যগুলি যদি এদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেয় এবং এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে ত বিদেশে চালান দিয়ে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি করা অসম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হয় তবে আমরা শ্বেত ব্যাঘ্রের বংশবৃদ্ধি কামনা করি।

আলোক সেন

সেকালের পাতা : একালের চোখ

রত্নাকর

'সাহেব লোক' যে ভাষায় কথা বলত তাকে কোন ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে ফেলা যায় না। নানা ভাষার নানা শব্দ একসঙ্গে মিলেমিশে বিচিত্র ধ্বনি তুলত। মনের ভাব ব্যক্ত করার এই কিঞ্চিৎ আদিম পদ্ধতিতে খুশী হতে পারেননি কিছু কিছু রুচিবান ভদ্রলোক। হিন্দুস্থানী অভিধান তৈরী হল। এই প্রসঙ্গে খিচুড়ি ভাষারও কিছু নমুনা দেওয়া হল।

সেকালের দুর্গোৎসব ছিল বিত্তের বিজ্ঞাপন; শুধু বিজ্ঞাপন নয় প্রতিযোগিতাও। বাইজীর নাচগান সেই উৎসবের প্রধান প্রাণকেন্দ্র, কে আগে সবচেয়ে বিখ্যাত বাইজীকে বায়না করতে পারে তার জন্য প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না। লোকের ভিড় হত। সাহেব লোক পদধূলি দিতেন। আত্মপ্রসাদ পেতেন বিত্তবান। এই রকমের একটা সংবাদ দেওয়া হল।

আরমানিরা বড় ধুরন্ধর। হাট-বাজারের খবরাখবর তাদের নখদর্পণে। অন্দরমহলের কেচ্ছাও তাদের জানা। তাই সেকালে বাদশার কাছে দরবার করতে যাওয়ার সময় ইংরেজরা আরমানি বণিক দলে নিতে ভুলত না। কোম্পানীর আমলে আরমানিদের প্রতিপত্তি না থাকলেও প্রাচীন ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল তার প্রমাণ নিকি বাইজীর গুপ্তকথা। সেই খবরটি এবার সংকলিত হল।

'সাহেব লোক' এ দেশে এসেও সে-দেশী। কলকাতার গরমে রাত চারটা অবধি নেচেও সাধ মেটে না। তাই নানা ক্লাব গড়ে ওঠে। এমনি একটা ক্লাব হল এমফিয়ন ক্লাব। কিন্তু সে ক্লাবেরও রীতি আছে। ক্যালকাটা জার্নাল থেকে সেই ক্লাবের খবর দেওয়া হল।

আজকাল প্রতিমার সামনে সঙ হয়ে নাচা কোন ঘটনার মধ্যে পড়ে না। দৃশ্যটা দৃষ্টিকটু হলেও আমরা সবাই মোটামুটি মেনে নিয়েছি; ব্যাপারটা আজ হয়েছে গা-সওয়া। কিন্তু সেবার সরস্বতী পুজো উপলক্ষে সঙ নাচার জন্য যে জরিমানা দিতে হয়েছিল সেই খবর সমাচার দর্পণ থেকে সংকলিত হল।

হুকুম করো এক বটটল সিমকিন

ক্যালকাটা 'জার্নাল' সম্পাদক
সমীপেষু,

মহাশয়,

এই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলার সময় যে ধরণের ভাষা ইয়োরোপীয়রা ব্যবহার করে থাকেন তা শুনতেও কষ্ট হয়।......

সে ভাষা আরবী নয়, ফার্সী নয়, সংস্কৃত নয়। সে নয় ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ইংরাজী, ফরাসী বা স্প্যানিশ। অথচ এই সবকটি ভাষার শব্দ এসে ঢুকে পড়ে কথার সঙ্গে। শুধু তাই নয় এর মাঝে মাঝে আবার শুনতে পাওয়া যাবে বাঙলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কথ্য শব্দ;— যাকে বলা হয় 'দখনো ভাষা'। অবশ্য ভাষার মূল কাঠামো হল হিন্দুস্থানী। সেই হিন্দুস্থানী ভাষার সঙ্গে এসে পড়ছে এতগুলো ভাষা ও উপ-ভাষার শব্দ। ফলে এই ভাষা কোন ব্যাকরণের ধার ধারে না। কথাটা সত্যি এবং সত্যি বলেই আমি লজ্জিত। এই হল কলকাতার 'সাহেব লোক'দের ভাষা।

এই জগা-খিচুড়ি ভাষা কি করে উদ্ভব হল জানি না। জানি না কি করে ভাষার মধ্যে এইসব অনাচার এল। কিন্তু হেডলে, ফার্গুসন প্রমুখ ব্যক্তিরা অকৃত্রিম হিন্দুস্থানীর পক্ষপাতী। ভাষার অনাচারে তাঁদের হাত যেন একেবারে নেই এ কথা বলা চলে না। ডঃ জন বরথউইক গিলখিস্টে প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিত। কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য তিনি হিন্দুস্থানী অভিধান বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার নিশ্চয়ই গভীর মূল্য আছে। তবু তাঁর রচনাও ত্রুটিমুক্ত নয়।.. ...

কলকাতার বাজারচলতি সাহেবী হিন্দুস্থানীর নমুনা দেওয়া যাক:

দয়া করে চুপ কর ... চুপ ইউ শোর
এই মালী, সব্জি দে ... ইউ মালী
ডোলি লাও

এক বোতল শ্যামপেন দাও ...

হুকুম করো এক বটটল সিমকিন।

শুনেছো, তপসে মাছগুলো টাটকা নয়...

ম্যাংগো পিস বে করতো ইউ, শুনো।

ঘোড়ার অসুখ করেছে ...

গোরা সিকম্যান হ্যায়
যা চলে যা ... যাও জাহান্নাম

এই হল ভাষার নমুনা। এই অবস্থায় আমি কথ্য হিন্দুস্থানীর একখানি অভিধান প্রণয়ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।...আমি সাধারণের উপকারের জন্য এই পরিশ্রম করছি এবং এর জন্য কোন পুরস্কার আশা করি না। বিচক্ষণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমার কাজের মর্যাদা দিলেই যথেষ্ট......।

ভবদীয়
কলকাতার একজন প্রবীণ বাসিন্দা
চাঁদনী চক
৩০শে অগস্ট, ১৮১৯।
(ক্যালকাটা জার্নাল। ৩১-৮-১৮১৯
অনূদিত।)

দুর্গাপুজো হল হিন্দুদের মহাপুজো। এই উপলক্ষে এদেশের বড়লোকদের মধ্যে জাঁকজমকের অন্ত থাকে না। আনন্দ-উৎসব হয় এবং সেই উৎসবের মধ্যে রেষারেষি লেগেই থাকে। বিত্তবানেরা নাচের আসরের জন্য তৈরি হয়। কার বাড়িতে নাচের আসর ভাল হয়—এই হল প্রধান তর্ক।

প্রতি বছরই মহারাজা রামচন্দ্র রায় এবং নীলমণি ও গোষ্ঠদাস মল্লিকের বাড়ি দুর্গাপুজো উপলক্ষে মহা আড়ম্বর হয়। তাঁদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা বিভিন্ন প্রকারের আমোদ-প্রমোদ ও উচ্ছ্বসিত স্ফূর্তির আসর হয়ে ওঠে। এ বছরের পুজোতেও তাঁরা সেই আড়ম্বর করতে চান। উল্লিখিত বিত্তবান ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধবরা আগামী উৎসবের প্রস্তুতি পর্বের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বছরের আসরের জন্য তাঁরা বিখ্যাত বাইজী ও নর্তকীদের বায়না করেছেন। এদের আসরে নিয়ে আসতে এবং গান গাওয়াতে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে এত বিপুল ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য। যাঁরা নিকি বাইজীর মদির কণ্ঠস্বর শুনেছেন অথবা দেখেছেন তার বিষন্ন সুন্দর লাবণ্য অথবা আসরুণ বেগমের বিলোল কণ্ঠে শুনেছেন বিচিত্র রাগের কাজ তাঁদের পক্ষে আগামী পুজোর আকর্ষণী অবশ্যই দুর্নিবার। অনিন্দসুন্দর কণ্ঠে এই রাগবৈচিত্র্য শোনার জন্য তাঁরা সব কিছু করতে প্রস্তুত।

কিন্তু এই বছরের পুজোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল নুরবকসীর আবির্ভাব। প্রাচ্য সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ

নিদর্শন এই তরুণী গায়িকা এই বছর প্রথম আত্মপ্রকাশ করবেন। যাঁদের নুরে নকসীকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা সবাই এই গায়িকা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। তাঁরা সবাই একে অসাধারণ বিশেষণে ভূষিত করে থাকেন। যাঁরা সুর তাল রাগ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন, যাঁরা রসবেত্তা তারাও নুরেবকসীর অসাধারণ প্রতিভা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয়। আশা করা যায় আরও পরিণত বয়সে এবং সাধনার পর নুরেবকসী প্রাচ্য সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন বলে বিবেচিত হবেন। তিনি অনায়াসে নিকি ও আসুরুণের পাশে আপনার স্থান করে নিতে পারবেন।

উল্লিখিত বিত্তবান ব্যক্তিদের প্রাসাদ সাজান যে কি ভাবে হয় তা বর্ণনা দিয়ে বোঝান আমাদের পক্ষে অসম্ভব। শব্দ ব্যবহার করে আমরা সেই আড়ম্বরের অস্পষ্টতম রূপও পাঠকদের দৃষ্টির সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারব না। ইয়োরোপীয় শিল্পের মহামূল্য নিদর্শন, বিচিত্র ঝাড়লণ্ঠন ও আয়না ইত্যাদি সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। এর জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করা হয়েছে। প্রাচ্য দেশের সমস্ত কল্পনাশক্তি ও রুচিবোধ দিয়ে এই আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানকে বিচিত্র করে তোলা হবে।

যাঁরা কলকাতার দুর্গোৎসব দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত তাঁদের বলি আরব্য রজনীর আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী স্মরণ করতে। সত্যি কথা বলতে কি আগামী ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে তারিখে রাজা রামচন্দ্র রায়ের প্রাসাদে সত্য হবে আরব্য রজনীর অবিস্মরণীয় ঘটনা।

(ক্যালকাটা জার্নাল। ২২-৯-১৮১৯ অনূদিত)

ক্যালকাটা জার্নাল সম্পাদক সমীপেষু,
মহাশয়,

গত শনিবারের হরকরায় প্রকাশিত "দুর্গাপূজায় নাচের আয়োজন" শীর্ষক সংবাদ আমি এইমাত্র পাঠ করেছি। এই সংবাদের একটি অনুচ্ছেদে বিনি ওরফে বুন্নোজান বাইজী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমি কিছু নিবেদন করতে চাই। আপনি সত্যের পূজারী। তাই আপনার পত্রিকা মারফৎ সাধারণ্যে আমি একটি সত্য ঘটনা প্রকাশ করতে চাই। হরকরার সংবাদে বলা হয়েছে যে বিনি হল কাশ্মীরী। বিনি যদি কাশ্মীরী হয় তবে আমিও কাশ্মীরী। কিন্তু আমরা কেউই কাশ্মীরী নই। বিনিরও জন্ম হয়েছে এই কলকাতায়। এই কলকাতাতেই সে মানুষ হয়েছে। বিনির মায়ের নাম রূতন। ভুলুর বাড়িতে রূতনের গর্ভে বিনির জন্ম হয়। এই ভুলু এখনও জীবিত আছে। কলুটোলায় তার বড় ইয়োরোপীয় কায়দায় সাজান বাড়িতে ভুলু এখন বাস করছে। ভুলু এবং রূতনের মুখে আমি শুনেছি যে বিনির বাবা কলকাতার একজন ইংরেজ মার্চেণ্ট। বিনির জন্মানোর পরই তার বাবা এই ইংরেজ মার্চেণ্টের কাছ থেকে বিনিকে সরিয়ে ফেলা হয়। এই অবসরে বিনি বোধহয় কাশ্মীরী হয়ে উঠেছে। গত বুধবার একজন বিত্তবান মোগল বণিকের সঙ্গে তিন মাসের জন্য বিনির বিয়ে হয়। বিয়ের কথা কোন চাপা ব্যাপার নয়। বিয়ের যৌতুক হিসাবে মোগল বণিককে দিতে হয়েছে নগদ এক হাজার টাকা এবং এ ছাড়া প্রতি মাসে দিতে হবে দুশ টাকা। বিনির পাতানো-খালা (কাকা) ফৈজ বক্সের বাড়ি বিনির

নুর বকসীর আবির্ভাব

এই বিয়ে উপলক্ষ্যে বিরাট ভোজ ও নাচগানের আয়োজন করা হয়। কলকাতার সমস্ত নর্তকী ও বাইজীরা কর্তব্যবোধে এই বিবাহ বাসরে উপস্থিত থেকে নাচ ও গীত পরিবেশন করেন।

ইতি—
আপনার অনুগত ভৃত্য
একজন আর্মানী

চন্দননগর
১৭-১০-১৮১৯
(ক্যালকাটা জার্নাল। ২২-১০-১৮১৯ অনূদিত।)

কি ভয়নক ব্যাপার

কুক কোমপানিরা একজন মোগলকে ঘোড় দৌড়ের চাকর রাখিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি ঘোড় দৌড়ে চারি শত টাকা জিতিয়া সাহেবদিগের নিকট একশত টাকা পারি-তোষিক চাহিয়াছিল সাহেবরা কহিলেন ৮ টাকা বেতনে চাকর রাখিয়াছেন পুনর্বার পারিতোষিক কেন দিবেন, ইহাতে গতকল্য বেলা নয় ঘন্টা কালে ঐ মোগল কুক সাহেবদিগের ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার উপর চড়িয়া বাহির হইয়া যায়, ঐ কালীন দৌবারিক প্রতিবন্ধক হইয়াছিল তাহাকে সেইখানেই তলবারাঘাতে নিপতিত করে পরে লাল দীঘার নিকট দুইজন ও জগন্নাথ ঘাটে একজন চৌকীদারকে আঘাতী করিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া রাজা নরসিংহ চন্দ্র রায়ের বাটীর ভিতরের বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, চারজন চৌকীদার আসিয়া নানা কৌশলে ঐ স্থানে তাহাকে ধৃত করিয়া পোলিসে লইয়া গিয়াছে, আমারদিগের দৌবারিক কহিল আঘাত ব্যক্তিরা কদাচিত রক্ষা পায়।

(সম্বাদ ভাস্কর—৯ই মাঘ ১২৬০)

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা নগরীয় শোভাবাজার বট-তলা স্থানীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়কারী শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন শীল কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, শ্রীরামপুরীয় পাদরি শ্রীযুক্ত মাস্যমেন সাহেবের মহাভারত ছাপার পরে এই ছাপা হইল, মধুসূদন শীল অগ্র গ্রাহক-দিগের স্থানে চারি টাকা, নগদ ক্রেতাদিগের স্থানে পাঁচ টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যে মহাভারত পাঠ শ্রবণ করিতে ধনিগণের সহস্র ২ টাকা পার হইয়া যায়, আমার-দিগের পাঠক মহাশয়েরা কি পাঁচ টাকাতেও সে মহাভারত পাঠ করিতে অশক্ত হইবেন।

[সম্বাদ ভাস্কর, ৯ই মাঘ ১২৬০ (১৮৫৪)]

শুনা গেল যে ধোপাপাড়া নিবাসি রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকাশী-নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীসরস্বতী প্রতিমার বিসর্জ্জনের দিবসে প্রতিমা সমভিব্যাহারে এক সং বাহির করিয়াছিলেন তাহার ভাব এই সাধারণ কথা আছে যে, পথে হাগে আর চক্ষু রাঙ্গায়। এইভাবে একটা মনুষ্যাকার পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া সম্মুখে একটা জলপাত্র রাখিয়াছিলেন ইত্যাদি তাহার ভাব শুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাতে সংশুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় পুলিসে ধৃত হইয়াছিলেন পরে বিচারকর্ত্তা সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে, তুমি তোমারদিগের দেবতার সম্মুখে এপ্রকার কদর্য্যাকার সং করিয়াছ এ অতি মন্দ কর্ম্ম ইত্যাদি কথায় অনেক ভর্ৎসনা করিয়া শেষ ৫০ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড করিয়াছেন।

সমাচার দর্পণ। ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮২৫। ২৫ মাঘ ১২৩১)।

ভারতচন্দ্র রায়কৃত অন্নদামঙ্গল ভাষা-গ্রন্থের অন্তঃপাতি বিদ্যাসুন্দরবিষয়ক এক প্রকরণের ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে।

(সমাচার দর্পণ। ১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮)।

লেডিজ অব দি প্রেসিডেন্সি অবি-বাহিতদের জন্যে বল নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন গত সোমবার সন্ধ্যায়। এই অনুষ্ঠান যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। রাতের ভীষণ উপেক্ষা করে এই নাচ চলেছিল ভোর চারটা অবধি।

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২০)

ভোরের আলো আকাশে ফুটছে।

রাত্রির অন্ধকার কেটে গেল। তারই সঙ্গে পালাল সারা রাত ধরে জমা হচ্ছিল মনের মধ্যে যে ভয়, যে আশঙ্কা, যে দুর্ভাবনা। আশ্চর্য প্রকৃতির সঙ্গে মনের মিল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে এখন মনে হচ্ছে কাল রাত্রে কেন আমি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলাম। যে কোন কারণেই ঐ বন্ধ বাড়ীতে আলো জ্বলুক না কেন তাতে আমার ভাবনার কি আছে। এ বাড়ীতে আমার শত্রু তো কেউ নেই।

আমি মনে মনে ঠিক করেই নিয়েছিলাম, রাত্রের ঐ বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা কারুর কাছেই বলব না। কি দরকার, হয়ত শুনে সবাই হাসবে।

কিন্তু চায়ের টেবিলে বসে আপনা থেকেই ঐ প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। অবশ্য কথাটা এল গল্পচ্ছলে। আলোচনা হচ্ছিল ভূতের অস্তিত্ব আছে কিনা তাই নিয়ে।

তুবড়ী গম্ভীরভাবে বলল, ভূত আছে।

শীলা থামিয়ে দেয়, বাজে বকিস্ না।

—তুমি এ বাড়ীতে থাক না, দেখিয়ে দেব।

—তুই চোখে দেখেছিস?

—দেখেওছি, তার কান্নাও শুনেছি। তুমিও তো শুনেছ, বলনা অনুদি।

আমায় সালিশী মানায় আমি হেসে ফেল্লাম।

তুবড়ী তাতে রেগে যায়, তুমি শোননি কান্না, সত্যি কথা বল।

হেসে বল্লাম কান্না শুনেছি বটে, কিন্তু তা মানুষের কি পাখীর, না জন্তুর তা বুঝতে পারিনি।

দিদিমণি আমাদের কথা শুনেছিলেন, বল্লেন তুমিই একমাত্র ব্যতিক্রম, এ বাড়ীতে যেই আসে সেই নাকি ভূত দেখতে পায়। কখনও বা ঠক্ ঠক্ শব্দ, নিঃশ্বাসের আওয়াজ, কে যেন চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয় আলো জ্বলছে, নিভছে, এই পর্যন্ত বলেই দিদিমণি সশব্দে হাসতে লাগলেন, আসলে কি জান সবই মনের ভুল। এত বড় বাড়ীতে তো থাকা অভ্যেস নেই। তাই মনের মধ্যে যে সব ভয় জমা হয়ে থাকে, তারই কল্পনার ছবি এই বাড়ীর উপর আরোপ করে কথাটা এতদূরে ওঠায় স্বীকার না করে পারলাম না কাল আমিও কিন্তু পুবদিকের ঐ ভাঙ্গা অংশটায় আলো জ্বলতে দেখেছি।

দিদিমণি আরও হাসলেন, এইরে, তাহলে তোমারও শুরু হয়েছে। এরপর দেখবে আলো শুধু জ্বলছে না, নাচছেও। এগুচ্ছে, পেছুচ্ছে, নিভছে, কতরকম হচ্ছে।

ওঁর কথা বলার ধরনে আমরা সকলেই হাসলাম। শুধু হাসলেন না একজন, তিনি ব্রজবালা দেবী। দেখি একমনে ছুরি দিয়ে আপেলের খোসা ছাড়াচ্ছেন, কিন্তু চোখ দুটো আমার উপর নিবদ্ধ।

চা-পানের পর আমি তুবড়ীকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলাম। তুবড়ী জিজ্ঞেস করল, কি এখন অঙ্ক কষতে হবে নাকি?

বল্লাম, না। তোমাকে একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করার আছে।

—বল।

যতদূর সম্ভব গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলাম, কেন তুমি কাল আমায় মিথ্যে কথা বলেছ?

—কি কথা?

—কমলেশবাবুর মনিব্যাগ তুমি নাওনি।

—সত্যিই তো আমি নিইনি।

—এখনও মিথ্যে কথা বলছ?

তুবড়ীও কিন্তু রুখে উঠল, না আমি নিইনি।

—আমি তোমার ঘর থেকে ঐ ব্যাগ পেয়েছি।

—আমার ঘর থেকে, কোথায় ছিল?

আলমারিতে কোটের পকেটে ছিল। এখনও বল তুমি নাওনি।

তুবড়ী জোর দিয়ে বলে, মিথ্যে কথা। আমি নিইনি।

বিরক্ত হয়ে বললাম, আমি নিজে তোমার কোটের পকেট থেকে ঐ ব্যাগ উদ্ধার করে কমলেশবাবুকে দিয়ে এসেছি।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—আমারও ইচ্ছে করছে তোমার মার মত সজোরে একটা চড় মারি, মিথ্যেবাদী, সত্যি কথা বলবার এতটুকু সাহস পর্যন্ত নেই।

তুবড়ী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল তারপর ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ে, বলে, আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি ঐ ব্যাগ আমি নিইনি। আমি মিথ্যেবাদী, আমি চোর সত্যি কথা, কিন্তু ঐ ব্যাগ আমি নিইনি। অন্যদের কাছে হাজার মিথ্যে বললেও তোমার কাছে আমি মিথ্যে বলি না। কারণ—

তুবড়ী কথাটা শেষ করতে পারল না, চোখে তার জল এসে পড়েছিল। বুঝতে পারলাম সে বলতে চাইছে। 'কারণ, তুমি আমায় ভালবাস'।

আমি ডাকলাম তুবড়ী।

তুবড়ী চট করে উঠে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমাকে এক মহাসমস্যার মধ্যে ফেলে দিল তুবড়ী। ব্যাগ আমি ওর ঘর থেকেই পেয়েছি, চুরি করা ওর অভ্যাস জানি, তবু কেন জানি না, তুবড়ীর কথাগুলো অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কে ঐ ব্যাগ কমলেশবাবুর কাছ থেকে সরিয়ে এনে, তুবড়ীর জামার পকেটে রেখে দিয়েছিল? কি তার উদ্দেশ্য?

একটু পরে লক্ষ্মীর মা এসে জানাল, ব্রজবালা দেবী আমায় খুঁজছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, উনি কোথায়?

—নিজের ঘরে।

—দিদিমণি কি করছেন?

—আজকে বড় ঘর খোলা হয়েছে সারাদিন ঐ কাজেই কেটে যাবে। বাবা, কম জিনিস ওঘরে!

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা লক্ষ্মীর মা, ভুতুড়ীর ঘরের কাজ কে করে?

—আমিই করি।

—মানে বলছি, জামাকাপড় গুছিয়ে রাখা, আলমারির জিনিসপত্র দেখা।

লক্ষ্মীর মা হাসল, ও মা দুপুর বেলা, আমারে একটু ভয় করে, আর কে সাহস করে ঢুকবে।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম লক্ষ্মীর মা জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ একথা শুধোলে কেন গা দিদি? কিছু হয়েছে?

বললাম, না, গতকাল ওর ঘরে আর কেউ ঢুকেছিল কিনা তাই জানতে চাইছিলাম।

—কাউকে দেখিনি তো।

আমি যখন ব্রজবালা দেবীর ঘরে এলাম, উনি দেরাজ খুলে কিছু খুঁজছিলেন।

আমাকে দেখে বসতে বল্লেন।

আমি চেয়ারে বসে কাগজটা উল্টে-পাল্টে দেখছি, উনি বল্লেন, দেখতো, Seeker-এর লিখা বেরিয়েছে কিনা।

ভুলে গিয়েছিলাম আজ সোমবার। সাপ্তাহিক কাগজ উল্টে দেখি Seeker-এর কলম শুরু হয়েছে।

বললাম, হ্যাঁ বেরিয়েছে।

ব্রজবালা দেবী আলমারি বন্ধ করে আমার পাশে এসে বসলেন, পড় না শুনি।

Seeker লিখছে, যদি সহ্যশক্তির কথাই বলতে হয় আমি বলবো মেয়েদের মত সহ্যশক্তি পুরুষের নেই। মনে পড়ছে অনেকদিন আগের একটি ঘটনা, একটা আট-দশ বছর-এর দুষ্টু বালক সে তাদের বাড়ীর রেলিঙ টপকে বাইরে যাবার চেষ্টা করছিল, লাফ দিতে গিয়ে বোধহয় তার পাটা ফসকে যায়, রেলিঙের উপরকার বর্শার মত ছুঁচোল ফলাকে তার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। ছেলেটি অসহায় অবস্থায় সেই রেলিঙের উপর থেকে চেঁচাতে শুরু করে যারা এ দৃশ্য দেখছিল, সকলেই ভয়ে সচকিত হয়ে ওঠে। ছেলেটির পেট বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, তার সঙ্গে আর্ত চীৎকার, এ দৃশ্য সত্যিই ভয়াবহ। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সেই বালকের মা নির্ভীকচিত্তে কাছে এগিয়ে এলেন নিজের হাতে সন্তানকে তুলে নিয়ে গাড়ী ডাকিয়ে চললেন হাসপাতালে। সেদিন তাঁর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র দেখিনি, সন্তানের কাতর উক্তি তাঁকে বিচলিত করেনি। পুত্রের যন্ত্রণা দেখে উনি নিজেকে এতটুকু দুর্বল করেননি ডাক্তাররা যেভাবে চিকিৎসা করতে চেয়েছেন তিনি তাতে সম্মতি দিয়েছেন।

ছেলে নিজে কষ্ট সহ্য করতে না পারলেও তার হয়ে তার মা পারেন। এই কথাটা বলবার জন্যেই উপরের ঘটনাটা উল্লেখ করলাম। আমি বলতে চাই নারীর এ সহ্যশক্তি না থাকলে সংসার চলত না। ক্রমশঃ সংসারে অচলাবস্থা দেখা যেত।

আমার এ লেখা পড়ে পুরুষ পাঠক মাত্রেই কটাক্ষ করবেন জানি, বলবেন নারীর প্রতি এ পক্ষপাতিত্ব আমার কেন। আমি বলব—

এই পর্যন্ত যেই পড়েছি, ব্রজবালা দেবী থামিয়ে দিলেন। বললেন—আবার গোড়া থেকে পড়ত মা।

আমি বললাম—এখনও শেষ হয়নি।

—জানি। আবার পড়।

পড়লাম। শুধু একবার নয় বৃদ্ধার অনুরোধে তিন-চারবার ওঁকে ঐ লেখাটি শোনালাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ঘটনার উল্লেখ Seeker করেছে তা অত্যন্ত মামুলি। তা এতবার পড়বার কি আছে? কিন্তু আশ্চর্য শেষবার পড়া শেষ করে যখন ব্রজবালা দেবীর মুখের দিকে তাকালাম মনে হল উনি সম্পূর্ণ অন্য জগতে চলে গেছেন। মুখে প্রসন্ন মৃদু হাসি, অথচ চোখ দিয়ে নীরব জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। অস্ফুটস্বরে বললেন—এই Seeker-এর সঙ্গে যেমন করে হোক আমার আলাপ করতে হবে। কে এই মানুষটা? কেমন করে আমার মনের কথা সে জানতে পারে?

নিজেকে সামলাতে বৃদ্ধার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ ভাল কথা, তখন তুমি কি বলছিলে মা? কাল কোন ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছিলে?

বললাম, আমাকে এ প্রশ্ন করবেন না। শুধু কালকের রাতের ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিলাম।

দেখলাম ব্রজবালা দেবী বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। বললেন—তোমার একলা ঐ বাড়ীতে যাওয়া উচিত হয়নি।

বললাম—আমিও যেতে চাইনি। কিন্তু কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল।

—তুমি স্পষ্ট দেখেছ আলো জ্বলছে? আবার আলো নিভতেও দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—পায়ের শব্দ তোমাকে অনুসরণ করছিল বলে তোমার মনে হয়।

—হ্যাঁ।

তোমার ঘরের দরজার কাছে সেই পদশব্দ থামে।

—হ্যাঁ।

—বৃদ্ধা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—যদি এ ধরণের কিছু দেখ বা শোন কখনও একলা তার পিছু পিছু যেও না।

—জিজ্ঞেস করলাম—কেন? কিসের ভয়?

কে যেন আমার মুখে কথা জুগিয়ে দিল—কালকেও ত রাখছিলেন?

শীলা আরও চমকে ওঠে—কে বললে?

মিথ্যে বললাম—আমি দেখেছি।

শীলা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। জানবার চেষ্টা করল আমি কিছু বুঝতে পেরেছি কিনা। কিন্তু সে সুযোগ আমি তাকে দিলাম না। শুধু মৃদু হাসলাম। কিন্তু শীলার মুখ দেখে বুঝতে বাকি রইল না—কে কাল তুবড়ীর পকেটে কমলেশ-বাবুর মনিব্যাগ রেখে গিয়েছিল।

কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?

ঘরে ফিরে এসেও আমি এর কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না। শীলা কি ইচ্ছে করে ব্যাগটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল ধরা পড়ুক। চুরির অপরাধে দিদিমণির কাছে আবার শাস্তি পাক।

কিন্তু এতেই বা শীলার কি লাভ?

আমি অনেক ভেবেও এর কোন কিনারা করতে পারলাম না।

সেদিন বিকেলে লক্ষ্মীর মা চা আমার ঘরে নিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলাম—আজ ঘরে কেন লক্ষ্মীর মা? টি, টেবিলে ওনারা বসছেন না?

লক্ষ্মীর মা জানাল—দিদিমণিরা বাইরে কোথাও গেছেন—। গিন্নীমার দরজা বন্ধ. তাঁর চা ভেতরেই দিয়ে আসা হয়েছে।

আমি চা পান শেষ করে ঘরের মধ্যে আর বসে রইলাম না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে হাঁটতে লাগলাম। নিস্তরঙ্গ গঙ্গা, ফুরফুরে

আপনি এ ঘরে?

পরে ঐ টাকাটা আত্মসাৎ করবে বলে? মাত্র পঞ্চাশটা টাকার জন্যে অত বড়-লোকের মেয়ে, যার টাকার কোন অভাব নেই, সে এ-কাজ করবে কেন?

কিন্তু আর একটা কারণ হতে পারে. শীলা হয়ত চেয়েছিল তুবড়ীর ঘর থেকে ঐ মনিব্যাগ বার হোক,—সে করে হাওয়া বইছে। সূর্য অস্ত গেছে কিন্তু এখনও অন্ধকার নামেনি। এ-বাড়ীর কাছের ঘাটটা অনেক পুরনো। কয়েকটা ধাপ ভেঙে গেছে। তাই সন্ধ্যের দিকে কেউ বড় একটা স্নান করতে আসে না। অনেকদিন বাদে নিজেকে একলা পেয়ে বেশ ভাল লাগল। বাড়ীর কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে গগন সেনের কথা। পরশু আবার তার সঙ্গে দেখা হবে। আজই আমার উচিত ছিল ব্রজবালা দেবীর কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নেওয়া। বাড়ী ফিরেই সে কথা তুলব অখন।

সন্ধ্যা নামতেই বাড়ী ফিরলাম। তখনও ব্রজবালা দেবীর ঘর বন্ধ। লাই-ব্রেরীতে গিয়ে বসলাম। টেনে নিলাম একখানা বই। কিন্তু পড়তে ভাল লাগল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে চলল। লক্ষ্মীর মা এসে জিজ্ঞেস করল—খাবার দিয়ে দেব?

প্রশ্ন করলাম—একলা আমার?

—আর ত কেউ খাবার নেই। গিন্নী-মা আমায় বলে দিয়েছেন—খাবেন না।

অগত্যা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রথমটা নিজেকে একলা পেয়ে ভালো লাগছিল। কিন্তু এতক্ষণ একটানা চুপচাপ থেকে কেমন যেন ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত তখন কত জানি না। পাখীর কর্কশ চীৎকারে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। আমি বিছানার উপর উঠে বসলাম। বাইরে অন্ধকার। কেন জানি না—কালকের মত কৌতূহল জাগল. আজও কি এ-বাড়ীর পোড়ো অংশে রহস্যময় আলো জ্বলছে? উঠে জানলার কাছে দাঁড়াতেই এক অজানা আশঙ্কায় আমার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম কালকের সেই ভয়াবহ আলো আজও জ্বলছে। শুধু জ্বলছে নয়, আলোটা দুলছেও।

আজ কিন্তু আর সাহস করে বাইরে বেরুলাম না। মনে পড়ল ব্রজ-বালা দেবীর কথা। তাঁকে ডেকে দিতে বলেছিলেন। অতি সন্তর্পণে তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। মাঝ-খানের দরজা খোলাই ছিল। ও'র ঘরের মধ্যে ঢুকে চাপা গলায় ডাকলাম—শুনছেন, আমি অপু, শুনছেন।

কোন সাড়া নেই। আস্তে আস্তে খাটের কাছে গেলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম বিছানা শূন্য। ব্রজবালা দেবী সে ঘরে নেই। অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারলাম বারান্দার দরজা খোলা। মনে প্রশ্ন জাগল—এত রাত্রে উনি কোথায় গেলেন? ঐ আলোর অনু-সন্ধান করতে কি? আমাকেই বা ডাকলেন না কেন? (ক্রমশঃ)

সক্রিয় রিপীটার উপগ্রহ

আ্যানটেনা
সৌর
ব্যাটারি
পৃথিবী থেকে বার্তা
স্টোরেজ
ব্যাটারি
রিসিভার
ট্রান্সমিটার
আ্যানটেনা
বর্ধিত শক্তি বার্তার
পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন

অয়স্কান্ত

টেলিফোন ও টেলিভিশন

যোগাযোগ-ব্যবস্থায় নতুন যুগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণা-সংস্থার যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিভাগের পরিচালক লিওনার্ড জাফ্‌ফে গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এথেন্সে অনুষ্ঠিত একটি শান্তি সম্মেলনে উপগ্রহের মাধ্যমে বার্তা-প্রেরণ সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান ও কৌতূহলোদ্দীপক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কলকাতার ইউ-এস-আই-এস-এর সৌজন্যে এই বক্তৃতার একটি সচিত্র প্রতিলিপি আমরা পেয়েছি। নিচের লেখাটি লিওনার্ড জাফ্‌ফের বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার।

॥ প্রাচীন ও আধুনিক ॥

আন্তঃ-মহাদেশীয় যোগাযোগ-ব্যবস্থার প্রয়োজন যে কত জরুরী তার দৃষ্টান্ত হিসেবে উনিশ শতকের একটি নাটকীয় ঘটনার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তখন আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। শেষ যুদ্ধ হয় ১৮১৫ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে। অথচ এই তারিখের দু-সপ্তাহ আগেই ঘেণ্ট-এ শান্তি-সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। খবর পৌঁছতে দেরি হবার জন্যেই এই বিপত্তি।

আটলান্টিক মহাসাগরের এপারে-ওপারে টেলিগ্রাফ-বার্তার চলাচল প্রথম শুরু হয়েছিল ১৮৬৬ সালে। আরো ষাট বছর পরে ১৯২৭ সালে শুরু হয়েছিল হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিওর মাধ্যমে টেলিফোন যোগাযোগ-ব্যবস্থা। কিন্তু তৎকালীন টেলিফোন-ব্যবস্থা মাটির ওপরে যতোখানি উন্নত ছিল, আন্তঃ-মহাদেশীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ততোখানি উন্নত হয়ে উঠতে পারেনি। উন্নতি ও উৎকর্ষের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো ত্রিশ বছর, ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। এই উন্নতি ও উৎকর্ষ মুখ্যত একটি নতুন ধরনের কেব্‌লকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। বর্তমানে আটলান্টিকের এপারে-ওপারে টেলিফোনের চ্যানেল আছে প্রায় তিনশোটি।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়। একমাত্র ১৯৬০ সালেই আটলান্টিকের এপারে-ওপারে টেলিফোন-কলের সংখ্যা ছিল ত্রিশ লক্ষেরও

বেশি। ১৯৭০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা আরো সাতগুণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। শুধু সমুদ্রের তলা দিয়ে কেব্‌ল্ পেতে এই বিপুল মাত্রার প্রয়োজনকে সিদ্ধ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের সন্দেহ আছে। তাছাড়া, কেব্‌ল্-এর সংখ্যা যতোই বৃদ্ধি পাক, এই মাধ্যমটির সাহায্যে কোনো অবস্থাতেই টেলিভিশন-যোগাযোগ সম্ভব নয়।

মাটির ওপরে টেলিফোন ও টেলিভিশন যোগাযোগ সম্পন্ন হয়ে থাকে মাইক্রোওয়েভ রিপীটার ব্যবস্থার সাহায্যে। রিপীটার হচ্ছে একধরনের যান্ত্রিক আয়োজন যার সাহায্যে বার্তাবাহী বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বর্ধিতশক্তি হয়ে নির্দিষ্ট দিকে প্রেরিত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে মাইক্রোওয়েভের বৈশিষ্ট্যও স্মরণ রাখা দরকার। মাইক্রোওয়েভের চলাচল সিধে রেখায়। এই কারণে কুড়ি থেকে ত্রিশ মাইলের মধ্যে এক-একটি রিপীটার-স্টেশন থাকা দরকার। সিধে রেখায় ধাবমান মাইক্রোওয়েভ তো আর ভূপৃষ্ঠের বক্রতার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই বাঁক খাবে না—তা সিধে রেখাতেই শেষ পর্যন্ত মহাশূন্যে উধাও হয়ে যেতে পারে। রিপীটার স্টেশনের সাহায্যে মাইক্রোওয়েভকে বর্ধিতশক্তি করা হয় ও নির্দিষ্ট দিকে চালনা করা হয়।

কিন্তু আন্তঃ-মহাদেশীয় টেলিফোন ও টেলিভিশন যোগাযোগের ক্ষেত্রে মাঝখানে রয়েছে আটলান্টিকের মতো মহাসমুদ্র। সাধারণ বুদ্ধিতে এই সমুদ্রের বাধা অতিক্রমণের রাস্তা দুটি মনে হতে পারে। একটি হচ্ছে সমুদ্রের ওপরে কুড়ি-ত্রিশ মাইল পরে পরে রিপীটার স্টেশন স্থাপন। অন্যটি হচ্ছে অনেক অনেক উঁচু একটি মাস্ট খাড়া করা, যাতে মাইক্রোওয়েভের সিধে রাস্তা ছুটেও পুরো আটলান্টিক ডিঙিয়ে তবেই ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করবে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যাবে, প্রথমটি অবাস্তব, দ্বিতীয়টি অসম্ভব, কেননা মাইক্রোওয়েভকে আটলান্টিক পার করাতে হলে মাস্টের উচ্চতা হওয়া প্রয়োজন অন্তত ৪০০ মাইল।

তারপরে বিজ্ঞানীরা যখন এই সমস্যার সমাধানের জন্যে ভাবিত ছিলেন তখনই পৃথিবীর আকাশে মানুষের তৈরী উপগ্রহ পাক খেতে শুরু করেছিল। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, এই কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যেই এই দুরূহ সমস্যাটির অতি সহজ সমাধান হতে পারে। এ ক্ষেত্রে রিপীটার স্টেশনটি স্থাপিত হবে এই কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যেই। হাজার হাজার মাইল উচ্চতায় স্থাপিত এই কৃত্রিম উপগ্রহের রিপীটার স্টেশন পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ ও সমুদ্রকে সিধে রেখার নাগালের মধ্যে পেতে পারে।

বিষয়টি তত্ত্বের দিক থেকে খুবই সরল। মাটিতে থাকবে অত্যন্ত শক্তিশালী ট্রান্সমিটার। টেলিফোন ও টেলিভিশন বার্তা এই ট্রান্সমিটার থেকে প্রেরিত হবে দৃশ্যমান একটি উপগ্রহে এবং এই উপগ্রহের রিপীটার স্টেশন থেকে দৃশ্যমান ভূপৃষ্ঠস্থিত সকল বিন্দুতে।

বলা বাহুল্য, তত্ত্ব যতোই সরল হোক, রূপায়ণের পর্বটি খুবই জটিল।

॥ উপগ্রহের সংখ্যা ॥

কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে পাক খায় বটে কিন্তু কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে একটিমাত্র উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর সকল এলাকা দৃশ্যমান হয় না। অবশ্য কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর আকাশে এমন একটি বিশেষ উচ্চতায় স্থাপন করা যেতে পারে যে উপগ্রহ পৃথিবীকে একটি পাক দিতে সময় নেবে চব্বিশ ঘণ্টা। এ ক্ষেত্রে পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হবে, উপগ্রহটি পৃথিবীর আকাশে বিশেষ একটি বিন্দুতে স্থির হয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, এমনি ধরনের তিনটি 'স্থির' উপগ্রহ যদি পৃথিবীর আকাশের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে স্থাপন করা যায় তাহলে ভূপৃষ্ঠের গোটা এলাকাটি উপগ্রহের কাছে দৃশ্যমান হতে পারে। অর্থাৎ এক-একটি উপগ্রহের কাছে ভূপৃষ্ঠের এক-তৃতীয়াংশ। তিনটি মিলিয়ে ভূপৃষ্ঠের পুরো এলাকাটি।

॥ নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ॥

টেলিফোন ও টেলিভিশন যোগাযোগ-স্থাপনের উপগ্রহ হতে পারে দু-ধরনের। নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়। নিষ্ক্রিয় উপগ্রহে নিতান্তই একটি প্রতিফলক মাত্র। মাটি থেকে প্রেরিত রেডিও-তরঙ্গ এই উপগ্রহে প্রতিফলিত হয়ে আবার মাটিতেই ফিরে যায়। সক্রিয় উপগ্রহ রীতিমতো একটি রিপীটার স্টেশন। রেডিও-তরঙ্গ এখানে গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে, অ্যাম্‌প্লিফায়ারযন্ত্রে বর্ধিতশক্তি হয় ও ট্রান্সমিটারযন্ত্রে পুনরায় নির্দিষ্ট দিকে প্রেরিত হয়।

মার্কিন দেশের বিজ্ঞানীরা নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় উভয় ধরনের উপগ্রহ নিয়েই গবেষণা করেছেন।

॥ একো—১ ॥

এটি ছিল নিষ্ক্রিয় উপগ্রহ, ১০০ ফুট ব্যাসের একটি ধাতব বেলুন। আকাশে তোলা হয়েছিল ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে। এই উপগ্রহটির সাহায্যে আন্তঃ-মহাদেশীয় যোগাযোগ-ব্যবস্থায় অনেকগুলো সাফল্যমণ্ডিত গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। তবে কালক্রমে উপগ্রহের ভেতরকার গ্যাস বেরিয়ে যাবার ফলে উপগ্রহটি কুঁকড়ে ও চুপসে গিয়েছে। ফলে এখন আর প্রতিফলক হিসেবে উপগ্রহটিকে ব্যবহার করা চলে না। তবুও উপগ্রহটি এখনো পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী কৌতূহলের বস্তু হয়ে রয়েছে। কারণ এটিই একমাত্র কৃত্রিম উপগ্রহ যা খালি চোখে দৃশ্যমান।

॥ একো—২ ॥

এটিও নিষ্ক্রিয় উপগ্রহ। বর্তমানে নির্মীয়মান। ১৩৫ ফুট ব্যাসের একটি ধাতব বেলুন। তবে এটিকে এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে ভেতরকার গ্যাস বেরিয়ে যাবার পরেও বেলুনটি কুঁকড়ে ও চুপসে না যায় ও বেলুনের গা মসৃণ থাকে। এ-বছরের শেষ দিকে একো—২ আকাশে উড়বে আশা করা যাচ্ছে।

॥ স্কোর ও কুরিয়ার ॥

সক্রিয় উপগ্রহ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে ১৯৫৮ সাল থেকে। প্রথমটির নাম স্কোর। এই উপগ্রহটির সাহায্যে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বড়োদিনের বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়টির নাম কুরিয়ার (১৯৬০)। ট্রান্সমিটিং স্টেশনের ওপর দিয়ে যাবার সময়ে এই উপগ্রহের যন্ত্রে প্রেরিত বার্তা ধরে রাখা হত। তারপরে রিসিভিং স্টেশনের ওপর দিয়ে যাবার সময়ে এই বার্তা রিসিভিং স্টেশনে প্রেরিত হত।

॥ টেলস্টার-১ ॥

মার্কিন বিজ্ঞানীদের তৃতীয় যোগাযোগ-স্থাপনকারী উপগ্রহের নাম ছিল
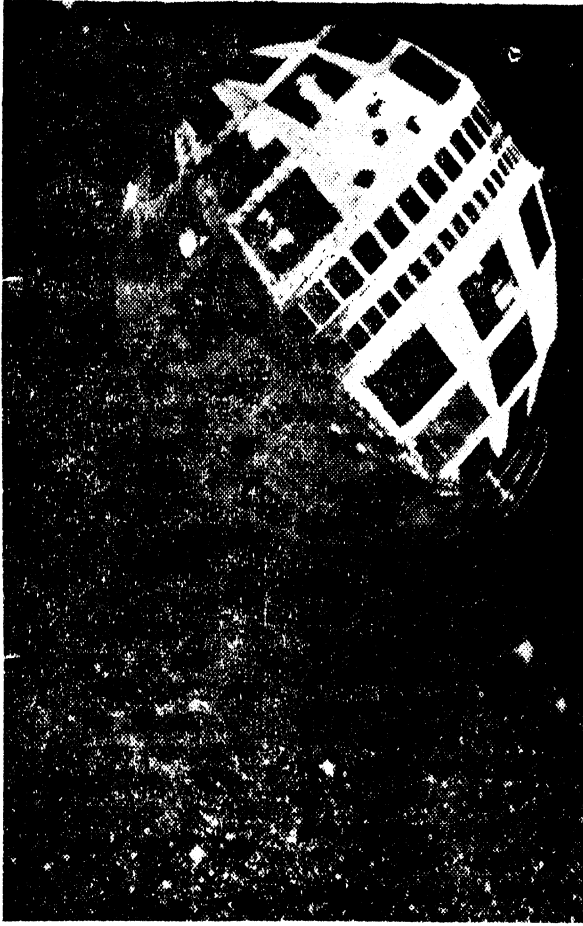
টেলস্টার

টেলস্টার—১ (জুলাই ১৯৬২)। প্রায় ৮' মাস ধরে এই উপগ্রহটির সাহায্যে অজস্র সাফল্যমণ্ডিত পরীক্ষাকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ-বছরের মার্চ মাস থেকে টেলস্টার—১ নিঃসাড় হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, উপগ্রহটির যান্ত্রিক আয়োজন বিকল হয়েছে মহাকাশের তেজস্ক্রিয় কণার সংস্পর্শে আসার ফলে।

॥ টেলস্টার-২ ॥

দ্বিতীয় টেলস্টারকে আকাশে তোলা হয়েছে ১৯৬৩ সালের ১৩ই মে তারিখে। এই উপগ্রহটির সাহায্যে এখনো পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত পরীক্ষা-কার্য অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। দ্বিতীয় টেলস্টারের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বিশেষভাবে নির্মিত। মহাকাশের তেজস্ক্রিয় কণার বিকিরণে এই যন্ত্রপাতির ক্ষতি হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

॥ রিলে ॥

১৯৬২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে আকাশে তোলা হয়েছে যোগাযোগ-স্থাপনকারী উপগ্রহ 'রিলে'। এই উপগ্রহের আটটি দিকে সৌর-ব্যাটারি আছে ৮০০০টি। এই উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর ব্যাপক অংশের মধ্যে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, ব্রেজিল, জার্মানি, জাপান ইত্যাদি) যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

টেলস্টার ও রিলে উপগ্রহদুটির সাহায্যে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে টেলিভিশন বার্তা বিনিময় হয়েছে, টেলিফোনে কথোপ-কথন হয়েছে ও স্থিরচিত্র প্রেরিত হয়েছে।

॥ সীন্‌কোম্ ॥

মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই বিশেষ ক্ষেত্রে আরো যে-সব গবেষণায় নিরত আছেন, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সীন্‌কোম্ বা "স্থির" উপগ্রহ স্থাপন। এই উপগ্রহটি কক্ষে স্থাপিত হবার পরেও উপগ্রহটির সঙ্গে যুক্ত থাকবে একটি রকেট-ব্যবস্থা, যার সাহায্যে উপগ্রহের কক্ষে কিছুটা পরিবর্তন সাধন করা চলবে।

যোগাযোগ-স্থাপনকারী উপগ্রহ হিসেবে সীন্‌কোমের কার্যকারিতা টেলস্টার বা রিলের চেয়ে অনেক বেশি। আর যে-কথা আগেই বলা হয়েছে, মাত্র তিনটি সীন্‌কোম্ উপগ্রহের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের গোটা এলাকায় যোগাযোগ স্থাপন করা চলবে।

১৯৬৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি পরীক্ষামূলক সীন্‌কোম্ উপগ্রহ আকাশে তোলা হয়েছিল। উৎক্ষেপণের পর্বে কোন ত্রুটি ছিল না। উপগ্রহটি স্থাপিত হয়েছিল একটি উপবৃত্তাকার কক্ষে, পৃথিবী থেকে যার দূরত্ব ছিল ২২,৩০০ মাইল। তারপরে উপগ্রহটিকে "স্থির" কক্ষে স্থাপন করবার জন্যে উপগ্রহের রকেট-ব্যবস্থাকে চালু করা হয়েছিল। তারপর থেকেই উপগ্রহটির যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর কোনো সাড়া জাগানো যায়নি। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে জানা গিয়েছে যে সীন্‌কোম্ মোটামুটি নির্ধারিত কক্ষেই স্থাপিত। উপগ্রহের যন্ত্র কেন বিকল হল তার কারণটি বর্তমানে অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে। উপযুক্ত প্রস্তুতির পরে সম্ভবত এই বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় সীন্‌কোম্ উৎক্ষিপ্ত হবে।

টেলিফোন ও টেলিভিশন যোগাযোগ-ব্যবস্থায় নতুন একটি যুগের সূত্রপাত হতে চলেছে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা আগামী পনেরো-কুড়ি বছরের মধ্যেই পৃথিবীর যে-কোনো অংশের একজন মানুষ পৃথিবীর অন্য যে-কোনো একজন মানুষের সঙ্গে সরাসরি টেলিভিশন বা টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে।

কবির গান

(৪)

রাম বসু

কবিগান সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এ'দের দুজনেরই মনোভাব ছিল এক রকম। সাহিত্যিক রুচি ও রস-বোধে উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য মিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।" তবে "তন্মধ্য কাহারও গীত অতি সুন্দর।" রবীন্দ্রনাথও এই "গানগুলির মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব, রসের জলীয়তা এবং কাব্যকলার প্রতি অবহেলা" লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন যে "স্থানে স্থানে সে-সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য এবং ভাবের উচ্চতা আছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল কবিওয়ালার গানের প্রশংসা করেছেন তাঁদের মধ্যে রাম বসুর নাম আছে। তিনি বলেছেন, "রাম বসু হরু ঠাকুর নিতাই দাসের এক একটি গীত এমন সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই।" অক্ষয়-চন্দ্র চৌধুরীর সাহিত্যানুরাগ প্রসঙ্গে এই রাম বসু এবং হরু ঠাকুরেরই নাম রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছেন তাঁর 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে।

১২৬১ সালের ১ আশ্বিনের সংবাদ-প্রভাকরে 'রাম বসু'র প্রসঙ্গ প্রথম প্রকা-শিত হয়। এই সংখ্যায় কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁর রচনার কিছু নিদর্শন ছাপা হয়েছিল। প্রসঙ্গ ওই সংখ্যায় সম্পূর্ণ হয় নি, ধারাবাহিকভাবে পর পর আরও তিন সংখ্যায় বেরিয়ে শেষ হয়।

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে লেখেন,—'রাম বসু যিনি কবিওয়ালাদিগের মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি অতি ভদ্রকুলোদ্ভব, কুলীন কায়স্থ, তাঁহার নাম রামমোহন বসু কলিকাতার পশ্চিম পারস্থ শালিখা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাবতেই তাঁহাকে "রাম বোস্" বলিয়া জানি-তেন, যথা 'রাম বোসের দল', 'রাম বোসের গান' ইত্যাদি।......ইনি জন্ম-কবি ছিলেন, পাঁচ বৎসর বয়সের সময় কবিতা রচনা করিয়াছেন, যখন পাঠ-শালে লিখিতেন তখন কবিতা রচিয়া কলাপাত লিপিবদ্ধ করিতেন, কবি-ওয়ালা ভবানে বেণে কোন উপায়ে তাহা জানিতে পারিয়া বিস্তর উপা-সনা করতঃ তাঁহার নিকট হইতে গান

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

সকল সংগ্রহ করিত। ঐ সময় বসুর বয়স ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। সেই সমস্ত গান গাহিয়া ঐ ভবানী বেণে অত্যন্ত প্রতিপত্তি করিয়াছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত রাম বসু সম্পর্কে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ ক'রেছিলেন তার বেশী আর কেউ কিছু পান নি। তাঁর কথাই আজ পর্যন্ত কেবল ভাষান্তরে লেখা হচ্ছে।

রাম বসু অভিজাত বাড়ির সন্তান। অবস্থাও মন্দ ছিল না বলে মনে হয়। তিনি যে কিছু ইংরেজি শিখেছিলেন, গুপ্তকবির লেখায় সে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ইংরেজি এতটা শিখেছিলেন যে তার জোরে "কেরাণীগিরি কর্মে নিযুক্ত" হতে পেরেছিলেন। কিন্তু কবিতা যার উপর ভর করে তার আর পরিত্রাণ নাই। চাকরি-বাকরির মায়ায় সে কি বন্ধ থাকে?

কবিতাকল্পে অতিশয় আমোদ জন্মি-বায় বিষয়কর্মে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। একারণ আশু সেই কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল গান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহাতে যতই তাঁহার অনুরাগের আধিক্য হইল ততই দৈবশক্তির কৃপা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

রাম বসুর খ্যাতি যতটা গায়ক হিসাবে তার চেয়ে অনেক বেশী কবি হিসাবে। গান গাওয়া যত সহজ, গান রচনা করা যে তত সহজ নয় পেশাদার কবিওয়ালারা তা বুঝতেন। ভাল কবির সন্ধান পেলে কবিওয়ালারা তাঁর কাছে গান লিখিয়ে নিতেন। ফরমায়েশী গানের জন্যে কবিদের তাঁরা খুব খাতির করতেন। রাম বসুর বাজারে খুব সুনাম ছিল। ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ প্রভৃতি নামকরা কবিদলপতি রাম বসুর গান গেয়ে আসর জমাতেন।

তাঁর গানের এই রকম সমাদর হওয়া-তেই বোধহয় তাঁর নিজের দল বাঁধার ইচ্ছা জাগে।

রাম বসুর দল কবে গাওনা আরম্ভ করে তা ঠিক করে বলা যায় না। তবে এইটুকু বলা যায় যে অল্পদিনের মধ্যেই 'রাম বোসের দল' বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কবি দীর্ঘায়ু ছিলেন না, মাত্র বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রাম বসুর গানের বিষয়ে বৈচিত্র্য ছিল। ভবানী বিষয়, সখী সংবাদ, বিরহ, খেউড়, লহর, সপ্তমী, শ্যামা বিষয়—সকল বিষয়েই তিনি গান রচনা করেছেন।

সপ্তমীবিষয়ক একটি গানের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি :

কও দেখি মা, কেমন ছিলে মা,
ভিখারি হরের ঘরে।
জানি, নিজে সে পাগল,
কি আছে সম্বল,
ঘরে ঘ র বেড়ায় ভিক্ষা করে॥
শুনিয়া জামাতার দুখ
খেদে বুক বিদরে॥
তুমি ইন্দুবদনি কুরঙ্গনয়নি
কনকবরণি তারা।
জানি জামাতার গুণ্
কপালে আগুন্
শিরে জঠা বাকোল্ পরা॥
আমি লোকমুখে শুনি
ফেলে দিয়ে মণি
ফণি ধরে অঙ্গে ভূষণ করে॥
গৌরী কোলে করে নগেন্দ্ররাণী
করুণাবচনে কয়।
উমা মা আমার সুবর্ণলতা,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়॥
মরি জামাতার খেদে
তোমারো বিচ্ছেদে
প্রাণ কাঁদ দিবেনিশি।
আমি অচল নারী
চলিতে নারি
পারি নে যে দেখে আসি॥
আমি জীবন্মৃত হয়ে
আশাপথ চেয়ে
তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝোরে॥

'খেউড়' জাতীয় গান সম্পর্কে রাম বসুর খুব সুনাম ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, তার কোনো কোনোটা "অতি সুন্দর, সর্বমনোরঞ্জক, রহস্য-পরি-পূরিত।"

অমৃতের পাঠক-পাঠিকাদের কৌতু-হল নিরসনের জন্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েক ছত্র তুলে দিচ্ছি। অবাচ্য কুবাচ্য-গুলিকে ডট চিহ্নের সাহায্যে আবৃত করে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। গানটির একটু ইতিহাস আছে, আগে সেটুকু বলে নিই :

রাম বসুর সমকালীন দুজন কবি-ওয়ালার নাম খুব প্রসিদ্ধ ছিল—

রামপ্রসাদ ঠাকুর আর নীলমণি ঠাকুর। দুই ভাই—নীলমণি বড়, রামপ্রসাদ ছোট। দল গড়েন নীলমণি, ভাই রামপ্রসাদ ছিলেন সহকারী এবং নীলমণির মৃত্যুর পর তিনিই দলটি চালাতে থাকেন।

শোভাবাজারের রাজবাড়িতে একবার কবি গাওনা হয়। সেখানে রামপ্রসাদের সঙ্গে রাম বসুর লড়াই বাধে। রাম বসুকে আক্রমণ করে রামপ্রসাদ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করলেন :

নাইক রাম বোসের এখন
সেকেলে গৌরব।
এখন দল করে হয়েছেন রাম বোস
রামকামারের...... ।।

রাম বসু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন :
তেমনি এই নীলুর দলে
রামপ্রসাদ একটীন্।
যেমন ঢাকের পীঠে বাঁয়া থাকে
বাজেনাক একটি দিন ।।
যেমন রাজভিখারীর ধামা বওয়া
থাকে এক এক জন।
হরিনাম বলে না মুখে পেছু থেকে
চাল কুড়োতে মন ।।
কর্মে অকর্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্মা
মন কাজের কাজী ঠাঁটের বাজী—
(ভাইরে)
ঠিক যেন ধোপার বিশ্বকর্মা—
যেমন বিদ্যেশূন্যে বিদ্যেভূষণ
সিন্ধিরস্তু বস্তুহীন ।।

নীলমণি মলে, নীলমণির দলে
ঢুকল শিংভাঙা
এ'ড়ে বাছুরের পালে।
যেমন নবাব মলে নবাব হল
উজীরালি আড়াই দিন ।।

রামপ্রসাদ—
যেমন......কাছে পেগের বড়াই
ঘরে করেন জাঁক,
দুনিয়ার কর্মেতে কু'ড়ে, ভোজনে
দেড়ে—
বচন শুড়িয়ে করেন খাক।
তেমনি শ্রীছাঁদ, এই
পেটকো মুলুকচাঁদ
তরেন রামপ্রসাদ
ধরে কৃষ্ণপ্রসাদ
যেমন জন্মে কভু হাত পোরে না—
দোলে লবেদার আস্তীন ।।

সখী সংবাদে রাম বসুর খুব সুনাম ছিল। তার নমুনা দিই :

আমার পর ভেবো সই—
পর সকলি হয়েছে।
আমি যে পর ভজিলাম সখি,
পরসুখে হব সুখী,
অপরে কি আছে বাকী
সে পরে পর ভেবেছে ।।
অতঃপরে না জানি কি
কপালে আছে ।।
যার লাগি ঘরে হলেম পর
সে ভাবিল পর,
পরে আবার সাধে বাদ
শুনি পরস্পর।
পরমভাজন ছিল যে জন,
পরোক্ষে সে হাসিছে ।।

আর একটি গানের অংশ :

এত ভৃংগ নয়, ত্রিভংগ বুঝি,
এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে।
গুনো গুনো স্বরে কেনো, অলি
শ্রীরাধার শ্রীপদে পুঞ্জে ।।
কৃষ্ণ বই কে আর বসতে পারে সই
শ্রীরাধার রাসকুঞ্জে ।।
জানি শ্রীমুখে বোলেছেন শ্রীকান্ত।
গীতা যোগ মধ্যে, তিনি
ঋতুর মধ্যে বসন্ত।
আরো পতঙ্গের মধ্যে,
কৃষ্ণ ভৃঙ্গরাজ,
নৈলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে ।।

রাম বসুর কবিত্ব সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, তবু তাঁর স্তুতিবাদটা শোনাই :

যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্রসন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।
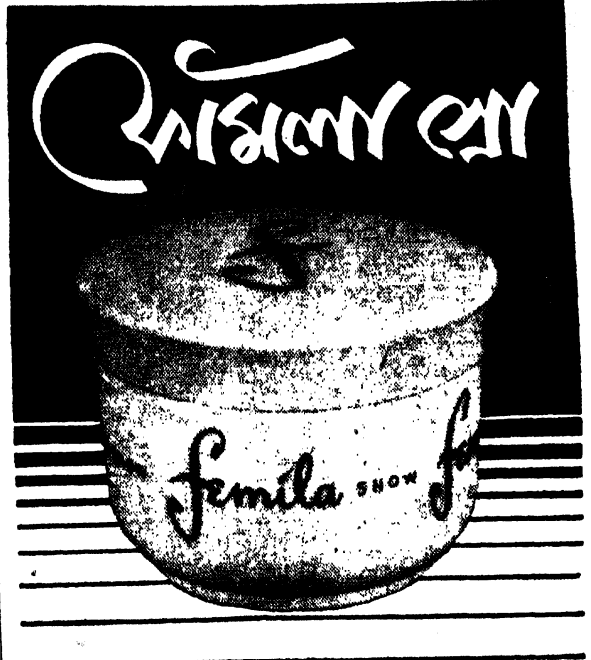
নারী ও রাজনীতি

রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী

'রাজনীতি' শব্দটির মধ্যেই কোথায় যেন একটি প্রবেশ-নিষেধের বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে। রাষ্ট্রের প্রধান যদি রাজা না হয়ে রাণীও হন (যথা সুলতানা রিজিয়া, ক্লিওপেট্রা, ক্রিশ্চিয়ানা) তথাপি তাঁদের শাসননীতিকে 'রাজনীতি'ই বলা হয়—'রাণীনীতি' কদাপি না। অথচ রাজ্যশাসনের কূটকৌশলে নারীরা যে পুরুষের মতই দক্ষ হতে পারেন, তার প্রমাণ মোগল যুগেই রয়েছে। জাহাঙ্গীরের বিশাল সাম্রাজ্য নূরজাহানের অঙ্গুলি-হেলনেই শাসিত হত। প্রাচীন যুগেও রাজসভায় রাণীর উপস্থিতি আবশ্যিক ছিল। রাজসূয় কোনো যজ্ঞই রাণীর অনুপস্থিতিতে হত না। রামচন্দ্রকে পর্যন্ত রাণী সীতার বনবাসকালে স্বর্ণসীতাকে সিংহাসনবর্তিনী করে যজ্ঞ সমাধান করতে হয়েছিল।

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে হিটলারই প্রথম মেয়েদের রাজনীতি করার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করেছিলেন। মেয়েদের প্রতি তাঁর ফ্যাশিস্ত পরামর্শ ছিল রন্ধনশালায় ফিরে যাওয়ার। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রধান অস্ত্র, ভোটাধিকারের রক্ষাকবচ রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। যদিও মেয়েদের ভোটাধিকার লাভ, পৃথিবীর সভ্যতম দেশেও, একশ বছরের বেশী পুরোনো না। এবং মেয়েরা রাজনীতি করবার সনদ পেলেই যে রাজ্যে প্রলয় ঘটাবেন, এমন কোনো প্রমাণ অদ্যাবধি গণতন্ত্রের ইতিহাসে নেই। যদিও সবদেশেই যে মেয়েরা রাজনীতিতে সমান সক্রিয় হয়েছেন বা হতে পেরেছেন, এমন দাবী আজো করা সম্ভব না, তবু সবদেশের রাজনৈতিক মঞ্চেই প্রমীলার প্রবেশ ক্রমশঃই বাড়ছে। রাজনীতিতে মহিলাধিক্য সম্ভবতঃ আমাদের দেশেই সর্বাধিক। বিধানসভায়, লোকসভায়, এমনকি কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলীতে মহিলা-সংখ্যার দিকে তাকালে ইংল্যাণ্ডের মত গণতান্ত্রিক দেশের রমণীসমাজও ঈর্ষিত হবেন সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী এন দিন নু দক্ষিণ ভিয়েৎনাম লোকসভার সদস্যা। আটত্রিশ বছরের প্রিয়দর্শিনী দিন নু-কে বলা হয় 'ফার্স্ট লেডী অফ সাইগন'। ভিয়েৎনামের রাজনীতিতে সব সময়েই দিন নু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন। স্বামী হলেন রাষ্ট্রপতি দিয়েমের সহোদর এবং প্রধান পরামর্শদাতা। রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হওয়ার ফলে দেশে শত্রুরও অভাব নেই দিন নুর। চারটি সন্তানের সংসার সামলেও প্রগতিশীল সব আন্দোলনেই অংশগ্রহণ করতে শ্রীমতী দিন নুকে দেখা যায়। ভিয়েৎনামে বহু-বিবাহ প্রথা এবং গণিকাবৃত্তির উচ্ছেদসাধনে তিনি বদ্ধপরিকর।

আধুনিক যুগে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে বিশ্ববিদিত হয়েছেন এমন মহিলার সংখ্যাও কম না।

প্রথমেই ধরুন আমাদের দেশে যাঁরা আধুনিক যুগে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সুচেতা কৃপালনী, ডাঃ সুশীলা নায়ার ইত্যাদি। আরো নাম করতে গেলে পুঁথি ভারী হয়ে যাবে।

ভা র ত ব র্ষে র নিকট-প্রতিবেশী

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসলোমন বন্দরনায়ক ১৯৫৯-এর ২৫শে সেপ্টেম্বর অকস্মাৎ আততায়ীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিলে তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক স্বামীর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে গৃহকোণ ছেড়ে এগিয়ে আসেন, সিংহলের মেয়েদের আজও প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে অগ্রগতির জন্যে লড়াই করতে হচ্ছে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মাদাম নগো দিন নু হলেন আরেক মহিলা রাজনীতিবিদ। সেখানকার পার্লিয়ামেন্টের সভ্য হিসেবে তিনি সেখানকার বহুবিবাহ এবং আরো অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথা তুলে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

এই নিবন্ধে আরো কয়েকজনের বিবরণসহ ছবি ছাপা হল। এ'রা সকলেই দীর্ঘকাল রাজনীতি চর্চা করে স্বদেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

আমেরিকার পঞ্চাশটি স্টেটে মাত্র পাঁচজন সেক্রেটারী অব স্টেটস্ এবং দুজন ট্রেসারার পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বাঙলাদেশেই মহিলা গভর্ণর, অনেক কৃতি মহিলা আমাদের এ্যাসেমব্লিতে, মন্ত্রিসভায় এবং পার্লামেণ্টে আছেন মহিলারা। চৌদ্দজন মহিলা মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী আছেন। মার্কিনী সেনেটে একজন এবং হাউস অব্ রিপ্রেজেনটেটিভ-এ ষোলোজন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের লোকসভায় তেত্রিশ এবং রাজ্যসভায় তেইশজন মহিলা সদস্যা আছেন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি তাঁর ক্যাবিনেটে একজন মহিলা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমাদের দেশে রাজনীতিতে নারীরা কেমন গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ছেন। বিশ্বের সমস্ত রাজনীতি-সচেতন দেশের পক্ষে এ ঘটনা ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে এক সময়।

সমাজজীবনে নারীর দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। বিশেষ করে প্রতিটি শিশুর জীবন গড়ে তোলায় তাঁদের দায়িত্ব অপরিসীম। ছেলেমেয়েদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষাদীক্ষা সবকিছুর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাহচর্যের দিকেও খেয়াল রাখা দরকার। তারপর শাসন করাও আছে। এই পরিশ্রমের পর নিজেদের অধিকারকে কেবলমাত্র তায় পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে তাল রাখতে গিয়ে নারীকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়।

শ্রীমতী ক্লেয়ার বুথ-লুস রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন। সাংবাদিকতার এবং থিয়েটারের মহল থেকে। প্রারম্ভিক জীবনে সাধারণেরই একজন ছিলেন। ওয়াশিংটনের সিনেটার নির্বাচিত হন তিনি ১৯৫৯ সালে। রোমে রাষ্ট্রদূত হয়ে যান। রোমের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত। পরে তাঁকে ব্রেজিলের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করা নিয়ে সিনেটে গোলমাল হয়। তিনি রাষ্ট্রদূতের পদে ইস্তফা দিয়ে আবার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ফিরে যান, তাঁর স্বামী হেনরী লুসে 'টাইম' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত এবং আমেরিকার অগ্রগণ্য প্রকাশকদের মধ্যে অন্যতম।

বিশশতকে যে যুগপ্রবাহ চলেছে, তা হল প্রত্যক্ষ রাজনীতিপ্রবাহ। আজ বাংলাদেশের বাস্তবজগতে যত হানাহানিই চলুক আর যত দুর্দশা-দুর্দিনই আসুক না কেন, সাংস্কৃতিক গগন কিন্তু সেই পরিমাণে আজ উজ্জ্বল। কেননা এ যুগ মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যুগ—রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার যুগ। যত দুঃসময়ের ঝড় বাঙলাদেশের উপর দিয়ে যাক না কেন, আজও এখানকার আবহাওয়া ক্রমশঃ মানুষের মঙ্গলময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এ ব্যাপারে মেয়েদের প্রচেষ্টা ও স্বীকৃতির দাবী রাখে সমভাবেই। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্যতা ও আয়াস অপরিসীম,—অবশ্য দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে তাঁরা এ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

সিরিমাভো বন্দরনায়েকে পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। আততায়ী কর্তৃক নিহত সলোমন বন্দরনায়েকের বিধবা পত্নী হিসাবে তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। মহিলা হয়ে সিংহলের মত একটি গোঁড়া দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয় এবং এই পদে আসীন হওয়ার জন্য তাঁকে কম ক্লেশস্বীকার করতে হয় নি। সারা দেশব্যাপী "ফ্রিডম পার্টি"র হয়ে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শ্রীমতী বন্দরনায়কের বর্তমান বয়স সাতচল্লিশ। সন্তান-সংখ্যা তিন।

মাদাম চিয়াং কাইশেক দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে স্বামীর পাশাপাশি থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছেন। মাদাম কাইশেকের পিতা সুঙ খুব দরিদ্র অবস্থায় আমেরিকায় যান এবং প্রভূত বিত্তের অধিকারী হন। তাঁর তিন কন্যার দুই কন্যাই বিখ্যাত, অপর কন্যা আমেরিকার একজন ধনাঢ্য মহিলা। মাদাম কাইশেকের সহোদরা মাদাম সান ইয়াৎ সেন কম্যুনিস্ট চীনের উপরাষ্ট্রপতি।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের পরিচিতি বাহুল্য-মাত্র। তিনি মস্কো, ওয়াশিংটন এবং লণ্ডনে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। শ্রীমতী পণ্ডিতই একমাত্র মহিলা যিনি রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে সভানেত্রী হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল। ১৯৩৭ থেকে ভারতের স্বাধীনতালাভের পূর্বেই তিনি এদেশের প্রথম মহিলা যিনি মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। এই বছর তিনি আবার রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় দলের প্রধানরূপে যাত্রা করছেন।
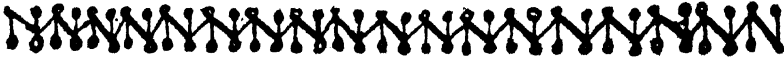
এলিজাবেথ সোয়ার্ৎস হাউপ্ট পশ্চিম জার্মানীর প্রথম মহিলা মন্ত্রী। ১৯৫০ সাল থেকে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করার পূর্বে শ্রীমতী এলিজাবেথ আইন-জীবী ছিলেন। বিবাহ তরুণদের সমস্যা বা পরিবার-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে পশ্চিম জার্মান সরকারকে যখনই কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হয় তখনই শ্রীমতী সোয়ার্ৎস হাউপ্টের পরামর্শ অপরিহার্য। কিছুদিন হল ইনি বন-এর প্রথম মহিলা মন্ত্রীরূপে জাতীয় স্বাস্থ্যের ভার পেয়েছেন।

সাহিত্য জগৎ

।। বুদ্ধদেব বসুর আমেরিকা সফর ।।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বসু বাইশে আগস্ট আমেরিকা যাত্রা করেছেন ছয় মাসাধিক কালের জন্য। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার্স-এর যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এই মাসের শেষে শ্রীযুক্ত বসু সেই সভাতেই সর্বপ্রথম যোগদান করবেন। তারপর তিনি ইণ্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটিতে ছয় মাসকাল লেকচারারের পদে কাজ করবেন।

বুদ্ধদেব বসু যে অসামান্য সৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন, তাতে তাঁর এই সম্মানলাভে আমরা প্রত্যেকেই

বুদ্ধদেব বসু

গৌরববোধ করি। কিন্তু তাঁর পক্ষে এই সম্মানলাভ প্রথম নয়। ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক রূপে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইউরোপে, জাপানে রবীন্দ্রনাথ বা সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্য বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। তাছাড়া দীর্ঘকালের সাহিত্য ও অধ্যাপনা জীবনে বাঙলা দেশের বহু গুণী ও বিদ্বান ছাত্র তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছে।

শ্রীযুক্ত বসুর ১৯০৮ সালে কুমিল্লায় জন্ম।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পাশ করেন। ১৩৩৫ সালে ঢাকা থেকে 'প্রগতি' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সাল থেকে কলকাতায় আছেন। কিছুকাল রিপন কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন। বেশ কিছুকাল যাবৎ তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। ১৯৩০ সালে প্রথম উপন্যাস 'সাড়া' ও প্রথম কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা' প্রকাশিত হয়। ছোটগল্পের বই 'অভিনয় অভিনয় নয়'ও ঐ বৎসরের প্রকাশ। 'কবিতা' ও ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' সম্পাদনা করেন। 'কবিতা ভবন' নামক একটি প্রকাশালয়ের স্বত্বাধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : যেদিন ফুটল কমল, বাসর ঘর, সূর্যমুখী, রাধারানীর নিজের বাড়ী, অসামান্য মেয়ে, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, মিসেস গুপ্ত, বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, সমুদ্রতীর, An Acre of Green Grass, লাল মেঘ, অসূর্যম্পশ্যা, তিথিডোর, শেষ পাণ্ডুলিপি, শোণপাংশু, একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু, জাপানি জার্নাল, যে আঁধার আলোর অধিক, আধুনিক বাংলা কবিতা (সম্পাদিত), কালিদাসের মেঘদূত, কঙ্কাবতী, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, বারো মাসের ছড়া।

।। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্বর্ধিত ।।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্বাধীনতার ষোড়শ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে সম্বর্ধিত হন। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীসেনগুপ্তকে গরদের চাদর এবং একটি অশোকস্তম্ভ উপহার দেওয়া হ'ল। সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণদান কালে তিনি সাহিত্যিকের জীবন-দর্শন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি ভাষণে বলেন : "যে উন্মাদ মতবাদ নিজের দেশকে ভাল না বেসে পরদেশকে পূজা করে তাদের জন্য ধিক্কারের ভাষা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সাহিত্যিকদের নূতন করে তৈরী করতে হবে, যেহেতু সে ভাষা অভিধানে নেই।"

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল বাঙলা সাহিত্যের সেবা করে আসছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৩১১ সালে নোয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩২৮ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়। এম-এ এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ১৯৩১ সাল থেকে অচিন্ত্যকুমার বাংলা গভর্নমেন্টের বিচার বিভাগে কর্মারম্ভ করেন। কাব্যগ্রন্থ : অমাবস্যা, প্রিয়া ও পৃথিবী। অন্যান্য গ্রন্থ : প্রথম প্রেম, প্রাচীর ও প্রান্তর, ঊর্ণনাভ, তৃতীয় গরল, ইতি, ছিনিমিনি, সঙ্কেতময়ী, কাকজ্যোৎস্না, ডবলডেকার, পলায়ন, বেদে, টুটাফুটা, প্রজাপতয়ে, যতনবিবি, কল্লোল যুগ, আসমান-জমিন, কাট-খড়-কেরসিন, চাষা-ভুষা, যায় যদি যাক, হাড়ি মুচি ডোম, পাখনা, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (৪ খণ্ড), পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ।

।। ডঃ সুকুমার সেন সম্বর্ধিত ।।

স্বাধীনতার ষোড়শ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ সুকুমার সেনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীপ্রতুল গুপ্ত বলেন : "স্বদেশে ও বিদেশে অধ্যাপক সুকুমার সেন প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইহা তাঁহার খ্যাতির অংশ মাত্র। সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ যথা বিদ্যাপতি গোষ্ঠী, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, ইসলামী সাহিত্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ তাঁর ভাষণে বাঙলা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত সেনের মূল্যবান অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁর রচনাভঙ্গি ও সুগভীর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি জানান।

গরদের জোড় এবং একটি অশোকস্তম্ভ দিয়ে শ্রীযুক্ত সেনকে সম্বর্ধিত করা হয়।

সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত সেন বলেন : তাঁহাকে যে সম্মান দেওয়া হইতেছে সে সম্মান তাঁহার প্রতি উপলক্ষ্য মাত্র। আসল লক্ষ্য তাঁহাদের যাঁহারা দেশে দেশে কালে কালে পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে কালের দীপ অনির্বাণ রাখিয়া উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া আসিয়াছেন।

আলাপ

মিহির আচার্য

দোতলার একটি কক্ষ। সামনে বারান্দা। সূর্যাস্তের মেঘ। অজস্র হাওয়া। চিত্রা ও বর্ণা। দুই বোন। চিত্রা বড়। উভয়েই বিবাহিতা। চিত্রার ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি। মলিন রায়, চিত্রার স্বামী গৃহে অনুপস্থিত।

চিত্রা ।। কাঁদিসনে। কান্না কোনো সমাধান নয়। আমাকে একটু ভাবতে দে। তোর কান্না দেখে আমার সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কাঁদবি যদি আমার কাছে এলি কেন, বাড়িতে বসে কাঁদতে পারতিস।

বর্ণা ।। আমি আর কী করতে পারি বলে দাও।

চিত্রা ।। তার আগে আমাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বল। কতদিন ধরে চলছে এ সমস্ত।

বর্ণা ।। বছর তিনেক।

চিত্রা ।। বছর তিনেক ধরে তুই সহ্য করছিস।

বর্ণা ।। আমি কী করতে পারি--

চিত্রা ।। তুই থাম। শোভনকে আমি বরাবরই জানতাম। সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন, চরিত্রহীন......

বর্ণা ।। না দিদি চরিত্রহীন নয়।

চিত্রা ।। ও তুই স্বামীর হয়ে সাফাই গাইছিস। তাহলে আর মামলা কি করে চলবে। কাদার মতো মন নিয়ে আর যাই হোক সংসার করা চলে না। দাম্পত্য বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন জিনিস। (একটু থেমে) কেন তোরা ভালোবেসে বিয়ে করিস নি?

বর্ণা ।। করিনি ক বলছে! আজো--

চিত্রা ।। আজো ভালোবাসা আছে এই বলতে চাস তো? দ্যাখ ছোটো, ভালোবাসা একটা চরিত্র, তা একটু বাতাসে বেতের মতো হেলে না। তোরা এখনো অ্যামেচার রয়ে গেলি। এই পাঁচ বছরে একটা বাচ্চা হয়েছে তোদের? কেন হয়নি? বিয়েটা ইয়ারকি নয়। রেস্তোঁরা-কাফে-পার্কে হাওয়া-খাবার জন্যে নয়। বিয়ের একটা উদ্দেশ্য আছে লক্ষ্য আছে। ফুল থেকে ফল হয়।

বর্ণা ।। বারে, ছেলে তো আমিই চাইনি।

চিত্রা ।। জীবনকে তোরা অশ্লীল করে ফেলেছিস। প্রচণ্ড স্বার্থপরতা। জানিস মানুষ সন্তান চেয়েও পায় না। আর তোরা, ছিছি।

বর্ণা ।। আমার কী দোষ। শোভন বাবা হ'য়েছে এ আমি ভাবতে পারিনে। আপিস থেকে সে হরলিক্স্ নিয়ে বাড়িতে ঢুকবে, দোলনা ঘাড়ে করে আনবে নুমার্কেট থেকে, সে-দৃশ্য আমি কল্পনাও করতে পারিনে। ও আমার প্রেমিক, সারা জীবন ওকে প্রেমিক ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাও করতে পারব না। না, সে আমি পারব না।

চিত্রা ।। তবে আমার কাছে এসে-ছিস কেন? তোর কান্না দেখাতে?

বর্ণা চুপ।

চিত্রা ।। বিয়ের পর প্রেমিককেও সংসার করতে হয়। প্রেমে দায়িত্ব নেই, বাঁধনও নেই। অথচ সংসার করা মানে দায়িত্ব নেওয়া। আর স্বামীই একমাত্র দায়িত্ব নিতে পারে। দ্যাখ বর্ণা, গৃহধর্ম করতে গেলে ঘর যত স্পষ্ট আর প্রত্যক্ষ হয় ততই মঙ্গল।

বর্ণা ।। কিন্তু আমি এখন কি করে বলব আমি মা হতে চাই? এই সমস্ত ঘটনার পরে? ও এখন ভাববে আমি স্থূলে একটা শেকল দিয়ে ওকে আটকাতে চাই। সে বড় কষ্টের ব্যাপার—

চিত্রা ।। কষ্ট।

বর্ণা ।। নয়? ওতে ওর স্বাধীনতা খর্ব করা হবে। ওকে বন্দী দেখতে আমার ভালো লাগে না। এখুনি ও সারা রাত ছটফট করে, ঘুমোয় না, আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। কিছু জিগ্যেস করিনে ভয়ে। ও কিছু বলতে পারবে না, বলতে চাইলেও না। ওর না-বলার কষ্ট আমায় বিঁধবে।

চিত্রা ।। বা, চমৎকার নাটক।

বর্ণা ।। দিদি তুমি আমার কথা একদম বুঝতে পারছ না।

চিত্রা ।। বেশ বুঝিয়ে বল।

বর্ণা ।। ও আমাকে ভালোবাসে।

চিত্রা ।। তাতে কি প্রমাণ হল।

বর্ণা ।। আমাকে ছেড়ে ও বাঁচতে পারবে না।

চিত্রা ।। তারপর—

বর্ণা ।। এইটেই তো সমস্যা।

চিত্রা ।। আহ্।

বর্ণা ।। ও আমাকে ছাড়তে পারবে না আমিও ওকে—অথচ ও হাঁপিয়ে উঠছে, ওর হাওয়া চাই, আলো চাই—

চিত্রা ।। তবে নিয়ে যা না কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে।

বর্ণা ।। ওর হাওয়া চাই, আলো চাই, সাহস চাই—বুঝতে পারছ দিদি?

চিত্রা ।। শুনি।

বর্ণা ।। তাই তো ওকে আমার ভয়। বাইরে বেরুলে সাহসের অভাবে কি যে করে! আমি ওকে স্বাধীনতা দিতে চাই। কিন্তু স্বাধীনতা উপভোগের সাহস ওর নেই। এমন লোককে তোমার বাইরে ছেড়ে দিতে ভয় করে না?

চিত্রা ।। জানিনে।

বর্ণা ।। ও বলল ওয়ালটেয়ারে যাবে। একা। বললাম বেশ তো যাও। সুটকেস গুছিয়ে দিলাম, বিছানা তৈরি করে দিলাম। আমি তো জানি ও একা যেতে পারে না। আমার বিশ্বাস ওর মনের মতো সাথী ছিল। ও মা! যাবার পরের দিনই হঠাৎ রাত বারোটার সময় ট্যাক্সী বাজিয়ে সে হুড়মুড় করে এসে পড়ল। চাকর-বাকরদের সামনে কী লজ্জা বলো তো। অতো রাত্রে কোথা থেকে বাবুর খাবার জোগাড় করি। দুধ ছিল পাঁউরুটি ছিল, কোনো রকমে তাই দিলাম জোগাড় করে। ওর সারা মুখ থকলে কালি, ভয়ানক শীর্ণ দেখাচ্ছে ওকে। দিদি, ওর এই চেহারা দেখে আমার কষ্ট হল। ও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভীত শ্রান্ত পালিয়ে এসেছে। ও জয় করে এলে আমারি ক্ষতি, কিন্তু বিশ্বাস করো, সে রাত্রে আমার সর্বান্তঃ-করণ দিয়ে চেয়েছিলাম ও জয়ী হয়ে আসুক।

চিত্রা ।। (তীক্ষ্ম কণ্ঠে) তুই জানতিস ওর সঙ্গে কে গেছে?

বর্ণা ।। আমি অনুমান করেছিলাম। কয়েক মাস ধরে শুধু ওয়েলটেয়ারে যাবার জন্যে সে শক্তি সংগ্রহ করছিল। আমি ওকে ওই কয়েক মাসই চিন্তিত দেখেছিলাম, ও দগ্ধ হচ্ছিল ওই একটি ইচ্ছাকে শরীর দেবার জন্যে। কিন্তু আমি জানি শেষ পর্যন্ত ও পারেনি, রাত্রির নির্জনতা তাকে পাথর করে দিয়েছিল।

চিত্রা ।। কি করে বুঝলি তুই ও পারেনি।

বর্ণা ।। পারেনি। সে রাত্রে ওর ব্যর্থতা আমার কাছ থেকে প্রচণ্ড ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিয়েছিল।

চিত্রা ।। (ব্যঙ্গে) কী-চমৎকার তোর ফিলসফি।

বর্ণা ।। তুমি বুঝবে না দিদি। এটা ফিলসফি নয়, জীবন, তার মিস্ট্রি, ধাঁধা।

চিত্রা ।। থাম তুই। ছোটো মুখে বড় কথা শোভা পায় না। সবই যদি বুঝবি তবে আমার কাছে এসেছিস কেন। শোভন শোভন শোভন। সে একটা স্কাউন্ড্রেল, লোফার।

বর্ণা ।। না দিদি না। তুমি একটুও বুঝছ না। একটা লোক অসহায়, দুর্বল, ক্রমশ জীবনের জটিলতায় আটকে যাচ্ছে। অথচ ইচ্ছেয় নয়, সে কখনো কোনো চেষ্টা করেনি। উদ্যোগ করে কিছু করা তার চরিত্রে নেই।

চিত্রা ।। তবে? উৎসাহ না পেলে মেয়েরা এমনিতেই তার প্রেমে পড়ছে?

বর্ণা ।। না দিদি উৎসাহ নয়। প্রশ্রয় বলতে পারো, ওর স্বভাবের প্রশ্রয়।

চিত্রা ।। সেটা কি জিনিস।

বর্ণা ।। ওর দুর্বলতা মেয়েরা পলকে বুঝতে পারে। আর ওর আছে শিশুর মতো কৌতূহল, দেখি-না-কি-হয়।

চিত্রা ।। এই রকম একটা অসৎ লোককে—

বর্ণা ।। দিদি।

চিত্রা ।। ওই একই কথা। খুন করা আর খুন করতে চাওয়া একই অপরাধ। তাহলে বল তুই ওকে প্রশ্রয় দিয়ে বাঁদর করেছিস!

বর্ণা ।। আমি তো ওকে বাইরে পাহারা দিতে বেরুব না। ও আমাকে ছোটো ভাববে আমি সইব কি করে। সে-ই বা মেনে নেবে কেন। পুরুষ তো। আমার কাছে আঘাত পেলে ও কষ্ট পাবে।

চিত্রা ।। (হতাশ গলায়) তুই আমার কাছে কী চাইছিস। দ্যাখ ছোটো, তোকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি।

বর্ণা ।। আহা, কে অস্বীকার করছে। একটু সমস্যাটা বোঝবার চেষ্টা করো।

চিত্রা ।। কী বুঝব। তোকে লুকিয়ে শোভন, যার নাম অশোভন হওয়া উচিত ছিল, দশটা বাজে মেয়ের সঙ্গে ইয়ে করছে, আর তুই প্রতিরোধ করছিস নে।

বর্ণা ।। প্রতিরোধ? দিদি তুমি ভীষণ শক্ত শব্দ ব্যবহার করো। বেশ তো আমি ওকে কি বলব, বলো। বলে দাও। আমি আজই ফিরে গিয়ে ওকে বলব।

চিত্রা ।। কেন, আইন তোর দিকে নেই?

বর্ণা ।। আইন! কি বলছ তুমি। আইন আমাদের মধ্যে কি করবে।

চিত্রা ।। শপথ করে বিয়ে করেনি? আমি, তোর জামাইবাবু তোদের বিয়ের সাক্ষী ছিলাম না? কি বলে শপথ করেছিল শোভন। 'বর্ণা বসুকে আমি স্ত্রী বলে গ্রহণ করলাম।' বলেনি!

বর্ণা ।। বলবে না কেন। তাই যে বলতে হয়!

চিত্রা ।। তবে!

বর্ণা ।। সে-শপথ তো সে ফিরিয়ে নেয়নি!

চিত্রা ।। তবে কি করে সে স্ত্রীকে প্রতারণা করে। ব্রিচ্ অব কনট্রাক্ট। আইন কার দিকে?

বর্ণা ।। দিদি আইনের কথা বোলো না।

চিত্রা ।। কেন বলব না। আকাশে চন্দ্রসূর্য উঠছে না?

বর্ণা ।। তা উঠছে।

চিত্রা ।। যতদিন আইন না বদলাচ্ছে—

বর্ণা ।। আবার আইন।

চিত্রা।। একশোবার আইন। আমি ইচ্ছে করলেই আইন ভাঙতে পারিনে। তাহলে সমাজ ভেঙে যায়।

বর্ণা।। সমাজ ভাঙলে তুমি ঠেকাবে কি করে।

চিত্রা।। বিবাহ বিচ্ছেদ করে।

বর্ণা।। কী বলছ দিদি। শোভন আমাকে ছাড়বে কেন। ও আমার ওপর কত নির্ভর করে। জানো ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে ওর সই আমাকে দেখিয়ে দিতে হয়। (হাস্য) জানো নিজের সইটাও ও নির্ভুল করতে পারে না। ওর চেক ব্যাংক থেকে ফিরে আসে। আর তাছাড়া—(দম নিয়ে) বিবাহবিচ্ছেদ করে বেকার হয়ে যাব না। আবার তো বিয়ে করতে হবে? একটা জীবনে কতবার বিবাহ করব আর বিচ্ছেদ করব। চুল পেকে যাবে না!

চিত্রা।। তবে তুই মেনে নিবি?

বর্ণা।। পারছি কই?

চিত্রা।। মেনেও নিবিনে ছাড়বিও নে, তার অর্থটা কী হল।

বর্ণা।। তাইতো ভাবছি। কি জানো দিদি এই পাঁচ বছরে এমন ভীষণ রকমের ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে, আমরা পরস্পরের অনেক দোষগুণ জেনে ফেলেছি। রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে ওকে পাশে না দেখলে এমন বিশ্রী লাগে—

চিত্রা।। (গম্ভীর হয়ে) ওটা অভ্যেস।

বর্ণা।। ঠিক বলেছ দিদি। কী বিশ্রী অভ্যেস, তাই না!

চিত্রা।। হ্যাঁ। ঠোঁট কামড়াস নে। খারাপ দেখায়।

বর্ণা।। ও আমার কাছে নেই আমি ভাবতে পারিনে। ও আমার ওপর নির্ভর করে। একটা অসহায় শিশু। আমার ওপর নিরংকুশ এই নির্ভরতায় ওর চলাফেরা স্বচ্ছন্দ। আমাকে বিশ্বাস করে বলেই ওর এত জোর!

চিত্রা।। ছাই। এখন বেশ বুঝতে পারছি অপরাধী ও নয়, তুই।

বর্ণা।। সত্যি দিদি ও যদি আমার ওপর কম নির্ভর করত তাহলে—

চিত্রা।। দ্যাখ বর্ণা নিজের কিছু না রেখে সব ছেড়ে দিলে দাম কমে যায়। কিছু হাতে রাখতে হয়।

বর্ণা।। ঠিক বলেছ।

চিত্রা।। মেয়েদের একটু ছলাকলা দরকার। পুরুষ জাতটার জোর বেশি বলে প্রচুর অধিকার খাটায়। দুর্বলরা মরে। গোড়ায় কত ন্যাকামো 'তোমাকে না-পেলে আমার জীবন বৃথা।' তারপর যখন সেই কথায় ভুলে ফাঁদে পা দেয়া বাস তুমি কে আর আমি কে। পাওয়াটা সহজ হওয়ার সংগে মানুষটাও সহজ হয়ে যায়। (গর্বের সংগে) এইজন্যেই শুভ্রকে জবাব দিয়ে দিই। ভালোবাসে বলেই ওর সংগে ঘর করা যায় না। বিশ্বাস কি, আমাকে তিনদিন দেখেই যে প্রেম নিবেদন করতে পারে সে-মানুষ প্রেমের লক্ষণে দীন। আমি মলিনকে বিয়ে করলাম।

বর্ণা।। ও দিদি—

চিত্রা।। নিশ্চয়ই আমি ভুল করিনি। শুনেছিস বোধহয় শুভ্রর টি-বি হয়েছে। ওর অসুখটাও আমার কাছে লুকিয়েছিল। একি উঠছিস কেন! বোস। তোর জামাইবাবু আসুন।

বর্ণা ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। চিন্তিত।

বর্ণা।। ওর জন্যে বাড়ি থেকে বেরুতে পারিনে। কখন আসবে কি দরকার পড়ে, চাকরকে কিছু বলবে না। আর চাকরটা ফাঁকি দেয়। একদিন—মার্কেট থেকে ফিরে দেখি ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। আমার বুক ছাৎ করে উঠল। বললাম ঃ অসুখ! ও বলল ঃ না কিছু নয়। 'তবে আলো জ্বলোনি কেন।' 'মনে ছিল না।' 'চাকরটাকে ডাকোনি কেন।' 'ধ্যাৎ, ভালো লাগল না।' ও জল চাইল। দিলাম। জল খেয়ে বলল ঃ ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল।

চিত্রা।। আবার জাবর কাটতে শুরু করলি।

বর্ণা।। না দিদি। তুমি জানো না। ও অমনি। আসলে আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম বলে বাবুর রাগ হয়েছিল। জানো সেদিন কী পাগলামো করেছে। আলো জ্বালতে দেয়নি। আমাকে কাছে টেনে বসাল। হঠাৎ আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল ঃ কে তোমাকে এত ভালো হতে বলেছে। কেন সন্দেহ করো না। কেন ঝগড়া করো না রাগ করো না।...আমি তো অবাক। জবাব দেবো কি। আমার গলা বন্ধ হয়ে গেছে। ও আমার গলায় মুখ ঘষতে ঘষতে আবার বলল ঃ কেন আমাকে ছেড়ে দাও। কেন পারো না আমাকে আটকে রাখতে। জানো দিদি, ও আর্তনাদ করছিল। আমি ভয়ে হিম।

চিত্রা।। নাটক। নিশ্চয় বাইরে কোথাও ঘা খেয়েছিল।

বর্ণা।। হবে। আমি ওর মাথা কোলে টেনে নিয়ে ওর চুলে হাত বুলোচ্ছিলাম, ওকে আদর করছিলাম যাতে ও শান্তি পায়। জানো ও কয়েকদিন বাড়ি থেকে বেরুল না, আপিসেই গেল না। আমাকেও চোখের সামনে আটকে রাখল। ওর এই মনোযোগ আমাকে দগ্ধ করছিল।

চিত্রা।। দগ্ধ?

বর্ণা।। দগ্ধ নয়, আমার লজ্জা করছিল।

"ধ্যাৎ, ভালো লাগল না।"

চিত্রা।। লজ্জা!

বর্ণা।। করবে না? ও যে কাজকর্ম ছেড়ে বাড়িতে কুঁড়েমি করছিল। পুরুষের এই বেশ ভালো লাগে? তুমিই বলো তো!

চিত্রা।। জানিনে। তোর জামাইবাবু আসুন।

বর্ণা।। দিদি তুমি ওকে ভাঙা জানালা দিয়ে দেখছ।

চিত্রা।। কি করব তোর মতো কাব্য তো করতে পারিনে। ওর তরফ থেকে এই অত্যাচারগুলোকেই তুই ভালোবাসিস। তুই বিকৃত হয়ে পড়ছিস এমন হয়। বড়ো মাছ এইভাবে ছোটো মাছকে গিলে ফেলে। কোথায় নিজেকে টেনে এনেছিস একবার ভেবে দ্যাখ। তোর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য—

বর্ণা।। দিদি তুমি আবার শক্ত কথা বলছ।

চিত্রা।। থাম তুই। শক্ত ব্যাপারে ভাষাও শক্ত হয়, হতে হয়। ফুল ছুঁড়ে দানবকে মারা যায় না। (একটু থেমে) যা বলছিলাম। তুই শোভনের প্রতিবিম্ব হয়ে পড়েছিস। ওর বিচিত্র আবেগের প্রতিক্রিয়া বহন করতে পেরে তুই নিজেকে কৃতার্থ মন করছিস।

বর্ণা।। আমি কী করব। ও যে আমার কাছে চায়। ও যে ভীষণ দুর্বল!

চিত্রা।। বার বার এক কথা।

বর্ণা।। ও যখন ওর কাজগুলোর জন্যে ঘা খায়, যন্ত্রণা পায় তখন আমার ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে ওর শান্তি আমার বুকে নেমে আসুক। দুর্বল মানুষের ওপর সংসারে এই অত্যাচার কেন বলো তো দিদি?

চিত্রা।। জীবনধারণের একটা ব্যাকরণ আছে—

বর্ণা।। দিদি আবার—

চিত্রা।। ব্যাকরণ বাদ দিলাম, লজিক আছে—

বর্ণা।। লজিক কেন?

চিত্রা।। বেশ। বাঁচার একটা নিয়ম আছে, মানিস তো?

বর্ণা।। না মানলে বেঁচে আছি কি করে।

চিত্রা।। একে বাঁচা বলে না। সূর্যমুখীর মতো সমস্ত দেহমন দিয়ে একাগ্র সাধনা, নিবাত নিষ্কম্প—

বর্ণা।। বুঝেছি।

চিত্রা।। কিছুই বুঝিস নি। অতো সোজা নয়।

বর্ণা।। অ দিদি?—

চিত্রা।। তোর জামাইবাবু আসুন। ছটফট করিসনে। বোস।

বর্ণা।। ছটফটের কথা নয় দিদি। তুমি শোভনের ওপর অবিচার করছ।

চিত্রা।। তাই বুঝি! বিচারটা শুনি?

বর্ণা।। সব মানুষের ভেতরে দুটো মানুষ রয়েছে। যতদিন যায় বাইরের জগতটা দুটো মানুষকে ভাগ করে দেবার চেষ্টা করে। যারা চতুর তারা দড়ির খেলা খেলে। আর যারা পারে না, দড়ি গলায় ফাঁস হয়ে ঝোলে।

চিত্রা।। এত সব তত্ত্বকথা শিখলি কোথা থেকে।

বর্ণা।। আমি জানি। নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছি। আমার এক চোখ ওকে ঘৃণা করে আর-এক চোখ ভালোবাসে। এবং এই ভাব-দুটো একসঙ্গেই কাজ করে। কেন করে?

চিত্রা।। আমি জানিনে।

বর্ণা।। তাই তুমি নিবাত নিষ্কম্প, নাকি বললে কথাটা—

চিত্রা।। তুই অতো উচ্চাঙ্গের কথা বুঝবিনে। কী বলছিলি, তোর সেই দুটো-জীবনের কথা বল।

বর্ণা।। বলছি। এই যুগ্ম-জীবনের টানাপোড়েনে শোভন কেবলই বিধ্বস্ত হচ্ছে। ও দুটোকে মেলাতে পারছে না। সে নিজেই যুদ্ধ করছে, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, ক্লান্ত হচ্ছে। ও ভাবছে একদিন যুদ্ধের শেষ হবে। এই অসম্ভবকে সম্ভবের চেষ্টায় ওর রণদীর্ণ মুখ দেখে আমার কষ্ট হয়। আমার সান্ত্বনা কি জানো দিদি: ও বিশ্বাস করে শেষ চূড়ায় একদিন উঠতে পারবে। হোক ভুল, হোক মিথ্যে, যে-মানুষ একটা বিশ্বাস নিয়ে প্রাণপণ করে, তাকে শ্রদ্ধা জানানো চলে।

চিত্রা।। আহা, রণদীর্ণ ভুলের জন্যে বিশ্বাস!

বর্ণা।। কেন নয়? ইতিহাসে এমন ঘটনা পাওয়া যায়, যে-বিশ্বাস নিয়ে কয়েকজন মানুষ সরল পরবর্তীকালে সে অধ্যায়টাই ভুল বলে চিহ্নিত হয়েছে।

চিত্রা।। (মুখ গোঁজ করে) একেবারে পুঁথিপড়া কথা—শেখানো-বিদ্যা।

বর্ণা।। সব বিদ্যাই তো শেখানো দিদি। সে কথা নয়। কথা হচ্ছে একটা মানুষ, যে ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় জীবনের জটিল আবর্তে পড়ে গেছে, সেই জটিলতাকে বোঝা দরকার। আমি জানিনে ও সরল নির্বোধের মতো বাঁচলে কেমন হত। যখন তা হয়নি, তখন তাকে বুঝতে হবে। বেঁচে-থাকা মানেই বুঝতে চেষ্টা করা। সমস্যা সব সময় আমার মুখ চেয়ে হবে এমন ভাবাই বোকামি। যা আমার মনোমতো নয় তার বিরুদ্ধতা করতে গেলে চ্যাঁচালেই শুধু হবে না, চরিত্রকে জানতে হবে। তার জন্যে সহৃদয়তা চাই।

চিত্রা।। জানিস তার জন্যে কত দাম দিতে হবে তোকে?

বর্ণা।। নিজের জন্যে না পারি, আমার প্রিয়জনের জন্যে সে দাম না দিতে পারলে চলবে কেন। একজন আগুন জ্বালিয়ে জ্বলছে আর আমি দূরে দাঁড়িয়ে কামেস্তারা বাজাব তা হয় না। ওর জ্বলুনি সে আমাকে দিতে চায় না। সেটা ওর নিজস্ব, তার বেদনাও ওর একার। আমার কাছে ও সবচেয়ে বেশি আশা করে, অথচ আমি কিছু করতে পারিনে এর চেয়ে করুণ কী আছে!

চিত্রা।। (হতাশ হয়ে) তাহলে আর আমি কী বলতে পারি?

বর্ণা।। পারো। নিজের ধারণার আলোয় একটা নতুন সমস্যাকে বোঝবার চেষ্টা কোরো না। এ যেন ছাত্রজীবনে পড়া জ্ঞান নিয়ে কলেজে বক্তৃতা দেবার ফাঁকি।

চিত্রা।। বেশ। তাহলে তুই কী করবি?

বর্ণা।। আমাকে ওর প্রয়োজন। সমস্যার ঢেউয়ে ওকে একা ছেড়ে দিয়ে আমি কোন্ নিরাপদে সরে পড়ব। ওকে ভালোবাসি। ওর গুণগুলো আমি ভালোবাসি, দোষগুলো না ভালোবাসলে সেটা স্বার্থপরতা হয়। দোষহীন গুণী মানুষ কোথায় পাব? ধরো ওর যদি ক্যানসার হত আমি কী ছাড়তে পারতাম?

চিত্রা।। হাসপাতালে পাঠাতিস।

বর্ণা।। হাসপাতালে পাঠালেই তো আমার গৃহসমস্যা মিটত না দিদি। ও যে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে।

চিত্রা।। তাহলে—

বর্ণা।। অসম্ভব জেনেও মানুষকে বিশ্বাস রাখতে হয়। কারণ আজ আর মানুষের সঞ্চয়ে বিশ্বাস ছাড়া কিছু নেই। যখন জানি সারা জীবন সে কষ্ট পাবে, সে-কষ্ট আমি বহন করতে পারব না, তখন আমার কর্তব্য করে যেতে হবে।

চিত্রা।। (চিৎকার করে) বর্ণা—

বর্ণা।। না দিদি আমাকে থামিয়ে দিও না। শোভনকে আমি যত চিনি, ও নিজেকেও তত চেনে না। বোধহয় এ-ই ভালো। কিন্তু আমার দুঃখ ওর জন্যে। যার সঙ্গে লড়াই করছে তার চেহারা ওর কাছে স্পষ্ট নয়। জীবনকে ও ব্যবহার করতে শেখেনি, জীবনই ওকে ব্যবহার করছে। ও জানে না কি চায়, আসলে ও কিছু চায় না। অন্ধ ভ্রমরের মতো সে চার-দেয়ালে আটকা পড়েছে, দেয়ালে মাথা কুটছে, গোঁ গোঁ করছে, কিন্তু বেরুবার পথ পাচ্ছে না।

চিত্রা মূক।

বর্ণা মূক।

নিঃশব্দতার গৈরিকবিষন্ন পর্দার অন্তরালে ওরা হারিয়ে গেল।।

॥ ডঃ শিশিরকুমার মিত্র ॥

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র তিনি এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপেই অতিবাহিত হয় তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন। কিন্তু তাঁর অসাধারণ প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে। প্রথম ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৯ সালে। তারপর ইউনিভার্সিটি অফ প্যারিসে গবেষণা করে ১৯২২ সালে দ্বিতীয়বার ডক্টরেট সম্মানে ভূষিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপকরূপে তিনি যোগ দেন ১৯২৩ সালে। তাঁরই উদ্যোগ ও উৎসাহে প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে ভারতের আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতারবিদ্যা পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। বেতার ও ঊর্ধ্ব আবহমন্ডল সম্পর্কে গবেষণায় ডঃ মিত্রের খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হয় সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে। ১৯৪৭ সালে তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দি আপার এটমসফিয়ার' আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে ও অতি অল্পদিনের মধ্যেই তার প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। গ্রন্থটি রুশ ভাষায় অনূদিত করেছেন সোভিয়েট সরকার। ঊর্ধ্ব আবহমন্ডলে তাঁর মৌল গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ লন্ডনের রয়াল সোসাইটি ১৯৫৮ সালে তাঁকে 'ফেলো'র মর্যাদা দান করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংখ্যাতীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন ডঃ মিত্র। তাই পরিণত বয়সে তিনি আমাদের মাঝ থেকে চলে গেলেও তাঁর স্থান অপূরণীয়।

॥ ত্যাগের আহ্বান ॥

কয়েকটি সাম্প্রতিক উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে কয়েকদিন আগে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হয়ে গেল তার ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি সমগ্র ভারতের রাজনীতিতে প্রবল আলোড়ন এনেছে। কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মকর্তারা স্থির করেন, একমাত্র প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ছাড়া কেন্দ্র ও সকল রাজ্যসরকারের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন। তারপর তাঁদের মধ্যে থেকে বিশিষ্ট কয়েকজনকে শ্রীনেহরু বেছে নেবেন কংগ্রেসের কাজে সকল সময়ের জন্য নিয়োগের উদ্দেশ্যে। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে সকল রাজ্যের মন্ত্রিসভাই পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং প্রায় সকলেই শ্রীনেহরুর কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র প্রেরণ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শ্রীনেহরুর আহ্বানে কংগ্রেসের সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত আছেন। এঁদের মধ্যে কজনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে শ্রীনেহরু তাঁদের কংগ্রেসের কাজে নিযুক্ত করবেন তা ২০শে আগস্ট নাগাদ জানা যাবে।

কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বড় যে সত্যটি আর একবার সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হল তা হ'ল শ্রীনেহরুর প্রতি সমগ্র কংগ্রেসের অকুণ্ঠ আনুগত্য। কংগ্রেসের নেতা ও দেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে তিনি যা করেন বা করা উচিত বলে মনে করেন সে সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করার মত কোন লোক শাসকদলে নেই। দ্বিতীয়ত, একথা জেনেও দেশবাসী যথেষ্ট সান্ত্বনা পাবেন যে, মন্ত্রিত্বকে চরম পাওয়া বলে এখনও মনে করেন না দেশের নেতৃবৃন্দ। প্রয়োজনে মৃৎপাত্রের মতই মন্ত্রিত্বকে দুই পায়ে ঠেলে তাঁরা আবার জনগণের মাঝে এসে দাঁড়াতে পারেন।

কিন্তু আমরা সবিনয়ে প্রশ্ন করি যে, মন্ত্রী থেকেই জনগণের মাঝে এসে দাঁড়াতে বাধা কোথায়? আর মন্ত্রী যতদিন না জনগণের মন্ত্রী হবেন ততদিন দেশের কল্যাণই বা কেমন করে সম্ভব? জনগণের নেতা জনগণের পাশে এসে দাঁড়াবেন সেটা সব সময়েই ভাল কথা। কিন্তু শাসনযন্ত্র যদি জনগণের প্রতি বিরূপ হয় তবে তাঁদের পক্ষে সরকারের বাইরে থেকে কিছু করা সম্ভব হবে কি? দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনই যদি কংগ্রেস নেতাদের বর্তমান চিন্তার বিষয় হয়ে থাকে, তবে আমরা মনে করি যে, দেশের ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতাদের সরকারের বাইরে না এনে তাঁদের দিয়েই সরকার গঠন করা উচিত। শুধু শাসনকার্যের মাধ্যমেই জনগণের হৃদয় জয় করতে পারে কংগ্রেস, বাস্তব সম্পর্কবর্জিত আদর্শপ্রচারের দ্বারা নয়। কংগ্রেসের যেমন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন ঠিক তেমনি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালন-দায়িত্বও এমন সব লোকের হাতে থাকা প্রয়োজন যাঁদের কর্মদক্ষতা সন্দেহাতীত ও যাঁদের আদর্শনিষ্ঠা সর্বজনস্বীকৃত।

॥ নাগা দৌরাত্ম্য ॥

নাগাদের আত্মসমর্পণের জন্য দু মাস সময় দেওয়া হয়েছিল। সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ১লা জুলাই থেকে ৩১শে আগস্টের মধ্যে যে সব বৈরী নাগা আত্মসমর্পণ করবে তাদের কোনরকম শাস্তি দেওয়া হবে না, এমন কি তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনেরও ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ছয় সপ্তাহ পরেও নাগা পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে যে নাগাদের উৎপাত নাগাভূমি থেকে বিস্তৃত হয়ে মণিপুরে প্রবেশ করেছে। সারা জুলাই মাসে মাত্র উনত্রিশ জন আত্মগোপনকারী নাগা খালি হাতে আত্মসমর্পণ করেছে, অর্থাৎ তাদের অস্ত্রগুলি দিয়ে এসেছে সঙ্গী যোদ্ধাদের হাতে। সরকারী হিসাবমতে এখনও আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার মত বৈরী নাগা আত্মগোপন করে স্থানীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এবং তারা লড়াইয়ে হাতবোমা, ব্রেনগান ইত্যাদি যে সব আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা বিদেশী কোন সরকারের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে অস্ত্র-সরবরাহ পাচ্ছে। কদিন আগে তাদের অতর্কিত আক্রমণে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর নয়জনের প্রাণহানি ঘটে, ষোলজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বৈরী নাগাদের তৎপরতা এইভাবে

বেড়ে যাওয়ায় জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে নাগাভূমির কয়েকটি স্থানে আর্জমা প্রদর্শনের ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

মণিপুরের সীমান্তবর্তী নাগা উপজাতীয়দের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ইতিমধ্যে হঠাৎ মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছে। গত কয়েক মাসে নাগাভূমির বৈরী নাগাদের মতই তারা সেতু ধ্বংস করেছে, জনপদের উপর হামলা করে টাকা-কড়ি ও খাদ্যসামগ্রী ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ও বহু নিরপরাধ নর-নারী তাদের হাতে বন্দী হয়েছে। মণিপুরের পাহাড়-পর্বত ও গভীর জঙ্গলে তাদের আশ্রয়, যেখানে সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে পৌঁছানো প্রায়-অসম্ভব কাজ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সরকারের বর্তমান নীতি অদূর ভবিষ্যতে নাগা সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে না।

॥ সিংহলের চা ॥

পয়লা আগস্ট সিংহল সরকারের পক্ষে অর্থমন্ত্রী শ্রীইলিঙ্গারত্নে ঘোষণা করেন, সিংহলের যাবতীয় বৈদেশিক বীমা-ব্যবসায় জাতীয়করণ করা হবে। জীবনবীমা ইতিপূর্বেই জাতীয়করণ করা হয়েছে। সিংহল সরকারের এই সিদ্ধান্ত বৃটিশ সরকারের পক্ষে ক্ষোভের কারণ হবে এবং সে কারণে তারা হয়ত সিংহলের চা কেনা বন্ধ করে সিংহলকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে—এই রকম একটা আশঙ্কার উপর ভিত্তি করে অর্থমন্ত্রী বলেন, যদি বৃটেন তাই করে তবে সব চা-বাগিচাও জাতীয়করণ করা হবে, আর সিংহলের চা বেচা হবে রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে।

সিংহলে শ্বেতাঙ্গদের যে চা ও কফি বাগানগুলি আছে তার মোট মূল্য প্রায় ২৬ কোটি পাউণ্ড। এ সব চা-বাগান থেকে যা লাভ হয় তার প্রায় শতকরা ৯০ সিংহল সরকার রপ্তানী শুল্ক ও অন্যান্য কর বাবদ আদায় করে নেন। সুতরাং বাকি মাত্র দশ শতাংশ লাভ কুক্ষিগত করার জন্য বাগিচাগুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ঝুঁকি সিংহল সরকারের পক্ষে নেওয়া ঠিক হবে কিনা সেটা অবশ্যই ভাববার বিষয়। প্রধানত শ্বেতাঙ্গ মালিকদের বাগানের চা বলেই বৃটেনের বাজারে যে চায়ের কদর, শ্বেতাঙ্গ মালিকানা চলে গেলে সে কদর নিশ্চয়ই থাকবে না। তখন সিংহলের পক্ষে রাতারাতি ঐ বিপুল পরিমাণ চায়ের বাজার নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। চা-উৎপাদনকারী দেশগুলির সংগে ক্রেতা দেশগুলির চুক্তির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের কোটা স্থির করা আছে, সিংহলের প্রয়োজনে কোন ক্রেতাদেশ নিশ্চয়ই চা-উৎপাদনকারী অন্য কোন দেশের সংগে চুক্তিভংগ করবে না। অথচ বৃটেন যদি হঠাৎ সিংহলের চা কেনা বন্ধ করে তবে সিংহলের যে কি সাংঘাতিক ক্ষতি হবে তা এই হিসাবটুকু থেকেই বোঝা যাবে। ১৯৬২ সালে সিংহল বিদেশে চা বেচে পেয়েছিল ৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, যা তার মোট রপ্তানীলব্ধ অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ। এর মধ্যে শুধু বৃটেনেই বিক্রয় হয়েছিল ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের চা। মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের এক-চতুর্থাংশ এইভাবে হারানোর ঝুঁকি সিংহল সরকারের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

॥ ফ্রান্স জার্মানীর সিদ্ধান্ত ॥

আংশিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তিতে যারা সম্মত হবে না বলে মনে করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে পরীক্ষা বন্ধের পক্ষে মনোভাব ব্যক্ত করেছে। এদের মধ্যে পঃ জার্মানীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। পঃ জার্মান সরকার স্থির করেছেন, তাঁরা আংশিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবেন। ফ্রান্স আংশিক পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্তকে অর্থহীন বলে ঘোষণা করলেও ফ্রান্স সরকারের পক্ষ হতে জানানো হয়েছে যে, সাহারা মরুভূমির বায়ুমণ্ডলে আর তাঁরা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করবেন না। সুতরাং আংশিক পরীক্ষা বন্ধের প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে বাকি রইল শুধু কমিউনিস্ট চীন। কমিউনিস্ট চীন তার এই আচরণ ও সিদ্ধান্ত দিয়ে আর একবার জানিয়ে দিল যে, বিশ্বজোড়া পারমাণবিক বিপর্যয়ই তাদের কাম্য, শান্তি তারা চায় না।

॥ প্রাভদার অভিযোগ ॥

চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধে সোভিয়েট সরকার এতদিন নীরব ও নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রাভদায় এ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে তাতে মনে হয় যে, সোভিয়েট সরকার এখন থেকে ভারতকেই এ ব্যাপারে সমর্থন করবেন। প্রাভদায় এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য চীনকে সুস্পষ্ট ভাষায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধের এখনও যে নিষ্পত্তি হয়নি তার জন্যে চীনই সম্পূর্ণ দায়ী। কারণ কলম্বো প্রস্তাব তারা গ্রহণ করেনি এবং ভারত-সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে তারা মীমাংসার প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

৮ই আগষ্ট-২২শে শ্রাবণঃ মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান—মাদ্রাজ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকামরাজ নাদারের প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নীতি-গতভাবে গ্রহণ। কংগ্রেসের সেবার জন্য শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর (কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) মন্ত্রিত্ব ত্যাগের ইচ্ছা।

রবীন্দ্র তিরোভাব দিবসে কবিগুরুর প্রতি জাতির শ্রদ্ধার্ঘ্য।

কলিকাতা ও হাওড়ায় মাছের বাজারে লাইসেন্স প্রথা চালু—কারবারীদের লাইসেন্স পরীক্ষার জন্য বাজারে বাজারে পুলিসের হানা।

আলোচ্য দিনে ৪৯৫ জন স্বর্ণ-শিল্পী সত্যাগ্রহীর গ্রেপ্তার বরণ।

'ভারত পরীক্ষা আইনে আটক-বন্দীদের মুক্তি দেওয়া চলে না' —সুপ্রীম কোর্টে এটর্নি-জেনারেল শ্রীসি কে দফ্‌তরীর সওয়াল।

৯ই আগষ্ট—২৩শে শ্রাবণ ঃ চীনা বিমান কর্তৃক দুইবার (৩০শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট) ভারতের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন—চীনের নিকট ভারতের প্রতিবাদ।

পশ্চিমবঙ্গে আচার্য বিনোবা ভাবের (ভূদান আন্দোলনের নেতা) পদযাত্রার (দশমাসব্যাপী) সমাপ্তি।

সুপ্রীম কোর্টে ভারত রক্ষা আইনে আটক-বন্দীদের আপীলের শুনানী শেষঃ স্পেশাল বেঞ্চ কর্তৃক রায়দান স্থগিত।

করিমগঞ্জ (আসাম) সীমান্তে পাকিস্থানী তৎপরতা বৃদ্ধি।

কলিকাতায় আরও ২৬১ জন স্বর্ণশিল্পী গ্রেপ্তার।

১০ই আগষ্ট—২৪শে শ্রাবণঃ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (দিল্লী বৈঠক) কর্তৃক কামরাজ (মাদ্রাজ মুখ্যমন্ত্রী) প্রস্তাব (প্রবীণ নেতাদের মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া কংগ্রেসের কার্যে আত্মনিয়োগের দাবীকৃত) সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন—শ্রীনেহরুর উপর প্রস্তাব কার্যকরী করার দায়িত্ব অর্পিত।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন (পশ্চিমবঙ্গ) ও অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীগণের পদত্যাগ করিয়া কংগ্রেস সংগঠনের কাজে নিযুক্ত হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ।

স্বর্ণশিল্পীদের আইন অমান্য আন্দোলনের (প্রথম পর্যায়) অবসান—শেষ দিনে (পঞ্চদশ দিবস) ৫২৫ জন গ্রেপ্তার।

১১ই আগষ্ট—২৫শে শ্রাবণ ঃ সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লীতে সংসদের বিরোধী সদস্যদের সহিত শ্রীনেহরুর বৈঠক— প্রধানমন্ত্রীর আশংকা ঃ চীন ও পাকিস্থান যুগপৎ ভারত আক্রমণ করিতে পারে।

বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে মধ্যরাত্রি হইতে বোম্বাই পৌরসভা শ্রমিকদের (প্রায় ৩০ হাজার) ধর্মঘট শুরু।

১২ই আগষ্ট—২৬শে শ্রাবণ ঃ বনগাঁ শাখার মধ্যগ্রাম ষ্টেশনে শোচনীয় মালগাড়ী দুর্ঘটনায় তিনজন রেলকর্মী নিহত।

আসামের বিভিন্ন নদীতে পুনরায় জলস্ফীতি—প্রবল বর্ষণের পরিণতিতে জোড়হাট শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন।

পৌরকর্মী ধর্মঘট, বর্ষণ ও বাত্যায় বোম্বাই শহরে অচলাবস্থা।

রেওয়ার শাদা বাঘ যুগলের আলিপুর চিড়িয়াখানায় উপস্থিতি।

১৩ই আগষ্ট—২৭শে শ্রাবণ ঃ প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের (৭৩) কলিকাতায় জীবনাবসান।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনে আচার্য কৃপালনীর (নব-নির্বাচিত লোকসভার সদস্য) অনুমতি লাভ—স্বাধীন ভারতের সংসদের ইতিহাসে নূতন নজীর।

আসাম পুলিশের ব্যারাকখানায় (গৌহাটির অনতিদূরে) প্রচন্ড বিস্ফোরণ—বত্রিশজনের প্রাণহানি।

১৪ই আগষ্ট—২৮শে শ্রাবণ ঃ নব-ভারত গঠনে নূতন করিয়া শপথ গ্রহণের আহ্বান—স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের বাণী।

মোহনবাগান দলের পুনরায় ফুটবল লীগ চাম্পিয়ান (একাদশ বিজয়) হওয়ার গৌরব লাভ।

শ্রীনেহরু কর্তৃক কলেজ-ছাত্রদের বাধ্যতামূলক এন্‌-সি-সি ট্রেনিং প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

॥ বাইরে ॥

৮ই আগষ্ট—২২শে শ্রাবণ ঃ মস্কোয় আংশিক পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ-চুক্তিতে (ত্রিশক্তি সম্পাদিত) ভারতের স্বাক্ষর।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ত্র প্রেরণ বন্ধের আহ্বান—রাষ্ট্রসংঘ স্বস্তি পরিষদে অ্যাফ্রো-এশীয় প্রস্তাব গৃহীত।

৯ই আগষ্ট—২৩শে শ্রাবণঃ রমে আবার গুরুতর রাজনৈতিক সংকট—এগারোজন শীর্ষস্থানীয় গ্রেপ্তার।

রাজা মহেন্দ্রের (নেপাল) আগষ্টের শেষদিকে ভারত সফরের সিদ্ধান্ত।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বৌদ্ধদের ধর্মীয় আন্দোলন প্রেঃ দিয়েম-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত।

১০ই আগষ্ট—২৪শে শ্রাবণ ঃ 'ভারতে প্রতিক্রিয়াশীলরা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে'—সোভিয়েট 'প্রাভদা' পত্রিকায় সমালোচনা।

কম্যুনিষ্ট চীনে ব্যাপক ক্রুশ্চেভ-(রুশ প্রধানমন্ত্রী) বিরোধী প্রচারের সংবাদ।

দক্ষিণ-পূর্ব জাপানে প্রবল ঘূর্ণি-বাত্যা।

চুম্বি উপত্যকায় (সিকিমের সীমান্ত-বর্তী) বিপুল চীনা সৈন্য সমাবেশ—নেপাল-তিব্বত সীমান্তের নিকটেও চীনা তৎপরতা বৃদ্ধি।

১১ই আগষ্ট—২৫শে শ্রাবণঃ পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভুট্টো কর্তৃক ভারত-সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের অভিযোগ অস্বীকার।

১২ই আগষ্ট—২৬শে শ্রাবণ ঃ নেপালে ভূমিধ্বসে দেড় শতাধিক ব্যক্তি নিহত ঃ তিনটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হওয়ার সংবাদ। নেপালের ডালোয়াতে কোশীর বাঁধ ভাঙ্গন অব্যাহত।

ভিয়েৎনামের হুয়ে শহরে আর একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর অগ্নিতে আত্মদান। —দক্ষিণ ভিয়েৎনামী প্রেসিডেন্ট নো দিন দিয়েমের ধর্মীয় নীতির কঠিন প্রতিবাদ।

নেভাদার ভূগর্ভে আমেরিকার আবার পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ।

১৩ই আগষ্ট—২৭শে শ্রাবণ ঃ সরকারের সংস্কারের দাবীতে কঙ্গোয় গণ-বিক্ষোভ—পুলিশ ও সেনাদলের গুলীবর্ষণ।

'আঙ্গোলা ও মোজাম্বিককে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র করিতে চাহিলে পর্তুগাল আপ্রাণ লড়াই দিবে'—পর্তুগীজ প্রধান-মন্ত্রী ডাঃ সালাজারের হুমকী—দুইটি অঞ্চলই পর্তুগালের অবিচ্ছেদ্য অংগ বলিয়া দাবী।

ভারত-সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য 'প্রাভদা' (সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি মুখপাত্র) কর্তৃক চীনের নিন্দা।

১৪ই আগষ্ট—২৮শে শ্রাবণ ঃ ব্রাজাভিলে (কঙ্গো) অবরোধ অবস্থা—আফ্রিকান মহল্লাগুলিতে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের পরিণতি।

শ্রীভূতলিঙ্গমের মস্কো মিশন (ভারতের জন্য অস্ত্রসংগ্রহ বিষয়ক) সাফল্যমন্ডিত।

পরলোকগত কথাশিল্পী মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৬ই আগষ্ট পরলোকগমন করেছেন। তাঁর আটাত্তর বৎসর বয়স হয়েছিল।

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগে বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রগুলি তাঁর রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হত। তাঁর 'স্বয়ংসিদ্ধা' উপন্যাসটি ছায়াচিত্রে খুবই সাফল্যলাভ করে।

১৮৮৬ সালে ২৪-পরগণা জেলার মণিখালি-কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ⁕শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আঠারো বৎসর বয়স থেকে তিনি সাহিত্য রচনা আরম্ভ করেন। কিছুকাল নাটক-সংক্রান্ত পত্রিকা 'নাট্য-মন্দির' সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে স্বয়ংসিদ্ধা, অপরাজিতা, রাগিণী, কন্যাপীঠ, অদৃষ্টের ইতিহাস, জাগ্রতা ভগবতী, দুঃখের পাঁচালী, কুমারী সংঘ, বাজীরাও, অহল্যাবাঈ, মহামানব বাসুদেব (শেষের চারখানা নাটক) উল্লেখযোগ্য। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গিরিশ অধ্যাপক' নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সম্প্রতি তিনি মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার লিখছিলেন। কিন্তু মাত্র এক ফর্মা বাকী থাকতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় গত কয়েক মাস যাবৎ কাশীধামে বাস করছিলেন। গত ১১ই আগষ্ট তাঁর জন্মদিনে তিনি কলিকাতায় পুত্রের কাছে ফিরে আসেন। ১৬ই আগষ্ট বেলা দুটো নাগাদ তিনি শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের এক বিস্মৃতপ্রায় যুগের বোধ হয় শেষ প্রতিনিধির জীবনাবসান ঘটল।

●

॥ পরলোকে তরুণ কবি ॥

গত ১৩ই আগস্ট মঙ্গলবার তরুণ কবি দিলীপকুমার সেনের মৃত্যু হয়। মৃত্যু সর্বদাই বেদনাদায়ক কিন্তু তা যখন আসে মাত্র বত্রিশ বছরের একটি সম্ভাবনাময় জীবনে তখন সে বেদনা মর্মান্তিক ও সান্ত্বনাহীন। তাঁর একমাত্র কাব্য উত্তর তরঙ্গের নায়ক। তা ছাড়া ইতস্তত পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো তাঁর অজস্র কবিতা আজও গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়নি। আধুনিক কাব্যনাট্য রচনায় তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর আগে আটমাস তিনি গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন। আমরা তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর
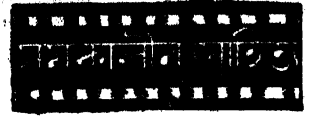
বাংলা সাহিত্যে ছড়া

১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি রচনা করেন এবং বাংলা সাহিত্যের ইতস্তত ছড়ানো অসংখ্য ছড়া যে লোক-সাহিত্যের কি অপূর্ব রত্ন-সম্ভার সেই বিষয়ে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেছিলেন—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান" এই ছড়াটি আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতি-প্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, অথচ এই সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোক-স্মৃতি চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।"

ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে চিরত্ব আছে, তা আজ থেকে উনসত্তর বছর আগে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন এবং মূলতঃ তাঁর প্রেরণায় বাংলায় লোক-সাহিত্যের পুনরাবিষ্কার এবং ছড়া সম্পর্কে নতুন গবেষণার সূত্রপাত ঘটেছে। গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে এই কর্মে যাঁরা ব্রতী ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নাম তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বাংলার প্রাণ-প্রবাহের সঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্যের নিবিড় সংযোগ, লোক-সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ মানবিকতার প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা, তাই অভিযাত্রীর মতো তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'বাংলার লোক-সাহিত্য' নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে আলোচনা এবং সেই গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে। সেই গ্রন্থে লেখক লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি 'ছড়া' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ডঃ ভট্টাচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বাংলা ছড়া বিষয়ে উৎসাহের কথা উল্লেখ করেছেন। সাহিত্য-পাঠকের কাছে রামেন্দ্রসুন্দরের এই প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান। পরিশিষ্টাংশে এই দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধটি সংযুক্ত করা হয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন যে "রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরই দুইটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ

হইতে ইঁহাদের সম্পর্কে (অর্থাৎ ছেলে-ভুলানো ছড়া, মেয়েলী ছড়া ইত্যাদি) আলোচনা করিয়াছেন। লেখক উপলব্ধি করেছেন যে প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন এবং সেই প্রসঙ্গে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে গভীরতর অনুশীলন আবশ্যক।

এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন, এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ও তথ্যনির্ভর আলোচনায় তিনি অধিকারী ব্যক্তি, তাই "বাংলার লোক-সাহিত্য" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন বিবেচিত হবে। তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত পথে বাংলা ছড়ার সাহিত্যিক ও সমাজজীবনের ধারা আলোচনা করেছেন। বিস্মৃতির গহ্বর থেকে বহু লুপ্তসম্পদ তিনি উদ্ধার করেছেন।

ডঃ ভট্টাচার্য-রচিত এই গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক বিন্যাস-পদ্ধতি আমাদের বিশেষরূপে ভালো লেগেছে। ভূমিকা-অংশে প্রাচীন ছড়ার রূপ এবং ছড়ার বিশেষত্ব এই দুই প্রসঙ্গে উপস্থাপিত বক্তব্য বিষয়ে লেখকের গভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

লেখক ছড়াগুলির বিভিন্ন রূপকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা : ঘুমপাড়ানি, ছেলেভুলানো, খেলা, কন্যা, পরিবার, প্রাকৃত জগৎ, অতি-প্রাকৃত জগৎ এবং সাহিত্যিক ছড়া। এই বিন্যাস থেকে অনুমান করা কঠিন হবে না যে কি বিরাট সম্পদকে তিনি পাঠক-চক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছড়া এবং সেই "ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়-বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।" একথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ সালে লিখিত তাঁর সুদীর্ঘ 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে ঘুম পাড়ানি ছড়া ও ছেলেখেলার ছড়া বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। ডঃ ভট্টাচার্য প্রণীত এই গ্রন্থ ছড়া বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-গ্রন্থ।

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সমাজ-জীবনের চিত্র, লোক-সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ আচার বাংলার প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধানতম উপাদান, সেইসব বিস্মৃতপ্রায় রত্নরাজি এইসব মুখে মুখে প্রচলিত সংক্ষিপ্ত ও সর্বজনপ্রিয় ছড়া ও গানের ভিতর ছড়িয়ে আছে। দেশের মাটির গভীরে তার শিকড় নেমেছে এবং বৈদেশিক সভ্যতার কৃত্রিমতা ও নগর-জীবনের বিলাস-বৈভব অনেক কিছু লুপ্ত করেছে কিন্তু এই জাতীয় সম্পদটিকে ধ্বংস করতে পারেনি। ডঃ ভট্টাচার্য এই দেশজ সম্পদকে একত্রে গেঁথেছেন, তাদের ছন্দ-মাধুরী, ভাষার সাবলীলত্ব এবং প্রচ্ছন্ন শ্লেষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

লেখক আর একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন প্রতিটি ছড়ার আঞ্চলিক উৎপত্তি-স্থল উল্লেখ করে। 'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি' ছড়াটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, হুগলী, ২৪ পরগণা, প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তা দেখে পাঠক বিস্ময়বোধ করবেন। প্রথম পদটিতেই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ। গ্রন্থকার ছেলেভুলানো ছড়ার দোলনা অংশে বিখ্যাত ইংরেজ লোকশ্রুতিবিৎ পণ্ডিত ডঃ ভেরিয়ার এলউইন সাহেবের একটি উক্তির উদ্ধৃতি-দান করেছেন, যথা :

"Cradle songs are everywhere very much the same; in talking to a baby all the world uses the same language — "

এই কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য।

শিশুর ঘুম, শিশুর খাওয়া ও শিশুর কান্না এই তিনটি বিশেষ উপ-লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে যে কত রকমের ছড়া প্রচলিত আছে তার বিস্ময়কর বিবরণ দিয়েছেন লেখক। এ ছাড়া খোকার ভ্রমণ, খোকার নৃত্য, খোকার জন্য চাঁদের আহবান, খোকার বিবাহ, ধন ধন ধন— ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি পাঠকালে এমন ব্যক্তি খুব অল্পই আছেন যাঁর অন্তরে শৈশবস্মৃতি জাগ্রত হবে না।

ডঃ ভট্টাচার্য অষ্টম অধ্যায়ে 'সাহিত্যিক ছড়া' এই প্রসঙ্গে আধুনিক-কালে রচিত ছড়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সাম্প্রতিকতম কবিদের রচিত ছড়ার দৃষ্টান্ত দান করে শুধু সাহিত্যিক উদারতা নয় দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরকালে শুধুমাত্র

সেক্সপীয়রের চতুর্থ শতাব্দী জন্মবার্ষিকী

আগামী বৎসর এপ্রিল মাসে মহাকবি সেক্সপীয়রের চতুর্থ জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্যাপনের জন্য গত সোমবার, ৫ই আগস্ট যুগান্তর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী এবং সাংবাদিক নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কমিটির প্রথম বৈঠকে একটি খসড়া কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। কার্যসূচীতে বলা হয়েছে যে, আগামী বৎসর এপ্রিল মাসে কলিকাতায় মহাকবি সেক্সপীয়রের জন্মোৎসব উপলক্ষে চারদিন সেক্স-পীয়রের নাটক, সংগীত এবং কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করা হবে। তাছাড়া এই উপলক্ষে একটি সেক্সপীয়র স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। এই গ্রন্থের সম্পাদনা করবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যো-পাধ্যায়। স্মারক গ্রন্থে ভারতে, বিশেষত বাংলা দেশে সেক্সপীয়র-চর্চার উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলিত হবে। উৎসব-কমিটি এই উপলক্ষে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সেক্সপীয়র সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থাও করবেন।

কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে : সভাপতি : শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী; সহঃ সভাপতি : শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমলেন্দু বসু ও শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ; যুগ্ম-সম্পাদক : শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু; সহকারী সম্পাদক : শ্রীকৃষ্ণ ধর ও শ্রীমণীন্দ্র রায়; কোষাধ্যক্ষ : শ্রীকৃষ্ণদাস রায়; নাটক উপ-সমিতি : শ্রীমন্মথ রায়, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসোমেন্দ্র নন্দী ও শ্রীকেশব মুখার্জি। উৎসব উপ-সমিতি : ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীআশু-তোষ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী ও শ্রীসুধীর ঘোষ। স্মারক গ্রন্থ উপ-সমিতি : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীমুকুন্দ-বিহারী মিত্র ও শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী। উপদেষ্টারূপে আছেন শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীমতী লীলা মজুমদার, শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, শ্রীতারকনাথ সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কমিটির কার্যালয় ৭২।১, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—৩। উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য সাধারণ সদস্য গ্রহণ করা হবে।

এই পরিচ্ছেদটুকু অবলম্বন করেই হয়ত উত্তরসূরীরা বিরাট গবেষণাগ্রন্থ রচনা করবেন, ডঃ ভট্টাচার্য পথ-প্রদর্শন করলেন। তিনি বলেছেন, "বিস্ময়ের সহিত ইহাও লক্ষ্য করিতে হয় যে, বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক মনীষী, চিন্তাবিদ, লেখক ও কবি লোক-সাহিত্যের এই ছড়া-তীর্থে অবগাহন করিয়া প্রাণের ঘট ভরিয়া লইয়াছেন।" গ্রন্থকারের এই উক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো, তিনিও লোকসাহিত্যের মহা-সাগরে প্রাণের ঘট পূর্ণ করার যে সুযোগ দান করেছেন এই গ্রন্থে তজ্জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শুধু ছড়া নয়, তার উৎপত্তি, বিশ্লেষণ এবং সমাজজীবনে তার সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি এক স্বপ্ন-স্নিগ্ধ সোনালি অতীতে পাঠকমনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। *

* **বাংলার লোক-সাহিত্য—২য় খণ্ড।। ডক্টর** আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত। (পৃঃ ৭৩০)। প্রকাশক—ক্যালকাটা বুক হাউস। ১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ ।। দাম বারো টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ মাত্র।

●

একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস

সুবোধ ঘোষ জনপ্রিয় লেখক। ইদানীং তিনি গল্প প্রায় লেখেন না বলা চলে, কিন্তু সাম্প্রতিককালে যে-কটি উপন্যাস লিখেছেন সবকটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'বসন্ত তিলক' তাঁর নবতম উপন্যাস। বাংলার বাইরে পরেশনাথ পাহাড়ের কাছাকাছি কোনো এক স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে এই কাহিনীর যবনিকা উঠলে দেখা যায় যে, নায়িকা আত্রেয়ীর কঠোর তপশ্চর্যা, তার স্বামী হেমন্ত বিয়ের পরদিন চলে গিছল জেলখানায় আর আত্রেয়ী শবরীর মত তার প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। এই তাপসীকন্যার জন্য সকলের প্রাণ স্নেহ ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ, অথচ যখন হাওয়া বদলের প্রয়োজনে পাশাপাশি বাড়িতে নিখিলরা এসে উঠল তখন আত্রেয়ী তার সঙ্গে অতিশয় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। কানাকানি আর চাপা আলোচনায় সকলে আতঙ্কিত এমন সময় হেমন্ত ফিরে এল, হিতৈষীরা বুঝল যে আত্রেয়ীর তপশ্চারণ বৃথা নয়, সে হেমন্তকে ভোলেনি নিখিলকে নিয়ে খেলায় মেতেছিল মাত্র। মিলনের মধুর পরিবেশে উপন্যাসের সমাপ্তি। কাহিনী সংক্ষেপে এই হলেও জীবনস্বপ্নের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত ও চরিত্র-বিশ্লেষণে প্রখ্যাত লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। 'বসন্ত তিলক' সুখপাঠ্য ও সুন্দর উপন্যাস। ছাপা এবং বাঁধাই মনোরম।

বসন্ত তিলক— (উপন্যাস) **সুবোধ ঘোষ। আনন্দ পাবলিসার্স (প্রা) লিঃ কলিকাতা—৯। দাম পাঁচ টাকা।**

●

কিংবদন্তীতে প্রাণসঞ্চার

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কুমার-সম্ভবের কবি' এই কাহিনীটি ইতিপূর্বে চিত্রনাট্য হিসাবে প্রচলিত ছিল, তখন তার নাম ছিল 'কালিদাস', লেখক সেই কাহিনীটি উপন্যাসের আঙ্গিকে নতুন করে লিখেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সর্বপ্রধান গুণ এই যে, তিনি যে কালের কাহিনী পরিবেশন করেন পাঠককেও সেই কালে নিয়ে যান। 'কুমারসম্ভবের কবি' এই কাহিনীটি এমনই অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক—কালিদাসের জীবন ও প্রেম কাহিনী সম্পর্কে সকলেরই আবছায়া একটা ধারণা আছে, লেখক কিংবদন্তীকে আখ্যায়িকায় প্রাণসঞ্চার করেছেন। একটা সুন্দর স্বপ্নের মত মহাকবি কালিদাসের সম্পর্কিত এই কিংবদন্তী পড়া শেষ হলে মন যেন কালিদাসের কালের স্বর্গ-রাজ্য থেকে একালের মর্তলোকে নেমে আসে। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

কুমারসম্ভবের কবি— (উপন্যাস) **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক বর্তিকা, ১।৩২এফ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা—২৬। দাম তিন টাকা মাত্র।**

●

দেশগঠনের নতুন পাঠ

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে এই নামে যাঁকে চেনা যায় না তিনি এস কে দে নামে পরিচিত। ভারত সরকারের কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট, পঞ্চায়েতী-রাজ ও কো-অপারেশন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাঁর জন্ম শ্রীহট্টে, তিনি আমেরিকায় দুটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস-সি ও এম-এস-সি পাশ করে ষোল বছর আমেরিক্যান জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে পুনর্বাসন ব্যবস্থা। তাঁর হাতে গড়া 'নিলোখেরী' এক কৃষি ও শিল্পসমৃদ্ধ জনপদ। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ 'কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট—এ ক্রনিকল" নামক ইংরাজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থের কোথাও অনুবাদকের নামোল্লেখ নেই, যদিচ অনুবাদকের কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত শাসন-ব্যবস্থা, নতুন রীতিতে পরিকল্পিত এই পঞ্চায়েতরাজ আগে যা ছিল, তার আধুনিক রূপ, সমবায়, নতুন গণতন্ত্র, কালেক্টারের কথা। নতুন তীর্থ সেবাগ্রাম, এটোয়া থেকে 'নিলোখেরী', 'উটি পাহাড়—আবু পাহাড়', মহীশূর থেকে কাশ্মীর, গ্রামসভা থেকে লোকসভা, চাই মানুষ প্রভৃতি আলোচনাগুলি মূল্যবান ও কৌতূহলোদ্দীপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ও কল্যাণব্রতী মানুষের কাছে এই গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হবে। গ্রন্থের আয়তন অনুপাতে সাড়ে সাত টাকা দাম একটু আকাশ-ছোঁয়া দাম বলে মনে হয়।

প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই গ্রন্থের মর্যাদার উপযুক্ত।

পঞ্চায়েতী রাজ— (সমন্বয়) **— এস কে দে প্রণীত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। প্রকাশক। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ, ১নং শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৯। দাম সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।**

●

অভিজ্ঞতার ফসল

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশক বলেছেন—এগুলির কতকটা গল্প, কতকটা প্রবন্ধ, কতকটা নাটকীয়তা, কতকটা সাংবাদিকতা, কতকটা রম্য-রচনা। সমাজ-সংস্কারমূলক প্রয়াসের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে কবিশেখর এগুলি রচনা করেছেন। ইতিপূর্বে কবির অন্য দুখানি গ্রন্থে এই জাতীয় রচনা পরিবেশিত হয়েছে এবং প্রশংসা অর্জন করেছে। এই গ্রন্থের তেইশটি রচনা পূর্বে সাময়িক পত্র-পত্রিকায় আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছে। সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার ফল এই সব স্কেচধর্মী রচনায় বিধৃত। একালের সমাজ-জীবনে যে কৃত্রিমতা ও আবিলতা প্রবেশ করেছে শক্তিমান লেখকের সুনিপুণ শ্লেষে তা মনোরম সমাজচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিও পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মত সমাদর লাভ করবে আশা করি।

ব্যঙ্গচিত্র— (সমাজদর্শন)**—কবিশেখর কালিদাস রায়। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা—১২। দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।**

বিনু বর্ধন পরিচালিত 'বিভাস' চিত্রে ললিতা চট্টোপাধ্যায়

নান্দীকর

আজকের কথা:

"বাঙলা ছবির ভবিষ্যৎ" প্রসঙ্গে :

গেল হপ্তায় "অমৃত"-এর স্বাধীনতা সংখ্যায় স্বনামধন্য চিত্র-সমালোচক নির্মলকুমার ঘোষ (এন-কে-জি) "আজকের বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ" শীর্ষক সুখপাঠ্য ও সুচিন্তিত প্রবন্ধে বাঙলা ছবির বর্তমান অসচ্ছন্দ অবস্থাকে দূর ক'রে ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করবার উপায় বাৎলাতে গিয়ে বলেছেন, "আজকে এমন সব নিয়মকানুন ও ব্যবস্থা করতে হবে যেটা আগামী কয়েক শতক অন্ততঃ কার্যকরী হয়। বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হবার ফলে আমরা যে বাজার হারিয়েছি চারদিক থেকে চেষ্টা করে তার ক্ষতিপূরণ করতেই হবে। আজকে বাংলা ছবির বাঁচবার সবচেয়ে বড় উপায় এর প্রদর্শনক্ষেত্রকে প্রসারিত করা এবং বাংলা ছবির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা। এই পথে যে যা যা বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাকে নির্মম-ভাবে পথ থেকে সরিয়ে দিতে হবে।"

বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের অন্তর্নিহিত রোগ উপশমের জন্যে এন-কে-জি যে দাওয়াই বাৎলেছেন, তা' সেবার বা খাওয়ানোর ভার অবশ্যই রাজ্যসরকারকেই নিতে হবে। শোনা যাচ্ছে, রাজ্যসরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারক কে. সি. সেনের নেতৃত্বে যে অনুসন্ধান-সমিতি নিয়োগ করেছিলেন, তার সুবিস্তৃত বিরাট রিপোর্ট অভিমত-সম্বলিত হয়ে রাজ্য-সরকারের হাতে এসে পৌঁছেচে। সংপ্রতি সরকার অভিনিবেশ সহকারে এই রিপোর্টটি পাঠ করতে ব্যস্ত। রাজ্য-সরকার চলচ্চিত্র-শিল্পরাজ্যে একটি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়াসী হবেন এই রিপোর্টেরই ভিত্তিতে। কাজেই যতদিন না সম্পূর্ণ রিপোর্টটি সাধারণ্যে প্রচারিত হচ্ছে এবং রাজ্যসরকার এই রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁদের কর্মসূচীকে প্রকাশিত করছেন, ততদিন আমাদের সাগ্রহে প্রতীক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এন-কে-জি তাঁর প্রবন্ধের সূচনায় বলেছেন, "কি ক'রে একটা সমৃদ্ধশিল্প আজকের হীন ও ম্রিয়মাণ অবস্থায় পৌঁছেচে......" ইত্যাদি অর্থাৎ তাঁর মতে বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্প অতীতে একদিন সমৃদ্ধির মুখ দেখেছে। তাঁর মতো অনেকেরই এই শিল্পটির অতীত সম্পর্কে বেশ একটা উজ্জ্বল ধারণা আছে; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ঠিক তেমন উজ্জ্বল ছিল না। বাঙলা ছবির নির্বাক যুগ ছিল যেমন প্রধানতঃ ম্যাডান কোম্পানীর এক ছত্রাধিপতিত্বের যুগ, তেমনই ছবি বাঙ্ময় ও মুখর হয়ে ওঠবার পরের যুগ ছিল নিউ থিয়েটার্সের যাদুস্পর্শের যুগ। নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত বাঙলার প্রথম পূর্ণ দীর্ঘ সবাক ছবি "দেনাপাওনা" বা "পুনর্জন্ম", "নটীর পূজা", "চিরকুমার সভা" প্রভৃতির শিল্পগত ও আর্থিক অসাফল্যের পরে যেদিন দেবকী বসু পরিচালিত "চণ্ডীদাস" মুক্তি পেল, ১৯৩২ সালের সেই শুভদিন থেকে শুরু ক'রে প্রায় ২০ (কুড়ি) বছর ধ'রে নিউ থিয়েটার্সই মুখ্যতঃ বাঙলা তথা ভারতকে অগণিত অনবদ্য চিত্র উপহার দিয়ে এসেছে। অন্ততঃ ১২৫ খানি ছবি নির্মাণ করা সত্ত্বেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিউ থিয়ে-টার্সকে দরজা বন্ধ করতে হয় কেন, এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর হচ্ছে আর্থিক অসাফল্য। কেন এই আর্থিক অসাচ্ছল্য? যে-প্রতিষ্ঠানে একদিন মাস মাহিনা হিসাবে অন্ততঃ ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা) খরচ করা হ'ত, সে-প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অসাচ্ছল্য কেন? কারণ অনুসন্ধান ক'রতে গেলে দেখা যায়, আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্প কোনো দিনই দৃঢ় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিচালিত হয়নি। ধনীর সন্তান বীরেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'নীল হাতী' মার্কা প্রতিষ্ঠানে দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতীন বসু, হেমচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি পরিচালক, সায়গাল, পৃথ্বিরাজ, নবাব, জগদীশ শেঠী, নজমাল হোসেন, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, কানন, উমাশশী, যমুনা, চন্দ্রাবতী,

শ্রীমতী সুচিত্রা সেনকে অভিনেত্রী সংঘ প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় জহর গাঙ্গুলী, সুচিত্রা সেন, দেবকী বসু, সুনন্দা ব্যানার্জি এবং আরো অনেকে। ফটো : অমৃত

রতনবাঈ, কমলেশকুমারী প্রভৃতি শিল্পী, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, মুকুল বসু, বাণী দত্ত, অতুল চট্টোপাধ্যায়, ইউসুফ মুলজী, বিমল রায়, সুধীন মজুমদার, সুবোধ মিত্র, সুবোধ গাঙ্গুলী প্রভৃতি কৃতী কলাকুশলীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোনোদিনই এমন একটি কর্মসূচী গ্রহণ ও প্রবর্তন করতে পারেননি, যাতে এ'দের সকলের কর্মশক্তিকে নিয়মিতভাবে নিয়োজিত রাখা যায়। ফলে এ'দের মধ্যে অনেকেই নিয়মিত মাসমাহিনা পাওয়া সত্ত্বেও মাসের পর মাস কর্মহীন অবস্থায় আলস্যে অতিবাহিত করতে বাধ্য হতেন। অপর দিকে ৬২ নম্বরের প্রোডাক্‌-সানটিকে চালু রাখা হ'ত ৬৫ নম্বর প্রোডাক্‌সানের জন্যে ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে আগাম পাওয়া টাকা খরচ ক'রে অর্থাৎ বর্তমান চলত ভবিষ্যতের টাকা দিয়ে। এ ছাড়া বাজার থেকেও টাকা ধার করা হ'ত ব্যবসাকে চালু রাখবার জন্যে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে যখন আর্থিক দিক দিয়ে অসফল ছবির মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল, তখন ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে অগ্রিম পাওয়া টাকার পরিমাণও যেমন একদিকে ক্রমেই কমতে লাগল, অন্য দিকে তেমনি বাজার থেকে ধার পাবার সুযোগও সংকীর্ণ হ'তে থাকল। এবং শেষ অঙ্কে দেখা গেল, প্রতিষ্ঠানটির মোট পরিসম্পদের চেয়ে মোট দায়ের পরিমাণ বেশী হয়ে দেখা দিয়েছে। অতএব যা হবার তাই হ'ল।

ঠিক এই একই কাহিনী বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতের অপর সকল প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এখানে বর্তমান যুগ থেকে অতীত যুগের চিত্র-প্রযোজনার রীতির মধ্যে পার্থক্যটুকু লক্ষণীয়। আগের যুগে বাঙলা দেশে, তথা কলকাতায় যে-ক'টি ফিল্ম স্টুডিও ছিল, তারা নিজেরাই ছিল ছবির প্রযোজক। প্রতিটি স্টুডিও মাস-মাইনে দিয়ে শিল্পী, কলাকুশলী এবং পরিচালক নিযুক্ত রাখত নিজেদের জন্যে। এই অবস্থার পরিবর্তন শুরু করে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। এই স্টুডিওই প্রথমে স্বাধীন একক চিত্র-প্রযোজককে ছবি প্রস্তুত করবার সুযোগ দেবার জন্যে নিজের দ্বারকে উন্মুক্ত করে। দৈনিক ৪০০‌৲।৫০০‌৲ টাকা ভাড়া দিলেই স্টুডিও তার সাউণ্ড স্টেজ এবং কলাকুশলী সমেত ক্যামেরা, শব্দধারক যন্ত্র, আলো, দৃশ্যপট প্রভৃতি আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় বস্তু কোনো ছবি নির্মাণেচ্ছু প্রযোজককে ব্যবহার করতে দিতে থাকল। এই ইন্দ্রপুরীর দেখাদেখি ক্রমে সব স্টুডিওই স্বাধীন প্রযোজকদের কাছে ভাড়া খাটতে থাকল; স্টুডিওর মালিকেরা নিজেরা ছবি তৈরী করা বন্ধ ক'রে দিলেন। চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই রীতি-পরিবর্তন শুভকর হয়েছে কিনা, সে-বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। এবং কি অতীতে, কি বর্তমানে, বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্র বাস্তব ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে কোনো সময়েই সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত হয়নি।

মঞ্চাভিনয়

মুখোশ সম্প্রদায়ের "সাজাহান" :

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত "সাজাহান" নাটক প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৫৪

'ক্যাপিকা বিদায়ে'র শততম রজনীর অভিনয় উৎসবে সবিতাব্রত দত্ত মানপত্র দিচ্ছেন শ্রীমতী আঙ্গুরবালাকে

বছর আগে। এই বহু অভিনীত জনপ্রিয় নাটকটি বহু বিখ্যাত শিল্পীর নাটনৈপুণ্যের কষ্টিপাথররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। নাম-ভূমিকায় প্রিয়নাথ ঘোষ, অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, ঔরংজীবের ভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দিলদারের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত হরিভূষণ শর্মা, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, জাহানারার ভূমিকায় সুধীরাবালা, সুশীলাসুন্দরী, কৃষ্ণভামিনী প্রভৃতি শিল্পী বিভিন্ন সময়ে তাঁদের নাট্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

মূল "সাজাহান" নাটকটি অভিনয় করতে পুরো পাঁচ ঘন্টা সময় লাগত বলে অনেক সময়ে সময় সংক্ষেপার্থ নাটকটির কোনো কোনো অংশ পরিত্যক্ত হ'ত। কিন্তু কোনো অছিলাতেই "আমার জন্মভূমি" বা "আজি এসেছি বধু হে নিয়ে এই হাসিরূপ গান" প্রভৃতি সমবেত-সঙ্গীত বিগত যুগে কখনই পরিত্যক্ত হত না। আজ কিন্তু যে-কোনোও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কোরাস গান গাইবার জন্যে গায়ক ও গায়িকাদল এবং সমবেত নৃত্যগীতের জন্যে সখিসঙ্ঘ নিযুক্ত রাখাকে বেজায় বাজে খরচ বলে মনে করেন; অথচ ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাট্যাভিনয়ের পক্ষে এ জিনিসটাকে একেবারে অপরিহার্য অঙ্গ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু "মুখোশ" সম্প্রদায়ের নাট্য-পরিচালক তরুণ রায় আধুনিক রুচির মুখ চেয়ে সাজাহান নাটকের মূল কাহিনীটিকে রাজপুত জন-জাগরণের অংশটি থেকে মুক্ত ক'রে যেভাবে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতকে বজায় রেখে মাত্র ২ ঘন্টা ৪০ মিনিটের মধ্যে দর্শক সমক্ষে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন, তাতে তাঁর মুন্সিয়ানার প্রশংসা না করে পারা যায় না। একটি মাত্র সুপরিকল্পিত দৃশ্যকে পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করে সম্রাট সাজাহান এবং পিতা-সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বকে মূল প্রতিপাদ্য নাট্যবস্তুরূপে দেখানো হয় তিনটি মাত্র অঙ্কের ভিতর দিয়ে। স্বাভাবিকভাবে সাজাহানই এ-নাটকে প্রধান চরিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে; পিয়ারা, দিলদার, নাদিরা, সিপার প্রভৃতি কয়েকটি ব্যতীত প্রায় অপর সকল গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রই সাজাহানের চরিত্রকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁরই অন্যতম বিখ্যাত নাটক "সাজাহান"-এর পুনরাভিনয়ে "মুখোশ" সম্প্রদায়ের শিল্পিবৃন্দ তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। পুত্র-স্নেহাতুর সম্রাট সাজাহানের শীর্ণ-স্থবির বাহ্যরূপ এবং বিক্ষুব্ধ, ব্যর্থ

জ্যোতির্ময় প্রবীণ কুন্ডুর 'কাঞ্চনকন্যা' চিত্রে অরুণ মুখোপাধ্যায় ও গঙ্গাপদ বসু

হাহাকারে ভরা অন্তর্দ্বন্দ্বকে তরুণ রায় যে অনায়াস ভঙ্গীতে মূর্ত করে তুলেছিলেন, তা' তাঁর নটকুশলতার একটি অনাবিষ্কৃত দিককে দর্শকসমক্ষে উদ্ঘাটিত করেছে। ঔরংজীবের ক্রূর-কপট চরিত্রটিকে উপযোগী বেশবাস, চাহনি, বাচন ও ভঙ্গী দ্বারা সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন সুধীর চৌধুরী। ঔরংজীব-পুত্র মহম্মদের উজ্জ্বল চরিত্রটি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে সমরেশ চক্রবর্তীর দরদী অভিনয়ের গুণে। দারার চরিত্রাভিনেতা অনুকূল দত্ত অনবদ্য সুকণ্ঠের অধিকারী এবং অভিনয়ের প্রতি নিষ্ঠাবান। তিনি যদি তাঁর বাক্যগুলির শেষাংশের শ্রুতিগ্রাহ্যতা সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত হন, তাহলে তাঁর ভূমিকাটিও অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে। পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় অভিনীত দিলদার চরিত্রটি বহুস্থলেই ছদ্মবেশী নিয়ামৎ খাঁর দার্শনিকতাকে ফুটিয়ে তোলায় যতখানি সিরিয়াস হয়েছে, ঠিক ততখানি কমিক হয়ে উঠতে পারেনি; অথচ চরিত্রটি সিরিও-কমিক বলেই দর্শকদের কাছে উপভোগ্য। এ ছাড়া সুজা, মোরাদ ও জিহন আলির চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন যথাক্রমে গোবিন্দ চক্রবর্তী, প্রণত ঘোষ এবং বিভাষ মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে জাহানারার ভূমিকায় প্রদীপ্ত অভিনয় করেছেন দীপান্বিতা রায়। পিতার দুঃখভাগিনী, ভ্রাতা ঔরংজেবের ক্রূরতায় দলিতা ভুজঙ্গিনী এবং পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্যকারিণীর চরিত্রটিকে তিনি মঞ্চের উপর মূর্ত করে তুলেছেন। পিয়ারার হাস্যোজ্জ্বল চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন জয়শ্রী চক্রবর্তী; সাধারণ মঞ্চে এই তাঁর প্রথম অবতরণ বলেই কিছুটা আড়ষ্টতা সত্ত্বেও তিনি প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। গাওয়ার গুণে তাঁর তিনখানি গানই—'এ জীবনে পুরিলনা সাধ ভালোবাসি', 'সুখের লাগিয়া এ-ঘর বাঁধিনু' এবং 'আমি সারা সকালটি বসে বসে'—শ্রুতিসুখকর হয়েছে। নাদিরার ভূমিকায় তপতী মণ্ডলের বাচন ও অভিব্যক্তি আরও সাবলীল হওয়ার অপেক্ষা রাখে। সিপারের ভূমিকায় কুমারী মিতার অভিনয় আন্তরিকতা ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে অপরূপ।

"মুখোশ" সম্প্রদায়ের 'সাজাহান' নাট্য-রসিকবৃন্দের অভিনন্দন লাভের যোগ্যতা রাখে।

স্টুডিও চত্বরে 'স্বর্গ' হতে বিদায়' চিত্রের পরিচালক মঞ্জু দের সঙ্গে জন ম্যাকনামোরা

বিবিধ সংবাদ

"রূপকার"-এর "ব্যাপিকা বিদায়" অভিনয়ের শতরজনী পূর্তি উৎসব ঃ

সঙ্গীত-নাটক আকাদেমী দ্বারা সদ্য পুরস্কৃত "ব্যাপিকা বিদায়" অভিনয়ের শতরজনী পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল গেল মঙ্গলবার, ১৩ই আগস্ট রঙমহল রঙ্গমঞ্চে। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধকরূপে যথাযোগ্য ভাষণ দান করেন যথাক্রমে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মন্মথ রায়। এই উৎসব উপলক্ষে রূপকার গোষ্ঠীর তরফ থেকে সবিতাব্রত দত্ত প্রায় ৩৭ বছর আগে "ব্যাপিকা বিদায়"-এর প্রথম অভিনয়-রজনীর একমাত্র জীবিতা শিল্পী সুধাকণ্ঠী আঙুরবালাকে অভিনন্দিত করেন। পরে রূপকার গোষ্ঠীর "ব্যাপিকা বিদায়" অভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বর্তমান ও প্রাক্তন শিল্পী থেকে সুরু করে টিকিট বিক্রেতা, পোস্টার লাগাবার লোক, পরিচ্ছদ-ধৌতকারিণী প্রভৃতি সকল কর্মীকেই সমমূল্যের পারিতোষিক দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। নাট্যাভিনয়

'মৌনমুখর' চিত্রের নায়িকা ভারতী রায়

যে একটি টিমওয়ার্ক, তার সাফল্যের মূলে যে পোস্টারম্যানেরও দান উপেক্ষণীয় নয়, কোনো একজনকে বাদ দিয়ে বাকী অংশটি চলতে পারে না, এই সত্যটিই সেদিনের দর্শকদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করলেন রূপকার-গোষ্ঠী। এই বিশেষ আনন্দ অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে-স্মারক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে, সেটিও নাট্য সংক্রান্ত বহু রচনা গুণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ১৯২৬ সালের ৯ই জুলাই তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে "ব্যাপিকা বিদায়"-এর প্রথম অভিনয়-রজনীতে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের যে-তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে সামান্য ভ্রম থেকে গেছে। 'রজ বাবুর্চি'র ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিলেন কার্তিক দে (অহীন্দ্র দে নয়) এবং মিসেস লীলা লাহিড়ীরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন সম্ভবতঃ নবতারা (সুবাসিনী নয়; সুবাসিনী ছিলেন একজন প্রথিতযশাঃ গায়িকা; তিনি মিনার্ভায় থাকলে কোনো গান গাইবার সুযোগ-সংবলিত ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতেন); আর বেয়ারার ভূমিকায় যতদূর মনে পড়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রভাত সিংহ।

সেদিনের উৎসবে সবিতাব্রত দত্ত বলেছিলেন—কোনো সৌখীন সম্প্রদায়ের পক্ষে একই নাটকের ক্রমান্বয়ে শতরজনী ধরে অভিনয় করার গৌরব রূপকার গোষ্ঠীরই প্রথম। কিন্তু তিনি বোধহয় জানেন না সৌভনিক সম্প্রদায় তাঁদের 'গোরা' অভিনয়ে এই গৌরব বহু পূর্বেই অর্জন করেছেন এবং সম্প্রতি তাঁরা তাঁদের 'যা-হয় না' নাটকের ২০০ রজনীর উৎসব পালন করতে চলেছেন। আর একটি প্রশ্ন। সৌখীন বা অ্যামেচার নাট্য সম্প্রদায় কাকে বলব? 'বহুরূপী', 'রূপকার', 'মুখোশ', 'শৌভনিক' প্রভৃতি নাট্য-সম্প্রদায়, যাঁরা নিয়মিতভাবে দর্শকদের কাছে টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় করে থাকেন, তাঁদের কি সৌখীন সম্প্রদায় বলা চলে?

হিন্দী "বিদ্যাপতি" ছবির জন্যে কলকাতায় লতা মঙ্গেশকার ঃ

একদা নিউ থিয়েটার্সের হয়ে পরিচালক দেবকীকুমার বসু বাংলা এবং হিন্দীতে 'বিদ্যাপতি' তুলে প্রভূত খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 'অনুরাধা'র ভূমিকায় কানন দেবীর অপূর্ব অভিনয় আজও স্মৃতির পটে জ্বলজ্বল করছে। সম্প্রতি আবার এই কলকাতা শহরেই নতুন করে হিন্দী 'বিদ্যাপতি' তোলা শুরু হয়েছে। ছবিখানির প্রযোজক হচ্ছেন প্রহ্লাদ শর্মা এবং পরিচালনা করছেন একটি গোষ্ঠী। ছবির সঙ্গীত-পরিচালক ভি বালসারা গেল ২রা আগস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে ৬০ জন যন্ত্রশিল্পীর সহযোগিতায় যে তিনখানি গানের রেকর্ডিং করলেন, তাতে কণ্ঠদান করেছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের জনপ্রিয়তমা কণ্ঠ-শিল্পী লতা মঙ্গেশকার। শ্রীবালসারাকে ধন্যবাদ যে, তিনিই প্রথম কলকাতায় লতা মঙ্গেশকারের প্লেব্যাক গান রেকর্ড করালেন। স্মরণীয় যে, শ্রীবালসারাই এর আগেও আশা ভোঁসলে এবং মহম্মদ রফিকে কলকাতায় প্লেব্যাক গান করান। সেদিন লতা মঙ্গেশকারের সঙ্গে আর যিনি গান ক'রে উপস্থিত সকলকে তাঁর কণ্ঠ-মাধুর্যে মোহিত করে-

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে ভি বালসারা ও লতা মঙ্গেশকর

ছিলেন, তিনি হচ্ছেন মলয় মুখোপাধ্যায়। বাঙলার চলচ্চিত্ররাজ্যে এই কণ্ঠশিল্পীর নাম অপেক্ষাকৃত নতুন হ'লেও তিনি যে খুব শিগ্গিরই নিজের প্রতিষ্ঠা ক'রে নিতে পারবেন, এ আশা অনায়াসেই পোষণ করা যেতে পারে। 'বিদ্যাপতি'তে এই দু'জন ছাড়াও কণ্ঠদান করছেন :— মহম্মদ রফি, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, আরতি মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু ও নির্মলা মিশ্র।

'কথা কও' শততম স্মারক উৎসব :

আসছে ২৭শে আগস্ট মঙ্গলবার রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠী প্রযোজিত অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র সরকারের চলতি নাটক 'কথা কও'-এর শততম রজনীর স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

রাগ-প্রধান সংগীতসমৃদ্ধ এই নাটকে সবিতাব্রত দত্তের (রূপকার) কয়েকখানি গান রঙ্গমঞ্চ জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নাটকের অন্যান্য চরিত্রে আছেন অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, হরিধন, জহর রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরদাস মিত্র, মিণ্টু, সমর, শিপ্রা মিত্র, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিকা দাস ও সরযূবালা প্রভৃতি।

অনন্যা শিল্পী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শক-মন জয় করেছে। মঞ্চ-পরিকল্পনায় অমলেন্দু সেন, শব্দ-প্রেক্ষণে প্রভাত হাজরা, আলোক-নিয়ন্ত্রণে অনিল সাহার কৃতিত্ব কম নয়।

আমরা রঙমহল-এর চলতি নাটক 'কথা কও'-এর দীর্ঘজীবন কামনা করি—

রূপান্তরী :

অপেশাদারী নাট্যব্রতী গোষ্ঠী 'রূপান্তরী' সমানেই নতুন নতুন মৌলিক নাটক প্রযোজনা করে নাট্যামোদী লোকের মনে রেখাপাত করেছেন। তাঁদের সর্বাধুনিক প্রযোজনা, জোছন দস্তিদারের লেখা 'কর্ণিক' নাটকটি আমাদের সমাজের অপাংক্তেয় পরিশ্রমী একদল লোকের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবে আজো যাদের প্রধান হাতিয়ার 'কর্ণিক'। এটি আসছে ২৫এ আগস্ট রবিবার সকাল দশটায় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হবে। পরিচালনা করছেন জোছন দস্তিদার স্বয়ং। প্রধান চরিত্রগুলিতে 'রূপান্তরী'র সুপরিচিত শিল্পীরাই আত্মপ্রকাশ করবেন।

'পূর্বসারথী'র 'বিলে থেকে বিবেকানন্দ' :

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত নাটক 'বিলে থেকে বিবেকানন্দ' পূর্ব সারথীর সভাবৃন্দ অতি দক্ষতার সংগে গেল ৪ঠা আগস্ট বেলেঘাটাস্থ সি, আই, টি বিল্ডিংস প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ করালেন। নাট্যকার ও পরিচালক কালীপদ চক্রবর্তী সম্পাদনী ও রুচি এবং দলগত অভিনয়ের দ্বারা প্রায় আড়াই হাজার দর্শককে বিমুগ্ধ করে রাখলেন। নাটকের মঞ্চসজ্জা এবং আলোক-সম্পাত

'একই অঙ্গে এত রূপ' চিত্রের সংগীতগ্রহণ মুহূর্তে পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত, সংগীত-পরিচালক আলি আকবর খাঁ, শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অতিথি অনিল চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

ও রূপসজ্জা খুব উচ্চাঙ্গের। প্রতিটি শিল্পী পরিমিত অভিনয়ের দ্বারা সংস্থাকে সম্মানের পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেছেন। অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান শেখর মজুমদার (বিলে), সলিল ঘোষ (নরেন্দ্রনাথ), অর্ধেন্দু দত্ত (হরিদাস), ব্রজেন দত্ত (আবদুল), শ্যামল পাল (রামকৃষ্ণ), কালীপদ চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য), অসিত গুহ (কাশী), আবির মজুমদার (মধুসূদন), সন্তোষ ভট্টাচার্য (রাজকুমার), বিনোদ সরকার (বৈরাগী), বিজয় রাণা (ফকির), প্রলয় চৌধুরী (ভক্ত), দিলীপ দাশগুপ্ত (হোসেন), শঙ্কর মজুমদার (মালিক), মিতা দাশগুপ্ত (ভুবনেশ্বরী), পরিতোষ বিশ্বাস (হানিফ), সুকোমল বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্বনাথ)।

মেট্রো সিনেমায় 'ভি-আই-পি-জ' :

লণ্ডন এয়ার পোর্ট। ঘন কুয়াসা প্লেন ছাড়াকে বিলম্বিত করছে। যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। এ'দের মধ্যে আছেন একজন কোটীপতি এবং তাঁর স্ত্রী, একজন চলচ্চিত্র প্রযোজক, একজন রূপসী চলচ্চিত্রাভিনেত্রী, একজন অস্ট্রেলিয়াবাসী ব্যবসায়ী ও তাঁর অনুগত সেক্রেটারী, একজন সম্ভ্রান্তা ডাচেস, জনৈক রোমান্স-অন্বেষী যুবতী এবং একজন সম্ভ্রান্ত সমাজের অন্তর্গত খেলোয়াড় যুবক। প্লেন ছাড়ার বিলম্বজনিত সময়টির মধ্যে এ'দের প্রত্যেকের জীবনে কি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেল, তারই চমকপ্রদ নাটকীয় চিত্র মেট্রো-গোল্ডউইনের আনাটোল দ্য গ্রুনওয়াল্ড-প্রযোজিত এবং অ্যান্থনি অ্যাসকুইথ পরিচালিত 'ভি-আই-পি-জ' ছবিখানিতে তুলে ধরা হয়েছে।

আসছে ৫ই সেপ্টেম্বর ছবিখানি কলকাতা শহরের মেট্রো ও বসুশ্রী, বোম্বাইয়ের মেট্রো ও স্ট্র্যাণ্ড এবং দিল্লীর ওডিন-এ একযোগে মুক্তি পাবে। ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন এলিজাবেথ টেলর, রিচার্ড বার্টন, লুই জর্ডন, এলসা মার্টিনেলী, মার্গারেট রাদারফোর্ড, ম্যাগি স্মিথ, রড টেলর, লিণ্ডা খুশিচয়ান এবং অর্সন ওয়েলস।

।। সুন্দরমের নবনাট্য উৎসব ।।

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'সুন্দরম' তাঁদের সপ্তম বার্ষিক জন্ম-শুভক্ষণ পালন করলেন গত পনেরোই আগস্ট। প্রসঙ্গতঃ ঐ দিন সন্ধ্যায় সংস্থার অনুশীলন কেন্দ্রে আইজেনস্টিনের 'আলেকজান্ডার নেভস্কী' প্রদর্শিত হয়। আর আগামী ছাব্বিশ, সাতাশ, আঠাশে আগস্ট মুক্ত-অঙ্গনে 'সুন্দরম' নাট্য-সংস্থা এক

বিচিত্র নবনাট্য উৎসবের আয়োজন করেছেন। প্রথমদিন দুটি উচ্চ প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত একাংক 'দর্পণের চোখ' আর 'মৃত্যুর চোখে জল' অভিনীত হবে। দ্বিতীয় দিন সমাজসমস্যামূলক নূতন নাটক 'চার দেয়ালের গল্প' এবং তৃতীয় দিন মঞ্চসফল 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' অভিনীত হবে। শেষ দুদিন যোগেশ দত্ত মূকাভিনয় করবেন ঐ সঙ্গে। সমগ্র নাট্যোৎসবটির পরিচালনার ভার নিয়েছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী এবং রূপসজ্জার ভার নিয়েছেন অনন্ত দাস।

অনুশীলন সম্প্রদায় :

প্রখ্যাত নাট্য-সংস্থা 'অনুশীলন সম্প্রদায়' তাদের নবতম প্রচেষ্টা রমেন লাহিড়ী বিরচিত 'পান্থশালা' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন আসছে ২রা সেপ্টেম্বর, সোমবার সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটে মিনার্ভা মঞ্চে। পরিচালনা করছেন শ্রীমমতাজ আহমেদ খাঁ।

রবীন্দ্রভারতীতে 'কবি-তিরোধান দিবস' :

'কবি-তিরোধান দিবস' উপলক্ষে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকেরা গেল ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭০-এ কবির রচনা থেকে গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করেছিলেন।

অরোরার : 'রাধাকৃষ্ণ' মুক্তি প্রতীক্ষায় :

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রযোজিত ও পরিবেশিত সঙ্গীতবহুল চিত্রার্ঘ 'রাধাকৃষ্ণ'র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। ছবিটি বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার বিভিন্ন লীলাকে কেন্দ্র করে অনেক ছায়াছবিই এপর্যন্ত নির্মিত হয়েছে, আশা করা যায় 'রাধাকৃষ্ণ' সেই সব ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিয়ে ছায়াছবির জগতে এক নতুনতম অধ্যায় রচনা করবে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রবীণ পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। সুরারোপ করেছেন কীর্তন-কলানিধি রথীন্দ্রনাথ ঘোষ। ২৩ খানি অনবদ্য গান ছবিটিতে সংযোজিত করা হয়েছে। ঐসব গান হবে 'রাধাকৃষ্ণ'র অনেক আকর্ষণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। গানগুলি গেয়েছেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা ও মানস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পিবৃন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার চরিত্রে রূপদান করেছেন যথাক্রমে উত্তর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবাগতা সঞ্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন অসিতবরণ (আয়ান ঘোষ), লীলা পাল (বৃন্দাদূতী), প্রতিমা চক্রবর্তী (চন্দ্রাবলী), অপর্ণা দেবী, রেণুকা রায়, কেতকী দত্ত, রমা দাস, সুবীরা রায়, জয়শ্রী চক্রবর্তী, গীতা গুপ্তা বেবী গুপ্তা, বীরেশ্বর সেন, দ্বিজু ভাওয়াল, শ্যাম লাহা, সমরকুমার, মিন্টু চক্রবর্তী, করুণ ব্যানার্জি, শ্রীপতি চৌধুরী, সন্দীপ দাস, সুনীত মুখার্জি, বিচিত্রা, সুনীতা, কবিতা, অপরাজিতা, সীমা, রুবী, বীণা, মল্লিকা প্রভৃতি শতাধিক শিল্পী।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে রয়েছেন বিজয় ঘোষ ও দিব্যেন্দু ঘোষ (চিত্রগ্রহণ), সমর বসু (শব্দগ্রহণে) ও সত্যেন রায়চৌধুরী (দৃশ্যসজ্জা)।

আঙ্গিকে, অভিনয়ে, সুরে আর গানে, 'রাধাকৃষ্ণ' ছবিটি প্রতিটি দর্শকের হৃদয় জয় করার দাবী নিয়ে শীঘ্রই শহরের বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

কানন দেবীর সংবর্ধনা :

গেল ২১এ আগষ্ট, বুধবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত ১৬শ বার্ষিক স্বাধীনতা উৎসব প্রাঙ্গণে

কানন দেবী

পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্রের পৌরোহিত্যে প্রথিতযশা চিত্রাভিনেত্রী কানন দেবীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ইউ-এস-এস-আরে সুচিত্রা সেনের সংবর্ধনা :

মস্কো শহরে অনুষ্ঠিত ৩য় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধানা অভিনেত্রীর সম্মানপ্রাপ্ত সুচিত্রা সেনকে সংবর্ধিত করবার জন্যে সোভিয়েত কন্সাল জেনারেল মিঃ এস আই রোগোভ গেল মঙ্গলবার, ২০এ আগস্ট একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

কথক গোষ্ঠীর 'নাগমণি' :

আসছে ৩রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে কথক-গোষ্ঠী জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নাগমণি' নাটকটিকে মঞ্চস্থ করবেন।

নিউ এম্পায়ারে পি সি সরকার :

২৩-এ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে যাদুকর পি সি সরকারের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী সুরু হবে।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা

জন্মাষ্টমীর শুভদিনে পি এ ফিল্মসের হাসির ছবি 'তাহলে' সঙ্গীতগ্রহণের মাধ্যমে শুভমহরৎ অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। সঙ্গীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্তের পরিচালনায় কন্ঠদান করেন শ্যামল মিত্র ও সবিতা চৌধুরী। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনাভার গ্রহণ করেছেন গুরু বাগচী। প্রধান দুটি প্রণয়মধুর চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা রায়। পার্শ্বচরিত্রে অংশগ্রহণ করবেন বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, অমিত দে, রেণুকা রায় ও রবি ঘোষ। এ মাসেই ছবির চিত্রগ্রহণ সুরু হবে। মিতালী ফিল্মস ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বিশ্বজিৎ ও মাধবী মুখোপাধ্যায় অভিনীত প্রথম ছবিটির নাম 'গোধূলি বেলায়।' সম্প্রতি এ-ছবির সপ্তাহকালীন দৃশ্যগ্রহণ সুসম্পন্ন হল ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয়। গত সপ্তাহে প্রাথমিক কাজটুকু শেষ করে বিশ্বজিৎ বোম্বাইয়ে ফিরে গেছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন চিত্ত বসু। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের সামাজিক উপন্যাস 'বধূর কাহিনী' অবলম্বনে এচিত্রের চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন সন্ধ্যারাণী, সুমিতা সান্যাল, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, বিপিন গুপ্ত ও দিলীপ রায়। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ-ছবির সঙ্গীত পরিচালক।

পরিচালক রাজেন তরফদার যে ছবিটি সম্প্রতি শেষ করলেন তার নাম 'জীবন কাহিনী'। একজন জীবনবীমা দালালের বাস্তব সংসার ও কর্ম-পরিক্রমার জীবন-দর্শনটি এ-ছবির মূল আখ্যানবস্তু। 'গঙ্গা' সাফল্যের পর এটি শ্রীতরফদারের একটি সার্থক প্রয়াস হিসেবে স্বীকৃতি পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রধান চরিত্রে অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যথাক্রমে বিকাশ রায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, জহর গাঙ্গুলী, সীতাদেবী, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায় ও বঙ্কিম ঘোষ। কলাকুশলী বিভাগে চিত্রগ্রহণ, শিল্প-

নির্দেশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন অনিল গুপ্ত, রবি চট্টোপাধ্যায় এবং তরুণ দত্ত। সংগীত পরিচালক প্রবীর মজুমদার।

বাংলাদেশে হিন্দী ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে যে সে খবর আপনারা সকলেই জানেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় শিল্পী মহম্মদ রফি এবং লতা মঙ্গেশকর এই প্রথম ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরটারীতে 'বিদ্যাপতি' হিন্দী ছবিটির জন্য কণ্ঠদান করে চলে গেছেন। কবি বিদ্যাপতির জীবনকে কেন্দ্র করে এছবির মূল বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে। বাংলা ও বোম্বাইয়ের শিল্পিগণ এ ছবিতে অভিনয় করবেন। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন ভি বালসারা। সাহিত্যিক প্রহ্লাদ শর্মা এ-ছবির প্রযোজক।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'অশান্ত ঘূর্ণী'র চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় আরম্ভ করেছেন। ছবিটি প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রশান্ত বন্দোপাধ্যায়। রহস্য-রোমাঞ্চ এই চিত্রনাট্যের বিভিন্ন চরিত্র অংশগ্রহণ করেছেন যথাক্রমে দীলিপ মুখোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, জীবেন বসু, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, সুখেন দাস, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, গীতা দে, রেণুকা রায় এবং অতিথিশিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কুশলী কর্মের প্রধান তিনটি বিভাগের চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় রয়েছেন অজয় মিত্র, রবীন দাস এবং বটু সেন। সংগীত-পরিচালনা করছেন রাজেন সরকার। এ ছবিটির পরিবেশনাভার নিয়েছেন মুভীউইন বিশ্ব-পরিবেশক।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্তের 'একই অঙ্গে এত রূপ' চিত্রের সংগীতগ্রহণ করলেন সংগীত-পরিচালক আলী আকবর খাঁ। গীতিকার শ্যামল গুপ্তের রচনায় কণ্ঠদান করেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ মাসের শেষেই এ ছবির পুনরায় চিত্রগ্রহণ শুরু হচ্ছে ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয়। চিত্রনাট্যের মূলচরিত্র অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মাদেবী, রবি ঘোষ ও সুদীপ্তা সাহা। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা এবং সর্বাধ্যক্ষকর্মে রয়েছেন দীনেন গুপ্ত, তরুণ দত্ত ও সুখময় সেন।

বোম্বাই

বি, এস, প্রোডাকসন্সের পরবর্তী রঙিন ছবিটি আগামী ২৬শে অগাস্ট থেকে মেহেবুব স্টুডিওয় নিয়মিত দৃশ্যগ্রহণ শুরু হবে। রাজেন্দ্রকুমার এ-ছবির নায়ক। ছবিটি পরিচালনা করবেন এস, ইউ সানি, নৌসাদ আলী এ-ছবির সংগীত-পরিচালক। পার্শ্ব দুটি চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন জনি ওয়াকার ও রেহমান।

সম্প্রতি মোহন স্টুডিওয় 'মজবুর'-এর কয়েকটি দৃশ্য গৃহীত হল নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ এবং ওয়াহিদা রেহমানকে নিয়ে। এ-ছবির অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন ললিতা পাওয়ার, রাজেন্দ্রনাথ, নাজ ও জগদেব। মোহন সায়গল প্রযোজিত এ-ছবির সংগীত-নির্দেশক কল্যাণজী ও আনন্দজী। ছবির পরিচালক নরেন্দ্র সুরী।

প্রযোজক-পরিচালক বি মিত্রের 'জি চাহতা হায়' ছবিটির চিত্রগ্রহণ এ মাসের শেষেই আবার শুরু হচ্ছে। জয় মুখার্জি ও রাজশ্রী এ-ছবির দুটি মধুর চরিত্রে। প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করছেন রাজেন্দ্রনাথ, অচলা সচদেব, মোতিলাল, চিটনীস, নাজির হোসেন, অবীন ও শ্যামা। সংগীত-পরিচালনা করছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

ইন্দো - আমেরিকা প্রোডাকসন্সের দোভাষি চিত্র 'গাইড'-এর ইংরেজী চিত্ররূপটি শেষ হয়েছে। বর্তমানে দেব আনন্দের নবকেতন প্রোডাকসন্সের উক্ত চিত্রটির হিন্দী সংস্করণের চিত্রগ্রহণ মেহেবুব স্টুডিওয় আরম্ভ হয়েছে। আর কে নারায়ণের কাহিনী অবলম্বনে এই রঙিন চিত্রের পরিচালক বিজয় আনন্দ। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন দেব আনন্দ ও ওয়াহিদা রেহমান। চিত্রগ্রহণে রয়েছেন ফলি মিস্ত্রী। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শচীনদেব বর্মন।

জেনিথ প্রোডাকসন্সের 'নূরজাহান'-এর সম্প্রতি মেহেবুব স্টুডিওয় সংগীত-পরিচালক রোসানের পরিচালনায় কয়েকটি গান গৃহীত হল। কণ্ঠদান করেন আশা ভোঁসলে। নামভূমিকায় অভিনয় করছেন মীনাকুমারী। নায়ক-চরিত্রে রয়েছেন প্রদীপকুমার। অন্যান্য চরিত্রে মনোনীত রয়েছেন রেহমান, ললিতা পাওয়ার, শেখ মুখতার ও বীণা। আগামী মাসে এ ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। এম সাদিক এ চিত্রের পরিচালক।

মাদ্রাজ

সংগীত শিল্পী এস, গোবিন্দরাজন 'নটরাজ ধরিসানম' চিত্রে ভক্ত নন্দনার চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবিটির পরিচালক সি, এস, রাও। দক্ষিণ ভারতের বহির্দৃশ্যে বিখ্যাত মন্দিরগুলির সুস্থাপত্যে এ-ছবির শোভা বর্ধন করবে। আজ থেকে ২৫ বছর আগে এ কাহিনী দুবার চলচ্চিত্রে রূপ পায়। সংগীতবহুল এ-চিত্রের সংগীত পরিচালনার দায়িত্বটুকু নিয়েছেন জি, রামানাথন।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

স্টুডিও থেকে চলচ্চিত্র এখন প্রায় মুক্ত। চারদেওয়ালের মধ্যে সাজিয়ে যে ছবি এতদিন চলচ্চিত্রে দানা বাঁধতো আজ তার বহির্দৃশ্যে শিল্প-শোভনতার রূপটি অনেক বেশী স্পষ্ট। চলচ্চিত্র শুধু নাটক নয়। শিল্পকলার একটি সমন্বিত প্রয়াস।

একাধিক শিল্পীর সংযুক্তি গুণে এ-শিল্পের স্বার্থকতা।

স্টুডিও অর্থাৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের যে কারখানা, সেই সম্পর্কে কিছু বলছি। চলচ্চিত্র যেদিন সৃষ্টি হয় তখন থেকে ছবির দৃশ্যগ্রহণ বহির্দৃশ্যেই গৃহীত হোত। তখন প্রয়োগশালা বলে কিছু ছিল না। সে সময়ে নীল আকাশের নীচে আকাশভরা সূর্যের আলোয় ছবির চোখ ফুটতো। দৃশ্যগ্রহণযন্ত্রে চলতি ছবির ছাপ উঠতো। প্রয়োগশালা-নির্মাণের প্রথম চেষ্টা হিসেবে ১৯০৫ সালে আমেরিকার এডিসন কোম্পানী সর্বপ্রথম একটা বড় ঘর তৈরী করে প্রয়োগশালার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঘরটি ছিল মাত্র কুড়ি ফুট চওড়া আর পঁচিশ ফুট লম্বা। আলকাতরা মাখানো কাগজের ত্রিপল ঢাকা দিয়ে স্টুডিওর ছাদ নির্মাণ হয়েছিল। ঘূর্ণি মঞ্চের ওপর এঘরটি নির্মিত হওয়ায় ইচ্ছামত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সূর্যের আলোয় দৃশ্যগ্রহণ চলতো। এর-পর দ্বিতীয় প্রয়োগশালা নির্মাণ করেন ফরাসী যাদুকর এম, মেলিজ। কিন্তু সূর্যের আলো ছাড়া তখনও কৃত্রিম আলোয় ছবি তোলা সম্ভব হত না। কাজেই প্রয়োগশালাকে প্রদীপ্ত করে তুলতে সূর্যালোক ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। তাই বর্ষাকালে ও গরমের দিনে প্রয়োগশালার কাজ তালা-বন্ধ থাকতো। কিন্তু ছবির চাহিদা বৃদ্ধির সংগে সংগেই চলচ্চিত্র ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। ব্যবসার প্রতিযোগিতায় একদিন কৃত্রিম আলোয় প্রয়োগশালাকে ভেঙেচুরে গড়া হল। সূর্যের মুখ চেয়ে প্রয়োগশালার আর দিন গুণতে হল না। এইভাবে প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে চলচ্চিত্র-প্রয়োগশালা আজ বিরাট চিত্র-নির্মাণের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রয়োগশালা সম্পর্কে চলচ্চিত্র দর্শকদের একটা আকাশ-কুসুম ধারণা মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। কিন্তু স্বচক্ষে স্টুডিওগুলো একবার পরিদর্শন করলে সে ধারণা আপনাদের অবিশ্বাসের সামিল হয়ে উঠবে। কিন্তু যেটা সত্যি, যা ঠিক তা নিয়ে বৃথাই স্বর্গ রচনা করলে অবিচার করা হবে। প্রয়োগশালা নিতান্তই একটা প্রকান্ড কারখানা-গৃহ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সাজানো বাগানের একপাশে সারি সারি কয়েকটি করোগেট টিনে নির্মিত বিশাল আটচালা অট্টালিকা। আটচালার মাথা প্রায় চারতলা বাড়ীর সমান। এই বিশাল ঘরের মধ্যে ছোট ছোট ঘর তৈরী হয় দৃশ্যগ্রহণের জন্য। কাঠ আর মোটা কাপড়ে তৈরী চার দেওয়ালের মাঝে এক অশ্বমেধ যজ্ঞ চলে। যন্ত্র আর জীবনের প্রতিযোগিতা চলে। আশেপাশে টিন, কাঠ, দড়ি, পেরেক, যন্ত্রযন্ত্র, ক্যামেরা আর ট্রলি মিলিয়ে একটা মেলার ভিড় চোখে পড়ে। ঘরের মেঝেয় পা বাড়াবার উপায় নেই। রবার পাইপে ঢাকা বৈদ্যুতিক তার চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সেইসংগে দৈত্যের মত আগুণে ছিটকে আসা বৈদ্যুতিক আলোগুলো আটচালার ছাদ থেকে আরম্ভ করে চারপাশে ঘিরে রয়েছে। যন্ত্রের ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসলে দেখবেন শিল্পীদের কাছাকাছি যন্ত্রনিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত রয়েছেন কলাকুশলী। শেষপর্যন্ত এত কান্ডের পর পরিচালক অভিনেতৃদের নির্দেশ দেন মহড়ার জন্য। কয়েকবার রিহার্সেলের পর ছবির মূল অংশটি গৃহীত হয়। প্রয়োগশালায় এসে ছবি তোলার এইসব এলাহি ব্যবস্থা দেখে অনেকেই অবাক এই ভেবে এরমধ্যে কেমন করে সুন্দর ছবি তোলা সম্ভব হয়?

বর্তমানের আধুনিক প্রয়োগশালায় আজকাল সবকিছুই সম্ভব। রাজপথ থেকে আরম্ভ করে শহরের প্রাসাদসম অট্টালিকাও তৈরী হয় এখানে। শিল্প-নির্দেশকের নিপুণ হাতে অংকিত দৃশ্যপট দেখে আপনি কখনোই বুঝতে পারবেন না এ-দৃশ্য প্রয়োগশালায় নির্মিত কিনা। বহির্দৃশ্যের পটভূমিও পটুয়াদেরই অংকিত। যেমন দৃশ্যাভিনয়ের সময় পাহাড়, অরণ্য, সমুদ্রতীর, নীল আকাশ এবং শহরের দৃশ্যপট যা আমরা ছবিতে দেখে আসল-নকল বুঝতে পারি না তা এই সুদক্ষ পটুয়া-তুলির বিভ্রম।

চলচ্চিত্রের বড় প্রয়োগশালা দেখে মনে হবে একটা ছোটখাটো শহর। প্রাচীর ঘেরা এই চিত্রজগতে চলচ্চিত্রের সবকিছু রসদ ছড়িয়ে রয়েছে। বিশেষকরে পাশ্চাত্যের প্রয়োগশালা মহামানবতীর্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের এখানে সেই তীর্থ নিকেতন গড়ে উঠতে বেশ কয়েক যুগ সময় লাগবে। —চিত্রদূত

।। হলিউডে নতুন সকাল ।।

হলিউডের বয়েস যে বাড়ছে তার নিরংকুশ প্রমাণ ক্রমশঃই পাওয়া যাচ্ছে। হলিউডে কালিদাসের কাল মেঘে মেঘে কবেই যে কেটে গেছে এতদিন বুঝি টের পাওয়া যায়নি—এমনকি ক্লার্ক গেবল, গ্যারী কুপার, টাইরন পাওয়ার, এরল ফ্লিন প্রমুখ একদা মধ্যমণি তারকাদের তিরোভাবের পরও যেন লস-এঞ্জেলেসে অপরাহ্নের আলো আসেনি। কিন্তু হলিউড আজকে সত্যিই বয়সিনী। ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা, রবার্ট মিচ্যাম, রে মিলান্ড ও ডীন মার্টিনের অনুরক্ত দর্শকবৃন্দ তাঁদের প্রিয় তারকাদের মুখের রেখায় যদি সেই বয়সটিকে ধরতে নাও পারেন বা না চান, কয়েকটি নতুন নাম নিশ্চয়ই তাঁদের অমোঘ কালস্রোতের দিকে ফেরাবে।

নামগুলি নতুন বটে, কিন্তু উপাধিগুলি দর্শকদের ভীষণ চেনা। ন্যান্সি সিনাট্রা, ক্লডিয়া মার্টিন, জিম মিচ্যাম ড্যানি মিলান্ড, ব্রনউইন ফিটজসিমনস প্রমুখ শিল্পীরা হলিউডের নতুন পথিক। আগামী দিনের রজতপট এঁরা অধিকার করে থাকবেন এবং এঁদের ঘিরেই হলিউডের ভবিষ্যৎ ইতিহাস আবর্তিত হবে। বিখ্যাত জনক-জননীর পদাংক অনুসরণে ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস, জুনিয়ারের মত এঁরা সকলেই বিখ্যাত হবেন কিনা এখুনি হয়ত স্থিরনিশ্চয়ে বলা যাবে না, কিন্তু সকাল যদি সারাদিনের আয়না হয়, তবে স্বচ্ছন্দেই বলা চলে নতুন শিল্পী সকলে ইতিমধ্যেই তাঁদের আলোকিত ভবিষ্যৎকে বর্তমানেই প্রতিবিম্বিত করতে পেরেছেন। হলিউডের পুরোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিল্পযশপ্রার্থী পুত্র-কন্যাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নীচে দেওয়া হল :

ন্যান্সি সিনাট্রা : ফ্রাংক সিনাট্রার ২৩ বছরের কন্যা। ফ্রাংক সিনাট্রা প্রযোজিত "ফর দোজ হু থিংক ইয়ং" ছবিতে অভিনয় করছেন।

ক্লডিয়া মার্টিন : ফ্রাংক সিনাট্রার ছবিতে ইনিও অভিনয় করবেন। বয়স ১৯। বাবা বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা ডীন মার্টিন।

জিম মিচ্যাম : রবার্ট মিচ্যামের পুত্র। বয়স ২২ বছর। কার্ল ফোরম্যানের "দি ভিক্টরস" ছবিতে মুখ্যভূমিকায় অভিনয় করছেন। রবার্টের সংগে এর চেহারার সাদৃশ্য অবাক করার মতন।

লিজা মিনেলী : জুডি গারলেন্ডের সপ্তদশ বর্ষীয়া কন্যা লিজাও মার মত সুকণ্ঠের অধিকারিণী। "বেস্ট ফুট ফরোয়ার্ড" ছবিতে অভিনয় করে অসামান্য অভিনয় এবং সংগীত-প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। লিজা আরো ছটি সংগীতমুখর চিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধা।

ড্যানি মিলান্ড : তাঁর ২৩ বছর বয়েসের পুত্র সম্পর্কে রে মিলান্ড একবার কৌতুক-কন্ঠে বলেছিলেন : 'ড্যানির বিপরীত ভূমিকার মেয়েটি যদি বেশী লম্বা না হয় তাহলে ড্যানির জন্যে গর্ত খুঁড়তে হবে পরিচালককে।' ৬ ফিট ৬ ইঞ্চি লম্বা ড্যানি আপাততঃ টেলিভিসন চিত্রের মধ্যে ব্যাপৃত।

ব্রনউইন ফিটজসিমন্স : মরিন ও হারার ১৯ বসন্তের মেয়েটি মায়েরই অবিকল প্রতিমূর্তি। ব্রনউইন গানও গাইতে পারে। "স্পেনসার্স মাউন্টেন" ছবিতে ছাড়াও ব্রনউইন পাঁচটি টেলিভিসন চিত্রে অভিনয় করেছে।

—চিত্রকূট

খেলার কথা

অজয় বসু

স্বাধীনতা উৎসব উদ্‌যাপনে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত গুণীজন সম্মাননার আসরে এবার গুণী ক্রিকেটার শ্রীকার্তিক বসুকে অভিনন্দন জানানোর আয়োজন ঘটেছে। খবরটা শুনে ও'র নিভৃত সান্নিধ্য পাবার আশায় আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই বড় বাড়ীটার ফটকে মাথা গলিয়ে ছিলাম একদিন।

স্বর্গীয় পারফিউমার এইচ কে বসুর প্রাসাদোপম এই অট্টালিকা বাংলাদেশের ক্রিকেটমহলে একান্ত পরিচিত। অট্টালিকা-সংলগ্ন ঘরোয়া মাঠে শুধু কার্তিক-গণেশ-বাপী বসুরই ক্রিকেটে হাতেখড়ি হয়নি। হয়েছে আরও অনেকেরই। এখানে একদিন অগুন্তি খেলোয়াড়ের ভীড় জমতো। সে ভীড় আজও জমে। তবে এখনকার ভীড়ের চেহারা কিছুটা হাল্‌কা।

কিন্তু আমার যাওয়া ভীড় দেখতে নয়। ভীড় এড়িয়ে কার্তিকদার সান্নিধ্য পেতে। ফাঁকিতে পড়িনি। সান্নিধ্য তো পেলামই। সেই সঙ্গে আরও কিছু। যা পেলাম, পাঠকদের সঙ্গে একাসনে বসে তা ভাগ করে নিচ্ছি।

খোস মেজাজে বৈঠকী গল্প চলছিল দুজনে। জিজ্ঞাস করলাম,

আচ্ছা, ব্র্যাডম্যানকে দেখেছেন তো। কেমন লাগলো আপনার?

চমকে উঠলেন কার্তিকদা। চোখ বুজে যুক্তকর ঠেকালেন কপালে। তারপর হাল্‌কা চালের সুর পাল্টিয়ে গদগদ কণ্ঠে সোচ্চার হলো,

তাহলে বলি শোনো।

১৯৩৮ সালের কথা। রাজপুতানা দলের সঙ্গে ইংলন্ড সফর করছি আমরা। আর ডন ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে। সেদিন আমরা সারেতে। আমাদের খেলা বন্ধ। অস্ট্রেলিয়া খেলছে সারে কাউন্টির সঙ্গে। তবে ব্র্যাডম্যানের খেলার কথা নেই।

ব্র্যাডম্যান অনুপস্থিত। তাই অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখায় আমাদেরও তেমন উৎসাহ নেই। ঘরে বসে সময় কাটাতে রামজী, হাজারে ও কেশরির সঙ্গে তাস পিটোচ্ছি। এমন সময় কমল (ভট্টাচার্য) হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্লে যে সারেতে ব্র্যাডম্যান খেলছেন। কমল শুধু খবরটা শোনেইনি। রীতিমতো দুপুরের কাগজে দেখেও এসেছে।

শুনেই দল বেঁধে ছুটলাম পড়িমরি করে। তাস উঠলো মাথায়। মাঠে পৌঁছে দেখি, কমলই ঠিক। ব্র্যাডম্যান ব্যাট হাতে ওভাল মাঠের উইকেটের মাঝখানে। বোর্ডে তাঁর নামের পাশে রাণ সংখ্যা ষাট।

জায়গা নিয়ে গ্যালারিতে স্থির হয়ে বসলাম তো। কিন্তু স্থির থাকতে পারলাম কই! আমরা বসা মাত্রই ডনের হাত থেকে গুটি তিনচার মার বেরুলো। দেখে শুধু চমকে গেলামই নয়, কেমন কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে জীবনের মতো ক্রিকেট খেলার সখও ঘুচে গেল! নিজের ওপর শ্রদ্ধা, আস্থা সব কিছুই হারিয়ে বসলাম।

আমি নাকি ভাল খেলি! মুখে মুখে এই কথা শুনে মনের কোণে

কার্তিক বসু

লুকানো গর্বও হয়তো কিছু ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সব ভেসে গেল। মনে মনে প্রশ্ন তুললাম, কেন আমরা ক্রিকেট খেলি? কি খেলি? খেলছেন তো উনি! ওই ডন ব্র্যাডম্যান! অন্যরাই বা খেলে কেন? কিসের আশায়?

ও'কে কি কেউ কোনোদিন স্পর্শ করতে পারবে? না পারবে ও'র মতো খেলতে? আর তা যদি না পারা যায় তাহলে খেলার দরকারই বা কি? প্রশ্ন করছি আর মনে মনে মাথা কুটছি এই বলে, ভগবান, তুমি কতো একচোখো! একজনকে, একমাত্র ডনকে তুমি এতো দিলে! আর অন্যদের বঞ্চিত রাখলে!

কি বলবো অজয়, পঁচিশ বছর আগেকার সেই ছবি আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে! যা দেখালেন ডন্ তা ধারণাতীত। কল্পনারও বাইরে। একটু-আধটু ক্রিকেট তো খেলেছো। ভাবতে পারো এ রকম মারের কথা।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন কার্তিকদা। তারপর সামান্য পেছনে হেলে হাতের ভঙ্গীতে ব্যাট চালালেন। না চালালেন না, খাঁড়ার মতো ওপর থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্লেন,

এমনি করে ডন মারলেন, এক হাতে। বল ছুটলো মিড অন দিয়ে। নিমেষে বাউন্ডারী। সে যে কি মার তা আমি বলে কি করে বোঝাবো তোমায়!

বোঝাবার দরকার ছিল না। এমনিতেই বুঝতে পারছিলাম যে ব্র্যাডম্যান সেদিন অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। নইলে কার্তিক বসুর চোখ ধাঁধিয়ে যায়!

কার্তিকদা কিন্তু তখনও থামেননি। সমানে ডন্ ডন্ করছেন। তারি ফাঁকে আরও জানালেন যে এমন অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আরও দুবার দেখা দিয়েছিল। দুবারই ইংলন্ড সফরের সূত্রে। ও'র কথায়,

সে বছরেই নটিংহাম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যান্ ম্যাকেবকে ২৩২ রান আর লর্ডসে ওয়ালি হ্যামন্ডকে ২৪০ করতে দেখে আবার আমার নিজের ওপর ওভালের অশ্রদ্ধার ভাব মাথা চাড়া দিয়েছিল। আমরাও খেলি। আবার ও'রাও, ওই ব্র্যাডম্যান, হ্যামন্ড, ম্যাকেবরাও খেলেন। একই খেলা, তবু দুপক্ষে কতো তফাৎ।

বলে যেন কার্তিকদা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। ব্র্যাডম্যান ও'কে কথা বলতে সমুদ্রের খোরাক জুগিয়েছেন। আরও কতো কথাই-না সেদিন উনি বলতেন যদি না আমি এক ফাঁকে ইচ্ছে করেই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতাম। ব্র্যাডম্যানকে চেপে দিয়ে তাই এবার একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পড়লাম।

আচ্ছা, যাঁদের বিপক্ষে নিজে খেলেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে 'ফাস্ট' কোন বোলারকে মনে হয়েছে?

উত্তর এলো,

দেখো, ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে বরাবরই ভালবাসতাম। ফাস্ট বোলিংকে মনের সুখে পেটানো যায়। পিটিয়ে আনন্দ পেতামও যথেষ্ট। তাই কোনো ফাস্ট বোলারের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে চাইনি।

আমাদের সময়ে বাংলাদেশে এবং ভারতের অন্য অঞ্চলেও অনেক ফাস্ট বোলার ছিলেন। কলকাতাতেই ছিলেন প্রিয়কান্ত সেন, বেরেহেন্ড, সুঁটে ব্যানার্জি, গিলবার্ট এবং আরও অনেকে।

কলকাতার বাইরে রামজী, মহম্মদ নিসার, সাহাবুদ্দিন, নাজির আলি, দেবরাজ পুরী। তাছাড়া বত্রিশ সালে এম সি সি'র পক্ষে এসেছিলেন নবি ক্লার্ক ও নিকলস। ও'দের সকলের বিপক্ষেই ব্যাট করেছি। হয়তো সময় সময় রাণও পেয়েছি। ও'দের সামনে খেলতে অস্বস্তি বোধ করিনি কোনোদিন। কিন্তু একজন ফাস্ট বোলার এক-দিনের জন্যে আমায় যে কি নাকাল করেছিলেন, সে কথা আমি তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই। সে অভিজ্ঞতা আমার জীবনের এক লজ্জা। তবুও তা লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই।

ফাস্ট বোলারটি হলেন জন ট্রিম। সেই যে প্রায়ার জোন্সের ফাস্ট-জুটি হিসেবে ১৯৪৮ সালে যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে আমাদের দেশে এসেছিলেন। সেই ট্রিমই আমায় নাজে-হাল করে ছেড়েছেন।

ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে সি সি আইয়ের খেলা। আমি তখন বোম্বাইবাসী। সি সি আইয়ের পক্ষে খেলে সেই ম্যাচে আশীর ঘরে রাণ তুলে দর্শকদের কাছ থেকে অনেক সুখ্যাতি পেয়েছিলাম। তবু জানি যে জন ট্রিমের স্বীকৃতি পাওয়া সেদিন আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কারণ ট্রিম আমায় আউট করে হারিয়ে দিতে না পারলেও, আমিও কিন্তু ও'র বলে মার মেরে রাণ করে ও'কে বাগ মানাতে পারিনি এক মুহূর্তের জন্যেও।

ঠিক ঠিক হিসেবে মধ্যাহ্নভোজনের আগে ছেষট্টি রাণে আমি অপরাজিত ছিলাম। কিন্তু জন ট্রিমের প্রথম বারো ওভারে রাণ করেছিলাম মাত্র একটি। তাও আবার আন্দাজে! মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ট্রিমের আরও কুড়িটি বল আমি খেলেছি, কিন্তু একটি রাণও কুড়োতে পারিনি।

কি যে আমার হয়েছিল জানি না। কি যাদুতে জন ট্রিম সেদিন আমায় বন্দী করে রেখেছিলেন অনেক চেষ্টাতেও আজও বুঝে উঠতে পারিনি। জীবনে যা কখনো ঘটেনি তাই ঘটলো সেদিন।

হাতের ব্যাট হাতেই রইলো। সামান্য নড়বার ফুরসৎ পেলাম না। তারই আগে বল এসে লাগলো ব্যাটে। একবার নয়, বার পাঁচ ছয়। জন ট্রিম কি সত্যিই এতো জোর বল করে থাকেন? আর তাই যদি করতে পারতেন তাহলে ও'র ফাস্ট বোলিংয়ের খ্যাতি তেমন ছড়ায় নি কেন?

কে জানে, সাধারণতঃ তিনি অমন জোরে বল করতেন কিনা! তবে হ্যাঁ, সেদিন ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামে তাঁর বলের গতি দেখে অবাক মেনেছিলাম সত্যিই। শুধু আমিই নয়। বিজয় মার্চেন্টও এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবিস্মরণীয় জর্জ হেডলেও।

মাত্র ১৫-৪ ওভার বল করে জন ট্রিম খেলা থেকে অবসর নেন। পরে শুনেলাম, বল করার সময় তাঁর চোখ বেয়ে দু ফোঁটা রক্ত ঝরেছিল। মাঠেই তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন পান বসন্তে। হয়তো শারীরিক অসুস্থতার অস্বস্তিতেই তিনি সেই মুহূর্তে অমন দুরন্ত খেলায় মেতে উঠেছিলেন!

আরও কতো কথা হলো সেদিন। সবই ক্রিকেট। তবে সব কথা আজ শেষ করতে পারছি না। ওদিকে বেলাও বেড়ে চলেছিল। এক ঝাঁক ছোট ছোট ছেলে এসে আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় জটলা পাকাতে লাগলো।

বুঝলাম, আমার পালা সারা। এবার ও'দের সুরু। এবার ওরা বসবে কার্ত্তিকদাকে ঘিরে। শুনবে ক্রিকেটের গল্প। শুনবে আর শিখবে। ওরাই তো ভবিষ্যত।

উঠে পড়লাম। শুধু আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের সেই বড় বাড়ীটার সিং দরজা পার হবার আগে একবার শুধালাম,

কংগ্রেসমণ্ডপে সম্বর্ধনা সভায় এসব কথা আপনি বলবেন তো? দেশের লোক জানতে চায় অতীত ইতিহাস।

হাসলেন কার্ত্তিকদা। তারপর আমায় কাঠগড়ায় তুলে ধরলেন,

কেন? তোমরা আছ কি করতে? বলবে তোমরা। লিখবে। লোককে জানাবে। আমার কাজ অন্য। খেলে, খেলিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকতে চাই।

কথাটা উনি মিথ্যে বলেননি। ও'র কাজ উনি করছেন। খেলার কাজ, প্রশিক্ষণের কাজ। আমাদের কাজটুকু আমরা যদি নিষ্ঠায় ও আন্তরিকতায় করে তুলতে পারি তাহলেই ভাল। আমাদেরও তো কাজ আছে ও'দের প্রতি সুবিচার করা!
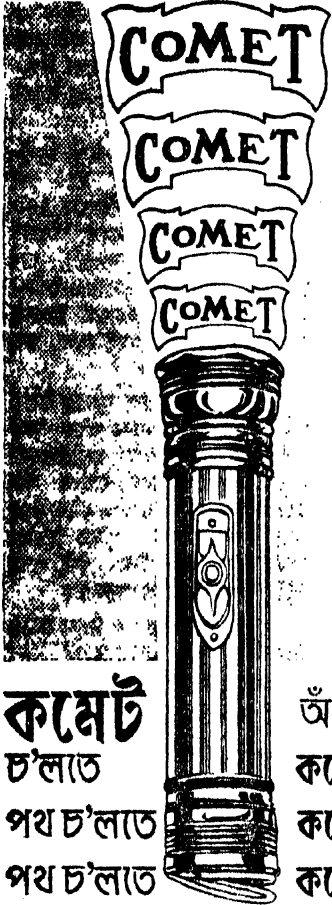
খেলাধুলা

দর্শক

॥ প্রথম বিভাগের লীগ খেলা ॥

গত বছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব ১৯৬৩ সালেও লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—২৮টা খেলায় তাদের ৪৭ পয়েন্ট উঠেছে। এই নিয়ে মোহনবাগান প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় ১১ বার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে মোহনবাগানের এই সাফল্য রেকর্ড হিসাবে গণ্য। মোহনবাগান ১৯৬২ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ৯ বার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পাওয়ার রেকর্ড ভেংগে দেয়। এই প্রসংগে ক্যালকাটার ৮ বার, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ৯ বার এবং ইস্টবেংগলের ৭ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। গত ১২ বছরের খেলায় মোহনবাগান লীগ পেয়েছে ৮ বার—তার মধ্যে পাঁচ বছরে (১৯৫৯-৬৩) চারবার। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার ইতিহাসে উপর্যুপরি ৫ বার (১৯৩৪-৩৮) লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে মহমেডান স্পোর্টিং যে রেকর্ড করেছে তা আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। এই রেকর্ডের পরই মোহনবাগানের স্থান—উপর্যুপরি তিনবার (১৯৫৪-৫৬) লীগ জয়। তাছাড়া মোহনবাগান উপর্যুপরি দু' বছর ক'রে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ৩ বার (১৯৪৩-৪৪, ১৯৫৯-৬০ ও ১৯৬২-৬৩)। উপর্যুপরি পাঁচ বছর লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর মহমেডান স্পোর্টিং উপর্যুপরি দু' বছর লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে মাত্র একবার (১৯৪০-৪১)। ইস্টবেংগল উপর্যুপরি দু' বছর ক'রে লীগ জয় করেছে দু'বার (১৯৪৫-৪৬ ও ১৯৪৯-৫০)। ১৯৫৪ সাল থেকে মোহনবাগান ক্লাবই লীগের খেলায় একাধিপত্য বজায় রেখেছে—১০ বারের খেলায় মোহনবাগান দলের জয় ৭ বার এবং একবার ক'রে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে তিনটি ক্লাব—মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং ইস্টবেংগল।

১৯৬৩ সালের প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতার শেষ দিকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ২০শে জুলাই তারিখে সমান ১৯টা খেলায় মোহনবাগানের ছিল ৩২ পয়েন্ট, ইস্টবেংগলের ৩০ পয়েন্ট এবং বি এন আর দলের ১৮টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট। ২৭শে জুলাই ইস্টবেংগল লীগের ফিরতি খেলায় মোহনবাগানকে পরাজিত ক'রে শুধু পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধই নেয়নি, দু' পয়েন্টের ব্যবধান কমিয়ে মোহনবাগানের সংগে সমান পয়েন্ট করে। তখন উভয় দলেরই সমান ২১টা খেলায় সমান ৩৪ পয়েন্ট। এই সময়ে বি এন আর ছিল দ্বিতীয় স্থানে—২০টা খেলায় ৩১ পয়েন্ট। এর পর মোহনবাগান এবং ইস্টবেংগল একটা ক'রে পয়েন্ট নষ্ট করে। ১০ই আগষ্ট তারিখে লীগের তালিকায় সমান ২৬টা খেলায় মোহনবাগানের ৪৩, ইস্টবেংগলের ৪৩ এবং বি এন আর দলের ৪০ পয়েন্ট ছিল। খেলার এই অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের লড়াই প্রধানতঃ মোহনবাগান এবং ইস্টবেংগল দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। এই সময় অনেকেরই ধারণা হয়, লীগের নির্দিষ্ট ২৮টা খেলার মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের নিষ্পত্তি হবে না—গত বছরের মত অতিরিক্ত খেলার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কোন প্রয়োজন হয়নি। ইস্টার্ণ রেল দলের সংগে খেলা ড্র ক'রে ইস্টবেংগল একটা পয়েন্ট নষ্ট করলো। একই দিনে মোহনবাগান ৫—০ গোলে এরিয়ান্সকে পরাজিত ক'রে ইস্টবেংগল দলের থেকে এক পয়েন্টের ব্যবধানে অগ্রগামী হ'ল। তখন মোহনবাগানের ২৭টা খেলায় ৪৫ পয়েন্ট এবং ইস্টবেংগল দলের ২৭টা খেলায় ৪৪ পয়েন্ট। উভয় দলেরই মাত্র একটা ক'রে খেলা বাকি। মোহনবাগান তার শেষ খেলায় ৩—১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে এবং ইস্টবেংগল শেষ খেলায় ১—০ গোলে বি এন আর দলের বিপক্ষে জয়ী হ'লে উভয় দলের মধ্যে পূর্বের এক পয়েন্টের ব্যবধান শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। এই এক পয়েন্টের ব্যবধানে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ান এবং ইস্টবেংগল ক্লাব রানার্স-আপ আখ্যা লাভ করেছে। গত বছর এই দুই দল লীগের নির্দিষ্ট সংখ্যক ২৮টা খেলায় ৪০ পয়েন্ট ক'রে পাওয়াতে অতিরিক্ত খেলার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল এবং সেই নিষ্পত্তিমূলক খেলায় মোহনবাগান ২—০ গোলে জয়লাভ ক'রে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছিল।

॥ এক নজরে ॥

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ
প্রথম তিনটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	পরা	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	২৮	২১	৫	২	৫৯	৮	৪৭
ইস্টবেংগল	২৮	২১	৪	৩	৪৫	১০	৪৬
বি এন আর	২৮	২০	২	৬	৫৫	১১	৪২

প্রথম বিভাগের লীগ খেলায় মোহনবাগানের এগার বারের জয়যাত্রা :

সাল		খেলা	জয়	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বি	পঃ
১৯৩৯	—	২৪	১৬	৭	১	৩১	৭	৩৯
১৯৪৩	—	২৪	১৬	৭	১	৩৫	৬	৩৯
১৯৪৪	—	২৪	১৮	৪	২	৩৯	৮	৪০
১৯৫১	—	২৬	২০	৪	২	৪৭	৫	৪৪
১৯৫৪	—	২৮	১৯	৮	১	৩৮	৭	৪৬
১৯৫৫	—	২৬	১৫	৮	৩	৩৯	১২	৩৮
১৯৫৬	—	২৬	১৯	৫	২	৫৫	৯	৪৩
১৯৫৯	—	২৮	২১	৬	১	৪৯	৪	৪৮
১৯৬০	—	২৮	২২	৫	১	৬১	১০	৪৯
১৯৬২	—	২৮	১৬	৮	৪	৪৭	১৮	৪০
১৯৬৩	—	২৮	২১	৫	২	৫৯	৮	৪৭

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগের খেলা আরম্ভ হয় ১৮৯৮ সালে। মেসার্স ওয়াল্টার লক এন্ড কোং প্রথম বিভাগের চ্যাম্পিয়ান দলের পুরস্কার হিসাবে একটি কাপ উপহার দেন। প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে আটটি দল যোগদান করে—পাঁচটি স্থানীয় ইউরোপীয়ান দল এবং তিনটি গোরা দল। প্রথম বছরে গ্লাস্টারশায়ার রেজিমেন্ট লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। স্থানীয় ইউরোপীয়ান দলের মধ্যে প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় ক্যালকাটা এফ সি, ১৮৯৯ সালে। প্রথম ভারতীয় হিসাবে প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ক্লাব ১৯১৫ সালে যোগদান করে। ১৯১৬ সালে তারা রানার্স-আপ খেতাব পায়। ১৯৩৪ সালের আগে মোহনবাগান মোট পাঁচবার রানার্স-আপ হয়; ১৯২৫ সালে তারা ক্যালকাটা দলের থেকে মাত্র এক পয়েন্ট কম পেয়ে রানার্স-আপ হয়েছিল। ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৩৪ সালে। শুধু তাই নয়, তারা উপর্যুপরি পাঁচ বছর (১৯৩৪—৩৮) লীগ জয় করে ডারহামস গোরা দল প্রতিষ্ঠিত উপর্যুপরি তিন বছরের (১৯৩১—৩৩) লীগ জয়ের রেকর্ড ভেংগে দেয়। মহমেডান স্পোর্টিং দলের এই রেকর্ড আজও অক্ষুন্ন আছে। ১৯৩৪ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ভারতীয় দলের পক্ষে সেই যে লীগ জয়ের পথ মুক্ত ক'রে দেয় পরবর্তীকালে কোন গোরা বা ইউরোপীয় দলের পক্ষে লীগ জয় করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে এই

(ওপরে) * বামদিকে : খেলা শুরুর আগে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা।
* ডান দিকে : চুণী গোস্বামী, অরুণ সিনহা (কোচ) ও জার্নেল সিং।
মধ্যে * মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা মাঠে নামছেন। —সামনে থঙ্গরাজ।
নীচে * ডান দিকে : চুণী গোস্বামীর গোল করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছেন মহমেডানএর গোলকীপার বি ভদ্র।
* বাম দিকে : খেলার ... অধিনায়ক চুণী গোস্বামী।
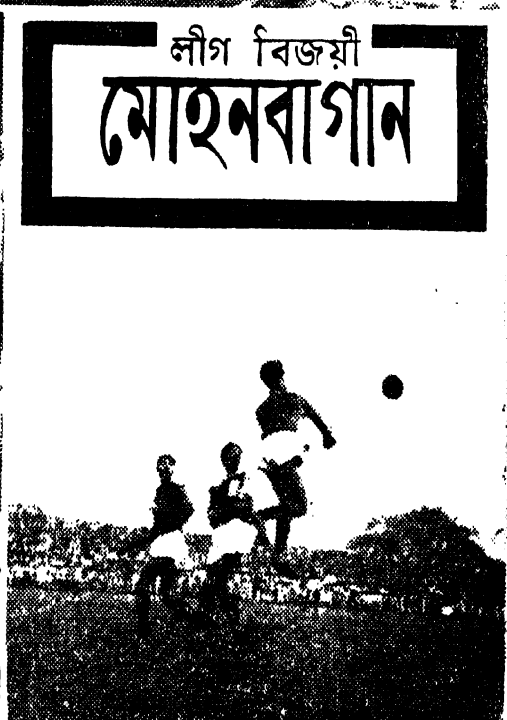
চারটি ভারতীয় দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে : মোহনবাগান (১১ বার), মহমেডান স্পোর্টিং (৯ বার), ইস্টবেঙ্গল (৭ বার) এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে (১ বার)। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুণ প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল এবং ১৯৫৩ সালে নির্দিষ্ট সময়ে লীগের খেলা শেষ না হওয়ার কারণে প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। স্থানীয় ইউরোপীয়ান ক্লাবগুলির মধ্যে প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে ক্যালকাটা এফ সি (৮ বার) এবং ডালহৌসী (৪ বার)। ১৯৫০ সালে ক্যালকাটা এফ সি এবং ১৯৫১ সালে ডালহৌসী প্রথম বিভাগ থেকে সেই যে নেমে গেছে তারপর আর প্রথম বিভাগে উঠতে পারেনি। বর্তমানে ডালহৌসী খেলছে দ্বিতীয় বিভাগে এবং ক্যালকাটা এফ সি তৃতীয় বিভাগে। ভারতবর্ষের মাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফুটবল খেলায় ইউরোপীয়ান ক্লাবগুলির দলগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ আগের মত আর নেই। বর্তমানে নিছক সময় কাটাবার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা ফুটবল খেলায় যোগদান করে।

সর্বাধিক গোলদাতা

বি এন আর দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড আপ্পালারাজু মোট ২৬টি খেলায় ২৩টি গোল দিয়ে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় সর্বাধিক গোলদাতার সম্মান লাভ করেছেন। পুলিশ দলের বিপক্ষে ৬ই আগষ্ট তিনি হ্যাট-ট্রিক করেন।

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

মালয়ের স্বাধীনতা দিবস উৎসব উপলক্ষ্যে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় জাতীয়তাবাদী চীন শেষ খেলায় ১—০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে ১৯৬৩ সালের রহমন ট্রফি জয় করেছে। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে জাপান এবং তৃতীয় স্থান দক্ষিণ কোরিয়া।

॥ আই এফ এ শীল্ড ॥

১৯৬৩ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা আগামী ২৩শে আগষ্ট শুরু হবে। প্রতিযোগিতায় ৪৩টি দল প্রবেশপত্র দাখিল করেছে—২৯টি স্থানীয় এবং ১৪টি বহিরাগত দল। এই বহিরাগত দলের মধ্যে আছে বাংলার বিভিন্ন জেলার ৬টি দল। সরাসরি তৃতীয় রাউণ্ডে খেলবে এই ৬টি দল—তালিকার প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল, ইণ্ডিয়ান নেভী এবং সেন্ট্রাল রেলওয়ে এবং দ্বিতীয়ার্ধে গত বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান, রানার্স-আপ অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ এবং মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেণ্টার। তালিকার একই দিকে একই বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী এবং রানার্স-আপ দলের খেলা দেওয়া সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম। দ্বিতীয় রাউণ্ডে সরাসরি খেলবে বি এন আর, ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং মহীশূরে একাদশ। বাকি ৩৪টি দলকে প্রথম রাউণ্ড থেকে খেলতে হবে।

ফাইনাল খেলার দিন নির্ধারিত হয়েছে ২১শে সেপ্টেম্বর।

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা

আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে ফ্রান্সের লিয়ঁ'তে যে আন্তর্জাতিক হকি লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে তাতে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সমেত মোট ১২টি দেশের যোগদান করার কথা আছে। এই প্রতিযোগিতার তালিকা এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান কখনও পরস্পরের সম্মুখীন হবে না। তালিকা অনুযায়ী ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান উভয় দেশই খেলবে বৃটেন, জার্মাণী, স্পেন এবং জাপান—এই চারটি দেশের সংগে। তাছাড়া ভারতবর্ষ খেলবে ফ্রান্স, ইতালী এবং আর্জেণ্টিনার সংগে এবং অন্যদিকে পাকিস্তানকে খেলতে হবে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং আমেরিকার সংগে। দুই দেশই মোট সাতটা খেলায় যোগদান করবে। গোলের গড় বিচার করে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশগুলির স্থান নির্ধারণ করা হবে।

লিয়ঁগামী ভারতীয় হকি দলের প্রশিক্ষণের ভার গ্রহণ ক'রেছেন হকি খেলার 'যাদুকর' ধ্যানচাঁদ, বলবীর সিং, ধরম সিং, গুরুবচন সিং এবং হাবুল মুখার্জি। শ্রীমুখার্জি ইতিপূর্বে দু'বার অলিম্পিক বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের কোচ নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি ভারতীয় হকির অতীত এবং বর্তমান ক্রীড়ামানের সংগে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল। শ্রীযুক্ত মুখার্জি জলন্ধরের শিক্ষা শিবির যাত্রার প্রাক্‌কালে সাংবাদিকদের বলেন, হকি খেলায় ভারতবর্ষকে তার হৃত গৌরব ফিরে পেতে হলে সরাসরি ক্রীড়াপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তাঁর মতে, অল্প দূরত্বে বল পাশ করার পদ্ধতি অবলম্বন করে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক হকি খেলায় তার পূর্ব প্রাধান্য নষ্ট করেছে। অল্প দূরত্বে বল পাশ ক'রে খেলার যে অসুবিধা তার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন, খেলোয়াড়দের প্রচুর দম এবং নিখুঁত বোঝাপাড়ার উপরই এই ক্রীড়াপদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে। এই ক্রীড়াপদ্ধতিতে আক্রমণভাগের কোন একজন খেলোয়াড়ের দম হ্রাস পেলে অথবা কোন একজন খেলোয়াড় আহত হলে আক্রমণভাগের খেলা প্রায় নির্জীব হয়ে পড়ে। লিয়ঁ যাত্রার পূর্বে ভারতীয় হকি দল জলন্ধরের শিক্ষা শিবিরে একমাসকাল অবস্থান করবে।

আগামী ২৫শে আগষ্ট জলন্ধরে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের এক সভা বসবে। এই সভায় ২২ জন বাছাই খেলোয়াড়ের থেকে চূড়ান্তভাবে ভারতীয় হকিদল গঠন করা হবে।

লিয়ঁ'র আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের নাম : ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, জার্মাণী, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, বেলজিয়াম, জাপান, আমেরিকা এবং আর্জেণ্টিনা।

ভারতবর্ষের খেলার তালিকা :

যে সব দেশ ভারতবর্ষের সংগে খেলবে তাদের নাম এবং খেলার তারিখ:

২৮শে সেপ্টেম্বর—জার্মাণী
২৯শে " —ফ্রান্স
৩০শে " —ইতালী
২রা অক্টোবর—স্পেন
৩রা " —আর্জেণ্টিনা
৫ই " —জাপান
৬ই " —ইংল্যাণ্ড

পাকিস্তানের খেলার তালিকা :

যে সব দেশ পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে তাদের নাম এবং খেলার তারিখ :

২৮শে সেপ্টেম্বর—স্পেন
২৯শে " —হল্যাণ্ড
৩০শে " —ইংল্যাণ্ড
২রা অক্টোবর—বেলজিয়াম
৩রা " —জাপান
৫ই " —আমেরিকা
৬ই " —জার্মাণী

উত্তর কলিকাতা টেবল টেনিস

চৌরঙ্গীর ওয়াই এম সি এ হলে অনুষ্ঠিত উত্তর কলকাতা টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার ফলাফল :

পুরুষদের সিংগলস : দ্বি এন লাহিড়ী ২১—১৫, ১৭—২১, ২১—২৬, ১১—২১ ও ২৫—২৩ পয়েন্টে মলয় ভট্টাচার্যকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : কুমারী ডাঃ তপতী মিত্র ২১—১৭, ২১—১৪ ও ২১—১৭ পয়েণ্টে কুমারী রবিনা রায়কে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : দীপঙ্কর ঘোষ এবং মলয় ভট্টাচার্য ২১—১৮, ১৭—২১, ২১—১৬ ও ২১—১৬ পয়েণ্টে জি এম ব্যানার্জি (রেলওয়ে) এবং দীপঙ্করকুমার ঘোষকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিংগলস : অমৃত খেমকা ২১—১৪, ২১—১৮, ১৭—২১, ৬—২১ ও ২১—১৯ পয়েণ্টে দীপঙ্কর চ্যাটার্জিকে পরাজিত করেন।

লংলাইফ অক্সফোর্ড
অনেক
দিনের
আরাম
শুধু আরাম নয়, গঠনেও আশ্চর্য মজবুত।
আচ্ছাদনে আগাগোড়া সরেস চামড়া সরেস তৈরী
সোল আর হিল, তার উপর নিপুণ
বিজ্ঞানসম্মত নির্মাণকৌশল।
ফলে অনেক দিন অবিকল থাকে এর
আঁটসাঁট গঠন, অনেক দিনের চলনেও মনে হয়
সদ্যকেনা, আনকোরা। বাটার এই জুতোগুলি
হাঁটাপথে পরিপাটি আরামের আধার,
বিচক্ষণ রুচির পরিচায়ক।
আজই একজোড়া কিনে পরখ করুন।
Bata
লংলাইফ নিউকাট ১৪.৯৫
মাধুরী ১৩.৫০
সুচিত্রা ১৩.৫০

ঝড় জলের অন্ধকারে
লণ্ঠন অপরিহার্য সাথী
কিষাণ লণ্ঠন
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং

সূচীপত্র

B.I.
MILK OF
MAGNESIA

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

সতীশ কাব্যিরাজের
মহা ভৃঙ্গরাজ তৈল
ইহাই একমাত্র কেশ তৈল
আয়ুর্বেদীয় ভেষজের গুণাগুণ ঠিক রাখিয়া প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য
ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।
P-2-62
আর্য্য ঔষধালয় (ঢাকা) কলিকাতা-৯

৩য় বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৭শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ নঃ পঃ

শুক্রবার, ১৩ই ভাদ্র, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
Friday, 30th. August, 1963. 40 Naya Paise.

লোকসভায় নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া গত সপ্তাহের প্রথম চারদিনে খুব ভাষণ, প্রত্যুত্তর-ভাষণ ও তর্কবিতর্ক হইয়া গেল। সেই সঙ্গে বিতর্কের মুখে ও মধ্যে, কারণে অকারণে কংগ্রেসী ও বিপক্ষ দলের মধ্যে অশোভন চীৎকার ও আস্ফালনের 'মেছোহাটা' প্রায় প্রত্যেক দিনই ঘটিয়াছিল। এবং বিপক্ষ দলের কয়েকজন, বিশেষে ডাঃ লোহিয়া, ভাষণ ও বিতর্কের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কুৎসা ব্যবহার করিয়া এই বিতর্ককে অতি নিম্নস্তরে নামাইয়া দিয়াছিলেন। বিতর্কের উত্তরে চতুর্থ দিনে শ্রীনেহরু নৈরাশ্যপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই বিতর্ক অনেক দিক হইতে প্রণিধানযোগ্য হইলেও বিপক্ষের ভাষণ ইত্যাদিতে যে স্তরের চিন্তা ও বিচার আশা করা হইয়াছিল তাহার কিছুই পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃহত্তর ও গৌরবময় ভবিষ্যতের বিষয়ে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও পরিচয় এই বিতর্কে বিরোধীদলের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ নেতিবাচক মনোভাবের বশে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের কাজে কোনও সুনির্দিষ্ট পন্থা নাই।

শ্রীনেহরু দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলেন যে, রাষ্ট্র-পরিচালন ইত্যাদি সম্পর্কে উচ্চস্তরের বিচার ও আলোচনার পরিবর্তে ব্যক্তিগত দোষারোপ ও গালিগালাজ ব্যবহারে বিতর্ককে বাজারের কোন্দলের স্তরে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন, দুর্নীতি যে একটা গুরুতর সমস্যা এবং তাহা যে বর্তমানে গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা নাই, কিন্তু কখনও কখনও এ বিষয়ে অভিযোগ এরূপ অতিরঞ্জিত করিয়া এমনভাবে করা হয় যে, তাহাতে দুর্নীতির অবসান না করিয়া বরঞ্চ উহাকে প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়। লোকসভার ইতিহাসে ইহা একটি বিশেষ মুহূর্ত এবং তাঁহার মনে হয় বিতর্কে এরূপ ক্ষুদ্র মনোবৃত্তি প্রকাশ সদস্যগণের পক্ষে শোভন হয় নাই, একথা তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন।

সরকারের কর্মপন্থা ও কর্মনীতির নানা অঙ্গ লইয়া এবং চীনা-আক্রমণজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিষয়ে বিপক্ষের সমালোচনার বিভিন্ন অংশের তিনি ধারাবাহিক উত্তর দিয়া এবং সবশেষে আচার্য কৃপালনী প্রস্তাবিত চীনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক-ছেদকে অকেজো বলিয়া তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

বিপক্ষ দলীয় বক্তাদের বক্তৃতা সম্পর্কে শ্রীনেহরুর মন্তব্য যথাযথ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা সরকার পক্ষের প্রধানগণের ভাষণ বা বিতর্ক পদ্ধতির মধ্যেও কোনও সুদূরপ্রসারিত কল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই নাই। একদিকে ভাষণ ও বিতর্কে যদি বাজারের ইতর মনোভাব দেখা যায়, তবে অন্যদিকেও ফৌজদারী আদালতের নিম্নস্তরের সওয়াল-জবাবেরই আভাস পাওয়া গিয়াছে। শুধুমাত্র পণ্ডিত নেহরু শোভন-অশোভনের মধ্যে ব্যবধান সম্পর্কে বিশেষ চেতনা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনিও এই "ঐতিহাসিক মুহূর্তের" উপযোগী ভাষণ দিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন বলা যায় কি?

শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিনাথ দে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আজ শ্মশানে বহ্নিশিখা অভ্রভেদী তীব্র জ্বালা,
আজ শ্মশানে পড়ছে ঝরে উল্কাতরল জ্বালার মালা;
যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব্ব শ্মশান শুধু হ'চ্ছে আলা,—
যাচ্ছে পুড়ে নূতন করে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।

একটি চিতায় পুড়ছে আজি আচার্য্য আর পুড়ছে লামা,
প্রফেসর আর পুড়ছে ফের্ পুড়ছে শমস্-উল্-উলামা,
পুড়ছে ভট্ট সংগে তারি মৌলবী সে যাচ্ছে পুড়ে
ত্রিশটি ভাষার—বাসাটি হায় ভগ্ন হয়ে যাচ্ছে উড়ে।

একত্রে আজ পুড়ছে যেন কোকিল 'কুকু' বুল্‌বুলেতে,
দাবানলের একটি আঁচে নীড়ের পিঠে পক্ষ পেতে;
পড়ছে ভেংগে চোখের উপর বর্তমানের বাবিল-চূড়া,
দানেশ-মন্দী তাজ সে দেশের অকালে আজ হচ্ছে গুঁড়া।

আজ শ্মশানে বঙ্গভূমির নিবল উজল একটি তারা,
রইল শুধু নামের স্মৃতি রইল কেবল অশ্রুধারা;
নিবে গেল অমূল্য প্রাণ নিবে গেল বহ্নিশিখা।
বঙ্গভূমির ললাট 'পরে রইল আঁকা ভস্মটীকা।

মধ্যপ্রদেশ থেকে আভা বসু ওপরের কবিতাটির সংগে পত্রযোগে জানিয়েছেন:
"বহুভাষাবিদ আচার্য হরিনাথ দে আমার জ্যেঠামশাই। মধ্যপ্রদেশে রায়পুরে আমাদের পৈত্রিক বাড়ীতে সম্প্রতি পুরান দিনের বহু কাগজপত্র দেখিবার সময় আচার্যের নানা লেখার মধ্যে কবি সত্যেন দত্তের এই কবিতাটি পাই। ১৯১১ সালের ৩০শে আগস্ট আচার্যের মৃত্যুদিন উপলক্ষে লেখা এই কবিতাটি তৎকালীন কোন কাগজে মুদ্রিত হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই।" —আভা বসু

রোদ

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ডুবে গেলে মাঠ ঘাট
যে সব সবুজ গাছ
মাথা তুলে বাঁচে,
সূর্যের আঁচে;—
বেঁচে আছি তেমনি করেই।

এদিকে শহরে সন্ধ্যা
হামাগুড়ি দেয় ঘরে ঘরে,
ব্রিজের ওপরে নাচে বিকেলের শেষ আলো
ক্যান্টিলিভারে রঙ ধরে।

বিষণ্ণ হৃদয় জুড়ে গুন গুন করে মৌমাছি;
স্ত্রী গেছে রাস্তার কলে
ঘরেতে অবোধ শিশু কাঁদে,
পুরোনো স্মৃতির মত তবু রোদ শিহর ছোঁয়ায়
জেনে শুনে দিয়েছি পা ফাঁদে।

অধঃপতনের শব্দ ছাপিয়ে

রত্নেশ্বর হাজরা

চতুর্দিকে শব্দ, ভাংগছে অট্টালিকা, বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষ
মায়াবতী কল্পনাও ধ্বংসের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল
মৌসুমের সফেদ মরাল ক'টি বিচ্ছিন্ন-শিকড় তমালে
পরিচিতির চিহ্নও পেল না,
এবং নোয়ার গলুই নিয়ে যখন ক্ষুধার্ত বাতাস আর
হাংগরমুখো পাতাল খেলা করছিল—
চেতনা বললে, আমি আছি। আমার হাস্যধ্বনির কাছে
অধঃপতনের সমস্ত চীৎকার তুচ্ছ......তুচ্ছতম।

বধূ-বরণ গোধূলির রূপ দেখতে দেখতে আঠাশের যৌব
ভাবছিল, রোজ এই তিল তিল অবক্ষয়ের হাত থেকে
পরিণতিহীন আকাঙ্ক্ষায় আত্মহননের লজ্জা এড়াতে
আত্মহত্যার বন্ধ্যা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া অনেক সহজ।
এবং সে যখন এমনি স্বপ্নই দেখছিল
প্রাণ বললে, আমি আমার মৃদুহাস্যে
দুঃস্বপ্নের কালাপাহাড় উড়িয়ে দিতে পারি,
কারণ আমি অস্তিত্বময় শ্রেষ্ঠতম অদৃশ্য ইন্দ্রিয়।

তারপর ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সমস্বরে বললে,
যৌবন দ্যাখো, কেমন ক'রে হাস্যধ্বনিতে
অধঃপতনের শব্দগুলোকে হারিয়ে দিচ্ছি।

স্বাভাবিক রক্তে তখন ভালোবাসার গান মোচড় দিয়ে উঠল॥

জাল প্রতাপচাঁদের কার্যকলাপের সময় আমি বা আমার পাঠকবর্গ কারোই উপস্থিতি থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই এমন একাধিক ঘটনা ঘটেছে যেখানে প্রতারণাকে নতুন নতুন ছদ্মবেশে আবির্ভূত হ'তে দেখা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী বলে পরিচয় দিয়ে বহু বছর প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছেন, এমন ব্যক্তি হয়তো শেষপর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছেন নন্ ম্যাট্রিক ব'লে। অবিবাহিত হিসাবে আত্ম-পরিচয় দিয়ে কেউ হয়তো বরপণের লোভে উপর্যুপরি বিবাহ ক'রে বিবাহ-বিশারদের শিরোপা নিয়ে চলে গেছেন প্রাচীঘেরা 'শ্বশুরবাড়িতে'। আবার কেউ হয়তো ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ইন্সপেক-টার সেজে নির্জন দুপুরে কোনো গৃহকর্ত্রীকে খুন ক'রে চরম শাস্তি পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

জাল পুলিশ বনাম নির্ভেজাল চোর

কিন্তু জাল পুলিশ, সে বড় আশ্চর্য ব্যাপার। সাধারণত ভেজাল আর জালি-য়াতির মুখোশ খুলে দেওয়াই যাঁদের কাজ, তাঁদের মধ্যেই যদি থাকে প্রতারণার গুপ্তকীট তাহ'লে ব্যাপারটা একটু বিসদৃশ হ'য়ে ওঠে বইকি! অথচ খবরে দেখা যাচ্ছে সেই ঘটনাই আত্মপ্রকাশ করেছে আসানসোলে। জনৈক ব্যক্তি নাকি সেখানে গত দুই মাস ধরে অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বলে পরিচয় দিয়ে বহাল তবিয়তে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল। এই অসমসাহসিক ব্যক্তিটি শোনা যাচ্ছে, অধস্তন পুলিশ অফিসারদের সেলাম কুড়িয়েছে, পুলিশ অফিসারদের সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছে এবং (যা তার আসল উদ্দেশ্য) একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজারকে ঠকিয়েছে।

তবে, বারবার দুঃসাহস দেখাতে গেলে যা হয়, লোকটি নিজেও শেষ পর্যন্ত ঠকেছে। দুর্গাপুর এলাকার ফরিদপুর থানার পুলিশ তার প্রতারণা ধরে ফেলে তাকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরেছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো পুলিশই শেষ অবধি এই 'পুলিশী' চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে এখন দুটি প্রশ্ন আমার মাথায় আসছে। এক নম্বর হল, পুলিশের মধ্যে এরকম আরো কিছু জালিয়াতের অস্তিত্ব আছে কিনা? এবং যদি থাকে, তবে তা সনাক্ত করার উপায় কী? কারণ সে রকম কোনো লক্ষণ জানা না থাকলে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মতো অনেক পুলিশ দেখেই হয়তো আঁতকে উঠতে হবে।

আর দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি পুলিশ সেজে ব্যর্থ হ'য়েছে সে যদি এবার চোর সাজে তবে তাকে, কিম্বা তার মতো অন্যদের ধরার মতো নির্ভেজাল পুলিশী ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিনা?

নাকি পুলিশেরা এবার থেকে আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে নিয়ে কাজে বেরোবেন!

•
• •

শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন বহু-কালের, এবং এ-ব্যাপারে চট ক'রে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় কিনা তা সন্দেহের বিষয়। এক পটভূমিতে যা অশ্লীল অন্য পটভূমিতে সেটা খুবই স্বাভাবিক মনে হ'তে পারে। বিশেষ ক'রে শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গহীনভাবে কোনো কিছুকে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে শ্লীল বা অশ্লীল বলে ঘোষণা করা সুবিবে-চনার কাজ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দোহাই দিয়ে হামেশাই আমরা কোনো কোনো রচনা বা ছবিকে অশ্লীল এবং সেই কারণেই আপত্তিকর বলে রায় দিয়ে থাকি। অথচ একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দুশ্চিন্তা নয়, বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ব্যক্তিগত রুচিকেই প্রধান মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করি।

সম্প্রতি কলকাতার এক প্রদর্শনীতে 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস' দেখানোর জন্যে যেসব স্থিরচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছিল, তা থেকে দুখানি ছবি অশ্লীলতার যুক্তিতে সরিয়ে ফেলা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হ'য়ে গেল তার মধ্যেও রয়েছে 'মনে করা' এবং 'মনে না করা'র দ্বন্দ্ব। কোনটা অশ্লীল আর কোনটা অশ্লীল নয় এ বিচারে কোনো পক্ষেরই বিশেষ উৎসাহ ছিল না। সত্যি বলতে কি, আমারও সেদিকে খুব একটা আগ্রহ নেই। তার কারণ, আগেই বলেছি, এ প্রশ্ন সহজে মীমাংসা হওয়ার নয়। কিন্তু কথাটা হল, রুচিটা যেরকমই হোক, তার মধ্যে একটা সংলগ্নতা থাকা দরকার। ক্ষেত্রবিশেষে ক্রমাগত বিচারের মাপকাঠি বদলালে সুবিচার প্রায় সেই গেছো দাদা'র হদিশ পাওয়ার চেয়েও দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে উঠতে পারে।

অশ্লীলতা : দেয়ালে এবং ঘরের বাইরে

এইজন্যে আমার অনুরোধ, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবার প্রদর্শনীর দেয়াল ছেড়ে বাইরের দেয়ালে নজর দিয়ে সারা কলকাতার রাস্তার দুপাশে গৃহপ্রাচীরের দিকে লক্ষ্য দিন একবার। দেখবেন, স্বল্পবাস নরনারীর দেহভঙ্গীকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে এমন অশ্লীল ক'রে তোলা হয় বোম্বাই-মার্কা বেশির ভাগ ছবির বিজ্ঞাপনে, যে তা থেকে যৌনলালসা যেন ঝ'রে ঝ'রে পড়তে থাকে। সেগুলোর বিষয়ে কি আমাদের কিছুই করণীয় নেই?

কিম্বা, করণীয় নেই সেই ছবি-গুলোর বিষয়ে, যেগুলো থাকে ফুটপাত-আশ্রয়ী বইয়ের স্টলে বিদেশী কেতাবের মলাটে। সস্তা দামের এইসব বই যে আমাদের অনেকেরই রসতৃষ্ণা মেটায় তা অস্বীকার করা যাবে না! কিন্তু মলাটে আঁকা অসম্ভব সব নারীমূর্তির অসম্ভব রকম প্রদর্শনকামিতা যে আমাদের রুচিকে খুব উন্নত ক'রে তোলে তাও বলা চলে না। বিশেষ ক'রে এসব বই যখন নগদ মূল্যে ফুটপাত থেকে ঘরে এসে আশ্রয় পায়, তখন বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েরা যে তাতে খুবই কৌতূহলী হ'য়ে পড়ে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এইভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের যে-রকম মানসিক অধঃপতন ঘটতে থাকে, একটি বিকাশশীল নতুন জাতির পক্ষে তা মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। ●

এদিকেও কি সুরুচির ন্যায়দৃষ্টি পড়বে না এবার? কেবল প্রদর্শনী থেকে ছবি সরিয়ে দিলেই কি বিকৃতির পথ আটকানো যাবে? মনে তো হয় না!
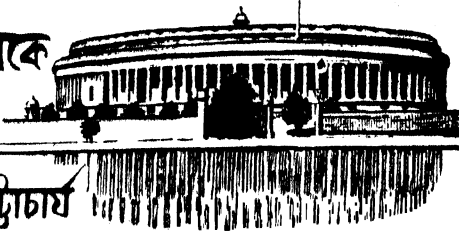
পরনিন্দা না হলেও, পরচর্চা করে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু তবু কাহিনীর শেষ নেই। এককালে দিল্লীর রঙ্গমঞ্চে বাদশা-বেগমরা অভিনয় করতেন; তাঁদের ছিটে-ফোঁটা কাহিনী নিয়ে কত গল্প, কত কাহিনী, কত নাটক সৃষ্টি হয়েছে। দিল্লীর ইতিহাস থেকে বাদশা-বেগমরা বিদায় নিয়েছেন; পারসীয়ান কার্পেট ঝাড়লন্ঠন শোভিত প্রাসাদ থেকে নূপুরের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দরবারী কানাড়া আজ আর কানে ভেসে আসে না। কিন্তু দিল্লীর নাট্যশালা আজও জমজমাট। নতুন নাটক, নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও বেশ জমিয়ে রেখেছেন। আমি শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মত সে অভিনয় দেখে চলেছি।

পার্লামেন্টের প্রায় সাড়ে সাতশ' মেম্বারের মধ্যে শ'খানেক এম-পি'র নাম খবরের কাগজের পাতায় মাঝে মাঝেই ছাপা হয়। দেশের লোক এঁদের জানে ও চেনে। পরবর্তী শ'খানেক পার্লামেন্টারী সার্কেলে পরিচিত। আরো শ'খানেক আছেন, যাঁরা মাঝে মাঝে 'মে আই নো স্যার' বলে প্রশ্ন করেন বা কদাচিৎ-কখনো এক-আধটা বক্তৃতাও করে ফেলেন। এরপর যাঁরা পড়ে থাকেন, এম-পি বলে তাঁদের নাম প্রায় অজ্ঞাত। কিন্তু কুঁজো বলে কি চীৎ হয়ে শুতে ইচ্ছা করে না? অজ্ঞাতগোষ্ঠীর এম-পি বলে কি মিনিষ্টার হবার সাধ হয় না?

দাদা আমাদের তৃতীয় দফার এম-পি হবার গৌরব দাবী করতে পারেন। দাস ফার নো ফারদার। আর কোন গৌরব আছে বলে জানা নেই। আজ পর্যন্ত দাদার কণ্ঠস্বর লোকসভায় শুনেছি বলে মনে হয় না। কোঁচাটি ধরে, পাঞ্জাবি চড়িয়ে নধর দেহটি হেলিয়ে-দুলিয়ে দাদা লোকসভায় আসেন। মোটা পাথরের থামের আড়ালে লোকসভার চক্রবাল-রেখার কাছাকাছি আসন গ্রহণ করে কিছুক্ষণ অবস্থান। অতঃপর সেন্ট্রাল হলে এক কাপ কফি ও একটা গোল্ড-ফ্লেক সিগারেট সেবন। সর্বশেষে পার্লামেন্ট মিল্ক-বুথ থেকে একটি বিশুদ্ধ ঘী'এর টিন নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন। এই হলো দাদার পার্লামেন্টের জীবন-কাহিনী। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দাদা এভাবে পার্লামেন্টে নির্বাক সৈনিকের অভিনয় করে চলেছেন।

হাজার হলেও ইয়ংম্যান; তারপর বিলেত-ফেরত। দেশসেবার জন্য দাদার প্রাণটা প্রায়ই কেঁদে ওঠে। কিন্তু নেহরু যেন কেমনতর? কয়লা-খনিতে দাদা যে একটি আস্ত হীরকখণ্ড, সে কি নেহরু বুঝতে পারেন না?

বছর দশেক এম-পি থাকার পর দাদা একজন সেন্ট্রাল মিনিষ্টারের নির্ভেজাল সাপোর্টার হবার গৌরব অর্জন করলেন। প্রায়ই সন্ধ্যায় সস্ত্রীক যাতায়াত শুরু করলেন এক বাংলো-বাড়ীতে। কিছুক্ষণ মন্ত্রী-সান্নিধ্য উপভোগ করার পর ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে মন্ত্রীর আশীর্বাদ শিরধার্য করে দাদা-বৌদি ফিরে আসেন নর্থ এভিনিউর ফ্ল্যাটে। দাদা সব সময় যেতে পারেন না; নিরুপায় হয়ে বৌদিকেই একা যেতে হয় বাংলোয়। শাড়ী-গহনা পরে হাতে ভ্যানিটিব্যাগ আর এক বাক্স কলকাতার সন্দেশ নিয়ে বৌদি তীর্থযাত্রায় রওনা হন। যাবার সময় দাদার কোলে আট মাসের শিশু-সন্তানটিকে আর ফিডিং বোতল ভর্তি দুধ দিয়ে বৌদি ট্যাক্সিতে চাপেন। মন্ত্রীর পাশে বসে বৌদি বেশ সুন্দর একটা পোজ দিয়ে ছবিও তুলেছেন। দাদার নর্থ এভিনিউর ফ্ল্যাটের ড্রইংরুমের সেন্টার টেবিলে সে ছবি দীর্ঘদিন শোভা পেয়েছে। তারপর এক মাহেন্দ্রক্ষণে মন্ত্রীর আবির্ভাব হলো দাদার ফ্ল্যাটে। সহাস্য বদনে সি-পি-ডবলিউ-ডি'র ডিনার-টেবিলে পটলের দোরমা, ছোলার ডাল, কাঁচা লঙ্কা-সরষেবাটার ইলিশ মাছের ঝাল, চিকেন-মাটন ও ঘন্টওয়ালার মিষ্টি খেয়ে গোল্ডফ্লেকের প্রথম সুখটান মেরে মন্ত্রী বৌদির পিঠে এক চাপড় মেরে বল্লেন, বেশ খাওয়ালে।

তারপর মিনিষ্টার কলকাতা গেলে দাদা-বৌদি গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে ডজনখানেক রজনীগন্ধার ষ্টিক কিনে ঠিক সময় হাওড়া ষ্টেশনে হাজির হতো। ফেরার সময় দাদা মন্ত্রীর গাড়ীতে এক টুকরি মালদার ফজলি বা সের কয়েক নলেন গুড়ের সন্দেশ চাপিয়ে দেবেনই।

এমনিভাবে চলে দাদার সাধনা। তারপর একদিন হাত কচলে মনের কথাটা বলেই ফেললেন, একটা কিছু না হলে তো আর পলিটিক্সে থাকা চলে না। মিনিষ্টার আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। 'আই উইল ডেফিনিটলি টেল প্রাইম মিনিষ্টার অ্যাবাউট ইউ।'

জয় মা কালী! তবে বোধহয় অদৃষ্ট খুলল। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-ভবন সার্কুলারে দাদার নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে নিজেই জানালেন, মিনিষ্টার আশা করছেন নেক্সট লিস্টে নাম থাকবে। কলকাতা এবং আশপাশ থেকে দাদার কাছে খানকতক গ্রিটিংস টেলিগ্রামও এলো। কনগ্র্যাচুলেশনস্! বেস্ট উইসেস্ ফর ইওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট এ্যাজ ডেপুটি মিনিষ্টার!

মিস্ফরচুন নেভার কামস্ অ্যালোন। সেকেন্ড লিস্টেও দাদার নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। মুষড়ে পড়লেন দাদা-বৌদি দুজনেই। ক'দিন দাদাকে ঘী'এর টিন নিয়ে পার্লামেন্ট-হাউস থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখলাম না। বুঝলাম, শকটা বেজায় রকমের হয়েছে। আমিও লজ্জায় টেলিফোন করতে পারছি না। এমন সময় একদিন বেশ গভীর রাত্রে আমার টেলিফোন বেজে উঠল...হ্যালো! সমস্ত কাহিনী আগেই জানা ছিল। শুধু বল্লেন, কি ব্যাপার বলুন তো? দেশের এই অবস্থায় ফ্রেস্ ব্লাড না নিয়ে বুড়োগুলোকে দিয়ে নেহরু কিভাবে গভর্ণমেন্ট চালাবেন বলুন তো!

—'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি ক'দিন ধরে!'

—'পলিটিক্স ছেড়ে প্রফেশনে লেগে যাব ভাবছি। পার্লামেন্টে থেকে আর কি হবে বলুন। অনেক ত দেখলাম।'

আমি আর কি বলব। শুধু বল্লাম, 'পলিটিক্স ছেড়ে কি থাকতে পারবেন? তাছাড়া জানেন তো, 'নাইট ইজ দি

ডার্কেস্ট বিফোর ডন......সূর্যোদয়ের আগেই তো সব চাইতে বেশী অন্ধকার হয়। হাল ছাড়বেন না।' শেষে পরামর্শ দিলাম, 'হোয়াই নট টেল প্রাইম মিনিস্টার এভরিথিং? আপনার মত কোয়ালিফায়েড লোক আছে জানলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু করবেন।'

নেহরুর চিঠিটা ড্রাফট করার জন্য পরের দিন দাদার বাড়ী আমার চায়ের নিমন্ত্রণ হলো। অনেক বুঝিয়েও কাজ হলো না, যেতেই হলো। এস্টিমড্ পণ্ডিতজীর জন্য ছোট্ট চিঠিটা ড্রাফট করে দিলাম। রিহার্সাল দিয়ে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলাম।...বৌদির হাতে ফুল আর আপনি হাক্সলে বা রাসেলের একটা বই নিয়ে যাবেন। নেহরু পছন্দ না করলেও তাঁকে প্রণাম করবেন। তারপর সোজাসুজি বলবেন, কিছু করে দিন।

ক'দিনের মধ্যেই প্রাইম মিনিস্টার্স হাউস থেকে চিঠি এলো। নেহরুর একজন সেক্রেটারী লিখলেন, রেফারেন্স টু ইওর লেটার টু দি প্রাইম মিনিস্টার ...প্রাইম মিনিস্টার উইল বি প্লিজড্ টু সী ইউ অ্যান্ড ইওর ওয়াইফ অন স্যাটারডে নেক্সট এ্যাট ফোর ফিফ্‌টিন পি এম এ্যাট হিজ অফিস।

সেদিন পাঁচটা বাজতে না বাজতেই আবার আমার টেলিফোন বেজে উঠল। ...হ্যালো! নেহরু আজ চমৎকার মুডে ছিলেন। আপনার বৌদি প্রণাম করতেই ওর হাত ধরে তুলে নিয়ে গালে একটা চড় মেরে বল্লেন, হোয়াট ইজ দিস? তারপর আমার কথা সব শুনে বল্লেন, তোমার কোয়ালিফিকেশন সম্পর্কে তো বলার কিছু নেই, তবে দেখি কি করা যায়।......আচ্ছা আপনার কি মনে হয় বলুন তো!'

—'ইণ্ডিকেশনস্ আর গুড।'

—'হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়।'

দাদার পরের কাহিনী লিখতে বুক ফেটে কান্না আসে। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। পার্লা-মেণ্ট হাউস দেখলে যেন বিভীষিকা মনে হতো দাদার। তারপর সপরিবারে চলে গেলেন কলকাতা।

দীর্ঘদিন বাদে দাদা আবার ফিরেছেন দিল্লী। আবার টেলিফোন: হ্যালো, দাদার প্লানে কে কে যাচ্ছে বলুন। জুনিয়র মিনিস্টারদের মধ্যে কেউ যাবে নাকি? আমাদের কি কোন চান্স আছে?

এবার আর আমি কাঁচা কাজ করছি না। দাদাকে পরামর্শ দিয়েছি, প্রথমে নেহরুর সঙ্গে দেখা করে মনে করিয়ে দিন এবং তারপর—।

এদিকে পণ্ডিত কৃষ্ণমূর্তিও দিল্লীতে এসে গেছেন। পণ্ডিতজীর ঠিকানাটা দাদাকে দিতে ভুলে গেছি; দু'একদিনের মধ্যেই দিয়ে দেব।

আলোচনা

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে রক্

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভবানী মুখো-পাধ্যায়কে অজস্র সাধুবাদ জানাই যে তিনি এমন একটি উপাদেয় প্রবন্ধ আমাদের পরিবেশন করলেন। চণ্ডী-মণ্ডপের কথা শুনলেই মন ছুটে চলে যায় সেই কল্পনাক্রান্ত যুগে যখন বাঙালীর জনচেতনায় নিখুঁত কিছু না থাকলেও জীবনে নিটোলতা ছিল, ছন্দ ছিল, সুর ছিল। আরো ছিল দল, আর দলাদলি, অভাব অভিযোগ অনটন, নায়েব জমিদার পাইক আমলা আদালত হুকুম হাকিম, রোগ শোক দুঃখ তাপ। তবু ভবানীবাবু যা বলেছেন তার সামাজিক জীবন বিধ্বস্ত হয়নি, গ্রামীণ সভ্যতায় চিড় খায়নি, তার ঘরমুখী মন চঞ্চল হয়নি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সে ভেঙে পড়েনি, তার বাড়ীর উঠোনে বেড়া পড়লেও আকাশ ছিল খোলা, মন্দা-ক্রান্তার আক্রান্ত হলেও সহজ সুস্থ ছিল। বোষ্টমী আসতো 'জয়রাধে' বলে, পাঁচালীর ছড়া শুনতো দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রবীণা পিতামহী থেকে রক্ত-অলক্ত পায়ে নবীনা বধূরা—ছেলেরা টানতো দড়ি, বাইতো বাচ, খেলা হতো কুস্তীগিজো কপাটিধাপসা। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে বলা যায় উমাপতিরা দারিদ্র হলেও হেয় নন, শ্মশানচারীর স্ত্রীরা পতিগৌরবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীদের সঙ্গে সমাজে সম আসন পেতেন। সেই চণ্ডী-মণ্ডপে বসতো গ্রামের পঞ্চায়েতী বিচার-শালা, সমাজপতিদের তর্ক জমতো, তর্কচঞ্চুদের তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল, প্ল্যান হতো বারোয়ারী পুজোর, কটা যাত্রার পালা আসবে, কারা গাইবে কৃষ্ণলীলার গান, বলবে নদের নিমাই-এর কথা। চলতো পাশা দাবা, কচ বারো, কাদের সাপ—ষড়্‌যন্ত্রে গঞ্জনোক্তো বিসর্জিত হতো চোখের জলে—সংগৃহীত হতো পরের ঘরের নব নব কুৎসা, শতশত গ্লানির কালিমার কাহিনী, শ্লেষ বিদ্রূপ ধ্বনিত হতো, রণিত হতো বুকভাঙা ইতিহাস তবু ছিল একটা সহজপ্রীতি, ভালোয় মন্দয় মিশানো একটা সামাজিকতা, আশ্রয়, আলাপ, হয়তো বা বিলাপ ও অপলাপ। বাহিরের জগতের প্রতি স্বাভাবিকই ছিল একটা বক্রোক্তি, ভীতি, অনমনীয়তা, অবজ্ঞা ও অজ্ঞানতা। কিন্তু এ বেন আমায় পাছে সহজে বোঝ তাইতো এত লীলার ছল, কারণ দা-কাটা কড়া তামাকের ধূম্রজালের মধ্যে বেরিয়ে পড়তো ক্ষণে ক্ষণে একটি নরম মন, একটি গরম বুক, এক টুকরো অনাবিল হাসি। ভবানীবাবু ঠিকই বলেছেন, তখন বাঙালীর মুখে হাসি ছিল। এইটেই হচ্ছে বড় কথা। প্রবন্ধের লেখক তাঁর লেখায় বিশেষ করে

জোর দিয়েছেন চণ্ডীমণ্ডপ থেকে রকে যাবার পথে, অভিব্যক্তির স্রোতে মাঝখানের জমাটী বৈঠকী আলাপের যুগটির উপর—তার ছোট ছোট সাহিত্যিক নিদর্শনগুলিকেই বিশেষ করে তুলে ধরেছেন—হতাশা, বিভ্রান্তি, আত্মগ্লানির মধ্য দিয়ে নয়, একটা সুস্থ স্বস্তিচঞ্চল পরিবেশে। জানি এখানে বলা হবে—এ তো হচ্ছে উপরতলার বৈঠকের গল্প, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দোতলায় গড়গড়া হাতে বাবুমশায়দের। এখানে জনগণের মণ্ডপাত নেই, প্রলেতারিয়াতের দিব্যদর্শন নেই, কামায়নপ্রচুর রসসিঞ্চন নেই—শুধু নিগুনাগেরা 'পথি পরিহরন' বসে আছেন স্থূল হস্তাবলেপের আশায়—আর যাদের গল্প ভবানীবাবু বললেন তাঁরা তো কেউ রবীন্দ্রনাথ, কেউ দ্বিজেন্দ্রলাল, কেউ সুকুমার রায়, কেউ শরৎচন্দ্র। প্রমথ চৌধুরীর ঘোষাল মশাইও অবশ্য বাদ যান না। ক্রিটিক বলবেন এঁরা শুধু নাম নন, নামী, সাধারণ মানুষ নন, টাইপ প্যাটার্ন। পূর্ণিমা মিলনের সভা বসছে ১৯০৫ সালে—আমন্ত্রণ করছেন দ্বিজেন্দ্রলাল—

আমাদের এই সাধু মতলবে
রবিবাবু আপনার যোগ দিতে হবে:

—মনকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়, হোক না তা উপরতলার "আরিস্তক্রাতে"র কথা। বসেছে বিচিত্রার বিচিত্র সভা—রবীন্দ্রনাথ ত একাই একশো নন, সহস্রকর দিবাকর, তবু শুনি যে চুপিচুপি শরৎচন্দ্রও এসে "বিলাসী" গল্প পড়ে গেলেন। সুকুমার রায়ের—

নিঝুম রাতে ফিসফাস
বাতাস ফেলে নিঃশ্বাস

—আমাদের শিহরিত করে তোলে। ভারতী পত্রিকার আড্ডা, ফোর আর্টস ক্লাবের হৈ হৈ, কল্লোল বা বঙ্গশ্রীর আস্তানা, ননসেন্স ক্লাবের ননসেন্স, উৎকেন্দ্র সমিতির পাগলামি, কিছুই হারিয়ে যায়নি। অন্য নামে অন্য সুরে, রূপ থেকে রূপান্তরে তারা বেঁচে আছে, হয়তো বা এম সি সরকারের দোকানে, কফি হাউসে, চক্রবৈঠকে রকবাহিনী আড্ডাদেবীর বহিরঙ্গে। কিন্তু তার অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত এখনও দেখি বন্ধুবান্ধবদের বৈঠকী আসরে,—চাম্পু চঞ্চল রবিবাসরীয় চাতকের দল এখনও জোটে, জোটে যে সব আড্ডায়। নিশ্চয়ই 'পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়' এমন কিছু কিছু আড্ডা এখনও আছে। আমরা বুড়ো হয়ে পড়েছি, সব আড্ডার খবর জানি না, জানার কথাও নয়, নিজে ধ্বজাধারী আড্ডাবিহারীও নই তবু প্রতি রবিবারের সকালে মন ফস্ ফস্ করে যদি না সুবোধ সেনগুপ্তের বৈঠকখানায় দুঘণ্টা কাটানো হয় বা প্রেমেন মিত্তিরের দোতালায় চায়ের কাপ হতে কাব্যালোচনার ভূমিকা ফাঁদা যায়। নিশ্চয়ই আরো অনেক এই ধরণের খুচরো সমাবেশ মিলবে কলকাতার একূলে ওকূলে, টালা থেকে টালিগঞ্জে, ত্রিকোণ পার্ক থেকে পঞ্চমুখী মোড় পর্যন্ত অলিতে গলিতে।

ভবানীবাবুর লেখার পরিপূরক হিসাবে অবনী ঠাকুরের বলা আরো কয়েকটি এই ধরণের উঁচু ক্লাসের সাহিত্যিক বৈঠকের নমুনা তুলে দিই।

—সে সময়ে রবিকাকার গানের সঙ্গে আমাদের বাজনা ইত্যাদি খুব জমত।......আমি এস্রাজ বাজাতুম, নাটোর বাজাতেন পাখোয়াজ। ঐ সময়ে একটা ড্রামাটিক ক্লাব হয়েছিল তাতে রবিকাকা আমরা অনেকগুলি প্লে করেছিলুম। ......বউঠাকুরাণীর হাটের বর্ণনাগুলি বাদ দিয়ে কেবল কথাটুকু নিয়ে খাড়া করে তুলেছি নাটক করব। ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, আমরা সব তাকিয়া বুকে নিয়ে এই সব ঠিক করছি—এমন সময় রবিকাকা কী একটা কাজে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, দেখি কি হচ্ছে। খাতাটা নিয়ে নিলেন, দেখে বললেন, না এ চলবে না—আমি নিয়ে যাচ্ছি খাতাটা, শিলাইদহে বসে লিখে আনব, তোমরা এখন আর কিছু করো না। যাক আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। এর কিছুদিন বাদেই রবিকাকা শিলাইদহে গেলেন, আট দশ দিন পরে ফিরে এলেন, বিসর্জন নাটক তৈরী।

এই ড্রামাটিক ক্লাবের বাড়তি চাঁদায় যে ভোজ হয় তাকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন ক্লাবের শ্রাদ্ধবাসর। তিনি বলছেন—দ্বিজুবাবু নতুন গান রচনা করে আনলেন "আমরা তিনটি ইয়ার" এবং "নতুন কিছু কর"। দ্বিজুবাবু আমাদের দলে সেইদিন থেকে ভর্তি হলেন।.........ঐ "বিনি পয়সার ভোজের" মতই কাঁচের বাসনগুলো হয়ে গিয়েছিল চকচকে আয়না, মাটন চপের হাড়গুলো হয়েছিল হাতির দাঁতের চুষিকাঠি, এ আমি ঠিকই বলছি। এই সভাতেই খামখেয়ালী সভার প্রস্তাব করেন রবিকাকা......প্রত্যেক মজলিশী সভ্যের বাড়িতে একটা করে অধিবেশন হোত। নতুন লেখা, অভিনয় কত কী হত তার ঠিক নেই, সঠিক বিবরণও নেই কোথাও।—........

খাস মজলিশের কর্মসূচী যতটা মনে পড়ে এইভাবে লেখা থাকত........

১৩০৩

স্থান জোড়াসাঁকো। নিমন্ত্রণ কর্তা—শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুষ্ঠান—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ কর্তৃক "অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি" আবৃত্তি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ কর্তৃক "ক্ষুধিত পাষাণ" ও "মানভঞ্জন" নামক গল্প পাঠ। গোঁসাইজীর গান ও তাঁহার দাদার সংগত। গীতবাদ্য। আহার। ধূপধুনা রসুনচৌকি সহযোগে তাকিয়ে আশ্রয় করিয়া, রেশম বস্ত্র মণ্ডিত জলচৌকিতে জলপান।

অভ্যাগতবর্গ—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর একটি নিমন্ত্রণপত্রের আবাহন ছিল এই রকম—

শ্রাবণ মাসের ১৩ই তারিখ
শনিবার সন্ধ্যাবেলা।
সাড়ে সাত ঘটিকায়
খামখেয়ালীর মেলা।
সভ্যগণ জোড়াসাঁকোয় করেন অবরোহণ
বিনয়বাক্যে নিবেদিছে শ্রীরমণীমোহন।

আর একবার ছিল—

এবার
খামখেয়ালী সভার
অধিবেশন হবার
স্থান কিছু দূরে
সেই আলিপুরে।
নির্মল সেন
সবে ডাকিছেন।
শনিবার রাত
ঠিক সাড়ে সাত।

তার অনেককাল পরে রবীন্দ্রনাথের লালবাড়িতে শুরু হয় বিচিত্রা। এরও পূর্বে ছিল "বিদ্বজ্জন সমাগম" যাকে ঠাট্টা করে 'বিদ্যুৎজ্জন সমাগম' বলা হোত, যেখানে রবীন্দ্রনাথকে গান গাইতে বলা হোত—'বলি ও আমার গোলাপবালা'—

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ

।। চিন্তাধারার দৈন্য ।।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশের চিন্তাধারার সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। লালা লাজপত রায় শতবার্ষিকী উৎসব কমিটির একটি সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন: "ভারত অনেক

সংগ্রামেই জয়ী হয়েছে এবং কয়েকজন মনীষীকেও জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের চিন্তাধারা এখনও নিম্ন-পর্যায়ে থেকে গেছে। আমরা বেশীর ভাগই প্রকৃত অর্থ না বুঝে নিছক পুরাতন বুলি কপচাই এবং প্রাচীন ধ্যান-ধারণা নিয়ে চলি। চিন্তার ক্ষেত্রে দুর্বল থাকলে কোন গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষেই ভালরকম এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়।"

তারপরই প্রধানমন্ত্রী যে অভিযোগ তুলেছেন তা আজকের দিনের সৎ ও বিবেকবান মানুষের পক্ষে চিন্তা করে দেখা উচিত:

"দেশে যেসব পুঁথি-পুস্তক লেখা হচ্ছে, সেগুলিও উপযুক্ত মানের হচ্ছে না। এই সমস্ত বই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীরও বলতে পারা যায়। যে কোন একটি সপ্তাহে অন্য দেশে প্রকাশিত গ্রন্থের সঙ্গে এই দেশের পুঁথি-পুস্তকসমূহের তুলনা-মূলক বিচার করলেই পার্থক্যটি ধরা পড়বে।"

কোন এক শ্রেণীর গ্রন্থ নয়, সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থ সম্পর্কেই এই অভিযোগ। স্বাধীনতাউত্তরকালে যে কয়বৎসর আমরা অতিক্রম করেছি, তার মধ্যে উৎকৃষ্ট বা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছি কতটুকু, তা বিচারের সময় হয়ত আজ হয়েছে। সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বা আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হয়ে হয়ত এ অভিযোগের অস্বীকৃতি অসম্ভব হয়ে পড়বে।

শতবার্ষিকী কমিটি লালা লাজপত রায়-এর যে জীবনী প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন তা উল্লেখ করে শ্রীনেহরু বলেন যে: "আমরা যেসব জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করি সেগুলি মোটেই আকর্ষণীয় হয় না।"

দেশে চিন্তাধারার সাধারণ মান 'অত্যন্ত নীচুতে' নেমে যাওয়ায় প্রধান-মন্ত্রীর এই যে চিত্তবিক্ষোভ তা দেশের প্রতিটি মানুষকেই নতুন করে চিন্তার সুযোগ দেবে বলে মনে করি।

।। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিদেশযাত্রা ।।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রনে আমেরিকা ভ্রমণে যাত্রা করবেন আগামী ৯ই আগষ্ট। সেখানে দু মাস অবস্থান করে তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণে যাবেন। লন্ডন, ফ্রান্স এবং আরো কয়েকটি ইউরোপীয় অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন।

কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয় ভারতীয় ভাষায় শ্রীযুক্ত মিত্র সুপরিচিত। আজকের দিনের পাঠকের কাছে তাঁর নতুন করে পরিচিতি দানের প্রয়োজন হয়তো নেই। এককালে বাংলা দেশে কয়েকটি পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যের নতুন প্রবাহ এসেছিল প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন সম্মুখের সারিতে। সুখ্যাত কবি হিসাবেই তিনি

আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে গল্প ও উপন্যাসের জগত তাঁর ক্ষমতাশালী লেখনীস্পর্শে সমৃদ্ধ। ছোট গল্পের প্রেমেন্দ্র মিত্র, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্র—এই তিনটি চরিত্র স্বতন্ত্র গতিপথে চলেছে—কিন্তু মানুষের প্রতি সমবেদনা এবং সহানুভূতির এক অন্তর্লীন প্রবাহ সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। ছোটদের বা কিশোর-সাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখ-যোগ্য। ঘনাদা-র বিচিত্র কাহিনীর সঙ্গে পাঠকমাত্রেই সুপরিচিত। একালে শ্রীযুক্ত মিত্র কাব্যজগতের সঙ্গে সঙ্গে কথা-শিল্পের জগতে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। আজকের বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখকগোষ্ঠীর তিনি অন্যতম।

শ্রীযুক্ত মিত্রের জন্ম ১৯০৪ সালে বারাণসীতে। সাহিত্যসাধনার সূচনা থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর সম্পাদনায় কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'কালি-কলম', 'বঙ্গবাণী', 'নবশক্তি', 'সংবাদ', 'বাংলার কথা', 'রং-মশাল' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির নাম করা যেতে পারে। দীর্ঘকাল ছায়াচিত্রের প্রযোজক ছিলেন। তাঁর কয়েকটি কাহিনী অবলম্বনে ছায়াচিত্র হয়েছে। 'আকাশ-বাণী" ও সাহিত্য আকাদমী'র সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল বেশ কিছুকাল। রচিত গ্রন্থ: পুতুল ও প্রতিমা, নিশীথ নগরী, ধূলি-ধূসর, বেনামী বন্দর, প্রথমা, সম্রাট, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, মৃত্তিকা, আগামীকাল, সাগর থেকে ফেরা, সপ্তপদী, প্রতিধ্বনি ফেরে, হুইট-ম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পঙ্ক, ওরা থাকে ওধারে, কিশোর সঞ্চয়ণ, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রেমই ধন্বন্তরী, অন্য এক নাম, স্ব-নির্বাচিত গল্প, পা বাড়ালেই রাস্তা, আবার ঘনাদা, স্তব্ধ প্রহর, শতাব্দীশতক (সম্পাদিত) এবং আরো অনেক।

।। রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী ।।

গত ২০শে আগষ্ট কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের শতবার্ষিকী কমিটির কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক রামেন্দ্রসুন্দরের নিরানব্বইতম জন্মদিনে শতবার্ষিকী উৎসব সম্পর্কে এক প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী ১৯৬৪ সালের ২০শে আগষ্ট আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শতবার্ষিকী কমিটি বিশদ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আচার্য রামেন্দ্র-সুন্দরের কার্যাবলী ও সাহিত্যকর্মের আলোচনাসভার অনুষ্ঠান, রামেন্দ্র-সুন্দরের জীবন ও কর্মকাল নিয়ে প্রদর্শনী, স্মারকগ্রন্থ, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা অবলম্বনে একটি সংকলনগ্রন্থ, বহরমপুরের ভাগীরথী নদীর উপরের সেতুটির নাম 'রামেন্দ্রসুন্দর ব্রীজ' ও স্বগ্রামে মুর্শিদাবাদের কোন একটি জনবহুল অঞ্চলে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিমূর্তি স্থাপনের ইচ্ছাও কমিটির আছে।

"এবারও দুর্বলতায়?"
২২-৮-৬৩ ইং
জনসাধারণ
ভারতের
নেফা লাদাক
লোহিয়া
পাকিস্তানের নতুন সৈন্য আমদানি ?
আইজ্ হাইট্!...
-টেন্-শন্ !!

শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প ঃ (সুইজারল্যান্ড)

ম্যাটারহর্নে রক্তের ছায়া

রবার্ট কিগী
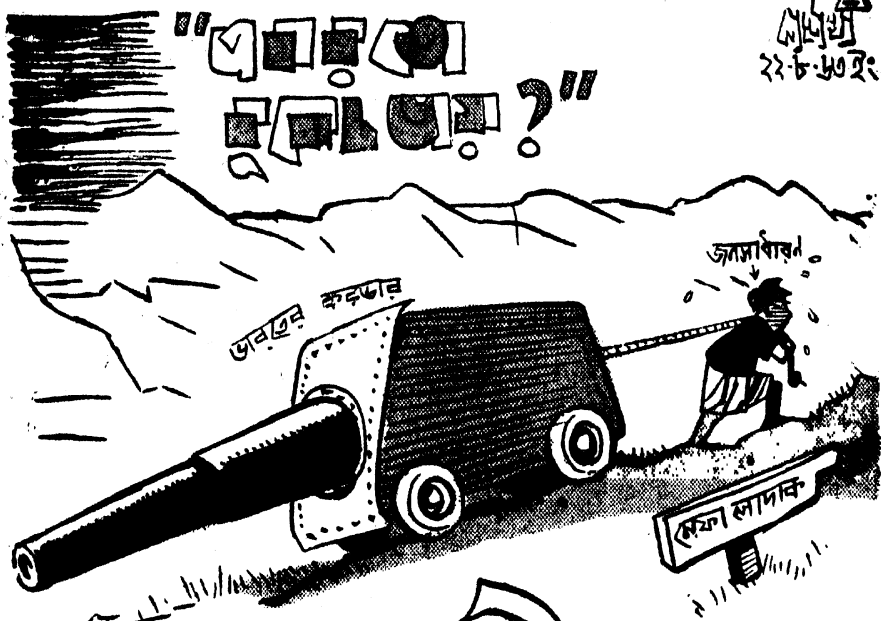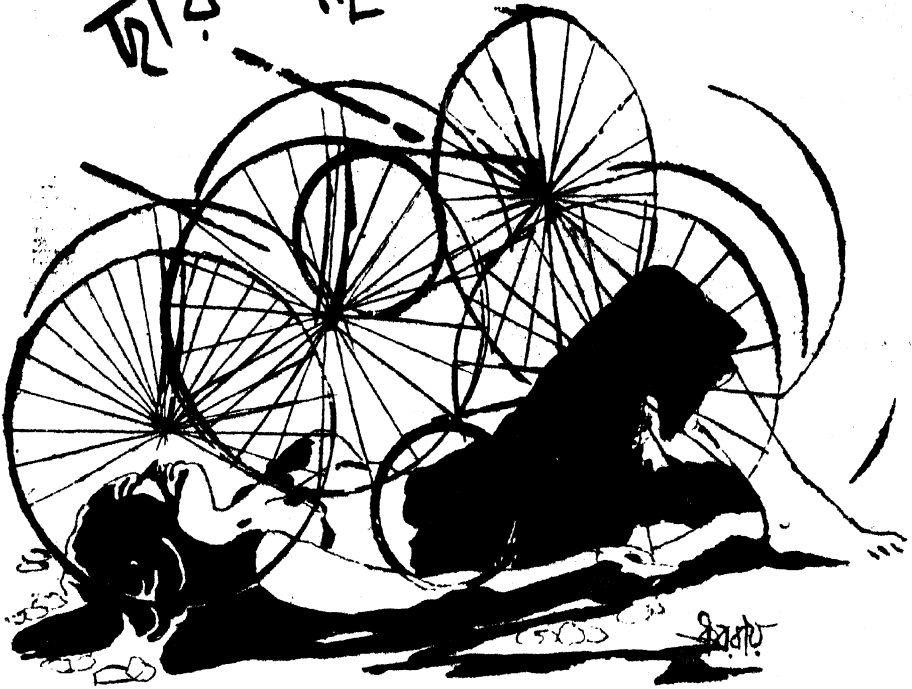
ব্যাপারটার সূত্রপাত হয়েছিল আগের দিন রাত্রে। ভিস্‌প্‌-এর গ্রণ্ট-কার্ডিনাল হোটেলের ছাতের রেস্তোরায় একটি দীর্ঘাঙ্গী আমেরিকান মেয়ে, কলেজের ছাত্রী, বসে বসে কফি খাচ্ছিল। স্থির হয়ে বসতে পারছিল না মেয়েটি, কেমন একটা অস্বস্তিতে যেন ছটফট করছিল।

এক পেয়ালা কফি শেষ হতেই দ্বিতীয় পেয়ালার হুকুম দিল মেয়েটি এবং ফের আর এক পেয়ালা। একবার ঘড়ির দিকে তাকাল তারপর অস্থির আঙুলে টেবিল বাজাতে থাকল। রাস্তাটা ভাল করে দেখে নিল একবার এবং ক্রমশঃ আরও অস্থির হয়ে উঠতে লাগল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একজন ওয়েটার বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে আর একজন ওয়েটারকে বলল, 'বেচারা! আসবে ব'লে শ্যাম আর এল না!'

হেলেন ইবারশফ্ কিন্তু অপেক্ষা করছিল তার বোন জেরেনের জন্য, কোন প্রণয়ীর জন্য নয়। জেরেনের ফিরবার কথা ছিল বিকেল পাঁচটায়। এখন সাতটা বেজে গেছে কিন্তু তবু তার দেখা নেই। সময় ঠিক না রাখা জেরেনের স্বভাব-বিরুদ্ধ; তাই হেলেন এতো অস্থির হয়ে উঠেছে।

সেদিন সকালেই দুবোন জেরমাট্ থেকে ভিস্‌প্‌-এর দিকে রওনা হয়েছিল। হেলেন ট্রেনে, জেরেন সাইকেলে। ট্রেনে আসতে কিছুতেই রাজী হল না জেরেন।

'কে কথা বলছেন, হের কিগী? আপনি কি এক্ষুনি এখানে চলে আসতে পারবেন? আপনাকে আমার বিশেষ দরকার। একটি আমেরিকান মেয়ে খুন হয়েছে—আলপ্‌স্ পাহাড়ে, ম্যাটারহর্ন উপত্যকা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। খুনের কেস এর আগে আমি কখনও করিনি, এই প্রথম। তাই আপনার পরামর্শ চাইছি, আপনার পরামর্শ আমার একান্ত দরকার।'

কথা বলছিল একজন পুলিশ কনস্টেবল; নাম জেগার। উত্তেজনায় কাঁপছিল জেগারের গলা আর টেলিফোন রিসিভারের মধ্য দিয়ে যেন শব্দের বন্যা নামছিল। কথা বলছিল বার্নের পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে। জেগারের নাম আগে কখনও শুনি নি, কিন্তু তবু তার অনুরোধকে সেদিন ঠেলতে পারিনি।

টেলিফোনে জেগার আমাকে তালগোল পাকান প্রায় অর্থহীন একটি কাহিনী বলল। একটি নয় দু'টি আমেরিকান মেয়ের উল্লেখ করল এবং তার মাত্রাহীন উত্তেজনা ভেদ করে আমি বুঝে উঠতে পারলাম না সত্যি সত্যি ক'টি মেয়ে খুন হয়েছে—একটি না দুটিই। শুধু তা-ই নয়, জেগার যখন ফোন ছেড়ে দিল তখন আবিষ্কার করলাম খুন কিভাবে হয়েছে তাও সে আমাকে ব'লে নি।

কিন্তু তবু কলপেত্রানের ট্রেনে উঠে বসলাম। কারণ দুটো—জেগারের অনুরোধ এবং আমেরিকান পাশপোর্টের উল্লেখ।

ঘটনাটা আজ ঘটেনি, ঘটেছিল বেশ কিছুকাল আগে, ১৯৩২ সালে। কিন্তু তবু তার প্রতিটি খুঁটিনাটি আজও পরিষ্কার মনে আছে আমার—যেন এই গতকালের ব্যাপার। কারণ হয়ত আমি প্রচণ্ড চটেছিলাম। আমার দেশে, এই সুইটসারল্যান্ডে যেখানে মানুষ আইন-কানুনের প্রতি এতো শ্রদ্ধাশীল সেখানে এমন ঘটনা ঘটল, জেরেইন ইবারশফ খুন হল!

প্রায় জিদ করেই এই পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পথ সাইকেলে পাড়ি দিল।

রাত বাড়তেই পাহাড়ী হাওয়া ঠাণ্ডা কনকনে হয়ে উঠল। আটটা নাগাদ হেলেনকে বাধ্য হয়ে লবি-তে উঠে আসতে হল। সেখানে বসে ভাবতে লাগল, কি করা যায়। নির্জনতা বা একাকীত্বের ভাবনার চেয়ে তার দুশ্চিন্তা বেশি হল। ভিস্প্-এর কাউকেই সে চেনে না। গোটা সুইট্সারল্যাণ্ডে একটাও পরিচিত লোক নেই তার। কি করবে সে। টুরিস্টদের মত হাঁপাতে হাঁপাতে থানায় গিয়ে বোনকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে রিপোর্ট করবে কি? তাতেও ঠিক সায় দিল না তার মন।

ভাবতে ভাবতে আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। হেলেনের মন তখন অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। সে স্থির করল, যা করবার সে নিজেই করবে। যে-পথে জেরেন ফিরছে সেই পথ ধরে এগুবে এবং মধ্যরাস্তা থেকে আবার একসঙ্গে ফিরবে দুজন। রাস্তায় জেরেনের সঙ্গে দেখা হলে মজাই হবে। হাঁটলে শরীরটাও ভাল লাগবে, তাছাড়া ঘরের মধ্যে এভাবে কাঁহাতক আর পায়চারি করা যায়! খুঁজে আমি ওকে পাবই অথবা এমন কাউকে না কাউকে পাবই যে ওর খোঁজ দিতে পারবে—হেলেন ভাবল।

রাতটা অপূর্ব। চাঁদ উঠছে, তার উজ্জ্বল আলো পড়েছে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বরফের প্রাচীর এক অপার্থিব দ্যুতিতে জ্বলছে। বিশাল নৈঃশব্দ চারদিকে। মাঝে মাঝে শুধু গরুর গলার ঘণ্টা বাজছে আর দূরে থেকে ভেসে আসছে পাখীর ভয়ার্ত চিৎকার। নীলাভ-সবুজ পাহাড়ের গায়ে কৃষকদের ঘরে ছোট ছোট আলোর শিখা জ্বলছে।

রাস্তার ধারের প্রতিটি বাড়িতে জেরেনের খোঁজ নিল হেলেন। —না, সাদা পোশাক-পরা কোন মহিলাকে সাইকেল চড়ে পশ্চিম-মুখো যেতে দেখে নি তারা।

হেলেন এগিয়ে চলল সেন্ট-নিকোলাস উপত্যকার গিরিবর্ত্ম দিয়ে। রাস্তা এমন গভীর এবং সংকীর্ণ যে চাঁদটা হঠাৎ হারিয়ে গেল এবং অসংখ্য ছায়ায় ভরে গেল রাত। স্ট্যালডেনে এসে রাস্তা শেষ হল, কিন্তু সেখান থেকে আবার শুরু হল আরও বিশ্রী সরু পাহাড়ী রাস্তা।

'জেরেন!'—প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে ডাকল হেলেন। পাহাড় প্রতিধ্বনিত হল এবং চারিদিকের বিশাল নৈঃশব্দ চুপ করে থাকল আবার। রাস্তা ভীষণ সঙ্কীর্ণ, অমসৃণ। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল হেলেন, ঘষটে নেমে গেল কয়েক গজ। উঠে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে নজরে পড়ল হাঁটু আর হাতের জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে।

দিনের বেলা আশ্চর্য উষ্ণ আর মনোরম এই দেশটা, অথচ রাত হতেই তার কী পরিবর্তন—যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন একটা। আশেপাশে কৃষকদের বাড়ির সংখ্যা খুব কম। তাছাড়া খুব কাছাকাছিও নয় বাড়িগুলি, বেশ দূরে দূরে।

যে বাড়িতেই বাতি জ্বলছে সেখানেই জেরেনের খোঁজ নিল হেলেন। সেন্ট নিকোলাস এবং কলপেগ্রানের হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলি খোঁজ নিতে অনেক সময় চলে গেল।

অবশেষে গ্যাসটফ-এ পোঁছে কিছু খবর পেল হেলেন। রাত তখন একটা। এক সরাইখানার মালিক বলল সাদা পোশাক পরা ঠিক ঐ রকম একটি মেয়ের সঙ্গে আগের দিন দুপুরের পর কথা বলেছে সে।

খবরটা শুনে খুশীতে হেলেনের ক্লান্তি কমে গেল। কিন্তু একটু ভাবতেই তার খুশী আতঙ্কে পরিণত হল। জেরেন যদি ঐ সময় এখানে পোঁছে থাকে তাহলে চারটের মধ্যে অবশ্যই ভিস্প্-এ পোঁছে যাওয়া উচিত ছিল ওর। অথচ রাস্তার দু'পাশের একটি লোকও তো জেরেনকে যেতে দেখেনি।

সরাইখানার মালিক হেলেনের মনের অবস্থাটা অনুমান করল। বলল, 'আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে যান আপনি। কাল ভোরে পুলিশকে খবর দেবেন। ওরাই খুঁজে বের করবে আপনার বোনকে।'

রাজী হল না হেলেন। কাল ভোরেই জেরেনকে খুঁজে বের করবার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে এ তার বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না।

'আপনি বুঝতে পারছেন না, ফুঁপিয়ে উঠল হেলেন, 'আমাকে এক্ষুনি ভিস্প্-এ ফিরে যেতে হবে। প্রতিটি ইঞ্চি পথ খুঁজে দেখতে হবে। হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে জেরেন পাহাড়ের ধারে অথবা হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে—শুয়ে আছে কোন বাড়িতে। ওকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে।'

সরাইখানার মালিকের স্ত্রী উলের মোটা একখানা শাল দিতে চাইল হেলেনকে। হেলেন নিল না; পথে বেরিয়ে আবার ভিস্প্-এর দিকে পা বাড়াল। হাঁটতে হাঁটতে পথের দু'পাশ, প্রতিটি পাহাড়ের ধার, প্রতিটি সেতুর আনাচকানাচ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে চলল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় তার শরীর যেন কেটে-কেটে গেল, জমে হিম হয়ে যেতে চাইল।

ভোর পাঁচটায় হেলেন স্টলডেনে পোঁছল। তখন সবে সূর্য উঠছে, লাল আর কমলা রঙের রোদ অজস্র রঙিন ফিতের মত ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের পেছনে পূব আকাশে। হেলেনের পায়ে ফোস্কা, হাঁটু ফুলে উঠেছে, শরীর এবং মন দুই-ই শ্রান্ত অবসন্ন। একটা সরাইখানায় ঢুকে এক পেয়ালা কফি চাইল হেলেন আর তারপর টেবিলে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কাঁদতে কাঁদতে ঘুম এলো, দু'ঘণ্টা ধরে মড়ার মত ঘুমুল হেলেন। ঘুম ভাঙতেই দেখল এক ঝাঁক মৌমাছির মত একদল লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তাকে। সবাই সাহায্য করতে ব্যগ্র, সবাই উৎকণ্ঠ।

পাহাড় চড়তে ওস্তাদ একজন বলল, 'ভয় কি, আমরা খুঁজে বের করব আপনার বোনকে। টুরিস্টরা হারিয়ে গেলে প্রায়ই আমাদের ডাক পড়ে তাদের খুঁজবার জন্যে। তাদের খুঁজে বের করে, খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করে তুলে পাঠিয়ে দিই। আপনার বোন নিশ্চয়ই এখন কারো ঘরে আগুনের কাছে বসে আছে।'

'তাছাড়া পুলিশও নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবে', আর একজন বলল, 'বলেন ত আমি আপনার সঙ্গে থানায় যেতে পারি। ওরা দেখবেন আপনার বোনকে খুঁজে বের করবেই।'

গায়ে মেষপালকদের মত রংচং-এ শার্ট আর চামড়ার ছেঁড়া প্যান্ট পরা একটি যুবক বলল, 'চলো বেরিয়ে পড়ি সবাই মিলে। একজনের চেয়ে এক ডজন লোক সব সময়ই এক ডজনগুণ ভালো।' চলো, রাস্তায় নেমে খুঁজতে শুরু করি।

ভরসা পেয়ে হেলেনের মুখে এবার একটু হাসি ফুটল। গত বারো ঘণ্টা একবিন্দু ভরসার জোর ছিল না তার মনে। বারো ঘণ্টা ত নয়, একটা পুরো জীবনের আতঙ্ক গেছে তার।

হেলেনকে সঙ্গে করে একটি ছোটখাট দল সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে গল্প শুরু হল। কত

আমেরিকান পাহাড়ের মধ্যে কিভাবে হারিয়েছিল তার গল্প এবং সেই সংগে হাসিঠাট্টা। হেলেনের মনে আনন্দের স্পর্শ লাগল আবার। আনন্দ বলে যে কিছু আছে তা যেন ভুলেই গিয়েছিল হেলেন।

এক জায়গায় এসে দেখল মেরির মূর্তির চারপাশে একদল লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। স্পষ্টতঃই কিছু একটা নিয়ে খুব উত্তেজিত।

তাদের কাছাকাছি যেতেই কয়েকটা কথা ভেসে এলো হেলেনের কানে—'একটি আমেরিকান মেয়ে—কলপেত্রানের কাছে খুন হয়েছে। ঘণ্টাখানেক আগে পুলিশ তার লাশ খুঁজে পেয়েছে।'

তার পরের ঘটনাগুলো খুব সম্ভবত হেলেন পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। পুলিশ এল এবং হেলেনকে নিয়ে কলপেত্রানে চলে গেল। সেখানে বাজারে পৌঁছে দুটি লোককে হেলেন প্রথম দেখল—পল জেগার এবং ডিটেকটিভ ইমহফ্। তাদের পেছন পেছন একটা কফিন ঘাড়ে করে চারজন লোক।

'কফিনের ভেতর কে?' উত্তাপহীন কণ্ঠে ডিটেকটিভ ইমহফ্-কে জিজ্ঞেস করল হেলেন।

'আমেরিকান মেয়ে একটি', ইমহফ্ বলল।

'নাম কি?'

'কি করে জানব', খুব শান্ত গলায় বলল ইমহফ্, 'মেয়েটির ব্যাগে আমেরিকান পাশপোর্ট পাওয়া গেছে। পাশপোর্টের নাম জেরেন ইবারশফ্।

হেলেনের চোখের সামনে পাহাড়গুলি কেঁপে উঠল এবং চারদিক থেকে

ধরফের স্রোত নেমে যেন ঘিরে ফেলল তাকে। তার সব অনুভূতি মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে গেল। ম্যাটারহর্নের বিশাল পাহাড়চূড়া ঘুরতে থাকল তার মাথার ওপর। আর তারপরেই অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

জ্ঞান ফিরলে হেলেন দেখল এক কৃষকের বাড়িতে বিরাট একটা ঘরের মধ্যে পালঙ্কের বিছানায় শুয়ে আছে সে। চোখ খুলতেই মনে হল পেছনে ফেলে আসা রাস্তা ধরে সে যেন ফের ফিরে চলেছে। স্মৃতি আরও পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে যে লোকটা তার সামনে বসে আছে যেন চেনা চেনা লাগছে তাকে।

'আগের চেয়ে ভালো বোধ করছেন ত?'—জানতে চাইল লোকটি, 'আমি কর্পোরাল হেরমান ইমহফ্ ভিস্প্-এর সিকিউরিটি পুলিশে কাজ করি। একটু কফি খাবেন? খান না।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই এক পেয়ালা গরম কফি হেলেনের হাতে তুলে দিল হেরমান।

'আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি সত্যি খুব দুঃখিত। কিন্তু আপনার বোনকে যে খুন করেছে তাকে আমরা ধরবই আর সেজন্য আপনার সাহায্য আমাদের খুবই দরকার।'

হেলেন নিরাবেগ, নিরুত্তাপ। কোন অনুভবই নাড়া দিল না তাকে। শুধু কর্পোরাল ইমহফের প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল—একের পর এক।

হ্যাঁ, জেরেন তার বোন, তারা দুজনেই ম্যাসাচুসেটের স্মিথ কলেজের ছাত্রী। তাদের বাড়ি ক্লিভল্যাণ্ডে। বাবা নেই। মা ক্লিভল্যাণ্ডের বাড়িতে তাদের দুবোনের পথ চেয়ে আছেন।

গ্রীষ্মকালটা তারা দুবোন জার্মানীতে সাইকেল চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। ঠিক করেছিল আগস্ট মাসের মাঝামাঝি দেশে ফিরবে। তারপর মতলব পাল্টে সুইট্সারল্যাণ্ডে যাওয়া স্থির হল। ঠিক হল দেশে ফিরবে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি।

জেরমাটে হেলেনের সাইকেলের ব্রেক ভেঙে গেল। হেলেন ট্রেনে ভিস্প্-এ ফিরে আসবে, জেরেন আসবে সাইকেলে—প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে—এই স্থির করে বেরুল দুজন।

কর্পোরাল ইমহফ্ যখন হেলেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তখনই কনস্টেবল জেগার বার্নে আমাকে টেলিফোন করেছিল। পরের দিনই আমি সেখানে সেই সব পাহাড়ের ছায়ায় পৌঁছে গেলাম।

শৈশবে সেসব পাহাড়ে বহুবার চড়েছি। পৌঁছেই একটি জ্যান্ত সমস্যার মুখোমুখী হলাম— একজন অজ্ঞাত খুনীকে খুঁজে বের করতে হবে।

কলপেত্রানে এসে যেখানে খুন হয়েছে সেই জায়গাটা একনজরে দেখে নিলাম এবং হেলেনের সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনা করলাম। হেলেন বলল, এখানে এসে এমন কোন লোকের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়নি যে মনে ভয়ের সঞ্চার করেছে। খবরটুকু ছাড়া জানবার মত আর কোন নতুন খবর ছিল না। হেলেনের কাছ থেকে তার কাকার নাম-ঠিকানা নিয়ে তাঁকে তার করলাম। জানতে চাইলাম, তার অন্ত্যেষ্ঠি কিভাবে করা হবে। হেলেনের মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ভিস্প্-এ একটি বাড়িতে নিয়ে তুললাম তাকে, কাগজের রিপোর্টার এবং অনুসন্ধিৎসু প্রতিবেশিদের খপ্পর থেকে দূরে এক শান্ত পরিবেশের মধ্যে। হেলেনকে দেখাশুনোর ভার পড়ল মাতৃস্নেহময়ী গৃহকর্ত্রীর ওপর।

জেনিভায় আমেরিকান কনসুলেটে খবর দিলাম। খুনীকে খুঁজে বের করবার জন্য তাঁরা তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি জানালেন। অবশ্য খুনী যে একজন সাধারণ মেষপালক থেকে ট্যুরিস্ট পর্যন্ত যে কেউই হতে পারে তাও আমরা সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম।

জেরেনের মৃতদেহ যে প্রথম আবিষ্কার করেছিল তার সঙ্গে দেখা করলাম। ভদ্রলোকের নাম এ্যালঅয়েস হের। শিকার করেন এবং পাহাড়ী পথে পথপ্রদর্শকের কাজ করেন। পাথর এবং জঞ্জালের একটা বিরাট স্তূপের পেছনে জেরেনের মৃতদেহ যখন তাঁর নজরে পড়ল তখন সবে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। তাঁর চোখে প্রথম পড়েছিল বড় পাথরের গায়ে হেলান দেওয়া একটা সাইকেল। সাইকেল দেখে ভাবলেন আশেপাশে নিশ্চয়ই কেউ আছে এবং খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন জেরেনের মৃতদেহ।

আলোচনা করতে বসে ডিটেকটিভ ইমহফ্ বললেন, খুনীর পক্ষে পালাবার সম্ভাব্য রাস্তা তিনটি। হয় সে পূব অথবা পশ্চিমের রাস্তা ধরে পালিয়েছে নতুবা রেলপথ ধরে। খুনটা হয়েছে বড় রাস্তা থেকে ছ' মাইল দূরে। রাস্তা শেষ হয়েছে স্টেগডেনে। সুতরাং খুনী খুব সম্ভবত মোটরে যাচ্ছিল।

জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইটালির সীমান্তরক্ষীদের খবর পাঠান হল—কলপেত্রান থেকে কোন সন্দেহজনক চরিত্রের লোক গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে থাকলে আমাদের জানাতে। দুজন স্থানীয় অফিসার গেলেন যাত্রীদের নামের তালিকা পরীক্ষা করতে—যেসব যাত্রীরা খুন হবার পর ট্রেন ধরেছে তাদের। এ লাইনে মাত্র দুটি ট্রেন, সুতরাং এ কাজটা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নয়।

ডিটেকটিভ ইমহফ্ খুনের দৃশ্য বর্ণনা করতে শুরু করল। 'ভয়ংকর, ভয়ংকর সে দৃশ্য', বলল ইমহফ্, 'ফোটো দেখেই বুঝতে পারছেন মেয়েটি চিৎ হয়ে পড়েছিল। তার মৃত্যু প্রায় হয়েছে বারো ঘণ্টা আগে; খুনটা হয়েছে নির্ঘাত সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। চুলগুলো রক্ত লেগে চটের মত শক্ত হয়ে গেছে; বাঁ চোখের নিচে এবং মাথার বড় বড় তিনটে ক্ষত থেকে রক্ত ছিটকে সাদা ব্লাউস এবং জামাকাপড় লাল হয়ে আছে। একটা মাঝারি সাইজের পাথর দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরেছে মেয়েটিকে। সেই পাথরটাও খুঁজে পেয়েছি আমরা, মেয়েটির কাছেই পড়েছিল। ছেঁড়া ছেঁড়া চুল তখনও তার গায়ে লেগে ছিল। জেরেন নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু আমরা যখন তাকে পেলাম তখন আর তাকে মোটেই সুন্দর দেখাচ্ছিল না।'

লক্ষ্য করলাম, ইমহফের এটা প্রথম খুনের কেস হলেও সামান্য খুঁটিনাটি জিনিসও তার নজর এড়ায় নি। সে জেরেনের ধুলোকাদা মাখা জুতোর বর্ণনা করল, তার মোজায় ময়লা এবং ঘাসের দাগের বর্ণনা করল এবং তার ধূসর রংয়ের স্কার্ট যে কোমর অবধি ওঠান ছিল তাও বলল।

বলল, 'খুনের উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার।'

আমি খুব সাবধানীর মত বললাম, 'পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকেই আমরা সে খবর জানতে পারব।'

'পয়সার লোভে খুন করেছে বলে মনে হয় না', জোর দিয়ে বলল ইমহফ্, 'মেয়েটির ব্যাগে কয়েক শ' সুইস ফ্রাঙ্ক ছিল, তার পরিচয়পত্র ছিল এবং হাতে দামী আমেরিকান ঘড়ি ছিল একটা।'

ঠিক হল খুনের জায়গাটা আবার একবার দেখতে যাব। যাবার পথে টাউন্

হলে দেখলাম নোটিশ ঝুলেছে। নোটিশে স্থানীয় লোকদের বলা হয়েছে, খুন সম্বন্ধে কিছু জানলে পুলিশকে জানাতে এবং সেইসঙ্গে ইচ্ছা করে খবর গোপন করা যে সুইস আইনে দণ্ডনীয় তাও বলা হয়েছে। একদল লোক ভিড় করে পড়ছে।

খুনের জায়গায় শীষভাঙা নুয়েপড়া ঘাস দেখে অনুমান করলাম, মৃতদেহকে বোধহয় এই পথে পাথরের স্তূপ অবধি টেনে আনা হয়েছিল। পায়ের ছাপ তখনও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কাছেই একটা ছোট ঝর্ণা। আমার কেমন মনে হল ঐ ঝর্ণার কাছেই মেয়েটি আক্রান্ত হয়েছিল। মেয়েটি বোধহয় তখন ঝর্ণা থেকে জল খাচ্ছিল। কিন্তু মাঠ, চারদিকের গ্রাম্য দৃশ্যাবলী থেকে আমরা আর কোন হদিস খুঁজে পেলাম না।

কলপেত্রানে ফিরে এসে স্থানীয় অফিসারদের রিপোর্ট পেলাম। ট্রেনের টিকেট যিনি বিক্রি করেন তিনি কোন সন্দেহজনক চরিত্রের লোককে ট্রেনে যেতে দেখেননি। সেদিন যারা ট্রেন ধরেছে তারা সবাই ভদ্র এবং সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের মধ্যে কোন খুনী ছিল না। স্থানীয় লোকদের প্রতি তার আনুগত্য এবং টিকেট বিক্রি করলেই খুনীকে যে তিনি অবশ্যই চিনতে পারতেন এই আত্মবিশ্বাস আমার হাস্য উদ্রেক করল।

আমি, আইসেনহাওয়ার এবং ইমহফ্ রেল স্টেশনের রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্ন ভোজন করতে গেলাম। কুড়ি বাইশ বছরের একটি স্বাস্থ্যবতী ওয়েট্রেস এলো আমাদের পরিবেশন করতে।

'এই স্টেশন থেকে যারা ট্রেন ধরে তাদের সবাইকেই ত বোধহয় আপনি চেনেন?' জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটিকে, 'বলতে পারেন গতকাল কে কে ভিস্প্ বা জেরমাটের ট্রেন নিয়েছে?'

মেয়েটি অহংকারে পায়রার মত যেন পাখনা ছড়াল। বলল, 'মাত্র দুজন—হের হকরুন এবং তাঁর স্ত্রী।

'কে এঁরা?'

'এখানকারই বাসিন্দা—সারাজীবন এখানেই আছেন, বৃদ্ধ হয়েছেন, লোকে সম্মানও করে। কাছেই গ্রামে একটা ডেয়ারি আছে এঁদের।'

'এ ছাড়া আর কেউ আসেনি স্টেশনে? অথবা এখানে রেস্তোরাঁয় খাবার খেতে?'

মেয়েটি সাতজনের নাম করল। আমি লিখে নিয়ে আইসেনহাওয়ারকে দিলাম। বললাম, 'এদের প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নাও। আমি যাব না। কারণ, ভিনদেশী বলে আমাকে এরা একটা কথাও বলবে না। কিন্তু তোমাকে বলবে। এদের গোষ্ঠী খুব ঠাসবুনোটে বাধা—সুইস সোয়েটারের মত। নিজেদের লোক না হলে মুখটি খুলবে না। আমি এখন টিস্-এর সরাইখানায় যাব—যার মালিকের সঙ্গে জেরেনের আলাপ হয়েছিল।'

হেলেন আঘাত কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছে কিনা সে খবরটা নেওয়া প্রয়োজন। ইমহফ্কে বললাম জেগারকে নিয়ে ভিস্প্-এ হেলেনের সঙ্গে দেখা করতে এবং পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টটাও সংগ্রহ করতে।

দুপুরের পরে জেরেন টিস্-এ ছিল—ভাবছিলাম আমি—কিন্তু খুন হয়েছে সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। মাঝের এই ক'ঘন্টা সে কোথায় ছিল? হিসেব পাচ্ছিলাম না। সময়ের এই গরমিল আমাকে চিন্তিত করছিল।

সরাইখানার মালিক জোসেফ ক্র্যান্ড অনেক কথা বলল। আমি তাকে ঘটনাটা তার নিজের অগোছাল ঢঙে বলতে দিলাম। জেরেনকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করল সে। সরাইখানায় ঢুকে দুধ চাইবার সময় জেরেন কি বলেছিল, তার উত্তরে সে কি বলেছিল, জেরেন তার কি জবাব দিয়েছিল, তার জবাবে সে কি বলেছিল—ইত্যাদি। এতো কথার স্তূপ থেকে একটি প্রয়োজনীয় খবর কিন্তু উদ্ধার করা গেল। জোসেফ বলল, জেরেনের সঙ্গে একটা থলে ছিল আর তার জলের বোতলে সে জল ভরে নিয়েছিল। কিন্তু খুনের জায়গায় থলে বা জলের বোতল কোনটাই পাওয়া যায়নি। খুনী এই দুটো সাধারণ জিনিস নিয়ে গেছে অথচ কয়েক শ' সুইস ফ্রাঙ্ক ফেলে গেছে। কেন?

'এখান থেকে বেরিয়ে জেরেন কোথায় গিয়েছিল এ তথ্যটা আমার জানা দরকার', বললাম আমি, কারণ কয়েকঘন্টা সময়ের কোন হিসেব পাচ্ছি না। সেই সময়টা সে কোথায় ছিল জানেন? যেমন ধরুন, হয়ত সে যাদুঘর দেখতে গিয়েছিল। যাদুঘর আছে নাকি এখানে?'

জোসেফ হাসল, 'এ তো আপনি এমিল শ্লাইডাররের সঙ্গে দেখা করলেই জানতে পারবেন। কাছেই থাকে। কিলোমিটারখানেক উৎরাইয়ে গেলেই তার বাড়ি। বন্ধুবান্ধব নিয়ে এখানে তাস খেলতে এসেছিল এমিল। বলল, সেদিন দুপুরের পর একটি সুন্দরী আমেরিকান মেয়ে গিয়েছিল তার ওখানে। সাইকেলের কাটা টায়ার সারাতে। টায়ারটা বেশ খানিকটা কেটেছিল তাই সারাতে সময়ও নিয়েছে অনেক। জেরেন কিন্তু কোন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেনি। বরং সে সময়টা এমিলের স্ত্রীর কাছে বসে লেস বোনা শিখেছে। মেরামতির জন্য এমিলকে জেরেন বেশ টাকাও দিয়েছে।

এমিলকে গিয়ে তার গোয়ালঘরে পেলাম। বলল জোসেফের কাহিনী সত্য। জেরেন সেখানে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছে এবং বলেছে ভিস্প্-এ গিয়ে তার বোনের সঙ্গে দেখা হবে। সাইকেলের হ্যান্ডেলের সঙ্গে তার জলের বোতল এবং থলেটা বাঁধা ছিল।

আমার অনুসন্ধান এখানে শেষ হল এবং এবং কলপেত্রানে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে আমি রওনা হলাম।

গিয়ে দেখলাম আইসেনহাওয়ার চিন্তিত মুখে বসে আছে। যে সাতজনের সঙ্গে তাকে আমি দেখা করতে বলেছিলাম তার মধ্যে ছ'জন একগাদা সন্তানের বাপ এবং বিবেকী লোক। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, সমস্যাও তাদের কিছু কম নয়। সাত নম্বর একটি অল্পবয়সের ছেলে, নাম হাইনরিক ওয়ালটার। খুনের খবরটা সে জানে বলেই মনে হল না। সুতরাং নিরাশ হয়েছে আইসেনহাওয়ার।

জেগার এবং ইমহফ্ খবর দিল, হেলেন তার কাকার নির্দেশ মত জেরেন-এর মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা করছে। মৃতদেহ পোড়ান হবে এবং তার ভস্ম নিয়ে যাওয়া হবে আমেরিকায়।

পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টও ভয়ংকর। ডাক্তারদের মতে জেরেনের তিনটে ক্ষত এমন মারাত্মক নয় যে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। সে নিশ্চয়ই বেশ কিছুক্ষণের জন্য প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেয়েছে এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, ঠান্ডা আর অপ্রত্যাশিত মানসিক আঘাতের ফলে তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সময় সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে।

'জেরেনের শীলতাহানি করা হয়েছিল কি? জিজ্ঞেস করলাম ইমহফ্কে।

'না তা হয়নি', বলল ইমহফ্, 'তবে খুনীর যে সে মতলব ছিল তার প্রমাণ জেরেনের শরীরে আঁচড়ের দাগ, ঘসটে ছুঁড়ে যাওয়ার চিহ্ন।

রাতে খেতে বসে টিস-এর খবর দিলাম ওদের। লোকের ভিড়ে শান্তিতে

খেতে পারছিলাম না পর্যন্ত। বোস্টনের এক খবরের কাগজ থেকে লোক এল। বলল, খুনের খবর আমেরিকার কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আরও খবর চাইছে তারা। অস্বস্তি হলেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে আমরা এ ব্যাপারে সামান্যই এগুতে পেরেছি। আমার বার্নের অফিস থেকে ফোন এলো; কিন্তু উৎসাহজনক কোন খবর তাদের দিতে পারলাম না। স্থানীয় লোকেরাও আমাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল খবরের সন্ধানে, কিন্তু নিরাশ হয়ে মাথা নেড়ে চলে গেল। কলপেত্রানের অফিস থেকে খবর এলো—জেরমাট-কর্তৃপক্ষ একজন সন্দেহজনক লোকের সন্ধান পেয়েছে।

কফির জন্য অপেক্ষা না করেই আমরা থানায় গিয়ে হাজির হলাম। জেরমাটে ফোন করে জানালাম তারা এক-জনকে গ্রেপ্তার করেছে, নাম কার্ল ব্যাশার। লোকটির অতীত ইতিহাস খুব খারাপ। খুনেরদিন রাতের ট্রেনে ভিস্‌প্‌ থেকে জেরম্যাটে পৌঁচেছে সে।

আমার থানায় যাওয়াই বৃথা হল। কারণ ট্রেনের কন্ডাকটর এবং কার্লের কামরার যাত্রীরা বলল, কার্ল একবারও কামরা ছেড়ে যায়নি। যে গ্রামে খুন হয়েছে সেখানে ট্রেন সামান্য কয়েক মিনিট দাঁড়ায়। কিন্তু কার্ল তখনও কামরায়ই বসে ছিল। দেখলাম ট্রেন আসতে আরও ছ ঘন্টা বাকি। এ সময়টা কোথায় যাই, কি করি। কেমন বিরক্তি-বোধ হল ভাবতে।

হঠাৎ ফ্রান্‌জ স্যা-র কথা মনে পড়ল। ফ্রানজ্‌ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সাইকেলের দোকানের মালিক। তাছাড়া বেশ ভাল ডিটেকটিভও বটে। বহুবার তার কাছ থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি।

কিন্তু এমনিই কপাল, এবার সে আমাকে কোন সাহায্যই করতে পারল না। খুনের খবরটাই সে জানে না। আমি তাকে ঘটনটা পুরো বললাম। গভীর মনযোগ দিয়ে শুনল সে।

'না, কোন সাহায্যই করতে পারলাম না তোমাকে, বলল ফ্রান্‌জ 'কিন্তু একটা খবর দিতে পারি হয়ত তোমার কাজে লাগতেও পারে খবরটা।'

'বলো বলো,' আমি হেসে বললাম, 'খবর সংগ্রহ করতে কোনকালেই আমার আগ্রহের কমতি নেই।'

'হাইনরিশ ওয়াল্টারের কথা কি মনে আছে তোমার?' বলল ফ্রান্‌জ, 'অল্প-বয়স্ক একটি ছেলে, পুলিশ ধরেছিল একবার। গত বুধবার সে আমার দোকানে এসেছিল একটা সাইকেল বেচতে। আমি কিনিনি, কারণ আমার সন্দেহ হল সাইকেলটা চোরাই মাল।'

'লাইসেন্স নম্বরটা জান?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নিশ্চয়ই?' শার্লক হোমসের মত হাসল ফ্রান্‌জ, 'দাঁড়াও, এক্ষুনি বলে দিচ্ছি তোমাকে!' টেবিলের ড্রয়ার থেকে কাগজপত্র ঘেটে নম্বরটা পাওয়া গেল। —ভি, এস, ৪০৭। ওখান থেকে বেরিয়ে আইসেনহাওয়ারকে ফোন করলাম। নম্বরটা দিয়ে জেরেনের সাইকেলের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে বললাম তাকে।

হাইনরিশ্‌ ওয়াল্টার নামটা আমার অজানা নয়—এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার শুনলাম। উনিশ বছর বয়স ছেলেটির, গত বছর শীতকালে সাইকেল চুরির দায়ে জেল খেটেছে। ছাড়া পেয়েছে জুলাই মাসে। এখন টিস্‌-এর এক খামারে কাজ করে। ওয়াল্টার নিশ্চয়ই খুনী প্রকৃতির ছেলে নয়, তার অতীত ইতিহাসেও তার কোন নজির নেই। আইসেনহাওয়ারও তার সঙ্গে কথা ব'লে সন্দেহজনক কিছু পায়নি। কিন্তু তবু ঠিক এই সময়ই সাইকেল বিক্রির ঘটনাটা যখন ঘটেছে তখন লাইসেন্স নম্বরটা মিলিয়ে দেখাই উচিত।

আধ ঘন্টা পর আইসেনহাওয়ারের ফোন এলো। বলল, 'একটা সাইকেল চুরির খবর পাওয়া গেছে। সাইকেলটা সেন্ট নিকোলাস ভ্যালির এক কৃষকের।

কলপেত্রানে ফেরার পথে সমস্ত ঘটনাটা আবার তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। ঠিক করলাম, ওয়াল্টার যদিও খুনী নয় তবু সাইকেল চুরির দায়ে ওকে আমি গ্রেপ্তার করব। অবশ্য এ গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্তে খুব একটা উল্লসিত বোধ করলাম না।

স্টেশনে ইমহফ্‌ এবং আইসেনহাওয়ার এলো। ফ্রিডেল এগমান নামে এক বিধবা মহিলার কাছে কিছু নতুন খবর পাওয়া গেছে। গত বৃহস্পতিবার মহিলা যখন তার সব্জিক্ষেতে কাজ করছিল একটি সুন্দরী আমেরিকান মেয়ে রাস্তা দিয়ে সাইকেল চড়ে চলে গেল।

'আহা, কি আশ্চর্য বন্ধুর মত ব্যবহার মেয়েটির', বলেছে মহিলা, 'আমাকে দেখে হাত নাড়ল, ডাকল।' মেয়েটির পোশাকের যে বর্ণনা দিয়েছে মহিলা জেরেনের পোশাকের সঙ্গে তার হুবহু মিল।

'চলো, দেখা করে আসি মহিলার সঙ্গে।' তিনজনই বেরিয়ে পড়লাম এগমানের খামারের দিকে।

বয়স হয়েছে মহিলার, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। দ্বিতীয়বার পুলিশের লোক দেখে একটু বিস্মিত হল সে।

আমার মাত্র দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য ছিল।

'আমেরিকান মেয়েটিকে ঠিক কোন সময় দেখেছিলেন আপনি?'

'সন্ধ্যে ছটার সময়। আমার মনে আছে সময়টা, কেননা, ছটার ট্রেনটা তখনই গেল।'

'ঠিক সেই সময় বা তার একটু আগে পরে কি আর কাউকে ওপথে যেতে দেখেছেন?'

ভ্রূ কুঁচকে একটু চিন্তা করল মহিলা।

'সে ত বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল। তাছাড়া অনেক বয়সও হয়ে গেছে আমার, স্মরণশক্তি আর আগের মত নেই। দাঁড়ান, একটু ভাবতে দিন আমাকে.....হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমেরিকান মেয়েটির আগে দুটি প্রেমিককে দেখেছি হেঁটে যেতে। আমেরিকান মেয়েটি চলে যাবার পর সাইকেল চড়ে হাইনরিশ ওয়াল্টার গেল।'

'আপনি কি ঠিক ঠিক জানেন হাইন-রিশ ওয়াল্টারই গেছে সাইকেল চড়ে?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার স্মৃতি দুর্বল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি নয়', মহিলার বলার ভঙ্গিতে অহংকৃত আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পেল,' 'ওটা নিশ্চয়ই হাইনরিশ। ওই অপদার্থটাকে বাচ্চা বয়েস থেকে চিনি আমি—ও যখন ওর বোনের কোলে কোলে থাকত। বোনটি মারা গেছে তাও চৌদ্দ বছর হল। ও নির্ঘাৎ হাইনরিশ, অন্য কেউ নয়।'

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। ইমহফ্‌ ওয়াল্টারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। কিন্তু আমার তখনও কিছু ঘটনা যাচাই করে দেখবার ছিল। খুনীকে নিশ্চিত হয়ে ধরা কিছু সহজ নয়, প্রায় পারদের বিন্দু খপ্‌ করে ধরতে যাওয়ার মত পিছলে বেরিয়ে যায় হাত থেকে। প্রাণপণ জোরে মারো, হাজার বিন্দুতে ছড়িয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবে পারদ। কিন্তু খুব সাবধানে হাতের

মধ্যে তুলে নাও নিটোল হয়ে থেকে যাবে বিন্দুটি।

ইমহফ্ আর আইসেনহাওয়ারকে জোর করে রেলস্টেশনের রেস্তোরাঁয় নিয়ে এলাম। ওয়েট্রেস মেয়েটি পরিচিতের হাসি হাসল এবং কফি এনে দিল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'বলতে পার বৃহস্পতিবার ঠিক কোন সময় ওয়াল্টার এখানে এসেছিল। খবরটা কিন্তু ভীষণ দরকারি।'

মেয়েটি চিন্তায় ডুবে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'মনে হয় সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা নাগাদ এসেছিল, উঠে গেছে সাতটার একটু আগে।'

ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম থানায়। খোঁজ নিতে দেখা গেল ওয়াল্টারের নামে কোন সাইকেল রেজেস্ট্রি হয়নি। সুইস আইন অনুযায়ী এই রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক।

এখন ওয়াল্টারের কাছে যাওয়া যেতে পারে।

আমরা চারজন, আইসেনহাওয়ার, ক্রেগার, ইমহফ্ এবং আমি সাইকেল নিয়ে গ্রিচেনের দিকে রওনা হলাম। অল্প কয়েক ঘরের একটি গোষ্ঠী বসবাস করে সেখানে। ওয়াল্টারও ওখানেই থাকে,—এমা স্প্রিংগ-নামক এক মহিলার বাড়িতে। বাড়ির আর দুজন বাসিন্দা মহিলার ছেলে এবং মেয়ে।

আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করলাম। বললাম, একটা সাইকেল চুরির ব্যাপারে ওয়াল্টারকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব।

যে বাড়িতে কখনও কেউ বেআইনী কাজ করে না সেখানে চারজন পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে মহিলার মনে ভয়ের সঞ্চার হল।

'ওয়াল্টার ওপরে তার ঘরেই আছে, গত কয়েকদিন ধরে সে ঘর ছেড়ে প্রায় বেরোয়নি। কাজে যায়নি পর্যন্ত। একটু অপেক্ষা করুন, ডেকে দিচ্ছি ওকে।'

'উহু', দরজায়ই থামিয়ে দিলাম মহিলাকে, 'আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস ক'রে নি আগে। কি সাইকেল চড়ে ওয়াল্টার?'

'ভালো করে ত দেখিনি কখনও। ও বলছিল, ধার করে এনেছে। তবে গত বিষ্যুদবার থেকে সাইকেলটা আর দেখছি না।'

'বৃহস্পতিবার রাত ক'টায় ফিরেছে ওয়াল্টার?'

'দেরীতেই, সাধারণত যে সময় ফেরে তার চেয়ে দেরীতে; ন'টার কাছাকাছি। ফিরে যখন এলো মনে হল যেন ভয় পেয়েছে, কাঁপছে। ভাবলাম, কিছু একটা অসুখবিসুখ করেছে, তাই এক গ্লাস গরম দুধ দিলাম খেতে।'

মহিলার ছেলে আসাতে কথায় বাধা পড়ল। আমাদের দেখে বিস্মিত হল

আমার রাগ হল, 'আপনারা খবরের কাগজও পড়েন না?' জিজ্ঞেস করলাম মহিলাকে।

একটু বিব্রত বোধ করল মহিলা, 'না, আমরা চাষী মানুষ। গ্রামে গিয়ে খবরের কাগজ প্রায় নিই-ই না। আমাদের সবটুকু সময় এই খামারেই কাটে।

এরিক ছবিগুলো নিয়ে এলো। ছবিগুলো হেলেন এবং তার বোনের, ইওরোপে বেড়াবার সময় তোলা।

আমেরিকান মেয়েটির আগে দুটি প্রেমিককে...

এরিক। সব শুনে সেও যোগ দিল আলোচনায় এবং কিছু খবরও দিল।

'বিষ্যুদবার রাতে হঠাৎ হাইনরিশের ঘরে ঢুকেছিলাম। দেখি বসে বসে কিছু পোস্টকার্ড আর সাইকেল-চড়া দুটি মেয়ের ছবি গুছিয়ে রাখছে। মেজাজটা তিরিক্ষি। আমি তাই আর কথা বাড়ালাম না, চলে এলাম।'

'গ্রেসেনজিয়া কি দেখেছে বলো ওদের,' মা বলল।

'গ্রেসেনজিয়া আমার বোন,' এরিক বলল, 'শুক্রবার সকালে পোস্টকার্ড আর ছবিগুলো আধপোড়া অবস্থায় পেয়েছে ওর মেয়ে দুটির ছবি সম্বন্ধে হাইনরিশের অস্থিরতায় হাসাহাসি করেছি আমরা। দাঁড়ান, ছবিগুলো নিয়ে আসছি আমি।'

সাইকেল চুরি এবং খুনের সন্দেহে হাইনরিশকে গ্রেপ্তার করার মত যথেষ্ট প্রমাণ এখন আমার হাতে। কিন্তু তবু তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে চাইলাম না। ইমহফ্কে নিয়ে ওপরে গেলাম।

সবে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। হাইনরিশ রাত্রিবাস পরে ঘরে বসে সিগারেট খাচ্ছে আর বাইরে সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। বললাম, 'একটা চোরাই সাইকেলের খোঁজ করতে এসেছি আমরা—যে সাইকেলটা জেরমাটের ফ্রান্জ স্যার কাছে বিক্রি করতে গিয়েছিল তুমি।'

'সাইকেলটা আমি চুরি করিনি', চটে গিয়ে বলল হাইনরিশ, 'ধার করেছিলাম এক বন্ধুর কাছ থেকে, বিষ্যুদবার সকালে ফেরত দিয়ে দিয়েছি।'

বন্ধুটি কে কিন্তু বলতে চাইল না। আমি সেই কৃষকের নাম করলাম যার

সাইকেল চুরি গেছে। রাগে মুখ ভার হল ওয়াল্টারের। বলল, 'তাহলে আমার বন্ধু নিশ্চয় ধার করে থাকবে।'

ওকে হঠাৎ কথার প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলব ভেবে আমার প্রশ্নের ধারা পাল্টে ফেললাম।

'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে সাতটায় কোথায় ছিলে?' জিজ্ঞেস করলাম।

প্রশ্ন শুনে ভ্রূদুটো ঠেলে তুলল একটু বলল, 'রেলস্টেশনে খাচ্ছিলাম।'

'তারপর কোথায় গেলে?'

'ঘুরে বেড়িয়েছি।'

'কেউ দেখেছে তোমাকে?'

'জানি না। এ প্রশ্ন কেন করছেন?' মারমুখী হল ওয়াল্টার, 'সাইকেল চুরি না খুনের তদন্ত? নিশ্চয়ই জানেন দুটোর মধ্যে তফাৎ অনেক। যেতে দিন আমাকে।'

'যতদিন না বলছি, তুমি এই গ্রিচেন ছেড়ে কোথাও যাবে না,' দৃঢ়কন্ঠে বললাম আমি তারপর বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম, ইমহফের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

বাইরে এসে আমার সহকর্মীরা নির্দয়ভাবে সমালোচনা করল আমাকে --কেন ওকে গ্রেপ্তার করলাম না। বললাম, সুসময় আসছে আমাদের। ও দোষী হলে নিজের জালেই জড়িয়ে পড়বে।

থানায় ফিরে কোন খবর আছে কিনা কিংবা কেউ কোন অনুসন্ধান করেছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। শুনলাম আমেরিকান কনসাল এসেছিলেন, বার্ন থেকে রিপোর্ট চেয়েছে এবং সংবাদপত্র-গুলো খবরের জন্য হাঁ করে আছে। তাছাড়া হেলেন এক করুণ আবেদন জানিয়েছে--খুনীকে ধরে দিন।

খুনের পর চারদিন কেটে গেছে। আমি একা বসে চিন্তা করতে লাগলাম। হাইনরিশ ওয়াল্টার--ওই সুদর্শন সরল-মনা ছেলেটি খুন করেছে একথা তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কারো গেটে পড়ে থাকা সাইকেল চুরি করা ওর পক্ষে অসম্ভব নয়। খুন অসম্ভব। আমি আর ইমহফ ওর ঘর খুঁজে থলে বা জলের বোতলের সন্ধান পাইনি। অবশ্য তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলতেও পারে।

রাতটা ঘুমিয়ে সকালে একটু চাঙ্গা বোধ করলাম। কিন্তু দুশ্চিন্তা গেল না। প্রাতঃরাশের টেবিলে দেখা করলাম ইম-হফের সঙ্গে। কফি আর রুটির জন্যে অপেক্ষা করছি একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি এসে হাজির। তার দাঁড়াবার ভঙ্গিতে আত্মসচেনতা, ময়লা টুপিটা মোচড়াচ্ছেন।

'টাউন হলে টাঙান নোটিশ পড়লাম', বললেন ভদ্রলোক, 'নোটিশে বলা হয়েছে খুন সংক্রান্ত কোন খবর জানলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমার নাম আগাস্ট ক্রোজ। আমি, কিছু জিনিস পেয়েছি, হয়ত আপনাদের কাজে লাগতে পারে।'

সাইকেল নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে চললাম। এগমানের বাড়ির কাছে ঘন জঙ্গলে ঢুকে একটা আঙুল দেখালেন তিনি।

জঙ্গলের নিচে একটা সাইকেল পড়ে আছে, লুকিয়ে রেখেছে কেউ। একটা ক্যানভাসের থলে আর একটা জলের বোতল হাতলের সঙ্গে বাধা। লাইসেন্স লেখা চাকতি থেকে নম্বরটা যেন তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে--ভি এস ৪০৭। এই সাইকেলটাই জেরম্যাটে বেচতে গিয়েছিল হাইনরিশ।

থলেটা খুব সাবধানে খুলে নিলাম, মৃত জেরেনের করুণ স্মৃতি! থলের মধ্যে একটা ব্রাউজ, নিউ ইয়র্কের ফিফথ এ্যাভিনুর এক দোকানের লেবেল লাগান, বোস্টনের একটা সোয়েটার, মোজা, বিভিন্ন জার্মান এবং সুইস শহরে আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানির ঠিকানায় আমেরিকা থেকে জেরেনকে পাঠান খানকয়েক চিঠি।

অগাস্ট বললেন, সেইদিন সকালেই সাইকেলটা দেখেছেন তিনি। শেয়াল মারতে এসেছিলেন তিনি। তার মুরগীর ওপর হামলা করছিল শেয়ালটা। সাই-কেলটা নিশ্চয়ই খুনের সঙ্গে জড়িত, তাই ভেবে আমাকে খবর দিতে এসেছেন।

ইমহফ সাইকেলটা নিয়ে থানায় গেল, আমি গেলাম হাইনরিশকে গ্রেপ্তার করতে। পরে আমরা চারজন--ইমহফ, আইসেনহাওয়ার, জেগার আর আমি হাইনরিশকে ধরে নিয়ে এলাম ভিসপ-এর জেলখানায়--তার শেষযাত্রার সহযোগী হয়ে।

বেশ কয়েকদিন ধরে হাইনরিশ গম্ভীরমুখে অপরাধ অস্বীকার করল। অবশেষে একদিন মধ্যরাত্রে জেলের প্রহরীকে ডেকে বলল সে তার স্বীকারোক্তি জানাতে চায়। যতদূর মনে পড়ে হাইনরিশ এই বিবৃতি দিয়েছিল :

'বিষ্যুদবার সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ খাওয়া শেষ করে চোরাই সাইকেলটা নিয়ে কলপেত্রনে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। পথে একটি সুন্দরী আমেরিকান মেয়ের সঙ্গে দেখা। ওটা ভিসপ-এ যাবার পথ কিনা জিজ্ঞেস করল মেয়েটি। হঠাৎ মেয়েটিকে স্পর্শ করবার একটা প্রচন্ড বাসনা জেগে উঠল আমার মনে।

'ইতিমধ্যে আমাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে মেয়েটি। তারপর জল খেতে একটা ঝর্ণার ধারে থামল। আমি দেখতে লাগলাম নিচু হয়ে জল খাচ্ছে সে। সেই অবস্থায় হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। অসম্ভব শক্তি ছিল মেয়েটির শরীরে। প্রাণপণ বাধা দিল আমাকে। জড়াজড়ি করে গড়াতে গড়াতে ছড়ান পাথরের মধ্যে এসে পড়লাম। চিৎকার করতে লাগল মেয়েটি।

'ভয় হল আমার। ওর চিৎকার মোটেই ভাল লাগছিল না। একটা পাথর নিয়ে মারলাম তাকে। খুন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, আমি চাইছিলাম চিৎকার বন্ধ করতে। মেয়েটি মরেনি মরতে পারে না--শুধু জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। আমি তাকে টেনে পাথরের স্তূপের ওপর নিয়ে এলাম।

'তার থলে আর জলের বোতলটা নিয়ে নিলাম--কেন একাজ করেছিলাম জানি না। সাইকেলটা জঙ্গলে লুকিয়ে রাখলাম, আর তারপর আবিষ্কার করলাম তার ছবিগুলো। মেয়েটি এতো সুন্দরী যে ছবিগুলো ফেলে দিতে পারলাম না, নিয়ে নিলাম।'

আট দিনের মধ্যে বিচার শেষ হয়ে গেল। এক মাস পরে হেলেন তার পরি-বারের সঙ্গে আমেরিকায় ফিরে গেল এবং জেরেনের ভস্মাবশিষ্টকে পারি-বারিক কবরখানায় করব দিল।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে সুইস আইন অনুযায়ী পনেরো বছর জেল হল হাইনরিশের। কিন্তু পুরো পনের বছর জেল খাটতে হয়নি তাকে। তিন বছর পরে বাইশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হল।

অনুবাদ : কালিকাপ্রসাদ চৌধুরী

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অন্যান্য বৎসরের মতো এবারও শারদীয় 'অমৃত' বিচিত্র রচনা-সম্ভার ও চিত্রাদি সুশোভিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করবে মহালয়ার আগেই।

এই বিশেষ সংখ্যায় থাকবে :

অবনীন্দ্রনাথের
অপ্রকাশিত পালা

●

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

একটি অবিস্মরণীয় গল্প

●

পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান ভিত্তিক রহস্য-উপন্যাস

●

শ্রীমনোজ বসুর

মানব-মানবীর হৃদয়-সংঘাত-মুখর সুদীর্ঘ উপন্যাস

স্বর্ণসজ্জা

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের সাহিত্যিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের স্মৃতিচিত্র

সুপ্রতিষ্ঠিত ও তরুণ সাহিত্যিকদের

●

শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের সংকলন ॥ কয়েকটি লঘু প্রবন্ধ ও রম্যরচনা ॥ শিকার কাহিনী ॥
সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ ॥ কৌতুক নক্সা ॥ কয়েকটি বহুবর্ণ চিত্র ॥ আলোকচিত্র ও কার্টুন ॥

দাম তিন টাকা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১ডি আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে

সনৎকুমার গুপ্ত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে উপনীত হলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠের উদ্দেশে বলেছিলেন,—

"জনম-দিবস আজি তোমার
ধর উপহার বড় দাদার
বিশ্বভারতী ভারত প্রাণ
নানা দেশে ধরি মূর্তি নানা,
প্রকাশিল লীলা অতি অপূর্ব,...
শান্তিনিকেতন হবে পৃথিবীর স্বর্গ
সত্য জ্যোতি বিনা হায় আঁধার
পৃথিবী
আঁধারের আলো রবি হোক
চিরজীবী।"

সর্বজ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে অভিনন্দন জানাবার সময় তাঁর অনেকগুলি গুণী ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে কেন বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে স্মরণ করলেন তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। মহাজাগতিক ক্ষেত্রে যেমন রবির প্রখর আলোকে জ্যোতিষ্কমন্ডলী অদৃশ্য হয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার পাশে তাঁর উপযুক্ত কয়েকজন ভাইয়ের প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয় নি। একথা দ্বিজেন্দ্রনাথ ভালভাবেই জানতেন। তাঁর চির-আদরের রবি সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতেগড়া। ইতিহাসে এঁরা দুজনই 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র মত রয়ে গেলেন। বিশেষ করে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত প্রতিভার কোন মূল্যায়ন এখন পর্যন্ত কেউ করেন নি। সুখের বিষয় শ্রীসুশীল রায় তাঁর সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্র পরিপুষ্ট করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মহৎ জীবন ও সাহিত্য-প্রতিভা নিয়ে বৃহৎ আলোচনার অবকাশ আছে, তা সুধীমাত্রেই স্বীকার করবেন। আমি এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিষয়ে কিছু নতুন আলোচনা করব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর পিতার পঞ্চম সন্তান। জন্ম ২২শে বৈশাখ, ১২৫৬ (৪ মে ১৮৪৯) জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের মত তাঁরও একটি আত্মজীবনী আছে। এই আত্মজীবনীর বিশেষত্ব এই যে, এটা তাঁর নিজের লেখা নয়। তিনি কথক হিসেবে নিজের জীবনের কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করেছিলেন এবং শ্রোতা ও লেখক হিসেবে কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সেগুলি লিখে নিয়েছিলেন। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। এর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় এগারো বছর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বহু কাজও করেছেন। এখনও পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্র-জীবনীর বিবিধ উপকরণ, তথ্যাদি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সেগুলি পাওয়া যাবে বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থ ও বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রিকায়।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' (১৩১৯), সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' (১৯১৫), মন্মথনাথ ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৩৩৪), ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী-সম্পাদিত 'পুরাতনী' (১৮৭৯ শকাব্দ) ও 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' (১৩৬৭), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধক চরিতমালায় 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৩৫৪) প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে বহু উপকরণ আছে। শ্রীকানাই সামন্তের 'চিত্রদর্শন' (১৩৬৬) গ্রন্থে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অধ্যায়ে' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা আছে। তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-লিখিত 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবন-স্মৃতি' (প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮) প্রবন্ধটিতে এবং অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৩৫১) ও 'ঘরোয়া' (১৩৪৮) গ্রন্থদ্বয়েও জ্যোতিরিন্দ্র-জীবনীর মূল্যবান উপকরণ সন্নিবিষ্ট আছে।

ভ্রমণ-উপলক্ষে যৌবনের প্রারম্ভই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে রাঁচী যেতেন। এই স্থানটি তাঁর ভাল লেগে যায়। সেখানে বঙ্গীয় সরকারের পি-ডবলিউ-ডির ইঞ্জিনিয়ার হাওড়া-শিবপুর নিবাসী মহেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পরিচিত হন। পত্নীবিয়োগের পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ থেকেই সংসারের প্রতি বীতরাগ হন। প্রকৃতির শান্ত লীলানিকেতনে একটি নীড় রচনা করে জীবনের অবশিষ্টকাল কাটাবার জন্য সচেষ্ট হন। এ বিষয়ে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় প্রাকৃতিক পরিবেশে গঠিত রাঁচীর মোরাবাদী গ্রামকে নির্বাচিত করেন। বন্ধু মহেন্দ্রনাথ দত্ত জমিসংগ্রহে ও পরে গৃহনির্মাণে সহায়তাদান করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'শান্তিধামে'র নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত সংবাদ

জ্যৈষ্ঠ ১৮৩২ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। এর অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

"কর্ম-শেষ জীবনে জন-কোলাহল পরিত্যাগ পূর্বক শান্তিলাভের ইচ্ছায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রথিতযশঃ দ্বিতীয় পুত্র ও পঞ্চম পুত্র ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্র-নাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পর্বত খন্ডকেই আপনাদের বাসোপযোগী স্থির করিয়া এখানে আশ্রম নির্মাণ করিয়াছেন। ... স্বামী অচ্যুদানন্দ মিশ্র শান্তিনিকেতন হইতে আসিয়া এই মন্দিরের আচার্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য ১৮৩২ শকের ৪ঠা বৈশাখ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন।......প্রায় ৮০ জন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এই প্রতিষ্ঠাকার্যে যোগদান করিয়াছেন।—বিদূষী ঠাকুর-পত্নী শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অতিথির সৎকারে বড় যশস্বিনী। ইঁহার সহিত মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী অতিথি সৎকারে যোগ দিয়াছিলেন।......"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষজীবনে মহেন্দ্র-নাথ দত্ত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর আত্ম-জীবনী "আত্ম-কাহিনী" গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথকে পান্ডুলিপি দেখতে দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা 'আমার মন্তব্য' লিখিয়া দেন। অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান হিসাবে এর যথাযথ উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

"মহেন্দ্রনাথ আত্ম-কাহিনীর প্রথম ভাগ ছাপাইবার পূর্বে আমার নিকট পাঠাইয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়া-ছেন। আমার এত ভাল লাগিল যে আমি শেষ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কি সুক্ষণেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বকীয় ধর্ম-জীবনের ইতিবৃত্তের নাম দিয়া-ছিলেন—'জীবন-বেদ'! নামটি অতি সুন্দর! আমার মনে হয়, প্রত্যেক মনুষ্যেরই জীবন-কাহিনী এক-একটি 'জীবন-বেদ'। উহাতে ভগবানের হাত যেরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতে নয়। প্রত্যেকেরই পারি-পার্শ্বিক আলাদা, কৌলিক ধারা আলাদা, মনের গতি ও প্রকৃতি আলাদা, শিক্ষা দীক্ষা অভ্যাস সংস্কার আলাদা। এই অন্তর ও বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে আমাদের নিয়তি গঠিত হয়। অজানা নিয়তি যেমন একদিকে আমাদের জীবনকে গড়িয়া তোলে, তেমনি আমরাও বুঝিয়া সুঝিয়া, কতকটা ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনা করিয়া আমাদের নিয়তিকেও আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি। কতকটা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া, কতকটা উদ্দাম প্রবৃত্তির বশে, আমরা মাকড়সার জালের মত আপনাকে এমনি জড়াইয়া ফেলি যে মনে হয় এই জাল ছিঁড়িয়া পলাইবার বুঝি আর কোন উপায় নাই; —মনে হয়, বুঝি এই জটিল 'গোলক-ধাঁধা' হইতে বাহির হইবার আর কোন পথ নাই। কিন্তু ভগবানের প্রসাদে, কোন এক শুভলগ্নে, এই বাহির হইবার পথটা আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হয়। প্রত্যেকের জীবন-ধারা যেরূপ বিভিন্ন, প্রত্যেকের উদ্ধারের পথও সেইরূপ বিভিন্ন। কাহাকে কোন পথ দিয়া ভগবান উদ্ধার করেন তা ভগবানই জানেন। ইহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। ইহা শুধু একটা কল্পনার কথা নহে, ইহা প্রত্যেক ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞ-তার কথা। কোন না কোন সময়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ
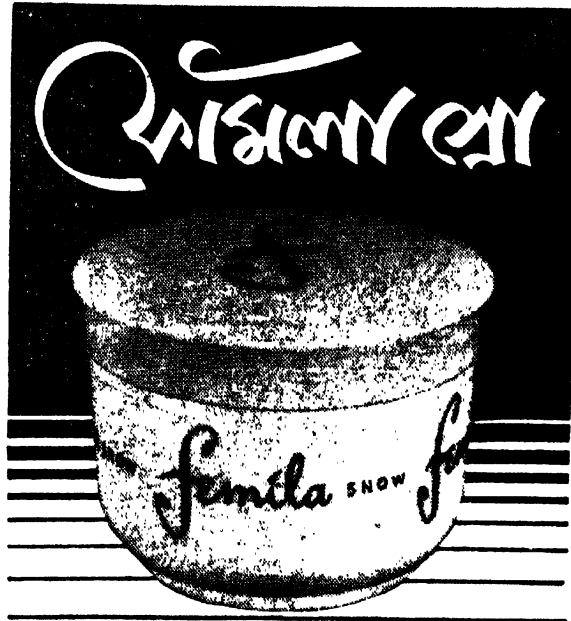
উপলব্ধি করিয়া থাকে। আত্মজীবনী-লেখক বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ম-জীবনের কিয়দংশ পর্যন্ত ঘটনা-সকল বিবৃতি করিয়াছেন। এই সকল ঘটনা যেরূপ কৌতূহল উদ্দীপক, সেই-রূপে শিক্ষাপ্রদ।

আর একটা। প্রত্যেকেই যদি আপন আপন জীবন-কাহিনী প্রকাশ করেন, তাহার আর একটা ফল এই যে, যাঁহারা মনস্তত্ব বিদ্যার অনুশীলন ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা এই সকল কাহিনী হইতে মানব স্বভাব-সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। পুত্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে ও লোক হিতার্থে তিনি তাঁহার এই জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিতেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হোক—এই আমার আশীর্বাদ।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের (১৮৭৫) রাণী পদ্মিনীর জ্বলন্ত অগ্নি-প্রবেশের দৃশ্যটির অংশে রবীন্দ্রনাথ গদ্য উক্তির স্থানে "জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" গান রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করি। 'সরোজিনী' নাটকের নির্দিষ্ট অংশে গান রচনার কথা বালক রবীন্দ্রনাথ এইভাবে চিন্তা করে থাকবেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য 'চিতোর রাজসতী পদ্মিনী' নামে একটি নাটক (জুন ১৮৭৫) প্রকাশ করেন প্রখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু। 'সরোজিনী' নাটকের বিষয়বস্তু ও মহেন্দ্রলালের 'চিতোর রাজসতী পদ্মিনী'র বিষয়বস্তু অভিন্ন। সরোজিনী নাটকটির প্রকাশকাল নভেম্বর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। অর্থাৎ মহেন্দ্রলালের নাটক প্রকাশের ও অভিনয়ের প্রায় পাঁচ মাস পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক প্রকাশিত হয়। 'চিতোর রাজসতী পদ্মিনী'র (পঞ্চম অঙ্ক। তৃতীয় গর্ভাঙ্ক) রাণী পদ্মিনীর নলিনী, মালতী সখী দুজন ও অসংখ্য কুলকামিনীদের 'প্রজ্বলিত চিতায়' "দুরাচার যবন! দেখ, ক্ষত্রিয় কুলকামিনীরা কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করে! নিষ্ঠুর পামর—নৃশংস তোদের কীর্তিস্তম্ভ দেখে যা (বেগে অনলে পতন)।" অংশটি লক্ষণীয়। এই নাটকের উল্লিখিত গর্ভাঙ্কের প্রথমে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত 'মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি' ও পদ্মিনীর উক্তি গদ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথ বয়সে বালক হলেও ঋষিপ্রতিম দূর-দৃষ্টি বলে 'সরোজিনী'র নির্দিষ্ট অংশে সঙ্গীত রচনার উপযোগিতা অনুভব করে থাকবেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সমসাময়িক রচনা 'হামির' নাটকের নির্দিষ্ট অংশে সঙ্গীত 'পদ্মিনী'র গীত আছে। বলা বাহুল্য এই তিনখানি নাটকের বিষয়বস্তুও অভিন্ন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে কটাক্ষ করে লেখা হয়। কেশবচন্দ্র কয়েকজন প্রগতিশীল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ

ব্রাহ্মকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্ম-সমাজ পরিত্যাগ করে পৃথক সমাজ গঠন করেন। এই ঘটনার উপর প্রহসনটি রচিত। তাঁর পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য ব্যাপারটি একমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনের চাপল্যে এই রচনা প্রকাশ করে কয়েকজন ব্যক্তি-বিশেষের কাছে সমাদর লাভ করলেও ধর্ম-প্রাণ সুধী ব্যক্তিরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। এ সম্বন্ধে ধর্মতত্ত্বে সংবাদ পাওয়া যায়,—

"আমরা শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামক একখানি নাটক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ভারতাশ্রম, ব্রহ্ম-মন্দির, প্রচারকগণকে বিলক্ষণ গালি দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মিকাগণকেও ইহার মধ্যে আনিয়া গ্রন্থকর্তা যথোচিত আপনার নীচতা ও বিকৃত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা একথা শুনিয়া অবাক হইলাম যে উক্ত গ্রন্থকর্তা কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের, ভক্তিভাজন প্রধান আচার্যের পুত্র। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। অবশেষে ব্রাহ্ম-সমাজের কপালে এই কি হইল? যে পরিবার এক সময়ে ইঁহার এত অনুগত ছিল এবং যাহা ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রসাদে এত সৌভাগ্য পবিত্রতা ও শান্তি লাভ করিল, তাহা হইতে কি ব্রাহ্মমণ্ডলীর উপরে এমন ভয়ানক কলঙ্ক আরোপিত হইতে পারে।......"

জীবনসায়াহ্নে সারা ভারতব্যাপী জাতীয়তা ও একতার উদ্দীপনা দেখে তাঁর আজন্ম-লব্ধ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে একটি জনকল্যাণমূলক বৃহৎ কাজ—লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক-লিখিত 'গীতা-ব্যাখ্যা'র (১৯২৪) অনুবাদ মূল মারাঠী গ্রন্থ থেকে সমাপ্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এটাই শেষ কাজ। 'অনুবাদকের ভূমিকায় তিনি বলেছেন,—

"লোকমান্য মহাত্মা তিলক তাঁহার প্রণীত "গীতারহস্য" বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ-কামনায় বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে,—অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছা-পূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম......এই বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া, এই রাষ্ট্রনৈতিক চাঞ্চল্যের দিনে যদি কাহারও স্থির প্রজ্ঞা লাভ হয়, যদি কাহারও অন্তরে অচলা ধর্ম-বুদ্ধি, নিষ্কাম কর্তব্য-বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তাহা হইলে আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।"

জীবনে নানা ঘাত, প্রতিঘাত ও সংঘাত সহ্য করেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কোন দিন তাঁর লেখাপড়া, সঙ্গীতচর্চা ও চিত্রঅঙ্কন প্রভৃতি কাজে অবসর গ্রহণ করেন নি। ২০শে ফাল্গুন ১৩৩১ (৪ঠা মার্চ, ১৯২৫) তারিখে রাঁচীর শান্তিধামে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর চির আকাঙ্ক্ষার বিষয় যা ছিল তা পরিপূর্ণ হয়েছিল, সেটি—প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের মহৎ জীবনের প্রতিষ্ঠা যা "চিরন্তন অত্যুজ্জ্বল নিত্য-উচ্ছ্বসিত" হয়ে জগৎব্যাপী হয়েছে।

অর্থনীতি

সতীকান্ত গুহ

কেরানী হরি ঘোষাল সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাল্যবন্ধু কুসীদজীবী রতন চাটুজ্যের বৈঠকখানায় উপস্থিত হলেন। একা ঘরে রতন চাটুজ্যে একমনে আল-বোলা টানছিলেন, সেই সঙ্গে হিসেবের খাতাটা উল্টে-পাল্টে দেখছিলেন।

রতন চাটুজ্যে বললেন, "এসো, এসো। বোসো। তামাক খাও।"

হরি ঘোষাল ম্লান মুখে বললেন, "না ভাই, তামাক খেতে আসিনি।"

রতন চাটুজ্যে হিসেবের খাতায় আবার মন দিতে দিতে বললেন, "টাকা-কড়ির দরকার নাকি ঘোষাল?"

হরি ঘোষাল ভগ্নকণ্ঠে বললেন, "যা নিয়েছি, তাই কবে শোধ হবে, জানি না। কর্জ বাড়াই কোন্ সাহসে!"

রতন চাটুজ্যে বললেন, "হুঁ! কোনো মারাত্মক প্রয়োজন নয় তাহলে।"

হরি ঘোষাল বললেন, "এমন কিছুই নয় ভাই। টাকার হিসেবটা শুধু দেখতে এসেছি। কত শোধ হল, কত শুধতে এখনও বাকী।"

রতন চাটুজ্যে কিছুক্ষণ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। আলবোলা টানতে টানতে পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "শোধ আর হল কই ঘোষাল, যা দিয়েছ তাতো সুদেই খেয়ে গেল।"

হরি ঘোষালের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি বললেন, "সুদ? এতগুলো টাকা সুদে খেয়ে গেল, তাছাড়া সুদের কথা তো ভাই জানতুম না! তুমিও বলনি!"

রতন চাটুজ্যে শান্তকণ্ঠে বললেন, "তুমি বন্ধু ব্যক্তি। টাকা চেয়েছিলে, টাকাটা দেওয়াই ছিল তখন আমার প্রথম কর্তব্য। সুদের কথা তুলতে আমার সৌজন্যে বেধেছিল। কিন্তু হিসেবে সেটা এসেছে।"

হরি ঘোষাল বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। খানিকক্ষণ পরে বললেন, "ভাই, এর কি কোনো উপায় নেই! তোমার এত টাকা এখন শোধ দিই কী করে? আমি তো ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না।"

রতন চাটুজ্যে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "বৃথা কাতর হচ্ছ কেন ঘোষাল! আমি তো টাকা শোধের জন্য তোমার গলায় গামছা বেঁধে টেনে আনছি না। ক্রমশঃ সহজ কিস্তিতে শোধ দিও।"

হরি ঘোষালের কণ্ঠে হতাশা ফুটে উঠল। বললেন, "কিস্তি আর সুদে মিলে যে অঙ্কটা দাঁড়াচ্ছে তা মেটাতে গেলে ছেলেটার পড়াশুনো যে বন্ধ করে দিতে হবে! জানো তো বি-এ পাস করে ও এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে।"

হরি ঘোষালের কথায় রতন চাটুজ্যে যেন এবার চিন্তিত হলেন। বললেন, "তাইতো, বড় মুস্কিলেই তো পড়েছ ঘোষাল! পারলে সুদটা ছেড়ে দিতুম। কিন্তু তাতে যে আমার পূর্বপুরুষের ধর্মে বাধবে।"

আলবোলায় কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, "দ্যাখো, তুমি আমার বাল্যবন্ধু। তোমার বিপদটা একা তোমার নয়, আমারও। একটা পথ আছে, ভেবে দেখতে পারো।"

আশাকুল চক্ষে হরি ঘোষাল বন্ধুর দিকে তাকালেন। রতন চাটুজ্যে বললেন, "তোমার ছেলে শিবু যদি আমার মেয়ে গৌরী'কে বিয়ে করে তবে আমার সাহায্য তো পাবেই, তাছাড়া সুদটাও মাপ করে দেবো।"

হরি ঘোষাল রতন চাটুজ্যের এ কথায় স্তম্ভিত হলেন। পরে অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "তোমার কথা কানে স্পষ্ট শুনেও বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমার মেয়ে সুন্দরী, শিক্ষিতা, ধনীর একমাত্র সন্তান। সে আমার ছেলেকে বিয়ে করতে যাবে কোন্ দুঃখে! পরিহাস তোমার সাজে না।"

রতন চাটুজ্যে অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, "বলতে পারো এটা আমার ও আমার মেয়ে উভয়েরই খেয়াল। ভেবে দেখো, প্রস্তাবটা মনঃপূত হলে জানিও। এ বিষয়ে তোমাদের উপর জোর করব না।"

হরি ঘোষাল গদ্‌গদ হয়ে বললেন, "রতন, তুমি এ যুগের মানুষ নও। তোমার এ ত্যাগের পাশে দাতাকর্ণের কীর্তি ম্লান হয়ে যায়।"

হরি ঘোষাল কয়েকটা দিন এলেন না। তারপর পাঁচদিনের দিন রতন চাটুজ্যের বৈঠকখানায় সন্ধ্যার দিকে এসে হাজির হলেন।

হরি ঘোষাল মাথা নেড়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, "নাঃ, আমার ছেলেটা পাগলামি করছে। বলছে, তোমরা দয়া করছ। সে দয়ার প্রার্থী হয়ে বিয়ে করবে না।"

রতন চাটুজ্যে বললেন, "তাহলে তো তোমার সমূহ বিপদ।"

হরি ঘোষাল বললেন, "আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। ও পাগলকে লেখাপড়া শিখিয়ে কী লাভ হবে! আমিও বলে দিয়েছি যে এ বিয়েতে রাজী না হলে পড়ার খরচ বন্ধ করব, প্রয়োজন হলে ত্যাজ্য করব।"

রতন চাটুজ্যে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, "না না, ঘোষাল, তোমার এত কড়া হওয়া উচিত হয়নি। অল্প বয়স, মাথা গরম। কী বলতে কী বলেছে।"

হরি ঘোষাল তেতে-মেতে বললেন, "রেখে দাও চাটুজ্যে, ও রকম মাথাগরম যৌবনে আমরাও কম করিনি। আমার যেমন কথা তেমন কাজ। এ বিয়ে যদি ও

না করে তবে আমি ওর মুখদর্শন করব না।"

তারপর কয়েক মুহূর্ত কী চিন্তা করে' হরি ঘোষাল বন্ধুকে বললেন, "ভাই, তুমি একবার ডেকে শিবুকে বোঝাও না। তোমাকে তো খানিকটা সমীহ করে। তোমার কথা হয় তো ঠেলতে পারবে না।"

রতন চাটুজ্যে আলবোলায় একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন, "তা কি হয়! বিয়ের ব্যাপারে ওর ভালোমন্দর বিচার ওর হাতে। ওর ওপর বয়সের বা টাকার জোর খাটানো উচিত হবে না।"

...বিয়ের ব্যাপারে ওর ভালোমন্দর বিচার ওর হাতে"

হতাশ হয়ে হরি ঘোষাল বললেন, "তা হলে উপায়!"

রতন চাটুজ্যে বললেন, "দেখি, গৌরী যদি কোনো উপায় বার করতে পারে। ওকে বলি। ও একবার শিবুকে ডেকে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে দেখুক।"

হরি ঘোষাল প্রস্থান করার পর গৌরী আরক্ত মুখে ঘরে এসে ঢুকল। সে কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছিল।

সে বেশ ঝাঁঝের সংগে বলল, "বাবা, তোমার কি আক্কেল বলো তো! ঐ মাথা-খারাপ ছেলেটাকে বিয়ে করার কথা ভেবে আমারই তো মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! তার উপর তাকে ডেকে সাধ্য-সাধনা করতে হবে! তুমি আমায় ভেবেছ কী বাবা!"

রতন চাটুজ্যে হেসে বললেন, "তুই ওকে ডেকে ওর দর না বাড়ালে ওর সম্মান বাঁচে কি করে' মা? একে তো ওর চালচুলো নেই, তার উপর তোর মত চৌকস মেয়ে! এই সৌভাগ্যের মূল্যে দেবে, সে কড়ি ওর ঝুলিতে নেই!"

সকোপে গৌরী তর্জন করে বলল, "তাই বুঝি তাকে পায়ে ধরে সাধতে হবে! আমার আর মান-সম্মানবোধ নেই বুঝি!"

রতন চাটুজ্যে বললেন, "তোর মান-সম্মানের পুঁজি থেকে কিছু খোয়া গেলেও যা থাকবে, তাতে তোর বেশ চলে যাবে মা! কিন্তু শিবুর মাথা হেঁট হলে ওর যে আর কিছুই থাকবে না।"

গৌরী এবার বলল, "তোমার মতলবটা কী বলো তো—বাবা! হঠাৎ আমায় শিবুকে ডেকে তোষামোদ করতে বলছ কেন?"

রতন চাটুজ্যে বললেন, "এই বিয়েটা না হলে যে আমার সুদটা আদায় হয় না মা। মুখে যাই বলুক, হরি তো ছেলেকে না পড়িয়ে পারবে না। ঋণ শোধ করবে কী দিয়ে? আমার টাকাটা যে মারা যায়।"

এবার গৌরী না হেসে পারল না। বলল, "ঐ সুদের কথা ভেবে তোমার তো আর ঘুম হচ্ছে না! বেশ বুঝছি তোমার কোনো মতলব আছে বাবা। আচ্ছা, আমি একবার রত্নটিকে এ-পিঠ ও-পিঠ বাজিয়ে দেখি।"

গৌরীর আহ্বানে শিবু ঘোষাল একদিন দুপুরে রতন চাটুজ্যের বৈঠকখানায় আবির্ভূত হল।

গৌরী তাকে বসতে দিল। সে নিজে না বসে রতন চাটুজ্যের টেবিলটার এক-পাশে দাঁড়াল।

শিবু ঘোষাল গম্ভীর মুখে বলল, "আমায় ডেকে পাঠিয়েছ কেন?"

গৌরী শিবু ঘোষালের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে' মনে মনে হেসে বলল, "কারণটা কি আর জানো না! বিষয়টা নিয়ে সাক্ষাৎমতো একটু আলোচনা করতে চাই।"

শিবু পরম ঔদাস্যে বলল, "আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।"

গৌরী হেসে বলল, "কেন, চিরকুমার থাকবে নাকি?"

শিবু সংক্ষেপে বলল, "প্রয়োজন হলে থাকব।"

গৌরী টিপ্পনি কেটে বলল, "প্রয়োজন নেই। তা-ছাড়া পাত্রী যখন প্রস্তুত!"

শিবু উচ্চ স্বরে বলল, "কিন্তু আমি প্রস্তুত নই।"

গৌরী জিজ্ঞাসা করল, "বাধা কী?"

শিবু জোর দিয়ে বলল, "আছে। আমার দিক থেকে একটা প্রবল বাধা আছে।"

গৌরী দৃঢ় স্বরে বলল, "বাধা থাকতে দেব না। আমি কোনো বাধা মানি না।"

শিবু এবার কম্পিত কণ্ঠে বলল, "আমি মানি। না মেনে উপায় নেই।"

গৌরী এবার উত্তপ্ত হয়ে বলল, "বলো, কী তোমার বাধা যে না মেনে পারো না?"

শিবু বলল, "আমি কোনো দিক দিয়েই তোমার যোগ্য নই। আমার অযোগ্যতাই হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা দুর্লংঘ্য বাধা।"

গৌরী মরীয়া হয়ে বলল, "তোমার বিচার যদি না মেনে নিই!"

শিবু দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "তা হলে আমার উপর অবিচার করবে। আমায় চিরকালের জন্য ঋণী রাখবে।"

রতন চাটুজ্যে সব শুনে বললেন, "হুঁ, ছেলেটার মাথায় দেখছি বিশেষ গোলমাল।"

গৌরী ওষ্ঠে দংশন করে বলল, "গোলমাল বলে গোলমাল! মাথা ঘুরে একদিন ভির্মি খাবে।"

রতন চাটুজ্যে চিন্তার ভান করে বললেন, "তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি। ছেলেটার সত্যিকারের মান-সম্মানবোধ আছে।"

গৌরী ঠোঁট উল্টে বলল, "মান-সম্মান ধুয়ে খাক—তা'হলেই যেন ওর চলবে!"

রতন চাটুজ্যে যেন মহা চিন্তিত, এই ভাব দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, যার সহায়-সম্পদ নেই, মান-সম্মান নিয়ে শেষ পর্যন্ত সে কী করবে! পথ তাদের গিয়ে ঠেকে হয় টি-বি হাসপাতালে নয় অকাল-মৃত্যুতে। তা, কি আর করা যাবে! ও যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওকে বশ করা তোর সাধ্য নয় মা।"

গৌরীর দু'চোখে আগুন ঠিকরে বার হল। "দ্যাখো বাবা, আমি অত সহজে হাল ছাড়তে প্রস্তুত নই। তোমার ওই শিবু ঘোষালকে আমি দেখে নেব। দেখি ও কি করে আমায় ফাঁকি দেয়!"

রতন চাটুজ্যে মনে মনে হাসলেন।

হরি ঘোষাল সেদিনই রতন চাটুজ্যের বৈঠকখানায় সন্ধ্যার গোড়াতেই উপস্থিত হলেন।

তার উদ্বিগ্ন দৃষ্টির অর্থ সহজেই অনুমান করে রতন চাটুজ্যে বললেন, "না হে ঘোষাল। কোনো ফল হল না। মেয়েটা এত করে বোঝালো। কিন্তু শিবু গোঁ ছাড়ার নয়। সে কিছুতেই দয়ার দান গ্রহণ করবে না।"

হরি ঘোষালের মনে যে একটা ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়েছিল, মুহূর্তে উবে গেল। সখেদে বললেন, 'এই হস্তি-মূর্খটাকে নিয়ে কি করি বলো তো চাটুজ্যে? ঋণের বোঝার উপর এই অপদার্থটার বোঝা—চাপে আমার নাভিশ্বাস বার হবার উপক্রম। তোমার ভাই টাকা আছে, ওর পিছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দাও।"

রতন চাটুজ্যে জিভ কেটে বললেন, "ছিঃ ঘোষাল, হাজার হলেও নিজের ছেলে। গুণ্ডার হাতে মার খেয়ে মুখ কালো করে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে, তাতে তো ভাই তোমার গৌরব বাড়বে না। তার চেয়ে বিষয়টা অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন। আমরা তো চেষ্টা করে দেখলুম।"

হরি ঘোষাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ভাই তুমি তো ও কথা বলে খালাস। আমি যে ছেলেটার জন্য ধনে-প্রাণে মারা যেতে বসলুম।"

এর কয়েকদিন বাদে হরি ঘোষাল সকালবেলা এসে হাজির। তার চুল উসকো-খুস্কো, পাংশু মুখ, চক্ষে দুর্ভাবনার চিহ্ন।

রতন চাটুজ্যে বললেন, "এত সকালে কি মনে করে ঘোষাল?"

হরি ঘোষাল কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, "ভাই সর্বনাশ হয়ে গেছে। ছেলেটা গৃহত্যাগ করেছে। একবস্ত্রে একটা কানাকড়ি না নিয়ে কোথায় গেল কে জানে! পাঁচদিন উদয়াস্ত খুঁজেছি। কোনো পাত্তা নেই। ভাবছি পুলিশে খবর দেব।"

রতন চাটুজ্যে বললেন, "ভাই, ও কাজটি কোরো না, তা হলে শিবুকে জেলে পচতে হবে।"

হরি ঘোষালের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

রতন চাটুজ্যে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, ভবিতব্য কে খণ্ডাবে ঘোষাল! আমাদের দুজনের কপালে যা ছিল তাই হয়েছে। তোমার শিবু যাবার সময় আমার গৌরীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে।"

হরি ঘোষাল বললেন, "ব্যাপারটা তো আমি কিছুই বুঝলুম না চাটুজ্যে! বিয়ের জন্য এত তোসামোদ করা হল, তখন আমোল দিল না। তারপর কিনা জেলের ঝুঁকি ঘাড়ে করে এই কাণ্ড করে' বসল!"

রতন চাটুজ্যে বললেন, "এ কাণ্ড কি আর শিবু করেছে? অদৃষ্ট তাকে দিয়ে করিয়েছে। এখন অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে তারপর যা হয় একটা বিহিত করা যাবে।"

হরি ঘোষাল বললেন, "পকেটে কানা-কড়ি নেই এই যা ভরসা। না ফিরে উপায় কি! তবে কেলেঙ্কারী রটবার আগে ফিরলেই হয়।"

রতন চাটুজ্যে বললেন, "ফিরলে একটা ব্যবস্থা হবেই। শিবুর ঘাড়ে ধরে তখন বিয়ে করাবো। আর সেই সঙ্গে তোমার সুদটাও মাপ ক'রে দেবো।"

শিবু ও গৌরীর ভিতর প্রথম সাক্ষাতের পর তাদের আর একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সংক্ষেপে তার একটা বিবরণ দেওয়া দরকার।

গৌরীর চিঠি পেয়ে শিবু ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে গৌরীর শোবার ঘরে ঢুকলো। বলল, "তুমি এ কী চিঠি লিখেছ? এর অর্থ কী! রতন-কাকা কোথায়?

গৌরী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "বাবা এক-দিনের জন্য মফঃস্বলে টাকা আদায়ে বেরিয়েছেন। সেই ফাঁকে এই কাজ করেছি।"

শিবুর চক্ষুদুটি আতঙ্কে স্থির হয়ে গেল। "কি কাজ করেছ—তাহলে তুমি কি সত্যিই—"

গৌরী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "মনকে প্রবোধ দিতে গিয়ে পারিনি। তাই বিষ খেয়েছি—"

"বিষ খেয়েছো"—শিবু ঘোষালের গলায় কথাটা যেন আটকে গেল।

"হ্যাঁ বিষ খেয়েছি। এখন পায়ের ধুলো দাও। স্বর্গে যাই।"

গৌরী হিন্দু সতীদের চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করে' তার উপাস্যের চরণ-যুগল ধরবার জন্য হাত বাড়ালো।—

শিবুর মন গভীর হতাশা ও অনু-শোচনায় ভরে গেল। সে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, "কেন বিষ খেতে গেলে—এখন উপায়?"

গৌরী বলল, "আর উপায় নেই—এখন আমায় শান্তিতে মরতে দাও।"

শিবু বলল, "উপায় বার করতেই হবে—আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।"

"খবর্দার" বলে গৌরী বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

শিবু বিস্ময়ে গৌরীর দিকে তাকালো। সে সংশয়ে সন্দেহে বলল, "তুমি কি সত্যিই বিষ খেয়েছ?"

গৌরী এবার হেসে কেঁদে বলল, "আমার দায় পড়েছে তোমার জন্য বিষ খেতে যাবো! তুমি যাও। এক্ষুনি যাও। আমায় আর জ্বালিয়ো না।"

শিবু ঘোষালের মুখে কথা জোগাল না। বিরহের অপরূপ রূপ দেখল। তারপর সে মাথা হেঁট করে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, "আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম।"

তার কথা শেষ না হতে গৌরীর প্রবল আকর্ষণে সে পড়তে পড়তে সামনে এগিয়ে গেল।

প্রথম ভাবাবেগের তীব্রতা কেটে যাবার পর তারা পরস্পর থেকে কিছু তফাতে সরে বসল।

শিবু ঘোষাল বলল, "কিন্তু বাবার আর কাকার কাছে যে আমার মাথা কাটা যাবে। এত আস্ফালনের পর হঠাৎ সুড়-সুড় করে বিয়ের পিঁড়িতে বসলে আমি যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না।"

গৌরী বলল, "তা বসতে যাবে কেন?"

শিবু বললে, "না বসে কী করব?"

গৌরী বলল, "পুরাকালে বীররা যা করত, তাই করো।"

শিবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে গৌরীর পানে তাকালো।

গৌরী বলল, "তুমি আমাকে হরণ করো—সুভদ্রাকে অর্জুন যেমন হরণ করেছিলেন।"

শিবু অবিশ্বাসের সুরে বলল, "অর্থাৎ—"

গৌরী বলল, "অর্থাৎ, তুমি আমায় নিয়ে আজ রাত্রেই পালাবে।"

শিবু স্তম্ভিত হল। "পালাবো! পালালে তোমার বাবা কী বলবেন! যদি পুলিশে ধরিয়ে দেন!"

শিবুর নাকটা মলে দিয়ে গৌরী বলল, "হাঁদারাম! যা ভাবা উচিত তাই ভাববেন।

পাশের ঘরটায় বসে এই বিষয়টা নিয়েই উনি এখন ভাবছেন। এক্ষুনি রওনা হতে হবে—পুরী এক্সপ্রেসে বার্থ রিজার্ভ করা আছে। বি এন আর-এর সায়েবী হোটেলে তার গেছে। তবে আগে থেকেই বলে রাখছি দুজনের আলাদা ঘর। বাবা ও বিষয়ে বড় কড়া।"

শিবু জেগে আছে কি স্বপ্ন দেখছে বুঝবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

গোরী বলল, "এখন হাঁ করে ভাববার সময় নয়। চাকরগুলোকে বাবা কাজের ছুতোয় বাইরে পাঠিয়েছেন। হঠাৎ এসে পড়লে পালানোর পথ বন্ধ হবে।"

শিবু গোরীকে একটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলল, "তুমি এতও জানো গোরী। তোমার সঙ্গে এঁটে ওঠা আমার কর্ম নয়।"

শিবুর সঙ্গে বিয়ের পর দুই বেয়াই বৈঠকখানায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। হরি ঘোষাল আলবোলায় একটা টান দিয়ে বললেন, "ভাই রতন, শিবু গোরীর ব্যাপারটা কিসের থেকে যে কী হল, বুঝে

"যা ভাবা উচিত তাই ভাববেন"

উঠতে আমার বুদ্ধিতে কুলোলো না। গোরীর মত মেয়েকে নিয়ে শিবু পালাবে এ কথা ভাই কে বিশ্বাস করবে! এযে ছাগলের বাঘ ধরে নিয়ে যাওয়ার মত। ব্যাপারটা কী বলো তো।"

রতন চাটুজ্যের মুখে একটা অর্থ-পূর্ণ হাসির ইঙ্গিত আভাসে ফুটেই মিলিয়ে গেল। বললেন, "ভবিতব্য খণ্ডা-বার নয় ভাই। তবে কি জানো, আমার সন্দেহ—এবং সন্দেহটা ক্রমশঃই প্রবল হচ্ছে—যে আসল আমার গোরীই তোমার শিবুকে নিয়ে পালিয়েছিল।"

হরি ঘোষালের দুচোখ ছানাবড়া হ'ল। বললেন, "সে কি! যা কস্মিন কালে ঘটে নি, মেয়ে ছেলেকে নিয়ে পালালো! তুমি বলো কি হে রতন! এ কথাই বা কে বিশ্বাস করবে!"

রতন চাটুজ্যে মাথা নেড়ে বললেন, "এতে অবিশ্বাসের কি আছে বলো! তার উপর গোরীর সঙ্গে এ বিষয়ে যদি তার বাপের যোগসাজশ থেকে থাকে।"

"সে কি!" সবিস্ময়ে হরি ঘোষাল চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর বিষয়টা বুঝতে পেরে তাঁর মুখ হাসিতে কুঁচকে গেল।

হরি ঘোষাল গদগদ কণ্ঠে রতন চাটুজ্যের হাতটা ধরে বললেন, "ভাই, এবার আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তোমায় অসাধ্য সাধন করতে হয়েছে। বিয়েটা না হলে তোমার সুদের চাপে পড়ে যে মারা যেতুম।"

রতন চাটুজ্যে বললেন, "অসাধ্য সাধন না করে উপায় ছিল না ভাই। শিবুর সঙ্গে গোরীর বিয়ে না হলে সম্পত্তির অর্ধেক তোমার শিবুর হাতে অর্থাৎ তোমার দখলে যেত। এখন সবটা গোরীরই অর্থাৎ আমারই থাকবে।"

হরি ঘোষালের কানে রতন চাটুজ্যের উক্তিটা একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর মত ঠেকল। কিন্তু একটা সংশয় তাঁর মনে কাঁটার মত বিঁধল।

আলবোলায় একটা লম্বা টান দিয়ে রতন চাটুজ্যে বললেন, "গোরীর মামা রসময়—ঐ যে দু মাস আগে মারা গেল, সেই রসময়কে চিনতে তো, লোকটা ছিল টাকার কুমীর। আমার সব বিষয়-আশয়ের মূলে হচ্ছে সে।"

হরি ঘোষাল বললেন, "বিলক্ষণ, না চিনবার কি আছে। কেওড়াতলায় নিয়ে যাবার সময়ে আমার শিবুও তো কাঁধ দিয়েছিল।"

রতন চাটুজ্যে বললেন, "কাঁধ দেবার কারণও ছিল। রসময় শিবুকে বেজায় ভালোবাসত। ছেলেবেলায় তোমার শিবু আমার গোরীর সঙ্গে খেলতে আসত, তখন থেকেই রসময়ের নজর পড়েছিল শিবুর উপর। শেষটায় সে ভাই এক বিভ্রাট বাঁধিয়ে বসল।"

হরি ঘোষাল উৎকর্ণ হয়ে শুন-ছিলেন। তিনি একটা ঢোঁক গিললেন।

রতন চাটুজ্যে বললেন, "রসময় ছিল ক্ষ্যাপাটে গোছের লোক। মাস ছয়েক আগে একদিন আমায় ডেকে পাঠাল। আমি যেতে বলল, 'রতন, শিবুর সঙ্গে গোরীর বিয়ে দাও।' আমি বললুম, 'সে কি! ও দরিদ্রের ছেলে, চালচুলো নেই।'

রসময় বলল, 'আমি বলছি দাও।' রসময়কে চটাতে পারি না, অথচ তার খামখেয়ালিতে সায়ও দিতে পারি না।' আমতা আমতা করে' বললুম, 'দুচার দিন সময় দাও ভেবে দেখি।' কয়েকদিন বাদে সে আবার ডেকে বলল, 'কই হে, শিবুর সঙ্গে গোরীর বিয়ের কি হল?' আমি রসময়কে বোঝাতে গেলুম, কিন্তু সে বিষম ক্ষেপে গেল। চোখ লাল করে বলল, 'দেখবো তোমার সুদের ব্যবসা কদিন চলে রতন। সব টাকা নিঙড়ে বার করে নেব।' আমি ভয় পেয়ে বললাম, 'ভাই চোটো না। দেখি কি করতে পারি।' সে আমার কথা কানেই তুলল না, বলল, 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। বিয়ের ব্যাপারটায় তুমি যাতে ফাঁকি না দাও, এখনই তার ব্যবস্থা করব। আমি আজই আমার বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি উইল করব।'

'রসময় আমাকে বাঁধবার জন্য এক সাংঘাতিক উইল করে' বসল—উইলের সবচেয়ে মারাত্মক শর্ত হল এই যে, শিবুর সঙ্গে গোরীর বিয়ে হলে রসময়ের স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি গোরী পাবে—অর্থাৎ আমার দখলেই থাকবে। যদি শিবুর সঙ্গে গোরীর বিয়ে না হয় তাহলে অর্ধেক সম্পত্তি শিবু পাবে—অর্থাৎ তোমার দখলে যাবে।' উইলের সাক্ষীদের টাকা কবুল করে বিষয়টা গোপন রেখেছিলুম। আজ এতদিন বাদে তোমাকে বললুম। তাছাড়া বলবই বা না কেন—হাজার হলেও তুমি আমার বাল্য-বন্ধু। তায় বেয়াই।"

হরি ঘোষাল রতন চাটুজ্যের কথা শুনে 'থ' হয়ে গেলেন। তারপর কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, "রতন, এতদিনে বুঝলুম তুমি ভয়ঙ্কর লোক। ছেলে-বেলায় খাবার কিনতে গিয়ে তুমি আমায় পয়সার হিসেবে ঠকাতে। সে-সব কথা বয়সের সঙ্গে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ তুমি আমার কি মহা সর্বনাশ করেছ ভাই। আমার ছেলেটাকে ঘোল খাইয়ে আমায় এই বয়সে পথে বসালে। তা যা হবার হয়েছে ভাই, এখন একটা বিহিত করো, যাতে একেবারে বঞ্চিত না হই। শিবুর ভাগের সবটা না দাও, কিছু দাও।"

রতন চাটুজ্যে হরি ঘোষালের ডান হাতটা খপ করে ধরে ফেলে জিভ কেটে বললেন, "ছিঃ ঘোষাল। আমি কি অতই চশমখোর যে তোমাকে একেবারে বাদ দেব? তোমায় ফাঁকি দিলে আমার পিতৃ-পিতামহের ধর্মে বাধবে। বলেছিলাম শিবু গোরীকে বিয়ে করলে ঋণের সুদটা মাপ করে দেব। ও কথার নড়চড় হবে না—এই নাও তিনশো পঁচাত্তর টাকা ছ আনা ন পাই—উসুলে দেখিয়ে সই করে দিয়েছি।' রতন চাটুজ্যে এক টুকরো কাগজ হরি ঘোষালের হাতে গুঁজে দিলেন।

হরি ঘোষাল ফ্যাল ফ্যাল করে বাল্য-বন্ধু রতন চাটুজ্যের পানে তাকিয়ে রইলেন।

লণ্ডন, ৬ই আগস্ট, '৬৩ : একবার প্রমথ চৌধুরী মাসিক পত্রিকায় 'বর্ষার কবিতা' লেখকদের বিড়ম্বনায় প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখিয়ে লেখেন যে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে আকাশে মেঘাড়ম্বর শুরু হবার অনেক আগেই আষাঢ় সংখ্যার জন্যে জ্যৈষ্ঠের নির্মেঘ ও জ্বলন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁদের গলদঘর্ম কলেবরে কবিতা লিখতে হয়।

তেমনি দৈনিক কিম্বা সাপ্তাহিক কাগজে যাঁরা নিয়মিতভাবে হাস্য-কৌতুক কিম্বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের 'কলম' বা বিভাগ লেখেন তাঁদের বাহাদুরির কথা ভেবেও আমি বিস্মিত হই। ধরুন, সোমবার যাঁর হাস্য-কৌতুকের পরিচ্ছেদ লেখার বরাদ্দ আছে, সপ্তাহশেষে মনটা বিগড়ে যাবার মত কত ব্যাপারই তাঁর ঘটতে পারে! তবু সোমবারের জন্যে, অন্তত রবিবারের বিকেলের মধ্যে তাঁকে অদৃশ্য, অগণ্য পাঠকের দিল খোশ করার মত খোরাক জোগাড় করতেই হবে। তেমনই হচ্ছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কলম'। যদিও ভাগ্য কিম্বা দুর্ভাগ্যগুণে আমাদের আজকের পারিপার্শ্বিককে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করবার মত ঘটনা ও ব্যক্তিবিশেষের অভাব নেই, তবু লিখতে বসার আগে দুর্লভ সুযোগে হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত খুশির দমকা দোলায় মনটা তো এমনিভাবেও হিন্দোলিত হতে পারে যে মানুষের দুর্বলতা এমন কি ক্ষুদ্রতা নিয়েও ব্যঙ্গ কিম্বা বিদ্রূপ করা প্রায় অসম্ভব?

তার চেয়ে আমরা বরং আছি ভালো। লেখাটায় বাধ্যবাধকতা, কিন্তু বিষয়বস্তুতে নয়। তার চেয়েও বড় কথা অপরের হাসির খোরাক জোগাড় করতে হয় না, খোরাক পেলে নিজেরাই উদ্দামভাবে হেসে নি। কখনো তা দেখে, কখনো শুনে, কখনো বা পড়ে।

যেমন ধরুন, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ সম্বর্ধনা সভায় বৃটেনে সিংহলের নবাগত হাই কমিশনার ডাঃ জি পি মালালাশেখরের দিকে তাকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্মকর্তা বল্লেন যে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারটি ডিগ্রী লাভ করেছেন। প্রবল হাততালি। কিন্তু তারপরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সলার রাণী-মাতা মেরী উঠে বল্লেন সেটাও নিশ্চয়ই খুব মাছ খাওয়ার জন্যে।'— এবার প্রবল হাস্যরোল।

পরে বোঝা গেল ব্যাপারটা কি। ঠিক এক বছর আগে জুন মাসে কানাডা ভ্রমণের সময় রাণী-মাতা মেরীর সঙ্গে মালালাশেখরের আলাপ হয়। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন সিংহলের কোথায় তাঁর বাড়ী?

মালালাশেখর তাঁকে উত্তর দেন যে পানাডুরা নামে একটি উপকূল-নগরীতে। তারপর বলেন, সম্ভবত রাজধানী কলম্বোর চেয়ে পানাডুরা থেকেই বেশি সংখ্যক কূটনৈতিজ্ঞ বা 'ডিপ্লমাটের' আবির্ভাব হয়েছে।

রাণী-মাতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার কারণ?— উত্তর হলো, 'সম্ভবত এই জন্যে যে আমরা খুব বেশি মাছ খাই।'

এক বছর পরেও রাণী-মাতা পানাডুরার অধিবাসীদের মস্তিষ্কের উৎকর্ষতার সেই কৌতুককর কারণটি মনে রেখেছিলেন এবং আশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নতার সঙ্গে উদ্ধৃত করলেন।

—অবশ্যই আমাদের দুবার হাসতে হয়েছিল। সমবেতভাবে শুধু রাণী-মাতার অদ্ভুত কথাটুকু শুনে। দ্বিতীয়বার তাঁর পূর্ব-প্রসঙ্গটুকু জেনে।

●

জুন মাসে রাষ্ট্রপতি কেনেডি আয়র্ল্যাণ্ডে পূর্ব-পুরুষের ভিটে দেখে একদিনের জন্যে ইংল্যাণ্ডে এসেছেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে তিনি সাসেক্সে প্রধানমন্ত্রীর পল্লী-ভবন 'বার্চ লজে' আসবেন। দেশ-বিদেশের সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের

লেডি ডরোথি ম্যাকমিলান

সঙ্গে আমরাও দাঁড়িয়ে আছি। ঘড়ির কাঁটা মুহুর্মুহুঃ এগিয়ে চলেছে। আর দশ মিনিটেই মধ্যেই রাষ্ট্রপতি এসে পড়বেন। নিরাপত্তার শাস্ত্রী ও গুপ্তচরেরা হুঁসিয়ার হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রীর পত্নী লেডি ডরোথী ম্যাকমিলান তাঁদের অতি গণ্যমান্য অতিথিকে অভ্যর্থনার জন্যে ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

●

হঠাৎ এক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ এক আমেরিকান গিয়ে লেডি ডরোথীকে সবিনয়ে বল্লেন, 'মহাশয়া আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি? বিষয়টা নেহাৎ জরুরী।'—

লেডি ডরোথি বল্লেন, 'অবশ্যই পারেন।' তিনি তাঁকে দ্রুতপদে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেলেন। পরে সেই জরুরী প্রয়োজনের রিপোর্ট পাওয়া গেল।

'হ্যালো! হ্যালো লিবার্টি? (লণ্ডনের একটি খানদানী বিভাগীয় বিপণী) দেখুন আজ সকালে যে সোয়েটারটা কিনেছি সেটা ছোট হচ্ছে। ওটা বদলে নেওয়া যাবে? যাবে?— থ্যাংকস।'

—তারপর প্রধানমন্ত্রীর বিস্মিত স্ত্রীর দিকে চেয়ে, 'ফোনটি ব্যবহার করতে দেবার জন্য থ্যাংকস।'......সেই মুহূর্তেই রাষ্ট্রপতি দ্বারে এসে হাজির।

●

বৃটিশ পার্লামেন্টের বিরোধীদলের নেতা হেরল্ড উইলসন মস্কো থেকে ফিরে এলেন। বিমানবন্দরে তাঁকে সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরলেন। তিনি বল্লেন, এই নিয়ে তিনি এগারোবার মস্কো গেলেন। এবার তাঁর জন্যে সব দ্বার খোলা ছিল। তিনি পাঁচজন প্রধান-প্রধান ব্যক্তির মধ্যে চারজনের সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় opposite number (অর্থাৎ রাশিয়ার বিরোধীদলের নেতা)-এর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি।

●

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলনের বাইরের আকৃতি—ঢুলু-ঢুলু চোখ, ঝুলো ঝুলো গোঁফ পৃথিবীর আর যে কোন রাষ্ট্র-নেতার চেয়ে কার্টুন শিল্পীদের প্রিয়। শুধু তাই নয়, তাঁর নামটাও বিচিত্র ও চমকপ্রদ চুটকি তৈরীর পক্ষে খুব জুতসই। প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম কটা বছর যখন তিনি একটির-পর-একটি তাকলাগানো সাফল্য লাভ করছিলেন তখন তাঁর উৎফুল্ল অনুগামীরা তাঁর নিত্য নব নাম দিচ্ছিলেন, 'সুপার-ম্যাক', 'ওয়াণ্ডার ম্যাক' ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রী গতবারের নির্বাচনের আগে মস্কো যাবার উদ্যোগ করলেন, অমনি ধ্বনি উঠলো 'ম্যাক প্যাক'। অর্থাৎ বাক্স-প্যাঁটরা গোছাও।

কিন্তু হায়! ভাগ্যের চাকা ঘুরলো। প্রফুমো-কেলেঙ্কারির পর সেই অনুগামীদেরই একটি বৃহৎ অংশ তাঁর পদত্যাগ দাবী করলেন। কিন্তু উত্তরাধিকারী হবেন কে?— মন্ত্রীদের মধ্যে সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ র‍্যাব বাটলার, না তরুণ ও তৎপর অর্থসচিব রেজিন্যাল্ড মর্ডালিং? —মীমাংসা হতে দেরী হলো। ইতিমধ্যে, কোলকাতার কাগজগুলি ছাড়া, অন্যত্র প্রফুমো-কেলেঙ্কারি বাসি ও পানসে হয়ে গেল, মস্কোয় আণবিক চুক্তির সাফল্যে সরকার বেসামাল অবস্থা অনেকটা সামলে নিল। সুতরাং রাষ্ট্রতরণীর হালে ম্যাকমিলানের শিথিল মুঠো আবার কঠিন হয়ে উঠলো। তাই এ বিষয়ে শেষ ছড়া হচ্ছে:

Sack Mac?
Who goes?
Who knows?
Mac back.

লণ্ডনের একটি খানদানী হোটেলে নৈশ ভোজসভা চলেছে। অভ্যাগতদের মধ্যে আছেন হেনরী মুর। তার পাশে বসেছেন আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ডের জমকালো পোশাক-পরিহিতা জনৈকা

হেনরী মুর

মহিলা। খুব আলাপী ও সামাজিক বলে তাঁর খ্যাতি। ডিনারে বসবার আগেই হেনরী মুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ ধরনের ডাকসাইটে আলাপী ও সামাজিক মহিলাদের যা ঘটে, তাঁরও ঠিক তাই হলো। বহু আলাপের ব্যস্ততার মধ্যে তিনি মুরের পরিচয়টা গুলিয়ে ফেল্লেন। কিন্তু তাতে কি?— কোন ধরনের লোকের সঙ্গে কিভাবে আলাপ শুরু করতে হয় তা তাঁর জিহ্বাগ্রে। তিনি জানতেন, যে কোন দেশেরই মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে তাতিয়ে তুলতে হলে আধুনিকতার বিরুদ্ধে খোঁচা দিতে হয়। তাই তিনি শুরু
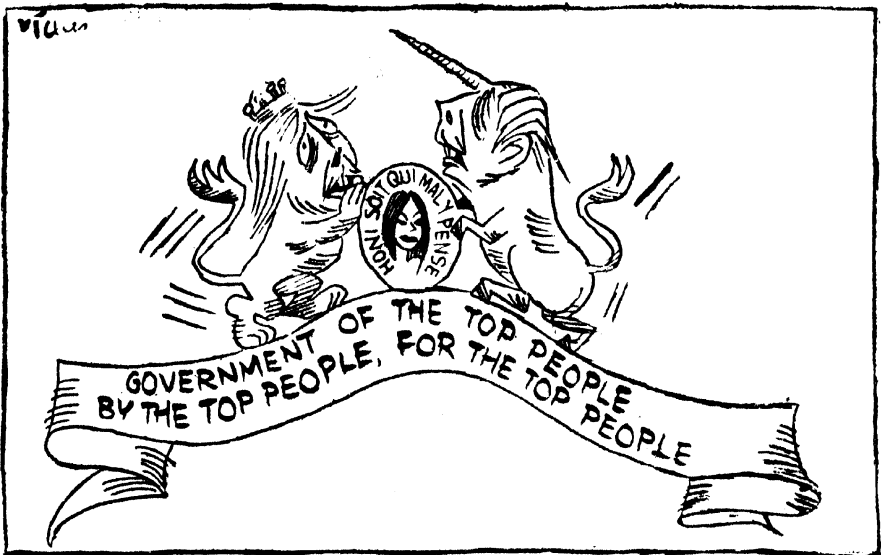
ম্যাক্‌মিলনের বাইরের আকৃতি কার্টুন শিল্পীদের প্রিয় (নিউ স্টেট্‌সম্যান)

করলেন 'আধুনিক আর্টকে আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না......... '

ওয়াকিবহাল পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়াই বাহুল্য যে, হেনরী মুর আধুনিক ভাস্কর্যে শুধু অগ্রগণ্য নন, তাঁর তথাকথিত কিম্ভূতকিমাকার দুর্বোধ্যতা নিয়ে বিতর্কও প্রবল।

দুঃখের বিষয় মহিলাটির মন্তব্যের উত্তরে মুর কি বলেছিলেন তা জানা যায়নি।

●

পার্লামেন্টের শরৎ-বিরতি শুরু হবার দু-একদিন আগে লর্ড সভায় প্রতিরক্ষা বিষয় নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। লর্ড মন্টগমারী বিভিন্ন কমিটির ভুয়ো ঝঞ্ঝাট বাঁধানো নিয়ে উগ্র সমালোচনা করতে গিয়ে একটি গল্প বল্লেন। সেটি এই:

ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'বাবা, উট কি?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'বাছা উট হচ্ছে ঘোড়া। কমিটি তাকে আকৃতি দিয়েছে।'

●

নতুন পোপ ও কোকোকলার ডিরেক্টার্স বোর্ডের একজন খুব প্রভাবশালী ডিরেক্টারের 'সাক্ষাৎকারের' একটি বিবরণী একটি লাগোত্তর খোস-গল্পে সম্প্রতি শুনলাম।

অনেক ধন্না দিয়ে উক্ত ডিরেক্টার মহোদয় পোপের খাস কক্ষে একটি দর্শনলাভের অতি দুর্লভ সুযোগ পেলেন। কক্ষে প্রবেশ করেই ডিরেক্টার মহোদয় নতজানু হয়ে বল্লেন, 'প্রভু সৎকর্মে আমি আড়াই লক্ষ ডলার আপনার শ্রীচরণে দান করতে চাই।'

পুণ্যবারিধি পোপ বল্লেন, 'করো।' ডিরেক্টার বল্লেন, 'কিন্তু প্রভু! একটি শর্ত আছে।'

পোপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি সেটি?'

ডিরেক্টার বল্লেন, 'প্রার্থনা-পুস্তকের একটি লাইনে ছোট্ট একটি সংযোগ করতে হবে!'

আশ্চর্য হয়ে পোপ বল্লেন, 'সে কী!'

'হ্যাঁ! দৈনিক প্রার্থনায় সেখানে আছে হেভেনলি ফাদার গিভ আস আওয়ার ডেলি ব্রেড, সেখানে স্বর্গস্থ পিতার কাছে দৈনন্দিন রুটি-ভিক্ষার সংগে বলতে হবে ব্রেড এণ্ড কোকোকলা।'

ভ্রূকুটি করে পোপ বল্লেন, 'তা হয় না।' ডিরেক্টার বল্লেন, 'প্রভু! পাঁচ লক্ষ ডলার দেবো।'

পোপ কঠিন কণ্ঠে বল্লেন, 'না, তাও হয় না।' ডিরেক্টার বল্লেন, 'প্রভু! সাড়ে সাত লক্ষ ডলার দেবো।' পোপ হুংকার করে উঠলেন, 'বেরিয়ে যাও!'

ডিরেক্টার তবু শেষ চেষ্টা করে বল্লেন, "প্রভু! দশ লক্ষ দেবো।'—এবার পুণ্য-বারিধির ধৈর্যচ্যুতি হলো। তিনি হাঁক দিলেন। ঝলমলে পোশাক-পরিহিত প্রাসাদরক্ষী সুইস গার্ডেরা হাজির হলো। পোপ হুকুম দিলেন, 'একে জানালা গলিয়ে ভ্যাটিকান-প্রাচীরের ওপারে ফেলে দাও।' পাঁচিলের ওপারে পড়তে-পড়তে ডিরেক্টারমহাশয় ভাবতে লাগলেন, "রুটিওয়ালারা না জানি কত কোটি ডলারই পোপকে দিয়েছে। হায়! আড়াই লাখের বদলে দশ লাখ দিয়েই আরম্ভ করা উচিত ছিল।"

●

গত বছর পূর্ব-ইউরোপে কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে কয়েকটি পরিহাস শুনেছিলাম। রাশিয়ার বাইরে, সে-সব দেশে বিশেষ করে পোল্যাণ্ডে, পরিহাসের সাধারণ পাত্র হচ্ছে রাশিয়ানরা। যেমন আজকের রাশিয়ায় সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে, কৃষিসমস্যা। সম্ভবত, আজ কয়েক বছরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ এমন একটি মুখ্য বক্তৃতাও করেননি, যাতে না তিনি কৃষি-সমস্যার উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু পোলেরা বলবে, কেন? রাশিয়ার কৃষি-উৎপাদন তো গড়-পড়তা ঠিকই আছে। গত বছরের চেয়ে কম আর আসছে বছরের চেয়ে বেশি!'

●

অনেক উগ্র জাতীয়তাবাদী দেশের চেয়েও রাশিয়ানরা ইদানীং অনেক ব্যাপারে বেশি জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছে এবং তাদের অনেক জিনিসকেই তারা অবলীলাক্রমে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে আগে, সবচেয়ে ভালো বলে দাবী করছে। —এমনি এক দাবী হচ্ছে ইতালীয়ান বিজ্ঞানী মার্কনীর চোদ্দ মাস আগে জারশাহীতে (১৮৯৪ খৃঃ) আলেকজাণ্ডার পপভ নামে রুশ বিজ্ঞানী বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

—পোলেরা এ বিষয়ে একটা আপোসের শর্ত চালু করেছে। তারা বলছে বেতারযন্ত্র মার্কনীই আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁকে টেক্কা দিয়ে পপভ আবিষ্কার করেন 'জ্যামিং' অর্থাৎ, বিদেশী বেতারের ঢেউ-এ বাধাসৃষ্টির কৌশল।

●

ফ্রান্সের প্রখ্যাতা লেখিকা ফ্রঁসোয়া সাগাঁ সম্প্রতি বলেছেন যে, তাঁর শেষ

ফ্রঁসোয়া সাগাঁ

স্বামী বব ওয়েস্টহফের সংগে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকেই তাঁদের দুজনের সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছে। বিবাহিত জীবনে একত্র বাস করবার সময়ের চেয়ে এখন একত্র থাকার মজা অনেক, অনেক বেশি।

●

লাতিন আমেরিকা থেকে নরকের এক নতুন ভাষ্য শোনা যাচ্ছে। সেখানে নাকি ইংরাজেরা রাঁধুনী, ফরাসীরা যন্ত্রী, জার্মানরা পুলিশ এবং আমেরিকানরা প্রেমিক।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কবির গান

(৫)

হরু ঠাকুর

কবিগানের ইতিহাসে হরু ঠাকুরের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এ'র আসল নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি, ঠাকুর উপাধি লোকমুখে পাওয়া। বাড়ি ছিল কলকাতায় সিমলে অঞ্চলে। পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে হরুঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু হয় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে।

বাল্যকাল থেকেই এ'র গান রচনার হাত ছিল। কণ্ঠে সুরেরও অপ্রতুল ছিল না। তরুণ বয়সেই কবি ও গায়ক বলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

সংস্কৃত বা ইংরেজি পড়বার সুযোগ তাঁর হয়নি কিন্তু বাংলার সাহায্যে যেটুকু বিদ্যা অর্জন করেছিলেন তার পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য ছিল না। অধ্যাপক পণ্ডিতেরাও তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকার করতেন। "এবং তিনি অনেকানেক স্থানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত তুল্য রূপে গাড়ু ঘড়া প্রভৃতি বিদায় লইয়াছেন।"

হরু যখন বালক তখন কবিওয়ালা রঘুর খুব নাম-ডাক। বড় বড় আসরে তাঁর দলের গাওনা হচ্ছে। তাঁর গানের কণ্ঠ ভাল ছিল, গান রচনার হাতও মন্দ ছিল না। এই রঘুর সঙ্গে হরুঠাকুরের যোগাযোগ হল। হরু রঘুর দলে বিনা বেতনে গাওনা শুরু করলেন। হরুর গান লেখা যে অভ্যাস ছিল রঘুর সাহচর্যে তা বৃদ্ধি পেল। তিনি যখন যা লিখতেন রঘুর দ্বারা সংশোধন করিয়ে নিতেন। কিন্তু গুরুর সাহায্য তাঁকে বেশী দিন নিতে হয় নি। "কারণ পরমেশ্বরের অনুকম্পায় তিনি সংক্ষেপ সময়ের মধ্যেই গুরুর নিকট এমন গুরু হইলেন যে গুরু হইয়াও রঘু তাঁহার নিকট লঘু হইল।"

কিন্তু গুরুর প্রতি শিষ্য খুব ভক্তিমান ছিলেন। তাঁর অনেকগুলি গানের ভণিতায় গুরুর নাম দিয়ে তাঁকে অমর করে রেখে গেছেন। যেমন,—

কহে রঘুনাথো হবে মনোনীতো
সকল ব্রজবাসি জনার।
অথবা
হেরে পালটিতে আঁখি
নাহি পারি সখি,
রঘু কহে একি দায়।
অথবা
এরূপো মিলন না দেখি কখন।
রঘু বলে কোথা মিলে
দুজনে সুজন।।

হরু ঠাকুরের নাকি কবিতার পাদপূরণের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। কবিতার একটি চরণ বললে তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ কবিতা রচনা করে দিতেন। কেউ বললেন,

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।

অমনি হরু ঠাকুর পূরণ করলেন,

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে।
শুনেছো কখনো জ্বলন্ত আগুনো
বসনে বন্ধনো করিয়া রাখে।।

একজন দিলেন,

তোমার আশাতে এ চারিজন।

হরু সঙ্গে সঙ্গে রচনা করলেন :

তোমার আশাতে এ চারিজন।
মোরো মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন।
আছে অভিভূতো হয়ে সর্বক্ষণ।
দরশো পরশো শুনিতে সুভাষো
করিতেছে আরাধন।।

হরু ঠাকুর কবি-গানের দলে যোগ দিলেও কবি-গানকে প্রথমে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই গানই তাঁর পেশা হয়ে দাঁড়ায়।

শোনা যায় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়িতে একবার গাওনা হচ্ছিল এক পেশাদার দলের। হরু ঠাকুর শখ করে বিনা পারিশ্রমিকে সেই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গান করছিলেন। রাজা বাহাদুর স্বয়ং আসরে বসে গান শুনছিলেন। হরু ঠাকুরের গান শুনে তিনি এত খুশী হলেন যে সভাস্থলেই গায়ককে একজোড়া দামী শাল বকশিস দিলেন। শাল জোড়া সেকালে সম্মানজনক পুরস্কার বলে পরিগণিত হত। কিন্তু হরু ঠাকুর তো অর্থ বা পুরস্কারের লোভে কবির দলে মেশেন নি, গানের নেশাই তাঁকে টেনেছিল। তাই রাজার হাতের বকশিস পেয়ে তিনি ভারী লজ্জিত হলেন, তাঁর বড় অপমান বোধ হল। আর উত্তেজনাবশে এমন এক কাণ্ড করলেন যার ফল খুব গুরুতর হতে পারত। কিন্তু হরুর বরাত ভাল ছিল তাই তাঁর সম্পদের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। কাহিনীটি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় পুনরাবৃত্তি করছি :

......হরু তাহাতে অপমান ও লজ্জা বোধ করতঃ অভিমানে ম্লান ও ক্ষুব্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই শাল ঢুলির মস্তকে অর্পণ করিলেন। মহারাজ তদ্দৃষ্টে চমকিত অথচ কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া "ঐ গায়ককে এখানে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়" পুনঃ পুনঃ এতদ্রূপ উল্লেখ করাতে ঠাকুর অতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন করণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পলাইতে পারেন নাই, অত্যন্ত ত্রাসিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন।

রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া ক্রোধ ভাব পরিহারপূর্বক সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হরু আত্মবিবরণ জ্ঞাত করিলে মহামতি শোভাবাজারাধিপতি অতি সন্তোষ চিত্তে তাঁহার প্রতি প্রীতিপূর্বক নিজ নামে দল করিতে অনুরোধ করিলেন, হরু সেই অনুমতির অধীন ও লোভাধীন হইয়া কাযে কাযে সমাজের মাথায় বাজের আঘাত করতঃ রাজের অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ইচ্ছায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় হরু ঠাকুরের দলের পত্তন হল এবং তাঁরই সাহায্যে হরুর দলের প্রসার প্রতিপত্তিও বাড়তে লাগল। রাজা জমিদারদের বাড়ি থেকে তিনি গাওনার আহ্বান পেতে লাগলেন।

ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, বিরহ, খেউড়, লহর—সকল বিষয়েই তাঁর হাত ছিল। একটি সখীসংবাদ শোনাই :

সখিরে গৃহে ফিরে চলো।
শ্রম শ্রীমতীর শ্রীমুখ ঘামিলো।
নিকুঞ্জে আজি যাওয়া না হলো।
ঐ দেখো না কিশোরী
বৃক্ষ শাখা ধরি—
কাতরা হয়ে দাঁড়ালো।।

ওই গানেরই পাল্টা উত্তর :

আমারে সখি ধরো ধরো।
ব্যথারো ব্যথিত কে আছে আমারো
পথ শ্রান্তে নাহি গো কাতরো।
হৃদে নবঘনো
দলিতাঞ্জনো বরণো
উদয়ে অবশো শরীরো ।।

আর একটি গানের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি :

যার স্বভাবে যা থাকে প্রাণনাথো
তা কি ঘুচাতে কেহ পারে।
নিদর্শন তোমারে ।।
শুনেছ কখনো অঙ্গারের মলিনো
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে ।।

নিম তরু যদি রোপনো হয়
শত ভারো শর্করে।
সে যে মিষ্ট রসো না হয় কখনো।
নিজ গুণো প্রকাশো করে ।।

হরু ঠাকুরের হাতে পারমার্থিক ভক্তিপূর্ণ গানও বেরিয়েছে :

হরিনাম লইতে অলস হয়ো না রসনা
যা হবার তাই হবে।
ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি
ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে ।।

খেউড় গানেই হরু ঠাকুরের খ্যাতি ছিল বেশী।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ২ ॥

কান্তির বৌয়ের নাম নাকি বিনতা—কিন্তু দেখা গেল নত সে কোনখানটাতেই নয়। তার বয়স অল্প—আর কিছুই অল্প নয়। জ্ঞান-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা—এ বোধ হয় বয়স্কা মেয়েছেলের মতোই।

বিয়ের কনে পাল্কী থেকে নেমে কড়ি খেলাটেলা নিয়মকর্মের পরই—রাণী যখন তাকে কাপড় ছাড়াতে নিয়ে যাবে—সে চুপি চুপি বলার চেষ্টায় ফ্যাশ ফ্যাশ করে বললে, 'চলো না অমনি একেবারে পুকুর ঘাটটা ঘুরে আসি। দেখে শুনে নিই, একশ'বার কী আর পরের খোশামোদ করব? শুনেছি তো এখানে কলতলা নেই আমাদের খিদিরপুরের মতো, পুকুরেই যা কিছু!'

যেন গালে একটা চড় খেল রাণী। কী সর্বনাশ! এ কাকে নিয়ে এল সে! এই যদি ওর স্বরূপ হয় তাহলে তা প্রকাশ পেতেও দেরি হবে না, মাসীমা কী বলবেন ওকে?

রাণী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিনতাই আবার বলে, 'ওমা কী হ'ল, খারাপ কিছু বললুম নাকি? বলি এই ঘরই তো করতে হবে, সব দেখে শুনে নেওয়া ভাল না? ঐ পুকুরেই তো সরতে হবে দুবেলা, তা সেটা দেখে নেওয়া আমার দোষের নাকি? আর যদিই দোষের হয়— তুমি তো আমাদের আত্মীয়—তুমি তো বলে দেবে সেটা।'

'না দোষ আর কি। চলো পুকুরেই যাই।' রাণী কোনমতে সামলে নেয় নিজেকে। একে তো মেয়েটার গলার আওয়াজ কেমন আধো-আধো—হয়ত আলজিবের বা জিবেরই কোন দোষ আছে, অল্পবয়সের খুকী হলে এ গলা মানায়, এই বয়সের মেয়ের গলায় ঐ রকম স্বর শুনতে বড় খারাপ লাগে; তার ওপর ঐ গলায় এই রকম পাকা পাকা কথা আরও অসহ্য।

পুকুরে যেতে যেতে কতকটা কথায় পৃষ্ঠে কথা বলার মতোই রাণী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ডাক নাম কি ভাই? বিনতা নামটা বড্ড ভারী না? সব সময় ব্যবহার করা যায় না।'

'হ্যাঁ, বিচ্ছিরি নাম। বাবার কে এক বোম্ব বন্ধু ছিল, সে-ই রেখেছে। কী আর করব, এত বয়সে তো আর নাম বদলানো যায় না। কিন্তু ডাক নামটা আরও খারাপ। মা ডাকে বাঁদী বলে। সে নাম কি কাউকে বলা যায়—বলো না! তা তোমরা বাপু বরং বিনু বলেই ডেকো না কেন! বিনতা থেকে বিনু—মন্দ কি! আমি অনেক ভেবেছি, ঐটেই আমার পছন্দ!'

ততক্ষণে পুকুর ঘাটে পৌঁছে গেছে ওরা। একবার ভ্রূ কুঁচকে ঘাটের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওমা ঘাটের ওপর কোন গাছপালা নেই যে একটু ছায়া হয়! এত তো বনজঙ্গল দেখছি এধারে, ঘাটের ওপর বুদ্ধি ক'রে কেউ একটা বড় গাছ দিতে পারেনি?......এ বাড়িতে তো ঝি নেই শুনেছি, আমাকেই তো বাসন-কোসন ছিষ্টি মাজতে হবে, আমি বাপু তা বলে ঠোকা রোদে বসে বাসন মাজতে পারব না। সেই বিকেলে ছায়া পড়লে তবে—'

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে রাণী, 'এখনই তো তোমাকে কেউ বাসন মাজতে বলছে না, এ বিয়ের আটদিন মাজতে হবেও না। পরের কথা পরে। আর কখনোই বা বাসন, মাজতে চাও সন্ধ্যেবেলাই মেজো না।...... আমরা আবিশ্যি দুপুরেই মেজেছি, কই পুড়েও তো যাইনি—তবে তুমি কাজ করবে, তোমার সুবিধে মতোই করবে বইকি! মাকে বলে নিও—'

'হ্যাঁ, তাই যা হোক একটা করতে হবে কিছু!...তবে তুমি আবার বলছ সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যেবেলা তো বাবুরা বাড়ি ফেরে, তখন বুঝি কেউ বাসন-কোসন নিয়ে জুবড়ে পড়ে থাকে! সন্ধ্যের আগে কাজকম্ম সেরে না নিলে কখন মাথা বাঁধব গা ধোব! তোমার যা বুদ্ধি!'

রাণীর আর সহ্য হয় না। বলে, 'নাও-নাও—যা করবে সেরে নাও। আর দ্যাখো, বিয়ের কনে পালকী থেকে নেমেই এত কথা বলতে নেই, ওতে বড্ড নিন্দে হয়।'

'তা বটে।' তৎক্ষণাৎ সায় দেয় বিনু। বলে, 'মাও সেই কথা একশ'বার বলে দিয়েছে পই পই করে। আমার যে কী এক পোড়া স্বভাব, থাকতে পারিনে চুপ করে।'......

কাপড় চোপড় ছাড়িয়ে সরবৎ খাইয়ে রাণী তাকে ঘরে বসিয়ে চলে এল। মন যতই খারাপ হয়ে থাক, ক্রিয়াকর্মের বাড়ি, থই থই করছে লোক চারিদিকে, অসংখ্য কাজ পড়ে—মন খারাপ করে বসে থাকবার অবসর নেই।

কিন্তু বিনতাও এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকবার মানুষ নয়। সে একটু ইতস্তত ক'রেই ঘরের বাইরে দালানে এসে দাঁড়াল। কুশণ্ডিকা কাল রাতেই সারা হয়ে গেছে ওখান থেকে, সন্ধ্যারাতে লগ্ন ছিল বলে হেমই বলেছিল কথাটা, ওদের কটা টাকাও ধরে দিয়েছিল সব যোগাড় করে রাখতে। আজ তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত, এখনই কোন ঝঞ্ঝাট করতে বসতে হবে না। দালানে তখন কনক আর মহাশ্বেতা বসে কুটনো কুটছে। মহাশ্বেতাও তেমনি, ওকে দেখে বলে উঠল, 'কী লো, কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিস? আয় না, বসে যা না।

আমরাই বা একা তোর বিয়ের কুটনো কুটে মরি কেন? কী বলিস ভাই বৌদি?'

বিনুও তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে সেখানে, 'দিন না, কুটনো কোটা তো ভারী কাজ! ও আমার খুব অবোস আছে।'

'থাক, থাক,' কনক ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'ওমা তুমি বিয়ের কনে এসেই কুটনো কুটতে বসবে কেন ভাই—আমরা এত লোক থাকতে! আঙুলে দাগ হয়ে যাবে—কী আঙুল কেটেই ফেলবে হয়ত। তুমি এমনিই বসো, গল্প করো বরং। তোমার বাপের বাড়ির গল্প বলো—'

'বাপের বাড়ির ছাই গল্প। বাপই নেই তার বাপের বাড়ি।—আপনি তো আমার বড় জা? এখানকার কথা একটু বলুন দিকি। আপনি তো সব জানেন শোনেন, আমাকে বুঝিয়ে দিন। আপনি তো দুদিন বাদেই ড্যাং করে চলে যাবেন—আমাকেই তো তখন এই ঘরকন্না করতে হবে। বুঝে নেওয়া ভাল আগে থাকতে!'

কনক অবাক হয়ে গেল। এ ধরণের কথা কনে বৌয়ের মুখে—তার কাছে কল্পনাতীত। সে যেন থতমতো খেয়ে গিয়ে ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

মহাশ্বেতা কথাগুলো ভাল শুনতে পায়নি। ইদানীং সেও একটু কম শুনছে কানে। যদিও সে নিজে সেটা মানতে চায় না। ওর ছেলেরা বলে, 'চে'চ্যে চে'চো মায়ের কানের পর্দা ফুটো হয়ে গেছে। যা চে'চান চে'চায় দিনরাত!'..... সে কনকের দিকে ফিরে বললে, 'কী হ'ল গো—তোমার হাত আবার থেমে গেল কেন! কী বলছে নতুন বৌ ফিস ফিস করে?'

বিনু আর একটু গলা নামিয়ে বলে, 'ইনিই আমার বড় ননদ না? সেবার মেয়ে-দেখা দিতে এসে দেখে গিছলুম। কানে কম শোনেন বুঝি? তাহ'লে কালার বংশ বলো!......বেশ বে হ'ল আমার। যত রাজ্যের কালা আর পাগলকে নিয়ে কারবার, জন্মে বরের সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইতে পারব না!......তা হ্যাঁ দিদি, আমার একটি পাগল ননদ আছে শুনেছি—সিটি কোথায়?'

তরু তখন দালানেরই একটা জানলার ওপর বসে ছিল চুপ করে—কনক নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

'ও মা, ও-ই নাকি? তা কৈ পাগলের মতো তো মনে হচ্ছে না। বেশ তো ভাল-মানুষের মতো চুপচাপ বসে আছে। ওকেই বোধহয় গুম পাগল বলে—না?'

'না না, ছোট ঠাকুরঝি তেমন পাগল কিছু নয়। অতিরিক্ত শোকেদুঃখে অমনি জবুথবু হয়ে গেছে, জোর করে না নাওয়ালে নায় না, না খাওয়ালে খায় না—এই! চে'চামেচি করা কি ভাঙ্গাচোরা—সেসব কিছু না!'

'সবরক্ষে! আমার যা ভয় হয়েছিল, পাগল শুনে। বলি কি না কি, মারধোর করবে কি ঘুমের মধ্যে গলাটাই টিপে দেবে—'

'ষাট! ষাট! ওসব কি অলুক্ষণে কথা। আজকের দিনে ওসব বলতে নেই। ছি!'

'না, তাই বলছি।' একটু অপ্রতিভ-ভাবে জবাব দেয় বিনতা।

ফুলশয্যায় আড়ি পাতবার উৎসাহটা রাণীরই বেশী। সে-ই দল পাকিয়েছিল। কনক আগেই বলেছিল, 'একজন তো কানে শুনতে পায় না, কথা আর কী হবে, হয় লিখে বলতে হবে নয় তো ঠারে-ঠোরে—আড়ি পেতে কি লাভ দিদি?'

কিন্তু রাণী সেসব কথা কানেই তোলেনি। বাইরের ঘরে ওদের ফুলশয্যা হবার কথা। সে বিকেল থেকে অনেক যত্ন অনেক তদ্বির করে একটা জানলার নর্দমা পরিষ্কার করে চে'চে বাড়িয়ে চোখ চলবার মতো করে নিয়েছিল। আর একটা জানলায় এমনিই ফাঁক একটু বেশী—সেখান থেকে একজন দেখতে পারে। এদিকে—অর্থাৎ রাস্তার দিকের রক থেকেও যাতে দেখা যায় সেটার জন্যে হেমের শরণাপন্ন হল শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যের দিকে, 'হেই ঠাকুরপো, একটা কিছু করে দাও ব্যবস্থা!'

হেম বলে, 'বেশ লোক তুমি! ভাই-ভাদ্দবৌয়ের ফুলশয্যায় আড়ি পাতার ব্যবস্থা করবে ভাসুর! লোকে শুনলে বলবে কি!'

'আরে তুমি তো পাতছ না, পাতব তো আমি। তুমি শুধু একটা দোর-জানলার খাঁজটাঁজ ঠিক করে দেবে—এই কথা!'

'ওসব হবেটবে না আমার দ্বারা। আমার ঢের কাজ আছে এখন, এখনই সব লোকজন এসে পড়বে।'

অগত্যা রাণী নিজেই সব ব্যবস্থা করে নেয়। ঠিক হয়, সে, কনক এবং ও বাড়ীর মেজগিন্নী প্রমীলা, আড়ি পাতবে, আর কারুর অত উৎসাহ ছিল না—মহাশ্বেতা একটু কৌতূহল প্রকাশ করেছিল। তাকে হেম ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দিল।

খাওয়াদাওয়া চুকে হাতের সুতো খুলতেই রাত দেড়টা বেজে গেল। তার-পর ওদের শোওয়ার ব্যবস্থা করে সব বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল প্রকাশ্যে—কিন্তু তারপরই ওরা তিনজনে আড়ি-পাতা ফোকরে চোখ দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে বাগানের দিকে রইল রাণী আর প্রমীলা, বাইরের দিকে কনক।

ওরা দোর ভেজিয়ে চলে আসবার পর প্রথমটা দুজনেই চুপচাপ পড়ে রইল—বর এবং কনে। বেশ কিছুক্ষণই। এরা যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছে তখন বিনতা হঠাৎ উঠে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিঃশব্দে এসে কপাটটায় খিল দিয়ে দিলে। তারপর জানলার কাছে এসে বেশ একটু শ্রুতিগম্য স্বরেই আপন মনে বললে, 'যে বেটাবেটিরা আজ আড়ি পাতবে তারা কিন্তু ঠকবে—নিজেদেরই ঘুম মাটি। এ তো আর গল্প করার মতো বর নয় যে কথা-বার্তা কইব—শুনবে! আর দেখবারই বা আছে কি প্রথম রাত্তিরে?'

ঘরে আলো রাখা নাকি নিয়ম—এরা হ্যারিকেনটাই কমিয়ে এক কোণে রেখে এসেছিল। সেখান থেকে সেটা তুলে পলতেটা বাড়িয়ে আলোটা উজ্জ্বল করে বিছানার পাশে এনে রাখল। তারপর বুকের জামার মধ্যে থেকে একটা পাট করা কাগজ আর একটুকরো ছোট পেন্সিল বার করে খশখশ করে কি লিখে কান্তির দিকে এগিয়ে দিলে বিনতা। বিস্ময়ে কান্তিরও চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল—বিস্ময়ে আর প্রশংসায়। বধূর বুদ্ধি এবং কর্ম-তৎপরতা লক্ষ্য করে বুঝি আশ্বস্তও হয়ে উঠেছিল মনে মনে। সেও উজ্জ্বল মুখে কাগজটা টেনে নিয়ে বৌয়ের লেখাটুকু পড়ে তার নীচে কি লিখে আবার তার দিকে ঠেলে দিলে।

এই ভাবেই চলল ওদের প্রথম প্রেমালাপ। আড়ি যারা পাততে গিয়ে-ছিল তাদের কারুরই আর রুচি ছিল না বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার। তারা যেন অদৃশ্য এক-একটা চড় খেয়েই অপমানে মাথা হে'ট করে এল আস্তে আস্তে। এখন লজ্জাটা তাদেরই।

নিঃশব্দেই এসে উঠোনে দাঁড়াল তিনজন। মুখে কথা ফুটছে না যেন কারও। আসল কথাটা কেউই কাউকে বলতে চাইছে না আসলে—আঘাত দেবার এবং পাবারও ভয়ে। শেষে প্রমীলাই কতকটা সামলে উঠে বললে, 'কখন ঐ কাগজ আর পেন্সিলটা যোগাড় করে জামার মধ্যে রেখে দিয়েছে ভাই, আশ্চর্য! আমরা কেউ টের পেলুম না! বোধহয় বাপের বাড়ি থেকে সব গুছিয়ে তোরঙ্গের মধ্যে করে নিয়ে এসেছিল একেবারে!

রাণী প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'খুব শিক্ষা হয়ে গেল আমার! আর যদি কারও বিয়ের কথায় থাকি কোনদিন! লোকের ভিড়ে গোলমালে এখনও অতটা লক্ষ্য করতে পারেননি মাসিমা, কিন্তু কাল-পরশুই বুঝতে পারবেন, তার পর আমি মুখ দেখাব কি করে! ছি-ছি!'

'আপনি ভুল করছেন দিদি' ওকে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে যেতে কনক বলে, 'ওর এমনি বৌই দরকার ছিল। বৌ নয়—ছোট ঠাকুরপোর একটা গার্জেনই দরকার, তাই পেয়েছে। ঐ হাবা-কালাকে নিয়ে

সংসার করা, বৌ শক্ত না হলে চলত কি করে!

হয়ত সারারাতই জেগে চিঠি লেখালেখি করেছে ওরা,—কিম্বা বিনতার বাপের বাড়ি থেকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে অন্তত প্রথম প্রথম খুব ভোরে উঠতে হয়। গুরুজনদের ওঠবার পর ঘরের দোর খুলে বেরোনো বড় লজ্জার কথা—ছোটবৌ খুব ভোরেই উঠোনের দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু উঠোনে পড়তেই তার নজরে পড়ল যে তরু তারও আগে উঠে পড়েছে এবং কি একটা করছে। আর একটু কাছে আসতে—কী করছে তাও বুঝতে পারল। আগের দিন রাত্রে অভ্যাগতদের পাতা থেকে নিছক কামড়ানো-চটকানো টুকরো-টাকরা বাদে অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট-গুলো একটা ঝুড়িতে তুলে রাখা হয়েছিল—সকালে ভিখারী কাঙ্গালীদের দেওয়া হবে এই উদ্দেশ্যে। তরু তারই মধ্যে থেকে বেছে বেছে মাছগুলো তুলে খাচ্ছে!

'ওমা, ওমা কি হবে মা! এ কি কাণ্ড!' ছোটবৌ সোরগোল তুলে দিল একেবারে, 'বিধবা মানুষ, তায় বামুনের বিধবা, মাছ খাচ্ছ কি! তায় সজিক-জাতের এ'টো। জাতজন্ম রইল কি তোমার?......বলে পাগল, পাগল না ছাই—সেয়না পাগল—বোঁচকা আগল! পাগলই যদি তো অন্য কিছু না খেয়ে মাছ খাবে কেন। মাছের সোয়াদটি তো ঠিক জানা আছে! বলি ও ছোট ঠাকুরঝি—ইকি কাণ্ড তোমার? এত নোলা!'

গাঁতোগুঁতি ক'রে অল্প জায়গায় শোওয়া—ঘুম ভাল ক'রে কারুরই হয়নি। এই চেঁচামেচিতে প্রায় সকলকারই ঘুম ভেঙ্গে গেল। হেম বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। কনক, রাণী এরাও ছুটে এল। শ্যামার কোমরটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠতে একটু দেরি হয়— তিনি যখন বেরোলেন তখন হেম হাত ধরে টেনে তরুকে সরিয়ে দিয়েছে, কনক নিয়ে যাচ্ছে ঘাটের দিকে মুখ-হাত ধোওয়াতে। ঘটনাটা যাই হোক, নতুন বৌ—বিশেষত ফুলশয্যার কনে-বৌকে এতটা চেঁচামেচি করতে নেই,—উপস্থিত সকলকারই এই কথাটা প্রথম মনে হয়েছিল, তরুর আচরণের থেকে ওর আচরণটাই দৃষ্টিকটু, শ্রুতিকটু দুই-ই লেগেছিল। কিন্তু, শ্যামা সেটা লক্ষ্য করলেও, নতুন বৌয়ের সামনে তরুর এই কাণ্ডতে অপমান বোধ এবং লজ্জাটাই প্রবল হয়ে উঠল। তার যেন মাথা কাটা গেল এই ব্যাপারে। হয়ত তরুর জন্যেই সবচেয়ে বেশী বিব্রত থাকতে হয়েছে এই ক'মাস, মেজমেয়ের কাছে নাতনীর কাছে মাথা হে'ট করতে হয়েছে অযথা—এই সব কারণে একটা অসহায়, প্রতিকার-হীন বিক্ষোভ মনে জমছিল বহুকাল থেকে—এই উপলক্ষে সেইটেরই বিস্ফোরণ ঘটল একেবারে। তিনি দ্রুত এগিয়ে এসে দু হাতে ঠাস ঠাস ক'রে গোটাকতক চড় কষিয়ে দিলেন তরুর দুই গালে। বললেন, 'হারামজাদী শুধু আমাকে জ্বালাতে পোড়াতে এসেছিল পেটে! জন্মভোর জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক ক'রে দিলে একেবারে! এত খাও তবু নোলা যায় না! সব্বস্ব খেয়ে বসে আছিস—এখনও খাওয়ায় এত লালসা। যত বুঝছে! সরুন—ওর হাত ধুইয়ে নিয়ে আসি!'

এবার শ্যামা সমস্ত আবেগ নিঃশেষ ক'রেই বোধ হয় কে'দে ফেললেন, 'মা মা, আমার আর সহ্যি হয় না। তোমরা বিষ এনে দাও, খেয়ে আমি শান্তি পাই। এ জ্বালানি পোড়ানি কতকাল ভুগব আর।'

ফ্যাশ ফ্যাশ ক'রে নতুনবৌ বললে, 'সত্যি দিদি, আপনি বলছেন বটে হু'শ-পব্ব নেই—কিন্তু মুখের তারটি তো ঠিক আছে—কই, কুমড়োর ঘ্যাঁট তো খায় নি, ঠিক মাছটিই বেছে মুখে দিয়েছে!'

......ইকি কাণ্ড তোমার?

অলক্ষ্মে আর অমঙ্গুলে কাণ্ড এখনও ক'রে যাচ্ছে! আর কী বাকী আছে, ঐ ছেলেটা তো? তা তাই না হয় তার মাথাটা কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খা। খেয়ে আমাকে অব্যাহতি দে। তুইও বাঁচ আমিও বাঁচি!'

কনক রাণী দুজনে মিলে ধরে তাঁকে সরাতে পারে না। বলছেন আর পাগলের মতো মেরেই চলেছেন। কনক বলল, 'ছি মা, ওর কী জ্ঞানবুদ্ধি আছে যে, ওকে অমন ক'রে মারছেন! একটু হু'শ থাকলেও কি আর এটা করে। এমনি তো দেখেন জোর ক'রে না খাওয়ালে খেতেই চায় না। একে লোভ বলছেন কেন! আপনিও কি পাগল হয়ে গেলেন। কাকে মারছেন আপনি, ও কি কিছু

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল যেন কনকের, সে একটু কড়া সুরেই বললে, 'তুমি চুপ করো! তুমি কনেবৌ—সব তাইতে তোমার কথা বলার দরকার কি!...এক বাড়ি গুরুজনের মধ্যে তোমার এত কথা বলতে লজ্জা করে না!'

এতক্ষণে শ্যামারও যেন খেয়াল হ'ল তাঁর নবনীতা পুত্রবধুর অশোভন আচরণ। অথবা সকালবেলাই এই অবাঞ্ছিত ব্যাপারটা ঘটে যাওয়াতে তাঁর মনে ইতিমধ্যে যে অনুতাপ আর অপ্রতিভতার ভাব দেখা দিয়েছিল—তার সম্পূর্ণ চোটটা গিয়ে পড়ল—এই সমস্তটার জন্য দায়ী ঐ মেয়েটির ওপরই। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে বললেন, 'তোমাকেও আমি এই সাবধান ক'রে দিচ্ছি ছোটবৌমা—নোলা দু

ধরনের আছে, এক বেশী খাওয়া আর এক বেশী কথা বলা। ও কোন নোলাই ভাল না। এক ফোঁটা মেয়ের এত কিসের বগবগানি সব তাইতে? ফের যদি ছোট মুখে এমনি বড় বড় কথা শুনি তো সকলের সামনে সাঁড়াশি পুড়িয়ে ঐ নোলা টেনে ছিঁড়ব। তোমার কোনও কাকা এসে রক্ষে করতে পারবে না বলে দিলুম!'

তার ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে, এবং কিছু পূর্বের চড় মারার দৃশ্য মনে পড়ায়, ভয় পেয়ে গেল বিনতা। সে দ্রুত পিছন ফিরে তাদের ঘরে ঢুকে গিয়ে সেখান থেকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'বারে! সব্বাই এখন আমার ওপরই ঝাল ঝাড়তে শুরু করল! যত দোষ এখন আমারই। বেশ তো!'......

এতদিনের এত কথা, এত তিরস্কার এত বকুনি এত অনুরোধ উপরোধ মিষ্ট বাক্যেও তরুর স্তম্ভিত ভাবটা কাটানো যায় নি। মনে হ'ত কিছুই তার কানে যায় না, কিছুই তার প্রাণে লাগে না। তার চিত্ত এবং বুদ্ধি দুই-ই বুঝি জড় হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পুকুর ঘাটে নিয়ে গিয়ে ওর মুখ ধোওয়াতে ধোওয়াতে—গালের ওপর যেখানে শ্যামার কর্মকঠিন আঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল—সেইগুলোয় জল ঘষে দিতে দিতে হঠাৎ নিজের হাতের ওপর গরম গরম কয়েক ফোঁটা কি গড়িয়ে পড়ায় কনক চমকে চেয়ে দেখল, তরুর দুই চোখের কোল উপছে তপ্ত অশ্রুই ঝরে পড়ছে। কনক তখনই কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না, শুধু নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে তুলে নিয়ে গেল। যেতে যেতে কেবল একবার বললে, 'শোকেতাপে নানা কারণে মার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভাই ঠাকুরঝি, তুমি মনে কিছু নিয়ো না, লক্ষ্মীটি!'

কথাগুলো তরু ঠিক বুঝতে পারল কিনা, ওর জড়ত্ব সম্পূর্ণ কেটেছে কিনা বোঝা না গেলেও কনক মনে মনে একটু আশ্বস্তই হয়ে উঠল। কারণ তরু কোন উত্তর না দিলেও বা কথা না কইলেও এবার নিজেই নিজের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো শুকনো করে মুছে নিল। কনক এরকম এর আগে শুনেছে তার বাবা-কাকার মুখে। এই ধরণের গুম পাগল, যারা কোন মানসিক আঘাতে এমনি জড়ভরত হয়ে যায়—তারা আবার কোন কঠিন আঘাতেই নাকি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। ওর মনে আশা হ'ল সম্ভবত তরুও এবার সুস্থ হয়ে উঠবে আপনা আপনিই।

সে আশা আরও বাড়ল তার দুপুর-বেলা, যখন ভাত খাওয়াবার জন্য ওকে নিতে এল কনক। বহু দিন পরে তরু কথা কইল, সামান্য দুটি মাত্র শব্দ—'ভাল লাগছে না, এখন থাক!' কনক ওকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর ক'রে শেষ পর্যন্ত খেতে নিয়ে গেল, বললে, 'একটা শুভদিন, এখনও চারদিকে লোকজন—তোমার ছোট ভায়ের বিয়ে, এই দুপুরবেলা যদি না খেয়ে পড়ে থাকো, তাদেরও যেমন অকল্যেণ, মার মনেও তেমনি লজ্জার শেষ থাকবে না, ভাববেন তাঁর জন্যেই তুমি খেতে চাইছ না। তিনি তো তোমাদের জন্যে অনেক করেছেন, তাঁকে একটু মানিয়ে মাপ ক'রে নিতে পারছ না?'

আর কোন কথা বলেনি তরু, শান্তভাবেই গিয়ে খেয়েছে, খাওয়া হ'লে বহুকাল পরে নিজেই এ'টো বাসন নিয়ে গিয়ে পুকুরে ভিজিয়ে রেখে মুখ ধুয়ে এসেছে। এ ঘটনাটা আরও অনেকেরই চোখে পড়ল, মহাশ্বেতা আগের দিন রাত্রে এ বাড়িতে থেকে গিয়েছিল, সে শ্যামাকে খুঁজে বার ক'রে উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'বলি তোমার দাওয়াই তো খুব ভালই ঝেড়েছ দেখছি। তরোর তো রোগ সেরে গেল।...হুঁশ তো বেশ খানিকটা ফিরে এসেছে বলেই মনে হচ্ছে। তোমার কেটো হাতের চড়ের গুণ আছে দেখছি!'

শ্যামা অবশ্য উত্তর দিলেন না, সকালের ব্যাপারটার জন্য তাঁর মনে অনুশোচনার সীমা ছিল না। সত্যিই তো—বেচারী জন্মঅভাগী, তাঁর কোলে এসে জন্মে জীবনভোর দুঃখই পেয়ে গেল।...ওর আর দোষ কি, গ্রহেই করাচ্ছে বৈ তো নয়। তাঁরও গ্রহ, মেয়েরও। না, মারাটা ঠিক হয় নি অমন ক'রে!...

ইচ্ছে হয়েছিল অনেকবারই, গিয়ে একটু কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর ক'রে আসেন, কিন্তু বহুদিনের অনভ্যাসকে কেমন একটা আড়ষ্টতা এসে গেছে কোথায়, সেটা আর সম্ভব হবে না বুঝে নিরস্ত হলেন। স্বাভাবিক যে কোমলতা থাকলে অনুতাপের এই বহিঃপ্রকাশে লজ্জা আসে না—সে কোমলতাকে উনি অনেক দিন পিছনে ফেলে এসেছেন, এখন নারী-সুলভ যে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করতেই যেন বাধ-বাধ ঠেকে।...

খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলের দিকে মহাশ্বেতা নিজের বাড়ি চলে গেল। রাণীরাও। বাইরের লোক বলতে আর কেউ ছিল না। কিছু বেঁচে-যাওয়া মিষ্টি নিয়ে আর রাণীর ছেলেটাকে কোলে ক'রে হেম গেছে রাণীদেরই পৌঁছে দিতে। বাসন-কোসন মাজামাজি ক'রে কনকও ক্লান্ত হয়ে ছেলেটাকে নিয়ে এক জায়গায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। শ্যামা তার অনেক আগেই শুয়েছেন এসে, সন্ধ্যাবেলা বাড়িটা শুধু নিস্তব্ধ নয়—নির্জনও ছিল। কান্তি গিয়েছিল মুদীর দোকানে বাড়তি ময়দা প্রভৃতি ফেরৎ দিয়ে তাদের হিসেব মিটিয়ে আসতে। ছোটবৌ নিজের ঘরে বিছানাপাতা চুলবাঁধা টুকিটাকি কাজ শেষ ক'রে সেইখানেই বসেছিল। এরই মধ্যে কখন তরু চুপিসাড়ে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, তা কেউই লক্ষ্য করে নি।

প্রথম হুঁশ হ'ল কনকেরই। হেম ও কান্তি ফিরল প্রায় এক সঙ্গেই। উঠে ওদের খেতে দিতে গিয়েই তার লক্ষ্য পড়ল।

'মা, ছোট্‌ ঠাকুরঝি কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো।'

শ্যামা তখনও অত কিছু ভাবেন নি। তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে শুধু বললেন, ঘরে নেই? জানলায়? দ্যাখো, হয়ত বাগানে গেছে কি ঘাটে। লম্পটা কোথায়? লম্প নিয়ে যায় নি?'

'কৈ না তো! বাগান—মানে পাইখানাও দেখে এলুম, কৈ ঘাটেও তো নেই!'

কেমন যেন একটা আশঙ্কার আকুলতা ফুটে ওঠে কনকের কণ্ঠে, ঘুমের ঘোরে শ্যামার কানে সেটা আর্তনাদের মতো শোনায়।

'কী সর্বনাশ! তাহলে কোথায় গেল সে।' শ্যামা ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন।

প্রথমে বাড়িটাই খোঁজা হ'ল তন্নতন্ন ক'রে। কোথাও পাওয়া গেল না। তখন কান্তি ছুটল বড় মাসিমাদের বাড়ি, হেম গেল বাজারের দিকে। চেনা দোকানদারদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবে—কারও নজরে পড়েছে কিনা। মহানের বাড়িতেই যাক, আর খালের দিকেই যাক, ঐ একই রাস্তা।

কিন্তু অত দূরে যেতে হ'ল না। সিদ্ধেশ্বরীতলা পর্যন্ত যাবার আগেই খবর পাওয়া গেল। খবর দিতেই আসছিল তিন-চারজন।

নতুন বামুনদের পাগলী মেয়েটা রেলে কাটা পড়েছে।

এই সন্ধ্যের বোম্বে মেল দুখানা ক'রে কেটে দিয়ে গেছে তাকে।

তবে দুর্ঘটনা না, আত্মহত্যা—সেইটেই শেষ পর্যন্তও জানা গেল না। কেউ বললে, লাইন পার হচ্ছিল গাড়ি এসে পড়েছে; কেউ বললে, না—ইচ্ছে ক'রেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সামনে।

(ক্রমশঃ)

বিনতা রায়

যুগাগ্রয়ী পরিবর্তনও নারীর স্বাধিকার

বৃহত্তম বা উচ্চতম ক্ষেত্রে শ্রীমতী বন্দরনায়ক, বিজয়লক্ষ্মী, পদ্মজা নাইডুর মতো কয়েকজন ভারতীয় মহিলা যে স্থান অধিকার করে আছেন, সেখানে গৌরব আছে, পারিবারিক সমস্যা নেই। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ যে পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে ঘরে ঘরে প্রতিটি নারীর উপার্জনের পথে পা না বাড়ালে সংসার রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ জীবনে নারীর এই কাজে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে পদেপদে বাধা। খুব সাধারণ জীবনে ঘরোয়া অসুবিধার বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। পরিসরের অভাবে সবদিকের কথা একসঙ্গে বলা সম্ভব নয়। আজ দুটি মাত্র ক্ষেত্রের কথাই ধরি। ১৯৪০ সন অর্থাৎ আজ থেকে বিশ বছর আগে বিবাহ করলে টেলিফোন কোম্পানীতে মেয়েদের আর চাকরি থাকতো না। সময়ের বহু পরিবর্তনের সঙ্গে আজ সে নিয়ম পালটেছে। বিবাহিতা বহু মেয়ে টেলিফোনে চাকরি করছে। এ'দের কাজ করতে হয় দুই প্রস্থে। ডে ডিউটি এবং নাইট ডিউটি। সকালবেলা তাড়াহুড়ো ক'রে স্নান খাওয়া সেরে ঘরের বৌ অফিসে চললো, ব্যাপারটা শাশুড়ীর যতই খারাপ লাগুক, মাস গেলে যে মাইনেটা হাতে এনে তুলে দেয়, সেদিকে চেয়ে মেনে নিতেই হয়। কিন্তু রাত্রে ডিউটি পড়লেই অশান্তির আর শেষ নেই। সারারাত জেগে ক্লান্ত, অবসন্ন শরীর নিয়ে বাড়ী ফিরেই মুখোমুখী পড়তে হবে স্বামীর রুক্ষ মেজাজের। নানারকম ব্যঙ্গোক্তিরও অভাব নেই। শাশুড়ী শুরু করলেন, ছেলে নিয়ে সারা দুপুরের মধ্যে দু চোখের পাতা এক করা তো ঘুচেই গেছে, তার ওপর আবার রাতভোর সামলাতে পারবো না বাপু। স্বামী-স্ত্রী দুজনের আয় মিলিয়ে কোনোমতে সারা মাসটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে মেয়েটি সারারাত জেগে পরিশ্রম করে এলো, তার যে এই মুহূর্তে কিছু খেয়ে একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, এ কথাটা যেন কারুরই ভাববার দরকার নেই। দরকার ছিল বৈকি! প্রথম দু একটা মাস সংসারের আয় বাড়ায় সবাই যখন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো, তখন তার খাওয়া, বিশ্রামের দিকে এ'রা যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটা এদের এতই অভ্যাস হয়ে গেছে যে, আজ যদি শারীরিক কোন কারণে অফিসের ছুটি নিতে হয়, (কাজ ছাড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না) তো তাতেও এ'রা কম বিরক্তবোধ করবেন না। আজ আর তার শরীর খারাপ লাগা, ক্লান্তিবোধ করা এসব নিয়ে ভাববার কিছু নেই। টেলিফোনে কাজ করা—বিশেষ করে রাত্রে যে কতরকম বিরক্তিকর ঘটনা ঘটে, তাতে কর্মীদের নিজেদেরই মনমেজাজ ভাল থাকার কথা নয়, তার ওপর দিনের পর দিন এই অশান্তি। 'থাক তবে কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে বসে থাকি' এ কথাই কি বলার যো আছে? উত্তরে যে ধরনের বাক্যবর্ষণ শুরু হবে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং দাঁতে দাঁত চেপে চুপ ক'রে থাকো। ক্লান্তি এড়াতে কয়েক ঘটি জল মাথায় ঢেলে স্নান সেরে নাও, তারপর সংসারের কাজে লেগে যাও। ডে ডিউটির দিনগুলিতে ছেলে শাশুড়ীর দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়, তাই তোমার যখন রাত্রে কাজ থাকবে, সে কটা দিন দুপুরে তাঁকে বিশ্রাম দাও, ছেলেটিকে তুমিই সামলাও। তাহলে কি এই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে মায়া-মমতা, সহানুভূতি বলে কিছু আর নেই? উত্তরে বলতে হয় তুলনামূলকভাবে অনেক কমে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হ'ল মধ্য ও নিম্নবিত্ত বাঙালী সমাজ আজ অর্থনৈতিক যে প্রচন্ড সংগ্রামে লিপ্ত, তারা এতটুকু সুবিধেকে আঁকড়ে না ধরে পারে না, প্রতি মুহূর্তে হারানোর শঙ্কা। তার জন্যেই অন্তরে যাই থাক, বাহ্যতঃ একটা নির্মমতার চেহারা প্রকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু এ কারণ বিশ্লেষণের কথা। পরিবেশ শিকার (victim of Circumstances) যে, তার যন্ত্রণা থেকেই যাচ্ছে।

তুমি এয়ার হোস্টেসের কাজ করো। তোমাদের পোশাকটি বেশ। মাইনেও তো ভালই পাও, তবু শান্তি নেই? বাবা নেই। ছোট তিনটি ভাইবোনকে স্কুল কলেজের গন্ডী পার করতে গিয়ে তোমার আর বিবাহের সময় হ'ল না। তা ছাড়া তোমার বিয়ের কথাটা ভাবেই বা কে? মা তো এ কথা মনেও ঠাঁই দেন না। ভাইটা যোগ্য হ'য়ে না ওঠা পর্যন্ত, একটা কাজ কর্মে না ঢোকা পর্যন্ত বিয়ে করা তোমার পক্ষে ভয়নাক স্বার্থপরতা হবে না? বরং যে বোনটি এবার বি.এ পাশ করলো,ওই যে কে একটি সুন্দর মতো ছেলের সঙ্গে ওর মেলামেশা, ছেলেটি একটা চাকরিও করে, ওদের বিয়ের ব্যবস্থাটা করে ফেলো। তোমার বয়স পার হ'য়ে যাচ্ছে, একটানা দীর্ঘদিন কাজ ক'রে জীবনে ক্লান্তি আসছে, একটি ছোট শান্তির নীড়ের লোভ মাঝে মাঝে মনকে পেয়ে বসছে। কিন্তু তোমার কি এসব ভাবা চলে? ভাই কলেজ পেরিয়ে অনির্শিচতকালের জন্যে বেকারি করবে। তোমাকেই একে তাকে ধরে, খোসামোদ করে চেষ্টা করতে হবে তার একটা কাজের। সেকি দুচার দিনের কথা? আরও পাঁচ-ছটা বছর কোন-না কেটে যাবে? তবু তুমি মুখে হাসি ফুটিয়ে যাত্রীদের প্রত্যেকের সুবিধার দিকে নজর রাখবে। কেউ অসুস্থ হ'য়ে পড়লে তাকে ধাত্রীর মতো সযত্নে সেবা করবে। দীর্ঘ পাড়ি দেবার সময় যে-কোনো রকমের বিপদাশঙ্কায় তুমি তাদের ভরসা দেবে। যে তোমার কেউ নয়, কোনোদিন তোমার কেউ হবেও না, পথে তোমার যত্নটুকু নিয়ে চলে যাবে নিজের গন্তব্যস্থলে, তেমন বিপদ ঘটলে, তাকেই বাঁচাতে তুমি তোমার প্রাণ দেবে।
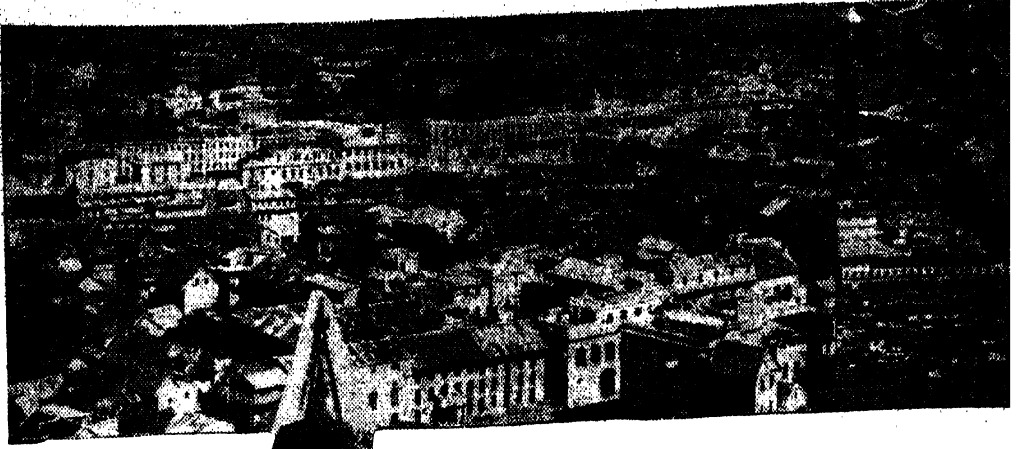
স্বর্গরাজ্য নেপাল

নেপালাধীশ রাজা মহেন্দ্র এবং তাঁর সহধর্মিনী রাণী রত্না দেবীকে স্বাগত জানায় স্বাধীন ভারতের কর্ণধার ও নাগরিকগণ। নেপালের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সুপ্রাচীন। হিমালয়ের ক্রোড়ে এই রাষ্ট্রটির সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব বন্ধন স্মরণ করে ভারত তাঁদের বিশেষভাবে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়। বিশ্বের এই সুপ্রাচীন রাজ্যটি স্বাধীনতার দুর্ভেদ্য দুর্গ। এর পরিবর্তন নেই। তবু সেখানে পরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে। রাজা মহেন্দ্রের নেতৃত্বে নেপাল আজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে—তার পাথেয় হল অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য আর ভবিষ্যতের প্রতি অবিচল আস্থা।

নেপালের রাজবংশের নবম বংশধর রাজা মহেন্দ্র। রাজা ত্রিভুবনের মৃত্যুর পর মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন। সিংহাসনে আরোহনের এক যুগের মধ্যেই রাজা মহেন্দ্র নেপালে প্রগতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেকে জনগণের সঙ্গে একাত্মভাবে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন। রাজা মহেন্দ্র মনে করেন যে, স্বাধীনতাকামীদের একটি জিনিষ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে দেশ সেবাই গণতন্ত্রের শক্তির আধার ও মূল উৎস।

রাণী রত্নাদেবীও নেপালে জনপ্রিয়। নেপালের জনগণ রাণীকেও মধুর-স্বভাবা মহান রাণী হিসাবে জানে। শান্ত ও ধীরস্বভাবা রাণী রত্নাদেবী তাঁর স্বামীর রাজকীয় কর্তব্যপালনে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন।

কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫২ সাল থেকে ভারত নেপালের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিবহন, যোগাযোগ, জলসেচ, বিদ্যুৎশক্তি, কৃষি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যোন্নয়নের বিভিন্ন কার্য-সূচীতে সাহায্য করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৭২ মাইল লম্বা ত্রিভুবন রাজপথ; ত্রিশূলী নদীর ওপর ৪৬৮ ফুট লম্বা বাঁধ দিয়ে নদীর জলকে বিশেষ ধারায় প্রবাহিত করে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে; ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ১০৫৪ জন নেপালী ছাত্রছাত্রী ভারতে শিক্ষালাভ করেছে; তিনটি উপত্যকা উন্নয়ন, বারটি নিবিড় উন্নয়ন ব্লক এবং একটি গ্রামোন্নয়ন ব্লক ভারতের সাহায্যে চালান হচ্ছে।
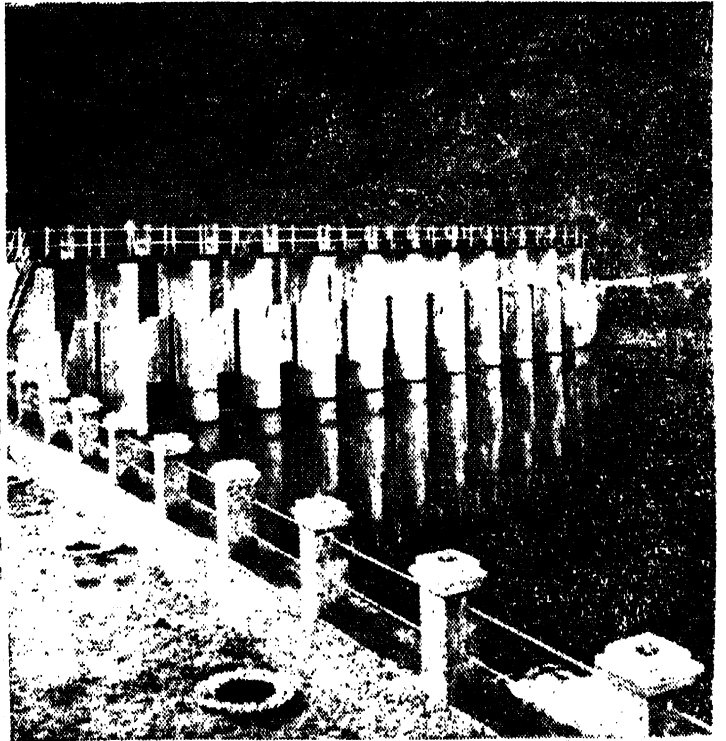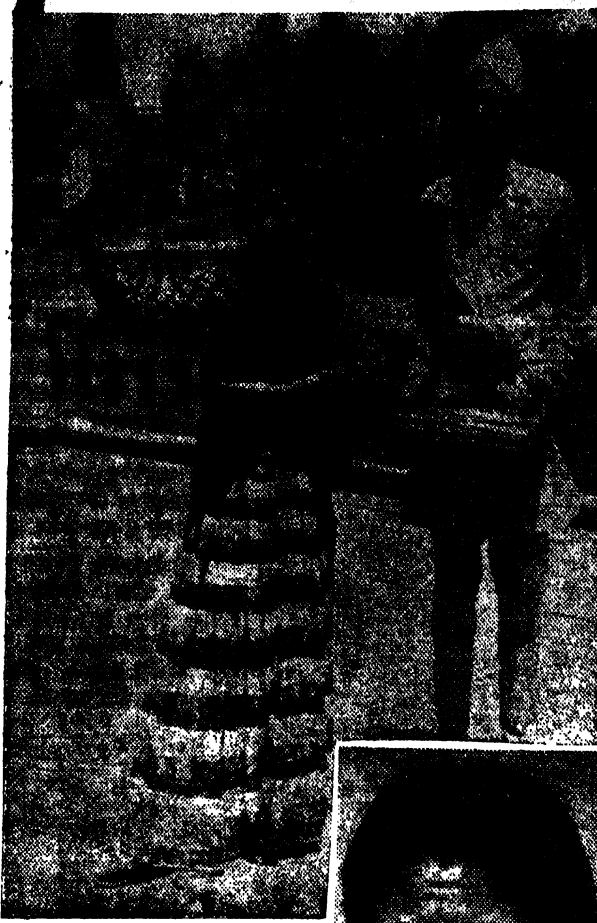
নেপালের আয়তন ১ লক্ষ ৪১ হাজার বর্গকিলোমিটার। নেপালের অর্থ-নীতি কৃষিভিত্তিক। দেশের এক-দশমাংশ অঞ্চলে চাষ হয়। নেপালের বন-সম্পদ ও জলসম্পদ প্রচুর। খনিজ সম্পদও নগণ্য নয়। এই নেপালেই রয়েছে বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশিখর এভারেস্ট, কাঞ্চন-জংঘা, লোত্‌সে, মাকালু, ধবলগিরি, মানসালু ও অন্নপূর্ণা। আবার বিশ্বের গভীরতম গিরিখাতও রয়েছে এখানে। যেমন, অন্নপূর্ণা (২৬,৫০৪ ফুট) ও ধবলগিরির (২৬,৮১১ ফুট) মধ্যে মাত্র কুড়ি মাইলের ব্যবধান। নেপালের সৌন্দর্য মনোরম। সে সৌন্দর্য যে কোন মানুষকে আকৃষ্ট করে।

নেপালের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল তার কঠোর পরিশ্রমী জনসাধারণ। নেপালীরা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। নেপালে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম রয়েছে পাশা-পাশি। আত্মবিশ্বাস নেপালীদের চরিত্রে এনে দিয়েছে অনন্যসাধারণ মর্যাদাবোধ ও স্থৈর্য। তারা মনেপ্রাণে স্বাধীনতা ভালবাসে। নেপালীরা সদানন্দময়। নৃত্য ও সঙ্গীতপ্রীতি তাদের রক্তে মিশে রয়েছে। নেপালের সাহিত্য এবং শিল্প-কলা তার মঠ-মন্দিরের সূক্ষ্ম-সুন্দর কারুকার্যের মতই সমৃদ্ধ এবং সৃজনী শক্তির পরিচায়ক।

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

সুদূর অতীতের দিকে চেয়ে আমরা দেখি মানুষ যেদিন স্পন্দিত হ'ল ছন্দে, সেদিনই তার জীবনে এল গতিবেগ। শুরু হ'ল তার জয়যাত্রা। জীবনকে সহজ ও সাবলীল করে ছন্দ। ছন্দোবদ্ধ কর্ম-শক্তির অপব্যয় হয় না। ছন্দের ধর্ম হ'ল শক্তিকে সংযত, সংহত ও একাগ্র করে তোলা। বিদ্রোহী মানুষ বাহিরের প্রকৃতি ও অন্তরের প্রকৃতির সঙ্গে দ্বিমুখী সংগ্রাম করে মনুষ্যত্বকে মহিমান্বিত করার পন্থার সন্ধান পেয়েছে। এই বিশ্বছন্দের চাঞ্চল্যে ও আন্দোলনে সাহিত্যের পূর্বেই নৃত্য হয়ে উঠেছে মানুষের ভাবের বাহন।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির চলমান অভি-যাত্রায় বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশে নৃত্যধারাও পরিবর্তিত হ'ল বিভিন্ন ভাবাদর্শে। অবশেষে ইংরেজ শাসনের বৃত্তপরিধিতে এসে তার গতিবেগ হ'ল মন্থর সঙ্কীর্ণ। এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিম, রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির আবি-র্ভাবের সময়েও যখন নাট্যশালা ও নাটকের পথ উন্মুক্ত হ'ল, তখনও নৃত্যকলা রইল অবহেলিত। রবীন্দ্র-নাথের প্রচেষ্টার পূর্ব পর্যন্ত নৃত্যকলা জনজীবনে বিশেষ করে শিক্ষিত উচ্চ-শ্রেণীর সমাজ থেকে বর্জিত হয়েছিল। কবিগুরু বললেন, "মানুষের জীবন বিপদসম্পদ সুখদঃখের আবেগে নানা-প্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলেছে; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে যে একটা বিচিত্র সঙ্গীত হয়ে ওঠে; তেমনি আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবল-মাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার ক'রে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে। কোনও ব্যাপারকে নিবিড় করে উপলব্ধি করাতে হ'লে আমাদের চৈতন্যকে এই রকম বেগবান করে তুলতে হয়।"

"আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ, এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র করে,—জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে; দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।" রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দিলেন নৃত্যকে তার তাত্ত্বিক ও জ্যামিতিক আবেগবৃত্তের পরিধি থেকে। ছড়িয়ে দিলেন সহজরূপে, সরলছন্দে, পরিশুদ্ধ প্রাণময়তায়।

ভারতের নৃত্যধারার আত্মিক ভাবা-দর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের কোনও অসামঞ্জস্য নেই।

"আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ববাঙ্ময়ম্।
আহার্যং চন্দ্রতারাদি তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্"।। ১ ।।

অভিনয়দর্পণে উল্লিখিত নটরাজ মূর্তির এই উদাত্ত কল্পনার সঙ্গে কবিগুরুও একাত্ম।

"নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়—
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার মহৎ ব্যক্তিত্ব তার সুদূরপ্রসারী চেতনা দিয়ে বিশ্বের সকল কালের সকল মানুষের চিন্তা-ধারাকে উপলব্ধি করে শিল্পতত্ত্বের সত্তাকে পরিস্ফুট করেছে। মানুষ নিজের প্রকাশে তার নিজের মধ্যকার অনন্ত বৈচিত্র্যকে আবিষ্কার করতে চায়। এই চেষ্টাই সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা প্রভৃতি রূপ ধারণ করে। আত্মপ্রকাশের এই পিপাসাই আত্মীয়তার প্রেরণা—আত্মো-পলব্ধির বাহন। "সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই

পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে! ভোলবার জো কি! সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা! সে বলছে আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে রংয়ে, সুরে, বাণীতে নৃত্যে।" আর সেই সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, সাহিত্যেও প্রকাশের আবেগেরই আর একটি সার্থক প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্র-নৃত্যধারায়। মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান এই নৃত্যকলায় ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই কবিগুরুর নৃত্যকল্পনা এক অনির্বচনীয় মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছে।

"মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয় তার ভাবের আন্দোলনকেও যেমন সাড়া দেয় এমন আর কোন জীবেই দেখিনে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা আছে কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গীর মতো সে ভাষা চিন্ময়রূপ লাভ করে নি, তাই তার তেমন শক্তি নেই, ব্যঞ্জনাও নেই। কিন্তু এ যথেষ্ট নয়। মানুষ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি করতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্যকে দাঁড় করাতে হয় বিশ্বগত সত্যে। সুখ, দুঃখ, রাগ, বিরাগের অভিজ্ঞতাকে আপন ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রূপসৃষ্টির উপাদান করতে চায় মানুষ। "আমি ভালবাসি" এই কথাটি ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত সংবাদ বহন করবার কাজে। আবার "আমি ভালবাসি" —এই কথাটিকে "আমি" থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টির কাজে লাগান যেতে পারে, যে সৃষ্টি সর্বজনের, সর্বকালের। যেমন সাজাহানের বিরহশোক দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তাজমহল, সাজাহানের সৃষ্টি অপরূপ ছন্দে অতিক্রম করেছে ব্যক্তি-মানুষ সাজাহানকে। নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবল মাত্র ছন্দের আনন্দ। গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালের একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি; সে কেবল তালের নেশা-জমানো, চেতনাকে ছন্দে দোল দেওয়া। কিন্তু এই ভাবাভিব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ্য করে রূপসৃষ্টিই হয় চরম তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য, সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হোলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে।"

নৃত্য সম্পর্কে কবিগুরুর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তার সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকাশগুলির মূলে যে কাব্যগত প্রেরণা প্রধান, সেই প্রেরণাই সংগীত ও নৃত্যকল্পনায় কাব্যের সুষম উপলব্ধিকে সুর ও ছন্দের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছে। সঙ্গীত ও নৃত্যের যুক্ত দ্বৈত প্রয়াসে অন্তরঙ্গ হয়েছে কবি-কল্পনা। সূর্যাস্তের রংলাগা পশ্চিম দিগন্তে হংসবলাকা যে আকুলতায় কবিহৃদয়কে আন্দোলিত করেছে, সেই স্পন্দনই সুর ও ছন্দে অবগাহণ করে কবির সঙ্গীত ও নৃত্য-কল্পনায় এনেছে পরিশ্রুত সৌন্দর্য। শিল্প ও সংস্কৃতি জীবনের উপস্থাপনা। তাই এর আনন্দের বৃন্তে রূপ ও রসের অজস্র বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা। এই আনন্দ ও সৌন্দর্যের মধ্যেই যে মুক্তি, সেই মুক্তিই কবিগুরু সঞ্চারিত করেছেন তাঁর নৃত্যধারায়।

অনেক সময় আমরা "রবীন্দ্র নৃত্য-পদ্ধতি" বলে একটি কথা শুনে থাকি। আসলে সেটা কি তার কোনও অর্থ আজ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ কি বিশেষ কোনও মৌলিক নৃত্যপদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন? এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন, কারণ আজকাল প্রায়ই সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গী রাবীন্দ্রিক হয়েছে কি হয়নি এই বিতর্ক উপস্থিত হয়। নৃত্যকলা সম্পর্কে নিশ্চই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কিন্তু তিনি শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী কোনও বিশেষ নৃত্যপদ্ধতি রচনা করেন নি। এই আলোচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত সতর্কভাবে নৃত্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও শান্তিনিকেতনে নৃত্য প্রযোজনার ইতিহাস অনুসরণ করতে হবে। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষের রচনা থেকে আমরা জানতে পারি—"এখানকার নাচকে এবং তার আদর্শকে ঠিকভাবে বুঝতে পারলে আমরা দেখতে পাব শান্তি-নিকেতনে নাচের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা কেবল নাচিয়ে তৈরী করা গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও অন্যান্য কলাবিদ্যা সমাজজীবনকে যেমন উন্নত শান্তিময় করে তোলে, নৃত্যকলাও যেন তাই করে।" এই উদ্ধৃতি থেকে শান্তি-নিকেতনের নৃত্য-প্রচেষ্টার মূল আদর্শ বোঝা যায়। ১৯০১ সালে শান্তি-নিকেতনের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে কবিগুরুর জীবিতকালে তিনি ভারতের প্রকৃত নৃত্যধারার প্রখ্যাত গুরুদের এনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু শান্তি-নিকেতনে প্রযোজিত নৃত্যগুলিতে ভারতীয় ঐতিহ্যের ও বিদেশীয় ভাবধারার সমন্বয় ঘটেছে, শাস্ত্রীয় নৃত্যের জটিলতা মুক্ত হয়েছে সহজ ছন্দে। নৃত্যপ্রয়োগের প্রথম পর্যায়ে দক্ষশিল্পী না থাকায় কবিগুরু নিজেই সহজভাবে সঙ্গীতের ভাবপ্রকাশের উপযোগী নৃত্য শিক্ষা দিতেন। প্রথমেই মূকাভিনয়, গীতাভিনয় ও দেহভঙ্গীতে একটু ছন্দ লাগিয়ে অভিনয় করা হত। গুজরাটী ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে সেখানকার লোক-নৃত্যও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। পরবর্তী কালে মণিপুরী নৃত্যের সহজ সাবলীল ছন্দ ও স্বচ্ছ বিন্যাসের সঙ্গে কবিকল্পনার একাত্মতাই এর কারণ। পরে কথাকলি, কথক ও ভারতনাট্যমও শান্তিনিকেতনে প্রচলিত হয়। কথক নৃত্যপদ্ধতি অবশ্য শান্তি-নিকেতনে বিশেষ জনপ্রিয় হয় নি। জাভা ও বালিদ্বীপের নৃত্যনাট্য সিংহলের ক্যান্ডি নৃত্য ও ইউরোপীয় ব্যালে নৃত্যের প্রভাবও দেখা যায়। দেশবিদেশের এই বিভিন্ন নৃত্যাদর্শ তাঁকে মুগ্ধ করলেও তিনি অভিভূত হন নি। তিনি বললেন—"মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্য ভাষায়। কোনো মানুষের চলাকে বলি সুন্দর, কোনোটাকে বলি তার উল্টো। তফাতটা কিসে। সে কেবল একটা সমস্যা সমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়, তাহলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলায় সমস্যার সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।" এই হচ্ছে নৃত্য সম্পর্কে কবিগুরুর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী। নৃত্যকলাকে জীবনের ছন্দরূপে মানুষের মনে কত সহজভাবে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন নীচের উদ্ধৃতি থেকে তা উপলব্ধি করা যায়।

"রোসো, নাচের কথাটা যখন উঠলো ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনাছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়।" এই হচ্ছে রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণভাবে রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে একদল তথাকথিত রবীন্দ্রঅনুরাগী যে অনুকরণপ্রিয়তা ও রবীন্দ্রধারা রক্ষার কথা বলেন তা নিশ্চয়ই রবীন্দ্র শিল্পকলার অনুকূল নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে—"সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক দিয়া, হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটার মতো সঙ্গীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস; কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নহে। অভিনয় জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশী ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশী ঝোঁক দিতে

গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে।"

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় এই সংযম ও কাব্যিক সুবিচারের প্রয়োজন সবথেকে বেশী। প্রসঙ্গত বর্তমানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক উদয়শঙ্করের "সামান্য ক্ষতি"র কথা মনে আসে। অনেক রবীন্দ্র অনুরাগী বলেছেন, ভাল হয়েছে কিন্তু ঠিক রাবীন্দ্রিক হয়নি। শ্রীউদয়শঙ্কর "সামান্য ক্ষতি" পরিকল্পনায় কাব্যিক সুবিচার করেছেন। পণ্ডিত রবিশঙ্কর সঙ্গীতাংশে কাব্যের মর্মকথা অনবদ্যরূপে ঝংকৃত করেছেন। তা হলে রাবীন্দ্রিক হয়নি এ প্রশ্ন কেন? কোনও পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর অনুকরণ করা হয়নি বলে? এই অনুকরণপ্রিয়তাকে কবিগুরু সবসময়েই নিন্দা করেছেন। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। কিছুকাল আগে জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রতারকা প্রযোজিত "চণ্ডালিকা" আমরা দেখেছি। কাব্যের মর্মকথাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চোখধাঁধানো দৃশ্য, মনমাতানো নৃত্যভঙ্গিমা ও ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখানোর অশোভন আতিশয্যে এই প্রচেষ্টা রবীন্দ্র-সংস্কৃতি চর্চার নামে রসবিকৃতির নিদর্শন। প্রকৃতির ভূমিকায় রূপায়ণী চিত্রতারকা দক্ষিণভারতীয় নৃত্যের একজন দক্ষ শিল্পী। কিন্তু তার পরিকল্পনার অসংযম ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উৎকট বিলাস দেখে "রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে"—এই কথাটি বার বার মনে হয়েছে।

অনেক প্রখ্যাত নৃত্যগুরুও রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় এই ভাবরূপের প্রতি বিশেষ অবহেলা দেখান। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্মকথা না বোঝাই এর কারণ। তারা অনেক সুন্দর নৃত্যাংশ রচনা করেন কিন্তু মনোগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই তা ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শনের আতিশয্যদুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কথায় "এরূপ অসংযত আতিশয্য অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করে ফেলে; তাতে কেবল বাইরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে ঢোকবার এমন বাধা তো আমি আর দেখিনে।" এই সংযম ও পরিমিতি সম্পর্কে কবিগুরু আরও বলেছেন, "আমাদের দেশের গাইয়ে বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার

দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি।"

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে নৃত্য, নাট্য ও কাব্যের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। সুরের রস, নৃত্যের রস ও কবিতার রস-এর সমন্বয়ে এক অখণ্ড রসবৈচিত্র্যের পরিপূর্ণ সংহতি। কাজেই এই ত্রিধারার সম্যক উপলব্ধি না ঘটলে শিল্পীর পক্ষে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের যথার্থ রূপায়ণ ও পরিকল্পনা অসম্ভব। প্রথমেই উপলব্ধি করতে হবে বিষয়বস্তুর ভাবরূপ—পরিকল্পনার যা প্রধান প্রেরণা। তারপরে নৃত্যের বিভিন্ন অংশের সংযোজনা ও ভারসাম্য। তারপরে পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্য যাকে কবিগুরু বলেছেন চালচিত্রে খাড়া করা। এবং সর্বোপরি প্রাণছন্দের ভাবসৌষাম্য অর্থাৎ সকল অভিব্যক্তির মধ্যে সুষমা স্থাপন, সৌন্দর্য ও আনন্দের সূক্ষ্ম সংবেদন রচনা করা যা মানবমনের গভীর অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে। ভাবরূপের সার্থকতা যদি নৃত্যরূপে সুষম হয়ে ওঠে তবেই সেই নৃত্যকল্পনা সার্থক, কারণ নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য তার সমগ্র ভাবটিকে দেহচাঞ্চল্যে প্রস্ফুট করা। অবশ্য এই সুষমা কিভাবে প্রস্ফুটিত হবে সেটা শিল্পীর দক্ষতার উপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছাপার অক্ষরে নির্ভুল পাওয়া যায়, সঙ্গীতেরও স্বরলিপি আছে কিন্তু নৃত্যের জন্য বিশেষ কোনও নির্দেশিকা না থাকায় অপব্যাখ্যা ও স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের বহু নিদর্শন দেখা যায়।

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে ভাবকে রূপ দেওয়ার জন্য যতটুকু চালচিত্র খাড়া করা দরকার ততটুকুই দৃশ্যপট, আলোক-সম্পাত, বেশভূষা, বর্ণসমন্বয় ব্যবহার করা উচিত। এর আতিশয্যও অনেক সময় পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে ভাব নিজেকে প্রকাশ করার জন্য রূপকে অবলম্বন করে। ভাব না থাকলে শুধু রূপ প্রাণহীন পুতুল। রবীন্দ্রনাথের কথায় "ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলাই রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তার কপালে মৃত্যু আছে। পাথরের টুকরা দিয়া রুটির কাজ চালান যায় না, বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়া অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা চলে না।" রবীন্দ্র-নৃত্য পরিকল্পনায় আঙ্গিক ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কবির কবিতা যেমন তার হৃদয়াবেগের ভাষা, তেমনি সুর ও নৃত্যও শিল্পীর হৃদয়াবেগের বাহন। আর কাব্য, সুর ও নৃত্যের যথার্থ ত্রিবেণীসঙ্গম না ঘটলে রবীন্দ্রনৃত্য কল্পনা অসম্পূর্ণ থাকে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক বাংলাদেশের কবিদের সম্পর্কে একটি অভিযোগ করা যেতে পারে। বর্তমানে কাব্যে, নাটকে, সঙ্গীতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রোত্তরকালে বাংলাদেশের কোনও কবি নৃত্যনাট্য রচনা করেননি। স্বভাবতই তার ফলে মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান নৃত্যকলার আধুনিক কালের বাহন হয়ে উঠতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কাব্য-নাট্য ও নৃত্যনাট্যের রূপ ও রীতির পার্থক্য কবিগুরুর রচনাতেই নির্দেশিত হয়েছে। কারণ কবিগুরুর "চিত্রাঙ্গদা", "শ্যামা" প্রভৃতির রচনা কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য দুইভাবেই করেছেন। শত-বার্ষিকীর কোলাহল নীরব হয়েছে,—এখন আমরা সাগ্রহে প্রত্যাশা করব কাব্য ও নৃত্যকলার সেতুবন্ধে সংস্কৃতির যে মুক্তি কবিগুরু প্রবর্তন করেছেন বাংলাদেশের কবিরা তার উত্তরসাধকের কর্তব্য পালন করতে এগিয়ে আসবেন।

সেকালের পাতা : একালের চোখ

[illegible]

সাবেকী কলকাতায় চৌরঙ্গী সমৃদ্ধ ছিল। আর তার একটু ওপারে জঙ্গল। ফিরিঙ্গীরা সেই জঙ্গল থেকে লুটপাট করত। পুলিসে কিছু করতে পারত না। সাগরদ্বীপ এখনও অবহেলিত; তখনও ছিল। তখন জাহাজ ঢুকতে পারত না গঙ্গায়। ওই সাগরদ্বীপের কাছাকাছি নোঙর করত। ডিঙি আর নৌকো করে আসত লোক-লস্কর, মালপত্র। তাই সাগরদ্বীপকে বন্দর করে তোলার পরিকল্পনা কোম্পানীর নিজের স্বার্থেই খুব দরকারী ছিল। সেই পরিকল্পনার সারাংশ দেওয়া হল। চৌরঙ্গী থিয়েটার নাম-করা। বলা হয় চৌরঙ্গী থিয়েটারে যেমন অভিনয় হয় তেমনটি নাকি খোদ বিলেতেও হয় না।

।। মফস্বলীয় সংবাদ ।।

পুলিসের যে ব্যবস্থা আছে তা অতি সামান্য। রোজই খবরের কাগজে নানা রকম চুরি-ডাকাতির বিবরণ থাকে। সেই সব অত্যাচার সত্যিই চাঞ্চল্যকর। এই নিয়ে সাধারণের মধ্যে অভিযোগের অন্ত নেই। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে এই সব দুষ্কৃতিকারীরা ইয়োরোপীয় পোষাকে সজ্জিত হয়ে শহরের জনবহুল অঞ্চলের মধ্যে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি করে বেড়ায়।

সাগরদ্বীপকে চাষবাসের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। এই দ্বীপে আবাদ করলে আরও নানাবিধ উপকার পাওয়া যাবে। সম্প্রতি শহরবাসীদের মধ্যে এই বিষয়ে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা চলেছে এবং তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। সাগরদ্বীপ উন্নয়ন পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয় তবে তার থেকে আরও নানা ধরনের উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উৎসাহী ব্যক্তিদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য সরকারও এই বিষয়ে এগিয়ে এসেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্য প্রথম সভা হয় টাউন হলে; দ্বিতীয় সভা হয় এক্সচেঞ্জ-এ। এই সভায় পরিকল্পনার অন্যান্য কার্যসূচী তৈরী করা হয়। পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য ব্যয়ের হিসাব করে শেয়ার বিক্রি করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত শেয়ারই বিক্রি হয়ে যায়। কাপাস উৎপাদন এই পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পায়। সকলের ধারণা সমুদ্র বায়ুর জন্য সাগরদ্বীপে অতি উৎকৃষ্ট কাপাস তুলো তৈরি করা সম্ভব হবে। সাগর রোডের ওপর জাহাজে মাল চালান দেবার জন্য গুদাম তৈরি করা এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। মালগুদামের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের দোকানও খোলা হবে। এখন সাগরদ্বীপে উপযুক্ত খাদ্য খুঁজে পাওয়া এক সমস্যার বিষয়। রোগী ও অসুস্থদের জন্য স্বাস্থ্য-নিবাস তৈরি করা এই পরিকল্পনার তৃতীয় উদ্দেশ্য। এই স্বাস্থ্য-নিবাসে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে জাহাজে বেড়ানোর দায় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য একটা ডাকঘর ও ছোট ছোট নৌকো রাখার ব্যবস্থা করাও এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। তাই আশা করা যায় যে একদিন এই সাগরদ্বীপ হয়ে উঠবে কলকাতার সব চেয়ে সুন্দর বন্দর। বড় বড় জাহাজ ঢুকবে সাগরদ্বীপের বন্দরে। মাল খালাস করবে সেখানে। কলকাতা থেকে সাগর অবধি কাটা হবে একটা টানা খাল। এই খাল-পথে সাগর-দ্বীপ থেকে কলকাতায় মাল আসবে। পরিকল্পনার এই উদ্দেশ্য যদি সত্যিই সফলতা লাভ করে তবে আশা করা যায় অতি অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যু, মহামারী ও বাঘের ক্রীড়া-নিকেতন এই সাগরদ্বীপ হয়ে উঠবে স্বাস্থ্য-সম্পদ ও আনন্দের আবাস। এই দ্বীপে গড়ে উঠবে নূতন সভ্যতা। অতি অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে সাগর-দ্বীপে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়াও সম্ভব হবে।

কলকাতায় চৌরঙ্গী থিয়েটার সকলেরই উৎসাহের বস্তু। বেশ কয়েক বছর ধরে চৌরঙ্গী থিয়েটার কলকাতার আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে এবং তা হওয়াও উচিত। চৌরঙ্গী থিয়েটারে যে সব নাটকের অভিনয় আমরা দেখেছি তা থেকে বলতে পারি যে অভিনয় ও নাট্য-উপস্থাপনার দিক থেকে চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গে ইয়োরোপের যে কোন থিয়েটারের তুলনা করা চলে। তাই চৌরঙ্গী থিয়েটারের নিন্দা করার বিষয় খুব কম; প্রশংসা করার বিষয়ই বেশী। চৌরঙ্গী থিয়েটারে এসে হতাশ হয়েছেন এমন দর্শকের সংখ্যা সামান্য, কিন্তু খুশি হয়েছেন এমন দর্শকই বেশি। চৌরঙ্গী থিয়েটারের টিকিটের দাম কমান হয়েছে। এ খুবই আনন্দের কথা। দাম কমানোর পর দু' রাত মাত্র অভিনয় হয়েছে। লক্ষ্য করা গেল টিকিটের দাম কমানোর ফল ইতিমধ্যে ফলতে সুরু করেছে। এর মধ্যেই দর্শকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় রাতে সত্যিই অভূতপূর্ব দর্শক সমাগম হয়েছিল। "মেরি ওয়াইভ অব উইন্ডসর" নামক কমেডি অভিনীত হয় এবং দর্শকরা অভিনয়ে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেছে বলা চলে।"

(ক্যালকাটা জার্ণাল থেকে অনূদিত।
২, ১০, ১৮১৮)

কলকাতায় দক্ষিণ পাড়ার অধিবাসীদের আমোদ-প্রমোদের ঋতু সুরু হয়েছে। থিয়েটার এবং লেডীজ এসেম্বলিতে ভিড় বাড়ছে। রূপসী ও ফ্যাসন বিলাসীদের কাছে এই সংগঠন দুটি খুবই প্রিয়। কিন্তু এতেও স্থান সংকুলান হওয়া মুস্কিল। শহরের অন্য স্তরের কিছু সংখ্যক অধিবাসীদের কাছে উপযুক্ত আনন্দ দিতে অসমর্থ বলে পরিত্যাজ্য। সম্প্রতি চৌরঙ্গীর মিউজিক্যাল পার্টিগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সপ্তাহে একদিন নাচের নূতন ব্যবস্থা করা হয়েছে। গতকাল রাত্রে চৌরঙ্গীর এক বিখ্যাত মহিলার বাড়ি এই নাচের ব্যবস্থা হয়। সকলে অপ্যায়ণ করা এবং আনন্দ দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে এই ভদ্রমহিলার। গত রাতের অনুষ্ঠানে যাঁরাই গিয়েছেন তাঁরাই যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছেন; সুরুচিতে মুগ্ধ হয়েছেন। ভারতবর্ষে শীত নামতে আর খুব বেশি দেরি নেই। আশা করা যায় আগামী শীতে শহরবাসীর আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠবে এই সব আসর।

(ক্যালকাটা জার্ণাল থেকে অনূদিত।
৯, ১০, ১৮১৮)

খগেন্দ্র দত্ত

মঞ্জুষা তো অবাক। বাড়ির ভেতরে এ শব্দই বা কিসের—আর খুকুই বা অমন করে উঠে গেল কেন বইপত্র ফেলে রেখে? তাহলে মেয়েটাকে যত বোকা মনে হয় ততটা বোকা নয়? রান্নাঘরে ঠাকুর কি ফেলেছে তাই কি দেখতে গেছে মেয়েটি? ওদের কি ক্ষতি করল তা জানার চেষ্টায় ছুটে গেছে? চিনে-মাটির ডিস না কাঁচের প্লেট ভাঙল দেখে আসতেই ছুটে গেল? আর গেল তো গেলই। কোথায় উঁকি মেরে দেখে ফিরে এসে লক্ষ্মী মেয়েটির মত বই-খাতা হাতে তুলে নেবে তা নয়, গেছে তো গেছেই। এতক্ষণ কি করছে কে জানে? কোন সাড়া-শব্দও তো নেই।

গলা ছেড়ে ডাকতে গিয়েও ডাকা হল না। দোরগোড়ায় দেখা গেল খুকুকে। চাকর কিংবা ঠাকুর কিছু ভেঙেছে বলে বিষণ্ণ তো নয়ই এমন কি মন খারাপের চিহ্নও নেই চোখে-মুখে। বরং তার বিপরীত। বেশ হাসিখুশী—বেশ উৎফুল্ল। কথা বলবে কি হেসেই আকুল। খিলখিল হাসি। হাসির সঙ্গে দুটো হাতের ইশারাও। মঞ্জুষাকে লক্ষ্য করে বলছে : দিদিমণি আসুন, দেখবেন আসুন......

বাকী কথা অনুচ্চারিত থেকে গেল। হাসির তোড়ে চাপা পড়ে গেল। এক ধমকানিতে ওর মুখের হাসি বন্ধ করে দেবে ভেবেও মঞ্জুষা নিজেকে সামলে নিল। দেখেই আসা যাক না কিসের জন্য খুকুর এমন পেটে খিল-ধরা হাসি। মঞ্জুষা চেয়ার ছেড়ে উঠতেই খুকু ভেতর-বাড়ির দিকে ছুটে গেল। নিমেষের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

মঞ্জুষা সেনের আগ্রহও কম নয়। নিশ্চয় ঠাকুর কিছু ফেলে দিয়েছে। থালা, ঘটি, বাটি কিম্বা অন্য কিছু অথবা নিজে পড়েছে। সটান লম্বা হয়ে। আর ঐ অবস্থায় ওকে দেখেই খুকুর এ উল্লাস, আনন্দ।

খুকুর পড়ার ঘরটার পরেই আর একখানা ঘর। সেটা এতদিন অনুমানের মধ্যেই ছিল। আজ দেখল মঞ্জুষা। সেই ঘরের দক্ষিণ দিকে ঠিক জানালার কাছে তক্তাপোষ। তার উপরে বিছানা। সেই বিছানায় শুয়ে আছেন খুকুর মা। অসুখে ভুগছেন। অসুখটা যে কি এখনও ধরা পড়েনি। তাই বলে চেষ্টার অন্ত নেই।

ডাক্তার দেখানো চলছে। এ খবর মঞ্জুষার জানা। খুকুর বাবাই জানিয়েছেন। দিন চার-পাঁচ আগে ওর মাইনেটা যখন দিতে এলেন তখনই কথায় কথায় ব্যাপারটা জানিয়ে গেছেন অনুপমবাবু। সঙ্গে সংসার করার জন্য আপশোসও করে-ছিলেন। হা-হুতাশ, সংসারে বড় জ্বালা। সমস্যার অন্ত নেই। একা মানুষ আর পেরে উঠছেন না। চারদিক থেকে নাজে-হাল হয়ে যাচ্ছেন।

সব শুনে ভদ্রলোকের স্ত্রীকে দেখবার বাসনা যে একবার মঞ্জুষার মনে উঁকি মারেনি তা নয়—কিন্তু করবে কি? যেচে গিয়ে দেখে আসাটা কেমন কেমন ঠেকেছে। বিবেক সায় দেয়নি। গায়ে পড়ে অন্তরঙ্গতা দেখানো কি ঠিক হবে? অনুপমবাবুর কথা আলাদা। সহজ সরল মানুষ। মনের কথা মনে রাখতে জানেন না। বিশেষ করে ব্যথা-বেদনার কথা। অপরকে শুনিয়ে নিজে হালকা হতে চান। সে সুযোগ নিয়ে মঞ্জুষা তার ঘরের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে গেলে আবার কি না কি ভাববেন কে জানে। হাজার হোক শিক্ষয়িত্রী। পাড়ায়ও তো ঐ পরিচয়। স্কুল-মিস্ট্রেস। ওর গতিবিধির একটা অলিখিত সীমানা আছে। সেই সীমানা লঙ্ঘন করলে লোকে ভাববে কি? নিজেরও তো একটা বিশেষ স্থান আছে এ বাড়িতে। একটা সীমারেখা আছে চলা-ফেরার। তার বেশী এগুবার কথা ভাবতে কোথায় যেন বাধ বাধ ঠেকে। অন্দর-মহলই তো নেচে আসবে ওর সঙ্গে পরিচয় করতে, ওর যেচে যাবার প্রয়োজন কোথায়? তাছাড়া এ পরিবারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ক'দিনের। মাত্র মাস দুই হল খুকুকে পড়াতে আসছে। দিন গুণতি প'য়ষট্টি দিন।

তবু একবার ঐ বিছানার রুগীর দিকে তাকাতে ভুল করল না মঞ্জুষা। ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন জানালার দিকে মুখ করে। হয়তো চিকিৎসকের নির্দেশ। মুক্ত আলো মুক্ত হাওয়া দরকার আছে হয়তো। ঘরের ও-দিকটা বেশ খোলা-মেলা। আকাশের বেশ কিছুটা অংশ দেখা যায়। এ মুহূর্তে হয়তো ঘুমিয়ে আছেন ভদ্রমহিলা। কিংবা বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যে তন্ময়। অথবা মনের সঙ্গে বোঝাপড়া।

মঞ্জুষার এ মুহূর্তের আকর্ষণ ভদ্র-মহিলা না, রান্নাঘর। তবু ঘরখানা পার হয়ে যেতে একটু দ্বিধা, একটু সঙ্কোচ বোধ হল। ঘরণীকে ডিঙিয়ে ঘর দেখতে যাওয়া যেন অশোভন। তবু কৌতূহল জয়ী হল।

পা টিপে টিপে সে ঘর পেছনে রাখল। এসে দাঁড়াল আর একটা দরজার কাছ বরাবর। সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গলা বাড়াল মঞ্জুষা। আরও ভেতরে উঁকি মেরে খুকুকে আবিষ্কার করতে চাইল। সামনেই এক ফালি বারান্দা। সেই বারান্দার এক ধারে হাত দুই উঁচু পাঁচিল-ঘেরা অল্প পরিসর জায়গা। সেই ঘেরার বাইরে দাঁড়িয়ে খুকু। ডানহাতের তর্জনী সেই ঘেরার ভেতরে। চোখ দিদিমণির মুখে। একটানা হাসির সঙ্গে অস্পষ্ট কথা : দেখে যান, দিদিমণি—দেখে যান।

মঞ্জুষা সেই দরজা পার হল। এগিয়ে গেল খুকুর কাছ বরাবর। গলা বাড়িয়ে দেখল পাঁচিল-ঘেরা ঘরটার ভেতর। দেখে চলে আসতে পারলেই ভাল হত, কিন্তু তার আগেই মুখ থেকে ফসকে গেছে একটি প্রশ্ন : কি দেখব ওখানে?

মঞ্জুষা কি জানতো যে অনুপমবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাবে। দুটো চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়বে মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা সাদা জিনিসগুলোর ওপর। শিউলি ফুলের মত ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা একরাশ ভাত, উনুনের পাশে উপুড় হয়ে থাকা এলুমিনিয়মের একটা হাড়িও।

তবু পেছিয়ে আসতে চাইল মঞ্জুষা। কিন্তু পারল কোথায়? অনুপমবাবু কি বলছেন তা না শুনে ফিরে আসা যায় কি করে? আর বলেন কেন, কপালে যে দুর্ভোগ লেখা আছে তা তো ভোগ করতেই হবে......বলতে গিয়ে ডানহাত-খানাই তুলে ধরলেন; বাড়িয়ে ধরলেন : দেখুন না, হাতটাও পুড়ে একাকার।

হাত পুড়েছে......কথাটা নিজের অজ্ঞান্তেই উচ্চারণ করে বসল মঞ্জুষা। শুধু উচ্চারণই করল না, উদ্বেগও মিশে গেল সেই উচ্চারণের সঙ্গে। খানিকটা সহানুভূতির মিশেল। ওখানেই থামল না, মঞ্জুষা? আরও এগুল। দুজনের মাঝ-খানে সামান্যতম যে দূরত্ব তাও ঘুচিয়ে এগিয়ে গেল। ভুলে গেল যে ও এ গৃহের শিক্ষয়িত্রী। ভুলে গেল যে ওর স্থান বাইরের ঘর পর্যন্ত, রান্নাঘরে নয়।

খুকুর হাসিও থেমে গেছে। হাসির বদলে কালির ছিটে। বাবার হাত পুড়ে গেছে শুনে মন খারাপ হল। ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল দিদিমণির মত।

কোথায়? শুধু কি হাত পুড়েছে না দেহের অন্যত্রও? নারকেল তেলের শিশিটা কোথায়? মঞ্জুষা ব্যস্ত হয়ে উঠল : নারকেল তেল লাগিয়ে দিলে ফোস্কা পড়বে না।

খুকুই নিয়ে এল শিশি। সে শিশি নিজের হাতে নিল মঞ্জুষা। বাঁ হাতে ধরল অনুপমবাবুর হাত। প্রথমে হাত তারপরে কব্জি। ডানহাতে ঢালল নার-কেল তেল। তার পরেই সরিয়ে রাখল শিশি। হাত ধুয়ে নিল পাশে রাখা বালতির জলে। এদিক-ওদিক না তাকিয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে বসে পড়ল। স্তুপীকৃত ভাতের রাশ থেকে কিছুটা তুলে নেবার চেটা করতেই বাধা দিলেন অনুপমবাবু : একি করছেন?

করছি ঠিকই......আপনি একটু সরে বসুন......কথার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভাত তুলে নিল আলতো হাতে। রাখল ভাতের হাড়িতে। বাকিটা তোলার উপায় নেই। কলিশুদ্ধ উঠবে। মুখে দেওয়ার অযোগ্য। মেঝেটা মুছে নিল মঞ্জুষা, মুছল ভাতের হাড়ি। চকচকে ঝকঝকে করে তুলল। বসে বসে দেখলেন অনুপমবাবু নির্বাক দর্শকের মত। কথা বলল মঞ্জুষা : রান্নার জন্য লোক রাখতে পারেন না? এমন করে হাত-পা পুড়ে কি লাভ?

লাভ আছে বৈকি! মঞ্জুষার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীর শান্ত গলায় বলতে লাগলেন অনুপমবাবু : একটা লোক রাখতে গেলে কত টাকা খরচা জানেন? তার খাওয়া, তার মাইনে—সব মিলে কম করে পঞ্চাশ।

আনাড়ি মানুষের টাকা যাওয়াই ভাল......আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসির সঙ্গে বলল মঞ্জুষা : পঞ্চাশ টাকা বাঁচাতে ডাক্তারের পকেটে যখন কয়েক শো যাবে?

মঞ্জুষার কথার উত্তর দিতে গিয়ে অনুপমবাবু বললেন : সব বুঝি মিস সেন। কিন্তু কি করব বলুন, মাসে পঞ্চাশ টাকা চাকরের পেছনে খরচা করার সঙ্গতি কোথায়? ও ঘরে রোগীর পেছনে কি আন্দাজ ঢালতে হচ্ছে জানেন? আয় তো সওদাগরী আফিসের কেরাণীগিরি।

আয়ের অঙ্কটা না জানলেও আন্দাজ করতে পারে মঞ্জুষা। তাই কিছু বলে না। কিছু বলা মানে কথা বাড়ানো। লাভ নেই। কাছাকাছি একটা বাটিতে পোয়াটাক ডাল ছিল, সে ডাল উনুনের কড়াইয়ে ঢেলে দিয়ে অনুপমবাবুর মুখে তাকাল। কয়েকটি পলক তাকিয়ে থাকল। লোকটি বেশ। নিরহঙ্কার, মিষ্টভাষী। কোন-কিছু ঢাকতে চেষ্টা করেন না। লুকো-চুরিও না। তবু এমন একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে সমীহ কেন মঞ্জুষার ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ও। কেন অযথা এ সঙ্কোচ কে জানে? কয়েকটি মুহূর্ত চুপচাপ কেটে যাওয়ার পর মঞ্জুষা বলল : আর কি রান্না করবেন দিন।

এবার একটু সিরিয়স হয়ে উঠলেন অনুপমবাবু। মুখের হাসি বশে আনলেন। গলার স্বর অপেক্ষাকৃত ভারী করে বললেন : তা হয় না মঞ্জুষা দেবী...আপনি এবার উঠুন।

কেন? মঞ্জুষার গলার স্বর তখন বেশ পরিহাস-তরল : আবার কিছু পুড়ে হাস-পাতাল পর্যন্ত দৌড়াবার ইচ্ছে আছে বুঝি?

না, না সে রকম কোন ইচ্ছে আমার নেই। অভ্যাস করতে দিন। ভবিষ্যতে

কাজে লাগবে। বরং একটু সাবধানে করব। শিখে রাখা ভাল।

শিখে রাখবেন না ছাই.........মঞ্জুষার গলা থেকে পরিহাসের সুর উধাও হয়ে গেল, এমন কি মুখের হাসিও ঃ সাবধানী লোক হলে কি এ রকম করে হাত পুড়ে বসেন?

মৃদু হাসলেন অনুপমবাবু।

হাসল মঞ্জুষাও। বলল ঃ কলম ঠেলার হাত দিয়ে কি খুন্তি ঠেলা যায়?

যায় মঞ্জুষা দেবী......এটা এক্সিডেন্ট ছাড়া আর কিছু না। এবার আপনি উঠুন, তরকারিটা আমিই রান্না করতে পারব।

না উঠলে হাত ধরেই তুলে দেবেন এমন একটা ভাব অনুপমবাবুর, এমন কি কণ্ঠস্বরেও তার সমর্থন। এ প্রকৃতির লোকগুলো সব পারে। গত দু'মাসের কথায়-হাসিতে-ব্যবহারে বুঝে নিয়েছে মঞ্জুষা। হোলই বা মঞ্জুষা শিক্ষয়িত্রী। অনুপমের কাছে ওর সে আসন নেই। কতকটা অসাধারণ নারী মাত্র। দূরে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, আবার দূরে ঠেলে সম্মানের প্রত্যাশীও নয়। কাছে টানতে চান আপন-জনের মত, মিশতে চান বন্ধুর মত। এতকাল শুধু নাটকে-নভেলেই পেয়েছে মঞ্জুষা এ ধরনের চরিত্রের হদিশ, এবার বাস্তবে। চোখের সামনে, জীবনের আঙিনায়।

শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল মঞ্জুষা। পা পা করে বাইরে এল। রান্নাঘর ছাড়তেই নিজের সম্বন্ধে সজাগ হল। খানিকটা যে বেশী এগিয়ে গিয়েছিল তা বুঝতে পারল। তাই বলে একেবারে নীরবে সরে যাওয়া যায় না। অশোভন। গলা বাড়িয়ে বলল ঃ আপনি তাহলে রান্না করুন, আমি চলি...........

অনুপমবাবু মাথা নাড়লেন। হাসলেন ওর দিকে তাকিয়ে। মঞ্জুষা আর দাঁড়াল না। পা পা করে বাইরের ঘরে এল। সঙ্গে সঙ্গে খুকুও। পড়াবার জন্য বই হাতে তুলে নিল বটে কিন্তু একটি লাইনও পড়াল না। বইয়ের পাতায় চোখ রাখল বটে—মন দিতে পারল না। বার বার উন্মনা হয়ে যেতে লাগল। ঘুরে-ফিরে মনের মধ্যে এক প্রশ্ন। কেন রান্নাঘর পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল ও? খুকুর ডাকে মনের মধ্যে কৌতূহল মাথা-চাড়া দিতে পারে, আর সে কৌতূহলের আকর্ষণে এগিয়ে যেতে পারে, তাই বলে রান্নাঘরের কাজে হাত লাগাতে গেল কেন ও? কি প্রয়োজন ছিল এতটা হৃদ্যতা, এতটা মাখামাখির? এ জাতীয় সহস্র প্রশ্ন মনের সামনে ভিড় করে এল। শুধু ভাবনা, এলো-মেলো অসংলগ্ন প্রশ্নের মিছিল। ওকে? খাতার উপরে পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটতে লাগল। এভাবে কতক্ষণ কেটে গিয়েছিল কে জানে, যখন খেয়াল হল তখন বেলা ন'টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে রেখে উঠে দাঁড়াল। স্কুলের সময় হয়ে গেছে।

বিকেলে পড়াতে এসে দেখল ছাত্রীর সিট খালি। কিন্তু কেন? এমন তো কোন-দিন হয় না। খুকু তো বইপত্র নিয়ে এখানেই বসে থাকে। আজ নেই কেন? এ ব্যতিক্রমের কোন হেতু খুঁজে পেল না মঞ্জুষা। দরজায় গলা বাড়িয়ে খুকুর নাম ধরে ডাকবে না চুপচাপ সিটে বসে থাকবে প্রথমটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না মঞ্জুষা। শেষ পর্যন্ত ডাকতে যাবে এমন সময় দরজায় খুকুর মুখ ভেসে উঠল। মঞ্জুষার দিকে তাকিয়ে শান্ত করুণ গলায় বলল ঃ দিদিমণি, একবার এদিকে আসুন না।

সকালবেলার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভেবে গম্ভীর হল মঞ্জুষা। কিন্তু তা তো হয় না। খুকুর বাবার তো ফিরে আসার সময় নয় এখন। তাছাড়া খুকুর চাহনী, খুকুর গলার স্বরও এক নয়। তাহলে কি অন্য কোন অসুবিধা? ওর মার কি খুব বাড়াবাড়ি? ডেকে ডেকে সাড়া-শব্দ না পেয়েই কি ওকে ডাকতে এসেছে? হয়তো তাই। বলল ঃ কি হয়েছে?

মার ওষুধটা ঢালতে পারছি না......

খুকুর চোখে-মুখে গলার স্বরে অসহায় আকুতি ঃ ওষুধ খাওয়ানোর সময় হয়েছে।

ঘরের ভেতর পা দিয়ে মঞ্জুষা দেখল ভদ্রমহিলা আজও একইভাবে শুয়ে আছেন। সেই জানালার ধারে, বাইরের দিকে চোখ। মঞ্জুষা কাছে আসতেই পাশ ফিরলেন, তাকালেন ডাগর ডাগর দুটো চোখ মেলে। কত আর বয়েস, ওরই বয়েস বড় জোর। এরই মধ্যে শেষ হতে চলেছে সব। জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পৃথিবীর রূপ-রস, দৈনন্দিন বৈচিত্র্য সবকিছুর উপরে যবনিকা নেমে আসছে। চোখ দুটো গর্তে। নীচে কালির পোঁচ। গলার কাছটায় দেখেই মনে হল ওর দেহের সব হাড় গোনা যাবে একটা একটা করে।

খুকু হাতে তুলে নিয়েছে ওষুধের শিশিটা। মঞ্জুষা কাছে গিয়ে নিজের হাতে নিল। ওষুধটা ঢালতে গিয়ে মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। মেয়ে-মন বলেই হয়তো স্বভাবজাত দুর্বলতায় কোমল হয়ে গেল। সেই কোমলতার উপরে যেন কেউ একটা আঁচড় কাটল।

ওষুধ ঢেলেই শুধু দায় সারল না মঞ্জুষা। খাইয়েও দিল। কথা বলল ঃ শরীরটা বড় দুর্বল আপনার না?

হ্যাঁ ভাই, দেখতেই পাচ্ছেন। আপনি এসেছেন দু'মাস অথচ একটা দিনও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি।

কি করবেন বলুন, অসুখটা তো আর নিজের ইচ্ছায় আসেনি।

হঠাৎ যে কি হল কিছুই বুঝতে পারছি না। দু-দুটো ডাক্তার পর্যন্ত হিম-শিম খেয়ে যাচ্ছেন। কিছুতেই অসুখটা ধরতে পারছেন না।

তার জন্যে আপনি ভাববেন না। অসুখ নিশ্চয় সেরে যাবে। খুকু চল......

চললেন কেন, বসুন না। দেখুন না, একটা কথা বলারও লোক নেই। সারাদিন বোবা হয়ে.........

কিন্তু আপনার যে কথা বলা বারণ।

বারণ তো অনেক কিছুই, সব মানতে গেলে বাঁচি কি নিয়ে?

এভাবে আর ক'দিন? অসুখ সারলে তখন তো আর সর্ত-বিধি-নিষেধ থাকবে না। আর কটা দিন ধৈর্য ধরুন......

ধৈর্য আর নেই ভাই। মরলেই যেন বাঁচি। যত ভাবনা শুধু মেয়েটাকে নিয়ে। তবু আপনি এসেছেন পর থেকে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি।

খুকুর ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যে দায়িত্ব নিয়েছি তা আমি ঠিক পালন করব।

তাই করবেন ভাই......দুর্বল দু'খানা হাত তুলে মঞ্জুষার ডান হাতখানা ধরলেন ভদ্রমহিলা। অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। অস্পষ্ট গলা, কিছু বোঝা যায় কিছু বোঝা যায় না। চুপচাপ শুনল মঞ্জুষা। শেষ পর্যন্ত বলল ঃ ওর পড়া-শুনার জন্য অত ভাববেন না। সেজন্য আমি আছি।

এই আশ্বাসবাণীতেও বোধ করি আশ্বস্ত হতে পারলেন না ভদ্রমহিলা। ঘরের সব অসুবিধার কথা বললেন। শুধু খুকুর নয়—খুকুর বাবারও। কিন্তু কি করবেন, ও'র নিজের উঠে বসবার ক্ষমতা যদি থাকত। আবার আশ্বাস দেয় মঞ্জুষা। শুধু খুকুকে দেখবার আশ্বাস নয়—ভদ্র-মহিলাও যে সেরে উঠবেন সে আশ্বাসও। তারপর উঠে যায় বাইরের ঘরে।

পরদিন সকালে পড়াতে এসে অকারণেই একবার ঘরের ভেতর ঢুকল মঞ্জুষা। খুকুর মা শুয়ে আছেন চুপচাপ নির্জীবের মতো। মঞ্জুষা কাছে গেল। মাথার পাশে বসল। কপালে হাত রেখে বলল ঃ কেমন আছেন?

দুটো চোখ মেললেন ভদ্রমহিলা। ম্লান বিষণ্ণ মুখে হাসির ছোঁয়া লাগল। সে হাসিও নিষ্প্রাণ। বললেন ঃ আগের মতই দুঃসহ.........

তারপর দু' চারটে কথা নিতান্ত গতানুগতিক। গতদিনের কথারই পুনরাবৃত্তি। এক সময়ে এসে খুকুকে পড়াতে বসলেও মনটা উসখুস করতে লাগল। অনুপমবাবু কি করছেন একবার দেখে এলে হতো না? আজও কি কাল-

কেরই মতো রান্না করছেন নিজের হাতে? আর নিজের অনভিজ্ঞতার জন্য ফেন ফেলতে গিয়ে ভাতই ফেলে দিয়েছেন? কিন্তু মন চাইলেই তো যাওয়া যায় না। ইচ্ছে করলেই তো লোকটার সামনে গিয়ে হুট করে দাঁড়ানো যায় না।

সামনে গিয়ে না দাঁড়ালেও খোঁজ-খবর নিতে ভুলে থাকে না মঞ্জুষা। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে খুকুর কাছে প্রশ্ন করতে ভুল করে না। কি রান্না হয়েছিল, কে রান্না করেছিল?

এভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন খুকুর মার ওষুধটা ঢেলে দিয়ে উঠে আসবার সময় কেন কে জানে, রান্নাঘরের দিকে একবার উঁকি মেরে দেখে আসবার লোভ সংবরণ করতে পারল না মঞ্জুষা।

আর সে মুহূর্তে ভাতের ফেন ফেলতে তৈরী হচ্ছিলেন অনুপমবাবু। তাঁর আনাড়িপনায় মঞ্জুষার হাসি পেল। কিন্তু হাসতে পারল না। হাসির চেষ্টাই সার হল। নিজেরই অজান্তে বলে উঠল: উহুঁ......ওরকম করে নয়......... বলতে বলতে এগিয়ে গেল সামনে। এগিয়ে গিয়ে ভাতের হাড়িটা নিজেই ধরল। ফেন ফেলে হাত খালি হতেই তরকারিটা বসিয়ে দিল উনুনে।

বাধা দিতে চেষ্টা করলেন অনুপমবাবু কিন্তু সে বাধা মানে কে? এদিকে নিজেও অনভিজ্ঞ। বাসায় ঝিয়ের হাতেই এ বিভাগের দায়িত্ব। তবু নিজের সহজ-বুদ্ধি বলে একটা কিছু আছে তো! সেটাকেই কাজে লাগাল। নুন, হলদে, লংকা দিল—উনুনের আঁচে হাওয়া দিল। বেরিয়ে এল রান্না শেষ করে। বেলা তখন নটা। ঘড়ি দেখেই চঞ্চল হয়ে উঠল মঞ্জুষা। এখান থেকে গিয়ে স্নান, খাওয়া, তারপর স্কুল। আর দেরী করা চলে না।

পরদিন খুকুকে পড়াতে আসতেই সেখানে এসে দাঁড়ালেন অনুপমবাবু। হাসি-হাসি মুখ। হাতে মশলা বাটার জাফরানি রং। শুধু কি হাতে, পরনের কাপড়ের এখানে সেখানেও। মঞ্জুষা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, দেখে মনটা কেমন করে উঠল। বুকের ভেতরে একটা মোচড়! কি কষ্টই না হচ্ছে ভদ্রলোকের। এমন দুঃসময়ও আসে মানুষের জীবনে?

অনুপমবাবু এসে টেবিলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তাকালেন মঞ্জুষার মুখের দিকে। অন্য দিন হলে চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিত মঞ্জুষা। আজ সরাল না। এমন কি সরিয়ে নেবার চেষ্টাও করল না। অনুপমবাবুই মুখ খুললেন: খুকুর মা কি বলছিল জানেন?

কি? মঞ্জুষা ছোট্ট একটি প্রশ্নে জানতে চাইল।

আপনার মত মেয়ে নাকি হয় না। এতটা লেখাপড়া শিখেছেন, সমাজে কত উঁচু আসন তবু নাকি একটুও অহংকার নেই আপনার।

তাই নাকি? মাথা নীচু করল মঞ্জুষা। একি খুকুর মার কথা না সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির, কে জানে। নিজের স্তুতি স্ত্রীর নামে চালিয়ে দিতে বিচিত্র কি! মনের জিজ্ঞাসা মনেই থাকল, হাতের বইখানা নাড়াচাড়া করল। লজ্জা আর উত্তর খুঁজে বেড়াবার প্রয়াসই বুঝিবা।

অনুপমবাবু তখনও বলে চলেছেন, একটুও না থেমে: খুকুর মা কেন, আমারও তাই মত। আপনি আমার বাড়ির শিক্ষয়িত্রী, কত সম্মানের আসন আপনার। কত উঁচুতেই বসে থাকবেন। অথচ আশ্চর্য, আপনি সে আসন থেকে নেমে এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মনে হয় যেন আপনি আমাদের পরিবারেরই একজন, যেন কতকালের আত্মীয়।

অনুপমবাবুর দুটো চোখ চকচক করে উঠল। ভরাট দুটো গালে রক্তের উচ্ছ্বাস। মঞ্জুষার মুখখানা আরও নীচু হল। আগের চেয়েও। আর একটু হলে যেন গিয়ে টেবিলে ঠেকবে। চুল নয় শুধু, কপালও স্পর্শ করবে কাঠ।

সে অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে উঠতে কতক্ষণ? চেষ্টা করেই মুখ তুলল আস্তে আস্তে। তারপর অনুপমবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: এদিকে আমার প্রশংসায় মশগুল, ওদিকে রান্নার কি হয়েছে?

ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ......হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছেন এমন ভঙ্গি করলেন অনুপমবাবু: ওদিকে যে ভাত বসিয়ে এসেছি সে কথা আমার খেয়ালই নেই।

এই বুঝি সাবধানী মানুষের পরিচয়? ছোট্ট একটা খোঁচা দিল মঞ্জুষা।

সেই খোঁচা খেয়ে হাসলেন অনুপমবাবু। বললেন: আসছি, একটু পরেই...

অনুপমবাবু ঘর ছেড়ে গেলেও তাঁর ভাবনা যায় না। বসে বসে ওর কথাই ভাবে মঞ্জুষা। বেশ লোক। এ বয়েসের মানুষগুলো মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে কত সংকোচবোধ করে, কত কুণ্ঠা? আর এই মানুষটা?

সেদিনও একবার রান্নাঘরটা ঘুরে আসবার ইচ্ছে মনে জাগলেও যাওয়া হল না। যেতে পারল না। মনে সংকোচ। অথচ না গিয়েও স্বস্তি নেই। লোকটা কি করছে কে জানে?

যাবে কি যাবে না ভেবে ঠিক করবার আগেই অনুপমবাবু এলেন আবার। বললেন: কপালে কি আছে জানি না মঞ্জুষা দেবী, এই বাচ্চা মেয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াব?

সহজ হবার চেষ্টা করল মঞ্জুষা। সফলও হল। অনুপমবাবুকে সাহস দিতে গিয়ে বলল: আপনি অমন করে ভেঙে পড়বেন না অনুপমবাবু। চিকিৎসা করালেই খুকুর মা ভাল হয়ে উঠবেন। আপনি ডাক্তার বদলান।

অনুপমবাবুও আশ্বস্ত হন। কথা বাড়ান না আর। চুপ করে থাকেন। কিংবা অন্য কথা বলেন, অন্য প্রসঙ্গ।

মঞ্জুষা ইদানীং আরও সহজ আরও সরল। খুকুর মার কাছে গিয়ে বসে। গল্প করে গল্প শোনায়। ওষুধ ঢেলে দেয়, খাইয়ে দেয়। সাহস দেয়—আশার আলো দেখায়। একবেলা নয়—দিনে দুবেলা। সকাল বিকেল।

তা বলে কি অনুপমবাবুকে ভুলে থাকা যায়? কি অমানুষিক খাটুনিই না খাটছে মানুষটা, ঘরে বাইরে সমানে। যাবে না ভেবেও আবার রান্নাঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সাহায্য করে। শুধু কি রান্নার কাজে, ঘরের এ কাজে ও কাজেও। অনুপমবাবু কথায় কথায় বলেন: আপনি আমাদের জন্য কি কষ্টটাই না করছেন।

কোথায় কষ্ট?

কষ্ট বই কি। খুকুকে পড়িয়ে আমার সংসারের কাজও অর্ধেক করে দিচ্ছেন। তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না, কিন্তু স্বীকার না করেও স্বস্তি পাচ্ছি না।

ধন্যবাদের দরকার কি!......মঞ্জুষাও উত্তর দিতে দেরী করে না। হাসতে হাসতে বলে: আমি তো আপনাদের আপনজন মনে করেই করছি।

অনুপমবাবুর চোখে আলো জ্বলে, মুখের উপরে আবিরের ছোপ লাগে। আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলেন: তাই করুন মঞ্জুষা দেবী, এই ঘর, এই মেয়ে নিজের মনে করেই দেখাশুনা করুন—তাহলে আমি একটু স্বস্তি পাই।

মঞ্জুষার মুখ আনত হয়। চুপ করে থাকে। অনুপমবাবুর কথার অর্থ খুঁজে বেড়ায় নিজের মনের মধ্যে। ঐ কথাটির কি কি অর্থ হতে পারে ভাবে। এক সময় বলে: তাই তো করছি......নিজের মনে করি বলেই তো।

মাঝপথে থেমে যায় মঞ্জুষা। থামেন না অনুপমবাবু। দুটো চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি ওর মুখের উপর স্থির রেখে বলেন: ভবিষ্যতেও যে করবেন এ আশ্বাস কোথায়।

মঞ্জুষা আবার অপ্রস্তুত। কি লোকরে বাবা। লজ্জাসরমের বালাই নেই। কোন
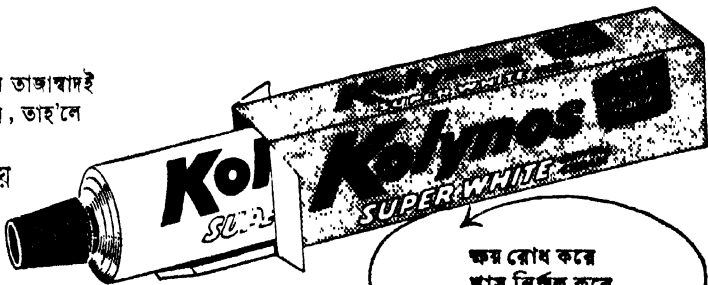
কথা থেকে লাফিয়ে কোন কথায় গিয়ে পড়ে তা বোঝা মুস্কিল। ঐ কথার অর্থ খুঁজে বেড়াতে হয় না। পরিষ্কার কথা। অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু বলেন কি করে। ভাবতে গিয়ে নিজের চোখে-মুখেই লজ্জার ছোপ লাগে মঞ্জুষার। দুটো গণ্ডে কুমকুমের ছিটে।

এমনি করেই দিনগুলো গত হয়। এ পরিবারের সঙ্গে আরও সহজভাবে মেশে মঞ্জুষা। আরও ঘনিষ্ঠ হয়। খুকুর মার অসুখ সারছে না। ডাক্তার পাল্টানো হয়েছে। সেই নতুন ডাক্তারবাবুও নাজেহাল। ফটোর পর ফটো নিচ্ছেন, ইঞ্জেকসনের পর ইঞ্জেকসন। তবু রোগের নিরাময় নেই। সেই দুর্বলতা, সেই ক্লান্তি। ডাক্তারবাবু অন্য কথা বলেন : অসুখ সেরেছে। শরীর সারাতে হলে স্থানান্তরে যেতে হবে। শরীর বড় দুর্বল। সেজন্যে উঠতে বসতে পারে না। চলা-ফেরা করতে পারে না। দরকার হাওয়া বদলানো।

অনুপমবাবুর মনে দ্বন্দ্ব। বাইরে যাবেন কি যাবেন না। এ রোগী যে কোনদিন বিছানা ছেড়ে উঠবে সে বিশ্বাস তাঁর নেই। ওষুধ আর ইঞ্জেকসনের জোরে কথাবার্তা বলতে পারছে বলেই ভাল হয়ে গেছে রোগী? ডাক্তারের কথার উপরেও সন্দেহ। অসুখ সেরেছে বলে ওর মনে হয় না। সেরেছেই যদি দেহে মাংস লাগে না কেন? সুনন্দার শরীরের নমুনা কি এই? এক বছর আগের সুনন্দাকে আজকের সুনন্দার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কি? অসুখই হয়তো সারেনি। আসলে ডাক্তারবাবুই ভুল করছেন। কিংবা বুঝেও গোপন করার চেষ্টা। মিথ্যা আশ্বাসে আশ্বস্ত করার প্রয়াস।

আশ্বাস মঞ্জুষাও দেয়। আপনি ডাক্তারবাবুর কথা শুনুন। চেঞ্জে যান, অসুখ নিশ্চয় সারবে।

সারবে না ছাই। আসলে কোন ডাক্তারই অসুখ ধরতে পারেন নি।

মঞ্জুষার মনের কথাও তাই। কিন্তু প্রকাশ করা ঠিক নয়। বরং ভরসাই দেয় : ডাক্তার যা বলে, তাই তো আমাদের শুনতে হবে অনুপমবাবু। তাছাড়া আর উপায় কি?

অনুপমবাবুর চোখে তখনও অবিশ্বাসের ঘোর। এত ওষুধে, এত টাকা খরচায় যার শরীরে মাস লাগল না তার শরীর সারবে মাস খানেকের জন্য বাইরে গেলেই? এত ওষুধে আর ইঞ্জেকসনে যার দেহে একটুও পরিবর্তন আনল না তার শরীরে আগের রূপ-যৌবন ফিরে আসবে মাসখানেকের জন্য বাইরে গেলেই? হাওয়া বদলালেই যদি হারানো দেহ তার জৌলুস ফিরে পাওয়া যেত তাহলে তো আর কথাই ছিল না। শেষ পর্যন্ত আবার মধ্যস্থ মানে মঞ্জুষাকে : আপনিও বলছেন বাইরে যেতে? গেলেই ওর শরীর সারবে?

মঞ্জুষার মনেও সন্দেহ। তাই বলে সে সন্দেহ তো বাইরে প্রকাশ করা যায় না। ভয়ের দিনে অভয়ের বাণী শোনানোই তো বন্ধুর কর্তব্য। হিতাকাঙ্ক্ষীর দায়িত্ব। শেষ পর্যন্ত আমতা আমতা করে বলে : সারবে, আমার বিশ্বাস সারবে।

শেষ পর্যন্ত চেঞ্জে গেলেন অনুপমবাবু। যাবার দিনে মঞ্জুষাও এসে হাজির হয়। জিনিসপত্র গুছিয়ে দেয়। এমন কি ষ্টেশন পর্যন্ত যায় ওদের সঙ্গে। গাড়িতে তুলে দেয়।

একান্তে পেয়ে অনুপমবাবু বললেন : চিঠিপত্র লিখবেন নিশ্চয়?

মঞ্জুষা নীরব। কয়েকটি লহমা কেটে গেলেও কোন উত্তর নেই।

কথাটা আবার বলেন অনুপমবাবু : কৈ, উত্তর দিচ্ছেন না যে?

তা কি করে হয় অনুপমবাবু, খুকুর মা থাকছেন সঙ্গে; তিনি কি মনে করবেন।

কিছুই মনে করবেন না; সে জানে আপনি আমাদের কত আপনজন। বলুন লিখবেন? কথা দিন.........

কথা না দিয়ে উপায় কি? ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এল। অথচ লোকটার তরফ থেকে উঠবার কোন তাগিদ নেই। প্ল্যাটফর্মে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখলে মনে হবে গাড়িতে বসা ভদ্রমহিলাকে তুলে দিতে এসেছেন ওরা দুজনে। কিংবা ঐ ট্রেনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। একান্তে দাঁড়িয়ে কথা বলতেই যেন এসেছেন। ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। অনুপমবাবু তখনও দাঁড়িয়ে। মঞ্জুষার মুখ থেকে প্রতিশ্রুতি না নিয়ে যেন নড়বেন না। শেষ পর্যন্ত মঞ্জুষা বলল : আপনি পৌঁছে সংবাদ দেবেন, আমিও লিখব।

সত্যি বলছেন?

সত্যি।

প্রথম চিঠির জবাব না দিলেও দ্বিতীয় চিঠির দিল। তার উত্তর এল সপ্তাহের মধ্যেই। তার প্রতি-উত্তরও পাঠাল মঞ্জুষা। এভাবে চিঠি লেখালেখি চলল। অনুপমবাবুর চিঠিতে ব্যক্তিগত কথা। আর মঞ্জুষা? তাকে বাধ্য হয়ে অন্য পথ ধরতে হয়। রাজগীর জায়গা কেমন? জল-হাওয়া খারাপ কি ভাল? খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা কেমন? জিনিসপত্রের দাম কি রকম। কলকাতার তুলনায় বেশি না কম? খুকুর পড়াশুনো কেমন চলছে?

চিঠি লিখতে বসলে একটি কথা বার বার মনে আসে মঞ্জুষার। সে কথা কিন্তু লিখতে পারে না। সে প্রসঙ্গ খুকুর মার। লিখতে সাহস হয় না। কি জানি কি উত্তর আসে। আশার না নিরাশার। কেন এমন হয় বুঝতে পারে না। নিজেই তো অনুপমবাবুকে ভরসা দিয়ে, সাহস দিয়ে বাইরে পাঠিয়েছে।

খুকুর মা ভাল হবে, তাঁর শরীর সারবে। অথচ সেই সুখবরটাকে এত ভয় কেন বুঝতে পারে না মঞ্জুষা।

দেখতে দেখতে দুটো মাস কেটে গেল। অনুপমবাবুর ছুটি শেষ। ফিরে আসছেন কলকাতায়।

গাড়ি ইন করতেই জানালায় গলা বাড়ালেন অনুপমবাবু। কাকে যেন খুঁজে বেড়াল তাঁর দৃষ্টি। গাড়ির গতি স্তব্ধ হতেই নেমে এলেন। প্ল্যাটফর্মটা ঘুরে দেখলেন। অযথা দেরী করলেন ট্যাক্সি নিতে। সর্বক্ষণ যেন উন্মনা হয়ে রইলেন। যা আশা করেছিলেন তা যেন হল না।

বাড়ি এসেও তিন দিন কাটল। প্রতি দিন আশা করলেন মঞ্জুষাকে। মঞ্জুষা এল না। তাহলে কি শেষ চিঠি পায়নি? শেষ চিঠিতে তো ফিরে আসছে এ খবর দেওয়াই ছিল। যে তারিখে গাড়ি ধরছেন সেই তারিখ, কবে কখন ষ্টেশনে আসছেন তারও উল্লেখ ছিল। এমন কি কোন সময় গাড়ি ইন করবে তাও। তবু এল না কেন বুঝে উঠতে পারলেন না অনুপমবাবু।

দিন তিন-চার পরে নিজেই গেলেন। একা থাকেন মঞ্জুষা দেবী। অনুপমবাবু যখন গিয়ে হাজির হলেন তখন ঘরে ছিল না মঞ্জুষা সেন। স্নান করতে গিয়েছিল। ঝি বসতে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে হাজির হলো। সবেমাত্র স্নান সেরেছে। কালপাড় শাড়ি পরনে, গৌরবর্ণ দেহে আভরণ নেই বললেই চলে। একান্ত যা না থাকলে চলে না তাই আছে। গলায় এক গাছা স্বর্ণ-হার। সকালের প্রশান্ত আলোয় চিকচিক করছে। মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। সবুজ ঘাসের মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথের মত সীঁথি। কিন্তু মুখের সে লাবণ্য কোথায়? কোথায় দু' মাস আগের সে একফালি কমনীয়তা?

বিষণ্ণ ম্লান মুখেও হাসি টানতে চেষ্টা করে সামনে এল মঞ্জুষা। নমস্কার বিনিময় হল সহাস্যে। কিন্তু সে হাসিতে ঔজ্জ্বল্য কোথায়? ভেতর থেকে যেন নিভে গেছে মঞ্জুষা সেন, কোন একটা আশাভঙ্গের বেদনায় যেন দুটো চোখ নিষ্প্রভ, দ্যুতিহীন।

তবু জোর করে হাসি ফোটাল মঞ্জুষা। সামনের চেয়ারে বসল। কিছুক্ষণ

কাটল নীরবে। মুখোমুখি বসে নির্বাক দু'জনে। এক সময় মুখ খুলল মঞ্জুষা। প্রশ্ন করল ঃ কি দেখছেন?

আপনাকে।

কেমন দেখছেন বলুন—সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলল মঞ্জুষা সেন।

কি বললে আপনি খুশী হবেন আগে তাই বলুন।

যা হয় একটা কিছু বললেই তো পারেন।

মঞ্জুষার কথায় যেন বেদনার আভাস। শুধু কি কথায়—চোখে-মুখেও।

অনুভব করেও নিরাসক্তের মত অনুপমবাবু বলেন ঃ কেমন আছেন?

ভালো.........

ভালো থাকার চেহারা কি এই? অনুপমবাবুর গলায় উদ্বেগ ঝরল ঃ আপনার কি হয়েছে বলুন তো? অসুখ-বিসুখ করেছে বলেও তো জানান নি।

ওসব কথা থাক অনুপমবাবু......

কেন? আপনার চেহারা খারাপ হলে আমাদের বুঝি মন খারাপ হতে নেই?

নিজেকে আর সামলাতে পারল না মঞ্জুষা। দারুণ অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে উঠল ওর মন। তবু যতদূর সম্ভব সংযত হয়ে বলল ঃ ঐ প্রসঙ্গ বাদ দিন অনুপম-বাবু। বরং আপনার খবর বলুন।

কোন কথা বললেন না অনুপমবাবু। শুধু দুটো চোখ খোলা রেখে চুপ করে থাকলেন। মঞ্জুষার মুখে তাকিয়ে থাকলেন। মঞ্জুষাকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে, মঞ্জুষা যেন বদলে গেছে।

মঞ্জুষাও চুপ। একটি কথা জিজ্ঞেস করার বড় ইচ্ছে, বড় আকুলি বিকুলি। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে না। চিঠি'তে যেমন বার বার এড়িয়ে গেছে, সযত্নে গোপন করে গেছে একটি প্রসঙ্গ, আজ আলোচনা থেকেও দূরে রেখে চলেছে সে প্রসঙ্গটাকে।

কিন্তু কতক্ষণ এড়িয়ে চলা যায়? শেষ পর্যন্ত জিভের ডগায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু আটকে গেল। তার বদলে অন্য প্রশ্ন ঃ খুকু কেমন আছে?

সে তো ভালোই আছে। এসেই আপনার খোঁজ করছিল। কৈ, আপনার খবর তো বললেন না। কেন এমন চেহারা হল, কি হয়েছে, কিছুই তো জানা গেল না।

আমার কথা?...তারপরও কি বলতে গেল মঞ্জুষা, কিন্তু বলতে পারল না। ঠোঁট কাঁপনই সার হল, কথা ফুটল না মঞ্জুষার মুখে।

ওপরের দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরল। কিন্তু চেষ্টা করেও আত্মসংবরণ করতে পারল না।

ও কি, আপনি কাঁদছেন?

অনুপমবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর মঞ্জুষা ঈষৎ রুদ্ধ স্বরে বলল ঃ করুণা আর সহানুভূতি ভাল লাগে না অনুপম-বাবু, সহ্য হয় না। ভাল থাকব, সুখী হব—সে কপাল নিয়ে তো জন্মাই নি।

রুদ্ধস্বরে কতকটা বিব্রত বোধ করলেন অনুপমবাবু। নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন মঞ্জুষার বিষণ্ণ মুখে। ঐ মুখের কথায়, গলার স্বরে শুধু হতাশাই নয়—অভি-মানের বাষ্পও আছে। তাই কি? কোন আশাভঙ্গজনিত নৈরাশ্যের আমেজও কি মিশে যায়নি ঐ উক্তির মধ্যে?

হয়তো মিশেছে বলেই অনুপমবাবু বললেন ঃ আপনার কথাই ঠিক মঞ্জুষা দেবী, এ প্রসঙ্গ তোলাই ভুল হয়েছে। যা হবে বলে মানুষ মনে করে সব সময় তা তো হয় না।

আচমকা যেন সাপের ছোবল। বিষে বিষে মুখ নীল। যন্ত্রণায় ঠোঁট কুঁচকে গেল, যে কথা জিজ্ঞেস করি করি করেও করা হয়ে ওঠেনি—যে কথা অনুপমবাবুও এড়িয়ে গেছেন চিঠিতে সে কথাটাই বলে বসলেন অনুপমবাবু। অর্থাৎ খুকুর মা সেরে উঠেছেন।

বাইরের দিকে তাকাল মঞ্জুষা। পথের গলানো পিচ যেন কেউ আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছে, বড় বিষাদ-মলিন মনে হল সকালবেলার শান্ত রোদটুকুকে।

অনুপমবাবু তখনও থামেন নি। বলে চলেছেন ঃ যাই হোক, ঘরের কোণে না হোক মনের কোণে আপনার ঠাঁই রইল।

কথাটা আচমকা শেষ করে মঞ্জুষার মুখে তাকিয়ে থাকলেন নিষ্পলক। কী বলেন দেখা যাক, ওর কথাটাকেও কি ভাবে নিচ্ছেন তাও দেখা দরকার।

কিন্তু কিছুই বললে না মঞ্জুষা সেন। বলবারই বা কি আছে? সে কি নিজেই জানতো যে ওর মনটা এমন করে খারাপ হয়ে যাবে; বুকটা টনটন করে উঠবে একটা অজানিত ব্যথায়, সে কি একটু আগেও ভাবতে পেরেছিল? অনুপম-বাবুর স্ত্রী সেরে উঠেছেন এ খবর এক-রাশ আনন্দই বহন করে আনতে পারত, কিন্তু তা না এনে নিয়ে এল কিনা এক-রাশ হু হু করা কান্না।

কিন্তু কেন?

তাহলে কি সে নিজেও ঐ ঘরের কোণে ঠাঁই কামনা করেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মাটির দিকেই তাকাল মঞ্জুষা। সেই অবকাশে ওর সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

আর তখন অস্বাভাবিক দ্রুততায় চোখের জল লুকোতেই বুঝি মঞ্জুষা সেন মুখ ফেরাল অন্য দিকে।

"ভালো থাকার চেহারা কি এই?"

আসে ভায়োলেট আর বন্য চন্দ্রমল্লিকার বর্ণাঢ্য সাজি নিয়ে। দিরাঙে অজস্র ম্যাগনোলিয়া আর কল্পকতাংয়ে হাজার রকমের আর্কিড সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

ফুলভারেও কামেং সীমান্ত অবনত। ন্যাসপাতি, কলা, পীচ আর মাঝে মাঝে আঙুরের ক্ষেত রয়েছে ধানক্ষেতের পাশাপাশি। ধান এখানে খুব ভাল জন্মে।

দিরাং, তাওয়াং ও কল্পকতাং-এর আদিবাসীরা অত্যন্ত সরল মানুষ। তারা সৎ, পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান। ক্রীড়ামোদীও বটে। পঞ্চাশ পাউন্ডের বোঝা পিঠে নিয়ে সারাদিন পাহাড় বেয়ে উঠতে পারে, বা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমানে ঘোড়া চালিয়ে যেতে পারে।

মনপারা সৌন্দর্য-প্রিয়। তাদের পোশাক, কার্পেট বা কাঠের পাত্রে নানা

কামেঙের মানুষ

রাজেশ্বরী রায় চৌধুরী

পূর্ব হিমালয়ের প্রায় সাড়ে পাঁচ হার্জার বর্গমাইল অঞ্চল নিয়ে কামেং সীমান্ত ডিভিসন গঠিত। এখানে সত্তর হাজার লোকের বসবাস। কামেংকে বিচোম নদী ও তার শাখা-উপশাখার উপত্যকা বলা যেতে পারে। এখানে প্রধানতঃ সরল আদিবাসী মনপাদের বাস। তাছাড়া তেনগা উপত্যকায় আছে শেরদুখপেন গোষ্ঠী। এছাড়াও দাফলা, মিজি এবং আকাস গোষ্ঠীর উপজাতিদেরও বাসভূমি কামেং।

পশ্চিম কামেং-এর কয়েকটি অঞ্চল বোধ করি হিমালয়ের মধ্যে সুন্দরতম। এখানে গ্রীষ্ম প্রখর নয়, শীতও সীমিত, বৃষ্টিপাত ত্রিশ থেকে চল্লিশ ইঞ্চির মধ্যে। সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়-গুলি ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছে—আর তারই সানুদেশে ধানের আবাদ। তাই এই মনপা অঞ্চলে জীবনধারা তেমন কঠোর নয়। শরৎকালে তাওয়াঙের আশেপাশে বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে কসমস ফুলের সমারোহ। আবার বসন্ত

কামেঙের প্রাণবন্ত মানুষ

মুখোশ নৃত্য

রঙের বৈচিত্র্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আদিবাসীদের মধ্যে বর্ণপ্রীতি অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু পশ্চিম কামেং-এ রং-এর কাজের মধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। হাল্কা হলুদ, হাল্কা নীল, হাল্কা সবুজ এদের অসাধারণ বর্ণ-রুচির পরিচয় দেয়।

মনপারা সাহসীও বটে। কোনো উদ্দেশ্যসাধনে এদের ধৈর্য ও অধ্যবসায় অতুলনীয়। স্বভাবে মনপারা অনমনীয়। নিজেদের বিশ্বাস থেকে কিছুতেই তাদের টলানো যায় না। বোধ হয় এই কারণেই ইতিহাসের উত্থান-পতনের মধ্যেও এরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে।

মনপা এবং বাজুনি গোষ্ঠীর উৎপত্তির ইতিহাস কালস্রোতে বিস্মৃত। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম দিকে রূপতি নামে এক নৃপতি সমভূমি অঞ্চল থেকে তাওয়াঙের মধ্যে দিয়ে বর্তমান ভুটানের দিকে চলে যান। রূপতির দলের কিছু-সংখ্যক লোক তাওয়াং উপত্যকায় থেকে যায়। রূপতি সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষ কিছু জানা যায় না—তবে এইটুকু জানা যায় যে, তিনি তান্ত্রিক হিন্দু ছিলেন। মনপাদের প্রথম প্রধান ছিলেন ডেকচাং আপা। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন, প্রজারা রাজার যে-সব কর্তব্য স্থির করে দেবে, রাজাকে তাই পালন করতে হবে, রাজা নিজেই নিজের কর্তব্য স্থির করতে পারেন না।

দ্বাদশ শতাব্দীতে মনপারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। প্রথমে মনপারা ছিল লো দ্রুকপা মতাবলম্বী। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এরাই প্রবল ছিল। তারপর ভুটানের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গেলুকপা মতপ্রচার শুরু করেন। তাঁর ভাগিনেয় মেরালামা তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করেন। মনপা প্রধানদের উৎসাহে এবং সমভূমি অঞ্চলের বৌদ্ধদের সাহায্যে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মনপা অঞ্চলে গেলুকপা মতপ্রচার সম্পূর্ণ হয়। এই ব্রত পালন উৎসব উপলক্ষে মেরালামা তাওয়াং গোম্ফা প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র ভারতে এখন এটিই বৃহত্তম বৌদ্ধ মঠ।

মোগলেরা যখন আসাম অভিযান করে তখন কামেং অঞ্চলে তার বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ১৮২৬ সালে ইংরেজরা আসাম অধিকার করার পর থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ঘটনাবলীর সংগে কামেং অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র সংস্থাপিত হতে শুরু করে। ১৮৪৪ সালে এবং পরে ১৮৫০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মনপা ও শেরদুখপেন প্রধানদের সংগে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। এই সংবিধানপত্রে কামেং কর্তৃপক্ষ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি তাঁদের আনুগত্য নূতন করে স্বীকার করেন।

১৯১৪ সালে পশ্চিম কামেং ও তিব্বতের সীমারেখা গোরীচেন পর্বত-মালা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর ক্রমান্বয়ে পরোক্ষ শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনা হয়।

লামা আশীর্বাদ করছেন একজন ভক্ত শিশুকে

।। মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস ।।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হেলথ এডুকেশন কমিটি কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত "চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণায় সুফল হয় কি?" নামক পুস্তিকায় ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতির সুফল মানুষই ভোগ করছে।

পুস্তিকাটিতে ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাধির ফলে মৃত্যুর হার এবং জনসংখ্যা বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। হিসাবে দেখা যায়, ঐ সময়ের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে যুক্তরাষ্ট্রের ২৬,৭৪,১৪৪ জন লোক ব্যাধির ফলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

পুস্তিকাটিতে আরও বলা হয়েছে, ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন মারাত্মক ব্যাধিতে মৃত্যুর হার সবিশেষ হ্রাস পেয়েছে। কয়েকটি ব্যাধির হার এই রকম :

—যক্ষ্মারোগ এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার ৮৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

—ইনফ্লুয়েঞ্জাতে মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে ৯৩ শতাংশ এবং পোলিও বা শিশু-পক্ষাঘাতে ৯০ শতাংশ।

হুপিং কাশিতে মৃত্যু একরকম নেই বললেই চলে।

—কঠিন বাতজ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৮৩ শতাংশ।

—আমাশয় রোগে মৃত্যু হ্রাস পেয়েছে ৮৬ শতাংশ, সিফিলিসে ৭৯ শতাংশ, অ্যাপেন্ডিসাইটিসে ৮১ শতাংশ এবং কঠিন নেফ্রাইটিসে ৬২ শতাংশ।

—নিউমোনিয়া এবং অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা ৩১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

রিপোর্টে এই কৃতিত্বের কারণ হিসাবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ-পরিচালিত গবেষণাকার্য এবং "স্বেচ্ছাব্রতী স্বাস্থ্যরক্ষা সংস্থাগুলির প্রচেষ্টার" উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষালাভের চিরন্তন তৃষ্ণা

প্রতি বৎসরই দেশে-বিদেশের অসংখ্য "বয়স্ক" ব্যক্তি স্কুলে যেতে আরম্ভ করে। এরা সবাই আংশিক সময়ের ছাত্র—প্রধানত যুবক; কিন্তু
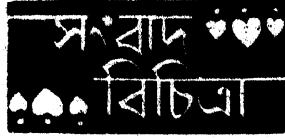
মধ্যবয়স্ক এবং বয়স্ক ছাত্রও এদের মধ্যে বহু আছে—যারা নানা বিষয়ের সান্ধ্য-কালীন ক্লাসগুলিতে এবং কোর্স-গুলিতে যোগদান করে থাকে। অনেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাও গ্রহণ করে থাকে। অন্য অনেকে তাদের 'হবি' এবং বিশেষ-ভাবে যে-সমস্ত বিষয়ে তাদের আগ্রহ রয়েছে—ছুতোরের কাজ অথবা পোশাক তৈরী থেকে সমকালীন ঘটনা অথবা শিল্পকলা পর্যন্ত—সেই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করে থাকে।

এই ধরনের অতিরিক্ত শিক্ষালাভের আগ্রহ সাম্প্রতিককালে খুব বেড়েছে। এক লন্ডনেই প্রায় ৩০০,০০০ পুরুষ ও নারী প্রতি বৎসর লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত সান্ধ্য ক্লাসগুলিতে শিক্ষালাভ করে থাকে। শত শত শিক্ষাবিদ্ অন্যান্য দেশ থেকে এখানে এসে ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজের নিকটে অবস্থিত লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের হেড কোয়ার্টার্স পরিদর্শন করে থাকে এই বয়স্ক শিক্ষা-ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। প্রকাশ, এই ধরনের সুলভ ও ব্যাপক বয়স্ক শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশ্বে আর কোথাও নেই।

অনেকে শুনে আশ্চর্য হবেন, সপ্তাহে একরাত্রির জন্য একজন ছাত্রকে সারা সেপ্টেম্বর-জুন মাসের সেশনে ব্যয় করতে হয় মাত্র ২০ শিলিং (১৩.৫৫ টাকা) বা তারও কম, এবং অতিরিক্ত রাত্রির জন্য সারা সেশনে ব্যয় করতে হয় মাত্র পাঁচ শিলিং। এইসব ক্লাস পরি-চালনার জন্য প্রচুর অর্থসাহায্য প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ : সান্ধ্যকালীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে এজন্য ব্যয় করতে হয় বৎসরে প্রায় ১,৬০০,০০০ পাউন্ড (২.১৩ কোটি টাকা)। কিন্তু ফী থেকে আয় হয় মাত্র প্রায় ১৮০,০০০ পাউন্ড (২৪ লক্ষ টাকা)। কাউন্সিল এই নামমাত্র ফী-এ কম করেও ৫৫০টি বিষয়ে শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করে থাকেন। এই সকল কোর্সে যাঁরা শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁরা সকলেই অভিজ্ঞ শিক্ষক।

কাউন্সিলের বার্ষিক আশি পৃষ্ঠার গাইড 'ফ্লাডলাইট' থেকে জানা যায় সান্ধ্য ক্লাসগুলিতে গ্লাস-ব্লোয়িং, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, ক্যালিগ্রাফি, মিডিভ্যাল ইকনমিক্স এবং ব্যালে নৃত্য সকল রকম বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৬১-৬২ সালের প্রোগ্রামে কোর্সে অন্তর্ভুক্ত হয় : রোড ট্রাফিক ইঞ্জিনীয়ারিং, কুকুরকে তালিম দান, পুতুলের থিয়েটার ও গৃহনির্মাণ।

প্রতিটি নতুন কোর্স খোলা হয়ে থাকে পরীক্ষামূলকভাবে, এবং এই পরীক্ষায় সাধারণত সাফল্যই লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দু বৎসর পূর্বে 'লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল এডুকেশন সার্ভিস' বহু মহিলার কাছ থেকে তাদের আকৃতি ও ব্যক্তিত্বের উন্নতির জন্য নতুন কোর্স খোলার অনুরোধ পান। তাঁরা একটি সৌন্দর্যচর্চা, একটি পরিচ্ছন্নতা এবং একটি সামঞ্জস্য, ব্যক্তিত্ব ও পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে কোর্স প্রবর্তন করেন। ১৯৬১-৬২ সালে এই কোর্সে যোগ-দানের জন্য আবেদনপত্রের সংখ্যা এত বেশি হয় যে তাঁরা প্রতিটি বিষয়ের জন্য যথাক্রমে ২১, ২৪ ও ২৫টি কোর্স খুলতে বাধ্য হন।

অ-বৃত্তিমূলক কোর্সও পরি-চালিত হচ্ছে। এই সকল কোর্সের বিষয়-গুলির মধ্যে কয়েকটি বিষয় হল—পাকপ্রণালী, পোশাক তৈরী, গৃহস্থালী, আভ্যন্তরীণ অলংকরণ ও শিশু পরিচর্যা, কিংবা হাতের কাজ, চামড়ার কাজ, ছবি ও খেলাধুলা। কারুকর্মের কোর্সগুলিতে আছে কাঠখোদাই, চামড়ার কাজ, বই বাঁধাই, টুকরি তৈরী, মৃৎশিল্প ইত্যাদি নানারকমের বিষয়। শিক্ষাসংক্রান্ত কোর্সগুলিতে আছে প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা শিক্ষা থেকে জ্যোতির্বিদ্যা, তুলনামূলক ধর্ম পর্যন্ত বহুরকম বিষয়।

"আত্ম-উন্নয়ন" সংক্রান্ত কোর্স-গুলিতে ছাত্ররা শিক্ষা করে বিতর্ক-পদ্ধতি, কথাবার্তার রীতি, ইত্যাদি।

তাছাড়া শত শত কোর্স পরিচালিত হচ্ছে সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রশিল্প, নাটক, রচনাপদ্ধতি, দর্শন এবং কলা ও হিউম্যানিটিজ বিষয়ে। এক নৃত্য সম্বন্ধেই কুড়ি রকমের কোর্স পরিচালিত হয়। এই কোর্সগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। এ ছাড়া পরিচালিত হয় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে নানাধরনের কোর্স।

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২১)

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সাজি হাতে নীচের বাগানে নেমে গেলাম। অনেকদিন ফুল তোলা হয়নি। ব্রজবালাদেবী ফুল পেলে খুশী হন। ঘাসের উপর শিশির পড়েছে। ভিজে মাঠে খালি পায়ে হাঁটতে আমার ভাল লাগে। পূবদিকের টগর ফুলের গাছটা শাদা ফুলে ভরে রয়েছে। আমি লঘু পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাজি আমার ফুলে ভরে গেল।

—অর্পিতা! কে আমার নাম ধরে ডাকলো। পিছু ফিরে তাকালাম। ব্রজবালাদেবী দোতলায় জানালায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। উনি বললেন—দাঁড়াও আমি নীচে আসছি।

কাল রাত্রিবেলা ওঁকে বিছানায় দেখতে না পেয়ে আমি অজানা আশংকায় মনে মনে খুবই শংকিত হয়েছিলাম, তাই এই ভোরবেলা তাঁর প্রসন্ন মুখখানি দেখে অনেকখানি আশ্বস্ত বোধ করলাম। ব্রজবালাদেবী নীচে নেমে আসতেও আমি কালকের কথা মোটেও উল্লেখ করলাম না। কারণ দেখলাম তিনিও সে প্রসঙ্গ নিয়ে কোন আলোচনা করছেন না। উনি শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন—কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল মা?

বললাম—হ্যাঁ।

—আমিও খুব ঘুমিয়েছি।

কথাটা শুনে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু ব্রজবালাদেবী তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গন্ধরাজ ফুলের গাছটা দেখছিলেন। নিজের মনেই বললেন—ফুলের চেয়ে পবিত্র আর কোন জিনিস নেই। কত অনায়াসেই মনকে স্নিগ্ধ করে। তুমি ফুল ভালবাস ত মা?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

বৃদ্ধা নিজের মনেই বিড়বিড় করেন—নয়নতারা ফুল ভালবাসে না। ওদের পাটনার বাড়ীতে শুধু কাগজের ফুলে সাজান থাকত। আসল আর নকলে কত তফাৎ ওরা বোঝে না। আশ্চর্য।

এ-কথার আমি কোন উত্তর দিলাম না। এক ফাঁকে শুধু বললাম, কাল একবার আমার সেই আত্মীয়দের বাড়ী দেখা করতে যাব। দু'তিন ঘন্টা ছুটি চাই।

উনি বললেন—নিশ্চয় যাবে। এ-নিয়ে আর বলবার কি আছে? তবে তোমার সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হ'লে বলো Seeker-কে সে যেন নিশ্চয় করে ধরে আনে। তাকে আমার বিশেষ দরকার। অনেকগুলো কথা বলবার আছে।

—সেদিনও বলেছিলাম, কালও আবার বলব। কিন্তু শুনেছি ঐ Seeker ভদ্রলোক নাকি অদ্ভুত ধরনের। কারুর সঙ্গে সহজে দেখা করতে চান না।

ব্রজবালাদেবী সাগ্রহে বললেন—যদি তিনি সময় দেন আমি নিজে গিয়ে দেখা করতে রাজি আছি। প্রয়োজন হলে কলকাতাতেও যেতে আমি প্রস্তুত।

তাঁর এতখানি আগ্রহ দেখে বললাম, যতদূর সাধ্য আমি চেষ্টা করব।

—অন্ততপক্ষে তোমার বন্ধুটিকেও ধরে এনো। তাকে প্রশ্ন করেও Seeker সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমি নিশ্চয়ই জানতে পারব।

আমি খুশী হয়ে বললাম, —যদি পারি কালকেই ওঁকে নিয়ে আসব আপনার কাছে।

ব্রজবালাদেবী খুশী হলেন। আমার হাত ধরে বললেন—চল নিশ্চয়ই এতক্ষণে চা হয়ে গেছে।

আমরা দুজনে উপরে উঠে এলাম।

চায়ের টেবিলে দিদিমণিকে দেখলাম না। শীলা জানাল,—মার শরীরটা ভাল নেই। আর আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছে।

চা পান করে আমি দিদিমণির ঘরে গেলাম। উনি গম্ভীর মুখে খাটের উপর বসেছিলেন। গভীর চিন্তামগ্ন। আমি যে ঘরে ঢুকেছি তা তিনি বুঝতে পারেন নি।

জিজ্ঞেস করলাম—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন দিদিমণি?

দিদিমণি আমার দিকে ফিরে তাকালেন—ও অর্পিতা! এস। বস আমার কাছে।

আমি দিদিমণির পাশে খাটের উপর বসলাম। উনি বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করতে শুরু করলেন—তুমি ত, এ বাড়ীতে প্রায় এক মাস কাজ করছ, বাইরের লোক কে কে আসে বলতে পার?

ভেবে বললাম—কৈ কাউকে ত আসতে দেখিনি।

—ঠিক জান?

—অন্তত আমি দেখিনি।

—দিদিমণি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মনের কথা পড়বার চেষ্টা করছেন।

—মা কোথায় কোথায় বেড়াতে যান, বিশেষ করে কাদের বাড়ীতে?

বললাম—গঙ্গার ধারে, কিংবা মাঠে। দুএকদিন বাজারেও গিয়েছিলেন। কিন্তু কারুর বাড়ীতে ওঁকে যেতে দেখিনি।

—ও'র চিঠি পত্রের জবাব সব তুমিই লেখ ত?

—হ্যাঁ।

—এমন কোন চিঠি পেয়েছ যার তলায় কোন নাম থাকে না!

এ ধরণের প্রশ্নে আমি অবাক হলাম! বললাম—না।

পরের প্রশ্নটা আরও অদ্ভুত ধরনের। জিজ্ঞেস করলেন—কোন কোন চিঠির উত্তর উনি নিজের হাতে লেখেন কি?

ভেবে বললাম—আমি ত দেখিনি। তবে অন্য সময় কিছু লেখেন কিনা বলতে পারি না।

দিদিমণি বালিশের তলা থেকে কালকের সেই চিঠির খামটা বার করলেন, এই হাতের লেখাটা চেন? কোথায়ও দেখেছ?

বললাম—না।

—এই খামটা তোমার কাছে রেখে দাও। যদি এই রকম হাতের লেখা কোন চিঠি মার কাছে আসে আমাকে সে কথা জানাতে ভুলো না।

আমি খামটা হাতে নিলাম, কিন্তু কোন জবাব দিলাম না। দিদিমণি এতক্ষণ এত কড়া মেজাজে কথা বলছিলেন যে, আমি কিছুতেই সহজ হতে পারছিলাম না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আর কিছু বলবেন? নয়ত আমি ঘরে যাই।

—যাও। কিন্তু এসব কথা নিয়ে মার সঙ্গে আলোচনা করো না। আমার কথামত কাজ করো, চাকুরিতে তুমি ক্রমশ উন্নতি করবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার।

আমি ঘরে ফিরে এসে দিদিমণির কথাগুলো ভাবছিলাম। এতদিন যে রকম

ওকে হাসিখুশী দেখেছিলাম —এ একেবারে বিপরীত চেহারা। কি কারণে উনি এতখানি গম্ভীর হয়ে গেলেন? কেন আজ ব্রজবালাদেবী সম্বন্ধে হঠাৎ এতগুলো প্রশ্ন করলেন আমায়? এসব গন্ডগোলের মূলে কি ঐ চিঠিখানা?

খামের লেখাটা আবার ভাল করে দেখলাম। না, এ হস্তাক্ষর আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

পরদিন দুপুরবেলা আমি যখন গগন সেনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সেজেগুজে ঘর থেকে বেরিয়েছি, দিদিমণির সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল। উনি স্বাভাবিক গলায় হেসে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় যাচ্ছ অর্পিতা?

বললাম— ব্যান্ডেল চার্চের কাছে। আমার এক আত্মীয়রা থাকেন। সপ্তাহে একদিন করে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাই।

—মাকে বলেছ?

—হ্যাঁ।

—তবে চল। তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

—আপনি ঐদিকেই কোথায়ও যাচ্ছেন বুঝি?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে দিদিমণি নীচে নামলেন। ও'র নির্দেশ-মত আগে থেকেই গাড়ীর ড্রাইভার তৈরী হয়ে ছিল। আমরা গিয়ে তাতে ওঠে পড়লাম।

দিদিমণি বললেন—আমারই হয়েছে জ্বালা। এতবড় সম্পত্তি দেখাশুনো করা যে কি হাঙ্গামার ব্যাপার তা বুঝবে না। যে কটাদিন আসি কীভাবে আমার কাটে দেখতেই পাচ্ছ।

বললাম, আপনার এখন পাটনায় থাকার দরকার কি? এখানে চলে এলেই পারেন।

দিদিমণি চিন্তিত স্বরে উত্তর দেন—তাই আসতে হবে দেখছি। মা বড় ভাল মানুষ, তার উপর বয়েসও হয়েছে। পাঁচভূতে ও'কে ঠকিয়ে নেয়। এখানেই এসে থাকতে হবে। তবে যতদিন না আসতে পারছি তুমি আমার হয়ে সব দেখাশুনো করো। দরকার বুঝলেই চিঠি দিও। আমি চলে আসব।

বললাম—বেশ ত, যতদূর সাধ্য আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

দিদিমণি আমার পিঠের উপর হাত রেখে বল্লেন—বড় ভাল মেয়ে। ভাগ্যিস তোমাকে আমরা পেয়েছিলাম।

গাড়ী ব্যান্ডেল চার্চ পেরিয়ে 'ডানলপের' রাস্তা ধরতেই মোড়ের মাথায় নেমে পড়লাম।

দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন, এইখানেই বাড়ী বুঝি?

—হ্যাঁ। এ মেঠো রাস্তাটার শেষে গঙ্গার উপর ছোট্ট বাড়ী।

—ঘন্টা দুই বাদে এ-রাস্তা দিয়ে যখন ফিরব তোমাকে কি তুলে নিয়ে যাব?

—তার কোন দরকার নেই। আমি রিক্সা করে চলে যাব।

দিদিমণির গাড়ী চলে গেল। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কেন জানি না কাল থেকে দিদিমণির সঙ্গে কথা বলতে ভয় ভয় করছে। এত রকম প্রশ্ন করছেন যার উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়।

রাস্তা দিয়ে একটু এগুতেই দেখলাম গেটের কাছে পাইপ মুখে গগন সেন দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখতে পেয়েই চোখ দুটো তার আনন্দে হাসল। প্রথম কথাই বলল—যাক্ ভুলে যাওনি তা হলে!

সহাস্যে বললাম—ভুলে গেলেই বুঝি আপনি খুশী হন।

—এত খুশী হতাম যে তোমার বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করে মালিকানের সামনে সজোরে গাট্টা মারতাম মাথায়।

—তা হলে আমার খুব সুবিধে হত। আমার মালিকান ত চান আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।

—হঠাৎ এ অধমকে তাঁর পছন্দ হল কি করে?

—সে আপনার বন্ধুভাগ্যের জন্যে। নাকের বদলে নরুনের মত Seeker-এর বদলে আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন।

গগন সেন গল্প করতে করতে আমাকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসাল। আগে থেকেই টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজান রয়েছে। বেতের চেয়ার দুটো মাঝখানে পাতা। বসলেই সামনে গঙ্গা দেখা যায়। বললাম—এ জায়গাটা বড় সুন্দর।

গগন সেন স্বভাব-সুলভ চটুল উত্তর দিল, সেই টানেই ত এতদূর আসি। অবশ্য তুমি এখানে আসার পর থেকে টানটা আরও বেড়েছে। যদি অনুমতি কর সপ্তাহে দুদিন করে আসতেও আমি রাজি আছি।

—তার আগে আমার মালিকানের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিন। ওনার যা আগ্রহ দেখছি তাতে সপ্তাহে দুদিন কেন উনি হয়ত আপনার জন্যে একখানা ঘরই ছেড়ে দেবেন।

—তাহলে ত এখুনই আলাপ করতে হয়।

মালী এসে কেটলীতে গরম জল ঢেলে দিয়ে গেল। মিষ্টি আর সিঙাড়া আগে থেকেই প্লেটের উপর ঢাকা দেওয়া ছিল। গগন সেন এগিয়ে দিয়ে বলল—আমার কিন্তু বেশ খিদে পেয়ে গেছে। অনেকক্ষণ থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি কিনা।

ঘড়ি দেখিয়ে বললাম—বাঃ। আমি বুঝি দেরী করেছি। এখনও ত চারটে বাজেনি।

গগন সেন হাসতে হাসতে বলল—আমি যে বারটা থেকে অপেক্ষা করছি। দোষটা আমারই, তোমার নয়। আমি কিন্তু খেতে শুরু করলাম।

আমি কেটলী থেকে চা ঢেলে গগন সেনের দিকে এগিয়ে দিলাম। বললাম, এই ক'টা দিন বড্ড হৈ-চৈ এর মধ্যে কাটছে। তাই তোমাকে,—একটু থেমে নিজেকে শুধরে নিয়ে বললাম—আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি।

গগন সেন খুশী হয়ে বলল—আর ও ফরমালিটির দরকার কি? আপনির চেয়ে তুমিটা অনেক সহজ তাই না?

আমিও হাসলাম। কিন্তু বোধহয় চাপা লজ্জার রক্তিম আভাস মুখে ফুটে উঠেছিল।

—তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে অপু।

লজ্জা কাটিয়ে বললাম—একথা তুমি রোজ বল।

গগন সেন গাঢ়স্বরে বলে—প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি মনে হয়েছিল তোমার মন বড় অশান্ত, কি যেন খুঁজছ। কিন্তু এখন চেহারায় একটা প্রশান্ত ভাব এসেছে। মনে হচ্ছে যা খুঁজছিলে তা হয়ত পেয়েছে।

বললাম, সত্যিই পেয়েছি।

—কি?

—পথ। বিশ্বাস কর চারদিকটা অন্ধকার মনে হত। বাড়ীতে অভাব, কলেজের পড়া হল না। রোজগার করার চেষ্টা করলাম। কত রকম অন্তরায়। টাকার বিনিময়ে সকলেই সুবিধে নেবার চেষ্টা করেছে। উঃ, সে সময়টা দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে আমার। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

গগন সেন দুষ্টুমি করে বলল—এই-রে কৃতজ্ঞতা জানাতে শুরু করবে নাকি? ঐ জিনিসটাকে আমি বড় ভয় পাই।

জিজ্ঞেস করলাম,—কেন?

—কৃতজ্ঞতা জানাবার পরই নমস্কার বিনিময় করতে হয়। তারপরই বিদায়।

দুজনেই হাসলাম।

চা পর্ব শেষ করে দুজনে হাঁটতে লাগলাম বাগানে। এ বাগানে বেশীর

ভাগই মৌশুমী ফুল। অত্যন্ত কেয়ারী করে সাজান। হাঁটতে হাঁটতে বাগানের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলাম। এর পরই গঙ্গা। ছোট্ট একটা সাদা বেঞ্চী পাতা রয়েছে। গগন সেনের অনুরোধে সেই-খানেই বসলাম দুজনেই পাশাপাশি।

গগন সেন জিজ্ঞেস করল,—এবার শুনি গত সাতদিন কি রকম কাটল।

আমি একে একে সব কথা জানালাম। বিশেষ করে বললাম দিদিমণির কথা। তাঁকে হাসিখুশী দেখে কি রকম আমার ভাল লেগেছিল, তারপর কাল থেকে যে পরিবর্তন দেখছি, যা দেখে ভয় পাচ্ছি সে কথাও বললাম অকপটে।

গগন সেন একমনে সব কথা শুনছিল। হঠাৎ উঠে পড়ে পায়চারি করতে শুরু করল। জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাবছেন?

গগন সেন অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, ভাবছি তোমাদের দিদিমণির মেয়ে শীলার কথা। একটি মেয়ে কত নিষ্ঠুর হতে পারে তারই উদাহরণ ঐ শীলা। ও চেয়েছিল বুড়ী মার খাক। তাইতেই ওর আনন্দ। এ পৃথিবীতে এক একজন লোক আসে যারা অন্যের নির্যাতন দেখলে খুশী হয়, আনন্দ পায়। শীলা ঐ জাতের মেয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি করে জানলে?

—এদের কথা আমি বই-এ পড়েছি। যে কোন মনস্তাত্ত্বিকের কাছে নিয়ে যাও তারা বিচার করে বলে দিতে পারবে।

বললাম, শীলাকে আমারও ভাল লাগে না। কিন্তু ঐ বাড়ীতে ও ঐ রকম সৃষ্টিছাড়া হলো কেন?

গগন সেন মৃদু হাসল, এর উত্তর হঠাৎ দেয়া যায় না। ভাল করে মিশলে তখন হয়ত বলতে পারব। তবে এই-টুকু জেনে রেখো এই সব পুরনো জমিদার বংশে পূর্বপুরুষদের পাপের ছোঁয়া লাগে বংশধরদের উপর।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম,—এ সব কুসংস্কার আপনি বিশ্বাস করেন?

গগন সেন উদাস কণ্ঠে উত্তর দিল, করি। না করে উপায় নেই বলে। এ কুসংস্কার নয়। কঠিন বাস্তবের মতই নির্মম সত্য। তুমি কি ভাব অন্যায়, অত্যাচার, পাপ, এসব ধামাচাপা দিয়ে রেখে দেয়া যায়? অসম্ভব। বাইরের লোক হয়ত জানতে না পারে। কিন্তু একদিন না একদিন তা প্রকাশ পাবেই। আর সে প্রকাশ মহাব্যাধির রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। কার সাধ্য তখন তাকে অস্বীকার করে।

কথা বলতে বলতে গগন সেন ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। আমি ভাবছিলাম প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য কথা পাড়ব কিনা। এমন সময় মালী এসে জানাল আমাকে নেবার জন্যে গাড়ী এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে গগন সেন চমকে উঠল,—কার গাড়ী? কে এসেছে?

বললাম, দিদিমণি বোধহয় ফেরার পথে আমার খোঁজ করছে।

—এ-বাড়ী তাঁকে দেখান তোমার মোটেই উচিত হয়নি।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি দেখা করবে?

গগন সেন রেগে উত্তর দিল, না। তোমার যেতে হয় চলে যাও। আমি চাই না কোন অজানা লোক এখানে ঢোকে।

নিমেষের মধ্যেই গগন সেন বদলে গেল। তার চোখ, মুখ, কণ্ঠস্বর সবের মধ্যে চাপা রাগের আগুন। আমি কিছু বুঝতে না পেরে সভয়ে বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বেরিয়ে এসে দেখি গাড়ী একেবারে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

দিদিমণি জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখছেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে উঠে তাঁর পাশে বসলাম।

দিদিমণি তারিফ করে বললেন, চমৎকার বাড়ী, কৈ কাউকে দেখলাম না ত?

বললাম, আমরা সবাই বাগানে ছিলাম। গাড়ী এসেছে শুনে ছুটে চলে এসেছি।

সারা রাস্তা আমি গগন সেনের কথা ভেবেছি। কিন্তু মানুষটার হঠাৎ এতখানি বিরক্তির কারণ আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। কি দোষ হয়েছে আমার? আমি ত দিদিমণিকে আসতে বলিনি। তিনি স্বেচ্ছায় জোর করে যদি এসে হাজির হন আমি তার কি করব।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুমতে পারলাম না। অনেক আশা নিয়ে গগন সেনের কাছে গিয়েছিলাম। কথা বলতে বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু তার শেষের ব্যবহার আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছে। তার মুখে আমি দেখেছি স্পষ্ট ঘৃণার আভাস। যা বোধহয় সে চেষ্টা করেও গোপন করতে পারেনি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল কত কথাই ভাবলাম। গগন সেন শীলার সম্বন্ধে যা বলেছে তা কি সত্য হতে পারে? কোন দিদি ইচ্ছে করে নিজের ভাইকে পীড়ন করতে চায়? এই পীড়নেই তার আনন্দ? আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হল। আজ আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি গগন সেন বড়বেশী খামখেয়ালী মানুষ। দূর থেকে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা চলে কিন্তু কোন সময়ই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না, কারণ এতে যে ঘনিষ্ঠ হয় তারই লোকসান বেশী।

দূরে কোন মিলের ভোঁ বাজল। কত রাত হয়েছে কে জানে? কিছুতেই ঘুম আসছে না। উঠে গিয়ে চেয়ারে বসলাম। মশা কামড়াচ্ছে। রাত্রিবেলা মশারির মধ্যে ছাড়া শোয়া যায় না। মশার উপদ্রব খুব। চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করলাম কিছুক্ষণ।

খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হল। কান খাড়া করে শুনলাম। এ ছিটকিনি আমার ঘরের নয়। ব্রজবালা-দেবী কি বাইরে বেরুলেন? আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে মাঝখানের দরজা অল্প ফাঁক করলাম। টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা জ্বলছে। যা ভেবেছিলাম তাই, বৃদ্ধা ঘরে নেই। বারান্দার দরজা খোলা। কিন্তু এত রাতে উনি কোথায় গেলেন?

জানালার কাছে সরে এসে দেখলাম আগের দিনের মত সেই পোড়ো বাড়ীতে আজও আলো জ্বলছে। অনুভব করছি আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেছে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছি। জানলা থেকে মাঝখানের দরজা পর্যন্ত। এক একবার দেখছি ঐ পোড়ো বাড়ীর দিকে। আলো তখনও জ্বলছে। আবার ফিরে আসছি ব্রজবালাদেবীর ঘরে। তিনি তখনও ফেরেন নি। এই অনিশ্চয়তার দোলায় প্রায় আধ ঘন্টা কেটে গেল। আমি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারলাম না। দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম পূর্বদিক লক্ষ্য করে। কিন্তু বাঘের ঘর পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। কাদের কণ্ঠ-স্বর যেন ভেসে আসছে। আমি অন্ধ-কারের মধ্যে দেয়ালের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম ব্রজবালা-দেবী বলছেন, এ বাঘটাকে আমি এখানে বাঁধিয়ে রেখেছি শুধু তোমারই জন্যে। এর অর্থ আর কেউ না জানুক তুমি বেশ ভালই জান।

যিনি একথার উত্তর দিলেন তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং দিদিমণি।

—তার মানে তুমি চাও না আমি এ-বাড়ীতে আসি।

—আস আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে রাশ টেনে থাকতে হবে।

দিদিমণি ফোঁস করে উঠলেন—কালই আমি চলে যাব। শুধু শীলা তোমার কাছে থাকবে।

ব্রজবালা দেবী কঠিন স্বরে বললেন, না, তাকেও তুমি নিয়ে যাও। কেবল বুড়ী থাকবে। এইটুকু মনে রেখ এই মরা বাঘটাই আমাকে পাহারা দেবে, আর কাউকেই আমার দরকার নেই। মনে হল ও'রা বোধহয় এই দিকেই আসবেন। আমি আর সেখানে অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম। দরজা বন্ধ করে দিয়ে হাঁপাচ্ছি। এই ক'দিনের মধ্যে একের পর যে-সব ঘটনা ঘটে চলেছে, সে-সব টুকরো কথা আমি শুনছি কোনটারই হিসাব মেলাতে পারছি না। ব্রজবালাদেবী কি সত্যিই চান না দিদিমণি এ বাড়ীতে থাকেন? কিন্তু কেন?

(ক্রমশঃ)

এক আশ্চর্য খ্যাতিমান শিল্পী : মকবুল ফিদা হুসেন

কলারসিক

বাঙলা দেশের অধিকাংশ শিল্পীই দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য সংগ্রামরত। শুধু বাঙলা কেন, সমগ্র ভারতীয় শিল্পী-সমাজের অধিকাংশের পক্ষে এ-কথা সত্য। লক্ষ্মীর বরপুত্র হওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে খুব কম শিল্পীই জন্মগ্রহণ করেছেন এ-দেশে। কিন্তু এ-দেশেরও কোন কোন শিল্পীর লক্ষ্মী-ভাগ্য অনেকের মনে ঈর্ষার আগুন যে জ্বালাতে পারে গত সপ্তাহে অশোকা গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের চিত্র-প্রদর্শনীতে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।

গত ৯ই আগস্ট শিল্পী হুসেনের চিত্র-প্রদর্শনী উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রদর্শিত চিত্র বিক্রয় হতে শুরু করে। এবং প্রদর্শনী শেষ হওয়ার আধ ঘন্টা আগে (১৪ই আগস্ট) অশোকা গ্যালারীতে উপস্থিত হয়ে দেখি ভাগ্যবান ক্রেতারা তাঁর ছবি নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রদর্শিত কুড়িখানা ছবির মধ্যে দশখানা ছবি প্রদর্শনী-কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। প্রতিখানি চিত্রের গড়পড়তা মূল্য ছিল ১,৫০০ হাজার টাকা। অর্থাৎ ছোট একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমেই শিল্পী হুসেন পেয়ে গেলেন অন্যূন ১৫,০০০ হাজার টাকা। আমার জীবনে কলকাতার কোন প্রদর্শনীতে এমন ভাগ্যবান শিল্পীর সাক্ষাৎ সত্যি ঘটেনি। যাঁরা আরও প্রাচীন তাঁদের মুখেও শুনলাম, কলকাতার চিত্র-প্রদর্শনীর জগতে শিল্পী হুসেন একটি উজ্জ্বল রেকর্ড সৃষ্টি করে গেলেন।

অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই সেই হুসেন যিনি একদা কাপড়ের কলের মজদুর ছিলেন, যাঁকে একদা আসবাবপত্র তৈরী করে মজুরী নিতে হয়েছে, যিনি জীবিকার দায়ে পুতুল-খেলনার নক্সা প্রস্তুত করতেন, সিনেমা-হলের পোস্টার আঁকতেন, যাঁর বিশ্রামের স্থান ছিল না, রাতের পর রাত কাটাতে হয়েছে যাঁকে ফুটপাতে কিংবা সরাইখানায়, সেই অবজ্ঞাত, অখ্যাত মজদুর হুসেন আজ ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ মহলে শুধু সুপরিচিত নন, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে আজ নিজের নামের পতাকাকেও গর্বের সঙ্গে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর জীবন থেকে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর দংশন-জ্বালা অপসারিত আজ, রাজধানী দিল্লী এবং ধনীর স্বর্গরাজ্য বোম্বাই শহরে এখন তিনি পর্যায়ক্রমে অবস্থান করেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রধান রাষ্ট্রসমূহের দিল্লীস্থ দূতাবাসের সর্বোচ্চ কর্তারা শিল্পী হুসেনকেই ডেকে পাঠান তাঁদের প্রয়োজনমত চিত্রাঙ্কনের জন্য।

শিল্পী হুসেনের এই জীবন-কাহিনী রূপকথার মত মনে হলেও এতটুকু মিথ্যা নেই উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যে। আজ আটচল্লিশ বৎসরের এই প্রবীণ শিল্পীর ভিতর ভারতের তরুণ শিল্পী-সমাজ নিশ্চয় খুঁজে পেতে পারেন তাঁদের দুঃখ-জয়ের আদর্শ। দীর্ঘদেহী, শ্মশ্রুমণ্ডিত, ধূসর কেশের তীক্ষ্ণ-চক্ষু এই মানুষটির চিত্র-প্রদর্শনীতে আমরা যে চিত্রগুলি দেখার সুযোগ পেয়েছি তার মধ্যেও উপলব্ধি করেছি তাঁর পরিণত শিল্পী-মনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

হুসেনের চিত্র দেখে একটা কথা আমার মনে হয়েছে। তিনি সত্যি কোন বিশেষ আঙ্গিকের মায়ায় বাঁধা পড়েননি। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে তিনি তাঁর আঙ্গিক নির্বাচন করেছেন। কোন চিত্রে চ্যাপ্টা রঙ, আবার কোন চিত্রে রেখার বলিষ্ঠপ্রয়োগ; কোথাও চিত্র-বক্তব্যের দুর্বোগত আভাস কোমল রঙের আস্তরণ ভেদ করে প্রকাশমান, আবার কোথাও উজ্জ্বল রঙে আর রেখায় সমগ্র চিত্রপট উদ্ভাসিত। কোথাও জ্যামিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ আবার কোথাও লৌকিক চেতনার শিল্পায়িত রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর চিত্রে। সাম্প্রতিক বিমূর্তবাদীদের মত তিনি শুধু রঙের খেলায় দর্শকমন ভুলাতে যাননি। তাঁর বিমূর্ত-চেতনার পথ বেয়ে আমরা বাস্তবকে স্পর্শ করতে পেরেছি। রঙের এত চমৎকার সুসম প্রয়োগ এবং চিত্র-সংস্থাপনের এমন নিপুণ কৌশল খুব কম শিল্পীর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি যে এককালে খেলনার নক্সাকারক ছিলেন তার আভাস 'হস্তী-পরিবার' (৫), 'কাঠপুতুলী' (৯) প্রভৃতি ছবি দেখলে অনুভব করা যায়। শিল্পী হুসেনের প্রতিটি চিত্রই আমাদের মুগ্ধ করেছে। এমন একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য আমরা অশোকা গ্যালারীর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। শুনেছি শিল্পী হুসেন বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার দিল্লী-ভবনের জন্য যে মুর্যাল চিত্র অঙ্কন করছেন তাতে দুটি প্যানেলে ভেষজ-বিজ্ঞানের ইতিহাস চিত্রিত হবে এবং সম্ভবতঃ এটি হবে ভারতবর্ষের বৃহত্তম মুর্যাল চিত্র। আগামী সেপ্টেম্বরে শিল্পী হুসেন তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করবেন। আমরা শিল্পী হুসেনের সৌভাগ্যে গর্বিত।

॥ অনাস্থা ॥

স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অনাস্থা প্রস্তাবের উপর তিন দিনব্যাপী আলোচনা শেষ হ'ল। অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া আর সকল বিরোধীদল সম্মিলিতভাবে এবং তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন সদ্য-নির্বাচিত সংসদ-সদস্য প্রবীণ নেতা আচার্য কৃপালনী। প্রস্তাবটি যে ভোটে গৃহীত হবে না একথা সকলেরই জানা ছিল কিন্তু শ্রীনেহরুর ষোল বছরব্যাপী অবিসংবাদিত শাসনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশের এই প্রথম প্রয়াস নানা কারণে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

প্রথমতঃ এইবার প্রথম কম্যুনিস্ট-বিরোধী অকংগ্রেসী দলগুলি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক প্রশ্নে ঐকামত হলেন, যদিও সে ঐক্যের ভিত্তি ছিল নেতিবাচক। বিরোধীদলগুলির পক্ষ হতে এমন কথাও বলা হয় যে, প্রয়োজন হলে তাঁরা কোয়ালিশন সরকার গঠন করবেন। চীনা হামলার পর সাতটি সংসদীয় নির্বাচনে চারটিতে কংগ্রেস পরাজিত হওয়ায় কংগ্রেসের পক্ষেও একথা জোরের সংগে বলা কঠিন হয়ে পড়েছে যে, তাঁদের অনুসৃত নীতিগুলির প্রতি দেশবাসীর আস্থা অটুট আছে। প্রধানতঃ এই কারণেই কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির কথা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে চিন্তিত করে তুলেছে। সংসদের বর্তমান ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস শুধু কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন আশা করতে পারেন কিন্তু সে সমর্থনে নির্বাচনে সাফল্যের আশা সামান্যই বৃদ্ধি পাবে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও একটি শক্তিশালী উপদল গড়ে উঠেছে যাঁরা নেহরুনীতির সংগে সব সময় একমত হন না।

কিন্তু নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশকালে বিরোধীদলগুলি এমন কোন সম্মিলিত কর্মসূচী বা চিন্তাধারা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন নি যাতে তাঁদের প্রতি দেশবাসীর আস্থা বৃদ্ধি পেতে পারে। জোটনিরপেক্ষতা ভোয়াচুক্তি, জাতীয় পরিকল্পনা, করবৃদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়েই বিরোধী দলগুলি ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে দলগুলির মধ্যে গুরুতর মতভেদ সেই দলগুলির হাতে ক্ষমতা গেলে দেশের অবস্থা এখনকার চেয়ে ভাল হবে এমন কথা অতি নির্বোধের পক্ষেও চিন্তা করা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের মতই একটি সর্বভারতীয় গণতন্ত্রীদল যতদিন না কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন ততদিন পর্যন্ত দেশবাসী কংগ্রেসকেই ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও সাম্প্রতিক নির্বাচন বিপর্যয় ও এই অনাস্থা প্রস্তাব হতে এইটুকু কংগ্রেসের উপলব্ধি করা উচিত যে নানা কারণে দেশবাসীর বিক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে এবং অনতিবিলম্বে যদি এই সব বিক্ষোভের প্রতিকার না হয় তবে বর্তমান রাজনৈতিক ভারসাম্য খুব বেশী দিন বজায় থাকবে না।

॥ বোম্বাই ধর্মঘট ॥

বোম্বাই পৌরসভার তেত্রিশ হাজার কর্মী মূল্যবৃদ্ধির জন্য মাগ্গীভাতার দাবীতে ১১ই আগষ্ট ধর্মঘট শুরু করেন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র সোস্যালিস্ট পার্টিই ছিলেন এই ধর্মঘটের সমর্থক, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ছিল আংশিক সমর্থন। আপৎকালীন অবস্থায় এই ধরনের ধর্মঘট কংগ্রেসের সমর্থন তো ছিলই না এমন কি কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ হতেও এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু ধর্মঘট শুরু হওয়ার মাত্র আট-নয় দিনের মধ্যে যে দ্রুতগতিতে প্রসারলাভ করে তা কারো পক্ষে চিন্তা করা সম্ভবপর হয়নি। কয়েক দিনের মধ্যেই পৌরসভার পরিচালনাধীন বোম্বাই বিদ্যুৎ ও পরিবহন সংস্থার তেইশ হাজার শ্রমিক ঐ ধর্মঘটে যোগ দেন। পৌরশ্রমিকদের সমর্থনে ১৮ই আগষ্ট মধ্য রাত্রিতে সতেরো হাজার ট্যাক্সীচালক অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট ঘোষণা করেন। পরদিন বারো হাজার ডক শ্রমিকও সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট শুরু করেন। মঙ্গলবার সমগ্র বোম্বাই শহরে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। সাড়ে সাত লক্ষ শ্রমিক এই সাধারণ ধর্মঘটে যোগদান করেন অর্থাৎ তেত্রিশ হাজার ধর্মঘটী শ্রমিকের দাবীর সমর্থনে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এগিয়ে আসেন সাড়ে সাত লক্ষ শ্রমিক। দেশে যে সময় ঐক্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী সেই সময় এই জাতীয় ব্যাপক ধর্মঘট খুবই অবাঞ্ছিত; কিন্তু তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচার দেশবাসীকে আজ এমনই বিক্ষুব্ধ ও বেপরোয়া করে তুলেছে যে, অনুচিত জেনেও অনেক সময় তাঁরা এমনিভাবে সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসছেন। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই বিক্ষোভ সর্বাধিক চিন্তার বিষয় কারণ দেশের উৎপাদন মূলতঃ তাদের শ্রমের উপরই নির্ভরশীল।

॥ দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অশান্তি ॥

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বৌদ্ধধর্মীদের বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করেছে। সে দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা প্রায় এক কোটী ঃ আর ক্যাথলিক খৃষ্টানের সংখ্যা মাত্র দেড়লক্ষ কিন্তু দেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ক্যাথলিকদের হাতে। জনকল্যাণে সরকার সে দেশে যে অর্থ
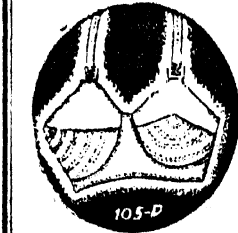
বরাদ্দ করেন তা সবই ব্যয় হয় ক্যাথলিক-দের মধ্যে। সরকারী ব্যয়েই নির্মিত হয় ক্যাথলিক গির্জা, সেনাবিভাগে অপ্রতিহত ক্যাথলিক কর্তৃত্ব, পদস্থ কর্মচারী মাত্রই ক্যাথলিক। এবং শিক্ষা-ব্যবস্থারও সকল ক্ষেত্রে ক্যাথলিক পক্ষপাতিত্ব।

ক্যাথলিক নো দিন দিয়েম-এর সাম্প্রদায়িক শাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বৌদ্ধরা দীর্ঘ দিন ধরে সংগ্রাম করছেন। তাঁদের সে স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামকে নির্মম হাতে দমন করছেন দিয়েম সরকার। তাঁদের প্রার্থনা-সভাগুলির চারিদিকে কাঁচা তার দিয়ে ঘিরে প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই অবিচারের প্রতিবাদে গত ১১ই জুন কম্বোডিয়ার দূতাবাসের সম্মুখে বিরাট জনতার উপস্থিতিতে নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ ভিক্ষু থিচ্ কুয়াং দুক। জীবন দিয়ে বৌদ্ধদের এই প্রতিবাদ আজ সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ছড়িয়ে পড়েছে। দিয়েম সরকারের অন্যায় পীড়নমূলক শাসনের প্রতিবাদে এ পর্যন্ত পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু আত্মদান করেছেন। ফলে সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েৎনাম-ব্যাপী এমন প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে যে দিয়েম সরকার সামরিক আইন জারী করতে বাধ্য হয়েছেন। সমগ্র ভিয়েৎনামে অবরোধ অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে হয়ত আরও রক্তপাত হবে, কিন্তু যা অনিবার্য তাকে খুব বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না দিয়েম সরকার। এক কোটী মানুষের ন্যায্য দাবীর কাছে নতিস্বীকার করতেই হবে—মাত্র দেড়লক্ষ ক্যাথলিক-সমর্থিত সাম্প্রদায়িক সরকারকে।

॥ ইস্লামী যুক্তরাষ্ট্র ॥

ইরাণের শাহের মধ্যস্থতায় কিছু-কাল আগে পাকিস্থান ও আফগানিস্থানের দীর্ঘ দিনের বিরোধের একটা কার্যকরী নিষ্পত্তি হয়। তারপরে ঐ তিনটি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা ওঠে। পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব এই যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সমর্থক ছিলেন।

তাঁর আশা ছিল হয়ত এই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়েই তিনি পাখতুনিস্থান সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। কিন্তু ইরাণের শাহ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবটিকে বাতিল করেছেন। তাঁর আপত্তির

প্রধান কারণ ভাষা। পশ্চিম পাকিস্থান, ইরাণ ও আফগানিস্থানের পার্শ্ববর্তী হলেও পূর্ব পাকিস্থানের অবস্থিতি প্রায় হাজার মাইল দূরে। পাকিস্থানের অধিকাংশ লোকই বাস করে সেই স্থানে এবং তাদের মাতৃভাষা বাংলার সঙ্গে আরবী ফার্সী প্রভৃতির সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই। এই বিচ্ছিন্নতা ও ভাষার পার্থক্যকে ইরাণের শাহ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পথে অনতিক্রম্য বাধা বলে মনে করেছেন, সুতরাং আয়ুবের স্বপ্নের ঐশ্লামিক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে না এবং এই সুযোগে পাখতুনদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী নস্যাৎ করার যে মতলব করেছিলেন তিনি তা ব্যর্থ হলো।

॥ মৈত্রীসফর ॥

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ যুগোশ্লাভিয়া সফরে গিয়েছেন। তিনি পনেরো দিন থাকবেন সেখানে। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট-যুগোশ্লাভিয়া বিরোধের অবসানকল্পে ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভ প্রথম বার যুগোশ্লাভিয়া যান। তারপর যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো দুবার সোভিয়েট সফরে আসেন। টিটো সর্বশেষ সোভিয়েট সফরে আসেন গত বছর ডিসেম্বর মাসে, সেই সময় ক্রুশ্চেভকে তিনি যুগোশ্লাভিয়া সফরের আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণ রক্ষাকল্পে ক্রুশ্চেভ এই দ্বিতীয়বার যুগোশ্লাভিয়া গেলেন। যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান মনোভাব চীনের বিবেচনায় বিশেষ আপত্তিকর, কিন্তু সে আপত্তিকে তুচ্ছ করে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে আরও হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশে ক্রুশ্চেভ বেলগ্রেডে গেছেন। সুতরাং এ মৈত্রীসফর রাজনৈতিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কম্যুনিষ্ট দুনিয়ায় এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

॥ সংস্কৃতির আতঙ্ক ॥

পূর্ব পাকিস্থানের সরকারপুষ্ট প্রতিষ্ঠান বেঙ্গলী একাডেমির সভাপতি মহম্মদ বরকতুল্লা গত ২রা আগষ্ট ঢাকায় এক বক্তৃতায় বলেন, কলকাতা থেকে ঢাকায় যে বই আমদানি করা হয় সেটা পাকিস্থানের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর এবং অবিলম্বেই তা বন্ধ হওয়া উচিত। ক্ষতির কারণও তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এইভাবে একটি বিদেশী জাতির সাহিত্য ও ভাষা পূর্ব পাকিস্থানের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেলে পূর্ব পাকিস্থানের সংস্কৃতিই শেষ পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়বে।

বক্তা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, বাঙলা ভাষা চিরদিনই হিন্দু-প্রভাবিত ছিল না, তার নিজস্ব একটা 'মুসলমানী সত্তা' আছে। সেই সত্তাকে জাগরিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যের পূর্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে।

॥ ঘরে ॥

১৫ই আগষ্ট—২৯শে শ্রাবণ ঃ কলিকাতাসহ দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবসের (১৫ই আগষ্ট) ষোড়শ বার্ষিকী উদ্‌যাপিত—দিল্লী হইতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক জাতির প্রতি যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান। স্বাধীনতা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের (পশ্চিমবঙ্গ) বেতারভাষণ ঃ সীমান্তে বিপদ (চীনা হুমকীজনিত), তাই আত্মত্যাগের সংকল্প চাই।

যুক্ত বিমান প্রতিরক্ষা-শিক্ষণ-মহড়ার জন্য ভারতে মার্কিন রাডার ও সাজ-সরঞ্জাম (প্রথম দফা চালান) উপনীত।

ঋষি শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব দিবসে (১৫ই আগষ্ট) জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১৬ই আগষ্ট—৩০শে শ্রাবণ ঃ 'সীমান্তের অবস্থা আরও ভয়ংকর, চীনারা সীমান্তের অনেকখানি নিকটে চলিয়া আসিয়াছে' — লোকসভায় শ্রীনেহরুর জরুরী বিবৃতি—ভারত-চীন পত্রাদি বিনিময় সম্পর্কে নবম শ্বেতপত্র পেশ।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দোপাধ্যায়ের (৭৮) কলিকাতায় জীবনাবসান।

বোম্বাইয়ের পৌরসভা-কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে কুড়ি হাজার পরিবহন ও ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্মীর ধর্মঘট শুরু।

১৭ই আগষ্ট—৩১শে শ্রাবণ ঃ 'প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমালব্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলেও তাঁহার সততায় সন্দিহান নহি'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি—সিরাজুদ্দীন কোম্পানী-মালব্যজী যোগাযোগ প্রশ্নে বিচারপতি শ্রীদাশের তদন্ত রিপোর্টের উল্লেখ—রিপোর্ট বহুলাংশে মালব্যজীর পক্ষে ও কিছুটা বিপক্ষে বলিয়া ইঙ্গিত।

'স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আদেশ পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠে না'—লোকসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র উক্তি।

বোম্বাইয়ে পৌরকর্মী ধর্মঘটে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের দাবী (বিরোধীদের) অগ্রাহ্য।

১৮ই আগষ্ট—১লা ভাদ্র ঃ মৎস্য-নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গের অভিযোগে কলিকাতায় আটজন পাইকারী মৎস্য-বিক্রেতা গ্রেপ্তার।

দেশে চিন্তাধারার দারুণ দৈন্যে শ্রীনেহরুর গভীর ক্ষোভ।

বোম্বাইয়ে পৌরকর্মীদের ধর্মঘটে (সপ্তম দিনে) ট্যাক্সি-চালকদেরও (সাত হাজার) যোগদান—মুখ্যমন্ত্রীর (শ্রীএস কান্নামওয়ার) তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছাসেবীদের (কংগ্রেস) নগরীর আবর্জনা পরিষ্কারের উদ্যম।

১৯শে আগষ্ট—২রা ভাদ্র ঃ নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে আচার্য কৃপালনীর (লোকসভা সদস্য) কঠোর সমালোচনা—চীনের সহিত সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ ও হৃতভূমি পুনরুদ্ধার দাবী—লোকসভায় ঐতিহাসিক অনাস্থা প্রস্তাবের (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে) আলোচনা আরম্ভ।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় হস্তিনী 'ফুলমালা' কর্তৃক মাহুত (ফরমান মিঞা) নিহত—মধ্য রাত্রিতে গুলী করিয়া হিংস্র 'ফুলমালাকে' হত্যা।

আসামের চালিহা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম অনাস্থা প্রস্তাব—বিধানসভায় উত্থাপিত।

২০শে আগষ্ট—৩রা ভাদ্র ঃ 'বোম্বাই বন্ধ' আহ্বানে সারা বোম্বাইয়ে সর্বাত্মক হরতাল—মহানগরীতে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা বিপর্যস্ত—মূল্যবৃদ্ধি ও অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

'কংগ্রেসই গণতন্ত্রকে বাঁচাইয়াছে'—লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনায় শ্রী এস কে পাতিলের ঘোষণা—কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীর আক্রমণে বিরোধী দল জর্জরিত।

'শৌলমারীর সাধু নেতাজী নহেন'—বিধান পরিষদে (পশ্চিমবঙ্গ) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের উক্তি।

২১শে আগষ্ট—৪ঠা ভাদ্র ঃ দশ দিন পর বোম্বাই পৌর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত—কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচাবনের আবেদনে সুফল।

লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের উপর পুনরায় বিতর্ক—সোস্যালিষ্ট নেতা ডাঃ লোহিয়ার দাবী ঃ নেহরু সরকারের প্রতি আস্থা নাই, দেশে নূতন করিয়া নির্বাচন চাই। অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র পাল্টা উক্তি ঃ গণসমর্থিত অন্য দল (কংগ্রেস ছাড়া) নাই, দায়িত্ব ত্যাগ অসম্ভব।

খাদ্য ও মূল্য নীতির (সরকারী) প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী (পশ্চিমবঙ্গ) আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ—কলিকাতায় ত্রিশজনের গ্রেপ্তারবরণ।

॥ বাইরে ॥

১৫ই আগষ্ট—২৯শে শ্রাবণ ঃ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ধর্মীয় (বৌদ্ধ) নির্যাতনের প্রতিবাদে জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরও অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আত্মবিসর্জন।

'ভারত সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিল্পের ক্ষেত্রে মার্কিন সাহায্য বন্ধ করা হইলে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটিবে'— নিউইয়র্কে ভারতস্থ প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গলব্রেথের সতর্কবাণী।

১৬ই আগষ্ট—৩০শে শ্রাবণ ঃ 'ভারতের নিরপেক্ষতা নীতির উপর চীন অব্যাহত আক্রমণ চালাইয়াছে'—সোভিয়েট পত্রিকা 'প্রাভদার' কঠোর মন্তব্য।

চীন-পাকিস্থান বিমান যোগাযোগ সম্পর্কে করাচীতে আলোচনা শুরু।

পদত্যাগকারী সমরমন্ত্রী প্রফুমোর (মিস কিলার কেলেঙ্কারীর সহিত জড়িত) শূন্য আসনে (বৃটিশ পার্লামেন্টে) সরকারী রক্ষণশীল দলের প্রার্থীই নির্বাচিত।

১৭ই আগষ্ট—৩১শে শ্রাবণ ঃ নেপালে গুরুত্বপূর্ণ নূতন সামাজিক আইন (শতবর্ষব্যাপী পুরাতন ব্যবস্থার স্থলে) প্রবর্তন।

সিনকিয়াং-এ (চীনা অধিকৃত) চীন-বিরোধী বিক্ষোভ ধূমায়িত হওয়ার সংবাদ।

১৮ই আগষ্ট—১লা ভাদ্র ঃ 'আটকাধীন খান আব্দুল গফুর খানের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে'—পাকিস্থানী নেতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির বিবৃতি।

পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থানে আবার হিন্দু নির্যাতনের সংবাদ।

সায়গনে দিয়েম সরকারের (দক্ষিণ ভিয়েৎনাম) বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের প্রবল বিক্ষোভ।

রুশ-চীন সীমান্তে উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশ। (লণ্ডন সংবাদ)।

১৯শে আগষ্ট—২রা ভাদ্র ঃ পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের স্পীকার মৌলবী তমিজুদ্দিন খানের (তিয়াত্তর) ঢাকায় পরলোকগমন।

চীনের হালচালে সোভিয়েট প্রধান-মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ উদ্বিগ্ন।

২০শে আগষ্ট—৩রা ভাদ্র ঃ দশ দিনের মধ্যে নেপালে আবার ভূমিকম্প—কয়েকজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু।

যুগোশ্লাভিয়া সফরে মিঃ ক্রুশ্চেভের বেলগ্রেডে উপস্থিতি ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভ—প্রেসিডেন্ট টিটোর (যুগোশ্লাভ-প্রেসিডেন্ট) সহিত রুশ প্রধানমন্ত্রীর হৃদ্যতাপূর্ণ বৈঠক।

২১শে আগষ্ট—৪ঠা ভাদ্র ঃ দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সামরিক আইন জারী—বৌদ্ধ আন্দোলন দমনের ব্যবস্থা।

নতুন বই

জর্জ বার্নার্ড শ

তিলোত্তমা উপাখ্যানে আছে যে দৈত্যদলনের জন্য ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা ত্রিভুবনের সকল উত্তম পদার্থের তিল তিল অংশ সংগ্রহ ও যোজনা দ্বারা, পুরুষের দেহমনের সকল কামনা ও লালসা আকর্ষণের জন্য তাহাকে সৃজন করেন। তাহাকে দেখিয়া শুধু যে সুন্দ উপসুন্দের মত দৈত্যদ্বয়ই মুগ্ধ প্রলুব্ধ ও মত্ত হয় তাহাই নয়। সৃষ্টির পর সে যখন দেবতাদিগকে প্রদক্ষিণ করে তাহাকে নিরন্তর দেখিবার জন্য ব্রহ্মার চারিদিকে চারিটি মুখ ও ইন্দ্রের বদনে সহস্র লোচন সৃষ্ট হয়, ঐ পরমাসুন্দরী নারীর মোহিনী শক্তি এমনই প্রবল ছিল।

যদি রূপে গুণে আকৃতিতে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির কিছু কল্পনা করা যায় তবে তাহার নাম জর্জ বার্নার্ড শ। দীর্ঘ, কৃশদেহযুক্ত কঠোর পুরুষমূর্তি, প্রশস্ত ললাটের নীচে দীর্ঘ খাড়া নাসিকা ও তীব্রদৃষ্টিপূর্ণ নীলাভ চক্ষু এবং বিদ্রূপের হাসিমাখা ক্রুর ওষ্ঠ ও চিবুক এবং প্রকাণ্ড মাথা ও লম্বা রক্তিম মুখ ঘিরিয়া অগ্নির আভাযুক্ত কেশ গুম্ফ ও শ্মশ্রু, এই তো ছিল তাঁহার মুখাবয়বের বর্ণনা।

সেই সঙ্গে ছিল ক্ষুরধার ধীশক্তি, তীক্ষ্ণ, গভীর ও অব্যর্থ লক্ষ্যসন্ধানী দৃষ্টি, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর অচলা বিশ্বাস, অদম্য সাহস এবং সর্বোপরি ছিল দুর্দমনীয় যুযুৎসু ভাবাপন্ন উদ্দাম আইরিশ প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি, যাহার চালনায় প্রতিষ্ঠিত সবকিছু স্থিতিচ্যুত করার, সোজাকে উল্টাইয়া দেখিবার ও যাহা কিছু মানবসমাজে চিরন্তন প্রথায় স্বীকৃতি পাইয়া আসিতেছে তাহাকে কক্ষচ্যুত করার স্পৃহা তাঁহার মনে সদা জাগ্রত থাকিত। এবং এই সকল প্রবল শক্তি ও প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত ছিল নিজের সবল চিন্তা, কল্পনা ও মননশক্তি-প্রবাহকে অতি আশ্চর্য মর্মভেদী ভাষায় রূপান্তরিত করার অমানুষিক ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার প্রয়োগ হইত কখনও শাণিত বর্শাফলকের মত অন্তর্ভেদীভাবে, কখনও বিদ্রূপের কশাঘাতে, কখনও বা বিদূষকের হাস্যরসের সহিত। আবার গুরু-গম্ভীর বিষয়ের চর্চাও অতি সহজ সরলভাবে চালিত হইত ঐ একই লেখনিতে, যদিও তাহারই মধ্যে শ্লেষ-বিদ্রূপের খোঁচা হঠাৎ আসিয়া পড়িত কেননা একই ধারায় একই মুখে তাঁহার চিন্তা, ভাষা বা কথার প্রবাহ চলিতে চাহিত না। এই ছিল ঐ অপূর্ব শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব। এবং এই কারণেই এইরূপ বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তি ও প্রেরণায়, তিনি প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে চমকিত, বিচলিত, মথিত ও মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লণ্ডনে, ছাত্রাবস্থায়, একদিন ক্রমওয়েল রোডস্থ নর্থ ব্রুক সোসাইটির বসিবার ঘরে দেখিয়াছিলাম, কয়জন ইংরাজ সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক সেইদিন বিকালের দৈনিক Westminster Gazette-এ প্রকাশিত এক ব্যঙ্গচিত্র লইয়া হাসির রোল তুলিয়াছেন। চিত্রটি প্রসিদ্ধ কার্টুন চিত্রকার Sir Frederic Carrinthers-Goield অঙ্কিত এবং তাহাতে ছিল G, B, S, আকাশে পা তুলিয়া দাড়ি ও দুষ্টহাসি লইয়া শীর্ষাসনে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত ও বিচলিত ভাবে, অবাক দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখিতেছেন তাঁহার পরম বন্ধু ও সুহৃদ সুপ্রসিদ্ধ নাট্য প্রযোজক ও পরিবেশক Charles Frohman। ছবির নিচে লেখা "Charlie was pained to see the dear fellow still in the same position as he was when he left". ফ্রোমান তার দুইদিন আগে দীর্ঘ দশ বৎসরের প্রবাস যুক্তরাষ্ট্রে কাটাইয়া ফিরিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলি যে সেই সময় শ, Peter Pan লেখক জেমস্ ব্যারি ও ফ্রোমান এই তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বোধহয় ঐ কার্টুনের সময়ে বা তাহার অল্প পরে Pygmalion নাটক মঞ্চস্থ হয় এবং ইলাইজা ডুলিটলের ভূমিকায় Mrs. Patrick Campbell ভদ্রসমাজে নিষিদ্ধ বাক্য "Not bloody likely" বলিয়া সারা লণ্ডনে হাসির বন্যা বহাইয়াছিলেন। এই সময়ের প্রায় বিশ বৎসর পরে যুক্তরাষ্ট্রের Heron Lakes নামক অঞ্চলে একদল শ্বেতাঙ্গ নরপিশাচ কয়েকজন জীবন্ত নিগ্রোকে পোড়াইয়া মারে এবং স্থানীয় নিগ্রোদের উপর পশুবৎ অত্যাচার চালায়। শ'য়ের মন্তব্য "It is time the 'Mayflower' was fitted out again to carry civilization to the americans" বিলাতের দৈনিকগুলিতে প্রকাশিত হয়। ঐ Mayflower জাহাজেই ইংরাজ পিউরিটান ঔপনিবেশিক পিতৃগণ বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রে সভ্যতা লইয়া গিয়াছিলেন।

এই কঠোর কর্কশ পুরুষভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বের অন্তরে দয়া-দাক্ষিণ্য বদান্যতা ইত্যাদি কোমল ভাব যে থাকিতে পারে মনে হয় না। অথচ আমার পরিচিত এক চিত্রশিল্পী, যিনি তখন কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের একজন চিত্র-শিক্ষক ছিলেন, অল্প পূর্বে আমায় দেখাইয়া নিজের অঙ্কিত শ'য়ের এক pen and ink sketch জাতীয় প্রতিকৃতি পাঠাইয়াছিলেন। ঐ কালি-কলমের রেখায় আঁকা ছবিটি ভাল হইয়াছিল বলিয়া তিনি শ'কে এক চিঠি লিখিয়া তাহা উপহার হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন। চিঠিতে তিনি ইংরাজীতে নিজের শিল্পী-জীবনের আশা-নিরাশার কথা নিজের ভাষায় বলেন এবং একথাও স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে চিঠির বা ছবির প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত তিনি প্রত্যাশা করেন না। তিনি শ'য়ের মত ভুবন-বিখ্যাত লোকের পক্ষে এরূপ একজন দূর দেশের অজ্ঞাত ও অখ্যাতনামা লোকের চিঠি বা সামান্য উপহারের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ ভিন্ন অন্য কিছু করা সম্ভব নয়—একথা জানেন এবং সেই কারণে তিনি চিঠি ও ছবি পাঠাইয়াই সন্তুষ্ট। আমি বলিয়াছিলাম হয়ত শ'য়ের সেক্রেটারি প্রাপ্তিস্বীকার করিবেন, তিনি তাহাতে বলেন তাহাও প্রায় অসম্ভব বলিয়া তিনি মনে করেন। নিজের মনের কথা নিবেদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট। আশ্চর্যের কথা এই যে উত্তর আসিল এবং তাহা স্বয়ং শ'য়ের হস্তাক্ষরে। সামান্য কয়ছত্র লেখা কিন্তু আরম্ভেই ছিল "Courage, brave Biren", ইত্যাদি উৎসাহদানের কথা এবং সবশেষে

প্রায় একই টানে ও একসঙ্গে তাঁহার স্বাক্ষর। এতো অল্পকথায় অতটা স্নেহ-সহানুভূতিজ্ঞাপন শ'য়ের পক্ষেই সম্ভব ছিল!

এই অশেষ বৈপরীত্যপূর্ণ ঘটনাবহুল দীর্ঘজীবনের অনেক কিছুই দুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। মৈত্রী-দ্বন্দ্ব, প্রণয়-বিচ্ছেদ, সখ্য-বিরোধ ইত্যাদি অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে ঐ চুরানব্বই বৎসরের প্রায় সমস্তটাই অতিবাহিত হইয়াছিল। উপরন্তু শয়ের ব্যক্তিত্ব ছিল এক জীবন্ত ব্যাসকূট। কথাবার্তায়, লিখিত মন্তব্যে, নাটকে, রচনা ও পত্রাবলীতে তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রতিরূপের পিছনে প্রচ্ছন্ন ছায়া-মূর্তির আভাস প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পাওয়া যাইত। এই দুইটির মধ্যে কোনটি নকল, কোনটি আসল তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং সেই কারণে অনেকে নানা-ক্ষেত্রে তাঁহার মুখোশকেই প্রকৃত মুখ বলিয়া ভ্রম করিয়া গিয়াছেন। এই রহস্যময় জীবনের সম্যক ও সঠিক পরিচয়দান প্রায় অসম্ভব। যতটা সম্ভব তাহা সাফল্যের সহিত করিয়াছেন ভবানী মুখোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশের ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও নাট্যমঞ্চের অধিকারী-অভিনেতৃ লইয়া গঠিত ব্রিটিশ রসিক-সমাজের জীবনস্পন্দন ও বিবর্তনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে শ-য়ের জীবন বিজড়িত। সেই কারণে ইহার ধারাবাহিক বিবরণের মধ্যে সমসাময়িক সাহিত্য ও নাট্যজগতের এবং ব্রিটিশ শিক্ষিত রসিক-সমাজের নানা চিত্রাবলী দেওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে এই দুর্দান্ত, দুর্বিনীত অভব্য ও অসামাজিক চরিত্রের সংঘর্ষে ঐ সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত সমাজদ্বয়ের প্রতিক্রিয়ার নিদর্শনরূপে তাঁহার নিজের ও অন্য নানাজনের পত্রাবলী, কথাপ্রসঙ্গ, সমালোচনা ও অলিখিত মন্তব্যের উদ্ধৃতিও নিতান্তই প্রয়োজন। আবার ঐ জাতীয় সমসাময়িক কথাপ্রসঙ্গে, মন্তব্যে ও আলোচনায় এতো বিভিন্ন প্রকারের—অনেক ক্ষেত্র পরস্পর-বিরোধী—মতামতে শ-য়ের জীবন-পরিক্রমার পথ আকীর্ণ হইয়া আছে যে তাহার মধ্য হইতে যথাযথভাবে তথ্যচয়ন ও তাহার ব্যবহার দুই-ই দুরূহ কাজ। ভবানীবাবু ওই বিচিত্রজীবনের ক্রমবিকাশ দেখাইবার জন্য সুনিপুণভাবে তথ্যচয়ন করিয়া যে ভাবে তাহার ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহার মত সুদক্ষ ও কৌশলী কথা-শিল্পী ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিভাবে ঐ "raw aggressive Dubliner" আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও সংঘাতের পথে প্রথমে "priviledged lunatic with the license of a jester" রূপে পরিচিত হইয়া শেষজীবনে প্রখর বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন বিশ্ব-পর্যবেক্ষক ও সমালোচক-রূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। এই জীবন-আলেখ্যের মধ্যে ভবানীবাবু অতিশয় মনোগ্রাহীভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এবং ঐ বিবৃতি নভেলের মত সহজ ও সুস্পষ্ট। *

শ মার্কসবাদকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা এবং তিনি সত্যসত্যই স্টালিনের গুণমুগ্ধ অনুরাগী ছিলেন কিনা—এই প্রশ্নের কোনও নিঃসন্দেহ নিষ্পত্তি কোনদিন হইবে কিনা সন্দেহ কেননা তাঁহার নিজস্ব মন্তব্য দুমুখো করাতের মত মার্কসবাদ ও তাহার বিরোধী-মত এই দুইকেই আংশিকভাবে কর্তন করিয়া গিয়াছে। তিনি স্টালিনের ভক্ত ছিলেন কিনা এ প্রশ্ন আরও জটিল। সহজ বিচারে মনে হয় জর্জ বার্নাড শয়ের মতো আত্ম-কেন্দ্রিক ও অনন্যতন্ত্রতাপূর্ণ চরিত্রের পক্ষে কোনও বাঁধাধরা, ছাঁচে-ফেলা, রাষ্ট্র-নৈতিক মতবাদকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করা বা স্টালিনের মত রাষ্ট্রনৈতিক-জগতের একাংশের অধীশ্বরকে অকপটে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব্যাপার।

যে সময়ের ঘটনাবলী এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে সেই সময়েই শয়ের প্রতি-দ্বন্দ্বী ওয়েলস কার্ল মার্কস ও মার্কস-বাদকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ চালাইতে-ছিলেন। সেটা প্রসিদ্ধ "Zinovieff letters"-এর যুগ এবং ঐ জালপত্রাদির ব্যবহারে ব্রিটিশ লেবার পার্টিকে আসন-চ্যুত করার কথা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন ব্রিটেন ও আমেরিকায় তখন সোভিয়েট ও স্টালিনের প্রতি কি প্রবল বিদ্বেষের প্লাবন বহিতেছে। সুতরাং মার্কসবাদ, স্টালিন ও সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের প্রশংসায় মুখর হওয়াই তো শ-য়ের পক্ষে স্বাভাবিক।

—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

*** জর্জ বার্নাড শ'** (জীবন-গ্রন্থ) —ভবানী মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য দশ টাকা।

●

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন-সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য ঘটেছিল যাঁদের, তাঁদের মধ্যে বিশ্বভারতীর বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার সুধীরঞ্জন দাসের নাম উল্লেখ-যোগ্য। দীর্ঘকাল আইন ব্যবসায়ে জড়িত থেকেও তাঁর মনের মধ্যে যে গভীর সাহিত্যরস লুপ্ত ছিল, তার পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম কিছুকাল আগে প্রকাশিত 'আমাদের শান্তিনিকেতন' নামক গ্রন্থে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত দাসের 'আমাদের গুরুদেব' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান স্মৃতিমূলক গ্রন্থখানি রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু পাঠক এবং গবেষকদের কাছে মূল্যবানরূপে বিবেচিত হবে। বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতনের জন্মকথা থেকে শুরু করে বিভিন্ন অধ্যায়ে রবীন্দ্র-দর্শন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাহচর্যে শ্রীযুক্ত দাস তাঁকে যে কত গভীরভাবে জানতে পেরেছিলেন তার পরিচয় সর্বত্র সুস্পষ্ট। বিশ্ব-মানবিকতা ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা—রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচিত্র রূপ ও বিকাশ, রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের গোড়ার কথা—অধ্যায়গুলি সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট করে।

শ্রীযুক্ত দাসের এই মূল্যবান গ্রন্থ-খানির হৃদয়গ্রাহী ভাষা-মাধুর্যই পাঠক-মনের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। তাঁর রবীন্দ্র-সেবা—বিশ্বভারতী সেবা সার্থক হোক। তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও কিছু জানবার ইচ্ছা আমাদের রইল।

আমাদের গুরুদেব— (স্মৃতিকথা)—সুধীরঞ্জন দাস। বিশ্বভারতী—৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭। দাম ৩·৫০

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথাঃ

সাধনা ও সিদ্ধি ঃ

অন্ততঃ একজনের জীবনে আমি দেখেছি যে, বড়ো হবার ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে সাধনা করলে সিদ্ধি একদিন না একদিন হাতের মুঠোর মধ্যে আসবেই। অবশ্য এই সাধনা করবার আগে কিছু কি মূলধন ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। ছিল বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, সুন্দর মুখচ্ছবি এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে অর্থব্যঞ্জক ভাসন্ত একজোড়া চোখ—আমি শ্রীমতী কাননের কথা বলছি।

কতক শোনা, কতক নিজের চোখে দেখা, কত কথাই না আজ মনের মাঝে ভীড় ক'রে দাঁড়াচ্ছে। রাধা ফিল্মস্-এর জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "মানময়ী গার্ল্স্ স্কুল'-এর ট্রেড শো (সকালের বিশেষ প্রদর্শনী) দেখবার পর আমরা কয়েকজন জড়ো হ'য়েছি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে স্টুডিও-ম্যানেজার অমর মল্লিক মহাশয়ের ঘরে। বড়োদের মধ্যে জোর আলোচনা চলেছে ছবিটির নায়িকার অভিনয় নিয়ে। আমি নীরব শ্রোতা। হঠাৎ মিঃ বড়ুয়া আমার মতামত চেয়ে বসলেন। আমি খুব বিপন্ন বোধ করলুম; কারণ বড়ুয়া সাহেব তার আগেই যে-ভাবে শতমুখে নায়িকার
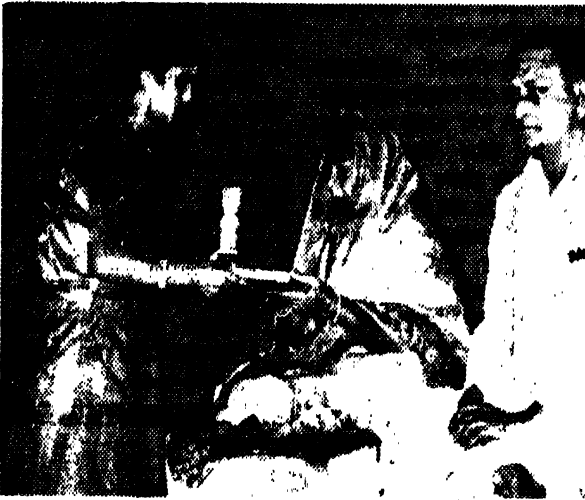
প্রশংসা করছিলেন, আমি ঠিক ততটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারছিলুম না। একে 'মানময়ী গার্ল্স্ স্কুল'-এ নায়িকাকে অত্যন্ত কৃশাঙ্গী ও রুগ্না বোধ হয়েছে, তার ওপর জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে নাট্য-নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগই বা কোথায়? তাই আমি অপ্রিয় ভাষণ করছি জেনেও বললুম, 'এমন কিছু আহামরি অভিনয় দেখলুম না; বলতে পারা যায়, সাধারণভাবে ভালো।' আমার কথা শুনে মিঃ বড়ুয়ার মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল; তিনি ধাঁ ক'রে টেবিল থেকে একটি কালো রঙের গোল রুলার (কাগজের ওপর লাইন টানবার জন্যে যা ব্যবহৃত হয়) তুলে নিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "আমার মাথায় মারুন।" আমি কেন, ঘরের সকলেই কিছুক্ষণের জন্যে হতভম্ব! আমি খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রুলারটিকে ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর আবার নামিয়ে রাখলুম এবং বললুম, "আসলে আপনি জানতে চান, মেয়েটির নাট্য-সম্ভাবনা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ আছে কিনা?—তা' নিশ্চয়ই আছে, একশো বার আছে।" মিঃ বড়ুয়ার মুখ সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; তিনি বললেন, "তাই বলুন; আপনি আমাকে একেবারে বসিয়ে দিয়েছিলেন। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পরিচালক বড়ুয়া যে আদৌ ভুল করেন নি, তার প্রমাণ 'মানময়ী গার্ল্স্ স্কুল'-এর নায়িকা কাননের—তখনও পর্যন্ত তিনি কাননবালা নামেই পরিচিতা ছিলেন—পরবর্তী জীবন। এই স্মরণীয় দিনটির পরেই কানন রাধা ফিল্মস্-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে নিউ থিয়েটার্স-এ এসে যুক্ত হন এবং বলাবাহুল্য, নিউ থিয়েটার্স-এর পতাকাতলেই কাননের অভিনেত্রী-জীবনের সমুজ্জ্বলতম অধ্যায়।

বহু গুণীজনের সান্নিধ্যে আসার ফলে এই নিউ থিয়েটার্সেই কাননের মনে অভিনেত্রীরূপে যশের উচ্চতম শিখরে

উঠবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করবার জন্যে তিনি যত রকম কৃচ্ছ্রসাধন করা সম্ভব, সমস্তই করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্সে তাঁর প্রথম ছবি 'মুক্তি'-র সাফল্যের কথা বাঙলার চলচ্চিত্রজগতে ইতিহাস হয়ে রয়েছে। তাঁর মুখের "ওগো সুন্দর, তোমার মুরতিখানি" গানখানি তখন শত-সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'ত। গায়িকা-নায়িকা হিসেবে তাঁর জুড়ি আমাদের বাঙলাদেশে খুঁজে পাওয়া যায়নি। 'বিদ্যাপতি' ছবিতে অনুরাধার ভূমিকায় তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় ক'রেছেন। "তব রথচক্রতলে প্রাণ দিব আমি"—ব'লে কবি বিদ্যাপতির রথের সামনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাঁর গতিরোধ করার দৃশ্য যিনি একবার দেখেছেন, তিনি তা' ইহজীবনে ভুলতে পারবেন না, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

বড়ো হবার জন্যে মানুষ কতখানি অক্লান্ত সাধনা করতে পারে, সে সম্পর্কে কানন-জীবনের দু'টি শোনা-কাহিনী এখানে উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্রের 'পরাজয়' ছবিতে কাননের যে-ভূমিকা ছিল, তাতে সাইকেল চালনার আবশ্যকতা ছিল। শ্রীচন্দ্র স্থির করেছিলেন, সাইকেল চালনার দূরের দৃশ্যে (লঙ শটে) তিনি কোনো দক্ষ সাইকেল-চালককে কাননের রূপসজ্জায় সজ্জিত ক'রে তাঁরই ছবি তুলবেন এবং নিকটের দৃশ্যে (ক্লোজ শটে) সাইকেলকে কোনো চলন্ত গাড়ীর ওপর দাঁড় করিয়ে রেখে তাতে শ্রীমতী কাননকে বসিয়ে ছবি তুলে নেবেন। কিন্তু নায়িকা কাননের এই ব্যবস্থা মনঃপূত হয়নি। তিনি যথার্থ সাইকেল-আরোহিণীরূপে দর্শকদের চোখের সামনে উপস্থাপিত হ'তে চাইলেন এবং এই কারণে প্রতিদিন শেষ রাতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে সাইকেল-চালনা অভ্যাস করলেন তিন-চার মাস ধ'রে।

পরিচালক ফণী মজুমদারের পরিচালনায় 'সাথী' ছবি তোলা হচ্ছিল—সায়গাল নায়ক এবং কানন নায়িকা। এখানে নায়িকাকে পথে পথে নেচে-গেয়ে বেড়াতে হয়েছে ছবির প্রথমাংশে। পরিচালক মজুমদার দাবী করলেন, শ্রীমতী কানন যেন কাজ-চলা গোছের নৃত্য-ভঙ্গিমা আয়ত্ত ক'রে নেন। নৃত্যের দৃশ্যগুলিতে যেখানে ক্লোজ-আপে পায়ের কাজ দেখানো হবে, সেখানে কোনো যথার্থ নৃত্যকুশলাকে ব্যবহার ক'রে কাজ চালানো হবে, এই রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীমতী কানন এ-ক্ষেত্রেও তাঁর জিদের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রয়োজনীয় নৃত্যশিক্ষার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন কথক-নৃত্যবিশারদ শম্ভু মহারাজ। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে শ্রীমতী কানন নৃত্যাভ্যাস করেছিলেন।

'জীবনকাহিনী' চিত্রে সন্ধ্যা রায়

পূর্বাচল-এর একটি দৃশ্যে কাজল গুপ্ত ও মাঃ রাজা

একদিন অভ্যাসের সময় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় তিনি মূর্ছিতা হয়ে পড়েন। শুশ্রূষার পর মূর্ছাভঙ্গে তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মহারাজ আছেন ত'! কারণ, মহারাজের কাছে সেই দিনই তিনি আরও তালিম নিতে বদ্ধপরিকর। বলা বাহুল্য 'সাথী' ছবিতে নাচের কোনো শটে অপর কোনো নৃত্যশিল্পীকে প্রয়োজন হয়নি।

নিউ থিয়েটার্সে থাকতেই কানন ইংরাজী ভাষার পাঠ নিতে শুরু করেন। ইংরাজী পড়া, লেখা ও তার প্রতিটি কথার বাঙলা শব্দার্থ তিনি যখন নিয়মিত অভ্যাস করছিলেন, তখনকার একটি ঘটনা আজও আমার স্মরণ আছে। নিউ থিয়েটার্সের মিউজিক রুমে আমরা কয়েকজন ব'সে আছি এবং বাঙলাতেই কথাবার্তা চলছে; হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন আর একজনকে ইংরাজীতে একটি প্রশ্ন ক'রে বললেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ইংরাজীতেই তার উত্তর দিলেন। বেশ বুঝলুম, কাননকে না বুঝতে দেবার জন্যেই তাঁরা ইংরাজীর আশ্রয় নিয়েছেন। কিছুক্ষণ বাদে কানন আমাকে একলা পেয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, প্রথম ব্যক্তি ইংরাজীতে এই কথাটি বলেছেন এবং প্রতি শব্দের বাঙলা অর্থ ক'রে জানতে চাইলেন সমস্ত বাক্যটির অর্থ বাঙলায় তিনি যা বুঝেছেন, তাই কিনা। এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর সম্পর্কেও অনুরূপভাবে বাঙলা অর্থ করলেন। এবং দু'টির প্রায় ত্রুটিহীন অর্থই তিনি করেছিলেন। আমি রীতিমত বিস্মিত হলুম, তাঁর স্মৃতিধরত্ব এবং ইংরাজী শিক্ষার জ্ঞান দেখে।

চলচ্চিত্রের গান ছাড়াও তিনি বহু রবীন্দ্র ও আধুনিক সঙ্গীত গেয়েছেন এইচ-এম-ভি এবং মেগাফোন রেকর্ডে। শেষোক্ত কোম্পানীর তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ রয়্যালটি-প্রাপ্তা গায়িকা। তিরিশ দশকে বাঙালী গায়িকাদের মধ্যে তাঁর রেকর্ডেরই চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশী।

তিনি স্বাধীনভাবে যখন চলচ্চিত্র-প্রযোজনার কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে শ্রীমতী পিকচার্স স্থাপন করেন, তখনও প্রযোজকরূপে তিনি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং একজন অভিজ্ঞ ও কৃতী প্রযোজকরূপে পরিবেশক-মহলে সম্মানিত হন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি স্বাধীনতার ষোড়শ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে গেল বুধবার, ২১-এ আগস্ট তারিখে পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্রের পৌরোহিত্যে শ্রীমতী কাননের সাফল্যমণ্ডিত শিল্পীসত্তার প্রতি সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলে তিনি যে সুন্দর নাতিদীর্ঘ প্রতিভাষণ দেন, তাতে বাঙলা চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতি তাঁর একান্ত মমত্ববোধই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিধন্য এই শিল্পটি যাতে সুস্থ পরিবেশে উন্নতির পথে চালিত হয়, তার জন্যে রাজ্যসরকারের কাছে তাঁর বিনীত আবেদন যেন ব্যর্থ না হয়।

নিউ এম্পায়ারে বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি, সি, সরকার :

ম্যাজিকের অর্থই হচ্ছে ভেলকিবাজী; কোনো মন্ত্র নয়, তন্ত্র নয়, সম্মোহনী-শক্তি নয়, স্রেফ ভেলকি বা চোখকে ফাঁকি দেবার কায়দা। কিন্তু সেই কায়দা যে সমবেত দর্শকমনে কি অসম্ভব মুগ্ধ-বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারে, বালক এবং বৃদ্ধকে সমানভাবে হতবাক ক'রে তুলতে পারে, তার সম্যক পরিচয় মেলে বিশ্ব-বন্দিত জাদুকর পি, সি, সরকারের 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনী থেকে।

একটি ছোট্ট খালি বাক্স থেকে শান্তির প্রতীক হিসেবে এক জোড়া পায়রা বার করা থেকে শুরু ক'রে এ্যাচ্যান্টেড গার্ডেন, মেটিরিয়ালাইজিং ডাক্‌স্‌, বার্ডস্‌ ফ্রম নো হোয়্যার, মিরাকল অ্যাট ডন, এক্সরে আই, ডাইভিসেকশন অব টোয়াইন ক্রাউন্‌স্‌, পাল্কী ইলিউশন, জাগ অব মিল্ক, কাটিং এ লেডী ইন হাফ্‌স্‌, হিন্দু ডার্করুম ম্যাজিক প্রভৃতি প্রায় ৩০টি খেলার মাধ্যমে প্রায় সওয়া দু'ঘণ্টা ধ'রে তিনি দর্শকদের প্রায় সম্বিৎহারা ক'রে রাখেন। বিশেষ ক'রে হাতলওয়ালা জালের সাহায্যে শূন্যে থেকে পাখী ধরা, ছ'খানি তাস হাতে ক'রে তার থেকে বারংবার তিনখানি ক'রে তাস ফেলে দেওয়ার পরেও হাতে ছ'খানি তাসই বাকী থাকা দেখানো, একটি মেয়েকে তার এক বগলের তলায় একটি খুঁটি দিয়ে শূন্যে নানা ভঙ্গীতে শায়িতা দেখানো, কঠিনভাবে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় যে-কোনো লেখা পড়া বা অল্প একটু খড়ির দাগকে ধ'রে নানা রকম ছবি আঁকা এবং একটি মেয়েকে ইলেকট্রিক করাতের সাহায্যে কোমরের কাছে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে তার কর্তিত অংশ দু'টিকে একেবারে তফাৎ ক'রে দেওয়া প্রভৃতি চমকপ্রদ খেলা যে অসাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য ও নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি মঞ্চের ওপর অনুষ্ঠিত করেন, সে একমাত্র তাঁর মতো শ্রেষ্ঠ জাদুকরের পক্ষেই সম্ভব। আমেরিকা, ইংলণ্ড ও রাশিয়ায় সমভাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাদুকররূপে তিনি যে সম্মানিত হয়েছেন, তা তাঁর যোগ্যতারই পরিচায়ক।

তাঁর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীতে তাঁকে সহায়তা করবার জন্যে আছেন বহু তরুণ এবং হাস্যলাস্যময়ী সুবেশা তরুণী। প্রচুর দ্রব্যসম্ভার, দৃশ্যপট এবং ছায়াছবির সাহায্যে পরিবর্তনশীল পশ্চাদ্‌পট ও বাদ্য-শিল্পীর সমন্বয়ে গঠিত এত বিরাট ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী এক পি, সি, সরকার ছাড়া আর কেউ মঞ্চস্থ করতে পেরেছেন ব'লে আমাদের জানা নেই।

রূপান্তরীর 'কর্ণিক' :

যে-সকল নাট্যগোষ্ঠী আজ পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাট্য-প্রযোজনায় নিজেদের ব্রতী করেছেন, নির্দ্বিধায় রূপান্তরী তাঁদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁরা কখনও গতানুগতিকতার পথে নিজেদের চালিত করেন না; সব সময়েই তাঁদের নাট্য-প্রযোজনার মাধ্যমে নূতন ভাবনা, নূতন উপস্থাপনা কৌশল, নূতন বক্তব্য সোচ্চার হয়ে ওঠে।

গেল রবিবার, ২৫-এ আগস্ট নিউ এম্পায়ারে তাঁদের নবতম নাট্য-নিবেদন 'কর্ণিক'-এর মধ্যেও এই নবসৃষ্টির প্রচেষ্টারই আর একটি নিদর্শন পাওয়া গেল। কর্ণিক হচ্ছে রাজমিস্ত্রীর আয়ুধ; এরই সাহায্যে সে গ'ড়ে তোলে ইঁটের ইমারত। 'কর্ণিক' নাটক বাড়ী তৈরীর কাজে নিযুক্ত মিস্ত্রী, কুলি, কামিন, বেলদার প্রভৃতিকে নিয়ে গঠিত একটি শ্রমবাহিনীর সঙ্গে অর্থগৃধ্নু কন্ট্রাক্টর-গোষ্ঠীর সংঘাতের কাহিনী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নাটকখানিতে সংঘাতের চূড়ান্ত রূপ উল্লেখ্যভাবে অনুপস্থিত। যে-চরম পরিণতি দর্শকের চিত্তে কাব্যিক ন্যায়-বিচারের রূপ ধ'রে প্রতিভাত হয়,

সগৌরবে দ্বিতীয় সপ্তাহ চলিতেছে

প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬॥   শনি ও রবিবার — ৩টা ও ৬॥টায়

নিউ এম্পায়ার

কলিকাতা : : ২৩—১৪০১

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর

রাশিয়া এবং আমেরিকা কর্তৃক সমভাবে অভিনন্দিত—বিশ্বশ্রেষ্ঠ যাদুকররূপে স্বীকৃতি—তাঁর অদ্ভূত অভূতপূর্ব, অলৌকিক, লোমহর্ষণ ই-ন্দ-জা-ল এত বিরাট যাদুপ্রদর্শনী সমগ্র এশিয়াতে ইতিপূর্বে আর কখনও সম্ভব হয় নাই—বহু চমকপ্রদ নূতন নূতন খেলা।

টিকিট :—২০্, ১০্, ৮্, ৫্, ৩·৫০ ও ২·০০

সে-পথে নাটক সহজভাবে অগ্রসর হ'ল না দেখে ব্যর্থতা অনুভব করতে বাধ্য হয়েছি।

প্রচুর বাঁশের খুঁটি, ভারা, অর্ধসমাপ্ত কংক্রীটের থামওয়ালা দৃশ্যের পরিকল্পনা যাঁরা করেছেন, তাঁদের সুন্দর কল্পনা-শক্তির অভিনবত্ব প্রশংসনীয়। বিভিন্ন ভূমিকায় জোছন দস্তিদার (সূর্য্য), চিন্ময় ঘোষ দস্তিদার (রবি), কুমার বসু (মীরচাঁদ), নিখিল চক্রবর্তী (যশোবন্ত), চন্দ্রা দস্তিদার (লখিয়া), চিত্রলেখা চক্রবর্তী (বাতোসী), মণিকা চক্রবর্তী (গুলাবী), জগদীশ চক্রবর্তী (মিঃ রে), সুজিত ঘোষ (দাসবাবু), শিশির চন্দ্র (গাঙ্গুলী) প্রভৃতি সকলেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

আবহ-সংগীত সৃষ্টিতে নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল।

(ওপরে) মস্কো টেলিভিসনের কর্মীর সংগে সুচিত্রা সেন। (নীচে) সোবিয়েত কনসাল জেনারেলের অফিসে প্রদত্ত অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সংগে শ্রীমতী সেন।

বিবিধ সংবাদ

ইন্দ্রাণী প্রোডাকসন্স-এর "হাসি শুধু হাসি নয়" :
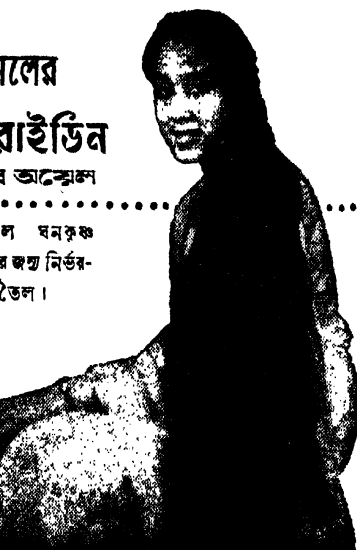
আসছে শুক্রবার, ৬ই সেপ্টেম্বর রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে ইন্দ্রাণী প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন "হাসি শুধু হাসি নয়" মুক্তিলাভ করবে। জগন্নাথ চক্রবর্তীর প্রযোজনায় ছবিখানির পরিচালনা এবং সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে সন্তোষ গুহরায় এবং শ্যামল মিত্র। চিত্রনাট্য লিখেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিশ্বজিৎ, জহর, ভানু, নীতিশ, অজিত, গঙ্গাপদ, কল্যাণী, জয়শ্রী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি শিল্পী। পরিবেশনায় আছেন ছায়ালোক (প্রাঃ) লিঃ।

"কাঞ্চন-কন্যা" :

দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যে আদর্শগত বিরোধ তা থেকে যে পরিস্থিতির সূচনা,

'কাঞ্চন-কন্যা' চিত্রের ভিত্তি তারই উপর। মূল চরিত্রে কণিকা মজুমদার ও অরুণ মুখার্জি যুগলে অবতীর্ণ। এই ছবিটির অন্তর্গত টাইপচরিত্রে যাঁদের দেখা পাওয়া যাবে তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য— অনুপকুমার, সুস্মিতা সান্যাল, পাহাড়ী ও অমর গাঙ্গুলী।

ভি বালসারা পরিচালিত গানগুলি এ ছবির সম্পদ বাড়িয়েছে। ছবি তুলেছেন স্বনামধন্য কলাকুশলী দেওজী ভাই।

সুখেন চক্রবর্তী পরিচালিত চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থা প্রযোজিত এ ছবিটি শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স-এর পরিবেশনায় বর্তমানে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

'শৌভনিক'-এর 'যা-নয় তাই' নাটকের দু'শততম রজনীর স্মারক উৎসব :

কলকাতার অন্যতম নাট্য সংগঠন 'শৌভনিক' তাঁদের প্রহসন নাটক 'যা-নয় তাই'-এর দুশততম রজনীর অভিনয় উৎসব পালন করবেন আসছে ১লা সেপ্টেম্বর সংস্থার নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ মুক্তাঙ্গনে। এর আগেও এই সংস্থা তাঁদের গোত্রা নাটকেরও শততম রজনী উৎসব পালন করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বর্তমান পর্যায়ে শৌভনিক 'যা-নয়-তাই' নাটকের অভিনয় বন্ধ রেখে নতুন আঙ্গিকে নিবেদিতা দাসের ঐতিহাসিক নাটক 'ঝাঁসীর রাণী' বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করবেন। নাটকটি দেশপ্রেমমূলক।

।। একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠান ।।

বর্ষসমাবর্তন প্রতিষ্ঠান উপলক্ষ্যে আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবারে ঝাড়গ্রাম পলিটেকনিকের ছাত্রবৃন্দ ছাত্রাবাসের প্রাঙ্গণে যে উৎসবের আয়োজন করেছে তাতে সভাপতিত্ব করবেন ঝাড়গ্রামের রাজা শ্রীএন, এম, দেব। প্রখ্যাত শিল্পী সর্বশ্রী শ্যামলকুমার মিত্র, দ্বিজেন মুখার্জি, আরতি মুখার্জি, মৃণাল গাঙ্গুলী, পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে সংগীত পরিবেশনে অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করবেন।

।। কোলাহলের অনুষ্ঠান ।।

দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম এবং খ্যাতনামা নাট্য-সংস্থা 'কোলাহল' গোষ্ঠী সুনীল দত্তের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর নাটক 'খর নদীর স্রোতে' গত ১লা আগস্ট বেহালার অহীন্দ্র-মঞ্চে মঞ্চস্থ করেন। তিন-অঙ্কের এই পূর্ণাবয়ব নাটকে দেখান হয়েছে একটা সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙ্গনের রূপ। অহংকার এবং অহমিকা মানুষের জীবনে স্থিতিশীল নয়, খর নদীর স্রোতের মতই সেই সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙাগড়ার মধ্যেই সৃষ্টি করে নতুন চরের—সবুজ ফসলের। প্রখ্যাত এবং শক্তিমান পরিচালক হরেন ভৌমিকের দক্ষতা এবং দূরদৃষ্টির ক্ষমতা-নৈপুণ্যে নাটকের পটভূমি জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন—গীতা সেন, তপন পাল, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, সরোজ চট্টোপাধ্যায়, শেখর মুখোপাধ্যায়, সুখেন্দু ঘোষ, তপন ঘোষ, অনাদি প্রামাণিক, সুবোধ দত্ত এবং সবিতা দাস।

কলকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ

কলকাতা

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'মহানগর' চিত্রের সম্পাদনা ও শব্দ-পুনর্যোজনা সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে সুসম্পন্ন হল। আগামী অক্টোবর মাসে আর, ডি, বনশাল-এর প্রযোজনা ও পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে। নরেন্দ্র মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে এ চিত্রনাট্যে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় হরেন চট্টোপাধ্যায়, শেফালিকা পুতুল, জয়া ভাদুড়ী, প্রসেনজিৎ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ভিকি রেডউড, অনুরাধা গুহ, মনীষা চক্রবর্তী ও শীলা পাল। কুশলী বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় সুব্রত মিত্র, দুলাল দত্ত এবং বংশীচন্দ্র গুপ্ত। সংগীত-পরিচালনা করেছেন শ্রীরায়। এ বছরের সপ্তদশ এডিনবরা চলচ্চিত্র-উৎসবে 'মহানগর' যোগদান করার আমন্ত্রণ পেয়েছে।

মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায় অভিনীত আর একটি ছবির নাম 'সিঁদুরে মেঘ'। গত সপ্তাহে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় এ ছবির প্রথম চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। শুভদিনের সূচনা ও ক্ল্যাপস্টিক দেন সত্যজিৎ রায় এবং অসিত সেন। সাংবাদিক সরোজ সেনগুপ্ত প্রোডাকসন্সের এটি প্রথম প্রয়াস। সুলেখা সান্যাল রচিত এ চিত্রটি পরিচালনা করছেন সুশীল ঘোষ। চিত্রগ্রহণ, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনার ভার নিয়েছেন গণেশ বসু, গৌর পোদ্দার এবং শিব ভট্টাচার্য। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অসিতবরণ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্মিতা সান্যাল, গীতা দে, জীতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, রমা দাস ও রমা গুহঠাকুরতা। কিনে কর্ণার পরিবেশিত এ ছবির সংগীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রমের 'ন্যায়দণ্ড' অন্যতম। জরাসন্ধ রচিত এ চিত্রটি পরিচালনা করেছেন মঙ্গল চক্রবর্তী। কানাই দে ও ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ এ ছবির চিত্রগ্রাহক এবং সংগীত-পরিচালক। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অসিতবরণ, রাধামোহন ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী তন্দ্রা বর্মণ, আশীষকুমার, তরুণকুমার, অরুন্ধতী দেবী, রবি ঘোষ, সবিতা বসু ও রঞ্জনা সরকার।

'মরুতৃষা' আর একটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি। সুদেশ রায় পরিচালিত ও কাহিনী-রচনার বিভিন্ন অংশে চরিত্রানুসারী অভিনয় করেছেন বিপিন গুপ্ত অসিতবরণ, শীতিশ মুখোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বসু, জয়শ্রী সেন, তপতী ঘোষ, মাং শ্রীমান ও জহর রায়। সংগীত-পরিচালনা করেছেন মুরারী ঘোষ।

বোম্বাই

বি আর, চোপরার প্রথম রঙিন চিত্রটির আগামী মাস থেকে চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন যশ চোপরা। কাহিনীর প্রধান চরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন সুনীল দত্ত, রাজকুমার, শশি কাপুর, সাধনা ও বলরাজ সাহানী। সংগীত-পরিচালনা করবেন রবি।

ফিল্মীস্তান স্টুডিওয় সম্প্রতি এস, এম, সাগর প্রযোজিত 'ওস্তাদো কী ওস্তাদ' চিত্রের সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ শেষ হল। চিত্র-নাট্যের মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন অশোককুমার, প্রদীপকুমার, শশিকলা, জনি ওয়াকর ও আনোয়ার হুসেন। এ ছবিরও সুরকার রবি।

শক্তি সামন্ত পরিচালিত 'কাশ্মীর কি কলি' ছবির প্রথম অভিনয়ের পর বাঙলার শর্মিলা ঠাকুর সম্প্রতি আরও দুটি নতুন ছবির জন্য মনোনীত হয়েছেন। বাঙলা ছবি 'না'-এর হিন্দী সংস্করণ করছেন প্রযোজক মোহন সেগল। পরবর্তী

পি সি সরকার

ইন্দ্রজাল

কয়েকটি অবর্ণনীয় খেলা

ছবিটি বিমল রায় প্রোডাকসন্সের নামে পরবর্তী ধ্বংস না। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রূপ হ'ল অভিশাপ'।
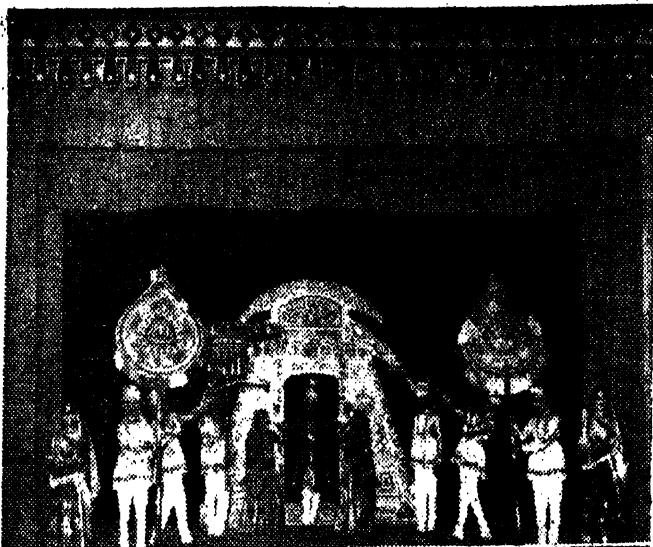
প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা আই, এস, জোহার তাঁর 'গোয়া' ছবিটির পুনরায় চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন কারদার স্টুডিওর। মুখ্য চরিত্রে রূপদান করছেন আই, এস, জোহার, সিমি, মামুদ, সোনিয়া সাহনি, সুলোচনা, উল্লাস, লীলা চিটনীস, সুরেন্দ্র ও কমল কাপুর। আগামী অক্টোবরে ছবিটি শেষ হবে বলে জানা গেছে। সঙ্গীতগ্রহণ করেছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

মাদ্রাজ

আদিনারায়ণ রাও প্রযোজিত ও ইন্দর রাজ আনন্দ পরিচালিত অঞ্জলি পিকচার্সের 'ফুলোঁ কী সেজ' সম্প্রতি চিত্রায়িত হচ্ছে বিজয়া স্টুডিওয়। আগামী মাসে একটি বহির্দৃশ্যে এ ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। 'আন্ধেরী চিরাগ' কাহিনী অবলম্বনে এ চিত্রে অভিনয় করছেন বৈজয়ন্তীমালা মনোজকুমার, অশোককুমার, নিরূপা রায়, মামুদ, শুভা খোটে ও ললিতা পাওয়ার। সঙ্গীত এবং চিত্র গ্রহণ করেছেন আদিনারায়ণ রাও ও কমল ঘোষ।

ডাঃ রায়। ডাক্তার দীপ্ত রায়। বিখ্যাত সার্জন, ক্যান্সার অপারেশনের সুদক্ষ কুশলী। বিদেশে শিক্ষালাভ করলেও নিজের দেশের প্রতি দুর্বলতা ছিল খুব বেশী। তাই বছর পাঁচেক পর নিজের দেশ রূপনগরে ফিরে এসে গড়ে তুললেন বিরাট হাসপাতাল। জীবনের সত্যকে বাস্তবে রূপায়িত করতে দীপ্ত চিরদিনই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কোনদিনই একটুকু দুর্বলতা পর্যন্ত তাকে উতলা করেনি। ভালবাসাকে পর্যন্ত দীপ্ত দূরে ঠেলে দিয়েছে। 'রোমান্স'! একদিন তার জীবনেও এসেছিল। কিন্তু আজ তা সম্পূর্ণই অতীত এবং মৃত। জীবন-স্মৃতির সেই মুহূর্তগুলি দীপ্ত একদিন তরুণ ডাক্তার পঙ্কজকে বলতে বাধ্য হল। কারণ ডাঃ রায় জানতে পারেন যে পঙ্কজ একজনকে ভালবাসে। সাধনা থেকে বিচ্যুত হওয়ায় ডাঃ রায় ক্ষেপে উঠলেন। জানতে চাইলেন পঙ্কজের কাছে—'রোমান্স! কোনটা বড় তোমার কাছে, তোমার ডাক্তারী না ভালবাসার একটি মেয়ে?'

—'আমার কাছে দুটোই বড়', জবাব দেয় পঙ্কজ। এ বিশ্বাস যে কতবড় ভুল তা ডাঃ রায় নিজের অতীত-স্মৃতি কথনে বোঝাতে চাইলেন। পঙ্কজ শোনে ডাক্তার

দীপ্তর ফেলে-আসা একটি ভালবাসার জীবন।

দীপ্ত যখন এফ, আর, সি, এস হয়ে বিলেত থেকে ফিরে অনাথা, দরিদ্র আর অবহেলিত মানুষদের চিকিৎসার জন্য বিরাট হাসপাতাল গড়ে তুললেন তখন সেই রূপনগরের জমিদার শিবদাস ধর আত্মগর্বে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন ডাক্তারকে। অখ্যাত জায়গায় প্রতিটি শক্ত অপারেশন যখন সাফল্যলাভ করতে থাকে তখন দীপ্ত প্রথম অনুভব করলেন যে তাঁর পাশেই সবসময় অপরিচিতার মতো অপারেশন-রুমে নার্স হয়ে রয়েছে। নাম তার অচেনা।

শহরের অনেক বড় হাসপাতালকে লজ্জা দিয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত রূপনগর হাসপাতালটি বাঙলা-বিখ্যাত হয়ে উঠলো। দীপ্ত রায় তাঁর স্বপ্নকে রূপ দিয়ে মৃত শিবদাসের ইচ্ছা পূর্ণ করে চলেছেন। দেখতে দেখতে রূপনগর একটি স্বপ্নের পৃথিবী হয়ে উঠলো। দীপ্ত-অচেনার সহজ মেলামেশাটুকু একদিন কাজের ফাঁকে কখন যেন নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে। সকলের চোখে এটা যেন খুব রহস্য হয়ে উঠছে। তাই দীপ্ত অচেনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব আনে। অপরিচিতা এক অশ্রুভরা কন্যার জীবনে কনে-দেখা আলো ফুলশয্যার চার-দেওয়ালকে ভরিয়ে তুললো। সহকর্মিণী অচেনা হল দীপ্তর সহধর্মিণী।

অভাবনীয় আস্বাদনে অচেনা গৃহিণী হয়ে পড়ে। সহধর্ম ভুলে একটি ছোট্ট সংসারের সুখস্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চায় অচেনা। কিন্তু দীপ্ত যে কর্মকেই বড় বলে জানে। অচেনার দৃঢ় বন্ধন তাকে মাঝে মাঝে উতলা করে। নার্সিং ছেড়ে দিয়ে সে ঘর-কন্যায় মেতে উঠেছে। তবে দীপ্তকে সম্পূর্ণ বাঁধতে পারলো না অচেনা। কাজের মধ্যেই দীপ্তর জীবনযাত্রা। ঘরে-ফেরা মনে অচেনার সুখ-স্মৃতি দীপ্তকে হাতছানি দেয় না। এমনকি অচেনার সন্তান-সম্ভবা সময়েও একটু কাছে আসবার সময়টুকু পর্যন্ত দীপ্তর হাতে থাকে না। অবশ্য অচেনার একলা থাকার শূন্যতাকে পূর্ণ করতে দীপ্ত অচেনাকে আবার হাসপাতালে যোগ দিতে অনুরোধ করে। সে অনুরোধ ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু একটি কঠিন অপারেশনের আকুল আবেদনে অচেনা রাজী হয়। কার্যক্ষেত্রে নিজের আসন্ন অসুস্থতার জন্য হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ায় আদর্শবাদী দীপ্তর হাতে রোগীটি মারা গেল। আদর্শ-চ্যুত হওয়ায় দীপ্ত স্পষ্ট জানায় যে গৃহলক্ষ্মী করে সাজিয়ে রাখবার জন্য সে অচেনাকে বিয়ে করেনি—সে ভালবেসে-ছিল নার্স অচেনাকে, তাকে বিয়ে করে-ছিল তার অপারেশন টেবিলের পাশে চিরদিন বেঁধে রাখতো। এই চরম আঘাতে অচেনার বড় সাধের সংসার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দীপ্তর জীবন থেকে হারিয়ে যায় অচেনা চিরদিনের জন্য।

। 'অয়নান্ত'-র একটি বিশেষ মুহূর্তে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও শম্পা চক্রবর্তী।

ডাক্তার রায় থামলেন। স্তব্ধ হয়ে রইলো পঙ্কজ। ডাক্তার দীপ্ত আবার বললেন—তারপর অনেক খোঁজ করেছি অচেনায়, কোথাও খুঁজে পাইনি তাকে। তোমাকে এতকথা বলার কারণ হল যে কষ্ট সে পেয়েছে, তা আর কেউ পাক, এটা আমি চাই না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দীপ্ত রায় অনেকখানি হাল্কা হলেন। কাহিনী এখানেই শেষ। মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি 'সূর্যশিখা'র এ গল্প সংক্ষেপে জানালাম। কাহিনী, চিত্রনাট্য, প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন সলিল দত্ত। সঙ্গীত ও সম্পাদনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায় এবং বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রধান চরিত্রে ডাঃ দীপ্ত রায়, অচেনা, পঙ্কজ ও শিবদাসের ভূমিকায় রূপদান করেছেন যথাক্রমে উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অশোক মুখোপাধ্যায় এবং ছবি বিশ্বাস। চণ্ডিমাতা এ-ছবির পরিবেশক। —চিত্রদূত

ভিন দেশী ছবি
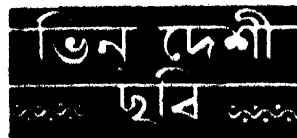
'ভি, আই, পিজ' :

আগামী সেপ্টেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে সারা পৃথিবীর সাতশটি প্রেক্ষাগৃহে 'ভি, আই, পিজ' মুক্তিলাভ করবে। এই চিত্রটির জন্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই চারটি চিত্রগৃহ নির্দিষ্ট হয়েছে। বম্বের মেট্রো, স্ট্যাণ্ড এবং কলকাতার মেট্রো এবং বসুশ্রী।

ভি, আই, পিজ প্রখ্যাত নাট্যকার টেরেন্স র‍্যাটিগানের মূলে চিত্রনাট্য অবলম্বনে নির্মিত। লণ্ডন বিমান-বন্দরে কুয়াশার জন্যে বিমান চলাচল ব্যাহত হয়। অভিজাত সমাজের কয়েকজন পুরুষ এবং মহিলা যাত্রী বিমানবন্দরের ভি, আই, পি লাউঞ্জে আটকা পড়েন। প্রতিটি যাত্রীই তাড়াতাড়ি লণ্ডনে পৌঁছতে ব্যস্ত, কিন্তু কুয়াশা তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনের গতি পাল্টে দেয়। এচিত্রের নায়ক-নায়িকা রিচার্ড বার্টন এবং এলিজাবেথ টেইলর। শ্রীমতী টেইলার ধনকুবের বার্টনের স্ত্রী। লুই জর্ডান একজন সুঠাম যুবক। শ্রীমতী এলিজাবেথ মার্টিনেল্লী হলিউড-প্রিয় অভিনেত্রী এবং অর্সন ওয়েলস উক্ত অভিনেত্রীর বৃদ্ধ প্রেমিক চিত্রপ্রযোজক।

ছবিটি রঙীন, এবং প্যানাভিশনে তোলা। ভি, আই, পিজ পরিচালনা করেছেন এ্যান্থনি এ্যাসকুইথ।

'চ্যারেড' :

আগামী শীতকালের মধ্যেই স্টানলি ডোনেন প্রোডাকসন্স-এর 'চ্যারেড' ছবিটি মুক্তিলাভ করবে। হলিউডের বিখ্যাত দুজন নট-নটী এই প্রথম একটি ছবিতে পরস্পরের বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করবেন। 'চ্যারেড' চিত্রের নায়ক-নায়িকা হলেন ক্যারি গ্রান্ট এবং অড্রে হেপবার্ন। আরেকটি প্রধান ভূমিকায় আছেন ওয়াল্টার ম্যাথু। কৌতুক এবং রহস্য-মিশ্রিত এই চিত্রটি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করেছে। নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ রেডিও সিটি মিউজিক হলে ছবিটি মুক্তি পাবে। এই প্রেক্ষাগৃহে ইতিপূর্বে ক্যারি গ্রান্টের পঁচিশটি ছবি মুক্তিলাভ করেছে এবং এদের মধ্যে সর্বাধিক সাফল্য করেছে 'দ্যাট টাচ অফ মিংক' ছবিটি। দশ সপ্তাহে এই চিত্রের উপার্জন হল প্রায় উনিশ লক্ষ টাকা।

✻খেলার কথা✻
অজয় বসু

বাংলা দেশের ফুটবল খেলার বড় আসর কলকাতার ময়দানে প্রথম অঙ্কের নাটকাভিনয় শেষ হয়েছে। বাকী আছে উত্তরাংশ। উত্তরপর্বের অনুষ্ঠান জমবে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতাকে ঘিরে।

জমবে নিশ্চয়ই, তবে দ্বিতীয় অঙ্কের আসর প্রথমাঙ্কের মতো উপভোগ্য হবে কিনা সন্দেহ। প্রথম পর্বের আসর সত্যিই এবার জমে ঘন হয়ে উঠেছিল।

প্রথম পর্বের প্রতিযোগিতা লীগের খেলা। প্রায় চার মাস ধরে লীগ জয়ের জটিল প্রশ্নের সমাধানে কয়েকটি দলের মধ্যে যে ক্ষুরধার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেধে উঠেছিল, লীগের ওপর যবনিকা পড়ে গেলেও সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমেজ ক্রীড়ানুরাগীদের মন থেকে এখনও বোধ-হয় মুছে যায়নি।

লীগে প্রবল পক্ষ ছিল এবার দুই রেল এবং প্রবলতর মোহনবাগান ও ইস্ট-বেঙ্গল। তাজা ঘোড়ার অফুরন্ত উৎসাহে এঁরা শ্রেষ্ঠের সম্মান অর্জনে দৌড় শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি-সীমায় এসে মোহনবাগান যেন ইস্ট-বেঙ্গলের আগে নামমাত্র নাকটি বাড়িয়েই ফিতে স্পর্শ করেন।

প্রথম পর্বে চার প্রতিযোগী, শেষ-দিকে দুই অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বী মোহন-বাগান আর ইস্টবেঙ্গল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়েছিলেন। দেখে মনে হয়েছিল যে এবারেও বুঝি গতবারের পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু তা ঘটেনি। ইস্টবেঙ্গল তীরে এসেও তরী ভেড়াতে পারেন নি। পেরে-ছেন মোহনবাগান। তাই তাঁদের চার মাসের প্রস্তুতি ও পরিশ্রম সবার চেয়ে সার্থক ও সফল হয়ে উঠেছে।

বাস্তবানুগ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে লীগে মোহনবাগানের সাফল্যের নজীরই সবচেয়ে সুসমঞ্জস। কাগজে-কলমে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। তাঁদের সংগৃহীত খেলোয়াড় ছিলেন, সংখ্যায় ও নাম-ডাকের পুঁজিতে প্রয়োজনেরও অতি-রিক্ত।

যে অপরিমিত মূলধন ছিল তাতে মোহনবাগানের সহজ সাফল্যই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু সব খেলোয়াড় কাগজের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে পালন করতে পারেন নি। পারলে তাঁরা দলের প্রতি সত্যি-কারের সুবিচার করতে পারতেন। এবং বিজয়লক্ষ্মীর প্রসন্নতা আদায়ে এতো পরিশ্রমে ও চিন্তায় মোহনবাগানকে প্রহর গুণতে হোতো না নিশ্চয়ই।

মোহনবাগানের অনুপাতে এবার ইস্ট-বেঙ্গলের তেমন সামর্থ্য ছিল না। তাঁদের প্রাথমিক আচরণে উত্তরপর্বের বলিষ্ঠ ভূমিকার ইঙ্গিতও মেলেনি। তবুও ধাপে-ধাপে এগিয়ে এসে লীগ প্রতি-যোগিতার সায়াহ্নে ইস্টবেঙ্গল যে শক্তিধর মোহনবাগানের নাগাল ছুঁয়ে ফেলেছিল, একথাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

লীগ জয় না করতে পারলেও প্রতি-যোগিতাটিকে শেষাঙ্কে নতুন জীবনে উজ্জীবিত রাখতে ইস্টবেঙ্গল যা করতে পেরেছে তাই যথেষ্ট। কাপ মেডেল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে যথার্থ ভূমিকার সঠিক মূল্যায়নে যদি ভুল না হয় তাহলে রসিকজন ইস্টবেঙ্গলকেও সাধুবাদ জানাবেন।

মোহনবাগানের প্রাপ্য বিজয়ীর অভি-নন্দন— ইস্টবেঙ্গলের সংগ্রামমুখী চরিত্রের। তাঁদের প্রতি প্রসারিত সাধুবাদে স্বাতন্ত্র্য থাকলেও, সেই সাধুবাদের মূল্যও আছে।

বছর বছর এই মোহনবাগান আর ইস্ট-বেঙ্গল কলকাতার ফুটবল লীগকে দুরন্ত প্রতিযোগিতার টানাপোড়েনে জীবন্ত করে রাখেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং বাড়তি প্রতি-যোগিতা জমেছে বি এন আর এবং ইস্টার্ন রেলের সাময়িক চ্যালেঞ্জে। এই চ্যালেঞ্জ দর্শকদের মনে কিছু বাড়তি উপভোগ্য উপকরণও জুগিয়েছে, সন্দেহ নেই।

মূল প্রতিযোগিতা অন্য অন্যবারের মতো একপেশে হয়ে থাকতে পারেনি। মূল প্রতিযোগিতা যতোই প্রসারিত হয়, খেলার মানের পরিপ্রেক্ষিতে ততোই মঙ্গল এবং মূল প্রতিযোগীদের স্বার্থের পটভূমিকায় ততোই কল্যাণপ্রসূ। অন্যদের চ্যালেঞ্জ উগ্র হয়ে উঠলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল নতুন শক্তিসঞ্চয়ে প্রেরণা পাবে। আর তাতেই বড় তরফের খেলার মানোন্নয়নের রাস্তাও হবে সাফ।

সবল, শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন বি এন আর। তবু তাঁদের আরও কিছু করা উচিত ছিল। বলরাম ও অরুণ ঘোষের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বি এন আরের সামর্থ্যের সম্ভাবনা কারুর চেয়ে, অন্ততঃপক্ষে ইস্ট বেঙ্গলের অনু-পাতে নিশ্চয়ই কম ছিল না। তবু তাঁরা পিছনের সারিতে সরতে বাধ্য হলেন কেন?

তাছাড়া গোল করায় বি এন আরের শক্তি ছিল সব প্রতিযোগীর চেয়েও বেশী। তাঁদের ফরোয়ার্ড লাইনে নিদেন পক্ষে এমন চারজন ছিলেন যাঁদের অসঙ্কোচে 'স্কোরার'-এর স্বীকৃতি দেওয়া যায়। তবু বি এন আর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি মূলতঃ এই কারণেই বোধহয় যে, দলগত শক্তির চেয়ে তাঁরা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন।
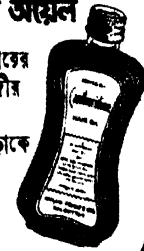
ফুটবল দলগত খেলা। একজন হয়তো সময়বিশেষে মুস্কিল-আসানের ভূমিকা নিতে পারেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাঁকে দিয়েই কাজ হাঁসিলের পরিকল্পনা আঁটা কাজের কথা নয়। দক্ষতা যখন খেলার মাপকাঠি, সাফল্যের চাবিকাঠি তখন দক্ষ খেলোয়াড় সময় সময় নিজেকে প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত করবেনই। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে সবকিছু করে ওঠা সম্ভবপর নাও হতে পারে।

এই উপলব্ধি সহজ ও স্বাভাবিক। তবু বি এন আর সবকিছুর প্রত্যাশায় নির্ভর

করেছেন বলরামের ওপর। যেন অসহায়ের মতো। কিন্তু বলরামও অতিমানব নন। স্বাভাবিক কারণে তিনি যেদিন প্রত্যাশা মিটিয়ে দিতে পারেন নি, সেদিন জয়ের সন্ধানে বি এন আরকে গোলকধাঁধায় ঘুরতে হয়েছে।

এ কথাটি মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দল সম্পর্কেও খাটে। মোহনবাগান চুণী গোস্বামী, শেষদিকে জার্নেল সিং ও ইস্টবেঙ্গল সমাজপতির ওপর যেন বড্ডো বেশী নির্ভর করে থেকেছেন। এই নির্ভরতায় চাপ আরও হাল্কা হয়ে থাকলে আমার ধারণায় ও'দের দলগত খেলার ধরণ কিঞ্চিৎ সংশোধিত হতে পারতো।

খেলার ধরণ-ধারণের বিচারে ইস্টার্ন রেলকে অনেকেরই মনে ধরবে। কারণ ও'রা ব্যক্তির চেয়ে দলগত সংহতির ওপর জোর দিয়েছেন বেশী এবং ও'রা চড়াখাতের খেলায় অভ্যস্ত নন। ও'দের খেলার মেজাজ শান্ত ও পরিশীলিত। তাই যেদিন প্রদীপ ব্যানার্জি ও প্রদ্যোৎ বর্মণের মতো নামী খেলোয়াড় মাঠে নামেন নি সেদিনও ইস্টার্ন রেলের খেলার মান যায়নি তলিয়ে।

তা ছাড়া এই ইস্টার্ন রেল দল এবার শেষদিকে লীগ প্রতিযোগিতাকে ক্ষণে-ক্ষণে বাঁকের মুখে ঠেলে দিতে পেরেছেন।

তাঁরা এক পয়েন্ট কেড়ে নিয়ে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের সমস্যা যেমন বাড়িয়েছেন, তেমনি এক গোলে হারিয়ে বি এন আরকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছেন।

মাত্র তিনজন ছাড়া ইস্টার্ন রেলে তেমন খ্যাতিমান খেলোয়াড় নেই। এবং বয়সের হিসেবে তাঁদের অনেকেই প্রায় প্রাচীন। কিন্তু তবু তাঁরা সমানে লড়ে গিয়েছেন। কারণ, তাঁদের পরিকল্পনা ছিল সুচিন্তিত এবং দলগত দক্ষতা অনেকটা অধিগত।

এই চারটি দল ছাড়া প্রথম ডিভিশন লীগের অবশিষ্ট প্রতিযোগীদের চ্যাম্পিয়ানশিপকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন বা সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নের পথ আগলে দাঁড়াতে তাঁরা যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। আসলে অপ্রধান দলগুলি নিজেদের মধ্যে খেলার সময় না পারলেও প্রবলতর পক্ষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কালে অনমনীয় মনোভাবে, অপরিমিত উৎসাহে কোমর বাঁধতে পেরেছেন।

এই লক্ষণ আশাব্যঞ্জক। বড়, ছোট সব প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে অপ্রধান প্রতিযোগীরা যদি এমন মানসিকতায় প্রস্তুত থাকতে পারতেন, তা'হলে তাঁদের চেষ্টাতেই খেলার সামগ্রিক মান উন্নয়নমুখী হোতো। কিন্তু তাঁরাও, বড়দের মতোই সমমানের খেলা খেলতে পারেন নি। যেদিন পারবেন সেদিন বাংলার ফুটবলের মান সম্পর্কে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবো। প্রকৃতপক্ষে এই অপ্রধান দলগুলিই হলো খাঁটি বাংলার ফুটবল মানের অবিমিশ্র প্রতীক।

বাইরের খেলোয়াড় আনিয়ে তাঁরা দলভারী করেন না। তাঁদের আর্থিক সংগতিও সামান্য। তাঁরা অপরের দিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা না করে নিজেদের সামর্থ্যের ওপরই ভরসা রাখেন।

বিগত মরশুমের লীগের খেলা দেখে আমাদের ফুটবলের মান নামছে, একথা বলতে আমি রাজী নই। সব দলই, কি ছোট, কি বড়, সমস্ত পক্ষই সুনিয়ন্ত্রিতভাবে খেলার চেষ্টা করেছেন। সর্বক্ষেত্রে হয়তো তাঁদের চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু তাঁদের আন্তরিক প্রয়াসের নজীর নেপথ্যে থাকার নয়।

ক্রীড়াধারা বিন্যাসে যদি তাঁদের এমন আন্তরিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আজকের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধিত হবে। সব দলই মোটামুটিভাবে কোচ-নির্দেশিত পথ-পরিক্রমা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অবশ্য তার মধ্যে শেষ পর্বের কয়েকটি খেলায় দৃশ্যতঃ ছাড়-ছাড় ভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। তবে সেগুলি খেলা নয়। নামে ক্রীড়ানুষ্ঠান হলেও তা কলকাতার ফুটবল লীগের আবর্জনা বিশেষ। তাই সেগুলি ধর্তব্যও নয়।

বহুক্ষেত্রে অনেক নামী খেলোয়াড়কে গোল করার একান্ত সহজ সুযোগ হাতছাড়া করতে দেখেছি। সট করে তাঁরা বল পাঠিয়েছেন বিপথে। কেন? এর কারণ এই যে, সট নেওয়ার সময় তাঁদের দেহের ভারসাম্য অটল ছিল না। 'মন্-কিকিং ফুট'টির যে মস্তো কাজ থাকে, সট করার সময় তাঁরা সেকথা মনে রাখতে চাইতেন না। এবং পায়ের 'ফলো থ্রু' বা অন্তিম টানও অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি।

তবে গোলের সুযোগ যেমন নষ্ট হয়েছে তেমনি অনেক ভাল গোলও হয়েছে। চকিত, স্থির, কার্যকর ও দর্শনীয় সটে জনকয়েক ফরোয়ার্ডও যে বিপক্ষের রক্ষণ-ব্যূহকে ভেঙ্গে দিয়েছেন তাও উল্লেখযোগ্য। তা'ছাড়া একাধিক ফরোয়ার্ডকে 'সোয়ারভিং' বা বাঁকানো সট করতেও দেখেছি। সটের পর শূন্যে বলের গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। এসব দৃষ্টান্ত কি সহজেই মন থেকে সরে যেতে পারে?

অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে, খেলার দিক থেকে আমরা দর্শকেরা, ভাল, মন্দ দুই পেয়েছি। সুতরাং কেউ কিছুই খেলতে পারেন নি বা খেলার মান নামছে এমন নেতিমূলক আক্ষেপের শূন্যতায় ডুবে থাকা চলে না।

আক্ষেপ করছি না। আমি নতুন আশার স্বপ্ন দেখছি। আমি দেখেছি, সব দলের আচরণেই ক'বছর আগেকার এলোমেলো ভাবটি অন্তর্হিতপ্রায়। সবাই চেষ্টা করেছেন বল দিয়ে-নিয়ে খেলার। তাঁরা নড়েচড়ে ছক কেটেছেন, কোনাকুনি রেখা এ'কেছেন।

রক্ষণকাজে অনেক দলই ভারসাম্য বজায় রাখায় হদিশ জেনেছেন। অনুপাতে পুরোভাগের খেলোয়াড়দের চিন্তায় ও কর্মে ভারসাম্য কিছু ঘাটতি অবশ্যই ঘটেছে। তবু আশা রাখি যে, আরও অনুশীলন ও কোচের পরিণত নেতৃত্বের কল্যাণে এ ঘাটতিও তাঁরা একদিন পুষিয়ে দিতে পারবেন।

তবে একাজ সহজ নয়। ফরোয়ার্ডেরা গড়েন। রক্ষণভাগ ভাঙ্গেন, বাধা দেন। রক্ষণভাগের বাধার বিন্ধ্যাচল ডিঙ্গিয়ে পুরোভাগের খেলোয়াড়দের গোল বানাতে হয়। কাজটি সত্যিই কঠিন। তাই তাঁদের প্রস্তুতি সাধনাসাপেক্ষ। সেই সাধনা ফাঁকিতে না পড়লে ভবিষ্যতে আমাদের ফুটবলও যে জাতে উঠবে, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

খেলাধূলা

দর্শক

ডেরিক মারে

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পঞ্চম টেস্ট

ইংল্যাণ্ড : ২৭৫ রান (ফিল শার্প ৬৩, ব্রায়ান ক্লোজ ৪৬, ব্রায়ান বোলাস ৩৩ রান। গ্রিফিথ ৭১ রানে ৬ এবং সোবার্স ৪৪ রানে ২ উইকেট) **ও ২২৩ রান** (ফিল শার্প ৮৩ রান। হল ৩৯ রানে ৪, গ্রিফিথ ৬৬ রানে ৩ এবং সোবার্স ৭৭ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৪৬ রান (কনরাড হান্ট ৮০ এবং বুচার ৫৩ রান। ট্রুম্যান ৬৫ রানে ৩ এবং স্ট্যাথাম ৬৮ রানে ৩ উইকেট) **ও ২৫৫ রাণ** (২ উইকেটে। হান্ট নটআউট ১০৮, কানহাই ৭৭ এবং বুচার নটআউট ৩১ রাণ। লক ৫২ রাণে ১ এবং ডেক্সটার ৩৪ রাণে ১ উইকেট)

প্রথম দিন (২২শে আগষ্ট) :
ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৭৫ রানের মাথায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় দিন (২৩শে আগষ্ট) :
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেট পড়ে ২৩১ রান ওঠে।

তৃতীয় দিন (২৪শে আগষ্ট) :
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৪৬ রানে শেষ হলে ইংল্যাণ্ড ২৯ রানে অগ্রগামী হয়। ২২৩ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ হয়। কোন উইকেট না পড়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ রান ওঠে।

চতুর্থ দিন (২৬শে আগষ্ট) :
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২ উইকেট খুইয়ে ২৫৫ রাণ তুলে দিয়ে ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

ঐতিহাসিক ওভাল মাঠে ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের একাদশ টেস্ট সিরিজের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৮ উইকেটে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে ৩—১ খেলায় 'রাবার' জয় করেছে। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই দ্বিতীয় 'রাবার' জয় এবং খাঁটি ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়ের নেতৃত্বে প্রথম জয়। ১৯৫০ সালে জন গডার্ডের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডের মাটিতে প্রথম 'রাবার' জয় করেছিল (খেলা ৪, জয় ৩, হার ১)। বর্তমানে ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১১টি টেস্ট সিরিজের ফলাফল দাঁড়াল : ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৫, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৪ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২। টেস্ট খেলার ফলাফল : মোট খেলা ৪৫, ইংল্যাণ্ডের জয় ১৬, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১৩ এবং খেলা ড্র ১৬।

১৯৬৩ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে শুধু কাল্পনিক 'রাবার' জয়ই করেনি, সেই সঙ্গে পেয়েছে 'উইসডেন ট্রফি'। ক্রিকেট খেলার তথ্যসম্বলিত প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে উইসডেন বার্ষিকীর খ্যাতি অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থের শতবার্ষিকী স্মারক 'উইসডেন

কনরাড হান্ট

ট্রফিটি' উপহার দিয়েছেন গ্রন্থের মালিক জন উইসডেন এ্যাণ্ড কোম্পানী। ইংল্যাণ্ড—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রতিটি টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলের পুরস্কার হিসাবে এই ট্রফি উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা এই প্রথম চালু করা হ'ল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল আজ খুবই খুশী—তাঁর নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ক্রিকেট খেলার সর্ব বিভাগে ইংল্যাণ্ডের থেকে প্রভূত পরিমাণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে 'রাবার' জয় করেছে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে বলবার বিশেষ কিছু নেই। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্টে ইংল্যাণ্ডের প্রধান ভরসা ছিলেন ফ্রেডী ট্রুম্যান এবং তিনি চতুর্থ দিনে এক ওভার বল দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু ট্রুম্যানের বিশেষ কিছু করার ছিল না। চতুর্থ দিনে তিনি বল দিলে বড় জোর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল কম উইকেটের ব্যবধানে জয়ী হ'ত। চতুর্থ টেস্টে নায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন কনরাড হান্ট—প্রথম ইনিংসে ৮০ রাণ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে নটআউট ১০৮ রাণ। বোলিংয়ে ইংল্যাণ্ডের মেরুদণ্ড ভেঙেছিলেন চার্লি গ্রিফিথ—১৩৭ রাণে ৯টা উইকেট (৭১ রাণে ৬ এবং ৬৬ রাণে ৩ উইকেট)। আর উল্লেখযোগ্য, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সমর্থকদের জয়োল্লাস—নাচ, গান, বাজনা, পতাকা, বেলুন প্রভৃতির সমারোহে ওভাল মাঠ তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। কনরাড হান্ট উৎসাহী সমর্থকদের কাঁধে চড়ে মাঠের বাইরে যেতে বাধ্য হন।

ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার টসে জয়ী হয়ে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করেন। এই নিয়ে ডেক্সটার টেস্টের খেলায় ৯ বার টসে জয়ী হলেন ২৫ বারের মধ্যে। ইংল্যাণ্ডের প্রথম উইকেটের জুটি বোলাস এবং এডরিচ দলের ৫৯ রান তুলে দেন। সোবার্সের বল মেরে বোলাস দলের ৫৯ রানের মাথায় উইকেট-কিপার মারের হাতে আউট হন। পাঁচ মিনিট পর প্রথম উইকেট জুটির অপর খেলোয়াড় এডরিচও একইভাবে খেলা থেকে বিদায় নেন। এইদিন খেলার সূচনা থেকে হল এবং গ্রিফিথের বল ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হলকে এক সময়ে আম্পায়ার সতর্ক করেও দেন। কিন্তু হল আম্পায়ারের কথায় কর্ণপাত না ক'রে আগের মতই বল দিতে থাকেন। তখন আম্পায়ারকে বাধ্য হয়ে দলের অধিনায়ক ওরেলের কাছে হলের বল দেওয়া সম্পর্কে নালিশ জানাতে হয়। ওষুধে কাজ দেয়; হল তাঁর উদ্ধত ফণা নামিয়ে বল দিতে থাকেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের ৮৩ রান দাঁড়ায়, ২ উইকেট পড়ে। এইদিনের খেলায় সোবার্স সটান

ক্রীড়াকুশল
ইস্টবেঙ্গল
অমিয় ব্যানার্জী
দেবনাথ
সি পাল
এস সিংহ
এবং
বাল,

শুয়ে পড়ে বাঁ হাত দিয়ে ব্যারিংটনের একটা শক্ত ক্যাচ লুফে মাঠের হাজার হাজার ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সমর্থকদের আনন্দ দেন। সোবার্সের এই বল ধরার মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। মাঠের দর্শকেরা ব্যারিংটনের এই মার থেকে অবচ্ছন্দে দুটো রান আশা করেছিলেন। তার জায়গায় দলের ১০৩ রানের মাথায় তিনি আউট হলেন। চা-পানের সময় দলের রান ছিল ১৮৮, ৪টে উইকেট পড়ে। তখন উইকেটে খেলছিলেন ইয়র্কশায়ার দলের দু'জন খেলোয়াড়—ক্লোজ এবং শার্প। এই পঞ্চম উইকেটের জুটি ভাঙে দলের ২১৬ রানের মাথায়। ক্লোজ তাঁর ৪৬ রানের মাথায় গ্রিফিথের বলে সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড হন। এই পঞ্চম উইকেটের জুটি ১০৫ মিনিটের খেলায় দলের ১০১ রান তুলে দেয়। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২৭৫ রানের মাথায় শেষ হয়। চার্লি গ্রিফিথ ৭১ রানে মোট ৬টা উইকেট পান। নতুন বল হাতে পেয়ে এক সময় তিনি ইংল্যান্ডের পক্ষে খুবই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—৯ ওভার বলে মাত্র ২৭ রান দিয়ে সেই সময়ে উইকেট পেয়েছিলেন ৫টা। চা-পানের আগে গ্রিফিথ মাত্র ১টা উইকেট পান। ফিল শার্প দলের সর্বোচ্চ ৬৩ রান করেন। চা-পানের পর ইংল্যান্ড বাকি ৬টা উইকেট খুইয়ে ৮৭ রান যোগ করে

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করে। তাদের আরম্ভ সুবিধার হয়নি। দলের ১০ রানের মাথায় প্রথম এবং ৭২ রাণের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট পড়ে যায়। হান্ট এবং কানহাই দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ৭৫ মিনিটের খেলায় দলের ৬২ রান যোগ করেন। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের রান দাঁড়ায় ৯৪, এদিকে উইকেট পড়ে দুটো। দলের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে হান্ট এবং বুচার ৮০ রান যোগ করেন। হান্টও নিজের ৮০ রান করেন। হান্ট ১৯৫ মিনিট খেলে ৭টা বাউন্ডারী মারেন। এইদিন হান্টের তৃতীয় উইকেটের জুটি বুচার যেন 'বেড়ালের পরমায়ু' নিয়ে মাঠে খেলতে নেমেছিলেন। ইংরেজি ১৩ সংখ্যাটা যে কত অপয়া তা বুচার হাড়ে হাড়ে টের পান। নিজের ১৩ রানের মাথায় তিনি এক চুলের জন্যে 'রান-আউট' থেকে ছাড়ান পান। দলের তখন রান ১০৫। তারপরও তিনি দু'বার আউট হ'তে হ'তে বেঁচে যান। কিন্তু তাঁর কপালের 'রান-আউট' লেখাটা তিনি শেষ পর্যন্ত মুছে দিতে পারেন নি।

চা-পানের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের [illegible] দাঁড়ায়, ৩টে উইকেট পড়ে। এতক্ষণ ধরে ভাগ্যদেবী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কাঁধে ছিলেন; চা-পানের পর তিনি স্থান পরিবর্তন করলেন; ইংল্যান্ড হাতে-নাতে তার সুফল পেল। বরাত-জোর না থাকলে তিন ওভারের খেলায় দুইজনকে রান-আউট করা, সহজভাবে কেউ ভাবতেই পারেন না। লকের একটা বল সোবার্স সোজা মারেন। এই মার-খাওয়া বলটাই বুচারের কাল হ'ল। তিনি রান নেওয়ার জন্যে উইকেট ছেড়ে যান। আর লক বিদ্যুৎ গতিতে বলটা কুড়িয়ে নিয়েই বুচারের উইকেট ভেঙে দেন। দলের রান তখন ১৮৫। বুচারের শূন্য উইকেটে খেলতে নামেন সলোমন। দলের ১৯৮ রানের মাথায় লকের মন্ত্র-পূত (?) বলটায় ব্যাট লাগিয়ে সলোমন নিজের উইকেট বাঁচান, কিন্তু অন্য-দিকে সোবার্সের উইকেট ভাঙে। সোবার্স রান নিতে গিয়ে রান-আউট হ'ন। ক্লোজের নিখুঁত টিপে তাঁর ছেড়ে-আসা উইকেট ভেঙে যায়। লক এবং ক্লোজ ইংল্যান্ড দলের সমর্থকদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ পান। মাঠে নতুন বল পড়বার আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দুর্গে এই বিপর্যয় ঘটে যায়। ধীর পদক্ষেপে সোবার্সের শূন্য উইকেটে খেলতে নামেন অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। সমস্ত মাঠ জুড়ে দর্শকদের করতালি পড়লো। কিন্তু তিনিও দলের পতন রোধ করতে পারলেন না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ২৩১ (৮ উইকেটে) রানের মাথায় দ্বিতীয় দিনের খেলা ভাঙে। চা-পানের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ৫টা উইকেট পড়ে মাত্র ৫২ রান যোগ হয়। এইদিন ফ্রেডী ট্রুম্যান ৫৮ রানে দুটো উইকেট পেয়ে ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের টেস্ট সিরিজে প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক উইকেট (৩৩ উইকেট) পাওয়ার রেকর্ড স্পর্শ করেন। এ রেকর্ড করে-ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের আলফ ভ্যালেনটাইন ১৯৫০ সালের ইংল্যান্ড সফরে। ট্রুম্যান আলোচ্য খেলায় হলকে শুধু বোল্ড আউটই করেননি—তাঁর বলের ঘায়ে একটা স্টাম্প ভেঙে দেন।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের বাকি দুটো উইকেট পড়তে মাত্র ১৫ মিনিট সময় লাগে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলা ২৪৬ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলায় অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দেন সলোমন—৯৮ মিনিট উইকেট কামড়ে থেকে মাত্র ১৬ রান করেন। ট্রুম্যানের ২৭তম ওভারের প্রথম বলেই গিবসের অফ্-স্টাম্প ছিটকে পড়ে এবং সেই-সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসও শেষ হয় ২৪৬ রানের মাথায়। এই উইকেট লাভের ফলে আলোচ্য টেস্ট সিরিজে তাঁর উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪টি। ফলে ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট সিরিজে আলফ ভ্যালেন-টাইন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ১৯৫০ সালে সর্বাধিক উইকেট (৩৩টি উইকেট) পাওয়ার যে রেকর্ড করেছিলেন ট্রুম্যান তা অতিক্রম করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ট্রুম্যানের উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৪টি (বিশ্ব রেকর্ড)।

লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় রান ছিল ৩৭, ২টো উইকেট পড়ে। অর্থাৎ ইংল্যান্ড তখন ৬৬ রানে অগ্রগামী। ৭৫ মিনিট খেলে ইংল্যান্ড ৫০ রান পূর্ণ করে—তখন হাতে জমা ছিল ৮টা উইকেট। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ১৬১, ৫টা উইকেট পড়ে। এই সময় ইংল্যান্ড ১৯০ রাণে অগ্রগামী ছিল। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ফিল শার্প এবং জিম পার্কস এক ঘণ্টায় খেলায় ৫২ রান যোগ করেন। ফিল শার্প দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৮৩ রান করেন। এই নিয়ে আলোচ্য টেস্ট সিরিজে শার্প তিনবার অর্ধশত রান করলেন। ২২৩ রানের মাথায় ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিতে হয়। হল (৪ উইকেট), গ্রিফিথ (৩ উইকেট) এবং সোবার্স (৩ উইকেট)—এই তিনজনের বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের এই কাহিল দশা হয়। এই দিন ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সমর্থকেরা প্রায় প্রতিটি বল দেওয়ার সময় গগনভেদী সিংহনিনাদে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের বিচলিত করার চেষ্টা করেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের উইকেট-কিপার ডেরিক মারে আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ২৪ জনকে আউট ক'রে একটা টেস্ট সিরিজে উইকেট-কিপার হিসাবে সর্বাধিক খেলোয়াড়কে আউট করার বিশ্ব রেকর্ড করেন। পূর্ব রেকর্ড ছিল ২৩টি—এ রেকর্ড করেছিলেন জে এইচ বি ও য়েট (দক্ষিণ আফ্রিকা) নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫৩-৫৪ সালে এবং গেরী আলেক-জান্ডার (ওয়েষ্ট ইন্ডিজ) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে। ডেরিক মারে ইংল্যান্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়—বয়স ১৯ বছর। টেস্ট খেলায় হাতে-খড়ি নিয়েই তিনি বিশ্বরেকর্ড করার গৌরব লাভ করলেন।

খেলায় জয়লাভের জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ২৫৩ রাণের প্রয়োজন হয়। হাতে যথেষ্ট সময়—পুরো দু'দিনের খেলা। তৃতীয় দিনে খেলায় বাকি পাঁচ

মিনিট সময়ে তারা কোন উইকেট না খুইয়ে পাঁচ রাণ করে—তখন জয়লাভের আর ২৪৮ রাণ করতে বাকি থাকে।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৭১ রাণ দাঁড়ায় কোন উইকেট না পড়ে। উইকেটে ছিলেন হাণ্ট এবং রডরিগস। দলের ৭৮ রাণের মাথায় প্রথম উইকেটের জুটি ভেঙে যায়—রডরিগস ২৮ রাণ ক'রে আউট হ'ন। দ্বিতীয় উইকেটে হাণ্টের সঙ্গে জুটি বাঁধেন কানহাই। এই জুটি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয়লাভের ভিত আরও সুদৃঢ় করে। দলের ১৯১ রাণের মাথায় কানহাই নিজস্ব ৭৭ রাণ ক'রে খেলা থেকে বিদায় নেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ১১৩ রাণ যোগ হয়। কানহাই ৯০ মিনিটের খেলায় ১০টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। চা-পানের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের রাণ দাঁড়ায় ২০৩, ২টো উইকেট পড়ে। তখন জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ৫০ রাণ করতে বাকি ছিল। উইকেটে ছিলেন হাণ্ট এবং বুচার। ডেক্সটা'রর বলে লেগ্-গ্লান্স ক'রে হাণ্ট তাঁর শত রাণ পূর্ণ করেন। এই সেঞ্চুরী করতে তাঁর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগেছিল—বাউণ্ডারী ছিল ৮টা। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে হাণ্টের এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী—প্রথম সেঞ্চুরী (১৮২ রাণ) প্রথম টেস্টে। মোট ৩১টা টেস্ট খেলায় তাঁর সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়াল ৬টা।

খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট আগে দলের ২৫১ রাণের মাথায় বুচার যে বল মারেন তার থেকেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২ রাণ উঠে যায়। এদিকে বুচারের বল মারার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের মধ্যে হাজার হাজার দর্শক আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঢুকে পড়েন—বলটিকে আর সেই জনসমুদ্র থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

ফলে বাউণ্ডারী হিসাবে বুচারের রাণ সংখ্যায় ৪ রাণ দেওয়া হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের মোট রাণ দাঁড়ায় ২৫৫ (২ উইকেটে)। পুরো একদিন এবং ১ ঘণ্টা ৫ মিনিটের খেলার সময় বাকি থাকতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

॥ ডেভিস কাপ ॥

১৯৬৩ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকান-জোন সেমি-ফাইনালে আমেরিকা ৪—১ খেলায় মেক্সিকোকে পরাজিত ক'রে গত বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে।

প্রথম দিনে দুটি সিঙ্গলস খেলা হয় এবং উভয় দেশই একটা ক'রে খেলায় জয়লাভ করে। মেক্সিকোর রাফেল ওসুনা প্রথম সিঙ্গলস খেলায় এ-বছরের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান 'চাক' ম্যাকিনলেকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলায় আমেরিকা জয়লাভ ক'রে ২—১ খেলায় অগ্রগামী হয়।

তৃতীয় দিনের বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলাতেও মেক্সিকো পরাজয় স্বীকার করে। এইদিনের প্রথম সিঙ্গলস খেলায় আমেরিকার রলস্টোনের কাছে রাফেল ওসুনা পরাজিত হ'ন।

জোন-ফাইনালে আমেরিকার খেলা পড়েছে ভেনিজুয়েলার সঙ্গে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, গত বছর আমেরিকান জোনের খেলায় মেক্সিকো ৩—২ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত ক'রে শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল।

জন পেনেল (আমেরিকা) পোলভল্টের উচ্চতা অতিক্রম করে বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করছেন।

॥ পোলভল্টে বিশ্ব রেকর্ড ॥

জন পেনেল গত শনিবার (২৪শে আগস্ট) ফ্লোরিডার মিয়ামীতে অনুষ্ঠিত এক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ১৭ ফিট ০¾ ইঞ্চি (৫·২০ মিটার) উচ্চতা অতিক্রম ক'রে পোলভল্ট অনুষ্ঠানে নিজ বিশ্ব রেকর্ড (১৬ ফিট ৮¾ ইঞ্চি) ভেঙে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। গত জুলাই মাসে পেনেল লণ্ডনের হোয়াইট সিটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বৃটিশ এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতায় ১৬ ফিট ৮¾ ইঞ্চি অতিক্রমের বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন।

ফিনল্যাণ্ডের পেনিট নিকুলা প্রতিষ্ঠিত ১৬ ফিট ২¾ ইঞ্চি উচ্চতাই বর্তমানে সরকারীভাবে বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে অনুমোদিত। সুতরাং জন পেনেলকে সরকারী অনুমোদন লাভের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড
অমৃত
১৮শ সংখ্যা মূল্য ৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ২০শে ভাদ্র, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
Friday, 6th September, 1963. 40 Naya Paise

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় অনেকগুলি আসন খালি করানো হইয়াছে এবং শোনা যাইতেছে যে আরও অনেকগুলি প্রাদেশিক ও হয়ত আরও কয়েকটি কেন্দ্রীয় আসন খালি করানো হইবে। এ-বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ পন্ডিত নেহরুর হাতে যদিও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার উপর কোন নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার আছে কিনা সন্দেহ। তবে তিনি দেশের শাসন ও চালন বিষয়ে উচ্চতম অধিকারি এবং সেই হিসাবে তাঁহার পরামর্শ দিবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

এই অভিনব কার্যক্রমের মূলে রহিয়াছে কামরাজ প্রস্তাব ও তাহার বশে গৃহীত নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সংকল্প। কংগ্রেস পার্টিতে নানাপ্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ ও বহুবিভেদকারী শক্তির প্রক্রিয়ায় অবনতি দেখা যাওয়াতে, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়াছেন। ইহার প্রতিকার করার জন্য যে সকল শক্তিমান নেতা কংগ্রেস পার্টির কাজ ছাড়িয়া মন্ত্রীসভাগুলিতে গিয়াছেন তাঁহাদের পার্টির কাজে নজর দেওয়া প্রয়োজন এবং যেহেতু সেকাজে সম্পূর্ণ মন দিয়া সর্বক্ষণ তাহাতেই নিযুক্ত থাকা বিধেয় সে কারণে তাঁহাদের মন্ত্রীসভার আসন হইতে নামিয়া দশের মধ্যে দাঁড়াইতে ও চলিতে হইবে, ইহাই কামরাজ প্রস্তাবের সারমর্ম। এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সেই অনুযায়ী সংকল্প করিয়া ডাক দেওয়ায় কেন্দ্রের ও রাজ্যের সকল মন্ত্রীই—অন্ততঃ অধিকাংশই সে ডাকে সাড়া দিয়াছেন, ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

যেদিন প্রথম পণ্ডিত নেহরুর "ছাঁটাই ফর্দ" প্রকাশিত হইল এবং তাহাতে ছয়জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ছয়জন মুখ্যমন্ত্রীর নাম দেখা গেল, সেইদিন হইতেই সাধারণ ও অসাধারণ, অনেকজনের মনে এক খট্‌কা লাগিল, কার্য-কারণ সম্বন্ধ লইয়া। কি ভাবিয়া ও কি বুঝিয়া পণ্ডিত নেহরু এই বারোজনকে কংগ্রেসের উন্নয়ন ও সংশোধনের কাজে উপযুক্ত মনে করিলেন সে কথার সদুত্তর সকলক্ষেত্রে—অর্থাৎ মনোনীত সকলজনের সম্পর্কে—কেহই খুঁজিয়া পাইলেন না। এবং লোকসভা ও অন্য রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল প্রশ্নোত্তর বা জল্পনা-কল্পনার কথা সংবাদপত্রে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ও অন্যত্র যে সকল বদল হইয়াছে ও হইবে তাহার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকারি ও কংগ্রেস পক্ষ হইতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও পরিস্থিতি এখনও ঘোরালো অবস্থাতেই আছে।

বিগত ৩০শে আগষ্ট লোকসভায় প্রশ্নোত্তর সময়ে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ছয়জন সদস্যের পদত্যাগের সহিত কোনও নীতি পরিবর্তনের প্রশ্ন নাই। বিশেষ অবস্থার কারণে তাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন। পূর্বে কখনও এইরূপ ব্যাপার ঘটে নাই। মন্ত্রীদের পদত্যাগের সহিত অনাস্থা প্রস্তাবের কোনও সম্পর্ক নাই। বরঞ্চ ঐ প্রস্তাবের দরুণই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সংকল্প কার্যকর করিতে বিলম্ব হইয়াছে। তিনি বিশেষভাবে বলেন যে, অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনাকালে কম্যুনিষ্ট পার্টি যে দুইজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, যথা শ্রীমোরারজি দেশাই ও এস কে পাতিলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে সেই অশোভন আচরণের সহিত ঐ দুইজনের পদত্যাগের কোনও সম্পর্ক নাই। ঐ দুইজন মন্ত্রীর নীতি ও সরকারের নীতি অভিন্ন। এ-বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কথা মানিয়া লইতে আমাদের কোনও দ্বিধা নাই।

কিন্তু তবে কি পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ দুইজনকে দেশের কাজ হইতে সরাইয়া পার্টির কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে? এ-বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ বা বিবৃতি পাওয়া যাইতেছে না। যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে পরিস্থিতিকে পরিষ্কার বুঝার উপায় নাই। লোকসভায় অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা সমন্বয় মন্ত্রণালয়ের বিলোপ সাধন করা হইবে কি না এবং সমাজ উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ঐ সব বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে। তবে কি বুঝিতে হইবে যে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিলে তাঁহাদের কাজ ও দপ্তর কিভাবে চালিত হইবে সেকথা বিবেচনা না করিয়াই তাঁহাদের বিদায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

পাতঝর

শান্তিকুমার ঘোষ

একটানা পাতঝর। চুম্বনের মতো পড়ে
অঝোর সফেদাগুঁড়ো দামাল চিকন চুলে।
এতক্ষণ সোহাগা-গলানো রোদ : ঝোরায় গাহনে নেমে
জল ছুঁড়ে শব্দক্রীড়া : মন্ত্রবলে আচম্বিতে
শুশুককে করা দ্রুত তরুণ সরাল।

এখন কবিত্বময় বিষণ্ণ বিকেল। মুখ্যত্য জানায় হিম
পাহাড়কে উপত্যকা, জল প্রবাহকে সাঁকো, সৌগন্ধাকে
চপল বর্ণিমা।

নাচে ডেকে নেয় পাতা সৌন্দর্যের পতনের মূর্ছনায় :
বলে, দ্যাখো, ইচ্ছা করো, ছোঁও
আসন্ন তিমির-টানা লোভন শরীর।

ঝড়েও নেভে না

বাসুদেব দেব

বিস্তারিত মেঘপটে অবসরে বিষাদের ছবি
আঁকা হয়। অথচ হৃদয়ে কত অগাধ বিষাদ
ছায়ার মতন ফেরে উৎসবে উৎসবে। এ পূরবী
সন্ধ্যার বকুলে কাঁদে, চলে গেলে রৌদ্রের নিষাদ।

দুঃখের অনেক রূপ, অভাবের বহু পরিচয়—
আমরা লবণ জল পাড়ি দিয়ে খুঁজি এক দ্বীপ,
রৌদ্রোজ্জ্বল। 'সে দ্বীপ কোথাও আছে'—এই বরাভয়।
ঝড়েও নেভে না আছে বুকে সেই সোনার প্রদীপ।

'এ বিষাদ, এ উৎসব, মেঘ ও বিদ্যুৎ শেষ হলে
প্রগাঢ় আকাশ নীল'—প্রেম শুধু এই কথা বলে॥

যখন গোধূলি

উত্তমকুমার দাশ

শিমুলে শাখার মতো দুলে ওঠে যখন গোধূলি
প্রতিশ্রুত তুমি আসবে বনভূমি নিঃসৃত মর্মরে
শোনাবে বৈকালী গান, চেয়ে থাকি স্মিত কৌতূহলী
কখন ফোটাবে হাসি কৃষ্ণচূড়া তোমার অধরে।

তোমার দেহের স্পর্শ মোহনীয় স্মৃতিতে নির্জিত
পুনর্বার স্পর্শ করো অগ্নিগর্ভ তোমার তর্পণ
অমোঘ শিল্পীর মতো গড়ে নেবো মুক্তিতে নন্দিত;
আমার জয়ের তূর্য পরিপ্লুত সমুদ্র-গর্জন।

না তোমার স্পর্শ নয় দুঃস্থ যন্ত্রণার মতো ম্লান
অন্ধকার চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হলে প্রিয় প্রতিশ্রুতি
কারুণ্যে গুঞ্জন করি, প্রতিদিন উন্মোচিত গান
প্রিয়নামে সংকেতিত করি তবু আনন্দের দ্যুতি।

কে আমায় ছুঁয়ে গেল সমস্ত চেতনা ঘিরে বাজে
আনন্দের অভিমান সীমাশূন্য শূন্যতার মাঝে।

শিক্ষা নিয়ে লিখছি, কিন্তু দোহাই আপনাদের, চট ক'রে পাতাটা উল্টে যাবেন না। একদা যে আবেগ নিয়ে বাংলার মহাকবি শ্রীমধুসূদন লিখেছিলেন, 'দাঁড়াও পথিকবর' ইত্যাদি, আমিও সেই আকুতি নিয়েই বলছি—'দাঁড়ান'।

আমি জানি, এ বিষয়ে আপনাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। দেশের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষিত হোক এ আপনারা অবশ্যই চান, কিন্তু সে শিক্ষাটা কেন সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে না, বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষার বাধা কোথায় এসব কথা জানার হয়তো বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই আপনাদের।

কারণ, আপনাদের ধারণা হয়তো এই যে, নতুন ক'রে এ বিষয়ে জানার কিছু নেই। দেশে আজ নানারকম সমস্যা। ভাবছেন সেই সব দুর্বিপাকের চাপেই হয়তো শিক্ষার দিকে তত বেশী নজর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, সেই যে মহামতি গোখলে কবে যেন বলেছিলেন, বাঙালী আজ যা ভাবে, ভারতবাসী তা কাল ভাববে, সেকথাও হয়তো মনে ছাপ রেখে গিয়েছে কারো কারো।

নীতিবিহীন শিক্ষানীতি

আর তারই প্রভাবে ভাবছেন বৈষয়িক উন্নতিটা আমাদের খুব বেশি হোক না হোক, পড়াশোনায় আমাদের এই বাংলা দেশ যথেষ্টই উন্নত। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ আমরা, শিক্ষাদীক্ষায় এখনও পয়লা সারিতেই আছি।

দুঃখের বিষয়, এ অনুমান নিতান্তই কাল্পনিক। সারা বাংলার কথা বাদই দিলাম, বঙ্গ সংস্কৃতির মহাপীঠ এই কলকাতা শহরও শিক্ষার দিক দিয়ে ভারতের অন্য অনেক শহরের সমকক্ষ নয়। '৬১ সালের আদমসুমারীতে এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে। এবং বর্তমানের অবস্থা এই যে, ৬ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই থাকে এখানে বিদ্যালয়সংস্পর্শহীন নিরক্ষর অবস্থায়।

অথচ এরাই আমাদের ভবিষ্যত নাগরিক। এদেরই মুখ চেয়ে অপেক্ষা করছে সমস্ত দেশ। এ শহরে উৎসবের দিনে কাঙালী ভোজন করানো হয়, রাস্তায় বেওয়ারিশ অবোলা প্রাণীদের জন্য রয়েছে পশু-ক্লেশ নিবারণের সংঘ, কিন্তু মানুষের সন্তানকে 'মানুষ' করে তোলার ব্যবস্থা নেই।

সকলেই জানেন, প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব রয়েছে কর্পোরেশনের হাতে। কিন্তু শহরের সোয়া তিন লক্ষ শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার মতো সঞ্চয় নেই কর্পোরেশনের থলিতে। এর জন্যে সাড়ে এগারো কোটি টাকা চেয়েছিলেন তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছে, এবং '৫৩ সাল থেকে এ বিষয়ে বহু কমিটি, প্রস্তাব, নোট, উত্তর, প্রত্যুত্তর এবং পুনঃপ্রস্তাব চলাচল করেছে '৫৮ সাল পর্যন্ত। কিন্তু কাজ এগোয়নি এক কদমও। তারপর পাঁচ বছর চললো ডুব সাঁতারের পালা, দুপক্ষই চুপচাপ। ইতিমধ্যে গজিয়ে উঠল হাজার রকম প্রিপারেটরী স্কুল এবং ব্যক্তিগত মালিকানার শিক্ষাব্যবস্থা। ফলে সারা কলকাতার শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে আজ অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং অর্ধশিক্ষার চরম নৈরাজ্য। যাঁরা সন্তানের অভিভাবক, তাঁরা জানেন সে অভিশাপ কি নিদারুণ!

হালে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এক বিশেষজ্ঞ দল এ বিষয়ে শলাপরামর্শ শুরু করেছেন। কিন্তু জানিনে, লজিক যেখানে হার মানে সেখানে ম্যাজিক ছাড়া কি আর কি আশা করার থাকে!

• • •

পাতাল জায়গাটা কেমন এ বিষয়ে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।। প্যারাডাইস লস্ট-এ দেখেছি, সেটা হল গন্ধকের আগুনজ্বলা নরক। স্বর্গচ্যুত শয়তান সেখানে রাজ্য ফেঁদে বসেছে।

কিন্তু এ হল কবির কল্পনা। প্রত্যক্ষভাবে এর কোনোদিন পরিচয় পাব সে আশা ছিল না। তবে হালে একটা খবর পড়ে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি। এই মরদেহেই পাতাল অথবা নরকদর্শনের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে কলকাতায়।

আমি তাই পাতাল দেখতে যাচ্ছি। পাতাল নয় তো, হাসপাতাল, কিম্বা নরক—ওগুলো একই কথা। আপনারা যাঁরা সে সুযোগ লাভ ক'রে ধন্য হ'তে চান, আমার সঙ্গে আসুন। দেখবেন, আধুনিক কলকাতা শহরের একটি প্রথম শ্রেণীর হাসপাতালে কেমন নরকের আবহাওয়া বিরাজিত। আজ মিলটনের সম-প্রতিভাসম্পন্ন কোনো কবি থাকলে এই সুসভ্য হাসপাতালটি দেখেই রচনা করতে পারতেন দ্বিতীয় প্যারাডাইস লস্ট।

হাসপাতালে পাতালের হাসি

জায়গাটা হল নীলরতন সরকার হাসপাতাল। খবরে দেখছি, সেখানে (১) কুলপী বরফওয়ালা নির্বিবাদে হাসপাতালের ভেতর বরফী ফিরি করে, (২) বাইরের একদল যুবক ফুটবল খেলে, (৩) হাসপাতালের জমিতে চা, তেলেভাজা ও পানবিড়ির দোকান গজিয়ে উঠেছে, (৪) রাত্রির অন্ধকারে এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে যেতে গেলে নার্সদের সামনে মাতালের আবির্ভাব ঘটে, এবং (৫) হাসপাতালের কর্মীদের সহযোগিতায় হাসপাতালের মধ্যেই খোলা হয়েছে গরুমোষের খাটাল, যা থেকে চলে সুপরিকল্পিত দুধের ব্যবসা। (তালিকা অসম্পূর্ণ)।

মোটামুটি এই বর্ণনা থেকে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, এইসব বহুমুখী কর্মতৎপরতার ফলে রোগীরা সেখানে কি রকম নিরুদ্বেগ আবহাওয়ায় নিরাময় লাভ করছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে হাসপাতাল না হ'য়ে জায়গাটা যদি পাগলা-গারদ হ'ত, তাহলে বোধহয় এতদিন কুরুক্ষেত্র বেধে যেত। কিন্তু প্রকৃতিস্থ মানুষের অনেক দায়। বিশেষ করে তাঁরা যে অসুস্থ, শয্যাশায়ী! তাই এরকম বেপরোয়া জুলুমকেও তাঁদের মুখ বুজেই সহ্য করতে হয়।

তা সে যাই হোক, রোগ হলে মানুষ হাসপাতালে যাবে, বাঁচবার হয় বাঁচবে নয়তো বা ললাটলিপি—তা নিয়ে সোরগোল ক'রে লাভ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওপরের তালিকাটি অসম্পূর্ণ, হাসপাতালকে পাতাল অর্থাৎ কিনা পুরোপুরি নরক করতে হলে সেখানে কেবল কুলপী বরফ আর পানবিড়ির দোকান নয়, রুগীদের বিদায় দিয়ে ঐসব বড় বড় বাড়িতে গোটাকতক কার্নিভ্যাল খুললে সেটা আরো কৌতুহলোদ্দীপক হ'য়ে উঠতে পারে।

• • •

নিচে একখানি চিঠি তুলে দিচ্ছি। পত্রলেখক 'খোলাচিঠি' শিরোনামায় এই চিঠি লিখেছেন জৈমিনিকে।

"সংবাদপত্রে দেখলাম, এ রাজ্যে মৎস্য পরিকল্পনার খাতে লোকসান একষট্টি লক্ষ। কোন বঙ্গজননীর 'ষাট-ষাট' আশীর্বাদে একষট্টির কোঠায় পোঁছোল তা আমার জানা নেই।

অথ পরবর্তী পরিকল্পনা হাঙর ধরা (যন্ত্রস্থ)।

আপনার নাম জৈমিনি। সেকালের জৈমিনি ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ—একালের আপনি নিশ্চয়ই একালজ্ঞ। অতএব পূর্বাহ্নে যদি হাঙর-ধরা লোকসানের অঙ্কটা গণনা ক'রে অভাজনদের জানান তো ভবিষ্যৎ দুর্ভাবনা থেকে কিঞ্চিৎ রেহাই পাই। অলমিতি

গৌরীশঙ্কর গুপ্ত, চুঁচুড়া, হুগলী।"

পত্রলেখক সংবাদপত্রে যা দেখেছেন তা ঠিকই, কিন্তু হাঙরধরা পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা সর্বাংশে সুচিন্তিত নয়। কারণ তিনি বোধহয় লক্ষ্য করেন নি যে

হাঙর ধরার মূলতত্ত্ব

হাঙরধরা ব্যাপারটা এখন আর ঠিক পরিকল্পনার স্তরে নেই। হাঙর ধরা শুরু হ'য়ে গিয়েছে। তবে এই হাঙরগুলো জলচর জীব নয়, স্থলচর—এবং নিজেরাই মৎস্য-ব্যবসায়ী। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগ ইতিমধ্যেই এই ধরনের কতকগুলো হাঙরকে জাল পেতে ধ'রে ফেলেছেন। অতএব 'প্রকৃত' হাঙর ধরার পরিকল্পনার বরাতে যাই ঘটুক, আমাদের সুপরিচিত 'গভীর জলের জীবগুলো' যে কিছুটা বেকায়দায় পড়েছে, সেটা অস্বীকার করা যাবে না।

কিন্তু একটি কথা। মৎস্য-পরিকল্পনায় লোকসান ঘটেছে এ কথা পত্রলেখকের অনুমান মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে শোনা যাচ্ছে ও-রকম কোনো পরিকল্পনাই নাকি ছিল না। কাজেই, মাথা না থাকলে মাথাব্যথা হবে কী করে? একষট্টি কি বাষট্টি লক্ষ ক্ষতির কথা যা আমরা শুনি সেটা মস্ত একটা প্রহেলিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাজপুত্রের রাজসিংহাসন ত্যাগের কাহিনী প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সে কাহিনীর আর একবার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তবে অতীতের রাজসিংহাসন ত্যাগের সঙ্গে আজকের মন্ত্রীত্বের গদীত্যাগের মধ্যে অনেক পার্থক্য। সেকালের রাজা-মহারাজের আধিপত্য কস্মিনকালেও আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের উপর বিস্তৃত ছিল না। অতীত ভারতের মোগল সম্রাট আকবর বা রাজর্ষি অশোকের অধীনে আজকের ভারতের অর্ধেকের বেশী ছিল না। আগের দিনের মত আজকের মন্ত্রীদের যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা নেই সত্য, কিন্তু ভারত সরকারের যে কোন মন্ত্রীর আধিপত্য অতীতের মোগল সম্রাটদের চাইতে অনেক বেশী। তাই হাসিমুখে স্বেচ্ছায় সেই সব মন্ত্রীত্বের গদী ত্যাগ করা কম শৌর্য-বীর্যের পরিচয় বহন করে না!

তাই তো বলি আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের আর একটি অধ্যায় শেষ হলো। সাউথ ব্লকের হোম মিনিস্ট্রী থেকে বিদায় নিলেন শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী। সবাই হয়ত জানেন না, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চাইতে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি আজ আর ভারতবর্ষে হয় না। বিশ্বাস করুন, প্রত্যক্ষ ক্ষমতার দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর চাইতেও এঁর ক্ষমতা বেশী। রাষ্ট্রপতি চলেন হোম মিনিস্ট্রীর পরামর্শে; ভারতের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারক ও লাটসাহেবের দলও সরাসরি হোম মিনিস্ট্রীর আওতায়। এ ছাড়া ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন, স্পেশ্যাল পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ ছাড়াও ছোট-বড় প্রায় অর্ধ-শতাধিক সংস্থা ঐ সাউথ ব্লকের হোম মিনিস্ট্রীর দ্বারাই পরিচালিত। ভারত সরকারের হোম মিনিস্টারই হলেন সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানতম রাজনৈতিক পরামর্শদাতা। সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এঁরই এবং এই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে প্রাদেশিক সরকারকে বাতিল করে সরাসরি সরকার পরিচালনার ক্ষমতাও একমাত্র হোম মিনিস্ট্রীরই আছে। সুতরাং একবার মুদ্রিত নয়নে চিন্তা করুন ভারত সরকারের হোম মিনিস্টারের ক্ষমতা। এ হেন ক্ষমতাসম্পন্ন হোম মিনিস্টারের গদী থেকে হাসিমুখে সরে দাঁড়ানো মনে হয় সহজ ব্যাপার নয়! ভগবান বুদ্ধদেবের
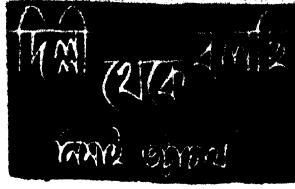
দেশ ভারতবর্ষে আজ লালবাহাদুর ছাড়া বোধকরি আর কেউ নেই, যিনি এমন প্রশান্তচিত্তে হাসিমুখে এই 'সাম্রাজ্য' ত্যাগ করতে পারেন।

অজাতশত্রু লালবাহাদুর! কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বিদায় সম্বর্ধনা সভায় কমিউনিস্ট এম-পি গোবিন্দন নায়ার শাস্ত্রীজির হাত দুটি চেপে ধরে বল্লেন, সবাইকে দুঃখ দিয়ে এভাবে মন্ত্রীত্বত্যাগের কি কোন অর্থ হয়? বিশ্ব-নিন্দুক সোস্যালিস্ট এম-পি রামসেবক যাদব একটু কড়া মেজাজেই বলে ফেল্লেন, ম্যায় সাফ্ সাফ্ বাতা দেতা হুঁ, এ কাম আপ আচ্ছা নেই কিয়া। পি-এস-পির নাথ পাই ব্যারিস্টারী ইংরেজিতে বল্লেন, কুড ইউ টেল মি হু ওয়ানটেড ইউ টু লীভ? পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের আর কোন সর্বাধিনায়ককে বিরোধীদলের সদস্যরা এভাবে বিদায় জানিয়েছেন বলে আজ পর্যন্ত দেখিনি বা শুনিনি। পার্সোনাল স্টাফের দল তো চোখের জলে বিদায় নিলেন! চোখের জল মুছতে মুছতে বৃদ্ধ জগন্নাথ সহায় বল্লেন, ভট্টাচারিয়া, বিশ্বাস করো, বুড়ো বয়সে পিতৃবিয়োগ সহ্য করা যায় কিন্তু শাস্ত্রীজির মত মানুষের সংসর্গ ত্যাগ করার দুঃখ সহ্য করা যায় না। পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্ট ভেঙ্কটরমন বলছিলেন, বিলিভ মি, শাস্ত্রীজি ওয়াজ অফ গ্রেটার অ্যাট্রাকসন টু মি দ্যান ইভন মাই হোম। তুমি তো দেখতে, [illegible] ওঁর কাছে পড়ে থেকেছি [illegible] করেছি; কিন্তু মুহূর্তের জন্য বিরক্তি বোধ করিনি, কারণ জানতাম উনি তো আমার চাইতেও বেশী পরিশ্রম করেন।

সত্যি এমন মানুষ আজ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।.. তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে এ-আই-সি-সি হেড্ কোয়ার্টার্স কংগ্রেস সেণ্ট্রাল ইলেকশন কমিটির মিটিং'এ মনোনয়ন দেবার কাজ চলছে। মুচকি হেসে জওহরলাল আমাদের এড়িয়ে গেলেন; অস্বাভাবিক ব্যস্ততার ভান করে দ্রুত পদক্ষেপে ইন্দিরা পাশ দিয়ে চলে গেলেন। ধীর পদক্ষেপে শাস্ত্রীজি বেরিয়ে আসতেই জোঁকের মত করসপনডেন্টরা ঘিরে ধরলাম। দু'চারটে কথা বলে গাড়ীতে চাপলেন। আমি গাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করে হিন্দীতে কি যেন জিজ্ঞাসা করলাম; উত্তর দিয়ে বিদায় নিলেন শাস্ত্রীজি। গাড়ীটা সাত নম্বর জন্তর মন্তর থেকে বেরিয়ে যেতেই আনন্দস্বরূপ আমাকে জানাল যে আমি নাকি এমন ধরনের হিন্দীতে শাস্ত্রীজির সঙ্গে কথা বলেছি, যা অব্যবহার্য। মনটা ভীষণ খারাপ লাগল। পরের দিন সকালে উঠেই গেছি এক নম্বর ইয়র্ক প্লেসে মাপ চাইতে। মুখ কাচু-মাচু করে লনের এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন শাস্ত্রীজি।

'কিয়া হুয়া? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

'দাদাজী, মাপ কর দেনা। কাল রাত্রে বোধহয় একটু অশ্লীল হিন্দীই ব্যবহার করেছিলাম......কিন্তু ইচ্ছা করে বলিনি।'

'বোকা কোথাকার! এর জন্য লজ্জিত হবার কি আছে? হিন্দী তো তোমার মাতৃভাষা নয়, সুতরাং ভুল হলে লজ্জার কি আছে? আমি তো জানি, তুমি আমাকে অপমান করার জন্য কিছু

বলনি........আর তাছাড়া আমিও যে মাঝে মাঝে তোমার সংগে দু' একটা বাংলা বলি, সেগুলোও কি সব ঠিক হয়?'

যাবার মুখে হাতে একটা কমলালেবু দিয়ে বল্লেন, খেতে খেতে আমাদের বাড়ী যাও।

যে কাজের জন্য অন্য কেউ গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতেন, তারই জন্য শাস্ত্রীজির এই ব্যবহার!

এক সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেও কাজের চাপে রক্ষা করতে পারলেন না শাস্ত্রীজি। সেদিন পার্লামেণ্ট চলেছিল রাত আটটা পর্যন্ত এবং তারপর রাত এগারটা পর্যন্ত এক ক্যাবিনেট সাব-কমিটির মিটিং। পরের দিন গিয়েছি শাস্ত্রীজির অফিসকক্ষে। সোজাসুজি উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত দুটি চেপে ধরে বল্লেন, আই ওয়াণ্ট টু এ্যাপোলোজাইস্।......আই উইশ কম্পেনসেট ইউ লেটার। আমি তো হতবাক! প্রবাদ চালু আছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কুকুরকেও 'আপনি' বলে সম্বোধন করে সম্মান দিতেন। বিদ্যাসাগরের এই কাহিনীর সত্যাসত্য বলার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু শাস্ত্রীজিকে দেখে বুঝেছি ভারতবর্ষে এমন লোক থাকা অসম্ভব নয়।

শীতকাল। ডিসেম্বর কি জানুয়ারী মনে নেই। সন্ধ্যার পর শাস্ত্রীজির বাড়ী গিয়ে দেখি, গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে অথচ শাস্ত্রীজিকে কোথাও দেখছি না। খবর নিয়ে জানলাম, সারভেণ্টস কোয়ার্টারে গিয়েছেন। অফিস-ঘরের পাশ দিয়ে সিকিউরিটি ষ্টাফের তাঁবুর বাঁ দিক দিয়ে হাজির হলাম সারভেণ্টস কোয়ার্টারে। দেখি, চাকরটির শিশু-সন্তান ডবল-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। শাস্ত্রীজি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ডাক্তার দেখাচ্ছেন। নিজের গাড়ী দিয়ে একজন পি-এ'কে পাঠিয়ে দিলেন ঔষধ আনতে। দিল্লীর প্রবল শীতে চাকরটির শিশু-সন্তান মেঝের পর সামান্য বিছানায় শুয়ে ছিল। শাস্ত্রীজি তৎক্ষণাৎ বলে দিলেন, 'কোঠিকা অন্দর সে চারপায়ী লে আও; আর আমার ঘর থেকে হিটারটা নিয়ে এসে এখানে জ্বালিয়ে রাখ।' ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে নিজের স্ত্রীকে চাকরের ঘরে থাকতে বলে শাস্ত্রীজি গেলেন অফিস। অফিস গিয়েও কি স্থির থাকতে পারেন? ঘণ্টায় ঘণ্টায় টেলিফোন করে খবর নেন, টেম্পারেচার কমতি হুয়া? যে মানুষ রাত এগারটা পর্যন্ত অফিস করেন, তিনিই চাকরের শিশু-সন্তানের অসুস্থতার জন্য বাড়ী এলেন কদিন সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না। শাস্ত্রীজিকে দেখে তাই ভাবি, মহত্ত্ব আর ঔদার্য না থাকলে কখনও এমন মানুষ হয় না।

জার্মান ভাষায় 'দেবতাত্মা হিমালয়'

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল দীর্ঘদিনের সাহিত্যসাধনায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী 'মহাপ্রস্থানের পথে'। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের তিনিই একমাত্র শক্তিশালী ভ্রমণকাহিনী লেখক। বলা যায় বাংলা সাহিত্যের এই দিগন্তটি তাঁর লেখনীস্পর্শেই সাহিত্যমর্যাদা লাভ করেছে। 'মহাপ্রস্থানের পথে' বইখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে এক অভূতপূর্ব জনসমাদর লাভ করে। সম্প্রতি তাঁর অবিস্মরণীয় হিমালয়-আলেখ্য "দেবতাত্মা হিমালয়" জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

'দেবতাত্মা হিমালয়'-এর জার্মান অনুবাদের প্রচ্ছদ চিত্র

অনুবাদ করা হয়েছে মূল বাংলা ভাষা থেকে। অনুবাদ করেছেন হিদেলবার্গ ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডঃ গিরিজাকুমার মুখোপাধ্যায়। 'দেবতাত্মা হিমালয়'-এর বিস্ময়কর রূপালেখ্যে হিমালয়ের যে জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে জার্মান পাঠকের কাছে তা নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে।

শ্রীযুক্ত সান্যাল দীর্ঘকাল কয়েকটি সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'কল্লোল' তাদের মধ্যে অন্যতম। কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিকের সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদনা এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পদাতিক'-এর সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি পালন করেছিলেন এক সময়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে এবং বিশেষ করে তীর্থস্থানগুলি তিনি বহুবার পর্যটন করেছেন। এই সমস্ত স্থানের কাহিনী অবলম্বনে তাঁর কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার অন্যতম 'মহাপ্রস্থানের পথে'। ১৯৩১ সালে তাঁর প্রথম গল্পসংকলন 'নিশিপদ্ম' প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য জগৎ

প্রবোধকুমার সান্যালের রচিত গ্রন্থ: প্রিয় বান্ধবী, আঁকা বাঁকা, নিশিপদ্ম, অবিকল, আগ্নেয়গিরি, শ্যামলীর প্রেম, অঙ্গরাগ, চেনা ও জানা, অঙ্গার, তরঙ্গ, মল্লিকা, নদনদী, তরুণীসঙ্ঘ, অরণ্য পথ, জলকল্লোল, নবীন যুবক, দিবাস্বপ্ন, ইতস্ততঃ, দেশদেশান্তর, জীবনমৃত্যু, হাসুবানু, লগ্ন শুভ, রাশিয়ার ডায়েরী, বিবাগী ভ্রমর, তুচ্ছ, উত্তরকাল, বন্যাসঙ্গিনী, বেলোয়ারী, শ্রেষ্ঠ গল্প, মনে রেখ, দেবতাত্মা হিমালয় (১ম ও ২য় খণ্ড), ইস্পাতের ফলা, স্বনির্বাচিত গল্প চিত্র-বিচিত্র, ঝড়ের সংকেত, মহাপ্রস্থানের পথে।

'চিন্তাধারায় দৈন্য' প্রসঙ্গে একটি চিঠি

রিচি রোড থেকে অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ পত্রযোগে জানিয়েছেন:

মহাশয়,

আপনাদের 'সাহিত্য জগতে'-এ "চিন্তাধারার দৈন্য" সম্পর্কে পন্ডিত নেহরুর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এবং সমর্থনও জানিয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। সে সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত জানাচ্ছি। ভাব অর্থাৎ অনুভব এবং চিন্তা এক বস্তু নয়। ভাব নিরাবলম্ব; আবেগের তরঙ্গে তার অভিব্যঞ্জনা সম্ভব এবং তা কাব্য তথা সাহিত্য রচনার পক্ষে হয়তো পর্যাপ্ত। কিন্তু চিন্তা বস্তুকে অবলম্বন করে অগ্রসর হতে বাধ্য। বস্তুর প্রাথমিক পরিচয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয় এবং তার প্রসার নির্ভর করে অনুকল্প এবং যথার্থ মানস-প্রতীকের উপর। ভাষার বাহন শব্দ এবং এই শব্দই মানসজগতে বস্তুর প্রতীক হিসাবে কাজ করে। অতএব বস্তু জগতের সঙ্গে আমাদের মানসিক পরিচয় এই সকল প্রতীক শব্দের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। এখন চিন্তা দানা বেঁধে উঠতে পারবে সক্রিয় এবং সার্থকভাবে তখনই যখন বস্তু এবং প্রতীকের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। এই ঘনিষ্ঠতা মাতৃভাষাতে যেভাবে সম্ভব কোন পরদেশী ভাষায় তা থেকে পারে না। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য আমরা চিন্তাজগতে বস্তুর পরিচয় লাভ করি বৈদেশিক শব্দের মাধ্যমে। ফলে চিন্তাজগতে আমরা ভ্রমণ করি অনেকটা প্লেটোর ভাবকল্পের মধ্যে অর্থাৎ বস্তুগুলি অর্ধ উপলব্ধ ছায়ামূর্তি দ্বারা পরিবৃত হয়ে। আমাদের চিন্তার দৈন্যের এ-ই প্রধান কারণ।

মনে রাখতে হবে ইংরাজীর মাধ্যমে প্রগতিশীল চিন্তাজগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় দেড়শত বৎসর হতে চলল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৭ সালে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ সালে। বাস্তবিক যদি বিদেশী ভাষায় মৌলিক চিন্তা সম্ভব হত, এই দীর্ঘকাল তার পক্ষে নিশ্চয় পর্যাপ্ত। এও মনে রাখা উচিত যে বিশ্বজ্ঞান-ভান্ডারে আমরা সামান্য যা কিছু দিতে পেরেছি তা বিজ্ঞানের সেই বিভাগে ভাষা যেখানে বিশ্বপ্রতীকত্ব লাভ করেছে। শুনতে পাই, আমাদের মন 'দার্শনিক' ধাতুতে গড়া, অথচ এই মৌলিক ধাতুকেও আমরা কোন নতুন তত্ত্বরূপ দিতে পারিনি: ইতিহাস, অর্থনীতি, সাহিত্যতত্ত্ব ইত্যাদির কথা উল্লেখ নাই করলাম। আমাদের ধীশক্তির অভাব এই অভিযোগ করে আমি জাতির অপমান কখনই করব না।

অতএব যদি আমাদের চিন্তার দৈন্য ঘুচাতে হয় তা হলে আমাদের ভিত নতুন করে গড়তে হবে; শিশুকাল থেকে আমাদের বংশধরদের চিন্তা স্বদেশী ভাষায় করতে শেখান একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যম ও রাষ্ট্রভাষা এক নয়; অনেকে যে এই দুটির এলাকা মিশিয়ে ফেলেন তা আমাদের চিন্তার দৈন্যেরই পরিচয়।

গত সপ্তাহে 'সাহিত্য জগতে' প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিদেশ যাত্রার সংবাদ ভুলবশতঃ ৯ই আগস্ট ছাপা হয়েছে। ওখানে ৯ই সেপ্টেম্বর পড়তে হবে।

মন্ত্রীসভা
জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা
পাঞ্জাব ... গুজরাট ... মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
গাহে তব জয় গাথা
কতো
অজানারে
জানাইলে তুমি...
পুরানো আবাস
ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি
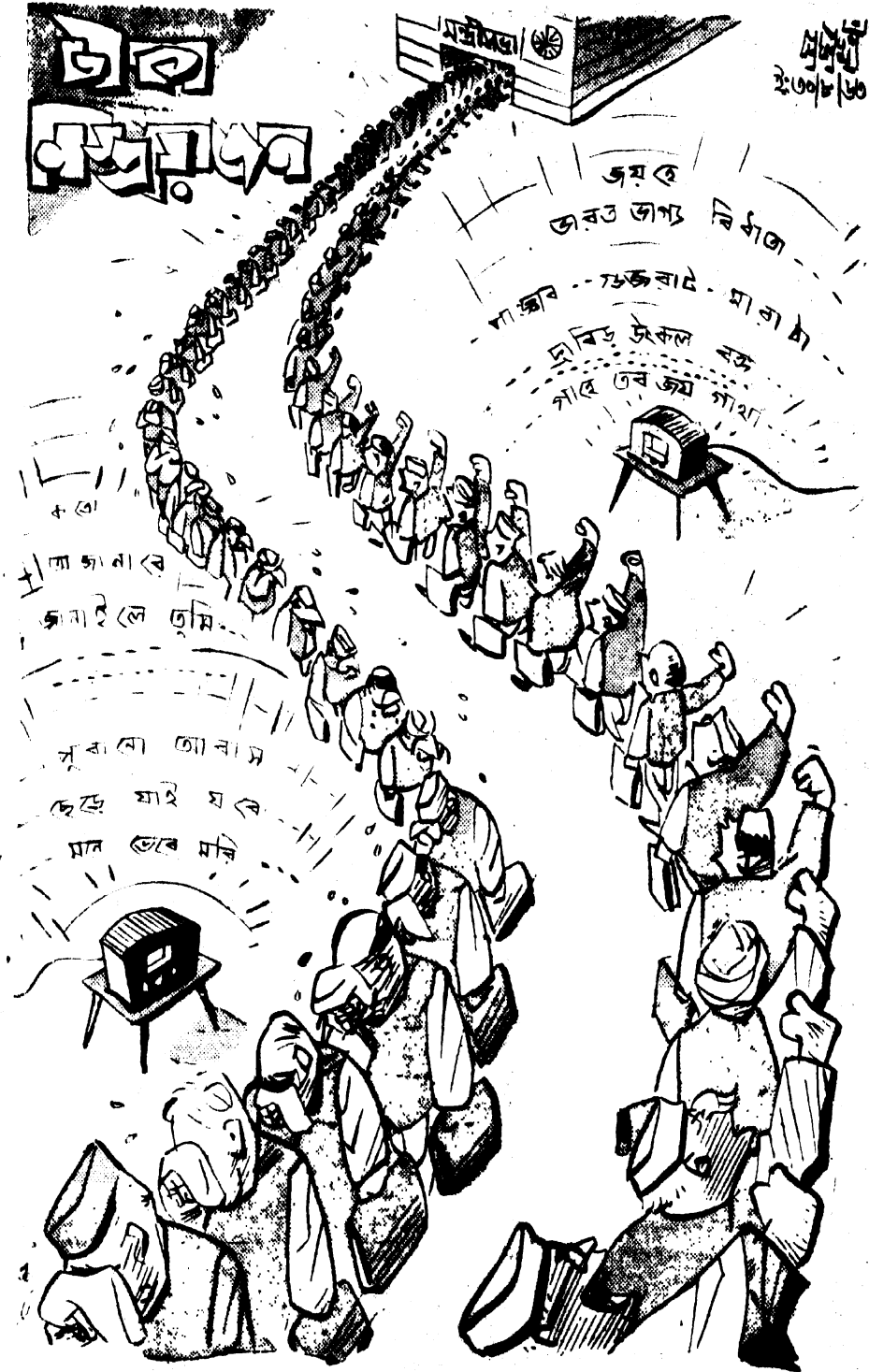
ভুল যত সামান্যই হোক না কেন, তা যে সব সময়েই বুঝতে পারা যায় না— তা নয়। কিন্তু কঠিন হলো এই ছোট্ট ভুল শুধরোনো। বিশেষ করে আপনি যদি সত্যান্বেষী অপরাধবিশেষজ্ঞ হন, আর রহস্য সমাধানের গুরুভার যদি চাপানো হয় আপনার কাঁধে—তাহলে এই ছোট্ট ভুলই যে শেষকালে কি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, তা শুধু আপনিই হাড়েহাড়ে টের পান। তদন্তের শুরুতেই যদি কোন রকমে ভুলপথে চালিয়ে দেওয়া যায় আপনাকে, তাহলেই তুমুল বিপর্যয়ের মাঝে পড়ে সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়তে আপনি বাধ্য।

প্রথম থেকেই আমার কেন জানি মনে হয়েছিল বাদালোনার খুনের কেসটাতে রহস্য রয়েছে প্রচুর। আপাতদৃষ্টিতে যত সরল মনে হয়েছিল, তত সরল নয় কেসটি। সমস্ত হত্যাপর্বটা এমনই গোলমেলে যে মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার। খবরের কাগজে বর্ণিত লোমহর্ষক নাটক হিসাবেই প্রথম শুরু হয়, কাহিনীটা। স্বভাবমত সংবাদিকরা দিব্যি চাঞ্চল্যকরভাবেই পরিবেশন করেছিল খবরটা। কিছু কিছু আবছা ইঙ্গিত আর সম্ভাবনাও উল্লেখ করতে ভোলে নি। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসের শেষাশেষি শুরু হয় এই সংবাদপত্র-নাটকের। বাদালোনার একটা ভিলায় মাটির নীচে একটি যুবতী মেয়ের লাশ পাওয়া গিয়েছে। বাদালোনা অবশ্য বার্সেলোনার কাছেই। সম্ভবত মাসখানেক আগে খুন করা হয়েছিল মেয়েটিকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তার বিকৃত দেহ। মুখ দেখে জানার উপায় ছিল না তার প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু এইটুকু বোঝা গিয়েছিল যে বছর তিরিশ হবে তার বয়স।

বাড়ীটা একতলা। মালিকের নাম অ্যান্তোনিও ক্যারিরা জানকোসা। মাস তিনেক আগে আর্জেন্টিনার এক ভদ্রলোককে বাড়ীটা ভাড়া দিয়েছিলেন তিনি। ভদ্রলোকের নাম অরিলিও মার্তিনেজ। নিজকে আর্জেন্টিনার বাসিন্দা বলে দাবী করলেও আসলে তিনি ছিলেন স্পেনের অধিবাসী।

লাশ পাওয়ার একমাস আগে এই ভদ্রলোকই বাড়ীর চাবী মালিকের হাতে

বাদালোনা-র সেই লাশটি

ডন ভিসেনতি রেগুয়েনগো

তুলে দিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যান। দিন-কয়েক পরে ঘরদোর তদারক করতে এলেন জান্‌কোসা। তখনই কিরকম একটা গন্ধ পেলেন উনি। শুধু তাই নয়। লক্ষ্য করলেন, মেঝের কয়েকটা টালিও আলগা হয়ে গিয়েছে। সংগে সংগে পুলিশের শরণ নিলেন জান্‌কোসা। ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন মেঝের টালি সরিয়ে পরীক্ষা করা হোক। মাটি খুঁড়তেই পাওয়া গেল মেয়েটার দেহ। একটা থলির মধ্যে হাত-পা বাঁধা লাশটা ঠেসে সযত্নে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল মুখটা।

ড্রেসিং গাউন ছাড়া আর কিছুই ছিল না মেয়েটির পরনে। খবরের কাগজের সবজান্তারা লিখেছিল, গলা টিপে অথবা মাথায় চোট মেরে জীবনদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল হতভাগিনীর। লাশ পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন প্রায় তিরিশ বছর তার বয়স।

এখনও মনে পড়ে কেসটা হাতে নেওয়ার পর বাদালোনায় গিয়ে কি পরিমাণে দমে গিয়েছিলাম আমি। অল্প কয়েকটি শহুরে-তলী ভিলা দিয়ে গড়ে-ওঠা অঞ্চলটিতে জীবনের চঞ্চল স্রোতস্বিনী যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এরকম নিঝুম নিশ্চুপ জায়গা মোটেই ভাল লাগে না আমার। বিশেষ করে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না খুন যেখানে হয়েছে, সেই ভিলাটিকে। পূতিগন্ধে ভরপুর বাতাসে যেন দম আটকে আসতে চায়। ঘরের মেঝেতে বিশাল একটা গর্ত দেখলাম। লাশটা থলিতে পাওয়া গিয়েছিল এই ঘর থেকেই।

তন্নতন্ন করে বাড়ী তল্লাস করে একগাদা পরিধেয়, একটা চশমা এবং একটা হাতব্যাগ জড়ো করলাম আমি, কতকগুলো পোশাকে রক্তের দাগ লেগেছিল। বলা-বাহুল্য জিনিসগুলো নিহত মেয়েটিরই। সারা তল্লাটে দারুণ গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল খুন যেই করুক না কেন, এই তার প্রথম খুন নয়। পাড়াপড়শীদের দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে একটু বুদ্ধি খরচ করলেই পুলিশের কর্তারা এই 'মৃত্যু-ভবন' থেকে আরও অনেক লাশ আবিষ্কার করতে পারবে। গুজবগুলো যে নিছাৎই গুজব এবং ভিত্তিহীন, তা না বললেও চলবে। সেই কারণেই প্রথমেই বলে নিয়েছি আমি কেসটার প্রকৃত রহস্য ধরতে না পারার ফলেই এতখানি জটিল হয়ে উঠেছিল এই তদন্ত-পর্ব।

জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেল শব-ব্যবচ্ছেদ করার পর। তাড়াহুড়ো করে কোনোরকমে ওপরে-ওপরে কর্তব্য শেষ করলেন ডাক্তার। মেয়েটির বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, তথ্য পেলাম তাঁর কাছে থেকেই। ফলে, ঐ বয়সের অনেক-গুলি মেয়ের নাম পাওয়া গেল। খামোকা খানিকটা সময় নষ্ট করলাম তাদের প্রত্যেকের হদিশ বার করতে। শেষকালে দেখা গেল প্রত্যেকেই জলজ্যান্ত জীবিত।

হত্যা-রহস্য সমাধানে একটা মস্ত বড় বিষয় হচ্ছে মোটিভ অর্থাৎ হত্যার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক গোয়েন্দাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মোটিভ নির্ণয় করার জন্যে আদাজল খেয়ে উঠে-পড়ে লাগে। কিন্তু এদিক দিয়েও আমি অসহায়। কেননা, খুনের আগে আরিলিও মার্তিনেজের জীবন সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানতাম না আমি। মাস দুয়েকের জন্যে ভিলায় আস্তানা পেতেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর আরও মাস দুয়েক কেটে গেছে, নতুন কোনো ভাড়াটে বসান নি তিনি বাড়ীতে। পাড়াপড়শীদের কাছে শুনলাম সন্ধ্যের অন্ধকার না নামলে ভদ্রলোককে বাইরে বেরোতে দেখা যেত না। দেখতে শুনতে যুবাপুরুষের মতই। মৃদুস্বরে বড় সুন্দর কথাবার্তা বলে চিত্তজয়ের গুণ ছিল তাঁর। কৃশকায়। উচ্চতাও তেমন কিছু নয়। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে ফুলবাবুটির মত সেজেগুজে থাকতেন। চেহারার ওপর যে বিলক্ষণ যত্ন ছিল মর্তিনেজের, তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত।

বাড়ীর লীজে সই দেওয়ার সময়ে আত্ম-পরিচয় দেওয়া আইডেনটিফিকেশন কার্ডটি সংলগ্ন করে রেখেছিলেন মার্তি-নেজ। এই কার্ড পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম অনেক যত্ন নিয়ে সই করেছেন ভদ্রলোক। তাইতেই আমার আর তিল মাত্র সন্দেহ রইল না যে এ নাম তার পিতৃদত্ত নয়—ছদ্মনাম। আমি জানি অনেকে মনে করেন Graphology অর্থাৎ হাতের লেখা পরীক্ষা করে চরিত্র নিরূপণের শাস্ত্রে নাকি কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাঁদের সংগে এ সম্পর্কে একমত নই আমি। ঠিকানা ছাড়া কার্ডে যা কিছু তথ্য পাওয়া গেল, তা ডাহা মিথ্যে। ঠিকানা দেওয়া ছিল ১০নং ক্যাল্লি দ্য টলার্স, বার্সিলোনা। গেলাম সেখানে। বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল যে স্ত্রীলোকটির ওপর, তাকে জিজ্ঞাস করলাম আরিলিও মার্তিনেজ বলে কেউ এ বাড়ীতে থাকতেন কিনা। বাড়ীর মালিকের কাছে আমাকে নিয়ে গেল সে এবং তার কাছেই জানলাম, আরিলিও মার্তিনেজের নাম এ বাড়ীর কেউ এর আগে শোনে নি। কিন্তু সহজেই হাল ছাড়বার পাত্র নই আমি। নামটা যে আসল নয়, তা তো আমি জানতামই। কাজেই, মার্তিনেজের চেহারার বর্ণনা দিলাম এবার। কাজ হোল তাতে। বাড়ীওলা বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি বই কি। বেঞ্জামিন বালসানোকেই তো এই রকম দেখতে। আমার এই বাড়ীতেই কিছু-দিন ছিলেন ভদ্রলোক। বড় অল্প কথা-বার্তা বলতেন। তাছাড়া বাঁধাধরা জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি—বড় বিশৃঙ্খল ছিল তাঁর প্রকৃতি। মাঝে মাঝে দারুণ টানাটানি চলতো। তবে একবার শুনে-ছিলাম, বার্সিলোনাতে নাকি তাঁর একটা ভিলা আছে।'

নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেল পয়লা নম্বরের জোচ্চোর এই বালসানো। অনেকগুলো শহরের পুলিশ মহলে বিলক্ষণ নামডাক আছে তার। দুরন্ত জুয়াড়ী সে, হাতের মার-প্যাঁচেও মহা ওস্তাদ। এ ধরনের লোকদের জীবনে অভাব-অনটন আর স্বাচ্ছল্যের যেমন দ্রুত পরম্পরা দেখা যায়, বালসানোও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বালসানো আর আরিলিও মার্তিনেজ যে এক এবং অভিন্ন পুরুষ, তা প্রমাণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হলোনা। ক্যাল্লি দ্য টলার্সের বাড়ীওলা আর বাদালোনার প্রতিবেশীদের পুলিশ ফোটোগ্রাফ দেখাতে তারাও একবাক্যে সমর্থন জানালো আমার সিদ্ধান্তকে।

তদন্ত-পর্বের এই পর্যায়ে পৌঁছে অনায়াসেই বালসানোর নামে গ্রেপ্তার পরোয়ানা বার করে দিতে পারতাম। কিন্তু নিহত মেয়েটিকে তখনও শনাক্ত করে উঠতে পারি নি আমি। কাজেই চট করে কিছু করা সংগত মনে করলাম না। এই সময়ে খবর পেলাম, ইউলেলিয়া মাইনো নামে একজন বিবাহিত মেয়ের সংগে বার্সিলোনাতে প্রায় দেখতে পাওয়া যেত বালসানোকে। গোলগাল নধরকান্তি চেহারা মেয়েটার। চুলের রঙ কুচকুচে কালো। ক্যাল্লি দ্য লা ক্যাডেনাতে একসাথে একটি ঘরে কিছুদিন ছিল ওরা দুজনে।

তারপর উধাও হয়ে যায় বালসানো এবং মেয়েটি। এবং কেউ জানে না বর্তমানে পৃথিবীর কোন মুলুকে আস্তানা নিয়েছে দুই মূর্তিমান।

আরও খবর পেলাম, ইউলেলিয়া তার সৎমায়ের সঙ্গে গ্র্যানোলার্স-এ থাকতো। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলাম সেখানে। বিমাতা বড়ীতেই ছিলেন। আমাকে দেখেই না জানি কি হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছে মনে করে রীতিমত শংকিত আর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এই বাড়ীতেই একটা চিঠির কয়েকটা ছিন্ন অংশ পেলাম। জোড়া লাগাতেই পেলাম পুরো চিঠিটা। ইউলেলিয়ার চিঠি। এক-জন বন্ধুর সঙ্গে বার্সিলোনা ত্যাগ করে যাচ্ছে সে। বিমাতার কাছে তার অনুরোধ তিনি যেন পড়া শেষ হয়ে গেলেই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেন। চিঠির তারিখ ছিল ২৩শে মার্চ, ১৯৩২। বাদালোনায় মৃত-দেহ আবিষ্কারের ঠিক দুদিন আগেকার তারিখ।

এ কেসের একটা অত্যন্ত দরকারী সূত্র হচ্ছে বালসানো—ইউলেলিয়া ঘটিত প্রণয় উপাখ্যানটি। কিন্তু তার চাইতেও দরকারী যা, তাহলো খুনে পাষন্ডটার নাম ধাম জানা। শবব্যবচ্ছেদ হওয়ার পর যে রিপোর্ট পেয়েছিলাম, তা আমার কাছে অন্তত সন্তোষজনক মনে হয় নি। কিন্তু একগুঁয়ে ডাক্তার কিছুতেই তাঁর রিপোর্ট শুধরোতে রাজী হলেন না। মেয়েটির বয়স নাকি কোনমতেই তিরিশের বেশী নয়—ছিনেজোঁকের মত এই তথ্য-কেই আঁকড়ে রইলেন ভদ্রলোক। ভেবে দেখলাম ক্যাল্লি দ্য টলার্সের বোর্ডিং হাউসে গেলে অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর আমি পেলেও পেতে পারি। তাই আবার গেলাম বাড়ীওলার সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে।

এমি ল্যাংগার নামে একজন জার্মান স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিছুদিনের জন্যে এ বাড়ীতে সংসার পেতেছিল বালসানো। প্রায় ষাট বছর বয়স এমি ল্যাংগারের। বিধবা। স্বামী ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনীয়র। অবস্থা ভালই ছিল তাঁর। আসক্তি মদ আর অন্যান্য মাদক দ্রব্যে। বিস্তর অর্থ ছাড়াও অনেক হীরে জহরৎ ছিল নাকি তার গহনার পেঁটরায়। চলে যাওয়ার সময়ে সব কিছুই নিয়ে গিয়েছিলে সে, ফেলে গিয়েছিল শুধু একটা কাকাতুয়া। দিব্যি জার্মান বলতে পারে পাখীটা। দেখলাম, মনিবানীর আকস্মিক অন্তর্ধানে দারুণ মুষড়ে পড়েছে বেচারী। খুঁজে-পেতে এমন একজনকে বার করলাম যে জার্মাণ কথা কইতে পারে। তাকে নিয়ে এলাম কাকাতুয়ার সামনে। ওদের কথা-বার্তা থেকে নতুন কোনো তথ্য জানতে পারব, এই আশা ছিল আমার। কিন্তু এবারও আশাহত হতে হলো আমাকে।

কিন্তু এমি ল্যাংগারই যে বালসানোর হাতে খুন হয়েছে এবং বাদালোনার সেই লাশটি যে তারই সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল আমার। বাদালোনার ভিলাতে পাওয়া কিছু কিছু আসবাব-পত্র আর বই যে এমি ল্যাংগারেরই, তাও প্রমাণ করতে মোটেই বেগ পেতে হয় নি আমাকে। খুঁজতে খুঁজতে বার্সিলোনায় একটী দোকানের সন্ধান পেলাম। পুরোনো জিনিস খরিদ করতো দোকানদার। এমি ল্যাংগারের কিছু পোশাক উদ্ধার করলাম দোকান থেকে। বালসানোই বিক্রি করে-ছিল। কিন্তু আসল কাজটাই যে তখনো বাকী। যেমন করেই হোক আমাকে প্রমাণ করতেই হবে যে লাশটা এমি ল্যাংগারেরই এবং কোনো তরুণী মেয়ের নয়। এ ব্যাপারে আমার ওপর কিঞ্চিৎ কৃপা-বর্ষণ করলেন ভাগ্যদেবী। হঠাৎ খবর পেলাম, এমির পায়ে একবার একটা দগদগে ঘা হয়েছিল। অস্ত্রোপচার করে তবে সুস্থ হয়েছিল সে। ভেবে দেখলাম, এ খবর যদি নির্ভেজাল হয়, তাহলে লাশটা আর একবার পরীক্ষা করলেই
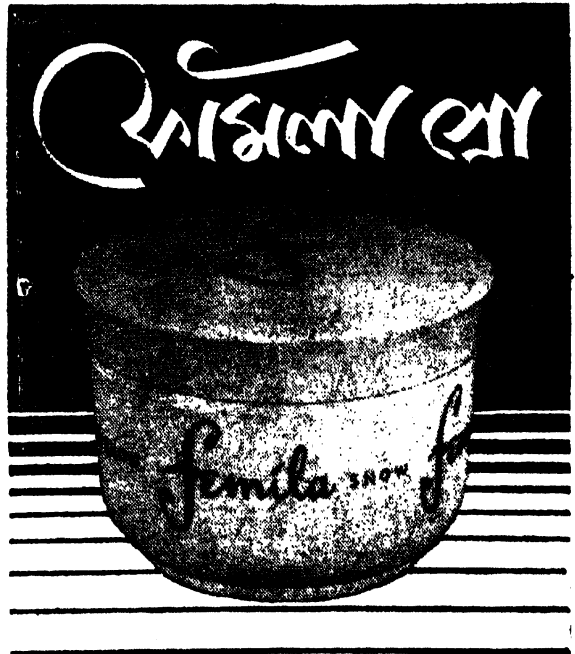
মুস্কিল আসান হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ সে ব্যবস্থা হলো। অপারেশনের চিহ্নও পাওয়া গেল পায়ে। ডাক্তারও শেষ পর্যন্ত সুর পালটে স্বীকার করলেন, মেয়েটার বয়স তিরিশ নয়, ষাট এবং সে এমি ল্যাঙ্গারই বটে।

এবার বালসানো আর তার নতুন প্রণয়িনীকে জালে ফেলতে হবে। কাগজে কাগজে ছেপে দিলাম ওদের ছবি আর দৈহিক বর্ণনা। পরিশেষে মাদ্রিদের লার্ভেপিস্ কোয়ার্টারে একটা বোর্ডিং হাউসে গ্রেপ্তার করা হলো দুজনকে। যে ঘরে এমি ল্যাঙ্গারকে পুঁতে রেখে-ছিল, তার নক্সা আর খবরের কাগজে প্রকাশিত খুনের বিবরণটা নিজের কাছেই রেখেছিল বালসানো।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর এতটুকু চঞ্চলতা দেখা গেল না বালসানোর ধীর-স্থির মুখে। ওর বিরুদ্ধে কেসটা যে-ভাবে দাঁড় করিয়েছিলাম তাতে ফাঁক ছিল না কোথাও। কিন্তু অম্লানবদনে ও সব অভিযোগ অস্বীকার করে বসলো। এমি ল্যাঙ্গারকে নাকি সে কস্মিনকালেও দেখেনি এবং এ জঘন্য হত্যা তার নয়, তারই জানাশুনো আর একজন অপরাধীর। এমি ল্যাঙ্গার নিহত হওয়ার সময়ে শ্রীঘরে ছিল তার এই খুনে বন্ধুটি—এ খবর শুনেও তিলমাত্র বিচলিত হলো না ও। ওর মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে বেশ কয়েকবার অকুস্থলে নিয়ে গেলাম ওকে। প্রতিবারই বিন্দু বিন্দু ঘামে ওর বিরঙ মুখ ভরে উঠলেও কিছুতেই স্বীকার করানো গেল না যে সেই হত্যাকারী।

ভিলার মধ্যে কিন্তু এমি ল্যাঙ্গারকে খুন করা হয়নি। ক্যাল্লি দ্য টলার্সের বোর্ডিং হাউস ছেড়ে বার্সিলোনার ক্যাল্লি দ্য রোজেনল-এ একটা বাড়ীতে আস্তানা নিয়েছিল ওরা। খুনের দিন-তিনেক বাদে বালসানোকে একটা বিশাল সুটকেশ বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছিল একজন মেয়ে-কুলি। বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে ভেতর থেকে। জার্মান স্ত্রীলোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে সে নাকি একাই ফিরে যাচ্ছে, এই সাফাই গেয়েছিল বালসানো।

নাক সিঁটকে শুধিয়েছিল মেয়ে-কুলিটা—"কিন্তু ঐ সুটকেশটা থেকে ও-রকম যাচ্ছেতাই গন্ধ বেরুচ্ছে কেন বলুন তো? কি আছে ওতে?"

'সসেজ—একদম খারাপ হয়ে গেছে কিনা, তাই', চটপট জবাব দিয়েছিল বাল-সানো।

এই সুটকেশটাই ভিলাতে নিয়ে গিয়েছিল সে। ভেতরে ছিল হতভাগিনী এমি ল্যাঙ্গারের লাশ। সুটকেশটা পরীক্ষা করার পর রক্তের দাগ পাওয়া গেল ভেতরে। পেরেকে লেগে থাকা মেয়েদের পোশাকের সুতোও পেলাম।

হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছে মনে করে...

খুনের সূত্রপাত হয় একটা ঝগড়া থেকে। বালসানোর ধারণা ছিল কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে এমি ল্যাঙ্গারের। কিন্তু যখন সে দেখলে যে সব ভুয়ো—অত টাকাই নেই তার, তখন সংহার মূর্তি ধারণ করলো সে। মদে চুর-চুর হয়েছিল এমি। কথা-কাটাকাটি হতে হতে ফস করে সে খামচে ধরে বাল-সানোর মুখ। তৎক্ষণাৎ ছুরি বাগিয়ে ধরে বালসানো এবং পরমুহূর্তে একটি মাত্র মোক্ষম টানে দুটুকরো করে দেয় এমির কন্ঠনালী। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রুধির স্রোত। আঘাতটা যে মারাত্মক, তখনও তা বুঝতে পারেনি বালসানো। তাই গোটা দুই মোজা এমির গলায় পেঁচিয়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে ও। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নিষ্প্রাণ হয়ে যায় এমির দেহ। নির্বিকারভাবে এবার লাশ সরানোর আয়োজনে তৎপর হয়ে ওঠে বালসানো। স্বল্প পরিসরে দেহটাকে যাতে ঠেসে নিয়ে যাওয়া যায়, তাই আরও ক্ষতবিক্ষত করে নেয় লাশটা। এই কারণেই বিকৃত দেহটা পুলিশের হাতে পড়ার পর চুল-চেরা পরীক্ষা না করার ফলে ঠিক কি-ভাবে খুন হয়েছিল এমি, তা জানা যায় নি অনেকদিন পর্যন্ত।

এমিকে কবর দেওয়ার জন্যে ভিলার বাগানটাই প্রথমে মনোনীত করেছিল বালসানো। কিন্তু যে রাতে কাজ সারবে বলে স্থির করলে সে, সেই রাতেই এক-জন চৌকিদার তাকে দেখতে পায়। কাজেই পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলে বালসানো। ঘরের মেঝেতেই সমাহিত করা হলো এমি ল্যাঙ্গারকে। বার্সিলোনার ক্রিমিন্যাল কোর্টে খুনের অপরাধে বিচার শুরু হলো তার আর ইউলোলিয়া মেইনোর। কিন্তু তখনও অবিচল বালসানো। দৃঢ়কণ্ঠে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করার পর বার বার এই বলে সে হুঁশিয়ার করে দিলে আদালতকে যে নির্দোষীকে অবিচারের যাঁতায় ফেললে প্রত্যেকেরই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। মুক্তি দেওয়া হলো ইউলোলিয়াকে। কিন্তু খুন আর ডাকাতি করার জন্যে বাইশ বছর এবং দলিল দস্তাবেজ জাল করার জন্যে আরও দুবছর সশ্রম কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হলো খুনে বদমাস বেঞ্জামিন বালসানোকে।

১৯৩৬ সালে শুরু হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ। বালসানো তখনও জেলে। যুদ্ধের দুর্যোগ বার্সিলোনার ওপর ঘনিয়ে আসতেই অন্যান্য কয়েদীদের সাথে তাকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালে আবার নতুন অপরাধের জন্যে তাকে পাঠানো হয় কারাকপাটের অন্তরালে।

অনুবাদ : অদ্রিশ বর্ধন

মালয়

সুরেশচন্দ্র সাহা

কুয়ালালামপুর মালয়ের রাজধানী। হাল আমলে এর প্রসার, এর প্রাসাদ সৌধাবলী, পেটালিং জয়ার শহর সম্প্রসারণ, আকাশচুম্বী স্কাই স্ক্রেপার ইত্যাদি দেখলে কল্পনা করার উপায় নেই, মাত্র একশ' বছর আগে এই কুয়ালালামপুরের সারাটা অঞ্চলই ছিল দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আকীর্ণ।

মালয়ের লোকে কুয়ালালামপুরকে সংক্ষিপ্তাকারে বলে কে-এল, যেমন বাতুপাহাতকে বলে বি-পি। বড় নামকে ছেঁটে ছোট করে উচ্চারণ করা এদেশের এক স্টাইল। এ যেন অল্প সোনায় হাল্কা অলংকার গড়ে প্রচন্ড মূল্য প্রকাশের প্রয়াস। আমরাও অবশ্য পন্ডীচেরীকে বলি পন্ডী। পাকিস্থানীরা রাউল-পিন্ডিকে তেমনি বলে শুধুই পিন্ডি।

মালয়ে নতুন আগন্তুকের কাছে মনে হয় কুয়ালালামপুর যেন স্বপ্নপুরী। দেখার প্রথম সুযোগে মুগ্ধ হয়। কুয়ালালামপুর যেন আদুরে শিশুর খেলাকরা বর্ণাঢ্য মোটর গাড়ি; দম দিলে চলে, আলমারীতে রেখে দিলেও ঘরের শোভা বৃদ্ধি হয়। এখানে মানুষ দমে চলে রঙে নাচে। মালয়ের জঙ্গল এবং অবারিত রাবার বাগানের কথা ভেবে মনে হয়েছিল কুয়ালালামপুর বুঝি বা ঝোপের অবগুন্ঠনে এক ছোট্ট শহর। এর এত প্রাণ এত রূপ এত রস এত রঙ সত্যি অনুমান করতে পারি নি। দম যদি কোনদিন ফুরিয়ে আসে তবু খেলাকরা মোটর গাড়ির সমস্ত গতি-বেগের স্তব্ধতা নিয়ে কুয়ালালামপুর হরদম বিরাজ করবে মহাকালের মনে। কুয়ালালামপুর আজ নবীনা রূপসী, যৌবনমদে মত্তা।

মালয়ে চীন-সম্পদের ব্যবহার প্রায় দু'হাজার বছর আগে থেকে, সেই হিন্দু সংস্কৃতির যুগে। তারপর ক্রমে চাহিদা বাড়তে বাড়তে মোটর যুগে এর ব্যাপ্তি হয়ে পড়ে সীমাহীন। মালয়ের রাজধানী কুয়ালালামপুর সেলাংপুর রাজ্যের প্রধান শহর। পাশের পেরাক রাজ্যের মূল শহর ইপো। পেরাক এবং সেলাংপুর রাজ্যের টীন প্রাচুর্যের জন্য চীনারা দলে দলে এসে ভিড় করতে থাকে এই দুটি শহরে। কুয়ালালামপুর এবং ইপো মূলত সেই টীন ব্যবসায়ের সূত্রে গড়ে-ওঠা শহর, অবশ্য কুয়ালালাম-পুরের রাবার সম্পদের অবদান রাজ-ধানীর রাজসিক রূপের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

রাবার গাছ থেকে রস সংগ্রহ

কুয়ালালামপুরে দেখবার অনেক কিছুই আছে, আবার হয়ত অনেক কিছুই নেই। মারদেকা স্টেডিয়াম দেখলে কিন্তু মনে হয় এ যেন এক অগ্রগামী জাতির ক্রীড়াশীলতারই প্রতীক। বৃটিশ যুগে আরব্ধ এই স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয় ১৯৫৭ সালের ৩০শে আগস্ট, মারদেকা বা স্বাধীনতা ঘোষণার একদিন আগে। এর অন্তবর্তী মাঠটি আয়তা-কারে তৈরী। যত্নে-ছাটা সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন। ৩০ হাজার আসন সমন্বিত মারদেকা স্টেডিয়াম দেখবার মত জিনিস।

মারদেকা স্টেডিয়ামের পাশে শিশু-দের জন্য নির্মিত টুংকু আব্দুল রহমান পার্ক। মালয়ের জননেতা এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রীর অতিপ্রিয় নামের স্মৃতি-বিজড়িত। এইখান থেকে চোখে পড়ে মালয়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ মূল পর্বত-মালা, উত্তরে শ্যামের সীমানা থেকে কুয়ালালামপুর হয়ে সেরিম্বনে যার সমাপ্তি। এই সেরিম্বনেরই দক্ষিণ-পূর্বে শ্রী মেনন্তী, নেগ্রিসেম্বিলন রাজকুলের পারিবারিক বাসভূমি। নয়টি তালুকের সম্মেলনে গঠিত নেগ্রিসেম্বিলনে এক-কালে সবাই ছিল হিন্দু।

কুয়ালালামপুরের লেক গার্ডেন বিখ্যাত। সবুজ ঘাসের কার্পেট মোড়া পাহাড়ী উপত্যকা, তার উপর টবে ও মাটিতে বাগান ফুলের কেয়ারী। এখানে ওখানে বেঞ্চপাতা। নিম্নঢালে খালের মত কতগুলি ছোট জলাশয়, খোলা জলে ভরা। ঢাকুরিয়া লেকের সঙ্গে এর খুব বেশী সাদৃশ্য নেই। এখানকার লেক গার্ডেনটি যেন জোহোরের ইস্তানা গার্ডেনের কার্বন-কপি। এই পাহাড়ী উপত্যকায় ফুলেল পরিবেশে সান্ধ্য

আক্তসার-মুখরতা ঢাকুরিয়ার চাইতেও এক ডিগ্রী বেশী।

কুয়ালালামপুর শহর থেকে মাইল আটেক দূরে পেটালিং জয়া, কুয়ালালামপুরের বালীগঞ্জ। বিদগ্ধ বসতির সংগে সংগে পেটালিং জয়াতে দ্রুত গড়ে উঠছে আপিস-পাড়া। এর হৃদকেন্দ্রের অদূরে মালয়ের নবনির্মিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং চৌদ্দ-তল ভাষা-মন্দির আধুনিক স্থাপত্যকলার নিদর্শন।

মালাক্কা থেকে ট্রেনযোগে রওনা হয়ে ১৯২৭ সালের ৩০শে জুলাইয়ের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ কুয়ালালামপুর রেল স্টেশনে অবতরণ করেছিলেন। যে বিপুল জনতা স্টেশনে সেদিন কবির জয়ধ্বনি করেছিল, যে উদ্দীপনায় ভারতীয় সঙ্গীত গীত হয়েছিল, কুয়ালালামপুরের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। রবীন্দ্রনাথের কিছুদিন আগে মালয়ে এসেছিলেন আর একজন বিখ্যাত পুরুষ, স্যার রোনাল্ড রস। জনসভায় বক্তৃতাকালে সেলাংগরের ইংরেজ রেসিডেন্ট বলেছিলেন—মালয়ের কি সুদুর্লভ সৌভাগ্য, বিগত এক বছরের মধ্যে এমন সব বিশ্ববিখ্যাত পুরুষের পদধূলি পড়েছে এইখানে। আজ মালয়ীরা স্বাগত জানাচ্ছে একজন বিশ্ববন্দিত চিন্তানায়ক, কবি ও আচার্যকে যাঁর মত জ্ঞানী পুরুষদের আবির্ভাব প্রাচ্যখণ্ডেই যুগে যুগে হয়ে এসেছে।

কবি বলেছিলেন—আমি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নানা দেশেই ভ্রমণ করেছি; প্রত্যেক দেশের মানুষের কাছেই প্রচুর ভালবাসা পেয়েছি। হয়ত তাঁরা আমার মধ্যে এমন কিছু দেখেছিলেন যার জন্য ভাবতে পেরেছিলেন আমাকে তাঁদেরই আপনজন, আপন বন্ধু হিসেবে। আমি তোমাদের কাছে সেই বন্ধুত্বই কামনা করি।

॥ ২ ॥

কুয়ালালামপুর থেকে মাইল বিশেক দূরে ক্ল্যাঙ। সেলাংগরের সুলতানদের পৈতৃকভিটা এইখানে। বিলেতের রাজকুলের পল্লীভবন সান্ড্রিংহামের যে পৃথিবী জোড়া রাজকীয় মর্যাদা আছে, ক্ল্যাঙের সে গৌরব নেই। ক্ল্যাঙ ছোট শহর, ছবির মত; যেন বিলেতেরই একটি ছোট শহরের দূরপ্রাচ্য সংস্করণ। এখানকার সুলতান প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন মসজিদ আশ্চর্য রকমের সুন্দর। মালয়ে অনেক রাজপ্রাসাদ, অনেক সৌধ, অনেক সমাধি দেখেছি। বার বার মনে হয়েছে পাষাণের হাসিতে প্রেমকে অমর করে আজ পর্যন্ত সেখানে ত তৈরী হয়নি একটি তাজমহল। কোথায় শাজাহান, কোথা মমতাজ, প্রেমিকের প্রিয়া?

পেটালিং জয়া থেকে ক্ল্যাঙের দিকে এগিয়ে যেতে ক্ল্যাঙ নদী পার হতে হয়। মালয়ের একমাত্র ডবল-ডেকার ব্রীজ এই এই ক্ল্যাঙ নদীর উপর নির্মিত হয়েছে। কুয়ালালামপুরের হৃদকেন্দ্র দিয়ে এ'কেবেঁকে যে ক্ল্যাঙ নদী এসেছে তা যেমন শীর্ণকায়া, জলও তেমনি বিশ্রী রকমের ঘোলা। ক্ল্যাঙ শহরের কাছে সেই নদীরই আর একটি সর্পিল প্রবাহ দেখা গেল। এই অংশটুকু আরও প্রশস্ত। কিনারার দিকে অনেক গাছপালা ঝুঁকে আছে।

সারঙ্গপরা জ্যাকেট-গায়ে মালয়ী মেয়ে

ভাঁটার জল অনেক নিচে পড়ায় মনে হল গাছগুলি গোড়া থেকে জলের ধার পর্যন্ত সমস্তটা অংশ জুড়ে কে যেন প্রাণের রস সব শুষে নিয়ে খাড়া তীরটিকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে। কুয়ালালামপুরে মাউন্টব্যাটেন রোডের অদূরে দাঁড়িয়ে মিস সিনাইয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্ল্যাঙ নদীর যে অংশটুকু দেখেছিলাম তা কিন্তু অতি শীর্ণ। স্রোত প্রচণ্ড। জল আরও ঘোলা। তখন ভাবতে পারি নি, মাত্র বারো-তেরো-হাত প্রশস্ত নদী-নামের-অযোগ্য ঘোলা জলের খালে এত কুমীরের বাস। ক্ল্যাঙ গভীর। কুম্ভীরাশ্রয়ের লীলাভূমি ক্ল্যাঙ রহস্যময়। তাই জনসাধারণের খাতিরে ক্ল্যাঙ শহরের অদূরে নদীর এই অংশটুকু মানুষ-খেকো কুমীরের তাণ্ডবের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে বিপজ্জনক এলাকা বলে। আরও ভাঁটিতে পোর্ট সুইটেনহাম বন্দরের কাছে এই নদীর বিস্তার অনেক বেশী। সেখানে জোয়ারের লবণজলদুষ্ট ক্ল্যাঙ নদী গোটা তিনেক ধারায় বিভক্ত হয়ে মালাক্কা সাগরে পড়েছে।

ক্ল্যাঙ শহরের প্রান্ত সীমায় মিডল্যান্ড রাবার এস্টেট। এতদিন মাইলের পর মাইল রাবার বন দেখে আসছিলাম। এইবার একটি রাবার এস্টেটের আপিস, কারখানা, কর্মীসংঘ এবং তাদেরই কর্মে যত্নে কুশলতায় সৃষ্ট ও বর্ধিত কতগুলি রাবার বাগান দেখবার সুযোগ হল।

মালয়ে বট-অশ্বত্থ গাছ চোখে পড়ে না। কাঁচা-বয়সের বট অশত্থের নিচে বেদী তৈরী করে তাতে শিলাখণ্ড বসিয়ে তেলে-সিন্দুরে-ফুলে পুজো করার রেওয়াজ মালয়ে নেই; যেমনটি দেখা যায় কলকাতার মত শহরে অথবা গাংগুটিয়ার মত গ্রামে। মিডল্যান্ড এস্টেটে ঢুকতে এমন একটা দৃশ্যই চোখে পড়ল, যদিও পুজো-পাওয়া শিলাখণ্ডের মাথার উপর ছায়াতরুটি বটও নয়, অশত্থও নয়। এই এস্টেটের ছ'শ দাক্ষিণী কর্মীর মধ্যে কয়েকজন উত্তর প্রদেশের লোকও আছে; রাবার বাগানে শ্রমের কাজ করার চাইতে আপিসের আর্দালীত্বই তাদের বেশী পছন্দ। কাজের বরাদ্দ সময় বাদে এরা পুজো করে, তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে, ঠাটামি করে রাধা-কেষ্ট বলার কেউ নেই বলে নিরুদ্বেগে উচ্চারণ করে সীয়ারাম।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে হাইল্যান্ড মালয়ান প্ল্যানটেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে; উদ্দেশ্য, রাবার রসের ব্যবসা করা। মাত্র চারটি এস্টেট নিয়ে আরব্ধ এই সংস্থায় বর্তমানে রাসেক, আইল্যান্ড, বুকিত জেলুং, মিডল্যান্ড ইত্যাদি নিয়ে মোট এস্টেট সংখ্যা ২০টি। শুধু মিডল্যান্ড এস্টেটের অধীনেই আছে রাবার চাষযোগ্য ৩৮০০ একর জমি। প্রতি একর জমিতে গড়ে ১৬৮টি রাবার গাছ লাগান চলে।

রাবার গাছের বয়স যখন আট বছর, তখন এর রস দেওয়ার উপযুক্ত সময়। গড়ে ৩৫ বছর পর্যন্ত এক একটি গাছের রসময় জীবন। তারপর কেটে জ্বালানী কাঠে পরিণত করে তার স্থানে রোপিত হয় নতুন চারা। সারাদিনে যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে কেটে রস সংগ্রহ করার উপায় নেই। সকালে রাবার-ট্যাপার এসে গাছের নিম্নকাণ্ডের যে কোন অংশ থেকে প্রায় হাতখানেক লম্বা একটা ছাল তুলে পোয়াটাক ওজনের একটি ছোট্ট পাত্র গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে যায়। এই ছাল এত সরু যে মাস-ভরে পর পর তুলে নেওয়া ছাল একত্র জুড়লে তার প্রস্থ দাঁড়ায় মাত্র দু ইঞ্চি। রাবার বাগানে গাছও নানা রকমের, কাটার রীতিও

বিভিন্ন। কোন কোন গাছকে ক্রমাগত এক মাস ধরে কাটার পর এক মাস বিশ্রাম দিয়ে আবার তৃতীয় মাসে কাটা শুরু হয়। প্রারম্ভে গাছের একদিকেই কাটার নিয়ম, ২০।২৫ বছর বয়স হলে এদিক-ওদিক দুদিকেই একই সঙ্গে ছুরি চালনা করা চলে। অবশ্য গাছের স্বাস্থ্য, প্রকৃতি ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর দুদিক-কাটা নির্ভরশীল।

কাটার পরে টস টস করে রস ফোঁটায় ফোঁটায় এসে জমতে থাকে নিচের ছোট্ট পাত্রে। ঘণ্টা তিনেক পর ট্যাপাররা এসে সব রস সংগ্রহ করে নিয়ে যায় কারখানায়। এই রসের পারিভাষিক নাম ল্যাটেক্স (Latex)। ঘন দুধের মত রসগুলি কারখানায় ফরমিক এসিড মেশাবার ফলে আরও ঘন হলে এলুমিনিয়ামের ট্রেতে ভরে ট্রেগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয় চেম্বারে। প্রায় ১৫ ঘণ্টা পর রস থেকে রাবার হলে ষ্টীম-রোলারে চেপে মোলায়েম করা হয়। তখন ফুট-পাঁচেক লম্বা ট্রে-সাইজের একেক টুকরোকে মেশিনে দুখণ্ডে কেটে স্মোকরুমে নিয়ে দিন চারেক ধরে শুকিয়ে বেল তৈরী করে চালান দেওয়া হয় বিলেতে, কোম্পানীর মালিকদের দেশে। শুধু যে সব ছাট-কাট নিয়ে বেল তৈরী করা চলে না তাই বিক্রী হয় স্থানীয় বাজারে। প্রায় এক টাকা পাউন্ড দরে।

মিডল্যান্ড এস্টেটে রস সংগ্রহকর্মে নিযুক্ত অধিকাংশ কর্মীই দক্ষিণ ভারতীয়, কিছু চীনা ও মালয়ী মেশানো। অন্যান্য কর্মী ও অফিসারদের মত ট্যাপারদেরও এস্টেট থেকেই দেওয়া হয়েছে ফ্রি কোয়ার্টার। এদের মাথাপিছু নিম্নতম রোজ বেতন প্রায় তিন ডলার, বরাদ্দ রসের বেশী সংগ্রহ করলে চার ডলার। ট্যাপার ছাড়া আরও একদল কর্মী আছে। প্ল্যান্টার। এদের কাজ প্রয়োজনমত গাছে ওষুধ দেওয়া, জমি পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। এরা ফিল্ড ওয়ার্কারের দল-ভুক্ত। ট্যাপার ও ফিল্ড ওয়ার্কার দলে নারী, পুরুষ, বালক, বালিকা সবাই আছে। বারো বছরের কম বয়স্কদের নিয়োগ আইনানুগ নয়। তবে শিশু শ্রমিকদের বেলায় কতটা আইন মানা হয় তা ভগবানই জানেন।

রাবার মালয়ের প্রাণরস। টীন আর রাবারের জোরে মালয়ে আজ উন্নত অর্থ-নৈতিক মান। পৃথিবীর বৃহত্তম রাবার উৎপাদক দেশের মধ্যে মালয় অন্যতম। রাবার ছাড়া নারকেল সুপারী আনারস মৎস্যসম্পদ ইত্যাদি থেকেও মালয়ের প্রচুর অর্থাগম হয়। যুদ্ধের পূর্বে ১৫ লক্ষাধিক টাকার মাছ মালয় থেকে বিদেশে চালান হত। মালয়ে নারকেলের চাষ হয় পাঁচ লক্ষ একর জমিতে এবং এতে জীবিকার জন্য সামগ্রিক অথবা আংশিক-ভাবে ছয় লক্ষ লোক নিয়োজিত। এদেশে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় তাতে কিছুটা অকুলান হয় সম্বৎসরের খোরাকীর। পার্শ্ববর্তী শ্যাম দেশের চাউলে সে অভাব মেটায়। অবশ্য রাবারে নারকেলে এত জমি চাষ না হলে মালয় চাউলে অনায়াসে স্বাবলম্বী হতে পারত। যখন প্রথম শতাব্দী থেকে ভারতীয়রা মালয়ে আসত বাণিজ্য করতে, তখন মালয় ছিল নানা সম্পদে ভরপুর। সেদিন ভারতীয়রা মালয়ীদের কাছে কিনত হাতির দাঁত তৈরী নানা জিনিস, সোনা-দানা ইত্যাদি। সুলভ স্বর্ণপ্রাচুর্যের জন্য গোটা দেশটাকেই ভারতীয়রা নাম দিয়েছিল সুবর্ণ-ভূমি। এখনও মালয় তেমনি স্বর্ণময়। সে সোনা তার টীন, রাবার, নারকেল কোপড়া, সুপারী, আনারস। তবুও মালয়ের মাত্র এক পঞ্চমাংশ জমি এ পর্যন্ত সমস্তরকম চাষের অধীনে। বাকী সব জঙ্গল। ১৯৫৯ সালে মালয় থেকে প্রায় ৪৫ কোটী টাকার কাষ্ঠ-সম্পদও বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছিল। আজ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ টীন উৎপন্ন হয় একমাত্র মালয়েই। সুকৌশল প্রচার ব্যবস্থায় ভ্রমণার্থী আকর্ষণ করে ১৯৫৯ সালে মালয়ের ৩০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা লাভ হয়েছিল; ১৯৬২ সালে দেড় কোটী।

মালয়ে রাবার চাষ হয় ২০ লক্ষ একর জমিতে। রাবার শিল্পে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা তিন লক্ষ। পৃথিবীর বৃহত্তম রাবার গবেষণা-কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে মালয়ে।

১৯৬৩ সালের মধ্যে ভারতে ৮০০০ একর জমিতে এবং পরবর্তী প্রতি বছরে ১২,০০০ একর জমিতে রাবার চাষের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১৯৭০ সালের মধ্যে ভারতে পরিকল্পিত রাবার চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়াবে ৯৬,০০০ একর অর্থাৎ মালয়ের প্রায় ২০ ভাগের এক ভাগ। দক্ষিণ ভারতে কেরালা এবং কন্যা-কুমারীতে রাবার জন্মে। বর্তমান ভারতে মোট উৎপাদিত রাবারের পরিমাণ ৩০,০০০ টন। ১৯৭৫ সালের মধ্যে এর পরিমাণ বেড়ে এক লক্ষ টন হবে আশা করা হয়েছে। ১৯৬২ সাল থেকে ভারত-বর্ষ প্রতি বছর মালয় থেকে ১৫,০০০ টন রাবার ক্রয়ের চুক্তিবন্ধ।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কিছু রাবার জন্মে। বিগত ২০০ বছর ধরে আন্দামানে চলেছে কাঠের কাজ। বন কেটে নতুন বন-শ্রেণী গড়ে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে আন্দা-

টিন উত্তোলনের দৃশ্য
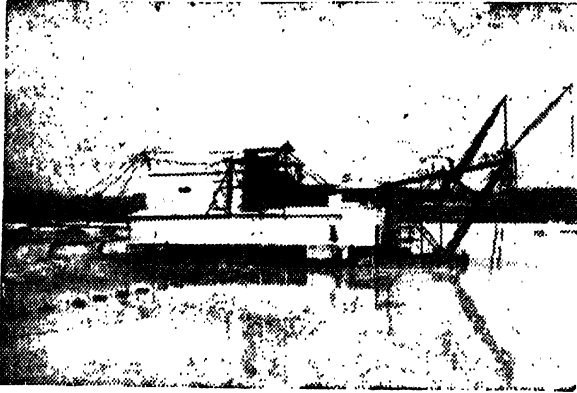
মানে ব্যাপকভাবে রাবার উৎপাদনের চেষ্টা করলে হয়ত আমাদের পক্ষে লাভজনকই হবে।

॥ ৩ ॥

মালয়ের সংবাদপত্রের পীঠস্থান কুয়ালালামপুর। পত্রিকাগুলির প্রচার সংখ্যা অসাধারণ। দক্ষিণ ভারতে প্রায় সর্বসাধারণ মানুষের হাতে-হাতে-ফেরা তামিল পত্রিকার সঙ্গে এ বিষয়ে এদের মিল। অন্যান্য অধিকাংশ বিষয়েই মিল বিলেতি পত্রিকাগুলির সঙ্গে। সিঙ্গাপুর থেকেও প্রকাশিত হয় ইংরেজী, চীনা, তামিল ভাষায় কয়েকটি পত্রিকা। পেনাঙও অবশ্য পিছিয়ে নেই। এ দেশের ইংরেজী পত্রিকাগুলি যেন একই সুরে গাঁথা—বিলেতের মত প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফের শিরোনামায় যৌন অপরাধ, চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবির খবর এবং এমন সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ছবি যা পত্রিকায় কেন স্থান পায় আমরা ত ভেবেই পাই না। এমনধারা সংবাদ এবং দেদার বিজ্ঞাপন-ঠাসা অজস্র পৃষ্ঠা-সংখ্যার মধ্যে আসল খবর যেন খুঁজে বার করতে হয়।

ঘটনাটি ঘটেছিল আমি মালয়ে থাকতে। সিউ ওয়া মেন ট্যাক্সি ড্রাইভার। ৩২ বছর বয়স। বৌকে লুকিয়ে ৪৪ বছর বয়স্কা বিধবা মহিলা ইয়ং সি হোওয়ার সঙ্গে বসবাস করে আসছিল দীর্ঘ দুবছর ধরে। ইয়ং সি হোওয়া চুল-ছাঁটা সেলুনের স্বত্বাধিকারিণী, বিস্তর টাকার মালিক। প্রণয়ী সিউকে হাজার দশেক টাকাও দিয়েছিল তার ট্যাক্সির ব্যবসা প্রসারের জন্য।

ইয়ং সি হোওয়ার একমাত্র সন্তান বী-ইয়ং। ১৪ বছরের মেয়ে। একদিন হঠাৎ দেখা গেল মেয়েটিকে কে যেন হত্যা করে ফেলে রেখেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, সিউ ওয়া মেন আদালতে অপরাধী প্রমাণিত হল। দিনের পর দিন বিচার চলাকালে প্রকাশ পেল সিউ ওয়া মেন প্রণয়িনীর কন্যাকে ট্যাক্সি চড়িয়ে প্রায়ই নিয়ে যেত। এ ছাড়া সেলুনের সিনিয়ার এপ্রেণ্টিস্ দুটি মেয়ে অনেক দিনই সিউ আর বীকে দেখেছে রুদ্ধদ্বার কক্ষে। সাত বছর বয়সী স্যামুয়েল হংগ নামে একটি স্কুলবালক ওদেরকে মাত্র একদিন দেখেছিল ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে যেতে।

মৃতদেহ পরীক্ষা করা হল। জানা গেল ইয়ং বীকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। তখন সে চার মাসের গর্ভবতী। সিউর অপর এক প্রণয়িনী সেলুন-মালিকার প্রেমাসক্ত সিউর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিল যে সিউ ওয়া মেন ইয়ং বীকে হত্যা করে তার বাড়িতেই উঠেছিল এবং তাকে এ হত্যার কথা বলেওছিল।

মালয়ে সংবাদপত্র জগতে এ এক বিরাট ঘটনা। দৈনিক লক্ষ কপি বিক্রী-হওয়া একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় কয়েক-দিন পর্যন্ত অনেকটা স্থান দখল করে বসেছিল উপরোক্ত ঘটনাটি। বিস্তৃত বিবরণের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল ইয়ং বী, তার মা, মায়ের ও নিজের প্রণয়ী সিউ ওয়া মেন, স্কুলবালক স্যামুয়েল এবং বিচারকের ছবি। সিওর বৌ এবং ঈর্ষান্বিতা প্রেমিকাটির ছবিও বাদ যায়নি। এর মধ্যে ইয়ং বি এবং সিউ ওয়া মেনের ছবি প্রতিদিনই এবং স্যামুয়েলের ছবি দুইদিন প্রকাশিত হয়েছিল। একেবারে বৃটেনের হুবহু অনুকরণ।

বিলেতের এক রকবাজ ছোকরার নাম ছিল মাইলস, পুলিশের নামে চটা। শেষ পর্যন্ত রাগের মাথায় একদিন এক পুলিশ অফিসারকে গুলী করে ফেলল। বিস্তৃত ঘটনার সচিত্র বিবরণ বের হল কাগজে কাগজে। এমন কি মাইলসের গার্ল ফ্রেণ্ডের ছবিও বাদ গেল না। ওর

মারদেকা স্টেডিয়াম
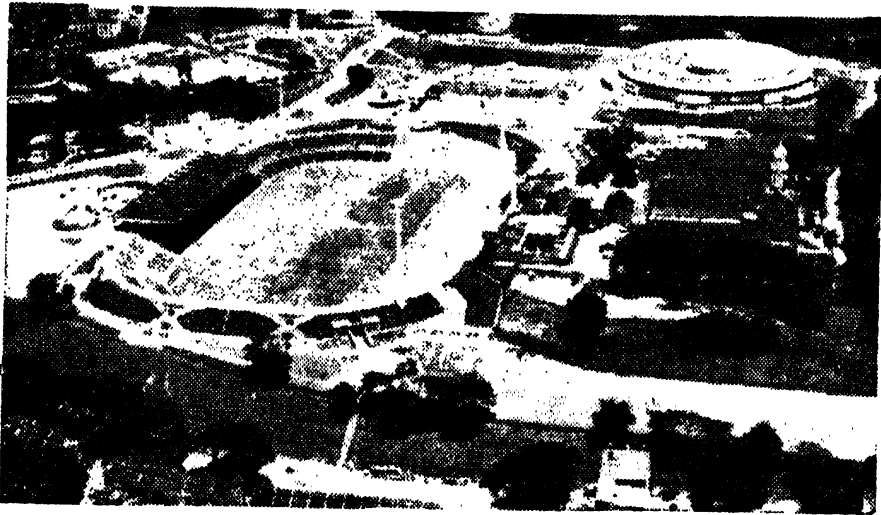
ফাঁসির সংবাদে বান্ধবীর হৃদয়ে কতটা আঘাত লাগল সেই কথা বলতে গেলে তারও ছবি ছাপা দরকার বৈকি! শুধু কি তাই, সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হওয়ার সময় মাইলস-বান্ধবীর লাল চেক স্কার্টের সঙ্গে ম্যাচ করা যে জ্যাকেট-পরা ছিল তারও বিস্তৃত বিবরণ ছিল।

অবশ্য জনচিত্তজয়ী চাঞ্চল্যকর খবর পরিবেশন ছাড়াও মানবিক ঘটনা বা বীরত্বের কাহিনী যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিলেতে এবং মালয়ের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেন রোড ফ্লিট স্ট্রীটকে কখনও বা ছাড়িয়েও যায়।

বিলেতের অনাথ বালক জন। খৃষ্ট-মাসের দিন কয়েক আগে হাসপাতালের রোগশয্যায় গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছিল—আহা, খৃষ্টোৎসবে একখানা কার্ড দিয়ে আমাকে স্মরণ করারও কেউ নেই। কোন এক পত্রিকায় বড় হরফে ছাপা হল এই দীর্ঘশ্বাসবাহী হতাশা। তারপরেই কত সব অজানা শুভার্থীর নিকট থেকে জনের নামে আসতে লাগল অজস্র কার্ড আর উপহার। পত্রিকায় তার বিবরণ এবং কার্ড-উপহারের স্তূপে বিহ্বল হয়ে উপবিষ্ট জনের ছবি ছাপা হল। হাসপাতালের হীন-জন রাতারাতি মহা-জনে পরিণত হল।

মালের পত্রিকায় রোস্না ত মস্ত হিরোইনের স্থান দখল করেই বসেছিল। এগার বছরের স্কুল-ছাত্রী রোসনা-বিন্তে আকাসা তিন বছরের একটি শিশুকে নদীতে ডুবতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জীবন বাঁচিয়েছিল। অবিলম্বে পুরস্কার মিলল। রোসনাকে উপাধি দেওয়া হল—"১৯৬১ সালের মালয়ে বীরশ্রেষ্ঠ সন্তান"।

ইয়াং ডি পার্তুয়ান আগোং মারদেকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত নিখিল বিশ্ব শিশুদিবসে রোসনাকে আবার পুরস্কৃত করলেন বিশেষ উপহারে, "বিংগত হ্যাং টুয়া" নামে বহুমূল্য স্বর্ণপদক দিয়ে। এই উপলক্ষে রোসনাকে ল্যান্ডরোভার গাড়িতে চড়িয়ে স্টেডিয়ামের চারদিকে এমনভাবে ঘুরিয়ে আনা হল যাতে উৎসবে যোগদানরত ৩৫,০০০ বালক-বালিকা মালয়ের হিরোইনকে একবারটি দেখে অভিনন্দন করতে পারে। নানা কাগজে বিভিন্ন পোজে রোসনার কত ছবি যে ছাপা হয়েছিল তার শেষ নেই।

এইসব ছোট ছোট দেশে পত্রিকা চালনার কৌশল এমনই যেন ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিকেও উপেক্ষা না করা হয়। দেশ ছোট আর জনসংখ্যা অল্প বলে দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ঘটনাই যেন পত্রিকায় স্থান দেওয়া সহজতর। সর্বস্তরের সকল লোকের কথা স্থান পাওয়ায় তারাও যেমন দেশের সঙ্গে নিজেদের যোগযুক্ত করে, পত্রিকার প্রচার সংখ্যাও স্বাভাবিক কারণেই বেড়ে চলে।

।। ৪ ।।

মালয়ীরা অতীত নিয়ে বড় মাথা ঘামায় না। তারা প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপে উপলব্ধি করে বর্তমান তাদের সার্থক, ভবিষ্যৎও প্রতিশ্রুতিময়—অবশ্য যদি রাজনৈতিক ডামাডোল, ইজমের সংঘাত, চীনের পীতপ্রবাহ হিমালয় থেকে মালয় পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। মন্বন্তরে আমরা মরি নি, মারী নিয়ে এখনও ঘর করি। আর আসন্ন উপ-প্লাবনে মৃত্যুশঙ্কিত সমস্যার মধ্যে আমাদের অগ্নি-পরীক্ষা। তেমনি অগ্নি-পরীক্ষা আজ মালয়েরও।

যে মহান জননেতার অতি সাবধানী পরিচালনায় মালয়ের সর্বাংগীন স্বার্থ সংরক্ষিত, তাঁর নাম টুংকু আব্দুল রহমান পুত্র।

টুংকু অর্থ রাজকুমার, আবার রাজ-কুমারের সন্তানকে বলা হয় পুত্র, মালয়ী উচ্চারণে 'পুত্রা'। কেদা রাজ্যের সুল-তান পুত্র আজকের মালয়ের প্রধানমন্ত্রী, সর্বজন শ্রদ্ধেয় আব্দুল রহমান। তার নামের আগে ও পরে শ্রদ্ধায় ব্যবহৃত হয় দুটি শব্দ, টুংকু ও পুত্র—রাজমর্যাদার স্মারক।

টুংকুর দেহে কিছুটা ভারতীয় রক্তও নাকি আছে—চোল রাজকুলের হিন্দু রক্ত। শ্যাম দেশের রাজকুমারীর গর্ভজাত টুংকু আব্দুল রহমানের শিক্ষা শুরু হয় কেদাতে; তারপর মাতামহের খরচে দশ বছর বিলেতে কাটিয়ে ব্যারি-স্টারী পাশ করেন। কর্ম-জীবনের শুরু কেদাতেই। ডেপুটি পাবলিক প্রসি-কিউটর হিসেবে। ক্রমে ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হয়ে দেশের শাসনকার্যের নানা বিভাগে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেন, পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে তা পরম সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়েছে। নবাগত অফিসারকে ঘুষ কেরানীরা যেমন করে ঘোল খাওয়ায় টুংকুর কাছে তা কারও কোনদিন সম্ভব হয় নি। আপিসী কেতার লালফিতাসুলভ চালাকী হাতে-কলমে কাজ-করা টুংকুর কাছে কারও চলে না।

এই তীক্ষ্ণধী চিরতরুণ জনদরদী ও পরমতসহিষ্ণু দেশনায়ক সম্বন্ধে লোকের ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। রাবার টাপার থেকে পল্লীর অতি সাধারণ মানুষ—সকলের সঙ্গেই টুংকুর মধুর ব্যবহার। আদর করে সবাই বলে—টুংকু! তখন কোথায় থাকে অতিমান্য প্রধানমন্ত্রী; পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা-মুক্ত টুংকু তখন তাদেরই একজন, প্রতি মানুষের হৃদয়ের সম্পর্কে ডাকা টুংকু—ঠিক আমরা যেমন আদর করে কাউকে ডাকি রাখালদা বলে—সে তখন আমার, তার, তোমার—সকলেরই সাধারণ রাখাল-দা।

টুংকুর ঘরোয়া জীবনেও অশেষ গুণ। গল্‌ফ্ খেলায় তাঁর জুড়ি মেলে না। তাঁর ক্যামেরায় তোলা ছবি পেশাদার ক্যামেরাম্যানকেও হার মানায়। মোটর চালনায় টুংকুর সংগে পাল্লা দিতে পারে এমন লোক সব দেশেই বিরল। চির-দিনের ক্রীড়াকৌতুকময় টুংকু যেন চির-যুবা; আর তাঁরই মত প্রাণোচ্ছল নব-জাগ্রত মালয় তাঁর হাতে, যার ভাগ্য-বিধাতা তিনি নিজ।

জাপানী শাসনের যুগে মালয়ের অনেক চীনা কম্যুনিস্ট জংগলে লুকিয়ে থেকে জাপানীদের হত্যা করত। এরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল মালয়ের জাপাবিরোধী সৈন্যবাহিনী বলে—মালয়ান পিপল্‌স্ এন্টি-জাপানীজ আর্মি। এই থেকে পরবর্তীকালের মালয়ে দীর্ঘস্থায়ী কুখ্যাত গরিলা যুদ্ধের সূত্রপাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে চীনা গরিলারা দাবী জানাল—ইউনিয়ন গভর্ণমেন্ট চাই, যেখানে সুলতানী শাসনের তান্ডব থাকবে না। বৃটিশ সর-কার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করতেও চেয়েছিল, কিন্তু সুলতানরা হল বাম। তখন চীনা গরিলারা আবার আশ্রয় নিল জংগলে। সেই জংগল থেকে চালিত হতে লাগল গরিলা যুদ্ধ, মালয়কে এই কৌশলে কম্যুনিস্ট করলে আনার জন্য। বৃটিশ দীর্ঘদিন লড়েছিল এই গরিলা দের সংগে।

বর্ষীয়ান মালয়ী নেতা দাতো (মালয়ের অতি উচ্চ সম্মানের উপাধি দাতো— মহারাজা, স্যার, ভারতরত্ন ইত্যাদির মত) জাফর সর্বপ্রথম অনু-ধাবন করতে পেরেছিলেন যে মালয়ের সকল জাতির, সকল শাখার মিলিত প্রতিরোধই এর দাওয়াই। তখন মালয়ে প্রতিষ্ঠিত হল ইউ-এম্‌-এন-ও—ইউ-নাইটেড্ মালয়ান ন্যাশনাল পার্টি। দাতোর পরে এলেন টুংকু, ১৯৫১ সালে ইউ-এম-এন-ওর নেতা নির্বাচিত হয়ে। টুংকুর অক্লান্ত চেষ্টায় আর দুটি রাজ-নৈতিক দল—এম-সি-এ বা মালয়ান চাই-নিজ কংগ্রেস এবং এম্‌-আই-সি বা মালয়ান ইণ্ডিয়ান কংগ্রেজ টুংকুর দলের সংগে হাত মেলালেন। এর মূলে টুংকুর কূটকৌশল আর ধৈর্যের সীমা নেই।

১৯৫৭ সালে মালয় স্বাধীন হলে টুংকু হলেন প্রধানমন্ত্রী। সমগ্র মালয়ের জনসমর্থনে তিন বছরের মধ্যে গরিলারা নিশ্চিহ্ন হল। টুংকুর জীবনে এ এক অতিবড় কীর্তি। তাঁরই প্রচেষ্টায় উপ-রোক্ত তিন পার্টির মিলিত সংস্থার নাম

টুংকু আব্দুল রহমান

তুন হাজী আব্দুল রেজাক

হল এলায়েন্স গ্রুপ। এই এলায়েন্স গ্রুপই বর্তমান মালয়ের শাসক পার্টি, ভারতবর্ষের কংগ্রেসের মত।

এলায়েন্সের আজ অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী, বিশেষত পি-এম-আই-পি বা প্যান মালয়ান ইসলামিক পার্টি, প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় মুসলিম লীগের মত। টুংকু বলেন—এই পার্টির কাজ হল দলীয় স্বার্থসাধনে জনমত বিষাক্ত করা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা। মালয়ীদের মধ্যে এবং মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে ভেদের দুস্তর প্রাচীর গেংথে তোলাই এদের কাজ।

কিন্তু এই জাতীয় বিশ্লেষণ, কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং বিস্তর ভাল ভাল কথা সত্ত্বেও ভারত ভাগ হয়েছিল। ভারতের প্রাক-বিভাগীয় লীগের মত মালয়ের ইসলামিক পার্টি ক্রমশ শক্তি সঞ্চয়ের পথে। পি-এম-আই-পি শাসন-ক্ষমতা পেলে হয়ত মালয়ের চেহারা যাবে বদলে—ভারতীয়, চীনা এবং মালয়ের মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি জগা-খিচুড়ি অবস্থার সৃষ্টি হবে যা পরিণামে চরম অশুভকেই ডেকে আনবে বলে অনেকের আশঙ্কা। তবু এ সর্বাকছুকে ছাপিয়ে মালয়েশিয়ার গঠন, ইন্দো-নেশিয়ার উষ্মা, লাল চীনের আস্ফালন—ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে মালয়ের আকাশ যেন কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে।

মালয়ে কার্ড প্রথার প্রচলন করেছিল বৃটিশ সরকার। টুংকু সে প্রথাকে আরও ঢেলে সেজে নবরূপ দান করেছেন। মালয়ে এখন চার রকমের কার্ড চালু। এর নাম আইডেনটিটি কার্ড। মালয়ের ফেডারেল নাগরিকদের জন্য নীল কার্ড। যারা মালয়ের নাগরিক নয়, অথচ স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের জন্য লাল কার্ড।

বৎসরাধিকাল বসবাসেচ্ছুকদের জন্য সবুজ কার্ড।

ঠগী, ডাকাত, গুণ্ডা, সমাজবিরোধী-দের চিহ্নিত করার জন্য বাদামী কার্ড।

কার্ড প্রথা চালু থাকায় মালয়ে অপরাধপ্রবণতা অনেক কমে গিয়েছে। কোন এলাকায় খুন, রাহাজানি অথবা বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পেলেই সেই অঞ্চলের বাদামী কার্ডওয়ালাদের ধরে ধোলাই শুরু হয়। ফলে বাদামীরা আর বাড়াবাড়ি করতে সাহস করে না।

মালয়েশিয়া বলতে খুব নতুন একটা কিছু বোঝায় না—পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং একই ভাবধারায় সমৃদ্ধ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে সংহতিদান এবং সর্ব-রকম পক্ষপাত ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে সর-কার গঠনই এর আসল লক্ষ্য। মালয়ে-শিয়ার অঙ্গরাজ্যগুলি হল— মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রুনী, সারওয়াক, সাবা অথবা উত্তর বোর্নিও। এই পাঁচটি রাজ্যে জল-বায়ু প্রায় একই রকমের। ভৌগোলিক দিক থেকে লাগাও এই দেশগুলির মানুষের ধমনীতে একই রকমের রক্তধারা। তাদের সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তাতেও অসাধারণ ঐক্য। ভাষা এবং মুদ্রা একই। মালয় এবং এই পাঁচটি রাজ্য সর্বতো-ভাবে পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলার মত।

উপরোক্ত দেশগুলির মধ্যে মালয় বৃহত্তম; লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ। সিঙ্গাপুর ক্ষুদ্রতম, ১৭ লক্ষ অধিবাসী নিয়ে লোকসংখ্যায় দ্বিতীয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে মালয়ের আর্থিক মান সর্বোন্নত। মালয়েশিয়ার প্রস্তাবনার সুরু থেকেই টুংকু আশ্বাস দিয়েছেন মালয়ের এই আর্থিক সৌভাগ্য সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করা হবে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়—মালয়েশিয়া প্রস্তাবনাকালে তাঁর ভাষণে আচরণে কোনদিনই প্রকাশ পায়নি লড়কে-লেঙ্গে মনোভাব।

সারওয়াক, ব্রুনী ও উত্তর বোর্নিওর মধ্যে তৈল সম্পদে সবার সেরা ব্রুনী। বহুদিনের বৃটিশ আশ্রয়ে লালিত ব্রুনী সুলতানের কিন্তু বড়ই আপত্তি ছিল মালয়েশিয়াতে হাত মেলাতে। অবশ্য তেমন আপত্তি আরও অনেকেরই। টুংকু বলেছিলেন—এই রাজ্যগুলির মালয়ে-শিয়াতে যোগ দেওয়ার অর্থ স্বাধীনতায় বিলীন হয়ে যাওয়া—এ মার্জার হল ফ্রিডম। ব্যক্তিগত গুণপনায়, রাষ্ট্রচিন্তায়, জনদরদে অথবা দেশনায়কোচিত যোগ্য-তায় টুংকু আব্দুল রহমান পুত্রার মত মানুষ সব দেশেই বিরল।

একদিন সাংবাদিকের নজর, পুলিশের প্রহরা এড়িয়ে কুয়ালামপুর রেল স্টেশনে এসে টুংকু একখানা পেনাঙের টিকিট চাইলেন। স্টেশনমাস্টার জানালেন যে সব টিকেট বিক্রী হয়ে গেছে। তবে একখানা বিক্রীত টিকেট বাতিল করে তাঁকে দেওয়া যেতে পারে। টুংকু আপত্তি জানালেন। তখন স্টেশনমাস্টার গাড়ির সঙ্গে একখানা স্টেট সেলুন জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। টুংকু তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—এ তো সর-কারী কাজ নয়; আমার ব্যক্তিগত প্রয়ো-জনে পেনাঙ যাচ্ছি যে। যাই হোক, নিজের মোটরেই যাব।

তাই গিয়েছিলেন। ঘটনাটি ছোট। কিন্তু এই থেকে তাঁর চরিত্রের একটা বড় দিক উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। সরকারে সংশিলষ্ট আমাদের মত মান্যগন্যজঘন্যরা ব্যক্তিগত কাজে বাইরে গিয়ে তাকে সর-কারী ফরমুলায় ফেলে রেলের মাশুল, খাওয়ার খরচ, ভ্রমণের ভাতা উশুল করে সবিশেষ তৃপ্তি পাই। এইজন্যই বোধহয় আমরা টুংকুর মত নই।

মালয়ের রাজনীতিতে আর একটি মানুষের ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় লক্ষ্য করার মত : তুন হাজী আব্দুল রাজাক, মালয়ের সহকারী প্রধানমন্ত্রী। টুংকু আর তুনের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী আগামী-দিন তা প্রমাণ করবে।

অনিল ভৌমিক

নক্ষত্রের নিঃসঙ্গতে

এক ফোঁটা হাওয়া নেই এমনি দুপুর। আজকে সেই দুপুর গেছে। দুপুর তখন বিকেলের দিকে গড়ান দিয়েছে। রোদের তেজ কমেনি। উনুনের গনগনে আগুনের মত রোদ। কড়াই-পাতার ফাঁক দিয়ে আসছিল। তাত উঠছিল। ঝিকিয়ে উঠছিল রেললাইনের বাঁক শ্যামপুরের সারি সারি গুদোম-ঘরের টিনের চাল, নিথর ঝিল। এই শেষ খর মধ্যাহ্নের সূর্যটা ছিল পেছনে। সমীরদা এসেছিল এ সময়। সমস্ত পরিবেশটা থেকেই যেন উঠে এসেছিল। আগুনে হল্কার মত। রোদের ঝাঁজ বেরুচ্ছিল নাক-মুখ দিয়ে। কালচে হ'য়ে উঠেছিল ফর্সা মুখটা। এসে তক্তপোশের ধারে পা ঝুলিয়ে বসেছে। যতক্ষণ গল্প ক'রেছে (কতক্ষণই বা) ওর অস্বস্তিকর হাঁপ-ধরা ভাবটা কাটেনি। বার বার হাত ঢুকিয়েছে পকেটে। রুমাল তুলে এনেছে। ঘাড় মুছেছে। মুখ-কপাল মুছেছে। ঘষে ঘষে। আর নয়। এই শেষ। এমনি ভঙ্গীতে। কিন্তু কিছুক্ষণ। আবার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। বিন্দুগুলো পরস্পর মিলেছে। ফোঁটা হ'য়েছে। বড় বড় ফোঁটা। স্থানচ্যুত রুমালটা লেপ্টে ধ'রেছে। কথায় ফাঁক খুঁজেছে সমীরদা। তারপর মাত্র একবারই ধরেছে কেয়ার হাতটা। কোলের ওপর টেনে নিয়েছে। আলতো হাতে চুড়িদুটো ঘুরিয়েছে। বার কয়েক। খুক খুক ক'রে হেসে উঠেছে। তাতে গল্প থামে নি। গল্প চলেছে। এ সবের মধ্যে কেয়া নিজেও খেই হারিয়ে ফেলছিল। গল্পেরও, মনেরও। কেয়া ভেবেছে তারপর কীই বা ঘটতে পারত। সমীরদা বড়জোর এক কাপ চা চাইত অথবা নিজেই এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিত, (যেমন বরাবর নেয়) তারপর চলে যেত। কিন্তু এসবের কিছুই ঘটল না। যা ঘটল তাতে দু'জনেই চমকে উঠল। ভীষণভাবে! হন্তদন্তে রক্তশূন্য মুখ, উড়ো চুল, ময়লা ছোপধরা শাড়ী, হাত-ওচানো অসম্ভব রোগা শরীরটা নিয়ে মা এসে দাঁড়িয়েছে। দরজা হাট করে। জোলো, ভাসা-ভাসা চোখদুটোর তীব্র দৃষ্টি সমীরের ভীষণ ভয়-পাওয়া মুখের ওপর রেখে চিলের মত চেঁচিয়ে উঠেছে—'বেরিয়ে যাও। বেরোও বলছি—'। সমীরদার শুকনো মুখটা আরো শুকিয়ে গেছে। কেয়া লক্ষ্য করেছে। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়েছে সমীরদা। তারপর পা বাড়িয়েছে দরজার দিকে। কেয়ার দিকে

একবারও তাকায় নি। কাগজের মত খস-খসে গলায় মা বলেছে,—'আর কখনো এ বাড়ীতে আসব না।' তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়েছে চৌকাঠের ওপরেই. এক প্রচণ্ড আক্ষেপে শুকনো ডালের মত হাতটা বেঁকে গেছে। কেয়া গিয়ে ধরেছে হাতটা। ধরে ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। সব অবস্থাটুকু বুঝে নিতে কেয়ার সময় নিয়েছে। ততক্ষণ চৌকাঠ ধরে মা হাঁপিয়েছে। চোখের দৃষ্টিটাও ঝিমিয়ে এসেছে। হঠাৎ কেয়ার মনে হয়েছে—চলে যাই এখান থেকে। থাক বসে নয়তো শুয়েই পড়ুক মাটিতে। আমার বয়ে গেছে ধরতে। কিন্তু পারেনি চলে যেতে ধরে ধরে নিয়ে গেছে। কাঠের ভাঙা ময়ূরঅলা খাটটায় শুইয়ে দিয়েছে। মা তীব্র দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে। নাকের পাতা ফুলে ফুলে উঠেছে। তারপর এক সময় পাশ ফিরে শুয়েছে। কথা বলেনি। বোধহয় শক্তি ছিল না। কখনো কখনো মা এমনি করে তাকিয়ে থাকে। চোখের মণিদুটো স্থির, অচঞ্চল। পাতা পড়ে না চোখে। তার তীব্রতা যেন আঁতিপাতি করে খোঁজে কেয়ার মনের আনাচ-কানাচ। অসহ্য লাগে কেয়ার। এক একবার ভাবে চেঁচিয়ে বলে উঠবে—'অমনি করে তাকিয়ে থেকো না। দোহাই—যা হোক কিছু বলো। যা খুশি।'

কেয়া নিজের ঘরে এল। এখানে টেবিলটা আছে। পাড়ের সুতোয় ফুল-তোলা ঢাকনা আছে। তার সর্বাঙ্গে তেলের দাগ। আর রাখা আছে ওর চুল বাঁধার সরঞ্জাম। আয়না, চিরুনি, ফিতে, টিপের গুঁড়ো। এক এক করে জড়ো করে সব। চুলে চিরুনি টানতে টানতে জানলায় এসে দাঁড়ায়। প্রতিদিন বিকেলের মত। এতক্ষণে হাওয়া দিয়েছে। এলো-মেলো ছড়ানো ঝিলগুলোর জলে বিকেলের ছায়া পড়েছে। শরবন কাঁপছে। কালচে জলে তিরতির ঢেউ উঠছে। কোন শব্দ নেই, কোনদিকে। এমনি ছায়া-ছায়া বিকেলগুলোতে কেয়া এখানে বসে থাকে। চারদিকের এমনি নৈঃশব্দের মাঝখানে। একা একা। আর ঠিক তখনই কী এক নাগাল-না-পাওয়া শূন্যতায় ওর মন ভরে যায়। দাঁত দিয়ে ফিতেটা চেপে ধরে কেয়া। ভাবে—আমার কেউ নেই। কোনদিন কেউ নেই। বাইরের আকাশ, আবদ্ধ ঘর সবকিছুর মধ্যেও যেন বরাবরের মত একটা বিষণ্ণতাকে পায়। সেটা যেন এমনি ছায়া-বিকেলের মত ওকে স্পর্শ করে। ওর দেহকে ওর মনকে। চোখদুটো জ্বালা করে। একবার নাক টেনে হাতের উল্টোপিঠে চোখ মোছে। 'মা আমাকে হিংসে করে। হ্যাঁ—আমার সুখ আমার ভাল দেখতে পারে না। সমীরদাকে অপমান করেছে। তাড়িয়ে দিয়েছে। এবার আমার পালা। কেয়া ভাবে। মাথায় ঝাঁকুনি দেয়—আমি কী অন্যায় করেছি? সঙ্গী নেই সাথী নেই। একা একা থাকি। ভূতের মত। হেঁশেল ঠেলি। পরিপাটি হিসেব রাখি তেল নুন, লঙ্কার। তবু সমীরদা আসত। দুদণ্ড গল্প করত। সময় কাটত। আর সমীরদা আসেও তো ভারি! দশ দিন পনের দিনে একদিন। আশ্চর্য! মা ঠিক জানে। সমীরদা এলে ঠিক বোঝে। অন্য দিন কিছু বলে নি। আজকেই চিরকাল ধরে শুয়ে-থাকা মা উঠে এসেছে। চৌকাঠ ধরে হাঁপিয়েছে। চিলের মত তীক্ষ্নস্বরে চেঁচিয়েছে। সমীরদাকে অপমান করেছে। তাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন ন'মাসীকে তাড়িয়েছিল। ন'মাসীকে চলে যেতে হয়েছিল। মার জন্যে। মা তাড়িয়ে দিয়ে-ছিল। সেদিনটা ছিল মেঘের। মেঘ আর বৃষ্টির ঝাপসা অন্ধকারের। সেদিন সেই বিবর্ণ দিনটির সঙ্গে ন'মাসীর মুখের আশ্চর্য মিল ছিল। বাবাই ন'মাসীকে এনেছিলেন। মার সম্মতি ছিল না। সেটা শেষের দিকে প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্রী রকম শাপ-শাপান্ত, চীৎকার, জিনিসপত্র ভাঙা-ভাঙির মধ্যে দিয়ে। সব শাপ-শাপান্ত, চীৎকার থেমেছিল সেই বিবর্ণ দিনটির পর থেকে। ন'মাসী চলে গেলে। বাবার অফিসের ভাত, সংসারের তদারকি, মার পথ্য, ঘড়ি দেখে ওষুধ গেলানো। তারওপর সময়মত মাথা ধোয়ানো, গা-পোঁছা, বেড-প্যান হাজির রাখা। কেয়া একা পেরে উঠছিল না। ন'মাসীকে তাই আনানো হয়েছিল। বাবাই এনেছিলেন।

বাবার বরাবরের থমথমে মুখটা সেদিন চেনা যাচ্ছিল না। বাবা খুব হাসিখুশী হয়ে উঠেছিলেন। চোখদুটো পুষিকার মত চকচক করছিল। কী এক খুশীতে, তৃপ্তিতে। রেঁধেছিলেন ন'মাসী। বাবা খুব সুখ্যাতি করছিলেন রান্নার। হাসছিলেন হো হো করে। আদুর গা নাচিয়ে। কেয়ার সঙ্গে এটা-ওটা নিয়ে ঠাট্টা করছিলেন। ন'মাসী পরিবেশন করছিলেন। তাকেও হাসতে হচ্ছিল। কেয়ার মনে হচ্ছিল অনেক দিন পর বাড়ীটা যেন আড়মোড়া ভাঙল। ঘুম থেকে জেগে উঠল। কেয়ার ভাল লাগছিল। বাবাকে। ন'মাসীকে। উনুনের আঁচে ন'মাসী ঘেমে উঠে-ছিলেন। গলার খাঁজে লেপটে ছিল সোনার চিলতে হারটা। হাতে এক গাছাও চুড়ি ছিল না। ন'মাসী বিধবা। ন'মাসীর বর আত্মহত্যা করেছিল। দেশের বাড়ীতে। জলে ডুবে। কেউ জানে না কেন? ব্রহ্ম-পুত্র পেরিয়ে ওপারে যেত সেরেস্তার কাজে। কেউ বলে ঝড়ের মুখে পড়েছিল। কেউ বলে ইচ্ছে করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তিন দিন পরে ফুলে ঢোল হাত-পা, মাছে-খাওয়া চোখের খোঁদল, ঠোঁটে চেপে-বসা হলদে দাঁত—ন'মাসীর বরের মৃতদেহ ভেসে উঠেছিল। মাইল পাঁচেক দূরে। নান্দিনার কাছাকাছি। বাবার নিষেধ ছিল। মারও। ন'মাসীর সামনে এই নিয়ে কেউ কথা বলত না কিন্তু কেয়া অস্বস্তি বোধ করত। একটা প্রশ্ন করতে চাইত বার বার। কতবার গল্প করার ফাঁকে চুপ করে গেছে। চেয়ে থেকেছে ন'মাসীর দিকে। ভেবেছে এই-বার প্রশ্নটা করবে। স্থির সংকল্প। ঠিক তখনই ন'মাসী কিছু আন্দাজ করেছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছে। ধীর স্বরে বলেছে—কিছু বলবি? চটকা-ভেঙে ওঠার মত কেয়া বলে উঠেছে—'না—না'। কিন্তু এক দিন বলে ফেলেছিল হঠাৎই—

ঃ মেসোমশাই বোধ হয় সাঁতার জানতেন না-না?

গলাগলি উলের কাঁটা দুটো থেমে গিয়েছিল। মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল। চুপসে গিয়েছিল। প্রথমে দৃষ্টিতে ছিল সন্তর্পণতা। তারপর ভয়, লজ্জা, বেদনা। সব মিশিয়ে কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছিল। কপালের নীলচে শিরটা ফুলে উঠেছিল।

ঃ 'না।' শব্দটা ছিল দুর্বল। কেয়ার কানে বাজল তীব্র আর্তনাদের মত। শব্দটাকে ঘরে রেখে ন'মাসী চলে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে। কেয়া আর কোন-দিন জিজ্ঞেস করেনি।

মার আপত্তি সত্ত্বেও ন'মাসী থেকে গিয়েছিলো। বাবার অফিস-যাওয়া অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। কোন দিন যেতেন কোন দিন যেতেন না। যেতেন দেরী করে ফিরতেন তাড়াতাড়ি। তাসের আড্ডা বন্ধ হয়েছিল। ন'মাসীর পুব-টেরের ঘরটায় জমাট গল্পের আসর বসতে লাগল। সময় নেই, অসময় নেই। মার খোঁজ-খবর নেওয়া বন্ধ হয়েছিল। সামান্য ভুলচুকে কেয়ারও রেহাই ছিল না। গাল খেতে হত। অথচ কেয়াকে মা বলত 'বাপ-সোহাগী'। কেয়ার ভাল লাগছিল না। কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। কী যেন আগের মত নেই। কেউ যেন আগের মত নেই। না বাবা, না মা, না ন'মাসী। ন'মাসীও বদলাল। মাও। বাবাও। মা কথা বলাই বন্ধ করেছিল। সকলের সঙ্গে। বাবা হয়ে পড়েছিলেন মনভুলো, জেদী। ন'মাসী আদুরে পুষিটার মত সুখী আয়েসী। হেঁশেলের ধারে-কাছেও যেত না। বিছানায় শুয়ে শুয়েও মা এ খবরটা পেয়েছিল। আর সেদিনই হয়েছিল চূড়ান্ত। শাপ-শাপান্ত, গালাগাল, চীৎকার। না খেয়েই বাবা অফিস চলে গিয়েছিলেন। ন'মাসী সারা দিন পুবটেরের ঘরটায় বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অফিস-ফেরত বাবা আর বসেন নি। ন'মাসীকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। সেদিনটা ছিল মেঘলা। বৃষ্টি হচ্ছিল। আকাশটা ছিল বর্ণহীন। ন'মাসীকে পৌঁছে দিয়ে বাবা কত রাতে ফিরেছিলেন কেয়া জানতে পারে নি। পরদিন থেকে বাড়ীটা আবার নিস্তব্ধ হয়েছিল। ন'-মাসী চলে যাবার পর। ফ্যাকাশে ঠোঁট, নির্জীব চোখ, থান-পরা ন'মাসী এসে-ছিল। মুখে পান-দোক্তার কালচে দাগ,

কাজল-টানা চোখ আর চওড়া-পাড় শাড়ী পরা ন'মাসীকে বিদায় নিতে হয়েছিল। মা ন' মাসীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। সন্ধ্যে হল। মার ঘরে যেতে হবে। কুলুঙ্গিতে ঠাকুর'কে সন্ধ্যাবাতি দেখাতে হবে। শাঁখ বাজাতে হবে। মা বোধহয় এক্ষুনি ডাকতে শুরু করবে। পায়ে পায়ে কয়েকটা ভাবনাকে টানতে টানতে কেয়া এল। মার ঘরে। ওষুধ, পিকদানি, নোংরা, ময়লা বিছানার গন্ধ। গা' সওয়া হয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে ধক ক'রে গন্ধটা নাকে লাগে। গা' গুলিয়ে ওঠে। মা'র কাঠের ভাঙা ময়ূরঅলা খাটটার দিকে পেছন ফিরল কেয়া। তেলের বাতিটা জ্বালল। সলতেটা উস্কে দিল। তেল-চটচটে আঙ্গুল কটা মাথায় মুছল। শাঁখ বাজাল। গুণগুণ করে খানিকটা পড়ল। 'শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম'। পেছনে না তাকিয়েও কেয়া বুঝতে পারছিল জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে মা তাকিয়ে

আছে ওর দিকেই। লক্ষ্য রাখছে। একটু এদিক-ওদিক হলে রিণরিণে গলায় ধমক দেবে। শক্ত হাতটা কপালে ঠুকে বলবে—হা কপাল! কতদিন মা বিছানায় শুয়ে আছে। কেয়ার মাঝে মাঝে মনে হয় মা বোধহয় চিরকাল শুয়ে আছে। চিরকাল শুয়ে থাকবে। মা—শুয়ে থাকতে থাকতে তুমি হিংসুটে হয়ে উঠেছো। আলো না বাতাস না। তুমি সবকিছুকে হিংসে করতে শুরু করেছো। ন'মাসীকে হিংসে করতে। আমাকেও হিংসে কর। আমারও ভাল দেখতে পার না। আমাকেও তাড়াবে ঠিক। ন'মাসীকে তাড়িয়েছো। সমীরদাকে তাড়িয়েছো। এবার আমার পালা। সবাইকে তাড়াবে। শুধু বাবাকে আটকাবে। আটকে রাখবে। শুধু বাবার মুক্তি নেই। এই ঘরের গা-বমি-বমি-করা গন্ধ বাবাকে দুবেলা শুঁকতে হবে। তাকে থাকতে হবে। তোমাকে আগলে থাকতে হবে। শ্মশানঘাটে যেমন মড়া আগলে থাকতে হয়। তারপর বাবাও একদিন তোমার মত বিছানা নেবে। কেয়া চমকে উঠল। ভয় পেল। মা ঠিক লক্ষ্য করছে।

ও ফিরে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছিল। মার প্রসারিত দৃষ্টিটা এক্ষুনি কুটিল হয়ে উঠবে। দৃষ্টিটা পড়বে ওর মুখের ওপর। চোখের ওপর। তন্ন তন্ন করে খুঁজবে কেয়ার ভাবনাকে। ওর চিন্তার জটিলতাকে হাঁটকাবে। অগোছাল করবে। খুঁজে বের করবে এই চিন্তাকে। মৃত্যু-কামনা! বিস্ময়ে চোখদুটো কাঁচের মত হয়ে যাবে। তারপর ঘৃণায় আরো কুঁচকে যাবে হলদেটে, হাড়-উঁচানো বাসি ফুটির মত মুখটা, ঠোঁটের পাশ, কপাল ভুরু। অভিশাপ দেবে। বাছা বাছা কথায়। দম ফুরোবে। ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরোবে গলা থেকে। তখন কপালে হাতের চেটো ঠুকবে। আশ্চর্য! মা সব বোঝে, সব জানে। শুয়ে শুয়েও। কে আসছে, কে যাচ্ছে, কে কি চাইছে, কে কি ভাবছে, স—অব। সলতেটা পুড়ে এসেছে। উস্কে দিতে গিয়ে তেলে ডুবে গেল। দপ করে আলোটা নিভে গেল অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।

: কী হল? অন্ধকার বিছানা থেকে মা জিজ্ঞেস করল।

: কিছু না। আলো জ্বলল। মা ডাকল—

: বালিশটা একটু তুলে দে তো।

: অমনি করে ঠেস দিয়ে বসো না। মাথা ঘোরে। বমি কর।

: বকিস নি—

শুকনো খড়খড়ে ঘাড়টা ধরল কেয়া। ন্যাতা ন্যাতা বালিশ দুটো জড়ো করে তুলে দিল। মা ঠেস দিয়ে উঁচু হল। শুল।

: ফিরেছে-এ? টেনে টেনে বলল।

: না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

: পিলটা দে। আঁ—আর পারি না।

কেয়া ফিরল। জল তোলা, ধোয়া-মোছা, উনুন ধরানো অনেক কাজ বাকী। বারান্দা পেরোতে থমকে দাঁড়াল কেয়া। পুবটেরের ছায়াচ্ছন্ন ঘরটা দেখল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ন'মাসী। পাশে বাবা। ঝুঁকে দরজার তালা খুলছেন। কতদিন বন্ধ ছিল ঘরটা। ন'মাসী কখন এল? কেয়া একেবারেই টের পায়নি। বাবা এগিয়ে এলেন। হাতে একটা ভাঁড়। শালপাতার ঠোঙা চাপানো। কেয়ার ঘরের হাঁ-করা দরজাটা দিয়ে আলো আসছে। আলোর দাগটা পেরোতে গিয়ে চোখ কোঁচকালেন বাবা। হাত দিয়ে চোখের পাশ ঢাকলেন। আলো আড়াল করলেন। হাসলেন। কেমন শুকনো শুকনো সন্ত্রস্ত হাসি। প্রায় কেয়ার কানের কাছে মুখ আনলেন। ফিসফিস করে বললেন—'মাকে বলিস নি যেন। ইয়ে বুঝলি কিনা——তোরও কষ্ট, দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলা, চৌদ্দ ঝামেলা পোহানো

'ফিরেছে-এ?'

বুঝি—তাই নিয়ে এলাম।' কেয়া তাকিয়ে রইল। কথা বলল না। হিসহিস শব্দ হচ্ছিল বাবার গলায়। কেয়ার গা শিরশির করে উঠছিল। বাবা পুবটেরের ঘরটার দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন শেষ করলেন কথাটা—

: সুরমা—তোর ন'মাসী। কেয়া চুপ করে রইল।

: কী রে—ভাল হল না?

: মাকে না বলে—

: মাথা খারাপ—এক্ষুনি তেড়ে আসবে। একটা হাড়হদ্দ রুগী দিন-

রাত—যাক গে—' বাবা থামলেন। অপ্রস্তুত হাসলেন।

ন'মাসী এগিয়ে এসে দাঁড়াল। কেয়াকে কিছু বলতে চাইল। বলল না। তিনজন দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে। তিনটি চিন্তিত মন কাছাকাছি এল। মিশল না। ন'মাসীর ঘরে আলো জ্বলে নি। ন'মাসীর ছায়া পড়ে নি। কেয়ার ছায়া পড়েছে। বারান্দায় অর্ধেক, উঠোনে অর্ধেক। বাবার শরীরের এক পাশের ছায়া পড়েছে। কেয়া তাকিয়ে থাকল বাবার ছায়াটার দিকে। তারপর তাকাল কয়েতলার দিকে। কড়ই গাছের গুঁড়িটা দেখল। সেই কবে ঝড়ে উপড়ে গিয়েছিল। করাত-কল থেকে বাবা লোক আনিয়েছিলেন। গাছটা কাটিয়েছিলেন। (আগে আগে বাবা সব কাজই হাঁকডাক করে করতেন। সেটাই ভালবাসতেন বোধ হয়।) গুঁড়িটা কাটা হয় নি। তেমনি আছে। রোদে জলে মাটি ঝরে গেছে। মাটিছাড়া শেকড়গুলো উঁচিয়ে আছে। আঁকাবাঁকা অজস্র আঙুলের মত। কেয়ার মনে পড়ল—ন'মাসী সেবার যখন এসেছিল রিক্সার ভেঁপু বেজেছিল, বাবা হাঁকডাক শুরু করেছিলেন। এক হাঁড়ি দৈ হাতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এই বারান্দায়। কেয়া—আয় দেখে যা কাকে নিয়ে এসেছি।' আজ সব নিঃশব্দে ঘটছে। ন'মাসীর আসা। বাবার চাপা স্বরের কথা বলা। সব। কী যেন লুকোতে চাইছে। কী যেন উচিত হয়

নি। বাবা স্পষ্ট ভয় পেলেন। প্রত্যেকের চিন্তাকে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। বোধ হয় থামিয়ে দিতে চাইলেন। 'যাক গে—শোন। হোটেল থেকেই মাংস নিয়ে এসেছি। তুই শুধু চাড্ডি ভাতে-ভাত চাপিয়ে দে। গরম ভাতে মাংস। বেড়ে হবে। কী বল? লক্ষ্য ন'মাসী। ন'মাসী কিছু বলল না। ঘোমটাটা তুলে দিয়ে বারান্দা পেরোলো। পুবটেরের ঘরের দরজাটা খুলল। আলগোছে। শব্দ না হয়। (সবাই শব্দকে ভয় পাচ্ছে)। ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। ঘরে আলো জ্বলল। অনেক দিন পর। এতক্ষণে ন'-মাসীর ছায়া পড়ল। জানালা ডিঙিয়ে। বারান্দায়। মার ঘর থেকে পুবটেরের ঘর দেখা যায় না।

হাওয়া আসছে। নারকেলগাছটাতে সরসর শব্দ উঠছে। বাইরে মেটে জ্যোৎস্না। আবছা আলো পড়েছে মশারীর চালে। হাওয়া লেগেছে। ওটা দুলছে। ঢেউয়ের দুলুনি। স্বস্তিতে আয়েসে কেয়া পা ছড়াল। হাত জড়ো করল বুকের কাছে। মশারীর চালটা নড়ছে, দুলছে। আস্তে আস্তে ওটা আবছা হল। অসমান হল। ধোঁয়া হল। সাদাটে ধোঁয়া। তারপর নীলচে রং হল। কুয়াশা হল। খুব ঘন কুয়াশা পড়েছে। আবছা ভাঙা ভাঙা দেখা যাচ্ছে। নদী। হ্যাঁ। চাঁপাতলা ঘাট। ব্রহ্মপুত্র নদী।

কাদামাটিতে পা পড়ছে। খালি পা। একটা অস্বস্তিকর শিরশিরানি। পায়ের পাতা থেকে উঠল। হাঁটু অবধি। আর উঠল না। সয়ে গেল। নরম পলিমাটি। ঠাণ্ডা। পা ডুবে যাচ্ছে। কালচে রঙের একটা ডিঙি-নৌকো। পায়ে জল লাগছে। এক পা ডিঙির ওপরে। পা-টা এগিয়ে গলুইয়ের ওপর রাখল। ডিঙিটা দুলছে। শ্যাওলা-ধরা গলুই। সাপের গায়ের মত ঠাণ্ডা। স্যাঁতসেঁতে। পেছল। পা পিছলে যাচ্ছে 'সাবধানে উঠিস'। কানের কাছে কে বলল। নৈঃশব্দ খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। চমকে উঠল কেয়া। তাকাল। জমাট অন্ধকার। এক-তাল কাদার মত। লোকটা নীচু হয়ে নৌকোর খুঁটি তুলছে। এবার উঠল। উঠে দাঁড়াল। চাঁদের আলো পড়েছে কপালে, নাকে, ভুরুতে। চোখ অন্ধকার।

ঃ বাবা তুমি?

ঃ ভয় পেয়েছিস?

কেয়া মাথা নাড়ল। (ভয় কীসের? চরে যাবো। আমার চোখে নেশা। নীল ফুলের। ভয় কেন?)

জলের ওপর টলছে ডিঙিটা। দুলে দুলে চলেছে। জল ছুঁয়ে হাওয়া আসছে। কেমন ভেজা-ভেজা। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। পলিমাটির, মাছের, পচা-পানার, ঝাউপাতার।

ঃ কোথায় যাবি?

ঃ চরে।

ঃ কেন?

ঃ ফুল। ফুল আনতে।

ঃ কী ফুল?

ঃ নাম জানি না। ফুলের রং নীল। নাম জানি না।

ঃ দুঃ—উ—উ—'। অসহিষ্ণু শব্দটা ছড়াল। দু' পাশের নিথর জলের ওপর। ডিঙির চারপাশে। ওদের জড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মিলিয়ে গেল।

কেয়া ফুল তুলছে। টক টক শব্দ হচ্ছে। বোঁটা ছেঁড়ার শব্দ। কণ্টিকারী, বুনো ঝাউ, গাঁদালতা। তারই ফাঁক-ফুকুরে ফুটে আছে ফুলগুলো। এদিক ওদিক। চারপাশে। ঠিক মাঝবরাবর। একটা ছোট্ট বোতামের মত কালো দাগ। গাঢ় নীল রঙটা পাপড়ির শেষাশেষি ফিকে সাদা। শিরগুলো সাদাটে।

পায়ের নীচে বালি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কানের দু' পাশ অবশ। ঝিম ধরে আছে। এত গভীর অখণ্ড শব্দহীনতা চারদিকে। ঢালু হয়ে চর শেষ। জলের শুরু। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় জল ঝিকিয়ে উঠছে। ঘাট শূন্য। ডিঙি নেই। কেয়া ভয়ে কেঁপে উঠল। হাতদুটো অবশ হল। আঁচল খসল। পায়ের ওপর পড়ছে ফুল-গুলো। টুপ টুপ। চীৎকার করে ডাকল 'বাবা—আ।' একটা গরম হাওয়া ঠেলে এল। গলা পর্যন্ত। শব্দ বেরুল না। হঠাৎ দূরে দেখল কেয়া। ঝাউবনটাকে বাঁ পাশে রেখে বানচাল ডিঙিটা ভেসে যাচ্ছে। কেয়া ছুটল। বালিতে পা আটকে আটকে যায়। তবু ছুটল। জ্যোৎস্না পড়েছে। নৌকোয় কে বসে আছে। সমীরদা? কাছাকাছি এসে গেছে। ডাকল সমীরদা? শব্দ বেরুল না। মূর্তিটা স্পষ্ট হল। বাবা। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়ল। একটা নিস্তেজ অন্ধকার। সমস্ত দৃশ্য কিছুক্ষণ ঢাকা রইল। চাঁদ মেঘমুক্ত হল। কেয়া দেখল—নৌকোটা টাল গেল। ঘুরল। গলুইতে একটা নারী মূর্তি। ঘোমটা টানা। সাদা কাপড়। কাঁচের পুতুলের মত। অনড় বসে আছে। ডিঙিটার কাছে এসে পড়েছে কেয়া। পায়ে ভিজে বালি লাগছে। পায়ের পাতা ভিজে উঠছে। বুক ভরে দম নিল কেয়া। হাত দুটো মুখের সামনে গোল করে ধরল। ডাকল 'বাবা—আ।' বুকে গলায় হাওয়া ঘুরল। কোন শব্দ বেরুল না। এবারেও। আর ছুটতে পারছে না। গলার কাছে বাতাসে নেই যেন। ডিঙি ভেসে চলল। হঠাৎ হাওয়া উঠল। বালি উড়ল। ঝাউবন নড়ল। জলে শিরশির ঢেউ উঠল। কাঁচের পুতুলের ঘোমটা খসে পড়ল। সে পাশ ফিরল। মুখ অস্পষ্ট। তবু কেয়া চিনল—ন'মাসী। আবার চীৎকার করে ডাকল কেয়া— 'বাবা—আ আ।' পায়ে পা বেঁধে আছাড় খেয়ে পড়ল। মুঠিতে বালি খামচে ধরল। হাওয়া থেমে গেছে। ডিঙি নেই। ভাসছে কুয়োতলার কড়ইগাছের গুঁড়িটা শেকড়গুলো উঁচিয়ে আছে। আঁকাবাঁকা অজস্র আঙ্গুলের মত। জ্যোৎস্না নিভে যাচ্ছে। কেয়ার দমবন্ধ হয়ে আসছে। জলের অনেক নীচে অন্ধকার। ওখান থেকে যেন উঠে আসছে। দু' হাতে জল সরাতে সরাতে। উঠে আসতে লাগল হাওয়ার দিকে। আলোর দিকে। আঃ—হাওয়া। ফিকে আলো।

সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। জামাটা লেপ্টে গেছে গা-পিঠের সঙ্গে। কপালের দু' পাশের শিরা দপদপ করছে। হাত-পা শরীর অসাড় হয়ে আছে। চোখ মেলে ভাবতে লাগল কেয়া—কোথায় আছে ও। ঝুল মশারী। জানলার গরাদ। ছায়া ছায়া নিস্তেজ আলো। নিজের ঘর। অন্ধকারেও বুঝল ডানহাতি চেয়ারটা। হাত বাড়ালেই ঠেকবে টেবিলের কোণা, কয়েকটা বই-খাতা, আয়না, চিরুনি। বুকের কাছ থেকে হাত দুটো সরাল। টান টান করে পাতল বিছানায়। অবশ শরীরটায় একটু সাড় এল। বার দুয়েক মাথা নাড়ল। না! ঠিক আছে। কারা কথা বলছে। মার ঘরে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবু এলেন নাকি! তবে কি—' কেয়া চমকে উঠল। নাঃ। মার গলা। দু-একটা কথার টুকরো আচমকা জোরে এল। 'অন্যায়—কিস্‌সু দরকার নেই—বিয়ের যুগ্যি—'

কান পাতল কেয়া। কিছু স্পষ্ট শোনাল কথাগুলো।

ঃ —পোড়কাঠ। জোয়ান না হলে মন সরবে কেন? মার তিক্ত কণ্ঠস্বর।

ঃ কী যা তা বকছ! বাবার সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ জানি—' মার ফোঁপানি কান্না। ভাঙা ভাঙা কথা একটানা কী বলে গেল। গুন গুন স্বরে। যেমন করে কেয়া 'শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম' পড়ে। অস্বস্তিকর। একঘেয়ে। বৈচিত্র্যহীন।

সুজনিটা কুঁচকে আছে। দুটো তোলা ফুল দুমড়ে গেছে। বাইরের আকাশ থেকে মেটে আলো পড়েছে ওখানে। নরম পালকের মত। ছোঁয়া যায়। হাওয়া আসছে। বাইরে পাতানড়ার শব্দ। মশারী কাঁপছে। মেটে আলোর পালক নড়ছে। কেয়ার মনের অস্বস্তির মত। ভুরুর কাছটায় ক্ষীণ ব্যথা। চোখ দুটো জ্বালা করে জল এল। নাক টানল কেয়া। হঠাৎ সর্বশরীর দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাঁদতে থাকল যতক্ষণ না বাইরের আকাশের মেটে আলোটা একেবারে নিভে গেল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হল। বৃষ্টি থামল। তারপর চাঁদ উঠল। পরিপূর্ণ আলোয় চারদিক ভাসল। কেয়া বালিশে থুতনি গুঁজে বাইরে তাকিয়ে রইল। কোথাও কোন শব্দ নেই। মার ঘরও নিস্তব্ধ। বাইরে কাঁঠালপাতাগুলো নড়ছে। চিকচিক করছে। পাতাগুলো যেন রাংতা-জড়ানো।

একশো বছর আগে, ৩০-এ জুলাই, যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট শিল্পপতি হেনরী ফোর্ড জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র কৃষকের সন্তান ফোর্ড উত্তরজীবনে অগাধ ঐশ্বর্যের অধিপতি হন এবং তাঁর ঐশ্বর্যের এক বিপুল অংশ মানবকল্যাণে উৎসর্গ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে বৃহদায়তনহারে মোটরগাড়ি নির্মাণ-শিল্পের ক্ষেত্রে হেনরী ফোর্ডের ভূমিকা অসামান্য কৃতিত্বে উজ্জ্বল।

নিজের আবিষ্কৃত প্রথম গাড়ীর চালক ফোর্ড

সুবীর বসু

১৮৬৩ সালের ৩০শে জুলাই, আধুনিক আমেরিকার বিশিষ্ট সন্তান হেনরী ফোর্ড মিশিগান রাজ্যের এক খামারবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের পড়া-শোনায় তিনি সামান্যই এগিয়ে ছিলেন, পরিচালন-ক্ষমতায়ও কোনও অসাধারণ প্রতিভা ছিল না, অদ্ভুত ধরণের কিছু কিছু ধ্যান-ধারণা ও অন্ধমূল সংস্কার ছিল তাঁর কিন্তু এই মানুষই পরে বিপুলায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভারূপে জগৎ-বিখ্যাত হন, কুবেরের ঐশ্বর্যের অধি-কারী হয়েও সেই সম্পদের বৃহদাংশ বিশ্বের বৃহত্তম মানব-কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য দান করে যান। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ আড়াইশো কোটি ডলার। চারুকলা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহদান এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াও বিকাশ-মুখী রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে বার্ষিক কুড়ি কোটি ডলারেরও বেশী এই অর্থ থেকে ব্যয় করা হয়।

ফোর্ডের নাম মোটরগাড়ী শিল্পে বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রতীক। ব্যাপক হারে উৎপাদন ও ক্রয়সাধ্য মূল্যের জন্য আমেরিকার প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারই আজ মোটরগাড়ীর মালিক। এই অসাধারণ মানুষটির বিস্ময়কর কৃতিত্ব এবং তারই পাশাপাশি কিছু বিস্ময়কর ব্যর্থতা আমেরিকাকে গতির যুগে উন্নীত করেছে এবং বিংশশতাব্দীর ব্যবসাজগতের ইতিহাসে চূড়ান্ত সাফল্যের এক বিখ্যাত কাহিনী সংযোজিত করেছে।

হেনরী ফোর্ডের বাবা আয়ার-ল্যাণ্ডের মানুষ। ছোটবেলায় হেনরী স্কুলের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। পনেরো বছর বয়সের আগে তিনি স্কুলে পড়েন নি। কিন্তু ছোট বয়স থেকেই

ইঞ্জিন ও সকল রকমের হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তেরো বছর বয়সেই হেনরী একটা ঘড়ি খুলে আবার সেটি জোড়া লাগান। ষোল বছর বয়স হতেই তিনি

ডিট্রয়েটে চলে যান, সেখানে একটা যন্ত্রপাতির দোকানে দৈনিক দশ ঘন্টা করে কাজ করতে থাকেন এবং রাত্রি বেলায়ও একটা গয়নার দোকানে কাজ নেন। এরপর তিনি আবার তাঁর পৈতৃক খামারে ফিরে গেলেন এবং একটা বাষ্প-চালিত ট্রাক্টর ও একটা 'অশ্ববিহীন গাড়ী' বানাবার চেষ্টা করলেন। দুটি প্রয়াসই ব্যর্থ হল তাঁর।

১৯০৩ সালে হেনরী 'ফোর্ড মোটর কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে যে পাঁচটি মডেল তৈরি করেন তিনি বাজারে সেগুলির মোটেই চাহিদা হল না। ১৯০৮ সালে তাঁর কোম্পানী বিখ্যাত "মডেল টি" গাড়ী তৈরি করল। গাড়ীগুলি দেখতে ভাল না হলেও বেশ মজবুত ছিল। এই গাড়ী এত দিনে সস্তা দামের সাদাসিধে অথচ মজবুত গাড়ীর অভাব পূরণ করল। আমেরিকা-বাসীদের জীবনে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। পাঁচ বছরের মধ্যেই ফোর্ডের কারখানায় মোটরগাড়ীর বিভিন্ন অংশ জোড়ার ব্যবস্থা চালু হয় এবং দৈনিক দশ হাজার করে "মডেল টি" গাড়ী নির্মিত হতে থাকে।

ফোর্ড কোম্পানীর শ্রমিক-নীতি বহুদিন যাবৎ তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। শ্রমিকদের উঁচু হারে মজুরী দেওয়া ও তাদের কাজের ঘন্টা অপেক্ষা-কৃত হ্রাস করার আন্দোলনের তিনি ছিলেন পুরোধা। ১৯১৪ সালে তাঁর কোম্পানী ও অন্যান্য কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত দৈনিক ন-ঘন্টা কাজের জন্য গড়পড়তা ২·৪০ ডলার মজুরীর পরিবর্তে তিনি যখন দৈনিক আট ঘন্টা কাজের জন্য সর্বনিম্ন মজুরীর হার ৫ ডলার রূপে নির্দিষ্ট করেন চারিদিকে তখন এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বহুলোক তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষীরূপে অভি-নন্দিত করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে মিঃ ফোর্ড অকৃত্রিম শান্তিবাদী হয়ে ওঠেন। ১৯১৫ সালে তিনি অস্কার-২ নামক একটি জাহাজে করে একদল সমাজসেবী ও শান্তিবাদী তত্ত্বজ্ঞকে যুদ্ধের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবার জন্য ইউরোপে পাঠান। কিন্তু "শান্তি জাহাজের" এই প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং মিঃ ফোর্ড তাঁর উৎপাদন দক্ষতাকে অস্ত্রসজ্জায় নিয়োজিত করেন। ফোর্ড মোটর কোম্পানী তখন এরোপ্লেন তৈরীর কাজে অগ্রণী হয়।

হেনরী ফোর্ড এক সময় বইপত্র ছাপার কাজেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়নি। তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। আসলে ফোর্ড ছিলেন একজন রুচিশীল, সৎ ও খাঁটি মনের মানুষ, কিন্তু অকৃত্রিম সরলতা বশতঃ তিনি মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন।

হেনরী ফোর্ড সম্পর্কে লিখিত বইগুলির মধ্যে তিনখানি সর্বাধিক পরিচিত, 'ফোর্ড দি টাইমস, দি ম্যান,
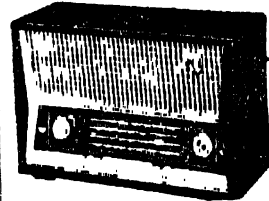
দি কোম্পানী।' বইটির লেখকন্বয় হচ্ছেন অ্যালান নেভিনস ও ফ্র্যাংক আর্নেস্ট হিল। দ্বিতীয় বইটি চার্লস ই. সোরেনসেনের লেখা 'মাই ফরটি ইয়ার্স উইথ ফোর্ড' এবং তৃতীয়টি হচ্ছে কীথ সোয়ার্ডের লেখা 'দি লিজেণ্ড অব হেনরী ফোর্ড।'

বইগুলি ফোর্ডের বিস্ময়কর একটু-বা পরস্পরবিরোধী ভাবে ভরা, বিচিত্র ব্যক্তিত্বে এক আশ্চর্য, নিখুঁত প্রতিফলন।

হেনরী ফোর্ড ছিলেন এক লাজুক প্রকৃতির বিচক্ষণ, স্বচেষ্টতায় শিক্ষিত যন্ত্রবিদ, সারাজীবন তিনি আত্মপ্রত্যয়ী ও কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী ছিলেন, স্বদেশের প্রতি তাঁর অসীম আস্থা ছিল। তিনি ছিলেন উদ্যমশীল, সংযত কঠোর চরিত্রের মানুষ, অনেক বিষয়ে যেমন অজ্ঞ ছিলেন, অনেক ব্যাপারে তেমনি মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। আবেগপ্রবণ, স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিপরায়ণ, খেয়ালী, নিয়ম-কানুনের প্রতি উদাসীন, তামাসাপ্রিয়, সাধারণতঃ বন্ধুত্বপূর্ণ, প্রায়ই বেশ জেদী ধরণের, কখনও বা প্রতিহিংসাপ্রবণ ফোর্ডের চরিত্র ছিল এই সব বিচিত্র উপাদানের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ।

আধুনিক শিল্পায়ণের সঙ্গে ফোর্ডের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হলেও প্রথম যুগের আমেরিকানদের স্মরণচিহ্নসমূহ সংরক্ষণের জন্য তাঁর ক্লান্তিহীন উদ্যম দেখলে বোঝা যায়, সাদাসিধে, গ্রামাজীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি কত ব্যাকুল ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে সেকালের গ্রামীণ নৃত্যকলাকে পুনঃপ্রচলিত করবার জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট হন।

টমাস আলভা এডিসনের সংগে রসিকতা করছেন ফোর্ড

ডিট্রয়েট থেকে অল্প দূরে গ্রীণ-ফিল্ড গ্রামে তাঁর আমেরিকার জীবন সম্পর্কিত বিচিত্র সংগ্রহগুলি সংরক্ষিত আছে। এখানে তাঁর প্রিয় বন্ধু টমাস এডিসনের ল্যাবরেটরীটিতে দেখতে পাওয়া যাবে, ওয়াশিংটনে যাওয়ার আগে এব্রাহাম লিংকন যে আদালতে আইন-জীবীর কাজ করতেন, সেই আদালত-গৃহ, ফিলাডেলফিয়ার ঐতিহাসিক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হল ও কংগ্রেস হলের প্রতিকৃতিও এখানে বিশেষ যত্নে সংরক্ষিত আছে। বিশাল হেনরী ফোর্ড মিউ-জিয়ামটিতে হেনরী ফোর্ডের জীবনের বিচিত্রপর্বের সঙ্গে জড়িত দলিলপত্র ছবি ও অন্যান্য জিনিসপত্র এবং তাঁর প্রথম নির্মিত গাড়ীটি সাজানো রয়েছে। গ্রীণফিল্ড গ্রামের ছয়টি স্কুলে ফোর্ডের শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়। তত্ত্বের সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞানের, শহরের সঙ্গে ক্ষেত-খামার জীবনের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সমন্বয়সাধনই এই শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য।

১৯০৪ সালে ডিট্রয়েটের পিকুইট এভিনিউ-এ মডেল-কে গাড়ী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।।৩।।

সেদিনের রাত্রিশেষটা বোধ হয় কারুর পক্ষেই সুপ্রভাত হয়নি।

অনেক দিন পরে বাপের বাড়ি থেকে খুশী মনেই ফিরছিল মহাশ্বেতা। সে অতশত বোঝে না, নতুন বৌয়ের কথাবার্তাও বিশেষ তার কানে যায়নি; হাবা-কালা ভাইটার একটা সদ্গতি হল—সেইটেই তার কাছে বড় কথা। বৌ এমন কিছু খারাপ দেখতেও নয়, বেশ নতুন-বৌ নতুন-বৌই তো দেখাচ্ছিল ছুঁড়িকে বাপু। আরও খুশী হবার কারণ তরুর হুঁশজ্ঞান ফিরে আসবার লক্ষণটা। আহা, যদি ভাল হয়ে যায় মেয়েটা সত্যি সত্যিই—ওরও শান্তি, মায়েরও শান্তি। অনেক তো কষ্ট পেলে, এবার কিছুদিন শান্তিতে থাকে। 'যে যেখানে আছে ভাল থাক।' এইটেই বলতে বলতে এসেছে সে প্রায় সারা পথটা।

বাড়ীতে পেঁৗছেও সে অতটা কিছু লক্ষ্য করেনি। 'মহারাণী'র সঙ্গে তার খুব সম্প্রীতি নেই দীর্ঘকালই—তবু আজ বাড়ীতে ঢুকে তাকে সামনে পেয়ে তার কাছেই হাত-পা নেড়ে গল্প করতে লেগে গেল। বৌভাতের গল্প, কতটি লোক খেয়েছে (যেন ওরা কেউ যায় নি!), কী কী রান্না হয়েছিল ইত্যাদি, মার কৃপণতা যে দিন দিন বাড়ছে তার কতকগুলি সদ্য-দৃষ্টান্ত; দাদা কীভাবে সারাক্ষণটা বড়বৌদির পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করেছে ('এখনও বাপু টানা যায়নি যে যতই বলে!) তারই রসালো বিবরণ এবং সর্বোপরি মার তিন-চারটি চড়ে কেমন করে তরুর চৈতন্যোদয়ের লক্ষণ দেখা দিল তারই বিস্তৃত ইতিহাস সালঙ্কারে ও এক নিঃশ্বাসে বিবৃত করছিল, হঠাৎ অনেকক্ষণ একতরফা বকে যাবার পর একসময় তার খেয়াল হল যে, তার শ্রোতা ও শ্রোত্রীরা সকলেই কেমন অস্বাভাবিকভাবে চুপ করে আছে, সকলেরই মুখেচোখে কেমন থমথমে ভাব।

প্রথম যা মাথায় ঢুকতে দেরি—তারপর জিনিসটা পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া কঠিন নয়। মেজবৌয়ের ভাবভঙ্গীর হদিশ মহা কোনদিনই ভাল পায় না—ওর কথা না হয় ছেড়েই দিল—কিন্তু ছোটবৌয়েরও বিষণ্ণ গম্ভীর ভাবটা উড়িয়ে দিতে পারল না। খানিকটা বোকার মতো এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে ছোটবৌকেই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে, কী হয়েছে রে, তোরা অমন মুখ অন্ধকার করে আছিস কেন? সবাই ভাল আছে তো? কোথাও থেকে কোন খারাপ খবরটবর আসেনি?'

বলতে বলতেই লক্ষ্য হল মানুষটাকে। রোদ এখনও ও-বাড়ির পাঁচিলের মাথায়—এমন সময় তো কোনদিন ফেরে না। সে মেজ ছেলের দিকে ফিরে বললে, 'হ্যাঁরে, এঁই, অ ন্যাড়া। তোদের গুষ্টি আজ এরই মধ্যে বাড়ি ফিরেছে যে? এতক্ষণ ঠাওর করি নি। এত সকালে বাড়ি ফিরল, শরীর ভাল আছে তো? তোরা খবরটবর নিয়েছিলি একটু?'

এই প্রথম বোধ করি, তার ছেলেদেরও চপল ও বাচাল রসনা স্তব্ধ রইল। ন্যাড়া কেন, তার পরের আরও দুটো ভাই উপস্থিত ছিল কিন্তু কারও মুখে কোন কথা সরল না। ন্যাড়া মাথা হেঁট করে বসে মেঝেতে নখ দিয়ে দাগ কাটতে লাগল।

ওদের ভাবভঙ্গীতে মহাশ্বেতার উত্তরোত্তর ভয় বেড়ে যাচ্ছিল, সে প্রায় কান্নার মতো করে চেঁচিয়ে উঠল, 'আ মর, তোরা অমন করে মুখে গো দিয়ে রইলি কেন সকলে মিলে। ভেঙ্গে বলবি তো কি হয়েছে। আমার যে পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে তোদের রকমসকম দেখে......বল না মুখপোড়ারা কী হয়েছে!'

এইবার মেজবৌই কথা বললে, তার স্বভাবসিদ্ধ লঘুভঙ্গী ত্যাগ ক'রে আস্তে আস্তে বললে, 'বটঠাকুরের চাকরি শেষ হয়ে গেল আজ থেকে, তাই সকাল করে ফিরে এসেছেন!'

'কী—কী হয়ে গেল বললি?' বিশ্বাস হয় না নিজের কানকে। অভয়পদর কোনদিন চাকরি না থাকতেও পারে—একথাটা এতকাল বোধ হয় এ বাড়ির কারও মাথাতে যায়নি। তাই মহাশ্বেতার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেও তেমন করুণ শোনাল না। দৃঢ় অবিশ্বাসই বেশী সে কণ্ঠে। নিজের কানকেই অবিশ্বাস।......অবিশ্বাস আর সন্দেহ।

'ও'র নাকি যতদিন চাকরি করার কথা—তার চেয়ে বেশী দিন হয়ে গেছে,

তাই ও'কে সাহেবরা বসিয়ে দিয়েছে। বলেছে যে, আর কতকাল টুল জোড়া ক'রে বসে থাকবে? নতুন লোকদেরও তো ক'রে খাওয়া দরকার। আর ঢের দিন তো হ'ল—অনেক দিন তো খাটলে, এবার কিছুদিন আরাম করো গে।'

এবার আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। অবিশ্বাসেরও না। এমন কথা নিয়ে কিছু তামাশা করবে না মেজবৌ। বিশেষ বড়কর্তার কথা নিয়ে করবেই না। তাছাড়া কিছু একটা হয়েছেই নিশ্চয়—নইলে এমন সময় বাড়িতেই বা ফিরবে কেন? এতকালের মধ্যে, আঙুলে গুণে বলে দিতে পারে মহাশ্বেতা, চারদিন না পাঁচদিন সকাল করে ফিরেছে সে। সেও কোন 'বিপর্যয়ে' কান্ড কোথাও হয়েছে, সেই জন্যে অফিসই সকাল করে বন্ধ হয়েছে—তবে!...তাছাড়া কিছু একটা তো হয়েছেই, নইলে এমন সময়ে বাড়িতেই বা ফিরবে কেন! তাছাড়া চুপ ক'রে রকের ধারে বসে আছে—কোন কাজ-কর্মে হাত না দিয়ে—এটাও একটা নিয়মের প্রচন্ড ব্যাতিক্রম।......

লক্ষণ সমস্তই মন্দের। আর মন্দটাই বেশী ফলে—এটা মহাশ্বেতা তার গন্ডীবন্ধ জীবনেও অনেকবার দেখেছে। যে কথা রটে, বেটা লোকে অনুমান করে—তার মধ্যে যা ভাল, তা কদাচ কখনও সত্য হয়, কিন্তু খারাপ যেগুলো, সেগুলো ঠিক সত্যি হয়ে বসে থাকে।

তবু চাকরিটা সত্যিই নেই, আজ থেকেই নেই—সেটা যেন এখনও বিশ্বাস হয় না।

হয়ত নোটিশ দিয়েছে, হয়ত সময় একটা বে'ধে দিয়েছে। সেটাও যথেষ্ট খারাপ খবর, তবু আজ থেকেই—? না না, তা কখনও হ'তে পারে? হলে যে তাদের চলবে না, তাদের এতবড় সংসার অচল হয়ে যাবে! এতবড় 'বেশরৎ গুষ্টি' খাবে কি? এই জন্যেই মন বিশ্বাস করতে চায় না বোধ হয় চরম দুঃসংবাদটা। মনে মনে কোথায় একটা অস্তিত্বহীন আশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

অভয়পদ অবশ্য নাগালের বাইরে কোথাও নেই—সামনেই বসে আছে। তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। সে স্ত্রী, তার তো ষোল আনা অধিকারই আছে জিজ্ঞাসা করবার। তবু যেন সাহসে কুলোয় না মহাশ্বেতার। অনেকক্ষণ পরে পা পা ক'রে গিয়ে পেছনে দাঁড়ায় শুধু—কোন প্রশ্ন মুখ ফুটে করতে পারে না।

আজ কিন্তু—বোধ করি এই প্রচন্ড আঘাতেই—অভয়পদরও একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেছে মনের মধ্যে। সে-ই খানিকটা পরে, পিছনে না ফিরেও স্ত্রীর উপস্থিতিটা অনুভব ক'রে আস্তে আস্তে বলল, 'সত্যিই ছুটি হয়ে গেল এবার—। আজ থেকেই।'

'আজ থেকেই একেবারে—?' কোন মতে ফিসফিস ক'রে বলে মহাশ্বেতা।

'হ্যাঁ। আরও তিন মাসের মাইনে পাব অবশ্য, তবে অপিসে আর যেতে হবে না। শুধু সাত দিন পরে একবা'র যেতে হবে হিসেবটা চুকিয়ে নিয়ে আসতে।'

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মহাশ্বেতা, কোন প্রশ্নই করতে পারে না।

অভয়পদই একটু পরে আবার বলে, তেমনি ধীরে ধীরে, ভাবলেশহীন কণ্ঠে—লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, এও তো এক রকমের মৃত্যুই—পুরুষ মানুষ ঘরে এসে বসব হাত পা গুটিয়ে—এ আর মৃত্যু ছাড়া কী?—তা সবই সেই লোভ থেকেই হ'ল আর কি!...বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর চাকরি হ'ল—বোধ হয় আরও বেশিই হবে, আমার হিসেব নেই অত—অফিসেরও সে সব খাতা নষ্ট হয়ে গেছে—তা সবাই মিলে, আমাদের বড়বাবুই উয্যুগী হয়ে বলেছিল, যা হোক দু চারটে টাকা করেও অন্ততঃ পেনসন দিতে, কিন্তু সাহেবরা কেউ রাজী হ'ল না।......আসলে সেই সাহেব দুটো যে বেইজ্জৎ হ'ল—ওদের জাতের মুখ ডুবল—সে কথাটা ওরা ভুলতে পারছে না। আমার ওপর একটা আক্রোশ পড়েছে ওদের। ওদের মনে হয়েছে যে আমি কসাইয়ের মতো সুদ আদায় ক'রে তাদের রক্ত মাংস মায় হাড় কখানা পর্যন্ত চুষে খেয়েছি। আমি অমনভাবে টাকা না যোগালে নাকি তারা অতটা অধঃপাতে যেতে পারত না। তাছাড়া আমি যে সর্বস্বান্ত হয়েছি, এও ওরা মানতে চায় না। ওরা স্পষ্টই বলেছে যে, আমি নাকি অনেক টাকা গুছিয়ে নিয়েছি চড়া সুদ খেয়ে খেয়ে। আমার যা ডুবেছে তা নাকি লাভের তুলনায় কিছুই নয়। তাই ওরা কোন রকম দয়া-ধর্ম করতে রাজী হল না কিছুতেই।......প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা অনেকখানিই তো তুলে নিয়েছিলুম—এখন সব মিলে যা পাব, হয়ত হাজার টাকারও কম দাঁড়াবে।'

'তাহ'লে এখন উপায় ?'

অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে উচ্চারণ করে মহাশ্বেতা কথাগুলো।

'উপায় ভগবান!' শব্দগুলো অভয়পদর পক্ষে স্বাভাবিক—কিন্তু এই প্রথম, তার অত্যন্ত শান্ত উদাসীন কণ্ঠে বিষণ্ণতার সুর ধরা পড়ে একটু। একটা নিঃশ্বাসও পড়ে কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে।

সারা বাড়িটার সেই থমথমে স্তব্ধ আবহাওয়া একটা প্রবল দমকা বাতাসে আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। কান্তি খবরটা নিয়ে এল প্রায় ছুটতে ছুটতে। তবু আজ সন্ধ্যের রেলে কাটা পড়েছে, ওদের কারুর একবার যাওয়া দরকার এখনই। দাদা একা—কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বড়দা আজই কোথায় গেছে থিয়েটার দেখতে—কোথায় গেছে কখন আসবে, তা কেউ জানে না। মা খবর শুনে পর্যন্ত চৌকাঠে মাথা ঠুকছেন—বৌদি তাঁকে সামলাবে, কি ছেলে দেখবে, কি বাড়িঘর দেখবে ভেবে পাচ্ছে না। পাড়ার লোক কেউ কেউ এসেছে বটে—কিন্তু এরা না গেলে দাদা জোর পাচ্ছে না।

ছেলেরা তখনই হৈ হৈ ক'রে বেরিয়ে পড়ল। অম্বিকাপদ একবার দাদার মুখের দিকে আড়ে চেয়ে নিয়ে দুর্গাপদকে বললে, 'তুমিও একবার না হয় যাও—ছেলেরা যতই করুক, পাকা মাথা কেউ থাকা দরকার।'

অভয়পদ তখনও পর্যন্ত রকের ধারের সেই জায়গাটিতে চুপ ক'রে বসে ছিল। তার ঐ একভাবে ব'সে থাকাতে সকলেই একটা অস্বস্তি বোধ করলেও কেউ কিছু বলতে সাহস করে নি। বোধ হয় কী বলবে, কী বলে সান্ত্বনা দেবে তাও ভেবে পায়নি। মহাশ্বেতা অনেকক্ষণ কাছে বসে ছিল চুপ করে, তারপর সেও উঠে গেছে। সংসারের কর্মচক্রে আবর্তিত হওয়া দীর্ঘদিনের অভ্যাসে তার সংস্কারে পরিণত হয়েছিল, তাই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পরও আর নিষ্ক্রিয় হ'য়ে বসে থাকতে পারে নি। তার নিজের ভাষাতেই 'অসুমার' কাজ পড়ে চারদিকে, দেখেশুনে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না।

সে চলে যাবার পরে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে, অভয়পদকে আচ্ছন্ন ক'রে ঘনীভূত হয়ে এসেছে, কিন্তু তবুও অভয়পদ ওঠেনি, নড়ে নি। এই প্রথম, সে শুধু নড়লই না, উঠে দাঁড়াল। বলল, 'না খোকা থাক বরং, আমিই যাচ্ছি। আমারই যাওয়া দরকার। পুলিশের ব্যাপার একটা আছে বোধ হয়—ওরা ছেলেমানুষ সামলাতে পারবে না।'

তার এই মানসিক অবস্থায় এসব ব্যাপারে যাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে উপস্থিত সকলের মনেই প্রবল সন্দেহ দেখা দিল, মেজবৌ কী একটা ফিস-ফিস ক'রে বললও অম্বিকাকে—বোধহয় নিরস্ত করারই কথা—কিন্তু অম্বিকা কিছু বলতে পারল না শেষ পর্যন্ত। বহুদিন ধরে এ-বাড়িতে অভয়পদরই সর্বশেষ কথা বলার অধিকার স্বীকৃত হয়ে এসেছে প্রায় নির্বিচারেই—

তা'হলে এখন উপায়?

আজও তাই কেউ কোন কথা বলতে পারল না তার ওপর।

অভয়পদর সঙ্গে মহাশ্বেতাও যাবে এইটেই সকলে ধরে নিয়েছিল। স্বাভাবিকও সেটা। কিন্তু বিকেলের ঐ আঘাতের পর এখনই আবার এই আঘাত তাকে একেবারে অনড় ক'রে দিল। সে যেন খুব চীৎকার ক'রে কাঁদতেও পারল না—প্রথমটা একবার জোরে কেঁদে উঠেই বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব ক'রে দু'হাতে বুক চেপে শুয়ে পড়ল। ছোট-বৌ তরলা ছাড়া সেটা তখন কেউ লক্ষ্যও করেনি। সংবাদটার অপ্রত্যাশিততা ও আকস্মিকতায় বিস্ময়-বিমূঢ় সকলে সংবাদদাতাকেই ঘিরে দাঁড়িয়েছিল কৌতূহলী হয়ে। তরলাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাড়িবকে মাথায় বাতাস করতে বলে নিজে তার বুকে তেল-হাত বুলিয়ে ছুঁচে দিল খানিকটা। তাতে একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসলেও পায়ে বল ফিরে এল না। তার চোখের সামনে দিয়েই ছেলেরা, কান্তি সবাই চলে গেল, অভয়পদও। সে যেতে পারল না।

অভয়পদ যখন যায়—একবার কাঁদো-কাঁদো গলায় সে বলেছিল অবশ্য, 'ও গো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, ওগো আমার মা যে সেখানে দহড়া পিটছে গো একা একা—আমি মা গেলে কে তাকে দেখবে।......আমি ঠিক যাব—আমার কিছু হবে না। আমার মিত্যু নেই। নইলে কোলের বোনটা চলে গেল, ছোট ভাইটা নিখোঁজ হ'ল—দ্যাখো আমি এখনও ঠিক বেঁচে আছি। আমি বেশ যেতে পারব ছোট—আমাকে যেতে দে তোরা!'

বলেছিল, কিন্তু উঠতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত উঠতে পারেনি।

হাঁটুটায় কোন জোর ছিল না, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারল না কিছুতেই।

ছেলেরা প্রায় সবাই চলে গিয়েছিল—মেজকর্তার একটি আর ছোট কর্তার একটি ছাড়া। আজ বড়দের কারও খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই মানসিক অবস্থায় ভাত গলা দিয়ে নামবে না কারুরই। শুধু ছোট দুটোকে আর বুড়োর বৌকে ধরে জোর ক'রে যা-হয় এক-এক গাল খাইয়ে দিল প্রমীলা। ছোট কর্তাকেও

বলেছিল—কিন্তু সে কিছু খেতে রাজী হয়নি। তরলা মহাশ্বেতাকে নিয়ে মহার ঘরে—গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মাথার বাতাস ক'রে সুস্থ করার চেষ্টা করছে। অনেকটা শান্ত ক'রে এনেছেও, কিন্তু এখনই তাকে ফেলে ওঠা উচিত নয়।

অগত্যা মেজকর্তা আর মেজ-বৌকেই রান্নাঘর সারা, বাসনপত্র দালানে এনে রাখা, খিড়কীর দোর, সদর-দোরে চাবি দেওয়া, গোয়াল দেখা প্রভৃতি করতে হ'ল। ওরা কখন আসবে তার ঠিক নেই কিছু। সম্ভবতঃ রাত ভোর হয়ে যাবে। ওদের ভরসায় জেগে বসে থেকে লাভ নেই। কেউ আগে ফেরে, খেতে চায়—হাঁড়িতে ভাত, ঢাকার নীচে ডাল-তরকারি সবই রইল কিছু কিছু—খেতে পারবে।.........

সব কাজ সেরে, তালাগুলো বার বার টেনে দেখে, বেঞ্চির তলা, তক্তপোশের তলা সব 'লম্প'র আলো ফেলে দেখে অম্বিকাপদ নিজের ঘরে শুতে গেল। ইদানীং এই 'বাই'টা তার বেড়েছে। সর্ব-দাই চোরের ভয়। ভেতর থেকে সব দোরে তালা দেওয়া হয়, শুধু খিল-ছিট্‌কিনিতে বিশ্বাস নেই তার। দালান আর নিচের ঘরগুলোর জানলাতে শক্ত মজবুত জাল পরানো হয়েছে। প্রতি দরজায় ডবল ছিট-কিনি। অর্থাৎ বাড়িটাকে যতটা সম্ভব দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য ক'রে তুলতে যত্নের ত্রুটি নেই তার। কিন্তু তাতেও সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না, খাট-চৌকীর তলাগুলো না দেখা পর্যন্ত। তার বিশ্বাস, সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রে দরজা বন্ধ করা অবধি এই যে তিন-চার ঘণ্টা সময় এর ভেতর কেউ যদি কোন বদ মতলবে এসে কোন চৌকী কি খাটের তলায় ঘাপ্‌টি মেরে থাকতে চায় তো তার সুযোগ-সুবিধার অভাব হবে না। বহু অসতর্ক মুহূর্তে দরজা খোলা হাঁ-হাঁ করে—নিচের তলা বা ওপরের দালানে কেউ থাকে না। হয় নিজের নিজের ঘরে কি ছাদে কি বাগানে থাকে—নয়তো রান্না-ঘরে বসে জটলা করে। এর ভেতর অমন দশ-বিশটা লোক এসে বিভিন্ন ঘরে তক্তা-পোশ-খাটের নিচে ঢুকে যেতে পারে। তারপর সকলে ঘুমোলে বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ। আর সেরকম ক্ষেত্রে ভেতর থেকে তালাই দাও, ছিটকিনিই দাও—যথাসর্বস্ব বার ক'রে নিয়ে যেতে তাদের কোনই অসুবিধা নেই। এমন কি—জান-প্রাণও নিরাপদ নয় তেমন কাণ্ড হ'লে।... কথাটায় যুক্তি যতই থাক, ছেলেদের হাসি পায় কথাটা শুনলে। কিন্তু কারও ঠাট্টা-তামাশা-পরিহাস গ্রাহ্য করবার মানুষ অম্বিকাপদ নয়, নিজে তো যতটা পারে দেখেই—যেটা পারে না, যেমন ভাদ্র-বৌ কি ভাইপো-বৌয়ের ঘর—বার বার করে বলে দেয় দেখে শুতে।

তবু, এতকরেও যেন স্বস্তি পায় না আজকাল। ন্যাড়ার কথা যদি সত্যি বলে ধরতে হয়—ইদানীং মেজকর্তা নাকি রাত্রে ঘুমোয় না ভাল করে..., প্রায়ই উঠে উঠে নিঃশব্দে বাড়িটা ঘুরে দেখে যায়। ন্যাড়াই ব্যাখ্যা করে কারণটা, নিজের মনের মতন করেই করে অবশ্য। বলে,—'পোষ্টাপিসে ব্যাঙ্কে যা টাকা রেখেছে মেজকা, সেটা লোক-দেখানি বৈ তো নয়—তার অন্তত দশগুণ টাকা দ্যাখো গে যাও ঘরে রেখে দিয়েছে। ওর ঘরের দ্যালে আর মাটির ইঁট ক'খানা আছে, সবই তো টাকা আর সোনার বাট দিয়ে গাঁথা!......চুরি-বাট-পাড়ির টাকা ব্যাঙ্কে-পোষ্টাপিসে মানে সদরে রাখতে তো সাহস হয় নে—কোন্ ভরসায় রাখবে বলো—তাই অমনি ক'রে রাখা। আর সেই জন্যেই অত পাহারা দেবার বাই! বুঝলে না?......

আজ আবার ছেলেরা কেউ নেই, বাড়িতে লোকজন কম বলে আরও বেশী সময় লাগল অম্বিকাপদর সব দেখে-শুনে শুতে। সে ওপরে উঠে যাবার পর নিচের দালানের ছোট টিনের দেওয়াল-আলোটা যথাসম্ভব কমিয়ে (এ বাজে খবরটাও ইদানীং করা হচ্ছে অম্বিকাপদর নির্দেশে) প্রমীলা এসে মহাশ্বেতার দোরের সামনে দাঁড়াল। মহাশ্বেতা এতক্ষণে একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়—কিন্তু তরলা এখনও বসে বসে বাতাস করছে। প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেও প্রমীলার উপ-স্থিতি টের পেল তরলা, সে পাখাখানা নামিয়ে রেখে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। চুপিচুপি বলল, 'এই সবে ঘুমিয়েছে।' কিন্তু আজ কি আর ওকে এখন একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে?......আমি বরং থাকি, আপনি আপনার দেওরকে একটু বলে দিন, দোর দিয়ে শুয়ে পড়তে!'

প্রমীলা সে কথার কোন উত্তর দিল-না, অল্প কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে কেমন একরকম দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'শোন্, আমার সঙ্গে একবার ওপরে আয়, একটা মজা দেখাব!'

সামান্য আলো, তবু তার বিচিত্র দৃষ্টিটা তরলার চোখ এড়ায় নি। তার মনে হল প্রমীলার দুই ওষ্ঠের প্রান্তে একটা কৌতুকের হাসি চাপবার চেষ্টা করছে সে। অকারণেই তার বুকটা কেঁপে উঠল।

কিন্তু প্রমীলা তাকে কিছু ভাববার সময় দিল না। তার একটা বাহুমূল ধরে একরকম টেনেই নিয়ে চলল ওপরে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ-দিকে তরলাদের ঘর, কিন্তু সে দিকে গেল না প্রমীলা, ডান দিকে মোড় নিয়ে একেবারে দালানের সর্বশেষ প্রান্তে বুড়োর ঘরের সামনে গিয়ে থামল।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল তরলার—যা কিছু দেখবার। যা দেখাতে চায় প্রমীলা, যা দেখাতে এনেছে।

ঘরের মধ্যে আলো থাকে না সাধারণত, কিন্তু আজ ছিল। বোধ হয় ছেলেমানুষ একা থাকবে বলেই মেজ-বৌ বলে দিয়ে-ছিল হ্যারিকেনটা কমিয়ে রাখতে— কিম্বা তখনও শুয়ে পড়েনি বলেই জেলে রেখেছিল তড়িত।

মশারীর বাইরে দাঁড়িয়ে তড়িতের একটা হাত ধরে টানছে দুর্গাপদ, তড়িত চেষ্টা করছে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে। সম্ভ-বত মশারীর মধ্যেই ছিল সে—দুর্গাপদই তাকে বাইরে টেনে এনেছে, অন্তত অবস্থা দেখে তাই মনে হয়। কারণ তড়িতের গায়ে-মাথায় কাপড় ঠিক অসম্বৃত না হ'লেও অবিনাস্ত, তার কপালের কোলে কোলে ঘাম জমে উঠেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। সে বেঁকে-চুরে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

ওরা কেউই লক্ষ্য করেনি এদের। প্রমীলাই জানিয়ে দিল নিজেদের উপ-স্থিতিটা। নিঃশব্দে চলে যাবে বলে সে আসেনি, এক ঢিলে অনেক পাখী মারবার ব্যবস্থা তার। সে একটা চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল যেন, হাসতে হাসতেই তরলার একটা হাত ধরে বলল, 'হ'ল তো? চ, এবার নিচে যাই।'

হাসি যতই চাপা হোক তার শব্দ মাত্র হাত তিনেকের ব্যবধানে না পৌঁছবার কথা নয়। দুজনেই শুনতে পেল। দুর্গা-পদ হঠাৎ বিছে-কামড়ানোর মতোই তড়িতের হাতটা ছেড়ে দিলে, কিন্তু তখনই কোথাও পালাতে কি আত্মগোপন করতে পারল না, যেন পাথর হয়ে গেল সে। শুধু তড়িত ছুটে বাইরে এসে প্রমীলাকে জড়িয়ে ধরল, কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'নিত্যি এমনি ফাঁক পেলেই টানাটানি করবে ছোট্-কা। আমি লজ্জায় বলতে পারি না কাউকে, কিন্তু আমার আর ভাল লাগে না বাপু—রোজ রোজ এই জ্বলাতন-পোড়াতন। ওঁকে বললেও যা না বললেও তাই—দাঁত বার ক'রে হাসে শুধু!...... তুমি তো এবার নিজে-চক্ষে দেখে গেলে—যা হোক একটা বিহিত করো মেজকাকী!'

(ক্রমশঃ)

অয়স্কান্ত

॥ বিজ্ঞানের দর্শন ॥

বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেম্‌স্‌ জীন্‌স বিজ্ঞানকে তুলনা করেছিলেন অন্তহীন সমুদ্রে জাল দিয়ে মাছ ধরার সঙ্গে। এই সমুদ্রটি হচ্ছে বাস্তবতার সমুদ্র আর জালটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই উপমাটির সাহায্যে তিনি একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, অন্তহীন সমুদ্রে এমন অনেক কিছুই থেকে যায় যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জালের নাগালের বাইরে। স্যার জেম্‌স্‌-এর এই উক্তিটি এমন কি আজকের দিনের আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে বাস করেও সম্পূর্ণ বাতিল করা চলে না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে কয়েকটি অত্যন্ত সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা তুলতে চাই।

বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি ঘটনা সম্পর্কেই দু-অক্ষরের একটি ছোট্ট প্রশ্ন করা চলে : কেন? মোটরগাড়ি চলে কেন? আকাশ নীল কেন? গোরু কেন? হাতি কেন? এমনি অন্তহীন 'কেন' পর-পর সাজিয়ে যেতে কোনো বাধা নেই। আর এই প্রশ্নটি আজকের নয়, পৃথিবীতে যবে থেকে মানুষ এসেছে সেই জন্ম-মুহূর্ত থেকেই।

আকাশ নীল কেন? প্রশ্নটি চিরকালের মানুষকে ভাবিত করেছে। দুভাবে প্রশ্নটির জবাব দেওয়া যেতে পারে। একদল বলবেন, ভগবান আকাশকে নীল করেছেন তাই আকাশ নীল। বলা বাহুল্য, এই জবাবে ঈশ্বর-বিশ্বাস যতোটা প্রকাশ পাচ্ছে, মানুষের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার আগ্রহ ততোটা নয়। আসলে এ-ধরনের জবাব জবাব-এড়িয়ে-যাওয়ার নামান্তর।

অতএব, আকাশ নীল কেন, এ-প্রশ্নের জবাবে পদার্থবিদ্যার সূত্র অনুসরণ করে কার্যকারণের ব্যাখ্যা অনুসরণ করা দরকার। তখন বলতে হবে : পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আছে অজস্র কণিকা, সূর্যের আলোয় আছে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি; কণিকাগুলো সূর্যের আলোর ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়; ফলে পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হয় যে, ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মিগুলো সূর্য থেকে নয়, সারা আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে; মানুষের চোখে এই ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মির রঙ নীল বলেই আকাশ নীল।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই ব্যাখ্যা শোনার পরে থেমে যাওয়ার উপায় নেই। ব্যাখ্যা স্পষ্টতর করার জন্যে তখন আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা শুরু করতে হয়। আর গবেষণার সূত্র ধরে অগ্রসর হতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট আরো অনেক প্রশ্নের জবাব বেরিয়ে পড়ে।

বিজ্ঞান এমনিভাবেই জাগতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে।

কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই উপলব্ধি করা যাবে যে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতেও অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে। ঈশ্বরবিশ্বাসী বলছেন, সৃষ্টির কারণেই আকাশ নীল। বিজ্ঞানী বলছেন, আলোর গতিপথের বৈশিষ্ট্যের জন্যেই আকাশ নীল। দুটি জবাব থেকেই শেষ পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে তা 'কেন' নয়, 'কি করে'। অর্থাৎ, আমরা জানছি আকাশ কোন্‌ কোন্‌ কারণে নীল হয়েছে; কেন নীল হয়েছে, কোন্‌ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে, তা আমাদের অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে।

মনে করা যাক, দাঁতে-দাঁত লাগানো দুটি চাকা ঘুরছে। একটি চাকায় দাঁত আছে ছত্রিশটি, অপরটিতে বারোটি। এক্ষেত্রে একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। আমরা বলতে পারি, ছত্রিশটি দাঁতওলা চাকার একটি পাকে বারোটি দাঁতওলা চাকার পাক হবে তিনটি। এ-ঘটনার কোনো ব্যতিক্রম নেই। একটি চাকা ঘুরলে অপরটিও অবশ্যই ঘুরবে এবং একটির এক পাকে অপরটি অবশ্যই তিন পাক। কার্য-কারণ সম্পর্কের দিক থেকে এই ঘটনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্ভব। কিন্তু যদি প্রশ্ন ওঠে, দাঁতওলা চাকা কেন, তার জবাব কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে পাওয়া যাবে না। জাগতিক ব্যাপার অবশ্যই দাঁতওলা চাকার পাক খাওয়ার মতো সরল নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি জাগতিক ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আসলে এই কার্যকারণ সম্পর্কেরই অনুসরণ : ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত কতকগুলো কারণের পরিণতি স্বরূপ একটি কার্য। আকাশকে আমরা নীল দেখি। এটি হচ্ছে কার্য। এই-এই অবস্থার জন্যে আকাশ নীল। এগুলো কারণ। এক্ষেত্রে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি, একটি বিশেষ জগৎ-ব্যবস্থার পরিমাপ্য কাঠামোর মধ্যে এই-এই কারণ ঘটলে এই-এই কার্য আশা করা যেতে পারে। অর্থাৎ এই গোড়ার কথাটাই এসে যাচ্ছে। আমরা জানছি 'কি করে?' আমরা জানছি না 'কেন?'

আকাশ নীল কেন, এ-প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞানী বলতে পারেন, এই-এই কারণে নীল। কিন্তু শ্রোতা অবশ্যই প্রশ্ন তুলতে পারেন—আকাশ যে নীল তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী? সার্থকতা কী? এ-প্রশ্নের জবাব এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানের জানা নেই। সম্ভবত এ-প্রশ্নের শেষ জবাব কোনো কালেই জানা যাবে না। কারণ এই শেষ জবাবটি জানার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি, মানুষের জ্ঞানের পূর্ণতা।

উদ্দেশ্য ও সার্থকতার প্রশ্নটিকে

আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন, পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে, এটি একটি ঘটনা। অস্তিত্ববাদের সূত্রে এই ঘটনার ব্যাখ্যাও আছে। কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায় : পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে? পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের সার্থকতা কী? বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারে এ-প্রশ্নের জবাব নেই। সম্ভবত বিজ্ঞানী বলবেন, এ-প্রশ্নের জবাব দেবার দায়িত্বও বিজ্ঞানের নয়। জবাব দেবে শিল্প, ধর্ম ও দর্শন। আসলে মানুষের শিল্প ধর্ম ও দর্শন যুগে-যুগে এই প্রশ্নেরই জবাব দেবার চেষ্টা করেছে। সকলের কাছে তা গ্রাহ্য কিনা সে-কথা আলাদা।

বিজ্ঞানী যখন কোনো জাগতিক ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করেন, তার শুরুতে থাকে একটি ঘটনা। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই তাঁর পর্যবেক্ষণ, অনুমান, পরীক্ষা-কার্য ও ব্যাখ্যা। কিন্তু সবকিছুর পরেও স্বীকার করতে হবে, ঘটনাটির দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে তা পরিমাপ করার কোনো যন্ত্র বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতে নেই। তার প্রয়োজনও নেই। কারণ, বিজ্ঞানীর গবেষণার ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধ থাকছে কোন্ কোন্ কারণ অনুষ্ঠিত হবার ফলে কোন্ কোন্ কার্য সংঘটিত হচ্ছে তার ব্যাখ্যায়। একটি স্লট্‌মেশিনে মুদ্রা ফেললে ওজন-জ্ঞাপক কার্ড বেরিয়ে আসে। বিজ্ঞানী বলবেন, ওজন-জ্ঞাপক কার্ড প্রাপ্তিতেই যন্ত্রের উদ্দেশ্যসাধন। একথার অর্থ এই নয় যে বিশ্বজগতও বিজ্ঞানীর কাছে একটি স্লট্‌মেশিনের মতো। তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, এই বিশ্বজগৎ নিয়ত-পরিবর্তনশীল, নিয়ত-উত্তরণশীল, অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। এবং বিজ্ঞানীও এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তবু পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার দ্বারা তিনি এই প্রক্রিয়াটিকেই অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন। এই অনুধাবনের ক্ষেত্রে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রকমের যথাযথ, অতিমাত্রায় সঠিক। কিন্তু তারপরেও স্বীকার করতে হবে, এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি কী, তা তাঁর গবেষণার বিষয় নয়।

আলোচনায় যদি এখানে এসেই থামা যেত তাহলে কোনো জটিলতা ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি এমন কতকগুলো আবিষ্কারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে এখন আর কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে জাগতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। গ্যালিলিওর আগে প্রায় দু-হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ নীতি মেনে নিলে পরেই জগৎ-ব্যাপারের সম্পূর্ণ একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করা সম্ভব। বস্তু মাটিতে পড়ে কারণ মাটিই তার যথার্থ স্থান। ধোঁয়া আকাশে ওঠে কারণ আকাশই তার যথার্থ স্থান। এই নীতিকে মেনে নিলে কেন মাটিতে পড়ে আর কেন আকাশে ওঠে তার কার্য-কারণ সম্পর্কের প্রশ্নটি অবান্তর হয়ে ওঠে। গ্যালিলিওই প্রথম প্রশ্ন তুললেন : কেন? কী কারণে? পরের যুগে এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েই নিউটন আবিষ্কার করলেন গতিবিজ্ঞানের কতকগুলো সূত্র। তখন অনায়াসেই বিশ্বাস করা গেল যে, জগৎ-ব্যাপারের মূলে রয়েছে কতকগুলো যান্ত্রিক নিয়মের অনুসরণ। স্লট্‌মেশিন থেকে ওজনজ্ঞাপক কার্ড বেরিয়ে আসার ঘটনাকে যেমন ব্যাখ্যা করা চলে, তেমনি করা চলে এই বিশ্বজগতকেও।

কিন্তু তারপরে বিশ শতকের গোড়ার দিকের দুটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই নিউটনীয় বিশ্বতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে। দুটি আবিষ্কারের একটি হচ্ছে কোয়ান্‌টাম তত্ত্ব, অপরটি আপেক্ষিক তত্ত্ব। প্রথমটির আবিষ্কারক মাক্স্ প্লাংক, দ্বিতীয়টির আইনস্টাইন। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে এই দুটি তত্ত্ব দুটি স্তম্ভবিশেষ। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা এই দুটি স্তম্ভের ওপরেই। প্রথম তত্ত্বটির অনুসন্ধান-ক্ষেত্র পরমাণুর অভ্যন্তর, দ্বিতীয়টির অন্তহীন মহাকাশ।

সকলেই জানেন, উত্তপ্ত বস্তু জাজ্বল্য হয়ে উঠলে দীপ্তিমান হয়। নিঃসৃত দীপ্তি প্রথমে হয় লাল, তারপরে উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথাক্রমে কমলা, হলদে ও সাদা। বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকেই এই তেজ-বিকীরণের ব্যাপারটিকে একটি সূত্রের মধ্যে প্রকাশের চেষ্টা করছিলেন। এই বিষয়ে [illegible] সাফল্য অর্জন করলেন মাক্স প্লাংক। একটি গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে তেজ-বিকীরণের যে ব্যাখ্যা তিনি উপস্থিত করলেন তা প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এই যে তেজ-বিকীরণের ব্যাপারটি ঘটে অবিচ্ছিন্ন ধারায় নয়, দমকে দমকে, যার নাম তিনি দিলেন 'কোয়ান্‌টা'। এই আবিষ্কার ১৯০০ সালে।

আরো পাঁচ বছর পরে আইনস্টাইনের গবেষণার ফলে কোয়ান্‌টাম তত্ত্ব নতুন তাৎপর্য লাভ করল। আইনস্টাইন বললেন যে, কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, সকল ক্ষেত্রেই (তা আলোই হোক বা উত্তাপই হোক বা এক্‌স্-রেই হোক) তেজ-বিকীরণের ব্যাপারটি ঘটে থাকে অসম্পৃক্ত ও বিচ্ছিন্ন কোয়ান্‌টার দমকে। আগুনের সামনে বসলে আমরা যে তাপ অনুভব করি তা আসলে আমাদের শরীরের চামড়ার ওপরে বিকীরিত উত্তাপের অসংখ্য কোয়ান্‌টার আঘাতের ফল। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তিনি ঘোষণা করলেন যে, আলোও আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারার তরঙ্গ নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি। এই কণিকাগুলোর নাম তিনি দিলেন 'ফোটোন'। কিন্তু তারপরেও এমন কতকগুলো ব্যাপার থেকেই গেল যা আলো-কে তরঙ্গ হিসেবে কল্পনা না করলে ব্যাখ্যাই করা চলে না। অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, আলো তরঙ্গও বটে, কণিকাও বটে।

পরবর্তী কালের গবেষণা বিষয়টিকে আরো অনিশ্চিত করে তুলেছে। বলা হচ্ছে, বস্তুর বা অন্যতম মূল উপাদান, যাকে বলা হয় ইলেকট্রন, সেটি কোনো কঠিন কণিকা নয়, তরঙ্গের একটি বিশেষ বিন্যাস। এই তত্ত্বকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে একথাই বলতে হয় যে, আমরা বাস করছি এক তরঙ্গময় জগতে। বস্তুকণা বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই, সবকিছুই তরঙ্গসমষ্টি। এ-বিষয়ে ধারণা দিতে গিয়ে স্যার জেমস্ জীনস্ বলেছেন যে গোলাকৃতি কঠিন বস্তুকণার বিশেষ একটি অবস্থান থাকে, ইলেকট্রনের তা নেই। কঠিন বস্তুকণাকে খানিকটা জায়গা দখল করতে হয়। ইলেকট্রন জায়গা দখল করে কিনা সে-আলোচনায় যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তার চেয়ে বরং আলোচনা করা ভালো যে, আতঙ্ক বা উদ্বেগ বা অনিশ্চয়তা কতখানি জায়গা দখল করে।

পদার্থবিজ্ঞানের এই পরিপ্রেক্ষিতটি সামনে রাখলে স্বীকার করতে হয় যে, বিশ্বজগতকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা মানুষের পক্ষে কোনো কালেই সম্ভব নয়। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই প্রকট হতে থাকবে। এ-প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের একটি চমৎকার উপমা আছে। আলোর একটি বৃত্ত ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এই বৃত্তের পরিধি [illegible] বাড়া হবে [illegible] অন্ধকারকেও স্পর্শ করবে।

বিদেশী সাহিত্য

।। সাতাত্তরের কবি এজরা পাউণ্ড ।।

সাতাত্তর বছর বয়সে কবি এজরা পাউণ্ড বলেছেন : "আই স্যাল নেভার রাইট অ্যানাদার লাইন।" কারণ তিনি মনে করেন : "এ গ্রোইং নলেজ অব্ এররস্"। আধুনিক চিত্রকলায় পিকাসোর যেমন স্থান, আধুনিক কবিতায় ক্ষেত্রে এজরা পাউণ্ডের স্থান ততখানি বৃহৎ। কাব্যচর্চার প্রথম অধ্যায়ে সাদর অভ্যর্থনা না মিললেও বেশ কিছুকাল বাদেই কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইংলণ্ডের নতুন কাব্যান্দোলনে পাউণ্ডের স্থান উল্লেখযোগ্য। টি, এস, এলিয়ট, উইণ্ডহ্যাম লুইস, জেমস জয়েস ইয়েটস—এ'রাই ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ, তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী। আধুনিক ইংরিজি কবিতায় পাউণ্ডের মূল্যবান অবদান হল আঙ্গিকগত পরিবর্তনে। তার জন্য পাউণ্ডকে দীর্ঘকাল গভীরভাবে পড়াশুনা করতে হয়েছে। পৃথিবীর বহু প্রাচীন ভাষার কবিতা অনুবাদ করে নিজের চিন্তাশক্তির বৈচিত্র্যসাধনায় তৎপর হয়ে ওঠেন। একালের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পাউণ্ড খ্যাতি লাভ করেছেন যেমন, তেমনি নিন্দাবাদও যে তাঁর ভাগ্যে জোটেনি এমন নয়। কিন্তু যে বলিষ্ঠতম

এজরা পাউণ্ড

ব্যক্তিত্ব তাঁর কাব্য-জগতে সুস্পষ্ট তাই-ই তাঁকে স্বতন্ত্র কবি-খ্যাতি দান করেছে।

কিন্তু বার্ধক্যের অনিবার্য আঘাতে আজ পাউণ্ড যেভাবে কাজের জগত থেকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন তা আমাদের প্রত্যেকের কাছেই বেদনাদায়ক। তাঁর দীর্ঘ কাব্য-সাধনার সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত—যাঁরা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তগুলিতে তাঁর সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন—তাঁদের অনেকেই হয়ত আজ এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু জীবন্ত একটি মানুষকে ধীরে ধীরে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে নীরব হয়ে যাওয়ার এমন করুণ কাহিনী আমাদের প্রত্যেককেই আজ প্রচণ্ডভাবে আঘাত দিয়েছে।

।। চারশততম জন্ম-বর্ষ—সেক্সপীয়র ।।

১৯৬৪ সালের ২৩ এপ্রিল সেক্সপীয়রের চারশততম জন্ম-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলেছে বিশ্বব্যাপী। বিভিন্ন পুস্তক ব্যবসায়ী নানাভাবে এই চিরজীবী নাট্যকারকে স্মরণ করবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। 'ডিক্সনারী অব্ সেক্সপীয়ারস্ কোটেশানস্'—পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিক্ষিত মানুষের কাছেই বিশেষভাবে পরিচিত। সেক্সপীয়র সংকলনে ডি সি ব্রাউনিং-এর এই গ্রন্থখানি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৬৪ সালে এর একখানি চারশততম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। 'থিয়েটার রিসার্চে'র সম্পাদক ফিলিস্ হার্টনল সমস্ত অলংকরণগুলি অনুমোদন করেছেন। পুনঃসম্পাদিত হওয়ার পর উদ্ধৃতি বা নির্বাচিত অংশগুলির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় চারশ, এবং কাহিনী সারাংশ, বিভিন্ন সময়ে সেক্সপীয়র সম্পর্কে আলোচনার অংশবিশেষ এবং নানারকম সেক্সপীয়র সংক্রান্ত সংবাদ-এ গ্রন্থখানি বিপুলায়তন ধারণ করবে।

।। দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ।।

সম্প্রতি দুখানি সমালোচনা গ্রন্থ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই সাহিত্য-রসিক পাঠক মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ডিফো, রিচার্ডসন এবং ফিল্ডিং-এর উখেযোগ্য রচনাবলীর সত্য-মূল্য প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন আয়ান ওয়াট—'দি রাইজ অব্ দি নভেল' গ্রন্থে। আজকের দিনে যাকে আমরা উপন্যাস বলি তার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে মল ফ্লানডারস্' (১৭২২), পামেলা (১৭৪০) এবং টম জোন্স (১৭৫২)-এ। (ডেনিয়েল ডিফো, সামুয়েল রিচার্ডসন, হেনরী ফিল্ডিং:—প্রকৃতপক্ষে এ'দের হাতেই ইংরিজি উপন্যাসের জন্ম) 'নিউ বিয়ারিঙস্ ইন ইংলিস পয়ট্রি' লেখবার পর লিভস সমালোচক ও পাঠক মহলে প্রচণ্ড নিন্দাবাদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে গ্রন্থখানির প্রশংসায় গ্রন্থখানির বিক্রি বহুগুণে বেড়ে গেছে। এলিয়ট, পাউণ্ড, হপকিন্স—যাঁদের কপালে কবিতা প্রকাশের প্রথমাবস্থায় প্রচণ্ড নিন্দাবাদ জুটেছিল দুর্বোধ্যতা আর অর্থহীনতার অভিযোগে, তাঁরাই আজকের যুগের উল্লেখযোগ্য কবি। একদা নিন্দিত ও বর্তমানে প্রশংসিত—আমাদের যুগের এই সব স্মরণীয় কবিদের আলোচনা রয়েছে বর্তমান গ্রন্থখানিতে।

উইণ্ডহ্যাম লুইস

।। মূল্যবান পত্র সংকলন ।।

উইণ্ডহ্যাম লুইসের একটি পত্রাবলীর সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। লুইস মারা যান ১৯৫৭ সালে। সমস্ত জীবনব্যাপী তিনি শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। বিশশতকের প্রথমার্ধের বুদ্ধিজীবীমহলে লুইস ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তাঁর তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাস 'দি হিউম্যান এজ্'—এক সময়ে সাহিত্য-জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। জীবিতকালে বহু বিখ্যাত লেখক ও শিল্পীর সঙ্গে লুইসের যে সমস্ত পত্রবিনিময় হয়েছিল সেগুলি নিয়েই বর্তমান পত্র-সংকলনখানি প্রকাশিত হয়েছে।

।। গ্রীসের ইতিহাস ।।

উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল ম্যাকেনড্রিক প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থগুলির জন্য পাঠকমহলে সুপরিচিত। গত বছর তাঁর 'দি মিউট স্টোনস স্পিক' প্রকাশিত হলে টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট লিখেছিলেন :

> "first-class **Laute Vulgarisation,** the fruits of deep scholarship presented in most palatable form, a civilised **sade mecum** for any modern traveller making the twentieth century equivalent of Grand Jour".

সাধারণভাবে প্রায় সকল সমালোচকই একমত হয়েছিলেন যে, ইটালীর পুরাতাত্ত্বিক পরিচয় এমন জীবন্ত ও মনোরমভাবে কেউ ইতিপূর্বে বলতে পারেন নি। এ বছরেই ম্যাকেনড্রিকের 'দি গ্রীক স্টোনস স্পিক' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক জীবন ভাষাও ছবির মধ্য দিয়ে অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। প্রায়াম পূর্ববর্তী ট্রয় থেকে শুরু করে হাড্রিয়ান পরবর্তী এথেন্স-এর কাহিনীই বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

সেকালের পাতা : একালের চোখ

রত্নাকর

কলকাতা এখন অতি সভ্য। শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। কিন্তু ব্যবসাদার হয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন সামান্য দু'-একটি প্রতিষ্ঠান। তার জন্য দীর্ঘ বিজ্ঞাপন কে দিতে যাবে? কিন্তু সেকালের কলকাতায় দীর্ঘ বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। আসত বিলিতী শিল্পীর আঁকা ছবি। মোটা মোটা ফ্রেম। সেই ছবি কিনতেন কলকাতার বনেদী বাবুরা। আজও সাবেকী বাড়িতে তার চিহ্ন আছে। বিজ্ঞাপনের একটা নমুনা দেওয়া হল।

কলকাতায় তখনও ভাল লাইব্রেরী হয় নি। অথচ বই পড়ার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক সভ্য মানুষের মধ্যেই থাকে। সেকালের সব সাহেবরাই হুল্লোড়-বাজ নয়। তাই কয়েকজনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল ক্যালকাটা লাইব্রেরী সোসাইটি। এই সোসাইটির কর্মধারা জেনে রাখা দরকার। এই ধারায় হয়ত গড়ে উঠতে পারে পারিবারিক পাঠাগার। ক্যালকাটা জার্নাল থেকে সেই ক্লাবের খবর দেওয়া হল।

রামমোহনকে নিয়ে আমেরিকার কাগজও মাতামাতি করেছিল এই খবরে খুশি হবেন অনেকেই।

নোটিশ

ওয়াটারলু যুদ্ধের ছবি আমাদের শো রুমে সম্প্রতি দেখান হচ্ছে। এই বিরাট ছবিটি কলকাতার বহু গণ্যমান্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সর্ব-সাধারণের জ্ঞাতার্থে আমরা জানাচ্ছি যে যাঁরা এখনও এই ছবিটি দেখেন নি তাঁরা আমাদের শো রুমে পদার্পণ করতে পারেন। সুন্দর ভাবে ছবি টানাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শিল্পীর নামও আমরা প্রকাশ করেছি।

১৮২৫ সালে 'মার্কুইস অব ওয়েলিংটন' নামক জাহাজে এই ছবির ফ্রেম আমদানি করা হয়েছে এবং ওই বছরই 'জর্জ হোম' নামক বেসরকারী জাহাজে এসেছে এই ছবি।

আমরা যতদূর জানি এই ছবি ইতি-পূর্বে কলকাতায় কখনও প্রদর্শিত হয় নি। যদি হয়েও থাকে তবে প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তির এই ছবি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আশা করি আরও বহু উৎসাহী ব্যক্তি আছেন যাঁরা এই ছবি দেখতে আগ্রহী। তাঁদের আগ্রহ চরিতার্থ করার জন্য আমাদের এই ব্যবস্থা। রসিকজনের অন্তরে আমরা কোন ক্ষোভ রাখতে দেব না। অত্যন্ত যথাযথ হয়েছে এই ছবি। শিল্প-রীতি এক কথায় অনবদ্য।

পেনগোলি, মর্টিমার অ্যান্ড কোং
(ক্যালকাটা গেজেট। ১৩-২-১৮২৬।
অনুদিত)

ক্যালকাটা লাইব্রেরী সোসাইটি। সোসাইটি পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। যারা লেখাপড়া চর্চায় উৎসাহী তাদের পক্ষে এই সোসাইটি খুবই ফলপ্রদ হবে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিকতম ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। অথচ এই জন্য তাঁদের যা ব্যয় করতে হবে তা খুবই সামান্য।

এই লাইব্রেরীর বর্তমানে ২৭০০টি গ্রন্থ আছে। তা ছাড়া প্রতি মাসেই ইংলণ্ড থেকে সদ্য প্রকাশিত ও সুনির্বাচিত গ্রন্থ এই লাইব্রেরীতে আসবে। প্রত্যেকটি গ্রন্থ দু' কপি করে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কপি লাইব্রেরীর জন্য রাখা হবে এবং অন্য কপি বিক্রি করার অধিকার থাকবে লাইব্রেরীর। এর ফলে সাধারণ পাঠক উপকৃত হবেন। তাঁরা সামান্য দামে নূতন বই সংগ্রহ করতে পারবেন।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভদ্রলোকের উৎসাহে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। জনসেবাই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। একদিন এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান থেকে সাধারণ পাঠাগার গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপন করতে চান উদ্যোক্তরা। এই লাইব্রেরীতে যে সব গ্রন্থ আছে তার জন্যই সভ্যদের প্রবেশমূল্য বাড়ান উচিত বলে মনে হয়। কিন্তু ১লা মে-এর আগে সভ্যদের প্রবেশমূল্য বাড়ান হবে না বলে স্থির করা হয়েছে। তাই ইতিমধ্যে উৎসাহী ব্যক্তিরা বর্ধিত প্রবেশমূল্য না দিয়েই "প্রোপাইটার্স" হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।

গত ২৯শে মার্চ লাইব্রেরী ভবনে "প্রোপাইটার্স"দের একটি সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় :

এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে এই সোসাইটির কর্মধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।

ভবিষ্যতে এই সোসাইটির জন্য কোন নূতন সদস্য গ্রহণ করা হবে না। বর্তমানে যাঁরা সোসাইটির সভ্য আছেন তাঁরা সোসাইটির বিধিমত এককালীন ১৬০্ টাকা দান করে "প্রোপাইটার্স" হতে পারবেন।

১লা এপ্রিল থেকে "প্রোপাইটার্স"-দের মাসিক চাঁদা ৬্ টাকা থেকে ৮্ টাকা করা হবে।

১লা মে'র পর থেকে যাঁরা এই সোসাইটির "প্রোপাইটার্স" হিসাব যোগ দিতে চান তাদের এককালীন ২০০্ টাকা দান হিসাবে দিতে হবে।

ডঃ ডবলু রাসেল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

আগামী বছরের জন্য এই কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে কার্যকরী কমিটি গঠন করা হল : রেভাঃ জে, পারসন, জেমস কেলডার, জেমস ইয়ং, জি, জে, গর্ডন। জে, রবিসন সন হলেন এই সোসাইটির সম্পাদক।

(ক্যালকাটা জার্নাল। ৬-৪-১৮১৯।
অনুদিত।)

আমেরিকান রিভিউ-এর একটি সংখ্যা আমাদের হস্তগত হয়েছে। আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে এদেশের হিন্দুদের মধ্যে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় যে পান্ডিত্য ও দার্শনিকতাপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার ঢেউ সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত গিয়েছে। আমরা এই দেখে আরও তৃপ্তিলাভ করেছি আমেরিকার অধিবাসীবৃন্দ রামমোহনের বক্তব্য সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন রামমোহনের মতবাদের কী সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সেই পত্রিকার আলোচ্য প্রবন্ধটি পুনর্প্রকাশ করতে পারি। ভারতীয় বিষয়ের ওপর আমেরিকার সমালোচকের রচনার সাহিত্যগত দিক থেকেও মূল্যবান।এর একটা আলাদা মর্যাদা আছে। তা ছাড়া উক্ত আলোচনা হয়ত রামমোহনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কিঞ্চিৎ ফলপ্রসূও হতে পারে। এই তপস্বীর ও অনাড়ম্বর মনীষীর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। আমরা দেখিছি কী দুঃসহ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে রামমোহন তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রতিকূলতার সামনে সাধারণ মানুষ দাঁড়াতেই সক্ষম হত না। তাই রামমোহনের মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের কাজে আমরাও আমাদের সামান্য ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত এবং এই সাহায্যের মধ্য দিয়ে আমরা বিপুল আনন্দ লাভ করব।

(ক্যালকাটা জার্নাল থেকে অনুদিত।
১০, ১০, ১৮১৮)

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সত্যিই দিদিমণিরা চলে গেলেন।

এক সপ্তাহ হৈচৈ হাঙ্গামার মধ্যে দিন কাটিয়ে আবার সেই আগের শান্ত জীবন ফিরে এল এই বাড়ীতে। ব্রজবালা দেবী, তুবড়ী আর আমি—সেই তিনজন। আবার ঘরে ঘরে তালা বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের জন্যে খোলা রইল সেই আড়াই-খানা ঘর, আধখানা বারান্দা, আর নীচের বাগান। রাত্রে আর ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। পোড়ো বাড়ীতে আলো জ্বলতে দেখিনি, অদ্ভুত শব্দও কোন রকম ভেসে আসেনি কানে।

ব্রজবালাদেবী দিদিমণি থাকতে সব সময় নিজের ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতেন। আমাদের কাউকেও ডাকতেন না কাছে। বেশীর ভাগ সময় তাকে চিন্তারত দেখেছি। কপালে ভাবনার রেখা। এখন আবার তাঁর স্বাভাবিক জীবন ফিরে এসেছে, এ ব্রজবালাদেবীকে আমি চিনি কিন্তু আগের সপ্তাহে যাঁকে দেখেছি, তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। যেন অতীত যুগের মানুষ।

তুবড়ী আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একদিন ভয়ে ভয়ে সে শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি। আগের মত সে আর দুর্দান্ত নেই। কথা বললে শোনে, সময়ে অসময়ে কাছে এসে বসে, পড়া দিলে পড়ে আর সবচেয়ে বড় কথা, যা অন্ততঃ আমি অনুভব করতে পেরেছি, সে আমাকে ভালবাসে।

তুবড়ীর মতে, দিদি আমায় দু'চোখে দেখতে পারে না। ও সব সময় যাকে ক্ষেপিয়ে দেয়, আর বাবা, ও'কে কেউ গ্রাহ্য করে না। উনি যেন কিরকম।

তুবড়ীর এ কথাগুলো আমি কত সময়ে ভেবেছি। ছোট ছেলে হলেও ওর বোঝবার ক্ষমতা আছে। মাত্র সাতদিন দেখেই আমার অন্ততঃ এটুকু ধারণা হয়েছে শীলা সরল মেয়ে নয়। তার চোখে মুখে প্রায়ই একটা নিষ্ঠুর ভাব ফুটে ওঠে, যাকে বিশ্বাস করা শক্ত। শীলা আমারই বয়সী মেয়ে, কিন্তু সে কি চায়, বোধহয় নিজেই জানে না।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি আরও পড়বেন?

শীলা উত্তর দিয়েছিল, পড়তে আর ভাল লাগে না।

—তাহলে এর পর কি করবেন?

—ভাবছি বাইরে যাব, ইওরোপে, আমেরিকায়।

—কিসের জন্যে?

শীলা অন্যমনস্ক স্বরে উত্তর দেয়, জানি না। তবে এদেশে থাকতে আর ভাল লাগছে না। বড় একঘেয়ে আর নিরামিষ জীবন এখানকার। আমি চাই লাইফ্, যা হয়ত ইওরোপে গেলে পাব।

কথা বলতে বলতে শীলার চোখ-গুলো জ্বল জ্বল করে উঠ্ল, কিন্তু এর জন্য টাকার দরকার। অনেক টাকা।

বললাম, আপনাদের টাকার অভাব কি?

—টাকা হয়ত আছে, কিন্তু সে আমার নয়।

শীলার সঙ্গে কথা বলে আমার এইটুকু ধারণা হয়েছিল, কারুর সঙ্গেই যেন তাঁর আত্মিক সম্বন্ধ নেই। কাউকেই সে আপনার মনে করে না। তবে তার জাতক্রোধ বোধ হয় তুবড়ীর উপর। তাকে দেখলেই সাপিনীর মত সে হিস্ হিস্ করে, কখন তাকে ছোবল বসাবে।

কিন্তু দিদিমণিকে আমি বুঝতে পারিনি। এমনিতে কথায় বার্তায় ব্যবহারে, আমার বেশ ভালই লেগেছিল। অথচ শেষ রাত্রে ব্রজবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন আমায় বিচলিত করেছে। তিনিও কি শীলার মতই কাউকে বিশ্বাস করেন না। সেই জন্যেই কি আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনুরোধ করেছেন ব্রজবালা দেবীর উপর নজর রাখতে। কিন্তু এ সবের কারণ কি? ঐখানেই একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

তৃতীয় মানুষটি ওদের মধ্যে একে-বারে খাপছাড়া। আমার মনে হয়েছে কমলেশবাবু শুধু শান্তিপ্রিয়ই নন, একেবারেই সাতে পাঁচে থাকতে চান না। তাঁর চোখে আমি দেখেছি উদাস দৃষ্টি, ব্যবহারে বিনম্র ভাব। কথাবার্তায় এতটুকু ঝাঁঝ নেই। প্রথম দু'দিন তাঁকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এক সন্ধ্যেবেলায়, গঙ্গার ধারে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। উনি ভাঙ্গা ঘাটের কাছে চুপ করে বসেছিলেন। আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে একলা বসে আছেন যে!

কমলেশবাবু আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াতে গেলেন, আমি বাধা দিয়ে বললাম, উঠছেন কেন বসুন না।

—হ্যাঁ, বসি। বলে আবার বসে পড়লেন।

পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, একলা একলা এখানে কি করছেন!

ভদ্রলোক আমার প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলেন না, তবে বললেন, একলাই তো ভাল। কারুর সঙ্গে কথা বলতে হয় না। কিছু শুনতেও হয় না। তাই না?

আমি হাসলাম, যার যেরকম ভালো লাগে।

—আমি তখন থেকে বসে বসে ঐ নৌকোটাকে দেখছি। স্রোতের উল্টো-দিকে পাল তুলে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে, মাঝিদের কোন ভাবনা নেই। একজন শুয়ে ঘুমচ্ছে, আর একজন করছে রান্না। যে লোকটা হাল ধরে বসে, সে মালা নিয়ে জপ্ছে। কি চমৎকার জীবন ওদের।

না বলে পারলাম না, নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।

কমলেশবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ঠিক তা নয়। যদি আমি ঐ মাঝিদের মত হতে পারতাম, নিজের ইচ্ছে মত কাজ করার স্বাধীনতা আমার থাকত, বোধ হয় আমি সুখী হতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ, আমাকে হতে হয়েছে ঐ নৌকো।

এই পর্যন্ত বলেই ভদ্রলোক অদ্ভুত রকম হাসলেন, বললেন, সারাটা জীবন স্রোতের বিরুদ্ধে আমাকে চলতে হবে, আর আমার উপর বসে ঐ মাঝিদের মতই কয়েকজন নিজের আনন্দে দিন কাটাবে। একেই তো আপনারা ট্র্যাজেডী বলেন, তাই না?

আমি অবাক হয়ে ও'র কথা শুনছিলাম। বললাম, যদি বুঝতেই পেরে থাকেন, যেদিকে স্রোত, সেই দিকে নৌকোর মুখ ফিরিয়ে নিন না।

—কে ফেরাবে? যে হাল ধরে বসে আছে, সে যে মালা জপ্ছে। ভগবান হয়ত তার সামনে এসে দেখা দেবেন, যে রাঁধছে তার ভোগ হয়ত প্রসাদ করে দেবেন, আর যে ঘুমচ্ছে তাকে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু বেচারী নৌকো, তার কথা তিনি বুঝবেন কি করে? বলেই হা হা করে হাসলেন কমলেশবাবু।

একসময় জিজ্ঞেস করলাম, এখানে থাকতে আর আপনার ভাল লাগছে না?

ভদ্রলোক স্পষ্ট উত্তর দিলেন, না।

—পাটনায় ভাল লাগে!

—সেখানে অন্ততঃ লুকোবার জায়গা আছে।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ী ফিরবেন না?

উনি বললেন, আপনি যান। আমি আর একটু বসে থাকি।

আমি চলে আসছিলাম, কমলেশবাবু আবার ডাকলেন, একটা অনুরোধ করবার আছে।

—বলুন।

—তুবড়ী আপনাকে ভালবাসে, আপনিও তাকে স্নেহ করেন, ও এখনও ঘুমচ্ছে। আমার অনুরোধ, ওকে একটু সাবধানে রাখবেন, যদি কখনও ঘুম ভাঙে, দেখবেন যেন আলোর মধ্যে সে কাজ করতে পারে, আর রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত এর উল্টোটা যেন ওর জীবনেও না ঘটে।

সেদিন বাড়ী ফিরে এসে কমলেশবাবুর কথাগুলো বহুক্ষণ ভেবেছি। খুব স্পষ্ট করে না বললেও এটুকু বুঝেছি, উনি সুখী হতে পারেন নি। শুধু কর্তব্যের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রথম থেকেই ওঁর প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল, সেই সন্ধ্যার পর থেকে সহানুভূতির মাত্রা আরও বেড়ে গেছে।

এখানে একলা বসে আছেন যে?

দিদিমণিরা চলে যাবার দিন তিনেক বাদে গগন সেনের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম, সে লিখেছে,

অর্পিতা,

শেষের দিন তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করেছি। সে কারণ আমি সবিশেষ লজ্জিত। আমি অকপটে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কেন যে সেদিন অতখানি রেগে গেলাম, তা এখনও বললে তুমি বুঝতে পারবে না, তাই শুধুই তোমার মার্জনা চাইছি।

কবে, কোথায়, দেখা করতে পারি জানিও। অনুমতি পেলে তোমার মালিকানের সঙ্গেও আমি দেখা করতে প্রস্তুত, তোমার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম, চিঠি না পেলে জানব, তুমি এখনও আমার উপর রেগে আছ।

আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নিও।

ইতি—

তোমারই

গগন সেন।

গগন সেনের এ চিঠি আমার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। শেষের দিন তার ব্যবহারে আমি ব্যথিত হয়েছিলাম, মনে মনে ঠিক করেছিলাম গগন সেনকে বন্ধু হিসেবে দূরে দূরে রাখাই ভাল, তার মতন খামখেয়ালী লোকের ঘনিষ্ঠতা আনন্দের চেয়ে দুঃখই দেবে বেশী। কিন্তু এ চিঠি পড়ে আমার অভিমান অনেকখানি দূর হল। তাকে জানিয়ে দিলাম সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি কলকাতায় যাচ্ছি। সেই পার্ক স্ট্রীটের রেস্তরাঁয় তার সঙ্গে আমি দেখা করব।

মাসের গোড়ায় মাইনে পেয়ে আমি ব্রজবালা দেবীর কাছ থেকে দুদিনের ছুটি চেয়ে নিলাম। উনি সানন্দে তা মঞ্জুর করলেন। তবে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না আমি যেন ফেরার সময় Seeker বা তার বন্ধুকে বাক্সে-রাস্ত করে তাঁর কাছে নিয়ে আসি। আমি দুদিনের জন্য কোলকাতায় যাচ্ছি শুনে তুবড়ী প্রথমটা গাঁইগাঁই করছিল; কিন্তু আমি যখন তার কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, ফেরার সময় ওর জন্যে বিশেষ কোন উপহার নিয়ে আসব তখন আর মোটেই আপত্তি করল না।

ট্রেনে উঠে মনে পড়ল ঠিক একমাস বাদে কোলকাতায় ফিরছি। এর আগে এতদিন কোলকাতা ছেড়ে আমি বাইরে কোথাও ছিলাম না। হয়ত কোলকাতায় গিয়ে দেখব কতকি বদলে গেছে। আশ্চর্য এই শহরটা। ওখানে কর্ম-ব্যস্ততার কোন শেষ নেই। নিত্যনূতন বাড়ী উঠছে। কোথাও বস্তী ভেঙে সৃষ্টি হচ্ছে পার্ক। কোথাও লেক, কোথাও বা সিনেমা হল। বড় বড় প্যাণ্ডেল, সভাসমিতি, বিয়ে, দোল, দুর্গোৎসব সব অনুষ্ঠানেই এই শহর নতুন রূপে সজ্জিত হয়। হাওড়ায় পৌঁছে কি দেখব কে জানে?

হাওড়ায় আমাদের গাড়ী যখন থামল অফিস যাবার ব্যস্ততা তখন নেই। বেলা বেশী হয়েছে। চেষ্টা করলে ট্রামে বাসে ওঠা যেত। কিন্তু এতদিন বাদে বাড়ীতে ফিরছি সেই আনন্দে ইচ্ছে করে একটা খালি ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। স্টেশন পেরিয়ে আমার ট্যাক্সি উঠল হাওড়া ব্রীজে। এখানে কোন সময় গাড়ী চলাচলের কম নেই। ট্রাম, বাস, ঠেলা ঠিক আগের মতই চলছে। ব্রীজ পার হয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরলাম। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। প্রত্যেকটা ঝাঁকুনিতে গাড়ীটা লাফিয়ে উঠছে। এখানেও গাড়ী, এখানেও ভিড়। নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলাম একেবারে রাজভবনের সামনে এসে। এইখান থেকে তবু ফাঁকা। রেড রোড ধরে চলে গেলে ভিক্টোরিয়া ঘুরে একবারে কার্মানি হাসপাতালের সামনে গিয়ে পড়া যায়। কিন্তু কৈ নতুন কিছু ত চোখে পড়ল না? এক মাস আগে যে কোলকাতা দেখে গেছি আজও সেই একই কোলকাতা। পরিবর্তনের মধ্যে দেখলাম দু একটা সিনেমার ছবির নাম বদলেছে। দু চার রকম নতুন পোস্টার চোখে পড়ছে। তা ছাড়া আর কিছু নয়। কালীঘাট পার হয়ে আমাদের গলিতে ট্যাক্সি ঢুকল। পাড়ার চেনা ছেলেগুলোকে দেখতে পাচ্ছি। বাড়ীর পুরনো চাকর দারোয়ানরা বসে আছে। এদের দেখে মনটা খুশী হল। একদিন যে পাড়া থেকে নিছক আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম সেই পাড়াতে ফিরতেই আজ ভাল লাগছে। মনে

পড়ছে কত কথা, কত ছোটখাট ঘটনা। চোখের সামনে ভাসছে কতজনের মুখ। ঐ সেই দত্তবাড়ী, শাটু দত্তর বউকে আবার দেখতে পাব, পাশের বাড়ীর পাগল ছেলেটি কি এখনও আগের মত চেঁচায়? আজ রাত্রেই তা জানতে পারব।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে ছোট্ট ব্যাগটা হাতে নিয়ে যেই দোর গোড়ায় নেমেছি দেখলাম অদূরে পাপিয়া দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে ম্লান হাসছে, কিন্তু কাছে এগিয়ে এল না।

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কি রে পাপিয়া আমায় চিনতে পারছিস্ না।

—ও শুধু মাথা নাড়ল।

—মা, বাবা কই।

—বাবা আফিসে, মা রান্না করছে, ডাকব?

বললাম, এখন থাক। আগে উপরটা ঘুরে আসি। আয় আমার সঙ্গে।

পাপিয়া কিন্তু আগের মত তখুনি এল না, মুখে বললে, মাকে বলে আসি।

আমি বুঝতে পারলাম, এতদিন দেখা হয়নি তাই লজ্জা পাচ্ছে। উপরে উঠে দরজায় টোকা মারতেই বৌদি দরজা খুলে দিল। কে বলবে এ সেই বৌদি। একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানাল, এসো ঠাকুরঝি। আমরা ভাবছিলাম নিশ্চয় তুমি দু'একদিনের মধ্যেই আসবে।

আমার হাত থেকে বৌদি নিজেই ব্যাগটা নিয়ে নিল, চেঁচিয়ে ডাকল, মেজো, দেখ কে এসেছে।

প্রথমটা আমি সত্যিই অবাক হয়ে-গিয়েছিলাম, এত হাসিখুশী বৌদিকে আমি অনেকদিন দেখিনি।

ডাক শুনে মেজদি বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, আমাকে দেখেই সে জড়িয়ে ধরল। কতদিন বাদে আবার ওকে কাছে পেলাম, চেষ্টা করেও চোখের জল সামলাতে পারলাম না। আনন্দে মেজদির শরীর থর থর করে কাঁপছিল, আহা বেচারী, এখনও সেই আগের মত রোগা, হাড় বার করা।

মেজদির বিছানায় গিয়ে আমরা বসলাম, বৌদির কিন্তু উৎসাহের শেষ নেই। সে হাসতে হাসতেই বললে, দুই বোনে এখন খুব খানিকটা কাঁদো, আমি ততক্ষণে চা করে আনি।

বাধা দিলাম না, কারণ মেজদির সঙ্গে একলা কথা বলতেই চাইছিলাম। মেজদি আমার মুখের উপর আলতো করে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, শরীর ভাল আছে তো অপু?

জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কি রকম মনে হচ্ছে?

মেজদি সস্নেহে বলল, ভালই দেখাচ্ছে। কোন অসুবিধে হয়নি তো তোর ওখানে?

অসুবিধে কেন হবে। বিরাট বাড়ী, ভাল লোকজন, সকলেই আমাকে ভালবাসেন। এইবার তোমরা একদিন চল।

—আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে রে। একটা রোববার দেখে সকলে ঘুরে আসব, কি বলিস্?

খুশী হয়ে বললাম, খুব মজা হবে তাহলে। অনেক জিনিস ওখানে দেখবার আছে, কত পুরোন ইতিহাস,—

উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অনেক কথা বলে গেলাম, যা আমাকে গগন সেন বুঝিয়ে-ছিল। ইতিমধ্যে বৌদি চা আর আমার সেই অতি প্রিয় তেলেভাজা নিয়ে এসে হাজির। পেছনে পেছনে দেখি পাপিয়াও এসেছে। বুঝলাম ওকে দিয়েই বৌদি তেলেভাজা আনিয়েছে।

সবাই মিলে গল্প করতে করতে হৈ হৈ আনন্দের মধ্যে তেলেভাজা আর চা খাওয়া হল। সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি এত আনন্দ বাড়ীতে ফিরে আমি পাব। যে ঘরে বসে আজ এত হাসছি এই ঘরেই তো কম চোখের জল ফেলিনি, মাত্র ক'মাস আগে।

কিন্তু এরই মধ্যে বৌদি এক সময় বলল, আমার কিন্তু দোষ নেই ঠাকুরঝি, তোমার এই মেজদিটি আজকাল বড্ড একগুঁয়ে হয়েছে, সময় মত ওষুধপত্র খায় না, মাঝে মাঝে জ্বর হয় সেকথা জানাতেও দেয় না তোমাকে।

আমি মেজদির দিকে তাকালাম।

মেজদি ক্লান্ত হেসে বলল, যে বার-মেসে রুগী, তার অসুখের কথা জানিয়ে কি লাভ। মিছি মিছি তোর মন খারাপ হবে। এখন আমি খুব ভাল আছি, কপালে হাত দিয়ে দ্যাখ, কোন জ্বর নেই।

একথাটা শুনে আমার ভাল লাগল না। জিজ্ঞেস করলাম, তার মানে প্রায়ই বুঝি তোমার জ্বর হয়।

বৌদি জবাব দিতে যাচ্ছিল, মেজদি তাকে থামিয়ে দিল, আঃ বৌদি। অপু বেচারী আমার জন্যে অনেক কেঁদেছে, দু দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে, ওকে একটু হাসতে দাও।

আমি কিন্তু আর হাসতে পারলাম না, বুঝলাম মেজদি ইচ্ছে করে অনেক কথা চেপে যাচ্ছে, দূরে থাকার এই বিপদ, এমনি করেই দূরত্ব ব্যবধান গড়ে ওঠে।

দুপুরবেলা আমি বাড়ী থেকে বেরলাম। জানতাম গগন সেন আমার জন্যে পার্ক স্ট্রীটের রেস্তরাঁয় অপেক্ষা করবে। আমার অনুমান ভুল হয়নি। রেস্তরাঁর সেই নির্দিষ্ট আসনে গগন সেন বসে ছিল, আমাকে দেখে এতটুকু আশ্চর্য হ'ল না, উঠে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক গলায় বললে, বস। তোমার জন্যে এত-ক্ষণ বসে আছি, খাবার অর্ডার দিইনি।

হেসে বললাম, যদি আমি না আসতাম!

—যদি নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। সেরকম তো অনেক কিছুই ঘটতে পারে। যদি ঘটে তখন দেখা যাবে।

—আপনার সঙ্গে কথায় পারবে কে!

গগন সেন শুধরে দিল, আপনি নয় তুমি।

হেসে ফেললাম, সব সময় মনে থাকে না।

—ওটা ভাল লক্ষণ নয়। যেটা মনে রাখবার সেটা মনে রাখতে হবে বৈকি। এখন যদি আমার নামটা ভুলে গিয়ে

গদাধর সেন বলে ডাকতে শুরু কর, আমি খুশী হব না মোটেই।

ওর কথার ধরনে না হেসে পারলাম না।

গগন সেন খাবার অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ক'দিনের ছুটি?

—পরশু ভোরবেলা ফিরব।

—কাজটা ভালই লাগছে?

—কাজ তো নেই, শুধু বসে থাকা, ভাল লাগবে না কেন?

গগন সেন হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেছে এই রকম ভাব করে বলল, ওহো ঃ, তোমার জন্যে Seekerকে আমি টেলিফোন করেছিলাম। কিন্তু যা এক-গুঁয়ে লোক কিছুতেই তোমার মালিকানের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হল না।

আমি বিষণ্ণ মুখে বললাম, তাহলে কি করা যাবে? উনি কিন্তু বলেছেন Seekerকে সঙ্গে করে ধরে নিয়ে যেতে।

গগন সেন না ভেবেই উত্তর দিল, বল তো আমি প্রক্সি দিতে পারি।

—অগত্যা আর কি করা যাবে। ভদ্রলোক যখন কিছুতেই রাজী হবেন না, আপনিই চলুন।

—কিছু ঘাবড়ো না অর্পিতা, এই দাড়ি চুমরে চোখ পাকিয়ে এমন সব বড় বড় কথা বলব, বৃদ্ধা নির্ঘাৎ খুশী হবেন। আর কিছু না জানলেও Seekerএর লেখাগুলো তো আমি পড়ি, তাছাড়া বন্ধুত্বও কম দিনের নয়।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, Seeker বা তার বন্ধু যাকেই হোক নিয়ে গিয়ে ওঁর কাছে হাজির করতে পারলে তবেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব।

গগন সেন বলল, মা ভৈঃ।

খাবার এসে গিয়েছিল, নানারকম পদ। গগন সেন খেতে খেতে এক সময় জিজ্ঞেস করল, তোমাদের বাড়ীতে কারা এসেছিলেন, চলে গেছেন?

বললাম, হ্যাঁ। দিদিমণিরা এখন পাটনায়, এখন আমরা মাত্র তিনজন প্রাণী। পরশু দিনের কথা কিন্তু ভুলবেন না।

গগন সেন আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো, বোকা মেয়ে, গরজটা আমারই বুঝি কম, তোমার মালিকানের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলে সপ্তাহে একবার ছেড়ে তিনবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সে লোভ সামলান কি সহজ?

আমি চোখ তুলে গগন সেনের দিকে তাকালাম।

সে ফিস ফিস করে বলল, কালো হরিণ চোখ।

আমার সারা শরীরে শিহরন খেলে গেল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম মিউনিসিপাল মার্কেটে। মার্কেটে বেড়াতে আমার বরাবরই ভালো লাগে। আজ অবশ্য যাবার উদ্দেশ্যও ছিল, কারণ ঠিক করেই রেখেছিলাম মাইনে পেয়ে কয়েকটা জিনিস কিনব; ছোটখাট উপহারের সামগ্রী। মার্কেটে এলে আমি দেখেছি একঘেয়েমীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নিতানুতন ডিজাইনের শাড়ী, জামা, কাপড়, গহনা, কি রকম লোভনীয় করে সাজিয়ে রাখে। কত আলো, কত লোকের যাতায়াত। এ যেন বারমেসে এক্জিবিশান চলছে।

আমি এক দোকান থেকে আর এক দোকানে ছুটোছুটি করছিলাম। গগন সেন মন্তব্য করল, মনে হচ্ছে কোন জিনিস আর বাদ রাখবে না, সবকিছু কিনে ফেলবে।

হেসে উত্তর দিলাম, কেনার চেয়ে দেখতে আমার ভাল লাগে।

—সাধু, সাধু। সব মেয়েদের এই সুবুদ্ধি হত তাহলে আর স্বামী বেচারীদের সদা আতঙ্কে থাকতে হত না।

—খুব যে ছেলেদের হয়ে সাফাই গাইছেন।

গগন সেন মৃদু হাসল, হাজার হোক নিজে ছেলে তো।

কি যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সামনের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে আমি থেমে গেলাম, মুখ দিয়ে আর কোন কথা সরল না। ভদ্রলোকও তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারলাম, মিঃ দত্ত, অলকার সেই পাতানো মেসোমশাই।

গগন সেন জিজ্ঞেস করল, মিঃ দত্তকে চিনতে পারলে।

বললাম, হ্যাঁ।

—সঙ্গের মেয়েটি কে?

—চিনতে পারলাম না।

গগন সেন ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, বুড়ো নতুন শিকার ধরেছে।

বুকের ভেতরটা আমার ধক্ করে উঠল, কি করে জানলেন।

—এ আর জানবার কি আছে, মেয়েটির বয়েস অল্প, বেশ সুন্দরী, চমৎকার গড়ন, ঝলমলে সাজ-পোশাক, মিঃ দত্ত তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে, নতুন মেয়ের কখন কোন জিনিসটা পছন্দ হয়ে যায় কে বলতে পারে, তখনই সেটা কিনে দিতে হবে তো। টাকা নেই বললে চলবে কেন?

জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে অলকার কি হোল?

গগন সেন নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দেয়, হয় নির্বাসিত, আর নয়ত পদমর্যাদা খুইয়ে ঐ বাড়ীতেই সামান্য আশ্রিতা হয়ে আছে।

আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, এও কি সম্ভব!

—এরকম একটা কিছু ঘটবে আমি আগেই জানতাম।

অলকার জন্যে আমার মন আর্দ্র হয়ে উঠল, মনে হল বেচারীর সঙ্গে আমার এখনই একবার দেখা করা দরকার। মেয়েটি বড় ভাল, আমার জন্যে কত কি না করেছে। যদি সে সত্যিই বিপদে পড়ে থাকে, তাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। যদি সাহায্য করতে না পারি অন্ততঃ পাশে গিয়ে তো দাঁড়াতে পারব।

কাতর কণ্ঠে বললাম, অলকার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।

গগন সেন সহজ গলায় বলল, বেশ চল। কোথায় সেই রাসবিহারী এভিন্যুর দোকানে?

বললাম, হ্যাঁ।

মার্কেটে কিছুই কেনা হল না, সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা ট্যাক্সি ধরলাম। যেমন করে হোক অলকার সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে।

(ক্রমশঃ)

※ প্রদর্শনী ※

কলারসিক

শিল্পী বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রাফিক চিত্র

রিসোন্যান্স

আগস্টের শেষ সপ্তাহে তরুণ শিল্পী বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গ্রাফিক চিত্রের প্রদর্শনী পার্ক স্ট্রীটস্থ আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে উদ্বোধিত হয়েছে। শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্ব-প্রদর্শিত চিত্র-প্রদর্শনীতে যে বিমূর্ত চেতনার পরিচয় তুলে ধরেছিলেন বর্তমান প্রদর্শনী তারই এক নতুন সংস্করণ। অবশ্য এবার মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটেছে। আর এই পরিবর্তনে তিনি তাঁর বিমূর্ত চেতনার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পুনর্বার নিজেকে সমর্পণ করে সানন্দে ঘোষণা করেছেন : "One could easily observe a new kind of two dimensional architecture or visual music in the graphics by Bimal Banerjee".

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাঁর প্রদর্শিত গ্রাফিক চিত্রকলার মধ্যে খুব সহজে 'দ্বি-মাত্রিক স্থাপত্যরীতি' কিংবা 'মূর্ত-সঙ্গীত'-এর বিশেষ কোন পরিচয় পাইনি। তবে একটা জিনিস বিমলবাবু করতে পেরেছেন। তিনি তাঁর চিত্রকলায় বিষয়মুখীন কোন চিন্তা-ভাবনাকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর গ্রাফিক চিত্র আপাতঃ সহজ পদ্ধতিতে বক্তব্যহীন বক্তব্যকে কখনো সাদা-কালোর বিভাজনে, কখনো বর্ণময় প্যাটার্ণে বা নক্সায় কিঞ্চিৎ দৃষ্টি-সুখ-গ্রাহ্য যে করে তুলেছে, তা স্বীকার্য। আর, পরিপ্রেক্ষিতে কৌণিক চিত্র-সংস্থাপন যদি স্থাপত্যরীতির পরিচয় বহন করে কিংবা লম্বমান রেখার আভাসে যদি সঙ্গীত দৃশ্যমান হয় তবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা সার্থক। কিন্তু অত স্বচ্ছন্দে আমরা এই ঘোষিত বক্তব্যকে সত্যিই গ্রহণ করতে পারিনি।

যাহোক, শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায় পরিশ্রমী শিল্পী। তাঁর শিল্প-চর্চায় তিনি কি যেন অনুসন্ধান করে ফিরছেন, কিন্তু এখনো সেই বস্তু তাঁর অনায়ত্ত। এই অনুসন্ধিৎসাই তাঁকে হয়তো ঈপ্সিত ফললাভে সাহায্য করবে।

এতদসত্ত্বেও আলোচ্য প্রদর্শনীর গ্রাফিক চিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি জিনিস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রথমতঃ তাঁর চিত্র-সংস্থাপনে কষ্টকল্পিত প্রচেষ্টার লক্ষণ কম ছিল। আঙ্গিকগত দিক থেকে এই সহজিয়া পদ্ধতি রঙ আর রেখার সন্নিবেশে চিত্রপটকে সৌন্দর্যমণ্ডিত না করলেও মনকে কোন কোন সময় খুশী করতে পারে। খেয়াল-খুশির মধ্যেও যে ছন্দহীন ছন্দের আভাস থাকে, বিমলবাবুর চিত্র সেই লক্ষণাক্রান্ত। দ্বিতীয়তঃ বিমলবাবু গ্রাফিক-পদ্ধতির বিভিন্ন মাধ্যম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অগ্রসর হয়েছেন। তাই তিনি উডকাট, এচিং, লিথো এচিং, লিনোকাট, স্টেনসিল-নীডলকাট, একুয়াটিন্ট অথবা মিশ্ররীতি প্রয়োগ করে রচনা করেছেন তাঁর প্রদর্শিত বত্রিশখানি গ্রাফিক চিত্র। তৃতীয়তঃ মূলতঃ তিনি বিমূর্ততার অনুসারী হলেও প্রদর্শিত 'ন্যুড' চিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ অবয়বহীন করে সৃষ্টি করেননি। তাঁর কাঠ-খোদাইয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট 'পাতা' (৪)-র মধ্যেও বাস্তব-চেতনার স্বাক্ষর বিদ্যমান। প্রদর্শিত চিত্রগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'কম্পোজিশান—৩' (৮), 'এ থিম ইন ব্ল্যাক' (১৫), 'গ্রটেস্ক্যু একুয়াটিন্ট' (১৬) ও 'রিসোন্যান্স' (১৮) গ্রাফিক চিত্ররূপে দৃষ্টিসুখকর বলে মনে হয়েছে।

শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায় যদি তাঁর কল্পিত শিল্প-জগতের বাইরে এসে দাঁড়াতে না পারেন তবে আশংকা হয় তিনি হয়তো অচিরেই শিল্পরসিক সাধারণ মানুষের বাস্তব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুর্ভাগ্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেবেন। সুস্থ শিল্প-চর্চার প্রয়োজনে এই ভবিতব্য কোন শিল্পীরই কাম্য নয় বলে বিশ্বাস করি। তরুণ শিল্পী বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কথাটি ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ জানাই।

রিপলস্ (উডকাট)

চলচ্চিত্রে টম জোনস

কণাদ চৌধুরী

হেনরি ফিল্ডিং-এর কালজয়ী উপন্যাস এতদিন পরে চলচ্চিত্রের আলোয় উদ্ভাসিত হল। ছবিটি পরিচালনা করছেন বৃটেনের 'নবতরঙ্গে'র পরিচালক টনি রিচার্ডসন। রিচার্ডসন জনচিত্তে স্থায়ী হয়েছেন "লুক ব্যাক ইন এ্যাঙ্গার" এবং "স্যাটারডে নাইট এ্যান্ড সানডে মর্ণিং" পরিচালনা করে। ইংল্যাণ্ডের ক্রুদ্ধ নাট্যকার জন অসবোর্ন ছিলেন প্রথমোক্ত চিত্রের নাট্যকার। টম জোনস-এর চিত্রনাট্যও অসবোর্ন রচনা করেছেন।

ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং-এর বাল্যকাল কেটেছিল ডরসেটের গ্রাম্য পরিবেশে। ডরসেট গ্রামে সময় যেন আজো স্থাবর হয়ে আছে। ফিল্ডিং-এর ডরসেট-এর সঙ্গে আজকের ডরসেটের পার্থক্য বলে না দিলে চেনার উপায় নেই। সেই গোলাবাড়ি, রাস্তায় ঘাটে গৃহপালিত শুয়োরের আনাগোনা, ঘোড়ার পিঠে চড়ে গ্রাম্য শিকারীদের শিকার, সবই আজো অব্যাহত। অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ড, ডরসেট গ্রামের মায়া কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কাটাতে না পেরে যেন থেকেই গেছে গ্রামটিতে। পরিচালক টনি রিচার্ডসন তাই এই গ্রামটিকেই টম জোনস চিত্রের বহির্দৃশ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

।। কাহিনী ।।

টম জোনসকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন এ্যালওয়ার্দি। এ্যালওয়ার্দি গ্রামের একজন ছোট-খাটো জমিদার। টম জোনসকে তিনি নিজের ছেলের মতনই মানুষ করতে থাকেন। টম তার পালক পিতার কাছেই বড় হতে থাকে। তার সঙ্গী হল এ্যালওয়ার্দির বোনের ছেলে কুচক্রী ব্লিফিল। লেখাপড়ায় টমের মনোযোগ ছিল না কখনো। শিকার করে, অন্যের পুকুরে মাছ ধরে কিংবা গ্রামের মেয়েদের উত্যক্ত করে দিন কাটত তার। যৌবনের হঠাৎ হাওয়ার তাগিদে সুন্দরী মেয়েদের পেছন পেছন ছুটলেও শেষ পর্যন্ত টম পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদার কন্যা সোফির প্রেমে পড়ে। সোফির বাবার আশা ছিল ব্লিফিলের সঙ্গে সোফির বিয়ে দিয়ে, দুই জমিদারি এক করে দেবেন। ব্লিফিলের সঙ্গে সোফির বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন ব্লিফিলের মা। তাঁর আশা ছিল পুত্রকে এক বিরাট জমিদারির মালিক করা। টমের উচ্ছৃংখলতায় বিরক্ত হয়ে তার পালক-পিতা এ্যালসওয়ার্দি তাকে তাড়িয়ে দেন।

মলি (ডায়েনা সিলেন্টো) টমের সঙ্গে প্রেমালাপে মগ্ন ছিল, হঠাৎ লোকজনের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা ছোট সেতুর তলায় লুকিয়ে পড়েছে।

টম জোন্সের একটি দৃশ্যগ্রহণের দৃশ্য। ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন, পরিচালক রিচার্ডসন

জাত মহিলাবৃন্দের পরিপ্রেক্ষিতে সোফির কমনীয় চরিত্রটি অসীম নিষ্ঠায় ফুটিয়েছেন শ্রীমতী ইয়র্ক। জ্যাকলা সিলেন্টো অভিনয় করেছেন জনৈক উদ্যান-রক্ষকের কন্যার ভূমিকায়। টম জোনস-এর একটি হাস্যোদ্বেল দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেছেন জয়েস রেডম্যান। একটি সরাইখানায় দুহাতে বিপুল আহার্যের গোগ্রাস ভক্ষ্যাহারের দৃশ্যটিতে রেডম্যানের সঙ্গী ছিলেন আলবার্ট ফিনে। হিউজ গ্রীফিথ সোফির বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন; ডেম এডিথ ইভান্স সোফির শহুরে পিতৃস্বসা; জর্জ ডেভাইন টমের সদাশয় পালক-পিতা এবং খল-নায়ক ব্লিফিল হলেন ডেভিড ওয়ার্নার। এ ছাড়াও ডরসেট অঞ্চলের গ্রামবাসীরাও প্রত্যেকে এই চিত্রে অভিনয়ের জন্যে চুক্তি-বদ্ধ হয়েছেন। গ্রামটিকে আড়াইশ বছর অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকেও পরিচালক রিচার্ডসন কোনো ত্রুটি রাখেন নি। টেলিভিশন, রেডিওর তার বাড়ির ছাদ থেকে সাময়িকভাবে তুলে নিয়েছেন, আধুনিক যুগের বিজ্ঞাপনের পোস্টারও খুলে নেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীরা চশমা এবং হাতঘড়ি খুলে ফেলেছেন, পীচ-বাঁধানো রাস্তার ওপর বালি ছড়িয়ে বৃষ্টির দিনের কাদা-কাদা রাস্তার দৃশ্য তৈরী করা হয়েছে।

টম লণ্ডনের পথে রওনা হয়। লণ্ডনে আসবার পর সুপুরুষ টমকে নিয়ে লণ্ডনের অভিজাত মহলের মহিলাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। লেডি বেলাস্টন টমকে স্বগৃহে আশ্রয় দিলেন। টমকে অভিজাত সমাজের উপযোগী করে তুলবার জন্যে প্রচুর অর্থব্যয়ও করলেন লেডি বেলাস্টন। এই অভিজাত মহিলার গৃহে একবার এক উৎসবের আয়োজন হয়। উৎসবে সোফিও বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। সোফির প্রতি টমের অনুরক্তির কথা জানতেন লেডি বেলাস্টন। সোফির দেখা পেয়ে যদি টম তাঁকে পরিত্যাগ করে এই ভয়ে টমকে সোফির সঙ্গে দেখা করতেই দিলেন না তিনি।

এদিকে ব্লিফিল বুঝে ফেলেছে যে টমকে পথ থেকে না সরালে সোফিকে তার পাওয়ার কোনো আশা নেই। ব্লিফিল ষড়যন্ত্র করে টমকে ডাকাতি করার মিথ্যে অপবাদে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। বিচারে ফাঁসির হুকুম হয় টমের। কিন্তু ভাগ্যচক্রে ফাঁসির অব্যবহিত পূর্বে টম রক্ষা পায়, এবং সোফির আলিঙ্গনের মধ্যে টম জোনস কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

।। ভূমিকালিপি ।।

'স্যাটারডে নাইট এ্যান্ড সানডে মর্নিং'-এর নায়ক এ্যালবার্ট ফিনে 'টম জোন্স'-এর ভূমিকায় তাঁর জীবনের স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। সোফির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুসান ইয়র্ক। গ্রামের অন্যান্য দামাল মেয়ে এবং শহরের অভি-

শিকার যাত্রার প্রাক্কালে ভোজন পর্ব। একেবারে বাঁ-দিকে সোফি (সুসান ইয়র্ক)

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

১। মানুষ জল না খেয়ে কতদিন বাঁচতে পারে এবং কোন খাদ্য না খেয়ে কতদিন বাঁচতে পারে?

২। কোন্ খেলা সবচেয়ে ব্যয়-বহুল এবং কোন দেশে সেটার প্রচলন বেশী?

পৃথ্বীতোষ বিশ্বাস,
১৬বি, সৎচাষীপাড়া লেন।
কলিকাতা—৩৬।

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতের 'জানাতে পারেন' বিভাগে দুটি প্রশ্ন পাঠালাম। বিচক্ষণ পাঠক-দের কাছ থেকে উত্তর আশা করি।

১। 'বেহালা বাদ্যযন্ত্রের জন্মভূমি প্রাচ্য না পাশ্চাত্য? শোনা যায়, প্রাচীন ভারতে বাহুলীন নামে প্রচলিত ছিল। এই ধারণা কতদূর সত্য?

২। ঠুংরি গানের বৈশিষ্ট্য কোথায়, সুরে, তালে, ভাবে না চালে? প্রথম কে কোথায় এই গানের প্রবর্তন করেন?

কাবেরী ধর,
কাঁকুলিয়া রোড
কলিকাতা—১৯।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগের জন্যে একটি প্রশ্ন পাঠালাম।

ভারতের Constitution-এ কতবার Amendment হয়েছে? Amend-mentগুলি কি কি প্রয়োজনে করা হয়েছে, সংক্ষেপে জানতে চাই।

অসীমকুমার নাথ
মহুদা ধানবাদ,
বিহার।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

অমৃত 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীদেবব্রত পালিতের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি—

১। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনপ্রণালী প্রসঙ্গে পুস্তপালদের উল্লেখ আছে। সে সময়ে প্রাদেশিক শাসনে প্রধান শাসককে (যিনি উপরীকা মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন) সাহায্য করার জন্যে অনেক অধিকারী থাকতেন। তাঁদের মধ্যে এক বিশিষ্ট পদাধিকারী "পুস্তপাল" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাজ বর্তমান কালের 'রেকর্ড-কীপারের' কাজ ছিল।

মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী,
ডালটনগঞ্জ, বিহার।
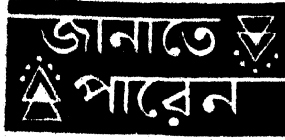
(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ৫ই এপ্রিল "অমৃতে" প্রকাশিত শ্রীনিশীথকুমার ঘোষের ৩নং প্রশ্নের উত্তরে গত ৩১শে মে 'অমৃতে' শ্রীকনক বাগচী যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নিবেদন করছি। শ্রীহরিনাথ দে পৃথিবীর সর্ব-শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্ একথা শ্রীবাগচী অস্বী-কার করেছেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন যে, কার্ডিন্যাল মেজ্জোফান্তি ১২৪টি ভাষা 'জানতেন' এবং আমে-রিকান অধ্যাপক আর জি কেন্ট ৪০টি ভাষায় 'কথাবার্তা বলতে পারতেন'। সেই তুলনায় শ্রীহরিনাথ দে ৩৪টি ভাষা 'আয়ত্ত করেছিলেন'। সুতরাং শ্রীহরিনাথ দে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্ নন।

কিন্তু এখানে একটি কথা বিশেষ-ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। একটি ভাষা সাধারণভাবে 'জানা' অথবা সেই ভাষায় 'কথাবার্তা বলতে পারা' এবং সেই ভাষা 'আয়ত্ত করা', এ দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ইংরাজিতে যাকে বলে working knowledge আমার মনে হয় সম্ভবতঃ সেই অর্থেই কার্ডিন্যাল মেজ্জোফান্তি ১২৪টি ভাষা এবং আমে-রিকান অধ্যাপক ৪০টি ভাষা 'জানতেন'। শ্রীহরিনাথ দে যে ৩৪টি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, সেটা বিশেষ বিশেষ ভাষায় working knowledge নয়। যাকে Mastery over a language বলে শ্রীহরিনাথ দে'র ভাষাজ্ঞান ছিল সেই স্তরের।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক পরলোকগত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যিনি শ্রীহরিনাথ দে'র ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছিলেন কোন একদিন আলোচনা-প্রসঙ্গে আমার কাছে হরিনাথ দে'র ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে একটি সুন্দর মন্তব্য করেন। মন্তব্যটি আমার বিশেষভাবে মনে আছে, এবং সেটা এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছিলেন "With Harinath De knowing a language meant being able to use it in speech and writing as to the manner born". এই যে "as to the manner born" এটাতেই হরিনাথ দে'র ভাষাজ্ঞানের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠে। হরিনাথ দে'র ফরাসী ভাষায় লিখিত কোন প্রবন্ধ পড়লে মনে হতো যেন সেটা কোন ফরাসীদেশীয় লোকেরই লেখা। বিদেশীর লেখা বলে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ত। এই অর্থেই হরিনাথ দে ৩৪টি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। প্রত্যেকটি ভাষাই ছিল তাঁর কাছে Vernacular-এর মতন।

সুতরাং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে দেখলে হরিনাথ দে'কেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ বলে স্বীকার করতে হয়। অবশ্য তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ না বলে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা-বিশেষজ্ঞ বলাটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীদেবপ্রসাদ সিংহ,
১৮।৮৪, ডোভার লেন,
কলিকাতা-২৯।

সবিনয় নিবেদন,

গত অমৃতের ১৪শ সংখ্যার জানাতে পারেন বিভাগে শ্রীকানন ঘোষ যে ক'টি প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর দিলাম।

মহাভারতে এত অষ্টাদশের সমা-বেশের পশ্চাতে কোনো কারণ নেই। অধ্যাপক জিতেন্দ্রকুমার ঘোষের মতে মহাভারত যখন প্রথম রচিত হয়েছিল তখন এর শ্লোক সংখ্যা ছিল ৮০০০-এর কিছু বেশী, তারপরে যুগে যুগে বিভিন্ন কবিগণ মহাভারতের মধ্যে নিজেদের শ্লোক প্রবেশ করিয়েছেন, যার ফলে বর্তমানে এর সংখ্যা হয়েছে এক লাখেরও বেশী। কাজেই বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন কবিদের নিজস্ব শ্লোক সংযোগের ফলেই এত অষ্টাদশের সমা-বেশ হয়েছে।

নির্মলেন্দুবিকাশ মিত্র,
পোঃ বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।

গত ২।৮।৬২ তারিখের অমৃতে 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যেঃ

১। বাংলা ভাষার প্রথম সবাক চিত্র 'জামাইষষ্ঠী'। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন 'অমর চৌধুরী। ১৯৩১ সালের প্রথমদিকে ক্রাউন সিনেমায় (উত্তরা) দেখান হয়।

তবে আমার মতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা সবাক চিত্র 'ঋষির প্রেম'। ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি ক্রাউন সিনেমায় দেখান হয়। এতে শ্রীজয়-নারায়ণ মুখার্জি নায়ক এবং শ্রীকানন দেবী নায়িকা ছিলেন।

২। বাংলা ভাষায় প্রথম সিনেমা পত্রিকা বোধহয় 'নাচঘর'। 'হেমেন্দ্র-কুমার রায় সম্পাদক ছিলেন। ঐ সময় খেয়ালী নামে আরও একটি সিনেমা পত্রিকা ছিল।

ডাক্তার গৌর সেন,
১৩।২, চৌরঙ্গী টেরেস,
কলিকাতা—২০।

অবাক সন্ধ্যাকে ডরাট করে এলো রাত্রির নীরবতা। ফাঁকা ফাঁকা অন্ধকারগুলি সরে এলো, ঘন হয়ে এলো আরও কাছাকাছি; খুলে দিল তাদের জড়জড়িমার জানালাগুলি। আলোয় আলোময় হল এসপ্ল্যানেড। রংবাহারে রূপের বান ডেকে গেল আকাশে বাতাসে, গাছের পাতায় পাতায়। স্থাণুর অন্ধকার যেন উপহাস কুড়িয়ে গুটিয়ে নিল নিজেকে। জড়, মূক, চেতন, অচেতন সবাই শপথ নিল তাই নতুন করে বাঁচবে বলে।

বিজ্ঞাপনের হরপগুলি নতুন জীবন পেয়ে প্রচন্ড উচ্ছ্বাসে প্রেম নিবেদন করছে একে অন্যকে। তার জোয়ার প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে, পথচলাকে করতে চাইছে আরও দ্রুত। কিন্তু অবসন্ন পায়ে পথ অনেক বেশী দুর্গম হয়েছে। তবু কোথায় যেন একটা গলদ আছে। অন্ততঃ স্থবিরের তাই মনে হয়। সে বলে, এ চোখের আলো, মনের আলো নয়। তাই যদি না হবে তবে এসপ্ল্যানেডের গোলকধাঁধা থেকে চৌরঙ্গী কেন ছিটকে বেরিয়ে যায় ভবানীপুরের দিকে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত? রোজ পার্ক স্ট্রীট থেকে হেঁটে এসপ্ল্যানেড চলে আসে স্থবির পাঁচ পয়সা ভাড়া বাঁচাবার জন্য, সে আজ প্রায় দশ বছর আগে থেকে। তাই সে জানে চৌরঙ্গীর দুঃখ, তার চোখের জল। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে লাল আলো দেখে মাতাল গাড়ীগুলো টাল খেয়ে খেয়ে যখন থামে স্থবির শুনতে পায় তার আকুতি, ওগো তোমরা একটু থামো, একটু বিশ্রাম করতে দাও।

পার্ক স্ট্রীট থেকে এসপ্ল্যানেড। এইটুকু পথ শান্তির পথ, তার জীবনের ছন্দের লাইনটা এখানে মিল পেয়ে সুষম হয়েছে। চৌরঙ্গীর দু কাঁধে ভর দিয়ে এই যে অজস্র মানুষের পথচলা স্থবিরের স্থির বিশ্বাস এরা সকলেই উন্মাদ। নয়তো এমনভাবে ছুটছে কেন? চল্লিশ বছরের জীবনে এই গতির কোন প্রয়োজন আছে বলে কোনদিন তার মনে হয়নি। আর কাজই বা কোথায়। জীবনে যে কোন কাজ নেই একথা সহজেই সে প্রমাণ করতে পারে।

আজ পনের বছর চাকরী করছে স্থবির কিন্তু কাজ সে করেনি কোনদিন, তবু মাইনে গড়িয়ে গিয়ে হয়েছে প্রায় আড়াইশো। তার মাত্র চারটি ছেলেমেয়ে শুনে অফিসের প্রসন্নবাবু বলেছিলেন, আপনি তো রাজা লোক মশাই। আমার মাইনে তো জানেন, শ' দেড়েক পাই, তার উপর ইতিমধ্যে আটটি, বড় ছটিই মেয়ে। এতে বোধহয় অসহিষ্ণু হয়েই একটি ছোকরা বলেছিল, এর পরেও আপনি হাসেন প্রসন্নবাবু? আপনার সাহস তো কম নয়।

এরপর হাসিটি গর্বিত করে প্রসন্নবাবু বলেছিলেন, হাসব না কেন হে? আমার ভাবনা কিসের? চোখটা বুজতে পারলেই তো হোল। তুমি কি বলতে চাও, আর বছর পাঁচেকের বেশী আমি বাঁচব?

এ এক অদ্ভুত আশ্বাস। স্থবির জানে এর মর্মার্থ। পাঁচ বছর পরেও এই আশ্বাসের প্রতিটি রেখা একই রূপ নিয়ে স্থির হয়ে থাকবে: —সত্যিই মৃত্যুর সঙ্গে এমন প্রেমিকের মত ব্যব-

হার করতে একমাত্র বাংলাদেশের কেরানীরাই জানে। তাই এরা ভাবে না মোটে, শুধু বয়ে যায়। যাঁরা ভাবতে চেষ্টা করে, দেখতে চায় একটু এগিয়ে কি একটু পিছিয়ে তারা হারিয়ে যায়, মহাস্রোতের ঘূর্ণিতে তারা হয় নিঃসীম উধাও। স্থবিরও ভাবে না, সে জানে, ভাবনার অচলায়তন ঠেলে এগোতে গেলে সারা মুখেচোখে কয়েকটি বলির রেখা ছাড়া আর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না। ভাবনার অসারতা তার কাছে স্পষ্ট হলেও কেন জানি লোকের ধারণা সে চিন্তাশীল। এই তো আজই আনন্দবাবু বলছিলেন, কি অত ভাবেন মশাই? খাবেন দাবেন, ঘুমোবেন ব্যস। পাগল ছাড়া আর কার চিন্তা থাকতে পারে? আপনি তবু তো বিয়ে করেছেন। আমার কথা ভাবুন দেখি, এখান থেকে ফিরে একেবারে একলা। প্রজাহীন রাজার দশা একেবারে।

স্থবিরকে কোন প্রশ্ন বা উত্তর করতে হয় নি। আনন্দবাবু নিজেই বলে চললেন, জানেন মশাই, বাবা-মা বেঁচে থাকলে আমার কি এ দশা হতো? দাদা বললেন, তোর ঐ এক মাথা টাক দেখিয়ে আমি কনে জোগাড় করতে পারব না। ইজ্জৎ বলে কথা আছে তো? প্রেমট্রেমের কথা যদি বলেন তো, অস্বীকার করব না, সুযোগ যে ছিল না তা নয়। কো-এডুকেশন কলেজে যখন পড়ি আমার চেয়ে বেশী বয়সী মেয়েরা পর্যন্ত যখন 'আনন্দদা' বলে ডাকতে আরম্ভ করল, হোপলেস হয়ে পড়লুম একেবারে।

ভেবে দেখল স্থবির, এতক্ষণের কথাবার্তায় তার হাসা উচিত ছিল কিন্তু আশ্চর্য, হাসি তার পেল না। তার গম্ভীর মুখ দেখে আনন্দবাবু বললেন, না মশাই আপনার কপালে দেখছি সুখ নেই। সৌন্দর্য দেখার চোখটিকে খেয়ে বসেছেন। কবিতা লিখুন, দেখবেন আপসে চোখ খুলে যাচ্ছে।

চমক ভাঙল স্থবিরের। কবিতা লিখলে চোখ খোলে নাকি! আবছা যতদূর মনে পড়ে কবিতা সে লিখত এককালে। হয়তো স্বপ্নও দেখত, সে কবি হবে। পঁচিশ বছর বয়সে যখন সে প্রথম চাকরী নেয়, সে স্থবিরের রূপ ছিল অন্যরকম। অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার সময় চাকরীর স্থায়িত্বের কথা মনেও থাকত না। বাবা মারা যাওয়ার সময় উপদেশ দিয়ে গেলেন, কবিতাটা ছেড়ে দিয়ো। ওতে পয়সা রোজগার হয় না। আর যারা নিজের উন্নতি না দেখে পরের উন্নতি দেখতে যায়, তারা সত্যিকারের কারো কোন উন্নতি করতে পারে না। কথাগুলি স্থবির শুনেই রেখেছিল মাত্র।

এর পর হল বিয়ে। তাপসী তার প্রেমিকা নয়, শুভানুধ্যায়ী। স্থবিরের হাসিতে সে নাকি বোকামীর লক্ষণ দেখতে পেত আর বীরত্ব প্রকাশ করতে গেলে দুর্বলতা অনাবৃত হোত। এই দুটো দূর করতেই তাপসী বিয়ে করল আর স্থবির বোধহয় সত্যিই দুর্বল আর বেকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাপসী তার রূপ বদলায় নি। প্রেম সে দিতে পারে নি বটে কিন্তু সে না থাকলে তার এ সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়তো। প্রথম মেয়েটির পর ছেলেটি যখন হল, তাপসী বলেছিল, কবিতাটা এবার ছেড়ে দাও। আর তোমায় সাজে না, সংসারের প্রতি ক্ষতিকরও। কথাটা শুনে চোখ খুলে গিয়েছিল স্থবিরের। এতটুকু প্রতিবাদ করে নি। তার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করে আর দ্বিতীয় দিন কলম ধরে নি সে।

বাসে যেতে যেতে ভাবে স্থবির। কি সব আজেবাজে কথা বলে লোকগুলো, কোন মানেই হয় না। জগৎ জুড়ে এই যে কথার রাশি ফুটছে আর ঝরছে, সব অর্থহীন। সে দেখেছে, কোন কথা না বললেও মানুষ দিব্বি বেঁচে থাকতে পারে। তবু লোক কথা বলে, তাকেও বলতে হয়।

বাস থেকে নেমে মনে পড়ল, ওষুধ কিনতে হবে। পকেট হাতড়ে প্রেসক্রিপশনটা খুঁজে দেখল, গোটাকতক ওষুধ, মিকশ্চার আর কিছু ফল। হাসি পেল স্থবিরের, মনে পড়ল প্রসন্নবাবুর কথা, আপনি তো রাজা লোক মশাই। তা বটে, রাজকন্যেকে একবার দেখলে তিনি রাজাকে আবিষ্কার করতে পারতেন। শরীরটা শুকিয়ে কয়েকটা হাড়ে এসে ঠেকেছে মাত্র। প্রতি মাসে একশো থেকে দেড়শো টাকা ইঞ্জেকশন, টনিক, ওষুধ আর ফলে বেরিয়ে যায় অথচ দিনকে দিন চেহারার যা অবস্থা হচ্ছে, তাকিয়ে থাকা যায় না। এর ওপর আবার দিন-কতক হোল, বড় ছেলেটি অসুখে পড়েছে। ডাক্তার নাকি বলেছে, অসুখের লক্ষণ ভাল নয়। তা হোক গে, একবার দেখতেও ইচ্ছে করে না তাকে। আর এ ছাড়া সময়ই বা কোথায়? তার স্ত্রী একবার বলেছিল, তোমার অফিসের ফোন নাম্বারটা বল। কিন্তু স্থবির দেয় নি, বলে, ওতে চঞ্চল হয়ে লাভ নেই। বাড়ী এসে খবর পেলেই হবে। স্বামীর নিষ্ঠুরতায় তাপসী চোখের জল ফেলে গোপনে। স্থবির বোঝে, তবু চুপ করে থাকে।

জীর্ণ হাল ধরে মাঝির দুরবস্থায় নৌকার পাল হয়ে এতদিনে অনেক এগিয়ে এনেছে তাপসী। কিন্তু আর পারে নি। প্রায়ই অসুখ হয় তার এখন, মধ্যে মধ্যে শয্যাশায়ী পর্যন্ত। তাই বাধ্য হয়ে মাঝিকেই গুন টেনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে কোনরকমে। স্থবির জানে না, কবে সে গুন ছিঁড়ে যাবে অথবা মাঝি পড়বে উলটে; অবশ্য এটা ভাববার কোন বিষয়ই নয় তার কাছে। সে বলে, একদম ছোট দুটোর এখনও অসুখ হয় না—নিশ্চয়ই তারা অসুখ হবার পক্ষে নেহাতই অনুপযুক্ত। অসুখ না হওয়াটাই তো বিচিত্র তার সংসারে।

কম্পাউন্ডার বললেন, মিকশ্চারটা একটু পরে এসে নিয়ে যাবেন। ট্যাবলেট কটা নিয়ে যেতে পারেন।

—না না, আমার তাড়াতাড়ি কিছু নেই। আপনি তৈরী করুন। আমি অপেক্ষা করছি।

এই মিকশ্চারের গুণ স্থবির জানে। শুধু জল খাওয়ালেও বোধ হয় এর চাইতে ভাল উপকার হতে পারে। তবু তাকে কিনতে হয়। এর চাইতে বেশী পয়সা খরচ করার সামর্থ্য কোথায়? এতে অন্ততঃ তাপসীকে কিছুটা সান্ত্বনা দেওয়া যায়।

এখান থেকে কয়েকটা ফল কিনে বাড়ী যেতে হবে। সেই একঘেয়ে এক প্রস্থ বাড়ী। তাপসী হয় রান্নাঘরে, নয় পল্টুর বিছানায়। শোবার ঘরটায় ঢুকে দেখবে মণি বসে আছে স্থাণুর মত, তার কদম সাদা চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্য কি ভয়ার্ত করে তুলবে কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নেবে, ম্লান হবে, মেয়েটা

অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। বোধহয় কাল থেকে একটু বেশী।

তার পায়ের শব্দ পেয়ে তাপসী ছুটে আসবে। বলবে, ভাল আছ তো? দুপুরে খেয়েছ? খাটুনি এবার কমিয়ে দাও একটু। স্থবির তখন যন্ত্রের মত বলবে, না, খাটুনি আর কোথায়? বরং নিজের চেহারার দিকে একটু দেখ। কথাগুলি বলতে তাকে ভাবতে হয় না কিছু, অন্তরও যোগ করতে হয় না, কেমন আপনা হতেই বেরিয়ে আসে যেন। তারপর তাপসীর গায়ের হঠাৎ স্পর্শ পেয়ে বলবে, তাও যন্ত্রের মত, একি! তোমার দেখছি জ্বর। ডাক্তার দেখিয়েছ! জ্বর গায়ে কাজ করবার দরকার কি?

তাপসী বলবে, কোথায় জ্বর? তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও। স্থবির উঠে পড়বে, কারণ সে জানে জ্বর হলেও তাপসীকে কাজ করতে হবে, না হলে তাদের খাওয়া হবে কি করে?

আপনার মিকশ্চার হয়ে গেছে।

ও হ্যাঁ, দিন।

পয়সাটা গুনে দিয়ে বেরিয়ে এল স্থবির। বাজার থেকে কিছু লেবু আর আপেল কিনে গলিটায় ঢুকে পড়ল। যেন অসহায় রূপটা বাইরের রৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে নিজের খোলসটা তুলে নিল গায়ে।

এখানে আলোর চমক অনেক কমে গেছে। একটি উদ্দাম যুবক কয়েক মুহূর্তে পরিণত হল একটি অস্থিচর্ম-সার বৃদ্ধে। স্থবিরের চোখে এরা দুজনেই কিন্তু এক, কারণ এ অন্ধকার চোখের অন্ধকার, মনের অন্ধকার নয়। স্থবির জানে, বিস্তৃতির দিক বিচার করলে এসপ্ল্যানেডের লোকেদের আর এ গলির লোকেদের মনের রাজ্য একই। চরম পর্যায়ে পৌঁছতে তাদের উঠতে হয় একই সোপান বেয়ে। হয়তো তাদের অলঙ্কারের প্রতিফলন আর এদের ব্যর্থতার প্রতিভাস। তবু স্থবিরের চোখে কেউ ছোট নয়। বরং এরা নিজেদের চেনে, ওরা চেনে না।

গলির মোড় ঘুরতেই নজরে পড়ল সেই পাড়ায় ছেলেদের। রোয়াকের উপর বসে একইভাবে পায়ের উপর পা দিয়ে সিগারেট টানছে। মনে পড়ে স্থবিরের, সেও বসত সেখানে আজ থেকে ষোল সতের বছর আগে। সেটা সত্যিই ছিল স্বপ্নের যুগ, এদের চোখমুখ দেখে তার আভাস সে পায়। জগৎটা তখন ছিল একটা কল্পতরু বিশেষ, শুধু চাইতে হয় মাত্র। যে যত কায়দা করে সাজিয়ে চাইতে পারে, তারই জিত। কিন্তু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েও তারা বুঝতে পারে না, আশার মিনারগুলি ঠিক সিগারেটের ধোঁয়ার মতই নিরেট অদৃশ্য হয়ে যাবে।

আজ যেমন সে ফল আর ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফিরছে, ঠিক এমনিভাবেই আর কাউকে কুঁজো হয়ে পথে যেতে দেখলে মনে মনে করুণা করত স্থবির। ভাবত, দেশের দুর্দিনের কথা আর অমনি জাগত তার বিদ্রোহী রূপ। আজ সেও বোধহয় তেমনি কুঁজো হয়ে একই দৃশ্যের অবতারণা করে চলেছে। কুঁজো কিছুটা সে হয়েছে। আগে আয়নায় চুল আঁচড়াতে মাথা নীচু করতে হত কিন্তু এখন সোজা থেকেই আঁচড়াতে পারে।

হোক সে কুঁজো আর দুর্বলতার প্রতিরূপ তবু ওরা সুখে থাকুক। কেন থাকবে না? সবাই যে তার মত হবে, তার কি মানে আছে? ঐ সেই যুবকটা যে প্রসন্নবাবুকে হাসতে বারণ করেছিল, সে এসে আজ তাকে একটা নিমন্ত্রণের কার্ড দিয়ে গেল, বলল, যাবেন নিশ্চয়ই।

কার্ড খুলে স্থবির বলেছিল, কার বিয়ে? তোমার? উত্তর দিতে পারে নি যুবকটি। লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল। তার বোকা বোকা মুখ দেখে মনে হল, তাপসীও বোধহয় ঠিক এমনি রূপ দেখেছিল স্থবিরের মুখেচোখে। করুণা করতে এসেছিল। অথচ ফলটা হল কি মর্মান্তিক। ভেঙেগ দুমড়ে হারিয়ে গেল হাসির জগৎ থেকে। কিন্তু আশ্চর্যতম এই যে, এটাকে অদৃষ্ট বলেই মেনে নিয়েছে তাপসী।

বাড়ী ফিরে কেমন অন্যরকম মনে হোল স্থবিরের। শোকার্ত অবসন্নতায় যেন ঝিম মেরে গেছে। চাপ চাপ নিঃশ্বাস ঠেলে এগিয়ে গেল সে। সব চেয়ে ছোট শিশুটা অদ্ভুত বিস্ময়ে কাঁদতে ভুলে গেছে। প্রায় অথর্ব, ফ্যাকাশে চাহুনি নিয়ে মণিও নেই তার যথাস্থানে। ভীড় হয়েছে যত পিন্টুর বিছানায়। একরাশ ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা কাঁদবার চেষ্টা করতে করতে বিহ্বল হয়ে কি যেন বলতে চাইছে হাত পা নেড়ে। একটা কথাও কানে আসছে না স্থবিরের। তাপসী প্রায় শুয়ে পড়েছে, বোধহয় চোখের জলের ভারে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। দেখল অবাক হয়ে, কি অপূর্ব শান্তশিষ্ট ভাব পিন্টুর চোখে-মুখে, যেন এক জেলখাটা কয়েদী মুক্তি পেয়ে তার আকাঙ্ক্ষার আকাশ খুঁজে পেয়েছে। শুধু চোখ দুটো, মনে হয়, এতদিনের পন্ডশ্রমকে ব্যঙ্গ করবার ভাষা পেয়ে স্থির হয়ে গেছে। স্থবিরের চোখে তবু জল এল না।

হঠাৎ হাতের দিকে নজর পড়তেই হুঁশ ফিরে এল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সেখান থেকে, খুব ভাগ্য কারো নজরে সে এখনো পড়ে নি। দোকানে ফিরে সমস্ত ওষুধ কম্পাউন্ডারের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এগুলো ফেরত রেখে দিন, আর দরকার হবে না।

কম্পাউন্ডারকে অবাক হতে দেখে বলল, ভাববার কিছু নেই। মিকশ্চার ফেরৎ হবে না জানি। ট্যাবলেটগুলো আর শিশিটার দাম দিন।

কেন কি হল? কম্পাউন্ডারের এখন সবিস্ময় প্রশ্ন।

কি আবার হবে? ওষুধগুলো ফেরৎ দিতে এসেছি।

পয়সা কটা ফেরৎ নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরে গেল স্থবির। এবার একেবারে পিন্টুর বিছানায়, পিন্টুর মাথার কাছে রাখা একটা চেয়ারে। বোধহয় ডাক্তারকে বসতে দেওয়া হয়েছিল। স্থবিরকে দেখে তাপসীর ভাবের ঝড় আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। তার চোখের জল পিন্টুর মুখ বুক ছেড়ে এবারে আক্রমণ করল স্থবিরের পা দুটোকে, বিলাপের সম্বোধন পিন্টুর প্রতি 'তুই' থেকে তার প্রতি 'তুমি' তে এসে দাঁড়ালো —ওগো আমার কি হবে গো? তাকে একবার দেখতেও পেলে না শেষবারের মতো। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নির্বিকার স্থির হয়ে বসে অবাক চোখে দেখছিল স্থবির। সবাই প্রায় কেঁদে ফেলেছে। আবার কয়েকজন মিলে পিন্টুর অদ্ভুত অদ্ভুত এমন সব গুণের কথা নির্দ্বিধায় আবৃত্তি করছিল, স্থবিরের পক্ষেও এই পিতৃজীবনে যার পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি।

তবু স্থবির ভাবে, ভাবে এরা কান্না-কাটি করছে। কিন্তু কেন? এই শোকের সৃষ্টির মূলে কিসের অভাব? পিন্টু নিশ্চয়ই শান্তিতে আছে দূষিত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে আর সমাজবিরোধী হলেও স্থবির কিছুটা আশ্বস্ত যে তার তরফ থেকে একটা খরচের বোঝা নেমে গেল। তাপসী হয়তো বলবে, একটি ভালবাসার পাত্র হারিয়ে গেল তাই তার কান্না পাচ্ছে। কিন্তু পাত্র হারাবে কোথায়? হারায় নি, ভেঙেগ গেছে। যে পাত্রে আর ভালবাসা দেওয়া যাবে না, সে পাত্রের জন্য শোক করে লাভ কি? ভালবাসা দেওয়া যাবে না বলেই তো যত দুঃখ, তা সেটা অন্য পাত্রে দিলেই তো হয়।

কিন্তু বিধির নিয়ম এই যে, চোখের জল এত ভাবনাচিন্তা ক... আসে না। তবু আশ্চর্য, স্থবিরের এতটুকু কষ্ট হয় নি, তার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। হয়তো কোনদিন সব কিছু অগ্রাহ্য করে যুক্তির বাঁধ ভেঙেগ আসবে সে চোখের জল; বুঝবে ভালবাসা এত সূক্ষ্ম যে তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, উপলব্ধি করতে হয় ভালবাসার পাত্রের স্পর্শে। তাই এ কান্না মিথ্যের স্বরূপ নিয়েও আপাতসত্য।

এ আঘাত নতুন রূপ নিয়ে এলেও নতুনত্ব নেই কোন। পরদিন যথারীতি খেয়ে দেয়ে অফিসে গেল স্থবির। তবে কাবলী জুতোর বদলে রাবার স্লিপার—নিজের নয় তাপসীর। সেই একই পরিবেশ, একই আবহাওয়া। কারো প্রমোশনের গল্প, কারো শ্যালিকার কথা, কারো বা বাড়ী জমির আখ্যান; মোট কথা, সব মিলেয়ে মুখরতার পুনরাবৃত্তি, পরিবেশের একঘেয়েমী কাটাতে প্রচন্ড একঘেয়ে চেষ্টা। অফিসের প্রবীণতম সহকর্মীর নবীনতম রসিকতা শুনে সেই আগের মতই শ্লথ করতে হল ঠোঁটদুটোর দৃঢ়তা। অবাক মনে হয় স্থবিরের। কাল বাড়ী ফিরে মনে হয়েছিল, শোকের ছায়া বুঝি জগৎময়। কিন্তু আশ্চর্য, এরা কেউ এর কোন খোঁজ রাখে না, এমন স্থবির নিজেও বোধহয় জানে না।

দুপুরে জলখাবারের ফাঁকে অঞ্জলীর

কথাবার্তায় সকলের মুখ উদ্ভাসিত হতে দেখে স্থবিরের মনে হয় নর্দমার পাঁক উঠে এসেছে সেখানে। কিন্তু স্থবির শিউরে ওঠে না, হাসে, বোধ হয় হাসতে হয়। কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাওয়া মনটা বিশ্লেষণ করে দেখেছে, হাসির প্রলেপে যে উচ্ছ্বাসের ঢেউ মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায় তা ভিত্তিহীন, অপ্রকৃতিস্থের দগ্ধনগ্ন ভস্মাবশেষ। এর চাইতে অনেক ভালো, অনেক বেশী সুখ-কর, দুঃখের মৃদু দহন। তার স্নিগ্ধ-তায় জীবনবোধের অবকাশ আছে। সেদিন মার্তন্ডবাবু বলছিলেন, আমি দুঃখ পাই বটে কিন্তু অনুতাপ করি না তার জন্য। স্থবিরের স্থিরবিশ্বাস মার্তন্ডবাবু দুঃখ সম্ভোগ করেন নি মোটে। কারণ দুঃখের জন্য অনুতাপ হয় না, অনুতাপ হয় সুখের পর। প্রদীপের আলোতে দুঃখের স্নিগ্ধমধুর দীপ্তি কিন্তু তার রূপের আকর্ষণে সুখ, সেই সুখ অনুতাপ হয় পতঙ্গের মৃত্যুরূপে। দুঃখসুখের জগতে দুঃখ সুখ আলাদা বলে কিছু নেই, অনন্ত দুঃখের নশ্বর রূপই সুখ। সুখের অন্তরেই আছে দুঃখ। দুঃখ স্থির বলেই গভীরতর আর সুখ অস্থির ও আকর্ষণীয়। স্থবিরের ধারণা প্রসন্ন-বাবু স্থিতপ্রজ্ঞ। স্ত্রীর কাছ থেকে আটটি সন্তান উপহার পেয়েও তিনি তাঁর চুল ও রান্নার প্রশংসা করেন। সেই ফুলশয্যার রাত্রির বর্ণনা দিতে গিয়েও যখন তাঁর গায়ে কাঁটা দেয়নি তখন স্থবির ধরে নিয়েছে যোগাভ্যাস কিছু তিনি জানেন। প্রতিদিন দুইবেলা অষ্টপাশের রাহুগ্রাস সহ্য করেও অক্লেশে তাদের ক্ষমা করেন। মৃত্যু কামনা করেন নিজের অথচ স্থবির একবারও নিজের মনকে বিশ্বাস করাতে পারে নি যে পিন্টুর মৃত্যুতে তার কষ্ট হয়েছে।

অফিস ছুটি হয়, স্থবির ফিরে আসে বাড়ীতে। শোকতাপে ভরা পরি-বেশ আধশোয়া অবস্থায় আহ্বান জানাল। মনে হোল, তাপসীর মুখেচোখে একটু খুশীর আভা। স্থবির তখনও জামা-কাপড় ছাড়ে নি, তাপসী বলল, জানো, কাল তড়িৎদা আসছে।

—কে তড়িৎবাবু! স্থবিরের নিরুত্তাপ চোখে সবিস্ময় প্রশ্ন।

একটু ক্ষুণ্ণ হয় তাপসী। বলে, তড়িৎদাকে চেনো না? আজকাল তুমি সব ভুলে যাও দেখছি। নাকি ইচ্ছে করেই ভুলতে চাও?

কি জানি, কথাটা হয়তো ঠিক। তড়িৎবাবুকে চেনে স্থবির, কিন্তু 'তড়িৎদা আসছে' বললেই চিনতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করতে হবে, এতে আপত্তি আছে তার।

তবু প্রসঙ্গটা একটু সহজ করে বলল, তোমার দূর সম্পর্কের কোন এক দাদা তো?

তাপসীর স্বর একটু উত্তপ্ত হোল, দূর মনে করলেই দূর। সে তো কত আপন ভাবে আমাদের। আমাদের খবর শুনে রীতিমতো দুঃখ প্রকাশ করে জানালো শীগগির আসছে!

তাপসীকে বোধ হয় একটু রাগাতে চাইল স্থবির। বলল, মিছিমিছি কতক-গুলো সহানুভূতি কুড়োতে গেলে কেন?

কিন্তু তাপসী অনেক বেশী বাস্তব-মুখী। বলল, তুমি যে দিনকে দিন কি হচ্ছ না? ও সহানুভূতি মোটেও মিথ্যে নয়। লিখেছে, আমার সুযোগ থাকতে তোমরা এমন কষ্ট করে থাকবে এটা মোটেও কাজের কথা নয়। মণির একটা ভাল চিকিৎসার কথাও ভেবেছে। দেখো, ও এলে যা বলবে তা করো যেন। গোয়ার্তুমি করে সুযোগ নষ্ট করে দিয়ো না।

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল স্থবির। বলল, বড়লোককে তো নিমন্ত্রণ করলে, কি খাওয়াবে শুনি?

রসিকতার উত্তর দিতে চেষ্টা করল তাপসী। বলল, সে তোমার ভাবতে হবে না। আমাদের অবস্থা ও জানে। যদি তেমন দরকার মনে করে, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে আসবে। যতই তুমি ঠাট্টা করো না কেন, পয়সা থাকলেও তড়িৎদার এতটুকু অহংকার নেই।

জামাটা ছেড়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল স্থবির, কিন্তু তুমি মনে রেখো, আমার সঙ্গে কথা বলতে এলে, কথা বলার যা ধরন ঠিক তেমনটিই শুনতে হবে। ভদ্রতার কোন কালি দিয়ে তা কিন্তু পরিবেশন করা হবে না।

তারপর একটু সহজ স্বরে বলল, তুমি খেয়েছ তো আজ?

তাপসীর বোধহয় কাজের কথা ফুরিয়েছে। কথাটার উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ না করে চলে গেল ঘর ছেড়ে। স্থবিরের নজর পড়ল, ঘরের কোণে বসে আছে মণি তেমনি একঘেয়েমি নিয়ে, শুধু চোখ দুটো জলে ভরে উপচে পড়ছে। আস্তে আস্তে উঠে গেল তার কাছে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, কি হয়েছে রে মণি? কাঁদছিস কেন?

তাপসী ঘরে ঢুকে বলল, মণিটা সারাদিন কেবলই কাঁদছে। স্নান খাওয়া করে নি মোটে।

কেন, কে জানে, মণির মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরল স্থবির। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নায় বুকটা ভেসে গেল। যেন কয়েক ফোঁটা জল সূর্যের তাপে অতিষ্ঠ হয়ে বিরাট একটি পাথরে আত্মসমর্পণ করতে চাইছে, কিন্তু পাথরটা তাকে গ্রহণ করতে নারাজ। স্থবির সে ভাষা বুঝল, উপলব্ধি করল কিন্তু প্রকাশ করল না।

এমনি রূপ আগে অনেক দেখেছে; এ ভাষা অনেক শুনেছে স্থবির। বর্ষা-ঘন রাত্রিতে এমনিভাবেই কাঁদতে দেখেছে আকাশকে, কেঁদেছে হাওয়ার দোলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। স্থবির অনুভব করেছে শিহরণ দিয়ে, ঘুমিয়ে পড়েছে তার রেশটুকু নিয়ে। কিন্তু আজ আর ঘুম আসছে না, মণি যে কান্নার রেশ দিয়ে হৃদয়ের চোখ খুলে দিয়েছে, স্থবির তাই দিয়ে দেখছে অবাক হয়ে।
তবু বর্ষাঘন কালোয় জাগে বিদ্যুতের চমক। শোকতাপের বাড়ীটাতেও লাগলো আলোর চমক, খুশীর আমেজ আর প্রাণের উদ্বেলিত রূপ। তড়িৎবাবু এলেন, শুধু এলেনই না। স্থবিরকে নিভিয়ে, তাপসীকে ফুটিয়ে হাসি জাগা-লেন মণির মুখে। আশ্চর্য হয়ে ভাবল স্থবির, মণিও বোধহয় জানে, অব্যক্ত জীবনেও প্রাণের দাম আছে।

তড়িৎবাবু রাশভারী লোক। দু দুটো কোম্পানীর ডিরেক্টর। তাপসীই বলেছে, তার বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘরের মেঝে মোজায়েক করা। তাদের গাড়ীর দরজা খুলতে একজন চাকর আছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

স্থবির দেখেনি তড়িৎবাবুকে এর আগে। কিন্তু তাপসীর মুখে তার কথা শুনে অনেকটা চেনা হয়ে গিয়েছিল। তবু ভদ্রলোকের এত কেরামতি সত্ত্বেও অফিস থেকে আগে চলে আসার প্রয়ো-জন বোধ করেনি সে। যথারীতি ধীরে-সুস্থে ভিড় কাটিয়ে বাড়ী ফিরল। তাপসী ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। উষ্মা প্রকাশ করল একটু অন্যভাবে, তড়িৎদা এসেই খোঁজ করল তোমার। তোমার যদি কোন কান্ডজ্ঞান থাকে?

তার যে কোন কান্ডজ্ঞান নেই, প্রমাণ দিল তখনও নির্বাক থেকে এবং জামা-কাপড় ছেড়ে সোজা কলতলার দিকে গিয়ে। এমন কি হাত মুখ ধুয়েও স্থবির যখন সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ল তাপসীর শরীর রীতিমতো জ্বালা করতে লাগল। খুব ভাগ্য, তড়িৎবাবু ভাল লোক। নিজেই এলেন দেখা করতে। স্থবিরকে বিছানায় দেখে বল-লেন, কি ব্যাপার। কখন এলেন? শরীর খারাপ নাকি?

না, তেমন কিছু নয়। স্থবির উঠে বসল, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন, তাপসীর মুখে হাসি ফুটল।

তড়িৎবাবু ব্যবসায়ী লোক। কাজের কথা না হলে ব্যাপারটা সেরে নেন

সংক্ষেপে। তাই বললেন, আপনাদের সব শুনলুম তাপসীর কাছ থেকে। সত্যিই এরকম করে—

অসহিষ্ণু হয়নি স্থবির। তবু বলল, আজ ওসব কথা থাক। অনেক-দূর থেকে এসেছেন। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। কাল ছুটির দিন আছে, অনেক আলোচনা করা যাবে।

অসহিষ্ণু বোধ হয় তড়িৎবাবুর বললেন, না না, ক্লান্তি কোথায়? যার জন্য এলুম, সবার আগে সে কাজটা সেরে নেওয়াই ভাল। তাছাড়া এমন দুরবস্থার কথা শুনে কে স্থির থাকতে পারে বলুন? অন্ততঃ আমি তো পারি না। এটা আমি কর্তব্য বলেই মনে করি।

হাসবার চেষ্টা করল স্থবির, ঠিক আছে, একদিনে এমন কিছু কর্তব্যচ্যুতি হবে না। এ ছাড়া আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করাটাও তো আমার কর্তব্য।

তড়িৎবাবু বোধহয় ক্ষুণ্ণ হলেন কিন্তু স্থবিরের জবাবের প্রশংসা করে ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

আলোচনায় বসে স্থবিরের মনে হল, তড়িৎবাবু মনুষ্যত্বের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। বলে গেলেন তিনি প্রায় বক্তৃতার সুরেই, কথা কি জানেন, আমি সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী। যদি সমাজ গড়ে আমাদের বাস করতে হয়, তবে পশুর মত বাঁচব কেন? আপনার বিপদে যদি আমি সাহায্য না করি, সেটা ন্যায়গত অপরাধ বলেই আমার বিশ্বাস। শুনলাম, আপনি মাইনে পান মাত্র আড়াই শো। আমি তো শুনে অবাক হয়েছিলাম, এতে আপনার মত ফ্যামিলির পক্ষে এই কোলকাতার বুকে নুনভাত খেয়ে থাকাও সম্ভব নয়। আমি একটা চাকরী ঠিক করে এসেছি আপনার জন্য, শ চারেক টাকা মাইনে। আমার বাড়ীতে অনেক জায়গা খালি থাকে, স্বচ্ছন্দে সেখানে থাকবেন। মণিকে দার্জিলিং-এ পাঠাব, আমার এক বন্ধু সেখানে ডাক্তার। ট্রিট্‌মেন্টের কোন অসুবিধে হবে না। যা লাগে, মামা হয়ে সেটা বহন করবার অনুমতি চাইছি আপনার কাছে।

গম্ভীর হল স্থবির। আস্তে আস্তে শামুকের খোলস ছাড়ার মত বলল, আপনি মহানুভব। আমাদের প্রতি আপনার দয়া অস্বীকার করবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই আমার। কিন্তু যুক্তি ছাড়াও স্বকীয়তার একটা রূপ আছে। সেই রূপের দোহাই দিয়ে আমি অনুরোধ করছি, আমায় লোভ দেখাবেন না।

আহত হলেন তড়িৎবাবু, বললেন,

আপনি কিন্তু ভুল বুঝলেন আমায়। দয়া আমি মোটেও দেখাতে চাইনি। তাপসী আমার খুব আদরের বোন। আপনাকে আমি লোভ দেখাব একথা বলতে পারলেন? আমার অন্তরটা দেখলেন না একবার?

গাম্ভীর্যটা লঘু করে বলল স্থবির, দোষ আমার। কথাটা হয়তো ঠিক বোঝাতে পারি নি। প্রতি জিনিষেরই দুটো দিক আছে। একটি দাতার, একটি গ্রহীতার। আমি গ্রহীতার দিকটা বিশ্লেষণ করে যাচ্ছি, দয়া, লোভ এসব আমার কাছে মনে হচ্ছে।

তড়িৎবাবু বোধ হয় সুযোগ পেলেন, বললেন, এটা আপনার কমপ্লেক্স। আমি যখন ভাল মনে দিচ্ছি তখন কেন আপনি নেবেন না? এরকম-ভাবে দুঃখকষ্টের সাথে লড়াই করবার কি কোন মানে আছে?

স্থবির হেসে বলল, দুঃখকষ্টের সঙ্গে লড়াই করেই যখন মানুষকে বাঁচতে হয়, তখন আমাকে আর তা থেকে বঞ্চিত করে লাভ কি?

জীবন-দর্শন সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞের মত হাসলেন তড়িৎবাবু, অজ্ঞকে উপদেশ দেবার মত করে বললেন, এরকম ফ্রাসট্রেশন জীবনে লড়াই করতে করতে প্রায়ই আসে। আমার নিজের জীবনেও কতবার এসেছে। তখন মনে হয়েছে, জীবনটা যাক ভেসে যেখানে খুশি, কি প্রয়োজন আছে এর? এরকম মর্বিডিটি কিন্তু হেরে যাবার লক্ষণ স্থবিরবাবু।

স্থবির চুপ করে রইল, বোধ হয় উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। কিন্তু তড়িৎবাবু ব্যস্ত লোক, বললেন, চুপ করে গেলেন কেন, জবাব দিন?

ভারী চোখ তুলে স্থবির বলল, জবাব আমার আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছে তড়িৎবাবু। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, নিজেকে বিশ্বাস করবার অধিকার আপনার মত আমারও আছে। ফ্রাসট্রেশনের কথা যখন তুললেন তখন কিছু বলি। যে দুঃখকষ্টের কথা এতক্ষণ শুনতে হোল, ওটা আমার নয়, আপনার বা আপনাদের মত সহানুভূতিশীলেদের। আমরা থাকি বেশ সুখে, যে দুঃখ বা কষ্টের কথা বললেন তা আমার মত আপনাদেরও আছে। তবে হ্যাঁ, দুঃখ আমাদের আসে যখন আপনাদের সাক্ষাৎ পাই। আপনাদের চেহারায় নিজেদের প্রতিবিম্ব হারিয়ে ফেলি তাই কষ্টটা উপলব্ধি হয়। এক বেলা না খেতে পেলে কষ্ট হয় না মোটে কিন্তু কষ্ট পেলাম আপনার কাছ থেকে কথা শুনে। আমাদের দুঃখ কষ্ট আপনার কল্পিত, বিলাসী চোখের জল ফেলেন ভাল কথা কিন্তু আমাদের সামনে কেন?

আঘাত পেলেন তড়িৎবাবু। কোন ভাষা খুঁজে পেলেন না ঠিকমত। তবু বললেন, মানুষের দুঃখে মানুষ যদি চোখের জল ফেলে, সেটা কি অপরাধ?

না, এটা অপরাধ নয়। চোখের জল মানুষের দুঃখে পড়ে না, পড়ে তার প্রতি করুণায়, তাই সেটা অপরাধ। আমার মনে হয়, মানুষ যখন মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা করে, সে তার জীবনের চরমতম ভুল করে।

তড়িৎবাবু নিরুত্তর হলেন। অনেকক্ষণ মৌন থাকার পর স্থবির উঠে চলে এলো নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণ পর তাপসী এসে জানাল, তড়িৎবাবু চলে যাবেন সন্ধ্যের গাড়ীতে। স্থবির কোন শব্দ করল না, চোখ বুজে রইল।

ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এলো। স্থবির উঠে বসল। তাপসী কোথায় গেছে কে জানে। অন্ধকারগুলো ঘন হয়ে নেমে আসছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। আলো কেউ জ্বালে নি। ভালই হয়েছে, বেশ লাগছে তার। শুধু ঘরের কোণে চেয়ারটার উপর বসে থাকা মণির চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে। স্থবির উঠে ছাতে গেল।

অনেকদিন ছাতে আসে নি। কেমন নতুন নতুন লাগছে যেন। কেমন ভারী ভারী যেন সব কিছু। অনেকক্ষণ ধরে কিছুই ভাবল না, আবার ভাবল সব কিছুই—সামনের বাড়ীগুলো, রাস্তার লোকজন, আকাশ, বাতাস সব কিছু। হঠাৎ কার স্পর্শ পেয়ে চমক ভাঙল তার। দেখল তাপসী এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। স্থবির কিছু বলল না, শুধু মনটা অপরাধী অপরাধী ভাব নিয়ে সংকুচিত হল।

তাপসী বলল, একলা দাঁড়িয়ে আছ যে?

কোন শোকের বালাই নেই। কোমল সুন্দর গলা শুনে আশ্বস্ত হল স্থবির। বলল, আমি কিন্তু অপমান করতে চাইনি তড়িৎদাকে।

তাপসী বোধহয় অনেকটা দুর্বল, অন্ততঃ মানসিক। না হলে মাথাটা তার বুকের উপর রাখবে কেন? নম্র-ভাবে অপরাধীর সুরে বলল তাপসী, তুমি অপমান করবে কেন? আমি অপমান করেছি তোমায়, চিনতে পারি নি এতদিন এক সঙ্গে থেকেও। কি ভেবেছিলাম জানো? তড়িৎদা তোমার ভাল বন্দোবস্ত করে দিয়ে তোমায় বলবে আবার কবিতা লিখতে, অন্ততঃ আমি শুনব বলে। কিন্তু এখন আর আমি তা চাই না।

এমন কঠিন স্থবিরেরও বুকটা দুলে উঠল, ভরে উঠল। আবিষ্কার করল, সমস্ত জীবনে এই প্রথম ভালবাসায় সিঞ্চন তার হৃদয় স্পর্শ করল। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কবিতা না লিখলেই কি আর কবি হওয়া যায় না? কবিতা লিখতে গেলে তো কবিত্বকে বরং খাটো করে নিতে হয়। খাতা কলম নিয়ে বসে আর লাভ কি? তার চাইতে এই বেশ আছি।

তাপসী কোন উত্তর করল না। চুপ করে রইল।

উপরের নীল আকাশ কালো অন্ধকারের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে নীল আভা অনেকটা হারিয়েছে। স্থবির নতুন করে দেখল। বুঝল, এ মনের আকাশ, চোখের আকাশ নয়। হয়তো প্রসন্নবাবুর কথাই ঠিক। সুখটা তো একটা কল্পনা বই আর কিছু নয়; তাই পাঁচ বছর বাদে মৃত্যুর সুখের কল্পনা দিয়ে লাঘব করতে চান সমস্ত দুঃখকে।

সেই ছোকরা, প্রসন্নবাবুকে যে হাসতে বারণ করেছিল, সে বোধ হয় এখনও স্বপ্ন দেখে। আজ তার ফুলশয্যা, মনে পড়েছে স্থবিরের। ফুলের প্রাচুর্যে ঘেরা রাজকন্যাকে দেখে অষ্ট-পাশের কথা তার হয়তো মনে পড়বে না। কিন্তু আনন্দবাবু কাল তাকে নিশ্চয়ই দেবদূত বলে ভুল করবেন। ছোকরার কাছ থেকে বিয়ে হবার আশ্বাস পেয়ে তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখে যাবেন একলা ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত।

জীবনের অলিতে গলিতে যুদ্ধ করে করে ছোকরাটি হয়তো নেমে আসবে একই চক্রে তবু তা এতো ধীরে যে তার নজরেও পড়বে না, যদি না তড়িৎবাবু-দের মত কেউ এসে জোর করে দেখিয়ে দেয়। মার্তণ্ডবাবুর মতই সেদিনও সে বলবে, আমি দুঃখ পাই বটে কিন্তু অনুতাপ করি না তার জন্যে।

এদের সকলকে চেনে স্থবির। তার দৃঢ় বিশ্বাস, যারা পথ চেনে, তারা কেউ ভুল নয়, সবাই ঠিক। শুধু চলার ভঙ্গীতে তফাৎ। এদের দিয়ে নিজেকে চিনেছে স্থবির তাই নিজের উপর এত অগাধ বিশ্বাস।

একটা ঠান্ডা হাওয়ার স্রোত দুজনকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। রাত তখন গভীর হতে গভীরতর হয়েছে।

প্রাচীন সাহিত্য

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কবির গান

(৬)

নিতাই বৈরাগী

নিতাই বৈরাগীর একটি গান দিয়ে প্রবন্ধ আরম্ভ করি।

বধুঁর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল।
সুধা বরষিল শ্রবণে॥
বৃক্ষডালে বসি পক্ষী অগণিত
জড়বত কোন কারণে।
যমুনার জল বহিছে তরঙ্গ
তরু হেলে বিনে পবনে॥
একি একি সখি একি গো নিরখি
দেখ দেখি সব গোধনে।
তুলিয়ে বদন নাহি খায় তৃণ
আছে যেন হীন চেতনে॥
হায়, কিসের লাগিয়ে বিদরয়ে হিয়ে
উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাত একি প্রেম উপজিল
সলিল বহিছে নয়নে॥
আর এক দিন শ্যামের ঐ
বাঁশী বেজেছিল কাননে।
কুললাজভয় হরিল তাহাতে
মরিতেছি গুরু গঞ্জনে॥

গানটি একালের অপরিচিত, কিন্তু প্রাচীনরা যখন গানটি পড়বেন, তখন জননান্তরসৌহৃদের মত তাঁদের কারও কারও কানে এর সুরের গুঞ্জন উঠতে পারে।

কবিগানের গায়কদের মধ্যে সুরের খ্যাতি অনেকেরই ছিল। নিত্যানন্দও সুগায়ক বলে সমাদর লাভ করেছিলেন। বাংলা সন ১১৫৮ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭৫১ সালে নিত্যানন্দের জন্ম হয় এক বৈষ্ণব পরিবারে।

সেকালে জাতটা ছিল মানুষের একটা বড় পরিচয়। কবিওয়ালাদের নামের দিকে লক্ষ্য করুন। কারও নাম কেষ্টা মুচি, কারও নাম নিমে শুঁড়ি, কারও নাম ভোলা ময়রা। অ্যান্টনির নামের সঙ্গে ফিরিঙ্গী উপাধি জড়িত হয়ে আছে। ভবানী কবিওয়ালা ভবানী বেনে বলেই পরিচিত। নিত্যানন্দও নিতে বৈষ্ণব বলে আখ্যাত হতেন। এঁর পুরো নাম নিত্যানন্দদাস বৈরাগী। সংক্ষেপে 'নিতাই বৈরাগী' বলেও কখনো কখনো তাঁর নামোল্লেখ করা হয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্ত বলছেন, "এই নিতাই-দাস ঈশ্বরানুকম্পায় এতদ্দেশীয় সংগীত-বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হইয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠবিগলিত সুস্বর শুনিয়া সকলেই মোহিত হইতেন।" কিন্তু গান-রচয়িতা হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর প্রশংসায় খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। তিনি বলেছেন, নিত্যানন্দ গান রচনা করতেন বটে তবে "গাহনা বিষয়ে ইঁহার যদ্রূপ ক্ষমতা ছিল, কবিতা রচনা পক্ষে তদ্রূপ ছিল না।"

নিত্যানন্দের প্রসঙ্গে তৎকালীন আর দুজন কবির নাম পাওয়া যায়। একজন হলেন গোঁর কবিরাজ, আর এক-জন নবাই ঠাকুর। এঁরা "কবিতাসকল প্রবচনপূর্বক ইঁহাকে প্রদান করিতেন। তাঁহারদিগের প্রণীত গীতের দ্বারা নিতাইদাস সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেন।"

কবিওয়ালাদিগের গীত-সংগ্রহেও ঈশ্বর গুপ্তের কথাই সমর্থিত হয়েছে। সেখানেও বলা হয়েছে, গায়ক হিসেবে নিত্যানন্দ খুব জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁর কথনভঙ্গীও ছিল চিত্তাকর্ষক। তবে গান রচনায় দক্ষতা বেশী ছিল না। গোঁর কবিরাজ আর নবাই ঠাকুর ছিলেন তাঁর দলের বাঁধনদার। তাঁদের রচিত গানই নিতাইদের দলে গাওয়া হত।

নিতাইয়ের জন্ম হয় চন্দননগরে। ছেলেবেলায় লেখাপড়া বেশী কিছু শিক্ষা হয়নি। গান-বাজনার দিকে ঝোঁক ছিল, তাতেই দিন কেটেছে। বড় হয়ে কলকাতায় এসে নীলু ঠাকুরের কবির দলে যোগ দিলেন। গোঁর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর তখন এই দলেরই বাঁধনদার ছিলেন। এখানেই তাঁদের সঙ্গে নিত্যানন্দের আলাপ হয়। তারপর নিত্যানন্দ যখন নিজেই দল খুললেন তখন গোঁর ও নবাই তাঁর দলেও গান বেঁধে দিতেন। বাঁধনদার হিসাবে গোঁর কবিরাজের যে খুব নাম ছিল তার প্রমাণ আছে। লক্ষ্মীকান্ত যোগী, লোকে যুগী বলে যিনি পরিচিত ছিলেন, তাঁর দলের জন্যেও গোঁর গান রচনা করতেন। নিতাইয়ের কণ্ঠ ছিল, সুরজ্ঞান ছিল। এদিকে গীত-রচয়িতা হিসাবে সুদক্ষ লোকের সাহায্য পেয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর দল অতিশয় প্রসিদ্ধি পেয়েছিল।

নিতাইয়ের দলে বাঁধনদার থাকলেও সব গানই তাঁরা রচনা করতেন একথা ভাবলে ভুল হবে। নিতাই নিজেও গান রচনা করতেন এবং সে গানও নিতান্ত নিন্দনীয় ছিল না। দোষ কিছু কিছু থাকলেও বাঁধনদারদের সাহায্যে একটু সংশোধন সম্মার্জন করিয়ে নিতেন। ফলে তাঁর রচিত গানগুলিও উৎকর্ষে ন্যূন হত না। "সভ্যতা ও বক্তৃতাগুণে কেহই তাঁহাকে অশাস্ত্রিক জ্ঞান করিতে পারিত না, কারণ বাক্‌পটুতা ভাল ছিল, এবং নিজে যে যে কবিতা রচিতেন তাহা নিতান্ত মন্দ হইত না। বিশেষতঃ অপরের আনুকূল্যে যে সকল কবিতা গান করিতেন প্রায় সকলেই তৎসমুদয় তাঁহার কৃত বলিয়াই জানিত। সেই গীতাবলীর শব্দ-পারিপাট্য ও বিশুদ্ধ ভাব জন্য পণ্ডিতেরাও নিতাইকে পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করিতেন।"

সেটাও একটা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ গানগুলি নিত্যানন্দের নিজের রচনা তা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। ঈশ্বর গুপ্ত বহু দিন পর্যন্ত পরিশ্রম ও বহু কষ্ট ভোগ করিয়া বহু স্থান হইতে বহু লোকের উপাসনা-পূর্বক নিতাইদাস বাবাজীর দলের কয়েকটি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ গীত সংগ্রহ করত" প্রকাশ করেছেন। নিত্যা-নন্দদাস বৈরাগীর জীবনী প্রসঙ্গে সেগুলি মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু কোন্‌টি যে কার লেখা তা তাঁর পক্ষেও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তিনি তাই লিখেছেন, "এই স্থলে এইমাত্র আক্ষেপ রহিল যে, প্রত্যেক কবিতার প্রবচকদিগের নাম পৃথক পৃথক প্রকাশ করিতে পারিলাম

না, কারণ কোন্ গান কাহার কৃত তাহার নির্ণয় হইল না। কিন্তু কোন কোন প্রাচীন লোকে কহেন, নিতাই যে সকল ভাল ভাল বিরহ গাহিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই গৌর কবিরাজের কৃত।"

আমরা প্রবন্ধের গোড়ায় যে গানটি উদ্ধৃত করেছি সেটি 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থেও উদ্ধৃত হয়েছে। 'বঙ্গের লেখক'-এর সম্পাদকও নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে এই গানটিই উদ্ধৃত করেছেন।

রাম বসুর প্রসঙ্গে (৩য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, ২৩ আগস্ট ১৯৬৩) বঙ্কিমচন্দ্রের যে উক্তিটি উদ্ধৃত করেছিলাম এখানে আর একবার সেটির উল্লেখ করার দরকার বোধ করছি। বঙ্কিমচন্দ্র তিনজন কবির নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, তাঁদের কোনো কোনো গীত এত সুন্দর যে, "ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই"। এই তিনজনের মধ্যে নিতাই দাসের নামও ছিল। এই যশোগৌরবের কতখানি তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য আজ আমরা সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করছি—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথা থেকে বুঝতে পারি নিতাইয়ের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। অন্ততঃ দু-চারটি ভাল গান নিশ্চয় তিনি পড়েছিলেন বা শুনেছিলেন যা নিতাইয়ের রচিত বলে তিনি অসন্দিগ্ধভাবে জানেন। আমরা নিত্যানন্দের নামে প্রচলিত দু-একটি গানের অংশ উদ্ধৃত করি :

আগে মন করে দান
ফিরে যদি লই।
লোকে দত্তহারী কবে সই॥
ভাল বলে ভালবাসি যায়
প্রাণ সঁপি তায়।
সে কি মন্দ হলে তারে
মন্দ বলা যায়॥
এত তার শঠতা ব্যাভার।
তবু সে অত্যাজ্য আমার।
সখ্যতা করেছি আগে
কেমনে বিপক্ষ হই॥

আর একটি গানের প্রথম অংশ এই রকম :

কেন সজনি মোর
মরণ নাহিক হয়।
সুখকালে সুখঋতু
দুখ দেও অতিশয়॥
তথাচ এ পাপ প্রাণ
কি সুখে এ দেহে রয়॥

যার অনুগত প্রাণ
সে গেল ত্যেজে আমায়।
তার সাথে সেই পথে
প্রাণ কেন নাহি যায়॥
মরিলে এ দেহ সখি
জ্বলে চিতা আগুনে।
দুখ বোধ নাহি হয়
শব অঙ্গ দাহনে॥
সজীব শরীর এ যে
বিরহ অনলে দয়।
দগধিয়ে মরে সখি
ইহা কি পরাণে সয়॥

নিতাই বাঁধনদার উচ্চশ্রেণীর ছিলেন কিনা তা সঠিক জানা না গেলেও বাজনদার যে বেশ বড় ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ফরাসডাঙ্গায় এক বিখ্যাত ঢুলী ছিল, নাম তার মোহন। নিতাই যখন গাইতে গাইতে মেতে উঠতেন তখন মোহনের কাঁধ থেকে ঢোল নিয়ে নিজেই বাজাতে আরম্ভ করে দিতেন। "নিতাইয়ের আড়ি, পরম আর তেহাই যে শুনিত সেই গলিয়া যাইত।"

প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সঙ্গে লড়াই না হলে দলের নাম হয় না। নিতাইয়ের সমসাময়িক কবিওয়ালা ছিলেন ভবানী বণিক বা ভবানী বেনে। তাঁর দলও বেশ বিখ্যাত হয়েছিল। এই দুই দলে মাঝে মাঝে সংগ্রাম বাধত। ধনীদের গৃহে পর্ব-পার্বণ উপলক্ষ্যে কবির গানের আয়োজন করা হত। সকলেই নিতাই এবং ভবানী এই দুজনকে গাওনার জন্য আমন্ত্রণ করতে চাইতেন। এই দুজন একত্র হলে আমোদের উত্তেজনা উদ্বেল হয়ে উঠত। "নিতে ভবানের লড়াই"য়ের নাম শুনলে আসরে লোক ধরত না। কবিদের নাম উহ্য রেখে কেউ কেউ এ'দের কবিত্ব-সংগ্রামকে 'বাঘে-মহিষের লড়াই' বলতেন। 'মোহনবাগান' 'ইস্ট-বেঙ্গল' প্রভৃতি দলের যেমন গোঁড়া ভক্ত দেখতে পাই, সেকালে কবিওয়ালাদেরও তেমনি অনুরাগী ভক্তসম্প্রদায় ছিল। দলের জয়ে তাঁরা আনন্দে উদ্দাম হয়ে উঠতেন, দলের পরাজয়ে তাঁদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হত। দুই দলের গানের লড়াইয়ের সূত্র ধরে দু-দল ভক্তের মধ্যে রক্তারক্তিরও ইতিহাস আছে।

"এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতাইয়ের নামে ও ভাবে গদগদ। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের পরিসীমা থাকিত না। যেন হৃতসর্বস্ব হইলেন এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকের আহার-নিদ্রা রহিত হইত। কতস্থানে কতবার গোঁড়ায় লাঠালাঠি ও কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে।"

দেশে বিদেশে

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

॥ দেশের ডাক ॥

মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে যে দেশের সেবায় বিশিষ্ট নেতৃবর্গ আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত করেছেন তার এক ভয়ংকর দুর্দশাগ্রস্ত রূপ সংসদের সাম্প্রতিক আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা-কালে সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রামমোনহর লোহিয়া বলেছিলেন, এদেশের শতকরা ষাটজন লোকের দৈনিক আয় তিন আনার বেশী নয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু তার উত্তর দেওয়ার সময় বলেছিলেন, ডঃ লোহিয়ার তথ্য ভুল, দেশের সর্বনিম্ন আয়সম্পন্ন লোকও লোহিয়া-প্রদত্ত হিসাবের পাঁচগুণ বেশী আয় করে থাকে। যাঁরা সংবাদপত্র পাঠ করে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত থাকেন তাঁদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর উক্তিটিই বেশী নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। কারণ আর কিছু না হলেও দুটি পঞ্চবার্ষিক যোজনার কাজ প্রায় নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে—এটুকু অন্তত দেশবাসীর অজানা নয়।

কিন্তু এর মাত্র কদিন পরে সংসদে বিতর্ককালে পরিকল্পনা ও নিয়োগ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ এ সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে দেখা যায়, সর্বনিম্ন আয় সম্বন্ধে সরকারী হিসাব প্রধানমন্ত্রীর তথ্য অপেক্ষা ডঃ লোহিয়ার তথ্যেরই বেশী নিটকবর্তী। এদেশে অন্তত শতকরা দশজন, অর্থাৎ, প্রায় সাড়ে চার কোটি লোক আছে যাদের দৈনিক ব্যয় চার আনার কম। অর্থাৎ চারজন লোক নিয়ে এই নিম্নআয়ের লোকেদের যে-সব পরিবার গঠিত তারা দৈনিক এক টাকা বা মাসে মোট ত্রিশ টাকার মত ব্যয় করতে পারে, যা এক-মণ চালের দামও নয়। এরপরও আছে আশ্রয় ও লজ্জা নিবারণের মৌলিক প্রশ্ন। সুতরাং সরকারী হিসাবের ভিত্তিতেই এই অবাঞ্ছিত ভয়ংকর সত্য আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে, এই অভাগা দেশের সাড়ে চার কোটি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের কোন সংস্থান নেই। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬২ সালের জুলাই—অর্থাৎ মাত্র এক বছর আগের সংগৃহীত তথ্য থেকে শ্রীনন্দ এই সংবাদ আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত

শ্রীমোরারজী দেশাই

শ্রীজগজীবন রাম

শ্রীগোপাল রেড্ডী
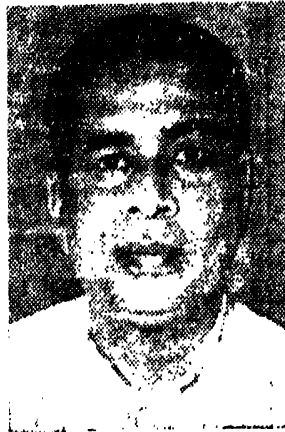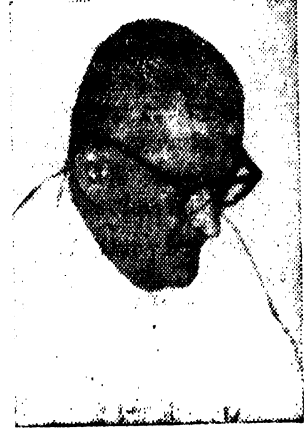
শ্রীএস কে পাতিল

হিসাব থেকেই আমরা জানতে পারি যে, এদেশের শতকরা সত্তরজনের মাসিক ব্যয় ত্রিশ টাকার কম। দেশের বৈষয়িক দুর্গতির ভয়ংকর চেহারা এর চেয়ে বোধ হয় আর কিছুতেই প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। তারপরেও মনে রাখা দরকার যে, এটা ব্যয়ের হিসাব, আয়ের নয়। আয় আরও কম, যেকারণে এদেশের কোটি কোটি মানুষ বংশপরম্পরায় ঋণগ্রস্ত।

আরও নৈরাশ্যকর তথ্য পরিবেশন করেছে মহলানবিশ কমিটির রিপোর্ট। তাতে বলা হয়েছে, দেশের লোকসংখ্যা প্রতি বছর দুই শতাংশ করে বাড়ছে, কিন্তু জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধি দুই শতাংশের কম। অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে দেশের জাতীয় আয় ক্রমহ্রাসমান, যার মানে দাঁড়ায় যে, করভারে পিষ্ট জাতি একটির পর একটি পঞ্চবার্ষিক জাতীয় যোজনার কাজ শেষ করছে, কিন্তু তাতে দেশের বৈষয়িক উন্নতি না হয়ে অবনতিই হচ্ছে দিনে দিনে। তাই জাতীয় অর্থনীতির কর্মকর্তা যাঁরা, তাঁদের অবশ্যই নতুন করে ভেবে দেখা দরকার যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে কিনা। দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবছেন, কিন্তু অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস ছাড়া তা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

॥ চীনের নতুন কথা ॥

গত বছর অতর্কিতে ভারত আক্রমণ করে চীন এদেশের কয়েক হাজার মানুষকে হতাহত ও বন্দী করে ও কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট করে। যে-সকল অঞ্চল তার সৈন্যবাহিনী দখল করে তার অনেকাংশ এখনও ভারত ফিরে পায়নি। কিন্তু এত বড় নির্লজ্জ দস্যুবৃত্তির পরেও চীন কখনও স্বীকার করেনি যে, সে ভারত আক্রমণ করেছিল। বরাবরই চীন বলে আসছিল যে, ভারতের সৈন্যবাহিনীই প্রথম তাদের আক্রমণ করেছিল এবং সে আক্রমণ প্রতিহত করার

ডঃ কে এল শ্রীমালী

শ্রীকামরাজ নাদার

জন্যই নিতান্ত নিরুপায়ের মত তারা অস্ত্র ধারণ করেছিল। যারা ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল তারা নাকি চীনের নিয়মিত সৈন্য পর্যন্ত নয়, সীমান্ত প্রহরী মাত্র! কিন্তু চীনের এই মিথ্যা প্রচারে পৃথিবীর কোন দেশই কর্ণপাত করেনি। পৃথিবীর সকল দেশই হয় প্রকাশ্যে চীনের কার্যকলাপের নিন্দা করেছে, নয়ত নীরব থেকে ও পরোক্ষে ভারতকে সমর্থন করে চীনকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার আক্রমণাত্মক নীতিকে তারা সমর্থন করে না। বিশ্ব-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে চীন, কিন্তু বিশ্বের রাষ্ট্র-সমাজে আজ সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও একঘরে সে। সারা কমিউনিস্ট দুনিয়াও এখন চীনের প্রতি খড়্গহস্ত। সোভিয়েট ইউনিয়ন ত প্রকাশ্যেই চীনের ভারত আক্রমণকে নিন্দা করতে আরম্ভ করেছে।

এই রকম বিশ্বব্যাপী প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে চীন বোধহয় তা কল্পনাও করতে পারেনি। তাই এইবার সে বলতে বাধ্য হচ্ছে, আর কখনও সে ভারত আক্রমণ করবে না, এমনকি ভারত যদি তাকে আক্রমণ করে তবুও। ভারত যদি তাকে আক্রমণ করে তবে

বক্সী গোলাম মহম্মদ

শ্রীবিজু পট্টনায়ক

শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত

শ্রীবিনোদানন্দ ঝা
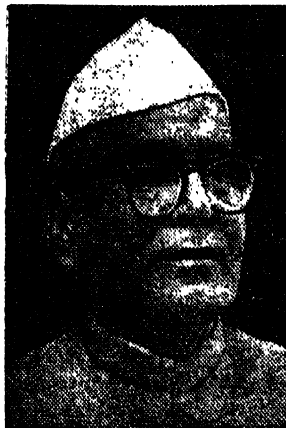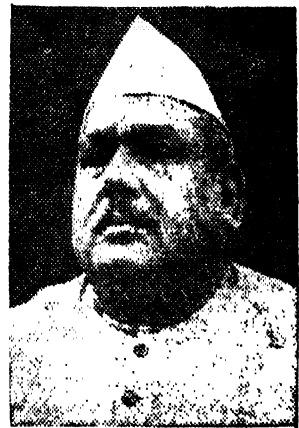
কলঃম্বো শক্তিবর্গকে সেকথা জানিয়ে সে তার প্রতিকার প্রার্থনা করবে। কতখানি প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলে তবে চীনের মত দুর্বিনীত ও নীতিবোধহীন রাষ্ট্রকে এই রকম ভালমানুষ সাজতে হয় তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তার জন্যে চীন সম্পর্কে ভারতের বর্তমান নীতি পরিবর্তিত হওয়ার কোনই কারণ নেই। কারণ, যে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, চীনের এই মত-পরিবর্তন মতি পরিবর্তন নয়, প্রতিকূল অবস্থার চাপে কৌশল বদল মাত্র। সুযোগ পেলেই আবার সে স্বরূপ ধারণ করবে।

॥ পাকিস্থানে গণ-বিক্ষোভ ॥

আয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে গণ-বিক্ষোভ ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করেছে এবং পূর্ববঙ্গে সে বিক্ষোভ প্রায় বিস্ফোরণের কাছাকাছি পৌঁচেছে। পূর্ণ স্বাধিকারের দাবীতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ দলমত নির্বিশেষে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত জননেতা মৌলানা ভাসানী বলেছেন, পূর্ব পাকিস্থানের বর্তমান ঔপনিবেশিক অবস্থার অবশ্যই অবসান ঘটাতে হবে এবং এমন সংবিধান প্রবর্তন করতে হবে পাকিস্থানে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অর্থ ছাড়া অন্য কোন দপ্তর থাকবে না। পূর্ব পাকিস্থানের জনমতকে সন্তুষ্ট করার আশায় কূটবুদ্ধি আয়ুব মৌলানা ভাসানীর সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু ভাসানী তাঁকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, চারটি ন্যূনতম সর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনভাবে আয়ুব সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না। সে সর্তগুলি হল—গণতান্ত্রিক সংবিধান, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও সকল রাজবন্দীর মুক্তি। বলা বাহুল্য, ভাসানীর পক্ষে সর্তগুলি ন্যূনতম হলেও আয়ুবের পক্ষে তা মানা অসম্ভব, কারণ এই চারটি দাবীর অস্বীকৃতির উপরেই আয়ুবের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। ভাসানীর এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে আয়ুবের সঙ্গে তাঁর কোন আপোসই সম্ভব হয়নি এবং ভাসানীও পূর্ণ উদ্যমে যুগপৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে তাঁর পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম পাকিস্থানেও মৌলানা ভাসানী আশাতীতভাবে সাড়া পেয়েছেন। পাক জাতীয় পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে যেভাবে জনমত ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করছে তাতে মনে হয় না যে, আয়ুব খাঁর পক্ষে এ দাবী খুব বেশী দিন প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হবে।

॥ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অবস্থা ॥

ক্যাথলিক সমর্থনপুষ্ট দিয়েম সরকারের নির্যাতনে সে রাজ্যের বৌদ্ধদের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে একটি ক্যাথলিক পরিবার আজ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সর্বময় কর্তা, এবং সে পরিবারটিও পরিচালিত হয় এক ক্ষমতালিপ্সু তীব্র বৌদ্ধ-বিরোধী নারীর নির্দেশে; আরও কঠোর পীড়ন-নীতি বর্তমান সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে মনে করেন যিনি। এই নারীটি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অকৃতদার প্রেসিডেন্ট নো দিন ইয়েমের ভ্রাতৃবধূ ও ইয়েম অনুজ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান নো দিন নুর স্ত্রী। সরকারী পরিচয়ে মাদাম নু শুধু দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জাতীয় সংসদের একজন সদস্য মাত্র ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্টের সঙ্গিনী ফাষ্ট লেডী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই আজ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ভাগ্যবিধাত্রী। মাদাম নু প্রেসিডেন্ট ইয়েমকে যে পরামর্শ দেন প্রেসিডেন্ট তা না মেনে পারেন না, কারণ পারিবারিক মতবৈষম্যের কথা তিনি সাধারণে প্রকাশ করতে ভয় পান। আর প্রেসিডেন্ট যা নির্দেশ দেন তা অস্ত্রের জোরে সফল করেন নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান, পত্নীপ্রাণ অনুজ নো দিন নু। আর ক্যাথলিক স্বার্থের রক্ষক হলেন প্রেসিডেন্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নো দিন থুক, রোমান ক্যাথলিক চার্চের আর্চবিশপ তিনি। তাঁর উপরেও মাদাম নুর সীমাহীন প্রভাব। প্রেসিডেন্ট ইয়েমের অপর এক ভাই নো দিন ক্যান মধ্যাঞ্চলের শাসনকর্তা ও সর্বকনিষ্ঠ নো দিন লুয়েন দঃ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রদূতরূপে গ্রেট বৃটেনে আছেন। মাদাম নুর বাবা ত্রান ভান চুয়াং যুক্তরাষ্ট্রে দঃ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রদূত। অবশ্য বাবার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক এখন ভাল নয়। কিন্তু নো দিন পরিবারের উপর মাদাম নুর প্রভাব এত বেশী যে, বছর তিনেক আগে যখন একবার দঃ ভিয়েৎনামে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্ট ইয়েম তাদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন তখন বিদ্রোহীরা দাবী জানিয়েছিল যে, মাদাম নুকে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ থেকে অপসারিত করতে হবে।

একটি নিষ্ঠুর নারীর মোহপাশে আবদ্ধ নো দিন পরিবারের হাত থেকে দঃ ভিয়েৎনামের শাসনব্যবস্থা কেড়ে নেওয়ার দাবী আজ শুধু সে দেশের বৌদ্ধ জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এ দাবী উঠেছে এবং একারণে ইয়েম পরিবারের রক্ষাকর্তা যুক্তরাষ্ট্র সরকারও বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রতিদিন দশ লক্ষ ডলার ব্যয় করেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জন্যে আর চোদ্দ হাজার মার্কিন সৈন্য মোতায়েন আছে সেখানে যে কোন জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হতে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পতন হলে লাওস, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড এমন কি মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়বে কমিউনিষ্টদের হাতে।

॥ কামরাজ পরিকল্পনা ॥

ভারতের বৃহত্তম ও সর্বাধিক ঐতিহ্যসম্পন্ন রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসের সাংগঠনিক পুনরুজ্জীবনের বিষয়টিকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন তা শ্রীনেহরুর বৈপ্লবিক ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায়নি। ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যেই কংগ্রেসী শাসন বহাল আছে এবং কেন্দ্রে পরস্পর-বিরোধী অকংগ্রেসী দলগুলি সম্মিলিতভাবেও কংগ্রেসের এক-পঞ্চমাংশ শক্তির অধিকারী নয়। তবুও কংগ্রেস সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির প্রশ্নটিকে এত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বলে মনে করেছেন দেখে স্বভাবতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, কয়েকটি উপনির্বাচনে পরাজয়ই এর আশু বা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ নয়। সংসদীয় পদ্ধতিতে শাসিত গণতন্ত্রী দেশমাত্রেই দেখা যায় যে, যোগ্যতম ব্যক্তিদের হাতে শাসন দায়িত্ব দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতাদের হাতে দলের কার্য পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। তার কারণ, শাসনক্ষমতা দখলের জন্যই দলের প্রতিষ্ঠা ও শক্তিবৃদ্ধি নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইংলণ্ডের ভোটদাতারা শ্রমিক দল অথবা রক্ষণশীল দলকে ভোট দেবেন সেটা স্থির করেন ক্ষমতাসীন দল দেশের কতটা কল্যাণসাধনে সমর্থ হয়েছে তার বিচার করে। একারণে সেদেশে যখন যে দল ক্ষমতা লাভ করে সে দলের সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই মন্ত্রিসভায় যোগ দেন ও দলীয় কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সচেষ্ট হন। ইংলণ্ডের এই নীতি বিশ্বের সকল গণতন্ত্রী দেশেই অনুসৃত হয়ে থাকে এবং ভারতও এতদিন তার ব্যতিক্রম ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সরকারের চেয়ে দলকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং একারণে শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী, শ্রীজগজীবনরাম প্রমুখ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও ও শ্রীকামরাজ, শ্রীবিজু পট্টনায়েক প্রমুখ বিশিষ্ট মুখ্যমন্ত্রীদের শাসন-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নিযুক্ত করেছেন। এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটি, সংসদীয় বোর্ড, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিচালন ও নির্দেশনা সংস্থাগুলি আর অন্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের সরকারগুলি।

॥ ঘরে ॥

২২শে আগস্ট—৫ই ভাদ্র : লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব (কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আচার্য কৃপালনী উত্থাপিত) বিপুল ভোটাধিক্যে (৬১—৩৪৬) অগ্রাহ্য।

পি-এস-পি'র আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় দিন : কলিকাতায় পঁচিশ জন গ্রেপ্তার—অন্যান্য স্থানেও সত্যাগ্রহ।

'যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় নেতাজীর নাম নাই'—রাজ্যসভায় পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং-এর ঘোষণা। শ্রীনেহরুর উক্তি : স্বামী সারদানন্দ (শৌলমারীর সাধু) নেতাজী নহেন।

আগরতলার (ত্রিপুরা) উপর দিয়া পাক জেট বিমানের পরিক্রমার সংবাদ।

২৩শে আগস্ট—৬ই ভাদ্র : আসাম বিধানসভায় চালিহা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যুক্ত বিরোধী ফ্রন্টের অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন—পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ রোধে সরকারী ব্যর্থতার কঠোর সমালোচনা।

অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রত্যাহারের দাবী—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী সদস্যদের অভিমত ব্যক্ত।

'কামরাজ পরিকল্পনা' অনুযায়ী মন্ত্রীদের (কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের) পদত্যাগপত্র গ্রহণ সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (দিল্লী) বৈঠকে আলোচনা।

২৪শে আগস্ট—৭ই ভাদ্র : ছয়জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীএস কে পাতিল সহ) ও ছয়জন মুখ্যমন্ত্রীর (মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকামরাজ নাদার, কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়ক সহ) পদত্যাগপত্র গ্রহণের সুপারিশ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অনুমোদিত চাঞ্চল্যকর ঘোষণা—কংগ্রেস সংস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যসমন্বিত 'কামরাজ নাদার প্রকল্পের' ক্রমিক রূপায়ণের উদ্যোগ।

২৫শে আগস্ট—৮ই ভাদ্র : মন্ত্রীদের (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী) পদত্যাগের প্রস্তাবে বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া—মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন সম্পর্কে সর্বত্র জল্পনা-কল্পনা ও দিল্লীতে কর্মতৎপরতা।

উত্তরবঙ্গের নদীসমূহে জলস্ফীতি ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত।

হিন্দু উদ্বাস্তুর ছদ্মবেশে পাকিস্তানী মুসলমানদের দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের সংবাদ।

২৬শে আগস্ট—৯ই ভাদ্র : 'আসাম সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানের পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি : বিদেশীদের নেতৃত্বে রাত্রির অন্ধকারে সমরশিক্ষা'—রাজ্য বিধানসভায় শ্রীচালিহার (মুখ্যমন্ত্রী) বিবৃতি। লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা : আসাম সীমান্তে (লাটিটিলা অঞ্চল) পাক দৌরাত্ম্য দমনে সশস্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবন্ত রাও মন্দলই কর্তৃক মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ।

জম্মু সীমান্তে পাকিস্তানীদের অবিরাম গুলীবর্ষণের সংবাদ।

২৭শে আগস্ট—১০ই ভাদ্র : নয়াদিল্লীতে সফরাগত নেপালের রাজদম্পতির অভ্যর্থনা—সম্বর্ধনার উত্তরে রাজা মহেন্দ্রের উক্তি : নেপাল কাহারও সহিত বিরোধ চাহে না।

শ্রীচালিহার নেতৃত্বাধীন আসাম মন্ত্রিসার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

২৮শে আগস্ট—১১ই ভাদ্র : দিল্লীতে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে নেপালের রাজা মহেন্দ্রের সহিত শ্রীনেহরুর দীর্ঘ আলোচনা—পূর্বেকার ভুল বোঝাবুঝির মনোভাবের পরিবর্তন।

কাশীপুরে লেভেল ক্রসিং-এ (কলিকাতা) স্টেট বাস ও মালগাড়ীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ—চারজন নিহত : প্রায় কুড়ি জন আহত।

॥ বাইরে ॥

২২শে আগস্ট—৫ই ভাদ্র : ইস্রায়েল-সিরিয়া সীমান্ত বরাবর ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা—সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সৈন্য-সজ্জা।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বৌদ্ধ নির্যাতন অব্যাহত—মঠে মঠে তল্লাসী ও ব্যাপক ধরপাকড়। সরকারী নীতির প্রতিবাদে ৭১-বৎসর বয়স্ক বৌদ্ধ পুরোহিত থিচ তিউ দিউ'র জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দানের (১৬ই আগস্টের ঘটনা) সংবাদ।

২৩শে আগস্ট—৬ই ভাদ্র : দক্ষিণ ভিয়েৎনামে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভু ভ্যান মাউর পদত্যাগ—ক্যাথলিক দিয়েম সরকারের বৌদ্ধ নির্যাতন নীতির প্রতিবাদ।

রাজা মহেন্দ্রের নেতৃত্বে নেপালে উচ্চশক্তিসম্পন্ন জাতীয় নীতি-নির্ধারক পরিষদ গঠন।

২৪শে আগস্ট—৭ই ভাদ্র : দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অব্যাহত অশান্তি—সায়গনের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে ক্যাথলিক ও বৌদ্ধ সৈনাদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সংবাদ—সংঘর্ষে ষাট জন সৈন্য নিহত ও শতাধিক আহত—বৌদ্ধ নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেঃ দিয়েমের সৈন্যদলে ভাঙ্গনের সূচনা।

মার্কিন প্রতিনিধি সভা কর্তৃক ৪১০ কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য বিল হইতে ৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ছাটাই—সভার সিদ্ধান্তে প্রেসিডেন্ট কেনেডির ক্ষোভ।

২৫শে আগস্ট—৮ই ভাদ্র : বিভক্ত জেরুজালেম শহরে জর্ডন ও ইস্রায়েলী সৈন্যদের সংঘর্ষ।

'ইন্দোনেশিয়া বা ফিলিপাইন যাহাই করুক, মালয়েশিয়া গঠিত হইবেই'—মালয়ী প্রধানমন্ত্রী টুংকু আব্দুল রহমানের ঘোষণা।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজধানী (সায়গন) রণক্ষেত্রে পরিণত—অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় নো দিন দিয়েম সরকার কর্তৃক শহরময় সৈন্য মোতায়েন—হাজার হাজার ছাত্র গ্রেপ্তার।

২৬শে আগস্ট—৯ই ভাদ্র : নির্জন দ্বীপে (রাইওনি দ্বীপ) যুগোলাভ প্রেসিডেন্ট টিটোর সহিত রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভের রাজনৈতিক আলোচনা শুরু।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রাবার লাভ—ইংল্যাণ্ড দলের পরাজয় বরণ।

২৭শে আগস্ট—১০ই ভাদ্র : 'বলপ্রয়োগে সীমান্ত সমস্যার (রুশ অঞ্চলের উপর চীনা দাবী সংক্রান্ত) সমাধান চলিবে না'—চীনের প্রতি রাশিয়ার পরোক্ষ সতর্কবাণী।

মুখ্য আন্তর্জাতিক প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ-টিটো ঐকামত (বৈঠকান্তে বেলগ্রেড হইতে ঘোষণা)।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের বৌদ্ধ নির্যাতন নীতির প্রতিবাদে বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অনশন ধর্মঘট।

খাকসার নেতা আল্লামা মাশরিকীর (৭৫) লাহোরে লোকান্তর।

'চীন ভারত আক্রমণ করিবে না বলিয়া আশ্বাস লাভ'—ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সুবান্দ্রিও'র উক্তি।

২৮শে আগস্ট—১১ই ভাদ্র : ওয়াশিংটনে মহামানব আব্রাহাম লিঙ্কনের মর্মর-মূর্তির সম্মুখে বিক্ষুব্ধ লক্ষাধিক নর-নারীর সমাবেশ—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব হইতে আশু মুক্তি দাবী

হাঙ্গামা-বিধ্বস্ত দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজধানী সায়গনের অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক।

অভয়ঙ্কর

জাতীয়তাবাদের মন্ত্রগুরু শ্রীঅরবিন্দ

১৯০০ খৃীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ য়ুরোপ পরিভ্রমণ করে স্বদেশে ফিরে এলেন। শরীর ক্লান্ত, দেহে রোগের আক্রমণ হয়ত শুরু হয়েছে, মনে জ্বলছে আগুন। কয়েকজন তরুণ বঙ্গসন্তান তাঁর সঙ্গে বেলুড়ে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, উদ্দেশ্য কি তা ইতিহাসে লেখা
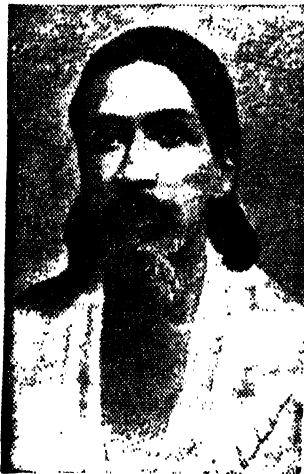
শ্রীঅরবিন্দ

নেই। কিন্তু স্বামীজী সেদিন তাঁদের যা বলেছিলেন তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। তিনি বলেছিলেন — "ভারতে এখন প্রয়োজন বোমার।" সেই সময় প্রিন্স ক্রোপটকিন এবং আয়ারল্যান্ডের বিপ্লববাদ সম্বন্ধে তাঁর হয়ত কিছু জ্ঞান হয়ে থাকবে। শ্রীঅরবিন্দ কথাপ্রসঙ্গে নীরদবরণকে বলেছিলেন নিবেদিতা সম্পর্কে :

"হ্যাঁ, কিন্তু বিবেকানন্দের কাজ হিসাবেই তিনি রাজনীতি গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর লেখা বই-ই শ্রেষ্ঠ। বিবেকানন্দ নিজেও রাজনৈতিক বিষয়ে ভাবতেন ও মাঝে মাঝে বিপ্লবের প্রকোপে পড়তেন। একবার একটা Vision দেখেন, অনেকটা মাণিকতলা বাগানের সাথে তার মিল আছে—"

[শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা—নীরদবরণ]

এ ছাড়া অন্যত্র শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন—
"In the Alipore Jail I had the GITA and UPANISHADS with me, practised the Yoga of the GITA and meditated wth the help of UPANISHADS; these were the only books from which I found guidance; the VEDA which I first began to read long afterwards in Pandicherry rather confirmed what experience I already had than was any guidance to my SADHANA. I sometimes turned to the GITA for light, when there was a question or a difficulty and usually, received help or an answer from it."—

নীরদবরণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "সমগ্র ভারতেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের সক্রিয় প্রভাব ছিল। হঠযোগ অভ্যাস করার সময় আমি আর একবার বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। মনে হল পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি আমার ওপর নজর রাখছেন, পরবর্তীকালে এই ঘটনা আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।"

শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে অবস্থানকালে গীতা ও উপনিষদের মধ্যে যখন গভীরভাবে আত্মমগ্ন হয়ে আছেন সেইকালে—

"It is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence. The voice spoke only on a special and it ceased as soon as it had finished saying all that it had to say on that subject."

কাশ্মীরের মহারাজকুমার যুবরাজ করণ সিং সম্প্রতি Prophet of Indian Nationalism নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন, গ্রন্থটি এই বছর মে মাসে লন্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক জর্জ এ্যালেন এ্যান্ড আনউইন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। যুবরাজ করণ সিং এই গ্রন্থটির জন্য ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন। গত বছর কাশ্মীরে এই প্রসঙ্গে এই নিবন্ধ-লেখকের সঙ্গে যুবরাজ করণ সিং-এর সঙ্গে আলাপ হয়। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন তাঁকে আকৃষ্ট করেছে তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। ঐশ্বর্যের বিলাসবৈভবের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে যুবরাজের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দেখে আমি সেদিন আশ্চর্য হয়েছিলাম, শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর এই গ্রন্থটি পাঠ করে আমার শ্রদ্ধা গভীরতর হয়েছে। যুবরাজ করণ সিং জাতীয়তার মন্ত্রগুরুর জীবন ও কর্ম এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন।

রাজোচিত রজোগুণ যথা "Shikar Polo, and High-Society"-র পরিবর্তে যুবরাজের বৈদগ্ধ্য দেখে পণ্ডিত নেহরু ভূমিকায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

এই গ্রন্থের উপনাম "A study of the Political Thought of Sri Aurobindo Ghosh (1893-1910)— এতদ্বারা বোঝা যাবে যে, শ্রীঅরবিন্দের ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে সহসা আপনাকে সরিয়ে আনার মধ্যে যে ঘটনাময় কাল, যুবরাজ করণ সিং সেই কালের কথাই আলোচনা করেছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদে শ্রীঅরবিন্দের দান যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রেরণা দান করেছে সেই কথা এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। লেখক বলেছেন যে,

যুবরাজ করণ সিং

এই গ্রন্থ রাজনৈতিক ভাবনা সম্পর্কিত, রাজনৈতিক ইতিহাস নয়। রাজনৈতিক ঘটনা এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে বিশেষ কোনও মন্তব্য না করার তিনি চেষ্টা করেছেন। অবশ্য তিনি লোভ সংবরণ করতে পারেন নি, ফলে জীবনী ও দর্শনের ব্যাখ্যা অপেক্ষা ইতিহাস অনেক বেশী অংশ গ্রাস করেছে। এই ত্রুটির আর একটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে, এই নিবন্ধ-লেখকের মনে হয়েছে যে, ডক্টরেট-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে লিখিত থীসিসকে সাধারণের গ্রহণ ও পাঠযোগ্য করার জনাই হয়ত লেখককে এই পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।

যে কালের কথা এই গ্রন্থে বিধৃত, সেই কাল সম্পর্কে কোন কিছু বলতে গেলে ভারতে ব্রিটিশের আধিপত্যের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু না বলা কঠিন, এবং আনুমানিক ভিত্তিতে কিছু মন্তব্য

না করেও পারা যায় না। সর্দার কে এম পানিক্করের মত যুবরাজ করণ সিংও বলেছেন ভারতে ব্রিটিশের দ্বারা আনিত পরিবর্তন কোনক্রমেই বৈপ্লবিক নয়, একথা কিন্তু উভয়েরই মনে হয়নি যে, ইংরাজী ভাষার স্বর্ণসূত্র ভিন্ন ভারতের এতগুলি প্রদেশের ঐক্যের মালিকা গাঁথা সম্ভব হত না। অবশ্য ইংরাজীর স্থলে যদি সংস্কৃতকে সর্বভারতীয় ভাষা করা সম্ভব হত, তাহলে ঐক্য হয়ত আরও সুদৃঢ় হত। হিন্দু ধর্মের সৃজনশীল প্রভাব যে ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে সহায়ক হয়েছে এই বিষয়ে করণ সিং-এর সঙ্গে আমরা একমত।

চোদ্দ বছর কাল ইংলণ্ডে কাটিয়ে শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ ইংরাজী কেতায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ইংরাজী স্বভাব, হাব-ভাব, কেতা, আদর্শ সর্ববিষয়েই তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নাকি স্বেচ্ছায় সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করেন, এই বিষয়ে তাঁর নিজের মুখের কোন কথা নেই, কিন্তু তিনি বরোদা ষ্টেট সার্ভিস গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়, রাজকার্যে তাঁর অনীহা হয়ত ছিল, সোজা-সুজি ইংরাজের দাসত্ব করায় তাঁর মন রাজী ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় থাককালে মাতৃভাষা বাংলাও জানতেন না এবং সেই সময় স্বর্গতঃ দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা শিক্ষাদানের। শ্রীঅরবিন্দের বাংলা শিক্ষার আগ্রহের মধ্যে তাঁর জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল কিনা কে জানে। লেখক শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় চেতনা এবং ধীরে ধীরে এই শান্ত, শিক্ষিত এবং ইংরাজীনবীশ মানুষটি কিভাবে জাতীয়তার উদ্গাতা ও বিপ্লবী নায়কে পরিণত হলেন তার সুন্দর বিবরণ দান করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় চেতনার তিনটি ধারা—কংগ্রেসের সমালোচনা, ব্রিটিশের সমালোচনা এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ড। তিনি সন্ত্রাসবাদকে শেষ পর্যন্ত বর্জন করেন, মধ্যবিত্তের আলোচনা-মঞ্চ কংগ্রেসের স্বাদেশিকতা ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটা ফাঁক তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব কার্জনী বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তিনি বলেছিলেন—

—"We do not care to purchase an outfit of political ideas properly adjusted to our national temper and urgent requirements, but we must eke out our scanty wardrobe with the cast off rags of our English masters. We cease to hanker after the solid crumbs which England may cast us from her table."

শ্রীঅরবিন্দের কর্মসূচী সেইকালে তাই গুপ্তচক্র এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ। তিনি বলেছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শক্তি ছিল পিছনে। আন্দোলন তার গুপ্তদলসহ এমন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল যে, রাজনীতি যেখানে মজ্জাগত এমন অন্য যে কোন দেশে সেটা ফরাসী বিদ্রোহের রূপ নিত। সমস্ত জাতের সহানুভূতি ছিল আমাদের দিকে।" (১৪।১২।৩৮)

(শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা : নীরদবরণ)

শ্রীঅরবিন্দ আশা করেছিলেন যে, সৈন্যদলে বিদ্রোহ ঘটবে এবং দেশে সাড়া জাগবে, সম্ভবতঃ তা সফল না হওয়ায় দেশবাসী প্রস্তুত নয় ভেবেই তিনি একদিন সন্ত্রাসবাদের পথ থেকে নিঃশব্দে সরে গেলেন। কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় নেতা যিনি ভারতের যে কোন পন্থায় স্বাধীনতা-অর্জনের পথনির্দেশ দিয়েছিলেন, সন্ত্রাসবাদ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, বয়কট, কিম্বা সশস্ত্র বিদ্রোহ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মত তূর্যধ্বনি করে এই নিদ্রিত ভারতকে জাগ্রত করেছিলেন, জাতীয় জীবনে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন।

১৯০৭-এ শ্রীঅরবিন্দের জীবনে পরিবর্তন ঘটল। পণ্ডিচেরীর আশ্রমের নির্জন সাধনায় তিনি আত্মমগ্ন হলেন। অনেকের ধারণা যে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়াবার জন্যই তিনি আত্মগোপন করেছিলেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও কর্মের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা এই ভ্রান্ত মতের সমর্থক হবেন না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"With stupendous intensity the World as cinematographically a vacant form in the impersonal universality of the Absolute Brahman."

আলিপুর মামলায় জাস্টিস বীচক্রফট শ্রীঅরবিন্দকে নির্দোষ বলে মুক্তিদান করলেন। সেইকালে তাঁর যে অতি-মানসিক অভিব্যক্তি তার কথা কে বলবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"No one can write about my life because it has not been on the surface for man to see." —সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে যুবরাজ করণ সিং যেটুকু লিখতে পেরেছেন তার জন্য অভিনন্দন জানাই। তিনি অ-বাঙালী, তাই তাঁকে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে বিচার করার কর্মে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে, তবু তিনি একটি মূল্যবান গ্রন্থ দ্বারা ভারতের জাতীয় জীবনের পথিকৃৎ শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে লিখেছেন এবং সফল হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দকে সন্ত্রাসবাদী বলে কেউ স্মরণে রাখবে না, তিনি

স্বদেশপ্রেমিক এবং জাতীয় চেতনার মন্ত্রগুরু, এই সিংহপ্রতিম, বিরাট ও সম্বোধিদীপ্ত মহামানব জাতীয় ইতিহাসে তাই স্মরণীয়।

বিস্ময়কর প্রতিভা

বিগত যুগের বাংলা সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর বিদ্যার খ্যাতি গত যুগে এতটা প্রসার লাভ করেছিল যে বিদ্যার গৌরবসূচক 'বিদ্যাভূষণ' উপাধির আড়ালে তাঁর প্রকৃত পদবি 'ঘোষ' প্রায় চাপা পড়ে গেছে। তাঁর পাণ্ডিত্যের সংগে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁদের অধিকাংশেরই ও-পদবির কথা জানা নেই। বিদ্যাভূষণ নামেই তিনি খ্যাত। এবং সে খ্যাতি অর্থহীন নয়। বিদ্যা যথার্থই তাঁর ভূষণস্বরূপ ছিল। এ-কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তাঁর কীর্তিতে। পেশায় বিদ্যাভূষণ মশায় যদিও ছিলেন শুধু বিদ্যাসাগর কলেজের পালি-প্রাকৃতের অধ্যাপক, তবু বিদ্যার নেশায় তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল জ্ঞানের প্রায় সব শাখাতেই। তাই, বাংলার জ্ঞানসাধকদের সেদিন প্রায় সকলকেই তাঁর কাছে আসতে হয়েছে বহুবার—বহু জিজ্ঞাসা নিয়ে, বহু সহায়তার আকাঙ্ক্ষায়। বিদ্যাভূষণ মশায় নিজেই একটা ইনষ্টিটিউশন হয়ে উঠেছেন। তার প্রমাণ আছে তাঁর অনন্য কীর্তি 'বঙ্গীয় মহাকোষ' প্রণয়নে। এই বিপুল গ্রন্থ যদিও সম্পূর্ণ হয়নি, যদিও কেবল 'অ' এবং 'আ' এই দুটি বর্ণই সমাপ্ত হয়েছিল, তবুও এতেই তাঁর এনসাইক্লোপিডিক নলেজের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, এদেশে তার তুলনা বিরল। তাঁর বিদ্যার ব্যাপ্তির কাহিনী এখনো পর্যন্ত প্রায় একটা মিথ হয়েই রয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় তাঁর রচনার সংগে বর্তমান দিনের বাঙালী পাঠকদের পরিচয় খুবই কম। তার কারণ অবশ্য বাংলার প্রকাশকদের মানস-দৈন্য। লঘু-পাচ্য সস্তা মালের বাজারের দিকেই তাঁদের একমাত্র ঝোঁক। তাই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কোন গ্রন্থই বাজারে পাওয়া যায় না এখন আর।

এমন অবস্থায় আলোচ্য গ্রন্থের প্রকাশ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এ-গ্রন্থ মোট দশটি প্রবন্ধের সংকলন—(১) প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি, (২) বৈদিক যজ্ঞপ্রথা, (৩) বৈদিক যুগে শিক্ষার ধারা, (৪) মহাকাব্যযুগে শিক্ষার ধারা, (৫) বৈদিক যুগের শিল্প, (৬) বৈদিক যুগের শিল্পশিক্ষা, (৭) প্রাচীন যুগের অলংকার, (৮) প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য সমিতি, (৯) প্রাচীন ভারতে পুঁথি ও পুঁথিশালা এবং (১০) সংস্কৃতি ও সাহিত্য। এই তালিকায় কেবল শেষ রচনাটি ব্যতীত বাকী সবগুলিরই পটভূমি প্রাচীন ভারত। বিষয় হিসাবে এটা অবশ্যই গবেষণা-কর্মী এবং পণ্ডিত-জনেরই বিষয়। কিন্তু বিদ্যাভূষণ মশায় এই প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন সাধারণ-জনের জন্যেই। তাই, তাঁর ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গী যেমন সরল তেমনি প্রাঞ্জল। সেইজন্য অব্যাপারের ব্যাপারীকেও কখনো হোঁচট খেতে হয় না এই প্রবন্ধগুলিতে।

যে-সব বিষয়ে এবং যে-যুগ সম্পর্কে এই প্রবন্ধগুলি রচিত, সেইসব বিষয় এবং সেই যুগ সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দেহত্যাগের (১০ই বৈশাখ, ১৩৪৭) পরেও কিছু কিছু কাজ হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক ভারত, বিশেষভাবে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পা, সম্পর্কে পিগট-এর গ্রন্থ, এবং হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের সন্ধিক্ষণ ও বিশেষভাবে আজীবিকদের, সম্বন্ধে অধ্যাপক ব্যাসামের রচনা তো

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এই সব গ্রন্থে নতুন কিছু কিছু তত্ত্ব ও তথ্য জানা গেছে, যা বিদ্যাভূষণ মশায়ের সময়ে জানা ছিল না। তাই, এই প্রবন্ধগুলির কোন কোন অংশে সংশোধনের কিছু অবকাশ। অবশ্য সে-জন্য এদের নিজস্ব মূল্য কিছুমাত্র কমেনি।

গ্রন্থশেষে যে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়েছে, সেটা খুব পূর্ণাঙ্গ হয়নি। আলোচ্য বিষয়ে আরো এমন বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যাদের উল্লেখ না করলে এ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী পূর্ণ হতে পারে না।

তা ছাড়া, গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদও চোখে পড়লো। দু-একটি ক্ষেত্রে এতে পাঠকের অর্থগ্রহণেও বিপত্তি ঘটতে পারে; যথা—ভুড (শুদ্ধ—ভৃগু, পৃঃ ২২); ঐতরে (শুদ্ধ ঐতরেয়, পৃঃ ৩১); বর্ণই (শুদ্ধ—বর্মই, পৃঃ ৮৪); শূদ্রদের (শুদ্ধ—শূদ্রকের, পৃঃ ৯৮); বেশর ছিল (শুদ্ধ—দিল, পৃঃ ১১০); ব্রহ্মাচার্যগণ (শুদ্ধ—বজ্রাচার্যগণ, পৃঃ ১৩৪) ইত্যাদি।

আশা করি, প্রকাশক পরবর্তী সংস্করণে এই অনবধানজনিত ত্রুটিগুলি সংশোধন করবেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আরো বহু মূল্যবান রচনা প্রকাশকের আগ্রহের অভাবে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। সেগুলির মুদ্রণ বাঙালী প্রকাশকদের আশু কর্তব্য। আশা করি, উৎসাহী সংস্কৃতিবান প্রকাশক এ কাজে অচিরে অগ্রসর হবেন এবং তাতে সরকারী দাক্ষিণ্যের অভাব হবে না।

বর্তমান গ্রন্থের মুদ্রণ-পারিপাট্য এবং প্রচ্ছদ-সৌন্দর্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য— (প্রবন্ধ-সংকলন) পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ভারতী লাইব্রেরী, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দু' টাকা।

●

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক মুখপত্র **'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা'র** তৃতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যার তিনটি উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র এবং অনিলকুমার রায়চৌধুরী। তানসেন পাণ্ডে সম্পর্কে লিখেছেন আরতি মৈত্র। আরো কয়েক-জনের লেখা স্থান পেয়েছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশিত ও সম্পাদিত এই পত্রিকাটির সম্পাদনায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলেই মনে হয়েছে এর পর পর প্রকাশিত তিন সংখ্যায়। ৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

●

বাঙলা ভাষায় মনোবিজ্ঞান পত্রিকা-গুলির মধ্যে **'মানব মন'** অন্যতম। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি ইতিমধ্যে বিশেষ জনসমাদর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। ১৩২।১এ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

গঙ্গা মাইয়া তোহে পিয়ারী চঢ়াইবো (ভোজপুরী) **:** নির্মল পিকচার্স-এর নিবেদন: ৩,৮৪৮ মিটার দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা **:** বিশ্বনাথপ্রসাদ শাহাবাদী; পরিচালনা **:** কুন্দনকুমার; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ **:** নাজির হোসেন; সঙ্গীত-পরিচালনা **:** চিত্রগুপ্ত; গীতরচনা **:** শৈলেন্দ্র; চিত্রগ্রহণ **:** আর, কে, পণ্ডিত; শব্দানুলেখন **:** জাহাঙ্গীর, নাসেরওয়াঞ্জি ও অবনী চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীতগ্রহণ **:** কৌশিক ও বি, এন, শর্মা; কণ্ঠশিল্পী **:** লতা ও ঊষা মঙ্গেশকর, মহম্মদ রফি ও সুমন কল্যাণপুর; নৃত্য পরিচালনা **:** বদ্রী প্রসাদ; শিল্প-নির্দেশনা **:** হীরাবাঈ প্যাটেল; সম্পাদনা **:** কমলাকার; রূপায়ণ **:** কুমকুম, অসীমকুমার, নাজির হোসেন, তিওয়ারী, হেলেন, লীলা মিশ্র, কুমারী পদ্মা প্রভৃতি। কীর্তি ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল ২৩-এ আগষ্ট থেকে হিন্দ, মেনকা, মৃণালিনী ও অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"গঙ্গা মাইয়া তোহে পিয়ারী চঢ়াইবো, সৈঁয়াসে কর্ দে মিলনোয়া হো রাম"—হে গঙ্গা মা, আমি তোমার পূজো দেব, আমার প্রিয়তমের সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দাও,—ভোজপুরী বা পুরবিয়া ভাষা যে অঞ্চলে প্রচলিত, সেই উত্তর বিহারের প্রায় প্রতিটি গ্রাম্য মেয়ে দলবদ্ধভাবে এই গান গেয়ে গঙ্গায় স্নান করে; অন্তরের আকুতিকে সোচ্চার গানের ভাষায় সুপ্রকাশ করতে তাদের কোনো লজ্জা নেই।

গ্রাম্য মেয়ে সুমিত্রীরও সাধ ছিল, ঠাকুর বেচন সিংহের সুশিক্ষিত সন্তান শ্যামের সঙ্গে তার জীবনধারা একই খাতে প্রবাহিত হবে। কিন্তু সাধ থাকলেই যে তা পূর্ণ হবে এ তো বিধির বিধান নয়। বিশেষ যখন কুসীদজীবী বেচন সিংহের অর্থগৃধ্নুতা পূরণ করা সুমিত্রীর দরিদ্র পিতা লক্ষ্মণ সিংহের সাধ্যাতীত ছিল। যদ্যপ লক্ষ্মণ বেচনের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মেয়ের পার্থিব সুখের আশায় নিজেরই বন্ধু, স্থানীয় বৃদ্ধ ধনীর সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করলে; কিন্তু নবপরিণীতার সঙ্গে নিজগৃহে পৌঁছোনোর মুহূর্তেই সম্ভবতঃ উত্তেজনার আতিশয্যে বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে সুমিত্রীর সুখ-স্বপ্নকে ভেঙে চৌচির ক'রে দিল। এর পরেই আসে সুমিত্রীর মায়ের মৃত্যু এবং

'মহানগর', 'বিনিময়' 'বর্ণালী'র প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী গীতালী রায় —ফটো**:** অমৃত

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার শাশুড়ী কর্তৃক তার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের জঘন্য আয়োজন।

ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুমিত্রী ঝাঁপ দেয় গঙ্গায়। কিন্তু মানুষ চায় এক, হয় আর। তাই যিনি সুমিত্রীকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন, সেই প্রৌঢ়া বাঈজী তাকে ক'রে তোলে নৃত্যগীতপটীয়সী। দৃশ্যতঃ লজ্জাকর জীবনযাপনে বাধ্য হ'লেও মাতৃসমা প্রৌঢ়ার স্নেহসিক্ত সুমিত্রী তার শুচিতাকে রক্ষা ক'রে চলেছিল অন্তরে বাহিরে।

এর পর বহু আবর্তের মধ্যে দিয়ে সুমিত্রী কেমন ক'রে তার দয়িত শ্যাম এবং স্নেহময় পিতা লক্ষ্মণ সিংহের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, তাই নিয়েই "গঙ্গা মাইয়া তোহে পিয়ারী চঢ়াইবো"-র শেষের উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে।

ছবিটিতে এমন একটি মাটির মিষ্টি সোঁদা গন্ধ আছে, চরিত্রগুলি এমনই 'দেহাতি' ভাবাপন্ন ও জীবন্ত, ঘটনাগুলি এমনই সহজ ও স্বাভাবিক এবং কথাবার্তাগুলি এমনই প্রাঞ্জলভাবে ঘরোয়া যে, ছবিটি কিছু দূর এগোতে না এগোতেই দর্শক তার সঙ্গে একাত্মবোধ না ক'রে পারেন না।—ছবি দেখতে দেখতে দর্শক কাহিনীর চরিত্রগুলির সঙ্গে মিশে গিয়ে মশগুল হ'য়ে ওঠেন। এবং এ ব্যাপারে অসামান্যভাবে সাহায্য করেছে ছবির গানগুলি—যেমন সহজ, সরল, আবেদনপূর্ণ ভাষা, তেমনই মিষ্টি সুরারোপ। 'হে গঙ্গা মাইয়া তোহে পিয়ারী চঢ়াইবো', 'হম তো খেলত রহলী অম্মাজী কো গোদিয়া', 'কাহে

বসা্ইয়া বজওলে', 'সোনোয়াকে পি'জরামে বন্দ ভৈল হায় রাম' প্রভৃতি প্রতিটি গান দর্শককে মাতিয়ে তোলে, সুরতরঙ্গের আঘাতে তাদের চিত্তকে করে উদ্বেল। শৈলেন্দ্ররচিত গানগুলিতে যথাযোগ্য সুরারোপ ক'রে সুরের সুর-ধুনী বইয়ে দিয়েছেন সংগীত-পরিচালক চিত্রগুপ্ত। 'গংগা মাইয়া তোহে পিয়ারী চঢ়াইবো' ছবির অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার মূলে এর সংগীতাংশের অবদান অনস্বীকার্য। ছবিটির প্রথম অর্ধের মতো এর শেষাংশও যদি অতি-নাটকীয় ও বহুলাংশে কৃত্রিম না হয়ে সহজ সরল স্বাভাবিকতাকে অনুসরণ করত, তাহ'লে চিত্ররসিক দর্শকের খুশীর অবধি থাকত না এবং ছবিটি চলচ্চিত্র-জগতে একটি বিস্ময়কর স্মরণীয় সৃষ্টিরূপে স্বীকৃত হ'ত।

ছবিটির অসামান্য আর্থিক সাফল্য ও জনপ্রিয়তার জন্যে আর যাঁর কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য, তিনি হচ্ছেন এর নায়িকা সুমিত্রীর চরিত্রাভিনেত্রী কুমকুম। এ-ছবিটির তিনিই হচ্ছেন প্রাণকেন্দ্র; এমন সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, বাস্তবধর্মী অভিনয়ের সঙ্গে এমন উপভোগ্য নৃত্যগীতের স্রোতে দর্শকচিত্তকে অবগাহন করানোর শক্তি আমরা ছবির পর্দায় খুব কমই দেখতে পেয়েছি। কোনো স্তুতিবাচক বিশেষণই তাঁর নাটনৈপুণ্যের সম্যক পরিচয়দানে যথেষ্ট হবে না। তাঁর পরেই নাম করতে হয় সুমিত্রীর পিতা লক্ষ্মণের ভূমিকায় নাজির হোসেনের। স্নেহপরায়ণ মদ্যপের চরিত্রের প্রতিটি প্রতিক্রিয়া তাঁর আন্তরিক অভিনয়ের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। নায়ক শ্যামের ভূমিকায় অসীমকুমার যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটী করেননি। সুমিত্রীর বান্ধবীর ভূমিকায় নবাগতা পদ্মা প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। উৎসব দৃশ্যে হেলেনের নাচটি তাঁর খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এ-ছাড়া প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন লীলা মিশ্র, তিওয়ারী এবং মিশ্র।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ পরিচ্ছন্ন। বিশেষ ক'রে বহির্দৃশ্যের আলোকচিত্র গ্রহণ ও শব্দধারণে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন যথাক্রমে আর, কে, পণ্ডিত এবং অবনী চট্টোপাধ্যায়।

'গংগা মাইয়া তোহে পিয়ারী চঢ়াইবো" ছবিটি সহজ সরল কাহিনী, কুমকুমের অসামান্য অভিনয় এবং মনমাতানো সংগীতের গুণে অসামান্য জনপ্রিয়তালাভে অধিকারী, এ-কথা নির্ধিধায় বলা যায়।

মঞ্চাভিনয়

কর্ণার্জুন (নবপর্যায়ে পুনরভিনয়) ঃ নাট্যরচনা ঃ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; নাট্যগ্রন্থনা ঃ বিধায়ক ভট্টাচার্য; নাট্য-শিক্ষণ ঃ সন্তোষ সিংহ ও কানু বন্দ্যো-পাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা ঃ আর, আর, সিন্ধে (দৃশ্যসজ্জা) এবং সত্যেন রায় চৌধুরী (রূপসজ্জা); সুরসৃষ্টি ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়; আলোকসম্পাত ঃ অমর ঘোষ; রূপায়ণ ঃ সাধনা রায় চৌধুরী, জয়শ্রী সেন, শকুন্তলা ভড়, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, সুজিত পাঠক, প্রবীরকুমার, তরুণ মিত্র, নিমাই ঘোষ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি ঘোষাল, জয়নারায়ণ মুখো-পাধ্যায়, বীরু মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, পিকলু নিয়োগী, তারক ঘোষ, বলাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। গেল ২৫-এ জুলাই থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার, বেলা ৩টায় এবং শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে নিয়মিতভাবে অভি-নীত হচ্ছে।

মনোমোহন থিয়েটারে চক্ষুতে অস্ত্রো-পচারের পরে জরাগ্রস্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) 'ললিতাদিত্য' প্রভৃতি নাটক দ্বারা কোনোক্রমে অভিনয় চালিয়ে

যাচ্ছেন, নূতন নাটক "শকুন্তলা"র উদ্বোধন দিবসেই নিমার্ভা থিয়েটার সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত, স্টারে 'অযোধ্যার বেগম', 'নবাবী আমল', 'রিজিয়া', 'তরু-বালা' প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের পর অত্যন্ত মন্দা চলছে, ম্যাডান প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী 'আলমগীর' 'মুক্তার মুক্তি', 'রত্নেশ্বরের মন্দিরে' প্রভৃতি চালাবার পর দরজা বন্ধ করেছে, এমন সময়ে কলিকাতার নাট্যানুরাগী জনগণকে সচকিত ক'রে প্রাচীরপত্র মারফত ঘোষিত হ'ল—আর্ট থিয়েটার-এর আসন্ন উদ্বোধনের কথা। শিল্পিগোষ্ঠীর মধ্যে তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র মিত্র, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন পাইন, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এমন সব নাম দেখা গেল, যাদের সঙ্গে বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীকৃত 'আঁধারে আলো' এবং 'চন্দ্রনাথ' ও 'ফিল্মস্ অব ইস্ট' প্রযোজিত 'সোলস্ অব এ স্লেভ-ছবির মাধ্যমে ওরই মধ্যে নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম চিত্ররসিকদের কাছে কিছুটা জানা। কিন্তু অভিনব এবং সুপরিকল্পিত প্রচারগুণে শীঘ্রই এই নামগুলি নাট্যরসিকদের মুখে মুখে নানারূপ কাল্পনিক এবং কিছুটা বাস্তব কাহিনী সংযোগ পল্লবিত হয়ে ঘুরতে লাগল। এবং সকলেই সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল আর্ট থিয়েটারের উদ্বোধন রজনীর জন্যে। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গদাধর মল্লিক সতীশ সেন প্রভৃতি ধনী, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গুণিজন পরিচালিত 'আর্ট থিয়েটার' স্টার রঙ্গমঞ্চে তার শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন করল ১৩৩০ সালের ১৫ই আষাঢ় শনিবার, আর্ট থিয়েটারের ম্যানেজার ও নাট্যশিক্ষক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য "কর্ণার্জুন"-কে অবলম্বন ক'রে। পৌরাণিক নাট্যাভিনয়ের চিরাচরিত পোশাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ ক'রে অভিনব প্রয়োগকৌশল অবলম্বন করা হ'ল এই 'কর্ণার্জুন' নাটকেই এবং শক্তিশালী শিল্পিবৃন্দের অভিনব অভিনয়ধারায় সমুদ্ভাসিত হয়ে 'কর্ণার্জুন' সহজেই নাট্যরসিক দর্শক চিত্তকে জয় ক'রে নিয়েছিল।

আজ ৪০ বৎসর পরে ১৩৭০ সালের ৮ই শ্রাবণ (১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জুলাই) তারিখে সেই আর্ট থিয়েটারের বিজয়বৈজয়ন্তী 'কর্ণার্জুন' নাটকের পরিবর্তিত, পরিবর্জিত, পরিবর্ধিত এবং বিশেষভাবে সংক্ষেপিত রূপকে অবলম্বন ক'রে বিশ্বরূপা থিয়েটার পৌরাণিক নাট্যাভিনয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ করলেন। 'কর্ণার্জুন' অভিনয়ের নির্ঘণ্ট-সূচীতে প্রযোজকের নিবেদনে বলা হয়েছে : "......নাট্যশিল্প অতীতকে ধ'রে রাখে নাট্য বক্তব্যে। বহিরঙ্গে অর্থাৎ উপস্থাপনায় কালের প্রয়োগকৌশল ও অভিনয়শৈলীর সাথে (সঙ্গে?) সামঞ্জস্য বিধানই থাকে লক্ষ্য। 'কর্ণার্জুন'-ও এর ব্যতিক্রম নয়। মঞ্চপ্রকরণের অগ্রগামী বৈজ্ঞানিক চিন্তার সাথে (সঙ্গে?) যুক্ত হয়েছে অতি আধুনিক অভিনয়-আঙ্গিক। নাট্যবক্তব্য উপস্থাপনে যেমন যুগ প্রয়োজনে সীমিতসময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে তেমনি সুসংবদ্ধ ঘটনা পারম্পর্য রক্ষায় গ্রন্থনারীতির অভিনব প্রয়োগ পরীক্ষার চেষ্টাও হয়েছে। সব মিলিয়ে অতীতের ছায়ায় বর্তমানের কায়া রচিত।"

অর্থাৎ ৫ ঘন্টাব্যাপী অভিনীত "কর্ণার্জুন" নাটককে ৩ ঘন্টার মধ্যে অভিনয়োপযোগী করবার জন্যে প্রযোজককে নাট্যান্তর্গত কাহিনীর যে সংক্ষেপিত রূপ দিতে হয়েছে, তারই সমর্থনে কিছু বিবৃতি তিনি দিয়েছেন। অভিনয়ের জন্যে নাটকের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করা কিছু নতুন কথা নয়। শেক্সপীয়রের নাটকের 'হেনরি আর্ভিং' সংস্করণ তারই একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর নাট্যরূপে শিশিরকুমার যথেষ্ট পরিবর্তন

করছেন নাটকককে সুসংবদ্ধ করবার জন্যে। একদা আটটি মাত্র দৃশ্যের সহায়তায় তিনি 'আলমগীর' নাটকের সুসংবদ্ধ সংক্ষেপিত রূপ অভিনয় ক'রে নাট্যরসিকদের চমৎকৃত করেছিলেন। এবং অতিসম্প্রতি ধনঞ্জয় বৈরাগী দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের একটি সংক্ষেপিত রূপই মুখোশ সম্প্রদায় মারফত সাধারণ্যে পরিবেশন করছেন।

অভিনয় মাধ্যমে নাট্যকাহিনীর যদি একটি অখণ্ড রূপে প্রকাশ পায় এবং নাট্যবস্তুর রসগ্রহণে কোনোরকম বাধার উপস্থিতি না ঘটে, তাহ'লে মূল-নাটকের যুগোপযোগী পরিবর্তনে কারুর কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের দ্বারা যদি মূল নাট্যান্তর্গত চরিত্রের কোনোরকম বিকৃতি ঘটে, তাহ'লে তা 'খোদার উপর খোদাকারি'-রূপে সমালোচনার সামগ্রী হয়ে পড়ে। 'দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম

'রাফ মাস্টার' চিত্রে শাম্মি কাপুর ও শায়রা বানু

মম, কিন্তু পুরুষত্ব করায়ত্ত মোর" বীরকর্ণের এই সদম্ভ উক্তি সত্ত্বেও নেতান্ত দৈববিড়ম্বনাতেই কর্ণের পতন অনিবার্য হয়েছিল, নাট্যকার অপরেশচন্দ্র এই সত্যই উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে। এমন কি দাতা কর্ণের দান করবার সহজাত প্রবৃত্তি তাঁর 'সহজাত কবচকুণ্ডল' থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করেছিল এই বিরুদ্ধ দৈবই। দৈবের নিবন্ধনেই তিনি দুষ্ট দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বী হয়েছিলেন। এবং বহু গুণ সত্ত্বেও কর্ণ পাণ্ডবদের সম্বন্ধে আদৌ উদার ছিলেন না। তাই দ্যূতক্রীড়া-সভায় শকুনির শাঠ্যে যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতাসমেত যখন কৌরবের দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন, তখন অপরেশচন্দ্র কর্ণের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন : 'আছে মাত্র দ্রৌপদী সম্বল!' বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রদত্ত নাট্যরূপে কর্ণকে মহানুভবরূপে প্রকট করবার একটা উগ্র চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাই কর্ণের কথাটি দুঃশাসনের মুখে বসিয়েই শ্রীভট্টাচার্য ক্ষান্ত হননি, দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসনের অমানুষিক ব্যবহারের সময়ে তাঁকে সভাত্যাগ করতেও দেখা যায়। তা' ছাড়া লক্ষ্যবেধ-সভায় কর্ণের সুন্দর অবয়বের প্রতি দ্রৌপদীর আকর্ষণবোধজনক স্বগতোক্তি দ্রৌপদী চরিত্রকে নিশ্চয়ই বিকৃত করেছে। এবং অবন্তীপুর-রাজ আখ্যাধারী অপদার্থ চরিত্র উগ্রসেনের যোজনা স্বয়ংবর-সভাকে অত্যন্ত লঘু ক'রে তুলেছে। এ ছাড়া কিছু স্বগতোক্তিকে টেপ-রেকর্ডের সাহায্যে ব্যক্ত করা এবং কিছু স্বগতোক্তিকে পাত্রপাত্রীদের মুখে রাখার খুব বেশী যৌক্তিকতা দেখা যায় না। 'নিয়তি'র অর্থ অপরেশচন্দ্র নিজেই দিয়েছেন; নিয়তির মুখ দিয়েই তিনি বলিয়েছেন; "এ সংসার মায়ার ডোরে গাঁথা বিচিত্র হার! গ্রন্থির পর গ্রন্থি—খোলবার যো নেই! এক চুল এদিকে ওদিকে নড়াবার যো নেই! ঘেঁটির পর ঘেঁটি—থরে থরে সাজানো ঘটনা, ভাবলে কি হবে! উপায় নেই, উপায় নেই!" কাজেই আজকের বৈজ্ঞানিক শব্দ-ক্ষেপণের যুগে 'নিয়তি'কে মূর্তিমতী (personified) ক'রে না দেখিয়ে যদি অশরীরী নেপথ্যকণ্ঠের অধিকারিণী-রূপে দেখানো যায় এবং তাতে নাটকের সংক্ষেপিতকরণের সুবিধা হয়, তাতে কোনো রসজ্ঞ নাট্যবিদ্ই আপত্তির কারণ দেখতে পাবেন না। এবং যেভাবে নাটকের অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল নাট্যকাহিনীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অংশ-

গুলিকে বর্জন ক'রে নাটকটিকে গ্রথিত করা হয়েছে, তাতে শ্রীভট্টাচার্যের মুন্সিয়ানারই পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রথমে উল্লিখিত অযথা পরিবর্তনগুলিকে পরিহার করতে পারলে নাটকে যে-সব রসহানির নিদর্শন পাওয়া গেছে, সে-গুলির উদ্ভব ঘটত না।

নবপর্যায়ে 'কর্ণার্জুন' নাট্যাভিনয়ের উপস্থাপনা ব্যাপারে বিশ্বরূপা অত্যন্ত অভিনবভাবে যান্ত্রিক স্বরপ্রেক্ষণের সাহায্যে নাট্যমুহূর্ত রচনা এবং ক্লাইম্যাক্স-এর সৃষ্টি করেছেন। তবে দৃশ্যরচনায় তাঁরা কভার-ডিস্কভারের সনাতন প্রথাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। মূল পঞ্চাঙ্ক নাটকের ৩১টি দৃশ্যের পরিবর্তে নব-গ্রন্থনায় দুটি পর্বে ১৭টি দৃশ্যের মধ্যে অন্ততঃ ৮টি দৃশ্য একরঙা পশ্চাদপট বিশিষ্ট কভার সিনে অভিনীত হয়েছে। দৃশ্যরচনায় অধিকতর আধুনিকত্বের পরিচয় দেবার অবকাশ ছিল ব'লে মনে হয়।

অভিনয়-নির্দেশে নাট্যশিক্ষকরূপে সন্তোষ সিংহ এবং কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষিত হয়েছে। দু'জনেই অভিজ্ঞ নট এবং নাট্য শিক্ষক। এ সত্ত্বেও 'কর্ণার্জুন' নাটকের প্রধান তিনটি পুরুষ চরিত্রই—কর্ণ, অর্জুন এবং শকুনি—এমন দুর্বলভাবে অভিনীত হয়েছে কেন, তা' আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কর্ণ এবং অর্জুনের ভূমিকায় যাত্রাজগতের দুই ধুরন্ধর নট—দিলীপ চট্টোপাধ্যায় এবং সুজিত পাঠক অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই এই চরিত্র দুটিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বাক্যের শেষাংশকে দর্শক শ্রুতিগ্রাহ্য না ক'রে বলায় কর্ণরূপী দিলীপ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত পটু; কিন্তু এই দোষ পরিহার করতে না পারলে তিনি রূপাভিনেতা-রূপে সাফল্যলাভের অধিকারী হবেন না। সুজিত পাঠক মুখচোখের সাহায্যে ভাবাভিব্যক্তির তেমন অনুশীলন করেননি; তাই সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে

জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, কল্যাণী ঘোষ

তাঁর মুখমণ্ডলে সামান্য মাত্র কুঞ্চন বা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গ লক্ষ্য করা যায়নি। মনে হয়েছে, অর্জুনের ভূমিকাভিনয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ। শকুনির ভূমিকায় রবি ঘোষ কি রূপসজ্জায়, কি চরিত্রসৃষ্টিতে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। গালে, কপালে, চোখের কোণে কোনোরকম কুঞ্চনরেখা ব্যতীত চতুর্দিকে লম্বমান শুভ্র কেশকে 'পরচুলা' ছাড়া অন্য কি মনে হ'তে পারে? শকুনি হচ্ছে কুচক্রী; সে দুর্যোধনের বিপক্ষে অস্ত্র ধ'রে নয়, দুর্যোধনকে দিয়েই তার বংশ ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যার সে প্রতিশোধ চায়। কিন্তু সে হচ্ছে smiling damned villain। রবি ঘোষ বহুরকমে তাঁর বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন উপস্থিত করলেও শকুনির একটি গোটা রূপ আমরা তাঁর অভিনয়ের ভিতর থেকে আবিষ্কার করতে পারিনি। অথচ মূল-নাটকের এই তিনটি প্রধান চরিত্রে তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং নরেশ-চন্দ্র মিত্রের বিস্ময়কর নাট্যনৈপুণ্য 'কর্ণার্জুন' নাটকের মঞ্চসাফল্যকে বহু-লাংশে সম্ভব করেছিল। বর্তমান নাট্যা-ভিনয়ে অপ্রধান বহু চরিত্রই বরং অপেক্ষাকৃত সাফল্যলাভ করেছে। বাচন খুব ছন্দোবন্ধ না হ'লেও শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রবীরকুমার আমাদের তৃপ্তিই দিয়েছেন। এ-ছাড়া ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য, ভীম, দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, শল্য, জামদগ্ন্য এবং ঋষির ভূমিকায় যথাক্রমে জয়-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন শেঠ, বিদ্যুৎ গোস্বামী, শান্তি ঘোষাল, তরুণ মিত্র, নিমাই ঘোষ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই মুখোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারক ঘোষ নিজেদের নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কুন্তীবেশিনী সাধনা রায়-চৌধুরীর। মুখচোখের ভঙ্গীতে এবং দরদী-কণ্ঠে কুন্তীকে তিনি মূর্ত করে তুলেছিলেন। বলতে বাধা নেই, সেদিনের (২৯-এ আগস্টের) অভিনয় মঞ্চের উপর তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। দ্রৌপদীর ভূমিকায় জয়শ্রী সেনও অত্যন্ত সু-অভি-নয় করেছেন। নেপথ্য হতে নিয়তির অমোঘ বাণী শ্রবণে অন্তরের প্রতি-ক্রিয়াকে তিনি যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা এক অভিনব অভিনয়রীতিকে সুপ্রতি-ষ্ঠিত করেছে। পদ্মাবতীর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূমিকায় শকুন্তলা ভড়ও মোটের উপর সুঅভিনয় করেছেন বলা যেতে পারে। স্বয়ংবর-সভায় দ্রৌপদীর সখী-রূপে শান্তা সরস্বতীর বাচনভঙ্গী প্রশংসনীয়। কিন্তু রাজনর্তকীর নৃত্যটি বর্জন করলেও ক্ষতি ছিল না; কারণ ওর দ্বারা মঞ্চের উপর আসীন রাজন্যবর্গের চিত্ত বিনোদন হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে উপবিষ্ট দর্শকদের কিছুমাত্র তুষ্টিলাভ ঘটেনি।

পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে প্রায় সকল [illegible]কেই কমবেশী গৈরিশ ছন্দে রচিত সংলাপ বলতে হয় এবং সেই সংলাপ যাতে প্রেক্ষাগৃহের সকল দর্শকের পক্ষে সমান শ্রুতিগ্রাহ্য হয়, এমনভাবে স্বরক্ষেপ-কৌশলও আয়ত্ত করতে হয়। আশা করি, সম্যক অনুশীলনের পর নবপর্যায়ে 'কর্ণার্জুন'-এর শিল্পিবৃন্দ একটি একসুরে বাঁধা গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

বিবিধ সংবাদ

শৌভনিকের 'যা-নয়-তাই' প্রহসনের ২০০ রাত্রির স্মারক-অভিনয় :

গেল রবিবার, ১লা সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলিকাতার 'মুক্ত অঙ্গন'-এ শৌভনিক নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের জনপ্রিয় প্রহসন 'যা-নয়-তাই'-এর ২০০ রাত্রি ধরে অভিনীত হওয়ার স্মারক উৎসব পালন করলেন। অভিনয়অন্তে রবীন্দ্র-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুধাংশুকুমার সান্যাল সভাপতিরূপে শৌভনিক গোষ্ঠীর শিল্পী, কলাকুশলী, নেপথ্য-কর্মী প্রভৃতি সকলকেই স্মারকোপহার বিতরণ করবার পর এই গোষ্ঠীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে একটি সরস নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

বি এফ জে-এর কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন :

গেল শনিবার, ২৪-এ আগস্ট "রূপমঞ্চ" কার্যালয়ে বি এফ জে-এর নবনির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষ সমিতির প্রথম অধিবেশন বসে। প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং শ্রেষ্ঠ কলা-কুশলীদের মধ্যে প্রশংসাপত্র বিতরণ করা ছাড়াও এই [illegible] পন্থা গ্রহণ করা [illegible] গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে, এ আশ্বাসও দেওয়া হয়। পরিশেষে "রূপমঞ্চ" মাসিকের প্রতিনিধি প্রীতি দেবী মুখোপাধ্যায় সমবেত সভ্যবৃন্দকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। তাঁকে এই কার্যে সাহায্য করেছিলেন আরতি মুখোপাধ্যায় এবং রূপমঞ্চ-সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়।

ই আই এম পি এর বিশেষ উৎসব :

গেল শনিবার, ৩১-এ আগস্ট ই আই এম পি এ (পূর্বভারতীয় চলচ্চিত্র সংস্থা) রঞ্জি ইনডোর স্টেডিয়ামে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেদিন থেকে চলচ্চিত্র-শিল্পে সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারদানের ব্যবস্থা হয়েছে, সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে-সব বাংলা ছবি রাষ্ট্রীয় স্বর্ণ-

শৌভনিক-এর 'যা নয় তাই' নাটকের ২০০ তম রজনীর স্মারক উৎসব অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর
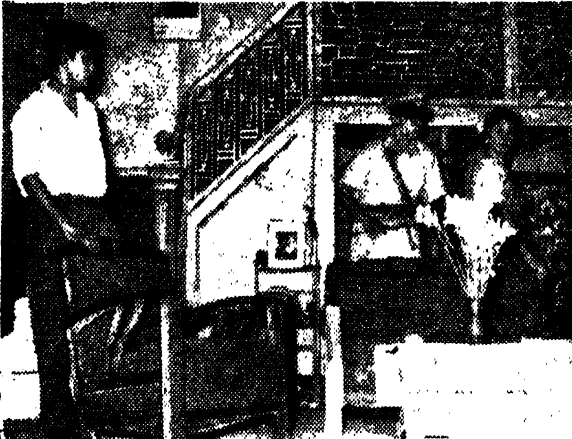
সুন্দরম-এর 'ফিঙ্গার প্রিন্ট'এ পার্থপ্রতিম, অলোক রায়চৌধুরী ও চিত্রা মণ্ডল

'বাদশা' চিত্রে কালী ব্যানার্জী ও শংকর

পদক, রৌপ্য-পদক এবং প্রশংসাপত্র লাভ করেছে, তাদের প্রযোজকদের ই আই এম পি এ একটি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৫ সালে প্রথম স্থান অধিকারী "পথের পাঁচালী"র প্রযোজক রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি পি এস মাথুর থেকে শুরু করে ১৯৬২ সালে প্রথম স্থান অধিকারী "দাদাঠাকুর"-প্রযোজক শ্যামলাল জালান প্রথমে "শিখা-সমন্বিত প্রদীপধারী নারীমূর্তি" স্মারক-চিহ্নরূপে উপহার লাভ করবার পরে শিশুচিত্র এবং অপরাপর পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছবির প্রযোজকদেরও অনুরূপভাবে উপহার দেওয়া হয়। উপহার বিতরণ করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্থা সভাপতিরূপে মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী ভাষণের পর উপহার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পর অনুষ্ঠান-সভাপতি এবং প্রধান অতিথিরূপে যথাক্রমে অর্থমন্ত্রী শংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রচারমন্ত্রী জগন্নাথ কোলে তাঁদের ভাষণে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যথাসম্ভব সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। অনুষ্ঠানঅন্তে অভ্যাগতবৃন্দকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

প্রবীণ শিল্পী, চিত্রপরিচালক ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় সম্বর্ধিত :

গেল মঙ্গলবার ২৭-এ আগস্ট মহাজাতি সদনে পৌরপ্রধান চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রবীণ চিত্র-পরিচালক ও শিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (ডি জি) ৭০ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার জন্যে আমাদের মতো বহু সাংবাদিকই এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হননি। আমরা প্রবীণ শিল্পীর সুস্থ ও নীরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করি।

'অন্বেষা'র 'নমো যন্ত্র' এবং 'তাহার নামটি রঞ্জনা' :

গেল বুধবার ২৮-এ আগস্ট প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে অন্বেষা সম্প্রদায় গঙ্গাপদ বসু রচিত 'নমো যন্ত্র' এবং বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'তাহার নামটি রঞ্জনা' নাটক দুটিকে মঞ্চস্থ করেন। একটি খবরের কাগজের মেশিনম্যানের মুদ্রণযন্ত্রের প্রতি অবিচলিত ভালোবাসা, যাকে প্রায় অপত্য স্নেহের পর্যায়ে ফেলা যায়, সেই রকম ভালোবাসাকে উপজীব্য করে গঙ্গাপদ বসু 'নমো যন্ত্র' নাটকটি রচনা করেছেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'তাহার নামটি রঞ্জনা' অনেকটা কাব্যধর্মী; একটি মধ্যবিত্ত ঘরের সৎ ছেলে উপার্জনের চেষ্টায় পথে বেরিয়ে সৎ আদর্শকে অনুসরণ করতে গিয়ে হত্যা করতে বাধ্য হয় এবং ফলে ফাঁসির আসামীরূপে জেলে যায়। ঠিক

'কর্ণার্জুন'-এ দ্রৌপদীর ভূমিকায় জয়শ্রী সেন

ফাঁসির সময়টির ঘণ্টা কয়েক আগে তারই ছোট বোন আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। যখন সে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল, তখন এই বোন ছিল নিতান্ত বালিকা। প্রায় দশ বারো বছর পরে ফাঁসির পূর্বমুহূর্তে সেই বোনের কাছে দাদা বলে নিজের পরিচয় দিতে তার বাধলো; তাই শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে সেই নিরুদ্দিষ্ট দাদার বন্ধু বলে বোনকে 'বোন' সম্বোধন করলে এবং পূর্বস্মৃতি দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে উঠল। নাটক দুটির অভিনয় কিন্তু আমাদের খুশী করতে পারেনি। প্রথম নাটকে ভোলার ভূমিকায় স্বদেশ বসু এবং দ্বিতীয় নাটকে কৌশিক ও রঞ্জনার ভূমিকায় যথাক্রমে স্বদেশ বসু ও মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় কিছুটা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

"সেতু"র ৯০০তম রজনীর স্মারক উৎসব :

দীর্ঘদিন চলার রেকর্ড সৃষ্টিকারী "সেতু" নাটকের ৯০০তম রজনীর স্মারক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হবে আসছে সোমবার, ৯ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

"কথা কও"-এর শততম অভিনয়ের স্মারকোৎসব :

গেল মঙ্গলবার, ২৭-এ আগস্ট রঙমহলের শিল্পিগোষ্ঠী অভিনীত "কথা কও" নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারকোৎসব পালিত হয়। প্রধান অতিথি এবং সভাপতিরূপে যথাক্রমে ডঃ প্রতাপ-চন্দ্র চন্দ্র এবং রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মনোজ্ঞ ভাষণ দেবার পর "কথা কও" অভিনয় সংশ্লিষ্ট নাট্যকার, শিল্পী, নেপথ্যকর্মী প্রভৃতি সকলকে রৌপ্যনির্মিত টি-সেট, হাতঘড়ি, ফাউন্টেনপেন ও পেন্সিল ব্যাগ প্রভৃতি পুরস্কার বিতরণ করেন কানন দেবী। পরিচালক শিল্পিবৃন্দ—সরযূ-বালা, জহর রায়, রবীন মজুমদার, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নিজেরা পুরস্কার গ্রহণ করেন নি। অবশ্য সাবিত্রী চট্টো-পাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে সরযূ দেবী এবং জহর রায়কে পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠান-অন্তে অভ্যাগতবৃন্দকে জলযোগে আপ্যা-য়িত করার পর "কথা কও" নাটকটি অভিনীত হয়।

একটি সাধু প্রস্তাব :

সুদূর ভুবনেশ্বর থেকে প্রমথেশ ভট্টাচার্য অনুরোধ করেছেন : "যদি কোনো সহৃদয় চিত্র-প্রদর্শক কানন দেবী অভিনীত পুরানো ছবিগুলো কল-কাতার কোনো চিত্রগৃহে পুনঃপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন, তাহলে একালের অনেক সিনেমাপ্রিয় দর্শক সেকালের কানন দেবীকে দেখে তাঁর অভিনয় ক্ষমতার সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন।" আমরা এই সাধু প্রস্তাবের প্রতি আন্ত-রিক সমর্থন জানিয়ে কলকাতার চিত্র-

প্রদর্শকদের এই কাজে অগ্রসর হতে আহ্বান জানাচ্ছি।
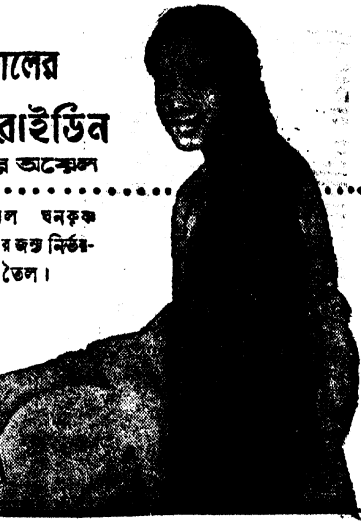
✶ কলকাতা ✶ বোম্বাই ✶ মাদ্রাজ

কলকাতা

অভিনেত্রী মঞ্জু দে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলেন দিবিত্রি ফিল্মসের 'স্বর্গ হতে বিদায়' ছায়াচিত্রে। দৃশ্যগ্রহণকালে শ্রীমতী দে-র পরিচালনা-ক্ষমতা দেখে মনে হয়েছে এ ছবি দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হবে। বিশেষ করে এ ছবির নায়ক দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়-জীবনের একটি শ্রেষ্ঠচিত্র হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। শেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, অনুভা গুপ্তা, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, অজয়কুমার, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সুখেন ও সুমিতা সান্যাল। এ মাসেই এ ছবির অর্ধাংশের কাজ সুসম্পন্ন হবে ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয়। চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অনিল গুপ্ত এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনা ও পরিবেশনার দায়িত্ব পালন করছেন দিবিত্রি ফিল্মস।

উত্তমকুমার ফিল্মসের তৃতীয় ছবি সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ' চিত্রটি পরিচালনা করছেন তপন সিংহ। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শেষে বর্তমানে পরিচালক বহির্দৃশ্যের জন্য রওনা হয়েছেন। কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী দেবী, গীতা দে, বিকাশ রায়, বিনতা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, পিণ্টু ও মাঃ গৌতম। আলী আকবর পুত্র আশীষ খান এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় রয়েছেন বিমল মুখোপাধ্যায়, সুবোধ রায় এবং সুনীত মিত্র। ছায়াবাণী ছবিটির পরিবেশনাভার গ্রহণ করেছেন।

সম্প্রতি মৃণাল সেন 'প্রতিনিধি'-র সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ শেষ করেছেন। বর্তমানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবে সম্পাদনার কাজ শুরু হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে এ চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় শেষ করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, প্রসেনজিৎ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শৈলজা চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর নস্কর, বংশী চন্দ্রগুপ্ত এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'সাত পাকে বাঁধা'-র পর অজয় কর 'বর্ণালী' ছবিটি পরিচালনা করছেন। সুবোধ ঘোষের এ কাহিনীর মূল চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর। পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছেন পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, ছায়া দেবী ও এন বিশ্বনাথন। শব্দধারক দেবেশ ঘোষ ছবিটির প্রযোজক। সঙ্গীত-পরিচালক কালীপদ সেন। চিত্রগ্রাহক শিশু চক্রবর্তী। চণ্ডীমাতা ফিল্মস এ ছবির পরিবেশক।

বোম্বাই

প্রযোজক-পরিচালক ভি শান্তারাম বর্তমানে একটি মারাঠী ছবির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন। এটি তাঁর মারাঠী ভাষায় দ্বিতীয় ছবি। বছর দশেক আগে তিনি করেছিলেন প্রথম মারাঠী ছবি 'সাহির প্রভাকর'। নতুন ছবিটির নাম রেখেছেন 'এ মারাঠীছিয়ে নাগারি'। এ মাস থেকেই রামকমল স্টুডিওয় এ ছবির নিয়মিত দৃশ্যগ্রহণ শুরু হবে। নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সন্ধ্যা।

এ- আর- প্রোডাকসন্সের নতুন ছবিটির সম্প্রতি মহরৎ অনুষ্ঠিত হল রঞ্জিত স্টুডিওয়। প্রধান চরিত্রাভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন নন্দা, মনোজকুমার, মামুদ, শশিকলা ও লোলিতা পাওয়ার। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনায় রোশন।

প্রযোজক-পরিচালক এস ডি নারাং-এর রঙিন চিত্র 'সানহাই' সমাপ্তপ্রায়। প্রধান চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন বিশ্বজিৎ, রাজশ্রী, পরভীন চৌধুরী, নিরুপা রায়, বীণা, রেহমান ও সাপ্রু। রবি এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক।

মাদ্রাজ

রাঙ্গার প্রথম তামিল ছবি 'নিছায়া থাম্বলাম' চিত্রটি পুনরায় নতুন করে চিত্ররূপ পাচ্ছে। মুকরাম শর্মা এ ছবির সংলাপ ও রবি সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন শিবাজী গণেশন ও যমুনা। সম্প্রতি হিন্দী ছবি 'প্যায়র কিয়া তো ডরনা কেয়া'-র চিত্রগ্রহণ শেষ করেছেন। শাম্মি কাপুর ও সরোজা দেবী এ ছবির নায়ক-নায়িকা।

—চিত্রদূত
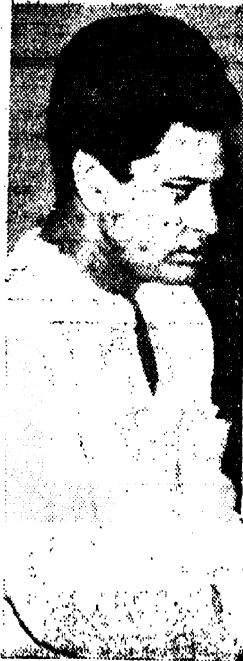
রঙমহলের 'কথাকও' নাটকের শততম রজনীতে কানন দেবী সবিতাব্রতকে পুরস্কৃত করছেন।

স্টুডিও থেকে বলছি

'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়'—এই প্রবাদবাক্যের ভিত্তিতে 'সিঁদুরে মেঘ' চিত্রটির কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপ নিচ্ছে। চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। সরোজ সেনগুপ্ত প্রডাকসন্সের এ ছবিটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন পরিচালক সুশীল ঘোষ। সুলেখা সান্যাল রচিত এ কাহিনীর আরম্ভ বাসররাত্রির একটি নাটকীয় মুহূর্তে। মাধুরী আর অনন্ত দুটি জীবনের এই শুভলগ্নে মাধুরীকে যেন সবচেয়ে বেশী উতলা মনে হয়। অতীতকে সে কিছুতেই ভুলে যেতে পারে না। সারা জীবনের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করার আগে তাই বারবার অনন্তকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করে। অনন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মাধুরী তার পেছনে ফেলে আসা জীবনের টুকরো ইতিহাস থেকে কাহিনী শুরু করে।

দেশ বিভাগের পর ছোট্ট একটি সংসার মহানগরের বুকে আশ্রয় নেয়। মাধুরীর বাবা আদর্শ শিক্ষক। সারা জীবন ধরে আদর্শকেই সমাজকল্যাণে কাজে লাগিয়েছেন। আজ তিনি রিক্ত-অচল। একমাত্র কন্যার কোন আশাকেই তিনি পূর্ণ করতে পারেন নি। মাধুরীর স্কন্ধে এ সংসার অস্থায়ী নিরাপত্তার নদীতে ভেসে চলেছে। একটি সহজ-সরল কোমল-হৃদয় মহানগরের চোখে খুবই আশ্চর্য সম্পদ। চারদিকে যেন আসন্ন কামনার আসক্তি ছড়ানো। ভয় পায় মাধুরী। মহানগরীর একটি ক্ষয়িষ্ণু সংসারের সে এখন একমাত্র প্রতিনিধি। প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা মেটাতে নিদেনপক্ষে শুধু প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাকুরির জন্য পথে নামে মাধুরী। কলেজ শেষ করে যে আশার ঘর একদিন সবার মনকে রাঙিয়ে তোলে আজ তার বিপরীতে মাধুরী হেঁটে চলেছে। রোগগ্রস্থ পিতা এবং মায়ের দৈন্যতাকে ভরিয়ে তুলতে। বাস্তবের সিঁড়িপথ বেয়ে উঠতে-নামতে মাধুরীর জীবন-দর্শনের দর্পণে একটা ভয়ার্ত ছাপ ধরা পড়ে। কলেজের বন্ধু রাকা বসুর নেতৃত্বে বিরাট ধনী সংস্থার পরিচালক মিঃ গুপ্তর কাছ থেকে অবশেষে মাধুরী চাকুরি পেল। কিন্তু তার বিমিনয়ের দৃষ্টিতে কিসের যেন কামনার ইঙ্গিত প্রতিনিয়ত বর্ষিত হয় মাধুরীর দরবারে। দ্বন্দ্ব বাধলো আরও নাটকীয়-ভাবে। মিঃ গুপ্তের সহকারী সুশান্ত হঠাৎ মাধুরীর মধুর দর্শনে উতলা হয়ে পড়ে সুখ-স্বর্গ রচনায়। মাধুরীর জন্য

সরোজ সেনগুপ্ত প্রযোজিত 'সিঁদুরে মেঘ'-এর শুভ দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে নির্দেশ দিচ্ছেন ছবির পরিচালক সুশীল ঘোষ (বাম দিকে)। নিমন্ত্রিত ও শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অসিত সেন, চিত্রগ্রাহক গণেশ বসু, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ এবং সত্যজিৎ রায় ফটো : অমৃত

ঝড় ওঠে মিঃ গুপ্ত ও সুশান্তর কামনার আকাশে। কালবৈশাখীর সে ঝড়ে মাধুরী মুক্তি পেল। নতুন করে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে অনন্ত আসে মাধুরীর জীবনে। কিন্তু ভয় পায় মাধুরী। অতীতের অভিশপ্ত কোন অশুভ মুহূর্ত আবার যদি তাকে সুখী না করে। কিন্তু অনন্ত তার সব-কিছু নিরাপত্তার ছাড়পত্র নিয়ে মাধুরীকে টেনে নেয়। সান্ত্বনা দেয় তারও অতীতের অপরাধী জীবনের কাহিনী শুনিয়ে। বড় হতে অনন্তও চেয়েছিল। কিন্তু অনর্থ বাধলো সমাজের অর্থ ও প্রতিপত্তির মোহে। অর্থই সমাজের একমাত্র মানদন্ড। মিঃ গুপ্ত আর সুশান্তর মত কামনাদীপ্ত চরিত্র বর্তমান সমাজের আনাচে-কানাচে পরিব্যাপ্ত। অনন্ত এদের আকর্ষণের মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছিল। তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মিঃ গুপ্ত একদিন সুশান্তকে সম্মানের প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু চিরদিনের জন্য আপন স্ত্রীকে সুশান্তকে ভুলে যেতে হয়। সেই থেকে অনন্ত অপরাধী।

ফুলশয্যার দুটি অতীত জীবনী নিজেদের বেঁধে নিল। সরল বিশ্বাসের যুক্তি নিয়ে মাধুরীকে অনন্ত গ্রহণ করলো। নতুন দিনের সূর্য যখন উঁকি দিয়েছে বাইরের আকাশে তখন গত-রাত্রির নিদ্রাহীন চোখে ঘুমের মাদকতা একটি রোমাঞ্চিত জীবনকে স্পর্শ করলো।

চলচ্চিত্রায়নের এ কাহিনী সমাজ-কল্যাণের বলিষ্ঠ বিষয়বস্তুর অতি সমকালীন সমীকরণ নিঃসন্দেহে আশা-প্রদ। কাহিনী নির্বাচনে পরিচালকের মহৎ নিষ্ঠার পরিচয় জাগে। চিত্র-কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন, মাধুরী—মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত—অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত—অসিতবরণ, মাধুরীর বাবা—জীতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মা—গীতা দে, মিঃ গুপ্ত—হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাকা বসু—সুমিতা সান্যাল ও ললিতা—রুমা গুহ-ঠাকুরতা।

কুশলী বিভাগে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় গণেশ বসু, শিব ভট্টাচার্য এবং গৌর পোদ্দার। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কিনে কর্ণার এ ছবির পরিবেশক।

—চিত্রদূত

খেলার কথা

অজয় বসু

অ্যাথলিটদের সামর্থ্যের শেষ কোথায়? হিসেব করে, অঙ্ক কষে তাঁদের দক্ষতা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে বেঁধে দেওয়া কি সম্ভবপর? বোধহয় না।

একদিন হয়তো তাঁদের সামর্থ্য ও সম্ভাবনার পরিমাপ করা সাধারণ ধারণায় কুলিয়ে উঠত। কিন্তু ক্রমোন্নতির অসাধারণ নজীর গড়ে অ্যাথলিটরা সাধারণ ধারণার ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিয়েছেন। আরও জোরে ছোটার, আরও ঊর্ধ্বে ওঠার এবং আরও দূরে চলে যাবার সর্বাত্মক সাধনায় আত্মনিমগ্ন এই অ্যাথলিটরা মহাকাশমুখী যুগেরই অবিমিশ্র প্রতীক। মানুষ আজ চাঁদে হাত দিয়েছে। অ্যাথলিটরাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে ওঠার তাগিদে তাঁরা যেন ভূমির সীমা ছাড়িয়ে মহাকাশেই ছড়িয়ে পড়তে চাইছেন।

অ্যাথলেটিকের ক্ষেত্রে অগ্রগমনের, ক্রমোর্ধ্বারোহণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে। প্রাক যুদ্ধকালের স্বীকৃত বাধাগুলি অপসারিত হয়েছে ক্রমে ক্রমে। আজকের হিসেবে অ্যাথলেটিকের কোনো বিভাগেই স্বীকৃত বাধার বা 'ব্যারিয়া'রের' অস্তিত্ব নেই।

প্রাক্ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এক মাইল দৌড়ে চার মিনিট, শত মিটারে দশ সেকেন্ড, ব্রডজাম্পে সাতাশ ফুট, হাইজাম্পে সাত ফুট, পোলভল্টে ষোল ফুট ইত্যাদির সীমাচিহ্ন ছিল প্রচলিত মতে অনতিক্রম্য বাধা। কিন্তু সে সব বাধা নড়েছে। সরে গিয়েছে।

ইংলণ্ডের রোজার ব্যানিস্টার এক মাইল দৌড়ে সর্বপ্রথম চার মিনিটের বাধা ডিঙোলেন। দেখতে দেখতে অস্ট্রেলিয়ার জন ল্যান্ডি ও হার্ব ইলিয়ট এবং শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডের পিটার স্নেলের চেষ্টায় মাইল দৌড়ের বিশ্বরেকর্ডটি কমে এসে দাঁড়ালো ৩ মিনিট ৫৪·৪ সেকেণ্ডে।

অবিস্মরণীয় নিগ্রো অ্যাথলিট জেসি ওয়েন্সের শত মিটার দৌড়ে ১০·২ সেকেণ্ডের এবং ব্রডজাম্পে ২৬ ফুট ৮ ইঞ্চির বিশ্ব রেকর্ড দীর্ঘদিন অস্পর্শিত থাকার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালেই দুটি নজীরই গুঁড়িয়ে গিয়েছে। জার্মানীর আর্মিন হ্যারি, কানাডার হ্যারি জেরম মাত্র দশ সেকেণ্ডে শত মিটার দৌড়ে এবং আমেরিকার রালফ বোস্টন ও রাশিয়ার তের ওভানেসিয়ান সাতাশ ফুটের ওপারে ব্রডজাম্প করে দুটি বিভাগেই নতুন কীর্তি স্থাপন করেছেন।

জন উলসেস (আমেরিকা) পোল ভল্ট অনুষ্ঠানে ১৬ ফুট উচ্চতা অতিক্রমের গৌরব লাভ করছেন।
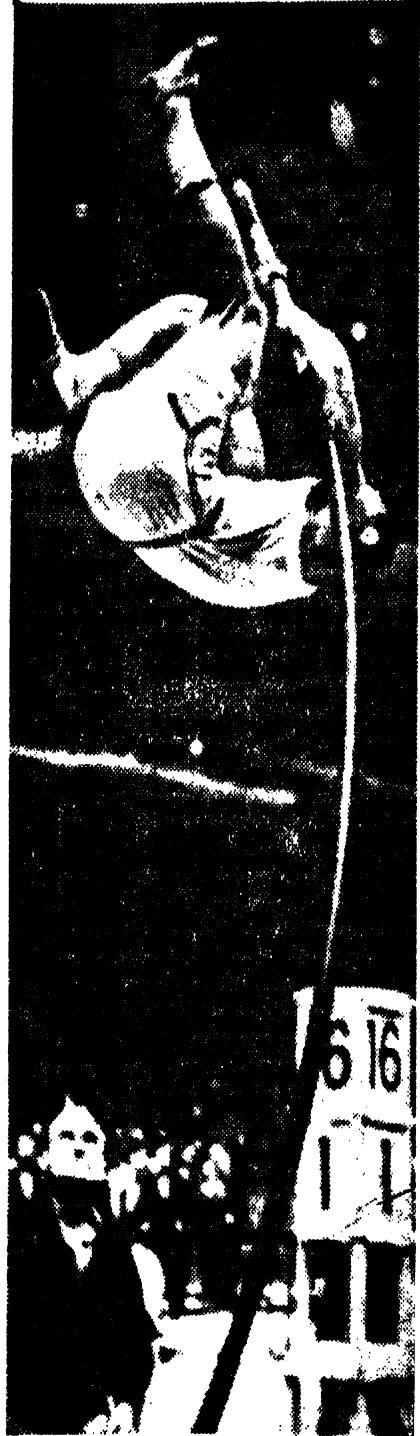
নিগ্রো তরুণ চার্লস ডুমাস হাইজাম্পে সাত ফুটের বাধা ডিঙোলেন প্রথম। তাঁকে অনুসরণ করে রুশ তরুণ ভ্যালেরি ব্রুমেল একলাফে উঠে গেলেন সাত ফুট পৌনে ছ ইঞ্চি ওপরে। আরও উঠবেন এই ব্রুমেল—যদিও ঊর্ধ্বাকাশে আজ তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সেখানে তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম।

একই পথ-পরিক্রমায় কোমর বেঁধেছেন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সটপুটার, ডিসকাস ও বর্শা নিক্ষেপকেরা এবং রুমানিয়ার ইওলাণ্ডা বালাস, রাশিয়ার

তামারা প্রেস, আমেরিকার উইলমা রুডলফের মতো তরুণীরা। পিছিয়ে থাকতে তরুণ তরুণী, নায়ক নায়িকা, সকলেরই আজ প্রবল অনীহা।

যুগটাই এগিয়ে চলেছে। সেইসঙ্গে যুগের প্রতীক তরুণ, তরুণীরা। এগোতে এগোতে আজ তাঁরা কোথায় এসে পড়েছেন একমাত্র পোলভল্টের বিষয় বিশদ আলোচনা করলেই তা উপলব্ধি করা যাবে।

ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে শুনতাম যে আমাদের দেশের রঘুডাকাতেরা এক-লাফে দোতলা বাড়ীর মাথায় চড়ে বসতেন। কথাটায় হয়তো কিছুটা বাড়াবাড়ি থাকতে পারে। হয়তো সেকালে এতোটা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আজ যে এ কৃতিত্ব অনেকেরই সাধ্যায়ত্ত তার প্রমাণ হাতেনাতেই রয়েছে।

স্বীকৃত বাধা ষোল ফুট ডিঙিয়ে গেলেন ব্রায়ান স্টার্নবার্গ, জন উলসেস, ডেভ টর্ক, ফিনল্যাণ্ডের পেন্‌টি নিকুলা প্রমুখেরা। একটি দণ্ড হাতে নিয়ে ওঁরা সেদিনের স্বীকৃত বাধা ষোল ফুট ডিঙিয়ে তো গিয়েছেনই। উপরন্তু জন পেনেল ১৭ ফুট ¾ ইঞ্চি অতিক্রম করে অ্যাথলেটিক-চর্চার ইতিহাসে সাফল্যের আর এক অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন।

অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কোনো পোলভল্টারের পক্ষে চৌদ্দ ফুট দেড় ইঞ্চির বেশী অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়নি। ১৯৪২ সালে মার্কিন তরুণ কর্ণেলিয়াস ওয়ারমারদাম যেদিন পনেরো ফুট আট ইঞ্চি ওপরে ওঠেন সেদিন বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত রায় দেন যে এই শেষ। এর ওপরে ওঠা মানুষের সাধ্যাতীত এবং ওয়ারমারদামই বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পোলভল্টার।

কিন্তু বছর দশেক যেতে না যেতেই বিশেষজ্ঞদের বেকুফ বানিয়ে আমেরিকার জর্জ ডেভিস উঠলেন পনেরো ফুট সোয়া দশ ইঞ্চি এবং গটৌম্পিক ও অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ডন্‌ ব্র্যাগ পনেরো ফুট পৌনে দশ ইঞ্চি উপরে। এবং ১৯৬২ সালে মার্কিন তরুণ জন উলসেস সর্বপ্রথম ষোল ফুটের 'ব্যারিয়ারও' পার হয়ে গেলেন।

কদিন পর ফিনল্যাণ্ডের পেনটি নিকুলা ষোল ফুট আড়াই ইঞ্চি অতিক্রমে বিশ্ব রেকর্ডের যে নজীর গড়লেন পরের এক বছরের মধ্যেই সে রেকর্ডটি বার-বার খান খান্‌ হয়ে গেল জন পেনেল আর ব্রায়ান স্টার্নবার্গের ব্যক্তিগত কৃতিত্বে।

শিক্ষাশিবিরে মারাত্মক আঘাত পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ব্রায়ান স্টার্নবার্গ আজ অবশ্য অ্যাথলেটিক-চর্চায় ক্ষান্তি দিয়েছেন। কিন্তু জন পেনেল আছেন। তাঁরই চেষ্টায় গত ২৪শে আগষ্ট মিয়ামির ফ্লোরিদায় পোলভল্টে সর্বপ্রথম সতেরো ফুটের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। জন পেনেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাজা তরুণ। সুতরাং রঘুডাকাতদের পুরোনো দিনগুলিকে পেছনে ফেলে রাখাও হয়তো তাঁর অসাধ্য হবে না।

একালের পোলভল্টারদের এই প্রায় অবিশ্বাস্য সাফল্যের সূত্র কি? শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সাধনার ফলশ্রুতি? না বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রাপ্ত তত্ত্বের মূলধন?

অথবা দুয়ের সমষ্টিগত পুঁজি? বোধহয় তাই। এই পুঁজিই তাঁদের পরম পাথেয়। সাধনার সঙ্গে তাঁরা বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রে পাওয়া জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছেন। বিজ্ঞানের আশীর্বাদেই একালের পোলভল্টাররা এমন একটি বিশেষ ধরণের পোল বা দণ্ড হাতে পেয়েছেন যা ছিল না প্রাক্‌ যুদ্ধকালে। এবং রঘুডাকাতদের হাতেও।

কাঁচ-তন্তুতে নির্মিত এই দণ্ড চাপের মুখে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। তারপর চাপ শিথিল হলেই জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো সোজা হবার চেষ্টায় অ্যাথলিটকে ঠেলে দেয় ওপরে। দণ্ডের প্রচণ্ড ধাক্কায় অ্যাথলিটের গতি হয় আরও ঊর্ধ্বমুখী। সমস্ত প্রক্রিয়াটি কিন্তু রীতি-মতো অনুশীলন-সাপেক্ষ। অ্যাথলিট যদি দেহের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারেন তাহলে কাঁচ-তন্তুর দণ্ডও তাঁকে কোনো সাহায্যই করতে পারে না।

কাঁচ-তন্তুর দণ্ডটি দুর্মূল্য। বাজারে কিনতে কুড়ি থেকে চল্লিশ পাউণ্ড পড়ে। দুর্মূল্য এবং আনুষঙ্গিক আর নানান কারণে কাঁচ-তন্তুর দণ্ড অনেকেরই চক্ষুশূল। কেউ কেউ বলেন যে, অ্যাথলিটরা এগোতে পারছেন না। আসলে এই দণ্ডই তাঁদের এগিয়ে দিচ্ছে। মানুষের দেহগত সামর্থ্য নয়, যন্ত্রই এক্ষেত্রে প্রবল পক্ষ।

কাঁচ-তন্তুতে গড়া এই দণ্ড ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারীরও দাবী উঠেছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক নিয়ামক সংস্থা সে দাবীতে কান পাতেন নি। কাঁচ-তন্তুর দণ্ড সচল থেকেই দেশ-বিদেশের অ্যাথলিটদের আরও সচল হতে পাথেয় যোগাচ্ছে।

অর্থাৎ এককথায় বলা যেতে পারে যে কাঁচ-তন্তুতে গড়া দণ্ডের আবির্ভাবে পোলভল্টের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা ঘটিয়েছে। এই যুগের দিশারী হলেন গ্রীসের জর্জিয়াস রোবানিস। ১৯৫৬ সালেই এই রোবানিসই কাঁচ-তন্তুর দণ্ড হাতে নিয়ে অ্যাথলেটিক আসরে নেমেছিলেন। রোবানিস নিজে অবশ্য তেমন উচ্চতা অতিক্রমে সফল হননি। কিন্তু তিনি এমন একটি সূত্র রেখে গিয়েছিলেন যা হাতে নিয়ে উত্তরসূরীরা আজ পথিকৃতকেই অতিক্রম করে চলেছেন।

অ্যাথলেটিকের, বিশেষভাবে পোল-ভল্টের ক্ষেত্রে নতুন যুগের আবির্ভাব নতুন কোনো ঘটনা নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রে বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়েছে পোল-ভল্টে।

প্রথম পর্বে ছিল বাঁশের দণ্ড। তারপর আসে ইস্পাতের এবং ছাপান্ন সালের আগে পর্যন্ত চলছিল অ্যালুমিনিয়ামে গড়া দণ্ড। অনগ্রসর অঞ্চলে এখনও অ্যালুমিনিয়াম বা বাঁশের দণ্ডই ব্যবহৃত হয়। বাঁশের যুগে কর্ণেলিয়াস ওয়ারমারদামই ছিলেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ। অ্যালুমিনিয়ামের কালে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন বব্‌ রিচার্ডস, যিনি পনেরো ফুট পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত উঠেছিলেন।

আর কাঁচ-তন্তুর আমলে কে শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি পাবেন? আপাততঃ সে শিরোপা নিঃসন্দেহে জন পেনেলেরই প্রাপ্য। তবে অদূরভবিষ্যতে পেনেলও তাঁর শীর্ষাসন অটুট রাখতে পারবেন কিনা সন্দেহ। অনেকেই এগিয়ে আসছেন। জন পেনেল সতেরো ফুটের উপরে উঠেছেন। এরপর আর কাউকে আঠারো ফুটে পৌঁছতে দেখলেও বোধহয় কেউই বিস্মিত হবেন না।

দর্শক

ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৯৬৩ সালের টেস্ট সিরিজে ৩—১ খেলায় (১টা ড্র) ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে 'রাবার' জয় করেছে। গত ১৭শ সংখ্যায় (৩০শে আগষ্ট, ১৯৬৩) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ডের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলার আলোচনা প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করেছিলাম। এই দুই দেশের মধ্যে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ আরম্ভ হয় ১৯২৮ সালে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। সেই থেকে এ পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে ১১টা টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে—ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ৬টা এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ৫টা। এই এগারটা টেস্ট সিরিজের ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৫ বার, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪ বার এবং দু'বার টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে গেছে। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এই নিয়ে দু'বার 'রাবার' পেল। ইংল্যাণ্ড পেয়েছে ৪বার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 'রাবার' পায় জন গডার্ডের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে ৩—১ খেলায়। সুতরাং ১৯৬৩ সালেও ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৯৫০ সালের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে এই দুই দেশের কোন টেস্ট পর্যায়ের ফলাফল অমীমাংসিত হয়নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে এই দুই দেশের মধ্যে ৫টা টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ২ বার, ইংল্যাণ্ডের ১ বার (১৯৬০) এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২ বার (১৯২৯-৩০ ও ১৯৫৩-৫৪)। ১৯৫৯-৬০ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে পিটার মে'র নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড ১—০ খেলায় প্রথম 'রাবার' জয় ক'রে। এই টেস্ট সিরিজের বাকি ৪টে টেস্ট খেলা ড্র যায়। কলিন কাউড্রে ৪র্থ ও ৫ম টেস্ট খেলায় দলের নেতৃত্ব করেন।

১৯৬৩ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাতে ইংল্যাণ্ডের পরাজয়ের ফলে ইংলিশ ক্রিকেট খেলার দৈন্যদশা পুনরায় প্রকাশ পেয়েছে। ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলার বাজার খুবই মন্দা—দিন দিন ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ হ্রাস পেয়ে চলেছে। জনসাধারণের অভিযোগ, ক্রিকেট খেলায় জৌলুসের অভাব। যুদ্ধোত্তরকালে (১৯৪৬ থেকে ১৯৬৩) ইংল্যাণ্ড বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এপর্যন্ত ৩৬টা টেস্ট সিরিজে যোগ দান ক'রে ২০টা সিরিজে 'রাবার' পেয়েছে। ৯টা টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে এবং ৭টা টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে গেছে। ইংল্যাণ্ডের এই জয়লাভের প্রাধান্য সীমাবদ্ধ আছে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড সুবিধা করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৯টা টেস্ট সিরিজের খেলায় ইংল্যাণ্ডের হার ৫, জয় ৩ এবং ড্র ১। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৬টা টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের জয় ২, হার ৩ এবং ড্র ১। গত তিন বছরে (১৯৬১-৬৩) ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট সিরিজের ফলাফল দাঁড়িয়েছে : জয় ৩, হার ৩ এবং ড্র ১। ইংল্যাণ্ড 'রাবার' পেয়েছে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২ বার (১৯৬১-৬২ ও ১৯৬২) এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ বার (১৯৬৩)। গত তিন বছরে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে অস্ট্রেলিয়া ১৯৬১ সালে, ভারতবর্ষ ১৯৬১-৬২ সালে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬৩ সালের টেস্ট সিরিজে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট সিরিজ যা অমীমাংসিত থেকে গেছে। সুতরাং টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ডের মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

টেস্ট খেলার ফলাফল

স্থান	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ওয়েস্ট ইঃ জয়ী	ড্র
ইংল্যাণ্ড	১১	৬	৬
ওয়েস্ট ইঃ	৫	৭	১০
মোট :	১৬	১৩	১৬

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

স্থান	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ওয়েস্ট ইঃ জয়ী	ড্র
ইংল্যাণ্ড	৪	২	০
ওয়েস্ট ইঃ	১	২	২
মোট :	৫	৪	২

সদ্য সমাপ্ত ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট সিরিজে (১৯৬৩) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলার সর্ব বিভাগে ইংল্যাণ্ডের থেকে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সেঞ্চুরী করেছেন কনরাড হান্ট—১৮২ রান (১ম টেস্ট, ম্যাঞ্চেস্টার) ও ১০৮ নট আউট (৫ম টেস্ট, ওভাল), বেসিল বুচার—১৩৩ রান (২য় টেস্ট, লর্ডস) এবং গারফিল্ড সোবার্স—১০২ (৪র্থ টেস্ট, লিডস)। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কোন খেলোয়াড়ই এক-শত রানের ঘরে পেঁছিতে পারেননি। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেন স্টুয়ার্ট—৮৭ রান। টেস্ট ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন কনরাড হান্ট—মোট রান ৪৭১ এবং গড় ৫৮·৮৭। অবিশ্যি দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন রোহন কানহাই—৪৯৭ রান (গড় ৫৫·২২)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন চার্লি গ্রিফিথ—৫১৯ রানে ৩২ উইকেট (গড় ১৬·২১)। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় ফিল সার্প—মোট রান ২৬৭ এবং গড় ৫৩·৪০। দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বাধিক সংখ্যক রান (৩৪০) তুলে তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন (গড় ৩৪·০০)। বোলিংয়ে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন ফ্রেডী ট্রুম্যান—৫৯৪ রানে ৩৪ উইকেট (গড় ১৭·৪৭)। ট্রুম্যান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্রিফিথের থেকে ২টো উইকেট বেশী পেয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ট্রুম্যানের উইকেট সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে—৫,৯৮৯ রানে ২৮৪ উইকেট (বিশ্বরেকর্ড)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চৌকস খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ৩২২ রাণ (গড় ৪০·২৫) এবং ৫৭১ রাণে ২০টা উইকেট পেয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বর্তমানে তাঁর মোট রাণ দাঁড়িয়েছে ৪,০৯৮ এবং উইকেট সংখ্যা ৯৮। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ পর্যন্ত কোন খেলোয়াড় ৩০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করতে সক্ষম হননি। সুতরাং আর মাত্র ২টি মূল্যবান উইকেট পেলেই সোবার্স সেই দুর্লভ সম্মান লাভ করবেন। পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থে বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় সোবার্সের ব্যাটিং এবং বোলিং সাফল্যের পরিসংখ্যান পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল।

॥ ভারত সফরে এম সি সি ॥

আগামী ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংল্যাণ্ডের এম সি সি দল ভারত সফরে আসছে। এম সি সি দলের খেলার তালিকায় আছে মোট দশটি খেলা—পাঁচটি পাঁচদিনব্যাপী সরকারী

টেস্ট খেলা এবং পাঁচটি তিন দিনের খেলা। এম সি সি দল আট সপ্তাহকাল ভারতবর্ষে অবস্থান ক'রে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে স্বদেশে ফিরে যাবেন।

মোট ১৫ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে ভারত সফরগামী এম সি সি দল গঠন করা হয়েছে। দলের অধিনায়ক পদ লাভ করেছেন মাইকেল কলিন কাউড্রে এবং সহ-অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করা হয়েছে মাইক স্মিথকে। দলের পনের জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ১১ জন খেলোয়াড় ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডের পক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন এবং এই ১১জন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে সাতজন—কাউড্রে, ব্যারিংটন, বোলাস, এডরিচ, পার্কস, সার্প এবং টিটমাস সদ্য সমাপ্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে খেলেছিলেন। এম সি সি দলের সঙ্গে ডেক্সটার, ট্রুম্যান, ব্রায়ান ক্লোস, ব্রায়ান স্ট্যাথাম, টনি লক, টম গ্রেভনী, বব্ বারবার এবং এম জে স্টুয়ার্ট প্রভৃতি খ্যাতনামা খেলোয়াড় ভারত সফরে না আসায় ভারতবর্ষের ক্রিকেট অনুরাগী মহলে যথেষ্ট নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। অন্ততঃ বোলিংয়ে বিশ্ব-রেকর্ড স্রষ্টা ফ্রেডী ট্রুম্যান দলের সঙ্গে এলে নৈরাশ্যের অর্ধেক কেটে যেত। এম সি সি দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় হলেন সারে দলের ব্যারিংটন (বয়স ৩২) এবং সর্বকনিষ্ঠ গ্লামর্গান কাউণ্টি দলের আইভর জেক্রে জোন্স (বয়স ২২)।

এম সি সি দলের খেলোয়াড় নির্বাচন সম্পর্কে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট মহলেও যথেষ্ট নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া দলের আগামী ১৯৬৪ সালের ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শক্তিশালী ইংল্যান্ড টেস্ট দল গঠনের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এম সি সি কর্তৃপক্ষ আগামী এম সি সি দলের ভারত সফরে কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করেছেন। কয়েকজন খ্যাতনামা টেস্ট খেলোয়াড় ব্যক্তিগত কারণে ভারত সফরে যোগদানের অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। একটানা বিদেশ সফরের পর তাঁদের বিশ্রামেরও প্রয়োজন। মোদ্দা কথা, ইংল্যান্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ মহল ভারতবর্ষের থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজের গুরুত্ব অনেক বেশী দেন। এই ধারণার পরিবর্তন শুধু অনুরোধ-নিবেদনে হবে না। ভারতবর্ষকে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। ইংল্যান্ড-ভারতবর্ষের মধ্যে এ পর্যন্ত ৮টা টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। ফলাফল : ইংল্যান্ডের 'রাবার' জয় ৬, ভারতবর্ষের ১ (১৯৬১-৬২) এবং টেস্ট সিরিজ ড্র ১ (১৯৫১-৫২)।

কলিন কাউড্রে ইতিপূর্বে ১১ বার ইংল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট দল পরিচালনা

গারফিল্ড সোবার্স—টেস্ট পরিসংখ্যান

বিপক্ষ দল	ব্যাটিং: টেস্ট খেলা	মোট রান	সর্বোচ্চ রান+	সেঞ্চুরী সংখ্যা	বোলিং: মোট রান	উইকেট সংখ্যা
[illegible]	১৬	১৩৯১	২২৬	৪	১৩৬৩	৩৮
[illegible]	১০	৯৮১	১৯৮	৫	[illegible]	[illegible]
অস্ট্রেলিয়া	৯	৬৬১	১৬৮	২	[illegible]	[illegible]
পাকিস্তান	৮	৯৮৪	৩৬৫*	৩	[illegible]	[illegible]
নিউজিল্যান্ড	৪	৮১	২৭	×	৪৯	২
মোট :	৪৭	৪০৯৮	৩৬৫*	১৪	৩৪৩৩	৯৮

+ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান। * নট আউট

করেছেন—১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৪র্থ ও ৫ম, ১৯৫৯-৬০ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৪র্থ ও ৫ম, ১৯৬০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫টা টেস্ট এবং ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১ম ও ২য় টেস্ট। ইংল্যান্ড কাউড্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২ টো, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩টে টেস্ট খেলায় জয়ী

কলিন কাউড্রে

হয়েছে। খেলা ড্র গেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুটো ক'রে। কাউড্রের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের একমাত্র পরাজয় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে (৫ উইকেটে)। কাউড্রের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড ৩—০ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে 'রাবার' জয় করে। সুতরাং কাউড্রে ইংল্যান্ডের যোগ্য এবং পয়মন্ত অধিনায়ক।

॥ খেলোয়াড় পরিচিতি ॥

মাইকেল কলিন কাউড্রে (কেণ্ট) :

জন্ম : ২৪-১২-১৯৩২, বাংগালোর
টেস্ট খেলা : ৬৭
টেস্টে মোট রান : ৪,৫৮৫
টেস্টে সেঞ্চুরী : ১৩
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ১৮২ (বিপক্ষে পাকিস্তান, ওভাল, ৫ম টেস্ট, ১৯৬২)

কলিন কাউড্রে ডান হাতে ব্যাট করেন। 'বছরের সেরা পাঁচজন' খেলোয়াড়ের একজন হিসাবে প্রখ্যাত 'উইসডেন' ক্রিকেট বার্ষিক পঞ্জিকার ১৯৫৫ সালের সংস্করণে নির্বাচিত হন।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলেছেন ৫টা (১৯৫৯ সালে)। মোট রান দাঁড়িয়েছে ৩৪৪ এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৬০ (৩য় টেস্ট, লীডস)।

এম জে কে স্মিথ (ওয়ারউইকস) :

জন্ম : ৩০-৬-১৯৩৩
টেস্ট খেলা : ২২
টেস্টে মোট রান : ১০৯০
টেস্টে সেঞ্চুরী : ২
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ১০৮ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, দ্বিতীয় টেস্ট, ত্রিনিদাদ, ১৯৫৯-৬০)

মাইকেল জে কে স্মিথ ডান হাতে ব্যাট করেন। ভারতবর্ষের বিপক্ষে তিনি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ৬টা (১৯৫৯ সালে ২ এবং ১৯৬১-৬২ সালের ভারত সফরে ৪)। ১৯৬১-৬২ সালের ভারত সফরে তিনি চারটে টেস্টে মোট ১২৬ রান করেন। এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ছিল ৭৩ (মাদ্রাজ, ৫ম টেস্ট)।

শেষ টেস্ট খেলেছেন পাকিস্তানের বিপক্ষে (৩য় টেস্ট, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২)

কেন ব্যারিংটন (সারে) :

জন্ম : ২৪-১১-১৯৩০
টেস্ট খেলা : ৪৫
টেস্টে মোট রান : ৩৪৫৪
টেস্টে সেঞ্চুরী : ৯
টেস্টে উইকেট : ৭৬০ রানে ১৫
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ১৭২ (বিপক্ষে ভারতবর্ষ, ২য় টেস্ট, কানপুর, ১৯৬১-৬২)

কেন ব্যারিংটন ডান হাতে ব্যাট করেন। লেগ-ব্রেক এবং গুগলী বল দেন। ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলেছেন ১০টা (১৯৫৯ সালে ৫ ও ১৯৬১-৬২ সালে ৫)। ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজে তিনি উভয় দলের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান পান—মোট রান ৫৯৪ (গড় ৯৯.০০)। সেঞ্চুরী করেছিলেন তিনটে—১৫১ নট আউট (১ম টেস্ট, বোম্বাই), ১৭২ রান

আউট (২য় টেস্ট, কানপুরে) এবং ১১৩ নট আউট (৩য় টেস্ট, দিল্লী)। ভারতবর্ষে তাঁর দ্বিতীয় সফর।

ব্রায়ান বোলাস (নটিংহামশায়ার) :

জন্ম : ৩১-১-১৯৩৪
টেস্ট খেলা : ২
টেস্টে মোট রান : ১০৫
টেস্ট সেঞ্চুরী : শূণ্য
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ৪৩ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬৩)

জন ব্রায়ান বোলাস টেস্ট খেলায় নবাগত। ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৩ সালের সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে প্রথম যোগদান করেন। ডান হাতে ব্যাট করেন এবং বাঁ হাতে বল দেন।

জন এডরিচ (সারে) :

জন্ম : ২১—৬—১৯৩৭
টেস্ট খেলা : ৩
টেস্টে মোট রান : ১০৩
টেস্ট সেঞ্চুরী : শূণ্য
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ৩৮ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, চতুর্থ টেস্ট, ১৯৬৩)

জন এইচ এডরিচ টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত খেলোয়াড়। টেস্ট খেলায় তাঁর হাতে-খড়ি—১৯৬৩ সালের সদ্য-সমাপ্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। ন্যাটা ওপনিং ব্যাটসম্যান।

বেরী নাইট (এসেক্স) :

জন্ম : ১৮-২-১৯৩৮
টেস্ট খেলা : ১২
টেস্টে মোট রান : ৩৬০
টেস্টে সেঞ্চুরী : ১
টেস্টে উইকেট : ৮৯৫ রানে ৩২
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ১২৫ (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, প্রথম টেস্ট, ১৯৬৩)

বেরী নাইট ডান হাতে ব্যাট ও ফাস্ট-মিডিয়াম বল করেন। ১৯৬১-৬২ সালে এম সি সি দলের সঙ্গে ভারত সফরে এসে টেস্ট ক্রিকেটে হাতে-খড়ি নেন। ভারতবর্ষের বিপক্ষে চারটে টেস্ট খেলে মোট ১১৫ রান করেন—এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ছিল নট আউট ৩৯ (চতুর্থ টেস্ট, কলকাতা)। উইকেট পেয়েছিলেন ৩০৫ রানে ৮টা (গড় ৩৮·১২)। ১৯৬৩ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তিনি দলভুক্ত হননি।

ডেভিড লার্টার (নর্থান্টস) :

জন্ম : ২৪-৪-১৯৪০
টেস্ট খেলা : ৪
টেস্টে মোট রান : ২
টেস্টে সেঞ্চুরী : শূণ্য
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ২
টেস্টে উইকেট : ৩৮৩ রানে ১৯

ডেভিড লার্টার ১৯৬৩ সালের অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড সফরে ৪টে টেস্ট খেলেন। ডান হাতে ব্যাট এবং ফাস্ট বল করেন।

জন মর্টিমোর (গ্লস্টারশায়ার) :

জন্ম : ১৪-৫-১৯৩৩
টেস্ট খেলা : ৫
টেস্টে মোট রান : ১১৮
টেস্টে সেঞ্চুরী : শূণ্য
টেস্টে উইকেট : ২৬৭ রানে ৭
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ৪৪ নট আউট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ৫ম টেস্ট, ১৯৫৮-৫৯)

জন মর্টিমোর ডান হাতে ব্যাট করেন এবং বল দেন অফ্-ব্রেক। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২টো টেস্ট খেলেছেন ১৯৫৯ সালে। ১৯৫৮-৫৯ সালের সফরে তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১টা এবং নিউ-জিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২টো টেস্ট খেলেন।

জিম পার্কস (সাসেক্স) :

জন্ম : ২১-১০-১৯৩১
টেস্ট খেলা : ১১
টেস্টে মোট রান : ৫০০
টেস্টে সেঞ্চুরী : ১
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ১০১ নট আউট (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ৫ম টেস্ট, ত্রিনিদাদ, ১৯৫৯-৬০)

জিম পার্কস ডান হাতে ব্যাট করেন এবং লেগ্-ব্রেক বল দিতে পারেন। তিনি অবিশ্যি উইকেট-কিপার হিসাবে দলভুক্ত হয়েছেন। সদ্য সমাপ্ত ১৯৬৩ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তিনি চারটে টেস্ট খেলে মোট ১৯০ রান করেন এবং এক ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ রান উঠেছিল ৫৭। ফুটবল খেলায় ইন-সাইড রাইট খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর নাম আছে।

ফিল সার্প (ইয়র্কসায়ার) :

জন্ম : ২৭-১২-১৯৩৬
টেস্ট খেলা : ৩
টেস্টে মোট রান : ২৬৭
টেস্টে সেঞ্চুরী : শূণ্য
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ৮৫ নট আউট (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, তৃতীয় টেস্ট, ১৯৬৩)।

ফিল সার্প ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৩ সালের সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে টেস্ট খেলায় হাতেখড়ি নেন এবং ইংল্যাণ্ড দলের ব্যাটিংয়ের গড়-পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান পান (গড় ৫৩·৪০)।

ফ্রেডী টিটমাস (মিডলসেক্স) :

জন্ম : ২৪-১১-১৯৩২
টেস্ট খেলা : ১৬
টেস্টে মোট রান : ৪৪২
টেস্টে সেঞ্চুরী : শূণ্য
টেস্টে উইকেট : ১২৭৪ রানে ৪৪
এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ৫৯ নট আউট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬২-৬৩)

ফ্রেডী টিটমাস ডান হাতে ব্যাট করেন এবং বল দেন অফ্ ব্রেক। হেনডন ফুটবল দলের তিনি ইন সাইড লেফট খেলোয়াড়।

ফ্রেডী টিটমাস ১৯৫৫ সালে তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। দীর্ঘ ৬ বছর পর পুনরায় ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২, ১৯৬২-৬৩ সালে অস্ট্রে-লিয়ার বিপক্ষে ৫, ১৯৬৩ সালে নিউ-জিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩ এবং ১৯৬৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৩টে টেস্ট ম্যাচ খেলে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট সিরিজের ৩য় টেস্টের প্রথম ইনিংসে টিটমাস ৫৮ বলে মাত্র ৫ রাণ দিয়ে ৪টে উইকেট পান—এই খেলায় তিনি মোট ৭টা উইকেট পান ৭৯ রাণে।

নীচের চারজন খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কোন টেস্ট ম্যাচে খেলেননি।

জিম বিঙ্কস (ইয়র্কসায়ার) : জন্ম ৫-১০-১৯৩৫। ডান হাতে ব্যাট করেন। উইকেট-কিপার। ১৯৬০ সালের ক্রিকেট মরশুমে ১০৮ জনকে আউট করেন (কট্ ৯৭ ও স্টাম্পড্ ১১)। এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৫৯ (স্কটল্যাণ্ডের বিপক্ষে), ১৯৫৮।

আইভর জেফ্রি জোন্স (গ্লামর্গান) : জন্ম ১০-২-১৯৪১। ডান হাতে ব্যাট করেন এবং বাঁ হাতে ফাস্ট বল দেন।

জন প্রাইস (মিডলসেক্স) : জন্ম ২২-৭-১৯৩৭। ন্যাটা ব্যাটসম্যান। ডান হাতে ফাস্ট বল দেন।

ডন উইলসন (ইয়র্কশায়ার) : জন্ম : ৭-৮-১৯৩৭। বাঁ হাতে ধীরগতিতে বল করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৫০৩	সম্পাদকীয়		
৫০৪	সর্বত্র আকাশ	(কবিতা)	—শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়
৫০৪	ওরা	(কবিতা)	—শ্রীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায়
৫০৫	অলাম্বিত		—শ্রীজৈমিনি
৫০৭	দিল্লী থেকে বলছি		—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৫০৯	সাহিত্য জগৎ		
৫১০	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীকাফী খাঁ
৫১১	বাঘে মানুষে		—শ্রীসমর বসু
৫১৯	প্রিয়পাত্র	(গল্প)	—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার
৫২৬	প্যারিস থেকে বলছি		—শ্রীদিলীপ মালাকার
৫২৯	শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প : শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র আদুরে খোকা	মূল :	জন ফ্লানেগান
		অনুবাদ :	—শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১-ডি, আনন্দ চাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৫৩৪	সেকালের পাতা : একালের চোখ		—শ্রীরত্নাকর
৫৩৫	পৌষ-ফাগুনের পালা	(উপন্যাস)	—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
৫৩৯	প্রদর্শনী		—শ্রীকলারসিক
৫৪১	কালো হরিণ চোখ	(উপন্যাস)	—শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগী
৫৪৬	জানাতে পারেন		—শ্রীপ্রদ্যোৎ মিত্র ও শ্রীবিমান দাশগুপ্ত
৫৪৭	সাদ্‌সুক্‌জিন্‌দিম্‌		
৫৫০	লুই আর্মানিস		—শ্রীকণাদ চৌধুরী
৫৫২	প্রাচীন সাহিত্য		—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
৫৫৫	দেশেবিদেশে		
৫৫৬	ঘটনাপ্রবাহ		
৫৫৭	সমকালীন সাহিত্য		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৫৬০	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৫৭১	খেলার কথা		—শ্রীঅজয় বসু
৫৭৪	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

ডুরাফ্লীপ

সতীশ কবিরাজের
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
ইহাই একমাত্র কেশ তৈল
আয়ুর্বেদীয় ভেষজের গুণাগুণে ঠিক রাখিয়া প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য
ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
দ্বারা পরীক্ষিত ও সমর্থিত।
আর্য্য ঔষধালয় (ঢাকা) কলিকাতা-৯

৩য় ব ২য় খণ্ড

অমৃত

১৯শ সংখ্যা মূল্য ৪০ নঃ পঃ

শুক্রবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৩৭০
Friday, 13th September, 1963. 40 Naya Paise.

দ্রব্যমূল্য, বিশেষে খাদ্যশস্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশের লোকের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে কিনা সে বিষয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা যতই হোক, সরকারী পক্ষ একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, কৃষিজাত পণ্য ও অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

পশ্চিমবাংলা বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের শেষ দিনে (শুক্রবার ২০শে ভাদ্র) বিরোধীসদস্যগণ বলেন যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর গগনস্পর্শী এবং সেইসঙ্গে করভার অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথ বিধ্বস্ত হইতেছে। কংগ্রেস পক্ষেরও কোন কোনও সদস্য এ বিষয়ে অল্প-বিস্তর সমর্থন করেন। ঐ দিনে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্রের মূল্য স্থির রাখিবার ব্যবস্থাগ্রহণ ও করনীতি পরিবর্তনের দাবী করিয়া এক বেসরকারী প্রস্তাব আসে। প্রস্তাব উত্থাপনকারী বিরোধীসদস্য বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে স্থিতিশীল করার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগতই চড়িতেছে। তিনি জরুরী অবস্থার পটভূমিকায় করনীতিরও পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হইয়াছে বলেন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে অন্য এক বিরোধীসদস্য বলেন যে, "অত্যাবশ্যক দ্রব্য আইন" প্রয়োগ করিয়া চাউলের দর বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। একজন সুপরিচিত বিরোধীসদস্য স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়কে "গোদের উপর বিষফোঁড়া"র সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে, আত্মসন্তুষ্ট সরকার যদি কর বাড়াইয়াই চলেন তবে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভও বাড়িবে।

কংগ্রেসপক্ষেও একজন করভার ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তবে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অন্য একজন খ্যাতিমান কংগ্রেসীসদস্য তাঁহার নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত গৃহস্থসাধারণের দুর্দশা ও দুরবস্থার বর্ণনায় বলেন যে, সেখানকার শতকরা নব্বুই জনের একবেলা আহার জোটে না। অথচ তাহারা চিরদিন গরীব ছিল না। একদিন তাহাদের অনেকের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইত। তিনি বলেন করবৃদ্ধিতে তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে।

অর্থমন্ত্রী এই সকল আলোচনার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা গৃহস্থসাধারণের পক্ষে সন্তোষজনক বা আশাপ্রদ বলা যায় না। তাঁহার মতে করবৃদ্ধির পরও এই রাজ্যের করের হার বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ইত্যাদি ভিন্ন রাজ্যের তুলনায় কম। তিনি মনে করেন এবার রাজ্যে যে সমস্ত নূতন কর বসিয়াছে তাহা দ্বারা সাধারণভাবে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। সেই সঙ্গেই তিনি বলেন স্বর্ণনীতি বা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা রাজ্যসরকারের আয়ত্তাধীন নয়। সবশেষে তিনি বলেন যে, দেশবাসীর কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে আরও কর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে!

স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বিধির প্রয়োগ ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করার জন্য শ্রী এস এস খেরকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই কমিটি দশ-বারো দিনের মধ্যেই রিপোর্ট দিবেন ও নূতন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী সংসদের বর্তমান অধিবেশনের মধ্যেই ঐ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্পর্কে বিবৃতি দিবেন—এই কথা ঐদিনই (শুক্রবার ৬ই সেপ্টেম্বর) নয়াদিল্লীতে ঘোষিত হয়।

অন্যদিকে লোকসভায় তাহার পূর্বদিনে (৫ই সেপ্টেম্বর) খাদ্যপরিস্থিতি ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনায় সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আসে যে, সরকার দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। সরকার কর্তৃক উদ্ধৃত পাইকারী মূল্য ও সাধারণ ক্রেতার ক্রয়মূল্যের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করা হয় এবং চিনি কেলেঙ্কারীর যথাযথ তদন্তের দাবী জানানো হয়।

এইভাবে সংসদে ও পরিষদে জনসাধারণের অসন্তোষ ও দুর্দশাজনিত বিক্ষোভের যে চিত্র দেখা যাইতেছে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে শুভলক্ষণ নয়। সরকারী অক্ষমতার যে সকল নিদর্শন সর্বজনবিদিত তাহার মধ্যে পণ্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে অক্ষমতা ও অনিচ্ছা, দুই অভিযোগেরই প্রচার চলিতেছে। এবং দ্রব্যমূল্য ও করভারে ক্লিষ্ট ও পিষ্ট জনসাধারণের মনে উহার প্রতিক্রিয়া কিভাবে চলিতেছে সে বিষয়ে কি আমাদের মন্ত্রীগণ কোনও খবর রাখেন না? দেশের বর্তমান জরুরী পরিস্থিতির মধ্যে এরূপ অসন্তোষের প্লাবন বহিলে অবস্থা কোন দিকে যাইবে সে বিষয়ে তাঁহাদের চেতনার উদয় প্রয়োজন।

সর্বত্র আকাশ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

তুমি চলে যাবে সব গোলাপের মতো,
সন্ততিবিহীন একা! কেবল বাতাস
কেঁপে উঠবে অকস্মাৎ বকুলের ডালে
গহন আঘাতে। দূরে পূবে ও পশ্চিমে
নিরুপায় দিক্‌হস্তী ক্ষিপ্ত পদপাতে
পিষ্ট ক'রে চলে যাবে, যেন দিনশেষে
সূর্যের রক্তিম রূপে অতর্কিতে বড়
ভয় পেল। ভয় পেল নীলিমার রঙে।

আমিও অমন ভয়ে হয়ত বা কোন
বাঁশরীর অন্তরালে ছুটে যাব, মূঢ়
তারাগুলি সমুৎসুক হিংসায়, কৌতুকে
অঙ্গুলি সংকেতে এই গুপ্ত পলায়ন
সহজে ধরায়ে দেবে। কোথায় লুকাব?
আকাশেরে ভয় পাই, সর্বত্র আকাশ!

ওরা

দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়

যেদিন আকাশে তারাপুঞ্জ ফোটে, অন্ধকার গুঁড়ি দিয়ে নামে—
কি জানি কোথার থেকে হিমেল বাতাস এসে এইখানে থামে:
কান পেতে শুনি ওরা কারা ডাকে—ফিসফাস আনাচে কানাচে।
অতন্দ্র আমার রক্তে পলাতক নাবিকের শোনিত কি নাচে?

কি যেন সঙ্গীত শুনি উচ্চকিত সাগরের তরঙ্গধারায়—
কি এক অতৃপ্তি নিয়ে বারে বারে কি যেন সে চায়;
ঝাউশাখে হতাশ্বাস রাত্রি-দিন, নির্ঝরের অশান্ত প্রবাহে
কিসের সঙ্গীত শুনি? তুমি নও,—কোনো এক ব্যাপ্ত চেতনায়
লীন হ'তে গিয়ে তবু হৃদয়ের রক্তাক্ত প্রবাহে
সঙ্গীতের সমে এসে বারে বারে ফিরি মূর্ছনায়।

তুমি আজ যেও না, যেও না, আজ হিমেল হাওয়ায়
ওদের গর্জন শুনি, ওরা সাগরের নির্ঝরের গর্জমান স্রোতে
পুরানো কালের সব দিনগুলি ইতিহাস হ'তে ফিরে পায়,—
কালপুরুষের সাথে মিতালি পাতায় ওরা বহুদিন হতে।
ওরা শুধু ঝাউশাখে হতাশ্বাস ফেলে যায় আমাদের গ্রামে—
যেদিন আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন অন্ধকার গুঁড়ি দিয়ে নামে।

একই দিনে একই পৃষ্ঠায় দুটি খবর পড়লাম কাগজে। দুটি সংবাদ এমন দু ধরণের অভিজ্ঞতা বিতরণ কর'ছে যাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একটু কণ্টকর হ'য়ে উঠল আমার কাছে।

প্রথম খবরটা এই রকম—

"দুঃসহ গরম। বেদম ভ্যাপসা গরম...। খেয়ে সুখ নাই, শুয়ে সুখ নাই, কথা বলতে ইচ্ছা হয় না, সারাদিন শুধু ঢক-ঢক ক'রে জল খাওয়া আর প'ড়ে প'ড়ে পচা গরমের বেধড়ক মার খাওয়া...!"

এই সংবাদটিকে যদি 'ভাজার কড়াই' বলা যায় তবে দ্বিতীয় সংবাদটিকে বলতে হয় 'জ্বলন্ত আগুন'। সেটার বক্তব্য এই—

"কর্পোরেশনের দূষিত পানীয় জল হইতে সহরবাসী সাবধান!...কর্পোরেশনের 'পানীয় জল' (কমা-র বন্ধনী জৈমিনির নয়!) হইতে সাবধান। পৌর-কর্তৃপক্ষ নানা হাঁক-ডাক দিয়া সগর্বে প্রচার করিয়া থাকেন যে, পলতা ও টালা পাম্পিং স্টেশান হইতে যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় তাহা সম্পূর্ণ বীজাণুমুক্ত। কিন্তু সম্প্রতি ষ্ট্যান্ডিং হেলথ কমিটিতে চীফ অ্যানালিস্ট এক রিপোর্ট দিয়া জনাইয়াছেন যে, সহরের কয়েকটি বড় বড় রেস্তোরাঁর, মিষ্টির দোকান এবং সোডা-লেমনেডের কারখানার জল দূষিত।... পাইপের ছিদ্র দিয়া পানীয় জলের অপচয় নিবারণের জন্য ভূগর্ভে তিনশতটি মিটার আছে।.....তিনশতের মধ্যে দুইশত আশীটি মিটার দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরিয়া অচল হইয়া পড়িয়া আছে।...পানীয় জলের পাইপে ছিদ্র থাকিলে অপরিস্রুত জল ও নর্দমার জল পাইপের মধ্যে প্রবেশ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে নাকি এইরূপ করিয়াছেও।..."

জলাতঙ্ক : জল ও কুকুরের কামড়ে

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে যাঁরা এটা পাঠ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ভাবতে শুরু করেছেন—জল পান না বিষপান? একদিকে দারুণ গরম এবং জল খাওয়ার প্রেরণা, আর অন্য দিকে জলের মধ্যে শত-সহস্র বীজাণুর উদ্যত আক্রমণ। এ দুয়ের মধ্যে শাটল কর্কের মতো ঠোক্কর খেতে খেতে আমরা যদি ভবখেলার বাউন্ডারী ছাড়িয়ে

যাই তাহলেও হয়তো আশ্চর্যের কিছু নেই।

ইতিমধ্যে অবশ্য কর্পোরেশন রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর ধরা শুরু করে দিয়েছে। উদ্দেশ্য অবশ্যই কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক আর সাক্ষাৎ মৃত্যুর আমাদের রক্ষা করা। কিন্তু কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক আর সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূতে বীজাণুযুক্ত জল দেখে জলাতঙ্কের মধ্যে কি খুব একটা পার্থক্য আছে!

• • •

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, সম্প্রতি আমরা কী রকম জন্তুর বিষয়ে কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছি? প্রথমে এল রেওয়ার শাদা বাঘ। তারপর গেল ফুলমালা পর্ব। তৃতীয় দফায় শোনা গেল শাদা বাঘের বউ আসার খবর। অতঃপর জলপাইগুড়ির কাদম্বিনী গণ্ডার, এবং তারই ফাঁক দেখা গেল বিলাতের এক চিড়িয়াখানায় একজোড়া শাদা বাঘের ছবি।

জন্তুর সমাদর অবশ্য আমাদের দেশে চিরকালই প্রচলিত আছে। গরু আমাদের কাছে সাক্ষ্যাৎ ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সঙ্গী কুকুরটিকে ছেড়ে স্বর্গে পর্যন্ত যেতে রাজি হননি। আর ভারতের মন্দিরগাত্রে হাতি ঘোড়ার মূর্তি যে কতো আছে তার সীমাপরিসীমা নেই।

অতএব জীবজন্তুর বিষয়ে আমাদের কৌতূহলকে নতুন বলা চলে না। কিন্তু বিপত্তি ঘটিয়েছে এইসব বড় খবরের পাশে ছোট্ট একটি খবর। এই খবরের আলোচ্য বিষয় হল ইঁদুর— হাতি-গণ্ডার-বাঘের তুলনায় যা তুচ্ছ বললেও বেশি বলা হয় না। কিন্তু এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইঁদুর আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে এমন একটি কাণ্ড করে চলেছে যার কাছে হাতি-ঘোড়াও হার মেনে যেতে পারে।

জন্তুপ্রেম : ধনাত্মক ও ঋণাত্মক

শোনা যাচ্ছে, ভারতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের শতকরা দশভাগই যায় এই ইঁদুর জাতির পেটে। একটি অন্নাভাবপীড়িত জাতির পক্ষে এই ধরনের অনুচ্চারিত ট্যাক্সের জোগান দেওয়া যে কী কঠিন কাজ তা বলাই বাহুল্য। কাজেই অন্য জন্তুদের ক্ষেত্রে যাই হোক, ইঁদুরের বেলায় দেখা যাচ্ছে আমাদের সম্পর্কটা কেবল ধনাত্মক নয় হয়তো কিছুটা ঋণাত্মকও। প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকার ডি, ডি, টি তৈরি করে ইঁদুরের কাছে আমাদের ঐ জাতীয়-ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত সকলের ঘরে যে দুবেলা হাঁড়ি চড়বে এমন ভরসা নেই।

• • •

শুনে আশ্বস্ত হওয়া গেল, কলকাতার তিনটি ওয়ার্ড থেকে খাটাল সরানোর যে ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল জুলাই মাসে, সে কাজ এখন বন্ধ করা হ'য়েছে।

খাটাল যে কী ভয়ঙ্কর স্থান, তা আশাকরি আপনাদের আর বিশদ ক'রে বুঝিয়ে বলতে হবে না। একটা খোলা জায়গায় কয়েকশ গরু-মোষ প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভর করে বসবাস করলে সেটা বৃষ্টির দিনে কী শোভা ধারণ করতে পারে তা বলাই বাহুল্য। এইসব অবোলা প্রাণীর যারা পরিচর্যা করে তাদের পায়ে নিশ্চয়ই লোহার মোজা পরানো থাকে, তাই তারা সেই আজানু বিস্তৃত গলিত পদার্থের মধ্যে নিঃশঙ্ক চিত্তে বিচরণ করতে পারে। কিন্তু অন্যদের তা দেখলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

আর সেইসঙ্গে তার সুবাস, এবং সযত্নপালিত মশা ও মাছির বংশবৃদ্ধি। কলকাতার স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের উদ্বেগের অবধি নেই। কতো পরিকল্পনা, কতো শলা-পরামর্শে আমরা উদ্ব্যস্ত হ'য়ে থাকি সারা বছর। বসন্ত মহামারী একটু থিতিয়ে পড়লেই সামনে এগিয়ে আসে কলেরা; কলেরা একটু কোণঠাসা হ'তে না হ'তেই শোনা যায় মশারা নাকি ডি, ডি, টি-প্রতিরোধী হ'য়ে উঠছে। আর মশারা যেখানে অমর, ম্যালেরিয়াও সেখানে নিশ্চয় সুযোগসন্ধানী হ'তে ত্রুটি করবে না। কিন্তু এসব দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান পথটাতেই পড়ল এখন তালাচাবি। মহামারীর মূর্ত প্রতিভূ খাটালগুলি থাকবে যথাস্থানেই।

খাটালে নৈব নৈব চ

আমরা শুনেছি, ঐ তিনটি ওয়ার্ডের গরু-মোষ যাতে আশ্রয় পায় সেজন্যে হরিণঘাটা ও কল্যাণীতে নতুন গোশালা নির্মিত হ'য়েছে। সেখানে অন্তত ৬০০০ গরু এবং ২২০০টি মোষকে আশ্রয় দেওয়া যেত সহজেই। তাছাড়া খাটাল সরানোতে পাছে আইনগত বাধা আসে সেজন্য '৬১ সালেই পাশ করা হ'য়েছিল গরু-মোষের লাইসেন্স নেওয়ার আইন। কিন্তু সুদীর্ঘ আড়াই বছরের মধ্যেও আলোচ্য খাটাল-কর্তারা আইন অনুসারে লাইসেন্স নেওয়ার দরকার বোধ করেননি। তারপর এখন যেই খাটাল সরানোর জন্যে লোকজন এসে উপস্থিত হ'য়েছে অমনি শুরু হল 'গেল গেল' আর্তনাদ। আর সঙ্গে সঙ্গেই থম্‌কে দাঁড়াল এতদিনের সমস্ত কিছু আয়োজন।

কিন্তু আমি বলি, এ ভালোই হ'য়েছে। আমরা যে এক আজন্মলালিত জড়তার পাঁকে নিমজ্জিত হ'য়ে আছি, তার মধ্যে বোধহয় খাটালের পরিবেশই সুশোভন, সুস্থ সবল নাগরিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা বিসদৃশ।
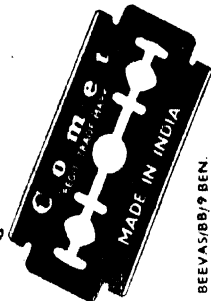
প্রতিদিনের ইতিহাস আর অসংখ্য মানুষের মিছিল দেখে চলেছি। বিচিত্র ঘটনা, বিচিত্রতর মানুষ দেখি এই মিছিলে। কখনও অতীত, কখনও ভবিষ্যতের ছবি দেখি সাংবাদিক জীবনের চলমান প্রদর্শনীতে। কিন্তু এমনভাবে অতীত বাংলার স্বর্ণযুগের এক অধ্যায়ে ডুব দিতে হবে, একথা কোনদিন ভাবিনি।

......মহারাজ লক্ষণ সেন। বাঙ্গালীর ইতিহাসের এক অধ্যায়ে তাঁর কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে চিরকালের জন্য। দ্বাদশ শতাব্দীর সেই স্মরণীয় দিনগুলিতে আজকের নবদ্বীপ সেদিনের নদীয়ায় রাজত্ব করতেন লক্ষণ সেন। লক্ষণ সেন নিজে বাঙ্গালী ছিলেন না; বাংলা দেশে এসেছিলেন কর্ণাটক থেকে। কিন্তু হৃদয়বত্তার জোরে বাংলার মাটিকে লক্ষণ সেন স্বর্গ জ্ঞান করতেন। তাইতো রাজস্ব আদায়ের চাইতে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের বিপ্লব আনতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এই রাজর্ষি লক্ষণ সেন। বাংলার হৃদয়-ঐশ্বর্যভরা মানুষকে তিনি পরমাত্মীয় জ্ঞানে কোলে তুলে নিয়ে দিয়েছিলেন নতুন সামাজিক মর্যাদা। কূপমণ্ডুক বাংলার ব্রাহ্মণ-সমাজ এই মহাপুরুষের মহাবিপ্লবকে ছুৎ-মার্গে পরিণত করে পরে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের পবিত্রধারাকে কলুষিত করলেও, লক্ষণ সেনের অক্ষয়-কীর্তি আজও সর্বজনস্বীকৃত। ......ঝড়ের বেগে ইতিহাসের মোড় ঘুরল। এলো ত্রয়োদশ শতাব্দী। সন-তারিখ ঠিক মনে নেই; তবে বারোশ' দুই কি তিন হবে। ......বাংলার দ্বারে হাতিয়ার নিয়ে আঘাত পড়ল পররাজ্যলোভীর। লক্ষণ সেন ছুটে গেলেন জ্যোতিষীর কাছে। যারা দিবারাত্রি গণনার পর জানা গেল, বাংলার হিন্দুরাজত্বের দিন আজ শেষ হতে চলেছে, মুসলমান আধিপত্যের যুগ সমাগত। কালবিলম্ব করলেন না লক্ষণ সেন। মাত্র ক'জন আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে নৌকায় চড়ে পাড়ি দিলেন পূবের দিকে। এক ফোঁটা রক্তপাত হলো না; মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাংলার গদী দখল করলেন বখতিয়ার খিলজি। বিধাতা পুরুষের রসিকতার এমন কোন চরম কাহিনী আর কোন দেশের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা জানি না। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন রসিকতার কাহিনী বার বার বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

শোনা যায় লক্ষণ সেন নদীয়া ত্যাগ করে নদীপথে হাজির হন ঢাকা বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনীর সন্নিকটবর্তী রামপাল গ্রামে। এর পরের কাহিনী ডক্টর রমেশ মজুমদার কি ডক্টর নীহার রায় জানলেও সাধারণ বাঙ্গালীর জানা নেই। শুনেছি অনেকে বিশ্বাস করেন, রামপালেই লক্ষণ সেনের মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিকরা লক্ষণ সেনের দুই পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের উল্লেখ করেছেন। পরে নেপালে আবিষ্কৃত এক সংস্কৃত পুঁথি থেকে লক্ষণ সেনের তৃতীয় পুত্র মধু সেনের খোঁজ পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে ইতিহাসের পাতায় লক্ষণ সেনের কাহিনী এখানেই শেষ।

......অন্ধকার রাত্রি; তারপর মুষলধারে বৃষ্টি। হেড্‌লাইট জ্বালিয়ে, ওয়াইপার চালিয়েও সামনে কিছু নজর আসে না। ঢুকে পড়লাম ডেপুটি মিনিষ্টার মনমোহনদার বাড়ী। এক কাপ দুধ আর গোটা কতক সন্দেশ খেয়ে আড্ডা দিতে দিতে হদিশ পেলাম যুবরাজ ললিত সেনের।

সেন্ট্রাল হলের আড্ডাখানায় ললিতসেনকে দেখেছি; কিন্তু পরিচয় ছিল না। টেলিফোন করে পরের দিন সকালেই হাজির হলাম ওয়েস্টার্ণ কোর্টে, যুবরাজের সুয়টে।

যুবরাজ ললিত সেনের আজকের পরিচয় পার্লামেন্টের মেম্বর বলে। আর এক ধাপ পিছিয়ে গেলে এঁর পরিচয় অধুনালুপ্ত দেশীয়রাজ্য সুকেতের অধিপতিরূপে। এর বেশী বোধকরি অনেকেই জানেন না। অথচ সুকেত রাজবংশ মহারাজ লক্ষণ সেনের বংশধর বলে দাবী করেন। ওয়েস্টার্ণ কোর্টের বারান্দায় বসে চায়ের পেয়ালা তুলতে গিয়েও নামিয়ে রাখলাম, স্ন্যাকস্ ছুলাম না। হাঁ করে চেয়ে রইলাম যুবরাজের দিকে। সুকেত রাজবংশের ইতিহাসের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন যুবরাজ ললিত সেন। ......লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা নাকি গঙ্গা নদী ধরে উত্তর ভারতের দিকে এগুতে থাকেন। এঁদের এই যাত্রাপথের কাহিনীর পরিচয় আজও বিদ্যমান। কুলুর কাছাকাছি আজও এক 'নির্মাণ্ড' তাম্রফলক দেখা যায়। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর প্রচলিত বাংলা ভাষায় এই তাম্রফলকে সেনবংশের এই দীর্ঘ পরিক্রমার কাহিনী লেখা আছে। পাঞ্জাব হিলস-এর পাদপ্রান্তেও এমন তাম্রফলক দেখা যায়। সিমলার কাছে সুকেত রাজ্যের রাজধানী সুরেন্দ্রনগরের রাজপ্রাসাদে আজও বহু প্রাচীন তালপাতার পুঁথি পাওয়া যাবে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলাতেই এই পুঁথিগুলি লেখা। যুবরাজ ললিত সেনের আলমারীতে বাংলা খোদাই করা বহু ঢাল-তলোয়ার ও নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র আজও মজুতে। যুবরাজের হেপাজতে বহু প্রাচীন 'সীল'ও রয়েছে। লক্ষণ সেন বা তাঁর সন্তানরা এই 'সীল' দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করাতেন বলে সুকেত রাজবংশের বিশ্বাস।

যুবরাজ আরো বলছিলেন। বলছিলেন, এঁদের গৃহদেবতা হচ্ছেন দশভূজা জগন্মাতা মহিষাসুরমর্দিনী, মা-দুর্গা। লক্ষণ সেনের বংশধরদের সহগামী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের বংশধররাই আজও নিত্যসেবা করে চলেছেন এই জগন্মাতা চিন্ময়ী দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর।

ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে ডক্টর হাচিন সেন ও রেভারেন্ড ফোগল অপরিচিত নন। এঁদের দুজনেই নাকি দীর্ঘ গবেষণার পর লিখেছেন, সুকেত রাজবংশ বাংলা থেকে পাঞ্জাব 'হিলস'-এ এসেছিলেন এবং এই বংশের সংগে লক্ষণ সেনের বংশের যোগাযোগ থাকার সংগত কারণ আছে বলে মনে করার বহু প্রমাণ আছে। সুকেত রাজ্যের বা পাঞ্জাবের প্রাচীনতম ডিষ্ট্রিক্‌ট গেজেটারেও এই ঐতিহাসিক ধারার উল্লেখ আছে।

নবদ্বীপের ওপারে জলংগীর ধারে শুকনো বল্লালদীঘি দেখেই বহুদিন পূর্বে বিস্মিত হয়ে অতীত বাংলার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম, তা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। বহুদিন পরে ওয়েস্টার্ণ কোর্টে যুবরাজ ললিত সেনের কাছে এসে ফিরে পেলাম অতীত স্মৃতি। মন পাড়ি দিল সেই সুদূর অতীত দিনের কাহিনীতে। পেষ্ট্রী-কেক-স্যান্ডউইচ-কাজুর প্লেট ভর্তিই পড়ে রইল। চায়ের পেয়ালা ছুঁতেও ভুলে গেলাম।

যুবরাজ বলছিলেন, জানেন ভাই, আমাদের পরিবারের 'মটো' হচ্ছে 'ব্রেক' বাট নট বেন্ড'। শুনেছি লক্ষণ সেনেরও এই 'মটো' ছিল। বাংলায় লেখা আছে এই 'মটো' আমাদের বাড়ী। ......একটু উদাস হলেন যুবরাজ। আবার বলেন, বাবা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই 'মটো' লেখা পবিত্র আধারটি নিজের হাতে রাখতেন। ......একটু সামলে নিলেন যুবরাজ। আমাদের বাড়ী গেলে দেখতে পাবেন মধ্যযুগীয় বাংলার শিল্পকলার অসংখ্য স্বাক্ষর।

যুবরাজ নিজে ইতিহাসের ছাত্র। আগ্রহের আতিশয্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপককে দিয়ে নিজেকে টেস্ট করিয়েছেন। পরীক্ষায় জানা গেছে, ললিত সেন অস্‌ট্রোলন্‌য়ডিক গ্রুপের মানুষ। ...... ইতিহাস বলে লক্ষণ সেনের বংশও এই গ্রুপেরই মানুষ।

ইতিহাসের ছাত্র আমি নই। ললিত সেনের বংশপরিচয় নিয়ে গবেষণা করা আমার বিদ্যার বাইরে। বাংলাদেশে গুণীব্যক্তির অভাব নেই। তাই বলি, নিজেদের ইতিহাসের জন্য বিদেশী ঐতিহাসিকদের মুখাপেক্ষী আর না হয়ে বোধকরি সুকেত রাজবংশের ইতিহাস উদ্ধারের দায়িত্ব আমাদের নেবার দিন সমাগত।

সাহিত্য জগৎ

।। বাঙলা নাটকের ভবিষ্যৎ ।।

অনেকেই হয়ত জানেন কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর 'ঐক্যের সন্ধানে ভারত' বিষয়ে যে নাট্য প্রতিযোগিতা আহবান করেছিলেন তার ফলাফল মারাত্মক শোচনীয় রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উৎকৃষ্ট নাটক খ‍ুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে বাঙলা ভাষার নাটক সম্পর্কে এখানে দু-একটি কথা বলতে চাই।

'বাঙলা নাটক'। আজকের দিনে কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আব-হাওয়াটা কেমন নাটকীয় হয়ে ওঠে। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত নাট্যজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন প্রবীণ পরিচালক অভিযোগ করেছিলেন, 'বাঙলা নাটকের জগৎ অন্ধকার'। অনেকদিন আগে, একশ' বছর হয়ে আরও কিছুকাল পেছিয়ে যাওয়ার পর বাঙলা নাটকের জন্মস্থান খ‍ুঁজে পাওয়া যাবে। তারপর সুদীর্ঘ ষাট সত্তর বছর উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাঙলা নাটকের গতি ছিল প্রাণবন্ত। ক্ষমতাশালী নাট্য-কারদের অবদানে বাঙলা নাটক সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। একমাত্র ঐ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের ওপরই বাঙলা নাটক আজও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অর্থাৎ আজ থেকে গত পনের কুড়ি বছরের মধ্যে হয়ত বহু অনুসন্ধানের পর কয়েকখানি সার্থক নাটক খ‍ুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এ সময়ের মধ্যে বহু উদ্দেশ্য-প্রধান নাটক জন-প্রিয়তা অর্জন করেছে। এই উদ্দেশ্য-প্রাধান্যের প্রাবল্যে সে সমস্ত নাটক অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত শিল্পধর্ম-বিচ্যুত হয়েছে। সে কারণে সার্থক শিল্পসৃষ্টি হিসাবে তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে নানাবিধ মতানৈক্যের ধূম্রজাল দেখা দিয়ে থাকে। তার থেকেও বড় কথা নাটক লিখে নাটককে জনপ্রিয় করবার দায়িত্ব অনেকেই নেননি। ক্ষমতাশালী প্রতিভাবান তরুণ নাট্যকাররা অনেক সময়েই এক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। মনে হয় নাটককে সাহিত্যমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন না। কিন্তু যদি কিছু করবার থাকে, তা একমাত্র তাঁরাই করতে পারেন। প্রবীণ নাট্যকার-দের কাছে আমাদের কিছু হয়ত আর পাওয়ার নেই। মঞ্চে সাফল্য-লাভই সার্থক নাটকের চূড়ান্ত বিচার নয়। এককালে যে নাটকগুলি অত্যন্ত সাফল্যের মধ্য দিয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল আজ তাদের অনেক-গুলি খ‍ুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বিদেশী সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে অনেক নাট্যমোদীই হয়ত বিস্ময় প্রকাশ করে থাকেন। বাঙলা ভাষার অন্যান্য বিভাগ যতখানি এগিয়ে এসেছে যুগের সঙ্গে তাল রেখে বাঙলা নাটককে ঠিক ততখানি সমভাবে এগিয়ে আসবার জন্য তরুণ নাট্যকারদের দায়িত্ব অপরিসীম।

গত ২৫শে আগষ্ট বৈদ্যবাটি যুবক সমিতির মহিলা সভ্যবৃন্দ মহিলা সাহিত্যিক শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সভানেত্রী শ্রীমতী সুরমা দেবী মানপত্র অর্পণ করছেন।

'ঐক্যের সন্ধানে ভারত' পর্যায়ে সর্ব-ভারতীয় নাটক প্রতিযোগিতায় বাঙলা বিভাগের সাফল্য মর্মান্তিকভাবে করুণ। হয়ত বাঙলার প্রবীণ বা প্রতিভাবান তরুণ নাট্যকাররা ঐ প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করেননি; করলেও উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে পারেননি।

বাঙলা নাটককে জনপ্রিয় করবার জন্য তরুণ প্রতিভাবান নাট্যকারদের দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। নাটক পড়ার অভ্যাস দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জাগাতে পারলে বাঙলা নাটকের ভবিষ্যৎ নিয়ে হয়ত ভবিষ্যতে আর কোন চিন্তার প্রয়োজন হবে না। অনেকেই একথা সত্য ব'লে স্বীকার করবেন, বাঙলার ভাল নাটকের যেমন অভাব তেমনি বাঙালী পাঠকের নাটক পড়ার অভ্যাস নেই। নাটক যেমন চোখে দেখার জিনিস তেমনি তা পড়ে দেখবারও বটে। একথা স্মরণ রাখবার প্রয়োজন আছে।

।। আশাপূর্ণা দেবী সম্বর্ধিত ।।

বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট মহিলা কথাশিল্পী শ্রীআশাপূর্ণা দেবীকে বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির মহিলা বিভাগের সভ্যগণ সম্বর্ধনা জানান গত ২৫শে আগষ্ট। সংবর্ধ-নার উত্তরে মহিলা সাহিত্যিক তাঁর ভাষণে বলেন : "আজ মহিলাগণ বাহিরকে হাতের মুঠোর মধ্যে গ্রহণ করলেও তাঁরা যেন ঘরকে না ভুলে যান। পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে তাঁরা যেন কাজের যন্ত্রে পরিণত হয়ে মাধুর্য, শান্তি ও নারীর আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে না বসেন। নারীর কর্তব্যই হল ঘর বাঁধা ও ঘরকে শ্রী-মন্ডিত করে তোলা। ভারত বহু বিষয়ে পিছনে পড়ে থাকলেও ভারত-বর্ষের আদর্শ ও তার সনাতন ধর্ম বিশ্বের শ্রদ্ধা জাগায় এবং তা চির অম্লান।" তিনি আরও বলেন যে সমগ্র বাঙালী সাহিত্যিক সমাজের পক্ষ থেকে তিনি এই মানপত্র গ্রহণ করছেন।

শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি-স্বরূপ এই সম্বর্ধনালাভে আমরা গৌরববোধ করি। তাঁর রচনাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্বীয় নারী-স্বভাবকে সুপ্ত রেখে একজন মানুষ হিসাবে জীবন চিত্রণে তৎপরতা। পূর্ব-বর্তী মহিলা সাহিত্যিকদের এই গুণের অভাব ঘটায় অতি অল্পকালেই তাঁরা প্রায়-বিস্মৃত। তাছাড়া মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে আশাপূর্ণা দেবী নিজের দৃষ্টিশক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনা এবং নারীর অবমাননার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর সত্যের অনুসন্ধানে দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত করে দিয়েছেন।

।। পরলোকে কানাড়ী কবি ।।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর কানাড়ী কবি মনজেশ্বর গোবিন্দ পাই ম্যাঙ্গালোরে পরলোকগমন করেছেন।

হেন্ডার্সন ব্রুকস রিপোর্ট
পার্বত্য যুদ্ধ নীতি
কূটনীতি
রাজনীতি
নেফা
লাদাক
নতুন 'ক্রুসেড'
আয়ুব আর
মাওকে
একবার
পেলে...
৬.৯.৬৩

বাঘে মানুষে

সমর বসু

সারা পৃথিবীর প্রায় সব জাতির পুরাণে ও উপকথা-রূপকথায় মানুষের সংগে বন্য জন্তুর যুদ্ধের বিবরণ আছে। আর সেসব যুদ্ধে প্রায়শঃ দেখা যায়, কায়িক শক্তিতে হীনতর হওয়া সত্ত্বেও, মানুষকেই জয়ী করা হয়েছে। তার কারণ, প্রথম অবস্থায় মানুষকে তার প্রয়োজনের তাগিদেই বন্য জন্তুর সংস্পর্শে যেতে হত, এবং সে উপলক্ষে তাদের সংঘর্ষও অনিবার্য হয়ে দাঁড়াত। এসব যুদ্ধের ফল যাই হোক না কেন, মানুষ কখনো দমিত হয় নি, দমিত হলে তার চলতও না। তাই, মানুষকে বিশ্বাস-

অবিশ্বাস কিংবা সম্ভব-অসম্ভব নানাভাবে তার জয়ের কাহিনী প্রচার করতে হয়েছিল। সেই সব কাহিনী শুনে পরবর্তী মানুষ সাহস সঞ্চয় করেছে।

কিন্তু একটা দুর্ধর্ষ হিংস্র বাঘ বা সিংহকে সত্যই কি কোনো মানুষ গায়ের জোরে টুঁটি চেপে মারতে পারে? সম্ভবতঃ সেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ভেবেই বুদ্ধিমান কাহিনীকার ভীমসেন কিংবা হারকিউলিসকে অলোকিক শক্তিধররূপে অংকিত করেছিলেন। তাতে মনে হয়, মানব জাতির স্বার্থে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা সেসব গল্প রচনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে সাধারণ মানুষ সেই গল্পগুলিকে সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করেছে এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে আরো রসাল ভাষায় নতুন নতুন গল্পকে যথার্থ ঘটনা বলে চালান হয়েছে। শেষোক্ত গল্পগুলির পশ্চাতে বুদ্ধিমত্তা না থাকলেও অজ্ঞতা ও অবিবেচনা আছে প্রচুর পরিমাণে।

সত্য বটে, রোমান গ্লাদিয়েতরগণ বাঘ, সিংহ, ভল্লুক বা অনুরূপ ভয়াবহ হিংস্র জন্তুর সংগে লড়াই করত এবং অধিকাংশ সময়ে তাদের হাতে সেসব জন্তুর মৃত্যু ঘটত। স্পেনের বীরগণও তাদের জাতীয় উৎসবে দুর্মদ বলীবর্দের সংগে যুদ্ধ করত। কিন্তু সেসব যুদ্ধ কি গায়ের জোরে হত? ইতিহাস তা বলে না। আমাদের দেশে প্রাচীন ও মধ্য যুগে দুই জানোয়ারের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে মজা দেখা হত। সময়ে সময়ে মানুষও জন্তুর সংগে লড়াইয়ে নেমেছে বটে, কিন্তু কখনো নিরস্ত্র হয়ে নয়। তথাপি, দেশে দেশে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে, আজও কারো কারো বিশ্বাস, মানুষ গায়ের জোরে বাঘ-সিংহকে পরাজিত করতে পারে। এ বিশ্বাসের ভিত্তি হয়তো বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত সেই সব গল্পভিত্তিক ঘটনা। শক্তিচর্চার একজন উৎসাহী হিসাবে সে সব ঘটনার সত্যাসত্য বা সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সামান্য সামান্য আলোচনা করব।

প্রথম, জাহাংগীরের প্রসিদ্ধ 'আত্মস্মৃতি' দিয়ে শুরু করা যাক্। তাঁর বর্ণিত এক কাহিনীতে আছে:

আকবরের প্রিয় পার্শ্বচর মোসাহেব খাঁ উজ্‌বেকী ছিলেন এক অত্যন্ত বলবান পুরুষ। লাহোরের কাছাকাছি এক জংগলে শিকারের সময় হঠাৎ তিনটি সিংহী একযোগে হাতীর হাওদায় উপবিষ্ট আকবরকে আক্রমণ করে। একটি সিংহী উরুতে থাবা মেরে আকবরকে নিচে ফেলে দেয়। মোসাহেব খাঁ তখন ছুটে এসে সরাসরি সিংহীটার মুখের মধ্যে ছোরা চালিয়ে দেন। সংগিনীর দুরবস্থা দেখে বাকি সিংহী দুটো তৎক্ষণাৎ হাতীকে ছেড়ে দিয়ে দুপাশ থেকে যুগপৎ মোসেহেবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল! ভাগ্যক্রমে তাঁর দুটি হাত সিংহীদুটোর ঘাড়ের ওপর পড়ল। সেই বিপজ্জনক মুহূর্তে অস্ত্র চালনার সুযোগ না থাকায় অগত্যা তাঁকে দুই হাতে তাদের মাথাদুটিকে পরস্পরের সংগে ঠোকাঠুকি করতে হল। সেই ঠোকাঠুকিতে তাদের নাক মুখ দিয়ে রক্তপাতের ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মৃত্যু হয়।

গল্পবাজিতে বাংলাদেশও নিশ্চয়ই পিছিয়ে নেই; বরং তা আরো জোরালো আরো রসাল,—জাহাংগীরের গল্পকে তা নিশ্চিতভাবে পিছনে ফেলার দাবী রাখে। একটি গল্পের উল্লেখ করব। এই গল্পের পটভূমি মলুটি গ্রাম।

গ্রামটি বীরভূম জেলায় মল্লারপুর ষ্টেশন থেকে মাইল আট পশ্চিমে। এ গ্রামের মুখোপাধ্যায়রা এক সময়ে রাজবংশ বলে খ্যাত ছিল। একদা এই বংশে হরচন্দ্র নামে এক বলবান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। এ যাবৎ অন্তত খান দুই পুস্তকে তাঁর 'জীবন্ত বাঘ' ধরার কাহিনী ছাপা হয়েছে। তাতে দেখা যায়ঃ—

হরচন্দ্রের মায়ের একটি দুগ্ধবতী মোষ ছিল। একদিন মোষটাকে বাঘে নিয়ে যায়। মনের দুঃখে মা অন্নজল ছাড়লেন। বললেন, 'নিজের হাতে বাঘটাকে কেটে রক্ত না দেখা পর্যন্ত অন্নজল স্পর্শ করব না।' মাতৃভক্ত হরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তীর-ধনুক নিয়ে বনে গেলেন এবং কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরেই বাঘের সংগে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল। বাঘ তখন মোষের ওপর বসে তার রক্ত পান করছিল। রাগের মাথায় হরচন্দ্র সংগে সংগে তীর-ধনুক বাগিয়ে ধরলেন, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁর মায়ের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হল। তাই তাকে নিজের আওতায় আনার জন্য বাঘকে লক্ষ্য করে তিনি একটি লঘু তীর ছাড়লেন। বাঘটাও চটে গিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর যায় কোথায়? সেই দণ্ডেই এক হাতে বাঘের গলা এবং অন্য হাতে তার কোমর ধরে তাকে চ্যাংদোলা করে বাড়ী নিয়ে এলেন! তাঁর কাণ্ড দেখে সবাই অবাক্‌। কিন্তু তিনি নিজে রইলেন নির্বিকার। মাকে বললেন, 'মা, এই নাও তোমার জ্যান্ত বাঘ!' মা পুত্রের কীর্তিতে আহ্লাদে আটখানা! বললেন, 'তুই, বাছা, বাঘটাকে একটু তুলে ধর, আমি ওর গলাটাকে কেটে ফেলি।' এই বলেই তিনি তীক্ষ্ম অস্ত্র দিয়ে বাঘের গলাটাকে কেটে ফেলে রক্ত দেখলেন, এবং শেষে মহানন্দে অন্নজল গ্রহণ করলেন।

এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, যে দেশে যত বেশি অশিক্ষা-কুশিক্ষা এবং যে সমাজে যত বেশি দায়িত্বজ্ঞানহীন অলস লোকের সংখ্যা, সেই দেশে এবং সেই সমাজেই অলৌকিক কাহিনীর প্রাধান্যও তত বেশি হতে বাধ্য। আমাদের দেশে, তাই, অধ্যাত্মবাদকে কেন্দ্র করে অতি অদ্ভুত ও উদ্ভট কাহিনীর সৃষ্টি হয়। এবং এইজন্যই সাধু-সন্ন্যাসী বা ফকির-দরবেশরা পারে না, এমন কাজ আছে বলে আমরা বুঝি না। এবং খড়ম পায়ে জলের ওপর হাঁটা, প্রাণায়ামের সময় আসনাবদ্ধ অবস্থায় শূন্যে ওঠা, এক ব্যক্তির একই সময়ে দূরবর্তী বিভিন্ন স্থানে অবস্থান, তরবারির আঘাতে দেহ আহত না হওয়া কিংবা কামানের গোলাকে টপাটপ গিলে ফেলার কাহিনীকে অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় বলে গ্রহণ করি। এসব কাহিনী যদি সত্যি হয়, তবে কেন হিংস্রতম বাঘকেই বা মানুষ যখন-তখন হাঁস-মুরগীর মতো গর্দান ধরে আনতে পারবে না? বসুন্ধরার বুকে যদি যুক্তিবাদী মানুষ থাকে, তবে অন্ধ অজ্ঞান গুলিখোরের থাকতে বাধা কি? কিন্তু তাই বলে কি জাহাঙ্গীরের বিবরণটাও মিথ্যা? তামাম হিন্দুস্থানের এক সময়ে যিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, এবং যাঁর 'আত্মস্মৃতি'র অংশ-বিশেষ পরবর্তী লেখকরা যত্নের সংগে প্রামাণিক তথ্যরূপে নিজ নিজ গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন, তা কি মিথ্যা হতে পারে?

হয়তো পারে না, তবু প্রশ্ন তোলা যায়, তিনি কি মোসাহেবের সিংহ মারার ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন? না, তা করেন নি।

হয়তো মোসাহেব খাঁ যথার্থ সাহসী বলবান পুরুষ ছিলেন। তাই, আকবর তাকে 'শের ফরাজ খাঁ' উপাধিসহ তিন-হাজারী আমিরের পদে উন্নীত করে-ছিলেন। কিন্তু মদ্যপ জাহাঙ্গীর মোসাহেবের শক্তি ও কীর্তি সম্পর্কে এতই অন্ধ বিশ্বাসী ছিলেন যে, পিতার মৃত্যুর পরে নিজে গদীয়ান হয়ে তাঁকে পাঁচ-হাজারী আমির করার পরে গুজরাটেরও শাসনকর্তা বানিয়েছিলেন। এই অতি বিশ্বাসের পরিণামেই, মনে হয়, লোকমুখে কিংবা স্বয়ং মোসাহেবের কাছে অতিরঞ্জিত গল্প শুনে তিনি তার অসম্ভাব্যতার কথা ভাবতে পারেন নি। অস্বীকার করা যায় না যে, ক্ষমতাগর্বিত লোক চিরদিন মোসাহেবদের প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। তা ছাড়া, সে যুগের মর্জি-বান রাজা-বাদশাহদের কথা ও কাজের সমালোচনা করার সাহস ক'জনারই বা হত? কেনই বা হবে? তাই, স্তাবক বা মোসাহেবদের দ্বারা তাদের অযৌক্তিক কথা ও কাজ সমর্থন পেয়ে যেত এবং বহু সময়ে এর জন্য পুরস্কারও মিলত। তাতে মনে হয়, মোসাহেব খাঁ হয়তো যথার্থ 'মোসাহেব'ও ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই, তিনটি সিংহীর একযোগে আকবরকে আক্রমণ করার কি কারণ ছিল? বাঘ-সিংহের মতো দুর্দান্ত জানোয়ারও কি তবে পাঁঠা-ছাগলের মতো দল বেঁধে চলে? অভিজ্ঞ শিকারীরা তার জবাব দিন।

...তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল

আরো প্রশ্ন এই যে, মোসাহেব কর্তৃক একটিকে আহত হতে দেখে বাকি দুটি সিংহীকে আক্রমণের বুদ্ধি দিল কে? তাও আবার দুদিক থেকে অভি-নব কায়দায়? তারপর, মোসাহেবের বাহুবন্ধ হয়েও কেন তারা তাদের মারা-

তবে দাঁত নখরকে কাজে লাগাল না? কিংবা দাঁত নখর ব্যবহার করেও কেন তারা তার দেহের ক্ষতি করতে পারল না? তবে কি মোসাহেবের দেহটাও গাছ-পাথরের উপাদানে গঠিত ছিল? কিংবা এক বোনকে বিপন্ন দেখে বাকি দুটি কি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে মরতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল? হয়তো এসব প্রশ্ন তোলা আজ একেবারেই নিরর্থক। কেননা, জাহাঙ্গীর বহুকাল মৃত; হয়তো তাঁর ভূতও আজ আর বেঁচে নেই। অতএব, পর্যালোচনাশীল পাঠকদেরই এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

তবে হ্যাঁ, এমন লোক আজও অনেক দেখা যায়, যাঁরা একসঙ্গে তিনটি বাঘ বা সিংহের সঙ্গে লড়াই করাটাকে সম্ভব বিবেচনা না করলেও একটির সঙ্গে সম্ভব মনে করেন। তাঁদের দৃঢ় ধারণা, মানুষ ডন-কসরৎ করে গায়ের জোরে বাঘ-সিংহকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং প্রয়োজন হলে গায়ের জোরে তাদের সার্কাসের তাঁবুতে বহু লোকের সামনে প্রত্যহ ধোবাকাচাও করতে পারে। এ ধারণার সমর্থনে তাঁরা শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা ইউজেন সাণ্ডোকে টেনে আনেন। অতএব, বাধ্য হয়েই আমাদের একবার শ্যামাকান্ত ও সাণ্ডোর বাঘ এবং সিংহের লড়াই দেখতে হবে। কিন্তু তার আগে বাঘ কি বস্তু, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ বোধ হওয়া দরকার।

আমাদের দেশে অনেক শিকারী আছেন,—তাঁরা কথায় কথায় বাঘ মেরে ফেলেন। তাঁদের গুলী ছাড়তে যেমন দেরি হয় না, তেমনি সে গুলী খেয়ে বাঘের মরতেও সবুর সয় না। আমি এখানে অবশ্যই সেসব বাঘের কথা বলছি না; আমি বলছি সেসব বাঘের কথা যাদের যোজনবিস্তৃত অরণ্যেও ক্রোশের পর ক্রোশ পরিক্রমা করে কদাচিৎ দেখা মেলে। সেসব বাঘের শক্তি সাহস তেজ ও দুর্দমনীয়তার পরিচয় দেবার আগে সামান্য একটি পোষা বিড়ালের দৃষ্টান্ত দিই।

সামান্য এক পোষা বিড়াল লেজ-সমেত যার দৈর্ঘ্য দু ফুটের বেশি নয়, ওজনও তার কিছুতেই ৮ পাউণ্ড ছাড়ায় না। সে হিংস্র নয়; সর্বদা মানুষের সংস্পর্শে থেকে সে হয় শান্ত নিরীহ। ক্ষুধা পেলে সে মিউ মিউ করে মানুষের পায়ে পায়ে ঘোরে, নয়তো চোখ বুজে বসে থেকে মানুষের কৃপা ভিক্ষা করে। মাঝে মাঝে হয়তো সে চুরি করেও খায়,—ব্যস, এই পর্যন্ত। অথচ, এ হেন নিরীহ বিড়ালটিকে পলায়নের পথ বন্ধ করে মারতে গেলে সে প্রচণ্ড মূর্তিতে পাল্টা আক্রমণ করতে ছাড়ে না। সে চেহারা দেখে মানুষ ভয় পায়। দ্বিগুণ বা তিনগুণ চেহারার কুকুরের বিরুদ্ধেও সে অমিতবিক্রমে রুখে দাঁড়ায়। এমন কি, তার তীক্ষ্ণ ও তীব্র দাঁত এবং নখরাঘাতে কুকুরকেও হটে মানতে হয়। অথচ কুকুরও দাঁত ও নখরযুক্ত পশু। এরূপ একটি ক্ষিপ্ত বিড়ালকে কি একজন শক্তিমান যুবকের পক্ষেও রিক্তহস্তে ধরা সহজ? মানুষের গায়ের জোর বিড়ালের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও সে জোর কি এরূপ ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসে?

সামান্য পোষা বিড়ালটার 'যুদ্ধং দেহি' কীর্তি ও চরিত্র যদি এই, তা হলে তদপেক্ষা সবলতর এবং হিংস্রতর বন্য বিড়াল (Jungle cats) কি হতে পারে? তারপরে জাতি, দেহ-গঠন, দেহ-পরিধি, স্বভাব-চরিত্র, শক্তি, দুর্দমনীয়তা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ভীষণ-তর জানোয়ার নেকড়ে, বাঘডাশ, কুত্তা-বাঘ, পুমা, জাগুয়ার, হায়না ইত্যাদির কথা কল্পনা করা যাক। এরা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ জন্তু; শক্তিও এদের কম নয়। তথাপি এদের কেউ যথার্থ বাঘ নয়। জানোয়ার হিসাবে এরা যতই দুর্দান্ত হোক, মোহনা দেখে যেমন সমুদ্রের কল্পনা করা যায় না, এদের দেখেও তেমনি বাঘের চরিত্র বিচার করা যায় না। দধির সাধ ঘোলে মিটানর মতো গ্রামের জঙ্গলে কুত্তাবাঘ বা বাঘডাশ মেরে অনেকে বাঘ মারার বড়াই করেন বটে, কিন্তু বাঘ সত্য সত্যই অত সুলভ বস্তু নয়,—বাঘ মারাটাও যেমন-তেমন শিরদাঁড়ার কর্ম নয়।

বাঘের মধ্যে বহু জাত আছে বটে, তবে তার মধ্যে প্যান্থার, ব্ল্যাক প্যান্থার, চিতা বা লেপার্ড, গুলবাঘ, ডোরদার প্রধান কিংবা উল্লেখযোগ্য। বাঘ যে জাতেরই হোক, কিংবা চেহারা তার যত ছোট হোক, চাল-চলন, তেজ-বিক্রম এবং হিংস্রতায় সে একেবারেই ভিন্ন শ্রেণীর। তার চেহারার বৈচিত্র্য, ক্ষিপ্রতা, চারিত্রিক কুটিলতা, শক্তি ও নৃশংসতা অন্য সকল জানোয়ারের চোখেও ভীতিপ্রদ। দৈহিক পরিধিতে হাতী বাঘের যত গুণ হোক, তার কায়িক শক্তিও যত বেশি হোক, তবু বাঘকে তার দস্তুর মতো ভয় করে চলতে হয়। অমিতবলের অধিকারী বিশাল দাঁত ও শুণ্ডাগ্রযুক্ত বন্য হাতীর অবস্থা যখন এই, তখন বাঘের সঙ্গে মানুষের লড়াইর প্রশ্ন তোলা বাতুলতা মাত্র। কুকুর, বিড়াল তবু ছুটতে পারে, মানুষ তাও পারে না। তাই বাঘ যখন কোনো কারণে দুর্বল, রুগ্ন বা পঙ্গু হয়, কিংবা বৃদ্ধ হয়ে কর্মশক্তি হারায়, তখন লোকালয়ের নিকটবর্তী এসে নরভুক (Man Eater) হয়ে দাঁড়ায়। হৃতশক্তি এই বাঘগুলিকে মারতে গিয়ে বড় বড় শিকারীরাও দিনের পর দিন হিমসিম খেয়ে যান, সময়ে তাদের হাতে শিকারীর মৃত্যুও ঘটে। তাদের দৌরাত্ম্যে বহু সময়ে এক-একটা জনপদ ছারখার হয়েও যায়। বলতে গেলে, মানুষই তার খাদ্যবস্তুর মধ্যে দুর্বলতম জীব।

আমরা সাধারণতঃ বাঘ দেখি বই-পত্রিকায়, ছায়াছবির পর্দায়; নয়তো বা পশুশালায় আর সার্কাস আসরে। এই সব পিঞ্জরাবদ্ধ, অর্ধভুক্ত দুর্বল অসহায় বাঘ দেখে কি স্বাধীন মুক্ত জংলী বাঘের কল্পনা করা যায়? আমরা যখন পশুশালায় বাঘকে ভেংচি দেখাই, ঢিল ছুঁড়ি, সে হয়তো ফিরেও তাকায় না। সে জানে, বন্দী-দশায় তার প্রতাপ প্রকাশ অর্থহীন। কিন্তু জংলী বাঘের গতিবিধি যিনি দেখেছেন, তার শিকার ধরার অমোঘ কৌশল যার নজরে পড়েছে, তিনিই জানেন, সে বিবরণ দেবার শক্তি বা ভাষা তাঁর নেই। কণ্টকিত দেহ-মনে সে দৃশ্য অনুভব করা ছাড়া তার যথার্থ বিবরণ দেওয়া সম্ভবও নয়।

কেননা, নিরাপদ উচ্চতার ডালে বা মাচায় বসে বাঘকে শুধু চোখে দেখে বহু সময়ে নতুন শিকারীর হাত থেকে রাইফেল খসে পড়ার কথা শোনা যায়। ক্ষিপ্ত বাঘের মেদিনীকম্পিত গর্জনে স্নায়ুদুর্বল ব্যক্তি সংজ্ঞা হারিয়েছে, এমন ঘটনাও দুর্লভ নয়। পুরো দুই মাইল দূরে থেকে ক্ষিপ্ত বাঘের ভয়াবহ গর্জন শুনে নতুন শ্রোতার মনে ত্রাস জেগেছে, তাও আমার জানা ঘটনা। বাঘ কত যে অপরিসীম জীবনীশক্তির অধিকারী, এসব কথায় তার কিছু কিছু আভাস মিললেও যথার্থ ধারণা আসে না। কেননা, বিগত শতাব্দীর একজন প্রখ্যাতনামা বাঙালী শিকারী তাঁর 'শিকার কাহিনী'তে স্বীকার করেছিলেন যে, একবার হাতী ও হাতীর পৃষ্ঠোপবিষ্ট শিকারী পরিবেষ্টিত এক বিরাট বাঘের শুধু চোখের দিকে চেয়ে হাতীর পিঠে বসেও তাকে গুলী করা দূরে থাক, রাইফেলটা তুলতেও তাঁর সাহস হয়নি।

এ তো হল বাঘের দৃশ্যগত পরিচয়। তার পরেই আসে তার দৈহিক বৈশিষ্ট্য, বিস্ময়জনক ক্ষিপ্রতা, ক্লান্তিহীন দেহ-পটুতা, অপরিমিত শক্তি, দুর্জয় সাহস ও বীভৎস হিংস্রতার কথা। সব মিলিয়ে বাঘ অধিকাংশ স্থলচর জীবের কাছে এক প্রচণ্ডতম বিভীষিকা।

সচরাচর বাঘের দৈর্ঘ্য বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে তার লেজসহ পূর্ণ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ মূলে বাঘ ঐ মাপের কম-বেশি দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র। তার মানে, ১০ ফুট বাঘের প্রসারিত মস্তকের নাসিকাগ্র থেকে লেজের মূল পর্যন্ত ছয় ফুটের সামান্য বেশি হবে। আর এই মাপের বাঘের গড়-পড়তা ওজন প্রায় ৪০০ পাউন্ড। তার পেশীগুলি নরম, অথচ রবারের মতো দোলায়মান এবং স্থিতিস্থাপক। দেহটা কোমল মখমলের মতো, অথচ হাড়গুলি পুষ্ট এবং বজ্রের মতো শক্ত। হাল্কা সবুজ রংয়ের চোখ দুটিকে দেখায় কাচের মতো চকচকে, সে চোখের তীব্রতা অনন্যসাধারণ। নিবিড় অন্ধকারেও সামান্যতম আলোর প্রতিফলনে তা জ্বল-জ্বল করে, ঘন অন্ধকারেও তার চলাফেরায় বা শিকার ধরতে বাধা হয় না।

সমস্ত রকম বাঘের মধ্যে আকৃতি ও হিংস্রতায় সম্ভবতঃ 'রয়েল বেঙ্গল' সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ। অবশ্য হিংস্রতা ও ধূর্ততায় লেপার্ডের সঙ্গে কারোই তুলনা হবে না। তবে 'রয়েল বেঙ্গল' লম্বায় ১৩।১৪ ফুট পর্যন্ত হতে পারে, ওজনও তার ৭০০ পাউন্ড হওয়া সম্ভব। এমন ভারি দেহ নিয়েও বাঘ রাতারাতি সাধারণভাবে ১৫।২০ মাইল পরিভ্রমণ করতে বা ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। তার অর্থ, তার গতিবেগ একটা ট্রেনের প্রায় সমান। তা ছাড়া, বাঘ যখন-তখন ৭।৮ ফুট উঁচুতে কিংবা ১৪।১৫ ফুট জমি লাফাতে পারে যদিও লাফের ক্ষেত্রে সেটাই তার শেষ সীমা নয়।

বস্তুতঃ লাফের ক্ষেত্রে বাঘের সর্বশেষ সীমা কি, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সে পরীক্ষা আজো পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে বলে শুনিনি। বাঘের সে ক্ষমতা সম্পর্কে বড় বড় শিকারীরাও কিছু বলতে পারেন না। কারণ, বাঘ স্বভাবতঃ আত্মগোপন করে ধীরে ধীরে যথাসম্ভব লক্ষ্যের নিকটবর্তী হয়, এবং তারপরেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতএব, আক্রমণের সময় তার বড় লাফের প্রয়োজন হয় না। আবার ভয় পেয়ে পলায়নের সময়ও বাঘের চারিত্রিক বিশেষত্ব এই যে, সে কখনো শিয়াল কুকুরের মতো ছুটে পালায় না; কিংবা শুওরের মতো লাফিয়ে লাফিয়েও ছোটে না। ঝাড়ু বা হাকোয়ার মুখেও সে চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে ধীরে ধীরে থেমে থেমে কখনো বা ঝড়ের বেগে বিদ্যুতের ভঙ্গিতে এপাশে-সেপাশে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে চলে। গন্তব্য পথে খানা-ডোবা বা নালা পড়লে হয়তো তাকে লাফাতে হয়; কিন্তু সম্ভব পক্ষে সে খানা-ডোবাকেও এড়িয়ে চলে। কাজেই, বাঘের লাফের চূড়ান্ত মাপ বলা কঠিন। এমতাবস্থায় এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত হিসাব বা ধারণাটা উপস্থিত করতে বাধা নেই।

দু ফুট বিড়ালকে খাওয়ার লোভে আমি চার ফুট উঁচু তাকে বা খাড়াই দেয়ালে লাফিয়ে উঠতে দেখেছি; আর, ভয় পেয়ে পলায়নের পথে তাকে সাত ফুট নালা পার হতে দেখেছি। তাতে বোঝা যায়, বিড়াল উচ্চতায় তার দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ এবং লম্বায় সাড়ে তিন গুণ লাফাতে পারে। দৈহিক পটুতার ক্ষেত্রে বাঘ তুলনামূলকভাবে ঠিক বিড়ালের সমকক্ষ নয়। এই হিসাবে, আমার মনে হয়, ১০ ফুট বাঘ উচ্চতায় তার দেড় গুণ অর্থাৎ ১৫ ফুট এবং লম্বায় আড়াই গুণ বা ২৫ ফুট লাফাতে পারে।

বিড়ালের মতো বাঘও যেকোনো অবস্থা থেকে, এমন কি হাত-পা ছড়িয়ে নিদ্রিতাবস্থা থেকেও এক মুহূর্তে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠতে পারে। বিড়ালের মতোই বাঘ তার বিরাট দেহভার নিয়েও বনপথে এত লঘু পদক্ষেপে চলতে পারে যে, বহু সময়ে সতর্ক শিকারীরা পর্যন্ত ১৫।২০ ফুট দূরত্বে তার উপস্থিতি বুঝতে পারেন না। বাঘের ঘ্রাণশক্তি তত প্রখর নয় বটে, কিন্তু তার চোখ ও কান অতিমাত্রায় সজাগ। গাছ থেকে একটা পাতা পড়লেও তার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়, জঙ্গলের বিবিধ শব্দের মধ্য থেকেও সে তার নিজের প্রয়োজন উপযোগী শব্দ বেছে নিয়ে সেদিকেই এগিয়ে যায়।

স্থলচর প্রাণীর মধ্যে ওজনের নিরিখে বানর জাতীয় জীব এবং সিংহ ছাড়া অন্য কোনো জন্তুকে বাঘের চেয়ে বলশালী মনে করা যায় না। বানর জাতীয় প্রাণীর মধ্যেও শুধু গরিলা ব্যতীত আর কাকেও বাঘ পরোয়া করে না। এজন্যই নিজের ওজনের চেয়েও ভারি ভারি জানোয়ারের ঘাড় কামড়ে ধরে বাঘ অতি সহজে সিকি মাইল বা তারো বেশি দূরে চলে যেতে পারে। এমন কি, শিকার মুখে নিয়েই পাহাড়-পর্বতের চড়াই-উৎরাই, ঝোপ-জঙ্গল, ছোট ছোট খানা-ডোবা দিব্যি সহজে পার হয়ে যায়। শিকার নিয়ে বাঘ ৭।৮ ফুট পাঁচিল টপ্‌কে গেছে কিংবা ১২।১৪ ফুট নালা পেরিয়েছে, তেমন নজিরও আছে। কিন্তু বাঘ শিকারকে পিঠে ফেলে নিয়ে ছুটে পালায়, এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। বাঘকে কুলী মনে করা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। সাধারণ বুদ্ধি দিয়েও বোঝা যায়, কামড়ে ধরা জন্তুটাকে পিঠে বা কাঁধে ফেলতে হলে তার নিজের ঘাড় বা মুখটাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে রাখতে হবে এবং তা করতে গেলে তার পক্ষে সামনে দৃষ্টি রাখা বা সহজে চলা সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে আরো ভুল ধারণা আছে যে, হঠাৎ ভয় দেখাতে পারলে বাঘ ছুটে পালায়। ভালুক মরা জীবকে স্পর্শ করে না বলেও এক মারাত্মক ভুল ধারণা আমরা পোষণ করি। এগুলি আনাড়ি লোকের দ্বারা শিশুদের বইতে প্রচারিত হতে দেখেছি। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, ভালুক ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত খায়। সব জাতের না হলেও কোনো কোনো ভালুক জ্যান্ত মানুষ খায়, মৃত পচা জন্তু খেতেও ছাড়ে না।

প্রায় ৬০০ পাউন্ড ভারি একটা মৃত পশুকে সিকি মাইল দুর্গম পথে বয়ে নিতে ৮।১০ জন জোয়ান পর্যন্ত হিম্‌সিম্ খায়। অথচ একটা বাঘ সে কাজ করতে কোনো ক্লেশ বোধ করে না। অতএব, বাঘের শক্তি কত, সাধারণ লোকের পক্ষে তা অনুমান করাও অসাধ্য। আর, যে-জন্তু এত বড় বোঝাটাকে দাঁতে কামড়ে নিয়ে ছুটে পালাতে পারে, তার দাঁত, চোয়াল এবং ঘাড়ের জোরই বা কত! তার দাঁতগুলি লোহার ছোট ছোট বল্টুর মতো যেমন দীর্ঘ, তেমনি শক্ত এবং সূক্ষ্মাগ্র তীক্ষ্ণ। একজন পূর্ণ বয়স্ক পালোয়ানের বাহুর হিউমারাস বা উরুতের ফিউমারেল হাড় কম শক্ত নয়,

সমান জমিতে এক হাজার পাউণ্ডের চাপেও তা ভাঙে না। কিন্তু বাঘ সে হাড়কে চিবিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারে।

তারপরে তার থাবার জোর। ওপরে-নিচে মজবুত চৌকাঠে আঁটা ½ ইঞ্চি মোটা চার ফুট দীর্ঘ লোহার গরাদকে উত্তেজিত বাঘ এক চাপড়ে বেঁকিয়ে ফেলেছে এমন কথা আমি শুনেছি। এক চাপড়ে বাঘ একটা গরু বা মোষের মাথাকে ফাটিয়ে দিয়েছে, এমন নজিরও দুর্লভ নয়। সাধারণ জোয়ানদের ছেড়েই দিই, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বলী কিংবা ভুবন-বিজয়ী মুষ্টিকের পক্ষেও এ কীর্তি অকল্পনীয়।

বাঘের অন্যান্য দক্ষতাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। যখন-তখন জলে না নামলেও সব জাতের বাঘই কম-বেশি সাঁতার জানে। কোনো কোনো বাঘ সাঁতারে রীতিমতো দক্ষ; সেসব বাঘ জোয়ারের মুখেও ভরা নদীর প্রবল স্রোতকে উপেক্ষা করে নদী পার হয়। লেপার্ড ৬।৭ ইঞ্চি জলে থাবা চালিয়ে বা মুখ ডুবিয়ে মাছ খায়, এমন কথাও শোনা যায়।

ওজন বেশি হবার দরুণ বাঘ সব গাছে চড়তে পারে না বটে, কিন্তু উপযুক্ত মাপের অর্থাৎ তার হাতের বেড়ের উপ-যোগী গাছ হলে গায়ের জোরে বা নখর বিঁধিয়ে সে গাছেও ওঠে। একবার একটা বাঘ ক্ষিপ্ত হয়ে মোটা গাছ বেয়ে ১৪ ফুট উঁচুতে শিকারীর মাচা ধরে ফেলেছিল। লেপার্ড এবং প্যান্থার তো দিব্যি সহজে গাছে চড়ে; বরং দিনের বেলায় অবসর সময়ে নিচে থাকার চেয়ে কোনো বড় গাছের আগডালে থাকাটাকেই তারা নিরাপদ মনে করে। এই ধরনের বাঘ ক্ষেপে গিয়ে ১৯।২০ ফুট উঁচু ডাল থেকে শিকারীকে পেড়ে খেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। তবে গাছ খুব সোজা, সরু বা মসৃণ হ'লে বাঘ তাতে চড়তে পারে না। ঘন কাঁটার বন এবং বেত-ঝোপকে বাঘ পছন্দ করে না, অত্যন্ত শুষ্ক এবং গরম আবহাওয়াও তার পছন্দ নয়। কলকাতার চিড়িয়াখানায় বাঘগুলির নিস্তেজ হয়ে পড়ার কারণ শুধু স্বল্পাহার নয়, ঘনপাতাবিশিষ্ট ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ বাসস্থানের অভাবও তার অন্যতম প্রধান কারণ। রুক্ষ সিমেন্টের শয্যা থেকে ঠাণ্ডা বালি বা মাটি তার বেশি কাম্য।

ভয়াবহ দাঁত এবং নখরাস্ত্র ছাড়াও দেহগত ক্ষিপ্রতার জন্য বাঘ দুর্দান্ত বলশালী গণ্ডার ভালুকের মতো নির্ভয় জন্তুরও তোয়াক্কা রাখে না। কেননা, দৌড় বা লাফ-ঝাঁপে তারা কেউ বাঘের সমকক্ষ নয়। আর এইজন্যই সবলতর ভালুককেও ক্ষিপ্রতার অভাবে দীর্ঘ-স্থায়ী যুদ্ধে বাঘের মার খেতে হয়। কাজেই বাঘের সঙ্গে মানুষের কুস্তি লড়ার কথা গঞ্জিকাসেবীর কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছু নয়। এমন কি, ঢাল-তরোয়াল বা সরকী-বল্লম নিয়েও যার-তার পক্ষে বাঘের সামনে যাওয়া সম্ভব নয় যদি না সেসব অস্ত্র অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে প্রযুক্ত হয়।

পেশাদার গ্লাদিয়েতরগণ দক্ষ যোদ্ধা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তথাপি বহু সময়ে পশুর হাতে তাদের মৃত্যুও ঘটে-ছিল। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর নেপালী শিকারী আছে শুনেছি, যারা কেবল কুকরি চালিয়ে বন্য বাঘকে হত্যা করে। এ ক্ষেত্রে বাঘ শিকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে পলকের মধ্যে শিকারী এক পাশে হেলে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর হাতের কুকরি বিদ্যুৎগতিতে তার গলায় বসিয়ে দেয়। কোপের ফলে বাঘের শ্বাসনালীসহ গলায় প্রায় আধা-আধি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এরূপ শিকারের সচিত্র বিবরণ আমি বইয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু বড় বড় শিকারীদের কাছে শুনেছি, এ বিষয়ে তাঁরা কিছু জানেন না।

যদি এ ধরনের শিকারের সত্যতা থাকে, তবে স্বীকার করতেই হবে, তা অতীব কঠিন এবং যথেষ্ট অভ্যাস ও ঝক্কিসাপেক্ষ। বিষাক্ত সাপ হাতে ধরা যেমন কেবল সাহস দ্বারা হয় না, তার সঙ্গে ক্ষিপ্রতা ও কৌশল থাকা চাই, উল্লিখিত নিয়মে বাঘ মারতেও তেমনি ক্ষিপ্রতা এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে আঘাত করা চাই। সাপের ক্ষেত্র থেকেও এ ক্ষেত্রে আরো বেশি সতর্কতা প্রয়োজন। কেননা, সাপ ভীতু, মানুষ দেখলে সে পলায়মান হয়, আর বাঘ দুর্মদ সাহসী, সোজাসুজিভাবে লক্ষ্যে পড়লে সে ছুটে আসে। অন্যথায় নোটিশ দিয়ে আসে না, আসে একান্ত সংগোপনে শিকার বা শিকারীর অলক্ষ্যে।

বাঘের আক্রমণ প্রায় অমোঘ, সে আক্রমণ থেকে হাজারে একজনও রেহাই পায় না। কদাচিৎ তাড়া খেয়ে কিংবা দৈব প্রতিকূলতার ফলে বাঘ তার শিকার ফেলে পালায় বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির বলবীর্যের কথা অবান্তর যদিও এরূপ ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির বলবীর্য সম্পর্কে বহু বহু উদ্ভট কাহিনী তৈরী হয়। সেটা হয় অনেকটা 'ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে' গোছের অবস্থা! আবার

সময়ে সময়ে দৈবক্রমে অবস্থার ফেরে বাঘেরও মৃত্যু ঘটে। বিগত যুগের সুপ্রসিদ্ধ কৈলাস বাঘার হাতে বাঘ মারার কাহিনী এই হিসাবে খুবই উল্লেখযোগ্য যদিও সে ক্ষেত্রে তাঁর শক্তিমত্তা এবং সাহসিকতার কথা প্রচারিত ছিল। কিন্তু আমি এখানে আসল ঘটনাটাই বলব, ঘটনার দীর্ঘকাল পরে স্বয়ং তাঁর মুখ থেকে যেমন যেমন শুনেছিলাম।

ময়মনসিংহ জেলায় পুলিস বিভাগে কাজ করার সময়ে একদা ১৮৯০ অব্দে কিংবা তার সান্নিহিত কোনো সময়ে মির্জাপুর থানার নিকটবর্তী এক জঙ্গলে তিনি এক লেপার্ড কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। বেলা তখন দুটো-আড়াইটা। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার উদ্দেশ্যে কাছেই এক জঙ্গলে একটা বড় গাছের নিচে নৌকা বেঁধে গাড়ু হাতে নিয়ে কয়েক গজ দূরে এক ঝোপের আড়ালে তিনি বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর কানে এল, একটা অদ্ভুত গম্ভীর গড়-গড় আওয়াজ—যেন কোথাও কেউ যাঁতা ঘুরিয়ে ডাল ভাঙছে! ধারে-কাছে কি তবে কোনো বাড়ীঘর আছে? নাঃ, তা নেই। এ তল্লাটের সবকিছু তাঁর নখদর্পণে। একটু বিস্মিত মনে এদিক-ওদিক তাকাতেই একটা দৃশ্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। দেখলেন, প্রায় ১০।১২ গজ দূরে একটা মোটা গাছের গুঁড়িটাকে বেষ্টন করে ছোট ছোট গাছের ঝোপ, আর সেই ঝোপের মধ্যে কিসের যেন একটা লেজ আনন্দে আন্দোলিত হচ্ছে। লেজটার মৃদু মৃদু আঘাতে ঝোপের গায়ে ছপ্ ছপ্ শব্দ হচ্ছে। গড় গড় শব্দটাও ওখান থেকেই আসছে। মুহূর্তে কৈলাস বাঘার রোমাঞ্চিত হল, ভয়ে তাঁর দেহের রক্ত জমাট বাঁধার উপক্রম করল। তিনি বুঝতে পারলেন, ওটা বাঘ! এবং লেপার্ড জাতের অতি ভয়াবহ বাঘ।

তাহলে উপায়? হাতে তো পিতলের গাড়ু মাত্র। নৌকার বৈঠাটা হলেও না হয় কথা ছিল। সেটা রয়েছে নৌকায়। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপটার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে একপা দুপা করে তিনি নৌকার দিকে পা বাড়ালেন এবং নৌকায় উঠেই সাত ফুট বৈঠাটাকে দুই হাতে বাগিয়ে ধরলেন। তার পরবর্তী ঘটনা ঘটে গেল চোখের পলকে।

বাঘটা ঝোপ থেকে বেরিয়েই সোজাসুজি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাগ্যক্রমে নৌকার কাছাকাছি দুই-তিন ফুট ওপরে একটা বড় ডাল আড়াআড়িভাবে ছিল। বাঘ সেই ডালটাকে ডিঙিয়ে আসার সময় কৈলাস বাঘা শূন্যপথেই তাঁর সর্বশক্তিতে বাঘের নাক লক্ষ্য করে বাড়ি ছাড়লেন। বাড়ির চোটে সাত ইঞ্চি চওড়া প্রায় তিন ফুট দীর্ঘ ফলকটা সশব্দে ভেঙে ছিটকে পড়ল। আর আঘাতের ফলে প্রতিহত হয়ে জন্তুটা নৌকার ওপর পড়েও আজন্ম অভ্যাস অনুযায়ী পলকের মধ্যে সামনের থাবা তুলে আবার লাফিয়ে উঠল।

তখন কিভাবে কি করা যায়, সে চিন্তার শক্তি বা সময় ছিল না। তাই বাঘটা পিছনের পায়ের ওপর লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দুই ইঞ্চি মোটা চার ফুট লম্বা হাতলটা দিয়ে তিনি সোজা তার গলায় গুঁতো বসিয়ে দিলেন। এবার বাঘটা গুঁতোর চোটে দুই পায়ে দাঁড়ান অবস্থা থেকে বেটাল হয়ে নৌকার ধারে জলে পড়ে গেল। তারপর জলের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়নের পরেই সব চুপচাপ। বাঘটা মরল।

লেপার্ড সাধারণতঃ ১০ ফুটের বড় হয় না। এটা ছিল প্রায় সাড়ে আট ফুট, ওজনও ছিল তার ২০০ পাউন্ডের বেশি। এই ঘটনাটি পরে নানা লোকের মুখে নানাভাবে প্রচারিত হয়ে কৈলাসচন্দ্র বসু 'কৈলাস বাঘা' নামে খ্যাত হন। প্রচারিত সেসব গল্পের সার মর্ম এই যে, কৈলাস বাঘা অত বড় পালোয়ান ছিলেন বলেই বাঘটাকে গর্দান চেপে জলে চুবিয়ে মেরেছিলেন। কারো কারো মতে, ঘুসি মেরে বাঘের নাক-মুখ থেঁতলে ফেলা হয়েছিল!! আরো বেশি গল্পবাগীশ দল বলত, বাঘটাকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে নৌকার গলুইতে আছড়ে মারা হয়েছিল!!! কিন্তু কৈলাস বাঘার নিজের মত, ভাগ্য ও দৈব সহায় না হলে সে যাত্রা তাঁর প্রাণ রক্ষা পেত না। কেননা—

ডাঙ্গা থেকে নৌকাটা দু-তিন ফুট ব্যবধানে থাকায় বাঘটা সোজাসুজি ছুটে আসেনি, আসতে হয়েছিল লাফিয়ে, তারপর নৌকার গলুইর কাছাকাছি ঈষৎ উঁচুতে ডালটা থাকায় তাকে ডাল টপকে আসতে হয়েছিল এবং সেই জন্য কৈলাস বাঘার পক্ষে কায়দামতো বৈঠার বাড়ি মারা সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ, চ্যাপ্টা বৈঠার আঘাতটা এমন তীব্রভাবে বাঘের নাকে পড়েছিল যে, তাতে তার নাক সাংঘাতিকভাবে থেঁতলে গিয়েছিল। বাঘের দেহের অপর কোথাও এ আঘাত লাগলে তার বিশেষ কোনো ক্ষতি হত না।

তৃতীয়তঃ, বাঘ দ্বিতীয়বার সামনের দুই থাবা তুলে লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাঠের ডান্ডার বাড়ির বদলে গুঁতো মারায় ফল চমৎকার হয়েছিল। বাড়ি খেয়ে বাঘ জব্দ হত না, জলেও পড়ত না।

চতুর্থতঃ, বাঘ জলে পড়ে যাওয়ায় সে তার সহজ আক্রমণের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল।

পঞ্চমতঃ, ঊর্ধ্বাঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে পড়ে যাবার সময় বাঘের মাথা ডুবে গিয়েছিল আগে এবং ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে সে নৌকার তলায় চলে গিয়েছিল।

অতএব, বাঘটা মারা পড়েছিল দৈবক্রমে, কিছুটা বে-কায়দায় এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে! সাক্ষ্য মানুষে কৈলাস বাঘার কথাই ঠিক। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাঘ মারার কাহিনীও আলোচনার যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সাচ্চা বিপ্লবী হিসাবে আমিও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি বলেই তাঁর সম্পর্কে অহেতুক বা অতিরঞ্জিত গল্প প্রচলিত থাকুক, তা চাই না। তাঁর বাঘ মারার কাহিনী বিভিন্ন বইয়ে যেমন আছে, তা মোটামুটি এই—

এক সময়ে ছুটি উপলক্ষে যতীন্দ্রনাথ গ্রামে গিয়ে শুনলেন, একটা বাঘ কিছুদিন থেকে বিশেষ উৎপাত সৃষ্টি করেছে। অনেকে তাঁকে বাঘ মেরে দেওয়ারও অনুরোধ জানাল। যতীন্দ্রনাথ তখন তাঁর মামাত ভাই ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বাঘ শিকারে বেরোলেন। ফণীন্দ্রনাথের হাতে ছিল বন্দুক, আর যতীন্দ্রনাথের হাতে একটি দুধারি ছোরা। তাঁদের সঙ্গে গ্রামেরও বহু লোক গেল। বাঘ দেখার পরে যতীন্দ্রনাথ ইসারায় গুলি করতে মানা করা সত্ত্বেও ফণীন্দ্রনাথ গুলি করে বসলেন! ক্ষিপ্ত হয়ে বাঘ তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিংবা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। যতীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় ছোরা বসিয়ে দেন; বাঘও রাগের মাথায় তখন যতীন্দ্রনাথের হাঁটু কামড়ে দিল। বাঘ লোকজনের চিৎকারে পালিয়ে গেলেও ছোরার আঘাত এমন সাংঘাতিক হয়েছিল যে পরে সে মারা যায়। এদিকে বাঘের কামড়ে যতীন্দ্রনাথের পা সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে যায়, হাঁটুর কাছে তাকে কেটে ফেলার কথাও হয়েছিল। কিন্তু প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর চিকিৎসায় শেষ পর্যন্ত পা রক্ষা পায়, তবে পাটা আগেকার মতো জোরদার হতে পারেনি। এই সংঘর্ষে যতীন্দ্রনাথের হাতের একটা আঙ্গুলেও জখম হয়েছিল। তাঁর 'বাঘা যতীন' নাম হয় এই ঘটনার পর থেকে।

বস্তুতঃ প্রত্যক্ষদর্শীর অভাববশতঃ এখন এই ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা সহজ নয়। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দুজন, এক স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ, অন্যজন ফণীন্দ্রনাথ; উভয়েই লোকান্তরিত। আমার বিশ্বাস, সাহসিকতাপূর্ণ কোনো ঘটনার অতিরঞ্জিত ভ্রান্তিপূর্ণ বিবরণ প্রচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জনপ্রিয়তার পরিচয় হলেও পরিণামে তা তাঁর সম্মানের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ভুল জন-প্রবাদকে চিরদিনই ঘৃণা করি। মহা-বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের ঘটনাটির উল্লেখ করার প্রয়োজনও এইজন্যই।

ঘটনার বিবরণ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বাঘ শিকারের প্রচলিত কোনো নিয়মই এখানে ছিল না। অর্থাৎ 'মাড়ি' কিংবা 'মাচা' ইত্যাদি কোনো কিছুর ব্যবস্থা হয়নি। গ্রামের লোকজন সংগে গেলেও তারা শিকারী ছিল না। তার-পর যতীন্দ্রনাথ নিজে বন্দুক চালনায় সিদ্ধহস্ত হওয়া সত্ত্বেও সে অস্ত্রটি তাঁর হাতে ছিল না। পক্ষান্তরে, তাঁর হাতে ছিল সামান্য একটি ছোরা। এই ক্ষুদ্র ছোরা নিয়ে তিনি মারতে গেলেন বাঘ!! তবে কি বুঝে নিতে হবে, বাঘ সম্পর্কে তাঁর কি কোনো ধারণাই ছিল না? সম্ভবতঃ তাঁর ঘৃণ্যতম শত্রুও সেকথা বলবে না, অবশ্যই যদি আদৌ তাঁর তেমন কোনো শত্রু থাকে। বরং আমার বিশ্বাস, সর্বকাজে তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতার কথা প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হয়।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, যতীন্দ্রনাথ ঠিক বুঝেছিলেন, গ্রামের লোক 'বাঘ বাঘ' বলে যতই আতঙ্কিত হয়ে থাক, আসলে তা যথার্থ বাঘ নয়। কেননা, সাধারণ পাঁঠা-ছাগল ছাড়া সে ঘটনায় মানুষ বা গরু-মোষের ওপর আক্রমণের সংবাদ ছিল না। তা ভিন্ন দু' চার মাইলের ভিতর পাহাড়-পর্বত কিংবা বড় ও গভীর জঙ্গল না থাকলে গ্রামের সামান্য সামান্য জঙ্গলে সহসা বাঘের উপস্থিতি সম্ভব নয়। আসলে বাঘ দেহ-গঠনের বিচারে বিড়াল জাতীয় জীব, আর হায়না কুকুর জাতীয়। ঠিক তেমনি বাঘডাশ্ বাঘের মতো অবয়ব-সম্পন্ন জীব এবং কুত্তাবাঘ হায়না জাতীয় জানোয়ার। গ্রামাঞ্চলে মাঝে মাঝে এরূপ বাঘডাশ বা কুত্তাবাঘের দৌরাত্ম্য হয়, আর গ্রামের লোক সাধারণ-ভাবে এগুলিকেই 'বাঘ' বলে ভ্রম করে আতঙ্কিত হয়। সাধারণভাবে এ জাতীয় 'বাঘ' মানুষকে ভয় করে বটে, তবে দায়ে পড়লে মানুষকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করে না। পাঁঠা-ছাগল, কুকুর-বিড়াল, এমন কি শিয়াল-খট্টাসের মতো ধূর্ত জন্তুকেও এরা অনায়াসে ধরে খায়। নির্দিষ্ট অবস্থান বুঝে জঙ্গল বেষ্টন করে সড়কি-বল্লম বা হেশারের সাহায্যেও এদের মারা চলে। প্রায় ৩৫ বছর পূর্বে আমাদের গ্রামে আমাদেরই হাতে এ-জাতীয় এক জন্তু মারা পড়ে-ছিল দেহ-গঠনের বিচারে যে প্রায় 'বাঘ'ই ছিল। মাপেও সে ক্ষুদ্র ছিল না: পাঁচ ফুট ডোরাদার চেহারা নিয়ে সে গ্রামে বেশ কিছুকাল ত্রাস সৃষ্টি করে-ছিল। শুধু এক ছোরার ভরসায় এ জাতীয় জানোয়ারের সম্মুখীন হওয়া যায় না। যারা তা করতে যায়, তারা মৃত্যুভয়হীন অসম সাহসী পুরুষ সন্দেহ নেই। যতীন্দ্রনাথ অবশ্যই সে স্তরের ব্যক্তি ছিলেন।

যথার্থ বাঘের একটি কামড় বা থাবলায় পৃথিবীর সবলতম মানুষও শেষ হয়ে যেতে পারে। এমন কি মারাত্মক আঘাতে মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও সে যদি মানুষকে নাগাল পায়, তবে চূড়ান্ত অবস্থা ঘটিয়ে দিতে পারে। প্রসিদ্ধ শিকারী কুমুদনাথ চৌধুরীর অব্যর্থ গুলির আঘাতে উড়িষ্যার কালা-হাণ্ডি জঙ্গলে নরভুক (Man Eater) বাঘটা মরেছিল বটে, কিন্তু মরার আগে সেও লাফিয়ে মঞ্চোপবিষ্ট শিকারীকে চূড়ান্ত আঘাত হেনে গিয়েছিল যে আঘাতের ফলে রক্তাক্ত কলেবরে অচৈতন্য অবস্থায়ই চৌধুরীসাহেবকেও শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছিল। অথচ এই পঙ্গু ও আহত বাঘটা তেমন বড়ও ছিল না। এরূপ দৃষ্টান্ত আরো আছে, কিন্তু উল্লেখ প্রয়োজন নেই।

—(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভারত দর্শন
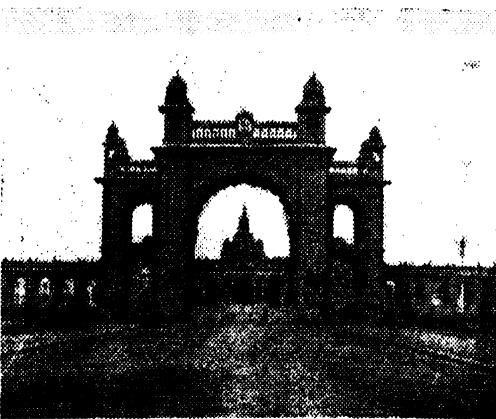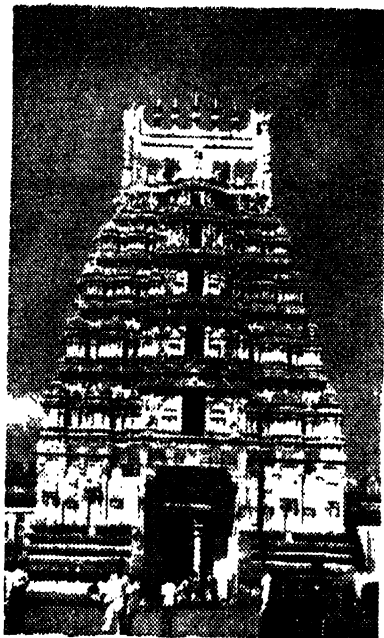
(বামদিকে) টিপু সুলতান দুর্গের অভ্যন্তরে রঙ্গস্বামী মন্দির (ওপরে) এবং শিবসমুদ্রমে কাবেরী জলপ্রপাত (নীচে)।
ডানদিকে নান্দী মূর্তি (ওপরে), বৃন্দাবন উদ্যান (মধ্যে), মহীশুর প্রাসাদ (নীচে)। ফটোঃ অতুল দে

এ অফিসে নতুন যারা ঢুকেছে তারা কোনদিন তারকবাবুকে চেয়ার ছেড়ে উঠে ওঠা-হাঁটা ক'রতে দেখেনি। চেয়ার জুড়ে' একই জায়গায় এমনভাবে বসে ভদ্রলোক কাজ করেন হঠাৎ দেখলে বড়-লোকের বৈঠকখানায় টাঙান ভারিক্কী একটা অয়েল-পেন্টিং বলে' মনে হ'বে।

সুধা এ অফিসে নতুন ঢুকেছে। একসঙ্গে কাজ করবার আরো নতুন সঙ্গী সে পেয়েছে, কিন্তু তার ভাগ্যে মাথার ওপর আছেন তারকবাবু। তাঁর সঙ্গ সত্যিই কেমন যেন ভয়ের। আঁট-সাঁট, গোলগাল তারকবাবুর চেহারাটা কখনো কখনো সুধার চোখে পড়ে গেছে, নিশ্চল হয়ে পাথরের ঠাকুরের মত তারই দিকে যেন চেয়ে আছে। চোখ নামিয়ে নিলেও সুধা যেন সে-পাষাণ দৃষ্টির প্রখরতা অনুভব করতে পারে। হঠাৎ অমন ক'রে কাজ ছেড়ে ভদ্রলোক কি দেখেন, কাকে দেখেন? সুধা জানে, তার পিছনে দেওয়ালটা কঠিন-কঠোর, ধূলি-মলিন ফাইল এবং র‍্যাকে পরিপূর্ণ। ওখানে নেহাৎ প্রয়োজন না হ'লে বড় কেউ একটা দৃষ্টি দেয় না।

কথাটা একদিন পাশের সহকর্মী, বছর দুয়েকের সিনিয়র সুকল্যাণকে জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবলে সুধা। নানা বয়সের তারা দশজন, কিন্তু সে-ই কেবল মেয়ে। তারকবাবুকে বাদ দিয়ে ন'জন তারা ছোট ছোট টেবিলে পাশাপাশি সামনে-পিছনে জোড়া জোড়া বসেছে, গায়ে গায়ে বলা চলে স্থান সংকুলানের জন্যে।

স্থান যে আর কোথাও নেই! বাড়িতে যেমন, রাস্তায় তেমন, অফিসেও তদ্রূপ! পা মুড়ে হাত-মুড়ে সংকুচিত হয়ে থাকা যেন সর্বত্র, পাছে আর কারো অসুবিধার কারণ ঘটে!

ভাগ্যে মনটাকে এখনো মুড়তে দোমড়াতে হয় না? পায়ের তলার শক্ত কোন মাটি আঁকড়াতে হয় না! কৌটোর মধ্যে পুরলেও ভাবতে পারে মন আপনা থেকে! কাজের কথা ভাবতে ভাবতে প্রথম দিন থেকেই বড়বাবু, তারকবাবুর কথা ভেবেছে—সবার থেকে পৃথক নৈবেদ্যের মন্ডা যেন!

সুধা জিজ্ঞেস করবার আগেই সুকল্যাণ নিজে থেকে একদিন বলল, "ভদ্রলোকের সব দিকে নজর আছে, অমন চুপচাপ বসে থাকলে কি হবে! কাজে একেবারে যাকে বলে—"

নতুন বলে অফিস-কাজের বাক্য-রীতি এখনো রপ্ত করতে পারেনি, সুকল্যাণ থেমে গিয়ে সুধার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সুধা হেসে বললে, 'খুব ভাল কাজ জানেন বুঝি?'

সুকল্যাণ বড়বাবুর চেহারাটার সঙ্গে কাজের মাপ করে নিতে সোজাসুজি কর্তব্যরত তারকবাবুর দিকে চেয়ে বললে, 'খু-উ-ব!'

সুধা মাথা নিচু করলে। ভাবলে সেই জন্যে বোধহয় তারকবাবু পৃথক আসনে বসে সবার কাজের তদারক করেন। ঠিক ও'র বয়সী না হলেও প্রায় সমবয়সী আরো দুচারজন সহকর্মী আছেন, যাঁরা তাদের সঙ্গে গায়ে-গায়ে ঘেঁষে কাজ করছেন। কোনই স্বাতন্ত্র্য নেই!

হ্যাঁ, ভয়ই হয় সুধার। কাজের জন্যে। সে তো সারাদিন প্রায় কিছুই করে না। নিজের মনে হিসাব করে দেখেছে, কাজ তার এমন কিছুই হাতি-ঘোড়া নয়! একেবারে পিছনে বসে সুকল্যাণকে সাহায্য করা, চিঠিপত্রের আগমন, নির্গমন এবং প্রত্যাগমন লিপি-বদ্ধ করা।

দূর থেকে হঠাৎ বড়বাবুর চেয়ে-দেখার অর্থ তাই সুধা মনের মধ্যে ভিন্নভাবে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ভয় হয় কাজ নিয়ে হয়তো বকাঝকা করবেন, যেমন আর সবার সঙ্গে রোজ করেন। ভয়ে ভয়ে সুধা চোখ নামিয়ে খাতা বাগিয়ে কপট মনো-যোগে ঘর্মাক্ত হ'য়ে ওঠে। এই বুঝি বড়বাবু কাছে ডেকে সারাদিনের কাজ দেখতে চান, এই বুঝি—

না, এই একমাসের মধ্যে তারকবাবু হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে দেখা ছাড়া সুধার ওপর বড়বাবুগিরি ফলাননি! সুধার কাজ নিয়ে বলবারও যেন কিছু নেই।

বড়বাবুর ডাকে সুকল্যাণকে প্রায়ই সিট ছেড়ে উঠতে হয়, এটা ওটা নিয়ে তারকবাবুকে গিয়ে বুঝিয়ে আসতে হয়? সুকল্যাণকে বড়বাবু ডাকলেই সুধার কেমন মনে হয়, হয়তো তার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করবেন—কেমন কাজ করে কি কাজ করে ইত্যাদি।

না, সুকল্যাণ ফিরে এসে কিছু বলে না। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। খুব দরকার বা প্রয়োজন না হলে কোন কাজ করতে বলে না। অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই সে কাজের লোক হ'য়ে উঠেছে। একদিন ঐ বড়বাবুর চেয়ারে গিয়ে বসবে, তখন অমন করে চাইলে কি মানে করবে সুধাধারা মিত্র? দূর-র তর্তাদন কে কোথায় থাকে তার ঠিক নেই!

তবু দিনে অন্তত একবার না একবার বড়বাবুর তার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপের অর্থ নিয়ে বিশেষ যেন ভাবনায় পড়ে সুধাধারা। কাজ পছন্দ নয়? ফাঁকি দিচ্ছে ভাবেন? ঠিকমত কাজের চাপ নেই? না কি—

ভয়ে ভয়ে সুধাধারা জিজ্ঞেস করলে, 'বড়বাবু কি বললেন?'

সুকল্যাণ ব্যস্ত হ'য়ে ফাইলের একটা চিঠি হাতড়াতে হাতড়াতে বললে, 'কিছু না।'

উত্তরটা ঠিক মনঃপূত হয় না সুধাধারার, আবার জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি কিছু না।'

'না'। চিঠিটা এখনই পে'ছৈ দিতে হ'বে বড়বাবুর টেবিলে সুকল্যাণকে।

কাজের জন্যে সময় সময় কেমন সংক্ষিপ্ত আর সুদূর হয়ে যায় সুকল্যাণ পাশে বসেও। বড়বাবুর মতনই তাকে ভয় করে সুধাধারার।

চিঠি খুঁজে বড়বাবুর টেবিলে রেখে এসে সুকল্যাণ এতক্ষণে যেন খেয়াল করলে, 'বলুন, কি বলছিলেন এবার!'

সুধাধারা কিছু বলে না, ঘাড় গুঁজে কাজ করে। সুকল্যাণ বুঝতে পারে, অস্ফুটে বলে, 'কি, রাগ করলেন?'

সুধা তেমনি নিরুত্তর, কৈফিয়ৎ শুরু করে সুকল্যাণ, 'ভদ্রলোক এমন ব্যস্ত করেন বলবার নয়! মুখ থেকে কিছু বার করলেই হলো!'

মুখ তুলে সুধাধারা আড়চোখে চেয়ে দেখে, যেন হাঁফ ছেড়ে বে'চেছে সুকল্যাণ, অবসর পেয়েছে হাতের কাজ শেষ করে: সহকর্মিণীর সঙ্গে আলাপ করবার সময় হয়েছে!

তারপর দুজনেই যেন সভয়ে লক্ষ্য করে, বড়বাবু তাদের দুজনকেই একদৃষ্টে দেখছেন। কেমন কৈফিয়ৎ-ভৎর্সনা যেন উপছে উঠেছে সে-চাহুনিতে।

দেখে দেখে ভেবে ভেবে সুধা একদিন মাথা নিচু করে বললে, 'বড়বাবু অমন করে এদিকে কি দেখেন বলুন তো!'

সুকল্যাণ হেসে বললে, 'আপনাকে!'

কান-মুখ লাল হয়ে উঠলো সুধাধারার।

না বোধহয়, ওদের পাশাপাশি বসে অন্তরঙ্গতা করা তারকবাবু পছন্দ করেন না। সুধা দেখেছে যখনই সুকল্যাণ কাজ শেষ করে তার সঙ্গে একটি কি দুটি কথা কয়েছে অমনি মোটরের হেডলাইটের মত বড়বাবুর এক জোড়া চোখ এই দিকে ফিরেছে। সুধা মাথা নামিয়েছে, সুকল্যাণ কাজের অছিলায় একাগ্র হয়ে উঠেছে।

তারকবাবুকে বাদ দিয়ে আরো সাতজন সহকর্মী আছেন যাঁদের কথা সুধাধারার এমন করে মনে হয় না। তাঁদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে দিনে সর্বক্ষণ কাজ না করলেও তাঁদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে-বসে সুধার কত সময় কেটে যায়। কিছুই মনে হয় না। ও'দের মধ্যে প্রশান্তবাবু কিছু বয়স্ক। ভদ্রলোক সারাক্ষণ নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত আছেন, কাজ ছাড়া কিছু যেন বোঝেন না, সুধার মনে হয়, লক্ষ্যও করেন না। সুধা এসে পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে, চেয়ার টেনে বসেছে—প্রশান্তবাবু সেই ফাইল পড়ছেন, কি চিঠি লিখছেন, কি চোখ বুজে কিছু একটা ভাবছেন!

এ সময় সুধার এসে কারো কাছে বসবার কথা নয়, উচিতও নয়। টিফিন হোক চাই নাই হোক, কেউ যখন কাজ করে তখন তাকে জ্বালাতন করা অন্যায় —একে সরকারী অফিসে নাকি কাজ হয় না তায় কারো কাজে বাধা সৃষ্টি করা অমার্জনীয় অপরাধ। প্রশান্তবাবু অত টিফিন-ফিফিন-এর ধার ধারেন না। হাতের কাজ নিয়ে সময়-অসময় জ্ঞান করেন না। সুধা অবাক হয়েছে ভেবে এত কাজ ভদ্রলোক পান কোথা থেকে, এত কাজ করেন কি করে, এত বছর কাজ করেও কাজের টান কমেনি, কেবল অফিসের কাজ নিয়ে—

সুকল্যাণ বলে, 'প্রশান্তবাবু কেবল কাজ বাড়ান, কাজ তৈরি করেন, করা-কাজকে আবার করেন, বাতিক আছে ভদ্রলোকের!'

সুকল্যাণের কথা সুধাধারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তবে কথাটার মধ্যে কিছু যে সত্যি থাকতে পারে তা অবিশ্বাস করে না। তার এক বিধবা পিসিমার কথা মনে পড়ে—তিনি অমনি কাজ বাড়াতেন, কিছুতে চুপচাপ বসে থাকতে পারতেন না। কিছু কাজ নেই তো রান্নাঘরের মাজা বাসন নিয়ে কলতলায় মাজতে বসতেন, কি আলনা থেকে কাচা কাপড় নিয়ে কাচতে বসতেন।

সুধা বলে, 'যাঃ, তা কখনো হয়?'

সুকল্যাণ মুখ তুলে প্রশান্তবাবুর হে'ট-মাথাটা দেখিয়ে বলেন, 'বেশ, বিশ্বাস না হয় নিজের চোখে দেখে আসুন।'

কয়েক সেকেন্ড তো বটেই, প্রশান্তবাবুর কাজ দেখতে এসে সুধা কোন সাড়া পায় না। প্রশান্তবাবু আপন মনে ফাইলের একটা চিঠি কপি করছেন। ঠোঁট নড়ছে, হাত চলছে, চশমার মধ্যে দৃষ্টিটা কেমন ঘোলাটে যেন। কারো কাজ দেখতে এসে তাকে এমন করে দেখা উচিত নয়, শোভনও নয়। কিন্তু না-দেখে উপায় কি, প্রশান্তবাবু যে চেয়েও দেখেন না।

কয়েকদিন পরে সুধার সাহস হলে সরাসরি এসে বলে, 'কি করছেন?'

একেবারে যেন অনামানুষে প্রশান্তবাবু কাজ থেকে মুখ তুলে একগাল হেসে বলেন, 'এই যে।'

কাজ নিয়ে কোন কথা হয় না, কি কাজের কোন পাঠও প্রশান্তবাবু দেন না। ভাবটা কেমন লাজুক-লাজুক করে হাসি-মাখা মুখটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের বুকে-পিঠে কাজের হাতটা বুলিয়ে প্রশান্তবাবু বলেন, 'কেমন লাগছে?'

একটু আগেও সুধার খুব ইচ্ছে করেছিল ভদ্রলোকের কাছে কাজ শিখবে, কাজের কথা খু'টিয়ে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ভদ্রলোকের বিনয়াবনত ভাবটা দেখে সব ভক্তি যেন উড়ে গেল। প্রশান্তবাবু এমন ভাব করছেন যেন নারী-সঙ্গ উনি কোনকালে করেননি। আর সুধা তো ধরতে গেলে ও'র মেয়ের বয়সী! সুধা হঠাৎ যেন ভাবে, তারকবাবু আর প্রশান্তবাবু, এ'দের মধ্যে কে বড় হবেন বয়সে? বোধ হয় প্রশান্তবাবুই!

সুধাধারা মুখে বললে, 'ভাল!'

আবার কাজের হাতটা উঠিয়ে বুকে রেখে প্রশান্তবাবু নিঃশব্দে হাসলেন। সুধা লক্ষ্য করলে, হাসিতে ভদ্রলোকের মুখের ওপর-পাটির ফোগলো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। মাড়িটা কালো।

বিশ্রী! যতই কাজের লোক হোন, সুধার দু'মিনিটের বেশি কাছে বসতে ইচ্ছে করে না। কাজের লোকের চেহারা তে এই—দাড়ি কামাননি, হাতের নখ কাটেননি, চশমার কাঁচটা পর্যন্ত ভাল করে মোছেননি, পাঞ্জাবির কাঁধটা ঘামের দাগে থিন-এরারুট-মার্কা বিস্কুট-রং হয়ে আছে, বুক পকেটটা চোতা কাগজে টেবো হয়ে আছে। বিশ্রী—

এত যদি কাজের লোক তা হলে, সুধাধারা নিজের সিটে এসে বসতে

বসতে ভাবলে, প্রশান্তবাবু আজও বড়বাবু হলেন না কেন? সুকল্যাণ ঠিকই বলে, ভদ্রলোক আড়া কাজ বাড়া করেন, কাজের পোকা বাছেন! 'এফিসিয়েন্সি' নেই, চিনির বলদের মতন খেটেই মরেন!

অফিসে আরো পুরোন হ'লে সুধা একদিন সুকল্যাণকে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, প্রশান্তবাবু তো বয়সে বড়, কাজও করছেন অনেকদিন, প্রোমোশন পাননি কেন?'

সুকল্যাণ বললে, 'কেবল বয়সে বড় হ'লে অফিসে প্রমোশন হয় না?'

'তা হ'লে?'

'যোগ্যতা, বুদ্ধি, তৎপরতা!'

'কেন ও'র নেই? উনি তো ভাল কাজ জানেন, করেন?'

'বলল্ম তো, শুধু কাজ করলেই হয় না।' সুকল্যাণ উঠে পড়ল, তারকবাবু চোখ তুলে ডাকছেন।

ফিরে আসতে সুধা প্রশ্ন করলে, 'তারকবাবু খুব যোগ্য তা হ'লে?

'তাতে আর সন্দেহ কি!' সুকল্যাণ বড়ববাবুর কাজটা হাতড়াতে হাতড়াতে বললে, মুখে অস্ফুটে কি যেন উচ্চারণ করলে—মুখ-চোখ দেখে মনে হ'ল মনোরম কিছু নয়, বিষোদ্গার!

তারকবাবুর সম্বন্ধে সুধাধারার আবার ভয় ধরে। প্রশান্তবাবুর চেয়েও কাজের লোক, না জানি কি! যোগ্যতা, তৎপরতা, বুদ্ধিমত্তা—কথাগুলো সুধা মনে মনে ঝালিয়ে নিলে। বড়বাবু সবার চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ! তাই বুঝি ভদ্রলোকের দিকে চাইলে এত ভয় করে, আর উনি চেয়ে দেখলে, কি যেন সব মনে হয়।

তারপর হঠাৎ একদিন তারকবাবু সুধাকে ডেকে বসলেন। প্রথমে সুধা দেখেও যেন দেখতে পায়নি এমনি ভাব করলে, খাতায় তোলা চিঠিগুলো এক এক করে দেখলে।

তারকবাবু তেমনি চেয়ে চেয়ে ডাকছেন। দেখে সুকল্যাণ বললে, 'যান, আপনাকে ডাকছেন!'

ভয়ার্ত চোখে অস্ফুট স্বরে সুধাধারা বললে, 'আমাকে কেন?'

'কি জানি, যান না, ডাকছেন!' সুকল্যাণ যেন কৌতুক করে।

সুধাধারা মুখ তুলে সোজাসুজি চাইলে। বড়বাবুর কাছে-ডাকা দৃষ্টিটা সরল রেখায় প্রখর হ'য়ে জ্বলছে যেন।

সুধাধারাকে ইতস্তত করতে দেখে সুকল্যাণ বললে, 'যান না, ভয় করছেন কেন—বাঘ-ভাল্লুক নয় যে খেয়ে ফেলবে!'

মনে মনে সুধা সুকল্যাণের ওপর অসন্তুষ্ট হয়, তার বিপদে এমন করে রহস্য করবে ভাবতে পারেনি। পাশে বসে' এক সঙ্গে কাজ করে এই বন্ধুত্ব? বাঘের মুখে ঠেলে দিয়ে বলছে কিনা যান না! নাঃ, দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস নেই, বন্ধু কেউ নেই!

মুখে সুধাধারা চোট-পাট করে, 'কে বললে আপনাকে, আমার ভয় করছে, কে বললে ও'কে আমি বাঘ-ভাল্লুক ভাবছি? যা খুশি বললেই অমনি হ'লো!'

সুকল্যাণ হাসলে, 'না ভাবলেই ভাল! সত্যিই তো, মানুষকে দেখে মানুষের ভয় করবে কেন!'

সুধা উঠে গেল। সুকল্যাণ আড়-চোখে চেয়ে দেখলে।......

টিফিনের পরে চলনের রাস্তায় দেখা হ'তে প্রশান্তবাবু কেমন একরকম ক'রে হেসে যেন চাইলেন, তারপর দুপা এগিয়ে একপা পিছিয়ে এসে সুধাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আলাপ হ'লো?'

প্রথমটা সুধা বুঝতে পারলে না, 'কি বলছেন?'

হাসিটাকে আরো ইঙ্গিতপূর্ণ করে প্রশান্তবাবু বললেন, 'বলছি ভাল! বড়বাবু আপনাকে ডাকেনি?'

সুধা বুঝলে, মুখ-চোখ কেমন আরক্ত হ'য়ে উঠলো, নতুনের পক্ষে
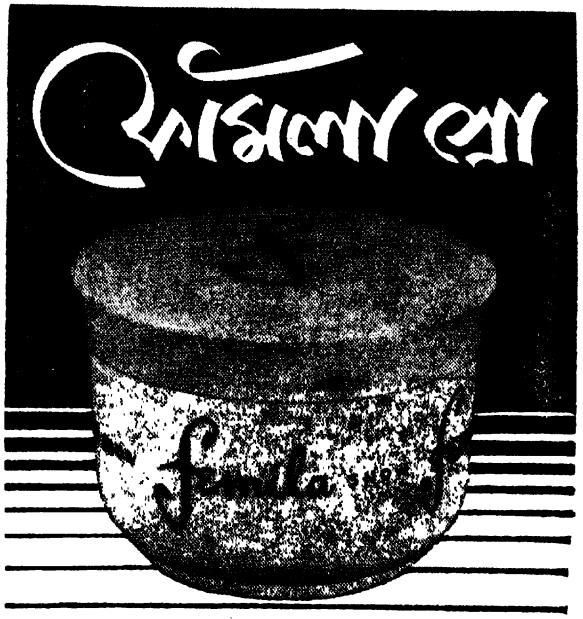
একটু চড়া সুরেই বললে, 'আলাপ আবার কি?'

তেমনি হাসিটা মুখে মাখিয়ে প্রশান্তবাবু বললেন, 'না, তাই জিজ্ঞেস করছি!!

হঠাৎ কি দুষ্টুমি বুদ্ধি মাথায় আসে, সুধা বললে, 'বড়বাবু বলছিলেন কাল থেকে আপনার পাশে বসে কাজ করতে! আপনি একা পারছেন না, আপনাকে এ্যাসিস্ট করতে!'

প্রশান্তবাবু আর দাঁড়ালেন না, বোধহয় কাজের ব্যবস্থাটা বদল করে নিতে বড়বাবুর কাছে ছুটলেন। তাঁর কোন সহযোগী বা সাহায্যকারী চাই না, কাজ তিনি একাই করবেন এতকাল যেমন করে এসেছেন।

সুধা ভদ্রলোকের ব্যস্ততা দেখে মনে মনে হেসে বাঁচে না। বড় চালাকি করতে এসেছিলেন—'আলাপ হ'লো? কি বললেন?' যেন আর কোন কথা নেই।

কিন্তু এটা সুধাধারা লক্ষ্য করেছে, কেমন যেন মনে মনে সে বুঝতেও পেরেছে তার বড়বাবুর কাছে যাওয়া নিয়ে সহকর্মীরা উৎসুক হ'য়ে উঠেছে। কেবল প্রশান্তবাবু নয়, সুধীরবাবু, ফটিক-বাবু, জয়ন্তবাবু, প্রমথবাবু, সবাই। অথচ ব্যাপারটার মধ্যে কি আছে সুধা ভেবে পায় না। বড়বাবু ডাকলেই সবাইকে কাছে যেতে হয়, কাজ থাকলে পাশে বসে বুঝিয়ে দিতে হয়, নয়তো কাজের নির্দেশ নিয়ে এসে কাজে বসতে হয়। অফিসে বড়বাবু আছেন সেই জন্য।

তারপর থেকে বড়বাবু প্রায়ই ডাকেন, কাজ-কর্মের কথা জিজ্ঞেস করেন, অফিস কেমন লাগছে জানতে চান, ব্যক্তিগত কথাও বলেন। যথাসম্ভব সংযত এবং বিনম্র হ'য়েই সুধা তারকবাবুর কথার জবাব দেয়। বড়বাবুর কাছ থেকে উঠে আসার সময় লক্ষ্য করে অনেকগুলো উৎসুক দৃষ্টি এইমাত্র আনত হলো। উৎসুক আগ্রহ বিদ্যুৎ ঝলকের মত চমকে স্থির নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে গেল। পিন-পড়া নীরবতা!

সুধাধারা সুকল্যাণকে জিজ্ঞেস করলে, 'কি ব্যাপার বল তো, সবাই অমন হাঁ করে চেয়ে থাকে কেন? আমি কি অফিসে নতুন চাকরি করতে এসেছি?'

সুকল্যাণ গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'না, বড়বাবুর কাছে নতুন যাচ্ছ!'

'সবাই তো যায়! ডাকলে যাবো না?' সুধা বেশ যেন রেগে বললে।

সুকল্যাণ উত্তর দিলে না, নিজের মনে কাজ করতে লাগল।

সুকল্যাণও কি ওদের দলে? বড়-বাবুর ডাকা নিয়ে ওদের মত বিপরীত কোন চিন্তা করে? আশ্চর্য সব, আশ্চর্য মনোভাব সহকর্মীদের।

কথাটা পরিষ্কার ক'রে নেওয়া উচিত। সুধা গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'কি উত্তর দিচ্ছ না যে?'

'কি উত্তর দেব? ডাকলে নিশ্চয়ই যাবে।' তেমনি অন্যমনস্ক হ'য়ে সুকল্যাণ বলে।

রাগটা আরো যেন চড়ে যায়। সুধা-ধারা বললে, 'যাবই তো! তোমরা যাও না?'

একেবারে পাথরের মত স্থির হ'য়ে সুকল্যাণ চেয়ারের সংগে এ'টে থাকে। ভাবলেশহীন কেমন যেন! সুধাধারা মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে।......

তারকবাবু সাগ্রহে বললেন, 'হ্যাঁ, কাজ-কর্ম শিখে নিন, আপনাকে অন্য কাজ দেব! ও চিঠি ডাইরি আর কতদিন করবেন! আপনারা শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, আপনাদের ইন্টেলিজেন্ট কাজ দেওয়া উচিত!'

সুধাধারা যেন ভয়ে ভয়ে বললে, 'কিন্তু চিঠির কাজগুলো—'

তারকবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'রেখে দিন ওকাজ, আপনি ওর জন্যে নন! আমি আপনাকে ভাল কাজ দেব! গুড্ ওয়ার্ক, ইন্টেলিজেন্ট ওয়ার্ক, ইন্টারেষ্টিং এ্যাট্ দি সেম টাইম! কেমন রাজী তো?'

সুধা মাথা নাড়লে। তারকবাবু বললেন, 'এতদিন দেওয়া উচিত ছিল! পাশে বসে কল্যাণ এতদিন কি করেছে? কিছু শেখায়নি, রেকর্ড ক্লার্কের কাজ করিয়েছে! না না, ওসব রেখে দিন, আপনারা শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী!.........

'কল্যাণবাবু?'

সুকল্যাণ এসে বড়বাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়াল। তারকবাবু যেন ধমকে উঠলেন, 'এ্যাদ্দিন এ'কে কি কাজ করিয়েছেন? আপনাদের মশাই একটু ইয়ে নেই......যেটা না দেখবো, গোলমাল করে' দেবেন! সি ইজ গ্রাজুয়েট, ও'র কি চিঠি ডাইরি করা কাজ? আপনি হ'লে কি করতেন, বলুন?'

সুকল্যাণ চুপ করে' রইল। সুধা লক্ষ্য করলে কল্যাণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন প্রকৃত অপরাধী সে। ভেবে পেল না তার হ'য়ে সে কিছু বলবে কিনা, বলা উচিত কিনা, কাজ-ভাগ সুকল্যাণ করে দেয়নি! কল্যাণ তার সম্বন্ধে কি ভাবছে, হয়তো—

বড়বাবু তেমনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'উনি খুব ভাল তাই, কিছু বলেন নি, অন্য লোক হ'লে মজা দেখিয়ে দিতো! কি বলবো আপনাদের, একজন গ্রাজুয়েট মহিলাকে দিয়ে যত রাবিশ কাজ করাচ্ছেন! ইস্-স্-স্!'

স্-স্টা ভর্ৎসনার মত শোনায়। সুকল্যাণ এতক্ষণে মাথা তুলে বললে, 'আপনি তখন চিঠি-ডাইরি করবার কথা বলেছিলেন, তাই—'

আর এক ধমক দিয়ে তারকবাবু বললেন, 'যান-ন্ আর তর্ক করবেন না! আমি বলেছিলুম! আমার ঘটে কোন বুদ্ধি ছিল না কিনা! যান্ একটা ডিষ্ট্রিবিউশন লিষ্ট করে আনুন! এ'কে একটা ইন্টারেষ্টিং এ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট

...আপনারা শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী

কাজ দেবেন! হুঁ, চিঠি-ডাইরি একটা কাজ!'

সুকল্যাণ ফিরে গিয়ে নিজের সিটে গোঁজ হ'য়ে বসল, সুধাধারা আড়চোখে লক্ষ্য করলে। মুখটা সুকল্যাণের কেমন যেন কঠিন দেখাচ্ছে। হয়তো ভাবছে সেই এসে বড়বাবুকে কাজের কথা নিয়ে লাগিয়েছে।

অমায়িক কণ্ঠে বড়বাবু বললেন, 'এখন কয়েকদিন নতুন কাজ করুন, তারপর দেখে শুনে আরো নতুন একটা কাজ আপনাকে দেব। আপনার কোন ভাবনা নেই, আমি আছি আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন আটকালে। অল্‌ওয়েজ ওয়েলকাম!'...

ভদ্রলোকের ব্যবহারটা খুবই অমায়িক। সব সময় সুধাধারার ওপর নজর রেখেছেন। এক রকম চোখে-চোখে, নিজের কেউ যেন ভাগ্যক্রমে অধীনে কাজ করতে এসেছে। শিখিয়ে-পড়িয়ে, বুঝিয়ে যতটা পারা যায়। তারকবাবুর আগ্রহের শেষ নেই। যে-লোক কোনদিন সিট ছেড়ে ওঠেনি, সে-লোক যখন-তখন আসন ছেড়ে উঠে আসেন—পাশে বসে' কি দাঁড়িয়ে কাজের কৌশল শিখিয়ে দেন. সুধাধারা অনেক সময় অস্বস্তি বোধ করে। আড়ষ্টস্বরে বলে, 'আমি ঠিক পারবো, আপনি যান।'

তারকবাবু ছাড়েন না। বলেন, 'পারবেন তো, এমন কি আর শক্ত! কিন্তু ভাল করে পারা চাই। কাজের ভাল মন্দ আছে!'

ওদিকে আর একপাশে সুকল্যাণ কাঠ হ'য়ে বসে কাজ ক'রছে। মনে হয় বড়বাবুর কথাগুলো যেন সে উপভোগ করছে। মনে মনে বলছে, কেমন মজা! পড়েছে কার পাল্লায়!

হঠাৎ যেন তারকবাবুর নজর পড়ে. সুকল্যাণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই যে, আপনি কি ক'রছেন? একেবারে এত শক্ত কাজ এ'কে দিয়েছেন? না না—'

সুকল্যাণ চোখ তুলে চাইলে. মৃদু-স্বরে বললে, 'আপনি দেখে দিয়েছেন!'

'আমি দেখে দিয়েছি! আর আপনারা একজনের ঘাড়ে যত পেরেছেন কাজ চাপিয়ে দিয়েছেন! খুব বিবেচনা আপনাদের! না, না, না—' খাঁমচি মেরে বাড়তি কাজগুলো যেন তুলে নেন তারকবাবু, 'নিন্‌-ন্‌ আপনারা করবেন!'

সুধাধারা অপ্রস্তুতের একশেষ! আবার একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি করলেন বড়বাবু! সব বিষয়ে ভদ্রলোকের খবরদারালি! সুধাধারা আস্তে বললে, 'আমিই করবো।'

তারকবাবু চটে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'নোঃ আই টেল্‌ ইউ আপনারা করবেন!'

শ্রুতিকটু, দৃষ্টিকটু উভয়তই। এ আর এক জ্বালাতন; দূরে থেকে দৃষ্টিক্ষেপের চেয়েও প্রাণান্তকর! সুধা কাউকে বোঝাতে পারে না, এতে তার অপরাধ কিছু নেই। বড়বাবু শুধু শুধু তাকে নিয়ে গোলমাল করছেন। কাজ শেখার জন্যে এমন কিছু আগ্রহ তার নেই, কোন সুপারিশই সে করেনি কোনখানে। বড়বাবু নিজে থেকে তাকে কাজের লোক করতে চাইছেন!

এদিকে সুকল্যাণই তাকে ভাবায় বেশি। তার পাশে বসাটাও যেন তার ইচ্ছে নয় আর, সব সময় যেন আমড়া খেয়ে আছে। বড় গম্ভীর হয়ে থাকে।
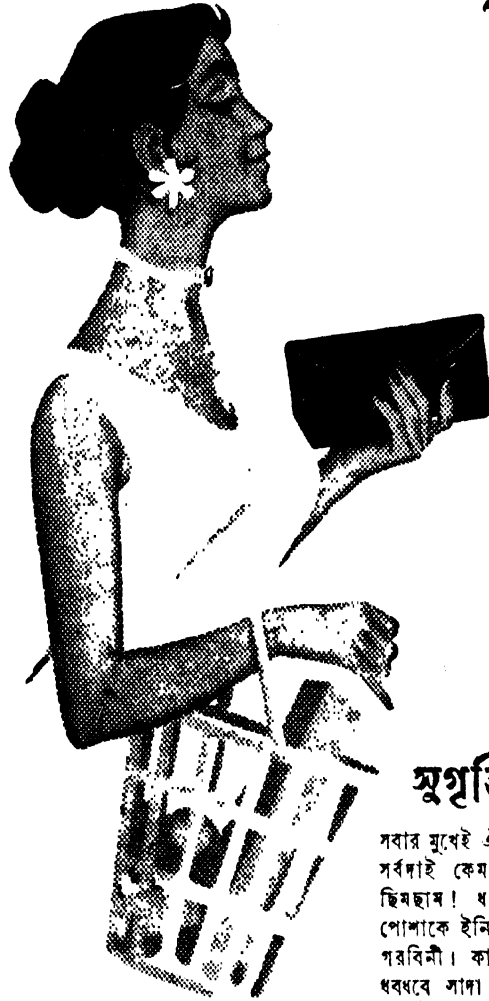
কথা কইতে ভয় করে। কাজের অছিলায় অনেকে [illegible] কাছে আসবার চেষ্টা করে নিজে থেকে পিছিয়ে গেছে সুধাধারা। তারও অভিমান হ'য়েছে, বেশ সে-ও কথা কইবে না, তারও অত বয়ে যায়নি কারো সঙ্গে যেচে পড়ে' কথা কইতে। অফিসে এসেছে কাজ করতে, কাজ করে চলে যাবে!

কিন্তু তবুও বার বার কাজের ফাঁকে সুকল্যাণের গম্ভীর মুখটা আড়চোখে দেখে নেয় সুধা। অভিমানটা একেবারে পর্দানসীন করে না। নিজেকেই সুধা দোষ দেয়, যেন সুকল্যাণের গম্ভীর হবার, কথা না কইবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাদের মধ্যে কেন সে বড়বাবুকে আসতে দিলে? তাকে কাজ দেওয়া নিয়ে বড়বাবু সুকল্যাণকে কথা শোনালেন? রাগ তো হ'বেই! সে হ'লেও রাগ করতো!

আবার নিজের পক্ষ নিয়েও সুধা সুকল্যাণের বিরূপতার কথা ভাবে। কোন কারণ নেই সুকল্যাণের গাম্ভীর্যের, শুধু শুধু অভিমান বা রাগ করে আছে। বড়বাবু এমন কিছু বলেন নি যা নিয়ে রাগ করতে হ'বে, কথা বন্ধ করতে হবে! সুকল্যাণেরই তো দোষ, কেন তাকে গোড়া থেকে উপযুক্ত কাজ দেয়নি? কি, চেয়েছিল কাজ না শিখে বোকাসোকা হ'য়ে থাকুক সুধা?

ঠিক আছে, অফিসে কে কার, কাজের সঙ্গেই সম্পর্ক, কাজ ফুরলে যে যার বাড়ি যাবে! অত কিসের!

কয়েকদিন মনকে শক্ত করে মাথা গুঁজে কাজ করলে সুধা, যেন কাজ ছাড়া চোখ-চেয়ে কিছু দেখবার তার সময় নেই। মাঝে মাঝে কাজ হ'য়ে গেলে উঠে গিয়ে বড়বাবুর টেবিলে রেখে আসে কাগজপত্র। বড়বাবু খুবই উৎসাহিত বোধ করেন, খুবই তারিফ করেন, 'বাঃ, এই তো চাই! একদিনে এতো! চমৎকার!'

তারকবাবুর প্রশংসাবাক্যে মাথা কিন্তু সুধার হেঁট হ'য়ে আসে। আরো আটজন সহকর্মী যেন বড়বাবুর কথাটা উপভোগ করছে, প্রশংসার বহর দেখে মনে মনে হাসছে। যেন বড়বাবু একটা শিশুকে ভোলাচ্ছেন!

বড়বাবুর টেবিলে কাজ রেখে সুধা তাড়াতাড়ি চলে আসতে চায়। বড়বাবু ছাড়েন না। সাগ্রহে বলেন, 'বসুন না, অনেক কাজ করেছেন!'

সুধাধারা চলে আসতেও পারে না, আবার বলতেও পারে না। ইতস্তত করে। তারকবাবু পাশের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'বসুন!'

সুধা মাথা নিচু করে অস্ফুটে বলে, 'বলুন!'

তারকবাবু মুখটা কাছে এনে ছোট করে বললেন, 'চা খাবেন?' যেন এ অবস্থাটা আর সহ্য করা যায় না, একটা কারণ থাকা চাই বড়বাবুর পাশে বিনা কাজে বসার, সুধা মাথা নাড়লে, মানে খাবে সে চা।

তারপর ট্রেতে করে চা আসতে সুধা চা তৈরী করলে। তারকবাবুকে এক কাপ চা এগিয়ে দিলে। অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে তারা চা খেলে। কাজের চাপে আর সবাই মাথা গুঁজে রইল, নিঃশ্বাস বন্ধ হ'ল।...

সুধাধারা দেখিয়ে দেখিয়ে কাজ করে, যখন-তখন এসে বড়বাবুর পাশে বসে। হাত-নেড়ে মাথা-নেড়ে কাজের চেয়ে অকাজের গল্পই যেন করে। তারকবাবুর চেয়ে সুধার আগ্রহ যেন আজকাল বেশি।

প্রশান্তবাবু আজকাল আর ডেকে কথা বলেন না, দেখা হ'লে কেবল হাসেন। ফোকলা দাঁতের হাসি বিশ্রী দেখায়। সুধা চোখ নামিয়ে নেয়। ফটিকবাবু, জয়ন্তবাবু, মাখনবাবু, প্রমথ-বাবু তাকে দেখে কি যেন ইশারা ক'রে চোখ টেপাটেপি করে। সুকল্যাণের তো কথাই নেই, লক্ষ্মণের মত প্রতিজ্ঞা করেছে মুখের দিকে তাকাবে না। উপায় থাকলে হয়তো নারী-সঙ্গ ত্যাগ করতো সে।

সুধাও দেখে নেবে। সেও দেখিয়ে দেখিয়ে প্রজাপতির মত নেচে-নেচে গিয়ে বড়বাবুর টেবিলে বসবে। বড়বাবুর সঙ্গেই ভাব করবে। তাতে লাভ আছে, ভবিষ্যৎ ভাল হবে।

কিন্তু প্রশান্তবাবুর হাসিটা, ওদের কথাকাটা, সুকল্যাণের গাম্ভীর্যটা মাঝে মাঝে কেমন যেন হুল ফোটায়, সুধাধারা জ্বালা বোধ করে। নিজের মনে অস্থির হয়ে ওঠে। সমবয়সী কেউ নেই যে তার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে হাল্কা হবে। যাও সুকল্যাণ ছিল সে তো অসহযোগ আরম্ভ করেছে। আর যারা সাতে-পাঁচে নেই তাদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা কওয়া নির্বুদ্ধিতা। কেবল বয়স্ক নয় কেমন যেন সব ভোঁদা ভোঁদা! ও'দের সঙ্গে আবার কি কথা কইবে সুধা? মনের কথা কি বলবে? কারো মাথায় টাক, কারো দাড়িতে পাক ধরেছে, কারো মাথার চুল শোন দড়ির মত হয়ে গেছে, কারো ভ্রূতে সাদা রেখা পড়েছে!

তারকবাবুর বয়স হয়েছে, কিন্তু এঁদের মতন এত বুড়ো দেখায় না। চুল অবশ্য তাঁর পেকেছে, কিন্তু আর কজন বুড়োর মত পড়ে যাবার অবস্থা হয়নি। বেশ আঁট-সাঁট, গোলগাল চেহারা বড়বাবুর!

প্রশান্তবাবু একদিন বলেছিলেন, 'তারক আমারই বয়সী, কিন্তু চেহারাটাকে বেশ রেখেছে!' এই বেশ-রাখার অর্থও ক'রে দিয়েছিলেন, "থাকবে না কেন, বিশ বছর তো আর কেরানীগিরি করতে হয়নি! হ'লে বুঝতো! অমন তুলতুলে চেহারা কখনো থাকতো?'

কার সংসারে কেমন ঝামেলা সে-কথা মাঝে মাঝে ওঠে। প্রায় সকলেই ফল-ভারে অবনত। লাউ-কুমড়োর মাচা। এখন কবে বলতে কার গাছ উপড়ে নতুন বীজ বপন করতে হয়! সেদিক থেকেও নাকি তারকবাবু ভাগ্যবান। সংসারে তার চ্যাঁ-ভ্যাঁ নেই। ছেলেমেয়েরা বড় হ'য়ে গেছে, গিন্নীর বয়স হ'য়েছে; মোট পাঁচটি প্রাণী—দুই মেয়ে, এক ছেলে, নিজে আর স্ত্রী।

প্রশান্তবাবু বলছিলেন, 'ওর কি, বাজার-হাট করতে হয় না, ছেলে ধরতে হয় না! এই তো অফিস থেকে যাবে আর চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে পড়বে, ইচ্ছে হ'লে খাবে নয় তো সারা রাত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে। চেহারা ভাল থাকবে না তো কি?'

বাকি কথাটা সুধার কানে এসেছিল, জয়ন্তবাবুকে প্রশান্তবাবু বলছিলেন, 'তারপর মাঝে মাঝে ঢুকু ঢুকু চালায়, চেহারা ওতেই ফুলে যায়! তোমার-আমার ভাতের সঙ্গে নুন জোটাই দায়!'

কথাগুলো নেপথ্যে হ'লেও সুধার কানে ঠিক পৌঁছয়। যত সে তারকবাবু-ঘেঁষা হয়, তত এ'রা কি ভেবে তারক-বাবুর কুলুজী বার করেন। একদিন ফটিকবাবু তো বললেন, 'বউটাকে ইচ্ছে করেই মারছে! অসুখ করেছে, চিকিৎসা করাচ্ছে না! বলে টাকা নেই!'

কতদিন তারকবাবুর স্ত্রীর অসুখ করেছে সে-খবরও সুধার জানা হ'য়ে গেছে। 'আট ন'মাস হ'য়ে গেল—বড়-বাবুর স্ত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন। সহকর্মীদের বদ্ধমূল ধারণা স্ত্রীকে তারকবাবু ইচ্ছে করেই ভাল ডাক্তার দেখাচ্ছেন না! নিজে মোটা তাই রোগা কাটির মত স্ত্রীকে পছন্দ হয় না। এখন মরলেই ভাল। আবার—

কথাটা আস্তে বললেও সুধাধারা শুনতে পায়। বুড়ো বয়সে নাকি তারক-বাবু পত্নী-বিয়োগ হ'লেই টোপর মাথায় দেবেন। ভদ্রলোকের খুব ইচ্ছে। জানে তো আর ক'দিন পরে অফিসার হ'বে, একটা কেন পাঁচটা বউ ইচ্ছে করলে পুষতে পারবে!

মন্তব্যটা এমন ক'রে করে যেন এর মধ্যে সুধাধারার কিছু কারসাজি আছে!

মনে মনে সুধাধারা সহকর্মীদের সঙ্গে লড়াই করে। দেখবে এই করে তারা কি করে বড়বাবুর সম্বন্ধে তাকে বিরূপ করতে পারে! বড়বাবু ওদের তুলনায় অনেক ভদ্র!......

দরজা খুলে দিয়ে সুধা তো অবাক হ'য়ে গেল। কেমন যেন চমকে উঠলো, 'আপনি'!

তারকবাবু আশ-পাশ পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'খুব অবাক হ'য়েছো তো? জানি হ'বে! কিন্তু দুদিন এলে না দেখে ভাবলুম, হয়তো অসুখ-বিসুখ করলো

নাকি......চলে এলুম। উঃ কম ঘুরতে হ'য়েছে, সাতরাজ্য পেরিয়ে তবে!'

সুধা দরজাটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে অভ্যর্থনা ক'রে বললে, 'আসুন! দেখবেন এইখানটায় একটা গর্ত আছে!'

তারকবাবু তখন কারণ দর্শাতে আরম্ভ করেছেন, 'তুমি তো কোনদিন এলে না, আমিই এলুম! তারপর কেমন আছ বল? একটা রিপোর্ট করতে হয় তো!'

সুধা পথ দেখিয়ে বললে, 'নিজের কিছু নয়, মা হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন, কাল আমি অফিসে যেতুম!'

'তা যাও, একটা খবর তো দেবে!' ভাবনা ধরে গিয়েছিল!' গর্তটা সামলে পাকা মেজের ওপর পা দিয়ে তারকবাবু বললেন, 'চল, তোমার মাকে দেখে আসি —কেমন আছেন?'

সংকুচিত সুধা বললে, 'ভাল! আপনার কষ্ট হ'ল!'

বড়বাবু সহাস্যে বললেন, 'তা একটু হল।'

পরের দিনই কথাটা রাষ্ট্র হ'য়ে গেল —বড়বাবু সুধার বাড়ি ধাওয়া করেছিলেন! এই এত খাবার-দাবার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন! খুব আত্মীয়তা করেছেন! আহা, এমন সজ্জন ব্যক্তি আর দেখা যায় না!

সেই ফোকলা দাঁতে প্রশান্তবাবু কথাগুলো চেপে চেপে বললেন, 'আরো কত দেখবে! ইনি গেছেন এবার উনি আসবেন!'

চারদিক চেয়ে ফটিকবাবু বললেন, 'মায়ের পায়ে হাত দিয়ে আবার পেন্নাম করেছেন! ভক্তিতে গদগদ!'

জয়ন্তবাবু ফিস্-ফিস্ করে বললেন, 'কই, শশীর মা-টা যখন মারা গেল, তারকবাবুর পাত্তা ছিল? শশীর ছুটি নিয়ে কি কান্ডটা করলে, মনে নেই?'

'শশী তো আর যুবতী নারী নয়।' মাখনবাবু মন্তব্য করলেন।

সুধা কিছুতে ভেবে পেল না, তার বাড়িতে তারকবাবুর আসাটা এরা জানলো কি করে। কে বললে? অফিসের দেওয়ালের না হয় কান আছে, লোকে বলে, কিন্তু বড়বাবুদের পিছনে পিছনেও কি চোখ-কান ঘুরে বেড়ায়? কে জানে!

বুড়োদের বিরূপ সমালোচনায় কিছু মনে করে না সুধাধারা। কিন্তু কথাটা সুকল্যাণের কানে গিয়ে সে কি ভাববে ভেবে সুধাধারা ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। কিছুতে সুকল্যাণের পাশ ছেড়ে ওঠে না, চোখে-চোখে রাখে পাছে সুকল্যাণ গিয়ে ওদের কথায় কান দেয়, কি কিছু বলে! সে বড় লজ্জার।

অনেকদিন পরে সুধা কাজের জন্য সুকল্যাণের সাহায্য চাইলে। সুকল্যাণ চোখ তুলে চোখ নামিয়ে নিলে। সুধা জড়িত কণ্ঠে আড়ষ্টভাবে বললে, 'এই জায়গাটা কি হ'বে বল তো, কিছুতে বুঝতে পারছি না।'

সুকল্যাণ আবার চোখ তুললে, আবার চোখ নামালে—তারপর কাগজখানা টেনে নিয়ে বললে, 'মায়ের অসুখ, কই আমায় তো কিছু বলনি?'

সুধাধারা আবোল-তাবোল কি সব বকে গেল, যার অর্থ খুব পরিষ্কার নয়। সুকল্যাণ বললে, 'বড়বাবু জানলেন কি করে?'

'উনি নিজে থেকে গেছলেন, আমি বলিনি!'

'ও।' সুধার কাজটা সুকল্যাণ করে দিলে।

সুধা বললে, 'তুমি এদের কথা বিশ্বাস কর?'

'কাদের কথা? কি কথা?'

'প্রশান্তবাবু, জয়ন্তবাবু, ফটিকবাবু এ'রা সব, আমাকে নিয়ে যা তা বলছেন?' কাঁদ-কাঁদ স্বরে সুধা বললে।

'না, না!' সুকল্যাণ হেসে উড়িয়ে দিলে, 'আর তো ও'দের কাজ নেই!'

'তুমি বিশ্বাস কর না?'

'না।'

'আমাকে বিশ্বাস কর?'

'করি।' সুকল্যাণ বললে, 'নাও নাও, বড়বাবু দেখছেন!'

রোগীর ঘরে ঢুকেই তারকবাবু বেরিয়ে এলেন। যেন ভূত দেখেছেন। পিছন পিছন সুধা বেরিয়ে এসে রোয়াকে দাঁড়াল। বললে, 'বস্‌বেন না?'

'না', রোয়াকের নীচে দাঁড়িয়ে বড়বাবু বললেন, 'ভাবলুম খবরটা তোমাকে দিয়ে যাই।'

সাগ্রহে সুধা জিজ্ঞেস করলে, 'কি খবর? বলুন না!'

'আমার প্রোমশন হ'য়েছে, কাল থেকে অফিসার হ'য়েছি।'

সুধা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললে, 'খুব ভাল, খুব ভাল! খাইয়ে দিন!'

তারকবাবু বিরক্তির কারণ আর চাপতে পারলেন, বললেন, 'ও কখন এল?'

সুধা বুঝলে কে। অপরাধীর মত বললে, 'এই একটু আগে!'

গম্ভীর হ'য়ে তারকবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'রোজ আসে বুঝি!'

সুধা ইতস্তত করলে। তারকবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সুকল্যাণ তোমার কেউ হয় বুঝি?'

'না, অফিসের বন্ধু! মার অসুখে উনি আমাকে খুব সাহায্য করেছেন।'

'ও।' তারকবাবু আর দাঁড়ালেন না।......

অফিসার হ'য়ে ঘেরা-ঘরে ঢুকে তারকবাবু সুধাকে যখন-তখন সেলাম দিয়ে পাঠান। সুধা যায় আসে, গম্ভীর হ'য়ে নিজের সিটে এসে বসে কি যেন ভাবে। বেশ ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়। সুকল্যাণ আর পাশে নেই, অন্য ঘরে চালান হ'য়ে গেছে, তারকবাবুই সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা, পাশাপাশি দুজন অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে বসে কাজ করা মানে কাজের ক্ষতি করা। বড়সাহেবও তাই বিশ্বাস করেছেন।

একদিন টিফিনের সময় করিডরে দেখা হ'তে সুধাধারা কাঁদন-মাদন হ'য়ে বললে, 'তুমি বেশ আছ! আমি তো আর পারি না!'

'কেন কি হ'য়েছে?'

'আমাকে জ্বালাতন করে মারলে! রাতদিন ঘ্যান ঘ্যান করছে।'

'করুক না, কতদিন আর করবে?'

'তারপর কিছু হ'লে, আমি কিন্তু জানি না।'

'কি হ'বে?'

'জানি না, তুমি কি কিছু বুঝবে না?'

'যা বোঝবার তা তো বুঝেছি, একটু ধৈর্য ধর লক্ষ্মীটি!' সুকল্যাণ সুধার হাত ধরতে গেল, সুধা প্রশান্তবাবুকে দেখিয়ে সরে গেল।......

কয়েকদিন পরে সুধা তারকবাবুকে নেমন্তন্ন ক'রতে এসে কাটা দরজা ঠেলে থমকে গেল। দেখলে, তার আগে সুকল্যাণ তাদের বিয়ের চিঠি দিয়ে গেছে। তারকবাবু চিঠিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছেন। সাড়া পেয়ে তারকবাবু চোখ তুলে বললেন, 'আসুন।'

সুধা বসতে বললেন, 'মিস্ মিত্র, আমি খুব দুঃখিত আপনাদের বিয়েতে যাওয়া হ'বে না। আমার অশৌচ, কাল আমার স্ত্রী মারা গেছেন। উইস্ ইউ গুড লাক!'

সুধা সমবেদনা জানালে, 'অনেকদিন ভুগছিলেন!'

হঠাৎ তারকবাবু চোখ মুছলেন, উঠে আসতে আসতে সুধা ভাবলে, ভদ্রলোক বুড়ো বয়সে স্ত্রী-বিয়োগে খুবই বিচলিত হ'য়েছেন, হওয়াই স্বাভাবিক! তাই কাঁদছেন?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও সুধাধারার মনে হ'ল, তারকবাবু রাতারাতি প্রশান্তবাবুর চেয়ে বুড়ো হ'য়ে গেছেন, মাথার চুল সব সাদা হ'য়ে গেছে!

কিন্তু কারণটা কি, সুধা ভাবলে, ও'র স্ত্রী-বিয়োগ, না তাদের বিবাহ?

সাহিত্য: শিল্প: ফ্যাশান

প্যারিস থেকে বলছি

দিলীপ মালাকার

প্যারিস, সেপ্টেম্বর—দুই-এক বছর অন্তর প্যারিসে দেখি নতুন হুজুক। কখনো চলে তরুণ সাহিত্যিকদের নিয়ে, কখনো বা নতুন শিল্পীদের নিয়ে। বছর দেড়েক ধরে নতুন হুজুগ উঠেছে এখানে তরুণ গায়কদের নিয়ে। সংবাদপত্রে, রেডিও-টেলিভিশনে এদের নিয়ে প্রতিদিন সংবাদ রচিত হচ্ছে। এরা যেখানেই গান গাইতে যায় সেখানে তরুণ শ্রোতার দল আনন্দে আত্মহারা হয়ে সিনেমা থিয়েটারের চেয়ার ভেঙে হয় খণ্ড যুদ্ধ বাঁধায় নয়তো ওখানেই গায়কের সাথে গলা মিলিয়ে গান ও নাচ জুড়ে দেয়। তরুণ গায়করা কেউই বিশের কোঠা পেরোয়নি আর তাদের শ্রোতার দল আট-দশ হতে ষোল কি আঠার। এদের নিয়ে অনেক গুরুজন বেশ চিন্তিত। আবার কেউ বলছে ওটা ওদের যুগ। বুড়োদের যুগ ফুরিয়েছে। বালখিল্যদের যুগ চলেছে।

১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দেখেছি ফ্রান্সে তরুণ সাহিত্যিকদের যুগ। অষ্টাদশী ফ্রাসোয়াঁ সাগ' ও আট বছরের মিনু দ্রুয়ের সাহিত্য নিয়ে তখন চলছিল বেশ হুজুগ। সে হুজুগের যবনিকা যেই পড়ল অমনি শুরু হল ফরাসী সিনেমা মহলে 'নুভেল ভাগ' বা নতুন ঢেউ দলের আবির্ভাব। ফরাসী সিনেমা-শিল্পে আসে কতিপয় তরুণ শিল্পী ও পরিচালক। শিল্পী ও পরিচালকদের বয়স বিশের কোঠায়। শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী ব্রিজিত বার্দো তখন ফরাসী যুব মহলের 'আইডল' বা দেবী।

ফরাসী সিনেমা জগতে 'নুভেল ভাগ' দলে একটু ভাঁটা পড়তেই দেখা গেল তরুণ গায়কদের আবির্ভাব। তরুণ গায়কদের অধিকাংশের বয়স ষোল থেকে বিশ। এই দলের নেতা হচ্ছে জনি হ্যালিডে। জনি হ্যালিডের বয়স এখন মাত্র বিশ। দুই বছর আগে অর্থাৎ আঠার বছরে যখন তার গানের রেকর্ড বাজারে বেরুল তখন ভীষণ হৈচৈ। এইসব তরুণ গায়করা কেউ উচ্চাঙ্গের সংগীত গায় না। কোনো বাধাধরা সংগীতের নিয়ম-কানুন এরা মেনে চলে না। প্রধানতঃ এদের হাতিয়ার হল গীটার, তার সংগে কেউ তবলা জাতীয় যন্ত্র বাজিয়ে সংগত করে। অধিকাংশ গায়ক নিজেই সংগীত রচনা করে। তবে এদের গানের বৈশিষ্ট্য হল আমেরিকান জ্যাজ ধর্মী সুরে গলা ফাটিয়ে, নেচে-ঘেমে, শুয়ে বা লাফিয়ে গান গাওয়া। এইসব ভাবভঙ্গি দেখে তরুণ শ্রোতারা উন্মত্ত নৃত্যে যোগ দেয়। গান গাওয়ার সংগে চলে শারীরিক কসরৎ। অধিকাংশ শ্রোতার বয়স আট-দশ থেকে ষোল-আঠার। তাদের কাছে সংগীতশিল্প যতখানি নয় তার চেয়ে বেশী হল খেলা-ধুলো। ওরা এটাকে খেলাধুলোর সামিল মনে করে বলেই এত ভালবাসে তরুণ গায়কদের। তার ওপর শ্রোতাদের সমবয়সী হচ্ছে গায়কের দল। এরা বলে যে, বুড়োরা তরুণদের মন ভাল করে বুঝতে পারে না। তরুণ গায়করা তাদের মনের কথা গানে প্রকাশ করে বলেই তাদের কাছে তারা এত জনপ্রিয়। এদের জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ হল গুরুজনরা তাদের বিরুদ্ধে নয় বলে। অনেক বৃদ্ধদের কাছে শুনেছি যে, এদের গানে ও নাচে ছেলে-ছোকরাদের বেশ ব্যায়াম হয়। গানের কোনো মাথা মুণ্ডু নেই, 'ইয়ে-ইয়ে-ইয়ে' বলে চেঁচান বা অন্য একটা শব্দ নিয়ে চেঁচান আর তার সংগে 'টুইস্ট' নাচ নাচা। টুইস্ট নাচে পেটের ভাত হজম হয় ভাল, ব্যায়াম হয় বেশ। নাতিদের পাল্লায় পড়ে অনেক ঠাকুরদাদের এই গান হজম করতে হয়। মায় ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্যগল পর্যন্ত এইসব বালখিল্য গায়কদের তারিফ করতে বাধ্য হয়েছেন পাল্লায় পড়ে। দ্যগলের তিনচার নাতি-নাতনী যাদের বয়স আট-দশ থেকে চোদ্দ-পনর তারা নাকি নিয়মিত তাদের প্রিয় তরুণ গায়কদের গানের রেকর্ড বাজিয়ে শোনায়। ফলে দ্যগল তাঁর নাতিদের সমর্থন না করে যান আর কোথায়। এইভাবেই তরুণ জ্যাজ ও টুইস্ট নাচের গায়কেরা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এদের গানের খদ্দের আবার তরুণেরাই। এদের এক-একটা গানের রেকর্ড বিক্রি হয় লাখ-লাখ। তাই আজ তরুণ গায়কেরা লক্ষপতি নয় কোটি-পতি। যে সব তরুণ গায়ক বিশেষ জনপ্রিয় তাদের মধ্যে হচ্ছে জনি হ্যালিডে, সিলভি বার্তাঁ, ফ্রাঁসোয়াজ হার্দি, শিলা ও আরও অনেকে। জনি হ্যালিডের বয়স এখন কুড়ি এবং মাসে

কবি জাক্ প্রেভের থেকে রঙিন ছবি কাটছেন

শ্রীমান জনি হ্যালিডে ও কুমারী সিল্ভি বার্তা

এর আয় পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। সে শুধু রেকর্ডে গান নয় সিনেমা-থিয়েটারে ও ফ্রান্সে বা বিদেশে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে বেড়ায়। সিল্ভি বার্তা, ফ্রাসোয়াজ হার্দি ও শিলা এরা তিনজনেই মেয়ে এবং ষোড়শী। এদের নিয়ে আজকাল সিনেমা তোলাও হচ্ছে। এরা এখনও ইস্কুলের ছাত্রী। এদের আয় মাসে দশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা। মাসখানেক আগে সিল্ভি বার্তার গানের পর তরুণ শ্রোতারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে সিনেমা হলের সব চেয়ার ভেঙেছে। ফ্রান্সের অনেক ছোট শহরের পৌর-পিতারা তাঁদের শহরে এদের গানের আসর যাতে না জমে তার জন্যে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তারা বলে যে, ছোট শহরে সিনেমা-থিয়েটার হল নেই সুতরাং গানের আসর বসাতে হয় পৌরপ্রতিষ্ঠানের হলঘরে। আর প্রায়ই গানের আসরে তরুণ শ্রোতারা নাচতে নাচতে চেয়ার-টেবিল ভাঙে। এই কারণেই আজকাল ছোট শহরে এদের গানের আসর নিষিদ্ধ। এই নিয়ে আজকাল বিভিন্ন সংবাদপত্রে চলছে সমালোচনা। কেউ তাদের পক্ষে কেউবা তাদের বিপক্ষে। এরাই হল একালের ফরাসী তরুণ মহলের 'আইডল' বা পূজনীয় দেব।

* * *

ইউরোপের যে কোনো একটি দেশে কোনো একটা হুজুক উঠলেই তার ঢেউ এসে লাগে অন্য দেশগুলোতে। ফ্রান্সের মতন বৃটেন, জার্মানী ও ইতালিতেও চলছে এখন তরুণ গায়ক দলের উপদ্রব। লন্ডনে শীলা নাম্নী ষোড়শী ট্যুইস্ট নাচের গান গেয়ে রাতারাতি শুধু জনপ্রিয় নয় লাখপতি হয়ে গেছে। মাস-খানেক আগে আমিই তো দেখলাম পশ্চিম জার্মানীতে তরুণ গায়ক দলের দৌরাত্ম্য। রেকর্ডের দোকানে তরুণ গায়ক দলের রেকর্ডে আর ছবিতে ভরে গেছে।

তবে এইসব দেশে আজকাল ছেলে-মেয়েরা শুধু নাচ-গান নিয়েই মেতে নেই। তাদের অন্য দিকটাও দেখবার মতন। যেমন ধরুন পশ্চিম জার্মানীতে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা। বিদ্যালয় পত্রিকা সম্পাদনা ও পরি-চালনা করে মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা স্বাধীনভাবেই। শিক্ষকরা শুধু পরামর্শ দিয়েই খালাস। এই ধরনের পত্রিকার সংখ্যা এক পশ্চিম জার্মানীতে

সাহিত্যিক জ' কক্‌তোর আঁকা ছবি থেকে ডাকটিকিট

৮৭৬টি। এদের মধ্যে অধিকসংখ্যক প্রকাশিত হয় উচ্চ বিদ্যালয় হতে। উচ্চ বিদ্যালয়, টেকনিকাল স্কুল, কমার্সিয়াল স্কুল থেকে প্রকাশিত পত্রিকাই বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। দশবারজন ছাত্রের সম্পাদকীয় দল চালায় এই পত্রিকা-গুলো। তাতে মাত্র একজন শিক্ষক থাকেন উপদেষ্টা হিসাবে। এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশিত হয় বছরে ছয়টি বা নয়টি সংখ্যা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। এই পত্রিকাগুলো হাতে লেখা নয়। ছাপা হয় সাধারণতঃ হাজার থেকে দেড় হাজার কপি। পত্রিকায় থাকে অসংখ্য ছবি। ছাত্ররা লেখে বিদ্যালয়ের পড়া-শোনা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু নিয়ে, ভ্রমণকাহিনী, দল বেঁধে বেড়ান বা চড়ুইভাতির বৃত্তান্ত, ইস্কুলের খেলা-ধুলোর খবর, ছাত্র-ছাত্রীদের সান্ধ্য সম্মেলন বা নাচের খবর। কোনো লেখক-বিশেষের লেখা ছাপা হয় না। সব কোনো ছাত্র চিঠির আকারে লিখে চিঠির মতন সম্পাদকীয় চিঠির বাক্সে ফেলে দেয়। সেই চিঠি বা প্রবন্ধ সংগ্রহ করে সম্পাদকমণ্ডলী বেছে ছাপে তাদের পত্রিকায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পত্রিকা আরও কৌতূহলজনক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে লেখকরা তাদের গোটা গোটা করে লেখা ও ছবি আঁকে 'লিনোলিয়াম্‌ ম্যাটে'র ওপর। সেটাকে ব্লক করে ছাপা হয় কাগজে। এক একজনের হাতের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে কবিতা, গান ও ছবি-ছড়া যখন ছেপে বের হয় তখন সেগুলো দেখবার মতন। এদের কাগজে কোনো বাধানিষেধ, আইনকানুন নেই। যে যা খুশী লিখতে পারে। তবে শিক্ষকরা ছাপাটাপার ঝামেলা পোহায়। এদের পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা যেমন কম তেমনি প্রচার সংখ্যা।

গ্রে প্রতিষ্ঠানের পোশাকের নমুনা

গ্রীষ্মকালে ফরাসীরা প্যারিসে বসে কড়ি কাঠ গোনে না। তারা দলে দলে বেরোয় গ্রামের দিকে, সমুদ্রোপকূলে অথবা পাহাড়ে। প্রকৃতিদেবীর সৌন্দর্য তারিফ করতে শুধু নয়, রোদ পোহাতে। যাদের মনিব্যাগ বেশ মোটা, তারা দু'-তিন মাস কাটায় দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে। যার নাম রিভিয়েরা। যেসব ফরাসী শিল্পী-সাহিত্যিক নাম-যশ-অর্থ করেছেন, তাঁরাও যান ছুটি কাটাতে ফরাসী রি ভি য়ে রা তে।
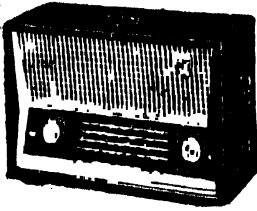
সাহিত্যিকরা ওই সময়ে শুয়ে-বসে লেখেন গল্প-উপন্যাস আর চতুর আর্টিস্টরা ছবি যেমন আঁকেন, তেমনি করেন ছবি বিক্রী। রথ দেখা ও কলা বেচা দুই চলে। কারণ, শুধু প্যারিসের ধনী সম্প্রদায় নয়, দেশ-বিদেশের ধনপতির দল আসে রিভিয়েরায় ছুটি কাটাতে। তাই প্যারিসের আর্ট গ্যালারীর মালিকরা ওই সময়ে নিস্, কান্, আণ্টিব বা অন্য সব সমুদ্রোপকূলবর্তী শহরগুলোতে খোলেন তাঁদের দোকান। ওই সব আর্ট গ্যালারীতে শুরু হয় খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা চিত্র প্রদর্শন এবং চড়া দামে বিক্রী হয় সেই সব ছবি। কারণ, সেখানে তারা পায় ধনপতিদের।

আজকাল পিকাসো বাস করেন রিভিয়েরায়। তাঁর আঁকা ছবি আজকাল সচরাচর প্রদর্শিত হয় না প্যারিসে। হয় তাঁর গ্রামের বাড়ীতে, নয়তো আণ্টিবে বিক্রী হয়। যাদের গরজ তারা ওখানে গিয়ে কেনে। এ-বছরের আগস্ট মাসে আণ্টিব শহরের মিউজিয়মে হয় দুটো উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী। প্রথমটি হল পিকাসোর, আর দ্বিতীয়টি পিকাসো-বন্ধু ও খ্যাতনামা ফরাসী কবি জাক্ প্রেভর-এর চিত্র প্রদর্শনী। প্রেভর প্রদর্শনী অন্য রকমের। ইনি ছবি আঁকেন নি। পত্র-পত্রিকা থেকে রঙ্গীন ছবি কেটে অন্য ছবির ওপর জোড়াতালি দিয়ে বিস্ময়কর জিনিস সৃষ্টি করেছেন। কবি মানুষ, তাই তাঁর চিন্তার অভাব নেই। অধিকাংশ ছবিগুলো কাব্যিক। যেমন ধরুন প্যারিসের সেইন নদীর ওপর শুয়ে আছে উনবিংশ শতাব্দীর কোনো সুন্দরী রমণী। এমনি ধরনের গোটা-ত্রিশেক ছবি স্থান পেয়েছে প্রেভর প্রদর্শনীতে। জাক্ প্রেভর ফরাসী সাহিত্যে সম্রাট। কবি হিসেবে তাঁর স্থান ফরাসী সাহিত্যে সুধীন দত্ত বা বিষ্ণু দে-র মতন। এঁর একটি কবিতার বই "লে পারোল" যখন প্রথম ছাপা হয় পাঁচ হাজার কপি, তখন প্রকাশক আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর সেই বই বিক্রী হয় যথাক্রমে এক লাখ, দুই লাখ আর বর্তমানে পকেট সংস্করণ বিক্রী হয়েছে চার লাখ। জাক প্রেভর শুধু খ্যাতনামা কবি নন, তিনি জনপ্রিয়। একালের যুব মহলে তিনি অতি-পরিচিত। এর আগে অনেক ফরাসী লেখকই তুলি ধরেছেন। তবে একালের লেখকদের মধ্যে ছবি এঁকে নাম করেছেন জঁ কক্তো। জঁ কক্তোর আঁকা ছবি থেকে তো ফরাসী সরকার ডাক-টিকিট বাজারে ছেড়েছেন। জঁ কক্তো দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি ছোট গীর্জার অভ্যন্তরে দেয়াল-চিত্র এঁকেছেন বছর ছয়েক আগে।

গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে আসছে। ফরাসীরা এখন প্যারিসে প্রবেশ শুরু করেছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে অর্থাৎ জুলাই মাসের শেষে হয়েছে প্যারিসের পোশাক-বিলাসীদের দোকানে ফ্যাসান প্যারেড। প্রতি বছর এই সময়ে থাকে শীত-কালীন পোশাকের প্রদর্শনী। জুলাই মাসে শীতকালীন পোশাকের প্রদর্শনী হয় বটে কিন্তু তার ছবি ছাপা হয় না ওই সময়ে কোনো পত্রিকায়। তার এক মাস পরে পত্র-পত্রিকায় সে-সব ছবি ছাপা হয়। আগস্টের শেষ সপ্তাহে প্যারিসের সব পত্র-পত্রিকায় পোশাক প্রদর্শনী বা 'কলেক্শিয়ঁ'-র ছবিতে পৃষ্ঠা ভরে গেছে। যেসব বড় বড় পোশাক প্রতিষ্ঠান তাদের সমিতির সদস্য যেমন, ডিয়র, বালমাঁ, বালাসিয়াগা, গ্রে, স্যাঁলির, কার্ডাঁ, রিশি, লভ্যাঁ, হাইম এদের পোশাকের ছবি প্রদর্শনীর পরেই কোনো কাগজে ছাপা হয়নি। যেসব প্রতিষ্ঠান সমিতির সদস্য নয় বা নতুন কিম্বা তেমন নামজাদা নয়, যেমন ইয়র্ন, এস্তেল প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীর আগে এবং মধ্যেই নানা পত্রিকায় তাদের ছবি ছেপেছে। এগুলো সমিতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। এবারকার শীতের পোশাকের বিশেষ পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে নানান্ রকমের ফারকোট ও পশুর চামড়া। মায় চিতাবাঘের চামড়া পর্যন্ত। প্যারিসের পোশাক-বিলাসের ব্যবসা বড় মজার ব্যবসা। একটা হুজুক তুলে ব্যবসায়ীরা পোশাক-বিলাসিনীদের প্রচুর টাকা জলের মতন ব্যয় করিয়ে দেয়। আর মহিলারা তাতে পান পরম তৃপ্তি।

শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প : (শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র)

আদুরে খোকা

জন ফ্ল্যানেগান

রাত তখন দুটো।

টেলিফোন এল শিকাগোর সীমানা ঘাঁটি থেকে। রাইটউড এভিন্যুতে ছোট্ট একটা পানাগারে এইমাত্র একটা রাহাজানি হয়ে গেল। টেলিফোনেই ঘটনাটার খুঁটিনাটি বিবরণ শুনলাম কর্তব্যরত সার্জেন্টের কাছ থেকে।

জায়গাটা শহরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। কাজেই চট করে একটা গাড়ী নিয়ে ঝটিতি পেঁছে গেলাম অকুস্থলে। গিয়েই দেখা হয়ে গেল মার্টিন চৌয়ানস্কির সঙ্গে। দারুণ উত্তেজনায় প্রায় লাফাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। ধড়ে যে তখনও প্রাণটা রয়ে গেছে, এ জন্যেও আনন্দের অবধি ছিল না তাঁর। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের এবং সেই বৃত্তান্তই আমাকে বলতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

"দুটো বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকী। দোকান বন্ধ করবো করবো ভাবছি, এমন সময়ে একটা লোক এসে হাজির। লোকটাকে আমি চিনিই না। ঠিক বন্ধের মুখে হুট করে আসার জন্যে মেজাজ খিঁচড়ে গেল আমার। তাই সাফ বলে দিলাম, চটপট এক ঢোক গিলেই বিদেয় হতে হবে। কেননা, পানাগার বন্ধ করে দিচ্ছি আজ রাতের মত। খদ্দের বেশী ছিল না তখন। কপোত-কপোতীর মত একটি যুগল মুর্তি আর মেডার্ড বসাকি। মেডার্ড বসাকিকে তো আপনি চেনেনই। উনিও তো পুলিশ অফিসার। আজ রাতে ও'র কোনো ডিউটি ছিল না।

"লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম কি ধরণের সুরা তাকে দেব। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর-টুত্তর না দিয়ে ফস করে এক জোড়া রিভলবার বার করে আমার দিকে তাগ করে ধরলো সে। আর তারপরেই এক হুংকার—"টাকাগুলো বার করে দিলে কি রকম হয়?"

"শুনেই বসাকি হাত বাড়ালেন তাঁর রিভলবারের দিকে। লোকটা কিন্তু ভারী হুঁশিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে যেন কিছুই হয় নি এমনি স্বরে বলে উঠল— "আপনি বরং ওটা টেবিলের
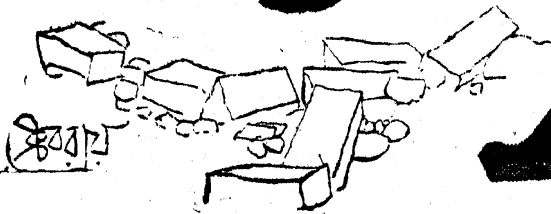
ওপরেই রেখে দিন। তা না হলে আজ রাত্তেই একজনকে অক্কা পেতে হবে।"

"আমিই বললাম বাসাকিকে—'শুনুন, শুনুন, রিভলবারটা সরিয়েই রাখুন। আমি চাই না খামোকা একটা খুনোখুনি হয়ে যাক এখানে। নগদ যত টাকা আছে, তা না হয় ওকে দিয়ে দিচ্ছি আমি।'

"কথা শুনলেন বসাকি। গোঁয়াতুর্মি করলেন না। বাস্তবিকই, আমাকে অথবা অন্য কাউকে বিপদে ফেলার ইচ্ছে তো ও'র ছিল না।

"বন্দুকধারী এবার বসাকিকেই উদ্দেশ করে বললে—'ভালো মানুষের মত রিভলবারটা আমার দিকে ঠেলে এগিয়ে দিন দিকি মশাই।' কথার সংগে সংগে ক্লিক করে শব্দ হলো ওর দুটো রিভলবারেই।

"প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলাম লোকটা এ কে বা রে ই নিরুত্তেজ, নিরুদ্বেগ আর সংহত। বসাকি রিভলবারটা বারের টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিলে পর নির্বিকার-ভাবে লোকটা তা তুলে নিয়ে গ‍ুঁজে রাখলে নিজের পকেটে। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললে—'এবার স্মার্ট ছেলের মত চটপট টাকা-কড়িগুলো বার করে দিন তো! সবুজ রঙের যা কিছু নোট-ফোট আছে, তাই দিন। খুচরা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

"বাক্যব্যয় না করে কড়কড়ে আটটা ডলার তুলে দিলাম লোকটার হাতে। টাকাটা পকেটস্থ করেই এক দৌড়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল সে।"

বসাকি এর পর এক মুহূর্তের বেশী সবুর করেন নি। কিন্তু আততায়ী তাঁর চাইতে অনেক বেশী ক্ষিপ্র। কাজেই পথে বেরিয়ে লোকটার টিকিও দেখতে পান নি বসাকি। রাস্তায় শুধু তাল তাল অন্ধকারই ছিল না, ছিল অজস্র আঁকাবাঁকা সরু গলি। যে কোন একটার মধ্যে ঢুকে সটকান দেওয়া এমন কি আর কঠিন কাজ।

আমি আসার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন বসাকি। খুব শীগগিরই তাঁর সংগে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও কম। তবুও বন্দুকধারী আগন্তুকের নিখুঁত দৈহিক বর্ণনা পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না আমাকে। লোকটা ধূমকেতুর মত যখন ঢুকে পড়ে মদ্যশালায়, তখন যে তরুণ-তরুণী দুটি ছিল ঘরের মধ্যে, তাদের কাছ থেকে এবং চৌরানঙ্কির মুখে যা শুনলাম, তা থেকেই লোকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল মনের চোখে। বয়সে সে যুবাপুরুষ, কালো-কালো এক মাথা চুল, ছিপছিপে চেহারা—দেখতেশুনতে মন্দ নয়। পরনে তার কালো প্যান্ট। খাটো হাতা স্পোর্টস শার্টটা প্যান্টের ওপর এমন-ভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছিল সে যে বেল্টে গোঁজা রিভলবার দুটো তাইতেই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

বসাকি আসার আগেই বেশ বুঝেছিলাম লোকটাকে। বসাকির কাছে পরে শুনলাম লোকটার চেহারার আর এক দফা বর্ণনা। আর এ রকম হরিণের মত দৌড়োতে নাকি তিনি এর আগে আর কাউকে দেখেন নি। ঘাঁটিতে বসে এ সম্বন্ধে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হলো আমাদের মধ্যে। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল ফুলের তারিখ দেওয়া আমার রিপোর্টটাও সংগে ছিল। লেফটেন্যান্ট ফ্র্যাঙ্ক পেপে রিপোর্টটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে এক কথায় বলে দিলেন এ অপকর্ম কোন্ মহাপ্রভুর।

বললেন—"এ কাজ ঐ বোম্বেটে কার্পেন্টার ছোকরার। এই নিয়ে সত্তর-বার হলো। কিন্তু ওকে আমি বার করবোই। এই যদি আমার জীবনের শেষ গ্রেপ্তার হয়, তাহলেও জেনো, ওর রেহাই নেই।"

বাস্তবিকই রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন ফ্র্যাঙ্ক পেপে। ঝানু অফিসার হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা তো বড় কম নয়। সহকর্মীরা তাঁকে যেমন ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো ঠিক তেমনি তাঁকে যমের মত ভয় করতো আর দুচক্ষে দেখতে পারতো না শিকাগোর অপরাধ-দুনিয়ার বাসিন্দারা। বেশ কয়েকবার গুলি-গোলা চলেছিল পুলিশ আর শহরের গুন্ডাদের মধ্যে। ফ্রাঙ্ক পেপে কিন্তু লড়াই-অন্তে এমন আটজন মূর্তিমানকে শ্রীঘরে পাঠিয়ে-ছিলেন, খুন-জখম আর ডাকাতির জন্যে যারা কুখ্যাত।

পেপের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হলে 'পর ফিরে এলাম আমার অফিসে। বার করলাম রিচার্ড কার্পেন্টারের ইয়া মোটা ফাইলটা। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে লোকটাকে খুঁজছি আমরা। উচ্চতায় সে পাঁচ-ফুট এগারো ইঞ্চি। ওজন ১৬৫ পাউন্ড। মাঝে মাঝে গোঁফ রাখে। কোটরে-বসা চোখ। বয়স ছাব্বিশ বছর। বিস্তর ডাকাতির মামলা ঝুলছে তার নামে। কিন্তু গত পনেরো মাস যাবৎ আরও ঘন ঘন আর বেশী সংখ্যায় রিপোর্ট আসা শুরু হয়েছে। তার কীর্তিকলাপের ধরণ দেখে মনে হয় শিকাগো শহরের বাইরে সে কোন দিনই যায় নি। মুদীখানা, পেট্রোল পাম্প, পানাগার, হোটেল, লন্ড্রী ইত্যাদি ছোটখাটো জায়গায় ক্ষমতা জাহির করেই খুশী সে। ছদ্ম-বেশ ধারণের প্রচেষ্টা কোন দিনই করে নি কার্পেন্টার এবং একলা কাজ করাই পছন্দ করে সে। এখনও কাউকে সে যমালয়ে পাঠায়নি বটে, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস একদিন না এক-দিন সে তা করবেই।

অনেক তথ্যই জানা গিয়েছিল ওর সম্বন্ধে। প্রতিবারেই ক্যাশ লুঠ করার সময়ে হুমকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল দুটো বার করে ফেলে ও। তারপর কোনো গাড়ীর সাহায্য না নিয়েই চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যায় নগদ সমেত। দারুণ চটপটে সে। দৌড়োতেও পারে হরিণের মত অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে। এবং যেখানেই তার আবির্ভাব হোক না কেন, রিভলবার দুটো সব সময়ে তার সংগে থাকবেই। ভয় দেখাবার জন্যে পিস্তলের হ্যামার ঠুকে ক্লিক্ ক্লিক শব্দ করাও তার আর একটা নিয়মিত নষ্টামি। বাঁধাধরা সূচি অনু-সারেই কাজ চালিয়ে যায় কার্পেন্টার। দেখা গেছে, প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ ডলার দরকার পড়ে ওর। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো জায়গায় চড়াও হওয়ার পর যদি একশো ডলার হাতাতে পারে কার্পেন্টার, তাহলে অন্ততপক্ষে চারদিন আর কোনো উৎপাত করতে শোনা যায় না ওকে। আবার কখন-সখন যদি এর দ্বিগুণ অর্থ পকেটস্থ করতে পারে, তাহলে তো পুরো এক হপ্তা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে জিরিয়ে নেয়। মদাশালায় তার আবির্ভাব ঘটে শুধু রাত্রে—দোকান বন্ধ করার সময়ে। কেননা, এই সময়ে ক্যাশে যত টাকা জমা পড়ে, তত টাকা সারা দিনে অন্য কোনো সময়ে পাওয়া সম্ভব নয়। কোনো কোনো পানাগারে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সামনে বিয়ারের গেলাস নিয়ে ঝিমুতে থাকে ও। তারপর কাজ হাসিল করার পরেই গেলাসটি চুরমার করে দিয়ে যায় যাতে তার আঙুলের ছাপ গোয়েন্দাদের হাতে না পড়ে।

এইভাবে যাদের সিন্দুক ও হাল্কা করেছে, তাদেরই একজনকে দিব্বি শান্ত-ভাবে বলেছিল কার্পেন্টার—'আরে মশাই নিজের মগজ খাটান। উত্তেজিত হবেন না, নার্ভাসও হবেন না। দেখতেই তো পাচ্ছেন কি রকম স্থির আমি। আপনাকে পরলোকে পাঠানোর কোনো সদিচ্ছাই নেই আমার। কাজেই আমার মতই নির্বিকার থাকুন। তবে, চালাকি দেখলেই আপনার ঐ আস্ত মগজে একটা ফুটো করে দিতে এতটুকু দ্বিধা আমি করব না।' আর এক মদের দোকানের মালিকের কাছে শুনেছিলাম, কার্পেন্টার নাকি ক্যাশ থেকে তিনশো ডলার হাতিয়ে নিয়ে উধাও হওয়ার পরেও খদ্দেররা বিন্দুবিসর্গ টের পায়নি। পুলিশ আসবার পরে টনক নড়ে তাদের।

একবার ক্যাশ লুঠের পরেই একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারকেও আশাহত করেছিল কার্পেন্টার। ড্রাইভারকে ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে যে, একটা মারমুখো লোকের কাছ থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে

চাইছে সে। স্ত্রীর শোবার ঘরে নাকি কার্পেণ্টারকে দেখতে পেয়েছিল লোকটা। তাই তার রক্তদর্শন না করলে নাকি স্বামী ভদ্রলোক শান্ত হবে না। কাজে কাজেই যত তাড়াতাড়ি এ অঞ্চল থেকে সটকান দিতে পারে সে, ততই মঙ্গল। ড্রাইভার ভাবলে বুঝি সত্যি সত্যিই আরোহীর জীবনরক্ষা করছে সে। কিন্তু এত ঝুঁকি পোহাবার পুরস্কার মিললো মাত্র দশ সেণ্ট বখশিস! নিজের পরিবার ছাড়া, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই রকম সংকীর্ণমনা ছিল কার্পেণ্টার। তাছাড়া, আরও একটা গুণ ছিল তার। বেশীর ভাগ লুঠেরা খোলামকুচির মত টাকা ছড়িয়ে দুদিনেই ফতুর হয়ে যায়। কিন্তু কার্পেণ্টার ছিল বড় হিসেবী। অপচয় করা তার কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না।

একবার খবর এল বেশ কয়েক মাস হলো নর্থ ক্যারোলিনা এভিনুতে বোবা-কালাদের প্রতিষ্ঠান ক্র্যাকোভার হোম-এ আস্তানা নিয়েছে সে। জোর কানাঘুসো শুনলাম, এখানে গেলেই দর্শন মিলবে মহাপ্রভুর। বাড়ীটা ঘেরাও করে ফেললাম আমরা। কিন্তু দেখা গেল দুহপ্তা আগেই পাখী উড়েছে!

রাইটউড সরাইখানায় তার কুকীর্তির পর দুমাস কেটে গেল। কিন্তু কোন গর্তে যে সে সেঁধিয়ে বসে রয়েছে, তার কোন হদিশ পেলাম না আমরা। কার্পেণ্টারের মার্জারের মত ক্ষিপ্রতা আর তড়িৎ-তৎপরতায় প্রতিটি পুলিশ কর্মী সজাগ হয়ে উঠেছিল। গায়ে এতটুকু আঁচ না লাগিয়ে পর-পর এতগুলি বেআইনী কাজ করে সারা পুলিশবাহিনীকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছিল ও। শেষকালে সম্মেলনে বসলাম আমরা। নতুন কৌশল আর কর্মপদ্ধতির উদ্ভাবন করলাম। খুব সম্ভব মেয়েদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে তার বর্তমান ঠিকানা, এই আশায় এই ধরনের হেন মেয়ে নেই, যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে ছাড়লাম আমরা। কিন্তু কার্পেণ্টারের ছবি দেখা সত্ত্বেও কেউ চিনতে পারলো না ওকে। শেষকালে বারমেড, সস্তা হোটেলের রিসেপসন ক্লার্ক, এবং অপরাধ-দুনিয়ার ছিঁচকে চোর-ছ্যাঁচোড় থেকে শুরু করে রাঘব-বোয়ালদেরও রেহাই দিলাম না। কিন্তু বৃথাই। দেখা গেল, কার্পেণ্টার বাস্তবিকই নির্বান্ধব। শিয়ালের মতই ধূর্ত সে। নিজের জীবিকা-সমস্যার সমাধান করে সে নিজের বুদ্ধি-শক্তি দিয়েই—দুনিয়ায় কারোর ওপর আস্থা নেই তার।

লোকটার সম্ভবপর গতিবিধি বিশ্লেষণ করার জন্যে হয়তো একজন মনোসমীক্ষকেরই দরকার ছিল আমাদের। অনেকবার এমন সম্ভাবনাও এসেছে আমাদের মাথায় যে হয়তো শহরতলীরই কোনো সম্মানজনক প্রতিষ্ঠানে দিনের বেলা ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে সে। আর রাতের বেলা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে কোনো কারখানায় দিনের তৎপরতা গোপন করার জন্যেই। কিন্তু শিকাগো শহরটা তো আর ছোট শহর নয়। কাজেই এত সহজে এ রকম চিরুনি-আঁচড়ানো তল্লাশি-পর্ব পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না কোনোমতেই।

কার্পেণ্টারের জন্ম হয় ১৯২৯ সালে। অর্থনৈতিক নিস্তেজনার সেই সঙ্কট দিনগুলিতে শান্তি ছিল না পরিবারে। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল বাবা আর মায়ের মধ্যে। শেষকালে, বিবাহ-বিচ্ছেদ করে পৃথক হয়ে গেলেন ওর মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আর, তার কিছু-দিন পরেই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ওর বাবা। রিচার্ড কার্পেণ্টারের বয়স তখন মাত্র দশ বছর। জীবন-বীমা না থাকায় দারুণ চাপ পড়লো ওর মায়ের ওপর। অভাব-অনটনের নিত্য 'নেই নেই' হাহাকারে দেখতে দেখতে বুড়িয়ে গেলেন তার মা। তবুও ভেঙে পড়লেন না ভদ্র-মহিলা। কষ্টেসৃষ্টে কোনোমতে শান্তি বজায় রাখলেন ছোট্ট পরিবারটির মধ্যে। রিচার্ড, তার দুই বোন, আর নিজে—এই নিয়ে ছিল তাঁর ছোট্ট সংসার। ছেলেমেয়েদের মধ্যে রিচার্ডকেই তিনি বেশী ভালবাসতেন। তাছাড়া, আশ্চর্য একটা সম্প্রীতিবোধ ছিল তিন ভাই-বোনের মধ্যে। এমন বড় একটা দেখা যায় না। রিচার্ড কিন্তু মা বলতে অজ্ঞান। মা ছাড়া তার এক দণ্ডও চলতো না। মায়ের কোলে বসে আদর পাওয়ার মত লোভনীয় জিনিস তার কাছে আর কিছুই ছিল না। একদিন এইভাবেই কোলে বসে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল রিচার্ড। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—'মা, নিজেকে বড় একা লাগছে আমার। আমাকে ছেড়ে যেও না।' এ রকম পরিস্থিতিতে সে যে মায়ের সবচেয়ে আদুরে হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য।

সংসারের টানাটানি আরও বৃদ্ধি পেল। শেষকালে নিরুপায় হয়ে মিল-অকির একটা অনাথ আশ্রমে রিচার্ডকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন ওর মা। রিচার্ড কার্পেণ্টারের পরবর্তী জীবনে যে কলঙ্কময় অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়ে-ছিল, তার সূচনা কিন্তু এইখান থেকেই। রিচার্ডের সঙ্গে কেউই নিষ্ঠুর ব্যবহার করেনি। বরং যত্ন পরিচর্যার সীমা ছিল না সেখানে। কিন্তু বাড়ী থেকে অনেক দূরে থাকার ফলে তার মানসিক অশান্তির সীমা-পরিসীমা ছিল না। কাজেই শত চেষ্টাতেও ওর শিক্ষকেরা এদিক দিয়ে ওকে সুখী করে তুলতে পারেননি। কোনো রকম ত্রুটি ছিল না তার আচারে ব্যবহারে। চোখে-মুখে এমন একটা ছেলেমানুষী মিষ্টি-ভাব ছিল যে ভাল না বেসে পারা যেত না। কিন্তু পড়াশুনোর দিক দিয়ে ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে লাগল রিচার্ড। আপ্রাণ চেষ্টা করলেন শিক্ষকরা। কিন্তু কিছুতেই স্কুলের পড়াশুনোয় মন বসাতে পারলো না রিচার্ড কার্পেণ্টার।

ষোলো বছর বয়েসে তার চাইতে অনেক কমবয়েসী ছেলেদের ক্লাসে বসতে হলো তাকে। সমবয়সী ছাত্ররা তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, চেহারায়, পোশাকে নোংরা থাকার বদভ্যাস শুরু হয় এখন থেকেই। স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর ও ঘুরতে থাকে এক কাজ থেকে আর এক কাজে। কখনও হয়েছে জাহাজঘাটার কেরানী, কখনও ট্রাক-ড্রাইভার। কখনও নিয়েছে ডিস ধোওয়ার এবং এই ধরনের আরও কত ছোটোখাটো কাজ। কিন্তু কোথাও বেশীদিন টিঁকতে পারেনি ও। যতবার চাকরী গিয়েছে তার, ততবারই সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপে মনের জ্বালা জুড়োনোর জন্যে ছুটে গেছে মায়ের কাছে। প্রতিবারই অভিযোগ জানিয়েছে বড়ই অসুখী আর নিঃসঙ্গ সে।

আঠারো বছর বয়েসে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখালো রিচার্ড কার্পেণ্টার। কিন্তু মিলিটারী সম্পত্তিতে ক্ষতি করা থেকে শুরু করে এত রকম নিয়ম লঙ্ঘন আরম্ভ হলো যে গার্ডহাউসেই বিস্তর সময় ব্যয় করতে হলো ওকে। শেষকালে এ ধরনের অবাঞ্ছিত লোককে বরখাস্ত করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। সৈন্যবাহিনী থেকে বেরিয়ে এল রিচার্ড কার্পেণ্টার শুধু একটি জিনিস ভাল-ভাবেই রপ্ত করে এবং তা হচ্ছে পিস্তল চালানো। কিন্তু তার চরিত্রের আশ্চর্য দিকটুকু জানলে বাস্তবিকই অবাক হতে হয়। এ হেন লোকেরও আন্তরিক আসক্তি ছিল সিরিয়াস সংগীত, অপেরা, সিম্ফনী আর কনসার্টে। বহু রবিবাসরীয় অপরাহ্নে ক্লাসিকাল রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছে ও মাকে। ভালো ভালো রেকর্ড সংগ্রহের বাতিকেই উড়ে যেত ওর যাবতীয় উদ্বৃত্ত অর্থ।

অপরাধী জীবনের গোড়ার দিকেই দু' দুবার পুলিশ পাকড়াও করে রিচার্ড কার্পেণ্টারকে। প্রথমবার সৈন্যবাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর বেআইনী-ভাবে পিস্তল বহন করার অপরাধে। সৈন্যবাহিনীতে একসময়ে যারা কাজ করেছে, হামেশাই লুকিয়েচুরিয়ে পিস্তল সঙ্গে রাখতে দেখা যায় তাদের। কাজেই কার্পেণ্টারকেও একপ্রস্থ ধমকধামক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। কঠিন শাস্তি হলো না। এগারো মাস পরে বাড়ীর মধ্যে বসে দুটো রিভলবার পরিষ্কার করছিল রিচার্ড। হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলি ছুটে যায়—গুলি গিয়ে লাগে ওর মায়েরই গায়ে। কপাল ভাল, খুব গুরুতর চোট লাগেনি। কিন্তু পুলিশ যখন জানতে চাইল আসল ব্যাপারটা কি, তখন চটেমটে ওর মা পুলিশ-

মহলকেই অভিযুক্ত করে বসলেন। তারা নাকি খামোকা তার আদরে ছেলেকে নাজেহাল করছে।

১৯৫১ সালে রিভলবার উঁচিয়ে একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কাছ থেকে আট ডলার ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার হলো রিচার্ড কার্পেণ্টার। মূল সাক্ষী কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানতো না যে কার্পেণ্টারই প্রকৃত অপরাধী। তা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করা হলো ওকে। আটটা ডলার আর একটা রিভলবারও পাওয়া গেল ওর কাছ থেকেই। তাতেই আদালতের আর কোনো সন্দেহই রইল না কয়েদীর কুকীর্তি সম্বন্ধে। এক বছর কারাবাসের দণ্ড দিলেন ধর্মাবতার।

বড় কড়া দাওয়াই দেওয়া হলো রিচার্ডকে। অন্তত সেই ভাবেই শাস্তিটাকে নিয়েছিল ও। এক বছরের মধ্যে কোনো কয়েদীর সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে দেখা গেল না ওকে। মা মাঝে মাঝে আসতেন। সঙ্গে আনতেন মিঠাই আর কেক। কার্পেণ্টার কাউকেই ভাগ দিত না এইসব খাবারদাবারের। খুপরির অন্যান্য কয়েদীরা 'আদুরে খোকা' বলে খেপাতো ওকে। ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল ওর মনের জ্বালা।

শ্রীঘর থেকে বেরিয়ে এসে কার্পেণ্টার প্রতিজ্ঞা করলো জীবনে আর কখনো আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে খেলা করবে না। খুঁজেপেতে একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কাজও জুটিয়ে ফেলল ও। প্রতি হপ্তায় আশী ডলার রোজগার করতে লাগল কার্পেণ্টার। চরিত্রের মধ্যে অতিনৈষ্ঠিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্কুরও দেখা গিয়েছিল সে সময়ে। বারবনিতা বা জুয়াড়ীদের ট্যাক্সীতে তুলতো না ও। নিঃসঙ্গ নেকড়ের মতই ভয়াবহতা ওর প্রকৃতির কন্দরে সুপ্ত ছিল তখন। কিন্তু মাঝে মাঝে দুই বোন আর একজন খুড়তুতো বোনকে নিয়ে প্রায় সিনেমায় যেত। স্কেটিং করতেও যেত সবাইকে নিয়ে। পরে এই খুড়তুতো বোনের কাছে শুনেছিলাম—'রিচার্ড নিজে কিন্তু স্কেটিং জানতো না। তবুও রাত্রে আমাদের একলা ছেড়ে দিতে চাইত না ও। অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে এ রকম ভাই পাওয়া যায়।'

তিন বোনের জন্যে সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে আনত রিচার্ড। নিজে কিন্তু নোংরা অগোছালো বেশবাস পরেই দিন কাটিয়ে দিত। একটি মাত্র সুট ছিল ওর। জুতোর অবস্থাও ছিল শোচনীয়—ঘন ঘন মেরামত না করলে চলতো না। রীতিমত উত্তেজনার ঝোঁকে যখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে কার্পেণ্টার, তখনও কিন্তু ওর ঠাকুরদা বিশ্বাস করতে চাননি যে রিচার্ড কার্পেণ্টার একজন বিপজ্জনক প্রকৃতির অপরাধী। জোর গলায় বলেছিলেন বৃদ্ধ—"ভারী ভালো ছেলে ছিল ডিকি। একটু খামখেয়ালী ছিল বটে, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ও যখন ট্যাক্সি চালাতো, তখন আমার জন্যে দুটো তিনটে সিগার আনতে কোনোদিনই ভুল হতো না ওর। বাজে সিগার নয়—যথেষ্ট ভালো সিগার।"

রিচার্ড কার্পেণ্টারের পরিবারের সবাই ভাবলে ছেলেটির এত মানসিক অশান্তির মূলে কারণ হলো পুলিশের হয়রানি আর আদালতের সমবেদনার অভাব। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের চার তারিখে আর একবার স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলল কার্পেণ্টার। একটা মোটর চুরি করল ও। পরে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল গাড়ীটা ওরই হাতে। একটা মুদীখানায় হানা দিয়ে লুঠ করল একশো ডলার। এই ঘটনার পর থেকে আর কোনোদিন সে ফিরে আসেনি নিজের বাড়ীতে। পরিবারের কারোর সঙ্গেও আর দেখা করেনি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল কার্পেণ্টার। পায়ে তার ক্রেপসোলের জুতো। বেল্টে গোঁজা এক-জোড়া রিভলবার। পর-পর দুঃসাহসিক রাহাজানির এক ভয়ংকর তালিকার সূচনা কিন্তু এই ঘটনা দিয়েই শুরু।

কোয়ার্টার আসছিল মাটির তলার রেলে চেপে। ডাকাতির তদন্ত করাই ছিল চশমাচোখো মর্ফির একমাত্র কাজ। কার্পেণ্টারের রাহাজানি সম্পর্কিত সব-কটা স্টাফ মিটিংয়ে হাজির ছিল মর্ফি। কাজেই চলন্ত ট্রেনে বন্দুকধারী ছোকরাকে দেখে চিনতে ভুল হয়নি ওর। তৎক্ষণাৎ লম্বা লম্বা পা ফেলে রিচার্ডকে গ্রেপ্তার করেও ফেলে ও। রুজভেল্ট রোড আর স্টেট স্ট্রীটের প্ল্যাটফর্মে কার্পেণ্টারকে নিয়ে নেমে পড়ে মর্ফি। তারপর এক অসতর্ক মুহূর্তে পকেট থেকে কার্পেণ্টারের ফোটোগ্রাফ বার করে যখন আসল লোকটার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই রিভলবার বার করে এক গুলিতেই মর্ফিকে খতম করে দিলে কার্পেণ্টার। ফোটোগ্রাফ উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। উদ্যত রিভলবারের সামনে ভয়চকিত জনতাকে স্থাণুর মত দাঁড় করিয়ে রেখে ও গিয়ে উঠে পড়ল একটা মস্ত গাড়ীর মধ্যে। সাবওয়ে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ দিয়েই বাইরে যাচ্ছিল গাড়ীটা। দরজা খুলেই ভেতরে উঠে পড়ে কার্পেণ্টার। বিদ্যুৎ গতিতে আবার কার্তুজ ভরে নেয় রিভলবারে।

"গাড়ীটা না চালিয়ে নিয়ে গেলে আপনাকেও খুন করবো আমি"

পুরো আঠারো মাস সবার চোখে ধুলো দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রইল রিচার্ড কার্পেণ্টার। পুলিশ মহলের প্রত্যেকেই তখন খুঁজছে ওকে। তারপর এল ১৯৫৫ সালের অগাস্টের সেই শোকাবহ দিনটি। আমার বন্ধু আর সহকর্মী ডিটেকটিভ মর্ফি বাড়ী থেকে হেড-

এবং পরক্ষণেই ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে নলচেটা স্থির করে রেখে গর্জে ওঠে চাপা কণ্ঠে—"এইমাত্র একজনকে খুন করে এলাম আমি। চেঁচামেচি না করে গাড়ীটা না চালিয়ে নিয়ে গেলে আপনাকেও খুন করবো আমি।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

৩.৯৫—৪.৯৫
মোকাসিন ৩.৭৫—৪.৫০
বুলবুল ৫.২৫—৬.২৫
মানিক ৫.৯৫
৯.৯৫—১৩.৯৫
পূজোয় চাই নতুন জুতো
বাছাই জিনিস পেতে হলে সওদার সময় এখনি—দেরিতে নয়। দেরিতে দোকানে ভিড়, সময় তাই কম। ছোটদের পায়ে জুতোর পরিপাটি ফিটিং সময় সাপেক্ষ। তাই অনুরোধ—অবিলম্বে তাদের নিয়ে আসুন বাটার দোকানে। নকশায়, বৈচিত্র্যে, পদশোভার এখানে আশ্চর্য আয়োজন।
Bata

সেকালের পাতা : একালের চোখ

রত্নাকর
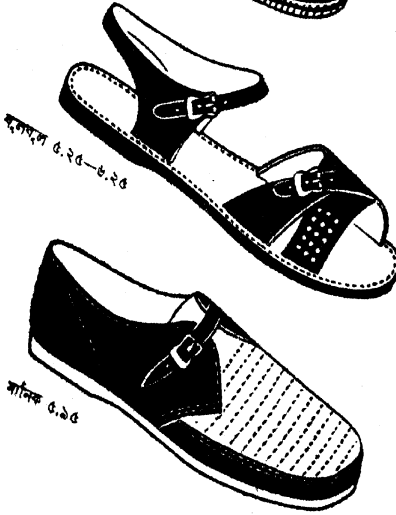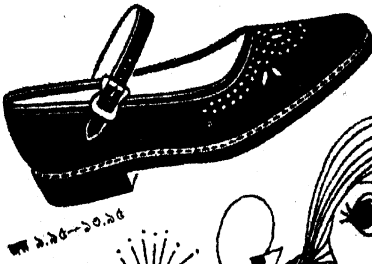
'সুন্দরবনের' বাঘ, স্বীকার করি, কুলীন। কিন্তু তাই বলে কম কুলীন নয় সুন্দরবনের নদীর কুমীর। যে উপভোগ্য লড়াই হল সেদিন বাঘে আর কুমীরে তার ফলাফল হল 'ড্র'। এ থেকে বোঝা যায় কেউ কারো চেয়ে কম নয়।

সেকালের সাহেব ও বাবু কেউ কুস্তি লড়তেন না ঠিক। কিন্তু পালোয়ান পুষতেন। বুলবুলির লড়াই-এর মত এও এক লড়াই। তফাৎ যাই থাক উদ্দেশ্য এক—স্ফূর্তি করা। কুস্তির একটা খবর এখানে সংকলিত হল।

নোট আজকে চলে। কিন্তু যখন প্রথম নোট চালু হয় বিস্তর ঝঞ্ঝাট হয়েছিল। একে ত' নোট, এই অর্থে, আগে আমাদের দেশে ছিল না। তার ওপর সেই সময় বিভিন্ন গোষ্ঠীর চক্রান্তে বাংলাদেশের আর্থিক বাজার খুবই অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের গদিদারদের মানসিকতা অবশ্যই লক্ষ্যণীয়।

বাঘে কুমীরে লড়াই

সুন্দরবনের আথরাবাকি নামক এক ভীষণ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা খাল বয়ে গেছে। কতকগুলি মাঝি সেই খাল দিয়ে নৌকা করে আসার সময় এই লড়াইটি লক্ষ্য করে। একটা বাঘ জল খাওয়ার জন্যে খালের ধারে আসা মাত্রই একটা কুমীর তার পা কামড়ে ধরে। বাঘ প্রাণপণে কুমীরের কামড় থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে এই লড়াই চলে। কোন পক্ষই ছাড়বার পাত্র নয়। একবার কুমীর আক্রমণ করে, বাঘ আত্মরক্ষা করে। একবার বাঘ আক্রমণ করে, কুমীর আত্মরক্ষা করে। বাঘের ঘন ঘন গর্জনে গভীর জঙ্গল মুখরিত হয়ে ওঠে। অবশেষে কুমীর বাঘকে টেনে জলে নামাতে সমর্থ হয়। জলে এসে পড়তেই ভীত বাঘ কুমীরকে ছেড়ে দেয়। মুক্তি পেয়ে কুমীর পালিয়ে যায়। মান বজায় রেখে বাঘটিও জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

কুস্তি লড়াই

গত শনিবার বিকাল চারটার সময় রাজা বৈদ্যনাথ রায় মহাশয়ের প্রাসাদে বিরাট কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় যে কুস্তিগীরগণ অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের নাম গত সপ্তাহের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রতিযোগী কুস্তিগীরগণ মেজর ক্যামবেল, মিঃ জর্জ পামার, বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার ও বাবু আশুতোষ সরকারের অধীনে কাজ করেন। মেজর ক্যামবেল ও মিঃ জর্জ পামার এই প্রতিযোগিতার বিচারক নিযুক্ত হন। কুস্তিগীরগণ পরস্পরের করমর্দন করার পর আসরে অবতীর্ণ হন। বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের চাকর ভুর্তন সিং এবং বাবু গোপাল দাসের চাকর বাহাদুর খাঁর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। জয় পরাজয় সম্পর্কে বিশেষ উত্তেজনা দেখা যায়। অবশেষে ভুর্তন সিং বিপুল করতালির মধ্যে তার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে পাঁচ শ' টাকা পুরস্কার লাভ করে।

(ক্যালকাটা গেজেট ৪-১-১৮২৭। অনূদিত।)

ব্যাঙ্ক নোট

মার্চেন্টদের ৩৫ সংখ্যায় 'মাড়োয়ারী সার্ফ' নামে এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদে প্রকাশ মাড়োয়ারী গদিদার এবার থেকে ব্যাঙ্ক নোট আর গ্রহণ করবেন না। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নোট তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তাঁদের হাতে এখন যত ব্যাঙ্ক নোট আছে তা ধীরে ধীরে বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা করবেন। মাড়োয়ারী গদিদারদের এই সিদ্ধান্তে সমস্ত ব্যবসায়ী মহলে ত্রাসের সঞ্চার হয়। এই সম্প্রদায়ের ব্যবসাদাররা আরও সিদ্ধান্ত করেন যে আগামী চৈত্র অথবা ১৮২৭ সালের ২৭শে মার্চের মধ্যে তাঁদের হাতে জমা ব্যাঙ্ক নোটগুলি কাঁচা টাকা করে আনবেন এবং ঐ তারিখের পর থেকে তাঁরা ব্যাঙ্ক নোট গ্রহণ করবেন না। এই সম্প্রদায়ের হাতে অর্থ আছে। তাই বাজারে এদের বিশেষ প্রতিপত্তি। পর পর কয়েকটি দুর্ঘটনায় তাঁদের আর্থিক ক্ষতি হয়। সে ক্ষতি এখনও পূরণ হয় নি। তাই তাঁরা প্রতি পদেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে ব্যগ্র।

এই জন্য গত ৩রা মাঘ (ইং ৩০শে জানুয়ারী) কলকাতার সমস্ত সার্ফদের গমস্তা বড়বাজারের ১২নং পাগেয়াপট্টিতে শেঠ গোপালদাস ও বাবু মনোহর দাসের গদিতে একটা সভায় মিলিত হয়।

এই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রায় বারো দিন আগে বাবু বংশীধর বাবু মাধুরী দাসকে এই মর্মে একটি পত্র লেখেন, "বর্তমানে ব্যাঙ্ক নোট নিয়ে বাজারে বিশেষ গোলমাল চলছে। এই অবস্থায় আমরা কি করব?" মাধুরী দাস উত্তরে জানান যে, এই অবস্থায় তাঁদের একত্রিত হয়ে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার। এই ঘটনার দু' দিন পরে বাবু দেবীদাস ও বালমুকুন্দ শেঠ গোপালদাস ও বাবু মনোহর দাসের গদিতে কিছু ব্যাঙ্ক নোট পাঠান এবং তাঁরা ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের নোট গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন না। তাই এই সভার আয়োজন হয়।

এই সভায় বাবু মাধুরী দাস বলেন, "ব্যাঙ্ক নোট নিয়ে বাজারে যে গোলমাল চলছে তাতে মনে হয় কাঁচা টাকাই আমাদের নেওয়া উচিত। ব্যাঙ্ক নোট যদি নিতেই হয় তবে আমরা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নোট নেব।" এই কথার উত্তরে বংশীধর বলে ওঠেন, "আপনি বলেছিলেন যে আমরা মিলেমিশে পরামর্শ করে এ বিষয়ে কর্তব্য স্থির করব। কিন্তু তার আগেই আপনি কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। আমি আপনার গদিতে ব্যাঙ্ক নোট পাঠিয়েছিলাম এবং আপনিই তা ফেরত পাঠিয়েছেন। তার জবাব কি?" বাবু মতি চাঁদ বললেন, "আপনাদের কথা হবে আমার কথা। আপনারা ভেবে-চিন্তে যা করণীয় বলবেন আমি তাই করব। তবে আমার মনে ওই নোটের হাঙ্গামার মধ্যে আমাদের না যাওয়াই ভাল। আমরা সব সময় কাঁচা টাকা নেব। তাতে কোন ঝুঁকি থাকবে না। কিন্তু আজকেই চটপট করে কিছু ঠিক করা ভাল হবে না। আজকের সভায় অনেকেই আসেন নি দেখছি। আমাদের আরও ধৈর্য ধরতে হবে।"

বাবু মতি চাঁদের কথায় সায় দিয়ে বললেন বাবু গোবিন্দ চাঁদ, "খুব ঠিক কথা। বাজারে ব্যাঙ্ক নোট বেশ চলছে। আমরা ব্যাঙ্ক নোট নেব না বললে অন্যরকম তার ফল হবে। আমাদের কথায় আরও দু' পাঁচ ঘর গরীব বেচারা মারা না যায় সেদিকেও ত দেখতে হবে। তাই আমাদের আরও ভেবে দেখা দরকার।"

মাঝ রাত অবধি এই বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়। তারপর সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে বর্তমানে যাদের কাছে যত ব্যাঙ্ক নোট আছে তার বদলে কাঁচা টাকা করে আনা সর্বাগ্রে দরকার। পরে অন্য কর্তব্য স্থির করা হবে। শেঠ গোপাল দাস ও বাবু মনোহর দাসের গমস্তাদের আলাপ-আলোচনার ধরন থেকে বোঝা যায় যে বর্তমানে তাঁদের হাতে কোন হুণ্ডি নেই। তাই এই সিদ্ধান্তে তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক নোট স্বীকার না করার এই সিদ্ধান্তে অনেক গদি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(ক্যালকাটা গেজেট। ৮-২-১৮২৭। অনূদিত।)

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৪ ।।

দুর্গাপদর জীবনে এ এক নূতন অভিজ্ঞতা হ'ল। ওর বিশ্বাস ছিল যে, সাধারণভাবে সমস্ত স্ত্রী-জাতিকে এবং বিশেষ ক'রে নিজের স্ত্রীকে চেনা ওর শেষ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, যে স্ত্রীর সঙ্গে এই গত উনিশকুড়ি বছর ঘর করেছে সে—তাকে চিনতে এখনও অনেক বাকী।

শুধু দুর্গাপদই নয়, অবাক হয়ে গেল অনেকেই। কারণ তরলা তখন যে শুধু কোনরকম কটূক্তি বা মন্তব্য না ক'রে নিঃশব্দে নিচে নেমে এসে আবার পাখাটা হাতে ক'রে মহাশ্বেতার বিছানার পাশে বসেছিল তাই নয়—পরের দিনও তার নিত্যকার কাজে কি কথাবার্তায়, আচার-আচরণে কোন বৈলক্ষণ্য টের পেতে দিল না কাউকে, যেন একরকম কিছুই ঘটেনি অথবা ঘটলেও তরলার কিছু আসে-যায় না তাতে। তবু প্রমীলা অপেক্ষা করেছিল দুপুরটার জন্যে। খাওয়ার সময় ভাতে বসে কিনা সেইটেই বড় প্রশ্ন, সেটা দেখলেই বোঝা যাবে কত শক্ত মেয়ে সে, কতটা মনের জোর। কিন্তু দুপুরবেলা খেতে ডাকতেই—নিতান্ত স্বাভাবিক-ভাবেই এসে বসল তরলা; যেমন অন্যদিন এসে বসে। বরং তড়িতই যেন মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না ছোটকাকীর দিকে। সত্যিই তার কোন দোষ নেই—এ বাড়িতে তাকে ধরে টানাটানি করাটা বহুকাল থেকে একটা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে—অন্তত মেজবৌয়ের তাই বিশ্বাস—তবু, তরলার এই নিঃশব্দ ঔদাসীন্যেই সে যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, তরলার কাছে অপরাধী মনে করছিল নিজেকে।

অবশ্য খেতে বসলেও, খেল খুব সামান্যই। কিন্তু এমন কম নয় যে বিশেষ কারও চোখে পড়ে। এক প্রমীলা ছাড়া সেটুকু চোখে পড়লও না কারও। দুপুরে রাত্রে সহজভাবেই এসে খেতে বসতে লাগল সে—শুধু দুবেলা জলযোগটাই ছেড়ে দিল। অবশ্য এ বাড়ির গিন্নীরা কেউ বিকেলে কি সন্ধ্যায় জলযোগ করে না, কারণ দুপুরের খাওয়া চুকতেই বেলা তিনটে বাজে, সন্ধ্যা পর্যন্ত অম্বলেই ছটফট করে বড় আর মেজগিন্নী। কোন সুদূর-সম্ভাবিত অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য দুবেলাই দুটি দুটি চাল বেশী নেওয়ার প্রথা আজও এ বাড়িতে অব্যাহত আছে, বোধহয় ক্ষীরোদার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত থাকবেও। ফলে সে ভাত প্রায় দুবেলাই পান্তা হয়ে থাকে, আর তা এদেরই খেতে হয়। আর সেই কারণেই এদের এত অম্বল এবং বদহজম। অবশ্য রাত্রে না হলেও—সকালে মুড়ি, নারকেল, বাতাসা কি গুড়, দুটো গাছের কলা—এ খাওয়ার রেওয়াজটা আছে এখনও, বস্তুত ছোটবৌয়ের বিয়ের পর থেকেই এটা চালু হয়েছে—কিন্তু সেটা খুব নিয়মমতো কেউই খায় না—হয়ত সময়ই হ'য়ে ওঠে না এক-এক দিন, তাই সেটা বন্ধ হ'ল কিনা তাও লক্ষ্য করবার কথা নয় কারও। প্রমীলাই শুধু লক্ষ্য করল, জলখাবার বাদ দেওয়া এবং দুবেলা আহারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া—দুটো মিলিয়ে দেখে সে শঙ্কিত হয়ে উঠল একটু।

তরলার তা'হলে মতলবটা কি?

ওকি এমনি ক'রে আস্তে আস্তে নিজেকে ক্ষয় ক'রে আনতে চায় নাকি?

দিনকতক দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। এতখানি দায়িত্ব নিজের ওপর রাখা উচিত নয়। সে এক ফাঁকে ছোট কর্তাকে নিভৃতে ডেকে বলল, 'কী করছ কী, যাহয় ক'রে মিটিয়ে নাও। বৌটার দিকে তাকিয়ে দেখেছ—কী হয়ে যাচ্ছে?'

কদিন ধরে দিনরাত একটা অস্বস্তি অনুভব করলেও এ দিকটা জানা ছিল না দুর্গাপদর। বস্তুত স্ত্রীর মুখের দিকে সে তাকাতেই পারে নি, আর পাছে সে মা-পারাটা কারও কাছে ধরা পড়ে, তাই চোখাচোখি হওয়ার সম্ভাবনাগুলোও এড়িয়ে গেছে সে প্রাণপণে। কী খাচ্ছে না খাচ্ছে তাও অত লক্ষ্য করা হয়ে ওঠেনি। সেই জন্যে—দুবেলা খেতে বসছে ঠিক-ঠিক, সেইটে আড়ে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে শুধু, আর তাতেই কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল। প্রমীলার কথায় সে তাই রীতিমতো চমকেই উঠল। বলল, 'কেন—খাচ্ছে না?......বসে তো দেখি—'

'হ্যাঁ বসে কিন্তু কী খায় কতটুকু খায় তা দ্যাখো কি? নামমাত্তরই বসে। ও খাওয়ায় মানুষ বাঁচে না, বিশেষ অমন সাজোয়ান সাজোল মেয়ে-মানুষটা। জোর করে জীবনটা নিলে পাছে চারদিকে ঢি-ঢি পড়ে যায়, একটা কেলেঙ্কার হয়—তাই আস্তে আস্তে চুপি চুপি পাত করছে নিজেকে। ও কি কম চাপা মেয়ে!'

'তুমিই তো এই কাণ্ডটা করলে। বিশ বছরের আকোচটা মেটালে!'

'এ কান্ড না করলে কি তুমি সায়েস্তা হ'তে—না তোমার আক্কেল হ'ত? সে যে আরও একটা বড় কেলেঙ্কার হয়ে বসে থাকত—তোমাকেই যে গলায় দড়ি দিতে হ'ত সে ক্ষেত্তরে। তোমাকে বাঁচাতেই এটা করেছি মনে রেখো।'

'হ্যাঁ—তা আর নয়, আমার ওপর কত টান তোমার।...আসলে তোমার রীষ!... তোমাকে আমি চিনি না—কত বড় হারামজাদা মেয়ে-মানুষ তুমি!'

প্রমীলা কিন্তু এ বিশেষণে রাগ করল না, বরং মুখটিপে হাসল একটু। বলল, তাই যদি জানো তো বিশ বছর ধরে একটা আকোচ বুকে ক'রে রেখেছি তাই ভাবো কেমন করে?......ওগো ঠাকুর, তোমাকে জব্দ করতে—নাকের জলে,

চোখের জলে করতে আমার একদিনও লাগত না। তুমি আমার হাতের মধ্যেই আছ। তোমার এত দিকে এত কালি যে— আর যত্ন ক'রে কালি ছিটোতে হয় না।... তা নয়, এ-সব আড়ি-আকোচের কথা নয়, যা করতে যাচ্ছিলে তা যে কত গর্হিত কাজ তা তুমি সহজে বুঝতে না—সে চীজই নও তুমি।......আজ বলে তো নয় —তোমার ওপর নজর আছে আমার চির-কাল—আমার চোখের আড়ালে যাবার সাধ্যি নেই তোমার। বাড়াবাড়ি করছিলে বলেই একটু জব্দ ক'রে দিলুম।...তা সে যাক—এখন যা বলছি তাই শোন; যেমন ক'রে হোক হাতে-পায়ে ধরেও অন্তত রাগারাগিটা মিটিয়ে নাও গে।'

অন্যদিকে চেয়ে মুখটা গোঁজ ক'রে বলে দুর্গাপদ, 'রাগারাগিটা কোথায় তাই যে বুঝতে পারি না—তা মিটিয়ে নেব কি বলো!......, কথাও কয় সবই করে—'

'কথা কয়?... সহজভাবে কথা বলে?' এবার বিস্মিত হবার পালা প্রমীলার। বিশ্বাস হ'তে চায় না তার কথাটা।

'বলে বৈকি। নিজে থেকে বলে না। তবে আমি যেচে কথা বললে জবাব দেয় তো দেখি—'

'তাই তো!' আরও কি বলতে যাচ্ছিল প্রমীলা কিন্তু ছেলেরা দু'-তিনজন এসে পড়ায় আর বলা হ'ল না। শুধু যেতে যেতে বলে গেল, 'তবু নিজে থেকেই ওপরপড়া হয়েও কথাটা পাড়ো অন্তত। এ সর্বনাশ ফেলে রেখে দিও না—'

বিস্ময়টা দুর্গাপদরও বড় কম নয়। সে ভেবেছিল আর যাই করুক, বাইরে যত স্বাভাবিক আচরণই বজায় রাখুক, কথা সে কইবে না স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই। অন্তত বেশ কয়েকদিন কঠিন হয়ে থাকবে, হয়ত ঘরেই আসবে না, দালানে কি ছাদে গিয়ে শুয়ে থাকবে, কোথাও, সাধ্যসাধনা ক'রে কথা বলাতে হবে রাগ ভাঙ্গাতে হবে। কিন্তু সেসব কিছুই হ'ল না। যেমন ছোট ছেলেটাকে নিয়ে সে নিচে বিছানা ক'রে শোয় তেমনিই শুল পরের দিন, এমন কি কোথাও কোন অস্বাভাবিক কাঠিন্যও প্রকাশ পেল না তার চলা-ফেরায় কি ব্যবহারে। বরং দু'তিন দিন দুর্গাপদই সঙ্কোচে বা ভয়ে কথা কইতে পারে নি। শেষে একদিন, এ নীরবতা তার নিজের ছেলেমেয়ের কাছেই সন্দেহের ব্যাপার হয়ে উঠছে দেখে—মারীয়া হয়েই কতকটা—কি একটা প্রশ্ন করেছিল সে। প্রশ্ন করার সময় সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবার আশা আদৌ করে নি—কিন্ত খুব সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিয়েছে তরলা, সঙ্গেসঙ্গেই। সংক্ষেপে হয়ত—তবে নিঃসঙ্কোচে। এত সহজে উত্তর পেয়ে চমকে উঠেছিল দুর্গাপদ—যেমন এই মাত্র সে সংবাদে প্রমীলা চমকাল।

তারপরও দু-একটা কথা কয়েছে দুর্গাপদ—উত্তরও পেয়েছে। এমন কি ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনে নিজে থেকেও কথা কয়েছে তরলা। সেসময় তার স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠস্বর আরও মৃদু হয়েছে বা তাতে কোন ক্ষোভ কি উষ্মা কিম্বা ধিক্কার প্রকাশ পেয়েছে তাও বলতে পারবে না দুর্গাপদ।

তবে এও ঠিক যে, অস্বস্তিটা তার কাটেনি। কেন কাটেনি তা হয়ত সে বোঝাতে পারবে না। অস্বস্তিটা অকারণ না হলেও আকারহীন—সেইটেই (যুক্তি দিয়ে কাউকে) হয়েছে তার মুশকিল।

ব্যাপারটা যে ঠিক স্বাভাবিক নয়, এটা বোঝবার মতো সাংসারিক জ্ঞান দুর্গাপদর আছে। নিজে থেকে, নিষ্প্রয়োজনে কথা কয়নি তরলা একটিও। নিতান্ত খোশগল্পের অবসর কম এবাড়িতে—তার স্বভাটাও সে রকম নয়, স্বভাবতই স্বল্পভাষী সে, এমন কি স্বামীর কাছেও—তাই শুধু প্রয়োজন-মতো কথা বলাটা আর কারও কাছে তত অস্বাভাবিক ঠেকে নি—কিন্তু দুর্গাপদর কাছে এই সামান্য তফাৎটুকুও পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।

অথচ সে করবেই বা কি—তাও তো ভেবে পায় না।

এর মধ্যে, সাত-আট দিন কেটে যাবার পর একদিন রাত্রে তাকে শয্যার দিকেও আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে দুর্গাপদ, তাতেও বাধা দেয়নি তরলা, তবে স্বেচ্ছাতেও আসে নি। আকর্ষণেই এসেছে শুধু, জড় কোন বস্তুর মতো। এসেছে, বসেওছে বিছানায়। বসেও থেকেছে কিছুক্ষণ—কিন্তু সে সময় ওকে, কাঠের পুতুলও নয়—মড়ার মতোই মনে হয়েছে তার। তবে বাধা দেয়নি সে কোনও সময়, শক্ত হয়ে বেঁকেও দাঁড়ায় নি। হয়ত শেষ পর্যন্ত কোন বাধা দিত না। কিন্তু সেটা পরখ ক'রে দেখতে আর ভরসায় কুলোয়নি। নিজের আচরণ নিজের কাছেই লজ্জাজনক বলে মনে হয়েছে। যা-হোক একটা কিছু বোঝাপড়া হেস্তনেস্ত হয়ে জীবনযাত্রাটা স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক হয়ে না এলে এদিকে এগোনোও যাবে না বুঝেছে সে... স্ত্রীর গায়ে জড়ানো হাত শিথিল হ'য়ে এসেছে তার নিজে থেকেই। যেন কিছুটা লজ্জায়, কিছুটা ভয়েই ছেড়ে দিয়েছে সে।

তরলা কিন্তু আরও কিছুক্ষণ বসে ছিল সেখানে, স্বামীর শয্যায়। তারপর আবার সহজভাবেই এসে নিচের বিছানায়

...যা হয় করে মিটিয়ে নাও

শুয়ে পড়েছিল। কিছুই বলেনি, কোন মনোভাবই তার আন্দাজ করা যায় নি।

বুঝতে পারছে না, কিছুই বুঝতে পারছে না দুর্গাপদ। হয়ত সেদিন ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি, হয়ত তরলাও তা আশা করেনি—কে জানে। হয়ত সাহস ক'রে আর একটু এগোলেই সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। সেদিনও কুলোয়নি, তার পরেও না। কী হবে—কী এবং কতটা প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব, কোন্‌দিকে যাচ্ছে তরলা—আসলে তার মতলবটা কি, তাই যে বুঝে উঠতে পারছে না!

যে কুরূপা স্ত্রীকে সে দীর্ঘদিন অবহেলা করেছে, আদৌ তাকে কোনদিন জীবনসঙ্গিনী, শয্যাসঙ্গিনী করবে কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ ছিল বহুকাল—সেই স্ত্রীর সামান্য একটু মনোযোগ যে ওর কাছে এমন আরাধনার বস্তু হয়ে উঠবে—তার মনোভাব জানবার জন্য যে ওর দুশ্চিন্তার অবধি থাকবে না—তা কে ভেবেছিল!

অদৃষ্টের পরিহাস—না কী একটা কথা আছে না—নাটকে-টাটকে প্রায়ই ব্যবহার হয়—এও বোধ হয় তাই। একেই বোধহয় অদৃষ্টের পরিহাস বলে—মনে মনে ভাবে দুর্গাপদ।

এমনিই যথেষ্ট অস্বস্তি ভোগ করছিল, প্রমীলা সচেতন ক'রে দেবার পর থেকে সেটা সত্যিই দুশ্চিন্তায় পরিণত হ'ল। আরও দিন দুই ভেতরে ভেতরে ছটফট করবার পর সে স্থির করল যে, মেজবৌয়ের পরামর্শই সে নেবে, ওপরপড়া হয়েই স্ত্রীর সঙ্গে একটা মিটমাট করবে।

সেই দিনই রাত্রে, বাড়িটা মোটামুটি নিস্তব্ধ হয়ে এলে খাটের বিছানা থেকে নেমে এসে স্ত্রীর বিছানার পাশে, মেঝেয় বসল। তরলা জেগেই ছিল, স্বামীর এ নিঃশব্দ ও গোপন সঞ্চার সবই টের পেল সে। হয়ত সে অন্ধকারে চেয়েই ছিল এদিকে।

সে যে জেগে আছে দুর্গাপদও তা জানত। আজকাল অনেক রাত অবধি যে তরলা জেগে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে সেটা অজানা ছিল না ওর কাছে। তবু তখনই সাহস হ'ল না কথা কইতে। অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ ক'রে বসে রইল সে। কথাটা অপর পক্ষ থেকে শুরু হ'লে বেঁচে যায়। কিন্তু তা হ'ল না। তখন—বেশ কিছুটা সময় চুপ ক'রে বসে থাকবার পর অতি সন্তর্পণে তরলার গায়ে একটা হাত রাখল। কোথায় হাত দেবে—সেও একটা সমস্যা। একেবারে পায়ে হাত দিতে লজ্জা করে। অথচ ক্ষমাপ্রার্থী সে, তাছাড়া দেহের অন্য কোন অংশে হাত দিলে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা। অনেক ভেবে সে হাঁটুর কাছটাতেই হাত দিল।

'এই শুনছ, জেগে আছ?'

হাতটা সরিয়ে দিল না তরলা, নিজের পা-ও সরিয়ে নিল না। খুব আস্তে হলেও—খুব স্পষ্টভাবেই উত্তর দিল, 'কী?'

ছোট ছেলে আর মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ—তবু তাদের দিকে অন্ধকারেই যতটা সম্ভব তাকিয়ে দেখে নিয়ে তেমনি চুপিচুপি বলল, 'আমাকে—আমাকে এইবারটি মাপ করো, আর কখনও এমন হবে না। এইবারটি শুধু বিশ্বাস করো আমাকে।'

প্রায় মিনিটখানেক চুপ ক'রে রইল তরলা। এসব ব্যাপারে একেবারে অনভ্যস্ত দুর্গাপদর মনে হ'ল এক যুগ। গোটা বাড়িটা তখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, এত নিস্তব্ধ যে নিচে মহাশ্বেতার সামান্য নাক-ডাকার শব্দও এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আরও নানা বিচিত্র শব্দ হচ্ছে চারিদিকে—ঝিঁঝিঁপোকার ডাক, ব্যাঙের ডাক, দূরে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে তার একটানা আওয়াজের সঙ্গে ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ—এতকাল পরে এই যেন প্রথম শুনল দুর্গাপদ। গভীর রাত্রেও এত যে কোলাহল হয় চারদিকে—তা তো সে জানত না!

কিন্তু তরলা চুপ ক'রে ছিল এক মিনিটই। তারপর কেমন যেন নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'কেন, তোমার কি কিছু অসুবিধা হচ্ছে?'

এ আবার কি কথা! কী কথার কি জবাব এটা!

রাগ করলে, অভিমান প্রকাশ করলে তিরস্কার করলে বুঝতে পারত দুর্গাপদ—কিন্তু এ ধরনের কথার সুদূর গূঢ়ার্থ বোঝা তার সাধ্যাতীত। সে যেন ঘেমে উঠল দেখতে দেখতে।

অনেকবার এদিক-ওদিক চেয়ে, বারকতক মাথা চুলকে, খানিকটা আমতা-আমতা ক'রে বলল, 'না তা নয়—মানে সুবিধে-অসুবিধে আর কি—আমরা ধরো অত কিছু অসুবিধে সুবিধের ধারও ধারি না—। তবে, মানে—অত রাখা-ঢাকা ন্যাকামির দরকারই বা কি, সবই তো বুঝতে পারছ, কাজটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে, তা আমিও মানছি—অবশ্য করে ফেলেছি একটা ঝোঁকের মাথায়—তবু হাজার হোক আমি তোমার স্বামী তো—এইবারটির মতো আমাকে মাপ করো, এই তোমার পায়ে ধরছি!'

'ছিঃ!' এবার দুর্গাপদর হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে বসে তরলা; পায়ে হাত দিও না, ছেলেমেয়ের অকল্যাণ হবে। আর মিছি কথা বলতে কি—তোমার খুব দোষও দিই না। দোষ আমার অদৃষ্টের—সেইটেই বড়, মানুষের দোষ ধরতে গেলে আমার বাপ-মায়ের দোষ, তোমার বৌদিদের দোষ। আমার মতো কালো কুচ্ছিৎকে এনে তোমার পাশে দাঁড় করানোই উচিত হয়নি তাঁদের। রূপের আশা মেটেনি বলেই ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়াতে হয়—যেখানে সেখানে হ্যাংলা-

বিক্রি করতে যাও।...... আগে থেকেই করছিলে, মেজদি জানতেনও—জেনে-শুনে, তাঁর রূপে-গুণে যে মজেছে তার বৌ ক'রে আমাকে আনা তাঁর উচিত হয়নি। হয়ত ইচ্ছে ক'রেই এনেছেন, তুমি চিরদিন হাতে থাকবে বলেই—কিন্তু আমিও তো মানুষ, আমার কাছে আমার জীবনের, আমার সুখ-দুঃখের দাম আছে। সেটা উনি ভেবে দেখতে পারতেন। কালো কুচ্ছিৎ বলে স্বামীর ভাগ ছেড়ে দেব—এটা ভাবা ও'দের উচিত হয়নি।... সব সময় কিছু আয়নাও বাঁধা নেই মুখের সামনে যে নিজের চেহারার কথাটা অষ্টপ্রহর মনে পড়বে!'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল তরলা। বোধ হয় অবাধ্য চোখের জল সামলে নিতেই। এই স্বামীর সামনে কোন প্রকারে দুর্বল হয়ে পড়া, ভেঙ্গে পড়া চলবে না। তার চেয়ে লজ্জার বা ঘেন্নার কথা আর কিছু নেই।......

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে কণ্ঠ-স্বরটা আগের মতোই আবার নির্লিপ্ত ও ভাবলেশহীন করে' নিয়ে বলল, 'যাও, তুমি শুতে যাও।...... ভয় নেই—আমি এখনই মরছি না। প্রাণের মায়া নয়—যাদের এ সংসারে এনেছি তাদের অন্তত একটুখানি বড় ক'রে দিয়ে যাওয়া কর্তব্য বলেই মরব না। বেঁচেও থাকব, তোমার সংসারের কাজকর্মও করে যাব ঠিক ঠিক, কোন হুকুম থাকলে জানিও—তাও তামিল করব, কিন্তু তার বেশী আর কিছু আশা করো না। ভালবাসা—? আমার মনে হয়—স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় স্ত্রী যদি স্বামীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে না পারে তো সেখানে ভালবাসা সম্ভব নয়, অন্তত স্ত্রীর থেকে তো নয়ই। আর সবই তোমাকে দিতে পারব কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধা আলাদা জিনিস, সেটা মন থেকে আসে। সেটা বোধ হয় আর আসবে না। আজ এই কাণ্ডটা ঘটেছে বলে নয়, বহুকালের বহু আচরণে সে ভক্তি নষ্ট ক'রে দিয়েছ তুমি।...... তবে তুমি তো কখনও এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাও নি, আজই বা ঘামাতে যাচ্ছ কেন? প্রয়োজনের সময় কাছে টেনেছ, প্রয়োজন হ'লেই আবার টেনো—কিছু অসুবিধে হবে না।...... তোমার খাচ্ছি পরছি, তোমার কাজে ত্রুটি হ'লে চলবে কেন?'

কথা শেষ করে সে এবার খুব সহজ-ভাবেই, ছেলের যে হাতটা এদিকে এসে পড়েছিল সেটা সরিয়ে দিয়ে—তার দিক ফিরেই শুয়ে পড়ল। চিরদিনই কাপড়-জামা গুছিয়ে জড়িয়ে শোওয়া অভ্যাস তার, আজও তাই শুয়েছিল, তবু একবার হাত বাড়িয়ে পায়ের দিকের কাপড়গুলো টেনে নামিয়ে দিল—কিন্তু তারপরই একে-বারে নিথর হয়ে গেল। ঘুমিয়েছে কি জেগে আছে, তা বোঝবার কোন উপায় রইল না।

দুর্গাপদ হতভম্বের মতো সেখানেই বসে রইল অনেকক্ষণ। প্রথমটা সত্যিই কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। তরলা যে এত কথা বলবে, এতকথা যে বলতে পারে—সেইটেই আশা করে নি সে। এ ধরনের বক্তব্যও তার কাছে একেবারে নতুন, অপ্রত্যাশিত। এর পুরো অর্থটাও তার বোধগম্য হ'ল না হয়ত। কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটতেই সে জায়গায় দেখা দিল অপরিসীম ক্রোধ। মুখের ওপর যেন চাবুক খেয়েছে সে—সত্যি সত্যিই যেন তেমনি জ্বালা করছে মুখটা। স্ত্রীর কাছ থেকে এ রকম ব্যব-হারে অভ্যস্ত নয় সে, এরকম কথাতেও না। অপমানের আঘাতে তাই দারুণ রোষই সৃষ্টি হবার কথা। এক এক সময় মনে হ'তে লাগল যে ঐ মুখখানা নোড়া দিয়ে কিম্বা লাথি মেরে ভেঙ্গে দেয় সে—এই তেজের উপযুক্ত জবাব দিয়ে দেয় এখনই।

'ওঃ—' মনে মনে বার বার বলতে লাগল সে, 'একটু এদিক-ওদিক কী করেছি তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে একেবারে। পুরুষমানুষ অমন কত কী করে। সেকালে যে বামুনের ঘরে পঞ্চাশ-ষাটটা সতীন নিয়ে ঘর করতে হ'ত—তার বেলায়! তেজ, তেজ দেখাতে এসেছেন আমার কাছে, এখনও ইচ্ছে করলে আমি ওর মতো বৌ দুশো পাঁচশটা এনে জড়ো করতে পারি তা জানে না! মেয়েছেলে হ'ল জুতোর জাত, পায়ের নিচে না রাখলে টিট্ থাকে না। হুঁ!'

কিন্তু মনে মনে যতই গজরাক, মুখে একটি কথাও বলতে পারল না সে। মুখ ভেঙ্গে দেওয়া তো দূরের কথা, গায়ে হাতটা পর্যন্ত রাখতে পারল না আর। কেন যে পারল না, কী যে হ'ল তাও বুঝতে পারল না। কোথায় একটা সঙ্কোচ, নাম-না-জানা একটা সমীহের ভাব তাকে অনড় ক'রে রাখল।

খানিকটা চুপ ক'রে বসে থেকে দুর্গাপদ এক সময় গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়। তখনও তার রাগটা কমে নি, রুদ্ধ আক্রোশে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে লাগল যে, যার জন্য এত কাণ্ড, এবার থেকে তাই করে বেড়াবে সে। যা-খুশি করবে, যেখানে খুশি যাবে। রীতিমতো বেলেল্লাগিরিই করবে সে, দরকার হয় তো বেশ্যাবাড়িও যাবে, দেখবে কে ঠেকায়। কী করতে পারে তার ও মাগী, দেখে নেবে সে।......

বহুরাত অবধি তারও ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে তেমনি নিষ্ফল শব্দহীন আস্ফালন ক'রে যেতে লাগল। কিন্তু যতই ভেতরে ভেতরে গজরাক সে, যতই ভয়ংকর ভয়ংকর প্রতিশোধের সংকল্প নিক—মনের মধ্যে যেন কিছুতেই কোন জোর পেল না। আপাতবাধ্য শান্ত সহিষ্ণু স্ত্রী তার যেন হঠাৎ কেমন ক'রে হাতের বাইরে নাগালের বাই'রে চলে গেছে, দয়ার পাত্রী কেমন ক'রে দয়াবিতরিত্রীর আসনে উঠে গেছে—কিছুতেই আর যেন তার ধরা-ছোঁওয়া পাচ্ছে না। কে জানে এটা কেমন ক'রে হ'ল।

সেই সমস্যাটাই সমস্ত ব্যর্থ আস্ফা-লনের পিছনে মনের অবচেতনে তাকে পীড়িত করতে লাগল, বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না দুর্গাপদ।

(ক্রমশঃ)

ফরাসী চিত্রকর জর্জ ব্রাক

বিংশ শতাব্দীর শিল্পজগতে যে তিনজন শিল্পী তাঁদের বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে শিল্প-রসিক মানুষের চিত্তলোক জয় করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ফরাসী শিল্পী জর্জ ব্রাক গত ৩১শে আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অন্য দু'জনের মধ্যে আঁরি মাতিসও বিদায় নিয়েছেন। অতীত দিনের স্মৃতি নিয়ে আমাদের মাঝখানে আজ শুধু বেঁচে রইলেন শিল্পী পিকাসো।

১৮৮২ খৃস্টাব্দের ১৩ই মে আজাতীয়-স্যুর-সীনে এক শিল্পী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন জর্জ ব্রাক। ঘনবাদের স্রষ্টা পল সেজানের প্রদর্শিত পথে শিল্পী ব্রাক এমন এক নতুন আঙ্গিকের জন্ম দিলেন, যাকে ভিত্তি করে পরবর্তী কালে শুরু হল কিউবিজমের আন্দোলন। শিল্পী ব্রাকের নাম স্মরণীয় হয়ে রইল এই আন্দোলনের স্রষ্টারূপে।

অথচ ভাবতে অবাক লাগে, একদিন যে শিল্পীকে বিশ্বজগৎ শ্রদ্ধায় আর সম্মানে বরণ করে নিল, সেই শিল্পীর চিত্রকলা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে চিত্র-প্রদর্শনীর জন্য চিত্র-মনোনয়নের সময়। বিখ্যাত কলা-সমালোচকের রূঢ় মন্তব্যেও ধিক্কৃত হয়েছে শিল্পী ব্রাকের সৃষ্টি। কিন্তু সব প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে মহৎ কল্পনাপ্রতিভার শিল্পী ব্রাক আবিষ্কার করেছিলেন শিল্পকলার নতুন পথ। তাঁর রঙ আর রেখার বিশ্লেষণী ঘনত্ব মুগ্ধ করেছে অগণিত কলারসিককে। শুধু চিত্র-রচনায় নয়, ভাস্কর্য-কলাতেও শিল্পী ব্রাকের বিস্ময়কর নৈপুণ্য স্বীকার করেছেন পরবর্তীকালের কলা-সমালোচকেরা। দীর্ঘ সত্তর বৎসর একটানা শিল্পসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ফরাসী সরকার তাঁকে লেজিয় দ'নর পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।

সেই মৃত্যুঞ্জয় শিল্পী ব্রাকের উদ্দেশে আজ বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমরাও জানাই আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কলারসিক

দুটি প্রদর্শনী : কারুশিল্প ও চিত্রকলা

কলকাতার চিত্র-প্রদর্শনীর গ্যালারীগুলি কিছুকাল নীরব থাকার পর আবার সরব হতে শুরু করেছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনের দুটি কক্ষে প্রায় একই সঙ্গে দুটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এর একটি হল নাগাভূমির কারুশিল্পের প্রদর্শনী, অন্যটি তরুণ শিল্পী অরুণ মুখোপাধ্যায়ের একক চিত্রকলার প্রদর্শনী। দুটি প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে অ্যাকাডেমী তার বর্ষাকালীন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শরৎকালীন সরবতাকে সানন্দে বরণ করতে চলেছে। প্রদর্শনী-কক্ষে নানা মানুষের আনাগোনায় সেদিন দেখলাম এরই স্বীকৃতি।

॥ নাগাভূমির কারুশিল্প ॥

নাগাভূমির কারুশিল্পের প্রদর্শনীটি আয়োজিত হয়েছে সেখানকার সরকার এবং অ্যাকাডেমী কর্তৃপক্ষের যুগ্ম উদ্যোগে। যে অরণ্যচারী মানুষের বিচিত্র জীবন-যাত্রা সমতটবাসী মানুষের, বিশেষ করে শহুরে মানুষের কাছে রূপকথার মত মনে হয়, সেই অরণ্যচারী মানুষের শিল্প-চেতনার নিদর্শন শহুরে মানুষের মনেও যে আনন্দ দিতে পারে তারই সুস্পষ্ট উদাহরণ এই প্রদর্শনীটি। আদিম শিল্প-চেতনায় যে সহজ-সরল সৌন্দর্যানুভূতি ক্রিয়াশীল, নাগাভূমির অধিবাসীদের হাতে তৈরী কারুশিল্পের নিদর্শনগুলিতে তা প্রকাশিত হলেও বয়ন-শিল্পের জটিল নক্সা পরিকল্পনার মধ্যে কিন্তু এমন এক উন্নত শিল্প-রুচিকে আমরা খুঁজে পেলাম যার মধ্যে সারল্য ও জটিলতার সহাবস্থান ঘটেছে। ফলে, আমাদের শহুরে জটিল মন নাগাভূমির বয়নশিল্পের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে। এমনি দৃষ্টি আকর্ষণকারী অনেকগুলি শাল এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। তবে একটি কথা মনে হয়েছে। নাগাভূমির বিভিন্ন ডিজাইনকে ভেঙে আধুনিক কালের বয়নশিল্পীদের দ্বারা বোনা বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদকে এই প্রদর্শনীতে

প্রাধান্য না দিয়ে যদি আরও প্রাচীনতম বয়নশিল্পের নিদর্শন এখানে উপস্থিত করা হত তা হলেই আমরা খুশী হতাম বেশী।

বয়নশিল্পের নিদর্শন ছাড়া কাঠ, বাঁশ, বেত প্রভৃতি দিয়ে প্রস্তুত অনেকগুলি শিল্প-নিদর্শনও এই প্রদর্শনীর অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। এর মধ্যে দুটি কাঠের পুতুলের খোদিত রূপ এবং সাজ-সজ্জার মধ্যেই আদিম শিল্প-চেতনা সবচেয়ে বেশী অভিব্যক্ত হয়েছে। নাগাভূমির শিকারী মানুষেরা যে তীর ও তরবারি ব্যবহার করে এবং সেগুলিকে তারা কত যত্নে ও নানা উপকরণে সজ্জিত করে তারও নিদর্শন ছিল এই প্রদর্শনীতে। শোনা গেল, এখানে প্রদর্শিত তরবারির আঘাতে নরমুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়েছে নাকি একাধিকবার।

এই সব শিল্প-নিদর্শন ভিন্ন আলোকচিত্রের সাহায্যে নাগাভূমির অধিবাসীদের জীবন-যাত্রাকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা। এই প্রদর্শনী আমাদের মনের আগ্রহ বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু এত সীমিত শিল্প-দ্রব্যে সে আগ্রহ পরিতৃপ্ত হয়নি। আশা করি ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে নাগা রাজ্যের কারু-শিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করে উদ্যোক্তারা আমাদের খুশী করবেন।

শিল্পী অরুণ মুখোপাধ্যায়ের চিত্র-প্রদর্শনী

নাগাভূমির কারুশিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধনের মাত্র এক দিন আগে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনের অন্য এক কক্ষে শিল্পী অরুণ মুখোপাধ্যায়ের চিত্র-প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। সম্ভবতঃ শিল্পী মুখোপাধ্যায়ের এটিই প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী। অবশ্য কলকাতার কয়েকটি সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীতে ইতিপূর্বে আমরা অরুণ-

অন দি স্ট্রীট — শিল্পী : অরুণ মুখোপাধ্যায়
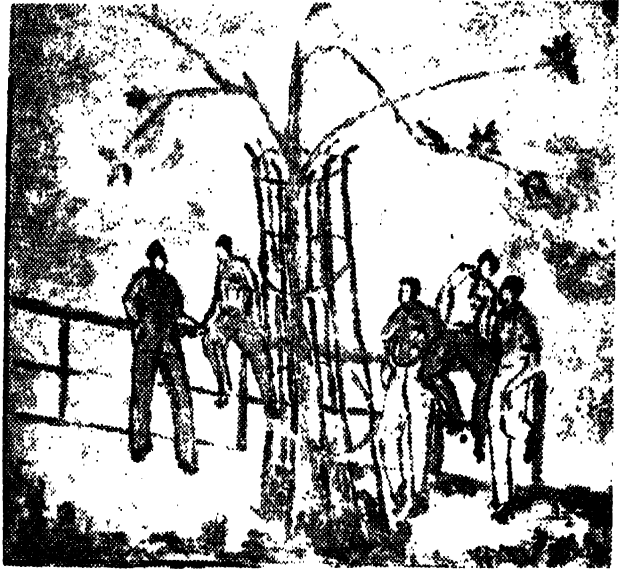
বাবুর চিত্র-নিদর্শন দেখার সুযোগ পেয়েছি। সেই সব চিত্র-প্রদর্শনীতে অরুণ মুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু ভাল কাজও ছিল। এবার এই প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী দেখে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশান্বিত হতে পারি।

এই প্রদর্শনীতে জলরঙ, তেলরঙ ও গ্রাফিক-মাধ্যমে অঙ্কিত মোট কুড়িখানি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। গ্রাফিক এবং তেলরঙের মাধ্যমে শিল্পী মুখোপাধ্যায় এর আগে কাজ করেছেন বলে জানতাম কিন্তু জলরঙের মাধ্যমে এবারই প্রথম তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ফলে, বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্পীর দক্ষতা বিচার করে নেবার সুযোগ ঘটেছে।

আলোচ্য প্রদর্শনীর তেলরঙের চিত্রগুলিতে শিল্পী বাস্তব ও বিমূর্ত-চেতনার এক মিশ্র প্রতিক্রিয়াকে মৃদু রঙ ও রেখায় ধরতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর চিত্র-সংস্থাপন সত্যি প্রশংসনীয়। বিশেষ করে 'এ ম্যান রিটার্নস্ হোম' (৩), 'অন দি স্ট্রীট' (৬) ও 'ইয়ুথ' (৭) চিত্র তিনখানির আবেদন দর্শক-মনকে স্পর্শ করতে পেরেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

জলরঙের চিত্রগুলির সবই নিসর্গ-ভিত্তিক। বিশেষ করে ভারতের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান ও নিসর্গ দৃশ্য এগুলিতে মূর্ত হয়েছে। এর মধ্যে 'ঘাটশীলা' (৯), 'হরিদ্বার' (১০), 'রামপুর' (৩) এই চিত্র তিনখানি মনোমুগ্ধকর। তবে জলরঙে আলো-ছায়ার বর্ণসম্পাতে শিল্পী এখনও দ্বিধান্বিত বলে মনে হল। জলরঙ ও প্যাস্টেলের মিশ্র মাধ্যমে রচিত চিত্রের মধ্যে 'রিভার সাইড' (১৭) চিত্রখানি আমাদের ভাল লেগেছে। নদীর রঙে হলুদ, ধূসর ও নীলের টান একটু কম থাকলে বোধ হয় আরও সুন্দর হত।

গ্রাফিক চিত্রকলায় শিল্পী মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লিনোকাট 'পিজিয়নস উইথ ফ্লাওয়ার' (২০) নিঃসন্দেহে মনে রাখার মত সৃষ্টি।

শিল্পী অরুণ মুখোপাধ্যায় তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সত্যি উল্লেখযোগ্য প্রতিভার অধিকারী। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ চিত্র-প্রদর্শনীর অপেক্ষায় রইলাম।
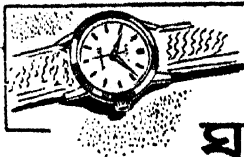
কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরেগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৩)

আশ্চর্য মানুষের মন। অতীত নয় ভবিষ্যৎ নয় শুধু বর্তমানকে কেন্দ্র করেই তার বিচরণ। যা দেখছি, সকাল বিকেল যাদের সংগে দেখা হচ্ছে তাদের বাইরে আর কিছুই আমরা দেখতে পাই না, ভাবতেও চাই না। তা না হলে এই ক'মাসের মধ্যে আমি অলকার কথা সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিলাম কি করে।

আমার বিপদের সময় অলকা আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। বৌদির নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, অল্পদিনের জন্যে হলেও নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রতিদানে আমার কাছে সে কিছুই চায়নি। মিঃ দত্তর শ্যেনদৃষ্টি আমার উপর না পড়লে আমি হয়ত এখনও অলকার সংগেই থাকতাম, চুঁচড়োয় গিয়ে চাকরি করার প্রয়োজন হত না। ক'মাস আগেও যার সংগে সকাল বিকেল কাটিয়েছি, এত সহজে তাকে ভুলে যেতে পারলাম কি করে।

পরক্ষণেই মনে হল অলকার কথা ভাবিনি সত্যি কিন্তু সে বোধহয় প্রয়োজন নেই বলে। মিঃ দত্তর বাড়ী ছেড়ে যখন চলে এলাম, যদি না অলকাকে অজয়ের সংগে দেখতাম তাহলে নিশ্চয় তার জন্যে দুশ্চিন্তা আমার থাকত। অজয়ের রাসবিহারী এভিন্যুর বাড়ীতে হাসি-খুশী চঞ্চলা অলকাকে দেখে আমি যে শুধু আনন্দই পেয়েছিলাম তা নয় বুঝেছিলাম ওদের যুগ্ম জীবনে আমি আনন্দিত। সেই জন্যেই ওদের কথা ভাবিনি। ইচ্ছে করেই নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম।

আজ মার্কেটে অন্য একটি মেয়ের সংগে মিঃ দত্তকে ঘুরে বেড়াতে দেখে অলকার সংগে দেখা করার জন্যে যদিও আমি উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু জানতাম তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। অলকাকে আমি অজয়ের নতুন সংসারে নিশ্চয় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পাব।

ট্যাক্সীতে গগন সেনকে একথা বলায় সে মৃদু হাসল, অনু, তুমি বড় সরল। সংসারটা যদি এমনি সরল হত।

বললাম, কেন একথা বলছি অজয়ের সংগে পরিচয় হলে তুমি বুঝতে পারবে। সেও আমারই মত—

—বোকা।

আমি গগন সেনের দিকে তাকালাম, সে সহাস্যে বললে, সরল আর বোকা দুটো শব্দ আমরা প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করি। অথচ দুটোর মধ্যে কত তফাৎ।

—কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না।

—এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

আমার নির্দেশমত অজয়ের দোকানের সামনে ট্যাক্সী থামল, গগন সেন নামল না, বলল, তুমি আগে দেখা করে এস, আমি গাড়ীতে অপেক্ষা করছি।

আমি দোকানে ঢুকে দেখি অজয় নিজেই দুই ভদ্রমহিলাকে কাপড় দেখাচ্ছে। আমাকে দেখে প্রথমটা সে চমকে উঠল, পরে বিস্ময়ের মাত্রা কাটিয়ে হাত তুলে নমস্কার করল, বলল, একটু অপেক্ষা করুন, এ'দের শাড়ী দেখিয়ে আমি আসছি।

অজয়কে দেখে কিন্তু আমিও কম আশ্চর্য হইনি। আগের চেয়ে রোগা হয়েছে, চোখের তলায় কালি, মুখে এতটুকু হাসি নেই। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ওকেই দেখছি।

একটু পরেই ভদ্রমহিলাদের সামনে একরাশ শাড়ী সাজিয়ে রেখে অজয় আমার কাছে এল। কি বলে কথা শুরু করব ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন?

অজয় দায়সারা উত্তর দিল, ভাল।

—আমি এসেছিলাম অলকার সংগে দেখা করতে।

অজয় প্রথমটা কোন উত্তর দিল না, পরে গম্ভীর স্বরে বলল, অলকা আর এখানে আসে না।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম, তার মানে?

—মানে, সে আর আসে না।

এরপর কি বলব বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, অলকার সংগে কোথায় দেখা করতে পারি।

অজয় কাগজে একটা ঠিকানা লিখে আমার দিকে এগিয়ে দিল, এখানে গেলে ওকে পাবেন।

কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রশ্ন করলাম, ও এখন কি করছে?

—জানি না।

একটু চুপ করে থেকে নমস্কার করে বললাম, তাহলে এখন আসি।

অজয় গম্ভীর মুখে প্রতিনমস্কার করল।

ট্যাক্সীতে ফিরে আসতেই গগন সেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আবার কোন দুঃসংবাদ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, এই ঠিকানায় একবার যেতে হবে।

গগন সেন একবার হাতের কাগজটা দেখে ড্রাইভারকে ঠিকানাটা বলে দিল, আমাকে জানাল, কাছেই, বেশী দূরে নয়। কে থাকে এখানে?

—অলকা।

—তাহলে যা ভেবেছিলাম ঠিকই, নির্বাসিতা।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। অজয়ের সংগে কথার পর থেকে অলকার জন্যে সত্যিই আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি। বুঝতে পারছি সে মিঃ দত্তের কাছেও নেই, আর যে কোন কারণের জন্যেই হোক অজয়ের সংগে তার সব সম্পর্ক কেটে গেছে। তবে সে এখন একলা ঐ নতুন ঠিকানায় কি করছে। এ অবস্থায় সাধারণতঃ মেয়েদের যে পথ বেছে নিতে হয় তা চিন্তা করে আমি শিউরে উঠলাম। ভগবান করুন সে অবস্থায় যেন অলকাকে আমায় কোনদিন দেখতে না হয়।

নির্দিষ্ট ঠিকানায় ট্যাক্সী থামল। এবারও আমি একলাই নামলাম। এটা

ঠিক ফ্ল্যাট বাড়ী নয়। হোটেলের মত থাকবার ব্যবস্থা। বেশীর ভাগই একখানা ঘর আর বাথরুম। রাঁধবার খুব অল্প জায়গা।

অলকার নাম বলতেই লিফট্ম্যান তিনতলায় নিয়ে গিয়ে একখানা ঘর আমায় দেখিয়ে দিলে। দরজার বেল টিপতেই খুলে গেল, সামনে দাঁড়িয়ে অলকা।

—আরে অপু তুই? আগের মতই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। কতদিন বাদে দেখা হল বল ত? কি খবর? কেমন আছিস? মেজ্দি ভাল আছেন?

একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করল অলকা। আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। অলকাকে দেখে আমার ভাল লাগল। চেহারা তার আগের মতই আছে।

বহুদিন বাদে দুই বন্ধুতে দেখা হওয়ার প্রথম উচ্ছ্বাসটা কেটে যাবার পর আমি আসল কথায় এলাম, তুই এখন কি করছিস? অলকা হেসে বলল, কিছু না রে, চাকরি খুজছি। দু'এক জায়গায় ইনটারভিউও দিয়েছি, মনে হচ্ছে কোথাও না কোথাও একটা পেয়ে যাব। এত সহজে অলকা কথাগুলো বলল যেন তার কিছু পরিবর্তন হয়নি। সঙ্কোচ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মিঃ দত্তর সঙ্গে তাহলে আর—,

অলকা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কোন সম্পর্ক নেই। উনিও বেঁচেছেন, আমিও বেঁচেছি।

—কিরকম?

—তোকে না পেয়ে উনি নতুন উদ্যমে অন্য একটি মেয়েকে ধরবার ফাঁদ পাতলেন।। সে ধরা দিল। তখন উনি আমাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন, মুখ ফুটে বলতেও পারছেন না, অথচ আমি ওর মনের কথা বুঝতে পারছি। শেষ পর্যন্ত আমিই একদিন খোলাখুলি আলাপ করে নিলাম। দুজনেই মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

বললাম, তুই তো এক নিঃশ্বাসে বেশ বলে দিলি, কিন্তু তারপর কি হোল?

অলকা হাসল, তারপর আবার কি, এই তো দেখছিস এখানে বসে আছি।

—তা নয়, মানে আমি বলছিলাম অজয়ের সঙ্গে তোর?

—ওহো, অজয়ের কথা তোর মনে আছে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, মনে থাকবে না, আমি তো ভেবেছিলাম তুই অজয়কে—,

অলকা পদপূরণ করে নিল, ভালবাসি। সত্যি কথা।

—তবে?

—সে তুই বুঝবি না। আমার ভালবাসার কোন খাদ ছিল না, নেইও।

—তবে তোরা বিয়ে করলি না কেন? অলকা ক্লান্ত স্বরে বলল, হয় না।

—কেন?

—সে অনেক কথা, দীর্ঘ ইতিহাস শুনিয়ে কোন লাভ নেই। তবে তোর বোঝবার সুবিধের জন্য এটুকু বলতে পারি সংসারে এক একজন লোক পাবি যারা সারাজীবন ছেলেমানুষ, যাদের মনের বয়েস বাড়ে না। বাইরে থেকে দেখলে কিন্তু এদের বোঝা যায় না, বোঝা যায় যখন কোন কঠিন পরীক্ষা আসে। যতদিন মিঃ দত্তর হাত থেকে রেহাই পাইনি ততদিন অজয়কে আমি বুঝতেও পারিনি। ভেবেছিলাম তার ভালবাসাতেও কোন খাদ নেই।

এই পর্যন্ত বলে অলকা থামল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন কি তোর মনে হয় অজয় তোকে ভালবাসে না?

—হয়ত বাসে, কিন্তু সেও ছেলেমানুষের ভালবাসা। যতদিন মিঃ দত্ত আমার ভার বয়েছেন, অজয় ততদিন পর্যন্ত খুব সহজ হয়ে আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে পেরেছে, কিন্তু যেদিন প্রশ্ন উঠল পুরোপুরি আমার ভার তাকে নিতে তখনই দেখলাম বেচারীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ওর মনের কথা বুঝতে পেরে আমি তাকে মিঃ দত্তের মতই স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়েছি।

অলকার কথায় আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম, অজয় আর তোর কাছে আসে না?

—আমি বারণ করে দিয়েছি।

—এখন তার মানে তুই একেবারে একলা?

অলকা হাসল, নারে, মিঃ দত্তর কাছ থেকে আসবার সময় হেমোর মাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম, সে আমার কাছেই থাকে।

হেমোর মা অলকার খাস দাসী ছিল, তাকে আমি ভাল করেই চিনতাম, অলকাকে সে অত্যন্ত ভালবাসে।

না বলে পারলাম না, তোর চলে কি করে?

অলকা ম্লান হাসল, মিঃ দত্ত সে ব্যবস্থাটুকু করে দিয়েছেন, একেবারে আমায় জলে ভাসিয়ে দেননি। প্রতি মাসে তিনশ' টাকা আমার নামে উনি ব্যাঙ্কে জমা করে দেন। একলা মানুষের দিব্যি চলে যাচ্ছে।

একথায় খুব ভরসা পেলাম না, পরে যদি না পাঠান।

—ততদিনে একটা চাকরি নিশ্চয় পেয়ে যাব।

অলকার কথা শুনে মন আমার ভারী হয়ে উঠেছিল, বললাম, ক'দিন তুই চল আমার সঙ্গে থাকবি, গঙ্গার ধারে, বেশ লাগবে দেখিস্।

অলকার চোখ সজল হয়ে উঠল, তুই যে যেতে বলেছিস্ এইতেই আমি খুশী। পুরোন বন্ধুদের কারুর সঙ্গেই আর দেখা হয় না, নিজেরও একটা সঙ্কোচ আছে কে কিভাবে নেবে তা তো জানি না। তুই যে নিজের থেকে এসেছিস আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তোকে বলে বোঝাতে পারব না।

আমিও চোখের জল সামলাতে পারলাম না, বললাম, অলকা, আমায় কথা দে, আমার কাছে তোর প্রয়োজনের কথা গোপন করবি না। জানিস্ তো অত্যন্ত অভাবের দিনেই তোর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, আজ আমি অনেকটা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। এখন যদি তোর কোন কাজে আমি লাগতে পারি—

অলকা আগের মতই আমার গালটা টেনে নিয়ে আদর করল, তোর মুখে বলার দরকার নেই, আমি বুঝতে পেরেছি।

তারপর অত্যন্ত প্রশান্ত গলায় বলল, কারুর বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ নেই অপু, মিঃ দত্ত আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন, তিনি না বাঁচালে এ সংসারে হাজারো অবাঞ্ছিত সন্তানের মত আমাকে অন্ধকারের মধ্যে বেঁচে থাকতে হত, উনি আমাকে বাঁচবার সুযোগ দিয়েছেন। অজয়কে ভালবেসে আমার অপূর্ণ সাধ আমি মিটিয়েছি, তার বিরুদ্ধেও আমার কোন অভিযোগ নেই। ভালবাসা বড় পবিত্র জিনিস, ওর শেকল দিয়ে বেঁধে আমি বেচারীকে পিষে মারতে চাই না। আস্তে আস্তে সে আমাকে ভুলে যাবে, বিয়ে-থা করবে ঘর-সংসার হবে, সেই তো ভাল, কি বল?

বুকের মধ্যে ব্যথা গুমরে উঠছিল, তাই বোধ হয় বললাম, আমি কি করে বুঝব, তুই তো বলেছিলি, নিজেকে ছাড়া আমি কাউকে ভালবাসি না।

অলকা খিলখিল করে হাসল, সে কথা আজও মনে আছে?

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে অলকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি নীচে নেমে এলাম। কিন্তু আসবার সময় এ বাড়ীর টেলিফোন নাম্বারটা আমি নিয়ে নিতে ভুলিনি যেখানে বললে অলকাকে ডেকে দেবে।

ট্যাক্সীতে গগন সেন ছিল না। ড্রাইভার অপর ফুটপাতের একটা মাদ্রাজী কাফে দেখিয়ে বলল, সাহেব ঐখানে গেছেন। আপনাকেও যেতে বলেছেন। রাস্তা পেরিয়ে কাফেতে ঢুকে দেখি গনন সেন এক মনে মাদ্রাজী প্রথায় এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে গরম কফি ঢালাঢালি করছে। আমাকে দেখে সকৌতুকে বলল, এতক্ষণ ধরে সখী-সংবাদ নেওয়া হল, আমি বেচারী হাই

ভুলে পায়চারী করে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে এখানে ঢুকে পড়লাম। আমি লজ্জিত কণ্ঠে বললাম, বেচারী, তোমাকে বড্ড কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু কি করব, এতদিন বাদে অলকার সঙ্গে দেখা হল।

—ওর কি খবর।

—সে অনেক কথা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না।

গগন সেন হেসে পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, বোস না। আমি আর এক গ্লাস কফি আনাচ্ছি।

কাফেতে আর বাইরের লোক কেউ ছিল না, এ সময় ফাঁকাই থাকে। ভিড় হয় অফিস ভাঙ্গার পর। আমি আস্তে আস্তে অলকার কথা সব বললাম, মিঃ দত্তর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ, অজয়কে স্বেচ্ছায় মুক্তি দেওয়া এবং বর্তমানের একক জীবন। কিন্তু সেইখানেই আমি শেষ করলাম না, নিজের বক্তব্যটুকুও জানালাম, অলকা এ মহা ভুল করল। অজয়কে তার বিয়ে করা উচিত ছিল।

নির্বিকার গগন সেন উত্তর দিল, আমার মনে হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। এত দিনে অলকা কিছুটা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। মিঃ দত্তর কাছ থেকে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছে এতে সে বেঁচে যাবে। দিনের পর দিন প্রতারণা করে বেঁচে থাকা বড় কষ্টের। মনে এতটুকু শান্তি থাকে না। কিন্তু অজয়কে বিয়ে করলে ওর দুঃখ বাড়ত বই কমত না।

—তবু তো একটা আশ্রয় পেত।

—ও কপট আশ্রয়ের কোন দাম নেই। তোমাকে আগেও যা বলেছি, আজ তাই বলছি, প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের চেয়ে ট্র্যাজেডী এ সংসারে আর কিছু নেই। তুমি নজীর দিয়ে একশ'বার বলতে পার, কত পরিবারকেই চেন যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা নেই। অথচ তারা সংসার-ধর্ম পালন করে চলেছে। অস্বীকার করব না। কিন্তু বলব, এ প্রথা না চললেই ভাল হত। তাদের যুক্তি হল স্ত্রী একটি আশ্রয় পেয়েছে, স্বামী কর্তব্য পালনের জন্য সন্ধ্যাবেলা একটা জায়গা পেয়েছে। আর তাদের ছেলে-মেয়েরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যাধি, বাইরের শত্রুর হাত থেকে বাঁচার মত একটি বাসা পেয়েছে। আমি ঐ স্বামী-স্ত্রীর কথা বলছি না, তারা দুজনেই স্বার্থপর, নিতান্ত জৈব কারণে সমাজের কাছ থেকে বিবাহের ছাড়পত্র নিয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশিমত ব্যাভিচারে মত্ত। উঁচু থেকে নীচু, সমাজের সব স্তরে এই এক ব্যাধি। পশুর সঙ্গে মানুষের যে পার্থক্য তাও তারা ভুলতে বসেছে।

কথা বলতে বলতে গগন সেনের চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তবু আমি বলবার চেষ্টা করলাম, তার মানে তুমি কি বলতে চাও, এ সব ক্ষেত্রে বিয়ে না করাই ভাল?

গগন সেন জোর দিয়ে বলল, একশ'বার। এরা এত বড় স্বার্থপর, শুধু নিজেদের সুখটুকু বোঝে, ছেলে-মেয়েগুলো কি করে মানুষ হবে, একবার ভাবতেও চায় না। শুধু একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়, দুটো ভাত, লজ্জা নিবারণের কিছু জামা-কাপড় এই দিয়েই তারা ভাবে তাদের কর্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু শিশুর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা। যে বাবা-মা তা দিতে পারে না, তাদের উচিত নয় ঈশ্বরের দূত নিষ্পাপ শিশুকে এই পাপের সংসারে টেনে আনা।

একটু থেমে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে গগন সেন বলল, অন্ততঃ এই কারণে আমি অলকাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। হয়ত বাকী জীবনটা একলা কাটাতে তার কষ্ট হবে। হয়ত সংগ্রাম করতে হবে। তবু সে যে স্বার্থপরতার পরিচয় দেয় নি সেই জন্যেই সে বড়।

কি খেয়াল হল জানি না, গগন সেনের মুখে অলকার এই প্রথম প্রশংসা শুনেই বোধ হয়, বললাম, ওর সঙ্গে একবার দেখা করবে? আমি জানি ও তোমায় দেখলে খুব খুশী হবে।

—না, আজ থাক।

আবদার করে বললাম, কেন, চল না, আবার কবে আসা হবে?

শেষ পর্যন্ত গগন সেন রাজী হল, বেশ চল।

রাস্তা পার হয়ে আমরা অলকাদের বাড়ীর গেটে ঢুকতে যাব, ট্যাক্সী ড্রাইভার ডাকল, বাবু সাব।

গগন সেন, পকেট থেকে একটা দু' টাকার নোট বার করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে হেসে বলল, মিটার নয়, বকশিস।

ড্রাইভার আর বিরক্ত করল না, সেলাম করে চলে গেল।

বলাই বাহুল্য আমাদের দেখে অলকা অত্যন্ত খুশী হল। সাদরে

চেয়ারে বসিয়ে গগন সেনকে বলল, আপনি এতক্ষণ নীচে অপেক্ষা করছিলেন বুঝি? ছি, অপুর উচিত ছিল আপনাকে ওপরে নিয়ে আসা।

গগন সেন উত্তর দিল, আমি ইচ্ছে করেই আপনাদের দুই বান্ধবীর আলাপ আলোচনার মাঝখানে এসে পড়ে বাধার সৃষ্টি করতে চাই নি।

অলকা হেসে বলল, এমন কোন কথা আমাদের ছিল না যা আপনাকে বলা যায় না, বিশেষ করে আমার কথা আপনি তো সবই জানেন।

—যেটুকু জানতাম না, এখন তাও শুনলাম।

—তাতে মন ভরবে?

—জানি না।

—এমন একটা কিছু করুন যাতে রুটিরও সংস্থান হয় আবার মনও ভরে।

অলকা মুখ তুলে তাকাল, কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

গগন সেন পাইপটা দাঁতে কামড়ে রেখে বলতে শুরু করে, ধরুন একটা বাচ্চাদের স্কুল যেখানে চেষ্টা করা হচ্ছে শিশুদের মনে মনুষ্যত্বের বীজ বোনার। বাড়ীতে যে পরিবেশের মধ্যেই তারা থাকুক না কেন যদি তাদের ভালবেসে শিক্ষা দেওয়া যায়, নানা রকম গল্প, মন

...তাতে মন ভরবে?

অলকা আমার দিকে তাকাতে বললাম, উনি তোর খুব প্রশংসা করছিলেন।

অলকা বলল, এতে প্রশংসা করার কিছু নেই, এছাড়া আমার কিছু করবার ছিল না।

গগন সেন পাইপ ধরাতে ধরাতে বলল, এর পর?

—চাকরি।

ভোলানো খেলনা, সবের মধ্যে দিয়ে একটা সুস্থ জীবনের স্বপ্ন গাঢ় করে তাদের মনে এঁকে দেওয়া যায়, হয়ত তারা একদিন সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে। এ ধরনের একটা আদর্শ স্কুল চালাতে গেলে কিছু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন, যারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারবে, যারা দুনিয়াটাকে দেখেছে, এর অসারতার কথা বুঝেছে, অথচ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে নি। জীবনের ওপর আস্থা হারায় নি। তারাই শুধু এ কাজে ব্রতী হতে পারবে।

অলকা চুপ করে কথা শুনছিল, বলল, এ সব শুনতে বেশ ভাল লাগে, কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের স্কুলই বা কোথায়, আর আমাকে তারা নেবেই বা কেন? আমার তো কোন অভিজ্ঞতা নেই।

—ধরুন যদি আমি ব্যবস্থা করে দিই, এ ধরনের কাজ আপনি নেবেন?

অলকার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, সানন্দে। এবং এর জন্যে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

গগন সেন উঠে পড়ে, তাহলে এই কথা রইল, যথাসময়ে অপু আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

গগন সেনের কথা শুনে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি, ভেবেছি এমন একটা জানা প্রতিষ্ঠান যদি তার থাকে সে আমাকে জানায় নি কেন। অলকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে ট্যাক্সীতে সেই কথাই আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

গগন সেন স্বভাবসুলভ রহস্যভরা গলায় উত্তর দিল, প্রতিষ্ঠান এখনও নেই, তবে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়?

—জায়গা খুঁজছি, সেই সঙ্গে খুঁজছি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী।

সঅভিমানে বললাম, আমাকে তো আগে বলনি?

—সময় হয় নি বলে।

কথাটায় ব্যথা পেলাম, না বলে পারলাম না, দুনিয়ার সকলের কাছে বলতে পার; আমাকে বাদ দিয়ে। আমি কি এতই ছেলেমানুষ?

গগন সেন আমার দিকে ফিরে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, এর পর থেকে তাহলে তোমার অনুমতি না পেলে কাউকে কিছু বলব না। খুশী তো?

এ কথায় আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম, সত্যিই তো কি ছেলেমানুষের মত কথা বলেছি, গগন সেনের উপর আমার কি অধিকার আছে যে, তার মনের সব কথা প্রথম আমাকেই জানাতে হবে। তবু চোখের জল বাধা মানল না, আমি তা গোপন করার জন্যেই মাথা নীচু করলাম। তা বুঝতে পেরেই বোধ হয় গগনে সেন আলতো করে আমার মুখ তুলে ধরল, ঝাপসা চোখে দেখলাম সে হাসছে, উজ্জ্বল প্রশান্ত হাসি, আমি সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

(ক্রমশঃ)

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

"জানাতে পারেন" বিভাগ মারফত নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর পেলে বাধিত হব।

(১) সংখ্যাগণনা কে, কতদিন আগে আবিষ্কার করেন?

(২) ধারাপাতে শতকিয়াতে যে একে চন্দ্র থেকে দশে দিক আছে, তা বলবার আবশ্যকতাই-বা কি?

(৩) একে চন্দ্র, দুই-পক্ষ, তবু বোঝা যায়; কিন্তু তিনে নেত্র, সাতে সমুদ্র ও আটে অষ্টবসু এ-গুলিরই বা অর্থ কি?

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
গ্রাম—জয়রামপুর,
জেলা—২৪-পরগণা।

সবিনয় নিবেদন,

১। কাঠের আসবাবপত্রে ঘুণ ধরে কেন? কি করলে ঘুণ ধরা নিবারণ করা যায়।

২। খানিকটা ঘুণধরা আসবাব আর যাতে নষ্ট না হয় তার কি কোন উপায় নেই? ঘুণ মারা যায় কি করে?

পুষ্পদল ভট্টাচার্য,
১৫।৬, সিভিল লাইন্স,
কানপুর।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রকাশিত অমৃত পত্রিকার আমি একজন পাঠিকা। পত্রিকার জানাতে পারেন বিভাগ আমার কাছে বড়ই চিত্তাকর্ষক। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছা করি। আশাকরি প্রশ্নগুলির জবাব অমৃত মারফৎ জানতে পারবো।

(১) কোন্ কোন্ বাঙালী হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন।

(২) পি ই এন ক্লাব কি?

রমা ভট্টাচার্য,
প্রফেসারস' কর্ণার
মাল্কী, শিলং

সবিনয় নিবেদন,

হাওড়া ষ্টেশনে রেলের টিকিটের উপর হাওড়া ব্রীজের জন্য কোন ট্যাক্স ধরা হয় কি?

যদি কোন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা উপরোক্ত প্রশ্নটির উত্তর দেন, তবে বড়ই উপকৃত হই।

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ সান্যাল,
হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের দেশের দেব-দেবীর রূপে বৈচিত্র্যময়। অবশ্য এ'কথা ঠিক যে, প্রতিটি বৈচিত্র্যের পিছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অথচ, এ'দের রূপের বিশেষ করে প্রতিমাগুলি বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করার কারণ আমার কাছে অজ্ঞাত। তাই, আপনাদের জানাতে পারেন অতীব চিত্তাকর্ষক বিভাগটিতে এ'দের রঙ-রহস্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা মিলবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস।

কুমারেশ সেন,
১৪৬, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড,
নূতনপাড়া, বেহালা।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গেল সংখ্যার 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত ডাক্তার গৌর সেন লিখিত পত্রে কিছুটা ভুল থেকে গেছে। হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত সাপ্তাহিকটির নাম 'নাচঘর' এবং ওটি মঞ্চ ও পর্দা—দুই বিষয়েরই, মাত্র সিনেমা সংক্রান্ত নয়। মাত্র সিনেমা সংক্রান্ত পত্রিকা হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়—'বায়োস্কোপ'; এর সম্পাদক ছিলেন চারু রায় এবং স্বত্বাধিকারী ছিলেন 'শো-হাউস'এর (বর্তমানে টকী শো-হাউস) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিমল পাল।

প্রণব বসু
১৮সি, মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা-২৯

সবিনয় নিবেদন,

গত ৬ই সেপ্টেম্বরের অমৃত পত্রিকার "জানাতে পারেন" বিভাগে প্রকাশিত শ্রীপৃথ্বীতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের ১নং প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

মানুষ জল এবং কোন খাদ্য গ্রহণ না করে কতদিন বাঁচতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য বিপ্লব যুগের নেতা কালীঘাট (রসা রোড) নিবাসী শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস মহাশয় একাত্তর বৎসর বয়সে ১৯৬১ সালের এপ্রিল-মে মাসে নিজের উপর পরীক্ষা করেন। তিনি একাদিক্রমে ছাব্বিশ দিন বিন্দুমাত্র জল কিংবা খাদ্য গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সজ্ঞানে অবস্থান করেন। এই দীর্ঘদিন নির্জলা অনশনের পরেও তাঁর স্বাস্থ্যের কোন অবনতি হয়নি। এখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং নিরোগ আছেন।

মিহির দাশগুপ্ত
বেথুয়াডহরী, নদীয়া।

প্রদ্যোৎ মিত্র ও বিমান দাশগুপ্ত

সাদ্ সুক্ মিন্ সিম্

তখন সবে এপ্রিল পড়েছে। শিলঙের বাতাসে তখনও রয়েছে বসন্তের আমেজ। মৌলাই এলাকার লুম্‌পুম্‌ওয়েকিং ক'দিন নতুন সাজে সেজে উঠ্‌লো। সে সাজে ছিল রঙ, ছিল ছন্দ। সেদিন সুবেশ তরুণ-তরুণীর নৃত্যে, 'তাংমি' বা 'তাংমুরি'র (পাইপ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র) তানে ও কাবোমের বোলে যে আনন্দ-সম্ভোগের আয়োজন হয়েছিল, তা' ভারতের নিজস্ব সম্পদ। ভারতবাসীর বৈচিত্র্যভরা জীবনের অন্তর্ভুক্ত এ উপ-চার। এদিন খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের খাসিয়ারা 'সাদ্‌সুক্‌মিন্‌সিম্' পালনে ব্যস্ত।

প্রতি বছরই এপ্রিল মাসে লুমপুম-ওয়েকিঙে 'সাদ্‌সুক্‌মিন্‌সিম্' পালিত হয়। উৎসব দেখতে আসে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা; নাচে অংশ গ্রহণ করে অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা। বাছাই করা পোশাক সবচেয়ে সেরা অলংকার তাদের দেহে অঢেল সৌন্দর্য ঢেলে দেয়। সেদিন সারা খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ে উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে যায়। উত্তরাংশ থেকে আসে ভোই খাসিয়া, পূর্বাংশ থেকে আসে সিন্‌টেং খাসিয়া, দক্ষিণাংশ থেকে আসে ওয়ার খাসিয়া। তাছাড়া শিলঙের আশেপাশের মূল খাসিয়ারা তো যোগ দেয়ই। সকাল থেকেই দলে দলে ছেলে-বুড়ো চলে মৌলাই-এর পথে পথে। তাদের গতি দ্রুত, লক্ষ্য এক। কজন যুবতীকে জিজ্ঞাসা কোরলাম, "খুবলেই কং, ফিন্ লেইত্ সানো" (নমস্কার বোন, তোমরা কোথায় চলেছ)। হাসি-ভরা মুখে তারা বলল, "ঙিন-কাওয়া বান্‌সিম্ বন্‌তা হাকা সাদ্‌সুক্‌মিন্-সিম্" (আমরা সাদ্‌সুক্‌মিন্‌সিম্ দেখতে যাচ্ছি)। কেউ আবার বলল, "ঙিন কাওয়া বন্ লাইত্ পেইত্ সাদ্‌সুক্‌মিন্‌সিম্" (আমরা সাদ্‌সুক্-মিন্‌সিমে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছি)।

ওয়াইত্‌লুম্ (তরবারী নৃত্য)-রত যুবক

'সাদ্' (নাচ) 'সুক্' (সুখী) 'মিন্‌সিম্' (আত্মা) প্রফুল্ল মনের পরি-চায়ক। খুশী মন, সৌন্দর্যের ডালি, সম্প্রীতির বাহন নিয়ে প্রকৃতির পূজা,

ঝিমলায়ের (মঞ্চ) উপর বোসে বাজনা বাজিয়ে চলেছে বাজনাদারেরা

সৌন্দর্যের উপাসনা এই 'সাদ্'। এটা ধনাধান্যজ্ঞাপক নৃত্য। এ অঞ্চলের প্রধান ফসল আলু। আলুর বীজ বপন কোরে খাসিয়ারা এ সময় অবসর পায়—তখন হয় এই নাচের উদ্‌যাপন। বোধকরি এ ধারণা সত্য যে, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মৌলাইতে এই অনুষ্ঠান হত না। বহু পূর্বে এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল বিজয়-নৃত্য। তখন খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ছিল বহু ছোট ছোট রাজ্য। তাদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী এলাকার যুদ্ধজয়কে চিহ্নিত করে রাখবার জন্য বিজয়-নৃত্য করা হত। এখন পট পরিবর্তিত হয়েছে। আজও সাদ্‌সুক্‌-মিন্‌সিমের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ পুরুষদের 'সাদ্‌ওয়াইত্‌' (তরবারি নৃত্য)। পূর্বে প্রথা ছিল সকল 'সিয়েম্‌' (রাজা) এ উৎসব পালন করবে। এখন মৌলাইবাদে একমাত্র চেরাপুঞ্জিতে 'সাদ্‌-সুক্‌মিন্‌সিম্‌' পালিত হয়।

পরিচালনা ও সকল ব্যবস্থাদির ভার 'সেংখাসী'র ওপর—'সেংখাসী'ই এর পুরোহিত ও হোতা। 'সেংখাসী' হল অ-খৃীষ্টান খাসিয়া সমিতি। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সম্পাদক ও কার্য-নির্বাহক সভ্যবৃন্দ রয়েছেন। তিনদিনের সাদ্‌সুক্‌মিন্‌সিমে মূলতঃ অংশ গ্রহণ করে অ-খৃীষ্টান খাসিয়ারা। প্রথমে সকলে জমায়েৎ হয় সেংখাসী হলে। সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা শুরু করেন—"আ ব্লেই ব্রাই কন্‌রাদ, উ নংথাও, উনংবু, লা ইয়া পই মিন্‌তা, কুম্‌ যা লা ইয়া বু, বান ইয়া মি, কা সাদ্‌ ক মেন.........অর্থাৎ হে ঈশ্বর! তুমি মানব স্রষ্টা, আজ নির্দিষ্ট দিনে আমরা এখানে এসেছি—সকলে খুশীভরা মনে মিলিত হতে। উৎসব প্রাঙ্গণে নৃত্য করবার জন্য.........ইত্যাদি।

এরপর সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলে—"কুম্বা কা ইয়া বু, বা লা পই কা ম্নি কা ইয়া বান ইয়া মি, কা সাদ্‌ কা মেন, দা কা সুক্‌মিন্‌সিম্‌ বারো, কুম্বা ইয়া লং বা ইয়া তিপ্‌ ই কুর ই খা, পয়া খুন খাসী প্নার...হা কা সাদ্‌ কা মেন..." অর্থাৎ, আজ উৎফুল্ল মন নিয়ে নাচের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হবার দিন এসেছে। আজ আমাদের গোত্র ও সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে জাগ্রত হওয়া উচিত—খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের পূর্ব ও পশ্চিমের সকলের নিজ নিজ কৃষ্টি অনুসরণ করা উচিত। ...এখন আমরা তরবারি ইত্যাদি নিয়ে নাচের জন্য প্রস্তুত হব, ...এমন এক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করব যা মানুষ ও ঈশ্বরের

শুমপুম সাদে (নাচের উদ্যান) মুক্তরে মেয়েদের নাচ

কাছে চিরকাল গৌরবের মর্যাদা পাবে... ইত্যাদি।

প্রার্থনার শেষে সবাই লম্‌প্‌রম্‌-সাদের (নাচের প্রাঙ্গণ) দিকে এগিয়ে চলে। সন্ধ্যা নেমে আসবার আগে অবধি চলে তাদের নাচের ঝংকার। সন্ধ্যার পর মিষ্টিমুখ ও নাটক। তবে তৃতীয় দিনের নাচই সবচেয়ে জমাট হয়।

'লম্‌প্‌রম্‌সাদ্' যেন প্রমোদউদ্যান। আকাশে বাতাসে সেখানে আনন্দের ফোয়ারা। চারদিকে বন্ধুর জমি ও পাহাড়, মাঝখানে মসৃণ 'লম্‌প্‌রম্‌সাদ' সমতল। চারপাশে পোঁতা কাঠের খুঁটি দিয়ে এ জায়গাটুকু ঘেরা থাকে। সীমানার চারপাশ থেকে সবাই উৎসব উপভোগ করে। নাচ দেখে তৃপ্ত জনতার উল্লাস পাহাড়ের দেহ ছুঁয়ে ফিরে যায় আবার। সে শব্দের সঙ্গে যোগ দেয় 'ভাংমী', 'কাবোম', ও 'কাবোমসিনে'র আওয়াজ। ছন্দের স্বন্দ্ব, তানের তর্ক। পাশেই তৈরী করা হয় কাঠের 'বিন্-সাম' (মাচা)—বাজনাদারদের বসবার জন্য কোনও গান নেই। শিল্পীরা মূক। তাদের পা চঞ্চল, দেহ উচ্ছল। মাঝে মাঝে পুরুষ নাচিয়েরা ছড়া বলে —পদোর ভঙ্গিতে, সুর না জুড়ে। তা শুনে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে 'ওকিউ'। এ হল 'ফাওয়ার'—আহ্লাদের প্রতীক।

মেয়েরা নাচে মাঝখানে। কেউ জোড়ায় জোড়ায়। কেউ একলা। তাদের ডান হাতে দোলে রুমাল। নম্র চোখ তাদের মাটির দিকে নিবন্ধ। প্রকৃতিকে সম্ভ্রম দেখাতে ব্যস্ত। গায়ে তাদের দামী দামী মখমল ও সিল্কের তৈরী 'জাইন্‌সেম্' (পোশাক), মাথায় তাদের সোনার বা রুপার 'পান্‌স্‌গাইট্' (মুকুট)। পা নগ্ন। গতি ধীর। পুরুষ শিল্পীর মাথায় থাকে 'জাইনস্‌ফোং (পাগড়ী)। পাগড়ীতে গোঁজা থাকে 'থইয়া' (সাদা মুরগীর পালক)। পোশাকের মধ্যে 'জিংফং' (কালো কোট) অপরিহার্য। পুরুষদের হাতে থাকে 'ওয়াইতলুম' (তরবারি) অথবা 'স্টিয়ে' (ঢাল)। তাই দিয়ে মাঝে মাঝে কৃত্রিম যুদ্ধের ভান করে। মেয়েদের ঘিরে নাচে পুরুষেরা। পুরুষেরা রক্ষী —নারীদের সতীত্ব রক্ষায় ব্রতী। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। এমনও কথিত আছে পূর্বে এই সাদ্‌সুক্‌মিন্‌সিমের আড়ম্বরের মধ্যেই পাত্র-পাত্রী বাছাই করবার প্রথম পর্ব সমাধা হত। প্রত্যেকেই তাই উৎকৃষ্ট পোশাকে আসতো—আজও আসে। তবে বাছাই করবার প্রথা আজ পড়তির মুখে।

এ নৃত্যানুষ্ঠান খাসিয়াদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়তর করে। সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এ দিন তিনটিতে সকলে প্রীতির নিবিড় ডোরে বাঁধা পড়ে—আনন্দ লুটে নেয় দুহাতে। অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য বিশিষ্ট আসন নির্দিষ্ট থাকে। উৎসব-প্রান্তরে রকমারি দোকান-পসারেরও অভাব নেই। শুভ ও সুন্দরের মেলা সৌন্দর্যপূজারী খাসিয়াদের 'সাদ্‌সুক্‌মিন্‌সিম্' উৎসব।

লুই ম্যাকনিস

কণাদ চৌধুরী

উনিশ শ তিরিশের যে কটি নতুন কবিকণ্ঠ ইংল্যাণ্ডে উচ্চকিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে লুই ম্যাকনিসের স্বর বোধ করি ঠিক অনুভূতিপ্রবণ। অডেন, স্পেণ্ডার, ডে লুইস প্রমুখ কবিদের বুদ্ধিবাদী বিদ্রোহের শরিক হলেও দৃশ্যজগতে অনুভূতি স্থাপনে কখনো দ্বিধান্বিত হননি ম্যাকনিস। হয়ত তাই তিরিশ দশকের কবিদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একমাত্র তিনিই স্বাধিকারে প্রমত্ত থাকতে পেরেছেন। বামপন্থী মতবাদ, এলিয়ট অনুসরণ, স্পেন যুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণ বিচার করে ম্যাকনিসকে, অডেন-স্পেণ্ডার-ডে লুইস গোষ্ঠীর অন্তরতম সদস্য গণ্য করা হয়। যদিও এই 'কবি সংঘ' ঘটিত ব্যাপারটিকে স্পেণ্ডার সম্প্রতি অস্বীকারই করেছেন। (একটি প্রবন্ধে স্পেণ্ডার বলেছেন যে তিরিশ দশকে তিনি ডে লুইসের সান্নিধ্যে আসেননি। তিনজন প্রথম একত্রিত হন ভেনিসে, ১৯৪৯ সালে।) উনিশ শ তিরিশের সমস্যাবলীর বিরুদ্ধে একত্রে দাঁড়াতে গিয়ে অডেন, স্পেণ্ডার, ডে লুইস এবং ম্যাকনিস ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু এই চারজন কবি নিজেদের কদাপি এক মতবর্তী বলে স্বীকার করেননি। এবং তাঁরা যে সত্যি আলাদা ছিলেন পরবর্তী কালের পরিণতি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। একদা 'পিংক লিবারেল' অডেন, ইদানীং ধর্মাচারের চারণ, স্পেণ্ডার অন্তর্জগতের নাগরিক, ডে লুইসের কলমে এখন শুধু সৌখীন ব্যঙ্গের কালি। এঁদের মধ্যে ১৯৩০ সাল থেকে যিনি সবচেয়ে কম 'বৈপ্লবিক' ছিলেন, সেই ম্যাকনিসই স্বীয় বিশ্বাসে শেষদিন পর্যন্ত স্থির ছিলেন। তাঁর অনুভূতিপ্রবণ কবিতাবলীকে কখনো ত্যাগ করেননি তিনি এবং তাঁর 'উদারনৈতিক প্রগতিবাদ'কেও না। সহকবিদের মতন ম্যাকনিস কখনোই তাঁর কাব্যকৃতিকে, ইতস্ততঃ পদক্ষেপে দ্বিধাগ্রস্ত করেননি। উনিশ শ তিরিশ থেকে আরম্ভ করে তাঁর কবিতা পরিণতির সোপান ছাড়া অন্য কোনো পথে পায়চারি করেনি।

মিল খুঁজতে গেলে ম্যাকনিসের সঙ্গে অডেনের সাযুজ্যই সর্বাগ্রে চোখে পড়বে। কবিতায় কথ্য-রীতির ব্যবহার, শহুরে চিত্রকল্প প্রভৃতি বহিরঙ্গের বিচারে দুই কবির সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু ম্যাকনিসের 'সেনস্যুয়্যালিটি' অডেনের কবিতায় দুর্লভ। এবং অডেন অপেক্ষা ম্যাকনিস অধিক ব্যক্তিগত। দৃশ্যমান জগতের দৃশ্যগুলি, লোকগুলি এবং জটিলতাগুলির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ এবং সম্পর্ক তাঁর কবিতার মূলে অনুষঙ্গ। সমসাময়িক কবিবন্ধুদের মধ্যে ম্যাকনিস সম্ভবতঃ কম এ্যাবস্ট্রাক্ট। তবে অডেন এবং ম্যাকনিসের আপাত
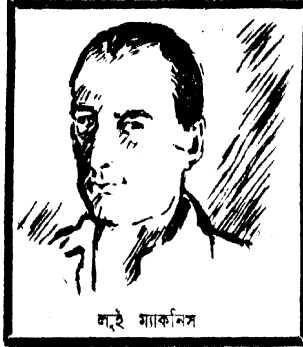
লুই ম্যাকনিস

সাদৃশ্যের একটি প্রধান কারণ যে দুজনেই কবিজীবনের প্রারম্ভে মৌলিক আশ্রয়স্থল খুঁজতে গিয়ে বায়রণ এবং পোপে আসক্ত হয়েছিলেন।

মার্কসীয় দর্শনে ম্যাকনিসের কোনোদিনই আস্থা ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক আস্থা ছিল 'উদারনৈতিক প্রগতিবাদে'। শ্রমিক পক্ষে তাঁর সমর্থন ছিল, কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজে তাঁর উৎসাহ ছিল না। রাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দেওয়ারও বিপক্ষে ছিলেন তিনি। স্পেণ্ডারের মত হঠাৎ হাওয়ার তরঙ্গে গা ভাসান নি (স্পেণ্ডার অতি অল্পকালের জন্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন) বলেই হয়ত ম্যাকনিসের উনিশ শ তিরিশের বামপন্থী চরিত্র শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

কাব্যাদর্শের দিক দিয়ে বিচার করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় তিরিশ দশকের শেষ কবি ছিলেন লুই ম্যাকনিস। তাঁর আকস্মিক পরলোকগমনে আমরা তিরিশের এক প্রত্যয়ী প্রতীককে হারালাম।

।। কবির আত্মকথিকা ।।

জন্ম তারিখ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সাল। জন্মেছি বেলফাস্ট শহরে। বাবা, মা দুজনেই আইরিশ। বাবা রেভারেণ্ড জন ফ্রেড্রিক ম্যাকনিস প্রোটেস্টাণ্ট বিশপ। স্কুল শিক্ষার জন্যে আমাকে ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয় ১৯১৭ সালে। মার্লবরো স্কুলে ভর্তি হই। ১৯২৬—৩০ সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ডে দর্শন এবং ক্লাসিকাল সাহিত্য অধ্যয়ন করি। ১৯৩০ সালে বিয়ে করি। এবং সেই বছরেই বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসিকসের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হই। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ঐ পদেই ছিলাম, তারপরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেডফোর্ড কলেজে গ্রীক ভাষার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করি। ইংল্যাণ্ডের ক্লাসিক সাহিত্য শিক্ষা-পদ্ধতি আমার মতে অত্যন্ত খারাপ। সন্তান একটি পুত্র। ১৯৩৬ সালে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ। ১৯৪০ সালে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার বিশেষ অধ্যাপকরূপে যোগদান। বিভিন্ন সময়ে অজস্র পুস্তক সমালোচনা করতে হয়েছে। বিভিন্ন ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছি।

প্রভাবের কথা বলতে গেলে অক্সফোর্ডে থাকাকালে এলিয়ট, জয়েস, লরেন্স এবং কয়েকজন দার্শনিকের (এখন অবশ্য দর্শন আর পড়ি না) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম। এখন ইতিহাস, জীবনী, সংখ্যাতত্ত্বর বই পড়তে ভাল লাগে। কচিৎ উপন্যাস পড়ি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে টলস্টয়ের ওয়ার এণ্ড পীসের নাম করতে পারি। তিনটি উপন্যাস লিখেছিলাম গোড়ার দিকে, সেগুলো কিছুই হয়নি।

রাজনীতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য : আমি কোনো রাজনৈতিক দলকে বিশ্বাস করি না, কিন্তু মনে করি ধনতন্ত্রের

দক্ষিণায়ন

নিদাঘের রৌদ্রবেলা কোন মন্ত্রে সুতীব্র এখনি
ঝুঁকে পড়া শুকনো গাছে অকস্মাৎ বসন্তের হাট?
মাত্র এক মুহূর্তে সে পেছন ফিরেই ঘুরে দাঁড়াল আবার
সূর্যের ঝাঁঝরি থেকে গলে আসা রোদ
তার ছায়া-অন্ধকার মুখে মেখে নিল
সে বাঁচতে চায়।

এবং অভূতপূর্ব সব কিছুই এখানে এখন
এইখানে সব ছিল, সব যথাযথ
কেবল কথার ফাঁকে শব্দগুলি অর্থে অদ্ভুত
কিন্তু তাতে ভুল বোঝা দায়।
টকটকে রাঙা জিব নেড়ে সুখী ফলগুলি ঢের কথা বলে গেছে
সে আর সে যেন নয়—একদা যা ছিল।

সেই রমণীকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই
যার জন্য তার দিনগুলো অপেক্ষায় অপরূপ
যার চোখে দুটি আছে আজো তার চোখের মতই
উন্মুক্ত দরোজা।
স্থায়ী গানের সন্ধানে একমাত্র উত্তরন পথ।

নিদাঘের তীব্র বেলা কোন মন্ত্রে আছে এতক্ষণো?

[লুই ম্যাকনিসের 'সলসটিস' কবিতাটির অনুবাদ : কণাদ চৌধুরী]

* *

উচ্ছেদ হওয়া উচিত। ১৯৩৯ সালে বার্সিলোনায় গিয়েছি এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে আমার মতে, রিপাবলিক্যান সরকারই ন্যায্য। আয়ারল্যান্ড বিভাগের আমি বিরুদ্ধে। সাধারণতঃ আমি শ্রমিক দলকেই ভোট দিয়ে থাকি, তবে মনে করি, যতদিন না শ্রমিক দল থেকে প্রতি-ক্রিয়াশীল নেতাদের দূর করা হচ্ছে, ততদিন ভালো কিছু হবার নয়। লন্ডনের ইংলিশ গ্রুপ থিয়েটার-এর সঙ্গে কিছুকাল যুক্ত ছিলাম। ১৯৩৬ সালে আমার অনূদিত এস্কাইলাসের 'এগামেনন' এবং আমার একটি পরীক্ষা-মূলক নাটক মঞ্চস্থ করে 'ইংলিশ গ্রুপ থিয়েটার' সম্প্রদায়।

।। পরিশিষ্ট ।।

আত্মকথিকায় কবি অনেক কথাই জানান নি। যেমন কবির গোড়ার দিকের কিছু রচনা "লুই মালোন" ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। টেনিস খেলায় কবি পারদর্শী ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রধান শখ ছিল ভ্রমণ। ১৯৩৭ সালে কবিবন্ধু অডেনের সঙ্গে আইসল্যান্ডে যান এবং অডেনের সঙ্গে যুগ্ম লেখক হিসেবে "লেটারস ফ্রম আইসল্যান্ড" প্রকাশিত করেন। ম্যাকনিস হেব্রাইডিস-এর উপরেও একটা ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছেন।

অনেক ভারতবাসী লুই ম্যাকনিসকে দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করবেন, কারণ ম্যাকনিস দুবার ভারতে এসে-ছিলেন। তাঁর শেষ আগমন ঘটেছিল এই বছরেরই গোড়ার দিকে। তাঁর ভারত-ভ্রমণের স্মৃতি : কতকগুলি কবিতা, বিশেষ করে মহাবল্লীপুরম এবং 'লেটারস ফ্রম ইন্ডিয়া' এবং বি-বি-সি মারফৎ প্রচারিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কথিকাগুলি। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ম্যাকনিস বি-বি-সি-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এই সময়ে অনেকগুলি ফীচারও লিখেছিলেন লুই ম্যাকনিস।

।। রচনাবলী ।।

কাব্যগ্রন্থ : ব্লাইন্ড ফায়ার ওয়ার্কস (১৯২৯); পোয়েমস ('৩৫); দি এ্যাগামেনন অফ এস্কাইলাস ('৩৬); আউট অফ দি পিকচার ('৩৭), দি আর্থ কমপেলস ('৩৮); সলস্টিস ('৬১) প্রভৃতি।

গদ্যগ্রন্থ : লেটারস ফ্রম আইসল্যান্ড ('৩৭); আই ক্রসড দি মিনেট ('৩৮); জু ('৩৮); মডার্ণ পোয়েট্রি ('৩৮); দি পোয়েট্রি অব ডবল্যু বি ইয়েটস ('৪১)।

কবির গান

(৭)

ভবানী বেনে

আগের বারে 'বাঘে মহিষের লড়াই'-য়ের কথা বলেছি। কে বাঘ কে মহিষ, তা বলা শক্ত। তবে বাঘে মহিষের লড়াইয়ে সব সময় যে মহিষই হারে তা নয়। কাজেই ভবানীকে যদি বাঘের মর্যাদা নাও দিই তাহলেও তাঁকে খাটো করা হবে না। তাছাড়া 'নিতাই বৈরাগী' প্রসঙ্গে এটা স্পষ্টই দেখা গেছে যে নিতাই এবং ভবানীর মধ্যে কেউ কম ছিলেন না।

ভবানীর সঙ্গে নিত্যানন্দের একটি বিষয়ে বড় রকমের মিল ছিল। গায়কদিগের উভয়েই শক্তিমান ছিলেন, কিন্তু কবিতা রচনায় দুজনেরই কৃতিত্ব খুব বেশী নয়।

ভবানী জাতিতে ছিলেন গন্ধবণিক। তাই লোকে তাঁকে ভবানী বেনে বলত। তাঁর আদি বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলায়। সেখানেই তাঁর জন্ম হয়েছিল কি না তা সঠিক বলা যায় না। কেউ কেউ বলেন বরাহনগরই তাঁর জন্মস্থান এবং এই বরাহনগরেই তিনি সারাজীবন কাটিয়েছেন। আবার কারও কারও ধারণা বরাহনগরে নয় জোড়াসাঁকোয় তাঁর বাসা ছিল।

ভবানী বাল্যকালেই কবির দলে ঢুকেছিলেন। তাঁর প্রথম গুরু হরুঠাকুর। গানের গলাটি ভাল ছিল বলেই বোধহয় হরুঠাকুরের দলে তিনি স্থান পেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি জিল দিতেন তার পরে দোহার বা গায়ক নিযুক্ত হন। আসলে তাঁর কবি গানের হাতেখড়ি হয় হরুঠাকুরের দলেই।

এখানে কিছুকাল কাটিয়ে অর্থাৎ শিক্ষানবিশি শেষ করে ভবানী নিজেই একটি দল গড়লেন। রচনায় তাঁর অধিকার খুব বেশী না থাকলেও সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল না। গানের অভাব তাঁর কখনও হয়নি। হরুঠাকুর তাঁকে গান জোগাতেন। হরুঠাকুরের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা—এঁরাও যখন তাঁর দল ছেড়ে গিয়ে নিজেরা নূতন করে এক একটি দল গড়লেন তখনও হরু তাঁদের ত্যাগ না করে তাঁদের গান সরবরাহ করতে লাগলেন।

কিন্তু গুরুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শোনা যায় শিষ্যদের মধ্যে ভোলা ময়রার প্রতিই হরুঠাকুরের একটু পক্ষপাত ছিল। এটাই গুরু-শিষ্যের বিচ্ছেদের প্রধান কারণ কি না তা জোর করে বলা যায় না।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

হরুঠাকুরকে ছেড়ে ভবানী যাঁর আশ্রয় নিলেন তাঁর নাম রামজী দাস। তারপর থেকে রামজীই ভবানীকে গান রচনা করে দিতে থাকেন। এমনিভাবে কিছুকাল কাটে। তারপর তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে কেমন করে রাম বসুর সন্ধান পান এবং কেমন করে তাঁর গান গেয়ে নিজের দলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়ান আগের প্রবন্ধে সে কথা বলেছি।

একাধিক দক্ষ বাঁধনদারের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ায় ভবানীর সুখ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটাই একটা অসুবিধের কারণ হয়েছে। তাঁর নামে যে সব গান প্রচলিত হয়েছিল তার মধ্যে কোন্‌টি কার রচনা নির্ধারণ করার উপায় মিলছে না। ঈশ্বর গুপ্তের পরেও কবিগানের যে দু-একটি সংগ্রহপুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যেও মতানৈক্য দেখা যাচ্ছে। যেমন

মানিনী শ্যামচাঁদে, কি অপরাধে।
তুমি হয়েছ রাধে।।
ঠেকিলাম আজ একি প্রমাদে।
ম্লান শশিমুখ কেন গো রাই
হেরি গো আজ এত আহ্লাদে ।।
এই দেখে এলেম কৃষ্ণ
সহিতে হাস্য কৌতুকে।
ছিলে গো রাই দোঁহে অতি পুলকে।।
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদ অনল
উঠিল কি বাদানুবাদে।।

এই গানটি হরুঠাকুরের লেখা বলে সংবাদ প্রভাকরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কবিসংগ্রহ এবং গুপ্তরত্নোদ্ধারেও হরুঠাকুরকে এই গানের রচয়িতা বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু 'প্রীতিগীতি'-তে এই গান ভবানী বণিকের নামে ছাপা হয়েছে।

অনুমান করি, গানের রচনা হরুঠাকুরের এবং গাহনা ভবানীর। ভবানীর দল গড়ার প্রথম দিকে হরুর কাছ থেকে তিনি যে সব গান নিয়েছিলেন এটি তার অন্যতম হওয়া সম্ভব।

ঈশ্বর গুপ্তের গানের তালিকায় নিম্নোদ্ধৃত গানটি আছে রাম বসুর নামে। গানটি অসম্পূর্ণ। গুপ্ত কবি এই অসম্পূর্ণ গানটিই ছেপে দিয়েছেন। গানের শেষে মন্তব্য করা হয়েছে "এই গান ভবানে বেণে গাহিয়াছিল।" গানটি এই :

শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথাহে হরি।
লুকালে কি প্রাণহরি, ও প্রাণ হরি।।
এলে বনে কুল হরি, কে জানে বধিবে হরি,
হরি, ভয় কি মনে করি,
মরি বলে হরি হরি।।
হরি নিয়ে বিহরি বনে
এই ছিল প্রয়াস।
বনমালী, বনকেলি করিলে নিরাশ।।
কি জানি কি অপরাধে,
তেজিলে দুঃখিনী রাধে,
সাধে সাধে সুখ সাধে
গেলে হে বিষাদ করি।।

অন্য একটি গীতিসংকলন গ্রন্থে এই গানটির রচয়িতা বলে ভবানী বণিকের নাম দেখছি।

বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে ভবানী বেনের নামে একটি গান উদ্ধৃত হয়েছে। গানটির কয়েকছত্র এখানে তুলে দিলাম :

একবার কুঞ্জবনে কৃষ্ণ বলে
ডাকরে কোকিলে।
মধুর কুহুধ্বনি শুনে
তাপিত প্রাণ জুড়াবে গোপীগণে,
নীরব হয়ে বসে কেন
রইলি তমাল ডালে।।

....

আমরা দুখিনী গোপী
বিরহিণী কৃষ্ণবিরহে,
দেখরে বিহঙ্গ, বিনে ত্রিভঙ্গ,
অনঙ্গে অঙ্গদহে।।
কৃষ্ণ হয়েছে রাধার কলেবর
শোনরে ওরে পিকবর
সে পায় জীবন এখন
ওরে কৃষ্ণ নাম শুনালে।।

ভবানীর নামে প্রচলিত আর একটি গানের প্রথম কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করি :

বঁধু কার কখন মন রাখবে।
তোমার এক জনালা নয় দুদিক রাখা,
বল কিসে প্রাণ বাঁচবে।
সমভাবে কেমনে রবে।।
সবে তোমার একমন।
তায় করেছ প্রেমাধিনী দুঠেঁয় দুজন।।
কপট প্রেমে বল দেখি প্রাণ
হাসাবে কায় কাঁদাবে।।

ভবানীর প্রসঙ্গে আর একটি গানের কয়েকছত্র উল্লেখ করতে চাই। গানটি যে উদ্ধৃতির যোগ্য সে বিষয়ে পাঠকও আমার সঙ্গে একমত হবেন আশা করি।

জলে কি জ্বলে, কি দোলে,
দেখগো সখি
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারিনে স্থির নির্ণয় হে করিতে।।
শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি
নির্মল যমুনা জলেতে।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনীতে গানটি রাম বসুর রচিত এবং নীলু-ঠাকুরের গীত বলে বলা হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত এই গানের প্রসংগে ভবানীর নাম করেননি। কিন্তু প্রাচীন কবিসংগ্রহে বলা হয়েছে, গানটি হরুর রচিত, গীত হয়েছিল ভবানীর দলে। আর একটি সংকলনে (প্রীতিগীতি) গানটি ভবানীর বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

নানা মতের মধ্যে থেকে খাঁটি সত্য নিরূপণ করা কঠিন। কোন্ গানের সাহায্যে ভবানীর কবিপ্রসিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আজ কারও পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু গাহনার দিক দিয়ে তিনি এবং তাঁর দল যে অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল সে বিষয়ে সংশয় নেই। "তৎকালে যদিও অন্যান্য অনেক দল ছিল, কিন্তু হরুঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক এই তিন জনের দল সর্বাপেক্ষাই প্রধানরূপে গণ্য ছিল।"

গত ৫ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ ৭৫ বৎসর পূর্ণ করে ৭৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন। দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসাবে সমস্ত পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ভারত ইতিহাসের এক কঠিন পরীক্ষার দিনে সমগ্র জাতি আজ তাঁর পরিচালনায় ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে। তিনি আরও দীর্ঘজীবন, সুস্বাস্থ্য এবং সাফল্যময় ভবিষ্যৎ নিয়ে সমগ্র জাতির সেবা করুন—আজকের দিনে এই-ই আমাদের একমাত্র কামনা।

দেশে বিদেশে

॥ নেফা বিপর্যয় ॥

গত বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চীনাদের অতর্কিত আক্রমণের মুখে আমাদের সৈন্যবাহিনী বিশেষ করে নেফা সীমান্তে কেন অতখানি বিপর্যস্ত হ'ল, এ নিয়ে দেশের সকলের মনেই একটা বিরাট জিজ্ঞাসা ছিল। সরকারেরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ চীনাদের আশংকিত পুনরাক্রমণের সম্মুখে একই অবাঞ্ছিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিরোধ সম্পর্কে তাঁদের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী। প্রধানত এই কারণেই নেফা বিপর্যয় সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু এ সম্বন্ধে তদন্ত করে লেঃ জেনারেল হেণ্ডারসন ব্রুকস যে ক'টি তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচাবন সম্প্রতি সংসদের উভয় সভায় তা থেকে যেটুকু সদস্যদের শুনিয়েছেন তার কোনটিই কারও কাছে অপ্রত্যাশিত বা অজ্ঞাত কারণ বলে মনে হবে না। বিপর্যয়ের প্রকৃতি প্রত্যক্ষ ক'রে দেশের সাধারণ মানুষ দূরে থেকে যা অনুমান বা আশংকা করেছিলেন, সমর-বিশেষজ্ঞরা সমরাঙ্গণ থেকে তাই সত্য বলে জেনে এসেছেন। সৈনিকদের সাহস ও কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে কারও মনেই কোনদিন প্রশ্ন জাগেনি, তদন্তকারীরাও সে সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি। তাঁরাও বলেছেন, দেশের বীর জওয়ানরা বীরের মতই শত্রুর সম্মুখে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা পরাজিত বা নিহত হয়েছেন এমন সব কারণে যার প্রতিকার করার দায়িত্ব বা ক্ষমতা তাদের ছিল না। পার্বত্যরণে নিপুণ দুর্ধর্ষ চীনা বাহিনীর সম্মুখে আমাদের এমন সব সৈন্যদের পাঠানো হয়েছিল যাদের পার্বত্য-যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক যা তা হল, এই সব সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর ছিল সেই সেনাপতিদেরই নেফা অঞ্চল সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। শত্রুদের আসা-যাওয়ার সম্ভাব্য পথ সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ফলে অতর্কিতে শত্রু সৈন্যরা এসে যখন তাদের ঘেরাও করে ফেলেছে তখন আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন কিছুই তাদের করণীয় ছিল না। যুদ্ধের অনিবার্য অংশ গুপ্তচরবৃত্তিতেও আমাদের পটুতা ছিল চীনাদের অনেক পিছনে। এই সব অক্ষমতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল প্রশাসনিক অযোগ্যতা ও যুদ্ধের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পদস্থ ব্যক্তিদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। যার ফলে শুধু দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে আমাদের সৈন্যরা। সরকারী অব্যবস্থার ফলে অনেক সময় হাজার হাজার বস্তা চাল নষ্ট হয় বা সিমেণ্ট জমে যায়, সে-সব ঘটনা দুঃখজনক হলেও এমন হৃদয়-বিদারক ও অসহনীয় নয়। কারণ এক্ষেত্রে সরকারী অব্যবস্থার বলি হয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। চীনাদের সঙ্গে কোন দিন সংঘর্ষ হলে তার প্রথম পর্যায়ের লড়াই কয়েক মাইল উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় হিম-

ভারতের খ্যাতনামা আইনশাস্ত্রবিদ ও পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীপি আর দাশ ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁর পাটনাস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর।
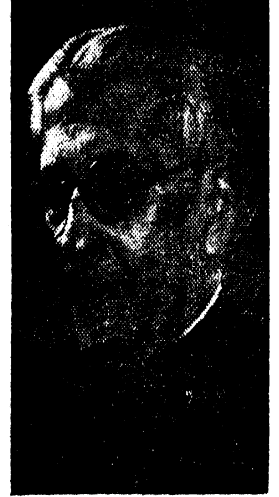
শীতল পরিবেশে হবে একথা সকলেরই জানা ছিল। তবুও যদি বিপর্যয়ের পর কারণস্বরূপ বলা হয় যে, পার্বত্য-সংগ্রামে অভিজ্ঞতা না থাকার জন্যই হার হয়েছে তবে তাতে হয়ত সত্যরক্ষা হয় কিন্তু কোন সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। যে-কটি কারণ দেখিয়েছেন তদন্ত কমিশন তার মধ্যে এমন একটিও নেই যা দূরে করা বা যার প্রতিকার ঘটানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

যাই হোক, বিপুল ক্ষতি স্বীকার করে যে অভিজ্ঞতাটুকু আমরা অর্জন করেছি তা ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে আমরা যেন ভুল না করি। ভবিষ্যতে আবার যদি চীনারা আক্রমণ করে এদেশ, তবে আমাদের সৈন্যরা যেন শুধু বীরের মত মৃত্যুবরণই না করে, বীরের প্রাপ্য জয়মাল্যও যেন দোলে তাদের গলায়।

॥ সংকুচিত মন্ত্রিসভা ॥

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মত রাজ্য মন্ত্রিসভাও সংকুচিত হয়েছে, কিন্তু সংকোচনের নীতি বা কারণ উভয়ক্ষেত্রে এক নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে যাঁরা পদত্যাগ করেছেন তাঁরা শুধু মন্ত্রিসভারই বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন না, কংগ্রেস সংগঠনেরও তাঁরা প্রথম সারির নেতা। একারণে কংগ্রেস সংগঠন পুনরুজ্জীবনকল্পে তাঁদের নিয়োগ ও মন্ত্রীর দায়িত্বভার হতে তাঁদের অব্যাহতিদান সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কংগ্রেসের যে শক্তি ও রাজনৈতিক মর্যাদা আজ নেতৃবৃন্দের কাম্য, তা একমাত্র শাস্ত্রী-দেশাই'র মত দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত নেতাদের স্বারাই অর্জন করা সম্ভব।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যাঁদের মন্ত্রিসভা হতে অপসারিত করা হয়েছে তাঁরা কেউই এরাজ্যের সুপরিচিত সংগ্রেস নেতা নন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পরলোকগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন এ'দের উপমন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করেন তখন শাসনদায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী একটি নূতন নেতৃত্ব গড়ে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটা হয়ত খুব বড় যুক্তি বলে মনে হয়নি, বা হয়ত তিনি মনে করেছেন যে, ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব মন্ত্রিত্বের মসনদে গড়ে উঠবে না, গড়ে উঠবে শহর-গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে। অল্প কয়েকদিন মাত্র মন্ত্রী হয়ে যে হারে তাঁদের কেউ কেউ পেট্রোল পোড়াতে ও টেলিফোনের বিল তুলতে আরম্ভ করেছিলেন তাতে সরল অনাড়ম্বর কর্মী মুখ্যমন্ত্রীর তাঁদের প্রতি অপ্রসন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানিয়েছেন, বাঙলায় কামরাজ পরিকল্পনা কার্যকরী করার কোন তাগিদ নেই, কারণ কংগ্রেস এরাজ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে তার সম্পর্কও আদর্শস্থানীয়। তবুও তিনি যে মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা কমিয়ে অর্ধেক করে এনেছেন এবং আরও কমাবেন বলে জানিয়েছেন, অপ্রয়োজনীয় অর্থব্যয় বন্ধই তার প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

॥ ক্রুদ্ধ পাকিস্থান ॥

পাক-চীন বিমানচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার তীব্র ভাষায় পাকিস্তানের কার্যকলাপের নিন্দা করেন ও তারপরেই ঘোষণা করেন যে, ঢাকার বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার একথা অবশ্য কোথাও বলেননি যে, চীনের সঙ্গে বিমান-চুক্তি সম্পাদনের জন্যই যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করেছেন, কিন্তু ঐ চুক্তিকে 'স্বাধীন দুনিয়ার ঐক্যে ভাঙন' বলে নিন্দা করে তাঁরা পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁদের বর্তমান মনোভাব সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানকে সাংঘাতিকভাবে বিক্ষুব্ধ করেছে। পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মহম্মদ সোয়াইব প্রায় হুমকি দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য যদি রাজনৈতিক শর্তসাপেক্ষ হয় তবে তা আমরা গ্রহণ করব কিনা সেটা আমাদেরই নতুন করে ভেবে দেখতে হবে। পাক-সরকারের মনোভাব যে এ ব্যাপারে অপরিবর্তনীয় সেটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে গত ৩১শে আগষ্ট চীনের একদল বিমান-বিশেষজ্ঞ ঢাকায় আমন্ত্রণ করে আনা হয় এবং তাঁরা বিমান-বন্দর পরিদর্শন করে যান। পাক সরকার এইটাই বোঝাতে চান আমেরিকাকে যে, মার্কিন সাহায্য বন্ধ হলেও সে বিচলিত হবে না, দরকার হলে চীনের সাহায্য নিয়ে ঢাকার বিমান-বন্দর গড়ে তুলবে। তারপর পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী এক ঘোষণায় জানান যে, পক্ষকালের মধ্যেই চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের একটি বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হবে।

পাকিস্তানের এই গোঁয়ার্তুমি আমেরিকাকে তার মনোভাব পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। আমেরিকার প্রতিনিধিরূপে মিঃ জর্জ বল এসেছেন পাকিস্তানে। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকায় সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, মিঃ বল প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে এই কথাটাই বলতে গিয়েছেন যে, আমেরিকার সাহায্য নিতে হলে পাকিস্তানকে এটা প্রমাণ করতে হবে যে, স্বাধীন দুনিয়ার ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে আমেরিকা তার উপর নির্ভর করতে পারে। সারা দুনিয়া যখন চীনের নীতিজ্ঞানবর্জিত আচরণে বিক্ষুব্ধ ও তার সঙ্গে সকল রকম সম্পর্কচ্ছেদে উদ্যোগী, ঠিক সেই সময়েই পাকিস্তান তার সঙ্গে সৌহার্দ্যস্থাপনে অত্যুৎসাহী হয়ে আর একবার প্রমাণ করে দিল যে, রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতিবোধের প্রতি তার আনুগত্য কত সামান্য।

॥ ঘরে ॥

২৯শে আগষ্ট—১২ই ভাদ্র : তিনজন পুরাতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নূতন দপ্তর—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : শ্রীগুলজারীলাল নন্দ; অর্থমন্ত্রী : শ্রীটি টি কৃষ্ণমাচারী; কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী : সর্দার শরণ সিং।

"কামরাজ পরিকল্পনার" পশ্চাতে দুরভিসন্ধি নাই—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

লোকসভায় কেন্দ্রীয় ডাঃ কে এল রাওয়ের ঘোষণা : চতুর্থ পরিকল্পনার শেষাশেষি ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হইবে।

কলিকাতায় জনসভায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বৌদ্ধ দলনের প্রতিবাদ।

৩০শে আগষ্ট—১৩ই ভাদ্র : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচিত বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০ কোটি টাকার) কেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদন—প্রয়োজনীয় দশ কোটি টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বৌদ্ধ নির্যাতনে ভারত সরকারের গভীর উদ্বেগ—লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি। বৌদ্ধ দলনের জন্য কলিকাতা পৌরসভায়ও উদ্বেগ প্রকাশ।

'উন্নতিশীল দেশগুলির মঙ্গলের জন্য শান্তি বজায় রাখা অপরিহার্য'—রাজা মহেন্দ্র (নেপালাধীশ) ও শ্রীনেহরুর প্রচারিত (দিল্লী হইতে) যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা।

৩১শে আগষ্ট—১৪ই ভাদ্র : পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার আয়তন হ্রাস করার সিদ্ধান্ত—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিবৃতি।

সরকারী খাদ্য-নীতির প্রতিবাদে অকম্যুনিষ্ট বামপন্থী দলগুলির (পশ্চিমবঙ্গের) নেতৃত্বে 'সারা বাংলা দিবস' পালন—কলিকাতায় আন্দোলনকারীদের সভা ও মিছিল।

'খাদ্যশস্যে মুনাফার হার নির্দিষ্ট'—ভারত রক্ষা বিধি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক কার্য-ব্যবস্থা।

১লা সেপ্টেম্বর—১৫ই ভাদ্র : 'কামরাজ প্রস্তাব' অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার আয়তন হ্রাসের ব্যবস্থা—রাজ্যের সাতজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও সবকয়জন উপমন্ত্রীকে (নয়জন) বিদায়দানের সিদ্ধান্ত—পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীরা সকলেই আপাততঃ বহাল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কয়েকটি দপ্তরের পুনর্বণ্টন—আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের হাতে অতিরিক্ত ডাক ও তার দপ্তরের এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবিরের হস্তে অতিরিক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ। (অস্থায়ী ব্যবস্থা)

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কর্তৃক দুর্গাপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্গাপুর—কলিকাতা গ্যাস গ্রীডের উদ্বোধন।

দ্বারভাঙ্গায় বৃহৎ জ্যোতিষী ও পণ্ডিত সম্মেলনে এই বৎসর (১৩৭০ বাং) সেপ্টেম্বর (মল মাস) পরিবর্তে অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের পক্ষে অভিমত প্রকাশ।

২রা সেপ্টেম্বর—১৬ই ভাদ্র : সকাল বেলা শ্রীনগরের (কাশ্মীর) অদূরে ভয়াবহ ভূমিকম্প—শতাধিক লোক নিহত : প্রায় পাঁচ শত আহত : সহস্রাধিক গৃহ ধ্বংস।

নেফায় বিপর্যয় সম্পর্কে লোকসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবনের বিবৃতি—তদন্তে উর্ধ্বতন সেনানায়কদের বিচ্যুতি ধরা পড়ার উল্লেখ।

'ভারত রক্ষা বিধি বলে আটক বন্দীর আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার নাই'—সুপ্রীম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়—রাষ্ট্রপতির আদেশ বৈধ বলিয়া মন্তব্য।

বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীএম গুরুস্বামীর (৬০) পরলোকগমন।

ভারতে পত্র-পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি—প্রেস রেজিষ্ট্রারের রিপোর্ট।

৩রা সেপ্টেম্বর—১৭ই ভাদ্র : প্রখ্যাত আইনবিদ শ্রীপি আর দাশের (৮২) পাটনায় জীবনাবসান।

'দেশরক্ষায় বিদেশী সৈন্যের সাহায্যের প্রশ্নই ওঠে না'—রাজ্যসভায় শ্রীনেহরু। প্রধানমন্ত্রীর অপর মন্তব্য : পাকিস্তানকে কাশ্মীর সমর্পণের অর্থ ভারতের মৃত্যু।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—১৮ই ভাদ্র : মার্কিন সাহায্য ছাড়াই অবিলম্বে বোকারো ইস্পাত প্রকল্প রূপায়ণে ভারতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

'বিশ্ব সরকার ছাড়া মানব জাতির বাঁচিবার উপায় নাই'—দিল্লীতে সর্বভারতীয় বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও বিশিষ্ট বৃটিশ রাজনীতিবিদ লর্ড এটলীর ভাষণ। শ্রীনেহরুর উক্তি : অস্ত্র সম্বরণ ব্যতিরেকে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অসম্ভব।

॥ বাইরে ॥

২৯শে আগষ্ট — ১২ই ভাদ্র : করাচীতে পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে বিমান চুক্তি স্বাক্ষরিত—উভয় রাষ্ট্রের জঙ্গী আঁতাত আরও জোরদার।

১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৩) মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নূতন দিন ধার্য। (লণ্ডনের সংবাদ)

আমেরিকায় ঐতিহাসিক নিগ্রো অভিযানের (রুজি-রোজগার ও স্বাধিকারের দাবীতে) প্রথম পর্বের সমাপ্তি।

৩০শে আগষ্ট—১৩ই ভাদ্র : দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সংকট মুহূর্ত আসন্ন—আমেরিকার সহিত সম্পর্কের অবনতির জের।

চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'পিপলস্ ডেইলি'তে সোভিয়েট নেতাদের বিরুদ্ধে পুনরায় বিষোদ্গার।

শুক্রগ্রহের আবহাওয়ায় অক্সিজেনের অস্তিত্ব থাকা সম্পর্কে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের দাবী।

৩১শে আগষ্ট—১৪ই ভাদ্র : আলোচ্য দিনে সিঙ্গাপুরের পূর্ণ স্বাধীনতালাভ—সারাওয়াকেরও (পরশাসিত) কার্যতঃ স্বাধিকার অর্জন।

আকস্মিক যুদ্ধ নিরোধে প্রস্তাব অনুযায়ী মস্কো-ওয়াশিংটন 'হট লাইন' (জরুরী যোগাযোগ ব্যবস্থা) স্থাপিত।

১লা সেপ্টেম্বর— ১৫ই ভাদ্র : করাচীতে নূতন ভারত-পাক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত।

পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের নিকট মৌলানা ভাসানীর (জাতীয় আওয়ামী লীগ নেতা) চরমপত্র—রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রভৃতি ছয় দফা দাবী পেশ।

২রা সেপ্টেম্বর—১৬ই ভাদ্র : সিরিয়া ও ইরাকের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার সমন্বয়ের প্রস্তাব—উভয় রাষ্ট্রের যুক্ত বিবৃতি।

৩রা সেপ্টেম্বর—১৭ই ভাদ্র : ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক ১৬ই সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া গঠনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ।

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জর্জ বলের রাওয়ালপিণ্ডি উপস্থিতি—পাক-মার্কিন সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনার সূচনা। পাক-চীন আঁতাতে আমেরিকার উদ্বেগ।

রুশ-যুগোশ্লাভ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—১৮ই ভাদ্র : পাক-মার্কিন সম্পর্ক বিষয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর সহিত সফরকারী মার্কিন মন্ত্রী মিঃ বলের বৈঠক।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে দিয়েম সরকারের বৌদ্ধ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমগ্র বৌদ্ধ দুনিয়ার ধিক্কার।

জুরিখে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় আশী জন আরোহীই নিহত।

বৃটিশ গায়নায় জরুরী অবস্থার অবসান।

অভয়ংকর

॥ শিল্প ও সাহিত্যের ক্রমাবনতি ॥

সম্প্রতি লালা লাজপত রায় শত-বার্ষিকী সভায় প্রদত্ত একটি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সখেদে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন :—

"এই দেশের ভাস্কর, লেখক, জীবনীকার, চিত্রশিল্পী যে ধরণের কাজ করছেন তা আশানুরূপ নয়। দেশে যেসব গ্রন্থাদি রচিত হচ্ছে, তার মান অতি নিম্নস্তরের, তাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ বলা চলে। যে কোনও একটি সপ্তাহে পৃথিবীর অন্য দেশসমূহে প্রকাশিত গ্রন্থের সংগে ভারতবর্ষে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তুলনামূলক বিচার করলে এই উক্তির যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করা যাবে।"

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য বলাবাহুল্য বিচারযোগ্য। অনেকেই যেমন তাঁর উক্তির সংগে একমত হবেন তেমনই অনেকে এই জাতীয় একতরফা ডিগ্রি ডিসমিসে সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। বর্তমান কাল-টিও অবশ্য আর্টের বিকাশের পক্ষে তেমন অনুকূল নয়, এক হিসাবে আর্টের দুঃসময় বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অবস্থা। ক্রুশ্চেভ কর্তৃক বিমূর্তেনবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা এই সূত্রে স্মরণীয়।

আমাদের দেশে স্বাধীনতালাভের পর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে, তথাপি সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের লক্ষণ দেখা যায়নি। য়ুরোপের সাহিত্যে বা শিল্পে যখন যা নতুন ঢেউ ওঠে, এদেশেও তার ধাক্কা এসে লাগে। সাহিত্য-বিষয়ক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইসংগে হালকা ধরণের চটুল সিনেমা পত্রিকাদির সংখ্যাও কম বাড়েনি। সিনেমার মানও আজ পর্যন্ত বেশ নীচে। লোকসংখ্যা স্বাধীনতালাভের পর নিঃসন্দেহে বেড়েছে, অনেক নতুন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে, তথাপি উল্লেখযোগ্য সৃজনীমূলক সাহিত্যসৃষ্টি হচ্ছে না একথা ঠিক। উল্লেখযোগ্য সৃজনীমূলক সাহিত্য কথাটির হয়ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন, আমাদের দেশে কবিতা ও কথাসাহিত্যকে সৃজনীমূলক সাহিত্য বলে ধরা হয়। জীবনী, আত্মজীবনী, সমালোচনা বা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সৃজনীমূলক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয় না, রম্যরচনাও নয়। তথাপি নেহরুজীর উক্তি যে যা কিছু লেখা হয়েছে তা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর রচনা মাত্র—এই কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি যে সবদেশের সাহিত্যের কথা মনে মনে ভেবে তুলনামূলক বিচারের কথা বলেছেন, সেই সেই দেশে ক'খানি গ্রন্থ এই পনের বছরে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করেছে তা উল্লেখ করা উচিত ছিল। পশ্চিমের সাহিত্য যদি বিচার ও বিশ্লেষণ করে কোনও নিরপেক্ষ পাঠক পাঠ করেন তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে রায় দেবেন যে সেইসব অঞ্চলেও সাহিত্যের অবস্থা অনুরূপ।

কিছু কিছু ভাস্কর্য নেহরুজীর কাছে ugly and horrifying মনে হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতায় ডাঃ বিধানচন্দ্রের যে মর্মর মূর্তি তিনি উন্মোচন করেছেন তার চিত্ররূপ দেখে আমাদেরও তাই মনে হয়েছে। কিন্তু ভাস্কর্যে আজো দেবী-প্রসাদ রায়চৌধুরী, রামকিঙ্কর বা প্রদোষ দাশগুপ্তের মত শিল্পী বর্তমান। কৃষ্ণ-নগরের মাটির পুতুল বা দক্ষিণ ভারতের হাতির দাঁতের কারুকার্য সারা বিশ্বের বিস্ময়।

স্থাপত্যে আমরা পিছিয়ে নেই। ময়দানবের শহর ইন্দ্রপ্রস্থে এককালে স্যার এডওয়ার্ড লুটেনাস নতুন দিল্লী গড়েছিলেন, তাঁর পরিকল্পনায় নয়া-

দিল্লীর শহর, রাজপথ, পরিষদ ভবন, সেক্রেটারিয়েট ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি ভবন গড়ে উঠেছিল ইন্দো-ব্রিটিশ ভাবধারা অনুসারে। একালের স্থপতি 'চন্ডীগড়' গড়ার পর, ভারতের প্রায় সর্বত্র এলোপাথাড়িভাবে 'চন্ডীগড়ে'র অনুকরণে অসংখ্য প্রাসাদ তৈরী হয়েছে, সেইসংগে মার্কিনী ঢঙের স্কাইস্ক্র্যাপার। জয়পুর উড়িষ্যা বা দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য বা মোগলযুগের স্থপতিরা ক্রমে বিস্মৃত হবেন, তথাপি তাঁরা চিরস্মরণীয়।

চিত্রশিল্পে আজ বিমূর্তনবাদের প্রাধান্য বেশী। অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত প্রাচ্য ভারতীয় ধারা আজ অবলুপ্তির পথে। লোকশিল্পীদের আঁকা কালিঘাটের পটের অনুসরণে আঁকা ছবিও সমাদৃত হয়েছে স্বদেশে ও বিদেশে। অনুকরণ এবং অনুসরণে গঠিত বিমূর্ত শিল্পও ক্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য আকাদেমি, ললিতকলা আকাদেমি, ও সংগীত-নাটক আকাদেমি গড়ে উঠেছে। এই তিনটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সংগে দেশের নাড়ির যোগ কতখানি তা অবশ্য বিচার্য।

ললিতকলা আকাদেমি 'মুঘল মিনিয়েচার', 'অজন্তা পেইংটিং', 'পেইনটিংস অব দি সুলতানস অ্যান্ড এমপারাৰ্যার্স ইন আমেরিক্যান কালেকসানস' প্রভৃতি কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য গ্রন্থগুলির মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার অনেক উর্ধ্বে।

কিন্তু ললিতকলা আকাদেমি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য বিশেষ প্রদর্শনী, বিশেষ বক্তৃতা বা আলোচনার ব্যবস্থা করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা-সভা আহ্বান করে তাদের জ্ঞান বা আগ্রহ বর্ধনের চেষ্টা করেননি।

সংগীত নাটক আকাদেমির পরিধি আরো বৃহত্তর। নাটক, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে অর্থানুকূল্য করা হয়েছে, তাঁদের প্রদত্ত উৎসাহও বিশেষ মূল্যবান। আকাদেমি সক্রিয়ভাবে অনেক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে থাকেন। তথাপি নাটক ভারতের যে দুটি অঞ্চলে জনপ্রিয় সেই মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোনো অঞ্চলে তেমন বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নৃত্য-সংগীত বা নাটক অন্য অঞ্চলে প্রচারিত হতেও দেখিনি।

এইদিক থেকে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জনী প্রতিষ্ঠান জনচিত্তে অনেকদূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা এমনই সফল হয়েছে যে সুদূর পল্লীগ্রামেও তাঁদের প্রশংসা শোনা গেছে।

সাহিত্য আকাদেমি 'মেঘদূত' প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের একটি ইতিহাসও প্রকাশ করেছেন। আঞ্চলিক সাহিত্যের গুণবিচারে প্রতি বৎসর চোদ্দটি সংগঠন স্বীকৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য গ্রন্থকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দিয়ে থাকেন। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী-মহলে সাহিত্য-প্রচারে তাঁরা কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করেছেন বলে শোনা যায়নি। আঞ্চলিক সাহিত্যকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যও বিশেষ কোনো আয়োজন হয়নি।

শোনা গেল সম্প্রতি পঞ্চদশটি ভাষায় রচিত একটি নাটক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ। বিবেচনার্থে জমা পড়েছিল মোট ৭৪৪ খানি নাটক। ভারত সরকার নাটকের বিষয়বস্তু স্থির করে দিয়েছিলেন 'INDIA QUEST FOR UNITY' পাঠকগণ নিশ্চয়ই একথা শুনে বিস্মিত হবেন যে এই নাটকাবলীর একটিও সম্পূর্ণভাবে পুরস্কারলাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

এই সংবাদ নিঃসন্দেহে সুসংবাদ নয়। বর্তমানকাল রে'নেসাসের উপযুক্ত কাল হয়ত নয়, এবং একথাও বলা যায় যে ফরমায়েসী রচনা সর্বদা তেমন সার্থকতা লাভ করে না। লেখকের প্রাণে উপযুক্ত প্রেরণার অভাব আছে। দারিদ্র্য ও বেকারী মানুষের গুণরাশি যেমন নাশ করে তেমনই আবার প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টির সহায়ক হয়, এই দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক পুরস্কারদান-ব্যবস্থাও তেমন কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয় না। এতকাল যেসব গ্রন্থ পুরস্কার পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বিচারে তারা কোন শ্রেণীতে স্থান পাবে?

"যৌবনে দাও রাজটীকা" এই নীতি অনুসারে তরুণতম লেখকের রচিত সাহিত্যকীর্তিকে সম্মানিত করার রেওয়াজ আজো এই দেশে গড়ে ওঠেনি। তরুণ লেখককে 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে—' বলে এক প্রকাশক থেকে অন্য প্রকাশকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হয় ম্লানমুখে। জলদি সংস্করণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন গ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকের স্বাভাবিক কারণেই উৎসাহের অভাব। চাকুরীক্ষেত্রের মত এইসব ক্ষেত্রেও কিঞ্চিৎ উমেদারি করতে হয়।

প্রতিভার অনাদর যে হয় একথা অস্বীকার করা যায় না। নবীন লেখক যদি আত্ম-প্রকাশের সুযোগ না পায় তাহলে কোনোদিনই উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, শ্রেণী-বিভাগ করার কথা উঠবে তারও পরে।

।। লুইস ম্যাকনীস ।।

বিখ্যাত ব্রিটিশ কবি ও নাট্যকার লুইস ম্যাকনীসের বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ছাপান্ন বছর হয়েছিল। তিনি প্রায় ছ'বছর বার্কিংহাম য়ুনিভার্সিটির 'ধ্রুপদী সাহিত্যে'র অধ্যাপক ছিলেন এবং আরো চার বছর বেডফোর্ড কলেজে গ্রীক সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৩০ থেকে প্রায় দশ বছরকাল অধ্যাপনা করার পর ১৯৪১ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি বি বি সি'র কর্মসূচীর লেখক হিসাবে কাজ করেন। গান্ধীজীর মৃত্যুকা'লে তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন এবং পরে তিনি বি বি সি'র জন্য ভারত-বিষয়ক কয়েকটি সুন্দর ঘটনালেখ্য রচনা করেন। তাঁর অনেকগুলি কবিতার উপজীব্য ভারতীয় উপকথা এবং বিষয়বস্তু। লুইস ম্যাকনীস গ্যয়টের 'ফাউস্তে'র প্রথম এবং দ্বিতীয় খন্ড এবং এসকাইলাসের 'আগামেমনন' অনুবাদ করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'দি আর্থ কমপেলস' 'আটম জার্নাল' ও 'হোলস ইন দি স্কাই' বিশেষ বিখ্যাত, শেষোক্ত গ্রন্থটি ডবু এচ অডেনের সংগে যুক্তভাবে রচিত। আমরা এই প্রখ্যাত কবির মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত।

নতুন বই

আদর্শের জয় ঘোষণা

শ্রীযুক্ত জগদীশপ্রসাদ দাশের সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস 'অনুরাগে রাঙা' বাঙালীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কয়েকটি চরিত্র নিয়ে বৈষ্ণবধর্মের শাশ্বত প্রেমাদর্শের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। নবগোপাল, বংশীদাস, কমলতা কিশোরী স্ব স্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। নবগোপাল ও বংশীদাস চরিত্র দুটি অত্যন্ত সজীব তুলিতে অঙ্কিত।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রেমের যে আদর্শ, ভারতীয় প্রেমের বৈশিষ্ট্য তা থেকে স্বতন্ত্র। লেখক সেই ভারতীয় প্রেমের আদর্শের জয়ঘোষণা করেছেন। আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা উল্লেখযোগ্য। বর্ণনাভঙ্গী, সংলাপ সজীব ও চরিত্রানুগ।

অনুরাগে রাঙা—(উপন্যাস) জগদীশপ্রসাদ দাশ। সাহিত্য কেন্দ্র, এ-১৩১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম ২-৫৯ নঃ পঃ।

●

প্রথম বাঙলা ট্রাজেডি

বাঙলা ভাষায় মেঘনাদবধ কাব্যের পরেই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ অবদান 'কৃষ্ণকুমারী।' 'কৃষ্ণকুমারী' বাঙলায় প্রথম ট্রাজেডি এবং ঐতিহাসিক

নাটক। অধ্যাপক অলোক রায় সম্প্রতি এই নাটকখানি সম্পাদনা করেছেন। সুদীর্ঘ ভূমিকায় বহু মূল্যবান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে নাটক সম্পর্কীয় দীর্ঘ আলোচনাটিতে শ্রীযুক্ত রায়ের নাটক বিষয়ক ধারণার গভীরতাই প্রমাণ করে। বাঙলা নাটকের উদ্ভব—বাঙলা মঞ্চ—মধুসূদন এবং মধুসূদনের নাট্যাদর্শ অধ্যায়গুলিতে প্রয়োজনীয় উপাদানের সমাবেশ ঘটেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে তাঁর আলোচনা মধুসূদন সম্পর্কীয় চিন্তাধারায় কিছু অভিনব তথ্যের সংযোজন ঘটাবে। তাছাড়া সুদীর্ঘ ভূমিকায় আরও অনেক কিছুর আলোচনা করা হ'য়েছে। সম্ভবতঃ এইটিই কৃষ্ণকুমারীর প্রথম সম্পাদিত সংস্করণ।

কৃষ্ণকুমারী নাটক— মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অধ্যাপক অলোক রায় সম্পাদিত সাহিত্য প্রকাশ ৪৭।২, **রামেন্দ্রপ্রসাদ মজুমদার লেন। হাওড়া। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।**

●

বঙ্কিম ও আধুনিক রীতির লেখন

একশ একত্রিশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই গল্পসংগ্রহে লেখিকার এগারোটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে। গল্পগুলি সুলিখিত এবং সুচিন্তিত। তবে নাম-গল্পটি দেখা গেল যে লেখিকা শুধু সাধু ভাষায় গল্পটি রচনা করেছেন এবং পাত্র-পাত্রীও বঙ্কিমী রীতিতে 'হইয়া' 'করিয়া' বলে কথা বলছে। এযুগে এ রীতি কিঞ্চিৎ বিসদৃশ। অন্য গল্পগুলি অবশ্য আধুনিক রীতিতে রচিত। গল্পগুলির মধ্যে বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ছাপা এবং প্রচ্ছদ সুন্দর।

বিন্দু ও ত্রিভুজ— (গল্প সংগ্রহ) চিত্রিতা দেবী। প্রকাশক। সুজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৬, **বিপিন গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা চার আনা। পরিবেশক —ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা।**

●

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

বহুল প্রচলিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে অভিনব পাক্ষিক কার্টুন পত্রিকা 'টেক্কা'র আবির্ভাব নিতান্তই সাম্প্রতিক কালে। বর্তমান দ্বিতীয় সংখ্যায় আছে ন'জন কার্টুনিস্টের আঁকা বিভিন্ন ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য তীক্ষ্ণ ও কটাক্ষপূর্ণ কার্টুন। তাছাড়া আছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির ব্যঙ্গাত্মক রচনা, সরস ফীচার, ব্যঙ্গকাব্য, হাসির কবিতা ইত্যাদি। রেখা ও রেখার জীবন্তস্পর্শে, বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায় পত্রিকাটি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। ২৪।১, দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৩ থেকে প্রকাশিত এবং তুষারকান্তি সম্পাদিত। বাঙলা ভাষায় পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রতি সংখ্যার দাম ৩০ নয়া পয়সা।

●

মনোজ বসু সম্পাদিত **'সাহিত্যের খবর'** মাসিক সাহিত্য-পত্রিকাটি বিভিন্ন মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যার তিনটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন পুলিনবিহারী সেন, রঞ্জিত সিংহ এবং অমলেন্দু ঘোষ। পুলিনবিহারী সেনের 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে এই পত্রিকায়। 'বাংলায় কালিদাস-চর্চা'—এ সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা করছেন অমলেন্দু ঘোষ। বিষ্ণু দে'র কবিতার ওপর আলোচনা করেছেন রঞ্জিৎ সিংহ। এ ছাড়া আরো কয়েকটি বিভিন্ন রকমের রচনা স্থান পেয়েছে। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ঃ ১২ থেকে সাহিত্যের খবর প্রকাশিত হয়।

●

কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকা **'আগন্তুক'** তরুণ সাহিত্যসেবীদের মুখপত্র। তরুণদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন প্রবীণেরও রচনা বর্তমান সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ ধর, গোপাল ভৌমিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় অমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শুভাশিস গোস্বামী, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, শংকর দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমানাথ রায় এবং আরো কয়েকজন। কয়েকটি রচনা না ছাপলেই পত্রিকাটি আরও ভাল হত বলে মনে হয়। মৃণাল বসু চৌধুরীর সম্পাদনায় জয়নগর (জয়নগর মজিলপুর, দত্তবাটী, ২৪ পরগণা) থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

●

বাঙলাদেশের পাঠকের কাছে **'পরিচয়'** পত্রিকার নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ৩৩ বর্ষ ১ম সংখ্যাটি বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা (১) রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর কয়েকটি মূল্যবান রচনা স্থান পেয়েছে। অবশ্য সমস্ত রচনাগুলিই বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। তা-হলেও স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসাবে এদের মূল্য কম নয়। সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, অর্থনীতি, যুদ্ধ, শান্তি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বাঙলাদেশের কয়েকজন প্রবীণ ও তরুণ সমালোচক বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন। গোপাল হালদার ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত।

●

।। কয়েকটি মূল্যবান পুস্তিকা ।।

যে কোন দেশ সম্পর্কে জানবার আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহার পরিচয়। এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা ঘরে বসে অন্যান্য দেশের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে চান। আজকের দিনে প্রত্যেক দেশের সরকার তাঁদের দেশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে থাকেন। ঐ সব পুস্তিকায় একটি সমগ্র সভ্যতার পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাধারণত আলোচনা করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত আলোচনায় তথ্যের পরিমাপই বেশি থাকে।

'আমেরিকার সমবায় আন্দোলন', 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা' এবং **'আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের কথা'**—এই তিনটি পুস্তিকায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন দিক এবং জাতীয় জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা, প্রতিটি মানুষের জীবনধারণ, সামাজিক স্থায়িত্ব, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, শ্রমিক আন্দোলনের উৎপত্তি থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য এই তিনটি পুস্তিকার মাধ্যমে জানা যাবে।

'অলীক ধারণা ও বাস্তব সত্য'—১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আটর্ণী জেনারেল রবার্ট এস. কেনেডি ও মিসেস কেনেডি জাপান, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, ইতালী, জার্মাণী, হল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। ঐ সমস্ত দেশে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে মনোভাব কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান পুস্তিকায়।

গঠনের পথে ভারত—ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার সচিত্র বিবরণী, ভারতের শিক্ষা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় কতদূর উন্নতি হয়েছে তার বিবরণ এই বইয়ের মধ্যে একনজরে পাওয়া যায়। অনেকগুলি একবর্ণ ও বহুবর্ণ ছবি বইয়ের অঙ্গসজ্জা ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

এই পুস্তিকাগুলি ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস্, কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা ঃ

(১) **হাসি শুধু হাসি নয়** (বাঙলা) ঃ ইন্দ্রাণী প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৩,১৭৬ মিটার দীর্ঘ এবং ১১ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী; তত্ত্বাবধান ঃ নবগোষ্ঠী; পরিচালনা ও প্রধান চিত্রগ্রহণ ঃ সন্তোষ গুহ রায়; কাহিনী ঃ ইন্দ্রাণী প্রোডাকসন্স গ্রুপ; চিত্রনাট্য ও সংলাপ ঃ বিনয় চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ শ্যামল মিত্র; গীতরচনা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ ঃ রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়; শব্দানুলেখন ঃ জে ডি ইরাণী, শিশির চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন পাল ও (বহির্দৃশ্যে) অবনী চট্টোপাধ্যায়; প্রধান সম্পাদনা ঃ সুবোধ রায়; সম্পাদনা ঃ অনিল সরকার; শিল্পনির্দেশনা ঃ গৌর পোদ্দার; রূপায়ণ ঃ কল্যাণী ঘোষ, কবিতা রায়, শিপ্রা মিত্র, পদ্মা দেবী, জয়শ্রী সেন, গৌরী মজুমদার, রাজলক্ষ্মী (বড়), জহর রায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ (অতিথি), তুলসী চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, শ্যাম লাহা, মণি শ্রীমানী প্রভৃতি। ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ৬ই সেপ্টেম্বর থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"হাসি শুধু হাসি নয়" ছবির নায়ক সেজেছেন জহর রায়, ছবির পার্শ্ব-চরিত্রগুলিতে আছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্তী, বড়ো রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি হাসির হররা ছোটানো নামকরা শিল্পী এবং ছবিটিকে উৎসর্গ করা হয়েছে পরলোকগত হাস্যাভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। তবু "হাসি শুধু হাসি নয়" ছবিটি যে মাত্র হাসির ছবিই নয়, তার মধ্যে ভাববার, চিন্তা করবার, উপভোগ করবার অন্য উপকরণও আছে, তাই বোঝাবার জন্যেই ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছে—"হাসি শুধু হাসি নয়" অর্থাৎ এতে হাসিও আছে এবং যা হাসি নয়, এমন বস্তুও আছে (ভাষাটি অবশ্য আমার নিজের)। চার্লি চ্যাপলিনের ছবিতে যেমন দুরন্ত হাসির অন্তরালে গোপন ফল্গুধারার মতো একটি তীব্র বেদনার সুর বাজতে থাকে, "হাসি শুধু হাসি নয়" ছবিতে তেমন কিছু না থাকলেও জহর রায় অভিনীত ছবির মূল চরিত্রটির নিখাদ ভালো-মানুষী দর্শকহৃদয়কে স্পর্শ না করে পারে না। পল্লীগ্রামের সরলমতি নির্বোধ হরিধন কলকাতা শহরে কোন-না-কোন রকমে জীবিকার্জনের চেষ্টায় এসে যখন ঘটনাচক্রে চেহারার মিলের দরুণ বিধবা রাণীমার হারানো সন্তান বুদ্ধিমান সামন্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন তার অতি-সারল্য এবং আপাততঃ নির্বুদ্ধিতার বশে সে এমন সব কাজ করতে থাকে, যার ফলে সে রবীন্দ্রনাথের নির্বোধ রামকানাইকেও মহানুভবতায় পরাস্ত করতে সমর্থ হয়; দর্শক প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই বুদ্ধিমান সামন্তরূপী হারাধনের নির্বুদ্ধিতাকে ভালোবেসে ফেলেন। এবং এইখানেই "হাসি শুধু হাসি নয়" ছবির সার্থকতা।

'বিংশতী জননী' চিত্রে লিলি চক্রবর্তী। ফটো ঃ অমৃত

জহর রায় হরিধন তথা বুদ্ধিমান সামন্তের চরিত্র-চিত্রণে এমন এক আশ্চর্য স্বাভাবিকতার সঙ্গে অপূর্ব সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, যাকে অভূতপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই চরিত্রটি জহর রায়ের চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জীবনে একটি স্মরণীয় সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হবে। কুটচক্রী মিঃ চৌধুরীর ভূমিকায় নীতীশ মুখোপাধ্যায় সার্থক অভিনয় করেছেন। ছবির রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা, বেকার সুজিত এবং চৌধুরী-কন্যা রীতার ভূমিকায় যথাক্রমে বিশ্বজিৎ ও কল্যাণী ঘোষ গানে এবং অভিনয়ে যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার ক'রে ছবির উপভোগ্যতাকে সাহায্য করতে ত্রুটি করেন নি। অপরাপর ভূমিকায় পদ্মা দেবী (রাণীমা), শিপ্রা মিত্র (চৌধুরী-পত্নী), কবিতা রায় (শৈল), শ্যাম লাহা (মাসিক-পত্রের মালিক), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (পুলিশ ইনস্পেক্টার), তুলসী চক্রবর্তী (বিবাহবিচ্ছেদকামী প্রৌঢ়), বড়ো রাজলক্ষ্মী (ঐ স্ত্রী), নৃপতি চট্টোপাধ্যায়

(পকেটমার-শিক্ষা কলেজের অধ্যাপক), অজিত চট্টোপাধ্যায় (পকেটমার দলস্থ সদস্য), গঙ্গাপদ বসু (মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী) প্রভৃতি নিজের নিজের নাট-নিপুণতা স্বাক্ষর রেখেছেন।

চিত্রনাট্যকাররূপে বিনয় চট্টোপাধ্যায় আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। ছবির আলোকচিত্রের কাজ সর্বত্র সমান নয়। সুরযোজনায় কোনো অভিনব বৈচিত্র্যের সন্ধান দিতে পারেন নি সুরকার শ্যামল মিত্র; আবহসঙ্গীত ছবির চাহিদা মিটিয়েছে। শিল্প-নির্দেশনা এবং সম্পাদনাও সাধারণ পর্যায়ের।

"হাসি শুধু হাসি নয়"-এর মুখ্য চরিত্রে জহর রায়ের স্মরণীয় অভিনয়ের জন্যে ছবিটি চিত্ররসিকদের দর্শনীয়।

(২) **ভি-আই-পিজ (ইংরাজী) :** মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার-এর চিত্র; প্রযোজনা : আনাতোল দা গ্রুনওয়াল্ড; পরিচালনা : অ্যান্থনী অ্যাসকুইথ; রচনা : টেরেন্স র‍্যাটিগ্যান; সঙ্গীত-পরিচালনা : মিকলোজ রোজা; রূপায়ণ : এলিজাবেথ টেলর, রিচার্ড বার্টন, লুই জর্ডান, এলসা মার্টিনেলি, মার্গারেট রাথারফোর্ড, ম্যাগি স্মিথ, রড টেলার, অর্সন ওয়েলস, লিণ্ডা খৃশ্চিয়ান প্রভৃতি। গেল ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে মেট্রো এবং বসুশ্রীতে দেখানো হচ্ছে।

প্যানাভিশন এবং মেট্রোকালারে তোলা এম জি এম-এর নবতম চিত্র-নিবেদন "ভি আই পিজ" নানা কারণে একটি অনন্যসাধারণ চিত্র। প্রথমেই লণ্ডনের বিমানবন্দর তার অতিব্যস্ত আন্তর্জাতিক পরিবেশ নিয়ে ছবিটির কাহিনীর অকুস্থল। দ্বিতীয়, নিউ ইয়র্ক-গামী বিমানটির যাত্রাকাল ঘন কুয়াশার জন্যে বিলম্বিত এবং অনিশ্চিত হওয়ায় সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এমন একটি দ্বিতীয় বাস্তববোধের সৃষ্টি হয়েছে যে, কাহিনী-বর্ণিত প্রতীক্ষমান যাত্রীগুলির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকসমাজও ঐ বিমানের নিশ্চিত যাত্রা-কালের ঘোষণাটি শোনবার জন্যে উৎ-কণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করতে থাকেন। তৃতীয়, বহু ছোটখাট ঘটনার মধ্যে অন্ততঃ চারটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর ভিন্নধর্মী পরিবেশকে সুকৌশলে পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় এমন একটি বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায়, যা সাধারণতঃ অন্য ছবিতে অনুপস্থিত। এবং সবশেষে, এলিজাবেথ টেলর, রিচার্ড বার্টন এবং লুই জর্ডান অভিনীত ত্রিভুজ কাহিনীর শেষাংশ তার বৈচিত্র্যময় পরিণতির জন্যে অবিস্মরণীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করেছে।

ধনী ব্যসায়ীর স্ত্রীর মনে হয়েছে, স্বামী তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে না, কর্মব্যস্ত স্বামী দ্বারা সে উপেক্ষিতা। তাই সে স্থির করেছে, স্বামীরই বন্ধু-

'মহানগর' চিত্রে ভিকি রেড উড্

স্থানীয় লঘুচিত্ত ভদ্রলোকটির সঙ্গে সে দেশান্তরে পালিয়ে যাবে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে তাকেই বিবাহ ক'রে সুখী হবে। স্বামী স্ত্রীর মনোগত অভিপ্রায়ের কথা না জেনেই স্ত্রী এবং বন্ধুকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছে বিমানবন্দরে; কর্তৃপক্ষকে বলে ওদের দুজনের পাশাপাশি বসবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে স্ত্রীর হাতে লেখা একখানি ছোট্ট চিঠি থেকে স্ত্রীর আন্তরিক অভিলাষের সংবাদ পেয়ে সে যখন মর্মাহত, তখনই বেতারবার্তায় খবর পেল আমেরিকা যাবার নির্দিষ্ট বিমানটি কুয়াশার জন্যে যাত্রা স্থগিত রেখেছে। স্ত্রীর ধারণা ছিল, স্বামী যখন তার চিঠি পাবে, তখন সে আকাশপথে আটলাণ্টিক পার হচ্ছে। কিন্তু যাত্রা বিলম্বিত হওয়ায় সমস্ত ওলটপালট হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী বুঝল, তার স্বামীর জীবনধারণের জন্যে তাকে তার স্বামীর প্রয়োজন, তার অনুপস্থিতিতে তার স্বামীর জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তা পূর্ণ হবার নয়। কাজেই বন্ধুকে যেতে দিয়ে স্ত্রী ফিরে এল স্বামীর সোহাগভরা বাহুবন্ধনে। স্ত্রী এবং স্বামীর ভূমিকায় এলিজাবেথ টেলর এবং রিচার্ড বার্টনের অভিনয় দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখে।

দ্বিতীয় গল্পে রড টেলার অভি-নীত অস্ট্রেলিয়ার ব্যবসায়ীকে তার সুন্দরী সেক্রেটারী (মিস্ ম্যাগী স্মিথ)

কি দুঃসময় থেকে রিচার্ড বার্টনের আর্থিক সহায়তা পরিবার ধ্বংস থেকে রক্ষা করে, তাই চিত্রিত হয়েছে।

তৃতীয় আকর্ষণ হচ্ছেন, প্রৌঢ়া ভাচেসের ভূমিকায় কৌতুকময়ী মার্গারেট রাদারফোর্ড; তিনি জীবনে কোনো দিন বিমানে আরোহণ করেননি।

আর চতুর্থ কাহিনীর নায়ক হচ্ছেন চলচ্চিত্র-পরিচালকের ভূমিকায় অর্সন ওয়েলস্; তিনি তাঁর প্রধানা অভিনেত্রী-রূপসী এলসা মার্টিনেলিকে নিয়ে ইংলণ্ডের মাটির সংস্পর্শে সেই দিনই আগে করতে পারলে এক বিরাট আয়কর দেওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পান এবং সেই সময়ে বিমান ছাড়তে যত বিলম্ব হচ্ছে, ততই অস্থির হয়ে পড়ছেন।

ভি-আই-পি'জ্‌ একটি অবশ্য দর্শনীয় আনন্দদায়ক চিত্র।

(৩) তেরো নদীর পারে (বাঙলা): রায়বন্ধু পিকচার্স-এর নিবেদন: ২,৯৫৭ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১১ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা: রাজেন্দ্রনাথ সাহা; এবং বারীন সাহা; চিত্রনাট্য, পরিচালনা এবং চিত্রগ্রহণ: বারীন সাহা; কাহিনী: নির্মল ঘোষ; সঙ্গীত-পরিচালনা: জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ; নৃত্যপরিচালনা: প্রিয়ম; শব্দানু-লেখনে: গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর ঘোষ; সম্পাদনা: দুলাল দত্ত; রূপায়ণ: জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ম্ হাজারিকা এবং আরও অনেকে।

দুটি গ্রাম্য সার্কাস পার্টি। একটি পার্টিতে সার্কাসের সঙ্গে নর্তকীদের

'ন্যায়দণ্ড' চিত্রে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়
ফটো: অমৃত

নৃত্যগীতও দেখানো হয়, অন্যটিতে তা' হয় না। কাজেই প্রথমটিতে দর্শকের ভীড় লেগেই আছে এবং দ্বিতীয়টির আসর প্রায় ফাঁকা। দু' নম্বর পার্টির ওস্তাদ খাঁটি সার্কাসে বিশ্বাসী; তার ধারণা, উচ্চ শ্রেণীর খেলা দেখাতে পারলে দর্শক সমাগম আজ না হয়, কাল হবে। সে বলে—পারিক মাছির মতো; নর্দমাতেও বসে, আবার রাবড়ী পেলেও ছাড়েনা। কিন্তু তার দলের ম্যানেজার ভিন্নমত পোষণ করে; তার মতে দর্শক আকর্ষণ করবার জন্যে চটকদার মেয়েছেলের নাচ চাই-ই চাই। দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারের মতই অভ্রান্ত। সার্কাসের সঙ্গে নৃত্যকুশলা রমণীর যোগ হওয়া মাত্র ওস্তাদের সার্কাস জমে উঠল; এমন কি লোমহর্ষক ত্রিফলার ছোরার খেলা দেখার চেয়ে নারীর কোমর-বাঁকানো নৃত্যের চাহিদা বেশী, দেখা গেল। এতে ক্লাউনের বেশধারী ওস্তাদ হ'ল মর্মাহত। সে মত্ত অবস্থায় রাত্রিকালে এক দ্বিতল গৃহের বারান্দা থেকে খেলা দেখাতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে তুলল। নবাগতা নর্তকী তার সেবা করতে গিয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। দুজনে মিলে একটি নৌকা ক'রে নির্জন অভিযানে বেরুল এবং নদীর মোহানায় পৌঁছে নর্তকী মনের আনন্দে করল জলের উপর দিয়ে দুরন্তভাবে ছুটোছুটি; যেন সে জীবনটাকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো উপভোগ করতে চায়। কিন্তু ফিরে আসতেই তারা কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হ'ল। ম্যানেজার ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওস্তাদের উপর; আঘাত প্রতিঘাত করতে করতে দু'জনেই গড়িয়ে পড়ল জলের মধ্যে। এমন সময়ে নর্তকীর আহ্বানে দলের লোকেরা এসে তাদের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করল। এর পর শান্ত মুহূর্তে ম্যানেজার যখন বুঝল, জোর ক'রে নারীর মন জয় করা যায় না, তখনই সে দল ছেড়ে রওনা দিল; ওস্তাদের অনুনয় বিনয়েও সে ফিরল না। নর্তকী হিসাবী মেয়ে; সে জানে ম্যানেজার ছাড়া সার্কাস চলবে না; খাম-খেয়ালী ওস্তাদের সাধ্য নেই সার্কাস চালাবার। কাজেই সেও প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই রওনা দিল।

এই কাহিনীকে উপজীব্য ক'রে যে-ছবি নির্মিত হয়েছে, তার নাম কি ক'রে "তেরো নদীর পারে" হয়, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এবং কাহিনীর চলচ্চিত্রা-য়ণের মধ্যে দর্শককে ছবির সঙ্গে একাত্ম করবার কোনো সার্থক প্রচেষ্টাও দেখতে পাওয়া গেল না। মাত্র ছবির উদ্বোধন দৃশ্যে এবং আরও কয়েক স্থানে চিত্রগ্রহণে শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া ছবিটিকে অত্যন্ত অপটু হাতের সৃষ্টি ব'লেই মনে হয়েছে। ওস্তাদের ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়নৈপুণ্যও ছবিটিকে উপভোগ্য ক'রে তুলতে পারে নি।

মঞ্চাভিনয়

(১) হঠাৎ নবাব: 'চলাচল'-এর নিবেদন; নাটক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্রযোজনা: শ্যামল সেন; আলোক পরিকল্পনা ও দৃশ্যসজ্জা: নির্মল গুহরায়; নৃত্য-নির্দেশনা: লোচন দে; শব্দ-নিয়ন্ত্রণ: বাবলু ঘোষ; রূপায়ণ: রবি ঘোষ, নিমাই ঘোষ, প্রেমাশীষ সেন, লোচন দে, উমানাথ ভট্টাচার্য, সুনীল রায়, সুনীল বন্দ্যো-পাধ্যায়, ভোলা দত্ত, বনানী দাশগুপ্ত, অন্নপূর্ণা রায়, চিত্রা মন্ডল, অলকা সেন প্রভৃতি।

'চলাচল' দক্ষিণ কলিকাতার একটি নবগঠিত আনন্দসংস্থা। নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেই এই সংস্থার সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ আনন্দ পেতে এবং আনন্দ দিতে চান ব'লে মনে হয়। এ'রা কোনো কিছু বলার চেয়ে কোনো কিছু করার প্রতিই বেশী আস্থাশীল এবং নতুন কিছু করার চেয়ে নবীন কিছু করার প্রতিই যে এ'দের ঝোঁক বেশী, তা' এ'দের প্রথম নাট্যপ্রয়াস 'হঠাৎ নবাব'-এর মঞ্চোপস্থাপনা দেখবার পর বুঝতে কষ্ট হয় না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের 'লে বুর্জোয়া

'জীবনকাহিনী' চিত্রে সন্ধ্যা রায়

জাঁতিয়ম' থেকে স্বাধীন অনুবাদ 'হঠাৎ নবাব' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। মূল নাটকে পাঁচটি অঙ্কের মধ্যে ছিল অন্ততঃ ৫০টি দৃশ্য—কোনোটি বড়, কোনোটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী। নাটকখানি সেযুগে কিভাবে অভিনীত হ'ত, প্রহসনটিকে কতখানি গীতিনাট্যের বা অপেরার রূপ দেওয়া হ'ত, তা' মুদ্রিত নাটক দেখে খুব বেশী বোঝবার উপায় নেই। মাত্র তৃতীয় অঙ্কের ২১শ দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়, নাট্যকার দৃশ্যটিকে নৃত্যনাট্যরূপে অভিনীত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন : '৬ জন গায়ক নাচিতে নাচিতে আসিয়া নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রী আনিয়া স্থাপন'।

একজন দোকানদার সহসা অত্যন্ত ধনশালী হয়ে নিজেকে সম্ভ্রান্ত সমাজ-ভুক্ত করবার জন্যে নাচে গানে, তলোয়ার খেলায় এবং তত্ত্ববিদ্যায় শিক্ষিত হবার চেষ্টা করেছিল প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। হঠাৎ বড়লোক হ'লে প্রতিটি মানুষই যেমন নিজেকে সর্বগুণান্বিত করবার চেষ্টা ক'রে থাকে, দোকানদার জুর্দনও তাই করেছিল; কিন্তু প্রচুর অর্থব্যয় ক'রে নর্তক, গায়ক, তলোয়ার-শিক্ষক এবং তত্ত্বজ্ঞানী নিযুক্ত করলে কি হবে, হঠাৎ অত্যধিক অর্থপ্রাপ্তির ফলে তার মাথা যথেষ্ট গরম হয়ে পড়েছিল এবং কোনো কিছুই মনঃসংযোগ ক'রে শিক্ষা করবার ধৈর্য তার ছিল না; অথচ অপাত্রের হাতে অর্থ পড়ায় তার খামখেয়ালী মনে নতুন ক'রে প্রেমপিপাসা জাগে এবং স্ত্রী বর্তমানে দেলমনিয়া নামে এক বেগমের জন্যে অস্থির হয়ে পড়ে। অপর পক্ষে নিজের কন্যা রোশনীকে তার প্রেমাস্পদ খেলাৎ খাঁর সঙ্গে বিবাহ দিতে তার ঘোরতর আপত্তি; কারণ খেলাৎ ধনী নয়। শেষে খেলাতের নফর কবলু খাঁর কূট-বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হয়ে একদিকে তিনি যেমন নিজের মেয়ের সঙ্গে খেলাতের বিবাহ দিতে বাধ্য হন, তেমনই তাঁর নিজের প্রেমপিপাসারও নিবৃত্তি ঘটে। তিনি যে এক বিরাট মূর্খ, তা' প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রহসনের উপর শেষ যবনিকা পড়ে।

নবগঠিত চলাচল সম্প্রদায় প্রায় ৮০ বছর পরে এই প্রহসনটিকেই তাঁদের প্রথম মঞ্চোপহার হিসেবে নির্বাচিত ক'রে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন এই কারণে যে, বাঙলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের একটি প্রহসনকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করাবার সুযোগ দিলেন। এবং সমস্ত প্রহসনটিকে যে-ভাবে সাজসজ্জায় মণ্ডিত ক'রে প্রায় নৃত্যনাট্যের ছাঁচে ফেলে তাঁরা মঞ্চে উপস্থিত করেছেন, তাতেও তাঁদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। নির্মল গুহরায় পরিকল্পিত দৃশ্যটিও অভিনব। পাঁচ অঙ্কে এবং ৫০টি দৃশ্যে সমাপ্ত মূল প্রহসনের বিশেষ কোনো অঙ্গহানি না ক'রে এ'রা ৮টি মাত্র দৃশ্য-বিভাগের দ্বারা 'হঠাৎ নবাব'কে মঞ্চস্থ করেছেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দৃশ্যের মধ্যে বিরতি না ঘটিয়ে এ'রা অনায়াসে দৃশ্য-সংখ্যাকে ৭ করতে পারতেন। প্রহসনটির কয়েক স্থানে নৃত্যনাট্যকে প্রাধান্য দিয়ে ইঙ্গিতধর্মী করা হয়েছে; যেমন দর্জিদল দ্বারা জুর্দনের পোশাক পরিধান এবং দেলমনিয়া দৌলৎ খাঁ ও জুর্দনের পানাহারের দৃশ্য। এ ছাড়া প্রায় সমস্ত প্রহসনটি জুড়ে কোথাও নাচ, কোথাও গান এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে একটু বিশেষ ভঙ্গীর কথা, মোটের ওপর যাকে বলে স্টাইলাইজড অ্যাকটিং সেই ভঙ্গীতে, ট্যাবলো ঢংয়ের দাঁড়ানো (খেলাৎ ও কবলুর প্রথম দৃশ্য) প্রভৃতি মিলিয়ে এমন একটি উপভোগ্য নূতনত্বের প্রবর্তনা করা হয়েছে, যা সংপ্রতিকালে কোনো নাট্যাভি-নয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি ব'লে মনে করতে পারছি না। শুনেছি, এই প্রহসনই অত্যন্ত সাদামাঠা ভাবে অভিনীত হয়েও অত্যন্ত উপভোগের সামগ্রী হয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু 'চলাচল' প্রদত্ত 'হঠাৎ নবাব-এর এই বর্ণাঢ্য রূপও আমরা কম উপভাগ করিনি। জুর্দনরূপে রবি ঘোষ, গানের ওস্তাদের বেশে উমানাথ ভট্টাচার্য, নাচের ওস্তাদ ও হেড দর্জিরূপে লোচন দে, তত্ত্বজ্ঞানীর বেশে প্রেমাশীষ সেন, কবলু খাঁ-রূপী ভোলা দত্ত, খেলাৎ খাঁর বেশে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, দৌলত খাঁ রূপে সুনীল রায়, জুর্দনের

স্ত্রী-বেশে বনানী দাশগুপ্ত, মঞ্জুলিকা-রূপে চিত্রা মণ্ডল, রোশনী বেশে অন্নপূর্ণা রায় এবং দেলমনিয়া রূপে অলকা (কালিন্দী) সেন—প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূমিকার যথোপযুক্ত নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সমগ্র প্রহসনটিকে রসোত্তীর্ণ করতে সাহায্য করেছেন। মাত্র একেবারে শেষ দৃশ্যের শেষাংশে কিছুটা সঙ্গীত বর্জন করতে পারলে ভালো হ'ত; এ ছাড়া জুর্দন চরিত্রের আকাঠ মূর্খতার পরিচয়ে প্রহসনটির ক্লাইম্যাক্স রচনা ক'রতে পারলে প্রহসনটি আরও অর্থ-ব্যঞ্জক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মূল নাটকে জুর্দেনের মস্তকমুণ্ডন প্রভৃতি দ্বারা একটি বিচিত্র মূর্তিকে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত ক'রে কয়েদের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে : "এত ক্ষেত্রেও যদি কোন বেশী পাগল থাকে, সে কেবল উজোর।" এই উক্তির প্রকৃষ্ট অর্থ আজ আর বোধগম্য হয় না; কাজেই অন্য কোনো ভাবে জুর্দনকে অতিমাত্রায় হাস্য-কর অবস্থাতেও 'দেখ, আমায় কেমন সুন্দর মানিয়েছে" ইত্যাদি গোছের আত্মতুষ্টির বাণী দেওয়ার মধ্যে যবনিকা পতন ক'রতে পারলে ভালো হ'ত ব'লেই মনে হয়। "চলাচল"-এর যাত্রাপথ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সুগম হোক, এই কামনাই করি।

(২) পান্থশালা : অনুশীলন সম্প্রদায়ের নিবেদন; রচনা : রমেন লাহিড়ী পরিচালনা : মমতাজ আহ্‌মেদ; শিল্প-নির্দেশনা : মদন গুপ্ত ও সুবিমল রায় আলোক-সম্পাত : তাপস সেন; রূপায়ণ : বিশ্বেশ্বর সেন, অরূপ দত্ত, মমতাজ আহমেদ, সুব্রত নন্দী, দিলীপ বিশ্বাস, আদিত্য পাল, সীতা মুখোপাধ্যায়, দীপু দত্ত, রত্না গোস্বামী প্রভৃতি।

ওঙ্কার মিউজিক সার্কেলের আয়োজিত মাসিক অধিবেশনে এবার অংশ গ্রহণ করেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ ও তাঁর সহশিল্পীরা গত ২৪শে আগস্ট তারিখের অনুষ্ঠানে।

রমেন লাহিড়ী রচিত কৌতুক-নাট্য "পান্থশালা" বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত এবং এই একই কাহিনী নিয়ে ভিন্ন নামে ভিন্ন ব্যক্তি রচিত কৌতুক-নাট্যের অভিনয় আমরা দেখেছি।

পথভ্রষ্ট শহুরে বাবুদের আসল গন্তব্যস্থলকেই হোটেল বলে বর্ণনা করে এবং সেই বাড়ীর আসল মালিক ও জমিদারকে হোটেলওয়ালা বলে পরিচিত করিয়ে তাদের সেইখানে পাঠিয়ে দেওয়ার ফলে যে বিভ্রাট বাধে, তাকেই উপজীব্য করে এই কৌতুকনাট্যের সৃষ্টি। সোমেন্দ্র নন্দী প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় নাট্য সংসদ দ্বারা এই "পান্থশালা" নাটকটি পূর্বে অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু অনুশীলন সম্প্রদায় এই কৌতুকনাট্যটিকে সমবেত অভিনয়োৎকর্ষের দ্বারা যেন আরও বেশী করে উপভোগ্য করে তুলেছেন।

গেল ২রা সেপ্টেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তাদের এই কৌতুকনাট্যের প্রথম অভিনয় রজনীতে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন মায়ার ভূমিকায় রত্না গোস্বামী। নাট্যোল্লিখিত 'মায়া'কে তিনি মূর্ত করে তুলেছিলেন মঞ্চের উপরে; এখন লাস্যময়ী বাস্তব রূপায়ণ আমরা মঞ্চে কচিৎ দেখেছি। তার পরেই নাম করতে হয় প্রকাশকের ভূমিকায় মমতাজ আহ্‌মেদের। তিনি যে সিরিও-কমিক ভূমিকায় একজন সুদক্ষ অভিনেতা, এ-কথা আজ আর নতুন করে বলার দরকার নেই। রমণীমোহনের ভূমিকায় বিশ্বেশ্বর সেনও অত্যন্ত বাস্তব অভিনয় করে দর্শকদের প্রীতি-বর্ধন করেছেন। এ ছাড়া সুব্রত নন্দী (অজয়), অরূপ দত্ত (লাট্টু), আদিত্য পাল (মোশান মাস্টার), সীতা মুখোপাধ্যায় (বিরজা), দিলীপ বিশ্বাস (বামদেব) প্রভৃতিও উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। মীরার ভূমিকায় দীপু দত্তের অভিনয়ে উন্নতির অবকাশ আছে।

শিল্পনির্দেশনা এবং রূপসজ্জায় যথাক্রমে মদন গুপ্ত ও সুবিমল রায় এবং মনতোষ রায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোক-সম্পাতে কোনো বৈশিষ্ট্য দেখাবার অবসরই নেই।

বিবিধ সংবাদ

নান্দনিকের "চন্দ্রগুপ্ত" :

"নন্দনিক সম্প্রদায় বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত গিরিশ নাট্যোৎসবে আগামী

শনিবার ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা ২-৩০ মিনিটে দ্বিজেন্দ্রলালের অমর নাটক "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয় করবেন। ভূমিকায় নীতিশ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মিত্র, প্রেমাংশু বসু, শৈলেন ভট্টাচার্য, গোপাল ভট্টাচার্য, অজনী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী শেফালী দে, সবিতা মুখোপাধ্যায়, মঞ্জরী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অবতীর্ণ হবেন। পরিচালনা ও চাণক্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য।

নিখিল ভারত মুরারি স্মৃতি সংগীত প্রতিযোগিতা :

মুরারি স্মৃতি সংগীত সম্মিলনীর পরিচালনায় একবিংশ বার্ষিকী সংগীত প্রতিযোগিতা অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আরম্ভ হবে। প্রতিযোগিতার বিষয়—(ক) কণ্ঠসংগীত, (১) ধ্রুপদ, (২) খেয়াল, (৩) ঠুংরী, (৪) গীত, (৫) ভজন, (৬) কীর্তন, (৭) রাগপ্রধান, (৮) বাউল, (৯) ভাটিয়ালী, (১০) পুরাতনী, (১১) রবীন্দ্রসংগীত, (১২) আধুনিক; (খ) যন্ত্রসংগীত—(১) সেতার, (২) এসরাজ, (৩) স্বরোদ, (৪) বেহালা, (৫) গীটার, (৬) তবলা, (৭) পাখোয়াজ; (গ) নৃত্য—(১) ভারত-নাট্যম, (২) কথাকলি, (৩) কথক, (৪) মণিপুরী, (৫) লোকনৃত্য, (৬) আধুনিক, (৭) রবীন্দ্র-নৃত্য। ধ্রুপদ, খেয়াল রবীন্দ্রসংগীত, সেতার, এবং স্বরোদ প্রতিযোগিতায় সর্ববিভাগীয় পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীদের মধ্যে যাঁরা উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীর প্রথম নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করবেন, তাঁদের পাঁচটি ২৫৲ টাকার এককালীন বৃত্তি দেওয়া হবে। আবেদনপত্র ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিম্নঠিকানায় গ্রহণ করা হবে—৯বি, দ্বারিকানাথ ঘোষ লেন, চেতলা, কলি ২৭। কমলালয় স্টোর্স (পুস্তক বিভাগ), ১৫৬এ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিঃ ১৩। রাধাকৃষ্ণ শর্মা এণ্ড কোং ৫৮, বিবেকানন্দ রোড, কলিঃ ৬। এস চন্দ্র এণ্ড কোং, ৪, ওয়েলেসলি স্ট্রীট কলিঃ ১৪। দি মেলোগ্রাম, ৮২এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৬।

'কাঞ্চনকন্যা' চিত্রে সুস্মিতা সান্যাল ও পাহাড়ী সান্যাল

॥ নাট্যমের অনুষ্ঠান ॥

ডি ভি সি বোকারো থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের নব গঠিত "নাট্যম" সংস্থার সভ্যবৃন্দ গত ২৫শে আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় বোকারো ক্লাবে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "বারোভূতে" নাটকটি সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করেন।

"বারোভূতে" নাটকটি অভিনীত হওয়ার পূর্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের প্রতিকৃতির সম্মুখে ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীজ্যোতি-প্রসাদ মিত্র।

ইতালীয়ান চিত্রের ভেনিস পুরস্কার লাভ

প্রখ্যাত পরিচালক ফ্রান্সেস্কো রোসি পরিচালিত ইতালীয়ান ছবি 'লে মানি সাল্লা সিট্টা', (হ্যান্ডস অন দি সিটি) ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের গোল্ডেন লায়ন অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছে।

বিচারকেরা সর্বসম্মতিক্রমেই ছবিটিকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করেন।

'অনির্বাণ' নাটকের একটি দৃশ্যে প্রেমাংশু বোস ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

কয়েক জনের ভাষণদানের পরে "বায়োস্কুতে" নাটকটি অভিনীত হয়। দলগত অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটি উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। অভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন ঃ সর্বশ্রী মনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিমল সেন, মৃণাল জানা, সুবীর রায়, যাদবচন্দ্র কর মজুমদার, তমোনাশ দাস, গোপাল মুখোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, গোপাল দে, অর্ধেন্দু রক্ষিত, সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, শুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল দাস, সন্তোষ মুখোপাধ্যায় এবং কুমারী কৃষ্ণা মিত্র।

।। শ্রীমঞ্চের নতুন নাট্যপ্রচেষ্টা ।।

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্যে শ্রীমঞ্চের প্রযোজনায় সুকুমার দত্ত রচিত নতুন দেশাত্মবোধক নাটক "অনির্বাণ" মঞ্চ এবং চিত্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীপ্রেমাংশু বোসের পরিচালনায় কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। মঞ্চপরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন্দ্র ভারতী (সংগীত নাট্য একাডেমী)-র অধ্যাপক শ্রীগণেশ মুখার্জি। বিগত ২০, ২১ এবং ২৩শে আগষ্ট ওভারটুন হল (ওয়াই এম সি এ) কলেজ স্ট্রীট-এ নাটকের অভিনয় সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৮ এবং ২০শে সেপ্টেম্বর উক্ত সংস্থা কর্তৃক "অনির্বাণ" নাটকটির পুনরাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে।

।। হাওড়া বিদ্যার্থী সমাজের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ।।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬ ঘটিকায় হাওড়া বিদ্যার্থী সমাজ আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার শুভারম্ভ হবে। উক্ত অনুষ্ঠান ১৫ দিনব্যাপী হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। বহু বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা এই প্রতিযোগিতায় অপরাপর বৎসরের মত যোগদান করবে।

অনুশীলন সম্প্রদায়ের নবপ্রচেষ্টা ঃ

সৌখীন নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অনুশীলন সম্প্রদায় নির্দ্বিধায় একটি সম্মানীয় নাম। বিভিন্ন ধারার নাট্যরস পরিবেশনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৫৪ সালের জন্মক্ষণ থেকে শুরু

করে এ'রা রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', ঋত্বিক ঘটকের দলিল, রণেন দস্তিদার ও মমতাজ আহমেদের ইস্পাত, সলিল চৌধুরীর অরুণোদয়ের পথে, উমানাথ ভট্টাচার্যের শেষ সংবাদ, সুকুমার রায়ের চলচ্চিত্র চঞ্চরী এবং রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা—এই সাতখানি নাটক মঞ্চস্থ করে নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দের প্রশংসা পেয়েছেন অজস্র। গেল সোমবার, ২রা সেপ্টেম্বর এ'রা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে রমেন লাহিড়ী রচিত 'পান্থশালা' নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন। অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ আমরা আসচে বারে পত্রস্থ করব।

অনুশীলন সম্প্রদায় নাট্যরসিকদের সহানুভূতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আসচে অক্টোবর মাস থেকে প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। তাঁদের যাত্রা শুরু হবে প্রশংসাধন্য নাটক "শেষ সংবাদ-কে অবলম্বন করে। আমরা তাঁদের এই নব প্রয়াসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

সুন্দরম-এর মঞ্চসফল নাট্যোৎসব

বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা সুন্দরম তাঁদের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিলেন গত ছাব্বিশ, সাতাশ ও আঠাশে অগাস্টের নাট্যোৎসবে। মুক্তাঙ্গনে তিনদিনব্যাপী এই বিচিত্র নাট্যোৎসব সমবেত সমস্ত দর্শককে বিস্ময়ে আবিষ্ট করে রেখেছিল, বিশেষকরে এ সংস্থার নাটক নির্বাচনের প্রসঙ্গে এবং স্বতঃস্ফূর্ত সামগ্রীক দলগত অভিনয়ের অবিস্মরণীয় নৈপুণ্যে। প্রথমদিন এ'রা মনোজ মিত্রের 'মৃত্যুর চোখে জল' ও পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'দর্পণের চোখ' একাঙ্কিকা দুটি পরিবেশন করে রুচিবোধের পরিচয় দেন। ন্যুব্জ-কুব্জ একটি রোগগ্রস্থ বৃদ্ধের মূল ভূমিকায় তরুণ শিল্পী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের একক কৃতিত্ব চরিত্রাভিনয়ের এক আশাতীত সাফল্য বলা চলে। দলগত অভিনয় আরও সাবলীল হওয়া প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় একাঙ্ক 'দর্পণের চোখ' প্রতীক-নাটক হিসেবে বক্তব্যের মহত্তম বৈশিষ্ট্যে উচ্চাঙ্গের হয়েছে। এই নাটকের শিল্পায়নে বিমল মজুমদার আধুনিক শিল্পনির্দেশনার দর্শনীয় রূপটি নাটকানুযায়ী পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছেন। এই নাটকের মূল চরিত্রাভিনেতা ও নাট্যকার পার্থপ্রতিম চৌধুরী, তন্দ্রা চরিত্রে চিত্রা মণ্ডল এবং দুলাল ঘোষ এ নাটকে স্মরণীয় অভিনয় করেছেন।

'চার দেওয়ালের গল্প' এই নাট্যোৎসবের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর, আকর্ষণীয় এবং অধিকতর উপভোগ্য হয় দ্বিতীয় দিনের মঞ্চপ্রাঙ্গণে। সমাজ সমস্যার এমন একটি দিক এই নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে নাট্যকার সমস্যা সমাধানের আলোকপাত করেছেন তা নাট্যসাহিত্যের পাতায় এক স্বতন্ত্র ভূমিকা বলে মনে হয়। দর্শক সাধারণের সার্বজনীন আবেদনের জন্য বাংলা মঞ্চালোকে এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। এই নাটকের শেষদৃশ্যের মুহূর্তটি যেকোন রসিক দর্শককে রসাপ্লুত করবে। মহৎ সৃষ্টির সমস্ত সর্তকে পালন করে 'চার দেওয়ালের গল্প' কি চরিত্র সৃষ্টিতে, কি প্রয়োগ কৌশিল্যে, কি মঞ্চসজ্জায়, কি দলগত অভিনয়ে সার্থক হয়েছে তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মনে হয় বহুদিন পর বাঙলা মঞ্চে দর্শকদের সত্যিকারের তৃপ্তি এনেছে। নাট্যকার, নির্দেশক এবং সঙ্গীত-পরিচালনায় শ্রীচৌধুরী যথেষ্ট জনপ্রীতি লাভ করবেন বলে আমাদের ধারণা।

সমাপ্তি উৎসবের শেষদিনে সুন্দরমের বহুল প্রচারিত 'কিনু্যার প্লিন্ট' নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অভিনয়ে পার্থপ্রতিম, দুলাল ঘোষ, চিত্রা মন্ডল, বেবী মিত্র, হরিদাস

'ভি আই পিজ'—লুই জর্ডান এবং এলিজাবেথ টেলর

চট্টোপাধ্যায় এবং অমিয় মুখোপাধ্যায় সবচেয়ে সার্থক। এই নাটকের শেষদৃশ্যটি রহস্যে, উৎকণ্ঠায়, অভিনয়ে এবং শিল্পগুণে ভোলার নয়।

ভি. বালসারাকৃত আবহসঙ্গীত ও পরিবেশ রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সুন্দরমের এই মঞ্চসফল চারটি নাটকের সর্বাঙ্গসুন্দর প্রবর্তনা সাফল্যজনক। বিশেষ করে 'চার দেওয়ালের গল্প' ও 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' ভবিষ্যতে সুধীনাট্যরসিক ও দর্শকসমাজের কাছে বিশেষ পরিচিতি পাবে বলে আমাদের ধারণা। এদুটি নাটকের নিয়মিত অভিনয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সুন্দরমকে অনুরোধ জানাই। নাট্য উৎসবে যোগেশ দত্তের মূকাভিনয় একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

চিত্রজগতের নতুন প্রচার সংস্থা 'এপিক পাবলিসিটির' শুভ উদ্বোধন :

গেল **১২ই** 'আগস্ট জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে চলচ্চিত্রজগতের নতুন একটি সর্বভারতীয় প্রচারসংস্থা 'এপিক পাবলিসিটি'র শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। **উক্ত সংস্থার শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কলকাতার 'মোকাম্বো রেস্টুর্যান্টে'** একটি চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। এই চায়ের মজলিসে কলকাতার চিত্রজগতের বহু বিশিষ্ট প্রযোজক, পরিবেশক, শিল্পী, সাংবাদিক এবং গণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থেকে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের শুভ যাত্রাপথে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

চিত্রজগতের যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী উত্তমকুমার, হেমন্তকুমার মুখার্জি, আর ডি বনশল, খান বাহাদুর জি এ দোশানি, দিলীপ সরকার, অজিত বসু, শ্যামলাল জালান, ভি এ পি আয়ার, মহেন্দ্র গুপ্ত, সূর্য লাডিয়া, তরুণ মজুমদার, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, ভোলানাথ রায়, মঞ্জু দে, হেমন্ত ব্যানার্জি, নলিন ব্যানার্জি, শ্যামলকুমার মিত্র, জগনাথ চক্রবর্তী, বেলা মুখার্জি, শেখর রায়, ভারতী রায়, অজিত চ্যাটার্জি, এবং সাংবাদিক সর্বশ্রী নির্মলকুমার ঘোষ, প্রসাদ সিংহ, গিরীন্দ্র সিংহ, শান্তিকুমার মিত্র, পশুপতি চ্যাটার্জি, বীরেন সিমলাই, ধীরেন মল্লিক, সুকুমার দত্ত, বিজন দত্ত, আশীষতরু মুখার্জি রণজিৎ দত্ত।

এই প্রচার প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা **করছেন** জনপ্রিয় অভিনেতা বিশ্বজিৎ তরুণকুমার, সঙ্গীতপরিচালক অমল মুখার্জি, প্রযোজক-আলোকচিত্রী হেমেন মিত্র, আশীষ রায় ও চিত্র-সাংবাদিক শ্রীপঞ্চানন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শুভ উদ্বোধনের দিনেই **উক্ত** প্রচারসংস্থা কলকাতা ও বোম্বাই-**এর মোট আটটি ছায়াছবির প্রচারের** দায়িত্ব নিয়েছেন।

থিয়েটার সেন্টারে নাট্য প্রতিযোগিতা

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারেও থিয়েটার সেন্টার একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। একাঙ্ক নাটকের এটি নবম বর্ষ ও পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতার ৩য় বর্ষ। নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করার শেষ দিন **৮ই** অক্টোবর '৬৩। অফিস **৩১এ,** চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ, কলিকাতা—২৫।

গন্ধর্ব নাট্যসম্প্রদায়ের 'শঙ্খ'

বিশিষ্ট নাট্যসম্প্রদায় 'গন্ধর্ব' গেল রবিবার ১৮ই আগস্ট সকালে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে বিমল কর রচিত 'শঙ্খ' নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন। চৈনিক আক্রমণের পরিস্থিতিতে জনৈক সরকারী ওভারশিয়ার সড়ক তৈরীর কাজে কোনো কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে কর্তব্যে অবহেলা করেছিলেন—ঐ ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রে ঐ ওভারশিয়ারের সঙ্গে তাঁর দুই বোন এবং ছোট ভাইয়ের মধ্যে যে আদর্শগত সংঘাত, তাকেই উপজীব্য ক'রে 'শঙ্খ' নাটকটি গড়ে উঠেছে। নাটকীয় পরিস্থিতির অপ্রতুলতা এবং কল্পনার সংকীর্ণতার জন্যে নাটকটি আদৌ নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা এবং যদিই বা হয়ে থাকে তা' কতটুকু হয়েছে, সেটি চিন্তার বিষয়। অভিনয়ে অযথা বিলম্বিত ভাব প্রকাশ ও অকারণ গতিভঙ্গী পীড়াদায়ক। বিভিন্ন ভূমিকায় মমতা চট্টোপাধ্যায় (অমলা), অরূপ মুখোপাধ্যায় (বরুণ), কাজল মুখোপাধ্যায় (মণি), দেবদত্ত (লোকনাথ) এবং কণিষ্ক রায় (শিবনাথ) অল্পবিস্তর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

মঞ্চসজ্জাটি প্রশংসনীয়।

।। উদীচীর বর্ষামঙ্গল ।।

গেল ১০ই আগস্ট শনিবার সন্ধ্যায় উদীচী ভবনে শ্রীশচীন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত সহযোগে বর্ষামঙ্গল সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। প্রথমে সম্পাদক শ্রীশৈলেন ভড় রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ১৫।১৬ বছর বয়স থেকে গান লেখা শুরু করে ৪০ বছর বয়স অবধি রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানের সংখ্যা মাত্র ৭টি। কবির জীবনের শেষ ৪০ বছরে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০-এর ওপর। শ্রীভড় আরো বলেন, শহরের মধ্যে বর্ষাকে ঠিকমত উপলব্ধি করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-সঙ্গীতের রস উপলব্ধি করতে হলে শ্রোতাদের মনে মনে একটি পল্লী-পরিবেশ কল্পনা করে নিতে হবে।

সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন শ্যামলী গাঙ্গুলী, মৃদুলা চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা রায়, জগন্নাথ দত্ত ও নিরাপদ মন্ডল। যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন ভবতারণ সাঁতরা, রবীন্দ্রমোহন রায়, ইরা সান্যাল ও গোবিন্দ সাধু।

'এরা কারা' চিত্রে নন্দিতা দে এবং জনৈক শিল্পী

✶ কলকাতা ✶ বোম্বাই ✶ মাদ্রাজ

কলিকাতা

এম কে জি প্রোডাকসন্সের অষ্টম চিত্রটির সম্প্রতি নামকরণ হয়েছে 'কষ্টিপাথর'। জ্যোতির্ময় রায়ের পাকেচক্রে কাহিনীর অবলম্বনে এটির আখ্যানবস্তু চিত্রনাট্যে স্থান পেয়েছে। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় এ ছবির পরিচালক। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের বাস্তব ঘটনা ও পরিবেশ নিয়ে যে নাটক অভিনীত হয় তারই চরিত্র-বিচিত্র জীবনের কিছু নাটকীয় মুহূর্ত নিয়ে এ-কাহিনী বিবৃত। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় এ ছবির চিত্রগ্রহণ নিয়মিত এগিয়ে চলেছে। মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন সন্ধ্যা রায়, বসন্ত চৌধুরী, কমল মিত্র, জহর রায়, অনুপকুমার, প্রেমাংশু বসু, সাধনা রায়চৌধুরী, অরুণ চৌধুরী, জয়শ্রী সেন, চন্দ্রশেখর দে ও রবি ঘোষ। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ ছবির সরকার। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা এবং শিল্পনির্দেশনায় যথাক্রমে দায়িত্ব নিয়েছেন বিজয় ঘোষ, রবীন দাস ও কার্তিক বসু।

লেক টাউনের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে নিবেদিত 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে শক্তি নাগ (কোটাল)। চিত্রা মণ্ডল (শ্যামা) এবং বালকৃষ্ণ মেনন (বজ্র সেন)। ফটো : অমৃত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'অশান্ত ঘূর্ণী' পরিচালনা করছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ সম্পন্ন হচ্ছে। রহস্যমূলক এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবেন বোস, রেণুকা রায়, প্রশান্তকুমার ও গীতা দে। সংগীত, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় দায়িত্ব পালন করছেন যথাক্রমে রাজেন সরকার, অজয় মিত্র, রবীন দাস এবং বটু সেন। প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এ ছবির প্রযোজক।

সলিল দত্তের মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবিটির নাম 'সূর্যশিখা'। একটি আদর্শ ডাক্তারের জীবন-কাহিনী এ ছবির কেন্দ্র-বিন্দু। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অসিতবরণ, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য। বিজয় ঘোষ ও বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে চিত্রগ্রাহক এবং সম্পাদক। সুরসৃষ্টি করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। চণ্ডীমাতা ফিল্মস ছবিটি পরিবেশনা করছেন।

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার চতুর্থ ছবি 'কাঞ্চনকন্যা' এ মাসেই মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, সুস্মিতা সান্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, অনুপকুমার, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায় ও শান্তি দাস। ভি, বালসারা সুর-কৃত চিত্রটির চিত্রগ্রহণ করছেন দেওজী ভাই।

বোম্বাই

প্রযোজক এ কে নদিয়ালা-র নতুন রঙিন ছবি 'চিত্রলেখা'র গত সপ্তাহ থেকে রূপতারা স্টুডিওয় দৃশ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অশোককুমার, মীনাকুমারী ও প্রদীপ-কুমার। ছবিটির পরিচালক কেদার শর্মা। সংগীতে সুরসৃষ্টি করবেন রোসান। পার্শ্বচরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন মিনু মমতাজ, প্রীতিবালা এবং মামুদ। পুষ্প পিকচার্স এ ছবির পরিবেশক।

প্রযোজক-পরিচালক ও কাহিনীকার কে এ আব্বাস সম্প্রতি যে ছবিটি শেষ করলেন তার নাম 'সেহর অউর স্বপ্ন'। সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন নাটকীয় মুহূর্তে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হল। প্রধান কয়েকটি চরিত্রের নাম : দিলীপরাজ, সুরেখা, মনমোহন কৃষ্ণ, পালশিকর ও ডেভিড। নয়া সংসার ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

জোহরা ফিল্মস-এর 'গোয়া'র আগামী মাসে গোয়া-অঞ্চলে বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। প্রযোজক-পরিচালক- কাহিনীকার এবং নায়ক আই এস জোহর এ ছবির নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন। নায়িকা চরিত্রে রূপদান করেছেন নবাগতা সোনিয়া সাহনি। কাহিনীর অন্যান্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন সিমি, মামুদ, মুকরি সাপ্রু, মুরাদ, উল্লাস, সুলচনা, লীলা চিটনীস, কমল কাপুর, মমতাজ বেগম, মিশ্র এবং সুরেন্দ্র। কল্যাণজী আনন্দজী এ ছবির সংগীত-পরিচালক।

প্রযোজক-পরিচালক অজিত চক্র-বর্তী শ্রীসাউণ্ড স্টুডিওয় 'আপনে হুয়ে প্যায়রে' ছবির দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি আরম্ভ করেছেন। ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় কৃত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন মালা সিনহা, মনোজকুমার, শশিকলা, আগা, সুন্দর ও দুলারী। গীতিকার শৈলেন্দ্র এবং হসরৎ জয়পুরী রচিত সংগীতে সুরসৃষ্টি করছেন সংগীত-পরিচালক শংকর-জয়কিষণ।

মাদ্রাজ

হিন্দী ছবির দুটি জনপ্রিয় নাম মামুদ এবং শোভা খোটে। সম্প্রতি মারাঠী ছবি 'আ মালক'-এর নায়ক-নায়িকা চরিত্রের জন্য এ'রা মনোনীত হয়েছেন। এ মাসের মধ্যসপ্তাহ থেকে

নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হবে বোম্বে এবং মাদ্রাজে। বিখ্যাত ইংরাজী নাটক 'সি স্টুপস টু কংকার' অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন নন্দু খোটে। সংগীত পরিচালক পি সাওলারাম।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

থিয়েটারের গল্প নিয়ে সিনেমা হচ্ছে। রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে শিল্পী এবং কলাকুশলীর যে পরিক্রমা, তারই পরিবেশে রচিত 'জ্যোতির্ময় রায়-এর 'পাকচক্র'। চলচ্চিত্রের নতুন নাম এখনও ঠিক হয়নি। এম কে জি প্রোডাকসন্সের 'অষ্টম ছবি' হিসেবে দৃশ্যগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয়। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় এ ছবির পরিচালক। বাস্তবধর্মী এ কাহিনীর বেদনা স্পষ্ট হলেও হাস্যরসের যথেষ্ট উপাদান আছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি। বেশ মজার গল্প।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চ রঙ্গম থিয়েটারের গল্প নিয়েই এ ছবির চিত্রনাট্য। রঙ্গম-এর দরিদ্রতা নিয়ে এ কাহিনীর সূচনা। যদিও একদিন রঙ্গমের বেশ সুদিন ছিল। কিন্তু সে অতীত এখন ভগ্নপ্রায়। লুব্ধ-কুঞ্জের সামিল। নাম-ডাকের প্রতিধ্বনি-প্রেরণা নিয়ে সংস্থার কর্তৃপক্ষরা আবার সেই নাম পুনরুদ্ধার করতে একজোট বাঁধলেন ভোম্বলদা, মণি, অক্ষয়, নিত্য আর অর্চনা সোম। অবস্থা বিপাকের জন্য এরা ছাড়া আর সব রণে পলায়ন করেছে। এখন এরাই একমাত্র প্রতিনিধি। বহু পরামর্শ আর পরিকল্পনার পর দেখা গেল অর্থই সব অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ নেই। এবং এ অর্থের মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা। অর্থ প্রয়োজনের চেষ্টা চলে। সম্পূর্ণ অর্থ সংগ্রহ হলে রঙ্গম আবার বসন্তে মালা গাঁথবে। নতুবা মঞ্চের পরিক্রমা হঠাৎ রুদ্ধ হতে পারে। তাই অভিনয়-নাটক ছেড়ে এ দলের ভোম্বলদা ব্যবসায়ী এবং ধনী রজত চৌধুরীর কাছে উক্ত টাকাটা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করার উপায় খুঁজতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু রজত চৌধুরী খুব ব্যস্ত মানুষ, তাঁর সঙ্গে দেখা করা আর হয়ে উঠছে না। ভোম্বলদার দল আসে আর ফিরে যায়। শুধু মানুষটিকে ছাড়া সব তাঁদের চেনা লাগে খুব। যেমন গাড়ি এবং বাড়ি।

এরমধ্যে রমা দত্ত নামে একটি আট-পৌরে মেয়ে অভাবের অনটনে এই রঙ্গমে এসে যোগ দিল।... বয়স হলেও এখনও বিয়ে হয়নি। অভিনয় চলে। হঠাৎ একদিনের ঘটনায় রমাকে সবাই খাতির করতে আরম্ভ করে। কারণ ছিল
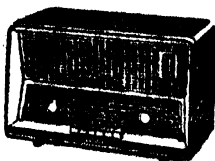
'গোধূলি বেলা' চিত্রে বিশ্বজিৎ ও সুমিত্রা সান্যাল। ফটো : অমৃত

নিশ্চয়ই। থিয়েটারে আসবার সময় পথে রজত চৌধুরীর গাড়ির চালক রমাকে দেখতে পেয়ে রঙ্গমে গাড়ি করে পৌঁছে দেয়, কারণ ড্রাইভার রমার পূর্বপরিচিত। থিয়েটারে রজত চৌধুরীর গাড়ি দেখে ভোম্বলদা লাফিয়ে ওঠেন। ড্রাইভারকেই চৌধুরী ভেবে এরা রমার শরণাপন্ন হল টাকাগুলোর জন্য। উপায় নেই। বাধ্য হয়ে রমাকে মিথ্যে বলতে হল যে সে রজতকে চেনে এবং টাকা পাওয়ার ব্যবস্থাও করে দেবে। কিন্তু অলক্ষে রমা খুব বিপদে পড়ল। এই নতুন সমস্যার কি করে সমাধান হতে পারে। কারণ সত্যি বলতে সে তো রজতকে চেনে না। চেনে শুধু চৌধুরীর গাড়ির চালককে। মাঝে-মাঝে পরিচিত গাড়ির রমাকে পৌঁছে দেবার বহর দেখে সকলেই রজতের সংগে রমার ঘনিষ্ঠ হবার খবর পৌঁছে দেয়। মুখরোচক খবর প্রকাশ করার জন্য চিত্রসাংবাদিক ডি ডি টি এই সংবাদ পেয়ে সোজা রজত চৌধুরীর বাড়িতে দেখা করে। শ্রীচৌধুরীকে সব খুলে বলতে তিনি রেগে ফেটে পড়লেন। মাথা ঠাণ্ডা করে অনুসন্ধানের চেষ্টায় পা ফেললেন। শেষপর্যন্ত নিজেকে গোপন রেখে নতুন নামে পরিচিত হলেন রমার সংগে। লোকে জানলো রজতকে গোবিন্দ চক্রবর্তী হিসেবে। এমনিভাবে ঘটনার প্রবাহে গোবিন্দ-রমার সান্নিধ্য একটু ঘনিষ্ঠই হল। রমা তখন ভোম্বলদার কথা রাখতে গোবিন্দর পরামর্শ চাইলো। রজত চৌধুরী সেজে গোবিন্দ, ভোম্বলের কাছে গিয়ে পঁচিশ হাজার টাকা থিয়েটারকে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ভোম্বলদা আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু রমা। সে মিথ্যের আশ্রয়কে চাপতে না পেরে সব-কথা খুলে জানালো ভোম্বলদাকে। দুঃখে এবং ক্ষোভে তারা ঐ টাকার চেক ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এদিকে চেক ভাঙানো হয়নি দেখে রজত থিয়েটারে চলে আসে এবং ক্যাশটাকা সে নিজেই পৌঁছে দেয়। অবাক হয় সবাই। বুঝতে পারে না কেউ কে রজত চৌধুরী আর কেইবা গোবিন্দ চক্রবর্তী?

কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন রমা দত্ত—সন্ধ্যা রায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী এবং রজত চৌধুরী—বসন্ত চৌধুরী, ভোম্বলদা—কমল মিত্র, মণি—জহর রায়, অক্ষয়—অনুপকুমার, নিত্য—প্রেমাংশু বোস, অর্চনা সোম—লিলি চক্রবর্তী এবং ডি ডি টি-র চরিত্রে রবি ঘোষ। সংগীত-পরিচালনা করছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন বীরেশ্বর সেন, জয়শ্রী সেন, অরুণ চৌধুরী ও সাধনা রায়চৌধুরী।

—চিত্রদূত

খেলার কথা

অজয় বসু

এম সি সি'র সদর দপ্তরের খবর : ভারত সফরে এম সি সি'র দলনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন কলিন কাউড্রে।

আমরা যারা ক্রিকেট-অনুরাগী তাদের কাছে এটি শুধু খবরই নয়, সুখবরও বটে। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে যে কজন খেলোয়াড় রসিক দর্শক ও বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে অভিজাত ব্যাটসম্যানের অসংকোচ স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছেন, কলিন কাউড্রে তাঁদের অন্যতম।

মনে পড়ছে যে ১৯৬২-৬৩ সালে এম সি সি'র ভারত সফর উপলক্ষ্যে আমাদের দেশে আগত ইংলণ্ডের এক বিশিষ্ট সাংবাদিকের কথা। কাউড্রে প্রসঙ্গে ভদ্রলোক রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। আবেগকম্পিত কণ্ঠে জানালেন,—

'কাউড্রের খেলা যাঁরা দেখেন নি, তাঁদের পক্ষে যুদ্ধোত্তরকালের ইংলণ্ডের ব্যাটিংয়ের যথার্থ চরিত্রের সন্ধান জানা সম্ভব নয়। আর যথার্থ পরিচয় মানেই ইংলণ্ডের ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।'

তাঁর মতে, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে ইংলণ্ডের ব্যাটিংয়ের শ্রেষ্ঠ প্রতীক হলেন পিটার মে আর কলিন কাউড্রে। এই প্রহরে লেন হাটন ও ডেনিস কম্পটন মাঠে হাজির ছিলেন বটে। কিন্তু ও'রা দুজনে ঠিক যুদ্ধোত্তরকালের প্রতিনিধি নন। ও'রা যেন প্রাক্-যুদ্ধ ও যুদ্ধ-উত্তর পর্বের সেতু বিশেষ।

তাছাড়া লেন হাটনের মধ্যে পেশাদারের মানসিকতার আভাস ছিল। কিন্তু পিটার মে ও কলিন কাউড্রে বৃটিশ সাংবাদিকটির মতে, সঙ্কোচের শাসানি থেকে মুক্ত। সাংবাদিকটির হয়তো পিটার মে ও কলিন কাউড্রে সম্পর্কে বিশেষ অনুরাগের কারণ আছে। তবু মনে হয় যে, তাঁর মন্তব্যটিকে বোধহয় ফেলে দেবার মতোও নয়।

পিটার মে এবং কলিন কাউড্রে, দুজনেই মানুষ হয়েছেন ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলে। পাবলিক স্কুলের আবহাওয়া জীবনের সহজ প্রকাশের পথটি পরিষ্কার করে রাখে। সে পরিবেশ কাউকে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠার তাগিদ জানায় না। বিকল্পে সহজ ও স্বাভাবিক পথে ছড়িয়ে পড়ার প্রেরণা জোগায়। এই প্রেরণা কলিন কাউড্রেকে সঠিকপথেই গড়েছে, একথা বিশ্বাস করারও সঙ্গত হেতু আছে।

কলিন কাউড্রে

মে ও কলিন সমকালীন খেলোয়াড়। স্কুল-কলেজ এবং উত্তর জীবনেও ও'রা দীর্ঘদিন পাশাপাশি ছিলেন। ও'দের পেয়ে ইংলণ্ডের ক্রিকেটমহল একদিন হৃত অতীতকে ফিরে পাওয়ার স্বর্ণ-স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তাঁদের দৃষ্টিপথ থেকে তখন সরে গিয়েছিলেন বিখ্যাত ব্যাটসম্যান ওয়াল্টার হ্যামণ্ড। অথচ হ্যামণ্ডের খেলা মন থেকে মুছে যাবার নয়। তাই যে মুহূর্তে কলিন পা বাড়িয়ে কভার-ড্রাইভ মেরেছিলেন, সেই মুহূর্তেই ইংলণ্ডের ক্রীড়ামোদীদের মনে আবার হ্যামণ্ডের সেই অবিস্মরণীয় ক্রীড়ারীতির প্রতিচ্ছবি উঁকি মেরেছিল। ওয়াল্টার হ্যামণ্ড আর কলিন কাউড্রে; দুজনের আলোকচিত্র পাশাপাশি রেখে, স্বতন্ত্র দুটি মানুষের মধ্যে অভিন্ন ক্রীড়াশৈলী ও প্রথা-প্রকরণের অস্তিত্ব খুঁজতে চেয়েছিলেন।

হয়তো অনেক সাদৃশ্যের সন্ধানও পেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তবুও তাঁরা ফিরে পাননি দ্বিতীয় হ্যামণ্ডকে। ফিরে পাওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ ওয়াল্টার-হ্যামণ্ডের মতো খেলোয়াড়ের আবির্ভাব প্রতিনিয়তই ঘটে না। ঘটতে পারে না। ডন্ ব্র্যাডম্যানের কি দ্বিতীয়বার আবির্ভাব ঘটেছে? অথচ আয়ান ক্রেগ বা নর্ম্যান ওনিলকে দ্বিতীয় ব্র্যাডম্যানরূপে স্বাগত জানাতে অস্ট্রেলীয় ক্রীড়ামহলে উৎসাহের বিন্দুমাত্র ঘাটতি ঘটেনি একদিন। তাছাড়া কলিন কাউড্রেও বোধহয় তাঁর প্রথম জীবনের সমস্ত প্রতিশ্রুতি উত্তরজীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারেন নি।

তবে না পারলেও, বছর ন-দশেকের মধ্যে ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি যা করতে পেরেছেন তা শুধু উল্লেখ্যই নয়, প্রশংসনীয়ও।

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ব্যক্তিগতভাবে চার হাজার রাণ সংগ্রহে যাঁরা সফল কলিন কাউড্রে তাঁদের অন্যতম। এই সাফল্যে অনেকের ভাগ নেই। আছে মাত্র এগারোজনের। টেস্ট খেলায় কাউড্রের সেঞ্চুরীর সংখ্যা তেরো। এই সংখ্যাও কম নয়। কাউড্রের স্বদেশীয় ক্রিকেটারদের মাত্র পাঁচজন, হ্যামণ্ড, সাটক্লিফ, হবস, হাটন ও কম্পটন ছাড়া আর কেউই এই কৃতিত্বকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

কাউড্রে জাতীয় দলের নেতৃত্বও করেছেন। সবসমেত এগারোবার। তারমধ্যে দুবার ভারতেরই বিরুদ্ধে। সুতরাং ভারতীয় ক্রিকেটে তিনি অপরিচিত নন। ভারতের বিরুদ্ধে খেলেছেন। ভারতের ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামেও। এবং তার চেয়েও বড় কথা এই যে, তিনি জন্ম নিয়েছেনও ভারতভূমিতেই।

দক্ষিণ ভারতের বাঙ্গালোরেই হলো কলিন কাউড্রের জন্মস্থান। জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর কেটেছে সেখানেই সুতরাং বলতে পারি যে কলিন কাউড্রে এবার আসছেন জন্মস্থান পরিভ্রমণে—যদিও আসন্ন সফরে তিনি 'ভারত-বন্ধু'র ভূমিকা নিতে পারবেন না।

কাউড্রের পুরো নাম মাইকেল কলিন কাউড্রে। সংক্ষেপে এম সি সি। এম সি সিই ইংলণ্ডের তথা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। কলিনের নামকরণে নিয়ামক সংস্থার নামানুসরণে নিষ্ঠা দেখিয়েছিলেন কলিন-জনক ই এ কাউড্রে।

এই নিষ্টার উৎস জনকের ক্রিকেট-প্রীতি। বড় কাউড্রে নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন। ভারতে থাকতেই তিনি নিয়মিত মাঠে নামতেন এবং ১৯২৬-২৭ সালে আর্থার গিলিগ্যান পরিচালিত প্রথম ভারত সফরকারী এম সি সি'র বিপক্ষে মাদ্রাজে ইউরোপীয় একাদশের পক্ষে খেলেওছিলেন। শুধু খেলাই নয়, তদানীন্তন বিশ্বশ্রেষ্ঠ মিডিয়াম পেস বোলার মরিস টেট্ এবং ডব্লিউ ই এস্টিলের আক্রমণ প্রতিহত করে ৪৮ রাণও কুড়িয়েছিলেন।

বাঙ্গালোরে থাকতে থাকতেই পিতৃ-উৎসাহে ভারতের মাটিতেই কলিনের ক্রিকেটে হাতেখড়ি হয়। তারপর ইংলণ্ডে ফিরে হোমফিল্ড ও টনব্রিজ স্কুলের শিক্ষাগেহে পান ক্রিকেট খেলার পর্যাপ্ত সুযোগ।

সে সুযোগ কৃতজ্ঞচিত্তে সদ্ব্যবহার করে সাত বছরের ছেলে যেদিন ৯৩ রাণ করে ফেললো সেদিন টনব্রিজের প্রধান শিক্ষক তাকে সস্নেহে উপহার দিলেন জ্যাক্ হব্‌স-স্বাক্ষরিত এক বিখ্যাত ব্যাট। এই ব্যাটে কলিন বছরে বছরে অজস্র রাণ-সংগ্রহের সূত্রে যেদিন সর্বপ্রথম পাবলিক স্কুলের প্রতিনিধি-মূলক খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তখন তার বয়স মাত্র তেরো।

এর আগে এতো কম বয়সে পাবলিক স্কুল ম্যাচ উপলক্ষে আর কেউই লর্ডস মাঠে আসতে পারে নি। শুধু আসাই নয়, লর্ডসে প্রথম আবির্ভাবের মুহূর্তে কলিন সংগ্রহ করলো ৭৫ ও ৪৪ রাণ। আর সংকটকালে তারই দৃঢ় ক্রীড়ারীতির কল্যাণেই সেই আসরে কলিনের দল টনব্রিজ জিতলো দু রাণের ব্যবধানে। স্কুল-জীবন শেষ করার সময় এই লর্ডস মাঠেই কলিন সম্মিলিত সেনাদলের বিপক্ষে ১২৬ ও ৫৫ রাণ করেছিলেন।

জানেন কি, স্কুলে থাকতে কলিন বলও করতো? স্কুল-জীবনে ২৮৯৪ রাণ করা ছাড়াও ২১৬টি উইকেট সে পেয়েছিল। উত্তরপর্বে ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করতে গিয়ে কাউড্রে বোলিং ছেড়ে দিয়েছেন।

১৯৫০ সালে কলিন কাউড্রে মাত্র আঠারো বছর বয়সে কাউন্টি লীগে কেন্টের প্রতিনিধিত্ব করার প্রথম অধিকার পান। পরে কেণ্ট ক্লাব ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বের অধিকার তাঁর হাতে আসে। পরবর্তী বারো বছরের মধ্যে কাউড্রে ধহুবারই কাউন্টি লীগের গড় হিসাব তালিকায় প্রথম তিনজনের মধ্যে জায়গা পেয়েছেন এবং ১৯৫৯ সালে তাঁর রাণ-সংখ্যা দু'হাজারেরও গণ্ডী পেরিয়ে যায়।

কাউন্টি লীগে বছর চারেক খেলার সুযোগেই কাউড্রে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী এম সি সি দলভুক্ত হন এবং অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত সিড্‌নী মাঠে প্রথম আবির্ভাবের সূত্রে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে দু ইনিংসে সেঞ্চুরী (১১০ ও ১০৩) করেন।

সিড্‌নী মাঠে তাঁর সেদিনের খেলা যিনি দেখেছেন তিনিই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আছেন। সেই এক দিনের দেখাতেই সার লেন হাটন কাউড্রেকে টেস্ট খেলায় তাঁর সঙ্গে প্রথম উইকেটে খেলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কাউড্রের টেস্ট খেলা সেই সুরু। সুরুতে চল্লিশ রাণ এবং কয়েক দিন পর তৃতীয় টেস্টে ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী সংগ্রহ। আরম্ভ ভালই হয়েছিল।

সেই থেকে, ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে কলিন কাউড্রে ৬৭টি টেস্টে অংশ নিয়েছেন। ব্যাটসম্যানদের যে-সব কৃতিত্বের নজীর পরিসংখ্যান তালিকায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে যথা টেস্ট ম্যাচে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরী অথবা টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী; সে কৃতিত্বে কাউড্রে এখনও ভাগ বসাতে পারেন নি। তবে সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬১ সালে কেন্টের পক্ষে তিনি দু ইনিংসেই সেঞ্চুরী (১৪৭ ও ১২১) করেছেন। এ কৃতিত্ব কেন্টের আর কেউই, ফ্র্যাঙ্ক উলে ও আর্থার ফ্যাগ পর্যন্ত দেখাতে পারেন নি।

কলিন কাউড্রে ক্রিকেট-পঞ্জিকা 'উইজডেন' স্বীকৃত (১৯৫৬) পাঁচজনের অন্যতম ক্রিকেটার। এই 'উইজডেন' এবং এম সি সির কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঘিরে ইংলণ্ডের নেতৃপদের সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন দেখেছিলেন একদিন। সে স্বপ্ন বাস্তবে যেমন পূর্ণ হয়নি তেমনি নেতৃপদে কাউড্রের দাবী এখনও বোধহয় পুরোপুরি খারিজ হয়েও যায়নি।

তাঁকে উপলক্ষ্য করে এম সি সি অতীতে নানান পরীক্ষা চালিয়েছেন। সে পরীক্ষায় অভ্যস্ত জায়গা ছেড়ে অনভ্যস্ত প্রথম উইকেটে কাউড্রেকে ব্যাট করতে হয়েছে। নেতৃপদের পরীক্ষায় তিনি তেমন সফল হননি। তবু তাঁরই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ নতুন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন আজ অধিনায়ক হিসেবে তাঁকে ভারতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে।

কাউড্রে সম্পর্কে এম সি সি এখনও হাল ছাড়তে রাজী নন। তাঁদের আশা, হয়তো কাউড্রে জাতীয় দলের এক বিরাট সমস্যা মিটিয়ে দিতে পারবেন। যে সমস্যার সমাধান করতে টেড্ ডেক্সটার এবার সাফল্যলাভ করতে পারেন নি।

দেখা যাক্, ভারতে এসে কাউড্রে কি করে উঠতে পারেন। এমনিতেই এই সফরের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সমস্যা নিতান্ত সামান্য নয়। ১৯৬২-৬৩ সালে টেড ডেক্সটার ভারতে এসে সর্বপ্রথম 'রাবার' খুইয়েছেন। সে পরাজয়ের বেদনা ভোলাবার গুরুদায়িত্ব পড়েছে আজ কাউড্রের কাঁধে।

কাউড্রে পারবেন কি তাঁর উপর ন্যস্ত আস্থার প্রতি সুবিচার করতে? কে জানে! জানি একা তাঁর সাধ্য নয়। তবে একথাও জানি যে, ভারতে এসে একা কাউড্রের ব্যাটিং যদি পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এই একটি মানুষই বহুজনের ভূমিকা নিতে পারবেন। এবং সেক্ষেত্রে একা তিনিই পারবেন বিপক্ষের সামনে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল গড়ে রাখতে।

জানি কাউড্রে খেললেই ভারতের বিপদ। তবু প্রার্থনা, ভারতে এসে কাউড্রে যেন জাত-ব্যাটিংয়ের পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। বিশ্বাস করি, ভারতের ক্রিকেট অনুরাগীদের মন খেলোয়াড়োচিতোই। কিন্তু ঝুঁকি নিতে তাঁরা রাজী আছেন খেলার মতো খেলা দেখতে পাওয়ার প্রত্যাশায়। তাই তাঁদের বিশ্বাস, পুরোপুরি কাউড্রেকে নিয়ে গড়া যে দল সেই দলকে হারানোর মধ্যেই জয়লাভের পূর্ণ সান্ত্বনা আছে। আর যাই হোক্ আধখানা ইংলণ্ডকে হারিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব আজ আর ভারতের পক্ষে লোভনীয় নয়।

দর্শক

॥ আমেরিকান লন টেনিস ॥

আমেরিকান জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসে দুই জায়গায় —ব্রুকলিন এবং ফরেস্ট হিলস। ব্রুকলিনে পুরুষ ও মহিলাদের ডাবলস খেলা হয় এবং ফরেস্ট হিলসে খেলা হয় বাকি তিনটি—পুরুষ ও মহিলাদের সিংগলস এবং মিক্সড ডাবলস। ব্রুকলিনের খেলা শেষ হয়েছে এবং ফরেস্ট হিলসের খেলা শেষ পর্যায়ে এসে গেছে।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে 'চাক' ম্যাকিনলে এবং ডেনিস রলস্টোন (আমেরিকা) ৯-৭, ৪-৬, ৫-৭, ৬-৩ ও ১১-৯ গেমে রাফেল ওসুনা এবং এন্টোনিয়ো প্যালাফক্সকে (মেক্সিকো) পরাজিত করে দ্বিতীয়বার খেতাব পেয়েছেন। তাঁরা ১৯৬১ সালের ফাইনালে ওসুনা এবং প্যালাফক্স জুটিকে পরাজিত করেছিলেন কিন্তু গত বছর (১৯৬২ সাল) ওসুনা এবং প্যালাফক্স জুটির কাছেই তাঁরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে আমেরিকা এবং মেক্সিকোর একই জুটি গত তিন বছর খেলছেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনালে খেতাব পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মিস্ মার্গারেট স্মিথ এবং রবিন এবর্ণ। তাঁরা ৪-৬, ১০-৮ ও ৬-৩ গেমে মিস ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) এবং মেরিয়া বুইনোকে (ব্রেজিল) ফাইনালে পরাজিত করেন। মিস স্মিথ এবং এবর্ণ ১৯৬৩ সালের উইম্বলেডন ফাইনালে মিস হার্ড এবং বুইনোর হাতে পরাজয় বরণ করেছিলেন। মহিলাদের ডাবলসে এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ান জুটি খেতাব পেলেন। ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মিস লেসলি টার্ণার আমেরিকার মিস ডার্লিন হার্ডের সংগে জুটি হয়ে খেতাব পেয়েছিলেন। আমেরিকার মিস ডার্লিন হার্ড এ পর্যন্ত পাঁচবার ডাবলস খেতাব পেয়েছেন—দু'বার করে মিস মারিয়া বুইনো এবং মিস জিনি আর্থের জুটিতে এবং একবার মিস মার্গারেট স্মিথের জুটিতে।

॥ ভারতীয় হকি দলের সফর ॥

লিয়'র আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় হকি দল বিদেশ যাত্রা করেছে। এই ভারতীয় হকি দলে মোট ২০ জন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন। হাফ-ব্যাক চিরঞ্জিৎ সিং (পাঞ্জাব) ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতীয় দল লিয়'র (ফ্রান্স) আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা ছাড়াও তাদের দু'মাসের বিদেশ সফরে একাধিক দেশে হকি খেলবে। কেনিয়াতে এই দলটি ৫ই থেকে ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৯টি খেলায় যোগদান করবে—এই খেলার তালিকায় আছে চারটি টেস্ট ম্যাচ। ফ্রান্সের লিয়'তে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের প্রথম খেলা পড়েছে ২৮শে সেপ্টেম্বর এবং শেষ খেলা ৬ই অক্টোবর। লিয়'র আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর ভারতবর্ষ খেলবে স্পেন অথবা ইংল্যান্ডে (৭ থেকে ৯ অক্টোবর), বেলজিয়ামে (১২ই অক্টোবর), হল্যান্ডে (১৩ই অক্টোবর), জার্মাণীতে (১৫ই থেকে ২০ অক্টোবর), পোল্যান্ডে (২১শে থেকে ২৪শে অক্টোবর), পুনরায় জার্মাণীতে (২৬শে অক্টোবর) এবং ইতালীতে (২৭শে থেকে ২৯শে অক্টোবর)। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় হকি দল স্বদেশে ফিরে আসবে।

ভারতবর্ষ উপর্যুপরি ৬টি অলিম্পিক অনুষ্ঠানে হকি খেতাব জয়লাভের পর অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে পাকিস্থানের কাছে ০—১ গোলে পরাজিত হয়ে খেতাব হাতছাড়া করে। ১৯৫৮ সালে টোকিওর ৩য় এশিয়ান গেমস এবং ১৯৬২ সালের জাকার্তা ক্রীড়ানুষ্ঠানেও ভারতবর্ষ হকি খেলায় পাকিস্থানের কাছে পরাজিত হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক হকি খেলায় ভারতবর্ষের দীর্ঘকালের সুনাম যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতবর্ষের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড়াবে পাকিস্তান। সুতরাং লিয়'র আসন্ন আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা ভারতবর্ষের কাছে অগ্নি-পরীক্ষার সমান গুরুত্বপূর্ণ, যদিও এই প্রতিযোগিতায় এই দুই দেশ কখনও সম্মুখ-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবে না। লিয়'র আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার গোল সংখ্যার উপর প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১২টি দেশের যোগ্যতা নির্দ্ধারিত হবে।

॥ টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন ॥

বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার (টমাস কাপ) ইণ্টার-জোন খেলায় ভারতবর্ষ ৭—২ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করেছে। এই খেলাটি নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৯টি খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ জয়লাভ করে ৪টি সিংগলস এবং ৩টি ডাবলসের খেলায়। অপর দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ১টি সিংগলস এবং ১টি ডাবলসে জয়ী হয়।

প্রথম দিনে দুই দেশই দুটি ক'রে খেলায় জয়লাভ করে—একটি সিংগলস এবং একটি ডাবলস খেলা।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ বাকি তিনটি সিংগলস এবং দুটি ডাবলস খেলায় জয়ী হয়। ভারতবর্ষের পরবর্তী খেলা পড়েছে মালয়ের সংগে।

ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেছিলেন ত্রিলোকনাথ শেঠ, দিনেশ খান্না, দীপু ঘোষ, নান্দু নাটেকার, সি দেওরাস, রমেন ঘোষ এবং ডি খেমকা।

॥ ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন দল ॥

ভারতবর্ষ এক আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ৫-২ খেলায় নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করার গৌরব লাভ করে।

নিউজিল্যান্ডের ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় (ব্যক্তিগত বিভাগ) ভারতবর্ষের নান্দু নাটেকার এবং ত্রিলোকনাথ শেঠ সিংগলসের সেমি-ফাইনালে মালয়ের খেলোয়াড়দের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। ডাবলসের সেমি-ফাইনালেও ভারতীয় জুটি নাটেকার এবং দেওরস মালয়ের জুটির কাছে পরাজিত হন।

॥ আই এফ এ শীল্ড ॥

গত ২৩শে আগষ্ট থেকে ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আই এফ এ ফুটবল শীল্ড খেলা আরম্ভ হয়েছে। এ পর্যন্ত (৭।৯।৬৩)
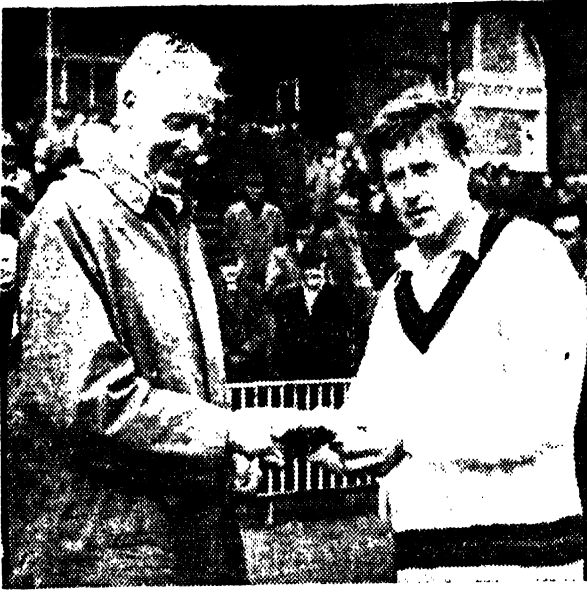
ইংল্যাণ্ডের 'গিলেট' নক-আউট ক্রিকেট টুর্নামেণ্টের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় পিটার মার্নার (ল্যাংকাসায়ার) লিস্টারসায়ার দলের বিপক্ষে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ ক'রে ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ফ্র্যাঙ্ক উলীর হাত থেকে সর্বপ্রথম স্বর্ণপদক এবং ৫০ পাউণ্ড পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

তৃতীয় রাউণ্ডের খেলা হয়েছে মাত্র একটা। গত বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় হাওড়া জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশন দলকে ৬—০ গোলে পরাজিত ক'রে চতুর্থ রাউণ্ডে প্রথম পৌঁছবার গৌরব লাভ করেছে। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় এ পর্যন্ত একমাত্র মোহনবাগানই ছয় গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। খিদিরপুরের বিপক্ষে বি এন রেলওয়ে অবিশ্যি ৬ গোল দিয়েছে কিন্তু এক গোল খেয়েছে। এ পর্যন্ত শীল্ডের খেলায় 'হ্যাট-ট্রিক' করেছেন এই চারজন খেলোয়াড় ঃ (১) সালাউদ্দিন (মহমেডান স্পোর্টিং) কালীঘাটের বিপক্ষে, (২) পি সরকার (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) হুগলী জেলা দলের বিপক্ষে, (৩) আপ্পালারাজু (বি এন আর) খিদিরপুরের বিপক্ষে এবং (৪) সুনীল নন্দী (মোহনবাগান) হাওড়া জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের বিপক্ষে। আপ্পালারাজু খিদিরপুর দলের বিপক্ষে 'হ্যাট-ট্রিক' সমেত মোট চারটা গোল দিয়েছিলেন। দলের গোল সংখ্যা ছিল ৬টা।

॥ গিলেট কাপ ॥

ইংল্যাণ্ডের নবপ্রতিষ্ঠিত নক্-আউট ক্রিকেট টুর্নামেণ্টের ফাইনালে সাসেক্স কাউণ্টি ক্রিকেট দল ১৪ রানে ওরস্টারসায়ার দলকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বৎসরেই 'গিলেট কাপ' জয় করেছে। ইংলিস কাউণ্টি লীগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী সমস্ত দলই (মোট ১৭) এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগিতার বিশেষতঃ, প্রতিটি খেলায় নির্দিষ্ট সময় ছিল মাত্র একদিন। গত দু' বছরের (১৯৬২-৬৩) কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়ান ইয়র্কশায়ার দল এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউণ্ডে সাসেক্স দলের কাছে ২২ রানে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। সদ্য সমাপ্ত ১৯৬৩ সালের কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতায় সাসেক্স দল চতুর্থ স্থান পেয়েছে। বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি খেলায় উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের দরুণ একজন ক'রে খেলোয়াড়কে স্বর্ণপদক এবং ৫০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন খেলায় বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় খেলোয়াড়কে। ক্রিকেট খেলাকে প্রাণবন্ত করাই ছিল এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসিদ্ধ গিলেট ব্লেড প্রস্তুতকারক-কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আর্থিক সাহায্যে এই নক-আউট ক্রিকেট টুর্নামেণ্ট ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট অনুরাগী মহলে যথেষ্ট সাড়া এনে দিয়েছে।

প্রতিযোগিতায় কুশলী খেলোয়াড় নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বিচারকের ভূমিকায় ইংল্যাণ্ডের যে-সব অবসরপ্রাপ্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ফ্র্যাঙ্ক উলী, জর্জ গেরী, সিরিল ওয়াসব্রুক, চার্লস বার্ণেট, হার্বার্ট সাটক্লিফ, জ্যাক রবার্টসন, এ্যালেক বেডসার এবং জো হার্ডস্টাফ প্রভৃতি।

খেলায় স্বর্ণপদক এবং ৫০ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেছেন ঃ পিটার মার্নার (ল্যাংকাসায়ার), ডন বেনেট (মিডলসেক্স), ব্রায়ান বোলাস (নটিংহামসায়ার), বার্নার্ড হেজেস (গ্লামর্গান), ডেরিক মর্গান (ডার্বিসায়ার), জিম স্ট্যাণ্ডেন (ওরস্টারসায়ার), রোগার প্রিডেক্স (নর্থহ্যামটনসায়ার), পিটার রিচার্ডসন (কেন্ট), জ্যাক ডাইসন (ল্যাংকাসায়ার), জিম পার্কস (সাসেক্স), টম গ্রেভনী (ওরস্টারসায়ার), কলিন মিলবার্ণ (নর্থহ্যামটনসায়ার), বব এণ্টউইস্টল (ল্যাংকাসায়ার), জ্যাক ফ্ল্যাভল (ওরস্টারসায়ার) এবং টেড ডেক্সটার (সাসেক্স) প্রভৃতি।

ফাইনাল খেলা

সাসেক্স ঃ ১৬৮ রান (জিম পার্কস ৫৭)
ওরস্টারসায়ার ঃ ১৫৪ রান

॥ ইংলিশ ক্রিকেট লীগ ॥

১৯৬৩ সালের ইংলিশ কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতায় গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইয়র্কসায়ার দল ১৪৪ পয়েণ্ট তুলে উপর্যুপরি দু'বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। রাণার্স-আপ হয়েছে গ্লামর্গান (১২৪ পয়েণ্ট) এবং তালিকায় তৃতীয় স্থান পেয়েছে সামারসেট (১১৮ পয়েণ্ট)। ইয়র্কসায়ার দল প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় ১৮৯৩ সালে এবং এই নিয়ে তারা ২৭ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হ'ল। ১৯৪৯ সালে ইয়র্কসায়ার ও মিডলসেক্স যুগ্মভাবে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। ইয়র্কসায়ার উপর্যুপরি ৩ বার অথবা ততোধিক বার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে ঃ ১৯০০-১৯০২; ১৯২২-২৫, ১৯৩১-৩৩, ১৯৩৭-৩৯ এবং ১৯৪৬ সালে। সারে দল ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি ৭ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে লীগ ক্রিকেট খেলায় যে দলগত প্রাধান্য লাভ করে ইয়র্কসায়ার ১৯৫৯-৬০ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে তাদের একটানা প্রাধান্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৬৪ সালে যে এম সি সি দলটি ভারত সফরে আসছে, সেই দলে লীগ চ্যাম্পিয়ান ইয়র্কসায়ার দলের এই তিনজন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন—ফিল সার্প, জিম বিন্কস এবং ডন উইলসন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ
২য় খণ্ড
অমৃত
২০শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৩রা আশ্বিন, ১৩৭০
Friday, 20th. September, 1963. 40 Naya Paise.

সাপ্তাহিকী

।। স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বিধি ।।

নয়াদিল্লী, ৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদ : **কেন্দ্রীয় সরকার** স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ-আদেশের **প্রয়োগ ও কার্যকারিতা** পর্যালোচনার **জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি** গঠন **করেছেন**। আলোচ্য কমিটির চেয়ারম্যান **নিযুক্ত** হয়েছেন মন্ত্রিসভা সেক্রেটারী শ্রীএস এস খের। নতুন অর্থমন্ত্রী শ্রীটি টি কৃষ্ণমাচারী সংসদের চলতি অধিবেশনেই স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি দিতে চাইছেন। তা যাতে সম্ভবপর হতে পারে, সেজন্য ঐ কমিটিকে দশ-বারো দিনের মধ্যেই রিপোর্ট পেশ করতে হবে। সংসদের বর্তমান অধিবেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে ২০শে সেপ্টেম্বর।

।। বোকারো ইস্পাত প্রকল্প ।।

'প্রকল্প অনুযায়ী বোকারোতে চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপনে ভারত কৃত-সংকল্প আর তা মার্কিন সাহায্য না পেলেও'।—এই দৃঢ় ঘোষণাটি করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গত ৮ই সেপ্টেম্বর। আমেরিকার মতিগতি বুঝে ইতোমধ্যে কেনেডি সরকারকে তিনি এই কথাও জানিয়ে দিয়েছেন, বোকারো প্রকল্পের জন্য সাহায্যের অনুরোধটি পর্যন্ত ভারত প্রত্যাহারে প্রস্তুত।

এদিকে বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানী বোকারো ইস্পাত কারখানার ব্যাপারে সাহায্যদানের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মস্কোর ৭ই সেপ্টেম্বরের সংবাদ অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়নও এই প্রকল্পের রূপায়ণে আবশ্যক সাহায্য দান করতে আগ্রহশীল।

।। আলাবামায় নিগ্রো নির্যাতন ।।

এতো প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সত্ত্বেও আলাবামায় নিগ্রোদের ওপর নির্যাতন বন্ধ হয় নি। পরন্তু গত ৭ই সেপ্টেম্বর আলাবামার গভর্ণর জর্জ ওয়ালেস দম্ভ সহকারে ঘোষণা করেছেন : পরিণতি যা-ই হোক, বর্ণ-বৈষম্যের বিলোপের বিরুদ্ধে সংগ্রামদমনে তিনি পিছপাও হবেন না।

ওয়াশিংটনের ১০ই সেপ্টেম্বরের সংবাদ : প্রেসিডেন্ট কেনেডি বর্ণ-বিদ্বেষী গভর্ণর ওয়ালেসকে সাবধান করে দিয়েছেন—নিগ্রো-বিদ্বেষ বন্ধ করতেই হবে। ওদিকে নিগ্রোদের মুক্তির জন্য সংগ্রামকারী বিভিন্ন দল নিউইয়র্ক সিটি হল অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৬৩)।

।। কায়রণ মন্ত্রিসভা প্রসঙ্গ ।।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রণকে কেন্দ্র করে এর ভেতর (৬ই সেপ্টেম্বর) সংসদে তুমুল আলোড়ন হয়ে গেছে। সুপ্রীম কোর্টে এক আপীলের মামলায় কায়রণের বিরুদ্ধে সমালোচনা থাকার দরুণই এই বিতর্ক-বিতণ্ডা। বিরোধীরা সেভাবে দাবী জানালেও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কায়রণের নেতৃত্বাধীন বৈধ সরকার ভেঙ্গে দেবায় পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতিপরায়ণ, এই অভিযোগ ভিত্তি-হীন। ওদিকে কায়রণ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে একটি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন পাঞ্জাব বিধানসভার বিরোধী কম্যুনিষ্ট সদস্যগণ। (চণ্ডীগড়, ৭ই সেপ্টেম্বর)

।। দাবানল ও অগ্ন্যুৎপাত ।।

রিও-ডি-জেনিরো থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পরিবেশিত সংবাদ : দক্ষিণ ব্রেজিলের পারানা রাজ্যে প্রচণ্ড দাবানল সৃষ্টি হয়েছে। এই বিধ্বংসী দাবাগ্নিতে এর ভেতরেই নিহত হয়েছে প্রায় ২৫০ জন আর আহতের সংখ্যা হবে চার শতাধিক।

৭ই সেপ্টেম্বর জাকার্তার এক সংবাদে জানা যায়—বলীদ্বীপে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎ-পাতে হতাহত হয়েছে অসংখ্য নর-নারী। নিহতের সংখ্যা ৫০-এর কম হবে না।

।। অবশ্য সঞ্চয় ব্যবস্থা ।।

নয়াদিল্লীর ৯ই সেপ্টেম্বরের একটি সংবাদ : ১২ জন সংসদ সদস্য (কংগ্রেস) সরকারের নিকট যুক্ত দাবী জানিয়েছেন—অবশ্য সঞ্চয় প্রকল্পটি একেবারে বর্জন করা হোক কিংবা তার আমূল সংশোধন করা হোক। শ্রীনেহরুর সঙ্গেও এই প্রতি-নিধি দলটি সাক্ষাৎ করেন—দলের নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সংসদ সদস্যা শ্রীমতী রেণুকা রায়।

দিল্লীরই পরবর্তী (১০ই সেপ্টেম্বর) সংবাদ : প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও অর্থ-মন্ত্রী শ্রীটি টি কৃষ্ণমাচারী কংগ্রেস সংস-দীয় দলের নিকট একটি আশ্বাস দিয়ে-ছেন। আশ্বাসবাণীটি হলো—কার্যক্ষেত্রে অবশ্য সঞ্চয় ব্যবস্থার যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়বে, সরকারের পক্ষ থেকে সেগুলির অবসানের জন্য চিন্তা নিবদ্ধ করা হবে।

।। রাষ্ট্রসঙ্ঘে বৌদ্ধ নিপীড়ন প্রসঙ্গ ।।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে দিয়েম সরকার বৌদ্ধদের ওপর যে যথেচ্ছ নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়েছেন, সমগ্র বৌদ্ধ দুনিয়ায় ও সভ্য সমাজে এর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সায়গনের ৭ই সেপ্টে-ম্বরের এক সংবাদে বলা হয়—সেখান-কার ছাত্রীরা পর্যন্ত সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে যোগ দিয়াছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ মহল থেকে প্রাপ্ত সংবাদে (৮ই সেপ্টেম্বর) জানা যায়, এশিয়া ও আফ্রিকার ১৩টি সদস্য-রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদে ঐ বৌদ্ধ নির্যাতন প্রসঙ্গটি যাতে আলোচিত হয়, সেভাবে প্রস্তাব করেছেন। এই প্রচেষ্টার অগ্রদূত হচ্ছেন সিংহলের আবাসিক প্রতিনিধি স্যার সেনেরত গুণবর্ধন। উল্লেখযোগ্য যে সাধারণ পরিষদের এবারকার অধিবেশন বসবে ১৭ই সেপ্টেম্বর।

।। আলজিরিয়ায় গণভোট ।।

নতুন শাসনতন্ত্র অনুমোদনের ব্যাপারে গত ৮ই সেপ্টেম্বর আলজিরিয়ার সর্বত্র গণভোট গ্রহণ করা হয়। ৯ই সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্স থেকে সরকারী সূত্রে যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে, তাতে দেখা যায় আলজিরিয়ার নাগরিকগণ নতুন সংবিধানের অনুকূলেই রায় দিয়েছেন।

।। স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতি ।।

কন্যাকুমারিকাতে বিবেকানন্দ শিলায় ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিমূর্তি স্থাপনে কোন কোন মহল থেকে যে আপত্তি উঠেছে, এর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে নানা জায়গায়। প্রকাশ্যভাবে বিরোধিতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গত ৯ই সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে (কলিকাতা) একটি বিরাট সভা হয়ে গেছে। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

।। ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি ।।

৯ই সেপ্টেম্বরের একটি শোকসংবাদ : প্রবীণতম শিক্ষাবিদ্ ও স্বনামধন্য ঐতি-হাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জির (৮৩) কলিকাতায় জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। সুধী সমাজ এই মনীষীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

সম্পাদকীয়
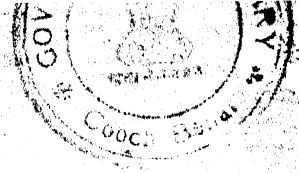
সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের অধিকারী কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, লোকসভা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব সীমান্তে আসাম ও পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাবের বিধানপরিষদে একে একে হইয়াছে। এবং যথাক্রমে একে একে নানা অভিযোগ অনুযোগ, উত্তর-প্রত্যুত্তর ইত্যাদিতে বাক্যের আস্ফালন ও বিস্ফোরণের পরে সেগুলি ভোটাধিক্যের দরুণ প্রত্যাখ্যাতও হইয়াছে।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে বিরোধী দলগুলি এই সকল লোকসভা বিধানপরিষদ ইত্যাদিতে পরাজয়টাকে কোনও বিশেষ গুরুত্ব দিতেছেন না। ঐ সকল আইনসঙ্গত রাষ্ট্রনৈতিক কসরৎগুলিকে বরঞ্চ তাঁহারা ব্যাপকতর অভিযানের ঘোষণারূপে বা বিজ্ঞপ্তিরূপে প্রযোজিত করিতেছেন। এবং সরকারী নিষ্ক্রিয়তার গুণে নানা ক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের কার্যক্রম এইভাবে অগ্রসর হইতে থাকে।

কলিকাতায় তো শোভাযাত্রা, অশোভনযাত্রা, বিক্ষোভমিছিল, গণআন্দোলন ও দাঙ্গা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই উৎসমুখ হইতে, একই প্রবাহপথে চালিত সরকার-বিরোধী অভিযানের বিভিন্ন অবস্থার রূপান্তর মাত্র। পূর্বেকার দিনে এইভাবেই কলিকাতায় ও কলিকাতার উপকন্ঠের নানা গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে অশান্তি ও অরাজকতা দেখা গিয়াছে এবং প্রতিবারেই জনসাধারণের কাজকর্ম ব্যাহত ও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে ও প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেই জনসাধারণই। বিশেষে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থসাধারণ, যাঁহাদের নির্ভর দৈনিক উপার্জনের উপর।

আমরা সেই পুরাতন পন্থারই প্রচ্ছন্ন অথচ ব্যাপকতর সূচনা দেখিয়াই গতবারে জানাইয়াছিলাম যে, যে ভাবে পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ও অন্য জনস্বার্থবিরোধী বিষয়ে সরকারী নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে প্রচার চলিতেছে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে শুভলক্ষণ নহে।

সাধারণ অবস্থাতেও এরূপে অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে ক্রমে প্রবল হইতে দেওয়া উচিত কাজ নহে, কেননা প্রথমদিকে যাহাকে প্রচার বা সরকারী কার্যকলাপের কিছু পরিবর্তনের দ্বারা ব্যর্থ বা ব্যাহত করিতে পারা যাইত, শেষে তাহা ব্যাপক বিক্ষোভ বা দাঙ্গার রূপ ধরিলে তাহার দমনে প্রবল শক্তি প্রয়োগ এবং প্রচুর অর্থব্যয় করিলেও সেরূপ সুফল পাওয়া যায় না।

কলিকাতায় যাঁহারা মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে "আইন-অমান্য" আন্দোলন চালাইতেছেন তাঁহারা জানাইয়াছেন যে ২৪শে সেপ্টেম্বর তাঁহারা আরোও একধাপ অগ্রসর হইবেন—দিনব্যাপি হরতালের দ্বারা। হরতাল, অবশ্য "শান্তিপূর্ণ" হইবে এবং বিকাল চারিটা পর্যন্ত, একথা ঘোষিত হইয়াছে। কার্যতঃ কি হয় দেখা যাউক।

হরতালের ঘোষণার সঙ্গে ব্যাপক দাবীর তালিকাও দেওয়া হইয়াছে, সরকারী খাদ্যনীতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, করবৃদ্ধি, সবকিছুই তালিকায় স্থান পাইয়াছে। হরতাল ঘোষণা করিয়াছেন প্রজা-সোস্যালিষ্ট দল কিন্তু অন্য অ-কম্যুনিষ্ট বিরোধীদলের ইহাতে যোগ থাকিবে।

দিল্লীতে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিগত সপ্তাহে এক বিরাট মিছিল বাহির করে। মিছিলে লোক ছিল প্রায় ৫০ হাজার এবং সেইদিনই এক কোটি "গণস্বাক্ষর" যুক্ত জনগণের প্রতিবাদজ্ঞাপক পত্র লোকসভার অধ্যক্ষ সর্দার হুকুম সিং-এর নিকট দাখিল করা হয়। এই মিছিল ও প্রতিবাদপত্রের লক্ষ্য ছিল দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, করভারের বৃদ্ধি ও অবশ্য সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ জ্ঞাপন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিরোধী দলগুলি বর্তমানে সরকারী নিষ্ক্রিয়তা বা দীর্ঘসূত্রতার ফলে যে সুযোগ দেখা দিয়াছে তাহা পূর্ণরূপে ব্যবহার করিতে মুহূর্তমাত্র নষ্ট করেন নাই। এবং এবার নয়াদিল্লীতেও বিক্ষোভ মিছিল চলিয়াছে।

অন্যদিকে ঐদিনই সরকারী পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সংসদে জানানো হয়, যেহেতু সরকার এক উচ্চশক্তিযুক্ত কমিটিকে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির নানাদিক পর্যবেক্ষণ করিতে নিয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহারা কি করা যায় সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন সুতরাং অন্য কোনও সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রয়োজন নাই। সরকারী কমিটি মাত্র এক বৎসর কাটাইয়াছেন অবস্থা-বিচারে!

জৈমিনি

কয়েকদিন আগে অশুভ '১৩' শিরোনামায় যে সংবাদ-কণিকা পরিবেশিত হয়েছে আশা করি সকলেই আপনারা তা দেখেছেন। সংবাদের বয়ানে বলা হয়েছে, "অশুভ ১৩-ই যে......ভাইকাউন্ট বিমান দুর্ঘটনার মূলে, এই বিষয়ে অন্ধবিশ্বাসীদের মধ্যে আর দ্বিমত নাই।"

এই অশুভ '১৩'-র সমাবেশ দেখানোর জন্যে তথাকথিত 'অন্ধবিশ্বাসীরা' যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

"......দুর্ঘটনায় পতিত বিমানখানি ১৩খানি বিমান লইয়া গঠিত একটি 'ফ্লীটে'র অঙ্গী। বিমানখানিতে যাত্রী ছিলেন ১৩ জন। ভাইকাউন্ট পাইলটগণ রেডার ছাড়া বিমান চালাইতে অস্বীকার করার পর আই এ সি কর্তৃপক্ষ সদ্য যে রেডার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও সংখ্যায় ত্রয়োদশ।"

কাজেই নাকি শেষ পর্যন্ত বিমানখানির ঐ দুর্দশা।

ছোটোবেলায় আমি যখন মফস্বলে ছিলাম তখন বাড়ি থেকে দূরদেশে যাওয়ার সময় যাত্রা করে বেরোনোর রেওয়াজ ছিল।

অন্ধ বিশ্বাস বনাম মুক্ত বিশ্বাস

পাঁজি দেখে ভালো দিন এবং ভালো সময় বার করা হ'ত। সেই সময়টাতে ভগবানের নাম নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে হত।

কিন্তু এমন ঘটনা অনেক সময়েই ঘটত যখন একটা বিশেষ দিনে বেরোতেই হবে, অথচ তার আগে-পিছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভালো সময় নেই। তখন, কোনো কোনো সময় খনার বচন মানা [illegible]

মংগলের ঊষা, বুধে পা
যথা ইচ্ছে তথা যা।

অর্থাৎ বুধবারের ভোরবেলায় বেরোলে আর দিন দেখার দরকার নেই। কিন্তু যখন বুধবার দূরের ব্যাপার হত তখন অন্য উপায় খোঁজা হ'ত। এর মধ্যে একটা ছিল এই উক্তি—'সর্বশুদ্ধা ত্রয়োদশী'। অর্থাৎ ত্রয়োদশী তিথিতে বেরোতে পারলে পাঁজি মিলিয়ে দিন না দেখলেও চলে।

পাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আলোচ্য বিমান-দুর্ঘটনা বুধবারেই সংঘটিত হয়েছিল। এবং ১৩ তারিখ আর ত্রয়োদশী তিথি এক ব্যাপার না হ'লেও মূলগতভাবে শাস্ত্রে যে ১৩-র প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখানো হয়েছে, তাও অসার প্রতিপন্ন হয়েছে।

বরং বিদেশী অন্ধবিশ্বাস 'অশুভ ১৩'ই যেন সত্যি বলে প্রমাণিত হচ্ছে। আমি নিজে অবিশ্যি এ ব্যাপারে দুটো নিয়ম মেনে চলি। যেমন, আমার কাছে কেউ যদি টাকা পায় তো সে দেনা আমি কিছুতেই ১৩ তারিখে শোধ করি না। কিন্তু আমার পাওনা টাকা আমি ১৩ তারিখেও নিতে প্রস্তুত থাকি।

আশাকরি, ১৩-র বিষয়ে অন্ধবিশ্বাসীরাও আমার এই ডবল স্ট্যান্ডার্ডের উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করবেন এবং এ ব্যাপারে 'আমারই মত 'মুক্তবিশ্বাসী' হবেন!

•
• •

হাওড়া ব্রীজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে যে ব্যক্তিটি ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা জুড়োতে গিয়েছিল তার কথা আপনারা সকলেই পড়েছেন। পোর্ট পুলিশ লোকটিকে জল থেকে তুলে আত্মহত্যার প্রয়াসের দায়ে আদালতে হাজির করেছে। কাজেই তার এই ডবল ব্যর্থতার জ্বালা কী পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

আত্মহত্যা যে-কোনো অবস্থাতেই অমার্জনীয়, একথা আমরা সকলেই জানি। ভাবাবেগে অন্ধ হ'য়ে মানুষ এমন একটা ভয়ানক কাজ ক'রে বসে যার কোনো চারা থাকে না। এ জন্যে অন্যান্য সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের মতো আমিও আত্মহত্যাকামী ব্যক্তিদের সাহস ও ধৈর্য অবলম্বন করতে পরামর্শ দেব। আমিও বলব, জীবনে ব্যর্থতা আছেই, কিন্তু একটি ব্যর্থতাতেই জীবন একেবারে মরুভূমি হ'য়ে যাবে এমন মনে করার কারণ নেই। ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই নতুন জয়ের দরজা খুলে দেবে, আর তখন মনে হবে, একদিন কী ছেলেমানুষীটাই না করা গেছে!

কিন্তু সে আলোচনা এখন মুলতুবী থাক। বরং ভেবে দেখা যাক একটা নতুন প্রশ্ন।

আমরা সকলেই বলে থাকি, প্রেমের অর্থ হল দুটি নরনারীর হৃদয়ের আদান-প্রদান। কিন্তু সত্যিই কি তাই? মানুষ আর যাই হোক নিজের চেয়ে আর কাউকেই বেশি ভালোবাসে না। কারো প্রতি প্রেমাসক্ত হ'য়ে সেই নিজেকেই যখন মানুষ ধ্বংস করতে উদ্যত হয় তখন বোঝা যায় প্রেম তার নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকেও তুচ্ছ ক'রে দিয়েছে তার কাছে।

পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রেম

কিন্তু কথা হল, এই যে আত্মবিলোপী প্রেম, তার অনুভব পুরুষজাতকেই এমন করে পেয়ে বসে কেন? নারীর প্রতি পুরুষ প্রেমাসক্ত হ'য়ে আত্মহত্যা করেছে এ দৃষ্টান্ত তো অজস্র, কিন্তু পুরুষের প্রেমে অন্ধ হয়ে নারী ঐ চরম দন্ড দিয়েছে নিজেকে এমন ঘটনা তো শোনা যায় না!

আমি একথা বলি না যে নারীর কোনো সাহস নেই বা তাঁরা ক্ষুদ্র স্বার্থে মশগুল। প্রয়োজন হলে জীবন বিসর্জন দিতে তাঁরাও জানেন এবং দিয়ে থাকেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, তার মধ্যে কটি ঘটনা ঠিক প্রেমে পড়ার জন্যে?

বরং অনেক বেশি ঘটনাই যে ঘটে প্রেমে না পড়ার জন্যে, এই কথাই কি সত্যি নয়? আমাদের মহাকাব্যগুলিতে এর প্রমাণ বারে বারে মিলবে। রাবণ সীতাকে অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিল, বলতে গেলে সীতার জন্যেই সে ধনে-প্রাণে মারা গেল। কিন্তু সীতা তাকে

গ্রহণ করতে পারেন নি। অথচ এই গ্রহণ না করার জন্যে তাঁকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি। ঐতিহাসিক যুগেও দেখা যায়, আলাউদ্দিন খিলজি পদ্মিনীর

রূপে যেভাবে উন্মাদ হ'য়ে উঠেছিল, পদ্মিনীর কাছে তা অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল, আর পরিণামে তাঁকে আগুনে প্রাণবিসর্জন দিয়ে গ্রহণ করতে হ'য়েছিল এই ভালো না বাসতে পারার শাস্তি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রেম নামক ব্যাপারটা আসলে দিল্লী-কা-লাড্ডুর মতো, যে খায় সেও পস্তায়, যে না খায় সেও স্বস্তি পায় না।

হায় প্রেম!

•••

আমার এক কবিবন্ধু আছেন। তিনি প্রায়ই খেদ করে বলেন, কবিতা লেখার কোনো মানে হয় না।

নিজে যিনি কবিতা লেখেন তাঁর মুখ থেকে এ ধরণের কথা শুনে বলাবাহুল্য আমি খুবই চমৎকৃত হই। সাধ্য অনুসারে প্রতিবাদও করি। কিন্তু বন্ধুবর অটল, নিজের মতে তিনি স্থির-সিদ্ধান্ত।

বন্ধু বলেন, যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন তাঁদের কতো চাহিদা। ভালো একখানা বই বাজারে বেরোলে সকলে পড়বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে—দেখতে দেখতে কাবার হয় সংস্করণের পর সংস্করণ। যাঁরা গান গাইতে পারেন, তাঁদেরও নগদ বিদায়ে দেরি হয় না। ছবি-আঁকিয়েরা আর কিছু না হোক ইস্কুলের চাকরী বা কমার্শিয়াল কাজ করেও চালিয়ে যেতে পারেন দিব্যি। নাচিয়ে বা অভিনেতা হ'লে নিশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া যায় না, এত চাহিদা আজকাল। এমন কি ফুটবল বা বক্সিংয়েরও সামাজিক মূল্য আছে; মূল্য দিয়ে সে রস উপভোগ করতে চায় সমাজের মানুষ। কিন্তু কবিতা, হা অদৃষ্ট, যে লেখে সেও যেমন ম্রিয়মাণ হ'য়ে থাকে, তার বইয়েরও ঘটে সেইরকম ধূলিমলিন অবস্থা। কবিতা লেখা নিছকই একটা বাহুল্য ব্যাপার।

কবিতার প্রয়োগ ও সিদ্ধি

এসব কথার সত্যিই কোনো জবাব হয় না। কাজেই মোটামুটি একটা সহানুভূতির ভাব দেখিয়ে চুপ করেই বসে থাকতাম এতদিন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটার ফলে আমার সমস্ত ধারণা একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেল।

সকলেই শুনেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে চীনের নাকি এখন খুব একটা বনিবনাও নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে দুপক্ষেই এখন এমন মনোভাব দেখা দিয়েছে যেটা দূর থেকে অমিত্রজনোচিতই মনে হয়। আমরা ভারতবাসীরা জানি, চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলা কী মারাত্মক হ'য়ে উঠতে পারে। রাশিয়াও এখন তা টের পাচ্ছে। অনেক বড় বড় বিবৃতি এবং আলোচনা উপস্থিত ক'রে রাশিয়া চীনকে বেড়াজালে ফেলার চেষ্টা করছে। বলতে গেলে রাশিয়া এ ব্যাপারে অনেকটা সক্ষমও হয়েছে। কারণ চীন বিশ্বজনমতের দরবারে কোণঠাসা হয়ে এসেছে। কিন্তু বেকায়দায় পড়ে চীন এখন এমন একটা কাজ করে বসেছে যাতে রাশিয়া একেবারে মর্মান্তিকভাবে চটে গিয়েছে।

চীন কবিতা লিখেছে। রাশিয়াকে ব্যঙ্গ করে একটা কবিতা লিখে চীন এবার আসর মাৎ করার চেষ্টা করছে।

ভেবে দেখুন, অনেক প্রবন্ধ, আলোচনা, রস-রচনা, এমন কি গল্পও হয়তো লিখেছে চীন রাশিয়াকে নিয়ে, তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি, কিন্তু যেই চীন কবিতা লিখেছে, অমনি একেবারে হাতে হাতে প্রার্থিত ফললাভ।

কাজেই কবিতার কোনো মূল্য নেই একথা যাঁরা ভাবেন তাঁরা ভ্রান্ত। যাঁরা একথা ভাবেন, তাঁদের নামে কেউ দু'লাইনের একটা ছড়া লিখলেই টের পাবেন কবিতার ক্ষমতা কতো সুদূরপ্রসারী।

দুঃখের বিষয়, আমার কবিবন্ধু নিজে এটা বুঝতে পারেন নি।

দেবা ন জানন্তি

দিল্লী থেকে বলছি

নিমাই ভট্টাচার্য

লণ্ডনপ্রবাসী এক বন্ধুগৃহে খিচুড়ি খেয়ে আণ্ডার-গ্রাউণ্ডের সেণ্ট্রাল লাইনে চড়ে ফিরছিলাম। হোয়াইট সিটি ষ্টেশন থেকে ট্রেনটা ছাড়ার পর কম্পার্টমেণ্টের চারপাশ চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে একটু দূরে এক প্রলম্বিত শাড়ীর আঁচলের ঊর্ধে এক সুদর্শনা ভারতীয় নারীর মুখ নজরে পড়ল। লণ্ডন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বা বাসের মধ্যে দু' একজন ভারতীয় দেখতে পাওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই নজর ফিরিয়ে নিলাম। হল্যাণ্ড পার্ক, নটিং হিল গেট, কুইনসওয়ে, ল্যাংকাস্টার গেট, মার্বেল আর্চ, বণ্ড ষ্ট্রীট ষ্টেশন পার হতেই উঠে দাঁড়ালাম। অক্সফোর্ড সার্কাসে নেমে পড়লাম। বেকারলু লাইনের গাড়ী ধরে পিকাডেলী সার্কাস যাবার জন্য অন্য প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে যাবার সময় কম্পার্টমেণ্ট-সঙ্গিনীকে আবার নজরে পড়ল। হঠাৎ যেন মনে হলো, কোথায় যেন দেখেছি। শীতের সন্ধ্যায় প্রাণপণে মাথায় ধোঁয়া দিয়ে ব্রেনকে সাফ করে নিলাম; কিন্তু তবু মনে পড়ল না কোথায় দেখেছি। অথচ 'দেখেছি' 'দেখেছি' ভাব মনের মধ্যে থেকেই গেল। কাজের মধ্যে কদিন কেটে গেল। তারপর এক ভারতীয় কূটনৈতিক বন্ধুর আমন্ত্রণে ইণ্ডিয়া হাউসের উপরতলার রেস্টুরেন্টে কাঁটা-চামচ দিয়ে ডাঁটা-চচ্চড়ি খেতে গিয়ে ঠিক পাশের টেবিলে সেই 'তন্বীশ্যামাঅধরাবসনা'কে এক যুবকের সঙ্গে মশগুল হয়ে গল্প করতে দেখলাম। ঐ সিচুয়েশনে আমার মত বয়সের মানুষের পক্ষে ভদ্রমহিলাকে বিব্রত করা সমীচীন বোধ করলাম না। মনের প্রশ্ন মনেই র'য়ে গেল।

কদিন ঘুরে-ফিরে দিল্লী চ'লে এলাম। ভদ্রমহিলার স্মৃতিও মন থেকে মুছে গেল।

দীর্ঘকাল পর এক বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের প্রেস-সেক্রেটারীর দিল্লী-ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলাম গলফ লিংকে। একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। অভ্যাগতের দল আগেই এসে গিয়েছিলেন। আমন্ত্রণকারী ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী সাদরে অভ্যর্থনা করলেন; পরিচয় করিয়ে দিলেন কয়েকজন অপরিচিতের সঙ্গে। হোয়াইট হর্স, স্কচ, রাম, জিন, শেরী অথবা একটু ব্রাণ্ডির গেলাস নিয়ে সবাই ব্যস্ত। ছোট ছোট দলের আলোচনায় আমিও মিশে গেলাম। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ নিজেকে দেখলাম এক আধা-পরিচিতার পাশে। ধোঁয়া দিয়ে আবার ব্রেনটা সাফ ক'রে নিলাম। মনে পড়ল, একেই তো দেখেছিলাম লণ্ডন আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে, আর ইণ্ডিয়া হাউসের রেস্টুরেন্টে!

—এক্সকিউজ মি, আই সাপোজ উই হ্যাভ মেট বিফোর।......ওয়ার ইউ ইন লণ্ডন লেট লাস্ট ইয়ার?

জিন-লাইম ওয়াটারের গ্লাসটা পাশে রেখে বল্লেন, সারটেনলি, আই ওয়াজ ভেরী মাচ্ দেয়ার। ইউ ওয়ার অলসো দেয়ার...........

হ্যাঁ।

আলাপ হলো। ইংরেজি থেকে বাংলায় কথাবার্তা বললাম। দীর্ঘদিন পূর্বে যেকালে কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝে পনের কি পঁচিশ টাকার রিজার্ভ ব্যাংকের চেক পেতাম, সেকালে মিস্ সেন তিনশ' সত্তর দশমিক চার মিটারে অনুষ্ঠান-প্রচারের ঘোষণা করতেন। বর্তমানে অন্য কোন কর্মব্যাপদেশে দিল্লীতে অবস্থান।

কথাবার্তা বলতে বলতে মিস সেন হঠাৎ আমাকে একটু দৃষ্টিকটুভাবে ধাক্কা দিয়ে পাশ ঘুরে মিঃ বেকারের হাতটা চেপে ধরলেন। চমকে গিয়েছিলেন বেকারসাহেব। সামলে নিয়ে বল্লেন, ইউ নটি গার্ল।......মিস সেনের রক্তাভ রঙীন গালে একটা টোকা মেরে বল্লেন, উইদাউট এনি ড্রিংকস?......কাম অন, হ্যাভ মাইন।

বেকারসাহেবের ডান হাতের উপর নির্লিপ্তভাবে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে মিস সেন বেকারের হুইস্কীর গ্লাসে চুমুক দিলেন। অসম্বৃত বেশ-বাস নিয়েই মিস সেন পার্টির শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বেকারসাহেবের বাহুবন্ধের উষ্ণ স্পর্শ উপভোগ করলেন। তারপর মধ্য-রাত্রির প্রাক্কালে মিঃ বেকারের পাশে বসে বিদায় নিলেন মিস সেন।

কলকাতা বেতারকেন্দ্রে যাকে পুরুষ দেখলে দশ হাত দূরে দিয়ে শাড়ির আঁচল টেনে টেনে দেহাবরণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে সলজ্জ পদসঞ্চারণ করতে দেখতাম সেদিন রাত্রে সেই মিস সেনকে প্রমত্ত ও অসম্বৃত অবস্থায় বেকারসাহেবের কাঁধে মাথা রেখে মধ্যরাত্রিতে উধাও হতে দেখে একটু বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

দিল্লীর সমাজ-বন্ধনহীন জীবনে মিস সেনের এই বিবর্তনে বিস্মিত হবার কারণ নেই। আমিও তাই বিস্মিত হইনি। এরপর মাঝে মাঝে জনপথের দোকানে, কনট প্লেসের সপিং ষ্টোরে,

কখনও কখনও 'শীলা' বা 'রিভোলি' চিত্রগৃহে সলোমান এ্যান্ড সেবা বা হিচ্-ককের কোন না কোন ফিল্ম দেখতে নানা সান্নিধ্যে মিস সেনকে দেখেছি। কদাচিৎ কখনো গেলর্ড-ওয়েঙ্গারে এসপ্রেসো কফি 'বারে' বা ডাইনিং-রুমে দেখা হলে মিস সেন ব্যাগ থেকে সিগরেট কেশ খুলে সামনে ধরেছেন। 'কাম অন জার্নালিস্ট, হ্যাভ এ সিগরেট।' নিঃশব্দে মাথা নীচু করে আদেশ শিরোধার্য করে সিগরেট তুলে নিতেই লাইটার জেবলে ধরেছেন মিস সেন। মুহূর্তের মধ্যে সিগরেটের ধোঁয়ায় অন্তর্হিত হতেন মিস সেন। কানে শুধু ভেসে আসত, বাই বাই, সী ইউ লেটার।

বছরখানেক আর হদিশ পাইনি মিস সেনের। খবর নেবার আগ্রহ বা সাহস হয়নি। তাছাড়া খবর করব কোথায়? বহুজনের হৃদয়ে যাঁর স্থান, অসংখ্য মানুষের সাহচর্যে যাঁর বিচরণ, তাঁর খবর করি কোথায়?

কিছুকাল আগে নিত্যকার মতন দৌড়ে দৌড়ে লাফ মেরে পার্লামেন্টের সিঁড়ি দিয়ে প্রেস গ্যালারী যাবার পথে ভিজিটার্স গ্যালারীর লাইনের মধ্যে অকস্মাৎ এক নতুন বেশে মিস সেনকে দেখে চমকে গেলাম। চওড়া কপালের মাঝে বিরাট গোলাপী টিপ, ঘন কালো কার্লিং হেয়ারের মাঝেও টানা সিন্দুর, মাথায় কাপড়, গায়ে-হাতেও যেন কিছু নতুন গহনা দেখলাম। প্রথম ঝলকে বেশ লাগল। ভাবলাম, হয়ত বা অসংখ্য হৃদয়ের হাটের মধ্যে ভালবাসার অভিনয় বিক্রী করে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন মিস সেন; তাই এবার এক মহাজন ঠিক করে ভবিষ্যতের দেওয়া-নেওয়ার কারবার সীমাবদ্ধ রাখতে চান। মনে মনে জিজ্ঞাসা করলাম, সব মেয়েই কি স্ত্রী হতে চায়? হয়ত তাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন? নতুন জীবন ভাল লাগছে তো?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বল্লেন, মীট মাই হাসব্যান্ড, মিঃ দেওয়ান চাঁদ।

তারপর এই কদিন আগে 'ওডিয়নে' ভি-আই-পি'র অ্যাডভান্স বুকিং'এর লাইন দিতে গিয়ে মিসেস দেওয়ান চাঁদের দর্শন পেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, সিন্দুর কই? মাথার ঘোমটা?

—'একা এসেছেন? ভাগ্যবান কোথায়?'

কড়া মেজাজে উত্তর পেলাম. আর ইউ টকিং এ্যাবাউট দ্যাট ইডিয়ট?...... প্লিজ ডোণ্ট..........।

মুনি-ঋষিরা নিশ্চয়ই বহু মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। কারণ তা না হলে 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা'-র অভিজ্ঞতার কথা বলে'ছন কি ভাবে?*

* নিতান্তই স্বাভাবিকভাবে চরিত্রের নামগুলি কাল্পনিক দেওয়া হয়েছে।

পরলোকে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় গত ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরাশি বৎসর।

ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৮১ সালে। বর্ধমান জেলার আহমদপুর গ্রামে আদি নিবাস হলেও তাঁর জন্ম হয় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। পিতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯০১ সালে দুই বিষয়ে অনার্সসহ বি-এ পাশ করেন। ইতিহাস ও ইংরিজিতে এম-এ পাশ করে রিপন কলেজে ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ডঃ মুখোপাধ্যায় ১৯০৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। বেঙগল ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন ১৯০৬ সালে। ঋষি অরবিন্দ ছিলেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯১৫ সালে পি-এইচ-ডি লাভ করেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে মণীন্দ্রচন্দ্র অধ্যাপক পদ লাভ করেন ১৯১৬ সালে। ১৯১৭ সালে যোগদান করেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসাবে। ১৯২১ সালে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ঐ পদে কাজ করেন। তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম 'এমিরিটাস' অধ্যাপক ছিলেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ডঃ মুখোপাধ্যায় অবিভক্ত বাংলার বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৯—৪০ সালে বাঙলা সরকারের ফ্লাডিড কমিশনের সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রথম রাজ্যসভার মনোনীত সদস্যও হয়েছিলেন ডঃ মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৭ সালে 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ 'হিস্টরী অব ইণ্ডিয়ান সিপিং', 'ন্যাশনালিজম ইন হিন্দু কালচার', 'মেন অ্যাণ্ড থট ইন অ্যানসিয়ান্ট ইণ্ডিয়া', অ্যানসিয়ান্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশন' এবং 'ইণ্ডিয়াজ ল্যাণ্ড সিস্টেম' প্রভৃতি।

দেশে বিদেশে

॥ অনাস্থার হিড়িক ॥

দেখা যাচ্ছে, এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলার কীর্তিকলাপ ভারত অনুসরণ করে থাকে। এ বছরের বর্ষাকালীন অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাতেই প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে। তারপরেই অনাস্থার উম্মাদনা যেন পেয়ে বসেছে ভারত তথা ভারতের অংগরাজ্যগুলির আইনসভার বিরোধী দলগুলিকে। শ্রীনেহরুর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কখনও অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়নি বলে আচার্য কৃপালনীর অনাস্থা প্রস্তাবটি দেশে এমন কি দেশের বাইরেও সাময়িকভাবে যথেষ্ট রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তারপরেই আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যগুলির বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনার যে হিড়িক শুরু হয়েছে তাতে অনাস্থা প্রস্তাবের প্রকৃত গুরুত্ব সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে সেটি একটি রাজনৈতিক প্রচারমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অনাস্থা প্রস্তাবই হল সংখ্যালঘিষ্ঠ বিরোধী দলগুলির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। কিন্তু এদেশের নিষ্ক্রিয় বিরোধী দলগুলির বারংবার অপপ্রয়োগে তা প্রায় সম্পূর্ণ অকেজো ও ভোঁতা হতে বসেছে।

এর চেয়েও বড় কথা হল যে, অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনকালে বিরোধী পক্ষ যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্যানির্ভর অভিযোগ আনতে না পারেন তবে অনাস্থা প্রস্তাব আনার মূল উদ্দেশ্যই শুধু ব্যর্থ হয় না, সরকার পক্ষের মর্যাদা তাতে আরও বৃদ্ধি পায়। তিনদিন ধরে অনর্গল বক্তৃতা দিয়েও বিরোধী পক্ষ যদি একটিও অপ্রতিবাদ্য ও অভ্রান্ত অভিযোগ সরকারের বিরুদ্ধে আনতে না পারেন তবে দেশের লোক এইটাই বুঝবে যে, সরকারের প্রতি বিরোধী দলের আক্রোশ থাকলেও কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। বিরোধী দলগুলি একথা মনে রেখে ভবিষ্যতে সস্তা প্রচারের লোভ যদি সংবরণ করতে পারেন তবে তাতে তাঁদের ও সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলির মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

॥ কংগ্রেসে অন্তর্বিরোধ ॥

বিরোধী দলগুলির অনাস্থা প্রকাশে কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী সরকারগুলির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হলেও কংগ্রেসের নেতৃ-

এস কে পাতিল
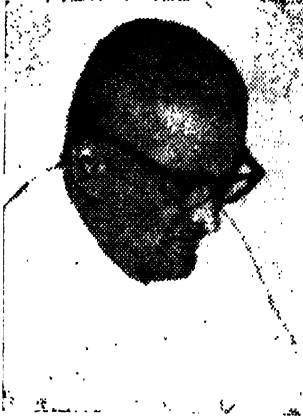
স্থানীয় কর্মীদের কার্যকলাপ বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিকল্পে কামরাজ পরিকল্পনা গৃহীত হলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ফল তার সম্পূর্ণ বিপরীত হতে চলেছে। এ আই সি সি-র প্রস্তাব অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির সকল মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী সমীপে পদত্যাগপত্র পেশ করলেও যাঁদের পদত্যাগপত্র শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে তাঁরা সকলেই এন্ডে সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয় না। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলের ক্ষোভ ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন যে, মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকামরাজ তাঁর নিজের রাজ্যের কথা চিন্তা করেই ঐ প্রস্তাব এনেছিলেন, ডি এম কে দলের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়েই কামরাজ কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধির কথা চিন্তা করেন। এর দ্বারা শ্রীপাতিল এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, একটি রাজ্যের সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যা করে তোলার পিছনে কোন সুস্থ রাজনৈতিক যুক্তি নেই। ওদিকে নূতন কংগ্রেস সভাপতিপদে শ্রীমোরারজী দেশাই ও শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে কে নির্বাচিত হবেন তা ঠিক স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

আবার যে ছয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে শুধু জম্মু ও কাশ্মীর এবং মাদ্রাজ ছাড়া অপর সকল রাজ্যেই নূতন নেতা নির্বাচন গোষ্ঠীকলহের ফলে প্রায় অসম্ভব দাঁড়িয়েছে। উড়িষ্যায় হয়ত শ্রীবিজু পট্টনায়েক ব্যক্তিগত প্রভাবের জোরে তাঁর নিজ-মনোনীত ব্যক্তিকে পরিত্যক্ত আসনে বসাতে পারবেন, কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে অবস্থা চরমে পৌঁচেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মধ্যপ্রদেশে ডঃ কাটজুকে আবার ফিরিয়ে আনতে চান, কিন্তু মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের একটি শক্তিশালী দল তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। বলা বাহুল্য, মধ্যপ্রদেশের পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন ঐ বিরোধী দলেরই পক্ষে। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত নিঃসন্দেহে এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন, কিন্তু তাঁর মনোনীত কোন ব্যক্তিকেও তাঁর অনুগামীরা সমভাবে সমর্থন জানাবেন এমন কোন ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের এই দ্বিধাই উত্তরপ্রদেশের বিরোধী দলের মূল অনুপ্রেরণা এবং ইতিমধ্যেই শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীকে নেতা নির্বাচিত করে তাঁরা উত্তরপ্রদেশ
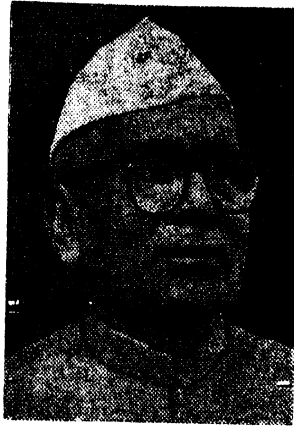
চন্দ্রভানু গুপ্ত

মন্ত্রিসভা দখলের তোড়জোড় শুরু করেছেন। আর বিহারের বিরোধ ত চরম সীমায় পৌঁচেছে। সে রাজ্যে এখনও রাজনীতির চেয়ে জাত বড় এবং জাতের ভিত্তিতেই তাঁরা দল পাকাতে শুরু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিহারে এ পর্যন্ত পাঁচজনের নাম শোনা গেছে। জোড়াতালি দিয়ে হয়ত সব রাজ্যেই শেষ পর্যন্ত একজন করে

কমলাপতি ত্রিপাঠি

নেতা নির্বাচন সম্ভব হবে, কিন্তু বিরোধের কোন মীমাংসা তাতে হবে না। ফলে কামরাজ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই তাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ওদিকে আকস্মিকভাবে গুজরাট মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। গুজরাট বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্যদের অধিকাংশ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবরাজ মেহতার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করাতে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁও কংগ্রেস-নেতৃত্বকে বিশেষ বিব্রত করে তুলেছেন। পাঞ্জাব কংগ্রেস ও পাঞ্জাব বিধানসভায় কায়রোঁর অপ্রতিহত প্রভাব, সে কারণে তাঁকে ওপর থেকে অপসারণের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সুপ্রীম কোর্টের মামলাতেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারপরেও সর্দার কায়রোঁকে সমর্থন করে

প্রতাপসিং কায়রোঁও
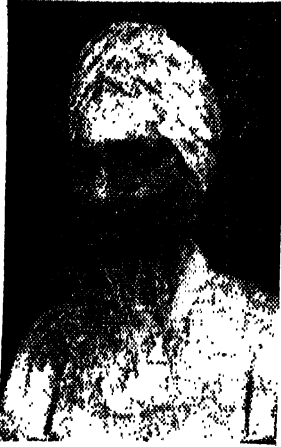
বহু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। মোট কথা সারা ভারতে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধ যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কংগ্রেস ছাড়া এমন কোন দল নেই দেশে যার হাতে দেশবাসী কেন্দ্র তথা অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনদায়িত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে। অথচ সেই দলের সংহতি ও মর্যাদা আজ গুরুতর সংকটের সম্মুখীন।

॥ দ্যগলের প্রস্তাব ॥

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে দ্য গলের প্রস্তাব আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য গল প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ ভিয়েৎনামের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগকে সংযুক্ত করে একটি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেছেন। এ সম্পর্কে ভ্যাটিকানে আগত ভিয়েৎনাম রোমান ক্যাথলিক চার্চের আর্চবিশপ ও প্রেসিডেন্ট দিয়েমের অগ্রজ নো দিন থাককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যদি আন্তর্জাতিক কমিশনের তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভিয়েৎনামের উভয় অংশের সংযুক্তির ব্যবস্থা হয় তবে তাতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই।

কমিউনিস্ট-শাসিত উত্তর ভিয়েৎনাম ও মার্কিন-পুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে মিলন যে সহজসাধ্য নয় বা অদূর-ভবিষ্যতেও তা ঘটা সম্ভব নয়—একথা নায়েল দ্য গল খুব ভালভাবেই জানেন। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য হল [illegible] প্রভাব থেকে ভিয়েৎনামকে মুক্ত করে তার উপর ফরাসী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা। সেদিক থেকে এই সময়টিকেই তিনি উপযুক্ত বলে মনে করেছেন। কারণ দিয়েম সরকারের বৌদ্ধ-দলন নীতিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার দিয়েমের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এ-অবস্থায় ফ্রান্সের আবেদনে দিয়েম-চক্রের মনে সহানুভূতিসূচক সাড়া জাগা খুবই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। উত্তর ভিয়েৎনামের যাবতীয় ফরাসী সম্পত্তি ১৯৫৪ সালেই হো চি মিন সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দেশগঠনের কাজে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে প্রত্যাশিত সাড়া না পাওয়ায় উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার আবার ফরাসী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছেন এবং এ-কারণে উত্তর ভিয়েৎনামের একটি প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যেই ফ্রান্সে গেছেন। আর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এখনও ফ্রান্সের যে শিল্প ও বাণিজ্য আছে তার মূল্য প্রায় তেইশ কোটি ডলার। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অর্ধেক রবারের ক্রেতা হল ফ্রান্স।

কিন্তু ফ্রান্সের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সম্পর্ক সহজে ছিন্ন হবার নয়। কারণ আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভিয়েৎনাম সাহায্য নিয়েছে প্রায় পাঁচ শ' কোটি ডলার।

প্রেসিডেন্ট দ্য গল

অর্থনৈতিক

ঋণ সংবাদ

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পারিবারিক ব্যয়ে ঋণের স্থান সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায় 'ইণ্ডিয়ান লেবর বুক' গ্রন্থে। পরিসংখ্যানগুলি অবশ্য অধিকাংশই ১৯৪৭-৪৮ সালের, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতালাভের অল্প পরের।

ঐ বছর নমুনা সমীক্ষাস্বরূপ বোম্বাইয়ের ২০৩০টি শ্রমিক পরিবারের ব্যয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানা যায় তাদের মধ্যে ১৩০১টি পরিবার ঋণগ্রস্ত ও তাদের গড় ঋণ ছিল ১২৩·৮৭ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের ২৭০৭টি শ্রমিক পরিবারের মধ্যে ঋণগ্রস্ত ছিল ১৯২৪টি পরিবার ও তাদের গড় ঋণ ছিল ১১৭·৬১ টাকা। শ্রমিক-নগরী জামসেদপুরের ৯৯১টি শ্রমিক পরিবারের মধ্যে ঋণগ্রস্ত ছিল ২২৩টি পরিবার ও তাদের গড় ঋণ ছিল ২৮·৫০ টাকা। মাদ্রাজে ২৭৪টি পরিবারের মধ্যে ঋণ করে সংসার চালাত ১৯৮টি পরিবার ও তাদের গড় ঋণের পরিমাণ ছিল ৭৯ টাকা।

মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি ছিল আরও ঋণভারপিষ্ট। দিল্লীর মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে ৪০% ও কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির ৭৬% শতাংশ চলত ঋণের টাকায়।

ক্রমহ্রাসমান জাতীয় আয় :

গত কয়েক বছরে জাতীয় আয়ের হিসাব লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অঙ্কের পরিমাণে তা কিছু কিছু বৃদ্ধি পেলেও গড় হিসাবে তা ক্রমহ্রাসমান। '৬০-৬১ সালে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল পূর্ব বছরের তুলনায় ৭·১ শতাংশ। কিন্তু পরের বছর ঐ বৃদ্ধির হার কমে হয় ৩ শতাংশ। আবার ১৯৬১-৬২ সালের তুলনায় ১৯৬২-৬৩ সালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ২·১ শতাংশ। ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যমান অনুসারে ১৯৬০-৬১ সালের ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১২,৭৫০ কোটি টাকা; ১৯৬১-৬২ সালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩,০২০ কোটি টাকা।

কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। খাদ্যের উৎপাদন ১৯৬১-৬২ সালে ছিল ৮ কোটি টন; ১৯৬২-৬৩ সালে তা কমে হয়েছে ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টন। অথচ এই এক বছরে দেশের লোক বেড়েছে শতকরা ২ ভাগ।

সাহিত্য জগৎ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কয়েক মাস পূর্বে লণ্ডনে যান। সেখানে ভারতীয় সঙ্গীত-গবেষক অধ্যাপক আর্নল্ড বাকের নিকট কয়েকটি বৌদ্ধ সহজিয়া সঙ্গীতের সন্ধান পান এবং সেগুলি সুরসহ সংগ্রহ করে আনেন। তারপর বিস্তারিত তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নেপালে গিয়ে পুঁথি ও পদ সংগ্রহ করে এনেছেন। চর্যাপদের ভাব ও ভাষার সঙ্গে এই ধর্মীয় সংগীত-গুলির অনেকটা সাদৃশ্য তিনি দেখতে পেয়েছেন। ডঃ দাশগুপ্ত প্রায় আড়াই-শত নতুন পদের সন্ধান পেলেও, এর বহু পদকেই তিনি অর্বাচীন বলে মনে করেন। পদগুলির ভাষাও চর্যাপদের ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক। বৌদ্ধ ধর্মের বজ্রযানপন্থী সাধকেরা পদগুলি নৃত্যগীতের মাধ্যমে ব্যবহার করলেও তাঁরা অনেক পদেরই অর্থ জানেন না। এমন কি অধিকাংশ পদেরই অর্থবিকৃতি ঘটেছে।

কিন্তু ডঃ দাশগুপ্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দর্শন চর্যা-পদাবলীর অনুসরণে রচিত শতাধিক নতুন পদের যে সন্ধান পেয়েছেন গত ৭ সেপ্টেম্বরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত সভায় সে সম্পর্কে একটি আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। নেপাল থেকে তিনি প্রায় পঁয়ত্রিশটি পদের সুর রেকর্ড করে এনেছেন এবং আনীত কয়েকটি পুঁথির গান সকলকে শোনান। নেপালে এগুলি 'চাচা' সঙ্গীত নামে পরিচিত।

পণ্ডিতদের বিশ্বাস বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল মোটামুটিভাবে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। উনিশ শ সাত খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সঙ্গীত বা পদ 'চর্যাশ্চর্য-বিনিশ্চয়' উদ্ধার করে আনবার পর বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন সম্পর্কে সকলে একমত হলেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষার আদি স্তর ঐ চর্যাপদের যুগে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। সম্প্রতি ডঃ দাশগুপ্ত আবিষ্কৃত পদগুলির মূল্য সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "ভাষা, সাহিত্য, দর্শন এবং সঙ্গীত—সকল দিক হইতেই পদগুলি গবেষকদের নূতন তথ্যের সন্ধান দিবে।"

সংগৃহীত প্রায় একশতটি পদ ডঃ দাশগুপ্ত তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে উনিশটি বাছাই পদের সাহায্যে নতুন তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হতে পারে। প্রায় পঁয়তাল্লিশটি পদ দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তীকালীন রচনা বলেই তাঁর বিশ্বাস; কিন্তু পদ-গুলির রচনাস্থান সম্পর্কে তিনি এখনও নিঃসংশয় হতে পারেন নি। যে পঁয়ত্রিশটি পদে সংস্কৃত শব্দের প্রবল আধিক্য বর্তমান সেগুলি নেপালে রচিত। দার্শ-নিক চিন্তাধারার দিক থেকে কয়েকটি পদের মূল্য অপরিসীম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

পদগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ দাশগুপ্ত বলেন যে, পদগুলির মধ্যে চর্যাপদের পরিবর্তন ও পরিণতি সাধনের পরিচয় সুস্পষ্ট। পদগুলিতে যে বচ্ছল দেবীর উল্লেখ আছে, তিনি তাকে চণ্ডীদাসের বাশুলী দেবী বলেই মনে করেন। এক প্রাচীন মন্দিরের বচ্ছল দেবীই এর পূর্ব রূপ। বচ্ছল বৎসল শব্দ থেকে আগত। "এই সময়ে রাধাকৃষ্ণের কাহিনীও পূর্ব ভারতে চালু হয় এবং ইহা হইতেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজিয়া শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।" বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কতকগুলি পদ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত। এগুলির ভাষা-ভঙ্গী ব্রজবুলির সমগোত্রীয়। দুটি পদে কোমল ও মধুর শব্দের ব্যবহার তিনি আবৃত্তি করে ব্যাখ্যা করেন।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

দীনেশচন্দ্র সেনের স্মৃতিরক্ষা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ এবং আজীবন সেবক স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরিচয় শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত। বাংলার পল্লী অঞ্চল থেকে পুঁথি সংগ্রহ করে এবং তা অবলম্বনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল সম্পদের প্রতি তিনিই সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার দ্বারাও তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। স্যার আশুতোষের ব্যবস্থা-পনায় উচ্চতম স্তরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ভার গ্রহণ করে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁর তিরো-ধানের বহু বৎসরের মধ্যেও 'দীনেশচন্দ্র স্মৃতি সমিতি' স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। বিলম্বে হলেও দীনেশচন্দ্র স্মৃতি সমিতি এই অবশ্যকর্তব্য কর্মে ব্রতী হয়েছেন।

দীনেশচন্দ্র সেন

গত ৬ই সেপ্টেম্বর দীনেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার তহবিল গঠনের এক প্রস্তাব সমিতির প্রথম বৈঠকে গৃহীত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন ডাঃ বনবিহারী দাশ-গুপ্ত। সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং রাজ্যসরকারের আর্থিক সাহায্যলাভের কথা উল্লেখ করেন তাঁর ভাষণে। দুই বৎসর অন্তর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা-মূলক গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য পুরস্কৃত করার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে বলে তিনি জানান।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে 'দীনেশ-চন্দ্র স্মৃতি সমিতি' গঠন করা হয় ঃ সভা-পতি—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, সহ-সভাপতি—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ প্রিয়রঞ্জন সেন; সাধারণ সম্পাদক—ডঃ শশিভূষণ দাশ-গুপ্ত, যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীপবিত্র সরকার ও শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত; কোষাধ্যক্ষ—ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য; সদস্যবৃন্দ—শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীশকুমার নন্দ, শ্রীজানকীনাথ বসু, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ [illegible], ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠি, শ্রীমতী মমতা অধিকারী, শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী উর্মিলা পুরকায়স্থ এবং শ্রীমতী কমলা কাঞ্জি-লাল।

বিদেশী সাহিত্য

চল্লিশ মিলিয়ন পুস্তকের আলোকচিত্র

জার্মান গবেষণা সমিতির উদ্যোগে পশ্চিম জার্মানীর বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত গ্রন্থালয়গুলিতে যাবতীয় পুস্তকের এক তালিকা প্রণয়নের কাজ চলেছে। যুদ্ধের পূর্বে এই জাতীয় গ্রন্থালয়গুলিতে পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৫৬ মিলিয়ন। যুদ্ধের সময় প্রায় ১৩ মিলিয়ন পুস্তক বিনষ্ট হয়, পাঁচ মিলিয়ন পূর্ব জার্মানীর গ্রন্থালয়গুলিতে থেকে যায় এবং বাকী ৩৮ মিলিয়ন পুস্তক পশ্চিম জার্মানীর অধিকারে থাকে।

একদল বিশেষজ্ঞের ওপর তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এদের কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটি পুস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার পর প্রত্যেকটি পুস্তকের জন্য আন্তর্জাতিক পরিচয়পত্রের মাপে একটি পরিচয়পত্র তৈরী হবে এবং মাইক্রো-ফিল্মে সেটির ছবি তুলে এনলার্জ করে দলিল সংগ্রহশালায় রেখে দেওয়া হবে। পরে সেগুলি একত্র করে জার্মান গ্রন্থালয়সমূহের এক প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত হবে। এই কাজে চল্লিশ মিলিয়ন পুস্তকের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হবে এবং সেজন্য ফিল্ম লাগবে এক লক্ষ বিশ হাজার ফুট।

ইতিমধ্যে এই তালিকা-প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা কয়েকটি "অমূল্য তথ্যের" সন্ধান পেয়েছেন যেমন এমন একটি পুস্তক পাওয়া গেছে যেটির প্রতিটি হরফ আলাদা মুদ্রিত হয়েছে। পুস্তকটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত। সারা বিশ্বে এই ধরণের ছাপা পুস্তক আছে মাত্র তিনখানি। অপর একটি গ্রন্থালয়ে একটি গীতিনাট্যের পুস্তক পাওয়া গেছে যাতে ১৬২০ থেকে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিত গীতিনাট্যের কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় পাওয়া যায়। দুচারটি এই ধরণের অমূল্য সম্পদ আবিষ্কারের পর পণ্ডিতরা আশা করেছেন অন্যান্য গ্রন্থালয়ে এবং অজানা অচেনা মঠে, দুর্গে, জমিদারগৃহে যেসব পুরাতন পুঁথিপত্র আছে সেগুলির মধ্যেও তাঁরা এমনি আশ্চর্য অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে পারবেন। [illegible]ম ১৯০২ সালে এই জাতীয় কাজে হাত দেওয়া হয় এবং তখন চতুর্দশ খণ্ডে যে পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হয়, তাতে ইংরেজী প্রথম দুটি অক্ষরের তালিকা মাত্র সমাপ্ত হয়েছিল। এখন অবশ্য আধুনিক পদ্ধতিতে এই কাজ সম্পন্ন করা হবে।
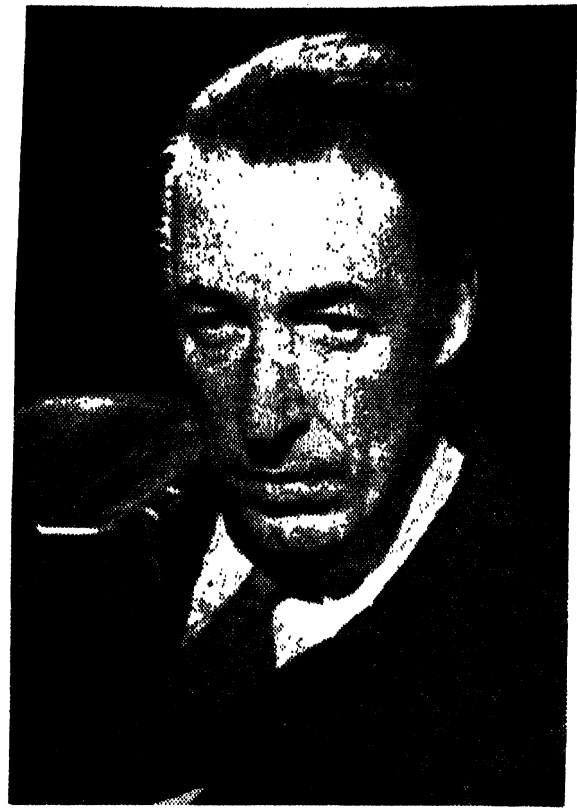
কবি ও নাট্যকার লুই ম্যাকনিস গত ৩রা সেপ্টেম্বর লণ্ডনে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর জীবনের ওপর ভারতের একটা সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ সালে তিনি ভারত পরিভ্রমণে আসেন। ভারতের সব প্রাচীন মন্দির দেখে তিনি 'মহাবলীপুরম'—কবিতাটি সংকলিত করেন তাঁর **'এইটি-ফাইভ' পোয়েমস** গ্রন্থে। এই সময়ে তাঁর আর একটি কবিতা হল 'লেটার ফ্রম ইণ্ডিয়া'। এটি প্রকাশিত হয় হোলস **ইন দি স্কাই** গ্রন্থে।

বর্তমান বৎসরে কবিতার জন্য পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পরলোকগত কবি উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামসকে। গত মার্চ মাসে ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। উইলিয়ামস্-এর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। তাছাড়া উপন্যাস, প্রবন্ধ, একাঙ্ক নাটক, ছোটগল্প, আত্মজীবনী রচনা করেছেন তিনি। কয়েকটি স্প্যানিশ ও ফরাসী গ্রন্থেরও অনুবাদ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে—কোরা ইন হেল (১৯২০), সাওয়ার গ্রেপস (১৯২১), কমপ্লিট কলেকটেড পোয়েমস (১৯৩৮), দি ব্রোকেন স্প্যান (১৯৪১)। অন্যান্য রচনার মধ্যে 'লাইফ অ্যামং দি প্যাসেইক রিভার' নামক ছোটগল্পের সংকলন এবং 'এ ভয়েজ টু প্যাগানি' নামক উপন্যাস উল্লেখযোগ্য।

নিউ ডিরেকশানস্ প্রকাশিত 'পিকচার্স ফ্রম ব্রুয়্গাল' কাব্যগ্রন্থের জন্য উইলিয়ামস্‌কে পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

* * *

মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সে মারা যান রুপার্ট ব্রুক। প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কবি রুপার্ট ব্রুক ও উইলফ্রিড ওএন খুবই অল্পবয়সে মারা যান। ১৯১৪ সালে ব্রুকের সনেটগুলি প্রকাশিত হয় তার মধ্যে—যুদ্ধ পূর্ববর্তীকালের উন্মাদনারও ওপর স্থান পেয়েছে তাঁর স্বদেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধ। ব্রুকের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনকে অবলম্বন করে ক্রিস্টোফার হ্যাসেল একখানি জীবনী রচনা করেছেন। কিন্তু হ্যাসেলও হঠাৎ একান্ন বৎসর বয়সে মারা গেছেন। মারা যাওয়ার আগে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করে যেতে পেরেছেন।

* * *

জন ফাউলস হ্যাম্পস্টেডের একটি সরকারী কলেজের ইংরাজি বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করেছেন বেশ কিছুকাল আগেও। কিন্তু জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিয়েছে তাঁর প্রথম উপন্যাস। ফাউলস 'দি কলেকটর' উপন্যাসখানি রচনা করবার পর বেশ কিছু পয়সা রোজগার করে নিয়েছেন। এখন তিনি গ্রীসের ওপর একখানি উপন্যাস লেখার কাজে ব্যস্ত।

স্বাধীনতার মূল্য
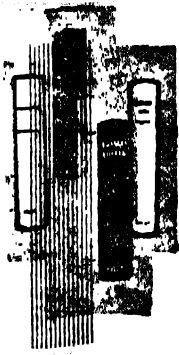
সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

আলজেরিয়ার তরুণী বিপ্লবী নায়িকা জামিলা বুপাসা। আলজেরিয়ার স্বাধীনতাসংগ্রামে ফরাসী সৈনিকেরা তার প্রতি যে অকথ্য অত্যাচার করেছে তার সবটা প্রকাশযোগ্য নয়। প্যারিসের আইনজীবী মহিলা মাদাম জিসেল হালিমিকে জামিলার ভাই কোনো রকমে জেল থেকে একটি চিঠিতে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অনুরোধ করেন ভগ্নী জামিলার পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য। মাদাম জিসেল শেষ পর্যন্ত এই দায়িত্বভার গ্রহণ করে আলজেরিয়ায় এসে বন্দিনী জামিলার সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ মারফৎ তার সুগভীর দেশপ্রীতি এবং দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় পেলেন, সেই সংগে জানতে পারলেন ফরাসী সেনাদের অত্যাচার কাহিনী।

জামিলার বয়স মাত্র বাইশ। তাদের বাড়ির সকলেই প্রায় স্বাধীনতাসংগ্রামের শহীদ। ১৯৫৯-এ আলজিয়ার্স ইউনিভার্সিটির একটি ভোজনশালায় আবিষ্কৃত হল সজীব বোমা। সেই বোমা আবিষ্কারের পর কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল কি সূত্রে বোমাটি এইখানে এল, কে রেখেছে! সন্দেহ পড়ল জামিলা বুপাসার ওপর। এই ঘটনা ঘটেছিল সেপ্টেম্বর মাসে। সেই থেকেই তার ওপর কড়া নজর পড়ল।

পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসে জামিলাদের বাড়ি সামরিক বাহিনী হামলা শুরু করল, প্রচুর সেনা ও পুলিশ নানারকম অস্ত্র নিয়ে এসে বাড়িটা তছনচ করে খানাতল্লাসী চালাল। তাদের বাড়ির লোকজনের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করল, জিনিসপত্র লুটপাট করল তারপর সংগীনের খোঁচা আর প্রহার। যাবার সময় খালি হাতে ফিরল না। জামিলাকে ধরে নিয়ে গেল।

বোমা রাখার অপরাধে তার বিচার হবে এই উদ্দেশ্যেই তাকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরের মাসে পনের তারিখের আগে তাকে আদালতে দাঁড় করানো হয়নি। এই সময়ের মধ্যে হাজতে তার ওপর চলেছে দিনের পর দিন অত্যাচার। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ফরাসী সামরিক রীতির বীভৎস উৎপাত। তাকে যে এতদিন বিনাবিচারে হাজতে আটকে রেখে নিগৃহীত করা হয়েছে কাগজে-কলমে তার কোনো প্রমাণ নেই। কারণ সেই সব কথা বেমালুম চাপা দেওয়া হয়েছে।

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে-সব আদিম যুগের পদ্ধতি আছে তার কিছু কিছু বাংলাদেশের মানুষদের জানা আছে। ব্রিটিশ আমলে বাংলার বিপ্লববাদী তরুণ-তরুণীদের এই ধরনের দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে। জামিলার বুকে জুতাসুদ্ধ লাথি মেরে তার হাড়-পাঁজরা ভাঙা হয়েছে। পোড়া সিগারেটের অংশ শরীরের অনাবৃত অংশে চেপে অঙ্গ দগ্ধ করা হয়েছে; হাত-পায়ে দড়ি বেঁধে মুখটা জলে চুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেহের অত্যন্ত নরম অংশে ব্যাটারি চার্জ করে অজ্ঞান করা হয়েছে ইত্যাদি। বাইশ বছরের তরুণী মেয়ে জামিলা, অফুরাণ তার প্রাণশক্তি তাই সে কোনো প্রকারে প্রাণটুকু রক্ষা করতে পেরেছে, নইলে বোধ হয় এই অত্যাচারেই তার দেহাবসান হত।

জামিলা বুপাসা
পিকাসো অঙ্কিত চিত্র

জামিলা সহজে ভেঙে পড়ার মেয়ে নয়, সে আবেদন করল তার প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সামরিক কর্তৃপক্ষ একজন সামরিক ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, সব বাজে কথা। উৎপীড়নের কোনোরকম লক্ষণ নেই।

এই মামলা পরিচালনা করতে এসে মাদাম জিসেল হালিমি দেখলেন যে, এই পরিস্থিতিতে ন্যায়বিচারের আশা দুরাশা। সেইখানে সকল অভিযোগের চিহ্ন ধুয়ে-মুছে বিষয়টিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টাই ছিল প্রবল।

মাদাম জিসেল হালিমি প্যারিসে ফিরে এলেন। জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে এই সব কলঙ্ককর কাহিনী প্রচার করলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কারমুক্ত মানুষ নিশ্চয়ই এই অমানুষিক বর্বরতার বিরুদ্ধে রায় দেবে। জামিলার দেশপ্রেমই তার অপরাধ, আর জামিলার প্রতি এই নিষ্ঠুর অত্যাচার করার আর একটি হেতু হয়ত আলজিরিয়ার অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের প্রাণে ত্রাস সঞ্চার করা।

মাদাম সীমঁ দ্য ব্যুভোয়াকে সভানেত্রী করে একটি কমিটি গঠিত হল। ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন। ফ্রাঁসোয়া মরি আক, ফ্রাঁসোয়া সাগ প্রভৃতি সাহিত্যিকরা এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দান করে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখলেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। এইভাবে আন্দোলন গড়ে ওঠার ফলে পৃথিবীর সুসভ্য দেশের অনেকে বিস্ময়ে, ঘৃণায় হতবাক হয়ে গেলেন। অনেকে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠিপত্র দিতে লাগলেন। কর্তৃপক্ষ কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব স্বীকার করতে রাজী নন।

জনমতের দাবী কিন্তু ক্রমশঃই প্রবল আকার ধারণ করল। শেষ পর্যন্ত ফরাসী সরকার অনুমতি দিলেন জামিলাকে প্যারিসে এনে নতুন করে ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে। জামিলা প্যারিসে এল। এখানে ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে অভিযোগের স্বপক্ষে তাঁর অভিমত দিলেন। মামলা আলজেরিয়া থেকে প্যারিসে স্থানান্তরিত করার অনুমতি পাওয়া গেল। অপরাধীদের সনাক্ত করার জন্য অবশ্য কোনো ব্যবস্থা করা গেল না, কারণ সামরিক কর্তৃপক্ষ বেঁকে দাঁড়ালেন, এবং তার পিছনে সরকারী সম্মতিও ছিল। জামিলা বুপাশার গোপন অঙ্গে যেভাবে মদের বোতল প্রবেশ করিয়ে পীড়ন করা হয়েছিল তা প্রমাণিত হয়েও তার কোনো নিষ্পত্তি হল না ফরাসী সরকারের অপকৌশলে।

ফরাসী সরকার যে-ব্যবহারই ক[illegible] ফ্রান্সের জনগণ কিন্তু এই [illegible]রে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে কাজ করেছেন। আলজেরিয়া থেকে প্যারিসে জামিলাকে আনতে ফরাসী সরকার অনুমতি দিয়েছিলেন এক শর্তে, আনুষঙ্গিক [illegible] যদি আসামী বহন করে। ফ্রান্সের লোক-

জন একদিনেই এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ফ্রাঁ চাঁদা তুলে দেন। সংবাদপত্রও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। পিকাসো স্বয়ং একটি সুন্দর ছবি এ'কেছেন জামিলার।

ফরাসী সরকারের সামরিক বাহিনীর এই পাশব অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন মাদাম জিসেল হালিমি। আর সেই বিবরণের সংগে মাদাম সীম দ্য বুভোয়ার তাঁর অননুকরণীয় ভংগীতে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত করেছেন। সব ভালো যার শেষ ভালো। এভিয়ান চুক্তির পর ১৯৬২-র ১৮ই মার্চ জামিলা বুপাসা মুক্তিলাভ করেছে, তার অভিযোগ শেষ হয়েছে। ফরাসী সরকারের এই বর্বরতা যদি ফরাসী জনসাধারণকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তারা যে অমানুষিক বর্বরতার অভিযোগে অভিযুক্ত, অনেক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতিও সেই কাজ করতে লজ্জায় নুইয়ে পড়বে। আলজেরীয়ার বিপ্লবীরা এর চেয়ে গর্হিত কর্ম করেছে বলে ফরাসী সরকার আত্মাপরাধ স্খালন করতে পারবেন না। গ্রন্থটি স্বাধীনতাসংগ্রামে যাঁরা নির্যাতিত এবং মুক্তি-আন্দোলনের সমর্থক তাঁদের কাছে মূল্যবান। *

* Djamila Boupacha: By Simone de Beauvoir and Gisele Halima (Andre Deutsch and Weidenfeld & Nicolson: Price- 25 Shillings.

ভাষাবিজ্ঞান

শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার কবি হিসাবে খ্যাত, তিনি একদা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু ছাত্রজীবনে রাজবন্দী হিসাবে ইংরেজের কারাগারে বন্দীদশায় অনেকগুলি দিন কাটাতে হয় তাই তিনি একরকম বাধ্য হয়েই বিজ্ঞানের বদলে কলাবিভাগের ছাত্র হয়ে যান। ভালোই হয়েছে, বিজ্ঞানী হিসাবে হয়ত তাঁর সন্ধান মিলত না, কলা বিভাগ তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে! অতীন্দ্র মজুমদার সম্প্রতি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি ভাষার সংজ্ঞা, উপভাষা-অপভাষা, ভাষাগোষ্ঠী, ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী, আদি ভারতীয় আর্যভাষা, মধ্য-ভারতীয়-আর্যভাষা, নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা, দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষা, জিপ্‌সীদের ভাষা, আধুনিক বাংলা উপভাষা ও বিভাষা, বাংলা শব্দভাণ্ডার, ...ত, পালি, প্রাকৃত বাংলা সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রথম পর্বে ভাষার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এমন একটি জটিল বিষয়কে অতিশয় মনোরম ভংগীতে সরল ভাষায় প্রকাশ করার লেখকের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য ভাষার ইতিহাস অংশটি যেমন মনোজ্ঞ ও কৌতুকপ্রদ, ব্যাকরণ অংশটি স্বাভাবিক কারণেই তেমন সহজ ও সরস নয়। পরিকল্পনার পূর্ণতার প্রয়োজনেই দ্বিতীয় পর্বে এই ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনা সংযুক্ত করা হয়েছে বোঝা যায়। এমন একখানি বৃহদায়তন গ্রন্থের সুপরিচ্ছন্ন মুদ্রণ আরো একটি প্রশংসনীয় বিষয়। আমরা ভাষাতত্ত্বের এমন একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা গ্রন্থের জন্য লেখককে অভিনন্দন জানাই।

ভাষাতত্ত্ব— অতীন্দ্র মজুমদার ॥ নয়া প্রকাশ ॥ কলিকাতা—ছয় ॥ সাধারণ বাঁধাই ছয় টাকা আশী নয়া পয়সা, লাইব্রেরী বাঁধাই—আট টাকা।

●

উপন্যাসে গ্রাম-পাহাড়

এই উপন্যাসটির লেখিকা নীলিমা দাশগুপ্ত ইতিপূর্বে প্রায় চারখানি গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। 'পাহাড়ি গাঁয়ের কথা' তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস। উপন্যাসটির শুরু ১৯৩০-এ আর সমাপ্তি স্বাধীনতার শেষসংগ্রামের কালে। হিমালয়ের চাম্বা এবং চৌরাসী গাঁয়ের পাহাড়ী নর-নারী এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। এই গাঁয়ের রূপসী তরুণী ফুলমু আর চৌরাসীর সর্দার পর্মা এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা। তাদের পরস্পরের ভালোবাসা এক স্বর্গীয় বস্তু। সেই স্বর্গরাজ্যে দুরন্ত দানবের মত মহাজন নাম্নু আর চা-বাগানের লালা সাহেবের লালসাসিক্ত কুৎসিত কামনা। পর্মা দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চায় তাই সে ফুলমুকেও যেন এড়িয়ে যেতে চায়। সরল পাহাড়ী মানুষদের নিয়ে এই ধরনের গল্প লিখেছেন বীরেশ্বর বসু, তাঁর 'চা-মাটি-মানুষ' নামক তিন খণ্ডের উপন্যাসে, তারপর বর্তমান লেখিকার এই বিস্ময়কর প্রচেষ্টা। লেখিকার গভীর মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান ও পাহাড়ী পরিবেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকায় উপন্যাসটি বাস্তবতার দিক থেকে নিখুঁত হয়েছে বলা যায়।

পাহাড়ী গাঁয়ের কথা —নী লি মা দাশগুপ্ত। প্রকাশক—এস সি সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রা) লিঃ। ১সি, কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা। দাম—পাঁচটাকা।

●

কাব্যের ব্যাকরণ

ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস "বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি" বিষয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন "দুটি কারণে (১) ছাত্রদের প্রয়োজনে (২) বাঙলা অলংকারের লক্ষণ, দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যার যথাযথ রূপ নির্দেশের জন্য।" গ্রন্থটিতে কাব্যলক্ষণ ও কাব্যস্বরূপ, কাব্য ও অলংকৃতি প্রথম পর্বে এবং দ্বিতীয় পর্বে শব্দালংকার, অর্থালংকার, এবং তৃতীয় পর্বে উল্লেখ্য রূপকারগণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডক্টর ক্ষুদিরাম দাসের ভাষা অতিশয় স্বচ্ছ, এবং বক্তব্য বিষয় উপস্থাপনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকায় এমন গুরুভার গ্রন্থটিও সুখপাঠ্য হয়েছে। ছাত্রদের পক্ষেই শুধু যে এই গ্রন্থ প্রয়োজনীয় তা নয়, সাহিত্য-কর্মীদের কাছেও গ্রন্থটি মূল্যবান বিবেচিত হবে।

বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস। প্রকাশক—বুকল্যান্ড (প্রা) লিঃ। ১নং শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা—৬। দাম—ছয় টাকা মাত্র।

●

প্রথম পরিচয়

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগরের গল্প, বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প, আলাপ-আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের হাস্য পরিহাস-- শরৎচন্দ্রের বৈঠকি গল্প, শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র। শরৎচন্দ্রের হাস্য-পরিহাস, প্রণয়-কাহিনী ইত্যাদি কয়েকখানি চুট্‌কি জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসের প্রয়োজনে এই জাতীয় গল্প বা গুজব কাহিনীর প্রয়োজন আছে আবার অপকারিতাও আছে। তথাপি সুখপাঠ্য সাহিত্য হিসাবে এই সব কাহিনীর সমাদরও আছে। গোপালচন্দ্র রায় অনেক পরিশ্রম করে নানা জায়গা থেকে তাঁর গ্রন্থাবলীর বিষয়বস্তু ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা করা উচিত। আলোচ্য গ্রন্থটিও কিংবদন্তী ও তথ্য-সমাবেশে সমৃদ্ধ। গোপালচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথের সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিচয় থেকে শুরু করে একুশটি অধ্যায় ১০৫ পৃষ্ঠায় শেষ করেছেন। গ্রন্থটি মূল্যবান বহু বিচিত্র তথ্য-সমাবেশে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তবে ১৬ পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ ১১ই মাঘ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এনেছিলেন এই ঘটনার উল্লেখ আছে এবং ১৮৮২-র এই বিশেষ দিনটিতে বঙ্কিমচন্দ্র কেন জোড়াসাঁকোয় এলেন সেই বিষয়ে অনেক অনুমান করা হয়েছে. কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঠাকুর-পরিবারে ১১ই মাঘটি যে একটি বিশেষ পর্ব দিন একথা লেখকের মনে হয়নি। এই জাতীয় দু-একটি শিথিল তথ্য পরিবেশিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থটি আকর্ষণীয় এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের সহায়তা করবে। ছাপা ও বাঁধাই ভালো নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—(প্রবন্ধ) গোপালচন্দ্র রায়। প্রকাশক: সাহিত্য সদন, এ-১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা— ১২। দাম তিন টাকা মাত্র।

পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার ফসল

আমরা ইতিপূর্বে 'অমৃত' পত্রিকার এক সংখ্যায় এই গ্রন্থাবলীর একটি খণ্ডের পরিচয় দান করেছি। সম্প্রতি এই গ্রন্থের অপর দুটি খণ্ড আমাদের কাছে এসেছে। একত্রে তিন খণ্ড এই বিরাট গ্রন্থ পাঠ করে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় পণ্ডিতপ্রবর ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন "যে স্বামী সত্যানন্দ মহারাজের রচিত গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করতে অতিশয় সংশয় ও দ্বিধা বোধ করছি।" কথাটি সত্য, স্বামীজী যে অপূর্ব অধ্যবসায়সহকারে দর্শনের মত এক জটিল শাস্ত্রের এমন মনোজ্ঞ পরিচয় রচনা করেছেন তা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। প্রথম খণ্ডে আছে Epistemology— এই বিভাগে বৈদিক যুগ, উপনিষদের যুগ, চার্বাক দর্শন, জৈন জ্ঞানকোষ, বৌদ্ধদর্শন, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, রামানুজীয় মতবাদ, মাধবাচার্যীয় মত, গীতার তত্ত্ব, ভারতীয় দর্শনের সাধারণতত্ত্ব, গ্রীক-দর্শন—সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল থেকে মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদদের মতবাদ সরলভাবে আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বেকন, স্পিনোজা, লাইবনিৎস, হিউম, কান্ট, হেগেল, বের্গসঁ, রাসেল, জীনস, জন ডিউই, শ্রীরামকৃষ্ণ, অভেদানন্দ প্রভৃতি আধুনিক চিন্তানায়কদের মতবাদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে—ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বর-ধারণা, মানব ও দেবতার সম্পর্ক, দ্বৈতবাদ এবং সেই সঙ্গে রুশ, চীন, ইসলামী, সুফীবাদ, শিখ সম্প্রদায়ের দর্শন, স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন প্রভৃতি আলোচিত, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকৃতি ও আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নানা মুনির নানা মত কিন্তু বর্তমান কাল প্রমাণ করেছে যে, যত মত তত পথ, তাই সমন্বয়সাধন করে সকল মতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলাটাই বাস্তববোধের প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় দ্বেষ ও ঈর্ষার দিন অতিক্রান্ত হবার কাল এসেছে, একথা বলেছেন ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। এখন সকল মত সহিষ্ণুতার সঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন, এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী সত্যানন্দ, যিনি গৃহস্থ জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তিনি এই বিরাট গ্রন্থমালা রচনা করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় ক্ষুদ্র পরিসরে দান করা সম্ভব নয়, যাঁরা এই বিষয়ে আগ্রহশীল তাঁদের এই মহা-গ্রন্থ পাঠ করার জন্য আমরা অনুরোধ করি। এই গ্রন্থ-রচনার মধ্যে পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। উপযুক্ত প্রমাণপ্রয়োগে যে সহজ এবং অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে World Philosophy রচিত, তা যিনি দর্শনের ছাত্র নন অথচ দর্শনশাস্ত্রে অনুরক্ত তাঁর কাছেও বক্তব্য ও বিশ্লেষণ সহজ এবং সরল মনে হবে।

গ্রন্থগুলির ছাপা এবং বাঁধাই গ্রন্থের মর্যাদানুযায়ী হয়েছে।

World Philosophy — (A synthetic study) **স্বামী সত্যানন্দ। প্রকাশক — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরাহনগর, কলিকাতা—৩৬। দাম প্রথম খণ্ড ৯, টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড ৯, টাকা, তৃতীয় খণ্ড ৭·৫০ নয়া পয়সা।**

●

প্রখ্যাত কবির মননধর্মী উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য কবি হিসাবেও যেমন শক্তিমান, মননধর্মী উপন্যাস রচনাতেও তাঁর তেমনই কৃতিত্ব। তাঁর রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ এই যে, সস্তা প্যাঁচে পাঠকের মন ভোলাতে তিনি রাজী নন, তাঁর উপন্যাস তাই হাটে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্রই সমাদৃত হতে পারে না। তথাপি বাংলাদেশের পাঠকসমাজের যথেষ্ট বোধশক্তি আছে, তাই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস নির্বাচিত পাঠকগোষ্ঠীর কাছে মূল্যবান বিবেচিত হয়। আলোচ্য উপন্যাস 'প্রতিধ্বনি'ও একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক, সাহিত্যিকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য তাঁর আছে, তিনি মধ্যবয়সী এবং আত্মীয়বান্ধবহীন। এ ক র্ র ক ম নিরালায় মনন ও চিন্তনেই তাঁর দিন কাটে। সাহিত্যে আবিলতায় তিনি শঙ্কিত এবং সৎ এবং মহৎ সাহিত্য রচনায় তিনি বিশ্বাসী। কলরব-মুখরিত খ্যাতির অঙ্গনে তাঁর স্থান নেই, মাত্র কয়েকজন অন্তরঙ্গ নিয়ে সাহিত্য-সাধনায় দিন যাপন করেন। ভক্ত নেই, নেই রজনীগন্ধার উপহার। হঠাৎ এমন সময় এল মিত্রা বোস, তার ইচ্ছা হয়েছিল লেখককে স্বচক্ষে দেখার। এইখানেই কাহিনীর শুরু। বয়সের দরুণ অরিন্দমও খানিকটা মোটা, তাঁর কোনও বই-এর চল্লিশটা এডিশন হয়নি। একা ভৃত্যসহ ফ্ল্যাটে থাকেন। সৎ সাহিত্যিক অরিন্দম। ত্রিদিব মিত্তির একটা উপন্যাসের প্লটগুলো লিখে দেয় গল্প করে আর সিদ্ধার্থ ঘোষ উপন্যাসের দুটো অধ্যায় গল্প বলে চালায়, অরিন্দম তা পারে না। টিচার মিত্রাকে ভালো লাগল অরিন্দমের, তার দেওয়া রজনীগন্ধা তিন দিন থাকে, সে এলে ঘরটা ভরা-ভরা থাকে। কিন্তু শেষে মনে হয় অরিন্দমের মিত্রা যদি মরে ভালো। সেই মিত্রা সাত দিন এলো না। ম্যানিঞ্জাইটিসে মারা গেল খবর এল। অরিন্দমের মনে হল আমারই ইচ্ছার জোরে মিত্রা মরেছে, তাই এ্যানজাইনা থাকা সত্ত্বেও বিষ-বড়ি খেয়ে সেও মরে। মিত্রার সঙ্গে সহমরণ বলা যায় একে। এখানেই কাহিনী শেষ। সোজা পড়ে গেলে একটি পরিপূর্ণ নিটোল কাহিনী মনে হবে, কিন্তু 'প্রতিধ্বনি' তা নয়, এক নিঃসঙ্গ মানুষের জীবনে এসেছিল বসন্তের বাতাস, আর সেই বসন্তশেষে সহসা মনে হল—কখন বসন্ত এল এবার হল না গান। অরিন্দম তাই আত্মহত্যা করে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এক প্রতীক সৃষ্টি করে এই কাহিনীর মধ্যে যে প্রতীক-ধর্মী বক্তব্য পেশ করেছেন তার মধ্যে যুগ-যন্ত্রণার পরিচয় সুস্পষ্ট।

গ্রন্থটির ছাপা এবং প্রচ্ছদ সুরুচি-সঙ্গত।

প্রতিধ্বনি—(উপন্যাস) সঞ্জয় ভট্টাচার্য। প্রকাশক—বসু চৌধুরী, ৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম তিন টাকা।

●

অতীতের কাহিনী

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের এই নামের উপন্যাসের প্রথম পর্ব। দেশবিভাগের আগেকার বাংলাদেশের সুমধুর চিত্র লেখক এঁকেছেন। কয়েকটি চরিত্র অতিশয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল তার চিত্রও এই উপন্যাসের পাতায় পাওয়া যায়। রচনা-রীতি প্রাচীন হলেও উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। ভাষা সরল এবং সুন্দর।

যে নদী মরুপথে— (উপন্যাস) যোগীলাল হালদার। রামলাল পার্বলিসিং হাউস, ১০৪বি, দেবেন্দ্র-চন্দ্র দে রোড, কলিকাতা—১৫। দাম তিন টাকা।

●

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

গঙ্গোত্রী—(৩য় বর্ষ—১ম সংখ্যা)—কবিতা-সংকলন। উপদেষ্টা দিনেশ দাস, সম্পাদক—দুর্গাদাস সরকার। ৪।১ আফতার মস্ক লেন। কলিকাতা—২৭। ৫০ নয়া পয়সা মাত্র।

"গঙ্গোত্রী কবিতা সংকলনটির এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি পাণ্ডুলিপি, সুশীল রায়, ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল, শোভন সোম, শ্যামল বসু, কেতকী কুশারী, বিনোদ, রেবা স্বদেশরঞ্জন দত্ত প্রভৃতি তরুণ ও নবীন কবির কবিতা, কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধ, দীপংকর ঘোষের আলোচনা, মুরারি ঘোষের বিদেশী সাহিত্য ও সান্ত্বনু দাস ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সমালোচনা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পত্রিকাটির আয়তন ক্ষুদ্র হলেও বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রশংসনীয়।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কবির গান

(৮)

ভোলা ময়রা

আমি ময়রা ভোলা ভিয়াই খোলা
সর্দি গর্মি নাহি মানি (ওগো)।
ফুরাইলে বারো মাস ষড়্‌ঋতুর হয় নাশ
কেবল এই কথাটাই জানি (ওগো)।।
শীত এলে লেপ লই গর্মি এলে ঘোল মই
যাহা কিছু হাতে আসে কবির নেশায় দিই ঢালি।
শরতে হেমন্তে বৈশাখে বসন্তে
ভোলার খোলা নহে খালি।।
কাল মেঘে বর্ষাকালে বক উড়ে দলে দলে,
ময়ূরের পেখমে বাহার।
ষড়্‌ঋতু বারমাসে মাঘের মেঘের শেষে
পেটের দায়ে জাতির ব্যাপার।।
নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস,
পূজা এলে পুরী মিঠাই ভাজি।
বসন্তের কুহু শুনে ভক্তির চন্দন সনে
মনফুল রামচরণে করি রাজি।।
তবে যদি কবি পাই, হটে কভু নাহি যাই,
হোক্ বেটা যতই মন্দ।
জাহাজ ডোঙ্গা সোলা নাও যাহাতে মিলাইয়া দাও
ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ।।

এই গানটিকে ভোলা ময়রার একটি সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত বলা চলে। ভোলা যে ময়রা ছিলেন এবং জাত-ব্যবসার সাহায্যেই তাঁর জীবিকা চলত এটা শুধু এই গানই নয় অন্যান্য সূত্রেও জানা যাচ্ছে। পেশা খোলা ভিয়ান, কিন্তু নেশা কবির গান। জগতে সবার ক্ষেত্রেই যা হয়েছে ভোলাও তার ব্যতিক্রম নয়। পেশার প্রয়োজন যতই বেশী হোক না কেন নেশার টান তাকে ছাড়িয়ে গেছে। বৃত্তি বলে না নেওয়ায় কবির গান জীবিকার দিক থেকে তাঁর সম্পূর্ণ সহায়ক হয়নি। বৈষয়িক বিচারে এ-গান তাঁর পক্ষে বরং ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছিল। গানের আকর্ষণ বেশী হওয়ায় দোকানের কাজে স্বভাবতই গাফলতি হত। তার জন্যে দুঃখ পেতে হয়নি তা নয়। কিন্তু সে [illegible] নিষ্ফল হয় নি। পূজায়-পার্বণে পুরী মিঠাই সেদিন আরও অনেকে ভেজেছিল কিন্তু বাগবাজারের আর কজন ময়রাকে আমরা মনে রেখেছি?

বাগবাজারে ভোলার বাড়ি ছিল বটে কিন্তু বাগবাজারেই তাঁর জন্ম হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কেউ কেউ বলেন, বাগবাজারে নয়, গুপ্তিপাড়ায় তাঁর জন্ম। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদের শেষের দিকে বা চতুর্থ পাদের গোড়ায় তাঁর জন্ম হয়। মৃত্যু হয় ১৮৫০ এর কাছাকাছি কোনো সময়ে।

ভোলা পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন। তারপর নিজের চেষ্টায় কিছু সংস্কৃত শেখেন, হিন্দীতেও কিছু জ্ঞান ছিল।

কবি হিসাবে ভোলার নামডাক খুব হয়েছিল তার কারণ এ নয় যে তাঁর রচনা সাহিত্যগুণে খুব উচ্চ পর্যায়ের ছিল। আসলে তিনি যে বড় বাঁধনদার ছিলেন এমন পরিচয় পাই না। তাঁর রচিত বলে যে গান সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যাও বেশী নয়। তিনি হরু ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এবং প্রথম যখন দল প্রতিষ্ঠা করেন তখন গুরুর গান দিয়েই দল চালান। তারপরে তিনি অন্যান্য বাঁধনদারের সাহায্য নিতেন বলে জানা যায়।

তাঁর খ্যাতির মূলে ছিল রঙ্গ-রসিকতা এবং প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব। আরও একটি গুণ ছিল তাঁর স্পষ্টভাষণ। তাঁর নামে যে গানগুলি প্রচলিত আছে এবং প্রখ্যাত হয়েছে, তাদের মূলে আছে এই গুণগুলিই। ভোলার জীবনেতিহাস থেকে বহুলপ্রচলিত একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই তাঁর কবিপ্রকৃতির আসল পরিচয়টি পাওয়া যাবে।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় জাড়া নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানকার ব্রাহ্মণ জমিদার রায়বাবুদের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির অভাব নাই। একবার এই জমিদারবাড়িতে গাওনার জন্যে ভোলার আহ্বান এল। প্রতিদ্বন্দ্বী যজ্ঞেশ্বর ধোবাও সেকালে নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। তিনি চন্দ্রকোণার লোক, চন্দ্রকোণাতেই তাঁর দল। চন্দ্রকোণাও মেদিনীপুর জেলায়, ঘাটাল এবং চন্দ্রকোণার মধ্যে দূরত্বও বেশী নয়। কাজেই রায়বাবুরা যজ্ঞেশ্বরের অপরিচিত ছিলেন না।

সৌজন্যের খাতিরে হয়তো পুরস্কারের আশাও একটা কারণ—যজ্ঞেশ্বর গাওনার শুরুতে রায়বাবুদের একটু স্তুতিবাদ করেন। জাড়াকে বৃন্দাবন এবং জমিদারবাবুদের কৃষ্ণবিষ্ণুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। গানের আসরে নায়ক অর্থাৎ গৃহকর্তার প্রশস্তি কীর্তন করা চিরাচরিত রীতি, কেবল কবিগান নয় সকল রকম গানের আসরেই এই রীতি আবহমান কাল চলে আসছে। সুতরাং যজ্ঞেশ্বরের তেমন কোনো অপরাধ হয়নি। কিন্তু ভোলার মনে হল যজ্ঞেশ্বরের একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। চাটুকারিতারও একটা সীমা আছে। তাঁর ধারণা হল যজ্ঞেশ্বর সে সীমা লঙ্ঘন করেছেন। তখন ভোলা যে গান ধরলেন কবিওয়ালাদের প্রসঙ্গে সে গান প্রায়ই উদ্ধৃত হয়ে থাকে। সেটা এই:

কেমন করে বললি যগা জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা চৌদিকে তার বাঁশের বন।
কেমন করে বললি যগা জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।।
যগা, কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড কোথারে তোর রাধাকুণ্ড
ওই সামনে আছে মাণিক কুণ্ডু করগে মুলো দরশন।
কেমন করে বললি যগা জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।
ওরে বেটা কবি গাবি পয়সা লবি খোসামুদি কি কারণ।
কেমন করে বললি যগা জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।।

কিন্তু এ-গানের এইখানেই শেষ নয়। মনে হয় রাগটা প্রতিদ্বন্দ্বী কবির উপরেই নয়, আসল রাগটা রায়বাবুদের উপরেই। রাগের কারণটা কোথায় আজ তা জানবার উপায় নেই। সন্দেহ হয় টাকাপয়সা নিয়ে কিছু একটা গোলমাল হয়েছিল। গানের শেষাংশ থেকে সেই অনুমান সমর্থিত হয়। যজ্ঞেশ্বর তৎকালীন জমিদার রায়বাবুকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই জমিদারবাবুর নামটি কি তা জানবার চেষ্টা করেছিলাম। জোড়ার রায়বাবুদের বর্তমান বংশধর প্রবীণ দেশকর্মী শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন,—শম্ভু রায়, উমেশ রায় আর ঈশ্বর রায় এই তিন ভাইয়ের মধ্যে কেউ হবেন। এই তিন ভাই সম্পর্কে কোনো কবিওয়ালা রচিত একটি ছড়ারও তিনি উল্লেখ করলেন। ছড়াটি এই :

বাবু তো বাবু শম্ভু আর বাবু ঈশ্বর রায়।
উমেশ শুটকে বাবু বসে আছে কেদারায়।

কোন্ কবির রচনা তা তিনি বলতে পারলেন না। ভোলার রচনা যে নয় সেটা কতকটা বোঝা যায়। প্রথমোক্ত গানের শেষাংশটি পড়লে আর সন্দেহই থাকে না। সেটি এই :

কৃষ্ণচন্দ্র কি সহজ কথা, কৃষ্ণ বলিস কারে।
সংসার সাগরে যিনি (যগা) তরাইতে পারে।।
বাবু তো বাবু লালাবাবু কলকাতাতে বাড়ী।
বেগুন পোড়ায় নুন দেয় না এ বেটারা তো হাড়ী।।
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায় মুফতের মধু অলি।
মাপ করগো রায় বাবু দুটো সত্য কথা বলি।।
যগা ধোবা খোসামুদে অধিক বলব কি।।
তপ্ত ভাতে বেগুন পোড়া পান্তাভাতে ঘি।।

ভোলার এই স্পষ্টভাষণ এবং শাণিত ব্যঙ্গোক্তির কথা ভেবেই বোধহয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন—"বাংলাদেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া বড় আবশ্যক।"

অনতিপ্রখর সরল সরস আর একটি গান উদ্ধৃত করছি—

পানকে তাম্বুল বলে পর্ণ সাধুভাষা।
বরুজে বিরাজ করে চাষার বড় আশা।।
বুড়োবুড়ী ছেলেমেয়ে যুবক যুবতী।
পান পেলে মন খুলে বাড়ায় পীরিতি।।
মোষের মত মুন্সীবাবু মসীর ন্যায় কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙায় চেহারাখানা ভালো।।
পূর্বজন্মের পুণ্যফলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া বাসীমড়া যার পানের কড়ি নাই।।

নীলুঠাকুরের নাম পূর্বে দু-একবার করেছি। নীলু, তাঁর ভাই রামপ্রসাদ আর ভোলানাথ এঁরা তিনজনই হরু ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। নবকৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর পর হরু ঠাকুর নিজের দল তুলে দিলে ভোলানাথ নিজেই একটি দল করলেন আর নীলু ও রামপ্রসাদ দুজনে মিলে আর একটি দল গড়ে তুললেন। শোনা যায় ভোলানাথের প্রতি হরুর একটু বেশী টান ছিল। নীলু ও রামপ্রসাদ এটা সইতে পারতেন না। নীলুর দলের সঙ্গে ভোলানাথের লড়াই হলে সেটা মাঝে মাঝে টের পাওয়া যেত। সুবিধে পেলেই নীলু ভোলানাথকে ঠোক্কর দিতে ছাড়তেন না।

একবার ভোলা ময়রা কোনো গানের আসরে নিজের গানের গুরু হরু ঠাকুরকে বন্দনা করে গান আরম্ভ করলে নীলু ঠাকুর এই গানটি ধরেন—

সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর
তুই পাষণ্ড নচ্ছার।
ভজিস ঢেঁকি বলিস কিনা গৌর অবতার।
কি সে করিস দ্বেষ নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ
বুঝিস না সুক্ষ্ম ও মূর্খ দিস কোন ঠাকুরের ঠেস।
তুই কাঠের ঠাকুর টটে তুলে দিছে করিস পাড়া জুর।
সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর।
যিনি বাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা করেন ব্রজপুর।
যিনি অভয় চরণ শিরে ধরে জীব তরাচ্ছেন গয়াসুর।
যে রজক ছেদন করে করে ধ্বংস করলে কংসাসুর
সেই হরি কি তোর হরি ঠাকুর।

ভোলা এই আক্রমণের কি জবাব দিয়েছিলেন তা আর জানবার উপায় নেই—কিন্তু এই গান থেকে দুটি জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে। এক,—হরু ঠাকুর এবং ভোলা ময়রার মধ্যে একটি স্নেহ-ভক্তির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। দুই,—ভোলা ময়রাকেও দু-কথা শোনাতে পারে এমন কবিও এক-আধ জন বর্তমান ছিলেন। তবে একথা অবশ্যই মানতে হবে যে প্রতিপক্ষেরই পরাজয় ঘটেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। সেই কারণেই ভোলার জনপ্রিয়তা এত বেড়েছিল। লোকের মুখে মুখে তাঁর সুনাম শোনা যেত। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, তাঁর কথায় বার্তায় সেটা বোঝা যেত। এই প্রসঙ্গে তাঁর নামে প্রচলিত একটি ছড়া উদ্ধৃত করি :

ভোলা যদি ধরে বোল তিনু নুটো ধরে ঢোল
আসরে বসিয়া যদি হরু দেন কোল।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবে হন অগ্রসর
নিস্তব্ধ হইয়া যায় মানুষের গোল ।।

ছড়াটিতে শুধু আত্মপ্রত্যয় নয় গুরুভক্তির পরিচয় মিলছে।

হরুর নামে কয়েকটি সরস ছড়া সেকালে লোকমুখে প্রচলিত ছিল। তার একটি এই রকম :

ময়মনসিংহের মুগ ভাল খুলনার ভাল খই।
ঢাকার ভাল পাতক্ষীর বাঁকুড়ার ভাল দই।।
কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল মালদহের ভাল আম।
উলোর ভাল বাঁদর পুরুষ মুর্শিদাবাদের জাম।।
রংপুরের শ্বশুর ভাল রাজশাহীর জামাই।
নোয়াখালির নৌকা ভাল চটগ্রামের ধাই।।
দিনাজপুরের কায়েত ভাল হাওড়ার ভাল শুঁড়ি।
পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভাল ফরিদপুরের মুড়ি।।
বর্ধমানের চাষী ভাল চব্বিশ পরগণার গোপ।
গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভাল শীঘ্র বংশ লোপ।।
হুগলির ভাল কোটাল লেঠেল বীরভূমের ভাল ঘোল।
ঢাকের বাদ্য থামলেই ভাল হরি হরি বোল।।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-কম, বি-কম ক্লাসে যে Commercial Geography পড়ানো হয়,—বোধিনীকারেরা যার বাংলা নাম দিয়েছেন বাণিজ্যিক ভূগোল—এই ছড়াটিকে তার একটি ব্যবহারিক পাঠ বলে মনে করা যেতে পারে।

জাতিবিচার সম্বন্ধে তাঁর নামে আর একটি সুন্দর ছড়া আছে। বহিরঙ্গে হাস্যাবিদ্রূপ থাকলেও ছড়াটির মধ্যে যে একটি গভীর তত্ত্বানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় সেটি সেদিনকার শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। আজকের পাঠকও তাকে নিতান্ত উপেক্ষা করতে পারবেন না।

বামুন বলে আমি বড় কায়েত বলে দাস।
বদ্যি বলে ক্ষত্রি আমি ঢাকা জেলায় বাস।।
যুগী বলে যোগী আমি চাষা বলে বৈশ্য।
শূদ্রেতে শূদ্রত্ব ছাড়ে যথা কালীঘাটের নস্য।।
বলে উগ্র নহি শূদ্র রাখি তলোয়ার।
হলে রাত্রি উগ্র ক্ষত্রি ভয়ে পগার পার।।
আমি ময়রা ভোলা ভিয়াই খোলা, ময়রাই বার মাস
জাতি পাতি নাহি মানি ওগো কৃষ্ণপদে বাস।।

ওয়াল্ট হুইটম্যানের অনুসরণে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দিনের ঝল্‌কানি দূরে গেলে
শুধু তিমির, ঘোর তিমির নিশীথিনী
আমার চোখে দেয় ধ্রুবতারার
আলো জ্বেলে।

ঢাকের রাজসূয় বাদ্য, কীর্তন,
যাত্রা আসরের সখীরা যায় যবে
তখন নীরবতা, নীরব দশ দিক
আমার আত্মাকে মন্ত্র করে—শুধু তখনই জানি
হবে, জয় হবে॥

অন্ধকারে

নির্মলেন্দু রক্ষিত

নদী তার সব ব্যথা নিয়ে যায় সাগরের কাছে;
মেঘে মেঘে বেদনার বোঝা।
জীবনের মানে কিছু জানি নাক আছে কি না আছে,
অন্ধকার ঘুরে ঘুরে শুধু তারে মিছিমিছি খোঁজা।
হৃদয়ের গিঁটগুলো যত খুলে ভাবি : এই শেষ।
সোজা কথাগুলো আজ কুহেলীর কোন্ দেশে হয় নিরুদ্দেশ।

হাজার বছর তাই তিলে তিলে শেষ হয়ে যায়—
তুমিও তো ভুলে গেলে পুরোনো শপথ।
অন্ধকারে জীবনের ছায়ায় ছায়ায়
আজো তাই ঘুরে মরি ঘুমঘুম কুয়াশার পথ।
মনে হয় বারে বারে যন্ত্রণাই বুঝি সেই প্রেম;
সেই প্রেমে পুজো করে তোমারেই বিলিয়ে এলেম।

নদী তার সব ব্যথা নিয়ে যায় সাগরের পানে;
মেঘে মেঘে বেদনার ভার।
সারা দিন সারা রাত বিষণ্ণ কি সুর বাজে কানে
প্রণয়ের বাতি নেবে; চারিদিকে আদিগন্ত ম্লান অন্ধকার।
বেদনার ধূপগুলি জেবলে জেবলে আজ তাই শুধু মনে হয় :
হিসেবে হয় নি শেষ আমাদের সে-খেলার জয়-পরাজয়॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লোকে বলে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।' কথাটা যথার্থ। বাঘ এত ভয়াবহ এবং ক্ষিপ্র জন্তু যে তার সামান্যতম স্পর্শেও মানুষের একাধিক, এমন কি বহু জায়গায় জখম হতে পারে। তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু না হলে বাঘের আঘাত সহজে সারে না—দূষিত বা সেপটিক হবার সম্ভাবনা থাকে। কখনো কখনো সে আঘাত থেকে জলাতঙ্ক বা হাইড্রোফোবিয়া রোগও দেখা দেয়।

গল্প বলেছিল। যারা সে খেলা দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিল, তারা তাদের বিশ্বাসপ্রবণতার ফলে আরো কিছুটা রং চড়িয়ে আরো মজার গল্প বানিয়েছিল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যেসব গল্প বাজারে চালু হয়েছে, তার সঙ্গে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। আর এই কারবারটি সম্ভব ও সহজ হয়েছিল তখন দেশে বিশেষ কোনো পত্র-পত্রিকা না থাকায়। যাও-বা ছিল, তাতে শক্তিচর্চার ঘটনাবলী প্রাধান্য পেত না। মাঝে মাঝে যেসব বিবরণ বেরোত, তা বেরোত একান্ত অবহেলায় সংক্ষিপ্ত আকারে।

সে সংবাদের সত্যাসত্য সম্পর্কে কারো কোনো আগ্রহ থাকত না। বহু সময়ে অন্যের দেওয়া সংবাদকেও পত্রপত্রিকা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করত, আজো তা হয়। পরবর্তীকালে শক্তি সম্পর্কে ধারণাহীন লেখকরা গল্পবাগীশ লোকদের প্রচারিত গল্পগুলিকেই মহা সমারোহে নিজ নিজ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। আমাদের দেশে আজও এমন লোকের অভাব নেই, যাঁরা ছাপা সংবাদকে বেদবাক্য বলেই মনে করেন। বিনা দ্বিধায় বলা যায়, এ জন্য আমাদের দেশের অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতাই দায়ী।

কিন্তু শুধু বাঘ নয়, সংসারে এমন কোনো জন্তু আছে কিনা সন্দেহ, যাকে মানুষ তার বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার সাহায্যে পোষ মানিয়ে ভৃত্যের সামিল করতে পারে না। তাই উপযুক্ত ট্রেণিং এবং টেমিংয়ের বলে বাঘকে প্রত্যহ সার্কাসে হাজার হাজার লোকের সামনে নিছক ময়দাডলা করলেও বাঘ মুখ বুজে তা মেনে নেয়। মেয়ে-খেলোয়াড়দের কোমল দেহ-বল্লরী দেখলেও তাদের জিবে জল ঝরে না, পরন্তু আজ্ঞাবহ হয়ে তার নির্দেশ মতো সব কাজ করে। কিন্তু আশ্চর্য এই, এক শ্রেণীর মানুষ মানুষের এই বিস্ময়কর শক্তিকে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। তাই, সাধারণ মানবসমাজের অসাধারণ পুরুষ শ্যামাকান্ত কিংবা স্যাণ্ডোকে তাঁরা অলৌকিক শক্তিধর বানাতে চাইছেন। কিন্তু শ্যামাকান্ত বা স্যাণ্ডো কদাপি বাঘ বা সিংহকে কায়িক শক্তিতে পরাভূত করার কথা কল্পনাও করেন নি। প্রথম শ্যামাকান্তর বিষয়েই বলি।

বস্তুতঃ শ্যামাকান্তর শক্তি, বিশেষ করে বাঘ লড়াই, সম্পর্কে যত উদ্ভট কাহিনী প্রচারিত হয়েছে, পৃথিবীর আর কোনো বলী সম্পর্কেই তেমন হয়নি। তার কারণ, তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আমাদের দেশে বাঘের খেলা দেখিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ তা ভয়-বিস্ফারিত নয়নে দেখেছিল, এবং বিস্ময়ের আতিশয্যেই সে তাতে খুশি-মতো রং ঢেলে নতুন করে অন্যের কাছে

যে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই, সে বিষয়ে লিখতে গেলে কেমন হাস্যকর অবস্থা হয়, আমাদের দেশে সেরূপ নজিরের অভাব নেই। আমি এখানে এরূপ একখানা বই-এর অংশবিশেষ উপস্থিত করব। এ বই বাংলাদেশের ব্যায়ামবীরদের জীবনী সম্বলিত ছোটদের উপযোগী ভাষায় রচিত, প্রথম প্রকাশ, ১৯২৭ অব্দে। সম্ভবতঃ উদ্[illegible] ও আজগুবি গল্পের জন্যই বইখানা রূপকথার বইয়ের মতো বিক্রি হয়েছে খুব এবং তাকে ছাপাতেও হয়েছে বার বার। দুর্ভাগ্য এই, যাঁদের কথা বইতে ছাপা হয়েছে, তাঁরা কেউ রূপকথার নায়ক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সবাই রক্ত-মাংসে গড়া বাংলাদেশের মানুষ,

আমাদের একান্ত পরিচিত এবং প্রিয় ব্যক্তি। এ গ্রন্থের লেখককে সাধারণভাবে মূর্খ বলারও উপায় নেই, কেননা তাঁর নামের শেষে এম-এ ডিগ্রী বসান আছে। বাঘের খেলার পূর্বে শ্যামাকান্তর শক্তি সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন আগে সেই কথার উল্লেখ করে নিই। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন,—

একবার শ্যামাকান্ত ঢাকায় ১৪ মণ ওজনের একটা কামানের ন্যায় বিপুলাকৃতি লৌহখন্ডকে মাথার ওপর তুলে বারকয়েক ভেঁজে সবাইকে বিস্মিত করেছিলেন।

কিন্তু ১৪ মণ ভার কি বস্তু এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান পুরুষও সে ভারকে আজ পর্যন্ত মাথার ওপর তোলা দূরের কথা, কোমর পর্যন্ত তুলতে পেরেছেন কিনা, সে সম্পর্কে লেখকের সামান্যতম জ্ঞানও নেই। কথাটা একেবারে অলীক এবং সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব কল্পনা। যুগের পর যুগ সংহত সাধনায় মানুষের কায়িক ক্ষমতা বেড়ে চলেছে এবং তারই ফলে পৃথিবীর সর্বজয়ী বীর উরি ভ্লাসোভের (Yuri Vlasov) পক্ষে ৪৪০ পাউন্ড (প্রায় ৫ মণ ১৫ সের) দুহাতে মাথার ওপর তোলা (Two Hands Clean Jerk) সম্ভব হয়েছে। কিন্তু শ্যামাকান্তর যুগে ভূমন্ডলের সেরা বলী আপোলোন (Apollon), লুইস্ শির (Louis Cyr) কিংবা কার্ল স্‌ভাবোদাও (Karl Swaboda) তা ভাবতে পারতেন না।

আর এক জায়গায় লেখক লিখেছেন, তাঁর মুষ্টিতে এত জোর ছিল যে দেয়ালের গায়ে ঘুসি মারলে চুন-সুরকি ও ইঁটের গুঁড়ো ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ত।

কিন্তু লোহার হাতুড়ীর সাহায্য ছাড়া যে দেয়ালের চুন সুরকি খসান যায় না, মানুষের মুঠোর ঘায়ে তা কি করে সম্ভব হতে পারে? অবশ্য দেয়াল যদি বালির কাজ করা হয় এবং তাতে যদি নোনা ধরে ঝুরঝুরে হয়ে যায়, তবে ঘুসি মেরে তার অংশবিশেষকে খসান যায় বটে। কিন্তু এখন দেয়াল খসানর জন্য শ্যামাকান্তর মতো একজন সম্মানিত বলবান পুরুষকে প্রয়োজন হয়েছিল কেন, অনুধাবন করা কঠিন। রূপকথার বইতে যে কথা বলা যায়, এ যুগের একজন মান্যবর ব্যক্তির সম্পর্কে সে ধরনের কাহিনী প্রচার [illegible] আর যাই হোক, সে ব্যক্তির প্রতি যে সম্মান দেখান হয় না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্যই, শক্তি সম্পর্কে ধারণাহীন ব্যক্তির পক্ষে যে-কোনো শক্তির গল্প, তা যতই অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য হোক, প্রচার করা অসম্ভব নয়। কিন্তু এই বইখানিতে অন্য রকমের অমার্জনীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিও যথেষ্টই আছে। যেমন—

শ্যামাকান্তকে অ-মানবিক শক্তিধর প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অন্যতম মহামল্ল পরেশনাথ ঘোষকে তিনি নামিয়ে দিয়েছেন। বাঘের থাবার জোর কত, সেকথা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, যেসব বাঘকে শ্যামাকান্ত কায়িক শক্তির বলে সব সময় নাড়াচাড়া করতেন, একদিন তারই একটা বাঘ, ভাওয়াল রাজার দেওয়া 'গোপাল' নামক বাঘটা, চার মণ ওজনের পালোয়ান পরেশনাথকে এক চাপড়ে কাৎ করে ফেলেছিল। কিন্তু সেই চাপড়ে তাঁর আর কোনো ক্ষতি হয়েছিল কিনা লেখক বলেন নি। এ গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি হয়তো শ্যামাকান্তকে পরেশনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলতে চেয়েছেন! কিন্তু শক্তিজগৎ সম্পর্কে যাঁরা দুরস্ত তাঁরা সবাই জানেন, শক্তির ক্ষেত্রে শ্যামাকান্ত তো বটেই, তখনকার অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী মল্লরাও অনেকেই পরেশনাথের সমকক্ষ ছিলেন না। বস্তুতঃ কুস্তিবীর হিসাবে শ্যামাকান্তর কীর্তি কখনো উল্লেখযোগ্য ছিল না।

কিন্তু সবচেয়ে মজা এই যে, লেখক শ্যামাকান্তকে বড় করতে গিয়ে স্বয়ং তাঁর চরিত্রেও মহা কলঙ্ক আরোপ করে বসেছেন। কেননা, তিনি বলেছিলেন, সান্ডো যখন এদেশে আসেন, তখন শ্যামাকান্ত তাঁকে কুস্তিতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। সান্ডো সে আহ্বানে সাড়া দিতে সাহসী হননি। কিন্তু সান্ডোর সংগী, প্রায় সান্ডোরই সমকক্ষ পালোয়ান এলমো (Elmo) যখন শ্যামাকান্তকে মুষ্টিযুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেন, তখন শ্যামাকান্ত সে আহ্বান গ্রহণ করেন। শেষে কলকাতার গড়ের মাঠে তাঁদের সেই মুষ্টিযুদ্ধে তিন মিনিট খেলার পরেই শ্যামাকান্ত সাহেবকে এমন আছাড় মারেন যে ১৫ মিনিট তাঁর চৈতন্যই হয়নি। মেম-সাহেবরা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'That's illegal.' সংগে সংগে শ্যামাকান্ত দম্ভভরে বলে উঠলেন, 'He can stand the shock of being thrown away. But from the standpoint of a boxer, I purposely avoided the calumny of being a murderer."

প্রায় ২৫।২৬ বছর বা তারো আগে তখনকার কোনো কোনো পত্র-পত্রিকায় আমি এই উদ্ভট কাহিনীর প্রতিবাদ করে জানিয়েছিলাম যে, সান্ডোর এদেশে আসার বেশ কিছুকাল পূর্বেই শ্যামাকান্ত সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। অতএব, শ্যামাকান্ত সান্ডোকে চ্যালেঞ্জ করতে যেমন পারেন না, তেমনি সান্ডোর সংগী বলে কথিত এলমোর সংগেও শ্যামাকান্তর মুষ্টিযুদ্ধ হতে পারে না। এর ফলে লেখক তাঁর বইর পরবর্তী সংস্করণে সান্ডোর নামটি তুলে দিলেও এলমোর কাহিনীটি সযত্নে রক্ষা করেছেন। এইভাবে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, এলমো নামে কোনো ইউরোপীয় বলী সান্ডোর আসার পূর্বেই এদেশে এসেছিলেন এবং শ্যামাকান্তর সংগে তাঁর ঐ ধরনের মুষ্টিযুদ্ধ হয়েছিল।

এতে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে, লেখকের মাথায় একটা জেদ চেপেছে যে, একটা কল্পিত গল্প যখন লেখা হয়েই গেছে, তখন যে কোনো সূত্রে তাকে জীইয়ে রাখতে হবে এবং এই জন্য প্রয়োজন হলে শ্যামাকান্তর জনপ্রিয়তার ওপর কালিমা লেপন করতেও বাধা নেই।

'কালিমা' লেপনের কথা বলছি এই জন্য যে, শ্যামাকান্ত মুষ্টিযুদ্ধের কিছুই জানতেন না এবং তাই কোনোদিন তিনি কারো সংগে মুষ্টিযুদ্ধে নামেন নি। তা ছাড়া, মুষ্টিযুদ্ধে আছাড় মারার বিধি নেই—সভ্য সমাজে নেই, অসভ্য বা বর্বর সমাজেও নেই। অথচ লেখক শ্যামাকান্তকে দিয়ে সেই অপকীর্তি করিয়ে ছেড়েছেন! তাও আবার কলকাতা শহরে হাজার লোকের চোখের ওপর হয়তো বা দিনে-দুপুরে! শুধু তাই নয়, এই কুকীর্তির প্রতিবাদ ওঠার সংগে সংগে শ্যামাকান্তকে দিয়ে অর্বাচীনের মতো দম্ভোক্তি পর্যন্ত করান হয়েছে!

শ্যামাকান্ত বেঁচে নেই বহুকাল। তাই বলে, তাঁর অবর্তমানতার সুযোগে তাঁকে জঘন্য চরিত্রের খাড়া করা যায় কিনা জানি না। কিন্তু উল্লিখিত বই প্রকাশের পর দীর্ঘ তিন যুগ কেটে গেছে, লেখকের এই দুষ্কর্মের প্রতিবাদে আর কেউ কোনো কথা বলেন নি, এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার!

এইবার শ্যামাকান্তর বাঘের খেলায় আসা যাক। জাতিগত বিদ্বেষবশতঃ হোক কিংবা অজ্ঞতা নিবন্ধন হোক, লেখক শ্যামাকান্তর বাঘের খেলার কথা শুরু করার মুখেই সান্ডোকে আর একবার কটাক্ষ করে বলেছেন, 'সুপ্রসিদ্ধ ডনগির সান্ডো একবার এক সিংহের সংগে লড়াই করেছিলেন। সে সিংহটির থাবা মুখ প্রভৃতি মারাত্মক অংগগুলি চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল, এবং নখ কেটে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শ্যামাকান্ড ও-সব ভড়ং-কায়দার ধার ধারতেন না। তিনি সোজা খাঁচার ভিতর ঢুকতেন, তারপর জোর-জবরদস্তি করে রীতিমতো লড়াই জুড়ে দিতেন।

তারপরই নাটকীয় চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লিখেছেন, 'শ্যামাকান্ত তাঁর সমস্ত হাতখানা জ্যান্ত বাঘের মুখে ঢুকিয়ে দিতেন। বাঘটা দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি দাঁত হাতে এমন বিঁধিয়ে দিত যে টস্ টস্ করে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ত। কিন্তু তিনি তা ধীরভাবে সহ্য

করতেন, বাঘকেও বুঝতে দিতেন না যে সে কামড় দিয়েছে।'

দেখা যাচ্ছে, লেখক নিজেও স্বীকার করছেন, শ্যামাকান্ত মানুষ ছিলেন এবং তাঁর হাতখানাও আর দশজনার মতোই রক্ত-মাংসে গড়া ছিল বলে বাঘের কামড়ে তাতে দেড়-দুই ইঞ্চি ক্ষত সৃষ্টি হত। তথাপি কেন যে শ্যামাকান্ত তাঁর হাতখানাকে 'জ্যান্ত' বাঘের মুখে ঢুকিয়ে দিতেন, তা লেখক বলেন নি। আরো আশ্চর্য, এমন কামড় খেয়েও শ্যামাকান্ত হাত ছাড়িয়ে আনতেন না, বরং ধীরভাবে সে যাতনা হজম করতেন! পক্ষান্তরে এমন সুবর্ণ সুযোগ সত্ত্বেও বাঘ ভদ্রলোকের মতো হাতটাকে ছেড়ে দিত! এমন কি দেড়-দুই ইঞ্চি দাঁত বসিয়ে দিয়ে রক্তের নাগাল পাওয়া সত্ত্বেও বাঘ বুঝতে পারত না যে সে সত্যই কামড় দিয়েছে! এ-ধরনের গল্প ছোটবেলায় 'ত্রিনাথ ঠাকুরের' মেলায় শুনেছিলাম বটে, পড়তে হবে ভাবিনি। শ্যামাকান্তের

[illegible]লংগী এবং সমসায়িক অন্তত ডজনখানেক লোকের সংগে আমার পরিচয় ছিল। তাঁর বোন সুশীলাসুন্দরী এবং ভাই শীতলাকান্তর সংগেও আমার একাধিকবার দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল; এই গল্পের ভিত্তি কি, তাঁরাও জানতেন না।

আসল কথা এই, বাঘ যদি পোষা (Trained or tamed) হয়, তবে সে কামড়াবে না, নখরাঘাতও করবে না। আর যদি জংলী হয়, তবে সুযোগ পেলেই সে মানুষ হত্যা করবে। এমন বাঘের খাঁচায় কেউ যাবে না, গেলে সে যে ব্যক্তিই হোক, ফিরে আসবে না। কেননা, বাঘের যেমন-তেমন এক থাবায়ও, শ্যামাকান্ত তো বটেই, তাঁর চেয়ে কয়েক গুণ বলশালীর মাথাটাও এক পলকে চৌচির হয়ে যেতে পারে। কিন্তু পোষা বাঘের সংগে খেলা করতে গিয়েও দৈবক্রমে কখনো কখনো তার দাঁত বা নখরের আঘাত লেগে যেতে পারে। সেই সামান্য বস্তুকে উপেক্ষা করাই স্বাভাবিক। প্রায় ১৪ বছর বাঘের খেলা দেখাতে গিয়ে শ্যামাকান্তের জীবনেও এমন ঘটনা হওয়াই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। সকলের ক্ষেত্রেই তা হয়; কিন্তু তা নিয়ে এমন অদ্ভুত গল্প রচনা করা যার-তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ, শ্যামাকান্তের সার্কাসে ছোট-বড় এবং পোষা বা নতুন-ধরা সব রকমের বাঘ ছিল। বাঘের অবস্থা অনুযায়ী তাঁর খেলার কায়দাও বিভিন্ন রকম হত। বাঘের খাঁচাও প্রধানতঃ দুরকমের দুটো ছিল; একটা বেশ বড়, আর একটা ছোট। বড় খাঁচাটার মধ্যে থাকত ছোট খাঁচা, তারই মধ্যে থাকত বাঘ। তাঁর বাঘের খেলাই ছিল ফিচার শো। সেইজন্য, সাধারণতঃ জিমন্যাস্টিকস্, অ্যাক্রোবেটিকস্, ব্যালেন্সিং, শক্তির খেলা, জাগ্‌লিং ইত্যাদির শেষে হত বাঘের খেলা। বাঘসহ খাঁচাটাকে সার্কাস রিংয়ে আনার সময় একজন ঘোষক বলতে শুরু করতেন :—

'এইবার শুরু হবে বাঘের খেলা, বাঘের লড়াই। বাঘ কী ভীষণ জানোয়ার, তা কম-বেশি সবাই কিছু কিছু জানেন। সেই বাঘের সংগে হবে মানুষের লড়াই। হাজার হাজার বছর আগে রোম সাম্রাজ্যের মহাবীর গ্লাদিয়েতরগণ এরূপ লড়াই করত, তাতে অনেক বীরের প্রাণও [illegible]। আজ, বহুকাল পরে, সেই গ্লাদিতরিয়েল যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ যুদ্ধ আপনারা এখানে দেখতে পাবেন। কেননা, এ যুদ্ধে মানুষ নামবে নিরস্ত্র হয়ে, রিক্ত হস্তে। এবং শুধু গায়ের জোরে বাঘকে পরাস্ত করা হবে। সেই রোমাঞ্চকর খেলা যিনি দেখাবেন, তিনি ভারতের সন্তান, বাংলার অসম সাহসী সর্বশ্রেষ্ঠ বীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

বলা বাহুল্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক, আর আজকের যুগে তফাত আকাশ-পাতাল। তখন এই বক্তৃতা দর্শকরা উৎকর্ণ হয়েই শুনত, আজ তা কেউ শুনতে রাজী হত না। যাই হোক, এরপর ব্যান্ড বাজতে থাকত এবং সেই উদ্দাম বাজনার মধ্য দিয়ে ঘটত শ্যামাকান্তর আবির্ভাব। তাঁর পোষাক হত তখন ফুল প্যান্ট, আঁটসাঁট কোট, মোজা-জুতা, কপাল ও মাথাঢাকা টুপি এবং হাতে চামড়া বা রবারের দস্তানা। সব কালো বর্ণের, কিংবা গাঢ় নীল বা ধূসর বর্ণও হতে পারত। ধীর স্থির গম্ভীর তাঁর মূর্তি, তাঁর মন্থর পদক্ষেপে সূচিত হত এক ভয়াবহ ও গুরুগম্ভীর পরিবেশ। কখনো কখনো তিনি শিকারীদের মতো ব্রিচেস্ এবং হান্টিং বুট পরেও আসরে নামতেন। পোষা বাঘ হলে তিনি রিক্তহস্তে আসতেন, নতুন ধরা বাঘ হলে হাতে নিতেন কাঠের একটা মোটা রুল।

পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতেন এবং বাঘের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে হাতের ইসারায় বাজনা বন্ধ করে দিতেন। দর্শকরাও সেইসংগে ভয়ে ভয়ে নীরব হয়ে যেত—কী জানি, অন্যমনস্কতার ফাঁকে কোন্ মুহূর্তে কি ঘটে যায়! একজন লোক কপিকলের সাহায্যে চেন্ টানার সংগে সংগে প্রথম অর্থাৎ বড় খাঁচার দরজা ওপরে উঠে যেত। পোষা বাঘ হলে তাঁর প্রথম খাঁচার মধ্যে ঢোকার পরে প্রথম দরজা বন্ধ করে দিয়ে দ্বিতীয় খাঁচার দরজাও খোলা হত। বাঘ তখন তাঁকে তার পালক বা প্রভু বলে চিনতে পারত এবং নীচু হয়ে ছোট খাঁচা থেকে বেরিয়ে তাঁর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াত। দর্শকরা মনে করত, শ্যামাকান্তর চোখের দীপ্তির কাছে বাঘটা নতি স্বীকার করল।

বেশিরভাগ বাঘই ছিল নিয়মিত ট্রেনিং পাওয়া। গোপাল, রাজা, বেগম ইত্যাদি রকমারি নামও তাদের ছিল। নাম ধরে ডাকা মাত্র সেই বাঘ এসে হাজির হত; এমন কি নিঃশব্দ ইংগিতে এইসব বাঘ তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ত। অতএব এসব বাঘের সংগে খেলা দেখাতে বা কুস্তির শো দিতে গায়ের জোরের কোনো প্রশ্ন ছিল না। শ্যামাকান্তর ইংগিতে এরা সামনের থাবা দুটি তাঁর কাঁধে স্থাপন করে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু বাঘ খুব বড় জাতের হলে পিছনের পায়ের ওপর বসেই সে সামনের দুই থাবা তাঁর কাঁধে তুলে দিত। কেননা, সেসব বাঘের ওজন এত বেশি হত যে, তাদের ভার শ্যামাকান্তর পক্ষেও বহন করা দুঃসাধ্য হত। বাঘ তার থাবা কাঁধে স্থাপন করার পরে এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে, এপাশে-ওপাশে ধাক্কাধাক্কি করে বা ঝাঁকানি দিয়ে শ্যামাকান্ত কুস্তির শো দিতেন। সময়ে সময়ে জাপ্টাজাপ্টিও করা হত এবং এইভাবে দু-চার মিনিট চলার পরেই তিনি বাঘটাকে নিচে ফেলতেন বা নিচে চেপে ধরতেন। শেষে তাকে ঠেলতে ঠেলতে ছোট খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার সংগে সংগে দ্বাররক্ষী দরজা ফেলে দিত।

কখনো কখনো দর্শকদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেবার জন্য শ্যামাকান্ত এমনভাবে বেরিয়ে আসার ভান করতেন যাতে বাঘটাও তাঁর সংগে সংগে বেরিয়ে আসতে উদ্যোগী হয়। এরূপ অবস্থায় শ্যামাকান্ত বাঘকে জোরে ধমকি দিতেন, তার কপালে বা নাকেও ঘুসি মেরে হটানর ভান করতেন। খেলার সময় এসব বাঘের মুখে শুধু হাত নয়, নিজের মাথা ঢুকিয়ে দেওয়াও কঠিন ছিল না; বাঘকে তখন হাঁ হয়ে থাকতে হত। সে বিশ্বস্ত ও অনুগত বলেই তা সম্ভব হত।

নতুন বাঘ হলে দ্বিতীয় খাঁচার দরজা কখনো খোলা হত না। তখন প্রথম খাঁচার মধ্যে ঢুকে দ্বিতীয় খাঁচার বাইরে থেকেই নানা কায়দায়, প্রয়োজন মতো রুলের গুঁতো দিয়ে বাঘটাকে উত্তেজিত করা হত। উত্যক্ত বাঘ দারুণ গর্জন করত, লোহার গরাদের ওপর থাবা মারত, হাঁ করে গরাদের ফাঁকে মুখ বাড়ানরও চেষ্টা করত। সেই অবস্থায় বাঘের আংগুলে বা নখের ওপর কিংবা মুখ ও দাঁতে রুলের আঘাত করা হত যাতে বাঘ তার দাঁত ও নখের ওপর বিশ্বাস হারাতে বাধ্য হয়। এগুলি অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ প্রণালীতে করা হত। নতুবা বাঘকে যখন-তখন যে কোনোভাবে মারলে সে পোষ না মেনে আরো বরং ভয়ংকর হতে পারত। এই ছিল তাঁর বাঘের খেলার মোটামুটি বিবরণ যা তাঁর পূর্বে ও পরে অনেকেই দেখিয়েছেন। মেয়েরাও দেখিয়েছেন। এমন কি, এজাতীয় জানোয়ারের সংগে খেলা দেখানয় তিনি প্রথম বাঙালীও নন। তাঁরও পূর্বে কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রথম কন্টিনেন্টে এবং পরে লন্ডনে সিংহের খেলা দেখিয়েছিলেন।

উপযুক্ত ট্রেনার বা টেমারের হাতে যে কোনো হিংস্র জানোয়ারই পোষ মানে। কর্ণেল বিশ্বাসের হাতে পোষ মানা একটি হাতী একবার বিক্রি হয়ে স্থানান্তরে যায়। তার ফলে সে খাওয়া ছেড়ে দেয়, উপায়ান্তর না দেখে শেষে জন্তুটির নতুন মালিক কর্ণেল বিশ্বাসকে মোটা মাইনে দিয়ে সেই পশুর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। বহু সময়ে টেমারের উপস্থিতিতে অন্য জানোয়ার

লোকের পক্ষেও বাঘ-সিংহের সংগে খেলা দেখান সম্ভব হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে নতুন আনাড়ি লোকেরও বিপদ ঘটার আশঙ্কা থাকে না। শ্যামাকান্ত বাঘকে পোষ মানানয় যে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৯২ অব্দে তার এক প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। সে সময়ে ঢাকা শহরে শ্যামাকান্ত এক বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করলেন, সার্কাসে এক মহিলাও

শ্যামাকান্তের পরে প্রসিদ্ধ সার্কাসবিদ প্রিয়নাথ বোস তাঁর সার্কাসে বাঘের খেলার পত্তন করেন এবং তাঁর সার্কাসে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় বিংশতি বর্ষের যুবতী সুশীলাসুন্দরীর বাঘের খেলা। একথা সত্য যে, জনচিত্তে চমক্ সৃষ্টির জন্য পেশাদার ব্যক্তিদের বহু সময়ে জাঁক্‌জমক ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিতে হয়। কাজেই, প্রিয়নাথ তাঁর সার্কাসের সেই বাঘের খেলাকে যখন 'প্রকৃত মল্লযুদ্ধ' কিংবা 'লোমহর্ষক ও

রুলের গুঁতো দিয়ে বাঘটাকে উত্তেজিত করা হত।

বাঘের খেলা দেখাবেন। বাস্তবিক তখন পর্যন্ত তিনি কোনো মহিলাকে বাঘের খেলায় যথারীতি ট্রেনিং দেন নি। তবু, তাড়াতাড়ি করে দুই-একদিন মাত্র ঢাকা শহরের এক বারবণিতাকে পোষা বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়ে সাহস বাড়ানর পরেই তাঁকে ঘোষণানুযায়ী প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে নামান হয়েছিল। তার ফলে সেবার তাঁর সার্কাসে টিকেট বিক্রি হয়েছিল প্রচুর। কেননা, বাংলাদেশে, এমন কি ভারতবর্ষেও, তার আগে আর কোনো মহিলা বাঘ বা সিংহের সংগে খেলা দেখান নি।

শোণিতশোষক ব্যাপার' বলে প্রচার করতেন, তখন তাতে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না। বস্তুতঃ সেখানেও এই নধরকান্তি তরুণী ছিলেন বাঘের কাছে ননীর পুতুল, কিংবা এই ননীর পুতুলের কাছেই বাঘটা ছিল খেলার পুতুল। শক্তি ও সাহসের কথা এসব ক্ষেত্রে সব সময়েই অবান্তর, বাজে কথা।

আগেকার যুগে বাঘ সিংহ কিংবা ঐ জাতীয় দুরন্ত জানোয়ারদের পোষমানানর ব্যাপারে সাধারণতঃ নানা ধরনের অমানুষিক পন্থা অবলম্বন করা হত। তাদের কম খাইয়ে, অনাহারে রেখে নিস্তেজ করা হত; কড়া নেশা খাওয়ানর ব্যবস্থাও থাকত। তা ছাড়া ছিল ইলেক্‌ট্রিক শকের ব্যবস্থা। এজন্য বিশেষভাবে তৈরী এক রকমের ধাতব চাবুক ব্যবহৃত হত। আজও ভালুকের নাকে দড়ি বেঁধে মরতন্ন ঘুরিয়ে শো দেওয়া হয়। এখন সে-সব পুরোন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে চলেছে, এবং জন্তু-জানোয়ারদের স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মারপিটের কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি এখানে জন্তু পোষ মানানর বিবিধ উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই না। তার চেয়ে বরং সাণ্ডোর সিংহযুদ্ধের পর্বে চলে যাই।

সাণ্ডো প্রধানতঃ শক্তির চর্চা করতেন, বহু জায়গায় তিনি পৃথিবীর প্রসিদ্ধ জোয়ানদের সংগে শক্তির পরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সিংহ বা অনুরূপ জন্তুর সংগে তিনি সচরাচর খেলা দেখাতেন না বটে, কিন্তু ব্যবসার প্রয়োজনে কোনো বিষয়েই তিনি পিছিয়েও যেতেন না। সারা জীবনে তিনি কয়েকবারই সিংহের সংগে খেলা দেখিয়েছিলেন, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রথম যে সিংহের সংগে খেলা দেখিয়েছিলেন, সেটাই ছিল সবচেয়ে বড়। সাণ্ডোর মতে, তার ওজন ছিল ৫৩০ পাউণ্ড।

সাণ্ডো খাঁটি জোয়ান ছিলেন বটে, কিন্তু সে যুগে মেকি বলীরও অভাব ছিল না। তাই, বহু সময়ে তাঁকেও নানা কৌশল প্রচারকার্য চালাতে হত এবং তা না করে উপায়ও ছিল না। কিন্তু সাণ্ডো কেবল পেশীর কাজে নয়, মস্তিষ্কের কাজেও অনন্যসাধারণ ছিলেন; তাই বহু সময়ে তাঁর প্রচারকার্যের মধ্যেও তিনি অভিনব কৌশল অবলম্বন করতেন, সে কৌশলের সূত্র ধরা সব সময় সকলের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। সান্‌ফ্রান্সিস্কোর সিংহ-যুদ্ধের বিবরণ এ হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বস্তুতঃ সিংহের সংগে যুদ্ধের প্রদর্শনী দেওয়ার খেয়ালটা তাঁর মাথায় এসেছিল একান্ত হঠাৎ।

সেই সময়ে সেই শহরে এক মেলা চলছিল; এই মেলায় সাণ্ডোর এক বন্ধু, কর্নেল বোন্ (Colonel Bone) প্রদর্শনী উপলক্ষে একদা এক সিংহের সংগে এক ভালুকের জীবন-মরণ যুদ্ধ হবার কথা ঘোষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রায় কুড়ি হাজার দর্শকের স্থান হতে পারে, এমন এক বিরাট তাঁবু তৈরী হল। মহা ঔৎসুক্যের বশবর্তী হয়ে হাজার হাজার দর্শক সে-যুদ্ধ দেখার জন্য টিকেট কিনল। কিন্তু দিন কয়েক আগে

হঠাৎ পুলিস কর্তৃক এই নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করার হুকুম হল। সাণ্ডো এই সুযোগ ছাড়লেন না; তিনি নিজে সিংহটির সংগে খেলা দেখাতে প্রস্তুত হলেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সিংহটার পালক ও মালিক ছিলেন প্রসিদ্ধ পশু-বশকারী কর্নেল বোন যিনি সাণ্ডোর বন্ধু।

সাণ্ডো নিজেও পশু-চরিত্র বুঝতে কম দক্ষ ছিলেন না। কিন্তু সিংহ বা বাঘ পোষা হলেও বে-কায়দায় পেলে সে কখনো কোনো মানুষকে হত্যা করবে না, এমন হতে পারে না। এই সিংহটিও প্রদর্শনীর দিন সাতেক আগে তার রক্ষককে (কীপার) হত্যা করেছিল। সিংহটির ভয়াবহতা সম্পর্কে লোকের মনে রোমাঞ্চ বাড়ানর জন্য সেই কথাটিকেও এই উপলক্ষে বিশেষভাবে ছড়ান হয়েছিল। অতএব সাণ্ডোর সংগে সেই সিংহের লড়াই হবে, বিজ্ঞাপন ছাড়ার সংগে সংগে চতুর্দিকে দারুণ সাড়া পড়ে গেল। বস্তুতঃ তাঁবুতে সেদিন একটি আসনও খালি ছিল না। খবরের কাগজের সংবাদদাতা এবং ফোটোগ্রাফারের ভিড়ও জমেছিল যথেষ্ট। কিন্তু লড়াইটা হয়েছিল কেমন?

সাণ্ডো নিজেই বলেছেন, প্রায় সবাইকে নিরাশ করে দিয়ে সিংহটা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করল। অথচ শো দেবার পূর্বে জন্তুটির মুখে মুখোস এবং থাবায় দস্তানা লাগানর সময় বহু লোকের সামনেই সে রাগের চোটে দুটি শিকল ছিঁড়ে ফেলেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে উদ্যত রিভলবার হাতে কর্ণেল বোন্ সাণ্ডোকে নিয়ে অগ্রসর হলেন, সেই মুহূর্তে জন্তুটা যেন চুপসে গেল!

আসলে রিভলভার কোনো কারণ ছিল না; কেননা, ওটির মূল্য কি, জন্তুটার তা জানা থাকার কথা নয়। কর্নেল বোনের উপস্থিতিই ছিল যথেষ্ট। কেবল দর্শকদের মনে অবস্থার ভয়াবহতা বাড়ানর জন্যই ওটার প্রয়োজন ছিল।

সিংহটা যখন কিছুতেই নড়তে চাইল না, তখন সাণ্ডো তার লেজটাকে মুচড়ে দিলেন। এবার সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার সাণ্ডোর দিকে এগিয়ে গেল। একেই উপযুক্ত মুহূর্ত বিবেচনা করে সাণ্ডো তাকে জাপ্টে ধরে ছুঁড়ে মারলেন! ব্যস! এর পরে জন্তুটা কিছুতেই আর আক্রমণ করল না! সাণ্ডো বলেছেন, লড়াইটা খুব বেশি হলেও দুই মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় নি। তাঁর ভয় হল, জন্তুটার বশ্যতা দেখে পাছে দর্শকরা হতাশ হয়ে যান। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তা হয় নি। তিনি পশুটাকে কাঁধে নিয়ে একবার এরিনার চারদিকে ঘুরে এলেন।

সান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরের সিংহ-যুদ্ধের মূল ঘটনা এইটুকুই। কিন্তু সাণ্ডো বিষয়টিকে এখানেই ছেড়ে দেন নি। কেননা, প্রদর্শনীতে ২০০০০ দর্শকই তাঁর জীবনের সব নয়, তা তিনি জানতেন। পৃথিবীর নানা দেশে তাঁর লক্ষ লক্ষ গুণমুগ্ধ ও অনুরাগী ছিল, তাদের জন্য কিছু চমকপ্রদ কাহিনী তাঁর বইর মারফৎ প্রচার না করলেই নয়। তাই, তাঁকে বাড়তি একটি সিংহ-যুদ্ধের রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিতে হয়েছে এবং সেটিকে তিনি প্রদর্শনী লড়াইয়ের পূর্ব দিনে অনুষ্ঠিত মহড়া (Rehearsal) বলে চালিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন যে, সে মহড়ার সময় বিশেষ কেউ উপস্থিত ছিল না। জনকয়েক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কর্নেল বোন্ এবং সাণ্ডোর ম্যানেজার মিঃ জীগ্‌ফীল্ড (Mr. Ziegfeld) অবশ্যই ছিলেন। বলা বাহুল্য, বইতে তিনি সাধারণ লোকের না-দেখা এই যুদ্ধের বিবরণই দিয়েছেন মহা উৎসাহে। তাঁর সেই বিবরণে দেখা যায়ঃ—

সত্তর ফুট প্রশস্ত সেই খাঁচাটায় সাণ্ডো ঢুকলেন কোমর পর্যন্ত নগ্ন দেহে। সিংহটার মুখে ও থাবায় মুখোস এবং দস্তানা থাকা সত্ত্বেও সে সংগে সংগে নিচু হয়ে থাপে বসল। তার চোখে ভয়ংকর দৃষ্টি। কিন্তু সিংহের স্বভাব সাণ্ডোর জানাই ছিল, তাই জন্তুটা যে মুহূর্তে তাঁকে লক্ষ্য করে লাফ দিল, সেই মুহূর্তে তিনি তীব্রবেগে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। সিংহটা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে আবার তৈরী হবার পূর্বেই তিনি ঘুরে গিয়ে বাম হাতে তার গলা ও ডান হাতে তার কোমর বেষ্টন করে কাঁধ পর্যন্ত তুললেন এবং একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, সাণ্ডোকে তার সমীহ করে চলা উচিত। তারপরেই তাকে তিনি সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেললেন। রাগে তখন সে গর্জন করতে করতে আবার ছুটে এল এবং সাণ্ডোর মাথা লক্ষ্য করে থাবা মারল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি মাথা সরিয়ে নেওয়ায় থাবাটা তাঁর মুখের সামনে দিয়ে চলে গেল; পলকের মধ্যে তিনি দুইহাতে তাকে এমন শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন যে, সাণ্ডোর বুকের সংগে সিংহের বুক ঠেকে গেল, আর তার সামনের থাবা দুটো তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে বাইরে চলে গেল। এবার শুরু হল লড়াই; সাণ্ডো তাকে যতই চাপতে এবং ঝাঁকানি দিতে লাগলেন, সেও ততই তার থাবার, ঢাকা থাকা সত্ত্বেও, আঁচড় লাগাতে থাকল। সিংহটা বহু চেষ্টা করেও সাণ্ডোর চাপাকল (ভাইস) সাদৃশ বাহু-বেষ্টনী থেকে মুক্ত হতে পারল না। শেষে এক সুযোগে তিনি তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সেই মুহূর্তে কর্ণেল বোন্ এবং তাঁর ম্যানেজার জীগ্‌ফেল্ড্ চিৎকার করে তাঁকে খাঁচার বাইরে আসতে বললেন। তথাপি সাণ্ডো বাইরে গেলেন না এবং জন্তুটাকে আরো একটু শিক্ষা দেবার জন্য প্রতিজ্ঞ হলেন।

সাণ্ডো একটু সরে গিয়ে এবার সিংহটার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন যাতে সে আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ হয়। বিশেষ দেরি হল না; সিংহটা এবার তাঁর পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়ল, এই অবস্থার জন্য সাণ্ডো তৈরীই ছিলেন। তাই, দুই হাত তুলে তিনি তার মাথাটা ধরে ফেললেন এবং গলাটাকে চেপে ধরে কুস্তির 'ধোবী-পাটের' ঢংয়ে হাঁচ্‌কা টানে তাকে তাঁর সামনের জমিতে আছড়ে ফেললেন। কর্ণেল বোন্ সেই সময়ে দুই হাতে দুইটি রিভলবার নিয়ে বেগে খাঁচায় ঢুকলেন এবং সিংহটাকে দূরে সরিয়ে দিলেন। সাণ্ডোর তখন পায়ের ও ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে দারুণ রক্তপাত শুরু হয়েছে, সর্বাংগেও নখের বহু আঁচড় লেগেছিল। সেই অবস্থায় তিনিও বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, জয়টা তাঁরই হয়েছে এবং পরের দিন অতি সহজেই তিনি তাকে বশ মানাতে পারবেন।

বলা বাহুল্য, অন্ধ স্তাবকদের খুশী করার জন্যই তিনি সিংহ-যুদ্ধের এই গল্পটি পরিবেশন করেছিলেন। তিনি নিজে বিলক্ষণ জানতেন, ৫৩০ পাউণ্ড এই জন্তুটির একটি মাত্র ছোট-খাটো থাবা সহ্য করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। কিন্তু বাঘ-সিংহের শক্তি সম্পর্কে ধারণাহীন ব্যক্তিরা কি তা স্বীকার করবেন?

—সমাপ্ত
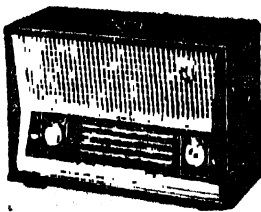
আলজিরিয়ার পুনর্জন্ম

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

পথের ধারে ডাস্টবিনের কাছে **ঝুলেটে ঝাঁঝরা রক্তাপ্লুত** মৃতদেহ পড়ে **থাকত সকালে** বিকালে। কে মেরেছে, কেন মেরেছে, **কার** মৃতদেহ—শেষের দিকে এসব নিয়ে কোন প্রশ্নও আর জাগত না **কারও মনে। ভীতসন্ত্রস্ত** চোখে দুই একবার এদিক ওদিকে তাকিয়ে পথচারীরা আরও দ্রুতপায়ে সেস্থান ত্যাগ করত। কারণ সেদিন আলজিরিয়ায় মৃত্যু ছিল এমনই অতর্কিত, নিষ্ঠুর ও নির্বিচার।

আলজিরিয়া স্বাধীন হওয়ার পর সেই ভয়ংকর দিনগুলির অবসান **হয়েছে। কিন্তু শতাব্দীকাল নির্মম শাসন ও শোষণের শেষে যে দেশকে পিছনে ফেলে গেছে ফরাসী** সাম্রাজ্যবাদী **ও উপনিবেশীরা** তার দুঃখ ও দুর্দশা **আজ অপরিসীম। চলে যেতে হবেই যখন বুঝতে পারে ফরাসী উপনিবেশী**

দেশের ভবিষ্যৎ নায়কেরা এখন থেকেই তৈরী হচ্ছে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য

'কলোন'রা তখন অন্ধ আক্রোশে যতগুলি সম্ভব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, কলকারখানা ও ক্ষেত খামার তারা ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করে যায় ও মানুষ খুন করে প্রায় দশলক্ষ। তাই আলজিরিয়া যখন স্বাধীন হয় তখন একেবারে কপর্দকশূন্য তার রাজভাণ্ডার, আর সম্পূর্ণ বিকল তার শাসনযন্ত্র। প্রতি পাঁচজন আল-জিরিয়র মধ্যে চারজন বেকার, আর শতকরা নব্বইজন নিরক্ষর। সারা দেশ-জুড়ে ক্ষুধাকাতর নরনারী।

নয় লক্ষ উনিশ হাজার বর্গমাইল আয়তন আলজিরিয়ার আর তার লোক-সংখ্যা মাত্র এক কোটি। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীদের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ, গত একবছরে তাদের মধ্যে নয় লক্ষ দেশছাড়া হয়েছে। বাকি একলক্ষও হয়ত এই বছর শেষ হওয়ার আগেই চলে যাবে। এভিয়ান চুক্তিতে 'কলোন'দের পরীক্ষামূলকভাবে তিন বছরের জন্য ফ্রান্স ও আলজিরিয়া উভয় রাষ্ট্রেরই নাগরিকতালাভের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ছয়জন মাত্র কলোন আলজিরিয়ার নাগরিকতা গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছে। সুতরাং আলজিরিয়ায় এখন লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে দশজনও নয়।

আবার প্রাকৃতিক সম্পদেও আল-জিরিয়া যথেষ্ট সমৃদ্ধ। খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ এই দেশটির খনিজ সম্পদও উল্লেখযোগ্য। লোহা, ফসফেট, দস্তা, শিসা, কয়লা, পেট্রোলিয়ম, প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় আলজিরিয়ায়। কিন্তু তবুও সে দেশ আজ নিঃস্ব। আলজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী বেন-বেলা তাই সক্ষোভে বলেছেন, সাত বছরের মুক্তিযুদ্ধে আর কলোনদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে আলজিরিয়া। এদেশকে গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক খরচ হিসাবেই দুশ' কোটি ডলার দরকার।

হতাশায় ভেঙে পড়েছে অসংখ্য বেকার যুবক

ফরাসীদের জেলে সাড়ে পাঁচ বছর বন্দী ছিলেন বেন বেলা। তারপর জেল থেকে পালিয়ে মৃত্যু-পরোয়ানা মাথায় নিয়ে মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব করেছিলেন আরও কয়েক বছর। তাই স্বাধীনতালাভের পর ফ্রান্স ও পশ্চিমী দেশগুলি সম্বন্ধে একটা তীব্র বিদ্বেষভাব ছিল তাঁর নিজের ও সহকর্মীদের মনে। তার ওপরে ছিল তীব্র দেশাত্মবোধ। একারণে প্রথমে নিজেদের শক্তিতেই দেশ গড়ার শপথ নিয়েছিলেন তাঁরা। বেন বেলা নিজের যাবতীয় সম্পত্তি জাতীয় তহবিলে দান করে জাতির কাছেও জানিয়েছিলেন ত্যাগের আহ্বান। আলজিরিয়ার অগণিত মানুষ সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, গ্রামের অবগুণ্ঠিতা বধূরাও দলে দলে এসে দান করে গেছে অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান সঞ্চয়। কিন্তু অনতিবিলম্বেই আল-জিরিয়ার নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন, দেশের সমুদ্র-প্রমাণ প্রয়োজনে জাতির সঞ্চয় গণ্ডূষের জল মাত্র।

বহিঃসাহায্যের অনিবার্য প্রয়োজনে বেন বেলা প্রথমে কমিউনিস্ট দেশগুলির শরণ নিলেন। দেশগঠনের সাধনায় কাস্ত্রো হল তাঁর আদর্শ। কিন্তু সাতমাস অতিক্রান্ত না হতেই বুঝলেন তিনি, আলজিরিয়ার প্রয়োজন ওপথেও পূরবে না। তাই নিরুপায় হয়েই পূব থেকে পশ্চিমে দৃষ্টি ফেরালেন বেন বেলা।

প্রথমেই চুক্তি সম্পাদিত হল ফ্রান্সের সঙ্গে, এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে। অর্থ-মন্ত্রী আমেদ ফ্রান্সিস প্যারী থেকে ফিরে এলেন, ১৯৬৩ সালের মধ্যে ২৮ কোটি ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। প্রায় একই সময়ে আলজিরিয়ার দুঃস্থ কৃষক-দের দুর্দশা লাঘবে এগিয়ে এল যুক্তরাষ্ট্র। আলজিরিয়ার অর্ধেক মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হচ্ছে আজ আমেরিকার খয়রাতি খাদ্যে। বেন বেলা চান আরও পশ্চিমী সাহায্য, জাতির মুখ্য প্রয়োজনে মতবাদ আজ গৌণ হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

কিন্তু আলজিরিয়ার অর্থনৈতিক বনিয়াদ এখন এত শিথিল ও তার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত অনিশ্চিত যে বেসরকারী উদ্যোগে আগ্রহী কোন দেশই সেখানে মূলধন নিয়োগে উৎসাহী হচ্ছে না। আলজিরিয়ার রাজস্বভাণ্ডার শূন্য হওয়ার প্রধান কারণ, যারা কর দিত সবচেয়ে বেশী সেই বিত্তবান কলোনরা ১৯৬১ সালের পর এক কপর্দকও আয়কর বা রাজস্ব সরকারী তহবিলে জমা দেয়নি। পরন্তু আলজিরিয়া স্বাধীন হওয়ার পরেই যে ছয় লক্ষ কলোন সেদেশ ত্যাগ করে তারা সকলেই টেলিফোন, গ্যাস বা ইলেকট্রিক বিল শোধ না করে চলে যায়। কলোনরা সংখ্যায় আলজিরিয়ার অধিবাসীদের এক-দশমাংশ; জাতীয় সম্পদের ৭৬ শতাংশ ছিল তাদের দখলে। দেশের ২৫ লক্ষ একর সেরা জমি নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাদের ১২ হাজার খামার। সুতরাং তারা যদি কর ও রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে তবে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কি হাল হয় তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

এইসব ক্ষেতখামার ও সেই সঙ্গে বহু ঘরবাড়ী ফেলে প্রায় সব কলোনরা ফ্রান্সে পালিয়ে গেছে। যারা যায়নি, তাদেরও যেতে হবে, কারণ আলজিরিয়ার নতুন পরিবেশের সঙ্গে তাদের মানিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স ছিল বলতে গেলে শ্বেতাঙ্গ-দেরই শহর। আজ সেখানে তাদের এক-জনকেও দেখা যায় না।

আলজিরিয়ায় রাষ্ট্রপতি শাসিত একদলীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলজিরিয়াবাসীদের অভিমত জানার জন্য গত ৮ই সেপ্টেম্বর যে গণভোট গৃহীত হয় তাতে ৬৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৮১৮ ভোটদাতার মধ্যে ৫২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৯৪ জন অংশ গ্রহণ করেন। এ'দের মধ্যে প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেন ৫১ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৮৫ জন। সুতরাং এর পর 'ন্যাশনাল লিবারেল ফ্রন্ট' ছাড়া আর কোন দল আলজিরিয়ায় থাকবে না। এই দল প্রধানমন্ত্রী বেন বেলাকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত করেছে, সুতরাং নূতন সংবিধান অনুসারে তিনিই হবেন একদল-শাসিত সাধারণতন্ত্রী আলজিরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ, সে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা।

এই রকম পরিত্যক্ত ও অচল অবস্থায় খামার ও কলকারখানাগুলি খুব বেশী পড়ে থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ তাহলে আলজিরিয়ার দুর্দশা আরও বাড়ত। তাই ঐ সব পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরাই এগিয়ে আসে তাদের কাজ নতুন করে শুরু করতে। ওয়ার্কার্স কমিটি গঠন করে যৌথ মালিকানাধীনে তারা কাজ আরম্ভ করে। প্রথমে এব্যাপারে কোন সরকারী অনুমোদন ছিল না, কারণ বিনা খেসারতে কলোনদের সম্পত্তি অধিকার এভিয়ান চুক্তির শর্ত-বিরোধী। কিন্তু আলজিরিয়ার অনিবার্য প্রয়োজনেই সরকার শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের ঐ উৎপাদনমূলক উদ্যম স্বীকার করে নেয়। বেন বেলা এ সম্বন্ধে বলেন—এ ছাড়া আর কিইবা করা যেতে পারত?

সরকারী অনুমোদনের পর খামারের যৌথ মালিকানাই আলজিরিয়ার নীতি হয়ে দাঁড়ায়। কৃষিমন্ত্রী ওমর উসেগেন বলেন, খামারের ফরাসী মালিকরা ভবিষ্যতে তাদের খামারের ম্যানেজার হিসাবে থাকতে পারবে, তাও যদি তারা আলজিরিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তবে। এপর্যন্ত একজন মাত্র কলোন এই শর্তে রাজী হয়েছেন। আড়াই হাজার একর স্থান জুড়ে গড়ে উঠেছিল সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক পুরাতন (১৮৪৩) খামার ডোমেইন দ্য লা ত্রেপ। এই খামারটিও এখন শ্রমিক পরিচালিত।

শ্রমিকদের "জবর দখল" এইভাবে সরকারী স্বীকৃতিলাভ করায় ফরাসী পরিচালিত বড় বড় দোকান, কাফে প্রভৃতির কর্মচারীরাও অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের মালিকদের তাড়াতে আরম্ভ করে।

কলোনদের পরিত্যক্ত খামারগুলি এখন ক্ষেতমজুরদের দখলে

এর ফলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয় তাতে শুধু ফরাসী কলোনরাই নয়, বিত্তশালী ইহুদিরাও আলজিরিয়ায় আর থাকা নিরাপদ বলে ভাবতে পারে না। তাই কলোনদের মত ইহুদিরাও আলজিরিয়ায় এখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, যার ফলে দিনে দিনে আরও দীন হচ্ছে আলজিরিয়া। দক্ষিণ আলজিরিয়ার শহর ঘরদাইয়ায় বারো শ' ইহুদির বাস ছিল, এখন সেখানে তাদের সংখ্যা মাত্র ছয়। কনস্টান্টাইন শহরে ইহুদিদের সংখ্যা বিশ হাজার থেকে কমে দাঁড়িয়েছে কিঞ্চিদধিক একশ'। আলজিরিয়ার যেসব সমৃদ্ধ আরব পলাতক কলোনদের কাছ থেকে অনেক খামার কিনে নিয়েছিল তারাও এই জবরদখলের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আলজিরিয়ার প্রথম আজাদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় পরিষদের প্রথম অধ্যক্ষ ফেরহাত আব্বাস বিত্তবান আলজিরিয়দের হয়ে বেন বেলার সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানান ও প্রতিকার প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদে কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ সম্প্রতি জাতীয় পরিষদের অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দিয়ে তিনিও আলজিরিয়া ত্যাগ করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনামূল্যে দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে আছে আলজিরিয়ার অর্ধেক মানুষ। যাবতীয় ভোগ্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, সারা দেশ ভরে গেছে বৃত্তিহীন মানুষে। বৃদ্ধদের পেন্সন দেওয়া বন্ধ হয়েছে। দেশের এই চরম বৈষয়িক বিপর্যয়ের একমাত্র প্রতিকার দ্রুত শিল্পায়ণ। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির অনিশ্চয়তায় তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশী মূলধনকে আকৃষ্ট করার কোন বৈষয়িক সামর্থ্য আজ আলজিরিয়ার নেই।

পরস্পর-বিরোধী দুই শক্তির এই টানা-পোড়েনই আলজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে আজ বেপরোয়া করে তুলেছে। ফ্রান্স এই বছর ২৮ কোটি ডলার সাহায্য দেবে, আগামী তিন বছরেও বাৎসরিক ২০ কোটি ডলার করে সাহায্য দেবে, বলে সে কথা দিয়েছে। তারওপর ফরাসী পরিচালিত সাহারা অইল কোম্পানী যে রাজস্ব দেয় আলজিরিয়াকে তাতে তার প্রায় অর্ধেক সরকারী ব্যয় নির্বাহ হয়। এ অবস্থায় ফ্রান্সকে নতুন করে অসন্তুষ্ট করার মত কোন কাজই আলজিরিয়ার করা উচিত হবে না এটা খুব ভালভাবেই বুঝেছেন বেনবেলা। তাছাড়া এও জানেন তিনি যে, ফ্রান্স-আলজিরিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে, পশ্চিমী দেশগুলি। সে সম্পর্কের উন্নতি ও স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করছে তাদের সাহায্য।

কিন্তু আলজিরিয়ার সাধারণ মানুষ ফরাসী উপনিবেশীদের দুর্ব্যবহারে ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের অতীত কার্যকলাপে ফ্রান্সের প্রতি এমনই বিরূপ যে, ঐ দেশটি সম্পর্কে কোন নরম নীতি অনুসরণের কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। তারওপর সাহারায় পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে ফ্রান্স আলজিরিয়াকে আরও অসহিষ্ণু করে তুলেছে। একারণে বেন বেলার বিশেষ সমর্থক যারা তারাও দাবী তুলেছে যে, ফ্রান্সের সঙ্গে কোনরকম আপোস করা চলবে না। কিন্তু একটি বিপর্যস্ত জাতির ভাগ্যোন্নতির দায়িত্ব হাতে নিয়ে বেন বেলা বুঝেছেন, এই একরোখা নীতির পরিণতি কি।

তাই প্রথমে তিন লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট চরম বামপন্থী দল 'জেনারেল ইউনিয়ন অফ আলজিরিয়ান ওয়ার্কার্স'কে বে-আইনী ঘোষণা করেন বেন বেলা। তারপর নিষিদ্ধ করেন আলজিরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে। এখন একমাত্র বেন বেলার নিজের দল 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট' (এফ এল এন) ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানই বে-আইনী সেদেশে। বেন খেদা, ফেরহাত আব্বাস প্রমুখ নিকটতম সহকর্মীরাও ছেড়ে গেছেন তাঁকে। নতুন যে সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তিনি তাতে আলজিরিয়ার সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই উপর অর্পিত হবে। আলজিরিয়ার ষাট হাজার সৈন্য তাঁর অনুগত। এই সৈন্য ও সংবিধানের জোরে নতুন করে তিনি গড়তে চান আলজিরিয়াকে। আলজিরিয়ার জাতীয়করণের কর্মসূচী তিনি বিঘ্নিত হতে দেবেন না, অথচ ফ্রান্স ও অন্যান্য অগ্রসর পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে তিনি গড়ে তুলবেন সৌহার্দ্যের সম্পর্ক।

অয়স্কান্ত

আর্কিমিডিস ও একটি পুরানো গল্প

প্রাচীনকালের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের নামে একটি গল্প শোনা যায়। তিনি নাকি বলেছিলেন যে পৃথিবীর বাইরে দাঁড়াবার মতো একটু জায়গা আর সঠিক দৈর্ঘ্যের একটি ঢেঁকি-কলের ব্যবস্থা করতে পারলেই তিনি পৃথিবীকে তুলে ধরতে পারবেন। সকলেই জানেন আর্কিমিডিস লিভার-এর সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। লিভার অনেকটা ঢেঁকি-কলের মতোই একটি আয়োজন। একটি স্থিরবিন্দুর চারদিকে ঘুরতে পারে এমনি একটি দণ্ডকে বলা হয় লিভার। দাঁড়িপাল্লার দণ্ড, কাঁচির ফলা, নৌকোর দাঁড়—এগুলো সবই লিভারের পরিচিত দৃষ্টান্ত। এমন কি মানুষের হাতও একধরনের লিভার। বলা বাহুল্য, লিভারও একধরনের যন্ত্র। এই যন্ত্রের বিশেষ সুবিধে এই যে সামান্য বলপ্রয়োগেই বিপুল বাধা অতিক্রম করা যেতে পারে। আর্কি-মিডিসের নামে গল্পটি যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে, লিভারের মতো সামান্য একটি যন্ত্রের সাহায্যেও পৃথিবীর মতো বিপুল একটি ভার উত্তোলিত করা সম্ভব। অন্তত লিভারের সূত্রের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী আর্কি-মিডিসের তাই ধারণা ছিল। এই ধারণার কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা বিচার করে দেখা যেতে পারে।

আর্কিমিডিস জানতেন, লিভারের সাহায্যে খুব সামান্য শক্তি প্রয়োগ করেও খুব ভারী ওজন তুলে ধরা সম্ভব। এক্ষেত্রে ওজনটি থাকবে লিভারের ছোট অংশের দিকে আর শক্তি প্রয়োগ করতে হবে অপেক্ষাকৃত বড়ো অংশের দিকে। এই বড়ো অংশের দিকটি ছোট অংশের দিকের চেয়ে যতো বেশি বড়ো হবে ততোই বেশি-বেশি ওজন তুলে ধরা যাবে।

ধরে নেওয়া যাক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস মহাকাশে দাঁড়াবার মতো একটু ঠাঁই পেয়েছেন আর সঠিক দৈর্ঘ্যের একটি লিভারের ব্যবস্থাও তাঁর জন্যে করা গিয়েছে। তাহলেও কি তিনি সত্যি সত্যিই পৃথিবীকে ঠাঁইনাড়া করতে পারতেন?

প্রথমে জানা দরকার পৃথিবীর ওজন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসেব থেকে জানা যায় পৃথিবীর ওজন হচ্ছে :

৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০ টন

অর্থাৎ, ছয়-এর পরে একুশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় ততো টন। আর্কিমিডিসের সময়ে পৃথিবীর এই বিপুল ওজন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণা ছিল না।

এবারে ধরে নেওয়া যাক, আর্কিমিডিস ৬০ কিলোগ্রাম ওজন সরাসরি তুলতে পারতেন। এই তাঁর বলপ্রয়োগের সর্বোচ্চ মাপ। কাজেই পৃথিবীকে তুলে ধরতে হলেও বলপ্রয়োগের এই সর্বোচ্চ মাপের মধ্যেই তাঁকে থাকতে হবে।

কাগজে-কলমে অঙ্কের হিসেব করে দেখানো যেতে পারে, উপযুক্ত লিভারের আয়োজন থাকলে এই সামান্য বল-প্রয়োগেও পৃথিবীর মতো বিপুল একটি ওজন তুলে ধরা সম্ভব। এই অঙ্কের হিসেবেই আরো প্রকাশ পাবে যে এই বিশেষ লিভারটির ছোট দিকের যা দৈর্ঘ্য হবে, বড়ো দিকের দৈর্ঘ্য হবে তার চেয়ে

১০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০ গুণ বেশি।

অর্থাৎ, একের পরে তেইশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় ততো গুণ বেশি।

ধরে নেওয়া গেল, এমনি একটি লিভারও বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস নাগালের মধ্যে পেয়েছেন।

এবারে প্রশ্ন ওঠে, তা সত্ত্বেও কি তিনি সত্যি সত্যিই পৃথিবীকে তুলে ধরতে পারতেন?

মনে করা যাক, খুব বেশি নয়, পৃথিবীকে মাত্র এক সেণ্টিমিটার পরিমাণ তুলে ধরতে হবে। তার মানে, লিভারের ছোট দিকের প্রান্তটি উত্তো-লিত হবে এক সেণ্টিমিটার পরিমাণ। এবারেও অঙ্কের হিসেব করে দেখানো যেতে পারে, ছোট দিকের প্রান্তটিকে এক সেণ্টিমিটার পরিমাণ ওঠাতে হলে বড়ো দিকের প্রান্তটিকে যে পরিমাণ নামাতে হবে তার মাপ হচ্ছে

১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০ কিলোমিটার লম্বা একটি বৃত্ত-চাপ।

অর্থাৎ, একের পরে আঠারোটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় ততো কিলোমিটার লম্বা একটি বৃত্তচাপ।

কাজেই পৃথিবীকে এক সেণ্টিমিটার পরিমাণ ওঠাতে হলেও লিভারটিকে এই বিপুল পরিমাণ দূরত্বে নামাতে হবে!

ধরে নেওয়া যাক, আর্কিমিডিস ষাট কিলোগ্রাম ওজনকে এক মিটার ঊর্ধ্বে তুলতে পারেন এক সেকেণ্ডের মধ্যে। এবারেও অঙ্কের হিসেব করে দেখানো যেতে পারে, পৃথিবীকে এক সেণ্টিমিটার তুলতে তাঁর সময় লাগবে

১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০ সেকেণ্ড।

অর্থাৎ একের পরে একুশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় ততো সেকেণ্ড। বছরের হিসেবে ত্রিশ-লক্ষ কোটি বছর।

আর্কিমিডিস যদি মহাকাশে দাঁড়াবার মতো একটু ঠাঁই পেতেন আর সঠিক দৈর্ঘ্যের একটি লিভারের আয়োজনও তাঁর জন্যে করা যেত তাহলেও তাঁর ত্রিশ-লক্ষ কোটি বছর সময় লাগত পৃথিবীকে এক সেণ্টিমিটার পরিমাণ তুলে ধরতে। আর্কিমিডিস যদি শতায়ুও হতেন তাহলেও তাঁর পক্ষে এই ব্যবস্থায় পৃথিবীকে চুলপরিমাণ স্থানচ্যুত করাও সম্ভব হত না।

যদি ধরে নেওয়া যায়, আলোর সমান গতিবেগে (যার চেয়ে বেশি গতি-বেগ এই বিশ্বে হওয়া সম্ভব নয়) আর্কিমিডিস লিভারটিকে নামাচ্ছেন, তাহলেও পৃথিবীকে এক সেণ্টিমিটার তুলে ধরতে তাঁর সময় লাগত এক কোটি বছর!

তার মানে, যতো সুবিধাজনক অবস্থাই কল্পনা করা যাক না কেন, আর্কিমিডিসের নামে প্রচলিত এই গল্পটি নিতান্তই একটি গল্পই থেকে যাচ্ছে।

একটি অমানুষিক বীরত্বের কাহিনী

জুলে ভার্নের একটি উপন্যাসে একজন রক্তমাংসের মানুষের এমন একটি বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যা আপাতবিচারে মনে হতে পারে অমানুষিক। মানুষটির বর্ণনা দিতে গিয়ে জুলে ভার্নে বলেছেন, হাপরের মতো তার বুক, থামের মতো তার পা; ক্রেনের মতো তার হাত, হাতুড়ির মতো তার মুঠি, বাঘের মতো তার ক্ষমতা। ঘটনাটি এই : একবার একটি জাহাজকে জলে নামানো হচ্ছে, শেষ কয়েকটি কীলক খুলে নিতে বাকি, এমন সময়ে দেখা গেল জাহাজের ঠিক সামনেটিতে

অতর্কিতে এসে পড়েছে ছোট একটি বজরা। এমনই অবস্থা যে জাহাজটি জলে নামতে শুরু করলে সরাসরি এই বজরাতে ধাক্কা লাগবে। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় ছিল না। সকলের আতঙ্কিত চোখের সামনে জাহাজটি জলে নামতে শুরু করল; শেষ কয়েকটি কীলক জাহাজটিকে ধরে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এমন সময়ে সেই বীর-পুরুষটি চোখের পলকে জাহাজের সঙ্গে লাগানো গুণটানা দাড়িটি ধরে একটা লোহার খুঁটির গায়ে কয়েক পাক জড়িয়ে নিয়ে অমানুষিক শক্তি প্রয়োগ করে টেনে ধরল। আর তখন দেখা গেল সত্যি সত্যিই জাহাজটি থেমে গিয়েছে। তবে মাত্র দশ সেকেণ্ডের জন্যে। তার-পরেই দড়িটি ছিঁড়ে যায় আর জাহাজটি আবার চলতে শুরু করে। মাত্র এই দশ সেকেণ্ডের জন্যেই বজরাটি দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

জুলে ভার্নের বর্ণনার গুণে ঘটনাটিকে একটি অমানুষিক বীরত্বের কাহিনী বলে সহজেই মনে হতে পারে। কিন্তু অঙ্কের হিসেবের মধ্যে গেলে দেখা যাবে, এই ঘটনায় ছিটেফোঁটাও বীরত্ব ছিল না। যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতা থাকলে যে-কোনো মানুষ উপরোক্ত পদ্ধতিতে এই জাহাজটিকে থামিয়ে দিতে পারত।

মোটরের সঙ্গে দড়ি বেঁধে দড়িটি একটি খুঁটিতে কয়েক পাক জড়িয়ে নিলে একটি বালকও সেই দড়ি টেনে ধরে চলন্ত মোটরগাড়ি থামিয়ে দিতে পারবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দড়ি যে টেনে ধরছে তার ক্ষমতা কোনো অলৌকিক কারণে আচমকা বেড়ে যাচ্ছে না, তার ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ঘর্ষণজনিত ক্ষমতা।

জুলে ভার্নে বর্ণিত জাহাজটির ওজন ছিল ৫০ টন। আর গুণটানা দড়িটিকে লোহার খুঁটিতে জড়ানো হয়েছিল তিন পাক। এবারে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে হিসেব করলে দেখা যাবে, জাহাজটিকে টেনে ধরবার জন্যে প্রয়োজন ছিল মাত্র দশ কিলোগ্রাম মাপের শক্তি। এই সামান্য শক্তি একটি বালকের পক্ষেও প্রয়োগ করা অসম্ভব নয়। এজন্য বাঘের মতো ক্ষমতাবান একজন বীর-পুরুষের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে এই ঘর্ষণজনিত বাধাকে আমরা নানাভাবে প্রয়োগ করে থাকি। আমরা যখন একটি বই হাতে নিয়ে পড়তে বসি তখন বইটি যে আমাদের হাত থেকে পিছলে পড়ে না তা এই ঘর্ষণজনিত বাধার জন্যেই। আমরা যখন দড়িতে গিঁট দিই তখনো এই ঘর্ষণজনিত বাধাকেই কাজে লাগাই। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে দড়ির গিঁট আসলে ক্যাপসট্যানে দড়ি পেঁচাবার মতোই একটি ব্যাপার। এক্ষেত্রে ক্যাপ্‌স-

থাকলে বোতামের ভারেই সুতোর পাক আলগা হয়ে যেতে পারত।

পদে পদে ঘর্ষণজনিত বাধা আছে বলেই আমরা মাটির ওপরে এমন অনায়াসে চলাফেরা ও দৌড়ঝাঁপ করে থাকি। বৃষ্টিতে পিছল রাস্তায় রবারের জুতো পায়ে দিয়ে চলাফেরা করতে হলে কেন খুব সাবধানে পা ফেলতে হয় তার কারণ নিশ্চয়ই এবারে বোঝা যাচ্ছে।

ঘর্ষণজনিত বাধা না থাকলে গোটা পৃথিবীকেই একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার বলে মনে হতে পারত। মেঝের ওপর দিয়ে টেবিল পিছলে যেত, টেবিলের ওপর থেকে বইখাতা কাগজপত্র, হাত থেকে কলম, আঙুল থেকে আঙটি। দেওয়ালে পেরেক মারা যেত না। ঘরের মধ্যে শব্দ হলে সেই শব্দ অনবরত দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসত—শব্দ কখনো থামত না। মোটর স্টার্ট দিলে চাকা অনবরত ঘুরে চলত, গাড়ি কিন্তু সামনে এগোত না। ঘূর্ণি হাওয়া উঠলে তা অনবরত পাক খেয়েই চলত, কখনো থামত না। এমন কি মুখের গ্রাস মুখে তোলবার আগেই হাত থেকে পিছলে পড়ে যেতে পারত।

যা দেখায় তার চেয়ে বেশি

লিভারের আলোচনা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই আলোচনা দিয়েই শেষ করছি।

মানুষের হাতকে বলা হয়েছে লিভার। এক্ষেত্রে স্থির বিন্দুটি রয়েছে কনুইয়ের কাছে আর দণ্ডটি হচ্ছে হাতের হাড়। শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে হাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত পেশীর সাহায্যে। এক্ষেত্রে কিন্তু লিভারের আয়োজনটি এমনই যে ওজন উত্তোলিত হয় অপেক্ষাকৃত বড়ো অংশের দিকে আর শক্তি প্রযুক্ত হয় অপেক্ষাকৃত ছোট অংশের দিকে। ফলে যে-পরিমাণ ওজন উত্তোলিত হয়, শক্তি প্রযুক্ত হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে দশ কিলো-গ্রাম ওজন তুলতে হাতের মাংসপেশীর শক্তি প্রয়োগ করতে হয় আশি কিলো-গ্রামের। আপাতবিচারে মনে হতে পারে এটা শক্তির অপচয়। আসলে কিন্তু তা নয়। এই বিশেষ আয়োজনের ফলেই মানুষের হাতের ক্ষিপ্রতা বেড়েছে। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, যে-গতিবেগে মাংসপেশীর শক্তি প্রযুক্ত হচ্ছে তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি গতিবেগে ওজনটি উত্তোলিত হচ্ছে। বেঁচে থাকার সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে এই ক্ষিপ্রতা অবশ্যই প্রয়োজন। বাড়তি শক্তির বিনিময়ে লাভ হচ্ছে এই ক্ষিপ্রতা। তাছাড়া আর একটি সান্ত্বনা যে মানুষের ক্ষমতা যা দেখায় তার চেয়ে বেশি।

একটি কাল্পনিক ছবি (আর্কিমিডিস কর্তৃক পৃথিবী উত্তোলন)।

বলবিদ্যা থেকে জানা যায় যে এই ঘটনার মূলে ছিল মানুষটির শারীরিক ক্ষমতা নয়, ফ্রিক্‌শন বা ঘর্ষণ, যা সৃষ্টি হয়েছিল লোহার খুঁটির চারপাশে দড়িটি পেঁচিয়ে নেবার ফলে। সকলেই জানেন জাহাজঘাটার জেটিতে পাশাপাশি দুটি লোহার মুণ্ডি বসানো থাকে। ইংরেজিতে বলে ক্যাপ্‌সট্যান। এই ক্যাপ্‌সট্যানে কয়েক পাক জড়িয়ে নিয়ে জাহাজের দড়িটি একজন মাত্র খালাসী টেনে ধরে আর সেই টানে মস্ত মস্ত মালবোঝাই জাহাজও থেমে যায়।

ট্যানকে আলাদাভাবে পাওয়া যাচ্ছে না, দড়ির একটি অংশকেই ক্যাপ্‌সটান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জাহাজীরা নানা ধরনের গিঁট দিয়ে থাকে। কোনোটা শক্ত, কোনোটা ঢিলে। শক্ত গিঁটে প্যাঁচ বেশি, ঢিলে গিঁটে প্যাঁচ কম।

জামায় বোতাম লাগাবার সময়েও কাপড়ের একটি অংশে একটি সুতোকে এফোঁড় ওফোঁড় করে পাক খাইয়ে দেওয়া হয়। ফলে সৃষ্টি হয় ঘর্ষণজনিত বাধা আর সুতোর পাক খুলে গিয়ে বোতামটি খসে পড়ে না। ঘর্ষণজনিত বাধা না

রাধাকৃষ্ণ চিত্রে চন্দ্রাবলীর ভূমিকায় প্রতিমা চক্রবর্তী

নান্দীকর

স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে চলচ্চিত্র-শিল্প :

গেল ৭ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীকামরাজ উটেকামাণ্ডের কিছু দূরে নীলগিরি পর্বতমালার ওপরে প্রাথমিক যন্ত্রপাতি স্থাপিত করেছেন ভারতে কাঁচা ফিল্ম প্রস্তুতের কারখানার। একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় হিন্দুস্থান ফোটো ফিল্ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী এই কারখানা থেকে শুধু যে চলচ্চিত্রের জন্যে কাঁচা ফিল্ম তৈরী করবে, তাই নয়, তার সঙ্গে প্লেট ফিল্ম, এক্স-রে ফিল্ম, ফোটোগ্রাফী পেপার প্রভৃতি যাবতীয় ফোটোগ্রাফী সংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করবে এবং আশা করা যাচ্ছে, বছর দুয়েকের মধ্যেই এই কারখানার তৈরী মাল বাজারে ছাড়া হবে। কাঁচা ফিল্ম প্রস্তুতের ব্যাপারে এককালে ফরাসী ডুপো কোম্পানীর প্রসিদ্ধি ছিল। সাহায্যকারী ফরাসী প্রতিষ্ঠান Banchat Company-র নামের সঙ্গে আমাদের পূর্বপরিচয় না থাকলেও এটা আশা করা অন্যায় হবে না যে, এঁদের সহযোগিতা আমাদের অভীষ্ট ফললাভে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হবে।

চলচ্চিত্র-শিল্পের দিক থেকে বলতে পারি, আমরা আমাদের দেশে কাঁচা ফিল্ম তৈরী করে শিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণতার ব্যাপারে একটি বিরাট পদক্ষেপ করব। আমরা প্রতি বছর গড়ে ২০ (কুড়ি) কোটী ফুট কাঁচা ফিল্ম বিদেশ থেকে আমদানী করে থাকি এবং এর জন্যে অনূন ২ কোটী টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয়ে থাকে। হিন্দুস্থান ফোটো ফিল্ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে আনুমানিক হিসেব পাওয়া গেছে, তার ওপর নির্ভর করে বলতে পারা যায়, ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রয়োজন মিটিয়েও উদ্বৃত্ত কাঁচা ফিল্ম বিদেশে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-গুলিতে বিক্রয় করে আমরা বেশ একটা মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারব।

কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কথা ছেড়ে দিয়ে যে-জিনিসটা আমাদের চোখে সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে, সেটি হচ্ছে চলচ্চিত্র-শিল্পের নিত্যকার প্রয়োজনীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যে-উপাদান, সেই কাঁচা ফিল্ম সম্বন্ধে আমাদের আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। এই জিনিসটি সম্বন্ধে বিদেশের ওপর একান্ত নির্ভরতা যে কী অস্বস্তিকর ব্যাপার, সে একমাত্র চলচ্চিত্র-প্রযোজকরাই মর্মে মর্মে অনুভব করেন। গেল বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে জাহাজ মারফত কাঁচা ফিল্মের সরবরাহ যখন অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল, তখন ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পকে কোনোক্রমে টিঁকে থাকবার জন্যে কি আপ্রাণ প্রয়াসই না করতে হয়েছে। বৈদেশিক ভারত সরকার তখন এক বিশেষ উপদেষ্টা পরিষদের ওপর, চল-চ্চিত্র-প্রযোজনার অনুমতি-পত্র প্রদানের (পারমিট ইস্যুর) দায়িত্ব অর্পণ করে-ছিলেন। এই পারমিট লাভের জন্যে প্রযোজক-মহলের মধ্যে সে কী ছুটো-ছুটি, তম্বির-তদ্বাস। আমরা শুনেছি, কোনো কোনো লোভী প্রযোজক নিজে ছবি-প্রযোজনার ঝুঁকি না নিয়ে মাত্র 'পারমিট' বিক্রয় করে লক্ষ টাকা উপার্জনকে শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে ছবির দৈর্ঘ্যকেও ১২,০০০ হাজার ফুটের মধ্যে সীমায়িত করা হয়েছিল এবং প্রতি ছবির জন্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচা মাল সর-বরাহের ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধ সমাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল অস্বস্তি এবং অশান্তিকর ব্যবস্থা রদ হয়। কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার পরে বছর পাঁচেক অতিবাহিত হতে না হতেই বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের জন্যে কাঁচা ফিল্মের আমদানীকে সীমিত করা হয় এবং তার ফলে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলচ্চিত্র প্রযোজককে তাঁর চাহিদামাফিক কাঁচা

ফিল্মের জন্যে আমদানী-রপ্তানীর যুগ্ম-নিয়ামকের (জয়েন্ট কন্ট্রোলার অফ ইমপোর্ট এ্যান্ড এক্সপোর্ট-এর) শ্বারস্থ হতে হয়। এ হেন অবস্থায় আমাদের দেশেই কাঁচা ফিল্ম তৈরী হবার শুভ-সংবাদ আমাদের অসংখ্য চলচ্চিত্র-প্রযোজকদের চিত্তকে যে আনন্দে 'ময়ূরের মতো' নৃত্যপর করে তুলবে, একথা বলাই বাহুল্য।

কাঁচা ফিল্ম তৈরী হতে এখনও কিছু দেরী আছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্র-পরিস্ফুটন ও মুদ্রণের জন্যে অবশ্য-প্রয়োজনীয় কিছু কিছু রসায়ন দ্রব্য আমাদের দেশেই বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ তৈরী হচ্ছে এবং প্রচুর ব্যবহৃতও হচ্ছে। কোনো কোনো রসায়নাগারিক অবশ্য এখনও বিদেশী রসায়নদ্রব্যের জন্যে হা-হুতাশ করেন বটে, কিন্তু আমাদের দেশজ দ্রব্যগুলি যে ক্রমেই তার সমকক্ষ হয়ে উঠছে, একথা অনস্বীকার্য। এ ছাড়া ক্যামেরা এবং প্রোজেক্টারের লেন্সও আমাদের দেশেই তৈরী করবার চেষ্টা চলেছে এবং শোনা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধিলাভে খুব বেশী বিলম্ব নেই। চিত্রগ্রহণ, শব্দানুলেখন, পরিস্ফুটন, মুদ্রণ, সম্পাদন প্রভৃতি চলচ্চিত্র প্রযোজনা-শিল্পের প্রতিটি বিভাগের সামান্যতম যন্ত্রের জন্যেও আমরা আজও পর্যন্ত বিদেশের মুখাপেক্ষী। কোনও যন্ত্রের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অকেজো হলে তার পরিবর্তনের জন্যে আমাদের বিদেশী মালের সরবরাহকারীর কাছে ছুটতে হয় এবং সেই বস্তুটি দৈবাৎ না পাওয়া গেলে—এবং এ ঘটনা হামেশাই ঘটে—সমস্ত যন্ত্রটিই বিকল হয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়। এই প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ পরিমাণের দিক দিয়ে চলচ্চিত্র-শিল্পে পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী।

৪০ কোটি লোকের জন্যে আমাদের ভারতবর্ষে মাত্র ৪ হাজারটি চিত্রগৃহ আছে। অর্থাৎ প্রতি এক লক্ষ লোকের জন্যে একটি চিত্রগৃহ। অথচ সবচেয়ে অল্প খরচে সবচেয়ে নির্দোষ আনন্দের বাহন হচ্ছে চলচ্চিত্র এবং সার্থক চলচ্চিত্র সম্বন্ধে একথাও বলা হয়ে থাকে যে, আনন্দ-বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র শিক্ষাও দেয়। (It entertains as well as educates) আন্তর্জাতিক মৈত্রীস্থাপনে, বৈদেশিক সম্মান ও অর্থ আনয়নে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় এবং আমোদকর, বিক্রয়কর, আয়কর, অন্তঃশুল্ক, প্রদর্শন-কর, ব্যবসায়-কর প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে সরকারী অর্থভান্ডার-পূরণে চলচ্চিত্রের কার্যকারিতা বিষয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলির কর্ণধারেরা যদি উচিত-মত অবহিত হন, তাহলে তাঁরা এই শিল্পটিকে যতশীঘ্র সম্ভব সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর হতে উপযুক্তভাবে সাহায্য করে একটি অবশ্য-কর্তব্য পালনে যত্নবান হতে অণুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না এবং আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্পও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্তে নিজেকে গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সুমহান ব্রতে আত্মোৎসর্গ করতে পারে।

একটি জিজ্ঞাসা :

সংপ্রতি নয়াদিল্লীস্থ সংগীত-নাটক আকাদেমী দ্বারা রূপকার গোষ্ঠীর মঞ্চ-প্রযোজনা 'ব্যাপিকা বিদায়' পুরস্কৃত হয়েছে, এ সংবাদ নাট্যরসিক মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁরা এও জানেন, উৎপল দত্ত-রচিত 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটিও শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছে। 'ব্যাপিকা বিদায়'-এর পুরস্কৃত হওয়া সম্পর্কে সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমী রূপকার-গোষ্ঠীকে যে তারবার্তা প্রেরণ করেছিলেন, তার একটি লাইন হচ্ছে "সঙ্গীত নাটক আকাদেমী কর্তৃক অনুষ্ঠিত নাট্য-প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের মধ্যে আপনাদের 'ব্যাপিকা বিদায়' নাট্যপ্রযোজনা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে।" (Your production Byapika Biday adjudged as best entry in Drama competition held by Sangeet Natak Akadami) ঠিক সমান ভাবেই উৎপল দত্ত-বিরচিত ফেরারী ফৌজ নাটকটিও নিশ্চয়ই মুদ্রিত

'যবসে তুমহে দেখা হ্যায়' চিত্রে গীতাবালী

নাটকাবলীর মধ্যে নাট্যরচনা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে।

আমাদের জিজ্ঞাসা, নাট্যাভিনয় এবং নাট্যরচনা সম্পর্কে এই দুটি প্রতিযোগিতা কি সঙ্গীত নাটক আকাদেমী দ্বারা প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়? যদি তাই হয়, তাহলে এগুলি সাধারণতঃ বছরের কোন্ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়? এবং অনুষ্ঠানের পূর্বে এই প্রতিযোগিতাগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচার করা হয় কি? (এ সম্পর্কে কোনো রকম বিজ্ঞপ্তি আমাদের চোখে পড়েছে বলে মনে করতে পারছি না।) প্রতিযোগিতা কি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হয়? এই প্রতিযোগিতা দুটির অনুষ্ঠানে কি নিয়মাবলী অনুসৃত হয়? এবং প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয় কি ভাবে?

এই সব প্রশ্ন আমরা বাঙলা দেশের বহু নাট্যসংস্থা এবং নাট্যকারের তরফ থেকে করছি। তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় বহু ব্যক্তির কথোপকথন থেকে আমরা অনুমান করছি, সঙ্গীত নাটক আকাদেমী পরিচালিত এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে তাঁরা প্রায় অন্ধকারেই আছেন এবং এতে যোগদান করার রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করে যথেষ্ট আলোকপাত করলে নাট্যসংস্থাগুলি তাদের যোগ্যতা নির্ণয়ে তৎপর হবে এবং বাঙলা দেশের অগণিত নাট্যকার তাঁদের কলমকে দৃঢ়তর করবার জন্যে উৎসুক হবেন।

বলে রাখা ভালো, নাট্য প্রযোজনা হিসেবে 'ব্যাপিকা বিদায়'-এর এবং নাট্যরচনা হিসেবে 'ফেরারী ফৌজ'-এর পুরস্কৃত হওয়ায় যোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় ত' বটেই, বরং অতিমাত্রায় যে আনন্দিত, তা' সংবাদ শ্রবণমাত্রই প্রকাশ করেছি 'অমৃত'-এর পৃষ্ঠায়। সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর কাছে আমরা বিভিন্ন নাট্যসংস্থা এবং নাট্যকারের জিজ্ঞাসা তুলে ধরছি মাত্র।

নটশেখর নরেশচন্দ্রের সংবর্ধনা :

নাট্যজগতে স্মরণীয় অবদানকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের পরামর্শক্রমে বিশ্বরূপা থিয়েটার কর্তৃপক্ষ গেল ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতি বছর নাট্যজগতের প্রথিতযশা অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাট্যকার, প্রযোজক বা কলাকুশলীদের মধ্যে একজনকে ১০০১, টাকা মূল্যের 'বিশ্বরূপা পদক' দ্বারা ভূষিত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রথম বছরে (১৯৬২) এই পদক লাভ করেছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। এ-বছর এই পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করা হ'ল নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্রকে। শক্তিমান নট, নাট্যশিক্ষক, নাট্য ও চিত্রপরিচালক রূপে নরেশচন্দ্র একদিন বাঙলার নাট্যরসিকবৃন্দের কাছ থেকে অফুরন্ত অভিনন্দন লাভ করেছেন। বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তিনি প্রথমে আবির্ভূত হন মিনার্ভা থিয়েটারে। আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ দলে যোগ দেন। এর পরে আসেন শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত নাট্যমন্দিরে। বিশ্বরূপার সেতু নাটকে দুঃখাবাবুর ভূমিকাই তাঁর শেষ অভিনয় এবং এই সেতুই তাঁর নাট্যপরিচালনার

শেষ নিদর্শন। মঞ্চে 'শকুনি' (কর্ণার্জুন), 'কাত্যায়ন' (চন্দ্রগুপ্ত), 'গোপী নায়েব' (দুই পুরুষ), 'ভৃঙ্গরায়' (পুণ্ডরীক) প্রভৃতি তাঁর অসামান্য নাট্যনৈপুণ্যের পরিচায়করূপে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। চিত্রপরিচালক রূপে তিনি 'কঙ্কাল', 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে', 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' প্রভৃতি বহু ছবিতে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বার্ধক্য আজ তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করেছে। তাই সেদিন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে সেতু নাটকের ৯০০তম রজনীর স্মারক-উৎসবে নাট্যকার মন্মথ রায় যখন তাঁকে বিশ্বরূপা পদক দ্বারা ভূষিত করলেন, তখন তিনি তাঁর নির্বাক স্মিতহাস্য দ্বারা তাঁর অন্তরের আনন্দ-বেদনাকে সমভাবেই প্রকাশিত করেছিলেন ব'লে মনে হয়। অভিনয়ের মাধ্যমে নটশেখর নরেশচন্দ্রের অজস্র অবদানের কথা আজ আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

মঞ্চাভিনয়

মঞ্চপ্রভার 'নিষ্কৃতি' :

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিষ্কৃতি গল্পের দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত নাট্যরূপ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে একদা নাট্যজগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এবং এর মূলে ছিল পরলোকগতা প্রভার সিদ্ধেশ্বরী এবং জহর গাঙ্গুলীর গিরিশ-এর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়। সেই অসামান্যা নাট্যনিপুণা প্রভারই স্মৃতিকে জাগরূক রাখবার জন্যে 'মঞ্চপ্রভা' নাট্যসংস্থার সৃষ্টি এবং এই সংস্থার প্রথম মঞ্চাবদান 'নিষ্কৃতি' প্রথম অভিনীত হ'ল গেল সোমবার ৯ই সেপ্টেম্বর ঐ রঙমহল রঙ্গমঞ্চেই। শুধু তাই নয়, গিরিশ-এর ভূমিকায় অভিনয় করলেন সেই জহর গাঙ্গুলী এবং সিদ্ধেশ্বরীর ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করলেন প্রতিভাময়ী প্রভার সুযোগ্যা কন্যা কেতকী। মায়েরই মত মধুকণ্ঠী কেতকী বয়সের তুলনায় অধিকতর প্রৌঢ়া সেজে সিদ্ধেশ্বরীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন মঞ্চের উপর। দশ বছর পরে জহর গাঙ্গুলী গিরিশকে আবার মূর্ত ক'রে তুলেছিলেন অত্যন্ত স্বাভাবিকতার সঙ্গে। ছোট বৌ শৈলজার ভূমিকায় দীপিকা দাস তাঁর দরদঢালা অভিনয় দ্বারা চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করতে ত্রুটি করেননি। মেনকা দত্তের নয়নতারাও চরিত্রানুগ হয়েছে। এছাড়া অপরাপর ভূমিকায় নবকুমার (রমেশ), সুখেন দাস (অতুল), কেকা (নীলা) এবং সমরকুমার (মণীন্দ্র) উল্লেখ্য অভিনয় করেন।

'মুঝে জিনে দো'—চিত্রের মুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন প্রযোজক সুনীল দত্ত
ফটো : অমৃত

অভ্যুদয়-এর 'মায়ের ডাকে' :

গেল ১৩ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার রাজাবাজারস্থ প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে অভ্যুদয় সংস্থা কিরণ মৈত্র রচিত 'মায়ের ডাকে' মঞ্চস্থ করেন। নাটকটিকে একদিক দিয়ে উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারধর্মী বলা চলে। পল্লীগঠনে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত এবং পল্লীর সমষ্টিগত স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজন হ'লে আত্মাহুতিও দেওয়া প্রয়োজন,—এই হচ্ছে নাটকের বক্তব্য। কিন্তু চাষীপ্রধান গ্রামের কৃষি-ফলনের জন্য সরকারী পুরস্কার পাওয়া এবং পরে পঙ্গপালের আক্রমণ থেকে গ্রামের ফলন্ত শস্যকে রক্ষা করাকে উপলক্ষ্য ক'রে যে মামুলী সংঘর্ষের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা' সর্বাংশে নাটকীয়ও হয়ে উঠতে পারেনি। সৎ-অসতের মানসিক দ্বন্দ্ব সমন্বিত হয়ে একটি মাত্র যে-চরিত্র সার্থকভাবে নাটকীয় হয়ে উঠতে পেরেছে, সেটি হচ্ছে কুসীদজীবী চরণ। এ ছাড়া আর কোনো চরিত্রই নাট্যবিভূতিসম্পন্ন নয়। এমন কি, গাইয়ে ছিটেলকে সহসা কেন যে মৃত্যুবরণ করতে হ'ল, তার কোনো সঙ্গত কারণ দেখতে পাওয়া গেল না।

অভিনয়ে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন চরণরূপী মনোরঞ্জন সোম ভূমিকাটির নাটকীয়তাকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলে। তাঁর পরেই অত্যন্ত দরদী ও বাস্তব অভিনয় করেছেন নিমাই এবং হানিফের ভূমিকায় যথাক্রমে বিশ্বনাথ পাল এবং শঙ্কর পাল। ছিটেলরূপী বিনয় দে পল্লী-সঙ্গীতগুলি গেয়েছেন ভালো। নায়ক গোবিন্দের ভূমিকায় শান্ত সান্যালের বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। বরং নাটকের একমাত্র স্ত্রী-চরিত্র নায়িকা রাধি কিছুটা জীবন্ত এবং অলকা গঙ্গোপাধ্যায় ভূমিকাটির প্রতি সুবিচার করেছেন। হরিশের ভূমিকায় কিরণ মৈত্র বড্ড বেশী স্বাভাবিক।

বিবিধ সংবাদ

৫ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র-উৎসবের উদ্বোধন :

গেল ১৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার সকাল ১০৷৷টায় জ্যোতি সিনেমায় ৫ম বার্ষিক আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র-উৎসবের সাড়ম্বর উদ্বোধন হয়ে গেল। আনন্দম্-এর শিশু সভ্যবৃন্দ কর্তৃক অতিথিদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি এবং জাতীয় সঙ্গীতের পর শিশু-চলচ্চিত্র পর্ষদের সভাপতি মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় অভ্যাগতদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে কর্পোরেশনের মেয়র চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে উদ্বোধন কার্য সমাধা করতে অনুরোধ করেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় একটি মনোজ্ঞ ভাষণে উদ্যোক্তাদের বিরাট প্রচেষ্টার প্রতি সরকার এবং জনসাধারণের অকৃপণ সহানুভূতি আকর্ষণ করার পর উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা

করেন। পরে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অক্লান্ত কর্মী দিলীপ ভট্টাচার্য এবারকার উৎসবের একটি নাতিদীর্ঘ কর্মসূচী পেশ করবার পর, উদ্বোধন দিবসের জন্যে বিশেষভাবে নির্বাচিত ৫ খানি ছবি দেখানো হয়। প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত এবং সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত হ্রস্বচিত্র 'স্বামিজীর ডাক' দেখানো হয়। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রস্তুত যতগুলি হ্রস্ব জীবনী-চিত্র বা তথ্য-চিত্র আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছে, তার মধ্যে এইখানিই নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। কোথাও বিশেষ ভাবে অঙ্কিত ছবি কোথাও মডেল, কোথাও মর্মর-মূর্তি, কোথাও পরিচিত চিত্র, আবার কোথাও বা জীবন্ত শিল্পীর অভিনয়—এদের সুকৌশল এবং সুচারু সংমিশ্রণে 'স্বামিজীর ডাক' একটি স্মরণীয় তথ্যচিত্রে পরিণত হয়েছে। পঙ্কজ মল্লিকের গান ও সুর-যোজনা ছবিখানির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ।

এর পরে UNO (য়ুনো) দ্বারা নির্মিত লিবিয়ার পটভূমিকায় রচিত 'চ্যালেঞ্জ ইন দি ডেজার্ট', মেট্রোর 'বিয়ার দ্যাট কুড নট স্লিপ' (কার্টুন চিত্র), অস্ট্রিয়ার 'চিলড্রেন্স ড্রিম' (ভারত, জার্মানী, বুলগেরিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ৫ থেকে ১২ বছর বয়েসের ছেলেমেয়েদের আঁকা রঙীন ছবিগুলিকে সুকৌশলে সাজিয়ে তাদের একটি সুন্দর চলচ্চিত্রের রূপ দেওয়া হয়েছে) এবং সবশেষে জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিকের ৮ রীলে সম্পূর্ণ রঙীন কাহিনী-চিত্র 'স্নো হোয়াইট অ্যান্ড সেভেন ডোয়ার্ফস্' দেখানো হয়। আমরা ওয়াল্ট ডিজনে কর্তৃক কার্টুনে নির্মিত 'স্নো হোয়াইট' ছবিখানি দেখে একদিন অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলুম; কিন্তু জীবন্ত শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত 'স্নো হোয়াইট' ছবি যে এত চমৎকার হ'তে পারে, তা' চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। রূপকথার সকল বিশেষত্বকে বজায় রেখে, বিশেষ করে ৭ বামনের কীর্তিকলাপকে অমন উপভোগ্য সুন্দরভাবে উপস্থাপিত ক'রে জি-ডি-আর-এর ছবি 'স্নো হোয়াইট' আমাদের চোখের সামনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

কলকাতায় শিশু চলচ্চিত্র-উৎসব ১লা থেকে ১০ই অকটোবর পর্যন্ত উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন চিত্রগৃহে অনুষ্ঠিত হবে এবং উৎসবের যা সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ, সেই শিশুমেলা বসবে ৪ঠা থেকে ১১ই অকটোবর রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়মে। এবারের উৎসবে শিশুসভ্যের সংখ্যা হয়েছে দু' লক্ষ এবং পৃথিবীর ৫১টি দেশ থেকে ৩৮৭টি ফিল্ম প্রদর্শিত হবার জন্যে এসে হাজির হয়েছে।

হরিকৃষ্ণ জেলোকার 'নতুন তীর্থ' ঃ

হরিকৃষ্ণ জেলোকার প্রযোজনায় এবং সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে 'নতুন তীর্থ' চিত্র নির্মিত হচ্ছে। প্রভা পিকচার্স পরিবেশিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় উত্তমকুমার, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, সুলতা চৌধুরী, মলিনা, ভারতী, রেণুকা রায়, সীতা দেবী প্রভৃতি শিল্পীকে দেখতে পাওয়া যাবে। সুর-সৃষ্টির ভার গ্রহণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

রূপলতার 'ইমন কল্যাণ' ঃ

গেল ১৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে রূপলতার সভ্যবৃন্দ 'ইমনকল্যাণ' নামে একখানি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেন।

দমদম কিশোর বাহিনীর অনুষ্ঠান ঃ

দমদম কিশোর বাহিনীর পাঠাগারের সম্প্রসারণার্থ গেল ১৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্ হলে নাটমহলের প্রযো-

বীরবাদল বরলাত চিত্রে বিশ্বজিৎ ও আশা পারেখ
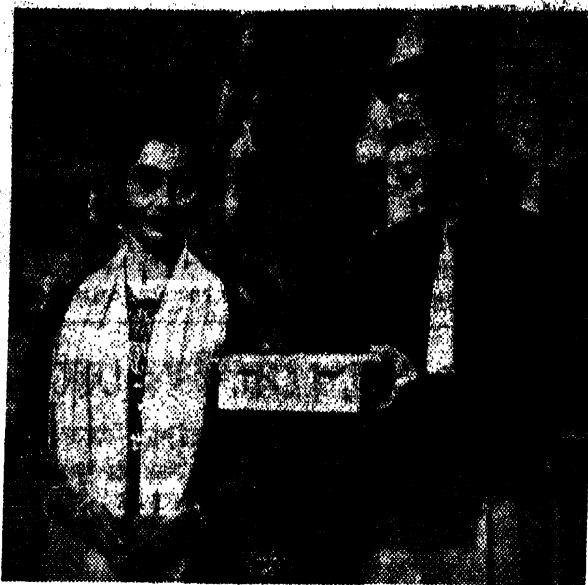
জনায় কিশোর বাহিনী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্য 'সূক্ষ্মবিচার' ও গীতিনাট্য 'বর্ষামঙ্গল' পরিবেশিত হয়েছিল। এ ছাড়া নাটমহল গোষ্ঠী দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দু'এর পিঠে এক শূন্য' নামে রঙ্গ-ব্যঙ্গভরা হাসির নাটকটির পুনরভিনয় করেন।

নাট্য-ভারতীর যাত্রা-উৎসব

গত ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্রাদল 'নাট্য-ভারতী' শোভনিক-এর সহযোগিতায় মুক্ত-অঙ্গনে দঃ কলিকাতার অধিবাসীদের সুবিধার্থে একটি চারদিনব্যাপী যাত্রা-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। মঞ্চে যাত্রাভিনয় দক্ষিণ কলকাতায় এটাই প্রথম। গত বছরের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়া পালাগান 'উপেক্ষিতা' (ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা), দ্বিতীয় দিন দেশাত্মবোধক পালাগান 'নবাব সিরাজদ্দৌল্লা', তৃতীয় দিন নাট্য-ভারতীর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য 'ধর্মের বলি', চতুর্থ দিন দর্শকদের অনুরোধে 'নবাব সিরাজদ্দৌল্লা'। এদিন মাননীয় প্রচার-মন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলে মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। তিনি যাত্রাশিল্পীদের আর্থিক দুর্গতি দূর করার জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি করার কথা বলেন। এর পর শোভনিক সংস্থার পক্ষ থেকে সভাপতি বাণীকান্ত গুহ এবং সম্পাদিকা নিবেদিতা দাস যাত্রাজগতের সর্বপ্রাচীন অভিনেতা শ্রীসূর্যকুমার দত্ত মহাশয় এবং বর্তমানে শ্রেষ্ঠ নট শ্রীফণীভূষণ মতিলাল (ছোট ফণী) মহাশয়কে তাঁদের আন্তরিক প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কাঁচের মঙ্গলকলস' উপহার দেন; এবং অন্যান্য শিল্পী-কুশলীদের মাল্যভূষিত করেন। নাট্য-ভারতীর পক্ষ থেকে সূর্যকুমার দত্ত মহাশয়কে ধুতি ও চাদর উপহার দেওয়া হয়। চারদিনে অভিনয়ে সমবেত দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিলেন যথাক্রমে ফণীভূষণ মতিলাল (ছোট ফণী), সুনীল মুখোঃ (রাজু), নন্দ ঘোষাল, পরেশ বন্দ্যোঃ, নবাগত দিলীপকুমার, কমিক চরিত্রে—হীরালাল বন্দ্যোঃ, মহেশ দে, বলাই গড়াই, বিজয় মিত্র, গানে—মদন রায় ও মাঃ নিতাই। নারী চরিত্রে—আশা, প্রভা প্রভৃতি।

গৌরীপুর মিউজিক ট্রাস্ট

সংস্কৃতি বিভাগ থেকে সাহায্য লাভ করে সঙ্গীত-সাধক বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী গৌরীপুর মিউজিক ট্রাস্টের সভাপতিরূপে তাঁদের সংগৃহীত হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বহু গান ও গতের বিভিন্ন স্বরলিপি প্রস্তুত করে দিল্লীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি মাসে ওখানকার আকাদেমীতে পাঠাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে এগুলির টেপ-রেকর্ডও পাঠানো হচ্ছে। সেখানকার লাইব্রেরীতে গিয়ে সকলেই স্বরলিপি দেখতে পাবেন, টেপগুলিও মাঝে মাঝে শোনানো হবে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের উপকারের জন্য 'গৌরীপুর মিউজিক ট্রাস্ট' গঠিত হয়েছে।

'সেতু'র ৯০০তম স্মারক উৎসব :

গেল ৯ই সেপ্টেম্বর, সোমবার বিশ্বরূপার, তথা বঙ্গরঙ্গমঞ্চের বিজয়বৈজয়ন্তী 'সেতু' নাটকের ৯০০তম রজনীর স্মারক উৎসব সম্পন্ন হয়। সেতুর এই অভাবনীয় সাফল্যের জন্যে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ তাঁদের সকল শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীকে ১৫ দিনের বোনাস দেবার কথা ঘোষণা করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই উৎসবেই নাট্যকার মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে নটশেখর

নরেশ মিত্র ফটো : অমৃত

মণ্ডপ্রজার উদ্যোগে স্বর্গতা প্রভা দেবীর স্মরণ অনুষ্ঠান

নরেশচন্দ্রকে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তাঁর অবি-স্মরণীয় অবদানের জন্যে 'বিশ্বরূপা পদক' দ্বারা ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠান-শেষে সমবেত অভ্যাগত ও দর্শকদের মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়িত করার পরে 'সেতু' নাটকের ১৩১তম অভিনয় শুরু হয়।

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস রিক্রিয়েশন ক্লাবের "সাহেব-বিবি-গোলাম" :

"হিন্দুস্থান বিল্ডিংস রিক্রিয়েশন ক্লাব (এল আই সি আই)-এর প্রযো-জনায় গেল ১০ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বিকাল ৫॥৩০ মিনিটে "স্টার" রঙ্গ-মঞ্চে শ্রীবিমল মিত্র রচিত 'সাহেব-বিবি-গোলাম' অভিনীত হয়েছে। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেছিলেন জোনাল ম্যানেজার শ্রী পি আর গুপ্ত এবং সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে-ছিলেন যথাক্রমে শ্রীনলিনীকুমার দত্ত ও প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

।। দিল্লীতে যাদু প্রদর্শনী ।।

আজ ২০শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর 'সপ্রু হাউস' রঙ্গমঞ্চে একটি যাদু-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মহিলা শাখার উদ্যোগে এই সাহায্য প্রদর্শনী। সংগৃহীত সমস্ত অর্থ নারী ও শিশুকল্যাণে ব্যয় করা হবে। চৈনিক আক্রমণের পটভূমিকায় যাদুকর মজারাজের 'এক জীওনী কহানী', 'জীলী জাতমহাজী আজির মনো-রম,' 'হামরা জওয়ানোকো মন্দ করো' এবং আরো কয়েকটি যাদু প্রদর্শিত হচ্ছে।

★ কলকাতা ★ বোম্বাই • মাদ্রাজ

কলকাতা

হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রোডাকসন্সের প্রথম পূর্ণ-দৈর্ঘ্য চিত্র 'একই অঙ্গে এত রূপ'-এর দৃশ্যগ্রহণের কাজ ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওর নিয়মিতভাবে এগিয়ে চলেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও পরি-চালনা করছেন হরিসাধন দাশগুপ্ত। একটি মেয়ের জীবনে দুজন আত্ম-কেন্দ্রিক ভালবাসার পুরুষ—এই ত্রিকোণ চরিত্র এবং তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনীই এ ছবির মূল কেন্দ্রবিন্দু। মুখ্য তিনটি চরিত্রে রূপদান করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখো-পাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী। পার্শ্বচরিত্রে রয়েছেন ছায়া দেবী, হরেন চট্টোপাধ্যায়, ভারতী দেবী ও নবাগতা সোনামচাপা দাশগুপ্তা। কুশলী কাজে রয়েছেন দীনেন গুপ্ত (চিত্রগ্রহণ), বিজয় বসু (শিল্পনির্দেশনা), প্রীতিময় সেন (উপ-দেশনা), তরুণ দত্ত (সম্পাদনা), অনন্ত দাশ (রূপন) এবং সুখময় সেন (কর্মা-ধ্যক্ষ)। আলী আকবর খান সুরকৃত এ ছবির দুটি গানে কণ্ঠদান করেছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার 'কাঞ্চনকন্যা' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। এ সংস্থার পরবর্তী ছবি বহুরূপী সম্প্রদায় অভিনীত নাটক 'কাঞ্চনরঙ্গ' নামে চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি ইন্দ্র-পুরী স্টুডিওয় আরম্ভ হয়েছে। কৌতুক নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন তৃপ্তি মিত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, জতিকা বসু, সমীর চক্রবর্তী, শান্তি দাস ও

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, তন্দ্রা বর্মণ, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, আশীষকুমার, অসিতবরণ এবং জহর রায়।

'বিদ্যাপতি'র কাজ দেখতে এসেছিলেন সত্যজিৎ রায়। শ্রীযুক্ত রায় চিত্রের নায়ক ভারতভূষণের সঙ্গে আলোচনা করছেন। ফটো : অমৃত

জালান প্রযোজিত হিন্দী ছবি 'বিদ্যাপতি'-র সঙ্গীতগ্রহণের পর বম্বের শিল্পীরা এসে সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় অভিনয় শুরু করেছেন। বৈষ্ণব কবির জীবনী চরিত্রে নামভূমিকায় অভিনয় করতে এসেছিলেন ভারতভূষণ ও সিমি।

বোম্বাই

এ আর কারদার পরিচালিত 'দিল দিয়া দরদ লিয়া' ছবির হঠাৎ বহির্দৃশ্যের পরিকল্পনাটি স্থগিত ছিল। কারণ সহ-নায়িকা শ্যামা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সম্প্রতি তিনি সুস্থ হয়েছেন। চিত্রগ্রহণের কাজ এ সপ্তাহ থেকে আবার নিয়মিত শুরু হচ্ছে। এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে এই প্রথম অভিনয় করছেন ওয়াহিদা রেহমান ও দিলীপকুমার। শাকিল বাদায়ুনী রচিত গানে সুর-সৃষ্টি করেছেন সঙ্গীত-পরিচালক নৌসাদ।

'জংলী' সাফল্যের পর পরিচালক সুবোধ মুখার্জি নৃত্যপরিচালক রাজের গঙ্গাপদ বসু। 'কাঞ্চনরঙ্গ' চিত্রের প্রযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অমর গাঙ্গুলী।

প্রযোজক শ্যামলাল জালান-এর এক-সঙ্গে হিন্দী ও বাংলা দুটি ছবির চিত্র-গ্রহণ শুরু হয়েছে। বাংলা ছবিটির নাম 'দীপ নেভে নাই'। 'আকাশ প্রদীপ'-র পর পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় এ ছবিটি পরিচালনা করছেন। কাহিনীর প্রধান অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন তরুণকুমার, বিকাশ রায় ও সন্ধ্যারাণী। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

নিউ এম্পায়ারে 'উর্বশী' পরিবেশিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' নৃত্যনাট্যে আরতি গুপ্ত ও গণেশ সিং

সংগে যে ছবিটি প্রায় শেষ করেছেন তার নাম 'সাত সাউর আওয়াজ'। এ ছবিতে রাজেন পরিচালনায় অপর্ণা সুপ্রভাশিল্পী সাহারাবান্দু মুক্তোভাশিল্পার পটুয়া অভিনয় করতে সমর্থ হয়েছেন। সাহারাবান্দুর বিপরীত নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয় মুখার্জি। আম্বেরীর ফিল্মালয় স্টুডিওর গত সাতদিন ধরে দৃশ্যগ্রহণের কাজ শেষ হল। এ ছবিটিরও সঙ্গীত-পরিচালক নৌসাদ।

বাংলাদেশের অভিনেত্রী সুপ্রিয়া চৌধুরীর পরবর্তী নতুন ছবিটির কাজ সম্প্রতি শুরু হল মোহন স্টুডিওয়। নায়ক চরিত্রে রয়েছেন ধর্মেন্দ্র। প্রযোজক-পরিচালক মোহনকুমার ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবির নাম 'আপকি পরছাইয়াঁ'। কুশলী বিভাগে শিল্প-নির্দেশনা ও চিত্রগ্রহণে রয়েছেন সুধেন্দু রায় এবং কে এইচ কাপাডিয়া। সুর-সৃষ্টি করছেন মদনমোহন। এ মাসের শেষে হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে।

মাদ্রাজ

ন্যাশনাল মুভিজের 'ধর্মাতিলকম' সম্প্রতি সেন্সারের ছাড়পত্র পেয়েছে। ছবিটি এ মাসেই মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়। প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন শিবাজী গণেশন এবং শ্রী সাবিত্রী। ম্যাজেস্টিক স্টুডিওয় এ-ছবির চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ হল। ছবিটি পরিচালনা করেছেন দাদা মিরাশী। জাগিরদার এ চিত্রের আলোকচিত্র-শিল্পী। —চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

সম্প্রতি 'উত্তর ফাল্গুনী'-র চিত্র-গ্রহণ সম্পূর্ণ হল দমদম বিমানঘাঁটির বহির্দৃশ্যে। শারদীয়া উৎসবের মুখর-দিনগুলোতে মুক্তিপ্রতীক্ষিত এ ছবিটি সবার মন জয় করবে। ছবির সংগে তিনটি জনপ্রিয় নাম, প্রযোজক উত্তম-কুমার, পরিচালক অসিত সেন এবং দ্বৈত ভূমিকায় সুচিত্রা সেন। কাহিনীর দুটি মুখ্য চরিত্রে মা পান্নাবাঈ এবং মেয়ে সুপর্ণা-র ভূমিকায় শ্রীমতী সেন সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম এই ভারতীয় চল-চ্চিত্রে। এমন কি পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতি-হাসে এ সংযোজন বিরল। ডাঃ নীহার-রঞ্জন গুপ্তের জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে এর চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণ চিত্ররূপ পেয়েছে। উত্তমকুমার ফিল্মস-এর এটি দ্বিতীয় প্রয়াস। তৃতীয়টি সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ'। পরিচালনা করবেন তপন সিংহ।

'উত্তর ফাল্গুনী'-র প্রচ্ছদপটে সুচিত্রা সেন অসাধ্য সাধন করেছেন। পার্শ্ব-চরিত্রে বিকাশ রায়। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে সম্পাদনার শেষ কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। তরুণ দত্ত এ ছবির সম্পাদক। আলোকচিত্র-শিল্পী অনিল গুপ্ত। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরকৃত এ কাহিনী আকর্ষণীয় নিশ্চয়ই। সম্পা-দনা টেবিলের একপাশে ছোট্ট মুভিয়লা-যন্ত্রে ছবির কয়েকটি দৃশ্য দেখে শ্রীমতী সেনের অভিনয় প্রতিভার চাক্ষুস প্রমাণ পেলাম। কী অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতা। একই বয়সের এত ব্যবধানে রূপসজ্জা ও অভিনয় পার্থক্যে এ ছবি দর্শনীয় পরিকল্পিত হল। আন্তরিকতা ও একাগ্রতা না থাকলে এমন অভিনয় সাধারণতঃ হয়ে ওঠে না। সাধারণ বধূ দেবযানীর চরিত্রে ছদ্মবেশী পান্নাবাঈ এবং কন্যা সুপর্ণার রূপদানে 'উত্তর ফাল্গুনী'-র দ্বৈত অংশে শ্রীমতী সেন একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বক্সঅফিসে বিশ্বাসী হলে মনে হয় এ ছবিটি জন-প্রিয় হবে। বহু-পঠিত গল্পটি অনেকেই জানেন, তাই বিস্তারিত কাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করবো না। সংক্ষেপে যেটুকু বলার প্রয়োজন সেটি উপস্থাপন করছি।

বিয়ের রাতে দেবযানী অঝোরে কেঁদেছিল। পিশাচ স্বামীর অত্যাচারে যন্ত্রণায় রাত কাটা হয়ে গিয়েছিল। প্রেমিক মণীশ রায় তখন সুদূর বিলেতে ব্যারিস্টার হবার স্বপ্ন দেখছে। নবাজী

[illegible] শ্বশুর পরিবারে [illegible] রূপবতী কন্যাটি রাখাল ভট্টাচার্যের সংসারে। [illegible] দেবযানীর এ আয়োজন। [illegible] সব কিছু বিসর্জন দিয়ে সে [illegible] ছিল। কিন্তু স্বামীর নেশার জগতে দেবযানী একান্তই অসহায়। যৌবনের সবটুকু সুধা দিয়েও রাখাল ভট্টাচার্য তৃপ্ত হয়নি। মোহ আর লোভের বশে এক-দিন গভীর রাতে নিদ্রিতা দেবযানীর ঘরে একজন পরপুরুষের তৃপ্তির জন্য আপন স্ত্রীকে উৎসর্গ করলো। ভিন্ন পুরুষের স্পর্শে দেবযানীর দেহ কেঁপে ওঠে। সেই মুহূর্তে অপমান আর ঘৃণায় নিজেকে মুক্ত করতে অন্তঃস্বত্বা কুলবধূ গৃহত্যাগী হল আত্মবিসর্জনে।

কিন্তু মরতে পারলো না দেবযানী। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত বাইজী মীরাবাঈয়ের স্নেহতীর্থে একদিন দেবযানী হল পান্নাবাঈ। নাচে, গানে, আর যৌবনে ভিন্ন রূপ নিল পান্নাবাঈ-র চরিত্রে।

কিন্তু পান্নার কোলে জন্ম নিল—কন্যা সুপর্ণা। সুপর্ণার ভিন্ন ব্যবস্থা হল। নিজের কলঙ্ক-জীবন থেকে আলাদা করে সুপর্ণাকে সে মানুষ করতে চেয়ে-ছিল। কিন্তু এখানেও রাখাল ভট্টা-চার্যের ছায়া এসে সুপর্ণাকে গ্রাস করলো। তারপরের কাহিনীতে না গিয়ে সুপর্ণার শেষটুকু বলি। বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছে মণীশ রায়। বাবার বান্ধবের হাতে সুপর্ণাকে তুলে দেবার পর এই প্রথম পান্নাবাঈ তাকে দেবযানী মণীশকে তার সবকথা জানিয়েছিল। বলেছিল—'মণীশ' দেব-যানী আজও যদি কোথাও বেঁচে থাকে, —সে আছে তোমার মধ্যে, সুপর্ণাকে দেখ। তোমার দেবযানীর আত্মা তৃপ্ত হবে।'

মঞ্জু দে পরিচালিত 'স্বর্গ হতে বিদায়' চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্তে দিলীপ মুখার্জি ও মাধবী মুখার্জি ফটো : অমৃত

সেই থেকে সুপর্ণাকে মানুষ করে-ছিল মণীশ রায়। সুপর্ণাও ব্যারিস্টার হল। কিন্তু এখানেও রাখাল ভট্টাচার্যের ছায়া এসে পড়লো। মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনকে পূর্ণ করতে পান্নাবাঈ নিজেই রাখালকে খুন করতে বাধ্য হল। কিন্তু আইনের আদালতে পান্নাবাঈ ধৃত। ন্যায়-দণ্ডের বিচারে মণীশ পান্নাকে বাঁচাতে উতলা হওয়ায় সুপর্ণা অজান্তে এবং অজ্ঞানে চরম আঘাত করে বলতে বাধ্য হয়—'কাকু, এই রকম একটা নোংরা মামলা নিয়ে মেতে উঠেছো কেন?' হঠাৎ সুপর্ণার এ প্রশ্নে মণীশ একটা শুধু উত্তরই দিয়েছিল—'বাঈজী পান্নাবাঈয়ের সেই মেয়ে হচ্ছো তুমি।'

—চিত্রদূত

খেলার কথা

অজয় বসু

ফ্র্যাঙ্ক ওরেলকে আর ক্রিকেট মাঠে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ আফসোস রাখি কোথায়?

বছর দুয়েকের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের আবার ভারত সফরের কথাবার্তা চলছে। হয়তো তাঁরা আসবেনও। কিন্তু সে দলে থাকবেন না 'কমপ্লিট ক্রিকেটার' ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। ওরেলকে 'কমপ্লিট ক্রিকেটার' বলছি কেন? বলছি তাঁর ক্রীড়াগত উৎকর্ষ এবং ক্রিকেট চরিত্রের কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতিতে।

ওরেল ফিল্ডিং করতে পারেন, ব্যাট করতে পারেন, বোলিংয়ে, কি সুইং বোলিং, কি স্পিন বোলিং, দু' ধরণের বোলিংয়েই তাঁর দক্ষতা স্বীকৃত। তাছাড়া অধিনায়ক হিসেবে তিনি চতুর, বিচক্ষণ এবং রীতিমতো সফলও। সুতরাং ওরেল যদি একজন সম্পূর্ণ ক্রিকেটার না হন, তাহলে 'কমপ্লিট ক্রিকেটার' যে কে তা আমার জানা নেই।

ক্রিকেট দলগত খেলা। তবু তা ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে দেওয়ার সহজ প্রক্রিয়া। ব্যক্তিত্বের প্রতিভায় আসল খেলাটিরও আকর্ষণ বাড়ে। ক্রিকেট ইতিহাসে তাই অবিস্মরণীয় পুরুষ বলে চিহ্নিত হয়ে যারেন তাঁরাই যাঁদের মূলধন শুধু ক্রীড়াগত দক্ষতাই নয়। স্মরণীয় তাঁরা যাঁরা প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষরে, চরিত্রের উত্তাপে ক্রিকেটকে আকর্ষণীয় ও রমণীয় করে তুলতে পেরেছেন। ওরেলের ক্রিকেট সেই রমণীয় সম্পদেরই প্রতীক। তাই তিনি বরণীয়ও।

ক্রিকেট যদি 'খেলার রাজা' হয়, তাহলে ক্রিকেটার ওরেল রাজার রাজা। মাঠে তাঁর আবির্ভাব ও অস্তিত্ব রাজকীয়। মেজাজও মেঠো নয়, অভিজাত। ব্যক্তিগত ক্রীড়াকৃতির মতোই। শুধুমাত্র আত্মপ্রকাশেই তাঁর বিজয়বার্তা ঘোষিত হোতো।

ওরেলের পরিমিতিবোধ পরিপূর্ণ। অথচ দর্শকদের কাছে তিনি কৃপণ নন। খেলায় আত্মস্থ হয়ে তিনি নিজে যেমন আনন্দের উপাদান তিলে তিলে সঞ্চয় করেছেন, তেমনি সেই উপকরণগুলিকে দরাজ মেজাজে দু'হাতে মাঠে মাঠে ছড়িয়ে দিতেও তাঁর বাধে নি।

বেশী দিনের কথা নয়। ১৯৬০ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম 'কালা অধিনায়ক' ফ্র্যাঙ্ক ওরেল অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে শুধু মুখের ভাষায় নয়, হাতে-নাতে, কাজে কর্মে ক্রিকেটকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে চাইছেন। অতি প্রত্যক্ষ সে ভূমিকায় প্রভাবও দূরপ্রসারী। দেখে অনুপ্রাণিত হলেন অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনোও। ওরেলের অনুসরণে তিনিও ঘটালেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

খেলা জমে উঠলো। উত্তেজনা, উদ্দীপনায় ক্রিকেটের প্রাঙ্গণ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে একটি টেস্টে দু' পক্ষের রাণ এক বিন্দুতে এসে আটকা পড়লো। যা আগে কখনো হয় নি। ভবিষ্যতে যা ঘটবে কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই।

সে পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে ময়দানে টেস্টখেলা উপলক্ষ্যে ঝুড়ি ঝুড়ি রাণ সংগৃহীত হয় নি। ব্যাটে-বলে টানাপোড়েন চলেছে নিয়মিত। পাশাপাশি চলেছিল সুপ্রতিভ ফিল্ডিং। আর সেই সব মিলিয়েই নতুন প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আসল অনুষ্ঠানটি। আসল অনুষ্ঠান ক্রিকেটের কাঠামোয় তো সবই থাকে—থাকে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং। তবে সে কাঠামো বহিরঙ্গ মাত্র। প্রাণ তার জীবন্ত নেতৃত্বের দান।

এতোকথা বলার পরেও স্বীকার করি যে, সেবার অস্ট্রেলিয়ায় যা ঘটেছিল দূরে থেকে আমরা তা দেখতে পাই নি, যতোই কেন না তা উপলব্ধি করার প্রয়াস পাই। কাছে থেকে, ব্রিজবেনের দর্শকআসনে হাজিরা দিয়েও প্রত্যক্ষদর্শীরাও বোধহয় তা তেমনভাবে দেখতে পান নি। যেমন দেখেছিলেন একমাত্র সেই অন্ধ তরুণ: আবেগে অস্থির হয়ে বোবা কান্নায় আঁকা ডাগর ডাগর আখরগুলি যিনি লেপাফায় ভরে ওরেলের কাছে পাঠিয়ে বলেছিলেন,

চোখ নিয়ে ভগবান আমায় মেরেছেন। কিন্তু আপনি আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। লোকে না করুক, আপনি বিশ্বাস করুন; আমি সত্যিই চোখ চেয়ে এবারের টেস্ট খেলার সূত্রে আপনাকেও দেখতে পেয়েছি। আপনি শুধু ক্রিকেটকে নতুন জীবনই দেননি, আমার মতো ভগ্যাহীনের অন্ধতাও ঘুচিয়ে দিয়েছেন!

এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে! চিঠিটা পড়তে গিয়ে চোখের জলে ফ্র্যাঙ্কির দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে উঠেছিল।

তারপরই এবারের ইংলণ্ড সফর। সেরা সেরা খেলোয়াড়েরা সহযোগী ছিলেন। মাঠের খেলায় ওরেলের সমস্যা তেমন ছিল না। কিন্তু সমস্যা ছিল স্বতন্ত্র।

ক্রিকেট শাস্ত্রের লেখক ওরেল ইংলণ্ডের ক্রিকেটের পেশাদারী মানসিকতাকে 'গাল' পেড়ে ইংলণ্ডের ক্রীড়ামহলের বিরাগভাজন হয়েছিলেন আগেই। তার ওপর কদিন আগে ইংলণ্ডের শহুরে জীবনে ধলাকালার সংঘর্ষে এক বিপর্যয় নেমে এসেছিল। এরই ফাঁকে দলনায়ক ওরেলের ইংলণ্ড পরিক্রমার আয়োজন।

দলে 'খুনে' ফাস্ট বোলাররা আছেন। দর্শকআসনে স্বদেশীয় সমর্থনের উত্তাপও রয়েছে। সংযমের ঘাটতি পড়লে যেকোনো মুহূর্তে বারুদে আগুনে-কাঠির ছোঁয়া লাগতে পারে। কিন্তু সব উত্তাপে জল ছিটিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল তাঁর শান্ত, সংযত, বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বকে জয়যুক্ত করে তুললেন।

হেরে গিয়েও গোঁড়া ইংরেজ ওরেলের জয়ধ্বনি তুললো। আদর করে ডাকলে 'শুভেচ্ছার মহান দূত' বলে। এই ডাকেই মানুষ ওরেলের কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতি আবার সোচ্চার হলো। এই উচ্চারিত অভিনন্দন কাল থেকে কালান্তরে এসেও যে মধুর হয়ে থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি!

মানুষ ওরেলকে ভাল করে চিনেছে হাতের কাছে পেয়ে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ড। আমাদের কপাল মন্দ। কারণ ওরেল ভারতভূমিতে অধিনায়ক হিসেবে কোনো দিন আসেন নি। এসেছিলেন খেলোয়াড় হিসেবে।

তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, তাঁর ক্রীড়াদক্ষতার এক অম্লান চিহ্ন আঁকা রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষেরই এক ক্রিকেট মাঠে। ফ্র্যাঙ্কির নিজের মতে ১৯৪৯-৫০ সালে কমনওয়েলথ বনাম ভারতীয় দলের চতুর্থ টেস্ট উপলক্ষ্যে কাণপুরে তিনি যেমন খেলেছিলেন তেমনি খেলতে আর কোনো দিনই তিনি পারেন নি। ও'র মুখেই শুনুন।

'যখনই কেউ আমায় জিজ্ঞাসা করেন, কোন্‌টি আপনার সেরা ইনিংস? অমনি আমি কাণপুরের দিকে তাকাই।

'কাণপুরে খেলা হয়েছিল দড়ির ম্যাটিংয়ে। উইকেট ব্যাটসম্যানের অনুকূলে ছিল না। তবু সেদিন আমি যা করেছি সবই সার্থক হয়েছে। রাণ পেতে আমায় মেহনত করতে হয়েছে। সেদিনে আমার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, শরীর প্রস্তুত এবং মনও সক্রিয়। ঠিক সময়ে ব্যাটের ঠিক জায়গায় বল লাগাতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি।

'ছ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট উইকেটে থেকে আমি ভারতীয় দলের সর্বাত্মক আক্রমণ উপেক্ষা করেছি। এবং শেষ

পর্যন্ত ২২৩ করে অপরাজিত থেকে যাই।

'কাণপুরের এই খেলাকেই আমি সব সময়ে আমার জীবনের সেরা ইনিংস বলে মনে করি। ইংলণ্ডে আমি বার দুয়েক ডাবল সেঞ্চুরী করেছি। হয়তো সেদুটি দৃষ্টান্ত আরও বেশী প্রচারিত। কিন্তু আমার কাছে কাণপুরের খেলায় সাফল্যের মূল্যই সবচেয়ে বেশী। কারণ ইংলণ্ডে ওই দুবারই উইকেট ছিল ব্যাটসম্যানের পক্ষে। কিন্তু কাণপুরে নয়। অনুকূল ও প্রতিকূল উইকেটে খেলার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই থাকে।"

অসংকোচ উক্তি আসল খেলোয়াড়-টির। তাই বলছিলাম যে ব্যাটসম্যান ওরেলের অভিজাত ক্রীড়াশৈলী প্রত্যক্ষ করার বড় সুযোগ আমাদেরই, ভারত-বাসীরই হয়েছে।

তবে কাণপুরের খেলা না দেখতে পেলেও ওরেলের খেলা দেখতে না পাওয়ার ক্ষোভ ইংলণ্ডের ক্রীড়ানুরাগীদের নিশ্চয়ই নেই। একমাত্র ১৯৫০ সালে তিনি প্রত্যাশামুখী মনের সমস্ত চাহিদাই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সফর উপলক্ষ্যে ওরেল করেছিলেন মোট ১৭৭৫ রাণ, গড়ে ৬৮·২৬। দুটি ডাবল সেঞ্চুরী সমেত ছটি সেঞ্চুরী। এবং টেষ্ট ম্যাচে উপর্যুপরি শতাধিক রাণ।

নটিংহামের ট্রেন্টব্রিজ মাঠে ইংলণ্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টে তাঁর ২৬১ রাণের কথা ইংলণ্ডের দর্শকেরা কি কোনোদিন ভুলতে পারবেন?

হাত-ছাড়া পোষা মারগুলি নটিং-হামের মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি দর্শক-দের চোখের সামনে কেতাবের সবকটি পাতাই তুলে ধরেছিলেন। ড্রাইভ, কাট হুক, পুল, যতো রকম মারের সন্ধান আছে শাস্ত্রে, সবকিছুরই পরিচ্ছন্ন নিদর্শন। সহযোগী উইকস সবিক্রমে খাঁড়া চালাচ্ছিলেন ওপ্রান্তে, আর এ প্রান্তে ওরেলের সহজ, স্বাভাবিক ক্রীড়া-রীতি দর্শকদের চোখে স্নিগ্ধতার কাজল আঁকছিল।

দুজনের মাঝখানে পড়ে সেদিন ইংলণ্ডের রণকৌশল আত্মবিলুপ্তি ঘোষণা করেছিল। দুজনে মিলে তিন ঘণ্টারও কমে রাণ তুলেছিলেন ২৪১। রাণ ওঠায় ঝড়ের গতি ছিল সন্দেহ নেই। তবু ওরেলের আচরণে সেদিন দ্রুতগতির আভাষ প্রত্যক্ষ ছিল না। কারণ তাঁর স্টাইল স্বতন্ত্র—যেমন সহজ, স্বাভাবিক, তেমনি পরিশীলিত। দেখে ইংলণ্ডের বিজ্ঞ সমালোচকেরা সেদিনই রায় দিয়ে-ছিলেন যে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলই হলেন বর্ত-মানে বিশ্বের সেরা স্টাইলিস্ট।

সত্যি স্টাইল বটে ওরেলের। কবি-গুরুর ভাষায় যা 'মুখশ্রী', 'মুখোশ' নয়, তাইই। খোলা মাঠের মতোই মুক্ত সেই স্টাইল। তেমনি উদার, দিগন্তপ্রসারিত, সেই স্টাইল আতঙ্ক জাগাতো না। ভাল-বাসতে প্রেরণা যোগাতো। তাঁর ব্যাটিংয়ের গতিপ্রকৃতি গতিশীলা স্রোতস্বিনীর মতো বয়ে যেতো অবাধে। স্রোতস্বিনী হাঁক-ডাক তোলে না, কুলকুল ধ্বনিতে সংগীতের মূর্ছনা জানায়। সেই সংগীতময় জগতের মাঝেই ওরেলের ব্যাটিং একান্ত সুসমঞ্জস।

আর একটি উপমারও উল্লেখ করা যায়। জমাটবাঁধা মাখনের ওপর শানিত ছুরির চাপ পড়লে যে অবস্থা হয়, ওরেলের ব্যাটিং যেন তাইই। কতো সহজে কতো দ্রুত রাণ যে তিনি তুলছেন তা চোখে দেখে বোঝা যেতো না। যেতো ঘড়ির কাঁটার সংগে রাণের গতি মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলেই।

দুরূহ কাজ সহজেই যাঁরা করতে পারেন তাঁদের প্রতিভা সহজাতই। সহজাত বলেই না ১৯৪৮ সালে ওরেল সেই ঐতিহাসিক উক্তি করেই পরক্ষণেই তাঁর কথা রাখতে পেরেছিলেন! কোন উক্তি? বলছি।

১৯৪৮ সালে 'গাবি' অ্যালেন পরি-চালিত ইংলণ্ডের বিপক্ষে পোর্ট-অব-স্পেন মাঠে তরুণ ওরেল সর্বপ্রথম টেস্ট খেলতে নেমে প্রথম ইনিংসেই ৯৭ রাণ করে ফিরে এলেন। তাঁবুতে শুভাকাঙ্খীরা ঘিরে ধরলেন তাঁকে,

'ইস্ আর তিনটি রাণ করতে পারলে না!' ওরেল বল্লেন,

'আফসোস কিসের? পরের ম্যাচেই সেঞ্চুরী করবো।'

এবং যেমন কথা, তেমনি কাজ। পরের টেস্টেই ওরেলের নামের সংগে যুক্ত হয়ে রইলো অপরাজিত ১৩১।

টেস্টম্যাচে ওরেলের সেঞ্চুরীর সংখ্যা মোট নটি। বিস্তৃত হিসাবে অপরাজিত ১৩১, ২৬১, ১৩৮, ১০৮, ১০০, ২৩৭, ১৬৭, অপরাজিত ১১১ ও অপরাজিত ১৯৭। মোট রাণ ৩৮৬০, গড়ে ৪৯·৪৮। জীবনমধ্যাহ্নে বছর কয়েক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে ওরেল ক্রিকেট নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি, ঘামালে হয়তো টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর সংগ্রহ আরও বাড়তো।

১৯২৪ সালের পয়লা আগস্ট বারবাদোজের ব্রিজটাউনে ওরেলের জন্ম। মাত্র সতেরো বছর বয়সে স্কুল-জীবনেই প্রথম শ্রেণীর আসরে নেমেছেন। ১৯ বছর ১১৯ দিনের মাথায় ৩০৪ রাণ (নট আউট) করে ট্রিপল সেঞ্চুরী করার সর্বকনিষ্ঠ-স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সেই ম্যাচে ট্রিনিদাদের বিপক্ষে বার-বাদোজের পক্ষে তিনি আর জন গডার্ড ৪০৪ মিনিটে এক উইকেটে ৫০২ রাণ যোগ করেছিলেন।

ওয়ালকটের সহযোগিতায় আরও একবার তিনি এক উইকেটে ৫৭৪ রাণ তুলেছিলেন মাত্র ৩৩৫ মিনিট খেলার সুযোগে। সেবার ওরেল নিজে করেন ২৫৫। এটি একটি রেকর্ড। কারণ ওরেল ছাড়া আর কেউই এখনও দু দুবার এক উইকেটে পাঁচশ রাণ তোলায় সতীর্থদের সহযোগিতা করতে পারেন নি।

কিন্তু একজন 'কমপ্লিট ক্রিকেটারে'র কেবলমাত্র ব্যাটিংয়ের কথাই আমরা আলোচনা করছি কেন? অন্য প্রসংগও আনা যাক্।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কালা আদিবাসী ফ্র্যাঙ্ক ওরেল জাতীয়দলের নেতৃত্ব করেছেন পনেরো বার। তাঁর নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছে নবার ও দুপর্যায়ে এবং হেরেছে এক পর্যায়ে ও মোট তিনটি টেস্টে। টেস্ট খেলায় উইকেট পেয়েছেন কমপক্ষে উনসত্তরটি, গড়ে উইকেট পিছু ৩৮·৭৩ রাণে।

ওরেলের ক্ষুরধার বোলিংয়ের কার্য-কারিতার সামান্য কিছু নজীর রেখেই আজ এই প্রসংগ শেষ করছি।

১৯৫০ সালে ইংলণ্ডে নটিংহাম-শায়ার কাউন্টি দলের সংগে খেলার মাঝপথে বৃষ্টি নামাতে মটসের দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিংয়ের সময় উইকেট স্পিন বোলিংয়ের অনুকূলে চলে গেল। দলে সেদিন নামকরা স্পিনাররা নেই। দলপতি গডার্ড ভাবছেন, কি করা যায়!

এগিয়ে এলেন ওরেল। বল্লেন, আমায় দিন্। ওঁদের ফিরিয়ে দিচ্ছি।

এবারেও কথায় ও কাজে পুরোপুরি মিলন ঘটলো। সাধারণতঃ সুইং বল করেন ওরেল। কিন্তু সেদিন বলে পাক ধরিয়ে অল্প রাণেই পাঁচটি উইকেট নিয়ে নটিংহামকে হারিয়ে দিলেন। কতকটা যেন একার সামর্থ্যেই।

সাসেক্সের সংগে খেলার দিনে কিন্তু আবহাওয়া ছিল ভারী আর উইকেটও প্রাণবন্ত, তবে স্পিন বোলিংয়ের প্রতি-কূল। সুযোগ বুঝে সেদিন ওরেল সুইং করাতে লাগলেন এমনই যে প্রথম দিনেই সাতাশ রাণে পাঁচটি উইকেট পেতে তাঁর অসুবিধা হোলো না, অসুবিধায় পড়লো সাসেক্স কাউন্টি এবং সেই সূত্রেই তারা পরাজয় মানতেও বাধ্য হলো।

একাধারে ব্যাটসম্যান, সুইং বোলার, স্পিনার, দক্ষ ফিল্ডসম্যান এবং সুচতুর দলনায়ক যিনি তিনিই তো সম্পূর্ণ বা কমপ্লিট ক্রিকেটার। তাঁর অবসর গ্রহণে ক্রিকেট দুনিয়া যে আধখানা বা ইনকম্-প্লিট হয়ে পড়বে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

অনেক দিয়েছেন তিনি আমাদের। চাইবার মতো কিছু অবশিষ্ট নেই। শুধু নিবেদন উত্তরসূরী ক্রিকেটারদের কাছে এইমাত্র, তাঁরা যেন নিষ্ঠায় ও শ্রদ্ধায় ফ্র্যাঙ্ক ওরেল প্রদর্শিত পথ পরিক্রমা করতে পারেন। সেই পথই ক্রিকেটের উজ্জীবনের পথ। ক্রিকেট অনুরাগীদের মুক্তির দিশানা।

খেলাধূলা

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

দর্শক

॥ অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ॥

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার পর টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন। এই সঙ্গে, ওরেলের নামের সঙ্গে এক হয়ে আছে এমন দু'জন অবসরপ্রাপ্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান টেস্ট খেলোয়াড়ের নামও স্বাভাবিক কারণে ক্রিকেট অনুরাগীদের মনে পড়বে। তাঁরা—ওয়ালকট এবং উইকস। ওয়ালকট, উইকস এবং ওরেল—এই তিনটি নাম ঐতিহাসিক কারণে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। এই তিনজনেরই নামের ইংরেজি আদ্য অক্ষর 'W'—এবং ক্রিকেট অনুরাগীরা যথার্থ কারণে এই তিনজনকে বলতেন তিন 'ডব্লিউ'-এর অবিচ্ছিন্ন জুটি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের এই ত্রিমূর্তি বিপক্ষ দলের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই তিনজনের যে কোন একজন উইকেটে থাকতে বিপক্ষ দলের দুশ্চিন্তার বিরাম ছিল না। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দল এই ত্রিমূর্তির শক্তিমত্তার পরিচয় হাড়ে-হাড়ে পেয়েছে। ১৯৫৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কিংসটনে উভয় দেশের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলা হচ্ছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে ৫৭৬ রান তুলে দেয়। স্কোর বোর্ডে তিনজনের পর পর নাম ছিল—ওরেল ২৩৭ রান, উইকস ১০৯ রান এবং ওয়ালকট ১১৮ রান। এই তিনজনের মধ্যে ওয়ালকট এবং উইকস তাঁদের জীবনের প্রথম টেস্ট খেলবার সুযোগ পান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৪৮ সালে (প্রথম টেস্ট, ব্রিজটাউন, জানুয়ারী ২১)। ওরেলকে একটা টেস্ট ম্যাচ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ওয়ালকট উইকস এবং ওরেল এই ত্রিমূর্তিকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পরবর্তী দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় দেখা গেল (ফেব্রুয়ারী ১১, ১৯৪৮)। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে পঞ্চম টেস্ট খেলে উইকস তাঁর ৪৮তম টেস্ট খেলার মাথায় টেস্ট খেলা থেকে অবসর নেন। ওয়ালকট অবসর নিয়েছেন ১৯৬০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পঞ্চম টেস্ট খেলার পর। ওয়ালকট ৪৪টা টেস্ট ম্যাচ খেলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক টেস্ট ক্রিকেট খেলার রেকর্ড করেছেন ওরেল—৫১টা টেস্ট খেলা। টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫০ সালের টেস্ট সিরিজে। মোট চারটে টেস্ট খেলায় তিনি ৫৩৯ রান করেন এবং নটিংহামের টেস্ট খেলায় তিনি ৩৩৫ মিনিটে ২৬১ রান করেন (৩৫টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউণ্ডারী)। এই টেস্ট সিরিজে আরও একটা সেঞ্চুরী (১৩৮ রান) করেন, ওভাল মাঠে। এই ১৯৫০ সালের টেস্ট সিরিজে উইকেট পান ৬টা, ১৮২ রানে। ওরেল লেফ্‌ট-আর্ম মিডিয়াম পেস বোলার হিসাবে টেস্টে একাধিক বার ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫১-৫২ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এডলেডের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ওরেল মাত্র ৩৮ রানে ৬টা উইকেট পান—সিরিজের এই তৃতীয় টেস্ট খেলাতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের একমাত্র জয় হয়।

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল একজন বিশ্ববিখ্যাত কুশলী ক্রিকেট খেলোয়াড়। শুধু খেলোয়াড় হিসাবেই তিনি খ্যাতিমান নন, দল পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা বিশ্ববিশ্রুত। তাঁর অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৯৬২ সালে ৫—০ খেলায় ভারতবর্ষকে এবং ১৯৬৩ সালে ৩—১ খেলায় (ড্র ১) ইংল্যান্ডকে পরাজিত ক'রে 'রাবার' জয় করেছে। তাঁর নেতৃত্বে দলের একমাত্র পরাজয় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে। তবে অস্ট্রেলিয়া সফরে (১৯৬০-৬১) 'রাবার' জয় করার চেয়েও ওরেলের বড় জয় হয়েছে—অস্ট্রেলিয়ার জনগণের হৃদয়। সেই সঙ্গে তিনি বিশ্বের ক্রিকেট-অনুরাগী মহলেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছেন। ক্রিকেট খেলার বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি টেস্ট সিরিজে দল পরিচালনা ক'রছিলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, নিস্তেজ ক্রিকেট খেলায় প্রাণ সঞ্চার করা—খেলার জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন ছিল তাঁর কাছে একান্ত গৌণ। ফলে প্রতিটি টেস্ট খেলাই দারুণ উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলা। এই প্রথম টেস্ট খেলায় উভয় দলেরই সমান ৭৩৭ রান ওঠে—টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। এই ঐতিহাসিক 'টাই' টেস্ট খেলার স্মৃতিরক্ষার্থে অস্ট্রেলিয়ারই উদ্যোগে ওরেল ট্রফির প্রবর্তন করা হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী দলের পুরস্কার এই ওরেল ট্রফি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যে নাগরিক সম্বর্ধনা লাভ করেন তা একমাত্র রাজারাণীর সম্বর্ধনা সভার সঙ্গে তুলনা করা যায়। দলের এই জনপ্রিয়তার মূলে ছিলেন অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল।

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ইংল্যান্ডের ক্রিকেট অনুরাগী মহলে বিশেষ জনপ্রিয় খেলোয়াড়। ইংল্যান্ডের সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাসায়ার লীগ এবং ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে তিনি দীর্ঘকাল পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে দর্শক সাধারণকে আনন্দমুখর ক'রে রেখেছিলেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করলেও ওরেল স্থানীয় ক্রিকেট খেলা থেকে উপস্থিত অবসর গ্রহণ করছেন না। ইংল্যান্ড সফর শেষ ক'রে তিনি জামাইকায় ফিরে সিনেট সভার সভ্য হিসাবে রাজনীতিতে যোগদান করবেন। তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হবে।

॥ আমেরিকান লন টেনিস ॥

আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস মহলে ইংল্যান্ডের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা এবং আমেরিকার জাতীয়

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল—টেস্ট পরিসংখ্যান

বিপক্ষ দেশ	ব্যাটিং: টেস্ট খেলা	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী সংখ্যা	বোলিং: মোট রান	উইকেট সংখ্যা
ইংল্যান্ড	২৫	১৯৭৯	২৬১	৬	১২১১	২৮
অস্ট্রেলিয়া	১৪	৯১৮	১০৮	১	৯৯৭	৩০
ভারতবর্ষ	১০	৭৩০	২৩৭	১	৩৮৪	১
নিউজিল্যান্ড	২	২৩৩	১০০	১	৮১	২
মোট :	৫১	৩৮৬০	২৬১	৯	২৬৭৩	৬১

লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার গুরুত্ব সব থেকে বেশী। ১৯৬৩ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা গত জুলাই মাসে শেষ হয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকার জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হল—ব্রুকলিনে পুরুষ এবং মহিলাদের ডাবলস খেলা (২৫শে আগষ্ট) এবং ফরেণ্ট হিলসে বাকি তিনটি—পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস (৮ই সেপ্টেম্বর)। এই দুই স্থানের মোট পাঁচটি বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি মহিলাদের সিঙ্গলস মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস ফাইনালে খেলে শেষ পর্যন্ত খেতাব জয় করেছে মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে। মিক্সড ডাবলস ফাইনালে বিজিত জুটিতেও অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি খেলেছিলেন আমেরিকার খেলোয়াড়ের সঙ্গে। প্রতিযোগিতার বাকি তিনটি অনুষ্ঠান—পুরুষদের সিঙ্গলসে মেক্সিকো, মহিলাদের সিঙ্গলসে ব্রেজিল এবং পুরুষদের ডাবলসে আমেরিকার প্রতিনিধি খেতাব পেয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথ তিনটি বিভাগের ফাইনালে খেলে দুটি খেতাব পেয়েছেন। সিঙ্গলসের ফাইনালে তাঁর পরাজয় রীতিমত আকস্মিক ঘটনা। কুমারী স্মিথ ১৯৬২ সালে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। উইম্বলেডন খেতাব না পাওয়াতে একই বছরে বিশ্বের এই সেরা চারটি লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব লাভের দুর্লভ গৌরব তিনি অল্পের জন্যে হাতছাড়া করেছিলেন। ১৯৬৩ সালে তাঁর খেলার ফলাফল গত বছরের থেকে খারাপ—মিস স্মিথ মাত্র দুটি সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন (অস্ট্রেলিয়ান এবং উইম্বলেডন)। ১৯৬৩ সালে আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় অস্ট্রেলিয়ার কোন খেলোয়াড় কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠতে পারেন নি—এ এক তাজ্জব ব্যাপার। কারণ গত সাত বছর (১৯৫৬—৬২) অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়ই সিঙ্গলস খেতাব জয় করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এই একটানা বিজয় অভিযানের পথে আজ জয়মাল্য গলায় নিয়ে দাঁড়িয়েছেন মেক্সিকোর রাফেল ওসুনা। সিঙ্গলস ফাইনালে ল্যাটিন আমেরিকার খেলোয়াড় ইতিপূর্বে একবার খেলেছেন কিন্তু সিঙ্গলস ফাইনাল খেলায় জয়লাভের পুরস্কার ল্যাটিন আমেরিকায় এই প্রথম গেল।

পুরুষদের ডাবলস খেতাব গত বছর আমেরিকা থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন রাফেল ওসুনা এবং প্যালাফক্স। এই জুটিই গত তিন বছর (১৯৬১—৬৩) ডাবলসের ফাইনালে খেলেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন ব্রেজিলের কুমারী মেরিয়া বুইনো। এই নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। প্রথম পান ১৯৫৯ সালে। ডাবলসের খেলোয়াড় হিসাবেও বুইনোর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। কুমারী বুইনো এবং আমেরিকার কুমারী ডার্লিন হার্ডের জুটি দু'বার (১৯৬০ ও ১৯৬২) মহিলাদের ডাবলস খেতাব পেয়েছেন।

প্রতিযোগিতায় প্রায় প্রতিবারের মত এবারও কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের পরাজয় দর্শকদের রীতিমত হতবাক করেছে এবং সেই সঙ্গে টেনিস খেলার পণ্ডিত মহল যথেষ্ট অপ্রস্তুত হয়েছেন তাঁদেরই প্রস্তুত ক্রমপর্যায় তালিকা মত খেলোয়াড়রা শেষ পর্যন্ত খেতাব পাননি বলে। পুরুষদের সিঙ্গলসে খেতাব পেয়েছেন চার নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রাফেল ওসুনা (মেক্সিকো)। এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় 'চাক' ম্যাকিনলে (আমেরিকা) সেমি-ফাইনালে ওসুনার কাছে পরাজিত হ'ন। দু' নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রয় এমার্সনকে চতুর্থ রাউণ্ডে পরাজিত করেন ফ্র্যাঙ্ক ফ্রোহলিং (আমেরিকা)। এমার্সন ১৯৬২ সালের সিঙ্গলস ফাইনালে রড লেভারের (অস্ট্রেলিয়া) কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ব্রেজিলের খেলোয়াড় রোনি বার্নেস প্রতিযোগিতার তিন নম্বর খেলোয়াড় ডেনিস রলস্টোন (আমেরিকা) এবং পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় কেন ফ্লেচারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত ক'রে শেষ পর্যন্ত সেমি-ফাইনালে ফ্র্যাঙ্ক ফ্রোহলিংয়ের কাছে পরাজিত হন। এক নম্বর খেলোয়াড় 'চাক' ম্যাকিনলের পরাজয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথম রাউণ্ডের খেলার সময়ই তাঁর দেহের একাংশের মাংসপেশী ছিঁড়ে যায়। অসুস্থ শরীর নিয়ে তাঁকে পরবর্তী রাউণ্ডের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

মহিলাদের সিঙ্গলস খেলাতেও বাছাই তালিকা মত ফল হয়নি। ইংল্যাণ্ডের মিস ডি ক্যাট চতুর্থ রাউণ্ডে তিন নম্বর বাছাই খেলোয়াড় কুমারী বিল্লি জিন মোফিটকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন। দু'নম্বর বাছাই খেলোয়াড় কুমারী ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) কোয়ার্টার ফাইনালে অপ্রত্যাশিতভাবে ইংল্যাণ্ডের শ্রীমতী এ্যান হেডেন-জোন্সের হাতে পরাজিত হ'ন। ফাইনালে এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় এবং গত বছরের বিজয়িনী কুমারী মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত হন কুমারী মেরিয়া বুইনোর (ব্রেজিল) কাছে।

মিক্সড ডাবলস ফাইনালে জয়লাভ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবং কেন ফ্লেচার। ফলে তাঁরা ১৯৬৩ সালের অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান—এই চারটি প্রতিযোগিতার মিক্সড ডাবলস খেতাব পেলেন। একই বছরে মিক্সড ডাবলস বিভাগে এই চারটি খেতাব ইতিপূর্বে কোন জুটি জয় করতে সক্ষম হননি।

প্রতিযোগিতায় একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন প্রেমজিৎ লাল। প্রথম রাউণ্ডের খেলায় পাঁচ নম্বর বাছাই খেলোয়াড় কেন ফ্লেচার (অস্ট্রেলিয়া) তাঁকে ৯—৭, ৪—৬, ৬—১ ও ১৪—১২ গেমে পরাজিত করেন।

॥ পরলোকে তরুণ সাংবাদিক ॥

গত ১৫ সেপ্টেম্বর তরুণ সাংবাদিক শুভময় ঘোষ ইনফেকটিভ হিপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। শ্রীনিকেতনের অন্যতম সংগঠক স্বর্গত শ্রীকালীমোহন ঘোষের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীসাগরময় ঘোষ তাঁর সহোদর।

॥ আই এফ এ শীল্ড ॥

১৯৬৩ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলার এখনও দুটো সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলা বাকি; কিন্তু বহু মুখে শুনছি, খেলা শেষ হ'তে আর বাকি কি আছে— যে খেলায় দুই খ্যাতিমান—মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের এক পক্ষও নেই সে খেলার শেষ হয়ে গেছে। চতুর্থ রাউণ্ডে মোহনবাগান ০—২ গোলে বি এন আর দলের কাছে এবং ইস্টবেঙ্গল ১—২ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলের কাছে পরাজিত হয়ে এ বছরের মত আই এফ এ শীল্ড খেলা থেকে বিদায় নিয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের মত উবে গেছে খেলার মাঠের উত্তেজনা এবং জনসমাগম। ক'লকাতার ময়দান এখন ভাঙ্গা-আসর।

১৯৪২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আই এফ এ শীল্ডের খেলায় আসর জমিয়ে রেখেছিল দুটি দল—মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। ১৯৪২ সাল থেকে মাত্র দু' বছর বাদে (১৯৫৫ ও ১৯৫৭) প্রতি বছর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে কোন-না-কোন এক পক্ষ ফাইনালে খেলেছে। আবার একাধিক বছর দেখা গেছে দুই পক্ষই ফাইনালে খেলছে। নানা কারণে, ১৯৪৬, ১৯৫২ ও ১৯৫৯ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলা বাতিল হয়ে যায়। এই তিন বছর বাদ দিয়ে বাকি ১৮ বছরের খেলার ফলাফল ধরলে দেখা যায়, মোহনবাগান ৭ বার এবং ইস্টবেঙ্গল ৭ বার আই এফ এ শীল্ড পেয়েছে। ১৯৬১ সালে যুগ্মভাবে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল শীল্ড পায়। বাকি পাঁচ বছরে শীল্ড পেয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৪২ ও ১৯৫৭), বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম রেলওয়ে (১৯৪৪), ইণ্ডিয়া কালচার লীগ (১৯৫৩) এবং রাজস্থান (১৯৫৫)। সুতরাং ১৯৬৩ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলার জৌলুষ যথেষ্ট কমে গেছে। টিকিটেরও হাহাকার থাকবে না।

শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প : (শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র)

আদুরে খোকা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গাড়ীটা চালাচ্ছিলেন তেষট্টি বছরের বুড়ো মিঃ চার্লস এ কোর্পার। কার্পেণ্টারের বজ্রগর্ভ হুমকি শুনেই আঁৎকে উঠে প্রাণ হাতে নিয়ে বায়ুবেগে গাড়ী চালালেন তিনি। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলেন শিকাগোর সবচেয়ে সরগরম স্থান লুপ, ডিয়ারবর্ণ আর ম্যাডিসন স্ট্রীটের কেন্দ্রে। একলাফে গাড়ী থেকে নেমেই উল্কাবেগে উধাও হয়ে গেল কার্পেণ্টার।

প্রথমেই যে পুলিশ প্রহরীটির সঙ্গে দেখা হলো, তার কাছেই হাউ-হাউ করে কোপার সাড়ম্বরে বর্ণনা করলেন এইমাত্র কি ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটে গেল। আঙুলের ছাপের বিশেষজ্ঞ এসে কোর্পারের গাড়ী থেকে উদ্ধার করলেন তালু আর তিনটে আঙুলের ছাপ। কার্পেণ্টারের ছাপের সঙ্গেই তা হুবহু মিলে গেল।

পুলিশ অফিসারকে নিকেশ করেছে কার্পেণ্টার। কাজেই পুলিশ ফোর্সের প্রত্যেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে তার পায়ে বেড়ি পরানোর। যেভাবেই হোক ফাঁদে ফেলতে হবে কার্পেণ্টারকে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, তাকে স্পর্শ করা ততটা সহজ নয়। একটা বাড়তি সূত্র অবশ্য পেয়েছিলাম। মিঃ কোর্পারের কাছে শুনেছিলাম হানাদার লোকটার মুখটা নাকি রোদে পোড়া তামাটে রঙের —প্রায় কালোই বলা চলে। স্থির করলাম, লেক মিচিগানে বেলাভূমিতে যেকটা সমুদ্রস্নানের স্থান আছে, সব কটাতেই একবার আমার যাওয়া দরকার। এ যেন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া, লাগলেও লেগে যেতে পারে।

কিন্তু কিছুই হলো না। চাঞ্চল্যকর গল্পে বোঝাই রইল খবরের কাগজের পাতাগুলো। আমাদের কাছেও এল এন্তার মিথ্যা সংবাদ। শিকাগোর একটি সংবাদপত্র পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে বসল। এমনকি সাহায্য করার জন্যে এফ, বি, আই, (Federal Bureau of Investigation) কয়েকজন এজেন্টকেও পাঠিয়ে দিলে আমাদের দপ্তরে। সবই হলো। কিন্তু কার্পেণ্টারের টিকি দেখা গেল না কোথাও।

ডিটেকটিভ মর্ফি নিহত হওয়ার তিনদিন পর পুলিশকর্মী ক্লারেন্স কের ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে রেখে বউকে

জন ফ্ল্যানেগান

নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন একটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত হলে। মজার ব্যাপার কি জানেন? যে ছবিটা দেখতে গিয়েছিলেন ক্লারেন্স কের, তার নামও কিন্তু 'কল মি ম্যাক'।

সিনেমা হলে ঢুকেই ক্লারেন্স কের-এর চোখ পড়ল একটা লোকের ওপর। পেছনের সারিতে নাক ডাকিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছিল লোকটা। এক নজরেই রিচার্ড কার্পেন্টারকে চিনতে পেরেছিলেন ক্লারেন্স। গোলমাল না করে বউকে বললেন গাড়ীতে ফিরে গিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে।

ইতস্তত করতে লাগলেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর ইচ্ছে ছিল ফোন করে পুলিশ ফোর্জ ডেকে আনা। কিন্তু ক্লারেন্সের সেই এক গোঁ—"কাজটা যখন আমারই আওতায় পড়ছে, তখন আমি একাই সামলাতে পারব তা।"

মাত্র বছরখানেক হলো পুলিশ ফোর্সে যোগদান করেছিলেন ক্লারেন্স। নবাগত তিনি, অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প। তাই বুদ্ধিমতী স্ত্রীর পরামর্শ শুনলেই ভাল করতেন। ঘুমন্ত কার্পেন্টারকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে কড়া গলায় শুধোলেন ক্লারেন্স—'এটা কি ঘুমোবার জায়গা?

'নিজের চরকায় তেল দিন।' ঘুম-জড়ানো স্বরে উত্তর এল তখুনি।

'আমি পুলিশ অফিসার। লবিতে আসুন আমার সঙ্গে।'

ধীর পদে উঠে এল কার্পেন্টার। এমনভাবে এল, যেন তখনও পুরোপুরি ভাবে জেগে ওঠেনি ও। এক হাতে রিভলবার আর এক হাতে ব্যাগ নিয়ে সজাগ হয়ে রইলেন ক্লারেন্স।

ঘুম-ঘুম স্বরে আবার বলে ওঠে কার্পেন্টার—"বাইরে বড় গরম, তাই ঠাণ্ডায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। বে-আইনী কিছু তো করিনি।"
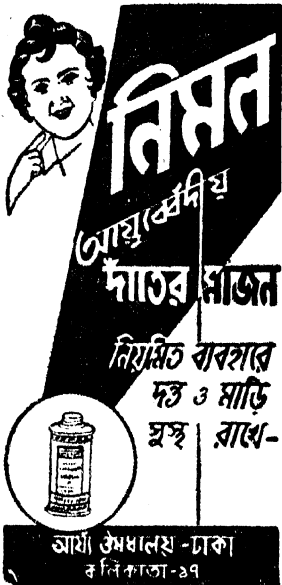
লবিতে প্রবেশ করে দুজনে। ঠিক এই সময়ে হোঁচট খাওয়ার ভান করেই রিভলবার বার করে সোজা ক্লারেন্সের বুকের ওপর গুলিবর্ষণ করলে কার্পেন্টার। ক্লারেন্সও পাল্টা অগ্নি-বর্ষণ করলেন বটে, কিন্তু গুলিটা লাগলো পলায়মান কার্পেন্টারের পায়ে। তীরবেগে ও ছুটে গেল জরুরী অবস্থায় বাইরে বেরোনোর দরজার দিকে। আড়াই শো লোক বসা থাকলেও তখনও বেশ অন্ধকার বিরাজ করছিল সিনেমা হলের মধ্যে। পটাপট শব্দে জ্বলে উঠল আলোগুলো—কিন্তু আবার পাকাল মাছের মতই হাত ফসকে অদৃশ্য হয়ে গেল রিচার্ড কার্পেন্টার।

গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শুনেই লবির দিকে ছুটে এলেন ক্লারেন্সের স্ত্রী। রাস্তা দিয়ে একজন যাজক যাচ্ছিলেন—ফায়ারিংয়ের শব্দে তিনিও বিলক্ষণ আঁৎকে উঠেছিলেন। আসবার সময়ে তাঁকেই হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন ক্লারেন্স-পত্নী। এসে দেখলেন টমাস ব্র্যাণ্ড নামে একজন মেডিক্যাল ছাত্র প্রাথমিক শুশ্রূষা করার পর চেষ্টা করছেন কেরের বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে ছুটে আসা রক্তস্রোত বন্ধ করতে। ক্লারেন্সের চেতনা তখন বিলুপ্ত প্রায়। সেই অবস্থাতেই দুর্বোধ্য ভাবে বিড়বিড় করে চলেছেন—"কার্পেন্টার...কার্পেন্টার...আমি চিনেছি ওকে, কার্পেন্টার·····।"

সেন্ট মেরী অফ নাজারেথ হাসপাতালে পুরো পাঁচ ঘন্টা অপারেশন টেবিলে শুইয়ে রাখা হলো ক্লারেন্স কের-কে। শিকাগোর সবচেয়ে নামকরা বুক আর হৃদযন্ত্র অস্ত্রোপচারক ডক্টর এডোয়ার্ড এ অ্যাভারী দুরূহ অস্ত্রোপচার করে জীবনরক্ষা করলেন ক্লারেন্সের। অত্যন্ত পল্‌কা সুতোর ওপর ঝুলছিল তাঁর জীবন। কেননা হৃদযন্ত্রের কাছেই একটা ধমনী জখম হয়েছিল গুরুতরভাবে। পরে ডক্টর অ্যাভারী আমাদের বলেছিলেন—"হৃদপিণ্ডের স্পন্দনই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কের-কে। বুক ফুঁড়ে বুলেটটা বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে সংকুচিত হয়েছিল ওর হৃদযন্ত্র। তা না হয়ে যদি প্রসারিত হয়ে থাকত, তাহলেই কিনারা কেটে বেরিয়ে যেত গুলিটা—সেক্ষেত্রে ওর মৃত্যু ছিল অবধারিত। কিন্তু এখন আর কোনো ভয় নেই।"

কার্পেন্টারের এই সর্বশেষ পাশবিক অন্তর্ধানের খবর ফলাও আকারে ছড়িয়ে পড়ল খবরের কাগজ, টেলিভিশন আর রেডিওর মাধ্যমে। সে যে কোথায় ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে, সে সম্বন্ধেও মন্তব্য করতে ছাড়লো না খবর পরিবেশকরা। কিন্তু এই একটিমাত্র সমস্যার সমাধান করতে গিয়েই পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেল। কোন্ কোটরে যে সেঁধিয়েছে আহত কার্পেন্টার, তার কোনো হদিশই পেল না পুলিশমহল। জখম অবস্থায় গাড়ী না নিয়ে বেশী দূরে যাওয়া কার্পেন্টারের পক্ষে সম্ভব নয় জানতাম। সারা শহর তখন সচকিত হয়ে উঠেছে—লোকের মুখে মুখে আলোচনা চলছে খুনে-প্রসঙ্গ নিয়ে। সেইজন্যেই আশা ছিল এবার জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তাছাড়া, কম করে ষাটটা পুলিশ স্কোয়াডকেও মোতায়েন করা হয়েছিল খুনে বন্দুকবাজকে পাকড়াও করার জন্যে। প্রতিটি হাসপাতালে খবর চলে গিয়েছিল—যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতস্থান চিকিৎসার জন্যে কার্পেন্টারের আগমন ঘটতে পারে। রেলপথ আর বাস-স্টপেজেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল গোয়েন্দারা। আজে-বাজে লোকের কাছ থেকে টেলিফোন মারফৎ কয়েকটা লোমহর্ষক গল্পও শুনলাম। তারা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে রাস্তার অন্যদিক দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে চলেছে খুনে কার্পেন্টার। কেউ কেউ তাকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছে বিশেষ কোনো ফ্ল্যাটে অথবা দোকানের

মধ্যে। সে নাকি নতুন একপ্রস্থ পোশাক কেনবার চেষ্টা করছে, লেক মিচিগানের নৌকোয় তাকে নাকি উঠতে দেখা গেছে, এবং নিশ্চিতভাবে সে-ই নাকি একটা মালবাহী গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে—এমনও দেখা গেছে। জনা'ছয়েক তরুণকে হাতকড়া লাগিয়ে টেনে আনলো পুলিশ। কিন্তু কার্পেণ্টারের সঙ্গে তাদের মুখের কোনোরকম সাদৃশ্যই পাওয়া গেল না। একজন আঁৎকে উঠে হন্তদন্ত হয়ে খবর আনলে একটা সিনেমাবাড়ীর ছাদে নাকি খুনেটাকে দেখতে পেয়েছে সে। সঙ্গে সঙ্গে স্কোয়াডের অফিসাররা বাড়ীটা ঘেরাও করে তল্লাশ করলে তন্নতন্ন করে। পরিশেষে ছাদের ওপর পাওয়া গেল শুধু দু'জন অর্ধ-বসনা তরুণীকে—রৌদ্র-সুখ উপভোগ করছিল তারা।

এ হেন গদামর পরিস্থিতিতে কার্পেণ্টার গ্রেপ্তার হলে বাস্তবিকই ক্লাইমাক্স থেকে বর্ণিত হতো এই চমকপ্রদ কাহিনী। কিন্তু এরপর যা ঘটলো, তাকে হলিউডি রীতি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না—অলীক উপন্যাস যেন চাঞ্চল্যকর বাস্তবে রূপান্তরিত হলো। যে রাত্রে সিনেমার মধ্যে পুলিশকর্মী ক্লারেন্স কের গুলিবিদ্ধ হলেন, ঠিক সেই রাত থেকেই বিচিত্র এই কাহিনীর মধ্যে জড়িয়ে পড়ল একটা অতি সাধারণ মার্কিন পরিবার--ট্রাক-ড্রাইভার লিওনার্ড পাওয়েল, তার বউ আর সাত বছরের ছেলে রবার্ট আর তিন বছরের মেয়ে ডায়ানা। ওয়েস্ট পোটোমাক এভিন্যুতে এদের নিবাস।

সেই রাতেই উৎসব ছিল পাওয়েলের বাড়ীতে। সাড়ম্বরে ডিনারের আয়োজন করেছিল পাওয়েল তার নবম বিবাহ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন নিয়ে স্ফূর্তিতে উচ্ছল হয়েছিল তারা রাত দশটা পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত। অতিথিরা যখন বিদায় নিলে, তখন পাওয়েলের ছোট মেয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে, আর ছেলে অন্যঘরে বসে টেলিভিশন দেখছে। দারুণ গরম পড়েছিল সে রাত্রে—গাছের পাতা নড়ানোর মত হাওয়াও বইছিল না। রান্নাঘরে গিয়েছিল লিওনার্ড রেফ্রিজারেটর থেকে কোল্ড ড্রিংক বার করার জন্যে, এমন সময়ে পর্দা লাগানো দরজায় টোকা মারার শব্দ শুনতে পেল ও। সামনেই দাঁড়িয়েছিল রিভলবার হাতে রিচার্ড কার্পেণ্টার। লিওনার্ড ওর দিকে ফিরতেই কার্পেণ্টার তুহিন-শীতল স্বরে বলল—"জানেন তো আমি কে?"

নীরবে মাথা হেলিয়ে লিওনার্ড জানালে, হ্যাঁ, সে জানে।

"এইমাত্র আরও একজন পুলিশের লোককে গুলি করে এলাম আমি। আমি যা বলি, তা যদি করেন তো কোনো ক্ষতি হবে না আপনার। আর

তা যদি না করেন, যদি দরজাটা খুলতে না চান—এইখান থেকেই আপনাকে গুলি করবো আমি। খুলে দিন দরজাটা।"

কয়েক মাস আগে মদ্যশালায় পুলিশ কর্মী বর্সাকির যে রিভলবারটা পকেটস্থ করেছিল কার্পেণ্টার, সেইটাই অকম্পিত হাতে উঁচিয়ে ধরে সে লিওনার্ডের দিকে।

পিস্তলটা পকেটে রাখলে ভাল করতেন। ওকে বুঝিয়ে বলব'খন আমাদেরই বন্ধু আপনি। ও তা বিশ্বাস করবে। গণ্ডগোলও করবে না। কিন্তু রিভলবার দেখিয়ে ওকে ভয় পাইয়ে দিলে হয়তো ও চেঁচিয়ে কান্নাকাটি করতে পারে।"

ববি ঘরে ঢুকতেই রিভলবার আড়ালে সরিয়ে রাখল কার্পেণ্টার। মদেজড়ানো গলায় আস্তে আস্তে কয়েকটি

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল রিভলবার হাতে

স্বর শুনেই রান্নাঘরে ছুটে এসেছিল মিসেস পাওয়েল। খুব ধীরাস্থিরভাবে সংক্ষেপে বলে উঠল লিওনার্ড—"ডার্লিং, উত্তেজিত হয়ো না। এরই নাম কার্পেণ্টার। ও বলছে, ওর কথামত কাজ করলে ও গুলি করবে না। আমাদের কোনো ক্ষতিই করবে না। চেঁচিও না।"

অন্যঘরে টেলিভিশন সেটটা চালিয়ে দিলে ববি। কথা বলার শব্দ কানে আসতেই সচকিত হয়ে ওঠে কার্পেণ্টার। সুধোয়—"ওঘরে কে?"

"আমাদের দুই ছেলেমেয়ে। ববি এখন টেলিভিশন দেখছে। কিন্তু এখুনি এঘরে আসবে ও শুভরাত্রি জানাতে।

কথাও বললো তার সঙ্গে। কোনো কিছু সন্দেহ না করে শুতে চলে গেল ববি।

পর পর দু'গেলাস জল খেল কার্পেণ্টার। তারপর মিসেস পাওয়েলকে হুকুম করলে ক্ষতস্থান বাঁধার জন্যে একটা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসতে। লিওনার্ড নিজে থেকেই ওষুধের দোকানে গিয়ে বীজবারক (অ্যান্টিসেপটিক) কিনে আনতে চাইল। কিন্তু কার্পেণ্টার বড় হুঁশিয়ার। বাড়ী ছেড়ে বেরোনো তো দূরের কথা, একটু বেচাল দেখলেই ভয়ংকর পরিণতির সম্ভাবনাটা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলো সে।

এরপর ট্রাউজার খুলে ফেলে আহত উরুর ওপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে কার্পেণ্টার। কের-এর প্রথম বুলেটটা মাংসের মধ্যে দিয়ে গেলেও দ্বিতীয় বুলেটটা গা ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে—এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি। মিসেস পাওয়েলকে দিয়ে টোস্ট আর কফি তৈরী করিয়ে আনল ও। কিন্তু খেল খুব অল্পই।

ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং ক্ষতস্থান শুশ্রূষার পর লিভিংরুমে গিয়ে পাওয়েল দম্পতির সঙ্গে টেলিভিশন দেখতে বসল কার্পেণ্টার। প্রোগ্রাম বন্ধ করে বিস্তারিতভাবে তার সর্বশেষ কীর্তির বুলেটিন প্রচারিত হওয়ার সময়ে নেকড়ের মত দাঁত বার করে হি-হি করে হেসে উঠল কার্পেণ্টার।

ট্রাক চালানোই লিওনার্ড পাওয়েলের পেশা। ছ' ফুট চার ইঞ্চি উঁচু বিশাল শরীরে শক্তি বড় কম নেই। ওজনও কার্পেণ্টারের চাইতে কম করে ষাট পাউণ্ড বেশী। কিন্তু খুনে কার্পেণ্টারের মন তো নয়—যেন একটা শক্তিশালী রাডার যন্ত্র! রাডার-মন দিয়ে পাওয়েলের চিন্তাশক্তি আঁচ করে নিয়ে ভ্রূকুটি করে চিবিয়ে চিবিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—"ও চেষ্টা করবেন না। বউ আর বাচ্চাগুলোর কথা মনে রাখবেন সবসময়ে।"

দেহের প্রতিটি তন্তুতে নিঃসীম ক্লান্তির গুরুভার নামলেও রীতিমত হুঁশিয়ার রইল কার্পেণ্টার। অনেকক্ষণ পরে পাওয়েল বললে এবার ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া দরকার। তা না হলে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হতে পারে। খড়খড়ির পাখিগুলো নামিয়ে দিতে হুকুম করলো কার্পেণ্টার। জানলার আর আলোর ওপরেও আবরণ টেনে দেওয়া হলো তার নির্দেশে। দেখতে দেখতে ভ্যাপসা গরমে উনুনের মতই তপ্ত হয়ে উঠল ঘরটা।

বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল পুলিশ সাইরেনের তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দ—আশপাশের অঞ্চল তন্নতন্ন করে খুঁজছিল ওরা। যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছে, এমনিভাবে বিড়বিড় করে ওঠে কার্পেণ্টার—"আমার সম্বন্ধে খুব বেশী মাথা ঘামাবেন না আপনারা। শুধু এইটুকুই জানিয়ে রাখতে চাই, প্রথম গুলিটা আমি ছুঁড়িনি। যাকগে, ও নিয়ে আর এখন ভেবে লাভ কি।"

তন্ময় হয়ে টেলিভিশন শুনতে লাগল কার্পেণ্টার। কের তখনও জীবিত ছিল কিনা, সেই খবরই জানার জন্যেই কানখাড়া করে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বললো—"শুধু একটি দুঃখ রয়ে গেল আমার। জীবনে এমন কোনো কাজ করে গেলাম না যার জন্যে আমার মা আর বোনেরা গর্ববোধ

করতে পারে। অত্যন্ত নোংরা আর উচ্ছৃংখল জীবনযাপন করেছি আমি। কিন্তু এখন বড় দেরী হয়ে গেছে। হয় ঐ টিকটিকিগুলোর গুলিতে আমাকে মরতে হবে, আর তা নাহলে ইলেকট্রিক চেয়ার তো রয়েছেই। মরবার আগে অন্তত একবারের জন্যে মা'কে দেখতে পেলে অনেকটা শান্তি পাবো আমি।"

বন্ধুর মতই সমবেদনার সুরে বলে লিওনার্ড—"চেষ্টা করলে আমার তো মনে হয় অনেক ভাল থাকতে পারতে তুমি, সবার ভালবাসাও পেতে। তোমার বর্তমান হাল দেখে, এত কষ্ট দেখে, বাস্তবিকই দুঃখ হচ্ছে আমার।"

সঠিক মনোবিদ্যা প্রয়োগ করেছিল লিওনার্ড। সমবেদনার স্নিগ্ধ ছোঁয়া পেলেই সবকিছু ভুলে যেত কার্পেণ্টার। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সংগে সংগে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল—"আজ সারারাত এখানেই থাকবো আমি। কাল রাতও থাকবো। অন্ধকার হলে তবে বেরোবো। ততক্ষণে টিকটিকি-গুলো নিশ্চয় এ অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যাবে আমাকে খুঁজতে।"

ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে ঘুমোবার ইচ্ছে ছিল কার্পেণ্টারের। সেক্ষেত্রে তার রক্ষণাবেক্ষণের ভারটা থাকতো নাকি ওদের ওপরেই। কিন্তু মায়ের মন কেঁপে উঠল তাতে। মরিয়া হয়ে এই বলে বোঝালে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ছোটোমেয়ে অচেনা মুখ দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে পারে। তাহলেই মহা-বিপদ। যুক্তিটা মনে ধরলো কার্পেণ্টারের। কাজেই বন্ধ ঘরে পাওয়েল দম্পতির সংগেই রাত কাটানোর আয়োজন করল ও।

একটির পর একটি ঘণ্টা কাটতে থাকে। আরও গুমোট হয়ে উঠতে থাকে ছোট্টো ঘরটা। রিভলবারটা হাতেই রেখেছিল কার্পেণ্টার। ঘুম-ঘুম চোখেও সজাগ রেখেছিল দৃষ্টি। ঘুমের দাপটে চোখ দুটো একবারেই বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্যে সারারাত সে কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা তার!

পরের দিন ভোরবেলা লিওনার্ড বললে—"আমাকে কাজে বেরুতে হবে। না বেরুলে কোম্পানী আর পাড়া-পড়শীরা অনেক প্রশ্ন করতে পারে।" অপলক চোখে লিওনার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে কার্পেণ্টার শুধু বললে—"যাচ্ছেন যান, কিন্তু মনে রাখবেন বাড়ীতে রইল আপনার স্ত্রী আর দুই ছেলেমেয়ে। আমি যদি আপনি হতাম, তাহলে এরকম পরিস্থিতিতে আহাম্মকের মত কিছু করতাম না। বুঝেছেন?"

লিওনার্ড বুঝেছিল। সাড়ে ছটার সময়ে বেরিয়ে গেল সে। রাত্রেই তো আপদ বিদেয় হচ্ছে বাড়ী থেকে। সংগে সংগে পুলিশে ফোন করলেই চলবে 'খন। ঐটুকু সময়ের মধ্যে বেশী পথ আর যেতে হচ্ছে না বাছাধনকে। লাঞ্চ খাওয়ার অবসরে স্ত্রীকে ফোন করলো লিওনার্ড। সব শান্ত, কোনো হাঙ্গামা নেই।

দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল কার্পেণ্টার। ঘুম থেকে উঠে এক পেট খেয়েও নিলে। তারপর গোঁফটা কামিয়ে ফেলে মুখ পরিষ্কার করে ফেলল। মিসেস পাওয়েলের ভয়ার্ত মুখচ্ছবি দেখে নিশ্চিন্ত ছিল কার্পেণ্টার। নিদারুণ আতংকে এমনই অন্তর-কাঁপুনি শুরু হয়েছিল তার যে কোনরকম বিপদের সম্ভাবনাই ছিল না ওদিক থেকে। সেইদিনই বিকেলে মিসেস পাওয়েলের মা এল মেয়ের সংগে দেখা করতে। এই সময়টা ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে ঘাপটি মেরে রইল কার্পেণ্টার।

দারুণ উদ্বিগ্ন মন নিয়ে কাজ থেকে ফিরে এল লিওনার্ড। সংগে এনেছিল সেইদিনকার দৈনিকের সর্বশেষ সংস্করণ। কাগজটা ছিনিয়ে নিল কার্পেণ্টার। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিজের সম্বন্ধে টাটকা সংবাদ জানার আগ্রহে। আর তখনই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলে উঠল ও—"অন্তত-পক্ষে আরও দুদিন এ জায়গা ছেড়ে বেরোনো চলবে না। এখানে থাকার জন্যে আপনাদের খরচপত্রও আমি পরে পুষিয়ে দেব কিছু টাকা পাঠিয়ে।"

ডিনার তৈরী করে ডাক দিল মিসেস পাওয়েল। কিন্তু অচেনা লোকের সংগে এক টেবিলে বসে খেতে ছেলে-মেয়েরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করায় কালো আঙুর আর শাকসব্জীভরা প্লেটটা নিয়ে সামনের ঘরে উঠে এল কার্পেণ্টার। ইতিমধ্যে খেতে খেতে ফিসফাস করে কি সলাপরামর্শ করে নিলে পাওয়েল দম্পতি। তারপরেই লিওনার্ড উঠে গেল অন্য ঘরে কার্পেণ্টারের কাছে। গিয়ে বললে যে তার ছেলেমেয়েদের একটা নিয়মিত অভ্যাস আছে। প্রতিদিন রাত্রে বাড়ীর সামনে গিয়ে ওরা মা আর দাদু-দিদিমার সংগে কিছুক্ষণ বসে থাকে। সে রাতেও ওদের যাওয়া দরকার। দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল কার্পেণ্টার।

কিছুক্ষণ পরে লিওনার্ড বলে উঠল—"এই যাঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম। শ্বশুরের সংগে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু

কথা কইবো বলেছিলাম। আমারই যাওয়া দরকার নীচে। তা নাহলে উনি নিজেই উঠে আসবেন।"

কার্পেণ্টার বললে—"অত কথায় কাজ কি। ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে আপনার ফিরে আসা চাই। ভুলে যাবেন না আপনার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা আমার রিভলবারের পাল্লার মধ্যেই রয়েছে।"

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল লিওনার্ড। পরক্ষণে গোটা কয়েক লম্বা লাফে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর পেছনে এসে ইঙ্গিতে স্ত্রীকে ডেকে বলে দিলে ছেলেমেয়ে আর তার বাবা-মাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে। ঠিক এইরকমটিই আশা করছিল মিসেস পাওয়েল। তারপর কি করা উচিত, তা তাকে না বললেও চলতো। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল লিওনার্ড। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে খেলায় মগ্ন ছেলেমেয়েদের চীৎকার করে সাবধান করে দিলে—"পালাও এক্ষুনি—বন্দুক নিয়ে আসছে একটা খুনে গুন্ডা।"

ঠিক নটা বেজে এক মিনিটের সময়ে টেলিফোন পেলাম লিওনার্ড পাওয়েলের। ডিটেকটিভদের ডেপুটি চীফ ফ্রাংক ও সুলিভ্যান টেলিফোন পেয়ে ছোট্ট করে বললেন লিওনার্ডকে—"গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। আমরা আসছি।" তৎক্ষণাৎ বেতার-বার্তা চলে গেল তিরিশটা পুলিশের গাড়ীতে। প্রত্যেকেই চতুর্দিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল পাওয়েলের ফ্ল্যাটের দিকে। কয়েক মিনিট পরেই সার্জেণ্ট মিকলাজ-এর গলা শুনলাম ঃ

"কার্পেণ্টার... কার্পেণ্টার... ওপরে হাত তুলে বেরিয়ে এস। বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছি আমরা। সরে পড়ার কোনো সুযোগই নেই।"

জানলার সামনে আবির্ভূত হলো কার্পেণ্টার। দড়াম করে সার্জেণ্টের দিকে গুলিবর্ষণ করেই সাঁৎ করে সরে গেল আড়ালে।

মিকলাজ এবার চীৎকার করে হুঁশিয়ার করে দিলে বাড়ীর অন্যান্য বাসিন্দাদের। সবাই যেন মেঝের ওপর শুয়ে পড়েন—পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করবে কার্পেণ্টারের ওপর। ইতিমধ্যে প্রায় হাজার দুয়েক উৎসুক লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল রাস্তার ওপর। সবার সামনেই আবার কার্পেণ্টার দেখিয়ে দিয়ে গেল তার অসমসাহসিকতা আর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা। পাওয়েলদের জানলা থেকে আচম্বিতে সে লাফিয়ে উঠল শূন্যপথে—চার ফুট দূরেই ছিল পাশের বাড়ীর জানলাটা। জনতা এবং পুলিশ কিছু বোঝবার আগেই দারুণ শব্দে খোলা জানলাটার ওপর আছড়ে পড়লো সে। ঝনঝন করে ভেঙে পড়লো সার্সির কাঁচ, অক্ষত রইল না তার মুখ আর হাত। চক্ষের নিমেষে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল কার্পেণ্টার—ঘরের মধ্যে যে কজন ছিল, তারা তো ভয়ে কাঠ হয়ে প্রায় মিশে গেল দেওয়ালের সঙ্গে। কোনো দিকে না তাকিয়ে এক দৌড়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও। সেখান থেকে সিঁড়ি টপকে পৌঁছোলো আর একটা ফ্ল্যাটে। মূর্তিমান বিভীষিকার মত রিচার্ড কার্পেণ্টারকে ধেয়ে আসতে দেখে সে ঘরের বাসিন্দারা আগেই উধাও হয়েছিল।

বাইরের বিস্ময়বিহ্বল দৃশ্য দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলো না কার্পেণ্টার। তাই জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই কালি পটকার স্তূপে আগুন লাগার মত প্রচণ্ড শব্দে এক ঝাঁক পুলিশের গুলি ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে। সাঁৎ করে কার্পেণ্টার আড়ালে সরে এল বটে, কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সার্সির কাঁচ আর ঝাঁঝরা হয়ে গেল কাঠের ফ্রেম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই স্কোয়াড অফিসাররা ঢুকে পড়ল বাড়ীর মধ্যে।

মেঝের ওপর বসেছিল কার্পেণ্টার। পুলিশ অফিসারদের রণমূর্তি দেখেই নিরীহ নাগরিকের মতই বলে উঠল—"আমি না, আমি না, আমাকে আপনাদের দরকার নেই। আমি তো এইখানেই থাকি।"

কিন্তু এ ধোঁকাবাজিতে ভোলবার পাত্র নয় অফিসাররা। হিড়হিড় করে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ওকে টেনে নামিয়ে আনা হলো নীচে। একবার তো ও ফস্ করে রিভলবারটা বার করে ফেলেছিল আর কি! তবে তাতে সুবিধে করা গেল না। রাস্তায় টেনে নামানোর পরও মানুষ-নেকড়ের মতই ও প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করতে থাকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার। হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল মারমুখো জনতা। আর সে কি চীৎকার—"মারুন, মারুন, খুন করে ফেলুন খুনে ছুঁচোটাকে!"

ঠেলেঠুলে পুলিশের গাড়ীতে তুলে দিলাম ওকে, মিনিট কয়েক পরেই চার্জ-রুমে দেহতল্লাস করা হলো ওর। পাওয়া গেল এই কটা জিনিস ঃ দুটো রিভলবার, ছটা ·৩৮ কার্তুজ, এক প্যাকেট অ্যাসপিরিন, হাতঘড়ি, পাঁচটা চাবি, দুটো পাঁচ ডলারের নোট আর খুচরো আটটা সেণ্ট।

বিচার শুরু হলে কার্পেণ্টারের হাত-পা বেঁধে এবং কোমর-বন্ধনীর সঙ্গে পুরু চামড়ার ফিতে লাগিয়ে আদালতে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। বড় বিশ্রী দেখাচ্ছিল ওকে দাড়ি না কামানোর জন্যে আর চুল না আঁচড়ানোর জন্যে। শুনানির সময়ে আগাগোড়া একজন আত্মীয়ার সঙ্গে কথা কইলো কার্পেণ্টার। স্টেট প্রসিকিউটর জোর গলায় বললেন, রিচার্ড কার্পেণ্টার আইনত সুস্থ মস্তিষ্ক। বেশ কয়েকজন মনোসমীক্ষককে ডেকে তিনি প্রমাণ করে দিলেন কোনটা ন্যায় এবং কোনটা অন্যায়, তা বোঝার টনটনে জ্ঞান আছে তার। কৌশুলীর সঙ্গে সহযোগিতা করার মত বুদ্ধিবিবেচনারও অভাব নেই।

আর তাই, ডিটেকটিভ উইলিয়াম মর্ফিকে হত্যার অপরাধে ১৯৫৬ সালের ১৬ই মার্চ আদুরে খোকা পুলিশ-হন্তা রিচার্ড ডি কার্পেণ্টারকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হোল শুনে কেউই অবাক হননি।

অনুবাদ ঃ অদ্রীশ বর্ধন

মন্দিরের প্রবেশদ্বারে খিলানের ওপর বিচিত্র কারুকার্য

বারেন্দ্রগলির শিবমন্দির

মৃণাল গুপ্ত
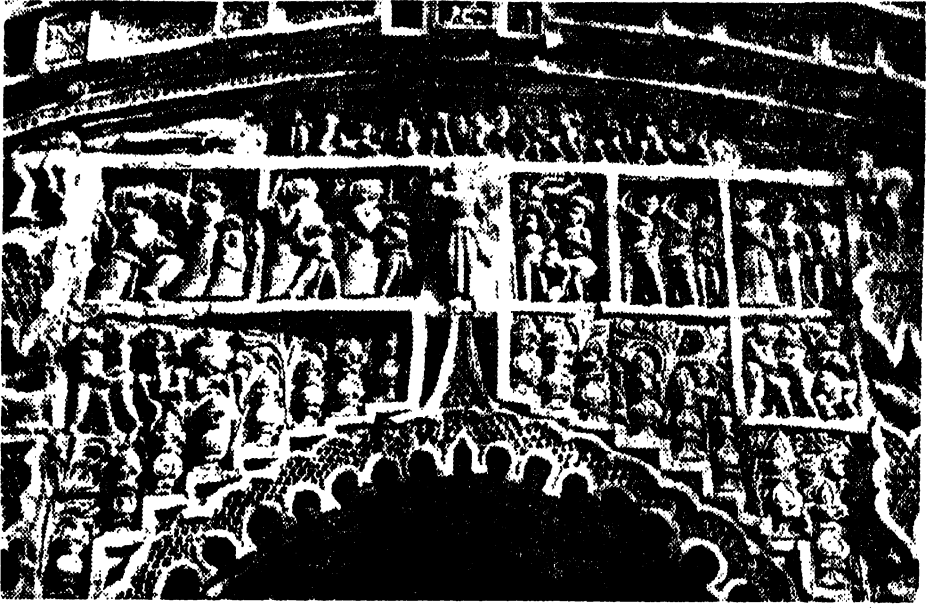
অতীত বাংলার রাজন্যবর্গ, নবাব-পরিবার ও বিশিষ্ট রাজকর্মচারীরা বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙালী শিল্পীদের শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিত্তবানদের কাছে আর্থিক সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়ে শিল্পীরাও তাদের নানা শিল্পকর্মের মাধ্যমে এক দুর্লভ শৈল্পিক নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কালের হাত থেকে কোন প্রকারে রেহাই পেয়ে অতীত বাংলার যে কয়টি শিল্পকর্ম ইতস্ততঃভাবে আজও আমাদের চোখে পড়ে, তাদের মধ্যেই বাঙালী শিল্পীদের এই স্বভাবসুলভ শৈল্পিক নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। স্থাপত্যশিল্পে বাঙালীর স্বকীয়তার সহজ দৃষ্টান্ত বিভিন্ন ঢঙে তৈয়ারী বাংলার জীর্ণ মন্দিরগুলো। মন্দিরের গাত্র অলঙ্করণের ক্ষেত্রেও দেশীয় মৃৎশিল্পীরা যে কম দক্ষ ছিলেন না, তার পরিচয় পাওয়া যায় বাংলার বিভিন্ন জেলার কোন কোন দেবমন্দিরের পোড়ামাটির সাহায্যে গাত্র অলঙ্করণের মধ্যে। সহজলভ্য মাটির ওপর সামান্যতম কারিগরি খাটিয়ে যে কত বৈচিত্র্যধর্মী শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব, তা মন্দির-গাত্রের পোড়ামাটির অলঙ্করণ প্রত্যক্ষ না করলে কল্পনাও করা যায় না। বাঙালী মৃৎশিল্পীদের এই স্বকীয়তা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হ'লো হালিশহরের বারেন্দ্র-গলির শিবমন্দিরের অপূর্ব অলঙ্করণ-কার্য।

হুগলী নদীর পূর্ব তীরে হালিশহর চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যতম জনপদ। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথের হালিশহর স্টেশনে নেমেও হালিশহরে আসা যায়। তবে আমি এসেছিলাম পশ্চিম তীরের ব্যান্ডেল স্টেশনে নেমে সাহাগঞ্জ ডানলপ্ রাবার ফ্যাক্টরির ঘাট পেরিয়ে। দূরে নৌকোর উপর থেকে হালিশহরের যে রূপটি আমার চোখে পড়ছিল, তা এমন কোন ঐতিহ্যপূর্ণ রূপ নয়। বরং নদীর পাড় ধরে আশেপাশের ছোট বড় কল-কারখানার উঁচু নীচু চোঙগুলোর উদ্ধত উঁকিমারা দেখে হালিশহরের এক আধো-যান্ত্রিকরূপকেই যেন প্রত্যক্ষ করে নিচ্ছিলাম। কিন্তু এই শহরের মাটিতেই যে যুগসঞ্চিত ঐতিহ্য বাসা বেঁধে রয়েছে, একথা উপলব্ধি করতে হ'লে হালিশহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়,—এক অনুসন্ধানী মন নিয়ে অলিতে গলিতে পা ফেলতে হয়। মুসলমানপরবর্তী যুগে নদীয়ার নবদ্বীপ ও হুগলীর ত্রিবেণী-উৎস থেকে নিম্নবঙ্গে যে সংস্কৃতির জোয়ার বয়ে গিয়েছিল, সেই প্লাবনে প্লাবিত হয়েছিল চব্বিশ পরগণার হালিশহর অঞ্চল। তাই বিগত পাঁচ ছ'শো বছরের নিম্নবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে হালিশহরের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধকদের লীলাক্ষেত্ররূপে হালিশহর শতাধিক বছর বিরাজ করেছে। চৈতন্যাগ্রজ ঈশ্বরপুরী, সাধককবি রামপ্রসাদ, পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির পবিত্র স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে হালিশহরের ধূলোমাটিতে। তাই হালিশহরের জীর্ণ লোকালয় ও দেবালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে শহরের এই ঐতিহ্যপূর্ণ রূপটিকে যেন কিছুটা প্রত্যক্ষ করা যায়। এই শহরের বুকে আজও ইতস্ততঃভাবে যে সমস্ত মন্দির ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের অধিকাংশই জীর্ণ ও পরিত্যক্ত। কেবল আমাদের আলোচ্য মন্দিরটি জীর্ণ হ'লেও তার ঐশ্বর্যের আভরণ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শিল্পরসিকের মন হরণ করছে।

হালিশহরের হুগলী নদীর কাছাকাছি একটি অপরিসর গলির নাম বারেন্দ্র-গলি। এরই পাশে এক অপ্রশস্ত আঙিনায় পূর্ব পশ্চিমে দুটো দুটো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোট চারটি মন্দির। বারেন্দ্র-গলির বিত্তশালী বারেন্দ্র

বংশোদ্ভূত রায় পরিবারের পূর্বপুরুষ কৃপারাম রায়ের পুত্র মদনগোপাল রায় ১১৫০ বঙ্গাব্দে (১৬৬৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই চারটি মন্দির। মদনগোপাল ছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাবসরকারের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মচারী। নবাবের কর্মচারী হ'লেও স্থানীয় অঞ্চলে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম।। মদনগোপালের যেমন সাতমহলা বাড়ী ছিল, তেমনি হাতি বাঁধার থামও ছিল। মন্দিরের পার্শ্ববর্তী তাঁদের বসতবাটীর জীর্ণকঙ্কাল আজও রায় পরিবারের সেই বিগত বৈভবের পরিচয় দেয়। কিন্তু এই বিত্তশালী রায় পরিবার আজ আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচনার বস্তু নয়, আলোচ্যবস্তু তাদেরই প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত মন্দিরের স্থাপত্য ও অলঙ্করণগত বৈশিষ্ট্যগুলি।

বারেন্দ্রগলির মন্দির

বিগত দু'তিন শতকের যে সমস্ত দেবমন্দির ভৌগোলিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলার বুকে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের গঠনসৌষ্ঠব লক্ষ্য করলে আমরা বাংলার মন্দিরস্থাপত্যের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পাঁচটি রীতির সন্ধান পাই। এই পাঁচ রীতির নমুনা হচ্ছে রেখ-দেউল, চালা-দেউল, বাংলা-মন্দির, রত্ন-মন্দির ও শিখরযুক্ত অষ্টকোণাকৃতি মন্দির। এ ছাড়া এই পাঁচ রীতির পারস্পরিক সংমিশ্রণে তৈয়ারী কিছু মিশ্র-রীতির মন্দিরও চোখে পড়ে। আমাদের আলোচ্য মন্দিরগুলো হচ্ছে 'বাংলা-মন্দির' রীতির শ্রেণীভুক্ত। দেবতাকে আত্মীয় ভেবে আত্মস্থ করার যে বাঙালী মানসিকতা তারই এক আশ্চর্য সুন্দর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই 'বাংলা-মন্দির' রীতি-স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে। মাটি আর খড়—এই অতি সাধারণ দুই উপকরণে রাঢ় বাংলায় দোচালা, চারচালা ও আটচালা গৃহনির্মাণের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সেই একই ঢঙে তৈয়েরী কখনো দোচালা, চারচালা কিংবা কখনো আটচালা মন্দির স্থাপনা করে বাঙালী তার আত্মীয় দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাঙালী মনের এই চিরাচরিত মনোভাবটাই ধরা পড়েছে বারেন্দ্র-গলির আটচালা বাংলা-মন্দিরের গঠনরীতির মধ্যেও। বক্রাকৃতি কার্ণিসসহ মন্দিরের চারদিকের চার-চালের সঙ্গমে রয়েছে আর একটি চারচাল বিশিষ্ট অনুচ্চ গৃহ। এই-টুকুই হচ্ছে এই মন্দির স্থাপত্যরীতির মোটামুটি বৈশিষ্ট্য। এছাড়া মন্দির-গুলোর স্থাপত্যগত আর কোন অতি বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু এদের মধ্যে একটি মন্দিরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অনিন্দ্যসুন্দর গাত্র-অলঙ্করণ।

মন্দিরের বিচিত্র অলঙ্করণের কয়েকটি নমুনা

অতীতে ধর্মপ্রাণ বিত্তবানের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় স্থপতি স্থাপনা করেছেন মন্দির, আর মৃৎশিল্পীরা অপরিসীম নিষ্ঠাভরে তার উপর বিকীর্ণ করেছেন জীবনের ধ্যান-ধারণার বিচিত্র মিছিল। সেই মিছিলে যেমন ধর্মীয় জগতের অতিমানবেরা যোগ দিয়েছেন, তেমনি ইহজগতের সাধারণ নারী-পুরুষও পিছিয়ে থাকেননি। তাই কোন প্রাচীন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তার অলংকৃত গাত্রের উপরে যখন বিমুগ্ধ দৃষ্টিকে প্রসারিত করি, তখন দুশো আড়াইশো বছরের অতীত বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রার এক বিচিত্র আস্বাদনই যেন অনুভব করি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, বাঙালীর এমন দুর্লভ শিল্পটিও আজ বিনষ্টপ্রায়। বারেন্দ্র-গলির ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগুলোর গায়ের অধিকাংশ অলঙ্করণই আজ লুপ্ত। তবুও পশ্চিমমুখী মন্দিরটির গাত্রের স্বল্প কয়েকটি অলংকরণের মধ্যেই বাঙালী শিল্পীদের অভাবনীয় দক্ষতার যে পরিচয় মেলে, তাতে বিস্ময়াবিষ্ট না হয়ে পারা যায় না। অন্যান্য মন্দিরের মতই চিরাচরিত প্রথায় এই মন্দিরের সম্মুখ-দেওয়ালেই রয়েছে অলংকরণের অতি প্রাচুর্য। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের খিলানের উপর বিকীর্ণ রয়েছে পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী। কোথাও দেখি রামানুগত বানরেরা দীর্ঘ সেতুবন্ধনে ব্যতিব্যস্ত, কোথাও তারা দশাননের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে বীরবেশে যুদ্ধরত, আবার কোথাও বা দেখি তাদেরকে দশাননজয়ী রামচন্দ্রের শ্রীচরণে প্রণিপাতে রত। রামায়ণের এই আকর্ষণীয় ঘটনাগুলোকে প্রবেশদ্বারের উপরিভাগের এক অপ্রশস্ত পরিসরে বিভিন্ন অলংকরণের সহায়তায় তাঁরা
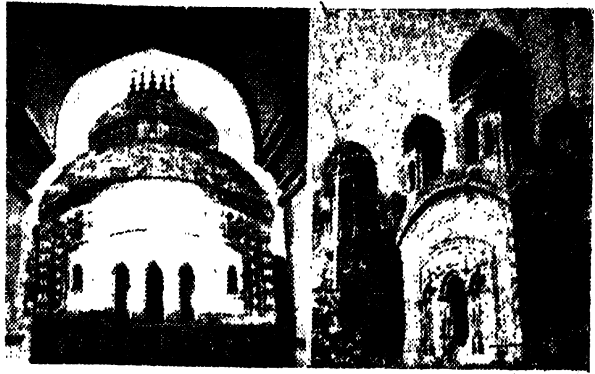
হালিশহরের কৃষ্ণরাইজী মন্দির ও রত্নমন্দির
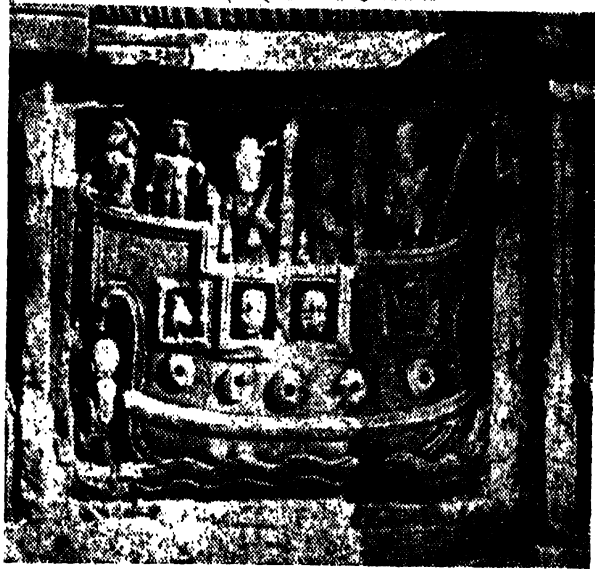
মন্দিরগাত্রে ফিরিঙ্গী বজরার নিখুঁত প্রতিকৃতি। বজরার ওপরে সশস্ত্র ফিরিঙ্গী।

ওপরে ধর্মীয় চিত্র। নীচে দুই ফিরিঙ্গীতে লড়াই চলেছে

সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছেন। লোক-শিল্পীদের শিল্পবিন্যাসের এই অনন্য-সুলভ ভারসাম্যটি শুধু লক্ষণীয়ই নয়, অনুকরণীয়ও বটে। রামায়ণের কাহিনী ছাড়াও অলঙ্করণের মধ্যে চোখে পড়ে কৃষ্ণলীলার কিছু কিছু খণ্ডচিত্র, যেমন ননীমন্থন, পুতনাবধ, কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, বকাসুরবধ, কালিয়দমন, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা প্রভৃতি। শুধুমাত্র কাহিনী বর্ণনের দিক থেকেই নয়, শিল্পসৃষ্টির দিক থেকেও এগুলো সমান আকর্ষণীয়। পুঁথিগত কোন ধর্মীয় জ্ঞানই হয়তো এসব লোকশিল্পীদের ছিল না। গ্রামের বারোয়ারী তলায়, কিংবা কোন চণ্ডী-মণ্ডপে বসে কথকঠাকুরের মুখে মুখে রামায়ণ, মহাভারত আর কৃষ্ণলীলার যে প্রাণবন্ত কাহিনী তাঁরা শ্রবণ করেছেন সেগুলোকেই তাঁরা শিল্পরসে সিঞ্চিত করে পরম নিষ্ঠাভরে মন্দিরগাত্রে বিকীর্ণ করেছেন। আশ্চর্য তাঁদের গ্রহণক্ষমতা! আর আশ্চর্য তার শিল্পপ্রকাশ!

অলঙ্করণের মাধ্যমে তদানীন্তন সমাজচিত্রণই বারেন্দ্র-গলির মন্দিরগাত্র-সজ্জার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। মৃৎশিল্পীরা যে শুধুমাত্র পুরাণের কল্পলোকেই বিচরণ করেননি, সমসাময়িক সমাজ-জীবনের বাস্তব পরিপার্শ্বকেও তাঁরা যে অতি গভীরভাবে অভিনিবেশ করেছেন, —একথা মন্দিরগাত্রের একাধিক সমাজ-চিত্রের উপর চোখ রাখলেই উপলব্ধি করা যায়। দুশো আড়াইশো বছর পূর্বে মৃৎশিল্পীরা এমনই এক সমাজব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করেছেন, যেখানে বিভিন্ন তলার মানুষের ধ্যান-ধারণা, চালচলন ও জীবনযাত্রার মধ্যে অপরিসীম বৈচিত্র্য ও পার্থক্য ছিল। অফুরন্ত ঐশ্বর্য আর ভোগবিলাসের রাজকীয় চৌহদ্দির মধ্যে যে সমস্ত ভাগ্যবানেরা জীবন কাটিয়ে-ছেন মৃৎশিল্পীরা যেমন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছেন, তেমনি তাঁরা অবাকবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছেন নবাগত ফিরিঙ্গী সাহেব-সুবাদের চলন-বলন ও অশন-বসনের সর্বপ্রকার অভিনব ভঙ্গী-গুলোকে। তাইতো দেখি মন্দিরের কোন ফলকে রয়েছে রাজকীয় জীবনযাত্রার এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, আবার তারই পাশা-পাশি ফলকে রয়েছে ফিরিঙ্গী সাহেব-সুবাদের নানা ভঙ্গীর অভিনব প্রতি-কৃতি। অভিজাত সমাজচিত্রণের এইসব মূল্যবান মৃৎফলকগুলো বারেন্দ্র-গলির মন্দিরগাত্রের নিম্নাংশেই চোখে পড়ে। এদের কয়েকটি প্যানেল সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। নিম্নাংশের বাঁদিকের একটি প্যানেলে সজ্জিত-পাল্কীতে নবাব অর্ধশায়িত। বেহারারা সেই পাল্কী বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে সশস্ত্র ফৌজ। হাতে লাঠি আর কাঁধে পাল্কী নিয়ে বেহারাদের ছুটে-চলার ভঙ্গীটি বড় আকর্ষণীয়। পাল্কীটির চেহারাও কিন্তু কম দর্শনীয় নয়। আঠেরো শতকে ব্যবহৃত পাল্কীরই একটি নিখুঁত নমুনা মেলে এতে। আর একটি প্যানেলে দেখতে পাই,—নবাব পালঙ্কে শায়িত, গোলামেরা পরিচর্যায় রত, পাশে একটি গোলাম কুর্নিসের বিনীত ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। কোন রাজপুরুষ রাজবেশে সজ্জিত, কেওবা তাম্রকূট সেবনরত, কেও আবার তার সাধের শ্মশ্রু বিন্যাসে ব্যতিব্যস্ত; —মৃৎ-ফলকের উপর অভিজাত জীবনের এমন অনেক রূপায়ণই চোখে পড়ে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের ডানদিকের একটি মৃৎ-ফলকে রয়েছে উপবিষ্ট ফিরিঙ্গীসাহেব এবং তার সম্মুখে খোল-করতাল সহ-যোগে কীর্তনে রত এক কীর্তনিয়া সম্প্রদায়। সাহেবকে কীর্তনের ভক্তিরসে আপ্লুত করাই যেন তাদের উদ্দেশ্য। খোল-করতালের সঙ্গত, আর কীর্তনের চড়া সুর সাহেব যে বেশ আমেজ দিয়েই উপভোগ করছেন, তা তাঁর বসবার ভঙ্গীটি দেখেই বোঝা যায়। সাহেবের পোশাকে, বসবার ভঙ্গীতে, চেয়ারের গঠনে মৃৎশিল্পীরা পুরোপুরি সাহেবী-য়ানা বজায় রেখেছেন। এমন কি চেয়ারের তলায় সাহেবের পোষা কুকুরটিকে শায়িত করে দিতেও শিল্পীরা ভুলে যাননি। কীর্তনিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চারটি নারীমূর্তি রয়েছে তাদের অঙ্গ-সজ্জার পারিপাট্যের দিকেও রয়েছে মৃৎশিল্পীদের সচেতন লক্ষ্য। বিষয়-বস্তুর দিক থেকে ফলকটি বড়ই অভিনব। আর একটি প্যানেলে চোখে পড়ে অস্ত্রসজ্জিত ও বাদ্যবাদনরত একদল ফিরিঙ্গী রেজিমেন্ট। যেন কোন আসন্ন যুদ্ধযাত্রার জন্যই প্রস্তুত তারা। পদক্ষেপের বলিষ্ঠতায়, অঙ্গের বেশ-ভূষায়, শিরস্থাপিত টুপির গঠনের পারিপাট্যে এতটুকু কোন ত্রুটী নেই,—সবই যেন নিখুঁত। কোন ফিরিঙ্গী আমেজ দিয়ে পাইপ টানছেন, কেউ বা বন্দুকের নল পরিষ্কারে ব্যস্ত, কেউ আবার ঘোড়াটানা এক্কায় হেলান দিয়ে বায়ু সেবনের যাত্রী,—এমনি সব সাহেবীয়ানার অনেক বিচিত্র চিত্রও রয়েছে মন্দিরের গায়েগায়ে। শুধুমাত্র এই মন্দিরেই নয়, হুগলী নদীর উভয় পার্শ্বস্থ অঞ্চলের অনেক মন্দিরেরই গাত্র-অলঙ্করণের বিষয়বস্তুর মধ্যে লক্ষ্য করেছি ফিরিঙ্গী সমাজচিত্রের এক ব্যাপক প্রাধান্য। এই প্রাধান্যের একটি স্বাভাবিক কারণ রয়েছে। ষোড়শ শতকের শেষাশেষিতে বোম্বেটে পর্তু-গীজেরা সপ্তগ্রাম অঞ্চলে যে বাণিজ্যের পত্তন করেছিল, তা পরবর্তী দু এক শতকের মধ্যেই হুগলী নদীর পশ্চিম পাড় ধরে দক্ষিণ দিকে ক্রমপ্রসারিত হ'তে শুরু করে। তখন এই প্রসারিত বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকেরা। বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে চুঁচুড়া, ব্যাণ্ডেল, চন্দননগরে যে ব্যাপক ফিরিঙ্গী সমাজের পত্তন হয়েছিল, তার অভিনব জীবনযাত্রার সমস্ত খুঁটিনাটি মৃৎশিল্পীদের মনে এক গভীর বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার করেছিল। তাদের এই বিস্ময় আর কৌতূহলেরই সফল অভিব্যক্তি দেখতে পাই নদীর বিপরীত তীরের বারেন্দ্র-গলির মন্দিরগাত্রের সাহেব-সুবার নিখুঁত প্রতিকৃতির মধ্যে
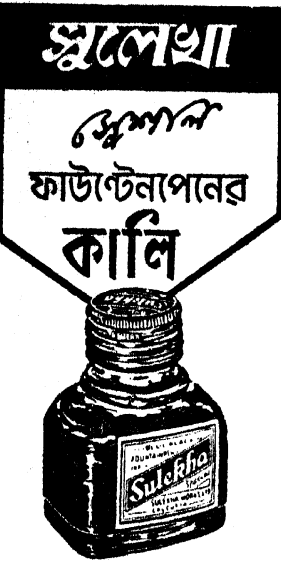
দিয়ে। অলংকরণের অতি ভিড়ের মধ্যেও একটি আকর্ষণীয় মৃৎফলক অনায়াসেই চোখে পড়ে। জনৈক উদ্ধত ফিরিঙ্গী এক সুকেশী নারীকে ধর্ষণ করছে, এমন একটি চিত্র মৃৎফলকটির গায়ে রয়েছে। একদা বোম্বেটে পর্তুগীজদের নৃশংস অত্যাচারে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের স্বাভাবিক বাঙালীজীবন যে বিপর্যস্ত হয়েছিল, একথা সুবিদিত। এই বিপর্যয়েরই একটি করুণ কাহিনীকে যেন মৃৎশিল্পীরা রূপ দিতে চেয়েছেন ছোট্ট এই মৃৎফলকটিতে। বাণিজ্যের দ্বন্দ্ব অনেক সময় ফিরিঙ্গীদের মধ্যে জঙ্গী মোকাবিলাতেও পরিণত হ'তো। একটি ফলকে এরই এক জীবন্তচিত্র দেখতে পাই দুই অশ্বারূঢ় ফিরিঙ্গী বণিকের দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। দ্বন্দ্বরত অশ্ব-দুটোর কি বলিষ্ঠ গঠন, আর কি তার স্বাভাবিক গতিভঙ্গী! শিল্পমানের দিক থেকে ফলকটি যে একটি মূল্যবান নিদর্শন, একথা নিঃসংশয়েই বলা চলে। একটি ফলকের উপর ফিরিঙ্গী বণিকদের যুদ্ধ-জাহাজের এক নিখুঁত প্রতিকৃতি আমাকে বড়ই মুগ্ধ করেছে। একটি মৃৎফলকের মধ্যে কতটুকুই বা পরিসর। কিন্তু সেই স্বল্প পরিসরেই তরঙ্গায়িত জলের রেখা টেনে বজরাটিকে এমন নিপুণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, মনে হচ্ছে বজরাটি যেন বাস্তবিকই গতিশীল। গঠনে, অলংকরণে, উপ-স্থাপনে ফিরিঙ্গী বজরার এমন অত্যাশ্চর্য শিল্পপ্রকাশ পশ্চিমবাংলার অন্য যে কোন মন্দিরের গাত্র-অলংকরণে একান্তই দুর্লভ।

ছোট ছোট মৃৎফলক, আর তার উপর এক একটি সংক্ষিপ্ত খণ্ডচিত্র। কিন্তু এইসব খণ্ড-চিত্রের মাধ্যমে মৃৎ-শিল্পীরা কত কাহিনীই না বলতে চেয়েছেন। জীবনযাত্রার কত চলমান মুহূর্তকে তাঁরা মূর্ত করতে চেয়েছেন। শিল্পী-হাতের অনুপম স্পর্শে। কিন্তু বড় আক্ষেপের বিষয়, বাংলার লোক-শিল্পের এমন সজীব ধারাটি শুধুমাত্র পৃষ্ঠপোষকতার একান্ত অভাবেই আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। পশ্চিমবাংলার যে কয়টি দেবমন্দির তার গাত্র-অলংকরণ নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অতীতের মৃৎ-শিল্পীদের শিল্পকুশলতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারাও আজ জরাজীর্ণ ও পরি-ত্যক্ত। এদের সংরক্ষণের কোন দায়িত্বই কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেই? বছর কয়েক আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ নামে মহাকরণে এক নতুন দপ্তর খুলেছেন। তার কর্ম-পরিধি আমাদের জানা নেই। তবে তাঁরা সরকারী মহা-করণে এক মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রত্ন-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানকার্য ও খননকার্য চালানোর ব্যাপারে যে অতিমাত্রায় আগ্রহী, এ খবর আমাদেরে জানা আছে। মহানগরীর বুকে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম ও আশুতোষ মিউজিয়ম নামে দুটো পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা রয়েছে, পশ্চিম-বঙ্গে খননকার্য চালাবার জন্য রয়েছে পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশু-তোষ মিউজিয়ম ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নামে আরো দুটো পৃথক সংস্থা। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁদের এই অতি আগ্রহের কারণ তো আমরা বুঝি না! তাঁদের এই অতি আগ্রহকে যদি তাঁরা পশ্চিম-বাংলার প্রাচীন মন্দির-সংরক্ষণ ও ঐতি-হাসিক দ্রষ্টব্য স্থান রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়িত করেন, তা খুবই সময়োচিত হবে বলে মনে করি। কারণ প্রাচীন ইতিহাসের যে সকল উপাদান বাংলার ভূগর্ভে সুদীর্ঘদিন ধরে সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে, তা আরো বেশকিছু বছর অনায়াসেই আবিষ্কারের অপেক্ষায় থাকতে পারে; কিন্তু পশ্চিমবাংলার বুকের উপর ইতিহাস ও শিল্পের যে সকল জরাজীর্ণ নিদর্শন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাভিশ্বাস তুলছে তারা কি আর সংরক্ষণের অনি-শ্চিত আশায় অপেক্ষা করবে? *

(* প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।)
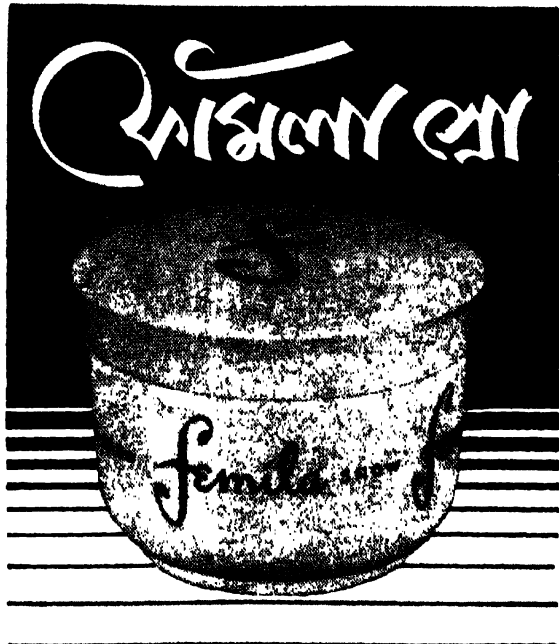
খোকা মোদের সোনা
মোরা স্যাকরা ডেকে
মোহর কেটে গড়িয়ে দেবো দানা
২২ ক্যারেট
১৮ ক্যারেট
২০ ক্যারেট
১৪ ক্যারেট
নিগ্রো স্বাধিকার
কাফী খাঁ
১৩.৭.৬৩
আঁধারে আলো
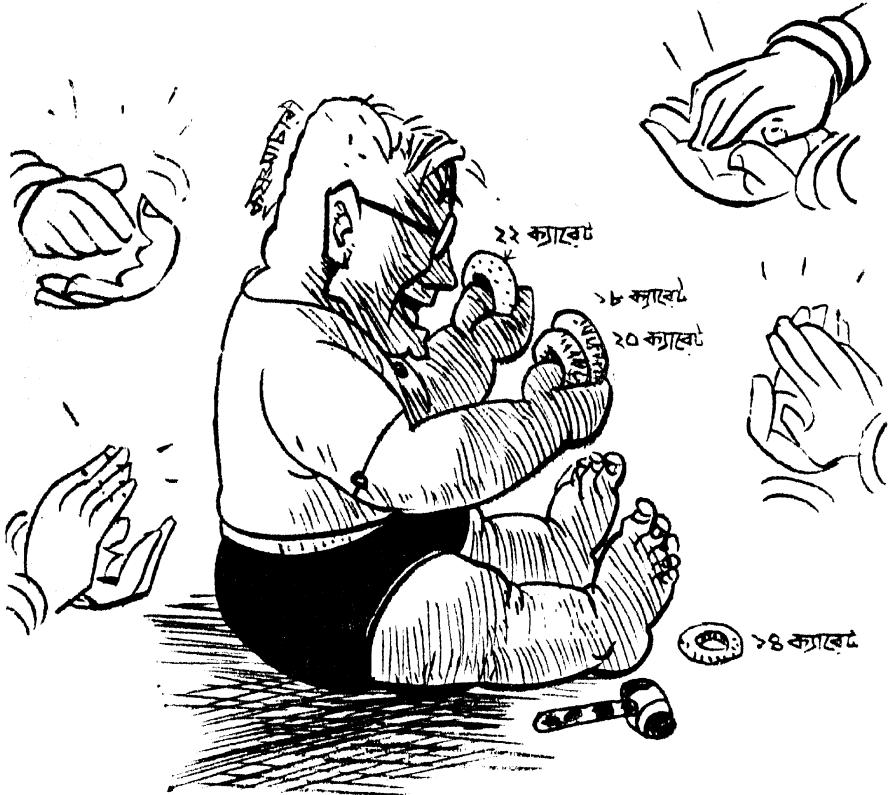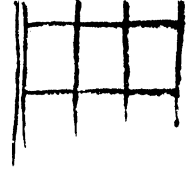
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

।। ১ ।।

অনেক দুঃখেই কথাটা বলেছিলেন শ্যামা। বোধহয় না বলে থাকতে পারেননি বলেই।

বিনতা পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছিল, নিতান্ত সাধারণভাবেই—শুধু-মাত্র সামনের ব্যক্তিটিকে শোনাতে—কিন্তু তাতেই তার কথাগুলো যে সামনের অন্তত দু বিঘের বাগান ছাড়িয়ে বাইরের রাস্তা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র ছিল না। চেঁচিয়ে এবং হাত-পা নেড়ে ছাড়া যেন সে কথাই কইতে পারে না।

এসম্বন্ধে বহুবার তাকে সতর্ক করেছেন শ্যামা, তিরস্কার করেছেন, কঠিন ব্যঙ্গে বিঁধতে চেয়েছেন—কিন্তু কোন ফল হয়নি। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল মেয়েটি বুঝি শুধুই 'বক্তার' অর্থাৎ বেশী কথা বলে, বা সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে কথা না কয়ে থাকতে পারে না। ক্রমে দেখা গেল গলাও তার কম নয়। আর নতুন বৌয়ের যে অত চেঁচানো বা অত কথা বলা অশোভন—একথাটাও তার মাথায় যায় না কিছুতে।

সেদিনও একটু আগেই শ্যামা বলেছেন, 'আমি তো নশো পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে নেই বৌমা—সামনেই আছি, তবে অত গলা বার করেছ কেন?...নতুন বৌয়ের গলা পাশের লোকও ভাল শুনতে পাবে না—এই ছিল আগেকার নিয়ম। বৌয়েরা শ্বশুরবাড়ি এসে একটু চড়া গলায় কথা বললে তার নিন্দে হত, বেহায়া বলত সকলে।...এখন অবিশ্যি অতটা নেই, তবু এত বাড়াবাড়িও কেউ বরদাস্ত করে না। এরই মধ্যে পাড়ায় বেহায়া নাম রটে গেছে তোমার। কেন—একটু আস্তে কথা বললে কী হয়? আমাকেই তো বলছ, ও পাড়ার ভগবতী গয়লাকে তো বলছ না বাছা।'

'ওমা, দুটো কথা কইব—তাও বর নয়, কোন পরপুরুষ নয়—শাশুড়ির সঙ্গে বসে কথা বলা—অত চেপেই বা বলব কিসের জন্যে? বলি অন্যাই অপরাধ তো কিছু করছি না। এতে আবার বেহায়া বলাবলির কি আছে! আর বলে—যে বেটাবেটিরা বলবে তারা নিজেদের মুখেই পাইখানা বসাবে। তাদের কথা আমি গেরাহ্য করি না।'

বলা বাহুল্য এবার গলা বরং আরও চড়া। যেন সে বেটাবেটিরা পথের ওপারে কোথাও বসে আছে—তাদের শুনিয়েই বলতে চায় সে।

একটু দম নিয়েই সে আবারও বলল, 'আপনি কিন্তু বেশ কথা বলেন মাইরি। হি হি, হাসি পায় আমার শুনলে বললেন কিনা, নতুন বৌ কথা বলবে পাশের লোকও শুনতে পাবে না। হি হি—তবে আর কথা বলাই বা কিসের জন্যে, পাশের লোকও যদি শুনতে না পায়? কাউকে না কাউকে শোনাবার জন্যেই তো বলে মানুষ!...সেকালের লোক-গুলো অমনি বোকা ছিল সব!'

তারপর প্রচন্ড একটা শব্দ ক'রে হাই তুলে বললে, 'আর নতুনই বা কি, দেখতে দেখতে তো পেরায় এক বছর ঘুরে এল, এখন তো আমি পুরনোর সামিল, আমার তো ঘর-সংসার বুঝে নেবার কথা এতদিনে!'

হাল ছেড়ে দেন শ্যামা। হাল ছেড়ে দিয়েছেন অনেকদিনই। অনেক বৌ-ঝি দেখেছেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা, ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ঘর করতে হয়েছে তাঁকে—তার মুখের কাছে দাঁড়াতে তো বোধ-হয় স্বয়ং নারদমুনিও ভয় পায়—কিন্তু এমনটি আর কখনও দেখেননি। এ বৌ সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। এর সঙ্গে তিনি যেন কিছুতেই পেরে ওঠেন না। ঝগড়া করলে তার সঙ্গে ঝগড়া করা যায়, তর্ক করলে যুক্তি দিয়ে যুক্তি খন্ডন করা চলে; এ সেসব কিছুই করে না, একে-বারে সোজাসুজি যেন উড়িয়ে দেয় তাকে, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। আর এমন ভাবেই করে যে মুখের কথাতে আর ওকে শাসন করা যায় না সে সময়। ওর একমাত্র ওষুধ হ'ল, সেই সময় ঘা-কতক দেওয়া, মুখখানা নোড়া দিয়ে থেঁতো করে দেওয়া। কিন্তু সেটা ঠিক ইচ্ছা করে না। চক্ষুলজ্জায় বাধে। অভ্যাসও তত নেই তাঁর, চট ক'রে হাত-পা চলেও না। নিজের ছেলেমেয়েদের গায়েই কখনও হাত দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না তেমন। দিলেও খুব অল্প। কদাচিত কখনও। তাছাড়া খোকা আর তরু তাঁকে চির-দিনের মতো ছেড়ে গেছে এই উপলক্ষ্য করেই। কেমন একটা ভয় হয়ে গেছে তাঁর আর কারুর গায়ে হাত তুলতে যেন সাহস হয় না।

আরও একটা কথা। একবার একদিন শাসন করলে বাগ মানবে—তেমন মেয়ে নয় এ। প্রতিদিন দিনরাত কিছু কেজিয়া করা যায় না। ছোটলোকদের ঘরেও তা করে না কেউ, করলে তাদের ঘরেও নিন্দে হয়। তাঁর এ তো বামুনের ঘর, ভদ্রলোকের ঘর।

তাই কীল খেয়ে কীল চুরি করার মতোই সব অসৈরণ হজম করতে হয়। আজও আর বেশী ঘাঁটালেন না শ্যামা। আপন মনে কাজ ক'রে যেতে যেতে এক সময় নিতান্ত ভালমানুষের মতো প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'আচ্ছা বৌমা, তোমার নাড়ী কেটেছিল কী দিয়ে জানো?'

'নাড়ী কেটেছিল? আমার? কি দিয়ে—তার মানে?...আপনি কী সব মজার মজার কথা বলেন না এক এক-সময়! আমার নাড়ী কেটেছিল কি দিয়ে তা আমি কী ক'রে জানব বলুন। তখন

কি আমার জ্ঞানবুদ্ধি কিছু হয়েছে যে দেখে রাখব।'

'তা বটে। সত্যি কথাই তো। ...না, তাই জিগ্যেস করছিলুম।' আরও নিরীহ-কণ্ঠে বলেন শ্যামা।

কিন্তু ততক্ষণে বিনতার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছে। সে সামনের দিকে একটু এগিয়ে এসে বলে, 'কেন বলুন তো মা? ব্যাওয়াটা কি?'

'না, ঐ যে বলে না—' পাতা চাঁচতে চাঁচতে বঁটির দিকে নজর রেখেই উত্তর দেন শ্যামা, 'যে চ্যাঁচারি দিয়ে নাড়ী কাটলে খুব চা'চা-ছোলা পরিষ্কার গলা হয়। তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। কথাটা মনে পড়ে গেল তাই—'

'ও, আমার গলার কথা বলছেন! ...সব্বরক্ষে! আমি বলি কী না কি ব্যাপার!...তা কে জানে বাপু কী দিয়ে চে'চেছিল,—মা জানতে পারে হয়ত। আমি কোনদিন মাকে জিজ্ঞেসও করিনি।'

বলতে বলতেই কী একটা কথা মনে পড়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে যেন, 'ওমা, সে বুঝি জানেন না—অনেককাল, বোধ-হয় অমন চার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত আমার কথাই ফোটেনি যে! ওরা তো ভয় পেয়েই গেছল যে বোধহয় বোবাই হবো, জন্মে আর কথা ফুটবে না মুখে। মা নাকি কান্নাকাটি করত সে জন্যে। তারপর মার কান্না দেখেই হোক আর নিজে ধম্ম ভেবেই হোক কাকা কোন এক বড় ডাক্তারকে দেখিয়েছিল, সে ডাক্তার এসে গলার মধ্যেটা কমনে কি চিরে দিতে তবে বুলি ফুটল!'

'তাই নাকি। তা সে কে ডাক্তার বৌমা, তার নাম কি?'

'কে জানে বাপু, অতশত আমি খবর রাখি না। জিজ্ঞেসও করি নি কখনও। কাজ হয়ে বয়ে চুকে গেছে কবে—নিশ্চিন্তি। অত—কী না কী বিত্তেন্ত তার চোদ্দপুরুষের নিকেশে আমার কী দরকার!'

'তা তোমার মনে নেই? কী তোমার কাকার?...একটা চিঠি লিখে দ্যাখো না! ...নাম-ঠিকানাটা কি, আর এখনও বে'চে আছেন কিনা!'

'তা লিখতে পারি। কিন্তু সে ডাক্তার দিয়ে আবার আপনার কী হবে! কাকে দেখাবেন—বলাইকে?'

'না, বলাইকে দেখাব কেন, তোমাকেই দেখাব—।'

'আমাকে? সে আবার কি? আমার আবার কী হ'ল?'

ঈষৎ ভ্রূকুটি ক'রে তাকায় সে। এতক্ষণে বুঝি কি একটা ভ্রূকুটি ঘনিয়ে আসে বিনতার মনে।

'দেখাব এই জন্যে যে, যিনি তোমার গলা চিরে বোল ফুটিয়েছিলেন, তিনিই এখন দেখে-শুনে সেটা সেলাই ক'রে আবার বোল বন্ধ করতে পারেন! তার জন্যে এমন কি যদি ষোল টাকাও ভিজিট নেন্ সে ডাক্তার তো আমি দিতে রাজী আছি!'

দেখতে দেখতে ভীষণ আকার ধারণ করল বিনতার মুখ। গলা আরও এক পর্দা চড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'কেন বলুন তো আমার বুলি বন্ধ ক'রে দেবেন! কিসের জন্যে!...এসব কি অলুক্ষুণে কথাবার্তা। আমি আপনার কী পাকাধানে মই দিয়েছি তাই শুনি!...... আমার কথা যদি এত খারাপ লাগে—আমার সঙ্গে কথা কইতে আসেন কেন? কাল থেকে আর কথা কইবেন না—আমার নাই বা দেখলুম কন্যেদের গুণ শুনতে আর আমার বাকী নেই এর মধ্যে কিছু। ......তার বেলা তো কিছু বলবার সাধ্যি হয় না। সে বুঝি সব ভাল। নিজের ময়লায় গন্ধ নেই—না? যত চোর দায়ে ধরা পড়ল বৌবেটি হতচ্ছাড়ি!... বাঃ, বেশ তো, বেশ বিচের যা হোক!'

আরও অনেক কথা বলে যায় সে। ঠিক প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষে সে গালাগালও দেয় ছড়া বে'ধে। বলতে বলতে গলার পর্দাও চড়ে, ক্রমশ যেন রণ-

একটু আস্তে কথা বললে কি হয়?

কথা শুনতেও হবে না!...বলে—না যাব নগর না হবে ঝগড়!...তাও অসাহ্যি লাগে ভেন্ন ক'রে দিন না। আপনার খারাপ লাগে বলে আমায় কি মুখে কুলুপ এ'টে থাকতে হবে নাকি?...ইল্লো!... আবদার মন্দ নয়। উনি যেন সাক্ষাৎ ভগবান এলেন একেবারে, কিম্বা খড়দর মা-গোঁসাই!... ও'কে তুষ্টি করতে জিভ কেটে দেব আমি!...কেন, আমার গলার ওপরই বা এত নজর কেন, নিজের মেয়েদের গলা কি কিছু কম নাকি?... বটঠাকুরঝির গলা তো শুনি সেই রাস-তলা থেকে শোনা যায়! মেজ-ঠাকুরঝি যখন আসে তখন তো শুনেছি আরও এক কাঠি সরেশ—কাক-চিল বসতে পায় না বাড়িতে!...ওগো, শুনেছি সব—চক্ষে রঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করে সে। তার দিকে চেয়ে এমন কি শ্যামাও একটু ভয় পেয়ে যান যেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে, মুখের দুই কষে ফেনার মতো কী জড়ো হয়েছে—এমন কি, চুল-গুলোও যেন খানিকটা খাড়া হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। ভদ্রঘরের মেয়ের এমন উগ্র মূর্তি কখনও দেখেন নি শ্যামা—বস্তি-টস্তিতে ঝগড়া বাধলে হয়ত এই রকম দৃশ্য নজরে পড়ে।

ভয় পেলেও—বেশীক্ষণ এ দৃশ্য সহ্য করা কঠিন। শেষে থাকতে না পেরে এক-সময় তিনি বলেন, 'তা বেশ তো, সে ফিরে আসুক, সেই কথাই বলো না বরকে। ভেন্ন হয়ে যেতেই বলো। তোমারও হাড় জুড়োয় আমারও হাড়ে বাতাস লাগে।

তাছাড়া—সত্যি কথা বলতে কি আমার একটু সুবিধেও হয়—তোমাদের দুজনকে খাওয়াতে পয়সাও তো কম খরচ হচ্ছে না আমার!'

'অ! জানেন সে অক্ষ্যাম, জানেন সে ভেন্ন হয়ে মাগ-ছেলে পুষতে পারবে না, তাই বুঝি এত টিটকিরি মারছেন!' ভীষণতর হয়ে ওঠে বিনতার কণ্ঠ, 'তা এত অক্ষ্যামই যদি জানেন, তবে বে দিয়ে-ছিলেন কেন ঐ হাবাকালা ছেলের! যার এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই তার বে দিয়ে বৌ আনবার শখ জেগেছিল কেন প্রাণে!...না কি ভেবেছিলেন অক্ষ্যাম ছেলে কোনদিন কোথাও চলে যেতে পারবে না—তার বৌকে দু পায়ে থ্যাত-লাবেন মনের সুখে!... হুঃ! স্বপ্নেও ভাববেন না আমি সেই বান্দা! খাওয়া। ভারী তো খরচ করছেন খাওয়াবার জন্যে। জেলের কয়েদীরা এর চেয়ে ভাল খায়। দুবেলা দু-মুঠো ভিক্ষের ভাত দিয়ে মাথা কিনে নিচ্ছেন একেবারে। সেই ভয়ে আমার মুখে কুলুপ এ'টে থাকতে হবে! ...কেন, কিসের জন্যে! অত সুখে আর রাধামণি বাঁচে না!...যদি ভেন্ন হই তো এটি জেনে রাখবেন যে সহজে ছেড়ে দেব না আমি, দস্তুরমতো খোরাকী আদায় ক'রে ছাড়ব। না দেন—জোর করে আদায় করব। দরকার হয় আদালতে গিয়ে দাঁড়াব—ছেলে চাকরী করে বলে ঠকিয়ে বে দিয়েছেন!'

শ্যামা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অসহ একটা ক্রোধে তাঁর হাত-পা কাঁপছে ভেতরে ভেতরে—কিন্তু কী করবেন, কি করে বাধা দেবেন একে, সত্যিই দু-চার ঘা কষিয়ে দেবেন কিনা—কিছুই ভেবে পেলেন না তিনি। এ যা মেয়ে, এ সব করতে পারে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। এই প্রথম তিনি ঐন্দ্রিলার আগমন প্রার্থনা করতে লাগলেন মনে মনে। একমাত্র সেই বোধহয় পারে—এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝগড়া করতে।

কিছুই বলতে পারলেন না শ্যামা, কোন প্রতিকারই তাঁর মাথায় এল না। এ ধারে কৌতূহলী প্রতিবেশীরা ইতি-মধ্যেই উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে—কেউ কেউ সোজাসুজি বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে এদিকে। ঐন্দ্রিলার কল্যাণে চেঁচামেচি ঝগড়া এ বাড়িতে নতুন নয়, তবু—এখন যে সে নেই, তাও অনেকে জানে। বৌ আর শাশুড়ী থাকে শুধু—বলতে গেলে নতুন বৌ—সুতরাং এখনকার চেঁচামেচি কিছু মুখরোচক নিশ্চয়ই। এ কৌতূহলও তাই নিতান্ত স্বাভাবিক। ওদের দোষ দেন না শ্যামা। আর এও তিনি জানেন যে সে কৌতূহল বেশীক্ষণ দূরত্ব বা ব্যবধান বজায় রাখতে দেবে না। এখনই হয়ত বেড়ার আগড় ঠেলে কেউ কেউ ভেতরে ঢুকবে ব্যাপারটা ভাল ক'রে উপভোগ করতে। তাঁকে এবং বৌকে নানাবিধ উপ-দেশ দিতে শুরু করবে তারা এখনই। তাদের সেই বিদ্রূপ-শাণিত দৃষ্টি এবং আপাত-আন্তরিক সহানুভূতি থেকে আত্মরক্ষা করতেই যেন শ্যামা হাতের কাজ সরিয়ে রেখে পিছন দিককার বাগানে চলে গেলেন—একরকম রণে ভঙ্গ দিয়েই। আশা যে, এই বিজয়-গৌরবের তৃপ্তিতে এবং একা একঘেয়ে ব'কে যাবার ক্লান্তিতেই এবার চুপ করবে বৌ।

সত্যিই বিনতা চুপ করতে বাধ্য হ'ল তখনকার মতো। যতবড়ই যোদ্ধা হোক—প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। কিন্তু সেটা শুধুই নিরুপায়ের শান্তি। মনে মনে একটা ভয়ংকরতর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। কান্তি বাড়ি ফিরলে সে এর একটা হেস্ত-নেস্ত বিহিত যা হোক করবেই—এই স্থির প্রতিজ্ঞা তার।

কিন্তু তার সব প্রতিজ্ঞা এবং প্রস্তুতি ভেস্তে দিল কান্তিই।

সে বাড়ি ফিরল প্রবল জ্বর এবং মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। কাজ করতে করতেই জ্বর এসেছে, তার ওপর জোর করে কাজ করতে গিয়ে বেড়ে গেছে আরও। আর সেই জন্যেই বোধহয় এত যন্ত্রণা। তখন মালিক জোর ক'রে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে-ছেন তাকে। ছাপাখানারই একজন সঙ্গে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। গাড়িভাড়ার পয়সা তিনিই দিয়ে দিয়েছেন—'উদিগের টেরাম-ভাড়া সুদ্দু'। ফেরার পয়সাও হিসেব ক'রে দিয়েছেন আর কিছু লাগবে না।

কান্তির বরাত ভাল। বধির কালা হয়েও মনিবের সুনজরে পড়ে গেছে,—ওর সহকর্মীর কণ্ঠে সেই প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা-টুকুও চাপা রইল না।

তা সে যাই হোক—ঝগড়াটা তখনকার মতো মুলতুবী রাখতে হ'ল বিনতাকে। কারণ জ্বরটা খুবই বেশী। শ্যামা যখন কপালে হাত দিয়ে দেখে জ্বরের পরি-মাণটা অনুমান ক'রে নিয়ে মাথা ধুইয়ে দেবার আয়োজন করলেন, তখন তাকে ভালমানুষের মতো জল-গামছা কলাপাতা হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে সাহায্যও করতে হ'ল যথাসম্ভব।

কান্তির জ্বর পরের দিনও কমল না, তারপরের দিনও না।

তখন চিন্তিত হয়ে শ্যামা ফকীর ডাক্তারকে ডাকতে বাধ্য হলেন। ফকীর এসে মিক্সচার এবং কী একটা পুরিয়া দিয়ে বলে গেলেন, 'সাবধানে নজর রাখ-বেন, জ্বরটা বাঁকা দাঁড়াতে পারে।'

এবার বিনতারও মুখ শুকোল। যার জোরে তার জোর—সে-ই যদি অসহায় হয়ে পড়ে থাকে এমন ক'রে, তাহলে আর বিক্রম দেখায় কোথায়? সে অন্য-লোকের অভাবে ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে বোধকরি বাসনগুলোকেই শুনিয়ে শুনিয়ে আপসায়, 'যার কপাল খারাপ হয় তার দেখি সব দিগেই মন্দ! অসুখবিসুখ জ্বরজাড়ি হয় লোকের—দুদিন খাড়া উপোস দিয়ে পড়ে থাকে—জ্বর ছেড়ে যায়, নিশ্চিন্তি! এ'র যখনই হবে

বাঁকা!... একবার তো শুনেছি এই জ্বর থেকেই কান দুটো গেছে—এবার বোধহয় চোখ দুটোও যাবে! ব্যাস্—তবেই আর কি, সুখের ওপর স্বর্গবাস হয় একেবারে! ভরাভরতি চোদ্দ পোয়া ভাগ্যি উপ্চে পড়ে। ঐটুকু শুধু বাকী আছে দুর্দ্দশা পুরো হ'তে।... ঝাড়ু মারো বরাতের মুখে—কেন, আমার বরাতেই বা এমন যে হবে কেন? কৈ আর কারুর তো এমন যে হ'তে শুনিনি। ভারী তো ডাক্তার—পনেরো টেক্‌লো মাইনের চাকর—তাও গোটা একটা আস্ত মুনিষ্যি পেলুম না গা! মুখে আগুন বরাতের, জ্যান্ত নুড়ো জ্বেলে দিতে হয় এমন বরাতের মুখে। এবার আর একটা অঙ্গ পড়লেই তো বুঝতে পাচ্ছি মালা হাতে ভিক্ষেয় বেরোতে হবে!'

শ্যামা ছেলের কাছে বসেছিলেন, অতটা শুনতে পাননি, ওধারের ঘাট থেকে মহাদেবের মা শুনতে পেয়ে ধমক দিয়ে উঠল, 'ওকি হচ্ছে গা বৌদি, ঘরে রোগা ভাইটা আমার পড়ে ছটফট করছে আর এখানে বসে বসে তুমি তার ঝাট বাচাচ্ছ! ওসব কি অলক্ষুণে কথাবাত্তার!'

অপ্রতিভ হয়ে তখনকার মতো চুপ ক'রে যায় বিনতা।......

জ্বর পাঁচ-ছ দিন পরে একটু নরম হয়ে আসে। ফকীর ডাক্তার অভয় দিয়ে যান, 'না, যা ভেবেছিলুম তা নয়—টাই-ফয়েড-টয়েড কিছু নয়। হয়—ওরকম হয়। আজকাল আকছার হচ্ছে এই রকম একজ্বরী মতো। যাই হোক—এবার আস্তে আস্তে ছাড়বে। তবে ছাড়বার মুখটাতে একটু হুঁশিয়ার থাকবেন, দুর্বল শরীর তো, হঠাৎ সব ঠাণ্ডা হয়ে আসতে পারে। সেই সময়টায় একটু গরম দুধ কি একটু গরম চা—নিদেন গরম চিনির জল খাইয়ে দেবেন—'

ফকীর ডাক্তার পাশকরা ডাক্তার নন, এক বড় ডাক্তারের কাছে কম্পাউন্ডারী করতে করতে ডাক্তারখানা খুলে বসেছেন। তা অবশ্য হয়েও গেল অনেক দিন। আগে আদৌ ভিজিট নিতেন না, পরে আট আনা করেছিলেন, এখন নাকি এক টাকা ভিজিটের কম কারও কাছে যান না। তবে শ্যামা বহুদিনের মক্কেল বলে এখনও আট আনা নেন, তাও সব দিন দিতে পারেন না শ্যামা, দুদিন ভাঁড়িয়ে একদিন দেন। কিন্তু ফকীর কিছু বলেন না—ডাকলেই আসেনও। ওষুধের দাম ওর কাছেই সবচেয়ে কম। অনেক ভেবেই তাকে ধরে আছেন শ্যামা।

লোকমুখে খবর পেয়ে বিনতার মা একদিন এলেন জামাইকে দেখতে। এর আগে আর কোন দিন আসেন নি তিনি। শ্যামা অবশ্যই যত্ন-আত্তির ত্রুটি করলেন না, বাজার থেকে বলাইকে দিয়েই মিষ্টি আনিয়ে দিলেন, মায় চা-খাবার অভ্যাস আছে শুনে এক পয়সার গুঁড়ো চায়ের প্যাকেট আনিয়ে বিনতাকে দিয়ে চা করিয়েও দিলেন।

অত দূর থেকে খুঁজে খুঁজে নতুন জায়গায় আসতেই ভদ্রমহিলার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগেই মাত্র এসে পৌঁচেছেন তিনি। তাই সন্ধ্যার পর বিদায় নেবার প্রস্তাব করতেই শ্যামা সরাসরি তা নাকচ ক'রে দিলেন।

'তা কখনও হয়! এই অন্ধকারে অজানা অচেনা জায়গায় আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি কখনও।......ও বাড়ির কোন নাতিটাতি এসে পড়লেও না হয় সঙ্গে দিতুম, কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসত। ...আর তার অত দরকারই বা কি, গরীব বেয়ানের কাছে এসে পড়েইছেন যখন—তখন কষ্টসৃষ্ট ক'রে একটা রাত না হয় কাটিয়েই যান না!'

অগত্যা বিনতার মাকে রাজী হ'তে হ'ল। তবে তিনি হাতজোড় ক'রে বললেন, 'কিন্তু ভোরবেলাই ছেড়ে দেবেন বেয়ান, মানে এখানে তো আর—'

'সে আমি জানি। নাতি হয়নি এখনও—এখানে ভাত খেতে বলবই বা কেন?'

কুটুম্ব মানুষ—এই প্রথম এসেছেন! তাঁকে আর কিছু ক্ষুদ-ভাজা কি চাল-ভাজা খাইয়ে রাখা যায় না। অগত্যা শ্যামাকে গিয়ে উনুন জ্বেলে রুটি গড়তে বসতে হ'ল। রুটি আর ভালরকম একটা কিছু তরকারি, ডালনা জাতীয়। বিনতা রাঁধে মন্দ নয়, কিন্তু বৌয়ের মায়ের জন্যে তাঁর সামনেই বৌকে রাঁধতে পাঠানো অনুচিত, তাছাড়া তাদের চিরদিন কয়লার জ্বালে রাঁধা অভ্যাস—কাঠ কি পাতার জ্বালে রুটি ভাল গড়তে পারেও না সে। রুটির পাটও কম এ বাড়িতে—শেখার সুযোগও মেলে নি। সুতরাং শ্যামাকে নিজেই যেতে হ'ল রান্নাঘরে। বিনতাকে এই অবসরে ঘরদোরের পাট সেরে নিতে বললেন, বিছানা একটা বাড়তি চাই আজ, বেয়ানের জন্য। আজ আর ছেলের কাছে বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিতেই সে অনেকটা ভাল আছে আজ, তার ওপর শুশ্রূষা করার লোকও আছে আর একজন। তার শাশুড়িই কাছে বসে বাতাস করছেন, মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মিছি মিছি আর একটা লোক সেখানে জোড়া হয়ে বসে থেকে লাভ কি?......

শ্যামা একমনে বসে রান্না করছেন, হঠাৎ বিনতা এসে পিছন থেকে দারুণ উত্তেজিতভাবে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে উঠল, 'আমি এ সব কিন্তু ভাল বুঝি না মা, আপনি যা হয় এর একটা বিহিত করুন!'

বিনতার উচ্চারণ এমনিই কেমন একটু আধো-আধো—উত্তেজিত হ'লে আরও জড়িয়ে যায় কথাগুলো। সে উত্তেজনার কারণও যে খুব বেশী—তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কারণ বিছানা করতে করতেই ছুটে এসেছে—হাতে তার এখনও বিছানাঝাড়া খ্যাংরাটা ধরা।

শ্যামা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী ভাল বুঝছ না বৌমা, কী হয়েছে?'

'না, না, মা-ই হোক আর যা-ই হোক, সত্যি কথা বলব তার অত ঢাকাঢাকি কিসের। মার কি উচিত অত বড় জামাইয়ের মশারীর মধ্যে ঢুকে তার মাথা টিপে দেওয়া? হ'লই বা শাশুড়ী—এমন কি বয়স হয়েছে মার!......না না, আপনি বারণ করুন মা!'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন শ্যামা। এ বধূ সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময়ের বোধকরি শেষ হবে না। বহুক্ষণ নির্বাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা নমস্কারের ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'ধন্যি মা ধন্যি, তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ!...... আমার গলা কেটে ফেললেও আমি গিয়ে এমন কথা তোমার মাকে বলতে পারব না বলতে হয় তুমিই বল গে।...ওঃ, আমার কান্তির বরাতকেও বলিহারী যাই—কোন্ নির্জনে বসে এমন বৌয়ের জন্যে তপস্যা করেছিল!'

মেঘের মতো অন্ধকার মুখ ক'রে বিনতা চলে গেল দুপ দুপ ক'রে পা ফেলতে ফেলতে। 'বলবই তো, বেশ—না হয় আমিই বলব। অত ভয় কিসের? নিজের সোয়ামীর ভাল-মন্দর কথা যেখানে, সেখানে অত ঢাক্-ঢাক্ চক্ষু-লজ্জা করতে গেলে চলে না। খারাপ দেখায় বলেই বলা তা নয়—সবই আমার দোষ। ভালকথা বললেও দোষ।...তপিসে—কী তপিসের বর রে আমার!'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত চাপা গলায় গজ-গজ করে সে। তবে শেষ পর্যন্ত—কে জানে কেন—কান্তির ঘরের দিকে আর যায় না, ও ঘরে গিয়েই বিছানা করতে শুরু করে আবার।

(ক্রমশঃ)

সেকালের পাতা : একালের চোখ

রত্নাকর
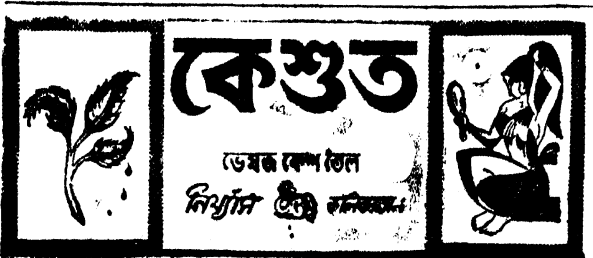
মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের প্রকাশ বাঙালা সাহিত্যে এক ঘটনা। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে শর্মিষ্ঠার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনার প্রতি আকৃষ্ট হবেন প্রত্যেক পাঠক।

সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব বেশি দিনের না হলেও বিশেষ তাপর্যপূর্ণ। উনিশ শতকের বেশ কয়েকখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে যে তালিকা প্রকাশিত হয় তা সংগ্রহ করা যায় পাঠকদের জন্য।

উৎকলবাসী পাল্‌কীবাহক যদি বা কাজে আবার ফিরে আসে, তবু ক্যালকাটা গেজেটে আমাদের চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ কি আজও সত্য নয়?

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়
(২৫শে বৈশাখ ১২৫৮)
শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সম্পর্কে

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত শর্মিষ্ঠা নাটক নামে যে এক অভিনব নাটক বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া এক-খণ্ড আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম যদিও অভিনয় দর্শন ব্যতিরেকে নাটকের প্রশংসা করা যাইতে পারে না তত্রাচ শর্মিষ্ঠা নাটক পাঠে অস্মদাদির পরম শর্ম্ম উদিত হইল। নাটক-নাটিকা সকলের উদ্দেশ্য এই যে মানব জাতির জীবদ্দশায় দৈবিক অথবা ভৌতিক কিম্বা মানুষিক ঘটনা বশতঃ যে সকল অবস্থান্তর হইয়া থাকে এবং তত্তদবস্থায় সেই সকল ব্যক্তি যাদৃশী চেষ্টা ও তদ্রূপ আন্তরিক ভাব প্রকাশ করেন বর্ণন দ্বারা কার্য নিবন্ধ হইয়া তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গের রসভাব প্রকাশক হয় এই কারণে কি সংস্কৃত কি ইংরাজী সকল ভাষার নাটকই গদ্য পদ্যময় দ্বিবিধ বাক্য দ্বারা হওনের প্রথা আছে। ফলতঃ কেবল পদ্যময় বাক্যে অভঙ্গ অথবা অবিকল চেষ্টা ও ভাব সকল প্রকাশিত হইতে পারে না, নাট্যাভিনয়ে ঐ সমুদায়ই সুস্পষ্ট প্রকটিত হইয়া থাকে। অপর কেবল এক প্রকার কথোপকথন দ্বারা সহৃদয় সভ্যদিগের প্রমোদ ক্রমাগত থাকিবার সম্ভাবনা হয় না, এ কারণ নাটক মধ্যে সঙ্গীত হইয়া থাকে, সেই সঙ্গীত দ্বারা নূতন ভাবোদয় হওয়াতে আমোদ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

উক্ত গ্রন্থকার মহোদয় নব প্রণীত নাটক গর্ভাঙ্ক নামে যে একটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যদিও সংস্কৃত নাটক-নাটিকায় তাহা দুষ্প্রাপ্য নহে তথাচ ইংরাজী নাটক যাহার অভিনয় সচরাচর নয়ন গোচর হয় না কিন্তু তাহাতেও প্রবন্ধর চকের বিপ্রলাপ বলিয়া দোষা-রোপ হইতে পারে না যেহেতু অঙ্কান্তর্গত অঙ্ক গর্ভাঙ্ক শব্দের অর্থ। পূর্বাপর পর্যালোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মানও হইল গ্রন্থকার মহোদয় তদ্রূপ তাৎপর্য্যই সংস্থাপিত করিয়াছেন।

যে যাহা হউক শর্মিষ্ঠা নাটকের ভূরি ২ অংশই যথানিয়মে নিবন্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসা কাহারো বদন হইতে বিনির্গত হইবেক এমন অনুমান হয় না। উক্ত নাটকে দোষের মধ্যে স্থানে ২ অপ্রসিদ্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে সচারাচর কথোপকথনে যাহা ব্যবহার করিলে লোকে পাণ্ডিত্য প্রকাশক বলিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিয়া থাকেন পরন্তু গ্রন্থকার বঙ্গভাষা লিখনে নূতন ব্রতি অতএব সে দোষ দোষ মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে গ্রন্থকার মহোদয়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে অনেক ব্যক্তির প্রমুখাৎ শুনিতে পাওয়া যায় শর্মিষ্ঠা নাটক দুষ্প্রাপ্য, অতএব অনুরোধ করি যাহাতে সাধারণের সুলভ হয় তদ্রূপ উপায় করেন তাহা হইলে গ্রন্থকার যে বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উহা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা সার্থক হইবেক। (এর পর শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে) ১৮ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ১২৬৬

সরকারি বিজ্ঞাপন

বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন

ঢাকা ও গয়াহাটি আসামাঞ্চলে দ্রব্যাদি প্রেরণ ও গমনাগমনের বিষয়। "যমুনা" নামক বাষ্পীয় জাহাজ বর্ত্ত-মানে এপ্রেল মাসের ১৪ তারিখে উপরোক্ত প্রদেশদ্বয়ে প্রেরিত হইবেক।

উক্ত জাহাজের মধ্যে আরোহিদিগের নিমিত্ত অতি উত্তম ৮ আটটা কুঠারী খালি আছে।

প্রাগুক্ত জাহাজের মধ্যে গমন জন্য বাষ্পীয় জাহাজের কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেবের দপ্তরখানায় আবেদন করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে

জে, সদরলেণ্ড
মেরিণ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সেক্রেটারী
ষ্টিম ডিপার্টমেন্ট

১১ এপ্রেল ১৮৫১

সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের তালিকা

......আমরা এ স্থলে সংবাদপত্রের ও অন্যান্য যন্ত্রালয়ের তালিকা পাঠক-বর্গের গোচর নিমিত্ত নিম্নে প্রকাশ করিলাম। যদিও কিয়দ্দিন গত হইল রেবেরেণ্ড লাং সাহেব যন্ত্রালয় সকলের তালিকা ইংরাজী ভাষায় প্রকটিত করিয়াছেন তথাপি আমরা যন্ত্রালয়ের তালিকা এ স্থলে প্রকাশ করণ নিরর্থক বোধ করি না যেহেতু মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা অহরহই বৃদ্ধি হইতেছে। অপর বাংলা যন্ত্র সকল কোথায় কত আছে ও তাহার সবিশেষ বিবরণ অস্মাদাদির সুবিদিত আছে অতএব এই তালিকায় পাঠকবর্গ অবশ্যই কিঞ্চিৎ অধিক জানিতে পারিবেন।

সংবাদপত্রের নাম	সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষের নাম	নিবাস ও মাসিক মূল্য
	(প্রাত্যহিক)	
সংবাদ প্রভাকর	শ্রীযুক্ত ঈশ্বরকুমার গুপ্ত	শিমুল্যা ১
,, পূর্ণচন্দ্রোদয়	,, অদ্বৈত চন্দ্র আঢ্য	আমড়াতলা ১
	(দিনান্তরিক)	
,, ভাস্কর	,, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	শোভাবাজার ১
,, রসসাগর	,, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	চোরবাগান ॥০
	(অর্ধ সপ্তাহিক)	
সমাচার চন্দ্রিকা	,, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আড়পুলি ১
সংবাদ রসরাজ	,, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য	শোভাবাজার ॥০
,, সজ্জনরঞ্জন	,, গোবিন্দ চন্দ্র গুপ্ত	পাথুরিয়াঘাটা ॥০
বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী	,, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্ধমান ॥০
	(সাপ্তাহিক)	
সংবাদ সাধুরঞ্জন	,, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	শিমুল্যা ।০
,, সুধাংশু	,, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	শিমুলিয়া ।০
গবর্ণমেণ্ট গেজিট	,, জান মার্সমন সাহেব	শ্রীরামপুর ১
সত্য প্রদীপ	,, টৌনসেন্ড সাহেব	,, ॥০
সংবাদ বর্দ্ধমান	,, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান ॥০
বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়	,, ,,	,, ॥০
রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ	,, গুরুচরণ শর্ম্মা রায়	রঙ্গপুর ॥০
	(অর্দ্ধ মাসিক)	

সংবাদপত্রের নাম	সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষের নাম	নিবাস ও মাসিক মূল্য
নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা	,, নন্দকুমার কবিরত্ন (মাসিক)	পাথুরিয়াঘাটা ৷৷৹
তত্ত্ববোধিনী	,, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	যোড়াসাকো ১৲
কৌস্তুভ কিরণ	,, রাজনারায়ণ মিত্র	শোভাবাজার ১৲
উপদেশক	,, পাদ্রি জে তামস সাহেব	বাহির রাস্তা ⁄৹
সত্যার্ণব	,, জে লাং সাহেব	মজাপুর ⁄১০
সর্বশুভকরী	,, মতিলাল চট্টোপাধ্যায় (তিরোধানপ্রাপ্ত)	বহুবাজার ৷৹
সংবাদ কৌমুদী	রাজা রামমোহন রায়	
সংবাদ তিমিরনাশক	কৃষ্ণমোহন দাস	
,, সুধাকর	প্রেমচাঁদ রায়	
সংবাদ রত্নাকর	ব্রজমোহন সিংহ	
,, রত্নাবলী	জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক	
,, সার সংগ্রহ	বেণীমাধব দে	
,, রত্নাবলী	মহেশচন্দ্র পাল	
,, অনুবাদিকা	প্রসন্নকুমার ঠাকুর	
সমাচার দর্শন	জান মার্সমন সাহেব	
,,	ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়	
মহাজন দর্পণ	জয়কালী বসু	
সমাচার সভা রাজেন্দ্র	মৌলবী আলি মোল্লা	
সংবাদ সুধাসিন্ধু	কালীশংকর দত্ত	
,, গুণাকর	গিরীশচন্দ্র বসু	
,, মৃত্যুঞ্জয়ী	পার্বতীচরণ দাস	
,, দিবাকর	গঙ্গানারায়ণ বসু	
,, নিশাকর	নীলকমল দাস	
,, মুক্তাবলী	কালীকান্ত ভট্টাচার্য	
জ্ঞানান্বেষণ	রসিককৃষ্ণ মল্লিক	
সংবাদ সৌদামিনী	কৃষ্ণহরি বসু	
বঙ্গদূত	ভোলানাথ সেন	
জ্ঞানাঞ্জন	চৈতন্যচরণ অধিকারী	
বেঙ্গল স্পেক্টেটর	রামগোপাল ঘোষ	
ভক্তিসূচক	রামনিধি দাস	
পাষণ্ড পীড়ন	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	
আক্কেল গুড়ুম	ব্রজনাথ বন্ধু	
সংবাদ রাজরাণী	গঙ্গানারায়ণ বসু	
সমাচার জ্ঞান দর্পণ	উমাকান্ত ভট্টাচার্য	
সংবাদ ভারতবন্ধু	শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
,, মনোরঞ্জন	গোপালচন্দ্র দে	
মুরশিদাবাদ পত্রিকা	রাজা কৃষ্ণনাথ রায়	
সংবাদ রত্নবর্ষণ	মাধবচন্দ্র ঘোষ (তালিকা অসম্পূর্ণ)	

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়—২ বৈশাখ—সোমবার ১২৫৮

নূতনত্বের প্রতি বীতরাগ

পালকী ও বাহকদের নাম রেজিষ্টারী করার আদেশের প্রতিবাদে কলকাতার উৎকলবাসীর মনে যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হয় তা এখন কমে গিয়েছে। অনেক উৎকলবাসী বাহককে বাহুতে রেজিষ্টারী নম্বরসহ তামার পাত পরিহিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। মনে হয় রেজিস্ট্রেশনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পারার জন্য তারা উত্তেজিত হয়। এদেশের লোক কোন নূতনত্বকে সহজে স্বীকার করতে পারে না। নূতনত্বের প্রতি বীতরাগ এই দেশের অধিবাসীদের ধর্ম। উত্তেজনার এও অন্যতম কারণ। উৎকলবাসী বাহকেরা মনে করে যে তামার পাত পরার ফলে তারা কোম্পানীর চাকর হয়ে উঠল। কোম্পানী যে কোন সময় তাদের কাজ করতে বাধ্য করাতে পারে। এই ভুল ধারণার অবসান হলে বাহকদের বিরূপতা অনেক কমে যাবে। অবশ্য ইতিমধ্যে বহু বাহক কলকাতা ত্যাগ করেছে এবং এই জন্য যানবাহনের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। তবে আশা করা যায় রেজিস্ট্রেশনের প্রকৃত অর্থ বোঝার পর বহু বাহক আবার কাজ করতে এগিয়ে আসবেন।

(ক্যালকাটা গেজেট। ৪-৬-১৮২৭।

(অনূদিত।)

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৪)

ট্যাক্সী এসে থামল আমার বাড়ীর সামনে। গগন সেনের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিয়ে নেমে পড়লাম। দোর গোড়ায় দেখি সেজদা দাঁড়িয়ে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম।

সেজদা হাসিমুখে বল্‌ল, তুই এসেছিস শুনে তখন থেকে হাঁ করে বসে আছি, কোথায় গিয়েছিলি?

বললাম, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

—উনি? সেজদা গগন সেনের কথা জিজ্ঞেস করে।

সংকোচের সঙ্গে বললাম, উনিই আমার এই চাকরিটা করে দিয়েছেন।

সেজদা ব্যস্ত হয়ে বলে, নামতে বল্‌লি না!

—তুমি বল, আমি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

পোষাকী আলাপ আর নমস্কার বিনিময়ের পরই সেজদা গগন সেনকে সাদর আমন্ত্রণ জানাল, আরে মশাই, দোরগোড়া থেকে চলে যাবেন। তাই কখনও হয়, নামুন। গরীবের বাড়ীতে অন্ততঃ এক কাপ চাও খেয়ে যাবেন।

আমি কিন্তু মনে মনে চেয়েছিলাম গগন সেন যেন এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে, কারণ বৌদি বা মেজদি তার সম্বন্ধে কিছুই জানে না, কিভাবে তারা এ অপরিচিত লোকটিকে গ্রহণ করে কে জানে। হয়ত আমার কপালে অসম্মতির কুঞ্চন রেখাও ফুটে উঠেছিল, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করেই গগন সেন ঝপ করে ট্যাক্সী থেকে নেমে পড়ল, হাসতে হাসতে বল্‌ল, সন্ধ্যেবেলা আমার কোন কাজ নেই, এক কাপ কেন, সাত কাপ চা খেতে রাজী আছি।

—তবে যে বড় নামছিলেন না?

—আপনার বোন কোনদিন নামতে বলে না তো আমি কি করব?

আমি একটা কি বলতে যাচ্ছিলাম, সেজদা থামিয়ে দিয়ে বল্‌ল, তর্কাতর্কি পরে হবে চল সব ওপরে যাওয়া যাক।

সিঁড়ি দিয়ে আমি আগে আগে উঠতে লাগলাম, পিছনে গগন সেন আর সেজদা গল্প করতে করতে আসছে। কিন্তু মন থেকে আমার দুর্ভাবনা তখনও যায়নি। বিশেষ করে বৌদির জন্যে। কাউকে অপছন্দ করলে চোখে-মুখে যে ভাব তার স্পষ্ট ফুটে উঠে, বাইরের লোক হলেও তা বুঝতে আর বাকী থাকে না।

উপরের দরজা খোলাই ছিল, আমি ভেতরে ঢুকে দেখি বৌদি আর মেজদি দুজনেই রান্নাঘরে লুচি ভাজতে ব্যস্ত। আমাকে দেখেই মেজদি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বল্‌ল, এই যে অপু এসে গেছিস, তোর জন্যে বৌদি সারা দুপুরে বসে মাংস রেঁধেছে। এই লুচি ভাজা হচ্ছে, গরম গরম খেয়ে নিবি চল্‌।

আমি ইচ্ছে করেই বললাম, কেন আমার জন্যে এত কষ্ট করতে গেলে বৌদি, যাহোক কিছু খেয়ে নিলেই তো হত।

বৌদি কাজ করতে করতে উত্তর দিল, এক মাস বাদে তুমি এলে, বাচ্চাগুলোও পিসী এসেছে শুনে খুব খুশী, একটু না হয় হৈ হৈ করা গেল।

বাইরে থেকে সেজদা ডাকল, তোমরা সব কোথায় গেলে, আমার সঙ্গে অতিথি রয়েছেন।

বৌদি তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা তুলে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, মুখ বাড়িয়ে দেখ তো অপু, কাকে আবার ধরে নিয়ে এলেন এ সময়?

আমি কোনও উত্তর না দিয়ে বাইরে এলাম, সেজদা বল্‌ল, বৌদিকে ডাক্‌ না।

বল্‌লাম, লুচি ভাজছে।

—আহা একবার আসতে বল না। মেজকেও ডাক্‌।

আমি ঘরে ঢুকে ওদের জানালাম সেজ্‌দার কথা। বৌদি জিজ্ঞেস করল, কে রে, কোন চেনা লোক?

আমি স্পষ্ট করে কোন জবাব দিলাম না, বললাম, সেজদা ডাকছে, তুমি যাও, আমি উনুনের কাছে বসছি।

বৌদিকে তুলে দিয়ে আমি লুচি ভাজার সরঞ্জাম নিয়ে মোড়ায় বসলাম বটে, কিন্তু কান পড়ে রইল বাইরের দিকে।

শুনতে পেলাম সেজদা বলছে, এঁর নাম গগন সেন, অপুর কাজ উনিই করে দিয়েছেন, জোর করে চা খেতে ধরে এনেছি, আর ইনি—,

গগন সেন উত্তর দিল, পরিচয়ের দরকার নেই, আমি এমনিতেই চিনতে পেরেছি, অর্পিতার বৌদি।

বৌদি কি বল্‌ল শুনতে পেলাম না।

গগন সেনের দরাজ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, আপনার কথা অর্পিতার মুখে এত শুনেছি যে আপনাকে চেনা আমার পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার। ক'লকাতার বাইরে

ও কি চাকরির সহজে নিতে চায়, মেজদির ভাবনা, বাড়ীর ভাবনা, কিন্তু দেখেছি ওর একমাত্র ভরসা আপনি। সব সময় বলে, বৌদি যখন আছে, ও ঠিক সামলে নেবে।

মেজদিও ততক্ষণে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা গগন সেনের কথা থেকেই বুঝতে পারলাম।

—আপনিও আমার অতিপরিচিত, অর্পিতার মেজদি, তাই না?

মেজদি বলল, আমার চেয়ে আমার অসুখের কথাই বেশী শুনেছেন বোধ হয়।

—শুধু অসুখ কেন, আপনার অপরিসীম স্নেহ-ভালবাসার কথাও যে আমি জানি। আর সেই দুষ্ট ছেলে দুটো কই! ভোম্বল আর দম্বল!

বৌদি হেসে বলল, স্কুল থেকে ফিরে মাঠে খেলতে গেছে।

গগন সেন প্রশ্ন করল, আর পাপিয়া?

—ও নিশ্চয় নীচে আছে, ডেকে পাঠাব অখন।

এতক্ষণে সেজদার গলা শুনতে পেলাম, আপনি তো দেখছি মশাই আমাদের বাড়ীর সকলের খবরই রাখেন। কেবল আমার কথাটাই অপু আপনাকে কিছু বলেনি।

গগন সেন সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিল, সে দুঃখ শুধু আপনার নয়, আমারও এ ফ্ল্যাটে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি, আমার সম্বন্ধেও আপনারা কেউই কিছু জানেন না। আমি যে অর্পিতার অনেক দিনের বন্ধু, আমার যে এর কম ছাগল-দাড়ি আছে, আর আমি যে একবার না সাধতেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি—এসব কিছুই অর্পিতা আপনাদের বলেনি দেখছি।

গগন সেনের কথায় সকলে হাসল, রান্নাঘরে বসে আমিও সে হাসিতে যোগ না দিয়ে পারলাম না। আশ্চর্য গগন সেনের মেশবার ক্ষমতা, আধ ঘন্টার মধ্যে সে বাড়ীর সবাইকে নিয়ে আসর জমিয়ে বসে গেল। নীচে থেকে পাপিয়া এল, ভাইপোরা ফিরল মাঠ থেকে। গগন সেনকে ঘিরে বারান্দায় এক চক্র বসেছে, কখনও সে ছেলেদের সঙ্গে রসিকতা করছে, কখনও আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছে বৌদিদের, আবার কখনও রাশভারী আলোচনা করছে সেজদার সঙ্গে।

কোথা দিয়ে যেন সন্ধেটা কেটে গেল।

এক সময় গগন সেন উঠে বলল, আজ চলি, পরে আবার দেখা হবে।

সেজদা বলল, পরে নয়, কালই আসতে হবে। আমারও ছুটি আছে, অপুও থাকবে, দুপুরে বেলা আপনার এখানে খাওয়ার নেমন্তন্ন।

গগন সেন সানন্দে বলল, অতি উত্তম প্রস্তাব। দুপুরে এখানে খাওয়া বিকেলে, উঁহু এখন বলব না।

বাচ্চারা সোৎসাহে প্রশ্ন করল, বিকেলে কি হবে, বলুন না।

গগন সেন তাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, কালকে জানতে পারবে, আমি বারটার সময় আসব, সবাই তৈরী থাকবে।

গগন সেন সকলের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিয়ে চলে গেল।

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে বড় ভালো লাগলো। কতদিন বাদে নিজের বিছানায় শুলাম। সেই ঘর, ওপাশে মেজদির খাট, সাজবার সেই ছোট্ট আয়নাটাও টাঙানো রয়েছে, বৌদির নড়বড়ে জাল-আলমারিটা এখনও দরজার কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুই বদলায়নি। আর একমাসের মধ্যে বদলাবার আছেই বা কি। শুধু বদলেছে বৌদি। আশ্চর্য, এখান থেকে যাবার আগে পর্যন্ত আমি ওর ভয়ে অস্থির হয়ে থাকতাম, কখন যে কি মুডে থাকে কার সাধ্য বোঝে। অথচ এবার ওর ব্যবহার সত্যিই আমাকে বিস্মিত করেছে। ভাবতেও ভালো লাগছে এ বাড়ীতে আমার শত্রু কেউ নেই, সকলেই আমার বন্ধু, সকলেই আমায় ভালোবাসে।

মেজদি তখনও ঘুমোয়নি, শুয়ে শুয়ে প্রশ্ন করলো, কৈ গগন সেনের কথা তো আগে কখনো বলিস নি?

বললাম, না।

—কতদিন তোর সঙ্গে আলাপ।

—তা বেশ কিছুদিন হবে। অলকা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

মেজদি নিজের মনেই বলল, ছেলেটি ভালো, অবশ্য ছেলে না বলে ওঁকে ভদ্রলোক বলাই উচিত।

গগন সেনকে মেজদির ভালো লেগেছে জেনে খুশী হলাম। বললাম, খুব দরদী মানুষ তা নাহলে বিপদের সময় আমাকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসবেনই বা কেন?

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

মেজদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন?

বললাম, যতদূর জানি, না।

একথায় মেজদি একটু অবাক হল, তার মানে, তুই ঠিক জানিস্ না?

হেসে ফেললাম, কি করে জানব? আমার সঙ্গে তো ওঁর তেমন কিছু আলাপ নেই।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর মেজদি কোন কথা বলেনি, একটু বাদে শুয়ে পড়ল। আমি কিন্তু ঘুমতে পারলাম না। কত আবোল-তাবোল কথা ভাবছি। গগন সেনের সঙ্গে বাড়ীর সকলের পরিচয় করিয়ে দেবার ইচ্ছে আমার অনেকদিন থেকেই ছিল। বিশেষ করে চেয়েছিলাম যাতে মেজদির সঙ্গে ওর আলাপ হয়। কিন্তু কি ভাবে তা করাব ভেবে পাইনি। অথচ আজ কত সহজে এই অপরিচিত মানুষটির সঙ্গে এদের আলাপ হয়ে গেল। সত্যিই ভাবতে আশ্চর্য লাগছে।

কিন্তু মনের কোণে কোথায় একটা ব্যথা জমা হয়েছিল, প্রথমে বুঝতে পারিনি কেন, পরে অনুভব করলাম এ ব্যথা অলকার জন্যে। অলকা আমার জন্যে অনেক করেছে, তারই বাড়ীতে গগন সেনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, অথচ সেই মেয়েটা আজ কোথায় নিঃসঙ্গ, একক জীবন কাটাচ্ছে, ভাবতেই খারাপ লাগলো। আমি কি তাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারি না? সেই হাসিখুশি-ভরা আগের জীবনে ফিরে যাওয়া কি একেবারে অসম্ভব! মনে পড়ছে মিঃ দত্তর বাড়ী, চাকর, বেয়ারা, গাড়ী, ড্রাইভার ঝলমলে সাজপোষাক, পার্টি, কি চোখ-ধাঁধানো প্রাচুর্য। মনে পড়ছে রাসবিহারী এভিন্যুর কাপড়ের দোকান, দোতলায় অজয়ের ছোট্ট বাসা। সেখানে অলকার হাসিখুশি সহজ রূপ দেখে কত না খুশী হয়েছিলাম, অথচ কোনটাই টিঁকল না, সব মিথ্যে হয়ে গেল। মনে এই প্রশ্ন জাগছে, তবে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে বুঝব কি করে?

ঘুম আসছে না দেখে ইচ্ছে করে উঠে পড়লাম। বেরিয়ে এলাম বারান্দায়, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আস্তে আস্তে

উঠে গেলাম আমার অতিপ্রিয় সেই সিঁড়ির ঘরটিতে। কে বলবে আমি ক'লকাতায় একমাস ছিলাম না। মনে হচ্ছে কালও যেন এখানে দাঁড়িয়ে আমি ঐ সামনের রাস্তাটা দেখেছি, বাড়ীগুলো অন্ধকার, শুধু আলো জ্বলছে রাস্তায়, আর নাটু দত্তর বাড়ীতে। আজও নিশ্চয় নাটু দত্ত ফেরেনি। তার বউ কি এখনও আগের মতই মাতাল স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকে। না, শুধু আলোটাই জ্বলে, সে আর বসে থাকে না। কে আর সঠিক খবর দেবে? পাগলাটা কিন্তু চেঁচাচ্ছে না, সেও কি বুঝে ফেলেছে চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই। প্রথম প্রথম তার চীৎকারে যাওবা অন্যরা ব্যস্ত হত, আজকাল তাও হয় না। কারণ অন্যের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হবার সময় কোথায়। পৃথিবী ঘুরছে, তারই সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে সংসারে, যে পারবে না, থেমে যাবে, তাকে নিয়ে মাথা ঘামালে তো অন্যদের চলবে না। পাগল ছেলেটো তা বুঝতে পেরেই বোধহয় তার স্বপ্নের কথা আর কাউকে শোনাতে চায় না, নীরবে শুধু দেখে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে মানুষ কি অনায়াসে ভেসে চলেছে। এক সময় আবার বিছানায় ফিরে গেলাম। আগের সঙ্গে রাত্রি জাগরণে কত না পার্থক্য। তখন ঘুম আসত না অন্তরের জ্বালায়, চোখের জলে মিছিমিছি তখন বালিশ ভিজিয়েছি। কিন্তু আজ আমার জেগে থাকতে ভাল লাগছে, ভাল লাগছে এ বাড়ীর প্রত্যেকটি জায়গা। দু'খানা ঘর, আধখানা বারান্দা, এক ফালি ছাদ, হোক্ না, তবু ভাল লাগে যদি সেখানে ভালবাসা থাকে, এ ভালোবাসার স্বাদ এ বাড়ীতে আমি আগে পাইনি বলেই বোধ হয় এ এক সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ঘুম ভাঙল আমার দেরীতে। কেউ আমাকে জাগায়নি, দেখি সবাই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে বিছানা তোলা হয়ে গেছে। তার উপর পরিপাটি করে বেড্ কভার, ঢাকা। সেজ্‌দা নাকি ভোরবেলা বাজারে চলে গিয়েছিল। দু'হাতে থলি ভরে মাছ, মাংস, তরিতরকারি নিয়ে এসেছে। মেজ্‌দি বারান্দার এক কোণে বঁটি নিয়ে বসে আনাজ কুটছে। বৌদি মহা ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার রান্নাঘর একবার শোবার ঘর, একবার বারান্দা। আর মাঝে মাঝেই তর্ক হচ্ছে সেজদার সঙ্গে।

সেজদা বলছে, আজ কিন্তু মাংসটা আমি রাঁধব। অপু অনেকদিন বাদে এসেছে, ভালমন্দ খেয়ে বাঁচবে।

বৌদি মুচকি হেসে জবাব দিল, শুধু তোমার বোন খেলে আমি কিছু বলতাম না, দাদা রেঁধেছে শুনলে পোড়া মাংসও অমৃত বলে চেটে খেত, কিন্তু বাইরের লোক যখন ডেকেছ, তখন বাড়ীর মান আমায় রাখতে হবে তো।

সেজদা আমাকে বলল, শোন অপু, তোর বৌদির কথাটা শোন। বাপের বাড়ীতে হেঁসেলে কখনও মাংস ঢুকত না, আমি হাতে ধরে রান্না শেখালাম, আর এখন—

—তুমি আমায় রান্না শিখিয়েছো? বলে ছোটবেলা থেকে আমার হাতের রান্না খাবার জন্যে পাঁচবাড়ী থেকে লোক আসত, চপ, কাটলেট, ফ্রাই, কি না করতে পারি। জোগান দেবার তেমন লোক পেলে চল্লিশ-পঞ্চাশজনকে একলা রেঁধে খাইয়ে দেব। দেখতে চাও তো বল।

—মোটেও চাই না। এই বাজারে তোমার রান্নার মহিমা দেখাতে গিয়ে যদি অতগুলো লোক খাওয়াতে হয় তো আমি ফতুর হয়ে যাব।

সবাই হাসলাম। কতদিন এরকম সবাই মিলে প্রাণখুলে হাসিনি। বেচারী সেজদা, বিশেষ করে আমার জন্যে বৌদির সঙ্গে তার সম্পর্কটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বৌদি সেদিন আমাকে একটা কাজও করতে দিল না। সেজদার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে বসে গল্প করলাম, পাপিয়ার আজ উপরে নিমন্ত্রণ। ভাল ফ্রক পরে চুলে রিবন বেঁধে সাতসকালে উপরে এসে হাজির হয়েছে, তাকে নিয়ে ভোম্বল আর দম্বল ক্যারামের জোর আসর বসিয়েছে সিঁড়ির ঘরে। মাঝে মাঝে তাদের দমকা হাসি আর ঝগড়া-ঝাঁটির টুকরো কথা হাওয়ায় ভেসে আসছে।

সেজদা বলল, মাঝে মাঝে বুড়ীকে বলে ছুটি নিয়ে পালিয়ে আসবি, এরকম ছুটিছাটার দিন দেখে, বেশ হৈ হৈ করা যাবে।

মেজদি বলল, সত্যি অপু, তুই চলে যাবার পর বুঝতে পারছি কিরকম আমরা একলা হয়ে পড়ি। আমাকে বাড়ীতে একলা রেখে সেজদা-বৌদি বেরতে চায় না, আবার ওদের সঙ্গে ঘুরতে বেরবার মত শরীরও তো আমার ঠিক থাকে না।

বললাম, ছুটি আমি পাব। আসব মাঝে মাঝে। এবার এসে আমার এত ভাল লেগেছে, কথাটা বলতে গিয়ে কেন জানি না আমার চোখে জল এল। আমি থেমে গেলাম। সেজদা আড়চোখে এক-বার আমার দিকে তাকাল, একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। আশা করি এবার থেকে এমনি আনন্দের মধ্যেই আমাদের দিন কাটবে।

মেজদি বলল, সেজদা, অপুর কাছে আমরাও একদিন বেড়াতে যাব। গঙ্গার ধারে চমৎকার জায়গায় থাকে।

সাগ্রহে বললাম, এ মাসের মধ্যেই আমি ব্যবস্থা করছি। শুধু যাওয়া নয়, এক রাত্তির থাকতেও হবে।

বারটার আগেই গগন সেন এল। ধুতি পরে আজ তাকে প্রথম দেখলাম, পরনে খদ্দরের রঙ্গীন পাঞ্জাবি, কাঁধে একটা ক্যামেরা ঝুলছে। হাতে একটা বেতের বড় বাক্স।

সেজদা বলল, হাতে বাক্স কেন? এখান থেকে আর কোথাও যাবেন বুঝি?

গগন সেন উত্তর দিল, এগুলো এখানকার জন্যেই এনেছি, বলেই বাক্সের ডালাটা সে খুলে ফেলে, দোকান থেকে একরাশ খাবার কিনে এনেছে।

বৌদি দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, এ আপনার ভারি অন্যায়, বললেই হোত আমাদের রান্না আপনার পছন্দ হবে না।

গগন সেন স্বচ্ছন্দ হাসে, এগুলো তো আপনার জন্য এনেছি, শুনেছি যিনি রাঁধেন তিনি নিজের রান্না খেতে

ভালবাসেন না। এগুলো আপনার। আর আমরা খাব আপনার রান্না।

বৌদিও হেসে বলল, আমি কি রাক্ষসী, ঐ অত খাবার আমার জন্যে।

আজকের দুপুরটাও অনাবিল আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা গেলাম সিনেমায়। গগন সেন পকেটভর্তি টিকিট কেটে এনেছিল। পাপিয়া সমেত বাচ্চারাও গেল আমাদের সংগে। ইংরিজী ছবি জাহাজ-ডুবি হয়ে একদল লোক অজানা দ্বীপে গিয়ে উঠেছিল, সেখানে কিভাবে তারা সংসার পেতে বসল তারই এক গল্প কথা। আজগুবি হলেও দেখতে বেশ ভাল লাগছিল, ভাল লাগছিল সকলকে নিয়ে একসংগে আসতে পেরেছি বলে। এরই মধ্যে এক ফাঁকে গগন সেনকে একলা পেয়ে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি কার্পণ্য করিনি। ফিসফিস করে বলেছিলাম, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সত্যি বলছি এতদিনের কল-কাতা-জীবনে এরকম প্রাণভরা আনন্দ আমি কখনও পাইনি। তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছো।

গগন সেন নিষ্কম্প কণ্ঠে উত্তর দিয়েছে, এ সবই তো তোমার জন্যে।

সসঙ্কোচে প্রশ্ন করেছি, আমার বাড়ীর লোকজনদের কেমন লাগল ?

গগন সেন ঘুরিয়ে কথা বলল, কেন, তা' কি তুমি বুঝতে পারছ না? যাদের তুমি ভালবাস আমিও তাদের নিশ্চয় ভালবাসতে পারব।

অন্যমনস্ক গলায় বলেছিলাম, কাল আবার কাজে ফিরে যেতে হবে।

—এবার একা নয়, আমিও সংগে যাব।

অন্যরা এসে পড়ায় আর কোন কথা হয়নি। সিনেমা দেখার পর আমরা ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরে এলাম। গগন সেন সেইখান থেকে বিদায় নিল।

সারা গাড়ী গগন সেনকে নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

বাচ্চারা বলেছে, ঐ বাবু আবার কবে আসবে? কি মজার গল্প বলতে পারে।

বৌদি বলেছে, ভদ্রলোকের ব্যবহার বড় চমৎকার, বাইরের লোক বলে মনেই হয় না।

সেজদা বলেছে, গগন সেনকে আমার ভাল লেগেছে এইজন্যে কথা বললেই বোঝা যায় লোকটা পড়াশুনো করেছে প্রচুর। কিন্তু কোন সময় তা জাহির করার চেষ্টা করে না।

যে কোন মন্তব্য করেনি সে মেজদি। আমি ওর দিকে একবার ফিরে তাকিয়েছিলাম, দেখলাম গম্ভীর মুখে কী যেন ভাবছে।

রাত্রিবেলা মেজদির সঙ্গে আমার কথা হল। আলো নিভিয়ে দিয়ে শুতে যাচ্ছি মেজদি আমায় কাছে ডাকলো, ওর পাশে গিয়ে বসলাম। মেজদি আমার হাতটা টেনে নিয়ে মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করল, একটা কথার ঠিক জবাব দিবি অপু?

আমি বুঝতে পেরেছিলাম মেজদি কি জিজ্ঞেস করবে, বললাম, বল।

—তুই গগন সেনকে ভালবাসিস?

এ প্রশ্ন আমি নিজেকেও করিনি। এর উত্তর কি দেব ভেবে পেলাম না। চুপ করে রইলাম।

—ও তোকে খুব ভালবাসে। বিয়ের কোন কথা হয়েছে নাকি রে?

ছোট্ট উত্তর দিলাম, না।

মেজদি সাগ্রহে বলল, তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। ক'দিন বাঁচব, কে জানে। কিন্তু তোদের আমি সুখী দেখে যেতে চাই।

মেজদিকে জড়িয়ে ধরে বললাম, কি বাজে বকছ। দেখ না, তোমাকে আমরা একেবারে সারিয়ে তুলব। আজ তোমার ঘুরতে কষ্ট হয়েছে?

—নারে, খুব ভাল লেগেছে। তোদের দুজনকে দেখছিলাম, আর মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম ভগবান তোদের চার হাত যেন এক করে দেন। নিজের জন্যে তো আর ভাবি না, বাতি নেভার বেলা ঘনিয়ে এসেছে, তোর জন্যে বড় ভাবনা হয়। বেচারী! এখন সাধ-আহ্লাদ করার বয়েস, অথচ টাকা রোজগারের জন্যে খেটে মরছিস, সেও আমার জন্যে।

মেজদির গলা ভারি হয়ে এল, আমি সজল কণ্ঠে বললাম, কেন তুমি মিছি-মিছি এইসব কথা ভেবে মন খারাপ কর। আমার জীবনে তুমি যে কতখানি—

আর বলতে পারলাম না, আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে এল।

মেজদি সস্নেহে বলল, তা আমি জানিরে অপু, তোরই জন্যে এত কষ্ট সহ্য করেও আমি বাঁচতে চেয়েছি। এখন আর আমার কোন ভাবনা নেই। যদি মৃত্যু আসে আমি তাকে বরণ করে নিতে পারব, এই ভেবে যে তোকে দেখবার লোক তুই পেয়েছিস। ভগবান তোদের সুখী করুন।

বহুদিন বাদে অন্ধকার ঘরে বসে দুই বোনে আগের মত অঝোর ধারায় কাঁদলাম। কেন জানি না মেজদির কথা শুনে আমার মন আশঙ্কায় ভরে উঠল, মনে হল মেজদি ইচ্ছে করেই আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

।। এক ।।

ভারতীয় সভ্যতা জলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ও স্থলপথে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। উহারই চিহ্ন সেই সমস্ত অঞ্চলের দেশসমূহ সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া ভারতীয় কৃষ্টির মহিমার জয়গান করিতেছে। আমাদের দেশে কিন্তু আমাদের সভ্যতার অনেক কিছু কালের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে বা বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। সেই হারানো সভ্যতার বা কৃষ্টির সূত্র উদ্ধার করিয়া ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিতে হইলে বহির্ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন রহিয়াছে উহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই উদ্ধার কার্যে বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত আজীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফলেই আমরা আজ ভারতের অনেক অজ্ঞাত বা লুপ্ত ধারার খোঁজ পাইয়াছি, অনুসন্ধান কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা আজ এখানে ঐ পথিকৃৎ পণ্ডিতদের একজনের জীবনালেখ্য তাঁহারই জন্মশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে পাঠকদের গোচরে আনিব। তিনি মধ্য এশিয়ার মরুভূমির বালুকাগর্ভে ও অন্যান্য স্থানে ভারতীয় ইতিহাসের যে সমস্ত মূল্যবান রত্ন সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া লুক্কায়িত ছিল উহার অনেক কিছুর উদ্ধার করিয়া প্রাচীন ভারতীয় কীর্তির নিখুঁত আলেখ্য অংকনে নিযুক্ত

মার্ক অরেল স্টাইন

শিবদাস চৌধুরী

পণ্ডিতদের কার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। এই নীরব স্থিতধী পণ্ডিত হইলেন মার্ক অরেল স্টাইন। তিনি ভারতীয়দের দ্বিতীয় প্রাতঃস্মরণীয় হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত। প্রথম জন হইলেন আলেকজাণ্ডার স্যোমা ডি করোসি।

।। দুই ।।

হাঙ্গেরিয়ান একাডেমী অব্ সায়েন্সের প্রাসাদ হইতে কয়েক গজ দূরে বুডাপেস্টের ছোট্ট টুকর স্ট্রীটের ধারে এক কৃষ্টিবান বণিকের ঘরে ১৮৬২ সালের ২৬শে নভেম্বর স্টাইন-এর জন্ম। পিতা নাথেন স্টাইন ও মাতা আন্না্র তৃতীয় সন্তান তিনি। পিতার বার্ধক্য হেতু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্ণস্ট এড্রয়ার্ড ও মাতুলের উপরে তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার ভার পড়ে। শৈশবেই তিনি হাঙ্গেরিয়ান ও জার্মান ভাষাতে কথা বলিতে পারিতেন। ড্রেসডেনের স্কুলে যখন ভর্তি হন তখন তাঁহার বয়স দশ। সেখানে গ্রীক, ল্যাটীন, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেন। এই স্কুলে পড়িবার সময়েই আলেকজাণ্ডারের সামরিক অভিযানের কাহিনী পাঠ করিয়া প্রাচ্যদেশের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুসন্ধিৎসা জাগরিত হয়। এতদ্ব্যতীত যৌবনে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক আর্মেনিয়স ভেম্বারীর মধ্য এশিয়ার ভ্রমণ কাহিনী তাঁহার মনে রেখাপাত করে। এই সময়ে প্রখ্যাত তিব্বতী-বিশেষজ্ঞ স্যোমা ডি করোসির কীর্তি কাহিনীর সাথেও পরিচিত হন। এই সমস্তের মিলিত প্রভাবে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থার ক্ষেত্র অজ্ঞাতে প্রস্তুত হইতে থাকে। বুডাপেস্টে উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে পাঠ শেষ করিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন (১৮৭৯)। লাইপৎসিন্ বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি ছাত্র ছিলেন। টুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় তখন ভারততত্ত্ব ও ইরানী বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান ছিল। জ্ঞানপিপাসু স্টাইন গেলেন টুবিনজেনে। সেখানে বেদ ও আবেস্তার প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক রুডলফ্ ফন্ রথের সংস্পর্শে আসেন। রথ তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। ইহার পরে হাঙ্গেরী সরকারের বৃত্তি লইয়া ইরানী ভাষাতত্ত্বের উপরে গবেষণা করিবার জন্য ইংলণ্ডে যান (১৮৮৪—৮৫)। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও লণ্ডনে তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল। সেখানে কার্য সমাপ্ত করিয়া বুডাপেস্টে ফিরিয়া আসিয়া স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদান করেন (১৮৮৬)। লুডোভিচাতে ভৌগলিক তত্ত্ব আয়ত্ত করেন। জরিপের কার্যও শিক্ষা করেন।

১৮৮৬ সনে ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত সপ্তম আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে অরেলের বহু জ্ঞানীগুণীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের গভীরতার জন্য সমকালীন প্রাচ্যবিদ্‌দের নিকটে তিনি সমাদৃত হন।১

লণ্ডনে থাকাকালে তিনি লর্ড রিয়ে, স্যার হেনরী ইয়ুল ও স্যার হেনরী রলিনসনের সংস্পর্শে আসেন। রলিনসন তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার চেষ্টাতে তিনি ভারতে চাকুরি পান। রলিনসন ও রিনহল্ডরোস্টের আশীর্বাদ লইয়া ২২শে সেপ্টেম্বর ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

।। তিন ।।

অরেল ১৮৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরের ওরিয়েন্টেল কলেজের অধ্যক্ষপদে যোগদান করেন; পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারও তিনি ছিলেন। নূতন পরিবেশে তিনি প্রথমে অস্বস্তি বোধ করিতেন। তাই কলেজের কাজ ফুরাইলেই ভাষাতত্ত্ব ও ভৌগোলিক তত্ত্ব অনুসন্ধানে ডুবিয়া থাকিতেন। সহমনের সহযাত্রী না পাওয়াতে অবসর বিনোদনে অবসাদ আসিত। তাই কলেজের গ্রীষ্মাবকাশে কাশ্মীরে চলিয়া যাইতেন। ১৮৮৯ সালে শরৎকালে প্রথম কাশ্মীরে যান। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁহাকে মোহিত করে। লাহোরের ক্লান্ত মনকে সবুজ ও সতেজ করে। সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন কাশ্মীরের ইতিহাস তাঁহাকে আকর্ষণ করে। এখানে তাঁহার সহচরদের মধ্যে গোবিন্দ কাউল ছিলেন প্রিয়তম। অক্টোবরের প্রথমদিকে শ্রীনগর হইতে বিদায় লইলেন। ইহার পরে যখনই সুযোগ আসিত তিনি তাঁহার প্রিয় শৈলনগরীতে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থের বেশীর ভাগই এখানে বসিয়া লেখা। সমুদ্র হইতে ১১০০০ ফুট ঊর্ধ্বে তাঁহার প্রিয় কুটীর মোহনমার্গ ছিল। প্রকৃতির বুকে শান্ত নীড়ে নীরবতার রাজ্যে তিনি নিজেকে খুঁজিয়া পাইতেন।

১৮৯২ সালে প্রিয়সহচর গোবিন্দ কাউলের সহযোগিতায় কহলনের রাজ-তরঙ্গিণী নামক ইতিহাসের একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তারপর তিনি কাশ্মীরের ইতিহাস, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব, লোককথা বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। আট বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনার পরে কহ্লনের গ্রন্থের ইংরাজী তর্জমা ও বিস্তৃত ভূমিকা প্রকাশিত হয় (১৯০০)। জীবনসায়াহ্নে তিনি এই পুস্তকের নবীন সংস্করণের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ১৮৯১ সালে কলি-কাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি কাশ্মীরের ভূগোল বিষয়ে তাঁহার প্রকরণগ্রন্থ প্রকাশ করে।

ইতিমধ্যে লাহোরের অবস্থার পরি-বর্তন হইয়া গিয়াছে। ঐ সময়ে সেখানে কয়েকজন গুণী ও সুধীজনের সমাবেশ হইল। স্টাইনের নিঃসঙ্গতা-বোধ দূরে হইল। লাহোর আকর্ষণীয় হইয়া উঠিল। রুডিয়ার্ডের পিতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ লকউড কিপলিং তখন সপরিবারে লাহোরে থাকিতেন। তিনি এই পরিবারের আপনজন হইয়া উঠিলেন। অক্সফোর্ডের পূর্ব পরিচিত (১৮৮৬) স্যার এডুয়ার্ড ম্যাকল্যাগনের সাথেও এখানে দেখা। লায়োনেল চার্লস ডানষ্টারভিলের (১৮৬৫—১৯৪৬) সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। রসরাজ পার্সী স্টাফোর্ড আলান (১৮৬৯—১৯৩৩) লাহোর সরকারী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া আসেন (১৮৯৭)। আলীগড় হইতে ঐশ্লামিক শাস্ত্রজ্ঞ সাধু স্যার টমাস ওয়াকার আর্নল্ড (১৮৬৪—১৯৩০) লাহোরে দর্শনের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন (১৮৯৮)। শেষোক্ত দুইজন ও তিনি মেয়ো লজে বাস করিতেন। এই গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন আর্ট স্কুলের ডিরেক্টর জে এইচ এন্ড্রুজ, পরবর্তীকালে তিনি তাঁহার গবেষণা কার্যে সহযোগিতা করেন। এই বন্ধুমহল তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন ও কর্মধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ভারতে আসিয়া ভাষাতাত্ত্বিক স্টাইন ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৯৭ সালে হাঙ্গেরীর একাডেমী অব সায়েন্সে এক বক্তৃতা দেন।২ পুরাতত্ত্ব তাঁহার মনকে এত আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে ১৮৯৮ সালে কাশ্মীরের দুর্গম অঞ্চল বুনারে প্রেরিত এক সমর অভিযাত্রীদলের সহিত যোগদান করেন। সেখানে তিনি পুরাতত্ত্বের নিদর্শন ও আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান বিষয়ে অনুসন্ধান করেন।

এবার তাঁহার কর্মক্ষেত্র পশ্চিম ভারত হইতে পূর্ব ভারতে স্থানান্তরিত হইল। কলিকাতার মাদ্রাসার তিনি অধ্যক্ষ হইলেন (১৮৯৯)। এই কাজ তাঁহার মনঃপূত ছিল না। এই সময়ে গয়া ও হাজারীবাগে পুরাতত্ত্ব নিদর্শন পরীক্ষা করেন। হিউএন সাঙ বর্ণিত বহুস্থান চিহ্নিত করেন ও পূর্ব নির্ধারিত বহু-স্থানের ভুল সংশোধন করেন। মধ্য এশিয়াতে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের যে অভিযান করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইবার সম্ভাবনা শীঘ্রই দেখা দিল।

।। চার ।।

খৃঃ ৫ম—৬ষ্ঠ শতকে মধ্য এশিয়া তুর্কী বা তুরস্কজাতির অধিকারে যায়। সেই হইতেই এইস্থানের নাম হইয়াছে প্রাচ্য তুর্কীস্থান। ইহার পশ্চিম ও উত্তর সীমানাতে থিয়েনশান পর্বতমালা, পশ্চিমে পামির ও কারাকোরাম আর দক্ষিণে কুন্‌-লুন্‌ পর্বতশ্রেণী; পূর্ব-দিকে চীনের সীমান্তবর্তী পর্বতমালা। মধ্যখানে গোবি মরুভূমি। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়াই আন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যের পথ চলিয়া গিয়াছিল। ফলে এখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটিয়াছিল। এই মিলন কেন্দ্রে দখিনা কৃষ্টিরও ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। এই কথা রুডল্‌ফ হরনুলে সর্বপ্রথমে আমাদের বলেন। কুচ ও খোটানের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনুমানিক ১৫০০ বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ভারতের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ইহার কৃতীত্ব—বাওয়ার, ম্যাকার্টনী, পেট্রোভস্কি, দুত্রোল দ্য রীন প্রমুখ পণ্ডিতদের।

১৮৯৮ সালে রাশিয়ার ক্লেমেঞ্জ তুরফানে মূল্যবান ঐতিহাসিক দ্রব্য আবিষ্কার করেন। এই সময়ে স্টাইন তারিম নদীর অববাহিকাতে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালাইবার জন্য এক যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব বিশেষজ্ঞদের গোচরীভূত করেন। ভারতে তখন রাষ্ট্রপ্রধান লর্ড কার্জন। তিনি স্টাইনের পরিকল্পনা সর্বান্তঃ-করণে সমর্থন করিলেন। বহুপ্রত্যাশিত যাত্রা এবার শুরু হইল।

।। পাঁচ ।।

১৯০০ সালের ২৫শে মে অভিযাত্রী দল কাশ্মীর হইতে তুর্কীস্থান অভি-মুখে রওনা হয়। এই দল লডাক এবং হুনজা হইয়া পামীর অতিক্রম করিয়া খাশগড় পৌঁছায়। সেখান হইতে খোটান; তারপরে তাকলামাকান মরু-ভূমির দক্ষিণ পার ধরিয়া ১৯০১ সনে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই দল দন্দন-ঐলিক, কেরিয়া, এন্দেরে প্রভৃতি স্থানে ভারত, চীন ও গ্রীকের সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত বহু দ্রব্যসামগ্রী পাইলেন। আর পাইলেন বাঁশপাতা ও কাঠে খোদাই পুঁথি। তিব্বতী বৌদ্ধ পুঁথিও এন্দেরে আবিষ্কৃত হয়। এই প্রথম অভিযানের কাহিনী তাঁহারই রচিত দুইটি বিরাট পুস্তকে পাওয়া যাইবে। প্রথমখানি৩ সাধারণ পাঠকের জন্য ও দ্বিতীয়খানি৪ বিদগ্ধ সমাজের জন্য রচনা করেন। অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ব্রিটিশ মিউজিয়মের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত কার্যে নিযুক্ত হন।

১৯০৪ সনে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ও বেলুচিস্থানের পুরাতত্ত্ব সমীক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করেন। এতদিনে মনের মতন কাজ

---

(১) ১৮৮৭ সালে Oriental and Babylonion নামক কাগজে তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ Zoroastrian: deities on Indo-Scythian coins প্রকাশিত হয়।

(2) White Huns and Kindered tribes of India.

(3) Sand buried ruins of Khotan (1903)

(4) Ancient Khotan ২ খণ্ড (1907) Archaeological exploration in Chinese Turkistan (1901)

পাইলেন। এ সময়ে ভারত সরকারের মানচিত্র অংকনের দায়িত্বও তাঁহার উপরে ন্যস্ত ছিল। প্রশাসনিক কাজের চাপে তাঁহার প্রিয়কার্যে ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। স্টাইনের প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের সাফল্য সত্ত্বেও তাঁহার আকাঙ্খিত দ্বিতীয় অভিযানের বন্দোবস্ত করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও জার্মান অভিযাত্রী দল৫ তারিম নদীর অববাহিকাতে পুরাতত্ত্বের অন্বেষণে অবতীর্ণ হইলেন। স্টাইন ইহাতে দমিবার পাত্র নহেন। তিনি কৌশলী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সরকার তাঁহার পরিকল্পনা অনুমোদন করিলেন। ভারত সরকার ও ব্রিটিশ মিউজিয়মের অর্থানুকুল্যে দ্বিতীয় অভিযানের প্রস্তুতি চলে।

দ্বিতীয় অভিযান ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আরম্ভ হইয়া ১৯০৮ সালে জানুয়ারী মাসে শেষ হয়। এই অভিযানে তিনি খোটান হইতে আরম্ভ করিয়া তাকলামাকান মরুর মধ্য দিয়া চীনদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত নানাস্থানে অনুসন্ধান চালান। নিয়া, মিরান, ল্যু-লান, দোমোকো ও তুন-হুয়াংএ যে সমস্ত দলিল, চিত্র, বস্ত্র, গৃহস্থালীদ্রব্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল তাহাদের অনেকগুলি দুই হাজার বৎসরেরও বেশী পুরাতন। তুনহুয়াংএ সহস্র বুদ্ধের প্রাচীরচিত্র তাঁহাকে অভিভূত করে। তিনি লোক-চরিত্র বুঝিতেন। ওয়াংগ নামে এক ভিক্ষুকে হাত করিয়া মন্দিরের ভান্ডার কক্ষের দ্বার নয় শত বৎসর পরে খোলাইলেন। উন্মুক্ত ভান্ডারের দৃশ্য দেখিয়া তিনি আনন্দে আকুল হইলেন। মন্দিরের ভিতরে সহস্র সহস্র দুষ্প্রাপ্য পুঁথি—তিব্বতী, খোটানি, শক ইত্যাদি লিপিতে লেখা। মন্দির-সংস্কারের জন্য যে অর্থ তাঁহার নিকট ছিল তাহা দ্বারা কতকগুলি পুঁথি ক্রয় করেন। ঐ অঞ্চলে খোটান হইতে আরম্ভ করিয়া লাদক পর্যন্ত প্রাচীন যুগের পণ্যবাহী সওদাগরদিগের পায়ে-হাঁটা রাস্তা তিনি খুঁজিয়া বাহির করেন। এই পথ বাহির করিবার সময়ে তাঁহার ডাইন পায়ের অঙ্গুলীগুলি বরফে জখম হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে হয়। এই দ্বিতীয় অভিযানের বিবরণ Ruins of Desert Cathay এবং Serindia (৫ খণ্ড) নামক গ্রন্থদ্বয়ে সাধারণ পাঠক ও বিশেষজ্ঞদের জন্য যথাক্রমে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভারত সচিব যখন তাঁহার তৃতীয় অভিযানের পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন তখন তিনি অসুস্থ; এক পা খোঁড়া। এতৎসত্ত্বেও ১৯১৩ সনের জুলাই মাসে যাত্রা শুরু করেন। দারেল হইতে যাত্রা করিয়া মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষিয়া পূর্বদিকে খারা-খোটা পর্যন্ত যান।

'কান্-সু হইতে মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকে বরকুল, গুচেন ও জীমসা পরিদর্শন করেন ও প্রত্যাবর্তনের পথে ইদিকুৎ-সাহ্রী, ল্যু-লান, কুচা, অক্ষু ও অন্যান্য প্রদেশে প্রাচীন স্থানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া চিহ্নিত করেন। ১৯১৫ সনে কাশগড় পরিত্যাগ করিয়া অক্সাস নদীর উত্তর দিকে শৈল-শ্রেণীর মধ্যেও তাহার অনুসন্ধান চালান ও সমরকন্দ, খোরাশান ও সিস্তান হইয়া ১৯১৬ সালে মার্চ মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন' (প্রবোধচন্দ্র বাগচী)। এই বার আবিষ্কারের মধ্যে ছিল সিল্ক ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের পথ, মার্কো-পোলোর চীনে যাওয়ার রাস্তা। এই অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়।৬ তাঁহার এই তিন অভিযানের তথ্যাদি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছে যে পাশ্চাত্য, ইরানীয়, চৈনিক ও ভারতীয় সভ্যতার মিলন কেন্দ্র ছিল এই মধ্য এশিয়াতে। এই হাটেই বিভিন্ন সভ্যতার আদান প্রদান চলিত। ১৯২৯ সালে বোস্টনের লাউয়েল ইনস্টিটিউটের আমন্ত্রণে এই তিনটি অভিযানের বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে ১৯০৩ সনে প্রকাশিত হয়।৭

তাঁহার অভিযান এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। অনুসন্ধিৎসু মন আরও অজানার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ব্যাকুল হইল। শারীরিক অসুস্থতা, বার্ধক্য ও দুর্গম পথ তাঁহার যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিল না। পরবর্তীকালের অভিযান তিনটি উদ্দেশ্য নিয়া পরিচালিত হইয়াছিল। প্রথমটিতে উদ্দেশ্য ছিল উত্তর ভারতের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও পুরাতাত্ত্বিক কতকগুলি জটিল গ্রন্থির উন্মোচন করা। দ্বিতীয়টি ভারত-চীন সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্র সন্ধান। তৃতীয় উদ্দেশ্য হইল ভারত ও এশিয়ার (বিশেষতঃ মেসোপটেমিয়ার) মধ্যে যে যোগসূত্র প্রাচীনকালে ছিল তাহার নিদর্শন সন্ধান করা। ১৯২৬-১৯৪১ সাল পর্যন্ত যে কয়েকটি পুরাতত্ত্বের অভিযান বেলুচিস্থানে, দক্ষিণ ও পশ্চিম ইরানে, ইরাকে এবং সিরিয়াতে তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত হয় তাহা ব্রিটিশ মিউজিয়ম, হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়, ইরাকের ব্রিটিশ স্কুল অব আর্কলোজি, ইরান ও অন্যান্য সরকারের অর্থানুকুল্যে সম্ভব হইয়াছিল। এই অভিযানের বিবরণ দুইখানি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।৮

১৯৩০ সালে চতুর্থবারের জন্য মধ্য এশিয়া অনুসন্ধানে বাহির হন—গম্য-

(৫) অধ্যাপক গ্রুণডেভেল দুইবার ও ডঃ এ, ফন লে কক্ একবার জার্মানী হইতে এবং অধ্যাপক পল পেলিও ফ্রান্স হইতে একবার মধ্য এশিয়া হইতে বহু প্রাচীন পুঁথি, ভাস্কর্য, চিত্রকলার নিদর্শন সংগ্রহ করেন।

(6) Innermost Asia., 4 vols.
(7) On ancient Central Asian tracks.

(8) Archaeological reconnaissances in N.W. India and S.W. Iran.

স্থান আন্তর্মঙ্গোলিয়া ও সিনচিয়াঙ্গ। সে সময়ে Hardt—Citron মিশন মধ্য এশিয়ায় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। দশ মাস কাজ করিবার পরে কোন কারণ না দেখাইয়া চীন সরকার তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না, ইহাতে তিনি অত্যধিক মনোবেদনা পাইলেন।৯ কিন্তু দমিবার পাত্র তিনি নহেন। স্বভাব-চতুর, কার্যক্ষম ও কুশলী স্টাইন অন্য রাস্তা ধরিয়া তাকলামাকানের চতুর্দিকে ২০০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া অনেক তথ্য ও নিদর্শন দ্রব্য সংগ্রহ করেন।

তাঁহার শেষ অভিযান পরিচালনা করেন জেড্রোসিয়াতে। ইহা ১৯৪৩ সনের জানুয়ারী হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত চলে।

।। ছয় ।।

এবার আমরা তাঁহার কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিব। তিনি ছিলেন স্বভাব-নম্র, চাপা অথচ সহৃদয়। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার জন্য তাঁহার স্মৃতিফলকে লেখা আছে 'a man greatly loved'। তিনি কেবল মানুষের প্রতি কোমলহৃদয় ছিলেন না, পশুপক্ষীর প্রতিও তাঁহার দয়া প্রকাশ পাইত। কি শীতে কি গ্রীষ্মে তাঁহার সাথী প্রাণীদের জন্য যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করিতেন। প্রকৃতি তাঁহার প্রিয়তম ছিল। সুন্দর ফুলও।

তিনি বেঁটে ও প্রশস্তস্কন্ধ ছিলেন। আর ছিল লোহসদৃশ শরীর। অসীম ধৈর্য, অফুরন্ত মানসিক ও দৈহিক শক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন। একবার উত্তপ্ত মরুভূমির বালুকারাশির উপর দিয়া ক্লান্তিদায়ক অবিরাম ৩৬ মাইল পদযাত্রার বিরতির পরে যখন বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটান হইল—তখন তিনি পথে প্রাপ্ত সংগৃহীত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িলেন। তাহার পরে প্রিয় এক বন্ধুকে সেইদিনের সমস্ত কথা লিখিয়া এক দীর্ঘ পত্র রচনা করিবার পরে বিশ্রাম করিতে গেলেন। রাত্রে ঘুমাইতেনও কম। আর একবার একজন পাঠান সৈন্যকে তাঁহার এক অভিযানে দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। অভিযান শেষে সৈন্যটি ক্যাম্পে ফিরিয়া গিয়া যাহা বলে তাহা কৌতূহলোদ্দীপক। সে বলে "স্টাইন সাহেব মানুষ নহেন। তিনি অতিমানব। তাঁহার সহিত পাহাড়ী দুর্গম রাস্তাতেও হাঁটিয়া উঠা কঠিন। আমাকে আর তাঁহার সাথে পাঠাইবেন না।" স্টাইনের বয়স তখন ৬০ এর উর্ধ্বে।

তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি একই পথে বিশেষ প্রয়োজন না হইলে দ্বিতীয়বার যাইতেন না। ফলে নূতন পথের নূতন তথ্যের বহু সন্ধান পাইয়াছেন। প্রত্যেকটি অভিযানের পূর্বে নিজে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেন। ইহার খুটিনাটি বিষয়টি পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। অল্প শ্রমে, অল্প অর্থে ও স্বল্পসময়ে নির্দিষ্ট কার্য সমাধা করিতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন; সাফল্যও লাভ করিতেন। একদিকে তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যাশ্চর্য অন্যদিকে ভাষাতত্ত্বে তাঁহার ছিল অদ্ভুত দখল। তিনি যেসমস্ত অঞ্চলে গিয়াছেন সেখানকার স্থানীয় ভাষাতে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ফলে স্থানীয় লোক তাঁহাকে খুব ভালবাসিত ও তাহাদের জ্ঞাত তথ্য দিয়া ও অন্যান্যভাবে তাঁহাকে সর্বদাই সাহায্য করিত। একমাত্র আরবী ভাষাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তিনি যে সমস্ত অঞ্চলে যাইতেন সেখানকার স্থানীয় অল্পভাষিত ভাষার শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রখ্যাত ভাষা-তত্ত্ববিদ্ জর্জ গ্রিয়ার্সনকে পাঠাইয়া দিতেন। অল্পখ্যাত লোকদিগের (যেমন পাখনো) সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক তথ্যও সংগ্রহ করিতেন—আর সংগ্রহ করিতেন ভৌগোলিক বৃত্তান্ত।

তিনি তাঁহার দীর্ঘ যাত্রাপথে শীতে গ্রীষ্মে মরুকান্তারে, বরফাচ্ছাদিত পর্বত শিখরে বহু দুঃখকষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সমস্তই তিনি সানন্দে বরণ করিয়া সহকর্মীদের অন্তরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগাইয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইয়াছেন ও জয়মাল্য লাভ করিয়াছেন। এই সাফল্যের কারণ এমিল সেনার্টের ভাষাতে 'he knows what he was looking for'। ১৯০৮ সনে ২০,০০০ ফুট উর্ধ্বে তাঁহার পা একবার গুরুতররূপে জখম হয়। ১৯১৪ সনে সুউচ্চ নানসান পর্বতে তাঁহার অশ্ব পিছনে উল্টাইয়া তাঁহার উপরে পড়ে; বাম উরুতে সাংঘাতিক আঘাত পান; ইহাতে কয়েক মাস চলাচল বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন। ১৯৩৩ সালে পারস্য উপ-সাগরে এক ঝঞ্ঝার মুখে পড়িয়া সৌভাগ্য-ক্রমে রক্ষা পান। ১৯৩৭ সালে তিনি তখন উত্তর-পশ্চিম ইরাণে; সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়াতে অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁহাকে ভিয়েনাতে পাঠান হয়।

অকালে তিনি মারা যান নাই সত্য। কিন্তু মৃত্যু যে তাঁহার শিয়রে এত শীঘ্র আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর কুড়িদিন পূর্বে তাঁহার প্রিয় বন্ধু সি, ওল্ডহামকে কাবুল যাত্রার কথা লিখিয়া এক চিঠি দেন। ১৯৪৩ সনের ১৩ অকটোবর তিনি লেখেন যে তিনি খুব কর্মক্ষম। তাঁহার চিঠিতে এই বৃদ্ধ-যুবকের জ্ঞান-পিপাসার চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

"I have had a wonderful life and it could not be concluded more happily than in Afghanistan which I wanted to visit for 60 years. It was the region in which I have spent so many happy years of my seminomadic life. It is indeed that border region which attracted me in my early boyhood, which led to the Sanskrit studies of my youth."

১৩ দিন পরের কথা। ২৬ অকটোবর অপরাহ্ণে কর্ণেলিয়স ভ্যান এইচ এনজার্টের বাড়ীতে অরেল স্টাইন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২৯শে কাবুলের খৃষ্টানদের কবরখানাতে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

---

(9) Old routes of Western Iran (1940).

উপসংহার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্রস্থান :

ধূ ধূ মাঠ তারা দুটিতে পেরিয়ে গেল। পায়ে পায়ে শুকনো খড়ের নাড়ী-ছেঁড়া ধ্বনি, শেষ শিশিরের স্খলিত কান্নার জল, হলুদ ঘাসের ধূসর হয়ে ওঠা, আয়ুহীন কীটেদের, টুকরো স্মৃতি-স্তম্ভ। কোন কথা না বলে তারা এগিয়ে গেল আরো গভীরে, দূরে মানুষের স্মৃতির দৃষ্টির অনুশোচনার সীমা ছাড়িয়ে। সেখানে মৃত নদী বাঁক নিয়েছে। সেখানে ভেজা বালিতে পাখিদের নরম পালক, নখের আঁচড়, কাঁকড়ার গর্ত, গুটিকয় মরা শামুকের ঝিনুকের খোল, দুজানুর মধ্যিখানে মাতাল স্রোতশায়ী ধারা, ...বালির শরীর থেকে নিঙড়ানো দৈবী চেতনার মৃদু প্রবাহে পাগলো ধুয়ে নিল। এরপর উঁচু পাড়। সে পাড় ভাঙে। ভেঙে ছিল। এখন ক্লান্ত, অবসরগত, নৈর্ব্যক্তিক। সেই খাড়া ধ্বংসসংকুল পাঁচিল তারা পেরোল হাঁটুতে চিবুক ঘষে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। এবং ওপরে দাঁড়িয়ে 'সুমুখে তাকাল। অপার গহন কাজল বিল। সূর্য সোনালী চিলের মতো ডুবল কোন অলৌকিক মাছের প্রতি ঠোঁট হেনে। তারা ঘন ফাঁড় ঘাসে পা ডুবিয়ে কিছু-দূর এগোল। সন্ধ্যার শ্লেটে আঁকা দুটি দূরগামী পথিকের মতো দেখাল।

কোন দিন ফিরবে না। কোনদিনও আর। পরম অভিমানে শরীরের নশ্বর আবরণ তাই খুলে ছুঁড়ে ফেলল। উলঙ্গ দুটি শিশুর মতো ঘাড় ধরাধরি করে এগিয়ে গেল ঈশ্বরের সন্ধানে। অসমাপ্ত অন্ধকারের প্রারম্ভে যেখানে প্রকৃতির নির্জন পথের শুরু, সেখানে পৌঁছে লীন হবার ইচ্ছায় অকুণ্ঠ পদ-ক্ষেপে তারা চলে গেল।

এবং পরদিন সকালে এক বুড়ো থুত্থুড়ে চাষা তার ঝুলেপড়া চোখের পাতার নীচে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে একটি যুবক ও যুবতীকে উলঙ্গ শরীরে পরস্পর সন্নিবিষ্ট শায়িত থাকতে দেখে। পুলিশ এসেছিল। কিংবা আসেনি। পরিশেষে গেঁয়ো লোকেরা—যারা শহর-সম্পর্কে কিছু প্রত্যাশা রাখত, হতাশ-ভাবে মাথা নেড়ে বলে, কোথাও কিছু আশা করার মতো নেই। সবকিছু বড্ড বাজে হয়ে যাচ্ছে।

আমার সাক্ষ্য :

ওরা আসছিল অনেক দূর থেকে। সবটুকু জানবার সুযোগ দেয়নি আমায়। ইলেমগঞ্জ বাস স্টেশনে নেমে শুধিয়ে-ছিল, শঙ্খিনী নদীটা কোথায় বলতে পারেন? বিল?

বললুম, শিকারে যাবেন বুঝি? বন্দুক খুঁজলুম। কারুর কাছে নেই। শরীর দুটো অবহেলায় ঢেকে রেখেছে মাত্র। পুরুষটির বড়ো বড়ো চুল কাঁধ-ছোঁওয়া, হাতগোটানো সাদা শার্ট, শার্টটা ধুলোয় ধূসর, পায়ে মোটা চামড়ার স্যান্ডেল ছিল কি না ছিল, আর জন মেয়ে, তার শাড়িটা ছিল ফিকে নীল, ব্লাউস ...সম্ভবত ঘন লাল, নাকি উদোম পা। পাখির মতো কলকল করে বলল, শহর থেকে আসছি।

বললুম, বিলে অনেক পাখি। বুনো হাঁস। এখন শীতের শেষ। এখন ওদের ঘরে ফেরার সময় প্রায় হয়ে এল। খালি হাতে ফিরবেন না, যান। একে-বারে সোজা এই পথ ধরে, কোন বাঁক নেই, বুঝলেন। আমার তো সঙ্গ দেবার উপায় নেই, দেখছেন তো সঙ্গে ইনি রয়েছেন—মানে আমার স্ত্রী, শহরে যাচ্ছি ...বরং ফেরার পথে যদি দেখা হয় শিকারের গল্প শোনা যাবে।

না, না। শিকারে নয়। পাখি আমরা মারি নে। ওদের মারতে নেই।

তবে?

শুধু যাওয়ার ইচ্ছে। দেখার ইচ্ছে। এমনি ইচ্ছে।

অবাক, আমি অবাক। কী দেখবেন ওখানে, কী আছে দেখবার? (এরা কি মানুষ, এরা কী মানুষ!)

হাসবেন না, দয়া করে।

না, না। বলুন।

ওখানে গেলে কেউ নাকি ফেরে না।

আশ্চর্য, চাষীরা প্রতিদিন যায় এবং ফেরে।

মাপ করবেন, আমরা চাষী নই।

ওদের ভাষা জানিনে মেনে চুপ করলুম। ওরা নরকে যাক। আমার কিছু আসে যায় না। বরং আমি বিব্রত রুমিকে নিয়ে। রুমির শরীর। রুমি এবং আমি, চারটি বাচ্চা। রুমিকে শহরে নিয়ে যাচ্ছি, মানে রুমির এক বান্ধবীর কাছে, যিনি সম্প্রতি ওখানে স্কুল বিভাগের এক সম্ভ্রান্ত কর্ত্রী, —না, না, আমার সঙ্গে কস্মিনকালেও পরিচয়াদি নেই। কেবল রুমি কীভাবে সংগ্রহ করেছে সংবাদটা, সত্যি বলতে কী, রুমি বড়ো প্রত্যাশিনী। আমি কী করিটরি বললেন? কিছু না। একসময় রাজনীতি করতুম। হে' হে' হে'—কেউ বিশ্বাস করে না সম্ভবত, নৈলে জীবনে চিরদিনই বেকার রয়ে গেলুম। আর, রুমি ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিল। আমি বরাবরই ওর মুখ-চেয়ে রয়েছি, লজ্জার কী আছে বলুন ...এমনি তো চলেছে অধুনা...তারপর সেই ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা রাঙা-মাটির ধুলো উড়িয়ে পথ চলতে থাকলেন। রুমি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। আমিও। কিন্তু হঠাৎ ...

আরে, আরে, কী অবাক, জানেন, আমিও কোন কোন অসংহত রাতে যখন জীবনকে বিষবৎ অনুভব করেছি, রুমির অস্বাস্থ্যে, আর্তনাদে, বাচ্চাদের ক্ষুৎকাতর আক্রমণে ...রুমি এবং আমি পরস্পরকে অবিশ্রান্ত ধিক্কারে ঘৃণায় লেহন করছি, 'খেতে না দিতে পারো, কেন বাচ্চাদের জন্ম দিতে...... ছি, ছি, আমার শরীরের রুগ্ন যৌবন মুহু-মুহু পরিতাপে স্বগত-দংশনে স্বেদ-ক্লিন্ন জর্জর, তবু প্রহারের উদ্যম, ঠিক সেইসব সময়ে শঙ্খিনী নদীর, বিলের কথা ভেবেছি। সেখানে অন্ধকারে জ্যোৎস্নায় বুনো হাঁসের ডানার অলৌকিক ধ্বনিপুঞ্জ, শঙ্খিনীর পাড় ধসে ধসে অমোঘ পতনের শব্দবিন্যাস সবই জীবিত এবং শাশ্বত, অপরূপ প্রতিভাস, ঈশ্বর তখনো ওখানে বেঁচে ...কোনদিন ফিরবো না সেই গহন চেতনার সীমা থেকে, আমি চলে যাবো একদিন, যাবোই, কারো কথা না ভেবে।

নিবিড় সংহত চোখে আমি ওদের চেয়ে চেয়ে দেখলাম। ওরা বাঁচুক, বাঁচুক। (কী আসে যায় কারুর!) চেঁচিয়ে বললুম, একটু শুনুন, ওখানে অনেক সাপ আছে কিন্তু। বিষধর। সন্ধ্যা। একটু পরে ঘন আঁধার নামবে। কৃষ্ণপক্ষ।

ওরা মৃদু হাসল ঘাড় ফিরিয়ে। তারপর চলে গেল।

শহরে পৌঁছতে সন্ধ্যা ঘন হল। তারপর আলোর উজ্জ্বলতাসমাকীর্ণ সেই প্রত্যাশিত শহরে ওর বান্ধবীর ঘরের দোরে কড়া নাড়ল রুমি। ভেতরে অনেক দূরের স্বর : ভেতরে আসুন। বাস, তারপরই আমি কাঠপুতুল। উনিও। একমুহূর্তের বেশী নয়। তারপরই শব্দ করে চেয়ারগুলো নড়ল। আমরা বসলুম।

আপনি? তীক্ষ্ম হারপুনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিঁধল শব্দটা।

হ্যাঁ, মানে রুমি আপনার কাছে ... আমার চোখ ওঁর সিঁদুরহীন সিঁথিতে কোন চিত্রকল্প খুঁজল।

ও আমার বন্ধু ছিল স্কুলে।

জানি। বাঃ তাহলে আমরা দুজনেই আপনার ইয়ে—

হ্যাঁ। ওঁর গাম্ভীর্য গমগম করে বাজছিল মসৃণ সরকারী দালানের শিলিঙে। কিছু কি হবে, কিছু কি পাবে রুমি? না, আমার জন্যে কিছু নেই। আমি চারটি বাচ্চায় জন্ম দিয়েছি। আমার শরীরে যদিও এখনো লক্ষ কোটি এ্যামিবা কোষবিভাজনে সম্প্রসারণে অযুত ভূমিকা গ্রহণে সদা উদ্যত, আর কী আছে এসব নিয়ে বৃথা ইচ্ছাবিস্তারে...আমি অকারণ হাসলুম। উনি এত নধর হয়ে গেছেন, ত্ব-ধরা, লালিত্য মাংসের ভাঁজে ভাঁজে, উজ্জ্বলতা পিচ্ছিল শৃঙ্খল ত্বকে, রীতি-মত শানিত দৃষ্টি, চশমার পাথুরে কাচে সংবদ্ধ নিষ্ঠুর দৃষ্টি—আমার হৃদপিন্ড স্মৃতির পীড়নে ধর্ষিত, এবং আশ্চর্য, একদিন কোন এক নির্জন রাতে ওঁর শরীরে আমার অপটু হাত ছিল, অনেকদিন আগে, আমি ভাবতে পারছি অবলীলায়, উনি কি জানেন, টের পাচ্ছেন না, নাকি স্মৃতি এত চতুর, ষড়যন্ত্রী! আমার হাতের নখের চিহ্নটা কোথায় লুকোলেন, বলুন, বলুন!

দুর্মর স্মৃতি :

রুমির সঙ্গে আমার বিয়ে হয় ৮ বছর আগে। বয়সের তফাত ছিল প্রায় চার বছরের। অর্থাৎ আমি সাতাশ, ও তেইশ। অথচ 'প্রেম'—নাকি প্রেমের পুতুল নিয়ে খেলা, ব্যাপারটা ঘটবার পেছনে এ ধরণের কী একটা ছিলই। রুমি পরে সবসময় ধরে এটুকু উল্লেখ করে আসছে। আমি প্রেমের জন্যে তৃষিত ছিলুম। কেন না সাতাশটি বছরের প্রথম চৌদ্দটি অস্ফুট সব চিত্রিত পাখির ডিম, আয়ার পালকে ঢাকা—পরের তেরটি পালকের নীচে ক্রমান্বয় ধ্বনি শুনে চমকে উঠছিল। এবং চমক বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা, তৃষ্ণা! গুটোন গুলিসুতো টেনে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। বাবা-মার মুখ আমি দেখিনি জন্মের পর। কাকা মানুষ করেছিলেন। আমি ভাবতুম, আকাশ থেকে স্খলিত হয়েছি, কোন নক্ষত্রের টুকরো। জ্বলতুম। জ্বালিয়ে মারতুম চারপাশের পৃথিবীকে। কাকা এই ভারসাম্যহীনতার হাত থেকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। আমি শেকল ছিঁড়েছি বারবার। রক্তে ক্ষতে যন্ত্রণায় জ্বলেছি পুড়েছি আর্তনাদ করেছি। কী চাই, কী পাইনে—খুঁজতুম। কী একটা শক্তি ছিল আমার নাভিমূলে, কুলকুন্ডলিনী, স্নায়ুতে ব্রহ্মরন্ধ্রে বিষজর্জর একটি আন্দোলন—আমায় সত্তাহীন করে তোলার ইচ্ছায় সে আছাড় মারতো। তৃষ্ণা—অন্ধ তৃষ্ণা। শরীরকে নিয়ে পথ করে তুললুম দুর্গম, পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত। এইটেই যেন চরম কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল দিনে দিনে।

আমার বাইশ বছর বয়সে আপনাকে দেখেছিলুম মিস নন্দিতা, স্মরণ করুন তো।

বহরমপুর কলেজ থেকে সদ্য পাশ করে বেরিয়েছি। একটা উচ্চাশা ছিলই। অস্পষ্ট ও দুরধিগম্য। তাই পথ খুঁজ-ছিলুম। রাজনীতির জটিল উদ্ভট একটা পথ পেয়েও গেলুম। এবং একদিন দুপুরের পর একটা উদ্‌ভ্রান্ত মিছিলে প্রথম আপনাকে দেখলুম। আপনার হাতে পতাকা ছিল। আমি আপনার হাত দেখলুম। ছোট্ট হাতের মুঠোয় নীল শিরা, পতাকার কর্কশ দন্ড, সবটা মোটামুটি হাস্যকর। আপনার শুকনো ঠোঁটের চারপাশের দৃঢ়তা,

চোখের ক্লান্তি ঢাকবার জন্যে দম বন্ধ করে জ্বালানো দৃষ্টির শিখা, ...যেন একটা কিছু ঘটবেই এবং সেই নীল শিরাগুলোর উদ্ধত সাজবার ভান, কী কুচ্ছিত দেখাচ্ছিল! ফিস ফিস করে বলার ইচ্ছে ছিল : 'হায়, আশাবাদিনী তরুণী' কিংবা 'গ্রীনরুমে গিয়ে আয়নায় দাঁড়াও।' বরং সেই আরেকটি মুটকি মতো মেয়ে, রাশভারী পয়মন্ত এক উকিলবাবুর কন্যা, যার গলার শিরাগুলো বন্দরের রশির মতো ইণ্ডিটাক ফুলে ছিল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদে' বড্ড মানিয়ে যাচ্ছিল। আপনি তো পাখির মতো মৃদুকণ্ঠি, গ্রামের বেণুবনে—মিষ্টি করে ভাবছিলুম, 'বেণুবন শীর্ষে দোলায়িতা দোয়েলা' (অশুদ্ধ?)—তখন আসন্ন বিকেলের ডিমের কুসুমগলা রোদে আপিস থেকে ছুটিপাওয়া লোকেরা হুড়মুড়িয়ে বেরুচ্ছে, দোকানদারেরা দুমদাম শব্দে দরজা-ঝাঁপ ফেলে দিল...শহরে বর্গীর হাঙ্গামা...আপনি চারপাশে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করলেন, এবং রিকসাওলারা অব্দি মিছিলে যোগ দিলে আপনার ঠোঁট দুটো বারবার কাঁপল, অসভ্যের মতো ভাবছিলুম, আপনি কি ঐ 'লারেলাপ্পা'গুলোর ঘামভেজা দুর্গন্ধ কপালে জয়টীকা আঁকবার সাধে একটি করে চুমু দেবেন, না, না, গোর্কীর 'মা'এর মতো আদৌ ভাবিনি আপনাকে।

ভাবুন, এই রুমিরও বয়স তখন সতের কিংবা আঠারো।

লজ্জা নেই বলতে, সেই সময় সেই মিছিলের অগ্নিগর্ভে বিধৃত থেকেই আপনাকে ভালবাসলুম। জেলাশাসকের বাড়ির সুমুখে সেপাইদের যুদ্ধ শেখবার ময়দানে মিছিলটা হাটু দুমড়ে বসল। আমার মাথাব্যথা করছিল। অদ্ভুত, এতবড়ো একটা গতিবান মহানদ হ্রদের মতো বুজকুড়ি তুলছে! দূর, এ আবার কী হল একটা, বলেও ফেললুম, কিস্সু হবে না!

আপনার কানটা নাকি তৈরী ছিল, রাজনীতির দক্ষ কামারেরা মানুষের হৃদয় অব্দি...(করে না মিস্ নন্দিতা?) ...যাক্ গে, আপনি বলে উঠলেন, কী বললেন? আবার বলুন।

আমি অপ্রস্তুত। না, কিছু না।

শুনেছি। কেন বললেন? পতাকাটা বেঁকে ছিল, সোজা করে ধরে ঘাসেঢাকা মাটির উপর ফণা তুললেন।

বিড়বিড় করে বললুম, আমরা কি আরো একটু এগোতে পারতুম না? আমার ইচ্ছে হচ্ছিল (এখনো হয়) কোথাও খানিক রক্তপাত হোক, আর্তনাদ, কলরব, ইতিহাসের ধাতব চাকা উল্টে যাওয়া প্রচন্ড ঝঞ্জনা, বিপ্লব—বিপ্লব শুরু হোক!

বিপ্লব ইচ্ছে করে ঘটানো যায় না। যেন সব টের পেয়ে গেছেন তৎক্ষণাৎ—এভাবে নিপুণ তার্কিকের মতো বললেন। বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুতি ও সময়ের মুখ চেয়ে থাকতে হয়। (হ্যাঁ নন্দিতা দেবী, সময়ের মুখ চেয়ে আমরা সারা জীবন বসে রয়েছি। কেউ এড়িয়ে নেই, কেউ!)

চুপ করে থাকলুম। হয়তো একটু ব্যঙ্গ ছিল আমার ঠোঁটের ফাঁকে হাসিতে ধরে রাখা।

আপনি বললেন, ওটা একটা অভিমান।

ছেলেমানুষী করে বললুম, পুরুষ হলে জনালাটা বুঝতেন।

তাই নাকি? আপনি হেসেছিলেন কিন্তু। আর, চারপাশে মুখগুলো আমাদের চেয়ে চেয়ে দেখছিল। কিছু বিদ্রূপ ছিল চারপাশে, কিছু বিরক্তি, সম্ভবত কিছু ঈর্ষা। আপনি হঠাৎ বললেন, কোথাও দেখেছি যেন আপনাকে।

কোথায় বলুন তো?

কলেজেই। কোন সভায়। ইউনিয়নের?

হবে।

আপনি কি [illegible] লেখেন?

হ্যাঁ! তাচ্ছিল্য ছিল আমার উচ্চারণে।

কলেজ ম্যাগাজিনে দেখেছি। কী যে সব লেখেন, বুঝিনে। কেন লেখেন... 'অবক্ষয়, যন্ত্রণা, বিপদ...একটা কবিতা অসংখ্য 'নীল' ছাড়া কিছু বুঝিনি।

তৎক্ষণাৎ গত সময়ের অসংখ্য দিন ও রাত ধরে যে সব টুকরো ইচ্ছেরা

আমায়, আমার শরীরকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, এই অপরিসীম অস্বাস্থ্যের থেকে মুক্তির একটা উজ্জ্বল এ্যাক-সিডেন্ট ঘটিয়ে দেবার জন্যে কণ্ঠস্বর দৃঢ় করে, কাতর করে, গভীর করে এবং সিক্ত করে বললুম, কিছু আশা করার মতো কোথাও কিছু নেই যে!

আপনার নিজের জন্যে?

নিশ্চয়। অন্যের কথা তো পরে আসে।

কিছুক্ষণ আমার মুখ দেখলেন। মাছের চোখের মতো চোখ। (আজ সেই চোখ আপনার নেই ম্যাডাম!) তারপর বললেন আশ্চর্য!

কেন, কেন? আমি পুলকিত।

আপনার মুখে টেররিস্ট যুবকদের আদল। ঐ যে—যাদের ভয়ানক একটা ইচ্ছে ছিল, স্পষ্ট বলতে পারছিনে, দেশ-প্রেমের ছদ্মবেশে একটা জটিল তাড়না, আমার মাপ করবেন, যেন নিজের অচিহ্নিত সত্তাকে চূর্ণ করে কোন বিশেষ চিহ্নে বেঁচে থাকার অভিমান...

বাঃ, বেশ চমৎকার বলতে পারেন তো আপনি!

আজকের কবিরা যেন তারাই—নতুন করে জন্ম নিচ্ছে।

অদ্ভুত!

কী?

আপনার ধারণা।

তারপর যখন দিনাবসানে কিছু পরিণতি লাভ করে মিছিলের স্তূপটা ভেঙে মিশিয়ে গেল ছড়িয়ে গেল পোকাদের মতো, ফাঁকা মাঠে দুজনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। গোটানো পতাকাটা হাতে নিয়ে আপনি সেই ছেলেটিকে খুঁজেছিলেন। পারলেন না। আমি বললুম, আর কী, চলুন। দুজনে হাঁটলুম পাশাপাশি। নিঃশব্দে। গঙ্গার কাছা-কাছি পৌঁছে হঠাৎ আপনি চমকে উঠলেন, আরে, কোথায় এলুম!

বললুম, বেশ তো। একটু হাওয়া গায়ে নিই। বাসরে, যে বিচ্ছিরি সময়টা গেল।

আপনি বললেন, বসবো? কিন্তু...

আহা, বসুন না। আপনার হাত ধরে টেনেছিলুম নন্দিতা দেবী, ও-হাতে সেদিন কোন ঘড়ি ছিল না। দুগাছি মিহি চুড়ি—কাচের। আপনি বালির ওপর বসলেন একটু দূরে। আমার আকর্ষণে আপনার চুড়িগুলো চামড়ায় বসে গিয়েছিল নাকি, হাত নাড়া দিয়ে ঠিক করে নিলেন। চুড়ির ধ্বনি শুনলুম। মনে হল, ওটা আমার মুক্তির সংকেত।

হ্যাঁ, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। সময় সব-কিছু হিম করে দেয়, আপনিও জানেন। তাই আমরা নিরন্তর ব্যস্ত। এবং প্রস্তুত। অথচ—

আপনার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হল পথে। নাকি একটা দোকানে। আমায় দেখে নেমে এলেন। হাতে আপনার প্ল্যাস্টিকের ঝুড়ি। কী ছিল তাতে, দেখার জন্যে আমি চোখ নত করেছিলুম। আপনি বললেন, কী দেখ-ছেন, জানি।

বলুন তো?

আমার মধ্যে সংসারীপনা কতটুকু।

ওতে কী লাভ আমার?

জানেন, হতাশাবাদীরা যতো অদ্ভুত সব আশা নিয়ে বাঁচে!

.................!!

আপনার বিপ্লবের খবর বলুন।

জোর করে আমার সংগুপ্ত সঙ্কল্প-গুলো যেন আদায় করে নেবেন, এমনি কণ্ঠস্বর ছিল আপনার। আমি বোকা সেজে বললুম, কী মুশকিল, আমায় কি পাগল ভাবেন?

দুষ্টুমি করে হাসলেন। আপনার সরু নাকে একফোঁটা ঘামে রোদ মণি হয়ে ছিল।

আমার মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

আপনার কি রাতে ঘুম হয় না ভালো?

কেন, কেন? আমি অবাক।

আপনার চোখদুটো ভয়ানক বসে যাচ্ছে। কেমন ঘরে শোন, মানে দেয়ালের রংটা কী, ঘরে কি আসবাবপত্তর ঠাসা, কিংবা ফাঁকা...একনাগাড়ে কলকণ্ঠে বলে চল-লেন। কিছু কি জানতে চাচ্ছিলেন?

নন্দিতা মুখার্জি, এর পর আর আত্মগোপনের প্রয়োজন ছিল না। অথচ আপনি আসলে একটি অস্তিত্বকে নিটোল করে পেতে চাচ্ছিলেন। তা কি হয়, হবে, বলুন তো, আজ আপনার জীবনে, অস্তিত্বে যদিও আপনার স্বাস্থ্যে ঐ ধরণের একটা সমারোহ, কিছু নিটোল করে পেলেন? আমি জানি, আমি জানি! আপনি রুমিকে নিয়ে মেতে রয়েছেন, জানিনে এর ফলে রুমির কতটুকু লাভ হবে শেষ অব্দি, আমি আপনাকে একটি কথা শুধোব: আপনি কী পেলেন, কতটুকু, শুধু সাবলীলতাই কি জীবনের পরমার্থের মাপকাঠি, বলুন, বলুন!

পরের একটি অক্ষয় রাতের কথা বলি। আমার ঘরে আপনি এসেছিলেন। প্রায় তাড়াখাওয়া হরিণের মতো বিপ্রস্তা। চুলগুলো ধ্বসেপড়া গম্বুজের মতো আপনার কাঁধে খোঁপাবন্ধ হয়ে স্খলিত। আপনার চোখ দুটি আরক্ত, ফুলো ফুলো। আপনি কোথাও অশেষ কান্নাকাটি করেছিলেন যেন। আমি সশব্যস্তে আপনাকে বসালুম। সব জানবার চেষ্টা করলুম। আপনি বল-লেন, বাবা গত রাতে আত্মহত্যা করে-ছেন।

কেন, কেন?

আপিসের ক্যাস ভেঙেছিলেন। যা হচ্ছে আজকাল। এসব কথা বলার সময় কিন্তু আপনার কণ্ঠস্বর অতি শান্ত ও সংযত ছিল। আমার কোন ভাই নেই। আমরা তিনটি বোন। মা। মা এ্যাজমায় ভুগছেন। বোনেরা বাচ্চা। সংসারের ভার কাঁধে পৌঁছল অশোকবাবু, পড়াশুনো রাজনীতি সব ঘুচল। আপনি ম্লান হাসলেন।

আর আমি অতর্কিতে আপনার হাতদুটো হাতের মুঠোয় চেপে গভীর আবেগে বললুম, ভয় কী, ভয় কেন নন্দিতা, আমি তো রয়েছি। আমার তো কোন দায় নেই।

তুমি কী করবে? তুমি শুনে আমার বুক কাঁপল।

কেন, আমি...আমি তোমায়—

বিয়ে করবে? (বলতে পারলেন মুখো-মুখি। রাজনীতির কর্মঠ কর্মকারেরা সত্যি অদ্ভুতকর্মা!) এবং তারপর অনেক সময় আমার ঘরে আমার এই শীর্ণ বাহুতে শরীর রেখে আপনি চুপটি করে বসে ছিলেন। আপনার ঠোঁটের ওপর দুটি দাঁত চাপ দিচ্ছিল। সম্ভবত একটি সিদ্ধান্ত খুঁজছিলেন। আশ্চর্য, অতদূরে এগিয়েও, আপনি সিদ্ধান্ত খুঁজলেন!

আমি কিন্তু আমার স্বভাবমতো একটি তীব্র পরিণতি চাইলুম। হোক

কেন?

আপনি প্রায় ধাক্কা দিয়ে আমায় সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখ বুজে ঢোক গিলে বললুম, তোমায় আমি বিয়ে করবই। পরিচিত মূর্তি হাসছিল মুখ টিপে। সে-মুখে পিতৃ-বিয়োগের শোক নেই। নির্লিপ্ত নিস্পৃহ মাছের চোখ দৃষ্টিতে। আমি আপনার হাত চেপে ধরলুম।

এক দৈব অপঘাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আপনি দ্রুত পালিয়ে গেলেন। রুগ্ন বাঘের মুখের শিকার

"বাবা গত রাতে আত্মহত্যা করেছেন"

তা বৈনাশিক। আপনার ঐ শরীরে ঝুঁকে পড়ে আমি আপনার পিচ্ছিল গালে ঠোঁট রাখলুম, আপনি বাধা দেননি। কেন বাধা দেন নি আমি জানিনে। যেন ঘুম থেকে জেগে বলে উঠলেন, এবার আসি।

না।

না।

কেন?

আমার ভয় করছে।

চলে গেলে যা ঘটতে থাকে। সে রক্তাক্ত অধ্যায়টা খুলে আর লাভ নেই। অনেকদিন পরে আপনার একটা ঠিকানা-বিহীন চিঠি পেয়েছিলুম। কলকাতা থেকে লিখেছেন। আমি এখানে। আপনি শুনলে ভয় পাবেন, ডাকটিকিটে পোস্ট-অফিসের নাম পেয়ে আমি আপনাকে অনেক খুঁজেছিলুম নন্দিতা দেবী, কল-কাতার ফুটপাত্ত আমার অনেক ইতিহাস ধারণ করেছে।

ওকি, আপনি উঠছেন? রুমির কী হল তবে? রুমির মুখে ও কিসের ছোপ।

উপসংহার ঃ

অশোক রুমির কাছে জানতে পারে সব কিছু এবং পরের গোটা দিনটি অসংলগ্ন চিন্তার তোড়ে খড়কুটোর মতো ভেসে থেকে অবশেষে গভীর রাতে নন্দিতা মুখার্জির ঘরে হানা দেয়। নন্দিতা ওকে দেখে অবাক হয়েছিল। অশোকের চেহারায় অবশ্যি ভয় পাবার মতো কিছু ছিল না। কিন্তু ওর হাতে নন্দিতার একটা ঠিকানাবিহীন চিঠি। অশোক তীব্রস্বরে স্ক্যান্ডালের ভয় দেখিয়ে—নন্দিতার একটি তুচ্ছ গূহ্য বিষয় নিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করার হিংস্র দুরভিসন্ধিতে, নন্দিতাকে রুমির চাকরীটা পাইয়ে দিতে চেয়েছিল। নন্দিতা প্রথমে সংযতভাবে ওর কথা শোনে মুখ বুজে। কিন্তু অশোকের উত্তরোত্তর রূঢ় আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে একসময় আত্মমর্যাদায় দৃঢ় হতে থাকে। নন্দিতা ওকে বেরিয়ে যেতে বলে। অশোক বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবং হঠাৎ অশোক হাঁটু দুমড়ে নন্দিতার হাঁটু লক্ষ্য করে হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রায় অপগন্ড শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করে। নন্দিতা আবার বিস্মিতা। তারপর সেও অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁদে ওঠে। বাইরের ছোট্ট ঘরটায় শুয়ে বুড়ি পরিচারিকা ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। মিলিত বয়স্ক নারী ও পুরুষের যুগপৎ তর্জন ও ক্রন্দনে রাতের গহন সময় হাহা হাসছিল। একসময় নন্দিতা তার অসহায় অবস্থাটা জানিয়ে দেয়। একটি মাত্র চাকরী—ওটা স্কুলবোর্ডের জনৈক সদস্যের আত্মীয়ার জন্যে সংরক্ষিত। সুতরাং..... ইত্যাদি। ইতি-মধ্যে বুড়ি পরিচারিকা সবটুকু টের পেয়েছিল। সে গুবরেপোকার মতো গড়িয়ে দরজায় কান পেতেছিল। তার ভাষণে জানা যায়, ওরা প্রত্যুষকাল অবধি নিরবধি পুলকে একই কক্ষে কালযাপন করে। পরবর্তী সংবাদ স্থানীয় সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়। 'স্থানীয় শিক্ষাবিভাগের জনৈকা পদস্থা ভদ্রমহিলা এবং এক অপরিচিত ব্যক্তি যুগলে ইলেমগঞ্জের নিকটবর্তী শঙ্খিনী নদীতীরস্থ বিশাল জলাভূমিতে আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় আত্মহত্যা করিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।'

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

অমৃত পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগের মারফৎ নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর পেলে বাধিত হব।

(১) বিলাতে যে 'হাউস অফ কমন্স' আছে তার কাজ কি?

শ্রীহরিসাধন চক্রবর্তী,
নিমতা, (উদয়পুর),
কলিকাতা—৪৯।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগে আমার প্রশ্নটির উত্তর পেলে বাধিত হব। এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাহিত্যে, সিনেমাশিল্পে ও খেলাধূলায় কোন কোন গুণীজনকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে।

কুন্দশ্রী চৌধুরী,
৬১, শোভাবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা—৫।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৩শে আগষ্ট অমৃত-এর 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত মৃদুলা নিয়োগীর প্রশ্নগুলির উত্তর জানাচ্ছি।

১নং প্রশ্নের উত্তর—বুধগ্রহের এক-দিকে চিরদিন এবং অপরদিকে চির-রাত্রি। চাঁদ পৃথিবীকে যেভাবে পাক দেয়, বুধ সেইভাবেই সূর্যকে পাক দেয়। অর্থাৎ সূর্যের দিকে বুধ সারাক্ষণ একটি মুখই ফিরিয়ে রাখে। তার কক্ষা-বর্তনের কাল (৮৮ দিন) অক্ষাবর্তনের সমান। তাই বুধের যে দিকটি সূর্যের দিকে সর্বদা ফেরানো সেখানে সবসময়ই দিন, অনন্ত গ্রীষ্ম। তেমনি আবার যে দিকটি সূর্যের দিক থেকে অন্যদিকে ফেরানো সেখানে শেষহীন রাত, অন্ত-হীন শীত।

২নং প্রশ্নের উত্তর—আমরা জানি বাদুড় রাতের ঘোর অন্ধকারেও অত্যন্ত কৌশলে আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। বাদুড়ের চোখ আদৌ আছে কিনা আমার জানা নেই। থাকলেও সেই চোখ রাতের অন্ধকারে কোন কাজেই আসে না। ওড়বার সময় এরা বিশেষ এক ধরণের শব্দ করে। ঐ শব্দের উৎস কারো মতে বাদুড়ের মুখ কারো মতে নাক। ঐ শব্দকে আবার সেই চার ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরণের গুঞ্জনধ্বনি যা এদের খুব কাছে না এলে শোনা যায় না। (২) এক ধরণের সাংকেতিক ধ্বনি যা সম্ভবত সংগী বাদুড়ের সংগে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহার করে। (৩) এক প্রকার ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ যা বাদুড় ওড়ার সময় শোনা যায়। (৪) এক প্রকার শব্দাতিগ ধ্বনি (Supersonic tone) যা মানুষের শ্রবণযোগ্য নয়। এই শব্দাতিগ ধ্বনি সম্মুখের বাধায় প্রতিফলিত হয়ে আবার বাদুড়ের কাছে ফিরে আসে। এবং এই প্রতিফলিত শব্দের সাহায্যেই এরা সম্মুখের বাধার অথবা শিকারের আকৃতি-প্রকৃতি, দূরত্ব ইত্যাদি সঠিকভাবে নির্ণয় করে। অতএব দেখা যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে নিরাপদে পাড়ি জমাবার জন্য এদের শ্রবণযন্ত্রই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শ্রীস্বপনকুমার বিশ্বাস,
কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, যাদবপুর,
কলিকাতা-৩২।

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৩শে আগষ্ট অমৃত পত্রিকার জানাতে পারেন বিভাগে শ্রীবিদ্যুৎ দাস সরমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে, বাংলা ভাষায় প্রথম সবাক চিত্র কণ্ঠহার এবং বাংলা ভাষায় প্রথম সিনেমা-পত্রিকা রূপমঞ্চ।

কিছুকাল আগে ভারতীয় ছায়া-ছবির আয়ু পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং তদুপলক্ষে বাংলা তথা ভারতীয় ছায়াছবির ইতিহাস সম্বন্ধে খানকতক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার পড়বার সুযোগ হয়। সে সব প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, প্রথম বাংলা সবাক-ছবি হচ্ছে—"জামাই ষষ্ঠি"। ছবিটি ম্যাডান কোম্পানীর দ্বারা তৈরি হয়ে ১৯৩১ সালের জুন মাসে মুক্তিলাভ করে।

শ্রীপ্রমথেশ ভট্টাচার্য,
৪৭নং বাপুজিনগর,
পোঃ ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগের শ্রীপতি গুহরায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি:

ভাষা কি—এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলতে গেলে মানুষের কণ্ঠোদ্-গীর্ণ সুনির্দিষ্ট অর্থবান ধ্বনি-সমষ্টিই ভাষা। একই ভাষাভাষী জনমণ্ডলীকে একটি ভাষা সম্প্রদায় বলা হয়। ভাষা সম্প্রদায় যদি বহুজন-ঘটিত ও বহু অঞ্চলে বিস্তৃত হয়, তবে তাতে বিভিন্ন উপভাষা থাকে। বহু-বিস্তৃত ভাষা সম্প্রদায়ে সকলে সকলের সংগে আলাপের সুযোগ পায় না বলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের ভাষায়ও উচ্চারণ ও শব্দ-ঘটিত বিশেষত্ব এসে উপভাষার সৃষ্টি করে। ভৌগোলিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ইত্যাদি কারণে যেমন ভাষা থেকে উপভাষার উদ্ভব হয়ে থাকে, তেমনি নানা কারণে কোন একটি উপ-ভাষা শক্তিশালী হয়ে অপর উপভাষা-গুলোকে আওতায় ফেলে বা আত্মসাৎ করে স্বতন্ত্র ভাষার পদবীতে উন্নীত হয়, এই আত্মসাৎ-করা উপভাষাকেই মৃত ভাষা বা Dead language বলা হয়।

ভারতবর্ষের অনেক ভাষা উপভাষা হতে সৃষ্ট। অনুমান,—এই উপভাষা: আর্যদের ভাষা সংস্কৃতের ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র রূপ। কালক্রমে মূল ভাষা সংস্কৃত, শক্তিশালী উপভাষার আওতায় পড়াতেই সংস্কৃত ভাষাকে মৃত ভাষা বলা হয়। এর পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণ আমার অজ্ঞাত। এই প্রশ্নের উত্তরে অন্য কেউ বিস্তৃত আলোকপাত করলে আনন্দিত হবো।

কল্লোলকুমার দত্তগুপ্ত,
এন/২৫, রেষ্ট ক্যাম্প,
পাণ্ডু, আসাম।

সবিনয় নিবেদন,

২৩শে আগষ্ট সংখ্যায় অমৃত পত্রিকায় শ্রীসরমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবিদ্যুৎ দাস জানিয়েছেন যে, শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত রূপ-মঞ্চ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সিনেমা পত্রিকা—তা ঠিক নয়। নিম্নে প্রকৃত তথ্য দেওয়া হল:—(১) বায়োস্কোপ (সাপ্তাহিক) বাংলা এবং ইংরাজী ভাষায় একই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা শ্রীচারু রায়, প্রকাশ কাল ১৯২৯। (২) চিত্রলেখা (সাপ্তাহিক) সম্পাদনা বি বি ব্যানার্জি, প্রকাশ কাল ১৯৩০। (৩) চিত্রপঞ্জী (ত্রৈমাসিক) সম্পাদনা শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, প্রকাশ কাল বাংলা ১৩৩৮ সাল। উক্ত পত্রিকা ১৩৪০ সালের কার্তিক মাস হতে শ্রীঅবনীনাথ বসু এবং শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পা-দনায় মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়।

শ্রীসন্তোষকুমার মুৎসুদ্দি,
৮বি, লেক টেম্পল রোড,
কলিকাতা—২৯।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে মোট ৬টি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে।

❋ বিষয় ❋

১। চব্বিশ পরগণার লোক-সাহিত্য
২। বাংলা সাহিত্যে চব্বিশ পরগণার অবদান
৩। চব্বিশ পরগণার উৎসব ও মেলা
৪। চব্বিশ পরগণার শিল্প সমৃদ্ধির ইতিবৃত্ত
৫। চব্বিশ পরগণার সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও সাংবাদিকতার ইতিহাস
৬। কোম্পানীর আমলে চব্বিশ পরগণা

❋ নিয়মাবলী ❋

(১) যে কোন ব্যক্তি পুরুষ বা নারী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।
(২) প্রতিযোগিতায় কোনরূপ প্রবেশ মূল্য লাগিবে না।
(৩) প্রত্যেক বিষয়ের উপর একটি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে।
(৪) প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় লিখিত ও ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা এবং মোট ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিত হওয়া চাই।
(৫) প্রত্যেক পুরস্কারের জন্য ৫০্ টাকা করিয়া নগদ অর্থ দেওয়া হইবে।
(৬) এই পরিষদের মনোনীত বিচারকের দ্বারা প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করা হইবে। এই বিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।
(৭) প্রত্যেক প্রবন্ধে তথ্য ও ঐতিহাসিক উপাদান এবং তদানীন্তন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর উল্লেখ থাকা চাই।
(৮) পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "সংস্কৃতি" পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।
(৯) আগামী শীতঋতুতে বারাসতে পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পুরস্কার প্রদান করা হইবে।
(১০) প্রবন্ধের সঙ্গে পুরা নাম ও ঠিকানা থাকা চাই।
(১১) প্রবন্ধ এই বছরের ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছান চাই।
(১২) এক ব্যক্তি একাধিক বিষয়ে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না।
(১৩) প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি, পাণ্ডুলিপি এবং মূল্যবান দলিলপত্র সাদরে গৃহীত হইবে।

প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—সঞ্জীবকুমার বসু, সাধারণ সম্পাদক, চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ, ১০নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা — ১।

বিনীত
অশোককৃষ্ণ দত্ত
(কার্যকরী সভাপতি)
চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ

৩য় বর্ষ
২য় খণ্ড

২১শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ নয়া পয়সা

শুক্রবার, ১০ই আশ্বিন, ১৩৭০
Friday, 27th. September, 1963. 40 Naya Paise.

সূচীপত্র

সাপ্তাহিকী

।। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা ।।

'কামরাজ পরিকল্পনা' অনুযায়ী **পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার** আরো দুইজন **সদস্য (পূর্ণমন্ত্রী)** মন্ত্রিত্ব থেকে বিদায় নিয়েছেন— সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি ও অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি। উভয়েরই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে বলে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণ করেছেন। সাতজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও নয়জন উপমন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয় পূর্বেই ঘোষিত হয়েছে। পদত্যাগী মন্ত্রীদের বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৩৮-এর স্থলে ১৬। তার মধ্যে বারোজন থাকছেন পূর্ণমন্ত্রী ও চারজন রাষ্ট্রমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের ঘোষণা অনুসারে রাজ্য-মন্ত্রিসভার আয়তন আর হ্রাস করা হবে না।

।। মালয়েশিয়ার জন্ম ।।

কুয়ালালামপুরের ১৫ই সেপ্টেম্বরের সংবাদ ঃ ঐদিন মধ্যরাত্রির পর (ইংরেজী মতে ১৬ই সেপ্টেম্বর) স্বাধীন সার্বভৌম মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার এই নতুন রাষ্ট্রটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মালয়, সিঙ্গাপুর, উত্তর বোর্ণিও ও সারাওয়াক। এর প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন টুঙ্কু আব্দুল রহমান (মালয়)। এই যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বৃটেনের সমর্থন লক্ষ্য করা গেছে গোড়া থেকেই। শেষটায় (১৪ই সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রসংঘ কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টও এই ব্যাপারে সম্মতি দেন। মালয়েশিয়ার উদ্বোধন উপলক্ষে অন্যান্যদের মধ্যে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।

।। ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভ ।।

মালয়েশিয়া সৃষ্টির বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ায় প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সেইসঙ্গে ফিলিপাইন্সেও বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছে, সংবাদে এমনি প্রকাশ। বলাবাহুল্য, ইন্দোনেশিয়া আর ফিলিপাইন্স মালয়েশিয়াকে স্বীকার করে নেয়নি। জাকার্তার ১৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদ অনুসারে মালয়েশিয়া ধ্বংসের দাবীতে সেখানে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী মালয়েশীয় ও বৃটিশ দূতাবাসে অভিযান চালায়। ম্যানিলাতেও অনুরূপ সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটে চলে একই সময়ে। অপরদিকে ১৭ই সেপ্টেম্বর কুয়ালালামপুর থেকে পরিবেশিত সংবাদ ঃ প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আব্দুল রহমান ঘোষণা করেছেন—ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন্সের সঙ্গে মালয়েশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক সূচনাতেই ছিন্ন করা হলো।

।। সীমান্তে পাকিস্তানী ফৌজ ।।

সংবাদে প্রকাশ—ভারতীয় সীমান্তে বিশেষ করে আসাম ও ত্রিপুরা সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানী ফৌজ সমাবেশ ও সামরিক তৎপরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। করিমগঞ্জ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর এবং এর পরেও সরকারীসূত্রে যা জানতে পারা গেছে, তাতে দেখা যায়—লাটিটিলা-ডুমাবাড়ি অঞ্চলে পূর্ব পাক বাহিনী বিনা প্ররোচনায় গুলীবর্ষণ করছে কয়দিন ধরেই। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লোকসভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। নয়াদিল্লী ১৭ই সেপ্টেম্বর। ঐ তারিখেই শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা ঃ পাকিস্তানী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠেই ১৬ই সেপ্টেম্বর শোনা যায়—শান্তিপূর্ণ পন্থায় পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধমীমাংসা সম্ভব হয়নি। পরন্তু, ভারত আক্রমণের পটভূমিতে পাকিস্তান সম্প্রতি চীনের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছে। সীমান্তে পাক ফৌজের হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি নিতান্ত জোরালো ভাষায়।

।। আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট ।।

আলজিয়ার্সের ১৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদ ঃ প্রধানমন্ত্রী আহমেদ বেন বেলা আলজিরিয়ায় প্রথম প্রেসিডেন্ট হওয়ার মর্যাদা পেয়েছেন। পূর্বদিন যে নির্বাচন (গণভোট) অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট প্রদত্ত হয়েছে তাঁরই অনুকূলে।

।। বিমান দুর্ঘটনা ।।

নাগপুর থেকে দিল্লীর পথে গত ১১ই সেপ্টেম্বর ভোরবেলা আই-এ-সির নৈশ ডাকবাহী একখানি ভাইকাউন্ট বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থল আগ্রার ৪০ কিলোমিটার দূরে মালিয়া রেল ষ্টেশন এলাকায়। বিধ্বস্ত বিমানে আরোহী সংখ্যা ছিল ১৮—তেরোজন যাত্রী ও পাঁচজন বিমানকর্মী। ঐ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় সকলেরই প্রাণহানি ঘটে। ফরাসী মুল্লুকের এক সংবাদ (১২ই সেপ্টেম্বর) ঃ চারজন বৈমানিক ও ৩৬ জন যাত্রীসমেত একখানি বিমান পিরেনিজ পর্বতমালায় ভেঙ্গে পড়ে। লণ্ডন থেকে দক্ষিণ-ফ্রান্স অভিমুখে যাওয়ার সময় বিমানটি দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়।

।। বোকারো প্রকল্প ।।

১১ই সেপ্টেম্বর লোকসভায় কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারী শিল্পমন্ত্রী শ্রীসি সুব্রহ্মণ্যমের একটি ঘোষণা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বোকারো ইস্পাত কারখানার জন্য ভারত যে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়েছিল, তা ইতোমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যথা সত্বর বোকারো প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করতে সরকার কৃতসঙ্কল্প ও প্রস্তুত। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লোকসভায় বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়।

।। নিকোশিয়া সম্মেলন ।।

আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থার নিকোশিয়া সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধিরা নানাভাবে নাজেহাল হয়েছেন। ১৩ই সেপ্টেম্বরের সংবাদ ঃ সম্মেলনে চীনের আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তির (মস্কো চুক্তি) বিরোধিতার প্রয়াস শেষ-পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১২ই সেপ্টেম্বরে প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত-চীন সীমান্তবিরোধ মীমাংসার দাবীটিও সম্মেলনে জোরালোভাবে উপস্থিত হয়েছিল। ফলে চীনা প্রতিনিধি দলের মধ্যে গভীর উষ্মা ও উত্তেজনা প্রকাশ পায়।

।। রাষ্ট্রসংঘের বৈঠক ।।

অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে ১৭ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অষ্টাদশ অধিবেশন সুরু হয়েছে। এই অধিবেশনের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ভেনেজুয়েলার ডাঃ কার্লোস রোদ্রিগেজ। সূচনা দিবসেই ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার স্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে।

অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনা ও
১৪ ক্যারেটের সোনা

লোকসভার চলতি অধিবেশনের শেষ দিনে ঘোষণা করা হয় যে, যাঁরা আয়কর দেন তাঁরা ছাড়া অপর চারটি ক্ষেত্র থেকে অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রত্যাহার করা হয়েছে। আয়কর দেন না এমন সমস্ত চাকুরিয়া অবশ্য সঞ্চয় প্রকল্প অনুযায়ী এ পর্যন্ত যে টাকা আমানত করেছেন যথাসম্ভব শীঘ্রই তা সুদসহ ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

তাছাড়া আরও বলা হয় যে, ১৪ ক্যারেটের বেশী বিশুদ্ধতার সোনায় তৈরী বর্তমান গহনাপত্র পূর্বেকার সোনাতেই নির্মাণ করবার অধিকার দেওয়ার জন্য স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশের কড়াকড়ি হ্রাস করা হয়েছে।

।। খাদ্য সত্যাগ্রহ ।।

সরকারী খাদ্যনীতির পরিবর্তনের দাবীতে পশ্চিমবঙ্গে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ২১-দিনব্যাপী সত্যাগ্রহের (প্রথম পর্যায়) সমাপ্তি হয়েছে গত ১১ই সেপ্টেম্বর। ঐদিন কলকাতায় ২৫ জন মহিলাসহ ৪৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার বরণ করেন। একুশদিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় গ্রেপ্তারবরণকারী সত্যাগ্রহীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় পাঁচ হাজার। অপরদিকে কর ও মূল্যবৃদ্ধি কমিটি ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু করেন এবং কলকাতায় প্রথমদিনেই গ্রেপ্তারবরণ করেন ৩১ জন।

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানের তরফ হইতে "লড়্‌কে লেংগে" ইত্যাদি বিভীষিকা প্রদর্শন ও বেতার ইত্যাদি প্রচারযন্ত্র হইতে ভারতবিদ্বেষী মিথ্যাবর্ষণ কিছুদিন যাবং একটু ভিন্নরূপ ধারণ করে। লালচীনের আক্রমণের সংগে সংগেই এই রূপান্তর লক্ষিত হয়। এবং কাশ্মীরসমস্যা, পূর্ব-পাকিস্তানিদের পশ্চিমবংগ, আসাম ও ত্রিপুরায় বিপুল সংখ্যায় বে-আইনী প্রবেশ, সীমান্ত-নির্দেশ ইত্যাদি বিষয়ে কথোপকথনের মধ্যে পাকিস্তানি দল যেরূপ অভব্য আচরণ ও বিনা দ্বিধায় কথার খেলাফ চালাইতে থাকেন তাহাতে মনে হয় যে কোনরূপ ছলছুতায় তাঁহারা বিবাদটাকে চরমে তুলিতে প্রস্তুত। তবে ব্রিটেন ও মার্কিনদেশ রাষ্ট্রনৈতিক পর্যবেক্ষক পাঠাইয়া এই ব্যাপারে তদ্বির করায় এবং ভারতীয় দলের ধৈর্য ও তিতিক্ষা অনন্ত ও অসীম হওয়ায় পাকিস্তানি দল খোলাখুলিভাবে বিরোধকে শেষপর্যায়ে আনিতে পারে নাই।

তারপর আরম্ভ হয় লালচীনের সহিত পাকিস্তানের প্রকাশ্য মিতালি এবং শেষপর্যন্ত তাহা পর্যবসিত হইয়াছে সীমান্তসন্ধি, বাণিজ্যসন্ধি ও হাওয়াই জাহাজ চলাচলের চুক্তিতে। শেষোক্ত ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রের সহিত প্রায় বিচ্ছেদ হইতে চলে কিন্তু মার্কিনদেশ এখনোও আশা না ছাড়ায় খোলাখুলি ফারকাৎ হয় নাই। নয়াদিল্লির এতদিনে টনক নড়িতে আরম্ভ হয়।

কিন্তু টনক নড়িলে হইবে কি ইতিমধ্যে অনেক বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। ভারতে পাকিস্তানি গুপ্তচরের চক্রান্ত ধরা পড়ায় দেখা গেল যে চক্রধারিরূপে বিরাজ করিতেছেন নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তানি হাইকমিশনারের হাওয়াই-বহর সংক্রান্ত "সলাহকার" এবং তাঁহার তিনজন সহকারীও বিশেষভাবে এই গুপ্তচরের কাজে লিপ্ত। এই চক্রান্তের জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাইয়া নয়াদিল্লির হুঁশ হয় এবং ঐ চারিটি মূর্তিকে ভারত হইতে অপসারিত করার দাবী পাক হাইকমিশনারের কাছে যায়। সেই মহাশয়ব্যক্তি আবদার ধরিলেন যে দিন ছয়েকের জন্য এই বিষয়ের সংবাদটার যেন প্রচার বন্ধ রাখা হয়, নহিলে ইন্দো-পাকিস্তানি দোস্তিতে মনকষাকষি আসিয়া একটা অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারে। নয়াদিল্লি রাজি হইলেন এবং বিষয়টি চাপা রহিল কয়দিনের জন্য।

কিন্তু ছয়দিন সময়ের প্রয়োজন হইল না। দুইদিন যাইতে না যাইতে পাকিস্তানি পররাষ্ট্রদপ্তর এক মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করিয়া, সেই "বোগাস" চক্রান্তের সংবাদ সরাসরি প্রকাশ করিয়া ভারতীয় অভিযোগ প্রকাশের পূর্বেই পৃথিবীময় ভারতের গুপ্তচর চক্রান্তের অপরূপ "কেচ্ছা" জাহির করিয়া দিলেন। তবে তাড়াতাড়িতে "কেস" সাজানো সেরকম ভাল হয় নাই সুতরাং ভারতীয় পররাষ্ট্রদপ্তর সমস্ত বিষয়টা—মায় পাক হাইকমিশনারের ছয়দিনের রেহাইয়ের অনুরোধ—প্রকাশ করায় সারা জগত বুঝিল এবং বলাবাহুল্য সারা জগতে নয়াদিল্লির ভালোমানুষীতে হাসির রোল উঠিল!

পণ্ডিত নেহরুরও এবার ধৈর্যচ্যুতি হইল। বিশেষে এই ব্যাপারের পরেই যখন আসাম প্রান্তে ও ত্রিপুরা সীমান্তে পাক সৈন্যবাহিনী তৎপর হইল এবং আসামের কাছাড় জেলার সীমান্তে লাটিটিলা দুমাবাড়ী অঞ্চলে গুলিবর্ষণ দিবারাত্র চালাইতে থাকিল। পণ্ডিত নেহরু নয়াদিল্লির সংসদে এতদিনে খোলাখুলিভাবে বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানের তরফ হইতে ভারত হিংসা-দ্বেষ—সহজ ভাষায় দুশমনি—ভিন্ন আর কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে না। কথাটা খুবই ঠিক।

গুলিবর্ষণ সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়াছে—বোধহয় নেফা অঞ্চলে পাকিস্তানের মিতার দল এখনও স্থির করিতে পারে নাই যে কবে কোথায় নূতন আক্রমণ চালাইবে। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে পাকিস্তান লালচীনের নির্দেশ অনুযায়ী চলিতেছে এবং এই যোগসাজশের আরম্ভ ১৯৫৮ সালের কাছাকাছি হয়। সেই সময়েই নয়াদিল্লিস্থ লালচীনা-রাষ্ট্রদূত স্পষ্টভাষায় বলেন যে, যদি সীমান্তবিরোধ লড়াইয়ে দাঁড়ায় তবে ভারতকে একসংগে চীন-পাকিস্তানি সামরিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হইতে হইবে।

এ বিষয়ে আমাদের আর কোনওরূপে মোহ রাখা উচিত নয়।

জৈমিনি

পাঠক! আমি বড় আহাম্মকী ক'রে ফেলেছি। আপনারা লক্ষ্য করেছেন, আমি মাঝে মাঝে ভবিষ্যদ্‌বাণী ক'রে থাকি। সপ্তাহ দুয়েক আগেও এইরকম একটা ভবিষ্যদ্‌বাণী আমাকে ভর করেছিল। কিন্তু কী কারণে জানি না, কলম হাতে নেওয়ার পর বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা। এখন দেখছি, অক্ষরে অক্ষরে মিলে যেতে শুরু করেছে আমার অনুমান।

আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে, পাহাড়ে ধোঁয়া দেখলেই বুঝতে হবে সেখানে আগুনের অস্তিত্ব আছে। চাল ও চিনির বর্তমান দুর্দশা দেখে আমিও বুঝতে পেরেছিলাম, এবার আমাদের কাপড়ে টান পড়বে। কিন্তু কী দুর্দৈব, কথাটা প্রকাশ করতে আমার দু'সপ্তাহ দেরি হ'য়ে গেল!

আমি সেইজন্যে এবার থেকে হুঁশিয়ার হব স্থির করেছি। চাল চিনি ইত্যাদি নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা দেখে আমাদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, নভেম্বর ডিসেম্বর নাগাদ এ দুরবস্থা নাকি কেটে যাবে। কিন্তু আমি অনুমান করছি, তা যাবে না।

তাঁর আশ্বাসের কারণ, ভালো ফলন।

আমার আশঙ্কার ভিত্তি, পূর্ব অভিজ্ঞতা।

আমি অনেক মনোযোগ দিয়ে ভেবে দেখলাম, ভালো ফলন হওয়ার সঙ্গে দাম কমার খাতায়-পত্রে যতো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই থাক, বাস্তবে এ দুটো ঘটনা পরস্পর-নির্ভরশীল নয়। ব্যাপারটা ঠিক কেন ঘটে তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু স্পষ্ট চোখের ওপর দেখছি, যে-জিনিসের দাম একবার বাড়ে, শত চেষ্টাতেও তা আর কমিয়ে আনা সম্ভব হয় না। ব্যাপারটা

কয়েকটি ভবিষ্যদ্‌বাণী

প্রায় আমাদের বয়স বাড়ার মতো। একটি দিন কেটে গেলে শত চেষ্টাতেও তা আর কমানো যায় না। কিম্বা আরো ভালো উপমা দিতে গেলে বলা যায়, দাম বাড়া যেন ট্রামের জানালা তোলার মতো। ওপরে তোলার সময় সামান্য টানলেই ওঠে, কিন্তু নিচে নামানোর সময় দু'দিক টিপে ধরে তবে নামাতে হয়। মাছের দর নিয়ে এই টানাটানির খেলা দু'তিন বছর থেকেই আমরা দেখছি। বর্তমানে চিনিতে দেখা দিয়েছে সেই অবস্থা চালেও। (এবং হাত পড়েছে এখন কাপড়ের দিকে।) এ বাড়ের আর বিনাশ নেই।

আমি তাই আরো কয়েকটা ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাই এখনি। কারণ বিলম্বে হতাশ হওয়ার সম্ভাবনা। সেগুলি হল নিম্নপ্রকার—

১। আগামী বছর ছেলেদের পাঠ্য-পুস্তকের দাম বাড়বে, ইস্কুল-কলেজের মাইনে বাড়বে, প্রাইভেট টিউটরের বেতন বাড়বে।

২। যাতায়াতের মাশুল বাড়বে, বাড়িভাড়ার সেলামী বাড়বে, মামলার খরচ বাড়বে, উকিলের ফি বাড়বে। তাছাড়া

৩। চালের কাঁকড়, ওষুধপত্রের দাম, ডাক্তারের ফি ইত্যাদিও বাড়বে।

পাঠক! ভয় পাবেন না, এসব ব্যাপার বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জৈমিনির কলমের স্পীডও বাড়বে। কাজেই সময়টা নেহাত মন্দ কাটবে না!

• • •

কলকাতা শহর যেন একটি প্রব্লেম চাইল্ড্ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা-ক্রান্ত শিশুটিকে নিয়ে সকলের যেন দুশ্চিন্তার আর অবধি নেই।

শাস্ত্রে বলেছে, যতো মত, ততো পথ। ব্রহ্মলোভে যার ঐকান্তিক আগ্রহ আছে, পথের অজস্রতায় সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। যে কোনো একটা সাধনপদ্ধতি বেছে নিয়ে এগোতে শুরু করলেই নাকি ক্রমে আসল উপায় সাধকের নিজের কাছেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু কথা হল, সেই ঐকান্তিক আগ্রহ। সে বস্তু যার নেই, শতসহস্র সদ্‌গুরুও তাকে উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মলোকের দরজায় পৌঁছে দিতে পারেন না।

কলকাতা কিন্তু সেদিক দিয়ে খুবই সৌভাগ্যশালী। সে নিজে কতোটা চিন্তিত সেটা অনুমানের বিষয় হলেও পরামর্শদাতাদের আজ উৎসাহের অবধি নেই।

সম্প্রতি কাগজে দেখলাম, বিলাতের একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ নাকি এখানে এসে মন্তব্য করেছেন, কলকাতাকে অবিলম্বে একটি সবুজ ফুসফুস দেওয়া দরকার।

সবুজ ফুসফুস এবং আমাদের ফুসমন্তর

নাহলে অবিলম্বে তার শ্বাসরোধে মৃত্যু অনিবার্য। বলাবাহুল্য, এই সবুজ ফুসফুস হল শ্যামলতার একটি বেষ্টনী, যা শহরকে ঘিরে থেকে তার দূষিত বায়ুকে নির্মল করবে, এবং সেইসঙ্গেই তার অধিবাসীদের নানাকাজের মধ্যে জিরিয়ে নেবার সুযোগ এনে দিয়ে স্বাস্থ্যকর হ'য়ে উঠবে।

এ প্রস্তাবে এমনিতে কিছু আপত্তি করার নেই। সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনো প্রস্তাবই মূলত আপত্তিকর হয় না। কিন্তু মুশকিল এই যে, এর মধ্যে এমন একটা জিনিসকে ধরে নেওয়া হচ্ছে, বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই। কলকাতার দুরবস্থায় আমরা নিজেরা যে খুব চিন্তিত নই, এইটি বুঝতে না পারাতেই ঘটেছে হিসাবের ভুল।

শহরের চারদিকে শ্যামল বেষ্টনীর কথা থাক, এই শহরের গণ্ডির মধ্যেই যতোটুকু করা সম্ভব সেটাও কি আমরা করে উঠতে পারছি? বরং এইটেই কি সত্যি নয় যে এ শহরে যেখানে যা কিছু শ্যামলতা অবশিষ্ট ছিল তাও ক্রমে লোপাট হ'য়ে যাচ্ছে আমাদের চরম অবহেলায়? ময়দানের পাশে গঙ্গাতীরের যে জায়গাটুকু আক্রান্ত হয়নি এখনো মালগুদামের প্রয়োজনে, সেখানে কি আমরা গ'ড়ে তুলতে পেরেছি সুরম্য পরিবেশ? লেকের চারপাশে কি আর কিছুই কি করার অবকাশ নেই? আমাদের পার্কগুলি কি যথেষ্টই সুন্দর? এবং যোজনবিস্তৃত এই শহরের সংখ্যাতীত রাস্তাগুলি কি প্রকৃতই তরুচ্ছায়া-স্নিগ্ধ?

আসলে যেসব পরিকল্পনায় কয়েক কোটি টাকার খেলা তার প্রতি আমাদের যেরকম সম্মোহিত ব্যগ্রতা, সহজসাধ্য

খরোয়া নিরাময়-ব্যবস্থার দিকে সে রকম আগ্রহ নেই। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, ঐসব বড় বড় প্রস্তাবে আমাদের নিজেদের কিছু করার থাকে না, সবই হয় কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে তাতে দোহার জমাতে আমাদের বাধে না। কিন্তু সেসব ছোটো পরি-কল্পনাকে কার্যকর করার দায় আমাদের নিজস্ব ব্যাপার, সেখানে আমরা 'পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্র' ধরণের চুলচেরা বিচারে মগ্ন থাকতেই ভালোবাসি, কাজে নামতে বললেই মুখ শুকিয়ে ওঠে।

সাহেবেরা বলে থাকেন, ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু তাকে দিয়ে জল পান করানো যায় না।' আমাদের বর্তমান পরামর্শদাতা হিতৈষী ব্যক্তি, তাই তিনি সবুজ ফুসফুসের কথা বলেছেন। কিন্তু জল পান করার জন্যে যার কোনো ঐকান্তিক তৃষ্ণা জাগেনি তাকে তিনি জলের কাছে নিয়ে গিয়ে কী করবেন?

•
• •

অনেকে হয়তো ভুলে গেছেন, কিন্তু আমার মনে আছে, আজ কাদম্বিনীর আদ্য শ্রাদ্ধের দিন। সেই উপলক্ষে আমি একটি শোকোচ্ছ্বাস নিবেদন করছি।

অয়ি কাদম্বিনি! পশুকুলে জন্ম-লাভ করিয়াও তুমি মনুষ্য সংসর্গে আসিতে চাহিয়াছিলে। কিন্তু সে আশা তোমার তোমার ফলবতী হইল না, তুমি স্বর্গে যাইতে বাধ্য হইলে।

জানিনা, তুমি কী হেতু অরণ্যপ্রান্তর হইতে মনুষ্যসমাজকে অধিকতর সুরম্য মনে করিয়াছিলে? তুমি কি মনে করিয়া-ছিলে, এইসব ইষ্টকনির্মিত হর্ম্যরাজি আনন্দের আকর, [illegible] প্রাণীগুলি জীবপ্রেমের প্রতিভূ? তুমি তো দেখ নাই, আমাদের এই [illegible] হাসির নিচে তোমার খলের চেয়েও কী তীক্ষ্ণধার জিঘাংসা আমরা পালন করি—

কাদম্বিনীর জন্যে শোকোচ্ছ্বাস

আমাদের অভ্যন্তরের দেহ তো বাঘ সুকঠিন চর্মের চেয়েও কতো বেশি দুর্ভেদ্য।

কাদম্বিনি! গণ্ডারকুলে জন্মলাভ করিয়াও তুমি মনুষ্যের কোমলতা অর্জন করিতে চাহিয়াছিলে, কিন্তু মনুষ্যকুলে জন্মলাভ করিয়াও আমরা গণ্ডারের অপেক্ষা বেশী অনুভূতিহীন, তাহা তুমি জানো নাই।

তুমি মরিয়া বাঁচিয়াছ, কাদম্বিনি, কিন্তু বাঁচিয়া আমরা মরিয়া রহিলাম॥
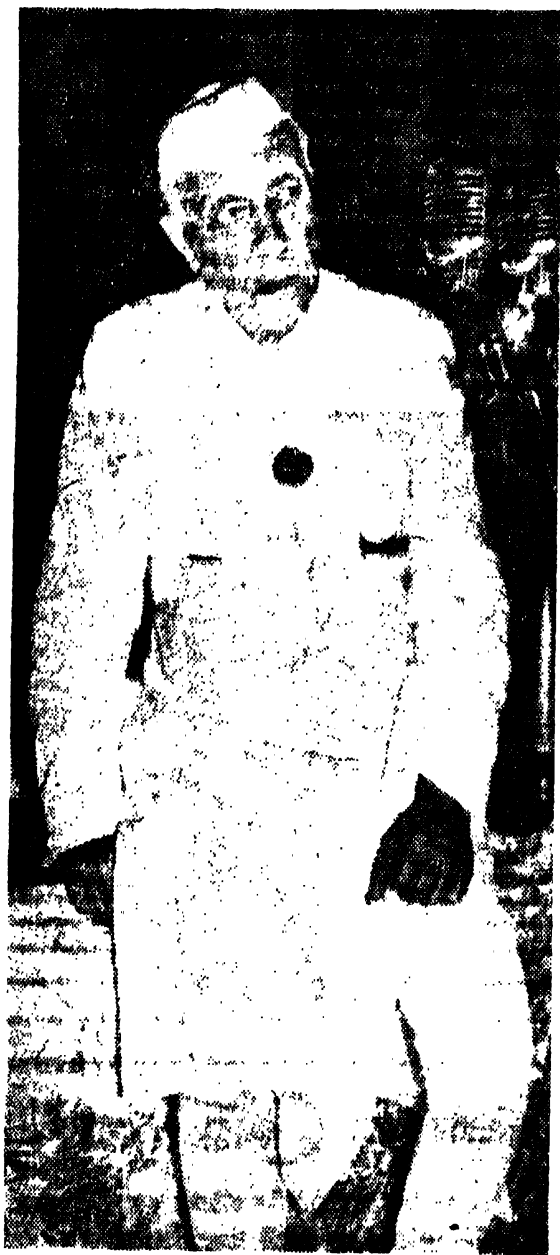
১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী আসাম-পূর্ব পাকিস্থান সীমান্তে লাটিটিলা এলাকার ডুমাবাড়ীতে ব্যাপক ও বেপরোয়াভাবে গুলীবর্ষণ করতে থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষকে এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, পাকিস্থান সরকারের সম্মতি না থাকলে ভারত-পূর্বপাকিস্থান সীমান্তে বারংবার গুলীবর্ষণের এই ঘটনা ঘটতে পারে না।

দেশে বিদেশে

॥ অব্যাহত বৈরিতা ॥

যে কোন অজুহাতে ভারতের সঙ্গে বিরোধ অব্যাহত রাখা এখন পাকিস্থানের স্থায়ী নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাকে অবশ্য ঠিক নীতি বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, কারণ নীতি মাত্রেরই যে মহৎ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এক্ষেত্রে তা কিছু আছে বলে গত সতেরো বছরে জানা যায়নি। যদিও গত সতেরো বছরে ভারতের পক্ষ হতে যাবতীয় বিরোধ ও বিসম্বাদ মিটিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়নি, এবং বহুক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেই সে পাকিস্থানকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে তবুও কখনো ভারতের প্রতি পাকিস্থানকে এতটুকুও প্রসন্ন হতে দেখা যায়নি। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলেন যে যতদিন পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ অশান্তি বজায় থাকবে ততদিন ভারতের সঙ্গেও তার বৈরিভাব থাকবে। কারণ শিয়রে শত্রু দেখিয়েই অসন্তুষ্ট দেশবাসীকে সবচেয়ে সহজে নিরস্ত করা যায়। অবশ্য একই দাওয়াই বারে বারে দেওয়া হলে শেষ পর্যন্ত তার যে আর কোন ফল ফলে না তা পাক সরকার এতদিনে খুব ভালভাবেই বুঝেছেন। কিন্তু অন্যকোন উপায় যখন জানা নেই তখন আর কিই বা করা যেতে পারে?

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনী হঠাৎ কাছাড়-পূর্ব পাকিস্থান সীমান্তে লাটিটিলা-ডুমাবাড়ী অঞ্চলে ভারতীয় সীমান্ত লক্ষ্য করে প্রবলভাবে গুলীবর্ষণ শুরু করেছে। ঐ অঞ্চল নিয়ে ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের প্রথম দিন থেকেই বিরোধ ছিল। কারণ র‍্যাডক্লিফ ঘোষণায় ঐ অঞ্চলের পাঁচটি গ্রাম সম্পর্কে যে গোঁজামিল দেওয়া হয়েছিল আজও তার মীমাংসা হয়নি। গ্রামগুলিকে মানচিত্রে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হলেও র‍্যাডক্লিফ ঘোষণায় লিখিতভাবে বলা হয় যে, ঐ গ্রামগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য র‍্যাডক্লিফ ঘোষণায় একথাও বলা ছিল যে, এই রকম বিরোধ যে সকল ক্ষেত্রে দেখা দেবে সে সকল ক্ষেত্রে লিখিত বিবরণকেই ঠিক বলে ধরতে হবে। সেই হিসাবে গ্রামগুলি ভারতেরই এবং এতদিন সেগুলি ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। তবুও ভারত বিষয়টিকে চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করেনি এবং নেহরু-নুন চুক্তিতে এ সম্বন্ধে বলা হয় যে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ঐ গ্রামগুলিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে, অর্থাৎ সেখানে ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাই বজায় থাকবে। কিন্তু

তারপর যতবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ততবারই পাকিস্থানের একগুঁয়েমির ফলে তা ব্যর্থ হয়েছে। কয়েকদিন আগে এ প্রসঙ্গে আর এক দফা আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরেই পাকিস্থানের বেপরোয়া গুলীবর্ষণ শুরু হয়েছে।

আশা ও আনন্দের কথা যে, পাকিস্থানের এই গায়ে-জোরী নীতির জবাব দিতে ভারত সরকার এবার কঠোর মনোভাব নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কদিন আগে সংসদে ঘোষণা করেছেন, পাকিস্থান একনাগাড়ে গুলী চালিয়ে ভারতীয় নাগরিক ও গবাদিপশু হত্যা করবে বা সম্পত্তি তছনছ করবে এ আর ঘটতে দেওয়া হবে না। পাক সৈন্যবাহিনী গুলী চালালে ভারতের সীমান্তরক্ষীরাও গুলী চালিয়ে তার জবাব দেবে। প্রধানমন্ত্রীর এই দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নীতি সারা ভারতের সকল মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করবে বলেই আমরা মনে করি। কারণ দুর্জন প্রতিবেশীর অবিশ্রান্ত আক্রমণ থেকে স্বজন ও সম্পত্তিরক্ষার আর কোন উপায় নেই।

॥ মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন ॥

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার পুনর্গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পরলোকগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মিলিয়ে মোট ছত্রিশজনকে নিয়ে যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তার সদস্য-সংখ্যা অর্ধেকের বেশী কমিয়ে ষোলজনে দাঁড় করিয়েছেন। অনুরূপভাবে আসামের মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। গুজরাটে যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হল তার সদস্য-সংখ্যাও দেখা যাচ্ছে ষোল থেকে কমিয়ে চোদ্দ করা হয়েছে। আগামী ২রা অক্টোবর আরও ছয়টি রাজ্যে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সব মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবেন তাদের সদস্য-সংখ্যাও বর্তমান অপেক্ষা হ্রাস পাবে বলে মনে হয়।

মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা হ্রাসের এই সিদ্ধান্তটি যে দেশবাসীর ব্যাপক সমর্থন লাভ করবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ গরীব দেশে কয়েক লক্ষ টাকার মূল্যও সীমাহীন। মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা হ্রাসের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে তিন-চার লক্ষ টাকা খরচ কমবে সেই টাকাটা মুখ্যমন্ত্রী যদি রাজ্যের দারিদ্র্যদীর্ণ শিক্ষকদের কল্যাণে ব্যয় করেন তবে শুধু যে কয়েক সহস্র সহৃদয় মানুষের অকুণ্ঠ অভিনন্দনই তিনি লাভ করবেন তাই নয়, এই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থারও তাতে উপকার হবে।

॥ নিকোসিয়া সম্মেলন ॥

সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়ায় আফ্রিশিয় সংহতি সম্মেলনের কার্যনির্বাহক সমিতির যে অধিবেশন হয়ে গেল সেখান থেকে চীনের প্রতিনিধিকে অভাবনীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বদেশে ফিরতে হয়েছে। এই প্রথম বিশ্ববিপ্লবী লাল চীন জানতে পারল যে, এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় সত্তরটি দেশের মধ্যে তার জঙ্গীচিন্তার অনুসারী একটি দেশও নয়। সম্মেলনের সভাপতি আলজিরিয় প্রতিনিধি ডাঃ লাইসারিডস সুস্পষ্ট ভাষায় চীনের নিন্দা করে বলেন, তার আক্রমণাত্মক নীতি ও কার্যকলাপ আফ্রিকার কোন দেশই সমর্থন করে না। সেইসঙ্গে কলম্বো প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, দুইটি রাষ্ট্রের বিরোধের মীমাংসাকল্পে এশিয়া ও আফ্রিকার ছয়টি দেশ সম্মিলিতভাবে একটি প্রস্তাব রচনা করতে পেরেছে—এটা এশিয়া ও আফ্রিকার সকল দেশের পক্ষেই বিশেষ গর্বের কথা। এরপর লেবাননের প্রতিনিধি কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে সীমান্ত-বিরোধের মীমাংসার জন্য চীন ও ভারতের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে চীনা প্রতিনিধি ক্রোধে প্রায় দিশাহারা হয়ে এমন অশোভনীয় ভাষায় বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেন যে, সভাপতি নিরুপায় হয়ে সাময়িকভাবে সভা স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। আংশিক পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ সম্পর্কিত মস্কোচুক্তির বিরুদ্ধেও চীনা প্রতিনিধির আক্রমণের ভাষা সকল শালীনতার সীমা অতিক্রম করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীনা প্রতিনিধি যখন বুঝতে পারেন যে কোন দেশই তাঁর আক্রমণাত্মক নীতি বা অশোভন আচরণকে সমর্থন করে না তখন প্রায় নিরুপায় হয়েই তিনি নতিস্বীকার করেন।

প্রায় একই সময়ে বেলগ্রেডে যে আন্তর্জাতিক সংসদীয় সম্মেলন হয়ে গেল সেখানেও চীনের কার্যকলাপ তীব্রভাষায় নিন্দিত হয়েছে। ঐ আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সেক্রেটারী তাঁর ভাষণে বলেন, চীন পূর্ব-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ভারত আক্রমণ করেছিল, এবং ভারতের বহুদূরে অভ্যন্তরে সে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করেছিল।

মোটকথা, আলবানিয়া, উঃ কোরিয়া ও উঃ ভিয়েৎনাম—এই তিনটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রাংশের কথা বাদ দিলে পৃথিবীর সকল দেশের কাছেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শান্তি ও সৌহার্দ্য চীনের কাম্য নয়। একমাত্র যে দেশ তার দাবীকে মাথা পেতে মেনে নেয় তাকেই সে কেবল মিত্র বলে স্বীকার করে, আর যে তার মিত্র নয় সেই তার শত্রু।

॥ সোভিয়েট ভেটো ॥

সিরিয়া-সীমান্তে দুইজন ইস্রায়েলী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র স্বস্তি পরিষদে যে প্রস্তাব আনেন সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেটোয় তা নাকচ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বস্তি পরিষদে সোভিয়েট ইউনিয়নের এটি ১০১তম ভেটো।

কুয়েট এই প্রসঙ্গে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছে যে—আরব দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্কের কথা

মনে রেখে তাদের ঐ প্রস্তাব না আনাই উচিত ছিল।

॥ বৃটিশ ভেটো ॥

দক্ষিণ রোডেসিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার অনুরূপ কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ শাসনের সম্ভাবনা প্রতিরোধকল্পে স্বস্তি পরিষদে যে প্রস্তাব আনা হয় বৃটেনের ভেটো প্রয়োগের ফলে তা নাকচ হয়ে যায়। স্বস্তি পরিষদের সতেরো বছর আয়ুষ্কালে বৃটেনের এটি তৃতীয় ভেটো।

বৃটেনের এই আচরণের নিন্দা করে দক্ষিণ রোডেসিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ধর্মযাজক সিথোল বলেছেন, বৃটেনের ভেটো শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সম্ভাবনাকে হত্যা করেছে। দক্ষিণ রোডেসিয়ার শ্বেতাঙ্গ স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বৃটেন বোধহয় ভুলে গেছে যে, তার কার্যকলাপের ফলে আফ্রিকার অন্যান্য সদ্যস্বাধীন দেশগুলির শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীদের স্বার্থই সর্বাধিক ক্ষুণ্ণ হবে। জোমো কেনিয়াট্টা-প্রমুখ আফ্রিকার বহু নেতা অতীতের কথা ভুলে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীদের সঙ্গে নতুন সৌভ্রাত্রবন্ধন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার মত দক্ষিণ রোডেসিয়াতেও যখন ব্যাপকভাবে কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতন শুরু হবে তখন আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশেই অনিবার্যভাবে তীব্র শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আর তার ফলে সেসব রাজ্যে শ্বেতাঙ্গদের বসবাস শেষপর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়বে। নেতৃবৃন্দের কোন সদিচ্ছাই তাদের সর্বনাশ হতে রক্ষা করতে পারবে না।

অর্থনৈতিক

জাতীয় ঋণ

১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৭,২৮৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ও ১,৭৬৯ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। এটা ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ ভারত সরকারের যে ঋণ ছিল তার চেয়ে পরিমাণে প্রায় সাতগুণ বেশী। ঐ সময় ভারতের আভ্যন্তরীণ ঋণ ছিল ৭৩৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ও বৈদেশিক ঋণ ৪৪৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।

দুই শ্রেণীর ঋণই সুদবহ হলেও দেশের অভ্যন্তর পরিশোধ্য ঋণ করসাপেক্ষ। অর্থাৎ সুদ বলে যা দেবেন সরকার কর বলে তার একটা বড় অংশ আবার ফিরিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু বৈদেশিক ঋণের সুদ যথাসময়েই দেয়, নইলে তা ক্রমেই বাড়বে। বৈদেশিক ঋণের হিসাবে বলা যায়, প্রত্যেক ভারতবাসী এখন বিদেশীদের কাছে ৪০·২০ টাকা ঋণী।

বিদেশে যাঁদের কাছে ঋণী আমরা, নিঃসন্দেহে যুক্তরাষ্ট্রের নাম তাদের শীর্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এপর্যন্ত নিয়েছি আমরা ২০৪০·৭ কোটি টাকা। অবশ্য তার মধ্যে সাহায্য হিসাবে পেয়েছি ৬২৭·৯ কোটি টাকা যা আমাদের শোধ করতে হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া মোট টাকার শতকরা ৩০·৮ ভাগ এসেছে অপরিশোধনীয় সাহায্য হিসাবে। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর যে সকল দেশের কাছ থেকে ভারত ঋণ সংগ্রহ করেছে তারা হল বৃটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, সুইজারল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড অস্ট্রিয়া ও কুয়েট।

পৃথিবীর সামরিক ব্যয়

এখন পৃথিবীর প্রতি বছরের সামরিক ব্যয় প্রায় ১২০০০ কোটি ডলার, যা সমগ্র পৃথিবীর বাৎসরিক উৎপাদনের প্রায় নয় শতাংশ। একটা মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, সমগ্র আফ্রিকার একত্রিশটি রাষ্ট্রের যা জাতীয় আয় পৃথিবীর সামরিক ব্যয় তার চতুর্গুণ।

মাত্র অল্প কয়েকদিন পূর্বে গৃহীত এই ফটোতেও প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু রহমানকে বেশ খোসমেজাজে দেখা যাচ্ছে। ম্যানিলা বৈঠকের সময় এই ছবি তোলা হয় এবং ঐ বৈঠকে সকলের মনের মিল হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এখন কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তির পক্ষে উহা আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য জগৎ

*** ভারতকোষ প্রসঙ্গ ***

বাংলা ভাষায় এনসাইক্লোপিডিয়া-জাতীয় গ্রন্থের অভাব দীর্ঘকালের। এই অভাব থেকে বাঙালীকে মুক্ত করবার জন্য বেশ কিছুকাল আগেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চার খণ্ডে সম্পূর্ণ 'ভারতকোষ' প্রকাশের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এঁদের বিলম্বিত লয়ে কার্যের অবশেষে প্রথম খণ্ডটি এই বছরে প্রকাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সম্প্রতি বিজ্ঞান পরিষদে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর বিবৃতি থেকে 'ভারতকোষ' সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য জানা গেছে। পরিষদ প্রথমে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় ধরেছিলেন ১,৯০,৯২০ টাকা—পরে ঐ টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৭৫,০০০ টাকা। পরিষদ মোট দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করছে। বাকি টাকা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের থেকে পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে। দুই সরকার ইতিমধ্যেই দিয়েছেন ১,১২,৫০০ টাকা এবং প্রকাশক গ্রন্থ-ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছে পরিষদ।

*** লেবাননের সাহিত্যিক ***

সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন লেবাননের দুজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ফাদার জ' কমের এবং সালাহ আসের। ভারত-লেবানন মৈত্রী দৃঢ় করবার জন্য তাঁদের এই সফর। ফাদার জ' কমের ও সালাহ আসের শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী পরিদর্শন করেন। তাঁরা দিল্লী, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, আরঙ্গাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, আলীগড়, জয়পুর ও দক্ষিণভারত পরিভ্রমণ করবেন বলে জানা গেছে। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন আগামী ৩ অক্টোবর।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর লেবানীজ সাহিত্যিকদ্বয় ইণ্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস্ হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁরা বলেন : "ভারতবর্ষ যেমন সংস্কৃতি ও সাহিত্যে সুপ্রাচীন, লেবাননও তেমনি সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সভ্যতায় প্রাচীনত্বের অধিকারী। সুতরাং এই লক্ষণগত সাদৃশ্য হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উভয় দেশের মানুষের মধ্যে একটি মিলনাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। আরবী ভাষায় গ্রীক সাহিত্যের ক্লাসিক রচনা ইলিয়াড, ভারতীয় মহাভারত ও ইসলামিক সাহিত্যের ক্লাসিক রচনাগুলিও সম্প্রতি অনূদিত হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও ফরাসী সাহিত্যে আঁদ্রে জিদ লেবাননবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় লেখক।"

লেবাননের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে তাঁরা বলেন : "তাঁহাদের দেশে সাধারণ শ্রমিকেরাও দৈনিক ৬।৭ টাকা উপার্জন করিয়া থাকেন। জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানির ব্যাপারে লেবাননে বিশেষ কিছু বিধি-নিষেধ নাই।" তাছাড়া তাঁদের দেশে জীবনধারণের মান বিশেষ উচ্চাঙ্গের বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

ফাদার কমের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সাহিত্যিক হিসাবে লেবাননে তাঁর স্থান উচ্চশ্রেণীতে। তিনি ইংরিজি ও ফরাসী অনুবাদের সাহায্য নিয়ে 'গীতাঞ্জলি' ও 'লেখন'-এর অনুবাদ করেছেন আরবী ভাষায়।

মাসিকপত্র 'আরব-চিন্তা'র সম্পাদক সালাহ আসের। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন। কবিতাটি বেইরুটে আয়োজিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবে পাঠ করা হয়।

*** শরৎ জয়ন্তী ***

কলকাতা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে দেবানন্দপুরে বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৮৮-তম জন্ম-বার্ষিকী পালিত হয়েছে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে। এই স্বল্পখ্যাত গ্রামটি বাইরের থেকে আগত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করে। শিল্পী-সংস্থা এবং দেবানন্দপুর পল্লী সেবক সমিতির যুক্ত উদ্যোগে এই জন্মবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি রবীন্দ্র-ভারতীর উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলেন : "গণজীবন চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়াই তিনি জনগণের এত প্রিয় ছিলেন।" এই সভায় ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য এবং ডঃ অজিতকুমার ভট্টাচার্য শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

*** প্রথম বাঙলা মহাভারত ***

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছরই বেশ কিছুসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি 'ডক্টরেট অব্ ফিলসফি' উপাধি লাভ করে থাকেন। অর্থাৎ পূর্বের থেকে এখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে খুবই বেশী পরিমাণে। তাঁদের পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এই অভিজ্ঞান।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এই সমৃদ্ধিতে আনন্দিত হব আমরা নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রশ্ন যে একেবারেই থাকে না তা নয়। বেশ কিছুকাল যাবৎ কয়েকখানি গবেষণা-গ্রন্থ দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। এর অধিকাংশই বাঙলা ভাষায় লেখা। এবং ধরে নিতে হবে এগুলির অধিকাংশ পুরনো সাহিত্যিক-বাঙলায় রচিত। এখনে একালের গবেষক ও একালের ভাষা-ভঙ্গীর মধ্যে একটি দুস্তর পার্থক্য আমাকে পীড়িত করেছে। কতকগুলি গ্রন্থের আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন—কেবলমাত্র তথ্য আর প্রবন্ধ বাক্যবিন্যাসই চোখে পড়ে। নতুন করে কিছু বলা অথবা নতুন তথ্য আবিষ্কার করে পুরনোকে খণ্ডন করার নিয়মকে অনেক জায়গায়ই দেখতে পাইনি। বিভিন্ন খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি পরীক্ষক হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ভ্রান্ত উচ্চারণপূর্ণ একখানি গ্রন্থ ডি-ফিল্ লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়েছিল তা অমৃতের 'নতুন বই' পর্যায়ে বহু পূর্বে আলোচিত হয়েছিল। যাই হোক গবেষণার নামে একটি 'ছেলে-খেলা'র ব্যাপার চলছে বলে অনেক সময় মনে হয়েছে।
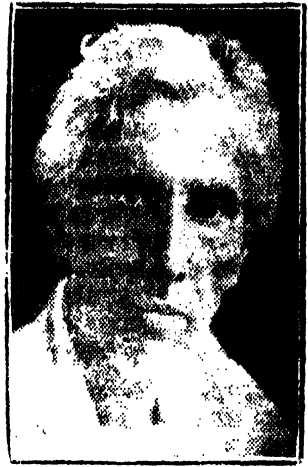
* শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি কলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক মুণীন্দ্রকুমার ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল্, ডিগ্রি লাভ করেছেন এমন একটি বিষয়ের ওপর যা সত্যিই আমাদের আনন্দিত করেছে। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর দীর্ঘ গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ বহুকাল যাবৎ কোন ডি. ফিল্, দেওয়া হয়েছে বলে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

ডঃ ঘোষের গবেষণার বিষয় ছিল সঞ্জয়ের মহাভারত। মধ্য-যুগের বাঙলা সাহিত্যে সঞ্জয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতমহল একমত ছিলেন না। অধ্যাপক ঘোষ সঞ্জয়ের পূর্ণাঙ্গ মহাভারত আবিষ্কার করে কবির ও কাব্যের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবি সঞ্জয় পঞ্চদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বাঙলায় মহাভারত রচনা করেন। ডঃ ঘোষের আবিষ্কার বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগকে নতুনভাবে আলোকিত করবে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের অধীনে তিনি গবেষণা করেন দীর্ঘ ছয় বৎসর। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ও অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই গবেষণা কার্যের পরীক্ষক ছিলেন এবং তাঁরা উভয়েই এই কার্যটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিদেশী সাহিত্য

সাম্প্রতিকালের জার্মান সাহিত্যে তরুণ ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের অবদান সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে বিদেশী পত্রিকায়। সেখানে বলা হয়েছে বর্তমান জার্মান সাহিত্যের জগৎ যেন একটি অবরুদ্ধ দুর্গ। যাঁরা এখানে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছেন—তাঁদের অতিক্রম করতে হয়েছে বহু প্রতিবন্ধক এবং নিশ্চিত করে নিতে হয়েছে নিজেদের উপযুক্ত স্থানের নিরাপত্তাকে।

যাঁদের বয়স ষাট বছর পার হয়েছে সাহিত্যের জগতে তাঁদের কোন স্থান নেই। জার্মান সাহিত্যের জগতে চলেছে আজ যুবক ও মধ্যবয়স্কদের আধিপত্য। এ সময়ে যাঁরা লেখা শুরু করেছেন তাঁরা জানেন যে নিজের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে গ্রন্থপ্রকাশককে গ্রন্থ-প্রকাশে আকৃষ্ট করার মধ্যেই তাঁর ভাগ্য চূড়ান্তরূপে নির্ভর করছে। সমগ্র জার্মানীতে প্রকাশকদের স্থান যথেষ্ট মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে জার্মান তরুণ সাহিত্যিকদের নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁরা দেখেছেন নতুন কিছু ভাববার বা করবার বাধা অসীম। বিভিন্ন দিক থেকে বাধা পেয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত গোষ্ঠী নিজেদের কাজ করবার পথকে সুগম করবার চেষ্টা করেছে। নিজেদের ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান অবস্থাকে বিপদমুক্ত করবার জন্য সচেষ্ট থেকেছে। 'গ্রুপ-৪৭' এমনই একটি গোষ্ঠী। বর্তমান তরুণ সাহিত্যসেবীদের অধিকাংশই এর সঙ্গে যুক্ত। গ্রুপ-৪৭কে বাদ দিয়ে কোন সাহিত্যসেবী নিজের প্রতিষ্ঠাকে বলিষ্ঠ করতে পারবেন না।—এমনই অনেকে বিশ্বাস করে থাকেন।

ইলসে আইকিনগির

হাইনরিশ বল

এই গোষ্ঠীর লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন : ইলসে আইকিন-গির ইংগেবর্গ বাখমান, হাইনরিশ বল, আড্রিয়ান মরিয়েন, গুনটার গ্রাস। অনেকেই গ্রুপ-৪৭-এর প্রদত্ত পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁদের জনপ্রিয়তালাভের পক্ষে সহায়তা করেছে। কুর্ট ক্রুগে-এর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য। বাইরের সমালোচকদের থেকে বহু আগেই হ্যান্স ওয়ারনার রিকশার-এর চোখেই পড়ে যান তিনি। এই গোষ্ঠীর অসামান্য মূল্য সম্পর্কে আজ আর কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। অন্যান্য অনেকেই আবার নিজেদের স্বতন্ত্র প্রকাশন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করে থাকেন।

তাসত্ত্বেও তরুণ সাহিত্যসেবীরা যে সম্পূর্ণভাবে বিপদমুক্ত তা নয়। এমন কথা বলা অসম্ভব যে ঐ বাঁকা পথে যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছেন তাঁরা সকলেই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারেন সাহিত্যক্ষেত্রে। তাই তাঁদের কাছে আজ দুটো সমস্যা বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সমস্যাদুটি হল পরিচিত হওয়া এবং দীর্ঘকাল সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা। অন্যান্য যে কোন শিল্পের মতই, মানুষের লেখক হওয়ার মোহ অতিঅল্পকালের মধ্যেই তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুভূত হয়, যে অধ্যবসায় বা পরিশ্রম এবং উপার্জন বা অর্থের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। বেঁচে থাকবার জন্য উপার্জনের প্রয়োজন সর্বদাই অনুভূত হয়—যদিও লেখাকে দ্বিতীয় বৃত্তি হিসাবেই স্বীকার করা হয়ে থাকে। জীবিকা-উপার্জনের জন্য সাহিত্যসেবী মানুষেরা এমনই একটি কাজ চায় যেখানে সময় প্রচুর—শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে নিশ্চিন্তভাবে কিছু সময় কাটান যায়—যে কাজের মধ্য দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। সে কারণেই অনেকেই প্রকাশন সংস্থায় অথবা রেডিও স্টেশনে কাজ করা পছন্দ করেন। তরুণ লেখকেরা—কাগজ অথবা রেডিওর জন্য লিখে থাকেন। এ কাজ তাঁরা যা লিখতে চান তার সঙ্গে যুক্ত নয়—এ কাজ তাঁরা প্রয়োজন মেটাবার জন্য করতে বাধ্য হন। তাঁরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কেউ বা সান্ধ্য কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বিবর্ধন প্রকল্পেও শিক্ষকতা করে থাকেন। যাঁদের অন্তত দু-তিনখানা বই বেরিয়েছে তাঁরা অনেক সময়েই—প্রথম শ্রেণীর বা জনপ্রিয় দৈনিক মাসিক কাগজে অথবা রেডিওতে কাজ করলেও এটাকে লেখকের পক্ষে গৌরব-জনক কিছু মনে করা হয় না—বাইরের থেকে—আত্মরক্ষার জন্য একটা কিছু করা এ হচ্ছে অনেকটা সেই ধরণের ব্যাপার।
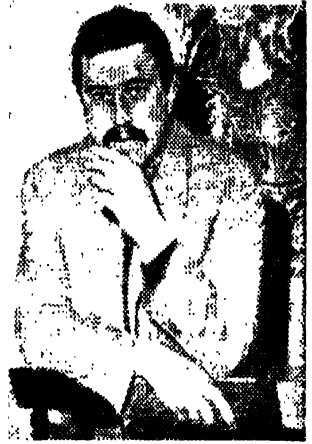
গুণটার গ্রাস

তরুণ লেখকদের সামনে আরও একটি সমস্যা আজও প্রবল। কোন সাহিত্যপত্রিকা বা রেডিওর গ্রন্থ-সমালোচনা সব কিছু নয়—এর জন্য তিন-চারটি দৈনিক পত্রিকার সমালোচনারই মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। এ সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আজ সার্থক সাহিত্যিক-এর খ্যাতি নিয়ে যাঁরা বেরিয়ে আসতে পেরেছেন তাঁদের সংখ্যা খুবই কম।

জার্মান সাহিত্যের এই দুর্গ-এর মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা দুর্গের রক্ষকদের কাজ থেকে সম্মান খ্যাতি পুরস্কার সব কিছুই পেয়ে থাকেন। তাছাড়া দুর্গ-নায়কদের ক্রমোচ্চ শ্রেণী-গত পর্যায়ে নিজের অবস্থানকে নিশ্চিত করা—যে উচ্চ মান দুর্গাভ্যন্তরেই সীমা-বদ্ধ তরুণ লেখকদের তার জন্য পরি-শ্রমের অন্ত নেই।

বাংলা উপন্যাসে যুগযন্ত্রণা

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর
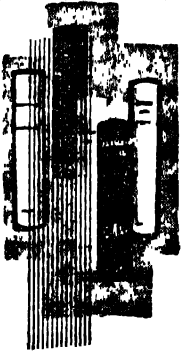
যুগযন্ত্রণা কথাটি ইদানীং বহু-ব্যবহৃত, বিভিন্ন অর্থে ও উদ্দেশে কথাটি চলছে, আলোচ্য নিবন্ধের যুগ-যন্ত্রণা নামকরণ করা হয়েছে অভিশপ্ত বর্তমানকালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তন ও তজ্জনিত সৃষ্ট যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করার জন্য। বর্তমান কাল, ভীষণ কাল। একদিকে কালোবাজারি, মুনাফাশিকারী, চোরাকারবারী Nouveau Riche-এর দল, এদের গাড়ি, বাড়ি, বিলাস-বাহুল্য, প্রমোদমত্ততার আর শেষ নেই আর অপর দিকে আদর্শভ্রষ্ট, জীবনসংগ্রামে পরাজিত, সৎ এবং সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ। মুনাফাশিকারের পর নয়া-ধনীদের আকৃতি ও প্রকৃতি নৃ-মুণ্ডশিকারীর মতই বীভৎস হয়ে উঠেছে আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত সাধারণ শিক্ষিত, সংস্কৃতি ও সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রসমাজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপে স্বেচ্ছায় না হলেও Nouveau Riche-এর কবলে পড়ে অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একটা জড়-পিণ্ডে পরিণত হচ্ছে। বর্তমান সমাজের এই অবস্থাটাকেই যুগযন্ত্রণায় নামাঙ্কিত করা যায়।

এই যুগের একটা আশ্চর্য প্রতিলিপি দেখা গেল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্প্রতি-প্রকাশিত উপন্যাস "মেঘের উপর প্রাসাদে"।—এই উপন্যাসটির সঙ্গে অমৃত পাঠকদের পরিচয় আছে, দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি অমৃতে প্রকাশিত হয়েছে। এই নিবন্ধ-লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার অনুরাগী পাঠক হলেও সত্য কথা বলতে কি, একটা মিশ্রিত মনোভাব নিয়ে উপন্যাসটি পড়া শুরু করেছিলাম, আর শেষ করে আশ্চর্য বোধ করেছি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর আগে অনেকগুলি সার্থক উপন্যাস রচনা করেছেন, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু আলোচ্য উপন্যাস নিঃসন্দেহে তাঁকে সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে স্থান দেবে।

'মেঘের ওপর প্রাসাদে'র কাহিনী-অংশ বেশ সরল এবং সর্বজনপরিচিত। —গৌরাঙ্গবাবু বারো বছর আগে পাকিস্তানের ঘরবাড়ি ছেড়ে নারকেল-ডাঙ্গার একটা নোংরা গলিতে বাসা বাঁধেন তেরো আর ছ' বছরের দুটি ছেলে, আট আর চার বছরের দুটি মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে। যা তাঁর পরিকল্পনা ছিল, তা সফল হয়নি, কঠিন বাতে তিনি পঙ্গু হয়ে পড়লেন। বড় ছেলে অভয় কারখানায় কাজ করে, স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করা হয়নি, ছোট মেয়ে তৃপ্তি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ে পড়া ছেড়েছে অভাবের জন্য, ছোট ছেলে অমিয় এইটে উঠে স্কুলের পাট উঠিয়ে ফুটবল খেলে ফুর্তি করে বেড়ায়। সংসার চালায় বড় মেয়ে দীপ্তি, সে থার্ড ডিভিসনে স্কুল-ফাইন্যাল পাশ। কিভাবে যে সংসার চালায় গৌরাঙ্গবাবু বুঝেও বোঝেন না। দীপ্তি কলকাতার হাল-ফ্যাসানের দেহ-পসারিণী, বার-রেস্তোরাঁ পথ-ঘাটে শিকার সংগ্রহ করে। এই বাড়িতে থাকে প্রভাত। সে জীবনযুদ্ধে পরাজিত। এখন মোটরকার-ড্রাইভার, ধনী কাঞ্জিলালের বাড়ি। প্রভাত এই উপন্যাসের নায়ক। তাকে নিয়ে উপন্যাস নয়, তবু সারা উপন্যাস জুড়েই সে আছে। যাকে সে ভালোবেসেছিল তাকে সে পায়নি। আকস্মিক ঘটনাচক্রে তার চরম দুর্ভাগ্যেরও সেইই কারণ। তারপর সে ড্রাইভারী করে। সেই রাণীর কথাই সে ভাবে, আর গৌরাঙ্গবাবুদের সংসারের একজন হয়ে পড়ে থাকে। অভয় বোঝে সংসারের বিপদ। তৃপ্তিকেও সুন্দরী দেখতে। পাড়ার রকবাজ ছেলে অমল তাকে জ্বালাতন করে। শেষ পর্যন্ত একদিন সে বোমাও ফাটায়, ফলে আহত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হয় দীপ্তি। দীপ্তি হাসপাতালে গেল, সেখানে জানা গেল সে সন্তানবতী। প্রভাতই এই সংকট ত্রাণ করে। তার প্রিয়তমা রাণীর কৃষ্ণনগরের সেবাসদনে তাকে ভর্তি করে দেয়। দীপ্তি এই সংকটের ভেতরও আশ্রয় পায় সদাশয় ডাক্তার মোমেন ঘটকের। ডাক্তার বলে, কুমারী অবস্থায় মা হতে চলেছেন, সোস্যালি ব্যাপারটার আকৃতি নোংরা, কিন্তু "যে যুগ, যে ইকনমি, যে গ্যাংগ্রীণের মধ্যে আমরা বাস করছি, তাতে আপনার কিসের লজ্জা?"—রাণী হয়ত মনে মনে ডাক্তারকে আকাঙ্ক্ষা করেছিল? সে তাই খুশী হয় না। ওদিকে ফুটবল-

রসিক অমিয় এক পাঞ্জাবী জুয়াচোরের প্রলোভনে ভুলে তৃপ্তিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। কাশীতে গিয়ে সে একটা চাকরী পায় এবং তার বোধ জাগ্রত হয়। তৃপ্তি বাঙালী জুয়াচোর নন্দলালের পাল্লায় পড়ে এক অনাস্বাদিত জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত প্রভাতের সঙ্গে তার বিবাহ-ব্যবস্থা হয়ে যায়। এইখানেই উপন্যাসের শেষ। এ ছাড়া মধ্যে আছে প্রভাতের মনিব কাঞ্চিলালের দিবাস্বপ্ন, আর তাঁর নিম্ফোম্যানিয়াগ্রস্ত বড়লোকের আদুরে স্বপনবিলাসিনী কন্যা রিণির উন্মার্গগামী মনোভঙ্গী।

সংক্ষেপে এই কাহিনী। কঠোর বাস্তবজীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। সংক্ষেপিত কাহিনীতে লেখকের শিল্পজ্ঞান ও রচনাশৈলীর পরিচয় প্রকাশ সম্ভব নয়। এই উপন্যাসে আধুনিক সমাজসত্যের একটা পালিশহীন ছবি এঁকেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা এই যুগের সমাজজীবনের প্রতিনিধি। বিয়োগান্ত সমাজনাট্যের বিভিন্ন ভূমিকায় এঁরা অংশগ্রহণ করেছেন। কেউ বাস্তুহারা গৌরাঙ্গবাবু, কেউ নৈশ-অভিসারিকা দীপ্তি, কেউ ফুটবলবিলাসী অমিয় যার ফ্রেন্ড জাঁদরেল চন্দন সিং আশমানে মনজিল বানানোর স্বপ্নে তাকে মুগ্ধ করেছিল, বুদ্ধিহীনা নব-যৌবনা তৃপ্তি, যে কেবল খাঁচা ভেঙে পাখির মতো পালাতে চায়, মদ্যপ আদর্শবাদী কাঞ্চিলাল আর তাঁর মেয়ে রিণি, প্রভাত এবং রাণী আর ডাক্তার ও দীপ্তি, সকলেই জীবননাট্যের পাত্রপাত্রী। যে যার ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। অস্বস্তিকর বাস্তবজগৎ স্বপ্ন আর কল্পনাকে দানা বাঁধতে দেয় না। জীবনযন্ত্রণার এক অতৃপ্তির অভিশাপে সকলেই জর্জরিত হয়ে এক অন্ধ নিয়তির চারপাশে ঘুরছে। বাস্তবের ভিত্তিভূমি রূঢ় রুক্ষতায় পরিপূর্ণ। সেখানে সত্য নেই, স্বপ্ন নেই, নিশ্চয়তা নেই, আছে অস্বস্তি, অতৃপ্তি, অস্থিরতার যন্ত্রণা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আশ্চর্য লিপিকুশলতায় এই উপন্যাসটিকে একটি সার্থক ও মহৎ উপন্যাসে পরিণত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী সাধারণ, ঘটনাপ্রবাহ সর্বজনপরিচিত, সমস্যা বহুল-আলোচিত, আর সেই কারণেই যুগযন্ত্রণার এমন সার্থক রূপায়ণ বিশেষ প্রশংসা ও কৃতিত্বের দাবী রাখে। বিচূর্ণিত মূল্যমানকে এমন সহজ ভঙ্গীতে এবং অনায়াসে ইদানীংকালে আর কেউ প্রকাশ করতে পেরেছেন কিনা জানা নেই। দেশবিভাগ বাস্তুহারা, মধ্যবিত্ত সমাজ ইত্যাদি নিয়ে অনেক গল্প ও উপন্যাস রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায় সন্দেহ নেই, কিন্তু অতিরঞ্জিত উচ্ছ্বাস ও আবেগে তার শিল্পমূল্য অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে। সংযমের সঙ্গে সীমিত পরিসরে অনেকখানি ছবির আভাস দেওয়া লেখকের শক্তিমত্তার পরিচায়ক। কাহিনীটিতে ঘটনা-সংস্থাপনার প্রয়োজনে কোনো কোনো অংশে অতিনাটকীয়ত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে, এই উপন্যাসের সেইটুকুই ত্রুটি। তবে হয়ত বিমূর্ত ভঙ্গি পরিহার প্রচেষ্টার জনাই লেখক এই আঙ্গিকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ইদানীং অনেক কম লিখছেন, রচনার উৎকর্ষ যে পরিমাণে নয় পরিমিতিতে সে জ্ঞান তাঁর আছে। আর তার পরিচয় তাঁর নবতম উপন্যাস 'মেঘের ওপর প্রাসাদ'।

মেঘের উপর প্রাসাদ— (উপন্যাস)— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক— এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা— ১২। দাম—সাত টাকা।

।। রেকর্ড-ধৃত কবিকণ্ঠ ।।

রবীন্দ্রনাথের গান ইদানীং আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করলেও আজ প্রায় সত্তর বছরকাল ধরে বাংলাদেশে প্রচলিত এবং প্রচারিত। অনেক বৃদ্ধের কাছে অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, বাংলার মাটি বাংলার জল, সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে প্রভৃতি গান শোনা যায়। এই সব গান তাঁদের বাল্য ও যৌবনে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'আমাদের দুঃখে-সুখে, শোকে-আনন্দে, বিপদে-উৎসবে, সংকটে-শান্তিতে, সংগ্রামে-বিজয়ে সব অবস্থাতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে সান্ত্বনা, প্রেরণা ও উদ্দীপনা জোগায়, তার তুলনা আর কোথাও আছে কিনা জানি না। ব্যক্তিজীবনে প্রত্যহের প্রতি অবস্থাতেই এই গানগুলির কাছ থেকে আমরা পরম বান্ধবতার অমৃতসঙ্গ লাভ করি, এই বাস্তবতার মূল্য নির্ণয় করা কি সম্ভব?' কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর গ্রামোফোন রেকর্ডে ধরা আছে এবং রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে কিছু নূতন রেকর্ডও করা হয়েছে। সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে অসীম অধ্যবসায়ে সন্তোষকুমার দে যে অনুসন্ধানকর্ম শুরু করেছিলেন তারই ফল এই কবিকণ্ঠ। কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় তিনি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ কবিকণ্ঠ গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন। প্রথম খণ্ডে চল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী কবিকণ্ঠ নামক প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান। কবির সংগীতের মত তাঁর কণ্ঠস্বরও বিজ্ঞানের প্রভাবে কালজয়ী করা সম্ভব হয়েছে। এই গ্রন্থে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য ছবিও দেওয়া হয়েছে। শেষাংশে রেকর্ডে কবিকণ্ঠের একটি সম্পূর্ণ তালিকা সংযোজিত। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে গ্রন্থটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে।

কবিকণ্ঠ— সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য। পরিবেশক— ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম পাঁচ টাকা।

●

নিচের তলার কথা

সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীসুনীল চক্রবর্তী নবাগত। ইতোপূর্বে তাঁর একখানি উপন্যাস বেরিয়েছে। সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে নতুনেরা যখন বক্তব্যহীন আঙ্গিকচর্চায় ব্যস্ত সেই সময় নতুন লেখকের এই উপন্যাস জোরালো বক্তব্য নিয়ে হাজির। সমাজকে ভিন্ন কোণ থেকে দেখবার স্পর্ধায় লেখক অবশ্যই অভিনন্দিত হবেন। নিচের তলার মানুষের প্রতিনিধি এই উপন্যাসের নায়ক মদন। জীবন তাকে কিছু দেয়নি তবু জীবনপ্রেমই তার মানবিকতাকে ভাস্বর রেখেছে। এই মানুষটির পাশাপাশি রয়েছে সমাজের ভণ্ড লম্পটের দল যারা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য যে-কোনো ছোটো কাজ করতে প্রস্তুত। লেখক সমাজের স্বপক্ষে মানুষের শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃপ্ত হুঁশিয়ারি ছুঁড়ে দিয়েছেন। এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন সাধারণ চোখে যারা অপাঙ্‌ক্তেয়, ঘৃণ্য, মানবতার দরবারে তারাই হৃদয়গুণে গর্বের বস্তু। লেখকের ভাষা বিষয়ানুগ! দৃষ্টিভঙ্গী সমাজসম্মত ।।

অপাংক্তেয় (উপন্যাস)—সুনীল চক্রবর্তী, প্রকাশক : ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৬।। মূল্য ৩·৫০

বিবেকানন্দ বিশ্বসভায়

স্বামী বিবেকানন্দ এ যুগের এক বিস্ময়। মাত্র উনচল্লিশ বছরকাল এই মর্তধামে তিনি বিচরণ করেও কিভাবে বিশ্বজয় করেছেন তা ইতিহাসের বিষয়-বস্তু। ভারতের নবজাগরণে স্বামীজীর অগ্নিগর্ভ বাণী, শঙ্কাহরণ অভয়মন্ত্র, স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙালীর ও ভারত-বাসীর মনে এক নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে। স্বামীজীর ভারত-চেতন তপের-তাপের বাঁধন কাটিয়ে ঈশ্বর-চেতনায় পরিণত হয়েছে। মানুষের দুঃখদুর্দশাকে তিনি এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হননি, তাই জীবে দয়া নয়, "জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" এই কথা তিনি বলতে পেরেছিলেন। তাঁর মন্ত্র ছিল উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত। উদার মতাবলম্বী এই মহামানব তাই বলতে পেরেছিলেন—

"I accept all religions that were in the past, and worship with them all; I worship God with everyone of them in whatever form they worship him". (Realisation of a Universal Religion).

প্রতিটি ধর্মের এই স্বীকৃতির মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টা ঋষি অখণ্ড ভাবধারা ও অখণ্ড জগতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"দ্বন্দ্ব নহে সহযোগিতা, ধ্বংস নহে সহকারিতা। বিভেদ ও কলহ নহে —শান্তি ও সমন্বয়"। স্বামীজীর এই বাণী পৃথিবীর বর্তমান সংকট মুহূর্তে স্মরণীয়। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর এই তিনজন কৃতী সাহিত্য-সেবী "বিশ্ব-বিবেক" নামক যে স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তা এই কারণে বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হবে। স্বামীজীর জীবন ও কর্মের ইতিহাস এই বিশ্ব-বিবেক। "আত্ম-পরিচয়" অংশে স্বামীজীর পত্রাংশ থেকে তাঁর আত্মকথা সংকলন করা হয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে বিবেকানন্দের জীবন অংশে সমসাময়িকদের চোখে-দেখা জীবনেতিহাস বিধৃত, আর মনীষী সঙ্গম অংশে আনী বেশান্ত থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত মনীষীবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি সংকলিত। ব্রজেন্দ্র শীলের রচনাটি কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী বিভাগে সংযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। আধুনিক মনের আলোকে বিবেকানন্দ বিভাগে প্রথম রচনাটি বনফুল-কৃত। এক হিসাবে বনফুলই একমাত্র সাহিত্যিক যাঁর রচনা এই সংকলনে সংগৃহীত, অপর সকলেই পরলোকগত মনীষী কিংবা অধ্যাপক, গবেষক বা রাজনীতিক। আমরা বনফুলের সংক্ষিপ্ত রচনা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি—

"হে দেব, হে বহ্নি, হে প্রদীপ্ত পাবকশিখা, হে সূর্য-সমুজ্জ্বল মহা-পুরুষ, তোমার নাম উচ্চারণেরও আমরা অধিকারী নই। আমরা ঘৃণ্য, পতিত, অন্ত্যজদের সমগোত্র হইয়া তোমার অমর-বাণী বিস্মৃত হইয়াছি। তোমার বজ্র এই কর্দমাক্ত প্রস্তরকে বিদীর্ণ করুক।"

এই সংকলনে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরাজী প্রবন্ধটি সংকলিত হওয়ার কোনো যুক্তি পাওয়া যায় না। এই সংকলনেই বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী মনীষীর রচনার বঙ্গানুবাদ আছে এবং এই গ্রন্থ বঙ্গভাষাভাষী পাঠকের উদ্দেশ্যেই সংকলিত। আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত করা হবে। গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় সম্পাদকত্রয়ের অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশকের সুরুচি এবং গ্রন্থপ্রকাশের মহৎ সংকল্পটুকুও প্রশংসনীয়।

বিশ্ব-বিবেক—সম্পাদনা — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর। প্রকাশক—বাক-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য দশ টাকা মাত্র।

●

উপন্যাসে সমাজচিত্র

বিমল মিত্র জনপ্রিয় উপন্যাস-লেখক। তাঁর গল্প ও উপন্যাসের পাঠক-সংখ্যা অনেক। তাঁর রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ এই যে, অতি সরল ভঙ্গিতে এবং সহজভাবে তিনি কাহিনী পরিবেশন করেন। নির্ভার নিস্তরঙ্গ কাহিনীর গভীরে পাঠকচিত্ত ডুব দেয়। 'নিবেদন ইতি' উপন্যাসের কাহিনীও সুন্দর। বাদামতলা কলকাতার উপকণ্ঠের এক শহরতলী, বিপিনবাবু সেকালের সৎ এবং ভদ্র মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, তাঁর একমাত্র বাসনা পুত্র প্রশান্ত মানুষ হয়। চোখে চোখে রাখা সত্ত্বেও যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে বিচিত্র ঘটনাচক্রে সে জয়ন্ত এবং অঞ্জলির মোহজালে জড়িয়ে পড়ে। পিতার স্নেহ এবং মমতার নিগড়ে আর তাকে ধরা রাখা যায় না। প্রশান্ত অবশ্য পরিশেষে ফিরে আসে বাস্তবের রুক্ষ-ভূমিতে। উপন্যাসটিতে আধুনিক সমাজ-জীবনের সুন্দর রেখাচিত্র কুশলী লেখকের তুলিতে রূপায়িত হয়েছে। নিবেদন ইতি একটি হৃদয়গ্রাহী সুখ-পাঠ্য উপন্যাস।

নিবেদন ইতি— (উপন্যাস)—বিমল মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স (প্রা) লিমিটেড। ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯। পাঁচ টাকা।

নতুন সমস্যা

বীথিকা আর তাপস। ভালো ছাত্র-ছাত্রী। দুজনের বিবাহ এবং সন্তান-লাভের পর বীথিকা একটা গবেষণার কাজে প্যারিস গেল, প্রথম প্রথম দু-তিনদিন খোকন সম্বন্ধে ব্যাকুল হয়ে পত্র দিত, ক্রমশঃ অবশ্য এই উৎসাহ ম্লান হয়ে আসে। সেখানে পলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়, পল বর্মায় পালিয়ে যায়। তাপস স্ত্রীর অবস্থা বুঝে খোকনকে তার দিদিমার কাছ থেকে নিয়ে আসে, তারপর খোকনের আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটল। তাপস শেষ পর্যন্ত টিকিট কাটে বীথিকার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। সংক্ষেপে সংঘমিত্রার এই কাহিনী। লেখক সংকর্ষণ রায় ইতি-মধ্যেই সাহিত্যিক-খ্যাতি অর্জন করে-ছেন। এই উপন্যাসে তাঁর লিপিদক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। উপন্যাসটিতে একটি মাত্র নতুন সমস্যার ইঙ্গিত আছে।

সংঘমিত্রা— (উপন্যাস)—সংকর্ষণ রায়। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

●

বিরাট গ্রন্থের বহিরেখা

আলোচ্য এই গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় লিখেছেন—"শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষের এই "রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা" বইখানি রবীন্দ্রনাথের উপর লেখা অতএব সুপাঠ্য।" কথাগুলি সত্য এবং তিনি 'আকার সংক্ষেপ' সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি পাঠ করে আমরাও সেই মত পোষণ করি। লেখক এক গুরুতর প্রসঙ্গ আলোচনার চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থে, এক হিসাবে এক বিরাট গ্রন্থের বহিরেখা বা আউট-লাইন এই গ্রন্থ। লেখক অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করেছেন এবং তার একটা ডাইজেস্ট এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রদান করার প্রচেষ্টা করে-ছেন। তাঁর ভাষা কাব্যধর্মী, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা সংক্রান্ত এই আলোচনা গ্রন্থটিকে তাই তিনি ক্ষেত্র বীজ অঙ্কুর বিকাশ ফুল ফল এই ছয়টি বিভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ এবং বিচারভঙ্গী প্রশংসার দাবী রাখে। ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নয়।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা— (প্রবন্ধ) ডঃ তারকনাথ ঘোষ। প্রকাশক। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলি-কাতা—১২। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কবির গান

(৯)

আন্টুনি ফিরিঙ্গী

ভোলা ময়রার সঙ্গে যে সব দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত তার মধ্যে আন্টুনির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিওয়ালার ইতিহাসে আন্টুনি-ভোলার লড়াই সম্পর্কে কয়েকটি কৌতুককর বিবরণ পাওয়া যায়। ভোলানাথ যেমন জাড়ার জমিদারবাড়িতে যজ্ঞেশ্বরকে এক হাত নিয়েছিলেন তেমনি শ্রীরামপুরের গোঁসাইদের বাড়িতে আন্টুনির মুখে তাঁকেও একবার শুনতে হয়—

তোমরা পয়সা পেলে হেসে খেলে
সাদায় কর কালো।
তোমাদের গোঁসাই চেয়ে, আমি বলি
কসাই তবু ভালো।।

তিরস্কারের লক্ষ্য যে গৃহকর্তা গোঁসাইরা তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার মাধ্যম হলেন ভোলানাথ যিনি গোস্বামীর পক্ষ নিয়ে গাওনা শুরু করেছিলেন। ভোলানাথের কোন কথার উত্তরে আন্টুনির রাগ হয়েছিল তার নজির আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু তাঁর এই গীতিখন্ড আজ পর্যন্ত আন্টুনির স্মৃতি বহন করছে—।

বাংলা কবিগানের আসরে এই পর্তুগীজ গায়কটি এমন গৌরবের আসন কি করে পেলেন ভেবে বিস্মিত হতে হয়। প্রতিভা তাঁর অবশ্যই ছিল কিন্তু সাধনার পাথরে ঘষে ঘষে তাতে নিত্য শাণ দিয়েছেন। সেটাই তাঁর সাফল্যের মূল কথা। একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে বাংলা ভাষায় অধিকার লাভ করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। স্বচ্ছন্দে বাংলা বলতে পারেন এমন ইউরোপীয়ের দেখা এ যুগে অনেক মেলে সে যুগেও মিলত। কিন্তু সেই ভাষার মর্মমূলে প্রবেশ করে তার সাহায্যে হাস্য-পরিহাস করা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা সেই ভাষায় কলহ-বিসম্বাদ করা সে বড় সহজ কথা নয়। ভাষার অধিকার বোঝা যায় তার ইডিয়মের সার্থক ব্যবহারে। 'গোঁসাইয়ের চেয়ে কসাই ভাল'—এর তাৎপর্য যার যতই আপত্তি থাক না কেন এটা যে চোস্ত বাংলার ইডিয়ম তাতে কারও সংশয় নেই। যে বিদেশী এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করতে পারেন তিনি যে বাংলা ভাষাজননীর অঙ্কে স্থান পেয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় না।

'বাপের জামাই' বললে কি বোঝায় তা এই বিংশ শতকের তৃতীয় পাদের শিক্ষিত লোকদের একটু ভেবে বলতে হবে। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শ্রোতা এই রসিকতায় প্রাণ খুলে হেসেছিল। এ রসিকতার মধ্যে অপরিচয়ের প্রয়াস নেই, আছে অতিপরিচয়ের স্বতঃস্ফূর্তি।

ঘটনাটি এই। এক কবির আসরে ঠাকুরদাস সিংহের সঙ্গে আন্টুনির 'যুদ্ধ' চলছে। ঠাকুরদাসের দলে রাম বসু গান ধরলেন। আন্টুনিকে লক্ষ্য করে বললেন,

বল হে আন্টুনি আমি
একটি কথা জানতে চাই।
এসে এদেশে এ-বেশে তোমার
গায়ে কেন কুর্তি নাই।।

এই প্রশ্নেরই জবাব দিলেন বিদেশী (?) কবি আন্টুনি :

এই বাংলায় বাঙ্গালীর বেশে
আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকরে সিংহের বাপের জামাই
কুর্তি টুপি ছেড়েছি।।

কারও ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে যখন শালা না বলে আত্মসংবরণ করা যায় না অথচ শালা বলতে একালকার ব্রাহ্মী রুচিতে বাধে তখন 'brother-in-law' বলে কোনো রকমে আমরা দুই কুল রক্ষা করি। ভাষান্তরণের ফলে শব্দের অশালীনতা কতকটা ঢাকা পড়ে। বাপের জামাইও এক রকমের ভাষান্তরণ। বিদেশীর পক্ষে এদেশীয় ভাষাজ্ঞানের এ এক আশ্চর্য নিদর্শন। প্রশ্নটা রাম বসুর হলেও গান গেয়েছিলেন দলপতি ঠাকুরদাস। কিন্তু রাম বসুর সঙ্গেও আন্টুনির সোজাসুজি কথা কাটাকাটি হয়েছে তার নিদর্শনও আছে। রাম বসু বললেন

সাহেব, মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে
মাথা মুড়ালি।।
ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে
গালে দেবে চুন কালি।।

আন্টুনি অনুত্তপ্ত শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন,—

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই,
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে
এও কথা শুনি নাই।।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ওই দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে।
আমার মানব জনম সফল হবে
যদি রাঙ্গা চরণ পাই।।

তর্কযুদ্ধে জিততে হলে সবচেয়ে বেশী দরকার যে অস্ত্রের সেটি হল ঠাণ্ডা মেজাজ। যে উকিল জেরার সময় প্রতিপক্ষের সাক্ষীকে রাগিয়ে দিতে পারেন তাঁর জয়ের পথ সরল হয়ে আসে। যারা পাকা সাক্ষী তাদের সহজে উত্তেজিত করা যায় না। আন্টুনির নামে যতগুলি গান প্রচলিত আছে সেগুলি অনুধাবন করলে এই ধারণা সুদৃঢ় হয় যে মানুষটির মেজাজ ছিল খুব ঠাণ্ডা। উত্তেজনার যেখানে কারণ বর্তমান সেখানেও তিনি শান্ত থাকতেন। গালাগালির উত্তরে তিনি যে সব জবাব দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে মানুষটির শান্ত সংযত অন্তঃপ্রকৃতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

আন্টুনি একবার এক আসরে গাইলেন,—

ভজন-পূজন জানিনে মা জেতেতে
ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া করে তরে মোরে এ ভবে
মাতঙ্গী॥

প্রতিপক্ষ ভোলা ময়রা ভগবতী সেজে উত্তর দিলেন,—

তুই জাত ফিরিঙ্গি জবড়-জঙ্গী।
আমি পারব নারে তরাতে
আমি পারব নারে তরাতে।
যীশুখৃষ্ট ভজগা তুই শ্রীরামপুরের
গীর্জাতে॥

আন্টুনি পাল্টা গাইলেন,—

সত্য বটে বটি আমি জাতিতে ফিরিঙ্গি।
তবে ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন অন্তিমে
সব একাঙ্গি॥

এমন সহজ সুরে এমন উচ্চ ভাবের কথা আর কোনো কবিওয়ালাকে বলতে শুনিনি।

ডাঃ শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি আন্টুনির প্রসঙ্গে অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন। তিনি নাকি আনন্দচন্দ্র মিত্রকে বলেছিলেন যে একবার ভোলা ময়রা ও আন্টুনির কবি-সংগ্রাম তিনি নিজে দেখেছিলেন। "উভয় দিকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এন্টনি যাহা করিতেছিল তাহা কণ্টপ্রসূত। ভোলা যাহা করিতেছিল তাহা বুদ্ধিপ্রসূত। It was a keen contest between labour and genius. প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি, সুতরাং অস্বীকার করবার কারণ নাই। কিন্তু এটা ঠিক যে আমরা আন্টুনির যতগুলি গান আলোচনা করে দেখলাম তার একটিও তো কণ্টপ্রসূত বোধ হল না। বরং ভোলানাথের স্থূল রসিকতার তুলনায় তাঁর রচনা অনেক শিষ্ট অনেক মার্জিত। আমার তো মনে হয় প্রতিভার ওজন বিচারে ভোলার চেয়ে আন্টুনির দিকেই পাল্লাটা কিছু বেশী ঝুঁকবে।

একজন বিদেশী বিধর্মী মানুষ এদেশের মানুষের সঙ্গে এমন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন দেখে আশ্চর্য লাগে। শুধু মানুষ কেন এদেশের সমাজ এদেশের ধর্ম এদেশের দেবদেবীদের সঙ্গে পর্যন্ত তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা

জন্মেছিল। তাই তিনি অনায়াসে মহামায়ার স্তব গেয়ে গেছেন.—

জয়া যোগেন্দ্রজায়া মহামায়া
অসীম মহিমা তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে
যে ডাকে মা তোমায়
তুমি কর তাকে ভবসিন্ধু পার॥
মা তাই শুনে এ ভবের কূলে
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে
বিপদ্‌কালে ডাকি দুর্গা কোথায় মা
দুর্গা কোথায় মা।
তবু সন্তানের মুখে চাইলিনি মা
আমায় দয়া করলি না মা,
পাষাণ প্রাণ বাঁধলি উমা
মায়ের ধর্ম এই কি মা॥
অতি কুমতি কুপুত্রে বলে
আপনিও কুমাতা হলে
আমার কপালে।
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণকুলে
ধর্ম তেমনি রেখেছ।
দয়াময়ী আজ আমায় দয়া করবে কি মা
কোন কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ॥

আন্টুনির সখীসংবাদও মন্দ নয়। একটি গানের কয়েক ছত্র এখানে তুলে দিচ্ছি :

ফিরে এসহে রাধার মান দেখে মান করে
শ্যাম আজ যেও না।
তুচ্ছ নারীর মান কদিন রবে।
তোমার রাই তোমার হবে।
শ্যামহে কেবল কথাই রবে,
রাগের ভরেতে ব্রজাঙ্গনার প্রাণ বধো না॥

বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালীর সমাজ বাঙ্গালীর দেবদেবী সর্বোপরি বাঙ্গালীর ধর্মীয় ট্রাডিশনের সঙ্গে বিদেশী আন্টুনির এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল কেমন করে এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে।

বিদেশী হলেও আন্টুনি এদেশে নবাগত ছিলেন না। এ'র পিতামহই বোধ হয় প্রথম ভারতবর্ষে আসেন। কলকাতায় 'আন্টনি বাগান' নাকি আজ পর্যন্ত তাঁরই স্মৃতি বহন করছে। ঐতিহাসিকেরা বলছেন পিতামহ আন্টুনি ছিলেন বেহালার প্রসিদ্ধ জমিদার চৌধুরী-বাবুদের প্রধান কর্মচারী। এ হল সপ্তদশ শতকের শেষদিকের কথা। জব চার্নক যখন কলকাতায় আসেন চৌধুরীবাবুর জমিদারিতে আন্টুনি তখন কর্মরত ছিলেন। এই আন্টুনির চাকরি ছাড়া ব্যবসাবাণিজ্যও অনেক রকম ছিল। পয়সা-কড়ি অঢেল অর্জন করেছিলেন। দুই পৌত্রকে উত্তরাধিকারী এবং প্রচুর উত্তরাধিকার রেখে তাঁর মৃত্যু হয়। আমাদের কবিয়ালা এই দুই ভাইয়েরই একজন। এ'র নাম Hensman Anthony। এই আদ্য নামটাও যে সেকালকার লোকেরা জানতেন তার প্রমাণ আছে। ভোলা ময়রা একটি গানে তাঁকে 'হেসমু' বলে সম্বোধন করেছেন।—"ওরে হেসমু মালার কুসুম পুষ্প নয় ফুলধনু প্রায়।"

কথাটা যখন উঠল তখন গানের ইতিহাসটাও বলে নিই।

একবার ভোলার সঙ্গে আন্টুনির লড়াই চলছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান চলছে কেউ কাউকে হারাতে পারছেন না। আন্টুনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি তখন এক ছড়া মালা নিয়ে ভোলার গলায় পরিয়ে দিলেন।—এর অর্থ এই হতে পারে যে,—তোমাকেই জয়মাল্য দিলাম, আজকের মত গান এইখানেই শেষ হোক। কিন্তু প্রতিপক্ষের কাছে পাওয়া এই গৌরবের মূল্য দেওয়ার মত মহত্ত্ব ভোলা ময়রার চরিত্রে ছিল না। তিনি মালা পেয়ে যে গান ধরলেন সেটি এই :

ওরে শালা, কি জ্বালা, এ মালা
দিলরে আমায়॥
চক্ষে বহে জল, অবিরল, বিফল
করিল কায়॥
কি জ্বালা এ মালা দিল রে আমায়॥
ওরে হেসমু, মালার কুসুম,
পুষ্প নয় ফুলধনুপ্রায়।
ওরে শালা, কি জ্বালা, এ মালা
দিল রে আমায়॥

হেসমু আন্টুনির জীবনেতিহাস ভাল রকম জানা যায় না। তবে এদেশেরই এক সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে তাঁর যে রোমান্টিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সেটা সত্য বলেই মনে হয়। এই মেয়েটিকে নিয়ে তিনি গোঁদলপাড়ার নিকটবর্তী গরীটির বাগান-বাড়িতে বাস করতেন। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল'-এ এই বাগান-বাড়ির ভগ্নাবশেষের উল্লেখ করা হয়েছে।

সাহেবের এই 'ব্রাহ্মণী'র প্রভাব তাঁর চরিত্রকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। 'বঙ্গভাষার লেখক' থেকে এই প্রসঙ্গে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি,—

"ই'হার প্রেমিকা ব্রাহ্মণকন্যা ম্লেচ্ছ-স্পৃষ্টা হইলেও হিন্দুধর্মে আস্থাবতী ছিলেন, দুর্গোৎসবাদি করিতেন। পূজায় তাহার বাটীতে কবি হইত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যার সম্পর্কে থাকিয়া সাহেব উত্তমরূপে বাঙ্গলা শিখিয়াছিলেন, কবির গান বেশ বুঝিতে পারিতেন। ক্রমে তাঁহার কবির নেশা জমিয়া গেল, তিনি শখের দল করিলেন। প্রেমে পড়িয়া ইতিপূর্বে তিনি বাণিজ্য-ব্যবসায়ে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, এক্ষণে যা কিছু সঞ্চিত বিত্ত ছিল শখের কবির দলে তাহাও নিঃশেষ করিলেন। কাজেই তখন শখের দলকে পেশাদারি করিতে হইল। দলের পসার বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল অর্জিত অর্থে তাঁহার স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতে লাগিল।"

শোনা যায় তিনি যখন প্রথম দল গঠন করেন তখন অন্যের তৈরি গান দিয়েই গাওনার পত্তন হয়। যে বাঁধনদার আন্টুনিকে গান দিতেন তাঁর নাম গোরক্ষনাথ ঠাকুর। টাকা-পয়সার ব্যাপারেই নাকি এ'র সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। কাহিনীটি এই।—

একবার দুর্গাপূজোর সময়ে চুঁচুড়ার কোনো ধনীর গৃহে আন্টুনির দল বায়না নিয়েছেন। গোরক্ষনাথ বলে বসলেন, আমার এ পর্যন্ত যত মাইনে বাকী পড়েছে সব চুকিয়ে দিতে হবে নইলে আর গান লিখছি না। গোরক্ষনাথের কথার ভঙ্গীতে সাহেবেরও মেজাজ গরম হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমার গান না হলেও চলবে। বলে নিজেই গান রচনা করলেন। তাঁর ভবানী বিষয়ক গানের নমুনা আগেই দিয়েছি। সে গানের রচনায় অতি উচ্চ গ্রামের কবিত্ব না থাক কিন্তু আর পাঁচজন প্রথম শ্রেণীর কবিওয়ালার গানের সঙ্গে একাসনে বসবার দাবি অনায়াসেই করতে পারে। শম্ভু মুখুজ্যে আন্টুনির 'labour' দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর 'genius' নজরে পড়েনি। আমাদের মনে হয় তাঁর চরিত্রে উভয়েরই সমন্বয় ঘটেছিল, তার সঙ্গে আর একটি জিনিস যুক্ত হয়েছিল—অখণ্ড আত্মপ্রত্যয়।

অর্ধনারীশ্বর

মণীন্দ্র রায়
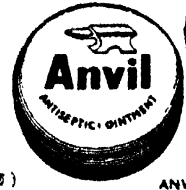
ভালোবাসাই যন্ত্রী এবং যন্ত্র একাধারে,
বেজে ওঠাই আমার পরিচয়।
বয়ঃসন্ধি সকাল থেকে পড়ন্ত যৌবনে
শ্রুতির পথে তাই খুঁজি অন্বয়।
তুমি এবং তোমরা যারা এলে বারম্বার,
কৃতজ্ঞতায় সবার প্রতি জানাই নমস্কার।
বিরল দিনে আকস্মিকের রঙ ধরেছে শুধু,
মেলেনি সেই ওতপ্রোত লয়।

গানের আগে যে শূন্য সেই অনন্তীতির পটে
সুর বুঝি এক দৃশ্যাতীত তুলি,
আনন্দিত যন্ত্রণার উধাও টানে টানে
ফোটায় তার স্বেচ্ছাচারগুলি।
মৃদঙ্গের আঘাত সে যে সমান্তরাল বাধা,
শেখায় তাকে কেন এবং কীসের জন্যে সাধা,
অন্ধকার তেপান্তরে প্রদীপশিখা যেন—
অকম্পিত দিশারী অঙ্গুলি।

ভালোবাসাই যন্ত্রী এবং যন্ত্র একাধারে,
আমি শুধুই প্রতিশ্রুত গান।
তুমি এবং তোমরা যারা এলে ক্রমান্বয়ে
মূল রাগিণীর পাওনি যে সন্ধান।
সে সুর যদি পেতে, তোমার ইন্দ্রসভার নাচে
দেখতে কেমন মৃত প্রেমিক মুহূর্তেকেই বাঁচে।
সঙ্গতি কী মন্ত্র, দেখ, স্বয়ং মহাকাল
অর্ধনারীশ্বরেই খোঁজে ত্রাণ॥

মেঘে মেঘে বেলা হলো

পরেশ মণ্ডল

মেঘে মেঘে বেলা হোলে জানা তো যাবে না। মনে আর
বুকের নিভৃতে ঢেউ; তবু যদি মুখ বন্ধ রাখো
খাঁচারুদ্ধ পাখিটির মতো, কোনোদিন পারাপার
হবে না সহজ। মনে মনে যতো বৃন্দাবন আঁকো,-

উধাও আকাশ, খোলা ক্ষেত, নদী, পাবে নাতো ছুঁতে;
কেবল জটিল হবে আপনার ক্ষতের অনলে
ডুবে যেতে যেতে। দ্যাখো—এখনো গঙ্গার সমতলে
উর্বর মাটির ঝাঁক স্বপ্ন দেখছে নির্জলা মরুতে।

অনেক দিনের কথা। তারপর হারানো পথিক
চড়াই উৎরাই পার হোয়ে বুঝি পথ পেলো খাদে।
আমনের ভরা তরী ধীরে ধীরে তীরের কিনারে

একটি বাসর তাজা করেছে কেবল। মানসিক
দ্বন্দ্বে ভিজে অরসিক নাগরিক মরেছে অবাধে,
মুক্তকল্প তুমি আজ অকপটে এলে অভিসারে।

অপ্রেমিক

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তখন অন্ধকার ছিল। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। অন্ধকারে ভিজতে ভিজতে বেরিয়ে গেছে নির্মলেন্দু। অণিমার যখন ঘুম ভাঙে তখন বৃষ্টি নেই। তখন নির্মলেন্দুও নেই। গাছ ভিজে। বারান্দা ভিজে। বাতাসও। নির্মলেন্দু কোথাও নেই।

অণিমা জানত, একদিন তাকে ছেড়ে, সংসার ছেড়ে দূরে কোন আশ্রমে কিম্বা পাহাড়ে কি তীর্থে চলে যাবে নির্মলেন্দু। সে থাকবে না। কিছুতেই না।

শীত-শীত বাতাসে কান্না ছিল। অণিমা কাঁদল। শরীর ভাল ছিল না নির্মলেন্দুর। বুকে ব্যথা ছিল। কাশি ছিল। অন্ধকারে জলে ভিজতে ভিজতে কেন সংসার ছেড়ে গেল ও!

নির্মলেন্দু আর ফিরবে না। কিন্তু সে আছে কোথাও না কোথাও। সে বেঁচে আছে। ঘরে থাকতে পারছিল না অণিমা। বাইরে যেতেও ভয় লাগছিল। নির্মলেন্দু কোথায় আছে?

সে কলকাতায় নেই। কাছাকাছি কোথাও না। মঠ মন্দির আশ্রম—না নেই। একটা কথা অণিমা জানতে চায়, জানবেই—নির্মলেন্দু যেখানেই থাক, সুখে আছে, ভাল আছে। যাবার আগে তাকে সে বলে গেল না কেন? কেন!

আকাশে ছাড়া ছাড়া মেঘ ছিল। গাছের পাতায় রোদ খেলছিল। বারান্দায় দোলানো আঁকড়ে অনেক চড়ুই দুলছিল—ডাকছিল। অণিমা দেখল না। শুনল না। সে সুতপাকে শক্ত করে ধরে ছিল—নীরেনের সঙ্গে কথা বলছিল। তার স্বর রুগির মতো মনে হচ্ছিল।

"আমাকে শুধু একটি খবর এনে দিন, ও বেঁচে আছে—"

"উনি নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। বেঁচে না থাকলে এতদিনে আমরা জানতে পারতাম।"

"কাঁদিস না অণু," সুতপা সান্ত্বনা দিল; আশ্বাস দিল, "ও তোকে ঠিক খবর এনে দেবে দেখিস। উনি ফিরে আসবেনই—"

"না না, আমি ওকে দেখতে চাই না, সংসারে টানতে চাই না। ও না ফিরে আসুক—কোথায় আছে, কেমন আছে, শুধু—"

"উনি ভাল আছেন—"

"দেওঘরে অনেক আশ্রম আছে না? আপনি কখনও কাশীতে গেছেন? মুরাড়ি? আচ্ছা, অসীমানন্দর নাম শুনেছেন? আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে? আসানসোলের কাছাকাছি ও হয় তো আছে। বেলুড়ে নখদর্পণে দেখা গেছে—"

"অণু, তুই এমন করিস না। খবর পাওয়া যাবেই। আয় অনু, বস।"

অণিমা শুনল না। বসল না। স্থির হতে পারল না। আবার বলল। বারবার বলল, শুধু একটা খবর তার চাই—তার স্বামী বেঁচে আছে। তারপর চলে গেল। কোনদিকে তাকাল না। যাবার সময় দেয়ালে হাত রেখেছিল। চেয়ারে ধাক্কা খেয়েছিল। চটি পায়ে দেবার কথা মনে ছিল না। ওকে একটা পাগল মেয়ের মতো দেখাচ্ছিল।

বারান্দা থেকে অণিমাকে আর দেখা গেল না। সুতপা ঘরে এল। হুস হুস শব্দ করে পাখি তাড়াল। দেয়ালে টাঙানো ওদের বিয়ের ছবিটা বেঁকে গিয়েছিল, সুতপা ঠিক করে দিল। নীরেনের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "খুঁজবে?"

সুতপার স্বর শুনে নীরেন তাকে দেখল। চমকাল। সুতপাকে এখন অন্য রকম মনে হল নীরেনের। ও বলল, "বললাম তো খুঁজব—"

"পুলিশ কিছু করে না?"

অবাক হয়ে নীরেন আস্তে আস্তে বলল, "এখনও তো কিছু করতে পারেনি—"

"জেলে পুরতে হয়, বুঝলে? বাবু সাধু হয়েছেন! বিয়ে করবার সময় মনে ছিল না? ন্যাকা! আমি যদি অণিমা হতাম—"

অনেকক্ষণ পর নীরেন হাসল, "আমি কিন্তু কিছুতেই নির্মলেন্দু হতাম না।"

পাখিরা আবার ভয়ে ভয়ে ঘরে আসছিল। সুতপা দেখছিল। তাড়াল না। সংসার তাকে টানছিল। ও কাপ ভাঙার শব্দ শুনল। নতুন কাপটা বোধহয়। তিন-চারদিন আগে কিনেছিল। এখনও বাজার আসেনি। ফলওলা বাইরে ডাকছে। খবরের কাগজ হয়তো দরজার কাছেই পড়ে আছে। আজ নীরেন বেরিয়ে গেলে ঝুল ঝাড়তে হবে। ইলেকট্রিক ইস্তিরিটা সারানো দরকার।

"অণিমার চেহারা দেখলে! কী হয়ে গেছে!"

"তুমি ওকে কিছুদিন এখানে থাকতে বললে না কেন?" নীরেন বাইরে তাকাল। পেয়ারা পাতা চিকচিক করছিল। নীরেনের সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করছিল। প্যাকেটটা খাবার ঘরে টেবিলের ওপর পড়ে ছিল। নীরেন সুতপার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমারও ভাল লাগত। আমার ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে।"

"কোথায় যাবে?"

"অণিমা যে-সব জায়গায় নাম করল, দেওঘর কাশী মুরাড়ি—তার আগে কলকাতায় আমি নিজে একবার ভাল করে দেখব—"

সুতপার মুখ কোমল হল। চোখ বিষণ্ণ হল। অণিমার কথা মনে করে ওর স্বর করুণায় ভারী হল, "বেচারী!"

এখন বাজার এসেছে। রান্নাঘরে বাসন ধোয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। নীরেনের দাড়ি কামাবার গরম জল হয়ে গেছে। সুতপা নীরেনকে আর চা দেবে না। সে এ ঘরে থাকবে না। তোয়ালেটা ঠিক জায়গায় আছে। আয়নায় ঝড়ের ধুলো লেগে আছে। বিছানার চাদরে কালির ফোঁটা পড়েছে। আজ কাচাতে হবে।

বাইরে কড়া রোদ ছিল। থেকে থেকে হাওয়া দিচ্ছিল। সুতপা জানলা-দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ওর ঘুম আসছিল না—অনিমার কথা মনে হচ্ছিল। সুতপার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। ওর জল খেতে ইচ্ছে করছিল।

এখনও অণিমা বেঁচে আছে। সুতপার বুক কাঁপছিল। ওর ভাবনা হচ্ছিল, নীরেনও নেই—নিখোঁজ হয়ে গেছে নির্মলেন্দুর মতো। একদিন ভোর-বেলা ঘুম ভেঙে যদি সুতপা দেখে নীরেন কোথাও নেই—সুতপা এপাশে-ওপাশে গড়াল। শুয়ে থাকতে পারল না। অনেক ঠান্ডা জল খেল।

খাবারঘরের জানালা খোলা ছিল। সুতপার গরম লাগছিল। ফুল-কাটা কলসীর মত কালো কুঁজোর গায়ে ও হাত রাখল। ঠান্ডা। সুতপার ভাল লাগল না। ও হাত সরিয়ে নিল। কুঁজোর মুখে একটা ঢাকা ছিল। সুতপা খুঁজে পেল না। ভাল করে খুঁজল না। ওর ভয় লাগল। নীরেনকে খুঁজতে হলে সুতপা বাঁচত না। অণিমা খুঁজছে—বেঁচে আছে। সুতপা পারত না।

এখন নীরেন ফিরবে না। আজ ওর আসতে দেরি হবে। ও নির্মলেন্দুর খোঁজ করবে। সুতপা শোবার ঘরের জানালা-দরজা খুলে দিল। পর্দা সরিয়ে রাস্তা দেখল। গাছ দেখল। বাড়ি দেখল। আকাশ দেখল। ওর ভাল লাগছিল না। সুতপা খাটে গড়াল। ছটফট করল। ভাবল, অণিমার কাছে যাবে। একা-একা রাস্তায় যেতে সুতপার ভয় লাগছিল।

নীরেন ফিরল দেরি করে। সুতপা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। নীরেন ট্যাক্সি থেকে নামল। ওর সার্ট ঘামে ভিজে গিয়েছিল। প্যান্ট গোল-গোল দেখাচ্ছিল। চুল উড়ে-উড়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল।

নীরেনকে দেখে সুতপা সুস্থ হল। ওর ভয় ভেঙে গেল। সুতপা জিজ্ঞেস করল, "এত দেরি?"

"মিসিং স্কোয়াডে গিয়েছিলাম," জুতো খুলতে-খুলতে নীরেন বলল, "ওরা খুব করল। এক অফিসার জীপ নিয়ে আমার সংগে সংগে ঘুরল। অনেক আশ্রম দেখলাম—"

"কিছু হল না?" সুতপার স্বর কাঁপছিল।

নীরেন বলল, "কলকাতায় বোধহয় নেই। কাল আরও দু-চার জায়গায় দেখব—"

সুতপা ছোট নীল তোয়ালে নীরেনের হাতে তুলে দিয়ে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "পুলিশ কী বলে?"

"বলে, কেউ হারিয়ে গেলে খোঁজা যায়, কিন্তু কেউ ইচ্ছে করে লুকিয়ে থাকলে তাকে বের করা খুব শক্ত—"

সুতপার চোখ হঠাৎ ভিজে উঠছিল : ভারী হচ্ছিল। নীরেন বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল। সুতপা মুখ তুলে বলল, "তাহলে?"

নীরেন ওর কথা শুনতে পেল না। সুতপা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল বাথরুমের আলো জ্বলে উঠল। জলের শব্দ হল। স্টোভে চায়ের জল ফুটছিল। কেটলির ঢাকনা উঠছিল—নামছিল। সুতপা ফুলকাটা কালো কুঁজো দেখল। কেটলি ধরল। সংসারের সব জিনিসের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল—ঠান্ডা-ঠান্ডা মনে হল।

নীরেনের চা ঢালতে-ঢালতে সুতপা বলল, "কোন খবর পাওয়া যাবে না?"

"খবর আনতেই হবে। তোমার বন্ধুর যা চেহারা দেখলাম!"

সুতপা বলল, "অণু আর বেশিদিন বাঁচবে না। তাড়াতাড়ি একটা কিছু কর—"

নীরেন চামচ দিয়ে গরম অমলেট ছিঁড়ছিল। মুখে তুলতে গিয়ে থামল। সুতপার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার এক পিসি ছিল। আপন না। অনেক দূর সম্পর্কের। একটিই ছেলে ছিল তার। কুড়ি-একুশ বছর বয়সে সেই ছেলে এক-দিন সন্ন্যাসী হয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল—"

চায়ের গরম কাপ শক্ত করে ধরল সুতপা। অধীর হল। নীরেনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল, "ছেলে আবার ফিরে এসেছিল?"

"না। আমাদের ছেলেবেলার কথা। কিন্তু পিসির চেহারা আমার পরিষ্কার মনে আছে—"

"বল?"

"কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল পিসি! নিজেও সংসারে আর থাকতে পারল না। তীর্থে-তীর্থে একা-একা ঘুরে বেড়াত। বোধহয় ভারতবর্ষের সব তীর্থই তার দেখা হয়ে গিয়েছিল—"

"তারপর?" সুতপার চোখ ছলছল করছিল। নীরেনের কথা শুনতে-শুনতে অণিমার মুখ মনে হচ্ছিল। ওর ভাল লাগছিল না।

নীরেন কপালের ঘাম মুছল। পাখার দিকে তাকাল। বাইরে হাওয়া খেলছিল

না। নীরেন অল্প হেসে বলল, "যেখানে যেত পিসি, অল্প বয়সের কত সন্ন্যাসী দেখত, অনেকক্ষণ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত—বলত, "বিশু না কি রে বাবা?"

সুতপা পিসির কথা ভাবছিল। নির্মলেন্দুর কথা ভাবছিল। গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর ভাসা-ভাসা মুখ ওর মনে হচ্ছিল। দেয়ালে পাখার ছায়া পড়েছিল। ছায়া কাঁপছিল। গল্পটা সুতপার শুনতে ইচ্ছে করছিল না। ও অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল।

নীরেন বলল, "এমন করে বিশুকে খুঁজতে-খুঁজতে দশ-বারো বছর পরে পিসি একদিন মারাই গেল—"

নীরেন শেষটা আগেই বলেছিল। সুতপা চমকাল। নীরেনকে দেখল। ওর চা খেতে ইচ্ছে করল না। চা জুড়িয়ে গিয়েছিল। আলো কম-কম মনে হচ্ছিল। বাল্বে ধুলো জমেছিল।

সুতপার চায়ের কাপ ঠেলে দিয়ে বলল, "তুমি কবে কলকাতার বাইরে যাবে?"

"শিগগিরই যাব," নীরেন অল্প ভেবে বলল, "পরশু কিম্বা তারপরের দিন। ছোট্ট স্যুটকেসটা খালি করে রেখ—"

সুতপা জিজ্ঞেস করল, "কবে ফিরবে?"

"আট-দশদিন তো লাগবেই।"

সুতপা দেয়ালে ছায়া দেখল। খালি কাপ দেখল। দূরে ট্রাম-ডিপোয় বড় বড় টিন ফেলার ঝম ঝম শব্দ হচ্ছিল। সুতপা ট্রেনের কথা ভাবছিল। নীরেন দূরে সরে যাচ্ছিল—হারিয়ে যাচ্ছিল। সুতপা পিসির কথা ভাবছিল। বিশুর কথা ভাবছিল। অণিমা আর নির্মলেন্দুর কথা ভাবছিল।

সুতপা ফস্ করে বলে উঠল, "আমিও যাব।"

"কোথায়?"

"তোমার সঙ্গে।"

নীরেন হাসল। বলল, "তোমার সংসার ছেড়ে তুমি অতদিন থাকতে পারবে না—"

"পারব।"

"কখন কোথায় থাকব ঠিক নেই," নীরেন আস্তে আস্তে বলল, "অনেক অসুবিধা। তোমার না যাওয়াই ভাল।"

সুতপা ঠাণ্ডা কাপ চেপে ধরে আর একবার বলল, "আমি যাব।"

নীরেন উঠল। সিগ্রেট ধরাল। সুতপাকে বোঝাল, "তুমি গেলে কাজ হবে না। আমার সুখ-সুবিধার কথা ভাববে। কিছু করতে দেবে না। দুদিন পরেই ফিরে আসতে চাইবে।"

সুতপা আস্তে আস্তে কথা বলল। কিন্তু ওর স্বরে ঝাঁজ ছিল, "আমি অতদিন একা থাকতে পারব না।"

"অণিমাকে এনে রাখলেই তো হয়?"

সুতপা মাথা নেড়ে বলল, "না। ওর পাগল শাশুড়ী আছে না?"

নীরেন খুশী হল না। ও শোবার ঘরে চলে এল। পাখা চালাল। খাটে গড়াল। নীরেন শুয়ে শুয়ে সিগ্রেট খাচ্ছিল। বারান্দায় সবুজ বেতের চেয়ারে সুতপা বসে ছিল। ওর মুখ থামছিল। ট্রাম ডিপোর ঝমঝম শব্দ হচ্ছিল। সুতপা এক-একবার নীরেনকে দেখছিল।

বেশি লোক ছিল না। এক প্রৌঢ় বসে-বসে ঢুলছিল। নীরেন চুপচাপ কী ভাবছিল। ট্রেন খুব জোরে চলছিল।

[illegible] শব্দ হচ্ছিল। সুতপা একবার নীরেনকে দেখছিল—একবার বাইরে তাকাচ্ছিল। এঞ্জিনের ঘন কালো ধোঁয়া কেঁপে কেঁপে ওপরে উঠছিল—ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছিল। সুতপা দেখছিল, দূরে ডোবা পুকুর ধানক্ষেত বাঁশঝাড় ছবির মতো সরে-সরে যাচ্ছিল।

সুতপার কিছু ভাল লাগছিল না। কলকাতার জন্যে, ওর সংসারের জন্যে মন কাঁদছিল। সুতপার মনে হচ্ছিল তার সংসার দূরে—আরও দূরে সরে যাচ্ছে। ওর মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল। রামু কী করবে কে জানে। টেবিল-চেয়ারে পুরু ধুলো জমবে। ঝড়-বৃষ্টি এলে দরজা-জানালা বন্ধ করার কথা হয়তো রামুর খেয়াল থাকবে না। পর্দাগুলো ভিজে যাবে। ফুলদান ভাঙবে। কবে আবার তার সংসারে ফিরে যেতে পারবে সুতপা!

সুতপাকে অনেকক্ষণ দেখতে-দেখতে নীরেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "সেই থেকে কী ভাবছ তুমি?"
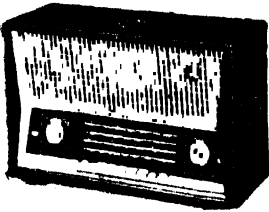
সুতপা সোজা হয়ে বসে বলল, "দেখ, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে।"

"কী?"

সুতপা বিব্রত হয়ে বলল, "গয়লাকে বারণ করা হল না। রামুটা কি বুদ্ধি খরচ করে কিছু করবে! অত-অত দুধ রোজ নষ্ট হবে—"

"আশ্রমে যাচ্ছ", নীরেন হালকা স্বরে বলল, "একটু অন্য দিকে মন দাও সুতপা—এসব তুচ্ছ কথা এখন ভাবতে নেই।"

"না, ভাবতে নেই—তোমার আর কী!"

নীরেন হাসল, "আমি তো বারবার তোমাকে আসতে বারণ করেছিলাম। কথা শুনলে না। সারাক্ষণ আমার কাছে শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর করবে—"

"বেশ করব", সুতপা রাগ করে বলল, "ঠিক সময় চা না পেলে কেমন অবস্থা হয় তোমার? এক মিনিট দেরি হলে কী কর তুমি?"

"তুমি কি আমার মুখের সামনে চায়ের কাপ ধরে দিতে আশ্রমে যাচ্ছ? কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গিতে নীরেন বলল, "আশ্রমে গিয়ে বাড়াবাড়ি কর না—লোকে নিন্দে করবে কিন্তু—"

"থাম, থাম আমাকে কিছু শেখাতে এসো না।"

একটা বড় স্টেশনে ট্রেন থামল। চা-ওলা বারবার ডেকে যাচ্ছিল। এখন নীরেনের চা খাবার সময়। সুতপা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল। ইচ্ছে করেই চা-ওয়ালাকে ডাকল না। নীরেন সব বুঝতে পারছিল। সুতপার দিকে তাকিয়ে আপন মনে হাসছিল।

ট্রেন ছাড়বার সময় হল। ঘণ্টা বাজল। বাঁশি শোনা গেল। সুতপা এদিক-ওদিক দেখল। চা-ওলাকে খুঁজল। পেল না। তখন নীরেনের দিকে তাকিয়ে কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করল, " চা খাবে না?"

"তুমি তো দিলে না?"

"ন্যাকামী হচ্ছে? খোঁটা মারবার বেলা খেয়াল থাকে না?" মুখ বাড়িয়ে সুতপা ডাকল, "চা, এই চা—তুমি একবার ডাকো না গো!"

"থাক থাক, দরকার নেই—"

"না, দরকার নেই—তারপর সারাদিন মুখ ভার করে বসে থাকবে। এই "চা—" এক হাত তুলে সুতপা চিৎকার করে ডাকল।

ছুটতে ছুটতে খাকী সার্ট-পরা একটা ছোকরা এল। দুটো ভাঁড়ে কেটলি থেকে খুব গরম চা ঢেলে এক-একটা করে সুতপার হাতে দিয়ে বলল, "বারো নয়া পয়সা—"

সুতপা একটা ভাঁড় এগিয়ে দিল নীরেনের সামনে। কথা বলল না। ছোট ব্যাগ খুলে চা-ওলাকে দাম দিল। ঠিক তখন ট্রেনটা দুলে উঠল। আর একটু হলেই গরম চা পড়ত সুতপার শাড়ীতে। নীরেনের দিকে সে তাকাল না। থেমে থেমে চা খেতে লাগল। নীরেন তখনও অল্প-অল্প হাসছিল।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছিল। সুতপা দেখল, নীরেনের গায়ে রোদ লাগছে। ওর মুখ লাল-লাল দেখাচ্ছে। সুতপার ইচ্ছে হল, ওকে এদিকে এসে বসতে বলে, কাঠটা নামিয়ে দিতে বলে। কিছু বলতে পারল না সুতপা। সে অন্য কথা ভাবছিল।

সুতপা ভাবছিল—যেখানে যাচ্ছে সেখানে না পৌঁছতেই তার মনে হচ্ছিল—আবার কবে এমন করে এই ট্রেনটাই কলকাতার দিকে যাবে। মোটে কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু সুতপার মনে হচ্ছিল, সে যেন কতদিন তার চেনা-চেনা জিনিসগুলো দেখেনি! খাট বেড-কভার কাচের বাসন আয়না আলনায় তার শাড়ী, নীরেনের কোট-প্যান্ট—সব সুতপার চোখের সামনে ভাসছিল।

কাল কি হবে! কোথায় থাকবে! আট-দশদিন অনিয়ম করে-করে নীরেনের স্বাস্থ্য ভাঙবে। নির্মলেন্দুর ওপর সুতপার রাগ হচ্ছিল। তাকে খোঁজবার ইচ্ছেও আর ছিল না। নির্মলেন্দুকে খুঁজতে আসেনি সুতপা। অনিমার কথা মনে করেও না। একটা নিষ্ঠুর সত্য সুতপার মনে জ্বলছিল—সে নীরেনের জন্যেই এসেছে। সুতপা নীরেনকে চোখে-চোখে রাখবে। অনিয়ম করতে দেবে না। অভ্যাসমতো তার দরকারী সব জিনিস ঠিক সময় হাতের কাছে এগিয়ে দেবে। কিন্তু নতুন নতুন জায়গায় তা কেমন করে সম্ভব হবে! সুতপার ভাল লাগছিল না। তার নিজের সাজানো সংসারের কথা মনে হচ্ছিল। সুতপা নীরেনকে দেখছিল।

মুরাড়ি স্টেশনে ট্রেন দু' মিনিট দাঁড়াল। খুব নিচু প্ল্যাটফর্ম। সুতপা সাবধানে আস্তে আস্তে নামল। নীরেন ওকে ধরলো না। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ট্রেন ধরতে এসেছিল। নীরেন তাদের মুখ দেখছিল। সে নির্মলেন্দুকে খুঁজছিল।

আধ মাইল দূরে আশ্রম। প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে এসে সুতপা আর নীরেন হেঁটে-হেঁটে যাচ্ছিল। লাল মাটি। ঘুঘু ডাকছিল। হু-হু হাওয়ায় লাল ধুলো উড়ছিল। ধানের ক্ষেতে পিঙ্গল আভা খেলছিল। পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ে একটা ভাঙা মন্দির ছিল।

ছোট স্যুটকেস মুখের কাছে এনে নীরেন সিগ্রেট ধরাল। সুতপার দিকে তাকিয়ে হাসল, "সেই জেদ করে এলে! এখন কষ্ট হচ্ছে তো? আরও অনেক দূর হাঁটতে হবে।"

সুতপার কষ্ট হচ্ছিল না। তার হাঁটতে ভাল লাগছিল। সে কথা বলল না। সুতপা বড় আকাশ দেখছিল। বক

উড়ছিল। সুতপার নাকে মাটির মিষ্টি গন্ধ লাগছিল। ওর মুখে খুশীর রেখা ফুটেছিল। সে অনেকক্ষণ পাহাড়ের ওপর ভাঙা মন্দির দেখছিল। আর দেখতে-দেখতে এই পাখি-ডাকা ধুলো-ওড়া দূরের নির্জন বিকেল সুতপাকে তার শৈশবের ভূ-মণ্ডলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। তার আবার লুকোচুরি খেলতে ইচ্ছে করছিল।

অনেক, অনেক আগে—হাঁটতে-হাঁটতে সুতপা ভাবছিল, বোধহয় উনিশ-কুড়ি বছর পার হয়ে গেল—তার বাবা যখন পাবনায় ছিলেন, খুব বড় একটা বাগান ছিল তাদের বাড়িতে। দীঘি ছিল। আর একটু দূরে, শ্যাওলা-জমা দীঘির পিছনে একটা পুরনো শিব-মন্দির ছিল। মা বরাবর সাবধান করে দিতেন, "ওদিকে কখনও যাস না, সাপ-কোপ আছে—"

দুপুরবেলা মা যখন ঘুমিয়ে পড়তেন আর চিনু-মিনুরা তাকে ডাকত লুকো-চুরি খেলবার জন্যে তখন মার কথা

শুনেত না সুতপা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পা টিপে-টিপে সেই স্যাঁত-স্যাঁতে ভাঙা শিব-মন্দিরে লুকিয়ে থাকত। চিনু-মিনুরা তাকে খুঁজে পেত না। আর অনেক পরে মন্দিরে যখন খস খস শব্দ হত, এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পড়ত সুতপার মাথায়—সে ভয় পেত। বেরিয়ে আসত। কিন্তু অনেকক্ষণ লুকিয়ে থাকবার অমন জায়গা সুতপাদের বাড়িতে আর ছিল না। সে আবার যেত সেখানে।

"থাম, থাম, আমাকে কিছু শেখাতে এসো না।"

বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছিল। আকাশে পাখির চক্র হারিয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারের আগে চার-পাশ ভিজে-ভিজে সবুজ-সবুজ মনে হচ্ছিল। আশ্রমের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। সুতপা তখনও ভাঙা মন্দির দেখছিল। তার সেখানে লুকিয়ে থাকার ইচ্ছে হচ্ছিল। নীরেন তাকে খুঁজবে, অনেকক্ষণ খুঁজবে—খুঁজে পাবে না! নীরেনের বিচলিত মুখ ভাবছিল। তার আনন্দ হচ্ছিল।

অন্ধকারের মুখে-মুখে আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে নীরেন সুতপাকে বলল, "এখানে কাউকে জানতে দিও না আমরা নির্মলেন্দুকে খুঁজতে এসেছি। বলবে, আশ্রম দেখতে এসেছি—বুঝলে?"

নীরেনের কথা শুনে সুতপা চমকাল। ঠিক এখন যেন ঘুম থেকে জাগল। কলকাতার কথা ওর মনে ছিল না। সে নির্মলেন্দুর কথাও ভুলে ছিল। সুতপার মনে তার নিজস্ব একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠছিল।

নীরেনের সঙ্গে পা ফেলে-ফেলে সুতপা আশ্রমের ভেতরে ঢুকল। খুব বড় আশ্রম। ছোট-বড় অনেক গাছ। ধূপের গন্ধ আসছিল। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ অনেক দূরে ভেসে যাচ্ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। বটের পাতায় সন-সন শব্দ হচ্ছিল। ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। দূরে-দূরে জোনাকি উড়ছিল।

সুতপার মুখে একটা ম্লান ছায়া কাঁপছিল। তার এই আশ্রমে প্রবেশের অধিকার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগছিল। নীরেনের শেখানো মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। নীরেনের পাশে পাশে চলতেও সুতপার সংকোচ হচ্ছিল। সে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল।

আশ্রমে অনেক আলো জ্বলছিল। একটা খুব বড় বটগাছের নিচে পাষাণ-বেদীতে ভক্তদের ভিড় ছিল। গোপালের মূর্তি দেখা যাচ্ছিল। কীর্তন হচ্ছিল। একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নীরেন কথা বলছিল। কথা বলতে-বলতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। নীরেন নির্মলেন্দুকে খুঁজছিল। সন্ন্যাসী সুতপাকে বটের পাষাণ-বেদীতে বসতে বলল। ওদের জিনিস তুলে নিল। নীরেনকে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

সুতপা বসল পাষাণ-মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে। ও গোপালের মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিল। একমনে গান শুনছিল। অল্প পরে টুপ করে শব্দ হল। সুতপা কাঁপল। ওপরে তাকাল। অনেক ওপর থেকে তার মাথায় বটের পাতা ঝরে পড়ল। সুতপার মুঠি খস-খস করল। ও হাত কপালে ঠেকাল। বুকের কাছে আনল। সুতপা গোপালকে দেখল। পাবনায় ভাঙা শিব-মন্দিরের কথা আবার তার মনে হল—তার মাথায় ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা পড়েছিল।

অনেক পরে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে নীরেন বলল "না, এখানে নেই।"

সুতপার চোখে ঘোর ছিল। ও নীরেনের কথা বুঝল না। জিজ্ঞেস করল, "কী নেই?"

"নির্মলেন্দু এখানে নেই", নীরেন সুতপার বিহ্বল মুখ দেখল। হেসে বলল, "এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলে?"

"না না, আমার খুব ভাল লাগছে।"

"তোমার চেহারা দেখে সবই বুঝতে পারছি," নীরেন চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে সুতপার আরও কাছে দাঁড়াল, "এক ঘরে থাকা হবে না। তোমার ঘর ওই দিকে—শুধু শুধু কষ্ট করে এলে! সব আশ্রমেই আলাদা থাকতে হবে।"

সুতপা মুখ বাড়িয়ে তার ঘর দেখল। একটু দূরে আর একটা গাছের পাশে ছোট ঘর। সাদা দেয়াল। সবুজ দরজা। নীরেন যে কথা বলল তা সুতপার মনে ছিল না। তার বই-এ পড়া তপোবনের কথা মনে হচ্ছিল। একটা পুকুর দেখা যাচ্ছিল। চাঁদের ম্লান আলায় জল চিক-চিক করছিল। সুতপা সেদিকে যাচ্ছিল।

নীরেন তার কাছে এসে বলল, "আমি সব ঘরে দেখেছি। নির্মলেন্দু এখানে কোথাও নেই। কালই চলে যাব।"

"কাল কখন?"

"সাড়ে এগারোটায় ট্রেন। কাল অন্য আশ্রমে যাব।"

সুতপা চুপ করে থাকল। এখন অণিমার জন্যে তার দুঃখ হচ্ছিল না। সে নির্মলেন্দুকে ঈর্ষা করছিল। নীরেন তার পাশে-পাশে হাঁটছিল। সুতপার ভাল লাগছিল না। তার একা থাকবার ইচ্ছা হচ্ছিল।

সুতপার ছোট ঘরে দুটো জানলা ছিল। একটা লণ্ঠন টিম-টিম করছিল। তেল ফুরিয়ে আসছিল। সুতপার ভয় করছিল না। অন্ধকারে মনে মনে সে গোপালের মূর্তি দেখছিল। তার কানে সধ্যার কীর্তনের সুর বাজছিল।

সুতপার আজ কোন কাজ ছিল না। তার সব কর্তব্য যেন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আশ্রমের অখণ্ড নীরবতায় তার গোটা সংসার মিশে গিয়েছিল হারিয়ে গিয়েছিল। বিশ্রামের পূর্ণ আনন্দ সুতপার মনে অদ্ভুত অনুভূতি জাগাচ্ছিল। আর তার দেহমন শিমুল তুলোর মতো হালকা হয়ে যাচ্ছিল—অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছিল।

শিমুল তুলোর কথা মনে হল সুতপার। বাবা তখন বহরমপুরে ছিলেন। মা ঘুমিয়ে পড়বার পর চৈত্রের নির্জন দুপুরে প্রাচীন বটের তলায় সুতপা চানাচুরওলার আলায় দাঁড়িয়ে থাকত। তখন শিমুল তুলো উড়ে আসত তার হাতের কাছে। সুতপার আনন্দ হত। সে হাত বাড়াত। ধরতে যেত। হাওয়ায় ভেসে-ভেসে হালকা শিমুল সরে যেত। ওপরে উঠে যেত। হারিয়ে যেত। সুতপা তার নাগাল পেত না।

দপ করে লণ্ঠন নিভে গেল। অন্ধকার আরও নিবিড় মনে হল। তক্ত-পোশের কাছে জলের কুঁজো ছিল।

সুতপার তৃষ্ণা ছিল না। গাছের পাতায় খস খস শব্দ হল। সুতপা পিসির ছেলে বিশুর কথা ভাবল। নির্মলেন্দুর কথা ভাবল। ওর মুঠিতে বটের পাতা ছিল।

দূর বনের মাথায় পঞ্চমীর চাঁদ উঠছিল। জানলা দিয়ে পাহাড়ের ওপর ভাঙা মন্দির ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় দেখা যাচ্ছিল। সুতপা গভীর নিশীথে একা-একা সকলের অলক্ষ্যে সেখানে উঠে যেতে চাচ্ছিল।

আশ্রমে কোন শব্দ ছিল না। সুতপার ঘুম আসছিল না। তার মনে হচ্ছিল বায়ু-কণিকায় শব্দের প্রচণ্ড তরঙ্গ খেলছে। সে-শব্দ সুতপার সমুদ্র-গর্জনের মতো মনে হচ্ছিল। সে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছিল। চন্দ্রকিরণ-ধৌত অপরূপ তরঙ্গমালা তাকে দোলা দিচ্ছিল। সুতপাকে সমুদ্র ডাকছিল। পাহাড় ডাকছিল—যে পাহাড়ে পুরনো ভাঙা মন্দির ছিল। আশ্রমের অখণ্ড নীরবতা, রাতের নির্জন অন্ধকারে নিঃসঙ্গ সুতপাকে তার প্রাত্যহিক কর্ম থেকে, সংসার থেকে, প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। সুতপা নির্মলেন্দুর মতো হারিয়ে যাচ্ছিল।

খুব ভোরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সুতপা নীরেনকে খুঁজছিল। তার পায়ে চটি ছিল না। তার চোখে-মুখে রাত জাগার ক্লান্তি ছিল। নীরেন পুকুরের দিকে যাচ্ছিল। সুতপা দ্রুত পায়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

তাকে দেখে নীরেন হঠাৎ থামল। অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে? ঘুম হয় নি, না?"

সুতপা অনেকক্ষণ নীরেনকে দেখে এলোমেলো স্বরে বলল, "একটুও ঘুম হয় নি। আমার খুব ভয় লাগছিল—"

নীরেন অপ্রসন্ন হল। মুখ দিয়ে বিরক্তির একটা অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করল, "কেন এলে তুমি আমার সঙ্গে?"

সুতপা ভিজে ভাঙা স্বরে বলল, "আমাকে কলকাতার ট্রেনে তুলে দাও। তুমি যে-আশ্রমে খুশি যাও। আমি আর কোথাও যাব না। আমি বাড়ি যাব।"

সুতপাকে দেখতে-দেখতে নীরেন শুধু বলল, "বাঃ!"

হাওয়ায় পুকুরের জল টলোমলো করছিল। পাহাড়ের গায়ে কাঁচা রোদ খেলছিল। সুতপা কোনদিকে দেখল না। গোপালের মূর্তির দিকে না। ভাঙা মন্দিরের দিকে না। ও মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। সুতপাকে অণিমার মতো দেখাচ্ছিল।

দাঁড়াও,
মজা দেখাচ্ছি'
মালয়ের
জঙ্গলে
উত্তর বোর্নিও
সারাওয়াক
মালয়েশিয়া

দুটি কুমীরের মৃত্যু

ভোলানাথ বিশ্বাস

অনেকদিন থেকেই কিছু লিখবো ভাবছি। কিন্তু বসলেই কি আর লেখা যায়! লিখতে বসে দেখলুম নিজের শটগানটা হাতে যেমন খেলে কলমটা ঠিক সে রকমটা খেলে না। তার ওপর আবার শিকার-কাহিনী।

বনে বনে ঘুরেছি অনেক। বন-জংগলের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারিনে। ছুটে যাই। তখন আর কোন খেয়াল থাকে না। সেখানে যে মৃত্যুফাঁদ পাতা আছে সে কথা আর মনে পড়ে না।

তেরশ' ছত্রিশ সালের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। তখন আমরা ভাগলপুর জেলার সুপৌল থানার গোনয়া গ্রামে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে গোনয়া মহিমান্বিত। গোনয়াকে ঘিরে বয়ে চলেছে তিলযুগা, বেতি আর পাতালিয়া। বালুচরে নল-খাগড়ার ঘন ঝোপ। কাশবনের দিগন্ত-জোড়া সমারোহ। পাতালিয়ার বালু-চরে ছিল বুনো হাঁসের আড্ডা। সে আড্ডার গুঞ্জন শোনা যেত অনেকদূর থেকে। শটগানটা হাতে নিয়ে প্রায়ই ওদের আড্ডায় হানা দিতুম। আমাকে ওরা চিনে ফেলেছিল, দূর থেকে দেখলেই ওরা মিলিয়ে যেত শূন্যে: চলে যেত নাগালের বাইরে।

সেদিনও আমার শটগানটা নিয়ে বেরিয়েছিলুম। বুনো হাঁসদের আড্ডায় হানা দেব—এই ছিল ইচ্ছে। গাঁয়েরই একটি ছেলেকে সঙ্গে করে বাঁধের ওপর উঠলুম। হাঁসদের দৃষ্টি এড়িয়ে গুঁড়ি মেরে একটা গাছের ডালে চড়ে বসলুম। ভেবেছিলুম একটা শটেই অন্ততঃ দু'চারটে ঘায়েল করতে পারবো। শটগানের নলটা ডান চোখের নীচে রাখতেই চোখটা চড়ায় আটকে গেল। বাঁধের নীচে চড়ার ওপর ছোটখাট একটা মাটির পাহাড় গড়ে উঠেছে কখন! রোজই প্রায় আসি। কখনও তো চোখে পড়েনি। ছেলেটিকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, সে আগে কখনও পাহাড়টা দেখেছে কিনা। সে ঘাড় নেড়ে বললে, না। সে আগে কখনও দেখেনি। আমি ওর কথা শুনে চমকে উঠলুম। ভাল করে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলুম। হ্যাঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই। কিন্তু এত বড় কুমীরটা এখানে এলো কি করে? বিস্মিত হলুম। সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। রোমাঞ্চ অনুভব করলুম। কিন্তু একটা শটগান আর কিছু ফেরিক্যাল বুলেট দিয়ে কি ঐ সমদুত্তীরকে মারা যাবে। দেখাই যাক। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। দুটো বুলেট লোড করে নিলুম। কুমীরটার চোখ লক্ষ্য করে ট্রিগারটা টিপে দিলুম। বুনো হাঁসেরা মানুষের এই বিশ্বাসঘাতকতায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড কলরব তুলে উড়ে পালালো। কিন্তু আশ্চর্য হলুম কুমীরটা একটুও নড়ল না দেখে। পর পর আরো দুটি গুলি করলুম। এবারেও সেই একই অবস্থা। একেবারে নিস্তব্ধ, নিষ্কম্প। হঠাৎ মনে হোল একটা লাল রঙের ধারা যেন জলের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। আনন্দে চীৎকার করে উঠলুম। সারা দেহ তখন আনন্দে কাঁপছে। ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে ছুটে গেলুম। কাছে গিয়ে দেখলুম প্রথম গুলীতেই ওর চক্ষু বিদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছি। গুলিটা চোখ দিয়ে ঢুকে মাথার খুলি ভেদ করে চলে গেছে।

ছেলেটাকে গাঁয়ে পাঠিয়ে কুমীরটাকে আগলে বসে রইলুম। ইচ্ছে কুমীরটা গাঁয়ের সকলকে দেখাবো। কিছুক্ষণ পরেই লোকজন এসে পড়লো। কাছেই দুটো ঘাস-কাটার নৌকো ছিল। ওরা নৌকো দুটোকে একসঙ্গে বাঁধলো। অনেক ধস্তাধস্তির পরে কুমীরটাকে নৌকোতে তুলতেই নৌকো দুটো এক-সঙ্গে গেল উল্টে।

শেষ পর্যন্ত কুমীরটাকে আর গাঁয়ে আনাতে পারিনি। মুচি ডেকে চামড়া ছাড়িয়ে যখন বাড়ী ফিরলুম রাতের দ্বিতীয় প্রহর তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

কুমীরটা ছিল একুশ ফুট লম্বা আর গলার বেড় ছিল উনষাট ইঞ্চি। পেট চিরে অনেক কিছু পাওয়া গিয়েছিল। বেশীর ভাগই সীসের গয়না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে তেরশো এক-চল্লিশ সালে। তখন আমরা কোলকাতায়। জমিজমা দেখতে প্রায়ই আমাকে গোনয়া আসতে হোত। সে সময় বর্ষাকাল। মেঘে মেঘে আকাশ ছাওয়া। কাশবনের মাথায় মাথায় হাওয়ার লুকোচুরি। তিলযুগা আর পাতালিয়ার বিরামহীন আস্ফালন। চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে সুপৌলে এসেছি।

সকালবেলা দাওয়ায় বসে দর্পণের সঙ্গে গল্প করছিলুম। দর্পণ গাঁয়েরই লোক। বলিষ্ঠ চেহারা। বেজায় সাহসী। পাঁচ বছর আগের সেই কুমীরমারার গল্প হচ্ছিল। হঠাৎ একটি চাষীর ছেলে এসে খবর দিল, বেতির চড়ায় একটি কুমীর রোদ পোয়াচ্ছে। দেখতে দেখতে উঠোনে ভিড় জমে গেল। সকলের অনুরোধে দর্পণকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে
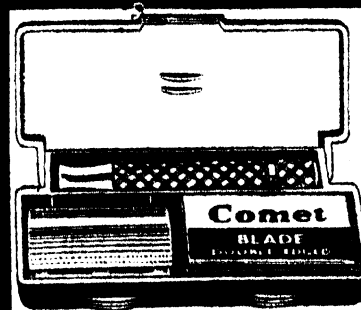
নিহত বিরাট আকারের কুমীরটি

পড়লুম বেঁতির চড়ার দিকে। বেঁত তখন বনবেতোসির মত হেলে দুলে বয়ে চলেছে। লিখাগড়ার জঙগলে বেঁতির চড়া ঢাকা। শটগান দিয়ে কুমীর মারতে হলে কাছ থেকেই শট করতে হবে। হামাগুড়ি দিয়ে নলখাগড়ার বনে ঢুকে পড়লুম। দর্পণও আমাকে অনুসরণ করলো। নিশানা ঠিক করে ট্রিগারটা টিপে দিলুম। দ্বিতীয় শটের আর অবসর পেলুম না। কুমীরটা ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কুমীরটা যে আহত হয়েছে সে ওর জলে পড়ার সময়ই টের পেয়েছিলুম। দর্পণকে ঘাসকাটার নৌকো আনতে বলে জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। নৌকো আসতেই চড়ে বসলুম। লগি মেরে দর্পণ জলের নীচটা খুঁজতে লাগলো। উত্তেজনায় পরিণামের কথাটা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলুম। কি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন যে আমাকে হতে হবে তখনও বুঝিনি।

আচমকা কুমীরটা একটু দূরে জলের ওপর ভেসে উঠলো। আর তীব্র বেগে ছুটে এসে নৌকোটা কামড়ে ধরলো। ওর লেজের একটা ঝাপটাতেই নৌকোটা গেল উল্টে। আমি আর দর্পণ বুকজলে গিয়ে পড়লুম। জলে আহত কুমীর আর আমরা দুজন বুকজলে দাঁড়িয়ে। মাথাটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগলো। জলে দাঁড়িয়ে ভগবানের নাম জপতে লাগলুম। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। দেখলুম দর্পণের অবস্থা আমার চাইতেও খারাপ। সে থরথর করে কাঁপছে।

কুমীরটা নৌকোটা উল্টে দিয়েই ডুব মেরেছিল এতক্ষণ। কিছুটা দূরে আবার ভেসে উঠলো আর চক্ষের নিমেষে হাঁ করে আমাদের দিকে তেড়ে এলো। কি যে করবো কিছু ঠিক করে উঠতে পারছিলুম না। শটগানে মাত্র আর একটা গুলী আছে। আর কিছু ভেবে না পেয়ে শটগানের ব্যারেলটাই কুমীরের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ট্রিগারটা টিপে দিলুম। কুমীরটা সঙ্গে সঙ্গে উল্টে গেল।

আজ ভাবছি সেদিন আমি বেঁচে-ছিলুম নেহাত কপালের জোরে।

নান্দীকর

আজকের কথা :

তথ্যচিত্র

আমাদের চিত্রগৃহগুলিতে সাধারণ প্রদর্শনী শুরু হয়ে থাকে একটি তথ্য-চিত্র এবং একটি সংবাদচিত্র দিয়ে। এই দুটি দেখানো হয়ে গেলে মূল কাহিনী-চিত্র আরম্ভ করা হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্তও দেখা যেত, অধিকাংশ দর্শকই প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করেন কাহিনীচিত্র শুরু হবার অব্যবহিত পূর্বে, তথ্যচিত্র এবং সংবাদচিত্র দেখে অযথা সময় নষ্ট করা তাঁদের রীতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু কিছুদিন হল অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে। সংবাদচিত্র এবং তথ্যচিত্র দেখবার প্রতি লোকের আগ্রহ বেড়েছে। একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে কষ্ট হবে না যে, গেল বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে তার খবর জানার জন্যে মানুষ ব্যগ্র এবং কোনো ঘটনা সম্পর্কে 'প্রত্যক্ষদর্শী'র কাগজে বিবরণের চেয়ে তার আনুষঙ্গিক শব্দময় চিত্ররূপ যে ঢের বেশী অনুভূতিকে নাড়া দেয়, একথা অবিসংবাদীভাবে সত্য। শুধু যে দেশ-বিদেশের ঘটনা জানবার জন্যেই লোকে উৎসুক তাই নয়, বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, স্বাধীনতালাভের পর আমাদের জনসাধারণের একটি বৃহত্তর অংশের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান-পিপাসাও বেড়েছে। আজকাল বেশী ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজে পড়ছে, বেশী লোক খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক বা মাসিকপত্র এবং বই পড়ছে, বেশী লোক সিনেমা-থিয়েটার দেখছে। আশা করি, কেউই অস্বীকার করবেন না, বই-পড়ার মতো সিনেমা-থিয়েটার দেখাও মাত্র আনন্দের জন্যেই নয়, কিছুটা শিক্ষার জন্যেও বটে। এই জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধির ফলেই চিত্রামোদী দর্শকদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে তথ্যচিত্রের প্রতি। কেমন করে ইস্পাত তৈরী হয়, চাষ আবাদের আধুনিকতম প্রণালী কি, পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তা তৈরী হয় কি উপায়ে, কাশ্মীর ভ্রমণ কি রকম রমণীয়, আদিবাসীদের উৎসব কেমনধারা,—এই রকম বহু তথ্য পরিবেশিত হয় ভারতীয় তথ্যচিত্রের মাধ্যমে। দেশ-বিদেশের স্থাপত্য, অঙ্কন, নৃত্য, সঙ্গীত বা অপরাপর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রযুক্তি—এত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আজকাল তথ্যচিত্র নির্মিত হচ্ছে যে, তার শ্রেণী-বিভাগ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। একটি সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই ৭,৩০০টি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছিল।

'একই অঙ্গে এত রূপ' চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

তথ্যচিত্র সম্বন্ধে আগে লোকের ধারণা ছিল যে, এ জিনিস আর্টের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। কিন্তু তথ্যচিত্রের আদি জনক রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি আমাদের এই ভুল ভেঙে দিয়েছেন। তাঁর "নানুক অব দি নর্থ" বা "ম্যান অব অ্যারাণ" চিত্রে আমরা দেখেছি, তথ্যচিত্র শুধু তথ্যই পরিবেশন করে না, সঙ্গে সঙ্গে তার শৈল্পিক আবেদনও অনিবার্য। "নানুক অব দি নর্থ" ছবিতে নিষ্ঠাবান সাংবাদিকের মতো এস্কিমোদের জীবন-যাত্রা প্রণালী দেখিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, তারই সঙ্গে তিনি আমাদের রস-সাগরেও ভাসিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যা, তারও অতিরিক্ত জীবনযাপনে সাহায্য করে তথ্যচিত্র। অধিকাংশ সময়েই আমরা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনধারণ, অন্য জীবনের সঙ্গে সংঘর্ষ, কিছুটা আঘাত বা ক্ষত কিংবা রক্তমোক্ষণ এবং কিছুটা জীবনধারণের উল্লাস প্রভৃতি থেকেই জীবন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করি। কিন্তু সময় সময় আমরা অপরের সঙ্গে যৌথ-ভাবেও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করি। যে লোক আমাদের কাছে জীবন-সম্পর্কিত কোনো অভিজ্ঞতা পৌঁছে দেন, তিনি যদি শিল্পী হন, তাহলে তিনি আমাদের জীবনের কোনো অজ্ঞাত দিগন্ত সম্পর্কে আমাদের অকস্মাৎ-এমন তীব্র ও স্বচ্ছভাবে সচকিত করে তোলেন, যা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো দিনই দেখতে পাওয়া যায় না। জীবন সাধারণতঃ সাধারণ গতানু-গতিকভাবেই চলে এবং মানুষের অবনত প্রকৃতির এই গতানুগতিকতাটিই অঙ্গ-বিশেষ। তবু মানুষ প্রতিনিয়তই এই গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে চাইবে,

এইটিই হচ্ছে তার ললাটলিপি। এই ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস থেকেই জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যের জন্ম। এই ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়াসই মানুষকে শিখিয়েছে, তথ্যচিত্রকেও শিল্পবস্তুতে পরিণত করবার কৌশল।

একটি তথ্যচিত্র মাত্র একটি অনুষ্ঠান এবং অনুত্তেজক ঘটনা-বিবরণী কিংবা সেটি একটি রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি এ বিচার করবার জন্যে প্রথমেই দেখা প্রয়োজন, সেই তথ্যচিত্রের মাধ্যমে কোনো রকম ভাব প্রকাশিত হচ্ছে কিনা। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ছবিটির মাধ্যমে যে ভাবপ্রকাশের প্রয়াস করা হয়েছে, সেটি ছবির মাধ্যমে প্রকাশিত হবার উপযোগী কিনা? এবং তার পেছনে যে অর্থব্যয় করা হয়েছে, সেই অর্থব্যয়ের যোগ্য কিনা? একটি দুর্বল ভাবপ্রকাশের জন্যে যে অর্থ ও শ্রমের প্রয়োজন, একটি সুস্থ সবল ভাবপ্রকাশের জন্যেও ততটুকু অর্থ ও শ্রমেরই আবশ্যকতা। বরং দুর্বল ভাবের দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্যে বেশী অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে ছবিকে জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলবার চেষ্টা দেখা যায়। অথচ একটি সুস্থ সবল ভাবব্যঞ্জক ছবি কলাকৌশলের কিছু'টা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ঐ জাঁকজমকপূর্ণ ছবির থেকে ঢের বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়।

যে বলিষ্ঠ ভাবটি ছবির মাধ্যমে প্রকাশিত করা হচ্ছে, সেটি যেন চলচ্চিত্রের উপযোগী হয়; অর্থাৎ সেটি মাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেই চলবে না, তার মধ্যে গতিশীলতারও উপাদান থাকা চাই। অনেক সময়ে দেখা যায়, চলচ্চিত্রের প্রয়োগরীতি-সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবে একটি বলিষ্ঠভাবকে মাত্র কতকগুলি স্থিরচিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা হয়েছে; তার মধ্যে গতিশীলতাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

কোনো একটি বিষয়-সম্পর্কে তথ্যচিত্র নির্মাণ করতে হলে যথেষ্ট তথ্যানুসন্ধান করতে হয়; চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার নিশ্চয়ই সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে পারেন না, কিন্তু যে কোনো বিষয় সম্পর্কে সম্ভবমত তথ্যানুসন্ধান তিনি নিশ্চয়ই করতে পারেন এবং এ ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞদের সাহায্যও গ্রহণ করতে পারেন। সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করবার পর সেই তথ্যগুলিকে ঠিকমত পর্যায়ভুক্ত করা প্রয়োজন। যেভাবে বিষয়টিকে কৌতূহলোদ্দীপক করে ছবিতে রূপায়িত করা হবে, সেইটি মনে রেখে বিষয়-সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজানো যে প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য। এইখানে চিত্রনাট্যকার তাঁর বিশেষ মানসিক ভঙ্গী অনুযায়ী চিত্রনাট্যটি রচনা করেন। একই তথ্যসম্ভারের সাহায্যে বিভিন্ন চিত্রনাট্যকার বিভিন্ন কায়দায় মধ্যে চিত্রনাট্য রচনা করতে পারেন। অবশ্য তাঁদের সব সময়েই মনে রাখতে হয় যে, চিত্রনাট্যটির একটি আরম্ভ, একটি মধ্যভাগ এবং একটি সমাপ্তি আছে। ঠিক নির্ভুল আরম্ভ করা চিত্রনাট্যের একটি বিশেষ সমস্যা। এমনভাবে আরম্ভ করতে হবে, যাতে মনে হবে, ঐ আরম্ভটি সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যের ওপর আলোকসম্পাত করবে। এমন চমকপ্রদভাবে আরম্ভ করার প্রয়োজন নেই, যে আরম্ভের সঙ্গে পরবর্তী দৃশ্যের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। একটি সামান্য বিষয়বস্তুর জন্যে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লাভ কি?

এবং আরম্ভভাগটি কতখানি স্থান জুড়ে থাকবে, তা নির্ভর করবে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের উপর এবং নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে যে, সমগ্র বিষয়টির সঙ্গে সেটি যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। দেহের তুলনায় মাথাটি খুব বড়ো হলেও যেমন বেমানান হলে ঠিক তেমনই খুব ছোট হলেও হবে।

একটি তথ্যচিত্র যদি ভাবসমৃদ্ধ বিবরণপূর্ণ এবং রসসৃষ্টিকারী হয়, তাহলেই তা সার্থক ও দর্শকদের হৃদয়গ্রাহী হবে। আমরা আজ পর্যন্ত যেমন বহু দেশী ও বিদেশী সার্থক তথ্যচিত্র দেখেছি, তেমনই পরিকল্পনাহীন, অর্থবিহীন তথ্যচিত্র নামে অযোগ্য বহু চিত্রও পর্দায় প্রতিফলিত হতে দেখেছি এবং বলা বাহুল্য সার্থক চিত্রের তুলনায় অসার্থক চিত্রের সংখ্যা বহুগুণ।

চিত্র সমালোচনা।
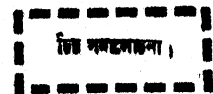
ন্যায়দণ্ড (বাংলা) : মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রম-এর নিবেদন; ৩,৯২২ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : রাধাকৃষ্ণ শর্মা; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্তী; কাহিনী : জরাসন্ধ; সঙ্গীত-পরিচালনা : আলী আকবর খাঁ, চিত্রগ্রহণ : কানাই দে; শব্দানুলেখন : শিশির চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল ঘোষ; আবহসঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরকার; রূপায়ণ : রাধামোহন ভট্টাচার্য; অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, জহর রায়, রবীন মজুমদার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, আশীষকুমার, অরুন্ধতী দেবী, সবিতা বসু, ছায়া দেবী, রূপতী ঘোষ বেলারাণী, সন্ধ্যা বর্মণ প্রভৃতি। গোল্ডউইন পিকচার্সের পরিবেশনায় গেল ২০এ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে

'রূপসনাতন' চিত্রে মিতা চট্টোপাধ্যায়

মিনার, বিজলী, ছবিঘর, এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

জরাসন্ধের 'ন্যায়দণ্ড' একটি সুখ-পাঠ্য হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসরূপে এমনই জনপ্রিয়তালাভ করেছে যে, এর আখ্যান ভাগের সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত। শিক্ষিত চাষী শশাঙ্ক মণ্ডলকে ডাকাতির দায়ে জেলে পাঠাবার পরে বিরুদ্ধ সাক্ষী সনাতনের সরল স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সত্যপ্রকাশ এবং শশাঙ্কের স্ত্রী রাধার বিষপানে আত্মহত্যা দণ্ডপ্রদানকারী ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ বসন্ত স্যান্যালের চিত্তকে এমন প্রচণ্ড-ভাবে আলোড়িত করেছিল যে, তিনি সাক্ষীসাবুদ এবং আইনের সাহায্যে প্রচলিত বিচারপদ্ধতির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, বিচার যদি নির্ভুলই হয়, তাহলে তার পরিণতি এমন মর্মান্তিক হবে কেন? এবং নিজের কৃত-কর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জজিয়তী ছেড়ে দিয়ে শশাঙ্ক মণ্ডলের আত্মঘাতিনী স্ত্রী রাধার শেষ অনুরোধ রক্ষার জন্যে তার দু' বছরের মেয়ে রাণীকে প্রতিপালন করবার ভার গ্রহণ করেছিলেন এই শর্তে যে, শশাঙ্ক জেল থেকে মুক্তি পেলে তার হাতে তার আদরিণী কন্যাকে তুলে দেবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। আন্তরিক ইচ্ছা এবং চেষ্টা সত্ত্বেও রাণীকে তিনি শশাঙ্কের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন নি; পরে রাণী যখন জজ-সাহেবের নাতনী মায়া রূপে একটি কলেজের ছাত্রী এবং সুবিমল নামে একটি যুবকের প্রণয়াসক্ত, তখন দৈব শশাঙ্ককে পৌঁছে দিল জজসাহেবের ঠিকানায়: মায়া জানল নিজের সঠিক পরিচয় এবং দুঃখে বেদনায় নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে সে যখন তার একান্ত পরিচিত ও প্রিয় আশ্রয় ত্যাগ ক'রে বাপের স্নেহময় কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হল, সেই সময়ে কর্তব্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় শশাঙ্ক পুনরায় আত্মগোপন ক'রে নিজের মেয়েকে তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই থাকতে দিয়ে তাকে দিয়ে গেল মুক্তি।

কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক মৃণাল চক্রবর্তী মূলকেই অনুসরণ করেছেন অধিকাংশ স্থানে: কাজেই কাহিনী যেখানে দৃশ্য-সংস্থাপনাগুণে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে, চিত্রও সেইখানে দর্শকচিত্তকে আলো-ড়িত করেছে। এবং এই হৃদয়গ্রাহিতা বেশী করে ধরা দেয় ছবির শেষাংশে: এক দিকে, তরুণী মায়া তার সত্য-পরিচয় জেনে উদ্বেল হৃদয় নিয়ে তার এতদিনের 'দাদু' জজসাহেবকে তার চতুর্দিকে মিথ্যা মায়ার জগৎ গড়ে তোলবার জন্য আর্তহৃদয়ে অনুযোগ করছে, অন্যদিকে কন্যাস্নেহে অন্ধ পিতা, জেলফেরত শশাঙ্ক মণ্ডল কন্যার বর্তমান পরিস্থিতিতে তার বিলাপ কান পেতে শুনছে, অপরাধীর বংশধর অপরাধের বিষে জর্জরিত হয়, কন্যার এই ভ্রম-মূল ধারণার কথা শুনে হৃদয়ে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। জজ বসন্ত সান্যাল নিজের প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্যে নিজের হৃদয়কে বলি দিচ্ছেন হৃদয়কে দৃঢ়বন্ধনে বেঁধে—

ছবির এই শেষাংশ কাহিনীতেও যেমন, ছবিতেও তেমনি হৃদয়গ্রাহী।

ছবির মধ্যে জেলজীবন এবং শশাঙ্কর জেলবন্ধু নিতাই সরকারের ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর কাহিনী মূল-কাহিনীর সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত নয়, যদিও নিতাইয়ের ভ্রাতৃবধূর প্রতি অত্যাচারের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ শশাঙ্ক আর একটি হত্যার ব্যাপারে অভিযুক্ত হয় এবং তারই পরোক্ষ ফলে নিজের কন্যার সন্ধান পায়। ছবির এই অংশকে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত করবার অবকাশ ছিল।

অভিনয়ে নিঃসংশয়ে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শশাঙ্ক মণ্ডলের ভূমিকায় অসিতবরণ। খালি গলায় গানের দু'-এক কলি গাওয়া আনুষটি দৈবের পীড়নে ক্ষতবিক্ষত হয়েও নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলেনি—এই সুমহান চিত্রটি তিনি অসামান্য দক্ষতার সংগে

ভি, আই, পি চিত্রে এলিজাবেথ টেলর

রূপায়িত করেছেন। মর্মপীড়িত, বিচারের প্রহসনের নায়ক সাজার জন্যে অবিচলভাবে প্রায়শ্চিত্ত-গ্রহণ করতে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ বিচারক বসন্ত সান্যালকে মূর্ত করে তুলেছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য। বহুরূপী নিতাই সরকার রূপে তরুণকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নাট্য-নৈপুণ্যের নিদর্শন দেখিয়েছেন। এছাড়া অপরাপর পুরুষ ভূমিকায় রবি ঘোষ (সনাতন), বীরেন চট্টোপাধ্যায় (অনুকূল চৌধুরী), তরুণ মিত্র (জেলার), সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রসিকিউটিং কাউন্সিল), জহর রায় (কালী), আশীষকুমার (সুবিমল) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

স্ত্রীভূমিকাগুলিতে অরুন্ধতী দেবী (জয়ন্তী), তন্দ্রা বর্মণ (রাণী বা মায়া), ছায়া দেবী (জজসাহেবের স্ত্রী বীণাপাণি), সবিতা বসু (রাধা), তপতী ঘোষ নিতাইয়ের ভাই আশুর স্ত্রী) প্রভৃতি যথাযোগ্য সুঅভিনয় করেছেন। এবং এঁদের মধ্যে বিশেষ করে সবিতা বসুর অভিনয় উপভোগ্য হয়েছে।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চমান রক্ষিত হয়েছে। আবহ-সংগীতে বস্তীর দৃশ্যে হিন্দুস্থানী চোলকী-গীত চমৎকার নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে। রূপসজ্জায় কয়েক ক্ষেত্রে বয়সের পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়নি; যেমন, জয়ন্তীকে আগাগোড়া এক বয়সেই দেখানো হয়েছে।

"ন্যায়দণ্ড" ছবিটি মূল কাহিনীর হৃদয়গ্রাহিতাকে যথাযথ বজায় রাখতে পেরেছে বলে জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা আছে।

জাজ্‌মেন্ট অ্যাট নুরেমবার্গ (ইংরাজী) : ইউনাইটেড আর্টিস্ট্‌স্‌ রিলিজ; ৫,২৭০ মিটার দীর্ঘ এবং ২২ রীলে সম্পূর্ণ'; পরিচালনা : স্ট্যান্‌লে ক্র্যামার; চিত্রনাট্য : অ্যাবে ম্যান; রূপায়ণ : স্পেন্সার ট্রাসি, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, রিচার্ড উইডমার্ক, ম্যাক্সমিলিয়ন শেল, মন্টগোমরী ক্লিফ্‌ট্‌, মার্লিন ডিয়েট্রিক, জুডি গার্ল্যান্ড প্রভৃতি। গেল ২০এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার থেকে লাইট হাউস-এ দেখানো হচ্ছে।

তৃতীয় রাইখ-এর আমলে জার্মানীতে নাৎসী পন্থার বিরোধীদের প্রতি, বিশেষ

ক'রে জার্মান জনদের প্রতি যে বর্বর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তা' নাকি সেই সময়কার চারজন বিচারকের দ্বারা নাৎসী আইনের অপব্যাখ্যার ফলেই সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই চারজন নাৎসী বিচারক শত শত নরনারী ও শিশুহত্যার কারণস্বরূপ হওয়ার জন্যে তিনজন আমেরিকান বিচারক নিয়ে গঠিত একটি ট্রাইব্যুন্যালে অভিযুক্ত হন। অভিযুক্ত নাৎসী বিচারকদের মুখপাত্রের যুক্তি ছিল, দেশের স্বার্থের চেয়ে বড়ো কিছু নয় এবং তার জন্যে আইনকানুন, এমন কি বিবেক পর্যন্ত বলি দেওয়া যায়। তা ছাড়া নাৎসী জার্মানীকে যখন রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশই স্বীকৃতি দিয়েছিল, তখন ঐ বর্বরতার সমর্থনের জন্যে মাত্র চারজন নাৎসী বিচারককে বিশেষ ক'রে বেছে না নিয়ে পৃথিবীর সকল জাতিকেই অভিযুক্ত করা উচিত। নাৎসী বিচারকের এই যুক্তিকে ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি সহজে উড়িয়ে দিতে পারেননি। তিনি সত্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বহু আইনঘটিত পুস্তক পাঠ ক'রে এবং বহুলোকের মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সভ্যজগতের শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে মানবতাবোধ এবং দেশাত্মবোধের দোহাই দিয়ে যদি কোনো বিচারক মানবতাবোধকে বিসর্জন দেন, তা' হ'লে তিনি মনুষ্যহীনতার অপরাধে অপরাধী। এই কারণে তিনি প্রত্যেক অভিযুক্ত বিচারককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার পরিবর্তে পনেরো বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

এই হচ্ছে "জাজমেণ্ট অ্যাট নুরেমবার্গ" চিত্রের কাহিনীর সারাংশ। আমরা আজ পর্যন্ত "উইটনেস ফর প্রসিকিউসান" প্রভৃতি বহু বিচারকাহিনীর চলচ্চিত্রই প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু এমন চুম্বকের মতো চিত্তআকর্ষণকারী ছবি আর কখনও দেখেছি ব'লে মনে করতে পারছি না। যখন যে পক্ষ যুক্তিতর্কের অবতারণা করছে, তখন মন সেইদিকেই চলে পড়ছে; আবার ট্রাইব্যুন্যালের প্রধান বিচারক যখন উভয় পক্ষের জোরালো বক্তব্য শ্রবণ করবার পরেও আদালত মুলতুবী রেখে সত্যানুসন্ধানে অশান্তচিত্তে পানাগার, ভোজনালয় প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং অত্যন্ত সাধারণ হোটেল-কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, তখন নাটকের গভীরতা অতলস্পর্শী হয়ে দর্শক-হৃদয়কে আলোড়িত করে। এইভাবে পূর্ণ তিন ঘণ্টাস্থায়ী সুদীর্ঘ চিত্রটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শক-কৌতূহলকে সমানভাবে বজায় রাখতে সমর্থ হয়। চিত্রনাট্য-রচনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখানোর জন্যেই অ্যাবে ম্যান ১৯৬১ সালে শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার বিবেচিত হয়ে 'অস্কার' দ্বারা পুরস্কৃত হন।

আলোচ্য ছবিখানিতে অভিনয়ের যে উৎকর্ষ দেখা গেছে, তাকে অভাবনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। অভিযুক্ত নাৎসী বিচারকদের পক্ষাবলম্বী আইনজ্ঞরূপে ম্যাক্সিমিলিয়ন শেল খাঁটি আইনজীবীর মতো অভিনয় ক'রে ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে 'অস্কার' লাভ করেছেন বটে, কিন্তু ট্রাইব্যুন্যালের প্রধান বিচারপতিরূপে স্পেন্সার ট্রাসি যে অসামান্য নাট্যনৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা যেমনই বিস্ময়কর, তেমনই রসোৎসারী। স্পেন্সার ট্রাসির এই অভিনয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অভিযুক্ত বিচারকদের প্রধানরূপে বার্ট ল্যাংকাস্টার প্রথমে বিচারের প্রহসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীরূপে যে তূষ্ণীম্ভাব গ্রহণ করেছিলেন, তা যেন বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায় আগ্নেয়গিরির সমতুল্য; এবং যখন জুডি গার্ল্যাণ্ড অভিনীত আইরিন হফম্যানকে কৌসুলীর অবমাননকর সওয়ালের হাত থেকে মুক্ত করবার জন্যে তিনি ভিসুভিয়সের মতো ফেটে পড়লেন, তখন সমগ্র কোর্টরুমের লোকেদের মতো দর্শক হিসেবে আমরাও কম আলোড়ন অনুভব করিনি। প্রসিকিউসান কৌসুলীরূপে রিচার্ড উইডমার্ক ও তাঁর বাস্তবধর্মী অভিনয়ে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখেন। আদালত-গৃহে নাৎসী বর্বরতার নিদর্শনস্বরূপে চলচ্চিত্র দেখানো অভিনবত্বের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই কিছুটা কৃত্রিমতারও সৃষ্টি করেছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত জনৈক নাৎসী বর্বরতাপীড়িত বিধবার ভূমিকায় মার্লিন ডিয়েট্রিকের বহুদিন পরে পর্দায় আত্মপ্রকাশ বিগতদিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীকে আজকের দিনে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দিয়েছে মাত্র। নাৎসী অত্যাচারের ভয়ে সন্ত্রস্ত হোটেল-কর্মীর ভূমিকায় মন্টগোমারী ক্লিফ্‌ট্‌ এবং জুডি গার্ল্যান্ড অসামান্য হৃদয়স্পর্শী অভিনয় করেছেন।

"জাজমেন্ট অ্যাট নুরেমবার্গ" নিঃসন্দেহে একটি অবিস্মরণীয় চিত্র এবং এই কারণেই পরিচালক স্ট্যানলে ক্র্যামার তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আর্ভিং থ্যালবার্গ পুরস্কার দ্বারা ভূষিত হয়েছেন।

ডোক্‌রা (বাংলা তথ্যচিত্র) : ৬০৮ মিটার দীর্ঘ এবং দুরীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ও পরিচালনা : আশীষ মুখোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য : প্রণবেশ চক্রবর্তী; সংগীত-পরিচালনা : শুভো গুহঠাকুরতা; চিত্রগ্রহণ : দিলীপরঞ্জন
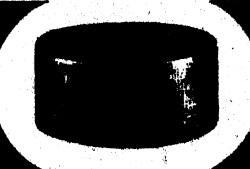
মুখোপাধ্যায়; সম্পাদনা : মণি অধিকারী; নেপথ্য-ভাষণ : কাজী সব্যসাচী।

সভ্যতা থেকে দূরে ছিটকে-পড়া একটি উপজাতি হচ্ছে এই ঢোক্‌রা সম্প্রদায়; কোথা থেকে তাদেরই একটি শাখা বর্ধমান জেলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে এসে কবে যে বসতি গেড়েছিল, তা' ইতিহাসে লেখা নেই এবং তাদের মধ্যে যেসব বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত নারী ও পুরুষ রয়েছেন, তাঁরাও জানেন না। আশ্চর্য তাদের ভাষা; অধিকাংশ কথাবার্তাই তারা আকারে ইঙ্গিতে সারে। এবং বিচিত্র তাদের উপজীবিকা; মাটি, ধুনো এবং পিতলের খণ্ড খণ্ড চাদরের সাহায্যে তারা যে-সব অসামান্য কারুকার্যের নিদর্শন গড়ে তোলে, শুধু বাংলা বা ভারত নয়, বিদেশেও তা' বহুসমাদৃত। বাঙালী গ্রাম্য সধবাদের মতো এদেরও বিবাহিতা মেয়েরা সিঁথের সিঁদুর পরে, স্বামীর কল্যাণ-কামনায় দেবতাস্থানে প্রণাম জানায়। অথচ শোনা যায়, এরা সমাজ-

ন্যায়দণ্ড চিত্রে তন্দ্রা বর্মণ

বহির্ভূত যাযাবর সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের সম্পর্ক রয়েছে মধ্যভারতের বিদর অঞ্চলের কোনো বাসিন্দাদের সঙ্গে। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এরা বাস করে কুঁড়ে ঘরে; চাষ-আবাদ এবং পিতলের শিল্পসামগ্রী গড়াই এদের অধিকাংশের উপজীবিকা।

এই ঢোক্‌রা সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাদের শিশু, যুবা, বৃদ্ধদের নিয়ে প্রযোজক-পরিচালক আশীষ মুখোপাধ্যায় একটি অতিসুন্দর তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার যে-চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন, তার ভিতর আছে সূতিকাগারের গা-ঘেঁষে রান্নার সরঞ্জাম, প্রসাধনরতা বিবাহিতা নারীর পাশেই বন্দী যৌবনের সার্থক হবার প্রতীক্ষায় আনমনা কিশোরী এবং অন্য পাশে বিগতযৌবনা বৃদ্ধা, স্তনদানরতা মায়ের পাশেই বাপের কোলে শিশুর আদর, আবার বৎসরান্তে কৃষ্ণযাত্রা করার আনন্দ-উৎসাহ, সেই চিত্র আমাদের প্রতি ক্ষণে জানিয়ে দেয়, ঐ যে নিরীহ, শান্ত, সামান্য গৃহস্থালী নিয়ে সুখী ঢোক্‌রা পরিবারের মানুষগুলি, ওরা আমাদেরই ভাই, বৃহৎ মানব পরিবারভুক্ত স্বজনরূপে ওরা আমাদের স্নেহ-ভালোবাসা পাবার অধিকারী এবং সমাজ থেকে ওদের যদি দূরে ঠেলে রেখে দেওয়া যায়, তাহ'লে তাতে শুধু যে ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা নয়; বৃহত্তর সমাজেরও তাতে কম ক্ষতি হবে না। যে-সহানুভূতির সঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায় ওদের চিত্রায়িত করেছেন, তা সার্থক হয়ে উঠেছে আলোকচিত্রশিল্পী দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, আবহ সঙ্গীত-স্রষ্টা শম্ভো গুহঠাকুরতা এবং নেপথ্য ভাষণদানকারী কাজী সব্যসাচীর অকুণ্ঠ ও দরদভরা সহযোগিতায়। নেপথ্য ভাষণের মধ্যে আশার বাণী শুনতে পাওয়া গেছে যে, আমাদের স্বাধীন সরকার এই উপজাতিটিকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখে এদের নানারকম অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন।

ঢোক্‌রা কিশোরী

শ্রীমুখোপাধ্যায় সৃষ্ট 'ঢোকরা' তথ্যচিত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দলিল।

বিবিধ সংবাদ

বিদ্যাসাগর নাট্যগোষ্ঠীর "অলকে অলকে"

খ্যাতিমান তরুণ নাট্যকার রমেন লাহিড়ীর সাম্প্রতিকতম রচনা অলকে অলকে একটি অনাবিল হাসির পূর্ণাঙ্গ নাটক। হাওড়ার বিদ্যাসাগর নাট্যগোষ্ঠীর সভ্য-সভ্যাবৃন্দ নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন

২৯শে সেপ্টেম্বর রামরাজাতলার বাণী নিকেতন হলে।

।। নতুন তীর্থ ।।

সুধীর মুখার্জি পরিচালিত এইচ জি প্রোডাকসন্সের নতুন তীর্থ চিত্রের চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নতুন তীর্থের প্রধান শিল্পীদের তালিকায় আছেনঃ—উত্তমকুমার, সুলতা চৌধুরী, সীতা দেবী, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, ভারতী দেবী, জহর গাঙ্গুলী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, রবি ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু, তরুণ-কুমার, দিলীপ রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। প্রযোজক হরিকৃষ্ণ জেলোকার। পরিবেশনায় প্রভা পিকচার্স।

।। একটি অনুষ্ঠান ।।

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট এ্যাম্বুলেন্স ডিভিশনের ২৩তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীআর কে চৌধুরী এবং পারিতোষিক বিতরণ করেন শ্রীমতী মায়া চৌধুরী। সভায় আর জি কর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মেজর এইচ কে ইন্দ্র ফার্স্ট এডের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ও ডাঃ জে কে বাসু ডিভিসনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীসুধীর-কুমার বসু ডিভিসনের কার্যাবলী বর্ণনা করেন।

।। গান্ধারের নাট্যানুষ্ঠান ।।

দক্ষিণ কলিকাতার প্রখ্যাত নাট্য-সংস্থা গান্ধারের তৃতীয় নাট্য নিবেদন অমরেশ ঘোষের 'শেষ স্বাক্ষর' আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর সোমবার, মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে।

নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন প্রথিতযশা নাট্য-পরিচালক ও অভিনেতা শ্রীঅমর বসু। তাঁর সঙ্গে সহ-যোগিতা করছেন গান্ধার নাট্য গোষ্ঠীর কুশলী শিল্পিবৃন্দ।

আন্তঃ-বিদ্যালয় সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট-পরিচালিত আন্তঃ-বিদ্যালয় সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা শীঘ্রই আরম্ভ হবে। ডি, পি, আই এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর অনুমোদিত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবে। যোগদানের শেষদিন ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

।। "ভাগ্যচক্র" ।।

নাট্যসংস্থার শিল্পীরা গত ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় নববৃন্দাবন মন্দিরপ্রাঙ্গণে শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ কচুরী-রচিত-প্রযোজিত-পরিচালিত 'ভাগ্যচক্র' যাত্রাভিনয় করে সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দদান করেছেন।

অভিনয়ে দলগত সংহতি ও দক্ষতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে কংসরাম, শ্যামসুন্দিম ইলিয়াস, সুদেব, রামচাঁদ, কমলা, বড়বেগম ও ইলাহীর চরিত্রে দীনেশ ভট্টাচার্য; কালীভূষণ কচুরী, সিদ্ধেশ্বর নাথ, কমল ঘোষ, মানিক কুণ্ডু, ভোলানাথ ভট্টাচার্য ও প্রমোদরঞ্জন রায় সু-অভিনয় করেছেন। নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা থাকলে যাত্রা-নাটক কতখানি উপভোগ্য হতে পারে তার সার্থক পরিচয় এ নাটকে আর একবার নতুন করে পাওয়া গেছে।
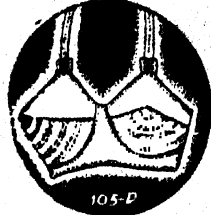
কাহিনীর সারাংশ

নিউ ভারত ব্যাঙ্ক-এর একাউন্ট্যান্ট সুব্রত মজুমদার সংসার চালাতে দিশেহারা হয়ে যায়। ছোট বোন বাণীর স্কুলের বেতন বাকী পড়েছে, পিতা প্রিয়গোপাল অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক—তাঁর একজোড়া চশমা নিতান্ত প্রয়োজন, মাতা সরোজিনীদেবীর নিয়মিত 'জরদা' খাওয়া অভ্যাস......। অথচ মাসিক আড়াইশো টাকা বেতনে এত সব ব্যবস্থা করা কি সম্ভব?

স্ত্রী আরতি সুব্রতর কাছ থেকে জানতে পায় যে বর্তমানের অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ে মেয়েরাও উপার্জন করছে। আরতি চাকুরীর জন্য দরখাস্ত পাঠায় এবং নিয়োগপত্রও আসে।

কিন্তু বৃদ্ধ প্রিয়গোপাল এ সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, "আমার পুত্রবধূ 'সেলস্‌গার্ল'রূপে চাকরী করবে?" "যুগ বদলে গেছে বাবা। এখন আর......" সুব্রত পিতাকে বোঝাতে চায়। প্রিয়গোপাল কঠোর হয়ে ওঠেন,—"তোমাদের যা খুশী করতে পার,—আমার কাছ থেকে কোনওদিন সমর্থন পাবে না।"

আরতি চাকুরী আরম্ভ করে,—এক নূতন জগতের সে সন্ধান পায়। ধনীগৃহেই তার বেশী যাতায়াত ক'রতে হয়। অফিসের অন্যান্য সহকর্মিনীদের খুবই ভাল লাগে। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে এডিথকে সে যেন বেশী ভালবাসে। জীবনে প্রথম 'লিপষ্টিক' মাখতে এডিথই শিখিয়ে দেয়। অফিসের মালিক কর্মঠ ব্যবসায়ী হিমাংশু মুখার্জী আরতিকে সুনজরে দেখেন,—প্রকাশ্যে তার কাজেরও প্রশংসা করেন।

কিন্তু সুব্রত? 'সেলস্‌গার্ল'-রূপী আরতির বাহ্যিক পরিবর্তন তাকে যেন উন্মনা করে তোলে,—একটা মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করে। সুব্রত মনস্থির ক'রে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে 'পার্ট টাইম' চাকুরীর প্রতিশ্রুতি আদায় করে।

*

*

আরতিকে চাকুরী ছেড়ে দিতে হবে। স্ত্রীকে সন্ধ্যায় সে জানিয়ে দেয়, "তোমার আর কাজ ক'রবার প্রয়োজন নেই,—আমি নিজের জন্য একটি অতিরিক্ত কাজ-এর ব্যবস্থা করেছি। তা ছাড়া তোমার

মহানগর

শরীরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে……”

পরদিন ক্ষুণ্ণমনে আরতি তার পদত্যাগ-পত্র নিয়ে অফিসে যায়। কিন্তু কোনও কিছু করবার পূর্বেই সুব্রতর টেলিফোন আসে, “আরতি,— তুমি চাকুরী ছেড়ো না। আমাদের ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে,— আমি এখন বেকার।”

……কর্মব্যস্ত মহানগরের রথচক্র এগিয়ে চলে। আরতির একক উপার্জনে সংসার চলছে। সুব্রত আজ অসহায়। স্ত্রী বাইরে কাজ করতে যায় আর ঘরে বসে সে সংবাদপত্রের ‘কর্মখালি’ বিজ্ঞাপন দেখে। আর প্রিয়গোপাল? পুত্রবধূর উপার্জিত অর্থ তিনি স্পর্শ করেন না। পুরাতন কৃতী ছাত্রদের কাছ থেকে ‘গুরুদক্ষিণা’ ভিক্ষা করেন।

পারিবারিক জীবনে একটা বিপর্যয় নেমে আসে। কিন্তু সংসার নাট্যের চরম যবনিকা বোধ হয় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। তার মূলে ছিল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে এডিথ।

……আরতি ও সুব্রত হৃষ্টমনে এগিয়ে চলে।……………………………

* * *

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই কাহিনী অবলম্বনে মহানগরের চিত্র-নাট্য, পরিচালনা এবং সুরসৃষ্টি করেছেন সত্যজিৎ রায়।

* * *

দুটি প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়কে।

* * *

এই কাহিনী ২৭এ সেপ্টেম্বর থেকে শ্রী : প্রাচী : ইন্দিরা ও সহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে পর্দায় রূপায়িত হচ্ছে।

* * *

এই চিত্রটি বিশ্ব-পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন আর, ডি, বি, অ্যাণ্ড কোং।

দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজের বার্ষিক উৎসব ও নবাগত সম্বর্ধনা

গত ২৯শে ও ৩০শে আগস্ট, গড়িয়া দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংসদের প্রযোজনায় দু'টি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। ২৯শে ছিল কলেজের নবাগত ছাত্র-ছাত্রী সম্বর্ধনা-উৎসব। এই উৎসবে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী-গণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত এবং একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করেন। ৩০শে আগস্ট উজ্জলা চিত্রগৃহে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক বিচিত্রানুষ্ঠান হয় সকাল ৮-৩০ থেকে বেলা ১-৪৫ পর্যন্ত।

।। মাস থিয়েটার্স ।।

সম্প্রতি শ্রীসুকৃতিমোহন ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাস থিয়েটার্সের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৬৩-৬৪ সালের কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয় :

সভাপতি—শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি— শ্রীপ্রদীপকুমার গুহ, শ্রীশৈলেন মল্লিক।

সাধারণ সম্পাদক—শ্রীশীতাংশু চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীরঞ্জিৎ রায়, প্রযোজনা-অধিকর্তা—শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

সভ্য : শ্রীনিরঞ্জন রায়, শ্রীগোপাল গাঙ্গুলী, শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, শ্রীঅসিত রায়চৌধুরী, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুকৃতিমোহন ভৌমিক।

শিল্পীরা ১৩ই এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর পাটনায় রবীন্দ্রভবনে বীরু মুখার্জীর 'চারপ্রহর' এবং প্র-না-বি-র 'গভর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টর' মঞ্চস্থ করে এবং দর্শকসাধারণের বিপুল অভিনন্দন লাভ করে। প্রদর্শনীর পর পাটনার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ এ, কে, সেন নিজগৃহে শিল্পীদের সম্বর্ধনা জানান। আগামী দুর্গাপূজার সময়ে কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ হলে তিনদিন-ব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করে জনপ্রিয় এই নটক দুটির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি নাট্যমোদীদের সামনে উপস্থাপিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

।। রঙ্গসভার 'ইমন কল্যাণ' ।।

বর্তমান বাংলা-নাট্যজগতে যে সকল নাট্য-গোষ্ঠী আজ পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাট্য-প্রযোজনায় ব্রতী—রঙ্গসভা তাদের অন্যতম।

খ্যাতনামা এই নাট্য-সংস্থাটি রুমানীয় নাট্যকার মিহাইল সিবাস্তিয়ানের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর একটি কাহিনী অবলম্বনে তাঁদের নবতম নাটক 'ইমন কল্যাণ' গত ১৫ই সেপ্টেম্বর নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করেন।

পীযূষ বসু-রচিত এই নাটকটি গড়ে উঠেছে বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক ও মানসিক সংগ্রামের পটভূমিকায়।

আকাশের তারারা যেমনি একের কক্ষ ছেড়ে—অপরের কক্ষে বিচরণ করতে পারে না—তেমনি সমস্যা এসে দেখা দিল প্রচুর বিত্তশালিনী রূপলাবণ্য-বিলাসিনী চিত্র-তারকা বন্দনার জীবনে। 'গতানুগতিক জীবনের উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে একদিন নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল সে। কিন্তু অতি আকস্মিক পরিস্থিতিতে তাকে আশ্রয় নিতে হয় সম্পূর্ণ বিপরীত আবহাওয়ার মানুষ প্রফেসার অজয় রায়ের কাছে একটি রাত্রের জন্য। ভালবাসার জন্ম হোল—কিন্তু সর্বদিকে বিপরীতধর্মী এই দুটি হৃদয়ের পরিপূর্ণ মিলন সম্ভব কি?

দুঃখের বিষয় নাটকটিকে সংঘাতের রূপ একমন্তই বিরল। তাই নাটকের যে চরম পরিণতি দর্শকের চিত্তে স্বাভাবিক বিচারের রূপ ধরে প্রতিভাত হওয়া উচিত ছিল—নাটকটি সে পথে সহজ গতি পেল না। কিন্তু এ অভাব সম্পূর্ণ পূরণ করে দিয়েছে—অভিনয় ও প্রযোজনার উৎকর্ষ।

বিগত-যৌবনা, বঞ্চিতা রমণী শিক্ষয়িত্রী ভ্রমর সেনের ভূমিকায় শ্রীমতী শিপ্রা মিত্র যে অভিনয় করেছেন—সে শুধু অপূর্বই নয়—একান্ত বিরলও বটে। তাঁর পরে যাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তিনি প্রফেসর অজয়ের ভূমিকায় দিলীপ রায়ের। এ ছাড়াও যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন—তপতী ঘোষ, ভোলা বোস, নিমাই মিত্র, পান্না দত্ত, আরতি সাহা, ছায়া দাস, সুতপা ভট্টাচার্য প্রভৃতি সকলেই।

প্রযোজনা, দৃশ্যসজ্জা ও আলোক-সম্পাতে রঙ্গসভার পূর্ব-সুনাম অক্ষুন্নই রয়েছে।

।। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ।।

ইউনাইটেড মিউ অর্গানাইজেশন-এর উদ্যোগে আগামী রবিবার ২৯শে সেপ্টেম্বর 'উত্তরা' প্রেক্ষাগৃহে সকাল ৯-৩০ ঘটিকায় বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভা ও 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' সাহায্য-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি।

উল্লেখযোগ্য যে, এই সংঘ গত পাঁচ বৎসর ধরে বিভিন্ন স্কুলের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্য-পুস্তক বিতরণ করে আসছে।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা

সম্প্রতি অভিনেত্রী পরিচালিকা মঞ্জু দে 'স্বর্গ হতে বিদায়' ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নালন্দা নির্বাচন করে ফিরেছেন। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে নালন্দায় এছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। বিদেশী গল্পের ছায়ানুসৃত শেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য-রূপ দিয়েছেন শ্রীমতী স্বয়ং। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে যথার্থ রূপদান করছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং মাধবী মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য অংশে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে অনুভা গুপ্তা, সুস্মিতা সান্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, অতনুকুমার, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার ও সুখেন অন্যতম। কুশলী-বিভাগে চিত্রগ্রহণ, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনায় রয়েছেন অনিল গুপ্ত, রবি চট্টোপাধ্যায় এবং তরুণ দত্ত। দিবিত্রি ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেড প্রযোজিত-পরিবেশিত এচিত্রের সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ক্যালকাটা মুভিটোন বাণী দত্তের শব্দগ্রহণে এছবিটি দ্রুত-অগ্রসরমান। আগামী অক্টোবরে ছবিটির কাজ সম্পূর্ণ হবে।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'নতুন তীর্থ'র কাজ নিয়মিত শুরু হয়েছে। হরিকৃষ্ণ জেলোকা প্রযোজিত এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। হৃদয়গ্রাহী কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সুলতা চৌধুরী, সীতা দেবী মঞ্জনা দেবী, রেণুকা রায়, ভারতী দেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, রবি ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু ও তরুণকুমার। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রভা পিকচার্স ছবিটির পরিবেশনাভার গ্রহণ করেছেন।

বোম্বাই

রাজকাপুর-সায়রাবানু অভিনীত 'দিওনা' রঙিন ছবিটির চিত্রগ্রহণ পুনরায় আর কে স্টুডিওয় এসপ্তাহ থেকে শুরু হল। অনুপম চিত্র নিবেদিত প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন ললিতা পাওয়ার, কমল কাপুর, সেলিম, রবীন্দ্র-কাপুর এবং হীরালাল। শৈলেন্দ্র-হসরৎ রচিত গানের কথায় সুরসৃষ্টি করেছেন শঙ্কর জয়কিষণ। ছবিটির প্রযোজনা ও পরিচালনার ভার নিয়েছেন মহেশ কাউল।

রাওয়াল ফিল্মসের 'দিল হি তু হায়' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। বি, এল, রাওয়াল প্রযোজিত ও পি, এল, সন্তোষী পরিচালিত এচিত্রের প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজকাপুর এবং নতুন। রোশন এ চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক।

মাদ্রাজ

প্রযোজক শঙ্করা রেড্ডি তাঁর 'লব-কুশ" ছবির অসাধারণ সাফল্যের পর গত সপ্তাহে বাওহিনী স্টুডিওর পরবর্তী নতুন ছবি (তামিল এবং তেলেগু ভাষায়) 'রাহাশ্যাম'-র শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন করেন। মহরৎ উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জনপ্রিয় শিল্পী মনোনয়নে এচিত্র আকর্ষণীয় হবে। চরিত্রলিপি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

পূর্ণেন্দু চৌধুরী তখন মালয় শহরে চাকরি করছে। ষোল বছর এরমধ্যে গড়িয়ে গেছে। হঠাৎ একযুগ পর কলকাতা থেকে পূর্ণেন্দুর কাছে এটর্নীর একটা চিঠি এসেছে। তাতে লেখা—

'আপনার জ্যাঠা মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর সময় সমস্ত সম্পত্তি আপনাকে দিয়ে গেছেন। তবে একটি শর্তে—জ্যাঠার মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করতে হবে। নইলে সব সম্পত্তি বিশু গোমস্তা পাবে।'

সরোজ সেনগুপ্ত প্রযোজিত 'সিঁদুরে মেঘ'-এর একটি রোমাঞ্চমধুর দৃশ্যে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অসিতবরণ। সুশীল ঘোষ এ ছবির পরিচালক। ফটো : অমৃত

পূর্ণেন্দুর বন্ধু সুদর্শনের অনুরোধেই তাকে কলকাতায় ফিরতে হল। পরের ঘটনার আগে পূর্ণেন্দুর মালয় যাবার কারণটা জানিয়ে রাখি। প্রায় ষোল বছর আগেকার কথা। পিতৃ-মাতৃহীন পূর্ণেন্দু তার নিঃসন্তান জ্যাঠার কাছেই ছোটবেলা থেকে বড় হচ্ছিল। জ্যাঠামশাইয়ের ইচ্ছে ছিল বড় হলে তার ব্যবসায় পূর্ণেন্দুকে ভার দেবে। কিন্তু সে রাজী নয়। পড়ালেখা করে সে নিজের স্বাধীনতায় বাঁচতে চায়। আপত্তি উঠলো সেখানেই। জেদাজেদির এই সংঘাতে বিদ্রোহী পূর্ণেন্দু জ্যাঠার সম্পর্ক ত্যাগ করে মালয় দেশে চলে আসে। কারণ জ্যাঠার স্বারস্থ সে কোনদিনই হবে না।

পূর্ণেন্দু তখন থেকে মালয়ে। তারপর দীর্ঘবছর পর এটর্নীর এই এই চিঠি। সুদর্শনই সবকিছু পরামর্শ দিল। বন্ধুকে বুঝিয়ে দিল—একবার দেখতে দোষ কি? যদি তোর ভাল লাগে, তবেই বিয়ে করবি। নইলে সোজা চলে আসবি। এতে ভয় বা ভাবনার কি আছে?

পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। বিমানপথে সমস্ত যাত্রী মারা যায়। সবাই জানতো পূর্ণেন্দু মারা গেছে। কিন্তু সময়াভাবের জন্য সে আগের টিকিটটি বাতিল করে দেয় শেষসময়। পরবর্তী বিমানের যাত্রী ছিল বন্ধে পূর্ণেন্দু আর সুদর্শন এ যাত্রায় রক্ষা পেল। জ্যাঠার বাড়ীতে যখন তারা উঠলো তখন দেখা গেল পূর্ণেন্দুরই শ্রাদ্ধ হচ্ছে বেশ ঘটা করে। সুতরাং আত্মপরিচয় দেবার আর কোন সুযোগই রইলো না তার। বাধ্য হয়ে অন্য নামে তার নাম হল নন্দগোপাল। সুদর্শন বলে, ভালই হল। ওদের ভুল ভেঙ্গে দরকার নেই, বেনামে মেয়েটিকে বাজিয়ে নে। তারপর সুযোগ বুঝলে আত্ম-পরিচয় দিবি।

মেয়েটির নাম—উমা। দেখতে ভালই। কিন্তু স্বভাব-চরিত্র? সব জানতে সুদর্শনের পরামর্শে নন্দগোপাল সেই আপন বাড়ীতে চাকরি নেয় ম্যানেজারের পোস্টে। এখন মালিক উমা। নন্দ তার প্রধান কর্মসচিব। যখন-তখন দেখা হচ্ছে। কিন্তু নন্দ কোন হদিস পায় না। বাড়ীতে এক সুদর্শন ডাক্তার আসে তার সঙ্গেই যেন উমা বেশী কথা বলে। ফলে যখন নন্দ নিরুপায় হয়ে ফিরে যেতে মন স্থির করছে, ঠিক তখন খবর পাওয়া গেল—বিমান দুর্ঘটনায় পূর্ণেন্দু রক্ষা পেয়ে ফিরে আসছে। নির্বাক হল আসল পূর্ণেন্দু অর্থাৎ নন্দগোপাল। কিন্তু ঘটনা এগিয়ে চললো। উমার সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে জাল পূর্ণেন্দু এবাড়ীতে এসে আত্মীয়র মত দাবী জানালো। সকলেই তাকে সমবেদনা জানিয়ে গ্রহণ করে। নন্দ ভেবে নেয় সব। এবার নকল পূর্ণেন্দুর মুখোস উন্মোচন করতে নন্দ যখন পা বাড়ায় তখন আইনের চোখে আসল পূর্ণেন্দু নকলের কাছে পরাভূত হল। আসল জাল, আর জালই আসল, প্রমাণিত হয়। মিথ্যা অপবাদে নন্দকে বন্দী করলো জাল পূর্ণেন্দু। অন্য এক চক্রান্তে তাকে ওরা গুম করে রাখে। পরের দিন সবাই জানতে পারে নন্দগোপাল অনেক টাকা চুরি করে রাতারাতি কোথায় পালিয়ে গেছে।

বিশুকাকা আর উমা নন্দর এব্যাবহারে খুবই ক্ষুন্ন হলেন। উমাকে শেষপর্যন্ত জাল পূর্ণেন্দুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হল। বিয়ের দিন নির্দিষ্ট হল। এদিকে বন্ধুর কোন খোঁজ না পেয়ে সুদর্শন পুলিশে-পুলিশে, পাড়ায়-পাড়ায় সন্ধান নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কোথায় পাবে নন্দকে। সেতো ঘর-বন্দী জাল পূর্ণেন্দুর চক্রান্তে। বিয়ের শুভদিনটি সুরু হল। বিয়ের আসরে উমার পাশে জাল পূর্ণেন্দু, পুরোহিত-মন্ত্র পড়ছে। হঠাৎ শুভবাসরে কোথা থেকে মুখে একগাল দাড়ি নিয়ে নন্দগোপাল অর্থাৎ আসল পূর্ণেন্দু ছুটতে ছুটতে হাজির হল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে—বিশুকাকা, এ বিয়ে বন্ধ করুন,—ঐ লোকটা আসল নয়। এ জাল পূর্ণেন্দু।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। নন্দ আবার মার খেল। বাড়ী থেকে তাকে বার করে দেবার সময় হঠাৎ সুদর্শন পুলিশসহ জাল পূর্ণেন্দুর স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত হল। জাল পূর্ণেন্দু ধরা পড়লো। দুর্ঘটনার বাধা এবং বিপত্তি কাটিয়ে কাঞ্চনকন্যা উমার সঙ্গে নন্দ অর্থাৎ আসল পূর্ণেন্দুর শেষপর্যন্ত বিয়ে হল।

কাহিনী এখানেই শেষ। চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার এ চিত্র-কাহিনীর নাম 'কাঞ্চনকন্যা'। মুক্তিপ্রতীক্ষিত এ ছবিটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, অনুপকুমার, সুমিতা সান্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, বঙ্কিম ঘোষ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণ সম্পাদনা, সঙ্গীত ও চিত্র-পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে দেওজীভাই, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভি, বালসারা এবং সুখেন্দু চক্রবর্তী। শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স এ ছবির পরিবেশক।

—চিত্রদূত

খেলাধূলা

দর্শক

তিক্ত অভিজ্ঞতা

পূর্ব আফ্রিকা সফরে ভারতীয় হকি দলের ব্যর্থতার সংবাদে আমরা খুবই আঘাত পেয়েছিলাম। খবরের কাগজে খেলার অতি সংক্ষিপ্ত ফলাফল থেকে আমরা প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম—বিদেশের জলবায়ু, অপরিচিত খেলার মাঠ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে বুঝাপড়ার অভাবই ব্যর্থতার কারণ। বিদেশে স্বাভাবিক কারণে সফরকারী দলকে এই রকম বিপর্যয়ের মুখে সফরের প্রথম দিকের খেলায় পড়তে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব আফ্রিকা সফরে ভারতীয় হকি দলকে এই ধরণের অসুবিধা ছাড়াও অন্য রকমের বহু অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। প্রথমতঃ ভারতীয় হকি দল বিদেশ যাত্রার মাত্র তিন দিন আগে পূর্ব আফ্রিকা সফরের তালিকা হাতে পায়। কেনিয়াতে পৌঁছবার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্থানীয় দলের বিপক্ষে ঠাণ্ডা পরিবেশের মধ্যে ভারতীয় দলকে মাঠে নামতে হয়েছিল। পরপর প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলার তারিখ পড়াতে ভারতীয় দল বিশ্রাম নিতে পারেনি। সফরের তালিকা পরিবর্তনের অনুরোধে কোন কাজ হয়নি; কেনিয়া হকি ইউনিয়ন ভারতীয় দলের অনুরোধের জবাবে এক পাল্টা অবাস্তব প্রস্তাব দেয়—একমাত্র আর্থিক ক্ষতির দায়িত্ব গ্রহণ করলে সফরের তালিকা পরিবর্তন সম্ভব।

তাদের এই প্রস্তাবে বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন জড়িত থাকায় ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত পূর্বের তালিকা অনুযায়ী খেলতে বাধ্য হয়। খেলার আইন এবং মাঠ নিয়েও ভারতবর্ষকে কম দুর্ভোগ পেতে হয়নি। প্রথম দুটি টেস্ট খেলায় আন্তর্জাতিক আইন-পালনের কোন বালাই ছিল না। তৃতীয় টেস্ট খেলার আয়োজন করা হয়েছিল ফুটবল মাঠে। অনুরোধ করেও কোন ফল হয়নি। ভারতবর্ষকে অনভ্যস্ত কঠিন মাটিতে চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্ট খেলতে হয়েছিল। এইখানেই দুর্ভোগের শেষ নেই। খেলার মাঠে এবং বাইরে ভারতীয় হকি দলকে যে ভারত-বিরোধী পরিবেশে পড়তে হয়েছিল তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি বেদনাদায়ক। আশ্চর্য, সংবাদপত্রও ভারত-বিরোধী মনোভাব উস্কানোতে জনসাধারণকে ইন্ধন দিয়েছিলেন। আরও আশ্চর্য লাগে, যখন খেলার মাঠে দেখা যায় শতকরা ৯০ জন দর্শক এবং খেলোয়াড়দের অধিকাংশই এশিয়াবাসী। পূর্ব আফ্রিকার হকি খেলায় প্রবাসী ভারতীয়দের দান কম নয়; আন্তর্জাতিক হকি খেলায় দল তৈরী করার সময় স্থানীয় ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রথমেই ডাক পড়ে। ভারতবর্ষ এবং কেনিয়ার মধ্যে যেখানে রাজনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সেখানে এই ধরণের ভারত-বিরোধী মনোভাব খুবই বেদনাদায়ক। কেনিয়ার মাঠে খেলাধুলোর আদর্শের যে মৃত্যু ঘটেছে সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। খেলাতে নিজ দলের জয়লাভ কামনা করা অথবা জয়লাভে উল্লাস প্রকাশ করা দোষের নয়। কিন্তু সেই কামনা এবং উল্লাসকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ভদ্রভাবে সীমাবদ্ধ না রাখলে মানুষের মধ্যে সুপ্ত পশুপ্রবৃত্তি ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে সমাজ-জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে। জাতীয় জীবনে এই ধরণের অশান্তি খুবই ক্ষতিকর। সুতরাং নিজের দল সম্পর্কে কামনা এবং উল্লাসের গণ্ডী সীমাবদ্ধ রাখতে হলে বিপক্ষ দলকেও খেলায় উৎসাহিত করা এবং তাদের পরাজয়ে সমবেদনা অনুভব করার অভ্যাস থাকা একান্ত প্রয়োজন। ন'চেৎ খেলাধুলো আর খেলাধুলোর পর্যায়ে থাকবে না—খেলাধুলা তখন সমাজ দেহে অতি যন্ত্রণাদায়ক একটা দূষিত ক্ষত হয়ে দাঁড়াবে।

মুখ রক্ষা

খুব যোগ্যতার সঙ্গেই বি এন আর এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ফুটবল খেলায় বাঙ্গালা দেশের মুখ রক্ষা করেছে। এ বছরের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান এবং রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অপ্রত্যাশিতভাবে আই এফ এ শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নেওয়াতে অনেকেরই আশঙ্কা হয়েছিল দ্বিতীয়বার বুঝি বাঙ্গলার বাইরে আই এফ এ শীল্ড চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত সেমি-ফাইনালে বি এন আর ৩—২ গোলে প্রখ্যাত হায়দরাবাদ একাদশ দলকে এবং অপরদিকে মহমেডান স্পোর্টিং ২—০ গোলে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে পরাজিত করায় দুর্যোগের ফাঁড়া কেটে যায়।

কিন্তু বাঙ্গলার মুখ রক্ষা করতে পারেনি গত বছরের জাতীয় জুনিয়র ফুটবল ট্রফী বিজয়ী বাঙ্গলা দল। এলাহাবাদে ১৯৬৩ সালের জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বাঙ্গলা অপ্রত্যাশিতভাবে ০—৩ গোলে [illegible]।

আপ্পালারাজু

॥ আই এফ এ শীল্ড ॥

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী দলের নামের তালিকায় এই নতুন নামটি উৎকীর্ণ হ'ল—বি এন আর। ১৯৬৩ সালের সদ্য সমাপ্ত আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে বি এন আর দল ১—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে তাদের প্রথম বারের শীল্ড ফাইনাল খেলায় শীল্ড জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ১৯৬৩ সালে বি এন আর দল আরও একটি মূল্যবান পুরস্কার জয় করেছে—আন্তঃ রেলওয়ে ফুটবল ট্রফি। তাছাড়া ক'লকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় তাদের এ বছরের খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা এক সময়ে লীগ চ্যাম্পিয়নসীপের পাল্লায় প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শেষ দিকে তারা হাল ছেড়ে দেয় এবং লীগের তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করে। পঞ্চম স্থান পায় মহমেডান স্পোর্টিং। সুতরাং লীগ তালিকায় তৃতীয় এবং পঞ্চম স্থান অধিকারী বি এন আর এবং মহমেডান স্পোর্টিং দল যে আই এফ এ শীল্ড খেলার ফাইনালে উঠবে—সে সম্পর্কে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহস পাননি। আই এফ এ শীল্ড খেলায় বি এন আর দলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল গত বছরের শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান এবং রানার্স-আপ হায়দরাবাদ একাদশ। বি এন আর কোয়ার্টার ফাইনালে ২—০ গোলে মোহনবাগানকে এবং সেমিফাইনালে ৩—২ গোলে হায়দরাবাদ একাদশ দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকে মহমেডান স্পোর্টিং দল কোয়ার্টার ফাইনালে ২—১ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে এবং সেমিফাইনালে ২—০ গোলে ইণ্ডিয়ান

মেন্ডী দলকে পরাজিত করে ৬ষ্ঠবার আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে খেলবার কৃতিত্ব লাভ করে।

ফাইনালে খেলা মোটেই উন্নত পর্যায়ের হয়নি। ফাইনাল খেলা দেখতে গিয়ে সব সময়েই দর্শকদের মনে পড়েছে মোহনবাগান এবং হায়দরাবাদ দলের বিপক্ষে বি এন আর দলের উন্নত পর্যায়ের খেলা। ফাইনাল খেলা আরম্ভ হওয়ার দু'মিনিটের মধ্যে বি এন আর এক গোল দিয়ে অগ্রগামী হয়। এই থেকে লোকের ধারণা হয়, মহমেডান স্পোর্টিং দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে হবে। বি এন আর দল গোল দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগগুলি নষ্ট না করলে লোকের ধারণা নির্ভুল হ'ত। প্রথমার্ধের খেলায় ১৭, ১৯ এবং ২৮ মিনিটে বি এন আর দল গোল দেওয়ার তিনটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে।

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ১৫ মিনিটের খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং দল দারুণ চেপে ধরে বি এন আর দলকে। কিন্তু তারা কোন সময়েই রেল দলের মত গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ সৃষ্টি করতে অথবা রক্ষণব্যূহ ভেদ করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারেনি। এই চাপের মুখে রেল দলের গোলরক্ষক ডি দাস এবং স্টপার অরুণ ঘোষের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ ১০ মিনিটে বি এন আর দলের আক্রমণভাগের চাপে পড়ে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে খুবই নাজেহাল হতে হয়েছিল। গোলরক্ষক মুস্তাফা, রাইট হাফ বি সরকার এবং লেফট হাফ মৈনের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই রেল দলের পক্ষে গোলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। এই দিন মাঠের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে দর্শক সাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন বি এন রেল দলের সেন্টার-ফরোয়ার্ড এন্টনী।

এ বছরের আই এফ এ শীল্ড খেলায় বি এন আর দলকে পাঁচটি দলের বিপক্ষে খেলতে হয়েছিল। তারা মোট ১৩টি গোল দিয়ে মাত্র ২টি গোল খায়। দলের যোগ্য অধিনায়ক আপ্পালারাজু একাই দুটি 'হ্যাট-ট্রিক' সমেত ৮টি গোল দেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ১৯৬৩ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলায় এই ৬ জন খেলোয়াড় হ্যাট-ট্রিক করেছেন : (১) সালাউদ্দিন (মহমেডান স্পোর্টিং) কালীঘাটের বিপক্ষে, (২) পি সরকার (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) হুগলী জেলা দলের বিপক্ষে, (৩) আপ্পালারাজু (বি এন আর) খিদিরপুর এবং হায়দরাবাদ একাদশ দলের বিপক্ষে, (৪) এস নন্দী (মোহনবাগান) হাওড়া জেলা দলের বিপক্ষে, (৫) কুপারস্বামী (এম আর সি) বর্ধমান জেলা দলের বিপক্ষে এবং (৬) ইউসুফ খান (হায়দরাবাদ একাদশ) স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের বিপক্ষে।

॥ রাজ্য সন্তরণ অনুষ্ঠান ॥

১৯৬৩ সালের রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় (২৬-তম বার্ষিক অনুষ্ঠান) ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন প্রত্যেকটি বিভাগীয় অনুষ্ঠানে (মোট সংখ্যা ৭) দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রে রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। হাটখোলা ক্লাবের নিমাই দাস ১০০, ২০০, ৪০০ এবং ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে প্রথম হ'য়ে ব্যক্তিগত সাফল্যের নজির রেখেছেন। ১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে এই নিয়ে তিনি চারবার প্রথম স্থান পেলেন।

নতুন রাজ্য রেকর্ড

ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
১ মিঃ ৬·১ সেঃ—সুব্রত সাহা (হাটখোলা)

বালক বিভাগ
(১৬ বছর বয়সের নীচে)

১০০ মিটার বুক সাঁতার :
১ মিঃ ২৬·০২ সেঃ—পরিমল চন্দ্র (সেণ্ট্রাল)

পূর্ব রেকর্ড : ১ মিঃ ২৭·৪ সেঃ (পি মুখার্জি), ১৯৬২
ভারতীয় রেকর্ড : ১ মিঃ ২৭·১ সেঃ (সুবীর সেন), ১৯৬১

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল :
৫ মিঃ ২৫·৯ সেঃ—প্রেমময় বিশ্বাস (ন্যাশনাল)

পরিমল চন্দ্র

দলগত সাফল্যের তালিকা
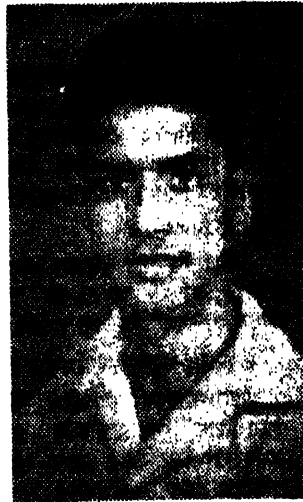
সিনিয়র বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ১ম—ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন (৫৫ পয়েণ্ট);
২য়—হাটখোলা (২৬ পয়েণ্ট)

ডাইভিং

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ১ম—ন্যাশনাল এস এ (১৬ পয়েণ্ট);
২য়—পশ্চিমবঙ্গ পুলিস (২ পয়েণ্ট)

ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ১ম—ন্যাশনাল এস এ (১৯ পয়েণ্ট);
২য়—বৌবাজার বি এস (৭ পয়েণ্ট)

জুনিয়ার বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ১ম—ন্যাশনাল এস এ (৪০ পয়েণ্ট);
২য়—বৌবাজার বি এস (১৫ পয়েণ্ট)

বালক বিভাগ
(১৬ বছর বয়সের নীচে)

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ১ম—ন্যাশনাল এস এ (২২ পয়েণ্ট);
২য়—ক্যালকাটা এস এ (৮ পয়েণ্ট)

মহিলা বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ১ম—ন্যাশনাল এস এ (২০ পয়েণ্ট);
২য়—ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং (৯ পয়েণ্ট)

জুনিয়ার

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ১ম—ন্যাশনাল এস এ (১১ পয়েণ্ট);
২য়— মেদিনীপুর (৬ পয়েণ্ট)

ওয়াটার পোলো : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহন বিভাগ ফাইনালে ১২—১১ গোলে জয়লাভ করে।

জেলা অঞ্চল

বালক বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ১ম—মেদিনীপুর (১৬ পয়েণ্ট);
২য়—২৪-পরগণা (৬ পয়েণ্ট)

॥ ডেভিস কাপ ॥

১৯৬৩ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার আমেরিকান জোন ফাইনালে আমেরিকা ৫—০ খেলায় ভেনেজুয়েলাকে পরাজিত করে ইণ্টার-জোন সেমিফাইনালে বৃটেনের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। সুতরাং ইণ্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে খেলবে আমেরিকা অথবা বৃটেন। ইণ্টার-জোন ফাইনালের বিজয়ী দেশ শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে (প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ে) গত চার বছরের (১৯৫৯—৬২) ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবে। এ পর্যন্ত আমেরিকা ১৯ বার ডেভিস কাপ জয় করেছে। যুদ্ধোত্তর কালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় গত ১৭ বছরের (১৯৪৬—৬২) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে মাত্র তিনটি দেশ খেলেছে — অস্ট্রেলিয়া (১৭ বার), আমেরিকা (১৪ বার), ইতালী (২ বার) এবং মেক্সিকো (১ বার)। এদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা একটানা ১৪ বছর (১৯৪৬—৫৯) পরস্পরের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে। এই ১৪ বছরের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ জয় ৮ বার এবং আমেরিকার ৬ বার। অস্ট্রেলিয়া পরবর্তী তিন বছরও (১৯৬০—৬২) ডেভিস কাপ পেয়েছে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ইতালী এবং মেক্সিকোর

আই এফ এ'র সভাপতি শ্রীঅতুলা ঘোষসহ ১৯৬৩ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী বি এন আর দল

বিপক্ষে খেলে। ফলে গত ১৭ বছরের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে (১৯৪৬--৬২) অস্ট্রেলিয়া প্রতি বছরই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে এবং ডেভিস কাপ জয় করেছে ১১ বার—ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব সাফল্য। অস্ট্রেলিয়া এ পর্যন্ত ডেভিস কাপ পেয়েছে ১৯ বার—আমেরিকার সমান (সর্বাধিক বার জয়লাভের রেকর্ড)।

॥ ইস্ট জোন টেবল টেনিস ॥

১৯৬৩ সালের ইস্ট-জোন টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা — মহিলা বিভাগের সিংগলস ফাইনালে বাংলার রবিনা রায়ের কাছে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়ান ঊষা সুন্দররাজের স্ট্রেট সেটে পরাজয়। বোম্বাইয়ের ফারুক খোদাইজি পুরুষদের সিংগলস এবং রতিশ চাচাদির জুটিতে ডাবলস খেতাব নিয়ে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস :

ফারুক খোদাইজি (বোম্বাই) ২১-১২, ২৪-২২ ও ২১-১৩ গেমে মলয় ভট্টাচার্যকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস :

রবিনা রায় (বাংলা) ২২-২০, ২১-১৬, ২১-১৩ গেমে ঊষা সুন্দররাজকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস :

ফারুক খোদাইজি এবং রতিশ চাচাদি (বোম্বাই) ২০-২২, ২৩-২১, ১৬-২১, ২১-৯ ও ২১-১৬ গেমে পাম্পু হালদাপ্পার (রেলওয়ে) এবং দিলীপ মুখার্জিকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিংগলস :

প্রসাদ ব্যানার্জি (বাংলা) ২১-১১, ২৫-২৩, ১৪-২১ ও ২১-১৮ গেমে অমৃত খোলসাকে পরাজিত করেন।

॥ টমাস-কাপ ব্যাডমিন্টন ॥

নিউজিল্যাণ্ডের ওয়েলিংটনে অনুষ্ঠিত টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার অস্ট্রেলিয়ান জোন সেমি-ফাইনালে মালয় ৮—১ খেলায় ভারতবর্ষকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। প্রথম দিনের উদ্বোধনী খেলায় ভারতবর্ষের অধিনায়ক নান্দু নাটেকার মালয়ের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় চেং হোকে পরাজিত করেন। প্রথম দিনেই মালয় ৩—১ খেলায় অগ্রগামী ছিল।

অস্ট্রেলিয়ান জোন ফাইনালে মালয় ৫—০ খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে জোন-ফাইনালে ডেনমার্কের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। জোন-ফাইনালের বিজয়ী দেশই শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবে গত দু'বারের (১৯৫৮ ও ১৯৬১) বিজয়ী ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে। টমাস কাপ বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ১৯৪৮ সালে। মালয় সূচনা থেকে উপর্যুপরি তিনবার (১৯৪৮-৪৯, ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৪-৫৫) টমাস কাপ জয় করেছে।

ভারত ১৯৫২ এবং ১৯৫৫ সালের টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষ ইন্টারজোন পর্যায়ে ৬—৩ খেলায় শক্তিশালী ডেনমার্ককে পরাজিত ক'রে জোন-ফাইনালে অল্পের জন্যে ৪—৫ খেলায় আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়। আমেরিকার বিপক্ষে ভারতবর্ষ জয়লাভ করলে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে টমাস কাপ বিজয়ী মালয়ের বিপক্ষে খেলতো। ১৯৫৫ সালের প্রতিযোগিতায় ইন্টারজোন ফাইনালে ভারতবর্ষ ৩—৬ খেলায় ডেনমার্কের কাছে হেরে যায়। গত ৫ম প্রতিযোগিতায় (১৯৬১) থাইল্যান্ড ৬—৩ খেলায় ভারতবর্ষকে এশিয়ান জোনের প্রথম রাউণ্ডেই পরাজিত করে। এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় প্রতি তৃতীয় বছরে।

খেলার কথা

অজয় বসু

খবরগুলো পুরানো। পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তবুও টুকরো খবরগুলিকে আজ এক জায়গায় সাজিয়ে রাখছি এই কারণে যে সংবাদগুলির পটভূমিকায় খেলাধুলোর দুনিয়ায় সমস্যা-কণ্টকিত যে বাস্তব ছবি রয়েছে, তা হয়তো এইসূত্রে পাঠকদের নজরে ধরা দেবে।

আপাতঃদৃষ্টিতে খবরগুলি মজাদার, মুখরোচক। কিন্তু কিঞ্চিৎ তলিয়ে ভাবলেই বোঝা যাবে যে প্রকৃতপক্ষে এই উপাদানগুলি আদৌ মজাদার নয়। মজার খবরের আড়ালে এমন অসুস্থ মনোভাবের ছিটেফোঁটা রয়ে গিয়েছে, যার ছোঁয়া খেলাধুলোর আদর্শকে কলঙ্কিত করে তোলায় যথেষ্ট।

ধরা যাক্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত আন্তঃ-কলেজ ফুটবল লীগের সেই খবরটির কথা। খবর এই যে এক অনুমোদিত

কলেজ দলে খেলতে আসার পরও এক ছাত্র-খেলোয়াড় অনেক চেষ্টাতেও তাঁর নাম স্বাক্ষর করতে পারলেন না।

তথাকথিত ছাত্রটি কাগজে হিজিবিজি আঁকলেন, কলমের নিব বাঁকালেন, দোয়াত ওল্টালেন, কিন্তু কিছুতেই পুরো নামের স্বাক্ষর কাগজের পাতায় ধরে রাখতে পারলেন না। উনি নাকি ছাত্র! স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার গন্ডী পেরিয়েই কলেজে ঢুকেছেন এই দাবীতেই উনি সেদিন আন্তঃ-কলেজ ক্রীড়ানুষ্ঠান-কেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন। অথচ সই করতে গিয়ে নাকাল!

সই করার চেষ্টায় তাঁর ঘর্মাক্ত চেহারা দেখে হয়তো আমরা হেসেছিলাম সেদিন। কিন্তু সত্যিই কি নজীরটি নিছক হাসিরই?

সই করতে কলম বাঁকান যিনি, তিনি অবশ্যই কলেজের ছাত্র নন। তবে তিনি কি করে দলে ঢুকলেন? নিশ্চয়ই কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিদেনপক্ষে পরোক্ষ অনুমোদন ছিল এ ব্যাপারে। কলেজগুলির খেলাধুলোর দিকে নজর রাখার জন্যে নির্দিষ্ট অধ্যাপকদের ওপর দায়িত্ব থাকে। তাঁরা কোন্ আদর্শ পথে যে সে দায়িত্ব পালন করছেন, এই দৃষ্টান্ত থেকেই তা মালুম পাওয়া যায়।

অন্যদের কথা না হয় উহ্যই রাখলাম। শিক্ষিত, পাণ্ডিত্যপ্রবর অধ্যাপকেরাও যদি এইভাবে মিথ্যার বেসাতিতে হাত পাকাতে শুরু করে দেন, তা'হলে আর কাদের ওপরই বা ভরসা রাখা যায়! ও'দের কাছেও হারজিত, কাপ-মেডেলের মূল্য বেশী। আসল খেলাটা ছোট! ততোধিক সামান্য ও'দের বিচারেও ক্রীড়ানুষ্ঠানের মূল্যশিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ!

বৃটেনের ফুটবল লীগের সেই খবরটির কথা হয়তো অনেকের মনে আছে। সেই যে জনতিনেক ফুটবলার একটি খেলার ফলাফল আগে থেকেই গড়েপিটে রাখতে হাত পেতে মোটা টাকা ঘুষ নিয়েছিল? তারাও খেলার জগতের সমস্যা। সামান্য নয়, মস্তো সমস্যা।

ধরা পড়ায়, তারা এফ এর বিধানে শাস্তি পেয়েছে। আদালতেও দণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু ওদের দলের সকলে এখনও ধরা পড়েনি। অমন আরও অনেকে আছে যারা খেলার ফলাফল গড়াপেটায় রীতিমতো সিদ্ধহস্ত। পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির কারবারে পুরানো ঘুঘু।

ফুটবল-দুনিয়ায় এমন অঞ্চল আছে, যেখানে শুধু খেলোয়াড়েরাই নয়, কর্মকর্তারাও খেলার ফলাফল গড়াপেটায় বড়পক্ষ। কিন্তু কর্মকর্তা বলেই তাদের জালে আটকাবার চেষ্টা করা হয় না। ফলে সে অঞ্চলের সমস্যা দিনে দিনে দঢ়তর হয়। কবে যে সে অঞ্চলের ফুটবলের রাহুমুক্তি ঘটবে, তা কে জানে!

ফুটবল একটি জীবন্ত অনুষ্ঠান। তাই তীব্র উত্তেজনারও আকর। ফুটবল খেলতে খেলতে অথবা দেখতে দেখতে উত্তেজিত মানুষ কতো কাণ্ডই না বাঁধিয়েছে!

ক'মাস আগে পেরুর ইমার এক মাঠে একদল উত্তেজিত দর্শক দক্ষযজ্ঞ বাধাবার পর পুলিশের প্রহারে তারা সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল। ওই উত্তেজিত দর্শককুলের আচরণ ছিল কিছুটা বিচিত্র। ইমার কাকুশে স্টেডিয়ামে তারা এসেছিল একটি বিশেষ দলকে সমর্থন জানাতে।

হঠাৎ বিপক্ষ দলে একজন নামী খেলোয়াড়ের উপস্থিতি আবিষ্কার করে সরবে তারা দাবী তুললো 'উনি কেন খেলবেন? তা'হলে যে আমাদের দল হেরে যাবে!' সেই দাবীতে সুর চড়লো। মেজাজও। তারপর বোতল, ইট, চেলা-কাঠ, রড ছুঁড়ে তারা দাবীদাওয়ার নিষ্পত্তি করতে এগুলো। অগত্যা পুলিশের আবির্ভাব।

এই মেজাজ কি মেঠো সমস্যা নয়? কে খেলবে কোথায় তা ডিক্টেট করার অধিকারও ওই অবুঝ দর্শকেরা নিজেদের হাতে তুলে দিতে চায়। এরপর ওরা কি চাইবে যে ওদের ইচ্ছে অনুযায়ীই খেলার হারজিত হোক্?

নিজের ইচ্ছেকে রেফারীর ওপর চাপিয়ে দিতেই অবুঝ উত্তেজিত দল-সমর্থকেরা ব্যস্ত। তবে এই ব্যস্ততায় যখন খেলোয়াড়েরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন, তখন ব্যাপারটি বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

সুস্থ, শিক্ষিত মন জানে যে মানুষ বলেই রেফারীর কাজে, নির্দেশে ভুলচুক ঘটা অস্বাভাবিক নয়। পরিচালন-পদ্ধতিতে গলদ দেখা দিলে, তা মেনে নেওয়াই খেলোয়াড়ের ধর্ম। কিন্তু সব খেলোয়াড় সে ধর্মাচারণে সঠিক ভূমিকা দিতে পারেন কই?

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত দল টাটা স্পোর্টস ক্লাবের লেফট ইনসাইড দেবদাস

হারউড লীগের এক খেলায় স্বধর্ম বিসর্জন দিয়ে রেফারীকে নিগৃহীত করেছেন। আইন অনুযায়ী দেবদাস দণ্ড পাবেন। কিন্তু দণ্ড পেলেও কি তাঁর অপরাধের ভার কমবে?

নিজে খেলোয়াড় হয়েও রেফারীকে 'সমুচিত শিক্ষা' দিতে মাঠের মধ্যে যিনি আইনটিকে নিজের হাতে তুলে নেন তিনি 'খেলোয়াড়' নন। এবং খেলাধুলো তাঁর জন্যেও নয়। খেলা খেলাই। ধুলোবর্জিত এক আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান মাত্র। কিন্তু যাঁরা খেলতে এসে শুধু ধুলো নিয়েই মাখামাখি করেন তাঁরা খেলার জগতের সমস্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা স্বধর্মচ্যুত, ব্রাত্য।

সিডনী থেকে পাওয়া এক খবরে জেনেছি যে, অস্ট্রেলিয়ায় ফুটবল মাঠে
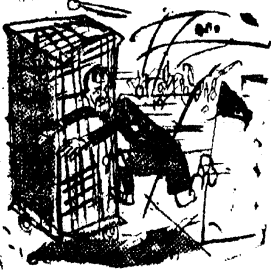
উচ্ছৃঙ্খল জনতার হাতে রেফারীরা যেন নিত্য নিয়মিতই নিগৃহীত হচ্ছেন। ফলে ব্যবস্থাপকেরা মাটির তলায় সুড়ঙ্গ গড়ে রেফারীদের সেই নেপথ্যে পথ পরিক্রমার ব্যবস্থার কথা ভাবছেন। এবং সেই সঙ্গে মাঠের পাশেই লোহার তারের একটি খাঁচা রাখবারও পরিকল্পনা আঁটছেন। বেড়া ডিঙিয়ে উত্তেজিত দর্শকেরা যদি মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়েন তাহলে রেফারী খাঁচার মধ্যে শরীর গলিয়ে বাঁচার রাস্তা খুঁজতে পারেন।

কিন্তু কোনো বেপরোয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক যদি খাঁচার ফাঁক গলিয়ে গুলী চালিয়ে দেন? তাহলে? তাহলে যে কি করা যাবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!

শুনেছি যে দক্ষিণ আমেরিকার দর্শকদের আগুনে মেজাজ তাতেও পেছপা নয়। সে দেশে দর্শকদের নাগাল এড়াতে মাঠের পাশে বড়সড় পরিখা খুঁড়ে রাখা আছে। বীর হনুমানকে স্মরণ ক'রেও দর্শকেরা এক লাফে পরিখা ডিঙোতে পারেন না। বড্ড অসুবিধা তাঁদের। তাই বুঝি দূরে থেকে তাক্ করে বারুদ শানাবার পথটিকে তাঁরা শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছেন!

অস্ট্রেলিয়ার সংগঠকেরা খাঁচা ও সুড়ঙ্গ গড়া ছাড়া খেলোয়াড়দের উৎপাত থেকে রেফারীদের বাঁচাবার তাগিদে আরও একটি পরিকল্পনার সুপারিশ জানিয়েছেন। এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে ফুটবল-রেফারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন জাঁদরেল মুষ্টিযোদ্ধারা। খেলোয়াড়েরা বাড়াবাড়ি করলে যাঁরা নির্মেঘে ঘুঁষি চালাতে কুণ্ঠিত হবেন না। এ দাওয়াই অভিনব। তবে এ পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ আদৌ সম্ভবপর কিনা তা জানি না। যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে ভবিষ্যতে ফুটবল মাঠে বল লাথালাথির বদলে কি ঘুষোঘুষি দেখতে হবে?

ফুটবল-রেফারীদের ভাগ্য দেখে আজ বোধ হয় কারুরই হিংসে হয় না। ও'রা তারিফ পান কদাচিৎ। নিন্দার ভাগ মেলে যত্রতত্র। কি সুখেই যে ক্রীড়ামোদীরা রেফারী হতে চান তা জানেন একমাত্র ও'রাই।

কিন্তু সুখ, স্বস্তি, সান্ত্বনা আছে অবশ্যই নইলে চেক্ তরুণী কুমারী গ্রেগ্রোভা বা আজ বাঁশী মুখে ফুটবল মাঠে নামবেন কেন? মহিলা-মহলে ফুটবল-রেফারীর ভূমিকায় তিনি পথিকৃৎ। কতকটা ঐতিহাসিক চরিত্রের মতো। তবে এ কাজে কুমারী গ্রেগ্রোভা দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবেন তো?

সপ্তদশী ছাত্রী গ্রেগ্রোভা কাগজে-কলমে সমস্ত পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর মাঠের ভূমিকায়ও সাফল্য লাভ করেছেন। মাঠের ভূমিকা তাঁর স্বভাবজাত নমনীয় নয়। দরকার পড়লে বদমেজাজী খেলোয়াড়দেরও তিনি মাঠ ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ছোটখাটো অভিজ্ঞতার পর সম্প্রতি তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ায় খেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

গ্রেগ্রোভার ব্যক্তিত্ব আছে। ইস্পাত-কাঠামো মনও তাঁর ফুটবলের হট্টগোলে বিচলিত হয় না। ওসবে তিনি রীতিমতো অভ্যস্ত। গ্রেগ্রোভার জনক ছিলেন এক পরিণত ফুটবল-রেফারী, বাবার হাত ধরে মাঠে মাঠে ঘুরেই গ্রেগ্রোভা ফুটবলের পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি শুধু পথিকৃৎই নন, ফুটবল-দুনিয়ায় একমাত্র মহিলা-রেফারী।

অনেকে বলেন যে, ফুটবল মাঠে এই মহিলার আবির্ভাব নাকি খেলোয়াড়দের সহবত মেনে চলায় নতুন প্রেরণা জোগাচ্ছে। তাঁর প্রতি সম্মান দেখানোর শিক্ষা উত্তেজনার মুহূর্তেও খেলোয়াড়েরা ভুলতে চাইছেন না।

এই উপলব্ধি যদি খাঁটি হয় তাহলে দেশে দেশে, সর্বত্রই মহিলা-রেফারী নিয়োগের প্রথা চালু করা হোক্ না কেন? পুরুষেরা যা পারেননি কুমারী গ্রেগ্রোভায়া যদি তাই সহজসাধ্য করে দিতে পারেন তাহলে লোকসানের আশঙ্কা কিছুই থাকবে না। বরং লাভের অঙ্ক আরও বাড়বে। আর তাঁদের উপস্থিতিতে ফুটবল মাঠে নতুন রঙয়েরও আঁচড় পড়বে। শুধু চড়া মেজাজ নিয়ে কতোদিন আর কাটানো যায়? বিকল্পে রমণীয় রঙ মন্দ কি!

প্রেগয়ে এক অনুশীলন ফুটবল খেলায় বদমেজাজী খেলোয়াড়দের প্রতি ফুটবল দুনিয়ার একমাত্র মহিলা রেফারী কুমারী গ্রেগ্রোভার চরম নির্দেশ।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

অভয়পদর পরে অম্বিকাপদর পালা।

অভয়পদর চাকরি যাবার মাসকতক পরে তাকেও হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে ঘরে এসে বসতে হ'ল। রিটায়ার করার কথা তার নাকি আরও আগেই—বহু কৌশল করে নানা ব্যক্তিকে ধরে-পাকড়ে, ক্ষেত্রবিশেষে দু'চার টাকা ঘুষ খাইয়ে এতকাল টিকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আর কিছুতেই বাঁচানো গেল না। এবার সত্যি-সত্যিই গেল চাকরিটা।

অবশ্য তাতেও কোন সান্ত্বনা পেল না মহাশ্বেতা। কারণ চাকরি যাবার কিছুদিন আগেই সেজকর্তা তার বড় ছেলেটিকে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, এখন শোনা গেল মেজটিরও একটা হিল্লে হবে। খোদ ছোটসাহেব নাকি কথা দিয়েছেন—কোথাও একটা টুল খালি হলেই বসিয়ে দেবেন তাকে।

সুতরাং জ্বালা বেড়েই গেল বরং। মহাশ্বেতার একটি ছেলেরও হিল্লে হয়নি আজ পর্যন্ত। কেষ্টপদর বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে প্রস্তাবটা মুখে আনতে পারে নি মহাশ্বেতা। শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যথেষ্ট উচ্চ-ধারণা থাকলেও এটা সে বুঝতে পেরেছিল যে, তার বা তার স্বামীর হাতে যখন একটি পয়সাও নেই, তখন তার তরফ থেকে আর কোন খরচা বাড়ানোর কথা মুখে আনা উচিত নয়।

সে অম্বিকাপদর প্রথম ছেলেকে চাকরিতে ঢোকাবার সময় 'শয়তান', 'কুচক্কুরে', বদমাইশ, 'একচোখো' প্রভৃতি বলে গালাগাল দিয়ে বাড়ি মাথায় করেছিল কিন্তু পরেরটির আসন্ন চাকরির সংবাদে একেবারে যেন পাথর হয়ে গেল। তার মানে ওরা সব দিক দিয়েই গুছিয়ে নিলে। চাকরি—তা সে যেমনই হোক—মহাশ্বেতার কাছে চাকরি মানেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। চাকরি মানেই—নিরাপদ নিরুদ্বিগ্ন স্বাচ্ছন্দ জীবন; বিয়ে, ছেলেপুলে হওয়া, আবার তাদের মানুষ হয়ে ওঠা—একটার পর একটা আপন নিয়মেই চলবে।

ওদের সব হ'ল—তারই কিছু হ'ল না। কেন হ'ল না তা অবশ্য প্রথম প্রথম যথেষ্ট বোঝবার চেষ্টা করেছে অম্বিকাপদ। তার ছেলেরা তবু কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছে, ম্যাট্রিক পাশ করতে না পারুক, ঘষে ঘষে কোনমতে উঁচু ক্লাশ পর্যন্ত উঠেছে, ইংরেজী হরফ চেনে, সাধারণ দু'-একটা কথার মানে বোঝে—ইংরেজী হরফে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারে। মহার ছেলেরা কিছুই জানে না, বাংলাও পড়তে পারে না ভাল করে। ওদের মধ্যে একমাত্র ন্যাড়াই যা চার-পাঁচ ক্লাস পড়েছিল ইংরেজী ইস্কুলে। এ অবস্থায় ওদের কোন আফিসে চাকরি হওয়া অসম্ভব। বড়বাবুই হোক আর খোদ সাহেবই হোক—এখন আর কারুর দ্বারাই সম্ভব নয় এমন অঘটন ঘটানো। এক বেয়ারার চাকরি হ'তে পারে, পনেরো টাকাতে ঢুকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত মাইনে—ওতেই জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু তাও, অম্বিকাপদ যেখানে সসম্মানে এতদিন 'বাবু'র কাজ করে এসেছে, যেখানে তার ছেলেরা 'বাবু'র কাজে বসেছে বা বসবে, —সেখানে নিজের ভাইপোদের সত্তিক-জাতে এঁটো গেলাস ধোবার জন্যে বেয়ারার কাজে লাগাতে পারবে না সে।

কিন্তু এসব কথা মহাশ্বেতার বোঝার কথা নয়। তখনও বোঝে নি, এখনও বুঝল না। তখন নিষ্ফল আক্রোশে গজরেছিল এখন কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। জিতে গেল ওরা, জিতে গেল! একপুরুষেই নয়, পুরুষানুক্রমেই ওদের কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হবে তাকে বা তাদের। বড় হয়েও কোনদিন বড়র সম্মান পেল না সে। আর কোনদিন পাবেও না। কোথায় একটা ব্যর্থ আশা পোষণ করেছিল মহাশ্বেতা এতদিন যে, একদিন না একদিন এই অবিচারের প্রতিকার হবে, একদিন আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে সে, নিজের প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কি ক'রে সেটা ঘটবে তা সে জানে না, কখনও তলিয়ে ভেবে দেখে নি, যা হোক ক'রে হবেই কোন উপায়—এই আশ্বাসটুকু ধরে ছিল শুধু। সেই আশাতেই আরও সে পাগলের মতো টাকা ধার ক'রে এনে অভয়পদর হাতে তুলে দিয়েছিল অপরকে ধার দেওয়ার

জন্য, অকল্পিত সুদের লোভে। অন্তত টাকাও যদি খানিকটা হাতে আসত তা হ'লে দেখে নিত সে, ওদের সামনে মাথা উঁচু ক'রে হাটতে পারত। তাও হ'ল না, ভগবান চিরদিনই ওদের দিক টেনেছেন, আজও টানছেন।

এক একবার এই অসহায় নৈরাশ্য—এই দিকদিশাহীন অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তা যেন নিজে আর বইতে পারে না মহাশ্বেতা—ছুটে যায় স্বামীর কাছে, 'ওগো, এদের কথাটা কি ভাবছ? কি গতি হবে এদের? চিরকালই কি ভিক্ষের ভাত খেয়ে কাটাবে? সেও যতদিন তুমি আছ, তারপর তাও জুটবে কি?'

অভয়পদ আজকাল অনেকটা সামলে উঠেছে, প্রথম দিককার মতো স্থবির হয়ে আর বসে থাকে না—বাগানে টুকটাক এটা-ওটা ক'রে বেড়ায়। বলতে গেলে সারা দিনটাই বাগানে কাটায়, সন্ধ্যার পর এসে নিজের চিরাভ্যস্ত বেঞ্চিটাতে শুয়ে পড়ে। অন্ধকারেই শুয়ে থাকে। তবে ঘুমোয় না যে—সেটা টের পায় এরা। বহু রাত অবধিই ঘুমোয় না। হয়ত বা সারা-রাতই জেগে থাকে এক এক দিন।

স্ত্রীর আকুল প্রশ্নেও তার অবিচল স্থৈর্য নাড়া খায় না। উদাস স্তিমিত চোখ দুটো অপর কোন বস্তুর ওপর নিবদ্ধ ক'রে জবাব দেয় সে, 'কী জানি। আমি আর কি করব বলো, আমার আর কি হাত!'

'তাহ'লে কি এরা উপোস ক'রে মরবে?'

'ভাগ্যে থাকে তাই মরবে। আমি আর কি তাতে বাধা দিতে পারব? ভাগ্যই সব। মানুষের চেষ্টাতে যে কিছু হয় না তা তো দেখলেই।'

'তা কোন কারখানা-মারখানাতেই না হয় ঢুকিয়ে দাও না। মেজকত্তা তার নিজের আপিসে ছেলেকে ঢুকিয়ে ব্যবস্থা করে তবে বেরুলো। তোমাদের তো আসলে কারখানাই—তুমি তো সেখানে ছিলে এতকাল—সেখানে ঢোকাতে পারবে না? আজকাল তো অনেক ভদ্দরঘরের ছেলে শুনেছি লোহাপেটার কাজ করছে!'

'সে আগে চেষ্টা করলে হ'ত। আমি থাকতে থাকতে বললে হয়ত এক-আধটাকে ঢোকাতে পারতুম। তাও ওরা পারত না অবিশ্যি। লোহা পিটিয়ে খেটে খাবার ক্ষমতা ওদের নেই। তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে পারত। কিন্তু এখন আর আমার কোন হাত নেই। আমার পুরনো সাহেবরা সবাই চলে গেছে। তারা থাকলে আমার চাকরিই বা যাবে কেন? পুরনো বড়বাবুরাও কেউ আর নেই। যারা আছে তারা আমার কথা রাখবে না।'

বক্তব্য শেষ ক'রে নিতান্ত নির্দ্বিকল্প-ভাবেই আবার নিজের কাজে মন দেয় অভয়পদ। যেন আর কোন [illegible]

কারও ভবিষ্যতের কথা, কোন পরস্যাপি পরের প্রসঙ্গ তুলেছিল মহাশ্বেতা। চির-দিন এই রকম। কখনও ওর দিকে, ওর ছেলেদের দিকে তাকাল না মানুষটা। কখনও ওদের কথা ভাবল না। স্ত্রী না হয় শত্রু, না হয় মনের মতো হয়নি—এরা তো নিজের ছেলে। কে জানে, কোন-দিনই স্বামীর মনের তল পেল না সে।

নিজের মনের তল অভয়পদই পেয়েছে কি কোনদিন?

ভবিষ্যতের চিন্তা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ, কোনদিনই করে নি—আজ নতুন করে শুরু করবে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু অতীতের চিন্তাও তো আগে কোনদিন করেনি, সেটা কেন এখন নতুন করে পেয়ে বসল তাকে?

এক এক সময় নিজেই অবাক হয়ে যায়—নিজের মনের চেহারা দেখে। গীতা পড়েনি সে বহুদিন অবধি, গীতা কেন—কোন বই-ই বিশেষ কখনও পড়েনি—পরে এক-আধদিন দু' চার-জনের কাছে গীতার কথা শুনে একটা বাংলা পদ্য গীতা যোগাড় ক'রে পড়েছে, এখনও পড়ে মধ্যে মধ্যে। না, সে সব কিছু নয়,

—নিজের মনে মনে? কবে যেন কোন্ সুদূর কৈশোরে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছিল সে, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নির্লিপ্ত জীবন-যাপন করবে। সংসার থাকবে কিন্তু তাতে বদ্ধ হবে না। পাঁকাল মাছের মতো থাকবে। হাঁস যেমন জলে থাকে অথচ জল তার দেহের কোথাও লাগে না—তেমনিই থাকবে সে সংসারের সহস্র আসক্তির মধ্যে।

এ কি কারও কথা শুনে কি কোন উপদেশে হয়েছিল? কে জানে, আজ আর তা মনেও নেই। সম্ভবত কারও মুখে এক সাধুর উপদেশের কথাই শুনেছিল সে। তবে সে কোন্ সাধু তা বলতে পারবে না। পরমহংস ঠাকুর কিংবা আর কেউ। তবে ঠিক সেই উপদেশেই এটা হয়েছে কিনা তারই বা ঠিক কি। আজ সবটাই যেন গোলমাল হয়ে গেছে মাথার মধ্যে, কিছুই পরিষ্কার মনে পড়ে না। হয়ত কোন একজনের কথায় হয়ও নি। ধীরে ধীরে, একটু একটু ক'রে সংকল্পটা মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু তাতেই বা লাভ কি হল? পারল কি সেদিনের সে প্রতিজ্ঞা পালন করতে? সে সংকল্পে অবিচল থাকতে? আসলে সে শক্তি ওর কোন দিনই ছিল না। একটা মিথ্যা অহংকারকেই বুঝি এতকাল মনে মনে লালন করেছে—নিজেকে স্তোক দিয়েছে। কিছুই হয় নি তার, সাধনার সিদ্ধি মেলা তো দূরের কথা। যা মিলেছে তা হচ্ছে তার স্পর্ধার উত্তরে বিধাতার পরিহাস।

কৈ, দুর্দান্ত অর্থলোভ তো ছাড়তে পারে নি সে। নিজের নিরাসক্তি যদি ঐ

স্থলে লোভটাই না ত্যাগ করতে পারল। ঐ লোভই তো তাকে কত না দুষ্কার্যে প্রবৃত্ত করাল, শেষ অবধি সেই লোভের কাছেই চরম মার খেতে হ'ল তাকে। একেই হয়ত বলে ভগবানের মার, বিধাতার বিচার!

অহংকার! আসলে সে অহংকারেরই সাধনা করেছে বসে বসে। এখনও তার চৈতন্য হয় নি—বসে বসে আহত অহং-কারটাকেই সযত্নে লালন করছে সে।...

কাজ করতে করতে হাত থেমে যায় তার, মন অতীতের রোমন্থনে মগ্ন হয়ে পড়ে। সে মুর্খ, লেখাপড়া শেখে নি; কারখানায় কাজ করা যাকে বলে—হাতে কলমে যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা—তাও খুব বেশীদিন করে নি সে—সাহেব-দের স্নেহদৃষ্টিতে পড়ে 'স্টোরে' চলে গেছে সে কবেই। বাবুও নয় বেয়ারাও নয়—এমনি একটা কাজে রেখে দিয়ে-ছিলেন তাকে সাহেবরা। পদটা যা-ই হোক, শেষ অবধি কার্যত সেই স্টোরের সর্বেসর্বা ছিল—আর সেই সুযোগেই সুদের বাজারে দু'পয়সা রোজগারও করতে পেরেছিল।

সে কথা থাক। তখনকার দিনে সাহেবরা যোগ্যের মর্যাদা বুঝতেন। ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ক-খ পড়া না থাকলেও যন্ত্রবিদ্যায় অভয়পদর একটা স্বভাবজ জ্ঞান ছিল; ওদিকে মাথা খেলত তার অসম্ভব। শুধু নক্সা দেখে দেখে অনেক জিনিস শিখে গিয়েছিল সে। জটিল যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার ঠেকত। একদিন দৈবাৎ সেই পরিচয় পেয়েই ওদের এক সাহেব কারখানার কাজ করার দায় থেকে অব্যা-হতি দেন ওকে। তিনি ঝোঁকের মাথায় কোম্পানীর খরচে ওকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ানোরও প্রস্তাব করেছিলেন—কিন্তু অভয়পদই বুঢ় তথ্যের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করে শেষ পর্যন্ত। যে ইস্কুলেই পড়েনি বলতে গেলে—তাকে ইঞ্জিনীয়ার করা দু-এক বৎসরের কাজ নয়।

তারপর বহুদিন বহু সাহেবই ওকে নিজেদের কামরায় ডেকে পাঠিয়েছেন—নক্সা খুলে দেখিয়ে ওর পরামর্শ চেয়ে-ছেন। সঙ্গে ক'রে যন্ত্রশালায় নিয়ে গেছেন—অচল যন্ত্রের কোথায় কি গোলমাল ঘটেছে বুঝিয়ে দিয়েছে সে। নক্সার ভুল-ত্রুটি ধরে দিয়েছে, দুর্বোধ্য অংশ বুঝে নিতে সহায়তা করেছে। এই তো সেদিনের কথা, হাওড়ার ভাঙ্গা পুল মেরামত করবার ঠিকা নিয়েছিল তাদের কোম্পানি। বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ার এসে দেখে গিয়ে নক্সা পাঠিয়ে দিয়েছিল, সে নক্সা এদের মাথাতে ঢুকছিল না। তখন অভয়পদ পিঠে একটা প্রকাণ্ড কার্বাঙ্কল হয়ে শয্যাশায়ী, ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেছে—চুপ ক'রে শুয়ে

থাকতে বলেছে। সাহেবরা স্টেচার আর গাড়ি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন অফিসে, যে অংশটা এখানকার আট-দশ জন মিলেও বুঝতে পারছিল না—সেই অংশটা ওকে দেখাবামাত্র বুঝিয়ে দিয়েছিল সে, বড়সাহেব খুশী হয়ে ওকে পচিশটা টাকা দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে—বকশিশ।

সেই কারণেই কেমন একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, যতদিন জীবিত থাকবে সে, ততদিন তার চাকরি যাবে না এ আপিস থেকে। আর যদিই বা কোনদিন যায়—অর্থাৎ সে নিজেই কোনদিন অথর্ব হয়ে পড়ে ছুটি চায় তো সাহেবরা তার একটা পেন্সনের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন—কিম্বা একটা মোটা গোছের থোক টাকা দিয়ে বিদায় দেবেন। এমন দিয়েছেনও ইতিপূর্বে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে। কিন্তু কিছুই পেল না সে, কিছুই মিলল না। এই দীর্ঘদিন, সেবার কোন
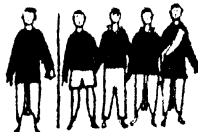
স্বীকৃতিই মিলল না। বরং কেমন যেন মুচে হস্তেই—আবর্জনার মতো সরিয়ে দেওয়া হ'ল তাকে।

এও সেই লোভ। অতিরিক্ত লোভের জন্যই এমন হ'ল। বহুদিন আগেই অবসর নিতে পারত সে। পুরো মাইনের মায়ায় প্রাণপণে চাকরিটা আঁকড়ে ধরে ছিল। তদ্বির করেছে যাতে তার এই দীর্ঘকাল চাকরির কথাটা সাহেবদের কানে না যায়। সে মায়া যদি না করত, পুরনো সাহেবরা থাকতে থাকতে যদি অবসর চাইত তা'হলে কিছু একটা সুব্যবস্থা তাঁরাই করে দিতেন। এখন নতুন আমল, নতুন লোক। তারা একটা লোককে এতকাল চাকরির সুযোগ দেওয়ার জন্য বিরক্ত, ক্রুদ্ধ। পুরনো সাহেবদের নির্বোধ খেয়াল বলে ধরে নিয়েছে এরা। কোন এক বৃদ্ধ কর্মচারী অভয়পদর ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞানের কথা বলতে গিয়েছিল—তারা হো হো ক'রে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'তখনকার দিনে যে-সব সাহেব এসেছে, তারা নিজেরাও কেউ লেখাপড়া জানত না—তাই ঐ মূর্খ বৃদ্ধকে নিয়ে নাচানাচি করেছে। এটা ইংরেজ জাতি এবং সমগ্রভাবে শিক্ষারই অপমান। 'আমাদের কোন দরকার নেই ঐ ফসিলকে, আমরা যথেষ্ট পড়াশুনো ক'রে এসেছি।'.........

শুধু তাই নয়—টাকা ধার-দেওয়ার ব্যাপারেও তারা সমস্ত অপরাধ অভয়পদর ঘাড়েই চাপিয়েছে, একজন স্থানীয় লোকের লোভের ফলে একটি ইংরেজের অকালমৃত্যু হ'ল—এ চিন্তাও তাদের কাছে অসহ্য।......আরও শুনেছে তারা, গত যুদ্ধের সময় স্টোরের বহু মাল পাহারার মধ্য থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথাও কানে গেছে তাদের। এসব জেনেও আগের সাহেবরা ওকে তাড়িয়ে দেন নি—এইতেই বিস্মিত বোধ করেছে তারা। এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছে যে—হয়ত ওর সঙ্গে তাঁদের কোন ভাগের বন্দোবস্ত ছিল, নইলে এটা বরদাস্ত করেছিলেন কী ক'রে? তাই কোম্পানীর দেহে পুরাতন বিষাক্ত ক্ষত মনে করেই ওকে সরিয়ে দিয়েছে তারা, ঘৃণা ও অবজ্ঞায়। কোন সহানুভূতি কি বিবেচনার পাত্র মনে করে নি।......'দ্যাট ওল্ড মিসচীভাস ম্যান'—নিজের সম্বন্ধে দীর্ঘদিন চাকরির পর ওপরওলাদের এই ধারণা ও অভিযোগ নিয়ে নিঃশব্দেই সরে আসতে হয়েছে ওকে—কোন প্রতিবাদ কি প্রতিকারের পথ খুঁজে পায় নি।......

অপরিসীম আত্মগ্লানিই বোধ করার কথা। নিজেরই অসংখ্য নির্বুদ্ধিতার জন্য গ্লানি আর অনুশোচনা। করছেও তাই। আর বোধকরি সেটা থেকে অব্যাহতি পেতেই তার মন বারবার চলে যাচ্ছে সেই দূর অতীতে, সেই অহংকারের ক্ষেত্রগুলিতে—যখন বহু শত এমন কি সহস্রাধিক টাকা বেতনের সাহেব মনিবরা উদ্বিগ্ন মুখে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন আর ও স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধ অভিভাবকের মতোই মধুর হাস্যে তাঁদের বরাভয় দিত আর—শিশুদের অকারণ উদ্বেগ যেমন সস্নেহে ও সপ্রশ্রয়ে অথচ অতি সহজে দূর ক'রে দেন তার পিতা-পিতামহরা—তেমনি ভাবেই দূর ক'রে দিত তা। সে সময় বিনয়-হাস্যের মধ্যেও অহঙ্কারের পরিতৃপ্তিতে মুখ রঞ্জিত হয়ে উঠত ওর।

ন্যাড়ার বিয়ের কথাটা মেজকর্তা নিজেই তুলল। একেবারে হঠাৎ। এ নিয়ে যে কোন কথাবার্তা চলছে বা ছেলে-মেয়ে দেখাদেখি হচ্ছে তা কেউই জানত না—বোধ হয় মেজগিন্নীও না। একেবারেই না-বলা-কওয়া সেদিন মহাশ্বেতাকে ডেকে বলল অম্বিকাপদ, 'ন্যাড়ার জন্যে মেয়ে মোটামুটি আমি একটা দেখে পছন্দ করেছি—তোমরা কেউ দেখতে চাও? কিম্বা আর কাউকে দেখতে পাঠাবে?'

কথাটা বুঝতে অনেক দেরি লাগল মহাশ্বেতার, সে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দেওরের মুখের দিকে চেয়ে থেকে কতকটা অসংলগ্নভাবে প্রশ্ন করল, 'কি দেখবে বলছ—? মেয়ে? মানে বে?...... কার বে?'

'কার আবার—ন্যাড়ার বে গো, ন্যাড়ার। ও ছাড়া এখন বের যুগ্যি আর কে আছে বাড়িতে?'

'ন্যাড়ার বে? এখন?' 'বলি আমি তো আর পাগলও হইনি, আর ছন্নও হইনি যে এখন ওর বের কথায় নেচে উঠব! বে ক'রে খাওয়াবে কি ন্যাড়া মাগ-ছেলেকে তাই শুনি? একা একটা পুরুষমানুষের দিন চলে যাবে, নিদেন মোট বয়েও খেতে পারবে, কিন্তু যার এক পয়সার রোজগার নেই সে বে করবে কি অনথক ন্যাঙ্গারি হয়ে শুকিয়ে মরবার জন্যে?—না নিজের ছেলেমেয়ে একটা একটা ক'রে চোখের সামনে না খেয়ে মরবে—সেইটে বসে দেখবে বলে?'

'কেন?, বুড়োর বৌ কি খেতে পাচ্ছে না? না ওর মেয়েই দুধ পাচ্ছে না?' অম্বিকাপদ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ—তা পাচ্ছে। মানছি। কিন্তু সে তো তোমার দয়া বই কিছু নয়। দয়া ক'রে দিচ্ছ তাই। তবে সে হয়ত একটা বলেই দিচ্ছ—গুষ্টিসুদ্ধকে যে তুমি এমনি চারকাল বসে খাওয়াবে—তার কোন লেখাপড়া আছে! পয়সা তো তোমার, তোমাকেও তো বুক-পোঁতা ক'রে দিয়েছে! এখন তুমি দোব না বললে জোর তো কিছু নেই!...তা'ছাড়া জীবন-মরণের কথাও আছে একটা। তুমি দিচ্ছ—তোমার ছেলেরা যদি না দেয়?.. না, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে—এর একটা কিছু হিল্লে না হ'লে ও কাজে যেতে দোব না। ......তোমার এত মাথাব্যথা তো তোমার ছেলের জন্যে, আমি বলছি তুমি তোমার বেটার বে দাও গে তাতে কিছু দোষ হবে না। আমি কোন দোষ ধরব না অন্তত। যে যেমন বরাত নিয়ে এসেছে তাকে তাই ভোগ করতে হবে—মিছিমিছি পরকে দোষ দিয়ে লাভ কি?'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না অম্বিকাপদ। বুড়োর বিয়ের কথা মহাশ্বেতাই তুলেছিল, তোলাই শুধু নয়, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত উত্যক্ত ক'রে মেরেছিল সকলকে। এত হিসেব-নিকেশ তখন শোনা যায় নি। এ ধরনের কথা ওর মুখে একবারে বেমানানও।

অম্বিকা জানে না, জানতে পারে নি—মহাশ্বেতা এই গত কমাসে অনেক শিখেছে। এতদিন যে জ্ঞানটা তাকে কেউ দিতে পারে নি—সেটা আপনিই তার মনে উদয় হয়েছে। চারদিক অন্ধকার ঠেকতে নিজে-নিজেই বুঝেছে সব। আগে জানবার চেষ্টা করেনি বলেই জানে নি। এখন ছোটবৌকে আড়ালে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে জেনে নিয়েছে। ওদের সম্পত্তি বলতে এই বাস্তু ছাড়া তাদের মোট ষোল বিঘে ধান-জমি আছে আর একখানা বাগান। তার তিন বখরার এক বখরা পেতে পারে তার ছেলেরা। ছ' জন ছেলের পাঁচ বিঘে জমি—ভরসার মধ্যে তো এই। বাকী যা সবই মেজকর্তার। কোথায় একটা বাড়ি কিনেছে—সে মেজগিন্নীর নামে। ভাগের ভয়েই স্ত্রীর নামে কিনেছে। টাকা কম নেই তো হাতে। বড় ছোট চিরকাল সবই এনে ওকে ধরে দিয়েছে। ছোটর অবশ্য আলাদা কিছু আছে, চাকরি ছাড়লেও মোটা টাকা পাবে আপিস থেকে। তারাই শুধু নিঃস্ব।

অবশ্য, ছোটবৌ যা বলে, মেজকর্তা নিজে টাকা বাড়িয়েছেও ঢের। এদিকে ওর মাথা খুব। তেজারতি তো আছেই, ইদানীং আর একটা কারবার ধরেছে, বাড়ি বেচা-কেনার কারবার। পুরনো বাড়ি কম দামে কিনে সারিয়ে-সুরিয়ে চকচকে ক'রে অনেক বেশী দামে বেচে দেয়। বলে, 'এতে লোকসান যাবার ভয় নেই, বসে তো থাকে না—সুবিধেমতো দাম পাই ভাল—না পাই ভাড়া বসিয়ে দেব। তাতেও লাভ!' আরও বলে, 'শেয়ারের বাজারে ফাটকা খেলে কি দাদার মতো চড়া সুদের লোভে শুধু-হাতে টাকা দিয়ে হঠাৎ নবাব হ'তে চাই না আমি। তার চেয়ে এ অল্প লাভের কারবার আমার ঢের ভাল!'

মহাশ্বেতা প্রতিপক্ষের অভাবে তরলার ওপরই ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, 'বলি তাতেও তো পয়সা লাগে লো! এ তো সব কারবারই—যা যা বলছিস—মোটা টাকার খেলা। সে টাকা তো আর

কেউ যোগায় নি। এই বড়কর্তাই এনে হাতে তুলে দিয়েছে। তাতে তো কোন সন্দ নেই আর।.....তবে? ওর উচিত নয় এর ছেলেদের ভাগের ভাগ বুঝিয়ে দেওয়া কি এদের নামে কোন সম্পত্তি ক'রে দেওয়া?'

তরলা কোন উত্তর দিতে পারে নি। শুধু ক্ষীণকণ্ঠে একবার ব'লেছিল, 'তা উনি তো তেমনি গোটা সংসারটা টেনেই যাচ্ছেন—বিয়ে পৈতে সব খরচাই তো করছেন, কারও কাছে তো কিছু চান নি কোনদিন!'

'হ্যাঁ তা কর্ছেন কিন্তু সে তো ভিক্ষে। আমাদের হকের ধন যা তার জন্যে ওদের হাত-তোলায় থাকব কেন আমরা—কিসের জন্যে?'

ভাবছি, বয়স তো শেষ হয়ে গেল। আর কবে যে করবে বলো!'

'তা হোক। বয়স যতই হোক, কিছু একটা না হ'লে—অন্তত মাসে দশটা টাকাও আমদানীর পথ না হ'লে ছেলের বে দিতে দোব না আমি—এই সাফ বলে দিলুম!'

বোধকরি এই দৃঢ়তাতেই খানিকটা কাজ হয়।

ভাল-মশলার দোকান ক'রে দেব।...হিসেব হ'লে চালও রাখতে পারবে।...বুড়ো, ন্যাড়া, ধনা—এরা তো দিনরাত ঘরেই থাকে, সবাই মিলে যদি লাগে—বাড়তি লোকও লাগবে না, চুরিরও ভয় থাকবে না।'

অভয়ের মুখে কোন ভাব পরিবর্তন হয় না এ প্রস্তাবে। শুধু বলে, 'পারবে কি চালাতে? শুধু শুধু কতকগুলো টাকা নষ্ট করবে না তো? সব জিনিসেরই শিক্ষা দরকার, ব্যবসা করতে গেলেও সেটা শেখা দরকার। ওরা তো কিছুই শিখল না—'

'না, আমি মনে করছি এখন খুব কম টাকা ঢালব, ছোটখাটো দোকান—আমাদের এ বাজারে অশ্বিনী যেমন দোকান করছে তেমনি। শ' পাঁচেকের মতো খরচ করব আপাতত। তারপর—তেমন বুঝলে, ওদের যদি সে রকম আগ্রহ দেখি, আর কিছু দিলেই হবে। তা'ছাড়া হিসেব-পত্রগুলোও আমি মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখতে পারব—একেবারে নয়-ছয় করতে পারবে না!'

'দ্যাখো—যা ভাল বোঝ করগে। আমি আর কি বলব।'

সংক্ষেপে এইটুকু বলেই সব দায়িত্ব নামিয়ে দেয় অভয়পদ।

মহাশ্বেতার কাছে প্রস্তাবটা এমনই অভিনব, এমনই অকল্পিত যে প্রথমটা সে কোন কথাই বলতে পারে নি। এইবার স একটু ক্ষীণ আপত্তির সুরে বলে, 'মুদি-খানা! ভদ্দরলোক বামুনের ছেলে মুদির দোকান দেবে!'

অম্বিকা জবাব দেয়, 'ভদ্দরলোক বামুনের ছেলেকে তো লোহাপেটা কার-খানায় দিতে চাইছিলে, তার চেয়েও কি এ কাজ খারাপ? এ তো স্বাধীন ব্যবসা। লেগে থেকে চালাতে পারলে ঐ থেকেই লাখ লাখ টাকা রোজগার কর'তে পারবে!'

কথাটা অবিশ্বাস্য, সে বরাত তার নয়—তা মহাশ্বেতা ভাল রকমই জানে। লাখে দরকার নেই, এখন কোনমতে দিন-গুজরানের মতো কিছু হলেও তো হয়। তা-ই হবে কি? পারবে কি ব্যাটারা চালাতে?

...কি দেখবে বলছ? মেয়ে?...

এ সবই পুরনো কথা, পুরনো যুক্তি। নতুন যা—তা নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। তাই'তেই তার কণ্ঠে এই অভূত-পূর্ব দৃঢ়তা ফোটে আজ।

অম্বিকাপদ একটু অসহায় ভাবেই বলে 'তা কেন। সে আমার ছেলের বে দু বছর পরে হ'লেও চলবে। একেবারে তো অরক্ষণা হয়ে পড়ে নি। ন্যাড়ার কথাই

দিন আষ্টেক পরেই একদিন দাদার কাছে এসে কথাটা তুলল অম্বিকাপদ, মহাশ্বেতা সামনেই ছিল, তার শোনবার কোন অসুবিধে নেই দেখেই সে কথাটা সেই সময় পেড়েছিল—নিহাৎ সোজাসুজি বৌদির কাছে কথাটা পাড়তে বোধহয় আত্মসম্মানে আঘাত লাগে ব'লেই। বলল, 'খটির বাজারে একটা ঘর দেখেছি দাদা, মনে করছি এদের একটা ছোটখাটো

তবু, সংশয়ের মধ্যেও, কোথায় যেন আশা ও আশ্বাসের আভাস পায়। কিছু তো একটা হচ্ছে। যাই হোক—তবু তাদের নিজস্ব কিছু।

সে মনে মনে মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে পুজো মানত করে। যেদিন দোকান খোলা হবে সে দিন সে আলাদা পুজো দেবে। পুজো আর হরির লুট!

(ক্রমশঃ)

কলারসিক

আকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনের তিনটি প্রদর্শনী

ক্যাথেড্রাল রোডের আকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রায় একই সঙ্গে তিনটি মনোরম প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। এর মধ্যে প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষের চিত্র-প্রদর্শনীটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অন্য দুটি প্রদর্শনীর একটি হল তরুণ শিল্পী বিবেক সাহার হাতের ছাপে অঙ্কিত স্কেচ-চিত্রের প্রদর্শনী এবং অন্যটি রুমানিয়ার প্রাচীনতম স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলার আলোকচিত্রের প্রদর্শনী।

শিল্পী গোপাল ঘোষের চিত্র-প্রদর্শনী

চল্লিশের দশকের যে-কয়জন বাঙালী শিল্পী নিজের প্রতিভাবলে খ্যাতিমান হয়েছেন শিল্পী গোপাল ঘোষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাঙালীর লিরিকধর্মী চেতনাকে গোপাল ঘোষ তাঁর চিত্রকলায় যেমনভাবে বিধৃত করতে সক্ষম হয়েছেন, বর্তমান কালের খুব কম শিল্পীর কাজেই তা লক্ষ্য করা যায়। গোপাল ঘোষের সমস্ত রচনার মধ্যে এমন এক প্রশান্ত সৌন্দর্য মূর্ত হয়ে ওঠে যে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। বাঙলায় গ্রাম-মাঠ, গাছ-গাছালী ফুল, লতা-পাতা, নদী-নালা, এক কথায় বাঙলার প্রকৃতিকে, তার পেলব সুষমাকে আমরা অনায়াসে গোপালবাবুর চিত্রপটে খুঁজে পেতে পারি। অথচ, তাঁর কোন ছবিই কোন বিশেষ স্থান বা কালের সীমায় আবদ্ধ বাস্তবের প্রতিফলন নয়। বাস্তবকে ভিত্তি করে গোপালবাবুর মানসলোকে সৃষ্ট এ-এক নতুনতর সম্পদ। ফলে, আমার বিশ্বাস, গোপাল-বাবুর ছবি কালের সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার দুঃসাহস রাখে। আলোচ্য প্রদর্শনীর ছবিগুলি বিচার করলে এ-সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এই প্রদর্শনীতে তিরিশখানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। এর মধ্যে কুড়িখানা ছবিই হল ফুলের স্টাডি। কত বিচিত্রবর্ণ ফুল কত চমৎকার রঙের সুষমায় যে একজন শিল্পীমনকে অভিভূত করতে পারে গোপালবাবুর এই প্রদর্শনী দেখে তা নতুনভাবে হৃদয়ঙ্গম করা গেল। জল-রঙ আর প্যাস্টেলের মিশ্রপদ্ধতি কী সুন্দর এফেক্ট সৃষ্টি করতে পারে প্রতিভাবান শিল্পীর হাতে, তারও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই প্রদর্শনী। গোপাল-বাবুর চিত্র-সংস্থাপন যেমন নিখুঁত তেমনি বর্ণাঢ্য রঙের দ্যুতিকে কিভাবে চিত্রপটে ছড়িয়ে দিয়ে হার্মোনি সৃষ্টি করতে হয় তাও যেন তাঁর নখ-দর্পণে। সব চিত্রেই এমনি এক স্বাভাবিক এবং বর্ণময় সুষমার ছড়াছড়ি। ১নং চিত্রের গাছের কাণ্ড এবং প্রসারিত দুই শাখার মাঝখানে নীল, হলুদ, লাল আর কালো রঙের বর্ণসুষমা, ১০নং ও ৩০নং চিত্রের গ্রামের অপূর্ব দৃশ্য, ১৩নং ও ২৬নং চিত্রের নিসর্গ-সৌন্দর্য কিংবা অন্যান্য প্রত্যেকটি চিত্রের স্নিগ্ধ পরিবেশ ক্লান্তি-ময় অশান্ত মনে ক্ষণিকের জন্যও প্রশান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পেরেছে বলে আমার বিশ্বাস।

শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ

শিল্পী ঘোষ এই প্রদর্শনী শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজনে যোগদান করতে চলে যাবেন। তাঁর এই যাত্রা শুভ হোক, আমরা এই কামনাই করি।

।। শিল্পী বিবেক সাহার রেখা-চিত্র ।।

মহেঞ্জোদারোর উদ্যোগে শিল্পী বিবেক সাহার যে রেখা-চিত্রের প্রদর্শনীটি শুরু হয়েছে তার অভিনবত্ব অনস্বী-কার্য। এতদিন আমরা জানতাম শিল্পীর রঙতুলির সাহায্য না পেলে কাগজে কিংবা ক্যানভাসে মূর্ত হতে পারে না। কিন্তু শ্রীসাহা আমাদের সেই বিশ্বাসের ভিতে নাড়া দিয়েছেন। তিনি তাঁর হাতের তালু আর আঙুলের সাহায্যে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এমন এক একটি স্কেচ তৈরী করেছেন যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। কালো রঙ হাতে লাগিয়ে অমন চমৎকার আলো-ছায়ার বর্ণ-সম্পাত ঘটানো যায় এবং তাও ৫ থেকে ৫০ সেকেণ্ডের মধ্যে, এ-কথা বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হয়। স্কেচগুলির মধ্যে 'প্রচেষ্টা' (২), 'পাখি-বিক্রেতা' (৫), 'ভারাক্রান্ত নারী' (১১), 'বিজয়ী ঘোড়া' (১৩) এবং 'স্নান শেষে' (১৬) যে-কোন দর্শককের মন আকর্ষণ করবে বলে আমার বিশ্বাস। অন্ততঃ এই স্কেচ-গুলিতে শিল্পীর পর্যবেক্ষণ শক্তি, কল্পনা ও রেখায়িত গতিবেগ সুন্দর-ভাবে ফুটে উঠেছে। এ-সব সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায় এবং শিল্পীর দক্ষতা স্বীকার করেও সময়-সম্পর্কে তাঁর ঘোষিত সীমা নিয়ে সংশয়বোধ করাও অসম্ভব নয় কোন দর্শকের পক্ষে। সবচেয়ে ভাল হয়, শিল্পী প্রদর্শনী চলাকালে তাঁর ক্রিয়া-কৌশল প্রদর্শন করে এই সংশয় মোচনের জন্য অগ্রসর হলে। আশাকরি আমাদের প্রস্তাবটি শ্রীসাহা ভবিষ্যতে বিবেচনা করে দেখবেন। তাঁর এই কারু-নৈপুণ্যকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

রুমানিয়ার স্থাপত্য-ভাস্কর্যের আলোক-চিত্র

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত রুমানিয়ায় শিল্প-ভাস্কর্যের যে অপূর্ব বিকাশ ঘটে তারই প্রায় ৮০টি নিদর্শনের আলোকচিত্র নিয়ে আকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ এক সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। রুমানিয়ার প্রাচীনতম পোড়া-মাটির নিদর্শনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীন পোড়ামাটির কাজের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। লোক-সংস্কৃতির বিশ্বধারার মধ্যে এই মিল সংস্কৃতির গবেষকদের কাছে নতুন বিস্ময় সৃষ্টি না করলেও অনুসন্ধিৎসাকে প্রবলতর করে তুলতে পারে। রুমানিয়ার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলা যে উন্নততর শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক, এই প্রদর্শনী দেখে তাও অনুমান করা যায়। এই ধরণের প্রদর্শনী দুইটি দেশের সাংস্কৃতিক মিলনের সেতুপথ রচনা করার পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ। আশা করি আকা-ডেমীর কর্তৃপক্ষ এই জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করতে ভবিষ্যতে আরও সচেষ্ট হবেন।

ফেলিনির 8½ সাড়ে আট

রাখী ঘোষ

ভারতীয় চিত্র-দর্শকের কাছে ফেডারিকো ফেলিনির নাম অপরিচিত নয়। কিছুদিন আগেই কলকাতায় তাঁর বিখ্যাত চিত্র **'লা দোলচে ভিটা'** প্রদর্শনী হয়ে গেছে। বিশেষ একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে ফেলিনির এই নামকরণ যেন ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে গেছে। বিগত প্রফুমো কেলেঙ্কারীর সময় এই ওপরতলার সমাজকে বোঝাতে বৃটেনের বহু লোক ফেলিনির দেওয়া নাম 'লা দোলচে ভিটা' ব্যবহার করেছেন। এই বই এনে দিয়েছে তাঁকে সাধারণ মানুষের বিপুল অভিনন্দন। ফেলিনি কিন্তু সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা নিতে রাজী নন। তিনি বলেন 'ছবিতে যে রোম দেখানো হয়েছে তা কোন বাস্তব নগরী নয়। এ রোম নিতান্তই আমার মানস-নগরী। আমি চরিত্র সৃষ্টি করি কিন্তু তাদের বিচার করি না।'

ফেলিনির নবতম বই 'সাড়ে আট' আবার নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বইটির নাম ফেলিনির কৌতুকপ্রবণ মনেরই পরিচয়। এপর্যন্ত সাতখানি পূর্ণ-দৈর্ঘ্য এবং একটি ছোট কাহিনীর তিনি চিত্ররূপ দিয়েছেন। সব মিলিয়ে দেনাপাওনার খতিয়ান হল **'সাড়ে আট'**।

ফেলিনি বলেন বইটির নামকরণের পেছনে কোন চমক দেওয়ার ব্যাপার নেই। আসলে বইটির কি নাম হওয়া উচিত ভেবে না পেয়ে অবশেষে ঐ নামই সাব্যস্ত করেছেন।

বইটির নামকরণের মত এর আগাগোড়া ইতিহাসই অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতায় ভরা। বইটির মস্কো ফেস্টিভালে গ্র্যান্ড প্রিক্স অর্জন করার কথাই ধরুন। বিচারসভার আটজন জুরীর মধ্যে সাতজনই ছিলেন কম্যুনিষ্ট। তবু একেবারেই অকম্যুনিষ্ট এই বইটিকে প্রথম সম্মান দিতে তাঁরা বিমুখ হননি। যদিও একদল রাশিয়ান এ নির্বাচন সমর্থন করেন নি। তাঁদের মতে এরকম ধোঁয়াটে ও অস্বচ্ছ চিন্তাধারার সঙ্গে বাস্তববাদী কম্যুনিষ্ট আদর্শের কোন মিল নেই। সুতরাং এই সম্মানলাভ

বইটির পক্ষে অভাবিত বলা যেতে পারে।

'সাড়ে আট' বহুলাংশে ফেলিনিরই আত্মজীবনী। গল্পের নায়ক ফেলিনির মতই মধ্যবয়স্ক এক চিত্রপরিচালক। জীবনে খ্যাতি সে পেয়েছে কিন্তু জীবনের মাঝপথে এসে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। মনে হচ্ছে তার নতুন কোন বক্তব্য নেই। সে ফুরিয়ে গেছে। পিছনে পড়ে আছে ফেলে-আসা জীবন, অসংখ্য ভুলভ্রান্তি আর স্মৃতির বোঝা নিয়ে। সমালোচকের নির্লিপ্ত দৃষ্টি নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে এই আত্ম-জিজ্ঞাসু। বাস্তব, স্বপ্ন আর মনের অবচেতনের কুয়াশায় ঘেরা সে এ[illegible] [illegible]র্ণ জগৎ। এই ভয়ংকর [illegible] আবিষ্কার করে আর তার বাঁচার স্পৃহা থাকে না। কিন্তু তারপরেই সে জীবনের পরম সত্যকে আবিষ্কার করে। নিজের মনের বাসনা-কামনার অন্ধকারে অবগাহন করে সে মুক্তিস্নান করে। নিজেকে সে চিনেছে। আর তার কোন গোঁজামিলের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই নিজেকে বা অপরকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রাখার। ভালোমন্দ সবকিছু নিয়েই জীবন। যতক্ষণ তাকে না জানা যায় ততক্ষণই চাঞ্চল্য। জানলেই স্বস্তি।

বইটি বৃটেনে আসার আগেই এর স্রষ্টা ও কাহিনী নিয়ে বহু আলোচনা

*

ফেলিনি একজন খাঁটি ইটালিয়ান। স্যুটিংয়ের সময় হাসিঠাট্টা, তামাসা ও উৎসাহ দিয়ে তিনি সবাইকে মাতিয়ে রাখেন। ইটালীর জলহাওয়া তাঁকে আমুদে ও সিনিক দুইই করেছে।

*

হয়। কিন্তু বিষয়বস্তু জানা থাকলেও বইটির সমগ্র উপস্থাপনা এমন এক জটিল ও মনোরম মনস্তত্ত্বের প্রকাশ করে যা ভাষায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব।

'সাড়ে আট' ছবিটি ফেলিনির বহুদিনের পরিকল্পনা। 'লা দোলচে ভিটা' বইটি করবার আগে তিনি এই বইটির কথা ভেবেছিলেন কিন্তু ঠিক কিভাবে একটি এযুগের মধ্যবয়সী মানুষের আত্মদর্শনকে তুলে ধরবেন বুঝতে পারছিলেন না। তাই তখনকার মত এই পরিকল্পনাকে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে অন্য বই করলেন। সেই বইটিই "লা দোলচে ভিটা"। 'সাড়ে আট'-এর মধ্যবয়সী নায়কের জীবনকে

ফেলিনি বিভিন্ন স্তরে উপস্থাপিত করেছেন। তার স্বপ্ন, তার স্মৃতি ও তার বর্তমান মিলিয়ে সে এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ জগৎ। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব জগৎ আছে। কিন্তু সে জগৎকে এই 'ডাইমেনশনাল' অর্থাৎ বাস্তব, পরাবাস্তব ও চিন্তার বিভিন্ন স্তরে উপস্থাপিত করতে আর কোন পরিচালকই সাহসী হন নি।

এ জীবনদর্শন যে বহুলাংশে ফেলিনির নিজেরই অভিজ্ঞতা তা ফেলিনি অকপটে স্বীকার করেন এবং যে কোন স্রষ্টার জীবনেই যে পথ-হারানোর লগ্ন আসে তা সত্যবাদী মাত্রই স্বীকার করবেন। সেদিক দিয়ে ছবিখানি নিষ্ঠুর সত্য।

গল্পের নায়ক এ যুগের এক ক্যারিফ্‌ বিধ্বস্ত আত্মা। সে একটি ছবি তোলা আরম্ভ করেছে কিন্তু কোন গল্প ঠিক করেনি। কোন নায়িকা বা নায়ককেই তার পছন্দ হচ্ছে না। পুরনো প্রযোজক দুঃখ ও বিরক্তিতে বিদায় নিলেন। এলেন নতুন প্রযোজক। ছ' মাস ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বিরাট অর্থব্যয়ে নির্মাণ হয়েছে 'রকেট'। কিন্তু কি বলবে পরিচালক? কিছু কি বলার আছে? বহু প্রথিতযশা নায়িকার আবেদন ও প্রণয়-নিবেদনে হতাশ পরিচালক স্ত্রীকে ফোন করে সেখানে আসতে বলে। কিন্তু স্ত্রী এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় সেই পুরোন ভুল বোঝাবুঝি হিংসা ও হতাশা। কখনও মনে হয় সত্যিই বুঝি সে স্ত্রীর ওপর অবিচার করেছে। কিন্তু ভেবে পায় না কি তার দোষ। এর মধ্যে তার রক্ষিতাকেও সে আসতে লিখেছে। কিন্তু তাকেও কি সে সত্যিই চায়? চায়ই যদি তাহলে তাকে নির্বোধ ও অসহ্য মনে হয় কেন? স্ত্রীর প্রতি মমতা ও জীবনের ক্ষণসঙ্গিনীদের প্রতি স্নেহ দুই জীবনে মেলান যায় না বলেই সে স্বপ্ন দেখে এক বিশাল হারেমের। সেখানে তার জীবনের সব মেয়েরা মিলে-মিশে সানন্দে আছে। সবাই তাকে ভালবাসছে, যত্ন করছে।

হারেমের একটি দৃশ্য। জীবনের প্রথম বয়সের এক বিচিত্র নারী ও পরিণত বয়সের আর এক পরিচিতা দুজনেই আছে সেই রমণীকুলের মধ্যে।

স্বপ্ন ভাঙে। প্রযোজক মরীয়া হয়ে উঠেছে। যাহোক চূড়ান্ত কিছু নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। হুড়মুড় করে স্ক্রিন-টেস্ট সারা হয়। পরিচালক মূক, বিমূঢ়। তার মতামতে অবশ্য কর্ণপাত করবার মত কারুর মনের অবস্থাও নয়। স্ক্রীন-টেস্টে কাহিনীর স্ত্রীর মুখে সে নিজের দাম্পত্য জীবনের উক্তি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বসিয়ে দিয়েছে। সবাই ফিসফিস করে—"এ হচ্ছে পরিচালকের আত্মকাহিনী।" পরিচালকের স্ত্রীর কাছে এর চেয়ে আর কোন অপমান অসহ্য হতে পারত না। পরের দিন 'প্রেসকে' ডাকা হয়েছে। পরিচালককে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হল তাদের সামনে। কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছে, সাংবাদিকরা অধৈর্য হয়ে উঠছে।

পরিচালকের মুখে কথা নেই কেন? জনতার মধ্যে থেকে হাসি-টিটকারীর বন্যা বয়ে যায়। চিত্রপরিচালকের চোখে একটি মুহূর্তের খণ্ডিত ভগ্নাংশে মনের মুকুরে ভেসে ওঠে অগণিত মুখ, অর্ধেক জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। সভা পণ্ড হয়। কিন্তু নায়ক যেন শান্তি পায়। সে আর যাই হোক, নিজেকে ঠকায় নি। জীবনের এই পরম মুহূর্তে সে জীবনের সকল অভিজ্ঞতাকে, সকল চরিত্রকে কৃতজ্ঞতা জানায়। এরা সবাই মিলিয়েই তো তার জীবন। বোঝা হালকা হয়ে যায়। নিজেকে মেনে নিয়ে সে এগিয়ে চলে নতুন উদ্যমে।

ছবির কাহিনীর মত 'সাড়ে আটের'ও কোন স্ক্রিপ্ট বা পাণ্ডুলিপি ছিল না। নায়ক মার্সেলো মাস্ট্রয়ানিকে 'লা দোলচে ভিটায়' আপনারা দেখেছেন। বহু অভিনেতার নাম বাতিল হবার পর অবশেষে ফেলিনি মাসট্রিয়ানিকেই নির্বাচন করেন। মধ্যবয়সী, বিধ্বস্ত নায়কের ভূমিকায় রূপদানের জন্য মাসট্রিয়ানি ফেলিনির অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে আট কিলো ওজন কমিয়ে ফেলেন। মাসট্রিয়ানি ছাড়া আর কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী কাহিনীর বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। ছবিতে আমরা প্রযোজক অভিনেতা ও কর্মীদের যে সংশয় ও জিজ্ঞাসায় দোদুল্যমান দেখি তা সত্যি ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। বইটি শুরু করবার আগের দিনও ফেলিনি ভেবেছেন প্রযোজককে ফোন করে জানাবেন তিনি কি ছবি তুলতে চলেছেন নিজেই জানেন না।

এ ছবিটি পরিচালকের নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় বহু রটনাই পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। ছবির শৈশবস্মৃতিতে যেখানে শিশু-নায়ক লুকিয়ে এক স্থূলাঙ্গী মহিলার রাম্বা নৃত্য দেখার জন্য স্কুলে শাস্তি পায় অনেকের মতে তা ফেলিনির নিজের জীবনেরই অভিজ্ঞতা। হারেমের দৃশ্যে যেখানে মেয়েরা যৌবন অতিক্রান্ত হলেই বাতিলের ব্যবস্থায় আপত্তি জানানোর ফলে নায়ক তাদের নির্মমভাবে চাবুক মেরে শায়েস্তা করে—অত্যুৎসাহী-দের মতে তা হল বৃটিশ সেন্সরকে খুঁচিয়ে জনসাধারণকে ছবিটির প্রতি উৎসুক করবার সহজ ফন্দী। ফেলিনি এ সব কথা সোজাসুজি অস্বীকার করেছেন। তবে ইংল্যাণ্ডে বইটি যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে এবং ফেলিনি আগেই সে ভরসা পেয়েছিলেন। "বইটি আমেরিকায় সফল হয়েছে কারণ আমেরিকানরা সকলেই আত্মবিশ্লেষণে অভ্যস্ত। নিউইয়র্কের যে কোন ট্যাক্সিচালক বা হোটেলের পরিচালক খোলাখুলি ভাবে নিজের অবচেতন মন নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। ইটালীর লোকেরা বন্ধু-ভাবাপন্ন কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত বিশেষ করে মনস্তাত্বিক স্বীকারোক্তিতে তারা অভ্যস্ত নয়। আর ইংল্যাণ্ড? সেখানে এ ধরণের আত্মবিশ্লেষণকারী বইয়ের সফল হবার খুবই সম্ভাবনা। কারণ সেখানকার লোকেরা এত চাপা ও নিঃশব্দ প্রকৃতির যে রিভলবারের সামনে দাঁড়িয়েও চেঁচাতে পারে না।"

তবে ফেলিনির নিজের মতেই "লা দোলচে ভিটা"র মত এ বই কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নয়। এ হল একটি মানুষের ব্যক্তিগত জগৎ। একে বুঝতে আরও সাহস, আরও অন্তর্দৃষ্টি দরকার।

চিত্র-পরিচালক ফেলিনি কাহিনীর নায়ক মাসট্রয়ানিকে নির্দেশ দিচ্ছেন। স্যুটিংয়ের সময় ঘন ঘন গল্প ও ঘটনার পরিবর্তনে অভিনেতারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও তাঁর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের কথা তাঁর সহকর্মী মাত্রই জানেন।

ডেভিড লো

সংবাদপত্রে প্রকাশ গত ২০শে সেপ্টেম্বর বিখ্যাত ব্রিটিশ ব্যঙ্গচিত্রকর স্যার ডেভিড লো ৭২ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন।

গত বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি আজ যাঁদের পরিষ্কার মনে পড়ে তাঁরা সকলেই এক পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যুতে বিমর্ষ হবেন। রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র স্রষ্টা হিসেবে তাঁর সমসাময়িক যুগে লো ছিলেন বোধহয় প্রথমশ্রেণীর প্রথম ব্যক্তি। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সকালে উঠেই খবরের কাগজ খুঁজতেন লো কি এঁকেছেন দেখবার জন্যে। এবং যুদ্ধের সময় ব্যঙ্গচিত্রকরের গুরুদায়িত্ব লো কিভাবে পালন করেছেন তা তাঁর "কর্ক্‌ন হার্ট" নামে আঁকা কার্টুনটি যাঁদের মনে পড়ে তাঁরাই বুঝতে পারবেন। ১৯১৮ থেকে ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর লোর তুলিকাপাতের গতি দেখে গেলে বোঝা যায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামগ্রিক চেহারার ওপর কি অসাধারণ দখলই না ছিল এই ভদ্রলোকের।

১৮৯১ সালে নিউজিল্যাণ্ডের ডিউনেডিনে স্কটিশ-আইরিশ পিতামাতার তৃতীয় সন্তান ডেভিড লো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ডেভিড ব্রাউন লো। নিউজিল্যাণ্ডের ক্রাইস্ট চার্চ বয়েজ হাইস্কুলে লেখাপড়া শেখেন। ১৯০২ সালে তাঁর প্রথম ছবি বেরোয় ক্রাইস্ট চার্চ স্পেকটেটরে অর্থাৎ ১১ বছর বয়সে। লো বলেন মাত্র আট বছর বয়সেই তিনি একটা পিয়ানোর খোলের মধ্যে নিজের স্টুডিও বানিয়ে ফেলেন। ১১ বছর বয়সে যথেষ্ট রোজগার হবার পর এক মোরগের খোঁয়াড়ে স্টুডিও খোলেন। বয়স যখন তাঁর ১৪ তখন জনৈক খবরের কাগজের সম্পাদক তাঁকে পয়সা দিতে নারাজ হয়ে ঠাট্টা করে বলেন যে, ইচ্ছে করলে তিনি টেবিল চেয়ারগুলো নিয়ে যেতে পারেন। লো বিনাবাক্যব্যয়ে সম্পাদকের কথামতই কাজ করে বসলেন।

বয়স যখন তাঁর ১৫ তখন তিনি ক্রাইস্ট চার্চ আদালতে গিয়ে এক সাপ্তাহিক কাগজের জন্যে আদালতের দৃশ্যাবলী আঁকতেন। এই প্রসঙ্গে একশ বছর আগেকার আরেক বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রকরের কথা মনে পড়ে যায়—দমিয়ে। ১৯১১তে তিনি সিডনী বুলেটিনে যোগদান করেন। বিচিত্র খেয়ালী মানুষ ছিলেন লো। একবার মনে হল একটু ব্যায়ামের প্রয়োজন। ব্যস কথা নেই বার্তা নেই মেলবোর্ণ থেকে সিডনী পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে বসলেন—দূরত্ব মাত্র ৬০০ মাইল। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রকর হিসেবে তাঁর খ্যাতি এতদূর বেড়ে যায় যে জাতীয় প্রয়োজনের খাতিরে তাঁকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯১৯ সালে তিনি লণ্ডনে এসে 'স্টার' পত্রিকায় যোগ দিলেন। এব্যাপারে তাঁকে প্রবৃত্ত করেছিলেন আর্নল্ড বেনেট। লয়েড জর্জের ছবি এঁকে তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। লয়েড জর্জ সরকারকে তিনি আঁকলেন এক দুমুখো গাধা যার পূর্বপুরুষের কোন গৌরব নেই, ভবিষ্যৎবংশীয়দের জন্যে কোন ভরসাও নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতা নিয়ে তিনি যে ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন তার নাম দেওয়া হয়—"স্বাধীনতার অগ্রগতি—অমৃতসরী কায়দা", ফলে তিনি স্বদেশে বহুনিন্দিত হন।

ডেভিড লো

১৯২৭ সালে তিনি লর্ড বীভারব্রুকের "ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড"এ যোগ দেন। ১৯২৮ সালে প্রথমে তাঁর কার্টুন আমেরিকায় রেডিওযোগে পাঠানো হয়। ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকের সময় গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

১৯৫০ সালে তিনি "ডেলি হেরাল্ডে" যোগ দেন এবং ১৯৫৩তে চলে আসেন "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে"। এখানেই তিনি শেষপর্যন্ত ছিলেন। তাঁর কাজের সম্মানে ১৯৬২ সালে সরকার তাঁকে নাইটহুড দেন।

লোর কাজের মধ্যে পেশাদার কার্টুনিস্টদের চিরাচরিত ভঙ্গিমার কোন লক্ষণ বা মুদ্রাদোষ দেখা যায় না। এদিক দিয়ে তাঁর আঁকা ছবি অদ্ভুতরকম মুক্ত এবং সাবলীল। ১৯৩২-৪৫ সালের যেসব রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের তিনি রূপ দিয়েছেন—যেমন, চার্চিল, বল্ডুইন, হিটলার, মুসোলিনী, স্ট্যালিন গোয়েরিং, চেম্বারলেন প্রভৃতি এর প্রত্যেকটিতেই দেখা যায় সাধারণ কার্টুনিস্টদের প্রায় সকলের চেয়েই শিল্পী হিসেবে তিনি অনেক বড়। ১৯৩৪ সালে নাৎসী প্রচারে বিভ্রান্ত ইউরোপের চিন্তার জড়তাকে মূর্ত করে তোলেন তিনি তাঁর "কর্নেল ব্লিম্প" চরিত্র সৃষ্টি করে। তিনি প্রায় ৩০ খানি বই লিখেছেন। এরমধ্যে "দি নিউ রেকস্ প্রগ্রেস", "পলিটিক্যাল প্যারেড", "কার্টুন হিস্ট্রি অব আওয়ার টাইমস্", "ব্রিস্টল কার্টুনিস্ট", "ইউরোপ সিন্স ভার্সাই", "ইউরোপ অ্যাট ওয়ার" ইত্যাদি অনেক বই-ই এদেশে বিশেষ সুপরিচিত।

সুরঞ্জন পালিত

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৫)

পরদিন ট্রেনে উঠেই মনে হল কি যেন আমি বাড়ীতে ফেলে এসেছি। ঠিক কি ফেলে এসেছি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। সামান্য একখানা ব্যাগ নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম, সেই ব্যাগ হাতেই আবার চুঁচড়োয় ফিরে যাচ্ছি, জিনিসপত্রও খুব বেশী নাড়া-চাড়া হয়নি। তবে কি ফেলে এলাম। যদি ফেলেই না এসে থাকি তবে হঠাৎ এ অনুভূতি মনে জাগল কেন? এ প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পেলাম না। কেন জানি না মনে হল অতি সতর্ক যাত্রীও কত সময় সাবধানে সঙ্গের জিনিসপত্র পরীক্ষা করে নিয়েও ভুলে ফেলে আসে বাক্সের চাবি। আমি কি সেই চাবি ফেলে এসেছি? যে চাবি দিয়ে মনের অন্তঃপুরের লুকোন দরজা খোলা যায়, যে চাবি হাতে থাকলে মনে হয় আমি রাজরাণী, অসীম ঐশ্বর্যের মালিকান। কিন্তু সে চাবি কোথায় হারালাম!

এসব কথা ভাবতে গিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। গগন সেন জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছ।

মাথা নেড়ে বললাম, কিছু না।

গগন সেন আজ সকালবেলা হাওড়া স্টেশনে আমার জন্যে টিকিট কেটে অপেক্ষা করছিল। দুজনে একসঙ্গে লোকাল ট্রেনে উঠেছি।

গগন সেন বললে, ছেলেটা কি গাইছে শুনছ?

এতক্ষণ আমি কিছুই শুনিনি, সাধারণতঃ শুনিও না, এসব ট্রেনে একের পর এক অন্ধ ভিখারীরা ওঠে, বেশীর ভাগই বেসুরো গলায় গান করে, হাতে পয়সা থাকলে হয়ত ভিক্ষা দিই, সে বোধ হয় গান শোনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

আজ গগন সেনের কথায় মুখ ফিরিয়ে দেখি বছর তের বয়েসের একটা ছেলে হাফ প্যান্টের উপর গেঞ্জী পরে আঙ্গুলে তাল ঠুকে গান করছে। চেহারাটা নরম, চুলটা কেয়ারী করে উল্টিয়ে আঁচড়ান, ঠোঁটে লাল পানের ছাপ, চোখের কোণে সুরমার টান, সেই ধরনের চেহারা যা দেখলেই গা'টা শির-শির করে। চোখে মুখে অল্প বয়েসে পেকে যাওয়ার ছাপ স্পষ্ট।

আমাকে ভুরু কুঁচকোতে দেখে গগন সেন বললে, ছেলেটাকে দেখতে বলিনি, যে গানটা গাইছে শোন।

মন দিয়ে শুনলাম, 'সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা। পৃথিবীতে কেহ ভাল তো বাসে না, এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না......'

ছেলেটি গান করতে করতে অন্য দিকে চলে গেল।

গগন সেন বললে, কি আশ্চর্য কথা-গুলো বল তো। যে গাইছে সেও লাইনের মানে বোঝে না, যাদের জন্যে গাওয়া, তারাও কেউ শুনছে না। কিন্তু সত্যই যদি কেউ শোনে, যেমন আজ আমরা শুনলাম; মনকে কতখানি নাড়া দেয় বল তো? এই হল বাংলা দেশ। এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে, গানে, কবিতায়, সবের মধ্যে বড় কথা, বড় ভাব অত্যন্ত সহজভাবে বলার চেষ্টা। সেই-জন্যেই তো কবির কথাই বলতে ইচ্ছে করে, সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।

আমি মন দিয়ে গগন সেনের কথা শুনেছিলাম, বললাম, এক এক সময় তোমার কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারি না, ঐ ছেলেটার গান তোমার এত ভাল লাগল কি করে?

গগন সেন বাঁ হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো ঠিক করতে করতে বললে, আমি ভাবছি কবির কথা, যিনি ঐ গানটা লিখেছেন। উনি বুঝতে পেরে-ছিলেন বহু দুঃখে বোধহয়, পৃথিবীতে ভালবাসার কোন স্থান নেই। তাই এমন জায়গায় সন্ধান চেয়েছেন যেখানে গেলে অন্যকে ভালবেসে ভালবাসার রাজ্যে তিনি দিন কাটাতে পারবেন। কবি সে রাজ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি পেয়েছি।

গগন সেনের এ কথায় আমি আশ্চর্য হলাম।

গগন সেন বলে চলে, সে রাজ্য শিশুদের জগতে, বালক-বালিকার আঙিনায়, কিশোর-কিশোরীর স্বপ্নে, শিশুর নিষ্পাপ সরল মনেই ভালবাসার পবিত্র স্থান। ভগবানের করুণা নিয়ে সে পৃথিবীতে আসে কিন্তু সংসার ক্রমে তাকে কঠিন করে তোলে। ভুলিয়ে দেয় তার সরলতা, যখন সে পুরোপুরি মানুষ হয়ে উঠল তখন আর সে কাউকে ভালবাসতে পারে না।

আমি কোন কথা বলিনি, গগন সেন বার দুই দেশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল। বড্ড হাওয়া, বার বার কাঠি নিভে যাচ্ছে। গগন সেন আবার সিগারেট পকেটে ঢুকিয়ে রাখে।

কথার খাতিরে বললাম, হেরে গেলে তো।

—কেন?

—সিগারেট ধরাতে পারলে না।

গগন সেন স্বভাবসুলভ মৃদু হেসে বললে, সে রকম অনেক কিছুই তো পারলাম না। জ্বালাবার চেষ্টা কি কম করেছি, কিন্তু জ্বলল কই? ঝড়, জল, হাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো লেগেই আছে, তবু চেষ্টা করে যাব, একদিন না একদিন প্রদীপ জ্বালাব নিশ্চয়। এমন প্রদীপ যা আলো দেবে কিন্তু পোড়াবে না। সেইজন্যেই তো স্কুল খোলার স্বপ্ন দেখি। একটা আদর্শ স্কুল। যেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতে পারব। তারা ভালবাসা নিতেও জানে, দিতেও জানে।

বললাম, সত্যিই কি তুমি স্কুল করতে চাও? আগে তো কখনও তোমার মুখে শুনিনি। এইবারই যা শুনছি।

—এতোদিন বলিনি, মনস্থির করতে পারিনি বলে। বাকী জীবনটা ওর পেছনে কাটিয়ে দেবো ভাবছি।

এতক্ষণ গাড়ী বেশ ফাঁকা ছিল কিন্তু শ্রীরামপুরে একসঙ্গে অনেক লোক উঠল আমাদের কামরায়। বেশী কথা বলার সুযোগ রইল না। তাই আমরা দুজনেই চুপ করে গেলাম।

চুঁচুড়োর বাড়ীতে পৌঁছে গগন সেনকে নীচে বসিয়ে রেখে আমি উপরে গেলাম রজবালা দেবীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। উনি নিজের ঘরে ইজি-চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছিলেন। আমি গিয়ে প্রণাম করতে সস্নেহে বললেন, থাক মা, বাড়ীর সব খবর ভাল তো।

মাথা নেড়ে বললাম, ভাল।

—আমি ভেবেছিলাম কাল রাত্রেই তুমি ফিরবে।

লজ্জিত স্বরে বললাম, অনেকদিন বাদে বাড়ীতে ফিরলাম কিনা, তাই দাদা, দিদি কিছুতেই ছাড়ল না, আমাকে আর এক রাত্রি আটকে রাখল।

—তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। তোমার জন্যে ভাবনায় পড়েছিলাম, একলা আসবে অনেকটা পথ, সেইজন্যে। যাও মুখ হাত পা ধুয়ে নাও, চা করতে বল।

বললাম, আমার সংগে এক ভদ্রলোক এসেছেন।

—কে?

—আপনি বলেছিলেন, Seeker-কে সংগে করে নিয়ে আসতে।

ব্রজবালা দেবী ব্যস্ত হয়ে পড়েন, Seeker এসেছেন নাকি?

বললাম, ওঁকে পাইনি, তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গগন সেনকে ধরে এনেছি।

একথা শুনে বৃদ্ধার উৎসাহ কিছুটা কমে গেল, তবু বললেন, বেশ তো মা; ওঁকে ওপরে নিয়ে এস।

নীচে নেমে গিয়ে দেখি গগন সেন হলঘরে আপন মনে পায়চারি করছে।

আমি ডাকলাম, ওপরে চল।

কোন সাড়া পেলাম না।

হেসে ফেললাম, ওরকম গম্ভীর মুখে কি ভাবছ? কানে কোন কথাই যাচ্ছে না।

এইবার গগন সেন আমার কাছে এল, জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব, ওপরে?

—হ্যাঁ। ব্রজবালা দেবী ডেকে পাঠিয়েছেন।

—চল।

গগন সেনকে নিয়ে আমি আবার বৃদ্ধার ঘরে ফিরে এলাম। গগন সেন হাত তুলে নমস্কার করল। ব্রজবালা দেবী প্রতিনমস্কার করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, ইনিই গগন সেন, Seeker-এর অন্তরংগ বন্ধু।

গগন সেন সহজ গলায় বলল, অন্তরংগ কিনা জানি না, তবে তার বন্ধু বটে। আপনি কি জানতে চান Seeker সম্বন্ধে।

ব্রজবালা দেবী একদৃষ্টে গগন সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললেন, আপনার নাম গগন সেন?

—হ্যাঁ।

—নামটা নতুন ধরনের।

—হ্যাঁ।

—Seeker-কে তুমি মানে আপনি—

গগন সেন হেসে বলল, আমাকে তুমি বলাই ভাল। বয়েসে—.

ব্রজবালা দেবী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তোমার বয়েস কত?

—বছর পঁয়ত্রিশ।

—জন্ম সাল ঊনিশ শ' কুড়ি?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য!

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে এঁদের কথাবার্তা শুনছিলাম, মনে হল ব্রজবালা দেবী ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। তবে কি গগন সেনকে দেখে উনি বিরক্ত হলেন। আমার উচিত হয়নি এভাবে না বলে ক'রে তাঁর সামনে এই অপরিচিত মানুষটিকে উপস্থিত করা।

বৃদ্ধা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললে, অর্পিতা, অতিথির জন্যে খাবার নিয়ে এস। দারোয়ানকে বল গরম সিংগাড়া যেন ভাজিয়ে আনে।

আমি তাঁর নির্দেশমত জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বাড়ীর ভেতরে চলে গেলাম। লক্ষ্মীর মাকে খাবারের ব্যবস্থা করতে বলে দিয়ে শাড়ী বদলে ফেলার জন্যে নিজের ঘরে ঢুকলাম। আজ ঘুম থেকে ওঠা হয়েছে অনেক ভোরে, এতখানি ট্রেনে করে আসার জন্যে আরও ক্লান্ত লাগছে। বিছানা

.....ইনিই গগন সেন.....

দেখে লোভ হ'ল কিছুক্ষণের জন্য গা এলিয়ে দেবার। কিন্তু সংগে সংগে ভয় ঢুকল পাছে ঘুমিয়ে পড়ি। কলঘরে ঢুকে মুখ ধুয়ে শাড়ী বদলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে খোঁজ করলাম চায়ের জল তখনও ফুটছে। লক্ষ্মীর মা জানাল দরোয়ান ইতিমধ্যেই গরম সিংগাড়া আর মিষ্টি কিনে এনেছিল, কর্তামার ঘরের দিকে গেছে।

কথা শুনে বিরক্ত হলাম, দরোয়ান নিয়ে গেল কেন? আমি নিজেই সাজিয়ে নিয়ে যেতাম।

—আপনি তো আমায় কিছু বলে যাননি, ভাবলাম আপনিও বোধ হয় ঐ ঘরেই আছেন। আমি এদিকে চা করতে ব্যস্ত, তাই দরোয়ানকেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

লক্ষ্মীর মার সংগে আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, দেখি ঠিকমত খাবার হয়ে গেল কিনা, চা হয়ে গেলে তুমি নিয়ে এস।

ব্রজবালা দেবীর ঘরের সামনে এসে অবাক হয়ে গেলাম। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। চাবীর ফুটো দিয়ে তুবড়ী ভেতরে উঁকি মারছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ও কি করছ তুবড়ী?

তুবড়ী চমকে উঠল, ঢোক গিলে বলল, কে একজন দাড়ীআলা লোক এসেছে।

—তাতে কি হলো।

—কিছু হয়নি, তুমি এসেছ খবর পেয়ে দেখা করবার জন্যে আমি দাদনের ঘরে ঢুকেছিলাম। দেখলাম দাদন কাঁদছে, আর একটা দাড়ীওয়ালা লোক চোখ পাকিয়ে ধমকাচ্ছে।

তুবড়ীর কথায় আমার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল, তারপর?

তুবড়ী বাঁ দিকের গালটা কুঁচকে বলল, দাদন আমাকে দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, এ ঘরে কি দরকার, যাও।

বললাম, অপুদির সংগে দেখা করতে এসেছি।

—সে এ ঘরে নেই। তুমি এখন যাও। আমি বেরিয়ে আসতেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তাই এই ফুটো দিয়ে দেখছিলাম, ঐ লোকটা কি করছে।

আমি কঠিন স্বরে বললাম, ও রকম করে না। ওটা অসভ্যতা। দাদন যখন বারণ করেছেন চলে এস।

তুব্ড়ীকে নিয়ে যদিও আমি নিজের ঘরে ফিরে এলাম কিন্তু তুব্ড়ীর মতই চাবির ফুটো দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারার কৌতূহল আমারও কম জাগেনি। Seekerএর খাতিরে এ বাড়ীতে আমি চাকরি পেয়েছিলাম, এখন তার বদলে গগন সেনকে এনে হাজির করায় আমার চাকরিটা না যায়।

তুব্ড়ীর জন্যে একখানা ইংরিজী ছবির বই ক'লকাতা থেকে কিনে এনেছিলাম সেটা পেয়ে সে খুশী হ'ল, বলল, আমি ভাবছিলাম তুমি আমার জন্যে কি আনবে।

জিজ্ঞেস করলাম, বই ছাড়া অন্য কিছু আনলে তুমি কি বেশী খুশী হতে?

তুব্ড়ী বলল, আর কিইবা আনবে। আমি এখন বড় হয়ে গেছি, আগে খুব খেলনা কিনতাম, এখন আর ওসব ভাল লাগে না। এই ধরনের ছবির বই-ই ভাল।

—এ ছবির বইটা কে পছন্দ করে দিয়েছে জান?

—কে?

—ঐ দাড়ীআলা বাবু।

তুব্ড়ী অবাক হয়ে বলে, ঐ বাবুটা বুঝি তোমার বন্ধু।

—হ্যাঁ।

—তবে ও দাদনকে অত বকছিল কেন?

বললাম, আমি কি করে জানব, আমি তো আর ওদের কথা শুনিনি।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীর মা এসে জানাল চা তৈরী করে সে দিতে গিয়েছিল, কিন্তু ঘর বন্ধ বলে সে ফিরে এসেছে।

বললাম, জল গরম করে রাখ দরজা খুললে যদি বলেন আবার তৈরী করে দেবে।

আমি বার দুই এক উঠে গিয়েছিলাম কিন্তু ঘর বন্ধ দেখে ফিরে এসেছি। গগন সেন যে-কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, অনায়াসে গল্পও করতে পারে অন্যের মন জুগিয়ে, ব্রজবালা দেবীকে কথা বলে মুগ্ধ করে রাখতে পারে সে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার জন্যে দরজা বন্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল? এমন কি গোপনীয় কথা থাকতে পারে যা তিনি চান না অন্য কেউ শোনে।

এই ধর নর নানা কথা ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে বিছানায় এসে শুয়েছিলাম। কতক্ষণ বাদে মনে নেই তুব্ড়ী এসে বলল, দাদন তোমায় ডাকছে অপুদি, শিগ্গীর যাও।

আমি উঠে বসলাম, যাচ্ছি চল।

—ওমা তোমায় বলতে ভুলে গেছি, মা তোমায় একটা চিঠি লিখেছে।

—দিদিমণি! চিঠিটা কোথায়?

—আমার ঘরে আছে।

—দিয়ে যেও, পড়ব।

—আচ্ছা, বলে তুব্ড়ী বেরিয়ে গেল।

আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটুল ঠিক করে নিলাম। বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে ঢুকলাম ব্রজবালা দেবীর ঘরে। উনি খাটের উপর শুয়ে রয়েছেন, উল্টো দিকে মুখ ফেরা। আস্তে আস্তে তাঁর খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, উনি মুখ না ফিরিয়েই প্রশ্ন করলেন, কে, অর্পিতা?

সাড়া দিলাম, হ্যাঁ।

—তোমার বন্ধুটিকে এখানে খেয়ে যেতে বলেছি, ব্যবস্থা করে রেখ।

বললাম, আচ্ছা।

উনি আর কোন কথা বলেন না। জিজ্ঞেস করলাম, আর কিছু বলবেন?

—না। তুমি এখন যেতে পার।

—গগনবাবু কোথায় গেলেন!

—দ্যাখ, বোধ হয় নীচে গেছে।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, লক্ষ্মীর মাকে দুপুরের খাওয়ার কথা বলে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম, মাঠ থেকে তুবড়ীর গলা ভেসে আসছে, একটু এগিয়েই দেখি তুবড়ী আর গগন সেন ঘাসের উপর বসে। আমাকে দেখে তুবড়ী চেঁচিয়ে উঠল, অপুদি শুনে যাও। এ বাবুটা বেশ গল্প বলতে পারে।

হেসে বললাম, তা আমি জানি। দেখলে না দাদনের সংগে কতক্ষণ গল্প করল।

আমার কথা শুনে গগন সেনও হাসল, সত্যি, নিজেও বুঝতে পারিনি যে এতক্ষণ আমরা বকবক করেছি।

তুবড়ী প্রশ্ন করল, দাদনকে তুমি কিসের গল্প বলছিলে?

—যে গল্প তোমার দাদন শুনতে ভালবাসে। শিকারের গল্প। বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, বন্দুকের শব্দ গুড়ুম গুড়ুম, এইসব আর কি।

তুবড়ী হাসছিল, বলল, তুমি ঠিক ধরেছ। ছোটবেলায় দাদন যত গল্প বলত সব শিকারের, যত বলতাম রূপকথার গল্প বল, দাদন পারত না।

—বেশ, পরে একদিন তোমায় রূপ-কথার গল্প শোনাব, এখন একটা চাকর দারোয়ান কাউকে ডাক দেখি, আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দেবে।

তুবড়ী ফস করে বলল, বকশীস দিলে আমিও নিয়ে আসতে পারি।

গগন সেন তুবড়ীর মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, তুমি কেন যাবে!

—না, না, আমি নিয়ে আসছি, টাকা দাও, এই তো সামনেই দোকান।

অগত্যা গগন সেন একটা নোট বার করে ওর হাতে দেয়, তুবড়ী সেটা চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

সেই দিকে তাকিয়ে গগন সেন বলল, এই ব্রজবালা দেবীর নাতি।

বললাম, হ্যাঁ দিদিমণির ছেলে। একটু খামখেয়ালী ধরনের।

গগন সেন মন্তব্য করল, না হওয়াই আশ্চর্য, বাপ-মার এতখানি অবহেলায় যে ছেলে মানুষ হয় সে আর কত ভাল হবে।

এতক্ষণ মনের মধ্যে যে কৌতূহল উঁকি মারছিল, গগন সেনকে একলা পেয়ে তা আর চেপে রাখতে পারলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি করে বল তো, বৃদ্ধাকে এতক্ষণ কি বোঝালে?

গগন সেনের চোখ দুটো হেসে উঠল, ওঁকে আমার ছেলেবেলার কথা বলছিলাম। সে কথা অবশ্য তোমাকেও বলিনি।

—কি কথা?

—বেশ কয়েক বছর এই চুঁচড়োতেই আমার কেটেছিল, যে জন্যে এ জায়গাটা আমার অতিপরিচিত। তখন এই মাঠে আমরা খেলা করতে আসতাম, আমার মত পাড়ার অনেক ছেলেই আসত। সেই সব কথা শুনতে শুনতে ভদ্রমহিলা একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন।

এতক্ষণে আশ্বস্ত হলাম, তবু ভাল, আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তোমার জন্যে না আমার চাকরিটা যায়।

গগন সেন শব্দ করে হাসল, সে আশংকা মোটেই নেই, বরং তোমার মাইনে বেড়ে যেতে পারে। বুড়ীকে আরও অনেক গল্প শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি।

গগন সেন পায়চারি করতে করতে গংগার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমিও তার পিছনে চলেছি। বলল, জান অপু, এ বাড়ী সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম গল্প বলে, সত্যি মিথ্যে জানি না। এ বাড়ীর পূর্বপুরুষরা নাকি ডাকাত ছিল।

চমকে উঠলাম, ডাকাত, কি বলছ তুমি?

—হ্যাঁ, ডাকসাইটে ডাকাত। রাতের অন্ধকারে এদের ছিপ বেরত গংগায়, আগে থেকে ঠিক করা থাকত কোন্ গ্রাম তারা লুঠ করবে, এদের সংগে থাকত বন্দুক, সড়কী, তলোয়ার। প্রয়োজন হলে ওরা নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করত। বিপদে পড়লে বাঁচবার জন্যে গ্রাম কে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত। এ তল্লাটে এদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। ভোর রাত্রে ছিপ-নৌকো ফিরে আসত বাড়ীতে। গংগার ভেতর থেকে সোজা খাল এসে ঢুকে গেছে এই বাড়ীর মধ্যে। লোকে বলে ঘড়া ঘড়া মোহর সব সময় বোঝাই থাকত কর্তাদের ভাণ্ডারে। ঐ যে গংগার ধারে বাড়ীটা দেখছ, ওরই নীচে মাটির তলায় দুখানা গুপ্ত ঘর আছে। ঐ খানেই নাকি লুঠের ভাণ্ডার থাকত।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, তা কি করে সম্ভব হবে, এঁরা তো শুনেছি মস্তবড় জমিদার ছিল।

গগন সেন সহাস্যে বলল, টাকা থাকলে জমিদার হতে বাধা কি। হোক না সে লুঠের টাকা। যে ভক্ষক সেই রক্ষক।

—অত টাকা গেল কোথায়।

—হয়তো কিছু আছে। বাকি উড়ে গেছে নিশ্চয়ই। টাকা কখনও থাকে না। আসে বা যায়। কর্তারা উড়িয়েছেন কেউ-বা বাঈ নাচ করিয়ে, কেউবা অন্যায় করে তা চাপা দেবার জন্যে উকিল-ব্যারিস্টারের পেট ভরিয়ে আবার কেউবা বনে-জংগলে বুনো জন্তুর পিছনে ছুটে বেড়িয়ে। এ অঞ্চলে এদের নামই ছিল ডাকাতে জমিদার।

সঅভিমানে বললাম, এদের সম্বন্ধে এত কথা যদি জানোই আমায় তা বলোনি কেন?

গগন সেন পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো, কত কথাই তো তোমাকে বলা হয়নি। কদিনেরই বা পরিচয়, এর মধ্যে কি জীবনের সব কথা বলা সম্ভব?

বললাম, তোমার সংগে কথায় কে পারবে?

—সত্যি বলছি অপু, আসল কথাটাই তো তোমায় এখনও পর্যন্ত বলা হয়নি।

—কি?

—আমি তোমায় ভালবাসি। বলেই গগন সেন প্রাণ খুলে হাসলো, এ রকম কাটখোট্টা ভাবে কেউ বোধহয় কখনো কাউকে প্রেমনিবেদন করেনি।

সংগে সংগে গলাটা যতদূর সম্ভব গম্ভীর করে বলল, ঠাট্টার কথা নয় অপু, তোমাকে না পেলে জীবনের উপর হয়তো আস্থা হারিয়ে ফেলতাম।

আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু গগন সেনের জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

ময়নামতীর দেশ চাওরা

বন্দনা গুপ্ত

চাওরার ছেলে

কার নিকোবর থেকে চাওরা যেতে হলে আপনাকে হয় নিকোবরীদের ক্যানোয় চড়ে যেতে হবে না হয় তো আকুজী কোম্পানীর শরণাপন্ন হতে হবে বোটের জন্য। নিকোবরীদের ক্যানোতে গেলে আবহাওয়া যদি ভাল থাকে তবে পৌঁছে যাবেন আট-দশ ঘন্টায় এই চল্লিশ মাইল রাস্তা। যদিও ঢেউয়ের সংগে সংগে একবার উঁচুতে উঠে আবার আছড়ে পড়বেন বেশ কয়েক ফুট নীচে। আর যদি আবহাওয়া বিরূপ হয় তবে দুই-তিন দিনও লাগতে পারে পৌঁছতে।

কার নিকোবরে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের দেখেও আপনি খাঁটি নিকোবরীর দেখা পাবেন না কারণ কার নিকোবরে বাইরের জগতের প্রভাব পড়েছে বড় বেশী। খৃষ্টান মিশনারীদের কর্মতৎপরতায় সেখানকার নিকোবরীরা আজ সভ্য-ভব্য হয়ে গেছে অনেকটা—তাদের আদিপোশাক পাতার ঘাগরার বদলে বেশীর ভাগ ছেলেরা পরে অতি আধুনিক পোশাক সার্ট, প্যান্ট আর মেয়েরা পরে ব্লাউজ ও লুঙ্গী, স্কার্ট ব্লাউজ। নিকোবরের একচেটিয়া ব্যবসায়ী আকুজি কোম্পানীর হেডকোয়ার্টার কার নিকোবর ক্রমে একটি কর্মব্যস্ত ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে যাচ্ছে; দেশ-বিদেশের কত লোকের আনাগোনা। বাইরের কিছু লোক বাসও করে এই দ্বীপে নানা কর্ম উপলক্ষ্যে, তাই যদি নিকোবরকে দেখতে চান তার আদিম ও অকৃত্রিম রূপে তবে আপনাকে যেতে হবে কার নিকোবর (নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে উত্তরের দ্বীপ) থেকে আরও চল্লিশ মাইল দক্ষিণে চাওরা দ্বীপে। এর সমগোত্রীয় টেরেসা, বমপকা ইত্যাদি আরও দ্বীপ আছে তবে সেগুলো আরও দক্ষিণে—আরও অনেক দূরে।

পোর্টব্লেয়ার থেকে কার নিকোবরে আপনি ইচ্ছে করলে মাদ্রাজগামী জাহাজে করে যেতে পারেন কারণ মাদ্রাজ যাওয়ার পথে কার নিকোবরে জাহাজ তিন-চার ঘন্টা দাঁড়ায়, কিন্তু চাওরা দ্বীপে যাওয়ার কোনই নিয়মিত ব্যবস্থা নেই। ভারত মহাসাগরের কাছাকাছি এই ছোট্ট দ্বীপটি অতীতেও যেমন ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাতে আপনি আজ এই বিংশ-শতাব্দীতে মানুষ যখন পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে মহাশূন্যে তখনো এই চাওরা দ্বীপ রয়ে গেছে প্রায় সেই আগের মতই। এখনো তারা ভূতপ্রেত, যাদুমন্ত্র, তুকতাক ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই দ্বীপের নিকোবরীরা সুদূর অতীতে যে রকম গৃহে বাস করতো আজও সেই বাসগৃহ রয়েছে ঠিক তেমনই—তাদের তৈরী নৌকো বা মাটির পাত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি আজ পর্যন্ত। বিদেশী বাণিজ্যজাহাজ তার যাত্রাপথে এই নারিকেল বৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন দ্বীপটির মায়াময় আকর্ষণে আসেনি নিকি আতিথ্য নিতে কোনদিন। আশ্চর্য এই দ্বীপটিতে কোনরকম বাইরের লোকের বসতি হয়নি আজ পর্যন্ত—চাওরা দ্বীপে চাওরাবাসী ছাড়া আর কেউ বাস করে না। তাই তাদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি কোন কিছুতেই ছাপ পড়েনি অন্য কোন জাতি বা দেশের। এই জন্যই সমগ্র নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে চাওরার স্থান একটু বিশিষ্ট।

নিকোবরীরা সিয়া বা অপদেবতায় বিশ্বাস করে। যা কিছু বিপদআপদ, রোগব্যাধি, দুঃখকষ্ট সব কিছুর জন্যই দায়ী এই সিয়া বা অপদেবতা এবং এই অপদেবতাকে যদি কারুর ক্ষমতা থাকে নিয়ন্ত্রণ করার তবে তা এই চাওরার অধিবাসীরাই তাই চাওরা নিকোবরীদের কাছে পবিত্র স্থান এবং চাওরার লোকেরা যেন এদের পুরোহিত সম্প্রদায়ের মত।

কার নিকোবরীদের চাওরা যাওয়াটা অনেকটা তীর্থযাত্রার মত—বিশেষ করে যে নিকোবরী ছেলে প্রথম চাওরা যাচ্ছে তার তো রীতিমত আনুষ্ঠানিকভাবে যেতে হয় এখানে। কচি কলাপাতার তৈরী নেকলেস পরে গলায়, হাতে পায়ে পরে রুপোর রিং—মুরগী উৎসর্গ করে কেটে তার রক্ত মেখে মাথায় আর কাঁচা ডিমের গোলা গায়ে মেখে—এই বিচিত্র বেশে যাত্রা করে চাওরার উদ্দেশ্যে। আরও একটি বড় কারণে চাওরায় বছরে একবার অন্ততঃ নিকোবরীদের যেতেই হয়—সেটা হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। নিকোবরের বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে ব্যবসার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হচ্ছে চাওরা। এর কারণ নিকোবরীদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য অঙ্গ ক্যানো এবং মাটির পাত্র এ-দুটোই তৈরী হয় শুধুমাত্র এই চাওড়া দ্বীপে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার অন্যান্য দ্বীপে যদিও বা ক্যানো তৈরী হয় কিন্তু তার 'ফিনিশিং' চাওরাবাসীদের হাতে হতেই হবে এবং তাদের মাধ্যমেই বেচাকেনা চলে আসছে আবহমান কাল থেকে।

কার নিকোবর আজ বাইরের জগতের সংস্পর্শে এসে অনেক কিছুই ছেড়েছে তাদের প্রাচীন রীতিনীতির। সুবেশ সুন্দর নিকোবরী তরুণ-তরুণীরা যখন গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসে আশ্চর্যহিক

প্রার্থনার পরে তখন তাদের দেখে ধারণা করা যায় না যে চাওরা যাওয়ার সময় এরাই পালন করে সমস্ত আচার নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। সব নিকোবরীরা এখনো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে চাওরার হাত দিয়ে যদি ক্যানো তাদের হাতে না আসে তবে সেই ক্যানোর উপর পড়বে অপদেবতার দৃষ্টি আর চাওরা ছাড়া অন্য কোথাও তৈরী মাটির পাত্রে রান্না করে খেলেও অপদেবতার কু-দৃষ্টিতে পড়তে হবে। এই বিশ্বাসই তাদের মজ্জায় মজ্জায় এবং এই বিশ্বাসই চাওরাবাসীদের দিয়েছে পুরোহিতের মর্যাদা। তা'ছাড়া চাওরাকে নিকোবরীদের আদিবাসভূমি বলে মনে করা হয় এবং এখানেই তাদের প্রায় আদিম ও অকৃত্রিম জীবনধারা এখনো অব্যাহত বলেও চাওরাকে তারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। পাতার ঘাগ্‌রা ছেড়ে স্কার্ট ব্লাউজই ধরুক আর সার্ট প্যান্ট জুতোমোজা পরে গীর্জাতেই যাক, সিয়া বা অপদেবতার (evil spirit) ভয় তাদের প্রতি পদে এবং এ বিষয়ে তারা এখনো চাওরার উপর নির্ভরশীল সম্পূর্ণরূপে।

এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে একটি উদ্ভট গল্প প্রচলিত আছে। একবার নাকি প্লাবনে সমস্ত দেশ ভেসে গিয়েছিল—রক্ষা পেয়েছিল একজন মাত্র লোক একটি গাছের ডালে আশ্রয় নিয়ে এবং সেই গাছে উঠে প্রাণরক্ষা করেছিল আর একটি প্রাণী—একটি কুকুরী। সেই মানুষটি আর কুকুরী থেকেই নাকি তাদের বংশের উদ্ভব। কুকুরের বংশোদ্ভব বলেই কিনা জানি না মাথার কুকুরের কানের মত দেখতে অদ্ভুত শিরস্ত্রাণ ও পরনের কাপড়ের পিছনদিকে এক-ফালি লম্বা কাপড় ঝুলিয়ে দেয় এরা ল্যাজের মত।

এদের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে নানা রকম মত প্রচলিত আছে। ১৯৫১ সালের সেন্সার সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ এস কে গুপ্ত মনে করেন রামায়ণে বর্ণিত বানর-সৈন্যের সঙ্গে এদের আশ্চর্য মিল আছে—অর্থাৎ এরা ভারতভূমিরই সন্তান। ব্রহ্ম, মালয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ব্যাপিয়া যে পীতজাতির কথা প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাওয়া যায় নিকোবরীরা তাদেরই একটি শাখা এবং রামায়ণে বর্ণিত বানর-সৈন্য মানেই এই পীতজাতি।

বাইরের কোন লোকও যেমন চাওরায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেনি আজ পর্যন্ত তেমনি চাওরার লোকরাও তাদের ঐ দ্বীপের বাইরে বসতি করেছে বলে শোনা যায়নি—তাই বোধহয় ঐটুকু অর্থাৎ মাত্র ২·৪ বর্গ মাইল পরিধির ঐ ছোট্ট দ্বীপটিতে লোকের বাস বর্তমানে ১২৫০ জন—নিকোবরের আর অন্য কোথাও লোক-বসতি এত ঘন নয়। পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীর সঙ্গে কোথাও মিল নেই এই দ্বীপের অদ্ভুত অধিবাসীদের। বাইরের জগতের কোন আকর্ষণ এদের টানতে পারেনি আজও। মহাকালের পদক্ষেপ তো দূরের কথা পদধ্বনিও পৌঁছয়নি এদের কানে। তাই বলছিলাম এখানে না গেলে নিকোবর দেখা আপনার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

চাওরার যে বিস্তীর্ণ বালুকাতটে গিয়ে আপনি বোট থেকে নামলেন সেখানে দেখবেন অজস্র উঁচু পাটাতনের উপর তৈরী গোলাকার নিকোবরী মৌচাক-কুটীর। এই অঞ্চলকে ওরা বলে আ-পানাম। বুনো ঘাস-পাতায় ছাওয়া এই কুটীরগুলোর দরজা একটি—আর কোন দরজা জানালা নেই। মই বা কাঠের তক্তা বেয়ে ঘরে উঠতে হয়। দরজা জানালাহীন ঘরগুলো দেখে আপনার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসলেও এগুলোই এদের অতিথিশালা (গেষ্ট হাউস) অর্থাৎ আপনাকে এখানেই বাস করতে হবে দ্বীপের অতিথি হিসাবে। এই ছোট্ট দ্বীপে এতগুলো অতিথিশালা দেখে অবাক হবারই কথা। কিন্তু এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে প্রচুর বাইরের লোকের আনাগোনা এবং সেজন্যই এগুলোর প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও এই জায়গাটা তাদের ক্যানো রাখবার জন্য ব্যবহৃত হয়। উঁচু উঁচু কুটীরের পাটাতনের নীচে তারা ক্যানো রাখে।

তামাটে গায়ের রং, অত্যন্ত শক্ত সমর্থ দেহের গড়ন মঙ্গোলীয় টাইপের চেহারা চাওরাবাসীদের পরনে আজকাল লুঙ্গী বা ইজের আর মেয়েরা পরে লুঙ্গী—ঊর্ধাঙ্গ প্রায় সকলেরই এখনো নগ্ন। এদের আদি পোশাক 'নঙ' (পাতার স্কার্ট) পালা-পার্বণ ছাড়া বড় একটা পরে না। কাপড়-চোপড় তারা পায় কার নিকোবরীদের কাছ থেকে যাদের সঙ্গে ওদের ব্যবসা চলে বিনিময় প্রথায়। চাওরায় খাওয়ার জিনিসের অভাব তাই শুকর, নারকেল ইত্যাদি খাবার জিনিস তাছাড়া কাপড়-চোপড়, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি জিনিস দিয়ে তারা নিয়ে যায় ক্যানো ও মাটির পাত্র।

অন্যান্য নিকোবরীদের মত এদেরও প্রধান খাদ্য শুকর ও মুরগী কিন্তু ভোজ ছাড়া এ সব বড় একটা হয় না। দৈনন্দিন খাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এদের প্যান্ডানাস ফলের রস দিয়ে তৈরী আঠার মত পদার্থ যার নাম ওদের ভাষায় 'লারোম'। এই লারোম ওরা তৈরী করে রেখে দিলে ২।৩ মাস পর্যন্ত রেখে খেতে পারে। খানিকটা নারকেলের দুধ, কিছু ফলমূল, লারোম, জমিয়ে রাখা শুকরের চর্বি, শাকসব্জী ইত্যাদি তাদের দৈনন্দিন খাবার। মাছও তারা খায় সাধারণতঃ আগুনে সেঁকে। রান্না না করে কাঁচা কিছু নিকোবরীরা সাধারণতঃ খায় না। এদের অদ্ভুত সব সংস্কারের মধ্যে একটি হচ্ছে মাছ এরা কখনো মাটির পাত্রে রান্না করে না।

সকালের দিকেই এরা ভারী খাবার খেয়ে নেয়.....আর-সারাদিন ডাবের জল, নারকেল গাছের রস (মাদক পানীয়) খায় যখনই প্রয়োজন অনুভব করে—আর সারাদিন ধরে সুপারি চিবানো তাদের একটা অভ্যাস। সুপারি চিবোতে চিবোতে তার কষ থেকে দাঁতগুলো কালো হয়ে যায়, ঠোঁট হয়ে যায় বিবর্ণ।

মুখশ্রী একদম নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু নিকোবরী যুবতীর মনোহরণ করতে হলে নাকি ঐ রকম দাঁত না হলেই উল্টো বিপত্তি। আন্দামানের এক-কালীন শাসনকর্তা ই এইচ ম্যান একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে—সবল সুন্দর দুটি চাওরার যুবক নাকি সমস্ত তরুণীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল পাত্র হিসাবে—অপরাধ তাদের দাঁত ছিল সাদা ঝকঝকে—সুপুরির কষে বিবর্ণ ও কুৎসিত নয়।

এই আশ্চর্য ছোট্ট চাওরা দ্বীপটি যদি সম্পূর্ণ ঘুরে দেখতে চান তবে দেখবেন এখানে মাত্র পাঁচটি গ্রাম আছে। যদিও এই দ্বীপ নিকোবরের এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারের শাসনাধীনে কিন্তু এখানে শাসনবিভাগের কোন রকম দপ্তর নেই। সরকারী শাসনকর্তার চেয়ে তাই এদের মোড়লের সঙ্গেই সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ। সমস্ত দ্বীপে একজন প্রধান আছে, সেই এই দ্বীপের সর্বপ্রধান ব্যক্তি, এ ছাড়াও প্রতি গ্রামে একজন মোড়ল রয়েছে তাকে সাহায্য করার জন্য। আবার এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সাহায্য করবার জন্য আর একজন এবং তাকে সাহায্য করবার জন্য আরও একজন অর্থাৎ প্রতি গ্রামে তিনজন করে মোড়ল আছে। এরা সকলে দ্বীপের প্রধানের অধীনে যার যার গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য দায়ী। প্রতি গ্রামের মোড়লরা বিচার্য কিছু থাকলে দ্বীপের প্রধানকে জানায় এবং তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়—তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সে গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়। বিচারে যে দোষী সাব্যস্ত হয় সে মামলার ফী বাবদ অন্ততঃ একটি শূকর দেয় এবং মোড়লরা সকলে সেটা ভাগ করে নেয়।

যে কেউ দ্বীপের মোড়ল হতে পারে না। মোড়লের অভাবে তার ছেলে বা ঐ রকম ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া কেউ মোড়ল পদ পাবে না। কার নিকোবরের মতন মেয়েদেরও মোড়ল হওয়ার নিয়ম নেই এখানে। কয়েক বছর আগে—তাহিয়ালা গ্রামের মোড়ল মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী মোড়ল হ'তে পারল না এবং সন্তানরাও ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক। তখন মোড়লের স্ত্রী বিয়ে করাতে তার নব পরিণীত স্বামী নুখা পেল মোড়লের পদ—যদিও সে ঐ গ্রামের লোক নয় এবং ভূতপূর্ব মোড়লের পরিবারে নেহাৎ আশ্রিত হিসাবেই সে বাস করছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও মোড়লের স্ত্রীকে বিয়ে করে সে মোড়ল হয়ে গেল।

ঘুরে ঘুরে পিপাসার্ত হয়ে থাকলে আপনি চাওরার সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ডাবের জল খেয়ে নিন—পানীয় জল

চাওরা দম্পতি

পাওয়া এখানে খুব সহজ ব্যাপার নয়। চাওরার লোকরা যে পানীয় জল ব্যবহার করে ত হয়তো আপনার পক্ষে পান করা সম্ভব হবে না। ৫০।৬০ ফুট নীচের কুয়ার যে জল তারা পান করে নোনতা ও বিকট স্বাদের জন্য আপনি তা মুখেও দিতে পারবেন না। আর আছে মাটির পাত্রে জমানো বৃষ্টির জল তা আবার ঘরের চাল ধোয়া—অর্থাৎ বৃষ্টির সময় যখন ঘরের চালা দিয়ে গড়িয়ে মোটা হয়ে জলের ধারা নামে তার নীচে মাটির পাত্র বসিয়ে দেয় তারা পানীয় জলের জন্য। এই অদ্ভুত রাজ্যের লোকরা মাঝে মাঝে এমন জলকষ্টের সম্মুখীন হয় যে তখন ওখান থেকে ১২।১৪ মাইল দূরে টেরেসা

চাওরার একটি গ্রাম

চাওরাদের বাসগৃহ

দ্বীপে গিয়ে তারা পানীয় জল নিয়ে আসে। আপনার আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই—কারণ এই অল্প সময় বাসকালীন পানীয় জলের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারবেন আপনি নারকেলের জল দিয়েই।

চাওরায় কার নিকোবরের মত আলাদা কোন প্রসূতিসদন নেই, যার যার নিজের বাড়ীতেই সন্তান প্রসব করে। সন্তানবতীর স্বামীও তার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভাবস্থার সব কিছু নিয়ম-কানুন পালন করে। সবচেয়ে মজার প্রসূতি প্রসব-বেদনায় কাতর হয়ে শুয়ে থাকলে স্বামীও সেই রকম শুয়ে থাকে এবং যন্ত্রণার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে! প্রসবে দেরী হলে তারা মনে করে শিশু কোন কিছুতে জড়িয়ে গেছে তখন তারা খুঁজে যায় করে কোথায়ও কোন শক্ত বাঁধন আছে কিনা—খুলে দেবার জন্য। ঘরের দরজা, বাক্সের ডালা খুলে দেয় ভাল করে যাতে বাচ্চার আগমন-পথও অমনি বাধাহীন হয় এবং সহজ-প্রসব হয়।

অপদেবতার উদ্দেশ্যে পূজা

চাওরার একটি সমাধি স্থান

এদের শিশুকে মায়ের দুধের পরে প্রথম খাদ্য দেওয়া হয় প্যাণ্ডানাসের রসে তৈরী খাবার ও নারকেলের দুধ।

চাওরায় কন্যা বিবাহযোগ্যা হলে তার বাপ-মা একটা ভোজ দিয়ে সেটা ঘোষণা করে। যুবক-যুবতীরা নিজেরাই বর বা বধূ মনোনীত করে তবে বিয়েটা পিতা-মাতারাই উদ্যোগ করে দেয়। নিকোবরের অন্য কোথাও বিয়ের উপলক্ষ্যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় না—শুধু খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান করে সকলে এক সাথে—একমাত্র এই চাওরা দ্বীপেই বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছু কিছু অনুষ্ঠান হয়। বর ও কনে উভয়েরই মাথা নেড়া করা হয় এবং সাতদিন তারা ঘরের বাইরে বেরোয় না। এই সময় গেরুয়া রঙের কাপড় পরে তারা দুজনেই। চাওরায় ছেলে-পক্ষকে পণ দিয়ে মেয়েকে কিনে নিতে হয়। আমাদের মত টাকা পয়সা গয়নাপত্র নয়—খানিকটা জমি, নারকেল গাছ ইত্যাদি মেয়ের বাপকে দিলেই হয়। কার নিকোবরে ছেলে মেয়ের বাড়ী যাবে না মেয়েই আসবে ছেলের বাড়ী সেটা নির্ভর করে অনেকটা আর্থিক অবস্থার উপরে কিন্তু চাওরায় মেয়েকেই আসতে হয় ছেলের বাড়ীতে বিয়ের পরে। এর কাছাকাছি টেরেসা দ্বীপে কিন্তু বিয়েই নেই, মনের মত সঙ্গী বেছে নিয়ে তারা বাস করে স্বামী-স্ত্রীর মত—যদি কখনো তেমন মনোমালিন্য হয় তবে ছেড়ে দিয়ে আবার মনোমত সঙ্গীর সঙ্গে ঘর করে দুজনেই —কোন বাধা নেই! কিন্তু একসঙ্গে দুজন পতি বা পত্নীর সঙ্গে ঘর-করা চলবে না কিছুতেই।

অশান্ত বঙ্গোপসাগরের বুকের মণিহার এই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোট্ট মণি এই চাওরা দ্বীপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আপনাকে মুগ্ধ করবে। নির্জন নিরালা সমুদ্রতটে বেড়াতে বেড়াতে যদি অন্যমনস্ক হ'য়ে একটু বেশী দূরে চলে যান লোকালয় ছেড়ে তবে হঠাৎ পশুপাখীর কলরব-মুখরিত সমুদ্রের ধারের এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই এবং তাদের হঠাৎ চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যদি আপনার অনুসন্ধিৎসা জাগে তবে একলা আর এগোবেন না—কারণ ওখানে গেলে শুধু গলিত শবদেহের অসহ্য দুর্গন্ধই নয় শ্মশানের যে ভয়াবহ পরিবেশ দেখবেন তা' আপনার আমার কল্পনার সম্পূর্ণ বাইরে।

গোড়া থেকে বলি—এই অদ্ভুত মানবজাতি মৃত্যুর পরে তাদের আজন্ম-সঙ্গী একটি ক্যানোকে সমান দু'ভাগে কেটে তার এক অংশে মৃতদেহটি রেখে অপর অংশ দিয়ে ঢেকে মাটীর নীচে কবর দেয়। কিন্তু কে জানে কেন ২।৩ দিন পরই সেই সমাধিস্থ দেহটিকে আবার কবর খুঁড়ে টেনে তোলে এবং

ক্যানোসমেতই মৃতদেহটিকে দুটো গাছের ডাল মাটীতে পুঁতে তার মাঝে টাঙিয়ে রাখে। আগার দিকটা দ্বিধাবিভক্ত এমন দুটো ডাল নেয় যাতে ক্যানোটাকে রাখবার সুবিধা হয়। তারপর সেই মৃতদেহটি নিয়ে পশুপাখীর ভোজ-উৎসবের মাতামাতি সমুদ্র সৈকতের নির্জনতা ভঙ্গ করে। কার নিকোবরেও কবর খুঁড়ে তোলা হয় তবে তা' প্রায় বছর খানেক পরে।

নাচ-গানের নেশা এদের রক্তের মধ্যে। অসামান্য সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমুদ্রতরঙ্গের ছন্দোময় সঙ্গীত, তাদের মনে দিয়েছে সুর, পায়ে দিয়েছে নৃত্যের ছন্দ। চন্দ্রালোকিত দ্বীপের আলোছায়ার মায়াময় পরিবেশে চাওরার যুবক-যুবতীর আনন্দোচ্ছল নৃত্যগীত দেখতে দেখতে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে এই দ্বীপে "ডাইনী হত্যার" (devil murder) মত নৃশংস ও বীভৎস কান্ড ঘটত এই অল্পদিন আগেও। এই কুসংস্কার যে মানুষকে কতটা হৃদয়হীন কতটা নৃশংস করে তুলতে পারে তার সাক্ষী চাওরার এই devil murder।

চাওরার লোকেরা যখনই মনে করে যে কেউ evil spirit বা অপদেবতা দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছে তখন পাছে আর কারোর উপর অপদেবতার কুদৃষ্টি সংক্রামিত হয়, সেই ভয়ে তাকে তারা এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেয়। নানা রকম কুসংস্কারে পরিপূর্ণ মন এই চাওরার লোকদের। যাদুমন্ত্র দিয়ে তারা রোগীর চিকিৎসা করে ভাল করে বলেও তাদের যেমনি ধারণা তেমনি আবার নানা যাদুবিদ্যা দ্বারা লোকের অমঙ্গলও ডেকে আনতে পারে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কাজেই যখনই কারোর মৃত্যুর কারণ বলে কোন একজন লোককে দায়ী মনে করে তখন গ্রামের বয়স্ক মাতব্বর লোকেরা একত্র গোপন পরামর্শ করতে বসে। তারা যদি মনে করে যে এ ক্ষমার অযোগ্য এবং গ্রামের মঙ্গলের জন্য তাকে সরানো প্রয়োজন তখন এই বিচারে তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কুসংস্কার ছাড়াও এর পিছনে তাদের অন্য উদ্দেশ্যও থাকে অনেক সময়। কারণ অপদেবতা দ্বারা প্রভাবিত লোক ছাড়াও ক্রমাগত চুরির অপরাধে অপরাধী, খুন-জখমকারী বা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক লোককেও এইভাবে হত্যার আজ্ঞা দেওয়া হয়। গ্রামের যুবকদের উপর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভার দেওয়া হয়। অভিযুক্ত লোকটির অজ্ঞান্তে হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে ঘাড়, হাত, পা তার সব পিটিয়ে ভেঙে ফেলে তারপর সেই দেহটিকে নৌকো করে মাঝ-সমুদ্রে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসে এবং মনে করে আর তার অমঙ্গল করার কোন ক্ষমতা রইল না। এরমধ্যে অন্যায় থাকতে পারে একথা তাদের ধারণার বাইরে—সমাজের জন্য ভাল কাজ করছে বলে তারা বরং গর্ব বোধ করে। রীতিমত বিচার ক'রে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়াটা রীতিসম্মত—ব্যক্তিগতভাবে কেউ হত্যা করলে হবে দোষণীয়।

চাওরার নিকোবরীদের বিচিত্র জীবন দেখা আপনার হ'ল। ছবির মত সুন্দর এই দ্বীপটিতে আরও কয়দিন থেকে নৈসর্গিক শোভা দেখে দিন কাটাতে আপনার হয়তো ভালই লাগবে—কিন্তু সন্দিগ্ধমন কাঠখোট্টা চাওরার অধিবাসীদের তরফ থেকে আন্তরিক আতিথেয়তার অভাব আপনাকে নিরুৎসাহ করে তুলবে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কার নিকোবর ও অন্যান্য দ্বীপে একটি ঢিলেঢালা সহজ সরল জীবনযাত্রা—নাচ-গান, নৌকো বাইচ্ ইত্যাদির ধুম লেগেই আছে—কিন্তু চাওরার পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্যরকম—এখানে নেই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগতা—অলস মধ্যাহ্নে সমুদ্রসৈকতে নারিকেল কুঞ্জছায়ায় বসে সমুদ্রের ঢেউ গোণার মত বিলাস এখানে নেই। এখানে নেই সেই শান্ত নির্জন ঘুমন্ত দেশের পরিবেশ যা' আপনার শহুরে মনকে নিরন্তর টানে—চাওরা দ্বীপের যেখানেই যাবেন দেখবেন কেউ বসে নেই—কেউ মাটীর পাত্র তৈরী করছে, কেউ নৌকো টানছে কেউবা রোগীর চিকিৎসা করছে। এখানে এরা কেউ স্বপ্নলোকের মানুষ নয়—সবাই মাটীর মানুষ, মেহনতী মানুষ—কঠোর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত।

সেকালের পাতা : একালের চোখ

রত্নাকর

মুলতানের এক বিদ্রোহী সিপাই পালিয়ে গিয়ে থাকত গাছে। এক বেশ্যা তাকে দেখাশুনো করত। একদিন পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক ইংরেজ। সিপাই তাকে আক্রমণ করল।
রামমোহন দিল্লীর বাদশার প্রতিনিধি হয়ে গেলেন বিলেতে। তবু বাদশার অন্যায় দাবী তিনি মানেন নি।

ইংগলন্ড দেশে রাজা রামমোহন রায়ের গমন বিষয়ে এবং দিল্লীর রাজবাটীর ব্যাপার বিষয়ে দিল্লী গেজেটে কএক প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য পাঠক মহাশয়েরদের শুশ্রূষা হইবে। তাহাতে বোধ হইবে যে দিল্লীর দরবার নানা দলাদলিতে বিভক্ত আছে এবং বাদশাহের অতিপ্রিয় তৃতীয় পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত সিলিম ও প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত বাবর ইঁহারাই মোগলের সাম্রাজ্যে এইক্ষণে যাহা আছে তাহার কার্য্য চালাইতেছেন কথিত আছে যে তাঁহারা আপনারদের নিজ ব্যয়ার্থ প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করিয়া লইতেছেন অথচ সিংহাসনের প্রকৃতোত্তরাধিকারী আলি আহেদ ঐ বংশের সর্ব্বাপেক্ষা মান্য অথচ সুশিক্ষিত ব্যক্তি বহুকালাবধি পিতার নিকটে অত্যপমানিত হইয়া আছেন তিনি উক্ত সংখ্যক টাকার অর্দ্ধেকও পান না যাহা পান তাহাও কোম্পানি বাহাদুর তাঁহার প্রতি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ঐ পত্রের লেখক আরো লেখেন যে বর্ত্তমান বাদশাহের পৌত্রেরদের মধ্যে কেহ ২ মাসিক এক শত টাকার অধিক প্রাপ্ত হন না এবং বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র এবং মাতৃস্বস্রীয় ও পিতৃস্বস্রীয় ও অন্যান্য বহিরংগ কুটম্বেরা তৈমুর বংশ হইয়াও একজন মশালচির মাহিয়ানার তুল্য বেতন এবং বাদশাহের বাবুর্চিখানা হইতে কিঞ্চিৎ ২ পোলাও পাইয়া কোনরূপে কালযাপন করিতেছেন। আরো কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়কে ইংগলন্ড দেশে ওকালতী খরচা দেওনার্থ ঈদৃশ দুর্বিধ ব্যক্তিরদের উপরেও দাওয়া হইতেছে। এবং কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়ের ওকালতী খরচা বাদশাহের মাসে অন্যূন ২০০০০ টাকা লাগিতেছে। রাজাজীর ইংগলন্ড দেশে গমনের অভিপ্রায় এই যে বাদশাহের সংগে যে প্রাচীন সন্ধিপত্র আছে তন্নিয়ম প্রতিপালন করা যায়। ঐ সন্ধিপত্রে লিখিত ছিল যে দিল্লী প্রদেশে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইবে তাহা শ্রীযুত বাদশাহেরই থাকিবে। তথাপি অনেকে বোধ করেন যে রাজাজীর বহুকালাবধি ইংগলন্ড দেশে থাকনের তাৎপর্য্য এই যে বাদশাহের রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্ত্তন হইয়া ঐ উত্তরাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের না হইয়া তৃতীয় পুত্র হন কিন্তু শুনিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম যে হরকরা সম্পাদক অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায় বাদশাহের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্ত্তক ব্যাপার বিষয়ে কোন প্রকারেই প্রবর্ত্ত নহেন তদ্বিষয়ে তাঁহার স্বপ্নেও চিন্তিত হয় নাই।

(সমাচার দর্পণ। ২১ ডিসেম্বর ১৮৩৩)

মফঃসল আকবরের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে দিল্লীর শ্রীযুত রেসিডেন্ট সাহেব শ্রীযুত রাজা সোহনলালের সমভিব্যবহারে সংপ্রতি দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের নিকট উপস্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন যে ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট আপনকার বৃত্তি বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন পরে ঐ সম্বাদসূচক যে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অনুবাদ করিয়া বাদশাহকে জ্ঞাপন করিলেন।

অতএব শ্রীযুত বাদশাহের উকীলস্বরূপ শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় যে বিলায়তে গমন করিয়াছেন তাঁহার যাত্রা নিষ্ফল কহা যাইতে পারে না বরং তাহাতে বাদশাহবংশের উপকার দর্শিয়াছে।

(সমাচার দর্পণ। ১০ আগষ্ট ১৮৩৩)

২০ আগস্ত তারিখের রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্রে লেখে যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের দরবারের খরচের নিমিত্ত এইক্ষণে বৎসরে যে ১২ লক্ষ টাকা দিতেছেন তদতিরিক্ত আর ৩ লক্ষ টাকা শ্রীযুত আনরবল কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এইক্ষণেও রাজা রামমোহন রায়ের এই দাওয়া আছে যে তাঁহার বিলাতে গমনের খরচা কোম্পানি দেন।

(সমাচার দর্পণ। ১ জানুয়ারী ১৮৩৪)

অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ যখন দিল্লীর বাদশাহের দরবারে পঁহুছিল তখন দরবারস্থ তাবল্লোক একেবারে হতাশ হইলেন বিশেষতঃ শ্রীযুত যুবরাজ মির্জা সিলিং ও তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা কহিলেন যে ইঁহার উদ্যোগক্রমে আমারদের বার্ষিক যে তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সম্ভাবনা ছিল এইক্ষণে সে ভরসা গেল। কিন্তু তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় নাই যদ্যপি ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট উক্ত সংখ্যক টাকা দিতে অংগীকার করিয়া থাকেন তবে সে ব্যক্তির উদ্যোগে অংগীকৃত হইয়াছিলেন এইক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কখন অপহ্নব করিবেন না।

(সমাচার দর্পণ। ৫ মার্চ ১৮৩৪)

আমরা কোন ইউরোপীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে রাজা রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশাহের যে ৩ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বর্ত্তন বর্দ্ধন করিয়াছেন তাহাতে কোন ব্যক্তি বাদশাহকে ঐ টাকা হেয় জ্ঞান করিতে এমত কুপরামর্শ দিয়াছেন যে তিনি তাহা কদাচ লইবেন না।

(সমাচার দর্পণ। ২৫ জুন ১৮৩৪)

মুলতান নগরের বিদ্রোহিদের মধ্যে জনেক সিপাহী স্বীয় নগরে পালায়ন করিয়া তথাকার এক বৃক্ষের উপর লুক্কায়িত থাকে এবং এক বেশ্যা দ্বারা প্রতিপালিত হয়। একদা সেই বৃক্ষের নীচে দিয়া জনেক ইংরাজ একাকী গমন করেন। বৃক্ষোপরি থাকিয়া সিপাহী—চাচা মনে মনে ভাবিলেন, "এ সাহেব বেটা ত একাকী যাইতেছে, ইহার প্রাণ নষ্ট করা কর্ত্তব্য হইয়াছে," এই বলিয়া তাহার পিত্তলের ঘটী ঐ সাহেবের মস্তকে ছুড়িয়া মারিলেন। সাহেব অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। সিপাহী গাছের উপর থাকিয়া মনে করিলেন, "এ বেটার প্রাণের শেষ করা কর্ত্তব্য." ; এই বলিয়া যেমনি সিপাহী চাচা বৃক্ষ হইতে নামিয়া সাহেবকে মারিতে গেলেন এমন সময়ে ঐ সাহেবের কুকুর আসিয়া সিপাহী চাচাকে কামড় দিল তাহাতে সে ভূমিতে পড়িয়া গেল। ইত্যবসরে সাহেব চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সিপাহীকে নগরের ভিতর টানিয়া লইয়া গেলেন; তথায় সিপাহী চাচা গুলি খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

(অরুণোদয়। ১ নবেম্বর ১৮৫৮)

সিনেমায় তখন আমি পুরোদমে কাজ করছি। দু'-তিনটে ছবিতে ড্যান্স-ডাইরেক্টরের কাজ শেষ করেছি। কিন্তু আমার পরিবেশিত নাচ হিট্ করে নি। দর্শকদের তত ভাল লাগে নি। ওদের আমার ওসব নাচ এত খারাপ লেগেছে যে, পর্দায় নাচ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ আধ-পোড়া বিড়ি পর্দার উপর ছুঁড়ে দিত, কেউ বা বিড়াল-ডাক শুরু করত আর আমাকে যে কি জঘন্য গালাগাল দিত তার তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন! সর্বশেষ যে ছবিতে আমি নৃত্য-পরিচালনা করেছিলাম তাতে নেচেছিলেন এক মস্তবড় শিল্পী। ভদ্রমহিলার খুব নাম আছে নৃত্যপটিয়সী হিসেবে। তিনি অন্ধ্র এবং মাদ্রাজে বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। সিনেমায় নামার আগে তিনি ছিলেন একটি বিখ্যাত দলে। তাঁর দলে থাকা অবস্থাতেই খ্যাতিঅর্জন শুরু হয়; শুধু দেশেই নয় বিদেশেও কয়েকটি জায়গায় তিনি ঘুরে এসেছেন। নাম তাঁর মৃণালিনী।

আমার পরিচালনায় নাচার ফলে তাঁর অর্জিত খ্যাতি খুন্ন হয়েছে। যে কোন ধরনের নাচ সে নাচতে পারে। এক কথায় তাকে প্রতিভাশালিনী বলা চলে। এমন প্রতিভাময়ী নৃত্যপটিয়সীকে যখন এক দিকে সাধারণ দর্শক ও অন্য দিকে চিত্র-পরিচালকদের বিরূপ মনোভাবের সম্মুখীন হতে হল তখন স্বভাবতঃই আমি মনে অত্যন্ত দুঃখ পেলাম।

তার দোষ কতটুকু? আমি যা কম্পোজ করেছি তাই তো সে রূপ দিয়েছে। ত্রুটি যদি কারও হয়ে থাকে তবে সেটা আমারই। আমি হয়ত দর্শকদের রুচি বুঝতে পারি নি, তারা যা চায় তা তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারি নি। আমার মতে মৃণালিনীর কোন দোষ ছিল না। মূল গলদ আমার পরিচালনায়। যাই হোক, ফলে সিনেমার পরিচালকদের কাছ থেকে তার ডাক কমে গেল। আমারও।

নিঃসন্দেহে আমারই দোষে তার উন্নতির পথ রুদ্ধ হল।

ভারত-নাট্যমের প্রতি আমার অনুরাগ সুগভীর। তিরুবনন্তপুরমের কথাকলির প্রতিও আমি কম অনুরাগী নই। এই দুই রকম নৃত্যে যতখানি আনন্দ পাই কথক বা মণিপুরীতে তত পাই না। কথকে এবং বিশেষ করে মণিপুরী নাচে বিদেশীর ছায়া খুব বেশী পড়েছে।

বেচারী মৃণালিনী কিন্তু এর জন্য আমাকে কোন দিন দায়ী করে নি। উল্টে আমাকেই সান্ত্বনা দিয়ে বলত, মাস্টারমশাই, আপনি যে-নাচ দর্শকদের দেখাতে চেয়েছিলেন আমি হয়ত তা ঠিক পারিনি তার জন্য সত্যি আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এর জবাবে আমি আর কিছু বলতাম না তবে আমি তাকে যতবার দেখেছি ততবারই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

এক দিন বাড়ির কোণে পড়ে-থাকা বীণাটি তুলে নিয়ে তার তারগুলো ঠিক করছি হঠাৎ শুনতে পেলাম, 'মাস্টারমশাই'। চমকে উঠে তাকাতেই দেখি মৃণালিনী। আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল। ভাবলাম কোন ছবিতে হয়ত কাজ পেয়েছে।

—কি খবর মৃণালিনী?

—একটা ভাল আইডিয়া আমার মাথায় খেলেছে মাস্টারমশাই।

—কি সেটা?

—আমরা দুজনে মিলে একটি নৃত্যশালা খুলবো ভাবছি। ছেলে-মেয়েদের সেখানে নাচ শেখানো হবে। জনসাধারণের মধ্যে সুরুচির প্রসার যদি ঘটাতে হয় তাহলে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এ ব্যাপারে একেবারে গোড়ায় হাত না দিলে কোন দিন দর্শকদের রুচি বদলাবে না।

দেশের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি গভীরভাবে তার উপদেশ অনুধাবন করার চেষ্টা করে বললাম, ঠিক আছে মৃণালিনী, তাই করা যাক।

আমি আর মৃণালিনী নাচের স্কুল খুললাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের নৃত্যশালার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। আশপাশের চারিদিক থেকে আরও বেশি করে ছেলে-মেয়েরা শিখতে আসল। ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্য মাঝে মাঝে আমাদের উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করত। ওরা চায় এই সব ক্ল্যাসিকাল নাচের পরিবর্তে সর্বাধুনিক রক-অ্যান্ড-রল্ বা এ জাতীয় কোন সস্তা নাচ শিখতে। আমরা ওদের বোঝানোর চেষ্টা করতাম, আগে আমরা যা শেখাচ্ছি তাই শিখে নাও, নাচের অ-আ-ক-খ না শিখলে তোমরা যা চাও তা কোন দিন শিখতে পারবে না। মূলসূত্র না শিখলে কোন বিষয়েই এগোনো যায় না।

মোটের উপর অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের নৃত্যশালা শুধু খ্যাতি অর্জনই নয় অর্থোপার্জনেও সক্ষম হয়। একটা মহতী কাজ করার আনন্দ পেতাম আমি এবং মৃণালিনী।

এই সময়েই সমন্তকমণির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মেয়েটির বয়েস ষোল বছরের চেয়ে বেশি হবে না। অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর, এবং চেহারা দেখে মনে হয় বয়েস তার চেয়েও বেশি। নাচের পক্ষে সত্যি চমৎকার চেহারা। খুব হিসেব করে কথা বলত। নিগূঢ় অর্থময় হাসি। দাঁতগুলো যেন মুক্তোর মত সাজানো। সে সম্পর্কে সে সচেতন। তাই সে ঘনঘন হাসত। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে ছিল শচীন্দ্র।

শচীন্দ্র আমার বাল্যবন্ধু। আমরা মাদ্রাজে আসার আগে অন্য এক শহরে ছিলাম। আমাদের বাড়ি থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে ওদের বাড়ি। যখন-তখন আমার বাড়িতে আসতো সে। রাজনীতিও করত শুনেছি। শিল্পকলা বিষয়েও তার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। বই একটি না লিখলেও সাহিত্যানুরাগী যে সে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অত সৎ লোকের রাজনীতিতে যাওয়া উচিত কিনা—মাঝে মাঝে ভাবতাম। এই কথাটাই তাকে আমি এক দিন বলেছিলাম। জবাবে সে বলল, গরীব জনসাধারণের দুরবস্থা দেখে আমি আর চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারছি না।

—স্বীকার করছি গরীবদের সাহায্য করা উচিত। প্রত্যেকেরই করা উচিত।

কিন্তু সেইজন্যেই তো একবার বিচার করে দেখা উচিত যে, কোন কাজের মধ্যে ওদের আমরা বেশি করে সাহায্য করতে পারবো। শিল্পকলার মাধ্যমেও তো তাদের সাহায্য করা যায়। ওদের প্রতি সহানুভূতিমূলক মনোভাব থাকলেই যে-কোন কাজের মাধ্যমে সাহায্য করা যায় বলে আমার ধারণা। এবং ঐভাবেই স্বভাবতঃই খ্যাতিও বাড়ে।

—না, আমি নাম করতে চাই না।

—তুমি কি চাও আর না চাও তার অপেক্ষা তো সব কিছু রাখে না। এ সব কাজে নামলে নাম হবেই।

শচীন্দ্র কিছুক্ষণ ভেবে বলেছিল, সবচেয়ে কোন কাজ কে যে পারবে তা নির্ধারণ করাও তো সহজ নয়। বুদ্ধি-বিদ্যা থাকলেই তো আর সব হয় না। যে কোন কাজে না নামলে বুঝবো কি করে।

—তা অবশ্য ঠিক। যা মন চায় তাই করাই উচিত। কাজ করতে করতে শেষে এক জায়গায় পৌঁছানো যাবে।

আমাদের এই কথোপকথন অবশ্য দশ বছর আগের। এরপর আমি নাচ শেখার জন্যে এবং এ বিষয়ে অনেকখানি দক্ষতা অর্জনের জন্য মাদ্রাজ চলে গিয়েছিলাম। সেখানে ভারত-নাটাম শিখে তিরুবনন্তপুরমে গেলাম কথাকলি শিখতে। সেখানে আরও দু' বছর কেটে গেল। বহু নৃত্যশিক্ষকের কাছে গিয়েছি নতুন নতুন ধরণের নাচ শেখার জন্যে। আর্যাবর্তের বহু অঞ্চলে ঘুরেছি একই উদ্দেশ্যে। তারপর মাদ্রাজে ফিরে এসে সিনেমার লাইনে নামলাম। সিনেমায় নামার পর বহির্জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হল সময়ের অভাবে। এমন কি বন্ধুবান্ধবদের কাছে চিঠি লেখার অবকাশও রইল না। শচীন্দ্রকে ভুলে গিয়েছিলাম বললে অত্যুক্তি হবে না।

এত বছর পরে আবার শচীন্দ্রের সঙ্গে দেখা। সমন্তকর্মাণকে নিয়ে সোজা আমাদের নৃত্যশালায় এল। তাকে দেখেই আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। তার চেহারা একটু বদলে গেলেও আমার একটুও অচেনা ঠেকে না। দেখেই চিনলাম। সে ঘরে পা রেখেই বলল, মনে পড়ে?

—পড়বে না মানে! তোমার মুখ প্রায়ই আমার চোখের সামনে ভাসে।

দুজনে বসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলাম। ছেলেবেলার অনেক কথা মনে পড়ল। সে এখনও রাজনীতিই করছে বলে জানাল। সে যে রাজনৈতিক পার্টিতে কাজ করে সেই পার্টিই নাকি মনে করে মানুষের শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা মিটে গেলেই সব হয় না, তার জীবনে সাংস্কৃতিক উন্নতিরও অবকাশ রয়েছে, প্রয়োজন আছে। তাই আমাদের দেশে ললিতকলা পুনরুজ্জীবিত করা উচিত। দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য নাকি কয়েকটি নাটক লেখানো হয়েছে। সেগুলো মঞ্চস্থ করার জন্য একটি নাট্য-সংস্থাও স্থাপিত হয়েছে। শচীন্দ্র নাকি সেই সংস্থার সম্পাদক। সে নিজেও নাকি দুটো নাটক লিখেছে। যে-কোন ভাবে তার এই শিল্পকলার ক্ষেত্রে আগমন ঘটায় আমি খুব খুশী হয়েছি। এর জন্য আমি তাকে প্রশংসামূলক কয়েকটি কথাও বললাম।

আমাদের কথা শুনে মাঝে মাঝে মুখ টিপে টিপে হাসল সমন্তকর্মাণ। দুই বাল্যবন্ধুতে এতদিন পরে দেখা তাই আমরা স্থানকালপাত্র ও পরিবেশ ভুলে হৈ-হৈ করে কথা বলছিলাম। প্রাণের অফুরন্ত আনন্দ প্রকাশ করছিলাম। আমাদের কথা ফুরিয়ে যাবার পর শচীন্দ্র সমন্তকর্মাণকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

—আমি যে নাটকগুলো লিখেছি তার নায়িকার ভূমিকায় সমন্তকর্মাণ চমৎকার অভিনয় করেছে, এখন নাচ শেখার জন্যেই তোমার কাছে আসা।

—ভালই করেছ। আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাকে দেখছিলাম। তরুণী নাচের উপযুক্ত হবে কিনা সেইটেই একটু বোঝার চেষ্টা করছিলাম।

মনে হল সমন্তকর্মাণ সত্যিই চমৎকার নাচ দেখাতে পারবে একদিন। মুখমণ্ডলে লালিত্য রয়েছে। উজ্জ্বল পটলচেরা চোখ। কোমরটাও সরু। এমনকি হাতের আঙুলগুলোও যেন ভাগ্যবতী নৃত্যপটিয়সীর। সামগ্রিকভাবে তার চেহারাটা নিঃসন্দেহে নাচের উপযোগী। কয়েক মুহূর্ত তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে বললাম, নিশ্চয়ই শেখাবো।

—কাছেই একটা বাসা নিয়েছি। ঐ ঘরেই থাকবে। সময়মত নাচ শিখতে আসবে। শচীন্দ্র বলল।

—ঠিক আছে।

—তোমার স্কুলে যা মাইনে তা আমি প্রত্যেক মাসে এসে দিয়ে যাব।

—টাকার জন্য অত ভাবনা নেই। তোমার যখন সুবিধা হবে দিয়ে যেও।

পরক্ষণেই আমি মৃণালিনীকে ডেকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যায় মৃণালিনী এবং সমন্তকর্মাণ দুজনে সিনেমা দেখতে গেল। আমরা সময় কাটানোর জন্য বীচে গেলাম।

ট্রিপ্লিকেন-বীচে যাওয়ার অভ্যেস আমার নেই। প্রচণ্ড ভিড় হয়। আমার কাছে মনে হয় জায়গাটা যেন স্টেশন। নির্জন নিঃশব্দ সমুদ্রসৈকতে বেড়ানোর ইচ্ছেই আমার প্রবল। বালিয়াড়ির উপর বসে সমুদ্রের ঢেউ দেখতে এবং তার মিষ্টি আওয়াজ শুনতে ভাল লাগে। মাঝে মাঝে আমি একা এসে বালিয়াড়ির উপর বসে সমুদ্রের সঙ্গে যেন সুখ-দুঃখের কথা বলি। দু'-চার দিন মৃণালিনী যে আমার সঙ্গে আসেনি তা নয়। তাই ইলিয়ট-বীচের সঙ্গে বহুদিন আগেই আমার সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সেদিন শচীন্দ্রকে সেই বীচেই নিয়ে গিয়ে বালিয়াড়ির উপর বসালাম। আমার ইচ্ছা জাগল সমন্তকর্মাণ সম্পর্কে আরও বেশি কিছু জানার। কিন্তু দু-চার কথার পরেই বুঝলাম তার সম্পর্কে শচীন্দ্র বেশি কিছু বলতে চায় না। দু-একটি কথা বলেই এড়িয়ে যাচ্ছে। শেষে বললাম, সে কি তোমার বান্ধবী?

—কে? সে এমনভাবে বলল যেন
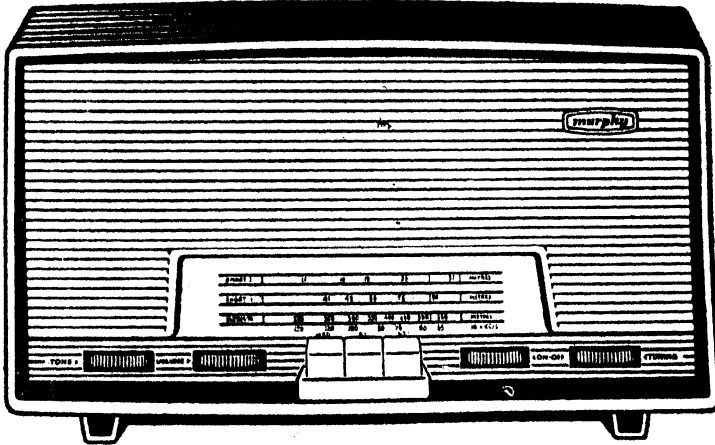
আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

—সমতকর্মাণির কথা বলছি।

—এক হিসেবে আমরা পরস্পরের বন্ধু বলতে পার।

—কোন্ হিসেবে?

—ওর স্বামী আমার বন্ধু। বন্ধু মানে সাধারণ বন্ধু আর কি।

—ওর বিয়ে হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। শচীন্দ্র এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করল যেন সে এ-ব্যাপারে আর কিছু বলতে নারাজ। আমিও কিছুক্ষণ সমুদ্রের গর্জন শুনলাম, ঢেউগুলো দেখলাম। শচীন্দ্রও তাই করছে। সেই পরিবেশ সেই মুহূর্তে আমার কাছে খুব ভাল লাগল। অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে শচীন্দ্র বলল, ভাবছি তোমাকে সবকথা বলে ফেলাই ভাল। কি বল?

—আমি আর কি বলব, তোমার যদি ইচ্ছে জাগে বল।

সে বলতে শুরু করল : সমন্তকর্মাণির স্বামী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, কবিরাজ। বয়স অল্পই। ছেলেমানুষ বলতে পার। সমন্তকর্মাণি বলতে সেও অজ্ঞান। কিন্তু লাভ কি! কি করে যে তাকে সুখী করতে হবে তা সে জানে না। সবসময় ঘরে বসে থাকতে বলে। ঘরকান্নার মধ্যেই তার জীবন আবদ্ধ রাখতে চায়। বাইরের সব কাজ সে নিজেই করতে চায়। এটা আবার সমন্তকর্মাণির পছন্দ নয়। পছন্দ হবেই বা কেন। দেখলে তো ওকে, দেখেই তো বোঝা যায় স্বাতন্ত্র্যবোধ তার প্রবল। ক্ষমতাও রাখে। সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে ও নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চায়। এসব কারণেই স্বামীর এই ব্যবহার সহ্য করতে পারল না। আমি তখন পার্টির পক্ষ থেকে নাটক প্রদর্শন করছি। একদিন সে ঘর ছেড়ে সোজা আমার কাছে নাটকে একটি পার্ট করার প্রস্তাব করে। তার আগ্রহ দেখে আমি গররাজি হতে পারিনি। তখন আমি জানতাম না সে কে। সে শুধু আমাকে বলেছিল তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা। নাটকে পার্ট করার অনুমতি নাকি তার স্বামী দিয়েছে। আমি খুশীমনে রাজি হলাম। তখন থেকে আমার নাটকে সে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছে। আমাদের পার্টির সভ্যাও সে হয়েছে। মেয়েটি খুব প্রতিভাময়ী। যা একবার ধরবে, সোনা করে ছাড়বে। কোন কিছু শেখার ব্যাপারে আগ্রহ তার সুগভীর। যত কঠিন চরিত্রেই তাকে নামাও, সে ঠিক অনবদ্য অভিনয় করে যাবে। আর চারজনার মত পরিচালক যা বলে, নাক-কান বুজে তাই করে যায় না। নাট্য-চরিত্রটা ঐ চরিত্রের মাধ্যমে কি বলতে চান, কি করাতে চান, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করে। এত স্বাভাবিক অভিনয় করে যে নাটক দেখতে দেখতে দর্শকরা ভুলেই যায় যে তারা নাটক দেখছে। সত্যি কথা বলতে কি তার কাছ থেকে প্রভাবিত হয়ে আমার নাট্য-সংস্থার অন্যান্য শিল্পীরাও নিজেদের চরিত্র জীবন্ত করে তোলে অভিনয়ের মাধ্যমে।......এখন আবার পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংস্কৃতিক এসব কাজকর্ম কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখতে হচ্ছে। ভেবেছিলাম আমি নিজেই টাকা-পয়সা ঢেলে চালিয়ে যাব। কিন্তু তুমি তো জান আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে আমি চির-কালই এক। উপরন্তু ভেবে দেখলাম যে, সমন্তকর্মাণির মত প্রভাবশালিনী শিল্পীকে শুধু নাটকের মধ্যে আবদ্ধ রাখা উচিত হবে না। আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে সমাজের উচিত তাকে ব্যবহার করা, তাই আজ তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।......

শচীন্দ্রের বক্তব্য কান পেতে শুনে বললাম, আর ওর স্বামীর কি উদ্দেশ্য?

—এসব করতে ওর স্বামী হয়ত রাজি হবে না। আমাদের নাট্য-সংস্থাতে কাজকরাকালীন সে এসে মাঝে মাঝে দেখা করে যেত আমার সঙ্গে। আমার প্রতি লোকটি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব দেখে-শুনে বলত, সংসারী লোক আমরা, আমাদের কি মশায় এসব ঝামেলা পোষায়! এদিকে সমন্তকর্মাণি আবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ : স্বামী অনুমতি দিক আর না দিক, সে যা করছে তাই করে যাবে। এবং তার ইচ্ছাপূরণের জন্য সে আমার সাহায্যও চেয়েছে। আমি এক বিশেষ মুহূর্তে কথা দিয়েছিলাম যে, যত বিপদই আসুক আমি মোকাবিলা করব। আমাদের সমাজে এই ধরনের মেয়েদের যে কি দুর্ভোগ ভুগতে হয়, তা তো সবাই জানে। কিন্তু তাই বলে একজনকে এগিয়ে আসতেই হবে। তাই ভাবলাম, সে-পাত্রটি আমিই হই। তাই ও যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে আমাকেই তার পাশে দাঁড়াতে হবে সবরকম সাহায্য করতে।

—হঠাৎ একদিন যদি তার স্বামী এসে ডাক দেয় সংসার করার জন্যে তখন কি হবে? আমার সন্দেহজনক প্রশ্ন উত্থাপন করলাম।

—সমন্তকর্মাণি আবার বিচ্ছেদের জন্যে দরখাস্ত করবে ভাবছে।

শচীন্দ্রের বিষয় আমি জানি। কোন-কোন ব্যাপারে সে যে স্বতঃস্ফূর্ত তাই নয়। লেগে থাকতেও পারে। একবার যে প্রতিশ্রুতি দেবে তা রক্ষা করবেই। অন্তর্বর্তীকালে অন্য কিছু আর ভাবে না। প্রয়োজন হলে তার জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতেও সে কার্পণ্য বোধ করে না।...... ঘরছাড়া এক বিবাহিত মহিলাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসা চারটিখানি কথা নয়। এ সমস্যা তো একদিনের নয়, অন্ততঃ স্বামী যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এ-সমস্যাও থাকবে। এই ধরনের মহিলাকে নৃত্যশালায় প্রবেশাধিকার

লে কোন অঘটন ঘটতে পারে এই শঙ্কা মনে জেগে ওঠায় আমি বললাম, -কোন ভাবে তার স্বামীকে রাজি রাতে পার না শচীন্দ্র?

—দেখা যাক।

সমুদ্রের উপর থেকে ঠান্ডা বাতাস াসছে। ঢেউগুলো বালিয়াড়ির উপর াছড়ে পড়ছে। আলো-আঁধারি আলোয় উয়ের ফেনা চিক্ চিক্ করছে। াকাশেও হালকা কয়েক টুকরো মেঘের ানাগোনা। বেশ বুঝলাম শচীন্দ্র বিষয়-কে গভীরভাবে চিন্তা করছে। হঠাৎ ক সময় বলে উঠল, ওকে নাচ শেখানোর াপারে কিন্তু তোমাকে বিশেষভাবে নোযোগ দিতে হবে।

—কথা দিচ্ছি, তা করবো। তুমি যখন ার উন্নতির জন্যই তাকে এনেছ, আমিও খন নিশ্চয়ই আমার যথাসাধ্য চেষ্টা রব।

—কি ব্যাপার জান—সে শুধু ামাদের দেশেই নয়, আমার মন বলছে মন্তকর্মাণ একদিন সারা বিশ্বে ভারতের াম উজ্জ্বল করবে। এ-ব্যাপারে আমার কান সন্দেহ নেই।

—আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না।

—শুধু চেষ্টার কথা বললে হবে না! য়োজন হলে রাত-দিন খেটে যতরকমের াচ আছে সব তাকে শিখিয়ে দিতে হবে। । তাকে সাহায্য নয়, মনে করবে ামাকেই প্রত্যক্ষ সাহায্য করছ।

শচীন্দ্রের এই শেষের কথাটি ঠিক ুঝতে না পেরে ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল রে তাকিয়ে রইলাম। সেও বলে গেল, দিন না ওর নিজের পায়ে দাঁড়াতে ারছে ততদিনই আমার দায়-দায়িত্ব াকছে, তারপর সে নিজের পথ নিজে দখে নেবে। দেখে নিতেও পারবে। সেই-ন্যই বলছি যত তাড়াতাড়ি পার শিখিয়ে াও। এর জন্য আমি সত্যিই তোমার াছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো। আমার তিজ্ঞা রক্ষার ক্ষেত্রে তোমার এ-উপকার কানদিন ভুলব না। সত্যি কথা বলতে কি, ার মত প্রতিভাময়ীকে সাহায্য করতে পরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আর এও দশের দুর্ভাগ্য যে, সমন্তকর্মাণর মত ক্ষমতাসম্পন্না প্রতিভাময়ী নারীকে এত ষ্ট পেতে হচ্ছে নিজেকে মহতী সামা-জিক কাজে লাগানোর জন্যে।

শচীন্দ্রের কথা শুনে বুঝলাম যে ত মহতী হোক না কেন, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। তবু আমার বন্ধু খন এতখানি এগিয়ে এসেছে তখন আমার পেছিয়ে পড়া উচিত নয় ভেবে তাকে নাচ-শেখানোর ভার নিয়ে স্বীকৃতি দিলাম। কথায়-কথায় হঠাৎ বললাম, বয়স তোমার যাই হোক শচীন্দ্র, মনের দিক থেকে তুমি সেই নিষ্পাপ ছেলেমানুষই রয়ে গেছো।
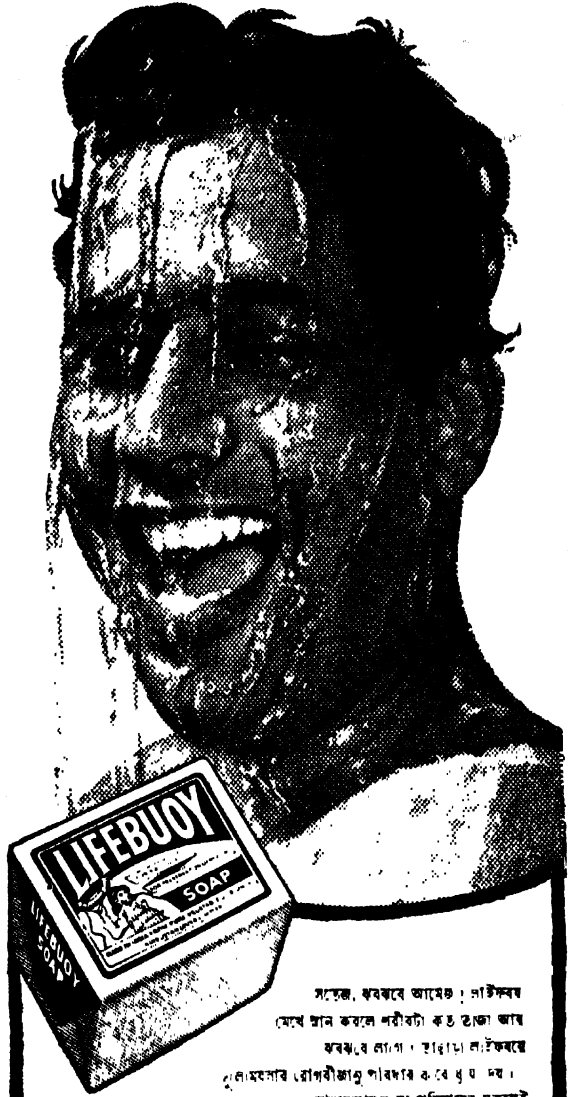
সে চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, ছেলেবেলায় দেখেছি অনেক ঝামেলায় তুমি নাক গলাতে, বহু-বার আবর্জনায় পা রেখেছো তুমি, কিন্তু তবু তার মালিন্য তোমাকে ছুঁতে পারেনি।

—যাক, তুমি তাহলে আমার কাজকে কদর্থ কিছু করনি। খুশী হলাম।

—না, কিছুতেই তা করতে পারি না।

বন্ধুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল সে, আমাদের সম্পর্কে কদর্থ করবে না ভেবেই আমি তোমার কাছে নিয়ে এসেছি মেয়েটাকে। তোমাকেই ভার দিচ্ছি, ওকে তুলে ধরার ভার তুমি যদি কিছুটা নাও তাহলে আমি অনেক-খানি শান্তি পাবো।

আমি মনোযোগ সহকারে সমন্তক-মণিকে নাচ শেখাতে শুরু করলাম, সে আলাদা একটা ঘর নিয়ে থাকত। দিনে দুবার আসত নাচ শিখতে—সকাল আটটায়, সন্ধ্যা পাঁচটায়। শচীন্দ্র তার সম্পর্কে যা বলল অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সত্যি সে প্রতিভাময়ী। যা শেখানো হয় তা নিখুঁতভাবে নাচের প্রতিটি ভঙ্গিমায় জীবন্ত রূপ দেয়। তার ন্যাক দেখে মৃণালিনীও আশ্চর্যান্বিত হত। নৃত্য-শালা খোলার গোড়ার দিকে এমন একটি ছাত্রীকে পেয়ে আমিও গর্ববোধ করে-ছিলাম। আমার সমস্ত শক্তি ও একাগ্রতা দিয়ে আমি তাকে নাচ শেখাতে লাগলাম।

কিন্তু দিনকয়েক পরে বুঝলাম তার মন নাচে তেমন বসছে না। নাচ শিখতে এসে আধঘণ্টা কাটিয়ে দিত গল্প করে। হেন বিষয় নেই যে সম্পর্কে সে প্রশ্ন করে না। মাঝে মাঝে মৃণালিনী সম্পর্কেও প্রশ্ন করত। মৃণালিনী সম্পর্কে তার প্রবল কৌতূহল লক্ষ্য করে আমি মনে মনে একটু বিরক্তি বোধ করতাম। হঠাৎ একদিন সে বলল, এই স্কুলে তার স্থান কি ধরনের?

—আমার যে ধরনের, তারও তাই।

—চমৎকার নাচতে পারে! আমার মনোভাব জানার জন্য সে প্রশ্ন করল।

—অদ্ভুত নাচতে পারে! অমন সুন্দর নাচিয়ে আমি জীবনে কখনো দেখিনি।

—বারে, আমিও তো তাই বলছি—চমৎকার নাচে!

—আমিও বোধহয় সেই কথাই বলছি, তাই না?

—অত জোর দিয়ে বলার কি আছে! আমি কি কথার অর্থ বুঝি না!

বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে ঢোকার ইচ্ছা না থাকায় আমি একেবারে চুপ করে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, আপনার চেয়েও ভাল নাচে?

—হ্যাঁ।

—আমিও তাই ভেবেছি।

—তুমি যা ভেবেছো তাই ঠিক।

—চেহারাও তার ভাল, দেখতেও সুন্দর।

—সত্যি সুন্দরী।

—আমার কাছে তো খুবই সুন্দরী বলে মনে হয়।

এ-বিষয়ে আর কোন কথা বলতে আমার ইচ্ছে করল না। চুপ করে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার সে বলল, গুম মেয়ে বসে আছেন কেন, কথা বললে কি মুক্ত ঝরে যাবে?

—তুমি তো দেখছো আমি আর কি মন্তব্য করবো।

—যে যাই বলুক, আমার কাছে কিন্তু খুব সুন্দরী বলে মনে হয়।

—তাহলে আর কি! আমাকে প্রশ্ন করা নিষ্প্রয়োজন।

—আপনার মতটা একটু জানার চেষ্টা করলাম আর কি।

ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে নানা প্রশ্ন করে শেষে আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে ছাড়ল যে মৃণালিনী সুন্দরী। এবং পরক্ষণেই বলল, আমিই যা কি তাকে সুন্দরী নয় বলেছি!

"আপনার মতটা একটু জানার চেষ্টা করলাম আর কি।"

অনেকদিন কেটে গেল। মাঝে-মাঝে এই ধরনের তর্কাতর্কি হত। এমন সুক্ষ্ম-ভাবে এক-একটা বিষয়ের অবতারণা করত যে তর্কে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার পর টের পেতাম। এবং মনে হত এ-বিষয়ে আমার নিশ্চুপ থাকাই উচিত ছিল। নাচের ব্যাপারেও গোড়ার দিকে যা ছিল এখন তার বিপরীত। কিছুদিন

আগে যে-নাচ শিখিয়েছি তা নাচতে বললে বলে, আর একবার দেখিয়ে দিন তো মাস্টারমশাই। একেবারে ভুলে গেছি। বিরক্তি ভাব না দেখিয়ে দেখাতাম। সে বলত, কি চমৎকার নাচতে পারেন। আপনার নাচার সময় হাঁ-করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতে ইচ্ছে করে। এই ধরনের প্রশংসাসূচক দু-একটি কথার জের টেনে গল্প জুড়ে দেয় কিন্তু নাচ আর শেখে না। শুধু তাই নয়, দিনকয়েক পরে সময়-মত আসে না, যাওয়ারও কোন সময় ঠিক নেই। এসব আমার ভাল লাগত না। অযথা কামাইও করত। দু-একটি উপ-দেশমূলক কথা শুনিয়েছিলাম, কিন্তু কাজ হয়নি।

একদিন এ-সমস্যা সম্পর্কে মৃণালিনীর সঙ্গে আলোচনা করলাম। মৃণালিনী মুখ টিপে শুধু হাসল।

—সে কি? শুধু হেসেই চুপ করে গেলে—আমার প্রশ্নের জবাব দাও?

—ও-মেয়েটা ঠিক নাচ শিখতে চায় না মাস্টারমশাই।

—তাহলে আর এখানে এসেছে কেন?

—ইচ্ছে জেগেছে, মজা করার জন্য এসেছে।

মৃণালিনীর কথার চেয়েও হাসিটা মারাত্মক। ওর হাসি দেখে আমার মনে হল সমন্তকর্মাণ সম্বন্ধে আমি যা জানি সে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে। কোন একটি বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে ধৈর্য ধরার সামর্থ্য তার আছে। তার এ-গুণে সম্পর্কে আমি ওয়াকেফহাল। সমন্তকর্মাণ সম্বন্ধে সে যা জানে তা আমাকে জানানোর জন্য পীড়াপীড়ি করলাম। সে বলল, কি জানি কেন মাষ্টারমশাই, মেয়েটি কোন ব্যাপারে মন বসাতে পারে না।

—কি করে বুঝলে মৃণালিনী?

—আপনার বন্ধু শচীন্দ্র তো এখানে আমাদের হাতে ভার দিয়ে চলে গেছেন। আর এদিকে মেয়েটি পরের দিন থেকেই সারারাজ্যের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিনেমা হলে ওকে চেনে না এমন লোক নেই, প্রত্যেকদিন ওর ঘরে কেউ না কেউ যাতায়াত করেই। প্রায় প্রত্যেকদিন নতুন নতুন লোকের সঙ্গে বাঁচে যায়, সিনেমা দেখে।

তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। স্বগতোক্তির মত আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল : তার মানে? আর কোন প্রশ্ন মৃণালিনীকে করতে পারলাম না। সেও আর কোন কথা বলল না। থ বনে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। এসব ব্যাপার আমি পছন্দ করি না। মহিলাদের প্রতি সাধারণ ভক্তিশ্রদ্ধা আমার আছে। কোন মহিলা যখন খারাপ পথে পা বাড়ায়, আমার বিরক্তি এবং রাগের সীমা থাকে না। সমন্তকর্মাণর কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল শচীন্দ্রকে। সেই তো চায় একে জগৎসভায় তুলে ধরতে। কিন্তু সে যদি জানতে পারে এ-সব, তাহলে কি সহ্য করতে পারবে? প্রতিভাবানদের এই-ই দোষ। বিভিন্ন খাতে নিজেকে ছড়িয়ে ফেলে। কেন্দ্রীভূত করে কেবল একটি বিষয়ে নিবন্ধ করতে পারে না। আরও অনেক বিষয় ভাবছি। হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল মৃণালিনী, আচ্ছা শচীনবাবুর কি বিয়ে হয়ে গেছে?

—বাচ্চা বয়সেই। দশ বছর আগেই ও দু'-তিনটে ছেলেমেয়ের বাবা। এখন কম করে ছ'টি ছেলেমেয়ের বাপ তো হবেই।

—ভদ্রলোকের স্ত্রীকে দেখার সুযোগ পেলে ভাল হত।

—ওর বউকে আমি দেখেছি। বউকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে দু'বার এসেছে শচীন্দ্র। খুব শান্ত, সুন্দরীও। স্বামী কোন ভুল-চুক করলে তা ঠান্ডা মাথায় সংশোধন করানোর ধৈর্য তার আছে।

—অমন সুন্দর বউ আর অতগুলো ছেলেমেয়ে থাকতেও যে লোক এ বিষয়ে আগ্রহ দেখায় তাকে নিশ্চয়ই একটা সংযমী লোক বলা যায় না। অপরপক্ষে এ মেয়েটিরও তো কোন ছেলেমেয়ে নেই। চালচলনও তেমন ভাল নয়। তাই ভাবছি ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

আমি চমকে উঠে মৃণালিনীর কথার তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করছিলাম। সেও নিজের মনের কথা ঢাকার জন্য কোন চেষ্টা করেনি।

—তুমি ভুল করছ মৃণালিনী। সমন্তকর্মাণ যে ধরনের মেয়েই হোক না কেন শচীন্দ্রকে আমি চিনি। তার মনে কোন পাপ নেই। হঠাৎ এক সময়

সে যা প্রতিজ্ঞা করেছে তাই কার্যকরী করার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি নেই।

মৃণালিনী কোন জবাব দিল না। অন্য কোন কাজে মনোনিবেশের ভান করল। ওর মৌন ভাব দেখে বুঝলাম যে, আমার কথা সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারে নি।

—কে যেন আপনার খোঁজ করছে মাস্টারমশাই। মৃণালিনী বলল। আমি তখন নাচ শেখাচ্ছি। দশ-বারজন আমাকে ঘিরে নাচ শিখছে।

—তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুণি আসছি।

মৃণালিনী বলল, লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে এসেছেন। ট্রেন থেকে নেমে সোজা এখানেই এসেছেন মনে হচ্ছে।

—তাহলে তো এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত নয়...তোমরা চুপচাপ বসো, গোলমাল কর না...আমি আসছি।

বারান্দায় চেয়ারে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। খদ্দরের জামা, খদ্দরের ধুতি। জরি পাড়ের একটি চাদর গলায় জড়ানো। হাতে একটি কাপড়ের ব্যাগ। মনে হচ্ছে তার ভেতর এক জোড়া ধুতি রয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেখে মনে হল মৃণালিনীর কথাই ঠিক—অনেক দূরের যাত্রী। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন, নমস্কার।

—বসুন, নমস্কার।

—আমাকে এর আগে হয়তো আপনি কোন দিন দেখেন নি। আমার নাম রামনাথম। আমি সমন্তকর্মণির স্বামী।

আমি থ বনে গেলাম। প্রথম কারণ সমন্তকর্মণির স্বামী এভাবে আসবে আমার কাছে তা কোনদিন কল্পনা করতে পারি নি। আর দ্বিতীয় কারণ হল লোকটার চেহারা সম্পর্কে আমার যা কল্পনা ছিল এ দেখছি তা নয়। শচীন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী আমি ভেবেছিলাম সমন্তকর্মণির স্বামীর কপালে বিভূতি আর কুমকুমের বড় টিপ থাকবে। আর চারজন কবিরাজকে যে রকম দেখতে এর পোশাক-আসাকেও তারই ছাপ থাকবে। অন্ততঃ একটি টিকি থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাও নেই।

ভ্রমণের ফলে কাপড়-জামা একটু ময়লা হয়েছে।

—আপনি সহৃদয় ব্যক্তি শুনেছি। সমন্তকর্মণির ঘরে যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য এসেছি।

—ঠিক আছে। আপনি এখন স্নান করে নিন পরে ধীরে-সুস্থে—

—সমন্তকর্মণির ঘরে যাচ্ছি তো—ওখানেই করব'খন। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—যাক অন্তত কফিটা—

—আসার পথেই খেয়ে নিয়েছি। আমার জন্য আপনাকে কোন কষ্ট করতে হবে না।

ততক্ষণে মৃণালিনী এল। পরিচয় করিয়ে দিলাম, রামনাথমের সঙ্গে। ভদ্রলোকই সমন্তকর্মণির স্বামী জেনে মৃণালিনী অবাক হল। ওখানেই একটি চেয়ারে বসে পড়ল। রামনাথম তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপাদ-মস্তক দেখল।

—শুনেছি শচীন্দ্র আপনার বন্ধু।

—হ্যাঁ, বাল্যবন্ধু।

—আপনাকে আমি কয়েকটি বিষয় জানাবো। সমস্ত ব্যাপার শুনে আপনার যদি কোন পরামর্শ দেওয়ার থাকে তো বন্ধু হিসেবে তা দেবেন।

—ঠিক আছে, বলুন।

—সমন্তকর্মণি এক অনাথ বালিকা। বাবা-মা যে কে তা জানি না। আমাদের বাড়ির পাশে এক সাব-ইন্সপেক্টর ছিল। তার কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। বউয়ের কথায় খুব অল্পবয়সে সমন্তকর্মণিকে অনাথ-আশ্রম থেকে নিয়ে এসে ও'রা বাড়িতে রাখেন। কিন্তু তাকে আনার মাস-খানেকের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী

মারা যান। তারপর ভদ্রলোক আর একটা বিয়ে করেন। দ্বিতীয় বউ সমন্তকমণিকে ভালভাবে দেখাশোনা করতেন। কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যে তাঁর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে হওয়ায় স্বভাবতই সমন্তকমণির উপর নজর রাখতে পারলেন না। মেয়েটা টই-টই করে যার-তার সঙ্গে সারাদিন ঘুরে বেড়াত। বারণ করলে শুনত না। মাঝে মাঝে সাব-ইন্সপেক্টর মশায় মারধোরও করতেন। মারার সময় কাঁদত। পাশের বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ আমরা শুনতে পেতাম। ওর কান্না শুনে আমরা দুঃখ পেতাম। কিন্তু পরক্ষণেই সে যথাপূর্বং নিজের খেয়ালখুশিমত কাজ করত। কিছুক্ষণ আগে যে সে মার খেয়েছে তা তার মনেই থাকত না। আবার মার খেত। আবার কাঁদত। পরক্ষণেই ভুলে যেত আর এমন ভাব দেখাত যেন তার কিছুই হয়নি। বিচিত্র এক স্বভাব তার। ইতিমধ্যেই অবশ্য আপনি নিশ্চয়ই কিছু টের পেয়েছেন। এমনি বাইরের দিক থেকে মনে হয় যেন মেয়েটি খুব অমায়িক খুব ভাল মেয়ে এবং আমারও সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যে কাজ দোষের মনে করি তার দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। অনেক সময় বহু সামাজিক দুষ্কর্ম সম্পর্কে তার ধারণা একেবারে উল্টো। আর সেক্স-বিষয়ে আলোচনা করতে এবং শুনতে সে এত ভালবাসে যে তা বলার নয়। মাঝে মাঝে সে এত অন্যমনস্ক থাকে যে দেখে অবাক হতে হয়। মনে হয় যেন বিরাট একটা বিষয়ে চিন্তা করছে। আর একবার সে যা করতে চাইবে, যে যাই মনে করুক সে তা করবেই। কোন বাধাই আটকাতে পারবে না তাকে। এ সব কিছু সহ্য করার শক্তি সকলের থাকে না। সহ্য করলেও কতদিন আর সহ্য করবে। আপন মা-বাবাই হয়ত পারত না। আর এতো পালিতা। আর পুলিস-সাবইনস্পেক্টরদের মেজাজ সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। ...তার উপর সে আরও একটা সাংঘাতিক কাজ করে বসল। কোন এক ছোঁড়ার সঙ্গে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। পুরো দুটি মাস বেড়িয়ে এল। ছোঁড়াটা হঠাৎ তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। আবার সে ঘুরে এল বাড়িতে। কি রকম এলো জানেন—কেউ দেখলে মনে করবে সিনেমা দেখে অথবা বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ঘুরে এসেছে। খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে এসে গেল। ইতিমধ্যে সাব-ইনস্পেকটরকে তো কম টিটকারী শুনতে হয়নি। তাকে দেখেই ভদ্রলোক অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। গর্জে উঠে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় গিয়েছিলে? ..... আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন,—সমন্তকমণি ধীরেসুস্থে বসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই দু মাসে যা যা ঘটল সব বর্ণনা করল। একটুও সঙ্কোচ নেই, ভয় নেই, দ্বিধা নেই। আর এদিকে সাব-ইনস্পেকটরের রাগ ক্রমশঃ বাড়ছে। ভদ্রলোকের তখন এমন অবস্থা যে সে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। তারপর হঠাৎ এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ে নিদারুণভাবে প্রহার করে বাড়ি থেকে বের করে দেন।......আমার মা তখন বেঁচেছিল। আমার মায়ের মত দয়ালু মা খুব কমই আছে। মেয়েটাকে ইসারায় ডেকে ঘরে বসিয়ে সমস্ত শুনে আমাকে বলল, খোকা এই মেয়েটার ভার তোকে নিতে হবে।......আমার মায়ের কথার বিরোধিতা আমি কোনদিন করিনি। সেদিনও না। দিন কয়েকের মধ্যেই সমন্তকমণির সঙ্গে আমার বিয়ে হল। সে আমাকে ভালবেসেছে কিনা আজও আমি জানি না। তবে আমি সত্যি তাকে ভালবেসেছি। আর ভাল না বাসলেও মায়ের নির্দেশমত তাকে সারাজীবন দেখাশুনা করতাম।......শিল্পকলার বিষয়ে তার ভীষণ ন্যাক আছে। আমাকে বিয়ে করার

পরও সে মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে নাচগান দেখতে চলে যেত। বলতে গেলে তার কথামতই আমি চলতাম। ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে তার সংগে শচীন্দ্রের পরিচয় হল।...ঘরের বউয়ের নাটকে নামা উচিত নয়, তাদের কোন স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়, তাদের সব সময় রান্নাঘরে আবদ্ধ থাকা উচিত —এ-সব আমি বিশ্বাস করি না, পছন্দও করি না। সমন্তকর্মাণ নাটকে নামতে চাইল। আমি বারণ করিনি। চোখের সামনে দেখলাম শচীন্দ্র তাকে সামাজিক নাটকে নামাচ্ছে। আমি বাধা দিইনি। এমন কি নিজেও তার অভিনীত নাটক বারকয়েক দেখেছি। কদিন পরেও সমন্তকর্মাণ আবার আগের মত খেয়ালী হতে লাগল। এর মূলে কারণ কিন্তু শচীন্দ্র। শচীন্দ্র অনেক বিষয় তাকে জানাত। ফ্রয়েডের তত্ত্বও জানিয়েছিল। সবকিছুর মূলে নাকি সেক্স। মা নাকি ছেলেকে ভালবাসে, আর বাবা মেয়েকে, দাদা বোনকে, দিদি ছোটভাইকে যে স্নেহ করে, ভালবাসে এ সবকিছুর মূলে সেক্স—এসব কথা শচীন্দ্র শেখাত। এরপরেই সমন্তকর্মাণ আরও বেশী খেয়ালী হতে লাগল। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল যে সে এতদিন যা করে এসেছে তাই ঠিক।......বুঝলাম, ঐ অবস্থায় তাকে বারণ করে কিছু লাভ হবে না। চোখের সামনে সব কিছু দেখেও চুপ করে রইলাম। স্পষ্ট দেখছি নিজের হাতে সে কবর খুঁড়ছে। তবু বাধা দিতে পারিনি। শুধু পরলোকগতা মায়ের কথা স্মরণ করে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলতাম। আমি আর কি করতে পারি।......

রামনাথমের কন্ঠস্বর ভারি হয়ে এল। এদিকে মৃণালিনীর চোখেও দেখি জল। রামনাথম আবার শুরু করল, এখন ওরা দুজন এখানে এসেছে। নাটকে নামিয়েও শচীন্দ্রের মন ওঠেনি। এখন সে আবার নাচ শিখিয়ে তাকে সিনেমায় নামাতে চায়। সারা পৃথিবীতে নাকি সমন্তকর্মাণর নাম ছড়িয়ে যাবে। এমন কি আমাকে বলে আসারও প্রয়োজন বোধ করেনি। আমাকে না-বলেই একেবারে হঠাৎ চলে এসেছে। খোঁজখবর পেয়ে ভাবলাম সমন্তকর্মাণর সংগে দুচারকথা বলা আমার কর্তব্য।... ...এখন আপনিই বলুন, আমি কি ভুল করছি?

—আমাকে সহৃদয় ভেবে আপনি যে বন্ধুর মত আমাকে খুলে সবকিছু বলেছেন এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। সমন্তকর্মাণকে তুলে ধরাই শচীন্দ্রের মূলে লক্ষ্য। তার মনে কোন পাপ নেই। কোন স্বার্থ নেই। ওর সংগে আমি অনেকক্ষণ বসে কথা বলেছি। মনেপ্রাণে সে চেষ্টা করছে সমন্তকর্মাণর প্রতিভাকে লোকের সামনে তুলে ধরতে।

—এখন পর্যন্ত আমিও তাই মনে করছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এই অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। সমন্তকর্মাণ থাকতে দেবে না। তখন সমস্যাটা অতি জটিল হয়ে যাবে। সেই অবস্থায় সমন্তকর্মাণ যে কী হয়ে যাবে আমি অনুমান করতে পারছি না। অনুমান করতে আমার ভয় করছে।.....যাক আপনার কাছে যদি সে নাচ শিখতে চায়, আন্তরিকতার সংগে শেখাবেন—এইটেই আমার অনুরোধ। উপরন্তু ওর যদি কিছু প্রয়োজন হয় আমি তা মেটাতে রাজি আছি।......আচ্ছা নমস্কার, এখন আসি। আজ সমন্তকর্মাণর ঘরেই থাকব। কাল ভোরেই চলে যাব। আবার আপনাদের সংগে দেখা হবে কিনা জানি না। আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ তার উপর নজর রাখবেন। ......নমস্কার।

আমি একভাবে বসে রইলাম। মৃণালিনী কাঁদছে।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্তরূপ : **বোম্মানা বিশ্বনাথন**

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রগতিশীল শারদ-সংকলন

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে

বিশেষ আকর্ষণ

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

...র জেরা ॥ মিহির সেন

মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয় ও তীব্র জীবন-যন্ত্রণার বাস্তবনিষ্ঠ রূপায়ণ।

মার্কসীয় দর্শনের সংকট

আলোচনা-চক্র

ভবানী সেন। ত্রিদিব চৌধুরী। পান্নালাল দাশগুপ্ত। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

উল্লেখযোগ্য রচনা

প্রবন্ধ: অধ্যাপক সুশোভন সরকার। অশোক রুদ্র। চিন্মোহন সেহানবীশ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদ্যোৎ গুহ। ভবানী মুখোপাধ্যায়। প্রিয়তোষ মৈত্রেয়। রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত। অসীম সোম। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

গল্প:... নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। অমল দাশগুপ্ত। সত্যপ্রিয় ঘোষ। চিত্তরঞ্জন ঘোষ। দেবেশ রায়। কালিদাস দত্ত। বীরেন্দ্র নিয়োগী। চিত্ত ঘোষাল। দেবব্রত ভৌমিক। রণজিত রায়।

কবিতা: বিষ্ণু দে। বিমলচন্দ্র ঘোষ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন বসু। মণীন্দ্র রায়। গোপাল ভৌমিক। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাম বসু। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। চিত্ত ঘোষ। অসীম রায়। মৃগাঙ্ক রায়। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। কৃষ্ণ ধর। সিদ্ধেশ্বর সেন। সতীন্দ্রনাথ মৈত্র। ধনঞ্জয় দাশ। তরুণ সান্যাল। তুষার চট্টোপাধ্যায়। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

॥স্থানীয় এজেন্ট॥

পারিজা ব্রাদার্স, কলিকাতা-৯

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিঃ-১২

কার্যালয়

১৭।১, মদন গোপাল লেন, কলিকাতা-১২

দাম : দুই টাকা

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড

অমৃত

২২শ সংখ্যা মূল্য ৪০ নয়া পয়সা

শুক্রবার, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৭০

Friday, 4th. October, 1963. 40 Naya Paise.

সূচীপত্র

সাপ্তাহিকী

।। মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচন ।।

'কামরাজ পরিকল্পনা' অনুযায়ী যে-ছয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ কংগ্রেসের সেবায় আত্ম-নিয়োগের জন্য পদত্যাগ করেন, ২৪শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তার পাঁচটিতেই (কাশ্মীর ছাড়া) কংগ্রেস পরিষদীয় দলপতি (মুখ্যমন্ত্রী) নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে যায়। লক্ষ্ণৌ'র ২১শে সেপ্টেম্বরের সংবাদঃ শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী সর্বসম্মতিক্রমে উত্তরপ্রদেশ বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের নেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। উত্তর প্রদেশের পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন তিনিই। পরন্তু এদেশে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার গৌরব শ্রীমতী সুচেতারই প্রাপ্য হলো।

উড়িষ্যায় শ্রীবিজু পট্টনায়কের স্থলে কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা (মুখ্যমন্ত্রী) নির্বাচিত হয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র (ভুবনেশ্বর, ২৩শে সেপ্টেম্বর)। একই সঙ্গে বিহার, মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশেও মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনপর্ব সমাধা হয়েছে। বিহারে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা'র স্থলে শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন, মাদ্রাজে শ্রীকামরাজ নাদারের স্থলে শ্রীএম ভক্ত বৎসলম ও মধ্য প্রদেশে শ্রীমন্দলয়ের স্থলে শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র।

।। অবশ্য সঞ্চয় ও স্বর্ণবিধি ।।

২১শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী লোকসভায় দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। একটি ঘোষণায় অবশ্য সঞ্চয়ের দায় থেকে আয়কর দাতাগণ ছাড়া অপর সকলকে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘোষণাটি স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বিধি সংক্রান্ত। এতে নিয়ন্ত্রণাদেশ শিথিল করা হয়েছে, যার ফলে পুরানো স্বর্ণালংকার ভেঙে সমমানে নতুন অলংকার তৈরী করা সম্ভবপর হবে। অর্থমন্ত্রীর এই দুইটি বড় রকম ঘোষণায় বিভিন্ন মহলে স্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। মিশ্র প্রতিক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও কর্মচ্যুত স্বর্ণশিল্পীরা স্বর্ণ নীতির সংশোধনকে স্বাগত জানিয়েছেন। দিল্লীতে স্বর্ণশিল্পী সত্যাগ্রহও আপাততঃ বন্ধ রাখা হয়েছে।

।। মালয়েশিয়া প্রসঙ্গ ।।

মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যে অশান্তি ধূমায়িত হয়, তার এখনও অবসান হয়নি পরন্তু জাকার্তার ১৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদ : মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সেখানে নতুন করে হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরম্ভ হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা ঐদিন বৃটিশ দূতাবাসে লুঠতরাজ চালায় ও অগ্নি সংযোগ করে। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত মিঃ গিলক্রাইষ্ট আক্রান্ত হন—সপরিবারে তিনি মার্কিণ দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে শুধু সমর প্রস্তুতিই নয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যও উদ্যোগী হচ্ছে বলে জাকার্তার ২৪শে সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে জানা যায়।

এদিকে ২২শে সেপ্টেম্বর কুয়ালালামপুর থেকে বার্তা আসে—সেখানকার মালয়েশিয়া সমর্থক ছাত্রবৃন্দ ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ টুঙ্কু আবদুল রহমানের দৃপ্ত ঘোষণা : প্রতিরক্ষামূলক জরুরী অবস্থার জন্য দেশকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর সেই সঙ্গে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে।

।। সর্বাত্মক হরতাল ।।

পণ্যমূল্য ও কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় গত ২৪শে সেপ্টেম্বর। ফলে ঐ দিন ভোরবেলা থেকে বেলা চারটা পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়েছিল। এই হরতালের সংগঠক ছিলেন বিভিন্ন বামপন্থী দলের গঠিত দ্রব্যমূল্য ও কর বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি।

।। বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব ।।

'মাত্র একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট তাঁর বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব পেশ করেছেন আর তিনি আর কেউ নয়, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু স্বয়ং।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীই এই তথ্যটি লোকসভায় পেশ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি এ-ও জানিয়েছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর নামে বৈদেশিক ব্যাঙ্কে জমা আছে মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড, আর সেটা তাঁর বইয়ের রয়্যালটি বাবদ পাওয়া।

।। কলকাতায় রাষ্ট্রপতি ।।

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন ২৪শে সেপ্টেম্বর একদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। ঐ দিনই মহানগরীতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। বিমানঘাঁটিতে রাষ্ট্রপতিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন—অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

এই সফর উপলক্ষে ডঃ রাধাকৃষ্ণন রাসবিহারী এভিনিউস্থ (কলিকাতা) শরৎ চাটার্জী (ত্রিকোণ) পার্কে শরৎ-স্মৃতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাঁরই কথায় 'বলিষ্ঠ লেখনী চালিয়ে সমাজের অনেক পাপ সম্পর্কে সমাজ-চেতনা আনতে সমর্থ হয়েছিলেন বিদ্রোহী শরৎচন্দ্র (অমর কথাশিল্পী)।' বালিগঞ্জে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমাবর্তন উৎসবে রাষ্ট্রপতির একটি বিশিষ্ট উক্তি : বাংলা ভাষা বিশ্বের সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।

।। লাটিটিলা পরিস্থিতি ।।

১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিলং থেকে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হয় যে, কাছাড় সীমান্তবর্তী লাটিটিলা-ডুমাবাড়ি এলাকায় পাকিস্তানী আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ ও গুলীবর্ষণ অব্যাহতভাবেই চলে। পরদিন প্রস্তাব অনুযায়ী সুতারকান্দিতে (করিমগঞ্জ-শ্রীহট্ট সীমান্ত সংলগ্ন) আসাম ও পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক সেনাধিনায়কদের এক বৈঠকে গুলীবর্ষণের বিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বটে কিন্তু পাকিস্তানের অনমনীয় মনোভাবের দরুণ মূল প্রশ্নের (মালিকানা সংক্রান্ত) কোন ফয়সালা হয় না। ২১শে সেপ্টেম্বর লোকসভায় শ্রীনেহরুকেও ঘোষণা করতে শোনা যায়—সুতারকান্দি বৈঠক অনুযায়ী লাটিটিলায় পাকিস্তানী গুলীবর্ষণ বন্ধ হলেও পাকিস্তানীরা অঞ্চল ত্যাগ করে যায়নি।

।। পুরুলিয়ায় সত্যাগ্রহ ।।

লোকসেবক সংঘের উদ্যোগে পুরুলিয়ায় ১৯শে সেপ্টেম্বর 'ক্ষুধা মুক্তি' সত্যাগ্রহ শুরু হয়। সূচনা দিবসেই সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ লাঠিচালনা করে। ফলে নারী ও পুরুষ অনেকেই আহত হন। প্রথম দিবসের সত্যাগ্রহের নেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ-সহ ৩৮ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রতিবাদে পুরুলিয়ায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয় ২০শে সেপ্টেম্বর।

।। কয়েকটি বিশেষ নিয়োগ ।।

রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রচারিত এক ইস্তাহার (১৯শে সেপ্টেম্বর) : সংসদ সদস্য শ্রীএইচ সি দাসাপ্পা (মহীশূর) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর উপর ভার অর্পিত হয়েছে রেল দপ্তরের। অপরদিকে উপমন্ত্রী শ্রীবলীরাম ভগত পরিকল্পনা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

গুজরাটে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কংগ্রেস দল কর্তৃক শ্রীবলবন্ত রায় মেহতা নির্বাচিত হয়েছেন। ডাঃ জীবরাজ মেহতা মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়ায় এই নির্বাচন হয়।

দিল্লীতে শ্রীনেহরুর এক সাম্প্রতিক ঘোষণায় জানা যায়—শ্রীঅশোক মেহতাকে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হচ্ছে।

।। রাষ্ট্রসংঘে কেনেডি ।।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি গত ২০শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে (অষ্টাদশ অধিবেশন) এক গুরুত্ববহুল ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর দাবী অনুসারে আণবিক শক্তির অধিকারী হলেও আমেরিকা ও রাশিয়াকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির ওপর সমধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। চন্দ্রে মনুষ্য প্রেরণে এই দুই রাষ্ট্রের যৌথ প্রচেষ্টারও তিনি আহ্বান জানান।

সম্পাদকীয়

নয়াদিল্লীর অধিকারিবর্গ কোনদিনই পশ্চিমবাংলাকে 'ভালোচোখে' দেখেন নাই। অবশ্য নয়াদিল্লীর পত্তনই হয় কলিকাতা তথা পূর্ব-ভারতকে রাষ্ট্রনৈতিক গতিপথ হইতে অক্ষচ্যুত করার জন্য। পলাশীর যুদ্ধ কোম্পানি বাহাদুরকে সমগ্র পূর্ব-ভারত, মায় উত্তর-ভারতের বিরাট অংশের পূর্ণাধিকার দেয়। তাহার পর ১৯১১ পর্যন্ত সমস্ত ভারতের ভাগ্যচক্র কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছিল। ১৯১১ সালের পর কি উদ্দেশ্যে ভারতের রাজধানী সরাইয়া লওয়া হয় তাহা এখন ভারতের ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই হউক ফল যাহা হইয়াছিল তাহাতে সমস্ত ভারতেরই অপকার হয় এবং যাহার চক্রান্তে বাংলা তথা পূর্ব-ভারতের ভাগ্যলিপি নৈরাশ্যের মসিলিপ্ত হয় সেই ব্রিটিশরাজ্যেরও গৌরব-সূর্য অস্তমিত হয়। এই অবনতি ও ধ্বংসের কোনও আধিদৈবিক কারণ ছিল না, রাজধানী দিল্লীতে সরিয়া যাওয়ায় ব্রিটিশরাজের ভাগ্য কোনও দুষ্টগ্রহের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল এমন কথাও শোনা যায় নাই। ইংরাজ অধিকারিবর্গের জাতক্রোধ হইয়াছিল বাঙালী তথা প্রায় সকল হিন্দুর স্বাধীনতা কামনায়। এবং সেই হিংসা ও দ্বেষের ফলেই সসাগরা বসুন্ধরার অধিকারি ব্রিটিশরাজের সাম্রাজ্য ধ্বংসের মুখে পড়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়কগণের বিপরীত বুদ্ধির ফলে। সেই হিংসা-দ্বেষের ফলে রাষ্ট্রচালনায় ও শাসনতন্ত্রের অধিকারদানে যোগ্যতার বিচার উঠিয়া যায় এবং দেশের গঠনমূলক বা প্রগতিমূলক কাজ মাত্রেরই অগ্রগতি রোধের চেষ্টায় নানা ছল-চাতুরি অজুহাতের—কখনও বা যথেচ্ছাচারের প্রয়োগ আরম্ভ হয়। অযোগ্য অধিকারি নিয়োগে আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে "নোকরশাহির" প্রবর্তন হয় এবং দেশের অধোগতি ক্রমে দ্রুত হইতে দ্রুততর হয়। সেই সঙ্গে আসে দুর্নীতির প্লাবন যাহার বিশেষ সহায়ক ছিল ঐ আমলাতন্ত্রের অপদেবতাগণ, যাঁহাদের তুষ্টিই ছিল আর্থিক উন্নতির একমাত্র পথ। এসব কথা তো ইতিহাসের অঙ্গ সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন, তবে আমাদের স্মৃতি ক্ষণভঙ্গুর সুতরাং পুনরুল্লেখ করিতেই হইল।

ব্রিটিশরাজ তো বাঙালীর ও প্রায় সকল হিন্দুরই ক্ষতি করিতে গিয়া নিজেই ধ্বংসের মুখে গেল। কিন্তু রাখিয়া গেল সেই আমলাতন্ত্র, সেই হিংসা-দ্বেষের ও দুর্নীতির আকর নয়াদিল্লী ও সেই সঙ্গে রাখিয়া গেল বাঙালী-বিদ্বেষের সেই বিজাতীয় স্পৃহা।

সেই কর্তাদেরই বক্রদৃষ্টির গুণে ফরক্কা বাঁধ পিছাইয়া গিয়াছে প্রায় বারো বৎসরের মত, সেই কর্তাদের কৃপায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কাজের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের টাকা যতদূর সম্ভব দেরীতে দেওয়া হইতেছে—বর্তমানে উহার প্রায় ২৭ কোটি টাকা পিছাইয়া আছে—সার্কুলার রেলের কথাও উড়াইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে।

তাছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানের পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তরক্ষার কাজে পশ্চিম বাংলার খরচ—যাহা পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়—বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দিতেই বা এত অনিচ্ছা কেন?

কিন্তু এরূপ অবস্থা আর কতদিন চলিবে? আশা করা যায় নূতন অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

জৈমিনি

বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। চমকে ওঠার কারণ নেই। আপনারা অনেকে হয়তো ঠিক অবহিত হন নি, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পুজো একটা সত্যিই হয়ে গেল। কাজেই যাঁরা পুজো করেছেন তাঁদের (এবং যাঁরা করেন নি তাঁদেরও) আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

কোন পুজো সঠিক এবং শাস্ত্রসম্মত তা নিয়ে আমি তর্ক তুলব না। সে ব্যাপারে আমি একান্তই অনধিকারী। কিন্তু যে-পুজো শেষ হল, তাতে বেশির ভাগ মানুষই যে যোগ দিতে পারেন নি তা আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। শারদীয় পুজোর ধর্মীয় ব্যাখ্যা যাই হোক, উৎসব হিসেবেই এখন এ-পুজো বাঙালীর জীবনে স্থায়ী আসন পেয়েছে। কিন্তু উৎসবের গোড়ায় থাকে আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং অবকাশ। বর্তমান পুজোর

প্রথম বিজয়ার সম্ভাষণ

সময় এ দুটোর একটাও মেলেনি বলে পুজো হলেও উৎসবটা ঠিক ভালোমতো ঠাহর করা যায় নি। পুজো এল এবং পুজো চলে গেল, অথচ আমরা তা ঠিক মতো যেন বুঝতেই পারলাম না।

তাছাড়া কী বিচ্ছিরি বৃষ্টি গেল ক'দিন। এ যদি আসল পুজোর সময় হত তবে সমস্ত বছরটাই মাটি হয়ে যেত আমাদের কাছে। আর তা হয়ও অনেক বছর। এবার, আশা করা যাচ্ছে, বর্ষাকে কিছুটা বিপথচালিত করা গেছে। যুদ্ধের সময় যেমন বিপক্ষীয়দের বিভ্রান্ত করার জন্যে ডামি-সৈন্য খাড়া করা হয় একটা রণাঙ্গনে এবং আক্রমণ চালানো হয় অন্যত্র, ব্যাপারটা যেন সেই রকমই। একটা সামান্য আয়োজনের পুজো ফেঁদে তারই উপর উজাড় করিয়েছি আমরা বর্ষার বেগ, বড় আয়োজনের উৎসব যাতে নির্বিঘ্নে হয়। পর্জন্যদেব নতুন স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ না করলে আমাদের এ ফন্দিটা উতরে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। এবং আমরা তখন প্রকৃত পুজোর আবহাওয়া দেখতে পাব।

তখন প্যাণ্ডেলে-প্যাণ্ডেলে ছেয়ে যাবে শহরের পার্ক আর রাস্তা, ইলেকট্রিকের আলোয় ঝলমল করে উঠবে উৎসবপ্রাঙ্গণ, অ্যাম্প্লিফায়ারে তারস্বরে বাজবে হিন্দি গানের রেকর্ড, আর আমরা ভিড়ের ধাক্কায় স্রোতের শেওলার মতো ঘুরে বেড়াব পথে পথে। তখন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শরীরের মধ্যে বইবে উত্তেজিত রক্তস্রোত, চিরদিনকার ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও রাত দশটায় গিয়ে বসব পাড়ার বারোয়ারী পুজোর যাত্রাগানের আসরে, এবং কী আশ্চর্য, লোকসমক্ষে যাই বলি, বিজয়ার দিন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সানন্দে উপভোগ করব প্রতিমা-অনুগামীদের উদ্দাম তাণ্ডা-নৃত্য!

কিন্তু এখনো সেজন্যে অপেক্ষা করতে হবে তিন সপ্তাহ।

অপেক্ষা করছি!

●

● ●

আজকাল করোনারী থ্রম্বসিসের কথা প্রায়ই শোনা যায়। সেটা জীবদেহের ব্যাধি। কিন্তু দেশেরও একটা জীবন্ত সত্তা আছে। সেইজন্যে সেখানেও ইদানীং দেখা যাচ্ছে অনুরূপ অবস্থা।

সকলেই স্বীকার করবেন, রেল-ব্যবস্থাই দেশের ধমনীস্রোত। কিন্তু সম্প্রতি রেল চলাচলে যে রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তাকে বোধহয় ক্রনিক থ্রম্বসিস বললেও অত্যুক্তি হয় না।

রেল চলাচলের সময় নির্দেশের জন্যে কর্তৃপক্ষ টাইম-টেবল প্রকাশ করেন। ঐ বই গল্প-উপন্যাসের মতো মনোরম নয়, তবু হাজার হাজার মানুষ তা কেনে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কেনে তা যে

রেলগাড়ী-ধৃত কূর্মশরীরম্‌

অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়ে যায় এ কথা ভুক্তভোগী মাত্রই স্বীকার করবেন।

নির্ধারিত সময়ে ট্রেন আসা এখন দুর্লভ ঘটনা! এমন কি টার্মিনাস থেকে যখন গাড়ি ছাড়া হয় তখনো সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। যাঁরা রেলওয়ে-তে চাকরী করেন তাঁদের সেইটেই একমাত্র কাজ। অতএব দু-একঘন্টা কম-বেশিতে তাঁদের হয়তো কিছু এসে যায় না। কিন্তু যাঁরা রেলগাড়িতে চড়েন, দুঃখের বিষয়, রেলভ্রমণই তাঁদের পেশা নয়। সেজন্যে তাঁদের বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।
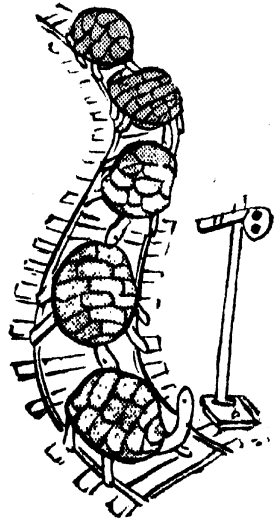
বাস্তবিক, অবস্থা এখন এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ঠিক সময় গাড়ি এলে সেইটেই হয় বিস্ময়ের বিষয়। অবিশ্যি অনেক সময় এমনো হয়েছে যে ঠিক

সময়ে গাড়ি এসেছে বলে খুব খুশি হয়ে তাতে চেপে বসে তারপর শোনা গেল, সেটা আসলে আগেকার একটা ট্রেন—দেড় ঘণ্টা লেট করে আসতেই পরবর্তী ট্রেনের নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে।

এ-সব দেখেশুনে মনে হয়, ছোটো-বেলায় আমরা যা গল্প শুনেছি তা হয়তো নিছক গল্প না হতেও পারে।

কোনো এক দেশে (কেউ কেউ বলেন সেটা নাকি ইউরোপেরই একটা দেশ) ট্রেন আসতে খুব দেরি করে। কিন্তু এক-দিন জনৈক ভদ্রলোক দেখলেন নির্ধারিত সময়েই ট্রেন এল। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তিনি যেই স্টেশনমাস্টারকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন তখনই শুনতে পেলেন আসল উত্তর—'না মহাশয়, এটা গত-কালের ট্রেন, ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা লেট করিয়া আসিয়াছে!'

লোকে বলে, ইউরোপ আজ যা করে, আমরা তা করি পঞ্চাশ বছর পরে। খাঁটি সত্যি কথা। ইউরোপে এখন এ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলেও, আমরা পশ্চাদনুকারী বলে আর দু-এক বছরের মধ্যেই যে আমরা চব্বিশ ঘণ্টা লেট করে ট্রেন চালাতে সক্ষম হব, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

•
• •

এক খবরে জানা গেল, বহরমপুরে একটি উন্মাদ-হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। তার ফলে রাঁচী থেকে কিছু বাঙালী পাগলকে সেখানে সরিয়ে আনা যাবে। এবং সেই কারণে বিহার সর-কারকে দেয় কয়েক লক্ষ টাকাও নাকি আমাদের বেঁচে যাবে প্রতি বছর।

কিন্তু আমার কথা হল, বহরমপুর হাসপাতালের বেডের সংখ্যা মাত্র ১০০টি। এই সামান্য আয়োজন নিয়ে পাগলামীর মতো একটা বৃহৎ সমস্যাকে কি আয়ত্তে আনা সহজ হবে? আমরা বাঙালীরা আর যাই পারি বা না পারি পাগল হতে পারি। সাহিত্যের জন্যে পাগল, অ্যাম্বিশানের জন্যে পাগল, পাগলাদ্য আদর্শের জন্যে পাগল—সুসমাচার এসব উচ্চমার্গের পাগ-লামী তো বটেই, নিছক সুকুমার রায়-বর্ণিত সেই হেড আপিসের বড়বাবুর 'হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা'র মতো অকারণ উন্মাদনাও আমাদের কিছু কম নয়।

অতএব আমার বিনীত প্রার্থনা, রাঁচী থেকে পুরনো পাগল না নিয়ে এসে বহরমপুরের হাসপাতালটিকে উদীয়-মানদের জন্যেই রিজার্ভ রাখা হোক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ ১০০টি বেডকে কর্মচঞ্চল করে তুলতে নতুন পাগলদের খুব বেশি সময় লাগবে না।

সংবাদে প্রকৃত কথাই বলা হয়েছে '.....এই উন্মাদাগারটি স্থাপিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ-বাসীদিগের একটি দীর্ঘ-দিনের অভাব দূরীভূত হইল......।'

নিশ্চিন্তমনে এখন আমরা, অর্থাৎ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীরাই, পাগল হতে পারি।

নিমাই ভট্টাচার্য

পার্লামেণ্টের সেই একঘেয়ে বক্তৃতা, সেণ্ট্রাল হলের কফি আর পরনিন্দার মহাভারত শুনতে শুনতে মাঝে মাঝেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়। মনটা উড়ু উড়ু করে: অথচ লাটাই-বাঁধা ঘুড়ির মত পার্লামেণ্টকে কেন্দ্র করে একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করতেই হয়।... 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল, বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।' ...ঔরংগজেব রোড থেকে ইমারজেন্সী নিমন্ত্রণ আসে: তোয়ালে হাতে নিয়ে ছুট দিই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভি-আই-পি বন্ধুর সাহচর্যে হাজির হই অশোকা হোটেলের সুইমিং হলে।

ইতস্তত বিদেশী টুরিস্ট বিধ্বস্ত ব্যালকনিতে বসে এক কাপ চা আর গোটাকতক গোল্ডফ্লেক উড়িয়ে দুজনে রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে এক নজরে দেখে নিই সুইমিং পুলের দৃশ্যটা। সাধারণতঃ এখানে কিছু ডিপ্লোম্যাট ও কিছু ফরেন টুরিস্টই নজরে পড়ে। মাঝে মাঝে দু'-চারজন পঞ্চনদী পাড়ের সর্দারজীদের বেণী বাঁচিয়ে সাঁতার কাটতেও দেখা যায়; আর পাওয়া যায় জনকয়েক এলিজাবেথ টেলরের ভারতীয় সংস্করণ। রঙীন মন নিয়ে অশোকা হোটেলের সুইমিং পুলের নীল জলে নামার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত এইসব ভারতীয় এলিজাবেথ টেলরের দল প্রায় শাড়ীর সমতুল্য দীর্ঘ তোয়ালে জড়িয়ে বিচরণ করেন। তারপর তোয়ালে ত্যাগ করে বিদ্যুৎবেগে হুড়মুড় করে নামেন জলে। আলট্রা মডার্ণ হয়েও সংস্কারমুক্ত হওয়া যে সহজ নয়, সেকথা এ'দের দেখে বেশ বোঝা যায়। সুইমিং পুল-সংলগ্ন ছোট্ট লনটির দৃশ্যের সঙ্গে বেইরুট-বীচের দৃশ্যের কোন পার্থক্য নজরে পড়বে না। টু-পিস্ বা থ্রি-পিস সুইমিং কস্‌ট্যুম পরে উদ্ধত যৌবনে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন 'চিনি গো, চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী'র দল। কখনও কখনও বা এ'দের দেখা যায় শায়িত পুরুষের পাশে কোকাকোলার বিজ্ঞাপনের মত চোখে সানগ্লাস দিয়ে হেলেদুলে বাঁকা হয়ে বসে পকেট-বুক সিরিজের বই পড়ত। আর নজরে পড়ে বন্ধ্যা মেমের কচি বাচ্চার সাঁতার কাটা। শীতের দেশে জন্মেও শৈশবে কিভাবে জলের সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব করল, তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার পর বন্ধুবর কোনক্রমে তাঁর ছত্রিশ ইঞ্চি বক্ষ উন্মুক্ত করে জলে নামেন। নির্লজ্জ বলে আমার খ্যাতি থাকলেও দেহের আবরণ উন্মোচনে আমার ভীষণ লজ্জা। আরো গোটাকতক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হবার পর আমাদের স্টান্ডার্ড অফ লিভিং কুতুব-মিনার সমান উঁচু হলে প্রচুর আহার-বিহার উপভোগ করার পর দেহটি দেখাবার মত না হওয়া পর্যন্ত আমাকে এই রকম সুইমিং পুলের ব্যালকনিতে বসেই কাটাতে হবে। তবে বসে বসে যে দৃশ্য দেখি তা সেন্সর বোর্ডের নির্মমতার জন্য কোন দেশী ফিল্মেও দেখা সম্ভব নয়।

একদিন পার্লামেণ্ট পালিয়ে মুষল-ধারে বৃষ্টির মধ্যে দুজনে হাজির হলাম অশোকা হোটেলের সুইমিং পুলে। শুধু আমরা দুটি প্রাণী ছাড়া আর কোন সুইমার নজরে পড়ল না। বন্ধু জলে নামলেন। আমি বসে বসে দেখি 'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো নেমে'। চারদিক ফাঁকা দেখে হয়ত বা মনে মনে গুণগুণই করেছিলাম। হঠাৎ চোখের সামনে লনের মধ্যে দুটি মূর্তি ভেসে উঠল। সাঁতার না কাটলেও সুইমিং কস্‌ট্যুম পরে দুজনকে প্রায় ক্লার্ক গেবল-সুসান হেওয়ার্ডের মত একত্রে ছোটাছুটি করতে দেখলাম। ঝাপসা ঝাপসা হলেও বুঝলাম এ'রা আমার স্বজাতি; অর্থাৎ বঙ্গ-ভাষাভাষী। সর্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি নিয়ে সিক্ত বসনে ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী যখন আমার পাশ দিয়ে ব্যালকনির কোণে রেস্টিং-রুমে চলে গেলেন, তখন নিজের অজ্ঞাতেই আমার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। ভাবি, 'একি কৌতুক নিত্য নতুন ওগো কৌতুকময়ী'?

...বাংলার এক পুরুষসিংহের রক্ত মেয়েটির ধমনীতে আছে বলে জেনে-ছিলাম প্রথম দর্শনের দিন। সে আজ দীর্ঘদিন পূর্বের কথা। তেরো-চৌদ্দ বছর আগে দেখেছিলাম চঞ্চলা যুবতীরূপে; আজও তিনি 'নহ মাতা, নহ কন্যা, সুন্দরী রূপসী'। শুধু দুটি চোখের কোণে গভীর কালো রেখা পড়ে গেছে। প্রসাধনের জোরে প্রৌঢ়ত্বের মাঝে দাঁড়িয়েও উর্বশী সুন্দরী উদ্ধতভাবে গর্বিত যৌবনের ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন। বিয়ে? ছিঃ হোয়াট এ সিলি আইডিয়া! শেষে বাঁদী-দাসী হয়ে কপালে সিঁদুর পরে বন্দিনী-জীবনের ঢাক বাজাবেন ইনি! এহ বাহ্য.....। তাইতো শ্রীমতী এখনও দিনের আলোয় বান্ধবী, রাতের আঁধারে মর্মসহচরীর

ভূমিকায় নিত্যনতুন মঞ্চে অভিনয় করে চলেছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের সংগে ঘুরেছিলাম সারা ভারতবর্ষ কুইনস্ প্রেস পার্টির মেম্বার হয়ে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা এলাম একদা এক দেশীয় রাজ্যের পুণ্যতীর্থে। সারাদিন ছোটাছুটি করে সন্ধ্যার পর টাইপ-রাইটার খটাখট করে প্রেস-মেসেজগুলো পাঠিয়ে দিয়ে হোটেলের মুখ দেখলাম। স্নান করে স্নো-পাউডার মেখে কালো স্যুট চাপিয়ে যখন রিসেপ্সনে হাজির হলাম, তখন রাত্রি প্রায় ন'টা। প্রাসাদ-বাড়ীর সেই মনোরম গৃহের চারদিকে ওমর খৈয়ামের মন-মাতানো তৈল-চিত্র। মাথার উপর ঝাড়-লণ্ঠন আর চরণ-যুগলের তলায় পারসিয়ান কার্পেট রেখে বিচরণ করছিলেন আধুনিক ওমরখৈয়ামের দল। ভিড়ের মধ্যে পাশ কাটিয়ে বিচরণ করতে করতে সোফিয়া লরেনের মত আলুথালু বেশে দেখলাম বাংলা দেশের সেই পুরুষ-সিংহের এই বংশধারিণীকেই। চোখের পাতা বেশ ভারী ভারী লাগল; মনে হল বেশ কয়েক রাউণ্ড হয়ে গেছে। রাজন্য-সমাবেশে আমার মত কোন সুতানুটি-গোবিন্দপুরবাসী থাকতে পারে, একথা নিশ্চয়ই শ্রীমতী প্রত্যাশা করেননি। তাই নির্লিপ্ত নির্বিকারচিত্তে এক চুমুকে গেলাসের তলানিটুকুও শেষ করে হাঁক দিচ্ছিলেন, বেয়ারা-আ-আ, অর এক বড়া লেআও।

পার্টি কতক্ষণ চলেছিল জানি না। রাত একটা নাগাদ ঘরে ফেরার সময় শ্রীমতীকে নেশার ঘোরে জনকয়েক কেতাদুরস্ত দেশী সাহেবের সংগে অর্ধেক শাড়ী ত্যাগ করে হাত তুলে ঘুরে ঘুরে স্প্যানিস ডান্স করতে দেখলাম। বাকি রাতটুকু কিভাবে ও কোথায় কাটিয়ে-ছিলেন জানি না।

পরের দিন সকালে ডাইনিং হলে ব্রেক-ফাস্ট খেতে গেলে দেখলাম গত রাত্রের স্প্যানিস ডান্সারকে। দামী শাড়ী পরেছেন, সযত্নে প্রসাধন করেছেন, কিন্তু তবুও বেশ বোঝা যায় সারারাত্রিব্যাপী সাইক্লোন বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে।

পরিচয় না দিয়ে পাশে গিয়ে শুধু বল্লাম, মর্ণিং...হাউ ওয়াজ লাস্ট নাইট?

মুচকি হেসে বল্লেন, ওয়াণ্ডারফুল। অনেক দিন বাদে অশোকা হোটেলের সুইমিং পুলে এঁকেই বৃষ্টির নুপুরের সংগে জীবন-নাট্যের নৃত্য করতে দেখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলেছেন, 'লণ্ঠনের চারদিকে আলো, তলাটাই কালো।'... পুরুষসিংহ ব্যক্তির বংশোদ্ভূতা মহিলাটি ইতিহাসের সম্মান রেখেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ।

দেশে বিদেশে

॥ নূতন নেতৃত্ব ॥

কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে যে ছয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছিলেন একমাত্র কাশ্মীর ছাড়া আর সকল রাজ্যেই তাঁদের স্থানে নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। কাশ্মীরের প্রধান-মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হয়েছে, কিন্তু তাঁর স্থান কে গ্রহণ করবেন সে সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে কিছু স্থির হয়নি। হয়ত গোলাম মহম্মদ সাদিকের উপরেই শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব অর্পিত হবে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে বোধহয় আরও কিছু সময় লাগবে। অন্য পাঁচটি রাজ্যে আগামী ২রা অকটোবর নূতন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবেন।

কংগ্রেসকে আরও বেশী শক্তিশালী ও সুসংহত করার উদ্দেশ্যে কামরাজ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু তার প্রথম পর্যায়ের কার্যসূচী শেষ করতে গিয়েই সব কটি রাজ্যে এমনকি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে যেভাবে দলাদলি ও সন্দেহ অবিশ্বাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে অনেকের মনেই, এমনকি কামরাজ পরিকল্পনা কার্যকরী করার দায়িত্ব যাঁর উপর অর্পিত হয়েছে সেই প্রধানমন্ত্রীর মনেও হয়ত ইতিমধ্যেই এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, একটা স্থিতাবস্থার উপর হঠাৎ এই রকম আঘাত হানা ঠিক হয়েছে কিনা। আরও ভাল করার উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার শেষ পরিণতি আরও অনেক বেশী খারাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে কিনা। প্রত্যেক রাজ্যে অবাঞ্ছিত দলাদলি দেখে প্রধানমন্ত্রী সক্ষোভে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, নেতৃত্বের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কামরাজ পরিকল্পনার মূলনীতির বিরোধী। কিন্তু তাঁর সেকথায় কোন রাজ্যই কর্ণ-পাত করেননি, এমনকি কামরাজের নিজ রাজ্য মাদ্রাজও নয়। সেখানেও নূতন নেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করা সম্ভব হয়নি। তবুও যেকটি রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে দেখা গেছে তাদের মধ্যে মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার পদত্যাগকারী মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়েরই কংগ্রেস পরিষদীয় দল বা কংগ্রেস সংগঠনের উপর কিছুটা কর্তৃত্ব আছে। তাঁদের মনোনীত প্রার্থীরা বিরোধী পক্ষীয়দের বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। উত্তর প্রদেশের পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রীও সামান্য ভোটের ব্যবধানে তাঁর মনোনীত প্রার্থীকে জয়ী করাতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের বিদায়ী মুখ্য-মন্ত্রীরা তাঁদের অধিকাংশ অনুগামীদের

নবনির্বাচিত কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় (বিহার)

ডি পি মিশ্র (মধ্যপ্রদেশ)

শ্রীবীরেন মিত্র (উড়িষ্যা)

সুচেতা কৃপালনী (উত্তরপ্রদেশ)

সমর্থন হারিয়েছেন। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেও সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগের পূর্বে তাঁরা যে মর্যাদা হারালেন সেটা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে বিশেষ ক্ষতিকর হবে।

এরপরেও একটা কথা আছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কামরাজ পরি-কল্পনা রূপায়ণের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর উপরে। কিন্তু নূতন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন যাঁরা তাঁরা সকলেই তাঁর সম্পূর্ণ অনুগত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ইতি-মধ্যেই দেখা দিয়েছে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছেন যাঁরা তাঁদেরও অনেকে নেহরু-নেতৃত্বের প্রতি অনুগত কিনা এখন তা বোঝা যাচ্ছে না। কলকাতায় শ্রীএস কে পাতিল সম্প্রতি যা বলে গেলেন, তাতে এ সন্দেহ অনেকের মনেই প্রবলতর হবে। বিভিন্ন রাজ্যে নেতৃত্বের লড়াইয়ে আপাতত যাঁরা পরাজিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই নূতন নেতাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু সে প্রতি-শ্রুতির কতখানি সত্য ও কতখানি কথার কথা তা বুঝতে সময় লাগবে। উড়িষ্যার শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান ত নেতৃত্বের লড়াইয়ে পরাজিত হওয়ার পরের দিনই জানিয়ে দিয়েছেন তিনি নূতন মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন না। বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের পরাজিত পক্ষের কাছ থেকে কতখানি সহযোগিতা পাওয়া যাবে তা পরবর্তী-কালে বুঝা যাবে। কিন্তু যদি তাঁরা এব্যাপারে কোন আপোস না করেন তবে ঐ সকল রাজ্যের পক্ষে খুবই

দুশ্চিন্তার কারণ হবে, কারণ বিরোধী-পক্ষীয়রা আপাতত সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও সংখ্যাগুরু পক্ষের সঙ্গে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তির খুব বেশী পার্থক্য নেই। আর জয়ী পক্ষও যে সকল রাজ্যে খুব সঙ্ঘবদ্ধ ও সমআদর্শে অনুপ্রাণিত তা মনে হয় না। নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর অনেক আশাহতই হয়ত আবার পক্ষ-পরিবর্তনের কথা চিন্তা করবেন। তবুও দেশবাসীর স্থির বিশ্বাস, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যম সফল হবে, তাঁর স্থিরবুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও বলিষ্ঠ চিন্তা-ধারা দেশকে সকল আশঙ্কিত সঙ্কট থেকে রক্ষা করবে।

॥ ইরানের জাতীয় নির্বাচন ॥

ইরানে সদ্যসমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে শাসকদল ন্যাশনাল ইউনিয়ন পার্টি আশাতীতভাবে সাফল্য লাভ করেছেন। জাতীয় পরিষদের ২০০টি আসনের মধ্যে তাঁরা জয়ী হয়েছেন ১৮১টি আসনে। ন্যাশনাল ইউনিয়ন পার্টির এই সাফল্য বিশেষ দুটি কারণে উল্লেখের দাবী রাখে। প্রথমত, এইবারের নির্বাচনেই ইরানের নারীরা সর্বপ্রথম ভোটদানের সুযোগ পেলেন। নারীদের ভোটাধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে কিছুকাল আগে ইরানের ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা কি রকম সাংঘাতিক বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল, তা আশা করি সকলেরই মনে আছে। সেই বিক্ষোভের আর এক ইন্ধন জুগিয়েছিল সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি।

কিন্তু সরকারী দলের বিপুল সাফল্যে প্রমাণ হল যে, প্রচণ্ড বিক্ষোভ-মাত্রই গণ-বিক্ষোভের কুদ্ধ প্রকাশ নয়। কয়েক হাজার এমন কি কয়েক লক্ষ লোক সাময়িকভাবে দল পাকিয়ে হয়ত একটা বড় রকমের হাঙ্গামা বাঁধিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু তা সব সময় জাতির বিক্ষোভের ইঙ্গিত নয়। এই কারণেই অনেক সময় দেখা যায় যে, দেশজোড়া ব্যাপক সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অব্যবহিত পরক্ষণেও জাতীয় নির্বাচনে সরকারপক্ষ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছেন। জাপানের বিগত সাধারণ নির্বাচন তার অন্যতম প্রমাণ। জাতীয় নির্বাচনই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মনোভাবের দর্পণ। ধর্মান্ধদের জেহাদ ও ভূম্যধিকারীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইরানের সাধারণ মানুষ যে যুগের অগ্রগতির পক্ষেই রায় দিয়াছেন, এটা সত্যই আশা ও আনন্দের কথা।

॥ রুশ-চীন সীমান্ত বিরোধ ॥

লালচীনের রক্তচক্ষু এবার রুশ-সীমান্তে প্রসারিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও তার বক্তব্য, রাশিয়া তার বহু এলাকা জবরদখল করে বসে আছে। চীনে কমিউ-নিস্ট শাসন কায়েম হওয়ার পর সোভিয়েট ইউনিয়নই হয়ে ওঠে তার নিকটতম বন্ধু ও পরিত্রাতা। বিপ্লবের পর যেটুকু শিল্পোন্নতি হয়েছে চীনের, তার প্রায় সবটুকুই গড়ে উঠেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতায়। দশ বছর ধরে উভয় দেশের মধ্যে সহ-যোগিতা ও মৈত্রীর আদানপ্রদানের অন্ত ছিল না। অথচ সেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের যখন নানা কারণে বিরোধ ও মনোমালিন্য দেখা দিল, তখনই শোনা গেল সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে তার অন্তহীন অভিযোগ। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল ভূমি চুরির অভিযোগ। এই নির্লজ্জ আচরণের জন্য চীন বোধ হয় সবচেয়ে বেশী ধন্যবাদ পাবে ভারতের কাছে। কারণ, এই থেকেই বিশ্ববাসী জানতে পারবে যে, সীমান্ত বিরোধের অবতারণা চীন কখন কোন্ অবস্থায় করে এবং তার প্রকৃত তাৎপর্যই বা কি। ভারতের সঙ্গেও একদিন প্রেমে বিগলিত ছিল চীন, কিন্তু যখনই সে-প্রেমে ফাটল ধরল, তখনই চীন জাগিয়ে তুলল সীমান্ত বিরোধ।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে জানানো হয়েছে, গত এক বছরে চীন সোভিয়েট সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে অন্তত পাঁচ হাজার বার। তারপর এ-কথাও সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, চীনের এই অন্যায় আচরণ সোভিয়েট ইউনিয়ন খুব বেশী দিন বরদাস্ত করবে না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চীনের যে মনোভাব, তাতে মনে হয় না যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সতর্কতা তাকে সংযত করতে পেরেছে।

চীন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যে অঞ্চলগুলি জবরদখলের অভিযোগ এনেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হ'ল। (১) সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত কাজাকস্তান, কিরঘিজিয়া ও তাজিকস্তান প্রজাতন্ত্র, চীনের ভাষায় যা বৃহৎ উত্তর-পশ্চিম (দি গ্রেট নর্থ-ওয়েস্ট)। সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া ১৮৬৪ সালে, অর্থাৎ একশ' বছর আগে, চুগুচোক চুক্তিবলে চীনের ঐ স্থানগুলি দখল করে নিয়েছিল। (২) পামির মালভূমি; ১৮৯৬ সালে বৃটেন ও রাশিয়া গোপনে ষড়যন্ত্র করে ঐ এলাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। (৩) বৃহৎ উত্তর-পূর্ব (দি গ্রেট নর্থ-ইস্ট); সোভিয়েট ইউনিয়নের সাইবেরিয়া অঞ্চলের একটি বিরাট অংশ। চীনের বক্তব্য, আইগাম (১৮৫৮) ও পিকিং (১৮৬০) চুক্তিবলে শতাধিক বর্ষ আগে ঐ স্থানগুলি রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

অর্থনৈতিক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৬২-৬৩ সালের জাতীয় উৎপাদন পূর্ব বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও, যোজনাকারদের পরিকল্পিত বৃদ্ধির তুলনায় তা খুবই কম। ১৯৬১-৬২ সালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল পূর্ব বৎসরের তুলনায় ৬.৫ শতাংশ। ১৯৬২-৬৩ সালে এই বৃদ্ধির হার হয় ৮ শতাংশ। কিন্তু যোজনাকারদের লক্ষ্য ছিল ১১ শতাংশ।

কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যর্থতাই এর প্রধান কারণ। পি-এল ৪৮০ অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর খাদ্য আমদানি হওয়া সত্ত্বেও ভারতের চাহিদানুসারে খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

ভারতীয় বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল এ এম ইঞ্জিনীয়ার গত শনিবার কাশ্মীর উপত্যকায় গিয়ে বিমান বহরের ঘাঁটিগুলি পরিদর্শনকালে কয়েকজন বিমান-সেনানীর সহিত আলোচনা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এ পর্যন্ত ১২১৫ কোটি টাকার খাদ্য আমদানি করা হয়েছে। পূর্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৬২-৬৩ সালে কৃষিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় ৪·৬ শতাংশ, তার মধ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য-বৃদ্ধির পরিমাণ ৭·৩ শতাংশ।

১৯৬১-৬২ সালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি টাকা; ১৯৬২-৬৩ সালে ঐ ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩২ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালে ঘাটতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৮১ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় যোজনার শেষে ট্যাক্স হিসাবে আদায় করা হয় জাতীয় আয়ের ৯·৬ শতাংশ। ১৯৬৩-৬৪ সালে আদায় করা হবে জাতীয় আয়ের ১৩ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে বলা হয়েছে, একমাত্র খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করেই জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন করা সম্ভব।

* * *

১৯৬২-৬৩ সালে সিংহলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন পূর্ব বছরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেলেও ভারতের লাভের অংশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬২-৬৩ সালে ভারত-সিংহল বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, পূর্ব বছরে যা ছিল ২১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। ভারত থেকে সিংহলে গত বছর পণ্য রপ্তানি হয়েছিল ১৭ কোটি ৬ লক্ষ টাকার, '৬১-'৬২ সালে হয়েছিল ১৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার। কিন্তু এই এক বছরের ব্যবধানে আমদানি-করা পণ্যের দাম বেড়েছে ৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা থেকে ৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। সুতরাং ভারতের অনুকূলে ১৯৬১-৬২ সালে যেখানে আমদানি-রপ্তানির ব্যবধান ছিল ১২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার, গত বছরে তা কমে হয়েছে ৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।

ভারত থেকে সিংহলে রপ্তানি হয়েছে বস্ত্র, ফল ও সব্জি, বাগিচাজাত পণ্য (চা, কফি, কোকোয়া, মশলা ইত্যাদি)। আর সিংহল থেকে ভারতে আমদানি হয়েছে তৈলবীজ, বাদাম প্রভৃতি।

ভারতে গত বছর চা উৎপন্ন হয়েছে ৭৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড, যা থেকে বিদেশে চালান গেছে ৪৭ কোটি ১০ লক্ষ পাউন্ড। বাইরে এখনও পর্যন্ত বৃটেনই আমাদের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। বৃটেন কিনেছে ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড চা। বৃটেনের পরে স্থান মিশরের, ঐ দেশে চালান গেছে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ পাউন্ড। ক্রেতার তালিকায় তৃতীয় নাম সোভিয়েট ইউনিয়ন, সেদেশে চালান গেছে ২ কোটি ৬৩ লক্ষ পাউন্ড। চতুর্থ ক্রেতা আয়ার-ল্যান্ড নিয়েছে ১ কোটি ২৭ লক্ষ পাউন্ড। ইউরোপের অন্যান্য দেশ মিলিয়ে নিয়েছে কিঞ্চিদধিক এক কোটি পাউন্ড।

* * *

বেলজিয়াম থেকে ভারত কিনে আনছে ১০টি বৈদ্যুতিক রেলইঞ্জিন ও দশ হাজার টনের তিনটি জাহাজ। এর জন্যে ভারতের ব্যয় হবে প্রায় ১২ কোটি টাকা। বাংলা-বিহার কয়লাখনি অঞ্চলের সরবরাহ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক রেলইঞ্জিনগুলি ব্যবহার করা হবে।

সাহিত্য জগৎ

রাষ্ট্রপতির ভাষণ

রাসবিহারী এভিনুয়ে শরৎ চ্যাটার্জি পার্কে শরৎ-স্মৃতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন: "শরৎ সাহিত্য মানবতার জয়গানে বিধৃত। সমাজের সর্বপ্রকার কপটতাকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিয়া গিয়াছেন। মানবাত্মার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তিনি সমাজের বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

"বাঙলার দুইজন শ্রেষ্ঠ সন্তান—রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রও দেশের মানুষকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজ-

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণ
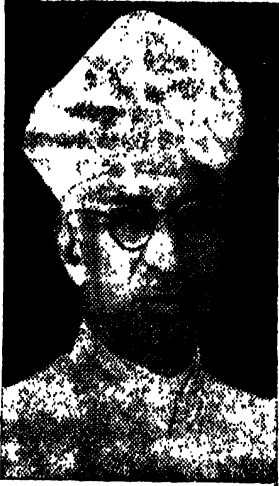
নৈতিক পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালা তিনি তাঁহার সাহিত্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"কলিকাতা মহানগরী কত স্বাধীনতা-যোদ্ধাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করিয়াছে। কিন্তু সে যুগে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য যাঁহাদের অবদান অসামান্য শরৎচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। পরাধীনতার গ্লানি তিনি তাঁহার সাহিত্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

মানবতার শ্রেষ্ঠ-পূজারী শরৎচন্দ্র সমাজের অবহেলিত অত্যাচারিতদের স্বপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। দরদ দিয়া তিনি তাঁহাদের বিচার করিয়াছেন। শরৎ-সাহিত্যে তাই তাহারা ভাগ্যহীন, হীন-চেতা নহে।

"সমাজের বর্তমান বিধানে সর্বপ্রকার নৈতিক কপটতা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। শরৎ-সাহিত্যে বিভিন্ন চরিত্রে ইহা অভিব্যক্ত। সামাজিক প্রথা যদি মানুষের প্রয়োজনে না আসে, তাহার টিকিয়া থাকার কোনো সার্থকতা নাই। সেইদিক হইতে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী ও বিপ্লবী।

"শরৎচন্দ্র চলমান আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের জয়যাত্রার গতি অবিরাম ও অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টাগণ সাহিত্যে যে ট্রাডিশন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, বাংলাদেশের অনুজ সাহিত্যিকেরা তাহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী"—বলে রাষ্ট্রপতি অভিমত প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতি এবারের কলকাতা সফরকালে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেন। এই সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবির যুক্তরাষ্ট্রের কন্সাল জেনারেল মিঃ ব্যাক্সটার এবং নিঃ ভাঃ বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা করেন।

সাহিত্য আকাদমির অনুবাদ গ্রন্থ

সাহিত্য আকাদমি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন ভারতীয় এবং বিদেশী মূল্যবান গ্রন্থসমূহ সর্বভারতীয় ভাষা-সমূহে অনুবাদ করা হচ্ছে। সাহিত্য আকাদমির এই উদ্যম ভারতবাসী মাত্রেরই আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করবে। সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ যে বিশ্বের বিভিন্ন ছত্রিশটি ভাষার ক্লাসিক সাহিত্য ভারতীয় ভাষাসমূহে অনুবাদের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আরবীয়, ইংরিজি, ফরাসী, জার্মাণ, চীনা, গ্রীক, ইতালীয়ান, জাপানী, ল্যাটিন, নরওয়েজীয়, রুশ, স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষার মধ্যে ম্যাকিয়াভেলি, থুকিডাইডিস, কনফুসিয়াস, মলিয়ের, সেক্সপীয়র এবং আরো অনেকের বই—বাঙলা গুজরাটী, হিন্দী, কানাড়ী, কাশ্মিরী, মালায়লম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলুগু এবং উর্দু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষাসমূহে অনুবাদ করা হয়েছে।

বিদেশী সাহিত্য

*** ডস্টয়েভস্কি ***

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে ডস্টয়েভস্কির স্থান নিরূপিত হয়ে গেছে বহু পূর্বেই। ম্যাক্সিম গোর্কি একবার বলেছিলেন : শিল্পের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের দিক থেকে তাঁর প্রতিভা শুধু শেক্স্পীয়রের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু বিগত পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে ডস্টয়েভস্কি সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়নি।

সম্প্রতি সোভিয়েত প্রকাশক 'মোলোদাইয়া গ্ভার্দিয়া', সোভিয়েত সাহিত্য-সমালোচক লিওনিদ গ্রসমান-এর 'ডস্টয়েভস্কি' গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন। প্রথম সংস্করণই মুদ্রিত হয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার কপি। ৫৪৪ পৃষ্ঠার এই বইয়ে গ্রসমান গত শতাব্দীর চল্লিশ-এর দশক থেকে সত্তর-এর দশক পর্যন্ত রাশিয়ার সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা ও সমকালীন জীবনের পটভূমিকায় ডস্টয়েভস্কির জীবন ও রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখার ধরণ ও ভাষা এতো স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল যে এই বইটি প্রায় উপন্যাসের মতোই সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিদেশী প্রকাশন-সংস্থা এই বইটির অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি চেয়েছেন।

*** নতুন উপন্যাসের লেখক ***

প্রথম প্রকাশিত রচনায় যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের তালিকায় আর একজনের নাম যোগ করবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। লেখকের নাম টমাস বার্জার। উপন্যাসখানির নাম হল 'রেইনহার্ট ইন লাভ'। মাত্র গত জুন মাসে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে।

*** পাকিস্তানে গ্রন্থ পুরস্কার ***

বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকগুলির মধ্য থেকে নির্বাচিত গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরস্কৃত করে থাকেন রবীন্দ্র-পুরস্কার দিয়ে। তাছাড়া আছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাময়িক ও সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সাহিত্য-পুরস্কার। সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কার 'অ্যাকাদেমী অ্যাওয়ার্ড'। মোটামুটিভাবে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্য থেকে নির্বাচিত গ্রন্থগুলিকে পুরস্কৃত করে থাকেন ঐ সমস্ত পুরস্কার-প্রদানের নির্বাচক কমিটি।

কিন্তু আমাদের বাংলার বাইরেও যে আর একটা বাংলাদেশ আছে সে-কথা অনেক সময়েই আমরা ভুলে যাই। সেখানে বাংলা ভাষা চর্চা আমাদের থেকে কোন অংশে কম নয়। উপরন্তু বহু পূর্বেই সেখানে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। স্বাভাবিকভাবে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হচ্ছে ঠিকই। এবং সেখানেও পুরস্কার প্রদান করে সাহিত্য-সেবী ও প্রকাশকদের উৎসাহ দান করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে 'দি ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান' কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কারগুলির মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্য থেকে তাঁদের নির্বাচিত ও পুরস্কৃত গ্রন্থগুলির নাম :

১। ছায়াহরিণ, প্রকাশক : কিতাবীস্তান, ঢাকা, শিল্পী আশিস চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদ প্রশংসালাভ করেছে। প্রথম পুরস্কার, ১০০০্ টাকা।

২। চীনা প্রেমের গল্প, প্রকাশক : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার, ৫০০্ টাকা।

১। ছবি আর বর্ণমালা, প্রকাশক : গ্রীণ পাবলিকেশনস, ঢাকা, শিশু-সাহিত্যের জন্য প্রদত্ত প্রথম পুরস্কার, ১০০০্ টাকা।

২। মাছরাঙা, প্রকাশক : কোহিনুর লাইব্রেরী, দ্বিতীয় পুরস্কার।

প্রচ্ছদ-অঙ্কনের জন্য পুরস্কারলাভ করেছেন শিল্পী কোয়ামারুল হাসান এবং হালিম খাঁ। গ্রন্থদুটির নাম যথাক্রমে 'লোকসাহিত্যে ছন্দ' ও 'আগডুম বাগডুম'। দুটি পুরস্কারেরই অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০০্ টাকা করে।

*** টলস্টয়ের জন্ম-বার্ষিকী ***

গত ৯ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব-সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী কাউন্ট লিও টলস্টয়ের ১৩৫তম জন্ম-বার্ষিকী পালিত হয়েছে। বাংলাদেশে টলস্টয় সুপরিচিত। তাঁর বহু রচনাই বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

আজকের দিনে টলস্টয়ের কথা ভারতে গিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের কথা স্মরণ না করে পারা যায় না। ১৯১০ সালে স্টকহোমে যে শান্তি কংগ্রেস হবার কথা ছিল, তাতে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে মৃত্যু-পথযাত্রী টলস্টয় উৎসাহের সঙ্গে এক নিবন্ধ লেখার কাজে রত হন। 'যুদ্ধকে কি ভাবে নিশ্চিহ্ন করা যেতে পারে' নামে পুস্তিকাটি পরবর্তীকালে বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন শিল্পী, রকওয়েল কেন্ট টলস্টয়কে বলেছেন 'শান্তির দেবদূত'। শান্তির সংগ্রাম সম্পর্কে টলস্টয় লিখেছিলেন, 'রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাত-সূর্যের উদয়ে'র মতোই আমাদের জয় সুনিশ্চিত।' —তাই আজ পৃথিবীর দুই শক্তিশালী রাষ্ট্র বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য যে ভাবে এগিয়ে এসেছে তাতে টলস্টয়ের বাণী সত্যে পরিণত হবার সম্ভাবনার দিন এগিয়ে এসেছে।

কলকাতায় সোভিয়েট অভিধান-প্রণেতা

ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণক্রমে যে দুজন বিশিষ্ট সোভিয়েট অভিধান-রচয়িতা ও ভারতবিদ এই মাসের গোড়ার দিকে ভারতে এসেছেন তাঁরা ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পৌঁছান। এই দুইজন ভারতবিদ হলেন ভারতীয় ভাষার অভিধানসমূহের সম্পাদকীয় দপ্তরের প্রধান ভি আই আলেকসিয়েফ (বামে) ও সিনিয়র সম্পাদক ভি এ ম্যাকারেঙ্কো। এঁরা রুশ-বাংলা, রুশ-হিন্দী ও রুশ-তামিল অভিধানগুলির পান্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। কলিকাতায় তাঁরা ভাষাবিদ পণ্ডিত ও অভিধান-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

সমকালীন সাহিত্য
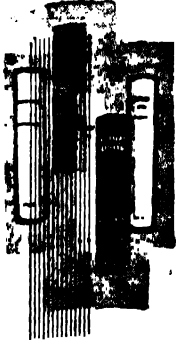
অভয়ঙ্কর
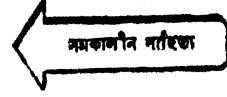
আমাদের দেশের কিছু মানুষের মনে এখনও একই সঙ্গে একই বিষয়ে দুরকমের মনোভঙ্গী সহাবস্থান করছে, সেইরকম একটি প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজীর সাম্প্রতিক এক উক্তিতে। কিছুকাল আগে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ-এ এক ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে আমাদের স্বদেশে ইংরাজী ভাষা একটা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন হয়ে উঠছে—

"We have arrived at a stage where we talk about Punjabi English, Bengali English and Madrasi English."

সংবাদপত্রের রিপোর্টে জানা যায় যে নেহরুজীর এই উক্তি প্রচুর হাসারোল-সহকারে নন্দিত হয়েছিল। সহজেই বোঝা যায় যে ইংরাজী ভাষার এই জাতীয় বহুবিধ রকমফের শুধু যে হাসির ব্যাপার তা নয়, এর মধ্যে হয়ত কিঞ্চিৎ জ্বালাও আছে। একথা ধরে নেওয়া যায় যে খাঁটি ইংরেজরা ঠিক যেমনটি লিখতে পারেন আমাদেরও ঠিক সেইরকমই লিখতে পারা উচিত, তার ব্যতিক্রমের অর্থ যে সে ইংরাজী ঠিক ইংরাজী নয়, ইংরাজী ভাষার অনুকৃতি বা caricature মাত্র, আবার সেই-সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ইংরাজী কোনোদিনই আমাদের জাতীয় ভাষা হিসাবে গৃহীত হবে না, 'আংরেজী হটাও' বলে কোমর বেঁধে আস্তিন গুটিয়ে আন্দোলনও করতে হবে পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ও বাঙালী ধরণের ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে।

নেহরুজীর কথাটি আরো একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে আমাদের পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বাঙালী, ইত্যাদি হরেকরকম ইংরাজীর অস্তিত্বই থাকে না, যদি না ইতিমধ্যে Indian English নামক একটা নতুন রীতির ভাষা চালু হয়ে থাকে, যেমন বিহারী হিন্দি, রাজস্থানী হিন্দি, ইউ পি হিন্দি, দিল্লীর হিন্দি প্রভৃতি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিভিন্ন রীতির হিন্দি গড়ে উঠছে। ভারতের প্রধানতম জাতীয় ভাষার যত সমৃদ্ধি হবে ততই তার বৈচিত্র্যবৃদ্ধি ঘটবে। আমেরিকাবাসীরা ইংরাজীকেই তাঁদের মাতৃভাষা করে রেখেছেন, তথাপি টেক্সান ইংলিশ, ইয়াঙ্কি ইংলিশ, প্রভৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মার্কিন ইংরাজী, কক্‌নি ইংরাজী, ওয়েলসীয় ইংরাজী এবং নদার্ণ টঙ্ প্রভৃতি ইংরাজী ভাষারই বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম অশ্বেত সম্প্রদায়ের—ইংরাজী ভাষায় যেখানে মানুষ কথা বলে ও লেখা পড়ে তার নাম—ভারতবর্ষ। সুতরাং যদি 'ইণ্ডিয়ান ইংলিশ' নামক একটি পদার্থ গড়ে ওঠে তাতে বিস্ময়ের কি আছে! সেটাই স্বাভাবিক কান্ড হিসাবে গ্রহণ করা কর্তব্য।

ভালোই হোক আর মন্দই হোক, ইণ্ডিয়ান-ইংলিশ নামক একটি পদার্থ গড়ে উঠেছে, তার স্বকীয় লালিত্য এবং মাধুর্য আছে। যে দেশের ভাষা এবং যাদের অধিকার এই ভাষায় ওপর সর্বাধিক তাদের কাছে এবং কানে এই 'ইণ্ডিয়ান-ইংলিশ' মারাত্মক মনে হতে পারে। এমন ধারণা যদি চালু থাকে যে কেবলমাত্র ইংরেজরা যেভাবে ইংরাজী বলে এবং লিখে থাকেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত তাহলে সেই ভাষার ঐশ্বর্য এবং প্রতিক্ষেপন শক্তিকে উপেক্ষা করা হবে। ইংরাজী ভাষা ভারতবর্ষে যেসব সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে একটি হল এই যে যে-সব ভারতীয় ভালো ইংরাজী বলতে বা লিখতে পারেন তাঁরা অসহিষ্ণুর ভঙ্গীতে অপরকে পাঞ্জাবী-ইংরাজী, মাদ্রাজী-ইংরাজী বা বাংলা-ইংরাজী বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন। আমাদের দেশের ভাষাগত সম্পদকে সেই নতুন-রীতির ভাষা যে কি আশ্চর্যভাবে সমৃদ্ধ করছে তা তাঁরা ভেবে দেখেন না, বা ভাবা উচিত ব'ল মনে করেন না।

এই মনোভঙ্গী প্রশংসনীয় নয়, আশ্চর্য মনে হতে পারে। কিন্তু কোয়েসলার লিখিত কখ্যাত গ্রন্থ "THE LOTUS AND THE ROBOT"-এ জাপানীরা উত্তমশ্রেণীর ইংরাজী লিখতে পারেন না বলে যে তাচ্ছিল্য করা আছে তার সঙ্গে এই উক্তির অদ্ভুত মিল আছে। কোয়েসলার তাঁর এই গ্রন্থে ইংরাজী ভাষার জাপানী অধ্যাপককে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন যে জাপান যদিও এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন উন্নত জাতি, তথাপি জাপান —"most drastically cut off from verbal commerce with the West."

হয়ত কোয়েসলারের এটা অনুযোগ মাত্র। মনে হয় তাই, কারণ তিনি বলতে চান যে জাপানীরা ইংরাজী কায়দায় চিন্তা করতে পারেন না। অথচ এই

দ্বটি থাকা সত্ত্বেও জাপানীরা উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে উঠতে পেরেছে। এই-সব উক্তি, মনোভঙ্গী, উপেক্ষা এবং উপহাসের মধ্যে একটি নীতিবাক্য আছে—সেটি 'বুঝ সাধু যে জানো সন্ধান'।

রাজনৈতিক বিচ্ছেদ যতই থাকুক, এবং ইংরাজী ভাষার ওপর অবজ্ঞা যতই প্রবল হোক ইংরাজী ভাষাকে আমরা যে কত অন্তরঙ্গ করে নিয়েছি তার প্রমাণ ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর পরিমাণ ও উন্নততর মান যা আগেও ছিল এবং অদ্যাপি চালু আছে।

স্বাধীনতালাভের পূর্বে আবেদন-নিবেদন ইত্যাদির পুস্তিকা রচিত হলেও সাহিত্যিক সম্পদও সৃষ্টি হয়েছে, এবং বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নোবেল প্রাইজে সম্মানিত হয়েছেন আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীতে 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ করার জন্যই। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীঅরবিন্দ, তরু দত্ত, মনমোহন ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি অবিস্মরণীয় মনীষীবৃন্দের সাহিত্য-কৃতির-নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

১৯৪৭-এর পর ইংরাজী ভাষা মুখ্যত স্বাধীনতা-সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করল এবং গল্প, উপন্যাস, কবিতা, সমালোচনা, আত্মজীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছে। গদ্যে মুলক রাজ আনন্দ, খুশাবন্ত সিং, সুধীর ঘোষ, নীরদ চৌধুরী, ভবানী ভট্টাচার্য, আর কে নারায়ণ প্রভৃতি, কবিতায় বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, ডম মোরায়েস, পি লাল, নিশিম ইজেকিইল প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। এইসব ভারতীয় নবীন কবি-বৃন্দ অতি স্বাভাবিক কারণেই এমন বাক-প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করবেন যা মূলতঃ ভারতীয়।

বেতারে একটা আলোচনা-প্রসঙ্গে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষার প্রধান অধ্যাপক ডঃ রাজন বলেছেন যে, ইংরাজী ভাষায় ভারতীয়দের অবদান বর্তমান কালে অতিশয় উত্তম, পাশ্চাত্য দেশীয় মানুষের লিখিত ইংরাজীর চাইতে কোনো অংশেই হীন নয়। কথাটি সত্য। ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে ভারতে রাজনৈতিক মনোভঙ্গী অনুদার হওয়া সত্ত্বেও এই অবস্থা। যদিচ ইংরাজী ভারতের অনেকের মাতৃভাষা তথাপি সিডিউলে তার অষ্টম স্থান মাত্র।

আজ পৃথিবীতে ইংরাজীর সম্মান ক্রমবর্ধমান, তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক, ভারত সরকার ইংরাজী ভাষার ক্রমাবনতির এই ভয়াবহ অবস্থা লক্ষ্য করেই একটু সচেতন হতে পেরেছেন। তবে কি ইংরাজীর আসন এদেশে পাকা হয়ে রইল?

নেহরুজী যাই বলুন, ইণ্ডিয়ান ইংলিশকে যদি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে আমাদের স্বদেশী প্রকাশকদের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করে বসে থাকলে চলবে না, সৎ সাহিত্যগ্রন্থও প্রকাশ করতে হবে। ইংলণ্ড বা আমেরিকায় ভালো গ্রন্থ সম্মানিত হলে তারপর এদেশে তার সমাদর ঘটে, এমন হয়েছে বারবার। এদেশে সেই গ্রন্থ ছেপে প্রকাশ করতে কি বাধা ছিল? রবীন্দ্রনাথকে এই নিয়ে আক্ষেপ করতে হয়েছে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। এদেশ সেদিন থেকে বিশেষ অগ্রসর হয়েছে মনে হয় না।

স্বদেশী ইংরাজীতে লজ্জা নেই, স্বদেশী ইংরাজীর লেখককে আজো প্রতিষ্ঠিত করার কোনো প্রচেষ্টা না দেখেই দুঃখবোধ করা প্রয়োজন, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী বা বাঙালী ইংরাজীর জন্য আক্ষেপের প্রয়োজন তেমন প্রবল নয়। স্বদেশী লেখকের গ্রন্থ স্বদেশে প্রকাশিত হয়ে বিদেশ থেকে জয়মালা নিয়ে আসুক, সেইদিনই ভারতের সাংস্কৃতিক অভিযান সার্থক হবে।

প্রেমের একটি সার্থক ব্যঞ্জনা

আধুনিক কবিতার চাতুর্য পরিবর্জন করে, ভাবের জটিলতা বা ভাষার দুরূহতা পরিহার করেও, এ-কালের বিশিষ্ট মহিলা-কবি উমা দেবীর সাম্প্রতিক কাব্য 'অরণ্য-মন' নিঃসন্দেহে আধুনিক, অথচ কোথাও আধুনিকতার তীব্র মোহ নেই। এঁর কাব্যে আছে এক অপূর্ব স্নিগ্ধতা আর মাধুর্য, বক্তব্য তাঁর ঋজু এবং স্থিরলক্ষ্য। এখানে কবি প্রেমের সার্থক ব্যঞ্জনায় তাঁর প্রেমাতুর মনকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, বিষয় ও ভঙ্গীতে একাত্মতা এনে পাঠক-মনের গভীরে প্রবেশ করেছেন। সহজ-স্বচ্ছ অনাড়ম্বর ভাষায় যে রসলোক সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তিনি বলেন :
এখন তোমাকে পেতে সাধ। আবার বলেন :

তুমি কেন ভেসে যাও সুরভি
মসৃণ-নীল ঘুমের প্রবাহে
—যখন জগৎ জ্বলে রক্তাক্ত
দুঃস্বপন-জাগা মর্মান্তিক দাহে।

এ-কাব্যগ্রন্থের সর্বত্র এক গভীর আন্তরিকতা, মিষ্টি হাতের স্পর্শ এবং পরিণত মননের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কুয়াশা', 'নিশীথ', 'অন্ধকার', হৃদয়' প্রভৃতি শব্দের প্রতি কবির বিশেষ সহানুভূতি এক ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

অরণ্য-মন— (কাব্যগ্রন্থ)—উমা দেবী। প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম : চার টাকা।

প্রকাশ-প্রকরণে সমৃদ্ধ কবি

যদিও পঞ্চাশেই কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তবু তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যে কোনো নিঃশ্বাসে' প্রকাশিত হোল ষাটের প্রারম্ভে। চিত কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২। এ কবিতাসমূহে আমরা এমন এক কবির সান্নিকট হই যিনি যথার্থই আধুনিক, অসুখী, অস্থিরতায় আর্ত। অন্ত্যার্থক বিশ্বাসমুখীনতা যদিও তাঁর কবিতায় লক্ষিত হয়, যদিও তিনি উপলব্ধি করেন 'পড়ে যেতে যেতে তবু আকাশের অধিকার চোখে মুখে বক্ষে' রাখার মহত্ত্ব, তবু বিশেষ বিশ্বাসে তিনি নিবদ্ধ হতে পারেন না। এবং একজন তরুণ কবির পক্ষে সেরূপ বিশ্বাসী হওয়া সম্ভবও নয়।

প্রকাশ-প্রকরণের নৈপুণ্য কবিতার সার্থকতার প্রথম শর্ত। এবং এই উপস্থাপন-কুশলতা সমরেন্দ্রবাবুর আয়ত্ত। আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাবলী এ মন্তব্যের সমর্থক। 'আমার বুক ভাঙতে ভাঙতে অন্ধকার গেল', কিম্বা 'এখনো রজনী এলে নিষিদ্ধ ফলের বৃক্ষ সতীদেহে দোলে', অথবা 'অদূরে পিয়ানো বাজছে; কোন নদী যেন পথ ভুলে। এঘরে ঘুরছে বৃথা বাদকের আকীর্ণ আঙুলে।' ইত্যাকার বহু পংক্তিতেই কবির অনুভবময় বক্তব্য অলংকৃত—ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। এবং এবম্বিধ চরণ-নির্মাণ কবির নৈপুণ্যের অভিজ্ঞান।

পরিশেষে কি যেন না-বলায় অস্বস্তি তবু থেকে যায়। তা হোলো, গ্রন্থটি পাঠ করে কবিকে নিশ্চিতভাবে আধুনিক কাব্য-রচয়িতাদের অন্যতম বলে মনে হয়, অথচ স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট করে চিহ্নিত করা কঠিন বোধ হয়। ফলত, চিন্তা এবং প্রকাশে এ'র কবিতা যেন কিছুটা আধুনিকতার ম্যানারিজম্ ও ক্লিশেতে আক্রান্ত, আবদ্ধ। হয়ত বা, কবিতায় বিশ্বব্যাপী যে অনুম্বেলবদ্ধতা সাম্প্রতিক কালে পরিদৃষ্ট আলোচ্য কবিও তার থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। অথবা এটা সময়ের দুর্লঙ্ঘ্য বিধান। একথা যেন কবিরও অজ্ঞাত নয়। তাই, এ গ্রন্থের যে কবিতাটি আমাকে সর্বাধিক আলোড়িত করেছে, সেই 'বোধন' শীর্ষক কবিতায় কবির আর্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

ভাঙো, চুরমার করো ওই তৃষ্ণাহীন
শব্দের পাহাড়;
এমন নিস্তব্ধ আমি বাংলাদেশ
কখনো দেখিনি।
....
ভাঙো, চুরমার করো, যদি ধ্বংসের ভেতরে
কোনো শব্দের দেবতা জাগে।

যে কোনো নিঃশ্বাসে (কবিতাগ্রন্থ) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। বসুচৌধুরী। কলিকাতা : ১২। দাম দু'টাকা।

জীবন-সত্যের বলিষ্ঠ প্রকাশ

'পথ চলিতে' উপন্যাসের কাহিনী-সৃষ্টিতে লেখিকা প্রীতিময়ী কর স্বীয় চিন্তা-চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। প্রেমধর্মী এই উপাখ্যানে নায়ক-নায়িকার প্রত্যক্ষ জীবন-চিত্রের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের যে গভীরতর সত্যরূপটি উদ্ঘাটিত তা লেখিকার গভীরতর জীবন-বোধের পরিচায়ক।—বাঙলা-সাহিত্যে মহিলা কথাশিল্পীদের ক্ষেত্রে তা অনেকটা ব্যতিক্রম-বিশেষ। তাছাড়া সমগ্র কাহিনীর মধ্যে একটি উদ্দেশ্যপ্রচারের যে গোপন ইচ্ছা বর্তমান তা কোথাও সমগ্র কাহিনীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। কাহিনী-রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

লেখিকার রচনার সবথেকে বড় গুণ তাঁর ভাষভঙ্গী। সাবলীল ভাষার জন্য প্রকাশভঙ্গী বলিষ্ঠ রূপে স্পষ্ট।

পথ চলিতে (উপন্যাস)— প্রীতিময়ী কর। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

●

অকৃত্রিম অভিজ্ঞান

কিরণশংকর সেনগুপ্তের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দিন যাপন'। চল্লিশের প্রাক্কালে কবিতা রচনা শুরু করে কবি কিরণশংকর চল্লিশের দশকে অন্যতম প্রতিষ্ঠিত কবি হিসেবে গণ্য হন। প্রকাশিত কাব্যসংখ্যা থেকেই অনুমেয় যে দীর্ঘকাল ধরে রচনাকার্যে ব্যাপৃত থাকলেও কবির রচনা অপর্যাপ্ত নয়। বর্তমান গ্রন্থে কবির পূর্বতন কাব্যগ্রন্থদ্বয় থেকে 'হে ললিতা ফেরাও নয়ন', 'স্বর' ইত্যাদি কয়েকটি খ্যাত কবিতাও সংকলিত হয়েছে।

কবি কিরণশংকর অজটিল কবিত্বের অধিকারী। ফলত এই চরিত্র-সারল্য এবং দুর্বোধ্যতার প্রতি অনাসক্তির জন্যই কবি প্রধানুগ চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিতে পরাঙ্মুখ নন। দিনযাপনের ক্লান্তিকর গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করে, কিন্তু মুমূর্ষু করতে পারে না, এক সুস্থ, আশাবাদী জীবনবোধ তাঁকে বারেবারে উদ্দীপিত করে। এ বোধ দ্বিধাগ্রস্থ নয় বলেই তাঁর উচ্চারণ ঋজু, দৃপ্ত। মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা, কুটিল রাজনীতি, লুব্ধ নীচতা—সমস্ত প্রত্যক্ষ করেও তিনি প্রত্যয়ে নিষ্ঠ :

কারা দৃঢ় পদক্ষেপে বেগে
সম্মুখে এগোয় পথে রাত্রিশেষে
মরীয়া আবেগে
দীর্ঘদৃপ্ত অভিযানে; সে-গতির
উত্তাপ মননে
অকৃত্রিম অভিজ্ঞান সৃষ্টি করে
যুগসন্ধিক্ষণে।
[দিন যাপন]

কর্মের আনন্দ, গৃহাসক্ত প্রেম, দেশ-প্রীতি প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী মানবিক অনুভব তাঁর মনীষাকে আলোড়িত করে, এবং তাঁর কাছে উচ্চারণের দাবী জানায়, ফলত এই সব সুস্থ মূল্যবোধই তাঁর কবিতা-রচনার উৎস। আশ্চর্য সরল কণ্ঠে তিনি বলতে পারেন—

ভালোবাসা, তুমি থাকো সমস্ত সৃষ্টির
অনুভবে
একটি রেখার মত আন্দোলিত নিভৃত
গৌরবে।
[ভালোবাসা]

বক্তব্যের উপস্থাপনায় কবি আয়ত্ত করেছেন এক প্রত্যক্ষ, সহজ ভঙ্গি—যা তাঁকে চিহ্নিত করে। এবং এদিক থেকে আধুনিক কবিতার গোঁড়া বিরোধীরাও তাঁর কবিতায় খুব একটা অসন্তুষ্ট হতে পারবেন না। পয়ারের আধারে প্রচলিত বাগ্‌যোজনাই প্রায়শ কবির কবিতার আশ্রয়। আর মাঝে মাঝে আবেগে উচ্ছল হয়ে উঠেছে তাঁর উচ্চারণ, প্রকাশে যুক্ত হয়েছে অলংকার। কবিত্বের মননসমৃদ্ধি এ কবিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

গ্রন্থের পশ্চাদপ্রচ্ছদে কবি কিরণশংকর সেনগুপ্তের কবিতা সম্পর্কে অগ্রণী কবিদের প্রশংসাসূচক অভিমত-সমূহের কয়েকটি সংকলিত হয়েছে।

দিন যাপন (কবিতা সংগ্রহ) কিরণশংকর সেনগুপ্ত। কবিতা পরিষদ। ৮০।২।৬, লেক রোড, কলকাতা—১৯। দাম আড়াই টাকা।

●

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

বসুধারা—(সপ্তম বর্ষ। ১ম খণ্ড। ৪র্থ সংখ্যা)—সম্পাদক : সুকুমার দত্ত। ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

'বসুধারা' পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রচনা শ্রীসুকুমার দত্তের 'ছন্দ-বিপ্লবী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল'। এই প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালকে বাঙলায় গদ্যকবিতার প্রবর্তক বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাঙলা ছন্দের বিবর্তনে দ্বিজেন্দ্রলালের মূল্যবান ভূমিকা এতদিন পর্যন্ত অস্বীকৃত বা অবহেলিত ছিল। বর্তমান প্রাবন্ধিক সে সম্পর্কে মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। সাহিত্য-সমালোচকেরা এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত করলে বহু নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হবে বলে মনে হয়। তাছাড়া আছে জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর চারটি গল্প। উপন্যাস, রম্য-রচনা, রস-রচনা প্রভৃতিতে বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

প্রাচীন সাহিত্য

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কবির গান

(১০)

'আদি কবি' গোঁজলা গ‌ুঁই এবং তাঁর শিষ্য রঘ‌ুনাথ দাস

গোঁজলা গ‌ুঁইকে 'আদি কবি' বলা হচ্ছে এইজন্যে যে আর কোনো কবি-ওয়ালার নাম আমাদের জানা নেই। ঈশ্বর গ‌ুপ্তের সংগ‌ৃহীত কবিজীবনী ছাড়া এ'র নাম আর কোথাও উল্লিখিত হয়নি। গ‌ুপ্ত কবি এ'র সম্বন্ধে লিখেছিলেন,

..."১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল গোঁজলা গ‌ুঁই নামক এক ব্যক্তি পেশাদারি দল করিয়া ধনীদিগের গ‌ৃহে গাহনা করিতেন, ঐ ব্যক্তির সহিত কাহার প্রতিযোগিতা হইত তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তৎকালে টিকেরার বাদ্যে সংগত হইত। লাল‌ু নন্দলাল, রঘ‌ু ও রামজী এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত গোঁজলা গ‌ুঁই প্রভৃতির সংগীত শিষ্য ছিলেন।"
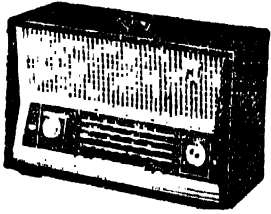
এই তথ্যটি বেরিয়েছিল ১২৬১ সালের ১লা অগ্রহায়ণের সংবাদ প্রভাকরে। ঈশ্বর গ‌ুপ্তের তথ্য প্রামাণিক কি না বলা যায় না। তাঁর সংবাদও লোক ম‌ুখে পাওয়া। তবে এই সংবাদ যদি সত্য হয় তো গোঁজলা গ‌ুঁই আজ থেকে আড়াই শ বছর আগে বর্তমান ছিলেন।

লাল‌ু নন্দলাল, রঘ‌ু ও রামজী সম্বন্ধে ঈশ্বর গ‌ুপ্তের উক্তিটি একটু সতর্কভাবে বিচার করতে হবে। তিনি যে বলেছেন, এ'রা তিনজন (?) গোঁজলা গ‌ুঁই প্রভৃতির শিষ্য ছিলেন সেটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। "গোঁজলা গ‌ুঁই প্রভৃতি" এই উক্তির তাৎপর্য কি? গোঁজলা গ‌ুঁই ছাড়া তাঁর সমকালীন আর কোনো কবির নাম সংগ্রহ করতে পারেননি বলে গ‌ুপ্ত কবি এই 'প্রভৃতি' শব্দটির দ্বারা সেকালকার সকল কবিওয়ালাকেই ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করেছেন। 'গোঁজলা গ‌ুঁই প্রভৃতির শিষ্য' বলে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের সকলে অথবা তাঁদের মধ্যে একজনও গোঁজলা গ‌ুঁইয়ের শিষ্য না-ও হতে পারেন। অন্ততঃ এমন কোনো প্রমাণ নেই যে তুলে ধরতে পারি।

গোঁজলা গ‌ুঁই প্রাচীনতম না হোন তবে প্রাচীন কবিওয়ালাদের অন্যতম এতে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। আর শিষ্য বলে যাঁদের নাম করা হয়েছে তাঁরা খ‌ুব সম্ভব সাক্ষাৎ-শিষ্য ছিলেন না, তবে গোঁজলা গ‌ুঁইকে তাঁরা প‌ূর্ব-স‌ূরীর সম্মান দিয়েছিলেন।—এই অন‌ু-মান করা যায়।

তথাকথিত শিষ্যদের কিছ‌ু কিছ‌ু গান পাওয়া গেছে। আমাদের এই প্রবন্ধ-ধারায় তার দ‌ৃষ্টান্তও দিয়েছি। কিন্তু কোনো ভণিতায় গোঁজলা গ‌ুঁইয়ের নাম দেখছি না। প‌ুরাতন কবিওয়ালাদের মধ্যে অনেকে গ‌ুর‌ুর নাম ভণিতায় উল্লেখ করতেন তার নজির আছে। গ‌ুর‌ু গোঁজলা গ‌ুঁইয়ের সে সৌভাগ্য হয়নি।

এ'র কবিত্বের পরিচয়ও সামান্যই পাওয়া গেছে। যেট‌ুকু পাওয়া গেছে সেও ঈশ্বর গ‌ুপ্তের দান। তিনি লিখেছেন,

"গোঁজলা গ‌ুঁই যে সমস্ত গান প্রস্তুত করেন কোনো বিশেষ বন্ধ‌ুর কর‌ুণায় তাহার দ‌ুইটি গীতের কিয়দংশ লাভ করত ঃ সাধারণের গোচরার্থ প্রফ‌ুল্লান্তঃকরণে প্রকটন করিলাম।" গ‌ুপ্ত কবির সংগ‌ৃহীত প্রথম গানটি এই ঃ

এসো এসো চাঁদবদনি।
এ রসে নিরাসো কোরো না ধনি॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ
তুমি কমলিনী আমি সে ভ‌ৃঙ্গ
অন‌ুমানে ব‌ুঝি আমি সে ভুজঙ্গ
তুমি আমার তায় রতনমণি॥

তোমাতে আমাতে একই কায়া
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥

দ্বিতীয় গানটির দ‌ুটি মাত্র ছত্র পাওয়া গেছে ঃ

প্রাণ তোরে হেরিয়ে দ‌ুখ দ‌ূরে গেল মোর।
বিরহ অনল হইল শীতল
জ‌ুড়াল প্রাণ চকোর॥

গোঁজলা গ‌ুঁইয়ের প্রথম গানটি পড়ে ঈশ্বর গ‌ুপ্ত আনন্দে অতিশয় উচ্ছ‌্বসিত হয়েছিলেন। তাঁর সেই উচ্ছ‌্বাসের অভি-ব্যক্তিট‌ুকু উদ্ধ‌ৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

ঈশ্বর গ‌ুপ্ত বলছেন,—"ইহার প্রথম গানটি কি চমৎকার!—বেদান্ত সিদ্ধান্তবৎ সিদ্ধান্তস‌ূচক শব্দবিন্যাস দ্বারা মনের ধ্বান্ত মোচন করিয়াছে। হায়রে, গ‌ুঁই, তুই কি মান‌ুষ ছিলি রে! মহাশ‌ুন্যের ন্যায় যাহার বিস্তার, তাহার নাম "গোঁজলা", আঁজলার দ্বারা কি এই গোঁজলার নির‌ুপণ হইতে পারে?"

রঘ‌ুনাথ

"গোঁজলা গ‌ুঁই প্রভৃতির" শিষ্য হিসাবে যে তিনটি নামের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হল রঘ‌ু। এ'র প‌ুরো নাম রঘ‌ুনাথ দাস।

রঘ‌ুনাথ দাস গোঁজলা গ‌ুঁইয়ের শিষ্য ছিলেন কি না সে বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে কিন্তু তিনি নিজে যে অনেক নাম-করা শিষ্যের গ‌ুর‌ু ছিলেন তার প্রমাণ আছে। রাস‌ু, ন‌ৃসিংহ আর হর‌ুঠাকুর কবিওয়ালাদের মধ্যে তিনটি দিক‌্পাল ছিলেন। তিনজনেরই শিক্ষারম্ভ রঘ‌ু-নাথের কাছে।

রঘ‌ুনাথের জন্ম হয় ১৭২৫ বা তার কাছাকাছি কোনো সময়ে। শোনা যায় অষ্টাদশ শতকের নবম দশকের শেষের দিক পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

'বঙ্গভাষার লেখক'-এ রঘুনাথ দাস সম্বন্ধে চার ছত্র পরিচয় আছে :

"কেহ বলেন রঘুনাথ সংশূদ্র, কেহ বলেন কর্মকার। কেহ বলেন কলিকাতায়, কেহ বলে সালিখায় কেহ বলেন গুপ্তিপাড়ায় রঘুর বাস ছিল। রঘু প্রকৃতপক্ষে দাঁড়া কবির সৃষ্টিকর্তা। রঘুর নিকটেই রাসুসিংহের 'কবি' শিক্ষা।"

অন্যসূত্রে জানা যায় রঘুনাথ জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন এবং তাঁর বাড়ি ছিল চুঁচুড়ায়। এ'র দুই পুত্রের নাম পাওয়া যায়। একজন মাধব অন্যজন নীলাম্বর। জীবনেতিহাস এর বেশী জানা যায়নি। একজন লিখেছেন রঘুনাথের একজন বংশধরের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে ইংরেজি শিখেছিলেন, তাঁর নাম নবীনচন্দ্র দাস।

'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে রঘুনাথ দাসের রচিত বলে একটি গান উদ্ধৃত করা হয়েছে। আমরা সেটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

ধিক ধিক ধিক তার জীবন যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন
সে চাহে না আমি তার যোগাই মন।
যেখানেতে না রহিল মানী জনার মান
সে কেমন অজ্ঞান তারে সঁপে প্রাণ।
সেধে কেঁদে হয়ে গেছে কলঙ্কভাজন॥
একি প্রণয়ের রীতি সই শুনেছ এমন
কেহ সুখে থাকে কেহ দুঃখে
জ্বালাতন।

শয়নে স্বপনে মনে যে যারে ধেয়ায়
সে জন তাহায় ফিরে নাহি চায়
তথাপি না পারে তারে হতে বিস্মরণ॥
সখি পিরীতি পরম ধন জগতের সার
সুজনে কুজনে হলে হয় ছারখার
সামান্য খেদের কথা একি প্রাণসই
কারেই বা কই প্রাণে মরে রই
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছন॥
যারে ভাবিব আপন সই
তার এ বোধ নাই
এমন প্রেমের মুখে তারো মুখে ছাই।
হেন অরণ্য রোদনে ফল আছে কি
এ হতে সুখী একা যে থাকি
ধরে বেঁধে করা কিনা প্রেম উপার্জন॥
যার স্বভাব লম্পট সই তার কি এ বোধ
আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ
অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন
এরূপ মিলন না দেখি কখন
রঘু বলে কোথা মিলে দুজনে সুজন॥

'প্রীতিগীতি' গ্রন্থেও এই গানটিকে রঘুর রচনা বলেই ধরা হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সংকলনে এই গানটিকে হরুঠাকুরের রচনা বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

রঘুর ভণিতাযুক্ত আরও একটি গান এখানে উদ্ধৃত করছি :

কদম্বতলে কে গো বাঁশি বাজায়।
এতদিন আসি যমুনা জলে
আমি এমন মোহন মুরতি কখন
দেখিনি এসে হেথায়॥
অঙ্গে গৌর চন্দনচর্চিত বনমালা গলায়।
গুঞ্জে বকুলের মালে বাঁধিয়াছে চূড়া
ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥
সেই সজল নবজলদ বরণ
ধরি নটবর বেশ।
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ
এই কি রসিক শেষ॥
চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ নখরের ছটায়।
আমার হেন লয় মন জীবন যৌবন
সর্পিব ও রাঙ্গা পায়॥
হায় অনুপম রূপ মাধুরী সখি
হেরিলাম কি ক্ষণে।
প্রাণ নিল হরে ঈষত হেসে
বঙ্কিম নয়নে।
সই কেন বা আপনা খেয়ে
আইলাম যমুনায়।
হেরে পালটিতে আঁখি নাহি পারি সখি
রঘু কহে একি দায়॥

গানটিতে রঘুর ভণিতা আছে বলেই এটিকে রঘুর রচনা বলে ধরা হচ্ছে। বাঙালীর গানে এবং বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে গানটিকে রঘুর বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত এটিকেও হরুঠাকুরের রচনা বলে অনুমান করেন। তাঁর ধারণা হরুঠাকুরই নিজের রচিত গানের ভণিতায় গুরুর নাম বসিয়ে গুরুঋণ শোধ করেছেন। উভয় পক্ষেরই নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব। অনুমান ছাড়া উভয় পক্ষেরই আর কোনো অবলম্বন নেই। তা যখন নেই তখন যুক্তিটা যেদিকে বেশি ভারী হয় আমাদের মনের পাখা সেইদিকেই ঝুঁকবে। আমরা বলি ভণিতায় যাঁর নাম আছে রচনা তাঁর হওয়াই স্বাভাবিক। যতক্ষণ না যুক্তিসহ প্রমাণ পাচ্ছি তিনি ইচ্ছে করে তাঁর নিজের গানে অন্যের নাম বসিয়ে দিয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত পাল্লার ঝুলে থাকবে নামের দিকে। নাম লঘু হলেও গুরুর চেয়ে তার গুরুত্ব বেশী।
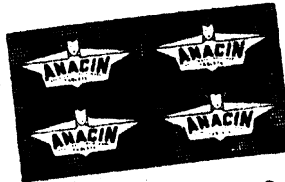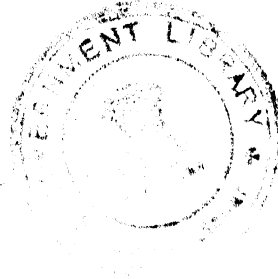
একান্ত বাতাস

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

সকালে জানালায় মাঙ্গলিক রোদ,
পান্থপাদপেরা বর্ণময়,
এসেছে সভাসদ শালিখ, পারাবত;—
একটি ইচ্ছার বাতাস বয়।

শাসন ছুঁড়ে ফেলে বাইরে চলে আসি,—
দু' চোখে ভীরু ঢেউ অবাধ্যতা
বুকের বানে মাথা একটিবার তুলে
মিলিয়ে যায়—মরা নদীর সোতা।
এতই ভীরু ঢেউ অবাধ্যতা।

দেখেছি, স্বাভাবিক দিনে ও রাত্রিতে
ইচ্ছাময় জালে হাজার দেহ
পড়েছে বাঁধা; যারা জেনেছে বলে, সে-ই
সার্বভৌমিক, অপরাজেয়।
বেঁধেছে এক জাল হাজার দেহ।

অথচ তুমি শত যোজন দূরে থেকে
অমোঘ ইচ্ছাকে বলো,
অনেক ফুল নয়, একটি ফুল নিয়ে
এবার বাড়ি ফিরে চলো॥

সৌপ্তিক

কমলেশ চক্রবর্তী

বুকে আমার সিন্ধু দোলে প্রেমের বিশ্বাসে
পাপড়ি খুলে দৃষ্টি হানে শোণিত অফুরান
মরণ আসে হৃদয় ঘিরে মরণ ভাসমান।

বুকে আমার সিন্ধু দোলে প্রেমের বিশ্বাসে
অলীক পায়ে মর্মরিত পাদপ মৎসর
চতুর্দিকে কেঁপে উঠলো আরেক তৎপর।

বুকে আমার সিন্ধু দোলে প্রেমের বিশ্বাসে
গগন ছেয়ে জগৎময় আবরি বনস্থলী
ফুলের বুকে নিদ্রা-ভূত গরলোপমা অলি।

বুকে আমার সিন্ধু দোলে প্রেমের বিশ্বাসে
হৃদয় মেলে গোপন করি প্রেমের অভিসার
কিন্তু তুমি আচম্বিতে মরণ উপমার।

সিন্ধু ফেটে জীবন ঘেরে সাগর দুঃসহ।
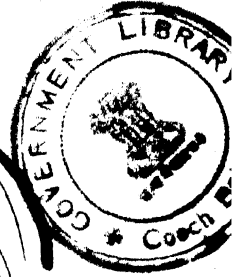
শ্যামাকান্তার ঘুম ভেংগে গেল। বিছানায় উঠে বসল সে। আলো না জেবলেও বুঝতে পারলো সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে পিঠের তলার বিছানার চাদরটা ঘামে বিছানার সংগে সেঁটে গেছে। গরম! অসহ্য গরম। জানালার দিকে চেয়ে দেখলো খোলাই আছে সেটা কিন্তু না, হাওয়ার কণামাত্র আভাসও তার শরীরকে শীতল করছে না। দারুণ বিতৃষ্ণায় বিছানা থেকে নেমে একটা বিড়ি ধরালো শ্যামাকান্ত। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলো অন্ধকার, কোথাও কোন শব্দ নেই, সব নিঃঝুম, মানে সবাই ঘুমুচ্ছে। এক গ্লাস জল খেয়ে আবার ঘুমের চেষ্টা করল শ্যামাকান্ত। কিন্তু না, ঘুম তার কিছুতেই এলো না। নানান ভাবনা আসতে লাগল তার মনে। এলোমেলো অসংলগ্ন চিন্তা। মন নিয়ে কারবার শ্যামাকান্ত করে না। খাটো, ঝগড়া করো, খাও, ঘুমও এই তার জীবন। আশ্চর্য। তার আঠাশ বছরের জীবনে এই প্রথম সে নিজের মধ্যে একটা মনকে অনুভব করল। হঠাৎ নিজেকে বড় একা মনে হোল তার। এত বড় বাড়ীটায় সকলেই ঘুমুচ্ছে, সে একাই শুধু ঘুমুতে পারেনি। কেউ কি তার মনে দুঃখ দিয়েছে? কেউ কি তাকে অপমান করেছে? না তা তো নয়, এত নরম মন তো তার নয়। দূর শালা, এ সব কি ভাবছি! আবার একটা বিড়ি ধরাল শ্যামাকান্ত। তারপর আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো সে।

সেই নির্ঘুম রাত্রে সবাই যখন ঘুমুচ্ছে তখন অন্ধকারে পথ চলতে লাগল শ্যামাকান্ত। আকাশে চাঁদ ছিল না, অন্ধকারে ভরে ছিল চারদিক। শুধু বহুদূর থেকে নেমে আসা তারার আলোয় তার মনে হোল যেন এক অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে। সেই তারার আলো ছড়ান অন্ধকারে নির্জন পথে তার আবার মনে হোল সে একা। একাকীত্বের এক অপরিচিত অনুভূতি আবার তাকে পেয়ে বসল। জোরে জোরে পথ হাঁটতে লাগল শ্যামাকান্ত। যেন সে ভয় পেয়েছে। ওয়া জিদ নগর লেন পার হয়ে গেল, তবুও হেঁটে চলল সে। কোথায় যাচ্ছে তার কোন ঠিক নেই। মসজিদ গলি পার হয়ে মল্লিকাদের বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার মনে হোল মল্লিকা কি ঘুমুচ্ছে? আজ তো তার ঘরে আলো শ্যামাকান্ত দেখতে পায়নি। সেই মধ্যরাত্রে তারার অস্পষ্ট আলোয় মল্লিকাদের বাড়ীটাকে ভারি অদ্ভুত লাগল তার। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলো সে। কোথাও কোন আলোর সন্ধান পেল না। এই মাঝরাত্তিরে সবাই এখন ঘুমুচ্ছে। সে জানে অনেক রাত অবধি মেয়েটা পড়ে। ওর কি পরীক্ষা হয়ে গেছে? শ্যামাকান্তর মনে পড়ল না। কাঁসারিপাড়া গলির ভিতর দিয়ে অবিনাশশংকর রোডের অনতি স্বচ্ছ আলোয় এসে দাঁড়ালো। চওড়া রাস্তাটা এখন জনহীন। সবাই কি ঘুমুচ্ছে? আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য মনে হোল তার, রাস্তাটা একেবারে নির্জন। দক্ষিণ দিক ধরে এগিয়ে চলল সে। কিছুদূর গেলেই বাঁদিকে গংগার ধারে যাবার পথ। খানিকটা গিয়েই ও অবাক হয়ে দেখল সেই জনহীন রাস্তায় কিছুদূরে আগে আগে আরও একজন চলেছে। মধ্যরাত্রের নির্জন রাস্তার দ্বিতীয় পথিকটি কে এবং কেন সে যাচ্ছে জানবার জন্য দ্রুত চলতে লাগল শ্যামাকান্ত। ওরও কি তবে ঘুম হয়নি? বাঁদিকে বকুলতলা গলি সোজা গংগার দিকে চলে গেছে। গলির মধ্যে ঢুকে দেখা গেল একজন লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। রাস্তার আলো গলির মধ্যে ভাল ঢোকেনি। অস্বচ্ছ আলোয় লোকটির দিকে ভাল করে তাকাল, ওর মনে হোল একে সে চেনে কিন্তু মনে করতে পারলো না কে। বকুলতলা গলিতে আরও একজনকে দেখা গেল। কখন যে লোকটি এসে ওদের পথে চলতে লাগল ওরা কেউ দেখেনি। গলির মধ্যে বোধ হয় একটা বকুল গাছ ছিল। সেই রহস্যময় রাত্রির মধ্যভাগে, সেই প্রায়ান্ধকার গলিতে কোথায় যাচ্ছিল শ্যামাকান্ত তা জানে না! হঠাৎ বকুল ফুলের মিষ্টি গন্ধে চকিত হয়ে উঠলো। গাছটা কোথায় তা জানে না, কোনদিন যে দেখেছে তাও মনে পড়ল না। আরও তিনজন নিশীথ পথচারীর সংগে এগিয়ে চলল সে।

খানিকটা এসেই ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে গংগা, ঝির ঝিরে বাতাসে জায়গাটিকে বড় মনোরম মনে হোল। ওরা বসবার জন্য তাকিয়ে দেখলো চারিদিক। এটা স্নানার্থীদের ঘাট। চওড়া চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে জলের দিকে। কোথাও তাতে ফাটল কোথাও বা ভেংগে গেছে। বহুকাল আগে কোন সদাশয় ধনী পুণ্য-কামনায় হয়ত এটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আজ অন্তত এই রহসাময় রাত্রির নির্জনতায় ঘাটটিকে নদীর সংগে পৃথক বলে মনে হোল না। হঠাৎ অশ্বত্থ পাতার মৃদু গুঞ্জনে ভরে উঠলো চারিদিক। রাত্রির নির্জন পরিবেশে কারা যেন এক সংগে কথা বলে উঠলো। অবিনাশ-শঙ্কর রোডের অনতি আলোকিত নির্জনতাকে আর পাওয়া গেল না।

এই প্রথম ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলো। কেউ কাউকে চেনে না। চারটি মানুষ মাঝ রাত্তিরে গংগার এই নির্জন ঘাটে এসে জমেছে। কেন এসেছে তার কোন নির্দিষ্ট কারণ নেই, অন্তত ওরা তা জানে না। কেউ কোন কথা বলল না। নিঃশব্দেই ওরা একটা লোহার বেঞ্চে এসে বসল। সিঁড়ির ওপরেই, কয়েকটা অশ্বত্থ গাছ গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারি নীচে ঘনীভূত

অন্ধকারের মধ্যে বেঞ্চিটা পাতা ছিল। ওরা চারজনে সেই একমাত্র বেঞ্চে এসে বসল।

ততক্ষণে আকাশে পান্ডুর চাঁদ দেখা দিয়েছে। অশ্বত্থ গাছের মাথায়, তার ডালের ভিতর দিয়ে ওদের ওপর ধূমাঙ্কিত লণ্ঠনের আলোর মত কৃশ হলুদ বর্ণের জ্যোৎস্না নেমেছে। শ্যামাকান্তর মনে হলো মল্লিকাদের বাড়ীর ছাদে, টবের মধ্যে রজনীগন্ধা ফুলগুলির উপর এখন এমনি জ্যোৎস্না নেমেছে। মল্লিকা হয়ত ঘুমুচ্ছে। ওর কি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল? শ্যামাকান্ত জানে না।

'এখানে কোন গরম নেই।'

কে বলল চকিতে সজাগ হয়ে তাকিয়ে দেখলো শ্যামাকান্ত। মনে হোল কোণের দিকে বসা লোকটিই বোধ হয় বলল। ওর মনে পড়লো বকুলতলা গলিতে ঢুকতেই যাকে সিগারেট খেতে দেখেছিল। সেই ছায়ান্ধকারে স্তিমিত জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে ওদের মুখের রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অবয়বের পার্থক্যটুকু শুধু সে অনুভব করতে পারলো। হঠাৎ বলে ফেলল শ্যামাকান্ত, আপনারও বুঝি ঘুম হয়নি?

'ঘুম!' সবাই এক সংগে বলে উঠলো, তারপর সবাই চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ পরে শ্যামাকান্তই আবার বলল, আমার আজ ঘুম হয়নি কিনা। কিছুতেই ঘুমুতে পারলাম না।...কোনদিন এমন হয় না।

আশ্চর্য, কোনদিন এমন হয় না.. আমারও হয়নি। কোণের লোকটি বলে চলল। শ্যামাকান্তর মনে হোল সবাই যেন বলল—আমারও হয়নি, আমারও হয়নি।...

'...কলেজ থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুতে শুতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি বুঝতে পারি না।'

'আপনি বুঝি ছাত্র?' মাঝের লোকটি বলল।

'না, অধ্যাপক। আপনি?'

শ্যামাকান্ত চিনতে পারল, পুরঞ্জয় সেন, নরসিংহ কলেজে পড়ায়।

'আমি ডাক্তার। চেম্বারটা দেখেছেন বোধ হয়, চৌমাথার পাশেই। 'এন কে পোদ্দার'।

এবার সবাই যেন অবশিষ্ট দুজনের দিকে ফিরে তাকাল। অন্ধকারেও শ্যামাকান্তর মনে হোল ওদের চোখে প্রশ্ন, কে তোমরা? শুনল ওর পাশের মানুষটি বলছে—আমি ব্যবসা করি, মৃণালিনী স্টোর্স দেখেছেন তো, ওই আমার দোকান।

ওরা সবাই চিনল মৃণালিনী স্টোর্সের মালিক নাগেশ্বর দত্ত। সব শেষে শ্যামাকান্ত শুনল ও নিজেই বলছে—'আমি শ্যামাকান্ত, মিলে চাকরী করি।'

মাথার ওপর অশ্বত্থ পাতার মৃদু গুঞ্জন কখন থেমে গেছে, ঝিরে ঝিরে বাতাস আর বইছে না। সেই নিস্তব্ধ রাত্রে, গংগার ধারে, অন্ধকারে লোহার বেঞ্চিতে বসে ওদের মনে হোল এখানেও গুমোট, এখানেও সেই বিদ্ঘুটে গরম, সময়টা বিশ্রী—

ওরা স্থির হয়ে শুনলো অধ্যাপক বলছে।......

আপনারা কেন এসেছেন আমি জানি না। কিন্তু আমাদের ঘুম হয়নি। কেউই আমরা ঘুমুতে পারিনি। আমরা কেউ বেকার নই। দিনের বেলা ঘুমোবার অবকাশ আমাদের নেই। আজ রাত্তিরে গরমটা বেশী কিন্তু কেবল গরমের জন্যই কি আমরা ঘুমুতে পারিনি? অধ্যাপক একটু চুপ করলেন।

সেই লোহার বেঞ্চিতে স্থির হয়ে বসে নির্বাক চারজন মানুষ পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলো। একজন অধ্যাপক, একজন ডাক্তার, একজন ব্যবসায়ী আর একজন শ্রমিক। ওরা ভাবতে লাগল সত্যিই কেন তারা ঘুমুতে পারেনি।

অধ্যাপক আবার শুরু করলেন—

অর্ধেক রাত এখনও কাটাতে হবে। আমার কথা বলছি, আজ প্রথম নিজেকে নিতান্ত একলা মনে হোল।

একলা! সবাই এক সংগে বলে উঠল।

আপনার কি বাড়ীতে কেউ নেই?

হ্যাঁ, বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী এক কথায় যাদের আমরা আত্মীয়বন্ধু বলি সবই আমার আছে। তবুও, আজকে আমার একা মনে হোল। মনে হোল একটা রংগীন কাঁচের চশমা হঠাৎ আজ রাত্তিরে আমার চোখ থেকে খুলে পড়ে গেল।

সুমনাকে ভালবেসে নিটোল নিস্তরংগ পুকুরের মতই কানায় কানায় ভরে ছিল আমার মন। কোথাও এতটুকু ফাঁক ছিল না। মনে হোত একটু অবসর পেলে ভাল হয়। বাইরে কলেজ আর বন্ধুরা আমার অনেক সময় কেড়ে নিত। সুমনাকে একটু কাছে পাবার, নিবিড় করে পাবার সময় কেবলি কম পড়ে যেত। মনে হোত আরও—আরও একটু সময় হাতে থাক। মনোরম সন্ধ্যা আশ্চর্য দ্রুত গতিতে কেটে যেত। রাত্রির নির্জন অবকাশকে আরও স্বল্পায়ু মনে হোত।

কিন্তু এই সুখস্বর্গ থেকে আমার নির্বাসন ঘটলো। কালিদাসের যক্ষের মত আমি কোন দেবতার বিরাগ ভাজনের কারণ হইনি, এমনকি চাকরী থেকেও বরখাস্ত হইনি বা সুমনার কোন গোপন অপরাধ হঠাৎ আমার নজরে পড়েনি বা সে দেখতে কুৎসিত হয়ে যায়নি। মাত্র তিন বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে।তবু এই অঘটন ঘটল। আজ রাত্রে আমার মনে হোল আমি একা। ...না সুমনা কোথাও যায়নি, বাড়ীতেই রয়েছে বরং আগের চেয়ে আরও সুন্দরী, আরও স্থূলাঙ্গী হয়েছে।

আজ সকালে কেউ বাড়ীতে ছিল না। সুমনাও ছিল না। একা একা ভাল লাগছিল না। নিজেই বাজারে গেলাম। অভ্যাস মত আদ্দির পাঞ্জাবি আর ধুতি পরেই বেরিয়েছিলাম। পথে দুই-একজন ছাত্রের সংগে দেখা হোল।

নমস্কার স্যার! কোথায় যাচ্ছেন? বাজারের থলিটা নিয়ে নিজেকে নিতান্তই বেমানান মনে হলো। কিছুতেই বলতে পারলাম না বাজারে যাচ্ছি। মনে হলো বাজারে যাওয়াটা আমার পক্ষে ঠিক নয়। সকালবেলায় আমার খবরের কাগজ কিংবা বই নিয়ে বসা উচিত। ছাত্র দুটি বাজারের থলিটির দিকে তির্যক চোখে চেয়ে চলে গেল।

কিছুদূরে গিয়েই কয়েকজন পুরোন বন্ধুর সংগে দেখা। তাদের সংগে স্কুলে একসংগে পড়েছিলাম। পরে আর তেমন মেলামেশা ছিল না। তারা আমাকে দেখে সম্বর্ধনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

পুরী যে, কোথায় চলেছিস? আরে বাজারের ব্যাগ হাতে যে! দ্যাখ্ দ্যাখ্, পুরী বাজারে যাচ্ছে। তোর ছাত্তররা দেখে ফেলবে যে।

তাড়াতাড়ি দেখে নিলাম সত্যিই কোন ছাত্র ব্যাপারটা দেখছে কিনা।

চল্ চায়ের দোকানে বসা যাক্। অনেকদিন বাদে তোর দেখা পেলাম, কিছু খরচ কর পুরোন বন্ধুদের জন্য।

সম্বর্ধনাটা মোটেই ভাল লাগেনি। ওদের কেমন করে এড়ান যায় ভাবছি। আশ্চর্য, ওরাই আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

ভয় পেয়ে গেলি যে! থাক্! তোকে আর যেতে হবে না। তুই এখন অধ্যাপক। আচ্ছা আমরা চলি।

মনে হোল ওদের সংগে চা খেলেই হয়ত ভাল হোত। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। ওদের আর ডেকে ফেরান যাবে না। মনে মনে খুবই খারাপ লাগল। কেন যে সকালে বেরিয়েছিলাম। একটা হেরে যাওয়ার গ্লানি এই প্রথম অনুভব করলাম।

মনে হোল আমার পরিচিত স্বর্গে ফিরে গেলেই এই ভাবটা কেটে যাবে। বাজার আর করা হোল না।

দুপুরে সুস্থির মন নিয়ে পড়বার চেষ্টা করলাম কিন্তু পড়তে পারলাম না। পুঁথির চরিত্রগুলির জীবনযাপনের তুলনায় নিজেকে কেবলি ছোট মনে হোল। খেলার মত লাগল। কাছাকাছি এক তাসের আড্ডায় গিয়ে হাজির হলাম। ইচ্ছা ছিল বিকেল পর্যন্ত চুটিয়ে তাস খেলব। যারা তাস খেলছিল তাদের অনায়াসে বন্ধু বলতে পারি। কিন্তু কোনদিন তা মনে করিনি। আমাকে দেখে তারা উল্লাসে হৈ হৈ করে উঠলো।

পুরঞ্জয় যে, এসো! এসো!

স্টেকে হোক তা হলে, কত করে খেলবে বল?

যা হোক কিছু ধর না।

দু এক হাত খেলেই বুঝতে পারলাম আমি খেলোয়াড় নই। মনে হোল এখানে না এলেই হোত। আমার পার্টনার পাকা খেলোয়াড়, মন দিয়েই খেলছিল সে। আমার কিন্তু ভাল লাগছিল না। মনে হোল এদের জীবন আরও গণ্ডীবদ্ধ, শুধু তাসেই বোঝে। যখন খেলা শেষ হোল অর্থাৎ আমি ছাড়া পেলাম দেখি বেশ কিছু হেরে গেছি আর আমার পার্টনার ভীষণ বিরক্ত হয়েছে। দর্শকজন হাসছে। ওরা বলল—

মাঝে মাঝে এসো ছুটির দিন। সারাদিন বসে বসে কি কর?

মাথাটা ধরে গিয়েছিল। অসম্ভব ক্লান্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরে দেখি এক অধ্যাপক বন্ধু হাজির।

'কোথায় কাটালে দুপুরটা'? 'চল বেরোন যাক্' 'একটু বসো।' 'কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বল তো?'

'মিউনিসিপ্যাল হলে। আজ যে চলন্তিকার রবীন্দ্র জয়ন্তী, কেন, তোমায় কিছু বলেনি?

মনে পড়ল—সেই একঘেয়ে, সেই কৃত্রিম কথাবার্তা, সেই অধ্যাপকসুলভ গাম্ভীর্য, সেই গরম। বন্ধুটির দিকে চেয়ে দেখি উৎসবের পোশাকে সজ্জিত হয়েই এসেছে। ভাঁড়ের মত মনে হোল তাকে। গম্ভীর হয়ে বললাম 'তুমিই যাও, আমাকে তো কিছু বলেনি।' বন্ধুটি চলে গেল। আমাকে সংগী পেলে ও খুশী হোত। কিন্তু খুশী করার পরিবর্তে ওকে নিতান্তই লঘু বলে মনে হোল। মনে হোল অধ্যাপকের জীবন কী মেকী! তাসুড়েদের চেয়েও মেকী। মনে পড়ল প্রায় ১০ টাকা আজ হেরে গেছি। সুমনার ওপর ভীষণ রাগ হোল। ও নেই বলেই না এসব হচ্ছে। দুপুরটা সুন্দর কেটে যেত ও থাকলে। আসুক সুমনা ঝগড়া করব আজ ওর সংগে। ওর তো বোঝা উচিত ছিল। মেয়েরা বড় স্বার্থপর। ও বোধহয় ভাবেইনি আমার কথা। কিন্তু সুমনা আসবে অনেক পরে।

সেই বিকেলে আমার করণীয় কিছুই ছিল না। সূর্যের আলো ক্রমেই কমে আসছিল। আমার বাড়ীর সামনের রাস্তায় সুবেশ পথচারীদের বেড়াতে দেখা যাচ্ছিল। আমার মনে কোন উৎসাহ ছিল না। পথচারীদের মিছিলে যোগ দেবার যেন আমার অধিকার নেই। সেই ছায়া ছায়া বিকেলে এক অস্থির উত্তেজনার মধ্যে মনে হোল ভীষণ একা আমি। না, সুমনা রয়েছে। সুমনাকে পেলেই আমার এই একাকীত্ব ঘুচে যাবে। ওর জন্য অধীর আগ্রহে পথে নেমে পড়লাম। এই বিশ্রী সময়টা কেটে যাক।

সুমনা ফিরল রাতে।

প্রতীক্ষার সময়কে দীর্ঘ বলেই মনে হয় কিন্তু ও যেন দীর্ঘতম সময়ের সীমানাকে অতিক্রম করে এলো। উৎসব বাড়ীর সজ্জা তখনও ছাড়েনি। বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিল সে। অপেক্ষা না করেই ডাকলাম, সুমনা শোন।

কি ব্যাপার? একটু অবাক হয়েই ও যেন এগিয়ে এলো।

এত দেরী হোল তোমার?

এত দেরী! মাত্র সাড়ে দশটা বেজেছে। আমরা তো তাড়াতাড়িই চলে এসেছি। ও চলে গেল।

সন্দেহেনী সুমনা। ভাবলই না আমার কথা। কোন গুরুত্ব না দিয়েই চলে গেল। এখন ও শোবার আয়োজন করবে। একটু পরেই তার ডাক আসবে। এবং তাকে যেতে হবে।

শোবে না? কি হয়েছে বল তো?

বলবার জন্যই আমি এগিয়ে গেলাম —সেই পুরোন ঘর, সেই পরিচিত খাট, সুমনার দাঁড়াবার ভঙ্গীটিও পরিচিত। তবুও সেই স্বল্পালোকিত ঘরে সুমনাকে যেন নতুন করে দেখলাম। রোজকার মতই সমস্ত অন্তর্বাস খুলে রেখেছে, একটা আলগা শাড়ী জড়ানো আছে গায়ে। বললাম,

জানো, আজ কি হয়েছে?

কি?

আমি আজ দশ টাকা হেরে গেছি তাস খেলতে গিয়ে।

যে সব কথা বলতে চেয়েছিলাম কিছুই বলতে পারলাম না। সারাদিন যে পীড়ন অনুভব করেছি তার চেয়ে যেন দশ টাকার হারাটা বড় হয়ে উঠলো। সুমনা কোন উত্তর দিলে না, শুধু মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠলো। দ্রুত হাতে মশারিটা খাটাতে লাগল ও।

সারাদিন আজ কী যে বিশ্রী লেগেছে ...তুমি ছিলে না...।

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো।

কঠিন শোনাল ওর গলাটা। চুপচাপ শুয়ে পড়লাম আমি। মনে হোল দিনের সেই অসহনীয় চিন্তাটা আবার জেগে উঠছে।

সুমনা এখন আমার পাশেই শুয়ে আছে। ওর যৌবনস্রোত শরীরটা আমার হাতের নাগালের মধ্যেই। হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। চকিতে ও আমার দিকে ফিরল আর বলল,

তোমার ডক্টরেটের থিসিস্ শেষ হয়ে গেছে?

না। অবাক হয়ে বললাম।

কোনদিনও তুমি শেষ করতে পারবে না।

অত্যন্ত বিরক্ত লাগল। রেগেই বললাম, কী যাতা বকছ!

একজন কেরানী আর প্রাইভেট কলেজের অধ্যাপকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

কথাটা বিয়েবাড়ীতে শুনেছে সুমনা। ওকে লক্ষ্য করে কেউ বলেনি কিন্তু ও উপস্থিত ছিল আর ওর স্বামী প্রাইভেট কলেজে পড়ায়।

আশ্চর্য! তুমি থামবে?

খুব খারাপ লাগছে না? প্রাইভেট কলেজে পড়িয়ে বাজী ধরে তাস খেলা যায় না বুঝলে!

ইডিয়ট।

কে ইডিয়ট তা ভেবে দ্যাখো। কত মাইনে পাও তা আমার জানা আছে। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

একটু চুপ করে রইল সুমনা তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অসহ্য রাগে আমি বলে উঠলাম, 'তুমি অতি নোংরা মেয়েমানুষও।

একটু চুপ করলেন অধ্যাপক, যেন লজ্জিত হয়েছেন। তারপর সংকোচ কাটিয়ে ধীর গলায় বললেন। তারপরও সুমনাকে আদর করেছি আমি ওর কান্না থামিয়েছি। কিন্তু ঘুমুতে পারিনি।

আমি তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে চলেছি এমন সময়ে আমার স্ত্রীর এ জাতীয় ইচ্ছায় আমি অবাক এবং বিরক্ত হয়েছিলাম। আমার এমনও মনে হয়েছিল হয়ত আমাকে বেশী সময় কাছে পাবার জন্য এই অনুযোগ। তখন সত্যিই আমি অত্যন্ত কম সময় দিতে পারতাম স্ত্রীর জন্য। একজন celebrated ডাক্তার হবার জন্য আমি সব কিছু করতে পারতাম। কলকাতার চেয়ে মফঃস্বলে সুবিধা হবে মনে করে এখানে এলাম। প্র্যাকটিস বাড়তে লাগল। উপা-

তোমার ডক্টরেটের থিসিস্ শেষ হয়ে গেছে?

যক্ষের তবু একটা আশ্বাস ছিল শাপমুক্ত হলে আবার সে ফিরে যেতে পারবে আপন স্বর্গে। কিন্তু আমার...?

অধ্যাপকের প্রশ্নের জবাব কেউ দিলে না, কারণ দিতে পারল না।

ডাক্তার বলে উঠলেন, এমন ব্যাপার যে হবে আমি ভাবতেই পারিনি। It was absolutely beyond my expectation অমাদের চিন্তার অবকাশ কম। I mean personal thinking. মিঃ সেন, আপনি ঠিকই বলেছেন একলা। আমি আজ 'ফিল' করেছি দারুণভাবে 'ফিল' করেছি সে কথা। I am dying out of loneliness.

ডাক্তার যেন থেমে গেলেন। কেউ কোন কথা বলল না। রাত শেষ হতে এখনও দেরী আছে। অশ্বত্থ পাতা দু একটা করে ঝরে পড়ছে।

আমি যাকে বিয়ে করি She was an accomplished girl. আমাদের পরিবারে এটাই শোভন ছিল। বিয়ের আগে প্রেম না থাকলেও পরিচয় ছিল। আমার স্ত্রী জানতেন আমি ডাক্তার হবো এবং তাঁকে ডাক্তারের বউ হতে হবে। কিন্তু বিয়ের কিছু পর থেকেই তিনি বায়না আরম্ভ করলেন অন্য কিছু করার জন্য। ডাক্তারিতে

র্জন ক্রমেই পাঁচশো থেকে হাজার, হাজারও পেরিয়ে গেল। প্র্যাকটিস যতই বাড়তে লাগল ততই স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। কারণ সময় নেই।

কিন্তু তাঁর প্রতি আগ্রহ ততই বাড়তে লাগল। মনে মনে একটা অপরাধ অনুভব করতে লাগলাম। একদিন কোনরকমে সময় করে লীলাকে বলে পাঠালাম 'রেডি থেকো সিনেমায় যাব'। আমার স্ত্রীর নাম লীলা। সে অবাক হয়েছিল আমার প্রস্তাব শুনে, আরও অবাক হয়েছিল যখন সিনেমার পর আমি তাকে এক স্টুডিওতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ফটো তুলব আমরা।

ও আর কিছু বলেনি কিন্তু এক সঙ্গে ফটো কিছুতেই তুলতে রাজী হলো না। বলল, ও কি হবে? বিয়ের সময়ের তো আছেই, আর দরকার নেই।

আমি পেড়াপিড়ি করিনি, কারণ ওর একখানা সিংগল ফটোই আমি চেয়েছিলাম। গোপনে কাছে রাখার ইচ্ছা হয়েছিল। কয়েকখানা ফটো তুলে আমরা চলে এসেছিলাম। সেদিন আর ডিসপেনসারিতে যাইনি। অবসর বুঝে

লীলাকে বলেছিলাম চল একদিন একটা লং ট্রিপ দিয়ে আসি মোটরে।

তোমার সময় কোথায়, রুগী নেই?

একদিন তো, ম্যানেজ করে নেবোখন। কতদিন তোমার সঙ্গে বেড়াইনি। বল তো।

তুমি উঠতি ডাক্তার, তোমার তো এসব সেন্টিমেন্ট ভাল নয়। আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।

ডাক্তাররাও মানুষ লীলা।

সত্যি?

ওর বিদ্রূপ গায়ে মাখিনি, কারণ নিজের অবহেলার জন্য ত্রুটিবোধ ছিল মনের মধ্যে। মৃদু হেসে ওর একখানা হাত তুলে নিয়ে বলেছিলাম, দেখতে চাও?

আমার অত শখ নেই।

গভীর মমতায় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এই নারীর অন্তর আমি ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে তুলবো।

প্র্যাকটিসের প্রাচুর্যে কোন কথাই রাখতে পারিনি। লীলাও তা বুঝেছিল, কোন অনুযোগ করেনি। ওর ফটো একখানা গোপনে নিজের কাছেই রেখেছিলাম। লীলার প্রতি অনুরাগ আমার বেড়েই চলল। ফটোখানা সময় পেলেই দেখতাম। আমাদের দাম্পত্য-জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি মনের মধ্যে ক্রমেই দৃঢ় হয়ে উঠলো। আমি প্রস্তুত হয়ে উঠলাম। আর ঠিক এই সময়েই ঘটনাটা ঘটলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন।

কয়েক মাইল দূরেই আমার এক ডাক্তার বন্ধুর এক নার্সিং হোম আছে। চিকিৎসার ব্যাপারেই আমি কখনও কখনও সেখানে যাই। আজও গিয়ে-ছিলাম। ডাক্তার আবার থামলেন। কথাটা বলা যেন তাঁর ইচ্ছা নয়।

বন্ধুটি তখন চেম্বারে ছিলেন। ঢুকতে গিয়ে শুনলাম ভেতরে রুগী আছে। বাইরেই বসলাম। টেবিলের ওপরে কয়েকটা Madical Journal পড়ে ছিল। তার একটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। ভেতর থেকে টুকরো টুকরো কয়েকটা কথা কানে এলো।

আপনি এ্যাবরশান করাতে চান?

হ্যাঁ।

কেন?

সন্তান ধারণ করতে আমার ইচ্ছা নেই...আমি অক্ষম।

এ কাজে দায়িত্ব আপনি বোঝেন? জানেন এটা বেআইনি?

জানি। Please dont refuse, কান্নায় করুণ শোনাল গলাটা।

আচ্ছা এটা কি আপনার......I mean......স্বামীর সন্তান?

হ্যাঁ

হ্যাঁ? Then why? আপনার স্বামী জানেন?

না, Please আর প্রশ্ন করবেন না। আপনি বুঝবেন না, You can't realise কেন আমি আমার স্বামীর সন্তান ধারণ করতে চাইছি না।

আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের কানে শুনলাম লীলা বলছে সে তার স্বামীর সন্তান ধারণ করতে চায় না। পারলাম না বসে থাকতে, ঝড়ের মত বাড়ী ফিরে এলাম। লীলা ফিরল কিছু পরে। আমাকে দেখেই সে বলল।

এত সকাল সকাল ফিরলে?

জবাব না দিয়েই বললাম, বসো এখানে। আদেশের মতই শোনাল।

তুমি এ্যাবরশান করাতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্থির কণ্ঠে বলল লীলা।

But why? চীৎকার করে উঠলাম।

আমি পারব না...পারব না তোমার সন্তান ধারণ করতে।
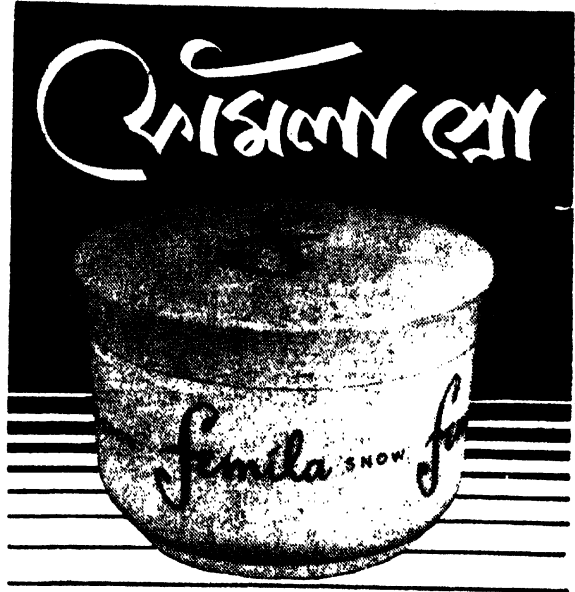
কেঁদে চীৎকার করে বলতে লাগল সে।

তুমি আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দাওনি। মানুষ বলে মনে করোনি। তোমার সন্তান ধারণের যন্ত্র আমি নই। আমি মেশিন নই।

লীলা!

না তুমি আমাকে ঠেকাতে পারবে না ...আমি পারবো না।

দু হাতে লীলাকে তুলে ধরে আবার বসিয়ে দিলাম আমি। আমার গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। অনেক কষ্টে বলতে পারলাম।

আমার সন্তানকে বাঁচতে দাও লীলা। তুমি মা হতে চাও না?

বসে থাকতে পারল না ও। উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। প্রবল কান্নায় কাঁপতে লাগল ওর শরীরটা।

সন্তানকে হত্যা করা পাপ লীলা। তুমি ওকথা চিন্তাও করো না।

আমি ওর পিঠে হাত রাখলাম।

লীলা ও সংকল্প ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু আমার সঙ্গে বাস করতে রাজী হয়নি। অনেকক্ষণ পরে অতি কষ্টে কথাটা বললেন ডাক্তার।

চাঁদ ডুবে গিয়েছিল, নিকষকালো আঁধারে ভরে গিয়েছিল চারিদিক। শ্যামাকান্তর মনে হোল সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠছে। যেন একটা ভার বোধ হচ্ছে। ব্যবসায়ী নাগেশ্বর দত্ত কী বলবেন? ও'র জীবনেও কি?

...শ্যামাকান্ত জানে না।

আমরা কয়েক পুরুষে ব্যবসায়ী। আমিও ব্যবসা করে খাই। এমনিতেই নানান চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এরকম চিন্তা কোনদিন করতে হবে তা ভাবতেই পারিনি, বিশেষত যার সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক নেই। আমাদের জগতে লাভ লোকসান দুই আছে। কখনও লাভ কখনও লোকসান। ঝুঁকি নিতে নিতেই এগোই আমরা, ব্যবসা বড় হয়। লোকসান হলেও তাই ভেঙ্গে পড়ি না। মনে লাগে কিন্তু সামলে উঠি। আজ মনে হচ্ছে আমি দেউলিয়া হয়ে গেছি।

দেউলিয়া! সবাই যেন সমস্বরে বলে উঠল।

যা ভাবছেন তা নয়। ব্যবসা আমার লাটে ওঠেনি। জীবনেই আমি দেউলিয়া হয়ে গেছি। ব্যবসা ছাড়াও ব্যবসায়ীর যে জীবন আছে, আজই আমি তা জানতে পারলাম। আর আশ্চর্য কি জানেন, যখন জানলাম তখন আর কিছু করার নেই। সব হারিয়ে একেবারে দেউলিয়া অবস্থা।

ঠিক এখনই ব্যবসা আমার সব চেয়ে ফেঁপে উঠেছে। সকলে জানে আমি মৃণালিনী স্টোর্সের মালিক। তা ছাড়াও নানা ব্যাপারে আমি টাকা খাটিয়েছি। তিনটে কারখানা আমার পুরোদমে চলছে। প্রায় গুছিয়ে এনেছি নিজেকে। সেদিন বিকেলে হঠাৎ হাজার পাঁচেক টাকার দরকার হয়ে পড়লো। কাছে নেই। অথচ টাকাটা আমার চাইই। ভীষণ চিন্তায় পড়েছিলাম কোথা থেকে টাকাটা পাই। দু এক জায়গায় লোক পাঠালাম তারা ফিরে এলো। জানতাম অত টাকা এক সঙ্গে কোথাও পাওয়া যাবে না। নগদ অত টাকা কেউ কাছে রাখে না। দারুণ দুশ্চিন্তায় বাড়ী চলে গেলাম যদি মায়ের কাছে পাওয়া যায়। সেখানেও পাওয়া গেল না। ভাবছি কোথা থেকে পাওয়া যায়। এমন সময় পুষ্প এসে ডাকল 'এসো'।

অনামনস্কভাবে ওর সঙ্গে গেলাম। ও আমার খাবার এনে দিল। বোধহয় কোন কারণে মাথাটা নেড়েছিল ও কারণ ওর কানের হীরের দুল দুটো ঝকমক করে উঠলো আলোয়। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হোল পুষ্পই তো পারে টাকাটা দিতে। কিভাবে কথাটা বলা যায় ওকে। ওই বলল

কি দেখছ অমন করে?

তোমাকে একটা কথা বলব পুষ্প।

কোন কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও। কিছু টাকার আমার ভীষণ দরকার। তোমার গয়নাগুলো কয়েক দিনের জন্য দাও।

ওর মুখটা কালো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে

বাঁধা দেবে বুঝি?

হ্যাঁ, হাজার পাঁচেক টাকার বড় দরকার।

কোন কথা না বলে উঠে গেল পুষ্প গম্ভীর মুখে। আমি বুঝতে পারলাম না কি করবে ও। একটা বাক্স ভর্তি গয়না নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে দিল। তারপর ওর গলা থেকে, কান থেকে, হাত থেকে সব খুলে ফেলতে লাগল। ওর রাগ দেখে আমি হেসে উঠলাম।

থাক আর দরকার নেই। যেগুলো পরে ছিলে ওগুলো খোলবার দরকার নেই।

তোমার তো টাকার দরকার!

বাক্সটা তুলে নিয়ে বললাম এতেই হয়ে যাবে।

ওকে কোন সান্ত্বনা না দিয়েই চলে এসেছিলাম। জানতাম বাক্সটা ফেরত দেবার সময় আর একটা গয়না বেশী দিলেই ওর রাগ জল হয়ে যাবে।

তারপর পুষ্পর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। টাকার প্রয়োজন মিটিয়ে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন রাত ১০টা বেজে গেছে। শুনলাম পুষ্প নেই। আমার শ্বশুরবাড়ী কাছেই। বুঝলাম ও সেখানেই গেছে। গয়নার শোক সামলাতে পারেনি। ওর বোকামীতে বিরক্ত লাগল। কিন্তু মনের মধ্যে তখন উল্লাসে ছটফট করছে। পুষ্পর গয়নার টাকাটা সত্যিই কাজে লেগেছে। ওর রাগ ভাঙ্গাবার জন্য আমি তখন সব করতে রাজী ছিলাম। কয়েক দিন পরে গয়নার বাক্সটা ফিরিয়ে এনে আর একটা দামী হীরের নেকলেস নিয়ে পুষ্পর কাছে গেলাম।

আমাকে দেখে ওর চোখ আনন্দে ভরে গেল না।

শান্ত বিষন্ন গলায় বলল।

এসো, তোমার কাজ মিটলো?

হ্যাঁ, তোমার কিন্তু রাগ করা ঠিক হয়নি। জান তো ব্যবসায়ে ওঠা-পড়া আছে।

জানি।

ওর কথায় বুঝলাম এখনও রেগেই আছে। ওকে আর চটানো ঠিক হবে না মনে করে পকেট থেকে গয়নার বাক্সটা বের করে ওর হাতে দিলাম। নাও। শোকে তো ভাল করে কথাও বলছ না।

শোক! একটু হাসলো পুষ্প, কিন্তু বাক্সটা এখানে আনলে কেন?

বাক্সটা নিয়ে ও চলে যাচ্ছিল ওর হাতটা ধরে ফেরালাম। এখনও রাগ! তোমরা মেয়েরা গয়না যে কি ভালবাসো। দ্যাখো কি এনেছি। নেকলেসটা খুলে ওর চোখের সামনে ধরলাম। দেখলাম লোভে ওর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠেছে। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

এটা আমি নেব না তুমি দোকানে ফিরিয়ে দিও।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম কেন?

তোমার ব্যবসাতে টাকা খাটাও আমার দরকার নেই।

এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে পুষ্প। এতেও তোমার মন উঠলো না? কত দাম জান ওটার?

তোমার দেওয়া কোন গয়নাই আমি আর পরব না। দাম জেনে কি হবে!

কারণ? গয়না দেবার অন্য লোক জুটেছে বুঝি?

'অতি নীচ তুমি!' ও উঠে চলে যাচ্ছিল। আবার ওকে ধরে বসালাম।

কী বলতে চাও?

বলেছি তো তোমার গয়না আমি চাই না।

কিন্তু কেন? গয়নায় তোমার লোভ নেই?

আছে, কিন্তু তুমি কি আমায় বিয়ে করেছিলে কেবল গয়না দেবার জন্য?

তা তো বটেই। তুমি আমার বৌ, তোমাকে গয়না কাপড় দেওয়া আমার কর্তব্য।

শুধু কি এই জন্যই বিয়ে করেছিলে?

হেঁয়ালী রেখে সোজা কথায় বল তুমি কি চাও?

আমি চাই বাঁচতে। ভাল ভাবে বাঁচতে। তুমি আমাকে ভুলিয়েছ, গয়না দিয়ে ভুলিয়েছ।

কাল পর্যন্ত তোমাকে আমার বৌ ছাড়া কিছু মনে হয়নি, এর মধ্যে তোমার এমনকি হোল যে তুমি একেবারে বদলে গেলে।

সত্যিই বদলে গেছি আমি। সেদিন তুমি যখন আমার গয়নাগুলো নিয়ে গেলে তখন দুঃখে কষ্টে আমি কথাও বলতে পারিনি। তুমি মনে করেছিলে রাগে, কিন্তু তা নয়। তোমাদের বাড়ীতে সত্যিকার রাগ করার শক্তি আমার ছিল না। কেন তোমার দরকার কিছুই বললে না, শুধু বললে 'দাও', তোমার দরকার। কিসের দরকার তা জানতে চাইবার কোন অধিকার তুমি আমায় দাওনি। যখন খুশি হয়েছে তোমার, ব্যবসায়ে লাভ হয়েছে তুমি আমায় গয়না উপহার দিয়েছ। তাই যখন ভাবলাম গয়নাগুলো কেমন করে আমার কাছে এসেছিল তখন একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি আমার চোখে পড়লো। অথচ তার আগে পর্যন্ত নিজেকে কী সুখীই না মনে হোত। তোমার মন বলে কিছু আছে কিনা জানি না। হয়ত ব্যবসার উত্তেজনায় তুমি তৃপ্তি পাও আর তাতেই মত্ত হয়ে আমাকেও নেশা ধরিয়েছিলে।

'নেশা'! আমি অবাক হয়ে বললাম।

হ্যাঁ নেশাই তো! গরীবের মেয়ে আমি, ভাল ভাল গয়না তো কখনও দেখিনি। বিয়ের পর তুমি আমায় দিতে লাগলে গয়না, নতুন নতুন গয়না। মনের মধ্যে লোভ ছিল তুমি তাতে ইন্ধন জুগিয়ে দিলে। আমিও মত্ত হয়ে গেলাম। তুমি তো মাঝে মাঝে নেশা করো না?

নেশা! কই না... তবে কখনও কখনও ক্লান্তি কাটাবার জন্য দু এক পেগ খেয়েছি। কিন্তু তুমি জানলে কি করে? তোমার তো জানার কথা নয়।

আমার মনে হয়েছে, আগে নয় আজই আমার মনে হোল। আমিও তো এতদিন নেশায় মত্ত ছিলুম কিনা।

মানে? তুমিও...

হেসে উঠলো পুষ্প। 'না মদ আমি খেতুম না। তবে মেয়েদের কাছে নতুন নতুন গয়নার নেশা মদ খাওয়ার চেয়ে কম কিছু নয়। তোমার মত আমিও ক্লান্ত হয়ে উঠতুম কিন্তু বিকেলে প্রসাধন করে গয়নাগুলো পরলেই খুশি হয়ে উঠত মন। দেখবার লোক যে বিশেষ কেউ ছিল তা নয়। তুমি গয়না দিয়েই সন্তুষ্ট ছিলে আর আমি পরে। কিন্তু নেশা আমার ভাঙল। তুমি হয়ত অবাক হচ্ছ। কিন্তু আশ্চর্য কি জান? সেদিন আমি নিজেও কম অবাক হয়নি। কেমন করে সহ্য করে ছিলুম? তোমার কথা বলতে পারি না। আমার আজ মনে হচ্ছে আমি যেন বেঁচে গেলুম।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে অন্য লোকগুলো বুঝি বেঁচে নেই।

অন্য লোকের কথা জানি না। তোমার কথা বলতে পারি। তুমি একটা উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছ তার নাম বাঁচা নয়।

থাক! তোমার কাছে আমার না শিখলেও চলবে।

রেগে আমি চলে এসেছিলাম। পুষ্পের কথার কোন মূল্যই দিইনি। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুতেই ওর কথাগুলো ভুলতে পারিনি। জীবনটা আমার ফাঁকি! সত্যিই তো, না হলে কার স্ত্রী অমনভাবে ফিরিয়ে দেয়। গয়নাটা পুষ্প নেয়নি। কিছুতেই নিলে না। ফেরৎ নিয়ে আসতে হোল আমায়। অসহ্য অপমানে অস্থির হয়ে উঠলাম, কিছুতেই ঘুম এলো না। মনে হোল ব্যবসায়ে নয় জীবনেই আমি দেউলিয়া গেছি।

তারপর সেই অদ্ভুত রাত্রিতে, সেই লোহার বেঞ্চিতে বসে অবশিষ্ট তিনজন নিদ্রাহীন নিশীথচারী আর একটি অথচ সম্পূর্ণ পৃথক কাহিনী শুনল। শ্যামাকান্ত যেন আর এক শ্যামাকান্ত এ মল্লিকার কাহিনী বলে গেল।।

ওকে আমি প্রথম দেখি অনেকদিন আগে। দুহাত দিয়ে বুকের কাছে একগাদা বই চেপে ধরে ছোট মেয়েটা ইস্কুলে পড়তে যেত। আমার তখন ইস্কুলের পালা সাঙ্গ হয়ে গেছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা আর দেওয়া হোল না। আগেই ফেল মেরে পড়াশুনা শেষ করে দিয়েছি। আর যেন ভাল লাগছিল না। কাজ নেই তাই ন্যাড়ার চায়ের দোকানে বসতে আরম্ভ করেছি। রাত ছাড়া প্রায় সব সময়েই আমায় তখন ওখানেই পাওয়া যেত। দোকানে বসেই দেখি মেয়েটা যাচ্ছে। ওর অতগুলো বই দেখে ভীষণ পাকা মনে হোত মেয়েটাকে। একদিন ন্যাড়াকে বললাম, ওইটুকু মেয়ে কত বই নিয়ে যাচ্ছে দ্যাখ।

ন্যাড়া একবার ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, মল্লিকা, নাইনে পড়ে।

ওইটুকু মেয়ে নাইনে পড়ে?

আর একবার ঘাড় বেঁকিয়ে ন্যাড়া আমাকে দেখল কিন্তু কোন কথা বললে না।

তারপর মল্লিকার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। সেদিন বোধহয় কিসের জন্য স্ট্রাইক ছিল। সব বন্ধ। আমরা গেলাম ওদের ইস্কুল বন্ধ করতে। বোধহয় দলের মধ্যে আমাকে বড় দেখে ও বলল, আপনারা কেন এলেন? আমরা নিজেরাই স্ট্রাইক করতাম। এমন সময় একজন টিচার এসে বললেন, মল্লিকা বাড়ী চলে যাও। ও বাড়ীর দিকে এগোল। আমিও ওর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম।

আপনার কলেজ স্ট্রাইক করেছে?

আমাদের...কলেজ! করেছে বোধহয়।

আপনি কলেজে পড়েন না?

মল্লিকাকে সেদিন সত্যি কথাই বলেছিলাম, পড়াশুনো আমি শেষ করে দিয়েছি।

সত্যি! হেসে ফেলেছিল মল্লিকা; আর পড়বেন না?

না!

তারপর থেকে রোজই ওকে দেখতাম চায়ের দোকানে বসে। আর ইস্কুল ছুটি হলে ওদের বাড়ী পর্যন্ত ওর সঙ্গে যেতাম। কোনদিন ও বারণ করেনি। একদিন মল্লিকার ইস্কুল শেষ হয়ে গেল আর আমিও চাকরীতে এসে ঢুকলাম। আমাদের দেখাশোনা কদাচিৎ হোত। ওর কলেজে যাবার সময় উপস্থিত থাকবার জন্য কতদিন কাজ কামাই করে চলে এসেছি। ও আমাকে দেখে শুধু হেসেছে। ওর সেই হাসি দেখার জন্য আমি সব কিছু করতে পারতাম। একদিন মল্লিকা বললে, তুমি বুঝি চাকরী ফাঁকি দিচ্ছ?

উপায় নেই কি করব বল!

না-না, এভাবে করো না......আচ্ছা তোমাদের বাড়ী থেকে আমাদের ঘরের জানালাটা দেখা যায় না?

আশ্বাসে আবেগে আশায় উজ্জ্বল চোখ তুলে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল সে

মল্লিকার দিকে। লজ্জিত মিষ্টি হাসিতে চোখমুখ ভরিয়ে অপরূপ মল্লিকা বলেছিল 'এবার চলি?' ও কলেজের দিকে চলে গিয়েছিল। সেদিন আমি আর কাজ করতে পারিনি পথেই দিনটা কেটে গেল।

অধ্যাপকের মনে হোল মল্লিকা নয় মল্লিকা ফুল। রাশি রাশি ছোট ছোট শাদা মল্লিকা ফুলের সৌরভে শ্যামাকান্তর মনটা টলমল করে উঠেছিল।

শ্যামাকান্ত আবার শুরু করল, যেন সে অন্য লোকের কথা বলে যাচ্ছে।

তারপরে রাত। রাত ১১টায় শ্যামাকান্ত দেখেছিল মল্লিকার আর এক রূপ। দোতলার জানালায় ছায়ার মত মল্লিকা দুহাতে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে হোল মল্লিকার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। তেমনি হাসি। এমনি করেই শরীরিণী মল্লিকা ছায়ার মত অস্পষ্ট হয়ে উঠলো। রাতে শ্যামাকান্ত দেখতো মল্লিকার ঘরে আলো আর এক ছায়াময়ীকে।

আজ যখন মল্লিকার ঘরে আলো জ্বলল না, যখন আর তাকে দেখা গেল না ঠিক তখনই এক অজ্ঞাত আশংকায় অস্থির হয়ে উঠলো সে। তার মনে হোল সে একা। এতদিন মল্লিকাকে তার ভাল লাগত কিন্তু কোন চিন্তা ছিল না। এই প্রথম সে চিন্তা করল আর তারপরই অনুভব করতে পারল মল্লিকাকে বাদ দিলে সে কী ভীষণ একা। ওর মনে পড়লো—

সেদিন মল্লিকার ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরোবার দিন ছিল। ও ফিরছিল মিল থেকে সারাদিনের খাটুনির পর। পথে হঠাৎ কোথা থেকে যেন মল্লিকা এসে দাঁড়ালো। অপেক্ষা করছিল সে। বলল, 'থামো!' ও নেমে পড়েছিল সাইকেল থেকে।

কী ব্যাপার! এত হাসি-খুশী?

আজ আমার রেজাল্ট বেরিয়েছে জানো?

তাই নাকি? পাশ করেছ বুঝি?

হ্যাঁ......।

মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। তাহলে খাওয়াচ্ছ বলো?

'চলো'। মল্লিকা ওর সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগল। অবাক হয়েছিল শ্যামাকান্ত। মল্লিকা ওকে সত্যিই এক রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। সেই পর্দাটানা ঘরে রকমারী অর্ডার দিয়ে খুশীতে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে উঠেছিল সে।

সব খেতে হবে। না খেলে বুঝবো তুমি খুশী হওনি।

অত চেঁচাচ্ছ কেন! অন্য লোকে শুনলে কি ভাববে?

বেশ করব। এ যেন আর এক মল্লিকা। বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল শ্যামাকান্ত। ফেরার পথে জিজ্ঞেস করেছিল, এবার কলেজে পড়বে তো?

দূর......ভাল লাগে না। আচ্ছা তুমি তো প্রাইভেটে ম্যাট্রিকটা দিতে পারতে! কোন জবাব দেয়নি শ্যামাকান্ত। মনটা ভারি হয়ে উঠেছিল তার। আলাপ আর তেমন জমেনি। পরীক্ষা পাশের উচ্ছ্বাস কেমন স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

আজ শ্যামাকান্তর মনে হোল এই সেদিনের কথা। কিন্তু সেদিনও এ নিয়ে সে মাথা ঘামায়নি। একবার মনটা একটু খারাপ লেগেছিল মাত্র। তারপর মল্লিকা যখন কলেজে ঢুকলো যখন দেখাশোনা বেশ কমে এলো কই তখনও তো তার মনে চিন্তা আসেনি। কিন্তু আজ?

শ্যামাকান্ত অনুভব করলো সব বাড়ীতে যখন অন্ধকার হয়ে যায় তখন মল্লিকার ঘরে আলো আজ সে দেখেনি।

......তার বোধ হয় পরীক্ষা হয়ে গেছে।

এবার মল্লিকা কি করবে? অধ্যাপক বলে উঠলেন অতি মৃদুস্বরে।

কি জানি, আমি জানি না।

আপনাদের কোন কথা হয়নি?

না......।

You must marry her ডাক্তার জানালেন।

মল্লিকার বাবা কি বড়লোক? জানতে চাইলেন নাগেশ্বর দত্ত।

আমি তাঁর মিলে চাকরী করি.....।

শ্যামাকান্ত চুপ করে গেল। কেউ আর কিছু বলল না। অনেকক্ষণ বাদে অধ্যাপক আবার বললেন, কিন্তু মল্লিকাকে পেলেই আপনি সুখী হবেন? আপনার সব দুঃখ ঘুচে যাবে?

হ্যাঁ.....ওকে না হলে......ওর ঘরে আলো না জ্বললে আমার তো ঘুম আসবে না।

তাহলে?

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলেন। তিনজনেই পরস্পরের দিকে তাকালেন। মনে হোল শ্যামাকান্তর কাঁচামীতে ওরা হেসে উঠবেন। কিন্তু আশ্চর্য, ওরা কেউ হাসলেন না। যেন এক গভীর আশংকায় তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অজ্ঞাত, অভাবিতপূর্ব সেই আশংকায় তিনজনেই যেন হঠাৎ মূক হয়ে গেলেন। অনুভব করলেন তারাও ঘুমুতে পারেননি।

সেই অবসিত প্রায় নিশীথে যখন পূবের আকাশে শুকতারাকে দেখা গেল তখন এক মৌন গাম্ভীর্যে থমথম্ করছিল নির্জন গঙ্গার ঘাট।

এখানে বসে থাকার কোন মানে হয় না simple meaningless ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তিনজনেই উঠে দাঁড়ালেন এবং বাড়ীর দিকে চললেন। কিন্তু ঘুম...কি আসবে? তিনজনেই ভাবলেন। তিনজনেরই মনে হোল কোনদিন কি তাঁরা ঘুমুতে পেরেছিলেন?

শ্যামাকান্ত, সে কি ঘুমুতে পারবে? কিন্তু ঘুমুতে হবেই। না ঘুমিয়ে তো মানুষ বাঁচে না।

দ্রুত চলতে লাগলেন অধ্যাপক, ব্যবসায়ী আর ডাক্তার।

তখন সমাসন্ন উষায় বকুলগন্ধে ভরে গিয়েছিল নির্জন গলিপথ। শ্যামাকান্তর মনে হোল গন্ধটা কি মল্লিকার চেয়েও মিষ্টি? মল্লিকা আর মল্লিকা ফুল। আরও দ্রুত চলতে লাগল শ্যামাকান্ত। হয়ত এখন মল্লিকার ঘুম ভেঙেছে। হয়ত সে এখন ছাদের আলসের রজনীগন্ধার টবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।
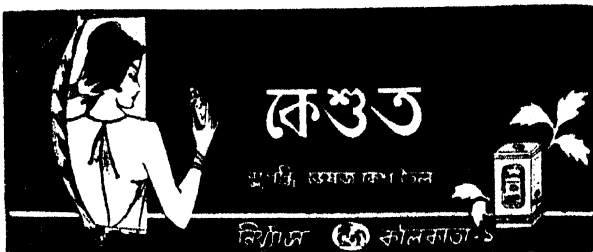
এক দশক পরে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্ট আবার নতি স্বীকার করল দুর্গম পথের অভিযাত্রী দুঃসাহসী মানুষের আকাশচুম্বী অভীপ্সার কাছে। হিমাদ্রির শীর্ষতম স্থানে আরোহণ করলেন আর একজন মার্কিণ পর্বতারোহী এবং তাঁর সহাভিযাত্রী শেরপা নওয়াঙ গম্বু। প্রথম হিমালয়-বিজয়ী শেরপা তেনজিঙ নোরগের ভাগিনেয় গম্বু।

১৯৫৩ সালের ২৯শে মে বৃটিশ অভিযাত্রী হিলারী এবং তেনজিঙ নোরগের এভারেস্ট-বিজয়-প্রচেষ্টা যেদিন সাফল্যমণ্ডিত হল তারপর থেকেই হিমালয় অভিযানে শেরপাদের অপরিহার্য গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলের কৌতূহল জেগে ওঠে। আজ নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, শেরপাদের সহযোগিতা ছাড়া হিমালয়-বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল সুদূর পরাহত।

নেপালী ভাষায় এভারেস্টের নাম সাগরমাতা, শেরপারা একে বলে 'চোমোলুঙমা'। 'চোমোলুঙমা' অভিযানের সহযাত্রী হিমালয়ের মানুষ শেরপাদের গোত্রপরিচয় প্রাচীন ইতিহাস,

কর্মরত শেরপা যুবক

হিমালয় সন্তান শেরপা

নলিনী কুমার ভদ্র

জীবনচর্যার পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা অন্তত বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইংরেজ জাতিতত্ত্ব সন্ধানীরাও শেরপাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হননি। এদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় একমাত্র জার্মাণ সন্ধানী Rene Von Nebesky Wojkowitz-এর একখানা বইয়ে। বইখানি ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে Where The Gods Are Mountains এই নামে। নেপাল, সিকিম এবং ভুটানের আদিম জাতির মানুষদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ জার্মাণ জাতিতত্ত্ববিদ Fr. Matthias Hermanns-এর The Indo Tibetans গ্রন্থেও শেরপাদের সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শেরপারা যে মূলত তিব্বতী জাতি থেকে উদ্ভূত তার অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। তিব্বতী ভাষায় শেরপা কথাটার মানে হচ্ছে পুবী মানুষ। বর্তমানে নেপালই হচ্ছে অধিকাংশ শেরপার বাসভূমি, তারা নাকি এদেশে এসেছিল তিব্বতের পূর্বাঞ্চল থেকে। শালাকা, পিনাসা, লামা, গোতারমা, দার্চাচিন্দো, দুগদোচ, খাম্বাজে, দুজাওয়া, গার্দজা এই দশটি বংশে বিভক্ত শেরপারা। তন্মধ্যে লামা বংশের লোকেরা বাস করে নেপালের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উচ্চভূমিতে। এরাই হচ্ছে মাউণ্ট এভারেস্টের নিকটতম স্থানের অধিবাসী। এভারেস্ট অভিযানে ভারবাহী এবং সহযাত্রী নির্বাচিত করা হয় এদের সমাজ থেকেই কেননা এদের পর্বতারোহণ-পটুতা এবং তিতিক্ষা উভয়ই বিস্ময়কর। এই লামা বংশেরই লোক এভারেস্ট-বিজয়ী বীর তেনজিং এবং তাঁর ভাগ্নে গম্বু।

শেরপাদের লোকসংখ্যা আসলে কত আজও তা ঠিকমত জানা যায়নি, তবে মোটামুটি হিসাবে পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি ধরা হয়। উত্তর নেপালেই এদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তবে সিকিমে এবং দার্জিলিঙ-এর চতুষ্পার্শ্বেও অনেকগুলি শেরপা বসতি আছে। এই দার্জিলিঙ জেলারই অধিবাসী তেনজিং।

শেরপা ভাষা তিব্বতী ভাষাবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত একটি উপভাষা। নেপালী ভাষা থেকে ধার করা বহু শব্দ পুষ্ট করেছে এদের মাতৃভাষাকে। আজকের দিনে অধিকাংশ শেরপাই মাতৃভাষারই মত অবলীলাক্রমে নেপালী ভাষায় কথা বলতে পারে। তিব্বতীদের সঙ্গে শেরপাদের আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতিগত অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তিব্বতীদের অনুরূপ বহুপতিক বিবাহপ্রথার ব্যাপক প্রচলন আছে শেরপাদের সমাজেও। শেরপা পুরুষদের মধ্যে তিব্বতী কাপড়-চোপড় পরার রেওয়াজ আছে, সাম্প্রতিককালে অবশ্য বহু শেরপা এই নয়নাভিরাম পরিচ্ছদ পরিহার করে বিলেতি জামা-কাপড় পরতে শুরু করেছে। শেরপা স্ত্রীলোকেরা কিন্তু অধিকতর রক্ষণশীল, বসনে-ভূষণে সনাতনের প্রতি অনুরাগ তাদের আজও অপগত হয়নি। হিমালয়ের সকল জাতির মেয়েদের মধ্যে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বর্ণাঢ্য। গায়ে কালো অথবা বাদামী রঙের আঁটসাট হাতাহীন জামা, তার উপর পীত, নীলাভ লাল, ঘন সবুজ অথবা কমলা রঙের সিল্কের জ্যাকেট। দেহের উত্তরার্ধ আচ্ছাদিত করে মেয়েরা এক ধরনের ডোরাকাটা তিব্বতী বহির্বাসে। হাঁটু পর্যন্ত উঁচু তাদের পাদুকাগুলিতে পর্যন্ত হরেক রকমের কারুকাজ। কব্জিতে শোভা পায় ভারী রুপোর চুড়ি, গলায় দুলিয়ে দেয় কবচ তাবিজ, রুপা এমন কি সোনায়

পর্যন্ত তৈরী মুক্তা এবং প্রবালে খচিত কাস্কেট, কান দুটিকে ঢেকে রাখে হাতের তেলোর মতো চওড়া বড় বড় সোনার চাকতিগুলি। শেরপা-সুন্দরীর পীত অথবা বেগুনী পশমী টুপীও প্রায়শঃই চওড়া সোনার কানাকে শোভিত দেখা যায়।

তিব্বতীদের সংগে সাজাত্য সত্ত্বেও শেরপারা কিন্তু তাদের প্রাক্তন বাসভূমির সংগে কোনো প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখে নি। আজ তারা নেপাল রাজ্যের নাগরিক অথবা গ্রামীণ মানুষ। বিগত শতকসমূহে কিন্তু দলৈ লামার দেশের সংগে সম্পর্ক ছিল তাদের ঘনিষ্ঠতর। সেকালে প্রতিবেশী নেপালীদের সংগে শেরপাদের লড়াই বাধলে তিব্বতী যোদ্ধারা শেরপাদের সাহায্য পর্যন্ত করত।

মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে একদিন পূর্ব-নেপালের কাম্পা চেন উপত্যকায় বিবদমান শেরপা এবং নেপালীদের মধ্যে
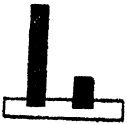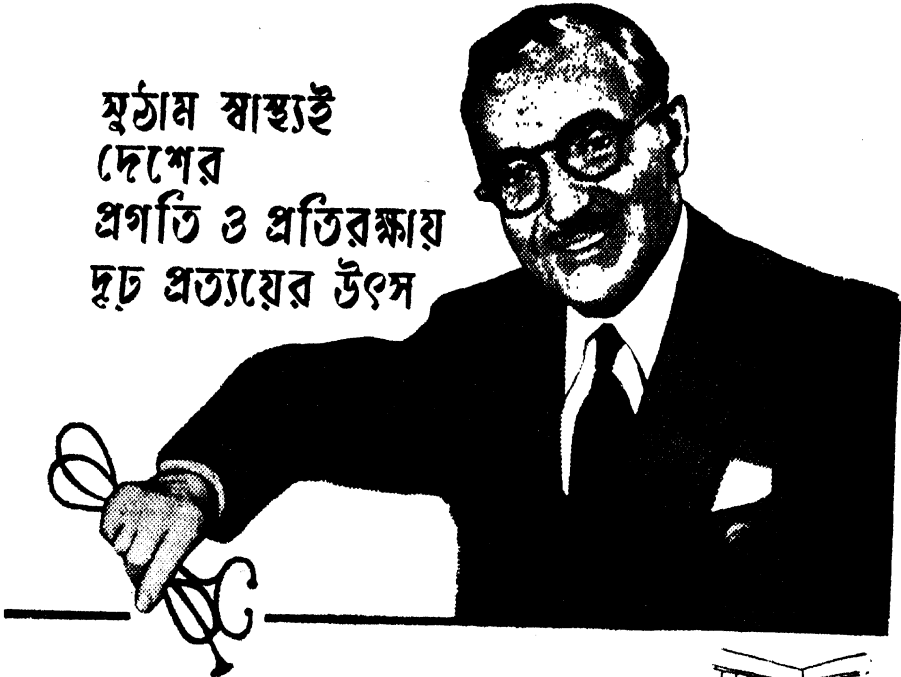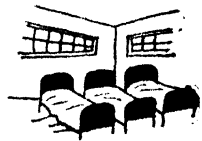
শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ। এই সংগ্রামের মূল কারণ কি তা বলা দরকার।

তখনকার দিনে মাঙার জাতীয় এক নেপালী রাজার এলাকাধীনে ছিল এক প্রকাণ্ড শেরপা বসতি। মাঙার-প্রধান প্রতি বৎসর একবার করে শেরপা গ্রামগুলিতে হাতিয়ার হাতে এসে উদয় হতেন খাজনা আদায় করবার জন্যে। একবার জোর করে খাজনা উশুল করবার সময় নেপালীরা যখন শুরু করে দিল জুগুপ্সিত পাশবিক আচরণ, শেরপারা তখন এক জোট হয়ে নেপালী-প্রধানকে মেরে ফেলল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নিহত ব্যক্তির বিধবা স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করলেন। এক বিরাট অন্ত্যেষ্টি-উৎসবের আয়োজন করলেন তিনি, কাম্পা চেন উপত্যকার যাবতীয় শেরপারাও আমন্ত্রিত হল সেই অনুষ্ঠানে। সরলবিশ্বাসী শেরপারা স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে হাজির হল সেই ভোজের আসরে। আকণ্ঠ পুরে পান করল তারা মাঙার-প্রধানার প্রদত্ত মদ্য। কিন্তু এই অসতর্কতার জন্যে যে মূল্য দিতে হল তাদের তা যেমন শোচনীয় তেমনি মর্মান্তিক। ঐ ধেনো মদের সঙ্গে এক প্রকার মারাত্মক বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন প্রতিহিংসাপরায়ণা মাঙার-প্রধানা। শোনা যায় যে, আন্দাজ হাজার খানেক শেরপা নাকি নিহত হয় এই ষড়যন্ত্রের দরুণ। যে স্থানে অনুষ্ঠিত হয় এই বিষমিশ্রণজনিত হত্যাকাণ্ড, আজও তা 'সহস্র হত্যার স্থান' নামে অভিহিত। মুষ্টিমেয় যে-কয়জন শেরপা সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়েছিল এই নরমেধের হাত থেকে তারা এর প্রতিবিধানার্থে প্রতিবেশী তিব্বত রাজ্যের শাসকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে। তাদের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি নরহন্ত্রী মাঙার-প্রধানাকে সাজা দেবার জন্যে প্রেরণ করলেন এক সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী। লোকজনসহ একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন মাঙার-প্রধানা। দুর্গ ঘেরাও করে ফেলল তিব্বতী সৈন্যরা, দুর্গ-কেন্দ্রটি দখল করবার জন্যে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তিন মাস কাল পৌনঃপুনিক আক্রমণ চালিয়েও সফলকাম হতে না পেরে অবশেষে তারা দুর্গাশ্রয়ী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবার উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিলে। সঞ্চিত জলরাশি বেরিয়ে যাবার উপক্রম হবামাত্রই মাঙার-প্রধানা শত্রুপক্ষকে প্রতারিত করবার উদ্দেশ্যে সমস্ত জলরাশি দুর্গপ্রাকারের উপর নিক্ষেপ করবার জন্যে হুকুম দিলেন। এই চাতুরীতে বিভ্রান্ত হয়ে তিব্বতীরা অবরোধ পরিত্যাগ করে যাত্রা করল স্বদেশাভিমুখে। মাঙার-প্রধানা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সৈন্যদের একত্রিত করে শত্রুদের অনুধাবন করলেন। কিন্তু স্বপক্ষের যোদ্ধাদের পরাক্রমের পরিমাণ নির্ধারণে ভুল করেছিলেন তিনি —লড়াইয়ে তিব্বতীদের নিকট তাদের হল শোচনীয় পরাজয়। শত্রুরা যখন তাঁকে বন্দী করতে এগিয়ে এল তখন তাদের প্রচণ্ড বিক্রমে বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন এই রণনিপুণা বীরাঙ্গনা। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তিব্বতীরা মাঙার বসতিগুলিতে অনুপ্রবেশ করে লুণ্ঠতরাজে প্রবৃত্ত হল। লুঠের মাল ভাগাভাগি করে নিলে তারা শেরপাদের সঙ্গে।

তিব্বতী বৌদ্ধধর্মই হচ্ছে শেরপাদের ধর্ম। তাদের অধিকাংশই 'লাল টুপি' সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী। এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতদের বিয়ে করে সংসারধর্ম করবার অধিকার আছে। কাজেই তাঁরা নিজ নিজ পরিবারের লোকেদের সঙ্গে বাস করেন এবং চাষ-বাস অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। কেবলমাত্র বিরাট ধর্মীয় উৎসবের সময়েই তাঁরা পুরোহিতের বিশিষ্ট পোশাক পরেন এবং নিকটবর্তী তীর্থমন্দিরে গিয়ে সমবেত হন। শেরপা মন্দির-সংলগ্ন দীর্ঘ প্রাচীরগাত্রে প্রায়শঃই প্রস্তর-ফলকে প্রার্থনামন্ত্র উৎকীর্ণ দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীর-প্রদক্ষিণ গণ্য হয় পুণ্যকৃত্য বলে। মন্দিরাভ্যন্তরে ধর্মগ্রন্থে পরিপূর্ণ বিরাট প্রার্থনাচক্রসমূহ নিরন্তর প্রচণ্ড শব্দে ঘূর্ণমান, শেরপা পল্লীতে বেড়াতে গেলে বাসগৃহগুলির সম্মুখে লম্বা বাঁশের ডগায় উড্ডীন শ্বেত পতাকাসমূহ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে বিশেষভাবে।

নিকটবর্তী তুষার-কিরীটী শিখরগুলির প্রতি লামাদের গভীর শ্রদ্ধা। কেননা ওগুলি হচ্ছে অগণিত দেবতা এবং দানবের অধিষ্ঠানক্ষেত্র, যাঁরা মানুষের সংসারে পাঠাতে পারে সৌভাগ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অথবা ব্যাধি ও মৃত্যু। স্মরণাতীত কাল থেকে শেরপা পুরোহিতরা জাতীয় ঐতিহ্যের অনুবর্তন করে আসছে। দৈববাণী সংবলিত গ্রন্থ এবং পাশা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করে তারা দেবতাদের; আগুনে পোড়ায় ভেড়ার রক্তমাখা কাঁধের একাংশ এবং অগ্নির সংস্পর্শে পশুটির হাড়ের মধ্যে যে সকল ফাটলের সৃষ্টি হয় সেগুলি নিরীক্ষণপূর্বক ভবিষ্যদ্বাণী করে।

অপরাহ্ণ কালে শেরপা পুরুষেরা যখন কোনো পরিবারের পূজাঘরে জমায়েৎ হয় তখন তাদের মনে পড়ে পুরনো প্রথাসমূহের কথা। তাই নিয়ে চলে কথাবার্তা, এখানে হয় পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, এখানেই স্বাগত করে তারা অতিথিকে। প্রত্যেক সম্পন্ন শেরপা বাড়িতেই একটি পারিবারিক পূজা-বেদী পরিলক্ষিত হয়। এটি বিবিধ কারুকার্যে খচিত, দেখতে কতকটা ঝাঁপির মতো। ভেতরে আছে কতিপয় খোলা খোপ—সেগুলিতে স্থাপিত সোনার পাতে মোড়া ষড়ানন বুদ্ধের অথবা বর্শাধারী কোনো দৈত্যের প্রতিমূর্তি। অর্ঘ্যস্বরূপ এগুলির সামনে রাখা হয় এড়োভাবে বসানো একটি তীর, এক বাটি ভর্তি গোধূম এবং জলপূর্ণ কয়েকটি পাত্র।

ফসল মাড়াই করছে শেরপা যুবতীরা

বেদীর পাশে প্রায়শঃই ঝুলিয়ে রাখা হয় ঝাপসা-হয়ে-আসা, ছেঁড়াখোড়া আলোক-চিত্রসমূহ—এগুলো হচ্ছে পরিবারস্থ লোকেদের পর্বতাভিযানে অংশ গ্রহণের স্মারকচিহ্ন।

সারাদিন শেরপারা থাকে কাজকর্মে ব্যাপৃত, নৈশ অন্ধকারে যখন দশদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন কোনো বাড়িতে জমে আড্ডা। গৃহাভ্যন্তর থেকে বাইরের পানে তাকালে নজরে পড়ে চঞ্চল, চলমান কয়েকটি প্রদীপ রাতের অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিবেশীরা এসে জমায়েৎ হয় নির্দিষ্ট গৃহে। মানুষের অপকার করবার উদ্দেশ্যে রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়ায় যে সকল অপদেবতা তাদের ভয় দেখানোর জন্যেই নাকি হাতে করে লণ্ঠন নিয়ে আসে তারা। আড্ডাধারীরা সমাগত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীচেকার দরজা খুলে দেওয়া হয়, ঠাট্টা-মস্করা আর উচ্চ হাস্যরোলে বিদীর্ণ হয় নৈশ নৈঃশব্দ্য। ঘরের ভেতরে ঢুকে প্রথমেই তারা দেবমূর্তিগুলির দিকে মুখ করে দাঁড়ায় এবং যুক্তপাণি হয়ে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করে। তাদের মধ্যে একজন হয়ত রক্তাম্বরধারী লামা। বেদীর সম্মুখে সটান শুয়ে পড়েন তিনি উপুড় হয়ে এবং বার কয়েক কপাল ঠেকান মাটিতে। প্রণতি শেষ হলে তবেই স্বাগত করা হয় আগন্তুকদের। অতঃপর গোল হয়ে বসে সবাই গদিতে। আলাপ-চারণার সূচনা হয় সারাদিনের ছোট-খাটো ঘটনাগুলিকে উপলক্ষ করে। ক্রমে রাত বাড়তে থাকে; শুরু হয় জোয়ার থেকে তৈরি মদের সদ্ব্যবহার, কথাবার্তাও তখন হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। মদ্যপান শেরপাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুণ্য-কৃত্য বিশেষ। প্রথমতঃ সৌভাগ্য-কামনায় পান-পাত্রের প্রান্তদেশে ভিজিয়ে নেওয়া হয় একদলা মাখন। তারপর ভূতলবাসী অপদেবতাদের তৃপ্ত্যর্থে অর্ঘ্যস্বরূপ কিয়ৎ পরিমাণ মদ্য নিক্ষেপ করা হয় মাটিতে এবং পানার্থী পাত্রে একটি আঙুল ডুবিয়ে কিছু পরিমাণ মদ ছিটিয়ে দেয় নরকের চিরতৃষাতুর আত্মাদের উদ্দেশ্যে। এই কৃত্যটি শেষ করে পানার্থী অভ্যাগত বিড় বিড় করে আশীর্বাদ উচ্চারণ করে গৃহস্বামী এবং পরিবারস্থ সকলের উদ্দেশে। এই সকল কৃত্য যথারীতি অনুষ্ঠিত হলে তবেই শুরু হয় সকল অভ্যাগতের মদ্যপানের পালা।

শেরপাদের এই নৈশ আড্ডায় শোনা যায় অনেক আজগুবি গাল-গল্প। পাহাড়-পাগল শাদা সাহেবদের' দুঃসাহসিক অভিযানের নতুন-পুরনো, সত্য এবং বানানো, স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনী বর্ণনায় তাদের ক্লান্তি নেই। প্রায়শঃই বিশেষভাবে বলে তারা সেই রহস্যময় তুষার-মানবের কথা—শেরপাদের ভাষায় যা হচ্ছে ইয়েতি। তাদের সকলেরই মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল যে হিমালয়ের তুষার-ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে অর্ধ-নর অর্ধ-বানরের মতো আকৃতিবিশিষ্ট এক জাতীয় প্রাণী। কচিৎ—কখনো দেখা যায় তাদের, তাও আবার দূরের থেকে, কেননা অত্যন্ত ভীরু এই প্রাণীরা। সে যাই হোক ইয়েতির সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সেজন্যে শেরপারা সদাই সতর্ক। কেননা তুষার-মানবের দর্শনই তাদের নিকট গণ্য হয় দুর্নিমিত্ত বলে।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে এভারেস্ট অভিযাত্রী এরিক শিপটন যখন তুষার-মানবের পদচিহ্নের কতকগুলি চমৎকার ছবি তুলে নিয়ে ফিরে এলেন তখন এই রহস্যময় অজানা জীব সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা একেবারে চরমে উঠল। বৎসর দুই পরে তুষার-মানব সম্পর্কিত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করবার উদ্দেশ্যে এক অভিযাত্রী দল রওনা হল হিমালয়ের অভিমুখে। জনকয়েক ব্রিটিশ, মার্কিন এবং ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ যোগদান করলেন এই অভিযানে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বলতে গেলে চষে ফেললেন তাঁরা উত্তর-নেপালের পার্বত্য ভূভাগ, কিন্তু তুষার-মানব আবিষ্কারের সকল চেষ্টাই তাঁদের পর্যবসিত হল ব্যর্থতায়। ধরা পড়ল না ঐ জাতীয় কোনো প্রাণী।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা-সঞ্জাত ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে আজ ইয়েতি প্রসঙ্গের ইতি হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের কল্পনাসৃষ্ট জীব ইয়েতি, বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে শেরপাদের কিন্তু কোনো মাথাব্যথা নেই। তাদের মুল্লুকে তারা যে মাঝে মাঝে দেখতে পায় ইয়েতিকে—যখন সে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় তখন তার দৈর্ঘ্য হয় সাত ফুট থেকে সাড়ে সাত ফুট পর্যন্ত, ঘন পিঙ্গল রোমরাজিতে আবৃত তার বলিষ্ঠ দেহ, বাহু দুটি দীর্ঘ, মাথা ডিম্বাকৃতি, মুখ বাঁদরের মুখের মতো। আগুনকে তার বড় ভয়। ইয়েতি এমনিতে মন্দ জীব নয়, কিন্তু আহত হলে ধারণ করে ভয়াল মূর্তি।

যুগযুগান্তর সঞ্চিত সংস্কারের ফলে ইয়েতি-ভীতি পুরুষানুক্রমে বাসা বেঁধেছে একেবারে শেরপাদের মর্মমূলে। দুর্গম পথে অভিযানে তারা অকুতোভয়, কিন্তু আলো হাতে না নিয়ে অন্ধকার রাত্রে পথ চলবার সাহস নেই তাদের।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা :

মহানগর (বাঙলা) : আর. ডি. বনশাল-এর নিবেদন; ৩,৬৫৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য সঙ্গীত-পরিচালনা এবং পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়; মূলকাহিনী : নরেন্দ্রনাথ মিত্র; চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র; শব্দানুলেখন : দেবেশ ঘোষ, অতুল চট্টোপাধ্যায় এবং সুজিত সরকার; আবহসঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশনা : বংশীচন্দ্র গুপ্ত; সম্পাদনা : দুলাল দত্ত; রূপায়ণ: মাধবী মুখোপাধ্যায়, জয়া ভাদুড়ী, শেফালিকা, ভিকী রেডউড, মিসেস ইয়েটি, শীলা পাল, স্মিতা সিংহ, অনুরাধা গুহ, মনীষা চক্রবর্তী, গীতালি রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, সুব্রত সেন, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। আর. ডি. বি-র পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২৭এ সেপ্টেম্বর থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র যেদিন 'অবতরণিকা' গল্পটি লিখেছিলেন, সেদিন তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, ঐ 'অবতরণিকা' নামে ছোট্ট গল্পটিকেই একদিন নানা ছাঁদে সাজিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গালভরা 'মহানগর' নামে ভূষিত ক'রে একখানি উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত করবার সুযোগ দেখা দেবে চলচ্চিত্রের মহিমায়। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, 'অবতরণিকা'র যে-কাহিনী, সে-কাহিনীর অকুস্থল কোনও মহানগরই এবং গল্প যখন একটি মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারকে ঘিরে গ'ড়ে উঠেছে, তখন সে মহানগর আমাদেরই চেনা ও জানা 'কলিকাতা মহানগর'।

সুব্রত এবং আরতির পারিবারিক পরিবেশে যে-সমস্যা এবং মানসিক সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, বর্তমানের অর্থনৈতিক চাপে এই সমস্যা ও সংঘাত প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে ঘরে। বিশেষ যেখানে আড়াইশো টাকা মাস মাইনে পাওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট্যান্টের স্ত্রীকে নিজের আকর্ষণীয় চেহারা ও স্কুল ফাইন্যাল পাশ করা বিদ্যে নিয়ে 'সেল্স্ গার্ল'-এর কাজ করতে হয় এবং মাত্র মাসখানেক কাজ করবার পরেই নিজ গুণপনার জোরে মনিবের প্রশংসার পাত্রী হয়ে উঠতে হয়, সেখানে দাম্পত্য সম্পর্কে একটা ছোটখাট ভুল-বোঝাবুঝির সংঘর্ষ ঘটা খুব বেশী অস্বাভাবিকও নয়। এবং অপরের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে সেই স্ত্রী যখন অনায়াসেই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চ'লে আসে, তখন আর্থিক অসুবিধার শত ভ্রূকুঞ্চন সত্ত্বেও স্বামীর মন থেকে যে একটি সন্দেহের গুরুভার নেমে গিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের ভারকেন্দ্র যে আবার সুস্থির হয়, সে-বিষয়েও সন্দেহ নাস্তি।

এই ছোট্ট এবং শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাপ্রসূত গল্পটিই সত্যজিৎ রায়ের নবতম সৃষ্টি 'মহানগর'-এর উপজীব্য। গল্পটি ছোট—

'একই অঙ্গে এত রূপ'-এর প্রধান নারী চরিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায়

সত্যিই ছোট; কিন্তু বিষয়বস্তুটি ছোট ত' নয়ই, বরং বর্তমান মধ্যবিত্ত জীবন-যন্ত্রণার একটি আণুবীক্ষণিক প্রকাশ (মাইক্রস্কোপিক রিভিলেশন) হিসেবে এর তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। এবং সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে বিষয়বস্তুর এই গভীরতাকে ওত-প্রোতভাবে বিশদরূপে প্রকাশিত করা চলচ্চিত্রের ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। একটি মধ্যবিত্ত সংরক্ষণশীল বাঙালী পরিবারের বধূ তার শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকতে এবং একটি শিশু-পুত্রের জননী হয়েও সংসারে কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা আনবার চেষ্টায় 'সেলস গার্ল' বা ক্যান্‌ভাসারের চাকরী নিলে সেই সংসারে প্রধানতঃ যে মানসিক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, তারই বহুমুখী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপকে তিনি বিধৃত করেছেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে। প্রথমে আর্থিক অসচ্ছলতার কয়েকটি নিদর্শন দেখিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে চাকরী করলে ঐ অসচ্ছলতা দূর হয়, একথা স্ত্রীকে স্বামীর ইঙ্গিতচ্ছলে বলাও অকস্মাৎ একজন গৃহস্থ বধূর পক্ষে কতখানি শঙ্কিং বা মানসিক বিহ্বলতা উৎপাদক, তা' পর্যন্ত চিত্রিত করতে পরিচালক শ্রীরায় বিস্মৃত হননি।

'স্মার্ট অ্যাট্রাক্টিভ সেলস গার্ল'-এর চাকরীটা যখন সত্যিই পাওয়া গেল, তখন প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বধূর মনে প্রথমে বিস্ময়, পরে দ্বিধা এবং শেষে চাকরী করা সম্পর্কে বাস্তবের মুখোমুখী হবার জন্যে যে মানসিক প্রস্তুতির ভাব জাগে, তা যেমন চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, তেমনই হয়েছে স্বামীর মনের মোটা প্রতিক্রিয়াগুলিও; অগে বললে গেছে......আমার প্রিয়দর্শনা স্ত্রী তাহ'লে শেষ পর্যন্ত চাকরী করতে চলল—যাক না, তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে, এমন তো আখছার কতই যাচ্ছে... ইত্যাদি গোছের মনোভাব। অপরপক্ষে সামাজিক জীবন সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন শ্বশুর সদ্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রিয়গোপাল তাঁর সনাতন আদর্শকে নবযুগের রথচক্রতলে বলি দিতে যে সম্পূর্ণ নারাজ এবং শাশুড়ী এই অকল্পনীয় ব্যাপারে অবস্থার চাপের কাছে শান্ত আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়েও ব্যথাবিধুর অন্তরের সাশ্রু-প্রকাশকে যে সংবরণ করতে পারছেন না, তার ছবির মধ্যে আমরা পরিচালকের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করি। যখন সত্যই চাকরীতে যোগ দেবার প্রথম দিনটি উপস্থিত হল, সেদিন বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীকে রেঁধে ভাত দেওয়ার পরিবর্তে শাশুড়ীই চোখের জল গোপনে মুছতে মুছতে ছেলে-বৌকে ভাতের থালা ধরে দিয়েছেন এবং দুজনে একসঙ্গে খাওয়া সেরে একসঙ্গে বাইরে বেরোবার উপক্রম করেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে এল প্রায় অনতিক্রমণীয় বাধা; মা যে সেজেগুজে বেরিয়ে যাবে তার ছোট্ট ছেলেটিকে বাড়ীতে ফেলে রেখে, একথা আরতির একমাত্র বাচ্চা বুঝে বুঝতেই চায় না—সে অভিমান ভরে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে। অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় তাকে ভুলিয়ে আরতি বার স্বামী সুব্রতর সঙ্গে তার কর্মস্থলে। 'সেলস গার্ল' রূপে ধনীগৃহে যাওয়া করার প্রাথমিক বাধা ও

সঙ্কোচের পর আসে সাফল্যের প্রতিশ্রুতি। প্রথম মাইনে পেয়ে শিশু-পুত্র, কিশোরী ননদ, শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী—বাড়ীর সকলের জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আরতি যখন বাড়ী ফিরল, তখন প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে চিত্রে। সনাতন আদর্শবাদী প্রিয়গোপালের বৌমার উপার্জিত অর্থকে স্পর্শ করতেও অসম্মতি ক্ষণিক বেদনার সৃষ্টি করেছে, যেমন অব্যক্ত বেদনার সৃষ্টি হয়েছে, একদা ছাত্র ও বর্তমানে খ্যাতিমান চোখের ডাক্তার প্রণবের সঙ্গে শিক্ষক প্রিয়গোপালের কথোপকথনের সময়ে একটি একটানা তীক্ষ্ম ধ্বনির নিপুণ প্রয়োগে।

অস্বাচ্ছল্যের পেষণে স্ত্রীকে একক বাইরে বেরোতে দেবার জ্বালা সুব্রতর মনে আগুন ধরিয়ে দেয় যখন সে দেখে

'মরুতৃষ্ণা' চিত্রে সাবিত্রী বসু

আরতি তার চাকরীকে ভালোবেসে ফেলেছে এবং সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছে। এতে ইন্ধন জোগায় প্রথমে আরতির ব্যাগে আবিষ্কৃত লিপস্টিক এবং পরে অফিসবস (মালিক) হিমাংশু মুখার্জির নিজের মোটরে করে আরতিকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া। আরতি স্বামীর মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখী হয়ে ব্যথিত হল; সে তার স্বামী থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, স্বামীর মনের এই ভ্রান্ত চিন্তাকে দূর করতে সে অপারগ হল এবং শেষে দাম্পত্য সম্পর্ককে বিঘ্নিত হতে না দেবার জন্যে চাকরীতে ইস্তফা দিতেও সম্মত হল। কিন্তু বিধির নির্বন্ধ; ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় সুব্রত হঠাৎ বেকার হয়ে পড়ল এবং ঠিক নাটকীয় মুহূর্তে টেলি-ফোনযোগে আরতিকে অনুরোধ করল পদত্যাগপত্র পেশ না করতে। এরপর সুব্রতর অবস্থা আরও করুণ; স্ত্রী উপার্জন করে আনে আর স্বামী ঘরের মধ্যে নিষ্ক্রিয় থেকে খবরের কাগজের স্তম্ভে কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়ে। অবস্থা অসহনীয় হওয়ায় সে একদিন, আরতিরই অফিসের মালিক মিঃ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করল; তিনি কিন্তু স্বামী-স্ত্রী একই অফিসে কাজ করে এ ব্যবস্থা পছন্দ করেন না। অথচ নিপুণ কর্মী আরতির স্বামীর জন্যে নিশ্চয়ই কিছু করা উচিত; অতএব তিনি সুব্রতকে অনুরোধ করলেন, ঐদিনই বৈকালের দিকে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে। সুব্রত এসেওছিল তাঁর কথামত, কিন্তু সিঁড়িতে ওঠবার মুখেই সে দেখা পেল অত্যন্ত বিচলিত আরতির এবং জানল, এক সহকর্মীকে অন্যায়ভাবে চাকরী থেকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে সে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এসেছে। অপ্রত্যাশিত আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে সুব্রত কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে রইল; কিন্তু পরে অন্যায়ের প্রতিবাদে তার স্ত্রী উচিত কর্তব্য করতে ত্রুটি করেনি, এই ন্যায়বোধ দ্বারা চালিত

হয়ে সে আরতিকে সানন্দে অভিনন্দিত করল— এই চিত্র আমরা 'মহানগর'-এ সমস্ত রূপ, রস, ব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রতিফলিত দেখতে পাই। সমস্ত ছবিটা জুড়ে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মানসিক অভিব্যক্তির এমন সুনিপুণ প্রকাশ আমরা ছবির রাজ্যে অতি অল্পই দেখেছি। প্রথমে ছবিটি কতকটা ধীর গতিতেই অগ্রসর হয়েছে। এমন কি ট্রামের তারের সঙ্গে লাগা চলন্ত 'পুলি'কে পরিচয়লিপির পশ্চাদ্‌পট রূপে ব্যবহারের মধ্যে শিল্পগত অভিনবত্ব থাকলেও ছবিটি ধীরগতিতেই এগিয়েছে প্রথমাংশে। কিন্তু আরতির চাকরী গ্রহণ করবার পর থেকে ছবিটি যেমন যেমন অগ্রসর হয়েছে, তার গতিও তেমনই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমেই তা' এমনই 'টেম্পো'তে উত্তীর্ণ হয় যে, ছবিটি শেষ হবার পর দর্শকের মনে এই অনুভূতি জাগে যে, ছবিটি অপ্রত্যাশিতভাবে বড় শিগ্‌গির শেষ হয়ে গেল এবং আরও কিছু যেন দেখতে পেলে ভালো হত। অথচ বইটি ১৪ রীল এবং ১২ হাজার ফুটে সম্পূর্ণ! অন্যায়ের প্রতিবাদে আরতির শেষ পর্যন্ত পদত্যাগপত্র পেশ করা, দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা এবং আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীর সম্মুখীন হওয়ার দৃশ্য অবিস্মরণীয়।

ছবিটির সাফল্যের ষোলো আনা অংশই চিত্রনাট্যকার, আবহ-সঙ্গীতকার ও পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের প্রাপ্য। অবশ্য তাঁকে এ-কাজে কলাকুশলীরূপে অকৃপণ সহায়তা করেছেন আলোকচিত্র-শিল্পী সুব্রত মিত্র এবং সম্পাদক দুলাল দত্ত। আবহ-সঙ্গীত রচনায় শ্রীরায় বহু স্থানেই অভিনব কৌশল অবলম্বনের নিদর্শন রেখেছেন। এবং শিল্পীরূপে তাঁকে এ-কাজে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সাহায্য করেছেন আরতির ভূমিকা-গ্রহণকারী মাধবী মুখোপাধ্যায়; প্রতিটি মনোভাব তিনি পরিস্ফুট করেছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে তাঁর দৃষ্টিতে, ভঙ্গীতে, চলনে, বলনে। এবং তাঁরই পাশাপাশি আছেন সুব্রতরূপী অনিল চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতারূপে তিনি তাঁর নাটনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন বহু ছবিতেই; কিন্তু এই প্রথম দেখলুম, তিনি তাঁর গৃহীত ভূমিকায় একটি ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছেন। অফিস-বস হিমাংশু মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় অত্যন্ত প্রত্যয়পূর্ণ বা কনভিনসিং; মনে হয়েছে, তিনি যথার্থই একজন অফিসার। কিশোরী ননদের ভূমিকায় জয়া ভাদুড়ী এমন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল অভিনয় করেছেন যে, রীতিমত বিস্মিত হতে হয়। অপরাপর ভূমিকায় প্রত্যেকেই পরিচালকের চাহিদামত সু-অভিনয় করেছেন এবং এ'দেরই মধ্যে হরেন চট্টোপাধ্যায় (পিতা প্রিয়গোপাল), শেফালিকা (মাতা সরোজিনী), ভিকী রেডউড (এডিথ), শ্যামল ঘোষাল (আরতির মামা), সুব্রত সেন (প্রণব), শৈলেন মুখোপাধ্যায় (ডাঃ ব্যানার্জি) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছবিটির সংলাপের মধ্যে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। স্ত্রী স্বামীকে বলছে, 'আর যাই কর, আমাকে ভুল কোরো না'; এখানে 'ভুল বুঝো না' বলাই সঙ্গত। আর এক স্থানে 'এখন মিন্টুকে চান দেবার সময়' বলা হয়েছে; 'চান করাবার সময়' বলা উচিত। বাঙালীদের সম্বন্ধে দু'জায়গায় নিন্দার্হ কথা অকারণে প্রযুক্ত হয়েছে। এটা অনায়াসে পরিহার করা

যেত। জাতীয় ত্রুটী-বিচ্যুতি দেখাবার অন্য পথ আছে।

ছোট 'অবতরণিকা' গল্প অবলম্বনে 'মহানগর'-এর মতো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিরাট চিত্ররচনা সত্যজিৎ রায়ের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি।

বীন বাদল বর্ষাৎ (হিন্দী) **:** উত্তম চিত্র-এর নিবেদন; ৪,২৩৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা **:** এন, সি, সিপ্পী; পরিচালনা **:** জ্যোতি স্বরূপ; সংগীত-পরিচালনা **:** হেমন্ত-কুমার মুখোপাধ্যায়; রচনা **:** দেব কিষেণ; গীত-রচনা **:** শকীল বদায়ুনী; চিত্রগ্রহণ **:** ভি, এন্, রেড্ডী; শব্দানুলেখন **:** কে, ডি, শাহ, এম্, জি দালাল, পি থ্যাকারসে এবং এইচ, কে, রাও; সঙ্গীত-গ্রহণ **:** মিনু কাত্রাক; শিল্প-নির্দেশনা **:** জি, এল, যাদব; সম্পাদনা **:** আর, ভি, শ্রীখণ্ডে; রূপায়ণ **:** বিশ্বজিৎ, আশা পারেখ, নিশি, দেবকিষেণ, মেহমুদ প্রভৃতি। মীরা পিক-চার্সের পরিবেশনায় গেল ২০এ সেপ্টে-ম্বর, শুক্রবার থেকে প্যারাডাইস, রূপম, ম্যাজেস্টিক, উত্তরা, উজ্জ্বলা প্রভৃতি চিত্র-গৃহে দেখানো হচ্ছে।

মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি হঠযোগ প্রক্রিয়ার ওপর আজও সমান আস্থা আছে, এমন ব্যক্তির সন্ধান প্রচুর পাওয়া যাবে আজকের এই স্বাধীন ভারতে। এবং হিন্দী ছবির দর্শকরূপে তাঁরাও জমায়েত হন শুধু মফস্বল অঞ্চলের প্রেক্ষাগৃহেই নয়, বহু শহর ও শহরতলীর চিত্রগৃহেও। কাজেই 'বীন বাদল বর্ষাৎ'-এর নায়ক প্রভাতের বংশে বহুকাল ধ'রে কোনো বিক্ষুব্ধ জিপ্সীর অভিশাপ কার্যকরী থাকায় সেবংশের কোনো বধূই যে এক বছরের অধিক কাল জীবিত থাকে না এবং কোনো নববধূর পক্ষে প্রকৃত প্রেমের স্বর্গীয় ও পবিত্র স্পর্শে সেই বহুদিনব্যাপী অভিশাপকে খণ্ডন করার চেষ্টায় সাফল্যলাভ করা সম্ভব, এ-কাহিনী আমাদের বুদ্ধিকে বিব্রত করলেও সাধারণ দর্শক যে কাহিনীর উদ্ভটতা নিয়ে আদৌ মস্তিষ্ক-চর্চা করবেন না, এই আশা পোষণ করা অন্যায় নয়। তা'ছাড়া প্রভাত-সন্ধ্যার প্রেমের দৃশ্যগুলি, অনৈসর্গিক কিছু ঘট-নার আশঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতিগুলি এবং আটখানি মন-মাতানো গান ছবিটির উপভোগ্যতাকে যে বহুগুণে বর্ধিত করেছে, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে হেমন্তকুমারের সুরসমৃদ্ধ গানগুলি এই ছবির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

অভিনয়ে নায়ক-নায়িকারূপে বিশ্ব-জিৎ এবং আশা পারেখ দর্শকমনকে জয় ক'রে নেন অতি সহজেই। সুন্দরের ভূমিকায় মেহমুদের হাস্যকৌতুকও উপ-ভোগ্য। এ ছাড়াও যাঁরা দর্শকদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেন, তাঁরা হচ্ছেন নিশি (জিপ্সী মেয়ে) এবং দেবকিষেণ (পুলিস অফিসার)।

কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চমান বজায় আছে।

বিবিধ সংবাদ

শৌভনিকের নব পদক্ষেপ

বিশিষ্ট নাট্য-সংস্থা 'শৌভনিক' আগামী ১৫ই অক্টোবর নিউ এম্পায়ারে 'উমার তপস্যা' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবে। নৃত্যনাট্য হিসাবে এটি তাদের প্রথম প্রচেষ্টা। সতু সেন, রবি চট্টো-পাধ্যায়, অসিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা কুশলীবৃন্দের সহযোগিতায় "উমার তপস্যা" নৃত্যনাট্যটি দর্শক মনোরঞ্জনে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যাসাগর নাট্যগোষ্ঠীর 'অলুক স্বন্দ' :

রমেন লাহিড়ী বিরচিত কৌতুক-নাট্য 'অলুকস্বন্দ' নিঃসন্দেহে একটি উপ-ভোগ্য রচনা : এর ভিতরে কোথাও কোথাও বিদেশী নাটকের ছায়াপাত হ'লেও নাটিকাটি যখন মঞ্চে অভিনীত হয়, তখন এর অন্তর্গত বিভিন্ন নাট্য-পরিস্থিতি যে দর্শকদের ভিতর হাসির হুল্লোড় বইয়ে দিতে সক্ষম হয়, তার চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিন বিদ্যা-সাগর নাট্য-গোষ্ঠী কর্তৃক নাটকখানির অভিনয়-আসরে। বিশেষ ক'রে দুই ভিন্ন-ধর্মী যমজ বোনের অবতারণা নাট্য-পরিস্থিতিকে যথেষ্ট ঘোরালো ক'রে তুলেছে। অভিনয়ে অজিৎ কুণ্ডু (নটরাজ মিত্র), বাবলু রায় (গুবরে), শিবনাথ ভাদুড়ী (ডেঁয়ো), হারাধন বসু (লম্বু), বিভু ভট্টাচার্য (ফড়িং), নাট্যকার রমেন লাহিড়ী (ফিঙে), অঞ্জলি লাহিড়ী (ধেবাড়ি, তুবাড়ি), অর্চনা খাঁ (জোনাকী) প্রভৃতি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা

সম্প্রতি এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ-তে বহির্দৃশ্য সমাপ্তি-শেষে রূপছায়া চিত্রের 'দেয়া-নেয়া'-র সম্পূর্ণ চিত্র-গ্রহণ শেষ হল। সঙ্গীত-জীবনের স্বপ্ন ও মধুর-মুহূর্ত মিলিয়ে এর কাহিনী চলচ্চিত্রনাট্যে স্থান পেয়েছে। সঙ্গীতশিল্পী শ্যামল মিত্র এছবির প্র যো জ ক এবং সঙ্গীত-পরি-

চালক। ক্লারিকা-চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেছেন বম্বের তনয়া তনুজা। উত্তমকুমার এ ছবির নায়ক। প্রধান চরিত্রে অংশ নিয়েছেন কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, ছায়া দেবী, লিলি চক্রবর্তী ও সুমিতা সান্যাল। কুশলীবিভাগে স্বনাম বজায় রেখেছেন আলোকচিত্রে কানাই দে ও সম্পাদনায় অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

তরুণ পরিচালকগোষ্ঠী সন্ধানী নিবেদিত সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে 'অয়নান্ত' চিত্রের নিয়মিত চিত্রগ্রহণ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর সুসম্পন্ন হচ্ছে। কাহিনীর বাস্তবধর্মী চরিত্রে অভিনয় করছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, বিশ্বনাথন, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্পা চক্রবর্তী ও সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগঠনে দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে আলোকচিত্রে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও সম্পাদনায় সন্তোষ গাঙ্গুলী। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন সলিল চৌধুরী। ছায়ালোক ছবিটির মুক্তিভার গ্রহণ করেছেন।

রাধারাণী পিকচার্সের 'প্রেয়সী' সম্প্রতি সম্পাদিত হয়েছে। সুবোধ ঘোষের জনপ্রিয় উপন্যাসও নাট্যসাফল্যের এ-কাহিনীর চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী। ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত। লুপ্ত জমিদারবংশের শেষপুরুষের নাট্যস্পন্দে অভিনীত প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বম্বে), পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, বিনতা রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, দীপিকা দাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অসিতবরণ, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথন, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তরুণকুমার, অনুপকুমার ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। নর্মদা চিত্র পরিবেশিত এচিত্রের সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়।

সুন্দরম প্রযোজিত ও উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত 'সপ্তর্ষি' ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওর সম্প্রতি চিত্রগ্রহণ শেষ হল। ছবিটির মুক্তি আসন্ন। অপরাধমূলক রোমাঞ্চমুখর কাহিনীচরিত্রে অভিনয় করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, নিরঞ্জন রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, মাঃ রাজা এবং গীতা দে। চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন দীনেন গুপ্ত এবং শ্যামল মিত্র।

পরিচালক রাজেন তরফদার সম্প্রতি তাঁর 'জীবনকাহিনী' চিত্রটি সম্পূর্ণ করেছেন। বর্তমানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে সম্পাদনার কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। কলাকুশলীর বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন চিত্রগ্রহণে অনিল গুপ্ত, শিল্পনির্দেশনায় রবি চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদনায় তরুণ দত্ত। কাহিনীর চরিত্র-রূপায়ণে সার্থক অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, সীতা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অরুণ রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায় ও শক্তিকম ঘোষ। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন প্রবীর মজুমদার।

অগ্রদূত পরিচালিত ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র 'বাদশা' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। সম্প্রতি সম্পাদনার কাজ শেষ হয়েছে। চিত্রগ্রহণ করেছেন বিভূতি লাহা। প্রধান চরিত্রগুলোতে অভিনয় অংশে রয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, প্রেমাংশু বসু, তরুণ মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, মাস্টার শিবশঙ্কর, রথীন ঘোষ ও সতু মজুমদার। সঙ্গীতে সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বোম্বাই

প্রযোজক-পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তীর রঙিন ছবি 'জিদ্দি'-র চিত্রগ্রহণ প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে। গত সপ্তাহে শহরের বিভিন্ন স্থানে এছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়। কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন জয় মুখার্জি, আশা পারেখ, মামুদ, শুভা খোটে, রমেশ, উল্লাস ও রাজমেহরা। শচীনদেব বর্মণ সুরকৃত এছবিটির আলোকচিত্রগ্রহণে রয়েছেন ভি, কে, মূর্তি। —চিত্রদূত
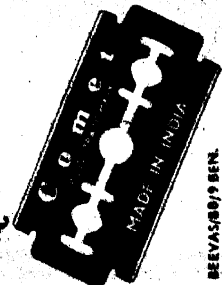
টি. শান্তারাম প্রযোজিত ও পরি চালিত পরবর্তী নতুন ছবি 'গীত গয়া'-র প্রধান চরিত্রে সম্প্রতি মনোনীত হয়েছে নায়ক সুরেন্দ্র। নায়িকা চরিত্রে থাকবেন শান্তারামকন্যা সুখ্যাত রাজশ্রী। নবাগতা শোভনা আর একটি আকর্ষণীয় সংযোজন। এস পি রামলাল এছবির সঙ্গীত-পরিচালক। রাজকমল ষ্টুডিওর আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

পুষ্পকন্যার রঙিন ছবিতে সুলতা চৌধুরী

বিজলগীত' ছবির নায়িকা নিরূপা

চালিত একাহিনীর প্রধানচরিত্রে অভিনয় করছেন অশোককুমার, প্রদীপকুমার, মীনাকুমারী, জনি ওয়াকার, সাপ্রু, বালম ও কপিলকুমার। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন রোশান।

সম্প্রতি 'মেহেবুব' সেন্সর ছাড়পত্র পেয়েছে। এই রঙিন ছবির বিভিন্ন অংশে

জয়, চট্টো

কাঞ্চনকন্যা চিত্রে অরুণ মুখোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার

সোহরাব মোদী সিনে-ইন্ডিয়া ইন্টার-ন্যাশনাল-এর যে নতুন রঙিন ছবিটি করছেন তার নাম 'নুরজাহান'। ছবিটির প্রধান চরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন আকবর চরিত্রে পৃথ্বিরাজ কাপুর এবং নামভূমিকায় সায়রাবানু। এ মাসের আরম্ভেই ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

সানন্দকলা-র নবতম রঙিন চিত্রটির নাম 'বহু-বেগম'। এম সাদিক পরি-

চরিত্রানুযায়ী সার্থক অভিনয়ে রূপদান করেছেন অশোককুমার, নিম্মি, রাজেন্দ্র-কুমার, সাধনা, অমিতা, প্রাণ ও জনি ওয়াকার। নৌসাদ এ ছবির সঙ্গীত-নির্দেশক। প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন এইচ, এস রাওয়াল।

আশা আর্ট প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'কাশ্মীরা'-র সম্প্রতি আশা স্টুডিওয় মহরৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। ছবিটি পরিচালনা করবেন রূপ কে সোরি। প্রধান প্রধান-চরিত্রে রয়েছেন অশোক-কুমার, আশা মাথুরণী, মাহমুদ, নাসা পালশিকর ও ললিতা পাওয়ার। এর মধ্যে ছবির কয়েকটি গান গ্রহণ করেছেন সংগীত-পরিচালক এন দত্ত।

প্রযোজক পান্নালাল মহেশ্বরী তাঁর নতুন রঙিন ছবি 'কাজল'-এর চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই শুরু করবেন। গুলসান নন্দার বিখ্যাত 'মাধবী'-র কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে।। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ফণী মজুমদার। ছবিটির পরিচালক রাম মহেশ্বরী। সঙ্গীতে সুরসৃষ্টি করবেন রবি।

[illegible] নায়িকা সন্ধ্যা রায়

মাদ্রাজ

তামিল ভাষায় 'কুমুদম' হিন্দীতে রূপায়িত করছেন পরিচালক ভীম সিংহ। প্রধানচরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন অশোককুমার। বাংলা এবং বোম্বাইয়ের পরিচিত অনেক শিল্পীই এ-ছবিতে অভিনয় করবেন। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন মদনমোহন।

অঞ্জলি পিকচার্সের 'প্রসাদম' চিত্রের নির্মিয়র দৃশ্যগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। মুখ্য কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন অশোক-কুমার, বৈজন্তীমালা ও মনোজকুমার। ইন্দররাজ আনন্দ এ-ছবির পরিচালক।

—চিত্রদূত

উত্তরফাল্গুনী চিত্রে বিকাশ রায় ও সুচিত্রা সেন

স্টুডিও থেকে বলছি

টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ার আকাশ এখন আসন্ন শরতে কুমারী মেয়ের মত রূপ পেয়েছে। লাবণ্য ও যৌবনে যেন সাতরঙা। নতুন নতুন ছবি মহরতের সিঁড়ি পেরিয়ে ধাপে-ধাপে শেষ হচ্ছে। মুক্তিপ্রতীক্ষিত চিত্র মুক্তিলাভ করছে। পরপর কয়েকটি সংখ্যায় মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি সম্পর্কে বিস্তারিত খবর পেশ করেছি, এবারে দৃশ্যগ্রহণরত নতুন একটি ছবির কথা বলি। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর এর দৃশ্যগ্রহণ সম্পূর্ণ হচ্ছে। ছবিটির নাম 'বর্ণালী'। শব্দধারক দেবেশ ঘোষ এর প্রযোজক। 'সাতপাকে বাঁধা'-র সাফল্যের পর পরিচালক এ-ছবিটি পরিচালনা করছেন। সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগে রয়েছেন চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্প-নির্দেশনা এবং সংগীত-পরিচালনায় যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী, সন্তোষ গাঙ্গুলী ও কালীপদ সেন। সহপরিচালনায় সাহায্য করছেন হীরেন নাগ, স্বদেশ সরকার এবং নরেশ রায়। চণ্ডীমাতা এ-ছবির পরিবেশক।

পরিবেশনা থেকে কাহিনীর পরিবেশনে আসা যাক। সুবোধ ঘোষের লেখা উপন্যাসের চিত্রনাট্য করেছেন হীরেন নাগ। কাহিনীর পরিবেশ বর্তমান শহুরে সমাজের ভাললাগা দুটি ছেলে-মেয়ের জীবনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ কলিকাতায় এক বিয়ে বাড়ীর নিমন্ত্রণ-পরিক্রমা দিয়ে কাহিনীর শুরু। কণ্ট্রাক্টরীতে অর্জিত অর্থশালী ত্রিদিব সরকারের একমাত্র মেয়ে নমিতার সঙ্গে ধনী-পুত্র শৈলেশ্বরের আগামী-দিনে বিয়ে। সেই উপলক্ষে পরিচিত প্রিয় বেশী অশেষ হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে বিয়ে-বাড়ির কাজে মেতেছে। নিমন্ত্রণ-পর্ব প্রায় সে শেষ করে এনেছে। শুধু একটা বাড়ি তখনও বাকী। একচল্লিশ নম্বর তার ঠিকানা। বাড়ির হদিশ জেনে সেই রাত্রে অশেষ যখন উপস্থিত হয় তখন সম্পূর্ণ অপরিচিতা অলকা তাকে বসিয়ে বাবা বিমান চৌধুরীকে এই আগন্তুকের উদ্দেশ্য জানায়। বাড়ীর সকলে ত্রিদিববাবুর নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে যেমন বিস্মিত, তেমনি আনন্দিত হন।

শেষ-নিমন্ত্রণ পৌঁছে দিয়ে যখন অশেষ বাড়ী ফিরে ত্রিদিববাবুকে সবকথা খুলে বললো, তখন অশেষের মারাত্মক ভুলের উদাহরণ স্পষ্ট হল। একচল্লিশের জায়গায় সে ভুল করে একচল্লিশের এক নম্বরে নগেনবাবুর জায়গায় বিমানবাবুর বাড়ীতে ঢুকে পড়েছিল। ফলে ভুলের জরিমানা যোগাতে আবার নিমন্ত্রণ বাতিল করতে বিমানবাবুর বাড়ীতে অশেষ ধুঁকতে ধুঁকতে ছুটলো। বেশ

দৃশ্যগ্রহণের অবসরে স্টুডিওর বাগানে ঘরোয়া আলাপ করছেন বসন্ত চৌধুরী ও শর্মিলা ঠাকুর। ফটো : অমৃত

সাহসের সঙ্গে বাড়ীতে আবার কোন অছিলায় গল্প জমাতে গিয়েও আসল কথাটা তার আর মুখফুটে বের হচ্ছিল না। শেষে রাত গভীর হয়ে আসলে আসল উদ্দেশ্য অতি সঙ্কোচের সঙ্গে বলে ফেললো। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এটাকে একটা কৌতুক বলেই ধরে নিলেন বিমানবাবুর বাড়ীর সকলে।

নিদারুণ লজ্জা নিয়ে পালিয়ে বাঁচলো অশেষ।

বাড়ীতে ফিরে এসেও অশেষের শান্তি ঘুচলো না। মনের সঙ্গে অনুশোচনার ঝড় উঠলো তার। অনেক রাত্রেই একচল্লিশের-এক নম্বরে বন্ধদরজার পাশে জানালার আলো জ্বলতে উঁকি দিয়ে দেখে অলকা তখনও অধ্যয়নরতা। তারপর এক-সময় চুপি-চমকে বিস্মিত অলকাকে আগমনের হেতু জানিয়ে আজকের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইলো। পাল্টা নিমন্ত্রণে অশেষকে রাজী করালো অলকা। যথাসময়ে পরের দিন দুপুরে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে এসে অশেষ দেখে শুধু অলোকাই সারা বাড়ী জুড়ে গিন্নী-পনা করছে। বাড়ীর লোকেরা হঠাৎ কাজে বেরিয়েছেন। নির্জন এ পরিবেশে অনেকটা অপরিচিতের অন্ধকার থেকে

দুজনেই সহজ হয়ে এসেছে। ক্রমে যখন দুপুরে রোমাঞ্চ-মধুর মুহূর্তে ভালবাসার গভীরে হেলে পড়েছে তখন অশেষ জানতে পারে অলোকা আর একজনকে ভালবাসে তার নাম শৈলেশ্বর। ঘটনাচক্রে সে ত্রিদিব সরকারের ভাবী জামাতা হতে চলেছে। সেই মুহূর্তে অলকাকে দুঃখ না দিয়ে অশেষ বিয়েবাড়ীতে ফিরে এসে কাজে পা বাড়ালো।

বিয়েবাড়ীতে অনেকেই প্রতিবেশী বিমান চৌধুরীকে না দেখে অবাক হলেন। বিশেষ করে মিঃ মুখার্জির অনুরোধে সম্মান বাঁচাতে ত্রিদিববাবু নিজেই ছুটলেন বিমান সকাশে। অলকারা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হল। অশেষ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শুধু অলোকাকে অপমান থেকে বাঁচাতে সেইমহূর্তে গাড়ী করে নানা গল্পের অছিলায় আলিপুরের এক প্রাসাদোপম বাড়ীতে ওকে নিয়ে হঠাৎ উপস্থিতি জানালো। একে একে বাড়ীর গৃহকর্ত্রী অশেষের খুড়িমার কাছে অলোকা জানতে পারলো—একমাত্র এঁর চেষ্টায় পিতৃমাতৃহীন অশেষ ডাক্তারী পাশ করেছে। যদিও অলোকা আর এক-জনকে ভালবাসে কিন্তু অশেষের সত্যি-কারে পরিচয়ে সে যেন অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লো ওর সঙ্গে। পরিচয়ের বন্ধন নিবিড় হলে অলোকাকে বিয়ে বাড়ীতে অশেষ ফিরিয়ে আনে। বিয়ের আসনে শৈলেশ্বরকে বসে থাকতে দেখে অলকা সোজা অশেষের হাত নিবিড় করে ধরে বাসর ঘরে দাঁড়ালো। চমক ভাঙ্গালো শৈলেশ্বর আর অলোকার। অশেষ তখন অলোকাকে কনেদেখা-আলোয় আবন্ধ করলো।

রোমাঞ্চ-মধুর এ কাহিনীচিত্রে অভিনয় করেছেন, অশেষ—সৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায়, অলোকা—শর্মিলা ঠাকুর, ত্রিদিব সরকার—কমল মিত্র, বিমান চৌধুরী—পাহাড়ী সান্যাল, ত্রিদিববাবুর স্ত্রী—ছায়া দেবী এবং শৈলেশ্বর—এন বিশ্ব-নাথন। —চিত্রদূত

ভিন দেশী ছবি

। ডাইলন টমাসের 'কাব্য-চিত্রনাট্য'

ছায়াছবির চিত্রনাট্যে কবিত্বের স্থান অল্পই। চিত্রনাট্যে কাহিনীর দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে গমন ঘটে স্থূল বর্ণনায়। সট ডিভিশন, ক্লোজ-আপ, লং-শট, প্যান, মিক্সড, ফেড ইন, ফেড-আউট ও কাট প্রভৃতি ক্যামেরা-নির্দেশনা যে-কোনো চিত্র-নাট্যেরই মূলে উপাদান। কিন্তু 'প্রতিভা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই সঞ্জীবিত করে'—এই বঙ্কিম-বাক্যটিকে সার্থক করার জন্যেই যেন প্রখ্যাত কবি ডাইলন টমাস একটি অ-সাধারণ চিত্র-নাট্য রচনা করেছিলেন। ডাইলন টমাসের এই চিত্র-নাট্যটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অক্সফোর্ডে থাকাকালীন ডাইলন টমাস ১৯৪০ সালে এই চিত্র-নাট্যটি রচনা করেন আর্থার র‍্যাংকের জন্যে। রবার্ট লুই স্টিভেন্সসন-এর একটি ছোট উপ-ন্যাস অবলম্বনে চিত্র-নাট্যটি রচনা করে-ছিলেন কবি। চিত্র-নাট্যটি প্রকাশিত হয়েছে "দি বীচ অফ ফেলেসা" নামে। শুধু শ্রেষ্ঠ চিত্র-নাট্য হিসেবেই নয়, ডাই-লন টমাসের অসাধারণ কবি-প্রতিভার স্বাক্ষরও বহন করেছে 'দি বীচ অফ ফেলেসা'। এই চিত্র-নাট্যে ক্যামেরার চোখকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজস্ব ভঙ্গীতে কবি দৃশ্য-দৃশ্যান্তরের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন একটি সাধারণ দৃশ্য-বর্ণনা!

ক্লোজ শট। বহির্গমনের পাশের দরজা হলুদ আলোয় উজ্জ্বল।

আরেকটি বর্ণনা ঃ

Lantern and the moonlight
make the bush all turning
shadows
that weave to meet and then
spin off,
that hover overhead and fly
away,
huge, birdlike,
into deeper inextricable dark.

র‍্যাংক প্রতিষ্ঠানের জন্যে চিত্র-নাট্যটি রচিত হলেও, শেষ পর্যন্ত ছবিটি ওঠে নি। চিত্রনাট্যটি এখন প্রখ্যাত অভিনেতা রিচার্ড বার্টন কিনেছেন ছবি করবেন বলে। নিউইয়র্কের জনৈক প্রযোজক এই চিত্র-নির্মাণে তাঁর সহযোগী।

'দি বীচ অফ ফেলেসা' কাহিনী দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। স্টিভেন্সসনের রচনার রোমাঞ্চকর সব বৈশিষ্ট্যই এই কাহিনীতে বর্তমান। এই চিত্রের নায়ক উইল্টশায়ার ফেলেসা দ্বীপে এসেছিল বাণিজ্য করতে। দ্বীপে আরেকজন শ্বেতকায় ব্যবসায়ী কেস তার সঙ্গে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিল। দুজনে দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে টিনের মাছ, কাপড় কাচার নীল বিতরণ করে জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করে। কেস তার বন্ধুকে ফেলেসা দ্বীপের একটি মেয়েকে নর্মসহচরী হিসেবে 'উপহার' দেয়। কিন্তু সহচরী হিসেবে তাকে পাওয়া গেল না। কেস উইল্টশায়ার ওর প্রতি শেষপর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে। এবং তখন উইল্টশায়ারের জীবনের জন্যে সংগ্রাম শুরু হল।

কবি ডাইলন টমাস স্টিভেন্সসনের কাহিনীর কোনো হের-ফের না ঘটিয়ে রোমান্টিক আবহাওয়ার আমদানী করে কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ অন্য এক জায়গায় নিয়ে গেছেন। চলচ্চিত্রে খল-নায়কের ভূমিকায় (কেস) অভিনয় করার কথা আছে জেমস মেসন-এর। উইল্টশায়ারের ভূমিকায় রিচার্ড বার্টন নিজেই নামবেন।

ডাইলন টমাস এই চিত্র-নাট্যের দরুণ পেয়েছিলেন ৩,৩০০ ডলার। ক্রিসমাসে ছেলে-মেয়েদের উপহার দেবার টাকা-

পয়সা নেই এই কাঁদুনী গেয়ে প্রযোজকদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ টাকাটাই নিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। প্রযোজক, পরিচালক এবং চলচ্চিত্র-মহলের লোকদের সঙ্গে আলোচনা-সভায় নিষ্ঠার সঙ্গেই যোগ দিতেন কবি, তাঁদের কথা মন দিয়ে শুনতেন, কিন্তু পানশালায় ঢুকে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সব আলোচনাই ভুলে যেতেন।

নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। যুদ্ধস্মৃতি দু'খণ্ডে রচিত। প্রযোজক জ্যাক লে ভিয়েসের সঙ্গে স্যার চার্চিল তাঁর যুদ্ধস্মৃতিকে চলচ্চিত্রে রূপায়ণের জন্যে একটি চুক্তিপত্রে সই করেছেন। ছবিটি পূর্ণ-দৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র হলেও, চিত্রে নাটকীয় উপাদানের অভাব হবে

তাঁর সম্বন্ধে জনৈক প্রযোজক বলেছেন : "ছোকরা যদি একটু সংযমী হত, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-নাট্যকার হতে পারত।"

।। চার্চিলের যুদ্ধস্মৃতি ।।

স্যার উইনস্টোন চার্চিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতি লিখে সাহিত্যে

না বলে জানিয়েছেন প্রযোজক। চিত্রের আরম্ভ হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তি থেকে এবং ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে চার্চিলের পরাজয়ে চিত্রের সমাপ্তি। ছবিতে চার্চিলের ব্যক্তিত্বের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

—চিত্রকূট

খেলাধূলা

দর্শক

সন্ধ্যা চন্দ্র

বিপদের সংকেত

লিয়ঁর (ফ্রান্স) আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা গত ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে সুরু হয়েছে। ১৯৬০ সালের অলিম্পিক হকি খেতাব পেয়েছিল পাকিস্তান এবং দ্বিতীয় স্থান ভারতবর্ষ। লিয়ঁর এই আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা আসলে আগামী ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক হকিরই এক প্রস্তুতি পর্ব। এই আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় বারবার ইউরোপীয় দেশগুলির চ্যালেঞ্জ ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান কি ভাবে গ্রহণ করে—বিশ্বের ক্রীড়ানুরাগীরা অধীর আগ্রহে তারই ফলাফলের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের পক্ষে খবর খুবই খারাপ। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান এ-পর্যন্ত দুটো করে ম্যাচ খেলেছে। ভারতবর্ষ তার প্রথম খেলা ড্র করেছে, পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে ১—১ গোলে। দ্বিতীয় খেলায় ভারতবর্ষ মাত্র ১—০ গোলের ব্যবধানে ফ্রান্সকে পরাজিত করেছে। স্পেনের বিপক্ষে পাকিস্তানের খেলা ড্র এবং হল্যাণ্ডের কাছে হার হয়েছে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে পশ্চিম জার্মানী প্রথম গোল দিয়ে প্রথমার্ধের খেলায় ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে খেলার ৫৩ মিনিটের মাথায় ভারতবর্ষ গোলটি শোধ দিয়ে কোন রকমে মুখ-রক্ষা করে। ফ্রান্সের বিপক্ষে ভারতবর্ষের ১—০ গোলে জয়লাভ, জয়ই নয়—শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয়। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১২টি দেশের মধ্যে সব থেকে দুর্বল দেশ হ'ল এই ফ্রান্স। ফ্রান্স পেনাল্টি সট থেকে গোল খেয়ে ভারতবর্ষের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। সংবাদে প্রকাশ, এই গোল দেওয়ার আগে ভারতবর্ষ কমপক্ষে ৯টি পেনাল্টি কর্ণার পেয়ে তার একটিরও সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। এই প্রতিযোগিতার খেলা হচ্ছে লীগ প্রথায়; কিন্তু সাফল্যের তালিকায় দলগুলির স্থান নির্ধারিত হবে গোল দেওয়া এবং খাওয়ার ভিত্তিতে। সুতরাং সব থেকে দুর্বল দলের বিপক্ষে যদি ভারতবর্ষের গোল দেওয়ার বহর মাত্র একটি হয়, তাহলে শক্তিশালী দলের বিপক্ষে কি অবস্থা দাঁড়াবে?

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের হকি খেলার পদ্ধতি একই ধরণের। তাদের গতানুগতিক আক্রমণ পদ্ধতি, ইউরোপীয় দেশগুলির পক্ষে যে আজ ভয়ের বিশেষ কারণ নয়, তা লিঁয়র চারটি খেলাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ উপর্যুপরি ৬টি অলিম্পিকে হকি খেতাব জয় করে যে বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জন করেছিল তা ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে পাকিস্তানের কাছে হাত-ছাড়া করতে হয়েছে। ইউরোপের বিপক্ষে ভারতবর্ষ এ্যাথলেটিক্‌স স্পোর্টস, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, সাঁতার প্রভৃতি বিভিন্ন খেলাধুলায় কোন সময়েই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। মাত্র হকি খেলায় ভারতবর্ষ একটানা প্রাধান্য রেখেছিল। ইউরোপের পক্ষ থেকে বলা হত, এত বিভিন্ন খেলাধুলায় তাদের আটকে থাকতে হয় যে, হকি খেলায় যথেষ্ট সময় এবং মন দেওয়ার ফুরসুৎ তাদের কোথায়? এই সুযোগেই হকি খেলায় ভারতবর্ষের সাফল্য। আমরা বলতাম, বিদেশী শাসন ব্যবস্থায় আমাদের দেশে খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা এবং প্রসার খুবই সীমাবদ্ধ—ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলির কাছে বিভিন্ন খেলাধুলোর আমাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ সেই কারণেই। কিন্তু আজ আমরা কোন্ মুখে নিজেদের অক্ষমতার কারণ দেখাব? স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ ষোল বছর আমরা হাতে পেয়েছি।

॥ আন্তঃ কলেজ সন্তরণ ॥

১৯৬৩ সালের আন্তঃ কলেজ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ ছাত্র বিভাগে এবং বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্রী বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, আন্তঃ কলেজ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় তাদের যোগদান এই প্রথম।

ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ছাত্র মদন মুখার্জী এবং বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রী কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র। মদন মুখার্জি ৪০০ ও ১,৫০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে নতুন রেকর্ড করেন। অপরদিকে সন্ধ্যা চন্দ্র এই তিনটি অনুষ্ঠানে নতুন রেকর্ড করেছেন—৫০ ও ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল এবং ১০০ মিটার চিৎ সাঁতারে। তিনি ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল এবং ১০০ মিটার চিৎ সাঁতারে তাঁরই পূর্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

নতুন রেকর্ড

ছাত্র বিভাগ

১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল :
২২ মিঃ ৩৫·৫ সেঃ—মদন মুখার্জি (মণীন্দ্রচন্দ্র)

৪০০ মিটার মিডলি রিলে :
৫ মিঃ ১৩·৫ সেঃ—মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল :
৫ মিঃ ২৮·৭ সেঃ—মদন মুখার্জি (মণীন্দ্রচন্দ্র)

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে :
৪ মিঃ ৩২·৩ সেঃ—বিদ্যাসাগর কলেজ (সন্ধ্যা)

ছাত্রী বিভাগ

৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল :
৩৭ সেঃ—সন্ধ্যা চন্দ্র (বিদ্যাসাগর)

মদন মুখার্জি

১০০ মিটার বুক সাঁতার ঃ
১ মিঃ ৪৫·১ সেঃ—মীরা কারিয়াপ্পা (স্কটিশচার্চ)

১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ঃ
১ মিঃ ২২·৭ সেঃ—সন্ধ্যা চন্দ্র (বিদ্যাসাগর)

১০০ মিটার চিৎ সাঁতার ঃ
১ মিঃ ৩০·৪ সেঃ—সন্ধ্যা চন্দ্র (বিদ্যাসাগর)

ছাত্র বিভাগ
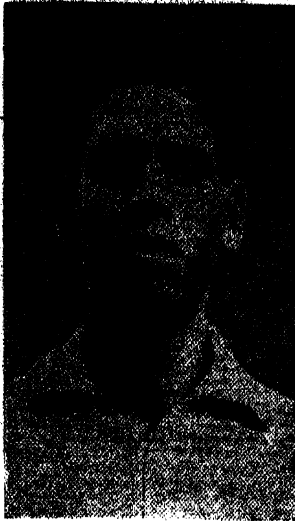
দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ : ১ম মণীন্দ্র চন্দ্র (৫৬), ২য় বিদ্যাসাগর সন্ধ্যা বিভাগ (৩৯), ৩য় সিটি (১১) ও ৪র্থ স্কটিশ চার্চ (৯)।

ছাত্রী বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ: ১ম বিদ্যাসাগর (১৯), ২য় ন্যাশনাল মেডিক্যাল (১২) ও ৩য় স্কটিশ চার্চ (৫)।

॥ ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন ॥

বিগত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রসঙ্গে একস্থানে (২১ সংখ্যার ৭০৩ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ৩য় লাইনে) যে 'সেন্ট্রাল' নামটি এসে গেছে তার পরিবর্তে 'ন্যাশনাল' পড়তে হবে।

॥ যোগ্যতার ন্যূনতম মান ॥

আগামী ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের এ্যাথলেটিক্স বিভাগে ভারতীয় প্রতিনিধি দল নির্বাচনের জন্যে ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এসোসিয়েশন যোগ্যতার যে ন্যূনতম মান প্রথমে বেঁধে দিয়েছিলেন তা নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়। তারই ফলে পূর্বের অনুমোদিত যোগ্যতার ন্যূনতম মান সংশোধন করতে হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ

॥ তুলনামূলক তালিকা ॥

	ভারতীয় প্রতিনিধির যোগ্যতার ন্যূনতম মান		[illegible]	
	সময়		সময়	
মিটার	মিনিট	সেকেণ্ড	মিনিট	সেকেণ্ড
৪০০	-	৪৬·১	-	৪৪·৯
১,৫০০	৩	৪৬·৬	৩	৩৫·৬
৫,০০০	১৪	১২·০	১৩	৪৩·৪
১০,০০০	২৯	৫০	২৮	৩২·২
		হার্ডলস		
৪০০	-	৫২·২		৪৯·৩
	ফিট	ইঞ্চি	ফিট	ইঞ্চি
হাইজাম্প	৬	১-৭৫	৭	১
লং জাম্প	২৪	৩-৫	২৬	৭¾
পোলভল্ট	১৪	৫-২৫	১৫	৫⅛
হপ-স্টেপ-জাম্প	৫১	১-৩	৫৫	১½
সটপুট	৫৫	১-৩	৬৪	৬¾
ডিসকাস	১৭০	৭-২৫	১৯৪	২
জ্যাভেলিন	২৪১	৭-৩৭	২৭৭	৮¼
হ্যামার	২০৯	১	২২০	২

অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে যোগ্যতার ন্যূনতম মান বর্তমানে কি অবস্থায় দাঁড়িয়েছে এবং সেই সব অনুষ্ঠানে ১৯৪০ সালের রোম অলিম্পিকে প্রথম স্থান অধিকারীর রেকর্ড কি ছিল তারই একটি তুলনামূলক তালিকা এই সঙ্গে দেওয়া হ'ল।

॥ ডেভিস কাপ ॥

১৯৬৩ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমিফাইনালে আমেরিকা ৫—০ খেলায় ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

আমেরিকার পক্ষে এই খেলায় যোগদান করেছিলেন 'চাক' ম্যাকিনলে, ডেনিস রলস্টোন এবং ফ্র্যাঙ্ক ফ্রোহলিং। এ'দের মধ্যে 'চাক' ম্যাকিনলে ১৯৬৩ সালের উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস খেতাব পেয়েছিলেন। ম্যাকিনলে এবং রলস্টোন জুটি ১৯৬৩ সালের আমেরিকান খেতাব পান। ফ্র্যাঙ্ক ফ্রোহলিং ১৯৬৩ সালের আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ফাইনালে উঠে পরাজিত হন। সুতরাং আমেরিকার ডেভিস কাপ দল ইংল্যাণ্ডের তুলনায় বেশ শক্তিশালী ছিল। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে খেলেছিলেন মাইক স্যাঙ্গস্টার, ববি উইলসন এবং বিলি নাইট।

ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ইংল্যাণ্ড ৯বার ডেভিস কাপ জয় করলেও সুদীর্ঘকাল ইন্টার-জোন ফাইনালে উঠতে পারেনি। ১৯৩৭ সালের ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলার পর ইংল্যাণ্ড এই প্রথম ইন্টার-জোন ফাইনালে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ বনাম আমেরিকার ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলাটি আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাইয়ের হার্ড-কোর্টে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে। ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষ বনাম আমেরিকার ডেভিস কাপ খেলা (ইন্টার-জোন সেমিফাইনাল) ১৯৬১ সালে একবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই খেলায় ভারতবর্ষ অল্পের জন্যে (২—৩ খেলায়) আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ যদি পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারে তাহলে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলবার গৌরব লাভ করবে। এবং সে গৌরব এশিয়া মহাদেশের পক্ষে হবে দ্বিতীয়বার। এশিয়া মহাদেশের পক্ষে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে প্রথম খেলেছিল জাপান ১৯২১ সালে আমেরিকার বিপক্ষে। খেলার ফলাফল

দাঁড়িয়েছিল—আমেরিকার ৫—০ খেলায় জয়।

॥ অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতা ॥

আগামী ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের হকি প্রতিযোগিতার তালিকা আংশিকভাবে তৈরী হয়েছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছুক ১৬টি দেশকে সমান দুভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি গ্রুপে ৮টি ক'রে দেশ খেলবে। দুই প্রথায় খেলা হবে—লীগ এবং নক-আউট প্রথা। প্রথমে হবে লীগের খেলা—গ্রুপের প্রতিটি দেশ সেই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশের সংগে একটা ক'রে ম্যাচ খেলবে। লীগ প্রথায় প্রতিটি দেশকে মোট ৭টা খেলায় যোগদান করতে হবে। লীগের খেলা শেষ হওয়ার পর নক-আউট পর্যায়ের খেলা আরম্ভ হবে। নক-আউট প্রথায় দু'টি রাউণ্ডের খেলা হবে—সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল প্রতি গ্রুপের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ নক-আউট পর্যায়ের সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করবে। সুতরাং সেমি-ফাইনালে খেলবে মোট ৪টি দেশ এবং সেমি-ফাইনালের খেলায় দু'টি বিজয়ী দেশ ফাইনালে খেলবে।

গত রোম অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান পেয়েছিল যথাক্রমে পাকিস্তান, ভারতবর্ষ, বৃটেন এবং স্পেন। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতার 'এ' গ্রুপে পাকিস্তান এবং বৃটেন এবং 'বি' গ্রুপে ভারতবর্ষ এবং স্পেনের খেলা পড়েছে। বাকি ১২টি দেশের খেলার তালিকা এখনও প্রস্তুত করা হয়নি। এই বারটি দেশ হ'ল—কেনিয়া, জার্মাণী, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, হল্যান্ড, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, জাপান, ইতালী এবং সুইজারল্যান্ড। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে এই বারটি দেশের যোগ্যতা বিচার ক'রে খেলার তালিকা তৈরী হবে।

পশ্চিম জার্মানীর কুমারী হেডী হিউমেল (উপরের ছবি, হাইজাম্পে ১·৬৯ মিটার উচ্চতা অতিক্রম ক'রে জার্মান রেকর্ড করেছেন। ফলে জার্মান মহিলাদের পক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপীয়ান মহিলাদের হাইজাম্প অনুষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করলেন।

সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা এইভাবে তৈরী হয়েছে :—'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান বনাম 'বি' গ্রুপের রাণার্স-আপ এবং 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান বনাম 'এ' গ্রুপের রাণার্স-আপ। সেমি-ফাইনাল খেলা হবে ১৯৬৪ সালের ২১শে অক্টোবর এবং ফাইনাল খেলা ২৩শে অক্টোবর।

ভারতবর্ষের লীগের ৭টা খেলার তারিখ : ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮ এবং ১৯শে অক্টোবর (১৯৬৪ সাল)। পাকিস্তানের খেলার তারিখ : ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮ এবং ১৯শে অক্টোবর (১৯৬৪ সাল)।

॥ কলেজ ফুটবল ॥

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত বাৎসরিক ফুটবল নক-আউট টুর্ণামেন্টের ফাইনালে মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ ১—০ গোলে চারুচন্দ্র কলেজকে পরাজিত করে 'অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র' শীল্ড জয় করেছে।

বঙ্গবাসী কলেজ ২—০ গোলে আনন্দমোহন কলেজকে পরাজিত করে আন্তঃ কলেজ ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ১৯৩৯ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বঙ্গবাসী কলেজ পুনরায় খেতাব লাভ করলো।

খেলার কথা

অজয় বসু

কলকাতায় ফুটবলের পাট আপাততঃ চুকেছে।

দীর্ঘমেয়াদী মরশুম-শেষে ময়দানী আসর আজ ফাঁকা। কদিন আগে এইখানেই ফুটবলের সাড়ম্বর অস্তিত্ব ঘিরে উৎসবমুখী জনতার মন কড়া পর্দায় বাঁধা ছিল। নাচানাচি, হাসাহাসি, কানাকানি, ঠেলাঠেলি, কোন কিছুতেই টান পড়েনি সেদিন।

আজ উৎসব-শেষে আসর ভাঙা ফুটবলের নিরঞ্জনও হয়ে গিয়েছে। বিসর্জনের সুরও অশ্রুত নয়। সবই যেন আজ শূন্য!

শূন্য? না, কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হলো না। সব শূন্য নয়। বহিরঙ্গ হয়তো মূক, মৌন। কিন্তু এই ময়দানের অন্তর মুখর। শোনার চেষ্টা করা গেলে হয়তো ময়দানের গোপন কথাটি কানেও উঠতে পারে।

ময়দানের বাইরের চেহারায় মোহনবাগানের লীগ জয়ের, বি এন আরের শীল্ড বিজয়ের, লীগে ইস্টবেঙ্গলের দুরন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বাক্ষর আঁকা আর অন্তরের নিভৃত কোণে আছে এক অনুচ্চারিত আশার বাণী।

কিসের আশা?

আশা, আমাদের ফুটবলের উজ্জীবনের। খেলার মানোন্নয়নের। এ কদিনে যা দেখেছি, তাতে আশা হার মানে নি। বরং মাথা তুলে দাঁড়াতে ধরার মতো শক্ত খুঁটি হাতের কাছে পেয়েছে।

এই খুঁটি হলো নতুন চেতনা। ভাল খেলতে হবে, খেলার মতো খেলা চাই— এই উপলব্ধিতে এবার অনেক পক্ষই সক্রিয় থাকতে পেরেছেন।

ভাল খেলার ক্ষমতা, যা যোগ্যতা-দক্ষতারই নামান্তর, তা গাছের ফল নয় যে হাত বাড়িয়েই ডাল থেকে তা নামানো যাবে। দক্ষতা অধিগত করার প্রয়োজন ঘটে সাধনা ও অনুশীলনের। সুস্থ চিন্তা ও অকাতর পরিশ্রমের। এই সব তত্ত্বকথায় অনেকেই যেন ক্রমশঃই আস্থা রাখতে চাইছেন।

চাইছেন কলকাতার সিনিয়ার ফুটবল দলগুলি। সব দলেই তাই আজ কোচ বা শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁদের নির্দেশে প্রস্তুতিপর্বে অনুশীলন চলেছে। মাঠের খেলাতেও সেই নির্দেশপালনেও আন্তরিকতা দেখেছি।

যথার্থ নিষ্ঠায় নিরলস অনুশীলনের ঝোঁক যদি দিনে দিনে বাড়ে তাহলে আমাদের ফুটবলের মানও বাড়বে। অবশ্য সেক্ষেত্রে সুষ্ঠু, সুস্থ সংগঠনের আশীর্বাদও প্রয়োজন। কারণ এক পক্ষের চেষ্টায় সামগ্রিক মানোন্নয়নের রাস্তা সাফ হতে পারে না। হতে পারে সমষ্টিগত চেষ্টার পরিণামে। খেলোয়াড়-কোচের চেষ্টার সঙ্গে ক্লাব ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার উন্নয়নমুখী প্রকল্প যুক্ত হয়ে থাকা চাই।

নিয়ামক-সংস্থা যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে কলকাতার সিনিয়ার দলভুক্ত খেলোয়াড়দের প্রায় পাঁচ মাস ধরে অবিরাম ম্যাচ খেলতে হয়েছে। ম্যাচ খেলায় শুধু দৈহিক সামর্থ্যই পরীক্ষার সামনে দাঁড়ায় না। সেই সঙ্গে স্নায়ুরও যুদ্ধ চলে।

এই অবিরাম যুদ্ধের চাহিদা মেটাতে গিয়ে খেলোয়াড়দের মানসিক ও দৈহিক

আই এফ এ শীল্ডে মোহনবাগান বনাম বি এন আর দলের কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানের দীপু দাসের গোল দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ করছেন বি এন আর দলের শান্ত মিত্র

পর্দজিতে টান পড়া স্বাভাবিক। টান পড়েও ছিল। তাই মরশুমের শেষ দিকে অনেক খেলোয়াড়কে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বলে মনে হয়। অনেকে মুখে-মুখেও সে ক্লান্তির কথা স্বীকারও করেন। নিয়ামক-সংস্থা যদি খেলার সংখ্যা কমিয়ে দেন তাহলে স্নায়ুর প্রভাব থেকে খেলোয়াড়রা অনেকটা রেহাই পান। এবং সেক্ষেত্রে সহজ পরিস্থিতিতে খেলা চালিয়ে যাবার সুযোগও তাঁদের হাতে আসে।

এই সহজ পরিস্থিতিই হলো ক্রীড়া-মানোন্নয়নের স্বাভাবিক পথ। এগিয়ে যাওয়া অন্য দেশে ট্রেণিং বা অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী। তাঁরা খেলেন কম, প্র্যাকটিশ করেন বেশী। আমাদের ফুটবলকে যদি তাঁদের পর্যায়ে তুলে ধরতে হয়, তাহলে তাঁদের অনুসৃত পথ-পরিক্রমায় আমাদেরও, মানে নিয়ামক-সংস্থাকেও সচেতন হয়ে উঠতে হবে।

খেলোয়াড়েরা যে সচেতন হয়ে উঠছেন সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বিগত মরশুমে দেখা গিয়েছে যে কলকাতার সব সিনিয়ার ফুটবল দলই সুনিয়ন্ত্রিতভাবে খেলার চেষ্টা করেছেন। ক্রীড়ারীতির পরিকল্পনাটি বিন্যাসে তাঁদের ঝোঁক ছিল। এলোমেলো সট করার, যত্রতত্র বল পাঠানোয় তাঁদের অনিচ্ছা। তাঁদের সামগ্রিক ক্রীড়াধারা ছিল এলোমেলো মনোভাববর্জিত।

এ দৃষ্টান্ত সুলক্ষণ। একটা পরিকল্পনা বা ছক মেনে যে তাঁরা খেলার চেষ্টা করেছেন তা বুঝতে প্রত্যক্ষদর্শীদের অসুবিধে হয় নি। সব দলই আধুনিক ক্রীড়ারীতি, তিনব্যাক প্রথায় খেলেছেন। কেউ রক্ষণ-ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় করতে তিনের জায়গায় চারজন ব্যাককে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন (দৃষ্টান্ত বালী প্রতিভা)।

কোনো দল সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে পিছিয়ে এনে (নজীর জার্নেল সিং) তাঁর ওপর আক্রমণ গড়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কেউ আবার একের জায়গায় দু-দুজন সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে সামনে রেখে গোলের জন্যে নতুন পথের সন্ধানে ফিরেছেন।

সবাই যে চিন্তা করেছেন স্বতন্ত্র ক্রীড়ারীতির দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ। এই প্রমাণ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে হলে আমাদের আর একবার ভাল করে বি এন আর দলের দিকে তাকাতে হয়।

বি এন আর লীগে খেলেছিল আপ্পালারাজুকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে কাজে লাগিয়ে। আপ্পালারাজু লীগে ভালই খেলেন, গোল করেছিলেন সর্বাধিক। তবু শীল্ড উপলক্ষ্যে বি এন আর দলের খেলার আগেকার ছক একেবারে বদলালো।

বদলে অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, আপ্পালারাজু ও রাজেন্দ্রমোহন, এই দুজনে ইনসাইড ফরোয়ার্ডের ভূমিকা গ্রহণ করে কার্যতঃ খেললেন আক্রমণাত্মক সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে। আর নামে যিনি সেণ্টার ফরোয়ার্ড সেই এণ্টনী পিছিয়ে এসে ইনসাইড ফরোয়ার্ড ও ভ্রাম্যমাণ হাফ-ব্যাকের যৌথ কাজ একাই করতে লাগলেন।

একের বদলে দুজন সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে দিয়ে আক্রমণ রচনা করায় বি এন আর যে বাড়তি সুবিধে পেলো তার চাপে মামুলী তিনব্যাকপ্রথা সময় সময় অসহায় বোধ করতে লাগলো।

ডাবল সেণ্টার ফরোয়ার্ড-ভিত্তিক আক্রমণকে চারব্যাক দিয়ে ঠেকানো যায়। কিন্তু বি এন আরের সব প্রতিদ্বন্দ্বী শীল্ডে চারব্যাক প্রথা অনুসরণ করে নি। ফলে শীল্ড প্রতিযোগিতায় ওলটপালট ঘটানো রেলদলের অসাধ্য থাকলো না।

নিঃসন্দেহে স্বীকার করবো যে এবারের শীল্ড খেলায় বি এন আর সাফল্যলাভ করেছে মূলতঃ তাঁদের স্বচ্ছ ও সক্রিয় চিন্তারই কল্যাণে। নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁদের সংকোচ ছিল না।

এমন অসংকোচ মন যাঁদের তাঁরাই প্রগতিপন্থী। তাঁদের সাফল্যে, আই এফ এ শীল্ডে নতুনের অভ্যুত্থানে তাই ফুটবলের নিজস্ব ভাবনাও আজ কিছুটা আশ্বস্তবোধ করতে পারছে। এই ভাবনা হলো ফুটবলের মানোন্নয়নের চিন্তা।

মান বাড়াতে হলে চিন্তা করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। পুরানো ধারণা ও রীতি বিসর্জন দিয়ে নতুন আঙ্গিকে নিজেদের পরিকল্পনাকে সাজাতে হবে। সে পরিকল্পনা বি এন আরের ছিল বলেই শীল্ড খেলায় তাঁদের সাফল্য আজ কলকাতার বিভিন্ন পক্ষকে নতুন চিন্তার খোরাকও জোগাতে পেরেছে বলে মনে করা যায়।

তাছাড়া নতুনের আবির্ভাবও আসল অনুষ্ঠানের পক্ষে কল্যাণকর। বছর বছর মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের প্রাধান্য কলকাতার ফুটবলে যে একমুখী একঘেয়েমী নেমে এসেছিল শীল্ডে বি এন আরের সাফল্যে সে অস্বস্তি কেটে যাবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।

আরও একটি কথা এই যে, বি এন আরের শীল্ড বিজয় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের কাছে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ বিশেষ। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল কলকাতার ফুটবল আসরে বড়পক্ষ। শীর্ষভাগে তাঁদের স্বস্থান অটল রাখতে হলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে ভবিষ্যতে বি এন আরের চ্যালেঞ্জকে বাগ মানাতে হবে। অর্থাৎ বড়পক্ষদেরও সক্রিয় হতে হবে। অনুমান করা যায় যে, ভবিষ্যতে বড়রা সক্রিয় হয়ে উঠবেন। তাঁরা সক্রিয় হলে এবং নতুনের চ্যালেঞ্জও ক্রমশঃই দানা বেঁধে উঠলে দুপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কলকাতার ফুটবলের সামগ্রিক মানকে উর্ধ্বে তুলে দিতে পারবে একদিন।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।।৩।।

রাণীর শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে পড়ছে সেটা সবাই লক্ষ্য করলেও ঠিক যে এতটা খারাপ হয়েছে তা কেউ বুঝতে পারেনি। একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে সকলকার খেয়াল হল।

আসলে রাণীই বুঝতে দেয়নি কিছু। যতটা পেরেছে যতক্ষণ পেরেছে সংসারে খেটে গেছে। এবার আর পারল না—একেবারেই ভেঙে পড়ল।

কমলা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁরও শরীর ভেঙেছে দস্তুর মতো। বর্ষা পড়লেই পেট ছেড়ে দেয়, হাত-পা, মুখ ফুলে ওঠে। এই বৌই তদ্বির-তদারক করে টোটকাটুটকি খাইয়ে কোন মতে সারিয়ে তোলে। শীতকালটা ভাল থাকেন তিনি, গরমটাও কোন মতে কাটে—বর্ষা পড়লেই আবার যে-কে সেই। কিন্তু ভালই থাকুন আর মন্দই থাকুন, খাটবার শক্তি তাঁর একেবারেই চলে গেছে। নতুন বাড়িতে এসে উৎসাহের প্রাবল্যে দিন-কতক খুব খেটে ছিলেন—এখন আর মোটেই পারেন না। কোন মতে বসে রান্না করতেও কষ্ট হয় তাঁর। এই বৌয়ের ওপরই ভরসা। বৌয়ের চেহারা যে দিন দিন শুকিয়ে কালি হয়ে যাচ্ছে তা তিনিও দেখেছেন—শ্যামা তো বহুবারই বলেছেন তাঁকে, কিন্তু তিনি কি করবেন—কীই বা করতে পারেন! তাঁর যতটুকু সাধ্য—সামান্য সামান্য চিকিৎসা করিয়েছেন, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, টোটকা। সাধ্যে আর সময়ে যতটুকু কুলিয়েছে।

গোবিন্দ কিছুই পারে না। তার আপিসের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ভরসা করে ওখানটা ছাড়তে পারলে হয়ত অন্য কোথাও কাজ পায় এখনও—কিন্তু সেই ভরসাটাই ওর নেই। চিরদিন, বলতে গেলে বাল্যকাল থেকে, এক জায়গায় কাজ করে এসে—অন্য কোথাও যে কাজ পাওয়া সম্ভব, বা সে কাজ পাওয়ার জন্য কীভাবে চেষ্টা করতে হয়—সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই তার। এ চাকরিও পেয়েছে সে বিনা তদ্বিরে, না চাইতেই; বন্ধু এসে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছে, কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। লোকমুখে শুনেছে, নিতাই শোনে যে, চাকরির বাজার খুব খারাপ। ভয়ও হয় তার—এই বাজারে কোথায় আবার চাকরি খুঁজতে বেরোবে সে, কার কাছেই বা যাবে! সুতরাং সেইখানেই পড়ে আছে সে—কাজ কমেনি, মাইনে বরং আরও কমেছে।

না, চাকরি ছাড়তে পারেনি সে। যেটা পেরেছে সেটা হ'ল এক বইওলার কাছে উপরি কিছু কাজ যোগাড় করতে। তাঁদের চিঠিপত্র লিখে দেওয়া, প্রুফ দেখা, কপি বুকের নক্সা করা—মায় ভূগোলের বইয়ের ম্যাপ আঁকা—সবই করতে হয় তাকে প্রয়োজন মতো—তার জন্য পারিশ্রমিক মেলে মাসিক কুড়িটি টাকা, তাও তিন-চার কিস্তিতে। গোবিন্দর হাতের লেখা ভাল—ম্যাপের কাজ করে করে খুব পরিষ্কার লিখতে শিখেছে, ছাপাখানা সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান আছে, সব মিলিয়ে ওকে পেয়ে তাঁদের সুবিধা হয়েছে ঢের, হয়ত চেপে ধরলে তাঁরা আর কিছু বাড়িয়েও দিতে পারেন—কিন্তু সেটুকু জোর করবারও সাহস নেই ওর।

তবু এটা মন্দের ভাল। মেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে, পেট বেড়েছে শুধু খাই-খরচাই কত। এই বাড়তি টাকাটা পেয়ে গ্রাসাচ্ছদনের টানাটানিটা কমেছে, দু টাকা মাইনে দিয়ে একটা ঝিও রাখতে পেরেছেন বাসন মাজার—কিন্তু তা থেকে ঘটা করে কারও চিকিৎসা চালানো অসম্ভব। তাছাড়া গোবিন্দর সময়টাও একেবারে কমে গেছে। সকালে স্নানাহার সেরে আটটা আঠারোর ট্রেন ধরতে হবে তাকে—পোনে আটটায় না বেরোলে গাড়ি ধরা যায় না। ঐ ট্রেনে গিয়েও তার নাকি দেরি হয়ে যায়, লোকজন এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দুটো চাকরি সেরে ফেরে একেবারে শেষ গাড়িতে—বাড়ি পৌঁছতে এগারোটা বেজে যায়। শুধু শনিবারটাতে একটু আগে ফেরা হয়—আটটা দশ কি আটটা চল্লিশের ট্রেন ধরে।

এর মধ্যে তো নিঃশ্বাস ফেলবারই অবকাশ নেই। ছুটি বলতে এক রবিবার—কিন্তু সেদিন আর নড়তে চায় না গোবিন্দ। কোথাও বেড়াতে যাওয়া কি আড্ডা দিতে যাওয়া তো দূরের কথা—বাজার-উটনোই আনাতে পারেন না কমলা। গোবিন্দরও বয়স হয়ে আসছে, এত খাটুনি তার পোষায় না আর, নিতান্ত বাধ্য হয়েই যেটুকু করতে হয়—তার বেশী কিছু করতে চায় না।

তবু রাণী একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে তারও টনক নড়ে। মরীয়া হয়ে পাড়ার চার টাকা ভিজিটের বড় ডাক্তারকেই ডেকে আনে সে। কিন্তু তিনি এসে পরীক্ষা করে দেখে ভুরু কোঁচকান। বাইরে এসে বলেন, 'এ করেছেন কি, এতো শেষ করে এনে তবে ডেকেছেন আমাকে! কতদিন থেকে এমন হয়েছে তা কেউ লক্ষ্যও করেননি। যা খেয়েছেন তা কিছুই হজম হয়নি—ও'র দেহ প্র্যাকটিক্যালি কোন খাবারই পায়নি দীর্ঘকাল। লিভার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই, হার্টের অবস্থাও খুব খারাপ। বাড়িতে এর চিকিৎসা হওয়া অসম্ভব, আপনাদের সাধ্যে কুলোবে না। এখনই যদি কোন বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারেন তো কিছু আশা আছে—কিন্তু সেও আপনাকে ওআর্

করে দিচ্ছি—এক আনার বেশী নয়। বাড়িতে রাখলে আর বড় জোর দিন কুড়ি-পঁচিশ, এর বাইরে যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

দু-একটা দামী ওষুধ লিখে দিয়ে, তাঁর ফী নিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার গোবিন্দ কিন্তু চোখে অন্ধকার দেখল একেবারে। সর্বনাশ এত আসন্ন তা সে কল্পনাও করেনি। প্রথম কৈশোর থেকেই স্ত্রীর সেবা-যত্নে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। ভাগ্যক্রমে দুটি স্ত্রীই পেয়েছিল সে সুগৃহিণী, কখনও কোনদিকে তাকাতে হয়নি—দৈহিক আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য এই স্বল্প আয়ের মধ্যে যতটা পাওয়া সম্ভব তার চেয়ে বেশীই পেয়েছে। আজ এই এতকাল পরে, প্রৌঢ়ত্বে পেঁৗছে স্ত্রী থাকবে না—তাকে একা সংসার করতে হবে—একথা ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

অনেকটা সামলে নিয়েই ঘরে ঢুকে-ছিল, তবু তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে রাণী বলল, 'কী হল—ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল তো? তোমার যেমন মাথা খারাপ, মিছিমিছি এক গাদা টাকা দণ্ড!'

নিতান্তই সহজ শান্ত সুর। যেন আর কারও কথা বলছে সে, আর কোনও কথা। নিজের মৃত্যুর কথা নয়।

গোবিন্দ অবশ্য কথাটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে, 'জবাব দেবার কথা আবার কে বললে! এই তো সব ওষুধ দিয়ে গেল। বাইরে নিয়ে গিয়ে বলছিল—হাসপাতালে ভর্তি করে দেবার কথা। শক্ত অসুখ, দামী দামী ওষুধ লাগবে—পারবেন কি সে খরচা চালাতে—এই বলছিল।'

কিন্তু সহজে বলতে পারে না শেষ পর্যন্ত, গলা কেঁপেই যায়। কান্নার মতো আওয়াজ বেরোয়। রাণী কিন্তু আর কিছু বলে না, হাসে একটু। ছেলেমানুষদের কাণ্ডকারখানা দেখলে বয়স্করা যেমন হাসেন তেমনি। খানিকটা পরে একেবারে অন্য কথা পাড়ে, 'হ্যাঁ গো, আমাকে একখানা খাম এনে দেবে—ডাকের খাম?'

অনুরোধটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি আকস্মিক। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে একেবারেই যোগাযোগহীন। গোবিন্দ ঠিক বুঝতে না পেরে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, সন্দেহ হয়—মাথার কোন গোলমাল হল কিনা। ভুল বকছে না তো?

কিন্তু রাণী খিলখিল করে হেসে ওঠে। সেই মুক্তোঝরা হাসিটা এখনও আছে বুঝি। বলে, 'ওমা, জন্মের মধ্যে কম্ম, মরণকালে একখানা খাম চেয়েছি, তাতেই যে তোমার বাক্যি হরে গেল দেখতে পাই। বলি কোনকালে কি খামের নাম শোননি—না নগো পঞ্চাশ টাকা খরচের কথা ভাবছ। আমার কি কাউকে একখানা চিঠি লিখতেও নেই?'

'তা কেন। তা বলছি না। হঠাৎ এর মধ্যে খামের কথা—। বাপের বাড়িতে লিখবে?'

গোবিন্দ অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

'থাক, হয়েছে। একখানা চিঠি লিখব তা কাকে কী বিত্তেন্ত—ছ বুড়ি ছত্রিশ গণ্ডার কৈফেৎ। দেখছি মেয়েটাকেই পাঠাতে হবে। যা পথ—ডাকঘর কি হেথায়—অন্তত একটি ক্রোশ রাস্তা, মেয়ে বড় হয়েছে—অতদূর পাঠাতে ইচ্ছা করে না। দেখি মল্লিকদের ছোট ছেলেটা যদি এনে দেয়—'

শেষের দিকের কথাগুলো যেন আপন মনেই বলে রাণী। কথা বেশীক্ষণ ঠিক মতো বলতে পারে না আজকাল। একসঙ্গে দুটো-চারটে কথা কইলেই শেষের দিকে গলা স্তিমিত হয়ে আসে, শব্দগুলো যেন জড়িয়ে জড়িয়ে যায়। এইতেই আরও ভয় পেয়ে যাচ্ছেন কমলা। লক্ষণ তাঁর ভাল ঠেকছে না আদৌ।

পরের দিন খাম আনিয়ে কোন মতে কনককে চিঠি লেখে একখানা। একেই হাতের লেখা তত ভাল নয়—তাতে দুর্বল হাতে আরও এঁকেবেঁকে যায়, কলম ধরতেই পারে না ভাল করে। তবু মেয়েকে দিয়ে লেখায় না, নিজেই লেখে চেষ্টা করে করে—অনেকক্ষণ ধরে।

লেখে, 'কে লো, খুব তো বলেছিলি মরণের সময় অবিশ্যি আসবি। এবার আয়! আর দেরি করলে তো দেখাই হবে না। বড়জোর আর সাত-আটটা দিন আছি। শিগগির চলে আয়। পর না আসতে পারে, অন্য কাউকে নিয়ে একাই চলে আসিস!'

ব্যস। ঐ দু ছত্র চিঠি। কোন সম্ভাষণ নেই, কুশল প্রশ্ন নেই। এইটুকু লিখতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে তার। আর লেখার প্রয়োজনই বা কি। সচেতন মৃত্যু-পথযাত্রীর কাছে আজ যেন সব কিছুই অবান্তর, অর্থহীন ঠেকছে।

কনক চিঠিটা পেয়ে প্রথমে মনে করল তামাশা। রাণীর স্বভাবজ কৌতুক-প্রিয়তা। তবু অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল একটা। এ আবার কী ধরণের তামাশা। অথচ ঠিক সত্য বলেও ভাবতে পারে না। সত্যি সত্যিই কি মানুষ নিজের মৃত্যুর কথা এমনভাবে লিখতে পারে?... আবার মনে হয় রাণী-বৌতে সবই সম্ভব। জীবনটাই তার কাছে প্রকাণ্ড একটা কৌতুক বলে মনে হয়—মৃত্যুটাও হয়ত তাই। তাছাড়া কান্তির বিয়ের সময় গিয়ে ওর শরীরটা খুবই খারাপ দেখে এসেছে, নিয়ে আসতে চেয়েছিল এখানে— তা তো এল না, তারপর যদি সারতে পেরে না থাকে তো এতদিনে খুবই খারাপ হয়ে পড়বার কথা। আর সারবেই বা কি করে—কি দিয়ে! অবস্থা তো নিজেই দেখে এসেছে কনক।

চিঠি বিলি হয়েছে বেলা বারোটা নাগাদ। অবশিষ্ট সারা বেলাটা ছটফট করে বেড়াল সে। বিকেলে হেম বাড়ি ফিরতে চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ে রইল।

'এর মানে কি বলে দাও আমাকে, আমার মাথাতে তো কিছু ঢুকছে না। সত্যি কথাই লিখেছে, না তামাশা?'

হেমও কিছু বুঝতে পারে না। তবু পড়তে পড়তে তার মুখও বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

'কী করে বলি বলো দিকি! লেখা তো খুবই জড়িয়ে জড়িয়ে গেছে, তবে সে অনাভ্যাসেও হতে পারে।......কিন্তু যার সাত-আট দিনের বেশী বাঁচবার মেয়াদ নেই—তার পক্ষে কি নিজের হাতে চিঠি লেখা সম্ভব?'

'তা হলে কি করবে?'

'তাই তো ভাবছি। বড়দাকে একটা চিঠি লিখে দেখব?'

'কিন্তু সত্যিই যদি এমন ধারা এখন-তখন অবস্থা হয়—তাহলে কি অত দেরি সইবে?......চিঠি যাবে উত্তর আসবে, তারপর তুমি পাস লেখাবে—সে তো অন্তত পাঁচ-ছ দিন!'

'তাহলে বলো। কালকেই পাস লেখাই। যদি তেমন হয় তো তোমাকে রেখে চলে আসব, নয়ত তখনই ফিরব। তিন-চার দিনের ছুটি চাইলে হয়তো পাওয়া যাবে!'

কনক বাইরে বেরিয়ে পুরনো দইয়ের হাঁড়িতে বসানো তুলসীগাছটার কাছে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে জানায়, ঠাকুর, এই কটা দিন তাকে বাঁচিয়ে রেখো অন্তত—গিয়ে যেন দেখাটা পাই!'

এককালে যে স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে তার ঈর্ষার অন্ত ছিল না, আজ তার সম্বন্ধে নিজেরই এই আকুলতা নিজের কাছেও আশ্চর্য লাগে।

কনক ঘরে ঢুকে সেই ফ্যাকাশে চামড়ায়-ঢাকা কঙ্কালটার দিকে চেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল বটে কিন্তু রাণীর মুখে-চোখে একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তির হাসিই ফুটে উঠল। সেই হাসি— এখনও তেমনি মিষ্টি আছে, আশ্চর্য। যে হাসির দিকে চেয়ে একদা হেমের মনে হত সারা জীবন শুধু এই হাসি দেখে কাটিয়ে দেওয়া যায়; তার চেয়ে বড় সার্থকতার কথা সেদিন ভাবতে পারত না সে। রাণী যখনই হাসে কেমন একরকম খিলখিল করে হাসে, যেন একটা আনন্দ সে হাসির সঙ্গে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। অতি মধুর একটা সুরের মতো মিষ্টি শব্দ হয় সে হাসির, কানে গেলে সঙ্গীত

সঙ্গীতের মতোই একটা আবেগের সৃষ্টি করে।

আজও সেই হাসি তেমনি অম্লান, তেমনি প্রাণবন্ত আছে। দেখলে মনে হয় জীবনে কোনদিন কোন দুঃখ পায়নি সে, কোন আশাভঙ্গের বেদনা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি, কোন অপূর্ণতা তার ছায়াপাত করতে পারেনি ওর মনে। এই অবিশ্বাস্য রূপ-গুণ নিয়ে যে অনায়াসে রাজা কি রাজার চেয়েও বড় ধনী কি প্রতিপত্তিশালী লোকের ঘরে পড়তে পারত, কোন সম্ভ্রান্ত বা বিখ্যাত লোকের স্ত্রী হলেই যাকে বেশী মানাত, তার অসামান্য রূপ-গুণের প্রকৃত সমাদর হত, কাজে লাগত সেগুলো—সামান্য বেতনের উদ্যমহীন নিতান্তই সাধারণ একটি কেরানীর হাতে পড়ে যার কোনদিকেই কোন সার্থকতা মিলল না জীবনে—তার এই হাসি দেখলে বাস্তবিকই বিস্ময় লাগে। সে হাসি শুধু অপরেরই দুঃখ ভোলায় না, শুধু অপরের মনে স্নিগ্ধ-মধুর মোহের সৃষ্টি করে না।— সে হাসি নিজের জীবনেরও পরিপূর্ণতা ঘোষণা করে। সে সুখী, সে তৃপ্ত—কোনও ক্ষোভ, কোন মালিন্য, কোন দৈন্য, কোন রিক্ততা যেন তার জীবনকে কখনও কিছু-মাত্র বিড়ম্বিত করেনি. অথবা করলেও সে কথা ভুলে গিয়েছে সে, তার জন্য কাউকে দায়ী মনে করে না সে— কোথাও সেজন্য এতটুকু অনুযোগ নেই তার মনে।

হাসিটা সামলে কথা কইতে একটু সময় লাগে রাণীর। বোধহয় ঐটুকু হাসতে গিয়ে তার দম ফুরিয়ে গেছে সাময়িকভাবে। কিন্তু পরে যখন কথা কয়, একেবারে ধমক দিয়ে ওঠে সে কনককে, ‘আ মর—কেঁদে মরছিস কেন এখন থেকে? এখনও কি আগাম বায়না চলে নাকি? ......নাকি আমার জন্যে কতটা কাঁদবি এর পরে আমাকে তার নমুনা দেখিয়ে রাখছিস?... শোন, চোখ মোছ—কান্নার ঢের সময় পাবি, এখন তুলে রাখ ওটা।...এই এখানে কাছে এসে বোস দিকি, এত জোরে বেশীক্ষণ কথা বলতে পারি না আর। ভয় নেই, ছোঁয়াচে রোগ নয়। কাছে এলে ক্ষেতি হবে না।’

তারপর, কনক একেবারে বিছানার ধারে এসে বসলে, নিজের শীর্ণ কম্পিত হাতখানি কনকের হাতের ওপর রেখে বলে, ‘এসে পড়েছিস না আমি বেঁচেছি! যা ভয় হয়েছিল। মনে হচ্ছিল চিঠিটা হয়ত পাবি না, কিম্বা পেলেও এতটা বাড়াবাড়ি বিশ্বাস করবি না। অথচ দিন দিন কেটে যাচ্ছে, মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে একটি-একটি করে নিত্যই। এরপর এলে হয়ত আর কথা কইতে পারতুম না—বেঁচে থাকলেও!’

তারপর খানিকটা দম নিয়ে আবার বলে, ‘কেমন আছিস কী বিত্তান্ত পরে হবে। এখন মন দিয়ে শোন—কদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিস তা তো জানি না, যদি মরা পর্যন্ত থাকতে পারিস তো ভালই, নইলে আগে গেলে আগেই নিয়ে যাস। ছেলেটার কথা বলছি লো, এবার অতি-অবশ্য ছেলেটাকে নিয়ে চলে যাবি, কারও কোন কথা শুনবি না। তোকে একেবারে দিয়ে গেলুম, আজ থেকে তোর ওপরই পুরো ভার দেওয়া রইল। তোর ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানুষ করবি—যেমন পারিস। খরচ-পত্তর কিছু দিতে পারবে না তোর ভাসুর, সে ভরসা নেই। তবুও তোকে বলতে আমার এতটুকু সঙ্কোচ হচ্ছে না, তার কারণ তোকে আমি চিনে
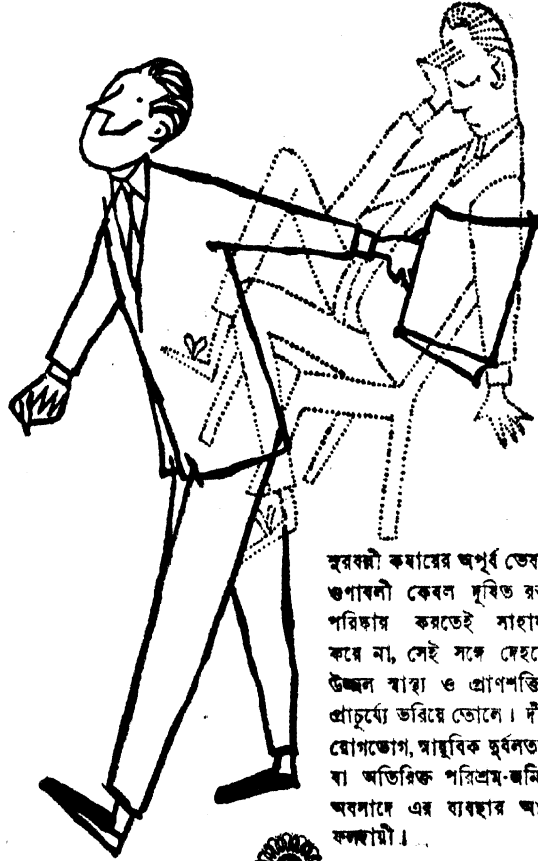
নিয়েছি, হয়ত ঠাকুরপোর চেয়েও ভাল চিনেছি। একমাত্র তোকেই এ দায়গছানো যায় অনায়াসে। নইলে আমার বাপের বাড়িতে তো হাটের ফিরিঙ্গি, বোনই রয়েছে একগাদা। তাদের চেয়ে তুই ওকে ঢের বেশী দেখবি তা আমার বিশ্বাস আছে। তাছাড়া ঠাকুরপোও—যত দুঃখীই হোক, পয়সার যত মায়াই হোক ওর—আমার ছেলেকে ও ফেলবে না—আমি জানি।'

আরও খানিকটা চোখ বুজে শুয়ে থাকে রাণী—শ্রান্তভাবে, তারপর চুপি চুপি বলে, 'কথা কইতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে আজ। একসঙ্গে এত কথা আজকাল বলতে পারি না। তার ওপর তোদের দেখে এত কথা একসঙ্গে ঠেলাঠেলি করছে বুকের মধ্যে যে—তাইতেই যেন আরও কষ্ট হচ্ছে, হাঁপ ধরছে।'

কনক এতক্ষণ পরে কথা বলার অবকাশ পায়। ব্যাকুল হয়ে বলে, 'থাক না দিদি এখনই সব বলতে হবে তার মানে কি—? আমরা তো এখনও আছি কদিন!'

'তোরা আছিস, কিন্তু আমি থাকব কিনা, সেইটেই যে ঠিক পাচ্ছি না। কেবলই ভয় হচ্ছে যদি বা দুটো-একটা দিন আরও থাকি—বুঝি হয়ত হয়ে যাবে। জিভটা কেমন এলিয়ে এলিয়ে যাচ্ছে—দেখছিস না? ......না বলেই নিই যা বলবার।'

তারপর কনকের দিকে কেমন যেন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলে, 'আমার বড্ড ভয় হ'ত যে তুই হয়ত আমাকে ভুল বুঝে বসে থাকবি। আবার ভাবতুম যে আমি যখন বিবেকের কাছে খালাস আছি—তখন এত ভয়ই বা কিসের? ঠাকুরপোকে দিয়ে আমার ভাইয়ের অভাব বন্ধুর অভাব মিটেছিল। তার চেয়ে বেশী, অন্য চোখে কোনদিন দেখেছি কি অন্যভাবে ভেবেছি বলে তো আমার মনে হয় না। নিজের মন বেশ ক'রে দেখবার চেষ্টা করেছি—মনের কাছে পোস্কার আছি আমি, একথা জোরগলায় বলতে পারি। আর ঠাকুরপোও বোধ হয়—ঠিক যাকে কুদৃষ্টিতে তাকানো বলে তা কোনদিন তাকায় নি। আমাকে দেখে ওর চোখ ধেঁধে গিয়েছিল এই পর্যন্ত। কী চায় তা বোধ হয় নিজেও ভেবে পায় নি কোনদিন।'

আবারও হেসে ওঠে একটু, তবে এবার নিঃশব্দে নয়, অভ্যাসমতো খিল-খিল ক'রেই হেসে ওঠে, বলে, 'তবে ভাই আজ মানছি, মরণের দিকে পা তুলে আর মিথ্যে কথা বলব না, দোষও ছিল একটু। তোর যে কী ক'রে দিন কাটছে তা আমি জানতুম। তবু গোড়াতেই কাটন-ছিঁড়েন করে দেবার চেষ্টা করিনি, তোর বরকে সরিয়ে দিতে পারিনি। আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছে, আমার কাছে থাকতে পেলে ও আর কিছু চায় না—এইটি মিষ্টি লাগত মনে মনে। কে জানে—মেয়েজন্মেরই দোষ বোধ হয় পুরুষ পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে এটা জানতে পারলে আর কিছু চায় না, পুরুষ নাচাতে মেয়েজাতের বড় সুখ। আবার তাতে যদি জানতে পারে যে অপর মেয়ের মনে রীষ হচ্ছে এ জন্যে তো কথাই নেই।...কিন্তু আজ সে জন্যে সত্যিই মনে মনে বড় আপসোস হয়, বিশ্বাস কর! আজ বুঝতে পারি সেদিন কী কষ্ট পেয়েছিস তুই, মনে হয় এটা খেলার জিনিস নয়। তুই তো মিথ্যে বলে জানছিস না—তোর মনে সেটা সত্যি... তবে তাও বলি, তুই বড় বোকাও ছিলি, পুরুষকে জোর ক'রে বশ করতে হয়—কবে তার দয়া হবে বলে বসে থাকতে আছে?...যাক, সে সব কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। আজ যখন ষোল আনা বুঝে পেয়েছিস তখন মনে আর কোন দুঃখ রাখিস নি বোন—হয়ত সেইটুকু অন্যায়ের জন্যেই আমাকে, ছেলেমেয়ে স্বামী, নিজের নতুন বাড়ি এমন পাতানো সংসার ফেলে এখন অসময়ে চলে যেতে হচ্ছে—কে জানে। অন্তত সেই ভেবেই তুই আমাকে মাপ করতে চেষ্টা করিস, আর কোন অভিমান রাখিস নি!'

'কী বলছ দিদি, ছি! আমার মনে আর কোন ময়লা নেই। যখন ছিলও, তখনও তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করিনি।'

'তা জানি। সেইজন্যেই তো এত লোক থাকতে মরবার সময় তোকেই ডেকেছি, সবচেয়ে ভারী বোঝাটা তোর ঘাড়েই চাপিয়ে যাচ্ছি।'

হেম বাইরে দাঁড়িয়ে গোবিন্দর সঙ্গে কথা কইছিল। এখন দুজনেই কাছে এসে দাঁড়াল। হেমের দিকে চেয়ে হেসে বলল, ঠাকুরপো, তোমাদের হাতে ছেলেকে দিয়ে যাচ্ছি ভাই, যতটা পারো মানুষ করো। মেয়েরা সেয়ানা হয়েছে—ওদের বিয়ে দিতেই হবে তোমার দাদাকে—যেমন করে হোক, আর বিয়ে হয়ে গেলে ওদের দায়ে নিশ্চিন্ত, যে যার শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। ছেলেটার জন্যেই ভাবনা।'

একটু থেমে—স্বামীর দিক তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে আবার হেমকেই বলল, তোমার দাদাকে আবার বিয়ে করতেই হবে, বিয়ে না ক'রে থাকতে পারবে না ও, বৌ একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে তো!...তা সে মানুষটার ওপর চিরকালের জন্যে সতীনের একটা বোঝা চাপিয়ে যেতে চাই না।'

গোবিন্দ ম্লান হেসে বললে, 'হ্যাঁ—তা আর নয়! আবার বিয়ে করছেন... পঞ্চাশ অনেকদিন পেরিয়ে গেছে—সে হুঁশ আছে?'

'বড্ড আপসোস হচ্ছে, না? মলুমই যদি সেই তো দুচার বছর আগে মলুম না কেন?...তা বাপু অত ভেবে-চিন্তে দেখিনি—দেখলেও না হয় দুদিন আগে তৈরী হতুম। সে যাকগে মরুকগে—অপরাধটা ক্ষ্যামাঘেন্না করে নিও; কী আর করবে। তবে বিয়ে তোমাকে করতে হবেই, করবেও—তার জন্যে অনর্থক লজ্জা পেও না। ষোল বছর বয়স থেকে ঘরণী গিন্নি বৌ নিয়ে ঘর করছ—এই বুড়ো বয়সে বৌ ছাড়া থাকতে পারবে না।...মার তো ঐ অবস্থা, তাকেই কে দেখে তার ঠিক নেই।...ঠাকুরপো একটা মেয়ে দেখেশুনে দিও তো ভাই, লক্ষ্মীটি। তবে যেন খুঁজে পেতে আমার চেয়ে সুন্দর একটা ধরে এনো না—তাহ'লে মরেও শান্তি পাব না! রূপের গরবটা যেন থাকে আমার।'

অনেক চেষ্টায় অনেক কথা বলে একেবারেই বুঝি শক্তির শেষ সঞ্চয়টুকু ফুরিয়ে যায় তার। শ্রান্ত হয়ে হঠাৎ চোখ বোজে, আর বুজেই থাকে। চোখও খোলে না বা কথা বলার চেষ্টাও করে না আর।

রাণীদি যা আশঙ্কা করেছিল তা যে আদৌ অমূলক নয়—সেটা ক্রমশঃ বুঝতে পারে কনক। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে রাণীর নির্ভুল হিসাব দেখে অবাক হয়ে যায় ও। সত্যি সত্যিই বুলি হরে গেল তার—সেইদিন, সেই মুহূর্ত থেকে। তারপর দুটো দিন দুটো রাত একটাও কথা কইল না সে, একবারও চোখ খুলল না। অথচ সেটা ঘুম নয়—তাও বুঝতে কোন অসুবিধা রইল না কারও। কারণ কনক যতবার ওষুধ কি পথ্য খাওয়াতে গেল—হাঁ করতে বলতেই হাঁ করল সে। খেলও একটু ওষুধ—এক আধ ঢোঁক। কিন্তু খেতে বোধ হয় হয় কষ্ট হচ্ছিল তার, কিন্তু খেয়েই শ্রান্তি বোধ করছিল—একবার দুবারের পরই ঘাড় নেড়ে নিষেধ করছিল কিম্বা মুখ বুজে ফেলছিল। অর্থাৎ সবই শুনছে সবই বুঝছে শুধু নিছক শারীরিক দুর্বলতার জন্যই চোখ খুলতে বা কথা কইতে পারছে না।

যেমন হঠাৎ মুখ বুজে ছিল, তেমনি হঠাৎই ঐ দুদিন পরে আবার মুখ খুলল সে।

সেদিন সকালে কনক ওর বাসি কাপড়টা ছাড়িয়ে যখন একটা কাচা কাপড় পরাচ্ছে—অকস্মাৎ তাকে চমকে দিয়ে চুপি চুপি বলে উঠল, 'দেরাজের মধ্যে একটা লালপাড় ফরাসডাঙ্গার শাড়ি আছে—আমাকে জন্মের ভাত-কাপড়ে দিয়েছিল এরা—সেইটে বার ক'রে পরিয়ে দে। ঐ কাপড় পরে মরব—অনেকদিনের ইচ্ছে!'

কনক খুব একটা প্রতিবাদ করতে পারল না, কারণ কনকের কোন কথাই

উড়িয়ে দেবার মতো নয়—এটা বুঝেছিল, তবু বলল একবার, 'তা যেদিন মরবে সেদিন মরবে—আজ তার কী?'

'ওলো নেকী, আমার কথাটা শোন। যা বলছি জেনেই বলছি।'

তারপর ওর কথার আওয়াজ পেয়েই, গোবিন্দ এসে দাঁড়াতে, চোখ খুলে একবার তার দিকে চেয়ে বলল, 'একবার কাছে এসো তো, এই বেলা জ্ঞান থাকতে ক্ষমতা থাকতে পায়ের ধুলোটা নিয়ে নিই।...অনেক জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে গেলুম—না কি যেন বলতে হয় না মরবার সময়? সে সব কিন্তু বলতে-টলতে পারব না আমি। এমন কিছু জ্বালাতন-পোড়াতন করিনি তোমায়।...কৈ গো, পাথর হয়ে গেলে যে একেবারে, এসো এসো, এইখেনে এসে দাঁড়াও! কিছু নয়।...আর মাকেও একবার আসতে বলো, তাঁর পায়ের ধুলোটাও নিয়ে নিই। সত্যি শাশুড়ি পেয়েছিলুম রে—যদি মেয়েজন্ম আবার নিতেই হয় তো জন্মে জন্মে যেন এমনি শাশুড়ি পাই!'...

আরও খানিক পরে, হেমকে কাছে ডেকে বললে, 'জ্বালাতন বরং তোমাকেই যা একটু করেছি ভাই, পার তো আমাকে মাপ ক'রো। আর মরেই যাচ্ছি যেকালে—মাপ না ক'রে উপায় কি? তোমার একটু দুঃখু হবে জানি।...তবু, তুমিই দাঁড়িয়ে থেকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিও—যাতে শ্মশানেও সকলে তাকিয়ে দেখে।...একটা মজার কথা জানিস কনক, তোর বর জানে, ও ছিল। সেখানে—আমার বাবা শ্মশানে দাঁড়িয়েই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল!'

হাসবার চেষ্টা করল সে—কিন্তু হাসির সেই মিষ্টি শব্দটা আর বেরোল না গলা দিয়ে।

একটু পরে আবার হেমের দিকে চেয়েই বলল, ছেলেমেয়েগুলোকে সকাল ক'রে খাইয়ে নিয়ে তোমাদের বাড়ি মাসিমার কাছে রেখে এসো গে। মায়ের মৃত্যুটা আর এ বয়সে না-ই দেখল ওরা, শুধু শুধু বিশ্রী স্মৃতি একটা থাকবে।...তোমরাও খেয়ে দেয়ে নাও গে সকাল সকাল। বিকেলের আগেই বাঁশ কাটতে ছুটতে হবে!'

বলতে বলতে কাসির ভঙ্গী হ'ল একটা মুখে। আবার চোখ বুজল। আবার কথা বলল একেবারে বেলা একটা নাগাদ।

শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ থেকেই—সেটা এরা সকলেই বুঝতে পেরেছিল। ডাক্তারও ডেকে এনেছিল একবার—তিনি অক্সিজেন আনার কথা বলেছিলেন। অবশ্য একথাও বলেছিলেন কলকাতা থেকে ভাড়া ক'রে আনা পর্যন্ত টিকবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং সে চেষ্টা করা হয় নি। গোবিন্দ ঘটনাটার এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায় যেন কেমন জড়ভরতের মতো হয়ে গেছে—তার মাথাতে কিছু আসছেও না। এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসবে—তা গোবিন্দ ভাবেনি একবারও। দেখা গেল ডাক্তারের চেয়ে রাণী নিজের শরীরের অবস্থা বেশী বুঝেছিল।

একটার সময় কনককে চোখের ইশারায় কাছে ডেকে বলল, 'একবার একটু চুপি চুপি ভগবানের নামটা শুনিয়ে দে তো ভাই—গুচ্ছের চিৎকার আমার ভাল লাগে না। সব যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, এরপর শোনালেও আর শুনতে পাব না।...আর অমনি, যদি পারিস একটু তো—ডান দিকে পাশ ফিরিয়ে দে। আমার আবার পোড়া অব্যেস—পাশ ফিরে না শুলে ঘুমটা যেন জমে না। সমস্ত শরীর এলিয়ে ঘুম আসছে—এবার একটু আরাম ক'রে ঘুমুই। কতকাল যে ভাল ক'রে ঘুম হয় নি—'

তারপর মুখ টিপে একটু হেসে, চোখে সেই চিরপরিচিত কৌতুকের নৃত্যোচ্ছলতা ফুটিয়ে বলে, 'কেমন লো, এবার যমের মুখে দিয়ে নিশ্চিন্তি তো?'

কনক প্রাণপণে চোখের জল চেপে অস্পষ্ট, প্রায় বুজে-আসা কণ্ঠে তিনবার তারকব্রহ্ম নাম শুনিয়ে তাকে আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়ে দেয়। রাণীও বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে পাশবালিসটা ভাল ক'রে জড়িয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে শুয়ে একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর সত্যি-সত্যিই যেন ঘুমিয়ে পড়ে, গাঢ় নিশ্চিন্ত সুখনিদ্রায়।

তারই মধ্যে যে কখন শেষনিঃশ্বাসটা পড়ে থেমে যায় সব—সেটা এরা ভাল মতো বুঝতেও পারে না।

(ক্রমশঃ)

ত্যাগ রাজ ও কাম রাজ
২৭·৮·৬৩
দিল্লী স্বরাষ্ট্র দপ্তর
দিল্লী অর্থ দপ্তর
পশ্চিম বঙ্গ অর্থ দপ্তর
ইত্যাদি

এডিনবরায় ভারতীয় সংস্কৃতি

লণ্ডন, ১২ই সেপ্টেম্বর—প্রায় সতেরো বছর আগে, ইউরোপের সর্বাঙ্গে তখনো মহাযুদ্ধের ভয়াল ক্ষতচিহ্ন। এমন দিনে বৃটেনের কয়েকজন মানবতাবাদী সংস্কৃতি-অনুরাগী পরিকল্পনা করলেন যে, প্রতি বছর শরৎ আগমনে তাঁরা এদেশে এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির মহোৎসব অনুষ্ঠান করবেন।

এই পরিকল্পনাকারীদের পথিকৃৎ ছিলেন আর্ল অব হারউড। সৌম্যদর্শন, মিতভাষী এই তরুণ আর্ল রাজপরিবারের নিকট-আত্মীয়। অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হিসাবে তাঁরা বেছে নিলেন ভ্রমণবিলাসীদের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্কটল্যাণ্ডের অপরূপ সুষমাময়ী ঐতিহাসিক রাজধানী এডিনবারা। বিশ্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবার পর থেকে এডিনবারা হয়ে উঠেছে সংস্কৃতি-অনুরাগী ও সাধকদের এক আন্তর্জাতিক মহাতীর্থ।

বৃটেনে ভারতীয় সংস্কৃতির যতজন মুগ্ধ সমর্থক আছেন আর্ল অব হারউড তাঁদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যতায় প্রায় অনন্য। তাই আজ কয়েক বছর ধরেই তিনি চেষ্টা করে

আর্ল অব্ হারউড

আসছিলেন যে, এক বছরের অনুষ্ঠানকে তিনি ভারতীয়-প্রধান করে তুলবেন। কিন্তু সে পথে বাধা ছিল অনেক। অনুষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তারা প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির বিপুল ব্যবধান অতিক্রম করে কি ভারতীয় শিল্পীরা যথেষ্ট সংখ্যক দর্শক আকর্ষণ করতে পারবেন? ভারতীয় শিল্পীদের নিয়ে আসার খরচও বিরাট। কিন্তু আর্ল অব হারউডের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং দৃঢ়তায় উৎসব-কর্তৃপক্ষের অন্য সকলে ক্রমশ ১৯৬৩ সালের অনুষ্ঠানে ভারতীয়

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিতে রাজি হলেন। কিন্তু তখনো কেউ অনুমান করেননি যে, এবারের এডিনবারা উৎসব ভারতীয় উৎসবে পরিণত হবে।

ভারত থেকে অনুষ্ঠানের জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন যন্ত্রশিল্পী আলী আকবর খান, রবিশংকর, বিশমিল্লা খান। তবলা বাদক হিসেবে আসেন আল্লারাখা। নৃত্যশিল্পী হিসাবে আসেন বালাসরস্বতী এবং কণ্ঠসংগীতের জন্যে আসেন শুভলক্ষ্মী। নিঃসন্দেহেই উৎসব-কর্তৃপক্ষ ভারতের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদেরই আমন্ত্রণ জানান। অবশ্য, শেষপর্যন্ত বিশমিল্লা খানের আসা সম্ভব হয়নি। দলের নেতা ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে আসেন ডক্টর নারায়ণ মেনন। তবে শিল্পীদের প্রকৃত নেতা, উৎসাহদাতা, বন্ধু ও ব্যাখ্যাকার ছিলেন ইহুদী মেনহুইন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধুর্য ও মহত্ত্ব সমগ্র উৎসবটির ওপরই একটি আনন্দময় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতি-প্রধান এই উৎসবের প্রকৃত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে কর্তৃপক্ষ একটি ভারতীয় প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেন। ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের এই ছোট কিন্তু বিশিষ্ট প্রদর্শনীটি সার্বজনীন প্রশংসার সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রদর্শনীর ঐটুকু পরিচয়ই সব নয়। ভারতীয় রাগ-রাগিণীর মর্মোপলব্ধির জন্যে কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীর একটি অংশে অনেকগুলি ছোট ছোট কক্ষ তৈরী করেন। সেই কক্ষে প্রবেশ করলে প্রথমেই দর্শক ছবি ও বর্ণনার সাহায্যে একটি বিশেষ রাগরাগিণী সম্পর্কে ধারণা পাবেন। তারপর শুনবেন সেই রাগ-রাগিণীর সুর। গার্ডিয়ান পত্রিকার ভাষায় পরিশেষে উপলব্ধি হয়, ভারতের সংস্কৃতি, চিত্র-ভাস্কর্য, সংগীত সবই একাত্ম ও পরস্পর-সম্বন্ধ।

প্রশংসামুখর পত্র-পত্রিকা

ত্রিশ দশকে উদয়শংকরের নৃত্য-শিল্পীদের গৌরবোজ্জ্বল সফরের পরে বৃটেনের জনসাধারণের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরার এতবড় একটা চেষ্টা আর হয়নি। যেহেতু উদয়শংকরের সফর এখন একটা অতীত স্মৃতি এবং তার চেয়েও বড় কথা যে, ইতিমধ্যে একটা মহাযুদ্ধ এসে ইউরোপকে তচনচ করে দিয়েছে, তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এই উৎসব ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের দরদীজনের দরবারে পৌঁছে দেবার অনন্য চেষ্টা।

বৃটেনের কয়েকখানি বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকা থেকে ভারতীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

সানডে টাইমসের কলাসমালোচক লিখেছেন, "আমি কখনোই আশা করিনি যে, এডিনবারা উৎসবে আমাকে ভারতীয় সংগীতকেই সর্বপ্রথম স্থান দিতে হবে।"

টাইমস পত্রিকার কলাসমালোচক লিখেছেন, "আজ সকালে ফ্রি ম্যাসনস্ হলে রবিশংকর ও আলী আকবর খান দ্বৈতভাবে বাজিয়ে যে অননাত্য, যে চাঞ্চল্য, যে একটি-বিশেষ ঘটনার ভাব সৃষ্টি করেন তা কি করে ব্যক্ত করবো?"

ঐ একই সমালোচক লিখেছেন, "তাঁদের দুজনের শিল্পীসত্তার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ই প্রধানত কনসার্টে এক বিদ্যুৎ-দীপ্ত পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়। রবিশংকরই দুজনের মধ্যে অধিকতর তৎপর, অগ্নিস্পর্শ ও সর্বাধিনায়কের মত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। চোখ, হাত ও মুখভঙ্গীর দ্বারা তিনি তাঁর নিজের ও সহকর্মীর সৃষ্ট সুরমূর্ছনায় আনন্দ, আশা ও উল্লাসের

ইহুদী মেনহুইন

অভিব্যক্তি করছিলেন। আর আলী আকবর যেন তাঁর সরোদ বাজান না, সভাপতিত্ব করেন। তিনি যখন নির্লিপ্তভাবে, প্রশান্ত শান্তির মধ্যে এক একটি তীক্ষ্ম, তীব্র শিহরণ জাগানো, দূর-দূরান্তরে বিলীয়মান সুরের মূর্ছনা সৃষ্টি করেন তখন যেন তিনি সচেতন নন।"

বালা সরস্বতীর নাচ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অবজারভার পত্রিকার নৃত্য-সমালোচক লিখেছেন, 'যশোদারূপিণী শিল্পী বালককৃষ্ণের মুখব্যাদনের মধ্যে যেমন করে বিশ্বরূপ দেখলেন তেমনি করেই যেন তাঁর নৃত্যের মধ্যে ভারতীয় নৃত্যের বিপুল বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করলাম।'

'শেষ দৃশ্যে কৃষ্ণ কাদা তুলে খাচ্ছেন আর আমি দেখলাম বালাসরস্বতী যেন আতঙ্কের ঝলকে জ্বলে উঠলেন। আমার মনও আতঙ্কে অভিভূত হয়ে গেল। আমি যেন বালাসরস্বতী হয়ে উঠলাম। আমরা দুজনেই কৃষ্ণের মা হয়ে গেলাম।"

প্রায় পক্ষকাল ধরে এখানের পত্র-পত্রিকায় এমনি যে-সব প্রশংসা ও অভিনন্দন বেরিয়েছে এত সংক্ষেপে তার সামান্য আভাসমাত্র দেওয়া যায়, পরিচয় নয়।—অবশ্যই লক্ষণীয় যে, শুভলক্ষ্মী কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছেন। রবিশঙ্কর আমায় বলেছেন, তার জন্যে শুভলক্ষ্মীর প্রতিভা দায়ী নয়। তা সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু এক দেশের কণ্ঠসংগীত আরেক দেশে সমাদৃত হওয়া সহজ নয়। তার জন্যে চাই শ্রোতাদের উপলব্ধি করার সাধনা ও প্রগাঢ় সহানুভূতি।

শুভলক্ষ্মী এখন লণ্ডনে। এতদিন তাঁর অমিয় কণ্ঠই শুধু শুনেছি। এখন তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয়েও মুগ্ধ হলাম। এখন আমাদের ছোটখাটো বৈঠকে তিনি গাইছেন। আর কী আশ্চর্য! ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠা গায়িকাকে উপরোধ অনুরোধের প্রয়োজন নেই। আমরা কোন গানটি শুনতে চাই সেটুকু বলাই যথেষ্ট। বলাবাহুল্য আমরা যখন আছি তখন তিনি রবীন্দ্রসংগীতও গাইছেন।

বিরূপ সমালোচনা

ভারতীয় শিল্পীদের নিয়ে কেউ যে কোন বিরূপ সমালোচনা করেননি তা অবশ্য নয়। কিন্তু তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচকদের অজ্ঞতা ও অনুধান-অক্ষমতা। যেমন একজন সমালোচক বিভিন্ন রাগের পার্থক্য ধরতে পারেননি। আলি আকবরের বাজানো তিনটি তাঁর কাছে 'সি মাইনর' ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি।

বালাসরস্বতী যে বিপুল আশা জাগিয়েছিলেন তাও কারো কারো মতে পূর্ণ হয়নি। কিন্তু রবিশঙ্কর আমাকে বলেছেন এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বালাসরস্বতী প্রতিটি অনুষ্ঠানেরই সাফল্য বিপুল। এখন তিনি জার্মানীতে। নারায়ণ মেননের পরিচয়দান অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ হয়। এ সম্পর্কে একজন প্রখ্যাত সমালোচক লিখেছেন, "মেনহুইনের পরিচয় প্রদান ছিল পরিষ্কার, বিনয়নম্র ও বিশ্লেষণাত্মক। মিঃ মেননও আমাদের হৃদয় জয় করেছেন,—কিন্তু তিনি কি বলছিলেন তা শোনবার জন্যে আমাদের মন কত আগ্রহান্বিতই না ছিল! মেনহুইন তাঁকে যখন কোন প্রশ্ন করছিলেন (ঠিক যে প্রশ্নগুলি আমরাও করতে চাইছিলাম) মেনন তখন মারাত্মক ভারতীয় ভদ্রতার সঙ্গে তাঁর বন্ধুর দিকে ঘুরে মাইক্রোফন থেকে মুখ সরিয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন। কিম্বা তিনি এমনি উদার ও হৃদ্য-হাসির সঙ্গে উত্তর দিচ্ছিলেন যাতে তাঁর সব ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগুলি অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। ভারতীয়রা চমৎকার লোক, কিন্তু প্রায়ই তাঁরা বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন নন।"

এছাড়া ছিল পাউন্ড-শিলিং-পেন্সের পীড়াদায়ক হিসাব। গতবছর উৎসবে ১১৫,০০০ পাউন্ড ঘাটতি ছিল। এবার কত হবে তা আরো কিছুদিন পরেই জানা যাবে। অতএব প্রশ্ন উঠেছে উৎসবকে এত উচ্চাঙ্গের (যার মধ্যে ভারতীয় অনুষ্ঠানগুলি অন্যতম) না করে আরো লোকরঞ্জনী করা উচিত কিনা।

রবিশঙ্করের বৈঠকে

ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে রবিশঙ্করই যে সবচেয়ে প্রখ্যাত তাতে সন্দেহ নেই। তার কারণ তাঁর মহান শিল্পপ্রতিভা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিত্ব। ইউরোপকে তিনি আবাল্য চেনেন। তাই ইউরোপীয় শ্রোতাদের কাছে কিভাবে ভারতীয় সংগীত পরিবেশন করতে হয় তা তিনি জানেন। তাঁর ব্যাখ্যা বা প্রস্তাবনা (ইন্ট্রোডাকশান) চমৎকার। তা ছাড়া তিনি জানেন কোন রাগ-রাগিণী কোথায় সমাদৃত হবে। পাশ্চাত্য শ্রোতাদের উপযুক্ত করে আলাপকে সংক্ষেপও করেন।

রবিশঙ্কর আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, এবারে এডিনবারা উৎসবে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে যে আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে তাকে যদি বাঁচিয়ে রাখা যায় তাহলে পাশ্চাত্যের দরবারে ভারতীয় সংস্কৃতির সম্মানিত আসন নিশ্চয়ই অচিরে নির্দিষ্ট হবে।

শুভলক্ষ্মীর স্বামী প্রখ্যাত কল্কি পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীসদাশিবম বলেছেন ভবিষ্যতে শিল্পী বিনিময়ের জন্যে বি-বি-সি এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিও প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বালা সরস্বতী

ভারত ভবনের উদাসীনতা

বৃটিশ জ্ঞানীগুণীরা যখন ভারত কিম্বা অন্য কোন দেশ ভ্রমণ করেন তখন বৃটিশ কাউন্সিলের তৎপরতার কথা ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রই জানেন। তাঁদের কর্মসূচী, তাঁদের পরিচয়—যা কিছু জ্ঞাতব্য থাকতে পারে তা অনেক আগে থেকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়। কর্মসূচীর সংগঠন ও তদারকও তাঁরাই করেন।

এ বছর ভারতের পাঁচ-ছ'জন শ্রেষ্ঠ শিল্পী যে বৃটেনে আসবেন সে কথাটা গত বছর থেকে জানা ছিল। কিন্তু এ যাবৎকাল ইণ্ডিয়া হাউসের কোন সার্কুলারে তার উল্লেখ দেখিনি। তাঁদের জন্যে কর্মসূচী গঠন, কিম্বা প্রচার-ব্যবস্থা করার কথা তো দূরের কথা।

একজন যে কোন মন্ত্রী কিম্বা মহারাজা এলে ইণ্ডিয়া হাউস তৎপর হয়ে ওঠে। সেই 'মান্যবরেরা' ওঠেন 'স্যাভয়' কিম্বা 'ক্ল্যারিজেসে'। ইণ্ডিয়া হাউসের সোফার-চালিত বড়-বড় কালো-কালো গাড়ীগুলি মোতায়েন থাকে। আর যখন রবিশঙ্কর-আলী আকবর-শুভলক্ষ্মী কিম্বা বালা-সরস্বতীর মত আমাদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠদূতেরা এদেশে আসেন তখন তাঁরা যেভাবে উপেক্ষিত হন তা দেখলে মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

দ্বৈত বাদ্যে রবিশঙ্কর ও আলি আকবর

★

বিশেষ প্রতিনিধি গৃহীত আলোক-চিত্র

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতের 'জানাতে পারেন' বিভাগে একটি প্রশ্ন পাঠালাম।

১। সংস্কৃত পাঠমালায় "সূক্তিরত্নাবলী" নামক কবিতার একুশ শ্লোকে আছে,

"কৃপণেন সমঃদাতা ভুবি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি অপি
ন বিদ্যতে"।

....।।

আচ্ছা, বলতে পারেন কৃপণকে তো আমরা সকলেই ঘৃণা করি কিন্তু শ্লোকে "কৃপণের মত দাতা আর পৃথিবীতে কেহ নাই"—এ কথা বলা হয়েছে? এর যথার্থ উত্তর আশা করি।

শ্রীমুকুন্দমোহন রায়,
৮৮, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন,
কলিকাতা—৩৬।

সবিনয় নিবেদন,

আমি আপনার "সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার" নিয়মিত পাঠক। সেই কারণ আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নটির সঠিক উত্তর আপনার পত্রিকার "জানাতে পারেন" বিভাগ মারফৎ পেলে অত্যন্ত উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব।

বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব-মোট স্থায়ী ও অস্থায়ী সিনেমা-হলের মোট সংখ্যা কত?

শ্রীপরিতোষকুমার বোস,
"শ্রীভবন"
পোঃ ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের জানাতে পারেন বিভাগের মারফত নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরগুলি পেলে আনন্দিত হব।

১। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ (আয়তনে) ষ্টেডিয়াম কোন্‌টি, কোথায়, কোন দেশে, তার accomodation কত এবং তার মধ্যে কত প্রকার খেলাধুলো করা চলে বা হয়ে থাকে?

২। ইংলিশ চ্যানেল সবচেয়ে কম সময়ে পার হয়েছে কে, কোথাকার লোক এবং কে সবচেয়ে বেশীবার পার হয়েছে ও স্রোতের পক্ষে ও বিপক্ষে কে কতবার পার হয়েছে?

৩। বলতে পারেন ভারতের রাজ-ধানীতে সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষটি কে?

৪। ক্যান্‌সার রোগের ঔষধ কে আবিষ্কার করেন, কবে, কোথাকার লোক, কি থেকে ঔষধ আবিষ্কার করেন?

৫। একতলা ও দ্বিতলবিশিষ্ট ষ্টেট বাসের দাম এবং একতলা ও বোম্বাইয়ের দ্বি-তলবিশিষ্ট ট্রামের মূল্য কত?

শ্রীবিদ্যুৎকুমার তপাদার,
২৬।৪ রাজা রাজেন্দ্র ষ্ট্রীট,
বড়বাজার, কলিকাতা।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয় আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন পাঠালাম। আগ্রহশীল পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে উত্তর পেলে আনন্দিত হবো।

(১) বর্তমানকালে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ লাইব্রেরী কোন দেশে এবং তার নাম কি?

(২) সত্যজিৎ রায়কে সর্বপ্রথম কোন দেশ বেশী সম্মান প্রদর্শন করে?

(৩) বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কে?

শ্রীচিন্ময় চৌধুরী,
২১ তেলীপাড়া রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের "জানাতে পারেন" বিভাগে কয়েকটি প্রশ্ন রাখলাম। উত্তর পেলে বাধিত হব।

১। এ দেশের নাম বঙ্গদেশ হল কেন?

২। বাংলার সাল গণনা করা হয় কোন্‌ সময় থেকে?

৩। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের নাম কি, কার লেখা?

৪। বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি এবং তা কোথা থেকে কোন্‌ সালে কি ভাষায় প্রকাশিত হয়?

ধনঞ্জয় হালদার,
গড়াপ, সাটীদহ,
হুগলী।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

"অমৃতের" গত ৮ম সংখ্যার শ্রীপ্রীতি গুহরায়ের প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি।

(১) মৃত ভাষা (Dead Language) প্রকৃতভাবে মৃত হয় না। যে ভাষা পূর্বে বহু প্রচলিত ছিল—কিন্তু বর্তমানে সেই ভাষা প্রচলিত নয় এবং সেই বহু প্রচলিত ভাষায় লোকে কথাবার্তা, ভাব আদান প্রদান করে না তাকেই "মৃত ভাষা" বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় বহু ভাষা চর্চা ও ভাব বিনিময়ের অভাবে "মৃত ভাষায়" পরিণত হয়েছে।

(২) সংস্কৃত ভাষাকে 'মৃত ভাষা' বলার কারণ হচ্ছে এই সুমধুর ভাষা দীর্ঘকাল চর্চা ও ভাব বিনিময়ের অভাবে 'মৃত' হয়েছে। যুগের প্রয়োজনে বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা আজ মৃত পর্যায়ে এসেছে। হয়তো এমন দেখা যেতে পারে যে বাংলা ভাষা ভবিষ্যতে মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে। এর পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। চর্চার অভাব ঘটলেই এমন হয়ে থাকে।

'অমৃতের' ৮ম সংখ্যার মঈনউদ্দিন আফজারের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে 'ও' আর 'এবং' কিছুটা ভাষাগত পার্থক্য আছে। পার্থক্য হচ্ছে সংখ্যার দিক দিয়ে দুটোই সংযোজক অব্যয়ের ন্যায় কাজ করে। 'ও' দুটো শব্দ বা বাক্যকে যোগ করে। কিন্তু 'এবং' দুই বা দুইয়ের অধিক শব্দ বা বাক্যকে যোগ করে।

রাধাশ্যাম ঘোষ,
গোমস্তাপাড়া,
জলপাইগুড়ি।

সবিনয় নিবেদন,

গত ৬ই সেপ্টেম্বর 'অমৃত'র ১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপৃথ্বীতোষ বিশ্বাসের ২নং প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

ব্যয়বহুল খেলার মধ্যে পোলো, টেনিস এবং ক্রিকেট খেলাই প্রধান। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যয়সাধ্য খেলা হ'ল পোলো। এই খেলার জন্য দরকার হয় সুদক্ষ ঘোড়ার এবং এক একটা ঘোড়ার দামই প্রায় ৩।৪ লক্ষ টাকা হয়ে থাকে। তাই এই খেলা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই খেলার সর্বাধিক প্রচলন রয়েছে ভারতে। ভারতের নানা দেশীয় রাজ্যের রাজা-মহারাজারা এই খেলা খেলে থাকেন। বর্তমানে পোলো খেলায় ভারত বিশ্ব-শ্রেষ্ঠের অধিকার অর্জন ক'রেছে।

অনুপম ভট্টাচার্য,
তারা ভৈষজ্য আশ্রম,
কোচবিহার।

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৩শে আগষ্টের 'অমৃতে' প্রকাশিত শ্রীমতী মৃদুলা নিয়োগীর ২নং প্রশ্নের উত্তর পাঠাচ্ছি। বাদুড় কেন কোন প্রাণীই একেবারে অন্ধকারে দেখতে পায় না, সম্ভব না। আমরা যা দেখি তা বস্তুটির উপর আলোকের প্রতিফলন ভিন্ন সম্ভব নয়। সুতরাং আলোক ভিন্ন বস্তুটিকে দেখা অসম্ভব। রাতে অন্ধকারে কোন বস্তুর অবস্থান অনুভব করা বাদুড়ের একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে চোখ এবং শ্রবণশক্তি নষ্ট করার পরও বাদুড় বস্তুর অবস্থান উপলব্ধি করতে পারে। এই আশ্চর্য শক্তিটি বাদুড়ের একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কাজ। বাদুড় দেহের একটি বিশেষ অংশকে অতিদ্রুত আন্দোলিত করে যার সংখ্যা এক সেকেণ্ডে ২০০০০-এর উপর।

এই অতিদ্রুত আন্দোলনের ফলে যে শব্দের (Supersonic) উৎপন্ন হয় তা' মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না কারণ মানুষ এমন শব্দই শুনতে পায় যার আন্দোলন-সংখ্যা সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০০০০-এর মধ্যে, কিন্তু বাদুড় তার উৎপাদিত শব্দ কোন বস্তুতে প্রতি-ফলিত হলে শুনতে পায় এবং বস্তুটির অবস্থান উপলব্ধি করে। কিন্তু কেমন করে বাদুড় তার খাদ্য বা শত্রু বিচার করে তা' অজ্ঞাত।

শ্রীমানবেন্দ্র নাগ,
বারাসত (নবপল্লী),
২৪ পরগণা।

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৬)

সেদিন দুপুরবেলা ব্রজবালা দেবী কিন্তু আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন না। লক্ষ্মীর মা এসে জানালো ওঁর শরীর ভালো নেই, নিজের ঘরেই অল্প ঝোল-ভাত খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। তাই আমাকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন আতিথি-সেবার যেন কোনরকম ত্রুটি না হয়।

টেবিলের একধারে গগন সেন, উল্টোদিকে আমি। মাঝখানে বসেছে তুবড়ী। গগন সেন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে, খেতে খেতে তুবড়ীকে গল্প বলছে, বিদেশী রূপকথার। খাবার প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে আমিও সে কাহিনী শুনেছি। রূপকথার রাজ্যের দুঃখহীন আনন্দের গল্প। বিরাট দৈত্যের কবল থেকে অনায়াসে রাজকুমারীর পলায়ন, রাজকুমারের সঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হওয়া, তাদের শুভপরিণয়ের মধ্যে গল্পের পরিণতি। কাহিনী মামুলি, বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু গগন সেনের বলার ধরন অনন্যসাধারণ। চোখে মুখে বিভিন্ন ধরনের ভাব ফুটিয়ে তুলে গল্পকে সে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তারই মাঝে মাঝে এক একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে আমার দিকে। সে চোখ যেন বলতে চেয়েছে, এ গল্প আমি তোমাকেই শোনাচ্ছি, যে দৈত্যই আমাদের জীবনে আসুক না কেন তাকে এড়িয়ে আমরা মিলিত হব। তার গল্প, তার চাহনি আমাকে সত্যি সত্যিই যেন টেনে নিয়ে গেছে সেই রূপকথার রাজ্যে।

খাওয়া দাওয়ার পর গগন সেন কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে চাইল না। বলল, আজ আমি চলি। কাজ আছে।

বললাম, এত তাড়াতাড়ি! আমি তো ভেবেছিলাম বিকেলে চা খেয়ে তারপর যাবে।

—আবার আসব।

—কবে?

—শিগগীরি।

জিজ্ঞেস করলাম, ব্রজবালা দেবীর সঙ্গে দেখা করবে নাকি?

গগন সেন বলল, না, আজ থাক। বিশেষ করে ওঁর শরীর ভাল নেই শুনলাম। যদি আমার খবর করেন, বোল, দু'একদিনের মধ্যে আসব।

গগন সেন তুবড়ীর সঙ্গে গল্প করতে করতে নীচে নেমে গেল।

আমি ঘরে ফিরে এলাম, দেখি টেবিলের উপর আমার নাম লেখা একখানা চিঠি পড়ে রয়েছে। নিশ্চয় দিদিমণির চিঠি, তুবড়ী রেখে গেছে। এতক্ষণ গগন সেনের সঙ্গে গল্প করার ফলে মনের মধ্যে যে সুন্দর আমেজ সৃষ্টি হয়েছিল, এ চিঠিটা দেখে তা এক মুহূর্তে কেটে গেল। প্রথমে ভাবলাম, এখন থাক, দিদিমণির চিঠি অবসর মত পড়া যাবে। কিন্তু কৌতূহলও দমন করতে পারলাম না, আস্তে আস্তে খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করলাম।

স্নেহের অর্পিতা,

তোমাকে চিঠি দিতে বেশ কিছুদিন দেরী হল, নানা কাজে আটকে পড়েছিলাম। আশা করি তোমাদের সব খবর ভাল। মার কাছ থেকে এসে পর্যন্ত কোন চিঠি পাইনি, তবে তুবড়ী জানিয়েছিল তোমরা সকলে ভাল আছ।

তোমাকে পেয়ে আমি যে কতখানি নিশ্চিন্ত আছি তা ভাই ভাষাতে বোঝাতে পারব না। তুবড়ী তোমাকে খুবই ভালবাসে, সব সময় তোমার কথা লেখে, তোমার কাছে থাকলে শেষ পর্যন্ত ছেলেটা হয়ত মানুষের মত হবে। মা-ও তোমাকে খুব স্নেহ করেন, তোমাকে পেয়ে তাঁর জীবনের নিঃসঙ্গতা অনেকটা কেটেছে।

আসবার আগে তোমাকে একটা অনুরোধ করে এসেছিলাম। মনে আছে কিনা জানি না। একটা খামের উপর আমার নাম আর ঠিকানা লেখা ছিল। তোমাকে বলেছিলাম সেইরকম হাতের লেখার কোন চিঠি যদি মার কাছে আসে আমাকে জানাতে ভুলো না, বিশেষ দরকার আছে। সে খামটা তোমার কাছে আছে তো, না, হারিয়ে ফেলেছো? যদি হারিয়ে ফেলে থাক, আমি আর একখানা খাম পাঠিয়ে দিতে পারি। ঐ হাতের লেখা কার আমার জানা বিশেষ দরকার। এ বিষয় যদি তুমি আমায় সাহায্য করতে পার, আমি শুধু তোমার কাছে কৃতজ্ঞই থাকব না, উপযুক্ত পুরস্কার দেব।

ভালবাসা নিও।

ইতি—

তোমাদের

দিদিমণি।

সত্যিই সে খামের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। খামটা আছে কিনা দেখবার জন্যে উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ টানলাম। না, হারায়নি, ক্লিপের মধ্যে গোঁজা রয়েছে। তুলে নিয়ে হাতের লেখাটা ভাল করে দেখলাম, কিন্তু এ লেখা কোথাও দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। কেন দিদিমণি এই হস্তাক্ষরের অধিকারীকে খুঁজছে, কি করেছে সে? এমন কি কিছু দিদিমণিকে লিখছে যার জন্যে তিনি ভীত, কিন্তু সে ভয় কিসের?

দুপুরবেলা একটু বেশীক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। লক্ষ্মীর মা এসে আমায় জাগিয়ে দিয়ে গেল, বলল, আপনি তৈরী হয়ে নিন, মা এখুনি আপনাকে নিয়ে গাড়ী করে বেরবেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়?

—তা তো জানি না, বোধহয় কোথাও বেড়াতে যাবেন।

যতশীঘ্র সম্ভব আমি গা ধুয়ে চুল বেঁধে শাড়ী পরে বেরিয়ে এলাম। শুনলাম ব্রজবালা দেবী আমার জন্যে বাগানে অপেক্ষা করছেন। আমি নামতেই উনি গাড়ীতে উঠে পড়লেন, আমি তাঁর পাশে বসলাম। ড্রাইভারকে বোধহয় আগেই নির্দেশ দেওয়া ছিল, সে সোজা কুঠির মাঠে নিয়ে গিয়ে গাড়ী দাঁড় করালো। আমরা নামলাম, প্রায় অন্ধকারের মধ্যে পায়চারী করছি। এ মাঠে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে, ক'লকাতার গড়ের মাঠের কথা মনে করিয়ে দেয়। তার সঙ্গে পুরোন ইতিহাসের রোমান্স মেশানো থাকে। সামনের বড় বড় থামওয়ালা ডাচ্ আমলের পুলিশ ব্যারাক, ওদিকে ফুটবল মাঠের ওপরই ডাচ্ ভিলা, কোন ওলন্দাজ শাসক সেখানে থাকত, কে বলতে পারে। এ মাঠে অনেকদিনই বেড়াতে এসেছি ব্রজবালা দেবীর সঙ্গে, ওঁর মুখ থেকেই এসব কথা আমার শোনা।

হঠাৎ কথা বললেন ব্রজবালা দেবী, এই গগন সেনকে তুমি কতদিন চেন?

এ প্রশ্নে বিস্মিত হলাম, বললাম, মাস কয়েক।

—কোথায় পরিচয় হয়।

—আমার এক বান্ধবীর বাড়ী, সেখানে উনিও আসতেন।

বৃদ্ধা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, গগন সেনের বাড়ী কোথায় জান?

বললাম, না।

—ওর আত্মীয় স্বজন কারো সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না।

—তবে কোন ভরসায় তার সঙ্গে মিশছ?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া উচিত ভেবে পেলাম না। মৃদু স্বরে বললাম, মানুষটা কিন্তু ভাল।

ব্রজবালা দেবী তখনই প্রশ্ন করলেন, কি করে জানলে?

—মানে, ও'র ব্যবহার, কথাবার্তা, মেলা-মেশার ধরন। এ-সব দেখলেই বোঝা যায়—,

বৃদ্ধা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, অত সহজে কাউকেই কিছু বোঝা যায়

না। একটু পরে বললেন, চল, বাড়ী ফেরা যাক, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

বাড়ী ফিরে দুজনেই কিছুক্ষণ লাইব্রেরীতে বসেছিলাম। তারপর খেতে বসলাম। খাওয়ার পর উনি শুতে চলে গেলেন। কিন্তু এতক্ষণ আমরা দুজনেই চুপচাপ ছিলাম, কেউ কোন কথা বলিনি। উনি কি ভাবছিলেন জানি না, আমি কিন্তু ও'র কথাই ভেবেছি। ভদ্রমহিলা কি চান না আমি আর গগন সেনের সঙ্গে মিশি। না ঐ মানুষটাকে ঘিরে অন্য কোন সন্দেহ তাঁর মনে জেগেছে যা তিনি আমার কাছে প্রকাশ করতে পারছেন না।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়েও ঐ কথা ভাবলাম, কিন্তু কোন কূল-কিনারা করতে পারলাম না।

পরের দিন সকালবেলা চায়ের টেবিলে যোগ দেবার জন্যে ব্রজবালা দেবীর সঙ্গে উপস্থিত হয়ে দেখি গগন সেন সেখানে উপস্থিত। বৃদ্ধার সঙ্গে চা-পান করতে করতে গল্প করছে, আমাকে দেখে হাত তুলে নমস্কার করল।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, আপনি!

গগন সেন হাসল, অবাক হচ্ছেন! এসে পড়লাম।

—এই ভোরবেলা, ক'লকাতা থেকে?

—কাল আর ক'লকাতায় ফিরি নি, চন্দননগরে একটা জরুরী কাজ ছিল, সেটা সারতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল তাই রাত কাটালাম আমার সেই বন্ধুর বাড়ী ব্যান্ডেলে। কখন ফিরে যাব জানি না, তাই মনে হল ভোরবেলা দেখা করে যাওয়াই ভাল। বিশেষ করে কাল ও'র কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নেওয়া হয় নি।

ব্রজবালা দেবী যদিও বল্লেন, বেশ করেছো বাবা, আমি খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে আমার তা মোটেই মনে হল না। আমি মনে মনে গগন সেনের উপর কিছুটা বিরক্তই হলাম। মানুষটাকে আমি বেশ চালাক বলেই জানি, এই সাত সকালে তার কি আসবার দরকার ছিল। কাল ওর সঙ্গে আলাপ করে ব্রজবালা দেবীর কি মনে হয়েছে তা জানাবারও তো সুযোগ পেলাম না।

প্রসঙ্গ বদলে গগন সেন বলছে কানে এল, এ সব জায়গা অনেক বদলে গেছে। আমাদের ছোটবেলার চুঁচড়োর সঙ্গে আজকের চুঁচড়োর কত পার্থক্য, এত এখন ছোট-খাট ক'লকাতা বললেই হয়।

ব্রজবালা দেবী মন্তব্য করলেন, সবই বদলায়, কোন জিনিসটাই আর একই রকম থাকে বল, তখনকার তুমি আর এখনকার তুমি কি এক?

গগন সেন হাসল, তা সত্যি, নিজের কথাটা মানুষ সব সময় ভুলে যায়। অবশ্য ছেলেবেলায় যখন এ বাড়ীতে আসতাম, তখন বাড়ীর ভেতরে ঢুকিনি, বাগানে খেলা করেই চলে যেতাম আমরা। তখন কি বাগানই না ছিল। কত ফুল।

ব্রজবালা দেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন, তা ছিল। ঐ একটাই তো সখ, সারা জীবন ধরে শুধু ফুল ফুটিয়েছি। আমারই দুর্মতি, কি বল অর্পিতা? জেনে-শুনে এমন জিনিস ফোটালাম, যা ঝরে পড়ে।

উত্তর দিল গগন সেন, সংসারী হলে আপনি ফুল গাছের বদলে আম জাম কাঁঠাল গাছ লাগাতেন, নিঃসন্দেহে আপনার চেয়েও তারা দীর্ঘজীবী হ'ত। ফলও দিত প্রতি বছর।

বৃদ্ধার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ভুল হয়ে গেছে। বেশীদিন বাঁচার এই বিপদ, ক্রমশঃ ভুলের সংখ্যা বাড়ে। সেই সঙ্গে অনুতাপের মাত্রাও।

চা-পান শেষ করে বৃদ্ধা উঠে পড়লেন, কাল তোমাকে যা বলছিলাম, চল, কর্তাদের আমলের বড় ঘরগুলো তোমাকে দেখিয়ে আনি। বিশেষ করে সেই বাঘটা।

গগন সেন সাগ্রহে বলল, ঐ বাঘটাকে দেখবার ইচ্ছেও আমার খুব। ছোটবেলা থেকে ওর কথা শুনেছি কিন্তু চোখে দেখিনি।

ব্রজবালা দেবী আমায় বললেন, অর্পিতা, তুমি একটু এদিকে থেক, লক্ষ্মীর মাকে রান্নার ব্যবস্থা করতে বোল, আমরা ঘুরে আসছি। গগন এখানেই খেয়ে যাবে।

গগন সেন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে, খাওয়ার ব্যাপারটা আজ থাক, ক'ল-কতায় ফিরতেই হবে।

বৃদ্ধা সেকথা শুনলেন না, সকাল-সকাল খেয়ে নিও, তাহলে তো আর ফিরতে দেরী হবে না। কাল তোমার খাওয়ার সময় আমি বসতে পারি নি। আজ নিজে তদারক করে খাওয়াব।

গগন সেন আর কথা বলল না, বৃদ্ধার পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, বিজয়ীর হাসি, যার অর্থ কত সহজে আমি তোমার মালিকানকে বশ করেছি।

ঘরে বসে বসে দিদিমণির চিঠির উত্তর দিলাম, তাকে জানালাম, যে হাতের লেখার উল্লেখ তিনি করেছেন সে-রকম কোন চিঠি তাঁর মার নামে আসেনি। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও বলতে ভুলিনি যে, এ-বাড়ীতে সব চিঠিই প্রথমে ব্রজ-বালা দেবীর কাছে যায়, তিনি লক্ষ্মীর মার হাত দিয়ে অন্যদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তবে ও'র চিঠিপত্রের ডেস্ক সব-সময় আমি খুলি, চিঠির জবাব দিই, তার মধ্যে ঐ হাতের লেখা কখনও চোখে পড়েনি।

চিঠিখানা খামে ভরে নীচে সরকার-বাবুর কাছে দিয়ে এলাম। সাধারণতঃ উনিই চিঠি পোস্ট করেন। আমাকে দেখে বললেন, কর্তা-মা বলেছিলেন, উকীল-

বাবুকে খবর দিতে। কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চান। উনি এসেছেন, উপরে কি নিয়ে যাব?

বললাম, ওঁকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে খবর দিচ্ছি।

উপরে এসে দেখি তখনও ব্রজবালা দেবী ঘরে ফেরেন নি। আমি তাঁকে খবর দেবার জন্যে বারান্দা অতিক্রম করে বাঘের ঘরে উপস্থিত হলাম। আলো জ্বলছে, বাঘটা দাঁড়িয়ে রয়েছে হাঁ করে লক্ষ দৃষ্টিতে। কিন্তু সে ঘরে তাঁদের কাউকে দেখতে পেলাম না।

পাশে হলঘরের দরজা খোলা, সেখানেও আলো জ্বলছে। কিন্তু ঘর ফাঁকা। অগত্যা এ ঘর অতিক্রম করে পাশের হলে যেতে হল। যে-ঘরে তুবড়ীর দাদু শিকার-করা জন্তুর দেহ সাজিয়ে রেখেছেন ঘরময়। আমি অত্যন্ত লঘুপায়ে চলছিলাম, যেকারণ আমার পায়ের শব্দ তাঁদের কানে পৌঁছয় নি, দু'একটা টুকরো কথা কানে ভেসে এল,—

ব্রজবালা দেবী বলছেন, এ বাঘের চামড়াটা আমি শোবার ঘরে রাখতে চাই।

গগন সেন প্রশ্ন করল, কেন?

—এ আমাকে পাহারা দেবে, লোকে জানে বাঘ মানুষ খায়, কিন্তু জানে না মরা বাঘ মানুষকে পাহারা দেয়। অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি সত্যি।

—বাঘটার কপালে একটা সাদা দাগ রয়েছে।

—ঐটাকেই চিহ্ন করে রাখ। অন্য বাঘের সঙ্গে গুলিয়ে যাবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

মনে হল একটা ভারী জিনিস নিয়ে ঘরের মধ্যে টানাটানি করা হচ্ছে। আমি ইচ্ছে করে সাড়া দিয়ে কাশলাম, শব্দ করে ঘরে ঢুকলাম. মনে হল, আমাকে দেখে ব্রজবালা দেবী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

—কিছু বলবে অর্পিতা? তাঁর স্বর রুক্ষ।

ভয়ে ভয়ে বললাম, সরকারমশাই খবর পাঠিয়েছেন উকীলমশাই এসেছেন। তাঁকে কি ওপরে আনা হবে?

—ও হ্যাঁ, উকীলবাবুর তো সকালেই আসবার কথা ছিল। আমি বরং তাঁর সঙ্গে কথা সেরে আসি। অর্পিতা তুমি একবার, কি ভেবে বললেন, না থাক, আমি দরোয়ানকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। গগন তুমি বাঘটা চিনিয়ে দিও ও আমার ঘরে নিয়ে যাবে।

গগন সেন বলল কোন দরকার নেই। আমি একলাই এটা নিয়ে যেতে পারব।

—তা হয় না, আমি দরোয়ান পাঠাচ্ছি। ব্রজবালা দেবী ঘর থেকে চলে গেলেন।

গগন সেন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, উঃ সকাল থেকে এ যা বুড়ীর পাল্লায় পড়েছি, বাঘ-ভাল্লুকের গল্প করে করে মাথার পোকা বার করে ছাড়ল।

ওর কথার ধরনে আমি হেসে ফেললাম। তবু জিজ্ঞেস করলাম, ঐ বাঘের ছালটা ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

গগন সেন যতদূর সম্ভব গলাটা গম্ভীর করে বক্তৃতার ঢঙে বলল, এ বাঘ যে-সে নয়, ঐ যে কপালে সাদা আঁচড় দেখছ, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারত-বর্ষে, আবার ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র শোনপুরের জঙ্গলে পাওয়া যেত, তাও মাত্র পাঁচ বছর এই জাতের বাঘ পাওয়া গিয়েছিল। যতদূর খবর পাওয়া গেছে, ঐ জাতের সতেরটা বাঘ শিকার করা হয়েছিল যার মধ্যে দশখানা মেরেছেন দশজন মহারাজা, ৬ খানা চারজন সাহেব আর সপ্তদশটি এ বাড়ীর কর্তার গুলীতে নিহত হয়, এই সেই ভাগ্যবান শার্দুল পুঙ্গব।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম।

গগন সেন চোখ পাকিয়ে বলল, খবর্দার, তোমার মালিকান-এর সামনে এ বাঘ নিয়ে হাসাহাসি কোর না, তাহলেই চাকরি একেবারে নট্ হয়ে যাবে।

ঘরের জীবজন্তুগুলো ঘুরে ঘুরে গগন সেন দেখছিল, বলল, দেখ মানুষের খেয়াল, নিজেকে তো রোজগার করতে হয়নি, শিকারের পেছনে ভদ্রলোক কত টাকা নষ্ট করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

বললাম, ভদ্রলোকের কিন্তু সাহস ছিল, আমার তো এ ঘরে ঢুকলেই ভয় করে। জানি জন্তুগুলো মরা, তবু ভয় ভয় করে। অথচ জঙ্গলের মধ্যে উনি এদের সামনা-সামনি দাঁড়াতেন তো?

দরোয়ান এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াল, বললাম, বাঘটা দেখিয়ে দিন, ও নিয়ে যাবে।

গগন সেন উত্তর দিল, না ওটা আমিই নিয়ে যাচ্ছি, ওকে দরজা বন্ধ করে দিতে বল।

—না, না, ওটা ধুলোয় ভরা, জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে।

গগন সেন মৃদুস্বরে বলল, বোকা মেয়ে, এসব না করলে বুড়ী খুশী হবে কেন?

বাঘের চামড়া কাঁধে করে গগন সেন ব্রজবালা দেবীর ঘরে ঢুকতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, সেকি দরোয়ানটা যায়নি, আমি যে পাঠিয়ে দিলাম?

গগন সেন বলল, আমি ওকে নিতে দিই নি।

—ছি ছি, এই ধুলো-ময়লা।

গগন সেন হাসতে হাসতে বলল, তাতে কি হয়েছে, আমি তো এখুনি স্নান করব, কতদিন গঙ্গায় নামিনি। আপনারা গঙ্গায় যান না?

ব্রজবালা দেবী ম্লান হাসলেন, বয়েস তো কম হল না, অনেকদিন যাইনি। তা'ছাড়া আজ কাজও আছে। উকীল-বাবুর সঙ্গে কথা বলছি।

গগন সেন আমার দিকে তাকিয়ে ফস্ করে বলল, তাহলে আপনি চলুন।—

আমি সভয়ে ব্রজবালা দেবীর মুখের দিক তাকালাম, বললাম, না, না, আমি এখন—,

ব্রজবালা দেবী কিন্তু সহজ গলায় বললেন, ইচ্ছে করে তো তুমি স্নান করে এস অর্পিতা, আমার এখন কোন কাজ নেই।

'আমায় জলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।'

গগন সেন আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ দিল না, বলল, চলুন না, কতক্ষণ আর লাগবে। দেখবেন গঙ্গায় স্নানের কি আনন্দ।

খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমি আর গগন সেন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি শাড়ীর আঁচলটা ভাল করে কোমরে জড়িয়ে নিয়েছি যাতে না জলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। গগন সেন ধুতিটা মালকোঁচা দিয়ে পরেছে, ওর মুখের রঙ তামাটে হলেও গায়ের রঙ ফর্সা। আমি জলের কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, আমার কিন্তু ভয় করছে জলে নামতে।

গগন সেন অভয় দিল, জলে নামলেই ভয় কেটে যাবে। তাছাড়া বলে রাখি আমি একজন নামকরা সাঁতারু ছিলাম, এ ঘাটটাও আমার অতি-পরিচিত। ছোটবেলায় কত যে স্নান করেছি। ঐ বুড়ীর ছোট ছেলে আমাদের সঙ্গে জলে নামত।

জিজ্ঞেস করলাম, কে শম্ভু?

—তুমি নামটা জান দেখছি।

বললাম, অনেকের মুখেই ওর কথা শুনি, কিন্তু তার সম্বন্ধে কোন ধারণা ঠিক করতে পারি না। শুনেছি লোকটা বদসঙ্গে মিশত, চুরির দায়ে জেলও হয়েছিল, পরে বুঝি......

গগন সেন আমার বাকী কথা নিজেই শেষ করল, মোটার এ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। যা শুনেছ একেবারে মিথ্যে নয়, শম্ভু যাদের সঙ্গে মিশত সে দলটা মোটেই ভাল ছিল না, তবু ছেলেটাকে আমাদের ভাল লাগত। কারণ ওর হৃদয় ছিল। যাক্‌গে সেকথা, চল জলে নামা যাক।

ভাঙা সিঁড়ি পেরিয়ে আস্তে আস্তে মাটিতে পা ফেলে আমি জলে গিয়ে নামলাম, গগন সেন ছপ ছপ করে জলের মধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, পেছন ফিরে হেসে ডাকল, এস।

বললাম, দাঁড়াও আসছি।

গগন সেনের মাথায় তখন দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলছে, ছুটে এগিয়ে এসে হিড় হিড় করে আমায় জলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। আমি সভয়ে ওর কাঁধটা চেপে ধরে ছিলাম।

গগন সেন ঝুপ ঝুপ করে বার-কয়েক ডুব দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, ডুব দাও।

আমি কিছুতেই জলের মধ্যে মাথা ডোবাতে পারলাম না। গগন সেন হাসতে হাসতে দু' হাতে জল ছিটিয়ে আমাকে ভিজিয়ে দিল। তারপরেই সাঁতার কেটে তর-তর করে এগিয়ে গেল মাঝ-গঙ্গার দিকে। আমি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছি, জলের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকতে বেশ ভাল লাগছে। প্রথমটা জল ঠাণ্ডা লেগে-ছিল, এখন বেশ গায়ে সয়ে গেছে, ঘাটে বেশী লোক স্নান করতে আসিনি, দু'-চারটে ছোট ছেলে একদিকে দাপা-দাপি করছে।

গগন সেন সাঁতার কেটে আমার কাছে ফিরে এল, কেমন লাগছে?

বললাম, খুব ভাল।

—সত্যি বলছ।

—সত্যি।

—এই হচ্ছে জীবন। ভগবানের দেওয়া নদীর জল, তার মধ্যে আমরা অবগাহন স্নান করছি, ওপরে নীল আকাশ, সূর্য উঠেছে, অদূরে মানুষের তৈরী ব্রীজ, বাড়ী-ঘর কল-কারখানা। আমি চারদিক তাকিয়ে দেখি, বড় ভাল লাগে দেখতে, বলতে ইচ্ছে করে যা পেয়েছি, যা দেখেছি তুলনা তার নেই, কি পাইনি বলে কেন দুঃখ করব, কি বল? আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। গগন সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, গগন সেন দরাজ গলায় বলল, তার ওপর তোমার ঐ কালো হরিণ চোখ। সে যে কত বড় আকর্ষণ তোমায় বোঝাব কি করে। কালও কলকাতায় ফিরতে পারিনি। আজও বোধ হয় পারব না।

গগন সেনের কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগছিল। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললাম, সাবধান, আমাদের এত মেলামেশা ব্রজবালা দেবী পছন্দ করবেন কিনা জানি না।

—কেন উনি কিছু বলেছেন নাকি?

—কাল সন্ধ্যেবেলা কুঠির মাঠে দাঁড়িয়ে তোমার বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। স্পষ্ট করে কিছু না বললেও, আমার মনে হল,—

গগন সেন থামিয়ে দিয়ে বলে, সে নিয়ে কিছু ভেব না অপু, আমি ও বুড়ীকে ঠিক হাত করে নেব।

মৃদু স্বরে বললাম, পারলেই ভাল। ভয় হয় এই জন্যে আমার কপাল বড় মন্দ। এত সুখ কি আমার বরাতে সইবে?

গগন সেন আমার হাতটা তুলে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলল, সে ভাবনা আমার। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

আমি উত্তর দিতে যাব হঠাৎ নজরে পড়ল বাড়ীর ছাদের মাথায় কে যেন দাঁড়িয়ে। আমাদের দিকে লক্ষ্য করছে। সভয়ে গগন সেনের কাছ থেকে সরে গেলাম, বললাম, ছাতে কে দাঁড়িয়ে, ব্রজবালা দেবী না?

গগন সেন দেখে নিয়ে বলল, হ্যাঁ।

—চল, এবার ওঠা যাক।

গগন সেনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আমি পাড়ের উপর গিয়ে উঠলাম। বুকের ভেতরটা আমার দুরু-দুরু করছে। ব্রজবালা দেবীকে আমি কখনও ছাদে উঠতে দেখিনি। শুধু আমাদের উপর লক্ষ্য রাখার জন্যেই কি উনি আজ উপরে উঠেছেন?

জানি না আজ তিনি কি বললেন।

(ক্রমশঃ)

ক্রায়োজেনিক্‌স্ : অতিহিম তাপমাত্রার পদার্থবিজ্ঞান

অয়স্কান্ত

আধুনিক বিজ্ঞানে এটি একটি নতুন শব্দ : ক্রায়োজেনিক্‌স্। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, অতিহিম তাপমাত্রায় কোনো কোনো পদার্থ অস্বাভাবিক চালচলনের পরিচয় দিয়ে থাকে। এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে গবেষণার ফলেই এই নতুন শাখাটির উদ্ভব।

তাপমাত্রাকে যদি শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইটের দুশো ডিগ্রি নিচে (শূন্য ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের ১২৭ ডিগ্রি নিচে) নামিয়ে আনা চলে তাহলে যে অবস্থাটি সৃষ্টি হয় তা কয়েক বছর ধরেই বিজ্ঞানীদের কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, এই বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়লে অনেক পদার্থই অদ্ভুত সব কান্ডকারখানা ঘটাবার ক্ষমতা অর্জন করে। যেমন, মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করতে পারা। এতদিন পর্যন্ত একমাত্র এইচ জি ওয়েল্‌স্-এর সায়েন্স ফিক্‌শনেই এমন পদার্থের কথা শোনা গিয়েছে যার ওপরে মাধ্যাকর্ষণ কার্যকর নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের ধারণা, অতিহিম তাপমাত্রার এলাকায় সাধারণ একটি পদার্থও এই অত্যাশ্চর্য গুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। তেমনি কোনো কোনো পদার্থ হয়ে উঠতে পারে বৈদ্যুতিক বিচারে রেজিস্ট্যান্সশূন্য বা রোধশক্তিশূন্য। তার মানে, এই অবস্থায় যদি পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ - সঞ্চারিত হয় তাহলে সেই বিদ্যুৎ অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে চলবে। এমনি আরো নানা অদ্ভুত সব কান্ডকারখানা ঘটতে থাকবে। অর্থাৎ, যে-সব লক্ষণ বিচার করে পদার্থকে আমরা পদার্থ বলে চিনে এসেছি সেগুলোই অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। তারপরেও পদার্থ অবশ্যই পদার্থ থাকছে কিন্তু পরিচিত চেহারায় তাকে আর চেনা যাচ্ছে না। অতি-পরিচিত পদার্থের এই অতি-অপরিচিত রূপ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রটিকেই বলা হয়েছে ক্রায়োজেনিক্‌স্।

এতদিন পর্যন্ত এই গবেষণা চলছিল নিতান্তই কৌতূহলের তাগিদে। কিন্তু সম্প্রতি মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভা এমন একটি যান্ত্রিক আয়োজনকে সম্ভব করে তুলেছে যার ফলে অ্যাবসোলিউট জিরো সৃষ্টি করা যেতে পারে (ফারেনহাইট স্কেলে শূন্য ডিগ্রির নিচে ৪৫৯.৭ ডিগ্রি বা সেণ্টিগ্রেড স্কেলে শূন্য ডিগ্রির নিচে ২৭৩.২ ডিগ্রিকে বলা হয় অ্যাবসোলিউট জিরো বা সম্ভাব্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা)। ফলে ক্রায়োজেনিক্‌স্-এর প্রয়োগও এখন আর বিজ্ঞানীর গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ নয়—শিল্প, বিজ্ঞান, এমনকি চিকিৎসাবিদ্যায় নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত।

এই বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক একটি আবিষ্কারকে তো রীতিমতো বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়া চলে। জানা গিয়েছে, রক্তকে তরল নাইট্রোজেনের সাহায্যে হিমায়িত করলে পুরোপুরি রক্তের অবস্থাতেই অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মজুদ করা চলে। সাধারণ হিমায়নের অবস্থায় রক্ত তিন সপ্তাহের বেশি বিশুদ্ধ থাকে না। এই কারণেই পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত মজুদ করার জন্যে বিশেষ আয়োজন করতে হয়। অতিহিমায়িত রক্তের ক্ষেত্রে এই বিশেষ আয়োজনটির প্রয়োজন নেই। বরফকে গলিয়ে জল করার মতো অতিহিমায়িত জমাট রক্তকে তরল করে নিলে তাজা রক্তের মতোই সেই রক্তকে ব্যবহার করা চলবে। মার্কিন দেশের শল্যচিকিৎসকরা সম্প্রতি পাঁচ বছর ধরে মজুদ করে রাখা অতিহিমায়িত রক্তকে সাফল্যের সঙ্গে শল্যচিকিৎসাধীন রোগীর দেহে সঞ্চালিত করেছেন। এমনকি তাঁরা এই মতও ব্যক্ত করেছেন যে, রোগীর দেহের পক্ষে অতিহিমায়িত রক্ত সাধারণ রক্তের তুলনায় অধিকতর নিরাপদ। তবে এখনো পর্যন্ত কিছু কিছু টেক্‌নিকাল সমস্যার জন্যে অতিহিমায়িত রক্তের ব্যাপক প্রচলন সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানীরা অবশ্যই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁদের নিশ্চিত ধারণা যে, নিকট ভবিষ্যতে রক্ত মজুদ করার এই বিশেষ পদ্ধতিটিই ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হবে।

শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্রায়োজেনিক্‌স্-এর প্রয়োগ এই একটিই নয়, আরো আছে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, এই বিশেষ পদ্ধতিতে শরীরের সুস্থ জীবকোষকে জীইয়ে রাখা চলে আর তার ফলে রোগাক্রান্ত জীবকোষকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জিত হয়। মার্কিন নিউরোসার্জন ডাঃ কুপার বিশেষ ধরনের মস্তিষ্কের রোগের চিকিৎসায় সাফল্যের

সঙ্গে ক্রায়োজেনিক ছুরির ব্যবহার করেছেন। ডঃ কুপারের মতে মস্তিষ্কের টিউমারের চিকিৎসাতেও এই ক্রায়োজেনিক ছুরি ফলপ্রদ হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রায়োজেনিক গবেষণার অন্যতম কেন্দ্রটি রয়েছে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতাপ বিষয়ক গবেষণাগারে। এখানে এলে প্রথমেই চোখে পড়বে অতি-জটিল সমস্ত রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ও মস্ত মস্ত রূপোলী ধাতব ফ্লাস্ক। এই ফ্লাস্কগুলোর মধ্যে আছে তরল হিলিয়াম ও অন্যান্য তরলীভূত গ্যাস। কক্ষের ঠিক মাঝখানটিতে রয়েছে একটি পেতলের পাইপ। এই পাইপটি চলে গিয়েছে নিচের তলার চারিদিক বন্ধ একটি ঘরে। ঘরটি বিশেষভাবে তৈরী, ঘরের দেওয়ালে বিশেষ ধরনের কংক্রীটের আস্তরণ। ঘরের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘন মোড়কে রয়েছে তিনটি মস্ত ইলেকট্রোম্যাগনেট বা বৈদ্যুৎ-চুম্বক। এই তিনটি বৈদ্যুৎ-চুম্বকের সাহায্যে পেতলের পাইপের পরিসরের মধ্যে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের চেয়েও ২,০০,০০০ গুণ জোরালো চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হতে পারে। কোনো কোনো পদার্থ চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে উত্তপ্ত হয়, আবার চৌম্বকক্ষেত্র অপসারিত হলে শীতল হয়। যে পদার্থটিকে হিমায়িত করা হবে তা রয়েছে পেতলের পাইপের মধ্যে। তরল হিলিয়ামে স্নাত হয়ে পদার্থটি আগে থেকেই খুবই শীতল অবস্থায় থাকে। তারপর ঠিক সময়টিতে চৌম্বকক্ষেত্রটি অপসারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পেতলের পাইপের মধ্যেকার পদার্থটিও নিম্নতম মাত্রায় শীতল হয়ে যায়। পদার্থকে হিমায়িত করার এই বিশেষ চৌম্বক পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছেন একজন নোবেলপুরস্কার-বিজয়ী মার্কিন রসায়নবিজ্ঞানী (William F. Giauque)

এই রসায়নবিজ্ঞানীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে শীতলীকরণের চৌম্বক পদ্ধতিটিই প্রচলিত অন্য সমস্ত পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর কার্যকরী। এই পদ্ধতিতে অ্যাবসোলিউট জিরো বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছনো চলে।

হিমায়নের এই প্রক্রিয়াটিকে তুলনা করা হয়েছে এভারেস্ট অভিযানের সঙ্গে। মাউণ্ট এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছতে হলে যেমন একটু একটু করে ওপরে উঠতে [illegible] শেষতম বিন্দুটিতে পৌঁছতে হলেও একটু একটু করে নিচে নামা। দুই অভি- [illegible] পৌঁছবার জন্যে দূর-দূর থেকে দূরতর পথ অতিক্রম করা প্রয়োজন। দুই অভিযানেই উত্তরোত্তর পর্যায়গুলোতে অভিজ্ঞতাও অভূতপূর্ব।

শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে ৫০ থেকে ১০০ ডিগ্রি নিচে (সেণ্টিগ্রেডে ৪৫ থেকে ৭৩ ডিগ্রি নিচে) নামতে পারলে যে তাপমাত্রায় এসে পৌঁছনো যাবে তার চেয়ে কম তাপমাত্রার কোনো নজির পার্থিব জগতে নেই। শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে ১১০ ডিগ্রি (সেণ্টিগ্রেডে ৭৮ ডিগ্রি) নামতে পারলে দেখা যাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড কঠিন পদার্থে পরিণত হয়েছে। এই তাপমাত্রায় কোনো কোনো জীব জীবন্মৃত অবস্থায় পৌঁছয়: এমন একটা অবস্থা যে দেখে মনে হবে প্রাণের কোনো লক্ষণ নেই, অথচ মৃতও নয়, জীবনক্রিয়াটা কিছুদিনের জন্য যেন স্থগিত রাখা হয়েছে এমনি একটা অবস্থা।

আরো একশো ডিগ্রি নিচে নামা যাক। এই এলাকায় পৌঁছতে পারলে দেখা যাবে, পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থই কঠিন রূপ ধারণ করেছে। শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইটের ২৫৮ ডিগ্রি নিচে নামতে পারলে (সেণ্টিগ্রেডে ১৫১ ডিগ্রি নিচে) মিথেন গ্যাসকে পাওয়া যাবে তরল অবস্থায়। ক্রায়োজেনিকস্-এর জগৎ এখান থেকেই শুরু হল বলা চলে।

১৯৫৯ সালে বিশেষভাবে নির্মিত একটি জাহাজ ২১,০০০ টন তরল মিথেন নিয়ে আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়েছিল। ঘটনাটি অভূতপূর্ব। পৃথিবীতে আর কখনো জাহাজ বোঝাই করে তরল মিথেন রপ্তানি করা হয়েছে বলে শোনা যায়নি। লণ্ডনে এই তরল মিথেন রূপান্তরিত হয়েছিল গ্যাসে আর তারপরে পাইপের ভেতর দিয়ে চালান হয়ে পৌঁছেছিল গৃহস্থের বাড়িতে ও কলে-কারখানায় জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্যে। এই পরীক্ষাকার্যের সাফল্যে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হয়েছেন। তাঁরা পরিকল্পনা করেছেন, সাহারা থেকে মিথেন (যেখানে এই গ্যাসটি স্বাভাবিক অবস্থাতেই প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে) সংগ্রহ করে ব্রিটেন, জাপান ইত্যাদি দেশে (যে-সব দেশে জ্বালানীর অভাব আছে) চালান দেবেন। সম্ভবত ১৯৬৫ সালের মধ্যেই এই পরিকল্পনা অনুসারে পুরোদমে ব্যবসা শুরু হয়ে যাবে।

অক্সিজেনকে তরল অবস্থায় পাওয়া যায় শূন্য ডিগ্রির নিচে ২৯৭ ডিগ্রি ফারেনহাইটে (সেণ্টিগ্রেডে ১৮১ ডিগ্রি নিচে)। এই ক্রায়োজেনটি ইতিমধ্যেই নানা প্রয়োজনে প্রযুক্ত হয়েছে। রকেটের ইঞ্জিনে জ্বালানী পোড়াবার জন্যে যে অক্সিজেনের প্রয়োজন, তা সরবরাহ করা হয় তরল অক্সিজেনের আকারে। উর্ধ্বাকাশে শ্বাসকার্যের সুবিধের জন্যেও তরল অক্সিজেনের বোতল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইস্পাতের কারখানাতেও এত প্রচুর পরিমাণে তরল অক্সিজেনের চাহিদা [illegible] যে কোনো কোনো দেশে (বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) ইস্পাতের কারখানার পাশেই তরল অক্সিজেনের কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে।

নাইট্রোজেনকে তরল অবস্থায় পাওয়া যায় শূন্য ডিগ্রির নিচে ৩২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (সেণ্টিগ্রেডে ১৯৬ ডিগ্রি নিচে)। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্যে তরল নাইট্রোজেনকে প্রয়োগ করার পদ্ধতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। খাদ্যদ্রব্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে চালান দিতে হলে যান্ত্রিক হিম-কামরার বন্দোবস্ত করতে হয়। তাতে খরচ পড়ে যায় খুবই বেশি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি নিম্নমাত্রার তাপ সৃষ্টি করবার জন্যে অন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিতব্য খাদ্যদ্রব্যের ওপরে তরল নাইট্রোজেন স্প্রে করা হবে এবং তার ফলে সৃষ্টি হবে নির্ধারিত নিম্নমাত্রার তাপের একটি পরিমণ্ডল। নাইট্রোজেন পদার্থটি গন্ধহীন, বর্ণহীন, স্বাদহীন ও অনুত্তেজক। এই কারণে নাইট্রোজেন স্প্রে করার পরেও খাদ্যদ্রব্য সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকবে। এই পদ্ধতির আশ্রয় নিলে খরচ অনেক কম পড়বে আশা করা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই পদ্ধতি রেফ্রিজারেশন শিল্পে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

তরল নাইট্রোজেনের তাপমাত্রাকে ছাড়িয়ে আরো আশি ডিগ্রি নিচে নামাতে পারলে যে এলাকাটি পাওয়া যাবে তা শৈত্যের দিক থেকে শনিগ্রহ ও আরো দূরবর্তী গ্রহের উপরিতলের সমতুল্য। মহাশূন্যের শৈত্যও এই একই মাপের।

আরো কিছুটা নামতে পারলে শূন্য ডিগ্রির নিচে ৪১১ ডিগ্রি ফারেনহাইটে (সেণ্টিগ্রেডে ২৪৪ ডিগ্রি নিচে) নিওন গ্যাস তরল হয়ে যায়। আর হাইড্রোজেন তরল হয় ৪২৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট নিচে (সেণ্টিগ্রেডে ২৫০ ডিগ্রি নিচে)।

আরো সাতাশ ডিগ্রি নিচে নামতে পারলে পাওয়া যাবে পূর্ববর্ণিত সেই অস্বাভাবিক এলাকাটি, যেখানে কোনো কোনো পদার্থের বৈদ্যুতিক রোধশক্তি লোপ পায়, কোনো কোনো পদার্থ মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে।

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, অদূর ভবিষ্যতেই ক্রায়োজেনিকস্-এর নানা উদ্ভাবনা শিল্প ও বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হবে। বিশেষ করে মহাকাশ-অভিযানে রকেটবিদ্যায় ও নিউক্লিয়র তাপের নিয়ন্ত্রণে ক্রায়োজেন পদার্থ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দশ কোটি ডিগ্রি ফারেনহাইট মাত্রার নিউক্লিয়র তাপকে নিয়ন্ত্রণ করবে সর্বনিম্ন তাপের ক্রায়োজেন পদার্থ—এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা এখন বোধহয় একমাত্র বিজ্ঞানের এলাকাতেই সম্ভব। * * *

বই কেনা বই পড়া আর টেলিভিশন

এই কর্মব্যস্ততার যুগে পৃথিবীতে আমরা ক্রমচক্রায়মান গতির আবর্তে আবর্তিত। এই গতির যুগে নিজেদের চিন্তাশক্তিকে বাইরের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতীতেও সম্ভব হয়নি। একালে রেডিও-চলচ্চিত্র-টেলিভিশন মানুষের চিন্তাজগতে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্পর্কে বিদেশে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। এর সুফল ও কুফল নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। বর্তমান আলোচনায় সে সম্পর্কে কিছু আভাস দেওয়া হ'ল।

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই বলে থাকেন বই পড়ার মধ্যেই পৃথিবীর সবথেকে বড় আনন্দ। ভিন্নজনে অন্য কথা বলতে পারেন। এমন কি বলেও থাকেন। তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক রবার্ট এসকারপিট্ তাঁর "দি বুক অ্যান্ড দি রিডার" গ্রন্থে এবিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রশ্ন তুলেছেন। বই পড়াকে তিনি যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। এমন কি ভিন্নমতাবলম্বীদের মতকে তিনি অস্বীকার করেননি। সাধারণ পাঠক যখন কোন বই কিনতে যান তখন দোকানদারই তাঁর একমাত্র সহায়। ক্রেতা লেখকের নিকট সামীপ্য উপলব্ধি করেন দোকানদারের মাধ্যমে। এবং মনের সব কথা খুলে বলেন তাকেই। বই পড়ার মধ্যেই যে নিঃসঙ্গ অভ্যাস গড়ে ওঠে তার মধ্যে চরিত্রের এক মহত্তর দিক ফুটে ওঠে। অধ্যাপক এই অভ্যাসকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যখন কেউ কোন বই পড়ে তখন সে কথা বলে না বা কোনও কাজ করে না। অন্যান্য নিকট-মানুষের কাছ থেকে সে যেমন নিজেকে

বাখের সুরকে জাজ সংগীতে রূপান্তর করা নিয়ে সংগীত-রসিক মহলে বাদানুবাদের অন্ত নেই। রূপান্তরকরণে সুরকার জ্যাকুয়াস লুকিয়ের-এর প্রচেষ্টা কম নয়। বর্তমান চিত্রে লুকিয়েরকে বাখের সুরগুলি পিয়ানোতে জাজ ঘরানার ধাজাতে দেখা যাচ্ছে। এবং এই সংগীতের সংগে ছায়া-নৃত্যও দেখানও হচ্ছে টেলিভিশনে।

সরিয়ে রাখে তেমনি পারিপার্শ্বিক থেকেও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। সংগীত বা চিত্রকলার মধ্যে একটা আবেদন রয়েছে। এবং তার যোগ রয়েছে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। দর্শক বা শ্রোতার মনে তার ক্রিয়াও ঘটে সেইভাবে। মনকে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু বই-পাঠ-করা কখনও মানুষের চিন্তাক্ষেত্রে ভিন্নতর পরিবেশকে নিয়ে আসে না। চিত্তের বিক্ষোভ ঘটায় না। মানুষের সচেতনতাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে নিয়ে একটি প্রায় অচেতন অবস্থায় নিয়ে যায় তাকে। এই পড়ার মধ্যে দুটি স্বতন্ত্রভাগ লক্ষ্য করা যায় এবং একসঙ্গেই বর্তমান এই দুই মানসিক অবস্থাকে সামাজিক এবং অসামাজিক নামে অভিহিত করা চলে। যে মানব সংসারেরই একজন পাঠক, সেই পরিবেশ থেকে সাময়িকভাবে সে দূরে সরে যায়। তখন এক নতুন বিশ্বে, নতুন পরিবেশে সে বিচরণ করে যেখানে তার পাঠরত মন ক্রিয়াশীল। পড়ার পারিপার্শ্বিক তার চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে নেয়।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত কোন গ্রন্থের পাঠক নিজেই নিজের ইচ্ছার বিচারক। ভালমন্দ বিচার করে রুচিমাফিক বই নিয়ে সে পড়তে পারে। কিন্তু সিনেমা বা টেলিভিশন-এর ক্ষেত্রে তার নিজের কিছু বাছাই করে দেওয়ার অধিকার নেই। তার ওপর একটি প্রোগ্রাম চাপিয়ে দেওয়া হয়—যার পরিকল্পনা সে নিজে করতে পারে না; তার সামনে তোলে ধরা হয়। তারা ঠিক করে দেবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিকল্পনা যার মধ্যে সে নিজের মনকে ছড়িয়ে দিতে পারে যদি সেখানে দর্শক-শ্রোতা তার মনের মুক্তি খুঁজে নেয়।

কেউ ইচ্ছা করলে বাজার থেকে রেকর্ড কিনে একটি কাহিনী শুনতে পারেন। এতে পড়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে রেকর্ডে শোনার কাজ চালান যায়। কথাটি শুনতে মজার হলেও বা সম্ভব হলেও কেমন একটা কৌতুককর ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় বইয়ের দোকানে রেকর্ড করা বইগুলোই তো কিনে এনেই আমরা পড়ি।

পাশ্চাত্যে সম্প্রতি টেলিভিশনের মাধ্যমে কাহিনী-প্রচারকে অনেকে বিভিন্ন ভাবে অভিযুক্ত করছেন। প্রথমদিকে এর অভিনবত্বে অনেকে মুগ্ধ হলেও—বর্তমানে এর কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। আবার অনেকে বলছেন সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখেই টেলিভিশনকে স্বীকার করে নিতে হবে। বিরোধীরা বলছেন এর ফলে মানুষের চিন্তা করবার শক্তি কমে যাবে। আপাত উপলব্ধ বিষয়কে নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু একথা কতদূর স্বীকার করা যায়—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। মানুষের উপলব্ধির বা কল্পনার দ্বার কখনও রুদ্ধ হতে পারে না। আজকের যুগে মানুষকে চিত্রের মধ্যদিয়ে আকর্ষণ করার প্রবৃত্তিটা এসেছে সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে, মুদ্রণজগতের সাহায্যে। যখন এর উদ্ভব তার পরেও বেশ কিছুকাল কেটে গেছে। কিন্তু মানুষ পেছিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে যে তারা এগিয়ে চলেছে। সুতরাং এদিক থেকে কোন প্রশ্ন না ওঠাই স্বাভাবিক। যাঁরা ছবি বেশী পছন্দ করেন তাঁরা মূলে বই পড়া থেকে ছবি দেখেই সময় বাঁচাতে চান। আজ অনেকেই ছবি দেখেন ভাসাভাসা ভাবে—ভেতরে না ঢুকেই। এ মানুষের বোধশক্তির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরিবর্তন নিয়ে আসবে। সমস্ত পৃথিবীটা তার সব আকার নিয়েই চিত্রে জীবন্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু মানুষের ভাষা বা শব্দগত ব্যাপারের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে।

এক্ষেত্রে রেডিও শব্দ এবং ভাষার ওপর নির্ভর করে বলে সাহিত্যের সঙ্গে জন্মগত একটা মিল পাওয়া যাবে। সিনেমার মধ্যে মানুষ নিজেকে মিলিয়ে নিতে বুঝতে চেষ্টা করে, ভাবতে পারে। কিন্তু টেলিভিশন বাধাবন্ধহীন। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন তার মধ্যে আবদ্ধ। অত্যন্ত দ্রুততার মধ্য দিয়ে তার সবকিছু হয়ে যাওয়ার চেষ্টা। মানুষ কোন কিছুই গভীরভাবে গ্রহণ করতে পারে না। আবছা উপলব্ধিই ওখানে যথেষ্ট।

মানুষের বই কেনার প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে লোপ পাবে। নিজের ইচ্ছামত মনের চাহিদা অনুযায়ী বই কিনে সে পড়তে চাইবে না। কারণ বই পড়ার অভ্যাস তার হারিয়ে গেছে। ফলে একটি বৃহৎ ব্যবসা ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা আছে।

পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হিসাবে মেনে নিয়ে, উপযুক্ত পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে টেলিভিশন যে বর্তমান-কালের মানুষকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অন্য কোন উপায় অপেক্ষা টেলিভিশন মানুষের কল্প-বৃত্তিকে নাড়া দিতে পারে প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রভাবও বিস্তার করে। মানুষের মনে বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন রচনা ও ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন কবির কবিতা, কোন সংস্কারকের রচনা, রাজনীতিবিদের ভাষণ মানুষ মাত্রেই পাঠ করে। সবকিছু বুঝে নেওয়ার আগেই সে নিজের মত করে একটা অর্থ উপলব্ধি করে। মানুষের মনে গভীর ক্রিয়া করবার আগেই একটা অস্পষ্ট প্রভাব পড়ে। কিছু যেখানে কিছু জানার পথে রয়েছে বিশাল উপাদান, সেখানে স্বতন্ত্র উপলব্ধির জগৎ দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে থাকে। তারা সমস্ত মানুষের মনে প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি করে—অতীতের বক্তা যেমনভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করতেন এও তেমনি। একজন বিশেষজ্ঞ বলছেন এর প্রভাব অপরিসীম। আধুনিক সংস্কৃতিতে অনেকটা 'বিপ্লবে'রই সূচনা করছে। টেলিভিশনের চিত্রমাধ্যম মানুষের মনকে আকৃষ্ট করবে। এবং এক সময় সমস্ত মানবসভ্যতাকে গ্রাস করে নেবে।

এই যে 'বিপ্লবে'র কথা বলেছেন তার দ্বারা অদূরভবিষ্যতে এক গ্রন্থহীন মানবসমাজের ছবি আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই যুগের দিকে তাকিয়ে আমরা ভীত না আনন্দিত হব? দীর্ঘ-দিনের ধ্বংস আর সংগ্রামের বুকে দাঁড়িয়ে যে সভ্যতার ভিত্তি আমাদের পূর্বপুরুষেরা গেঁথে গেছেন তাকে কি আমরা এক অশিক্ষিত যুগের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাব? পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষার মান অনেক নেমে গেছে, মানুষের রুচির মানও নীচের দিকে বলে অনেক পাশ্চাত্য মনীষী বহুক্ষেত্রেই বিভিন্নভাবে নিজেদের মনের খেদ প্রকাশ করেছেন। ভবিষ্যতে হয়ত এমন মানুষেরও জন্ম হবে যাদের চিন্তা করবার বা পড়বার কোন প্রয়োজন হবে না। এ কথা কি সত্য?

—অনিমেষ বসু

সেকালের পাতা : একালের চোখ

রত্নাকর

টেংরায় মেমসাহেবের বাড়ি বিক্রি হবে। তার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল সমাচার চন্দ্রিকায়। বিজ্ঞাপনটি মূল্যবান। কেননা এই বিজ্ঞাপন থেকে জানা যাবে সে যুগে সাধারণ সাহেবরা কি রাজার হালে থাকত। কত ছিল তাদের ব্যবহারের জন্য ঘর, আজকের গৃহসমস্যার দিনে যা মনে হবে রূপকথা।

বিলেতে গিয়ে রামমোহন সম্ভ্রান্ত লোকদের সংগে দেখা করেন। সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে সমাচার দর্পণে যার বিশেষ মূল্য আছে বাঙালী পাঠকদের কাছে।

বিজ্ঞাপন

মোং টাঙ্গরা গ্রামে ইটালির অতি সন্নিকটে এবং মেং বিবি সাহেবের বাগানের নিকট এক বাগান জমী ছয় বিঘা আটকাটা মায়পুষ্করিণী ও সানবান্ধা ঘাট এবং এক মতিঝিল এবং নানা প্রকার ইংরাজী ফল ও নানা প্রকার ফুলগাছ এবং বাগানের ভিতর পাকা রাস্তা এবং ফোলরওয়ালা একতালা বাটী এক হলঘর এবং চারি কামরা এবং সোঁথিংরুম দুই ও দুই তরফ থামওয়ালা বারাণ্ডা নূতন অতি সুন্দর ঘর আর ঘোড়ার আস্তাবল এবং গাড়ীর ঘর ও বোতলখানা ও বাবুরচিখানার ঘর ও গুদামঘর এক আছে এবং গেট দরওয়ানের ঘর আছে ইংরাজ লোকের বাস করিবার অতি উত্তম ঘর এবং কলিকাতার অতি নিকট ঐ বাগান বাটীর চৌহদ্দি শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের বড় রাস্তার উত্তর। শ্রীরামহরি দত্তের বাগানের দক্ষিণ। ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেনের বাগানের পূর্ব্বে। ও শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ ঘোষের বাগানের পশ্চিম এই চৌহদ্দির মধ্যে অতিসুন্দর বাগান ও বাটী যদি কাহার খরিদ করিবার প্রয়োজন থাকে তবে চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে তল্লাস করিলে তাহার বিশেষ যেওরা অবগত হইতে পারিবেন। ইতি—

সমাচার চন্দ্রিকা—১৩ বৈশাখ ১২৩৮

ধর্ম্মসভা

গত ১২ বৈশাখ রবিবার ধর্ম্মসভা—ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠক হয় গত বৈঠকের পর যে ২ কর্ম্ম হইয়াছিল তাহা জ্ঞাত করান গেল, সভাবাটীর নিমিত্ত যে স্থান দেখা গিয়াছে তাহাতে অন্যান্যাধ্যক্ষদিগের দেখিবার আবশ্যক আছে কি না এবং কাহার নামে ক্রয় পত্র লেখাইয়া লওয়া যাইবেক তাহাতে উত্তর হইল সমাজের ধনের আয় ব্যয় বিষয়ে যাঁহারা তত্ত্বাবধারকরূপে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের মতে বাটীর বিষয়ে তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক শ্রীযুক্ত বাবু ভবচন্দ লাহিড়ি যে বিষয় তরজমা করিয়া আনিয়াছেন ইহার এক পশন ইংরাজী ও এক নকল বাঙ্গালা লিখিয়া তাবৎ অধ্যক্ষগণের নিকট প্রেরণ করা উচিত তাঁহারা অবলোকন করিয়া আপন ২ মত ব্যক্ত করিলে আগামি বৈঠকে এ বিষয়ের বিহিত বিবেচনা হইবেক অপর নিয়মপত্র যাঁহার নিকট প্রেরণ হয় নাই পাঠাইয়া উত্তর আনা কর্ত্তব্য পরে তাহার যাহা করিতে হয় আগামী সভাতে করা যাইবেক চন্দ্রদ্বীপের সমাজপতি শ্রীযুক্ত রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের পত্রের উত্তর প্রদান করা আবশ্যক। সামাজিকতা বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর অদ্য হইতে পারে না যেহেতু তাবদধ্যক্ষ থাকিলে ভাল হয় নচেৎ অধিকাংশের মতের আবশ্যক আছে অদ্য অর্দ্ধেকও উপস্থিত হইতে পারেন নাই অতএব আগামি বৈঠকের কারণ বিশেষ করিয়া পত্র লেখা উচিত হয় ইত্যাদির পর সভা ভাঙ্গিল।

সমাচার চন্দ্রিকা—১৬ বৈশাখ ১২৩৮ (১৮৩১)

গত ১ ফিব্রুয়ারি তারিখের কেপের পত্রে প্রকাশ করে যে এলবিয়ন নামক জাহাজ তথায় পৌঁছিয়াছে যে জাহাজে শ্রীযুত রামমোহন রায় গমন করিতেছেন পরে গত ২৩ জানেওয়ারি তারিখে ঐ জাহাজ উক্ত স্থানে ছাড়িয়াছে—

সমাচার চন্দ্রিকা—২০ বৈশাখ ১২৩৮

ইংগলণ্ড হইতে শেষাগত সম্বাদের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে, শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায় লিবরপূর নগর হইতে লণ্ডন নগরে গমন করিয়া এক সরাইতে বাস করিতেছেন। তিনি অতি সমাদরপূরঃসর তত্রত্যকর্ত্তৃক গৃহীত হন এবং রাজধানীর অতিমান্য অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

(সমাচার দর্পণ। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮১৩। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায় যে সময়ে লিবরপূর নগরে অবস্থিত তৎসময়ে অত্রনগরস্থ তাবন্মান্য লোক তাঁহার সংগে সাক্ষাদর্থ আগত হন। ঐ নগর ও তৎসন্নিহিত যে সকল সুদৃশ্য বিষয় ছিল তাহা তিনি দর্শন করিলেন কিন্তু মাঞ্চেষ্টর নগরের লোহ ঘটিত রাস্তা দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বিশেষ চমৎকার হয়। তিনি পরীক্ষার দ্বারা ঐ অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকার সকলের বিষয় বিবেচনা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ তৎকর্ম্মাধ্যক্ষেরা রাস্তার উপরি তাঁহাকে সংগে করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন অতএব তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে সাত ঘণ্টার সময়ে যাত্রা করিয়া বাষ্পের গাড়িতে এক ঘণ্টা বিংশতি মিনিটে পনর ক্রোশ গমন করিয়া মাঞ্চেষ্টর নগরে পঁহুছিলেন। যাত্রাকালীন গাড়ী কোন ২ সময়ে ঘণ্টায় পনর ক্রোশের হিসাবে চলিল তাহাতে রামমোহন রায় যে পর্যন্ত চমৎকৃত হইলেন তাহা তিনি কহিতে অসমর্থ। পরে মাঞ্চেষ্টার নগরে পঁহুছিলে তিনি নানা শিল্পের কারখানা দেখিতে গেলেন। যখন তাঁহার পদব্রজে গমন করিতে হইল তখন নগরস্থ প্রত্যেক নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এবং কর্ম্মি অনেক ২ ব্যক্তিও স্ব স্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দর্শনার্থ আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিল। পরিশেষে তিনি তথা হইতে সরাইতে ফিরিয়া আসিয়া লিবরপূরে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ নগরে আরও নয় দিন অবস্থিতি করেন।

অনন্তর রামমোহন রায় লণ্ডন নগরে গমন করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে গাড়ি যে ২ স্থানে দুই মিনিট স্থগিদ থাকে সেই স্থানেই চতুর্দ্দিগে ইঙ্গলণ্ড দেশ দর্শনার্থ আগত বিদেশি ব্যক্তিকে দিদৃক্ষু মহাজনতা উপস্থিত হইল। তিনি যেমন দেশ দিয়া শকটারোহণে চলিতে লাগিলেন তেমনি কোন স্থানে পর্ব্বত কোন স্থানে উপত্যকা ভূমি ও উৎকৃষ্ট-কৃষ্ট ক্ষেত্র ও খাল ও নদী ও সাঁকো ও জমীদারদের বসতবাটি ইত্যাদি মহাধনি ব্যক্তিদের চিহ্ন দেখিয়া মহাহৃষ্ট চিত্ত হইলেন। মধ্যে ২ তিনি ব্রাহ্মণপরায়ণ ভারতবর্ষাপেক্ষা ইঙ্গলণ্ড দেশের এতাবদোৎকর্ষের চিহ্ন সকল তৎসহচর যুব রাজচন্দ্রকে দর্শাইতে লাগিলেন। পরে রামমোহন রায় লণ্ডন নগরে পঁহুছিলে দুই শত অতি শিষ্ট মান্যজন তাঁহার নিকটাগত হইয়া তাঁহার সঙেগ সাক্ষাৎ করিলেন কিন্তু কেপে তাঁহার পাদদেশে যে আঘাত হইয়াছিল তাহার বেদনাতে তাঁহাদের প্রতিসাক্ষাদার্থ গমন করিতে তিনি ক্ষম হইলেন না। সর এডূার্ড হৈড ইষ্ট সাহেব কোন দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঐ সাহেব যে পার্লামেণ্টের সুধারার বিপক্ষ তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে কিছু উপহাস করিলেন। ঐ সাহেব তাঁহার যুক্তিসিদ্ধ কথাসকল খণ্ডন করণার্থ যত্ন করিলেন। পরিশেষে তাঁহার গৃহে যে মহোৎসব হইবে তাহাতে বাবু রামমোহন রায়কে আহ্বান করিলেন।

অপর রামমোহন রায়ের সহচর যুব রাজচন্দ্র এক দিবস নগরোদ্যানে ভ্রমণকরতঃ শ্রীমতী রাণীকে দেখিলেন তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া অনেক কথোপোকথনান্তর রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষ প্রকৃতি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন।......

অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে তাঁহার বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের অত্যন্ত হিতের সম্ভাবনা তাহার কারণ এই ২ প্রথমতঃ যে সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর-কালীন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইতেছে এবং যে সময়ে রাজমন্ত্রী ও পার্লামেণ্ট এতদ্দেশের তাবদ্বিষয়ক সম্বাদের অনু-সন্ধান করিতেছেন এমত সময় তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ রাম-মোহন রায় এতদ্দেশের তাবদ্বিষয় সুজ্ঞাত এতদ্দেশে যাহার ২ আবশ্যক তাহা ও তৎপ্রাপনের উপায় তিনি অভিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের কিরূপ চাইল তাহা অবগত আছেন। এবং সংপ্রতিকার রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাতেও তাঁহার বিজ্ঞতা আছে এবং যে ২ রূপ মতান্তর করিলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে ক্ষম বটেন। তৃতীয়তঃ, রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকেদের সর্ব্বপ্রকার হিতৈষী এবং যাহাতে তাঁহার বোধে ভারতবর্ষের অমঙ্গল হয় এমত তিনি কোন পরামর্শ দিবেন না এমত কোন প্রস্তাব করিবেন না এই প্রযুক্ত তাঁহার পরামর্শ অনেকের অতিগ্রাহ্য হইবে। এবং বিশেষতঃ তিনি যে এতৎ সময়ে ইঙ্গলণ্ড দেশে গমন করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের অতিশুভ-সূচক অনুমান করিলাম।

(সমাচার দর্পণ। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮)

✲ প্রদর্শনী ✲

কলারসিক

শিল্পী সুনীল ভট্টাচার্যের একক প্রদর্শনী

শিল্পী : সুনীল ভট্টাচার্য

পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে শিল্পী সুনীল ভট্টাচার্যের একটি একক চিত্র-প্রদর্শনী গত ২৫শে সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে। প্রদর্শনীটিকে একজন ভারতীয় শিল্পীর ইওরোপ-প্রবাসের অভিজ্ঞতার ফসলরূপে চিহ্নিত করা যায়।

শিল্পী ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল গ্লাসগোর স্কুল অফ আর্টে চিত্রকলা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেছেন। ১৯৫৩ সালে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-ভবনে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনীতে যে প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে তাঁর দ্বিতীয় প্রদর্শনী দেখে পুনর্বার শিল্পী সম্পর্কে আমরা আশান্বিত হলাম। বহু ভারতীয় ছাত্র বিদেশে শিল্প-কলা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে যান প্রতি বছর। কিন্তু তাঁরা ফিরে এসে আমাদের যা উপহার দেন—সেগুলির মধ্যে ভারতীয়ত্ব প্রায় উহ্য থাকে। সুখের কথা, শিল্পী ভট্টাচার্য ইওরোপীয় আঙ্গিক-কৌশলে দক্ষতা অর্জন করেও তাঁর চিত্র-রচনায় ভারতীয় দৃষ্টি বা মেজাজকে উপেক্ষা করেননি। এ-দিক থেকে শিল্পী ভট্টাচার্য নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে শিল্পী ভট্টাচার্যের বত্রিশখানি চিত্র ছিল। সবগুলি চিত্রের মাধ্যম হল তেল-রঙ। তেল-রঙের মত কঠিন মাধ্যমকে শিল্পী অনায়াস-স্বচ্ছন্দে তাঁর চিত্ররচনার কাজে ব্যবহার করেছেন। এই রঙপ্রয়োগে কোথাও চড়া সুর নেই। মৃদু অথচ উজ্জ্বল রঙে প্রায় প্রতিটি চিত্রপট উদ্ভাসিত। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর রঙের ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি। প্রতিটি চিত্রেই এক গীতিধর্মী ছন্দিত রঙ আর রেখার সমন্বয় ঘটেছে। নিজের চেনা-জানা জগৎকেই শিল্পী রঙে-রেখায় বিধৃত করেছেন। তবে তাঁর অধিকাংশ চিত্র যেহেতু ইওরোপ-প্রবাসে রচিত সেইহেতু প্রায় সমস্ত চিত্রের বিষয়বস্তু আহরণ করা হয়েছে ইওরোপীয় পরিমণ্ডল থেকে। এইসব চিত্রের অনেকগুলি ইওরোপীয় নর-নারীর প্রতিকৃতি-চিত্র। কয়েকটি চমৎকার ন্যুড স্টাডিও আছে। 'ভারতীয় মেয়ে' (৫)—চিত্রখানি এই প্রতিকৃতি-চিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম। লাবণ্যময়ী এই ভারতীয় নারীর প্রতিকৃতি-রচনায় শিল্পী তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'কূটনীতিক-এর স্ত্রী' (১৫) চিত্রখানিতেও চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং শিল্পীর পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। নিসর্গ-চিত্র রচনাতেও শিল্পীর দক্ষতা অনস্বীকার্য। 'গ্লাসগোর কেলভিন গ্রোভ পার্ক' (১০), 'সুয়েজ' (২১) যেমন আমাদের ভাল লেগেছে তেমনি 'ভারতের নিসর্গদৃশ্য' (২৬) চিত্রখানিও বহু দর্শককে মুগ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 'বাজারের পথে' (১৮) এবং 'স্নানার্থী' (১৯) চিত্র দুখানি সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশে এবং ভারতীয় নর-নারীর এক বিশেষ মুহূর্তকে অবলম্বন করে রচিত। ১৮নং চিত্রখানিতে লোক-শিল্পের প্রভাব খুব স্পষ্ট হলেও রঙে ও ছন্দিত রেখায় দৃষ্টি-সুখকর। ১৯নং চিত্রখানির কম্পোজিশান এবং রঙপ্রয়োগ-পদ্ধতি নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গের শিল্পনিদর্শন।

শিল্পী ভট্টাচার্য এইসব চিত্র ছাড়া একখানি বিরাটাকার চিত্র-রচনা করেছেন। এই চিত্র প্রখ্যাত রুশ সংগীতজ্ঞ শোস্তাকোভিচের 'দ্বাদশ সিম্ফনী' অবলম্বনে রচিত। এই চিত্রপ্রসঙ্গে শিল্পীর দাবী: ইওরোপের কোন শিল্পীই এ-পর্যন্ত ঐদেশে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণী অবলম্বনে কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র-রচনা করেননি। তিনিই নাকি এই প্রথম একটি সিম্ফনীর ব্যঞ্জনাকে পরিপূর্ণভাবে চিত্রে রঙে আর রেখায় তুলে ধরলেন। তাঁর এই দাবী সম্পর্কে আমরা কোন মতামত না দিয়েও বলতে পারি শিল্পী যেভাবে এই বিরাটাকার চিত্রখানির প্রতিটি প্যানেল সংস্থাপন করেছেন এবং বিভিন্ন ভাব ও দৃশ্যের সামঞ্জস্য ঘটিয়েছেন রঙের সুসম সম্পাতে তাতে তাঁর কৃতিত্ব আছে নিশ্চয়। অন্যান্য কয়েকখানি চিত্র এই বাস্তবধর্মী চিত্রগুলির মধ্যে একটু বেমানান বলে মনে হল। কারণ এতগুলি বাস্তবধর্মী চিত্রের পাশে বিমূর্ত-চেতনার ১২নং, ২৭নং ও ২৮নং চিত্রগুলি যেন অনেকখানি ম্লান হয়ে পড়েছিল।

শিল্পী ভট্টাচার্যের এই বাস্তবধর্মী চিত্রগুলির অধিকাংশই ইওরোপের পট-ভূমিতে রচিত হলেও আমাদের ভাল লেগেছে। আশাকরি এবার তিনি স্বদেশের নর-নারী ও প্রকৃতিকে তাঁর চিত্রপটে উদ্ভাসিত করে আমাদের আরও তৃপ্ত করবেন।

সংক্ষেপিত প্রতিবেশী উপন্যাস তেলেগু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রামনাথমের চলে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে সমন্তকমণি নাচ শিখতে আসেনি। পথেঘাটেও তাকে দেখতে পাইনি। ভাবলাম একবার ওর ঘরে ঘুরে আসি। কিন্তু কেন জানি না যেতে ইচ্ছে করল না। উপরন্তু কানে আসতে লাগল নানান কথা। যারা সিনেমার নামে বা নাচ শিখে সেইসব যুবতী মেয়েদের সম্পর্কে এমনিতেই বাজারে একটা রটনা থাকে তার উপর সমন্তকমণি একা একটা ঘর নিয়ে থাকাতে অল্প দিনের মধ্যেই তার সম্পর্কে নানান ধরনের রটনা ছড়িয়ে পড়ল। বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে অনেক কথাই কানে এল। এমন কি চিত্রপ্রযোজক শ্রীধরও সেদিন সমন্তকমণি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলল। আমি বললাম, তোমার সঙ্গে পরিচয় হল কি করে?

—লোকের মুখে শুনতাম বটে, পরমাসুন্দরী এক তিলোত্তমা নাকি আমাদের শহরে এসেছে। পরশু কাকে যেন নিয়ে এল আমাদের স্টুডিওতে। তখন দেখলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েকজনার সঙ্গে জমিয়ে নিল। মনে হয় যেন তাদের সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় ছিল। সত্যি কথা বলতে কি ভাই ও-যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ স্যুটিং-এর কাজে ব্যাঘাত ঘটেছিল। প্রত্যেকেরই একটা চোখ ওর উপর। ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে পই-পই করে নিমন্ত্রণ করল। এইমাত্র তার ঘর থেকেই আসছি। যে ঘরে থাকে সেটা খুব ছোট। কিন্তু চমৎকার সাজানো। মেয়েটি সত্যি খুব ফরওয়ার্ড।

শ্রীধরের চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে সমন্তকমণি সম্পর্কে চিন্তা করলাম। আশ্চর্য—এক একজন ওর এক একটা গুণের প্রশংসা করে। একটা বিষয়ে সবাই একমত যে সে প্রকৃত সুন্দরী।

আমাকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে মৃণালিনী যেন একটা অস্বস্তি বোধ করল। সমন্তকমণি সম্পর্কে যা যা লোকের মুখে শুনেছি সব বললাম তাকে। মৃণালিনী বলল, ওকে নিজের পথেই চলতে দিন মাস্টারমশাই। ও-বিষয়ে ভেবে আপনি আর কষ্ট করবেন না।!... ...অবশ্য রামনাথমের কথা ভেবে যে একটু দুঃখ হয় না তা নয়।

রামনাথম অল্পক্ষণে তার চালচলন কথাবার্তায় আমাদের উভয়ের কাছে গভীরভাবে আসন করে নিয়েছে। আমরা উভয়েই তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছি। এখন শচীন্দ্রের প্রতি আমাদের সহানুভূতি কমে গেল।

ইদানীং তার সম্পর্কে আমরা বেশি ভাবছি।

মৃণালিনী বলল, সমন্তকমণিকে শোধরানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় মাস্টারমশাই।

—কেন?

—এই দুনিয়াকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি সমন্তকমণি সেই দৃষ্টিতে দেখে না—একথা আমি প্রথম দিনই জেনেছি। সেদিন আপনারা দুজনে গেলেন নীচে আর আমরা সিনেমায়। সিনেমায় সে আমাকে অনেক প্রশ্ন করল। আমরা দুজন পরস্পরকে বিয়ে না করলেও স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করছি বলেই তার দৃঢ় ধারণা। আমি অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, নাচের প্রতি আমাদের উভয়েরই অনুরাগ থাকায় একসঙ্গেই এই কাজে নেমেছি। অনেকক্ষণ ধরে বোঝালেও সে বুঝতে চায়নি। বলল, তা হয়তো সত্যি। তবু এটা কি রকম একটা অসম্ভব ব্যাপার না? একসঙ্গে কোন এক শিল্পসাধনায় আত্মনিয়োগ করব, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা পোষণ করব, অথচ দুজনে আলাদা-আলাদা-ভাবে থাকবো......ইত্যাদি। আমি তার এসব কথার কোন সঠিক জবাব দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারিনি।

মৃণালিনীর কথা আমি রুদ্ধশ্বাসে শুনেছিলাম। আমাদের উভয়ের সম্পর্ক সত্যি খুব পবিত্র। আমাদের সংকল্প : সমগ্র অন্ধ্রের নৃত্যকলার মান উন্নয়ন এবং দেশেবিদেশে তার প্রচার। কিন্তু আজ মৃণালিনী যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে তার কি জবাব আমি দেব ভেবে পাইনি।

—কই এতোদিন আমাকে তো এ-ব্যাপারটা জানাওনি মৃণালিনী!

—কি বলে জানাবো মাস্টারমশাই। কোন মেয়ে কি মুখ ফুটে এ-সব কথা বলতে পারে। এখন নেহাত বলতে বাধ্য হয়েছি তাই বলছি। যাই হোক আমার ধারণা সমন্তকমণি দুনিয়ার সবাইকে এই দৃষ্টিতে বিচার করে।

পরের দিন সমন্তকমণি স্কুলে এল। মুখ টিপে হেসে কয়েকবার পায়চারি করল স্কুলঘরে। এতদিন তাকে যে দৃষ্টিতে দেখতাম সেভাবে আজ তাকে দেখতে পারিনি।

—মাস্টারমশাই, আজ নাচ শেখাবেন তো?

—তোমার কি নাচ শেখার ইচ্ছা আছে, সমন্তকমণি?

—শিখছি তো।

—সত্যি সত্যি যদি নাচ শেখার ইচ্ছা থাকে তাহলে ঠিক সময় যাতায়াত করতে হয় আর শুধু এখানে যেটুকু শেখানো হয় তাই নয়, বাসায় গিয়ে অভ্যাস করতেও হয়। আর আজেবাজে বিষয়ে মন দিলে নাচে মন বসে না। একজন ভাল নাচিয়েকে ভগবানের যা দেওয়ার সবই দিয়েছেন তোমাকে, কিন্তু তুমি তোমার ক্ষমতা প্রয়োগ করছ না। তোমার সেই শক্তি বিভিন্ন ব্যাপারে ছড়িয়ে ফেলছ। ক্ষমতার অপব্যবহার করছ।

—এ ব্যাপার আপনি কি করে জানলেন মাস্টারমশাই?

—কোন ব্যাপার?

—ভগবান আমাকে শক্তি দিয়েছেন বলে।

সমন্তকমণির এই-ই দোষ। যে-কথার পরে আর কথা চলে না, যে বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা যায় না সমন্তকমণি ঠিক সেই বিষয়ই প্রশ্ন করে। আমরা যেখানে থেমে যাই ও সেখান থেকে শুরু করে। তার প্রশ্নে আমি খুব বিরক্তি বোধ করলেও নাচের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্কের উপর যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রীর সম্পর্কের বিষয়ে নাস্তি-

দীর্ঘ ভাষণ দিলাম। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম তাকে বোঝানোর এবং পাশাপাশি একটা তৃপ্তিও পেলাম যে, অনেকখানি বোঝাতে পেরেছি। আবার এও লক্ষ্য করলাম যে সমন্তকমণি আমার কথা শুনছে আর মুখ টিপে-টিপে হাসছে। বাচ্চা ছেলে বীরত্বের কথা শোনালে মা যেমন সহানুভূতির সঙ্গে, মিথ্যা হলেও সত্য কথা শোনার অভিনয় করে ঠিক তেমনি সমন্তকমণি আমার কথা শুনছিল। নাড়ু-চোর-দিগম্বর-শ্রীকৃষ্ণের কথা যেন যশোদা শুনছে। কিছুক্ষণ পরে বলল, আমি সত্যিই নাচ শিখতে চাই মাষ্টারমশাই।

সে দিন আমি তাকে নতুন এক নাচ শেখালাম। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তখনো আমি সমস্ত ভঙ্গিগুলো দেখাইনি। সেই মুহূর্তে আমি যে মূল সূত্রগুলি বলেছি সেই শুনে সে নাচতে শুরু করে দিল। সে কি নাচ! দেহের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সঠিক সঞ্চালন দেখে আমি অবাক হলাম। মনে হল যেন স্বর্গ থেকে মেনকা নেমে এসে আমার সামনে নাচছে। মনে হল যেন আমি ইন্দ্রলোকে আছি। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। অনেকক্ষণ পরে নাচ থামিয়ে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমার কাছে এসে যখন বলল, আমি সত্যি নাচ শিখতে চাই মাষ্টারমশাই, তখন আমি আবার আমাদের এই সমতলভূমিতে নেমে এলাম। হকচকিয়ে গিয়ে বলেছি, আজ এই থাক।

—আপনার খুশি মাষ্টারমশাই।

সে দিন থেকে সে প্রত্যেক দিন সময়-মত আসতো-যেতো। কিন্তু তাকে নাচ শেখানোর ক্ষমতা আমার মধ্যে আছে এই বিশ্বাস আমার মন থেকে মুছে যেতে লাগল। যা-হোক নতুন-নতুন পার্ট অবশ্য দিতাম। সেও চটপট শিখে দিত। কোন-রকম আলোচনার সুযোগ দিতাম না। একদিন সে বলল, আপনি অনেক বদলে গেছেন মাষ্টারমশাই।

—বদলানোর কি আছে!

—এতদিন আমার সঙ্গে যে-ধরনের ব্যবহার করেছেন, এখন যেন আমার সঙ্গে সে-সম্পর্ক নেই।

—থাকবে না কেন!

সে আর কোন জবাব দিল না। আমার মনে হল সে কাঁদছে। করুণা জাগল আমার মনে। সহানুভূতির সঙ্গে বললাম, কি হয়েছে সমন্তকমণি?

—কিছু না। হাত দিয়ে চোখের জল মুছে মুখ টিপে হেসে সে বলল, আপনারা সবাই খুব ভালমানুষ মাষ্টারমশাই।

সে কার কার উদ্দেশ্যে যে বলল, বুঝতে না পারলেও পরিষ্কার জিজ্ঞেস করার সাহস না থাকায় চুপ করে গেলাম। সে আবার বলল, মৃণালিনী ভাল, আপনি ভাল, শচীনবাবুও ভাল লোক, রামনাথমও তাই। সবাই ভাল যেদিক থেকেই বিচার করি না কেন আমিই খারাপ। উপরন্তু আপনাদের সবাইকে আমিই খারাপ করে দিচ্ছি।

—কে বললো এই কথা?

—কাউকে বলতে হবে কেন—আমি বুঝি না! যাই হোক, আজ আপনাকে একটা কথা বলছি, জীবনে সকলের উপকার ভুলে গেলেও আপনার উপকারের কথা ভুলে যাব না।......নিন, আজকে কি শেখাবেন, শেখান।

—আজ না হয় থাক।

—আপনার খুশি মাষ্টারমশাই।

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে শেষে অনুমতি নিয়ে চলে গেল সমন্তকমণি। সে চলে গেলেও অনেকক্ষণ ধরে তার কথা-গুলো আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারপর এক সপ্তাহ আর আসেনি। প্রথম দু'তিন দিন আমার ভালই লাগল। ক্রমশঃ আশঙ্কা হতে লাগল আমার। আর ঠিক সেই সময় রামনাথমের কাছ থেকে চিঠি এল। সে এখন আসতে পারছে না। তাই সমন্তকমণির উপর আমার বিশেষ নজর রাখার অনুরোধ জানিয়েছে। চিঠির কথাগুলো আমার মনে মাথাচাড়া দিচ্ছিল। এদিকে যে-মৃণালিনী সমন্তকমণি সম্পর্কে নির্বিকার নির্লিপ্ত থাকত সেও যেন হঠাৎ তার অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। আমাকে বলল, বেচারি কি যে করছে বুঝতে পারছি না। কোনকিছুর

সাহায্য দরকার হলে বুঝবার উপায় নেই। একবার ঘুরে আসবেন মাষ্টারমশাই?

—আমার তো মনে হয় তোমারই একবার ঘুরে আসা উচিত।

—আমার সঙ্গে তার অত সদ্ভাব নেই মাষ্টারমশাই। তা নাহলে আমিই যেতাম।

সেদিন সন্ধ্যায় সমন্তকমণির বাসায় গেলাম। এক বিরাট অট্টালিকার একটি ঘর সে ভাড়া নিয়েছিল। ঘরের কাছে গিয়ে দেখি দরজায় তালা ঝুলছে। বাড়িওয়ালার কাছে খোঁজ করলাম।

—যাওয়ার সময় বললেন, আমি আর আমার পরিবার মাসখানেক বেড়িয়ে আসার জন্য বেরোচ্ছি। ঘরের উপর একটু নজর রাখবেন।

আমি আর কি বলব। মনে পড়ল রামনাথমের কথা : কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এই অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। সমন্তকমণি থাকতে দেবে না। তখন সমস্যাটা অতি জটিল হয়ে যাবে।...... এখন দেখছি তার কথাই ফলতে যাচ্ছে। তবু বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। সত্যি

—আপনাকে একটা কথা বলবো ভাবছি মাষ্টারমশাই।

—কি?

—আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

সমন্তকমণির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি আমার এবং মৃণালিনীর সম্পর্কের মাঝে পাতলা একটা পর্দা যেন পড়ে গেছে। স্কুলের সব কাজই হত। তবু কেমন যেন ডিপার্টমেণ্টাল মনোভাব গজিয়ে উঠেছিল। ওর কাজ ও করত, আমার কাজ আমি। মৃণালিনীর চোখে-মুখে থমথমে ভাব। ব্যথা পেয়েছে সে। আমি বললাম, দেখো মৃণালিনী, সজ্ঞানে আমি কাউকে অবহেলা করেছি বলে আমার মনে পড়ছে না। অবচেতন মনে যদি করে থাকি, ক্ষমা চাইছি।

মৃণালিনী আমার দিকে তাকাতে পারল না। নখ দিয়ে মেঝের উপর ছবি আঁকতে আঁকতে বলল, ক্ষমা চাইবেন না মাষ্টারমশাই, ক্ষমা চাইবার কি আছে?

—কি বলতে চাও মৃণালিনী, খুলে বল না?

সে ঐভাবে মেঝেতে ছবি আঁকতে-আঁকতে বলল, চারদিক থেকে কালো কালো মেঘ সমন্তকমণিকে ঘিরে ফেলেছে। যে-কোন মুহূর্তে ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। তাই অনুরোধ করছি, তার সম্পর্কে আপনার বেশি আগ্রহ বোধহয় প্রকাশ করা ঠিক হবে না।

—কিন্তু সমন্তকমণির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একবার ভেবে দেখেছ.....অথচ মেয়েটি যে প্রতিভাময়ী সেটা নিশ্চয়ই আমরা সবাই টের পেয়েছি।

—তা ঠিক। মাঝে মাঝে ওর উপর যেন বিশেষ এক শক্তি ভর করে। অনেক অসাধ্যকে সে সাধন করতে পারে।

—তাহলে? এখন কি তার সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা উচিত নয়?

—উচিত। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের মোকাবিলা তো মৃদু বাতাস করতে পারে না মাষ্টারমশাই! চারদিক থেকে চেড়িরা যখন ঘিরে ফেলেছিল সীতাকে, তখন কি করতে পেরেছিল সে। সাহায্য তাকে যেটুকু করবার সেটুকু নিশ্চয়ই করা উচিত। কিন্তু তাকে মানসিক সান্নিধ্য দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত হবে না......

—ভগবান আমাকে শক্তি দিয়েছেন বলে।

—সপ্তাহখানেক আগে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে কোথায় গেছে। ঠিক কোথায় গেছে তা অবশ্য আমি জানি না।

নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে পারিনি। স্বামী আবার কে? রামনাথম? তা কি করে হয়। সে তো আসতে পারবে না বলেই আমার কাছে চিঠি দিয়েছে।

—যার সঙ্গে গেছে তার নাম জানেন?

—নিশ্চয়ই জানি। শচীন্দ্র।

—আরে মশায় ও-লোকটা সমন্তকমণির স্বামী নয়।

—খুব হয়েছে। ভদ্রলোক নিজের মুখে বললেন—

—কি বলেছে?

যদি শচীন্দ্র তা করে থাকে তাহলে তো কোন কিছুই অসম্ভব নয় দেখছি।

ফিরে এসে মৃণালিনীকে সব বললাম। সে বলল, যা ভেবেছি তাই হোল মাষ্টারমশাই।

—কি ভেবেছ?

—সমন্তকমণি আর শচীন্দ্রের সম্পর্ক এই পর্যায়ে নামবে জানতাম।

—তাহলে এখন রামনাথমের কি হবে?

—নতুন করে আর কি হবে? যা হওয়ার তা অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে।

আমি ভাবতে বসলাম। বিচিত্র এ-জগৎসংসার! অদ্ভুত সব মানুষগুলো!

কত গুছিয়ে বলেছে মৃণালিনী। আমার ও সমন্তকমনি সম্পর্কে সে যে এত গভীরভাবে চিন্তা করেছে তা এর আগে কোনদিন টের পাইনি। স্রষ্টার সুন্দরতম সৃষ্টি নারী। নারীর আবির্ভাব না ঘটলে পুরুষের জীবন যে মরুময় হয়ে উঠত সেই মুহূর্তে তা টের পেলাম। পুরুষের জীবন অনেক ভার হয়ে উঠত নারীর অভাবে। তার কাছে গিয়ে বললাম, মৃণালিনী, একবার আমার দিকে তাকাও।

—শিক্ষার্থীদের আসার সময় হয়ে গেছে, এখন আসি মাস্টারমশাই। ওর অন্য ঘরে চলে যাওয়ার পর তার নখ দিয়ে আঁকা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এই নৃত্যশালা স্থাপনা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে মৃণালিনীর ভূমিকা প্রোজ্জ্বল। সব সময় সে এই শিক্ষানিকেতনের উন্নতির কথা চিন্তা করত এবং হাতে-নাতে ক্রমোন্নতির চেষ্টা করত। এই প্রতিষ্ঠানের জন্যই সে ফিল্ম-লাইন ছেড়েছে। নিজের গচ্ছিত কয়েক হাজার টাকাও ঢেলেছে এরই উন্নতিকল্পে। পিতৃদত্ত দু-তিন একর জমি আমার আছে। কাকার কাছে চিঠি লিখেছি ভাল খদ্দের খোঁজ করার। তিনি সবকিছু ব্যবস্থা করে আমাকে অবিলম্বে দেশে যাওয়ার জন্য চিঠি লিখে জানালেন। অনেকদিন ধরে ভাবছি, মৃণালিনীর যে-টাকা আমাদের শিক্ষায়তনের জন্য খরচ করেছে তা ফেরত দেব। এখন সে-সুযোগ এসেছে। জমি বিক্রী করে এসেই তাকে এই টাকা ফেরত দেব মনস্থ করলাম। মৃণালিনীর যে-সাহায্য পেয়েছি তাই যথেষ্ট—তার কাছ থেকে আবার টাকা কেন?

জমি-জায়গা বিক্রী করার জন্যে আমার দেশে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্তকর্মাণি ও শচীন্দ্রের আর কোন খবর পাইনি। এমনকি ওদের ঘরে আসার খবরও কেউ দেয়নি। কার কাছ থেকে যেন মৃণালিনী জানতে পারল ওরা সেই ঘর খালি করে দিয়ে চলে গেছে বলে। যাই হোক, ও-ব্যাপারে মাথা ঘামানোর বা কিছু করার অবকাশ আমার ছিল না তখন।

আমার কাকা জমিবিক্রী সংক্রান্ত সবকিছু ঠিক করে রেখেছিলেন, তাই দেশে যাওয়ার দু-এক দিনের মধ্যে সব কাজ আমার হয়ে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাদ্রাজে ফিরতে পারলাম না। অনেকদিন পরে দেশে গেছি। তাই আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে কয়েক বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে হল। বাধ্য হয়েই কয়েকদিন কাটালাম সেখানে। ইচ্ছে জাগল এতদূর যখন এসেছি শচীন্দ্রের বউ-ছেলেমেয়েদের একবার দেখে যেতে।

শচীন্দ্রের পরিবার এর আগে যে-বাড়িতে থাকত সে-বাড়িতে তখন ছিল না। ও-বাড়ি এবং কিছু জমি-জায়গা নাকি শচীন্দ্র বছর কয়েক আগেই বিক্রী করে মাদ্রাজে ছায়াচিত্রের প্রযোজনার জন্য চলে গেছে। ওদের ঘরে গিয়ে দেখি পাঁচটি মেয়ে এবং তিনটি ছেলে এক ঘরের মধ্যে হৈ-চৈ—মারামারি করছে। ওদের মুখে অশ্লীল গালাগাল। আমাকে দেখেই একটি ছেলে চিৎকার করে বলল, মা, কে একজন এসেছে। তার চিৎকার শুনে শচীন্দ্রের বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়েই চিনতে পেরে বলল, আসুন। কবে এলেন মাদ্রাজ থেকে?...... খোকা, তোর মামাবাবুর জন্য মাদুর পেতে দে। বড় ছেলেটি ছেঁড়া একটি মাদুর পেতে দিল। আমি বসলাম। শচীন্দ্রের বউ আমার সামনে সসংকোচে বসে আমার খবর নিয়ে বলল, মাদ্রাজে ও'কে কোথাও দেখতে পান নি?

—এর মাঝে শচীন্দ্রকে দেখতে পাইনি।

ভদ্রমহিলার কাছ থেকে জানতে পারলাম শচীন্দ্র নাকি কথা দিয়েছিল ফিল্ম-লাইনে জাঁকিয়ে বসার পর পরিবারের সবাইকে মাদ্রাজে নিয়ে যাবে। ততদিন তালপাতার ছাউনি-দেওয়া এই কুঁড়েঘরের মধ্যে একটু কষ্ট করে থাকতে বলে গেছে বউকে।

—ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া তাহলে হচ্ছে না? প্রত্যুত্তরে শচীন্দ্রের বউ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। পারিবারিক নানান কথার পর উঠতে চাইলে সে-বেলা ফিরতে দেয়নি। খাওয়া-নাওয়া করেই ফিরে আসার মুখে বলল, মাদ্রাজে কোথাও

ওঁকে দেখতে পেলে একবারটি ঘুরে যেতে বলবেন।

নিশ্চয়ই বলবো।

ভদ্রমহিলা নিজে এবং তার পাঁচটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে সবাই আমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

সেদিন ঐ পরিবারে যে সকরুণ দৃশ্য দেখলাম তা জীবনে ভুলতে পারছি না। শচীন্দ্র নারী-স্বাধীনতা সম্পর্কে, তাদের প্রতিভা বিনষ্ট হওয়ার উপর কত দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিল সেদিন সমন্তকমণির প্রতিভা ব্যাপকভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রতিজ্ঞা করেছিল সেদিন আর সেই শচীন্দ্রের নিজের পরিবারের এই শোচনীয় অবস্থা!

প্রতিবেশীদের কাছেও একটু-আধটু খোঁজ নিয়ে যা জানলাম তাতে বোঝা গেল যে, সমস্ত দোষ শচীন্দ্রের। ভিটামাটি বিক্রী করে সেই যে বহুবছর আগে বেরিয়ে গেছে আর ঘরমুখো হয়নি। গ্রামের একটি মানুষও আমার বাল্যবন্ধু শচীন্দ্রের প্রশংসা করেনি। যা দেখলাম, যা শুনলাম তাতে ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

মাদ্রাজে ফিরে এসে নৃত্যশালার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য যে টাকা মৃণালিনী ঢেলেছিল তা ফেরত দিতে চাইলাম। কিন্তু মৃণালিনী কিছুতেই নিতে চায়নি। তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি হল। কদিন মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এরকম এক ঝামেলার সময় একদিন ভোর পাঁচটার সময় দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলতেই সামনে দেখি শচীন্দ্র। মলিন বেশ, রুক্ষ চুল, বিনিদ্র চোখ। মনে হয় যেন কত রাত তার চোখে ঘুম নেই। আমার দিকে সে ভালভাবে তাকাতেই পারল না। মাথা নিচু করে সে বলল, একটা বিষয়ে তোমার সাহায্য চাই, এই মুহূর্তে।

—কি সাহায্য চাও শচীন্দ্র?

—কিছুক্ষণের জন্য তোমার গাড়ি চাই।

—এক্ষুনি চাই?

—হ্যাঁ, এক্ষুনি।

—এমন কি দরকার পড়ে গেল যে—

—কাল হাসপাতালে সমন্তকমণি প্রসব করেছে। কিছুতেই সে হাসপাতালে থাকতে চায় না। ভীষণ গোলমাল শুরু করে দিয়েছে। ওকে যত তাড়াতাড়ি বাসায় আনতে পারি ততই মঙ্গল।

আর কোন প্রশ্ন করিনি তাকে। ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি নিয়ে যেতে। হাজারো প্রশ্ন মাথায় জেগে উঠল : সমন্তকমণি মা হোল কি করে! এতদিন এরা ছিল কোথায়! এখন কোথায় থাকে! সবকিছু আমার কাছে রহস্যময় ঠেকছিল। সকাল আটটার মধ্যেই ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরে এল। ও-ব্যাপারে একটু খবর নেওয়ার জন্য ছোট্ট প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম ড্রাইভারকে : নামিয়ে এসেছো?

—বাচ্চা, বাচ্চার মা আর তার বাবাকে ওদের বাসার কাছে নামিয়ে এসেছি।

—কোথায় আছে ওরা?

—ঐখানেই, আগে যেখানে ছিল।

—বাচ্চা আর তার মা ভাল আছে?

—ভালই আছে। তবে বাচ্চার মা ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। নার্স কিন্তু বারবার বারণ করেছে, ওরা নিজেদের দায়িত্বে সই করে চলে এসেছে। ড্রাইভার গাড়িটিকে শেডে ঢোকানোর পরক্ষণেই মৃণালিনী আমার কাছে এল। তাকে সব জানালাম। সে বলল, আশ্চর্য, শচীন্দ্র কি মানুষ না রাক্ষস! সবদিক থেকেই সমন্তকমণির সর্বনাশ করেছে!

সেদিন সারাদিন আমাদের দুজনের মনে সমন্তকমণি সম্পর্কে একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। এমন কি আমরা পরস্পরের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। কোন এক অজুহাতে সেদিন নাচ শেখানো বন্ধ করে দিলাম। বিরাট বাড়িতে আমি আর মৃণালিনী। আলাদা আলাদা রয়েছি। একা থাকলে মন যেন আরও ভার হয়ে ওঠে। মৃণালিনীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কি করছো মৃণালিনী?

—এই বীণার তার ছিঁড়ে গেছে মাষ্টারমশাই, ঠিক করছি।

—কি করে ছিঁড়লো?

—খুব টান পড়েছে।

—মৃণালিনী?

—কি মাষ্টারমশাই?

—আমাকে অতগুলো উপদেশ দিয়ে শেষে তুমি নিজেই সমন্তকমণি সম্পর্কে ভেবে অস্থির হচ্ছ দেখছি।

মৃণালিনী হা-হা করে কেঁদে বলল, এর চেয়েও আমার মাথায় বজ্র পড়লে ভাল হত মাষ্টারমশাই। সমন্তকমণি সত্যি প্রতিভাময়ী। তাকে এ-ভাবে নখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে কুরে কুরে খেয়ে শেষ করার কি অর্থ হয়! কী অন্যায়, কী অবিচার আমাদের এ-পৃথিবীতে চলে! এসব ভেবে আমার খুব ভয় করছে মাষ্টারমশাই। আমরা কত অসহায়। তার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে। তাকে সাহায্য করার ইচ্ছেও প্রবল। কিন্তু কি ভাবে যে করা যায় ভেবে পাচ্ছি না।

মৃণালিনীর প্রশ্নের জবাব আমি সেদিন দিতে পারিনি।

সন্তানপ্রসবের দশ দিনের দিন বাচ্চাটাকে একবার দেখে যাওয়ার জন্য সমন্তকমণি খবর পাঠাল আমার কাছে। আমি গিয়ে দেখি শচীন্দ্র ঘরে নেই। সমন্তকমণি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। সত্যি খুব রোগা দেখাচ্ছে তাকে। তবে চোখের ঔজ্জ্বল্য সেই-ই রয়েছে। আমাকে দেখেই মুচকে হেসে বলল, আমার সন্তানকে দেখার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি মাষ্টারমশাই। বাচ্চাটি লাল টুকটুকে হয়েছে। মুখে আঙুল পুরে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই দুনিয়ায় আমার যে কি জ্বালা তা এখনও সে টের পায়নি।

—বাচ্চাটি কার মত দেখতে মাষ্টারমশাই?

—এত কাঁচ-বয়সে কার আদল পেয়েছে কি করে বলবো।

—শচীন্দ্র তো বলে একে নাকি অবিকল রামনাথমের মত দেখতে।

কথাটা আমার কাছে গোলমেলে মনে হল। এ-ব্যাপারে কি যে উচিত, আর কি যে অনুচিত ভেবে পাচ্ছিলাম না।

—আমি কি ভুল বলেছি মাষ্টার-মশায়? কোন খারাপ কথা কি—

—তা খারাপের কি আছে, শচীন্দ্র তোমাকে যা বলল, তাইতো বললে আমাকে।

—শচীন্দ্র কি জানে কার মত হয়েছে। আমি ঠিক জানি বাচ্চাটি কার আদল পেয়েছে।

—কার? হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল এই প্রশ্ন।

—আপনার মাষ্টারমশাই— ঠিক আপনারই মত দেখতে হয়েছে।

আমি চমকে উঠলাম। কি যে বলতে চায় ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—অবাক হচ্ছেন? বলছি এ যখন পেটে ছিল তখন মনে আমার ইচ্ছে হয়েছিল ঠিক আপনার মত আদল-পাওয়া একটি ছেলের মা হ'তে। ঐ যে কথায় বলে, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি-র্ভবতি তাদৃশী—যে যেমন কামনা করে সে সেইরকম সিদ্ধিলাভ করে। সেই-জন্যেই তো আমারও কোল আলো করে এই ছেলেটি এসেছে।

আমার যে সেই মুহূর্তে কি বলা উচিত তা ঠিক ভেবে পাচ্ছিলাম না। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার ইচ্ছায় বললাম, এতদিন কোথায় ছিলে সমন্তকমণি?

শচীন্দ্র অজন্তা, ইলোরার ছবি দেখানোর জিদ ধরলো। গোড়ায় আমার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। যেতেই হল। সেখান থেকে অবশ্য আরও কয়েকটা জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি। আমরা ঘুরে এসেছি অবশ্য এক মাস হয়ে গেছে মাষ্টারমশাই। এই এক মাসের মধ্যে কোথাও যাইনি। ভাল কথা—মাষ্টারমশাই, আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো?

ভয়ে ভয়ে বললাম, করো।

—আমি নাকি অজন্তা-ইলোরার ছবির মত দেখতে—শচীন্দ্র বলল।

—তা অবশ্য ঠিকই বলেছে।

—কিন্তু মাষ্টারমশাই, ঐ মূর্তিগুলি দেখে আমার খুব দুঃখ হল। এখানে যে নারী-মূর্তিগুলো রয়েছে আপাতঃ-দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় যেন ও-গুলো বেশ ভালই। কিন্তু গভীর দৃষ্টি নিয়ে দেখে বুঝলাম, ওদের ভেতরেও কী বেদনা, কী যন্ত্রণা! প্রত্যেকটি নারী-মূর্তির মধ্যে বিষাদের সেই রূপ কোন্ ভাস্কর যে মূর্ত করে তুলেছিল.........

সমন্তকমণি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হল সমন্তকমণির যন্ত্রণার সঙ্গে সেই নারী-মূর্তিগুলোতে প্রতিফলিত যন্ত্রণার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। এ-রকম দু-চার কথার পরে বললাম, শচীন্দ্র কোথায়?

—ওর আমার উপর রাগ হয়েছে। খুব চটে আছে।

—কেন?

—ছেলেটি নাকি ওর মত দেখতে হয়নি তাই।

এ কথার আমি আর কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে

বললাম, তোমার কোনকিছুর অসুবিধা হচ্ছে না তো?

—অসুবিধা আর কিসের হবে মাষ্টার-মশাই।

—শচীন্দ্র ঠিকমত দেখাশুনা করছে?

—না দেখার কি আছে। মাষ্টারমশাই একবার হাত পাতেন তো—বাচ্চাটিকে আপনার কোলে রাখি।

আমি তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছি। সে গভীর মাতৃস্নেহ নিয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার মধ্যে সে-মুহূর্তে যে মাতৃমূর্তি দেখলাম তা আমার চোখের সামনে আজীবন প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।। কিছুক্ষণ পরে বললাম, এই ঘটনা কি রামনাথন জানে, সমন্তকমণি?

—ওঁকে চিঠি লিখে সব জানিয়ে দিয়েছি।

তারপর ছ'মাসের মধ্যে সমন্তকমণির সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। ইতিমধ্যে একটি বড় কাজে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হল। হায়দ্রাবাদে অন্ধ্রের নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়েছে। সরকার সেখানে নৃত্য-নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে আমাকে তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করতে চাইলেন। গোড়ায় আমি রাজি হইনি। কিন্তু মৃণালিনী আমাকে বাধ্য করল ঐ পদ গ্রহণ করতে। আমাদের স্কুল-পরিচালনার সমস্ত ভার মৃণালিনী নিল। শেষে সে-পদ গ্রহণ করলাম।

মাঝে মাঝে চিঠি লিখে যে নতুন নতুন উদ্যোগ আকাদেমীতে গৃহীত হচ্ছে তার খবর মৃণালিনীকে জানাতাম। মৃণালিনীর কাছ থেকেও খবর গ্রহণ করতাম। বুঝলাম আমাদের নৃত্যশালা ভালভাবেই চলছে। নতুন নতুন ছাত্রছাত্রীরা আসছে। হঠাৎ মৃণালিনীর কাছ থেকে চিঠি পেলাম মাদ্রাজে যাওয়ার জন্য। নতুন উদ্যোগে নৃত্যশালাকে উন্নত করার জন্য সে ঘটা করে একটি নৃত্য-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। আমার উপস্থিতি চাই-ই, অন্তত দিনের দিন। মাদ্রাজে ফিরে না এসে পারিনি।

মৃণালিনী যে এমন বিরাট এবং বিচিত্র এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বুঝতে পারতাম না। ভারতে যতরকমের নাচ রয়েছে প্রত্যেকটি সেই প্রদর্শনীতে দেখানোর আয়োজন করা হয়েছিল। পরের দিন মাদ্রাজে হেন পেপার ছিল না যা মৃণালিনীকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেনি। বহু বিখ্যাত এবং বড় বড় পত্রিকা মৃণালিনীর কাছে আবেদন জানিয়েছে—এই ধরনের নৃত্য-প্রদর্শনী ভারতে তথা বিশ্বে দেখিয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করার জন্যে। বহু বড়লোক এগিয়ে এল টাকা ঢালার জন্য। আমি নিজেকেও ধন্য মনে করলাম। এই সব আনন্দোচ্ছ্বাসের জোয়ার কেটে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে আমাদের মনে সমন্তকমণির প্রশ্ন জাগল। এত সব হয়ে গেল, অথচ একটি বারও তাকে দেখতে পাইনি। কারণ জানতে চেষ্টা করায় মৃণালিনী বলল, ওদের অবস্থা এখন ভাল নেই মাষ্টার-মশাই। শচীন্দ্র এখন ওকে খুব ভোগাচ্ছে বলে শুনলাম। এর মাঝে আপনার পক্ষে ওখান থেকে দেখা করা সম্ভব নয় বলেই আমি নিজে সমন্তকমণিকে দেখে এলাম। বাইরের দিকে ধরা না পড়লেও গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, মনে তার দাবানলের সৃষ্টি হয়েছে। মুখ ফুটে অবশ্য সে আমাকে কিছুই বলেনি। কিন্তু আমি যা হৃদয় দিয়ে বুঝেছি তাই ঠিক।

—ওর ছেলেটা কেমন আছে?

—ভালই আছে মাষ্টারমশাই। হাসছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, হাত-পা ছুঁড়ছে, কাঁদছে। সমন্তকমণির বিশ্বাস বাচ্চাটি নাকি আপনার আদল পেয়েছে। আমি প্রতিবাদ করিনি। তাতে যদি সে সান্ত্বনা পায় পাক না। বাচ্চাটিকে সবসময় আগলে রাখে।.........

—ঐ বাচ্চাটাই তার এখন সব—স্বগতোক্তির মত বললাম।

মৃণালিনী মাথা নিচু করে বিড়-বিড় করে বলল, শচীন্দ্র নাকি তাকে মারধোর করছে বলে শুনেছি মাষ্টারমশায়। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি সমন্তকমণির গায়ে বেতের দুটো দাগ। কালশিরে পড়ে গেছে।

সমন্তকমণিকে মারধোর করা! নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। এই কি সেই সমন্তকমণি, যার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে একদিন শচীন্দ্র তাকে আন কাছে এনেছিল বিশ্ব-সভায় তার প্রতিভ তুলে ধরতে! ঠিক করলাম হায়দ্রাবাদ যাওয়ার আগে তার সঙ্গে একবার দেখ করে যাবো। শুধু দেখাই নয় তার য সাহায্য দরকার তা করবো।

পরের দিন ভোরেই বেরিয়ে পড়লা আদাজল খেয়ে শচীন্দ্রের খোঁজ করতে শেষ পর্যন্ত পেলাম তাকে। আমাকে দেখেই সে সাপ দেখার মত চমকে উঠল মুখ তার চুন হয়ে গেল। গোটা মুখে কান্নার ছাপ। ওর হাত ধরে রয়েছে তা দুটো ছেলে।

—এখানে কেন শচীন্দ্র?

—হোটেলে থাকাই ভাল। ঐ যে সামনের হোটেলেই আছি।

—আর সমন্তকমণি কোথায়?

—এতদিন যেখানে ছিল।

ওর কথায় বুঝলাম অল্পদিন হ তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। সে বলল চলো হোটেলে, তোমার সঙ্গে অনে কথা আছে।

সে ঐ দুটো ছেলেকে দু-চার পয় দিয়ে বেড়িয়ে আসতে বলে আমা নিয়ে গেল হোটেলে। দুচার কথার পরে আমি তাকে আসল প্রসঙ্গে নামালাম প্রথমে এড়িয়ে যেতে চাইলেও শেষে বলল অনেকদিন ধরে তোমাকে একটা কথা বলবো-বলবো করেও বলা হয়নি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ
২য় খণ্ড

২৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ নয়া পয়সা

শুক্রবার, ২৪শে আশ্বিন, ১৩৭০
Friday, 11th October, 1963. 40 Naya Paise.

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সাপ্তাহিকী

॥ স্বামীজীর স্মৃতি-ফলক ॥

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রামেশ্বরমে রামনাথ স্বামী মন্দির-প্রাঙ্গণে 'ভারতআত্মা' স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। ছয়ষট্টি বছর পূর্বে আমেরিকা বিজয় সফরের পর স্বদেশে ফিরে এসে স্বামীজী সর্বপ্রথম যে বক্তৃতাটি করেন, তারই অংশবিশেষ এই ফলকে খোদিত করা হয়েছে।

ঐ উপলক্ষে প্রদত্তভাষণে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ধর্মের ব্যাপারে সকলেই যেন সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলন করেন, সেইভাবে আহ্বান জানান। তিনি স্পষ্টই বলেন : স্বামী বিবেকানন্দ একজন আধ্যাত্মিক গুরুই ছিলেন না, সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। ধর্ম বলতে তিনি বুঝতেন অভিজ্ঞতা, অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ও মানবজাতির সেবা। স্বামীজীর এই তিনটি শিক্ষা জনসাধারণের আচরণ করা উচিত।

॥ এলাহাবাদে ছাত্রবিক্ষোভ ॥

কয়েকজন ছাত্রনেতার বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবল ছাত্রবিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্র ক্লাশে যোগদানে বিরত থাকেন।

এলাহাবাদের ২৮শে সেপ্টেম্বরের সংবাদ : ঐদিন উপাচার্যের বাস-ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশ ধর্মঘটী ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে। ঘটনাস্থলে বত্রিশ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তারও করা হয়। ওদিকে উপাচার্য ডঃ বলভদ্র প্রসাদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার খাতিরে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটও পৌর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করেন, যার মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় পনেরো দিন।

॥ অবশ্য সঞ্চয় প্রকল্প ॥

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর অবশ্য সঞ্চয় প্রকল্প সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সার্কুলার প্রকাশ পেয়েছে, যাতে বলা হয়েছে—অবশ্য সঞ্চয় (আয়কর-দাতা) পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান আর্থিক বৎসর (১৯৬৩-৬৪) শেষ হওয়ার পূর্বে যে কোন সময় টাকা জমা দিলেই চলবে। পূর্বেকার এক সংবাদে (বিভ্রান্তিকর) ১৯৬৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্যে অবশ্য সঞ্চয়ের অর্থ জমা না দিলে অতিরিক্ত সারচার্জ বাদ দেওয়া হবে না, এইরূপ বলা হয়েছিল। সর্বশেষ সংবাদ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার আলোচ্য সার্কুলারটি বিভিন্ন রাজ্য-সরকারগুলির নিকট পাঠিয়েছেন।

॥ পঃ বঙ্গে কেন্দ্রীয় সাহায্য ॥

২৮শে সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দুর্গতির প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীর নিকট একখানি পত্র লিখেছেন। আলোচ্য পত্রে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের 'বেদনাদায়ক' আচরণের নাকি ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদেই বলা হয়, তৃতীয় পরিকল্পনায় এযাবৎ ব্যয় হয়েছে ১৪৯ কোটি টাকা, তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৬৮ কোটি টাকা দিয়েছেন। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গকে কিভাবে বারংবার বঞ্চিত করা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণমাচারীর নিকট সেই বিস্তৃত তথ্যও পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন। প্রকাশ, তিনি তাঁর দীর্ঘ পত্রে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে সীমান্ত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রায় চোদ্দ হাজার মাইল সীমান্তরক্ষার গুরুদায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

॥ পাকিস্তানী দৌরাত্ম্য ॥

বিভিন্ন সূত্রে যেসব সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায় যে, পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানী দৌরাত্ম্য এখনও বন্ধ হয়নি। করিমগঞ্জের ২৬শে সেপ্টেম্বরের একটি সংবাদ : মাটিটিলা-ডুমাবাড়ি এলাকায় পাকিস্তানীরা নতুন করে সামরিক প্রস্তুতি চালিয়েছে। শিলচরের এক সংবাদ (২৭শে সেপ্টেম্বর) অনুসারে পাকিস্তানী ফৌজরা সীমান্তবর্তী সুতারকান্দি থেকে মাইলখানিক উত্তরে ল্যাপচিলোয় ভারতের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে আর সীমান্ত বরাবর হাঙ্গামাও শুরু করেছে বিনা প্ররোচনায়।

আগরতলার ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংবাদ : সম্প্রতি পঞ্চাশ জন সশস্ত্র পাক হানাদার ত্রিপুরা-পূর্বপাকিস্তান সীমান্তবর্তী ফুলকুমারী বনাঞ্চলে ভারতীয় পুলিশবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করে। একজন হানাদারকে ধরে ফেলা হয়—অন্যান্যরা পাকিস্তান অভিমুখে চম্পট দেয়। অপরদিকে কুষ্ঠিয়া সীমান্ত বরাবর পাকিস্তান ব্যাপক সমরসজ্জা করেছে বলে কৃষ্ণনগরের একটি সংবাদে (২৮শে সেপ্টেম্বর) জানতে পারা যায়।

॥ ডেনিং রিপোর্ট ॥

প্রফুমো-কীলার কেলেঙ্কারী ব্যাপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান ও তাঁর সরকারের ওপর কোনরূপ দোষ চাপানো যায় না, এই অভিমত প্রকাশ করেছেন লর্ড ডেনিং (প্রখ্যাত বিচারপতি) তাঁর দীর্ঘ রিপোর্টে। (২৫শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন সংবাদ)

পঞ্চাশ হাজার শব্দ-সম্বলিত ঐ ডেনিং রিপোর্টের অপর মন্তব্য : যুবতী কীলারের সহিত প্রাক্তন সমর-সচিব প্রফুমোর যোগাযোগে চারিত্রিক শৈথিল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তিনি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করেননি। ডেনিং রিপোর্ট হাজারে হাজারে বিক্রি হওয়ার সংবাদও পাওয়া যায়।

॥ ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র ॥

স্যান্টো ডোমিনগো থেকে প্রাপ্ত ২৫শে সেপ্টেম্বরের সংবাদ : পূর্বদিন শেষরাত্রের দিকে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। পরিণতিতে প্রেসিডেন্ট জুয়ান ডি বশ ও তাঁর মন্ত্রিসভা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন—আইন সভার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। পরবর্তী সংবাদে (২৬শে সেপ্টেম্বর) বলা হয়—ক্ষমতা-দখলকারী সশস্ত্র-বাহিনী তিনজন বেসামরিক ব্যক্তির হাতে সরকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ন্যস্ত করেছে, তবে একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।

॥ মালয়েশিয়া প্রসঙ্গ ॥

ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ জাকার্তার এক জনসমাবেশে (২৫শে সেপ্টেম্বর) বলেছেন : উপনিবেশপন্থী মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে ইন্দোনেশিয়া কোনক্রমেই বরদাস্ত করবে না। রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক মালয়েশিয়া গঠনের অনুমোদন তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছেন। রাষ্ট্রসংঘ থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর সংবাদ : রাষ্ট্রসংঘস্থ ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধি মিঃ এল এন পালার পূর্বরাত্রে সাধারণ পরিষদে মন্তব্য করেছেন —দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ন্যায় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বৃটিশ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই মালয়েশিয়া গঠনের পরিকল্পনা রচিত হয়েছে।

এদিকে ২৫শে সেপ্টেম্বরের ক্যানবেরার একটি সংবাদ : মালয়েশিয়ার আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব ও স্বাধীনতারক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট মেঞ্জিস মালয়েশিয়া ও বৃটেনকে সামরিক সাহায্যদানে প্রস্তুত। অপর একটি সূত্রে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাকার্তাকে নতুন বৈষয়িক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এই মালয়েশিয়া প্রশ্নটি সামনে রেখেই। ওদিকে মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ টুঙ্কু আব্দুল রহমান নাকি ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের নিকট মালয়েশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বোঝাপড়া করার জন্য একটি আবেদন জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়
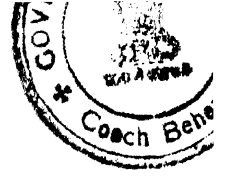
এ দেশের জলবাতাসের সঙ্গে অনিশ্চয়তা অতি সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত। মরসুমী আবহাওয়া ও ঋতুপরিবর্তন—বিশেষে বর্ষার আগমন, বর্ষণের পরিমাণ ও বর্ষাশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরবাড়ী-আশ্রয়স্থলের স্থায়িত্ব, যানবাহন ট্রেন-প্লেনের চলাচল বিশেষে শিয়ালদহের ট্রেন পর্যন্ত জীবনযাত্রার পরিবেশসংক্রান্ত সবকিছুই যেন অনিশ্চিত, কোন কিছুরই যেন স্থিরতা নাই।

কিন্তু এই অস্থির পরিবেশের মধ্যেও দুইটি বিষয়কে জনসাধারণ নিশ্চিত বলিয়া জানিত। প্রথম ছিল মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব,—অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য। যেনতেনপ্রকারেণ নির্বাচকমণ্ডলীকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া রাজ্যের বিধানমণ্ডলে বা আরোও কপাল-জোর থাকিলে কেন্দ্রীয় সংসদে স্থান পাইলে এবং সেই সঙ্গে দলনেতার সুনজরে পড়িলে বা উপদলীয় সমর্থন পাইলে, মন্ত্রিত্ব প্রায় নিশ্চিত। এবং মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর আসনে একবার বসিলে পাঁচ বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত। তবে মহাকালের আহ্বানে সংসার হইতে বিদায়কালে আসন ছাড়িতেই হয়। কিম্বা হয় রাষ্ট্রব্যাপী জনবিক্ষোভের ভূকম্পে, যেমন হইয়াছিল কেরলে অথবা শত্রুর প্রবল অভিযানে দেশের নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত হইবার কারণে দলের সদস্যবর্গ লাগামছেঁড়া অবস্থায় আসিলে, যেমন ঘটিয়াছে কৃষ্ণ মেননের কপালে বা পরোক্ষভাবে মালব্যের বরাতে।

দ্বিতীয় বিষয়টি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, বিশেষে খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি। যে কোন কারণে যে কোনও মিথ্যা অজুহাতে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া চলিবেই এবং কর্তৃপক্ষ নির্বিকার চিত্তে ঐ শোষণ-ক্রিয়া নিরীক্ষণ করিবেন, ইহাকেও ধরাবাঁধা স্থিরব্যবস্থা বলিয়া জনসাধারণে জানে।

কিন্তু মন্ত্রিত্বের ঐ স্থিরনিশ্চয়তা বিদীর্ণ হইল কামরাজ প্রস্তাবে। অবশ্য ঐ প্রস্তাবের বিরোধ কোনও মন্ত্রীপদস্থ ব্যক্তি করেন নাই, কি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে। বরঞ্চ সকলেই জোর গলায় সমর্থন করিয়াছিলেন ঐ প্রস্তাবের এবং সমান জোরে আপত্তি করিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আসনত্যাগের ইচ্ছাপ্রকাশে। এবং পরে প্রায় সকলেই সমান আগ্রহ প্রদর্শন করেন পদত্যাগপত্র দাখিল করায়। প্রধানমন্ত্রীর নিকটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সকলে ও সকল রাজ্যেরই মুখ্যমন্ত্রিগণ পদত্যাগপত্র দাখিল করেন, শুধু বোধহয় করেন নাই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী জীবরাজ মেহ্‌তা। তেমনি অন্যদিকে নিজে অগ্রসর হইয়া পদত্যাগ করেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ, তাঁহার মন্ত্রিসভার ও বিধানমণ্ডলীর তীব্র আপত্তিজ্ঞাপন সত্ত্বেও। তবে কার্যকালে জীবরাজ মেহতাকেও গদী ছাড়িতেই হইল।

সেই সঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রিসভার সকলে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট। যেখানে মুখ্যমন্ত্রীই সরিয়া গেলেন সেখানে তো মন্ত্রিসভাও সেই সঙ্গে গেল। এবং মুখ্যমন্ত্রী যেখানে রহিলেন সেখানে আসিল মন্ত্রিসভা সংকোচনের প্রশ্ন ও কয়েক ক্ষেত্রে তাহার ব্যবস্থা।

তারপর আসিল ভারমুক্তির—ছাঁটাই নয়—পালা, কেন্দ্রে ও রাজ্যে। প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকা ঘোষণা করিলেন। যাঁহারা মুক্ত হইলেন তাঁহাদের বদলে কেহ কেহ নিযুক্ত হইলেন। আবার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রিগণ ও পুরাতন মুখ্যমন্ত্রীও দু-একজন, মন্ত্রিসভার রদবদল বা সংকোচন করিলেন। ভারমুক্ত মন্ত্রিগণ বিনা বাক্যব্যয়ে বিদায় লইলেন। অন্ততঃপক্ষে বাহিরের লোক তাহাই বুঝিল—এবং পুলকিত হইয়া ভাবিল বুঝিবা কংগ্রেসে, সত্য না হউক, দ্বাপর না হউক, নিদেনপক্ষে ত্রেতা যুগই ফিরিয়া আসিল!

কিন্তু তারপর কানাঘুষো শোনা যাইতে লাগিল। আরও পরে শ্রীপাতিল হট্টা-কট্টা মহাশাস্ত্রীয়ের ধরণে কিছু 'হককথা' বলিলেন। পরে কতিপয় দুষ্টমতি সাংবাদিকও নানা বিশিষ্টজনের বিরূপ মন্তব্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া দিল। সবশেষে আসিল প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ও শ্রীকামরাজের ভাষণ ঐ সকল অপবাদের প্রতিবাদে। দুইজনের ভাষণেই মূল প্রস্তাব ও প্রস্তাব অনুযায়ী কার্যক্রমের সবল সমর্থন ছিল।

কিন্তু দেশের লোকে বুঝিল যে অনেক মন্ত্রীই ভালমনে বিদায় গ্রহণ করেন নাই। এবং আরও বুঝিল যে কংগ্রেসে ত্রেতাযুগ প্রবর্তনের আশা একেবারে নিশ্চিত হয় নাই। তবে পরিবর্তন যে কিছু ঘটিতেছে ইহা নিশ্চিত।

যাকে বলে স্বপ্নদর্শী, আমি তা কোনোকালেই হতে পারিনি। কল্পনা-লোকের উচ্চমার্গে বিচরণ করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি স্বপ্ন দেখি, একজন সাধারণ মানুষ যে রকম পারম্পর্যহীন আবোল-তাবোল ঘটনার প্রতিফলন দেখে ঘুমের মধ্যে, সেই জাতের স্বপ্ন।

কয়েকদিন আগে এইরকম একটি স্বপ্ন দেখে খুবই অস্বস্তি বোধ করে-ছিলাম। একটি বললাম এই কারণে যে, একই রাত্রে দেখেছিলাম ঐ স্বপ্ন, কিন্তু আসলে সেটা ছিল ক্রমশ প্রকাশিত উপন্যাসের মতো অনেকগুলি স্বপ্ন-অধ্যায়ের সমষ্টি বিশেষ।

এর মধ্যে গোটা-তিনেক স্বপ্ন মনে আছে আমার এখনো। জ্ঞাতার্থে নিবেদন করি আপনাদের দরবারে।

এক নম্বর স্বপ্ন যখন শুরু হয়, আমি বোধকরি তার একটু আগেই খবরের কাগজ পড়ছিলাম। স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম, অনেকগুলি লোক এক জায়গায় জমায়েত হয়ে লাউড স্পীকারের বক্তৃতা অথবা ঘোষণা শুনছে। বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা লাউড-স্পীকারের চোঙটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কিন্তু বক্তা বা ঘোষককে দেখতে পেলাম না। সে রকম যে কেউ আছে, তাও মনে হল না। কারণ ভালো করে ঠাহর করে দেখলাম, সেই বাঁশে-বাঁধা চোঙটার চারদিকেই গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলে, কাছে বা দূরে কোনো বক্তৃতা-মঞ্চের অস্তিত্ব নেই।

সপ্তাহ, সপ্তাহ এবং সপ্তাহ

চোঙ থেকে এইরকম একটানা শব্দ-স্রোত নির্গত হচ্ছিল।—

বনসংরক্ষণ সপ্তাহ। সাতদিন ধরে বৃক্ষরোপণ, গাছপালার তত্ত্বাবধান এবং বন-সচেতনতার কার্যক্রম। গাছপালা মানুষের উপকারে লাগে, মাটিকে উর্বরা করে, ভূমিক্ষয় নিবারণ করে। ... বসন্ত-নিরোধ সপ্তাহ। সাতদিন ধরে বসন্ত প্রতিরোধ করার জন্যে কার্যক্রম গ্রহণ। বসন্ত ভয়ানক ব্যাধি, মারাত্মক রকম ছোঁয়াচে, কাজেই মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ে। টিকা তার প্রতিষেধক। টিকা নিন, অন্যকে নিতে বলুন।...... বন্যজন্তু সপ্তাহ। বন্যজন্তু সংরক্ষণ করুন। জন্তু-সচেতন হন। নির্বিচারে হত্যা করবেন না। ......তাঁত সপ্তাহ। তাঁতের কাপড় কিনুন। হস্তশিল্পকে উৎসাহ দিন। ......চিনি সপ্তাহ। চিনি কম খরচ করুন। ......গম সপ্তাহ। বেশি করে গম খান। ...কাজ সপ্তাহ। বেশি কাজ করুন। ......কথা সপ্তাহ। কম কথা বলুন। ......চিন্তা সপ্তাহ। চিন্তা করতে শিখুন। ......অরণ্যে রোদন সপ্তাহ। অরণ্যে রোদন......।

এরপর বাকিটা আর শুনতে পেলাম না। বন থেকে শুরু করে আবার অরণ্যে এসে উপস্থিত হতেই স্বপ্নটা ফিকে হয়ে গেল। আবহসঙ্গীত হিসাবে কেবল বাজতে লাগল সপ্তাহ, সপ্তাহ; সপ্তাহ। এরই মধ্যে শুরু হল অন্য স্বপ্ন।

●

● ●

দ্বিতীয় স্বপ্নটার ঘটনাস্থল বোধহয় একটা ক্লাস রুম। কাঁধের উপর গরদের চাদর রেখে একজন জাঁদরেল অধ্যাপক লেকচার দিচ্ছিলেন। তাঁর স্পীচের মাঝখানে এসে আসন গ্রহণ করলাম আমি।

অধ্যাপক ব'লে যাচ্ছিলেন—

অঙ্ক হল এ সংসারের সবচেয়ে পারফেক্ট চিন্তার নিদর্শন। অঙ্ক অভ্রান্ত। অঙ্ক দিয়ে বিজ্ঞানের উন্নতি। কাজেই অঙ্কটা ঠিকমতো কষা চাই। ব্যবহারিক জগতেও আজ দেখতে পাচ্ছি অঙ্ক আমাদের কতোবড় সহায়। স্ট্যাটিস্-টিক্স্—কথাটার মানে কী? সমীক্ষা! এখন, সমীক্ষার গোড়ায় কি? না, অঙ্ক। কাজেই দেখছি, এই ফিগারস-ই হল সবকিছুর মূল। .....

সমীক্ষার শিক্ষা সম্যক

অল রাইট। ইউ বয়, তুমি এবার বল—কী বুঝলে ভালো করে বুঝিয়ে বল।

উদ্দিষ্ট যুবক উঠে দাঁড়িয়ে সোজা-সুজি তাকিয়ে বলল—স্যার, আমি বুঝলাম ফিগারসই হল আপনার স্পীচের মূল কথা।

মানে? অধ্যাপক ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন—ভালো করে বুঝিয়ে বল।

মানে, যুবকটি একবার অভিজ্ঞ বক্তার মতো চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, মানে সমীক্ষা ছাড়া কিছু বোঝা যায় না।

দৃষ্টান্ত দাও।

যেমন, ধরুন কলকাতার কলের জল। তাতে জীবাণু আছে কিনা? কেউ বলল আছে, কেউ বলল নেই। যারা নেই বলল তাদের যুক্তি কি জানিনে, কিন্তু যারা আছে বলল, তারা বলতে পারত কলকাতার খারাপ স্বাস্থ্য অনেকখানি এই খারাপ জল থেকেই এসেছে। কিন্তু তা বললে কেউ কান দেবে না। দরকার হল সমীক্ষা। এখন সমীক্ষা শুরু হতেই এসে গেল অঙ্কের রাজত্ব। জলের ভালো-মন্দ তখন আর বড় কথা রইল না, বড় হয়ে দাঁড়াল ফিগারস্-এর আলোচনা। একজন যেই জলের স্যাম্পল নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, শতকরা আশিভাগই খারাপ জল, অমনি আরেকজন বললেন চল্লিশ ভাগ, আর সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় গবেষক ঘোষণা করলেন ছাপান্ন, কি বাহাত্তর। ......ইতি-মধ্যে জল অবিশ্রাম যেমন ভাবে ফুটো-নলের ভেতর দিয়ে বয়ে চলছিল, তেমনি বয়ে যেতে লাগল।

অল রাইট। সীট ডাউন। তুমি, ইউ বয়, তুমি বল।

কী বলব স্যার?

যা বুঝলে।

স্যার, আপনার স্পীচ, মানে ফিগারস, ইয়ে, ফিগার অব স্পীচ, না-না, সমীক্ষা থেকে, ইয়ে, সমস্তই স্যার জলের মতো......মানে......সমীক্ষা হ'ল......!

ননসেন্স। কিছু বোঝোনি। শোনো। আমি বলছিলাম......

অধ্যাপকের কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন কী করে মৃদু হতে হতে মিলিয়ে যেতে লাগল। এবং—

• •
•

শুরু হল তৃতীয় স্বপ্ন। কী জন্যে জানিনে, আমি যেন কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু রাস্তাঘাট বেজায় ফাঁকা। বাসে উঠলাম, ভিড় নেই। অভ্যাস মতো রড ধরে ঝুলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আশেপাশে চোখ পড়ায় অনেকগুলি সীট বেওয়ারিশ দেখতে পেলাম। অগত্যা বসতে হল। তারপর যেখানে নামলাম, সেটা বোধহয় বড়বাজার অঞ্চল, সেখানেও লোকজন কম। এলাম কলেজ স্ট্রীটে, তারপর সেখান থেকে এসপ্ল্যানেডে, সব জায়গাতেই একই অবস্থা। ব্যাপার কি বুঝতে পারছিলাম না। অন্যদিন যেখানে পা ফেলা দুষ্কর হত, সেখানে এ রকম মরুভূমির মতো অবস্থা কেন? হঠাৎ আমার পাশ থেকে হেঁড়ে গলায় কে যেন বলে উঠল ঃ

নতুন দিগন্ত এবং পুরনো কৌশল

'কী মোসা, ঘাবড়ে গেলেন নাকি?'

তাকিয়ে দেখি রোগা মত একজন লোক, পানের ছোপধরা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। সে আবার বলল, 'নতুন এয়েছেন নাকি?'

'না', আমি শুকনো গলায় উত্তর দিলাম, 'কী, ব্যাপার কি বল তো ভাই লোকজন সব গেল কোথায়?'

'দেখবেন? তা আসুন না আমার সাথে।' এই বলে সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝলাম সে ট্যাক্সি খুঁজছে। আর, কী আশ্চর্য, দেখি এন্তার খালি ট্যাক্সি ঘোরাঘুরি করছে।

যাই হোক একটা ট্যাক্সি করে আমরা এগোতে শুরু করলাম। গতিপথ শেয়ালদার দিকে। কিন্তু বউবাজারের মোড় পেরিয়েই বুঝলাম, আর এগোনো একেবারেই অসম্ভব। চারিদিকে কেবল মানুষ, বাক্স-তোরঙ্গ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কাতারে কাতারে মানুষে পঙ্গপালের মতো এগিয়ে চলেছে স্টেশনের দিকে।

বোধকরি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, লোকটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, 'দেখলেন তো দাদু?...যাবেন আপনি?'

'কোথায়?'

'না মোসা, আপনি আমার সাথে ধাপ্পা দিচ্ছেন। কলকাতার লোক, আর ইটা জানেন না, কোথা?'

'সত্যি বলছি ভাই, জানিনে।'

'বর্ডার।'

'বর্ডার? কীসের বর্ডার?'

'পাকিস্তান বর্ডার। ...... আপনি যাবেন তো জমি কিনে লিন। এখনো কলকাতার দামেই পাবেন।'

'কিন্তু সে জমি আমার কোন কাজে লাগবে?'

'ব্যাওসা হবে মোসা। এক বছরে দশ গুণ টাকা উঠে আসবে।'

'কিন্তু ব্যবসাটা কীসের? জমি কেনা-বেচা? ও তো আমি ঠিক—।'

'আপনি মোসা একদম বুদ্ধু আছেন। বেচবেন কেন জমি? ঘর বানাবেন, ব্যাওসা করবেন।'

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ব্যবসাটা কীসের?'

'হরেক চিজ। শুপারী, তেল, নুন, গাঁজা, আফিন, স্যোনা!'

'মানে!'

'মানে চলছে সব, ...স্মাগলিং!'

'কী সাংঘাতিক! এরা তো এদেশেরই মানুষ!'

'এই বুঝে লিন!'

ট্যাক্সিওয়ালা ইতিমধ্যে জোর তাগিদে ভাড়া চাইল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাকিয়ে দেখি, আমি আমার সুখশয্যায় শায়িত—বাজারের থলি-হাতে সামনে দাঁড়িয়ে আছে গৃহ-পরিচারক। চোখ রগড়ে উঠে বসলাম।

আজো মনে পড়ে

নিমাই ভট্টাচার্য

অনেকেই হয়তো জানেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক বলেছেন, পাওনাদার ও বীমার দালালের চাইতে সমাজে যদি ভয়ঙ্কর কিছু থাকে, তবে তা খবরের কাগজের রিপোর্টার। কি চমৎকার সার্টিফিকেট বলুন ত! খবরের কাগজের রিপোর্টারের দল ভয়ঙ্কর কিনা জানি না, তবে কিছুটা নির্লজ্জ হওয়া আমাদের একেবারে বেসিক কোয়ালিফিকেশন। এর পর চাই নরমে-গরমে কাজ হাসিল করার বিদ্যা জানা। কখনও চাটি মেরে, কখনও চোখ রাঙিয়ে চলতে হয় আমাদের। ভদ্রতা করবার ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময়েই তা সম্ভব হয় না। তবে বহু ক্ষেত্রে মোসাহেবি তাঁবেদারিও করতে হয়। এক কথায় মোটামুটি মাঝারি ধরনের ভাল অভিনেতা হওয়া দরকার। এক সিনে খুনীর ভূমিকায়, অন্য সিনে প্রেমিকের ভূমিকায়।

দরিয়াগঞ্জের ভিড় ঠেলে এগুবার সময় হঠাৎ উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পাঞ্জাবীদের রীতি অনুযায়ী হাতে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, খবর সব আচ্ছা হ্যায়?

কৃতজ্ঞতায় গলে যাবার উপক্রম করলাম আমি। হাসি হাসি মুখে মাথা নীচু করে জানালাম, আপনার দয়ায় মোটামুটি ভালই আছি।

'ঘরকা খবর আচ্ছা হ্যায়?'

'জি হাঁ, বড়ে মেহেরবাণী আপকা'।

স্নেহপরায়ণ উকিলবাবু চা খেতে অনুরোধ জানালেন। সে অনুরোধ এড়িয়ে গেলাম; কিন্তু কালো কোটের ভিতরের পকেট থেকে বের করে একটা কার্ড গুঁজে দিলেন আমার হাতে। বল্লেন, জরুর কভি আনা। আসার আগে একটা টেলিফোন করে সোজা চলে আসবেন।

'জরুর আউংগা।'

উকিলবাবু ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। আমি কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম; মনে মনে বোধ হয় হেসেও ফেল্লাম উকিলবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে করে।

...টগবগ করে ফুটছিল সমগ্র পাঞ্জাব। 'সত্ শ্রী আকাল' বলে চীৎকার করে লক্ষ লক্ষ শিখ জমায়েত হচ্ছিল অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ও অন্যান্য গুরুদ্বারের সামনে। বৃদ্ধ মাষ্টার তারা সিং-এর নেতৃত্বে পাঞ্জাবী সুবার দাবী উঠল পাঞ্জাবের চারদিক থেকে। বজ্রমুষ্টি তুলে 'পাঞ্জাবী সুবা' আন্দোলন দমনে উদ্যোগী হলেন চীফ মিনিষ্টার প্রতাপ সিং কায়রণ। পার্লামেণ্টে নেহরু ঘোষণা করলেন, অলরেডি ডিভাইডেড্ পাঞ্জাব কান্ নট্ বি ডিভাইডেড্ এগেন, কাম হোয়াট মে।.........পঞ্চ নদীর দেশে অশান্তি আরো ছড়িয়ে পড়ল। চিন্তার কুটিল রেখা ফুটে উঠল নেতৃবৃন্দের ললাটে। অবস্থা চরমে উঠল মাষ্টার তারা সিং'এর আমরণ অনশন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। মাষ্টারজীকে বিরত করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের পবিত্র তীর্থে অশীতিপর বৃদ্ধ মাষ্টারজী আমরণ অনশন শুরু করলেন পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে। দিল্লী-চণ্ডীগড়-অমৃতসরের মধ্যে দূতের আদান-প্রদান হলো, বিনিময় হলো মতামত, অনুরোধ, উপরোধ। কিছুই হলো না। মাষ্টারজীর হেলথ্ বুলেটিনে উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হলো। অভাবিত ভবিষ্যতের চিন্তায় চাঞ্চল্য দেখা দিল বহু দিকে। কায়রণ ছুটে এলেন দিল্লী; শলা-পরামর্শ করলেন নেহরু ও পন্থজীর সঙ্গে।

শেষে প্রায় চরম মুহূর্তে নেহরুর ব্যক্তিগত ও একান্ত অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করলেন মাষ্টারজী। বৃদ্ধ মাষ্টারজীর প্রাণরক্ষায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন সবাই। শুধু পাঞ্জাব নয়, সমগ্র দেশবাসী সাধুবাদ জানালেন নেহরুকে। দিল্লী থেকে নেহরু চলে গেলেন ভবনগর কংগ্রেসে। ভবনগরে আলোচনার জন্য নেহরু আমন্ত্রণ জানালেন মাষ্টারজীকে।

নেহরু ও অসংখ্য দেশবাসীর মত আমরাও ভবনগর কংগ্রেসে গিয়ে মহা উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিলাম মাষ্টারজীর জন্য। অনেক খোঁজখবর করে জানা গেল, স্পেশ্যাল প্লেনে মাষ্টারজী আসছেন ভবনগর। কিন্তু সঠিক ক'টার সময় তাঁর প্লেন ল্যান্ড করছে ও কোন সময় নেহরু-তারা সিং সাক্ষাৎকার হবে তা জানা গেল না।

প্রথম কি দ্বিতীয় দিন হবে; এ-আই-সি-সি'র প্রাতঃকালীন অধি-বেশন শেষ হলো। একটু ফাঁকা পেয়ে মোরারজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাষ্টারজী কখন আসছেন?

'মাষ্টারজীর প্লেন তো ঘণ্টা দুই আগেই এসে গেছে এবং এতক্ষণে পণ্ডিতজীর সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনাও শেষ হলো বোধ হয়।'

সর্বনাশ। এক দৌড়ে প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরে। এসে দেখি পন্থজী তাঁর গাড়ীর দিকে এগুচ্ছেন। দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড......।

হাতের ঘড়ির দিকে এক নজর দেখে নিলেন পন্থজী। বল্লেন, আই থিঙ্ক দেয়ার টকস্ আর ওভার। ইন এনি কেস, ইউ যাষ্ট রাশ অন, হ্যাভ এ ট্রাই।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। চারদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলাম। হ্যাভ এ ট্রাই মানে একটা রিক্সায় চড়ে পড়া ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয় ভবনগরে। আমার অসহায় অবস্থা দেখে, পন্থজীর মন ভিজল। 'গেট ইন।'

ভবনগর রাজবাড়ীর রোলস রয়েসে চড়ে বসলাম পন্থজীর ঔদার্যে। গাড়ী চলল ভবনগর রাজপ্রাসাদের দিকে। (নেহরু ও পন্থজীই কেবল মহারাজার অতিথিরূপে রাজপ্রাসাদে ছিলেন; আর সবাইকে কংগ্রেস নগরের চাটাই-এর ঘরে বন্দী থাকতে হয়েছিল।) শহর শেষ হলো, গাড়ী ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অনেক দূর এগুল; তারপর ঢুকল একটা বিরাট বাগিচার মধ্যে। গাড়ীতে বসে বসেই ডানে বাঁয়ে ছোট-বড় নানা সাইজের ও ডিজাইনের রাজবাড়ীর মত প্রাসাদ নজরে পড়ল। জানকীকে জিজ্ঞাসা করলে জানাল, এগুলোও রাজবাড়ী; তবে আমরা চলেছি মেন প্রাসাদে। অসংখ্য গাছপালা-লতাপাতার মধ্যে দিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে গাড়ী মেন প্রাসাদের সামনে হাজির হলো। পন্থজী নেমে ডান দিক দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। জানকী আমাকে সোজা উপরে উঠে যেতে বল্লো।

সিঁড়ি ভেঙে উপরের বারান্দায় হাজির হতেই দেখি, আমার এক স্বজাতি মহা উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে। প্রায় চীৎকার বল্লো, হাউ কুড্ ইউ কাম হিয়ার...অর্থাৎ এতবড় বাগানের মধ্যে এতগুলো ডুপ্লিকেট রাজবাড়ী এড়িয়ে এখানে হাজির হলে কি করে?

মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখলাম নেহরু মাষ্টারজীর হাত ধরে বারান্দা অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। মাষ্টারজীর পিছন পিছন এলেন কালো কোট পরে এক বাণ্ডিল কাগজ হাতে এক উকিলবাবু।

মাষ্টারজী বারান্দায় পৌঁছতেই আমরা দুজনে তাঁর হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। গুণমুগ্ধ ভক্তের মত বিগলিত কণ্ঠে বল্লাম, আপনার এই বয়সে এমন স্বাস্থ্য নিয়ে এতদূর আসতে না জানি কি কষ্টই হলো?

মন্দ্রিত কণ্ঠে মাষ্টারজী পরম স্নেহের সঙ্গে বল্লেন, হাঁ বেটা কিয়া করুংগা?

স্বগতোক্তি করল আমার বন্ধু, 'আপনার মত আর কয়েকজন লোক থাকলে দেশের চেহারাই বদলে যেত।'

দুজনে মাষ্টারজীর দুদিক ধরে আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে বসালাম।

সবিনয় নিবেদনমিদং করে জিজ্ঞাসা করলাম, সারা দেশ আজ আপনার খবরের জন্য অতীব আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কথাবার্তায় কিছু ফল হলো?

দাড়ি নাড়িয়ে মাষ্টারজী বল্লেন, নেই বেটা ইধার কুচ নেই কহুংগা।...........দিল্লী লোটনেকা বাদ......।

সর্বনাশ! এখানে কিছুই বলবেন না?

হঠাৎ যেন কোথা থেকে মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। সেণ্ট পার্সেণ্ট পাঞ্জাবীদের

মত বল্লাম, কৈ বাত নেই! আর কাল-বিলম্ব নয়। এক চোখে বন্ধুকে ইশারা করে দুজনে যুগপৎ মাষ্টারজীর গা-হাত-পা মালিশ শুরু করলাম। দুজনেই প্রাণ-মন সমর্পণ করে মাষ্টারজীর পদসেবা করতে লাগলাম। উকিলবাবু হাঁ করে গাড়ীর জন্য বাইরের দিকে তাকিয়ে। কয়েক মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ মাষ্টারজী একটু নড়েচড়ে ঘুরে বসলেন, বুঝলাম পিছন দিকটা টিপতে বলছেন। দুই বন্ধুর ইশারা বিনিময় হলো; শুরু হলো কাঁধ-পিঠ টেপা।

কয়েক মিনিট বাদে মাষ্টারজী চমকে দিলেন ঃ বলে উঠলেন, ভকিল-সাব, দো বেটা কো দো কাঁপ দে দো.........!

উকিলবাবু যেন আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। 'নেই বাবুজি, দিল্লীতে আমাদের জন্য বহু প্রেসম্যান অপেক্ষা করছে।...... তাছাড়া শতাধিক ফরেন করসপনডেণ্ট ও রেডিও-টেলিভিশন রিপ্রেসেনটেটিভ নিশ্চয়ই পালামে এসে বসে আছে।

মাষ্টারজী বল্লেন, কৈ বাত নেই; দুই 'বেটাকে' দুটি কাঁপ দিয়ে দাও।

আমরা যেন কিছুই শুনিনি; নির্বি-কারচিত্তে গুরুসেবা করে চলেছি। উকিলবাবু নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে দুটি কাঁপ বের করে আমাদের হাতে তুলে দিলেন।

ইতিমধ্যে মাষ্টারজীর গাড়ী এসে গেছে। মিশনারী হাসপাতালের নার্সের মত আমরা দুজনে সন্তর্পণে ও সযত্নে মাষ্টারজীকে ধরে নিয়ে গাড়ীতে চড়িয়ে দিলাম। হাঁটু ছুঁয়ে দুজনেই মাণ্টার-জীকে প্রণাম করলাম। 'গেট ইন', 'গেট ইন', বলে উকিলবাবুকে এক ধাক্কা মেরে গাড়ীতে ঠেলে দিলাম। উকিলবাবুর বোধহয় একটু আঘাতই লেগেছিল। কটমট করে তাকিয়ে আমাদের কিছু বলবার পূর্বেই উর্দিপরা ড্রাইভার এ্যাক-সিলারেটরে চাপ দিয়েছে। ছেলেবেলার দুষ্টুমিবুদ্ধি আবার মাথায় চাপল; উকিলবাবুর দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালাম।

হাসতে হাসতে দুজনে দুটি কাঁপ নিয়ে দৌড় মারলাম কংগ্রেস নগরের উদ্দেশ্যে। কালবিলম্ব না করে প্রেস রুমে এসে টাইপ করে নেহরু-তারা সিং 'টক্কে'র ব্যর্থতার খবর পাঠালাম আমাদের নিজের নিজের কাগজে। অন্য সাংবাদিকরা মাণ্টার তারা সিং'এর হদিশ পাবার আগেই তাঁর স্পেশ্যাল প্লেন ভবনগর ছেড়ে দিল্লীর পথে উড়েছিল।

সেবার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা যে খবরের অধিকারী হতে চলেছিলাম আমরা, উকিলবাবু তারই অন্তরায় হতে চলে-ছিলেন। সেজন্য তাঁর উপর ঠিক সন্তুষ্ট থাকতে পারিনি। পরে দিল্লীতে উকিল-বাবুর যে মূর্তি দেখেছিলাম, তাতে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু কি করব, প্রথম আলাপের সেই প্রণয়-মধুর মুহূর্তটি আজও ভুলতে পারি না।
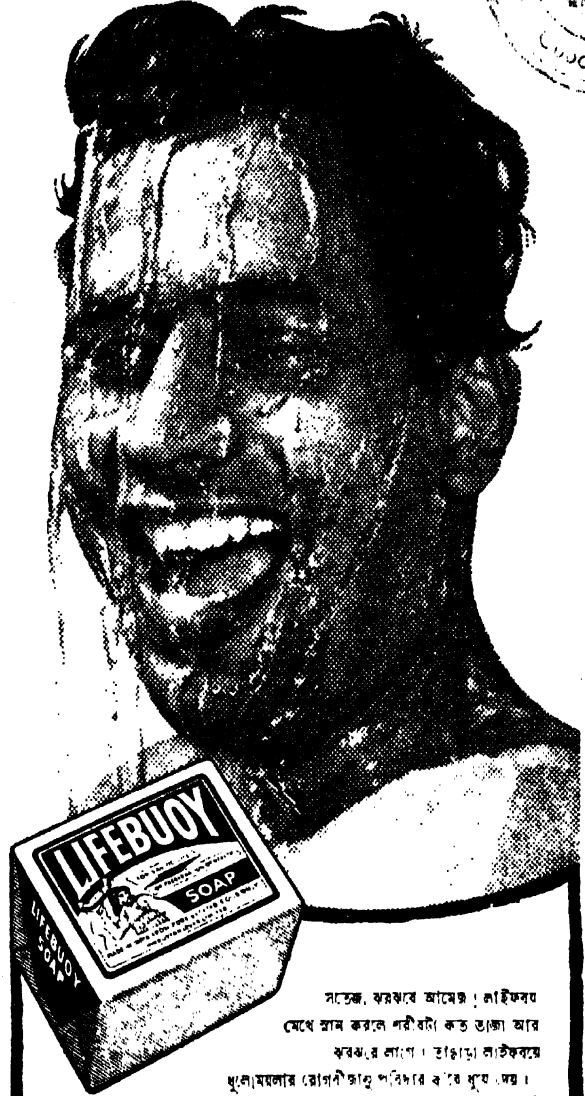
দেশে বিদেশে

॥ আজব কাণ্ড! ॥

দেশে আপৎকালীন অবস্থা এখনও বজায় আছে, সুতরাং সরকারী প্রহরা কোথাও শিথিল হওয়ার কথা নয়। অন্ততঃ বিমানঘাঁটির মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সরকারী সতর্কতায় শৈথিল্য এখনও পর্যন্ত হওয়ার কথা নয়। অথচ অবাক কাণ্ড যে, একজন বিচারাধীন ব্যক্তি সকলের চোখের সম্মুখে দিল্লীর সফদারজঙ্গ বিমান-বন্দর দিয়ে নিজে বিমান চালিয়ে উধাও হয়ে গেল, চেষ্টা করেও তাকে ধরা সম্ভব হল না। ট্রান্স-আটলাণ্টিক এয়ারওয়েজের প্রেসিডেণ্ট মার্কিন নাগরিক মিঃ ড্যানিয়েল এইচ ওয়ালকট শুল্কে ফাঁকি দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র চোরাচালান করার অভিযোগে দিল্লীর ফৌজদারী আদালতে একবার অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড ভোগ করে অপর একটি দেওয়ানী মামলায় সাড়ে বাষট্টি হাজার টাকা দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু আদালত ও সরকারী প্রহরাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ওয়ালকট আদালতের আদেশে ব্লোককরা নিজের পাইপার বিমানটিতে চেপে পাকিস্থানে পালিয়ে গেল। বলা বাহুল্য, বহুজনের সহযোগিতা ছাড়া এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল না। বিমান-বন্দর কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে ও বিনা প্রবেশপত্রে ওয়ালকটের পক্ষে সফদারজঙ্গ বিমান-বন্দরের হ্যাংগার পর্যন্ত কেমন করে যাওয়া সম্ভব হল? তারপর তার পড়ে-থাকা বিমানটিতে সংগে সংগে তেলই বা সংগ্রহ করে দিল কে? কিন্তু এসবের চেয়েও বড় কথা বিনা বাধায় নিরাপদে পালানো সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হলে পাইপার বিমানে করে উধাও হওয়ার ঝুঁকি ওয়ালকটের পক্ষে কিছুতেই নেওয়া সম্ভব ছিল না। যে কোন দ্রুততর বিমান দিয়ে তার গতিরোধ করা যেতে পারত। এত সহজে একজন বিচারাধীন ব্যক্তির পক্ষে বিমান-বন্দর দিয়ে পলায়নে আর একবার সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হল যে, আমাদের প্রহরার ব্যবস্থা কত শিথিল ও সহজভেদ্য।

এই প্রসংগে পাকিস্থান ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে জানানো উচিত যে, ওয়ালকট একজন সাধারণ অপরাধী, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী নয়। একারণে অবশ্যই তাকে ভারত সরকারের হাতে প্রত্যর্পণ করা উচিত।

ভরা নদী খর পরশা — ফটো ঃ সুকুমার রায়

॥ ভগবানের মার ॥

১৯৬১ সালের ১২ই জুলাই মহারাষ্ট্রের পুণা শহরের নিকট পাঁশেৎ ও খাদাকওয়াশলা বাঁধ দুটি ভাঙ্গার ফলে হঠাৎ যে সাংঘাতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী ভি এ নায়েককে নিযুক্ত করা হয়। দীর্ঘ দুই বছর বাদে বহু সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে ও মোট পোণে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করে শ্রীনায়েক ৭৫৮ পৃষ্ঠাব্যাপী যে রিপোর্টটি কদিন আগে মহারাষ্ট্র সরকার সমীপে পেশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে, বাঁধ ভাঙার জন্যে কেউ দায়ী নয়, ওটা ভগবানের মার! কিন্তু ঐ তদন্ত রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে, পাঁশেৎ বাঁধের কাজ তাড়াহুড়া করে নির্দিষ্ট সময়ের চোদ্দ মাস আগে শেষ করা হয়। ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি যার কাজ শেষ হওয়ার কথা, ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে হঠাৎ এক সরকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে জুন মাসের মধ্যেই শেষ করে ফেলা হয়। এই ব্যস্ততার ফলে বাঁধের কাজে কোন ত্রুটি হয়নি—এবিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কেমন করে? ২৫শে জুন থেকে ১২ই জুলাই পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে বাঁধের চারিপাশে এত জল জমে যে, তা নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় না এবং তারই ফলে ঐ বিপর্যয় ঘটে—একথা বলা হয়েছে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত জলাপসরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকাটাই কি বাঁধ নির্মাণের সবচেয়ে বড় ত্রুটি নয়? দুজন পদস্থ কর্মচারীকে

এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তব্য পালন না করার জন্য দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা যথেষ্ট কিনা সন্দেহ।

॥ গাম্বিয়ার স্বাধিকার ॥

পশ্চিম আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্র বৃটিশ উপনিবেশ গাম্বিয়া ৪ঠা অক্টোবর স্বাধিকার অর্জন করবে। গাম্বিয়া নদীর দুই উপকূলে প্রায় দুইশত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এই সংকীর্ণ ভূখণ্ডটির স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে টিকে থাকা সম্ভব নয়, তাই স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই গাম্বিয়ার প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ সেনগলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা আছে। ১৫৮৮ সালে গাম্বিয়া বৃটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই প্রসংগে উল্লেখ্য, জাঞ্জিবার দ্বীপপুঞ্জ ও কেনিয়ার স্বাধীনতার দিনও লণ্ডন থেকে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই বছরে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ঐ দুটি দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত তিনটি রক্ষণাধীন অঞ্চল বেচুয়ানাল্যাণ্ড, বাসুতোল্যাণ্ড ও সোয়াজিল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আলোচনাও শুরু হয়েছে। নিয়াসাল্যাণ্ডের স্বাধীনতার দিন ঘোষিত হয়েছে আগামী বছরের ৬ই জুলাই। বর্তমানে যেভাবে আলাপ-আলোচনা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তাতে মনে হয়, ১৯৬৮ সালের পর আফ্রিকায় বৃটিশ উপনিবেশ বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

॥ সৌদের প্রত্যাবর্তন ॥

চার মাস ধরে ভিয়েনায় আন্ত্রিক অলসারের চিকিৎসায় চল্লিশ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করে সৌদী আরবের রাজা সৌদ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বিমান-বন্দরে তাঁর সম্বর্ধনার কোন ত্রুটি হয়নি বা রাজধানী রিয়ধে রাজকীয় পরিবেশেই প্রবেশ করেছেন তিনি। কিন্তু সর্বক্ষমতাসম্পন্ন রাজাধিরাজরূপে চার মাস আগে যে রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন, সেখানে ফিরে এসে দেখলেন, নিয়মতান্ত্রিক রাজার অতিরিক্ত কোন ক্ষমতা নেই তাঁর। তাঁর উনচল্লিশজন সহভাইর অন্যতম যুবরাজ ফইজলই এখন রাজ্যের প্রকৃত শাসক ও সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। সৌদের বত্রিশটি ছেলেকেই তিনি প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করেছেন। ইতিমধ্যে ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘটিয়ে ও বিভিন্ন মরুগ্রামে স্কুল, হাসপাতাল, গৃহ ও পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুবরাজ ফইজল এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন যে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ রাজার পক্ষে আর কোন মতেই সম্ভব নয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আগেই রাজা এসব জানতে পারেন এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজারূপে রাজ্যশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজার পুত্রদের মধ্যে শুধু যুবরাজ মনসুরেরই এখনও পর্যন্ত কিছুটা সম্মান আছে কিন্তু তাঁরও ক্ষমতা সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। রাজার নিজস্ব সৈন্যবাহিনীকেও সৌদী আরবের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সৌদ এ অবস্থা মেনে নিয়ে খুব বেশীদিন চুপ করে থাকবেন বলে মনে হয় না। কারণ, আর কিছু না হলেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি এখনও আছে দশ কোটি ডলার, অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা। ফইজল-পক্ষীয় অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকেই এই টাকার জোরে কিনে নেওয়া অসম্ভব না-হতে পারে।

॥ অশুভ সূচনা ॥

আশঙ্কিত প্রতিক্রিয়াই সত্যে পরিণত হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে মালয়েশিয়া গঠন করে টুংকু আবদুল রহমান তাঁর পণরক্ষা করেছেন কিন্তু নবগঠিত রাষ্ট্রের জীবনে তা অবিমিশ্র আশীর্বাদ বর্ষণ করেনি। ফিলিপিন্স ও ইন্দোনেশিয়ার সংগে একত্রে 'মাফিলিন্দো' যৌথরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন মালয়ের প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু মালয়েশিয়া গঠিত হওয়ার পর ঐ দুটি দেশের সংগে মালয়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে এই জাতীয় সরিকানা বিবাদের কি মারাত্মক পরিণতি তা ভারতের অধিবাসীদের খুব ভালভাবেই জানা আছে। ইন্দোনেশিয়াতেই বিক্ষোভ সবচেয়ে গুরুতর রূপ নিয়েছে। সেখানে বিক্ষোভকারীরা মালয়ী দূতাবাস আক্রমণ করেছে ও বৃটিশ দূতাবাস জ্বালিয়ে দিয়েছে। মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মালয়ীরাও

ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাস আক্রমণ করে তার জানলা-দরজা ভেঙে দিয়েছে। আর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু ঘোষণা করেছেন, দেশে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ইন্দোনেশিয়া যদি গায়ের জোর দেখাতে চায় তবে মালয়েশিয়া শক্তির সাহায্যেই তার জবাব দেবে। অস্ট্রেলিয়া মালয়েশিয়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে আর বৃটেন বলেছে, মালয়েশিয়া কোন বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলেই বৃটিশ বাহিনী মালয়েশিয়াকে রক্ষা করতে এগিয়ে যাবে। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে আশঙ্কা হয়, ইন্দোনেশিয়া যদি সংযত না হয় তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অশান্তি চরমে উঠবে। আর ইন্দোনেশিয়াও খুব সহজে শান্ত হবে বলে মনে হয় না, কারণ এ ব্যাপারে তার প্রধান সহায় ও পরামর্শদাতা লাল চীন।

অথ নৈতিক

১৯৬১-৬২ সালে ভারতের মোট সম্পত্তি ছিল ১৫৫৮·২৫ কোটি টাকার এবং তার উপর সম্পত্তিকর আদায় হয়েছিল ৯·২৬ কোটি টাকা। তার পূর্বের বছরে সম্পত্তির মোট মূল্য ছিল ১৪৮৫·১৭ কোটি টাকা এবং তার উপর সম্পত্তি-কর আদায় হয়েছিল ৯·১০ কোটি টাকা।

১৯৬১-৬২ সালে সম্পত্তির মোট পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল ১২২৪·০৮ কোটি টাকার, হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের সম্পত্তি ছিল ১৯৪·২৭ কোটি টাকার ও কোম্পানীর সম্পত্তি ছিল ১৩৯·৯ কোটি টাকার। তাদের উপর সম্পত্তিকর ধার্য হয়েছিল যথাক্রমে ৭·৫১ কোটি, ১·১৫ কোটি ও ৬০ লক্ষ টাকা।

মিশরের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান প্রদানে ১৯৬১-৬২ সালের তুলনায় ১৯৬২-৬৩ সালে ভারতের লাভ বেশী হলেও লেনদেনের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬১-৬২ সালে লেনদেনের আর্থিক মূল্য ছিল ২৪·৯০ কোটি টাকা; পরের বছরে তা হ্রাস পেয়ে হয় ২২·৮৪ কোটি টাকা। ১৯৬১-৬২ সালে ভারত থেকে মিশরে মাল রপ্তানি হয় ১২·৮৬ কোটি টাকার, গত বছরে রপ্তানি হয় ১৩·০৬ কোটি টাকার। সুতরাং এক বছরে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ২০ লক্ষ টাকার। আবার ঐ একই সময়ের ব্যবধানে মিশর থেকে ভারতে পণ্য আমদানি হ্রাস পায় ১২·০৪ কোটি থেকে ৯·৭৮ কোটি টাকার। সুতরাং গত বছরের আমদানি রপ্তানিতে ভারতের অনুকূলে জমা পড়েছে ৩·২৮ কোটি টাকা, আগের বছর যেখানে জমা পড়েছিল ৮২ লক্ষ টাকা।

ভারত থেকে মিশরে গত বছরে যেসব পণ্য চালান গেছে তার মধ্যে বাগিচাজাত পণ্যের পরিমাণই সর্বাধিক। ৯·১৮ কোটি টাকার চা কফি মশলা ইত্যাদি মিশর আমদানি করেছে ভারত থেকে। এর পরেই স্থান কাপড়ের, ২·৭৯ কোটি টাকার কাপড় মিশর ভারতের কাছ থেকে কিনেছে। এ ছাড়াও কিনেছে ৪৭·৮ লক্ষ টাকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ১৩·৮৪ লক্ষ টাকার শস্য ও শস্যজাত খাদ্য, ৮·৭১ লক্ষ টাকার স্বর্ণেতর ধাতু ইত্যাদি। আর মিশরের কাছ থেকে ভারত নিয়েছে ১·৩৮ কোটি টাকার তুলা আর খনিজ পদার্থ সার, পেট্রোলিয়াম দামী পাথর, ইত্যাদি।

ভারতের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার বাণিজ্যিক লেনদেন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬২-৬৩ সালে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন হয় ৩০·৯৮ কোটি টাকার, পূর্বের আর্থিক বছরে হয়েছিল ২২·২৫ কোটি টাকার। ১৯৬১-৬২ সালে ভারত চেকোশ্লোভাকিয়ায় রপ্তানি করেছিল ৮·০৫ কোটি টাকার পণ্য ও আমদানি করেছিল ১৪·২০ কোটি টাকার পণ্য। সুতরাং সেবছর ভারতের কাছে চেকোশ্লোভাকিয়ার পাওনা হয়েছিল ৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। তারপর গত আর্থিক বছরে ভারত ১১·২৭ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে আমদানি করেছে ১৯·৭১ কোটি টাকার। সুতরাং গতবছরের লেনদেনে চেকোশ্লোভাকিয়ার আরও পাওনা হয়েছে ৮ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এবার যথেষ্ট খাদ্যের ঘাটতি পড়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর কারণ বলে বলা হয়েছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এবার খাদ্যের অভাব পড়বে। কানাডা থেকে ইতিমধ্যেই সোভিয়েট ইউনিয়ন ২২ কোটি ৭০ লক্ষ বুশেল গম আনার ব্যবস্থা করেছে, যার দাম পড়বে ৫০ কোটি ডলার। বিদেশ থেকে এত বড় অর্ডার ইতিপূর্বে কানাডা কখনও পায়নি। অস্ট্রেলিয়া থেকেও রাশিয়া ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ বুশেল গম আনার বন্দোবস্ত করেছে। কিন্তু তাতেও তার ঘাটতিপূরণ হবে না বলে সোভিয়েট ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম কেনার প্রস্তাব করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের এবার প্রায় ১০ শতাংশ খাদ্য কম হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সাহিত্য জগৎ

*** শারদীয় উপন্যাস ***

বাঙলা দেশের মানুষমাত্রেই শরৎকালের বৈচিত্র্যময়তায় আলোড়িত। বাঙালীর জীবনের সঙ্গে এর যোগ যে কত গভীর, তা বাঙলা দেশের মানুষমাত্রেই জানেন। দুর্গোৎসব-কেন্দ্রিক এই উৎসবে জীবনের এক আনন্দময় সত্তার অনিন্দ্য সুন্দর রূপটি স্বতঃধারায় বিকশিত হয়ে ওঠে।

প্রাচীন বাঙলা—মধ্যযুগের বাঙলা, আর একালের বাঙলা—তিন বাঙলা এই একটি ক্ষেত্রে আজও একবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দের উপকরণের পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের জীবনে পরিবর্তনের জোয়ার এনে দিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাঙালী আজও স্বীয় জাতি-বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে পারেনি। আনন্দঘন মুহূর্তে দীনতম আত্মা আপনার অন্ধকারাচ্ছন্ন আবাস থেকে হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে বেরিয়ে আসে। সুখী-স্বচ্ছল মানুষ আর অভাবী কোন ভেদ নেই। সকলেই এখানে এক। একই আনন্দের গতিধারায় প্রবাহিত।

এত কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। অনেকেই আরো ভালভাবেই এই কথাগুলো বলেছেন আগেই। গত বছরের অপ্রীতিকর ঘটনার আবহাওয়া মুক্ত হয়ে আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথে এগিয়ে যেতে পেরেছি—এটাই আমার কথাগুলি উল্লেখের প্রধান কারণ।

এখানে শারদ-সাহিত্য নিয়ে সংক্ষেপে একটি কথা বলতে চাই। বাঙলা দেশে ছাপাখানা উদ্ভবের বেশ কিছুকাল বাদেই মুদ্রিত আকারে শারদীয় উৎসব উপলক্ষে যে পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে, বর্তমান কালে তা আরো যুগোচিত রূপ লাভ করেছে। প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা-বৈচিত্র্যের সিঁড়িগুলো পেরিয়ে আমাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাটাতে হবে। এর মধ্যে বিশ্রামের অবকাশগুলি এক-একজন মানুষ এক-একভাবে কাটিয়ে দেয়। শারদীয় উৎসবের দিনে সকলের জন্য প্রকাশিত সুসজ্জিত পত্রিকাগুলি তাই আজ অবসর বিনোদনের প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে সকল মানুষের মনের মত বিষয়কে তুলে ধরবার একটা সযত্নপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

গত দশ বছরের মধ্যে পত্রিকার বাজারে পরিবর্তন ঘটেছে। বহু পত্রিকা বাজার যেমন ছেয়ে ফেলেছে, তেমনি লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

যাই হোক এ সমস্ত শারদ সংকলনে গল্প এবং উপন্যাসের চাহিদা ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে। কে কয়টি উপন্যাস প্রকাশ করল, কয়টি গল্প একটি পত্রিকায় আছে, তা পাঠক গভীরভাবে লক্ষ্য করে থাকেন। আর পত্রিকাগুলি দিনের পর দিন বিরাট কলেবরে প্রকাশের সূচনা দেখা দিয়েছে। শারদীয় পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত উপন্যাসগুলোকে শারদীয় উপন্যাস বলাই শ্রেয়। বর্তমান বছরে প্রকাশিতব্য উপন্যাসগুলি সম্পর্কে একটি তথ্য এখানে রাখছি পাঠকদের অবগতির জন্য।

শারদীয় উৎসব উপলক্ষে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ সুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন রচনার সমন্বয় এই পত্রিকাগুলির অন্যতম আকর্ষণ হল উপন্যাস। কোন্ পত্রিকায় সবথেকে বেশী এবং নামী লেখকদের উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে তা পাঠকেরা সাগ্রহে লক্ষ্য করে থাকেন। এবছরে প্রকাশিত এবং প্রকাশিতব্য পত্রিকাগুলির উপন্যাসের সংখ্যা মোটামুটিভাবে তুলে ধরছি। পাঠকসাধারণ সহজেই বাজারের হাল বুঝতে পারবেন এই তথ্যের সাহায্যে।

এর মধ্যে নামী অর্থাৎ যাদের বই বাজারে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়, এমন শ্রেণীর লেখকদের উপন্যাসের সংখ্যা হবে প্রায় পঞ্চাশ। তার মধ্যে এক-একজনের উপন্যাসের সংখ্যা হবে চার থেকে ছয়খানা। আবার কয়েকজনের সংখ্যা এক কিংবা দুই। এর পরের শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের সংখ্যা পঞ্চাশ তো হবেই, বরং কিছু বেশী হবেই হয়ত! তার পরবর্তী শ্রেণীর লেখকদের উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় পনেরোখানা।

অর্থাৎ আমার সংগৃহীত তথ্যে উপন্যাসের সংখ্যা এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে প্রায় এক শ'র কাছাকাছি।

*** কৃষ্ণকান্তের উইল ***

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বিখ্যাত প্রকাশক নিউ ডিরেকশন বেশ কয়েকদিন আগে প্রকাশ করেছেন। উনিশ শতকের বাঙলা তথা—ভারতীয় জীবনধারার যে পরিচয় এ গ্রন্থে উপস্থিত তা পাশ্চাত্য পাঠকসমাজে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় প্রকাশিত ভিক্টোরীয় যুগের এই 'চিত্রলিপি'র ইংরিজি অনুবাদ করেছেন জে সি ঘোষ। গ্রন্থটিতে একটি মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত হওয়ায় ইংরিজি পাঠক খুব সহজেই তৎকালীন বাঙলা—বঙ্কিমচন্দ্র এবং বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রয়োজনীয় ধারণা লাভ করবে।

*** অন্নদাশংকরের বিদেশ যাত্রা ***

শ্রীঅন্নদাশংকর রায় অক্টোবরের মাঝামাঝি বিদেশ সফরের উদ্দেশ্যে পশ্চিম জার্মানী যাত্রা করবেন। শ্রীযুক্ত রায়ের অনন্যসাধারণ ভ্রমণকথা 'জাপানে' ১৯৬২ সালের জন্য আকাদমি পুরস্কার পেয়েছে। বহু বৎসর আগে তাঁর 'পথে-প্রবাসে' গ্রন্থখানি বাঙলা দেশের মননশীল পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে নতুনত্বের স্পর্শে। এই মননশীল সাহিত্যিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমকালীন বাঙালী সাহিত্যস্রষ্টাদের থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। তিনি এমনই এক শিল্পজগতের নাগরিক যা সমকালীন বাঙলাদেশের সাহিত্য-গগনে অপর একজনের মধ্যে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সাহিত্যকে তিনি একাগ্র নিষ্ঠায় জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিনের সাধনায় শিল্পীর নির্লিপ্ততা তিনি অর্জন করেছেন।

শ্রীঅন্নদাশংকর রায়ের জন্ম ১৯০৪ সালের ১৫ মার্চ। আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিভিন্ন সরকারী কাজে জড়িত থাকবার পর অবসর নিয়ে বর্তমানে শান্তিনিকেতনে বাস করছেন। ১৩২৬-২৭ সালে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তে। তা হল **তিনটি প্রশ্ন** নামক টলস্টয়ের গল্পের অনুবাদ। গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পীমন বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রচিত গ্রন্থ : সত্যাসত্য (৫ খণ্ড), পথে প্রবাসে, আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা, অসমাপিকা, প্রকৃতির পরিহাস, ইসারা, আমরা, বিনুর বই, একটি বসন্ত, কন্যাবতী, কামনা পঞ্চবিংশতি, নতুন রাধা, রাখী, রাঙাধানের খৈ, দুঃখমোচন, জীবনশিল্পী, না, সুখ, কন্যা, রবীন্দ্রনাথ, মনপবন, যৌবনজ্বালা, মর্তের স্বর্গ, অপসরণ, অজ্ঞাতবাস, যার যেথা দেশ প্রভৃতি গ্রন্থ।

বিদেশী সাহিত্য

।। ভন ওয়াইক ব্রুকস প্রসঙ্গে ।।

ভন ওয়াইক ব্রুকস্ সম্পর্কে বর্তমান আমেরিকার তরুণ সমালোচকরা গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন না। কিন্তু ব্রুকসই প্রকৃতপক্ষে মার্কিণী সমালোচনা সাহিত্যের জনক। সাহিত্য সাধনার শুরু থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল কেমন করে সুস্থ সমালোচনার আবহাওয়া দেশের মধ্যে সৃষ্টি করা যায়। স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ।

সাহিত্য বলা সহজ—কিন্তু সার্থক সাহিত্যের স্রষ্টা হওয়া খুবই কঠিন একথা বারবার বলেছেন। নিজের দেশের সাহিত্যসম্ভারের উপযুক্ত সমালোচনায় এগিয়ে আসেন।

বয়স যখন খুবই অল্প তখন থেকেই ব্রুকস-এর মনে লেখক হওয়ার ইচ্ছা জাগে। ঔপন্যাসিক গল্পকার কবি হওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। সার্থক সমালোচক হওয়ার চেষ্টা তিনি সারাজীবনই করেছেন। এই গোপন ইচ্ছা ব্যক্তি মানুষ থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র থেকে সর্বজনীন রূপ লাভ করে। মার্কিণী সাহিত্য-জগতে সুস্থ সমালোচনার ছিল অভাব। এই অভাবকে দূর করবার জন্য তিনি দেশের সাহিত্যআকাশে নতুন প্রাণ সঞ্চারের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন কেমন করে সাহিত্যের জগতে সুস্থ সমালোচনার আবহাওয়া আনা যায়। তাঁর এ স্বপ্ন সার্থক হয়েছে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

১৯০৪-০৭ সালের কথা ব্রুকস তখন হার্ভার্ড-এর ছাত্র। ইউরোপীয় সভ্যতার ছোঁয়াচে আমেরিকার যুবক-সমাজ গভীরভাবে আলোড়িত। এখানে ব্রুকস তাঁর জীবনের বহু আমৃত্যু-সুহৃদ লাভ করেছিলেন। তাঁরা সকলে মনে করতেন কোন স্থায়ী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁরা জীবন্ত হয়ে থাকবেন। কিন্তু এই জন্মভূমিতে তাঁরা এমন কিছু পেতেন না যাতে কোন কিছু রচনা করে অমরত্ব লাভ করা যায়। তাই অনেকেই ইউরোপে চলে যেতে থাকেন। কেউ প্যারিস, কেউ লন্ডন, কেউ ইতালীতে ছুটলেন সত্যের সন্ধানে শিল্প-বস্তুর অনুসন্ধানে। জার্মানীতে গেলেন কেউ কেউ। নিউইয়র্ক থেকে ইউরোপ তাঁদের কাছে অধিকতর লেখার আবহাওয়াপূর্ণ জগৎ বলে মনে হয়েছিল। ব্রুকসও লন্ডনে গিয়ে সাংবাদিকের জীবনযাপন করেন কিছুকাল। তারপর তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন তেইশ বছর বয়সে। তারপরেই তিনি নিউ-ইয়র্কে ফিরে এলেন।

জীবনের প্রথম স্বপ্ন বা ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে আমৃত্যু সাহিত্য-সাধনা করেছেন ব্রুকস। আজকের মার্কিণী সাহিত্য জগতে যে নতুন পথ দেখা দিয়েছে তার জন্ম ব্রুকস্-এরই হাত দিয়ে। মাতৃভূমির ওপর দাঁড়িয়ে শিল্পের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগের বাণী প্রকাশে ব্রুকসই আমেরিকানদের কানে নিষ্ঠুর নাবিকের মত বার-বার ধ্বনিত করেছেন। যাঁরা ব্রুকস-এর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন একালে—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ব্রুকসই তাঁদের পথ দেখিয়েছেন কেমন করে সত্যকে চিনে নিতে হয়। প্রকৃত সমালোচনা কাকে বলে—তাও শিখিয়েছেন ব্রুকস্।

বহু পথে এগিয়ে গেলেও ব্রুকস বারবার একই লক্ষ্যে ফিরে এসেছেন। দুটি অধ্যায়ে যদি তার সাহিত্য-জীবনকে ভাগ করা যায় তাহলে প্রথম অধ্যায় হল ১৯০৯ - ১৯২৬। এঅধ্যায়ে নতুন সাহিত্যসৃষ্টির কথা তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বহুবার বলেছেন। সুকঠোর ভাষায় বারবার অক্ষম সৃষ্টির প্রতি আঘাত করেছেন। উপদেশ, ভর্ৎসনা, অবজ্ঞা বা ঘৃণার সাহায্যে অনেকের নিষ্করুণভাবে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। এ সময়ে রচিত তাঁর দুটি বিখ্যাত জীবনীর একটি হল **'দা অর্ডিয়াল অব মার্ক টোয়েন'** (১৯২০)। সে সময়কার প্রশ্ন, মার্কিণী সাহিত্যিকেরা স্বদেশে থাকবে না বিদেশে যাবে—তা বর্তমান গ্রন্থে অভিব্যক্ত। একজন শ্রেষ্ঠ মার্কিণ লেখক—স্বদেশে বসবাস করে প্রতিভার মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন স্থানীয় অপুষ্ট সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। **'দা পিলগ্রিমেজ অব হেনরী জেমস'** (১৯২৫)-এও ঐ একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—কারণ জেমস ছিলেন নিজের দেশের মানুষের নিকট সাহচর্য-বিচ্যুত। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্রুকস একথা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন যে দুজন লেখকই ভুল পথে চলেছিলেন। কারণ নিজের আত্মার সঙ্গে এ'দের যোগ ছিল না—স্বেচ্ছায় উপযুক্ত পথ ধরে অগ্রসর না হয়ে ভ্রান্ততার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

পরবর্তী জীবনে ব্রুকস পুরনো রচনাবলীর বারবার পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু কোথাও মূল বক্তব্যের পরিবর্তন করেন নি। মার্ক টোয়েন যেভাবে পরিবর্তন করেছিলেন তাতে মার্ক টোয়েন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অপরিবর্তিতই থেকেছে। কিন্তু হেনরী জেমস সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ব্রুকস্ নতুনভাবে জীবন গড়বার স্বপ্ন দেখলেন। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য বিগতজীবন থেকে ভিন্ন নয়। একই পথে এগিয়ে যাওয়া। চিরকাল তিনি যা ভেবেছেন যা করেছেন—অর্থাৎ মার্কিণী লেখকদের রচনার পরিচয় উদ্ঘাটন করা। কিন্তু অসুস্থতা বা যন্ত্রণার অধ্যায়ে ব্রুকসের মানসিক জগতে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। এ সময়ে মানসিকতার দিক থেকে মৃদু উপদেশের মধ্য দিয়ে সমালোচনার যে পদ্ধতি তিনি গড়ে তুলেছিলেন তার থেকে সরে পড়েন। একালের এই বিরোধী সত্তা গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও ব্রুকস অপরের ব্যর্থতায় আঘাত দিতে নিদারুণ ঘৃণা বোধ করলেন। ফলে স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে অবহেলিত বিগত মার্কিণ সাহিত্যিকদের রচনার প্রশংসা করবার জন্য নতুন করে কলম ধরলেন। এ সময়ে অসুস্থতা তাঁকে গভীর অধ্যয়নের জগতে নিয়ে যায়। কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত পাণ্ডিত্যের ওপর নির্ভর করে অর্জিত দ্বিতীয় সত্তার প্রভাবে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যেতে চাইলেন।

মেকার্স অ্যান্ড ফাইন্ডার্স-এর পাঁচটি খণ্ড দীর্ঘ উনিশ বছরের পরিশ্রমে রচিত। এক একখানি খণ্ডের জন্য প্রায় চার বছর সময় লেগেছে। দীর্ঘ এগারবার ঘণ্টা করে রোজ কাজ করেছেন এবং প্রায় পাঁচ হাজার বই পড়েছেন। প্রায় পাঁচ বছর ধরে এ সমস্ত বই অনেকের চোখেই পড়েনি।

মেকার্স অ্যান্ড ফাইন্ডার্স অসাধারণ গ্রন্থ, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে বিচার করা মার্কিণী সমালোচনা সাহিত্যে অনুপস্থিত। বর্তমান গ্রন্থে ব্রুকস এক নতুন সমালোচনা পদ্ধতির প্রবর্তন করে এক অসামান্য এবং অভাবিতপূর্ব কাজ করলেন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য। দীর্ঘকাল সমালোচনা-সাহিত্য ক্ষেত্রে গ্রন্থখানির অসামান্য উপযোগিতা স্বীকৃতি পাবে। ১৯৫২ সালে গ্রন্থখানি রচনা শেষ করে ব্রুকস নানাবিধ কাজ করতে এগিয়ে আসেন। ঐ গ্রন্থখানিতে যেন তাঁর সব বলা হয়নি। আরও দশখানি বই লিখলেন এগার বছরে। শিল্পী জন স্লোয়ানের জীবনী এবং আত্মস্মৃতির প্রথম খণ্ড লিখেছেন। সবগুলিও মেকার্স অ্যান্ড ফাইন্ডার্স-এর মূল মন্ত্রে প্রবাহিত। সুবিশাল বিস্তৃতি রয়েছে তাদের পটভূমিতে। ঘুমন এবং খাওয়ার মত নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল লেখা ব্রুকস-এর কাছে।

ব্রুকস তরুণ সমালোচকগণের দ্বারা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু এই অবহেলার এই বিদ্রুপের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, দুঃখবাদময় জীবনের এক অতিবেগনী রোগে আক্রান্ত অবহেলিত চরিত্র তিনি।
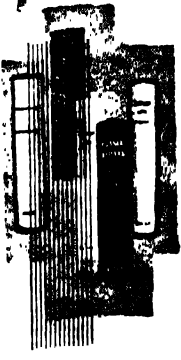
ইংরাজী সাহিত্যের ভারতীয় লেখক দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই বিশ্ব-সাহিত্যের মানচিত্রে স্থান পেয়েছিলেন, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলী' নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর ভারত জগৎ-সভায় আসন করে নিয়েছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবি দত্ত, তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু, হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল, স্বামী বিবেকানন্দ, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায়, মনমোহন ঘোষ প্রভৃতির সাহিত্যকর্ম বিদেশে সম্মান লাভ করেছে। শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী রচনা স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। জওহরলালজীর কথাও উল্লেখ্য। স্বাধীনতা-লাভের পর বিদেশে যে সব ভারতীয় লেখকের সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ হয়েছে তাঁদের মধ্যে মুলকরাজ আনন্দ, খাজা আহমেদ আব্বাস, ভবানী ভট্টাচার্য, খুসাবন্ত সিং, সুধীন্দ্র ঘোষ, কমলা মার্কণ্ডেয়, প্রবীর ঝাবভালা, আতিয়া হোসেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। An Autobiography of an unknown Indian— লিখে নীরদচন্দ্র চৌধুরী যথেষ্ট খ্যাতি ও অখ্যাতি লাভ করেছেন।

এই আলোচনায় এই জাতীয় কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া গেল। আগ্রহশীল পাঠক গ্রন্থগুলি সন্ধান করে পড়লে আনন্দ পাবেন। ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্য যে নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয়, তা বোঝা সহজ হবে।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী খাজা আহমেদ আব্বাসের উপন্যাস 'ইনকিলাবে'র উপজীব্য। এই উপন্যাসটি এ দেশে 'জয়কো' নামক প্রকাশকও সুলভে বিক্রী করছেন। দিল্লীর মুসলিম সমাজের আট বছরের ছেলে আনোয়ার, (তখন তিলক, মহম্মদ আলি-সৌকত আলির যুগ), আনোয়ারের বাবা প্রথমবার জেল খেটে পরে হিন্দু-মুসলিম মতভেদ হেতু কংগ্রেস থেকে সরে পড়লেন। আনোয়ার কংগ্রেস আঁকড়ে বসে রইলেন। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী কম্যুনিস্টরা তাঁর বন্ধু। গান্ধিজী, জওহরলাল, সুভাষ বোস, বাদশা খান প্রভৃতির কথাও আছে। মীরাট ষড়যন্ত্রের উল্লেখ আছে। আনোয়ারকে ইতিহাসের পটভূমিকায় খাড়া করিয়ে লেখক কর্তব্য শেষ করেন নি। ভাবপ্রবণ তরুণের জীবনদ্বন্দ্ব এবং ঘাত-প্রতিঘাত চমৎকার ভাবে রূপায়িত। সালমা মেয়েটির প্রতি আনোয়ারের প্রেম এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত। অবশেষে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পটভূমিতে উপন্যাসের শেষ। আনোয়ারের বয়স তখন একুশ।

শ্রীমতী কমলা মার্কণ্ডেয় রচিত SOME INNER FURY বা চাপা আগুন ছেপেছেন বিলাতের 'পুটনাম'

নামক প্রকাশ-প্রতিষ্ঠান। দাম পনের শিলং। জমিদার-বংশের মেয়ে মীরা-বাই এই উপন্যাসের নায়িকা। এক ইংরেজ যুবকের সঙ্গে তার প্রেম! ভায়ের বিবাহ ও ভ্রাতৃবধূর চরিত্রের ক্রম-বিকাশ প্রভৃতির সমন্বয়ে উপন্যাসটি বিচিত্র হয়ে উঠেছে।

মহীশূরের দেওয়ান স্যার মির্জা ইসমাইল ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ মনীষী। প্রাক-স্বাধীনতা ও তৎপরবর্তী কাল সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জীবনের কথা তিনি লিখেছেন MY PUBLIC LIFE নামক গ্রন্থে। গ্রন্থটির প্রকাশক—জর্জ এ্যালেন এ্যাণ্ড আনউইন। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি মহীশূরের দেওয়ান নিযুক্ত হন। পনের বছর এই পদে থাকার পর চার বছর জয়-পুরের প্রধানমন্ত্রিত্ব করেন। ১৯৬৪-এ হায়দ্রাবাদের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ শুধু ডায়েরী নয়। ভারতীয় রাজন্যবর্গের অব-লুপ্তি, ইংরাজী ভাষার পরিণাম, মধ্য-প্রাচ্য ও ভারতবিভাগ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বিশেষ কৌতূহল জাগায়। রাজনীতি ও আত্মস্মৃতি পাঠে যাঁদের আগ্রহ আছে এই গ্রন্থ তাঁদের ভালো লাগবে।

বেগম আতিয়া হোসেন ভারতীয় ঐতিহ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব তাঁর কাহিনীতে রূপায়িত করেছেন তাঁর PHOENIX FLED নামক গ্রন্থে। এই গল্প-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন চ্যাটো এ্যাণ্ড উইনডাস, দাম দশ শিলিং ছ পেন্স। বারোটি গল্পে আতিয়া হোসেন মূলতঃ স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব নিয়ে গল্প লিখেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী উগ্র পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন আর স্ত্রী প্রাচীন ঐতিহ্যের রক্ষণশীল প্রহরী। বেগম আতিয়া হোসেন এখন চলে গেছেন পাকিস্থানে। ইংরাজী ভাষায় রচিত এই গল্পের মধ্যে যুদ্ধোত্তরকালীন ইংরাজ সাহিত্যিকদের প্রভাব পাওয়া যায়।

বিদেশী ভাষায় যে সব ভারতীয় লেখক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের কাহিনীর ভিত্তি ভারতীয় ঘটনা। আর কে নারায়ণ, শকুন্তলা শ্রীরঙ্গম, সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

শ্রীমতী প্রবীর ঝাবভালা TO WHOM SHE WILL নূতন দিল্লীর রাজধানী শহরের শ্লেষা-ত্মক উপাখ্যান। এ গ্রন্থের প্রকাশক এ্যালেন এ্যাণ্ড আনউইন। প্রফেসর বুখ, লেডী রামপ্রসাদ আর শ্রীমতী ডাঃ মুখার্জি অতিশয় পরিচিত চরিত্র।

শকুন্তলা শ্রীরঙ্গেশের প্রথম উপন্যাসের নাম THE LITTLE BLACK BOX এই গ্রন্থের প্রকাশক সেকর এন্ড ওয়েবার্গ, দাম বার শিলিং ছ পেন্স। উপন্যাসের নায়িকার নাম সরলা। সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে। শেষ দৃশ্যে সরলার আত্মীয়রা এসে দেখেছে সে কালো বাক্সে কি রেখে যাচ্ছে।

সুধীন ঘোষের গ্রন্থ THE FLAME OF THE FOREST -এর অন্নপূর্ণা কার্লহিনের আঁকা ছবিগুলি চমৎকার।

আর কে নারায়ণের লেখক হিসেবে খুব নাম। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম WAITING FOR THE MAHATMA মথুয়েন এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। নারায়ণ রচিত AN ASTROLOGER'S DAY গ্রন্থটিও বিখ্যাত। ভারতকে পটভূমি করে যে সব গ্রন্থ বিরচিত হয়েছে স্বাধীনতার পর, নিঃসন্দেহে 'মহাত্মার জন্য প্রতীক্ষা' গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ। সরল কাহিনী, নগণ্য তথ্য কিন্তু অপূর্ব শিল্পচাতুর্য ও রচনা-শৈলী। কুড়ি বছর বয়সের অনগ্রসর সমাজের মানুষ নায়ক শ্রীরামের ঠাকুরমা তার জন্য অনেক টাকা জমিয়ে রেখে-ছিলেন, বড় হয়ে এই ছেলে প্রেমে পড়ল দৃঢ়চেতা ভারতীর, সে গান্ধিজীর শিষ্যা। তার পাল্লায় পড়ে শ্রীরামও গান্ধীভক্ত হল। উভয়ের পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক এই-ভাবে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে গান্ধিজীর মালগুদির ভ্রমণকাহিনীর পটভূমি আছে।

খুসোবন্ত সিং দিল্লীর বিখ্যাত কনট্রাক্টর শোভা সিং-এর পুত্র, ধনীর সন্তান। ইংরাজী শিক্ষা তাঁর সার্থক হয়েছে, তাঁর ইংরাজী অতিশয় মাধুর্য-মণ্ডিত এবং খাঁটি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের নাম TRAIN TO PAKISTAN। এই গ্রন্থের প্রকাশক চ্যাটো এ্যান্ড উইনডাস, দাম বারো শিলিং ছ' পেন্স। খুসোবন্ত সিং-এর এই উপন্যাস উচ্ছ্বাসহীন, অতি-নাটকীয়ত্ব বর্জিত। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার বশে যাঁরা মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন নি তিনি এই উপন্যাসে তাঁদের কথা বলেছেন। পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়। শিখ কিষাণদের শক্তি ও দুর্বলতা কোথায় তা তাঁর জানা আছে। কম্যুনিস্ট বিদগ্ধ মনীষী ইকবাল চরিত্রটির প্রতি তিনি অবশ্য অবিচার করেছেন। খুসোবন্ত সিং-এর বৈশিষ্ট্য চরিত্র-চিত্রণে। ঘটনা-সংস্থাপনের গতিবেগ অতি দ্রুত লয়ে চললেও হৃদয়গ্রাহী। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হুকুমচাঁদের শান্তিরক্ষার চেষ্টা এবং সংকটত্রাণে নায়ক জগজিৎ সিং-এর নানা-বিধ প্রচেষ্টা বিশেষ কৌশলসহকারে লিপিবদ্ধ। আধুনিককালের এত বড় বিপর্যয়ের ইতিহাসও অতি-নাটকীয়তায় আচ্ছন্ন হয়নি, এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

পণ্ডিচেরী থেকে কিছুকাল আগে, সম্ভবতঃ ১৩৬৩-তে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের অনূদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' (Songs of Vidyapati)। শ্রীঅরবিন্দ অনূদিত এই খণ্ডে বিদ্যা-পতির একচল্লিশটি পদ আছে, প্রাচীন সংস্করণ থেকে শ্রীঅরবিন্দ কবিতাবলী ভাষান্তরিত করেছেন। প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে আছে যে শ্রীঅরবিন্দ ইংলণ্ড থেকে ফিরেই এই কবিতাবলী অনুবাদ করেন। কিন্তু এই যদি শ্রীঅরবিন্দের প্রথম জীবনের রচনা হয়, তাহলে তিনি কালিদাসের ঋতুসংহারের ভূমিকায় যা লিখেছেন সেই কথা এখানেও প্রযোজ্য—"early works of a poet are even more interesting to a student of his evolution than his later masterpieces"

পরিশেষে বক্তব্য এই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ নয় আংশিক পরিচয় মাত্র।

কয়েকটি গল্পের একটি সংকলন

একশো সাত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই গল্প-সংগ্রহে লেখকের সাতটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে। অধিকাংশ গল্পই মোটামুটি সুলিখিত এবং সুচিন্তিত। তবে দু-একটি গল্পে ভাষার আড়ষ্টতা বা চরিত্র-গঠনে শিথিলতা সচেতন পাঠক-মনকে বারবার আঘাত করে। ১৯৪৪-৪৬-এর বাঙলা দেশের পট-ভূমিতে লেখা প্রথম পাঁচটি গল্পে লেখকের সমাজ-সচেতন মন এবং মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। 'মহাযুদ্ধের পরে' এবং 'কংসের দুধ লাগে মামলা করতে?' গল্প দুটি বেশ সুখপাঠ্য।

সুধীর মৈত্র অঙ্কিত প্রচ্ছদটিও সুন্দর।

মহাযুদ্ধের পরে— (গল্প-সংগ্রহ)— কৃষ্ণ চক্রবর্তী। প্রকাশক : স্মরণি পরিবেশক : বিহার সাহিত্য ভবন প্রাঃ লিমিটেড। ৩৭এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম : দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

●

।। নতুন লেখকের গল্প ।।

অমিতাভ বসু নতুন লেখক। তাঁর গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায় বলেছেন—"শ্রীমান অমিতাভ একালের জীবনের নানাদিক দেখতে চেয়েছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর মন সজাগ ও সচেতন।" এই সজাগ ও সচেতন মন নিয়ে লেখক যে কটি গল্প লিখেছেন তার মধ্যে শক্তির পরিচয় আছে। নতুন লেখকের রচনাকে আমরা উৎসাহদান করছি, অধিকতর অনুশীলন এবং পরিশ্রম

দ্বারা তিনি সার্থকতালাভ করবেন আশা করি।

এক মন বহু রঙ— (ছোটগল্প)—অমিতাভ বসু। পরিবেশক—পপুলার লাইব্রেরী। ১৯৫।১বি, বিধান সরণী। কলিকাতা—৬। দাম—দুই টাকা।

●

বাইবেলের দেশ

ঈশ্বরপুত্রের স্মৃতিতে পবিত্র প্যালেস্টাইন দেশ। বাইবেলের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল এই স্বল্পপরিসর বন্ধুর ভূমিখন্ডে। এই ভূখন্ডেই অবস্থিত পূত নগরী যিরুশালেম। খৃষ্টধর্মীদের নিকট পরিচিত ডেনিস ব্যালি রচিত 'প্যালেস্টাইন অ্যান্ড দা বাইবেল' গ্রন্থের অনুবাদ 'বাইবেলের দেশ' গ্রন্থে প্যালেস্টাইনের বাইবেলানুগ ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিশিষ্ট এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে বাইবেলের ঘটনাসমূহের সম্যক অনুধাবন ও উপলব্ধির জন্য এই ঘটনাবলী যে প্রাকৃতিক পরিবেশে সংঘটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এবং এদিক থেকেই আলোচ্য গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব।

অনুবাদকের বাগ্‌বিন্যাস স্বচ্ছ এবং অনাড়ম্বর। এ জাতীয় রচনার এটাই প্রধান গুণ। মানচিত্রগুলি এবং পরিশেষে সন্নিবিষ্ট স্থান ও বাইবেলে উল্লিখিত অংশের তালিকা গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছে।

বাইবেলের দেশ (প্রবন্ধ) ডেনিস ব্যালি। সুবোধবিকাশ দত্ত কর্তৃক অনূদিত। বেঙ্গলী থিওলজিক্যাল লিটরেচার কমিটি, কলিকাতা। মূল্য : দুই টাকা।

●

।। **লালদীঘির কাহিনী** ।।

তারকদাস চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে কৌতুকপুরের রূপকথা লিখে যথেষ্ট প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। 'দশটা-পাঁচটার ডালহাউসী' তাঁর নতুন উপন্যাস। এই উপন্যাসে অফিসপাড়ার জীবনের আশ্চর্য বাস্তব রূপে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। অফিসপাড়ায় বাঙালী মেয়েদের আবির্ভাব এবং তারপর কখন মেয়ে-পুরুষ সমান হয়ে গেল, উভয় শ্রেণীই ট্রামে-বাসে ঝুলতে শুরু করল, জীবন একাকার হয়ে গেল। সুধাময়বাবুরা খোকার ভাতে নেমতন্ন খেয়েও অরুণাদের কথা রাখেন না। ইউনিয়নের প্রকাশ বোস—ইত্যাদির সহযোগে এমন একটি সুন্দর কেরানীজীবনের ছবি ইদানীংকালে আর চোখে পড়েনি। লেখকের চরিত্র-চিত্রণের ও খুঁটিনাটি ঘটনা বিন্যাসের শক্তির পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত হয়েছি। এই উপন্যাসে অনেক পরিচিত মানুষ পাওয়া যাবে।

দশটা-পাঁচটার ডালহৌসী— (উপন্যাস)— তারকদাস চট্টোপাধ্যায়। পুঁথিঘর ।। ২২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ।। দাম—তিন টাকা প'চাত্তর নয়া পয়সা।

●

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

বৈতানিক—(বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা) সাহিত্য সংকলন। সম্পাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স্ প্রাইভেট লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : এক টাকা।

মননশীল সাহিত্য-পত্রিকা হিসেবে ভবানী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈতানিক' চিন্তাশীল সাহিত্য-পাঠকবর্গের কাছে যে বিশিষ্টতা এবং মর্যাদা অর্জন করেছে, বর্তমান বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা তা' সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সম্পাদকের সুনিষ্ঠ সম্পাদনায় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বেদান্তবাদ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষীবৃন্দ অধ্যাপক এবং সাহিত্যিকের কয়েকটি মূল্যবান রচনা এ-সংকলনটির গুরুত্ব এবং মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া ফ্র্যাঙ্ক দ্যোয়াক অঙ্কিত পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তৈলচিত্র এবং স্বামীজী সম্পর্কে কবিগুরুর একটি পত্রাংশের চিত্রসহ বিভিন্ন সময়ের বিবেকানন্দের সাতখানি চিত্র এ-সংকলনটির আর এক অমূল্য সম্পদ।

এই মূল্যবান সংকলনটির বহুল প্রচার কামনা করি।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কবির গান

(১১)

।। তিন ঠাকুরদাস ।।

তিন ঠাকুরদাসের মধ্যে ঠাকুরদাস সিংহের কথা প্রথমে বলছি। কবিওয়ালা আন্টনি ফিরিঙ্গী যাঁর 'বাপের জামাই' হয়ে কুর্তি টুপি ছেড়েছেন বলেছিলেন সেই 'ঠাকরে সিং' অর্থাৎ ঠাকুরদাস সিংহ যে খুব খ্যাতিমান কবিওয়ালা ছিলেন তা নয়। আন্টনিকে তিনি (বা রাম বসু?) যে কোন্ শুভক্ষণে একদিন জিগ্যেস করে ফেলেছিলেন, 'এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই' —তারই ফলে তিনি অমর হয়ে গেলেন। আসলে তাঁর প্রশ্নের জন্যে তিনি ততটা স্মরণীয় নন যতটা প্রতিপক্ষের উত্তরের জন্যে। গাল খেয়ে মৃত্যুঞ্জয় হবার এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

ঠাকুরদাস সিংহের জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস অজ্ঞাত। তবে তিনি যে রাম বসুর সমসাময়িক তার প্রমাণ পাচ্ছি এবং রাম বসু যে ১৮শ শতকের শেষপাদ থেকে ১৯শ শতকের দ্বিতীয় পাদের প্রথম দিক পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন তা আমরা আগে লক্ষ্য করেছি। ঠাকুরদাস সিংহকে ওই সময়ের মধ্যে ফেললে খুব ভুল হবে না।

প্রত্যুৎপত্তির জন্যে তাঁর খুব সুনাম ছিল বটে কিন্তু তাঁর কবিকর্মের নিদর্শন অতি বিরল। ঠাকুরদাসের রচনা বলে প্রচলিত একটি গান এই :

আমারে সখি ধর ধর।
ব্যথার ব্যথিত কে আছে আমার।
পথশ্রান্তে নহি গো কাতর,
হৃদে নবঘন দলিতাঞ্জন বরণ,
উদরে অবশ শরীর।
অঙ্গ থর থর কাঁপিছে আমার,
আর না চলে চরণ।
সেই শ্যাম প্রেমভরে পুলক অন্তরে,
সম্বরা যে ভার অম্বর ।।
হায় সে যে কটাক্ষের অপাঙ্গ ভঙ্গিম
বয়ান করে তা কি কব।
লেগেছে যাহারে প্রবেশি অন্তরে
সেই সে বুঝেছে ভাব ।।

কুলশীল ভয় লজ্জা তায় যার
না রাখে জীবন আশ।
তার জলে বা স্থলে বা অন্তরীক্ষে কিবা
সন্দেহ নাহি মরিবার ।।

ব্রজসুন্দর সান্যাল ঠাকুরদাস সিংহের রচনা বলে আরও একটি গানের উল্লেখ করেছেন। সেটি এই :

যতনে মম প্রাণ
প্রেয়সি করেছি তোমায় সমর্পণ।
তোমারি প্রেমে আমি বিক্রীত
অন্যের নহি কদাচন ।।
কেমন পুরুষের কপাল বুঝিতে নারি
তোমার নারী জাতির স্বভাব
কেবল অ-ভাব করা প্রাণ
এ ভাব শিখালে বল শুনি কে তোমায়।
অন্য কারো নই শুনলো রসমাই
মিছে দোষ দাও কেন আমায়।
অন্যের যদি হতাম
তবে তোমায় নাহি তুষিতাম
হরি লয়ে মন, যশ কর না এ কি দায় ।।
নারীর স্বভাব দোষে নাগরকে
নিবৃত্তি না মানে কথায়।
তার প্রত্যক্ষ দেখ সীতা সুন্দরী
রামকে বললেন, মৃগ দাও আমায় ধরি।
গেলেন কুটির ত্যেজে সীতার কথায়
রঘুনাথ
তবু লক্ষ্মণে দুষলেন সীতা
পুনরায় ।।

গানটি ঠাকুরদাসের নামে চললেও মালিকানা নিয়ে মতভেদ আছে। কারও কারও ধারণা এ-গান রাম বসুর রচিত।

।। ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ।।

আর একজন ঠাকুরদাসের পদবী চক্রবর্তী। এঁর জন্ম হয় ১৯শ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে। ওই শতকের ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। কবিওয়ালাদের প্রসঙ্গে ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর নাম শোনা গেলেও তিনি খাঁটি কবিওয়ালা ছিলেন না। তিনি নিজে কোনো দল গড়েন নি, পরের দলের জন্যে গান লিখে দিতেন। তাঁর একটি গান এই :

বল সই কি কথা
ভাবের অন্যথা নাহিক আমার।
তবে কর্মান্তরে হলে স্বতন্তর
তুষতে নারি প্রাণ তোমার।
তা বলে ভেব না প্রিয়ে আমার পর।
আমি নহি তো পরের প্রাণ
তুমি না পরের প্রাণ
তোমারি বাঁধা নিরন্তর।
পরের নিন্দা করা কেমন স্বভাব রমণীর
পুরুষ প্রাণ দিলেও নারী সুযশ
করে না।

কও কে শেখালে হে তোমারে এমন
ঘরভাঙ্গা মন্ত্রণা।
বিনা দোষেতে দুষো না।
সুখের প্রেমে দুখ দিয়ো না
মিছে অপযশ করলে ধর্মে সবে না।

ঠাকুরদাস সিংহের দ্বিতীয় গানটির সঙ্গে এর কয়েক ছত্রে বেশ মিল আছে। যেমন,

সিংহ।— এ ভাব শিখালে বল শুনি
কে তোমায়।
চক্রবর্তী।— কও কে শেখালে হে
তোমারে এমন।
সিংহ।— হরি লয়ে মন যশ কর না
এ কি দায় ।।
নারীর স্বভাব দোষে নাগরকে
নিবৃত্তি না মানে কথায়।
চক্রবর্তী।—পরের নিন্দা করা কেমন
স্বভাব রমণীর
পুরুষে প্রাণ দিলেও নারী সুযশ
করে না।

বাঙালীর গান ও প্রাচীন কবি-সংগ্রহ গ্রন্থে ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর রচিত বলে কয়েকটি গান তোলা হয়েছে। এর মধ্যে দু-একটি গান নিতান্ত মন্দ নয়। যেমন,—

একবার বলিস তো, আসতে বলি
মাধবকে
প্যারী, তোর সম্মুখে।
ওই দ্যাখ্ কালিয়ে, কুঞ্জের বাহিরে
দাঁড়ায়ে,
কেঁদে বলতেছে—'দয়া কর রাধিকে'।
প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে, নিকুঞ্জের নিকটে
হেরিয়ে বৃন্দে শ্রীমতীরে কয়।
রাধে কেঁদেছে যার আশাতে নিশিতে
সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।
কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মাণ, তাহে লজ্জা ভয়,
মুখে আধ-আধ ভাষা, গললগ্নবাসা,
কাতর মাধব অতিশয়।
দেখে রূপের চাঁদ পাছে রাই হয় উন্মাদ
কৃষ্ণ আগে তাই দিলেন আমাকে।
যদি স্বেচ্ছা হয় বলগো প্রধানা
গোপিকে।

কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত।
যেন গ্রহণান্তে শশী উদয় হল আসি
সর্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত।
নাহি সর্বাঙ্গে সুযোগ হলে কলঙ্কের দাগ,
নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদমুখে ।।

।। ঠাকুরদাস দত্ত ।।

ঠাকুরদাস সিংহ ও ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ছাড়া একজন ঠাকুরদাস দত্তের নামও পাওয়া যায়। ১২০৮ সালে (ইং ১৮০১) হাওড়া জেলার ব্যাটরা গ্রামে এ'র জন্ম হয়। বাবার নাম রামমোহন দত্ত। রামমোহন ফোর্ট উইলিয়মে চাকরি করতেন। তাঁর অবস্থা বেশ , সচ্ছল ছিল। তাই ছেলের পড়াশোনার ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ছেলের ঝোঁক ছিল লেখাপড়ার চেয়ে গানের দিকেই বেশী। তাই পড়াশোনা বেশীদূর এগোল না। অবস্থা বুঝে রামমোহন ছেলেকে ফোর্ট উইলিয়মেই একটি চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু গানে যাকে পেয়েছে চাকরিতে তার মন বসবে কেন। যাত্রা বা পাঁচালির নাম শুনলেই তিনি আফিস কামাই করতেন। রামমোহন বাবা-বাছা থেকে শুরু করে খড়ম পর্যন্ত যাবতীয় উপায় প্রয়োগ করে দেখলেন কিন্তু পুত্রের অধ্যবসায়ের কাছে পরাস্ত হয়ে শেষপর্যন্ত তাঁকে হাল ছাড়তে হল। ওই সঙ্গে পুত্রও চাকরি ছাড়লেন। চাকরি ছেড়ে তিনি এক গানের দল গড়লেন। এর কিছুদিন পরেই রামমোহনের মৃত্যু হল।

ব্রজসুন্দর সান্যাল বলছেন, এই রামমোহনের সঙ্গে রাম বসুর বন্ধুত্ব ছিল। রামমোহনের মৃত্যুর পর বন্ধুপুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ তিনি কখনো কখনো ঠাকুরদাসের দলে এসে গান করতেন। তাঁর মত,—এই ঠাকুরদাস দত্তের দলে গান করতে করতেই রাম বসু অ্যান্টনিকে প্রশ্ন করেছিলেন—'গায়ে কেন কুর্তি নেই'। কিন্তু সেটা কেমন করে হবে? অ্যান্টনির উত্তরে 'ঠাকরে সিংহের' কথা ছিল 'ঠাকরে দত্ত'-এর কথা তো শোনা যায় না, পাঠান্তর আছে বলেও এ পর্যন্ত কোনো গবেষক উল্লেখ করেন নি। আসল কথা, ঠাকুরদাস সিংহের সঙ্গে ঠাকুরদাস দত্ত মিশে যাওয়ায় একটু গণ্ডগোল ঘটেছে।

ঠাকুরদাস দত্ত খাঁটি কবিওয়ালা ছিলেন না। তবে কবি ছিলেন তার প্রমাণ আছে। পাঁচালীকার হিসাবে ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইনি প্রথম যে দল গড়লেন সেটি একটি যাত্রার দল। এই দলে বিদ্যাসুন্দরের পালার অভিনয় হত। তাঁর দলে মালিনী মাসী সাজতেন ব্যাটরার উমেশ মুখুজ্যে। ঠাকুরদাসের নিজের লেখা পালাগানের অভিনয়ও এখানে হত। বঙ্গভাষার লেখকে বলা হয়েছে 'লক্ষ্মণ বর্জন পালা' এখানে অভিনীত হয়েছে।

ঠাকুরদাসের যাত্রার দল বছর তিনেক পরেই ভেঙে গেল। তখন তিনি অন্যান্য শখের দলের জন্যে পালাগান রচনা করতে আরম্ভ করলেন। বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে তাঁর রচিত পালাগানের একটি বৃহৎ তালিকা দেওয়া হয়েছে।

যাত্রার দলের পর তিনি একটি পাঁচালির দল গড়লেন। এই দলের সুখ্যাতি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছিল। পাঁচালীর সঙ্গে কবির গানের অনেক বিষয়ে মিল আছে। "কবিওয়ালাদিগের ন্যায় পাঁচালী-দলেও সংগীত সংগ্রাম চলিত, প্রতিদ্বন্দ্বী দল থাকিত।" ঠাকুরদাস দত্তের কবিত্বের একটু নমুনা দিই :

এই যে ছিল কোথায় গেল কমলদল-
বাসিনী।
লোকলাজ ভয়ে বুঝি লুকাল
শশিবদনী ।।
কোথায় গেল সে সুন্দরী
কোথায় লুকাল সে করী
এ মায়া বুঝিতে নারি, সে নারী কার
কামিনী
যে দেখেছি কালিদহে
জাগিছে রূপ হৃদয়ে
অপরূপ এমন মেয়ে দেখিনে কোথায়।
এখন সে কালিদয়
হেরি সব শূন্যময়
কেবল জলে জলময়, কোথায় সে
করী-ধারিণী ।।

ঠাকুরদাসের কবিত্বের আর একটি নিদর্শন দিচ্ছি তাঁর 'কলঙ্কভঞ্জন' পালা থেকে। গানটি এই :

যা জান তাই কর নাথ, আমি ত
চলিলাম জলে।
বড় লজ্জা পাবে হরি দাসী তোমার
লজ্জা পেলে ।।
চললাম লয়ে ছিদ্র ঘটে
যদি কোন ছিদ্র ঘটে
গলেতে ঘট বেঁধে ঘাটে ত্যজিব প্রাণ
কৃষ্ণ বলে ।।
একে বুঝি শূন্য ঘটে
অঘটন ঘটনা ঘটে
যদি পড়ি হে সংকটে রেখো হে সে
সময় ৷ হলে]।
কমলিনীর হৃদকমলে
দাঁড়াও একবার বামে হেলে
দেখে যাই যমুনার জলে দেখি কি
ঘটে কপালে ।।

একটু মোটা সুরের নমুনা তুলছি ভয়ে ভয়ে নইলে কবির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না। বঙ্গের কবিতা থেকে উদ্ধৃত করছি :

"কিছুকাল পূর্বে তারকেশ্বরের এক মোহন্ত কুৎসিত মোকদ্দমায় হারিয়া কারাগারবাসী হইলে বঙ্গের একটা গান উঠিয়াছিল :

মোহন্তের তেল নিবি যদি আয়।
এ তেল এক কৌটা দিলে,
টাক ধরে না চুলে
কাণায় চোখে দেখতে পায় ।।
বিলাতী ঘানি নূতন আমদানী—
শিবের ষাঁড় জুড়েছে, তেলে তোলে
কামিনী—
হয়েছে ন্যাজে গোবরে যুব, কখন কি
দায় ঘটায়!
গানের অন্তরাটি জুড়িয়াছেন ঠাকুরদাস।"

দীপ্ত রঙ্ ঝরে যায়

রাম বসু

দীপ্ত রঙ ঝরে যায়
বিবর্ণ শ্রমের শেষে আকাশ এখন
সমর্পিত অন্ধকার
বিরল নক্ষত্র ওই মণি হবে গাছের চূড়ায়
এবার আতুর বিশ্বে আপনাকে মেলে ধর হ্রদ।

যা তুমি জানো না,—সেই বিশ্বস্থ মুখোস
আর নেই; আর নেই প্রয়োজন, প্রতিজ্ঞা, গণিত।
উদ্ভিদ, শামুক, পাঁকে স্থির মুখখানি
—হারানো গানের কলি
খুঁজে পাবে নিঃস্বতার পায়।

দীপ্ত রঙ ঝরে যায়, ঝরে যায়, ঝরে ঝরে যায়
হৃদয়, সময়, মহাশূন্যে অগ্নিময় কণা
জ্বালায় না কিছু, শুধু নিজে জ্বলে
জ্বলে, জ্বলে, অবস্থান খুঁজে নিতে যায়।
আশা সব ভয় হয়, সম্ভাবনা সব
হাঁসের মতন তারা জল ঝাড়ে পাড়ের ওপর।

এবার আতুর বিশ্বে চিনে নাও হ্রদ
ধ্বংসের চেয়েও তীব্র, স্বচ্ছ শান্ত অশ্রুর মতন
সেই স্তব্ধতা, বিভূতি, তোমার শরীর।

তাকে সিক্ত হতে দাও
তাকে ডুবে যেতে দাও তুমি
স্বরূপে, অর্পণে, পায়ে, চিহ্নহীনতায়
হৃদয়ের আবর্তনে, আকাশে পাতালে
একাকার বীজে ও পল্লবে।

এবার আতুর বিশ্বে আপনাকে তুলে ধর হ্রদ।

নির্বান্ধব কানন

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

প্রস্ফুটিত পদ্মসম তব মুখকান্তির মহিমা
এখনো স্মরণপথে ইতস্তত বিকীর্ণ সৌরভ,
শোণিতে তৃষিত দৃষ্টি লাবণ্যের শরীরী প্রতিমা
দগ্ধ করে। দূরবর্তী নদীতটে ভাসমান শব।
আমি যে আমার মধ্যে স্ফুরিত আঁখির সন্নিপাত
অনুভব করি যথা ধারাজল প্রথম শ্রাবণে,
মৃত অরণ্যের ছায়া পরিপূর্ণ তোমার আননে
গুপ্তচরের মতো ক্রিয়াশীল। বধির প্রপাত।

যদ্যপি তোমার মুখ অনুপম, শ্লথ বক্ষদেশ,
যৌবনের অপরাহ্ণ ম্লান রৌদ্রে; সুরভিসঙ্কেতে
কেশরাশি ভেসে যায় খরজলে : ভস্ম অবশেষ
ক্রমশ বিদীর্ণ তব অবয়বে। আমি হাত পেতে
কিছু ফুল নিতে চাই। দগ্ধ করে অরণ্যের সীমা
দৃপ্ত হোমবহ্নিসম তব মুখকান্তির মহিমা।

কবি কামিনী রায়

অমিয়সূদন ভট্টাচার্য

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি কামিনী রায়ের জন্ম ১৮৬৪ সালের ১২ই অক্টোবর। বর্তমান সংখ্যায় কবির জন্মশত-বার্ষিকীর সূচনা উপলক্ষে তাঁর কবিতা সম্পর্কিত এই আলোচনাটি প্রকাশিত হল।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ১৮৮৯ সালের ১লা নভেম্বর "কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভূমিকা সহিত" একখানি কবিতা-গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করিল। কাব্যের নাম আলো ও ছায়া। কবির নামটি কি? পাঠক সমগ্র বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিল, পাইল না। কি আশ্চর্য, কাব্যগ্রন্থে কবিরই নাম নাই! তবে কি ছাপাখানার ভুলের জন্যই কবিকে দন্ড পাইতে হইল?—না, তাহা নয়। পরের বছরই তো দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। তাহার পর তৃতীয় চতুর্থ, ১৯০৯এ পঞ্চম, ১৯২৫এ অষ্টম সংস্করণ। কিন্তু কোন সংস্করণেই কবির নাম মুদ্রিত হয় নাই। ইহার মূল কারণ, কবিই স্বীয় নাম গোপন রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তৎকালীন পাঠক অবশ্য কবির নাম সংগ্রহ করিতে বিলম্ব করেন নাই। কিন্তু বিপদ ঘটিয়াছে এ যুগে। আজিকার পাঠক এই সংগৃহীত নামটি পুনরায় হারাইয়া ফেলিয়াছে।

কামিনী রায়

এককালে আলো ও ছায়া বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল কিন্তু বর্তমানে তাহা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থতালিকার অন্তর্গত। বইটির খোঁজে লাইব্রেরীতে আসিতে হইল। কলিকাতার নাম করা বড় লাইব্রেরী। ইনডেক্স দেখিয়া কামিনী রায় নামটি বাহির করিলাম। নামের তলায় তাঁহার রচিত গ্রন্থ নির্মালা, পৌরাণিকী, গুঞ্জন, ধর্মপুত্র, অশোক-স্মৃতি, শ্রাদ্ধিকী, মাল্য ও নির্মাল্য, অশোক-সঙ্গীত, অম্বা, সিতিমা, বালিকা শিক্ষার আদর্শ, ঠাকুরমার চিঠি, দীপ ও ধূপ এবং জীবন পথে—এই নামগুলি পাইলাম। নির্মাল্য হইতে জীবনপথে পর্যন্ত আবার চোখ বুলাইলাম— বার বার। তবে আলো ও ছায়া কোথায় গেল, উহা কি এই লাইব্রেরীতে নাই? সব বই আছে কেবল কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থটিই নাই? দিশেহারা হইয়া পড়িলাম। কিন্তু মনের সংশয় ঘুচিল না। ক্রমাগতই মন প্রশ্ন করিয়া চলিল 'আলো ও ছায়া' থাকিবে না, এ কেমন কথা? তখন গ্রন্থকার তালিকাটি বন্ধ করিয়া একবার গ্রন্থের তালিকায় হাত দিলাম। বর্ণানুক্রমিক সূচীতে 'আ' খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ দেখি 'আলো ও ছায়া' bold হরফে ছাপা। মনের বোঝা সবটাই নামিয়া গেল। লাইব্রেরীর requisition slipএ তখনই বইয়ের call নম্বরটি টুকিয়া ফেলিলাম। নম্বর মিলাইতেছি, এমন সময় দেখি, এ কি আলো ও ছায়ার নীচে এ কাহার নাম?—এ যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তো হেমচন্দ্রের আলো ও ছায়া চাহিতেছি না। তাহার পর একবার ভাবিলাম হেমচন্দ্রই বা 'আলো ও ছায়া' নামে কবে বই লিখিলেন? তেমন কোন সন্ধান তো সাহিত্যের ইতিহাসে পাই নাই। কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল। যাহা হউক, স্লিপে বইটির নম্বর এবং গ্রন্থ ও লেখকের নামের জায়গায় যথাক্রমে আলো ও ছায়া এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াই লাইব্রেরীয়ানের নিকট হইতে বইটি সংগ্রহ করিলাম। পুরাণো বই, পাতা জীর্ণ, চামড়া দিয়া বাঁধানো। এবং তাহার উপরেও সোনালী অক্ষরে হেমচন্দ্রের নামটি উজ্জ্বল। গভীর সংশয় ও কৌতূহলের মধ্যে বইটি খুলিলাম—কিন্তু চোখে পড়িল—

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি, অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর
দুঃখিনী জনম-ভূমি—
মা আমার মা আমার।

আলো ও ছায়ার পরবর্তী কালেও কোনো কোনো পুস্তকে কামিনী রায় স্বীয় নাম গোপন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই সেইসব বইয়ের নামপত্রে দেখিতে পাই কবির নামের পরিবর্তে রহিয়াছে 'আলো ও ছায়া প্রণেতা প্রণীত'। কবির জীবন-ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় তিনি সর্বদাই আত্মপ্রচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

ষোল হইতে পঁচিশ—এই কয়েক বৎসরের কবিতার সংকলন—আলো ও ছায়া। আলো ও ছায়া প্রকাশের পিছনে একটি ইতিহাস আছে। কবিই কি নিজের রচিত কবিতাগুলি প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছিলেন? না তাহা নয়। যিনি কেবলমাত্র ভাবের আবেগে কবিতা লেখেন, তাহার উৎকর্ষ বিচার করেন না, প্রচার

কামনা করেন না, নাম গোপন রাখেন—তিনিই বা কি করিয়া গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী হইবেন? তবে এই গ্রন্থ কাহার উদ্যোগে প্রকাশিত হইল? তিনি কবির পিতৃবন্ধু, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল দুর্গামোহন দাশ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও তখন হাইকোর্টের উকিল। দুর্গামোহন বন্ধু হেমচন্দ্রকে একদিন কামিনী রায়ের কবিতাগুলি দেখিতে দেন। কবিতা পাঠ করিয়া হেমচন্দ্র সেগুলির ভাবের গভীরতা ভাষার সরলতা, রুচির নির্মলতা এবং সর্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে মুগ্ধ হইয়া গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দেন। কবিতাগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গাম্ভীর্যভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি। ...আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এ পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। ...পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি। আর, বলিতেই বা কি স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।'

আলো ও ছায়ায় মোট উনষাটটি গীতি-কবিতা রহিয়াছে এবং মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক নামে আরও দুইটি কবিতা আছে, কিন্তু তাহা গীতি-কবিতা নয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি খণ্ড কাব্য। আলো ও ছায়ার উনষাটটি কবিতার মধ্যে যে মূলসুরটি প্রধানতঃ ধ্বনিত হইয়াছে তাহা বিষাদ বা বেদনার সুর। এই প্রসঙ্গে প্রথমে প্রেম কবিতাগুলির আলোচনা করা যাইতে পারে। 'প্রণয় ব্যথা' কবিতাটিতে বেদনার চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে:

কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা,
জড়িত রহিল ভবে ভালবাসা সাথে?
কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্রুধার?
কেন কণ্টকের স্তূপ প্রণয়ের পথে?
বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে প্রাণ এক যবে খোঁজে
আকুল ব্যাকুল হয়ে সাথী একজন,
ভ্রমি বহু, অতি দূরে পায় যবে দেখিবারে
একটি পথিক প্রাণ মনেরি মতন;—
তখন, তখন তারে নিয়তি কেনরে বারে,
কেন না মিশাতে দেয় দুইটি জীবন?
অনতিক্রম্য বাধারাশি সম্মুখে দাঁড়ায় আসি
কোন দুইদিকে আহা যায় দুইজন?
অথবা, একটি প্রাণ আপনারে করে দান—
আপনারে দেয় ফেলে' অপরের পায়;
সে না বারেকের তরে ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করে
সবলে চরণতলে দলে' চলে' যায়।
নৈরাশ্যপূরিত ভবে শুভযুগ কবে হবে,
একটি প্রাণের তরে আর একটি প্রাণ
কাঁদিবে না সারা পথে;— প্রণয়ের মনোরথে
স্বর্গমর্ত্যে কেহ নাহি দিবে বাধা দান?

'ভালবাসার ইতিহাস' কবিতাতেও বেদনার সকরুণ বেণু বাজিয়াছে:

শূন্য আলয়ের মাঝে উদাস উদাস প্রাণ,
কাঁদে সদা ভালবাসা, কেহ নাহি তার,
কেহ তার নাহি সাজ সকরুণ গাহে গান;
সে যে গোঁথেছিল এক কুসুমের হার,
মাঝে মাঝে কাঁটা তার কেমনে জড়ায়ে গেছে,
টানিয়া না ফেলে কাঁটা, মালাগাছি ছিঁড়ে পাছে!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার [illegible] আঁখিজল,
ভালবাসা তপস্বিনী ক্ষীণ [illegible];
বিষাদ-সমাজে তার [illegible]
[illegible] ভার;
[illegible]-নিশ্বাস-বাণী [illegible] যায়,
[illegible] ভালবাসা—কে যেন রাখিয়া যায়।

কবি একটি আদর্শ গীতি-কবিতার পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। কবি কামিনী রায়কে যথার্থ বুঝিতে কবিতাটি এখানে আগাগোড়া তুলিয়া দিলাম:

"প্রণয়?"
"ছি!"
"ভালবাসা—প্রেম?"
"তাও নয়।"
"সেকি তবে?"
"দিও নাম দিই পরিচয়—
আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ,
আনন্দ সে নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ;
আছে গভীরতা তার উদ্বেল উচ্ছ্বাস,
দুধারে সংযম-বেলা, ঊর্ধ্বে নীলাকাশ
উজ্জ্বল কৌমুদীতলে অনাবৃত প্রাণ,
বিম্ব প্রতিবিম্ব কার প্রাণে অধিষ্ঠান;
ধরার মাঝারে থাকি ধরা ভুলে যাওয়া,
উন্নত-কামনা-ভরে ঊর্ধ্ব দিকে চাওয়া;
পবিত্র পরশে যার, মলিন হৃদয়
আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়,
ভকতি-বিহ্বল, প্রিয় দেব-প্রতিমারে
প্রণমিয়া দূরে রহে, নারে ছুঁইবারে;
আলোকের আলিঙ্গনে, আঁধারের মত,
বাসনা হারায়ে যায়, দুঃখ পরাহত;
জীবন কবিতা—গীতি, নহে আর্তনাদ,
চঞ্চল নিরাশা, আশা, হর্ষ, অবসাদ।
আপনারে বিকাইয়া আপনাতে বাস,
আত্মার বিস্তার ছাড়ি' ধরণীর পাশ।
হৃদয়-মাধুরী সেই, পুণ্য-তেজোময়,
সে কি তোমাদের প্রেম?—কখনই নয়।
শত মুখে উচ্চারিত কত অর্থ যার,
সে নাম দিও না এরে মিনতি আমার।"

কামিনী রায়ের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতায় পাশ্চাত্য লিরিক-রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবি উচ্চ-শিক্ষিতা ছিলেন এবং ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়নে তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। কামিনী রায়ই সর্বপ্রথম উদারতর পটভূমিকায় এবং বৃহত্তর চেতনার মধ্যে অবতরণ করিয়া বাংলা গীতি-কবিতার অনেকখানি সীমা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব ও পরবর্তী কবিদের মত কেবলমাত্র ঘরোয়া পরিবেশই তাঁহার কবিতার প্রধান বিষয় ছিল না। "সে কি" কবিতাটি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ কবি শেলীর "One word is too often profaned" কবিতার কথা সহজেই মনে আসে।

প্রণয়ের মুগ্ধ রূপটির চিত্র কবি সহৃদয়তার সহিত আঁকিয়াছেন:

সে কি কথা—যারে চেয়েছিলে
পাও নাই সন্ধান তাহার?
কার গলে' কার গলে দিলে
প্রণয়ের পারিজাত হার?
মুগ্ধ নর, আঁখি ছলে মন;
কল্পনা সে বাস্তবের ছায়;
তার মূর্তি করিয়া গঠন,
শিল্পী ভাল বেসেছিল তায়।

শিল্পী প্রেমের মধ্য দিয়া প্রতিমাকে আরাধনা করিয়াছে কিন্তু বাস্তবের দৃষ্টিতে তো তাহাকে পাওয়া যায় নাই, তাই কবি বলিয়াছেন:

পাষাণের প্রতিমাটি যবে
প্রাণময়ী নারী রূপ ধরে,
নারী তার পারে না কি তবে
দেবী হবে বিধাতার বরে?

ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক মহিলাকবির কবিতায় যে

'সে কি ?' কবিতায় প্রণয়ের নির্মল পবিত্র স্বর্গীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
রূপের কবি অপূর্ব ব্যঞ্জনা দিয়াছেন। সমগ্রভাবে কবিতাটিতে স্বামীর মৃত্যু বা ব্যক্তিগত শোক এই বিষাদকবিতার সংখ্যাধিক্য

ঘটাইয়াছে। কামিনী রায়ের কাব্যেও এই নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। কবির আলো ও ছায়া কাব্য বিবাহের পূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শোক নহে রোমাণ্টিক বিষাদই (romantic melancholy) কামিনী-কাব্যের মূল ভিত্তি।

'দিন চলে যায়' কবিতায় কবি অতিক্রান্ত জীবনের দিনগুলির দিকে ফিরিয়া তাকাইয়াছেন :

একে একে একে হায়! দিনগুলি চলে যায়,
কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায়,
সাগরে বুদ্বুদ্ মত উন্মত্ত বাসনা যত
হৃদয়ের আশা শত হৃদয়ে মিলায়,
আর দিন চলে যায়।
জীবনে আঁধার করি, কৃতান্ত সে লয় হরি
প্রাণাধিক প্রিয়জনে, কে নিবারে তায়?
শিথিল হৃদয় নিয়ে, নর শূন্যালয়ে গিয়ে,
জীবনের বোঝা লয় তুলিয়া মাথায়,
আর দিন চলে যায়।

'সুখ' কবিতাটি কামিনী রায়ের প্রকাশিত সকল কবিতাগুলির মধ্যে প্রাচীন অর্থাৎ তাঁহার সর্বাধিক নবীন বয়সের রচনা। আন্তরিকতার দিক দিয়া কবিতাটি অকৃত্রিম :

বিষাদ, বিষাদ, সর্বত্র বিষাদ,
নরভাগ্যে, সুখ লিখিত নাই,
কাঁদিবার তরে মানব জীবন,
যতদিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই।

কবির কি তাহা হইলে ইহাই শেষ ঘোষণা যে 'নরভাগ্যে সুখ লিখিত নাই'? কামিনী-কাব্যের প্রধান সুর বিষাদ, কিন্তু বিষাদই তাহার পরিণতি নয়।

নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলি কি নর জনম লয়?

তবে সুখ কোথায় মিলিবে? কবি সুখের সন্ধান দিয়াছেন :

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

কবিতার শেষ স্তবকে কবি তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন :

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী' পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

পরহিতের মধ্যেই বিষাদের বিষণ্ণ উপত্যকা অতিক্রম করিবার নির্দেশ। 'মা আমার' কবিতাটিতেও আপনার জন্য নয়, আপনার দেশের উদ্দেশে কবি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন :

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার।

'রমণীর স্বর' কবিতাটিও কবির স্বদেশচিন্তা হইতে উদ্ভূত। রমণীর স্বর কি কেবল আমোদের জন্য, রোদনের জন্য, পতির প্রণয় স্বপন সুখের জন্য, পুত্রকে স্নেহের জন্য? কবি উচ্চ কণ্ঠে দেশের ও দশের সেবায় নারী জাতিকে আহ্বান করিয়াছেন। নারীকণ্ঠ কেবল গৃহে নয়, গৃহভেদ করিয়া তাহা সমগ্র বিশ্ব-ভূমিতে ধ্বনিত হউক :

কে আজ নীরবে রয়েছিস্ দেশে?
কার ভ্রাতা, পতি মগন ঘুমে?
রমণীর স্বর গৃহভেদ করি
হউক ধ্বনিত সমগ্র ভূমে।

কামিনী রায়ের দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলিকে সাধারণ প্রেম কবিতা হইতে খুব একটা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। দেশের প্রতি কবির যে প্রেম তা বস্তুগত প্রেমানুভূতি নয়, তাহা ব্যক্তিপ্রেমের সঙ্গেই এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

ফিলিপাইন
চীন
ইন্দোনেশিয়া
সিঙ্গাপুর
মালয়
উত্তর বোর্নিও সারাওয়াক
বন্যপ্রাণী
সংরক্ষণ

অলীক শহর

বিমল রায়চৌধুরী

বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত হাজরা পার্কের ফুট-পাথে উঠে দাঁড়াল সুধীন। এমনিই দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। কপালে তিলক-কাটা জ্যোতিষীর ফুটপাতে ছক আঁকা দেখল, হাজরা পার্কের ঝোপঝাড়গুলোর ফাঁকে একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে ঘনিষ্ঠভাবে হাতধরাধরি করে কথা বলতে শুনল। মনে বিরক্তি জমলেই সুধীন আজ-কাল কলকাতার দিকে অর্থহীন তাকিয়ে থাকে। কলকাতা, এখনো ওর কাছে একটা তালগোল পাকানো লোনা শহর। এই শহরটার যেন আলাদা কোনো মানে নেই, শ্রী নেই। যেন দুশো কিংবা দেড়শ বছর ধরে একটা অতিকায় পেঁয়াজ গঙ্গার এপারে রোদে শুকোচ্ছে, জলে ভিজছে। যতই খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা কর কিছুই পাবে না, ঝাঁঝে চোখ দুটোই শুধু হেজে যাবে। উদ্দেশ্যের সুতোর গাঁথা, জনতা, এলো-মেলো গলি এবং অবিরাম কিছু যান-বাহনের মালা গলায় দিয়ে শুয়ে আছে কলকাতা নষ্ট মেয়েমানুষের মত। আজ প্রায় বছর দুই হল, কলকাতায় এলেও নিজেকে যেন এখনো আগন্তুক মনে হয় সুধীনের। যেন এত্তেলো না দিয়েই অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে দুবছর ধরেই অপ্রস্তুত হয়ে আছে সে। এবং অপেক্ষায় আছে গৃহকর্তা কখন ওর ওপরে গোটাকয়েক ভীষণ কুকুর লেলিয়ে দেবে। কলকাতা সম্পর্কে কতগুলো আজ-গুবি ধারণার হাত থেকে সুধীনকে রক্ষা করার ভার নিয়েছে কমলেশ।

—দেখুন সুধীনবাবু, কলকাতা হল রাজস্থানের কুয়ো, বেশী না খুঁড়লে জল পাওয়া যায় না। সবে এসেছেন, থাকুন, কিছুদিন ফেরীওয়ালার ডাক-গুলো কানে রপ্ত হোক, মাস্টারী করুন, সিনেমা দেখুন, রেস্টুরেন্টের মণদশেক চা পেটে পড়ুক। অর্থাৎ কলকাতাকে খুঁড়তে শিখুন, তখন বলবেন আমায়।

কিন্তু কমলেশ যাই বলুক, সুধীনের ধারণা কলকাতাকে খুঁড়লে সাপ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। তাই কখনো কলকাতাকে খুঁড়বার পণ্ডশ্রম করেনি সুধীন। সিনেমা দ্যাখে না বিশেষ, চাও খায় না, দুর্গাপুজোর সময় কলকাতার সজ্জিতা মেয়েদের দিকেও তাকায় না। উল্টোডাঙ্গা থেকে সাড়ে নটায় ভাত খেয়ে বাগবাজারে মাস্টারী করতে ছোটে, ছুটির পর কোনোদিন দেশবন্ধু পার্কের মাঝ-ময়দানে চিত হয়ে শুয়ে চীনাবাদাম চিবোয়, কোনোদিন পাড়ায় লাইব্রেরীতে গিয়ে ইংরেজী কাগজে চাকরীর বিজ্ঞাপন পড়ে। যদিচ্ছা দরখাস্ত করে। দুএকটা হাই তোলার জন্যে বইও অবশ্য পড়ে মধ্যে মধ্যে। শুধু মেসের ম্যানেজারীর ভারটা তার ওপর এলে খুব বিব্রত বোধ করে। কোনো কোনো দিন বন্ধু কমলেশের খোঁজে কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসেও যায়, কিন্তু না যেতে হলেই খুশী হয়। সব টেবিলেই যেন টেপরেকর্ডার চলছে, মনে হয় বহুদিনে আগে মৃত কোনো এক প্রতিভাবান নেতার সাহিত্য-শিল্প এবং রাজনীতি সম্পর্কের মতামতগুলোই দিনের পর দিন সব টেবিলে একইসঙ্গে বাজানো হচ্ছে। কমলেশের কিছু কিছু বন্ধুর সঙ্গে আলাপও হয়েছে সুধীনের। তবে সপ্তাহে একদিন অন্তত সুধীনকে এর চৌহদ্দীর বাইরে বেরোতে হয়। দক্ষিণ কলকাতায় আসতে হয় প্রতি রবিবার। মামা থাকেন কালিঘাটে, প্রতি রবিবারে শারীরিক সুস্থতার প্রমাণ মামার সামনে সশরীরে দিতে দেখা দিতে হয়। আজকেও তাই এসেছিল।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সুধীনের হঠাৎ কমলেশের বাড়িতে যাওয়ার কথা মনে হল। একটা আস্ত ঘর ভাড়া নিয়ে এ পাড়ায়ই থাকে কমলেশ। একা থাকে, পাইস হোটেলে খায়, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, রুম-মেটের তোয়াক্কা না করেই আলো নেভাতে পারে, বই পড়তে পারে, যখন খুশী আড্ডা মারতে পারে। ঘরের জন্যে কলকাতায় একমাত্র কমলেশই তার ঈর্ষিত ব্যক্তি। সুধীন হাজরা পার্কের ফুটপাত ধরে উত্তরমুখো হাঁটতে আরম্ভ করল। কমলেশের বাড়িতে এর আগে দুতিনবার এসেছে। কিন্তু একা কখনো আসেনি। প্রতিবারই কমলেশ ওর মেস-বাড়ি থেকে ওকে ডেকে নিয়ে গেছে। ঠিকানা না জানলেও পাড়ায় গিয়ে বাড়িটা খুঁজে বার করাটা কঠিন নয়। কলেজটার বাঁ দিক দিয়ে বেঁকে আবার

ডানদিকে ফিরলেই একটা খোলা মাঠ পড়ে। তার সামনেই কয়েকটা পরপর সাদা তিনতলা বাড়ি। তারই একটার নীচেরতলায় থাকে কমলেশ।

বাড়িটা চিনতে খুব কষ্ট হল না। হাস্নুহানার গন্ধেই টের পেল কমলেশের ঘরের গলিটা। এর আগে যে কবার এসেছিল এই গন্ধটা পেয়েছিল সুধীন। কিন্তু রাত্রে এসেছিল বলে ঠিক হাস্নুহানার ঝোপটা চোখে পড়েনি। পাশের বাড়ির গেট থেকে ঝোপটার কিছু অংশ গলির পাঁচিলটার এধারে এসে পড়েছে। গলির ভেতর ঢুকে সুধীন কমলেশের নাম ধরে কয়েকবার ডাকল। কোনো সাড়া নেই। রবিবারে সাধারণত ছটার আগে বেরোয় না কমলেশ। দেড়টা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে হোটেলে ভাত খেয়ে বাড়ি ফিরে টানা ঘুম দেয়। চারটে-পাঁচটার আগে ওঠে না। সুধীন ঘুমন্ত কমলেশের মুখ মনে রেখে জোরে জোরে কয়েকবার ডাকল। তাতেও সাড়া না পেয়ে দরজার কড়া ধরে ঝাঁকালো দু-তিন-বার। দরজার বদলে দরজার পাশের বড় জানালাটার একটা পাট খুললো।

—কে? কাকে চাই?

জানালার দিকে তাকিয়ে সুধীনের চোখ দুটো স্থির হয়ে আসে। জানালার ওধারে একটা অসম্ভব মুখ দুটো অসম্ভব চোখ নিয়ে সুধীনের দিকে তাকিয়ে। লোকটার দুচোখের কোলে অনেকখানি জায়গা অর্ধবৃত্তাকারে কালো। গাড়িটানা গরুর ঘাড়ের মাংস যেমন শক্ত হয়ে ঝুলতে থাকে লোকটার চোখের নীচের মাংসপেশীও যেন ঠিক তেমনি শক্ত হয়ে গালের ওপর ঝুলছে। গায়ের রঙ ঘোর খয়েরী। চোখ দুটো এত ছোট এবং এত লাল যে মনে হয় আদপে লোকটার কোনো চোখই নেই, নাকের দুপাশে শুধু বড় বড় দুটো রক্তের ফোঁটা চিকচিক করছে বাইরের আলো লেগে। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে ঠোঁট দুটো। পুকুরের জলে হঠাৎ হাওয়া লাগলে যেমন ওপরটা ছোট ছোট ঢেউয়ে কাঁপতে থাকে, ঠোঁট দুটোও যেন কোনো এক অদৃশ্য হাওয়ার বেগে অনবরত কেঁপে যাচ্ছে।

—কাকে চাই? লোকটার গলা কিন্তু অসম্ভব মেয়েলি।

—ইয়ে...মানে কমলেশ বসু আছেন?

—কমলেশ বসু? কমলেশ বসু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—দাঁড়ান। মুখটা জানালা থেকে সরে গেল। পায়ের শব্দে সুধীন বুঝল লোকটা দরজা খুলতে আসছে। দরজা খুলে লোকটা এক পাশে সরে দাঁড়াল।

—ভেতরে আসুন। কেন যেন ভেতরে যেতে ইচ্ছা করছিল না সুধীনের। কিন্তু এত ডাকাডাকি করে, কড়া নেড়ে না-যাওয়াটা কেমন বিসদৃশ দেখায়। তবু দরজার চৌকাটে পা দিয়েই বলল সুধীন:

—দেখুন কমলেশ যদি ঘুমোয় তাহলে আর ওকে ডেকে লাভ নেই। আমি বরং পরেই আসব।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকুল মেয়েলি গলায় বলে উঠল;

—না, না আসুন, আসুন! বাধ্য হয়ে ভেতরে ঢোকে সুধীন। ভেতরে কমলেশের ঘরের সামনের বারান্দাটা দেখতে পেলো সুধীন। বারান্দার শেষ প্রান্তে কমলেশের ঘরের দরজাও দেখতে পেলো।

—না না এদিকে এখন নয়। এই ঘরে, এই বাঁ দিকের ঘরে আসুন। সুধীন অবাক হয়ে তাকাল লোকটার দিকে। কমলেশের ঘরের দিকে যাবার উপায় নেই, লোকটা পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। নির্দেশমত বাঁ দিকের ঘরেই ঢুকল। আধময়লা একটা ছোট ঘর। কয়েকটা কাঠের চেয়ার আর মাঝখানে একটা টেবিল ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই।

—বসুন ওই চেয়ারটায়। সুধীনকে একটা চেয়ারে বসতে বলে লোকটাও সুধীনের সামনাসামনি একটা চেয়ারে বসল। সুধীন বসবার পর ছোট লাল চোখদুটোকে আরও ছোট করে খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে সুধীনের হতভম্ব মুখের দিকে।

—আপনার নাম?

—শ্রীসুধীন মুখোপাধ্যায়।

—কি করেন?

—মাস্টারী। সুধীন যেন নিজের অজ্ঞাতেই উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

—কমলেশ বসুকে কতদিন ধরে চেনেন ?

—বছর দেড়েক।

—কি সূত্রে পরিচয় ?

—কমলেশ আমার মামার ছাত্র।

—কমলেশ বসুর বাড়িতে এর আগে কখনো আপনি এসেছিলেন ?

—এসেছিলাম দুবার কি তিনবার, কমলেশবাবুই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

—আপনি ঠিক বলছেন আপনি কমলেশ বসুর বাড়িতে এসেছিলেন এর আগে ?

—নিশ্চয়ই এসেছিলাম। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন ত ? এত সব প্রশ্ন করছেন কেন আমাকে ? কমলেশ যদি বাড়ি না থাকে তাহলে আমি যাই, আমার অনেক দূরে যেতে হবে।

—বলছি, বলছি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ! সব বলছি ! তা কতদূরে আপনাকে যেতে হবে বলছেন ?

এবার ক্রমশঃ ভয় পেতে থাকে সুধীন। কমলেশের কি কিছু হয়েছে? নাকি সে এই বাড়ির কোনো মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছে! কিন্তু এতদিন ধরে কমলেশের সংগে মিশে মেয়ে নিয়ে কোনো কেলেঙ্কারী করার মতন ছেলে মনে হয়নি কমলেশকে।

—কি মশাই কতদূর যেতে হবে আপনাকে? একটু জোরে প্রশ্ন করল লোকটা।

—উল্টোডাঙ্গা।

—আচ্ছা, আপনি কমলেশ বসুকে বছর দেড়েক ধরে চেনেন বললেন না? কি করেন কমলেশ বসু?

—একটা পার্বালসিটি ফার্মে চাকরি করেন!

—বিয়ে করেছেন?

—না।

—কেন বিয়ে করেন নি?

—দেখুন আমাকে এই সব অবান্তর প্রশ্ন করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কমলেশ যদি থাকে ত ডেকে দিন, নইলে আমি যাই।

—অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? বলেছি ত সব বলব আপনাকে। কমলেশবাবু বিয়ে করেন নি কেন?

—সম্ভবতঃ ইচ্ছে নেই অথবা মাইনে বেশী পায় না অথবা বড় বড় বোনের বিয়ে হয়নি অথবা কাউকে ভালবাসতে চায়, ভালবেসে বিয়ে করতে চায়! সুধীন যেন হাঁপাতে থাকে। লোকটা হঠাৎ হেসে ওঠে সুধীর কথায়।

—বা, বা, বেশ। ভালবাসতে চায় এ্যাঁ! তা আপনি, আপনি বিয়ে করেছেন? না আপনিও ভালবাসতে চান?

—না আমি ভালবাসতে চাই না।

—কেন?

—আমি এ শহরের কাউকে চিনি না, এই শহরের কেউ আমাকে চেনে না। একটা অচেনা শহরে আমি একা থাকতে চাই—অন্ততঃ কিছুদিন।

—অচেনা কেন? কলকাতায় আপনি নতুন এসেছেন?

—হাঁ, বছর দুয়েক। আমি জলপাই-গুড়ির ছেলে। কলকাতায় চাকরি করতে এসেছি।

—আপনি তাহলে বাইরের লোক? বাইরের লোক হয়ে কলকাতার ভেতরের লোকদের সংগে মেলামেশা করছেন, তাদের বাড়িতে আসছেন, হাঁকাহাঁকি করছেন?

—ব্যাপারটা কি বলুন ত?

—ব্যাপার কিছুই না, শুধু আপনি বলছেন আপনি কমলেশ বসুর বাড়িতে আগে দু-একবার এসেছেন।

—কমলেশ বসুর বাড়িতে আসাটা এমন কি বড় ব্যাপার?

—বড় ব্যাপার বইকি! নিশ্চয়ই বড় ব্যাপার! লোকটা হঠাৎ গলাটা বদলে ফেলে।

—আচ্ছা আপনার ছোটবেলার স্মৃতি কিছু মনে আছে?

—হয়ত আছে।

—আপনার জন্ম জলপাইগুড়িতেই?

—হ্যাঁ!

—আপনার বাবা আপনাকে কখনো গোলাপরেউড়ী কিনে দিয়েছিলেন?

লোকটা যে পাগল সুধীন এতক্ষণে যেন নিঃসংশয় হল। একটু যেন স্বস্তিও পেল। অন্ততঃ রহস্যজনক কোনো কিছু হবার বা ঘটবার সম্ভাবনা নেই, শুধু কোনো রকমে লোকটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘরটা থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লেই বাঁচা যায়।

কমলেশেরই হয়ত পাগল আত্মীয় হবে লোকটা। কমলেশের অজ্ঞাতসারেই হয়ত ভেতরের ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সুধীন ওর কর্তব্য সম্বন্ধে এক-বার মনেমনে ভেবে নিল। যা খুশী প্রশ্ন করুক যথাসাধ্য জবাব দিয়ে যাবে সে। ইতিমধ্যে যদি কমলেশ এসে পড়ে ভালই, নইলে একটা সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়বে ঘর থেকে।

—কি মশাই বলছেন না যে, বাবা আপনাকে গোলাপরেউড়ী কিনে দিয়েছিলেন কিনা ছোটবেলায়?

—দিয়েছিলেন।

—ক বছর বয়সে?

—সাত কি আট হবে।

—কখনো পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ছোটবেলায় ডুবে গিয়েছিলেন?

—না?

—কি করে জানলেন?

—মনে আছে ডুবি নি।

—কলেজে যখন ভর্তি হলেন কি আশা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন?

—ইঞ্জিনীয়ার হবো এই রকম একটা আশা ছিল।

—ইঞ্জিনীয়ার হবেন আশা ছিল, হয়েছেন স্কুল-মাস্টার! কমলেশ বসুর বাড়ি এসেছেন আশা করে এসেছেন আমার বাড়িতে!

এবার চমকে ওঠে সুধীন। ঘরটার চারপাশে একবার তাকায়। কিন্তু এ ঘরে আগে কখনো আসে নি কাজেই এখান থেকে বসে এটা কমলেশের বাড়ি কিনা একেবারে নিশ্চিত বলা কঠিন। কিন্তু খোলা জানালা দিয়ে হাস্নুহানার গন্ধ তখনও আসছিল ঘরে। কমলেশের ঘরে যাবার বারান্দাটা দরজা দিয়ে চেয়ারে বসেই দেখা যাচ্ছিল।

—আজ্ঞে আপনি কি বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না। এটা কি কমলেশের বাড়ি নয়?

—না। কমলেশ বসু বলে কেউ কখনো এখানে ছিল না, আজও নেই। কেমন যেন ঠাণ্ডা গলায় কথা বলল লোকটা।

—সে কি! তাহলে ক্ষমা করবেন, আমি সত্যিই ভুল করে ফেলেছি। সুধীন উঠে দাঁড়ায় যাবার জন্যে।

—দাঁড়ান! যাচ্ছেন কোথায়? ভুল হয়েছে? আপনার বাবা আপনাকে গোলাপরেউড়ী কিনে দিয়েছিল কিনা মনে আছে, পুকুরে ডোবেন নি কখনো মনে আছে, আর কমলেশ বসুর বাড়িতে দেড় বছরের মধ্যে দু-তিনবার এসেছেন অথচ তার বাড়িই আপনার ভুল হয়ে গেল?

—সত্যিই আমি লজ্জিত। আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু—।

—কিন্তু-টিন্তু নয় মশাই। আপনি ভুল করেন নি। জেনে-শুনেই আপনি এ বাড়িতে এসেছেন। দেখলে ত আপনাকে ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হয়, শিক্ষা, দীক্ষা আছে অথচ ভদ্র-লোকের বাড়িতে এভাবে ঢুকে পড়েছেন! ছিঃ ছিঃ!

ভীষণ অসহায় বোধ করতে থাকে সুধীন। লোকটা যদি পাগল না হয় তাহলে নিশ্চয়ই সত্যি কথা বলছে। অর্থাৎ এ বাড়িতে কমলেশ থাকে না। আর যদি পাগল হয় তাহলে অবশ্য এটা কমলেশের বাড়িই হবে। কারণ হাস্নু-হানার গন্ধ এখনো নাকের সামনে ভাসছে।

—এটা কমলেশের বাড়ি নয়?

—ও এখনো আপনার সন্দেহ আছে? আমি বলছি বিশ্বাস হচ্ছে না? লোকটার ঠোঁটটা যেন আরো দ্রুত কাঁপতে থাকে। বাইরে থেকে যেন একটা দুর্বোধ্য হাওয়া লোকটার ঠোঁটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

—না সন্দেহ না মানে ঐ হাস্নুহানা ফুল ...।

—ফুল? কমলেশ বসুর বাড়ির সামনে হাস্নুহানার ঝোপ আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—আপনি হলপ করে বলতে পারেন ফুলগুলো কাগজের নয়? আপনি জানেন সারা কলকাতায় কাগজের ফুল ছড়ানো আছে এমনকি তার নকল গন্ধও আছে? আপনি জানেন না। আপনি কিছুই জানেন না, এবং যেটুকু জানেন ভুল জানেন। ঠিক আছে আপনাকে প্রমাণ দেবো এটা কমলেশের বসুর বাড়ি নয়।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা সাদা কাগজ বার করল।

—এই নিন, আপনার কলম দিয়ে এখানে লিখুন আপনার নাম, ঠিকানা, যেখানে কাজ করেন সেখানকার ঠিকানা। যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তার নাম-ঠিকানা। ও হো ঠিকানা ত জানেন না, বেশ তিনি যে অফিসে কাজ করেন সেই অফিসের নাম লিখুন!

—কেন? কি হবে এসব লিখে?

—লিখবেন। আমি লিখিত প্রমাণ চাই। আপনি বাইরের লোক আপনার কাছ থেকে আমার একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ চাই। পরে যদি আপনি নিজের নাম অস্বীকার করেন, কমলেশ বসুর স'ঙ্গ দেখা করতে এসেছেন অস্বীকার করেন? না, না, লিখুন।

সুধীন বাধ্য হয়ে কাগজটা টেনে নিল। খস খস করে নিজের নাম-ঠিকানা,

কমলেশের নাম, অফিসের নাম লিখল। কাগজটা লোকটার হাতে তুলে দিল।

—বেশ! এবার উঠুন আমার সঙ্গে। কমলেশ বসুর ঘরটা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। এ বাড়ির একতলায় মাত্র দুটোই ঘর আছে। একটা এই ঘর, আরেকটা বারান্দার শেষে। চলুন ঐ ঘরে। দেখুন ওটা কমলেশ বসুর ঘর কিনা। উঠুন। এতক্ষণে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল সুধীন। ঘরটা নিশ্চয়ই কমলেশের। হাস্নুহানার গন্ধ, টানা সরু বারান্দা, বাড়ির সামনের মাঠ—কমলেশের বাড়িকেই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। কমলেশ নিশ্চয়ই ভেতরের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সুধীন তাড়াতাড়ি বাইরে এল।

—উঁহু, আপনি আগে না। আমি যাচ্ছি, আমার পাশে পাশে চলুন। এই যে এই ঘর। এই ঘরে কমলেশ বসু থাকেন কেমন ত? বেশ। খুলুন দরজা। না, খিল দেওয়া নেই, ঠেললেই খুলে যাবে।

সুধীন স্পষ্ট বুঝতে পারল ওর হাত দুটো কাঁপছে। কিছুতেই ভেতরের দরজা সে খুলতে পারবে বলে মনে হল না তার। লোকটার দিকে তাকাল অসহায় ভঙ্গীতে। লোকটা ওর ছোট ছোট লাল চোখ ওর দিকে স্থির রেখে ওর বড় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখের নীচের শক্ত হয়ে থাকা মাংসপেশীগুলো যেন আরো শক্ত হচ্ছে ক্রমশঃ। এখান থেকে হাস্নুহানার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ির সামনে মাঠটাও কি আর আছে?

—কি হল খুলুন?

—আমি বাইরের লোক, আপনিই খুলুন।

এই প্রথম লোকটাকে হাসতে দেখল সুধীন। যেন সুধীনের ছেলেমানুষী ওর গায়ে ভীষণ সুড়সুড়ি দিচ্ছে। অসম্ভব কাঁপতে থাকা দুই ঠোঁটের বন্ধনীর মধ্যে লোকটার বড় বড় দাঁতগুলো রুপোর রেলিং-এর মত ঝকঝক করছে। খানিকক্ষণ একা একাই হেসে লোকটা এগিয়ে এল দরজার কাছে।

—সরুন আমিই খুলছি।

—এক ঝটকায় দরজাটা খুলে গেল। ঘরের দিকে চোখ পড়তেই পাথর হয়ে গেল সুধীন। না কমলেশ বসু কোনো দিন এ ঘরে ছিল না। কমলেশের ঘরে এরকম কোনো দৃশ্য থাকতে পারে না। ঘরটার দেয়ালগুলো টকটকে লাল ছিল কোনো এক দিন। কিন্তু দেয়ালগুলোর রঙ, রাত্রে পান খেলে পরদিন সকালে যেমন ঠোঁটের রঙ হয় ঠিক তেমনি। মধ্যে মধ্যে ঘায়ের মতন পলেস্তারা খসে গিয়ে চুনসুরকি বেরিয়ে আছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য দৃশ্য হল ঘরে কোনো আসবাব নেই, মেঝেতে একটা বিরাট সতরঞ্চ পাতা এবং তাতে অন্ততঃ বারোজন লোক খালি গায়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে। সকলেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওদের প্রত্যেকের বুকের ওপর একটুকরো কাগজ ছোট ইট দিয়ে চাপা দেয়া।

—কি মশাই? এটা কি কমলেশ বসুর ঘর? এ ঘরে আপনি এসেছিলেন কখনো? না কি ওই লোকদের মধ্যে কেউ আপনার কমলেশ বসু?

সুধীন অতি কষ্টে গলা দিয়ে আওয়াজ বার করল,

—না, না, এটা কমলেশ বসুর ঘর নয়। কিন্তু.....কিন্তু ওরা কারা?

—ওরা? ওরা আপনার মত কাউকে না কাউকে খুঁজতে এখানে এসেছিল। ওরা কার কাছে এসেছিল, তাদের নাম-ঠিকানা আর ওদের নিজেদের নাম-ঠিকানা সব ওদের বুকের ওপর কাগজটায় লেখা আছে—এই আপনি যেমন লিখেছেন। যান না গিয়ে দেখুন না কাগজগুলো। লোকটা ওর ছোট ছোট লাল চোখদুটো যতটা সম্ভব বড় করে তাকাল সুধীনের দিকে। খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর সুধীনের মনে হল, রক্তের ফোঁটা নয়, চোখ দুটো মাঝরাতের দুটো ট্রাফিকের লাল আলো—বিনা প্রয়োজনে জ্বলছে। চারপাশে কোথাও গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই তবু জ্বলে যাচ্ছে। সমস্ত কলকাতাকে অবিশ্বাস করে যেন লাল হয়ে আছে। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়েই কি চারদিকের কলকাতা চুপ হয়ে গেল। বাইরের রাস্তাটা দিয়ে একটা ফেরীওয়ালাও ত হেঁকে গেলে পারত।

—থামুন! সরে সরে যাচ্ছেন কোথায়? কমলেশ বসুর বাড়িতে? এবার নিশ্চয়ই আপনার সন্দেহ ঘুচেছে, নাকি এবার বলবেন আপনি শ্রীসুধীন মুখোপাধ্যায় নন, কমলেশ বসুকে খুঁজতে আসেন নি? কিন্তু আমাকে ফাঁকি দেয়া অত সহজ নয়। আপনাদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। শুধু আপনাদের কেন আমি এই কলকাতাকেই চিনে বসে আছি। আমি আপনাদের মত বাইরের লোক নই, কলকাতার ভেতরের লোক। আমাকেই কলকাতা বলে ধরে নিতে পারেন। বলিহারি যাই আপনাকে! আমার সঙ্গে এসেছেন চালাকি করতে!

সুধীন ভয় পেতে পেতে যেন ভয়ের বোধটাকেই আস্তে আস্তে কখন গিলে ফেলেছে। গলাটাকে কোনোরকমে নিজের মত করে এনে বলল,

—দেখুন আমি কোনো চালাকি করবার চেষ্টা করিনি। আমার ভুল হতে পারে না? মানুষ ত ভুল করে।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু আপনাদের মনুষ্যত্বের বুঝি ঐ একটাই বোধ হয় প্রমাণ যে, আপনারা ভুল করেন? আমি জানি মশাই, আমি জানি। সেইজন্যেই ত আপনার জন্যে এই ভুল বাড়িতে বসে আছি। এই ঘরে যারা

বুকে চিরকুট নিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে তাদের জন্যেও ছিলাম। ঐ দেখুন বাইরের লোকগুলো কেমন জামা-টামা খুলে ভেতরের লোক হয়ে নিজের বাড়িতেই যেন আরামে ঘুমিয়েছে। অথচ ওদের কেউ চেনে না, তাই বুকে ঠিকানা লেখা চিরকুট রাখতে হয়েছে আমাকে। আপনারো এই বাড়িটাকে ক্রমশঃ নিজের বাড়ি মনে হবে। আপনিও আপনার ওই খদ্দরের পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলবেন একটু পরে, ধুতিটাকে লুঙ্গী করে পরবেন আর এই চিরকুটটা—।

হঠাৎ লোকটা নিজের মুঠো-করা হাতের দিকে তাকালো।

—এ কি চিরকুটটা কই? কই কি করলেন মশাই কাগজটা? লোকটার কণ্ঠ-স্বর ক্রমশঃ তীব্র হতে থাকে। ঠোঁট দুটো এত জোরে কাঁপছে যে ওপরের আর নীচের ঠোঁট আলাদা করে দেখা যাচ্ছে না—ফ্যান ঘুরলে যেমন ব্লেড দেখা যায় না। লোকটাও যেন ক্রমশঃ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আসছে। সুধীনের দুকাঁধে হাত রেখে জোরে জোরে ওর কাঁধ ঝাঁকাতে থাকে।

—কই মশাই সেই কাগজটা কই? কাগজটা এখুনি বার করে দিন। এখুনি আপনি জামা খুলে ভেতরের লোক হয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন, আপনাকে চেনা যাবে না, আপনার হিসেব থাকবে না এই ঘরে। খবরের কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দিলেও আপনার হদিশ পাবে না কেউ। বার করুন তাড়াতাড়ি আপনার নাম-ঠিকানা লেখা কাগজটা!

—দেখুন কাগজটা বাইরের ঘরে বোধ হয় টেবিলের ওপরেই আছে। আমি আমার নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ নিয়ে কি করবো?

—বাঃ! বাইরের ঘরে নিজের পরিচয় রেখে ভেতরের ঘরে বসে দাঁড়িয়েছেন? দাঁড়ান নিয়ে আসছি। কিন্তু খবরদার মশাই আমার সঙ্গে চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না!

লোকটা তাড়াতাড়ি টানা বারান্দা দিয়ে বাইরের ঘরের দিকে চলে গেল।

আর তখনি সুধীন দমকা হাওয়ায় হাস্নুহানা ফুলের গন্ধ টের পেল। আর লোকটার দুটো দপদপে লাল চোখের আলোতেই কি সারা কলকাতা পাথর হয়ে ছিল! বাইরের রাস্তায় এতক্ষণে একটা ফেরীয়ালার হাঁক শুনতে পেল সুধীন। কলকাতার রাস্তায় গোলাপরেউড়ী হেঁকে যাওয়া স্বর এই প্রথম শুনল সে। তাহলে বাড়ির সামনের খোলা মাঠটা এখনো আছে। তার পাশ দিয়ে হাজরা রোডের দিকের রাস্তাটাও।

টানা বারান্দা, হাস্নুহানার গন্ধ, হাজরা রোডের দিকের রাস্তাটা দৌড়ে পেরোতে সুধীনের সাত মিনিটের বেশী সময় লাগল না।

পরদিন বিকেলে কফি হাউসে সব শুনে কমলেশ হেসে উঠল।

—শ্রাবণ মাস শেষ হতে চলল, আর আপনি এতদিনে একটা আষাঢ়ে গল্প শোনালেন আমাদের!

সুধীন প্রথমটা এক টেবিল লোকের মধ্যে একটু বিপন্ন বোধ করল। কিন্তু তারপর কমলেশের দিকে, টেবিলের অন্য বন্ধুদের দিকে না তাকিয়ে বলল,

—কমলেশবাবু, আপনি আমায় কলকাতাকে খুঁড়তে বলেছিলেন। না জেনেই বোধ হয় কাল আপনাদের কলকাতাকে খুঁড়ে ফেলেছিলাম এবং

"ওরা আপনার মত কাউকে-না কাউকে খুঁজতে এসেছিলো"

খুঁড়তে গিয়ে সাপই বেরিয়ে পড়েছিল, আমার মনে হয় ওটা বোধ হয় কোনো আফিন-কোকেনের আড্ডা। লোকগুলো সব নেশা করে ঘুমোচ্ছিল। আর ঐ লোকটার চেহারা কথাবার্তা সবই নেশা-খোরের মত।

সুধীনের কথায় কমলেশের একজন বন্ধু অনিশ্চিত একটা সায় দিল।

—বলা যায় না কিন্তু। হতেও পারে ওটা কোকেন-আফিমের ডেন। আর ত কোনো এক্সপ্ল্যানেশন নেই! সুধীনবাবুর সঙ্গে যে লোকটার কথাবার্তা হয়েছিল তার কথাবার্তাও ত ঠিক নরম্যাল না!

কমলেশকে বন্ধুর কথায় এবার একটু চিন্তিত দেখায়!

—আমার পাড়ায় কোকেনের ডেন আর আমি ওপাড়ার লোক হয়ে একদিনে কিছুই টের পেলাম না?

সুধীন যেন কমলেশের গলায় একটা মৃদু ক্ষোভের আভাস পেল। যেন ও বাইরের লোক হয়ে ওর পাড়ার ভেতরকার একটা খবর ওর আগে জেনে ফেলে ওকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই যেন বলল,

—বাইরের লোক বলেই ত আমি আগে টের পেলাম, নিজের দাঁত কি নিজে দেখা যায়—আপনিই বলুন না! আপনাকে ওরা চেনে, আপনাকে লোকটা ভেতরেই ঢোকাত না। আমাকে পুলিশের ইনফরমার ভেবেই হয়ত ভেতরে ঢুকিয়ে কোতল করবার তালে ছিল।

হঠাৎ কমলেশ ওর টেবিলের চার-পাশের বন্ধুদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল,

—এক কাজ করা যাক। চলুন আমরা এই ছজন মিলে আপনার ঐ বাড়িতে এখুনই ঢু মেরে আসি। বেশী গোলমাল হলে একজন ভবানীপুর থানায় ছুটে গিয়ে খবর দিয়ে আসবে।

পাড়ায় ঢুকে খোলা মাঠটার ধারের রাস্তায় এসে দাঁড়ায় ওরা ছজন। একটা সাংঘাতিক ঘটনার সম্ভাবনায় সকলেই উত্তেজিত।

—ঐ যে ঐ বাড়িটার নীচের তলায়! সুধীন বন্ধুদের আগে আগে পা চালিয়ে চলতে থাকে। কমলেশরা আসতে থাকে পেছনে পেছনে। হাস্নুহানার গন্ধটা নাকে আসতেই বাড়িটার ভেতরে ঢোকার গলিটায় দাঁড়িয়ে পড়ে সুধীন। বন্ধুদের জন্যে দাঁড়ায়। কমলেশ কাছে এসে প্রশ্ন করে,

—এই বাড়ি?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় সুধীন। কমলেশ কি যেন বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুধীন তৎক্ষণে গলির ভেতরে ঢুকে সেই দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল। জানালাটা বন্ধ কিন্তু দরজাটা মনে হল এমনিই ভেজানো আছে খিল দেয়া নেই। একবার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে নিল সুধীন। ওরা সকলেই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—আপনি ঠিক বলছেন এই বাড়িটা সুধীনবাবু? কমলেশ প্রশ্ন করল।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উত্তর দেয় সুধীন,

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই ত জানালাটা যেখান দিয়ে লোকটার মুখ প্রথমে দেখেছিলাম। এই ত, এই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে-ছিলাম। চলুন, ভেতরে ঢোকা যাক। আমরা ছজন আছি, কি করতে পারে একা লোকটা?

সুধীন দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল, পেছনে ওর বন্ধু পাঁচজন।

—এই যে, এই ঘরে বসেছিলাম। কিন্তু আজকে দেখছি তালা ঝুলছে ঘরে। লোকটা কি নেই?

—লোকটার নামও ত জিজ্ঞেস করেন নি, কি নামে ডাকা যায়? ঘরটা একবার দেখেই যাই আমরা। কমলেশের এক বন্ধু পেছন থেকে সুধীনের উদ্দেশে বলল।

তালা-বন্ধ ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে কমলেশের দিকে তাকিয়ে সুধীন প্রশ্ন করে,

—আচ্ছা অবিকল আপনার বাড়ির মতন নয় এই বাড়িটা?

—কিন্তু তার আগে আমাদের প্রস্তুত থাকা ভাল! বলা যায় না আপনার সেই লোকটা ওর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আমাদের আক্রমণও করতে পারে! কমলেশের আরেক বন্ধু যেন সেনাপতির গলায় কথা বলে।

—কিন্তু আমার মনে হয় না এখন অন্ততঃ একতলায় কেউ আছে। অবশ্য দোতলা থেকে আক্রমণ আসা বিচিত্র না। এক কাজ করা যাক, আপনাদের মধ্যে একজন রাস্তায়, আরেকজন গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকুন, কোন গোলমাল দেখলেই একজন থানায় খবর দেবেন, আরেকজন পাড়ার লোকদের ডাকবেন! সুধীন বলল।

কমলেশের কফি হাউসের বন্ধুদের মধ্যে দুজন সত্যি একটু ভয় পেয়েছিল। সুধীনের কথা শেষ হতে না হতে তারা দুজন বেরিয়ে গেল। ওরা চারজন এসে তালা-দেওয়া দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। কমলেশ সকলের পেছনে কেমন বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন বে-পাড়ার লোক এসে ওর পাড়ার একটা সাংঘাতিক সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারটায় ভেতর থেকে সায় দিতে পারছে না সে।

—কি কমলেশবাবু, অবিকল আপনার বাড়ির মতন নয় এ বাড়িটা? আমি কি সাধে ভুল করেছিলাম! কিন্তু কথাটা বলেই সুধীন দেখল কমলেশকে কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওদের চারজনের মনে হল কমলেশ ভয় পেয়েছে। কমলেশ হয়ত ভাবছে বন্ধ দরজাটা খুললেই ঐ লোকটা বেরিয়ে এসে ওদের নাম-ঠিকানা নিয়ে শুইয়ে দেবে ঘরের ভেতর! সুধীন বন্ধুকে সাহস দেয়া গলায় বলল,

—আপনি অত কি ভাবছেন কমলেশ-বাবু? আমরা এখানে চারজন, বাইরে চারজন। তাছাড়া এই দিনদুপুরে কি করতে পারে লোকটা? তালাটা বরং ভাঙা যাক এবার, কি বলেন?

সকলের পেছন থেকে কমলেশ ঠান্ডা ক্লান্ত গলায় বলল—না সুধীনবাবু। তালাটা দামী, ভাঙার দরকার নেই। এই নিন চাবি দিচ্ছি, দরজাটা খুলুন। ওটা আমারই ঘর। আপনি আবার ভুল করেছেন! বজ্রাহত সুধীনের হাতে একটা চাবি রাখল কমলেশ পকেট থেকে বার করে। একটাও কথা না বলে যেন যন্ত্র-চালিতের মত দরজাটা খুলল সুধীন।

কমলেশের ঘরের চেনা দৃশ্যটা আবার দেখতে পেল সুধীন। সেই দেয়াল-ঘেঁষা খাট, বইয়ের আলমারি, কোণে-রাখা জলের কালো কুঁজোটা। ঘরের চার দেয়াল সাদা ধবধবে, কোনোদিন দেয়ালে লাল রঙ করা হয়েছিল বলে মনে হল না কারুর।

—কমলেশবাবু!

একবার আর্তস্বরে চীৎকার করেই থেমে গেল সুধীন। তারপর গলাটা অস্বাভাবিক খাদে নামিয়ে প্রায় শোনা যায় না এমনি স্বরে বলল,

—তাহলে, তাহলে কাল কি এ বাড়িতে আসিনি? অন্য বাড়ি ঢুকেছিলাম? কিন্তু হাস্নুহানার গন্ধ? এ বাড়ি ছাড়া কি কাছাকাছি কোনো বাড়িতে হাস্নুহানার গাছ আছে?

—না, হাস্নুহানা অবশ্য পাড়ায় আর কোনো বাড়িতে নেই।

কমলেশের উত্তরটা শুনতে পেলো না সুধীন কারণ এ পাড়াতেই বড্ড ফেরীয়ালার হাঁকাহাঁকি; চীৎকার করে 'গোলাপরেউড়ী' হাঁকতে হাঁকতে একটা লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। বন্ধুদের গায়ে নিজের অনিচ্ছায় অসাড় হয়ে ঢলে পড়তে পড়তে সুধীনের মনে হল গোলাপরেউড়ীয়ালার গলাটা, ভীষণ চেনা, ভীষণ মেয়েলি।

নান্দীকর

আজকের কথা :

কথাসাহিত্য ও চিত্রনাট্য :

চলচ্চিত্র যেদিন থেকে সবাক হয়েছে, সেইদিন থেকেই তাতে আমদানী হয়েছে কথাসাহিত্য। গান রচনার তাগিদে ডাক পড়েছে সংগীত-রচয়িতার ও কবির এবং সংলাপ লেখবার জন্যে কথা-সাহিত্যিকের। বিদেশের চলচ্চিত্ররাজ্যে কি হয়েছিল জানা নেই, তবে বাঙলা চলচ্চিত্রজগতে সবাক যুগের প্রথম দিকে কোনো উপন্যাস বা নাটকের চিত্ররূপ দেবার সময়ে সেই উপন্যাস বা নাটকের সংলাপাংশে প্রয়োজন অনুসারে দাগ দিয়ে বিভিন্ন দৃশ্যের পাত্রপাত্রীদের বক্তব্য সংলাপ নির্ধারিত করা হোতো। এবং এই নির্ধারণের কাজ করতেন চিত্র-পরিচালক নিজে কিংবা তাঁরই প্রীতি-ভাজন কোনো নবীন লেখক। কিন্তু যাঁর উপন্যাস বা নাটকের চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে, দৃশ্য হিসেবে ভাগ করবার বা সংলাপ নির্ধারণ করবার সময়ে তিনি জীবিত এবং সহজলভ্য হ'লেও তাঁর কোনো মতামত নেওয়া হ'ত না কিংবা তাঁর সংগে পরামর্শ করাও প্রয়োজনীয় ব'লে জ্ঞান করা হ'ত না। কারণ চিত্র-পরিচালক এবং প্রযোজকদের মতে চিত্র-রূপায়ণ একটি বিশেষ আর্ট বা টেক্‌নিক্, যা ভালো ক'রে আয়ত্ত করা না থাকলে কোনো নামকরা সাহিত্যিকের বোঝবারই ক্ষমতা হবে না, ছবিতে কোন্ দৃশ্য থাকা উচিত এবং কোন্ সংলাপ কতটুকু থাকা উচিত। অতএব ধুয়ো উঠেছিল, সিনেমা থেকে সাহিত্যিকদের দূরে রাখ।

কিন্তু দিন যত এগুতে লাগল, বাঙলার চলচ্চিত্ররাজ্যে দিন চলা তত ভার হ'তে থাকল। প্রযোজকরা ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যে ভাটা পড়তে দেখে অনেক বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত করলেন, সবাকচিত্র যখন মানুষের চোখকে খুশী করার সংগে সংগে কানকে খুশী করারও দায়িত্ব নিয়েছে এবং একটি জটিল ও পরিপূর্ণ নাট্যকাহিনীই তার উপজীব্য, তখন কাহিনীটিকে সুষ্ঠুরূপে বর্ণনা করা নাট্যকৌতূহলকে ঠিক মত বজায় রাখা এবং পাত্রপাত্রীদের সংলাপকে প্রাণবন্ত করবার জন্যে সাহিত্যিকের অবশ্য প্রয়োজনকে

বিদ্যাপতি চিত্রের সুটিং এর কাজে কলকাতায় এসেছিলেন বোম্বের অভিনেত্রী নাজিমা।
ফটো : অমৃত

অস্বীকার করা উচিত নয়। কাজেই, সাহিত্যিকদের আহ্বান জানানো হোক। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ইসলাম, পরিমল গোস্বামী, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দেবনারায়ণ গুপ্ত, নিতাই ভট্টাচার্য প্রভৃতি সাহিত্যসেবী। এ'দের আগমনের ফলে প্রথম প্রথম দেখা গেল, ছবি অযথা সংলাপের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে লক্ষ্য করা গেল, সিনেমা বনাম সাহিত্যের দ্বন্দ্বে সাহিত্যই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে. পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী যে-সাহিত্যিক চলতে পারলেন না, তিনি সসম্মানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। এবং কিছু সাহিত্যিক সিনেমার বিদ্যে কুক্ষিগত ক'রে ফেলেছেন ভেবে নিজেরাই রণক্ষেত্রে নেমে পড়লেন পরিচালকের পোশাক প'রে। অবশ্য সিনেমা বনাম সাহিত্যের দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়েছিল বলেই চলচ্চিত্র-গঠনে চিত্রনাট্যের প্রয়োজনীয়তা একটা সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করতে পেরেছিল। দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া বা নীতীন বসু সবাকচিত্রের যুগে আসা মাত্রই একটি পূর্ণাঙ্গীন চিত্রনাট্য বা কখনও কখনও নিদেনপক্ষে একটি চিত্রনাট্যের কাঠামো হাতে না নিয়ে ছবির স্যুটিং আরম্ভ করতেন না; কিন্তু বহু পরিচালককেই মূল বইয়ের পাতায় দাগ দিয়ে, তাতে ৫৭ পৃষ্ঠার পরে ৬৯ পৃষ্ঠা দেখ ইত্যাদি লিখে দৃশ্যবিভাগ ক'রে বা বড় জোর একটি লম্বা খাতায় কালো কালিতে পাত্রপাত্রীর ক্রিয়াকলাপ এবং লাল কালিতে তাদের সংলাপ লিখে ছবির স্যুটিং করতে দেখেছি।

যদিও সাম্প্রতিককালের কোনো ছবিতে প্রথিতযশা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও চিত্রনাট্যকাররূপে ঘোষিত হ'তে দেখেছি, তবু অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, বড়ো সাহিত্যিক হ'লেই কেউ যে সার্থক চিত্রনাট্যকার হ'তে পারবেন, এ-ধারণা করাই উচিত নয়। সবাকচিত্র আসলে এবং প্রথমে চিত্র, পরে সবাক। এবং চিত্র হচ্ছে চলচ্চিত্র, গতিই যার প্রাণ। যে-কোনো নাট্য-সম্ভাবনাপূর্ণ কাহিনীকে চিত্রে রূপান্তরিত করতে গেলে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের মাধ্যমে তাকে এমনভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করতে হয় যে মাত্র চিত্রের পর চিত্র দেখলেই কাহিনীটি সকলের বোধগম্য হবে এবং তারপরে তার পাত্রপাত্রীর মুখে সেইটুকু সংলাপ দেওয়া হবে, যা চলচ্চিত্রের প্রাণধর্ম যে গতি, সেই গতিকে ত্বরান্বিত হ'তে সাহায্য করে। একটি সাধারণ রীতি আছে যে, কোনো চলচ্চিত্রের একের তৃতীয়াংশের বেশী স্থান যেন সংলাপ কখনও না অধিকার করে। সংলাপের গুরুভারে ভারাক্রান্ত হয়ে চলচ্চিত্রের গতি যদি রুদ্ধ হয়, তাহ'লে তার অপমৃত্যু অনিবার্য। বাক্য থেকে চিত্রের স্থান ঊর্ধ্বে ব'লেই সংলাপে মাধুর্য ও সাবলীলতা আনবার জন্যে কথা-সাহিত্যিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হ'লেও তিনি সব সময়েই চিত্রপরিচালকের অধীন থেকে তাঁর নির্দেশ পালন করতে বাধ্য।

॥ মহানগর প্রসঙ্গে ॥

গত সপ্তাহে শ্রীসত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'মহানগর' ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে একটি বিচ্যুতি ঘটে গেছে। আলোচনার এক জায়গায় বলা হ'য়েছে—

"ছবিটির সংলাপের মধ্যে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। স্ত্রী স্বামীকে বলছে, 'আর যাই কর, আমাকে ভুল কোরো না'; এখানে 'ভুল বুঝো না' বলাই সঙ্গত। আর এক স্থানে 'এখন মিন্টুকে চান দেবার সময়' বলা হয়েছে; 'চান করাবার সময়' বলা উচিত।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিতীয় সংলাপের ক্ষেত্রে ছবিতে স্ত্রী স্বামীকে 'ভুল বুঝো না' কথাটিই বলেছে ছবিতে। এই অনিচ্ছাকৃত প্রমাদের জন্যে আমরা দুঃখিত।

'এবলিঙ্কন ইন ইলিনয়েজ'-এর মঞ্চাভিনয়:

গেল শনিবার, ৫ই অক্টোবর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হলে নয়াদিল্লীস্থ ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফর্মেশন সার্ভিসের প্রয়োজনায় রবার্ট শেরউডের বিখ্যাত নাটক 'এবলিঙ্কন ইন ইলিনয়েজ'-এর অভিনয় হল। এই অসামান্য সাফল্য-মণ্ডিত অভিনয় সম্পর্কে আমরা বারান্তরে আলোচনা করব।

এলিট সিনেমায় 'ডক্টর নো':

আসচে ১৭ই অক্টোবর থেকে এলিট সিনেমায় আয়ান ফ্লেমিং রচিত এবং সিন কর্নোর অভিনীত 'ডক্টর নো' নামে চাঞ্চল্যকর গোয়েন্দা চিত্রখানি দেখানো হবে। হ্যারি সাল্টজ্‌ম্যান এবং কাবি ব্রোকোলির যুগ্ম-প্রযোজনায় নির্মিত এই টেক্‌নিকলার ছবিটি ইউনাইটেড আর্টিস্ট মারফত মুক্তিলাভ করবে।

এগ্রিকালচার ডাইরেক্‌টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'সমুদ্রশঙ্খ':

গেল ৩০-এ সেপ্টেম্বর, সোমবার স্টার রঙ্গমঞ্চে এগ্রিকালচার ডাইরেক্‌টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাবের চতুর্থ অবদান, রতনকুমার ঘোষ বিরচিত 'সমুদ্রশঙ্খ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। আদর্শবাদী বড়ো ছেলে প্রিয়তোষ, ক্ষমতালোভে মত্ত মেজ ছেলে বিলাস, অবহেলিত, অবজ্ঞাত, বাউণ্ডুলে ছোটছেলে অমল এবং যৌবন-যন্ত্রণাকাতর মেয়ে শান্তা—এই চারটি সন্তানকে নিয়ে পঙ্গু প্রাণতোষ রায়ের সংসার। এদের বিরোধ, পদস্খলন এবং আদর্শের বিরোধের মধ্যে অভিনব নাটকীয়তা কিছু নেই; বরং কোনোরকম প্রস্তুতি এবং অনিবার্যতা ছাড়াও বহু অবাঞ্ছিত ঘটনার সমাবেশ আছে। কিন্তু নাটকটির দুর্বলতা যতই থাক না কেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাট-নৈপুণ্য সমবেত দর্শকদের প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। বিশেষ করে দীপ্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (প্রিয়তোষ), দিলীপ মজুমদার (বিলাস), রতনকুমার ঘোষ (অমল), অমূল্য সরকার (মাণিকচাঁদ), ধীরমোহন মুখোপাধ্যায় (অরুণ), যশোদাদুলাল চট্টোপাধ্যায় (হারাধন), কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (কৈলাশ), গীতাচরণ মুখোপাধ্যায় (অবিনাশ), বিমলকুমার রায় (তড়িৎ), কুন্তলা চট্টো (বল্লরী), আরতি মজুমদার (শান্তা), বনশ্রী চক্রবর্তী (পদ্ম) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কালস্রোত চিত্রে বিকাশ রায় ও সুমিতা সান্যাল

কে, জি প্রোডাকসন্স-এর 'কিনু গোয়ালার গলি':

কে, জি প্রোডাকসন্স-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'কিনু গোয়ালার গলি'র চিত্রগ্রহণের কাজ পরিচালক অর্ধেন্দু গাঙ্গুলীর অধীনে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সন্তোষকুমার ঘোষ রচিত এই কাহিনীর চিত্ররূপের বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে সুমিত্রা দেবী, শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দকে। সুরারোপে আছেন সলিল চৌধুরী।

মুক্তিপ্রতীক্ষায় 'উত্তর ফাল্গুনী':

উত্তমকুমার ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত কাহিনী অবলম্বনে অসিত সেন পরিচালিত 'উত্তর ফাল্গুনী' অতি শীঘ্রই রূপবাণী, ভারতী এবং অরুণায় মুক্তিলাভ করবে। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরসমৃদ্ধ এই ছবিখানির উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মা এবং মেয়ের দ্বৈত ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের অনবদ্য অভিনয়। এবং তাঁর সঙ্গে আছেন বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, ছায়া দেবী, রেণুকা রায় প্রভৃতি। ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তিলাভ করছে।

মুক্তিপথে 'অশান্ত ঘূর্ণী':

সিলভার স্ক্রীন প্রোডাকসন্স-এর প্রথম প্রয়াস 'অশান্ত ঘূর্ণী' মুভীউইন-এর পরিবেশনায় মুক্তির অপেক্ষায় আছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন 'রক্তপলাশ', 'ঢুলি', 'মধ্যরাতের তারা' প্রভৃতি রজত-জয়ন্তী ছবির পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়। সুরারোপ করেছেন প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক রাজেন সরকার। 'অশান্ত ঘূর্ণী'র কাহিনী গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক আশাবাদী যুবককে নিয়ে। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন অনিল চট্টো, দিলীপ মুখো, জীবেন বসু, দীপক মুখো, জহর রায়, প্রশান্তকুমার, নীতীশ মুখো, রেণুকা রায়, গীতা দে, তুতু মণ্ডল, সুখেন দাস, মণি শ্রীমানী এবং নবাগতা জ্যোৎস্না বিশ্বাস।

রামকৃষ্ণ ফিল্মস্-এর 'সেবা':

রামকৃষ্ণ ফিল্ম ডিস্ট্রীবিউটার্স পরিবেশিত 'সেবা'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। সেবার চেয়ে ধর্ম নেই, এইটিই ছবিটির মূল কথা। দেশ ও দশের সেবায় বিভিন্ন ধারা নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গীতে চিত্রায়িত হয়েছে সেবায়।

অনন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে পরিচালনা করেছেন রূপাঞ্জন আঢ্য। চরিত্র রূপায়নে আছেন তৃপ্তি মিত্র, কমল মিত্র, অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, মলয়া সরকার, তন্দ্রা বর্মন, জহর রায়, নৃপতি ইত্যাদি।

কণ্ঠসংগীতে সন্ধ্যা, প্রতিমা ও গায়ত্রী।

একটি অনুষ্ঠান

গত ৮ই সেপ্টেম্বর '৬৩ বারাসতের সুছন্দম সংগীত বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস সাফল্যের সংগে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উৎসবে যে নতুনত্বের ছাপ দেখা গেলো তা হল নৃত্যের মাধ্যমে ফুল দিয়ে সভাপতি ও প্রধান অতিথির বরণ। প্রশংসা করতে হয়। কয়েকজনের নৃত্য দর্শকগণের প্রশংসা লাভ করে।

দেয়া নেয়া

এবারের পূজার অবকাশে গায়ক শ্যামল মিত্র আত্মপ্রকাশ করবেন প্রযোজক হিসাবে। তাঁর প্রযোজনায় রূপছায়া চিত্রের প্রথম ছবির নাম 'দেয়া নেয়া'।

কাহিনীর রচয়িতা বিধায়ক ভট্টাচার্য ও সুরকার প্রযোজক নিজেই। পরিচালনা করেছেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

'দেয়া নেয়া' ছবির নায়ক উত্তমকুমারের বিপরীতে অভিনয় করছেন বোম্বের অভিনেত্রী তনুজা। বাংলা ছবিতে তনুজার এই প্রথম আত্মপ্রকাশ। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়াদেবী, লিলি

চক্রবর্তী, সুস্মিতা সান্যাল, তরুণকুমার প্রভৃতি। পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন ছায়ালোক।

কালস্রোত

বি কে প্রোডাকসন্স-এর বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় নির্মিত 'কালস্রোত' চিত্রের কাহিনীকার বিনয় চট্টোপাধ্যায়. পরিচালক সুশীল মজুমদার। সম্প্রতি সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র লাভ করেছে ছবিখানি। এর চরিত্রলিপিতে আছেন অসিতবরণ, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, পাহাড়ী সান্যাল, সন্ধ্যারাণী, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারিণী ললিতা চট্টোপাধ্যায় এবং সুস্মিতা সান্যাল। সুরারোপ করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। চিত্রগ্রহণে, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে সন্তোষ গুহরায়, দুলাল দত্ত ও সুনীতি মিত্র।

সেক্সপীয়র নাট্য উৎসব

মহাকবি নাট্যকার সেক্সপীয়রের ৪০০তম জন্মশত বার্ষিকী আসন্ন। এই উপলক্ষে সারা বিশ্বের নাট্যামোদী রসিকবৃন্দ মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করবেন। বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদও সেই বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধাঞ্জলির অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এই উপলক্ষে কলকাতার বিশিষ্ট নাট্য সংস্থাগুলি কর্তৃক বিশ্বরূপা মঞ্চে সেক্সপীয়রের নাট্যাবলীর (বাংলা অনুবাদ) এক বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। একাধিক মূল ইংরাজী নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকবে। আগামী এপ্রিল (১৯৬৪) থেকে ছুটির দিন বাদে প্রতি শনিবার দ্বিপ্রহরে প্রায় তিন মাসব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

ত্রিবেণী শিল্প সংস্থা আয়োজিত এবং সুমিত্রা সেন পরিচালিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে নৃত্যরতা মঞ্জুশ্রী চাকী। ফটো : অমৃত

দীপশিখা গোষ্ঠীর অভিনয়

গত ২০এ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম নাট্য সংস্থা দীপশিখা শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীরা তাদের মঞ্চসফল নাটক শচীন ভট্টাচার্যের 'পাশের ঘরের ভাড়াটে'-র পঞ্চম অভিনয় থিয়েটার সেন্টারে মঞ্চস্থ করে।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে গোবিন্দ গাঙ্গুলী, নটরাজ সাহা, সত্যেন ব্যানার্জী, আশীষ চক্রবর্তী, কমলেন্দু বসু ও সুতপা ভট্টাচার্যের অভিনয় দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। নাটকটি পরিচালনা করেন শচীন ভট্টাচার্য।

বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব

আগামী ২০শে অক্টোবর, রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় আশুতোষ কলেজ হলে দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সঙ্গীত শাস্ত্রী, উৎসবে ভাষণ দেবেন এবং স্নাতকদের যোগ্যতা-পত্র বিতরণ করবেন।

এই উপলক্ষে শ্রীসুনীলকুমার রায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা

উৎপল দত্ত পরিচালিত ও বিদ্যুৎ প্রযোজিত 'ঘুমভাঙার গান' চিত্রটির সম্প্রতি চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। জীবনের বাস্তব রূপায়ণের দিক থেকে এটি একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রণ। ছবিটি সম্পর্কে রসিক দর্শকদের গভীর উৎসাহ রয়েছে। ছবির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এর বহির্দৃশ্য। কুশলী বিভাগের অন্যতম শাখা, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় যথার্থ দায়িত্ব পালন করেছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং শিব কল্যাণ। কাহিনীর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, শোভা সেন, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, মণি শ্রীমানী, অরুণ রায় ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটির সঙ্গীত-পরিচালক রবিশঙ্কর।

বাস্তবধর্মী ছবিনির্মাণে নতুন ধারায় বিশ্বাসী পরিচালক মৃণাল সেন সম্প্রতি 'প্রতিনিধি'-র বহির্দৃশ্য শেষ করে ছবিটি সম্পূর্ণ করলেন। বর্তমানে সম্পাদনার প্রধান কাজটুকু নিয়মিত সুসম্পন্ন হচ্ছে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটোরীতে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রী সেন। বিবাহিত জীবনের বাস্তব কয়েকটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে এ চিত্রকাহিনী নতুন চলচ্চিত্র ধারায় স্থান পেয়েছে। প্রধান চরিত্রে যথার্থ অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ও মাস্টার প্রসেনজিৎ। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা এবং শিল্পনির্দেশনায় কাজ করেছেন শৈলজা চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর নস্কর ও বংশীচন্দ্র গুপ্ত। দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত 'অশ্রুনদীর সুদূর পারে' এবং 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম' ছবিতে নতুন পরিবেশ রচনায় সার্থক হয়েছে। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চণ্ডীমাতা ফিল্মস এ ছবির পরিবেশক।

এম কে জি প্রডাকসন্সের 'কষ্টি-পাথর' পরিচালনা করছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। জ্যোতির্ময় রায় রচিত এ কাহিনীর বিষয়বস্তু রঙ্গমঞ্চের জীবনকে নিয়ে বিধৃত হয়েছে। কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন সন্ধ্যা রায়, বসন্ত চৌধুরী, কমল মিত্র, অনুপকুমার, জহর রায়, প্রেমাংশু বসু, অরুণ চৌধুরী, রবি ঘোষ, সাধনা রায়চৌধুরী, লিলি চক্রবর্তী ও জয়শ্রী সেন। সঙ্গীত-পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় রয়েছেন যথাক্রমে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিজয় ঘোষ, রবীন দাস এবং কার্তিক বসু।

পি এ ফিল্মসের হাসির ছবিটি 'তাহলে' নিয়মিত গৃহীত হচ্ছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। ছবিটি পরিচালনা করছেন গুরু বাগচী। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন সন্ধ্যা রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়,
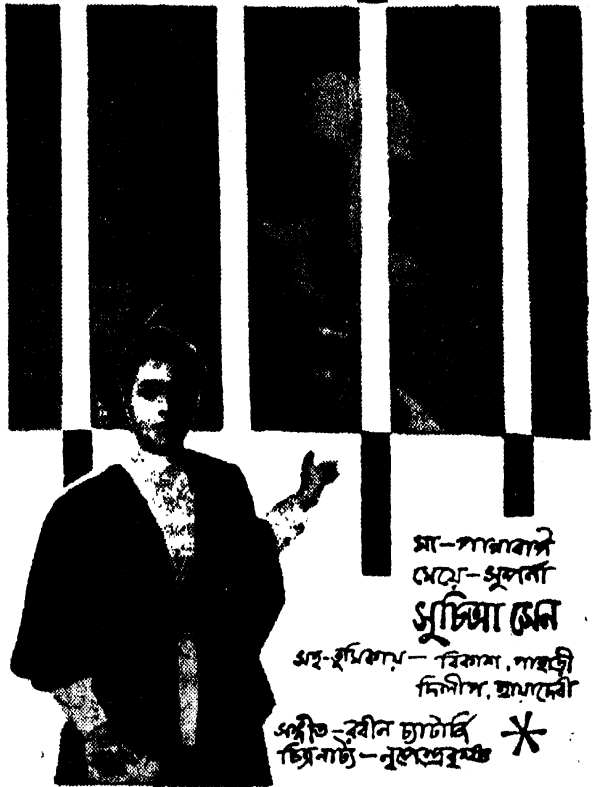
মৃণাল সেন পরিচালিত ইলোরা ফিল্মসের **প্রতিনিধি** চিত্রের নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

অমিত দে, বিকাশ রায়, মলিনা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, রেণুকা রায়, অনুপকুমার, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা দে। চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন অনিল গুপ্ত এবং সুধীন দাশগুপ্ত। মিতালী ফিল্মস ছবিটির পরিবেশনা-ভার গ্রহণ করেছেন।

বোম্বাই

ফিল্মালয়ের আগামী রঙিন চিত্র 'আও প্যায়ার করে'-র বহির্দৃশ্য ইউরোপে সুসম্পন্ন হবে। এ ছবির নায়ক-নায়িকা জয় মুখার্জী ও সায়রা বানু সম্প্রতি পরিচালকের সঙ্গে পাশ্চাত্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। রোম এবং ভেনিসে এ ছবির কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য গৃহীত হবে। এ ছবির পরিচালক আর. কে. নায়ার ও আলোক-চিত্রশিল্পী কে. এইচ. কাপাডিয়া দলের সঙ্গে যাত্রা করেছেন।

'চলতি কা নাম গাড়ী' ও 'ঝুমরু' সাফল্যের পর প্রযোজক অনুপকুমার সম্প্রতি আর একটি নতুন ছবির শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন করেন। নামহীন ছবিটির কাহিনী লিখেছেন ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়। প্রধান তিনটি চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মনোজকুমার, নন্দা ও মেহমুদ। ছবির পরিচালক রতন ভট্টাচার্য। সুরসৃষ্টি করবেন রোশন।

রালহান প্রোডাকসন্সের রঙিন নতুন ছবি 'সাকা'-র শুভদৃশ্য সাড়ম্বরে গৃহীত হল। মীনাকুমারী ও ধর্মেন্দ্র দুটি প্রধান চরিত্র। এ ছবির প্রযোজক-পরিচালক ও. পি. রালহান। রবি ছবির সুরকার।

মাদ্রাজ

ভিকরাম প্রোডাকসন্সের 'প্যায়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া' ছবিটির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। প্রযোজনা, পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ করেছেন বি. এস রাঙ্গা। প্রধান চরিত্রলিপিতে অবতীর্ণ হয়েছেন শাম্মি কাপুর, বি. সরোজা দেবী পৃথ্বিরাজ কাপুর, প্রাণ, আগা, নাজির হোসেন, শুভা খোটে ও ওমপ্রকাশ। সঙ্গীত-পরিচালক : রবি। আগামী মাসের এক তারিখে ছবিটি এখানে মুক্তি পাবে।

স্টুডিও থেকে বলছি

চলচ্চিত্রের আলোকরহস্য সম্পর্কে কয়েকটি অন্তর্নিহিত রূপ আপনাদের সহজভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছি। অভিনয় তো আছেই, কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে আলোকসম্পাত। সামান্য আলো-ছায়ার তারতম্য ঘটলে গৃহীত ছবির আকারের সামঞ্জস্য অনেক পাল্টিয়ে যায়। খালি চোখে ধরা না পড়লেও সাদা পর্দায় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সুতরাং একটি সার্থক কাহিনীর চলচ্চিত্র-রূপায়ণে আলো-ছায়ার সৌন্দর্য ও প্রকাশ-মাধুর্য নির্ভর করে সুনির্দিষ্ট আলোক-নিয়ন্ত্রণের ওপর। এমনকি আলোক-সম্পাতের কৌশলে কাহিনীর চরিত্র এবং পরিবেশের যে ছায়া, ছায়াধরযন্ত্রে ধরা পড়ে, তা কখনই ছায়া বলে মনে হয় না। রক্তমাংসের চরিত্র বলেই সকলের ভুল হয়। চিত্রগ্রহণের আগে স্টুডিওতে যে আলোর ভুবন রচিত হয় তা নিয়ে এবারে বলছি।

দিনের আলোর স্টুডিওর ভেতর কাজ করা চলে না। তার কারণ আলো নিয়তই পরিবর্তনশীল এবং মানুষ-নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাই বর্তমানে প্রয়োগশালার মধ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে সব ছবি গৃহীত হচ্ছে। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে অন্ধকার জগৎ আলোর ভুবনে পরিবর্তিত হয়। পরিচালকের ইচ্ছেমত আলোক-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পরিকল্পিত থাকে।

প্রয়োগশালার এই 'আলোকরহস্য' ছোটবড় আলোর সাহায্যে বিশেষ মাপ-জোক করে হিসেব মত আলোর ব্যবহার আলোকচিত্রগ্রাহক করে থাকেন। আলোর ব্যবস্থা যদি নিখুঁত না হয় তাহলে ছবি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই সঙ্গে কাহিনীর চরিত্র-অভিনয়ও। এমনকি ক্যামেরাও আলোর দোষে আশানুরূপ হয়ে ওঠে না।

অনেক সময় দৃশ্যগ্রহণের আগে আলোর পরিমাপ করতে গিয়ে চিত্রগ্রাহকের অনেকটা সময় লেগে যায়। কিন্তু পরিচালক যদি এটুকু সহযোগিতা না করেন তাহলে শুধু আলোর জন্যই ছবি দর্শকদের পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে পারে। একটি ছবি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করতে হলে চিত্রনাট্যের পর পরিচালকের উচিত আলোকশিল্পী, শিল্পনির্দেশক এবং সম্পাদক, এই তিনজনের সঙ্গে বসে প্রত্যেক দৃশ্যের খসড়া তৈরী করা। তাহলে ছবি-তৈরীর সুপরিকল্পিত রূপটি সহজেই দর্শনীয় হয়ে উঠবে।

সাধারণতঃ শ্রেণীবিন্যাসে ছবির আলোর ব্যবহার হেরফের হয়। যেমন হিসেবমত দুটো শ্রেণীর কথা উল্লেখ করি। দৃশ্যপট এবং পরিবেশ ছাড়াও অনেক কাহিনীর অভিনেতা-অভিনেত্রীই ছবির প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে আলোর ব্যবহার শিল্পীর প্রধান আকর্ষণের অনুকূল হবে। আর এক ধরণের ছবি হয় যাতে পাত্র-পাত্রীর ওপর শুধু পক্ষপাতিত্ব না করে সামগ্রিক গল্পের সাফল্য আসে তার ওপর আলোর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। এই দুই শ্রেণীর ছবিতে আলোর ব্যবহার দু' রকমের। প্রথম শ্রেণীর ছবিতে প্রধান ব্যক্তি বা নায়ক-নায়িকার প্রয়োজনে আলোর ব্যবস্থা সংগঠিত হবে। যিনি নায়ক বা নায়িকা তাকে যাতে সম্পূর্ণ ছবিতে সুন্দর ও মনোগ্রাহী করে তোলা যায় সেই দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। কারণ ছবির তিনিই হচ্ছেন একমাত্র আধার। আর সব তখন গৌণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবিতে ব্যক্তির প্রয়োজন প্রচ্ছন্ন থাকে। এখানে গল্পের আকর্ষণটাই মুখ্য। তবে আশাজনক, আজকাল প্রথম শ্রেণীর ছবির তেমন কদর নেই। তার কারণ নায়ক-নায়িকার খাতিরে পরিচালকদের প্রায়ই চলচ্চিত্রের এই সমন্বিত শিল্পকলাকে বিনাশ করতে হয়েছে। ছবি তুলতে এমনও দেখা গেছে যে তথাকথিত নায়িকার সুন্দর মুখের জন্য অনেক অপ্রধান ঘটনা যা চিত্রের খুবই প্রয়োজনীয় তা বাদ দিতে হয়েছে। যার ফলে সে ছবি উত্তীর্ণ হলেও রসোত্তীর্ণ হয়নি। আজকের চলচ্চিত্রনির্মাতা নতুনপন্থীরা প্রথম শ্রেণীর চিত্রদর্শন যুক্তিতর্কে সে মতবাদ বিসর্জন দিয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজকাল দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যার ফলে স্বাধীনভাবে একজনের ওপর শুধু মনোযোগ না দিয়ে সকলের ওপর সমান দৃষ্টি দেবার অবকাশ পেয়েছেন আলোক-শিল্পী। তা ছাড়া ছবির আলোক-সম্পাত গল্পের অনুকূলেই হওয়া উচিত। শ্রেষ্ঠ ছবির প্রধান গুণ হচ্ছে তাই। ছবির ঘটনা ও কাহিনীর অন্তর্নিহিত যে সুর, আলোর ভেতর দিয়ে তাকে যথার্থ অনুসরণ করতে পারলেই সে ছবি সার্থক হয়ে উঠবে।

প্রয়োগশালায় কৃত্রিম আলো ছাড়া যে বহির্দৃশ্যে প্রাকৃতিক আলোয় দৃশ্যগ্রহণ করা সম্ভব নয়, এমন যেন কেউ মনে করবেন না। বাইরের মুক্ত আলোয় এমন বহু ছবি আজকাল তোলা হচ্ছে যা স্টুডিও থেকে অনেক বেশী দর্শনীয় বলে মনে হয়। তবে সূর্যের আলোক নিয়ন্ত্রণ করতে সুদক্ষ কুশলীর প্রয়োজন এবং বহির্দৃশ্যে রিফ্লেক্টর বা প্রতিফলক আলোক অত্যাবশ্যকীয়। প্রয়োগশালার ভেতরে প্রতিফলক আলোর ব্যবহার আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে। কড়া আলো, নরম আলো, সামনের আলো, পিছনের আলো, মাঝের আলো এবং কোনাকোনি সব-রকমের আলোই এই রিফ্লেক্টর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ছবির কাহিনী অনুযায়ী, যেমন— গল্প গুরুগম্ভীর হলে আলোক-সম্পাত হবে সংযত। মেলো-ড্রামা হলে একটু নরম আলো দরকার। মধুর-মিলনান্তক বা হাসির ছবিতে আগাগোড়া জোর আলোর প্রয়োজন। নতুবা ঘটনার সঙ্গে আলোর সামঞ্জস্য থাকবে না। চলচ্চিত্রের আলোকরহস্য শুধু যে গল্প ও অভিনয়ের একটা নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে তাই নয়, দর্শকের মনকেও ছবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও রসগ্রহণের সহায়ক করে তোলে।

—চিত্রদূত

দৃশ্য গ্রহণের অবসরে স্টুডিও বাগানে ঘরোয়া আলাপ করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা। ফটো : অমৃত

এবার পূজায় এইসব তথ্যগুলি

১ ভারতে লক্ষ লক্ষ পরিবার তাদের **মারফি রেডিও** শুনে রোজ আনন্দ পায়। একমাত্র এই পূজার আগেই আরও ৬০,০০০ পরিবার **মারফি**-র মালিক হবার গৌরব অর্জন করেছে।
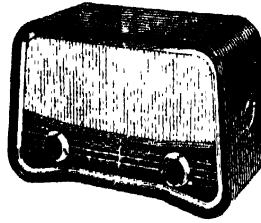
মডেল টিএ ০৭৫২
৫-ভাল্ভ • অল-ওয়েভ • ৩-ব্যাণ্ড
এসি কিম্বা এসি/ডিসি (দুটি মডেল)
তৎসহ: মডেল টিবি ০৭৫১
৫-ভাল্ভ • ড্রাই ব্যাটারী
(ব্যাটারী ব্যতীত মূল্য)
২৭০্ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ। বিক্রয়কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

৪ বছরের পর বছর আপনাকে নিখুঁতভাবে কাজ দেবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি **মারফি রেডিও** অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমাবেশ করা হয় ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয় যাতে রক্ষণাবেক্ষণ হয় সহজ ও সুবিধাজনক।

৫ সুদৃশ্য বাহারী **মারফি** ক্যাবিনেট আপনার গৃহসজ্জায় এক বিশিষ্ট শোভা ফুটিয়ে তোলে এবং সেইসঙ্গে আপনার অনন্যসাধারণ সুরুচির পরিচয় দেয়।
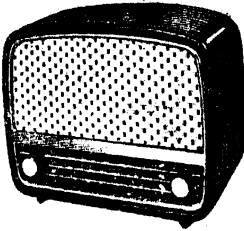
মডেল টিইউ ০২৯৮
৫-ভাল্ভ • অল-ওয়েভ •
৩-ব্যাণ্ড এসি/ডিসি
তৎসহ: মডেল টিবি ০২৯৯
৪-ভাল্ভ • ড্রাই ব্যাটারী
(ব্যাটারী ব্যতীত মূল্য)
২২০্ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ। বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।
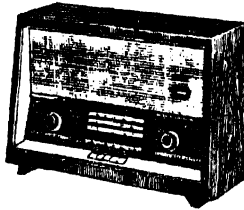
মডেল টিএ / টিইউ ০৭৭৪
৬-ভাল্ভ • ৪-ব্যাণ্ড • পিয়ানো-কি সুইচ • এসি কিম্বা এসি/ডিসি
৫৪৬্ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ। বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

৮ ৮০০ হিতৈষী **মারফি** ডীলার দেশের সর্বত্র আপনার পছন্দসই মডেল আপনাকে নিখরচায় বাজিয়ে শোনাবার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছে। আপনি শুধু অনুগ্রহ করে আপনার নিকটস্থ **মারফি** ডীলারের কাছে যান…এবং সেই সঙ্গে আপনার পরিবারের সকলকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

৯ এবার পূজায় **মারফি** আপনাকে ১২ রকম মডেল থেকে পছন্দ করার সুযোগ দিচ্ছে।
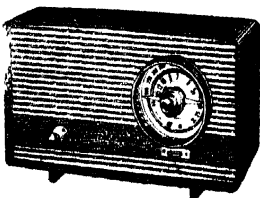
মডেল টিইউ ০৭০৪
৪-ভাল্ভ • অল-ওয়েভ
২-ব্যাণ্ড • এসি/ডিসি
তৎসহ: মডেল টি বি ০৭০৩
ব্যাটারী চালিত
(ব্যাটারী ব্যতীত মূল্য)
১২৫্ টাকা বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত। উৎপাদন কর সহ। লাইসেন্স ফি অবৈধ।
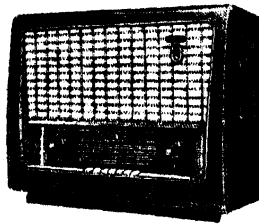
মডেল টিএ ০২৭৬
৮-ভাল্ভ • ১২টির ক্ষমতাসম্পন্ন •
৪-সাউণ্ড স্পীকার হাই-ফাই
ধ্বনি উৎপাদনের জন্য • অল-ওয়েভ •
৫-ব্যাণ্ড • পিয়ানো-কি সুইচ • এসি
৮৯৮.৩৩ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ। বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

সর্ব ভারতীয় মূল্য (মহারাষ্ট্র ব্যতীত)

কটি রেডিও কেনার আগে...
াপনাকে নিশ্চয় জানতে হবে

প্রত্যেক বছরেই মারফি তাদের রেডিও শ্রেণীতে নতুন-নতুন মডেল যোগ করে যা উন্নত অভিনবত্বের পরিচায়ক। এইবছর মারফি ৫টি নতুন মডেল উপস্থিত করেছে।

যান্ত্রিক উৎকর্ষ ও স্থায়ী শিল্পনৈপুণ্যের সমন্বয়ে প্রতিটি মারফি রেডিও আপনাকে দেয় চমৎকার একটানা কাজ, ধ্বনির অবিকল ব্যঞ্জনা এবং কণ্ঠস্বরের প্রাচুর্য।
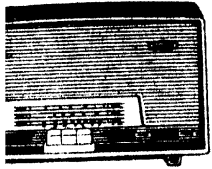
মডেল টিএ/টিইউ ০৫৫২
৫-ভাল্ভ • অল-ওয়েভ • ৩-ব্যাণ্ড • পিয়ানো-কি সুইচ • এসি এবং এসি/ডিসি
৩৩০্ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ। বিক্রয়কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।
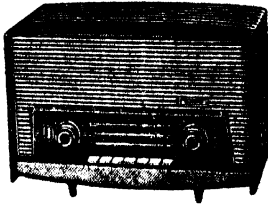
মডেল টিএ/টিইউ ০৪৫২
৬-ভাল্ভ • অলওয়েভ • ৩-ব্যাণ্ড পিয়ানো-কি সুইচ • এসি কিম্বা এসি/ডিসি (দুটি মডেল)
৩৭০্ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ। বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

সুদীর্ঘকাল ব্যাপক গবেষণার পর এইবছর মারফি তাদের প্রথম বহনযোগ্য ট্রানজিস্টার রেডিও বাজারে উপস্থিত করছে। প্রত্যেকটি মারফি মডেল নিখুঁত করার পশ্চাতে রয়েছে উন্নত কলাকৌশলের প্রতি এই নিষ্ঠা এবং উৎপাদিত প্রতিটি মারফি সেটে তা একান্ত মূর্ত হয়ে ওঠে।

মারফি রেডিওগুলির মূল্য সাধারণ লোকেরও আয়ত্বের মধ্যে। এগুলির মূল্য ১৩৫্ টাকা থেকে ৭৬০্ টাকা (এবং রেডিওগ্রাম ১৬০০্ টাকা)

মডেল টিবি ০৫৮৩
৯ ট্রানজিস্টর এবং ডাইওড • অল-ওয়েভ • ৩-ব্যাণ্ড
(ব্যাটারী ব্যতীত মূল্য)
৩৭৫্ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ। বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।
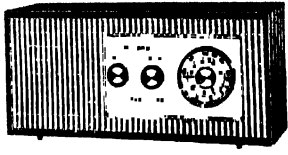
মডেল টিবি ০৬০৫
১১ ট্রানজিস্টর এবং ডাইওড • অল-ওয়েভ • ৩-ব্যাণ্ড
(ব্যাটারী ব্যতীত মূল্য)
৪১৫্ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ। বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

murphy radio

মারফি রেডিও গৃহকে আনন্দমুখর রাখে!

NAS 33363
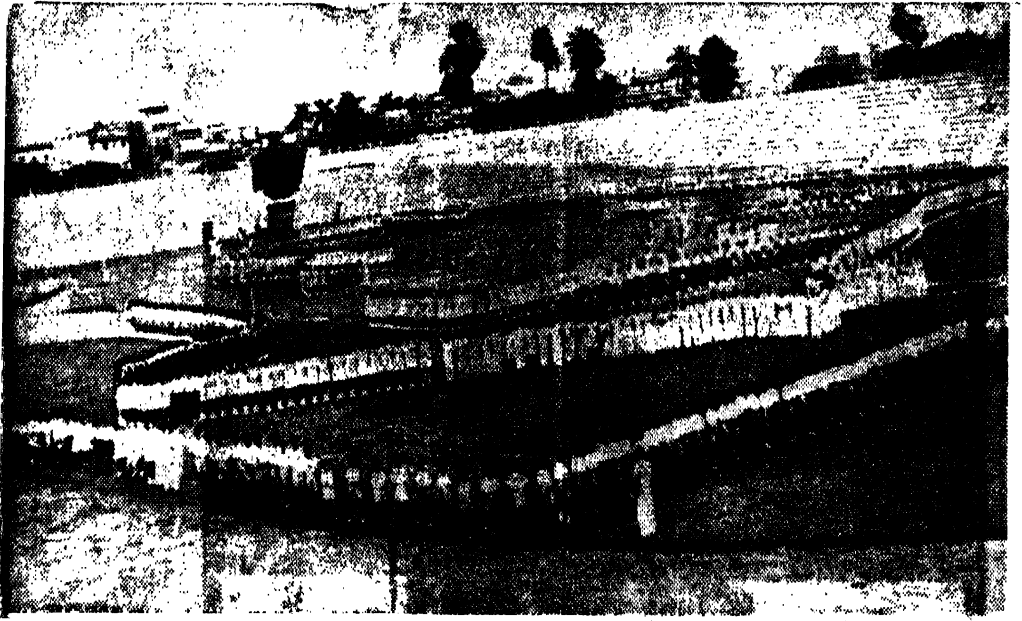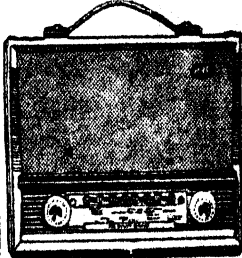
পঞ্চম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন দিনের অনুষ্ঠানে আকর্ষণীয় মার্চপাস্ট-এর দৃশ্য এবং একজন ভারত খ্যাত জিমন্যাসিয়ানের খেলার দৃশ্য।

ফটো : অমৃত

।। ডক্টর ইন ডিসট্রেস ।।

ডক্টর ইন ডিসট্রেস ডাক্তার সিরিজের পঞ্চম চিত্র। এই পর্যায়ের চিত্রগুলির জনপ্রিয়তার বিষয় নতুন করে কিছুই বলার নেই। ডক্টর ইন ডিসট্রেস চিত্রে জনৈক ফরাসী অভিনেত্রী, মীলেন দেমোগেত, নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন চিরদিনের 'ডাক্তার' ডার্ক বোগের্ড। ডার্ক বোগের্ড ইতিপূর্বে 'সিঙ্গার এ্যান্ড নট দি সঙে' শ্রীমতি মীলেনের বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ডাক্তার সিরিজের আরেকজন অভিনেতা ডোনাল্ড হাউস্টন এই চিত্রে থাকবেন।

—চিত্রকূট

খেলাধূলা

দর্শক

॥ ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশন ॥

আগামী ২৬শে অক্টোবর—ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশনের সুদীর্ঘকালের ঘটনাবহুল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় দিন হিসাবে মহা আড়ম্বরের সঙ্গেই উদ্‌যাপিত হবে। একশত বছর আগে—১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই ২৬শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডন সহরে অনুষ্ঠিত এক সভায় এগারটি ফুটবল ক্লাবের কর্মকর্তারা মিলিত হয়ে এই ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। এই ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশনই বিশ্বের ফুটবল খেলার প্রাচীনতম নিয়ন্ত্রণ-সংস্থা। ফুটবল খেলায় ইংল্যাণ্ডের লোকের আগ্রহ, উদ্দীপনা এবং উত্তেজনার শেষ ছিল না। ক্লাবের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। কিন্তু ফুটবল খেলার সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন এবং পরিচালনার সুব্যবস্থার অভাবে ফুটবল খেলায় যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা দেখা দিত; ফলে দেশের সমাজ জীবনে ফুটবল খেলা বেশীর ভাগ সময়ে এক বিপজ্জনক উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৮৪৮ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মহল ফুটবল খেলাকে শরীর চর্চার বিশেষ অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁরাই প্রথম ফুটবল খেলার আইন তৈরী করেন। তাঁদের প্রণীত এই আইনের নাম ছিল 'কেম্ব্রিজ আইন'। এই আইনটি কিন্তু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরোয়া ফুটবল খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রধান কাজ ছিল—ফুটবল খেলার আইন প্রণয়ন, খেলা পরিচালনার সুব্যবস্থা এবং স্থানীয় ক্লাবগুলিকে এসোসিয়েশনের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে ফুটবল খেলার প্রসার এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা। ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর ইংল্যাণ্ডে আরও তিনটি জাতীয় ফুটবল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়—১৮৭৩ সালে স্কটল্যাণ্ডে, ১৮৭৬ সালে ওয়েলসে এবং ১৮৮০ সালে আয়ারল্যাণ্ডে। ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশনেরই সক্রিয় চেষ্টায় ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশনস (F. I. F. A.)—এই প্রতিষ্ঠানই বিশ্ব ফুটবল খেলার প্রধান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা।

ফুটবল খেলার আইন তৈরী করার কৃতিত্বও ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশনের। তাদের রচিত সেই আইন অনুযায়ী খেলারই নাম 'এসোসিয়েশন ফুটবল'। আজ ১২৫টি দেশের জাতীয় ফুটবল সংস্থা পৃথিবীর বৃহত্তম ফেডারেশন অব্ ইন্টারন্যাশানাল ফুটবল এসোসিয়েশনের সভ্য এবং এইসব প্রতিনিধি 'এসোসিয়েশন ফুটবল' খেলাকে একবাক্যে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এবং একমাত্র এই স্বীকৃতির ভিত্তিতেই সভ্যপদের আবেদনপত্র বিবেচনা করা হয়। ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশন রচিত আইন অনুসারেই অলিম্পিক এবং জুল রিমে বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা হয়। এইখানেই ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশনের বিরাট প্রাধান্য স্বীকৃতিলাভ করেছে। ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা, ক্রমোন্নতি এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশন সকল দেশেরই পথ-প্রদর্শক। তাদেরই পথ অনুসরণ ক'রে ভারতবর্ষের ফুটবল খেলার প্রসার এবং উন্নতিকল্পে ক'লকাতায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন স্থাপিত হয় এবং সেই সঙ্গে ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড খেলার উদ্বোধন হয়।

ইংল্যাণ্ডে যেমন ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশনের নিজস্ব এফ এ কাপ ফুটবল নক্ আউট প্রতিযোগিতা তেমনি ভারতবর্ষে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের আই এফ এ শীল্ড নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। শুধু ভারতবর্ষই নয়, প্রায় সকল দেশই ফুটবল খেলার উন্নতিকল্পে ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশনের কার্যক্রম অবলম্বন করেছে।

ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশন কেবল ফুটবল খেলার একটি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাই নয়। এই সংস্থাকে বিরাট শিক্ষায়তনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। স্থানীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার আয়োজন করা ছাড়াও এসোসিয়েশন গঠনমূলক কাজে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এসোসিয়েশনের প্রত্যক্ষ

ইংল্যাণ্ডের ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত বাৎসরিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় 'এফ এ কাপ' হাতে পেয়ে ১৯৬১ সালের বিজয়ী টোটেনহাম হটস্পার দলের খেলোয়াড়দের জয়োল্লাস।

তত্ত্বাবধানে স্কুল-কলেজ ছাত্রদের ফুটবল খেলা শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা আছে। এসোসিয়েশনের পুস্তক-প্রকাশন বিভাগ এবং চলচ্চিত্র-নির্মাণ বিভাগটি ফুটবল খেলার প্রসার এবং উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দনপত্র পেয়েছেন। এবং এই শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ইংল্যান্ডে একাধিক ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২৩শে অক্টোবর ইংলিস ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত ইংল্যান্ড দলের বিপক্ষে খেলতে নামবে বিশ্ব-একাদশ দল। এই বিশ্ব-একাদশ দলে খেলবেন বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়রা।

॥ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ ।

কলকাতার 'আজাদ হিন্দ বাগে' অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ও ছাত্রী বিভাগে সর্বাধিক পয়েণ্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের সন্তরণ অনুষ্ঠান এই প্রথম। ছাত্র বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান বোম্বাই এ বছরের মোট ১১টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ৭টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে এবং বাকি ৪টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু বোম্বাইয়ের থেকে কলকাতা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান বেশী পেয়ে শেষ পর্যন্ত দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে।

মহিলা বিভাগের ৬টি অনুষ্ঠানেই কলকাতা প্রথম স্থান পেয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

ছাত্র বিভাগে মোট ৫টি অনুষ্ঠানে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। ছাত্রী

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে অনুষ্ঠানে বিজয়ী কলকাতা দল। কলকাতার পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সন্ধ্যা চন্দ্র, কল্পনা বিশ্বাস, অনিমা নন্দী এবং কল্যাণী বসু। ফটো : অমৃত

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের ১০০ মিটার চিৎ সাঁতারে (ছবির ডান দিক থেকে) কলকাতার সন্ধ্যা চন্দ্র প্রথম স্থান, পুণার শকুন্তলা ঘাটে দ্বিতীয় স্থান এবং কলকাতার কল্যাণী বসু তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ফটো : অমৃত

বিভাগের অনুষ্ঠান এই প্রথম, সুতরাং পূর্ব রেকর্ড ভঙ্গের প্রশ্ন আসে না।

ছাত্র বিভাগে দু'টি ক'রে অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পেয়েছেন বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই দু'জন ছাত্র—এ ডিসারাঙ্গ (১৫০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল) এবং আর উদেসী (১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক)।

ছাত্রী বিভাগে সন্ধ্যা চন্দ্র ৪টি অনুষ্ঠানে (১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক) প্রথম স্থান পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রথম স্থান লাভের গৌরব লাভ করেছেন। তাছাড়া তিনি ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে জয়লাভে সাহায্য করেন।

ওয়াটার পোলো অনুষ্ঠানে কলকাতা ১ম (৬ পয়েণ্ট) এবং বোম্বাই ২য় (৪ পয়েণ্ট) স্থান পায়।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপ (ছাত্র বিভাগ):
১ম কলকাতা (৫৮ পয়েণ্ট), ২য় বোম্বাই (৫৩ পয়েণ্ট), ৩য় বেনারস (৪ পয়েণ্ট) এবং ৪র্থ পুণা (২ পয়েণ্ট)।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপ (ছাত্রী বিভাগ):
১ম কলকাতা (৪৬ পয়েণ্ট), ২য় পুণা (১৪ পয়েণ্ট) এবং ৩য় পাঞ্জাব (১ পয়েণ্ট)।

ডাইভিং:
১ম কলকাতা (১৬ পয়েণ্ট) এবং ২য় আগ্রা (২ পয়েণ্ট)।

ওয়াটার পোলো:
১ম কলকাতা (৬ পয়েণ্ট), ২য় বোম্বাই (৪ পয়েণ্ট) এবং ৩য় দিল্লী (২ পয়েণ্ট)।

নতুন রেকর্ড : ছাত্র বিভাগ

১০০ মিটার বাটারফ্লাই:
১ মিঃ ১৬·৯ সেঃ—মধুসূদন সাহা (কলকাতা)।

২০০ মিটার বাটারফ্লাই:
৩ মিঃ ৪·২ সেঃ—রবীন ঘোষ (কলকাতা)।

৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রীলে:
৪ মিঃ ২৮·৮ সেঃ—(কলকাতা)।

২০০ মিটার চিৎসাঁতার:
২ মিঃ ৪৪·২ সেঃ—আর উদেসী (বোম্বাই)।

৪×১০০ মিটার মিডলে রীলে:
৫ মিঃ ৫ সেঃ—বোম্বাই।

॥ ভারত সফরে এম সি সি দল ॥

আগামী ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত এম সি সি দল ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলতে আসছে। বাঙ্গালোরে ৩রা জানুয়ারী এম সি সি দল তাদের ভারত সফরের প্রথম ম্যাচ খেলবে। সফরের শেষ খেলা আরম্ভের তারিখ ২২শে ফেব্রুয়ারী। এম সি সি দল ভারত সফরে পাঁচটি সরকারী টেস্ট ম্যাচ এবং পাঁচটি বে-সরকারী তিন-দিনের খেলা ছাড়াও জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি প্রদর্শনী খেলাতেও যোগদান করবে।

আগামী ৩০শে ডিসেম্বর এম সি সি দল বোম্বাইয়ে পেঁছিবে।

এম সি সি দলের ভারত সফরের সংশোধিত খেলার তালিকা :

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট (মাদ্রাজ) :
১০, ১১, ১২, ১৪ ও ১৫ই জানুয়ারী।

দ্বিতীয় টেস্ট (বোম্বাই) :
২১, ২২, ২৩, ২৫ ও ২৬শে জানুয়ারী।

তৃতীয় টেস্ট (কলকাতা) :
২৯, ৩০শে জানুয়ারী এবং ১, ২ ও ৩রা ফেব্রুয়ারী।

চতুর্থ টেস্ট (দিল্লী) :
৮, ৯, ১১, ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী।

পঞ্চম টেস্ট (কানপুর) :
১৫, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০শে ফেব্রুয়ারী।

বে-সরকারী খেলা

বাঙ্গালোর (৩—৫ই জানুয়ারী) :
প্রেসিডেণ্ট একাদশ দলের বিপক্ষে।

হায়দরাবাদ (৬—৮ই জানুয়ারী) :
দক্ষিণাঞ্চল দলের বিপক্ষে।

আহমেদাবাদ (১৭—১৯শে জানুয়ারী) :
পশ্চিমাঞ্চল দলের বিপক্ষে।

নাগপুর (৪—৬ই ফেব্রুয়ারী) :
পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল সম্মি-লিত দলের বিপক্ষে।

জলান্ধর (২২—২৪শে ফেব্রুয়ারী) :
উত্তরাঞ্চল দলের বিপক্ষে।

॥ রাশিয়া বনাম বৃটেন ॥

রাশিয়া বনাম বৃটেনের সদ্য-সমাপ্ত (২৯শে সেপ্টেম্বর) বাৎসরিক দ্বৈত এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বৃটেন ১৬৮-১৬১ পয়েণ্টে রাশিয়াকে পরাজিত করার গৌরব লাভ করেছে। পুরুষ বিভাগে বৃটেন ১১২-৯৯ পয়েণ্টে এবং মহিলা বিভাগে রাশিয়া ৬২-৫৬ পয়েণ্টে প্রথম স্থান লাভ করে। উভয় দেশের মধ্যে পয়েণ্টের ব্যবধান কম হলেও রাশিয়ার মাটিতে বৃটেনের এই সাফল্য যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকের প্রাক্কালে বৃটেনের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।

আধুনিক যুগের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা থেকে (১৮৯৬) আমেরিকা এ্যাথলেটিক্স বিভাগে যে একটানা (মাত্র ১৯৩৬ বাদ) প্রাধান্য অক্ষুন্ন রেখে চলেছিল, রাশিয়ার যোগদানের ফলে তা বহুলাংশে খর্ব হয়েছে। ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ণ এবং ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে রাশিয়া বহু পয়েণ্টের ব্যবধানে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। বৃটেন যে আগামী ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে রাশিয়া এবং আমেরিকার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে, রাশিয়ার বিপক্ষে বৃটেনের

পশ্চিম জার্মাণীর জুটা স্টক (বা দিক থেকে তৃতীয়) ১৩·৪ সেকেন্ডে ১০০ মিটার হার্ডলস রেস সমাপ্ত ক'রে রাশিয়ার লিডিয়া মকোসিনা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করছেন। বাঁ দিকের প্রথম মহিলা খ্যাতনামা জুটা হিন গত রোম অলিম্পিকে ২০০ মিটার হার্ডলসে রৌপ্য পদক পেয়েছিলেন; কিন্তু আলোচ্য অনুষ্ঠানে তিনি সামনার জন্যে প্রথম স্থান হাত-ছাড়া করেন।

সাম্প্রতিক সাফল্যই তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

আলোচ্য ১৯৬৩ সালের প্রতিযোগিতায় বৃটেনের বিপক্ষে রাশিয়ার এই পাঁচজন বিশ্বরেকর্ডধারী এ্যার্থলিট যোগদান করেছিলেন—মহিলা বিভাগের লংজাম্পে তাতয়ানা স্কেলকানোভাক, সটপুটে তামারা প্রেস এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে মারিয়া ইর্তাকিনা; পুরুষ বিভাগে ছিলেন দু'জন—লংজাম্পে ইগর তারওভানেশিয়ান এবং হাইজাম্পে ভ্যালেরি ব্রুমেল। তাতয়ানা স্কেলকানোভাক লং জাম্পে ২০ ফিট ৫½ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম ক'রে দ্বিতীয় স্থান পান। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী বৃটেনের শ্রীমতী মেরী র‍্যান্ড ২০ ফিট ১০ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম ক'রে প্রথম হন। মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বরেকর্ডধারী মারিয়া ইর্তাকিনা তৃতীয় হন। প্রথম স্থান পান এ্যান প্যাকার (বৃটেন)। মহিলাদের সটপুটে তামারা প্রেস (দূরত্ব ৫৪ ফিট ১১ ইঞ্চি), পুরুষদের লংজাম্পে ইগর তারওভানেশিয়ান (২৫ ফিট ১ ইঞ্চি) এবং হাইজাম্পে ভ্যালেরি ব্রুমেল (৭ ফিট ১½ ইঞ্চি) প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তাঁদের বিশ্বখেতাব অক্ষুণ্ণ রাখেন।

লিয়'র হকি প্রতিযোগিতা

লিয়'র আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। প্রতিযোগিতা শেষ হবে ৬ই অক্টোবর। মোট ১২টি দেশ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে।

এ পর্যন্ত মাত্র দুটি দেশ—ভারতবর্ষ এবং পশ্চিম জার্মানী কোন খেলায় পরাজয় স্বীকার করেনি। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা এবং স্পেন এখনও কোন খেলায় জয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি। প্রত্যেক দেশের পাঁচটা করে খেলা হয়েছে; আর দুটো করে খেলা বাকি।

বে-সরকারী লীগ-তালিকার বর্তমানে শীর্ষস্থানে আছে ভারতবর্ষ—৫টা খেলায় জয় ৪, ড্র ১, হার ০, স্বপক্ষে গোল ১৩, বিপক্ষে ১ এবং পয়েন্ট ৯। দ্বিতীয় স্থানে আছে পশ্চিম জার্মানী —৫টা খেলায় জয় ৩, ড্র ২, হার ০, স্বপক্ষে গোল ১৪, বিপক্ষে ২ এবং পয়েন্ট ৮। পাকিস্তান এবং হল্যান্ড আছে তৃতীয় স্থানে—উভয়েরই পয়েন্ট ৭। পাকিস্তানের জয় ৩, ড্র ১, হার ১, স্বপক্ষে গোল ৭ এবং বিপক্ষে ২। তালিকায় সর্বনিম্ন স্থানে আছে আমেরিকা—৫টা খেলায় হার ৪, জয় ০, ড্র ১ এবং পয়েন্ট ১।

শারদ সংখ্যা

এই সংখ্যায় বিশেষ করে রয়েছে

খেলার গুরু রবীন্দ্রনাথ
আরবি

বিদায় উমরিগর
শংকরীপ্রসাদ বসু

ব্যাডমিণ্টন খেলায় পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ
প্রণব বসু

আমার অভিজ্ঞতা
পরিতোষ চক্রবর্তী

উপেক্ষিত জেলা ক্রীড়াঙ্গন
সুনীল বন্দোপাধ্যায়

রোম থেকে টোকিও
বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

অলিম্পিকে ভারতের হকি ইতিহাস
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পাতৌদির নবাব
অধ্যাপক শ্রীঅমলকুমার মিত্র

ক্রিকেটের বিস্ময় — রণজি
জি, শংকর

ক্রিকেটের আর এক রাজকুমার
শংকরবিজয় মিত্র

খেলার মাঠের সম্রাট
তীর্থপথিক ব্রহ্ম

স্বল্প পাল্লার দৌড় প্রসঙ্গে
শ্রীহারাধন চক্রবর্তী

খেলার উপর নতুন ধরনের রহস্যমূলক হাসির গল্প
ফিঙ্গার প্রিন্টের ট্র্যাজেডি
রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী

অতীত এবং বর্তমানকালের ফুটবল খেলা প্রসঙ্গে
উমাপতি কুমার

আপনারাও ভাবুন
অমল দত্ত

ক্রিকেট খেলার উন্নতি করতে হলে ছাত্রদের গ'ড়ে তুলুন
শ্যামসুন্দর ঘোষ

মহারাজকুমারের ক্রিকেট ও অমরনাথ
অমূল্য বিশ্বাস

এ ছাড়াও লিখছেন—পঙ্কজ গুপ্ত, সন্তোষ গাঙ্গুলী, পণ্ডিতমশাই, সন্ন্যাসীপ্রসাদ, অমূল্য বিশ্বাস, শচীন হালদার, পরিতোষ, চুণী গোস্বামী, রঞ্জন রায়, বাঘা সোম, পিয়ার্সন সুরিটা এবং আরও অনেকে।

বিজয়ী, শতদল সুফি এবং OmiO-র ছাড়াও অনেকের খেলাধুলার উপর কার্টুন থাকবে।

এ ছাড়া অজস্র আকর্ষণীয় রঙীন চিত্র সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ।

মহালয়ার আগেই বের হবে

দাম—২·০০, রেজিঃ ডাকে—২·৭৫

গ্রাহক হোন ·৫০ নঃ পঃ দামের চারটি বিশেষ সংখ্যার সঙ্গে শারদ সংখ্যা বিনামূল্যে পাবেন। বার্ষিক চাঁদা ১২·৫০ নঃ পঃ প্রতি সংখ্যা ২৫ নঃ পঃ ক্লাব, লাইব্রেরী শিক্ষক রেফারী স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাঁদা—১০·০০ নঃ পঃ মাত্র।

২৫% অগ্রিম পাঠালে মফঃস্বলের এজেণ্টদের ২৫% কমিশনে ভি পি-তে বই পাঠান হবে।

ডন ব্রাডম্যান
নমিতা মিত্র

মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের জন্য কি বাংলার ঐতিহ্য নষ্ট হবে?
গোষ্ঠ পাল

এ্যামেচার না প্রফেশনাল?
সুকেশ পালিত

'সত্য রায়'
বেরী সর্বাধিকারী

ফুটবল খেলা ও আমি
প্রতুল চক্রবর্তী

কলকাতায় ফুটবল খেলার পরিবর্তনশীল রূপ
সিডনি ফ্রিস্কিন

দেহসৌষ্ঠব, ভারোত্তোলন ও বাংলা দেশ
সন্তোষ শীল

সেরা খেলা ক্রিকেট
কমল ভট্টাচার্য

সাধনা
অরুণ সিনহা

কলকাতার ফুটবল
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
(লালগোলারাজ)

ফুটবলের এক যুগ
ব্যোমকেশ বসু

সাঁতার শেখার আধুনিক কলাকৌশল
এস, পি, গোস্বামী

স্টেডিয়াম, ২০-এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২
প্রোগ্রেসিভ বুক এজেন্সী, ২৪৮, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

গল্প নয়। একেবারে নির্ভেজাল সত্যি।

দেশব্যবচ্ছেদের কয়েক বছর পরের ঘটনা এটি। পশ্চিম আর পূর্ব বাংলার আড়াআড়ি-রেখা অক্ষুণ্ণ রাখতে পাকিস্থানে সেদিন তোড়জোড়ের অন্ত নেই। সীমান্তে কড়া পাহারা বসেছে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় যাঁরা আসছেন তাঁদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও বিস্তৃত তল্লাসীর অত্যাচার চলেছে সমানতালে।

পূর্ব বাংলার ভিটেমাটি ছেড়ে একেবারে শূন্য হাতে যাঁরা আসতে চাইছেন তাঁদেরও রেহাই নেই। পাক্ প্রহরার রক্তচক্ষুর শাসানিতে সবাই সেদিন তটস্থ! এমন দিনেই সেই বর্ষীয়সী রমণী এসে হাজির দর্শনা ষ্টেশনে।

সামান্য আকৃতি তাঁর। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। সম্বল বলতে ছোট্ট একটি টিনের তোরঙ্গ আর হাতের লাঠিটি। যাবেন পশ্চিমপ্রান্তে। সেখানে জীবনের প্রতিশ্রুতি আছে। আর আছেন...। থাক সে কথা।

অতি সংক্ষিপ্ত, নিরীহ অস্তিত্ব বৃদ্ধার। তবুও তাঁকে ঘিরেই সেদিন পাক্-প্রহরী জবরদস্ত খানাতল্লাসীর জোয়ার বইয়ে দিলো।

কি আছে বাক্সে?

কি আর থাকবে? পরণের থান। পথের কড়ি। আর টুকিটাকি। বৃদ্ধা জবাব দিলেন।

কতো টাকা? সোনাদানা লুকানো নেই তো?

প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধা হাসেন। কি উত্তরই বা তিনি দেবেন! সোনা তো ভিটের মাটি। তা তো তিনি ওদের জন্যেই পেছনে ফেলে এসেছেন!

কি হাসছো যে! খোলো বাক্স, দেখি। হেঁকে হুকুম চালালো প্রহরী।

তোরঙ্গের ডালা তুলে ধরলেন বৃদ্ধা। পাক্-প্রহরীও শ্যেনদৃষ্টি মেলে ধরলো বাক্স-বন্দী সম্পদের দিকে।

কিন্তু বেশী ঘাঁটতে হোলো না পাক-শান্ত্রীটিকে। বৃদ্ধার কাপড়চোপড় ও টুকিটাকি জিনিসের ওপরই সযত্নে সাজানো ছিল একটি ফটো। তার ওপরেই প্রহরীর দৃষ্টি স্থির হয়ে আটকে পড়লো।

এবার তার অবাক হবার পালা। জিজ্ঞাসা করে উঠলো, এই ফটো কার? উনি আপনার কে?

বৃদ্ধার কণ্ঠেও বিস্ময়। কেন? ও তো আমার পোলা!

অ্যাঁ! নিমেষে রূপান্তর! দুর্ধর্ষ পাক্-সীমান্তরক্ষীর ডাকসাইটে আচরণও যেন কেমন ভদ্র দুরস্ত হয়ে উঠলো। তার আবেগ লাফিয়ে উঠলো ঊর্ধাকাশে!

লজ্জায় মাটিতে সিঁধোতে গিয়ে বলে চললো,

আপনি গোষ্ঠ পালের মা! তা আগে বলতে হয় সেকথা! দেখুন তো, শুধু শুধু আপনাকে কতো কষ্ট দিলাম! আমায় মাফ করবেন। না,না, আপনি একা গোষ্ঠ পালেরই নন্, আপনি আমাদেরও জননী!

বলতে বলতে পাক্‌প্রহরী জননীর পায়ের ধুলো ভক্তিভরেই মাথায় ঠেকালো। তারপর সবকাজ ছেড়ে দিয়ে মাকে নিয়েই পড়ে রইলো যতোক্ষণ না পশ্চিমমুখী ট্রেন ছাড়ে। ট্রেনের কামরায় মায়ের জায়গা করে দিয়ে বাঙ্কের ওপর তোরঙ্গ তুললো নিজের হাতেই।

বৃদ্ধা হকচকিয়ে রইলেন ছেলেটির কাণ্ড দেখে। তিনি বুঝতেই পারেন না ওর কাছে তাঁর ছেলের এতো কদর কেন? ছেলে তাঁর রাজনীতিক নেতা নয়, রাষ্ট্রের মাথা মন্ত্রী নয়, বিত্তবান ব্যবসায়ীও নয়, তবু পাক্‌প্রহরীর কাছে এমন সম্মানিত, শ্রদ্ধেয় কিসে?
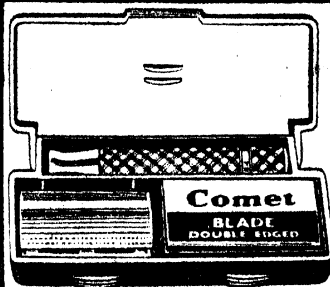
ভাবতে ভাবতে চলে এলেন তিনি পশ্চিম বাংলায়। স্টেশনে পুত্র অপেক্ষা করছিলেন। মাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,

পথে কোনো কষ্ট হয় নি তো মা?

কষ্ট! মা আর থাকতে পারলেন না। ঘটনাটি এক নিঃশ্বাসে উজাড় করে দিলেন ছেলের সামনে।

শুনে গোষ্ঠ পাল তো হেসেই কুটো-কুটি! তারপর তাঁর পাল্টা অনুযোগ সোচ্চার হলো,

দেখলে তো মা। তখন তো কেবলই ধমকাতে! লেখাপড়া নেই, কাজকর্ম নেই, কেবল খেলা আর খেলা! আজ বুঝছো পারছো, খেলার দাম কতো? ভাগ্যিস্ বলে পা দিয়েছিলাম তাই তো তুমি এতো সহজে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলে!

মাও হেসে উঠলেন। তারপর ছেলের হাত ধরেই স্টেশন ছেড়ে চলে গেলেন অন্যত্র, কিছু তৃপ্তি, কিছু সান্ত্বনার পুঁজি বুকে নিয়ে।

এ সান্ত্বনার মূল্য তো কম নয়। তাঁর ছেলে খেলোয়াড়। কেমন যে খেলতো সে তা তিনি কোনোদিনই দেখেননি। সে খেলার মূল্যই বা কি, তাও তিনি আগে বুঝতে পারেননি। বুঝতে চানওনি। শুধু বুঝতেন তখন যে ছেলেকে ঘিরে এক সময় হৈ চৈ উঠেছিল। কিন্তু তাও তাঁর কাছে ছিল নিতান্তই খেলা খেলা ভাব।

আর বুঝতেন সেদিন যেদিন মাঠের ব্যথা ঘরে এনে ছেলে বাড়ী ফিরতো। গরম জল করো। চুন-হলুদের প্রলেপ জোগাড় করো। সাত কাজ ফেলে কেবলই শুধাও, কিরে ব্যথা কমলো?

তখন কতোদিন বলেছেন, কাজ নেই বাপু তোর ফুটবল খেলায়। হাত পা-গুলো ভাঙ্গাবি শেষে! তবু ছেলে সে কথায় কান পাতে নি। লুকিয়ে লুকিয়ে মাঠের পথে পা বাড়িয়েছে।

ছেলেকে আটকাতে না পেরে মা হতেন রেগেই খুন। তবু আমরা ভাবি যে গোষ্ঠ পাল-জননী হেরে গিয়েও কিন্তু আমাদের জিতিয়ে রেখেছেন। সেদিন মা যদি জিততেন তাহলে কি গোষ্ঠ পালকে বাংলাদেশ পেতো? না গোষ্ঠ পালকে ঘিরে এমন কাহিনী গড়ে উঠতো?

অনুচ্চারিত, অপরিচিত এই কাহিনী এবং সংক্ষিপ্তও। তবু তা অবিস্মরণীয়। যে কাহিনীর নায়কের নামেই দেশ-কালের গণ্ডী, রাজনীতি-কূটনীতির কৃত্রিমতার দেওয়াল ভেঙে যায়, ভেঙ্গে যায়, সে নাম স্মরণধৃত, শ্রদ্ধেয়, সন্দেহ নেই।

সেকালের পাতা : একালের চোখ

রত্নাকর

বুলবুল-এর লড়াইতে টাকা উড়ত। বনেদী বাড়ির মান-সম্মান নির্ভর করত লড়াই-এর হারজিতের ওপর। কিন্তু এই লড়াই-তে আবার তাল কেটে যেত মাঝে মাঝে। বন্ধুত্বের বদলে দেখা দিত শত্রুতা। এইভাবে বাদী-প্রতিবাদী হয়ে পড়লেন বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র।

হাওড়া থেকে শ্রীরামপুরে। কতটুকু বা পথ! তবু এর জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে হত।

বুলবুলে পক্ষির যুদ্ধামোদে রসভঙ্গ

চারি বৎসর হইল শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র মহাশয় উভয়ে বাদি প্রতিবাদী হইয়া বুলবুলে পক্ষির যুদ্ধে আমোদ করিয়া আসিতেছিলেন, চারি বৎসরের মধ্যে গত তিন বৎসর বিনা চাতুর্য্যে এবং বিনা পক্ষপাতে মিত্রবাবুর পক্ষিগণ নিঃসন্দেহরূপে জয়ী হইয়াছিল, তাহাতে সপক্ষ বিপক্ষ উভয়পক্ষের আত্মীয়তা ভঙ্গ হয় নাই, এ বৎসর কলিকাতাস্থ প্রায় যাবদীয় বণিকগোষ্ঠি একবাক্য হইয়া চান্দাদ্বারা ব্যয়ধনস্থিত করিয়া উক্ত রাজাকে পরিত্যাগ করেন এবং রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়ের বাটীতে এক পক্ষিশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই রাজাকেই সেনাপতিস্বরূপে বরণ করিয়াছিলেন, রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় অতি চতুর, তিনি সময়মতে বিবেচনা করিলেন, যদি রাজেন্দ্র বাহাদুরের নামোল্লেখ না করা হয় তবে এবারেও আমোদকারি বাবুদিগকে মিত্রবাবুর পক্ষিশালায় গমন করিতে হইবেক; যেহেতু মিত্রবাবু এ বিষয়ে প্রাচীন মহারথী, ইঁহার নিয়মানুসারে নূতন ব্রতিকে প্রাচীন ব্রতির বাটীতে গমন করিতে হয়, এই সকল চিন্তানন্তর রাজা নৃসিংহ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়কে বহু যত্নে সম্মত করিয়া কেবল সাধারণ পত্রে তাঁহার নাম ব্যবহার করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গত ১৫ জানুয়ারি, রবিবার বেলা ১০ ঘটিকা সময়ে পক্ষিযুদ্ধ আরম্ভ হয়, এই যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তিস্বরূপ শ্রীযুক্ত হরিলাল গোস্বামী গত বৎসরের রীতি ক্রমে ব্রতী হইয়াছিলেন, পরে মিত্রবাবুর প্রথম পক্ষি একাদিক্রমে বিপক্ষ পক্ষের দুই পক্ষিকে প্রায় ১ ঘণ্টা যুদ্ধ দিয়া পরাস্ত করে তাহাতে বণিকদল ঘরপোড়া গরুভীর ন্যায় আশঙ্কাপ্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ ছলনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং মিত্রবাবু সরল স্বভাব বশত আপন পক্ষীয় পক্ষিগণকে সাবধান করিয়া সুবিবেচিতা প্রকাশপূর্ব্বক হাসিতে লাগিলেন পরে ক্রমে যত প্রগাঢ় যুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল বণিকবাবুরা ততই অত্যাচার প্রকাশ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তি গোস্বামির মীমাংসায় সম্মত হইলেন না, পরিশেষে মিত্রবাবু দেখিলেন যাঁহারা শিরশ্ছেদ করিয়া বৎসের দলে লিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই রবে রব মিশ্রিত করিলেন অতএব বেলা ১ ঘটিকার পর দয়ালবাবু কহিলেন এস্থলে তাঁহার আগমন স্বীকার করা অনুচিত হইয়াছে, কেন না যে ব্যক্তির সহিত পক্ষিযুদ্ধ তিনি কেবল সাক্ষীগোপাল, এমতস্থলে চতুরতাপূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বানে ভদ্র ব্যবহার হয় নাই; এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পক্ষিশালা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এইরূপ গণতা এবং অত্যাচার পরে প্রস্তুত হইল রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও বৈদ্যনাথ বসাক প্রভৃতি বিজ্ঞ মহাশয়েরা অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, যাহা হউক মিত্রবাবু বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করিয়াছেন অতএব আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

সম্বাদ ভাস্কর, ৭ই মাঘ, ১২৬০।

বিজ্ঞাপন

স্নানযাত্রা পর্ব্বাহে বাষ্পীয় শকট গমনাগমনের নিয়ম।

আগামী ১৫ই জুন, বুধবারে এক অতিরিক্ত বাষ্পীয় শকট শ্রেণী শ্রীরামপুর গমনার্থ বেলা ১০ দশ ঘটিকা সময়ে হাবড়া পরিত্যাগ করিবে, এবং মধ্যস্থ আড্ডা সকলে অর্থাৎ বালীতে ১০ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের সময়ে এবং কোন্নগরে ১০ ঘণ্টা ২০ মিনিটের সময় এক ২ বার অপেক্ষা করিয়া পরিশেষে বেলা ১০॥ সাড়ে দশ ঘটিকা কালে শ্রীরামপুরে পঁহুছিবেক।

উক্ত দিবসেই এই শকট শ্রেণী হাবড়ার প্রত্যাগমন করিবে, এজন্য শ্রীরামপুর হইতে ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের সময় বহির্গত হইয়া কোন্নগরে ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের সময় এবং বালীতে ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের সময় এক ২ বার অপেক্ষা করিয়া বেলা ৪ ঘটিকা কালে হাবড়ায় প্রত্যাগমন করিবেক।

তাং ১১ই জুন, ১৮৫৯।

জে সি বেচিলার,
ট্রাফিক মেনেজার

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

১লা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১২৬৬।

আলীগড়ের কর্তৃপক্ষেরা তথাকার ইমারত সকল সমভূম করিতে মানস করিবায় তথাকার প্রজাগণ গবর্ণমেন্টে সম্প্রতি আবেদন করিয়াছেন। সত্য

জাতীয়দিগের পক্ষে এরূপ কল্পনা শ্রেয়স্কর নহে।........

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

২রা বৈশাখ, ১২৫৮।

ফিনিক্স সম্পাদক বলেন, মিউনিসিপাল কমিশনরেরা সম্প্রতি আপনাদিগের অধীন তত্ত্বাবধারকদিগকে এই অনুমতি করিয়াছেন যে কলিকাতার মধ্যে খড়ুয়া ঘর না থাকে।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

২৮শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১২৬৬

হরকরার জনেক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সকল রহিত করা সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয়স্কর যেহেতু এবম্প্রকার মুদ্রার আবশ্যক সময়ে গবর্নমেণ্টের ব্যয় লাঘব হওয়া মঙ্গলের বিষয়, অপিচ যদবধি বাঙ্গালিরা স্বয়ং বিদ্যালয় স্থাপন করণে শক্য না হইবে এবং বিদ্যাশিক্ষার যথার্থ দক্ষিণা প্রদান না করিবে তদবধি তাহারা বিদ্যা যে কি অমূল্য ধন তাহা জ্ঞাত হইতে পারিবে না। পত্রপ্রেরক মহাশয় বুঝি প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা দান কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা জ্ঞাত নহেন তজ্জন্য এমত সংপরামর্শ প্রদান করিতেছেন অথবা হিংসা পরবস হইয়াছেন বলিতে পারি না, প্রজা মূর্খ হইলে রাজার অনেক অনিষ্ট জন্মে, সুতরাং গবর্নমেণ্টের রাজ্য রক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য যদ্রূপ আবশ্যকীয় তদ্রূপ প্রজা পালনেও প্রজার বিদ্যাশিক্ষার যে ২ ব্যয় হয় তাহাও তদ্রূপ আবশ্যকীয়।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ৩০শে বৈশাখ, ১২৬৬

অবগতি হইল যে ঢাকা কলেজে এ বৎসর তথাকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ছাত্র ও শিক্ষকদিগের ব্যবহারর্থ পাখা টানিবার নিয়ম রহিত করিয়াছেন বোধহয় এ বন্দোবস্ত বড় সুযুক্তি সিদ্ধ নহে যেহেতু এবম্প্রকার গ্রীষ্মের সময়ে যে স্থানে অধিক লোক একত্র হয়েন তথায় কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করাই কষ্টকর তদ্ব্যতীত যে স্থানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইতে থাকে তথায় যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশের সম্ভাবনা তাহা ভুক্তভোগীরাই অবগত আছেন, কেবল কষ্টকর হইলেও হানি ছিল না, ঐ নিয়ম রহিত হইবায় ছাত্র ও শিক্ষকের পীড়িত হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করেন ইহা সর্ব্বপ্রকারে বিধেয়।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ৩০শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১২৬৬

লেপ্টেনেণ্টর গবর্নর পুলিসথানার কর্ম্মকরদিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করেন, সুপ্রিম গবর্নমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই ব্যাপারে ৩৩৮৬০৯ টাকা অধিক ব্যয় হইবে। থানার মুহুরিদিগের ৪০, ৩৫, ৩০ এই তিন প্রকার, থানাদারদিগের ২০, ১৫, ১০ এই তিন প্রকার আর বরকন্দাজদিগের ৬, ৫ এবং ৪ এই তিন প্রকার বেতন নিরূপিত হইয়াছে।

*　　*　　*

গবর্নমেণ্টের অধীনে হউক আর নাই হউক যে সকল লোক মিলেটারি সংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত না থাকিয়াও বিদ্রোহ কালে গবর্নমেণ্টের বিশিষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে যে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে অথবা পুরস্কার দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, লর্ড ষ্টানলি তাহার একটি ফর্দ্দ চাহিয়াছেন।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ৩০শে বৈশাখ ১২৬৬
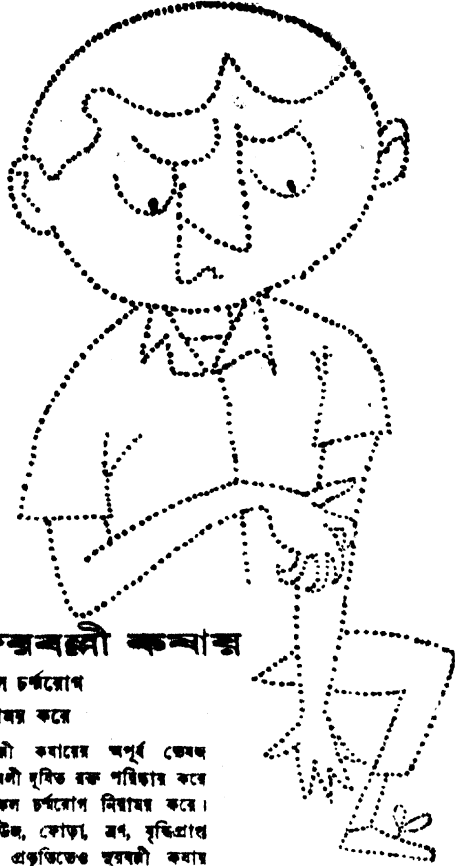
ক্লিওপেট্রায় লিজ টেলর

নিউয়র্ক। আমেরিকার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য শহর। পৃথিবীর শহরকুলের মধ্যে মর্যাদায় ও প্রতিপত্তিতে রাণীর স্থানে বিরাজমান। রাত্রিবেলায় এই শহর আলোয় আলোয় বন্যা ছড়ায়। শহর-বাসীরা পৃথিবীর ধনাঢ্যকুলের প্রতিভূ হিসেবে রাত্রিবেলার নিউয়র্ককে মর্যাদার উত্তুঙ্গ শিখরে নিয়ে তোলে। এই রকম এক রাত্রিতে ব্রড্ওয়েতে আলোর ঝলকানিতে দেখতে পেল "ক্লিয়োপেট্রার" নানা রঙের আলোর ইংরেজী ব্যানার! "ক্লিয়োপেট্রা" আসছে! "ক্লিয়োপেট্রা" আসছে!

তারপর দিন হ'তে সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ল ক্লিয়োপেট্রার বিজ্ঞাপন। পত্র-পত্রিকাগুলি প্রতিদিন এই অসামান্য চিত্রের নানা দৃশ্যের ছবিতে ছেয়ে গেল। সমস্ত আমেরিকার দৃষ্টি নিবদ্ধ হোল নিউয়র্কের ব্রডওয়েতে অবস্থিত

সুভদ্র মিত্র

রিভোলি থিয়েটারের ওপর। সমাজের সর্বস্তরে এই চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হোল। একমাস ধরে রিভোলি থিয়েটার এই ক্লিয়োপেট্রার জন্য নবসাজে তৈরী হতে লাগল।

অবশেষে সেই প্রতীক্ষার দিনের অবসান হোল। এল স্মরণীয় ১২ই জুন, ১৯৬৩। রিভোলি থিয়েটার এমন আলোর ব্যবস্থা করল যে—থিয়েটারের পাঁচশত গজ পর্যন্ত হয়ত বা একটি ছোট আলপিনও কুড়িয়ে পাওয়া যেত। সে এক মনোমুগ্ধকর বিচিত্র জগৎ। সমস্ত থিয়েটার ও তার বিরাট প্রাঙ্গণ লাল কার্পেট দিয়ে মুড়ে দেওয়া হোল। প্রতিটি কর্মচারীর "ক্লিয়োপেট্রা" চিত্র প্রদর্শনের জন্য নতুন পোশাক তৈরী হোল। বুধবার রাত নয়টা। রিভোলি থিয়েটারে নিউয়র্কের গভর্ণর চিত্রমুক্তি ঘোষণা করলেন। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বিদেশী দূতাবাসের গণ্যমান্য কর্মচারীরা এবং শহরের মানী ও গুণীলোকের একত্র সমাবেশ নিউয়র্কের জীবনে এক বিচিত্র স্বাদ এনে দিল। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিরা, হলিউডের নামকরা শিল্পীরা যখন আসতে লাগলেন—রিভোলি থিয়েটার সার্চলাইট ফেলে আলোর জগৎকে আরো বিচিত্র করে তুললো। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের দশ কোটি টাকা ব্যয়ের বিরাট চিত্র 'ক্লিয়োপেট্রার' মুক্তি সারা বিশ্বের চলচ্চিত্র-ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এমন জাঁকজমক-পূর্ণ প্রদর্শনী ইতিপূর্বে পৃথিবীর
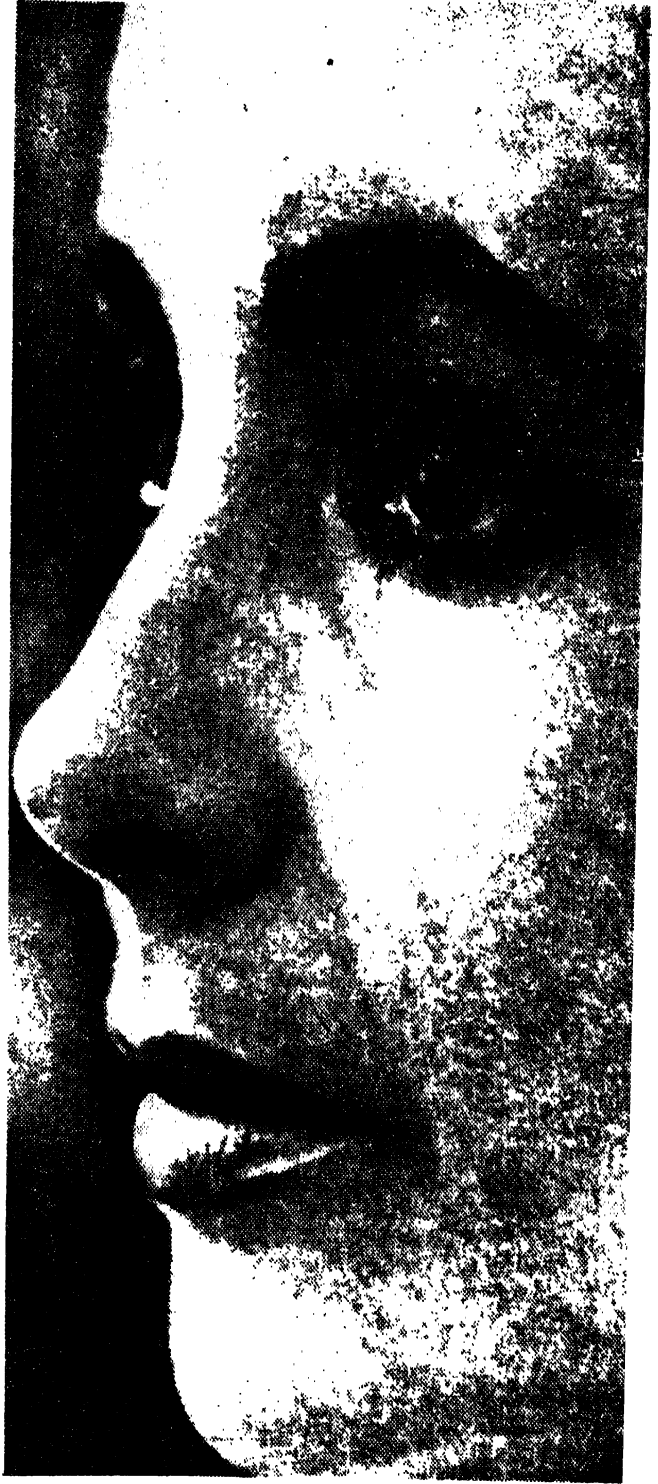
চলচ্চিত্রজগতে এলিজাবেথ টেলর জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে

কোথাও ঘটেনি। ব্রডওয়েতে অবস্থিত এই থিয়েটারে পৃথিবীর প্রায় শতাধিক কাগজের ফটোগ্রাফার টেলিভিশনের প্রতিনিধি এবং হাজার হাজার লোক এই চিত্র-প্রদর্শনের পূর্বমুহূর্তে উপস্থিত। উইলরজার্স মেমোরিয়াল হাসপাতালের ফান্ডের জন্য এই প্রদর্শনীর দর্শকদের একশত ডলার করে দিতে হয়েছে। পরের দিন—কাগজগুলোর সমস্ত পাতাজুড়ে 'ক্লিয়োপেট্রা' ও গত বুধবারের রাত নটার স্মৃতিকথা। কোন ছায়াচিত্র নিয়ে এমন করে পৃথিবীর আর কোথাও কখনও খবরের কাগজে আলোড়ন আসেনি। এখানে খবরের কাগজের উচ্ছ্বাসপূর্ণ লেখা-গুলির কিছু কিছু অংশ তুলে দেখার লোভ সংবরণ করা গেল না।—

নিউয়র্ক টাইমস লিখছে—

"ক্লিয়োপেট্রা চিত্রের খরচের কথা ভুলে যান, ভুলে যান দীর্ঘ সময়ের কথা, ভুলে যান সমস্ত কষ্টের কথা। শুধু ভাবুন—কি অপূর্ব কাব্যসুষমামণ্ডিত চিত্র
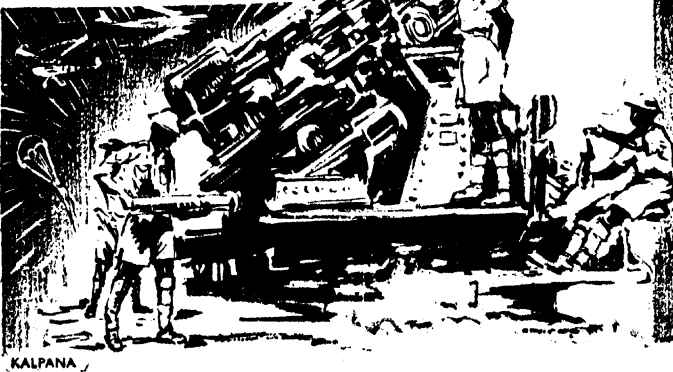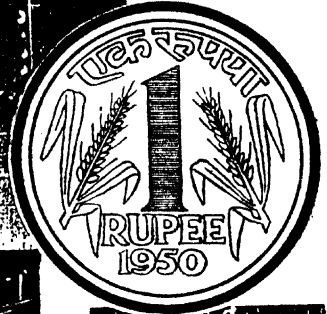
গতকাল রাত্রিতে রিভোলি চিত্রগৃহে দেখলেন। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয় কী অপূর্ব এর বিন্যাস। এলিজাবেথ টেলরের ক্লিয়োপেট্রা এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্বে পূর্ণ, সুষমামণ্ডিত এক বিচিত্র উদগ্র আশায় পূর্ণ পৃথিবীকে শাসন করার জন্য।"

নিউয়র্ক পোস্ট লিখছে—"পৃথিবীর চলচ্চিত্রে এমন চিত্র আর উপস্থিত হয়নি। ক্লিয়োপেট্রার রোমে প্রবেশ এক অতুলনীয় দৃশ্য। শ্বাস-রোধকারী এই দৃশ্য ভোলা যায় না।"

নিউয়র্ক মিরর বলছে—"ক্লিয়োপেট্রা শিহরণসৃষ্টিকারী এক বিচিত্র নয়নবিমোহন চিত্র। ক্লিয়োপেট্রার রোমে প্রবেশের দৃশ্য অতুলনীয়। আমি জানি, আপনিও জানেন—একদিন বলতে পারবো—ক্লিয়োপেট্রা আমরা দেখেছি। কারণ এ যে অবিশ্বাস্য চিত্র।"

ডেইলি নিউজ বলছে—"আপনি এই ছবি দেখতে গিয়ে হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ, অনুভূতির সম্পূর্ণ সন্ধান পাবেন। পাবেন ভালোবাসার মধ্যেও সৌন্দর্য, শিল্প ও সম্পূর্ণতার সন্ধান। প্রতিটি চরিত্রের আশ্চর্যসুন্দর অভিনয় আমাদের মনের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি জীবন্ত করে তুলে। রোমান এবং ইজিপ্সিয়ানদের জমকালো সেটের এবং ডিল্যুক্স কলারের টড্-আও সিস্টেমে তৈরী এই চিত্রে নাটকীয় মুহূর্তগুলি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। নৌ যুদ্ধগুলির দৃশ্য অতুলনীয়।"

জর্ণাল এমেরিকা লিখছে—জমকালো, নয়নবিমোহন, অত্যাশ্চর্য এই কথাগুলি শুধু ক্লিয়োপেট্রার জন্যই। চলচ্চিত্র-ইতিহাসের সবচাইতে ব্যয়বহুল চিত্র এই ক্লিয়োপেট্রা। আজ পর্যন্ত নির্মিত সমস্ত চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রচণ্ড দীপ্তিময়ী। এই ছবি শুধু জমকালোই নয়—জমকালোরও বেশী কিছু যা চোখের দ্বারা ক্রমশ সহ্য করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। ছবির প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে একটা একাগ্রতা, বিশ্লেষণমুক্ত পরিচ্ছন্নতা। এইভাবেই ক্লিয়োপেট্রার গল্প—সিজার ও এন্টনীকে নিয়ে। প্রাক-প্রদর্শনী, শিল্পজগতের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা উজ্জ্বল। ডিল্যুক্স কলারে এলিজাবেথ অপূর্ব। ক্লিয়োপেট্রার ফটোগ্রাফী পৃথিবীর ইতিহাসের এক স্মরণীয় দান।"

"ক্লিয়োপেট্রা"—এই ঐতিহাসিক মহিলার ব্যক্তিগত চরিত্রের একটু পরিচয় এখানে তুলে ধরা দরকার। ক্লিয়োপেট্রা—যিনি নিজের ছোটভাইকে বিয়ে করে-ছিলেন। যিনি তাঁর পারিষদের সঙ্গে ব্যভিচারে মত্ত ছিলেন। যিনি জুলিয়াস সিজারের মত বীর্যবান পুরুষকে নিজের রূপজালে

ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় এলিজাবেথ টেলর

বন্দী করে দেহদান করেছিলেন। যিনি দুজন রোমান প্রেমিকের চারটি অবৈধ সন্তান ধারণ করেন। যিনি বিষাক্ত সাপের কামড়ে নিজেকে মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়ে-ছিলেন। এই হোল ক্লিয়োপেট্রার চরিত্রের ভিন্ন দিক। এই ভূমিকায় এলিজাবেথ প্রথমে অভিনয় করতে চাননি—পরে পৃথিবীর চলচ্চিত্রে যা কোনদিন ভাবা যায়নি সেই আশ্চর্য টাকার কনট্রাক্ট করলেন। তিনি নিলেন দশ লক্ষ ডলার। শেয়ার টাকা নিয়ে তিনি পাবেন—তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। ভাবতে পারেন কোন অভিনেত্রী একটা ছবি করে এত টাকার মালিক হয়েছেন। এলিজাবেথ তাই পেলেন। অথচ এই অভিনেত্রী কোনদিনই সেটেতে ঠিক সময় আসেন না। সবাই এসে অপেক্ষা করেন তারপর তিনি মেক-আপ নিয়ে প্রতিদিনই সময় উত্তীর্ণ করে আসেন। কিন্তু তবু তিনি যখন সেটে আসেন সবাই কৃতার্থ হয়ে যান। সবই তাঁর রূপের মোহে জয় করে নেন। শ্রীমতী টেলর আজ পৃথিবীর তিনজন প্রসিদ্ধা মহিলার একজন। প্রথমজন হলেন—রাণী এলিজাবেথ, দ্বিতীয়া হলেন—মিসেস কেনেডী, আর তৃতীয়া হলেন আজকের পৃথিবীর সবচাইতে দামী অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর।

এলিজাবেথ জন্মসূত্রে বৃটিশ। কিন্তু তাঁর কথায় এবং চালচলনে সম্পূর্ণ আমে-রিকান। পাঁচ বছর লেগেছে এই ক্লিয়ো-পেট্রার চরিত্রে অভিনয় করতে। এলিজাবেথ টেলর একমাত্র অভিনেত্রী যিনি হলিউডে নিজের ইচ্ছেমত প্রডিউসারদের চালনা করেন। তাঁর মত বক্সঅফিসহিট্ অভিনেত্রী আজকের পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তিনি তাঁর জীবিতকালে মহিলা-অভিনেত্রীদের কাছে এক সম্পদ হয়ে রইলেন।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

'জানাতে পারেন' বিভাগ মারফত নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর পেলে বাধিত হব।

(১) সিগারেট জ্বলা অবস্থায় আগুনের তাপমাত্রা কত? এবং যখন সিগারেট টানা হয় তখনই বা কত থাকে?

(২) ডাকটিকিট প্রথম কবে আবিষ্কার হয়? ভারতেই বা এর কত সাল থেকে প্রচলন হয়?

লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
আই, এ, এম,
কাঠমণ্ডু, নেপাল।

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতের 'জানাতে পারেন, বিভাগে দুটি প্রশ্ন পাঠালাম। আপনাদের বিচক্ষণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে উত্তর পাব।

১। দুর্গাপূজার সময় যে-সব প্রতিমা দেখি তার একটি জিনিস বুঝতে পারি না। সেটা হোল গণেশের পাশে কলাবউ বলে কথিত বস্তুটি। এটা কেন রাখা হয়? এটার প্রয়োজন কি?

কমলকৃষ্ণ কুণ্ডু,
বক্সীবাজার, কটক : ১

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'জানাতে পারেন' বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যদি কিছু কেউ জানাতে পারেন ত বিশেষ বাধিত হব।

১। বিবেকানন্দ প্রণীত 'মাই মাস্টার' গ্রন্থে নিম্নলিখিত কথাগুলি রয়েছে :"......তাই রামকৃষ্ণ এক গম্ভীর রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রামগ্ন, তাহার গৃহে আসিলেন এবং নিজের দীর্ঘ কেশরাশি দিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণ মার্জনা করিলেন।" (রামকৃষ্ণের জীবন—রম্যা-রোলা : পৃষ্ঠা ৬৬।৬৭)

ক। 'নিজের দীর্ঘ কেশরাশি' রামকৃষ্ণ কত বৎসর বয়স পর্যন্ত রেখে-ছিলেন। এবং কেনই বা কেটে ফেলে-ছিলেন অথবা 'দীর্ঘ কেশরাশি' কেন-ই-বা রেখেছিলেন।

খ। এই দীর্ঘ কেশরাশিসহ ঠাকুর রামকৃষ্ণের কোন ছবি (photo) কারও কাছে আছে কি?

শ্রীশান্তি বসু,
৭০।৪ ডায়মণ্ডহারবার রোড,
কলিকাতা-২৩।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের প্রকাশিত সাপ্তাহিক অমৃত'র জন্ম থেকে আমি ওর বিশেষ ভক্ত পাঠক। প্রতি সপ্তাহে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি পরবর্তী খণ্ডটি পড়বার জন্যে। আপনাদের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অমৃত'কে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রীতি না জানিয়ে পারলাম না। বিশেষ করে 'জানাতে পারেন' বিভাগটির জন্যে। নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন করছি সবিনয়ে। উত্তর পেলে বড়ই উপকৃত হব।

১। যান্ত্রিক ঘড়ি সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করেন, কোথায়, কোন্ সালে এবং সে ঘড়ি কতটুকু যান্ত্রিক?

২। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও তরুণ প্রতিভাবান বিকলাঙ্গদের সরকারী বা বেসরকারী কোন আশ্রম আছে কি? যদি থাকে কোথায়, কি নামে এবং তার পুরো ঠিকানা কি?

৩। গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম "পাঞ্চজন্য" কেন হল, লোকমুখে প্রচারিত শঙ্খদৈত্যের কথা দিয়ে নয়, ঐতিহাসিক সত্যতা কি?

ইতি—
শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বেলার হোম, শ্রীরামপুর।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকায় পাঠক-সমাজের সুবিধার্থে "জানাতে পারেন" বলে একটি বিভাগ আছে। উক্ত বিভাগে প্রকাশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কতগুলি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাবার জন্য আপনার পত্রিকায় প্রকাশার্থে পাঠালাম।

৯ম হতে ১১দশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির সম্বন্ধে কত-গুলি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত বিষয়ের সঠিক আলোকপাত করতে পারেন তাহলে বিশেষ উপকৃত হব।

১। খিয়াই, মোড়াই, কুতুহলী, ব্রহ্মা, কুন্তী, সুধাবতী, গোঙ্গাড়ীখড়ি, দানাই, বিড়াই, পাবকী—উপরোক্ত এই নদীগুলি ৯—১১ দশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত ছিল? বর্তমানেই বা কোথায়?

২। বাগড়িখাল, কুমেরবুঝি, তারা-জুলি, মুণ্ডেশ্বর, চিন্তাঝিনুকি, বরুনা —এই নদীগুলি কোন নদীর শাখানদী বা উপনদী? এবং বর্তমানে অবস্থান কোথায়?

৩। মহানদী, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ভীমা, শ্যামা, শোন, সরযূ, গোমতী,— এই নদীগুলির অবস্থান বর্তমানে বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে দেখতে পাই। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় হলো যে ৯ম হতে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে এই নামে কোন নদী বর্তমান ছিল কিনা? এবং পরবর্তী শতাব্দীতে ঐ নদীগুলি অন্য নদী নামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে কিনা?

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা-২৯।

সবিনয় নিবেদন,

'জানাতে পারেন' বিভাগে দুটি প্রশ্ন পাঠালাম। সদুত্তর আশা করি

১। 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' এই নাম কে দিয়েছেন?

২। পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি একাধারে ছোটগল্প-লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি এবং নাট্যকার হতে পেরেছেন কি?

শ্রীগোপাল মুখার্জি,
ইষ্ট সাতগ্রাম কোলিয়ারী,
পোঃ জে, কে, নগর,
বর্ধমান।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর '৬৩ অমৃত-এর 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি:—

২নং প্রশ্নের উত্তর : একে চন্দ্র থেকে দশে দিক পর্যন্ত বলার সার্থকতা —জ্ঞানসঞ্চয়। তিরিশ বৎসর আগেও পাঠশালায় মুখে মুখে এ বিষয়ে বিস্তারিত শিক্ষা দেওয়া হোত।

৩নং প্রশ্নের উত্তর : তিনে নেত্র হইতে দশে দিকের অর্থ:—তিনে নেত্র—শিব; তিনটি চক্ষু; দক্ষিণ (অভয়), বাম (ক্রোধ) ও কপাল (সংহার)।

চারি বেদ:—হিন্দুদিগের ধর্মগ্রন্থ: ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব।

পাঁচে পঞ্চবাণ (শর) : কামদেব—এ'র পাঁচ বাণ— সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন; অথবা পদ্ম অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও নীলপদ্ম।

ছয়ে ঋতু:—ছয়টি ঋতু : গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

সাতে সমুদ্র:—সাতটি মহাসাগর—প্রশান্ত, ভারত, আটলান্টিক, আরব, কৃষ্ণ, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর।

আটে অষ্টবসু:—আটজন দেবতা : আপ বা সাবিত্র, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যুষ, প্রভাব বা প্রভাস।

ন'য়ে নবগ্রহ :— সূর্যপ্রদক্ষিণকারী জ্যোতিষ্ক : পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো।

দশে দিক:—দশদিক : পূর্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈর্ঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান, ঊর্ধ্ব ও অধঃ।

শ্রীহরিচরণ মিত্র,
লিপটন (ইণ্ডিয়া) লিঃ,
পোঃ সাকচি,
জামসেদপুর—১

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হিড়িক, বুঝলি—ও অমন এক একটা আসে মধ্যে মধ্যে। ও আমি ঢের দেখেছি। বলি বয়স তো আর আমার কম হ'ল না। কত হিড়িকই এল গেল—আমি ঠিক আছি। কিছুদিন অন্তর অন্তরই এই রকম এক একটা হুজুগ আসে। যারা আগল যারা ছুম, তারাই ঐ সব হুজুগে ধেই ধেই ক'রে নাচে।...ও সব দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেলুম।...তোরা বললি তোমরা চলে যাও, আর অমনি ওরা বাপের সুপুত্তুর হয়ে চলে গেল সব।...ও'রা খুব বাহাদুর হয়েছেন কিনা, সবাই একেবারে ও'দের ভয়ে জুজু হয়ে গেছে।...ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।...ইংরেজ একটা বন্দুকের শব্দ করলে বাবুরা কে কোথায় থাকবেন সব তার ঠিক নেই—ও'রা হুমকি দেবেন আর সেই ভয়ে ইংরেজরা অমনি শ্যালের গত্ত খুঁজবে লুকোবার জন্যে।...সেই সেবার—সেই যখন প্রথম স্বদেশী হুজুগ ওঠে— ব্যাংবাবু না কে এক গান বেঁধে ছিল না, খুব চলত গানটা তখন—বাংলা এবার স্বাধীন হবে বক্তৃতার জোরে, বাংলা ছেড়ে জাহাজ চড়ে সাহেব কাল পালাবে ভোরে *...... সেই বিত্তান্তই তো চলছে দেখছি আজও! কী সমাচার না ও'রা সব কংগ্রেসওলারা অনেক ভেবেচিন্তে চোখ বেরে দেখে বক্তৃতা দিলেন ইংরেজ তোমরা ভারত ছাড়!! ওরা যেন ঐ গান্ধী মশাইপাড়ার হুকুমটারই ওয়াস্তায় বসে ছিল এত দিন—মোট-ঘাট বেঁধে জাহাজঘাটায় গিয়ে—হুকুম পাস হয়েছে সব অমনি দুড়দাড় পালাবে!... রেখে বোস কিংক ওসব কথা! ঐ কাণ্ডে হাস্যাস্পদ হুজুগে তুলে এক দল লোক নিজের দিন কিনে নিচ্ছে, আর চিরকাল একদল বোকা মুখ্যু আছে তারা মরছে জেল খেটে ফাঁসির দড়িতে গলা দিয়ে!'

অন্য লোকের অভাবে নাতি বলাই-কেই হাত-পা নেড়ে বোঝান শ্যামা। এক-এক সময় দীর্ঘ বক্তৃতা দেন তাকে ধরে। বলাই উপলক্ষ্য, সে এসব কথা বোঝেও না বোঝার কোন গরজও নেই তার—কিন্তু তাতে শ্যামার কিছু যায়-আসে না, কেউ না থাকলেও আজ-কাল অমনি বকে যান শ্যামা। বয়স বাড়ার জন্যই হোক আর নানা রকম আঘাত সয়ে সয়েই হোক, তাঁর সেই আগেকার স্বভাব-গাম্ভীর্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। যে বকুনি বা 'থগবগানি' তিনি চিরকাল অপছন্দ করতেন—সেই বকুনি এখন যেন তাঁকেই পেয়ে বসেছে, বকুনি ছাড়া থাকতেই পারেন না আজকাল। কোন কারণ থাকলেও বকেন না থাকলেও বকেন, কারণ সৃষ্টি ক'রে নেন বকবার জন্য।

বকুনির মধ্যে আবার গালাগালেরই অংশ বেশী। কাউকে না কাউকে গালা-গাল দিয়েই যান। ছেলে বৌ মেয়ে জামাই পাড়া-পড়শী—আর দেশের সর্ব-জনশ্রদ্ধেয় নেতারা পর্যন্ত। শেষে, যখন আর কোন মানুষ অবশিষ্ট থাকে না তখন গাছপালাগুলোকে নিয়ে পড়েন, 'তোরাই কি কম শত্তুর সব! সব বেইমান, একধার থেকে সবাই বেইমান তোরা!... এত ক'রে কান্না করছি, একটা ফল দেবার নাম নেই কারুর! খাচ্ছেন দাচ্ছেন যেন বনবাসে থাইচ্ছেন সবাই। কেন, অন্য লোকের বাড়ি গিয়ে তো ফল-ফসল ঢেলে দিয়ে আসতে পারো সব!.. আমি কী এমন শত্তুরতা করেছি তোদের সঙ্গে যে আমার ওপরই এত আড়ি থাকবে? মর মর সবাই মর তোরা। দোব নবাবী ঘুচিয়ে একদিন—কাঠওলা ডেকে সব গাছ কাটিয়ে যখন বিক্রী ক'রে দোব—তখন বুঝবেন সব।...কেন, কেন—সুখসোমন্দা আমার মাটি জুড়ে বসে থাকবি শুনি!'...

পাড়ার লোক বলে পাগল। বলে নতুন বামুনদের বুড়িটার শোকে তাপে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বলাইয়েরও তাই ধারণা। পাগল সে বেশী দেখেনি বটে তবে পাগলদের কথা শুনেছে সে। এখানে বাজারে যে বুড়ো পাগলটা একেবারে উদোম বসে থাকে ময়রাদের উনুনের ধারে—সেও তো অমনি, দিন-রাত বকে আর গান গায়। এ বুড়ি গান গায় না বটে, বকে তার চতুর্গুণ।

বলাইয়ের এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছে করে না এখানে। নেহাৎ কোথাও তার স্থান নেই বলেই পড়ে থাকতে হয়। বড়মাসী আগে আগে বলত তার ওখানে গিয়ে থাকার কথা—কিন্তু এখন আর উচ্চবাচ্য করে না। তাদের অবস্থা নাকি খারাপ হয়ে পড়েছে—মেসো-মশাইয়ের চাকরি চলে গেছে—এক পয়সা রোজগার নেই, গুষ্টিসুদ্ধ মেজ-কর্তার 'হাততোলা'য় দিন কাটাচ্ছে। ও-বাড়ির মেজদার বিয়ের আগে নাকি মেজকর্তা ওদের একটা মুদীর দোকান ক'রে দিয়েছিলেন—ওরা সেটা চালাতে পারেনি, হাজার বারো শ' টাকা ঘুচিয়ে

---

* 'বেজায় আওয়াজ' নাটকে গানটি আছে। রচয়িতা দেবেন্দ্রনাথ বসু (ব্যাংবাবু)। দীর্ঘকাল আবুহোসেন গীতিনাট্যের সহিত প্রহসন হিসাবে অভিনীত হইয়াছিল। গানটির পংক্তিগুলি এইরূপ : 'বাংলা এবার স্বাধীন হবে বক্তৃতার জোরে, বাংলা ছেড়ে জাহাজ চড়ে সাহেব কাল পালাবে ভোরে। বাঙ্গালীর সাইকো একতা, বলো বলে কি একথা? প্যাকার্ড মারো হবে বক্তৃতা, হয়রত্তা গোলাকে অমনি টাউনহল ব্যাকে ভরে।'"

আবার ঘরে এসে বসেছে সবাই। কাজেই সেখানে গিয়ে ওঠবার কোন উপায় নেই।

আর হুট বলতে কোথাও যেতে আর ভরসাও হয় না ওর। ইদানীং দিদিমার মেজাজ হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর—তেমনি অর্থপিশাচও হয়ে উঠেছে। মেজমাসীর দুর্দশা তো চোখেই দেখল সে। অসুখে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে এসে দাঁড়াল—ঠিক রাস্তার কুকুরের মতো দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে দিদিমা। ঝ্যাঁটা মেরে তাড়ানোটা মুখের কথা নয় ওর—সত্যি সত্যিই ঝ্যাঁটায় হাত দিয়েছিল, যদি আর একটু দেরি করত উঠতে তো হয়ত সত্যিই ঝ্যাঁটা তুলত বুড়ী। বড়মাসীর বাড়ির কেউ বিশ্বাস করেনি কথাটা—কিন্তু বলাই নিজের চোখে দেখেছে। হ্যাঁ, মেজমাসীর দোষ আছে হয়ত—অসময়ে এসে উঠেছে তারপর সুযোগ পেলেই চলে গেছে, এদের সুবিধে অসুবিধের দিকে তাকায় নি—কিন্তু তবু পেটের মেয়ে তো হাজার হোক—ঐ মড়ার দশা হয়ে এসে দাঁড়াল। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেতে দিলে না। বাইরে থেকেই বিদেয় ক'রে দিলে। বাইরের বাগানে বসে পড়েছিল, সেইখান থেকেই উঠে চলে গেল চোখের জল মুছতে মুছতে। শেষ পর্যন্ত সেই বড়মাসীর বাড়ি গিয়ে উঠতে হ'ল তাকে। বরং মেজকর্তা—সে তো পর বলতে গেলে—সে অনেক ভদ্রতা করেছে। পাঁচ-ছ দিন ওখানে রেখে, ছেলেদের দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে, বলে-কয়ে একেবারে দশ-পনেরো দিনের মতো ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তবে ছেড়েছে সে। মায় একখানা নতুন থান ধুতি, মেয়ের বাড়ি যাবার গাড়িভাড়া পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে যাবার সময়। বড়মাসীকেও মানতে হয়েছে যে, 'হ্যাঁ, মেজকর্তা আমার মানটা রেখেছে বাপু, সেটা গরমান্যি যেতে পারব না।'

বলাই তবু শেষ পর্যন্ত আশা করেছিল যে, দু-চার দিন পরে দিদিমার মনটা নরম হবে, ওবাড়ি থেকে ডেকে পাঠাবে। ডেকে পাঠানো তো দূরের কথা, একটা উদ্দেশও করলে না। বরং মেজদা উপযাচক হয়ে একদিন খবরটা দিতে এলে বলেছিল, 'ওসব কথা আমাকে শোনাবার দরকার নেই। ওকথা আমি শুনতে চাইনি। আমার মেজ মেয়ে অনেকদিন মরে গেছে, খাল ধারে গেছে—এই আমি জানি। তার কথা ছাড়া যদি আর কোন কথা থাকে তো বল!'

এর পর দিদিমার আশ্রয় ছাড়বার কথা ভাবতেও হয় না বলাইয়ের। দিদিমা যে বলে, 'কাউকে চাই না আমার, কাউকে দরকার নেই। আমার সগুষ্টি মরেহেজে গেছে এই জেনে আমি নিশ্চিন্তি আছে'—সেটা কথার কথা নয়। বুড়ি একেবারে একাই থাকতে পারে, সত্যিই হয়ত কাউকে দরকার নেই ওর।

আর গেছেও তো একে একে সবাই চলে—নিহাৎ বলাইয়ের কোন উপায় নেই বলেই যেতে পারেনি—কিন্তু শ্যামা তো ঠিক মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছেন। কাউকে কোন দিন কাকুতি-মিনতিও করেন না এসে থাকতে—কারুর বাড়ি গিয়েও ওঠেন না। নিজের গাছ-গাছালি, তরুকলা আমড়া শষা কলা—নারকেল আর নারকেলের পাতা ঝাঁটার কাঠি এবং সুপুরি নারকেলের বেলদো—শুকনো বাঁশপাতা আমড়া পাতা, এই সব নিয়েই দিন কেটে যায় তাঁর। পাঁচটা মানুষের মুখও যে না দেখেন তা নয়, অধমর্ণের দল তো আছেই। নিত্য নিয়তিই আসে তারা। সব জড়িয়ে একটা নিরন্তর কর্মব্যস্ততার মধ্যেই দিন কাটে বরং।

ওরই মধ্যে এগারোটায় হোক বারোটায় হোক—অথবা তিনটেই হোক উনুনেও জ্বালেন একবার ঠিক। নিহাৎ ভাতে-ভাতও খান না—একটা-দুটো তরকারীও রান্না করেন। কারণ তাঁর ঘরেই রান্নার বহু উপকরণ থাকে। তবে রাঁধেন ঐ একবারই। যা রাঁধেন তাই থেকেই খানিকটা সরিয়ে রেখে দেন বলাইয়ের জন্যে। সে সন্ধ্যার পরই খেয়ে নিয়ে ও-পাট চুকিয়ে ফেলে। একটা ছেলের জন্য দুবেলা উনুন জ্বালার পরিশ্রম আর করেন না।

তবে এখনও পর্যন্ত—এসব পরিশ্রম ও'র গায়েও লাগে না। শুধু রান্নাই নয় বা ঘরের কাজই নয়—বাসনপত্রও ও'কেই মেজে নিতে হয়। একটু ঝুঁকে পড়েছেন আজকাল—ভারী জিনিসপত্র বা বাসন নিয়ে আনাগোনা করতে কষ্ট হয় ঠিকই—কিন্তু করে যান উনি মুখ বুজেই। টাকাখানেক মাইনে দিলেই একটা ঠিকে ঝি পাওয়া যায়—আজকাল এখানেও ঠিকে ঝিয়ের চলন হয়েছে—কিন্তু শ্যামার কাছে এতটা বাজে খরচ কল্পনাতীত। একটা টাকা মানে তাঁর কাছে মাসে দু পয়সা হিসেবে সুদ, অর্থাৎ বছরে ছ' আনা। তিন বছরেরও কম সময়ে সে টাকাটা দুটো টাকায় পরিণত হ'তে পারে। একটা টাকাও এমন কিছু ফেলনা নয়। টাকা তো টাকা, সাত হাত মাটি খুঁড়লে একটা পয়সা বেরোয় না। একটা টাকা যদি এতই তুচ্ছ হ'ত তাহ'লে রাজ্যের লোক সেই এক টাকা ধার করবার জন্যেই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত না তাঁর দোরে—তাও ঘর থেকে জিনিস বার ক'রে।

তাছাড়া, দরকারও নেই তাঁর অত সুখে। তিনি বেশ আছেন। ভালই আছেন! একটু ঝুঁকে পড়েছেন বটে, বেশী চলাফেরা বা বেশী কাজকর্ম করলে টনটন ক'রে ওঠে, তখন হাতের কাজ বা বোঝা ফেলে একবার পিঠটা ছাড়িয়ে না নিতে পারলেও চলে না কিন্তু তাই বলে দিদির মতো একেবারে অথর্ব হয়েও যাননি। হাত-পা এখনও তাঁর তাঁবে আছে। আর তা যতদিন আছে ততদিন কারও সাহায্য চানও না তিনি। বসে খাবার শখ তাঁর নেই। কোন কালেই ছিল না। সুখ যে তাঁর অদৃষ্টে নেই তা তিনি জানেন। অদৃষ্টে না থাকলে সুখভোগ হয় না। ঐ তো দিদিই—ছেলে পর পর তিনটে বিয়ে করল, শেষের বিয়ে তো করল স্রেফ মায়ের দোহাই দিয়েই, কাজ করার লোক চাই এই অজুহাতেই অমন সোনার প্রতিমার আসনে এনে বসাল কালো 'ব্রেষকাট' ঐ মেয়েছেলেটাকে—তাই কি দিদি বসে খেতে পারছে? উঠতে পারে না। পা দুটো পড়ে যাবার মতো হয়েছে—তবু পাছা-ঘষে-ঘষে, হামাগুড়ি
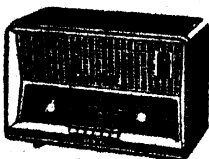
দিয়েও রান্নাবান্না কাজকর্ম করতে হচ্ছে। না ক'রে উপায় কি, এ বৌ যা কাজের— দিনান্তে এক গাল ভাত কারুর জুটত কিনা সন্দেহ, দিদি না সঙ্গে থাকলে।... পঙ্গু হয়ে, মরে মরেও সব করতে হচ্ছে দিদিকে, অথচ ঐ এককালে এক ঘটি জল পর্যন্ত গড়িয়ে খান নি নিজে হাতে।......

না, সুখ যার অদৃষ্টে নেই তার সুখভোগ হয় না কিছুতেই। তাঁরও তো বাড়বাড়ন্ত সংসার দেখে মা বিয়ে দিয়েছিলেন। সব যেন উড়ে-পুড়ে গেল—তিনি যেতে না যেতে।...তাও, বহু দুঃখ বহু লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে যদি বা আবার একটা সংসার খাড়া করলেন— ভোগে কি এল? বড় ছেলে, বড় বৌ, নাতি-নাতনী—সবাই তাঁকে এই বনবাসে ফেলে রেখে চলে গেল, পর হয়ে গেল হয়ত বা চিরকালের মতোই। আগে বছরে দু-তিনবার আসত—এখন কালে-ভদ্রে আসে। বছরে একবারও হয় কিনা সন্দেহ। ও'র এ-বাড়ির খাওয়া খেয়ে নাকি তারা থাকতে পারে না। সেখানে তিন আনা সের মাছে, রোজ মাছ খেয়ে খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে—এখানে থোড় সড়সড়ি ডুমুরের ঝোল দিয়ে ভাত রোচে না তাদের মুখে। নবাব সব। নবাব-পুত্তুর। তার ওপর আবার গোবিন্দর ছেলেটা গিয়ে জুটেছে ঐখানে—তার আরও নবাবী মুখ।—বৌ গিয়েমো। ক'রে নিয়ে গেছেন, কাউকে জিজ্ঞেস নেই মত নেওয়া নেই। দাসীবাঁদী যা হোক একটা পড়ে আছে তা একবার জানানো পর্যন্ত দরকার মনে করেন নি। যার সুবাদে সুবাদ সে-ই কিছু টের পেল না, একটা বোঝা চেপে গেল মাথায় চিরকালের মতো। ইচ্ছে করে যেচে সে বোঝা চাপানো হ'ল। আহাম্মক সব। আহাম্মক। নইলে ছেলে-মেয়েদেরই কি ঐভাবে তৈরী করে। কত মাইনে পাসরে বাবা—যে মাছ না হলে ভাত ওঠে না মুখে। তোদের বাপের যে এককালে ঐ ডুমুরের ডালনা শুষনি শাকের ঝোল দিয়েও ভাত জোটেনি এক কালে। এক-বেলা শুধু ভাত দুটি পেলেও বেঁচে যেত সে তখন।...তাতেও তার যে স্বাস্থ্য ছিল, যে খাটবার শক্তি—তা কি তোরা অত মাছ দুধ খেয়েও পাবি কখনও?.........

না, পাঁচটা মানুষের মধ্যে থাকা কি কারও সাহায্য পাওয়া ভগবান তাঁর অদৃষ্টে লেখেন নি যখন—তখন তিনিও চান না মিছিমিছি টানাটানি করে ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধতে। শুধু বড় ছেলে কেন—ওদের সবাইকেই খরচের খাতায় তুলে রেখেছেন তিনি। নইলে দু-দুটো মেয়ে বিধবা হয়ে শুধু-হাত করে এসে উঠল—তবু, তাদের ভাত-কাপড় দিয়ে পুষতে রাজী হয়েও তাদের কাউকে ধরে রাখতে পারলেন না কেন, তারা কেউ কাছে এল না কেন?...একজন তো মরেই গেল—মরার বাড়া গাল নেই— আর একজন 'হুতোশনী' মূর্তি ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাত দোরের লাথি ঝ্যাটা খেয়ে সেও তাঁর ভাল—তবু মার কাছে সম্মানের ভাত বসে-খাওয়া— তাও ভাল লাগে না। বিনা খাটুনীর রাঁধা ভাত তেতো লাগে তার। তা লাগুক— শ্যামা ঠাকরুণের কিছু এসে যায় না তাতে।......
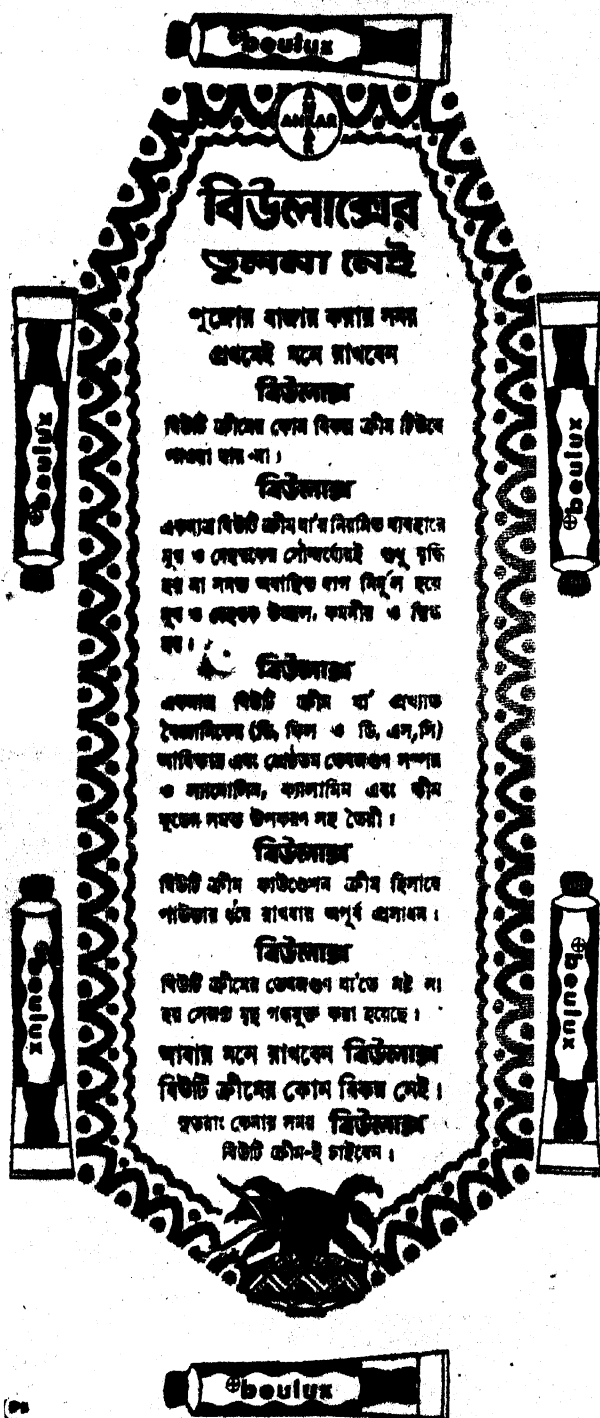
বেশী কথা কি—কালা-হাবা কাজের বার ছেলেটার বিয়ে দিলেন—বেছে বেছে যার সাত কুলে কেউ নেই—বাপে-মরা মায়ে-খেদানো মেয়ে দেখে—সেও তেজ

দেখিয়ে চলে গেল। তেজ যে দেখাল, দেখাতে পারল সেও বিধাতার বাদশাহী বলতে গেলে। ছাপাখানার পনেরো টাকা মাইনের চাকরি ক'রে আর বাচ্চাশুদ্ধকে এই বাজারে বাপ-ছেলে পুষতে হ'ত না। কোথা থেকে সেই ছাপাখানার মালিকের বন্ধু এক মারোয়াড়ীর নজরে পড়ে গেল তাই। বধির কালা আর ভালমানুষের মতো দেখে কী মনে হ'ল—দয়াই হ'ল কিম্বা অন্য কোন মতলব খেলে গেল মাথায়—এক টুকরো কাগজ দিয়ে এক লাইন ইংরিজী লিখতে দিলে। কান্তির হাতের লেখা চিরদিনই ভাল, মুক্তোর মতো—দেখেই পছন্দ হয়ে গেল ভদ্র লোকের। তখনই ওর সেই মনিবকে বলে একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল নিজের গদীতে—এক কথায়, সেধে—চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরিতে বসিয়ে দিলে সেই দিন থেকে। অফিসে বসে অপর বাবুদের সঙ্গে কাজ করতে হয় না—বাবুর বাড়িতে বসেই কাজ ওর। বিকেলে টিফিন পর্যন্ত দেয় বাবুর বাড়ি থেকে—ফল মিষ্টি নানা রকম ঘিয়ে-ভাজা খাবার। মাড়োয়ারী বাবুটির নাকি কি সব নিজস্ব খাতা লেখার কাজ আছে, সে সব হিসেব আলাদা, বাড়িতে বসেই করতে হয়—সেই জন্যেই খুব পছন্দ হয়েছে তাঁর, বধিরকালা লোক—কারও সঙ্গে চট ক'রে গল্প জমাতে পারবে না এই দেখেই পছন্দ হয়েছে আরও।

তা সে মাইনে কি আর তাঁর ভোগে লাগল? যেমন চাকরি পাওয়া—সর্বনাশা বৌ যেন টাক ক'রেছিল ('তা ওরই সিন্নি তো ঠাকুর গেলে বাপু' শ্যামা মনে মনে বলেন, 'ঠাকুর পোড়ারমুখোও তো কম এক-চোখো খোলো নয়!')—সঙ্গে সঙ্গে বরকে নিয়ে আলাদা হয়ে হয়ে গেল। এমন পাকা ঘরে থাকা, এমন নিজের বাড়িতে সম্মানের থাকা ভাল লাগল না তাদের, বালিগঞ্জের দিকে মনোহরপুকুর না কি এক পাড়ায় গিয়ে বস্তিতে উঠেছে—সেইখানেই দু-টাকা দিয়ে ঘর ভাড়া ক'রে! খুব সুখে আছে। এখানে অর্ধেক কাজ তো শ্যামাই ক'রে দিতেন, উনুনের ধারে তো যেতেই হ'ত না বলতে গেলে—সেখানে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব করতে হচ্ছে। ছেলে হয়েছে—হাস-পাতালে গিয়ে খালাস হয়ে এসে সেই অবস্থাতেই—আঁতুড়ের মধ্যেই নাকি রান্নাবান্না সব করছে। সেই ভাত ছেলেও খাচ্ছে। তবু সেও নাকি ওদের ভাল।

অথচ কী যে অনিষ্ট ওদের কর-ছিলেন তিনি, তা আজও ভেবে পান না। বৌকে যে তেমন কোন বকাঝকা করতেন তাও নয়—সত্যি কথা বলতে কি, করতে সাহসই হ'ত না—ঝগড়া তো কোন দিন করেনই নি। তাও তার এত

অসহ্য হ'ল? তার চেয়ে ঢের বেশী সয়েছে বড়বৌ—তা মানতেই হবে। আর কান্তি, কান্তিকে তো বুকে করে রেখেছিলেন, যাকে বলে ডানার আড়ালে, সেও অনায়াসে এতটা বেইমানী করতে পারল! আশ্চর্য।

আবার ভাবেন আশ্চর্য হবারই বা কি আছে! বেইমানের ঝাড় যে ওরা। যেমন বংশ তেমনি হবে তো।

তা তিনিও তেমনি—এক মাসের ছেলে নিয়ে দেখাতে এসেছিল ওরা, উনি কোন কটু কথা বলেন নি বটে তবে সে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েও দেখেন নি। আর দেখবেনও না কখনও, সেটা স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিয়েছেন। ও ছেলে তাঁর নাতি নয়, ওকে তিনি পৌত্র বলে স্বীকার করতে রাজী নন।...

এখন বন্ধনের মধ্যে এক বলাই; তবে তার আশা তিনি রাখেন না আর। বলেন, 'আগে ন্যাওলা যেমনে গেছে পেছ ন্যাওলাও তেমনে যাবে।' ওরা সব বুনো পাখী, খাবে-দাবে বনবাসে ধাইবে।... যে কদিন না খু'টে খেতে শেখে সেই কদিনই কাছে আছে। তারপর একদিনও থাকবে না আর তা আমি বেশ জানি।... তাই আশা-ভরসাও ওদের ওপর কিছু রাখি না, মায়া-মমতাও কিছু নেই। নিহাৎ কেষ্টোর জীব পড়ে আছে তাই দুমুঠো খেতে দিচ্ছি। ঐ পর্যন্ত! মায়া-মমতা কারুর ওপর নেইও, তার কাথাও নেই! '

বলাইয়ের যে ও বস্তুটার জন্য খুব একটা দুঃখ আছে, তা নয়।

আজন্মই তো বলতে গেলে সে মায়া-মমতা স্নেহ-ভালবাসার মুখ দেখে নি। বাপের কথা তো ওঠেই না, মা কিছুদিন ছিল, মায়ের কথা মনেও পড়ে কিন্তু সে থেকেও না থাকারই মধ্যে: মায়ের স্নেহ কাকে বলে তা বলাই জানল না একদিনের জন্যও। জ্ঞান হয়ে অবধি দেখে আসছে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত জড়ভরত। দিদিমার কাছে—কে জানে কেন, সে স্নেহ আশাও করেনি কোনদিন। দিদিমার সঙ্গে জড়িয়ে যেন ও বস্তুটি কল্পনাও করা যায় না। এখানে এসে একটু স্নেহ-ভালবাসা যা পেয়েছে বড়মাসীর কাছে—কিন্তু সেও এত দিনের কথা হ'ল যে, তার স্মৃতিটা পর্যন্ত ধূসর হয়ে গেছে মনের মধ্যে। ছোটবেলায় তিন বছরের স্মৃতি ভুলতে তিন দিনের বেশী লাগে না—ও বয়সে মনটাও থাকে সামনের দিকে, পেছনের কথা নিয়ে মাথা ঘামানো তার স্বাভাবিক নয়।

সুতরাং; স্নেহ-মমতার অভাব নয়—বলাইয়ের দুঃখ অন্যত্র। তার বড় দুঃখ এই বন্দীদশা। এই একটা বাড়ি এবং বেড়া দেওয়া এইটুকু জমির মধ্যে আটকে থাকা। অবশ্য এ বন্দীদশা কতকটা তার স্বেচ্ছাকৃত। সে-ই বেরোতে চায় না ইদানীং। শ্যামা বেরোতে বললে বিদ্রোহ করে, সোজাসুজি অস্বীকার ক'রে বেরোতে। কারণ লজ্জা নিবারণের মতো কোন বস্ত্র তার নেই। এই জন্যই তার লেখা-পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। যখন খুব ছোট ছিল তখনকার কথা আলাদা। ছে'ড়া পাঁচী ধুতির ওপর মহাশ্বেতার ছেলেদের পরিত্যক্ত ঢলঢলে পুরোনো জামা পরে (তাদের নতুন জামারও যা ছিরিছাঁদ—ভদ্রসমাজে পরে যাওয়ার মতো কিনা, বলাইয়ের আজকাল সন্দেহ হয়) সিদ্ধেশ্বরীতলার কাছে পাঠশালায় পড়তে যেত—সেখানে তত বেমানান দেখাত না সেটা। কিন্তু ইংরেজী ইস্কুলের কথা আলাদা। সেখানে ছেলেরা ফিটফাট না হয়ে আসুক, খুব পাগলের মতোও আসে না। অন্তত হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরে আসে একটা করে। পুরোনো হলেও তাতে এক-আধটার বেশী সেলাই থাকে না। অথচ বলাইয়ের আগে যাও বা ভদ্রতা রক্ষার মতো সামান্য কিছু ছিল, তাও রইল না ক্রমশ। শ্যামা দিনদিনই খরচের হাত গুটিয়ে আনছেন। বাড়িতে পরার জন্য ছে'ড়া গামছা বা দুসুতি বরাদ্দ হয়েছে।

এ দুসুতি বহুকাল আগে অভয়পদ দিয়েছে। আগে তাদের অফিসে বস্তা বস্তা আসত এগুলো। কী যেন কল-কব্জা মোছা না কী কাজে লাগত। অভয়পদ মধ্যে মধ্যে কতকগুলো করে নিয়ে আসত। সে আনত বাজারের ঝাড়ন বা রান্নাঘরের হাঁড়িকড়া মোছবার জন্য। নিয়ে এলে এ-বাড়িতেও খান-কতক করে ফেলে দিয়ে যেত। সেই-গুলোই পুতুপুতু করে জমিয়ে রেখে দিয়েছেন শ্যামা। গামছা হিসেবে ব্যবহার করলে গা-মোছা যায় হয়ত—কিন্তু পরে লজ্জা নিবারণ হয় না। শ্যামা বলাইকে সেই দুসুতিই মধ্যে

মধ্যে একটা ক'রে বার ক'রে দেন। বলেন, 'বাড়িতে তো দ্বিতীয় জন-মনিষ্যি নেই—থাকার মধ্যে তো আমি একা, তা আজকাল আমি তো চোখে ভাল দেখতেও পাই নাঁ, সব ঝাপসা ঝাপসা দেখি, কাজকম্ম করি আন্দাজে আন্দাজে—তা এখানে আর অত য়্যালবা-পোশাকে দরকার কি, এ-ই বেশ পরা যাবে। পরে থাক দিকি। অত কাপড় গামছা আমি যোগাতে পারব না। অত আসে কোথা থেকে? তোর বাপ্ কি জমিদারী রেখে গেছে? আর কী এমন নবাব খাঞ্জা খাঁ তুমি যে ফিনলে শান্তি-পুরের ধুতি এনে যোগাতে হবে!'

কিছুদিন যাবতই বাড়িতে এই ব্যবস্থা চলছে। আগে কোন খাতকের গলার আওয়াজ পেলে ঘরে ঢুকে বসে থাকত—কিন্তু তাতেও অব্যাহতি মিলত না, ঘরে আছে জেনে শ্যামা ডেকে এটা-ওটা ফরমাশ করতেন—আর ডেকে কোন কথা বললে মুখের ওপর কিছু না বলা যায় না—আর বেরোনো মানেই লজ্জা, মনে হয় এর চেয়ে এই মুহূর্তে মরে যাওয়াও ভাল। আজকাল তাই কাউকে বেড়ার আগড় খুলতে দেখলেই বা কারও গলার আওয়াজ পেলেই একেবারে পিছন দিকের পগারের ধারে গিয়ে বসে থাকে। এ অবস্থায় মানুষের সঙ্গর থেকে গোসাপ ভাম ভোঁদড়ের সঙ্গও বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

তবু—বাইরে বেরোবার জন্যও যদি একটা ধুতি দিতেন শ্যামা—অন্তত ওর পড়াশুনোটা বন্ধ হ'ত না। বাপ-মা মরা অনাথ বলে, বিশেষ ওর মা রেলে কাটা পড়ার পর ওর সম্বন্ধে সকলেই একটু দয়া অনুভব করতেন—প্রথম থেকেই পাঠশালে বা ইস্কুলে ফ্রী পড়ছে। ওর বই-খাতা যা দরকার মাস্টারমশাইরাই চেয়ে-চিন্তে যোগাড় ক'রে দিতেন—পড়াশুনোতেও খুব খারাপ ছিল না—কিন্তু ইস্কুলে যাওয়াই যদি বন্ধ হয় তো লেখাপড়াটা করে সে কী করে!

শ্যামা এ অসুবিধাটা আদৌ বোঝেন না। ও-বাড়ি থেকে কাঁথার নাম ক'রে ছেঁড়া ধুতিগুলো চেয়ে নেন—তাই আবার সেলাই ক'রে তালি দিয়ে পরতে দেন বলাইকে। সেই কাপড় পরে ইস্কুলে যেতে বলেন বলাইকে। বলেন, 'তুই যে গরীবের ছেলে অনাথ—সবাই তা জানে, তোর অত ভাল ভাল পোশাক না পরলেও চলবে!' কাপড় ও-ই, জামার অবস্থা আরও খারাপ। কারণ মহাদের ছেলেরা বেঁটে ধরনের, কাঁধগুলো চওড়া—বলাই এই বয়সেই বেশ ঢ্যাঙ্গা হয়ে উঠেছে—ঢ্যাঙ্গা আর রোগা—ওদের জামা একেবারেই তার গায়ে লাগে না। তবু প্রথম প্রথম—কতকটা পড়ার উৎসাহে, কতকটা এই শূন্য পুরী থেকে অব্যাহতি পেয়ে মানুষের মধ্যে, মানুষের হাসি-গল্প কোলাহলের মধ্যে গিয়ে পড়ার আগ্রহে—তাও গিয়েছিল বলাই। বেশ কিছুদিনই গিয়েছিল কিন্তু ক্রমশ ছেলেদের ঠাট্টা-তামাশা টিটকিরি অসহ্য হয়ে উঠল। শুধু সহ-পাঠীরা নয়—ইস্কুল সুদ্ধ ছেলেরা ঠাট্টা করে, ক্ষেপায়, হাততালি দেয়। এমন এমন কথা বলে যে, মায়ের মতো রেলে গিয়ে গলা দিতে ইচ্ছে করে বলাইয়ের।

তাদেরও খুব দোষ দেওয়া চলে না অবশ্য। অপর ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিজের বেশভূষাটা নিজের কাছেই হাস্যকর বলে মনে হয়েছে বলাইয়ের। উড়ে পুকুরের ধারে ভাঙ্গা চালাটার মধ্যে যে হাজারী বুড়ি থাকে—দোরে দোরে বাসন মেজে অতিকষ্টে দিন কাটে যার—তার নাতি এককড়িও বলাইয়ের চেয়ে ঢের ভদ্র পোশাকে আসে। খাকী হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি—কিন্তু এই ঢলঢলে অথচ খাটো সাত-তালি দেওয়া জামা আর শতচ্ছিন্ন কাপড়ের চেয়ে তো ঢের ভাল। তাও শ্যামা আজকাল চোখে দেখতে পান না, তালি বাঁকাচোরা বসে, তার ওপর সেলাইয়ের সুতোর রঙের ঠিক থাকে না। কারণ সুতো সবই ছেঁড়া কাপড় থেকে বার ক'রে নেন শ্যামা, জমির সাদা সুতোর সঙ্গে পাড়ের রঙীন সুতোও মিশে যায়।

যদি সত্যিই না থাকত তো এক রকম। দিদিমারও টাকা খরচ করতে হয় না। বলাই জানে বড়মাসী পুজোর সময় বলাইয়ের নাম ক'রে আলাদা টাকা পাঠান তার কাপড় জামার জন্য। সে টাকায় কাপড় কেনা হয় না কস্মিন কালে। শ্যামা বলেন, গরীবের আবার পুজো কি, পুজো তো বড়লোকের। কাপড় না থাকলে তবেই কাপড় কিনব—যদ্দিন চলে চলুক না। যার বাপ কিছু রেখে যায়নি, নিজে যে লেখাপড়া শিখল না, তার নবাবী অব্যেস করা ঠিক নয়।' মহা মাকে চিনেছে ইদানীং, নগদ টাকা সে দেয় না—যা দিয়েছে দু-একবার কাপড় কিনেই দিয়ে গেছে—কিন্তু সেগুলোও, একবার ক'রে পরিয়েই বাক্সয় তুলে রেখেছেন শ্যামা, শুধু বন্ধ থেকে থেকে সেগুলো বস্তাপচা হয়ে যাচ্ছে। সে কাপড়ের কথা তুললে বলেন, 'থাক না, ওদের তো আর খেতে দিতে হচ্ছে না, অবরে-সবরে কাজে লাগবে এখন! এক-আধটা ভাল কাপড় তুলে রাখা দরকার—নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন খেতে যেতেও তো কাজে লাগে!'...

বলাই জানে যে, 'অবরে-সবরে' তার কোনদিনই কাজে লাগবে না ও কাপড়। নেমন্তন্নই বা তাকে করছে কে? এই এত-কালের মধ্যে একবার ও-বাড়ীর মেজ-দার বিয়েতে যা গিয়েছিল—সে সময় বহুকালের একখানা কাপড় বার ক'রেও দিয়েছিলেন শ্যামা—কিন্তু দীর্ঘকাল আলোর মুখ না দেখার ফলে সে কাপড়ে ভাঁজে ভাঁজে এমন একটা ছোপ ছোপ দাগ পড়ে গিয়েছিল যে তাকে আর যাই হোক ধোপদস্ত কাপড় বলা চলে না কোন মতেই। সকলেই ফিরে ফিরে তার কাপড়ের সেই দাগগুলো দেখছিল বারবার—বলাইয়ের বেশ মনে আছে। তাও, সেই তো শেষ!

কাপড়গুলো নষ্ট হচ্ছে — হয়ে যাবেও, তবু শ্যামা সেগুলো বার ক'রে কোন দিনও পরতে দেবেন না ওকে, তা বলাই জানে। এর কোন প্রতিকারও তার হাতে নেই। এক একবার মনে হয় যে, সে কোথাও পালিয়ে যায়—তার না-দেখা ছোটমামার মতো। কিন্তু সাহস হয় না। সে কিছুই জানে না এ পৃথিবীর—এই ওর পরিচিত দু-তিন ক্রোশ পরিধির বাইরে যে বিপুল জগৎ, সে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই নেই। এতকালের মধ্যে ট্রেনে চড়েনি কখনও। কথা বলার লোকের অভাবে, না বলে বলে মানুষের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাসটাও গড়ে ওঠে নি ভাল ক'রে। লেখাপড়াও জানে না। কোথায় যাবে সে, কি খাবে, কোথায় কে তাকে আশ্রয় দেবে—অনেক ভেবেও সে ঠিক পায় না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কী ভাবে অন্নসংস্থান করা সম্ভব, তা কল্পনা করার মতো অভিজ্ঞতাও নেই ওর। কারও সঙ্গে পরামর্শও করতে পারে না। ওর পরিচিত মানুষ বলতে ও-বাড়ির ছেলেরা। তারা সকলেই ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়—তাছাড়া তারা ওকে জানোয়ার বা অর্ধ-মানুষের মতো কোন প্রাণী মনে করে—ভাল ক'রে কথাই বলে না ওর সঙ্গে। তাছাড়া তাদেরও জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তৃত নয়। সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি বলাইয়েরও আছে।

এর মধ্যে একবার বড়মামী যখন এখানে আসে তখন কথাটা পেড়েছিল বলাই। অনেক সাহসে ভর করে অনেক কষ্টে বলেছিল, 'আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন মামীমা, আমি—আমি আপনাদের ওখানে চাকরের কাজ করব সেও ভাল, এখানে থাকলে আমার লেখাপড়াটড়া কিছু হবে না।

ওর কথাটা বলার অসহায় দীন ভঙ্গীতে কনকের চোখে জল এসে গিয়েছিল—কিন্তু তবু বলাইকে নিয়ে যেতে সে পারেনি। প্রথমত আরও একটা খরচ বাড়াতে সাহস হয়নি। তার নিজের ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে, তার ওপর গোবিন্দর ছেলের দায় চেপেছে। যত সস্তাগণ্ডার দেশই হোক, হেমের মাইনেও এতদিনে সত্তরটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এখানে কুড়ি টাকা পাঠিয়ে যা থাকে তাতে এতগুলো প্রাণীর খরচা চালাতে প্রাণান্ত হয় কনকের। মাসে আট আনা দিলেও বাসন মাজার একটা

ঝি পাওয়া যায়—সেটুকুও বিলাস বলে মনে হয়। সর্বদাই টানাটানি করে চলতে হয়। সেক্ষেত্রে, আরও একটা পেট যোগ হওয়া, তার লেখাপড়ার খরচা—অনেকখানি দায়িত্ব এবং বোঝা। বলাই গেলেও মাসিক টাকাটা কমাতে দেবেন না শ্যামা। দু-একবার যে সে চেষ্টা করেনি হেম তা নয়—কিন্তু প্রস্তাব মাত্রে শ্যামা মাথা খুঁড়ে গালিগালাজ দিয়ে শাপান্ত ক'রে যে পাগলের মতো কান্ডকারখানা করেছেন যে তখন মনে হয়েছে যে-কোন মূল্যেও শান্তি কেনা শ্রেয়। সেদিকে কোন সুবিধেই হয়নি—মাসে মাসে সেই কুড়ি টাকাই টেনে যেতে হচ্ছে।

সুতরাং, আয় যেখানে বাঁধা, মোটা ব্যয় কিছু সংকোচ করা সম্ভব নয়, সেখানে আবার একটা খরচের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে সাহস হয়নি কনকের। সে কথাটাই ওকে বুঝিয়ে বলেছিল কনক। বলাই সব বোঝেনি হয়ত—বিশ্বাসও করেনি। তবে মোটা মোদ্দা কথাটা বুঝেছিল। কনক আরও বলেছিল, 'তা ছাড়া মা এখানে একা—একেবারে দোসর হীন—তুমি চলে গেলে তো দেখবারও কেউ থাকবে না। বুড়ো মানুষ, দিন দিন অথর্ব হয়ে পড়ছেন—এইভাবে একেবারে একা ফেলে রাখা কি উচিত? মরে দুদিন পড়ে থাকলেও তো কেউ একটা খবর পাবে না। আর মা-ই বা কি ভাববেন! পাড়ার লোকেও ছি-ছিক্কার করবে। মা আমাকেই কতকগুলো গালমন্দ শাপমন্যি দেবেন। সে আমি পারব না বাবা। তা অন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় না?'

সে অন্য ব্যবস্থাটা যে কী হতে পারে, তা কনকও কিছু বলতে পারেনি অবশ্য। বলাই তো বলতে পারেই নি। জামা-কাপড় চেয়ে কোন লাভ নেই। মিছিমিছি ওদের খরচান্ত করে লাভ কি? সুতরাং সে চুপ করেই গিয়েছিল। ম্লান মুখে নয়—বলাইয়ের মুখ ম্লানও হয় না ইদানীং। কেমন যেন ভাবলেশহীন পাথরের মতো হয়ে গেছে ওর মুখের চেহারাটা। কতকটা ওর মায়ের মতোই। দেখে বুকের মধ্যেটা ছাঁৎ করে ওঠে কনকের।

তবু কনক ওর সমস্যার কোন মীমাংসাই করতে পারেনি। কোন ব্যবস্থাই হয়নি। যেটা হয়েছে—বলাইয়ের সাধ্যর মধ্যে যেটা—সেটাই সে করেছে। ইস্কুলে যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছে। কেন কী হয়েছে—অকারণ বুঝেই হয়ত—কোন কারণও দেখায়নি। হঠাৎই একদিন বলেছে, 'আর যাব না',—বই-খাতাগুলো গুছিয়ে তাকে তুলে রেখে দিয়েছে। খুব সহজভাবে, খুব ঠান্ডা মাথাতে—যেন হিসেব করে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছে।

তাতে শ্যামারও বিশেষ কোন আপত্তি দেখা যায়নি। দু-একবার খুব মৃদু গোছের একটু অনুযোগ ক'রে একেবারে চুপ ক'রে গেছেন। ও প্রসঙ্গই আর উত্থাপন করেন নি। মনের কোন নিভৃত প্রত্যন্ত দেশে যেন তাঁর একটা আপত্তিই ছিল কোথায়—বলাইয়ের লেখাপড়া শেখা সম্বন্ধে—একটা অতি ঘোর স্বার্থপর আশঙ্কা। লেখাপড়া শেখার অর্থই হ'ল তার কাছে চাকরি পাওয়া, বিবাহ হওয়া—আবার পাখীর ডানা গজানো। তারপরই সে পৃথক হয়ে উড়ে চলে যাবে! এ সবই জানা কথা। একটার পর একটা। ছবিটা মনের মধ্যে পর পর যেন আঁকা হয়ে আছে তার মর্মান্তিক সত্য

বলাই মূর্খ। বলাই অসামাজিক—শহরে-ধরে-আনা বন্য জন্তুর মতোই অসহায় সে—কিন্তু একেবারে নির্বোধ নয়। সহজাত বুদ্ধি কিছুটা তার আছেই। দিদিমার এই স্বার্থপর চেহারাটা তার কাছে ঢাকা থাকে না, এটুকু সেও বুঝতে পারে যে, তিনি ইচ্ছে ক'রেই ওকে অমানুষ ক'রে রাখছেন।

আর কথাটা যখন ভাবে এক-একবার, তখন একটা ব্যর্থ, প্রতিকারহীন অন্ধ রোষে যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যে হয়ে ওঠে। ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে শোধ নিতে ইচ্ছে করে এই অবিচারের।

"আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন মাসীমা"

চেহারায়। পরিষ্কার দেখতে পান তিনি সেগুলো ভৃগুসংহিতার ফলাফলের মতো। তাই তার অবচেতন মন একান্তভাবে চাইছিল বলাই মূর্খ হয়ে, অপদার্থ হয়ে থাক। জীবনধারণের জন্য যেন সর্বদা তার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় ওকে। কোথাও না পালাতে পারে সে কোনদিন। পাখীর পায়ে শিকল দিয়ে রাখলেও কোন দিন সে শিকল কেটে উড়ে পালাতে পারে—কিন্তু যার ডানা কেটে দেওয়া হ'ল বা যার ডানা গজাল না আদবেই—সে কোন দিনই উড়তে পারবে না। এই আশ্বাসটুকুকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চান শ্যামা।

সেসময় ওর মনে হয় এক একদিন যে এই বাড়িটায়, তার এই জীবন্তসমাধির জায়গাটায় নিজে হাতে আগুন লাগিয়ে দেয় সে। কঠিনও নয় বিন্দুমাত্র, কোণে কোণে পুঞ্জীভূত হয়ে জমে থাকা, ঘরে দালানে স্তূপীকৃত হয়ে থাকা পাতার রাশিতে একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠি জেলে দেওয়ার ওয়াস্তা। চোখের নিমেষে বেড়াআগুন জ্বলে উঠবে চারিদিকে। বেশ হয়—ঐ বুড়িটা পুড়ে মরে। আর সে-ও। এ জন্তুর জীবন রেখেই বা লাভ কি, তার চেয়ে তার মা যেমন করেছে—এ জন্মের মতো এ-জীবন না হয় নিজেই শেষ ক'রে দেবে সে!
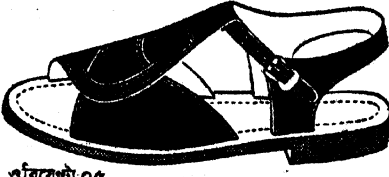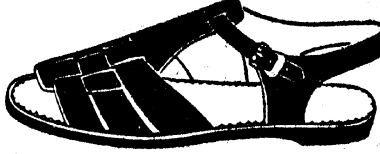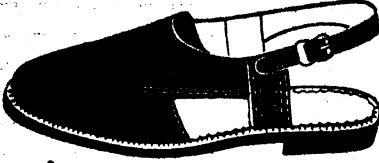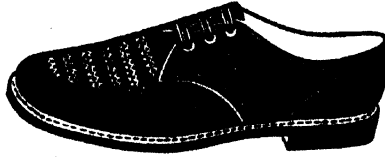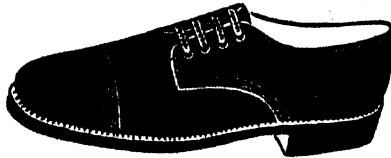
(ক্রমশঃ)

প্যারিস থেকে বলছি

দিলীপ মালাকর

ব্লাক স্টুডিওর অভ্যন্তরে

প্যারিস, সেপ্টেম্বর—সবার মুখে এক কথা শুনতে হচ্ছে, হায়! হায়! ছুটি ফুরিয়ে গেল। গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে পারিসিয়ানরা যে যার ঘরে ফিরেছে। ছুটির পর গৃহপ্রত্যাবর্তনকে এরা বলে "রন্ধ্রে"। অর্থাৎ প্রবেশ। প্যারিস এখন আবার জনসমাগমে জমে উঠেছে। কে কোথায় কিভাবে ছুটি কাটিয়েছে তারই ইতিহাস বর্ণনা চলেছে প্রতিটি পরিবারে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে গিয়েছিলাম প্যারিসের উপকন্ঠে আমারই এক বন্ধুর বাড়ীতে। আমার বন্ধুটির একান্নবর্তী পরিবার। সে একা তার স্ত্রীর সঙ্গে থাকে না। তার বাবা-মা ভাই-বোন নিয়ে বাস করে। খাওয়ার টেবিলে বসে খাওয়া ছাড়া চলছিল ছুটির গল্প। রাত তখন বেশী হয়নি, রাস্তা থেকে ভেসে এলো পটকা ও ক্ষীণ বাজনার আওয়াজ। এখন গ্রীষ্মের শেষ। শরৎকাল ছাড়িয়ে শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে। সবমিলিয়ে আমার মনে হল কালী পুজো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি একদল ছেলে-মেয়ে কাগজের লন্ঠন হাতে করে শোভাযাত্রা করে চলেছে। তাদের পুরোভাগে রয়েছে অপেশাদার বাদ্যকার। ছেলে-বুড়ো মিলে বাজনা বাজিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আর মাঝে মাঝে পটকার আওয়াজ। আমার বন্ধুটি বলল, ওই ছোট শহরের ছেলেদের ক্লাব শোভাযাত্রায় আয়োজন করেছে। কোন পুজো পার্বন নয়। এহল 'রন্ধ্রে' উৎসব। অর্থাৎ ছেলে-মেয়েদের ছুটি ফুরিয়েছে সামনের সপ্তাহ থেকে ইস্কুল খুলবে। তারই উপলক্ষে শোভাযাত্রা।
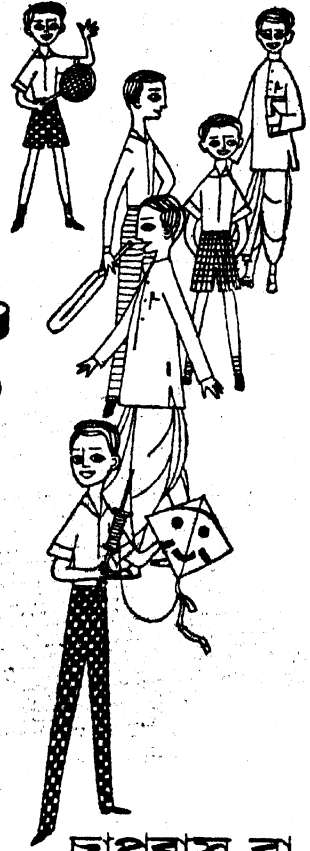
'রন্ধ্র' শোভাযাত্রা দেখে আমার বন্ধুর ছোট বোন 'হায় ছুটি! হায়! ছুটি!' বলে অবশ শরীরটা সোফায় এলিয়ে দিল। সবাই তার দিকে ছুটে গেল। কি ব্যাপার। শোভাযাত্রা দেখে তারও মন

* * *

* * *

খারাপ কারণ তার সুখের ছুটি ফুরিয়ে এসেছে মাস খানেক বাদে তাকেও কলেজে যেতে হবে। নাম তার মিশেল। মিশেলকে জিজ্ঞাসা করছিলাম তার ছুটি কেমন কাটল, কোথায় কাটাল, ইত্যাদি। প্রথমতঃ আগষ্ট মাস থেকে সেপ্টেম্বর যায় খুব খারাপ সময়। খালি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। জুলাই মাসটা খুব ভাল কাটে। যারা জুলাই মাসে ছুটিতে গেছে তারা ভাল-ভাবেই গ্রীষ্ম উপভোগ করেছে কিন্তু আগষ্ট মাসটা গেছে গোল্লায়। শুধু জল আর জল। মিশেলের রাগটা শুধু পবন দেবতার ওপর নয় সূর্যদেবের প্রতি বেশী বলে মনে হল।

ছুটিকে উপভোগ করতে হলে চাই ঝরঝরে আবহাওয়া। মেঘমুক্ত আকাশ আর সূর্যদেবের এক ঝলক হাসি। এসবের অভাব ছিল সারা আগষ্ট আর সেপ্টেম্বর মাস ধরে। যে মহিলারা গিয়েছিল সমুদ্রের ধারে গায়ের সাদা রং তামাটে করতে তারা ফিরে এসেছে বিরক্ত হয়ে। রৌদ্র না উঠলে সমুদ্রে স্নান করা যায় না, তেমনি গায়ে রৌদ্র মেখে স্নান না করলে তামাটে রং আসে না। অধিকাংশ মহিলার অনুতাপ এই কারণেই।

তবে মিশেল মেয়েটি অত বোকা নয়। সে আমায় জানাল যে, আগস্ট মাসটা সে ছুটিতে না গিয়ে প্যারিসের একটি কোম্পানীতে ঠিকে কাজ করেছে। ফলে এক মাস কাজ করার জন্যে পেয়েছে সাড়ে চারশ টাকা। সে-ই আমায় বলল যে, এই গ্রীষ্মের ছুটিতে বিভিন্ন অফিস-কাছারিতে পাওয়া যায় অসংখ্য ঠিকে কাজ। অনেক ছাত্র-ছাত্রী

এই সময়ে দু'পয়সা রোজগার করে নেয়।

কিছুদিন আমি প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি ছোট শহর থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেছি। প্রায়ই দেখতাম, গেটেতে একটি তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে টিকিট নিচ্ছে। তাকে একদিন জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম। কি হে! তোমায় দেখে তো মনে হয় না তুমি রেল কোম্পানীর কর্মচারী। আজকাল কি রেল কোম্পানী শিশুদেরও নেয় নাকি! আমার 'শিশু' শব্দ শুনে মেয়েটি চটে আগুন। সে শিশু নয়, তার বয়স চোদ্দ এবং সে ইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। যাক, এবার তাকে সম্মান দিয়ে বললাম, হে মাদ্‌মোয়াজেল, বল তোমার কথা। তারই কাছে শুনলাম যে, গ্রীষ্মের ছুটিতে রেল কর্মচারীরা যদিও পালা করে ছুটিতে যায়, তাহলেও চাই লোক। পোস্ট অফিস, রেল, ট্রাম-বাস, বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স, ব্যাঙ্ক এবং আরও কত বড় বড় অফিস চালাতে হয় নিয়মিত। শ্মশানের যেমন শনি-রবিবার বা ছুটি নেই, তেমনি নেই এই সব বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ছুটি। তার ওপর গ্রীষ্মে এক মাস করে ছুটি দিতে হয় প্রত্যেক কর্মচারীকে। তাই এই সব প্রতিষ্ঠান বাধ্য হয়ে ইস্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিতে বাধ্য হয়। মেয়েটি আমায় বলছিল যে, সে তো ইতিমধ্যে এক মাস ছুটি কাটিয়েছে, এক মাস রেলের টিকিট কালেক্টরের কাজ করে চারশ' টাকা রোজগার করবে। কাজ আর তেমন বেশী কি, প্রতি পনের মিনিট অন্তর ট্রেন আসে, তারই টিকিট গ্রহণ করা। মজার চাকরী তার কাছে। তার অনেক টাকা জমলে সে অনেক কিছু কিনবে। তার কি আনন্দ। প্রতি বছরে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি দেখেছি, রেলের অফিসে 'ইনফরমেশান' কাউণ্টারে ইস্কুলের ছেলেরা ট্রেনের সময় বলে দিচ্ছে, নয় তো টিকিট বিক্রি করছে। পোস্ট অফিসে এই সময়টা সবাই একটু গণ্ডগোল করে। ইস্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আসে গ্রীষ্মের ছুটিতে পোস্ট অফিসে কাজ করতে। তাদের আনাড়ি হাত প্রায় হিসেবে গোলমাল, নয় তো ভুল তথ্য দিয়ে খদ্দেরদের বিরক্তির কারণ হয়। তা সত্ত্বেও কেউ কিছু বলে না এই জন্যে যে, তারা ছাত্র, এসেছে কয়েকদিনের জন্যে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে শুধু ফ্রান্সেই নয়, সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ছাত্র-ছাত্রীর দল কাজ করে। সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় কাজ করে জার্মানীতে। জার্মান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দল বেঁধে কাজ করে কল-কারখানায় ও বড় বড় অফিসে। এরা প্রায় দুই-তিন মাস কাজ করে প্রচুর টাকা রোজগার করে এবং সেই টাকা দিয়ে তারা আগামী ছয় মাস পড়ার খরচ জোগায়। বাপ-মা বা বাড়ীর ওপর তাদের নির্ভর করতে হয় না। অনেকে কাজ করে অনুবাদক, ইণ্টারপ্রেটার, হোটেল-রেস্তোরাঁয় 'বয়'-এর কাজ। বছরখানেক আগে আমি
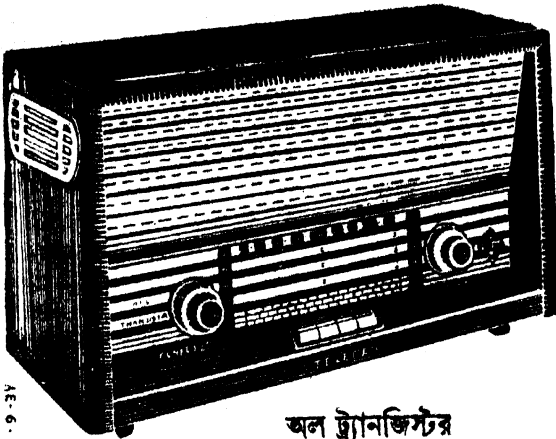
দক্ষিণ ফ্রান্সে যাবার সময় ট্রেনের রেস্তোঁরায় আলাপ হল একটি 'বয়'-এর সঙ্গে। ছেলেটি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ধনবিজ্ঞানে এম-এ পড়ছে। ছুটির সময়ে দু'মাস ট্রেন-রেস্তোঁরায় বয়ের কাজ করে যা টাকা রোজগার হবে, তাই দিয়ে তার কয়েক মাস বেশ চলে যাবে।

এবার মিশেলের কথায় আসা যাক। মিশেল আগস্ট মাসে কাজ করে যে টাকা রোজগার করেছে, সে টাকার সামান্য অংশ খরচ করেছে সেপ্টেম্বর মাসে, আর বাকী টাকায় সে জানুয়ারী মাসে যাবে আল্পস্ পাহাড়ে স্কী করতে। আজকাল শীতকালে পাহাড়ে ছুটি কাটান একটা বড় নেশা হয়ে উঠেছে সবার। পাহাড়ে স্কী করা অনেক ব্যয়সাধ্য। বছর-পাঁচেক আগেও সে সব ছিল ধনীদের বিলাসিতা। এখন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরাও যাচ্ছে দল বেঁধে আল্পস্-এ স্কী করতে। কারণ, এখন সবার পকেটেই টাকা কচ্-কচ্ করছে।

সেপ্টেম্বর মাসে দশ দিন ছুটি কাটিয়েছে মিশেল স্পেনে সমুদ্রোপকূলে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন প্রতি বছরে গ্রীষ্মের সময় সারা ফ্রান্স জুড়েই ছুটি কাটাবার জন্যে ক্যাম্পিং-এর ব্যবস্থা করে। ছাত্র সংঘ এমনভাবে আয়োজন করে, যাতে শোয়া ও খাওয়ায় কোনো অসুবিধে নেই, তেমনি খরচ অত্যন্ত কম। এবার তারা স্পেনেও তেমনি ক্যাম্পিং-এর ব্যবস্থা করে। দশ দিন কি দুই সপ্তাহের সব খরচ, মায় ট্রেনের খরচ বাবদ পড়ে দেড়শ' টাকা। ইউরোপের ছাত্র সংঘ আমাদের ছাত্র সংঘের মত শুধু রাজনীতি বা দলাদলি করে না। এরা সত্যিকারের গঠনমূলক কাজ করে। তার নমুনা এটি। ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংঘ গ্রীষ্মের ক্যাম্পিং-এর ব্যবস্থা করে। তাতে অল্প খরচে ছাত্র-ছাত্রী ছুটি কাটাতে পারে। ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সরকার অসংখ্য ঘরবাড়ী তৈরী করে দিয়েছে, সেখানে নামমাত্র মূল্যে এক মাস ছুটি কাটান যায়। তাদের দেখাশোনার জন্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।

গ্রীষ্মের ছুটিতে আগে সবাই যেত হোটেলে বা বাড়ী ভাড়া করে। আজকাল হোটেল-রেস্তোঁরায় খরচ বেড়ে গেছে বলে অনেকে নতুন পথ অবলম্বন করেছে, সে হল ক্যাম্পিং। যে যার গাড়ী হাঁকিয়ে তার পছন্দসই জেলায়, সমুদ্রের ধারে বা পাহাড়ে যায় ছুটি কাটাতে। আজকাল সব অঞ্চলেই রয়েছে ক্যাম্পিং করার নির্দিষ্ট জায়গা। সেখানে দৈনিক এক টাকা ভাড়ায় পাওয়া যায় এক ফালি জায়গা, যেখানে তাঁবু খাটান চলে। তাঁবুর নীচে ভাঁজ করা যায় তেমন খাট, বিছানা, বাতাস-ভরা রবারের বিছানা বিছিয়ে আরামে শোয়া যায়। তার ওপর গ্যাসের স্টোভ দিয়ে যা খুশি রান্না করা যায়। ভাঁজ-করা চেয়ার-টেবিল বিছিয়ে সংসার পাতে আজকাল অনেকেই। এ বছরে পঞ্চাশ লাখ নর-নারী একমাত্র ফ্রান্সেই ছুটি কাটিয়েছে ক্যাম্পিং-এ। প্রতি বছরে ২০ শতাংশ করে বাড়ছে এদের সংখ্যা। তার ওপর রয়েছে 'ক্যারাভান'-এর দল। এদের সংখ্যা ষাট হাজার। গাড়ীর পেছনে চলন্ত ঘরকে বলে ক্যারাভান। ক্যারাভানে রান্না করা যায়, হাত-মুখ ধোয়া যায়, তেমনি রাতে শোয়া। চলন্ত হোটেলও বলা যায়। ক্যারাভান নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘোরা যায় অনায়াসে। এতে অতি অল্প খরচে দেশভ্রমণ হয়।

* * *

একটি খবর এখানে সকলকে চমকিত করেছে। বেলজিয়ামের রাজা বদুয়াঁ গিয়েছিলেন সপ্তাহকয়েক আগে ফ্রান্সের লুর্দ শহরে তীর্থ করতে। লুর্দ শহর ইউরোপময় খ্যাত তার তুক্-তাক ও মানতের জন্যে। বেলজিয়াম রাজা বদুয়াঁর বিয়ে হয় বছর আড়াই আগে এক স্পেনীয় মহিলার সঙ্গে। রাজা-রানী দুজনেই গোঁড়া ক্যাথলিক। ক্যাথলিকরা তুক্-তাক ও মানতে বিশ্বাস করে। বছরখানেক আগে রানী ফাবিওয়ালার সন্তান জন্মাবার মতো না হওয়ায় রাজা-রানী দুজনেই দুঃখিত। তাঁরা দুজনেই অনেক পুজো-আর্চা করেছেন, মায় পোপের আশীর্বাদ পর্যন্ত। এবার রানী ফাবিওয়ালা গর্ভবতী হলে রানী পাঠিয়েছেন রাজা বদুয়াঁকে লুর্দ-এ মানত করতে। রাজা

বদুয়াঁ তাঁর অনুচরসহ দুই দিন কাটিয়েছেন লুর্দ-এ প্রার্থনা ও মানত করে। রাজার বয়স মাত্র বছর ত্রিশেক। তাঁর চাই উত্তরাধিকারী। শুনে হয়ত

ক্যাম্পিং-এর দৃশ্য

আশ্চর্য হবেন যে, ইউরোপের মতন প্রগতিশালী দেশেও চলে তুক্-তাক্ ও মানত। যখন মানুষের ক্ষমতার বাইরে চলে যায় তাদের প্রচেষ্টা, তখন মানুষ নির্ভর করে দৈবগুণের ওপর। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টোটা। ডাক্তার ও ওষুধের খরচ যোগাতে পারে না বলেই অধিকাংশ পরিবার ঝাড়-ফুঁক ও তুক্-তাকে নির্ভর করে।

বছর পাঁচেক আগে হল্যাণ্ডের রাজপরিবারে অমনি এক কেলেঙ্কারী হয়। বর্তমান ডাচ রাজ-পরিবারের ছোট মেয়ে মারিকা জন্মের কয়েক বছর পরে হয়ে যায় অন্ধ। তার সব রকমের চিকিৎসা করে যখন কোনো ফল পাওয়া যায়নি, তখন রানী এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহিলাকে নিয়োগ করেন। সেই মহিলা নাকি তুক্-তাক্ করে রাজকুমারী মারিকার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছে। এই নিয়ে হল্যাণ্ডময় চলে বিক্ষোভ। কারণ, খোদ রাজপরিবার যদি তুক্-তাকে বিশ্বাস করে, তাহলে সাধারণ লোকেরা কি করবে!

* * *

আর্ট জগতে অতি-আধুনিক ধারার প্রবর্তকদের মধ্যে পিকাশো ও ব্রাক অমর হয়ে থাকবে। সেই সময় শিল্পী ব্রাকের মৃত্যু হয়েছে। অনেক প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী বেঁচে থাকতে সম্মান দূরের কথা, দুবেলা খাবার জোটাতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভ্যান গখ্, তুলু লাতর্ক এবং আরও অনেকে। কিন্তু ব্রাক্ তাঁর জীবিতকালেই পেয়েছেন রাজকীয় সম্মান। ল্যুভার প্রাসাদ বিশ্বের দর্শনীয় বস্তু। সেই প্রাসাদে হয়েছে ব্রাক্-শিল্পের প্রদর্শনী গত বছরে। এক ব্রাক ছাড়া কোনো জীবিত শিল্পীর শিল্প-প্রদর্শনী আজ পর্যন্ত ল্যুভর প্রাসাদে হয়নি।

ব্রাকের মৃত্যুর পর তাঁর শবাধার আনা হয় ল্যুভর প্রাসাদে। শবাধারের সামনে রাজকীয় সম্মানে ফরাসী সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রী ও সাহিত্যিক ম' আঁদ্রে মালরো বলেন, "ব্রাকের সম্মান ফ্রান্সের সম্মানই নয়, উপরন্তু সমস্ত শিল্পী জগতের। তাই ফ্রান্স আজ জানাচ্ছে ব্রাকের মারফৎ আর্টিস্টদের সম্মান। যতদিন ফ্রান্স, ততদিন ব্রাক্ বেঁচে থাকবে।"

সাধারণতঃ শিল্পীর মৃত্যুর পর হয় তাঁর গুণের খতিয়ান। ব্রাকের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। অবশ্য এর জন্যে ফরাসী সরকারকেও সাধুবাদ দিতে হয়।

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৭)

আমি ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে ঘাট বেয়ে উপরে উঠে দ্রুত পদক্ষেপে খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করলাম। মাথা নীচু করেই ছিলাম, মনে হচ্ছিল ব্রজবালা দেবী তখনও উপর থেকে আমাদের দিকে লক্ষ্য করছেন। ভিজে আঁচলের মতই অব্যক্ত লজ্জা সংকোচ আমাকে ঘিরে ছিল।

কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে মনে হল কেন আমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছি, আমি তো কোন অন্যায় করিনি। তাঁর কাছে অনুমতি নিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলাম, আমার অপরাধ কোথায়!

স্নানের ঘরে ঢুকে ঝাঁঝরির তলায় দাঁড়ালাম। ঠান্ডা জলের ধারা ঝরনার মত ছড়িয়ে পড়ছে আমার গায়ে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিরশির করে নেমে যাচ্ছে। আমি দু'চারবার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলাম। বুক আমার ভরে গেল। এ এক নতুন অনুভূতি। বিদ্যুতের চকিত আলোকে যেন একজন অপরিচিতাকে চিনতে পারলাম। সে আর কেউ নয় আমি। বুঝতে পারলাম এ লজ্জা, এ সংকোচ, ব্রজবালা দেবীর ভয়ে নয়, এ বিচিত্র অনুভূতি প্রথম প্রেমের অনাস্বাদিত পুলক। সেই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম গগন সেনকে আমি ভালবেসেছি।

খাবার-টেবিলে এসে দেখি ব্রজবালা দেবী, গগন সেন আর তুবড়ী আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। বুধার নির্দেশ মত গগন সেনের পাশের খালি চেয়ারটিতে আমি বসলাম। তাঁরা দুজনে সরস গল্প করছিলেন, তাই চেয়ারে বসে আমারও আর নিজেকে আড়ষ্ট মনে হল না, বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করলাম।

এক মাস এখানে থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম ব্রজবালা দেবীর রন্ধন-তালিকায় কয়েকটি বিশিষ্ট পদ আছে, বিশেষ কাউকে আপ্যায়ন করতে গেলে উনি ঐ পদগুলির ফরমায়েশ দেন ঠাকুরকে। আজও দেখলাম টেবিলের উপর সাজানো, শুক্তনি, কলাই-এর ডাল, দাবুর পাঁপর ভাজা, মুড়োর ঘন্ট, সাদা স্টু-এর মত মাংস আর আলু বখরার চাটনি।

গগন সেন খেতে খেতে সানন্দে বললেন, কতদিন বাদে এসব খাচ্ছি।

ব্রজবালা দেবী উত্তর দিলেন, জানতাম তোমার ভাল লাগবে।

—বার মাস সকাল বিকেল হোটেলে খেয়ে মানুষ, এসব রান্না যত্ন করে দিচ্ছে কে?

—আজকাল এসব রান্নার চলও নেই। করতে সময়ও লাগে, তাছাড়া ঘরের চেয়ে বাইরের আকর্ষণ মেয়েদের কাছেও তো বেড়েছে, কে আর রান্নাঘর নিয়ে পড়ে থাকে বল!

গগন সেন মাছ মাংস ফেলে এত মন দিয়ে নিরামিষ তরকারি খাচ্ছিল যে আমার সন্দেহ হ'ল ব্রজবালা দেবীর মন রাখবার জন্যেই ও এরকম করছে। বোধহয় হেসেই ফেলেছিলাম। দুজনেই একসংগে আমার দিকে তাকালেন, আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলাম।

খাওয়া চলল অনেকক্ষণ ধরে, যত না খাওয়া হল তার চেয়ে গল্প হল অনেক বেশী। বার বার ব্রজবালা দেবী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই কথা জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি ঠিক বলছ? জায়গা পেলে, তুমি মনের মত স্কুল চালাতে পারবে?

গগন সেন জোরের সংগে উত্তর দিয়েছে, নিশ্চয় পারব, ঐ আমার স্বপ্ন, একটা সত্যিকারের ভাল স্কুল, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্যে। ঐ বয়েসটায় যদি তাদের মধ্যে সত্যের বীজ বুনে দেওয়া যায় ভবিষ্যৎ নিয়ে আর ভাবতে হয় না, সে বড় হবে, সেই গাছেই যে ফল ফলবে তা হবে জাতীয় সম্পদ। আপনার বাগানের কথাই ভাবুন না, কেন এ বাগানে ফুল হয় আর পাশের বাগানে হয় না। আপনি বেড়া দিয়ে রেখেছেন, আপনার বাগানে গরু ছাগল ঢুকতে পায় না, বৃষ্টির জল না পেলে, আপনি জল দেন, বেশী বৃষ্টি হলে জলের হাত থেকে চারা গাছকে বাঁচান। এত যত্ন করেন বলেই এ বাগানে বীজ মরে না। এখানকার গাছের ফুল হাসে। এ বাগানের ফল খেয়ে লোকে সাধুবাদ দেয়।

ব্রজবালা দেবী একাগ্র মনে গগন সেনের কথা শুনছিলেন। বললেন, তা সত্যি!

—ঠিক তেমনি করেই শিশুদের যদি আমরা মানুষ করতে পারি, সব রকম খারাপ থেকে আড়াল করে রেখে, ভালবেসে তবেই তারা দেশের গর্ব হয়ে দাঁড়াবে একদিন।

ব্রজবালা দেবী গম্ভীর স্বরে বললেন, চেষ্টা করব আমি তোমায় সাহায্য করতে। আমার সামর্থ্য অল্প, কিন্তু একটা জায়গা বোধহয় দিতে পারব।

—তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে—

গগন সেন কথা শেষ করতে পারল না, আন্তরিকতায় গলা ধরে এল। বুধা অন্যদিকে মুখ ফেরালেন, নিজের মনেই বললেন, মস্ত বড় কাজের দায়িত্ব নিতে চাইছ। চেষ্টা করে দেখ। করতে পারলে আমি খুব খুশী হব।

সেই দিনই আমি গগন সেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ধর যদি তুমি জায়গা পাও, এখুনি কাজ শুরু করতে পারবে?

গগন সেন সহজভাবে উত্তর দিয়েছে, পারব।

—টাকা পাবে কোথায়?

—একাজে টাকাটা বড় কথা নয়, অর্পিতা, চাই শিক্ষক। যারা শিশুদের ভালবাসতে পারবে, যে রকম ঐ বুধা ফুলের গাছ ভালবাসে। যারা টাকার জন্যে পড়ায় না, আদর্শের জন্যে পড়ায়।

—সেরকম শিক্ষক তুমি পাবে?

গগন সেন দৃঢ় স্বরে বলে, তুমি আছ, আমি আছি, হয়ত অলকাও আমাদের সংগে থাকবে, শুরু করার জন্যে তিনজন যথেষ্ট। স্কুলের যদি নাম হয়, ছাত্রছাত্রী বাড়তে থাকে শিক্ষকও নিশ্চয় পাব। যাদের মনে একটা আদর্শ আছে, চোখে স্বপ্ন আছে, দেহে কাজ করার শক্তি আছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনও কি আমার ডাকে সাড়া দেবে না। এদিকে আমি অত্যন্ত আশাবাদী অর্পিতা।

এই পর্যন্ত বলে গগন সেন হাসল, আর যদি আশাই না থাকবে, কি নিয়ে বেঁচে থাকব বল?

আমিও আশ্চর্য হয়ে মানুষটার কথা শুনছিলাম, চোখে মুখে কি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় মুখ তার রাঙা হয়ে ওঠে।

মৃদু স্বরে বললাম, তুমি পারবে।

গগন সেন আরও হাসল, এতদিন বুঝি বিশ্বাস হচ্ছিল না।

বললাম, তা নয়, এতদিন তুমি বলে গেছ, আমি বোধহয় খুব মন দিয়ে শুনিনি। আজ মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন কথা শুনছি। মনে হচ্ছে এর মধ্যে অসম্ভব কিছু নেই।

—সত্যিই নেই অপু, তোমাকে যখন কাছে পেয়েছি এখন আমি

নিশ্চিন্ত। মন প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারব।

আনন্দে আমার বুক ভরে গেল, আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে গগন সেনের দিকে তাকালাম. সে আমাকে নারীর দুর্লভ সম্মান দিয়েছে। নিজেকে ধন্য মনে হ'ল।

কয়েক দিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম এ বাড়ীর ছন্দ বদলে গেছে। এখন প্রায় প্রতিদিন গগন সেন আমাদের কাছে আসে। কাজ পড়লে কলকাতায় যায় নয়তো অনেক রাতই কাটায় তার বন্ধুর বাড়ী ব্যাণ্ডেলে। সকাল বিকেল তার আলোচনা, পাড়ার লোকের সঙ্গে পরামর্শ। যদি এখানে বাচ্চাদের স্কুল হয় ছাত্র পাওয়া যাবে কিনা? সকাল না দুপুর কখন ক্লাশ করা উচিত, এ ধরনের কত চিন্তা।

সবচেয়ে আশ্চর্য করেছেন ব্রজবালা দেবী। এ বয়সেও তাঁর যে এত উৎসাহ আছে আমি ভাবতে পারিনি। গগন

সেনের পরামর্শ মত সরকারী মহলের অনেকের সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করেছেন, প্রতিদিন চিঠি লেখাচ্ছেন আমাকে দিয়ে। আমি এবাড়ীতে এসে পর্যন্ত তাঁকে দেখেছিলাম বেশীর ভাগ সময় বিশ্রাম নিতে, কিংবা অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকতে। কিন্তু এ কদিনের মধ্যে তিনি যেন নতুন শক্তি পেয়েছেন, নতুন করে বেঁচে উঠার উদ্দীপনা তাঁর মধ্যে।

আমি হয়তো বলেছি, বড় বেশী পরিশ্রম করছেন, মাঝে মাঝে বিশ্রাম—

উনি হেসে উত্তর দিয়েছেন, ভয় নেই অপিতা, এত বছর বিশ্রাম নিয়েছি যে এখন একটু পরিশ্রম করলে ক্ষতি হবে না। তাছাড়া সময়ও তো ঘনিয়ে এলো, একেবারে চিরবিশ্রাম নেওয়া যাবে, কি বল।

—এ সব কি বলছেন!

—ঠিকই বলছি মা। শেষের কটা বছর বড় একলা কেটেছে, আর যেন টানতে পারছিলাম না, কিন্তু এখন আবার মনে হচ্ছে যদি ভগবান আরও দু চার বছর বাঁচিয়ে রাখেন হয়তো হাসিমুখে তোমাদের সঙ্গে কাজ করে যেতে পারবো।

জোর দিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই পারবেন।

ব্রজবালা দেবীর চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল, ভাগ্যিস তোমাকে পেয়েছিলাম। তোমার জন্যেই তো গগন এ বাড়ীতে এলো। বড় ভাল্মো ছেলে, তাই না?

সায় দিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

ব্রজবালা দেবী যে একদৃষ্টে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন এখনও সেটা বুঝতে পারিনি, উনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, ঠিক উত্তর দেবে মা?

—বলুন।

—তুমি গগনকে ভালবাসো?

বৃদ্ধা যে এ প্রশ্ন করবেন আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি, কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে রইলাম।

ব্রজবালা দেবী নিজে থেকেই বললেন, জানতাম, কারণ গগনও যে তোমায় খুব ভালবাসে। এতে লজ্জার কি আছে মা, এ তো খুব আনন্দের কথা। তোমরা দুজনেই বড় হয়েছো। দীর্ঘদিনের আলাপের পর যদি পরস্পরকে ভালবেসে থাকো তার মত সুখের কথা আর কি আছে।

আমি তখনও কিছু বলতে পারলাম না।

উনি আবার প্রশ্ন করলেন, গগনের সঙ্গে তোমার দাদা-দিদির পরিচয় আছে?

—আছে।

—তাঁদের কোন আপত্তি নেই তো এ বিয়েতে।

সলজ্জে বললাম, সে কথা নিয়ে কখনও আলোচনা হয় নি।

—তাঁদের বলো, তাঁদের সম্মতি পেলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। আমার এবাড়ী থেকেই সব আয়োজন করবো।

ও'র কথা শুনতে শুনতে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। উনি আমাকে সাদরে কাছে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর আন্তরিকতা আমার হৃদয় স্পর্শ করলো। মনে হল এ-জীবনে যে অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি সেই পবিত্র মাতৃস্নেহের স্বাদ এই যেন এখন অনুভব করলাম।

ব্রজবালা দেবীর সঙ্গে আমার এই কথাবার্তা গগন সেনকে বলার জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে উঠলাম। ছোটবেলার বাবা-মা হারিয়ে এটুকু বুঝেছিলাম যে, আমার সব দায়িত্ব নিজেকেই বইতে হবে। শুধু তাই নয়, যত বড় হতে লাগলাম জীবনের সমস্যা বাড়তে লাগল, সে বিষয়ে পরামর্শ করারও লোক পাইনি। অসুস্থা প্রেরণাকে
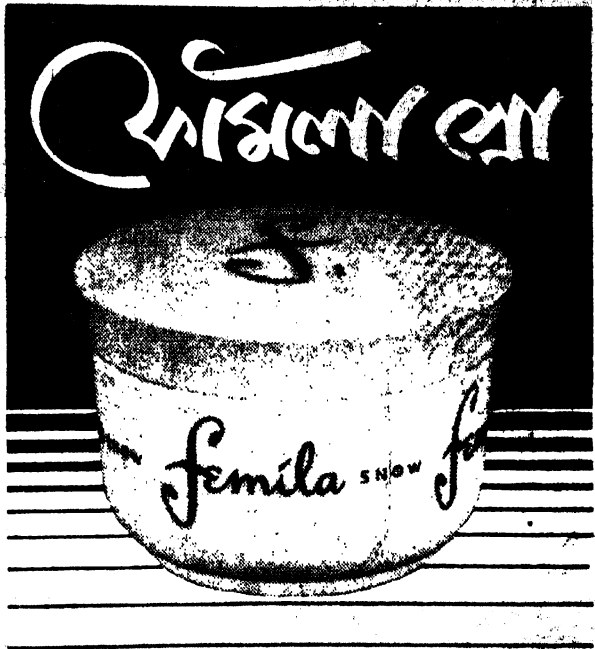
বিরক্ত করার ইচ্ছে হয়নি কোনদিন। তাই এতদিন পর্যন্ত নিজের মতেই কাজ করে এসেছি। লাভ লোকসান দুই-ই ঘটেছে জীবনে কিন্তু তার জন্যে অপরকে দায়ী করতে পারিনি। যখন কলেজে পড়তাম অনেক সহপাঠিনীদের মুখে শুনতাম অভিভাবকদের জ্বালায় তারা অস্থির, তারা খানিকটা অন্ততঃ স্বাধীনতা চায়। আমার কথা শুনে তারা ঈর্ষা করত, ভাবত আমি কত না সুখী, নিজের ইচ্ছে-মত আমি কাজ করতে পারি। কিন্তু তারা তো বুঝতে পারত না কত দমে-পড়া একলা মুহূর্তে আমি কায়মন-বাক্যে চেয়েছি আমাকে কেউ নির্দেশ দিক, আমাকে চালাক, অন্যের কথামত আমি চলি।

সেইজন্যেই বোধহয় আজ যখন ব্রজবালা দেবী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন নেবার সময় হয়েছে। এবার শরতের আসবার পালা। মাঝে মাঝে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। নীল আকাশের বুকে পেঁজা তুলোর মত মেঘ ঘুরে বেড়ায় অত্যন্ত লঘুছন্দে। আবার মাঝে মাঝে শেষবর্ষণের ধারা হঠাৎ শুরু হয়। হাল্কা কালো মেঘের আবির্ভাবে পথিক-জন সচকিত হয়। বোঝে এখনও শরৎ স্থায়ীভাবে আসেনি।

কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে ঘাস, তারই উপর দিয়ে আমি হাঁটছি। সারাদিন ঘরের মধ্যে আটকে থেকে বেশ লাগছে বাগানে বেড়াতে। একটু পরেই তুবড়ীকে নিয়ে গগন সেন ফিরল। দুজনেই হাসিখুশী, হাতে কতগুলো বই।

তুবড়ী আমাকে বলল, আজ আবার কত বই দিয়েছে দেখ।

"তুমি গগনকে ভালবাসো?"

যদি আমরা বিয়ে করি তার ভার নিতে তিনি প্রস্তুত, কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠেছে। মনে হয়েছে এ যদি সত্যিই তাঁর অন্তরের কথা হয় তবে এই মুহূর্তে আমার সমস্ত স্বাধীনতা তাঁর কাছে সমর্পণ করি। সেইসঙ্গে অবশ্য একটা দুর্ভাবনাও মনের মধ্যে উঁকি মেরেছে, তা হোল গগন সেনের চিন্তা, মানুষটা সব বিষয়েই অদ্ভুত, বৃদ্ধার কথাগুলো সে কি ভাবে নেবে কে বলতে পারে।

গগন সেন বিকেলবেলা তুবড়ীকে নিয়ে বেরিয়েছিল, আমি তাদের ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলাম। বর্ষার বিদায়

বললাম, তোমারই তো সব চেয়ে লাভ হয়েছে তুবড়ী. কিন্তু শুধু বই নিলেই হবে না পড়তে হবে।

—বাঃ আমি বুঝি পড়ি না? জিজ্ঞেস কর না আগের বইগুলো থেকে ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে দেব।

গগন সেন বলল, তুবড়ী তা পারবে অর্পিতা, আমার পরীক্ষায় ও পাশ করেছে বলেই এতগুলো বই আবার এনে দিলাম। যাও তুবড়ী বইগুলো উপরে রেখে এস। তুবড়ী চলে গেল।

আমি সেই দিকে তাকিয়ে বললাম ছেলেটা অনেক বদলে গেছে।

গগন সেন হেসে প্রশ্ন কর বদলাতে পারে মানুষ দুদিকে, ভাল হ না মন্দ হচ্ছে তাই বল।

—ভাল হয়েছে। কথা শুনছে, লে পড়া করছে।

—না করার তো কিছু নেই, ও যার কাছে তেতো লাগে তাকে কখ বুঝতে দিতে নেই তাকে তুমি জে করে ওষুধ খাওয়াচ্ছ। যে পড়ার ফেলে গল্পের বই পড়ে তাকে গল্পের ছলেই পড়াতে হয়। শুধু হলেও আবার চলে না, যাকে পড়া তাকে ভালওবাসতে হবে।

একথা যে কতখানি সত্য বি করে তুবড়ীর ক্ষেত্রে তা আমার চে ভালো আর কেউ জানে না। কয়েক আগে এই বিষয় নিয়েই আমার তুবড় সংগে আলোচনা হয়েছিল। সেদিন কয়েকজন বন্ধু এসেছিল ডাকতে ফু বল খেলতে যাবার জন্যে। তুবড়ী গে না, বললে, তার কাজ আছে। ছেলে চলে যাবার পর আমি জিজ্ঞেস ক ছিলাম, কি কাজ আছে যে তুমি খেল গেলে না।

সে বললে, হোম্ টাকসগুলো ক রাখি।

—কে দিয়েছে।

—ঐ দাড়ীআলা বাবু।

আমি ইচ্ছে করে প্রশ্ন করলাম, দাড়ীআলা বাবুকে তোমার ভাল লাগে

তুবড়ী আমার দিকে না তাকি সলজ্জভাবে বলল, খু-উ-ব।

—কেন?

তুবড়ীর সহজ উত্তর, ঐ বাবুটা আমায় ভালবাসে।

কথা শুনে আমি আশ্চর্য হল তুমি কি করে জানলে—

—আমি জানি।

আমার কৌতূহল বাড়ল, প্র করলাম, আর কে তোমায় ভালবাসে?

তুবড়ী আগের মতই মুখ নীচু ক উত্তর দিল, তুমি।

—আর কে?

—জানি না।

ঐ ছোট ছেলেটার কথা সেদি আমাকে স্তম্ভিত করেছিল। তার আছে বাবা আছে, আত্মীয়স্বজন স আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকে সে খুঁজে পেল না, যে তা ভালবাসে। ঐ কিশোরের জীবনে এ মর্মান্তিক ট্র্যাজেডী।

আমি একথা গগন সেনকে ব ছিলাম। কথা শুনে তার মুখ গম্ভ হয়ে যায়। সে বলে, স্নেহ ভালব বড় পবিত্র জিনিস। আত্মীয়ত বন্ধনের মধ্যেই সে সীমাবদ্ধ ন তুবড়ীর মত হাজার হাজার ছেলেমে এদেশে আছে, যারা বাবা-মা থাকতে অনাথ, এই অবাঞ্ছিত সন্তানের দল, এ

যত বড় হয় ঘুরতে পারে তাদের কেউ চায় না, কেউ ভালবাসে না, এ পৃথিবীতে আসাই যেন তাদের অন্যায় হয়েছে। এদের মধ্যে যারা ভীরু তারা আত্মহত্যা করে দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটায়। আর যারা সাহসী তারা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ করে সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে, হয়ত বা নিজেদের ভাগ্যের বিরুদ্ধে।

এই পর্যন্ত বলে গগন যেন চুপ করে যায়, নিজেকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করে, তারপর দৃঢ় অথচ মৃদু স্বরে বলে, অনেকে জেতে অনেকে হারে। তুবড়ীর দুঃখ আমি বুঝতে পারি অর্পিতা। এখনও যদি ও স্নেহভালবাসা পায়, তাকে যদি যত্ন কর, সে মানুষ হবে। পাঁচজনের মধ্যে একজন হবে। আর যদি এমনি করেই রেখে দাও, অযত্ন অবহেলায় আগাছার মত বেড়ে ওঠে, তবে একদিন সে সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দেখা দেবে। এইজন্যেই তো স্কুল স্কুল করে ক্ষেপে উঠেছি। তুবড়ীর মত কয়েকজনকেও যদি আমরা বাঁচাতে পারি।

তুবড়ী যে কি করে এত সহজে ঐ দাড়ীআলা মানুষটিকে ভালবাসতে পেরেছে তা আমি সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলাম।

আজ বই নিয়ে তুবড়ী উপরে চলে যাবার পর আমি চেষ্টা করলাম গগন সেনের কাছে সহজভাবে ব্রজবালা দেবীর কথা বলতে, কিন্তু পারলাম না। এতক্ষণ পর্যন্ত অধীর আগ্রহে তার জন্যে অপেক্ষা করেছি, কিভাবে কথা শুরু করব তাও মনে মনে একরকম সাজিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু দুজনে সামনাসামনি

দাঁড়িয়ে একান্ত নির্জন পরিবেশে সে কথার উত্থাপন করতে পারলাম না। বরং গগন সেনই আমাকে জিজ্ঞেস করল, এত গম্ভীর কেন, কিছু ভাবছ?

অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলাম, কই না?

—কেন তুমি মিথ্যেকথা বলার চেষ্টা কর, যা পার না।

হেসে ফেলে আরও মিথ্যা বলার চেষ্টা করলাম, কি জানি, হয়ত বাড়ীর কথা ভাবছিলাম, অনেকদিন কোন চিঠি-পত্র পাইনি।

গগন সেন বলল, তার জন্যে ভাবনার কি আছে? আমি যেদিন কলকাতায় যাব খবর নিয়ে আসব ওরা কিরকম আছে।

একথায় মনে হল মেজদিদের সবাইকে অন্ততঃ একদিনের জন্যেও ধরে আনতে পারলে ভাল হয়, ব্রজবালা দেবী নিশ্চয় ওদের দেখলে খুশী হবেন। মুখে বললাম, মেজদাকে বোল সবাইকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসবার জন্য।

—সে তোমায় বলতে হবে না, যদি রাজী হন আমি নিজেই তাঁদের ধরে নিয়ে আসব।

কথা বলতে বলতে আমরা বাগানের পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম, যেদিকে এখনও একটা পুরোন টিনের শেড আছে। আগে বুঝি ওটা ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। এখন ব্যবহার হয় গুদামঘর হিসেবে। ভাঙ্গা বাক্স-প্যাটরা, কিছু আসবাবপত্র স্তূপাকারে জড় করা আছে।

সূর্য ডুবে গেছে, এখনও আকাশের আলো নিভে যায়নি, পাখীরা বাসায় ফিরছে।

গগন সেন বলল, একটা মজা দেখবে।

—কি?

—এই ঘোড়ার আস্তাবলের ভেতর একটা লুকোন জায়গা আছে যার ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গপথে গঙ্গার ধারের বাড়ীর মাটির তলায় ঘরে যাওয়া যায়।

আমি চমকে উঠলাম, কে বলল তোমায়।

গগন সেন হাসল, ছোটবেলায় এই তো আমাদের খেলা ছিল, শম্ভু আমাদের দল-বল নিয়ে এই পথ দিয়ে ঐ বাড়ীর মধ্যে ঢুকত। সকলের অজান্তে খেলাধুলো করে আমরা চলে আসতাম।

—সত্যি?

গগন সেন এগিয়ে যেতে যেতে বলল, কতদিন আগেকার কথা, দেখি সে জায়গাটা খুঁজে পাই কিনা।

আমিও গগন সেনের সঙ্গে সেই আস্তাবলের মধ্যে ঢুকলাম। পুরোন জিনিসের একটা ভ্যাপসা গন্ধ। চারদিকে মালপত্তর এমনভাবে ছড়ানো যে তার মধ্যে দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। গগন সেন একটা ছোট আলমারীর উপর দাঁড়িয়ে উঠে অন্য-দিকে লাফিয়ে পড়ল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছ?

সে বলল, তুমি ঐখানে দাঁড়াও আমি জায়গাটা খুঁজছি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কিন্তু আমার আর ভাল লাগলো না, আমিও এগো-বার চেষ্টা করলাম। সামনে কয়েকটা সোফা উপুড় করে রাখা ছিল, ঠেলা-ঠেলি করতে তার মধ্যে দিয়ে অল্প পথ বেরুল, আমি কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে অন্যপাশে চলে এলাম। হাতেমুখে ঝুল লেগে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেললাম। সামনে খানিকটা ফাঁকা চত্বর রয়েছে তারপর একটা ভাঙ্গা ইঁটের দেওয়াল। তাতে অনেকগুলো ফোকর, আস্তে আস্তে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম গগন সেন মাটির উপর হাঁটু গেড়ে বসে কি যেন তোলবার চেষ্টা করছে।

আমার কিরকম যেন ভয় ভয় কর-ছিল, চাপাগলায় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কোন দিক দিয়ে যাব?

গগন সেন মুখ না ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, তুমি কোথায়?

—এই তো, দেয়ালের পেছনে।

—বাঁ দিকে একটা দরজা পাবে চলে এস।

আমি যখন গগন সেনের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, সে মেঝে থেকে একটা চৌকো কাঠের পাটাতন তুলে ফেলেছে। আমাকে দেখে বলল, সাবধান। এখানে গর্ত আছে।

আমি অতি সন্তর্পণে গগন সেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সবিস্ময়ে দেখলাম সুড়ঙ্গপথ নীচে নেমে গেছে। গগন সেন ইচ্ছে করে মুখ নীচু করে গুহার মুখে চেঁচাল, কে?

অল্পক্ষণের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি ফিরে এল, কে?

গগন সেন হাসল, আমিও হাসলাম, কিন্তু তারপরের কথায় আমার মুখ শুকিয়ে গেল। গগন সেন বলল, চল অপু, ভেতরে নামি।

আমি সভয়ে বললাম, এই সময়ে।

—ভয় কি, আমার কাছে টর্চ আছে।

গগন সেন সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বালল। ভাঙ্গা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে টর্চের আলো খানিকটা নেমে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষেপিত প্রতিবেশী উপন্যাস : তেলেগু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি ওর কথায় গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আরও কাছে গিয়ে বসলাম। সে বলল, আমি তোমাকে একটিও মিথ্যা কথা বলব না। কোনদিন তোমার কাছে অন্তত বলিনি। সমন্তকমণিকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দিনে যা বলেছিলাম, তার প্রতিটি শব্দ সত্য। সত্যি-সত্যি আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম সে উন্নত হোক। অবশ্য আমার সম্পর্কে তার ধারণা যে কী তা আমি আজো বুঝতে পারিনি।......মাত্র সেদিনের ঘটনা। জীবনে ভুলতে পারবো না। বাড়ি থেকে সেদিন মাদ্রাজে ফিরলাম। ফিরেই শুনলাম আগের দিন রামনাথম নাকি চলে গেছে। আমার অনুপস্থিতে সে নাকি এসে দু'চারদিন ছিল। তার থাকাকালীন যা-যা ঘটেছে তা সমন্তকমণি সবিস্তারে আমাকে বলল। আমি শুধোলাম, রামনাথমের এভাবে এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া করা উচিত হচ্ছে না। কথায় কথায় বলেছি—খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে বলিনি। আমার কথা শুনে সে মুখ টিপে হাসল। কি যেন কেন তার ঐ হাসি আমার বিশ্রী লাগল। বললাম, আমার কথা তাহলে শুনবে না সমন্তকমণি? রেগেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। পুরুষেরা এরকম করেই থাকে। কিন্তু সে এমন ভাব করল যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি। আবার সেই চাপা হাসি। এ-হাসি আরও মারাত্মক। মনে হল সে ভেতরে-ভেতরে হাসিতে ফেটে পড়ছে। আশ্চর্য—মেয়েটি একবারও চিন্তা করে দেখবে না, তার জন্য আমি দুর্ভোগ ভুগেছি! তার হাসি দেখে আমার মনে হলো না যে সে আমাকে মানুষ হিসেবে গণ্য করছে। আমার রাগের আগুনে ঘি পড়ল। তারপরের ঘটনা সহজ। রাগের মাথায় পুরুষ মানুষেরা যা করে থাকে তাই করেছি। দু'ঘা বসিয়ে দিয়েছি।......ওর সঙ্গে যে আমার এ-সম্পর্ক দাঁড়াবে কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি। ওকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়াই ভুল হয়েছে আমার। তবু ভাবলাম, একবার যখন পদস্খলন ঘটে গেছে আর পিছুপা হওয়া উচিত নয়। আশা করেছিলাম সেও শুধরে যাবে। আমিও তাকে স্ত্রীর মতই দেখতে লাগলাম। কিন্তু সমন্তকমণি কোনক্রমেই যেন এ-সব বুঝতে চায় না। এ-সব ঘটনায় আমার বোঝা যে বেড়ে গেছে এ যেন তার উপলব্ধির বাইরে। আগের মত আজো সে যায়-তার সঙ্গে বেড়াতে যায়। আর ঐ রামনাথমটাও হয়েছে তেমনি—যখন তখন এসে ঘুরে যাচ্ছে। আর ঐ ছেলেটাকে তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছো—অবিকল রামনাথমের মত দেখতে।......

—এ তোমার ভুল ধারণা শচীন্দ্র। সমন্তকমণি তো এমনি মুখে বলে ছেলেটি নাকি আমার মত দেখতে। কাজেই বুঝতে পারছো, তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ-ই ঠিক নও।

—অ। থাক—বুঝেছি। রামনাথম হয়ে গেল, আমি হয়ে গেলাম, এবার তোমার দিকে ঝুঁকছে!

আমি স্তম্ভিত হলাম! সমন্তকমণি সম্পর্কে শচীন্দ্রের ধারণা এত নীচ! অথচ তার রূপ-লাবণ্যের কত প্রশংসাই না করেছে। এবারে আর আমার তার সংগে কথা বলতে ইচ্ছে করল না। আমি সংক্ষেপে বললাম, তাহলে এখন কি ঠিক করেছো?

—ঠিক করার আর কি আছে। আর আমি ওর মুখ দেখতে চাই না। জীবনেও না। আমার বউ এ-ছেলেদুটোকে পাঠিয়েছে আমার সংগে আমি এখানে কি করি তা দেখার জন্যে। দু'-চারদিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

ভাবলাম, এ ঘটনায় খুব বেশি ক্ষতি হবে না। হয়তো এবার থেকে শচীন্দ্রের বউ সুখী হবে। কথায় কথায় বললাম, সময় পেলে একবার হায়দ্রাবাদে এসো—আমার যদি কিছু করার থাকে করবো। আর ওখানে বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। ফিরে গেলাম।

পরের দিনই আমাকে হায়দ্রাবাদ রওনা হয়ে যেতে হওয়ায় সেদিনই সমন্তকমণির সংগে দেখা করা ছাড়া

উপায় ছিল না। গিয়ে দেখি সে বাচ্চাটিকে কোলে শুইয়ে কি যেন ভাবছে। গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমার গলা শুনে সে চমকে উঠল। বলল, কখন এসেছেন মাস্টারমশাই?

আমি তার কাছে বসে সব বললাম। সে বলল, দেখুন মাস্টারমশাই, শচীন্দ্রকে আমি নিজে গিয়ে ডেকে আনতে যাব না—কোনদিন ডাকিনিও। আমার ডাকে কি সে এসেছে! নিজের খেয়ালে এসেছে, নিজের খেয়ালে যদি চলে যায় আমার করার কিছু নেই।

—না, তবু একটা জীবনের প্রশ্ন তো। ভালকথা, রামনাথম কি এর মধ্যে এসেছিল?

—হ্যাঁ, দুচারদিন থেকেও গেছে।

—কি বলল?

—তার তো ঐ এক কথা—ফিরে চলো। ছেলেটির ভার ত আমি নিচ্ছি ইত্যাদি।

—তুমি কি বললে?

—যাব না বললাম। আমি বললাম, এ ছেলেটির ভার যদি কাউকে দিতে হয় তো আমার মাস্টারমশাইকে দেবো।

—আমিও সাদরে গ্রহণ করবো তোমার এই শিশুটির লালন-পালনের ভার। কিন্তু তবু আমার অনুরোধ, এখানে তুমি একা থেকো না। আমাদের স্কুলে ফিরে চলো। ঐ বাড়িতেই তুমি-মৃণালিনী থাকবে একসংগে। মৃণালিনী সম্পর্কে তোমার যে কী ধারণা তা আমি জানি না। তবে তুমি বিশ্বাস করতে পার যে তোমার প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে। সত্যি তোমাকে সে বোনের মত ভালবাসে।

সমন্তকমণি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আপনাদের ওখানেই যাবো মাস্টারমশাই—তবে এখন নয়। আপনি এর পরের বার যখন হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে আসবেন তখন।

ওর এই আশ্বাসে আমার মন অনেকখানি হালকা হল। বললাম, তোমার এখন টাকাপয়সার কোন দরকার আছে সমন্তকমণি? থাকলে বলো, সংকোচ কর না।

—দরকার নেই মাস্টারমশাই। পরশু মৃণালিনী-দি এসে কিছু টাকা দিয়ে গেছে। এখনও তা ফুরোয়নি।

—তোমার যখন দরকার হয় মৃণালিনীর কাছে চেয়ে নিও। আমাদের পর ভেবো না যেন।

—তা ভাবতে পারব না মাস্টারমশাই, কিছুতেই না।

পরের দিন রাত্রে হায়দ্রাবাদ রওনা হয়ে গেলাম। মৃণালিনীর ওপরেই এদিকে স্কুল-পরিচালনার ভার রইল। তাকে বলে গেলাম সমন্তকমণির উপর নজর রাখতে, তাকে সাহায্য করতে। এমনকি সে যদি আবার নাচ শিখতে চায় তাও শেখাতে। আর সে যদি স্বেচ্ছায় রামনাথমের বাড়ি ফিরে যেতে চায় তারও ব্যবস্থা করতে। শচীন্দ্র সম্পর্কে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন ভেবে বলিনি।

কিন্তু হায়দ্রাবাদ পেণছোনোর দ্বিতীয় দিনেই মৃণালিনীর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম। তৎক্ষণাৎ ফিরে যাওয়ার জন্য লিখেছে। তাতে কোন কারণ লেখা ছিল না। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম : সব ব্যবস্থা তো করে এসেছি। দুদিন যেতে না যেতেই এমন কি দরকার পড়ে গেল। এদিকে একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ভার কাঁধে নিয়ে ঘন ঘন কামাই করাও চলে না। আবার এও সত্যি যে বড় ধরনের কোন বিপদে না পড়লে মৃণালিনী টেলিগ্রাম করত না। আমার জন্য সে কি না করেছে। আমার নৃত্যশালার উন্নতি-সাধনের জন্য সে সিনেমা-লাইন ছেড়েছে। নিজের গচ্ছিত সমস্ত টাকা এই নৃত্য-শালার জন্যই ঢেলেছে। অনেক ভেবেও সেই দিন সন্ধ্যায় মাদ্রাজের দিকে রওনা না হয়ে পারিনি।

মাদ্রাজ স্টেশনে নেমে খোঁজার চেষ্টা করলাম মৃণালিনী আমার অপেক্ষায় আছে কিনা দেখতে। আসেনি। ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোন কাজে আটকা পড়েছে। তা নাহলে নিশ্চয়ই আসত। ট্যাক্সি করে স্কুলে গেলাম। মৃণালিনী একা রয়েছে! আমাকে দেখেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমি অবাক হলাম। ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে, মৃণালিনী—কাঁদছো কেন? তার কান্না যেন আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। অজানা আশঙ্কায় আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। আবার বললাম, বলো মৃণালিনী, কি হয়েছে, তাড়াতাড়ি বলো।

—সমন্তকমণি আর নেই।

আমার মাথায় যেন বিনামেঘে বজ্রপাত হল। কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। গোটা শরীর টলছে। অস্ফুটস্বরে বললাম, কি বলছো মৃণালিনী!

সে তেমনি কাঁদতে-কাঁদতে বলল, কি আর বলবো মাস্টারমশাই, আপনি যেদিন গেলেন সেদিন রাত্রেই শচীন্দ্র সমন্তক-মণিকে হত্যা করেছে।

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। গোটা পৃথিবী টলছে। বললাম, কি বলছ মৃণালিনী!!

—ঠিকই বলছি মাস্টারমশাই। শচীন্দ্রকে পুলিসে এ্যারেস্ট করেছে।

তৎক্ষণাৎ আমি শচীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য জেল-হাজতে গেলাম। আমাকে দেখেই শচীন্দ্রের দুই চোখ ফেটে জল এল। জানলার গরাদের ওপার থেকে আমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল। বললাম, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, শচীন্দ্র!

সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার টুঁটি টিপে যেন সে বলল, সমন্তকমণিকে আমিই হত্যা করেছি।

—কেন? কেন শচীন্দ্র! কিসের জন্য এতবড় পাপ কাজ করলে?

—তোমার সঙ্গে সেদিন যখন কথা বলেছিলাম, সেই মুহূর্তে ঠিক করে-

ছিলাম বাড়িই যাবো। এতদিন নিজের পরিবারের প্রতি যা অবহেলা করেছি তা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দেবো। কিন্তু বাড়ি ফিরতে পারলাম না। এ মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে থাকবো কি করে! বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন প্রত্যেকেই ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাবে। এক বিঘৎ জমিও নেই। ছেলেমেয়েদের গায় এক চিলতে কাপড় নেই। নিজের বাড়িটিও অনেক-দিন আগে বিক্রী করে দিয়েছি। ফিরে গিয়ে কি করবো? দু-একদিনের জন্য গিয়ে ঐ ছেলেদুটোকে রেখে এলাম। বললাম, দু'চার দিনেই ফিরছি। ফিরে এসে হাজারো চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছি। পাগলের মত সারাদিন ঘুরেছি, কি করা উচিত। সমন্তকমণিকে একেবারে ছেড়ে যাওয়ার কথা যখন ভাবি সেই মুহূর্তে যেন আমারই ছবি আমারই সামনে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপ করে আমাকে। সন্ধ্যে হয়ে এল। মনে দারুণ এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। একবার ভাবি, কতটুকুই বা ওর বয়স। একবার না হয় ভুল করে ফেলেছে—ক্ষমা করি। এই বয়সে সে আমার যন্ত্রণা বুঝবে কি করে। ভাবলাম, এখন যদি ফিরে যাই সে আমাকে দেখে খুব খুশী হবে। তার আনন্দের আর সীমা থাকবে না। আমার সমস্ত রাগ এবং ক্ষোভ দমন করে গেলাম তার কাছে। সে গান গেয়ে বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। আমার দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে রইল। বললাম, আমাকে ক্ষমা করো সমন্তকমণি। প্রত্যুত্তরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে সে কি করল জানো? মুখ টিপে টিপে আবার সেই হাসি সে হাসল। যে হাসি দেখলে আমার গা-জ্বালা করে সমন্তকমণি সেই হাসিই হাসল। মুহূর্তে আমার গা-জ্বালা করে উঠল।

—ক্ষমা করবে না সমন্তকমণি? আমার গলা ধরে এল। এবারেও সে কোন জবাব দিল না। আমার দিকে অর্ধ-নিমীলিত চোখে তাকিয়ে আবার সে হাসল। এবারের হাসিটা যেন আরো মারাত্মক। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল আমার রাগের আগুন। দমন করতে পারলাম না। সমস্ত শরীরে যেন বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। সে তখনো হাসছে। সেই একই হাসি। হঠাৎ আমার হাতগুলো তার গলা টিপে ধরল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সমন্তকমণির নিষ্প্রাণ দেহ আমার হাতে হেলে পড়ল।......

তার চোখে তখনো ফোঁটা ফোঁটা জল। গরাদে মাথা রেখে সে ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে বলল, তুমিও কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না?

আমি ক্ষমা করার কে। এর পরের ঘটনা তেমন কিছু নয়। আমার টেলিগ্রাম পেয়ে রামনাথম এবং শচীন্দ্রের স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা ছুটে এল। রামনাথমের দুঃখের বর্ণনা কষ্টসাধ্য। শচীন্দ্রের স্ত্রীর কথা কি বলবো! বিচার হয়ে গেল। শচীন্দ্রের আজীবন কারাদণ্ড। শচীন্দ্রের বউ কিছুতেই মাদ্রাজে থাকতে চাইল না। জীবনের বাকি কটা দিন যে-কোনভাবে খেটে-খুটে কাটিয়ে দিতে পারবে বলে ফিরে গেল। আমাদের অনুরোধে রামনাথন সমন্তকমণির ছেলের লালন-পালনের ভার আমাদের উপর দিয়ে গেল।

শচীন্দ্র জেলে গেছে আজ দু'বছর। এই দু'বছরে আমি চাকরি ছেড়ে মাদ্রাজে ফিরে এসেছি। মৃণালিনীকে বিয়ে করেছি। দুজনে মিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নৃত্যপ্রদর্শন করে বেড়াচ্ছি। আমাদের নৃত্যকলার নাম রেখেছি 'সমন্তকমণি-নৃত্যপ্রদর্শনশালা'।

সমাপ্ত

অনুবাদ: বোম্মানা বিশ্বনাথম্

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৩য় বর্ষ
২য় খণ্ড

২৪শ সংখ্যা
৪০ নয়া পয়সা

শুক্রবার, ৩১শে আশ্বিন, ১৩৭০

Friday, 18th October, 1963. 40 Naya Paise

সূচীপত্র

সাপ্তাহিকী

॥ গান্ধীজীর জন্ম-জয়ন্তী ॥

পরম নিষ্ঠা সহকারে গত ২রা অক্টোবর সমগ্র ভারতে 'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধীর ৯৫তম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গও ঐদিন গান্ধীজীর শুভ জন্মোৎসব পালন করে। স্থানে স্থানে সূত্র-যজ্ঞ, প্রার্থনা-সভা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, জনসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বারাকপুর গান্ধীঘাটের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের নেতৃত্বে নাগরিকবৃন্দ ঐদিন নতুন করে জাতীয় সংহতির শপথ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে রাজধানীতে (দিল্লী) অনুষ্ঠিত জনসভায় মহাত্মাজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন অন্যান্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু। বোম্বাই শহরতলীর এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের বিশিষ্ট উক্তি : মহাত্মা গান্ধী গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের নতুন পথ প্রদর্শন করেছেন। ঐ সমাজতন্ত্রবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য ভারত তাঁর নিকট নিতান্ত ঋণী।

॥ মন্ত্রিসভার শপথ ॥

গান্ধী জয়ন্তীর পুণ্যাহে (২রা অক্টোবর) বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ ও মাদ্রাজের নতুন মন্ত্রিসভাগুলির শপথগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে নতুন মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথগ্রহণ করেছেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী। ভারতে তিনিই প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার গৌরব পেলেন। ঐদিনে তাঁর মন্ত্রিসভার গঠন-পর্ব কিন্তু পুরো সম্পন্ন হয়নি।

পাটনায় রাজভবনে নব-নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় শপথগ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে শ্রীসহায়ের নেতৃত্বাধীন কুড়িজন সদস্যবিশিষ্ট বিহারের নতুন মন্ত্রিসভায় শপথগ্রহণও সম্পন্ন হয়। চোদ্দজন সদস্য (নয়জন পূর্ণমন্ত্রী ও পাঁচজন উপমন্ত্রী) নিয়ে গঠিত উড়িষ্যা মন্ত্রিসভায় শপথগ্রহণও সমাধা হয় একই তারিখে। এই মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করছেন শ্রীবীরেন মিত্র (মুখ্যমন্ত্রী)। ওদিকে মাদ্রাজে আটজন সদস্য-সমন্বিত শ্রীএম ভক্তবৎসলম্ মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ করান রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী। এ ছাড়া গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ভূপালে মধ্যপ্রদেশের নতুন মন্ত্রিসভা শপথগ্রহণ করেন—যাঁর নেতৃত্বে আছেন শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র।

॥ পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি ॥

এক্ষণে এ প্রায় নিশ্চিত যে, শ্রীকামরাজ নাদার (বহু আলোচিত কামরাজ [illegible] প্ল্যানের প্রণেতা ও মাদ্রাজের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি হতে চলেছেন। অন্ততঃ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে (নয়াদিল্লী ৯ই অক্টোবর) সেভাবেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জানা গেছে, সভাপতি হিসাবে শ্রীনাদারের নাম প্রস্তাব করেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ।

৬ই অক্টোবরই বোম্বাই-এর এক সম্বর্ধনা-সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীঘোষ অবশ্য বলেছিলেন : কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া উচিত নয়। তাঁর অভিমত এই যে, কামরাজ প্রস্তাব অনুযায়ী যাঁরা মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকেই কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়া উচিত। একই সভাতে 'কামরাজ প্রস্তাব' অনুসারে পদত্যাগী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীএস কে পাতিল বলেন যে, এই বিষয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এ বছর কিংবা আগামী বছরে শ্রীঅতুল্য ঘোষ কংগ্রেস সভাপতি হবেন।

ওয়াকিং কমিটির বর্তমান সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তাহলে ভোট গ্রহণ করা হবে ৯ই ডিসেম্বর (১৯৬৩) আর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবে ১৫ই ডিসেম্বর। এই সভাপতি নির্বাচন সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীজগন্নাথ রাও চন্দ্রিকী।

॥ বিজ্ঞান কংগ্রেস ॥

নয়াদিল্লীতে গত ৭ই অক্টোবর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পঞ্চাশতম অধিবেশনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশের তরুণদের নেতৃত্বদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্মেলনের সভাপতি ডঃ ডি এস কোঠারির একটি দাবী : বিজ্ঞান বিষয়ে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, এই ক্ষেত্রটিতে যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকা উচিত। সেখানে থেকে নবীনদের প্রেরণা যোগানোই হবে তাঁদের মহত্তর কাজ।

॥ কাশ্মীর প্রসঙ্গে নয়া ব্যবস্থা ॥

কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ গত ৪ঠা অক্টোবর সদর-ই-রিয়াসতের নিকট নিজের ও মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। কামরাজ পরিকল্পনার সূত্র ধরেই মন্ত্রিত্ব থেকে তাঁরও এই বিদায়গ্রহণ।

বিদায়ের আগে বক্সী গোলাম মহম্মদ একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন গত ৩রা অক্টোবর। তাঁর এই ঘোষণা অনুসারে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ভবিষ্যতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজ্যপ্রধানকে (সদর-ই-রিয়াসৎ) রাজ্যপাল আর প্রশাসন-প্রধানকে (প্রধানমন্ত্রী) মুখ্যমন্ত্রী নামে অভিহিত করা হবে। কাশ্মীরের বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী এই ঘোষণাটি করেন রাজ্যের বিধান পরিষদে, যা বিভিন্ন মহলে অভিনন্দিত হয়। একমাত্র পাক সরকারী নেতৃবৃন্দ বক্সী গোলাম মহম্মদের আলোচ্য সিদ্ধান্তে তাঁর উষ্মা প্রকাশ করেছেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের মতে ঘোষণাটি 'রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিরোধী ও বে-আইনী'। (রাওয়ালপিন্ডি ৫ই অক্টোবর সংবাদ)

॥ নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্ন ॥

রাষ্ট্রসংঘ মহল থেকে পরিবেশিত গত ২রা অক্টোবরের এক সংবাদে বলা হয়—রাষ্ট্রসংঘ নিরস্ত্রীকরণ কমিটির আঠারোটি সদস্য-রাষ্ট্রের শীর্ষ বৈঠকের আহ্বানের জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব করেছে, সেই সম্পর্কে রুশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা-সহযোগিতা করতে বৃটেন সম্মত। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হিউমই সাধারণ পরিষদে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি করেছেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমস্যা সমাধানের জন্য মিঃ ক্রুশ্চেভ (রুশ প্রধানমন্ত্রী) যেরূপ 'ধাপে ধাপে' অগ্রসর হচ্ছেন, তজ্জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে লর্ড হিউম বলেছেন : দেখে-শুনে যতটা মনে হয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে।

॥ হন্ডুরাসে অভ্যুত্থান ॥

গত ৩রা অক্টোবর ওয়াশিংটন পররাষ্ট্র দপ্তর ঘোষণা করেন যে, হন্ডুরাসে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে এবং প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে। সামরিক অভ্যুত্থানের পরই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত হন্ডুরাসের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ৪ঠা অক্টোবর তারিখের ওয়াশিংটন সংবাদ : হন্ডুরাসের পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট র‍্যামন মোরেলস কোস্টারিকার রাজধানীতে যেয়ে আশ্রয় নিয়েছেন আর তাঁর ক্ষমতা দখল করেছেন কর্নেল ভোলাস কোয়াজ সেরাটো।

॥ 'মুজাহিদ' বাহিনী ॥

ঢাকার ৪ঠা অক্টোবরের এক সরকারী ঘোষণা : 'মুজাহিদ' নামে একটি নতুন বাহিনী গঠনকল্পে পাক সরকার শীঘ্রই সারা পূর্ব পাকিস্থানে সুস্থ ও সবল যুবকদের সংগ্রহ করবেন। সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই এই বাহিনীর সদস্যদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হবে।

ওদিকে আগরতলা, শিলচর, গৌহাটি ও কোচবিহার সীমান্ত থেকে পাকিস্থানী ফৌজের তৎপরতার সংবাদ নানা সূত্রে পাওয়া যায়।

সম্পাদকীয়

আগেকার দিনে পাণ্ডিত্যের লক্ষণ ছিল বড় বড় দাঁতভাঙ্গা শব্দের যোগে অভিভাষণ দেওয়া। শব্দগুলির অর্থ যাঁহারা বুঝিতেন না তাঁহারা নিজেদের অক্ষমতা ও বক্তার জ্ঞানের প্রাচুর্য বুঝিয়া চমৎকৃত হইয়া না-বুঝিবার আনন্দ উপভোগ করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতেন। যাঁহারা—অর্থাৎ যে সামান্য কয়জন—ঐ খটমট বা গূঢ়অর্থযুক্ত শব্দগুলির অর্থ জানিতেন, তাঁহারা বুঝিতেন যে পণ্ডিতমহাশয় উচ্চৈস্বরে যেসকল শব্দযোগে যেভাবে যাহা বলিতেছেন তাহার সমষ্টিগত কোনও অর্থ হয় না এবং তাহা তথ্যহীন, অর্থহীন পাণ্ডিত্যের আস্ফালন মাত্র। তবে অর্বাচীন বা নির্বোধ শ্রোতাসমষ্টিকে নিজের পাণ্ডিত্য বুঝাইতে হইলে উপায় কি? তাঁহাদের নিজেদেরও হয়ত ঐরূপ বক্তৃতা কোনও একদিন দিতে হইবে এই ভাবিয়া তাঁহারাও ঐ ভাষণ নীরবে গলাধঃকরণ করিতেন এবং উহা শেষ হইলে ধৃষভকণ্ঠে "সাধু সাধু" বলিতেন। রবীন্দ্রনাথের "হিং-টিং-ছট্" কবিতায় উহার সুন্দর বিবরণ আছে।

কিন্তু পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যের যুগ আর নাই। পণ্ডিতের কথা কে শুনিতে চায়, যদিনা অষ্টগ্রহযোগ বা ঐরূপ দৈব-দুর্বিপাক দেখা দেয়। কিন্তু ঐ জাতীয় বক্তৃতা আজকাল দিতেছেন রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রের আধিকারিবর্গ। বক্তৃতায় বর্তমানে জীবনযাত্রাপথে যে সকল বাধাবিপত্তি দেখা দিয়াছে তাহার অনেককিছুরই উল্লেখ থাকে। হয়তো রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বহির্রাষ্ট্র সম্পর্কিত সর্বকিছুরই কথা সংক্ষেপে বলা হইতে পারে এবং সেই সঙ্গে অধিকারিমহাশয়ের দলীয় আদর্শবাদের কথাও ঘোষিত হইতে পারে এবং সেই সঙ্গে বক্তার সেই আদর্শে নিষ্ঠা ও জনগণের মঙ্গলচিন্তার নির্দেশও থাকিবে। অর্থাৎ কিনা বক্তৃতা বা ভাষণ যাঁহারা শুনিবেন তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবেন যে, তাঁহাদের সকল সমস্যার অপনোদন বুঝিবা আসন্নপ্রায়। খবরের কাগজে, বিশেষে দৈনিকে, জায়গার টানাটানি সুতরাং বক্তৃতার "সারাংশ" মাত্র দেওয়া হয়। যদি সংবাদপত্রটি অধিকারিমহাশয়ের সমর্থক হয় তবে সেই "সারাংশ" পাঠকবর্গকে আরও আশান্বিত করিবে। যদি বিপরীত দলের হয় তবে সে সংবাদপত্রে বিরুদ্ধমত প্রচারিত হইবে—বা বক্তৃতার উল্লেখমাত্র থাকিবে না।

কিন্তু যদি কোনও সংবাদপত্র বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ দিয়া সেইসঙ্গে তাহার সকল বাক্য ও শব্দ সবিশেষ ছাপিয়া দেয় তখনই সেই বক্তৃতার সঙ্গে পূর্বকালের পণ্ডিতের অভিভাষণের সাদৃশ্য উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়।

বিগত ১১ই অক্টোবর আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীটি টি কৃষ্ণমাচারী এক বেতার-ভাষণে সমস্ত জাতির সম্মুখে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের কর্তব্য ও আদর্শ ইত্যাদির বিবৃতি দিয়াছেন। সেসকলের প্রতিকারে জনমতের দৃঢ় সমর্থন প্রয়োজন এবং বর্তমান অবস্থার ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন অবস্থার বিষয়ে জনসাধারণের বিবেচনা প্রয়োজন কেন সেসকল কথার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বক্তৃতার মধ্যে ছড়ানো আছে। তিনি যে সমাজতন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী একথা তিনি বলিয়াছেন কিন্তু "সবাই সর্বকিছু পাইবে" এই অর্থে সমাজতন্ত্রের প্রচারে উহার অবনতি হইতেছে একথাও তিনি বলিয়াছেন।

দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ করিয়া তাহাও তিনি ইংরাজী শব্দের মায়াজালে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। জনসাধারণের চেষ্টা, চিন্তা, সমর্থন ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। শুধু বলেন নাই তিনি বা যে মন্ত্রিসভায় তিনি আছেন তাহার প্রধান ও অন্য সভ্যগণ এই সকল নিদারুণ সমস্যার সমাধানে কি প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কোথায় কবে করিবেন। "করিতে হইবে" বা "করা উচিত" এই শব্দগুলি রহিয়াছে, আলগা অসংলগ্নভাবে। মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতা সযত্নে পাঠ করিয়া, তাহার বিচারে আমরা আশান্বিত বা উৎফুল্ল হইতে পারি নাই। 'শুধু অকারণ পুলকে' এরূপ ভাষণদানের কি সার্থকতা তাহাও আমরা বুঝিলাম না।

জৈমিনি

ত্রিবার্ষিক ডিগ্রি কোর্সের ভবিষ্যৎ নিয়ে সম্প্রতি দেশে অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা শুরু হ'য়েছে। অনেক শিক্ষাব্রতীই মতপ্রকাশ করেছেন যে এর ফলে শিক্ষারাজ্যে এক ধরনের অরাজকতা দেখা দিয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম দেশের সমস্ত ইস্কুলে চালু করা সম্ভব হয়নি। যোগ্য শিক্ষক, স্থান-সংকুলান এবং ল্যাবরেটরীর অভাবে অনেক ইস্কুলই রয়ে গেছে আগেকার দশম শ্রেণীর পর্যায়ে। এসব ইস্কুল থেকে যারা পাশ করে বেরয় তাদের কলেজে স্থান পাবার আগে আবার পাশ করতে হয় প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা। এইসব কারণে শিক্ষারাজ্যে দেখা দিয়েছে পূর্বোক্ত ঐ ভূশণ্ডীর মাঠের মতো অবস্থা। পরশুরাম-লিখিত গল্পে যেমন শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নেত্যর তিন জন্মের তিন স্বামী একটা চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে তুলেছিল, এখানেও দেখা দিচ্ছে সেই পরিস্থিতি।

যখন ত্রিবার্ষিক ডিগ্রি কোর্স চালু করা হ'য়েছিল তখন অনেক উচ্চাশাই নিহিত ছিল তার মূলে। একদা ভারতের জ্ঞানবান সুলতান মহম্মদ তোঘলগও এই রকম অজস্র উচ্চাশার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'তেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের পক্ষে তাঁর উচ্চাশার আক্রমণ ঠিক সুখকর হ'য়ে উঠতে পারেনি। দেখা যাচ্ছে, আমাদের

ত্রিবার্ষিকের সালতামামী

বর্তমান শিক্ষানিয়ন্তা-গণের কার্যক্রমও সেই একই নিয়তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের। দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন প্রস্তাব তত্ত্বগতভাবে নির্ভুল হলেও যে কী [illegible] দুরাচরণীয় হ'য়ে উঠতে পারে, এটা [illegible]রই সুস্পষ্ট নিদর্শন।

কিন্তু যা হবার তা হ'য়ে গেছে। এখন আশঙ্কা হ'চ্ছে সংশোধনের ফলে আবার নতুন বিপর্যয় এসে হাজির না হয়। শোনা যায়, অসুখের চেয়ে চিকিৎসাই নাকি অনেক সময় বেশি মারাত্মক হ'য়ে ওঠে। নতুন করে আবার মহম্মদ তোঘলগী পন্থায় 'দেবগিরি থেকে দিল্লিতে ফেরো' আদেশ জারি হ'লে সেটা মোটেই সুবুদ্ধির কাজ হবে না।

প্রকৃতপক্ষে একটা কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান করার অর্থ হ'ল সামনে এগিয়ে চলার উপায় আবিষ্কার করা, পিছনে ফেরা নয়। অথচ আমাদের স্বভাবই কেমন যেন হাল ছেড়ে দেবার দিকে। যে-সব কারণে দশম শ্রেণীর ইস্কুলগুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা যাচ্ছে না, সেগুলি গুরুতর হলেও তার সমাধান মানুষের অসাধ্য নয়। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতির উচ্চশিখরে উপস্থিত হয়েছে তারাও তাদের সংগঠন-পর্বের কোনো না কোনো সময়ে এসব সমস্যার সম্মুখীন হ'য়েছে এবং এগুলিকে আয়ত্তে এনেই তারা লাভ করেছে জয়মাল্য। আমরাই বা চটপট এত হতাশায় ভেঙে পড়ি কেন? এর দ্বারা কি এইটেই বোঝা যায় না যে, শিক্ষাকে এখনো আমরা জাতীয় প্রয়োজনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসিয়ে রেখেছি, প্রথম শ্রেণীর গুরুত্ব দিতে পারিনি? নাহলে একটা ড্যাম-এ ফাটল ধরলে আমরা তার সংশোধনের উপায় খুঁজি, (ড্যামটাকে ছেড়ে দিয়ে পালাইনে,) অথচ শিক্ষার বেলাতেই কেন শোনা যায় বারবার নতুন করে গোড়াপত্তন করার প্রস্তাব? একটা জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ হল তার মানুষ। সেই মনুষ্য-সম্পদের এতবড় অপচয় কি আমাদের মতো গঠনশীল জাতির পক্ষে একটু বেশি বিলাসিতা হ'য়ে যাবে না?

•
• •

উপরের ঐ অংশটুকু লেখার পরেই আমার ঘরে জনৈক বন্ধুর আবির্ভাব ঘটে। তিনি রসজ্ঞ ব্যক্তি, আমার ঐ সন্দর্ভটি পাঠ করে তিনি একমত হ'তে পারলেন না। আমি আবার অনেক যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বিষয়টা তাঁকে ভালো ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। তিনি বললেন—

তুমি যা বলবে সবই আমি অনুমান করতে পারছি। কিন্তু আমার আপত্তির কারণ কী, তা তুমি আন্দাজ করতে পারোনি। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কী, সেই নিয়েই তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ। তোমার ধারণা, শিক্ষার স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়িয়ে দিলেই দেশের ছেলে-মেয়েরা খুব শিক্ষিত হ'য়ে উঠবে। কিন্তু আমার ধারণা তা' নয়। আমি মনে করি যে, জগৎসংসার বদলাচ্ছে, আর এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে গেলে ছাত্রদেরও এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা টালমাটালে অভ্যস্ত হয়।

গাছে তুলে শিক্ষাদান

সেইজন্যেই ঘন ঘন পাঠক্রমের পরিবর্তন দরকার। এখন হল স্পেসের যুগ, রকেটে ক'রে শূন্যে উঠতে গেলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়েই ছুটতে হবে।

আমি তাঁর এ যুক্তিতে কী বলব ভেবে না পেয়ে হাসতে লাগলাম। তিনি কিন্তু সীরিয়াস। উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলেন—

বাস্তবিক ভেবে দেখ, প্রাচীন তপোবনে কি নালন্দাবিহারে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হত এখন সে ব্যবস্থা থেকে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। এমন কি শান্তিনিকেতনেও আজ আর ঠিক গাছে চড়ে শিক্ষালাভ করে না ছাত্রেরা। রবীন্দ্রনাথ—

বাধা দিয়ে আমি বললাম, আগে শান্তিনিকেতনে ছাত্রেরা গাছে চড়ে লেখা-পড়া করত—একথা কে বলল তোমাকে?

বন্ধু সবিস্ময়ে বললেন, কেন, কাগজ পড় না? এ বিষয়ে একখানি পুস্তকে ছাপার অক্ষরে লেখা হ'য়েছে, এবং তাই নিয়ে চিঠিপত্র লেখালেখি চলছে কাগজে, দেখনি?

নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত হ'য়ে আমি বললাম, না। কিন্তু এসব বই ছাপা

হয় কেন? যারা এসব বই পড়বে তারা কী মনে করবে বলতো?

কিছুই না, বন্ধু বললেন, গাছে চড়ে পড়াশোনা করা আর গাছের তলায় বসে পড়াশোনা করার মধ্যে পার্থক্য যিনি ধরতে পারেননি তিনিই তো আজকের দিনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ। কী বিরাট কল্পনাশক্তি, রকেটের চেয়েও দ্রুতগতি! আর তাই তো এমন দিগ্‌-বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে......!

আমি ধাঁধা দিয়ে বললাম, তুমি প্ল্যানিং কমিশনে ঢুকছ না কেন? তোমার মতো উর্বরমস্তিষ্ক লোক বাইরে থাকা জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। দেখনি, সেখানকার কাজকর্ম, ডিপার্টমেণ্ট বৃদ্ধি, মায় বাড়িটি নিয়ে পর্যন্ত কী রকম আলাপ-আলোচনা চলছে এখন! তুমি ঢুকলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়!

যা বলেছ! বন্ধুবর উচ্চহাস্যের সঙ্গে গাত্রোত্থান করলেন।

•
• •

কিন্তু এরপর লেখা প্রায় অসাধ্য হ'য়ে উঠল। একে মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে উঠেছিল, তার উপর চালের দুশ্চিন্তা। র‍্যাশানের দোকানের সামনে সকালেই অজগর-সদৃশ লাইন দেখে পশ্চাদ্‌-অপসরণ করেছিলাম, কিন্তু গরজ বড় বালাই, এবার না উঠলে নয়। ব্যাগ-র‍্যাশান কার্ড নিয়ে সম্মুখ সমরের জন্যে প্রস্তুত হলাম।

গিয়ে দেখি তখনও সেই একই অবস্থা। শ'খানেক মানুষের এক বিক্ষুব্ধ জনতা নানারকম মন্তব্যসহকারে সময়-বিনোদনের চেষ্টা করছে। মতমস্তকে আমিও তাদের সগোত্র হলাম।

সময় কাটাবার জন্যে আমার কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে। যখন ঘরে থাকি তখন বইপত্র পড়ি কিম্বা নিছক শুয়ে শুয়ে নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে চেয়ে দিবাস্বপ্নে মগ্ন হই। যখন রাস্তায় বেরোই তখন সাইনবোর্ড আর পোস্টার পড়ি, অথবা রাস্তার মোটর গাড়িগুলির নম্বর প্লেটের দিকে চেয়ে মানসাঙ্ক কষি। চারটে ফিগারকে নানাভাবে যোগ-বিয়োগ দিয়ে জোড়বিজোড় খেলি। কিন্তু উপস্থিত পরিস্থিতিতে এর কোনোটাই কাজে লাগল না।

চালবাজেরাও চালমাত হবে।

তখন লক্ষ্য করলাম, সময় জিনিসটা প্রায় ভূতের ভয়ের মতো। সে বিষয়ে সচেতন হ'লেই পেয়ে বসে। মনে করতে চেষ্টা করলাম, আমি অখণ্ড অবসর নিয়ে নিতান্ত মজা দেখার জন্যে এখানে এসেছি। আবার ভাবলাম, আমি যে লাইনে দাঁড়িয়েছি সেটা র‍্যাশানের দোকানের সামনে নয়, সিনেমা হাউসের সামনে। কিন্তু সেভাবেই বা কতক্ষণ কাটানো যায়!

অবশেষে একসময়ে দেখলাম, চালের দ্বারা চালিত হ'তে হ'তে আমি যতোটুকু অগ্রসর হ'য়েছি সেভাবে র‍্যাশানের দোকানের দরজায় পৌঁছতে আরো দশ-বারো ঘণ্টা দেরি আছে। ছেলেবেলায় আমি ভালো ছাত্র ছিলাম তা নয়, কিন্তু কোনো অপরাধেই আমাকে এত বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার শিক্ষা পেতে হয়নি।

কাজেই, অশিক্ষিত লোকের যা শেষ পরিণতি, পুনরায় জীবনসংগ্রামে (অথবা চালের সংগ্রামে) হেরে গেলাম। তখন মনে মনে এই বলে শান্তি পেতে চেষ্টা করলাম যে—

চাল নিয়ে আমার সঙ্গে যারা চালিয়াতি করল, সেই চালবাজ ব্যক্তিরাও অচিরে বেচাল হবে। চালের দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাল তাদের মগডালে তুলবে, চিনি তাদের চিনে নেবে, কাপড় তাদের ফাঁপড়ে ফেলবে......!

নিমাই ভট্টাচার্য

বছরের সেই দিনটি আবার এসে চলে গেল। এলাহাবাদের জর্জ টাউন, টেগোর টাউন, কটরা, সিভিল লাইনস, লক্ষ্ণৌ'এর কিছু কিছু মানুষ এবং নির্মম এই রাজধানীর কিছু লোক ছাড়া হয়ত আর কেউ তাঁকে আজ মনে করেন না। এরজন্য আশ্চর্য হবার কি আছে? যে গান্ধীজী ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি মানুষের জীবনে পরাধীনতার বন্ধনমুক্তি এনেছেন বলে দাবী করা হয়, সেই মহাত্মার বিদেহী আত্মার স্মৃতিতর্পণে আজ জওহরলালজী না এলে কয়েক ডজন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। যে সর্দার প্যাটেল পাঁচশ বাহান্নটি দেশীয় রাজ্যকে বৃহত্তর ভারতবর্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন, সেই 'লৌহ মানবের' জন্মদিনের সমাবেশে কনষ্টিটিউশন ক্লাবে আজ বক্তা আসেন, কিন্তু শ্রোতা পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জন্মদিনে কলকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভায় খবরের কাগজের রিপোর্টার, সভাপতি, প্রধান অতিথিসমেত জন পনের-কুড়ির বেশী হয় বলে আজ পর্যন্ত দেখিনি। ফিরোজ গান্ধীকে ভারতবর্ষের মানুষের এক বৃহত্তর অংশ না চিনলেও দুঃখ নেই; কারণ তাঁর স্বল্পকালীন কীর্তিকাহিনী স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের পাতায় এক অধ্যায় হয়ে রইবে। ইদানীংকালে আমাদের পার্লামেন্টে ডাঙ্গে, গোপালন, হীরেন মুখার্জি, কৃপলানী, অশোক মেটা, মীনু মাসানী, আচার্য রঙ্গ, ফ্রাঙ্ক এ্যান্থনী, প্রকাশ বীর শাস্ত্রী প্রভৃতির চাইতে যিনি ট্রেজারী বেঞ্চকে বেশী বিপর্যস্ত ও চমকিত করেছেন, তিনি ফিরোজ গান্ধী। ফিরোজ সাধারণতঃ খুব বেশী প্রশ্ন বা বক্তৃতা করতেন না; কিন্তু একবার উঠে দাঁড়ালে সমস্ত হাউসের মধ্যে এক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে যেত।

হাসতে হাসতে মৃদু কশাঘাত করে অপ্রিয় সত্য পরিবেশন করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ফিরোজ গান্ধীর। সেন্ট্রাল হলের কোণে বসে একদল এম-পি আর মিনিষ্টারের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন ফিরোজ। একজন আধা সোস্যালিষ্ট মিনিষ্টার এসে পাশে দাঁড়ালেন। 'আইয়ে সাব তসীব রাখিয়ে' বলে ফিরোজ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। দু'চার মিনিট একথা-সেকথার পর ফিরোজ বল্লেন, আমাদের দেশে তিন রকমের সোস্যালিষ্ট আছে। এলাহাবাদের পেয়ারার মত প্রথম শ্রেণীর সোস্যালিষ্টদের বাইরে সাদা কিন্তু ভিতর লাল; দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে বিটের মতন—যাদের ভিতরে-বাইরে একেবারে লালে লাল; তৃতীয় ধরণের সোস্যালিষ্টরা হচ্ছে বিলেতী মুলোর মত —বাইরে লাল কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধবধবে সাদা। আশেপাশের এম-পি—মিনিষ্টারের দলের কেষ্ট কেষ্ট বেশ অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছেন; ফিরোজ বুঝেও বুঝলেন না। রঙ'এর উপর রসান চড়িয়ে বল্লেন, কংগ্রেস বিলেতী মুলোর মত সোস্যালিষ্ট দিয়ে ভরে গেছে। পাশের এক আধা সোস্যালিষ্ট এম-পিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাই নয় কি?

থিমায়া-অধ্যায়ের পর কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টিতে ঝড় বয়ে গেল কৃষ্ণ মেননের বিরুদ্ধে। সমালোচনার টুকিটাকি জবাব দিলেন নেহরু; কিন্তু অনেকেই সন্তুষ্ট হলেন না। বহুজনেই মেননের কাছে সরাসরি বহু প্রশ্নের জবাব চাইলেন। মেনন-নেহরু দুজনেই সমালোচনার জবাব দিলেন; তবুও উত্তেজনা কমল না। পিছনের দিকে চুপচাপ বসে বসে সব খেয়াল করছিলেন ফিরোজ গান্ধী। তারপর নিজেই এগিয়ে এসে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। কোন লুকোচুরি না করে সোজাসুজি বল্লেন, কৃষ্ণ মেনন যে প্রাইম মিনিষ্টারের তোতা পাখী, একথা সবাই জানেন। মেনন হাঙ্গেরী বা অন্যান্য বিষয়ে ইউনাইটেড নেশানস'এ যা কিছু ব'লেছেন তা পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অনুমতি নিয়েই তিনি বলেছেন; সুতরাং যাঁদের সাহস আছে, তাঁরা যেন সরাসরি প্রাইম মিনিষ্টারের সমালোচনা করেন, মেননের নয়। আর বেশী কিছু বল্লেন না ফিরোজ; ফিরে এলেন নিজের আসনে। পার্লামেন্টারী পার্টির উত্তেজনাও থিতিয়ে পড়ল।

পার্লামেন্টের মেম্বার হবার পর ফিরোজ একটা এম-পিজ্ বাংলো নিয়েছিলেন। সকাল বেলা প্রাইম মিনিষ্টার, শ্রীমতী গান্ধী ও নিজের ছেলেদের সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে চলে আসতেন নিজের বাংলোয়। সেখানে বহুজনে আসতেন নানা কাজের জন্য; অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার জানিয়ে অনুরোধ আসত অসংখ্য। সাধ্যমত এদের সাহায্য করতেন ফিরোজ। একদিন সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ একদল গয়লা এসে হাজির। বাবুজী বাঁচাও, বাবুজী বাঁচাও করে এরা ফিরোজের হাত-পা জড়িয়ে ধরল। গয়লারা জানাল, নিউ দিল্লী

মিউনিসিপ্যাল কমিটির লোকেরা ওদের গরু-মোষ নিয়ে গেছে; গরু-মোষ ফেরত না পেলে না খেয়ে মরব।

মহামুস্কিলে পড়লেন ফিরোজ। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, দেখ ভাই, মানুষের চিন্তা করেই কূলকিনারা পাই না, তারওপর আবার ঐসব—!

নাছোড়বান্দা গয়লার দল। 'বাবুজী বাঁচাইয়ে, নেইত না খেয়ে মরব আমরা সবাই।'

নিরুপায় হয়ে ফিরোজ শুনলেন ওদের কাহিনী। নিউদিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও দিল্লী কর্পোরেশনের দুই এলাকার মধ্যবর্তী এক 'নো-ম্যানস ল্যাণ্ডে' এই গয়লাদের বাস। হঠাৎ কিভাবে তাড়া খেয়ে গোটাকতক গরু-মোষ ছুটে যেতেই নিউদিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটির লোকেরা গরু-মোষদের আটকে রেখেছে।

এই বিষয়ে খোঁজ করার জন্য ফিরোজ ডেপুটি কমিশনারকে টেলিফোন করলেন। ডেপুটি কমিশনার ঠিক কোন বর্ডার এরিয়ায় এই ঘটনা ঘটেছে তা বুঝতে পারলেন না। ফিরোজ তখন বল্লেন, ডেপুটি কমিশনার হয়ে আপনিই যদি আপনার এরিয়ার বর্ডারের খোঁজ না রাখেন, তবে গরু-মোষ সে খবর কি করে রাখবে বলুন তো?

বলা বাহুল্য কমিশনারসাহেব আর বেশী দূরে না এগিয়ে গয়লাদের গরু-মোষদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সামান্য অবস্থা থেকে দীর্ঘ সংগ্রামের পর জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন ফিরোজ। তাই সংগ্রামশীল মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা আমাকে মোহিত করত। দিল্লী ইউনিভার্সিটির একদল ছাত্র অর্থাভাবে বই কিনতে না পেরে পড়াশুনা বন্ধ করার উপক্রম করলে কোনপ্রকারে সে খবর এসে পৌঁছাল ফিরোজের কানে। এদের টেক্সট্ বুক কিনে দিলেন ফিরোজ; আর খুলে দিলেন নিজের বিরাট লাইব্রেরীর দরজা। বহুদিন বিকালের দিকে ফিরোজকে এদের নিয়ে বসতে দেখতাম, পড়াতেন ইকনমিক্স, পলিটিক্স।

প্রথম প্রথম দিল্লী এসে পার্লামেন্টের রিপোর্টে কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি থাকত আমার। বিকেলের দিকে ও'র লাইব্রেরীতে বসে বসে আমাকে ইনি নিয়মিত পার্লামেন্ট রিপোর্ট করার রীতি-নীতি বুঝিয়ে দিতেন।

ফিরোজের মৃত্যুতে আর কিছু না হোক, পার্লামেন্টের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। চলাপতি রাও ফিরোজকে বলেছেন, 'এ হাফ ফিনিশড় প্রোটেটে।' অর্ধ-সমাপ্ত প্রোটেটে হয়েই ফিরোজ মুন্দ্রা, এল-আই-সি, টি-টি-কে'কে নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন; না জানি বেঁচে থাকলে আরো কত ইতিহাস সৃষ্টি করতেন।

দেশে বিদেশে
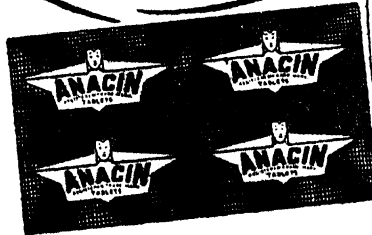
॥ অসহনীয় অবস্থা ॥

চাল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর মূল্য মধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। সরকারী হিসাবেই দৈনিক মাথাপিছু সাড়ে সাত আনা যাদের আয় তাদের পক্ষে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা মণের চাল যে কিনে খাওয়া সম্ভব নয় একথা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না। তারপরেও আছে ডাল, মাছ, শাকসব্জী ইত্যাদির প্রশ্ন, যার মহার্ঘতা চালের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সুতরাং অনাহারে দিনযাপন ছাড়া এই হতভাগ্য প্রদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মুখে আর কোন পথই খোলা নেই। ইতিপূর্বে বিধানসভায় যখন খাদ্য-পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন দেশের একজনকেও তিনি অনাহারে মরতে দেবেন না। তখন তিনি কোন হিসাবের ভিত্তিতে এই শপথবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন আমরা জানি না, অথচ আজ খাদ্যসঙ্কটের চরম মুহূর্তে নিতান্ত অসহায়ের মতই তিনি জানালেন —কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতা ছাড়া এ সঙ্কট হতে রাজ্যকে উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই তিনি দেখেন না। অসাধু ব্যবসায়ীরাও তাঁর এই হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্যের সুযোগ নিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করেনি। এক সপ্তাহের মধ্যেই চালের দর চল্লিশ পেরিয়ে পঁয়তাল্লিশের কাছে পৌঁচেছে, কদিন বাদে পঞ্চাশ হয়ে গেলেও দেশের লোক আর চমকে উঠবে না। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পর খাদ্যের এমন আকাশছোঁয়া দর আর কখনও হয় নি, সুতরাং এর পর যদি তেতাল্লিশের সেই নারকীয় দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে কি করবেন আমাদের শাসকবর্গ? সেদিনও কি তাঁরা বিত্তবান কৃষক ও আড়তদারদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ও নিজেদের অসামর্থ্য ও অসহায়তার কথা প্রকাশ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন?

বাঙলা দেশের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ লোকের রেশন কার্ড আছে। কিন্তু সরকার জানিয়েছেন, ৮৫ লক্ষের বেশী লোককে তাঁরা সপ্তাহে এক কিলোর বেশী চাল সরবরাহ করতে পারবেন না। সুতরাং খোলা বাজারের উপর নির্ভর করতেই হবে মানুষকে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, খোলা বাজারে চালের দর তিনি বাঁধতে পারবেন না। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, দরকার হলে গয়না থেকে শুরু করে বাটি পর্যন্ত বিক্রি করে লোককে এখন ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতে হবে, আর সরকার নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে তা দেখবেন। গম খাও, আলু খাও এসব উপদেশের কোন অর্থ আছে বলে মনে হয় না। ডাল-ভাত-মাছ যখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে তখন তার বদলে অন্য কিছু খেতে হয় এ কথা সবাই মানে এবং সকলে খায়ও তাই। তারপর তাও যখন জোটাতে পারে না তখন রাস্তায় শিয়াল-কুকুরের মত মরে। স্বাধীনতার পর এমন অসহনীয় অবস্থা এ রাজ্যে বোধ করি আর কখনও হয়নি। অথচ এই যে দুঃখের শেষ সীমা, এটুকু সান্ত্বনালাভের কোন উপায় নেই।

॥ বিশ্বের জনসংখ্যা ॥

বিশ্বের জনসংখ্যা সম্বন্ধে 'পপুলেশন রেফারেন্স' নামে আমেরিকার একটি গণসমীক্ষা সংস্থা সম্প্রতি যে সকল তথ্য প্রকাশ করেছেন তা এক কথায় ভয়াবহ। গত তিন বছরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়েছে সাড়ে আঠারো কোটি এবং এই হারেই যদি লোক বেড়ে চলে তবে পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে প্রায় সাড়ে ছয় শত কোটি হতে আর মাত্র আঠেরো বছর বা তারও কম সময় লাগবে। এই শতাব্দীতেই ১৯০০ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা একবার দ্বিগুণ হয়েছে, আরও একবার দ্বিগুণ হবে ১৯৮০ সালের মধ্যে। ঐ সময় চীনের জনসংখ্যা শত কোটি অতিক্রম করবে, যা এক শ বছর আগে সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল। মহাদেশ হিসাবে আফ্রিকার জন্মহার সর্বাধিক, হাজার করা ৪২, কিন্তু মৃত্যুহার যথেষ্ট উঁচু বলে (হাজারে ২৫) সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও পর্যন্ত শতকরা দুই। কিন্তু জনস্বাস্থ্যের উন্নতির সংগে সংগে আফ্রিকার যখন মৃত্যুহার কমতে থাকবে তখন সেখানে অবিশ্বাস্য হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুরু হবে। যেমন হচ্ছে ভারত, সিংহল, মালয় প্রভৃতি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। ম্যালেরিয়া বসন্ত প্রভৃতি মহামারী সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই সকল দেশে মৃত্যুহার খুব হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু জন্মহার আগের মতই আছে। ফলে সব দেশেই দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিংহলে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশ, ভারতে ২ শতাংশ, মালয়ে ৩ শতাংশ। মালয়ে এখন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু এই হারেই যদি লোক বেড়ে চলে, তবে ১৯৬৫ সালে

মালয়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হবে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার। ভারতে এখন যে হারে লোকবৃদ্ধি হচ্ছে তাতে ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ৯০ কোটি হতে আর মাত্র ৩৫ বছর লাগবে। এই হিসাবগুলি থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে, বর্তমান অবস্থাই যদি আমরা চলতে দিই তবে কি ভয়ংকর ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

পরলোকে সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজ্যসভার সেক্রেটারী শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ৮ অক্টোবর নয়াদিল্লীতে পরলোকগমন করেন। ১৯৫২ সালে রাজ্যসভা গঠিত হওয়ার সময় থেকেই তিনি এর সেক্রেটারী-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি বৎসর।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৮ সালে এবং কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৪ সালে অবিভক্ত বাংলার আইন বিভাগের কার্যে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে গণপরিষদে যোগ দিয়ে সংবিধান রচনার সর্বপর্যায়ে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সংবিধান রচনার পর তিনি দুই বৎসর আইনদপ্তরের প্রধান খসড়ারচনাকারীর কার্য করেন এবং ১৯৫২ সালে রাজ্যসভার সেক্রেটারী-পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সালে 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন।

পরলোকে ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলু

মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং লেনিন শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলু গত ৯ অক্টোবর নয়াদিল্লীতে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাত্তর বৎসর।

ডাঃ কিচলু অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বি-এ পাশ করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করেন এবং ১৯১২ সালে জার্মানী থেকে পি-এইচ-ডি লাভ করেন। লন্ডনেই সর্বপ্রথম গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

১৯১৩ সালে স্বদেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পর সমস্ত দেশের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২১ সালে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৯২৯ সালে ২৬-এ জানুয়ারী লাহোর কংগ্রেসে শ্রীজওহরলাল নেহরু-উত্থাপিত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবেও কিচলু সমর্থন জানান। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি যুগপৎভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সেক্রেটারীর কাজ করেছিলেন এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। 'ওয়ার্ল্ড পীস্ কাউন্সিল'-এর পরিষদ গঠিত হবার পর তিনি সহসভাপতি নির্বাচিত হন। নিখিল ভারত শান্তি পরিষদের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ সালে লেনিন শান্তি পুরস্কার পান এবং পুরস্কারের ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা শান্তি আন্দোলনের কাজে দান করেন।

অর্থনৈতিক

রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের গত বছর বাণিজ্যিক লেনদেন হয়েছিল ৯৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার। তার আগের বছর, অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ সালে এই লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৬৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। বাণিজ্যের পরিমাণ যেমন বাড়ছে, রাশিয়ার কাছে ভারতের ঋণের পরিমাণও তেমনি ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬১-৬২ সালের লেনদেনে ভারতের কাছে সোভিয়েটের পাওনা হয়েছিল ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। গত বছরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও ১৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

গত বছর ভারত থেকে রাশিয়ায় রপ্তানি হয়েছিল ৩৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার মাল ও আমদানি হয়েছিল ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার পণ্য। ভারত থেকে রাশিয়ার যা চালান হয়েছিল তার মধ্যে বাগিচাজাত পণ্য ছিল ১২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার, কাপড় ছিল ৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার, কাঁচা চামড়া ৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার। এসব ছাড়াও সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের কাছ থেকে নিয়েছে তামাক, সব্জী, পাটজাত দ্রব্য, জুতা ও চামড়ার অন্যান্য জিনিস, পশম, ইত্যাদি। আর সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ভারত এনেছে ২৯ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি, ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার ইতর ধাতু, ৪ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার খনিজ তৈল ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য বস্তু।

বিদেশী সাহিত্য

জাঁ ককতো

আকাদেমিসীয়ান জাঁ ককতো

'ফরাসী আকাদেমি'র সদস্য-পদ লাভ গৌরবজনক ব্যাপার। অন্তত ফরাসীদের জীবনে এ সম্মান গৌরবের বলেই তারা মনে করে। ১৯৫৫ সালে ককতো এ সম্মান লাভ করেন। ফরাসী শিল্প জগতে এক খামখেয়ালী উদ্ভট প্রতিভার চরম স্বীকৃতি। ফরাসী সংস্কৃতিতে ককতো একটি বিপ্লব। বিশ্ব সংস্কৃতিতে ততোধিক সত্য কোনরূপে শ্রেষ্ঠ যুগান্তর।

বিশ শতকের দুটি জটিল চরিত্র কাফকা আর ককতো। একজন বহুদিন বিগত। আজ ককতোও বিদায় নিলেন চুয়াত্তর বছর বয়সে। মৃত্যুর পক্ষে পরিণত বয়সই। জাঁ ককতো কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, প্রাবন্ধিক চিত্রনাট্যকার। চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন তিনি। নাটকও পরিচালনা করেছেন। এমন কি গানও লিখেছেন। বিশ শতকের ওই বিস্ময়কর প্রতিভা চিত্রকলায় স্বীয় চিন্তার মুক্তি খুঁজে পেয়েছিল। সঙ্গীত আর ব্যালে আকৃষ্ট করেছিল এই ঔপন্যাসিক-সুন্দর কবিকে।

ককতো কবি। তাই কবি ককতোর জীবন ভাবনা তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। কবিমন উচ্চকিত। কবিমনের যাবতীয় চিত্রবৈলক্ষণ সর্বত্রই বর্তমান। ককতোর চরিত্র ছিল আপাত বিরোধী সত্যের উজ্জ্বলতম প্রতীক। প্রচলিত সত্যের তিনি ছিলেন মূর্তিমান প্রতিবাদ—আবার নয়। তাঁর লেখা কোথাও উচ্চকিত—কোথাও নীরব। তাঁর নাটকগুলি অদ্ভুত আকর্ষণীয় হয়ত তাঁর দীর্ঘকালের মূল্য নেই। কিন্তু দর্শক বা শ্রোতার মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। আবার বলা যায় নাটকগুলির মূল্য কম নয়। ক্ষণকালের আবেদন জানিয়ে নীরব হয়ে যায় না। মহান সত্য আর সৌন্দর্যের বাঙ্ময় প্রতিমা যেন তাঁর প্রতিটি নাটক। গ্রীক পুরাণ আর আত্মায়িত। ককতোর তোলা চলচ্চিত্র ছিল নাটকগুলির বিস্ময়কর আধুনিক শিল্পরূপ।

ককতোর সমকালীন নাট্যজগতে গ্রীক পুরাণের পরিকল্পনায় পরিকল্পিত। পুরাণের মুক্তি নাট্যকারের জীবন জ্ঞানময় গভীরতর অনুগ্রহে সমৃদ্ধ পূর্ব বাক্-প্রতিভায় প্রজ্জ্বলিত। নতুন সত্যের মধ্যে পুরনো আত্মার কঙ্কালই শুধু বর্তমান। ককতোর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব কখনও পুরাণের মধ্যেই স্বীয় চিন্তার স্বাভাবিকত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। আবার কখনও পারেন নি বলেই আধুনিক মানুষ হিসাবে গ্রীক-পুরাণের সত্যকে ভুলে থাকতে চেয়েছেন। বিগত শতকের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে পৃথিবীতে আজ এখনও যাঁরা বর্তমান ককতো ছিলেন তাঁদেরই একজন। এঁদের প্রত্যেকেরই চরিত্রের সঙ্কট-জটিলতা-স্বরূপ লক্ষ্যণীয়। ককতো সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন।

ককতোর সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিশ-শতকের শিল্পভাবনায় ব্যতিক্রমবিশেষ। বাস্তবতার মাঝখানে অ-বাস্তবতার এক আত্মনিমগ্ন শিল্পমনের নিঃসীম অভিযাত্রা একালে একমাত্র ককতো-চরিত্রেই বর্তমান। ককতো মূলত কবি বলেই বারবার পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে গ্রীক-সত্যের জগতে ফিরে তাকিয়েছেন যে সত্যের খোঁজে পৃথিবীর সত্য তাঁকে সেখানে সম্পূর্ণ অভিলাষিত করেনি। তাঁর কবিমন অভাবিতপূর্ব রূপকল্পের মধ্য দিয়ে এক অনিন্দ্যসুন্দর সৌন্দর্যলোকে আলোকিত করে তুলেছে সমস্ত শিল্পজগতকে।

কখনও কখনও ককতোর উপন্যাস কবিতা হয়ে যায়। তাঁর চরিত্র—তাঁর সৃষ্ট মানুষ যে পরিণতির অনুসন্ধানে, যে উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে গেছে সেখানে পাঠকের বিস্ময়াবিষ্ট মুখের ব্যঞ্জনা স্বপ্নের ঘোরে প্রধাবিত। অবচেতন চেতনের প্রকল্পনায় আরোপিত চরিত্র বাস্তবতা অবাস্তবতার ঊর্ধ্বে বাস্তবিকতা আর স্বপ্নময়তায় ঊর্ধ্বচারী। কিন্তু আমাদের নিত্যকার জীবনচিত্র ককতোর কবিচরিত্রে গভীরতর অতলান্ত দ্যোতনায় বারবার আলোড়িত করেছে। গ্রীক পুরাণের মানুষের মুখোশ পরে চিরকালের সত্যের পূজারীরা এসেছে আধুনিক পৃথিবীর বুকে। ককতো ঐ মানুষের ঐ সত্যের জগতের একমাত্র ঈশ্বর—তিনিই তাদের স্রষ্টা।

তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই চিত্র-কল্পময়। জীবনের সমস্ত পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার এক আশ্চর্যতম প্রকাশ উপন্যাসগুলিতে। পরম পরিণতি চরিত্র-চিত্রণ, জটিল চিত্রসংক্ষোভ বেদনাআর্তির মধ্য দিয়ে চরিত্রের যে বিকাশ পরিস্ফুট-তার মধ্যে কবি ককতোই একমাত্র ভাস্বর। যা তিনি কবিতায় বলতে পারেননি, চিত্রনাট্য বা সিনেমায় যা অনুদ্ঘাটিত, নাটকে যা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়—তা উপন্যাসে অভিব্যক্ত। আবার উপন্যাসের অসম্ভব সম্ভব হয়েছে চিত্রাঙ্কণে। অধিকাংশ উপন্যাসে তিনি এমন সমস্ত সমস্যা নিয়ে উপস্থিত যা মাতিসের রেখার মতই জটিল হতে জটিলতর আবর্তে আবর্তিত। যা তাঁর নিজের চিত্তের মধ্যেও সুস্পষ্ট। কিন্তু ককতো ককতো অন্য কারো মত তিনি নন, তিনি স্বতন্ত্র বিশ্বের স্বাধীন নাগরিক—কোন প্রথা কোন বন্ধন কোন দাসত্ব তাঁর শিল্পীমনকে সীমিত করতে পারেনি। তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে মানুষটি জীবিত থেকে গেলেন তা দীর্ঘকালের সাহিত্যমানসে অনুকরণযোগ্য শিল্পরূপে বিবেচনার যোগ্য। উপন্যাসে রয়েছে গ্রীক পুরাণের জগত আর বাস্তব জগতের সত্যও অবাস্তবতার অতি-কল্পনা। ককতোর সমস্ত উপন্যাসে শিল্পী ককতো এমনভাবে উদ্ঘাটিত যা সহজবোধ নয় আবার দুর্বোধ্যও নয়।

তাঁর অধিকাংশ কাহিনীই গ্রীক পুরাণ বা উপাখ্যানের মধ্য থেকে চয়িত। কিন্তু উপস্থাপনায় আধুনিক শিল্পকলা স্বীকৃত। কিন্তু তা একান্তই বাস্তবধর্মী নয়—চিত্রকল্পময় বুদ্ধিদীপ্ত রচনা।

ককতো রচিত গ্রন্থাবলী :

* L'Aigle a deux teles, Maries de la Jour Eiffel, Orphee, Antigone, Oedipe-Roi, La Machine Infernale, Bacchus, Les Chevaliers de la Jable Ronde, Les Parents terribles, Renaud et Armide.
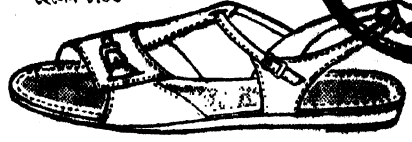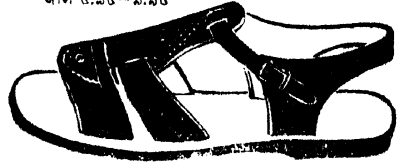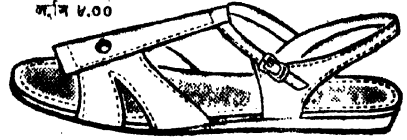
মেলামেশার উৎসবে

মরসুমী পদশোভা

শরতের শোভাযাত্রায় প্রথমে প্রয়োজন
মরসুমী পদশোভা। তারই বিরাট আয়োজন
বাটার দোকানে। যেকোনো
পোশাকের সংগে মানাবে এমন
অসংখ্য নকশা। হাজার
চলনেও থাকবে নতুনের মতো আনকোরা—
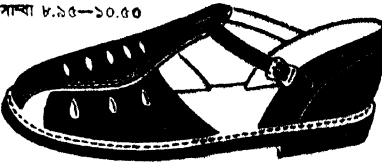
এমন নির্মাণকৌশল। উপাদানে উত্তম
বাটার জুতো—তাই এর জলুস সহজে
নিষ্প্রভ হবার নয়। আর চলনে চমৎকার
বাটার জুতো—এতো সকলের জানা কথা।

এযুগের কবি

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর
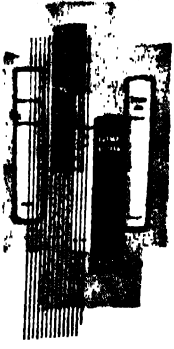
সম্প্রতি এ-যুগের এক মহৎ কবির ৭৫তম জন্মদিবস অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, সেপ্টেম্বরের শেষে, সেই কবির নাম টমাস এলিয়ট ষ্টার্ণস্ সংক্ষেপে টি. এস. এলিয়ট। মিসৌরী অঞ্চলের নিউ ইংলণ্ডে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এলিয়টের জন্ম। হার্ভাড, অক্সফোর্ড আর প্যারীর সরবোণে দর্শন অধ্যয়ন করেছেন তিনি।

প্যারীতে থাকার সময় এলিয়ট ফ্রান্সের প্রতীক-ধর্মী কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং বিশেষ করে তাঁর প্রথম যুগের কাব্যে সেই প্রভাব সুস্পষ্ট। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে এলিয়ট লণ্ডনে এলেন, একটা ব্যাঙ্কে চাকরী নিলেন, দর্শন অধ্যয়ন কাব্য-চর্চার খাতিরে স্থগিত রইল. ব্যাঙ্কের কর্মে কাব্য-চর্চায় অবসর ছিল।

কয়েক বছর ধরে লেখক এবং কাব্য রস পিপাসু মহলে এলিয়টের নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হত, তার কারণ তাঁর মধ্যে সম্ভাবনার লক্ষণ ছিল। ১৯২২-এ এলিয়ট বিদগ্ধ মহলকে বিস্ময়ে সচকিত করলেন তাঁর এক মহৎ কবিতার মাধ্যমে।

প্রথম মহাযুদ্ধের কাল অতিক্রম করার পর এলিয়টের The Waste Land সর্বাধিক আলোচিত এবং বিতর্কিত কবিতা। আজো এই কবিতা বিতণ্ডার সৃষ্টি করতে পারে। কবিতাটি যেন বিস্ফোরকের মত বিদীর্ণ হ'ল, আর কবিতার রচয়িতাকে নিয়ে চলল তুমুল আলোচনা এবং বিতর্ক। কবি হয়ত সেদিন বিস্মিত হয়েছিলেন,--যে প্রচণ্ড আঘাত তিনি অপ্রত্যাশিত হেনেছেন. তার জন্য কবির কোনো চিত্ত-চাঞ্চল্য নেই, তিনি নিস্পৃহ নিরাসক্তিতে ধীর পদক্ষেপে নিজের পথেই চললেন।

পেটের দায়ে যে চাকরী তাঁকে করতে হয়েছিল, সেই চাকরী ত্যাগ করে তিনি একটা প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলেন। এক বছর হার্ভাডে অধ্যাপনা করলেন। তারপর Waste Land-কে অনুসরণ করল একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ-গ্রন্থ ও একটি কাব্য-গ্রন্থ, সেই সঙ্গে Ash Wednesday এবং Four Quartets.

প্রবন্ধগুলি তাঁর কবিতার মত বিতর্কের ঝড় তুলল, সেই প্রবন্ধের বক্তব্য সাহসিক এবং নূতন চিন্তার পরিচায়ক। যেসব ক্ল্যাসিক্যাল লেখককে ব্রিটিশ বিদগ্ধসমাজ এতকাল সমালোচনার উর্ধে মনে করে এসেছেন, তিনি তাঁদের সম্পর্কেও সমালোচনা করতে দ্বিধা করলেন না। লয়েডস ব্যাঙ্কের কর্মচারী এলিয়ট The Criterion নামক সাহিত্য-পত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচক ও সাহিত্য-পাঠকরা বিচলিত হলেন। Waste Land কবিতা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। এই কবিতার সাফল্যের প্রধানতম হেতু তার মধ্যে আধুনিক কালের দুঃখ-বাদ, নৈরাশ্য এবং স্বপ্নভঙ্গের এক অপূর্ব অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। তাছাড়া মূল বক্তব্যের সঙ্গে ট্র্যাডিশনগত মিল কোথাও নেই। সুদীর্ঘ উধৃতি দিয়ে সমালোচক যেমন তার বক্তব্যের গুরুত্ব সপ্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, এলিয়টও তেমনই দীর্ঘ উধৃতি দিতে ভালোবাসেন কাব্যের অঙ্গে, অতীতের মহৎ সাহিত্য-কারের রচনা, বাইবেল, ভারজিল, মধ্য-

১৯৫৩ সালে যেকব এপস্টাইন কৃত টি এস এলিয়টের মূর্তি

যুগীয় ইতালীয় কবিতা, ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী কবিতা, সবদেশের খৃষ্টান মরমী সাধকের বাণী প্রভৃতিতে তাঁর কাব্য-সাহিত্য পূর্ণ।

Waste Land এবং Four Quartets-এর মধ্যে এলিয়ট একটি কাব্য-নাটক রচনা করলেন Murder in the Cathedral—এটি বিয়োগান্ত নাটক টমাস এ বেকেটের জীবনী অবলম্বনে রচিত। লণ্ডনের এক সাধারণ অঞ্চলের একটি ছোট রঙ্গমঞ্চে এই নাটক অভিনীত হল। এর জন্য ফ্যাসনদুরস্ত রঙ্গমঞ্চ পাওয়া গেল না। কিন্তু নাটক জমে গেল। এই নাটকের প্রযোজক ছিলেন মার্টিন ব্রাউন, অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রযোজক, নাম-ভূমিকায় রবার্ট স্পীআইট-চরিত্রের মর্ম তিনি ঠিক বুঝেছিলেন। কিন্তু নাটকের সাফল্য ঘটেছে নাটকেরই অন্তর্নিহিত গুণে।

Murder in the Cathedral—গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বমূলক নাটক। বিবেক, কর্তব্য এবং দিব্যকর্মএষনা হল নাটকের কেন্দ্রীয় বক্তব্য, এই বক্তব্যের পিছনে যদি যথোচিত শক্তি থাকে, তাহলে তা দর্শক গ্রহণ করে। নাটকের এই গুণ ছিল এবং অতিশয় মহৎ ভঙ্গীতে নাটকটি পরিবেশিত হয়।

এই নাটকের পর এলিয়টের সাফল্য হয়েছে আরো দুটি নাটকে—Family Reunion—অতিশয় কঠিন নাটক এবং এই নাটকেরও ধর্মীয় উপজীব্য, আর সাম্প্রতিক কালের The Cocktail party নাটকের নাম যেমনই হোক, মানবিক জীবনের কেন্দ্রগত সমস্যা গভীরভাবে এই নাটকে আলোচিত।

সকলেই, এমন কি, এলিয়টের সমসাময়িক লেখকসমাজও এলিয়টের সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে এবং কবি ও নাট্যকার হিসাবে তাঁর আসন সম্পর্কে অবহিত। তিনি কি লিখছেন—এ দেখার জন্য লেখক ও পাঠকমহল যতটা উদ্‌গ্রীব, আর কোনও জীবিত সাহিত্যিক সম্পর্কে এতখানি আগ্রহ দেখা যায় না।

এই প্রবন্ধ অবশ্য এলিয়টের সাহিত্য-কর্মের আলোচনা নয়, মানুষ এলিয়টের রেখাচিত্র পাঠকচিত্তে তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। তাই এলিয়টের ব্যক্তিজীবনের কথাই বলা যাক।

ইংলণ্ড জায়গাটা এক হিসাবে ভালো, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষত তারা দূরকে নিকট-বন্ধু ও পরকে ভাই করতে পারেন। সুরকার হ্যাণ্ডেলের Messiah তো ব্রিটিশরা জাতীয় সম্পত্তি মনে করে। মার্কিন কবি ১৯২৭-এ ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ তাঁকে অর্ডার অব মেরিটে সম্মানিত করেছেন। ত্রিশ বছর ধরে তিনি ব্রিটিশ সাহিত্যসমাজে নেতৃত্ব করছেন, এবং তাঁর অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। আধুনিককালের কাব্যে আর কোনও কবি এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। তাঁর প্রভাব শুধু পাঠাগারেই সীমাবদ্ধ নেই, রঙ্গমঞ্চে কাব্য-নাটকের পুনরুজ্জীবনে তিনি ভাবগঙ্গার ভগীরথ। এই পথে অপর লেখকের পরিক্রমণের সুবিধা ও সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন।

বিপ্লবী বলে অভিহিত হলেও মনে হবে এলিয়ট ট্রাডিশন্যাল লেখক। ট্রাডিশন্যাল কথাটি বলার কারণ এই যে সমসাময়িকের চোখে তাঁকে বিপ্লবী মনে হ'লেও তাঁর কাব্যপাঠে মনে হবে যে একটা ট্রাডিশন অনুসরণ করার জন্যই বেদনার্ত কবির অন্তরে গভীর আকুলতা। এলিয়ট স্বয়ং বলেছেন—"I am an Anglo-Catholic in religion, a classicist in literature, and a Royalist in politics." আধ্যাত্মিকতার অন্তরালে তাই চলে পথের সন্ধান, জীবনের মর্মকোষে বিরামবিহীন পরিভ্রমণ। ১৯৪০-এ এলিয়ট লিখেছেন— "The only hopeful course for the world today is in truly Christian Society". প্রাচীন ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন হয়েছে এলিয়টের কবি-মানসের মর্মবাণী।

এলিয়ট বুঝেছিলেন যে ওয়ার্ডস-য়ার্থ বা টেনিসনের কাব্যে যে ট্রাডিশনাশ্রয় মানিয়েছে, যুদ্ধক্লান্ত নতুন জগতে তা অচল। চারদিকে বিপর্যয়, আর ধ্বংসের তাণ্ডব। পৃথিবী শেষ পর্যন্ত বন্ধ্যাত্বে উপনীত, অহল্যা-জমিকে হল্যিকৃত করার চেষ্টা তাই একালের কবির। এই পরিবেশে প্রাচীন ঐতিহ্যের গান কে গাইবে! আকাশে পাখি আছে, কিন্তু সে পাখির গানের সুর বিভিন্ন, চাঁদ, তারা ইত্যাদির আকৃতি পরি-

বর্তিত। হ্যামলেটের ওফেলিয়ার "Good Night, Sweet Ladies"—এই বিদায়-বাণীর পরিবর্তে একালের বিদায়-বাণী তাই—

"Hurry up please it is time
Hurry up please it is time
Good night......."

এলিয়ট নতুন বাক্-প্রতিমার আবিষ্কার করেছেন যার মধ্যে আছে প্রাচীন ট্রাডিশনের বিচূর্ণিত গুঁড়োর মিশেল।

এলিয়ট মানুষ হিসাবে অতিশয় শান্ত, তিনি কারো নিন্দা করেন না। একবার তাঁর সামনে ইএটসের প্রশংসা হচ্ছে, কোনো সাহিত্যিকের সামনে অন্য সাহিত্যিকের প্রশংসা করা ঠিক নয় একথা বক্তার মনে হতেই তিনি চুপ করলেন। এলিয়ট তখন বললেন—"ইএটসের কবিতার সবচেয়ে বড় কথা এই যে তার যে কোনো লাইন আপনি তুলে নিয়ে যে কোনো দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করুন, ঠিক ওজন পাবেন।"

যেখানে অনেক সিংহ গর্জন করছে, সেখানে এই সিংহও গর্জন করাই স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি লাজুক, নম্র, ভদ্র।

এলিয়টের বিরোধীরা বলেন তাঁর কবিতা কেমন একটা পরিদগ্ধ, নীরস মনে হয়, এর মধ্যে প্রেম নেই। নিউ-ইংলণ্ডীয় পিউরিট্যানের ভাব নিশ্চয়ই আছে তাঁর কাব্যে, চমক নেই, বরং সেই অতি-সতর্ক ব্যাঙ্ক-কেরানীর মনোভাব যেন কবির চরিত্রে ফুটে উঠেছে। কবি নিজে বলেছেন—কি রকম দেখতে আমাকে—

"How unpleasant
to meet Mr. Eliot!
With his features
of clerical cut,
And his brow so grim
And his mouth so prim . . ."

প্রচার-বিমুখ কবি 'The Confidential clerk' নাটকের অভিনয়-রজনীতে তাঁকে নিয়ে যেন হৈ চৈ করা না হয় এই নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই সব কারণে, এলিয়টের জীবন-কাহিনীর অভাব আছে। তাঁর কবিতার সার্থক অনুবাদ করেছেন অনেক বাঙালী কবি, বিশেষতঃ বিষ্ণু দে। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর Ariel poems-এর অন্তর্গত "Journey of the Magi" নামক কবিতাটির অনুবাদ করেছেন, তার পংক্তি নীচে দেওয়া গেল—

"একেবারে দুর্জয় শীত।
উটগুলোর ঘাড়ে ক্ষত, পায়ে ব্যথা, মেজাজ চড়া;
তারা শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা-বরফে।
মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে,
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলীতে বসন্ত মঞ্জিল, তার চাতাল,
আর সরবতের পেয়ালা হাতে রেশমী সাজে যুবতীর দল।
এদিকে উট-ওয়ালারা গাল পাড়ে, গজগজ করে রাগে
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে।।"...
(অনুবাদ—রবীন্দ্রনাথ)

টি, এস, এলিয়ট শতায়ু হোন, আমাদের এই প্রার্থনা।

নতুন বই

।।একটি সার্থক কাহিনী।।

সাম্প্রতিককালে বাঙলা সাহিত্যে কয়েকজন মহিলা কথাশিল্পীর অবদান নানাবিধ কারণে উল্লেখযোগ্য। জীবনের গভীরতর সত্যের অনুসন্ধানে তাঁদের শিল্পীস্বভাব যুগোচিত চিত্রোপলব্ধিতে মুক্তি খুঁজে পেয়েছে।

'ইন্দ্রনীলা'-র লেখিকা নমিতা চক্রবর্তী যে কাহিনী বিবৃত করেছেন তার মধ্যে লেখিকার গভীর জীবনোপলব্ধির পরি-

চয় সুস্পষ্ট। চরিত্রগুলির মধ্যে রথ, রথের মা, তপন, তপনের বাবা চরিত্র কয়েকটি সর্বাপেক্ষা বেশি বিকশিত—বাস্তবায়িত। চরিত্রচিত্রণের ওপরে সব-থেকে বিশেষভাবে চোখে পড়ে লেখিকার রচনাশৈলী। সুনিপুণ বর্ণনামাধুর্যে কাহিনী সহজেই পাঠকমনকে আকৃষ্ট করতে পারবে। ভাষার ওপর লেখিকার দখলই তাঁকে এই সার্থকতা দিয়েছে।

ইন্দ্রনীলা— (উপন্যাস) : নমিতা চক্রবর্তী। সুতপা প্রকাশনী। ৪সি, রজব আলী লেন। কলকাতা-২৩। দাম—দু'টাকা।

●

॥ নাটক ॥

'অধিকার' নাটকের মূল সমস্যা ভূমিসংস্কার আইনজনিত গ্রামীন পরিস্থিতি। জোতদারের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ওপর 'অধিকার' বিস্তৃত।

নাটকটির সবচেয়ে বড় গুণ প্রচারের ঊর্ধ্বে রসই এখানে মুখ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। চরিত্রগুলি সবই জীবন্ত। রতন, নিতাই বাঘার বেদনা, করালীর বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ, রাখালের অসহায়তা, পিসির স্নেহ, নকড়ির আত্মসমর্থন, বিন্দাবনের স্বীকারোক্তি—সবই আমাদের স্পর্শ করে।

সংলাপ যথাযথ। বিশেষ করে করালীর উক্তি, নকড়ির স্বগতোক্তি এবং চাষীদের আলোচনা উল্লেখ্য।

দৃশ্য রচনায় নাট্যকারের চেষ্টা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে নকড়ির বার-বাড়ী যেন জোতদার-গোষ্ঠীর মনটিকেই ফুটিয়ে তুলেছে। প্রতীকের সার্থক ব্যবহার ঘটেছে পিসির গিনি প্রসঙ্গে এবং রতনের সন্তানলাভের মধ্যে।

নাটকটি তুলসীদাস স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং নাট্যকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। আমরা আশা করব তিনি বাংলা নাট্যরচনায় স্থায়ী চিহ্ন রাখতে সচেষ্ট হবেন।

অধিকার— নাটক। চিত্তরায়। পরিবেশক : জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম—দু' টাকা।

●

।। শিক্ষায় পুনর্গঠন ।।

১৯৫৫-এ ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী জনাব হুমায়ুন কবির লিখিত Education in New India নামক যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, আলোচ্য গ্রন্থ তার প্রথম বাংলা সংস্করণ। এই সংস্করণের শেষাংশ উত্তরলেখ অংশ যুক্ত করে শিক্ষাসংক্রান্ত আধুনিক সমস্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক ভারতে শিক্ষা-সম্প্রসারণের প্রয়োজন সর্বাধিক, যাতে সকল নাগরিক উন্নতির সমান সুযোগ পায় তার জন্য শিক্ষাপ্রণালীর পুনর্গঠন প্রয়োজন। জনাব কবির বিভিন্ন সময় ভারত, ইউরোপ এবং আমেরিকায় বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যে সব প্রবন্ধাদি লিখেছেন এই গ্রন্থে সেইগুলি সংকলিত। ভারতে শিক্ষা, বুনিয়াদি শিক্ষার তত্ত্ব ও ব্যবহারিক দিক, মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার, সামাজিক শিক্ষার কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, ইংরাজী শিক্ষা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাষ্ট্র, শিক্ষার্থীদের অনিয়মবর্তিতা, শিক্ষার স্থান, প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। লেখক দীর্ঘকাল শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং শিক্ষাব্যাপারে তাঁর অধিকার সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্লেষণ ও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাঁর শিক্ষাবিষয়ক মতামত বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ মূল্যবান।

নয়া ভারতের শিক্ষা— হুমায়ুন কবির। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি—কলিকাতা—১২। দাম আট টাকা মাত্র।

●

।। সুখপাঠ্য উপন্যাস ।।

পাদ্রীসায়েব অমলক, তার পরিচর্যা করে আসিতা। তার সঙ্গে আলাপ হল গজলের। চপলা মেয়ে। তারপর এলো মিরান্দা, সে অমলককে জয় করতে চায় না, শুধু তাকে নিরাপদ দেখতে চায়। গজল স্বাধীনতাসংগ্রামেও অগ্রণী হয়ে আসে। গজলই সব ব্যবস্থা করে শেষ পর্যন্ত মিরান্দার সঙ্গে অমলকের বিয়ের আয়োজন করে, সেইখানেই কাহিনীর শেষ। নির্ভেজাল প্রেমের কাহিনী অতিশয় সহজ ভঙ্গীতে এগিয়ে গিয়েছে। শ্রীবাসব কয়েকখানি জনপ্রিয় উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন, এই উপন্যাসটি তাঁর পূর্বখ্যাতি অম্লান রাখবে।

বাঁধন ছেঁড়া দাগ— (উপন্যাস)— শ্রীবাসব ।। শ্রীগোপাল প্রকাশনী ।। কলিকাতা—৩৩ ।। পাঁচ টাকা।

●

।। গল্পের মত গল্প ।।

ছোটগল্পের রাজ্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। 'কেউ তত লাজুক নয়' তাঁর সাম্প্রতিক গল্পসংগ্রহ। এই সংকলনে বিভূতিভূষণের পনেরটি বিখ্যাত গল্প আছে। বিভূতিভূষণের গল্প সমাজজীবনের নিখুঁত ছবি, ব্যথা ও বেদনার মধ্যে যেখানে হাসি লুকিয়ে আছে সেই হাসি তিনি টেনে বার করেন। তাই বিভূতিভূষণের গল্পের হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে অশ্রু। অতি অল্পকথায় বাংলার বনেদী মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র ছবি বিভূতিভূষণের এই গল্পগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

কেউ তত লাজুক নয়- (ছোটগল্প)— বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক —বার্তিক। ১৩২ এক, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা—২৬। দাম—চার টাকা।

কবির গান

(১২)

নীলমণি পাটনী ও তাঁর বাঁধনদার

কবিওয়ালা হিসেবে সেকালে নীলমণি পাটনী বা পাটনীর বেশ নাম ছিল। তাঁর জন্মকাল আমাদের জানা নেই। তবে তিনি হরু ঠাকুরের সমসাময়িক ছিলেন এই খবর নানা সূত্রে পাওয়া যায়। দুজনের প্রায় একই সময়ে মৃত্যু হয়। তখনকার সংবাদপত্র সমাচার-চন্দ্রিকায় দুজনেরই মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 'সিমল্যোনিবাসী হর ঠাকুর' ১৮২৪-এর ৬ই আগস্ট 'পরলোকগামী' হন এবং নীলমণির মৃত্যু হয় তার পরের বছর ১৮২৫ সালের নভেম্বর মাসে।

নীলমণি পাটনী গায়ক ভাল ছিলেন এবং তাঁর দলেও সম্ভবতঃ ভাল ভাল গায়ক অনেক ছিল। তিনি নিজে যে বড় বাঁধনদার ছিলেন, তা মনে হয় না। তিনি যে গান রচনার জন্যে অন্য বাঁধনদারের সাহায্য নিতেন সে প্রমাণ আছে। একজন বাঁধনদারের নাম আমরা জানি, যিনি নীলমণিকে গান লিখে দিতেন—তাঁর নাম গদাধর মুখোপাধ্যায়। এই গদাধর মুখোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতকের লোক। ওই শতকের শেষ দশকেই তাঁর মৃত্যু হয়। এর থেকে বোঝা যায়, নীলমণি পাটনীর দলের খ্যাতি তাঁর পূর্বেই বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল।

নীলমণির 'কবিত্ব' তাঁর পৈতৃক জীবিকা। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ দিতে গিয়ে সমাচারচন্দ্রিকা তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন 'লক্ষ্মীকান্ত কবিওয়ালার পুত্র' বলে।

নীলমণি পাটনীর স্বরচিত গান বেশী পাওয়া যায় না। যা সংকলিত হয়েছে, তার থেকে একটি উদ্ধৃত করি। গানটির বিষয় হচ্ছে শ্রীরাধার বিরহ।

সহে না কুহুস্বর, ক্ষেমা দে পিকবর
ডাকিসনে শ্রীকৃষ্ণ বলে।
শুন বলি হে নিরদয়
এতো সুখের সময় নয়
প্রাণে মরবে রাই
জ্বালার উপর জ্বালালে।
ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়নের জলে।
হয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল
কি গোপ কি গোপীকুল
পশুপক্ষীকুল বিরহে সকলে ব্যাকুল।
ভেজে বকুল-মুকুল অধীর অলিকুল
সব, কোকিল এ সময় কেন
এলি গোকুলে॥
বসন্ত ঋতু এসে সসৈন্যে
ব্রজে হইল উদয়
বিরহে ব্যাকুল হয়ে বৃন্দে
কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে।
কৃষ্ণবিরহিনী কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী
ধূলাতে পড়ে রয়েছে।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহীনে

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে
রাই, তারে কি হবে মধুর
ধ্বনি শুনালে॥
এমন দুখের সময় কোকিল পক্ষীরে
কেন তুই এলি রাধার কুঞ্জে।
ব্রজনাথ অভাবে ব্রজের শ্রীরাই
কাতরা হইয়ে কি সুখ ভুঞ্জে।
অধরা ধরাসনে পড়ে রাই
চক্ষে জলধারা বয়
এ সময় স্বপক্ষ হও পক্ষ,
বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়।
এই ভিক্ষা করি পিকবর।
বাঁধসনে কুলজা সম্মুখ থেকে যা
দুখিনীর কথা রক্ষা কর।
কোকিল দেখলি তো স্বচক্ষে
মরণের অপক্ষে
আর নাই হয়ে রয়েছে
জীবন্মৃত সকলে॥

সখীসংবাদ-বিষয়ক এই রকম গান তাঁর নামে আরও কয়েকটি চলিত আছে। কাব্যশাস্ত্রীয় যত অলংকার আছে, তার মধ্যে যেগুলি ওজনে ভারী, কবিওয়ালাদের বেশীর ভাগেরই নজর ছিল সেই দিকে। অনুপ্রাসের প্রতি তাঁদের ঝোঁক দেখলেই সেটা বোঝা যায়। পক্ষীকুল বকুল-মুকুল অলিকুল গোকুল কোকিল একসঙ্গে এতজনের একত্র সমাগম হয়েছে কেবল অনুপ্রাসের অনুরোধে।

রাধার চেয়ে অনুপ্রাসের প্রতিই কবির দুর্বলতা বেশী। এত বেশী যে, 'ক্ষ'-এর মত দুরক্ষর দিয়েও অনুপ্রাস প্রয়োগ করতে ছাড়েন নি। তাই 'পক্ষ'কে ধরে 'স্বপক্ষ' 'বিপক্ষ' সবাইকে 'স্বচক্ষে' দেখিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত মরণের 'অপক্ষে' রাখেন নি।

বঙ্গের কবিতার লেখক নীলমণি পাটনীর দলের একটি ভবানী-বিষয়ক গান শুনিয়েছেন। গানটি নীলমণিরই রচনা কিনা, সে-কথা বলেন নি। বলেছেন, গানটি তাঁর দলে গাওয়া হত। গানটির মধ্যে কবিত্ব আছে, তাই উদ্ধৃত করছিঃ

এবার বেঁধেছি মন আঁটাআঁটি
করেছি মন খুব খাঁটি
তারা গো মা, এবার ধরেছি
পাষাণের বেটি
আর পালাতে পারবি নে।
তারা গো আজ তারা ধরা
ফাঁদ পেতেছি মা
হৃদয় কাননে।
আমায় বলেছে সেই মহাকাল
আছে গুরুদত্ত মহামন্ত্র জাল।
সাধনপথে সেই জাল পেতে
থাকব কিছুকাল।
এখন ভক্তিডোর করেছি হাতে
তারা যদি যাস সে পথে
ধরবো মা তোর হাতেনেতে
বাঁধব দুটি চরণে।
মনোকারাগারে তোমায়
রাখব মা অতি যতনে॥
তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা
ষোড়শোপচারে পূজা
তেমন পূজা কোথা পাব বল।
তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল
অঞ্জলি করে
মানসে নৈবিদ্য করে
দিব মা তোর চরণ ধরে
নির্মল গঙ্গাজল।
আমি কোথা পাব অন্য বলি
মহিষাদি অজ বলি
দিব ছয় রিপুকে নরবলি
দুর্গা বলি বদনে।
মা, এবার পালাবার পথ তোমার নাই
উপায় নাই, সন্ধান নাই।
তারা ধরব বলে তারা
মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা
রেখেছি জ্ঞানচক্ষের তারা প্রহরী সদাই॥

এই গানেও অনুপ্রাস আছে কিন্তু আগের গানটির মত বাড়াবাড়ি নেই। 'আঁটাআঁটি', 'খাঁটি', 'বেটি'—দুঃশ্রাব্য হয়নি। 'তারা' শব্দে শুদ্ধ অনুপ্রাস নয়, শ্লেষও আছে, তাতে কাব্য-সৌন্দর্য বেড়েছে। তাছাড়া একটা সহজ স্বাভাবিক ভক্তিরসে সিক্ত হয়ে গানটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

গানটি হয়তো নীলমণির, হয়তো নীলমণির নয়, তাঁর দলের আর কোনো বাঁধনদারের। যারই হোক গানটি যে মনকে টানে, তাতে সন্দেহ নেই।

বাঁধনদারের প্রসঙ্গে গদাধর মুখোপাধ্যায়ের নামটা মনে পড়ল। সেটা এখানে উল্লেখ করা ভাল। নীলমণি পাটনীর দলে ইনি গান লিখতেন। তাঁর রচিত কোন্ কোন্ গান নীলমণির দলে গীত হয়েছিল, তার প্রমাণ আজ অবলুপ্ত। গদাধরের রচিত যে সকল গান সংগৃহীত হয়েছে, তার এক-আধটি নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করছি।

শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি যতকাল
পতি বিনা সকল জেনো
নারীর পক্ষে কাল।
সে কাল জেনো সুখের
যে কাল পতিসুখে যায়।
সুখের মূলাধার প্রাণপতি অবলার
পুরুষে অবলা জুড়ায়।
পতির সুখে সতীর সুখ
পতিদুখে দুখ নারীর সই
পতির বিচ্ছেদে অনেক জ্বালা
সইতে হয়।
ধৈর্য ধর সই অধৈর্য হওয়া উচিত নয়

আসবে নিবাসে প্রাণকান্ত হবে দুঃখ অন্ত
সুশীতল কর তাপিত হৃদয়।
কমল ত্যজিয়া মধুকর
স্থানান্তর কভু নাহি রয়।
কত দুঃখ দিলে রাবণ সীতা হরিয়ে
ঘুচিল দুখের কাল
হইল সুখের কাল
জুড়ালেন শ্রীরামে লয়ে।
নাথবিরহে সাবিত্রী ত বিবাদিত
হয়েছিল সই
আবার পুনরায় পেলে সে ত রসময়।

কবি-গানের বিরুদ্ধে সমালোচনায় প্রসঙ্গে এই গীতাংশটি অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন :

একে নবীন বয়স
তাতে সুসভ্য কাব্যরসে রসিকে।
মাধুর্য গাম্ভীর্য তাতে দাম্ভীর্য নাই,
আর আর যো যেমন ধারাব্যাপিকে।
অধৈর্য হেরে তোরে সজনি
ধৈর্য ধরা নাহি যায়।

এখন

আনন্দ বাগচী

এখন কিছুই দেখতে পাইনে আর
শুধু চোখে পড়ে অন্ধকারের চোখ
শুধু দেয়ালের রেখার কবর টানা
আর্ত দুচোখে হাত চাপা দেওয়া ছাদ।

বন্য শহর চলেছে অন্য মঠে
নকলনবীশ মৃত মানুষের ছায়া
প্রাক্ ইতিহাস জোনাকির মত স্মৃতি
লাসকাটা ঘরে ঠান্ডায় রাখা স্বাদ।

এখনো কি মেঘে চন্দ্রর চরালি
ইজেল রাঙায় জান্‌লার ফ্রেম আঁটা
কদম্ব-ঘন বর্ষণে বর্ষণে
চলে শ্রাবণের ঘুঙুর চরণে নাচ?

যাবজ্জীবন চেয়ারের পিঠে শুয়ে
শুধু বই পড়ি মসীর ভাষ্য টীকা
মৃত মানুষের অগণিত মৃতকথা
শুধু দিনরাত কানে বাজে প্রাণে বাজে।

শুনতে পাইনে, বুঝে নিই অনুমানে
নতুন যুগের এরিয়ালে ধরা সুর
অর্ধাঙ্গিনী অভ্যেস হয়ে গেছে
কবিতা না লিখে দিব্যই বেঁচে আছি!

শাশ্বতী

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সকলই হারাবে? এই বিষাদ-আশ্রিত ভালোবাসা—
বিরহের বিষণ্ণতা, মিলনের করুণ সংগীত?
আমার রক্তাক্ত আত্মবিলাপের শ্লোক সর্বনাশা—
উচ্চারিত অনুরাগ, ঊর্ধ্ব অধঃ ঈশান নৈঋত
দশদিক সপ্তসিন্ধু ভুলে যাবে আমার মরণে?
যে আমি শিল্পের কাছে, কবিতার সংগীতের কাছে
এ জন্ম, জন্মের ঋণ শোধ দিতে এ আত্মহননে
জন্মাবধি নিয়োজিত, তার ভাগ্যে কি বেদনা আছে?
হারাবে না। অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়মন
সকলই দিলাম সুখ নিশ্চিত আরাম জলাঞ্জলি—
ওই পদতলে। যাকে বিন্দু বিন্দু শোণিত ক্ষরণ
ফোটালো গোপনে, তার উজ্জ্বলতা যাবে পদদলি
ওই ভোলা মহেশ্বর? সময়ের প্রোজ্জ্বলিত চিতা
নিবিয়ে প্রাণের স্রোতে হেসে উঠবে আমার কবিতা।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের মুখটিকে যথাসম্ভব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন জীবন-বাবু। তারপর, সমস্ত দেহ আর চিন্তার মধ্যে বিরাট একটি অবসাদ ফুটিয়ে, অনেকটা নিজের মনেই, পুরানো সেই কথা ক-টি আর একবার উচ্চারণ করলেন তিনি : আমার মধ্যে আর কিছু নেই, আমার সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

এই শেষ হয়ে যাওয়ার বেদনাই বুঝি তাঁর মুখের ওপর রিক্ততার শ্বেত আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ ত্রিশটি বছরের খণ্ড-বিখণ্ড সংগ্রামের তিক্ত স্মৃতিকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। যে আদর্শ নিয়ে তিনি জীবন সুরু করে-ছিলেন, সৈনিকবৃত্তির অনতিক্রমণীয় জীবনবোধের চাপে পড়ে সেটি কখন গুঁড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আজ তাঁর যাত্রাপথের অজস্র ধূলিকণার ভিতর থেকে সেই হারানো কণাটি খুঁজে বার করার চেষ্টা ক্ষ্যাপার পরশ পাথর খোঁজবারই নামান্তর মাত্র।

অথচ আজই তাঁর সবচেয়ে বেশী আনন্দ করার কথা। বাংলা, তথা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে তিনি আজ স্বীকৃত। আজই ইংরাজী আর বাংলা কাগজের সহর-সংস্করণগুলিতে জীবনবাবুর ফটো আর জীবনী (?) ছাপা হয়েছে। সকাল থেকে টেলিফোনের কামাই নেই আর। শত্রু-মিত্র অভিনন্দন জানিয়েছেন। কাগজের রিপোর্টাররা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন। অনেকে বাড়ীতে হানা দিয়েছেন। বিকালে স্থানীয় সাহিত্যিকরা তাঁর সঙ্গে একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হবেন, মাল্যচন্দনে ভূষিত করবেন তাঁকে।

ষাট বছরে পা দিয়েছেন জীবনবাবু। শ্রেষ্ঠ সম্মানের পরিবাহক হলেও, এই বছরটিই তাঁর জীবনের একমাত্র পরিচয় নয়। বরং একথা বললে অযৌক্তিক হবে না যে, তাঁর ষাট বছরের মধ্যে শেষের পনেরটি বছর উত্তেজনা, আর আবেগে ভরপুর; একেবারে পৃথক করে চেনা যায় তাদের। এ যেন এক অন্য জগত, অন্য এক মানুষের ইতিহাস। এই পনেরটি বছরই প্রাচুর্যের উচ্ছ্বাসে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সাফল্য এসেছে, অর্থ এসেছে, এসেছে যশ আর প্রতিপত্তি। এদেশে সাহিত্যজীবনে এতগুলি দিন পাঠকের মনে এত অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে নিরঙ্কুশ বেঁচে থাকা একটি পরম বিস্ময়ের কথা। জীবনবাবুর ক্ষেত্রে সে-বিস্ময় সার্থক হয়েছে। তাঁর প্রতিভার উত্তরোত্তর চমৎকারীত্ব আপনার প্রাণ-প্রাচুর্যের উচ্ছলতায় পাঠক-পাঠিকাদের মনে চাঞ্চল্যের সাড়া জাগিয়েছে। সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব অকস্মাৎ না হলেও, কিছুটা অভাবিত তো বটেই।

অনেক উঁচুতে উঠেছেন জীবনবাবু, অনেক উঁচুতে। তারপর......

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হঠাৎ শিউরে উঠলেন জীবনবাবু। ভয়ে চোখ দুটি বুজিয়ে ফেললেন। মনে হল, বিরাট একটি জ্বলন্ত হাওয়াই তাঁর সামনে ভেঙে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে। হঠাৎ চীৎকার করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি।

হয়ত, এরজন্যে নিঃসঙ্গতাই দায়ী। আজ বলে নয়, চিরকালই মনের দিক থেকে তিনি একান্তভাবে নিঃসঙ্গ। জগতসংসারের নগ্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অনিবার্য কর্মচাঞ্চল্য, আর অশোভনীয় উন্মাদমত্তা তাঁকে আজ ক্লান্ত করেছে, বিপর্যস্ত করেছে। তাঁর অফুরন্ত কর্মপ্রেরণা আজ স্তিমিত। তাঁর অবচেতনার নাহদুয়ারে একটি আলস্যের নিঃশব্দ পদসঞ্চার ধ্বনিত হয়েছে। আজ ঠিক এই মুহূর্তে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভের পরম লগ্নে কে যেন তাঁর কানের কাছে শেষ বিদায়ের ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে। সময় এসেছে; খেসারৎ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও।

তীব্র আর অসহ্য হলেও, ঠিক এই ধরণের অনুভূতি তাঁর কাছে আজই নতুন নয়। সাফল্যের ধাপে-ধাপে এই অনুভূতি তাঁর কাছে বারবার সতর্কবাণীর মতই উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এতদিন তার দিকে চোখ ফেরাবার মত অবকাশ ছিল না তাঁর। তিনি বুঝেছিলেন, প্রেম আর যুদ্ধে আপোষ চলে না। জীবনযুদ্ধে তিনি সততা আর বিবেকের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন। এইটেই তাঁর সাহিত্যস্বীকৃতির গোড়ার কথা। সাহিত্যিক জীবনবাবু, আর মানুষ জীবনবাবু এক নন। অথচ ক-জনই বা সে-সংবাদ রাখে? তিনি নিজেও সব সময় সে-সংবাদ রাখতে পারেন নি।

স্ফটিকের মত স্বচ্ছ কাপে গরম হরলিক্‌স আর মাত্র দুটি থীন এরারুট নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল মিনতি।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, জীবনবাবু। মিনতির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মাঝে-মাঝে কাজের ফাঁকে-ফাঁকে এমনি করেই চেয়ে থাকেন তিনি। কী-যে দেখেন, তিনিই জানেন।

ব্যাপারটা সংসারে কারও চোখ এড়ায় নি; বিশেষ করে স্ত্রী বন্দনার।

বন্দনা বলেন : মিনু যে মাসে জন্মালো সেই মাসেই তো তোমার বই প্রথম সিনেমায় উঠলো, তাই নয় গো?

তাই বটে।

তাই মিনুর ওপর তোমার এতটা পক্ষপাতিত্ব।

পিতৃস্নেহের ওপর ব্যবসাদারের মনোবৃত্তি আরোপ করতে গেলে ভাল লাগার কথা নয়। তাই বাপ আর মেয়ে দুজনকেই এ অপবাদের প্রতিবাদ করতে হয়। কিন্তু মহিষী সে কথা শোনার পাত্র নন। তিনি হেসে বহুবার ঠাট্টার ছলে বলেছেন : আমার আরও তো ছেলেমেয়ে রয়েছে। কই তাদের দিকে তো। ......

অনিচ্ছা থাকলেও, প্রতিবাদের ভাষা হাতড়াতে হয় তাঁকে। সাহিত্যিক হয়েও এ-অপবাদের উপযুক্ত উত্তর খুঁজে বার করতে একটু দেরিই হয়ত তাঁর হয়; সেই সুযোগে বন্দনাদেবী তাঁর আসল বক্তব্যটি প্রকাশ করেন : তবে সত্যি কথা বলতে কি, তোমার আসল কর্ণধার আমি। আমি পিছনে না থাকলে শেষ পর্যন্ত তোমার যে কী হ'ত, একমাত্র ভগবানই জানেন।

ভগবানের অস্তিত্বে জীবনবাবুর বিশ্বাস কতটা জানি নে, তবে বন্দনাদেবীর কথাটি নির্ভেজাল মিথ্যা নয়। সীতা হরণের জন্যে শূর্পনখাই দায়ী, রাবণ নিমিত্ত মাত্র, এই কথাটি যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে জীবনবাবুর সৌভাগ্যের মূলে যে বন্দনাদেবীই আসল সেই কথাটিকে অমূলক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না।

কথাটা আজকের নয়, অনেক দিনের। কতদিনের, ভুলে যেতে পারলেই যেন ভাল হত। মেদিনীপুরে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার সন্দেহে যে যুবকটির পিছনে পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার নাম ব্যোমকেশ হালদার। পুলিশের নজর এড়াবার জন্যে অনেক ভোল বদলাতে হয়েছিল তাঁকে। মেদিনীপুর থেকে কাঁথি, কাঁথি থেকে ঘাটাল, ঘাটাল থেকে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। এমনিভাবে ঘুরতে-ঘুরতে একদিন তিনি আসামের চা-বাগানে হাজির হলেন। তখন আর ব্যোমকেশ হালদারকে চেনার কোন উপায় ছিল না। ব্যোমকেশ হালদার জীবন চট্টোপাধ্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছেন। তারপর একদিন আসামের একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার রায় বাহাদুর মাইকেল অনিমেষ গড়গাড়ির বাড়িতে আশ্রয় পেলেন। ভারতবিদ্বেষী কড়া মনোবৃত্তির জন্যে তিনি ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে অজস্র খিলাৎ পেয়েছিলেন। তাঁরই বাড়িতে জীবনবাবু আশ্রয় পেলেন বন্দনার গৃহশিক্ষক হিসাবে।

ব্যোমকেশ হালদারের নামে ইংরাজ সরকারের ওয়ারেন্ট ছিল, আসামের অনিমেষ গড়গাড়ির আশ্রয়ে থেকে জীবনবাবু সাময়িকভাবে সেই ওয়ারেন্টের বাইরে চলে গেলেন। তারই বছর তিনেক পরে রায় বাহাদুর হঠাৎ মারা গেলেন সীমান্তপ্রদেশে আততায়ীর গুলীর আঘাতে।

ভারতবিদ্বেষের জন্যে নয়, একটি বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন বলেই অনিমেষবাবু স্বজন পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, এবং হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই বোধ হয় হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এজগতে কিছু টাকা, স্ত্রী, আর ঐ একটিমাত্র কন্যা ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না। সুতরাং তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর পর বন্দনাদের সংসার থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ হয়নি জীবনবাবুর। সে সুযোগ আজও আসেনি তাঁর। একদিন যেখানে সত্যিকার নাড়ির টান ছিল, সে-টান কখন শিথিল হয়ে গেল; তারপর একদিন মাটি থেকে ছিন্ন হল মূল। নতুন করে জীবনের আর এক অধ্যায় সূচিত হ'ল তাঁর।

এ-জগতে এত কিছু হওয়ার থাকতে, কেন, আর কী করে যে জীবনবাবু সাহিত্যিক হয়ে গেলেন, তা তিনি নিজেও জানেন না। আজও যখন রিপোর্টাররা তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম স্ফুরণের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখনও তিনি চুপ করেই ছিলেন। একদিন ছিল যখন পৃথিবী রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। সেদিন আকাশে ছিল মেঘ আর রোদের লুকোচুরি, দেখে তিনি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতেন; রূপনারায়ণের তীরে-তীরে শুকনো বালির ধার ঘেঁষে অকারণ পুলকে ছোটাছুটি করতেন; কেয়ার ঝাড়, শৈশবের কৌতুক কৈশোরে ভাববিহ্বলতায় রূপান্তরিত হল। সেই ভাববিহ্বলতা স্বদেশীযুগের আবেগ-উত্তেজনায় মুখর করে তুললো তাঁকে। তাঁর জীবনের রোমাঞ্চমুহূর্তগুলি কাটলো সন্ত্রাসবাদীদের কর্মচঞ্চল উন্মামত্তার ভিতর। যৌবনের মধ্যপথে তিনি অতিপরিচিত জীবন থেকে পলাতক। আত্মীয়স্বজনের স্নেহ থেকে বঞ্চিত। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা আর আরণ্য প্রকৃতির বর্বরতা কখন যে তাঁকে বাইরের জগত থেকে সম্পর্কচ্যুত করে একেবারে নিজের ভিতরে নির্বাসিত করেছিল তা তিনিও বুঝতে পারেন নি। এই একান্ত নিঃসঙ্গতার পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে রায় বাহাদুরের পাঠাগারটিই ছিল তাঁর আত্মগোপন করার একটি মাত্র স্থান। জীবিত ও মৃত অসংখ্য মনীষীদের সঙ্গে এইখানেই তাঁর নিগূঢ় পরিচয় ঘটেছিল। তারপর একসময় ধীরে-ধীরে তাঁর মনের ভাবগুলি রূপ পরিগ্রহ করলো। হঠাৎ একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন, সাহিত্যের পথই তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র পথ।

কিন্তু নিছক সাহিত্য চর্চা করে তিনি বেঁচে থাকতে পারেন নি। দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটাতে তাঁকে কেরানীগিরি করতে হয়েছিল। মনপ্রাণ দিয়ে কোনদিনই তিনি চাকরি করতে পারেননি। কেবল পেরেছিলেন চোখ আর কানদুটোকে সজাগ রাখতে। ফলে, যা দেখেছিলেন তার আর তুলনা নেই। তখন ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজে ভাঙন ধরেছে। একটি অন্ধকার যুগ অতিক্রম করে আর একটি অন্ধকার যুগের দিকে পা বাড়িয়েছে ভারত। কোনদিকে সাদার নামগন্ধ নেই। কালোবাজার, ভেজাল, বিষাক্ত

দম্ভ আর শঠতা লক্ষ্য সমাজে কৌলিন্যের মর্যাদা কেবল দাবি করেই ক্ষান্ত হয়নি, জোর করে দখল করেছে। সামাজিক জীবনের সেই অজস্র তিক্ততা তাঁর জীবনকে রিক্ততায় ভরিয়ে দিয়েছে। এরই কিছু আগে দেশের বুকের ওপর দিয়ে যুগান্তকারী আগস্ট আন্দোলন চলে গিয়েছে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ইংরাজদের বুট আর বুলেটের দাপাদাপি চলেছে। আর দেশব্যাপী সেই আর্তনাদের গোঙানি তাঁর বুকের রক্তকে তোলপাড় করে দিয়েছে।

শিল্পীর কাছে সৃষ্টির মহত্তর ক্ষেত্র এর চেয়ে বোধ হয় আর কিছু নেই। জীবনবাবু সমস্ত মনপ্রাণ, শক্তি আর ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই অন্ধকারের বুকে। সমাজের ক্রমবর্ধমান বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

উন্মত্ত ক্ষুধাতুর পলাশী দানবের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজনায় ভরপুর তখন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত। আকাশে-বাতাসে উতরোল মৃত্যুর কলরোল। হত্যা, দস্যুতা, লুন্ঠন, আর রাহাজানি অত্যন্ত স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে এসেছে। বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা যেখানে যত কম, মনুষ্যত্ববোধকে অপাংক্তেয় করে রাখার চেষ্টাটা সেখানে মানুষের তত বেশী। তখন সাময়িক প্রয়োজনটাই মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। তখন অধিকাংশ দেশের মত বাংলাদেশের নীতির মানটাও ভাঁটার টানে নীচের দিকে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। জীবনবাবুর সৎসাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই বা কোথায়, প্রয়োজনটাই বা কোথায়? না পাঠকের, না প্রকাশকের।

জীবনবাবুর এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে রঙ্গভূমিতে বন্দনাদেবীর আবির্ভাব ঘটলো। সংসারসমুদ্রে এতদিন যে তরণীটি বাধাবিপত্তির উত্তাল তরঙ্গে টাল-মাটাল খাচ্ছিল, বন্দনাদেবী এসে সেই তরণীর হালটি শক্ত করে ধরলেন। তিনি স্পষ্টই দেখেছিলেন, যে-যুগে মূর্খলোকেরা বাবলাকাটা বিক্রী করে, কোটিপতি হচ্ছে, ছেঁড়া কাগজ বিক্রী করে লাখের ঘরে টাকা জমাচ্ছে, সেযুগে একটা মানুষ ভুয়ো আদর্শবোধের জন্যে দিনদিন অধঃপাতের দিকে এগিয়ে চলেছে। সে আদর্শ মানুষকে প্রাচুর্যের সন্ধান দেয় না, তা ভুয়ো ছাড়া আর কী? গতানুগতিক জীবনযাত্রায় বাধা এল জীবনবাবুর। কিন্তু কিছুটা সংঘর্ষের পরেই তিনি বুঝতে পারলেন, লক্ষ্মীর আরাধনা করতে হলে বন্দনাদেবীর নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ।

সুযোগও জুটলো একটা। যুদ্ধের সময় বিলেত থেকে একজন সাহেব এলেন কলকাতায় সরকারি প্রচারদপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে। অনিমেষবাবুর সঙ্গে এ'র যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল এক সময়। অনিমেষবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর সংসারের জন্যে সরকারের সে কিছু করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। কলকাতায় আসার পরে বন্দনাদেবী সেই সুযোগটি আদায় করে নিলেন। প্রচারদপ্তরে মোটা মাহিনায় জীবনবাবু চাকরি পেলেন।

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। ইংরাজ সরকারের প্রচারবিভাগ মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই মিথ্যার গহ্বরেই সোনার খনি লুকিয়ে ছিল। প্রথম কিছুদিন দুশ্চিন্তায় কাটার পরেই আফিঙের নেশার মত মিথ্যার নেশা তাঁর চেতনাকে স্তিমিত করে দিল।

মাত্র দুটি বছর। তারই ভেতর জীবনবাবুর সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো। তিনি বুঝে নিলেন, এদেশের মানুষ সত্য, মিথ্যা, আর রুচি নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ'রা তাঁর কাছে চায় সাময়িক আনন্দ আর উত্তেজনা। চটুল বাক্যবিন্যাসের ছটায় যৌন আবেদনকে পুরোভাগে রেখে যুদ্ধযুগের বিলাতি ছবি আর সস্তা ইংরাজি হরার রোমান্সের ককটেইল করে পরিবেশন করলেন বাংলা পাঠক-পাঠিকাদের। একদিনের সন্ত্রাসবাদী দেশপ্রেমিক ইংরাজদের মহিমা কীর্তন করে দেশপ্রেমের নতুন ব্যাখ্যা করলেন। তারপর দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীনতা-উৎসবে গরম-গরম ইংরাজ-বিদ্বেষী বক্তৃতা দিলেন। যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রাচুর্য আর প্রতিপত্তি এল জীবনে। জীবনবাবুকে স্বীকার করতেই হয়েছিল যে সাংসারিক বুদ্ধিতে বন্দনাদেবীর কাছে তিনি শিশুমাত্র।

সাহিত্যজগতে নাম করা যে এত সহজ জীবনবাবু তা বুঝতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই বোধ হয় তাঁর মনের মধ্যে মাঝে-মাঝে বিরাট একটি অস্বস্তি জেগে উঠতো। তিনি আশ্চর্য হয়ে ভাবতেন বর্তমান সমাজ সাহিত্যকেও একটি সামগ্রীতে পরিণত করেছে। যে সমাজে প্রচারের ওপরেই সামগ্রীর উৎকর্ষতা নির্ভর করে, সেই সমাজে প্রচারবিদ না হলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। কিন্তু একথাও তো মিথ্যা নয় যে, যে-আগুনকে আমরা জীবন বলে জানি, সেই আগুনেই পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সাহিত্যও তো আগুন। সেই আগুন নিয়ে ছেলেখেলা করলে ভবিষ্যৎ সমাজ কি ক্ষমা করবে তাঁকে?

তাঁর এই বিপ্লবী চিন্তার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে অটল পাহাড়ের মত এসে দাঁড়াতেন বন্দনাদেবী। সেই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে আপনার ক্লান্তিতে আপনিই শান্ত হ'ত বিপ্লব।

ভবিষ্যৎ কী? ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই; না মানুষের, না জগতের।

তা হলে?

বর্তমানই সব। মানুষের বর্তমান ক্ষুধাকে শান্ত করতে হবে।

কিন্তু তাতে মানুষের আত্মা বিক্ষুব্ধ হবে না?

মানুষ জীবনবাবুর সঙ্গে সাহিত্যিক জীবনবাবুর এইখানেই বিরোধ। মানুষের কাছে যেটা আসল, সাহিত্যিকের কাছে সেইটাই নকল। তাই যখন মানুষ জীবনবাবু বর্তমানকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, সাহিত্যিক জীবনবাবু সেই সময় অমরত্বের দাবি নিয়ে ভবিষ্যতের অন্ধকারে পা বাড়িয়েছিলেন। তাই বোধ হয় তাঁর কোন সৃষ্টির মধ্যেই ফাঁকির নজীর ছিল না।

কিন্তু কই? সৃষ্টির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না কেন?

কেন, এর উত্তর মানুষ জীবনবাবুই দিতে পারেন। তিনি জানেন, ভাবের রাজ্যে, আদর্শের রাজ্যে তাঁর প্রবেশ নিষেধ। তাই মুন্সীয়ানার রাজত্বে তিনি একেশ্বর। এদিক থেকে তাঁর কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল না। গ্রন্থ প্রকাশ করেই তাই তাঁর দায়িত্ব শেষ হ'ত না। প্রথম

প্রকাশনার পরে, অপরিচিত ধৈর্যশীল পাঠকের মত তিনি গ্রন্থের প্রতিটি প্রকাশনার পরে, অপরিচিত ধৈর্যশীল পাঠকের মত তিনি গ্রন্থের প্রতিটি ছত্র পড়তেন। চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনাবিন্যাস, বাচনভঙ্গী, আর বক্তব্য—কোনদিকেই তাঁর এতটুকু অবহেলা থাকতো না। দেখতেন, কিছুদিন আগেও যাকে তিনি একেবারে অনবদ্য বলে ভেবেছিলেন, তারই মধ্যে অনেক ভ্রম-প্রমাদ, অনেক শিথিলতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় সংস্করণে গল্পটি পরিমার্জিত হত। এমনি করে, তৃতীয়-চতুর্থ সংস্করণেও পালিশ-পলেস্তারার কাজ চলতো। তারপর একদিন শান্ত হতেন তিনি।

অথবা, নতুন একটা অশান্তি তাঁর মনের মধ্যে জ্বলে উঠতো। কিছুদিন তিনি গুম হয়ে থাকতেন। খেতে পারতেন না, বসতে পারতেন না, ঘুমোতে পারতেন না। কারও সঙ্গে কথা বলতেও তাঁর কষ্ট হত। ইচ্ছে হত নিজের রচনাগুলিকে ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দেন। মাঝে-মাঝে ঘুমোতে-ঘুমোতে তিনি চীৎকার করে উঠতেন। তাঁর চোখের সামনে অন্ধকারের বুকে জমাট রক্তের মত ডক্টর ফসটাসের মত দেহটা ভেসে উঠতো। বহুদূরে শতাব্দীর ওপার থেকে তিনি তার আর্তনাদ শুনতে পেতেন যেন। শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করার খেসারৎ দিতে হয়েছিল তাকে।

অ্যাকাডেমী পুরস্কার প্রাচুর্য সম্মান, আর প্রতিপত্তি। সত্য কথা, সাহিত্যিক জীবনবাবুকে জগৎ একদিন ব্যঙ্গ করেছে, প্রকাশকেরা তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করে নি, জীবনধারণের উপযুক্ত অর্থ তিনি পাননি। সেই ক-টি বছরই তাঁর ব্যবহারিক জীবনে দুর্যোগের ঘনঘটা ছাড়া আর কিছু নয়। লাঞ্ছিত, প্রবঞ্চিত, অপমানিত। পরের পনেরটি বছরে আসল তো তিনি তুলেইছেন, চক্রবৃদ্ধিহারে সুদও অনেক জমেছে। মূর্খ জগতের ওপর এ তাঁর একটি বিরাট প্রতিশোধ ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু তারপর?

ড্রেসিং টেবিলের কাছ থেকে সরে এলেন জীবনবাবু। আয়নার ওপর যে মূর্তিটি এতক্ষণ তাঁর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল সেটি হঠাৎ নেপথ্যে মিলিয়ে গেল। খোলা জানালাটার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। বাইরে এখন শরৎকালের নীল-নেশায় মাতামাতি চলছে। বৃষ্টিধোয়া প্রকৃতির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অজস্র রঙের লুকোচুরি। চারদিকেই আজ আনন্দের বান ডেকেছে। তাঁর অন্তরের কিনারতটেই কেবল একটা বোবা কান্নার আথালি-পাথালি উচ্ছ্বাস বারবার আছাড় খেয়ে পড়ছে।

আরও চাই। আরও ওপরে উঠতে হবে।

আকাশের ঐ উড়ন্ত পাখিটার মতই বুঝিবা ক্ষণিকের বিস্মরণে অফুরন্ত শূন্যতার মাঝে নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন জীবনবাবু। হঠাৎ ঐ কথা-কটি শুনে আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

কে, কে?

ঘুরে দেখলেন, তাঁর সামনে হাসি-মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বন্দনাদেবী। তাঁর হাতে রুপোর একখানা ট্রে। তার ওপর কয়েকখানি অভিনন্দনপত্র।

জীবনবাবুর এই পরিবর্তনে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন বন্দনাদেবী। হয়ত এই চীৎকারে একটি ভয়ার্ত আর্তনাদই ফুটে বেরিয়েছিল।

বন্দনাদেবী ট্রে-টিকে টেবিলের ওপর রেখে বললেন: হঠাৎ ভয় পেলে কেন?

জীবনবাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: না, এমনি।

কিন্তু তোমার মুখ যে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে?

কই না তো?

কী ভাবছিলে?

কী ভাবছিলাম? ভাবছিলাম, ঐ আরও ওপরে ওঠার কথাটাই কে বললো। ঠিক আমার মনের কথাটা তুমি জানতে পারলে কেমন করে?

বন্দনাদেবী হাসলেন: তাই বল। আমি ভাবলাম, হঠাৎ বুঝি ভূত দেখে আঁৎকে উঠলে।

জীবনবাবুও এবারে হাসলেন: আঁৎকে উঠেছিলাম সত্যি। তবে, ভূত নয়, ভবিষ্যৎ দেখে। আরও ওপরে বড় অন্ধকার, বন্দনা, বড় অন্ধকার। ও আমি সহ্য করতে পারব না।

তোমার ঐ একই কথা। অ্যাকাডেমীর পর নোবেল পুরস্কার পেতে হবে না?

জীবনবাবু অসহায়ভাবে প্রশ্ন করলেন: আবার নো-বে-ল?

এবার একটু বিরক্তই হলেন বন্দনাদেবী: যে পুরস্কার পেলে পৃথিবীর সাহিত্যিকরা নিজেদের জীবন সার্থক বলে মনে করেন, তার ওপর তোমার কোন লোভ নেই? আশ্চর্য কথা!

থাকাই স্বাভাবিক। তবে......

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে শেষ করলেন কথাটা: ও আর বুঝি সাধ্য নেই।

তোমার সাধ্য কতটুকু তা আমি জানি।

তাহলে হয়ত রয়েছে।

বন্দনাদেবী প্রসঙ্গান্তরে হাজির হলেন: শোন। আমরা একটু বেরোব। আজকে চারটের সময় সাহিত্যিক আর পণ্ডিতলোকেদের সমাগম হবে হেথায়। তাঁদেরই জন্যে জলযোগের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু এর ভেতর তৈরি হয়ে থেকো। কিছু বলতে হবে তোমাকে। রিপোর্টাররাও আসবেন।

বন্দনাদেবী ঘর থেকে চলে যাওয়ার জন্যে মুখ ঘোরাতেই জীবনবাবু ডাকলেন: বন্দনা।

ঘুরে দাঁড়ালেন বন্দনাদেবী।

মানুষ কী চায় বলত?

অর্থাৎ?

অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি। সবই পেয়েছ জীবনে। এবার আমাকে ছেড়ে দাও।

জীবনবাবুর মুখের দিকে একবার মাত্র চেয়ে থেকেই হো হো করে হেসে উঠলেন বন্দনাদেবী।

হাসছো কেন?

তোমার কথা শুনে। যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই তাকে কী বলে? না, না: এ দুর্বলতা তোমাকে ছাড়তেই হবে। আজকের ফাংশনকে সার্থক করে তুলতেই হবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন জীবনবাবু: সার্থক! আচ্ছা, তাই হবে।

বন্দনাদেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জানালার পাশে এসে আকাশের সীমাহীন শূন্যতার ভিতর আবার চোখ মেলে দিলেন জীবনবাবু।

সেখান থেকে চোখ ফেরালেন দূরের গাছপালার দিকে। সহর কলকাতার এই দিকটায় এখনও অজস্র গাছপালা আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজকে পৃথিবীর ওপর রোদের ফুলঝুরি ঝরে পড়েছে। গতকালের বৃষ্টির পর ভিজে গাছের পাতাগুলি বিপুল আনন্দে রোদ পোয়াচ্ছে। পৃথিবীর শব্দময় অসীম কলকোলাহলের মধ্যে এরাই কেবল নৈঃশব্দ্যের প্রতীক।

প্রাক-পুজোর বোল ফুটেছে চারপাশে। আগামীকাল সপ্তমী পুজো। কোথায় যেন মিঠে ঢাকের বাজনা বাজছে। তাই কিছুক্ষণ ধরে শুনলেন জীবনবাবু; এক সময় বিছানায় এসে বসে পড়লেন। কী যেন ভাবলেন। তারপর দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: না, আমার সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

শশধর রায় কোন একটি চালু বাংলা সাপ্তাহিকের সম্পাদক। তিনি সটান ঘরে এসে হাজির হলেন।

এইমাত্র ট্রেন থেকে নামলাম দাদা। ভাবলাম, অভিনন্দনটা জানিয়েই বাড়ী ফিরবো।

জীবনবাবু হেসে বললেন: অভিনন্দন পরে জানালেও চলতো। কিন্তু এইভাবে শরীর নষ্ট হলে কাগজ চলবে কেমন করে?

তা যা বলেছেন দাদা। কিন্তু বৌদি কোথায়? ছেলেমেয়েরাই বা সব গেল কোথায়? আমার যে আপনার প্রাইভেট

জীবনের ফটো চাই। এ সংখ্যাতে ফলোয়া করে ছাপাতে হবে তো।

তোমরা যে আমাকে ফাঁসির আসামী করে ফেললে হে।

শশধর রায় জিব কামড়িয়ে বলে : কী যে বলেন দাদা! আপনি হলেন আমাদের খাঁটি, জাতীয় সম্পত্তি। গৌরবের বস্তু। আর বাকি তো সব মেকী। ভাল কথা, শুনলাম, আজকের সভায় রাজকৃষ্ণ বসু আসছেন?

হবে। তোমাদের এই আয়োজনের লিস্ট তোমার বউদির কাছে। তিনি বাজারে গিয়েছেন। থাকলে দেখতে পেতে।

না, না দাদা। ও লোকটা ভাল নয়। এই একটু আগে ও'র সঙ্গে দেখা। ও'র ধারণা বাংলা সাহিত্যে উনিই একমাত্র মহারথী।

তা কিছু ভুল বলেন নি।

শশধর রায় চোখ বড়-বড় করে বলে : ভুল করেনি?

না। কারণ, আজকাল বাংলা সাহিত্যে কেউ পদাতিক অথবা রথী নেই। সবাই মহারথী।

এবার হো হো করে হেসে ওঠে শশধর রায় : যা বলেছেন। হাতী যায়, ঘোড়া যায়। ব্যাঙ ভাবে, আমিই বা কমতি কিসের? আমিও যাই। তবে সত্যি কথা বলতে কি, রাজুবাবু যদি সাহিত্যিক হন, তাহলে আমিও এবার লরিয়েট হওয়ার জন্যে দরখাস্ত করব। হ্যাঁ, তবে লিখিয়ে বটে। ভস ভস করে ছাইপাশ লিখে ফেলল। আবার বলে কি না, আমি টলস্টয়ের চেয়ে কমতি কিসে?

তাই বুঝি?

তবে আর বলি কি দাদা? আর কি হিংসে জানেন? আজ স্টেশনে দেখা হতেই বললে : তোমাদের জীবুদা তো অ্যাকাডেমী মেরে দিলে হে! তবে যাই বল বাপু, অমন একখানা স্ত্রী বাগাতে পারলে আমিও তিনবার অ্যাকাডেমী নিতাম। জীবনবাবুর স্ত্রীভাগ্য ভাল।

জীবনবাবু চুপ করে রইলেন। ভাবাবেগে ব্যস্ত না থাকলে শশধরবাবু দেখতে পেত, জীবনবাবুর মুখের ওপর একটা আর্ত ছায়া নেমে এসেছে।

শশধরবাবু উত্তেজিত হয়ে বলল : এসব বাজে সাহিত্যিকদের এখানে নিমন্ত্রণ করাটা ঠিক হয়নি বৌদির। তবে আমি এসে পড়েছি, এই রক্ষে। বেফাঁস কিছু বললে জিব ছিঁড়ে নেব না!

জীবনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন : আরে না, না। ওসব করো না। তা ছাড়া, সব সাহিত্যিকই ঐ রাজুবাবুর মত। কার মুখ চাপা দেবে তুমি। তার চেয়ে যার যা ইচ্ছা বলতে দাও। আজকাল গণ্ডারের চামড়া গায়ে না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, তাতো জান।

বন্দনা দেবীর গাড়ী ঢুকলো। শশধর রায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল : ঐ বৌদি এসে পড়েছেন। কী করা উচিত ও'র সঙ্গেই একটু শলাপরামর্শ করে আসি।

শশধর রায় তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল।

নীচের বড় হলঘরটার ভেতর থেকে বন্দনা-মিনতি-শশধরবাবুর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারা ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজনে ব্যস্ত। জানালা দিয়ে দেখলেন, সামীয়ানা, বাঁশ, চেয়ার নিয়ে ড্রয়িং-রুমের সামনের খোলা জায়গাটার ওপর ইতিমধ্যেই ম্যারাপ বাঁধার কাজ শুরু হয়েছে। ওদিকে ছোট ছেলে রতন একগাড়ী ফুল নিয়ে হাজির। পাড়ার ছেলেমেয়ের দল, তারাও কাজ করার জন্যে প্রস্তুত। একটা কিছু কাণ্ড আজ হবে।

অসীম ক্লান্তি নিয়ে বিছানায় ঢলে পড়লেন জীবনবাবু।

সময়ের হিসাব ছিল না তাঁর। এক-ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা হবে। তারও কিছু বেশী হতে পারে। হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙলো বন্দনা-দেবীর ডাকে।
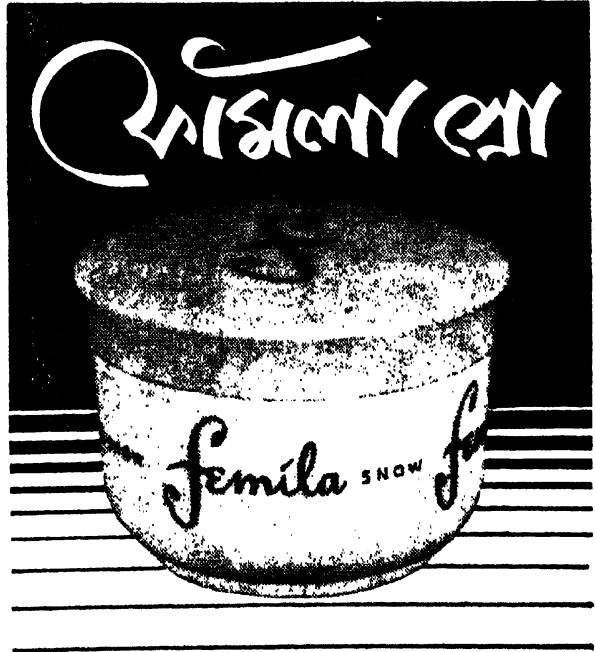
এই অবেলায় ঘুমোচ্ছ যে? শরীর ভাল তো?
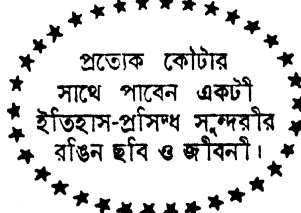
ধড়মড় করে উঠে পড়েন জীবনবাবু। হ্যাঁ, ভাল।

কী জানি বাপু? ভিড় দেখলেই তো তোমার আবার ব্লাড প্রেসার নেমে যায়।

একটু দেঁতো-হাসি হেসে জীবনবাবু বললেন ঃ না, তা নামবে কেন? কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছে না কি?

বন্দনাদেবী একবার তির্যক দৃষ্টিতে জীবনবাবুর দিকে চেয়ে দেখলেন! মুখের চেহারার পরিবর্তন ঘটলো; কপালের শিরাগুলি বারেকের জন্যে সংকুচিত হল। তারপর হঠাৎ ভাবাবেগকে সংযত করে হাসিমুখে বললেন ঃ আমরা আদার ব্যাপারী। জাহাজের খবরে দরকার কী? তবে তুমি কিন্তু বাবু একটা কাজ করো।

"আগরওয়ালা সাহেবের বাবার একটি জীবনী লিখে দিয়ো"

দুটি চোখই বড় বড় করে বন্দনাদেবী বলেন ঃ কী যে ছাই-ভস্ম বল? মাত্র পাঁচশ লোকের আয়োজন। গোটা-দুই গান, ছ'টা বক্তৃতা, মাল্যদান, অভিনন্দন পত্র পাঠ, আর তোমার অভিভাষণ। রিপোর্টাররা সব আসছেন। ফরেন করসপনডেন্টও দু'-চারজন আসবেন। এও তোমার হল গিয়ে বাড়াবাড়ি!

আবার ফরেন?

ফরেন না হলে বিদেশে নাম ছড়াবে কেমন করে?

তা এত খরচপত্র......?

এক গাল হাসেন বন্দনাদেবী ঃ যেমন তোমার বুদ্ধি! এর একটা পয়সা আমাদের নয়। আগরওয়ালা সাহেবের।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল জীবনবাবুর ঃ তিনি কেন?

তাতে তোমার আপত্তি করার কিছু নেই। সং কাজে ওদের দান কত? ওরা মঠ তৈরি করেছে, ধর্মশালা তৈরি করেছে, ইস্কুল গড়েছে, কলেজ করেছে।

এবার আর বক্রোক্তি না করে পারলেন না জীবনবাবু ঃ আর সেই সঙ্গে ব্ল্যাকমার্কেট করে হাজার হাজার মানুষের সর্বনাশ করেছেন।

কী?

আগরওয়ালা সাহেবের বাবার একটি জীবনী লিখে দিয়ো।

জীবনবাবুর কাছ থেকে কোন উত্তর আসার আগেই বন্দনাদেবী হঠাৎ একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন ঃ ইস্, সন্ধ্যে হয়ে এল, এখনও খাবার দিয়ে গেল না। ছেলেমেয়েরা যে কী করে? যাক, আজকের দিনে বেশ ভাল পোশাক পরতে হয়। মিনতি এসে তোমাকে সাজিয়ে দিয়ে যাবে। এর মধ্যে তোমার অভিভাষণটা শেষ করে ফেল।

বন্দনাদেবী চলে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত খাতা-কলম নিয়ে বসতে হ'ল জীবনবাবুকে। তাঁর মনের অবস্থা যাই হক, অভিভাষণ তাঁকে লিখতেই হবে। কয়েক ছত্র লিখলেনও, কিন্তু ভাল লাগলো না। আবার লিখলেন ছিঁড়লেন।

এমনি করে প্রায় আধঘণ্টা কসরৎ করার পর তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। চোখ মেলে দেখলেন, সাদা পাতার ওপর অসংখ্য কালির আঁচড় পড়েছে। তাদের কোনটাই পড়া যায় না। কেটেকুটে তছনছ হয়ে গিয়েছে সব।

ঝড়ের মত বেগে মিনতি ঘরে ঢুকলো। চোখে-মুখে তার আনন্দ আর উত্তেজনার ঢল নেমেছে।

বাবা, তোমার সিংহাসনটা যা হয়েছে না!

সিংহাসন কি রে?

বা, তোমাকে কি আর আজকে সকলের সঙ্গে বসতে দেওয়া উচিত?

ও, তাই বুঝি?

হ্যাঁ, সবাই আসতে শুরু করেছেন। যাঁরা আসতে পারবেন না, তাঁরা অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছেন। আমি কিন্তু আধঘণ্টার ভেতর আসছি। তোমাকে সাজিয়ে দেব। আচ্ছা বাবা, কী পরবে আজ বলত? সাহেবী পোশাকটা তোমাকে কোনদিনই মানায় না বাপু।

জীবনবাবু হেসে বলেন ঃ ঐ কথাটা আমাকে না বলে তোর মাকে বলতে পারিস নে?

মিনতি ঠোঁট উল্টিয়ে বলে ঃ বলি তো। কিন্তু শোনে কে?

তারপর সত্যিই সে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে।

তোমার তো আর দাড়ি নেই। থাকলে, না হয় ঐ রবি ঠাকুরের মত চাপকানই পরিয়ে দিতাম।

জীবনবাবু বলেন ঃ দেখ বাপু, তোদের যেভাবে আমাকে সাজাতে ইচ্ছে করে সাজাস, তবে তোর মায়ের মত নিয়ে করিস।

তাই হবে।

মিনতি চলে গেল।

জীবনবাবু একতলায় নেমে এলেন। পিছন থেকে উঁকি মেরে একবার প্যাণ্ডেলের ভিতরটা দেখে নিলেন। কেবল সাহিত্যিক নয়, পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছেন। সমাজের সব শ্রেণীর মুখপাত্ররাই বর্তমান। এ'দের অনেকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় নেই। জীবনবাবুর স্ত্রী-ভাগ্যটা সত্যিই ভাল।

ওপরে উঠে এলেন আবার। পড়ার ঘরে গেলেন। নীচের প্যাণ্ডেল সরগরম হয়ে উঠেছে। এবার আর রেহাই নেই তাঁর।

হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা কনকনে শিহরণ তাঁকে কাঁপিয়ে দিলে। তিনি সামনের দরোজাটা বন্ধ করে দিলেন। প্যাণ্ডেলে মাইক বসেছে। তারই প্রাথমিক আলাপ শুরু হয়েছে। বন্ধ দরোজার ভিতর দিয়ে দেওয়াল ফুটো করে সেই শব্দ তাঁকে অস্থির করে তুললো।

তারপর চকিতে কী যেন হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পাল্টিয়ে নিলেন তিনি। নীচে নেমে এলেন। লোকে লোকারণ্য চারপাশ। সেই ভিড়ের ভিতরে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে সটান খিড়কী দরজা দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

ফ্লবেয়রের প্রেম ও তাঁর উপন্যাস

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

শুধু অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যেই বাঁচা, আর সেই অভিজ্ঞতাকে লেখার কাজে লাগানোর জন্যেই কেবল জীবন-ধারণ—এই ছিল যাঁর ধারণা—গুস্তভ ফ্লবেয়র সেই অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক। সাধু-সন্ন্যাসীরা জীবনের সুখোপভোগের প্রতি উদাসীন হয়ে যেমন ঈশ্বর সন্ধান করেন, ফ্লবেয়রও বুঝিবা তার চেয়েও কঠোরভাবে স্বীয় অন্বিষ্টের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের সাহিত্যিক আদর্শের জন্যে জীবনের সুখোপভোগের মধ্যে জড়িয়ে পড়েননি। কেননা চোখের সামনে তাঁর ছিল শুধু লেখা—শুধু লেখার বিষয়ের খোঁজ করা। ফ্লবেয়রকে একাধারে রোমান্টিক ও রিয়ালিস্ট বলা হয়। বাস্তবের কুশ্রী রূপের প্রতি অন্তর্লীন ঘৃণায়, এই বাস্তবতাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের জন্যে ফ্লবেয়র কখনো কখনো অসাধারণ অদ্ভুত পরিবেশকে খুঁজেছেন। তবু ফরাসী অভিজাত সমাজের সংকীর্ণতা ও ক্লীবতা সত্ত্বেও ঐ সমাজের প্রতি ফ্লবেয়র আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তাঁর স্বভাবেই বিপরীতের প্রতি অদম্য আকর্ষণ নিহিত ছিল।

জীবনে ফ্লবেয়র একাধিকবার প্রেমে পড়েছেন। কিন্তু প্রেম তাঁর সুখের হয়নি। হয়তো তা হবারও ছিল না। পরস্ত্রীর কাছেই তিনি প্রথমপ্রেমের পাঠ নিয়েছিলেন। এই প্রেম সার্থক হওয়ার পথে সামাজিক বিধি-নিষেধের অন্তরায়, তৎসঞ্জাত নায়ক ও নায়িকার মনের জ্বালা-যন্ত্রণা সমস্তই লাগিয়েছিলেন তাঁর লেখার কাজে। প্রকৃত প্রেমের পাত্রীর চেয়েও তাঁর মনের আদর্শ নারীটিকেই হয়তো ফ্লবেয়র বেশি ভালবেসেছিলেন। বাস্তব নায়িকা শুধু তাঁর মানসী-প্রীতির ইন্ধন জুগিয়েছে—তাঁর জীবন পর্যালোচনা করে এমন কথাও মনে উদয় হয়। বাস্তব নারী-চরিত্র থেকে তিল-তিল সৌন্দর্য চুরি করে এমনিভাবেই তিনি যেন এমা বোভারিকে সৃষ্টি করেছেন। এবং এই পরকীয়া প্রেমোপাখ্যান নিজস্ব উপলব্ধিসঞ্জাত সমাজ ও ব্যক্তির সংঘর্ষকে প্রতিভাত করেছেন।

বছর পনেরো বয়েসেই ফ্লবেয়র প্রেমে পড়েছিলেন। গ্রীষ্মের সময় ফ্লবেয়র-পরিবার হাওয়া বদলাতে সমুদ্রতীরে ত্রুভিলের মত পরিচ্ছন্ন মফস্বলের একটা হোটেলে ওঠেন। মরিস স্লেসিঙ্গার নামে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রকাশক তাঁর স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে ঐ হোটেলে ছিলেন। ফ্লবেয়র এই মহিলার প্রেমে পড়লেন। ফ্লবেয়র অনবদ্য ভাষায় মহিলার যে চিত্র এঁকেছেন তা এই রকমঃ—

"দীর্ঘাঙ্গী তন্বী, গায়ের রং বাদামী, একমাথা কালো মনোহর কেশদাম কাঁধের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে; গ্রীকছাঁদের টিকলো নাক, দীর্ঘায়ত চোখের ভ্রূযুগল ধনুকের মত বাঁকা, ত্বকের লাবণ্য যেন গলা সোনার ঔজ্জ্বল্য। অতুলনার গলার দিকে তাকালে, স্বচ্ছ ত্বকের নীচে নীলশিরা চোখে পড়ে। বঙ্কিম ওষ্ঠে গরিমার পরিচয়। কণ্ঠস্বর সুরেলা। কথা বলার ভঙ্গী ধীর ও নম্র।"

এলিসা স্লেসিঙ্গারের বয়েস তখন ছাব্বিশ। তাঁর কোলে তখন একটি বাচ্চা।

ফ্লবেয়র
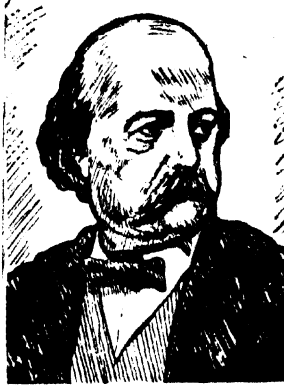
স্বভাবে ফ্লবেয়র ছিলেন খুবই লাজুক আর ভীরু। এলিসার স্বামী হাসি-খুশি ফূর্তিবাজ লোক না হলে এলিসার সঙ্গে কথা কইবার সাহসই হতো না ফ্লবেয়রের। এলিসারা একদিন ফ্লবেয়রকে নিয়ে নৌকাবিহারে করতে বেরুলেন। ফ্লবেয়র ও এলিসা পাশাপাশি বসলেন। কাঁধে কাঁধে ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছিলো। এলিসার পোশাকের অংশ বারবার স্পর্শ করছিল ফ্লবেয়রের বাহুমূল। নীচু গলায় নরম স্বরে এলিসা তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছিলো। প্রায় সংজ্ঞাহারা ফ্লবেয়রের কানে একটি কথাও ঢুকছিল না। কিছুই তাঁর মনে নেই। এই সুখের গ্রীষ্ম শেষ হয়ে এল। স্লেসিঙ্গারেরা ফিরে গেলেন। ফ্লবেয়রও ফিরে গেলেন রুয়েঁ-তে, ইস্কুলের ক্লাস করতে। এই বয়েসেই জীবনের অন্যতম প্রকৃত আবেগের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। দু'বছর পরে ত্রুভিলে গিয়ে দেখলেন যে সেই হোটেলে এলিসারা কিছুদিন থেকে চলে গেছে। এখন তাঁর বয়েস সতেরো বছর। এখন তাঁর উপলব্ধি হলো যে আগে তিনি এতই নাড়া খেয়েছিলেন যে মনের অত উত্তেজিত অবস্থায় এলিসাকে ঠিক ভালবাসতে পারেন নি। এখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়েছে। পুরুষের কামনা নিয়ে তিনি এলিসাকে ভালবাসেন। তাই এই অদেখা শুধু তাঁর কামনাকে আরো বাড়িয়ে দিলো।

যে উপন্যাসটি লিখতে লিখতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, বাড়ী ফিরে সেই অসমাপ্ত কাহিনী লিখে শেষ করলেন। 'লে মেমোয়ার দ্য ফু' নামে এই উপন্যাসেই আছে এলিসার সঙ্গে প্রেমে পড়ার গ্রীষ্মকালীন মধুর কাহিনী।

উনিশ বছর বয়েসে ম্যাট্রিক পাশ করার পর ফ্লবেয়রের বাবা খুশি হয়ে ডক্টর ক্লোকের সঙ্গে ফ্লবেয়রকে পাঠালেন পিরেনিজ, কর্সিকা ঘুরে আসবার জন্যে। ততদিনে তিনি পূর্ণ যুবক। চওড়া কাঁধ, পরিপুষ্ট শরীর এবং মাথায় সাধারণ ফরাসীদের অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছেন। ছিপ্‌ছিপে শ্রীসম্পন্ন চেহারা। দীর্ঘ পল্লবযুক্ত নীলচে চোখে, কাঁধ অবধি নেমে আসা দীঘল চুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গ্রীকদেবতার মত দেখাত। একথা লিখেছেন চল্লিশ বছর পরে একজন মহিলা লেখিকা যিনি যৌবনে যুবক ফ্লবেয়রকে চিনতেন। কর্সিকা থেকে ফেরার পথে ফ্লবেয়র মার্সাইতে নামেন। একদিন সকালবেলা সমুদ্রস্নান সেরে ফেরার পথে এক হোটেলের হাতায় সুন্দরী এক যুবতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। ফ্লবেয়রের সঙ্গে তাঁর সৌজন্য বিনিময় হলো। এই সূত্র থেকেই গভীর আলাপ জমে উঠলো। তাঁর নাম যুলেলি ফুকো। ফ্রেঞ্চ গায়ানায় তাঁর স্বামী চাকরি করতেন। স্বামীগৃহে ফিরবার জন্যে তিনি জাহাজের অপেক্ষা করছিলেন। ফ্লবেয়র সেই মহিলাটির সঙ্গে ঐ হোটেলে সেদিন রাত্রিযাপন করলেন। তাঁর নিজের কথায় সেই মধুর প্রোজ্জ্বল বাসনার রোমাঞ্চিত রাত্রির সৌন্দর্যের সঙ্গে তুষারের উপরে সিঁদুরবর্ণ সূর্যাস্তের সৌন্দর্যের তুলনা করা যেতে পারে। এই দৈহিক অভিজ্ঞতা তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। এরপরে ফ্লবেয়র প্যারিসে আইন পড়তে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাধরা জীবনে এবং আইনের বইয়ে তাঁর বিরক্তি জন্মেছিল।

প্যারিসে থাকার সময়ে 'নভেম্বর' নামে যে ক্ষুদ্র উপন্যাসিকা রচনা করেছিলেন তাতে যুলেলি ফুকোর সঙ্গে

তাঁর প্রেমের কাহিনীই লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ঐ উপন্যাসিকার নায়িকার সঙ্গে এলিসার হুবহু মিল। নায়িকার ভ্রূ এলিসারই ধনুর মত ভ্রূযুগলতুল্য। ওষ্ঠ অসীম বঙ্কিম এবং এলিসার মতই অপূর্ব গ্রীবার গড়ন।

ইতিমধ্যে এলিসাদের সঙ্গে ফ্লবেয়রের আবার যোগাযোগ হলো। প্রকাশকের দোকানে গিয়ে তিনি একদিন হানা দিলেন। ওদের বাড়ীতে তাঁর নেমন্তন্ন হলো। এলিসাকে যেন আরো সুন্দরী দেখাচ্ছে। ফ্লবেয়র প্রথম যখন তাকে দেখেন তখন তিনি ইস্কুলের বালক মাত্র। এখন পুরুষের কামনার চোখে এলিসার দেহসৌন্দর্য তাঁর কাছে আরো রমণীয় লাগলো। সহজেই তিনি ঐ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলেন। রোজই প্রায় এক সঙ্গে খেতে লাগলেন, বেড়াতে লাগলেন। তখনো ফ্লবেয়রের ভীরুতা কাটেনি। কারণ বহুদিন তিনি এলিসাকে প্রেম নিবেদন করেননি। অবশেষে যখন প্রেমনিবেদন করলেন তখন তাঁর আশংকা অনুযায়ী এলিসা রেগে গেল না, কিন্তু একথা জানাতে দ্বিধা করলো না যে, সে তাঁর বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই চায় না। এলিসার কাহিনীও বিচিত্র। ফ্লবেয়রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় সে মরিস স্লেসিঙ্গারের বউ ছিল না। সে আসলে এমিল জুডে বলে এক ভদ্রলোকের স্ত্রী ছিল। এমিল জুডে দেউলে হয়ে গেলে মরিস স্লেসিঙ্গার টাকাপয়সা দিয়ে তাকে সাহায্য করেছিল। এই দারিদ্র্যপীড়িত লোকটি স্ত্রীকে ছেড়ে ফ্রান্স ত্যাগ করে চলে যায়। সেই থেকে এলিসা, মরিসের সঙ্গেই বসবাস করতো। পরে তাকে অবশ্য সে বিয়ে করে।

ফ্লবেয়রের প্রেমনিবেদনে এলিসা হয়তো এই কৃতজ্ঞতার জন্যেই ইতস্তত করেছিল। তবু ফ্লবেয়রের বালক-সুলভ ব্যাকুলতা তাকে নাড়া দিয়েছিল। তাই ফ্লবেয়র তাকে একদিন ঘরে আসবার জন্যে রাজী করিয়েছিলেন। থরো থরো আগ্রহে ফ্লবেয়র অপেক্ষা করলেন। কিন্তু অবিশ্বাসিনী এলিসা এলো না। ফ্লবেয়রের জীবনীকারেরা তাঁর 'লেদু-কাসিয়োঁ সাঁতিসেতাল' থেকে ও কাহিনী টুকু উদ্ধার করেছেন। সম্ভবত এ কাহিনীর সত্যতা আছে। অন্তত এ কথা নিশ্চিত যে উত্তরকালে আর এলিসা তাঁর লীলাসঙ্গিনী হয়নি।

এর কয়েক বছর পরে মৃত ভগ্নী ক্যারোলিনের মর্মরমূর্তি তৈরী করানোর জন্যে ফ্লবেয়র প্যারিসে যান। সেখানে ভাস্করের স্টুডিও-তে এক মহিলা কবি—লুইসা কোলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। লুইসা কোলেৎ ছিলেন সেই ধরণের মহিলা সাহিত্যিক যাঁদের ধারণা যে নামজাদা ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ব্যক্তিগত সৃজনীশক্তির পরিপূরক।

এর ওপরে রূপের চেকনাইয়ের জোরে সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঐ মহিলা কবি। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই লুইসা কোলের সঙ্গে ফ্লবেয়রের প্রেম হয়ে গেল,—লুইসা কোলেৎ যদিও তখন ভিক্তর কুজোঁ নামে এক দার্শনিক ও রাজনীতিবিদের প্রেমিকা ছিলেন।

ভিক্তর তো রইলেনই। ফ্লবেয়র হয়ে উঠলেন জীবনের ঘনিষ্ঠতম নবীন আগন্তুক। দিনতিনেক পরে লুইসাকে চোখের জলে ভাসিয়ে ফ্লবেয়র বিদায় নিলেন। বাড়ীতে ফিরে সেরাত্রেই ফ্লবেয়র প্রেমিকার কাছে চিরাচরিত প্রেমিকের মত পত্রাবলী লিখলেন। বহু বছর পরে এদমে দ্য গ'কুরকে ফ্লবেয়র বলেছিলেন যে লুইসার প্রতি তাঁর প্রেম তীব্র ছিল। সর্বাকছুতেই অতিশয়োক্তি করা তাঁর অভ্যাস ছিল। কেননা, তাঁর চিঠি-পত্রে মোটেই এই প্রেমের তীব্রতা প্রকাশ পায়নি।

দশজনে যাকে চেনে এমন একজন মহিলাকে প্রেমিকা হিসেবে ঘোষণা করাতে হয়তো তাঁর অহংকার তৃপ্ত হতো। ফ্লবেয়র অন্যান্য কল্পরাজ্যের অধিবাসীদের মতই দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন। তাঁর মনে হতো কাছে পাওয়ার চাইতে দূরে থেকেই প্রিয়তমা প্রিয়তর হয়ে ওঠে।

সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হলেও এই কথা তিনি লুইসা কোলেৎকেও শুনিয়ে-ছিলেন। লুইসা চাইতো ফ্লবেয়র তাঁর সঙ্গে প্যারীতে এসে থাকুন। কিন্তু ফ্লবেয়রের জননী সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য এতই চিন্তাকাতর ছিলেন যে সন্তানের অদর্শন তাঁর পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। ফ্লবেয়রও তা জেনেশুনেই মাকে কষ্ট দিতে চাইতেন না।

লুইসা একবার ক্ষেপে গিয়ে ফ্লবেয়রকে এই প্রশ্ন করেছিল—"তুমি কি মেয়ে—যে তোমায় সকল সব সময় চোখে চোখে রাখে?" বলাবাহুল্য মৃগী-রোগী ফ্লবেয়রকে পরিবারের সকলে চোখে চোখে রাখারই চেষ্টা করতো।

লুইসাকে তাই অনেক জ্বালা পেতে হয়েছে। লুইসা একবার তাঁকে চিঠি লেখে—'তোমার প্রেম—প্রেম নয়; অন্তত আর যাই হোক তোমার সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে তা বিরাজ করে না।'

ফ্লবেয়র এর উত্তর দিয়েছিলেন—"জানতে চাও, আমি তোমায় ভালবাসি কি-না? যতখানি পারি, তোমায় ভাল-বাসি; তার অর্থ প্রেম আমার জীবনে পরমতম নয়, তার স্থান দ্বিতীয়।" এরকম দিলখোলা স্পষ্ট উত্তর দিতে ফ্লবেয়র গর্ব অনুভব করতেন।

লুইসার অধীরতার জন্যে ফ্লবেয়র মাঁত-এর একটি হোটেলে দুজনের

সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করেন। যেখানে লুইসা প্যারী থেকে এবং তিনি রুয়ে থেকে এসে দুপুরটা একসঙ্গে কাটিয়ে স্ব-স্ব গৃহে রাত্রির মধ্যেই ফিরে যেতে পারবেন। কিন্তু এতে লুইসা প্রথমে রাজী হয়নি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা স্বামী ও কন্যাকে হারিয়ে একটা অবলম্বন খুঁজছিল লুইসা। সে চেয়েছিল ঘর বাঁধতে।

এই ঘর-বাঁধার ব্যাপারটাকে ত্বরান্বিত করার তাগিদে লুইসার জন্যেই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘনিয়ে এলো। দু'বছরের মিলনকালের মধ্যে পরস্পরের সাক্ষাৎ এইভাবে ঘটেছিল মাত্র ছ'বার।

ইতিমধ্যে ফ্লবেয়র সাহিত্যকর্মে চূড়ান্তভাবে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। লেখার মাল-মশলা ও প্রেরণা সংগ্রহের জন্যে ইজিপ্ট, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, গ্রীস বন্ধুবর ম্যাক্সিমে দ্যু ক্যাঁপ-এর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

প্যারিসে ফিরে লুইসা কোলেতের সঙ্গে আবার দেখা হলো। ইতিমধ্যে লুইসার স্বামী মারা গেছে। পূর্বতন প্রেমিক ভিক্তর তাকে অর্থসাহায্য বন্ধ করেছে। চেষ্টা সত্ত্বেও লুইসার লেখা নাটকটিও কোনো কোম্পানী অভিনয় করার জন্যে নিচ্ছে না। চিঠি-পত্র লেখালেখি আবার শুরু হলো। ফ্লবেয়র প্যারীতে ছুটলেন। পুরাতন প্রেম আবার পল্লবিত হলো। চল্লিশে পা দিয়ে লুইসা কিঞ্চিৎ বুড়িয়ে এলেও তার আন্তরিকতা ফ্লবেয়রের হৃদয় স্পর্শ করেছিল বলেই হয়তো তা সম্ভব হয়েছিল। লুইসার চিঠি-পত্র নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ফ্লবেয়রের চিঠি-পত্র যা পাওয়া গেছে তার থেকে লুইসার প্রতি তাঁর স্নেহপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ফ্লবেয়র স্পষ্ট কথা বলতে গর্ব অনুভব করতেন। তাই লুইসা কবিতা লিখে পাঠাতো আর ফ্লবেয়র পাঠাতেন তার নিষ্করুণ সমালোচনা। ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিলো যে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য। সেই বিচ্ছেদ ত্বরান্বিত করায় পুরোপুরি লুইসার হাত ছিল। সে সহসা চতুর্দিকে রটিয়ে দিলো যে ফ্লবেয়র তাকে বিয়ে করবেন।

পাঁচ কান হতে হতে কথাটা ফ্লবেয়রেরও কানে পৌঁছালো। এরপরেই এক সাক্ষাৎকারে তীব্র কলহের মধ্যে ফ্লবেয়র তাকে জানিয়ে দিলেন যে এইখানেই সব শেষ। এরপরেও লুইসা ফ্লবেয়রের বাড়ীতে গিয়েছিল; বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে ফ্লবেয়র তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। লুইসাও প্রতিশোধ নিয়েছে একটি উপন্যাস লিখে যার মধ্যে ফ্লবেয়রের চরিত্র কুৎসিত ভিলেনে পরিণত হয়েছে।

দুজনের চিঠিপত্র থেকে 'মাদাম বোভারী' উপন্যাস লেখার বিষয় জানা যায়। ফ্লবেয়র জানিয়েছেন এই লেখায় তিনি দিনরাত তন্ময় হয়ে রয়েছেন। কিন্তু লেখা এগোচ্ছে বড় ধীর মন্থর গতিতে।

ফ্লবেয়রের প্রথমজীবনের লেখা প্রায় সবই আত্মকেন্দ্রিক। সেইসব উপন্যাসের নায়ক ফ্লবেয়র স্বয়ং। প্রথম পর্যায়ের লেখাকে তাই লেখকের আত্মজীবনী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

'মাদাম বোভারী' লেখার সময় ফ্লবেয়র 'অবজেকটিভ' হতে পেরেছিলেন, যদিও নিজেকে এই উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ কেন সরিয়ে নিতে পারেননি, সেকথা পরে আলোচনা করছি।

তবুও তাঁর লক্ষ্য ছিল যেমনটি দেখে যাচ্ছেন, ঘটনাকে সেইভাবেই তুলে ধরা—কোনো ঘটনা বা চরিত্রের প্রতি ব্যক্তিগত পক্ষপাত না জানিয়ে। কারোকে তিনি প্রশংসাও করবেন না, দোষও দেবেন না। ব্যক্তিচরিত্র সৎ হোক কি অসৎ হোক, তারা তাঁকে খুশি করুক কিংবা ক্রুদ্ধ করুক এবং কোনো চরিত্র তাঁর মনে যতই ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্রেক করুক না কেন তিনি মনের ভাব মনে গোপন করে নির্লিপ্ত দ্রষ্টার মত যথাযথ ঘটনার বিবরণ পাঠকের সামনে তুলে ধরবেন। কিন্তু উপন্যাস পড়ে পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ফ্লবেয়র উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা রাখতে সক্ষম হননি।

মাদাম বোভারী থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত রাখা ফ্লবেয়রের পক্ষে একেবারেই সম্ভব হয়নি। নির্বোধের নির্বুদ্ধিতা, ফরাসী অভিজাত সমাজের স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতা এবং মাঝারিত্বের প্রতি অসহ্য বিরক্তি, ঘৃণায় ও ক্রোধে ফ্লবেয়র ফেটে পড়েছেন। জীবন তাঁকে অনেক বঞ্চনা করেছে। নিজের স্বাস্থ্যহীনতায় তাঁর স্নায়ু জর্জর হয়েছে। জীবনের বঞ্চনায় সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতি তাঁকে আরো নির্মম নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। স্বাস্থ্যহীনতা তাঁর যে আশাকে চুরমার করে দিয়েছে, বাস্তবে স্বপ্নের যে মানসীর তিনি সন্ধান পেলেন না, এমা বোভারীর কাহিনীতে সেই ব্যক্তিগত বঞ্চনা ও স্বপ্নভঙ্গের প্রতিশোধ চরিতার্থ করেছেন। এই উপন্যাসের প্রায় চরিত্রই তাই নীচ, নির্বোধ, তুচ্ছ এবং অশ্লীলভাবে কুৎসিত। ফ্লবেয়রের একটা শহরে স্নেহ মমতা-করুণার হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন একা লোকও খুঁজে পেলেন না যে এমা-কে একটু হাত বাড়িয়ে দেয়—একটু সাহায্য করে—একথা ভাবতে আশ্চর্যই লাগে।

'মাদাম বোভারী'র গল্পও বাস্তব ভিত্তিক। ফ্লবেয়রের বন্ধু বুইলে এ কাহিনী ফ্লবেয়রকে সম্ভবত বলে ছিলেন। য়ুজেন দ্য লামার নামে রুয়ের হাসপাতালে একজন ডাক্তার ছিলেন কাছাকাছি ছোট মফস্বল শহরেও তাঁর পশার ছিল। প্রথম স্ত্রীবিয়োগের পর সে ফের প্রতিবেশী চাষীর সুন্দরী যুবতী মেয়েকে বিয়ে করে। মেয়েটি খুবই প্রাণচঞ্চল এবং ভীষণ খরচে ছিল। নির্বোধ স্বামীর সাহচর্যে সে হাঁপিয়ে ওঠে, বহু প্রেমিকের সঙ্গে প্রেম করে। পোশাকে-আশাকে অবস্থাতিরিক্ত খরচের জন্যে দেনার দায়ে সে অস্থির হয়ে ওঠে। মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে সে বিষ খায়। দ্য লামার আত্মহত্যা করে। এই গল্পই ফ্লবেয়রের উপন্যাসের মৌল প্রেরণা। একজন প্রেমিকও অভিজাত সমাজে পাওয়া গেল না যে এমা-কে দেনার দায় থেকে উদ্ধার করে এই মর্মান্তিক পরিণতি থেকে তাকে বাঁচায়। মাদাম বোভারী উপন্যাসকে তাই ফরাসী সমাজের নীচতা ও স্বার্থপরতার কাহিনী বললেও অত্যুক্তি হয় না। ট্রাজেডি না বলে দুর্ভাগ্যের, দুর্ঘটনার কাহিনী বলতে ইচ্ছা হয়।

এমা বোভারী ঘটনাবিস্তারে পাঠকের সমস্ত সহানুভূতি কেড়ে নেয়। ফ্লবেয়র তাকে সমস্ত দরদ ঢেলে সৃষ্টি করেছেন। এমা-ই তাঁর স্বপ্নলোকের মানসী এবং বলাবাহুল্য পরকীয়া। তার স্বপ্ন চুরমার হওয়ার জন্যে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কুৎসিৎ স্বার্থপর সমাজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে ফ্লবেয়র বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন—"I accuse!"

নিঃস্বার্থ ও আন্তরিকভাবে যে মহিলাকে তিনি সারাজীবন ভালোবেসে গিয়েছেন তার নাম এলিসা স্লেসিঙ্গার। তাঁর মনের সমস্ত আসন জুড়েই ছিল এলিসা। এক সন্ধ্যার আড্ডায় তোয়েফিল্ গতিয়ে ও গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর কৌমার্য অক্ষুণ্ণ আছে। তিনি কোনো মহিলার সঙ্গেই প্রকৃতভাবে ঘনিষ্ঠ হননি। যে মহিলাদের সঙ্গে তিনি বসবাস করেছেন তারা শুধু সেই একজনের কাছে পৌঁছানোর সিঁড়ি—যে তাঁর স্বপ্নলোকের মানসী। এলিসাই এই মানসী। এমা বোভারীর রূপান্তরে এলিসারই অন্তরঙ্গ উপস্থিতি—এমন অনুমানে হয়তো সত্যতা আছে।

কণাদ চৌধুরী

পুজো এলেই আমাকে দুঃখের ভারে, খরচের চাপে কুঁজো হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ শরৎকেই শ্রেষ্ঠ ঋতুর রাজমুকুট পরিয়েছেন কিন্তু আমার কাছে সেই রাজমুকুটঘটিত শেক্সপীয়ার-বাক্যটিই একমাত্র সত্য। আনইজি লাইজ দি হেড ড্যাট উইয়ারস দি ক্রাউন'—ঋতুরাজ শরৎ সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই খাটে।

বাস্তবিক আমার পক্ষে আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দিত হওয়া শক্তই। পুজোতে আমি কলকাতায় তাই থাকতে পারি না—আমার সেই নিষ্প্রভ ঘরটাতেই পুজোর চারচারটে দিন বন্দী হয়ে থাকি এবং শৈশবের শারদীয়া স্মৃতিগুলিকে অতীতের বাক্স থেকে বার করে নাড়াচাড়া করি। মনে পড়ে মার পরিয়ে-দেওয়া জরিপাড় ধুতিটা সামলাতে সামলাতে সপ্তমীর সকাল থেকেই পাড়ার পার্কে হাজির হতাম। টুলুদার আমার ওপর বিশেষ নেকনজর থাকায় লাল সিল্কের একটি ভলেণ্টিয়ারের ব্যাজ দিতেন। বুকপকেটে সেপ্টিপিন দিয়ে আটকে 'মহিলা' 'পুরুষ' লেখা দড়ির বিষুবরেখায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আমাদের মত ছোটদের দাঁড়াতে দিত না টুলুদারা।

'সন্ধ্যের ভিড় তোরা সামলাতে পারবি না, সন্ধ্যেবেলা আমরা বড়রা ভলেণ্টিয়ারী করব। তাছাড়া তোরা কি এক প্যাণ্ডেলেই সমস্ত পুজো কাটিয়ে দিবি অন্য পাড়ার ঠাকুর দেখবি না?' আমাদের মধ্যে তবু কেউ কেউ বায়না করলে তাকে মিসিং স্কোয়াড অফিসে ডিউটি দেওয়া হত। সন্ধেবেলা করে, দাড়ি কামিয়ে, জামায় গন্ধ মেখে, সেজেগুজে টুলুদারা ভিড় নিয়ন্ত্রণ করত। মেয়েদের মধ্যে যারা ঠাকুরের আরতি দেখতে চাইত তাদের জন্যে হন্তদন্ত হয়ে জায়গা করে দিত। অবশ্য সে ঐ নটা পর্যন্তই। নটার পর আমাদের মধ্যে যাদের ঘুম পায়নি, খিদে পায়নি তাদের ওপরে প্যাণ্ডেলের আংশিক শাসনভার এসে পড়ত। টুলুদাদের আর দেখা যেত না অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেকের মতন। টুলুদাদের এই সাময়িক অন্তর্ধান পাড়ার বড়রা কিন্তু ভালো চোখে দেখতেন না। এই অন্তর্ধানবর্তী সময়ের মধ্যে নাকি তাঁরা টুলুদাদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে দেখেছেন। টুলুদাকে নাকি বিনুর বড়দা এক অষ্টমীর দিন লেকে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখেছেন। বিনুর বাবার সঙ্গে প্যাণ্ডেলের আর চারজন ছেলের হঠাৎ বাসের মধ্যে সামনাসামনি দেখা। ওদের নাকি চারজনেরই তখন চোখ লাল, মুখে গন্ধ। আমার মার ধারণা "ছোঁড়াগুলো নিশ্চয়ই প্রতিমার পেছনে হাঁস রেঁধে খায়, নইলে সেদিন ফল কাটতে গিয়ে প্রতিমার পেছনে স্টোভ আর সসপ্যান ছিল কেন!" কিন্তু দশমীর পর থেকে আর কোনোরকম বেচাল লক্ষিত হত না। পাড়ার দিলদরিয়া হারানদাদু এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম কটাক্ষে বলতেন—

—আহা বাছারা মরশুমে চারটে দিন একটু ফুর্তিফার্তা করবে না ত এত কষ্ট করে খাটছে কেন?

পাড়ার বড়ছেলেরা যখন প্যাণ্ডেলে মত্ত, পাড়ার প্রবীণেরা তখন তাসের আড্ডায়। মিনুদের বাড়িতে পুজোর চারদিন যেন তাসসুয় যজ্ঞ হত। সপ্তমীর সকাল আটটা থেকে শুরু হত, নাওয়াখাওয়ার জন্যে মাত্র এক ঘণ্টা বিশ্রাম, তারপর টানা চলত সেই রাত বারোটা, কোনো কোনো দিন একটা পর্যন্তও গড়াত খেলা। সঙ্গে সঙ্গে চলত চা, পান আর সিগারেটের ফরমাস। যে ঘরে খেলা হত তার দরজা-জানলা কিন্তু বন্ধ থাকত। আমরা উঁকিঝুঁকি মারবার চেষ্টা করে ধমক খেয়েছিলাম মনে পড়ে। কিভাবে খেলা হত জানি না, তবে অনেক লোক মিলেই খেলা হত, দরজার কাছে জুতোর ডাঁই

পেছনে ড্রপসিন পড়ে যাওয়া হতভম্ব নায়কের মতন...

লেগে যেত। এই প্রসঙ্গেও হারানদাদুর মন্তব্য ছিল—

—কি আর করবে, সারা বছর চাকরী করে, ব্যবসা করে টাকা আমদানির এমন নেশা হয়ে গেছে যে ছুটির দিনেও কামাই নেই! সত্যি 'টাইম ইজ মানি' ওরাই শিখেছে বটে!

কিন্তু ও'রা না-খেলেই বা কি করতেন জানি না! নতুন জামা কাপড় পড়ে সেজেগুজে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার বয়েস ও'দের পেরিয়ে গেছে, প্যান্ডেলে রাত জাগার স্বাস্থ্য এবং সখও কারো নেই। তাহলে কিভাবে কাটাবেন পুজোর ছুটির দিনগুলো? পুজোয় কলকাতার বাই'র যেতে হলে টিকিটের জন্যে, বাইরে থাকার ব্যবস্থার জন্যে যে তোড়জোড় করতে হয় সকলেই তত করিৎকর্মা হতে পারেন না। তাছাড়া অনেকেই চারপাঁচ দিনের বেশী ছুটিও পান না। অতএব ছুটির চারটে দিনকে তাসদিবস করে নিঃসঙ্গতাকে ঠেকাতে হয়।

কিন্তু আমার মত অনেকের শারদীয় নিঃসঙ্গতা কিছু দিয়েই ঠেকাবার নয়। নেহাৎ সরকারী অফিসে চাকরী করি নইলে পুজোর লাল তারিখগুলোকে ওভার টাইমের কালিতে কালো করে ফেলতাম। অবস্থাপন্ন বন্ধুবান্ধবরা পুজোর ছুটিতে কেউবা ঘাটশিলা কেউবা শাহারানপুরে। অবস্থাপন্নদের মধ্যে যারা বাইরে যায়নি, সপরিবারে গাড়ি করে দিনরাত্রি দুর্গা দেখছে। যারা অবস্থাপন্ন নয় অথচ অবিবাহিত একমাত্র তাদেরই এটা 'মরশুমের চারদিন'। পুজোর জন্যে তাদের বান্ধবীদের অভিভাবক'দের শ্যেনদৃষ্টি শিথিল, যদচ্ছ তারা বাইরে বেরোচ্ছে ফলে আমার বন্ধুদেরও আমার সঙ্গে থাকবার ফুরসত নেই। তারা সবাই সন্ধ্যার লেকে, দুপুরের ইডেনে অথবা সিনেমা হলের অন্ধকারে ব্যস্ত। আমার মত যারা দ্বাদশবর্ষব্যাপী বিবাহিত তাদেরও মেজাজ তিরিক্ষি। এবছর 'রু-কুইন' শাড়ি হয়নি বলে তাদের গিন্নীর মুখ যেন চিমনীর তলা—বাক্যালাপ বন্ধ। মৌন স্ত্রীকে নিয়ে প্রতিমা দেখে যেটুকু সময় পাচ্ছে মানভঞ্জনে ব্যয় করছে।

অতএব আমার আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমিও ভাবছি তাসের দেশে যাব। না, তাসের আড্ডায় না, আর্থিক তাস খেলা আমার পক্ষে সম্ভব না। পুজো এ্যাডভান্স যা পেয়েছি কাপড়-চোপড় কিনতেই শেষ। অক্টোবর মাসের মাইনের কিছু টাকাও ওর মধ্যে ঢুকে গেছে তার ওপর সামনের মাস থেকে

এক অষ্টমীর দিন লেকে একটি মেয়ের সঙ্গে...

বেতন কর্তন। ভেবে দেখেছি আমার যখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই তখন তাসটাও আমাকে আমার নিজের সঙ্গেই খেলতে হয়। প্যান্ডেল থেকে ভেসে-আসা ঢাকের আওয়াজ শুনতে শুনতে বিছানায় তাস বিছিয়ে পেশেন্স খেলে যাই—পুজোর রমণীয় দিনগুলি। দৈবাৎ যদি কখনো সখনো বাড়িতে কোনো তরুণ লেখক-বন্ধুর আবির্ভাব ঘটে এক-মাত্র তখনই পুলকিত হই, নিঃসঙ্গতা বোধ কাটে। কারণ পুজোতে, আমি লক্ষ্য করেছি, আমার চেয়েও নিঃসঙ্গ আমার নবীন লেখক-বন্ধুরা। বিখ্যাত শারদীয়া সংখ্যাগুলিতে তাদের প্রত্যেকেরই লেখার আকুল ইচ্ছে। সেই জুলাই মাসেই কেউ কেউ ইণ্ডিতিনেক কবিতা, তিন পাতার গল্প পাঠিয়েছিলেন। উক্ত পত্রিকাগুলি বিজ্ঞাপন বেরোতেই নিঃসঙ্গ হলেন খানিকটা, নিঃসংশয় হবার জন্যে অবশ্য পত্রিকা বেরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। মহালয়ার পর বড় বড় পত্র পত্রিকা-গুলি বেরিয়ে যাবার পর প্রায়ই কোনো না কোনো লেখক-বন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হয় পত্রপত্রিকার স্টলে। কেমন পেছনে ড্রপসিন পড়ে-যাওয়া হতভম্ব নায়কের মতন রঙচঙে পুজো সংখ্যাগুলির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন। দুতিনবার ডাকলে তবেই সাড়া পাওয়া যায় তাঁর। পত্রিকার জলসায় নীরব কবিকে তখন কি যে নিঃসঙ্গ দেখায়। ঐ নিঃসঙ্গতা বোধ হয় অপরের যে কোনো শোককেই ভুলিয়ে দিতে পারে। আমার শারদীয়া শোকও।

নান্দীকর

আজকের কথা ঃ—

বিদেশের চিত্রনাট্যকার ঃ

গেল হপ্তায় 'কথা-সাহিত্য ও চিত্রনাট্য' প্রসঙ্গে আমি আমাদের বাঙলা দেশের চিত্রনাট্যকারদের নিয়েই প্রধানতঃ আলোচনা করেছিলুম। এবারে একটু বিদেশের দিকে তাকানো যাক। আমাদের দেশে যেমন বর্তমানে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, অসিত সেন, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রভৃতি এবং বিগত যুগে দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রভৃতি খ্যাতিমান পরিচালক নিজের ছবির চিত্রনাট্য নিজেই লিখে থাকেন বা থাকতেন, ঠিক সেই রকম রীতি বর্তমান ইয়োরোপে, বিশেষ করে 'নিউ ওয়েভ'-গোষ্ঠীভুক্ত পরিচালকদের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও, হলিউডের ধারা একেবারেই অন্য ধরনের। ওখানে চিত্রনাট্য লেখবার জন্যে শুধু যে অন্য লেখকই নিযুক্ত করা হয়, তাই নয়; ওখানকার বড়ো বড়ো স্টুডিওতে কাহিনী এবং চিত্রনাট্য রচনা-বিভাগ (স্টোরি অ্যান্ড স্ক্রিপ্ট ডিপার্টমেন্ট) নামে বহু কর্মী-সমন্বিত একটি বিভাগই চালু আছে। ঐ বিভাগের কাজ হচ্ছে মাত্র চলচ্চিত্রের উপযোগী কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করাই নয়, প্রকাশিত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে চলচ্চিত্রোপযোগী কাহিনী অন্বেষণ করা এবং চিত্রায়ণের জন্যে যে-কাহিনীর স্বত্ব ক্রয় করা হয়েছে, প্রযোজকের নির্দেশে তাকে চলচ্চিত্রের কাঠামোয় রূপান্তরিত করা। এই বিশেষ বিভাগটিতে যাঁরা মাস-মাহিনায় বা বিশেষ চুক্তিতে কাজ করেন, তাঁরা সাহিত্য এবং সিনেমা—এই উভয় বিদ্যাতেই পারদর্শী বলে ধরে নেওয়া হয়। এবং দেখতেও পাওয়া যায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বহু নাম-করা ও উঠ্‌তি সাহিত্যিকই কোনো-না-কোনো ফিল্ম স্টুডিওর 'কাহিনী বিভাগের' সঙ্গে জড়িত আছেন। ক্রিস্টোফার ফ্রাই, রবার্ট বোল্ট, টেনিসি উইলিয়মস্, আর্থার মিলার, লিলিয়ান হেলম্যান, জন ওস-বোর্ণ, পিটার উস্টিনভ, ইন্‌গ্‌মান বার্গ-ম্যান প্রভৃতির নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

যেদিন থেকে চলচ্চিত্র মুখর হয়ে উঠেছে, সেদিন থেকেই কথা-সাহিত্যিকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন হলি-উডের প্রযোজকরা। অবশ্য কথা-সাহিত্যিকরা চিত্রনাট্যকার হিসেবে প্রায় বরাবরই প্রযোজক এবং কখনও কখনও পরিচালকের নির্দেশ মতোই কাজ করে

'প্রেয়সী' ও অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের বিশিষ্ট ভূমিকায় তনুশ্রী গাঙ্গুলী ফটো ঃ অমৃত

দেয়ানেয়া চিত্রে তনুজা

এসেছেন। কারণ এটা ত' জানা কথা, কথা-সাহিত্যিক চিত্রনাট্যকারের সাহায্য ছাড়াও চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে এবং ছবি যতদিন শব্দহীন ছিল, ততদিন তাই-ই হয়ে এসেছে। সবাক বা নির্বাক, যাই হোক না কেন, চলচ্চিত্র আসলে গতিশীল চিত্র এবং এর প্রধান অবলম্বন হচ্ছে 'অ্যাকশন'—ক্রিয়াসমন্বিত ঘটনাপ্রবাহ। নির্বাক যুগে ছবির মধ্যে পাত্র-পাত্রীদের অংগভংগীর অর্থ জ্ঞাপন করবার জন্যে যে 'ক্যাপ্‌সন' বা বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যাসংবলিত সংলাপ দর্শকদের চোখের সামনে মাঝে মাঝে ফুটে উঠত, তা' রচনা করবার জন্যে বিশেষ কোনো কথা-সাহিত্যিকের ডাক পড়ত না, স্টুডিওর কর্মীরাই কাজটা চালিয়ে নিতেন। এছাড়া নির্বাক ছবির আদর্শ ছিল যতটা সম্ভব কম 'ক্যাপ্‌সন' ব্যবহার করা; 'সান রাইজ' ছবিতে ক্যাপ্‌সন ছিল মাত্র আট-দশটি এবং এমিল জেনিংস্ অভিনীত 'লাস্ট লাফ' ছবিতে একটিও ক্যাপ্‌সন ছিল না।

চলচ্চিত্র যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বেশী করে তার দিকে আকৃষ্ট করবার জন্যে শেক্সপীয়র, ডিকেন্স, ডুমা, কনান ডয়েল, জোলা প্রভৃতি সাহিত্যিকের বিখ্যাত রচনাবলীকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করতে শুরু করল, তখন থেকেই প্রযোজকরা মূল গ্রন্থ থেকে চলচ্চিত্রোপযোগী সংস্করণ প্রস্তুত করবার কাজে সাহিত্যিকদের পরামর্শ গ্রহণ করতে লাগলেন। অবশ্য সাহিত্যিকরা যে-পরামর্শ দিতেন, তাই যে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হত, এমন কথা বলা যায় না; এক্ষেত্রে চূড়ান্ত রায় দেবার মালিক ছিলেন প্রযোজক নিজে বা প্রযোজক-নিযুক্ত পরিচালক। এ-কথা প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, আজ পর্যন্ত কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'ক্ল্যাসিক' সাহিত্য-গ্রন্থের চিত্ররূপ মূল গ্রন্থের সমগ্র সৌন্দর্যকে বিকশিত করতে পারেনি। এবং চলচ্চিত্রে বহু গ্রন্থেরই অল্পবিস্তর বিকৃতি ঘটেছে; কোনো কোনোটির আবার এমন বিকৃতি ঘটানো হয়েছে যে, মূল গ্রন্থটিকে মাত্র রচয়িতা, চরিত্র ও গ্রন্থটির নাম ছাড়া অন্য কিছু দিয়েই চেনা যায় না।

আমেরিকায় এবং অনেক সময়ে ইংলণ্ডেও যখনি কোনো নতুন লেখক তাঁর দুই-একখানা উপন্যাস বা নাটক লিখে নাম করেন, তখনি তাঁকে স্টুডিওর কর্তৃপক্ষ টোপ ফেলে গাঁথবার চেষ্টা করতে কসুর করেন না। প্রচুর অর্থ দিয়ে এই সব নতুন সাহিত্যিককে হলিউডের 'কাহিনী বিভাগে'র খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়। এ'রা মাসের পর মাস প্রযোজকের নির্দেশের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকেন এবং যখন নির্দেশ-মাফিক কোনো কাহিনী রচনা করেন বা কোনো জনপ্রিয় রচনার চিত্ররূপ সত্যিই দেন, তখন প্রায়ই সখেদে লক্ষ্য করেন যে, তাঁর রচিত কাহিনী বা চিত্ররূপ নিয়ে প্রযোজক কয়েকদিন ধরে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ করেছিলেন, অকস্মাৎ এবং অকারণেই সেই উৎসাহে এমন ভাঁটা পড়েছে যে, তাঁর রচনা নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্যই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। মাসের পর মাস মোটা অঙ্কের চেক তাঁর সাহিত্যবুদ্ধিকে নিয়মিতভাবে বিদ্রূপ করে যায়।

বর্তমানে কথা-সাহিত্যিক চিত্রনাট্যকারের মর্যাদা এবং প্রভাব কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও হলিউডি চলচ্চিত্র প্রযোজনার বিরাট চক্রযন্ত্রে তিনি আজও একটি প্রয়োজনীয় অথচ নগণ্য স্ক্রু বা বল্টুর সামিল হয়েই রয়েছেন। এই স্ক্রু বা বল্টুটি নইলে সমস্ত যন্ত্রটাই বিকল হয়ে পড়বে; কিন্তু তারকারাজি, পরিচালক, সংগীত-পরিচালক, প্রযোজনা-রূপদাতা (প্রোডাকসান ডিজাইনার) এবং প্রযোজক প্রভৃতি বড়ো বড়ো বেগে ঘূর্ণমান চক্রের জলুসের কাছে ঐ স্ক্রু বা বল্টুকে চোখেই পড়ে না। চিত্রনাট্যকার হিসেবে তাঁর শিল্পগত স্বাধীনতা যদিও আজ ঢের বেশী মাত্রায় স্বীকৃত, তবু প্রযোজনার চক্রযন্ত্রে তিনি বন্দী স্ক্রু বা বল্টু মাত্রই হয়ে আছেন আজও।

আজ থেকে প্রায় বছর ত্রিশেক আগে যখন বার্ণার্ড শ' বা এইচ জি ওয়েলস্‌এর মত প্রতিভাধর সাহিত্যিক চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, তখন চলচ্চিত্র-জগতে রীতিমত একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল এবং আশা জেগেছিল, এই ধরণের সাহিত্য-প্রতিভা যদি সত্যি সত্যিই অনন্যমনা হয়ে এই শিল্পটির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে চলচ্চিত্রের শৈল্পিক সৃষ্টিধর্মিতা একটি নতুন দিগন্তের সন্ধান পাবে। কিন্তু হলিউড চলচ্চিত্র-জগতের একচ্ছত্র সম্রাটেরা হয়ত তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় এই আশাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করলেন। তাই আজও চলচ্চিত্রের লেখককে ছায়ারূপেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে। আদেশ করবার জন্যে নয়, হুকুম তামিল করবার জন্যেই তাঁর জন্ম। যেখানে দেখা গেছে, তাঁকে কর্তৃত্বের আসন দেওয়া হয়েছে, সেখানেই তাঁর প্রণীত সংলাপ চিত্রকে কোণঠাসা করে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছে; তিনি ভুলে যান, দর্শক ছবি দেখতে আসে,

'উত্তরফাল্গুনী'র দৃশ্যগ্রহণ চলাকালীন সময়ে গৃহীত চিত্রে সুচিত্রা সেন ও আরো কয়েকজন। ফটো : অমৃত

শুনতে আসে না। অতএব চিত্রনাট্যকারের বিশেষ করে সংলাপ-রচয়িতাদের স্থান সব সময়েই প্রযোজক ও পরিচালকের অধীন থাকাই বাঞ্ছনীয়।

চিত্র সমালোচনা

উত্তর ফাল্গুনী (বাঙলা) : উত্তমকুমার ফিল্মস্ প্রাঃ লিমিটেড-এর নিবেদন; ৩,৬২৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : অসিত সেন; কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত; চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়; আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত; চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা; শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল ও সুজিত সরকার; সঙ্গীত-গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প সম্পর্কিত উপদেশ : প্রীতিময় সেন; শিল্পনির্দেশনা : রামচন্দ্র সিন্ধে ও সুজিত দাস; সম্পাদনা : তরুণ দত্ত; রূপায়ণ : সুচিত্রা সেন, ছায়া দেবী, সীতা মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, রাজলক্ষ্মী (বড়), বিকাশ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ চক্রবর্তী, জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ১১ই অক্টোবর, শুক্রবার থেকে রূপবাণী, ভারতী, অরুণা এবং অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রীর জীবন অতিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা সাহিত্যে এবং জীবনে অগণিতবার ঘটেছে এবং চলচ্চিত্রেও তার প্রতিফলন বহুবারই দেখা গেছে। কিন্তু ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত "উত্তর ফাল্গুনী" কাহিনীর স্বামী-দেবতা রাখাল ভট্টাচার্য নিতান্তই অর্থলোভে নিজের সুন্দরী স্ত্রী দেবযানীকে অপরের লালসাবহ্নিতে আহুতি দিতে চেয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, তাকে অতি সাধারণ ঘটনা না বলে অতি অসাধারণ আখ্যাতেই ভূষিত করা সংগত। এবং এই অতি অসাধারণ পরিস্থিতিই দেবযানীকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই আত্মঘাতিনী হবার সঙ্কল্প নিয়ে গৃহত্যাগে বাধ্য করেছিল। অবশ্য সঙ্কল্প শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হ'তে পারেনি; চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়বার পূর্ব মুহূর্তে দেবযানী যার কাছ থেকে বাধা পেল, সে হচ্ছে লক্ষ্ণৌ শহরের নামকরা বাঈজী মীনাবাঈ। মীনাবাঈ নিজে যত্ন ক'রে দেবযানীকে পাকা গাইয়ে ক'রে তুলল; ক্রমে দেবযানী হয়ে উঠল প্রখ্যাতা মুজ্‌রোওয়ালী পান্নাবাঈ। গানে পরিতৃপ্ত হয়ে ধনীরা তাকে প্রচুর অর্থের উপঢৌকন দেয়। ভালোবাসা তার জীবন থেকে মুছে গেছে; কুমারী জীবনে যে তার দয়িত ছিল, সেই মনীষ আজ তার থেকে কত দূরে! এখন তার তৃষিত জীবনের একমাত্র অবলম্বন তারই আত্মজা সুপর্ণা—তাকে স্নেহ ভালোবাসায় ভরিয়েই তার অলস মুহূর্তগুলি রূপেরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। কিন্তু দীর্ঘ চার পাঁচ বছর বাদে আবার তার জীবনে দুষ্ট গ্রহের মতো উদয় হ'ল রাখাল ভট্টাচার্য। সে তার রোজগেরে স্ত্রীর কাছ থেকে বারংবার অর্থ আদায় করে স্ত্রী হিসেবে তাকে দাবি করবার ভয় দেখিয়ে। কন্যা সুপর্ণাকে দেখে তার পিতৃহৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্নেহের উদ্রেক হয় না; তাকে কেড়ে নেবার মিথ্যা ভয় দেখিয়ে সে আরও বেশী অঙ্কের টাকা আদায়ের ফন্দী আঁটে। দেবযানী মনস্থির ক'রে ফেলল; সকল স্নেহের বন্ধনকে নির্মমভাবে কেটে

ফেলে সুপর্ণাকে সে ভর্তি ক'রে দিয়ে যায় ক্রীশ্চান মিশনারী মাদার মার্মিনের হোমে। নিতান্ত আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যায় মনীষের সঙ্গে; মনীষ এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার। বাঈজী পান্নাবাঈ দু'এক কথায় মনীষকে এড়িয়ে যখন বিদায় নেয়, তখন বন্ধু মিঃ সোমের কাছ থেকে মনীষ জানতে পারে, দেবযানী এখন লক্ষ্ণৌয়ের পান্নাবাঈ। শুনে সে জ্বলে ওঠে এবং মিথ্যার আশ্রয়ে দেবযানীকে বাড়ীতে আনিয়ে তাকে চরম অপমান করতে উদ্যত হয়। কিন্তু দেবযানীর কাছ থেকে তার বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী শুনে যখন তার মন সহানুভূতিতে ভ'রে ওঠে, তখন দেবযানী তার একমাত্র আত্মজা সুপর্ণার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্যে তা'কে ব্যাকুল আবেদন জানায়। মনীষ এ আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারে না। তারই একান্ত যত্নে সুপর্ণা ধীরে ধীরে কনভেন্টের বিদ্যাভ্যাস সমাপ্ত ক'রে ইংলন্ড থেকে ব্যারিস্টার হ'য়ে আসে। মনীষ অচিরেই আবিষ্কার করেন, বিলাতে থাকতেই সুপর্ণা তার সতীর্থ ইন্দ্রনীল চৌধুরীর সঙ্গে একটি প্রীতির সম্পর্ক বাধিয়ে ফেলেছে। দেবযানী দূরে থেকে গোপনে নিজ কন্যা সুপর্ণা এবং ইন্দ্রনীল দুজনকেই দেখে এবং দূরে থেকেই তার অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ তাদের ওপর বর্ষণ করে। সুপর্ণার সঙ্গে ইন্দ্রনীলের বিবাহ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন, এই যখন দেবযানীর মনোভাব, এমন সময়ে শেষবারের মতো তার আশার অট্টালিকাকে ভূমিস্যাৎ করবার জন্যে আবির্ভূত হল রাখাল ভট্টাচার্য এবং দাবি করে বসল বেশ কয়েক হাজার টাকা। দেবযানী ঘৃণাভরে তার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করল এবং রাখাল ভট্টাচার্যের সকল দুরভিসন্ধিকে স্তব্ধ করবার জন্যে তাকে রিভলভারের গুলীর আঘাতে হত্যা করল। এবং নিজে টেলিফোন করে পুলিশ ডেকে জানাল, সে হত্যাকারী। নিদারুণ উত্তেজনার বশে অর্থপিশাচ ক্রূর প্রকৃতির স্বামীকে সে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, এই মর্মে তার পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে লাগলেন ব্যারিস্টার মনীষ রায়। সুপর্ণা বোঝে না, একজন নরহন্তা বাইজীর জন্যে তার কাকাবাবুর এত মাথাব্যথা কেন? যখন বুঝল, যখন জানল, তখন সে কি করেছিল, তারই নাটকীয় চিত্রণে ছবির পরিসমাপ্তি।

কাহিনীটি ঘটনাপ্রধান, ছকে বাঁধা এবং অভিনবত্ববর্জিত। কিন্তু এর চিত্ররূপ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে বিশেষ করে দুটি কারণে: এক, সামগ্রিক অভিনয় এবং দুই, সঙ্গীতাংশ। ছবিটির প্রতিটি চরিত্র এমন আশ্চর্যভাবে সুঅভিনীত হতে খুব কমই দেখা যায়। মা পান্নাবাই ওরফে দেবযানী এবং মেয়ে সুপর্ণা—এই উভয় চরিত্রে একই শিল্পীর আত্মপ্রকাশ আদৌ অপরিহার্য ছিল না; বরং মেয়ের কাছ থেকে মাকে ছবির প্রায় শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাখবার জন্যে এই দুটি চরিত্র দুই ভিন্ন শিল্পী দ্বারা অভিনীত হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হ'ত বলে মনে হয়। এই উভয় ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের অবতরণ অবশ্যই ছবির আকর্ষণকে বহু গুণে বর্ধিত করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাট্যনিপুণতার বহুমুখিতাকে প্রত্যক্ষ করবার একটি অসামান্য সুযোগ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে। বলতে বাধা নেই, কাহিনীবিন্যাসগুণে পান্নাবাই এবং সুপর্ণার চরিত্র দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের এবং এই উভয় ভূমিকাতেই শ্রীমতী সেন তাঁর অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেননি। শান্ত, মধুর, প্রপীড়িত দেবযানী এবং প্রাণোচ্ছল, বেগবতী নদীর ন্যায় সুপর্ণাকে তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়েছেন। মদ্যপ জুয়াড়ী রাখাল ভট্টাচার্য চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে কালীপদ চক্রবর্তীর অভিনয়গুণে। বিকাশ রায় মনীষের চরিত্রের প্রাণস্পন্দনের ফল্গুধারাকে আমাদের মধ্যে উৎসারিত করতে সমর্থ হয়েছেন; তাঁর অভিনয়ে উচ্ছ্বাস নেই, অনুভূতি আছে। তরুণ ব্যারিস্টার এবং সুপর্ণার প্রণয়ীরূপে দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের নাট-নৈপুণ্য প্রকাশের বিশেষ সুযোগ না থাকলেও তিনি ভূমিকাটির একটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ রূপদান করেছেন তাঁর সহজ-স্বচ্ছন্দ অভিনয়ের মাধ্যমে। লক্ষ্ণৌয়ের মীনাবাই-এর চরিত্রে ছায়াদেবী তাঁর অনবদ্য সহানুভূতিপূর্ণ অভিনয় দ্বারা আমাদের যতটা না মুগ্ধ করেছেন, তার চেয়ে শতগুণে বিস্ময়বিমুগ্ধ করেছেন তাঁর নিজের গাওয়া উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত পরিবেশন করে। এ ব্যাপারে সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে দিয়ে একটি অসাধ্য সাধন করেছেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। অপরাপর ভূমিকায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ লাহিড়ী), সীতা মুখোপাধ্যায় (মাদার), জহর গাঙ্গুলী (দেবযানীর বাবা), পাহাড়ী সান্যাল (জনৈক ব্যারিস্টার) প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

অভিনয়াংশের পরেই "উত্তর ফাল্গুনী"র উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এর সঙ্গীতাংশ। পরিচয়লিপির আবহ-সঙ্গীত থেকে একবারে গায়িকারূপী পান্নাবাই-এর কণ্ঠ-নিঃসৃত 'কোন্ তারাসে তুম্ খেল খেলতা হোলি' গানে এসে পড়া যে কি অসামান্য সঙ্গীত-কুশলতার পরিচায়ক, তা' বলে বোঝানো যাবে না; ছবি দেখে, কানে-শুনে বোঝবার জিনিস এই অভিনব ব্যাপার। পান্নাবাই-এর সঙ্গীত-সাধনা ছবির কিছুটা অংশ জুড়ে আছে এবং এর সবটাই ধ্রুপদী রাগসঙ্গীত। এই সঙ্গীত দর্শকের কানকে করে তৃপ্ত, মনকে দেয় ভরিয়ে এবং এর সঙ্গে 'আগুনের পরশমণি' গানখানি একটি বিশেষ মুহূর্তে বেদনাপূর্ণ আবহ সৃষ্টি করেও শেষ অবধি গিয়ে শেষ হয়েছে শিশুদের সমবেত সঙ্গীতে। আবহ-সঙ্গীত ছবির ভাব-প্রকাশক।

কলাকৌশলের অপর সকল দিক, বিশেষ করে ছবির চিত্রগ্রহণ একটি উচ্চমান রক্ষা করেছে; কিন্তু ছবির বহু স্থানে প্রতিধ্বনি (একো) সৃষ্টির চেষ্টায় শব্দপুনর্যোজনার কাজ ছবির রসসৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

সুচিত্রা সেনের যুগ্ম-ভূমিকায় অভিনয় এবং রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরসৃষ্টি "উত্তর ফাল্গুনীকে" জনপ্রিয় করে তুলবে অবিসংবাদিতভাবে।

মঞ্চাভিনয়

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' অবলম্বনে 'জ্যাঠামশায়' নাটকটি গত ৪ অক্টোবর নবাগত নাট্য সংস্থা কর্তৃক মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। নাট্যরূপ দিয়েছেন মৃণাল ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৃণাল ঘোষ, তমাল লাহিড়ী, শিবশঙ্কর ঘোষাল, তরুণ চক্রবর্তী, অনিল ঘোষ, গোবিন্দ গোস্বামী, সমীর চক্রবর্তী, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল দত্ত, অনিল দাস, রমেন বটি, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা ঘোষ। পরিচালনা করেছেন শ্রীতমাল লাহিড়ী। রূপসজ্জা—শক্তি সেন, আবহসংগীত—সপ্তক।

বর্তমান অভিনয়টি নানাবিধ কারণে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। কয়েকটি চরিত্রের অভিনয় উল্লেখযোগ্য সামগ্রিক অভিব্যক্তিতে। কয়েকটি জায়গায় চরিত্রানুযায়ী অভিনয় এমন শলথ হয়ে পড়েছিল যে চরিত্রগুলি দর্শক-মনে কোন প্রকার ছাপ রাখতে পারেনি। কিন্তু পুরন্দর (তমাল লাহিড়ী), জগমোহন (মৃণাল ঘোষ) ও পুরচরণের সমীর চক্রবর্তীর অভিনয়-দক্ষতায় নাটকটি কোথাও কোথাও রসঘন হয়ে উঠেছে। পরিচালক এবং আলোকসম্পাতকারী যদি আরও সচেতন হতেন তাহলে নাটকটি হয়ত সার্থক হতে পারত। 'নবাগত' নাট্যগোষ্ঠী যদি দীর্ঘ অনুশীলনের পর নাটক মঞ্চস্থ করেন তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত এতটা ব্যর্থতা তাঁদের স্বীকার করে নিতে হবে না।

বিবিধ সংবাদ

"সেতু"র ৫ম বর্ষে পদার্পণ :

১৯৫৯ সালের ৮ই অক্টোবর মহাসপ্তমী পূজার দিন বিশ্বরূপার "সেতু" নাটক তার যাত্রা শুরু করেছিল। এ বছরের ৮ই অক্টোবর নাটকখানির ৫ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে গেল শনিবার, ১২ই অক্টোবর বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে বিশ্বরূপার শিল্পী ও কর্মিবৃন্দ মঞ্চ থেকে দর্শকদের অভিবাদন করেন। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে রাসবিহারী সরকার একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণের মাধ্যমে বলেন : "...বিশ্বের দরবারে একটানা অভিনয়ের দীর্ঘ রেকর্ড সৃষ্টিকারী কয়েকটি নাটকের মধ্যে সেতু সগৌরবে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে। ......বাংলার নাট্যরসিকদের বর্ত-

বিনু গোয়ালার গলি

শর্মিলা ঠাকুর
সুমিত্রা দেবী
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

মান অবস্থার সুযোগে আন্তর্জাতিক থিয়েটার ইনস্টিটিউটে বাংলা নাটক প্রদর্শনের কথা চিন্তা করবার সময় এসেছে। ......নাট্যচেতনা সম্প্রসারণের জন্য নাট্যকৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। সে অনিবার্য প্রয়োজনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে নাট্য-সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র কলিকাতায় একটি রিসার্চ স্টেজ বা ল্যাবরেটরী মঞ্চ স্থাপনে সরকারের সাহায্য ও উদ্যোগ অতি প্রয়োজনীয়। ......বাংলার নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশে সাহায্য করার মানসে আমি বিশ্বরূপা থিয়েটারের পক্ষ থেকে ৫,০০০্ টাকা বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের হাতে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আশা করি, পরিষদের জ্ঞানীগুণীমণ্ডলী নাট্য উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যয় করবেন।......"

অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের পর "সেতু" নাটকের ৯৫১তম অভিনয় দর্শকরা প্রত্যক্ষ করেন। পাঠকদের জানা আছে, নায়ক তাপসের চরিত্রে বর্তমানে অবতীর্ণ হচ্ছেন প্রখ্যাত মঞ্চ ও চিত্রশিল্পী অসিতবরণ; "সেতু"র প্রথম যুগে ইনিই এই ভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলতেন মঞ্চের উপর। এ'র বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় জয়শ্রী সেন আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় করে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন।

ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভি[illegible] প্রযোজিত "এব লিঙ্কন ইন ইলিনয়েস"

রবার্ট এমেট শেরউডের বিখ্যাত [illegible] জনপ্রিয় নাটক "এব লিংকন ইন ইলি[illegible]নয়েস" ইউ এস আই এস-এর প্রযো[illegible]জনায় গেল শনিবার, ৫ই অকটো[illegible] স্থানীয় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ-হ[illegible] মঞ্চস্থ হয়েছিল। একটি মাত্র আর্চ[illegible] প্রতীক দৃশ্যসজ্জা হিসেবে ব্যবহার ক[illegible] নাটকটি অভিনীত হয় টম এ. নুনান্-[illegible] পরিচালনায় প্রধানতঃ দিল্লীর ইণ্ডো[illegible] আমেরিকান সোসাইটির সদস্যব[illegible] দ্বারা। মাত্র দশজন শিল্পী সমন্ব[illegible] গঠিত দলটি যেভাবে নাটকখানিকে ম[illegible] উপস্থাপিত করেছিলেন, তাতে তাঁ[illegible] নৈপুণ্যের প্রশংসাই করতে হয়। [illegible] লিঙ্কন এবং মিস মেরী টড-এর ভূমি[illegible] দুটিকে যথাক্রমে রামকুমার চোপরা এ[illegible] মিসেস জয় মাইকেল অত্যন্ত আ[illegible]রিকতা ও সাফল্যের সঙ্গে রূপা[illegible] করেছিলেন। এবং এ'দের স[illegible] উল্লেখ্য অভিনয় করেছিলেন শিো[illegible]

সিংহ (বিচারক গ্রীণ), রোশান শেঠ (নিনিয়ান এডওয়ার্ডস্), মিস কুসুম বল (অ্যান রুটলেজ) প্রভৃতি।

ইউনিটি থিয়েটারের "স্বর্ণকন্যা" ঃ

গেল বুধবার, ৯ই অক্টোবর রঙমহল রঙ্গমঞ্চে ইউনিটি থিয়েটার রবি দত্ত প্রণীত দেশাত্মবোধক নাটক "স্বর্ণকন্যা"-কে মঞ্চস্থ করেন। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন গৃহস্থ-বধূ কি অবলীলাক্রমে নিজের ভ্রান্ত স্বামীকে পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়ে দেশের নিরাপত্তায় সাহায্য করতে পারে, তারই অপরূপ নিদর্শন পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই নাটকখানির মাধ্যমে অতিসুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের দেশাত্মবোধক নাটকসমূহে 'জয়া'র মতো অবিস্মরণীয় চরিত্র বিরল। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় গীতা নাগ (জয়া), অলোক চট্টোপাধ্যায় (প্রবোধ), অরুণ চক্রবর্তী (প্রকাশ), রথীন দত্ত (প্রভাস), রাণু রায় (শান্তি) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছিলেন।

'মুখোশ'-এর বিশেষ অভিনয়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে "মুখোশ"-সম্প্রদায় প্রযোজিত "সাজাহান" নাটক নিয়মিতভাবে থিয়েটার সেণ্টার গৃহে অভিনীত হচ্ছে, এ-সংবাদ পাঠকদের নিশ্চয়ই নতুন করে দিতে হবে না। উত্তর কলিকাতার নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দের জন্যে এ'রা আসন্ন শারদীয়া পূজার মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী, ২৪, ২৫ ও ২৬-এ অক্টোবর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে "সাজাহান" অভিনয়ের আসর বসাবেন এবং এর মধ্যে শেষের দুদিন প্রত্যহ করে অভিনয় করবেন। নাম-ভূমিকায় যথারীতি নাট্যপরিচালক তরুণ রায়ই অবতীর্ণ হবেন।

জাজসম্রাট এলিংটন ঃ

বর্তমান আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম জাজ-শিল্পী ডিউক এলিংটন ও তাঁর সম্প্রদায় গেল ১৩ই অক্টোবর, রবিবার কলকাতায় এসে পেণছেছিলেন। ঐ দিনই সন্ধ্যায় বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, নিউইয়র্ক ছাড়বার পর তিনি ঐদিন প্রথম একটি যথার্থ সম্ভ্রান্ত হোটেলে তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজনে তাঁর রুচি অনুযায়ী 'স্টিক' খেতে পেয়েছেন। তাঁর মতে সংগীত শোনবার এবং উপভোগ করবার জন্যে সংগীতশাস্ত্র জানবার কোনই প্রয়োজন নেই। সংগীতের স্বরলিপির কড়াকড়ি তিনি পছন্দ করেন না: বলেন, ওতে বাদকের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। তিনি আরও বলেন, সংগীত পড়ে শেখার চেয়ে শুনে শেখা ঢের বেশী সহজ ও কাম্য; কারণ সংগীতের স্বর-প্রবাহ সহজেই মনে রাখা যায়। ১৪ই, ১৫ই ও ১৭ই তারিখে তিনি গ্র্যান্ড হোটেলের শেরাজাদীতে তাঁর জাজ-সংগীতের আসর বসিয়েছিলেন এবং ১৬ই সন্ধ্যা ৬টায় অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে তাঁর সংগীতের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন। কাল, শনিবার ১৯-এ অক্টোবর তিনি কলম্বো যাত্রা করবেন।

।। মহাকবি গিরিশচন্দ্র চিত্রাভিনয় ।।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে ইউনাইটেড নিউ অর্গানাইজেশন-এর উদ্যোগে 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' চিত্র-প্রদর্শনী ও বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রীজ্যোতির্বিকাশ মিত্র মহাশয়। তিনি তাঁহার ভাষণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভের বিভিন্ন বাধা বিপত্তির কথা উল্লেখ করেন।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি দেশের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে শিক্ষাসমস্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি

যেখানে এইরূপ সেখানে শিক্ষাসমস্যার ন্যায় মহা সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারের সঙ্গে অগ্রণী হওয়া একাধারে যেমন প্রশংসনীয়, অপরদিকে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও সেই কাজে অবিচলিত থাকা অটুট মনোবল ও অসীম সাহসিকতার পরিচায়ক। তিনি এই সঙ্ঘের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেন।

মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি তাঁর প্রধান অতিথির ভাষণে এই সঙ্ঘের কর্মীদের ন্যায় প্রতিটি যুবককে সেবাধর্মে অগ্রণী হতে আহ্বান জানান।

পরিশেষে সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে এবং উপস্থিত সুধীজনকে সঙ্ঘের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ইউনাইটেড নিউ অর্গানাইজেশনের পুরস্কার বিতরণ উৎসবে বক্তৃতা দিচ্ছেন শঙ্করদাস ব্যানার্জি। বাঁ দিকে ও ডান দিকে বসে আছেন সুধীরচন্দ্র ঘোষ, চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি ও জ্যোতিবিকাশ মিত্র।

কলকাতা

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার 'কাঞ্চনকন্যা' আগামী চব্বিশে অক্টোবর উত্তরা, পূরবী ও উজ্জলা চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়। সুখেন্দু চক্রবর্তী পরিচালিত এ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, পাহাড়ী সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, শান্তি দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, কুমার রায়, ইলা চক্রবর্তী, বঙ্কিম ঘোষ ও সুমিতা সান্যাল। সঙ্গীত, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা এবং শিল্প-নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে ভি. বালসারা, দেওজীভাই, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীল সরকার। শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স এ ছবির পরিবেশক।

কণিকা মজুমদার
সুমিতা সান্যাল
আশা দেবী

নবাগত নাট্যসংস্থা আয়োজিত নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠানে সমবেত অংশগ্রহণকারী অভিনেতাদের আলোকচিত্র।

সুবোধ ঘোষ রচিত 'বর্ণালী' কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রবীণ পরিচালক অজয় কর। ডি, আর, পিকচার্সের এ ছবিটি প্রযোজনা করছেন কুশলী-প্রযোজক দেবেশ ঘোষ। উচ্চশিক্ষিত দুটি তরুণ-তরুণীর ভালবাসার মুহূর্ত নিয়ে এ ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর। অন্যান্য ভূমিকায় রূপদান করেছেন ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বীরেশ্বর সেন, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও এন বিশ্বনাথন। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় রয়েছেন বিশু চক্রবর্তী, সন্তোষ গাঙ্গুলী এবং কার্তিক বসু। সঙ্গীত-পরিচালক কালীপদ সেন। চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ ছবিটি পরিবেশনভার গ্রহণ করেছেন।

পরিচালক বিনু বর্ধন 'বিভাস' ছবির সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ করেছেন। সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আর ডি বনশাল পরিবেশিত এছবির সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যের বিভিন্ন মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, মমতাজ আমেদ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও গীতা দে। ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত।

প্রবীণ পরিচালক চিত্ত বসুর 'গোধূলি বেলায়' সমাপ্তপ্রায়। ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের জনপ্রিয় উপন্যাস 'বধূ' অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণি বর্মা। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় এছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ সুসম্পন্ন হচ্ছে। কাহিনীর প্রধান অংশে রূপদান করছেন বিশ্বজিৎ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, সুমিতা সান্যাল,

অরুণ মুখোপাধ্যায়

পাহাড়ী সান্যাল

'মেরে মেহবুব' চিত্রে সাধনা ও অমীতা

তরুণকুমার, দিলীপ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশীষ ও বিপিন গুপ্ত। সংগীত-পরিচালনা করছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনা ও পরিবেশনায় রয়েছেন ইকনমিক প্রোডাকসন্স।

বোম্বাই

হেমন্তকুমার প্রযোজিত গীতাঞ্জলি পিকচার্স'র 'কোহরা' ছবির বহির্দৃশ্য গত সপ্তাহে মাদ্রাজের ত্রিবান্দ্রাম অঞ্চলে সুসম্পন্ন হল। বহির্দৃশ্যের এ দলটির সমষ্টিসংখ্যা প্রায় দেড়শতাধিক। বর্তমানে কেরালায় এছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার কয়েকটি মধুর দৃশ্য ও দুটি গান এ বহির্দৃশ্যে গ্রহণ করা হয়। এদুটি মধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ ও ওয়াহিদা রেহমান। ছবিটি পরিচালনা করছেন বীরেন নাগ। সংগীত-পরিচালক হেমন্তকুমার।

আগামী সপ্তাহ থেকে রূপতারা স্টুডিওয় ফিল্মইনডাস প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'কহি অর মিলা কর মুঝ সে'-র চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন নগেন্দ্র বহুগুণা। কাহিনীর দুটি প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন ধর্মেন্দ্র এবং রাজশ্রী। সংগীত-পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ ও শিল্পনির্দেশনায় রয়েছেন মদনমোহন, রতনলাল নাগর এবং শান্তি দাস।

প্রযোজক-পরিচালক ভি শান্তারামের নতুন ছবি 'গীত গায়া পাথারুনে'-র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি রাজকমল স্টুডিওয় আরম্ভ হয়েছে। শান্তারাম কন্যা রাজশ্রী এছবির নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন। বিপরীত নায়ক চরিত্রে রয়েছেন সুরেন্দ্র।

কে, নারায়ণের কাহিনী অবলম্বনে এছবির প্রধান চরিত্রে রয়েছেন সি এইচ আত্মা, মাইভিদ ও কে ডাতে। সংগীত-পরিচালনার ভার নিয়েছেন রামলাল।

মাদ্রাজ

সংগীত-পরিচালক সলিল চৌধুরী সম্প্রতি তামিল ছবি 'সান্দনা চিলিহি'-র সংগীতগ্রহণ শেষ করলেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রবীণ পরিচালক কে, সুব্রামানিয়ামের পুত্র এস ভি রামানান। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন টি কে বালাচন্দ্রন, ভি গোপালাকৃষ্ণন, ছো রামাস্বামী বসন্তদেবী ও এস ভি শুভলক্ষ্মী। কালীকুট সমুদ্রতীর দৃশ্যগ্রহণ শেষ হলে এমাসের শেষে ম্যাজেস্টিক স্টুডিওয় চিত্রগ্রহণ নিয়মিত শুরু হবে।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

বাঙলায় প্রথম অভিনেত্রী-পরিচালিকা মঞ্জু দে পরিচালিত 'স্বর্গ হতে বিদায়' ছবির বহির্দৃশ্য নালন্দা ভগ্নস্তূপে গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হল। শিল্পী ও কলা-কুশলীর একটি একান্নবর্তী সংসার নালন্দার ভগ্নস্তূপে কয়েকদিনের জন্য মাচা বেঁধেছিল। আত্মীয় ছিলাম আমরা পঁচিশ জনাধিক। বিহার সরকারের 'নালন্দা-রেস্ট হাউস'-এ আহার এবং বিশ্রামের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু। চিত্রগ্রহণ পরিক্রমার প্রথম আরম্ভ বক্তিয়ারপুর স্টেশন থেকে রাজগীর পর্যন্ত। ট্রেনের রিজার্ভ বগীতে নায়ক-নায়িকার পরিচয়-দৃশ্য গ্রহণ করার পর আসন্ন সন্ধ্যায় ঐতিহাসিক নালন্দা মহাবিদ্যালয়ে সদল-বলে আমরা এসে পৌঁছলাম। তখন কনে-দেখা-আলোয় রোমাঞ্চিত নালন্দাকে প্রথম দেখলাম। বড় করুণ মনে হল। সে জরাসন্ধ আর তার অমরাপুরীও নেই। সারা বিশ্বের জ্ঞাননিকেতন আজ কুব্জ খঞ্জ ন্যুব্জ ও অচল মনে হয়। শুধু ইতিহাসের একটি প্রমাণ হিসেবে তার অস্তিত্ব। ভগ্নস্তূপের নালন্দা আবিষ্কারক ক্যানিংহ্যাম এটি প্রথম চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে উনিশশো তেরো থেকে পনেরোর মধ্যে আবিষ্কার করেন। ১৯৩৫শে নালন্দার ভগ্ন স্থাপত্য-দর্শনে মানুষের পদযাত্রা শুরু হয়। হাজার হাজার বছর আগে পাটনা জেলার এই বড়গাঁও গ্রামের নালন্দার দ্বারে বিশ্বের বিদ্যার্থীরা জ্ঞান-ভিক্ষা করতে আসতো, আর আজ আসে এই ধ্বংসস্তূপের শেষ চিহ্নটুকু দেখতে। আটশো বছরের মঠ নালন্দা বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণে ধ্বংস হয়। মাটির নীচ থেকে ক্যানিং সাহেব প্রথম খনন করে শীলমোহরের গাত্রে লেখা বড়গাঁয়ে নালন্দাকে আবিষ্কার করেন। সেই শীলমোহরে এখনও লেখা আছে:—

'শ্রীনালন্দা মহাবিহারী আর্য্য ভিক্ষু সংঘস্য।'

এই ভগ্নস্তূপের পবিত্র আশ্রম এবং মন্দিরগুলো আজও এত যত্নে রাখা হয়েছে যা অদর্শনে বিশ্বাস হয় না। কি পবিত্র আর শান্ত স্বর্গীয় দৃশ্য। একের পর এক ভগ্ন মঠের সারি। ছোট বড় মন্দির। সারি সারি প্রহরীর মত প্রহর গুণছে। সূর্য উদয় আর অস্তের মধ্যবর্তী সমস্ত মুহূর্তগুলি মিলিয়ে 'স্বর্গ হতে বিদায়' ছবির রোমাঞ্চ-মধুর দৃশ্য ও প্রণয়ী কণ্ঠের একটি ভালবাসার গান,

'আমি চাই ছোট্ট একটি বাসা
আর তোমার ভালবাসা,'

গৃহীত হয়। সারিপুত্রচৈত্য মন্দির ও মন্দির-প্রদক্ষিণ পথের প্রতিটি অংশে এ ছবির নায়ক-নায়িকার ভালবাসার প্রথম শিহরণ ও সঙ্গীতের ছন্দে বিশেষ দৃশ্য-গুলি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। নায়ক অমল এবং নায়িকা চন্দনার চরিত্র দুটিতে অভিনয় করেন দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। কলাকুশলীদের মধ্যে ছিলেন চিত্র-পরিচালিকা মঞ্জু দে। আলোকচিত্রশিল্পী জ্যোতি লাহা। আলোকচিত্র পরিচালক অনিল গুপ্ত। শব্দধারক সুজিত সরকার। রূপসজ্জায় শৈলেন গাঙ্গুলী। সহকারী পরিচালক সুশীল বিশ্বাস ও নীতিন বন্দ্যো-পাধ্যায়। কর্মসচিব প্রভাত দাস। পার্শ্ব-চরিত্র অভিনয়ে রথীন ঘোষ। স্থিরচিত্রে স্টুডিও রেনেসাঁস।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই ধ্বংসস্তূপের নানান দৃশ্যে ছবির দৃশ্য-গ্রহণ এগিয়ে চলে। দুদিনের দৃশ্যগ্রহণে আমরা সবাই আত্মীয় হয়েছিলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নালন্দা স্থাপত্যের কিছু জনশ্রুতি আর ইতিহাসের প্রমাণ এবং দর্শনে অতীতের গৌরবময় অধ্যায় আমাদের আলোকিত ও মুগ্ধ করে। নালন্দার এই ঐতিহাসিক তথ্য আর জনশ্রুতির কয়েকটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি। সম্রাট অশোক—পালি সাহিত্যে যিনি 'দেবানাং পিয় পিয়দশী' বলে পরিচিত তাঁর সময়কালে কয়েকজন মহাভিক্ষু এ আশ্রমে এসে সাধনায় রত হন। সেই মহাভিক্ষুগণ যে বীজ বপন করে গেছেন, তারই পূর্ণফল এ নালন্দা। জনশ্রুতিবিশ্বাসী কেউ কেউ বলেন—এখানে বুদ্ধদেব তাঁর এক পূর্বজন্মে তপস্যা করতেন। জাগতিক জীবনের দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি সব দুহাতে দীন দুঃখীকে দান করতেন। সেজন্য তাঁর নাম হয় 'না-অলম-দা' অর্থাৎ নালন্দা যার সর্বস্ব বিলিয়েও তৃপ্তি হয় না।

এই মঠ নির্মাণের প্রথম পুরুষ হিসেবে কেউ কেউ রাজা শক্রাদিত্য-র নাম বলে থাকেন। তাঁর বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভক্তি ছিল গভীর। যখন বুদ্ধদেবের নির্বাণ হয় তখন তিনি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এই বিরাট আশ্রমটি নির্মাণ করতে শুরু করেন। এছাড়া কয়েকজন শ্রেষ্ঠী দশ কোটি মোহরে এই কুঞ্জটি কিনে ভগবান বুদ্ধের পায়ে ভক্তির নৈবেদ্য উপহার দেন। নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের ভিক্ষু আর ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এ আশ্রম এত বিস্তৃত যে কখনই স্থানের অকুলান ছিল না। সারি সারি ভগ্ন ছাত্রাবাস আজও
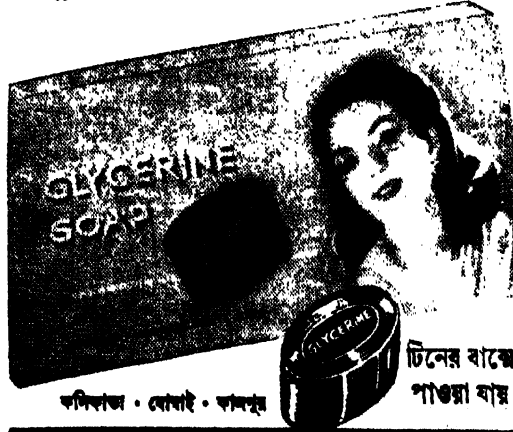
আছে। ঘরগুলো দেখে মনে হয় বারো হাত লম্বা আর আট হাত চওড়া। প্রত্যেকের জন্য একটা আলাদা ঘর থাকতো। তখন আশ্রমের খরচ চলতো নানান রাজার ভূমি ও অর্থদানে। আশ্রমের ভেতরে যে ছ'টি মহাবিদ্যালয় ছিল তার প্রথমটি তৈরী করিয়ে দেন শক্রাদিত্য। দ্বিতীয়টি রাজা বুধ গুপ্ত। তৃতীয়টি তথাগত রাজা। চতুর্থটি বলাদিত্য এবং পঞ্চমটির খরচ বহন করেন বজ্র রাজা। শেষটির খরচ মধ্য-প্রদেশের এক রাজা দিয়েছিলেন। সেই সময় নালন্দা মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন মহাস্থবির শীলভদ্র। অধ্যয়ন শেষে ছাত্রদের প্রতি মহাস্থবিরের এই উপদেশ বাণী বর্ষিত হ'ত—

'অক্রোধেন জিনে ক্রোধং,
অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কর্দারিয়ং দানেন,
সচ্চেন অলীকবাদিনং ॥'

অর্থাৎ, ক্ষমা দিয়ে ক্রোধ জয় করবেন, সাধুতা দিয়ে অসাধুকে জয় করবেন, কৃপণকে দান করে আর সত্য দিয়ে মিথ্যাবাদীকে জয় করবেন।

ঐতিহাসিক নালন্দার ইতিহাস বর্ণনা করা এত সংক্ষেপে সহজ নয়। শুধু কয়েকটি কথায় কিছু আইডিয়া দেওয়া। 'স্বর্গ হতে বিদায়' ছবির বহির্দৃশ্য আর একটি কারণে স্মরণীয়। নালন্দার ভগ্নস্তূপের কোন দৃশ্যই এর আগে কোন বাংলা ছবিতে গৃহীত হয়নি। প্রতিটি শিল্পী, কলাকুশলী ও স্থানীয় স্টেশন-মাস্টার এবং জন-সাধারণের একান্ত সহযোগিতায় এ ছবির বহির্দৃশ্য সুদৃশ্য ও সার্থক হয়েছে।

সম্পূর্ণ দৃশ্যগ্রহণ শেষ করে বিদায়ের শুভমুহূর্তে নালন্দাকে ছেড়ে আসতে সকলেরই মনে একটু বেদনার উদ্রেক হয়েছিল। তবে পিছনে ফেলে আসা নালন্দার অনেক ভাললাগা মুহূর্তই সবার অন্তরে সুখ-স্মৃতি হয়ে রয়েছে।

—চিত্রদূত

ভিন দেশী ছবি

॥ এইট্টি থাউজেন্ড সাসপেক্টস ॥

ভ্যালগেস্ট বৃটেনের প্রতিভাবান চিত্র-নির্মাতা। নানা ধরণের ছবি এ পর্যন্ত নির্মাণ করেছেন। পিটারসেলার্স অভি-নীত প্রথম সফল ছবি 'আপ দি ক্রীক'; যুদ্ধচিত্র 'ইয়েস্টারডেজ এনিমী'; সংগীত-মুখর "এক্সপ্রেসো বঙ্গো"; মনস্তত্বমূলক রহস্য-চিত্র 'দি ফুল ট্রিটমেন্ট' এবং আণবিক যুদ্ধ সংক্রান্ত সেই বিখ্যাত চিত্র 'দি ডে দি আর্থ কট ফায়ার' ইত্যাদি সব চিত্রেরই নির্মাতা ভ্যালগেস্ট। বর্তমানে গেস্ট বসন্ত রোগের সংক্রামকতাকে ভিত্তি করে একটি অসাধারণ ছবি তুলেছেন, 'এইট্টি থাউজেন্ড সাসপেক্টস' নামে। এডিনবরা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন-রজনীর জন্যে চিত্রটি নির্বাচিত হয়েছিল।

ভ্যালগেস্ট বাস্তবসম্মত চিত্র নির্মাণের পক্ষপাতী। কাহিনীর প্রয়োজনে যে কোনো রকম আবহাওয়াতেই বহির্দৃশ্য গ্রহণ করবার চেষ্টা করেন তিনি। তুষারপাত, ঝোড়ো হাওয়া কিছুই তাঁর ক্যামেরাকে নতীভূত করতে পারে না কখনও। 'এইট্টি থাউজেন্ড সাসপেক্টস' ছবির অনেক অংশই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় তোলা।

কাহিনীর সূত্রপাত হচ্ছে বাথ শহরের নববর্ষের নাচের আসরে। ডাঃ স্টিভেনস মংক সস্ত্রীক এসেছেন আসরে। ডাঃ মংক অত্যধিক কাজের নেশায় পাগল এবং এই নিয়ে তাঁর স্ত্রী জুলির অভিযোগও বিস্তর। মংকদম্পতির বিবাহিত জীবন প্রায় বিস্ফোরণের মুখে। নববর্ষের নাচের আসরে মংকের সহকর্মী ও বন্ধু ক্লিফোর্ড প্রেস্টনের স্ত্রীও এসেছেন। কিন্তু অতিরিক্ত পান করার ফলে মহিলাটি একেবারে উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠেন এবং বাথ শহরের সেই বিখ্যাত কুন্ডে পড়ে যান। কোনো রকমে তাঁকে ধরাধরি করে বাড়িতে পৌঁছে দেয় জুলি। এইখানেই বাথ শহরে প্রথম বসন্তরোগী আবিষ্কৃত হয়। স্ত্রীর চাপে ডাঃ মংক দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে যাবেন কথা ছিল। কিন্তু শহরে বসন্ত রোগ আবিষ্কার হওয়া মাত্র ডাঃ মংক ছুটি বাতিল করে দেন। তারপর থেকেই ছবিতে বসন্তরোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা পুংখানুপুংখভাবে দেখানো হয়েছে। শহরের সমস্ত লোককে টিকা দেবার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেরিয়ে পড়ে। জুলি আগে নার্স ছিল, সেও শহরে রোগ-প্রতিরোধে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সে নিজেই রোগাক্রান্ত হয়। শহরবাসীর সহযোগিতা এবং হাসপাতালের লোকজনদের দৃঢ়তায় অব-শেষে শহরে রোগ সীমিত হয়ে আসে।

পরিচালক গেস্ট আশী হাজার শহরবাসীদের নিয়ে একান্ত নিষ্ঠায় ছবিটি তুলেছেন। চিত্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে এলেস্টন ট্রেভর-এর লেখা একটি উপন্যাস অবলম্বনে। গেস্ট তারকা প্রথায় বিশ্বাস করেন না। তাঁর এই চিত্রে একমাত্র ক্লেয়ার ব্লুমই প্রখ্যাত অভিনেত্রী। জুলির ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন। ডাঃ মংক-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মঞ্চাভিনেতা রিচার্ড জনসন। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন ইয়াল্যান্ড ডোলান, সিরিল কুসাক।

'হাওয়ার্ড ফাস্ট'-এর উপন্যাসের চিত্ররূপ ঃ

হাওয়ার্ড ফাস্টের উপন্যাস 'ফলন এঞ্জেল'-এর চিত্ররূপ দেবার জন্যে হ্যারি কেলার ইউনিভার্সাল চিত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ফলন এঞ্জেলের চিত্রনাট্য রচনা করবেন 'চ্যারেড'-এর চিত্র-নাট্যকার পিটার স্টোন। ভূমিকালিপি এখনো ঘোষিত হয়নি, তবে যতদূর জানা গেছে অনেক বিখ্যাত মুখও এই চিত্রে আলোকিত হবে।

—চিত্রকূট

চিত্তোন্মাদনকারী জাজ সঙ্গীতের জগতে ডিউক এলিংটন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। আমেরিকার জাজ-সঙ্গীতকে এলিংটন এমন একটি মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন, যাকে অভূতপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোদের স্বতোৎসারিত কণ্ঠসঙ্গীত থেকেই 'জাজ'-এর উৎপত্তি। নিগ্রোদের স্তবগান ও লোকসঙ্গীতের ছন্দ, তাল ও লয়ের সঙ্গে আধুনিক গীতিনাট্যের বহু বিচিত্র উপকরণের সমন্বয়সাধনের ফলে 'জাজ'-সঙ্গীতের বিকাশলাভ ঘটেছে। কোনোও একটি বিশেষ শহর জাজের জন্মভূমি হিসেবে মর্যাদা দাবী করতে না পারলেও প্রথম যুগে নিউ অর্লিন্সই ছিল এর প্রাণকেন্দ্র; সেখানেই এই সঙ্গীত প্রথম বিস্তার লাভ করে।

সূচনায় জাজ ছিল প্রধানতঃ কণ্ঠ-সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র ছিল এই সঙ্গীতের সুরসঙ্গতি রক্ষার সহায়ক, কিন্তু বাদ্য-শিল্পীদের কুশলতায় এর রূপ পরিবর্তন ঘটল। কণ্ঠের পরিবর্তে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের কুশলী সমন্বয়ে উদ্ভূত সঙ্গীতই জাজ নাম ধারণ করল। ১৯৩০ সালের মধ্যে জাজ-সঙ্গীত জগতে বহু কুশলী শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। এ'রা প্রথম প্রথম সে-যুগে প্রচলিত 'সুইং ব্যাণ্ড' বা 'র‍্যাগটাইম ব্যাণ্ড'-এ যোগ দিতেন। কিন্তু ক্রমে এ'রা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তান, লয় ও ছন্দের ঐক্যসাধন এবং বিভিন্ন সুরের রীতি-বৈশিষ্ট্য রক্ষার প্রয়োজনে দলের নেতৃত্ব করবার জন্যে একজন সুর-পরিকল্পনাকারী পরিচালকের আবশ্যকতা অনুভব করেন।

উপস্থিতভাবে নতুন কিছু সৃষ্টি করাই হচ্ছে জাজ-সঙ্গীতের আদিযুগের বৈশিষ্ট্য। জাজের সুর বাজানোর সময়ে বাদকদলের কোনও একজন এক কলি সুর রচনা করলেন। সেটিকে যন্ত্রের সাহায্যে সুরে ফুটিয়ে তুললেন আর একজন সহ-শিল্পী। তাঁর কাছ থেকে আর একজন। এমনিভাবে দলের সকলেই সেই কলিটিকে নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে গমকে মূর্ছনায় মূর্ত করে তুললেন। তাল, লয় ও ছন্দের বাঁধনে ভাব রূপায়িত হল; সৃষ্টি হল জাজ-সঙ্গীত। বর্তমান যুগে গ্রামোফোন ও বেতার মারফৎ জাজ-সঙ্গীত সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। নিজের জন্মকাল থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই জাজ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে।

জাজ-সঙ্গীতে অনুসৃত আধুনিক ধারার সঙ্গে প্রথম যুগের রীতির বেশ একটা বড়ো রকমের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন নিউ অর্লিন্সের রীতি হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠাশ্রয়ী—অনেকটা লোকসঙ্গীতের মতোই মুখে মুখে গীত রচনার সাহায্যে রূপায়িত। কিন্তু আধুনিক জাজ অত্যন্ত জটিল ও প্রযুক্তিবিদ্যাসাপেক্ষ (টেক্‌নিক্যাল); এমন কি, আধুনিক জাজ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উপস্থিতভাবে (এক্সটেম্পোর এবং ইম্‌প্রোভাইজড্‌) রচিত না হয়ে আগে থাকতেই আদ্যোপান্ত স্বরলিপির আকারে রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই স্বরলিপির মধ্যে থাকে মূল গায়েনের একক সঙ্গীতের প্রাধান্য এবং তারই বিস্তার ঘটায় সমবেত বাদ্যসঙ্গীত; উদ্দেশ্য সুরকে স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত করা।

ডিউক এলিংটন জাজ-সঙ্গীতের প্রযোজক বা সুরকার হিসেবে নিজের একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। সমবেত কণ্ঠে গাওয়া জাজের আদিম রূপের কথা স্মরণে রেখে তিনি তাঁর সঙ্গীতসৃষ্টিতে কণ্ঠস্বরের মিলের সঙ্গে তাল ও ছন্দকে বজায় রেখেছেন এবং অপরদিকে তারের ঝংকার ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রনিঃসৃত সুরের ওপরেও যথোচিত প্রাধান্য দিয়েছেন।

খেলাধূলা

দর্শক

টোকিওর আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

জাপানের টোকিও সহরে আগামী ১৯৬৪ সালের ১১ই অক্টোবর অষ্টাদশ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান আরম্ভ হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে তাই সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। এক বছর সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হ'তে হবে এবং এই প্রস্তুতি সম্পর্কেই বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে টোকিও সহরে এক আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গত ১১ই অক্টোবর টোকিওর নতুন অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ৩৫টি দেশের এক আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। এই অনুষ্ঠান শেষ হবে ১৬ই অক্টোবর। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে 'টোকিওর আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান সপ্তাহ'। সংবাদপত্রাদিতে বলা হয়েছে 'প্রাক-অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান'। অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমান এক্ষেত্রেও ২০টি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অলিম্পিক মশাল এবং অলিম্পিক পতাকার অনুপস্থিতিই আগামী ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সঙ্গে বর্তমান আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের যা পার্থক্য। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে জাপানের প্রায় এক মিলিয়ন ডলার অর্থ ব্যয় হবে। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদের থাওয়া-থাকা এবং যাতায়াত খরচের ব্যয় জাপান বহন করেছে।

॥ লিয়'র হকি প্রতিযোগিতা ॥

লিয়'র আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফলের তালিকায় ভারতবর্ষ শুধু শীর্ষস্থানই লাভ করেনি, ভারতবর্ষ অপরাজেয় সম্মান লাভ করেছে। সাতটা খেলার মধ্যে ছ'টা খেলায় জয় এবং একটা ড্র (পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে ১—১ গোলে)। টোকিও অলিম্পিকের মাত্র এক বছর আগে আন্তর্জাতিক হকি খেলায় ভারতবর্ষের এই সাফল্য যথেষ্ট আশার কথা। অলিম্পিকের হকি খেলায় উপর্যুপরি ৬বার খেতাব নিয়ে ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের ফাইনালে ভারতবর্ষ ০—১ গোলে বিশ্ব-খেতাব হাত-ছাড়া করেছে প্রতিবাসী পাকিস্থানের কাছে।

লিয়'র হকি প্রতিযোগিতায় ১২টি দেশ যোগদান করেছিল। কিন্তু লীগ খেলার সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রতিটি দেশকে প্রত্যেকের বিপক্ষে খেলতে হয়নি। প্রত্যেকটি দেশের খেলার মোট সংখ্যা ছিল সাতটা। এই ধরণের খেলার তালিকায় অনেক দেশেরই প্রতি কিছু কিছু অবিচার করা হয়েছে। ভারতবর্ষও সেই তালিকায় পড়ে। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থানের মধ্যে কোন খেলা হয়নি। চারটি দেশ—পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, স্পেন এবং জাপান একটা করে ম্যাচ খেলেছে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থানের বিপক্ষে। এই চারটি দেশের বিপক্ষে ভারতবর্ষের খেলার ফলাফল জয় ৩ এবং ড্র ১ (পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে)। অপরদিকে এই চারটি দেশের বিপক্ষে পাকিস্থানের খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে জয় ২, হার ১ (পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে) এবং ড্র ১ (স্পেনের বিপক্ষে)। এই চারটি দেশের বিপক্ষে গোল সংখ্যা —ভারতবর্ষের স্বপক্ষে ১১ ও বিপক্ষে
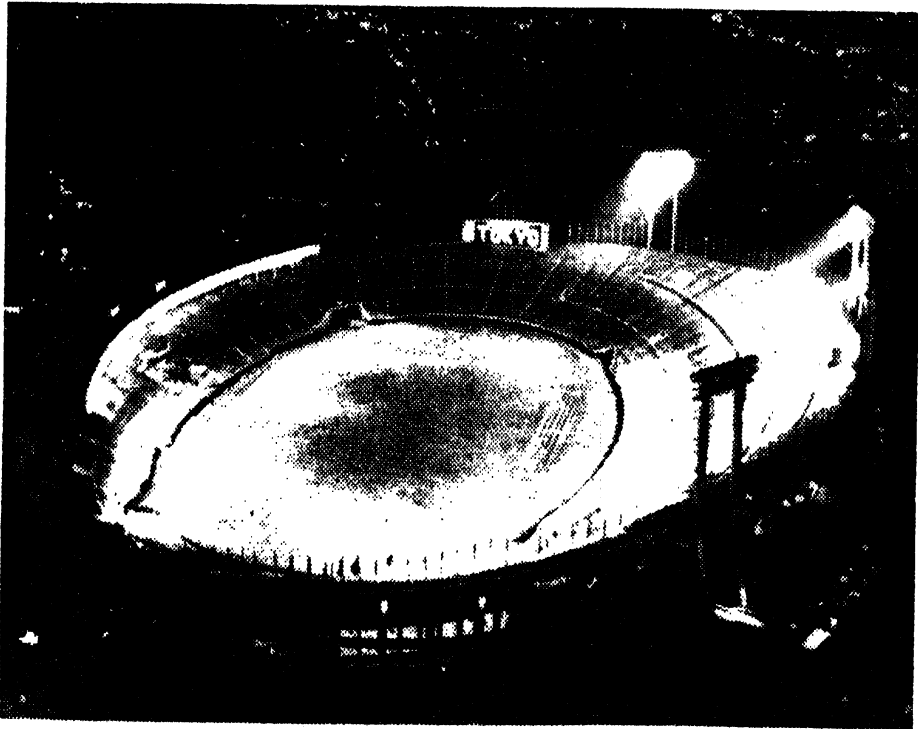
১৯৬৪ সালের অষ্টাদশ অলিম্পিকের ক্রীড়াকেন্দ্র টোকিওর জাতীয় স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামেই গত ১১ই অক্টোবর প্রাক্-অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে।

১; সেই জায়গায় পাকিস্থান ৫টা গোল দিয়ে ১টা গোল খেয়েছে। হকি খেলায় আমেরিকার কোন নাম-ডাক নেই; বলতে কি তারা এখনও হকিতে দাগা-বুলচ্ছে। এই দুর্বল আমেরিকার বিপক্ষে পাকিস্থান, পশ্চিম জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ডের খেলা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের খেলা পড়েনি। আমেরিকার বিপক্ষে পাকিস্থান ৭—০, পশ্চিম জার্মানী ৭—০ এবং ইংল্যাণ্ড ৭—১ গোলে জয়ী হয়ে আসর মাৎ করেছিল। ফলে এই তিনটি দেশ তাদের গোলসংখ্যা বৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েছিল। পাকিস্থান তাদের সাতটা খেলায় মোট গোলসংখ্যার (১৪টা) অর্ধেক তুলেছিল আমেরিকার বিপক্ষে। তবুও কোন দেশ ভারতবর্ষের গোল দেওয়ার সংখ্যা (মোট ১৯টা) ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

ভারতবর্ষ প্রথম দুটো খেলায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে প্রথম খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়। এই খেলা হয়েছিল রাত্রিতে এবং আলোর বিশেষ ব্যবস্থা থাকলেও ভারতবর্ষ এই অবস্থায় খেলতে মোটেই অভ্যস্ত নয়। ফ্রান্সের বিপক্ষে ভারতবর্ষ তার দ্বিতীয় খেলায় মাত্র ১—০ গোলে জয়লাভ করে। কিন্তু পরবর্তী পাঁচটি খেলায় ভারতবর্ষের জয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লিয়ঁর এই হকি প্রতিযোগিতায় কোন দলকে সরকারীভাবে 'চ্যাম্পিয়ন' ঘোষণা করা যে হবে না, তা আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল। তবুও ভারতবর্ষের এই বে-সরকারী চ্যাম্পিয়নসীপ লাভের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি। ক্রীড়া-সাংবাদিকেরা একমত হয়ে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হকি দল হিসাবে স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে হল্যাণ্ড এবং তৃতীয় স্থান পশ্চিম জার্মানী। হল্যাণ্ডের স্বপক্ষে ভোট ছিল ৯টি এবং পশ্চিম জার্মানীর দিকে ৫টি। সাংবাদিকদের এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতবর্ষ এবং হল্যাণ্ড একটি ক'রে বিশেষ কাপ পেয়েছে। তাছাড়া ভারতবর্ষ এবং হল্যাণ্ড আরও দুটি করে কাপ পেয়েছে—প্রতিযোগিতায় যোগদান এবং রাত্রির খেলায় সাফল্য লাভের দরুণ। ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মানীর রাত্রির খেলাটি ড্র ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষ এই খেলায় বেশী সংখ্যক পেনাল্টি কর্ণার পাওয়ার দরুণ প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে কাপ জয় করেছে। বারটি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ এবং হল্যাণ্ডই তিনটি করে কাপ পেয়েছে। স্পেন রোম অলিম্পিকে তৃতীয় স্থান লাভ করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল। কিন্তু লিয়ঁর হকি প্রতিযোগিতায় তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। সাতটা খেলায় ৪ পয়েন্ট পেয়ে নীচের দিক থেকে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। সর্বনিম্ন স্থান পেয়েছে আমেরিকা—পিত্তিরক্ষার মত মাত্র ১ পয়েন্ট; কানাডার বিপক্ষে ১—১ গোলে খেলা ড্র করে আমেরিকা এই পয়েন্ট পায়। পশ্চিম জার্মানী হকি খেলায় প্রভূত উন্নতি করেছে; ভারতবর্ষের থেকে ২ পয়েন্ট কম পেয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং ভারতবর্ষের মতই কোন খেলায় পরাজয় স্বীকার করেনি। হল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের বিপক্ষে তারা খেলা ড্র করে। তালিকায় তৃতীয় স্থান পেয়েছে হল্যাণ্ড (১০ পয়েন্ট) এবং চতুর্থ স্থান পাকিস্থান (৯ পয়েন্ট)। বেলজিয়াম এবং জাপান যুগ্মভাবে পঞ্চম স্থান পেয়েছে (৮ পয়েন্ট)। প্রতিযোগিতায় হল্যাণ্ড এবং জাপানের সাফল্য উল্লেখযোগ্য—বিশেষ করে জাপানের। জাপান মাত্র ১৫ বছর হল মন দিয়ে হকি খেলছে। লিয়ঁর হকি প্রতিযোগিতায় সাফল্যের ভিত্তিতে বলা যায়, আসন্ন টোকিও অলিম্পিকে পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড এবং জাপানের স্থান অগৌরবের হবে না।

॥ ভারত সফরে এম সি সি ॥

আগামী ভারত-সফরে এম সি সি দলের সঙ্গে অধিনায়ক কলিন কাউড্রে আসছেন না। তাঁর বদলে এম সি সি দলের অধিনায়কত্ব করবেন সহ-অধিনায়ক মাইক স্মিথ এবং কাউড্রের শূন্যস্থানে সারের মাইকেল স্টুয়ার্টকে সহ-অধিনায়ক হিসাবে দলভুক্ত করা হয়েছে। কাউড্রে দৈহিক অক্ষমতার কারণেই ভারত সফরে আসছেন না। গত জুন মাসে লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হলের বলে কাউড্রের বাঁ হাতের হাড় ভেঙ্গে যায়। ফলে তিনি পরবর্তী তিনটে টেস্ট খেলায় নামতে পারেননি। ভারত সফরের আগেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন এই আশাতেই তাঁর অধিনায়কত্বে এম সি সি দল গঠিত হয়েছিল।

॥ মৈনুদ্দোলা ক্রিকেট কাপ ॥

হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত প্রখ্যাত মৈনুদ্দোল্লা কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে বিজয় নগর একাদশ দল প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যার ভিত্তিতে টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। বিজয়নগর একাদশ দলের অধিনায়ক ছিলেন পাতৌদির নবাব এবং টাটা স্পোর্টস দলের নরি কন্ট্রাক্টর।

বিজয়নগর একাদশ দল ৬ উইকেটে ৫১৬ রাণ তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই রাণের মধ্যে বিজয় মঞ্জরেকারের ২৮৩ রাণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঞ্জরেকার ৪০২ মিনিট খেলেন এবং বাউণ্ডারী করেন ৩৬টা। মঞ্জরেকারের ব্যক্তিগত এই ২৮৩ রাণই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রাণ হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। দ্বিতীয় রেকর্ড, হায়দরাবাদের এই ফতে ময়দানে ইতিপূর্বে কোন দলই ৫১৬ রাণ তুলতে পারেনি। টাটা স্পোর্টস ক্লাবের প্রথম ইনিংস ১৪৩ রাণে শেষ হয়। বিজয়নগর একাদশ দল টাটা দলকে ফলো-অন করতে বাধ্য না করে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে এবং লাঞ্চের সময় ৪ উইকেটে ৭৪ রাণের মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। টাটা দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১২৯ রাণের মাথায় (২ উইকেটে) মুষল ধারায় বৃষ্টি নামে; ফলে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৫৫ মিনিট আগেই খেলাটি বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী এ সি সি দল (এসোসিয়েটেড সিমেণ্টস ক্লাব) এক ইনিংস ও ৭৪ রাণে হায়দরাবাদ একাদশ দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছে। হায়দরাবাদ একাদশ দল প্রথম ব্যাট ধরে। তাদের প্রথম ইনিংস মাত্র ৯১ রাণে শেষ হয়। বৃষ্টির দরুণ পীচের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। এ সি সি দলের অধিনায়ক বাপু নাদকার্নী টসে জয়লাভ করে হায়দরাবাদ দলকে ব্যাট করতে দিয়ে সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করেন। নাদকার্নী ২৩·৩ ওভার বলে ১৯টা মেডেন এবং মাত্র ২২ রাণ দিয়ে ৫টা উইকেট পান। এ সি সি দলের প্রথম ইনিংসে ২৬৫ রাণ ওঠে। হায়দরাবাদ দল দ্বিতীয় ইনিংসেও কোন সুবিধা করতে পারে নি। ১০৫ রাণের মাথায় তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে হায়দরাবাদ দলকে [illegible] রামকান্ত দেশাই। তিনি ২০ ওভার বলে ১০টা মেডেন এবং ২৯ রাণ দিয়ে ৫টা উইকেট পান। [illegible] ৩টে উইকেট ৩৭ রাণে।

॥ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ॥

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস, মহিলা বিভাগে বোম্বাই এবং বালকদের জুনিয়র বিভাগে বাংলাদেশ প্রথমস্থান পেয়েছে। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় কোন অনুষ্ঠানেই জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়নি। বোম্বাইয়ের পুরুষ সাঁতারুরা দ্বিতীয় দিন থেকে প্রতিযোগিতায় যোগদানে থেকে বিরত থাকায় সার্ভিসেস দলের পক্ষে প্রথমস্থান অধিকার করা খুবই সহজ হয়।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (১১১ পয়েন্ট); ২য় রেলওয়ে (২৪ পয়েন্ট); ৩য় বাংলা (১৩ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : ১ম বোম্বাই ([illegible] পয়েন্ট); ২য় বাংলা ([illegible] পয়েন্ট); ৩য় রেলওয়ে (১৬ পয়েন্ট)।

জুনিয়র বিভাগ : ১ম বাংলা ([illegible] পয়েন্ট); ২য় বোম্বাই (১৫ পয়েন্ট); ৩য় দিল্লী (৩ পয়েন্ট)।

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের পোলভল্টে আমেরিকার ডন্ ব্র্যাগ ১৫ ফিট ৫½ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম ক'রে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করছেন।

॥ অলিম্পিক পোল ভল্ট ॥

অলিম্পিকের পোলভল্ট অনুষ্ঠানে আমেরিকার অটুট প্রাধান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা থেকে (১৮৯৬) প্রতি অনুষ্ঠানেই আমেরিকা পোলভল্টে প্রথম স্থান লাভ করেছে। এ পর্যন্ত আমেরিকা পোলভল্টে ১৪ বার খেতাব পেয়েছে। এই সঙ্গে দ্বিতীয় থেকে ৬ষ্ঠ স্থান পাওয়ার হিসাব ধরলে দেখা যায় আমেরিকা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক স্থান পেয়েছে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে অলিম্পিক পোলভল্টে রৌপ্য পদক পেয়েছে একমাত্র জাপান।

॥ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ॥

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার উত্তরাঞ্চলের ফাইনালে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত বছরের যুগ্ম-বিজয়ী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দলকে ২—০ গোলে পরাজিত ক'রে মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

উত্তরাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে ক'লকাতা ৩—১ গোলে বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে যাদবপুর ৪—১ গোলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছিল।

অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

টোকিওতে ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে মোট ১৬টি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই ১৬টি দেশের মধ্যে মাত্র দু'টি দেশ—১৯৬৪ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রযোজক জাপান এবং ১৯৬০ সালের অলিম্পিক ফুটবল চ্যাম্পিয়ান যুগোশ্লাভিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় সরাসরি খেলবে এবং পাঁচটি অঞ্চলের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা থেকে বাকি ১৪টি দেশ বাছাই করা হবে। পাঁচটি অঞ্চলের নাম এবং প্রতিটি অঞ্চল থেকে বাছাই দলের সংখ্যা এই রকম ঃ এশিয়া—৩, ইউরোপ—৫, আফ্রিকা—৩, উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান—১, দক্ষিণ আমেরিকা—২।

এশিয়ান জোনে এই ১৬টি দেশের খেলা পড়েছে ঃ ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া (উত্তর অথবা দক্ষিণ), চীন (তাইওয়ান), মালয়, তাইল্যান্ড, ইরাণ, ফিলিপাইন, ভিয়েৎনাম, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, লেবানন এবং ইস্রাইল।

খেলার তালিকা

বিশেষ প্রাথমিক খেলা

(ক) কোরিয়া বনাম তাইওয়ান
(খ) মালয় বনাম তাইল্যান্ড
(গ) ভারতবর্ষ বনাম সিংহল
(ঘ) পাকিস্তান বনাম ইরাণ

প্রাথমিক খেলা

(ঙ) ফিলিপাইন বনাম বিজয়ী 'ক'
(চ) দঃ ভিয়েৎনাম বনাম ইস্রাইল
(ছ) সিঙ্গাপুর বনাম ব্রহ্মদেশ
(জ) ইন্দোনেশিয়া বনাম বিজয়ী 'খ'
(ঝ) লেবানন বনাম বিজয়ী 'গ'
(ঞ) ইরাক বনাম বিজয়ী 'ঘ'

চূড়ান্ত খেলা

(১) বিজয়ী 'ঙ' বনাম বিজয়ী 'চ'
(২) বিজয়ী 'ছ' বনাম বিজয়ী 'জ'
(৩) বিজয়ী 'ঝ' বনাম বিজয়ী 'ঞ'

এশিয়ান জোনের উপরের বিশেষ প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা ১৯৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং পরবর্তী প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা শেষ হবে ১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে।

ভারতবর্ষের প্রথম খেলা পড়েছে সিংহলের বিপক্ষে বিশেষ প্রাথমিক পর্যায়ে। এই খেলায় বিজয়ী দেশ পরবর্তী প্রাথমিক পর্যায়ে লেবাননের বিপক্ষে খেলবে।

॥ নীহারকান্তি স্মৃতি শীল্ড ॥

১৯৬৪ সালের নীহারকান্তি ঘোষ স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শীল্ড এবং গিরিবালা স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দু'টি অঞ্চলেরই (কলকাতা এবং দমদম) খেলা পূর্ণ উদ্যমে চলেছে। কলকাতা অঞ্চলে ১৬টি এবং দমদম অঞ্চলে ১২টি দল যোগদান করে। উভয় অঞ্চলেরই খেলা প্রায় শেষপর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

✻খেলার কথা✻

অজয় বসু

'জলের পোকাকে' আবার স্বস্থানে খুঁজে পেলাম সেদিন। সেদিন উপলক্ষ্য ছিল সামান্য। কিন্তু সেই সূত্রেই হারিয়ে যাওয়া অসামান্য অতীত এক মুহূর্তের জন্যে হলেও আবার উঁকি দিয়েছিল আমাদের মনে।

'জলের পোকা' বিশেষণ। আসল সংজ্ঞা, প্রফুল্ল ঘোষ—সাঁতারু। সাবেকী নাম ছিল 'বোকা'। ডাক-নামের সঙ্গে মিল রাখতে গিয়ে যেন রসিকতা করে একদিন হেঁকে উঠেছিলেন, বোকা তো নয়, ও হলো জলের পোকা! সেই উনি তাই-ই।

কিন্তু 'পোকা' কেন? মাছ বল্লেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো। জলে জলে গা ভাসাতে, সাঁতরাতে, অবিরাম অবগাহনে মানুষটি মাছের চেয়েই বা কম কিসে? জলেই উনি সহজ, স্বাভাবিক, পরিপূর্ণ।

হেদোর পাড়ে সেদিন (পয়লা অক্টোবর) আমরা একদল দর্শক জমেছিলাম প্রফুল্ল ঘোষের সাঁতার দেখবো বলে। দেখতে দেখতে খেইহারা মন কোন্ ফাঁকে ফিরে গেলো সেই দু-আড়াই যুগ আগেকার কালে।

তখন প্রফুল্ল ঘোষের যৌবন। দামাল ছেলের মতো নিত্য-নতুন 'হাঙ্গামা' পাকাচ্ছেন! এবছরে হাতছাড়ি দিয়ে অগুন্তিবার হেদো পারাপার হন তো ফি'রবছরে হাত-পায়ে শেকল এঁটে ভেসে বেড়ান দিবারাত্র। ক্লান্তি নেই। পরিশ্রমে ফাঁকি নেই। ভাসতে ভাসতে রাত ভোর করেন। আবার নতুন করে রাত্রির অন্ধকারকে ডেকে আনেন।

সংগঠকেরা ঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখে প্রহর গুনে চলেন। সংবাদপত্রে মোটা হরফে শিরোনামা বেরোয়। হেদোর ধারে লোক জমে কাতারে-কাতারে। ধনী-নির্ধন, সাধারণ-অসাধারণ সবাই আসেন। চাপাচাপি ভীড়ে পথ-ঘাট রুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। দক্ষতার কড়ি ফেলে প্রফুল্ল ঘোষ অবিরাম সাঁতারে এমনি করেই নতুন নজীর গড়েন। আবার এক অবকাশে সেই রেকর্ড গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজেই আসেন এগিয়ে।

অবিরাম সাঁতারে কতো কীর্তিই না তিনি রেখেছেন! পুরোনো কাহিনী সব মনে ভীড় জমাচ্ছিল তবে সেদিন আজ বিগত।

অতিক্রান্ত-যৌবন প্রফুল্ল ঘোষ আজ চৌষট্টি ছুঁয়েছেন। খাটার ক্ষমতা তাঁর কমেছে সন্দেহ নেই। তবুও ঘন্টা দুয়েকের আয়োজনে যে সাঁতার তিনি দেখালেন সেদিন তা তাঁর পুরানো পরিচয়ের সঙ্গেই মানানসই। একবার রপ্ত হলে সাঁতারের কৌশল নাকি ভোলা যায় না। আর সে কৌশল আয়ত্ত করে যিনি প্রফুল্ল ঘোষ হতে পেরেছেন, ভুলতে চাইলেও কি তাঁর পক্ষে তা ভোলা সম্ভব?

চৌষট্টি বছরের প্রফুল্ল ঘোষ সেদিন ফ্রিস্টাইল টানছিলেন। আর আমি স্মৃতি-চারণ করছিলাম পুরানো ভঙ্গীকে নিয়ে। গতি কিছু কমেছে। কিন্তু বাকী সবই অবিকৃত।

সেই মেজোভাব! হাত উঠছে, পাও চলছে। কিন্তু জলবিন্দুর আস্ফালন নেই। কেউ কি সাঁতার কাটছে? না। যেন গতিশীল একটি কাঠের পাটাতন নিঃশব্দে স্রোতের টানে এগিয়ে চলেছে। সাঁতার তো অনেক দেখলুম। রেকর্ড ভাঙ্গার অনেক নজীরও। কিন্তু সাঁতারের এমন পরিশীলিত, পরিচ্ছন্ন, রুচিস্নিগ্ধ চেহারা নজরে পড়লো কই! আমার তো মনে হয় যে পরিসংখ্যান কেতাবে লিপিবদ্ধ কোনো রেকর্ডই সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের আসল পরিচয় নয়। আসল শ্রী তাঁর সাঁতারের স্টাইলে।

প্রফুল্ল ঘোষ

আসর মাতাতে একা প্রফুল্ল ঘোষের আবির্ভাবই যথেষ্ট। তবু সেদিন তিনি যুক্ত হয়েছিলেন সমষ্টি-ক্রীড়া প্রদর্শনীতে। সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহধর্মিণী ইলা ঘোষ। আর বন্ধু-তনয়া মহামায়া দে।

আশ্চর্য সাঁতারু এই মহামায়া! দু'বছরের ফুটফুটে মেয়ে এখনও হাতপাড়ি তুলে গতিবেগ বাড়িয়ে সাঁতরাতে পারে না। কিন্তু ভাসতে একেবারে অদ্বিতীয়া! ভেসে থাকার অনেক কসরৎ সে দেখালো। কখনো একক প্রক্রিয়া। কখনো বা সমষ্টি-প্রদর্শনী। সবই অপ্রত্যাশিত কান্ড! তারপর পদ্মাসনে সমাধিস্থ হয়ে মহামায়া যখন ভেসে রইলো তখন দর্শকদের বিস্ময় হলো শতকণ্ঠে সোচ্চার।

এই মহামায়া আমাদের কাছে এক আবিষ্কার বিশেষ। আর সে গুরুর গর্বও। গুরু তাই সেদিন হেঁকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন 'এতো কম বয়সে

কুমারী মহামায়া দে

এতোক্ষণ কেউ যদি পদ্মাসনে ভাসতে পারে তাহলে আমি বাজী [illegible]

সম্প্রীক, স[illegible] সেদিন

সাঁতারের হরেক রকম কসরৎ দেখালেন। ফ্রিস্টাইল, বুকসাঁতার, প্রপেলিং, ফ্লোটিং, ক্রল, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাঁতার—কমপক্ষে সতেরোটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রদর্শনী।

সবই অভিপ্রদর্শনী। তার মধ্যে বিশিষ্টতম ছিল 'নেতাজী নাও' সন্তরণ। এই প্রদর্শনীতে কতকগুলি পতাকা বাঁধা দড়ির দু-প্রান্তে রইলেন প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্রীমতী ইলা। মাঝখানে মহামায়া। মহামায়ার বুকে দাঁড়ালো হাল্‌কা এক খুঁটি। সব মিলিয়ে জলের বুকে ভেসে উঠলো ছোট্ট একখানি নৌকা। তরিখানি তরতরিয়ে চলায় পরিকল্পনার মৌল আবেদনও তারিফ পেলো।

অবিরাম পা চালিয়ে জাহাজী কায়দায় সাঁতরাচ্ছিলেন যখন প্রফুল্ল ঘোষ তখন ঘোষকের কণ্ঠ কানে যাচ্ছিল,

'এই হচ্ছে আমেরিকান ক্রল। এই পদ্ধতির চল ছিল না আমাদের দেশে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে প্রফুল্ল ঘোষই আমাদের দেশে ক্রলকে চালু করেন। ক্রলই হচ্ছে উন্নত সন্তরণ-পদ্ধতির এক বিশেষ ধারা। এগিয়ে-যাওয়া দেশের সাঁতারুরা আজকাল ক্রল ছাড়া অন্য রীতি অনুসরণ করেন না।

ক্রল অর্থে অবিরাম পদ-সঞ্চালন। হাত উঠে একবার পড়ার মধ্যে বার-কয়েক পা চলে। সংখ্যায় যতো বেশীবার পা চলবে সাঁতারুর গতিও ততোই বাড়বে। বিখ্যাত সাঁতারু এবং ছায়াছবির 'টারজন' জনি ওয়াজমুলারের অলিম্পিক স্বর্ণ-সঞ্চয়ের মূলধন ছিল এই পদ্ধতির সাঁতার।

ঘোষক আরও একটি অজানা তত্ত্বের সন্ধান জানালেন।

পরিচিত সাঁতারু মহলে সেকালে ক্রল চালু না থাকলেও সমুদ্র উপকূল-বর্তী ভারতীয় ধীবরেরা কিন্তু এই রীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ভারত সফর-কারী এক মার্কিন সন্তরণবিদ ভারতীয় ধীবরদের কাছ থেকেই ধার করে এই সন্তরণ পদ্ধতিকে স্বদেশে চালু করেন। তাঁর চেষ্টায় ভারতীয় ধীবরদের আদ্যি-কালের সন্তরণপদ্ধতির কিছু উন্নয়নও ঘটে। সেই থেকে সাঁতারের এই রীতিটি আমেরিকান ক্রল নামেই পরিচিত হয়ে আসছে।

আর এক ধরনের সাঁতার কাটলেন প্রফুল্ল ঘোষ—যা দর্শনীয় নয় তবে প্রকল্পটির নেপথ্যে সাঁতারুর রসবোধ মিলেছিল।

এই প্রদর্শনীতে সাঁতারু একেবারে নুলো বনে গেলেন। দুটি হাতই আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়লো। তারপর তথাকথিত কর্তিত হাতদুটির সাহায্যে চললো সাঁতার কাটার প্রাণান্তকর চেষ্টা।

দেখে অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। প্রদর্শনীশেষে হাঁফছাড়ার স্বস্তিতে জিজ্ঞাসা করলাম,—

'ওটা কি ধরনের সাঁতার?'

কেন? কুঁজোর কি চিৎ হয়ে আরাম পেতে সাধ জাগে না? আমি নাম দিয়েছি জগন্নাথ সন্তরণ! জবাব দিলেন প্রফুল্ল ঘোষ।

তাজ্জব ব্যাপার! ঠাকুর-দেবতাকে নিয়ে পর্যন্ত রসিকতা করতে দ্বিধা নেই। যে বয়সে জগন্নাথ দেবের শ্রীচরণ দুটি ভক্তিভরে আঁকড়ে থাকায় ভক্তজনের ব্যাকুলতায় কামাই নেই, সেই বয়সেই কিনা প্রফুল্ল ঘোষ বিগ্রহের বিকলাঙ্গ রূপ নিয়ে মস্করা করছেন!

এতো পারেনও বটে। কান্ড দেখে মনে হচ্ছিল মানুষটি আজও বদলান নি। আগেকার সেই সরস জীবন, সেই জীবন্ত চরিত্র আজও অবিকৃত। চুলে পাক্‌ ধরলে কি হবে, মেজাজ তেমনি সবুজই রয়ে গিয়েছে। যেন আনন্দ-বিতরণই তাঁর জীবনাদর্শ। ফুরিয়ে যাবেন না কোনো-দিনই।

তবে এই মানুষটিকেই আবার আর এক রসিক পুরুষ কদিন পূর্বে বড্ড নাস্তানাবুদ করে তুলেছিলেন।

সেদিন হেদোতেই আন্তঃ বিশ্ব-বিদ্যালয় জলক্রীড়ানুষ্ঠান। এক বিভাগের পুরস্কার বিলোতে ওই ভদ্রলোক প্রফুল্ল ঘোষকে আমন্ত্রণ জানাতে সাঁতারু বল্লেন,

'আমি কেন? আমি তো ভাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দরজা পর্যন্ত এগোতে পারি নি?

ভেবেছিলেন বোধহয় যে রসিকতা করে এবারেও তিনি বাজীমাৎ করে দেবেন। কিন্তু তা আর হতে দিলেন না সেই রসিকজন। নাছোড়বান্দা তিনি। বল্লেন,—

তা হোক্‌। আপনিই আসুন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে না হোক্‌, সাঁতারে আপনি ভাইস-চ্যান্সেলার নিশ্চয়ই!

কথা শুনে আশ-পাশের আমরা ফিকিয়ে উঠেছিলাম।

সেই মুহূর্তে প্রফুল্ল ঘোষ আর 'রা' করবার ফুরসৎ পান নি। গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য হলেন বিজয়-মঞ্চের দিকে।

সেই একটি মুহূর্তে বোকা ঘোষকে সত্যিই কিঞ্চিৎ বোকা বোকা ঠেকেছিল!

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।।২।।

সেদিনকার সে ঝড়ের মধ্যেও এই মনোভাবটাই বোধ হয় প্রকট হয়ে উঠেছিল বলাইয়ের।

প্রথম যখন ঝড়টা ওঠে, তখন বোঝা যায়নি একটুও যে, কোন অঘটন বা এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। পুজোর সময় বাদ্‌লা তো হয়ই—এও সেই রকম একটা কিছু মনে করেছিল সকলে। সারাদিনটাই মেঘলা মেঘলা, মধ্যে মধ্যে দমকা হাওয়া আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি—এই ভাবেই চলছিল, বিকেলের দিকে শুধু হাওয়ার বেগটা একটু বেড়েছিল—এই মাত্র। তবু তখনও ঝড় বলে তাকে বোঝা যায়নি।

সেদিন ষষ্ঠী, শ্যামার উপবাস। নিরম্বু নয়, ষষ্ঠীতে নিরম্বু উপোস করতে নেই পোয়াতীদের—তবে ভাতটাও খেতে নেই। সব ষষ্ঠী শ্যামাদের নেই, কিন্তু 'দুগ্‌গো ষষ্ঠী'টা আছে। যদিও ছেলেদের গাল না দিয়ে জল খান না প্রায় কোনদিনই, ঠাকুর-দেবতার কাছে আসছে জন্মে আঁটকুড়ো হয়ে জন্মাবারই প্রার্থনা জানান নিত্য—তবু ষষ্ঠীর উপবাস পালনেও ভুল হয় না কখনও। পাঁচ পয়সার পুজোও পাঠিয়ে দেন সিদ্ধেশ্বরীতলায়। বাড়িতে পুজোর পাট অনেকদিনই উঠিয়ে দিয়েছেন, অত কাণ্ড করে কে, লোক কই তার? সিদ্ধেশ্বরী কালী—ওঁর মধ্যেই সব দেব-দেবীর অধিষ্ঠান, তাই ওখানেই যাকিছু পুজো পাঠিয়ে দেন আজকাল। জামাইবাড়ি বিগ্রহ আছে, বারো মাসে তের পার্বন তাদের করতেই হয়—সেখানেও পুজো দেওয়া চলে, কিন্তু জামাইবাড়ি পাঁচ পয়সার পুজো দেওয়া চলে না। সেটুকু চক্ষুলজ্জা এখনও তাঁর যায়নি। সিদ্ধেশ্বরীতলায় অত হিসেব কেউ করবে না, পয়সায় পয়সা মিশে যাবে, ও-ই তাঁর ভাল। হুঁশও থাকে শ্যামার—ঘরে পাঁজী নেই, কিন্তু আন্দাজে আন্দাজে ষষ্ঠী বা একাদশীর দিনগুলো ঠিক জিজ্ঞাসা করে জেনে নেন পাড়ার জীবন চাটুয্যেকে।

ভাত খেতে নেই—ময়দা খাওয়াই বিধি, কিন্তু মুখে দেবার মতো একটু কিছু থাকলে আর ওসব হাঙ্গামা করেন না। পাকা কলা প্রায়ই থাকে ঘরে, আর নারকোল। নারকোল কুরে তার সঙ্গে তিন-চারটে কলা চট্‌কে খেয়ে নেন। শেষে একটু গুড় গালে দিয়ে জল খান। ফলের পরই জল খেলে চণ্ডালের আহার হয়, তাই একটু মিষ্টি খাওয়া বিধি। কিন্তু সে যাই হোক, এইতেই চলে যায় তাঁর একটা দিন, এইতেই চালিয়ে নেনও সাধারণত। এবারে বড় বিপদে পড়েই অন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কলা পাকে নি আজ এক মাসের মধ্যে এক কাঁদিও। পাকতে—রঙ্‌ ধরব ধরব হয়েও ছিল—কিন্তু পুরো দুটি কাঁদি কলা 'কোন্‌ হাভাতের ঘরের বেটাবেটিরা', 'কোন্‌ আঁটকুড়োর পুষ্যিপুত্তুররা' কেটে নিয়ে গেছে চুরি করে। আর যা আছে নিতান্তই ছোট, অপুষ্ট। কেটে চট জড়িয়ে রাখলেও পাকবে না এখন।

অন্য ব্যবস্থা বলতে রুটি-পরোটা নয় অবশ্য। বাজার থেকে ময়দা-আটা আনিয়ে রুটি গড়তে বসার মানুষ নন শ্যামা। অবশ্য তার একটা অজুহাতও আছে, দাঁত সব থাকলেও জখম হয়েছে একটু—রুটি-পরোটা চিবোতে কষ্ট হয়। আরও কারণ আছে, রুটির সঙ্গে তরকারী চাই। এই সব দিনে যা সাধারণ দস্তুর তাঁর, তাই করেছিলেন। বহুকাল পরেই এ-পাট করলেন তিনি—ক্ষুদের সঙ্গে এক গাল ডাল ভিজিয়ে সরু-চাকলি করেছিলেন খানকতক। তা-ই দুই দিদি-নাতিতে দুপুরবেলা খেয়েছিলেন, বাড়তি তিন-চারখানা পড়েছিল বলাইয়ের ও-বেলার মতো।

জিনিসটার ঘটা যত না থাক, ল্যাঠা আছে। এক হাতে চাল-ডাল বাটা, গোলা, আবার একখানি একখানি করে তোলা—এইতেই খেয়ে উঠতে উঠতে বেলা চারটে বেজে গিয়েছিল। তারপর বাসন মেজে, রান্নাঘর আর দাওয়া নিকিয়ে কাপড় কেচে আসতে আসতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। সারাদিন একটানা খাটুনি আজকাল আর পেরে ওঠেন না—ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সন্ধ্যে হলে তো আর যেন বয় না, কেবলই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। শুয়েই পড়েন সাধারণত, তবে ঘরদোর তখন সারা হয় না। বলাইয়ের খাওয়ার সময় একবার লম্প জ্বালাই হয়—সেই সময়ই সেসব সেরে নেন। অবশ্য অন্য দিন ভাতের ব্যবস্থা, রান্নাঘরেই হাঁড়িতে থাকে—সেখানে গিয়ে ঠাঁই করে বেড়ে দিতে হয়। আজ সেসব কোন পাট নেই, সরুচাকলি চারখানা এক চিল্‌তে কলাপাতার ওপর বাটি চাপা আছে দালানের মধ্যেই—যখন হোক বাটি তুলে খেয়ে নিতে পারবে।

হাওয়ার গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না, ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে, ঝির্‌-ঝিরে বৃষ্টি তবু হাওয়ার বেগে ছুঁচের মতো বিঁধছে গায়ে এসে। সন্ধ্যা দেবার চেষ্টা করলেন শ্যামা—প্রদীপ জ্বলল না। ঘরে দ্বিতীয় আলোর ব্যবস্থা বলতে অদ্বিতীয় লম্প—সে[illegible] এ বাতাসে জ্বলবে না। সুতরাং দিনের আলোর শেষ আমেজটা থাকতে থাকতে বাইরের ঘর, রান্নাঘরে তালা দিয়ে সদর দরজা ভেজিয়ে খানকতক ইট সাজিয়ে

তা আটকে (খিল নেই বহুকাল) দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে দালানে এসে আশ্রয় নিলেন।

আলো জ্বললে মা কোনদিনই, তাতে কোন অসুবিধাও হয় না। শ্যামা শুয়ে পড়েন বটে সকাল সকাল কিন্তু জেগে থাকেন অনেক রাত পর্যন্ত। তিনিই রাজগঞ্জের ভোঁ শুনে শুনে সময় নির্ণয় করেন, যথাসময়ে উঠে খেতে দেন নাতিকে। নিজেরও কিছু খাওয়ার প্রয়োজন থাকলে সেই সময়ই খেয়ে দোরতাড়া দিয়ে শুয়ে পড়েন। বলাই সন্ধ্যা থেকে যতক্ষণ না শ্যামা উঠে খেতে দেন—মায়ের মতো দালানের একটা জানলাতে চুপ করে বসে থাকে (শ্যামার ভয় হয় মধ্যে মধ্যে মায়ের রোগে যাবে না। তো শেষ অবধি?)—অন্ধকার-জমাট-হয়ে-থাকা কাঁটাল গাছটার পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকিগুলো জ্বলে আর নেভে. বসে বসে তাই দেখে। বাইরে নক্ষত্রের একটা আলো থাকে, এ-বাড়ির উঠানে তাও নামে না, সে ক্ষীণ আলো এই অসংখ্য গাছপালা পত্রপল্লবের দুর্ভেদ্য অন্তরাল ভেদ করতে পারে না। তা হোক, তবু দালানের খোলা দোরের কাছটাতে একটু আলোর আভাস পাওয়া যায়. দিদিমার বিছানাটাও আন্দাজে আন্দাজে ঠাওর করতে পারে।

আজ কিন্তু দুজনেরই আলোর কথাটা মনে হ'ল। হাওয়া আর জলের ঝাপটায় জানলা খুলে রাখা গেল না, দরজাও বন্ধ করতে হ'ল। তার ফলে ভেতরের অন্ধকার ভয়াবহ হয়ে উঠল একেবারে—যেন কে গলা টিপে ধরছে ওদের। আলো নিভিয়েই শুয়ে পড়ে অন্যদিন দরজা বন্ধ করে, তবু জানলাটা খোলা থাকে—এসবই বন্ধ। শ্যামার নিজেরই হাঁফ ধরার মতো হ'ল—তিনিই বলতে বাধ্য হলেন, 'তা না হয় লম্পটাই জ্বাল না বাপু একটু—দোর-জানলা বন্ধ আছে, হাওয়ার ভয় তো নেই।'

কিন্তু লম্পটা জ্বালাতে গিয়ে দেখা গেল তাও আছে। পুরনো বাড়ির জানলা-কপাট কম দামেরই ছিল নিশ্চয়, সে নিবারণ দাসের সঙ্গতি বেশী ছিল না—একেবারে নিরন্ধ্র চাপা নয়। বেশ একটু-আধটু ফাঁক আছে, কোথাও কোথাও আলগাও হয়ে গেছে কাঠ কিছু কিছু। সেই সব সামান্য সামান্য ফাঁক দিয়েই প্রচুর বাতাস আসছে। সংকীর্ণ পথ দিয়ে প্রবল বেগে বাতাস ঢোকার ফলে একটা শিস্ দেবার মতো শব্দ হচ্ছে অবিরাম। সে হাওয়ায় বন্ধ ঘরেও লম্পর শিখা স্থির থাকে না। নিভে যাওয়ার মতোই অবস্থা হ'তে লাগল বার বার। বেগতিক দেখে শ্যামা নিজেই বেঁকেচুরে উঠে প্রায় হামা দিয়ে এসে তাড়াতাড়ি সেটা জলের কলসীর খাঁজে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতে নিভে যাওয়াটা বাঁচলেও, শিখার কেঁপে কেঁপে ওঠাটা নিবারিত হ'ল না। আর তার ফলেই ধোঁয়া বেরোতে লাগল প্রচুর, দেখতে দেখতে বিশ্রী কেরোসিনের গন্ধে ঘর ভরে উঠল। অর্থাৎ নতুন এক উপসর্গের সৃষ্টি হ'ল।

বাইরে বাতাসের শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে ওধারে। ঝড় ঝড় কটাং—বাঁশবনে শব্দ হচ্ছে। কট্ কট্ শব্দ করে বেঁকে বেঁকে উঠছে খড় বাঁশগুলো। বাঁশে বাঁশে ঠোকাঠুকি হচ্ছে অবিরত। রান্নাঘরের মটকাতে চড় চড় করে টান পড়ছে মধ্যে মধ্যে, সমস্ত চালাটা যেন উঠে পড়ছে খানিকটা ক'রে। আরও বারকতক এমন টান পড়লে উড়েই যাবে হয়ত—পুরনো দড়ি, সে প্রবল আকর্ষণ রুখতে পারবে না। ওদের মিষ্টি-আমড়ার গাছটা বোধ হয় পড়ে গেল পুকুরের মধ্যে, অন্তত সেই রকমই একটা বিরাট শব্দ হ'ল। গাছ আরও ভাঙ্গছে বোধ হয়—মড় মড় ক'রে বড় বড় ডাল ভেঙ্গে পড়ছে, সে শব্দ এই হাওয়ার শব্দ ভেদ করেও শুনতে পাচ্ছে ওরা। দুম্‌দাম্ নারকোল পড়ছে, সুপুরি নারকোলের বড় বড় পাতাগুলো বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে এসে আছড়ে পড়ছে ওদের দেওয়ালে, ওদের ছাদে—অন্য গাছের ওপরও। ঝড়ই—এবার আর কোন সন্দেহ রইল না। রীতিমতো বিরাট ঝড় একটা। শ্যামার মনে পড়ল সেবারের সেই আশ্বিনের ঝড়ের কথা। অস্পষ্ট হ'লেও মনে আছে সে কথাটা। তেমনি প্রলয় কাণ্ড একটা কিছু হবে না তো? আশ্বিন তো শেষ হয়ে আসতে গেল বাপু, আজই বোধ হয় সংক্রান্তি কিম্বা আজ কার্তিক মাসের পয়লা। কে জানে বাপু!......

দূরে বোধহয় কার টিনের চালা উড়ে গেল একটা—বিকট ঝনঝন শব্দ হতে লাগল কিছুক্ষণ ধরে—গাছে গাছে বা বিভিন্ন বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে বেধে। গাছও ভেঙ্গে পড়ছে মধ্যে মধ্যে—সে শব্দ ওদের পরিচিত, এখান থেকে ওই ঘরের মধ্যে বসেই বলে দিতে পারে কত বড় গাছ পড়ল। ইস্—সদর দরজাটাও থাকবে না বোধহয়—শুয়ে শুয়েই বিলাপ করতে লাগলেন শ্যামা—সামান্য দশ-বারোখানা ইঁট এ চাপ আর কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে?......

ভেতরে কেরোসিনের ধোঁয়া অসহ্য হয়ে উঠছে। ভুষোগুলো বাতাসে উড়ছে ঘরের মধ্যেই—বলাইয়ের মুখে মাথায় এসে পড়ল কতকগুলো। অবশেষে এক সময় 'দুত্তোর' বলে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে দালানের দরজাটা খুলে ফেলল বলাই। দমকা হাওয়ার সঙ্গে জলের ছাট ঢুকে দালানের অনেকখানি পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও গেল দপ্ ক'রে নিভে।

'ওকি, ওকি মুখপোড়া—আবার দরজা খুললি কেন, যথাসর্বস্ব যে ভিজে গেল—ও আবার কি ঢং? বাগানে যাবি নাকি এত রাত্তিরে আবার? পেট ব্যথা করছে?'

শ্যামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তবে তখনই উঠতে পারলেন না। আজকাল একবার শুলে ওঠা বড় কষ্টকর তাঁর পক্ষে। বেশ একটু সময় লাগে। শ্যামা শুয়েই পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন, 'কী রে—সঙ্গে যাব? দাঁড়াতে হবে?'

বলাই কোন উত্তরই দিল না। সাবধানে একটা কপাট ভেজিয়ে দিয় চেপে ধরে রইল সেটা। দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল সমানে।

বাইরে তখন প্রকৃতির একটা বিরাট পাগলামি শুরু হয়ে গেছে। ঝড়ের বেগ যথেষ্ট এমনিতেই, তার মধ্যেই আবার বোঁ-ও-ও ক'রে যেন ক্রুদ্ধ গর্জন ক'রে উঠছে এক একবার। সে সময়ে দোর-জানলাগুলো ঝনঝন ক'রে কেঁপে উঠছে। ভাগ্যে অভয়পদ সব জানলাতে দরজায় লোহার আল্‌তারাপ ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দিয়ে গেছে, আগেকার জরাজীর্ণ কাঠের ছিট্‌কিনি থাকলে দোর-জানলা বন্ধ রাখা যেত না। রান্নাঘরের চালাটার অবস্থাই খারাপ—

ক্ষ্যাপা হাওয়ার দমকা আঘাতে ফুলে ফুলে উঠছে, বেশ খানিকটা ওপরে উঠে যাচ্ছে এক-একবার। মনে হচ্ছে এখনই মটকার বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে যাবে চালাটা। অথচ ঠিক ছিঁড়ছেও না, শেষ পর্যন্ত শুধু ওর সেই সহস্র নাড়ির পাকে পাকে প্রবল টান পড়ায় চালাটা যেন ককিয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠছে সেই সময়টায়।

.........দূরে কাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে—বুঝি চেঁচিয়ে কাঁদছে কারা—অবশ্য এই বাতাসের তাণ্ডবে কান্নার মতো শব্দ তো চারিদিকেই—তবু মনে হচ্ছে বাউরীদের বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজও উঠছে একটা। ওদের টিনের চালা—উড়ে গেছে সম্ভবত কিম্বা ঘরই ভেঙ্গে পড়েছে সবসুদ্ধ। গাছ-পালা তো বোধহয় কারও বাগানে থাকল না—প্রায়ই মড়-মড়াৎ শব্দ উঠছে, বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ছে কোথাও না কোথাও। এই বোধহয় প্রলয়—বলাই মনে মনে বলল।

এবার শ্যামা উঠে এলেন, বেঁকে পরে কোমরটা সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ওর পেছনে, 'বলি কী হয়েছে কি, ঘরে যে নদী নালা বয়ে গেল। এমন ক'রে দাঁড়িয়ে ভিজছিস কেন?'

উঠল আবার। বলল, 'তুমি দোর দাও
বলাই যেন এতক্ষণে একটু নড়ে চড়ে

দিদিমা, আমি বাইরে থাকি, ডাকলে দোর খুলে দিও।'

'আ মর, বাইরে থাকবি কি, চারদিকে পাতা উড়ছে বড় বড়, গাছের ডাল ভেঙে এসে পড়ছে, শেষে কি একটা খুন-খারাপি কান্ড হবে?'

'তা হোক। তুমি দোর দাও। আমি রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসছি।'

বলতে বলতেই তরতরিয়ে উঠোনে নেমে গেল সে। যেতে গিয়ে সেই জল-কাদার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লও এক-বার—'মা গো!' বলে অস্ফুট শব্দও ক'রে উঠল ভয়ে, কারণ মনে হ'ল কী যেন একটা বিরাট পত্রপল্লবের স্তূপের মধ্যে জড়িয়ে গেল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকে উঠতে আশ্বস্ত হ'ল। কাদের একটা প্রকান্ড পেঁপে গাছ—ফুল-ফল সুদ্ধ উড়ে এসে পড়েছে তাদের উঠোনে। তাদের নয়, তাদের এতবড় পেঁপে গাছ নেই। হয়ত মল্লিকদের বাড়ি কিম্বা চাটুয্যেদের বাড়ি থেকে উপড়ে চলে এসেছে ঝড়ের টানে।

শ্যামা নিরুপায় হয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর এ বয়সে এসব দাপাদাপি সয় না। ভিজে জ্বর হয় ও-ই জব্দ হবে, টাঙিয়ে রেখে দেবেন তিনি একগাল মুড়ি খাইয়ে। আদর সোহাগ ক'রে ডাক্তারও ডাকবেন না কিম্বা সাগু-বার্লি-মিশ্রি এনে তোয়াজ ক'রে খাওয়াতে বসবেন না। পাগল, ছোঁড়াটাও পাগল হয়ে গেছে। মায়ের রোগে গেছে একেবারে।

দরজা বন্ধ ক'রে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে এসে আবার শুয়ে পড়লেন। যা হবার হোক গে, তার মাথায় ছাদটা না ভেঙে পড়লেই হ'ল।.........

বলাইও পেঁপে গাছ থেকে মুক্তি পেয়ে দুটো বড় বড় নারকোল পাতায় হোঁচট খেয়ে দাওয়ায় এসে উঠল। চালটার গতিক ভাল নয়, মনে মনে হিসাব করতে বসল বলাই, বছর চারেক আগে বড় মামা শেষ চাল বাঁধিয়েছিলেন দাঁড়িয়ে থেকে—সে দড়ি কি এতদিনে পচে যায় নি?......... তা যাক গে, চালাটা উড়ে গেলেও দেওয়াল চাপা পড়বে না। পাকা দেওয়াল। তবে তার ভয় করতে লাগল অন্য কারণে। সদর দরজায় কে যেন দুম দুম ক'রে লাথি মারছে। বেশ জোরেই মারছে, ঝন-ঝন ক'রে উঠছে কপাট দুটো। ঘর থেকে শোনা যায়নি এতক্ষণ, এখানে এসে বেশ স্পষ্ট শুনছে। কে এল এই এত রাত্রে—এই দুর্যোগের মধ্যে? ডাকাত নয় তো? তার দিদিমার ধন-অপবাদ বেশ ভালো রকমই আছে, ডাকাতি করতে হ'লে এই প্রকৃষ্ট অবসর—আজ একটি প্রাণীও বেরোবে না ঘর থেকে, ওদের খুন ক'রে মেরে রেখে গেলেও না। শুনতেই পাবে না কেউ তাদের চিৎকার।

আড়ষ্ট কাঠ হয়ে বসে রইল বলাই। ওদিকে লাথি মেরেই যাচ্ছে তারা। এখনই হয়ত কপাটটা ভেঙে পড়বে, বেশ বুঝতে পারছে বলাই। তারপর—

কিন্তু কপাটটা ভাঙল না অনেকক্ষণ অবধি। লাথি চলতেই লাগল সমানে। ক্রমে বলাইও বুঝতে পারল ব্যাপারটা। লাথি কেউই মারছে না, ওটাও হাওয়ার কীর্তি। হাওয়াতেই ঝন-ঝন ক'রে উঠছে দরজাটা। একটু আশ্বস্ত হ'ল সে। আবার নিশ্চিন্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকাল।

আকাশ-ভরা মেঘ কিন্তু তারই মধ্যে কেমন যেন একটা অনৈসর্গিক আলো ফুটে উঠেছে দিকচক্ররেখায়। সে আলো মনে কোন অভয়ের বার্তা আনে না, আতঙ্ক জাগায়। এখান থেকে আকাশটা এতখানি দেখা যায় না অন্য দিন, আজ গাছপালা বিস্তর ফাঁক হয়ে যাওয়ায় এতটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গাছপালা পড়েই যাচ্ছে বিপুল শব্দ ক'রে। ছোট-খাটো গাছ অথবা বড় গাছের ডাল মাটির দিক থেকে বাতাসের টানে শূন্যে উঠে যাচ্ছে, শূন্যেই পাক খাচ্ছে ঘূর্ণি হাওয়ায়, পড়ব পড়ব ক'রেও আবার দূরে সরে যাচ্ছে। কোথায় গিয়ে পড়ছে কে জানে, কোথাও পড়বে কিনা আদৌ তাই বা কে জানে! একটা-দুটো বহুক্ষণ ধরে—যেন ক্লান্ত হয়েই—ওদের উঠোনে বা ছাদে এসে আছড়ে পড়ছে, আবার চলেও যাচ্ছে হয়ত খানিক পরে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-চমকের সময় বড় বড় গাছের ডালগুলোকে ঘুরপাক খেতে দেখলে যেন কেমন ক'রে মনের মধ্যে।

ঝড় বেড়েই চলল রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতি সত্যিই যেন ক্ষেপে গিয়েছে। বহু হাজার পাগলা হাতি যেন ছেড়ে দিয়েছে কে আকাশে। এমন দাপা-দাপি বলাই জীবনে কখনও দেখেনি বা শোনে নি। ঝড় জল বর্ষাকালে হয়ই, কিন্তু সে ঝড় যে এমন প্রলয়ঙ্কর হ'তে পারে—তার সামনে মানুষের সমস্ত শক্তিকে এত তুচ্ছ এত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়—সে অভিজ্ঞতা ওর ছিল না। কেউ ওকে বলে দেয় নি, বললেও এ জিনিস ধারণা করা সম্ভব নয়।

জলে ভিজে ভিজে শীত করতে লাগল বলাইয়ের, দাঁতে দাঁতে লেগে কাঁপুনি শুরু হ'ল—তবু সে ভেতরে গেল না বা দিদিমাকে দোর খুলে দিতে বলল না। বরং কেমন যেন একটু অদ্ভুত আনন্দ বোধ করতে লাগল সে এই কষ্টের মধ্য থেকেই। পিশাচের মতো এই ধ্বংসলীলা দুচোখ, দুই কান ভরে পান করতে লাগল যেন। যত গাছপালা ভাঙে, যত দূরে পাড়ায় পাড়ায় চালা উড়ে যাবার বা বাড়ি ভেঙে পড়ার শব্দ হয়, ততই যেন আনন্দ বাড়ে তার। হি-হি ক'রে হাসে সে কাঁপতে কাঁপতেই। আর আপন মনে বলে, 'মর, মর, সবাই মর। সবাই মিলে সপুরী এক গাড়ে যা। কাল সকালে কেউ না বেঁচে থাকে আর।'

পড়ুক না, সব বাড়িগুলো ভেঙে পড়ুক—তাহলে আমি হরির নোট দিই—সব যাক। সব যাক!'

পরেরদিন সকালেও সে ঝড় থামল না। ঝড়ও না, জলও না। ঘর থেকে বেরোতেই পারে না কেউ। বারোয়ারী-তলার ঠাকুর নাকি গলে গেছে জল পড়ে পড়ে, মহাদেবের মা ভিজতে ভিজতে এসে খবর দিয়ে গেল, 'এমন অলক্ষুণে কান্ড জন্মে দেখি নি মা, কাচ্চা-বাচ্চাগুলোকে বাঁচাব কেমন ক'রে তাই ভেবে পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে।...তা এই কি তাহলে কলিযুগের শেষ হ'ল—হেই বামুন মা?'

সে তথ্য শ্যামাও যোগাতে পারেন না। সকালে উঠে বাগানের চেহারা দেখে তাঁর চোখে জল এসে গেছে। ফলন্ত গাছ সব—কোথায় যেন কী লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। কার একটা নারকেল গাছের মাথা এসে পড়েছে তাঁর পুকুরের জলে, তাঁরও একটা নারকেল গাছ পড়ে গেছে। লোকসান যা হবার তা তো হয়েছেই—এখন এই জঞ্জাল তিনি মুক্ত করাবেন কাকে দিয়ে—কত-দিনে? পয়সা খরচ ক'রে লোক লাগাতে হবে নাকি শেষ পর্যন্ত? এসব যে তাঁরা দিদি-নাতিতে পারবেন বলে মনে হয় না!'......

রাত্রে জেগে থাকব মনে ক'রেও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শ্যামা। শেষরাত্রে হঠাৎ চমক ভেঙে গাঢ় অন্ধকারে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন একবার, কারণ তখনও সে গর্জন সমানে চলছে বাইরে, দাপাদাপি গর্জনের কিছুমাত্র বিরাম নেই।......তার পর একটু সামলে নিয়ে ব্যাপারটা মনে করবার চেষ্টা করতেই মনে পড়ে গেল বলাইয়ের কথা। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে অল্প অস্পষ্ট ভোরাই আলোতে দেখলেন সে তখনও দাওয়ায় বসে বসে ভিজছে আর ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। অগত্যা শ্যামাকেও ভিজে ভিজে নেমে আসতে হয়েছিল, তিনিও হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন একবার পেঁপে গাছটায়—তাঁর খুব লাগেনি—উঠে বলাইয়ের কনুইটা ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন।

'আপদ বালাই! সাত জন্মের আপদ বালাই সব! যত রাজ্যের আপদ বালাইরা আমার কাছে মরতে আসে একধার থেকে। আর কোথাও তো যেতে পার না, আর কোন চুলো মনে পড়ে না তো! যেন সার বেঁধে বসে থাকে সব আমাকে জ্বালাবে-পোড়াবে বলে!'

বকতে বকতে ওর কাপড় ছাড়িয়ে গা মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন কাঁথা চাপা দিয়ে। বলাইও কোন প্রতিবাদ করেনি, কাঁপতে কাঁপতে তখন রীতি-মতোই কষ্ট হচ্ছিল তার, বিছানার উষ্ণতার মধ্যে অসতে পেয়ে বেঁচে গেল সে।

সেই থেকেই সে ঘুমোচ্ছে। কত বেলা হচ্ছে তা শ্যামা ঠাওর পাচ্ছেন না। রাজগঞ্জের ভোঁও বোধহয় বন্ধ আছে—কিম্বা এই আওয়াজে শুনতে পাচ্ছেন না।......

শ্যামা আর এর ভেতর ঘর-দোর মোছা বাসি-পাটের চেষ্টা করলেন না। অবিরাম আবর্জনা বাড়ছে, কত করবেন তিনি? ঘরের বাইরেই বেরনো যাচ্ছে না, ভিজে ভিজে এসব করতে পারবেন না।

আজ সপ্তমী পুজো—আটটা নটার মধ্যে দুটি ভাত ফুটিয়ে খেলে খাওয়া যেত—বলির হাঁড়িতে খেতে নেই, তা বলি কি ভোরবেলা হয়? ওসব মানেন না শ্যামা, সকাল ক'রে দুটো খেয়ে নিলেই হ'ল, তাতে বলির হাঁড়ির দোষ হবে কেন!—তা আজ আর সে ব্যবস্থা করা গেল না। কত বেলা তা-ই তো ঠাওর হচ্ছে না। মনে পড়ল বাসি সরুচাকলি ক'খানা পাতাতে বাটি-ঢাকা পড়ে আছে, বলাই খায় নি—হয়ত এলিয়ে নাল কেটে গেছে একটু একটু—তা হোক্, ঐগুলোই তিনি খাবেন'খন। বলাইকে এক গাল ডাল-ভাতে দিয়ে দুটো ভাত খাইয়ে দেবেন যখন হোক। বলাই উঠুক। রান্নাঘরের মধ্যেই পাতার জ্বালে তিজেলটা ক'রে ভাত চাপিয়ে দেবেন তখন।

শ্যামাও স্তব্ধ হয়ে বসে বসে প্রকৃতির এই অভাবনীয় তান্ডব দেখতে লাগলেন।

সেদিন সন্ধ্যার দিক থেকেই একটু-একটু ক'রে কমে এল ঝড়-জলের দাপট। পুরো দুদিন ধরে অশোভন মাতামাতি করার পর যেন শ্রান্ত হয়ে পড়লেন প্রকৃতি। অষ্টমীর দিন ভোর থেকে নিস্তব্ধ শান্ত হয়ে গেল চারিদিক। একটু একটু ক'রে পৃথিবী আবার তার স্বাভাবিক জীবন-স্পন্দন খুঁজতে শুরু করল, থেমে-যাওয়া নিঃশ্বাসটা ভরসা ক'রে টানতে আরম্ভ করল আবার।

কিন্তু এ স্তব্ধতা শ্মশানের স্তব্ধতা। যতদূর দৃষ্টি যায়, ক্ষতিই চোখে পড়ে শুধু। যা কিছু শোনা যায়—শুধু মানুষের সর্বনাশের বিবরণ। বিশেষত গরীব মানুষের। তাদের ঘর গেছে, বাড়ি গেছে, গরু গেছে, ছাগল গেছে, ধান গেছে চাল গেছে—প্রাণও গেছে বহু জায়গায়। মা এবার এসেছেন যেন শ্মশানবাসিনী ভৈরবীর বেশে, পুত্র-কন্যা নয়—ডাকিনী-যোগিনীদের সহচরী ক'রে। তাদেরই তাথিয়া তাথিয়া নাচে পৃথিবী টলমল করেছে দুদিন, প্রলয়ের আভাস ঘনিয়ে এসেছে তার বুকে। আজ তারা বিদায় নিয়েছে কিন্তু শ্মশানই ক'রে রেখে গেছে চারিদিক।......

তবু তখনও সর্বনাশের পরিমাণটা পুরো জানা যায়নি। কারণ জানার উপায় ছিল না। খবর পাওয়া গেল কদিন পরে। সত্যি-সত্যিই সর্বনাশ হয়ে গেছে মেদিনীপুরের। সেই চীনাসাগরের হারি-কেন বা টাইফুন যেন পথভুলে এসে হাজির হয়েছিল বঙ্গোপসাগরের কালো জলে। সে তার চিহ্ন রেখে গেছে মৃত্যুতে আর ধ্বংসেতে। সমুদ্র থেকে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ উঠে বড় বড় দোতলা তেতলা বাড়ি ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে, সে ভয়ংকর দৃশ্যের আতঙ্কের মূর্ছাতুর হয়ে পড়েছে অধিকাংশ প্রাণী, প্রাণরক্ষার চেষ্টা করতে হাত-পা ওঠেনি তাদের। এ-রকম যে হয় তাই এদের জানা ছিল না, স্মরণকালের মধ্যে এরকম মূর্তি সাগর-জলের তারা দেখেনি। সাইক্লোন তারা জানে, ঝড় এর আগেও বড় বড় হয়ে গেছে, কিন্তু এর চেহারা একেবারে আলাদা, এ একেবারে ভিন্ন জাতের। সাগরের জল বহুদূর পর্যন্ত জনপদের মধ্যে চলে এসেছে, সচল পর্বতের মতো ঢেউ এসে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে তাদের। জল যখন সরে গেছে তখন শুধু সারসার শবদেহই নজরে পড়েছে। জীবিত প্রাণী বিশেষ নয়। কত দেহ ভেসে গেছে তাও কেউ জানে না, কত দেহ পাঁক-কাদা ঘেঁটে বার করতে হয়েছে। এরকম সাংঘাতিক ধ্বংসলীলা এ জেলা'র লোক কেউ কখনও দেখেনি। মহাপ্রলয়ের স্বাদ পেলে তারা এই ক'ঘন্টায়।

তাও সর্বনাশের পূর্ণ পরিমাণটা একেবারেই জানা যায়নি। কারণ বলবার মতো বিশেষ কেউ ছিল না। যারা বেঁচে ছিল, তাদেরও সংবাদ পাঠানোর মতো অবস্থা ছিল না। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল তারা। তাছাড়া সংবাদ আসার পথও রুদ্ধ। টেলিগ্রাম টেলিফোন কিছুই নেই—খুঁটিগুলিরও চিহ্ন নেই কোথাও কোথাও।

বৃটিশ সরকার বহুদিন ধরে সুযোগ খুঁজছিলেন মেদিনীপুরকে জব্দ করবার—এই সুযোগে তাঁরা মানুষের যাতায়াতও বন্ধ ক'রে দিলেন। বিনা হুকুমে বাইরের কেউ ঢুকতে পারবে না সেখানে—সেবা-ব্রতীরাও কেউ নয়।

দুঃখিত হ'ল সবাই। শিউরে উঠল ভগবানের এই নির্মম মার প্রত্যক্ষ ক'রে—শুধু শ্যামা শুনে বললেন, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে! কেন—ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করার তো অত সাধ, কর্ এখন লড়াই। দেখলি তো, ভগবান সুদ্ধু ওদের দিকে। চালাকি করতে গিছলি, দিলে ঠান্ডা ক'রে। এখন থাকো কাঁকরমাটি চিবিয়ে—যেমনকে তেমনি!'

তিনি যেন একটা ব্যক্তিগত বিজয়গর্ব অনুভব করেন—তাঁরই স্বদেশবাসী, স্ব-ভাষাভাষী কতকগুলি মানুষের মর্মা-ন্তিক এই দুর্দশায়।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

দিল্লীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের পঞ্চাশ তম অধিবেশন শুরু হয়েছে। এখনো পর্যন্ত (৯ই অক্টোবর) এই অধিবেশনের যতোটুকু বিবরণ দৈনিক পত্রিকায় পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকে বলা চলে, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই অধিবেশনটি শুধু ভাষণদান ও নিবন্ধ-পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, ভারতের বৈজ্ঞানিক সংগঠনের বিশেষ একটি ব্যাধির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশের জন্যেও স্মরণীয় হবে। একটি মাত্র শব্দ ব্যবহার করে এই ব্যাধিটির পরিচয় যদি দিতে হয় তো বলতে হবে আমলা-তান্ত্রিকতা। দিল্লীর একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে এই ব্যাধির প্রথম প্রকাশ্য লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছিল। তারপরে প্রতি বছরেই প্রচুর-সংখ্যক অনন্যোপায় বিজ্ঞানীর উপযুক্ত জীবিকা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে দেশত্যাগের মধ্যে দিয়ে এই লক্ষণটি ভারতের বৈজ্ঞানিক সংগঠনের সর্বাঙ্গে জাঁকিয়ে বসেছে। বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুকাল ধরেই পত্র-পত্রিকায় আলোচনাও চলছিল। তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মহলে মূল ব্যাধিটির নিরাময়ের জন্যে কোনো সুনির্দিষ্ট তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। আশা করা চলে, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মতো ব্যক্তিও যখন বিশেষ করে এই ব্যাধিটির প্রতিই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন—তার কিছুটা সুফল হয়তো পাওয়া যাবে (যদি না নিতান্তই আমলাতান্ত্রিক ধরনে এই ভাষণটিও ঠাণ্ডাঘরে নিক্ষিপ্ত না হয়)।

খবরের কাগজের বিবরণে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নেহরু 'আমলা-তান্ত্রিকতা' শব্দটি ব্যবহার করেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল এই ঃ সরকারী কাজ-কর্ম যে পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যেন তা থেকে বিরত থাকবার চেষ্টা করেন এবং ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটি অথবা সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির মতো বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জন্যে সচেষ্ট হন।

বিশেষ করে প্ল্যানিং কমিশন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উক্তির মধ্যে একটি শোচনীয় চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, প্ল্যানিং কমিশন যে-পদ্ধতিতে কাজকর্ম করে থাকে তা সরকারী শাসনযন্ত্রের হুবহু প্রতিচ্ছবি; এই প্ল্যানিং কমিশনেও যে-কোনো সরকারী দপ্তরের মতো এক দঙ্গল সেক্রেটারি, আণ্ডার-সেক্রেটারি, ডিরেক্টর এবং আরো অনেক কিছু। এই অবস্থাকে এককথায় তিনি বলেছেন, ত্রাসজনক—ফ্রাইটেনিং। তারপরে অত্যন্ত শ্লেষের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, এমন কি প্ল্যানিং কমিশনের পাঁচতলা অট্টালিকাটি দেখলেও ত্রাসের সঞ্চার হয়ে থাকে।

আমরা এই মন্তব্যের সঙ্গে আরো একটু যোগ করে দিতে পারি। প্ল্যানিং কমিশন দেশের জন্যে যে ভবিষ্যৎ রচনা করেছেন, তা-ও অনেকটা তাঁদের নিজস্ব অট্টালিকার মতোই বহিরঙ্গে জাঁক-জমকপূর্ণ। কিন্তু বাস্তব ফলের বিচারে ত্রাসজনক। প্ল্যানিং কমিশনের নিজস্ব [illegible] এই ত্রাসজনক ভবিষ্যতের [illegible] আছে।

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অন্য একটি উক্তিও এদেশের প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে অনুসরিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতি হওয়া উচিত বয়স ও সিনিয়রিটির দাবিতে নয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে। তাঁর মতে, প্রতিভার উন্মেষের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর বয়স। এই অল্পবয়সীদের হাতেই তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচালনা-ভার অর্পণ করতে চেয়েছেন।

অধিবেশনের মূল সভাপতি ডঃ কোঠারির ভাষণে এই সর্বাধিক প্রয়োজনের দিকটিই সুবিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি জোর দিয়েছেন পাঠক্রম ও শিক্ষণপ্রণালীর আমূল

পরিবর্তনের প্রয়োজনের ওপরে। তাঁর মতে, ভারতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্যেই প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন ও গবেষণা-কেন্দ্রসহ সুসংহত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা দরকার। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই যুক্ত থাকবেন দেশের শ্রেষ্ঠ গবেষক ও বিজ্ঞানীরা।

পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র নির্মাণে ভারত

অধিবেশনে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র নির্মাণে ভারতের উদ্যোগ-আয়োজনের বিবরণ দিয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ দিয়েছেন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ এইচ জে ভাবা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিশেষ একটি ভারতীয় মনোভাবের উল্লেখ করে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। এই মনোভাবটিকে বলা চলে বিদেশীদের ওপরে ভারতীয়দের নির্ভরশীলতা। ভারতে যা কিছু করা হোক না কেন, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়াটা প্রায় রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রেই প্রমাণ আছে যে, সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় উদ্যোগেই অনেক বৃহৎ প্রকল্পের রূপায়ণ সম্ভব। ডঃ ভাবা ঘোষণা করেন যে, ভারতে যখন চতুর্থ পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে, তখন বিদেশী বিশেষজ্ঞের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরাই এই প্রকল্পের নক্শা প্রস্তুত করবেন ও নির্মাণকার্য সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ভারত স্বাবলম্বী হতে চলেছে, এই ঘটনাই হবে তার প্রমাণ।

তিনি বিশেষভাবে ট্রম্বের নির্মীয়মান পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের বিষয়ে উল্লেখ করেন। এই নির্মাণকার্যে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি নাঙ্গালে ভারী জল সরবরাহ কেন্দ্রের পরিকল্পনা রচনা ও বিহারের ইউরেনিয়াম খনির উন্নতিসাধনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের অবদানের বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

আমাদের দেশে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। ডঃ ভাবার ভাষণে এই সন্দেহবাদীদের জবাব দেবার মতো কয়েকটি তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন, তাপবিদ্যুৎ বা জলবিদ্যুৎ বা অন্যান্য প্রচলিত উপায়ে উৎপন্ন বিদ্যুতের তুলনায় পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুতের উৎপাদন-খরচ শতকরা প্রায় কুড়ি ভাগ কম। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে, বোম্বাইয়ে এখন যে তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে, তার খরচ পড়ে প্রতি ইউনিটে ৩·৭ নয়া পয়সা। আর তারাপুর পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, তার খরচ পড়বে প্রতি ইউনিটে ৩·০৬ নয়া পয়সা। রাজস্থানের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ আরো কম পড়বে (প্রতি ইউনিটে ২·৮ নয়া পয়সা)।

ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের পঞ্চাশতম অধিবেশন সম্পর্কে আরো কিছু বিবরণ আগামী বারে দেবার ইচ্ছে রইল।

শিশুদের জন্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

রবীন্দ্র স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত (৪ঠা থেকে ১১ই অক্টোবর) পঞ্চম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত একটি প্রদর্শনী দেখে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। প্রদর্শনীটির নাম 'শিশুদের জন্যে বিজ্ঞান'। চার্ট, মডেল ও বাস্তব নিদর্শনের সাহায্যে বিজ্ঞানের কতকগুলো মৌলিক বিষয় এই প্রদর্শনীতে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনীশক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। প্রদর্শনীর সংগঠকরা অবশ্যই দেশবাসীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হবেন।

দুদিন আমরা প্রদর্শনীতে গিয়েছি। দুদিনই চোখে পড়েছে, শিশুরা তো বটেই, এমনকি বয়স্করাও তীব্র আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনীটি দেখছেন। সম্পূর্ণ একটি শিক্ষামূলক আয়োজন যে এতখানি সার্থকতামণ্ডিত হতে পারে—চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত হত। আমরা অবাক হয়েছি কয়েকটি ফ্রক-পরা স্কুলের মেয়েকে ব্যাখ্যাতার ভূমিকায় দেখে। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয়কেও প্রাঞ্জল করবার চেষ্টা করেছে। দেশে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, এই মেয়েদের দেখে তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

প্রদর্শনীতে কী কী বিষয় উপস্থিত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রদর্শনীতে ঢুকেই চোখে পড়বে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের সহযোগিতায় আয়োজিত যানবাহন-চলাচলে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার একটি প্রদর্শনী। কয়েকটি চার্ট ও মডেলের সাহায্যে বিষয়টিকে অতি সুন্দরভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। এই অংশটি পার হয়ে প্রধান প্রদর্শনী শুরু। প্রথমে মানুষের উৎপত্তি। চার্ট, মডেল, হাড়ের টুকরো, মাথার খুলি ও মাটির তৈরি মূর্তির সাহায্যে এই অংশে দেখানো হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ ও কালের মধ্যে দিয়ে মানুষের বিবর্তন—জাভা মানুষ, পিকিং মানুষ, নেয়ানডার্টাল মানুষ থেকে লৌহযুগের মানুষ পর্যন্ত। প্রদর্শনীর এই অংশটি সম্পূর্ণ একটি কক্ষ অধিকার করে আছে।

পরবর্তী কক্ষে প্রথমে কয়েকটি চার্টের সাহায্যে উপস্থিত করা হয়েছে অপ্টিক্যাল ও রেডিও টেলিস্কোপের
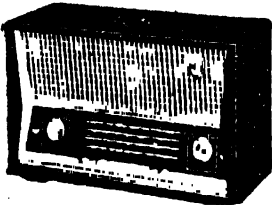
খ্‌'টিনাটি বিবরণ। তারপরে সৌর-জগতের একটি মডেল। সঙ্গে আছে অনেকগ্‌লো ছবি। তারপরের অংশটির নাম 'মহাবিশ্বের অঙ্গনে'। এটি হচ্ছে আধ্‌নিক বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা কৌত্‌-হলোদ্দীপক বিষয়। সংগঠকরা অবশ্যই চেষ্টার ত্র্‌টি করেননি। তবে মনে হয়, মডেল ও নিদর্শনের সাহায্য নিলে এই অংশটিকে আরো আকর্ষণীয় করা যেত।

এই একই কক্ষের একাংশে রয়েছে ভূবিদ্যা সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়: জিওলজিক্যাল অভিযান (জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার সহযোগিতায় আয়োজিত একটি মডেল), য্‌গে য্‌গে প্‌থিবীর পরিবর্তন (চার্ট ও ছবি), প্‌থিবীর আভ্যন্তরীণ গড়ন (চার্ট ও ছবি), আকাশের কিনারায় হাল্‌কা ডানায় ভাসা মেয়েরা (চার্ট ও ছবি), সম্‌দ্র ও প্‌থিবী (মডেল ও চার্ট)।

পরবর্তী কক্ষটি জী ব বি দ্যা, জীবাশ্মবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা সম্পর্কিত। এখানে দেখানো হয়েছে জীব ও জীব-কোষ (চার্ট ও ছবি), জীবন্ত যন্ত্র (চার্ট ও ছবি), ঘোড়ার বিবর্তন (চার্ট ও ছবি), মানবশরীর (বাস্তব নিদর্শন, মডেল, চার্ট ও ছবি), হাতির বিবর্তন (চার্ট ও ছবি) ও কয়েকটি দ্‌স্প্রাপ্য জী ব জ ন্তু র সংরক্ষিত নিদর্শন। প্রদর্শনীর এই অংশের একাংশে ব্যাঙ ও গিনিপিগের শরীর-ব্যবচ্ছেদও করা হচ্ছে।

পরবর্তী কক্ষে দ্রষ্টব্য বিষয়ের মধ্যে আছে ভারতীয় নৌবহরের জাহাজ, ঘরগ্‌হস্থালিতে বিজ্ঞান (ঘড়ি, হীটার ইত্যাদি), সেণ্ট্রাল গ্লাশ অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় প্রদর্শিত কয়েকটি নিদর্শন, বেতার স্ট্‌ডিও ও ট্রানস্‌মিটিং স্টেশন, যোগা-যোগ-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, দ্‌র-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নানা ধরনের খেলা। এমনকি বন্দ্‌ক ও রিভলবারের কায়দাকান্‌ন ব্‌ঝিয়ে দেবার একটি আয়োজনও রয়েছে এই একই কক্ষে।

এই হচ্ছে প্রদর্শনীটির মোটাম্‌টি একটি বিবরণ। সংগঠকরা বললেন যে, তাঁদের হাতে এই প্রদর্শনীর যে আয়োজন আছে, তার মাত্র এক-চতুর্থাংশ তাঁরা দেখাতে পেরেছেন। প্‌র্ণাঙ্গ প্রদর্শনীর জন্যে আরো অনেক বড়ো জায়গা চাই।

আমরা আশা করব, এই প্রদর্শনীটি কলকাতার প্রতিটি এলাকায় ও কল-কাতার বাইরে প্রতিটি শহরে ও গ্রামে উপয্‌ক্ত পরিবেশে আয়োজিত হতে পারবে। এজন্যে অবশ্যই বিভিন্ন শিক্ষা-ম্‌লক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা চাই। আমাদের বিশ্বাস আছে, মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এই প্রচেষ্টায় সকলেরই সাগ্রহ সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

পিতৃতর্পণ !
মহালয়া, ১৯৬৩
১০.১০.৬৩
ওরে !
মেয়েটা আমাকে
মেরে ফেল্লে রে !
ব্ল্যাকপুল রক্ষণশীল দলের
সম্মেলন
পশ্চিম বঙ্গ

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৮)

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গগন সেনের অনুসরণ করে আমি সুড়ঙ্গপথে নামতে লাগলাম। তাছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। আমি লক্ষ্য করেছিলাম কাঠের ডালা সরিয়ে ঐ গোপন পথ খুঁজে বার করার সংগে সংগে গগন সেনের চোখ মুখ উত্তেজনার অধীর হয়ে উঠেছিল। নীচে নামার তার প্রচণ্ড আগ্রহ, আমি নামতে না চাইলেও সে একলা নেমে যেত। চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে, এই পরিত্যক্ত আস্তাবলের মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে থাকার সাহস আমার হয়নি, তাই একরকম বাধ্য হয়েই প্রায় গগন সেনের অনুসরণ করেছিলাম।

অতি সন্তর্পণে ধাপের পর ধাপ পা ফেলে নীচে নামছি। হাঁটু, কোমর, বুক শেষ পর্যন্ত মাথাও ডুবে গেল। মাটির উপর থেকে মাটির তলার কত না পার্থক্য। এতক্ষণ উপরে দাঁড়িয়ে ফাঁকা হাওয়ায় যে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম তা বন্ধ হয়ে গেল। ড্যাপ্‌সা পচা গন্ধ। প্রথমটা নিঃশ্বাস বন্ধ করে চলছিলাম। পরে বুঝলাম তা অসম্ভব। এ সুড়ঙ্গ পথে চলতে গেলে এই দূষিত হাওয়াই সেবন করতে হবে।

গগন সেন তরতর করে নীচে নেমে যাচ্ছে। তার টর্চের আলোয় দেখলাম, সিঁড়ির শেষে সুড়ঙ্গ সমতল পথে এগিয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে খাড়া হয়ে হাঁটবার উপায় নেই, অনেকখানি মাথা নীচু করে চলতে হবে। গগন সেন আমার জন্যে সিঁড়ির তলায় অপেক্ষা করছিল, একবার জিজ্ঞেস করল, কষ্ট হচ্ছে?

মুখে বললাম, না।

কি করে তাকে বোঝাব আমি আর এক পাও এগোতে চাই না। এখুনি ফিরে যেতে পারলে আমি সবচেয়ে খুশী হই। অন্ধকারকে মানুষ ভয় করে, দেখা যায় না বলেই এ ভয়, কিন্তু চোখে সয়ে গেলে অন্ধকারকেও ক্রমে সহ্য করা যায়, এখানে শুধু অন্ধকার নয়, মাটির নীচের এক দম বন্ধ করা হাওয়া। কেন জানি না মনে হল, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, যদি আর উপরে উঠতে না পারি, এই পাতালেই আমাদের জীবন্ত সমাধি হয়ে যাবে। কেউ আমার কথা জানতে পারবে না। মেজদি নয়, সেজদা নয়, এমনকি ব্রজবালা দেবীও নয়, এ চিন্তায় সমস্ত শরীর আমার শিউরে উঠ্‌ল, উপরের দিকে তাকিয়ে আর আকাশ দেখতে পেলাম না। সামনে ঘন অন্ধকার, সেখানে আমাদের জন্যে কি অপেক্ষা করছে কে বলতে পারে।

আমি সভয়ে গগন সেনের কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালাম, তার কাঁধের উপর হাত রাখলাম, মনে হল পাথরের মত শক্ত দেহ। উত্তেজনায় সে-ও চঞ্চল, মুখে প্রকাশ না করলেও, তারও চোখে উদ্বেগের ছায়া। তবে সে নাম্‌ল কেন? কেনই বা আমাকে নীচে নিয়ে এল? আশ্চর্য মানুষের মন, কিছুতেই তাকে সংযত করতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম, সেখানে সন্দেহের আগুন জ্বল্‌ছে। নারীর চিরন্তন দুর্বলতা, অসহায়ভাবে মূর্ত হয়ে উঠ্‌ল আমার মধ্যে, নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য বার বার ধিক্কার দিলাম, ভুল করেছি, এভাবে গগন সেনের সংগে একলা আসা আমার উচিত হয়নি। হাজার হোক সে পুরুষ, আমি নারী।

গগন সেন যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারল, সহজ গলায় বল্‌ল, আর ভয় নেই অপু, আমরা এসে গেছি।

—কোথায়?

—ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগছে না?

ঠিক সেই মুহূর্তে এক ঝলক তাজা হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করেছিলাম, বললাম, হ্যাঁ। কোথা থেকে আসছে?

—গঙ্গার!

বলেই গগন সেন টর্চের আলো ডানদিকে ফেল্‌ল। দেখলাম জল সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করছে, চেঁচিয়ে উঠলাম, সেকি, কোথা দিয়ে যাব আমরা?

গগন সেন বল্‌ল, এই পর্যন্ত এসে সুড়ঙ্গ দুমুখে চলে গেছে। ডান দিকে গঙ্গা, বাঁদিকে পাতাল কুঠি। টর্চের আলোর অনুসরণ করে দেখলাম লোহার গোল জানালা।

গগন সেন বোঝাল, জাহাজের পোর্টহোলের মত ওটা খোলা যায়। চল আমরা ভেতরে ঢুকি।

অনেক দিন খোলা হয়নি বলে লোহার জানালায় জঙ্গ ধরে গিয়েছিল, অনেক টানাটানির পর সেটা খুল্‌ল। গগন সেন আলো ফেলে অন্যদিকটা দেখে নিয়ে অতি সাবধানে ভেতরে ঢুক্‌ল। আমি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম টর্চ ফেলে সে একটা দেয়াল হাঁতড়ে কি যেন খুঁজছে।

এক সময় চেঁচিয়ে উঠল, পেয়েছি।

জিজ্ঞেস করলাম, কি?

—ছিট্‌কিনি। এই দেখ দরজা খুলে দিলাম। তুমি ভেতরে এস।

গগন সেনের সাহায্যে জানালার ভেতর দিয়ে আমিও সেই ঘরে ঢুকলাম। আয়তনে ঘর খুব বড় নয়, খান দুই বিরাট লোহার সিন্দুক রয়েছে, আর একটা কাঠের আলমারী। সেই আলমারীর পাল্লা খুলতে পারলে তবেই এ সুড়ঙ্গ-পথের জানালা পাওয়া যায়। আমি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, বললাম, এ ঠিক গল্পের মত মনে হচ্ছে।

গগন সেন বল্‌ল, একদিন যা সত্য ছিল এখন তা' গল্প ছাড়া আর কি!

ডাকাতে জমিদারদের ছিপ নৌকো গঙ্গা ধরে সুড়ঙ্গ-মুখে এসে দাঁড়াত। সেখান থেকে লুঠের ধনরত্ন বয়ে এনে রাখা হত এই সিন্দুকে। বাইরের লোক কেউ তার খবর জানত না। এই হল পাতালপুরীর রহস্য।

অবাক হয়ে গগন সেনের কথা শুনছিলাম, বললাম, আমি এখানে এসে পর্যন্ত শুনেছি এ বাড়ীর মাটির তলার ঘরে এখনও নাকি ঘড়া ঘড়া মোহর পোঁতা আছে।

—শোনা কথা ঐভাবেই গল্পের রূপ নিয়েছে। কিন্তু এ ঘরের ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর। বড় করুণ।

—কি রকম!

—শুধু তো লুটের টাকাই এখানে রাখা হত না, কত লোকের জীবন্ত-সমাধি এখানে ঘটেছে কে তার খবর রাখে।

আমি শিউরে উঠলাম, সেকি?

গগন সেন গম্ভীর মুখে বলল, পুরুষের নিষ্ঠুর লালসার শিকার হতভাগিনী নারী। ছিপ নৌকো শুধু ধনরত্নই লুটে আনত না, তার সংগে জমিদারের মন হরণ করার মত সুন্দরী পরস্ত্রী, অনূঢ়া, বিধবা, কত নিরপরাধিনী যুবতীকে তারা চোখ বেঁধে এই পাতালপুরীতে এনে ফেলে দিত। ভাব তাদের কথা। আত্মীয় স্বজন সমাজ সংসার সবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরুষ বাঘের খাদ্য হিসেবে চোখের জলে দিন কাটাতে হয়েছে। তারপর তাদের লাঞ্ছনাময় জীবনের পরিসমাপ্তিও ঘটেছে এই পাতালপুরীতে। তাদের মৃতদেহ ঐ সুড়ঙ্গর মধ্যে দাহ করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে জলে। যদি এই ঘরের পাথরগুলো কথা বলতে পারত তবে সেই নিষ্ঠুর অত্যাচার, অবিচারের কাহিনী তারা তোমাকে শোনাত।

কথা শুনতে শুনতে আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম গগন সেন উত্তেজিতভাবে পায়চারী করছে, আবার বলতে শুরু করল, শুধু লালসাই নয়, কত নিরীহ প্রজাদের ধরে এনে এইখানে গুম খুন করা হয়েছে, যে-সব প্রজারা জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ করেছিল। কত কাহিনী শুনেছি, এ বাড়ীর শেষ কর্তা, ব্রজবালা দেবীর স্বামী এ ধরনের লোক ছিলেন না, তিনি মানুষ না মেরে বাঘ-ভাল্লুক শিকার করে বেরিয়েছেন। রক্ত এদের চাই, মানুষেরই হোক, পশুরই হোক, রক্ত, লাল রক্ত।

আমি এক সময় আস্তে আস্তে বললাম, চল এবার ফেরা যাক।

—চল। আমারই বোঝা উচিত ছিল এখানে এলে তোমার ভাল লাগবে না। তবু কেন যে নিয়ে এলাম। চল ফিরে যাই। উঃ, মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।

—শরীর খারাপ লাগছে?

—শরীর না মন জানি না। হয়ত বা বিবেকের দংশন। ঐ লোহার সিঁড়িটা দেখছ? পাক খেয়ে উপরে উঠে গেছে? ঐ দিয়ে উঠলেই গঙ্গার ধারের যে বাড়ীটা দেখতে পাও, তারই মধ্যে ঢুকতে পারবে। এ দিকটা ইচ্ছে করেই ব্রজবালা দেবী ব্যবহার করেন না। অতীতটাকে উনি দূরে সরিয়ে রাখতে চান।

আমি বললাম, মাঝে মাঝে রাত্রি-

বেলা এর ওপরের ঘরে আমি আলো জ্বলতে দেখেছি।

—কবে?

—দিদিমণিরা যখন ছিল।

—ব্রজবালা দেবী সেকথা জানেন?

—হ্যাঁ।

গগন সেন গম্ভীর হয়ে গেল, আর কিছু বলল না।

পাতালকুঠির গোপন দরজা বন্ধ করে জানালা টপ্‌কে বাইরে এসে আবার সুড়ঙ্গ পথ ধরে আমরা ফিরতে লাগলাম। এখন আর অত ভয় করছে না। আসার সময় মনে হয়েছিল পথ অতি দীর্ঘ, কিন্তু ফেরার বেলা অতি সহজেই সিঁড়ির ধাপের কাছে এসে গেলাম। দুজনেই উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তারাভরা নীল আকাশ। মনে হল অতি পরিচিত জন, যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

গগন সেন বলল, ভগবানের তৈরী পৃথিবী অনেক ভাল, তাই না অপু? বিশেষ করে মানুষের তৈরী এই পাতালের সঙ্গে তুলনা করলে।

আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম, বললাম, সত্যি। ধনরত্ন, টাকাকড়ি, তার জন্যে যদি এতখানি অস্বাভাবিক জীবন কাটাতে হয়, আমার তা চাই না। আমি সহজভাবে বাঁচতে চাই।

—আমিও তো তাই চাই অপু। শুধু বাঁচতে নয়, হাসতে, হাসাতে। চল, উঠি।

গগন সেন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল, একটা বলিষ্ঠ বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাতখানা সজোরে চেপে ধরেছে, পাছে না ভাঙা সিঁড়িতে আমার পা পিছলে যায়। যাবার পথে যে মানুষটার সঙ্গে চলতে আমার বুক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল এখন তারই হাত ধরে কত না নিশ্চিন্তে উপরে উঠছি।

উপরে উঠে সুড়ঙ্গের মুখ ঢাকা দিতে গিয়ে গগন সেন কান খাড়া করে কি যেন শুনল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে।

সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আমার মনে হচ্ছে তোমাদের বাড়ীর থেকে কেউ এই আস্তাবলের দিকেই আসছে।

এ কথায় আমি চম্‌কে উঠলাম, কে?

গগন সেন ক্ষিপ্র হস্তে ঢাকা চাপা দিয়ে সরে দাঁড়ালো, বলল, জানি না। তবে আমি এখানকার কোন আসবাবের পেছনে লুকিয়ে থাকব যেই হোক আমাদের জানা দরকার সে কে, আর কেনই বা এদিকে আসছে।

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, আমি তাহলে এখন কি করব!

—তুমি একলা চলে যাও। যদি কোন অচেনা লোক হয় আমি যথাসময়ে তোমাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে যাব। যাও, আর দেরী কোর না।

আমি আসবাবপত্রের ধার ঘেঁসে এগতে শুরু করলাম। শুনতে পেলাম গগন সেন খুব নীচু গলায় বলছে, যদি চেনা লোক বেরয় বোল না আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম।

একে ঐ পাতালকুঠির বিভীষিকা, তার উপর সুড়ঙ্গপথে যাতায়াতের অসীম উত্তেজনায় শরীর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, এখন আবার সামনে আর এক নতুন পরিস্থিতি। এতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে গগন সেন ছিল এখন আমি একেবারে একা, যদি মূর্তিমান বিপদ সামনে এসে দাঁড়ায় আমি কি তার সম্মুখীন হতে পারব?

অতি কষ্টে জিনিসপত্রের বাধা অতিক্রম করে আস্তাবলের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সূচীভেদ্য অন্ধকার, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। কে যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে পদশব্দ লক্ষ্য করে একদৃষ্টি তাকিয়ে রইলাম। মনে হ'ল যে এগিয়ে আসছে সে নারী, পরনে তার শাড়ী। ক্রমশঃ শাদা থান পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল, তিনি আমার কাছে এসে দাঁড়াতে চিনতে পারলাম, আর কেউ নন, স্বয়ং ব্রজবালা দেবী। আমাকে দেখে চম্‌কে উঠলেন, বোধহয় এ জায়গায় দেখবেন আশা করেন নি। আমিও তাঁকে দেখে কম অবাক হইনি। এ সময় তিনি এ নির্জন জায়গায় কেন?

নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ব্রজবালা দেবী বললেন, তোমাকেই খুঁজছিলাম অর্পিতা, বেড়াচ্ছিলে বুঝি?

বললাম, হ্যাঁ।

বোধহয় আমার গলা কেঁপে উঠেছিল। উনি জিজ্ঞেস করলেন, একা?

—হ্যাঁ।

ব্রজবালা দেবী যেন আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, আমার মনে হল ওঁর তীক্ষ্ন চোখ আর কাউকে খুঁজছে। সে ভাব গোপন করে বললেন, বাড়ীতে চল। একজনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

—চলুন।

ব্রজবালা দেবীর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলাম।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, তুবুড়ী কোথায় জান?

বললাম, ঘরেই তো ছিল।

—দেখতে পেলাম না, একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলেন, গগন সেন চলে গেছে?

চট্ করে আমি উত্তর দিতে পারিনি, পরে গগন সেনের নির্দেশ মনে পড়ায় দায়-সারা ছোট্ট উত্তর দিলাম, হ্যাঁ।

—ওকেও আমার দরকার ছিল।

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে বৃদ্ধার অনুসরণ করে আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলাম।

একতলার বারান্দার আলোয় আমার আপাদমস্তক ব্রজবালা দেবী নিরীক্ষণ করলেন। বললেন, অর্পিতা, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে একটু পরিষ্কার হয়ে আমার ঘরে এস।

এ কথার অর্থ তখন বুঝিনি কিন্তু ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। একি চেহারা হয়েছে আমার, চোখে-মুখে কালি, শাড়ীতে হাঁটুর কাছে ধুল লেগেছে, আঁচলে ছোপ ছোপ ময়লা দাগ। কেন আমায় বৃথা পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে বলেছেন বুঝলাম। এবং এও বুঝলাম তিনিও নিশ্চয় কম অবাক হন নি। ভাবছেন কোথায় এই ধুলো-কাদার মধ্যে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম।

দশ মিনিটের মধ্যে শাড়ী বদলে অল্প-বিস্তর প্রসাধন সেরে ব্রজবালা দেবীর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। উনি চেয়ারে বসেছিলেন, সামনে এক অপরিচিত ভদ্রলোক, পরনে তাঁর ফিকে গেরুয়া রঙের ধুতি-পাঞ্জাবি। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, টানা-টানা চোখ, উজ্জ্বল মুখ বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করছে।

ব্রজবালা দেবী পরিচয় করিয়ে দিলেন, এ আমার বড় ছেলে স্বদেশ। সন্ন্যাস নেবার পর অবশ্য আশ্রমিক নাম হয়েছে 'একান্ত'।

আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, থাক্ মা। চেয়ারে বস। এতক্ষণ তোমার কথা শুনছিলাম। এ বাড়ীতে স্কুল করতে চাও সে তো খুব ভাল কথা, যত কর্ম নিয়ে থাকবে ততই মনে আনন্দ পাবে। কাজের মধ্যে আনন্দ, আর আনন্দের সঙ্গে কাজ, ব্যাস্, এই যদি করে যেতে পার, আর কোন ভাবনা নেই।

সাধুজী কথাগুলি অত্যন্ত মিষ্টি করে বললেন। আমি মন দিয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম, আরো এই জন্যে, এতটা কাছ থেকে কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখার সুযোগ আমার আগে কখনও হয়নি। দু'একবার হয়ত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কোন নামকরা সাধু-দর্শনে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে ভক্তদের ঠেলাঠেলি, প্রণামের হুড়োহুড়ি দেখেই পালিয়ে এসেছিলাম। হয়ত তাঁদের ভাষণ শুনেছি, কিন্তু সে ভাষণ আমার মনকে স্পর্শ করেনি, মনে হয়েছে অনেক উঁচু থেকে তাঁরা কথা বলছেন, আমাদের মত তলার মানুষ তাঁদের কথা থেকে কি পাবে?

কিন্তু আজ ব্রজবালা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যাঁর স্যুট-পরা সুন্দর ছবি আমি লাইব্রেরী ঘরে দেখেছি, তাকেই এই সম্পূর্ণ নূতন বেশে দেখে আমি মুগ্ধ হলাম আরও এই জন্যে যে মনে হল এ মানুষটার ব্যক্তিত্ব এই গেরুয়া ধুতি-চাদরে অনেক বেড়ে গেছে। একবারও মনে হল না একে আমি আগে দেখিনি, এঁর সঙ্গে এই মাত্র আমার পরিচয় হল, মনে হ'ল উনি আমার বহুদিনের পরিচিত এবং অত্যন্ত কাছের মানুষ।

মৃদুস্বরে বললাম, অনেক কিছুই তো করার ইচ্ছে আছে, কিন্তু করতে পারব কি? কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা?

সাধুজী আগের মতই হাসতে হাসতে বললেন, মা, আমাদের ক্ষমতা কতটুকু? যিনি ক্ষমতা দেন যদি তাঁর ইচ্ছে হয় সব কাজই তুমি করতে পারবে। কারণ, তিনিই তোমায় ক্ষমতা যোগাবেন। তাঁর কৃপা পেলে জান তো, মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। তোমার মধ্যে কি শক্তি আছে তা তো তুমি জান না, যদি সেই শক্তির বিকাশ তিনি করান সবাই অবাক হবে। তুমিও অসাধ্য সাধন করবে তাই না?

আমার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সাধুজী সুমিষ্ট স্বরে বললেন, তোমার উপর তাঁর কৃপা আছে। সত্যি বলছি মা, বিশ্বাস কর। তা না হলে কে তোমাকে এখানে নিয়ে এল?

মাঝখান থেকে ব্রজবালা দেবী বলে উঠলেন, আমিও মাঝে মাঝে ঠিক তাই ভাবি। অর্পিতার মতন একটি মেয়েই আমি খুঁজছিলাম। ঠিক সময় মতই তাকে পেলাম। এখন আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি, এই বিরাট সম্পত্তির ভার তুমি তো নিলে না, আমার কাঁধে বোঝার মত চাপিয়ে রেখে গেলে। এতদিন ধরে এ ভার আমি বয়েছি, আর পারছি না।

কথা বলতে বলতে ব্রজবালা দেবীর গলা ধরে এল, রুমাল দিয়ে চোখের কোণের জল মুছে ফেলে বললেন, গগন আর অর্পিতা, এরাই হয়ত আমাকে দায়-মুক্ত করবে। সবচেয়ে আনন্দ হয় এই ভেবে, হয়ত একদিন যখন আমি থাকব না, এই নির্জন বিরাট বাড়ীখানা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কলধ্বনিতে ভরে উঠবে। তারা হাসবে, খেলবে, ছুটবে। ফুলগাছের চারার মত ধীরে ধীরে বেড়ে উঠবে, তারপর—তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফুলের মত ফুটে উঠবে, ভাবতেও বড় আনন্দ লাগছে। তবু বুঝব এ জায়গাটা দেশের কাজে লাগল।

ব্রজবালা দেবীকে এভাবে কথা বলতে আমি কখনও শুনিনি। দুঃখ হল গগনের জন্যে, বেচারী শুনলে খুব খুশী হত। এ স্বপ্নের কথা সেও যে আমায় অহরহ শোনায়। ব্রজবালা দেবীকেও ওযে সেই একই স্বপ্নমন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছে একথা জানলে, নিজে কানে শুনলে সে সুখী হত বৈকি। কিন্তু তাকে এখন কোথায় পাব। হয় সে বন্ধুর বাড়ী ব্যাণ্ডেলে চলে গেছে, আর না হয় ফিরে গেছে কলকাতায়।

ঠিক এমনি সময় দরজায় কে এসে দাঁড়াল, আমি পেছন ফিরে ছিলাম বলে দেখতে পাই নি, ব্রজবালা দেবী বললেন, ঐ যে গগন।

আমি তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। গগন সেনের চেহারা দেখে বুঝলাম, সে আর বাড়ী ফেরেনি। ঐ একই কাপড়-জামায় উপরে উঠে এসেছে। ধূলিমলিন দেহ, অবিন্যস্ত বেশ-বাস, কিন্তু সেদিকে তার কোন গ্রাহ্য নেই।

ব্রজবালা দেবী বোধহয় তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্রের সঙ্গে গগন সেনের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু গগন সেন সেজন্য অপেক্ষা করল না, দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে সাধুজীকে গড় হয়ে প্রণাম করল। আমি জানতাম গগন সেন ভগবৎ-বিশ্বাসী, জানতাম সাধু-সন্তে তার অগাধ শ্রদ্ধা, তাই এই গৈরিক বসনই দর্শনমাত্রে তাকে এভাবে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু অবাক হ'লাম তখন যখন দেখি নিশ্চল হয়ে সে পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে, উঠছে না। মনে হল সাধুজীর চোখেও করুণার ধারা। তিনি নিজেই নীচু হয়ে গগন সেনকে তুলে নিলেন। বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন, সে এক মহিমময় দৃশ্য, আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

(ক্রমশঃ)

কলারসিক

নতুন আফ্রিকার তরুণ শিল্পীদের চিত্র-প্রদর্শনী

নবজাগ্রত আফ্রিকার শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে এ-দেশের মানুষের মনে প্রবল ঔৎসুক্য বিদ্যমান। দীর্ঘকাল ঔপ-নিবেশিক শাসন-শোষণে জর্জরিত আফ্রিকার শৃঙ্খলমুক্তির সংবাদ এ-দেশে যত দ্রুত পৌঁছায়, তার শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে খবরাখবর এ-দেশে কিন্তু ততোধিক ধীর-মন্থর গতিতে আসে। সত্যিকথা বলতে কি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত আফ্রিকার সাহিত্য-জগতের সংবাদ যদিও বা সামান্য পাওয়া যায় কিন্তু তার শিল্পকলা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় একেবারেই দুর্লভ।

সুখের কথা, ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডম কলকাতার আকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর সহযোগিতায় আমাদের সেই অভাব দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। গত ৯ই অক্টোবর আকাডেমী-ভবনে তাঁরা সুদান, নাইজেরিয়া এবং মোজাম্বিকের তিনজন প্রখ্যাত তরুণ শিল্পীর চিত্রকলার এক মনোরম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন। কলকাতার মানুষ নবজাগ্রত আফ্রিকার শিল্পকলা এবার স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেলেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীর তিনজন শিল্পীই ভিন্ন মেজাজ এবং রচনা-শৈলীতে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেও তিনজনের চিত্রকলাতেই আফ্রিকার জাতীয় সত্তার পরিচয় পরিস্ফুট। এঁরা প্রত্যেকেই

দেশজ ঐতিহ্যে স্নান করে নিজস্ব আঙ্গিক-পদ্ধতি এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন।

সুদক্ষ শিল্পী ইব্রাহিম সালাহি। এই প্রদর্শনীতে এঁর মোট আঠারোখানি চিত্র স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে মাত্র দুখানা চিত্র জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত। বাকী ষোলখানারই মাধ্যম হল চাইনীজ ইংক এবং কলম। চিত্ররচনার প্রথম দিকে তিনি নাকি ইওরোপীয় পদ্ধতিতে নিসর্গদৃশ্য এবং প্রতিকৃতিচিত্র অঙ্কন শুরু করেন। কিন্তু ইওরোপীয় চিত্র-রীতি তাঁকে খুশি করতে পারেনি। আফ্রিকার ঐতিহ্য-পুষ্ট এমন চিত্র তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যার মধ্যে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি খুঁজে পাবে নতুনতর আত্মিক ঐশ্বর্য। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পী সালাহির চিত্র দেখে আমরা স্পষ্ট ঘোষণা করতে পারি তিনি তাঁর ঈপ্সিত শিল্পজগতে বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হয়েছেন। সুদানের ইসলামীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তাঁর অন্তর্লোকে যে শিল্প-ভাবনার জন্ম দিয়েছে তাকে তিনি বিধৃত করেছেন সূক্ষ্মতম রেখার ছন্দিত জালে। আরবীয় ক্যালিগ্রাফি এবং নক্সার অলঙ্কৃত প্যাটার্ণে তাঁর সমস্ত চিত্রজুড়ে নতুন আবহমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

শিল্পী সালাহির রেখা ব্যঞ্জনাধর্মী; তাঁর রেখার কমনীয় ভঙ্গীতে যাদুর স্পর্শ আছে, একথা আমরা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করছি।

শিল্পী সালাহির কয়েকখানি চিত্রে দেখলাম, অনেকগুলি চোখ যেন তার রেখাজাল ভেদ করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। সেই চোখে যেমন জিজ্ঞাসা আছে, তেমনি আছে কিছু বলার আকৃতি কিংবা সাবধান বাণী উচ্চারণের ভঙ্গী। এগুলি মানবীয় না দানবীয়, অথবা লৌকিক শিল্পকলার কোন ইঙ্গিত বহন করছে কিনা তা আমরা জানিনে। হয়তো এগুলির মধ্যে নবজাগ্রত আফ্রিকার কথাকেই শিল্পী প্রকাশ করেছেন। মোট-কথা, শিল্পী ইব্রাহিম সালাহীর শক্তি ও শিল্প-নৈপুণ্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

নাইজেরিয়ার শিল্পী উচে ওকেকে। এঁরও মাধ্যম কালি-কলম। ইনি আফ্রিকার সেই চিরাচরিত প্রথায় অঙ্কিত বাজার, নিসর্গ দৃশ্য কিংবা কলসী মাথায় আফ্রিকার নারী—ইত্যাকার ছবি রচনায় আগ্রহী নন বলে মনে হল। প্রকৃতপক্ষে লৌকিক চেতনাকে তাঁর শিল্পে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন শিল্পী ওকেকে। তিনি তাই তাঁর চিত্রের বিষয়-বস্তু আহরণ করেছেন আফ্রিকার লোক-

সাহিত্য থেকে। নাইজেরিয়ার প্রাচীন লোক-সংস্কৃতি, যাকে বলা হয় 'ইগবো সংস্কৃতি' তার থেকেই তিনি উপাদান সংগ্রহ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন এই সংস্কৃতিকে 'আদিম', 'অন্ত্যজ' বা 'বর্বর' বলার কোন অর্থ নেই। মানব-সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই 'ইগবো সংস্কৃতি'।

শিল্পী ওকেকে ইগবো লোক-কাহিনীর জীব-জন্তু, গাছ-পালা এবং

শিল্পী : সালাহি !

আদিম মানুষকে সূক্ষ্ম রেখার ঠাস-বুননীতে এমন এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যে বিধৃত করেছেন, যার সামনে অনেক সময় থমকে দাঁড়াতে হয়। ইগবো লোক-কাহিনীকে তাঁর আধুনিক শিল্পদৃষ্টিতে বিশ্লেষণও করেছেন শিল্পী ওকেকে। এই অর্থে শিল্পী ওকেকের রচনায় আধুনিক শিল্প-চেতনার স্বাক্ষরও বিদ্যমান। আফ্রিকার নতুন যুগের এই নতুন প্রবক্তাকেও আমরা তাই অভিনন্দিত করি।

উপরে আলোচ্য দুজন শিল্পীর তুলনায় মোজাম্বিকের শিল্পী ভ্যালেন্তে মালাঙ্গাতানা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এঁর চব্বিশখানি চিত্রের মধ্যে আঠারোখানি হল

পেন্সিল স্কেচ। অন্য ছয়খানি কালি-কলমে অঙ্কিত। শুধু মাধ্যমরূপে নয়, এই শিল্প-বক্তব্যে নিপীড়িত আফ্রিকার মানুষ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উদ্ভাসিত। এত চমৎকার ও বলিষ্ঠভাবে তিনি তাঁর পেন্সিল স্কেচগুলিতে আফ্রিকার নর-নারীর ভয়, নিপীড়ন এবং বীভৎসতাকে তুলে ধরেছেন যে, সেগুলির মাধ্যমে আমরা বর্তমান আফ্রিকার অন্তর্বেদনা, ক্ষোভ ও যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে পারি।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদেরও তাই ধন্যবাদ জানাই। প্রদর্শনীটি বিগত মঙ্গলবার, ১৫ই অক্টোবর শেষ হয়ে গেছে।

শিল্পী রমেন মিত্রের চিত্র প্রদর্শনী

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী-গৃহে রমেন মিত্রের একটি একক চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। শিল্পীর এই প্রথম একক প্রদর্শনীতে পঁচিশটি কাজের নিদর্শন দেখান হয়েছে। শ্রীমিত্র পেশাদার শিল্পী নন। কোন নিয়ম-মাফিক শিল্পশিক্ষাও তিনি করেননি। তাঁর বৃত্তি শিক্ষকতা, সখ চিত্রকর্ম। ছবির মাধ্যম হিসেবে তিনি প্যাস্টেলকেই বেছে নিয়েছেন। প্রদর্শিত ছবির সব-গুলিই প্যাস্টেলে আঁকা। কোথাও কালি দিয়ে রেখা গাঢ় করা হয়েছে।

শিল্পীর ছবিতে আধুনিক ফরাসী ও উত্তর ইউরোপীয় প্রকাশধর্মী শিল্পী-দের কাজের ছাপ লক্ষ্য করা গেল। রুয়ো, মুনখ্, শগাল প্রভৃতির কাজের আভাস কোন কোন ছবিতে পাওয়া যাবে। রবীন্দ্র-নাথের ছবির প্রভাবও এ'র কাজে দেখা যায়। যেমন ১নং ছবি 'ফেস'। ২নং ছবি 'ইক্লিপস্'-এ বর্ণ এবং রেখাঙ্কনে

শিল্পী : রমেন মিত্র

শিল্পী : রমেন মিত্র

মুনখ-এর ছাপ অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু ছবিটির প্রকাশভঙ্গী সাবলীল হওয়ায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলা চলে। কোন শিল্পীর কাজের প্রভাব থাকাটা অবশ্য কোন অপরাধ নয়। তবে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা জন্মালে সেটি অবশ্যই প্রশংসনীয় নয়। শ্রীমিত্রের কোন কোন ছবিতে সে দোষ লক্ষ্য করা গেল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় সব ছবিতে নয়। ১৪নং ছবি 'পার্পাজলেস' রং রেখা এবং কম্পোজিশনে সুদৃশ্য। ২৩নং ছবি 'ফলোয়িং দি ডিসীজড'এ গঠনের নতুনত্ব নেই বটে তবে বর্ণের কোমলতা এবং নকসার বাঁধুনিতে তৃপ্তি দেয়। খৃষ্ট-জীবনী নিয়ে আঁকা ছবিগুলিতে যেমন ১১নং ছবি 'মীটিং ইন প্রিজন'—রুয়োর প্রভাব সুস্পষ্ট। ১৯নং ছবি 'ফিগারস্ অ্যান্ড স্ট্রে ডগস্', নাইট মেয়ার (২১) ওয়েস্টেড নাইট'এর বর্ণের কোমলত্ব এবং ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্যণীয়। 'দি প্রিকার্সার অ্যান্ড দি ফারিসীজ' (২৫) ছবির গঠন পারি-পাট্য তৃপ্তিকর। অনেকগুলি ছবির মধ্যে কিছু অতীন্দ্রিয় বিভীষিকার ভাব লক্ষ্য করা গেল। যেমন, ১৬নং ছবি 'উয়োম্যান অ্যান্ড স্ট্রে ডগস্' নাইট মেয়ার (২১) 'ম্যান চেজিং এ হোয়াইট স্যাডো (১৮) ইত্যাদি। বিভিন্ন শিল্পীর প্রভাবগুলি আত্মসাত করে শ্রীমিত্র যদি নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে মনোযোগ দেন তবে আমরা আশা করি নতুন একজন শিল্পীর দেখা পাব। কারণ অনেক অপেশাদার শিল্পী দেখা গিয়েছে যাঁরা তাঁদের নিয়মমাফিক শিল্পশিক্ষার অভাব নিজেদের ব্যক্তিত্ব এবং সরলতা দিয়ে পূর্ণ করেছেন।

মাকাও

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতের মত শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধী দেশও স্বাধীনতার পর চোদ্দ বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত জোর করে মাতৃভূমির বিচ্ছিন্ন কটি অংশ গোয়া, দমন ও দিউ পর্তুগীজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। আফ্রিকার পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির মানুষেরা ত প্রায় শূন্যহাতেই পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। অথচ বিশ্ববিপ্লবের প্রচণ্ড শপথে উদ্বেল যে দেশ, যার বৈপ্লবিক তেজ এটম বোমা হাইড্রোজেন বোমার মত সর্বনাশা মারণাস্ত্রকেও লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ করে, সেই মহাশক্তিধর লালচীন তার পদপ্রান্তে পড়ে-থাকা অতি ক্ষুদ্র পর্তুগীজ উপনিবেশটি সম্বন্ধে কেন এমন নীরব ও উদাসীন? নির্লজ্জ উপনিবেশী নীতি অনুসরণের অপরাধে যে পর্তুগাল আজ সারা বিশ্বে ধিক্কৃত তার প্রতি বিশ্বের মুক্তিকামী কমিউনিষ্ট চীনের কেন এত মমতা? আপাতদৃষ্টিতে চীনের এই কথায় ও আচরণে পার্থক্য খুবই বিস্ময়কর।

কিন্তু কিভাবে লালচীন মাকাওকে কাজে লাগাচ্ছে সে সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করলেই চীনের এই আচরণের রহস্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। বস্তুত চীনের নিষ্ঠুর প্রয়োজনেই চীনের অভ্যন্তরে টি'কে আছে চার শতাধিক বছরের পুরনো, মাত্র ছয় বর্গমাইল আয়তনের ক্ষুদ্র পর্তুগীজ উপনিবেশ মাকাও। কিন্তু এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে মাকাওর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয়টুকু সংক্ষেপে সেরে নেওয়া প্রয়োজন।

মাকাও দূরপ্রাচ্যে প্রাচীনতম ইউরোপীয় উপনিবেশ। চীনের দক্ষিণ উপকূলে পার্ল নদীর মুখে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র উপনিবেশটিতে নাবিক অভিযাত্রী জর্জ আলভারিসের নেতৃত্বে পর্তুগীজরা প্রথমে আসে ১৫১৩ সালে। তারপর সেটি তাদের স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত হয় ১৫৫৭ সালে। রাণী এলিজাবেথ তখনও ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেননি বা আমেরিকা মহাদেশের কোথাও গড়ে ওঠেনি কোন ইউরোপীয় জনপদ। একমাত্র ওলন্দাজরা মাকাও থেকে পর্তুগীজদের উৎখাতের চেষ্টা করেছিল একবার ১৬২২ সালে, কিন্তু তাদের সে প্রয়াস বিপর্যয়কর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পর্তুগীজদের প্রতিরক্ষা দুর্গ মন্ট ফোর্ট থেকে হঠাৎ একটি কামানের গোলা ছিটকে গিয়ে পড়ে ওলন্দাজদের অস্ত্রাগারের মাঝখানে, যার ফলে আক্রমণকারী ডাচ সৈন্যরা প্রায় মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পর্তুগীজদের এই জয়ে চীন সম্রাট স্বয়ং খুশি হয়ে তাদের উপঢৌকন পাঠান।

পর্তুগীজরা প্রথমে মাকাওকে একটা মাঝপথের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করত। লিসবন থেকে নাগাসাকি পর্যন্ত সেদিন বিস্তৃত ছিল পর্তুগীজ বণিকদের ব্যবসায়, আর গোয়া, মালাক্কা, মাকাও ইত্যাদি ছিল তাদের মাঝপথের চৌকি।

চীনারা মাকাওকে বলে আ-মা-কাও, কারণ নাবিকদের দেবী আ-মা'র মন্দির আছে সেখানে। মাকানিজরা এখনও নিয়মিত পূজা দেয় আ-মা দেবীর মন্দিরে।

বৃদ্ধ আর অসমর্থ তাই নতুন চীনে স্থান নেই

আফিঙের নেশায় পঙ্গু জরাজীর্ণ মানুষের দল এসে ভিড় করেছে তাইপা আশ্রয়-শিবিরে

আ-মা স্থানীয় বৌদ্ধদের দেবী। জেলেরা মাছ ধরতে যাওয়ার আগে ধূপ জ্বালিয়ে পূজা দেয় ঐ মন্দিরে আর পুরোহিতদের দেয় কিছু ফলাহার। পুরোহিতরা তার বদলে বলে দেয়, কোথায় জাল ফেললে ভাল মাছ পাওয়া যাবে।

পর্তুগীজরা যখন মাকাও যায় তখন চীন ও জাপানের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য চীন সরকারের আদেশে নিষিদ্ধ ছিল। তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে অনতিবিলম্বে পর্তুগীজরা মাকাওকে একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করে। তারা চীন থেকে সিল্ক নিয়ে যেত জাপানে, আর জাপান থেকে রুপো নিয়ে আসত চীনে।

আজ অবশ্য মাকাওর সেদিন নেই। প্রাসাদবহুল ও জনাকীর্ণ এই ক্ষুদ্র বন্দরটির এখন প্রধান আয়ের উৎস সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান পণ্যের চোরাচালান, জুয়া ও পর্যটক। এছাড়া আছে মৎস্য-ব্যবসায় আর বাজি, দেশলাই ও ধূপের কুটিরশিল্প। মাকাওর বাজির চাহিদা আছে দক্ষিণ এসিয়ার বিভিন্ন দেশে। জাপানী আতসবাজির মত রকমারি না হলেও তার আওয়াজ নাকি প্রায় কর্ণ-পটাহবিদারী, ও সেইটিই তার প্রধান আকর্ষণ।

মাকাওর সঙ্গে কোন আন্তর্জাতিক বিমানপথের সংযোগ নেই, বা কোন পর্যটকবাহী জাহাজও মাকাওর উপকূল স্পর্শ করে না। তবুও মাকাওর জুয়া ও নৈশ আনন্দ আকৃষ্ট করে আনে নিকটবর্তী বৃটিশ উপনিবেশ হংকঙের বহু বিত্তশালীকে। মাকাও থেকে হংকঙের দূরত্ব মাত্র চল্লিশ মাইল। সেখান থেকে অপরাহ্নের ফেরী স্টীমারে প্রমোদ-বিহারীরা যাত্রা করে মাকাও পৌঁছায় সূর্যাস্তকালে। তারপর ভোজ, জুয়া ও নৈশ উল্লাস শেষ করে' মধ্যরাত্রিতেই আবার মাকাও ত্যাগ করে' স্টীমারের কেবিনে ঘুমোতে ঘুমোতে ভোরে ফিরে আসে হংকঙে। অনেকে আবার মধ্য রাত্রে হংকঙ থেকে যাত্রা করে' মাকাও ঘুরে ফিরে আসে পরদিন অপরাহ্নে। দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থাও আছে হংকঙ-মাকাওর মধ্যে। সামুদ্রিক প্লেনে পারাপার করতে সময় লাগে মাত্র পনেরো মিনিট।

দূরদেশের পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য মাকাওর কর্তৃপক্ষ প্রায় দুই কোটি ডলারের একটি বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছেন। ঐ অর্থে নির্মিত হবে বিত্তবানদের বাসোপযোগী বিরাট সুসজ্জিত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আধুনিক হোটেল, কৃত্রিম হ্রদে ভাসমান নাচঘর, ইত্যাদি। অদূরভবিষ্যতে মাকাও হয়ে উঠবে দূরপ্রাচ্যের মন্টিকার্লো।

মাকাওতে নানারকম জুয়ার প্রচলন আছে। কিন্তু সেখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় জুয়া হল ঝিঁঝি পোকার লড়াই। সাধারণত কবরখানার পাশ থেকে ঐ বলিষ্ঠ ঝিঁঝি পোকাগুলিকে ধরে আনা হয় এবং ঠ্যাঙের জোর অনুসারে এক-একটা ঝিঁঝিপোকার দাম সাড়ে আট ডলার পর্যন্ত ওঠে। কিন্তু তিনটি

জমাট জুয়ার আসর
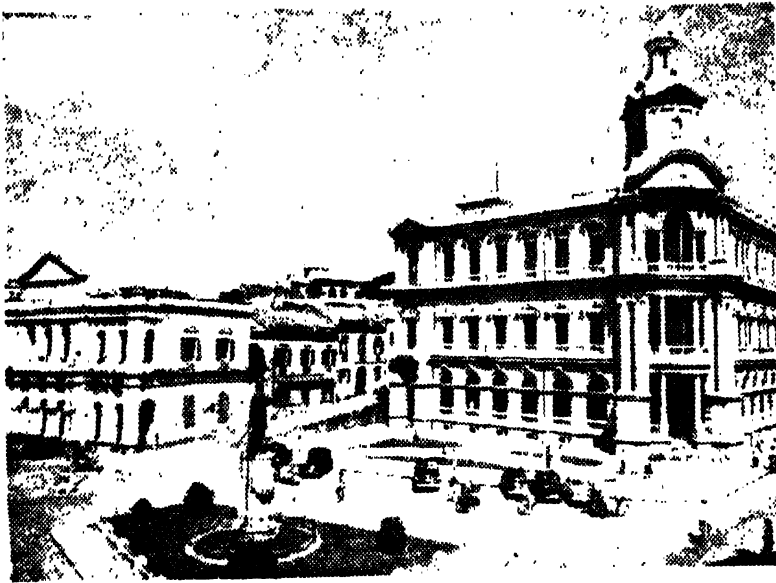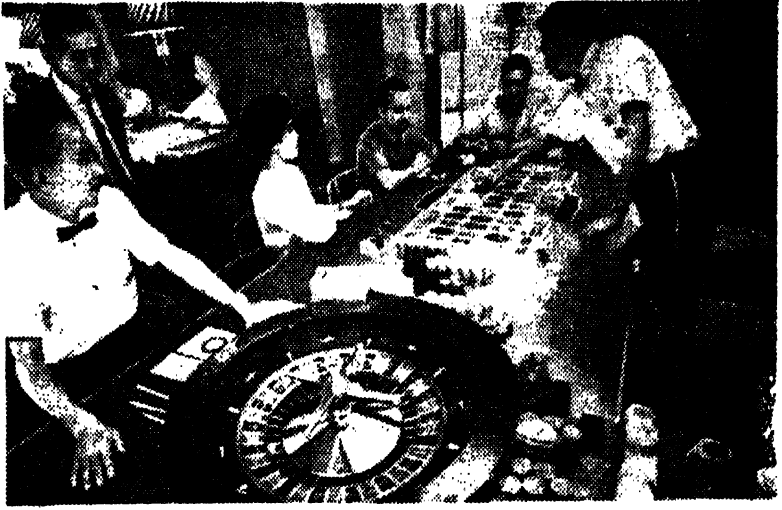
সিডিক স্কয়ার। ডানদিকে পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস; বাঁদিকে ১৫৬৯ সালে বিশপ অং মাকাও প্রতিষ্ঠিত 'হোলি হাউস অব্ মার্সি'।

ঝিঁঝি পোকার লড়াই-এর দৃশ্য।

চারটি লড়াইয়ে কোন ঝিঁঝিপোকা জিততে পারলে তার দাম দশগুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াইগুলোর জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দেওয়া হয়। সমশক্তিসম্পন্ন দুটো ঝিঁঝিপোকার লড়াই প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলে, আর সে লড়ায়ের উত্তেজনা যত বাড়ে তত স্ফীত হয়ে ওঠে জুয়াবোর্ড। কিন্তু আধুনিক জুয়াড়ীদের আকর্ষণের উদ্দেশ্যে গ্রেহাউন্ড রেস ইত্যাদি প্রবর্তনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

মাকাও উপদ্বীপ ও নিকটবর্তী আরও দুটি ক্ষুদ্র দ্বীপ তাইপা ও কালোয়ান নিয়ে গড়ে উঠেছে, পর্তুগীজ উপনিবেশ মাকাও। উপনিবেশটির মোট আয়তন মাত্র ছয় বর্গমাইল হলেও তার লোকসংখ্যা বর্তমানে আড়াই লক্ষ। এই বিপুলসংখ্যক নরনারীর মধ্যে দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার চীনা, যাদের প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট চীন থেকে বিতাড়িত। তাছাড়া আছে ১০৮০ জন পর্তুগীজ ও কুড়ি হাজার মাকানিজ, যারা ঐ দ্বীপের আদিম অধিবাসী।

চীন থেকে বিতাড়িত হয়ে যে দুই লক্ষাধিক হতভাগ্য মানুষ মাকাওতে এসে ভিড় করেছে, চীনের নতুন রাষ্ট্র-মঞ্চে তারা অপাংক্তেয়। অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, উন্মাদ ও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত যারা, জাতীয় উৎপাদনে অংশ গ্রহণের শক্তি লোপ পেয়েছে যাদের, লালচীনের নতুন সংজ্ঞায় তারা অলস ও অনুৎপাদক ভোগী। কিছু সৃষ্টি না করেও ভোগ করছে তারা অন্যের শ্রমোৎপাদিত ফসল, অতএব চীনে স্থান নেই তাদের। এইসব হতভাগ্যদেরই লালচীনের রক্তচক্ষু শাসকরা বিড়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়ে এসেছে মাকাওর সীমান্তে। একের পিঠে আর একজন হাত দিয়ে সারি বেঁধে প্রায় পাঁচ শত অন্ধ শ্রান্ত ক্লান্ত ও নিঃস্ব অবস্থায় প্রবেশ করেছে মাকাওয়ে। চীন থেকে এভাবে প্রতি মাসে মাকাওয়ে উদ্বাস্তু প্রবেশ করে গড়ে প্রায় আটশত। স্বভাবতই এই বিপুলসংখ্যক নরনারীর ভরণপোষণের শক্তি মাকাওর নেই। তাই সেখান থেকে অনেককে আবার হংকঙে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ক্ষুধাক্লিষ্ট রোগজীর্ণ কঙ্কালগুলি যখন ধুঁকতে ধুঁকতে মাকাওয়ে এসে পৌঁছায় তখন অধিকাংশকেই দেখে মনে হয় তারা বেশীদিন বাঁচবে না। কিন্তু তারা বাঁচে, সুস্থ হয় ও অনেকেই অনেক কাজে লাগে। নতুন জীবনের আনন্দে শুধু অন্ধের হাতের বীণার ঝঙ্কারই মধুর হয়ে ওঠে না, প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের কাজেও তাদের আঙুলগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মাকাওর সমীপবর্তী তাইপা দ্বীপে গড়ে উঠেছে আর একটি আশ্রয়-শিবির যার বাসিন্দা হল দুরন্ত আফিঙের নেশায় পঙ্গু পাঁচ শতাধিক বৃদ্ধ চীনা উদ্বাস্তু। অপ্রয়োজনীয় মুখ বলে তাদেরও স্থান হয়নি লালচীনে। কিন্তু চিকিৎসার পর তাদের অনেকেই ভাল হয়ে উঠেছে এবং বহু "উৎপাদনমূলক" কাজও তাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে।

অন্ধ বলে বিতাড়িত এই সমস্ত মানুষেরা আশ্রয় - শিবিরে এসে নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে।

কৃষ্ণচরিত্র এবং রামচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

অমিতা গুপ্ত

কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এবং রামচরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই আদর্শ মানবচরিত্রের সন্ধান করেছিলেন। নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের এই লক্ষণগুলি তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন কৃষ্ণ এবং রাম চরিত্রের মধ্যে।

উনিশ শতকীয় যুগ-সঙ্কটের মুহূর্তে গীতার বাণী এবং কৃষ্ণচরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে পরম নির্ভরতা দিয়েছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের জাগরণের ফলে তখন আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের গোষ্ঠী-স্বার্থপোষকতামূলক নীতিগুলি ভেঙ্গে পড়তে শুরু হয়েছে। ভাঙ্গনের এই রূপ বঙ্কিমচন্দ্রকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। জীবনে কোন এক ধ্রুব নীতির নির্ভরতা তিনি খুঁজেছিলেন। সে নীতি ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের ও সমাজের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব দূর করতে পারবে, এমন কি ব্যক্তির নিজের বিরোধী প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপনে সহায়ক হবে। বৃহত্তর আদর্শ, মহত্তর মানবকল্যাণমূলক নীতির অভিমুখী করে তুলবে ব্যক্তিজীবনকে। যুগ-সংকট থেকে তৎকালীন বিক্ষিপ্ত জীবনকে উদ্ধার করে কোন এক সুদৃঢ় আদর্শের বন্ধনে বেঁধে দেবার কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন। প্রথম জীবনে মিল-বেন্থামের হিতবাদী দর্শনে সেই আশ্বাস খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হিতবাদ তথা উপযোগিতাবাদের প্রয়োগক্ষেত্র সংকীর্ণ। তাছাড়া বাইরে থেকে আরোপ-করা এই থিওরি মানুষের অন্তর্জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ। তাই এই তত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস বেশিদিন থাকেনি। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' 'ইউটিলিটি বা উদর দর্শন' এবং 'আমার মন' নামক রচনায়, 'কি লিখিব' নামক 'কমলাকান্তের পত্রে' ভীষ্মদেব খোশনবীশ মহাশয়ের পত্র কর্তৃক 'ইউটিলিটি' শব্দের ব্যাখ্যায় তাঁর বিশ্বাসভঙ্গজনিত তিক্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

এরপর গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শে এবং সেই আদর্শের যিনি উদ্গাতা সেই কৃষ্ণচরিত্রে তিনি জীবনের প্রত্যয়কে খুঁজে পেয়েছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' 'ধর্মতত্ত্ব' এই তিনটি বৃহৎ প্রবন্ধ-গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্কাম কর্মের আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর জীবনের শেষপর্বে রচিত তিনটি উপন্যাস, 'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী' 'সীতারামে' মানবজীবনের সমস্যায় সমাধানে সেই আদর্শের প্রয়োগ দেখতে পাই।

পুরাণে, মহাকাব্যে, লোককথায় একই কৃষ্ণচরিত্রের বিচিত্ররূপ, বিপুল, বিশাল অথচ অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কাজ হলো সেই বিক্ষিপ্ত উপাদান থেকে তাঁর আদর্শ মানবচরিত্রকে আবিষ্কার করা। বঙ্কিমচন্দ্র কর্মযোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁর সমকালীন যুগের পটভূমিকায় তিনি কর্মনিষ্ঠ এক আদর্শ মানবচরিত্রের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সেই চরিত্রের প্রধান কাজ হবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, সমষ্টি-কল্যাণের আদর্শ দ্বারা যার ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত। বহুধাবিভক্ত পৌরাণিক কৃষ্ণচরিত্র থেকে তিনি এই রূপ-ই গ্রহণ করেছিলেন। 'আনন্দমঠে' সত্যানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের এই উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করেছেন—"প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা। দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন, কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধু-কৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়।" (আনন্দমঠ : পৃঃ ৬০)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের সুবৃহৎ আলোচনার মূল বক্তব্য সত্যানন্দের এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। এই বিস্তৃত আলোচনার প্রধানতঃ তিনটি দিক—প্রথমতঃ কৃষ্ণচরিত্রের অবতারবাদের অলৌকিকতা দূর করে তাঁর মানব-মহিমাকে পরিস্ফুট করার দিকে তিনি বিশেষ আগ্রহী—'এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব' এবং 'কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষশক্তি দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।' তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্য কৃষ্ণ-

চরিত্রের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করা। তৃতীয় পর্যায়ে কৃষ্ণচরিত্রের মূল আদর্শকে তিনি অনুসরণ করেছেন তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ও বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে। কৃষ্ণের সমগ্র জীবনের মধ্যে অনুশীলন তত্ত্বের মূল নীতিকে প্রমাণিত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল—"এই তত্ত্বটা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যও আমি শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

(কৃষ্ণচরিত্র : উপক্রমণিকা)

শৈশব ও কৈশোর লীলা থেকে পরিণতি পর্যন্ত কৃষ্ণচরিত্রের সমস্ত ঘটনা ও কাজকে তিনি এই তত্ত্বের সূত্রে গ্রথিত করেছেন। শৈশবে যে শিশু 'সর্ব্বজনের জন্য সহৃদয়তাপরবশ সর্ব্বজনের দুঃখ মোচনে উদ্যত' এবং 'অপ্রাপ্ত কৈশোরেই এই বিবিধ শত্রু পরাস্ত করিলেন' যৌবনে এবং পরিণতি-

কালে তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের ব্রত নিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রধান নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণচরিত্রকে এই তিন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অপ্রাকৃত, প্রক্ষিপ্ত এবং অযৌক্তিক উপাদানগুলি বর্জন করেছেন এবং কখনো অলৌকিক ঘটনার আবরণ সরিয়ে কৃষ্ণচরিত্রের অনুগামী সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। এই কাজ যেমন ব্যাপক ও বৃহৎ, তেমনি শ্রমসাধ্য।

রামায়ণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং সন্ধান-প্রবণতা রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষকাল থেকে দেখা যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'। এখানে তিনি দেখিয়েছেন নিরাশ্রয়া বন্দিনী বালিকার প্রতি দস্যু রত্নাকরের মনে জেগেছে করুণা। এই মানবপ্রেমেই তাঁর কবি বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রধান প্রেরণাশক্তি। এই প্রসঙ্গ মূল রামায়ণে নেই। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি।

এরপর ১৩০৪ সালে রচিত 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অপূর্ব রামায়ণে' কবি রামায়ণের এক অভিনব রূপক উদ্ঘাটিত করেছেন। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সেতু রচনা করে প্রেম, মৃত্যুর মধ্যে প্রেমের লয় এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পের জন্ম। রাজা রামচন্দ্র সেই জীবন-প্রেমিক মানুষ, সীতা এখানে প্রেমরূপা, মৃত্যু-তমসাতীরে তাঁকে নির্বাসন দেবার ফলে কুশ ও লব, কাব্য এবং ললিতকলা নামক যুগল সন্তানের জন্ম হয়। রূপকটি পাঞ্চভৌতিক সভার এক সভ্য সমীরের পরিকল্পিত এবং জীবনমৃত্যুর প্রসঙ্গে বলা। তথাপি এই রূপক রচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এই আলোচনাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রামায়ণের তথ্য অংশেই রবীন্দ্রনাথের মন নিবন্ধ থাকতে চাইছে না। বস্তুকে অতিক্রম করে আরো কিছুর সন্ধান করতে চাইছেন তিনি। কোন একটি বিশেষ-ভাবকে অন্বেষণ করছেন, সেই ভাব রামায়ণের প্রাণরহস্য, তাঁর সন্ধানের ধ্রুব লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ-জিজ্ঞাসা এখানেই শেষ হয়নি। ১৩০৬ সালে রচিত 'কাহিনী'র অন্তর্গত 'ভাষা ও ছন্দ' নামক কবিতায় পুনরায় বাল্মীকির কবিত্বলাভ প্রসঙ্গ এবং রামচরিত্রের আলোচনা উত্থাপিত হয়েছে। এখানে দেখি সৃজনোন্মুখ কবি বাল্মীকি, মানব-বন্দনায় ব্রতী, নারদকে তিনি প্রশ্ন করেছেন—

কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে
করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি
সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি
মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র,
মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে,
বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে,
কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে
রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে
দুঃখ মহত্তম—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি,
তাঁর পুণ্যনাম।

বাল্মীকি তাঁর এই জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন—

নারদ কহিলা ধীরে,
"অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

১৮৮২ শকের বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় 'বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা' নামক আলোচনায় অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন—'প্রকৃতপক্ষে বীর্যবান মনুষ্যত্বের আদর্শ—সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই যে সুগভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন, সেই পরিপূর্ণ মানবাদর্শই তিনি রামচন্দ্রের মধ্যে রূপায়িত করেছেন, বাল্মীকির বর্ণনার আক্ষরিক অনুকরণ করেন নি। মূল রামায়ণে বাল্মীকি-নারদ সংবাদে রামচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথ-বর্ণিত মহত্তর জীবনাদর্শকে ঠিক পাওয়া যায় না। গীতায় বর্ণিত 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ'—এই রূপটিই যেন রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ফুটেছে। ঈশোপনিষদের যে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' বাণীটিকে রবীন্দ্রনাথ জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন তাকে তিনি রামচরিত্রে সমন্বিত করেছেন।'

রামচরিত্রের মধ্যে দুঃখসহনের মহিমা রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল বেশি। মূল রামায়ণে বাল্মীকি-নারদের আলাপে রামচরিত্রের এই বিশেষ গুণটি উল্লিখিত হয়নি। 'কাহিনী'র 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার এই পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের অন্যান্য প্রসঙ্গ অপেক্ষা রামচরিত্রের উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে শুরু করেছিলেন।

এর পরেই পাচ্ছি 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত ১৩১০ সালে রচিত 'রামায়ণ' আলোচনাটি। 'ভাষা ও ছন্দের' স্বল্প পরিসরে রামচরিত্রের ভাবরূপ সযত্নচয়িত বিশেষণের মধ্যে মূর্তিবৎ পরিস্ফুট।
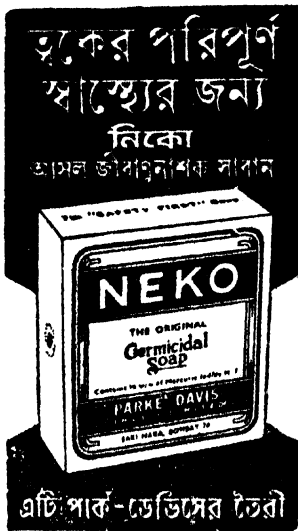
'প্রাচীন সাহিত্যে'র রামায়ণ আলোচনায় তারই বিশদ ব্যাখ্যা। কবি এখানে প্রধানতঃ রামচরিত্রকে অবতারবাদের অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন—'রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।'

রামচরিত্রের এই দেবোচিত মানব-মহিমায় রবীন্দ্রনাথের অটল বিশ্বাস ছিল। এইজন্য নৈয়ায়িক যুক্তির পথ পরিহার করে শুধুমাত্র প্রত্যয়ের শক্তিতে তিনি রামচরিত্রের অবতারবাদের অলৌকিকতাকে খণ্ডন করেছেন—"পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তব সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই। ইহাকেও সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্‌বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্তহৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন।"

পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিতই যে রামের জীবনী এবং কবির বস্তুভেদী কল্পনাশক্তিরই যে একমাত্র সেই সত্য উপলব্ধির সামর্থ্য আছে, এই বলিষ্ঠ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দে'র উপসংহারে এবং 'রামায়ণের' আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। রামচরিত্রের মানবীয় সত্তার সত্যমূল্যকে তিনি তথ্যের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করেন নি। কেবলমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে রামচরিত্রের মানব-মহিমাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৩১৮ সালে রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধে রামায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধান আরো বিস্তৃত হয়েছে। 'পরিচয়' গ্রন্থে প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে। তিনি এখানে রামের জীবন ও তাঁর স্মরণীয় কীর্তিগুলিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। তথ্যপুঞ্জ থেকে নিষ্কাসিত করে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক ভাবরূপ তিনি তুলে ধরেছেন এখানে, রাম সেই ভাবগত ইতিহাসের মানুষ। সংঘর্ষ ও বাধাকে জয় করে সরল সত্যের মধ্যে ভারতবর্ষের জীবনধারা পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই রকম এক সংকটকালে রামচন্দ্রের আবির্ভাব। আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব, যাগ-যজ্ঞ-অনুষ্ঠানাদির ক্রিয়ায় বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং ভক্তিধর্মে বিশ্বাসী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ যখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল, সেই সময় রাম তাঁর ক্ষত্রিয়গুরু বিশ্বামিত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুগের প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন। শৈবধর্মে বিশ্বাসী অনার্য সম্প্রদায়ের বাস দাক্ষিণাত্যের বিশাল ভূখণ্ডে। সেই শৈবোপাসক অনার্য প্রভাবকে নিরস্ত করবার জন্যই হরধনু ভঙ্গ করে রাম ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা জনকের ধরিত্রী-সম্ভূতা কন্যা সীতাকে বিবাহ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্ম-বিদ্যাকে বহন করে নিয়ে যান। পাষাণী অহল্যার মানবীতে রূপান্তরের কাহিনী তারই রূপক। পরবর্তী কালে এই দাক্ষিণাত্যেই ভক্তিধর্মের স্রোত উচ্ছ্বসিত হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত করেছিল। রাজনৈতিক এই বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে ঐক্যসাধন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন রাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ এখানে রামের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি ক্ষত্রিয়ের পরম শত্রু পরশুরামকে বশ করেছিলেন, বানরদের তিনি ভক্তিধর্মের দ্বারা জয় করেছিলেন। রামের জীবনের এই ঐক্য-সাধন ব্রতের উপর রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। পরবর্তী কালে রামচরিত্র সম্পর্কে বিরোধী মন্তব্য-গুলিকে অস্বীকার করে তিনি বলেছেন —"বস্তুত রামচন্দ্রের জীবনের কার্যে এই গতিস্থিতির সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে, তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব নহে, তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন: তিনি আর্য-অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন।" (পরিচয় ঃ রবীন্দ্র রচনাবলী অষ্টাদশ খণ্ড ঃ পৃঃ ৪৩৫)।

রামের জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'উদার বীর্যবান সহিষ্ণুতা'র পরিচয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রস্ফুটিত করবার চেষ্টা করেছেন। রামচরিত্র সম্পর্কে 'উদার বীর্যবান সহিষ্ণুতা'র উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'য় রামের জীবন ও কার্যের মধ্যে তাঁর এই বীর্যবান সহিষ্ণুতা প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাম-চরিত্রের এই ভাবরূপকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য 'ভাষা ও ছন্দে'র পদ্ধতিতে কেবলমাত্র সুচয়িত বিশেষণের মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার প্রয়াসে অসংগত, প্রক্ষিপ্ত ঘটনার আগাছা দূরে করবার কাজে মন দিয়েছেন। প্রতিটি ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করেছেন রামের জীবনের মূল ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, যে ধারা তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। শম্বুক-হত্যা এবং সীতা-নির্বাসনের ঘটনা রাম-চরিত্রের মহিমার বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের মতে পরবর্তীকালের সমাজ-রক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনবার জন্য রামচরিত্রের উপর এই অপবাদ আরোপ করেছিলেন। রাজা দশরথ কর্তৃক রামের বনবাসের আদেশকেও তিনি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। তাঁর মতে বশিষ্ঠ বংশই ছিল রামের চিরপুরাতন পুরোহিত বংশ, রাম অল্পবয়সে বিশ্বামিত্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। রাজা দশরথের তাতে অসম্মতি ছিল। রামের বিরোধী কোন দলের প্রবল প্রভাবে অন্তঃপুরের মহিষীদের ষড়যন্ত্রে বৃদ্ধ দশরথ যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় রামচন্দ্রকে নির্বাসিত করেছিলেন। অর্থাৎ পারি-

বারিক কাহিনীকে তিনি জাতীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় বিস্তৃত করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রামায়ণের অনুবাদ করেছেন অনেক লেখক। বাংলা দেশের গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশে এবং ভক্তিধর্মের আবহাওয়ায় রামচরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে বারে বারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই রামচরিত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের বাণীমূর্তি রূপে আবিষ্কৃত হয়েছে। রূপান্তর নয়, আবিষ্কার।

'রক্তকরবী'র প্রথম সংস্করণের 'প্রস্তাবনা' ১৩৩১ সালে লিখিত কবির একটি 'অভিভাষণ'। সেখানে রামায়ণের ঘটনাপুঞ্জ থেকে বিমুক্ত করে কেবলমাত্র সত্যের সারবস্তুকে তিনি পরিস্ফুট করেছেন সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যে। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'র বক্তব্য এখানে আরো ভাব-গূঢ়। তিনি দেখিয়েছেন রাম-রাবণের সংগ্রাম মূলতঃ দুই ভিন্নধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষ, আদর্শের দ্বন্দ্ব, সংস্কৃতির বিরোধ। রাবণ শোষণজীবী সভ্যতার অগ্রনায়ক। সেই সভ্যতার বিলাসোচ্ছলতা, ভোগ-লিপ্সা, সংগ্রহ-তৃষ্ণা অনেকটা রাক্ষসের মত। 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধে আমেরিকার ঐশ্বর্যসম্পদ দেখে তিনি এই কথাই বলেছিলেন— 'টাইটানিক ওয়েল্থ'—দানবীয় ঐশ্বর্য'। 'নবদূর্বাদল শ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিলেন'—তাই দুই সভ্যতার মধ্যে মরণান্তক সংগ্রাম শুরু হয়েছিল।

দস্যু রত্নাকর, যাঁর পেশা ছিল এই ধর্ষণ, আর শোষণ, যেদিন রামের ভক্ত হলেন, অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় দীক্ষা নিলেন, তখনই সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল, তিনি শোনালেন আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলংকার পরাভবের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন রাম এবং রাবণ নাম দুটির মধ্যে দুই ভিন্নধর্মী আদর্শের পার্থক্য পরিস্ফুট—"রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চিৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শব্দঘোষ।"

'ভাষা ও ছন্দ' থেকে শুরু করে 'রক্তকরবী'র এই প্রস্তাবনা পর্যন্ত বিশেষ একটি ভাবকণিকা সমস্ত ঘটনাংশ পিছনে ফেলে রূপের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে উঠতে চলেছে।

এই দুই আলোচনার উদ্দেশ্য এক, কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই যথাক্রমে কৃষ্ণ এবং রামের মধ্যে আদর্শ মানবচরিত্রের সন্ধান করেছিলেন। এঁদের মানবীয় সত্তার সত্যমূল্যে এবং ঐতিহাসিকতায় তাঁরা বিশ্বাসী। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নৈয়ায়িক বিশ্লেষণের পথ গ্রহণ করেছেন। যুক্তির আঘাতে অপ্রাকৃত, অসঙ্গত ঘটনার আগাছাকে করেছেন নির্মূল। যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি তাঁর, কিন্তু সেখানে অতি সহজেই রবীন্দ্রনাথের বস্তুভেদী কল্পনা-শক্তি তথ্যস্তূপ সরিয়ে মূল সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছে। তথ্য ও যুক্তি দিয়ে সত্যকে প্রমাণিত না করে বিশ্বাসের বলিষ্ঠতায় তিনি রামচরিত্রের ঐতিহাসিক ভাবরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের রামচরিত্র সংক্ষিপ্ত পরিসরে পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট। অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র সুবিস্তৃত, এর অনুধাবন শ্রমসাধ্য। বিতর্কের জটিল জালে কৃষ্ণচরিত্রের ভাবরূপ আবৃত, রসের মধ্য দিয়ে সে জেগে উঠতে পারে নি, যেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের রাম। এর প্রধান কারণ বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্বকে, একটি থিওরিকে প্রমাণ করতে সচেষ্ট, অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ জীবনসত্যকে উদ্ঘাটিত করতে নিমগ্ন। 'আধুনিক সাহিত্যে'র 'কৃষ্ণচরিত্রে'র আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, তত্ত্ব প্রমাণের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকায় সংশয়ী পাঠকের সঙ্গে তাঁকে অনাবশ্যক বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নতুবা ক্ষমা ও শৌর্যের আধার সেই মানবশ্রেষ্ঠকে যথাযথরূপে পাঠকের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে তিনি সমর্থ হতেন। রামচরিত্রের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এই রীতিই প্রধানতঃ অনুসরণ করেছেন।

বীর্যবান মনুষ্যত্বের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সশ্রদ্ধচিত্ত। কিন্তু এই শৌর্যের প্রকার-ভেদ দেখা যায় কৃষ্ণ এবং রামচরিত্রে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ প্রধানতঃ শত্রু-সংহারক। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা', 'ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুদ্ধ প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুদ্ধ শক্তিময়।' ('আনন্দমঠ' : পৃঃ ৬০)। শৌর্য এখানে অশুভবিনাশী রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের রাম 'বীর্যবান সহিষ্ণুতা'র প্রতিমূর্তি। রামচন্দ্র প্রেমের দ্বারা বিরোধ ও বৈষম্য দূর করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শান্তি ও সহিষ্ণুতার প্রতীক।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ এবং রবীন্দ্রনাথের রাম শতাব্দীর দুই পর্বের বাণীমূর্তি, এই দুই পর্বের দুই পুরোধা চরিত্রের ব্যক্তিত্বের আলোতে তাঁরা নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ ছিল সংগঠনের কাল। অনেক আগাছা সরিয়ে তবে তাঁকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়েছিল আগামীকালের জন্য। তাই সংস্কারক ও সংহারকের কর্তব্য তাঁর জীবনে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সব্যসাচীর মত তিনি এক হাতে সংস্কার ও অপর হাতে গঠনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সমস্ত বিষয়ে আদর্শ স্থাপন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই পটভূমিকায় তাঁরই জীবন-সাধনার সঙ্কল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র। সেইরকম তীক্ষ্ম, ঋজু, শক্তিমান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বাংলা দেশে শুরু হয়েছিল সমন্বয়ের পর্ব। এই সমন্বয়-সাধনা সার্থকতম রূপ নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। বাংলা দেশের সংস্কৃতি-চিন্তা তখন আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় বিস্তারলাভ করতে চলেছে। সর্বভারতীয় জীবনের বাণী রবীন্দ্রনাথের সারস্বত-সাধনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। পূর্ব ও পশ্চিম মহাদেশের বিরোধকে তিনি প্রীতির দ্বারা দূর করবার কথা চিন্তা করেছিলেন। এই সমন্বয়মূলক জীবনাদর্শের পটভূমিকায়, রবীন্দ্রজীবনের ঐকাসাধন ব্রতের আদর্শ নিয়ে রামচরিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কৃষিবিদ্যা ও ভক্তিধর্মের বাণী নিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সঙ্কটপর্বে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়েছিলেন রাম, আকর্ষণজীবী ভোগলোলুপ রাক্ষস সভ্যতাকে পরাস্ত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সঙ্কটকালে কর্ষণজীবী ভারতবর্ষের শান্তি ও সহিষ্ণুতার বাণী নিয়ে পশ্চিম দেশের ভোগক্লান্ত সভ্যতার দুয়ারে উপস্থিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সমগ্র ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব বৃহত্তর রূপ লাভ করেছে, এই ব্যক্তিত্ব প্রধানতঃ প্রেমময়। সৌন্দর্যে-মাধুর্যে তার বিকাশ।

সেকালের পাতা : একালের চোখ

রত্নাকর

সাহেবের হাতের তৈরি বাজনা। ইংরেজী সুর বাজবে না। বাজবে মল্লার, ইমন।

মহারাজাধিরাজ প্রতাপ চন্দ্‌ বাহাদুর রামরত্ন মল্লিকের ছেলের বিয়েতে নিজেকে প্রকাশ করতে চান নি। খালাসির ছদ্মবেশে হাজির হলেন মহারাজাধিরাজ। কিন্তু ছদ্মবেশ ত ধরা পড়ে গেল। খালাসির মাথায় মণি-মুক্তো থাকে নাকি? এই চমৎকার ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিল সম্বাদ ভাস্করে।

মান্দ্রাজের হাইকোর্টে অনেকগুলি বেরিষ্টার আছেন, এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি লোক ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করাতে, বিচারপতিরা সকলে পরামর্শপূর্ব্বক ঐ প্রকার অভিপ্রায় ধার্য্য করিয়াছেন যে হাইকোর্টের বেরিষ্টারদিগের সংখ্যা নিরুপণ করিয়া দিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় এই অভিপ্রায় সুসংগত বোধ হয় না! যখন অধিক লোক বেরিষ্টার হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের ফী ন্যূন হইতে পারে তাহাই সাধারণের সুবিধা।

* * *

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর রাজ্ঞী ও এডিনবরা ডিউকের সম্মানার্থে যে কবিতা লিখিয়াছেন তন্নিমিত্ত লার্ড আর্গাইলের সেক্রেটারী তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

* * *

বিজ্ঞাপন

সঙ্গীত-বিদ্যার অধ্যাপক টি ডবলিউ ডেবিস সাহেব কর্ত্তৃক উৎকৃষ্টরূপে গত বাঁধা হিন্দু বাদ্য। এই বাদ্য শব্দেরূপে গত বাঁধিতে পারগ একজন হিন্দু কর্ত্তৃক প্রাপ্ত। যে সকল বাদ্যের বাক্সে ৬টি সুর সে সকল নীচের লিখিত রাগে বাজিবেক।

লুম ঝিঁঝিট, দাস মল্লার, তাজা বেতাজা খাম্বাজ গথ, ইমন ইনিন, এই কয় রাগ বাজিলে ১৫০ টাকা। বাজনার বাক্স যাহাতে চারটি রাগ বাজিবে তাহার মূল্য ১০০ টাকা। ফইজাবাদস্থ ২৬ সংখ্যক ক্যামিরোনিয়ান সেনাদলের ব্যাণ্ডমাষ্টার অর্থাৎ প্রধান বাদ্যকারের নিকট আবেদন করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

26th Cameronians.
T. W. Davis Band Master

তারিখ ২৬ মে।
সন ১৮৭০ সাল।

* * *

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে লণ্ডনের অন্তঃপাতী সিটি রোড নামক ডাক্তারখানা হইতে বিবি গ্রে ধাত্রী বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং এক্ষণে কসাইটোলাস্থ নং ২ জেবস লেনে আছেন, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তথায় তত্ত্ব করিলে অনায়াসে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা। বিবি গ্রে
কসাইটোলা জেবস লেন।

তারিখ ৪ঠা জুন।
সন ১৮৭০ সাল।

* * *

১৪ আষাঢ় সোমবার ১২৭৭
সম্বাদ ভাস্কর (১২৬০)

..."প্রাপ্ত বাবু রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহ-সভা, যাহার তুল্য 'মহা-কলিকাতা নগরে আর হয় নাই, 'মহা-রাজাধিরাজ প্রতাপ চন্দ্‌ বাহাদুর ছদ্মবেশে সেই সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ সভার অগ্নিকোণে নীচলোক-দিগের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিলেও তাহার সামান্য টুপি হইতে এক হীরক নক্ষত্রের ন্যায় উদয় হইয়াছিল, 'প্রাপ্ত-বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর বরপাত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া চতুর্দ্দিগ দর্শন করিয়া রামরত্ন বাবুকে ডাকিয়া কানে কানে কহিলেন, তুমি সভার অগ্নিকোণে এক কৃত্রিম নক্ষত্র স্থাপন করিয়াছ, রামরত্ন বাবু কহিলেন, আমি ইহা জানি না, সূর্য্যকুমার বাবু কহিলেন, তবে তুমি তোমার বালকের সম্মুখে আসিয়া অগ্নি-কোণ দিগে নিরীক্ষণ কর তো, রামরত্ন বাবু তৎক্ষণাৎ সূর্য্যকুমার বাবুর সাক্ষাতে বসিয়া অগ্নিকোণে দেখিলেন খালাসিদিগের মধ্যে একটা নক্ষত্র উঠিয়াছে, তখনি রামরত্ন বাবু ও সূর্য্য-কুমার বাবু এবং অন্যান্য সভ্যেরা মশালাদি আলোক সহিত ঐ নক্ষত্র মুখে গেলেন এবং খালাসি সকলকে দূরীকৃত করিয়া ঐ টুপিধারীকে ধৃত করিলেন। তিনি খালাসিদের ন্যায় পরিধান পরিয়া-ছিলেন কেবল মস্তকে একটি সামান্য টুপি ছিল এবং দুই হস্ত পরিমিত ছোট একটি চাবুক যাহা কেবল হীরকময় বহুমূল্য, অশ্বারোহণ এবং পদব্রজে ভ্রমণ কালীন তাহা হস্তে রাখিতেন তাহাই বগলে রাখিয়াছিলেন, সূর্য্যকুমার বাবু ঐ ছদ্মবেশী খালাসিকে সভামধ্যে আনিয়া এক উত্তম সুখাসনে বসাইলেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, পরে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ক্ষণকাল সেই স্থানে থাকিয়া বাবু রামরত্ন মল্লিকের পুত্র বরকে এক হীরকাঙ্গুরী যৌতুক দিয়া প্রস্থান করিলেন।"—ইন্দোরের মহারাজা বাহাদুর ছদ্মবেশে এসেছিলেন বোম্বাই। সেই সংবাদ দিতে গিয়ে প্রসঙ্গত এই গল্পটি শুনিয়েছেন সম্বাদ ভাস্কর-এর সম্পাদক তাঁর ১২৬০ সালের (ইং ১৮৫৪) ২৭শে পৌষ মঙ্গলবারের পত্রিকায়।

* * *

কি ভয়নক রৌদ্র

এ কি হৈল, মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড করে যে দেহ রক্ষা হয় না, প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিনকর এমন প্রখর রূপে কর বর্ষণ করেন যে প্রাণিনিকর বাসগৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারেন না, বড় ২ পুষ্করিণীসকল জলশূন্য হইয়া গিয়াছে, কূপ মধ্যে বিন্দু মাত্রও বারি দেখিতে পাওয়া যায় না, গঙ্গাজল এ বৎসর নিদারুণ লবণাক্ত হইয়াছে, প্রত্যহ সায়াহ্নকালে গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হয় বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্রও জল বর্ষণ হয় না, দিনকর প্রতাপ দিন ২ অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল হইতেছে; অনল মহাশয় এই সুযোগে বিলক্ষণ ভোগ গ্রহণ করিতে-ছেন এমন ভয়নক রৌদ্র অনেক দিন এতন্নগরে সুপ্রকাশ হয় নাই।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২৮শে বৈশাখ, ১২৬৬

প্রশ্ন

সবিনয় নিবেদন,

'জানাতে পারেন' বিভাগ মারফৎ উত্তর পাবার আশায় কয়েকটি প্রশ্ন করলাম।

(ক) আমেরিকার নিগ্রো পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা কত? এদের মধ্যে বহুল প্রচার কোনটির?

(খ) আমেরিকার কোন রাজ্যে নিগ্রো-বিদ্বেষ বেশী ও কোন রাজ্যে এই বিদ্বেষ সর্বাপেক্ষা কম?
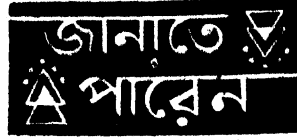
(গ) এইড ইণ্ডিয়া ক্লাব-এর প্রতিষ্ঠাতা কে? কবে স্থাপিত হয়েছে? এ পর্যন্ত ভারতকে কত কোটি টাকা সাহায্য করেছে?

(ঘ) 'পুলিৎজার' পুরস্কার কি? কি জন্য দেওয়া হয়? আমেরিকার জনসাধারণের গড় আয় কত?

বিনীত,
নির্মলেন্দুবিকাশ মিত্র,
পোঃ বাদুড়িয়া,
২৪ পরগণা।

সবিনয় নিবেদন,

'জানাতে পারেন' বিভাগে আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করলাম।

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় অনুসারে সাজিয়ে দিন—টোকিও, লণ্ডন, নিউ-ইয়র্ক, প্যারিস, মস্কো, ওয়াশিংটন, বোম্বাই, কোলকাতা, মাদ্রাজ।

(২) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বন্দর কোনটি?

প্রশান্ত দাস
১১৮ মহারাজা নন্দকুমার রোড (নর্থ),
কলিকাতা-৩৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগে দুটি প্রশ্ন করলাম। আশা করি উত্তর পাব।

১। গেরিলা যুদ্ধ কাকে বলে।

২। কমনওয়েলথ কি? এর উদ্দেশ্য কি? কোন কোন রাষ্ট্র এর সদস্য?

শ্রীরমেশচন্দ্র গাইন,
আঝাপুর উচ্চ বিদ্যালয়,
নবম শ্রেণী
বর্ধমান।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের "জানাতে পারেন" বিভাগে উত্তর পাবার আশায় দুটি প্রশ্ন পাঠাচ্ছি।

১। বাঙলা ভাষায় সর্বাধিক কোন্ ভাষার পুস্তক অনূদিত হয়েছে?

২। বাঙলা ভাষার পুস্তক কোন্ ভাষায় সর্বাধিক অনূদিত হয়েছে?

প্রীতি মিত্র,
স্টাফ কোয়ার্টার্স,
পোস্ট : তাবাবাড়িয়া,
জেলা : ২৪ পরগণা।

সবিনয় নিবেদন,

প্রশ্ন দুটির উত্তর 'অমৃত'এ দেখতে পেলে খুশী হবো। প্রশ্ন দুটি হল এই :

১। বাঙালীদের যেমন বয়োজ্যেষ্ঠদের অভিবাদনের প্রথা তাঁদের পদস্পর্শ করে—ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কি তাই? যদি তা না হয় তবে বিভিন্ন প্রদেশের কি কি বিভিন্ন প্রথা?

২। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের জন্মকথা বিজ্ঞানে পড়েছি। কিন্তু মহাশূন্যে প্রথম জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল?

সরমা বন্দ্যোপাধ্যায়,
২৬।২বি ওমদারাজা লেন,
কলিকাতা-১৫

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগ থেকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন দুটির জবাব পেলে খুবই সুখী হ'ব।

১। ক্রিকেট খেলার সৃষ্টি হয় কিভাবে, কোথায় এবং কতদিন আগে? ক্রিকেটের জনক কে? বিশ্বের প্রথম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ খেলা হয় কোন দল দুটির মধ্যে?

২। অলিম্পিক ক্রীড়ায় হকির প্রচলন হয় কতদিন আগে? ভারত কত খৃষ্টাব্দে অলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদান করেছিলো এবং কত খৃষ্টাব্দে ভারত প্রথমবার বিশ্বহকি বিজয়ী হয়েছিলো?

অনুপম ভট্টাচার্য,
তারা ভৈষজ্য আশ্রম,
কোচবিহার।

সবিনয় নিবেদন,

'জানাতে পারেন' বিভাগে আমার প্রশ্ন পাঠালাম।

১। দোঁহা কি?

২। পৃথিবীকে কতগুলি অরণ্য-বলয়ে ভাগ করা হয়?

শ্রীবিমলকুমার বসু,
গ্রাঃ মাথামাঙ্গা,
পোঃ বাদুড়িয়া,
জেলা—২৪ পরগণা।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর 'অমৃত'-এর 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীহরিসাধন চক্রবর্তীর প্রশ্নটির উত্তরে জানাচ্ছি।

বিলাতের 'হাউস অফ কমন্স' সভার কাজ দেশের আইন প্রণয়ন করা এবং প্রধানতঃ ঐ সভারই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কয়েকজন সদস্য এবং কখন কখন 'হাউস অফ লর্ডস সভা' থেকেও অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সদস্য নিয়ে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করা। এবং তার মাধ্যমে দেশের শাসননীতি নির্ধারণ এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। আরও সংক্ষেপে এর কাজ আমাদের দেশের লোকসভার কাজের অনুরূপ।

সরমা বন্দ্যোপাধ্যায়,
২৬।২বি ওমদারাজা লেন,
কলিকাতা-১৫।

ঝনঝনে রৌদ্রটাকে দিনের বেলা অসহ্য মনে হয়। কিন্তু রাত্রে আকাশের গাঢ় নীল রঙের অতল গভীরতায় সমস্ত ভাবনা লোপ করে দেয়—এমন শরতের দিনরাত। অজস্র নক্ষত্রের চোখগুলো ঝিকমিক করতে থাকে ফলেই বোধহয়, সৌরজগত একটা মানুষের সত্তাকে দেখতে পায়।

মানুষটি হল অংশু।

এক ফালি বারান্দায় রোজ রাত্রে এসে দাঁড়াতেই হয় অংশুকে। দাঁড়িয়ে অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য আকাশ দেখতে হয়, নক্ষত্র দেখতে হয়, রাস্তার সারসার আলোর উধাও দেখতে হয়। কয়েক মুহূর্ত নয়, এক এক রাত্রে কয়েক ঘণ্টাও হয়ে যায়। শরীরের দিনমান ক্লান্তির ক্লিন্নতা মালুম হয় না। উত্তেজনা ঈর্ষা ক্রোধ অপমান সব এমন একটা সীমাহীন খোলা মাঠে এসে পৌঁছয় যে উত্তেজিত অংশু চিন্তাহীন হয়ে যায়।

পুজোর সময়। কারখানায় ওভার-টাইম কাজ করে অস্থিতে মজ্জায় চড়া বেদনা বহন করে আনে। স্বভাবতঃই হোটেল থেকে খেয়ে এসে বিছানায় চিৎপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাঢ় নিদ্রায় নিশ্চেতন হবে। কিন্তু হয় না। অনেক রাতে ফেরে। যত রাতই হোক বারান্দায় অংশুকে সৌরজগতের চোখে নিজেকে দেখা দিতে দাঁড়াতে হয়।

পাঁচ ছয় দিন সারারাত্ত ডিউটি করতে হয়েছে। পুজোর প্রোডাক্সনে সারা বছরের লাভ করে কোম্পানী।

কাল রাত্রে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল যেন। মেশিনের স্টার্টার বিকল হয়ে গিয়েছিল যেন। আকাশের রঙ বদলে গিয়েছিল। প্লাস্টিক পর্দার মত ঘোলাটে মেঘের নিঃশব্দ আক্রমণে আকাশের রঙ বদলাচ্ছিল। মৌমাছির চাকের মত খুদে-খুদে ঘরগুলোর বাসিন্দেরা ফাঁকা থেকে ময়লা কাপড়-চোপড় খুঁটে সরিয়ে জড় করছিল ঢাকা বারান্দাটায়।

গরমের চাপে মনে হচ্ছিল আকাশটা ফাটবে।

অজিত মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়িওড়ানোর মজাটাই বরবাদ করে দিলে বৃষ্টিতে। অংশুর ঘরে ঘুড়ি সুতো লাটাই, আফসোসে মুখ ঢেকে এক কোণে পড়ে থাকল। শংকর, ভণ্ডা, অমল সবাই যে যার কেটে পড়েছে ভগবানকে গালাগাল দিয়ে।

অংশু উনুনে আঁচ দিয়ে খিচুড়ি চাপিয়ে দিল। চার্মিনার সিগারেট ধরিয়ে জানালায় কুচিকুচি বৃষ্টি পড়া দেখতে লাগল। জানলাটা উত্তরের, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর থেকে ভেসে আসা ঝড় আর তেমনি বৃষ্টিতে শরৎ-কালের চকচকে লাবণ্যটাকেই দিয়েছে তাল-গোল পাকিয়ে কাদাজল করে। ঝড় জল আর হিমেল ঝাপট দেখতে দেখতে অংশুর কড়া-পড়া মনটাও ঘুড়ি-লাটাইয়ের শোক ক্রমে ক্রমে ভুলতে লাগল, একটা উদাসীনতায় জড়িয়ে পড়তে লাগল।

একটু আগেই ভাবছিল, শালা এমন ঝড়-জল হবে জানলে দেশের বাড়িতে চলে যেতাম। বউয়ের গায়ের গরম পেলেও স্যাঁতসেঁতেটা কাটত। কী রকম শালা জড়-জড় লাগছে। ঠুঁটো জগন্নাথ। ফুর্তিফার্তা না থাকলে কি আর ভালো লাগে? মা হয় তো তিন তাসে বসলেও ঠান্ডাঠান্ডা মরা-মরা ভাবটাও কাটত।

ভণ্ডা এসে খবর দিল, 'অংশু চ, শংকররা বসেছে।'

অংশু জানলা থেকে চোখ তুলল না, বলল, 'নাঃ। আজ শালা ভালু লাগছে না।'

'চল না বে,—' উনুনের শব্দে দেখে নিল ভণ্ডা, 'তুই চাপিয়ে দিয়েছিস? আমরা যে র‍্যাং নিয়ে এসেছি। অমলা নিয়ে এসেছে শুয়রের নাড়ি। কীম রোলের মতন ভাজবে।' টেক্সাস পোশাকে ভণ্ডার ভঙ্গি হল ট্যাঁশদের মত। কোমরের নিচে বেল্টের ফাঁকে দুটো বুড়ো আঙুল ঢোকাল।

'তোমরা মৌজ কর ভাই।' অংশু কেরাসিন কাঠের র‍্যাক থেকে ফুলেল তেল টানল। ফুলেল তেল মাথায় মাখল।

ভণ্ডা অংশুকে চেনে। শিস দিতে দিতে সরে পড়ল।

কুচি কুচি বৃষ্টিতে হাওয়ার ধাক্কা লেগে লেগে ঝড় উঠেছে। সে ঝড় আস্তে আস্তে পাশবিক লিপ্সায় ক্রুরতর ঝঞ্ঝা হয়ে গেল। বাতাসের গতি হোল এলোমেলো। ঘূর্ণির সৃষ্টি হোল। সারা আকাশটা চরকিবাজির মত ঘুরপাক খেতে লাগল যেন। প্রাচীন একটা ফলসা গাছ পড়ল কোমর ভেঙে। জানলায় ঝড়ের ঝাপট আরও অবাধ হল। তবু জানলা বন্ধ করল না। সবুজ এবড়ো-খেবড়ো পতিত জমিটার গায়ের রঙ হাজার হাজার ইঁদুরের মত ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। এবারে ঘূর্ণির ছাট পলেস্তারা-ওঠা মেঝে কাদাকাদা করছে। এ বৃষ্টি চট করে থামবে না, মেঝেও চট করে শুকোবে না। তাও জানলা বন্ধ করল না অংশু।

ঝড় তুফান মিছিল আন্দোলন ইত্যাদি চড়া সুরের কিছু দেখলেই অংশুর রক্তের ভিতর উথালি-পাথালি করতে থাকে। তার জীবনটা নিয়ে একটা প্রচণ্ড আফ-সোস জাগে। ছোটবেলা থেকেই অংশু নিজেকে ডাকুর সর্দার, যুদ্ধের নায়ক, সিনেমার হিরো ভেবে এসেছে। কিন্তু চোখ ফোটার পর থেকে কলকাতার অ্যাসফল্টের রাস্তায় রুজির উপায় করতে গিয়ে নিজেকে একটা পলকা শামুকের চেয়ে প্রাণীন বেগবান কঠিন জীব বলে ভাবতেই পারে নি।

নইলে ষোল-সতের বছর আগে তার পার্শ্বচরীকে কেড়ে নিতে পারত না কালের আক্রমণ। সেই পার্শ্বচরীকে অংশু তার বউ নিরুর আদলে খুঁজেছে, পাড়ায় গ্রামে কারখানায় খুঁজেছে। কোথাও পায়নি। রাস্তায় কোনো ফুট-ফুটে চতুর্দশীকে দেখলেই চমকে ওঠে। যেন সেই চতুর্দশীর আকাশে দিনরাত হয়নি, ঝড়-ঝাপটা লাগেনি। সেই একই গড়নে, একই গরিমায় এখনো নিটোল থেকে গেছে। শুধু অংশু একটা দুর্ঘ-টনায় পড়ে গিয়ে কিমাকার হয়ে গেছে।

কোমর ধরে নাচ, ছুটোছুটি, বুড়ি-ছোঁওয়া আর ঐ সাহেববাগানে আম-বনের কালো ছায়ায় ঘনিষ্ঠতমতা, সব যেন নিষ্ঠুর থাবায় খাবলে নিয়ে পালিয়ে গেছে। অংশুর প্রেমোদ্দীপক নরম উষ্ণতা গেছে, রক্তের উত্তেজনা গেছে, নিরুপম আবেগের তুরঙ্গে জয় করবার মহত্ত্বও গেছে।

কারখানার মিস্ত্রী হয়েছে অংশু।

গায়ের পেশীগুলো চিমসে গেল, গালের ঢিবিটা নেমে গেল ভিতরের

দিকে। চোখের নিচে ঝুলিঢাকা দেয়ালের মতন অবস্থা হল লিভারের দোষে। নাকটা সরু মরচে-ধরা টিনের ফালির মত পাতলা বিবর্ণ হল।

এখন অংশুর স্বপ্নের অর্কেস্ট্রা চুরমার হয়ে গেছে। শুধু একঘেয়ে এক তালে শব্দিত হচ্ছে বুকের স্পন্দন। সেই তার সুর, সেই তার বাঁচবার ছন্দ।

চান করে এসে খিচুড়ি নামাল।

কেউ টোকা দিচ্ছে বোধ হয়। দরজা খুলে দিতে গেল অংশু। গলির প্রান্তে দরজা। গলির মাথায় ছাদ নেই, ভিজে গেল। রামধনু ছাতা মাথায় এক ভদ্রমহিলা। এত পিঙ্গল আর্দ্র বাতাবরণেও কিংশুকের মত জ্বলছে। ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে অংশু বুঝল, কিংশুকের মত নয় আগুনের মত জ্বলছে। তার আঁচে অংশুকে যেন ঝলসে ফেলল। কিসের আঁচ? রূপের? নাকি স্মৃতির? কোনো ভুল নেই অংশুর। সতের বছর বাদে দেখলেও সে ভুল করতে পারে না। সুন্দর মেয়ে মাত্রকেই লিপিকা বলে ভুল হবার পাগলামি এ নয়।

'কাকে চাই?' অংশু কেমন করে বলেছিল, গলায় বিস্ময় ছিল না বিমূঢ়তা ছিল তা আজ আর বলা তার পক্ষে অসম্ভব।

'মিঃ বিশ্বাস আছেন?' ভদ্রমহিলার মুখে বিরক্তি। কাদাজলের জন্য হবে বোধহয়। এও হতে পারে, যা দেখতে পাবে ভেবেছিল, যে রূপবান মানুষকে দেখতে চেয়েছিল তাকে দেখতে না পেয়ে একজন হতচ্ছাড়াকে দেখতে হচ্ছে। অংশুকে কী ভাবল লিপিকা? মিঃ বিশ্বাসের চাকর? নাকি ধ্বংসাবশেষ?

এ কথাটা অংশু ভালোই বুঝতে পারল, বিকাশের দিকে এখনো উন্মুখ লিপিকা বিনাশের দিকে জড়ীভূত অংশুকে চিনতে পারেনি।

'মিঃ বিশ্বাস! মানে—' অংশু যেন তোতলায়। অথচ সে মনকে ইতিমধ্যেই শক্ত করে ফেলেছে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ অংশুমান বিশ্বাস।' ভদ্রমহিলা এবার ধমকাল, 'জানো না, এ বাড়িতে থাকেন?'

'থা—থাকেন। তবে এ-এখন তো নেই। আপনি ভিতরে আসুন, বসবেন চ-চলুন। এসে পড়বেন।'

এক মুহূর্ত ভদ্রমহিলা কী ভাবল। স্লিপারের স্ট্র্যাপে কাদা দেখছিল মুখ নিচু করে। ঝমঝমানো বৃষ্টি তুমুল কোলাহল করে চলেছে। ভদ্রমহিলাকে অংশু রঞ্জনরশ্মিতে দেখছিল। অপূর্ব, এমন একটা প্রতিমার মত মুখ, যাকে যে কেউ পতাকার সম্মান দিতে পারে। কিন্তু পতাকা অর্ধনমিত কেন। কিসের ছায়া দেখল অংশু ভদ্রমহিলার মুখে।

ঘরের চেহারা দেখে ভদ্রমহিলার অপ্রতিভ ভাবটা আরও আড়ষ্ট হল। চিন্তার ছায়া আরও ঘন হল। এখানে মিঃ বিশ্বাস থাকেন বিশ্বাস করতে মন সায় দিল না। অথচ তার কোনো ভুল নেই। সতের বছর আগেকার কথা হলে কী হবে, সেই বাসার ঠিকানা মনে না-ও থাকতে পারে, কিন্তু অবস্থান তো কখনোই গোলমাল করে ফেলবে না। ওই সুন্দর মুখের ভিতর থেকেই দুটো কুৎসিত বরকন্দাজের মত ভদ্রমহিলার চোখ দুটি ঘরের সর্বত্র তল্লাশ করে ফিরতে লাগল, হাতড়াতে লাগল। সতের বছরের ধুলো-পড়া দেয়াল জানলা সিলিং যেন ঝাড়তে ঝাড়তে পরিষ্কার করে করে মিলিয়ে দেখল।

অংশু টিনের চেয়ারটা তাড়াতাড়ি তার শৌখিন তোয়ালে দিয়ে মুছে বসতে দিল ভদ্রমহিলাকে।

'এই সেই ঘর' অনেকটা স্বগতোক্তি করল মহিলাটি। বিশ্বাস ফিরে আসতে কিছুটা আশাও পেল বোধহয়। বাইরে চোখ পড়তেই স্বচ্ছন্দ গলায় শোকে যেন চিৎকার করে উঠল, 'ইস্, ফলসা গাছটা পড়ে গেছে। কবে পড়ল, কী করে পড়ল।'

কত কিছুই তো পৃথিবীতে রোজ মরছে। তার জন্য কেউ ভাবে না, মাথা ঘামায় না। চেনা-জানা কেউ মরলেই শোকার্ত হই আমরা। ফলসা গাছের দুঃখে ভদ্রমহিলার চোখ জলে ভরে গেল। সে দুটি বিন্দু জলের দাম বাইরের কোটি কোটি বৃষ্টি-বিন্দুর চাইতে অংশুর কাছে কোটিগুণ মারাত্মক।

মহিলাটি ঘর, বারান্দা, কড়িকাঠ, জানলা, উঠোন এমনকি বাথরুমেও

দেখছে। ভাবছে সবই সেই কিন্তু সবই জীর্ণ।

আর অংশু চুলচেরা চোখে সেই ফাঁকে মহিলাটিকে দেখছে। মানে লিপিকাকে। চুলের গোছ এখনো তেমনি ঝাঁকড়া, সারা গায়ের রঙে তেমনি এয়োস্ত্রীর সিঁদুর লাগা-লাগা জেল্লা, আর চামড়ায় কচিপাতার টানটান লাবণ্য এখনো নিটোল। শরীরে স্বাস্থ্যে মাধুর্যে এমনকি ওর মহিয়সী উপস্থিতির একটা মাতাল হাওয়াতে অংশুর বোধ বুদ্ধি বিলাসের কামনা—সব কিছুকে যেন আসন্ন অপারেশনের টেবিলে শায়িত করে নিস্তেজ করতে শুরু করেছে। লিপিকার আবির্ভাবে যেন ঝাঁঝালো ওষুধের গন্ধ। তাতে অংশুর শক্তিসঞ্চয় না আয়ুক্ষয়, ঠিকমত বুঝতে পারল না। এখন কেবল নির্বোধ হয়ে চলল।

'কী করে পড়েছে বললেন না তো!' লিপিকা বিদেশী নাচের মুদ্রায় পায়ের আঙুলের ডগায় ছোট্ট ঘুরপাক খেয়ে আবেগটা ধরে রেখেই বললে।

'ঝড়ে।'

'অংশুবাবু আপনার কে হয়।' আবার ওমনি ছোট্ট ঘুরপাক খেয়ে লিপিকা চলে গেল জানলার ধারে। গাছ দেখছে, পতিত জমি দেখছে, বৃষ্টির ধারা দেখছে।

অংশুবাবু কে হয়। কী বলবে অংশু। দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলছে টিনের ফ্রেম-আঁটা আয়না। তার মাথায় অংশুর ছোটবেলাকার ফটো। হ্যাফ-প্যান্ট পরা। মাথায় কী কম চুল, ঠিক মেয়েদের মতো। আয়নাতে নিজের বর্তমান, ফটোতে আবছা অতীত—বারবার মিলিয়ে তুলনা করে দেখছে অংশু। কী বলবে নিজেকে। অবশ্যই লিপিকা তাকে চিনতে পারে নি। তাহলে কোনো প্রশ্নই করত না। কিন্তু তাকে দেখে কি একেবারেই চিনতে পারেনি, একেবারেই সন্দেহ হয়নি। সেই অতীতের সঙ্গে একেবারেই কোনো সাদৃশ্য নেই বর্তমানের? নিশ্চয় নেই। কেন নেই। সে কেন বদলে গেল। লিপিকা কেন বদলাল না। তাহলে অতীত সকলের কাছে নিশ্চয় বাঞ্ছনীয় নয়। অতীতের ডানায় ভর করে, সকলে অশানুরূপ বর্তমানে তাহলে নিশ্চয় পৌঁছয় না। অতীত অনেকের কাছে শুধুই অতীত!

ভাঙা টিনের আরশিতে চেহারা দেখতে দেখতে তোয়ালে দিয়ে মুখের তেল মুছল ঘষে ঘষে। ফাটা-ফাটা রুক্ষ একটা ডাঙা, পাশেই ফসলিত ঋদ্ধ প্রান্তর। ইশ্!

'অংশুবাবু আপনার কে?' বৃষ্টির ভিতর থেকে ভেজাভেজা প্রশ্ন এল যেন। যেন লোকটা কে জানলেও চলে, না জানলেও ক্ষতি নেই।

'এ্যাঁ...... কেউ না। উনি আমার কেউ হন না।'

'মিঃ বিশ্বাস কখন আসবেন।'

'কটা বাজে?'

'প্রায় বারোটা।' হাতঘড়ি দেখে বলল লিপিকা। কালো ভেলভেট ব্যান্ডে সোনার ঘড়িটা গোল। বাঁ হাতে আর কিছু নেই। ডান হাতে একসার কাঁচের চুড়ি। টান করে বাঁধা চুলের পিছনে বিড়ে খোঁপা। কানে নকল হীরের ঝুমকো, অনেকটা আঙুর-গুচ্ছের গড়ন। অক্সেন ব্লাড রঙের ব্লাউজের অস্তিত্ব স্বচ্ছ সিল্কের লাল শাড়িতে সহজেই মালুম হয়। আরো সহজেই মালুম হয় তার যৌবনের সরব অহঙ্কার।

'এসে পড়বেন। সময় তো হল আসবার।' অংশু বুঝতে পারছে না, তার মুখের ভাঁজগুলি আরও গভীর হয়ে যাচ্ছে।

'এই ঘরটায় কে থাকে, তুমি? তুমি ও'র কে, কী কর এখানে। এ ঘরটাই তো সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে বড় ঘরটা না? মিঃ বিশ্বাস থাকেন কোন ঘরে?'

'অংশুবাবু এ ঘরে থাকেন না। না, এখানেই থাকেন না।'

'সে কী! থাকেন না! তবে... তাহলে!' লিপিকা কয়েক পা পৌঁছিয়ে গিয়ে আচমকা আঁতকে উঠল। একবার সদ্য-ধৃত পাখির মত অংশুর দিকে, পরক্ষণেই দরজার দিকে চকিতে চাইল। চাউনিতে কী নিদারুণ ছটফটানি! 'তবে—তবে যে তুমি বললে? মতলব কী তোমার।' ক্রুদ্ধ হবার ভান করে নিজেকে দৃঢ় অকুতোভয় জাহির করবার চেষ্টা প্রকাশ করল লিপিকা।

'থাকতেন। এখন মাঝে মাঝেই আসেন......প্রায়ই আসেন। এখুনি আসবেন। পুরনো জায়গা কিনা, এখানে না এসে থাকতে পারেন না......আমাদের দেখাশুনো করতে আসেন। শুধু আমাদের কেন, আমাদের মতন অনেক গরীবকে দেখাশুনো করেন......' অংশু গুছিয়ে বলতে পারল না। বিনয়ে বিগলিত হয়ে এলোমেলো জড়াজড়ি করে ঝরণা-ধারার মতন ছিটকে ছিটকে তরতরিয়ে বলে গেল। গন্তব্যে পৌঁছনোর দ্রুততায় অংশু যেন ব্যাকুল। কিসের গন্তব্য, কোথায় গন্তব্য। দেখতে পাচ্ছে কোনো সমুদ্রের চিহ্ন? তবে?

"মিঃ বিশ্বাসের চাকর? নাকি ধ্বংসাবশেষ"

সতের বছর আগেকার কিশোর কি এ জগতের কোথাও আছে। লিপিকা না জানলেও অংশু তো জানে। তাও তার মৃত চোখে এখনো স্বপ্নের শিহর অনুভব করতে চাইছে কেন। অনেকে বলেন : মরে গেলে আর কিছু আসে না, আর জন্ম হয় না। আবার কেউ কেউ বলেন : কোনো কিছুরই মৃত্যু নেই। সবাই

ঘুরে-ফিরে আসে, ঘুরে-ফিরে জন্মায়। এর প্রমাণ দিয়ে কারখানার ম্যানেজার কানাইবাবু বলছিল, চল্লিশ হাজার বছর আগেকার ফসিল-হয়ে-যাওয়া পদ্মবীজে আবার গাছ হয়েছে, ফুল ফুটেছে, ঠিক আগেকার মতই রক্তের মত লাল পদ্ম।

অংশুর খুব ইচ্ছে হল সেই পদ্ম-বীজের মত আবার ফুটে উঠতে। লিপিকার দিকে চাইল, সতের বছর আগেকার হালকা ডানার কিশোরী আজ গাম্ভীর্যে পোশাকে যৌবনে গরিমায় সমৃদ্ধ......একটু অতিরিক্ত সমৃদ্ধ। লিপিকার ঐশ্বর্যের স্তূপের পাশে নিজেকে উই-ঢিবির মত [illegible]-সম্বল পলকা পরিত্যক্ত স্থবির মনে [illegible]।

একবার নিভে যাচ্ছে, [illegible]ক্ষণেই জ্বলে উঠছে মনে মনে।

অংশু ভাবল, বলেই [illegible] ফেলা যাক। সতের বছর আগে যে [illegible]প্রাণ যুবককে চিনতে লিপি, যে অবিনশ্বর প্রতিশ্রুতির কদমে লিপিকা বেগবান দেখেছিল গতির অস্থিরতা, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অপরিসীম অট্টহাসির যে দিগন্তবিস্তৃত তরঙ্গে লিপিকার মিষ্টি রিণরিণে হাসি ভীরু সওয়ার হয়ে মিলিয়ে যেত ভবিষ্যত স্বপ্নের দিকে—সেই উচ্চাশা সেই সাহস আজ তোমার সামনে, ভাঙাচোরা ঢিলে গড্ডলিকাগামী।

কিন্তু বলতে পারল না অংশু।

বলল, 'আচ্ছা দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিগ্যেস করি। আপনার নাম কি শ্রীলিপিকা চক্রবর্তী?'

হাতঘড়িতে ঘনঘন সময় দেখছিল লিপিকা। কানের কাছে নিয়ে শুনেছিল, ঘড়িটা চলছে কিনা। ভাবছিল, এখানে থাকা এর পর উচিত হবে কিনা। চারিদিকে চেয়ে দেখছিল, সতের বছর আগে যে ঘর অতি-পরিচিত ছিল, এই ঘরটা সে-ই ঘর কিনা। সন্দেহের ভ্রূ-কুঞ্চন মুখের রেখায় রেখায় ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছিল। অথচ মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা না করে যেতেও তার মন সরছিল না।

অংশুর প্রশ্ন শুনে সংবিত পেল। বোধহয় ভরসাও পেল।

অথচ তির্যক চাউনি ছুঁড়ে তাচ্ছিল্য ছড়িয়ে লিপিকা বলল, 'তুমি কী করে জানলে যে লিপিকা বলে কারুর সঙ্গে মিঃ বিশ্বাসের জানাশোনা ছিল।'

'কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন। বসুন। বলছি।' টিনের চেয়ারটা এগিয়ে দিল আবার। অংশু বলল, 'আপনি বেঘোরে পড়েন নি। আপনি আমাকে না চিনতে পারেন, আপনাকে আমি চিনি। মিঃ বিশ্বাস যে খুবই ভালো লোক। প্রায়ই আপনার কথা বলেন। জানিস কেষ্ট, তোকে যেখানে থাকতে দিয়েছি, সে ঘর আমার ভারি প্রিয়। এই ঘরেই একটি মেয়ে আসত, খুব সুন্দর আর খুব ভালো। অমন উঁচুমন আমি জীবনে আর দেখিনি। আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, সে-ই সুন্দর মনের মালিক আপনি।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।' লিপিকা এবার ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে নড়বড়ে টিনের চেয়ারটিতে বসল।—'আমি তো তোমার দেরি করে দিলাম। খাবে কখন—' উনুনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বরং খেয়ে নাও। আমি বসছি।'

'আপনি কিছু খাবেন না?' মেয়েটি মাথা নেড়ে কী বলতে যাচ্ছিল, থামিয়ে দিল অংশু, 'না—না, আপনাকে দেবার মত ভাতের ব্যবস্থা আমার এখন নেই। আপনার জন্য একটু মিষ্টি আনিয়ে দিচ্ছি।'

'সেই সাত সকালে বেরিয়েছি। নটার সময়। কখন ফিরব ঠি[illegible] না কিছু। খেয়েই বেরিয়েছি। [illegible]-খিদে আর নেই।'

'ডানকুনি থেকে [illegible]ছেন তো। আমি জানি। আপনার বাবা অফিসের স্ট্রাইকে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন। তারপর তো আপনারা সাতের বি থেকে

চলে গেছেন। কোন ফরেস্ট অফিসারের সংগে আপনার বিয়ে হয়েছে, নাগপুরেই থাকতে থাকতে।'

'এত খবর জানো তুমি আমার সম্বন্ধে!' আশ্চর্য হল লিপিকা। খুশী খুশী ভাবটাই বেশী। বলল, 'চাকরি তো ভালোই করতেন—কিন্তু কী যে লোক, কিছুতেই ঘুষ নেবেন না। উপরে ঘুষ নেয়, নিচেও ঘুষ নেয়—তাদের ভীষণ অসুবিধে হচ্ছিল। শেষকালে ওপর-নিচ একজোট হয়ে দিল এ'র চাকরির দফা রফা করে। ডানকুনিতে আবার মাসীর দুয়ারে উঠেছি। কিন্তু পরের দুয়ারে কতদিন আর থাকা যায়। তাই ভাবলাম, দেখি অংশুবাবু কিছু করতে পারেন কিনা। আমার বিয়ে হবার পর থেকেই বাইরে বাইরে ঘুরছি, আত্মীয়দের সংগে যোগা-যোগ আর থাকেনি। কার কাছে যাব, কেই বা করবে আমাদের জন্য! মিঃ বিশ্বাসের কথা মনে পড়ল। হঠাৎ নয়, প্রায়ই মনে পড়ে। পুরনো কথা, বিশেষ করে মধুর সুখের কথা কি কেউ একে-বারে ভুলতে পারে! চলে এলাম মিঃ বিশ্বাসের কাছে। তিনি তো ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলে, কত হেঁজি-পেঁজিকেই তো দেখলাম, আজ কেউ-কেটা হয়ে বসে আছে। অংশুবাবুও নিশ্চয় এতদিনে মস্ত বড়ো হয়ে গেছেন। আসবার সময় অনেক ভেবেছিলাম, বুঝলে। ভেবেছিলাম, বোল-সতের বছর আগের সেই ছোট্ট একটা মেয়েকে মিঃ বিশ্বাসের মত লোকের কি মনে থাকবে?'

'কী বলেন আপনি! মনে থাকবে না মানে। নিশ্চয় মনে থাকবে। মনে আছে। তিনি তো প্রায়ই আপনার কথা বলেন। প্রায় রোজই বলেন। আপনার কথা না উঠলে আমরা ভাবি, আজ উনার মন খারাপ। সেদিন আর ও'কে বিরক্ত করি না। আমার তো মনে হয় না, আপনার এমন দুঃসময়ে অংশুবাবু কিছু করবেন না। দেখুন না মজাটা—' অংশু শুকনো হাসি হাসল, 'উনি অস্থির হয়ে কী রকম নাচানাচি করেন।'

'তুমি এবার খেয়ে নাও। আমি অপেক্ষা করছি। অনেক বেলা হল। দেড়টা বাজে—ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন কিছু আছে? ততক্ষণ পাতা ওল্টাই বসে বসে—' উঠল লিপিকা।

'হে' হে' হে'.........' বোকার মত হাসল অংশু, 'আজ্ঞে ওসব তো এখানে পাবেন না। হ্যাঁ, আপনি বিষ্টি দেখুন, ভাল লাগবে।'

লিপিকা জানলার কাছে গেল। বাইরে অশান্ত প্রকৃতির দিকে চোখ মেলল। দমকা হাওয়া আঁচল ফেলে দিল কাঁধ থেকে। বারবার গুছিয়ে রাখল আঁচলটা কাঁধের উপর, বারবার পড়ে গেল। শেষে বৃষ্টি দেখতে দেখতে গুছিয়ে রাখতে ভুলে গেল। অংশুকে লজ্জা করবার সভ্যতাটুকুও মনে থাকল না।

অংশু কখন বাইরে বেরিয়ে গেছে, কখন হাতে ঠোঙা নিয়ে ফিরে এসেছে, দেয়াল-আলমারী থেকে ঝকঝকে কাঁসার বাসন বার করেছে, তাতে সাজিয়ে দিয়েছে মিষ্টি, এগিয়ে দিয়েছে এক গ্লাস টলটলে জল, লিপিকার কোনো খেয়াল নেই। আঁচল মেঝেতে লুটোচ্ছে, জলে ভিজে এক সা।

'নিন' পূজারী-বামুনের মত গদগদ ভঙ্গিতে অংশু বলল।

'এ কি, এ সব করতে গেলে কেন। তুমিও দেখছি মিঃ বিশ্বাসের মত। কাজেও মিল আছে, চেহারাতেও দারুণ মিল। তোমাকে দেখে মনে মনে চমকে উঠেছিলাম। কী বোকা আমি দেখেছ—' আর কথা বলতে পারল না, খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসি যেন থামতেই চায় না।

অংশুও বেশ মাতব্বরী হাসি হাসছে। চোখের গভীরে ত্রাসটাকে চাপা দেবার জন্যেই সেও লিপিকার সংগে সমানে হো হো করে হেসে চলেছে।

লিপিকা চোখ-মুখ লাল করে হাসি থামিয়ে বলল, 'আরশির ওপর ওই ফটোটা.....'

অংশুর বুকে যেন দুরমুশ পিটছে।

'ওই ফটোটার সংগে মনে মন তোমাকে মিলিয়েছি। অথচ তোমার সংগে মিঃ বিশ্বাসের কোনো সাদৃশ্য নেই। না, নেই। কেন এমন বিদঘুটে জিনিস মনে হয়, কে জানে।' লিপিকা অতল অতীতে কোথাও দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, সেই মধুর মুহূর্তগুলি তুলে ধরে আনবার জন্য। পারছে না। আমোদে হাসছে প্রথম দিকটায়। শেষে না-পারার ক্লান্তিতে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। লিপিকা বলল, 'যখুনি আসতাম কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়তেন না। বিশেষ করে টক। মিঃ বিশ্বাস কিন্তু কখনো টক খেতে ভালো-বাসতেন না। ভালোবাসতেন মিষ্টি। আমার জন্যে টক থাকতই। সে কাঁচা আমের সংগে নুন-ঝাল—ওঃ সে যে কী জিনিস ছিল—'

'তা-ও শুনেছি। আপনার কথা এত শুনেছি যে দেখেই চিনতে পেরেছি।'

'হয়। আকচারই হয়।'

'আপনি মিষ্টিমুখ করুন, আমি ওই চায়ের দোকানটা একবার দেখে আসি। ওখানে উনি প্রায়ই গল্প জমান।'

'না না, তুমি এবার খাও। খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও। সে আবার কেমন কথা, আমি খাচ্ছি তিনবার, তুমি এখনো এক-বারও খেলে না—যাও, খেয়ে নাও।' মৃদু বকুনি দিল লিপিকা।

(আগামীবারে সমাপ্য)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ
২য় খণ্ড

২৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ নয়া পয়সা

শুক্রবার, ৭ই কার্তিক, ১৩৭০
Friday, 25th October, 1963. 40 Naya Paise.

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সাপ্তাহিকী

।। রাজ্যের চাউল পরিস্থিতি ।।

অক্টোবরের (১৯৬৩) সূচনা থেকেই কলকাতাসমেত পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র চাউল অতিমাত্র দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে চাউলের মণ ৫০ টাকা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায়। হাহাকার ও দারুণ খাদ্য-সঙ্কটের সংবাদ পাওয়া যেতে থাকে চারিদিক থেকেই। অবস্থার প্রতিকারের জন্য জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন শেষ অবধি সরকারেরও বিশেষ উদ্বেগ ও তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

কলকাতায় পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে ওঠে, যার জন্যে খাদ্য-সঙ্কট নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন মন্ত্রিসভার ঘন ঘন বৈঠক করেন। সরকারী নির্দেশে পুলিশ অসাধু চাউল ব্যবসায়ী, মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় ১৪ই অক্টোবর থেকে। ১৫ই অক্টোবর নাগাদ বিক্ষুব্ধ জনগণও ইতস্ততঃ অভিযানে নেমে আসেন। ন্যায্যমূল্যের চাউলের দাবীতে দোকানে দোকানে প্রচণ্ড ভিড় জমে যায়—অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীরা জনতার দাবী মেনে নিয়ে চাউল বন্টনে বাধ্য হন। জরুরী বার্তা পেয়ে প্রথমে দিল্লী থেকে ছুটে আসেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীচণ্ডী ব্যানার্জি। তারপর খাদ্য বিভাগের (কেন্দ্র) শ্রীএ এম টমাস ও বিভাগীয় সেক্রেটারী শ্রীভি শংকরও কলকাতায় উপস্থিত হন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের পরপর দীর্ঘস্থায়ী বৈঠক হয়ে চলে। শেষপর্যন্ত ১৬ই অক্টোবর ঘোষিত হয়—পশ্চিমবঙ্গের চাউল ব্যবসায়ীগণ (পাইকার ও আড়ৎদারেরা) রাজ্যসরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, সরু চাউল ৩৫ টাকা ও মোটা চাউল ৩২ টাকা মণ দরে (খুচরা) বিক্রয়ে তারা প্রস্তুত। অপর দিকে একই সময়ে কেন্দ্রের তরফ থেকেও এই আশ্বাস মেলে : আপাতত নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের চাউল চাহিদা কেন্দ্রীয় সরকার মিটিয়ে যাবেন।

।। পাক-চীন সমরসজ্জা ।।

নয়াদিল্লী ও শিলংয়ের ১৩ই অক্টোবরের সংবাদ : সিকিম সংলগ্ন তিব্বতের চুম্বি উপত্যকায় চীনারা পুনরায় সমরসজ্জা আরম্ভ করেছে। চীনাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির এই সংবাদ কেন্দ্রীয় সরকারও সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে আসাম-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তেও পাক বাহিনীর ব্যাপক তৎপরতা চলেছে বেশ কিছুকাল ধরেই। সীমান্তবর্তী লাটিটিলা-ডুমাবাড়ি অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যসমাবেশে আসাম সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। আগরতলার এক সংবাদ অনুসারে পাক বিমান ইতিমধ্যে আবারও বেলোনিয়া মহকুমায় ভারতের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করেছে।

ওদিকে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত চীন-পাকিস্তান আঁতাতের নিন্দা করেছেন। তাঁর কণ্ঠে স্পষ্টই ধ্বনিত হয় : এইরূপ ষড়যন্ত্রমূলক মৈত্রীর আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য রয়েছে—এই ব্যবস্থা বিশ্বশান্তিরও পরিপন্থী। (রাষ্ট্রসংঘ : ১১ই অক্টোবর)।

।। উঃ প্রদেশ মন্ত্রিসভা ।।

শেষ অবধি উত্তর প্রদেশে মন্ত্রিত্ব সংকটের অবসান হয়েছে—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী ১৬ জন পূর্ণমন্ত্রী ও পাঁচজন উপমন্ত্রী (মোট ২১ জন) নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। দিল্লী থেকে ১১ই অক্টোবরই ঘোষিত হয়—সেখানকার ঊর্ধ্বতন বৈঠকে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস পরিষদীয় দলের ত্রিপাঠি গোষ্ঠীর (বিরোধী) সঙ্গে শ্রীমতী কৃপালনীর একটা বোঝাপড়া হয়েছে। ঐ বোঝাপড়া অনুসারেই নবগঠিত মন্ত্রিসভায় পাঁচজন পূর্ণমন্ত্রী ও দুইজন উপমন্ত্রী রয়েছেন শ্রীত্রিপাঠির উপদলভুক্ত। লক্ষ্ণৌয়ে মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে ১৪ই অক্টোবর।

।। কাশ্মীরের নয়া সরকার ।।

'কামরাজ পরিকল্পনা' অনুসারে বক্সী গোলাম মহম্মদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর (মুখ্যমন্ত্রী) পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে যে আসনটি শূন্য হয়, তা পূরণ করেছেন তাঁরই আমলের রাজস্বমন্ত্রী খাজা সামসুদ্দীন। গত ১০ই অক্টোবর তিনি শ্রীনগরে জাতীয় সম্মেলনের আইনসভা দলের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে দলীয় নেতা নির্বাচিত হন। নতুন সরকার গঠন করেছেন তিনি এগারোজন মন্ত্রী নিয়ে। গত ১২ই অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ শ্রীকরণ সিং এই মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ করান।

।। আবশ্যিক সামরিক শিক্ষা ।।

পাঞ্জাবে কংগ্রেসকর্মীদের জন্য একটি নতুন কর্মসূচী প্রবর্তিত হতে চলেছে—আবশ্যিক সামরিক শিক্ষা। গত ১৩ই অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কাইরণ ঘোষণা করেছেন : পাঞ্জাব রাজ্যে ১৮ বছর বয়স থেকে ৬০ বছর বয়স অবধি সকল কংগ্রেস সদস্যকেই (সক্রিয় ও প্রাথমিক) বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষা নিতে হবে। সর্দার কাইরণ একথাও ঘোষণা করতে ছাড়েননি যে নিজের বয়স যদিও ৬৩ তবু তিনি সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করবেন।

।। দিল্লী-পিকিং সম্পর্ক ।।

ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে চীনা সরকার কলম্বো প্রস্তাবকে এখনও পুরো মেনে নেননি। কিন্তু ইতিমধ্যে পিকিং-এর ১৩ই অক্টোবরের এক সংবাদ অনুসারে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই বলেছেন বিরোধ আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর পক্ষে পিকিং আগমন সম্ভব না হলে তিনি নিজেই নয়াদিল্লী যেতে প্রস্তুত। এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগও করা হয়েছে। দিল্লী থেকে গত ১৬ই অক্টোবর স্পষ্ট ঘোষিত হয়েছে—বিনাসর্তে কলম্বো প্রস্তাব মেনে লওয়ার ভিত্তিতেই পিকিং সরকারের সহিত ভারতের আলোচনা সম্ভবপর।

ওদিকে কায়রো থেকে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের ও সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক (সফরকারী) এক যৌথ ঘোষণায় বলেছেন : চীন ও ভারতের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সম্পর্ক রয়েছে, তা দূর করার উদ্দেশ্যে কলম্বো শক্তিবর্গের আরও চেষ্টা করে যাওয়া উচিত।

।। ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবন ।।

নিউইয়র্ক থেকে ৭ই অক্টোবর প্রাপ্ত সংবাদ : তিনদিনব্যাপী প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ৪০ লক্ষ অধিবাসীসমন্বিত হাইতি দ্বীপের প্রায় চার হাজার নরনারী নিহত হয়েছে। তাছাড়া গৃহহারা হয়েছে সেখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ। হাইতির প্রেসিডেন্ট মিঃ দুভেলিয়র একে একটি 'জাতীয় বিপর্যয়' বলে অভিহিত করেছেন। কিউবা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড়ে কিউবারও সহস্রাধিক ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটেছে। একই সময় নাগাদ কাছাকাছি ত্রিপুরা ও পূর্ব পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয় এবং তাতেও প্রাণহানিসহ ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে যথেষ্ট।

এরপরই রোমের ১০ই অক্টোবরের এক সংবাদে জানা যায়, ইটালির একটি স্থলে বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় প্রলয় প্লাবন হয়। এবং তার পরিণতিতে একটি শহর বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং কয়েক হাজার লোকের প্রাণনাশ হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হয়।

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি মিশরের রাজধানী কাইরোতে তত্রস্থ পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত এস কে দেহ্‌লাভি এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছেন। ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, ভারতের ক্ষতিকারক কাজে সহযোগ ও সমর্থনদান এবং সাক্ষাৎভাবে ভারতের অনিষ্টসাধন এতো পাকিস্তানি রাষ্ট্রনীতির প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং সেই কারণে ভারতের অপবাদ প্রচার ও ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার—ইহাও পাকিস্তানি শাসনতন্ত্রের উচ্চ অধিকারিবর্গের প্রধান পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সভা-সমিতিতে, বেতারভাষণে, সাংবাদিক বৈঠকে মন্তব্যদানে, আয়ুব খাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই এই ভারত-বিরোধী অপপ্রচার ও সময়ে ও অসময়ে বিষোদ্গার করিয়া থাকেন। অবশ্য যখন পণ্ডিত নেহরুর কাছ হইতে কিছু আদায় করা প্রয়োজন হয় তখন কথাবার্তার ধরণ সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়। তখন বুঝিতেই পারা যায় না যে যে কণ্ঠে ঐরূপ সুমিষ্ট স্বর বাহির হয়, যে মুখ হইতে ঐরূপ মধুমাখা বচন বাহির হয় সেই কণ্ঠ ও সেই মুখ হইতে অন্যসময়ে দিনের পর দিন মাসের পর মাস, কিরূপে সেরূপ কর্কশ শব্দের সহিত বিষাক্ত মিথ্যাভাষণ ও অপপ্রচারের নির্গম সম্ভব হয়। সুতরাং পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের ঐরূপ বিষোদ্গার কিছু আশ্চর্য ঘটনা নহে, নূতন কিছু তো নহেই।

তবে কাইরোর সাংবাদিক বৈঠকে এই পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত যেভাবে অপবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রদূতদিগের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা এবং ভিন্ন দেশীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিষয়জনিত মন্তব্যপ্রদানের বাঁধাধরা শিষ্টাচারের নিয়ম আছে। এই রাষ্ট্রদূত পুঙ্গব বেসামাল হইয়া তাঁহার কথাবার্তায় সে সকল শিষ্টাচার ও ভব্যতার নিয়মকানুন ভাঙ্গিয়া নিজের পাকিস্তানি স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন।

কাইরোতে আমাদের রাষ্ট্রদূত ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দেহ্‌লাভির এইরূপ অসংযত ও অসমীচীন আক্রমণের প্রতিবাদে মিশরীয় পররাষ্ট্র দপ্তরে বিশেষ জোরের সহিত আপত্তি জানাইয়াছেন।

দেহ্‌লাভির ভাষা ও মাত্রাজ্ঞান দুইয়ের বিরুদ্ধেই আপত্তি জানানো হইয়াছে। মিশরের পররাষ্ট্র দপ্তর ইহার পূর্বেই এক নির্দেশে সকল বিদেশী রাষ্ট্রদূতদিগকে জানাইয়াছিলেন যে মিশরের সহিত যাহার মৈত্রী বা বন্ধুত্বের যোগ আছে এরূপ কোনও দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার মিশর সরকার (সংযুক্ত আরব গণতন্ত্র) নিষেধ করিতেছেন। ইহা জানা সত্ত্বেও পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত ঐরূপে অপপ্রচার করিয়াছেন—এবং তাহাও ইতর ভাষায়।

মিথ্যাকথা ও ইতরভাষার ব্যবহার ইহা একশ্রেণীর লোকের স্বভাবগত দোষ। ঐ শ্রেণীর লোক সম্প্রতি পাকিস্তানে উচ্চ অধিকারির পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। যে কারণে দেহ্‌লাভির ঐরূপ আক্রোশের স্ফুরণ কিছু আশ্চর্য নয়। তবে সম্প্রতি পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর সম্পর্কিত আপোষের প্রস্তাব ফিরাইয়া লইয়াছেন। কেননা আপোষ লইয়া বৈঠকে পাকিস্তানি দল যতদূর সম্ভব অভদ্র ও অসংযত ব্যবহার করে এবং তাহাদের আপোষ মানে যে সর্বগ্রাস সেকথা বুঝাইতে কসুর করে নাই। তারপর অন্য কথাবার্তায়ও পণ্ডিত নেহরু বুঝিতে দিয়াছেন যে যেহেতু পাকিস্তান ভারতের ক্রূর ও বিশ্বাসঘাতক শত্রু লালচীনের সঙ্গে মালাবদল করিয়া লুটের অংশে ভাগ বসাইতে চেষ্টিত অতএব পাকিস্তানও আর বিশ্বাসের পাত্র নয়।

পাকিস্তান প্রথমে ব্রিটেনের দৌলতে তো জন্মলাভ করিল। যে কয়জন স্বাধীনতাপ্রিয় পাকিস্তানি যোদ্ধা ভারতের স্বাতন্ত্র্যলাভের সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা হয় এখন মৃত নয় পাকিস্তানের জেলে আবদ্ধ। শুধুমাত্র মৃতপ্রায় খান আব্দুল গফর খান জেলের বাহিরে নজরবন্দী। ব্রিটেনের "রেক্ত" শেষ হইতে তাহাকে ছাড়িয়া পাকিস্তান মার্কিনদের গলে মাল্যদান করে। এখন তো মার্কিন হইতেছে "দুয়োরাণী" ও লালচীন "সুয়োরাণী"; সুতরাং ভদ্রতার প্রয়োজন কি ?

নানা বিপত্তির মধ্যেও অবশেষে পুজো এসে পড়ল। প্রথম দিকে জামা-কাপড়-জুতোর দোকানে যেরকম ভিড় জমে উঠেছিল, শেষের দিকে চালের ধকলে সেটা পাতলা হ'য়ে এলেও, কেনাকাটা যে একেবারে কম হ'য়েছে তা বলা যায় না। আমাদের মনোবল সত্যিই অসাধারণ।

এই মনোবলের আরো একটা দৃষ্টান্ত পেলাম স্টেটবাস কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে। পুজোর সময় তাঁরা বাস চলাচলের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছেন, বাসের সংখ্যাও বাড়িয়েছেন। কিছুকাল আগে শোনা গিয়েছিল, মেরামতের অভাবে ১০৮ খানি বাস নাকি অকেজো হ'য়ে পড়ে আছে সরকারী গ্যারেজে। সেই অচল বাসগুলির মধ্যে ৩০টি বাসকে মেরামত ক'রে পুজোর সময় রাস্তায় নামানো হবে স্থির হ'য়েছে।

বাস্ পেলেই বাস্!

এই পর্যন্ত পড়ে যাঁরা মুখ টিপে হাসছেন তাঁদের বক্তব্য আমি জানি। যে-সব বাস এতদিন ধরে অচল হ'য়ে পড়ে আছে, সেগুলি রাস্তায় ছাড়লে তাতে যাতায়াতের সুবিধে কি অসুবিধে হবে, এইটেই বোধকরি তাঁদের কৌতুক-বোধের নিহিত কারণ। কিন্তু এ সম্ভাবনার বিষয়ে বাস-কর্তৃপক্ষও যে কম সচেতন তা নয়। জনসাধারণকে সেবা করাই তাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, এবং সেইজন্যেই তাঁরা অচল বাসকে সচল করে রাস্তায় নামিয়েছেন, কিন্তু তাই ব'লে বাস্তব পরিস্থিতির বিষয়ে তাঁরা অচেতন এ অভিযোগ চলবে না। বাড়তি বাস রাস্তায় নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন—

রাস্তায় অচল বাসগুলি যাতে যান-বাহন চলাচলে বিঘ্ন না ঘটায় সেইজন্য অবিলম্বে সেগুলিকে গ্যারেজে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন স্টেটবাস কর্তৃপক্ষ। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ব্রেকডাউন স্কোয়াড প্রস্তুত থাকবে সর্বদা।

তবেই বুঝুন, কর্তৃপক্ষ কতোদূর বাস্তব-সচেতন! এখন বাকী ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমাদের হাতে। বাসে চেপে যেহেতু আমরা কোনো একটা বিশেষ গন্তব্যে পৌঁছাতে চাই, গ্যারেজে যেতে চাইনে, সেইজন্যে আমাদের উচিত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা, ব্রেকডাউন বাসগুলিকে গ্যারেজে ফিরিয়ে না নিয়ে, শুধু তার ইঞ্জিনটিকে যেন মেরামতের জন্যে গ্যারেজে পাঠানো হয়, এবং বাকী গাড়িটাকে ক্রেণলাগানো ব্রেকডাউন ভ্যানের সাহায্যে চালু রাখা হয় নিজস্ব রুটে।

এভাবে চললে বাস পেতে যে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না তা বলাই বাহুল্য। প্রচুর সংখ্যায় ব্রেকডাউন ভ্যানের ব্যবস্থা করতে পারলে শুধু ৩০টি কেন, গ্যারেজে অচল ১০৮ খানি বাসই অকুতোভয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারা যাবে।

•

• •

সম্প্রতি একখানি 'খোলাচিঠি' পেয়েছি। বজবজ থেকে শ্রীবিজয় গুপ্ত জৈমিনিকে লিখেছেন—

কিছুদিন আগে আপনার 'পূর্বপক্ষে' আধুনিক গল্প ও কবিতার বেশ একটি অম্লমধুর সমালোচনা পড়েছিলাম: তদবধি 'পরপক্ষে' তার পুনরাবির্ভাবের বাসনায় উদগ্রীব ছিলাম। কলকাত্তিয়া রক-ফেলার ভঙ্গিতে বলি, 'বেড়ে লেগেছিল লেখাটি।'

আধুনিক গল্প-কবিতা

কিন্তু অধৈর্য হয়ে বর্তমানে বলতে হচ্ছে, 'মশায় বড় বে-রসিক।'

আশাকরি, আর একবার আসরে নেমে বর্তমানে আধুনিক গল্প-কবিতার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার টিকি ধরে টান দেবেন। তবু তাতে যদি আমাদের' কিছুটা ক্ষোভ মেটে।......

এই চিঠির বক্তব্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল। পত্রলেখক আধুনিক গল্প-কবিতার খর রা এতটাই উৎপীড়িত যে অন্য কেউ 'তার টিকি ধরে টান' দিলেও তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হবেন। আমি কতদূর তাঁর কাজে লাগব জানিনে, কিন্তু সংক্ষেপে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি।

'পূর্বপক্ষ' পর্যায়ে একবার আধুনিক গল্প-কবিতা নিয়ে আলোচনা করার সময় লেখকগণের অপটুতা এবং চালিয়াতির বিষয়ে বলেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, দোষ কেবল নতুন লেখকদের নয়, আমাদের, অর্থাৎ পাঠকদেরও। পাঠক বলতে সাধারণ অসাধারণ সমস্ত পাঠকই বোঝায়। অসাধারণ পাঠকের চেয়ে সাধারণ পাঠকের সংখ্যা যে অনেক বেশি তাও খুবই স্পষ্ট। এই বিপুল সংখ্যক সাধারণ পাঠকের গল্প-ক্ষুধা মেটানোর জন্যে যে পরিমাণ গল্প-উপন্যাস লেখা হয় বাংলাদেশে (এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই) তা 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা'

বর্জিত, অনাধুনিক এবং নিষ্প্রাণ। পুনরুক্তিপ্রবণ এই সদর-সাহিত্যের প্রতিবাদেই সব দেশে অভিমানী তরুণ লেখকগণ একটা অন্দর-সাহিত্যের পথ খ'ুজতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কালক্রমে তা হ'য়ে দাঁড়ায় খিড়কির সাহিত্য।

কাজেই আধুনিক গল্প-কবিতার লেখককে দোষ দিতে এখন আমার একটু বাধে। তাঁরা যা লিখছেন, সমস্ত পৃথিবীতেই এখন তা সমালোচনার বিষয়। কিন্তু তাঁদের অভিমানের যে কোনো সংগত কারণ নেই তাই বা বলি কী ক'রে? এলিয়ট একবার বলেছিলেন, প্রত্যেক যুগেই তার পাওনা সাহিত্য পায়, কথাটা খুবই ভেবে দেখার মতো। তিনি আরো বলেছিলেন, কোনো বিশেষ লেখক ব্যর্থ কী বুজরুক তা হয়তো প্রমাণ করা যায়, কিন্তু কোনো একটা বিশেষ সময়ের সমস্ত লেখকই ধাপ্পা দি'চ্ছ বলাটা ঠিক সাহিত্য-সমালোচনার আওতায় পড়ে না।

তবে এটাও ঠিক যে, যা চলছে তাকেই ধ্রুব বলে মেনে নেওয়াটা মানুষের স্বধর্ম নয়। জীবনের অভিব্যক্তিই হল পরিবর্তন। কাজেই 'আধুনিক' সাহিত্য'কেও শেষ কথা মনে করার কারণ নেই। আধুনিকোত্তর সাহিত্যও অনতিবিলম্বে দেখা দিতে বাধ্য।

একেবারে অতি-সম্প্রতি লিখছেন এমন কয়েকজন শক্তিমান তরুণের গল্প-কবিতায় ইতিমধ্যেই কিছুটা মোড় ফেরার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ'দের মধ্যে যাঁরা উৎরে যাবেন, তাঁরা হয়তো শুধু নতুনত্ব বা রীতিচর্চার জন্যেই সাহিত্য-রচনা করবেন না।

•
• •

রবীন্দ্রনাথ বাসরঘরের উদ্দেশ্যে লিখেছেন,

হে বাসর ঘর
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন
তুমিও অমর।

পরশুরামের নায়িকা বুচু' বলেছিল, 'যাঃ!'

প্রেম নিয়ে মানুষের এই চিরন্তন মাধুর্য শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানের পরুষস্পর্শে উধাও হবে বলে যাঁরা আশঙ্কা করেন, তাঁদের কাছে নিবেদন করি—সোভিয়েট নভশ্চারিণীও বিবাহের প্রশ্নে বুচু'র মতোই 'যাঃ' বলে মৃদুহাস্যে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

শ্রীমতী তেরেস্কোভা অন্য একজন রুশ নভশ্চরকে বিবাহ করবেন কিনা তা আমার জানা নেই। কিন্তু এই একটা জিনিস আবিষ্কার করে আমি খুবই আশ্বস্ত হলাম যে,

প্রেম এবং বিজ্ঞান

মহাকাশে যতোরকম মহাজাগতিক রশ্মি বিকীরিত হয় তার চেয়েও মানুষের হৃদয়াবেগ অনেক বেশি শক্তিশালী। নাহলে শ্রীমতী তেরেস্কোভা বিবাহের প্রশ্নে হাসতে পারতেন না। অলমিতি!

জনৈক অনারেবেল
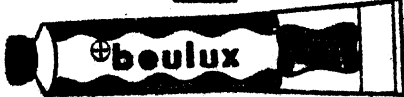
দিল্লী থেকে বলছি

নিমাই ভট্টাচার্য

ডিফেন্স মিনিস্ট্রি, ফিনান্স মিনিস্ট্রি, প্ল্যানিং কমিশন ও আরো গোটাকতক ছোট-বড় অফিস ঘুরেও একটা খবর পেলাম না। শেষে ক্লান্ত হয়ে এলাম অল ইন্ডিয়া রেডিও'র ক্যান্টিনে সুন্দরী সান্নিধ্যে সস্তায় গোটাকতক ভেজিটেবল চপ গলাধঃকরণের জন্য। ভাঙা প্লেটে নোংরা চামচ দিয়ে বাজারের সব চাইতে সস্তার আলু-বিট-গাজরের চপ খেতে খেতে ভাবছি, অতঃ কিম্? ব্রীফ-লেস ব্যারিষ্টার অথবা পসারহীন ডাক্তার ছাড়া সংবাদহীন সাংবাদিকের মনঃকষ্ট উপলব্ধি করা মুস্কিল। অবশ্য অন্যের ক্ষেত্রে সত্য না হলেও সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে একথা সত্য যে, হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে। তাই ভাবছিলাম, রাজধানীর পলিটিক্যাল অবজার্ভার বা সোর্স ক্লোজ টু ডিপ্লোম্যাটিক কোর-এর নামে বড় বড় কাগজের বড় বড় সাংবাদিকদের ধরণে কিছু সংবাদ ম্যানুফ্যাকচার করা যায় কিনা। ব্রেনের মধ্যে বিদ্যুৎতরঙ্গের গতিতে চিন্তার স্রোত দৌড়োদৌড়ি করছে, এক চামচ পচা আলু-বিট-গাজর মুখে পুরে বসে আছি, ঠিক এমন সময় আমার টেবিলের উপর একটা নোংরা চামড়ার ব্যাগ রেখে হাসতে হাসতে পরমেশ্বর পাশের চেয়ারে বসল।

'তারপর কি খবর? বহুদিন পর দেখা, তাই না?'

নিজেকেই দেখতে পাই না, আর আপনাদের দেখাই কখন?' হাসতে হাসতেই পরমেশ্বর আক্ষেপ করে। 'এমন মানুষের পাল্লায়ও আবার পড়ে! জানটা শেষ করে দিল একেবারে।'

পরমেশ্বরের মনঃকষ্টের কারণটা যে জানি না, তা নয়; তবুও বল্লাম, জননেতার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করছেন, এম-পি'র বাংলোয় বাস করছেন, আবার কি চাই জীবনে?

বেয়ারা এসে একটা পোড়া পোড়া মসলা দোসা ও ষ্টেনলেস ষ্টীলের পাত্রে কফি দিয়ে গেল। এক টুকরো মসলা দোসা ও এক চামচ সম্বর খেতে খেতে পরমেশ্বর বল্লো, কোশ্চেন কোশ্চেন করে মাথা খেয়ে ফেল্লো একেবারে। তারপর চাইছেন মোশান, রেজোলিউশন ইত্যাদি ইত্যাদি।

নার্ভাস না হতে উপদেশ দিয়ে পরমেশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

......উত্তর-পূর্ব ভারতের চায়ের বাগানের মালিক থেকেও কংগ্রেসের নেতা হলেন পরমেশ্বরের 'বস'। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে একলাফে এলেন পার্লামেন্টে। আশু মুখুজ্যে যেকালে চাষীমজুরকেও গ্রাজুয়েট করবেন বলে কলকাতা ইউনিভার্সিটি হাতের মুঠোয় রেখেছিলেন, সেকালেও ইনি এনট্রান্স'এর চৌকাঠ পার হয়ে আর এগুতে পারেননি। ধোপ-দুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি গান্ধী ক্যাপ ও হাতে একটা চমৎকার ব্রীফকেশ নিয়ে পার্লামেন্ট আসা আরম্ভ করলেন; কিন্তু কদিনের মধ্যেই উপলব্ধি করলেন নিজের ক্ষমতার দৌড়। নগদ বারো টাকা খরচা করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, ওয়ানটেড এ স্মার্ট ওয়েল এডুকেটেড পার্ট টাইম প্রাইভেট সেক্রেটারী ফর এ ওয়েলনোন এম-পি.........ফ্রি ফার্নিসড্ এ্যাকোমোডেশন এ্যান্ড রেমুনারেশন এ্যাকর্ডিং টু কোয়ালিফিকেশন। জন তিরিশেক ইন্টারভিউ দিয়ে পাশ করল রাজাগোপালন। সাউথ এভিনিউ'র এম-পি'র কোয়ার্টারের তিনতলার বর্ষাতিতে রাজাগোপালন বেশী দিন সুখভোগ করতে পারল না। মাস তিনেকের মধ্যে অনারেবল মেম্বার উপলব্ধি করলেন, পার্লামেন্টের সব গুরুদায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে হলে পার্ট টাইম সেক্রেটারী দিয়ে কাজ হবে না। তারপর এলো দুবে, এলো চৌবে, সনাতন ও আরো কয়েকজন। কিন্তু কেউই ধোপে টিকল না। তারপর এলো স্বয়ং পরমেশ্বর! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন অনারেবল মেম্বার।

সাদা ধবধবে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি গান্ধী টুপি চাপিয়ে হাতে ব্রীফকেশ নিয়ে পরমেশ্বরের বস্ পার্লামেন্টে যান, কোশ্চেন করেন, সাপ্লিমেন্টারী জিজ্ঞাসা করেন, জরুরী সরকারী সংস্থার বার্ষিক বিবরণীর উপর মোশান আনেন, আনেন নানা রেজোলিউশন, করেন বক্তৃতা। মিনিস্টার, ডেপুটি মিনিস্টারের দল হাউস থেকে বেরুবার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে যান আমাদের অনারেবল মেম্বারকে। প্রেস গ্যালারীতে বসে বসে বা সেন্ট্রাল হলের আড্ডাখানায় এমন দৃশ্য আমার নজরে পড়ে আর হাসি পায়।

পরমেশ্বর কোনমতে এক কাপ চা প্লেটে ঢেলে খেয়ে নিয়ে সকাল ছ'টায় অফিস চালু করে। সর্বাগ্রে মর্নিং পেপার দেখে সর্ট নোটিশ কোশ্চেন তৈরী ও নির্ধারিত প্রশ্নের সাপ্লিমেন্টারী ঠিক করতে হয়। সাহেবের সইকরা পার্লামেন্টের সবরকম ফর্মই পরমেশ্বরের টেবিলের এক পাশে থাকে। এইসব ফর্মে পরমেশ্বর সাহেবের জন্য কোশ্চেন রেজোলিউশন, মোশান অফ ডিসকাশন ইত্যাদি ইত্যাদি তৈরী করে দৌড়াবে পার্লামেন্টের নোটিশ অফিসে জমা দেবার জন্য। তারপর ফেরার পথে নিয়ে আসবে সাহেবের পার্লামেন্টারী কাগজপত্র ডিস্ট্রিবিউশন কাউন্টার থেকে; হাজার হলেও বিত্তশালী এম-পি কিনা, তাই আলতু-ফালতু কাগজপত্রের বান্ডিল নিয়ে পার্লামেন্ট হাউস থেকে বেরুতে সাহেবের লজ্জা হয়! বাড়ী ফিরেই ডাকের চিঠিপত্র খুলে দেখে পরীক্ষা করে প্রয়োজনে টুকটাক নোট দিয়ে সাহেবের টেবিলে রেখে দেয় পরমেশ্বর। পার্লামেন্ট ও সরকারী কাগজপত্রের জন্য প্রায় শ'খানেক ফাইল রয়েছে; এই ফাইলগুলির নিত্য-আহার্য পরমেশ্বরকে পরিবেশন করতে হয়। পার্লামেন্টের ডিবেট বা কোন মিনিষ্ট্রির আনুয়াল রিপোর্ট এলে কালবিলম্ব না করে ছুটতে হবে বাইন্ডারের কাছে। ডিবেটের মধ্যে সাহেবের বক্তৃতা না থাকলেও কপিগুলিকে চমৎকারভাবে চামড়ার বাঁধাই করে পরমেশ্বরকে সাজিয়ে রাখতে হয় সাহেবের ড্রইং রুমে।

পরমেশ্বরের এইসব নিত্যকর্ম পদ্ধতি শেষ করতে না করতেই সাহেব লাঞ্চে আসেন। লাঞ্চ শেষ করেই হাঁক পড়ে, পরমেশ! কাম হিয়ার। আজ কতকগুলো জরুরী চিঠি লেখার আছে জনকতক মিনিস্টারের কাছে। ....নিজের নির্বাচন এলাকা থেকে বহু চিঠি আসে। সে সব সম্পর্কে চিঠি লেখেন মিনিস্টারদের এবং সেই সব চিঠির চার কপি করে পরমেশ্বরকে টাইপ করতে হয়ঃ অরিজিন্যাল যাবে মিনিস্টারদের

কাছে, সেকেন্ড কপি যাবে সাহেবের ছেলের কাছে কলকাতায়, তৃতীয় কপি যাবে হেড অফিস অর্থাৎ চা বাগানের ম্যানেজারবাবুর কাছে 'উইথ দি ইন্সট্রাকশন টু ইনফর্ম দি পার্টি কনসার্নড়' এবং চতুর্থ কপি 'ফর দিল্লী অফিস'। নিদেন পক্ষে কুড়ি-পঁচিশটা এই ধরণের চিঠি পরমেশ্বরকে নিত্য বেলা দুটো থেকে চারটার মধ্যে টাইপ করে জি-পি-ও'তে গিয়ে পোস্ট করে আসতে হয়। হ্যাঁ, এর আবার ডেসপ্যাচ রেজিস্টার, স্ট্যাম্প এ্যাকাউন্ট তো আছেই।

পরমেশ্বরের সাহেব চা বাগানের বড়-কর্তা কিনা, তাই সখ অনেক। কোন সেন্ট্রাল মিনিস্টার নিজের এলাকায় গেলে তাঁকে নিজ গৃহে রেখে খাইয়ে-দাইয়ে নিজের ভাইঝিকে দিয়ে অন্ততঃ একটা সোলো ডান্স না দেখিয়ে তৃপ্তি পান না। এই ধরণের নিমন্ত্রণপত্র সাহেব নিজেই ড্রাফট করেন। পরমেশ্বরের স্ট্যাটিস্টিকস অনুযায়ী তার সাহেবের প্রতি ড্রাফটে গড়ে দশ থেকে বারোটা ভুল থাকে; কিন্তু সে ভুল সংশোধনের অধিকার কোন লোকের নেই। দু'একবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখিয়ে দিতে গেলে সাহেব বলেছেন, জান হে পরমেশ, আমার গার্ডেনগুলির সমস্ত করসপনডেন্স আমি নিজে করি; দ'দে ম্যানেজার ও জাঁদরেল বড়বাবু আজ পর্যন্ত একটা 'কমা' 'সেমি-কোলন' বসাতে পারেনি।

মোসাহেবীর হাসি হেসে পরমেশ উত্তর দেয় আজ্ঞে স্যার টি-গার্ডেনের ইংরেজি শিখলে কি আর আমার কোন দুঃখ থাকত? ওদের স্যার স্ট্যান্ডার্ড'ই আলাদা......আমরা স্যার এম-এ ক্লাসে যে ইংরেজি শিখেছি, আগে সেসব ইংরেজি এনট্রান্সে.........

আর এগুতে হয় না পরমেশ্বরকে। আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে সাহেব বলেন, দ্যাটস্ রাইট পরমেশ।.........

সাহেবের ইংরেজি জ্ঞান সম্পর্কে পরমেশ্বর অনেক কাহিনী বলেছে।

বছর তিন-চার আগে এক সেন্ট্রাল মিনিস্টার সাহেবের এরিয়ায় যাবেন বলে খবর পেতেই সাহেব যথারীতি একটা ইনভিটেশন লেটার ড্রাফট করলেন। অর্ডার হলো টাইপ ইট ইমিডিয়েটলি।

মেম্বার অফ দি হাউস অফ দি পিপল্‌ লেখা সত্যমেব জয়তে মার্কা প্যাডের পাতা টাইপরাইটারে চড়াল পরমেশ্বর। চিঠিটা বার কতক পড়ে নেয় কিন্তু টাইপ করতে পারে না সে। কন্সট্রাকশনে অনেকগুলো ভুল দেখে পরমেশ চিঠিটা নিয়ে যায় সাহেবের কাছে।

'ড্রাফট্‌টা যেভাবে আছে, ঠিক সেই-ভাবেই টাইপ করব?'

'ও ইয়েস।'

'কাইন্ডলি একবার দেখে নিন না।'

দেখে নেন সাহেব; বলেন, পার-ফেক্‌টলি অল রাইট।

মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে চিঠিটা টাইপ হয়ে গেল পরমেশ্বরের; সাহেবের দস্তখত হবার পর চাকর সাইকেল চড়ে ডেলিভারী দিয়ে এলো মিনিস্টারের বাংলোয়।

সন্ধ্যার দিকে একবার টেলিফোন বেজে উঠল।

'দিস্ ইজ প্রাইভেট সেক্রেটারী টু অনারেবল মিনিস্টার ফর......। এম-পি সাব কোঠীমে হ্যায়?'

'নেই।' ছোট্ট জবাব দেয়, এম-পি সাহেবের সেক্রেটারী এদিক থেকে।

'কখন ও'কে পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

'ঠিক বলতে পারি না; তবে ইফ ইউ প্লিজ আমাকে বলতে পারেন—আই এ্যাম হিজ প্রাইভেট সেক্রেটারী।'

মিনিস্টারের প্রাইভেট সেক্রেটারী পত্র-প্রাপ্তি জানিয়ে বলেন চিঠিটা ঠিক বুঝতে পারলেন না মিনিস্টার; তাই আমাকে টেলিফোন করে খোঁজ নিতে বল্লেন। কুড ইউ প্লিজ এক্‌সপ্লেন দি লেটার।

পরমেশ্বর নিজের অক্ষমতার জন্য মার্জনা চাইল; প্রতিশ্রুতি দিল সাহেব এলেই টেলিফোন করতে বলবে। সাহেব ফিরেই টেলিফোন করেছিলেন মিনিস্টারের বাড়ীতে কিন্তু উদ্দেশ্য সার্থক হলো না। অবশেষে মিনিস্টার প্রস্তাব করলেন, হোয়াই নট হ্যাভ ব্রেকফাস্ট উইথ মি টুমরো এ্যান্ড উই উইল ডিস্‌কাস্ ইওর লেটার।

পরের দিন সকালে উঠে পরমেশ্বরের সাহেব মিনিস্টারের বাড়ী ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়েছিলেন এবং চিঠির বক্তব্য বুঝিয়েছিলেন ঘন্টা খানেকের চেষ্টায়।

মিনিস্টার পরমেশ্বরের সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। টি গার্ডেনের লেবারারদের একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সন্ধ্যায় বরেণ্য ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে দেখেছিলেন অতিথি-সৎকারকের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সোলো ডান্স।

মিনিস্টারসাহেবও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেননি। বছর খানেক পর এক বিরাট সরকারী অনুষ্ঠানে ডান্স দেখাবার জন্য হাজার দেড়েক মাইল দূর থেকে আনিয়েছিলেন পরমেশ্বরের বসে'র ভাইঝিকে।

৪নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার (কলিকাতা) নিবাসী, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভেষজের অধ্যাপক ডাঃ ভুবনচন্দ্র সিংহ আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজী কর্তৃক সভ্য নির্বাচিত হইয়া বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন। করোনারি ব্যাধি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ও এ বিষয়ে অমূল্য অবদানের জন্য তাঁহাকে উপরোক্ত সম্মানে ভূষিত করা হয়। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, ডাঃ সিংহ আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ চেস্টার বোলসের নিকট হইতে অধুনা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইতেছেন।

দেশে বিদেশে

॥ চালের দর ॥

ভারতের কোন রাজ্যে যখন চালের মণ পঁচিশ টাকার বেশী নয়, সে সময় পশ্চিমবঙ্গে তা প্রায় পঞ্চাশ টাকায় গিয়ে ঠেকেছিল। ত্রিশ টাকা পার হওয়ার পরেই শঙ্কিত দেশবাসী এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাতে কোনই ফল হয় না। দর হু-হু করে বাড়তে থাকে এবং সরকার নিরুপায়ের মত সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধু দেশবাসীকে বলতে থাকেন, চালের বদলে অন্য কিছু খেতে। ব্যবসায়ীদের বেপরোয়া দরবৃদ্ধির কোন প্রতিবাদ সরকার করেন না বা দরকার হলে চালের দর বেঁধে দেওয়া হবে এমন কোন সতর্কবাণীও তাদের শোনান না। বরঞ্চ বিভিন্ন সময়ে এই কথাই রাজ্যসরকারের পক্ষ হতে বলা হয় যে, এই দরবৃদ্ধি অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য। দরবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন, অনশন ধর্মঘট, সত্যাগ্রহ, সর্বাত্মক ধর্মঘট সব কিছুই হয়েছে কিন্তু দর তাতে কমেনি।

শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে জনতা পথে নামল। সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ করে সোজাসুজি চালবিক্রেতাদের কাছে দলে দলে হাজির হয়ে সংযত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে দাবী জানাল, বারো আনা সের দরে চাল দিতে হবে। জনতার সে বলিষ্ঠ দাবীর কাছে ব্যবসায়ীরা নতিস্বীকার করতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না, কারণ লাভের লোভ তাদের সীমাহীন হলেও কোথায় কখন থামতে হয় তা তাদের ভালভাবেই জানা আছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনায়াসে কয়েক লক্ষ টাকা লুণ্ঠনের সুযোগ হয়েছে তাদের, এই লাভকেই আপাততঃ যথেষ্ট ধরে নিয়ে একদিনের মধ্যেই সরকারকে গিয়ে জানালেন তাঁরা, ভাল চাল পঁয়ত্রিশ টাকা মণ ও মাঝারি চাল বত্রিশ টাকা মণ দরেই বেচবেন তাঁরা। নতুন চাল না ওঠা পর্যন্ত এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না।

দেশবাসীর এই ন্যায্য দাবীর স্বীকৃতিতে আমরা আনন্দিত। যাঁরা আজ অগ্রণী হয়ে মুহূর্তের মধ্যে এত বড় একটা কঠিন সমস্যার সমাধান ঘটালেন তাঁরা হয়ত ভাবছেন, এতদিন নিষ্প্রতিকার প্রতিবাদ না জানিয়ে কয়েক মাস আগেই তাঁরা এভাবে তৎপর হননি কেন। তাহলে এমনিভাবে বাংলার প্রতিটি অভাবগ্রস্ত পরিবারকে নিঙড়িয়ে কয়েক লক্ষ টাকা সমাজ-বিরোধী অসৎ ব্যবসায়ীরা কিছুতেই বার করে নিয়ে যেতে পারত না।

দীর্ঘ চোদ্দ বছর পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত থাকবার পর ডাঃ কানরাড আদেনুর বিদায় নিয়েছেন।

জার্মানীর নতুন চ্যান্সেলর লুডুইগ এরহার্ড বিশ্ব-রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিস্ময়কর একটি নাম।

॥ এডেনুয়েরের বিদায় ॥

অবশেষে ডঃ কনরাড এডেনুয়ার প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিশাপে বিধ্বস্ত সর্বস্বান্ত জার্মানীর পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব তিনি অতি বার্ধক্যেই গ্রহণ করেছিলেন। তারপর চৌদ্দ বছরের মধ্যে যাদুকরের মত প্রায় অসাধ্যসাধন করে ৮৭ বছর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। জার্মানীর জাতীয় চরিত্র অবশ্যই তাঁর সহায়ক ছিল এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পশ্চিমী শক্তিবর্গের উদার সহায়তা। তবুও মাত্র চৌদ্দ বছরের ব্যবধানে জার্মানীর অভাবনীয় উন্নতি সমগ্র জগতের বিস্ময়, আর সে বিস্ময়ের মূল স্রষ্টা ফেডারেল চ্যান্সেলর ডঃ এডেনুয়ার। হিটলারের স্বৈরশাসনের কাছে মুষ্টিমেয় যে কজন জার্মান নতিস্বীকার করেননি ডঃ এডেনুয়ার ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাই হিটলারের কারাগারে দীর্ঘকাল বন্দী থাকতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু শত বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি নতিস্বীকার করেননি বা মনোবল হারাননি। সেই দুর্জয় ব্যক্তিত্বকে জার্মানী তার চরম প্রয়োজনের দিনে চিনতে ভুল করেনি, আর সেই নির্ভুল সিদ্ধান্তেরই পুরস্কার তার আজকের অমেয় ঐশ্বর্য। বিশ্ব রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে যে জার্মানী অতলে তলিয়ে গিয়েছিল, সেই জার্মানী আজ আবার বিশ্বের প্রথম সারীর রাষ্ট্র।

ডঃ এডেনুয়েরের স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক লুডুইগ এরহার্ড, অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও নীতিবাদীরূপে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি যাঁর। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় জার্মানীর আরও উন্নতি হোক ও জার্মান ও বার্লিন সমস্যার সমাধান হয়ে বিশ্বশান্তির ভিত্তি সুদৃঢ় হোক, বিশ্ববাসী মাত্রেরই এই কামনা। জার্মানীর অধুনা জনপ্রিয় সঙ্গীতের ভাষায় আমরাও বলি 'লেট ফ্যাটি হ্যাভ এ গো'।

॥ লাতিন আমেরিকায় অশান্তি ॥

লাতিন আমেরিকার অগ্রগতির উদ্দেশ্যে ২ হাজার কোটি ডলার ব্যয়ের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি। 'এলায়েন্স ফর প্রগ্রেস' নামে পরিচিত ঐ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল লাতিন আমেরিকার বৈষয়িক উন্নয়ন ও সব কটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়করণ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রেসিডেন্ট কেনেডির শাসনকালেই লাতিন আমেরিকার সাতটি রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটল। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে এল সালভাডোরে সামরিক শাসন কায়েম হওয়া দিয়ে এই গণতন্ত্র-বিরোধী অভিযানের সূত্রপাত হয়েছিল। তারপর একে একে আর্জেন্টিনা (মার্চ '৬২), পেরু (জুলাই '৬২), গুয়াতেমালা (মার্চ '৬৩), ইকুয়েডর (জুলাই '৬৩), ডোমিনিকান রিপাবলিক (সেপ্টেম্বর '৬৩) ও হণ্ডুরাস (অক্টোবর '৬৩) সামরিক শাসন কায়েম হল ও গণ-

প্রেসিডেণ্ট নাসের

শ্রীমতী বন্দরনায়েক

তান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটল। অবশিষ্ট ল্যাতিন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা ও ব্রেজিলে বর্তমানে যেভাবে অশান্তি শুরু হয়েছে তাতে ঐ সব রাজ্যে যে কোনদিন সামরিক শাসন কায়েম হতে পারে।

দুর্বল গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে রক্ষার প্রয়াসে মার্কিণ সরকারের ব্যর্থতা মার্কিণ রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং মার্কিণ কংগ্রেসের দাবীতেই মার্কিণ সরকার ডোমিনিকান রিপাবলিক ও হণ্ডুরাস থেকে যাবতীয় আর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

স্পেনের শাসন থেকে মুক্তিলাভের পর গত ১৪২ বছরে এইবার নিয়ে হণ্ডুরাসে ১৩৬ বার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটল। মাত্র দুজন নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট হণ্ডুরাসের ইতিহাসে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত শাসনকার্য চালাতে সমর্থ হয়েছেন। সদ্য পদচ্যুত প্রেসিডেণ্ট মবেলস মাত্র দশদিনের জন্য তাঁর শাসনের মেয়াদ শেষ করতে পারলেন না। অনিশ্চয়তাই সমগ্র ল্যাতিন রাজনীতির একমাত্র নিশ্চিত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥ কায়রো সাক্ষাৎকার ॥

কায়রোয় সম্প্রতি মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের ও সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েকের যে সম্মেলন হয়ে গেল তা নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কলম্বো সম্মেলনের উদ্যোগী উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে, চীন শেষ পর্যন্ত কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতেই মীমাংসায় অগ্রণী হবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের অবসান ঘটবে। ইতিপূর্বে প্রেসিডেণ্ট নাসের এক বিবৃতিতে জানান, মিশরের প্রধানমন্ত্রী আলি সাবরি পিকিঙ সফরকালে চীনা রাষ্ট্রনেতাদের জানিয়ে আসেন যে, বিরোধের মীমাংসা চীনের কাম্য হলে তাঁদের কলম্বো প্রস্তাব অবশ্যই মেনে নিতে হবে। সুতরাং কলম্বো সম্মেলনের উদ্যোগী রাষ্ট্রগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের সমর্থন যে ভারতের পক্ষে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি।

এই রাষ্ট্রগুলির চীন-বিরোধী মনোভাবের আরও পরিচয় পাওয়া গেছে বেলগ্রেড সম্মেলনের মত আবার একটি জোট-নিরপেক্ষ-রাষ্ট্র-সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাবে। যে সময় চীন, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্থান দ্বিতীয় 'বান্দুং' সম্মেলন আহ্বানের তোড়জোড় করছে ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় 'বেলগ্রেডের' আহ্বান যে চীন প্রভাবিত জোটের উপর এক বিরাট আঘাত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির যা গতিপ্রকৃতি তাতে 'বান্দুং-এর' মত অঞ্চলভিত্তিক সম্মেলন অপেক্ষা নীতি-ভিত্তিক বেলগ্রেড সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক বেশী।

অর্থনৈতিক

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। ১৯৬২—৬৩ সালের হিসাবে দেখা যায়, পূর্ব বছরের তুলনায় ৫৭টি দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে আছে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া, আফগানিস্থান, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতির মত উল্লেখযোগ্য দেশ আর ৪২টি দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে; যাদের মধ্যে আছে বেলজিয়াম, সিংহল, পশ্চিম জার্মানী, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, সুদান, থাইল্যান্ড প্রভৃতি।

মোট চল্লিশটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন ভারতের প্রতিকূলে ছিল। এর মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর পাওনা সবচেয়ে বেশী, প্রায় ৮২ কোটি টাকা। বৃটেনের আমদানি তালিকায় ভারত গত বছর অনেকগুলি নতুন জিনিস সংযুক্ত করতে পেরেছে। যেমন, প্লাস্টিকের জিনিস, রাসায়নিক, ওষধি, হস্তশিল্প, জুতা, সিগারেট, সিগার, বালতি, শাড়ী, তোয়ালে, কলে সেলাইয়ের সুতা, রাসিল্ক, টাই, টিনে ভরা মাছ, চিনি, প্লাইউড, কাঠ, ইত্যাদি। ইউরোপের খোলা বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন পূর্ব বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬১—৬২ সালে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি টাকা, গত বছরে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৪৭ কোটি টাকা। উচ্চ হারের শুল্ক ও বহুবিধ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণই এর জন্য দায়ী। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৭—৫৮ সালে যে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি টাকা, গত বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯২ কোটি টাকা, যা ভারতের মোট রপ্তানির ১৩·৩ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি দেড় কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের টিনেভরা মাছ, র'কটন, অভ্র, নারকেলের দড়ি, সেলাইকল, জুতা প্রভৃতির চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু কফি, মরিচ, চিনি প্রভৃতির চাহিদা কমেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব কটি দেশে ভারতের রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিম এশিয়া বা আফ্রিকাতেও ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বাড়েনি।

রপ্তানি তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতের সাবেকি মালগুলির চাহিদাই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন পাট রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ কোটি টাকার, চা ৭ কোটি টাকার, তামাক ৪ কোটি টাকার, চামড়া ২·৬ কোটি টাকার। আর রপ্তানি কমেছে, সুতী-বস্ত্রের ১·৯ কোটি টাকার, তৈরী চামড়ার ২·৮ কোটি টাকার, ম্যাঙ্গানিজ ২·৬ কোটি টাকার, তুলা ও তুলার ছাটের ৩·৩ কোটি টাকার, কাঁচা পশমের ২·৭ কোটি টাকার, লোহা ও ইস্পাতের ৭·৪ কোটি টাকার আর পুরানো লোহার ৪·২ কোটি টাকার। ১৯৬১-৬২ সালে লোহা ও ইস্পাত চালান গিয়েছিল ৯·৭ কোটি টাকার, গত বছর গেছে ২·৩ কোটি টাকার, সিমেন্টের রপ্তানি কমেছে ১০ লক্ষ টাকা থেকে ·৩০ লক্ষ টাকায়।

* * *

সোভিয়েট ইউনিয়নে এই বছরের খাদ্যঘাটতি সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া গেছে। 'টাস'-এর সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারগুলির কাছ থেকে সোভিয়েট সরকার এই বছর গত বছরের তুলনায় ১৮ শতাংশ কম খাদ্য পেয়েছেন। এই থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ ১৮ শতাংশ ভাবলে ভুল করা হবে। কারণ রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারগুলি তাদের অন্তর্ভুক্ত কৃষক পরিবারগুলির খাদ্য, পশু-খাদ্য ও বীজ ধান আলাদা করে রেখে বাকিটুকু সরকারের কাছে বিক্রী করে। এইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের চল্লিশ শতাংশ লোক ও সমগ্র গবাদি পশুর খাদ্য খামারগুলির হাতেই থেকে যায়। বাকি খাদ্য শহরবাসী ও শ্রমজীবীদের প্রয়োজনে সোভিয়েট সরকার সংগ্রহ করেন। এইভাবে গত বছর ১৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টন খাদ্য ও খাদ্যশস্যের মধ্যে সোভিয়েট সরকার সংগ্রহ করেছিলেন ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টন। সুতরাং এই বছর যদি সোভিয়েট সরকার তা থেকে ১৮ শতাংশ কম পেয়ে থাকেন তবে বুঝতে হবে এই বছর সেখানে প্রায় ১·২০ কোটি টন খাদ্যের অভাব হয়েছে। বাইরে থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন এ পর্যন্ত যে পরিমাণ গম কিনেছে ও কিনতে চায় তার পরিমাণও মোটামুটি ঐ রকম। কানাডা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে সোভিয়েট সরকার কিনেছেন প্রায় ৮০ লক্ষ টন গম, আর যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কেনার প্রস্তাব করেছেন প্রায় ৩০ লক্ষ টন।

সাহিত্য জগৎ

ভারত সরকারের সংস্কৃতি ও গবেষণা মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে দুইজন সোভিয়েত অভিধান প্রণেতা ভি. আই. আলেকসিয়েফ (বৈদেশিক ও জাতীয় অভিধানসমূহের রাষ্ট্রীয় প্রকাশালয়ের ভারতীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অভিধানসমূহের বিভাগের প্রধান) এবং ভি. এ. মাকারেঙ্কো (ঐ বিভাগের সিনিয়র এডিটর) ভারতে এসেছেন। গত ৪ অক্টোবর কলকাতার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবিদ্যা ও ভারতীয় ভাষার চর্চা এবং সোভিয়েত-ভারত অভিধান প্রণয়নের কাজ সম্পর্কে একটি মূল্যবান ভাষণ দেন।

রুশ ও ভারতীয় ভাষাসমূহের অভিধান রচনার কাজ যে সম্প্রতি শুরু হয়েছে তা নয়; এর শতাব্দীব্যাপী ঐতিহ্য আছে। ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতি রুশদের আগ্রহের প্রেরণা হিসাবে ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে জানার কামনা, এই দেশের বর্ণবহুল ও বিচিত্র অসংখ্য ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা।

আঠার শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রথম দিকে রুশ পণ্ডিত যেমন, টি. বেয়ার, ডি. জি. মেসেরশমিড্ এবং আরো অনেকে—সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে সাফল্য অর্জন করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে গেরাসিম লেবেদেফ ইংরিজিতে প্রকাশ করেন তাঁর পূর্ব-ভারতীয় বিশুদ্ধ ও মিশ্র উপভাষাসমূহের ব্যাকরণ গ্রন্থটি। আধুনিক ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে একজন রুশ-ভারতবিদের এটিই প্রথম গ্রন্থ।

ভারতীয় ভাষাগুলির অভিধান প্রণয়নের কাজ রাশিয়ায় শুরু হয়েছে একশ বছরেরও আগে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় কোসোভিচ প্রণীত প্রথম রুশ-সংস্কৃত অভিধান। রুশ আকাদমি-সদস্য পণ্ডিত ও. বোহ্‌ৎলিঙ্ক সাত খণ্ডে সংস্কৃত-জার্মাণ অ ভি ধা ন (১৮৫৫-১৮৭৫) প্রকাশ করেন এবং পরে (১৮৭৯-১৮৮৯) ওই অভিধান-টিরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই অভিধানগুলি তখন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত হয়। কিন্তু, একমাত্র মস্কোর লেনিন গ্রন্থাগারে ছাড়া আর কোথাও এই অভিধান বর্তমানে পাওয়া যায় না।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে রুশ অভিধান রচয়িতারা আধুনিক আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হতে থাকেন। তখন থেকে হিন্দুস্তানী ভাষার (বুনিয়াদী হিন্দী বা বুনিয়াদী উর্দু) অনেকগুলি ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেন আই. ইয়াগেলো, এ. ভিগোরানিৎস্কি, এ. গুইলফের্দিন এবং আরো অনেকে।

গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই আকাদমি-সদস্য পণ্ডিত এ. বারান্নিকফের সাধারণ নির্দেশনায় প্রকাশিত হয় একটি উর্দু-রুশ-ইংরিজি অভিধান (১৯৩০), একটি মারাঠী-রুশ ও রুশ-মারাঠী অভিধান (১৯৩৫) এবং একটি জিপসী-রুশ অভিধান (১৯৩৮)। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবিদ্যার চর্চার এবং বিশেষতঃ ভারতীয় ভাষাসমূহের অভিধান রচনার কাজ খুব ব্যাপকভাবে হতে থাকে। এ সময়ে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান হল ভি. বেসক্রভ্‌নি ও ভি. ক্রাসনোদেম্বস্কি সংকলিত উর্দু-রুশ অভিধান (১৯৫১; ২০ হাজার শব্দ; ৩,৫০০ কপি)।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ও বৈদেশিক ভাষার অভিধানের রাষ্ট্রীয় প্রকাশালয় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলির অভিধান রচনার কাজ আরম্ভ করে। ভারতীয় ভাষাসমূহ সম্পর্কে এই প্রকাশালয়ের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট সাফল্য হল ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হিন্দী-রুশ অভিধান (৩৫,০০০ শব্দ, ৫,০০০ কপি)। এই অভিধানটি সংকলিত হয় শ্রীবেসক্রভ্‌নি-র সাধারণ নির্দেশনায় এবং এ. বারান্নিকফের সম্পাদনায়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে এই অভিধানটির একটি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (৪০ হাজার শব্দ; ৫,০০০ কপি)। প্রথম রুশ-হিন্দী অভিধানটিও প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। আই. রাবিনোভিচের সাধারণ নির্দেশনায় একদল সম্পাদক কর্তৃক এটি সংকলিত হয়।

সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ও ভ্রমণ-কারীদের সুবিধার জন্য ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রকাশিত হয় ছয়টি পকেট সংস্করণ অভিধান ঃ বাংলা-রুশ, রুশ-বাংলা, হিন্দী-রুশ, রুশ-হিন্দী, উর্দু-রুশ, রুশ-উর্দু অভিধান। এগুলির প্রত্যেকটি আট থেকে দশ হাজার সাধারণ শব্দসংবলিত।

ভারতীয় ও প্রাচ্য ভাষাগুলির মধ্যে একটি প্রধান ভাষা হিসাবে বাঙলা ভাষা আঠার শতকের শেষ ভাগ থেকেই রুশ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গেরাসিম লেবেদেফই হলেন প্রথম রুশ যিনি শুধু যে এই ভাষা অনুশীলন করেছিলেন তাই নয়; তিনি ইংরিজিতে একটি বাঙলা ব্যাকরণ সংকলন করেন। অধ্যাপক পি. পেত্রোফ রুশ ভাষায় 'ভারতের প্রধান ভাষাসমূহ' নামে যে গ্রন্থ লেখেন (১৮৬৭-৬৯), তাতে তিনি বাঙলা, হিন্দুস্থানী ও মারাঠী ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

প্রথম বাঙলা ভাষাবিদ সোভিয়েত পণ্ডিত এম. আই. তুবিয়ান্‌স্কি রবীন্দ্র-নাথের রচনাবলী মূল বাঙলা থেকে—ইংরিজি অনুবাদের সাহায্য না নিয়ে—সর্বপ্রথম সরাসরি রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯২২ সালে তার টীকা ও ব্যাখ্যাসহ বাঙলা সাহিত্যের নির্বাচিত রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাগারে এই বইটির একটি কপি আছে। ১৯৩৫ সালে দাউদ আলি দত্ত ও এ. এস. জিমিন কর্তৃক সংকলিত প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বাঙলা ভাষা প্রকাশিত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় সংস্কৃতির ও ভাষাসমূহের অনুশীলন খুব ব্যাপকভাবে হতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে আই. এস. কোলোবকফ, ই. এম. বীকোভা, এল. এন. চেভীকিনা, ই. এ. আলেকসিয়েভা, প্রভৃতির লেখা বাঙলা ভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কতকগুলি ছোট অভিধান প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে সোভিয়েত দেশে আছে—বাঙলা-রুশ অভিধান (১৯৫৭; ৩৮,০০০ শব্দ; ৭,৫০০ কপি); তামিল-রুশ অভিধান (১৯৬০; ৩৮,০০০ শব্দ); পাঞ্জাবী-রুশ অভিধান (১৯৬১; ৩৫,০০০ শব্দ) এবং রুশ-উর্দু অভিধান (১৯৫৯: ২৩,০০০ শব্দ)। রুশ ভাষা শিক্ষার্থী ভারতীয়-দের জন্য ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছে একটি বিশেষ হিন্দী-রুশ-তালিম অভিধান।

বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ও বৈদেশিক ভাষার অভিধানের রাষ্ট্রীয় প্রকাশালয় একটি রুশ-বাঙলা অভিধান (২৩,০০০ শব্দ), একটি উর্দু-রুশ অভিধান (৩৮,০০০ শব্দ) এবং একটি রুশ-তামিল অভিধান (২৮,০০০ শব্দ) প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেছে। তেলেগু, মালয়ালম, মারাঠী, গুজরাটী ও নেপালী ভাষার অভিধানসমূহও এই একই গ্রন্থশালায় প্রকাশিত হবার জন্য সংকলিত হচ্ছে। এগুলির প্রত্যেকটিতে মোটামুটি ৩৮ থেকে ৪০ হাজার শব্দ থাকবে। দুটি বৃহত্তর অভিধান রুশ-হিন্দী অভিধান (৫০,০০০ শব্দ) এবং হিন্দী-রুশ অভিধান (৬০,০০০ শব্দ) সংকলনের কাজ চলেছে।

বিদেশী সাহিত্য

।। সেভেন সিজ্‌ বুক্স ।।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের উল্লেখযোগ্য গল্প, উপন্যাস, কবিতা বা প্রবন্ধের সমাবেশে বর্তমান সিরিজের গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়ে থাকে। ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত হয়ে এগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একদিকে যেমন ডিকেন্স থ্যাকারে বা মার্ক টোয়েনের রচনা রয়েছে এই সিরিজে তেমনি আছে সমকালীন লেখকদের মধ্য থেকে মিলে র্বা, অ্যালেকজাণ্ডার স্যাক্সটন, এবং আরো অনেক।

সম্প্রতি এই সিরিজে কয়েকখানি আকর্ষণীয় ও মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য হল আটশত বছরের জার্মান কবিতার বিরাট সংকলনটি। দ্বাদশ শতক থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

এ বিট অব্‌ ব্লাড্‌ আর্ণল্ড জ্যাইসের বারটি গল্পের সংকলন। গল্পগুলি ১৯১৫-৩৩ সালের মধ্যে লিখিত। তাছাড়া এই সিরিজের অন্যান্য নতুন প্রকাশিত গ্রন্থ হল আনা সেগহার্স-এর **রিভোল্ট অব্‌ দি ফিসারমেন অব্‌ সান্টা বারবারা** এবং **এ প্রাইস্‌ অন্‌ হিজ্‌ হেড**; উইলি ব্রেডেল-এর **দি ডেথ্‌ অব্‌ জেনারেল মরো**; এফ সি ওয়েসকফ-এর **দি ফায়ারিং স্কোয়াড**; জাঁ পিটারসেন-এর **আওয়ার স্ট্রীট**।

আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পুস্তক প্রকাশন ব্যবস্থা

মননশীল প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশনের পথে কয়েকটি বিশেষ ধরণের সমস্যা আমেরিকায়ও রয়েছে। তবে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়াম, লাইব্রেরী এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে এই ধরণের প্রচুর গ্রন্থ প্রতিবছর প্রকাশিত হয়ে থাকে, প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এই সকল পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে বছরে এই বিশেষ ধরণের পত্র-পত্রিকাই প্রকাশিত হয়ে থাকে ১২৫টি। আর মননশীল পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৪০০টিরও বেশী—এই সকল পুস্তকের কোনটিই গল্প উপন্যাস বা কাহিনী নয়।

এই ধরণের পুস্তক প্রকাশন-সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আমেরিকার ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়, পাঁচটি মিউজিয়াম, লাইব্রেরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মিলে "এসোসিয়েশান অব আমেরিকান ইউনিভার্সিটি প্রেসেস" নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছে। প্রতিবছরই গ্রীষ্মকালে এই সংস্থার বিশেষ প্রতিনিধিবর্গকে, কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিত হতে দেখা যায়। এঁরা হচ্ছেন পুস্তক সম্পাদক, ডিজাইনার্স এবং মুদ্রণকার্যে বিশেষজ্ঞগণ। এই বার্ষিক অধিবেশনে তাঁরা এই ধরণের পুস্তক-প্রকাশনের সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করে থাকেন।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই, বিদ্বজ্জন-সমাজে, প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারে এই সকল পুস্তক যায়। সারা বিশ্বের বিদ্বজ্জনই এই সকল পুস্তকের পাঠক।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পুস্তক-প্রকাশনা ব্যবস্থা মুনাফা-প্রসূত নয়। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৬৯ সালে প্রথম এই ধরণের পুস্তক প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের প্রসারের জন্য অল্পমূল্যে পুস্তক সরবরাহই ছিল এর উদ্দেশ্য। এর পরে এই লক্ষ্য নিয়েই জন হপকিনস বি শ্ব বি দ্যা ল য়ে, পেনসিলভ্যানিয়া, শিকাগো ও ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুস্তক-প্রকাশন শুরু হয়। অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র বিজ্ঞান ও শিল্পকলা সম্পর্কে গবেষণালব্ধ মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্বজ্জনেরা যে সকল পুস্তক রচনা করে থাকেন তাদের প্রকাশনই ছিল গোড়ার বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের পুস্তক-প্রকাশন ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। এর পরে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তারাও এই লক্ষ্য অনুসরণ করে চলেছে।

তবে লক্ষ্য এক হলেও পথ এক নয়। ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২১টির নিজেরই প্রিন্টিং প্রেস বা পুস্তকমুদ্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, ৩৪টি পুস্তক প্রকাশন ছাড়া এক বা একাধিক পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় জীবিত বিদেশী লেখকদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, একটি শিশুসাহিত্য, ১৫টি সমকালীন কাব্যগ্রন্থ, এবং ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করে থাকে। তবে ঐ ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি সাহিত্যাদি বিষয়, বিজ্ঞান এবং অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কে মননশীল পুস্তক প্রকাশ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অঞ্চলেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এই সকল পুস্তক প্রকাশন ব্যবস্থা রয়েছে।

এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে উরবানাস-স্থিত ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রেস থেকে প্রতিবছর ২৫টি বিভিন্ন বিষয়ে মননশীল পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাছাড়া "জার্ণাল অব ইংলিশ অ্যাণ্ড জার্মান ফাইলোলজী" নামে একটি পত্রিকাও ঐ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এটি চার মাস অন্তর প্রকাশিত হয়ে থাকে। ভাষা ও সাহিত্য, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান এই চারটি বিষয়ে পুস্তকমালাও প্রকাশিত হয়ে থাকে এই প্রেস থেকে।

এই সকল পুস্তক রচয়িতাগণ যে কেবলমাত্র ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছেন তা নয়, আমেরিকার, এমন কি দূরে বিদেশের ইস্তানবুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবর্গের পুস্তক পর্যন্ত এখানে গৃহীত ও প্রকাশিত হয়ে থাকে—বিনিময়ে তাঁদের সামান্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সকল প্রেসের সম্পাদকবর্গ পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিশেষ দায়িত্বের পরিচয় দিয়ে থাকেন তাঁদের সম্পাদনায় প্রকাশিত পুস্তকেই তার স্বাক্ষর রয়েছে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় তরুণ মার্কিন কবিদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে থাকেন। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় উপন্যাস প্রকাশ করেছেন—এই সকল উপন্যাসের মধ্যে ভারতীয় সাহিত্যিক আর কে নারায়ণ রচিত তিনখানি উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এই সকল প্রেস জাতীয় সমস্যা সম্পর্কেও যে বিশেষ সচেতন কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত এবং নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হ্যারী এস অ্যাশমোর রচিত 'দি নিগ্রো অ্যাণ্ড দি স্কুলস' নামক গ্রন্থ প্রকাশে তার প্রমাণ।

হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড হাওয়াই এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার উপর এবং কর্ণেল ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালায় মধ্যপ্রাচ্যের আশাআকাঙ্ক্ষা ও সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।
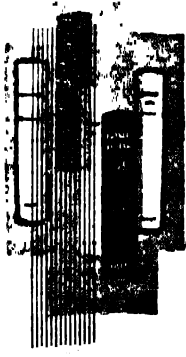
অভয়ঙ্কর

আবার শরৎ সমাগত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনের এই আঙিনায়', আশ্বিনের আঙিনায় বহু-বিচিত্রের সমাবেশ। এই কালটিতে আবহাওয়া কখনো শুষ্ক, কখনো আর্দ্র, আকাশে কখনো মেঘ, কখনো রৌদ্র, মাঝে বজ্রসহ দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে বিশেষতঃ গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে। ডিগ্রির তফাৎ থাকতে পারে চরিত্রে নয়। এই সময় ফসল কেটে ঘরে তোলার সময়, ধরার খুশি উপচে পড়ে, গ্রীষ্মের প্রখর তপন তাপ অন্তর্হিত, আর হেমন্তলক্ষ্মী হিমের ঘন ঘোমটায় নয়নটি ঢেকে আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছেন, আর হেমন্তই যদি এল—শীত কতদূর? এই যে শীতের আগমনের পূর্বাভাস—প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিতও সে আনে। য়ুরোপেও তাই, অপেক্ষাকৃত দক্ষিণাঞ্চলে ইতালী, সেখানে কবি ভার্জিল কিষাণদের বিপজ্জনক কালো-মেঘ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন কারণ এই মেঘই— "Flood the labours of oxen with terrific rain—" চীন-দেশেরও এক পণ্ডিত পঞ্জিকার এই অষ্টম মাস (সেই দেশে অবশ্য) সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করেছেন, কারণ এই মাসে ছাত-ওড়ানো ঝড়ের আবির্ভাব ঘটে, কালো মেঘের ভেতর থেকে ঝড় নেমে এসে ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়।

ট্রপিক্যাল আবহাওয়া-বিশিষ্ট দেশে এই দুরাবস্থার কথা অজ্ঞাত নয়, এসব দেশে বর্ষা ম্লান মুখে বিদায় নেয় না, শেষ বর্ষণের বিত্তবিহীন মেঘ শরৎ-চন্দ্রের সাগর সর্দারের মত যাওয়ার সময় জানিয়ে যায়—কে গেল!

তথাপি শরৎ, আমাদের দেশে আনন্দের কাল, এই কালে একসঙ্গে সবকটি ঋতুর সমাবেশ ঘটে, কিছু গ্রীষ্ম, কিছু বর্ষা, কিছু হিম-হিম, কিছু বা বাসন্তী বাতাস। শরৎ তপনে প্রভাত পবনে কে আর স্মরণে রাখে 'ভুবন ভরিয়া গগনে ছড়ায়ে এলোচুল, চরণে জড়ায়ে বনফুল' একদিন জলভরা বর্ষার আবির্ভাব ঘটেছিল।

যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে অঙ্কের সাহায্যে এবং অর্থনীতির সূত্রদ্বারা, পৃথিবীটা বেশ সুখেস্বচ্ছন্দে থাকতে পারে অনেক কম কাজ করে, অনেক কম সময় পরিশ্রম করে। ঘন্টা-মিনিটের হিসাবে জীবন ও কর্মকে বেঁধে না রাখলে উত্তম কর্মের সুফল লাভ হয়। এই উচ্চ আদর্শের প্রতি আমরা বিশ্ব-বাসীর (বিশেষতঃ ভারতবাসীর) দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কয়েক বছর আগে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভায় একজন অভিজ্ঞ শিল্পপতি, যিনি প্রায় তিন হাজার কর্মীর অন্নদাতা, বলেছিলেন প্রতিদিন প্রাতে চার ঘণ্টা হিসাবে কুড়ি ঘণ্টা কাজ এক সপ্তাহে যথেষ্ট।

সেই সপ্তাহ শুরু হবে সোমবার, শেষ হবে শুক্রবার। বাকী সময় অবসর ও চিত্তবিনোদনের জন্য একেবারে "OFF"।

শুধু প্রয়োজন এই হ্রাসপ্রাপ্ত কর্ম-কালে অধিকতর উৎপাদন। মানুষ স্বয়ং তার অনেক ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে রেখেছে। প্রকৃতি অতিশয় সদয় মনোভঙ্গী নিয়ে স্থির করে রেখেছেন যে মানুষ তার দৈনন্দিন কর্মে সূর্যোদয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করবে। রাত্রির শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রয়ে তারা অবসর গ্রহণ করে বিশ্রাম ও বিলাসে কালাতিপাত করবে। মানুষ কিন্তু প্রকৃতির ওপর যায়, তারা কৃত্রিম আলোর সৃষ্টি করে রাতকে দিন করে ফেলল, আর আপনাকে আলোর ক্রীত-দাস করে ফেলল। হয়ত এমন সময় আসন্ন যখন নৈঃশব্দ্যের মত অন্ধকারও একটা দুর্লভ আশীর্বাদ বলে মনে হবে।

যদি কর্মে কুড়ি ঘণ্টা ব্যয়িত হয় তাহলে বাকী ঘণ্টাগুলি কিভাবে উপ-ভোগ করা হবে? মানুষ অবসর যাপন করতে ভুলে গেছে, ফিল্মহীন-ফুটবল-হীন রিক্ত বৈরাগী হয়ে সে শুধু কাজ করে যাচ্ছে, যাতে দেশের মঙ্গল হয়, উত্তরকালে মানুষের ঘরে দুধ-ঘির প্লাবন বহে যায়। বেতারযন্ত্র প্রত্যূষ থেকে শুরু করে প্রায় মধ্যরাত্র পর্যন্ত সক্রিয়, খুব কমসংখ্যক বীর-পুরুষই অবশ্য শেষ পর্যন্ত বেতার শুনে থাকেন,

প্রোগ্রাম যতই বিচিত্র হোক। অবসর যাপনের উপায় সম্পর্কে নতুন নতুন পরিকল্পনা গড়ে উঠবে, হয়ত বহুমুখী বিদ্যালয়ে এই অবসরযাপন বিষয়ক-তত্ত্ব একটি আবশ্যিক পাঠক্রমে পরিণত হবে আর শিক্ষক-শিক্ষিকারা তার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিমসিম খাবেন। কারণ স্কুলের সময় নির্ঘণ্ট এবং সেই সঙ্গে মূল্যের পৃচ্ছদেশে শাকের মত পরীক্ষা-টুকুর জন্যও একটা সময় ঠিক করতে হবে।

মানুষ কঠোর শ্রম করে থাকে, একথা সাধারণগ্রাহ্য। এই পরিশ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য একদিন সে হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে অবসর গ্রহণ করে—বিশ্রামসুখ উপভোগ করে। একজন এফিসিয়েন্সী এক্সপার্ট একদিন এক রেলওয়ে স্টেশনে হৃষ্টপুষ্ট এক রেড-ইন্ডিয়ানকে অলস-আবেশে কালহরণ করতে দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—'ভায়া

কাজ করো না কেন?' লোকটি পাল্টা প্রশ্ন করে—"কেন করব?" "অর্থ উপার্জনের জন্য।" "কেন আমি অর্থ উপার্জন করব?" "তাহলে একদিন তুমি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে বিশ্রামসুখ উপভোগ করতে পারবে!" "সে-ত আমি এখনই করতে পারছি!" নতুন ধরণের এক ফ্যাসনেবল স্কুলের এক ছাত্রকে খেয়ালখুশি মতো কাজ করতে বলা হয়েছিল, সে একদিন বেঁকে বসলে—"বারে, রোজ রোজ কেন আমিই যা করতে চাই তাই করব? মাস্টারমশাইরাও ত' মাঝে মাঝে বলে দিতে পারেন আমরা কি করতে চাই—মানে চাওয়া উচিত!"

এমনও হতে পারে একদিন যে বিরাট ধর্মঘট করে শ্রমিকজগৎ তাঁদের কাজের সময় হ্রাস করার জন্য আন্দোলন শুরু করবেন। উত্তম জিনিসের আধিক্যও ভালো।

ভবিষ্যতে কি হবে হোক, উপস্থিত সামনে কিছু ছুটি এসেছে, ছুটির বাঁশী বেজেছে বলেই শরৎ এত মধুর, শরৎ আলোর কমল বনে, এতদিন যে মনে মনে ছিল সে বাইরে এসে বিহার করে। এই সময়টার একটা মোহিনী মায়া আছে, ক্লান্ত অঙ্গ বিশ্রাম চায়, আর সেই বিশ্রামের একমাত্র পথ হল ভ্রমণ। ভালোই হয়েছে, একটা সীজন বাঁধা আছে ভ্রমণের জন্য, (আগে ছিল দুটি, পুজো আর বড়দিন), তার ফলে হোটেলওলা রেলকর্তৃপক্ষ এবং আঞ্চলিক সওদাগর সম্প্রদায় খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠেন। দোকানে-দোকানে সফরকারি যাত্রী দল দুআনার জিনিস দু-টাকায় কিনে "একটা 'বারগেন' করলুম" বলে কলকাত্তাই ঢঙ-এ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই যে ট্যুরিজমের ব্যবসা এ ত' একেবারে মাঠে মারা যেত। কি করত, কাশী, গয়া, পুরী, মথুরা, বৃন্দাবনের পান্ডারা? কিন্তু যখন রাম, শ্যাম, যদু, মধু সকলেই একই সঙ্গে ভ্রমণ-সুখ উপভোগ করার জন্য উদ্যোগ করেন, তখন অবস্থাটা অনুমেয়। ট্রানসপোর্ট বা যানবাহনের স্বাভাবিক অবস্থাতেই জান নিয়ে টানাটানি, উৎসবের অবসরে তার চাহিদা তিন থেকে চার ডবল বেড়ে যায়, ফলে ছত্রভঙ্গ অবস্থা। যাঁরা থাকেন সমুদ্রতীরে তাঁরা ছোটেন পর্বতশিখরে, যাঁরা থাকেন ধূলিধূসরিত সমতলে তাঁরা যান স্বপ্নবিজড়িত নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় অবগাহন করতে, মানুষ ভ্রমণ করতে ভালোবাসে, সেই সঙ্গে তার পুঁটলি-পোঁটলা, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ, বিছানা-কম্বল, সেই সঙ্গে সুবৃহৎ পরিবারমণ্ডলী (পরিকল্পিত পরিবার এখনও অপ্রকাশিত), এঁরা ট্রেন নৌকা, বাস ও প্লেনের যাত্রী, যাঁদের নিজস্ব নির্ভরযোগ্য গাড়ি আছে তাঁরা সেই সব গাড়িতে আর যাঁদের কিছু নেই তাঁদের জয়-শ্রীচরণ ভরসা। এঁদের কাছে যাত্রাটাই প্রধান,—গন্তব্যস্থল নয়। তা ছাড়া সবচেয়ে আনন্দ ছুটির কথা চিন্তা করতে, ছুটি উপভোগের প্ল্যানিং-এ, সেই উপভোগের উপকরণ হল দেশভ্রমণ, কিন্তু দেশভ্রমণের চাইতেও দেশভ্রমণের কথা চিন্তা করা আরো ভালো, দেশভ্রমণের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করা, তার উত্তেজনা এবং সর্বশেষে যাত্রা করার যে যন্ত্রণা এবং যাত্রীর যে দুর্ভোগ তার চেয়ে যাওয়ার কথা মনে মনে ভাবা আর টাইম-টেবলের পাতা ওলটানো অনেক সহজকর্ম। স্বাধীন ভারতে রেলপথে ভ্রমণ এবং এভারেষ্ট চূড়ায় ওঠা, এই দুই কর্মের মধ্যে পার্থক্য কি তা আমার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

ট্রেনে ভ্রমণকারীরা সংখ্যাগুরু আর সব যানের চেয়ে এই বাষ্পীয় যানেই লোকের আকর্ষণ বেশী। রেলকর্তৃপক্ষরা—ঈশ্বর তাঁদের করুণা করুন—অবস্থানুসারে কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে লেগে যান, কয়েকখানি এক্‌সট্রা, কয়েকটা ডুপ্লিকেট এবং স্পেশ্যালের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু রক্তবীজের বংশধরদের মত ট্রেন-প্যাসেঞ্জারদের সংখ্যাধিক্য সকল রকমের ক্যালকুলেশ্যান একেবারে আপসেট করে দেয়, বানচাল হয়ে সবাই একাধারে বেসামাল। যে ব্যক্তি দেশে ফিরবে সে অতিভোরে উঠে তাড়াতাড়ি ছোটে রিজার্ভেসন কাউন্টারে স্লিপিং বার্থের সন্ধানে। যাঁরা অধিকতর সুযোগসন্ধানী তাঁরা অবশ্য দশদিন আগে কি বিশদিন আগে টিকেট কেটে গোঁফে তা দিতে থাকেন আর অনেক প্রাণী লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে, রোদ-জল-ঝড় উপেক্ষা করে আর একবার মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল ও সেই সঙ্গে ইষ্টনাম স্মরণ করে, তারা ভ্রমণের দু-তিনদিন আগেভাগে গিয়েও শূন্য হাতে ফিরি পথে পথে, নাথ হে বল্‌তে বল্‌তে ঘরে ফেরে। দেশের এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য যে পরিমাণ কাঠ-খড় কেরাসিন পোড়াতে হয় তার হিসাব কে রাখে। এর নাম ছুটির সীজ্‌ন। গাড়ি করে যে যাবেন, পথ-ঘাট সব বর্ষায় ভেঙে, খোঁদল হয়ে গেছে, সেই খানা-খন্দরে পড়ে গিয়ে সপরিবারে সশরীরে স্বর্গে গমন করা সহজ হতে পারে। স্পেয়ার টিউব, টায়ার, টুলবক্‌স সঙ্গে নিয়ে স্টেপনি চেক করে ছুটুন। উড়ে যেতে গেলে পাঁচ মাস আগে থেকেই প্ল্যানিং-এর প্রয়োজন। টুরিজম তাই অনেক সুবিধাজনক এবং অসুবিধাজনক, কিন্তু কেই বা বোঝে, ছুটির বাঁশী বেজেছে, কালটির নাম শরৎ, যতই অসুবিধা আর অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ হোক, এর নামই ত আনন্দ, এর নামই ত' উৎসব, আসল কথা কর্ম থেকে পলায়ন, তার পথ যাই-হোক, যে ভাবেই হোক।

।। সুরেন্দ্রজীবনী ।।

মননশীলতা ও কর্মসাধনার বলে ঊনবিংশ শতকে এই ভারতে যে সমস্ত মানুষ নবজাগৃতির প্লাবন এনেছিলেন তার পুরোভাগে ছিলেন বাঙালীরা। সারা ভারত কর্তৃক স্বীকৃত এই সত্যটি মহামতি গোখেল তাঁর "আজ যাহা বাঙলার চিন্তা, কাল তাহা সারা ভারতেরই ধ্যানরূপে দেখা দেয়"—এই কয়টি কথার মধ্যে মূর্ত করে তুলেছিলেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালার মনীষীরা প্রগতির পথে ভারতকে পরিচালিত করাতে ভারতের নব অভ্যুথান সম্ভব হয়েছে। প্রগতিপথের এই সমস্ত পথিকৃৎগণ স্মরণীয় ও বরণীয়; কিন্তু আমরা এতই দুর্ভাগা আত্মবিস্মৃত জাতি যে এই সমস্ত মহাজনদের জীবনালেখ্য আমরা বিস্মৃত হতে বসেছি। আজিকার দিনে তরুণগণ—যারা ভবিষ্যতের আশা ও ভরসা—তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও কর্মধারা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না; কারণ জানবার মতন করে সহজ সরল ভাষায় এঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে রূপ দেবার তেমন কোনও ব্যবস্থা ইতিপূর্বে হয় নি। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ইদানীং এরূপ প্রচেষ্টার সাক্ষ্য পাওয়ার শুভ সূচনা হয়েছে।

কৌতূহলোদ্দীপক মনোরম শৈলীতে এরূপ মহাজনদের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে জীবনীপুস্তক রচনায় যাঁর লেখা প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি হলেন অধুনা লোকান্তরিত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তারপর শ্রীমণি বাগচী কর্তৃক রচিত জীবনীগুলিও খুবই উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সম্প্রতি তাঁর 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ' নামে দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে জীবনীটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাঙলাদেশের একটি অভাব পূরণ হল। 'জাতীয়তার জনক'—এই গৌরবটি একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। অথচ তাঁর সম্পর্কে আমরা এতদিন এমনই উদাসীন ছিলাম যে, তাঁর একটি জীবনীও রচিত পর্যন্ত হয়নি। ইংরাজী ভাষায় লিখিত সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী ও সূর্যকুমার ঘোষালের 'কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ' ভিন্ন সুরেন্দ্রজীবনী বিষয়ে রচিত কোনও পুস্তক ছিল না। ঘোষাল মহাশয়ের পুস্তকখানিও দুষ্প্রাপ্য। যে সুরেন্দ্রনাথ একদা দেশের মুকুটবিহীন সম্রাটের দুর্লভ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ যিনি তরুণদের মনে স্বদেশচেতনা জাগাবার প্রথম পথিকৃৎরূপে যে দেশাত্মবোধ পূর্বে অতি অল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবির মধ্যে সীমিত ছিল তাকে দেশময়

ছড়িয়ে দেবার আয়োজন করে দেশব্যাপী মাতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্ভবপর করে তুলেছিলেন, নিখিল ভারতময় এক ঐক্য-বদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অঞ্চলে অঞ্চলে স্বদেশ-চেতনা জাগিয়ে ভারতে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলন 'ন্যাশনাল কনফারেন্স'-এর বৈঠক সম্ভবপর করে তুলেছিলেন, সেই মহান দেশনায়কের জীবনব্যাপী কর্মকৃতি ও চিন্তা-ভাবনার এক সুন্দর অথচ যথার্থ চিত্র তথা মূল্যায়ন এই পুস্তকে শ্রীমণি বাগচী করেছেন; ফলে সুরেন্দ্রনাথের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দুই-ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সাধনার এই প্রথম সার্থক পূজারীর যে শুধু প্রকৃত মূল্যায়নই এই পুস্তকের একমাত্র বিশেষত্ব তা নয় পরন্তু সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন লেখক নিপুণভাবে করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এদেশে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, সিভিল সার্ভিস হতে বিতাড়িত হওয়ার ফলেই সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থাতেই দেশ সবার্থে তৎকালের দুটি প্রধান আন্দোলনে (মদ্যপান নিবারণী আন্দোলন ও বিধবাবিবাহ আন্দোলন) সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এই সাক্ষ্য রেখে গেছেন যে, সেই তরুণ বয়স থেকেই দেশহিতকারী সকল কাজের সংগেই তাঁর হৃদয়ের যোগ ছিল। আর একটি উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এই যে, প্রথম যুগের সিভিলিয়ান হয়েও তিনি সে সময়ের ইংরেজনবীশদের মতন পুরো সাহেবী পোশাক-পরিচ্ছদে ভূষিত না হয়ে হ্যাট-কোটের পরিবর্তে পার্শি কোট ও বিভার টুপি শোভিত হয়ে এজলাসে বসতেন। সেযুগে এরূপ কাজ এক অসমসাহসিক ব্যাপার ছিল এবং অন্তরে জ্বলন্ত দেশ-প্রীতি ছিল বলেই তিনি বিলেত-ফেরৎ সিভিলিয়ান হয়েও সাহেব না বনে দেশীয় প্রথা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। সে যুগের পক্ষে এ এক ব্যতিক্রম।

সিভিল সার্ভিস ত্যাগের পর যখন তিনি বেকার তখন বিদ্যাসাগরের মহানুভবতায় সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষকবৃত্তি অবলম্বনের সুযোগ পান; কিন্তু তার অনতিকাল পরে যখন তাঁর বন্ধু আনন্দ-মোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী এক নূতন আদর্শে বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠাকল্পে সিটি কলেজ স্থাপন করলেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও দেশসেবার সুযোগলাভার্থে সেই সংস্থার সংগে যুক্ত হলেন। এই সংযোগ হল প্রকৃতপক্ষে মণি-কাঞ্চন সংযোগ; কেননা একেই কেন্দ্র করে ছাত্রমহলে স্বদেশানুভূতি জাগাবার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টায় স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ ম্যাটসিনী-গ্যারিবল্ডির স্বদেশ-সাধনা ও দেশাত্মবোধের কাহিনী প্রচার করে তরুণদের প্রাণে স্বদেশ-চেতনার উদ্বোধন করেন এবং তার মাধ্যমেই সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ। এর অনতিকাল পরে সর্বাংগীণ মুক্তিসাধনার জন্য আনন্দ-মোহন, শিবনাথ, দুর্গামোহন ও দ্বারকানাথ যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হলেন, সেই সময়েই তাঁদের সহযোগিতায় সুরেন্দ্রনাথ এদেশের প্রথম গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্থা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভার প্রতিষ্ঠা করলেন। পূর্বের রাজনৈতিক সংস্থাগুলির ন্যায় এ যে কেবল বুদ্ধিজীবীদের জন্য স্থাপিত হয় নি তার প্রমাণ এই যে, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতসভা কর্তৃক দেশময় রায়ত-গণের মধ্যে চেতনা জাগাবার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী রায়ত আন্দোলন প্রবর্তিত করে রায়তসভা স্থাপন করতে আরম্ভ করে। শ্রমিকদের প্রতি দরদী হয়ে এই সভা থেকে শ্রমিকগণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং প্রথমে সক্রিয়ভাবে ভারতসভা থেকে চা-শ্রমিকদের দাসত্ব-জীবন অবসানকল্পে আন্দোলনের সূচনা হয়। মণিবাবুর পুস্তকে সুরেন্দ্রনাথের বহুমুখী কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণ আছে তবে এই কুলি আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ না থাকায় একটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হল।

আলোচ্য পুস্তকটির সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে মনোভাববশে দেশবাসীর অনাদর এমন কি তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শেষপাদে বৃটিশ শাসনাধীন শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, লেখক সুনিপুণভাবে তার অনিবার্যতার প্রমাণ করে রাষ্ট্রগুরুর প্রতি আমাদের অমার্জনীয় মনোভাবের ভ্রম প্রদর্শন করেছেন। মোটামুটিভাবে পুস্তকখানি যে সুন্দর হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে দুই একটি স্থলে লেখকের মতের সংগে আমার মত মেলেনি।

—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ— শ্রীমণি বাগচি। জিজ্ঞাসা। ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম ছয় টাকা।

প্রাচীন সাহিত্য

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কবির গান

(১৩)

।। কবেল কামিনী সম্প্রদায় ।।

বাংলা সাহিত্যের গতিবেগ যতই বাড়ুক না কেন এখনও তার মহিলা কামরা 'কেবল মহিলাদের জন্য' লিখে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়। সাহিত্য সম্মেলনে এখনও মহিলা শাখার পৃথক অধিবেশন বসে। স্ত্রীজাতীয় লেখকদেরই তাতে নেতৃত্ব করতে ডাকা হয় এবং সে সভার 'সভা' তাও ওই জাতির সীমা লঙ্ঘন করতে ভরসা পায় না। সাহিত্যের এই মহিলা শাখার অধিবেশনে কেবল যে সন্তানপালন, প্রসূতিচর্চা এবং ধাত্রীবিদ্যার বিষয়ই আলোচনা করা হয় এমন নয়, সাহিত্য বলতে যা বোঝায় সবই তাঁরা আলোচনা করেন। তবে এই দ্বৈত সত্তার প্রয়োজন কি?
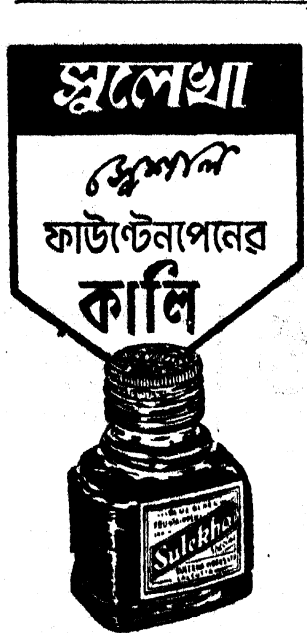
আসল কথা মেয়েদের হাত দিয়ে যা বেরোয় সেটুকুকে আমরা আলাদা করে দেখতে চাই, পুরুষের রচনার সঙ্গে তুলনা করে তার ভাল মন্দ যাচাই করতে চাই, 'মন্দ নয়' কে ভাল বলে একটু উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। সুখের বিষয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই মহিলারা আজ যে কৃতিত্ব অর্জন করছেন পুরুষের তুলনায় তা কোনো অংশেই কম নয়। আশা করা যায় আর বেশী দিন তাঁরা পুরুষের 'পৃষ্ঠপোষণে'র অপেক্ষা রাখবেন না।

ঊনবিংশ শতকে মহিলা কবির কবিতা কাগজে ছাপা হলে আমরা সম্ভ্রমে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হতাম, মহিলা কবিওয়ালার গানের লড়াই শুনেও আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকত না। তবে কবিওয়ালীর সংখ্যা এত বেশী ছিল না যে তাঁদের জীবনী ও রচনা অবলম্বন করে 'বঙ্গের মহিলা কবিওয়ালী' বলে একটা গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন করা চলে। কিন্তু দুচারজন রমণীও যে কবির গানকে বৃত্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং পুরুষ কবিওয়ালাদের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হতে ভয় পেতেন না একথা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে।

বর্তমান প্রবন্ধের নামে যে 'কবেল' শব্দটি দেখছেন ওটি হল 'কবিয়াল' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। কামিনী নামে এক গায়িকা কবির গানে এমন সুখ্যাতি পেয়েছিলেন যে লোকে তাঁর নাম উল্লেখ করতে হলেই 'কবেল' এই বিশেষণটি লাগাত। কবিওয়ালাদের তালিকায় এই 'কবেল কামিনী'র নাম চিরদিনের জন্যে মুদ্রিত থাকবে।

কামিনীর জন্মস্থান খুলনা জেলা। যশোহর-খুলনার ইতিহাসে সতীশচন্দ্র মিত্র এঁর নাম উল্লেখ করেছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইনি বর্তমান ছিলেন। এই 'কবেল' রমণীটি জন্মেছিলেন সমাজের নিতান্ত নিম্নস্তরে। লেখাপড়ার চর্চা সেকালের মেয়েদের মধ্যে তো বেশী ছিল না, বিশেষতঃ তথাকথিত নীচুজাতির মধ্যে। কামিনী সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। অ আ শেখার সুযোগও তাঁর জীবনে ঘটেনি। কিন্তু ঠাকুরদেবতার কথা শুনতে শুনতে অনেক জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন, পৌরাণিক কাহিনী তাঁর অনেক জানা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে কারও কারও কবির দল ছিল। সেই দলের গান শুনতে শুনতে তিনি নিজেও গান রচনা আরম্ভ করেন। গান তো লিখতেন না, মুখে মুখে রচনা করতেন মুখে মুখেই গাইতেন। গান যাঁরা শুনতেন তাঁদের প্রশংসা শুনে বালিকাকবির উৎসাহ ক্রমশ বেড়েই চলল। পরে কবিওয়ালারা আপন আপন দলের জন্যে তাঁর কাছে গানের ফরমায়েশ দিতে লাগলেন। তাঁর নিজের এক বোন-পো ছিলেন, নাম তারাচাঁদ। তারাচাঁদের নিজের এক দল ছিল। মাসীর গান দিয়েই তাঁর দল চলত।

'কবেল কামিনী' আসরে দাঁড়িয়ে গাইতেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু বাঁধনদার হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল বলে নানান কবির দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তাঁর রচিত গান জনগণের কাছেও বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। সে সমাদর গানেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, কবির কাছে পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এই রমণী যখন বর্ষীয়সী হয়েছিলেন তখন দেশের লোক তাঁকে 'কবেল মা' বলে ডাকত। কবি যে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন এই 'কবেল মা' নামকরণই তার বড় পরিচয়।

কবেল কামিনীর গান বেশী পাওয়া যায় নি। যা পাওয়া গেছে সবই শ্যামা সঙ্গীত। আমরা এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

কালো বেটি কত খাঁটি,
সে যে ফুলের মাথার পরে।
চরণ দুটি কত কোটি
চাঁদ সুরুজে আলো করে।
কত শলক, কত রশ্মি
কালী মায়ের পায়।
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে
কালী কালের ঢেউ দেখায়।

আর একটি গান এই রকম :

বলরে কালী মনের কালি
মুছবি যদি সংসারে।
তার মরা বাসি পচা কিছুই
নাইরে তার ঘরে।
সে কালা বেটি দাঁড়ায় খাঁটি
দিয়ে পাটি বাবার ঘাড়ে।
করে না লড়ন চড়ন কিরণ ঘুরণ
জাদু করে রাখে তারে।
বেটির আলোকে প্রাণ আছে তাজা
ডাকরে মন তাই তারে।

ঊনবিংশ শতকের আর একজন মহিলা কবেলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে 'বঙ্গের কবিতা' গ্রন্থে। বলা হয়েছে : "কবিওয়ালা শ্রেণীতে মোহিনী দাসী বলিয়া আর এক স্ত্রীনাম দৃষ্ট হয়।" এঁর বাড়ি ছিল মেদিনীপুর জেলায়। অধ্যাপক নিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে কবির বাসভূমির অঞ্চল থেকে কয়েকটি গান সংগ্রহ

করেছেন বলে লিখেছেন, কিন্তু গান-গুলি ওই গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নি।

'কামিনী' 'মোহিনী'র আগেও মহিলা কবেল অনেক ছিলেন এবং তাঁদের কেউ কেউ দল চালাতেন। অনাথকৃষ্ণ দেব লিখছেন,

"ভোলা ময়রার সময়ে বাংলাদেশে পুরুষ কবিওয়ালা এবং মেয়ে কবি-ওয়ালা—উভয় প্রকার কবির দল প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকের দলেও পুরুষ থাকিত এবং কখনও কখনও পুরুষের দলেও স্ত্রীলোক থাকিত। তবে কবি-ওয়ালার দলে কবিওয়ালী কদাচিৎ দেখা যাইত।"

ভোলা ময়রার সমসাময়িক একজন কবিওয়ালী বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে-ছিলেন। তাঁর নাম যজ্ঞেশ্বরী। শোনা যায় নীলু ঠাকুরের দলে যজ্ঞেশ্বরীর গান গাওয়া হত। এ'র একটি গান এই :

কর্মক্রমে আশ্রমে সখা
হলে যদি অধিষ্ঠান।
হেরে মুখ গেল দুখ
দুটো কথায় কথা বাঁচি প্রাণ।
আমায় বন্দী করে প্রেমে
এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।
আমি কুলবতী নারী
পতি বই আর জানি নে।
এখন অধিনী বলিয়ে ফিরে
নাহি চাও।
ঘরের ধন ফেলে প্রাণ
পরের ধন আগুলে বেড়াও ।।
নাহি চেন ঘর বাসা কি বসন্ত
কি বরষা
সতীরে করে নিরাশা, অসতীর
আশা পুরাও ।।
রাজ্যে থেকে ভার্যের প্রতি
কার্যে না কুলাও ।।

বিখ্যাত কবিওয়ালা রামবসুর সঙ্গে এই স্ত্রীলোকটির অন্তরঙ্গতা ছিল বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। অনুমানের পক্ষে অবশ্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না।

নীলু ঠাকুরের দলে ইনি কতদিন ছিলেন তা জানা যায় না। বেশী দিন ছিলেন না বলেই মনে হয়। কারণ যজ্ঞেশ্বরী নিজে যে একটি দল গড়ে-ছিলেন সে তথ্য অনেক সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

যজ্ঞেশ্বরীর রচিত আর একটি গান এই :

অনেক দিনের পরে সখা তোমারে
দেখতে পেলাম চোখেতে।
ভাল বল দেখি তোমার সখার সংবাদ
ভাল ত আছেন প্রাণেতে।।
তার মান ত নাই এ অধীনীরে
মর্মানার প্রাণধন হয়ে তিনি এখন
ভেসেছেন সুখ-সাগরে।
ভাল সুখে থাকুন তিনি তাতে
ক্ষতি নাই
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের
করাতে।।
বলো বলো প্রাণনাথেরে
বিচ্ছেদকে তাঁর ডেকে না যেতে।
যদি থাকে ধার না হয় শুধেই
আসব তার।
কেন তসিল করে পোড়া
মসিল বরাতে।
আমার হল উদোর বোঝা
বুধোর ঘাড়েতে ।।
তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর
মদন তা বুঝে না বল্লে শুনে না
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।
দেখি 'ধাপ দেশের' পাপ বিচার
দোহাই আর দিব কার
সদা প্রাণ বধে কোকিল কুহুস্বরেতে।।

যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে কোনো কোনো আসরে ভোলা ময়রার যুদ্ধ বেধেছে। স্বভাবতই সেসব যুদ্ধে ভোলানাথই জিতেছেন। যজ্ঞেশ্বরীর গানের ক্ষমতা যতই থাক রচনাচাতুর্য যে খুব বেশী ছিল না উপরের দৃষ্টান্ত দুটি থেকেই তা কতকটা অনুমান করা চলে। ভোলা-নাথের কবিত্ব তো ছিলই তা ছাড়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও কম ছিল না। আর অবাচ্য কুবাচ্যও তাঁর জিহ্বায় আটকাত না। সুতরাং যজ্ঞেশ্বরী কেন, কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষেই কবির আসরে দাঁড়িয়ে ভোলানাথের কাছে পার পাওয়া সহজ নয়। তাছাড়া ভোলানাথের আরও একটা দোষ ছিল, মড়ার উপরেও তিনি খাঁড়ার ঘা না বসিয়ে ছাড়তেন না। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও তাঁর একটু শিভালরি দেখা যায় নি।

এক আসরে ভোলানাথের সম্মুখীন হতে হল যজ্ঞেশ্বরীকে। ভোলানাথের স্বভাব তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। এত লোকের মধ্যে কি বলতে কি বলে ফেলবেন এই চিন্তায় যজ্ঞেশ্বরীর দুর্ভাবনার অন্ত নাই। তাই আসরে দাঁড়িয়েই যজ্ঞেশ্বরী ভোলাকে পুত্র সম্বোধন করে গান ধরলেন। পুত্রের পক্ষে মার সঙ্গে অশালীন রঙ্গরহস্য করা সম্ভব নয়। যজ্ঞেশ্বরীর ধারণা ছিল এই কৌশলে ভোলানাথের মুখ বন্ধ করবেন। কিন্তু ভোলানাথ ভোলবার পাত্র নন। তিনি একেবারে শাস্ত্র ধরে টান দিলেন।

"পঞ্চপিতা সপ্ত মাতা
শাস্ত্রে শুনতে পাই
তুমি আমার গাভীমাতা..."।
ইত্যাদি।

রামবসুর প্রসঙ্গটাও বাদ গেল না।

"তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী
সর্বকার্যে শুভঙ্করী
তোমার ওই পুরনো এঁড়ে
রাম বোস আমার বাপ।"

যজ্ঞেশ্বরী কিছু জবাব দিয়েছিলেন কিনা জানি না। যদি দিয়েও থাকেন তা নিশ্চয় মনে রাখবার যোগ্য নয়। বিস্ময়ের কথা, যে জাতীয় গানের সব-টুকু উদ্ধৃত করতে আমার কলমে বাধছে সেই পঙ্কিল ক্লেদাক্ত খেউড়ই ঊনবিংশ শতকের বাবু এবং তাঁদের পরিষদদলের মনোরঞ্জনের অন্যতম উপকরণ ছিল।
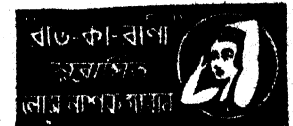
এই বুঝি পলায়ন?

বিষ্ণু দে

এই বুঝি পলায়ন?
যদি নিওন-আলোর ভিড়
ছেড়ে যাও কোনো অমাবস্যার আকাশে,
হাত তোলো হাত বাঁধো চোখে চোখে চেয়ে থাকো
নিষ্কম্প নিবিড় নীলে তারায় তারায়,
নক্ষত্রসমাজে নিজেকে মেলাও চারপাশে,
সংবিতের ছন্দে পাও গ্রহনক্ষত্রের ঘনিষ্ঠ সায়ন?

ধরমতলায় দূস্থ চৌরঙ্গিতে নেই বুঝি
মননের ভিড়ের উষ্ণতা?
সঙ্গজীবী মন তাই আকাশে আকাশে আশ্লেষ কুড়ায়,
তাই, চাঁদের তলায় কিংবা নগ্ন সূর্যে মাঠে বা নদীর তীরে
টিলায়, চূড়ায়, সবুজ মর্মরে ব্যাকুলতা
খুঁজে পায় মানুষের ভিড়,
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রাত্যহিক পরিশ্রমে নেহাৎই লাঙল তাঁতে
সামান্য চৈতন্য বিঁধে সমস্ত চৈতন্য চিরে সংলগ্ন নিয়মে
বহুর এককে, দূরে ও নিকটে একাধারে নিস্পৃহ নিবিড়?
এ কি পলায়ন, এ তো সূর্যে যাত্রা, যাত্রা যমে,
যে জনপদের পথে রৌদ্রে অন্ধকারে মিল,
শেষ মাত্রা যার আকাশেরই নীড়।

সেজন্য যখন ফেরো মাঝে মাঝে লালদীঘি বা ধরমতলায়
কিংবা চৌরঙ্গিতে দামী সরাইখানায়,
তখন সমস্ত মনে দৃশ্য শ্রাব্য স্পৃশ্য গ্রাহ্য
সব কিছু এককের মনীষায় গৈবী কাব্য গায়।
অন্ধকার আকাশে বা রৌদ্রের জ্বালায় দেশকালে
দেখ বুঝি দান্তের মতন আরেক নরক?
কিন্তু দেখ আরেক ভঙ্গীতে, নিঃসঙ্গ, বিশুদ্ধ,
মন ভাস্কর্যে পলায়ন অথবা মজ্জন দুইই বাহ্য।

প্রিয়তমা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

প্রিয়তমা, নিরবধি হিমালাপ এই ভালোবাসা।
জানো নাকি নাটকের অকস্মাৎ বিয়োগান্ত রূপ
টানে শেষ যবনিকা, মঞ্চে মুহুর্মুহু যাওয়া-আসা
থেমে যায়, ভবিতব্য, ভালোবাসা অস্থির তদ্রূপ।

বন্ধু মোর, সিন্ধু নহ, নহ তুমি নয়নের জল।
যন্ত্রণার দগ্ধবালি, অনুভূতি হীরকের ফল।
রাত্রির সোহাগস্পর্শ আনিয়াছে সফল সকাল,
প্রেম মোর প্লানি বহে পুঞ্জীভূত মুক্তা-প্রবাল।

পৃথিবীতে তুমি গড়ো আসক্তির শ্যাওলা-প্রাসাদ;
বিবিক্তির অপরাহ্ণ গা এলায়, ঘোর অবসাদ;
সুদূরতা শুক্লপক্ষ, অনির্দিষ্ট জীবনের সহা,
কেউ কাছে কেউ দূরে, সুনয়নে, চিরকাল বহা।

যীশুর নির্দোষ রক্তে ভাসিয়াছে মনুষ্যত্ব-তরী,
প্রেম যেন নিরবধি প্রবহতা, নিঃসঙ্গ শবরী।

প্রতীক্ষা

অমর ষড়ঙ্গী

বেদনাই সব নয়। তারপরও আছে অন্য কিছু—
কামনা বাসনা আশা
অনেক নির্জন স্বপ্নে, স্বপ্নের কুয়াশা
মন্দাক্রান্তা অতিক্রম করে হাঁটে পিছু পিছু
দক্ষিণী হাওয়ায়, হয়তো বা তার কাছে যাওয়া যেতে পারে
বৈকালিক ঝড়ে।

একাকিনী দরজা খুলে রেখে কার জন্যে প্রতীক্ষিতা?
হৃদয়ের জটিল গ্রন্থিতে,
নিজেই বন্দিনী, কেউ না কেউ আসবে আচম্বিতে
তার ঘরে, ভালোবাসবে গল্প করবে নীলপদ্মমণি
দেবে তাকে উপহার। নিশ্চয়ই সে একাকিনী তখন হবে না
কেউ তা জানবে না।

ঐশ্বর্য চায় না। চায় মুঠো মুঠো ফুল
সাজানো গোছানো ছোট ঘরে
প্রকৃতিকে অনুভব করে
আনন্দ সংগীতে আত্মহারা উদাস ব্যাকুল
চিরকাল থাকবে বসে দরজা খুলে রেখে
কেউ না কেউ আসবে তাকে দেখে।
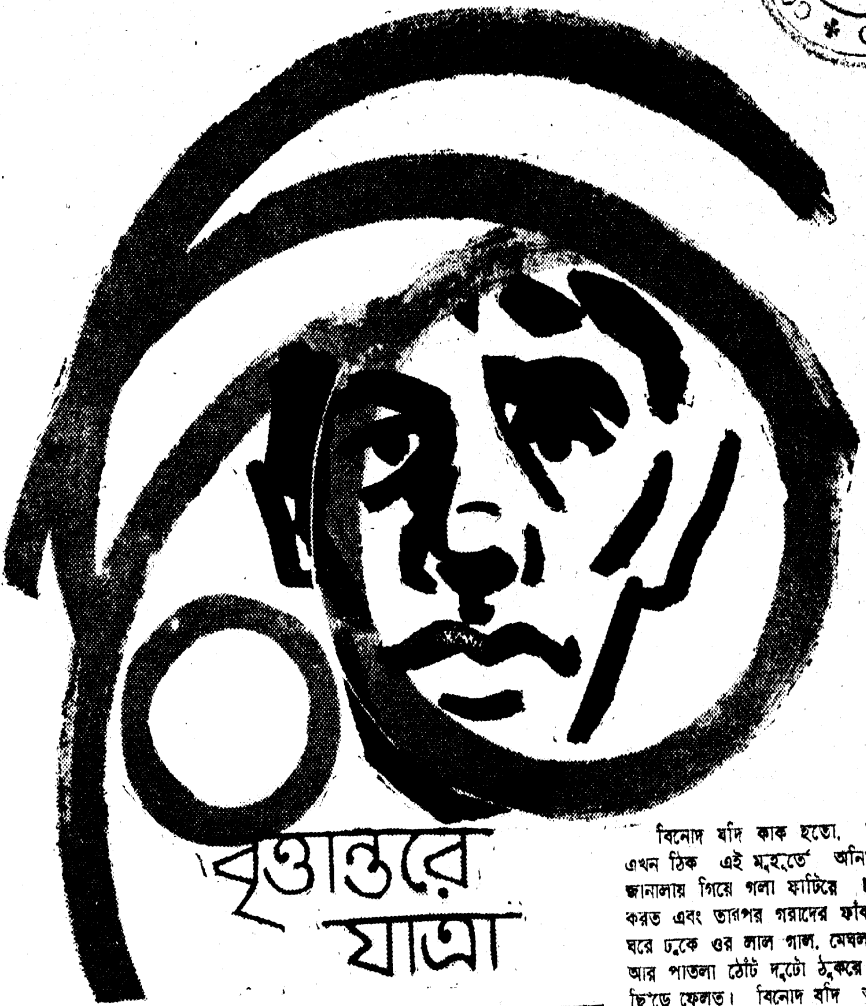
বৃত্তান্তরে যাত্রা

অমরেশ দাশ

উঠবো উঠবো করেও এতোক্ষণ ঘুম থেকে ওঠে নি বিনোদ। কয়েকবার পাশ ফিরে বালিশটা বুকে চেপে পড়ে রয়েছে। উঠলেই অন্যাদিনের মতো বাজারে যেতে হবে। একগাদা লোকের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে বাজার সারতে হবে। অভ্যাস হলেও কাজটা অস্বস্তিকর। এসব কথা ভেবেই আরো কিছুক্ষণ বিছানা আঁকড়ে পড়েছিল সে। এখন বুঝতে পারল উঠতে হবে। রামকিনু সরকার লেনের এই বাড়ীতে চিলে-কোঠা অবধি রোদ্দুরে তাড়া করেছে: কাজেই বেলা হয়েছে। মশারির ভেতর থেকে বিনোদ দেখল, পাশের বাড়ীর অনিমা পড়া মুখস্থ করছে। এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে ও। ওর পড়ার ভাসাভাসা আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছে।

বছর খানেক আগের কথা। সে-ও এমনি উৎসাহে বি-এ পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। আর এখন। ভাবতেই মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। দেরি না-করে উঠে পড়ল। জানালার গরাদ থেকে মশারির দড়ি খুলতে খুলতে দেখল, অনিমা তার দিকে তাকিয়ে। যেন দেখতে পায়নি এমন ভাব করে সে মশারি গুটিয়ে বিছানাটা পাট করে রাখল। র‍্যাক থেকে ছোটো আয়নাটা তুলে মুখটা দেখে নিল একবার। গোঁফের ওপর, কপালে এবং ঠোঁটের কোণে তিনটি ব্রণ পেকে সাদা হয়ে গেছে। আয়নাটা সামনে রেখে একে একে ব্রণ তিনটি গেলে পুঁজ বার করে দিল। ক্ষত জায়গার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে জানালা দিয়ে দেখল, অনিমা তখনো তেমনি তাকিয়ে। বোধহয় হাসছে।

বিনোদ যদি কাক হতো, তাহলে এখন ঠিক এই মুহূর্তে অনিমার ঐ জানালায় গিয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করত এবং তারপর গরাদের ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে ওর লাল গাল, মেঘলা চোখ আর পাতলা ঠোঁট দুটো ঠুকরে ঠুকরে ছিঁড়ে ফেলত। বিনোদ যদি অন্ধকার হতো, তাহলে এই রোদ্দুরের গায়ে থুথু ছিটিয়ে অনিমার নাক, মুখ, প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে ঢুকে ওর সমস্ত মন চিবিয়ে চিবিয়ে খেত। দুর্বোধ্য বিষাদে ভরে উঠল তার মন।

নীচে নেমে এল সে। ভাইঝিদের মাস্টারমশাই এসে গেছেন। রেডিওতে খবর পড়া হচ্ছে। ও-ঘরে মা পুজোয় বসেছেন। আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে বাবা খবরের কাগজটা গিলছেন। অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে কারুর কাগজ পড়তে চাওয়া বেয়াদপি। অন্যাদিনের মতো আজো তার চা ঢাকা দেওয়া আছে। প্লেটটা তুলে কাপে আঙুল ডুবিয়ে সে বুঝ চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রান্নাঘ বৌদির কাছে গিয়ে বলল, চা-টা গর করে দেবে বৌদি? তরকারি নাড় নাড়তে উত্তর দিলেন তিনি, এতো দে করে উঠলে কি আর গরম চা পাওয়া যায় এখন তোমার দাদার অফিসের রান্ন রাঁধবো, না, তোমার চা গরম করে দেবে

বিনোদ কোনো কথা না বলে চলে এল। ঘরে এসে জামাটা গায়ে গলিয়ে থলেটা নিল, দাদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজারে বেরিয়ে পড়ল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চা না পেলে বিনোদের মেজাজ খোলে না। রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই মোড়ের চায়ের দোকানটায় ঢুকে পড়ল। এক কাপ চা দিতে বলে কাগজটা নিয়ে বসল। প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা খবরের শিরোনামাটা পড়ল—"বৃহত্তর তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ"। প্রতিটি খবরের শিরোনামা পড়ে খেলার খবর এবং সিনেমার পাতাটায় চোখ বুলিয়ে কাগজটা বন্ধ করল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিস্বাদে মুখটা কুঁচকে বলল, কিরে কেষ্ট, আজকাল চাতে কি চিনির বদলে নুন দিচ্ছিস?

কেষ্ট সবিনয়ে উত্তর দিল, না বাবু, তা কি কখনো হয়! কলের জলের চা কিনা—তাই নোনতা লাগতে পারে।

সকাল হতে না হতেই চোখধাঁধানো রোদ্দুর উঠেছে। কেমন যেন শ্রীহীন কাঠিন্য। চারমিনারে আগুন দিয়ে এক-গাল ধোঁয়া ছাড়ল সে। কড়া তামাকের গন্ধে স্নায়ুগুলো চঞ্চল হল। ভালো লাগল। চায়ের দাম মিটিয়ে বাজারে বেরিয়ে পড়ল।

অনেকে বাজারে চলেছে, অনেকে বাজার করে ফিরছে। বাজার-ফেরতাদের অবস্থা সুবিধের নয়; ঘর্মাক্ত কলেবর। ভর্তি থলি নিয়ে কেউ কেউ চলতে পারছে না, একবার এ-হাত, একবার ও-হাত করছে। নিতান্ত গতানুগতিক পরি-চিত দৃশ্য। চলতে চলতে বাজার-ফেরতা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল বিনোদের। সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত তুলে নমস্কার করল। ভদ্রলোক সেদিকে না তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বললেন, দেখে চলতে পারেন না মশাই।

—মাফ করবেন; অন্যমনস্ক ছিলাম, লেগে গেছে।

কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে গেল বিনোদ। ভদ্রলোক এখনো দাঁড়িয়ে। আশেপাশে ক-একজন লোক জমে গেছে। বিনোদ মনে মনে বলল, আজ নিশ্চয়ই মাছের দর খুব চড়া।

দুপাশের ফুটপাথের দোকান দেখতে দেখতে বাজারে ঢুকে পড়ল। মিলিত কণ্ঠে এক অদ্ভুত আওয়াজ উঠছে। সকলেই ব্যস্ত। এখানে এলে মানুষের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। সকলের প্রকৃতিই এখানে এক। কেউ দর কষাকষি করে, কেউ মাছওয়ালার কাছে ফাউ চায়, কেউ দাঁড়িয়ে পাসান দেখে। সবাই সস্তা খোঁজে; তাড়াতাড়ি বেরুতে পারলে বাঁচে। বিনোদ বাজারে এসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এখানে দিনে অন্তত একবার সে জীবনের চাঞ্চল্য অনুভব করে। প্রথম প্রথম ভালোই লাগত বাজার করতে। এখন মনে হয়, দায় থেকে কোনোরকম রেহাই পেলে হয়!

চলতে চলতে ক্লান্তিবোধ করছিল বিনোদ। থলেটা বইতে কষ্ট বোধ হচ্ছিল। বাজার করতে অন্যদিনের চেয়ে আজ দেরি হয়েছে। ইতিমধ্যে রাস্তার চেহারা গেছে পাল্টে। জনে জনে সকলে বেরিয়ে পড়ছে অফিসের উদ্দেশ্যে; পড়ি-মরি করে ছুটেছে সবাই কর্মব্যস্ত; ক্লান্তিকর গতানুগতিক হলেও তাতে প্রাণ আছে। অনুরূপ কোনো ব্যস্ততা বিনোদের নেই। আর একটু হলেই একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগত তার। পাশ দিয়ে হন্ত-দন্ত হয়ে চলে গেলেন এক ভদ্রলোক। অতো জোরে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে রাস্তার প্রতিটি মানুষকে লক্ষ্য করছে। সকলের সঙ্গে কোথায় যেন তার একটা পার্থক্য অনুভব করছে। হাতের থলে প্রতি মুহূর্তে শ্লথ হয়ে আসছে। হাঁটু মুড়ে বসে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে রাস্তার ওপর। কাতারে কাতারে লোক চলছে; কেউ কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপও করছে না। মানুষের এই বিচ্ছিন্নতা তার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হল। অমন বিচ্ছিন্ন ভাবে সে চলতে পারে না। পথ চলতে চলতে প্রতিটি মানুষকে সে লক্ষ্য করে।

বাড়ীর কাছে আসতেই বিনোদ পকেটের পয়সাগুলোর হিসেব করে নিল। পঁচিশ নয়া-পয়সা ম্যানেজ করা গেছে। মানে, এক প্যাকেট চারমিনার, এক কাপ চা, এবং আরো কিছু।

বাড়ীতে ঢুকে সে বাজারের থলেটা বৌদির হাতে তুলে দিল। দাদা-মেজদা বেরিয়ে পড়েছেন জেনে একটু নিশ্চিন্ত হল। মাছ বার করেই বৌদি বললেন, এইটুকু মাছ এনেছো ঠাকুরপো, বারোটি পেট কি এতে চলে?

বিরক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল সে, আধসের মাছ আছে এখানে; এক টাকা পঁচাত্তর নয়াপয়সা দাম।

—কি দরকার ছিল এতো দামের মাছ আনবার! অতোই যদি সখ থাকে ভালো মাছ খাবার, তাহলে নিজে রোজগার করে খেয়ো। বৌদির গলা বেজে উঠল।

বাজারের ক্লান্তি তখনো কাটেনি। তারওপর বৌদির বাঁকা কথা অসহ্য মনে হল বিনোদের। বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল তাই। মোড়ের চা-এর দোকানটায় গিয়ে বসল। বৌদির কথাগুলো কানে বাজছে। মাঝে মাঝে ভাবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়বে, যেখানে খুশি চলে যাবে। সব সহ্য করতে পারে সে, কিন্তু মেয়েদের এ-ধরণের ইঙ্গিত সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, পৌরুষকে আঘাত করে মনে মনে খুশি হয় ওরা। সে লক্ষ্য করেছে, তার বর্তমান বেকারত্বের অজুহাতে বৌদি এবং অন্যান্য অনেকে তার অক্ষমতাকে প্রমাণ করতে সচেষ্ট। অথচ তাঁদের একথা কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে, ইচ্ছে করলেই কেউ চাকরি করতে পারে না।

দোকানটায় আরো কয়েকজন এসে বসেছে। বিনোদের সঙ্গীও আছে কজন। যারা এসেছে তাদের সকলের একই অবস্থা। বাড়ীতে থাকতে না পেরে চলে এসেছে এই দোকানটায়। সকাল থেকে একে একে এখানে জড় হয়। তারপর বেলা বারোটা পর্যন্ত আড্ডা চলে। আড্ডা ঠিক বলা যায় না; এক-আধ কাপ চা খায়, আর সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ায়। মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা ছুঁড়ে দেয় কেউ; রাস্তায় কোনো মেয়ে দেখে অযাচিত মন্তব্য করে।

এভাবে বসে থাকার কথা ভাবলে বিনোদ আশ্চর্য হয়ে যায়। কিছুদিন আগেও তার পক্ষে এখানে এভাবে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। পড়াশুনোর ব্যস্ত-তায় দিনরাত্রি ভরে ছিল। কিন্তু এখানে যারা বসে তারা সকলে তারই মতো। তাদের জীবনে কোনো ব্যস্ততা নেই, কর্মচাঞ্চল্য নেই—নিখাদ শূন্যতা। সময় কাটানো তাদের কাছে এক সমস্যা। তাদের কাছে দিন-রাত্রির সময়-দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। একবার আকাশে সূর্য উঠলে পশ্চিম আর নামতে চায় না।

বিনোদ এখানে বসে বসে রাস্তার মানুষ দেখে। কোনো কাজ না থাকায় নানা উৎকেন্দ্রিক ভাবনায় জড়িয়ে পড়ে। এখানে বসে তার মনে হয়েছে পুরুষেরা সব নেড়ি-কুকুর। নেড়ি-কুকুরের মতো তাদের ছুঁচলো মুখ সর্বদাই বিষন্ন, ভাটা-পড়া চাহনি, চোখের কোণে পিচুটি, তার সারা মুখে ডাস্টবিনে-ডাস্টবিনে ঘোরার ক্লান্তির ছাপ। উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য। বিনোদ মনে করতে পারে না, কটা পুরুষ সে দেখেছে যাদের মুখে শান্তি ও তৃপ্তির ইঙ্গিত পেয়েছে। প্রথম প্রথম সে মেয়েদের দিকে তাকানো ভালো মনে করত না। এখন বুঝেছে ওটা স্বভাব। দোকানে বসে এমনি নানা কথা মনে হয়। মাঝে মাঝে নিজের ওপর বিতৃষ্ণা হয়ে ওঠে। কারণ প্রতি মুহূর্তে অনু-ভব করছে, সে কিছু করতে পারছে না। আর কিছু করতে পারছে না বলেই সকলে তাকে বিদ্রূপ করে, তার অক্ষমতা প্রমাণ করতে প্রয়াস পায়।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হলো। একে একে অনেকেই উঠে গেছে। বিনোদও উঠে পড়ল। রাস্তার পিচ গলতে শুরু করেছে। ফাঁকা রাস্তায় মাঝে মাঝে দু-একটি বাস ছাড়া লোকজন বিশেষ চোখে পড়ে না।

দুপুর যেন একটা বিরাট পাইথন। পাইথন যখন একবারে অতিরিক্ত গলাধঃ-করণ করে তখন আর চলতে পারে না; বিরাট দেহটা মাটিতে বিছিয়ে বিশ্রাম

নেয়। দুপুরও তেমনি সকাল থেকে শহরের সমস্ত মানুষগুলোকে গিলে এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর চলতে পারছে না।

এমনি কতো বিনোদ কাটিয়েছে। সময় না কাটতে চাইলেও জোর করে বসে থেকেছে দোকানে। বাধ্য হয়েছে বসে থাকতে। কখনো পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে। সময় সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়েছে। এটা বিনোদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়; আপনিই হয়ে গেছে। এ যেন জীবনের ধীর লয়ের সঙ্গে মাথা নেড়ে তাল দেওয়া। প্রথম প্রথম এখানে-সেখানে ঘুরে বেরিয়েছে। এখন তাও ভালো লাগে না। রোজ সকালে দোকানে এসে বসে, রাস্তার মানুষ দেখে দেখে কোনোরকমে কাটিয়ে দেয়।

সাড়ে বারোটায় জল এসেছে। বিনোদ তাড়াতাড়ি স্নান সেরে মাকে ভাত বাড়তে বলল। খেতে বসে কোনো কথা না বলাই তার ইচ্ছে। কিন্তু তা হবার জো নেই। এই সময় মার সঙ্গে তার নানা কথা হয়। মা জিজ্ঞেস করেন, উত্তর না দিয়ে থাকা যায় না। কিন্তু বাড়ীর কারুর সঙ্গেই বেশি কথা বলতে সে চায় না। বেশি কথা বললেই অসন্তোষ বাড়ে। স্বভাবতই ব্যবহার ভালো থাকে না। মা ভাত বাড়তে বাড়তে জিজ্ঞেস করলেন, এতোক্ষণ কোথায় ছিলি?

—এই এখানেই। বিনোদ জড়ানো গলায় উত্তর দিল।

—এখানেই মানে তো ঐ চায়ের দোকানটায়। কেন, ওখানে বসে আড্ডা না দিলে চলে না।

—কি করবো?

—কেন, ঐ সময়টা তো চাকরি-বাকরির খোঁজ করলেও পারিস।

—চাকরি তো আর আমার জন্যে বসে নেই, যে গেলেই পাবো।

—তা কি কখনো কেউ পায় নাকি। খোঁজ করতে করতে জুটে যায় একটা।

—খোঁজটা ঘুরে ঘুরে না করলেও চলে। কত তো দরখাস্ত করলাম; কই কোনো কিছু তো হলো না।

—তাছাড়া এক-আধটা টিউশনিও করতে পারিস। এভাবে আর কতদিন চলবে?

—আমাদের কপালে টিউশনিও জোটে না। সকলেই আজকাল সায়েন্সের মাস্টার চায়; বি-এ পাস তাদের পছন্দ হয় না।

—কি জানি বাপু, ওসব বুঝি না।

কোনো উত্তর না দিয়ে একমনে খেতে থাকে বিনোদ। মা-ও চুপ করে থান। খাওয়া শেষ হলে বলেন, একটা কিছু কর বিনোদ।

"একটা কিছু কর বিনোদ"—কথাটা নতুন নয়। অনেকবার শুনেছে, নিজেও ভেবেছে। একটা কিছু করা যে দরকার একথা সে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে। মাঝে মাঝে আবেগের প্রাবল্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় সেই মুহূর্তেই কিছু করে ফেলতে। যাহোক কিছু একটা করা এমনি বসে থাকার চেয়ে ভালো মনে হয় তার কাছে। ভালো হোক, মন্দ হোক, একটা কিছু করার উন্মাদনা পেয়ে বসে তাকে। কিন্তু তা সাময়িক। সব কথা ভেবে আপনিই চুপসে যায়। বুঝতে পারে, ইচ্ছে থাকলেও কোনো খারাপ কাজ সে করতে পারবে না। অথচ ভালো কাজ করার সুযোগও জোটে না। এ এক অসহ্য অবস্থা। কিছু করতে না পারায় যন্ত্রণায় ছটফট করে। বাতাসে শুনতে পায়—"একটা কিছু কর বিনোদ"। দেয়ালে দেয়ালে ঐ একই কথা দেখতে পায়। যার দিকে তাকায়, মনে হয়, সে-ই যেন বলছে—"একটা কিছু কর বিনোদ"। চোখ বুজলেও ঐ একই ভাবনা জড়িয়ে ধরে। রাস্তায় অফিসযাত্রীদের দেখে ঐ কথাই মনে হয়। দিনে-রাত্রে, ঘরে-বাইরে, মুখে-মনে সর্বত্র ঐ একই ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে।

একটা ফাঁকা অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে সমস্ত পৃথিবী শুধু একটি নির্দেশই দিচ্ছে তাকে। সেই নির্দেশ বন্ধ দরজায় দেয়ালে আঘাত পেয়ে পেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বাইরে বেরুবার কোনো উপায় নেই। শত চেষ্টা করেও ঐ ঘর থেকে মুক্তি পায় না বিনোদ। ইচ্ছাকে দমিত করে, প্রাণকে উপোসী রাখে।

দরজায় খিল তুলল; একটা সিগারেট ধরাল। তক্তপোশের ওপর মাদুর পাতা। বালিশটা মাথার তলায় ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটুও হাওয়া নেই। অসহ্য গুমোট। সিগারেট টানতে ভালো লাগছে না। মাদুরের ওপর শুয়ে অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করে বিনোদ চুপ মেরে গেল। মাদুরে শুয়ে আছে বলে বোধ হচ্ছে না। কে যেন শজারুর ছাল ছড়িয়ে-বিছিয়ে দিয়েছে তক্তপোশের ওপর। পিঠে বিঁধছে কাঁটাগুলো। একবার ভাবল উঠে পড়বে। বেরিয়ে কোথাও কোনো গাছের তলায় গিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকবে। কিন্তু কাছাকাছি তেমন জায়গাও নেই। আর দুপুরে বেশিদূর যেতেও ইচ্ছে হয় না। অগত্যা দৈনিক পত্রিকাটি টেনে নিল।

রোদ্দুর এতোক্ষণে মিত্তির-বাড়ীর ছাদ থেকে পা-পিছলে এই জানালায় গরাদ ধরে ঝুলছে। একফালি রোদ মুখ-থুবড়ে পড়ে আছে বিনোদের পায়ের ওপর। উঠে জানালাটা বন্ধ করল তাই।

দুপুরটা যেন পূর্ণগর্ভ মেয়েমানুষ। শত প্রয়োজনেও তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না। কখনো কোমরে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, কখনো দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে হাঁটছে।

সারা দুপুর গরমে ছটফট করে বিকেলে আরাম বোধ হয়। অন্য সময়ের চেয়ে এখনকার বিকেল একটু বড়ো। তবু বিনোদের মনে হয় বিকেলটা যদি একটু বড়ো হতো—ভালো হতো। এই রেলওয়ে হাসপাতালের মাঠে রোজ বিকেলে তারা কয়েকজন এসে বসে। পাশে খেলার মাঠ থাকতেও যায় না। কেননা বড্ড ভিড় আর গোলমাল। তার চেয়ে অনেক ভালো এই মাঠ। তাদেরই মতো অন্য কি দুটো দল মাঝে মাঝে
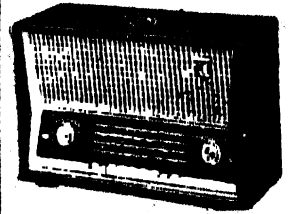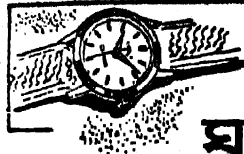
আসে। সবুজ মাঠে তিন-চারটে লম্বা পাম গাছ। কয়েকটা একতলা বাড়ী নিয়ে ছোট্টো হাসপাতাল। কোনো গোলমাল নেই, চাঞ্চল্য নেই। আকাঙ্ক্ষীত নীরবতায় সমস্ত পরিবেশ আচ্ছন্ন।

বিকেলে বিনোদ এবং তার বন্ধুরো এখানে সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে গল্প করে। একই কথার পুনরাবৃত্তি চলে। কথা ফুরিয়ে গেলে সিগারেট ধরায়, আকাশে নীড়গামী পাখীদের দু'চোখ ভরে দেখে। এই নিস্তব্ধ মাঠ তাদের মৌন মনের দোসর। মাঠটা যেন সব বোঝে; তাই চুপ করে শুয়ে থাকে। এমন কি গাছের পাতাও চুপি চুপি কথা বলে— যাতে কেউ শুনতে না পায়।

বিনোদ মাঠে এসে দেখল সবাই বসে। শংকর সকলের হাত দেখছে। পাশে বাঁ-হাতের ওপর ভর করে শুয়ে রবীন। বিনোদ পাশে গিয়ে বসল। সকলে একবার তাকে দেখে নিয়ে আগের মতোই কমলের হাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

—আর কি জানতে চাস?

—দেখে যা মনে হয় বলে যা।

—আপাতত কোনো পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না।

—"ডব্লু, পি, এস, সি" দিয়েছি: দ্যাখ তো পাস করবো কিনা।

—পাস বোধ হয় করে যাবি। তবে এসব কথা হাতের রেখা দেখে ঠিক বলা যায় না।

—ওর কেসটা একবার দ্যাখ তো। বিজ্ঞের মতো বলল রবীন।

—কেস ভালোই, জমে গেছে। তবে—ধোপে টিঁকবে কিনা সন্দেহ।

—মানে, আমাদের সব বুঝি ফালতু ভাবছিস! থাক, আর হাত দেখে কাজ নেই।

—এই তো! তুই একেবারে সেণ্টিমেণ্টাল। তোর দিক থেকে গড়বড় হবে না; তবে—না থাক বলবো না।

—বল না, না বললে মনটা মাইরি খুঁতখুঁত করবে।

—তোর লাইন ক্লিয়ার হতে এখনো বছর চারেক সময় লাগবে। তদ্দিনে তোর ইয়ের বিয়ে হয়ে যাবে।

—হলেই হলো! ও বিয়ে করবে না।

—মেয়েদের তুই চিনিস না। কত কেস্ দেখলাম; প্রথম প্রথম সব একেবারে সাচ্চা! শেষে পয়সাওলা বর জুটলে সব শালী ভুলে যায়।

বিষণ্ণভাবে হাতটা টেনে নিল কমল। একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়ল। বিনোদ চুপচাপ হাতটা বাড়িয়ে ধরল।

—তোর আবার কি হল? গত সপ্তাহে না দেখেছি!

—এক সপ্তাহে অনেক বদলে গেছে পৃথিবীটা।

—তাই বলে কি তোর হাতের রেখা বদলেছে?

—দ্যাখ।

—কি দেখবো?

—চাকরি।

কিছুক্ষণ কোনো কথা বলে না শংকর। বলার কিছু নেই। এর আগে বহুবার সে এই হাত দেখেছে। এবং এই একই প্রশ্নের একই জবাব দিয়েছে। কী আশ্চর্য মানুষের মন। তবু মনে করে হাতের রেখায় সব লেখা আছে। সত্যি কথা বলতে কি শংকর এখন হাত দেখছে না। দেখার ভান করছে। কেননা এই হাতের সমস্ত রেখা তার মুখস্থ।

—নারে, এখনো তেমন কোনো লক্ষণ দেখছি না।

—তা দেখবি কেন, দেখবি কে কার সংগে প্রেম করছে!

—আরে শালা, রেখা না থাকলে আমি কি বানিয়ে বলবো?

—থাক আর জ্ঞান দিতে হবে না। মনমেজাজ ভালো না।

—মেজাজ যে খারাপ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বাড়ীতে ঝগড়া করেছিস?

ঝগড়া করবো কেন। আমি কোনো কথা বললেই সকলের গা জ্বলে ওঠে।

—তা এখন কিছুদিন জ্বলবে। পয়সা আয় করলে দেখবি তারাই তখন তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে।

—তাই মনে হয়, দুনিয়াটা টোটালি হলেই ভালো হতো। মানুষগুলো যতো সব ঝঞ্ঝাটের মূল।

—কোনো মেয়েকে ভালোবেসে ফেল; দেখবি মেজাজ আপসে ভালো হয়ে গেছে। রবীন বিজ্ঞের চালে কথাগুলো বলে সিগারেটে টান দিল।

—তুই তো শুধু মেয়েদেরই চিনেছিস! প্রেম-টেম আমি বুঝি না; ওসব আমার দ্বারা হবে না।

—বোঝবার দরকার নেই। কাজ করে যা, তাহলেই হবে।

—ফালতু বকিস না।

দমে যায় রবীন। ভাবে, কোনো সাহস নেই। মেয়েদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে, অথচ ভালোবাসাতে পারবে না যতো সব ছ্যাবলামো!

—পড়াশুনোটা আবার শুরু কর। আস্তে বলল শংকর।

—না, ও আর হবে না।

—আমি বলছি, হবে।

—তুমি তো সবজান্তা। ছাড় হাত দেখতে হবে না। সুযোগ পেলে জ্ঞান দিতে কেউ ছাড়ে না! হাত ছাড়িয়ে শুয়ে পড়ল বিনোদ।

সকলে চুপ। যে যার মতো শুয়ে। কেউ আকাশের দিকে তাকিয়ে, কেউ দূরবর্তী ছাদে চোখ রেখে, কেউ হাসপাতালের জানালায় চোখ মেলে। বিকেল হলেই হাসপাতালের জানালাগুলোর পর্দা সরে যায়। অল্প কয়েকটা বেডের মানুষগুলো যে যার বিছানায় উঠে বসে। অনেকে জানালার ধারে এসে বসে, আকাশটাকে দেখে। মানুষগুলো একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন। নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে-বসে নিঃসংগতার সমুদ্রমন্থন করে চলে। দিনের শেষে উত্থিত হতাশ্বাস নিয়ে জানালার ভেতর দিয়ে কর্মমুখর পৃথিবীকে অনুভব করে।

এই হাসপাতালের রোগীদের সংগে বিনোদের একটা সামঞ্জস্য আছে। ওদের মতো সে-ও অসুস্থ। অসুস্থতার ভান নয়, সত্যি সত্যি সে অসুস্থ। তফাত শুধু—ওদের নাম হাসপাতালের রেজিস্টারে লেখা; বিনোদের নাম কখনো লেখা হবে না। অথচ সে অসুস্থ।

রবীন উল্টোদিকে মুখ করে এক বাড়ীর ছাদের দিকে তাকিয়ে। দুটি মেয়ে ছাদের ওপর থেকে এদিকেই দেখছে। রবীনকে ধাক্কা দিয়ে বিনোদ বলল, কিরে জন্মে কখনো মেয়ে দেখিস নি?

—দেখেছি; তবে এ দুটো একটু অন্যরকম।

আকাশটা এখানে এখন অনেক নিবিড়। এই আকাশে চোখ ভাসাতে ভালো লাগে; অবশ্য নিজেকে আরো একা এবং অসহায় বোধ করে বিনোদ। তাই যখন আর চুপ করে থাকতে পারে না, তখন গায়ে পড়ে কথা বলে। যে যার ভাবনায় মশগুল হয়ে থাকলেও সে পারে না। ভাবনার জাল বুনে মানসিক অবসাদ ছাড়া আর কিছু পায় না সে।

রবীন নাকি একজনকে ভালোবাসে। কথাটা বিশ্বাস হয় না বিনোদের। রবীন হয়তো ভালোবাসার স্বপ্ন দেখতে পারে; কারণ, এখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ইডেনে বা লেকে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ভীষণ ইচ্ছে ছিল বিনোদের। এখন সেকথা কল্পনা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় পাটকাঠি দিয়ে সাবানের ফেনা টেনে আকাশে উড়িয়ে দিলে তার মধ্যে অনেক রঙ দেখতে পেত।

—একটা সিগারেট দে তো!

পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেটটা বার করে বিনোদের দিকে এগিয়ে দিল শংকর।

—অনেক দিন সিনেমা দেখিনি; দেখাবি?

—পয়সা নেই।

শংকর জানত বিনোদ একথা বলবে। কেননা বরাবর সে ঐ একই কথা বলে; পয়সা তার পকেটে থাকে না।

—আর ভালো লাগছে না। চল, একটু হেঁটে আসা যাক।

উঠে বসল কমল। সামনেই রাস্তা।

হাসপাতালের পাশেই রাস্তা বলে গাড়ী-ঘোড়ার বেশি চল নেই।

—এই তো বেশ আছি।

ওঠার কোনো লক্ষণ না দেখিয়ে বিনোদ মেজাজে সিগারেট টান দিল। এখান থেকে উঠতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছে না তার। বেশ শান্ত পরিবেশ। খেলার মাঠের গোলমাল থেমে গেছে। আকাশ থেকে গুটি গুটি পায়ে নেবে এসেছে অন্ধকার। হাসপাতালের ঘরগুলোয় আলো জ্বলছে। অদূরে রাস্তার আলোর আভাস। অথচ এই মাঠ, এই পামগাছের তলা এখন পুরোপুরি অন্ধকার। এখানে আলো জ্বলবে না।

রবীন ও কমল চলে গেল। ওদের টিউশানি আছে। একটু পরে এই অন্ধকার আরো ঘন হবে, আরো আপন হবে;—

রাত বাড়বে। বসন্তের গুটির মতো তারা উঠবে আকাশে।

হাসপাতালের ঘণ্টা বাজল। রোগীদের রাতের খাবার সময় হয়েছে। বিনোদ আর শংকর অন্ধকারে শুয়ে। বাড়ী যেতে মন চায় না। বরং বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। সব সম্পর্ক থেকে দূরে যেতে পারলে ভালো হয়।

এমনি নির্জনে বসে বিনোদ আত্ম-বিশ্লেষণ করে। কতদিন ভেবেছে, চলে যাবে কোনো দূরগ্রামে। একটা স্কুল-মাস্টারী জুটলেই যাবে। বাড়ী থেকে দূরে দুটো কম পয়সা পেলেও ক্ষতি নেই! কিন্তু ভাবনাগুলো মাকড়সার জালের মতো। একটু জোরে বাতাস বইলেই ছিঁড়ে যায়।

না, না, না। তা হয় না; কি সুন্দর আকাশ, অন্ধকার কত আপন। পৃথিবীতে মানুষ এখনও আছে, থাকবে। তারা হাসবে, কাঁদবে, ভালোবাসবে, ঝগড়া করবে। গরুর গাড়ীর বলদের মতো জোয়াল টেনে টেনে মুখে ফেনা তুলে একসময় হাঁটু মুড়ে বসে পড়বে। বহুদিনের উঁচু মাথা আস্তে আস্তে নত হয়ে যাবে।

চঞ্চল হয়ে উঠল বিনোদ। আর্দ্র কণ্ঠে বলল, শংকর।

—উ।

—কথা বলছিস না কেন?

—বেশ ভালো লাগছে, না?

—ভালো! কি জানি। চুপ করে থাকলে কেমন যেন লাগে।

—বেশ ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে রে। বাড়ী ঢুকলে বাতাসও মাইরি পর হয়ে যায়।

একটা হাত বাড়িয়ে শংকরকে জড়িয়ে ধরল বিনোদ। সারাক্ষণ যদি দুজনে এমনি শুয়ে থাকতে পারতো! ভাবতেও ভালো লাগে। বাড়ীতে হয়তো এখন হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেছে। দাদা-মেজদা অফিস থেকে ফিরেছেন। বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে রাগে ছেলে-মেয়েগুলোর ওপর কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছেন দাদা। তারস্বরে চীৎকার করছে ওরা। কী চেঁচায় মেয়েগুলো!

বিনোদ যদি ওদের মতো হতো তাহলে এমনিতেই চেঁচাতো। মাঝে মাঝে চীৎকার করতে ইচ্ছে হয়। তারপর মনে হয় সকলে কি ভাববে। প্রাণ খুলে চীৎকার করাও অসভ্যতা! কিন্তু কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়। ফাঁকা মাঠে এক একটা গাছ কেমন নীরবে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকে—বহুদূরে আবছায়ার মতো যে গাছটা দেখা যায় তার দিকে চেয়ে। যদি সম্ভব হতো তেমনি নীরব থাকা তাহলে বিনোদ একটি কথাও বলত না। কিন্তু তার মন আছে, মস্তিষ্ক আছে। এই হয়েছে মুশকিল।

সে যদি বোবা হতো, তবে, সমস্ত জ্বালা বুকের মধ্যে পুষে রাখতে কষ্ট হতো না। না, ভুল ধারণা তার। সেটা আরো অসহ্য, আরো কষ্টকর। পৃথিবী তো বোবা! মনের আগুন যখন চেপে রাখতে পারে না, তখন ঘটে দুর্ঘট। আকাশ যখন যন্ত্রণায় ফেটে পড়ে তখন জ্বলে আগুন। বোবাদেরও অনুরূপ অবস্থা। বোবাদের স্কুলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করেছে সে। ওদের চোখে ভীষণ যন্ত্রণা; জানালার গরাদ ধরে ওরা যখন রাস্তার দিকে তাকায় তখন ওদের চোখে কান্না ঝরে পড়ে। না, বিনোদ বোবা হতে চায় না। সে কথা বলতে চায়, প্রাণ খুলে হাসতে চায়, মন খালি করে কাঁদতে চায়, গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে চায়।

—শংকর, চল কোথাও কদিন ঘুরে আসি।

—পয়সা পাবি কোথায়?

—যেখান থেকে হোক যোগাড় করবো। এখানে এভাবে বেশি দিন থাকলে পাগল হয়ে যাবো। উঃ! কতদিন কোথাও যাইনি—

—একটু পর দেখবি, বেরুবার কথা মনে থাকবে না। মাঝে মাঝে এমন হয়। নে, সিগারেট খা।

সিগারেটের ধোঁয়ার মতো জট পাকিয়ে পাকিয়ে যন্ত্রণা উঠছে বিনোদের বুকে। সে উঠে বসল।

বহুদিন আগে একবার সে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। বাবা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলেন এক জায়গায়, ছেড়ে দিয়েছিলেন তাকে। সে উন্মাদের মতো ছুটে বেড়িয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে চলে গিয়েছিল অনেক দূরে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। বিরাট দৈত্যের মতো অন্ধকার পা ছড়িয়ে বসে পড়েছিল পৃথিবীর ওপর। অনেক চেষ্টা করেও সেই দৈত্যটার পা ডিঙোতে পারে নি সে। তারপর এক সময় ভয়ে কেঁদে উঠেছিল। আর তার কান্না শুনে পাহাড় ফাটিয়ে হেসে উঠেছিল অন্ধকার।........ বিনোদের মনে পড়ল।

রাত অনেক হয়েছে। হাসপাতালের

দারোয়ান এসে উঠতে বলে গেছে। আর থাকতে দেবে না এখানে। এখন উঠতে হবে, যেতে হবে। উঠে পড়ল দুজন। কোনো কথা না বলে পাশাপাশি হাঁটল। রাস্তার মোড়ে এসে দুজনে দুজনের পথ ধরল।

যে শহর সেই সকাল থেকে এতোক্ষণ কলমুখর ছিল এখন নিস্তব্ধ, শান্ত। দোকান ঘরগুলোর বন্ধ দরজায় চাপ চাপ অন্ধকার। ফুটপাথের অধিবাসীরা ছেঁড়া কাঁথা বিছিয়ে শুতে শুরু করেছে। রাস্তার আলোগুলো একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। রাত্রি মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়েছে শহরটাকে। রূপকথার গল্প ফাঁদতে ফাঁদতে চুলে বিলি কেটে ঘুম পাড়াচ্ছে। ঘুমে ঢুলু-ঢুলু শহর। অথচ এই মা'র কোনো চিন্তা নেই বিনোদের মতো যুবকের জন্যে। ঘুম তো দূরের কথা, আদর করে কাছেও ডাকছে না। বিনোদ খুব সন্ত-র্পণে বাড়ীতে ঢুকল। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। খাওয়ার শেষে খাবারঘরে তালা লাগিয়ে চাবিটা জায়গা মতো রেখে ওপরে চিলে কোঠায় চলে এল।

ছাদে এসে সিগারেট ধরিয়ে চার-পাশটা দেখল। চাঁদটা মেঘের আড়ালে আচ্ছন্ন। আশপাশের বাড়ীগুলোতে মজা লুটছে অন্ধকার। নিস্তরঙ্গ বাতাস। অন্ধকার আর নিটোল নৈঃশব্দ্য। অত্যন্ত চাপা কণ্ঠে পড়ছে পাশের বাড়ীর অনিমা। বাতাস সেই ক্ষীণ কণ্ঠের বাহক। আশ্চর্য থমথমে ভাব।

ঘরে এসে বিনোদ আলো জ্বালল। মশারি টাঙিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। মশারির ভেতর থেকে সে দেখতে পাচ্ছে পাঠরত অনিমাকে। টেবিলের আলোয় ওকে দেখা যাচ্ছে। এই ঘর এখন অন্ধকার। বাতাসের ধাক্কায় মশারি দুলে উঠলে অন্ধকারও দোলে। অন্ধকারের কোনো দেহ নেই; অথচ কী প্রকট তার অস্তিত্ব। সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় সে সব কিছু গিলছে।

বিনোদের কাছে অন্ধকারের অন্য রূপ। ঝাঁকে ঝাঁকে কালো পিঁপড়ে ঢুকে পড়েছে তার ঘরে। মশারির চার-দিক থেকে উঠে আচ্ছন্ন করে ফেলছে মশারিটা। মশারির সাদা জাল যেন কালো পিঁপড়ের ঢিবি। মশারির ভেতর ঢুকে পড়ছে পিঁপড়েগুলো। বিনোদের দেহকে ঘিরে পরিক্রমণ শুরু করেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহটা কালো পিঁপড়ের তলায় চাপা পড়ে যাবে। বিনোদ শুনেছে, এক জাতীয় পিঁপড়ে নাকি দেহের সমস্ত রক্ত শুষে নেয়। এই পিঁপড়েগুলো বুঝি তাই।

রাত অনেক হয়েছে। বিনোদের ঘুম আসছে না। ছাদে পায়চারি করছে। মন্দ লাগছে না। কোথাও কেউ নেই; সে একা। একাকীত্ব পরিবেশের আনুকূল্য লাভ করে আরো গভীর হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছে সে একা, কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। অথচ এভাবে একা থাকা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গ যে কত দরকার তা এই মুহূর্তে বিনোদ আর একবার অনুভব করল।

অথচ তাকে সঙ্গ দেবার মতো কেউ নেই। সে এখন যেমন একা তেমনি একাই তাকে থাকতে হবে। রাতের পর রাত বিনিদ্র রজনী কাটাতে হবে, আর প্রতিমুহূর্তে এই একাকীত্ব তাকে চাবুক মারবে। মুহূর্তের জন্যে আত্মসচেতন হবে, চঞ্চল হবে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যে। অথচ কোনোদিনই বোধহয় তার এই একাকীত্ব ঘুচবে না। অন্ধকারে আত্ম-হননই বুঝি তার নিয়তি! কেননা সে অক্ষম পুরুষ; সামান্য প্রয়োজনেও আত্ম-নির্ভর নয়।

মনে পড়ছে, বাড়ীতে কেউ তার অবস্থা বুঝতে চায় না। সকলেই তার অক্ষমতাকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু সে যদি কোনোদিন এখান থেকে চলে যেতে পারে তাহলে তাকে ধিক্কার দেবার জন্যে কেউ পিছু পিছু যাবে না। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কিসের ভরসায় সে বেরিয়ে পড়বে, চলে যাবে এখান থেকে! তার তো কোনো মূল্য নেই। মানুষের মূল্য মানুষ হিসেবে নয়, কর্মক্ষমতার হিসেবে। বিনোদ মানুষ—কর্মক্ষম মানুষ; একথা সত্য হলেও সে প্রমাণ করতে পারবে না। অথচ প্রমাণ না করতে পারলে তার বেঁচে থাকা নিরর্থক।

ভাবনাগুলো ক্রমশ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে সবকিছুকে নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছে। ছাদের রেলিঙে ভর দিয়ে সে দাঁড়াল। ওপর থেকে রাস্তাটা বেশ নিচু। ভাবল, এখন যদি এখান থেকে লাফ দেয় তাহলে সে মরে যাবে। অত্যন্ত সহজেই সবকিছুর সমাধান হয়ে যায়। রাস্তাটা ওপর থেকে ভালো করে দেখলে বিনোদ।

সে দেখতে পাচ্ছে পাঠরত অনিমাকে

চমকে উঠল, এই দোতলার ছাদ থেকে লাফ দিলে সে যদি না মরে! মাটিতে আঘাত পেয়ে মাথাটা ফেটে যাবে, রক্ত পড়বে গলগল করে, মাথার ঘিলু ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবে ডাস্টবিনের নিদ্রিত মাছিগুলোর। গন্ধ পেয়ে আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে। হাত-পা ভেঙে যাবে, যন্ত্রণায় চীৎকার করবে—যেমন করে বাসে-চাপা-পড়া নেড়ি-কুকুর। শত চেষ্টা করেও এক পা নড়তে পারবে না। চীৎকার শুনে আশপাশের যারা ঘুমিয়ে তারা জেগে উঠবে। ছুটে আসবে একে একে।

সমস্ত অবস্থাটা ভেবে মাথা তুলল বিনোদ। অনিমার দিকে চোখ পড়তেই রেলিঙের ধার থেকে সরে এল। তেমনি চাপা কণ্ঠে পড়া মুখস্থ করছে অনিমা।

পূজা ১৯৬৩
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ
১৭.১০.৬৩
পশ্চিম বঙ্গ
বিদ্যাং দেহি
ধনং দেহি
যশো দেহি...
পশ্চিম জার্মানীতে পুরোহিত বদল
বলির পাঁঠা
মরক্কো আলজিরিয়া সীমান্তে তৈল ও লৌহ খনি অঞ্চল

ঔপন্যাসিক-নাট্যকার

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

নাট্যকার নাটক রচনা করেন ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝে ঔপন্যাসিক বা কবিরাও নাটক রচনা করে থাকেন। আবার নাট্যকারকেও মাঝে মাঝে নাটক ছেড়ে উপন্যাস রচনায় এগিয়ে আসতে দেখা যায়। এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। কোন কোন সাহিত্যিক সাহিত্যের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান।

তবে, অধিকাংশ সাহিত্যিকই সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাকে পথ-বদল বলে তা পছন্দ করেন না। প্রত্যেকেই প্রথম থেকে নিজের নিজের পথটি বেছে নিয়ে সেই পথ ধরেই যশের মন্দিরে প্রবেশ করতে চান। আর তাছাড়া লেখক যদি সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখার প্রতি নিষ্ঠাবান না হন তাহলে পাঠক-সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা ব্যাহত হতে পারে। এমনও গোঁড়া পাঠকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নয় যিনি তাঁর প্রিয় লেখকটিকে ঔপন্যাসিকরূপেই দেখতে চান, নাট্যকার হিসেবে নয়। আবার তাঁর প্রিয় লেখকটি যদি ভ্রমণ-কাহিনী বা রম্যরচনার লেখক হন তাহলে তিনি তাঁর কাছ থেকে উপন্যাস প্রত্যাশা করেন না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, কোন লেখকের পক্ষে একই সঙ্গে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করে একই ভাবে পাঠকের মনোরঞ্জন করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মত অ-সাধারণ প্রতিভার অধিকারী সব লেখক হতে পারেন না। অধিকাংশ লেখকই সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। তাই প্রায় প্রত্যেক লেখকই সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখার প্রতি নিষ্ঠাবান থাকেন। এবং সেটাই স্বাভাবিক। স্বল্প ক্ষমতাশালী লেখক যদি সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করেন তাহলে তা হাস্যকর বলে মনে হতে বাধ্য। অধিকাংশ সাহিত্যিক বা কবি নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুলতে চান না বলেই সেই নাবালক-সুলভ চপলতাকে পরিহার করে চলেন।

যদিও অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই উপন্যাস রচনাতেই তৃপ্ত থাকেন, তবুও কখনও কখনও কোন কোন ঔপন্যাসিককে নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর বহু দেশের ঔপন্যাসিকই নাটক রচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং এঁদের মধ্যে দু-একজন ঔপন্যাসিক নাট্যকার হিসেবে সার্থকতাও লাভ করেছেন। এখন, অসুবিধা হচ্ছে এই যে, একই লেখক যখন ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার এই দ্বৈত ভূমিকায় দেখা দেন তখন কোন্ ভূমিকায় তিনি শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে মতামত দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যান্য দিকের কথা এখানে উল্লেখ না করেও শুধু ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ এবং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করলে উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে রায় দেওয়া সুকঠিন বলে মনে হয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে বহু কথা-সাহিত্যিককে বা নাট্যকারকে একাধিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে। পিরানদেল্লো শুধু নাট্যকারই ছিলেন না। কবিতা, ছোট-গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সব কিছুই তিনি রচনা করেছেন। চেখভের ছোটগল্পগুলো তাঁর নাটকের তুলনায়, কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। গোর্কি যদিও তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্পের জন্যই পাঠকের নিকট অধিক পরিচিত কিন্তু তাঁর নাটকগুলোর কথা বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। আবার, গলস্‌ওয়ার্দি যদিও নাট্যকার হিসেবে সবিশেষ পরিচিত কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবেও ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম স্মর্তব্য। জাঁ পল সার্ত্রে যেমন নাট্যকার হিসেবে বিখ্যাত তেমনি ঔপন্যাসিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়াও আরও বহু লেখকের নাম উল্লেখ করা যায় যাঁরা একাধারে কথা-সাহিত্যিক এবং নাট্যকার। ব্রেখ্‌ট্, জে বি প্রিস্টলে, গ্রাহাম গ্রীন, চার্লস মর্গান, সমারসেট মম প্রভৃতি আধুনিক বিদেশী নাট্যকার-ঔপন্যাসিকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যেও এ ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অনেক প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকই নাটক রচনা করেছেন এবং তাঁদের কোন কোন নাটক জনপ্রিয়তা অর্জনেও সক্ষম হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রবীণ ও শক্তিশালী ঔপন্যাসিক, এমন কি, সাম্প্রতিক কালের অনেক তরুণ লেখক এক বা একাধিক নাটক রচনা করেছেন। এ ছাড়াও কোন কোন প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক বিখ্যাত বিদেশী নাটকের অনুবাদও করেছেন। আবার, নাট্যকারও যে উপন্যাস রচনায় এগিয়ে এসেছেন এমন দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়।

এখন, প্রশ্ন হল ঔপন্যাসিকেরা কখনও কখনও যে নাটক রচনায় উৎসাহিত হন তার কারণ কি? আমরা পূর্বেই বলেছি কোন কোন সাহিত্যিক সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান। এজন্যই তাঁরা ঔপন্যাসিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরেও নাটক রচনায় উৎসাহ দেখান। আবার, এমনও ঔপন্যাসিক আছেন যাঁর মন প্রথম থেকেই নাটকের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তাঁরা উপন্যাস রচনার মাধ্যমেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রসর হন বটে, পরবর্তীকালে তাঁরা নাটক রচনা করে থাকেন। এবং এই ধরণের কোন কোন ঔপন্যাসিক পরবর্তী জীবনে নাটক রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন—এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। এ ক্ষেত্রে লেখকের ঔপন্যাসিক-সত্তার আড়ালে তাঁর নাট্যকার-সত্তা আত্মগোপন করে থাকে। পরে, উপযুক্ত পরিবেশে তাঁর সেই নাট্যকার-সত্তার বিকাশ হয়।

অবশ্য, কোন ঔপন্যাসিকের নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার অন্য কারণও থাকতে পারে। অনেক সময় অর্থ, প্রতিপত্তি, খ্যাতির প্রলোভন ঔপন্যাসিককে নাটক রচনায় প্রলুব্ধ করে। সমারসেট মম একবার তাঁর নাটক রচনার কারণ দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন, I badly wanted to write plays that would be seen not only by a handful of people. I wanted money and I wanted fame. মম-এর এই স্বীকারোক্তিটি বহু ঔপন্যাসিক-নাট্যকারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ঔপন্যাসিকের খ্যাতি পরোক্ষভাবে আসে। কোন্ পাঠকের তাঁর উপন্যাস ভালো লেগেছে তা তাঁর পক্ষে সরাসরি ভাবে জানবার কোন উপায় নেই। তাঁর উপন্যাসের সংস্করণ-বৃদ্ধিই তাঁর জনপ্রিয়তার একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু নাট্যকারের সম্মান-প্রাপ্তি প্রত্যক্ষভাবেই ঘটে। তিনি তাঁর নাটকের অভিনয় চলাকালে দর্শকদের ঘন ঘন করতালি-ধ্বনি শুনে এবং উল্লসিত মুখগুলি দেখে বুঝতে পারেন যে তাঁর প্রার্থিত যশ তাঁর হাতের মুঠোয় এসে পৌঁছেছে। পাদ-প্রদীপের আলোর সামনে তাঁরই নাটকের চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে ঘোরা-ফেরা করছে, কথা বলছে, দর্শকদের হাসাচ্ছে-কাঁদাচ্ছে— এই দৃশ্য ঔপন্যাসিককে প্রলুব্ধ করে। তাঁর উপন্যাসের কোন্ চরিত্র কতখানি জীবন্ত হয়ে উঠেছে, পাঠকেরা তাকে কিভাবে গ্রহণ করেছে তা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে তা সহজেই সম্ভব। ঔপন্যাসিককে যশের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়—অনেক সময় বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু নাট্যকারের ক্ষেত্রে তা হয় না। তাঁর নাটক অনেক সময় অনতিবিলম্বেই তাঁর

মাথায় যশের মুকুট পরিয়ে দেয়। এবং এই নগদ লাভের জন্যই অনেক ঔপন্যাসিকই নাটকু রচনায় উৎসাহী হন।

তবে, সব ঔপন্যাসিকই যে রঙ্গমঞ্চে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেন তা নয়। অনেকেই মোহমুক্ত হয়ে ফিরে যান। দু'একজনই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন। একজন প্রসিদ্ধ বিদেশী ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে শোনা যায় যে তিনি একসময় রঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সত্যি সত্যিই একখানা নাটক লিখেও ফেলেছিলেন। তারপর, যেদিন তাঁর নাটকের প্রথম মহড়া হবে সেদিন তিনিও মহড়া দেখতে গেলেন। বেচারা ঔপন্যাসিক! তাঁর নাটকের সংলাপগুলো অভিনেতাদের মুখে কেমন শোনায় তা জানবার জন্য তিনি সারাক্ষণ অধীর আগ্রহ নিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু মহড়া যখন শুরু হল তখন তিনি অভিনেতাদের মঞ্চের কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে কোন্ সংলাপটি বলবে, দাঁড়িয়ে বলবে না বসে বলবে, কোন কাজ করতে করতে বলবে না অন্যভাবে বলবে, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলবে না পিছন ফিরে বলবে, কিভাবে উচ্চারণ করবে, থেমে থেমে বলবে না অন্যভাবে বলবে—এই নিয়েই যখন গবেষণা করতে দেখলেন তখন তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। এবং সত্যি কথা বলতে কি, একটি সংলাপ নিয়ে অভিনেতারা যে এত ভাবে এ দেখে তিনি বিস্মিত না হয়ে পারেননি। তিনি তাঁর নাটকের সংলাপগুলো অভিনেতাদের মুখে স্পষ্টভাবে শুনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলো নিয়ে যে এত গবেষণা করা যেতে পারে তা তিনি ভাবতে পারেননি। শোনা যায়, তিনি আর কোনদিন থিয়েটার-মুখো হননি।

কোন ঔপন্যাসিক যদি মনে করেন যে, তিনি ইচ্ছে করলেই একটি নাটক লিখে ফেলতে পারবেন তাহলে তিনি ভুল করবেন। ঔপন্যাসিকের পক্ষে উপন্যাস লেখা যত সহজ, নাটক রচনা করা কিন্তু তত সহজ নয়। কোন ঔপন্যাসিক যদি মনে করেন যে তিনি অনুগ্রহ করে নাটক লিখছেন না বলেই বাঙলা দেশের নাট্য-সাহিত্য পিছিয়ে আছে তাহলে তিনি বৃথাই আত্মশ্লাঘায় মত্ত হবেন। ঔপন্যাসিক ইচ্ছে করলেই নাট্যকার হতে পারেন না। যদিও রঙ্গমঞ্চের দিকে অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই একটা প্রবল আকর্ষণ বোধ করেন ঠিকই, কিন্তু সেই আকর্ষণের গুণেই তিনি নাট্যকার হয়ে যেতে পারেন না। নাটক রচনার জন্য বিশেষ ধরণের ক্ষমতার প্রয়োজন। অধিকাংশ ঔপন্যাসিকেরই তা থাকে না। দু'একজন ঔপন্যাসিকেরই সে ক্ষমতা থাকে। তাঁরাই নাট্যকার হিসেবে সম্মান পান। তখন একই লেখকের মধ্যে নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক এই দু'টি সত্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত একটি সত্তাই অপরটিকে অতিক্রম করে যায়। একই লেখক ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার হিসেবে সমান যশের অধিকারী হয়েছেন—এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে।

উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের বহু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসকে প্রয়োজনানুসারে দীর্ঘ করতে পারেন, নাট্যকারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। নাট্যকারকে বাধ্য হয়েই তাঁর নাটককে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। উপন্যাস পড়বার জন্যই লিখিত হয়। কিন্তু নাটক শুধুই পাঠ্য নয় তা অভিনয়ের জন্যই মূলতঃ রচিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক নাট্যকারকেই নাটক রচনার সময় অভিনয়ের উপযোগিতার দিকে নজর রাখতে হয়।

ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পারেন। তিনি তাঁর উপন্যাসের কোন বিশেষ চরিত্রের জীবনের সমস্ত ঘটনা, তার জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু ইত্যাদি সব কিছু সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লিখতে পারেন। এমন কি কোন চরিত্রের উপর কোন্ পরিবেশের প্রভাব কিরকমভাবে কার্যকরী হয়েছে তাও তিনি সুনিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখাতে পারেন। কিন্তু নাট্যকারের সে সুযোগ নেই। তাঁর নিজের কথা বলবার কোন সুযোগই তিনি পান না। বড় জোর, তিনি তাঁর নাটকের চরিত্রগুলোর মুখ দিয়ে তাঁর নিজের কথা বলিয়ে নিতে পারেন।

উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের আর একটা বড় পার্থক্য এই যে, ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখেই খালাস, পাঠককে বোঝাবার জন্য তাঁর আর কারোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। কিন্তু নাট্যকার নাটক রচনা করেই সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন না। অনেক সময় কোন কোন নাটকের অভিনয় সেই নাটকটিকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে দর্শককে সাহায্য করে। অভিনেতাদের উন্নত ধরণের অভিনয় এবং দর্শকদের গ্রহণ-ক্ষমতার উপর নাটকের সার্থকতা-ব্যর্থতা অনেকখানি নির্ভর করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এবং এইসব কারণের জন্যই কোন ঔপন্যাসিকের পক্ষে রাতারাতি নাট্যকার হওয়া সম্ভব নয়। আবার নাট্যকারের পক্ষেও ঔপন্যাসিকে রূপান্তরিত হওয়া খুব যে সহজ কাজ তাও নয়। আসলে উভয় ক্ষেত্রেই প্রলোভনটা খুব বেশি কিন্তু বাধা কম নয়।

তবু, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকালে বেশ কিছু লেখককে একই সঙ্গে ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে। আমরা পূর্বেই এই শ্রেণীর কিছু কিছু ঔপন্যাসিক-নাট্যকারের নাম উল্লেখ করেছি এবং বাঙলা সাহিত্যেও যে এ ধরণের লেখকেরা আছেন সেকথাও বলেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে এ'দের মধ্যে ক'জন এই দ্বৈত-ভূমিকায় সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন? অনেকেই পারেননি। আবার, এ'দের মধ্যে অনেকেই একটি ভূমিকায় সাফল্যলাভ করেছেন, কিন্তু অন্য ভূমিকায় ব্যর্থ হয়েছেন। পিরাণদেল্লো নাট্যকার হিসেবেই পৃথিবীতে অধিক পরিচিত। আবার, সমারসেট মম্-কে ঔপন্যাসিক বা ছোটগল্প-লেখক হিসেবে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়। এ'দের নিয়ে হয়তো মতান্তরের অবকাশ নেই, কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন লেখকের ক্ষেত্রে মত-বিরোধ দেখা দিতে পারে। তখন, কোনো বিশেষ লেখক ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার—কোন ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে অন্তহীন তর্ক শুরু হয়ে যেতে পারে।

বাঙলা সাহিত্যে যাঁরা একাধারে ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার হিসেবে পরিচিত এ'দের মধ্যে অনেকেই

ঔপন্যাসিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের উন্নতির জন্যেই যে এ'রা সবাই নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছেন তা মনে হয় না। আবার, এ'দের মধ্যে সকলেরই যে নাটক রচনার বিশেষ ক্ষমতা আয়ত্তে আছে তাও নয়। কারণ তাহলে এ'দের অবদানে বাঙলা নাট্য-সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে পারত। অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই নেহাৎ খেয়াল বা সখের বশবর্তী হয়ে নাটক রচনায় উদ্যোগী হন। ফলে, তাঁরা যে ধরণের নাটক রচনা করেন তাতে তাঁদের গৌরব বৃদ্ধি পায় না। দু' একজন ছাড়া অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই যে নাট্যকার হিসেবে ব্যর্থ হয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাঙলা সাহিত্যের এই অবহেলিত শাখার প্রতি কৃপা করবার অভিপ্রায় নিয়ে যদি কোন ঔপন্যাসিক নাটক রচনায় উৎসাহী হন তাহলে তিনি ভুল করবেন। কারণ, আমরা পূর্বেই বলেছি যে অধিকাংশ লেখকই সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। উপন্যাস এবং নাটক—সাহিত্যের এই উভয় শাখায় সমান পারদর্শিতা দেখাবার ক্ষমতা সবার থাকে না। সেক্ষেত্রেও, তাঁদের বরং শুধু উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়।

আর, তাঁরা যদি সত্যিই নাটককে ভালোবাসেন, নাটকের উন্নতি চান, নাটক রচনায় আগ্রহী হন তাহলে তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা, নিষ্ঠা, এবং একাগ্রতাকে এর জন্য উৎসর্গ করতে হবে। ঠিক যে পরিমাণ আগ্রহ নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেন, সেই সম-পরিমাণ আগ্রহ নিয়ে তাঁকে নাটক-রচনায় উদ্যোগী হতে হবে। একমাত্র তাহলেই ঔপন্যাসিকের পক্ষে সার্থক নাটক রচনা করা সম্ভব হবে।

মাঝে মাঝে কোন কোন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের নাট্যরূপ জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে উপন্যাসের নাট্যরূপ এবং নাটকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কোন উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপের জন্য অনেক সময় নাট্যরূপ-দাতাই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। ঔপন্যাসিক স্বয়ং যদি তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ না দেন তাহলে সেই নাট্যরূপের সার্থকতা-ব্যর্থতার জন্যই নাট্যরূপ-দাতাই দায়ী হবেন। কোন কোন ঔপন্যাসিক রঙ্গমঞ্চে তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপের সাফল্য দেখে নাটক রচনায় উদ্যোগী হন। কিন্তু সার্থক নাটক রচনা করবার ক্ষমতা তাঁর না থাকায় তিনি যে নাটক লেখেন তা ক্ষণকালের জন্য দর্শকদের মনোরঞ্জন করলেও কালের বিচারে টেকে না। সুতরাং কোনো ঔপন্যাসিকের এ জাতীয় হাস্যকর প্রয়াসে মত্ত না হওয়াই ভালো। কারণ ঔপন্যাসিক নাটক রচনায় ব্যর্থ হলে তিনি তাঁর নিজের সুনামকেও ক্ষুন্ন করেন। সার্থক নাটক রচনা করবার ক্ষমতা খুব কম ঔপন্যাসিকেরই থাকে।
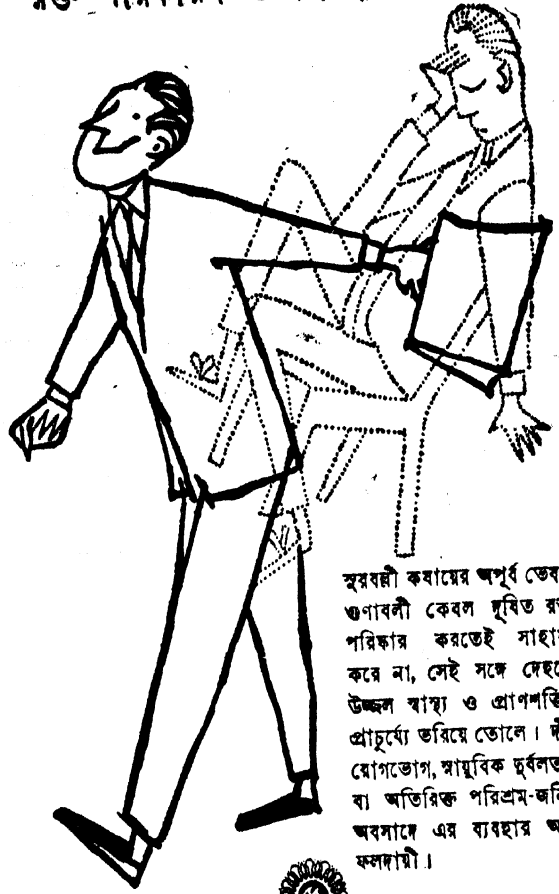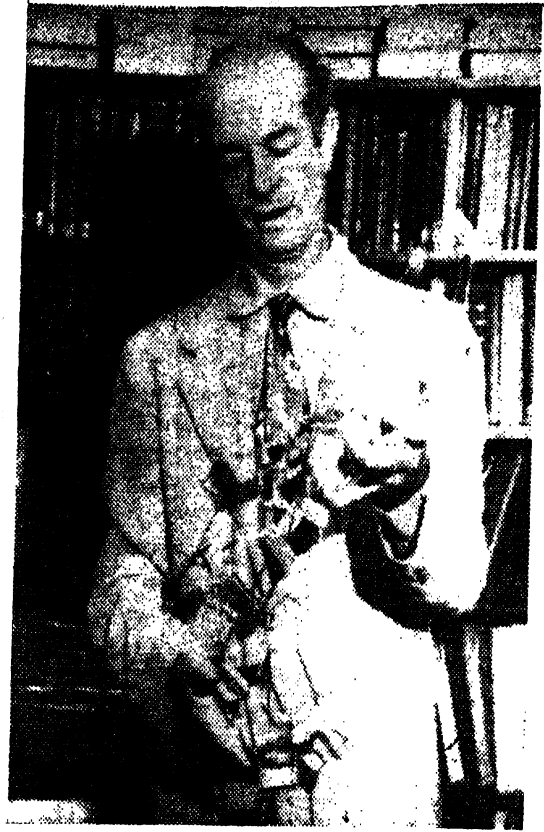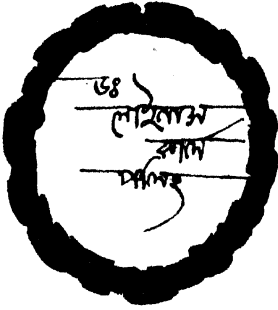
একই জীবনে দু-বার নোবেল পুরস্কার অর্জনের গৌরবে মাদাম কুরী ছিলেন অদ্বিতীয়া। এতদিনে মাদাম কুরীর পাশে আরো একজনের নাম যুক্ত হল। তিনি হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সর্বাগ্রগণ্য রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর লাইনাস কার্ল পলিং। তিনি প্রথমবার নোবেল পুরস্কার (রসায়ন) পেয়েছিলেন ১৯৫৪ সালে। দ্বিতীয়বার পেলেন ১৯৬২ সালে। দ্বিতীয়বারেরটি শান্তি পুরস্কার। এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে আজকের দিনের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেই নিয়োজিত নন, যুদ্ধহীন পৃথিবী রচনার মহত্তম আদর্শেও অনুপ্রাণিত।

অধ্যাপক পলিং ১৯২৮ সাল থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজির রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে তিনি কতকগুলি যুগান্তকারী গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর বন্ধনের সূত্র, বা রসায়নশাস্ত্রের ভাষায় যাকে বলা হয় রাসায়নিক বন্ধন (কেমিক্যাল বন্ড)। এই রাসায়নিক বন্ধন আছে বলেই পরমাণুর সঙ্গে পরমাণু যুক্ত হয়ে অতি-সরল থেকে অতি-জটিল বিভিন্ন অণু সৃষ্টি হয়ে থাকে। অধ্যাপক পলিং আবিষ্কার করেছিলেন রাসায়নিক বন্ধনের একটি ব্যাপক ইলেকট্রনিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বের সাহায্যেই সর্বপ্রথম অণুর গঠন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া গিয়েছিল।

ইউ এস আই এস প্রচারিত একটি পুস্তিকায় অধ্যাপক পলিং-এর গবেষণার অতি-সুন্দর বিবরণ আছে। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট অংশটি উদ্ধৃত করছি।

"সকল রকম রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, পরিবর্তন ও সংমিশ্রণে ইলেকট্রনগুলির ভূমিকা সম্পর্কে যে সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে......তিনি তা বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কিভাবে পরমাণুর সংযুক্তিকরণ হয় তাও তিনি আলোচনা করেছেন......। এই বন্ধনের প্রকৃতি সম্পর্কে আরও গভীর অনুসন্ধান করে তিনি বিবিধ প্রকার ইলেকট্রন-বন্ধন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইলেকট্রন তত্ত্বটিকে তিনি শুধু অণুর গঠনের ব্যাপারেই প্রয়োগ করেননি, স্ফটিকের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। ধাতু ও অন্যান্য কঠিন পদার্থে অণুসমূহ এই স্ফটিকের আকৃতিই গ্রহণ করে। আণবিক গঠন বিশ্লেষণে তিনি সর্বপ্রথম কোয়াণ্টাম মেকানিক্‌স্‌ সংক্রান্ত অনুনাদ তত্ত্বের প্রয়োগ করেন।

পদার্থবিজ্ঞানীদের সদ্য উদ্ভাবিত রঞ্জনরশ্মি অপবর্তন যন্ত্র (x-ray diffraction device), নিউক্লীয় চৌম্বক বর্ণালী নির্ণায়ক যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করে এবং নিজের সুনিপুণ গবেষণা পদ্ধতির সাহায্যে ডঃ পলিং অণুর গঠন সম্পর্কে এমন এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রকাশ প্রকাশ করলেন যার খবর ইতিপূর্বে বিজ্ঞান-জগতে কারও জানা ছিল না। এই সঙ্গে তিনি শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রসায়নে এক নতুন যুগের সূত্রপাতও করলেন। এই যুগটি হল সম্পূর্ণ কৃত্রিম সুতাতন্তু, কৃত্রিম রবার, প্লাস্টিক এবং মানুষের হাতে তৈরি আরও নানা বস্তুর যুগ।

এই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণার জন্য পলিং ১৯৫৪ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর সমস্ত গবেষণার ফল ১৯৩৯ সালে একটি গ্রন্থে সংকলিত হয়। গ্রন্থটির নাম 'দি নেচার অব দি কেমিক্যাল বন্ড'।

ডাঃ পলিং সম্প্রতি প্রাকৃতিক রসায়নের পরিবর্তে জৈব রসায়ন নিয়ে গবেষণার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। গাছপালা সংক্রান্ত রসায়ন ও প্রাণীজীবনই এখন তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। এই গবেষণায় তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন প্রোটিন অণুর বৈশিষ্ট্যের ওপর। প্রোটিন অণু সর্বপ্রকার গাছপালা ও জীবজন্তুর প্রধান উপাদান। এ ক্ষেত্রেও তাঁর গবেষণা মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এই সঙ্গে আরও অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।"

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ—

১৯৬৩ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে যুক্তভাবে তিনজনকে : ক্যানবেরার স্যার জন ক্যারু কলিস, কেম্ব্রিজের লয়েড হডকিন ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের অ্যান্ড্রু-ফিল্ডিং হাক্‌সলে। পরবর্তী কোনো সংখ্যায় এই তিনজন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

অয়স্কান্ত

জনপ্রিয় নায়িকা
সন্ধ্যা রায়

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা :

ডিউক এলিংটন সম্প্রদায়ের জাজ-সঙ্গীত

শুনেছেন ডিউক এলিংটন সম্প্রদায়ের জাজ-সঙ্গীত? যদি শুনে থাকেন, বলব, আপনি ভাগ্যবান; যদি না শুনে থাকেন, তাহলে বিখ্যাত সিগারেট কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের ভাষাকে অল্প একটু বদল করে বলব, আপনি কি হারিয়েছেন, তা' আপনি জানেন না। গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্যে যেমন বট্যানিস্ট হবার কোনো প্রয়োজন নেই, এলিংটন সম্প্রদায়ের বাজনা শুনে মুগ্ধ হবার জন্যে তেমনই সঙ্গীতজ্ঞ হবার দরকার করে না। সাংবাদিক সম্মেলনে ডিউক ঠিকই বলেছিলেন, "To listen to and enjoy music, it is not necessary that one should know the technicalities of music. My idea of music is that if it is good, it can be enjoyed by any man." (সঙ্গীত শুনে উপভোগ করবার জন্যে সঙ্গীতের ব্যাকরণাদি বা সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ হবার দরকার নেই। সঙ্গীত সম্পর্কে আমার ধারণা হচ্ছে, জিনিসটা যদি ভালো হয়, তাহলে যে-কোনো লোকই তা' উপভোগ করবে।) সঙ্গীত তো নয়, যেন অফুরন্ত রসের নির্ঝর। 'কানের ভিতর দিয়া' একেবারে মরমে প্রবেশ করে। হৃদয়কে এমনভাবে দোলা দেয় যে, সারা শরীর দুলতে থাকে। ডিউক যখন তাঁর দলের অন্যতম সুরস্রষ্টা (composer) বিলি স্ট্রেহর্ণ-এর পিয়ানো বাজানোর সঙ্গে ঘাড় দুলিয়ে ডান হাত নেড়ে তুড়ি দিতে দিতে তাল রাখছিলেন এবং দর্শকদেরও তাঁর অনুকরণে তাই করতে বলছিলেন, তখন নর-নারী, বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে বহুজনই অত্যন্ত সফলভাবে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে প্রমাণ করেছিলেন, প্রকৃত বাদ্যসঙ্গীত উপভোগের জন্যে সংগীতবিদ হবার প্রয়োজনীয়তা নেই।

নিঃসন্দেহে কলকাতার সাধারণ শ্রোতারা বহুদিন পর্যন্ত মনে রাখবেন, ডিউকের দলস্থ স্যাম উডইয়ার্ড-এর "স্কিন ডীপ" ড্রাম বাদ্য—অন্ততঃ বারো-তেরো মিনিট ধরে একজন বাদক বিভিন্ন ড্রাম এবং কয়েকটি বড়ো সিম্ব্যাল-এর সাহায্যে মানুষকে এমনভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারে, এ যেন বিশ্বাসই হয় না। এ'র পরেই নাম করতে হয় 'কুটি' উইলিয়ম-এর। এ'র ট্রাম্পেট বাজনার তুলনা নেই : "গ্রাউল" পদ্ধতিতে বাজানোই এ'র বিশেষত্ব। ডিউকের দলে প্রথম সৃষ্টির যুগ থেকেই ইনি নিজের আসনকে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন যে, বিংশ দশকের শেষভাগ থেকে এলিংটন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকবার পরে ইনি যখন ১৯৪০ সালে দলত্যাগ করে নিজের সম্প্রদায় গঠন করেন, তখন আমেরিকান কবি রেমন্ড স্কট এই বিচ্ছেদকে উপলক্ষ্য করে একটি শোক-গাথা রচনা করেন। তাই আবার ১৯৬২ সালে 'কুটি' যখন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ডিউকের দলে ফিরে আসেন, তখন চতুর্দিকে আনন্দের রোল পড়ে যায়। স্যাক্সোফোন বাজিয়ে শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেন হ্যারি কার্ণি, পল গন্সাল্ভেজ্ এবং জনি হজেস; প্রথমজন ব্যারিটোন এবং দ্বিতীয়জন টেনর স্যাক্সো-

কাঞ্চনকন্যা চিত্রে কণিকা মজুমদার

ফোন-বাজিয়ে হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন। ডিউক এলিংটন রচিত বিখ্যাত জাজ-সঙ্গীত 'ডিমিনুয়েণ্ডো অ্যাণ্ড ক্রেসেণ্ডো ইন ব্লু'-তে পল গন্‌সাল্‌ভেজ তাঁর বিশেষ অংশটিতে অপূর্বভাবে স্যাক্‌সোফোন বাজিয়ে ১৯৫৬ সালের নিউপোর্ট জাজ ফেস্টিভ্যালে অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। চড়া পর্দায় স্যাক্‌সোফোন বাজানোও যে এমন শ্রুতিমধুর হয়, তা জনি হজেস্‌-এর বাজনা না শুনলে কোনো দিনই বিশ্বাস করা যেত না। তাঁর আবেদনপূর্ণ সুরসৃষ্টি শ্রোতৃবৃন্দকে অভিভূত করেছিল। 'ডবল বাস'-বাজিয়ে আর্ণি শেফার্ডকেও শ্রোতারা সহজে ভুলতে পারবেন না। তাঁর অল্প দাড়িওলা হাসি মুখে 'টেক দি এ টেন' —গান গাইতে গাইতে বিরাট 'ডবল বাস' বাজানোর দৃশ্য পরম উপভোগ্য হয়েছিল। এবং সব শেষে 'মেডলে' প্রোগ্রামে সলিচুড, মুড ইণ্ডিগো, ক্যারাভান, আই লেট এ সং গো আউট অব মাই হার্ট প্রভৃতি বিখ্যাত সংগীতের সংগে ডিউকের নিজের পিয়ানো বাজনা অতুলনীয় মাধুর্যের সৃষ্টি করেছিল:

ডিউক এলিংটন এবং তাঁর সম্প্রদায়কে আমরা আমাদের অন্তরের অজস্র অভিনন্দন জানাই।

চিত্র সমালোচনা

দেয়া নেয়া (বাংলা) : রূপছায়ার নিবেদন; ৩,৫০৪ মিটার দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : শ্যামল মিত্র ও ভোলানাথ রায়; পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : বিধায়ক ভট্টাচার্য; সঙ্গীত-পরিচালনা : শ্যামল মিত্র; গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : কানাই দে; শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল ও সুজিত সরকার; সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরকার; সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণ : তনুজা, সুমিতা সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী ছায়া দেবী, উত্তমকুমার, তরুণকুমার, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, প্রেমাংশু বসু, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি। ছায়ালোক-এর পরিবেশনায় কাল বৃহস্পতিবার ২৪এ অক্‌টোবর থেকে বীণা, বসুশ্রী, মিত্রা, আলোছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

কাহিনী-চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই অবিসংবাদীভাবে দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন এবং এই চিত্তবিনোদনের কাজ হয়ে থাকে চক্ষু এবং কর্ণ—এই দুই ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়। অবশ্য এমনও দেখা গেছে, ছবির মধ্যে নয়নাভিরাম চিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, শ্রুতিসুখকর সংলাপ এবং সঙ্গীতের প্রস্রবণ বয়ে গেছে; কিন্তু 'তবু ভরিল না চিত্ত'; কাহিনীর বা আর কিছুর ত্রুটির জন্যে হৃদয় উঠল না দুলে, মন উঠল না ভরে এবং ছবিটি তাই হয়ে গেল ব্যর্থ। রূপছায়ার প্রথম চিত্রার্ঘ 'দেয়া নেয়া' কিন্তু আমাদের চোখ, কান এবং সংগে সংগে মনকেও কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছে অপরূপ মাধুর্যের অপর্যাপ্ত ধারায়। একটি ছোট্ট, সোজা কাহিনীকে যে এমন রূপে রসে প্রোজ্জ্বল করে দর্শকসমক্ষে পরিবেশন করা যায়, তা' না দেখলে বিশ্বাস করাই যায় না। যে-কোনো দর্শককে খুশীতে ভরিয়ে তোলবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ছবিখানির। অবশ্য এর সাফল্যের মূলে প্রযোজক ও সঙ্গীত-পরিচালক শ্যামল মিত্রের অসাধারণ অবদানের কথা অনস্বীকার্য। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার লিখিত গানগুলিকে তিনি যেভাবে সুরসমৃদ্ধ করে ছবির মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন, তার তুলনা বাংলা-ছবির রাজ্যে সহজে আবিষ্কার করা যাবে না। বললে অত্যুক্তি হবে না, গানই এই ছবির প্রাণ। কিন্তু কাহিনীর বিভিন্ন পরিস্থিতির সংগে যদি গানগুলির একাত্ম হয়ে যাবার সুযোগ না থাকত, তাহলে এই গানগুলিকেই সুমধুর হওয়া সত্ত্বেও অবান্তর বলেই বোধ হ'ত। সুখের কথা, তা হয়নি। মনে হয়েছে, গানগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ছবির মধ্যে এসেছে। দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, কৌতুক—প্রতিটি পরিস্থিতিই গানের ভাষা পেয়েছে এবং তারই সংগে আছে উপযোগী আবহ-সংগীত। কাহিনী, পরিস্থিতি, চরিত্র সংলাপ এবং গান—এগুলির মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এই 'দেয়া নেয়া' ছবিতে এবং সেই কারণেই ছবিটি রসোত্তীর্ণ হয়ে দর্শকহৃদয়কে মাতিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। একজন সংগীত-পরিচালক ছবির প্রযোজক হ'লে সঙ্গীতের কতখানি সার্থক ব্যবহার করা

সম্ভব তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন শ্যামল মিত্র।

লক্ষ্ণৌ-এর বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ী বি কে রায় (ধীরেন রায়) ভাবতেই পারেন না, কোনো ভদ্র-পরিবারের ছেলে গান-গান করে মেতে উঠে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগকে জলাঞ্জলি দিতে পারে। অথচ তাঁর নিজেরই ছেলে প্রশান্ত তার আপিসের কাজকে উপেক্ষা করে কলকাতা যাবার জন্যে বদ্ধ-পরিকর ঐ গানের ব্যাপারেই। রাগে ফেটে পড়ে তিনি ছেলেকে চিরজীবনের মতো বাপের আশ্রয় ত্যাগ করতে বললেন। স্ত্রীর অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাত করলেন না। ছেলেও মায়ের ডাক উপেক্ষা করেই বেরিয়ে পড়ল এবং কলকাতায় এসে উঠল তারই বন্ধু অশ্বিনীর বাড়ীতে। প্রশান্তর গানের রেকর্ড হুহু করে বিক্রী হয় এবং সে যেসব গান গায়, তার সবগুলিই টি-বি রোগী সুকান্ত বসুর রচনা। সুকান্তর রোগ যাতে ভালো হয় তার জন্যে সে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করে; তবু রোগ উপশম হওয়া দূরের কথা, ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে যেতে থাকে। অভিজিৎ চৌধুরী এই ছদ্মনামে প্রশান্ত তার গানের রেকর্ড করে; রেডিওতে গানও গায়; কিন্তু সে কোনো সাধারণ অনুষ্ঠানে বা জলসায় কখনও গান গায় না এবং নিজের চেহারার ফোটো কখনও তুলতে দেয় না। কাজেই ব্যক্তি-অভিজিৎ জনসাধারণ, এমন কি সাংবাদিকদেরও ধরা-ছোঁওয়ার বাইরেই বিচরণ করে। এই অবস্থায় স্রেফ অ্যাড্‌ভেঞ্চারের জন্যে দৈবপ্রেরিত হয়ে সে হল ধনী অমৃত মজুমদারের ভাগ্নী সুচরিতার মোটরড্রাইভার; এখানে সে নাম নিল 'হৃদয়হরণ'। নাম শুনে অবশ্য সুচরিতার নাসিকা যথাসম্ভব বক্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু একদিন বান্ধবীদের কাছে মোটরগাড়ীর দক্ষ চালক হিসেবে সুচরিতার মানরক্ষায় সেই ড্রাইভার হৃদয়হরণই সাহায্য করল কৌশলে এবং সুচরিতা হয়ে পড়ল তার প্রতি কৃতজ্ঞ। এদিকে সুচরিতা আবার অভিজিৎ-এর মস্ত বড় 'ফ্যান'; তাকে দেখবার, জানবার জন্যে তার অস্থিরতার অন্ত নেই। কি আশ্চর্য ঘটনার মধ্যে সুচরিতার ধ্যানের বস্তু অভিজিৎ এবং মোটরড্রাইভার হৃদয়হরণ একই লোক বলে প্রতিপন্ন হল এবং ব্যবসায়ী বি কে রায়-এর সঙ্গে তাঁর একমাত্র সন্তান প্রশান্তর আকাঙ্ক্ষিত মিলন ঘটল, তাই নিয়েই ছবির শেষের দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে।

কাহিনীর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু অসম্ভাব্যতা আছে; কিন্তু সমগ্রতার বিচারে এই অসম্ভাব্যতা নিঃসন্দেহে উপেক্ষণীয়। একজন জনপ্রিয় গায়ক তার ব্যক্তি-পরিচয়কে (identity-কে) গোপন রাখতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন

তাহলে চিত্রে মলিনা দেবী ও পাহাড়ী সান্যাল

স্টাডমেড রিক্রিয়েশন ক্লাব সভ্যগণ কর্তৃক ১৭ অক্টোবর মহাজাতি সদনে অভিনীত চন্দ্রগুপ্ত নাটকে তরুণ দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

অবান্তর বলেই মনে হয়। কারণ ছবির উপভোগ্যতাই প্রধান বিচার্য এবং কাহিনীর ত্রুটি এই উপভোগ্যতাকে কোনো সময়েই এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেনি।

"দেয়া নেয়া" ছবির অভিনয়াংশও অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের। নায়ক প্রশান্ত রায় ওরফে অভিজিৎ চৌধুরী ওরফে হৃদয়হরণের ভূমিকায় উত্তমকুমার তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। বিশেষ করে মোটর-ড্রাইভার হৃদয়হরণ রূপে কৌতুককর দৃশ্যগুলিতে তাঁর অভিনয় হয়েছে অনবদ্য। বোম্বাইয়ের অভিনেত্রী তনুজা নায়িকা সুচরিতার বেশে বাংলা ছবিতে প্রথম অবতীর্ণ হয়ে দর্শক মনোহরণে সমর্থ হয়েছেন। বোম্বের নায়িকাদের স্বভাবসিদ্ধ উগ্রতা তাঁর মধ্যে নেই; বরং বাঙ্গালী মেয়ের কোমলতা তাঁর মধ্যে অনেকখানি দেখতে পাওয়া গেছে। বন্ধু অশ্বিনী এবং বন্ধুপত্নী বিনোদিনীরূপে যথাক্রমে তরুণকুমার এবং লিলি চক্রবর্তী উপভোগ্য অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া কমল মিত্র ((ব্যবসায়ী বি কে রায়), পাহাড়ী সান্যাল (অমৃত মজুমদার), ছায়া দেবী (রায়-গৃহিণী), সুমিতা সান্যাল (বিশাখা), প্রেমাংশু বসু (কবি সুকান্ত), কবিতা-রায় (সুকান্ত-জায়া), শ্যাম লাহা (ড্রাইভার হনুমান) প্রভৃতি নিজ নিজ ভূমিকায় নাট্যনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

কলাকৌশলের বিভিন্ন অংশে সর্বত্রই একটি উচ্চমান রক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে চিত্রগ্রহণে কানাই দে, সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনায় শ্যামসুন্দর ঘোষ, শিল্পনির্দেশনায় সুনীল সরকার এবং সম্পাদনায় অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালক জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক চিত্র হচ্ছে "দেয়া নেয়া"।

"দেয়া নেয়া" অবিসংবাদীভাবে জনপ্রিয়তার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্ধিধায় করতে পারি।

মঞ্চাভিনয়

গুরুশিষ্য সংবাদ (বিলে নরেন) : এম জি এন্টারপ্রাইজ-এর নিবেদন—

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেই অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের উদ্দেশ্যে এম জি এন্টারপ্রাইজ নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দত্বে পরিণতিকে উপজীব্য করে যে নাটকখানি রচনা করিয়েছেন, গেল ১৬ই অক্টোবর, বুধবার ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টারে তাকেই আর একবার মঞ্চস্থ হতে দেখলুম। নরেন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব থেকেই যে অনন্যসাধারণ ঐশী শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং যার দ্বারা চালিত হয়ে কিশোর বয়সেই ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছিলেন, সেই শক্তি ভগবান রামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁকে কেমন করে জগন্মাতৃ-সকাশে শুদ্ধাভক্তিপ্রার্থী বিবেকানন্দে পরিণত করেছিল, এই কাহিনীই নাটকখানিতে বিধৃত হয়েছে আঠারোটি দৃশ্যের সাহায্যে। শৈশবের দুরন্তপনার মধ্যেও শিব সেজে খেলা এবং যে-কোনো হুঁকোয় তামাক খেয়ে 'জাত যাওয়া'র পরীক্ষা করা দিয়ে যে শিবশক্তিসম্পন্ন জীবনের আরম্ভ, কৈশোরে শরীর-চর্চার মধ্যে দুঃসাহসিকতার পরিচয়ের মধ্যে যে-জীবনের বিকাশ, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সামনে প্রথম উপস্থিত হয়ে সেই জীবন কিভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ল এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করা সত্ত্বেও তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্যে শেষ পর্যন্ত সেই ঠাকুরের কাছেই কিভাবে ছুটে এল এবং তারও পরে পিতার মৃত্যুতে উপার্জনের জন্যে দিশাহারা হয়েও মায়ের চরণে কিছুতেই অন্নবস্ত্রের জন্যে করুণা প্রার্থনা না করে জ্ঞানভক্তিই প্রার্থনা করে

বসল কেন, অত্যন্ত নিপুণতা ও দরদের সঙ্গে অভিনয়ের মাধ্যমে সেই চিত্র মঞ্চে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। শিল্পীদের মধ্যে প্রধানতম আকর্ষণ ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভূমিকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এই ভূমিকায় তাঁর খ্যাতি অনন্যসাধারণ। যুবক নরেনের ভূমিকায় অমরেশ দাসকে জীবন্ত নরেন্দ্রনাথ বলে বোধ হয়; কণ্ঠস্বর আর একটু ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক হলে তাঁর অভিনয়ও হত নিখুঁত। কিশোর নরেনরূপে রুণু বড়াল একটি মাত্র দৃশ্যেই তাঁর বাচন ও অভিব্যক্তিতে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। তাঁর সঙ্গে মন্টুরূপী মন্টু হালদারও সুন্দর ও সপ্রতিভ। এ-ছাড়াও যাঁদের নাট্যনৈপুণ্য অভিনয়টি সাফল্যমণ্ডিত করেছে, তাঁদের মধ্যে আছেন মলিনা দেবী (ভুবনেশ্বরী), শিশির মিত্র (বিশ্বনাথ দত্ত), হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (জেঠু), কবরী (কালিদাসী), লক্ষ্মী হালদার (শিশু নরেন) প্রভৃতি।

বিবিধ সংবাদ
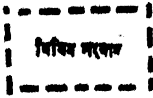
অরোরার সঙ্গীতবহুল ছবি "রাধাকৃষ্ণ"র মুক্তি আসন্ন :

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রযোজিত ও পরিবেশিত সঙ্গীতবহুল চিত্রার্ঘ "রাধাকৃষ্ণ" ছবিটি বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রবীণ পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জি। সুরারোপ করেছেন কীর্তন কলানিধি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ২৩ খানি অনবদ্য গান ছবিটিতে সংযোজিত হয়েছে।

'শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার' চরিত্রে রূপদান করেছেন যথাক্রমে উত্তর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবাগতা সঞ্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন—অসিতবরণ (আয়ান ঘোষ), শীলা পাল (বৃন্দাদূতী) প্রতিমা চক্রবর্তী (চন্দ্রাবলী), অপর্ণা দেবী, রেণুকা রায়, কেতকী দত্ত প্রভৃতি।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে রয়েছেন—বিজয় ঘোষ ও দিব্যেন্দু ঘোষ (চিত্রগ্রহণ), সমর বসু (শব্দগ্রহণ) ও সত্যেন রায়চৌধুরী (দৃশ্যসজ্জা)।

বেহালায় "অশোক" চিত্রগৃহের উদ্বোধন :

গেল শুক্রবার, ১৮ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বেহালায় "অশোক" চিত্রগৃহের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "মহানগর" প্রদর্শিত হয়।

"বীরেশ্বর বিবেকানন্দ" মুক্তি প্রতীক্ষায় :

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের সশ্রদ্ধ নিবেদন স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ জীবনালেখ্য 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছবিটির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। শ্রীমতী ইভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রবীণ পরিচালক মধু বসু। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন। সুরসৃষ্টি করেছেন—অনিল বাগচী।

নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—অমরেশ দাস। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করেছেন—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, বিপিন গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

উত্তমকুমার, তরুণকুমার, তনুজা, লিলি চক্রবর্তী ও সুমিতা সান্যাল

চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা ও শব্দগ্রহণে রয়েছেন যথাক্রমে—অজয় মিত্র, অর্ধেন্দ, চ্যাটার্জি বট, সেন ও বাণী দত্ত। ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন ভবতারিণী পিকচার্স।

কাঁচড়াপাড়ার আর্ট থিয়েটারের অভিনয়ঃ

গেল ১৩ই অক্টোবর কাঁচড়াপাড়া হাইণ্ডমার্শ রঙ্গমঞ্চে বাংলার অন্যতম শক্তিশালী নাট্যগোষ্ঠী আর্ট থিয়েটার কর্তৃক তুলসী লাহিড়ী রচিত দুটি একাঙ্কিকা 'নায়ক' ও 'মণিকাঞ্চন' অভিনীত হয়। বাংলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ মৃত্যুপণ প্রতিরোধ "নায়ক" নাটকের বিষয়বস্তু। শুধু বর্গীর হাঙ্গামাই নয় এ যেন দেশের যে কোন দুর্দিনে জনগণের মরণপণ দুর্জয় প্রতিরোধের চিরন্তন ডাক।

অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান মানবের ন্যূনতম চিরন্তন তিনটি দাবী। এই দাবীই ফুটে উঠেছে "মণিকাঞ্চন" নাটকে। নায়কের ভূমিকায় ভবেশ ভট্টাচার্য ও নিত্যানন্দের ভূমিকায় প্রবীর ঘোষ দর্শকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য সকলের সঙ্ঘবদ্ধ সুঅভিনয়ও দর্শকের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়।

নাটকটি পরিচালনা করেন সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপস্থাপনা করেন হাবু লাহিড়ী।

'মহাতীর্থ কালীঘাট' চিত্রে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণ ঃ

ভূপেন রায় পরিচালিত ও ন্যাশনাল মুভিজ পরিবেশিত আনন্দময়ী চিত্রপীঠের সঙ্গীতবহুল ভক্তিনিবেদন 'মহাতীর্থ কালীঘাট' ছবির তাণ্ডবনৃত্যে শিবের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যশস্বী নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণ। সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে বিপুল অর্থ ব্যয়ে ঐ দৃশ্যগুলির চিত্রগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ছবিটির দুটি রীল গেভাকালারে রঞ্জিত করা হয়েছে।

।। ক্ষীরোদপ্রসাদ জন্ম-শতবার্ষিকী ।।

সুজনী সাংস্কৃতিক সংসদের উদ্যোগে আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ধ্রুপদী নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ জন্ম-শতবার্ষিকী প্রতিপালন উদ্দেশ্যে একটি সর্বাত্মক কেন্দ্রীয় ও সর্বব্যাপক কর্মসূচী প্রণয়নকল্পে উপস্থিত একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সুবর্ণশিখা চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী

* * শুভমুক্তির সংবাদ * *

এ সপ্তাহে অনেকগুলি ছবি মুক্তি লাভ করছে কলকাতা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে।

- ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের **সুবর্ণশিখা** চিত্রটি রাধা-পূর্ণ-সুচিত্রা এবং আরো কয়েকটি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। সলিল দত্ত পরিচালিত এই চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু এবং আরো অনেককে।

- চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার **কাঞ্চনকন্যা** মুক্তিলাভ করেছে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং শহরতলীর আরও কয়েকটি চিত্রগৃহে।

- অশোককুমার, রাজেন্দ্রকুমার, সাধনা, নিম্মি, প্রাণ, জনিওয়াকার, অমিতা অভিনীত **মেরে মেহবুব** ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, কৃষ্ণা, দর্পণা, প্রিয়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করলো আজ শুক্রবার।

- সোসাইটি, প্রভাত, পূর্ণশ্রী, কালিকা, পার্কশো প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তি-প্রাপ্ত চিত্রটির নাম হল **আজ আউর কাল**। এই চিত্রের অভিনেতা-দের মধ্যে আছেন অশোককুমার, সুনীল দত্ত, নন্দা, তনুজা, সুদেশকুমার।

- আজ শুক্রবার **২৫শে** অক্টোবর অপেরা, গণেশ, খান্না প্রভৃত চিত্র-গৃহে মুক্তি পেল **হরিশ্চন্দ্র তারামতী**। অভিনয় করেছেন পৃথিবরাজ, জয়মালা, ধবলু এবং অনেকে।

- বসুশ্রী, বীণা, মিত্রা, আলোছায়া এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পেয়েছে রূপছায়া চিত্রের **দেয়া-নেয়া**। শ্যামল মিত্র প্রযো-জিত এই চিত্রটি পরিচালনা করেছেন সুনীল ব্যানার্জি। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, তনুজা, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, সুমিতা সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

আনেলিজে রোথেনবের্গের

আনেলিজে রোথেনবের্গের-এর নাম আজ ইউরোপ এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যেই সুকণ্ঠী এবং সুঅভিনেত্রী বলে এ'র নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতে শুরু করেছে। মানহাইমের হাইস্কুলে পড়বার সময়েই এ'র সঙ্গীত-প্রতিভা শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৪৭-এ হামবুর্গে মোৎসার্টের এক কনসার্টে আনেলিজের সঙ্গীত-শিল্পীরূপে জীবন শুরু হয়। তখনকার হামবুর্গ স্টেট অপেরা হাউসের সঙ্গীত-পরিচালক ডাঃ রেনার্ট সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চুক্তিবন্ধ করে ফেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আনেলিজে পাশ্চাত্য জগতের প্রায় সমস্ত অপেরা হাউসেই গান গাইবার সুযোগ পান এবং সব জায়গাতেই শ্রোতাদের মনোহরণ করেন। ১৯৫৭-তে তিনি ভিয়েনা স্টেট অপেরায় স্থায়ীভাবে কাজ করতে শুরু করেন। ১৯৬০-৬১-তে নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটান অপেরার পরিচালক রুডলফ বিং এ'কে রিচার্ড স্ট্রাউসের অপেরা "আরাবেলা"য় জদেন্‌কার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবন্ধ করেন। এই অপেরায় অভিনয়ের ফলে তাঁর জয়-জয়কার পড়ে গেল। আনেলিজে তারপর বহু অপেরায় গান করেছেন। ভার্ডির "রিগোলেত্তো"য় গিল্ডা, স্ট্রাউসের "রোজেন-কাভালিয়ের"এ সোফি, মোৎজার্টের অপেরায় সুজান বা কন্সস্টান্স। বি-বি-সি'র 'মিউজিক ফর ইউ' প্রোগ্রামে প্রায়ই তাঁর গান শোনা যায়। য়োহান স্টাউসের অপারেটা "ফ্লেডের-মাউস"এর যে ইংরিজি ফিল্ম হয় তাতেও আনেলিজে অভিনয় করেছেন আর করেছেন সালজবুর্গ প্রোডাকশনের "রোজেন কাভেলিয়ের"এ। ১৯৫৪ সালে গের্ড ডিবেরিৎস নামে এক সাংবাদিকের সঙ্গে আনেলিজের বিবাহ হয়। আনেলিজের জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ হল আজ পর্যন্ত কোন রকমেই তাঁকে বেচাল দেখা যায়নি বা তাঁকে নিয়ে কোন রকম কানা-ঘুষা শোনা যায়নি।

রাধাকৃষ্ণ চিত্রে শীলা পাল

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ চিত্রে গুরুদাস ব্যানার্জী

মহাতীর্থ কালীঘাট চিত্রে অমরেশ দাস ও কৃষ্ণা বসু

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা—

চিত্রনিপুণিকার প্রবর্তিত ও নিপুণা বিশ্বাস প্রযোজিত ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'স্বর্ণমৃগ' অবলম্বনে গত শুক্রবার ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরটারীতে সঙ্গীতগ্রহণের মাধ্যমে উক্ত ছবির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। তরুণ কুশলী রণজিৎ বিশ্বাস ছবিটি এই প্রথম স্বাধীনভাবে পরিচালনা করছেন। সঙ্গীত-পরিচালক কালীপদ সেন-র পরিচালনায় দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গৃহীত হয়। গান দুটির কথা 'স্বপন পারের ডাক শুনেছি' এবং 'পথের শেষ কোথায়!'

কণ্ঠদান করেছেন সুমিত্রা সেন ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। কাহিনীর প্রধান চরিত্রের জন্য মনোনীত দিলীপ মুখোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও রুমা দেবী। আগামী মাস থেকে দৃশ্যগ্রহণের কাজ শুরু হবে।

পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী 'শ্রেয়সী' ছবিটি শেষ করে সম্প্রতি 'কে তুমি' আরম্ভ করেছেন। প্রণব রায় রচিত এ কাহিনীর দুটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। পার্শ্বচরিত্রে রয়েছেন বম্বের সবিতা চ্যাটার্জি, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এ ছবির সঙ্গীত গৃহীত হয়েছে। কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'লালপাথর' ছবিটির বহির্দৃশ্য সম্প্রতি আগ্রায় সুসম্পন্ন হয়। প্রশান্ত চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে এটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নবাগতা শ্রাবণী বসু। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন সলিল চৌধুরী।

সরোজ সেনগুপ্ত প্রোডাকসন্সের 'সিঁদুরে মেঘ'-র নির্মিত দৃশ্যগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন সুশীল ঘোষ। সঙ্গীত-পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন গণেশ বসু, গৌর পোদ্দার এবং শিব ভট্টাচার্য। সুলেখা সান্যাল রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, গীতা দে, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জীতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, রমা দাস ও রুমা গুহঠাকুরতা।

বোম্বাই—

কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি পরিচালক হলেন। প্রযোজক এন এন সিপ্পি-র পরবর্তী ছবিটি শ্রীচট্টোপাধ্যায় পরিচালনা করছেন। চরণ দাস রচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়। ছবির কাজ তাড়াতাড়ি শুরু হবে জানা গেল।

প্রযোজক ও পরিচালক ভেদ-মদন-এর আগামী রঙিন এবং সিনেমাস্কোপ 'উমর খৈয়াম' চিত্রে নামভূমিকায় সম্প্রতি মনোনীত হয়েছেন সুনীল দত্ত। সম্ভবতঃ বিদেশী কোন অভিনেত্রী এ চিত্রে অবতীর্ণ হবেন। এ ছবির বহির্দৃশ্যে স্থান নির্বাচিত হয়েছে ইরাণ-এ।

লোটাস প্রোডাকসন্সের 'জুয়াড়ী'র একটি সঙ্গীত-দৃশ্য সম্প্রতি বম্বে স্টুডিওয় শেষ হল। সুরজ প্রকাশ এ ছবিটি পরিচালনা করছেন। নির্মল সরকার প্রযোজিত এ চিত্রের প্রধান চরিত্রে রূপদান ক'রছেন শশী কাপুর, নন্দা, তনুজা, নাজ, রেহমান, মাধবী, মদনপুরী, অচলা সচদেব, কমল কাপুর, সুলচনা ও আগা। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

নায়ক-প্রযোজক-পরিচালক প্রেমনাথ সম্প্রতি তাঁর নতুন ছবি 'রাজরাণী মীরা'র মহরৎ অনুষ্ঠান পালন করেন। নামভূমিকায় অভিনয় করছেন প্রেমনাথ-সহধর্মিণী বীণা রায়। এই রঙিন চিত্রটির সঙ্গীত-পরিচালক হলেন রোসান।

নবরঙ্গ ফিল্মসের দ্বিতীয় রঙিন চিত্রটির নাম 'গাল গুলাবি কিসকে হাই'। রে কে নায়ার পরিচালিত এ চিত্রের নায়ক-নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন জয় মুখার্জি ও সাধনা। পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনয় করবেন মতিলাল, আই এস জোহার ও ওমপ্রকাশ। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন রবি।

মাদ্রাজ—

ভিকরাম প্রোডাকসন্সের 'পেয়ার কিয়া তো ক্যা' ছবিটি আগামী নভেম্বরে মুক্তি পাবে। পরিচালক ও চিত্রগ্রাহক বি এস রাঙ্গা পরিচালিত এ চিত্রের দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাম্মি কাপুর ও সরোজাদেবী। রবি ছবিটির সুরকার।

অঞ্জলি পিকচার্সের 'ফ্লুলোঁ কি সেজ'-র বহির্দৃশ্য ওটিতে গৃহীত হল। ইন্দরাজ আনন্দ পরিচালিত এ কাহিনীর মুখ্যচরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন বৈজয়ন্তীমালা, অশোককুমার ও মনোজ-কুমার। —চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

চলচ্চিত্রে রূপসজ্জা একটি প্রধান অঙ্গ। অভিনীত চরিত্রের যথার্থ রূপটি রূপসজ্জার বিশেষ সহায়ক। এই শিল্প-কলা সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। চিত্রগ্রহণের পূর্বে রূপদক্ষের এ রূপান্তর সার্থক অভি-নয়ে একজন শিল্পীকে যথার্থ সাহায্য করে। কারণ অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতা যদি তাঁর আকার এবং প্রকারের সামঞ্জস্য না রাখেন তাহলে সে অভিনয় সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সার্থক হয় না। তবে চলচ্চিত্রে রূপসজ্জার নিখুঁত রূপা-য়ণে নিপুণ রূপকারের প্রয়োজন। কেননা ক্যামেরা লেন্সের প্রখর দৃষ্টি সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ম হয়। সামান্যকিছু ত্রুটি থাকলে তা অতি সহজে ধরা পড়ে। অনেক সময় চলচ্চিত্রে এ ত্রুটি আপনাদেরও চোখে পড়বে যদি একটু লক্ষ্য করে ছবি দেখেন। অবশ্য অর্থ-ক্রোমেটিক ফিল্মের আমলে রূপসজ্জার ভুল দেখা গেলেও বর্তমানে প্যান-ক্রোমেটিক ফিল্মের আবিষ্কারে এ শিল্প-কলা অনেক উন্নত ও নির্ভুল।

রূপসজ্জার কয়েকটি প্রাথমিক বিধি জানিয়ে রাখি। রূপসজ্জার প্রধান দৃষ্টি হল শিল্পীর মুখ। চরিত্রানুযায়ী এর রূপসজ্জার তারতম্য ঘটে। বিশেষ কোন চরিত্রাভিনয়ের সময় রূপসজ্জার প্রতি সতর্কতা ও বিধিমত যত্নবান হতে হয়। মুখের ওপর নানান বর্ণের তারতম্য ঘটিয়ে আলোছায়ায় ইচ্ছানুযায়ী রূপা-ন্তর আনা সম্ভব। অনেক সময় এই তীব্র আলোকসজ্জায় শিল্পীর মুখ-

নালন্দায় 'স্বর্গ হতে বিদায়'-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণকালে পরিচালক মঞ্জু দে, নায়ক দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

মণ্ডলে অনেক ত্রুটি সংশোধন করা চলে। যেমন ছোট্ট নাক, চোখ ও থুতনি নিখুঁত আকারে রূপ দেওয়া সম্ভব। 'নোজ পেস্ট' লাগিয়ে খাঁদা নাককে উঁচু করা যায়। ছোট ও সরুকে বড়ো এবং মোটা করা চলে। চোখ কিন্তু চরিত্রের মূল বস্তু। ভাবপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন। চোখ যার ভাল, চলচ্চিত্রে তার সাফল্য সবচেয়ে বেশী। মানুষের ঘৃণা, লজ্জা, লোভ, আশা, উৎসাহ, উত্তেজনা, আনন্দ, দুঃখ সবকিছুই দুটি চোখে ধরা পড়ে। সুতরাং সার্থক শিল্পীর চোখের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। রূপসজ্জার সাহায্যে চোখের গড়ন, চোখের পল্লব এবং ভ্রূযুগল একেবারে পাল্টিয়ে দেওয়া সম্ভব। বিশেষ চরিত্র ভূমিকায় অভিনয় করার সময় যথার্থ চরিত্রে সার্থক করে তুলতে পারে শিল্পীর চোখের সাহায্যে। চোখ-দুটি যদি নাকের খুব কাছাকাছি হয়, তাহলে সে চোখ সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষকে চিনিয়ে দিতে পারে সহজে। তেমনি চোখদুটি নাকের থেকে দূরে চলে যায় তাহলে সে মানুষকে দেখে অসাধু বলে মনে হতে পারে। চোখ যার খোলের ভেতরে ঢুকে গেছে তাকে দেখলে মনে হবে সে হিংস্র ও অবিশ্বাসী। চোখের সঙ্গে মানুষের ঠোঁটের সম্পর্ক খুব নিকটের। দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি দুটি পাতলা ঠোঁটের প্রকাশ ভঙ্গিতে প্রকাশ করা যায় শুধু রূপসজ্জার সাহায্যে। যাঁদের ঠোঁট পুরু ও মোটা তাঁরা রংয়ের সাহায্যে সে ত্রুটি সংশোধন করে নিতে পারেন। মেয়েরা অতিসহজে লিপস্টিক-এর ব্যবহারে অধরোষ্ঠকে সুন্দর করে নেন।

বয়সের রকমফের চোখে-মুখে ধরা পড়ে। রূপসজ্জার সাহায্যে 'বলিরেখা'-র বয়সের কমবেশী করা চলে। 'বলিরেখা'র সহজ উপায় হচ্ছে মুখে রং মাখার পর পেন্সিলের দাগ দিয়ে বিকৃত ও সঙ্কুচিত করলেই মুখমণ্ডলে সে ছাপ ফুটে ওঠে। পুরুষ চরিত্রে গোঁফ অনেক সাহায্য করে। তেমনি দাড়ি সম্পর্কে। মানুষের প্রকৃতি ও চরিত্রের আভাস পরিলক্ষিত হয়। ভ্রূ যেমন সৌন্দর্য ফোটায় তেমনি ভ্রূর গঠনে শয়তানের বিশেষ চরিত্র ধরা পড়ে।

রূপসজ্জার অনেক উপকরণ আছে। বিস্তারিত আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। শুধু মোটামুটি একটু ধারণা দেওয়া গেল। একটা কথা মনে রাখতে হবে ভূমিকা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, ক্যামেরার সামনে প্রত্যেক চলচ্চিত্র-শিল্পীকে রূপসজ্জা সম্পর্কে সদাসতর্ক হতে হবে। কারণ একটি মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ তার আকার প্রকারে আমাদের যথার্থ রূপটি পরিস্ফুট হয়।

—চিত্রদূত

'বিভাস' চিত্রে কমল মিত্র

॥ পেনিলোপী হাউস্টনের নতুন বই ॥

ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত প্রখ্যাত পত্রিকা 'সাইট এ্যান্ড সাউন্ড'-এর সম্পাদিকা পেনিলোপী হাউস্টন 'দি কন্টেম্পরারী সিনেমা' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে পেঙ্গুইন বুকস কর্তৃক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রের গতি-প্রকৃতির একটি সামগ্রিক বিবরণ দিয়েছেন শ্রীমতী হাউস্টন। চিত্র-নির্মাণের অর্থনৈতিক দিকের কথাও আলোচনা করেছেন লেখিকা।

ইংল্যাণ্ডে টেলিভিশনের প্রতাপে সিনেমাশিল্প প্রায় কোণঠাসা হবার মতন হয়েছিল। এখনও সিনেমার

বিখ্যাত জাজ সঙ্গীতজ্ঞ ডিউক এলিংটন সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন।

দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সুখী গৃহকোণে টেলিভিশনের ছায়াছবি দেখতেই পছন্দ করেন বেশী। দর্শকদের ওপর টেলিভিশনের প্রভাবকে নষ্ট করবার জন্যে তাই বৃটেন, আমেরিকা এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের চিত্র-নির্মাতারা জাঁক-জমকপূর্ণ চিত্র নির্মাণে মনোযোগ দিয়েছেন। 'বেন-হার', 'লরেন্স অফ আরেবিয়া' এবং 'ডক্টর নো' এই জাতীয় চিত্রের সফল নিদর্শন। তবে বৃটেনে ইদানীং ভিনদেশী ছবির দর্শকদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছে। ফ্রান্স, ইটালী এবং জাপানী ছবির দর্শক ইংল্যান্ডে এখন প্রচুর।

শ্রীমতী হাউস্টন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সিনেমাশিল্পের ওপর যুদ্ধোত্তর ইটালীয় ছবির প্রভাবের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিও-রিয়ালিস্ট ডি সিকা এবং রোসেলিনী থেকে আরম্ভ করে আন্তোনিয়নী, পাসোলিনী, এবং ওলমির প্রভাব আজকের বিশ্বচলচ্চিত্রে প্রত্যক্ষভাবেই উপস্থিত। শ্রীমতী হাউস্টনের মতে ভিসকন্টির 'লা টেরা ট্রেমা' একটি 'অপোষহীন মহৎ সৃষ্টি'। 'ইটালীর ছবি', হাউস্টন লিখেছেন, 'কখনই আমাদের ভুলতে দেয় না যে তাদের আধুনিক পর্ব আরম্ভ হয়েছিল সমাজ-সচেতনতার তাগিদে'। বৃটেনের পরিচালকরা কিন্তু বিশ্বাস করেন যে পরিচালকের মৌল কর্তব্য হচ্ছে ভাষ্যকার হওয়া, সৃষ্টি করা নয়, উচ্চ কণ্ঠে নিজের বিশ্বাসের কথা বলায় চাইতে, চিত্রনাট্যের প্রতি অনুগত হওয়াই বিধেয় পরিচালকের।

পেনিলোপী হাউস্টনের বইতে ফ্রান্সের 'নব-তরঙ্গ' আন্দোলন, ইংল্যান্ডের আধুনিকতম পরিচালকদের ওপরেও অনেকগুলি অধ্যায় আছে। ইংল্যান্ডের আধুনিকতম চলচ্চিত্র আন্দোলনের নায়কেরা সকলেই নব-নাট্য আন্দোলনের মঞ্চ থেকে এসেছেন। তবে হাউস্টন লিখেছেন যে, ইংল্যান্ডের চেয়ে ফ্রান্সে চলচ্চিত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ অনেক বেশী। কারণ চিত্র-নির্মাণের ব্যয় ফ্রান্সে ইংল্যান্ডের চেয়ে অনেক কম। আমেরিকা, রাশিয়া এবং জাপানের চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক দিকের কথাও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লেখিকা।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলেছেন যে, ভারতবর্ষের দর্শকবৃন্দ 'তারকাখচিত' ছবি দেখতেই ভালবাসেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে শ্রীমতী হাউস্টন উচ্ছ্বসিত। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের 'অপু-চিত্র' তাঁকে মুগ্ধ করেছে। রায় সম্বন্ধে লেখিকা বলেছেন :

Ray came along to recharge the batteries of humanist cinema at a time when neo-realism had sacrificed its momentum.

—চিত্রকূট

বিস্মৃত নায়িকা

তাঁর নাম আজকে বিশেষ কেউ মনে রাখেনি, তাঁর অভিনীত ছবির দর্শকও আজকে প্রায় অপ্রতুলিমেয়, কিন্তু তবু তিনি ছিলেন একদা। একটি মাত্র চিত্রের অদ্বিতীয়া নায়িকা রেনী ফেলকনেটি একটির বেশী ছবিতে অভিনয় করেননি, পত্রপত্রিকার গুজবের কারণ হননি কখনো। এ্যাকাডেমি এ্যাওয়ার্ডের পুতুল দিয়ে ঘরও সাজাতে পারেননি। চলচ্চিত্রের ইতিহাস তবু তাঁকে মনে রাখবে। মনে রাখবে ১৯২৭ সালে নির্মিত 'দি প্যাশন অফ জোয়ান অফ আর্ক' নামক নির্বাক চিত্রটিতে তাঁর স্মরণীয় ভূমিকার জন্যে। না, দেখতে অসামান্য রূপসী ছিলেন না রেনী ফেলকনেটি। সাদাসিধে, যৌন-আবেদনহীন অভিনেত্রী ছিলেন। চোখ দুটো যেন একটু বেশীই বিস্ফারিত, নখের কোণে ময়লা, একেবারেই চলচ্চিত্রা-ভিনেত্রীচিত নয়। কিন্তু রেনীর জোয়ান অফ আর্ক চরিত্র-সৃষ্টি, চলচ্চিত্র-সমালোচকদের মতে আজো অদ্বিতীয়। ঐতিহাসিক চরিত্রের বাস্তব রূপায়ণ করতে গিয়ে নিজের শরীরকে শরীর ভাবেননি তিনি। চিত্রের প্রয়োজনে মহিলা হয়েও মুণ্ডিত মস্তক হতে এতটুকু আপত্তি করেননি, শরীরে সত্যিকারের রক্তপাত ঘটিয়েছেন। এমনকি ক্রুদ্ধ ইংরাজ জনতা যখন জোয়ানের মুখে থুথু ছিটিয়েছে রেনী ফেলকনেটিও অম্লানবদনে একস্ট্রাদের থুথু গ্রহণ করেছেন মুখে। আমেরিকায় যখন 'দি প্যাশন অফ জোয়ান অফ আর্ক' প্রথম দেখানো হয়েছিল সারাদেশ তাঁর অভিনয় দেখে সেদিন স্তম্ভিত। তাঁর সম্বন্ধে তখনকার নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড টেলিগ্রাম লিখেছিলেন : 'ফেলকনেটির জোয়ান চরিত্রচিত্রণ চলচ্চিত্রের অভিনয়ের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।' বিখ্যাত চলচ্চিত্র-সমালোচক হেরমান ডাইনবের্গ-এর অকুণ্ঠ মত আরো উচ্ছ্বসিত: সারা বিশ্বের রজতপটে অদ্যাবধি যত অভি-

রেনি ফেলকনেটি

নেত্রী যে কটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ফেলকনেটির জোয়ানের ভূমিকার পাশে তাঁরা সকলেই ম্লান।

কিন্তু এহেন অভিনেত্রী বিস্মৃতির পথে আজকে কোথায় হারিয়ে গেছেন। ফেলকনেটি কে, কোথাকার লোক, কেন শুধু একটিমাত্র ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন—এসব প্রশ্ন আজো কিংবদন্তীর পাতায় উচ্চকিত হয়ে আছে। এমনকি তাঁর একদা ভক্তরাও আজকে জানেন না যে তিনি জীবিত না মৃত। ফেলকনেটি স্মৃতির অতলে ডুবে গেছেন, তার জন্যে অবশ্য দায়ী তাঁর নাম। ফেলকনেটির নাম যাঁরা শুনেছেন বা যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখেছেন তাঁদের সকলের ধারণা তাঁর নাম মারিয়া ফেলকনেটি। তাঁর ছবির সমালোচনাতেও 'মারিয়া' নামটিই মুদ্রিত হয়েছিল। কাজেই ১৯৪৪ সালে যখন রেনী পরলোকগমন করেন কেউ বুঝতে পারেননি যে রজতপটের জোয়ানের পার্থিব প্রতিভূই ইহলোক ত্যাগ করলেন।

আজকে রেনীর জীবনকাহিনীর উৎসমাত্র তিনটি। 'দি প্যাশন অফ জোয়ান অফ আর্কে'র বিশ্রুত পরিচালক বন্ধু কার্ল ড্রেয়ার, একটি ইটালীয় বিশ্বকোষ এবং রেনীর আইনজীবী কন্যা হেলেন ফেলকনেটি। রেনী জাঁ ফেলকনেট ১৮৯৩ সালে প্যারিসের কাছেই জন্মে-ছিলেন। আঠারো বছর বয়সে প্রথম তিনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন এবং সংগে সংগেই বিখ্যাত হয়ে পড়েন। মাত্র একত্রিশ বছর বয়েসেই রেনী প্যারিসের রয়াল সোসাইটি অফ অ্যাকট্রেস কর্তৃক অভিনয়ের জন্যে আমন্ত্রিত হন। কিন্তু 'কমেডি ফ্রানচাইজে' বেশীদিন থাকতে পারেননি। তিনি। ভালো ভালো সমস্ত ভূমিকা প্রবীণা অভিনেত্রীদের মধ্যেই সীমিত থাকত, তিনি কদাচিৎ অভিনয়ের

সুযোগ পেতেন সেখানে। ঝগড়া করে সম্মানিত পদে ইস্তফা দিয়ে রয়াল সোসাইটি থেকে বেরিয়ে আসেন রেনী। ঠিক এই সময় ড্যানিশ পরিচালক কার্ল ড্রেয়ার তাঁর ছবির নায়িকার সন্ধানে প্যারিসের থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ফেলকনেটির খ্যাতি শুনে, তাঁর অভিনয় দেখে তাঁকেই নির্বাচিত করলেন জোয়ানের ভূমিকায়। এই প্রসঙ্গে ড্রেয়ারের নিজের বিবরণটি উল্লেখ্য ঃ

ফেলকনেটিকে আবিষ্কার করার আগে আমি টর্চ হাতে প্যারিসের থিয়েটারে থিয়েটারে নতুন নায়িকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। ফেলকনেটি সম্বন্ধে অনেক কথাই ইতিমধ্যেই আমার শোনা ছিল। ধনবতী মহিলা হিসেবে প্যারিসের সমাজে নাম ছিল তার। উর্দি-পরা ড্রাইভারচালিত রোলস রয়েস চড়ে সে থিয়েটারে আসত। তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনই লক্ষ্য করেছিলুম যে, যদিও প্রসাধনের এবং লাস্যহাসির মুখোশ পরেছিল সে, তবুও লোরেনের সেই কৃষককন্যার মুখের আদলটি তাতে ঢাকা পড়েনি।

পরিচালক ড্রেয়ারের প্রস্তাবে সহজেই রাজী হয়েছিলেন রেনী, রাজী হয়েছিলেন প্রসাধনহীন হয়ে অভিনয় করতে, মস্তক মুণ্ডন করতে। কেশহীন নিজের ছবি দেখে একবার কেঁদেও ফেলেছিলেন রেনী। নিজের প্রসাধনহীন মুখ পর্দায় দেখে চীৎকার করে বলেছিলেন, 'আমি এত কুৎসিত?' ছবি শেষ হবার পর রেনীকে দীর্ঘকাল পরচুল পরে বাইরে বেরোতে হয়েছিল। কিন্তু চলচ্চিত্রে অভিনয় করে অপরিসীম খ্যাতি পেয়েও, চলচ্চিত্র-জগতে আর থাকলেন না তিনি, ফিরে গেলেন স্বরাজ্যে, পাদপ্রদীপের আলোয়। নিজের একটা থিয়েটারও কিনেছিলেন রেনী। বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষানিরীক্ষামূলক নাটক, যা অন্য কোনো থিয়েটার কর্তৃপক্ষ মঞ্চস্থ করতে সাহসী হবেন না, মঞ্চস্থ করেছিলেন। প্রথম বছর অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন তাঁর নতুন থিয়েটারে। কিন্তু পরের বছর রেনী শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। তিনি তাঁর যাবতীয় অর্থ এই থিয়েটারে বিনিয়োগ করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত তাঁর পরীক্ষামূলক পরিকল্পনাই তাঁকে দেউলিয়া করে দেয়। ক্রমশঃ মন ভেঙ্গে পড়ে রেনীর। থিয়েটারটি হাতছাড়া হবার পর তিনি নিজে ক্রমশঃ খুব কম নাটকে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। গত মহাযুদ্ধের সময় প্যারিস নাৎসীকবলিত হলে রেনী সুইৎসারল্যাণ্ডে চলে যান, সেখান থেকে ব্রাজিলে। ব্রাজিলে গান শিখিয়ে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্যারিস শত্রুমুক্ত হবার পর আবার প্যারিসে ফেরবার জন্যে, রঙ্গমঞ্চে পুনর্বার উদ্ভাসিত হবার জন্যে আকুল বাসনা ছিল রেনীর। তাঁর পুরানো নাট্যকার বন্ধু তাঁর জন্যে একটা নাটকও লিখেছিলেন। কিন্তু ফেলকনেটি ইদানীং একটু মোটা হয়ে যাওয়ার ফলে ভূমিকাটির পক্ষে একটু বেমানান হচ্ছিলেন। অনাহারে রোগা হবার সংকল্প নিয়ে আহার ত্যাগ করলেন। কিন্তু সামলাতে পারলেন না শেষপর্যন্ত, শেষনিঃশ্বাস পড়ল তাঁর, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪ সালে।

রেনী ফেলকনেটির চরিত্রের বিষাদ-ময় দিক তাঁর অধৈর্য। অধৈর্যতাড়িত হয়ে এ থিয়েটার থেকে ও থিয়েটারে গেছেন, দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছেন। তাঁর অভিনীত চরিত্রের নাটকীয় সংঘাত যেন তাঁর জীবনেও এসে ভর করেছিল। কখন স্থির হননি, শিল্প ছাড়া বোধহয় রেনীর আর কোনো বন্ধুও ছিল না।

কণাদ চৌধুরী

খেলাধূলা

দর্শক

টোকিওর প্রাক্-অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

টোকিওর 'প্রাক্-অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান সপ্তাহ' শেষ হয়েছে। জাপানকে নিয়ে মোট ৩৫টি দেশ এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করেছিল। প্রতিযোগিতার তালিকায় ছিল বিভিন্ন রকমের ২৩টি খেলাধূলা। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে জাপানের প্রতিনিধি সংখ্যাই ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী—৩,৩০০জন। প্রতিনিধি সংখ্যার দিক্ থেকে তারপর যথাক্রমে পশ্চিম জার্মানী (১১১) রাশিয়া (৯১) এবং আমেরিকার (৪০) স্থান। বেশী সংখ্যক অনুষ্ঠানে এবং সংখ্যায় বেশী প্রতিনিধি যোগদান করায় জাপানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী স্বর্ণপদক অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। স্বর্ণপদক লাভের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পায় পশ্চিম জার্মানী, তৃতীয় স্থান রাশিয়া এবং চতুর্থ স্থান আমেরিকা। নিউজিল্যাণ্ডের মাত্র দু'জন প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের জেফ জুলিয়ান ম্যারাথন রেসে এবং বিল বেইলী ১০,০০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক লাভ ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। যাঁরা দুটি ক'রে অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—জিমন্যাস্টিকে রাশিয়ার কুমারী লেটিনিনার তিনটি স্বর্ণপদক লাভ। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে লেটিনিনা মোট পাঁচটা পদক পেয়েছিলেন (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ১)। রাশিয়ার অপর মহিলা তামারা প্রেস আলোচ্য অনুষ্ঠানের সটপুটে (৫৬ ফিট ৭½ ইঞ্চি) এবং ডিসকাস নিক্ষেপে (১৭৪ ফিট ৬½ ইঞ্চি) স্বর্ণপদক পান; কিন্তু তিনি সটপুটে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ডের থেকে অনেক কম পথ অতিক্রম করেছিলেন। পশ্চিম জার্মানীর গারহার্ড হেট্জ পুরুষদের সাঁতারের দুটি অনুষ্ঠানে (৪০০ মিটার মেডলি রিলে এবং ১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে কেবল প্রথম স্থানই লাভ করেননি তিনি ৪০০ মিটার মেডলি রিলেতে ৪ মিঃ ৫০·২ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম ক'রে আমেরিকার টেড টিক্লসের বিশ্বরেকর্ড (৪ মিঃ ৫১ সেঃ) ভঙ্গ করেন। বিশ্বরেকর্ড স্রষ্টা মহিলা সাঁতারু সাতোকা তাজাকা (জাপান) ১০০ ও ২০০ মিটার চিৎ সাঁতারে স্বর্ণপদক পান। ইংল্যাণ্ডের মাত্র চারজন প্রতিনিধি এ্যাথলেটিকসে যোগদান ক'রে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। ইংল্যাণ্ডের ডোরোথি হিম্যান মহিলাদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান লাভ করেন।

প্রতিযোগিতার কোন কোন অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা এ্যাথলীটকে দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে হয়েছিল। যেমন মহিলাদের বর্শা নিক্ষেপ অনুষ্ঠানে বিশ্বরেকর্ড এবং অলিম্পিক বিজয়িনী (১৮৩ ফিট ৭½ ইঞ্চি) এলভিরা ওজোলিনাকে (রাশিয়া) পরাজিত ক'রে প্রথম স্থান পান পশ্চিম জার্মানীর এ্যানা-লিসা গারহার্ডস। পুরুষদের হাতুড়ি নিক্ষেপে রাশিয়ার জি নোভ্রাসোভ বিশ্বরেকর্ডধারী হ্যারোল্ড কনোলীকে (আমেরিকা) তৃতীয় স্থানে ফেলে রেখে প্রথম স্থান লাভ করেন।

প্রতিযোগিতায় যে সব আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ক্রীড়াবিদ স্বর্ণপদক লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম : পুরুষ বিভাগের লংজাম্পে বিশ্বরেকর্ডধারী আইগর তার-ওভানেসিয়ান (রাশিয়া), পোলভল্টে বিশ্বরেকর্ডধারী জন পেনেল (আমেরিকা) এবং বর্শানিক্ষেপে প্রখ্যাত জেমিস লুসিস (রাশিয়া); তাছাড়া মহিলা বিভাগের হাইজাম্পে ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিক বিজয়িনী আইয়োল্যাণ্ডা বালাস (রুমানিয়া)।

ভারতবর্ষের পক্ষে সাতজন প্রতিনিধি রাইফেল স্যুটিং এবং মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধের লাইটওয়েট বিভাগে পদম বাহাদুর মল এবং মিডলওয়েট বিভাগে সুরেন্দ্রনাথ সরকার দ্বিতীয় স্থান লাভ ক'রে ভারতবর্ষের পক্ষে রৌপ্যপদক সংগ্রহ করেন।

টোকিওর এই প্রাক্-অলিম্পিক এ্যাথলেটিক্সে একাধিক অলিম্পিক বিজয়ী এবং বিশ্বরেকর্ডধারী যোগদান করেও তাঁরা নিজেদের রেকর্ড স্পর্শ করতে পারেননি। বরং তাঁরা নিজেদের পূর্ব রেকর্ডের থেকে অনেক খারাপ ফল করেছেন। এইদিক থেকে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

॥ মৈনুদ্দৌলা ক্রিকেট কাপ ॥

পতৌদির নবাবের নেতৃত্বে বিজয়নগর একাদশ দল ৫ উইকেটে গত বছরের বিজয়ী এ সি সি (এসোসিয়েটেড সিমেন্ট ক্লাব) একাদশ দলকে পরাজিত ক'রে মৈনুদ্দৌলা গোল্ড কাপ জয় করেছে। চার দিনের ফাইনাল খেলা শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিনে চা-পানের নির্দিষ্ট সময় থেকে ২০ মিনিট আগেই শেষ হয়ে যায়। এ সি সি একাদশ দল পরিচালনা করেন ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড় বাপু নাদকার্ণী। উভয় দলেই একাধিক টেস্ট খেলোয়াড় যোগদান করেছিলেন।

ফাইনাল খেলা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল ১২ই অক্টোবর; কিন্তু প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ ঐ দিন ফাইনাল খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। ১৩ই অক্টোবর থেকে খেলা আরম্ভ হয়। প্রথম দিনের খেলায় গত বছরের বিজয়ী এ সি সি একাদশ দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৩ ঘন্টারও কম সময়ের খেলায় মাত্র ১২৫ রাণের মাথায় শেষ হয়। দলের সর্বোচ্চ ৬৭ রাণ করেন দলের অধিনায়ক বাপু নাদকার্ণী। চাঁদু বোরদে একাই মাত্র ২৪ রাণ দিয়ে ৫টা উইকেট পান। সেলিম দুরানী পান ২টো, ৫০ রাণে। বিজয়নগর দলকেও ৫টা উইকেট হারাতে হয় মাত্র ৬৯ রাণে। দলের নামকরা খেলোয়াড় বিজয় মঞ্জরেকার ১৭ রাণ এবং পতৌদির নবাব এক রাণ ক'রে খেলা থেকে বিদায় নেন।

ফাইনাল খেলার দ্বিতীয় দিনে বিজয়নগর একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ১০৫ রাণের মাথায় শেষ হয়।

১৯৬৪ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের একটি প্রাচীরপত্র
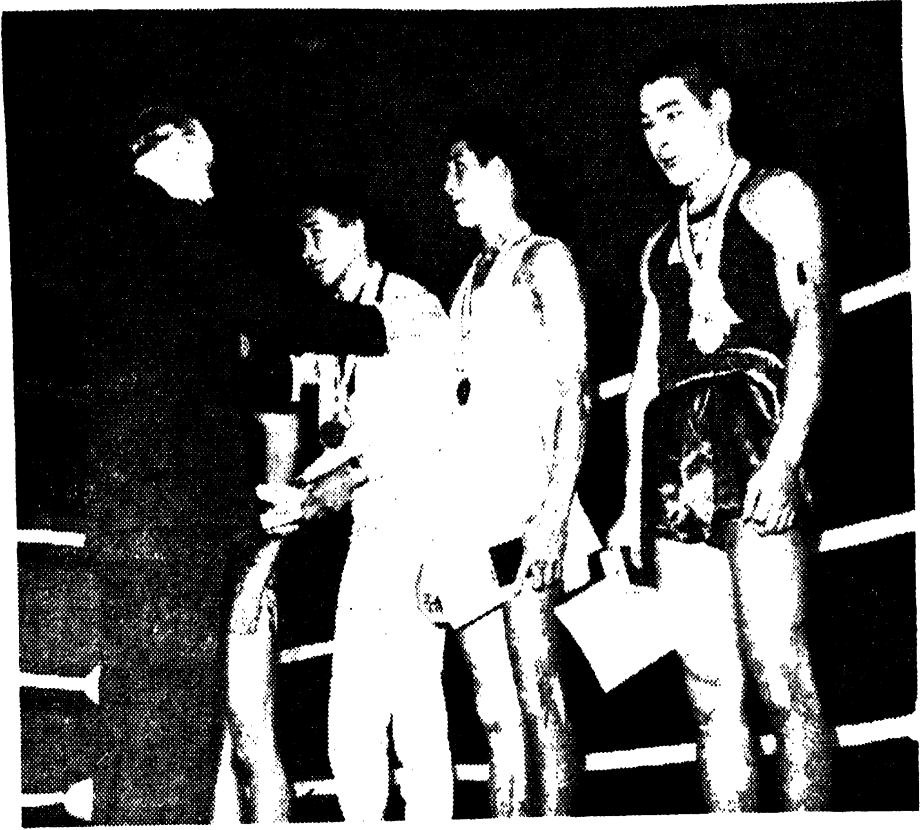
টোকিওতে সদ্য সমাপ্ত প্রাক-অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিজয়মঞ্চে লাইটওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ বিভাগের প্রথম তিনজন : প্রথম জাপানের বানামারু সিরোভোরি (ছবির বাঁদিকে), দ্বিতীয় ভারতবর্ষের পদম বাহাদুর মল্ল (মধ্যস্থলে) এবং তৃতীয় এন প্রাসেটসম (থাইল্যান্ড)।

এই দিন তারা ১১২ মিনিটের খেলায় পূর্ব দিনের ৬৯ রাণের (৫ উইকেটে) সঙ্গে ৩৬ রাণ যোগ করে বাকি ৫টা উইকেটে।

এ সি সি একাদশ দল ২০ রাণে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। চা-পানের সময় তাদের রাণ দাঁড়ায় ২টো উইকেট পড়ে ১০৩। সমর্থকদের পক্ষে খুবই আশার কথা। কিন্তু ক্রিকেট যে কত অনিশ্চিত খেলা তারই প্রমাণ পাওয়া গেল পরবর্তী এক ঘণ্টার খেলায়। এ সি সি একাদশ দলের আরও ৭টা উইকেট পড়ে গেল; এদিকে এই ৭টা উইকেট হারিয়ে রাণ পাওয়া গেল মাত্র ২৪টা। বোরদে ৮ ওভার বল দিয়ে এই ৭টা উইকেটের মধ্যে ৫টা উইকেট পান। প্রথম উইকেট পতনের পর সারদেশাই খেলতে নেমেছিলেন এবং তিনি দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৪ রাণ করেন। খেলার এই দ্বিতীয় দিনটা ছিল বোলারদের খেলা—১৪টা উইকেট নিয়ে তাঁরা মাত্র ১৬৮ রাণ করতে দিয়েছিলেন।

খেলার তৃতীয় দিনে এ সি সি একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৪৮ রাণের মাথায় শেষ হলে বিজয়নগর একাদশ দলের জয়লাভের জন্যে ১৬৯ রাণের প্রয়োজন হয়। ৫টা উইকেট পড়ে তাদের এই রাণ উঠে যায় চা-পানের নির্দিষ্ট সময়ের ২০ মিনিট আগে।

এ সি সি একাদশ : ১২৫ রাণ (নাদকার্ণী ৬৭। বোরদে ২৪ রাণে ৫ উইকেট) ও ১৪৮ রাণ (সারদেশাই ৫৪। বোরদে ৪৮ রাণে ৬ উইকেট)।

বিজয়নগর একাদশ : ১০৫ রাণ (কাদবেট ৩৪ রাণে ৪ এবং নাদকার্ণী ২৯ রাণে ৪ উইকেট) ও ১৬৯ রাণ (৫ উইকেটে। পতৌদির নবাব ৬১ রাণ। নাদকার্ণী ৪৮ রাণে ২ উইকেট)।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

গৌহাটিতে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল ফাইনালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল ৪—১ গোলে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত ক'রে সার আশুতোষ মুখার্জি স্মৃতি ট্রফি জয় করেছে। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গোল দেন আউটসাইড লেফট খেলোয়াড় অমৃত চ্যাটার্জি ২টি, ইনসাইড লেফট সন্তোষ চ্যাটার্জি এবং সেণ্টার-ফরওয়ার্ড শিবরাম সরকার ১টি ক'রে। প্রথমার্ধের খেলায় ক'লকাতা দল ৩—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ১৫ মিনিটের মাথায় ওসমানিয়া দলের আফজল একটা গোল শোধ দেন। খেলার প্রথম মিনিটেই ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রথম গোল করেন সন্তোষ চ্যাটার্জি।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার এই সার আশুতোষ মুখার্জি স্মৃতি ট্রফিটি দান করেছেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিযোগিতার প্রথম বছরেই (১৯৪১) ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই ট্রফি জয় করেছিল। প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে এ পর্যন্ত ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৮ বার এই ট্রফি জয় করেছে।

খেলার কথা

অজয় বসু

লিয়'র খবর বড় খবর।

খবর বড় বলেই যাঁরা এই খবর গড়েছেন তাঁরাও অভিনন্দিত হয়েছেন বড়-মানুষের স্বীকৃতিতে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন 'ভারতীয় হকি খেলোয়াড়েরা আমাদের গর্ব'!' প্রধানমন্ত্রীর উচ্চারিত কণ্ঠের সুরও অভিন্ন।

এরপর আর নতুন কোনো স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। তবুও এই অবকাশে সাধারণ ক্রীড়ামোদী হিসেবে আমরা জাতিগতভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই তাঁদের কাছে যাঁদের ক্রীড়াকৃতি আজ ভারতবাসীর মনের দিগন্তে আশার আলো ফুটিয়ে তুলেছে।

ফুটবল নিয়ে আমরা যতোই হট্টগোল পাকাই না কেন অথবা ক্রিকেটের সূত্রে ঢিলেঢালা মেজাজে মেলা বসাবার উৎসাহ আমাদের যতোই বেড়ে চলুক না কেন, আসলে হকিই আমাদের সব। আমাদের ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য হকিতেই। আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার আধুনিক আসরে হকিই আমাদের পরিচয়।

আটান্ন সালের এশীয় ক্রীড়ায়, ষাট সালে অলিম্পিক ক্রীড়াভূমি রোমে সেই পরিচয় হারাতে এক অস্বস্তিকর নৈরাশ্যের ছায়াপাত ঘটেছিল ভারতের ক্রীড়াজীবনে। কবছর কেটেছে গোমড়ামুখে। বোধহয় এই বিপর্যয় হালছেড়ে দেবার উপক্রমও ঘটাতে চলেছিল। কিন্তু লিয়'র সুযোগ ভরাডুবির মুখেই ভারতীয় হকিকে ভরাযৌবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি উজ্জীবিত করেছে।

ভারত লিয়'তে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা জয় করেছে। টোকিও ও রোমের সব আক্ষেপ না মিটলেও, এ সাফল্যে অনেক সান্ত্বনা আছে। সব খেদ মিটে যাবে যদি স্বস্থান ফিরে পেয়ে ভারত আবার টোকিওর আসর মাৎ করে দিতে পারে। ওই টোকিওতেই ভারতীয় হকিকে একদিন শ্রেষ্ঠের আসন বিকিয়ে দিতে হয়েছিল। তাই হৃতসম্পদ ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্র হিসেবে টোকিওই বোধহয় সবচেয়ে উপযুক্ত।

লিয়' প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়াও প্রত্যক্ষদর্শীদের একবাক্য বেসরকারী রায়েও ভারতীয় দল সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত। সেখানে অলিম্পিকজয়ী পাকিস্থানের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না বটে। কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই ছিল। আর ছিল ক্রমাগ্রসরমান ইওরোপের কটি নবীন শক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এতোগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্ত, সক্রিয় ভূমিকাকে ডিঙিয়ে একেবারে সামনের আসনটি দখল করে নেওয়া কোনো অতর্কিত ব্যাপার নয়।

অনুমানে বোধহয় যে, গত ক' বছরের তুলনায় আজ ভারতীয় হকি দল অনুকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন। হয়তো মন্ত্রগুপ্তির রহস্য ভেদ করা সম্ভবপর হয়েছে। কি করে তা সম্ভবপর হলো? লিয়'তে যাঁরা ভারতের পক্ষে খেলেছেন তাঁরা সবাই উঠতি নতুন খেলোয়াড় নন। দলে পুরানো খেলোয়াড়দেরই ভীড় ছিল বেশী। তবুও ও'রা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছেন কি করে?

মনে হয়, এই সাফল্যের হেতু পরিবর্তিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। লিয়' যাত্রার আগে দলের প্রস্তুতিপর্বে অনুশীলন পরিচালনা করেছেন প্রবীণ কোচ শ্রীহাবুল মুখার্জি ও শ্রীধ্যানচাঁদ। এবং স্বয়ং ধ্যানচাঁদই দলের শিক্ষক হিসেবে বিদেশেও দলের সহযাত্রী ছিলেন।

হাবুল মুখার্জি আগেও একাধিকবার বিশ্ববিজয়ী ভারতীয় হকিদলের শিক্ষাভার নিয়েছিলেন। তাঁর আমলে ভারতকে শ্রেষ্ঠের সম্মান বিসর্জন দিতে হয়নি। কিন্তু যে পর্বে প্রশিক্ষকের পদ থেকে হাবুল মুখার্জিকে সরানো হয়েছিল অথবা নেপথ্য চক্রান্তের চাপে ধ্যানচাঁদকে নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যপদ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল সেই পর্বেই ভারতীয় হকিকেও পেছনের সারিতে পিছিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই।

ও'দের সরিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত যে সুবিবেচকের কাজ নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশিক্ষক হিসেবে অনন্য খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদকে অথবা চিরদিনের সফল পক্ককেশ পরিণত হাবুল মুখার্জিকে পাওয়া পরম ভাগ্যের কথা। কিন্তু হাতে-পাওয়া এই ভাগ্যকে ভারতীয় হকির কর্তৃপক্ষ একদিন অনাদরে ফিরিয়ে দিয়ে হাতেনাতেই তার কুফল পেয়েছেন।

তাই প্রশিক্ষক হিসেবে ও'দের প্রত্যাবর্তনে ভারতবাসী মাত্রেই সুখী। ফিরে এসেই ও'রা ভারতীয় হকির সুদিনকে ফিরিয়ে আনায় উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি রেখেছেন এই লিয়' প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে। বিশ্বাস করি যে, এরপর আর কর্তৃপক্ষ হাবুল মুখার্জি আর ধ্যানচাঁদকে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে কার্পণ্য করবেন না। একদা যে মহাভুলের পথে পা মেলে কর্তৃপক্ষ দুর্দিন ডেকে এনেছিলেন সেপথ যে পরিত্রাণের পথ নয় এই উপলব্ধিতেই যেন ভারতীয় হকির দণ্ডমুণ্ডের মালিকেরা অনুপ্রাণিত হতে পারেন।

আমাদের মনে আছে যে ক'মাস আগে ধ্যানচাঁদ প্রকাশ্যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের শিক্ষাভার তাঁর হাতে অর্পণের দাবী তুলে বলেছিলেন যে, কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা পেলে তিনি ও তাঁর সতীর্থ'রা শ্রেষ্ঠাসনে ভারতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে দেবেনই। তাঁর সেই অভিমত যে নিছক বাক্যাড়ম্বর নয় লিয়'র পর সেকথা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে ঘটেনি।

ও'দের চেষ্টায়, হাবুল মুখার্জি আর ধ্যানচাঁদের প্রশিক্ষণগুণে ভারতীয় হকি আজ কিছুটা এগিয়েছে সন্দেহ নেই। তবু বলি যে, আরও এগোতে হবে। সামনে টোকিও অলিম্পিকের আসর। সেই আসর শ্রেষ্ঠের জাত যাচাইয়ের সব চেয়ে বড় পরীক্ষাভূমি।

লিয়'তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা জয়ের আনন্দে একেবারে দিশেহারা হওয়া এবং আত্মতুষ্ট থাকা আমাদের সাজে না। আত্মতুষ্ট মনোভাবের খেসারৎ দিতে গিয়ে ভারতকে যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে সেকথা ভোলাও চলে না।

তাছাড়া লিয়'তে ভারতীয় দল সবার সেরা দলের স্বীকৃতি পেয়েও একেবারে নিখুঁত ক্রীড়াকৃতির পরিচয় রাখতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। এ সন্দেহ প্রত্যক্ষদর্শীদের। তাঁদের আরও অভিমত এই যে, সামগ্রিক হিসাবে লিয়' প্রতিযোগিতায় খেলার মান অলিম্পিক ক্রীড়ামানের সমান উঁচুতে ওঠেনি।

সুতরাং অলিম্পিকের চ্যালেঞ্জ আরও দুরূহ। আগামী এক বছরের ফুরসতে সব দলই, বিশেষভাবে পাকিস্থান, পশ্চিম-জার্মানী, বৃটেন, নেদারল্যাণ্ড ও জাপান আরও প্রস্তুত হয়ে উঠতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। চারপাশের এই চ্যালেঞ্জের ক্রমবর্ধমান চাপকে সামলে দিতে হলে ভারতকে কোমর কষে সাধনায় মাততে হবে।

তাই বলছিলাম যে একটি কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আসল কাজ এখনও বাকী। আসল কাজ অলিম্পিকের স্বর্ণপদকটি পুনরুদ্ধার করা। কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা জয় করা আর অলিম্পিকে শীর্ষাসন পাওয়ার মধ্যে কিছু তফাৎ আছে।

অলিম্পিক ক্রীড়ার উপর সবাই গুরুত্ব দেয় বেশী। অলিম্পিকের মূল্যবোধ উপযুক্ত মানসিকতা গড়ে তোলে। সুতরাং সময় থাকতে ভারতীয় হকির কর্তৃপক্ষ যেন অলিম্পিকের গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে পারেন। আমাদের প্রার্থনা, লিয়'র শিক্ষা যেন বিফলে না যায়। হাবুল মুখার্জি, ধ্যানচাঁদকে যেন আমরা কাজে লাগাতে পারি। পারলে ও'রাই পারবেন ভারতীয় হকিকে নতুন জীবন দিতে।

কবি-নায়িকা রূপমতী

নারায়ন দত্ত

সূর্য বিহারে কত না কমল কলি
ফুলেরা ধন্য একটি সূর্যে চুমি'
মোরা কত তব রয়েছি ত সহচরী
মোদের সূর্য তুমি।'

যে মেয়েটি এই প্রণয়গীতিটি লিখেছিল তাকে নিয়েও কবিকল্পনার অন্ত নেই। বিন্ধ্য উপত্যকার গ্রাম্য কবির কণ্ঠে তার অনুপম রূপবর্ণনা অপূর্ব কাব্যরসের সৃষ্টি করে। সন্ধ্যার অস্তাচলের মত স্বর্ণ-রক্তিম তার অঙ্গবর্ণ, রাকাশশীর মত সুডৌল তার মুখখানি, দারুচিনি বনের গন্ধ তার দেহসৌরভে। আর সবকিছু মিলিয়ে সে কন্যার লাবণ্যশ্রী ভাগ্যবান পথিকের চোখে কোন সুদূর অপ্সর-লোকের মোহ ঘনিয়ে তোলে।

মালবের চারণ কবির বীণাযন্ত্র অন্ততঃ তাই গায়। আর তার দরদভরা গলায় বিষণ্ণ এক রূপকথা শোনায়। সে রূপকথার রাজকন্যা রূপমতী। নর্মদার তীরে সেই ছোট্ট রাজ্যের নাম ধর্মপুরী। রাজা থানসিং—রাঠোর রাজপুত। আর চৌদ্দ বছরের সেই কমলকলি রাজকন্যা এক বসন্ত উৎসবে মালবের এক ঘনবন নিকুঞ্জে বসে তার মধুঝরা কণ্ঠে গান ধরেছিল--'আওল ঋতুরাজ...' সেই গানের সুর প্রাণে বাজল মালবের নতুন রাজা বাজবাহাদুরের। বাজবাহাদুর বিন্ধ্যের বনে সেদিন শিকারে বেরিয়েছিলেন। গভীর বনের পাতায় পাতায় জড়িয়ে যাওয়া সেই মিষ্টি সুরের আনন্দ তাঁকে উন্মনা করে তুলল। দুর্ধর্ষ শিকারী বাজ-বাহাদুরের কাছে শিকারের পিছনে ধাওয়া একেবারে নিরর্থক বলে মনে হ'ল। বাজবাহাদুর সেই সুরের উৎস লক্ষ্য করে ছুটলেন। আর এক সময়ে স্বয়ং ঋতুরাজের মতই গিয়ে দাঁড়ালেন সেই পাষাণ বেদীর সামনে যেখানে সখীদের সঙ্গে বসে রূপমতী তাঁর বসন্তের গান ধরেছিলেন। যুগপৎ চকিত ও ত্রস্ত হয়ে পড়ল রূপমতীর সখীরা। মুহূর্তে সহজ লজ্জায় সবাই নিজের নিজের মুখ ঢেকে নিলেন। একজন শুধু নয়। সে রূপমতী। মরালীর মত গ্রীবা উন্নত করে, দৃঢ়, দৃপ্তকণ্ঠে বল্লেন রাজকুমারী—'কি চান আপনি ?'

বাজবাহাদুরের অনুচরেরা এসে পড়েছিল প্রভুর খোঁজে। কালক্ষেপ না করে তারা রূপমতীকে মাণ্ডুতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলে। এখনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে আজই রাত্রে মাণ্ডুর রাজ-প্রাসাদে বাজবাহাদুরকে দরবারী বা বেহাগ, মালকোষের আলাপ শোনাতে পারবে রূপমতী। কিন্তু বাজবাহাদুর তাদের তিরস্কার করলেন। রূপমতীকে সানুনয়ে বল্লেন, 'আমার রাজ্যে যাবে রাজকন্যা? মাণ্ডুতে?'

জীবনে প্রথম পুরুষের প্রণয় নিবেদনে রাজকন্যার তপ্তকাঞ্চন মুখখানি গোলাপের মত রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু রাজকন্যা তাঁর বংশমর্যাদা ভুললেন না। ভুললেন না তিনি রাজপুত কন্যা। মাণ্ডুর রাজা বিধর্মী। থানসিং মালবের করদ-রাজা ঠিকই, কিন্তু কখনও কন্যা দেবেন না বিধর্মীকে। তেমন দুর্দিনে মেয়ের মুখে তুলে দেবেন বিষ, তাকে সঁপে দেবেন জহর ব্রতের অগ্নিকুণ্ডে। রূপমতী প্রত্যাখ্যান করলেন বাজকে। সদম্ভে বল্লেন, 'আশ্চর্য স্পর্ধা আপনার। নর্মদার জল কি কখনও মাণ্ডুর শৈলশিখরে উৎক্ষিপ্ত হয়? এই অসম্ভব কোনদিন সম্ভব হলে তবেই যাব আমি মাণ্ডুতে।'

এ অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হয়? হয়। হয়। মালবের লোককবি বলে—'হয়'। প্রেমের এক আশ্চর্য যাদু আছে। দু'টি নিষ্পাপ মনের পবিত্র মিলনে ঈশ্বরের অশেষ আশীর্বাদ। আর তারই জোরে কত অঘটন ঘটে যায়। অসম্ভব সম্ভব হয়। নর্মদার জল উর্ধ্বগামী হয়ে মাণ্ডুর রাজপ্রাসাদ পবিত্র করে তোলে।

তারের যন্ত্র বাজিয়ে সুর করে গেয়ে গেয়ে মালবের লোককবি তাঁর আশ্চর্য রূপকথাটি বলে চলেন। —বাজবাহাদুর তখনকার মত চলে গেলেন। আর ধর্মপুরীর অধীশ্বরের কাছে ঘটনাটির বিবরণ যখন গিয়ে পৌঁছল, পরপুরুষকে মুখ দেখানর অপরাধে তিনি রূপমতীর শাস্তি দিলেন মৃত্যু। বিষপানে মৃত্যু।

সেটা বসন্তোৎসবের পুণ্যরাত্রি। রাজ্যের বৃদ্ধ পুরোহিত ছুটে এলেন 'হায়' 'হায়' করে, 'একি করে হয়? এই রাত্রে কখনও মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না। কোন কারণেই না।' পুরোহিতের কথা ঠেলতে পারলেন না থানসিং। সেই রাত্রিটুকুর জন্য স্থগিত রাখলেন মৃত্যুদণ্ড। আর সেই রাত্রেই বন্দিনী রাজকন্যা পেলেন দেবী নর্মদার স্বপ্নাদেশ: 'বাজবাহাদুরের সঙ্গেই মিলন হবে তোর। নর্মদার জল প্রস্রবণের ধারায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে মাণ্ডু পবিত্র করবে।' ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন, রূপমতী। শুনছিলেন দৈববাণী। আর প্রাসাদদ্বারে সেই সময়েই বেজে উঠ্‌ল অস্ত্রের ঝঞ্জনা। নিদ্রিত রাজপুরী আক্রমণ করেছেন মাণ্ডুরাজ বাজবাহাদুর। অপ্রস্তুত প্রহরীরা বাধা দেবার চেষ্টা করল। থানসিং কঠিন হস্তে অস্ত্র ধরলেন। কিন্তু, না। বাজবাহাদুরের শাণিত কৃপাণের কাছে কোন বাধাই টিকল না। ঠিক বাজপাখীর মতই তিনি তাঁর দয়িতাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন ধর্মপুরীর বন্দীশালা থেকে।

সেদিনের প্রত্যুষের প্রসন্ন আলো অশ্বারোহী দম্পতিকে বনের মধ্য দিয়ে মাণ্ডুর পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বিন্ধ্যের অজস্র দীর্ঘদেহ শাল ঝাউ গাছ প্রহরীর মত রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মাণ্ডুর সরসীতে ধর্মপুরীর কমলিনীকে নিয়ে এলেন বাজবাহাদুর।

কিন্তু এ ত শুধু অলীক কল্পনা। চারণ কবির মনের রঙেরসে বোনা এ' এক রূপকথার জামদানি। বাস্তবের কাহিনী বলেছেন মুঘল কাহিনীকার আহমদ-উল-উমরি। বলেছেন ফার্সীতে। সম্রাট আকবরের পাঁচহাজারী মনসবদার সরফুদ্দিন হুসেনের কাছে চাকরী করতেন আহমদ। এই কাহিনী তাঁর সুলিমান খাঁর কাছে শোনা। সুলিমান খাঁ বাজবাহাদুরের পিতা সুদাং খাঁর সঙ্গী। কাজেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতির অন্ততঃ আংশিক মর্যাদা আহমদের এই কাহিনীটিকে দেওয়া যায়। আহমদ এই কাহিনীটি লিখেছিলেন সম্রাট আকবরের তেতাল্লিশতম বছরে—পনের শ' নিরানব্বই সালে।

আহমদ বলেন, রূপমতীর বাপের নাম যদুরায়। যদুরায় ছিলেন মালবের রাজা সুজাৎ খাঁর অধীনে সামান্য জায়গীরদার। যদুগ্রাম তাঁর জায়গীর। তাঁর প্রাসাদে এক ভোজসভায় বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন বাজবাহাদুর। কি ছিল সেদিনের উৎসব মুখরিত পরিবেশে কে জানে, রূপমতীকে নয়—যেন বেহস্তের হুরীকেই দেখলেন বাজবাহাদুর। মুগ্ধ হলেন। আর যদুগ্রামের সেই সোনার মত মেয়ের কাছে মনপ্রাণ সব সঁপে দিয়ে বসে রইলেন।

রূপমতীর কোমলকান্তির বুকে তখন যৌবনের ঘনঘটা। পনরটি বসন্তের রস-বিলাস তার সর্বাঙ্গে। তার কুঞ্চিত কেশদামের ঈর্ষায় নর্মদার স্রোত চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার মুখের হাসি মালবের বুকে জ্যোৎস্না। আহমদ তাঁর নায়িকার রূপবর্ণনায় ক্লান্তিহীন।

বাজবাহাদুর মনপ্রাণ হারিয়ে এসেছেন যদুগ্রামে—এ' খবর এক সময় শুনলেন সুজাৎ খাঁ। বাজবাহাদুরেরই এক প্রিয়-বয়স্য খবরটি তুললে সুলতানের কানে। মেজাজ শরীফ বুঝে বল্লে কথাটা—'মহারাজ বোধ হয় শুনেছেন সংবাদটা।'

সুজাৎ খাঁ সোনার গড়গড়ায় রূপার কলকেয় রাখা তামাকে মৃদুমৃদু টান দিচ্ছিলেন। অম্বুরী তামাকের সৌরভে সুলতান তখন খুশ মেজাজ। বল্লেন, 'কি খবর হে?'

—'আর বলেন কেন? এই সব দিল চশ্‌পীর ব্যাপার। যুবরাজ কোন এক যদুগাঁয়ে—'

—'যদুগ্রাম—সেটা আবার কোথা?' বয়স্যকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সুলতান। অনেক ভরসা পেল বয়স্য। বলল, 'আজ্ঞে, আপনারই রাজ্যে। যদুগ্রামের সামন্তের নাম যদুরায়। তার মেয়ে নাকি ভারী খুবসুরত। যুবরাজ আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছেন।'

সট্‌কাটা মুখ থেকে নামিয়ে দিলেন সুজাৎ খাঁ। পাঠানবীর শেরশাহের হাতে-গড়া মানুষ তিনি। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ অবহেলাও তাঁর অসহ্য। সুশাসন তাঁর ধর্ম। আশ্রিতপালন তাঁর কাছে সবার উপরে। আপত্যস্নেহের উপরে ত বটেই। গম্ভীর মুখে সুজাৎ খাঁ বল্লেন, 'সে হয় না। বাজিদকে বলো তার মন শক্ত করতে। আমি হিন্দু সামন্তের কন্যাকে এভাবে আনলে আমার সুনাম নষ্ট হবে। এ' হয় না।'

বাজবাহাদুর নিরুপায়। বিরহের আগুনে জ্বলতে থাকেন তিনি। রূপমতীর রূপ তিনি নয়নভরে দেখে এসেছেন। মাঝে মাঝে তার গুণের কথা শোনেন। শোনেন তার অপূর্ব মিষ্টি গলার গান। তার কিন্নর কণ্ঠের আলাপে যদুগ্রামের বাতাসে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়। তারই অনুরণন সঙ্গীতরসিক রাজবাহাদুরের বেদনা আরও অসহ্য করে তোলে।

এমন সময় সুজাৎ খাঁ মারা গেলেন। বাজিদ খাঁ বা বাজবাহাদুর তাঁর অন্য দুই ভাইকে ছলে বলে হত্যা করে মালবের রাজমুকুট পরলেন মাথায়। আর অনতিবিলম্বে তলব করলেন যদুরায়কে। বাজবাহাদুরের নিজস্ব জায়গীর ছিল সারঙ্গপুর। সেই জায়গীর দান করলেন যদুরায়কে। আর বিনিময়ে লাভ করলেন তাঁর কন্যারত্ন রূপমতীকে।

বাজবাহাদুরের হারেমে রূপমতীর দিনগুলি কাটতে লাগল কখনও হিন্দোলামহলের হাওয়ায়। কখনও বা জাহাজমহলের ধারাস্নানে, কখনও বা চম্পা বাওরের শীতল জলের অবগাহনে। যখন সন্ধ্যা নামত, মাণ্ডুর রাজপ্রাসাদের মহলে মহলে আলো জ্বলে উঠত একে একে, নিখুঁত-নীল আকাশে একটি তারার মত — রূপমতী তাঁর নিজ মহলের অলিন্দে বসে বীণখানিকে বুকে করে তাতে বাজাতেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রাগিণী ভূপকল্যাণ। সেই গান শোনবার জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতেন বাজবাহাদুর সারাদিন। অন্য কাজে তাঁর মন বসত না। রাজপাট মনে হ'ত অসার। শুধু এক মিষ্টি গলার অপরূপ সুরের আলাপ বার বার ডাক দিত তাঁকে।

রূপমতী বীন বাজাতেন। আর বাজবাহাদুর তন্দ্রানিমীলিত নেত্রে সেই সুর উপভোগ করতেন। সেখানে কেউ থাকত না। এক সময়ে সেজের শান্ত দীপশিখাগুলিও সেই সুরের রসে মাতাল হয়ে ঢলে ঢলে ঘুমিয়ে পড়ত। আর উঠ্‌ত না। সে আলো আর কেউ জেলে দিত না। রাত গভীর হয়ে আসত। সেই অন্ধকারে, সেই বিস্তৃত অলিন্দে থাকত শুধু সুর-পাগল দু'টি হৃদয়—বাজবাহাদুর আর রূপমতী।

এমনি করে গানে গানে, আনন্দ উল্লাসে কাটল ছয়টি বছর। এক সময়ে কিন্তু এই আনন্দের আকাশে অশান্তির কালো মেঘ জমে উঠতে লাগল। সেদিন রূপমতীর মহলেই ছিলেন বাজবাহাদুর। খবর গেল, মুঘল দরবারে মালবের রাজদূতকে হঠাৎ বনপথে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। দুঃসংবাদ কখনও একলা আসে না। গুপ্তচর খবর দিলে আকবর বাদশা মালব আক্রমণের আয়োজন করেছেন।

বাজবাহাদুর তখনও সঙ্গীতচর্চায় মত্ত। ইন্দ্রিয়চর্চায় ডুবে আছেন। কিন্তু পাটরাণী রূপমতী চঞ্চল হয়ে পড়লেন। রাজ্যের অমঙ্গল আশংকায় উদ্বিগ্ন হলেন। বাজবাহাদুরকে তিনি প্রস্তুত হতে পরামর্শ দিলেন। বল্লেন, 'রাজসভা আহ্বান কর। অধীনস্থ সামন্তদের সংবাদ দাও।'

বাজবাহাদুর তাই করলেন। দূত গেল পরগণায় পরগণায়। জোর তাগিদে জায়গীরদারদের পাল্কী একে একে হাজির হতে লাগল মালবের রাজপ্রাসাদে। আর সেই রাজসভায় ঘটে গেল দ্বিতীয় দুর্ঘটনা। নিয়তির অমোঘ অঙ্গুলি-সংকেত। বাজবাহাদুর সিংহাসনে বসেছিলেন। রাজভৃত্য স্বর্ণমুকুট নিয়ে আসছিল মঙ্গলপাত্রে করে। বহুদিনের অভিজ্ঞ ব্যক্তি সে। এ কাজ তাদের পুরুষানুক্রমে। হঠাৎ তারই শক্ত হাত থেকে ফসকে ঝন্ ঝন্ করে মাটিতে পড়ে গেল মালবের রাজমুকুট। বাজবাহাদুর নিজের ভবিষ্যৎ যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন। দেখতে পেল রাজসভার সবাই। আর শিউরে উঠল অজানা আশঙ্কায়।

এই খবর অন্দরে পৌঁছল আর রূপমতীর অমন রাঙাবরণ মুখখানি ভয়ে সাদা হয়ে গেল। দুর্দিনের স্থির ইঙ্গিত বুঝতে তাঁর কষ্ট হ'ল না। ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেল্লেন তিনি। বাজবাহাদুরের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে কৃতসংকল্প হলেন।

কিন্তু নিয়তির শেষ নির্দেশ এল সেই রাত্রেই। বাজবাহাদুরের বিলাস-কুঞ্জে। হঠাৎ প্রাসাদের ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দৈববাণী শোনা গেল—'রাজ-লক্ষ্মী আজ ভূলুণ্ঠিতা। ধূলি থেকে কেউ তাকে টেনে তুলবে না।' যারা শুনলে তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল—'কে বল্লে এই কথা?' বাজবাহাদুর শুনলেন। তাঁর তন্দ্রাভঙ্গ হ'ল। চিৎকার করে উঠলেন তিনি—'কে বল্লে, কে বল্লে, একথা।' কিন্তু কে কোথায়? ত্রস্তে ভৃত্যেরা ছুটল। কিন্তু বৃথা। বহু খোঁজাখুঁজির পর একজন নফর খবর নিয়ে ফিরে এল। বল্লে, 'একজন ভিখারী কে একটু আগে রাজ-দ্বারের সামনে দিয়ে যেতে দেখা গেছে।

"অধীনস্থ সামন্তদের সংবাদ দাও।"

সেই বলে থাকবে কথাগুলো। কিন্তু তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।'

বাজবাহাদুর কথাগুলি শুনলেন। তাঁর সঙ্গীত-সভায় রাজনর্তকী তখন গান ধরেছিল। গানে গানে সে মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্বের কাহিনী বলছিল। বলছিল—সব ঐশ্বর্য পিছনে ফেলে কেমন করে রাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠির তাঁর শেষ যাত্রার পথের ধুলোয় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাজবাহাদুরের মনে হল গানখানি তারই সেই আসন্ন বিষণ্ণ দিনগুলির কাহিনী বলে চলেছে। আর্ত চিৎকার করে এ গান থামাতে বল্লেন বাজবাহাদুর। আর সেই পরম দুঃখের মুহূর্তে রূপমতীকে ডাকলেন গান শোনাতে।

কিন্তু কি গান গাইবে রূপমতী? বিচ্ছেদের বেদনায় তাঁর হৃদয় তখন ভরে আছে। সেই বিরহের গান ধরলেন তাঁর প্রিয় বীণায়। গাইলেন সেই বিরহের গান, যে বিরহ তাঁদের জীবনের দুয়ারে করাঘাত করছে। যে বিরহ ছাড়া বাজবাহাদুরের বাঁচবার কোন উপায় নেই। সেই বেদনার রক্তঝরা গান গাইতে গাইতে এক সময়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন রূপমতী।

কিন্তু ইতিহাস বলে, তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। রূপমতী নিজেকে বাজবাহাদুরের কাছ থেকে সরিয়ে নিলেন বটে, কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারলেন না তাঁর অবশ্যম্ভাবী পতন থেকে। মুঘল বাহিনী যখন মালবের উপান্তে ছাউনি ফেলল, তখনও নৃত্যপরা সুন্দরীদের নূপুর নিক্কণ, বীণা, রবাব, সারঙ্গী, তম্বুরার সুরজালে মাণ্ডুর বাতাস মৌ মৌ। পনরশ' একষাট্টি।

আকবরের মালব অভিযানে আধম খাঁ এলেন সেনাপতি হয়ে। সঙ্গে মুঘল গ্রন্থাগারিক পীরমুহম্মদ খাঁ। আরও একজন এসেছিলেন সঙ্গে। ইতিহাস-দেবতার নিজস্ব প্রতিনিধি—ঐতিহাসিক বাদাউনী।

মুঘল বাহিনী যখন মাত্র বিশ মাইল দূরে বাজবাহাদুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে সারঙ্গপুর থেকে তিন মাইল এগিয়ে গিয়ে ঘাঁটি বসালেন। কিন্তু মুঘল রণ-চাতুর্যের কাছে সহজেই হেরে গেলেন। উনত্রিশে মার্চ একটি নকল আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে

নিজেই নিজের বিপর্যয় ডেকে আনলেন বাজবাহাদুর।' যুদ্ধ হয়েছিল খুবই অল্প সময়ের জন্যে। বাজবাহাদুরের আফগান সামন্তরা বিশ্বাসঘাতকতা করে সরে পড়ে। নিঃসঙ্গ বাজবাহাদুর পালিয়ে বাঁচলেন আর আধম খাঁ তাঁর নবলব্ধ রাজ্যে অত্যাচারের রথচক্র চালিয়ে দিলেন। ইতিহাসের সে এক বীভৎস অধ্যায়। বাদাউনীর কাছেও ব্যাপারটা অসহ্য মনে হয়েছিল। আধম খাঁকে নিষেধ করেন তিনি। কিন্তু আধম খাঁ শোনেননি।

অচিরে বিরহিনী রূপমতীর কাছে আধম খাঁর দূত এল। মুঘল সেনাপতি তাঁর সঙ্গ কামনা করছেন। মুঘল দু'হাত ভরে মণিমুক্তা পেয়েছে এই অভিযানে। প্রভূত ঐশ্বর্যে ভরিয়েছে তার রাজকোষ। কিন্তু সব ঐশ্বর্যের সেরা যে নারীরত্ন তাকে না পেলে এসব পাওয়ার অর্থ কি? মালবের বহু বেগমই তখন উঠেছে মুঘল হারেমে। কিন্তু ক্রুদ্ধা রূপমতী বলে পাঠালেন—'আধম খাঁ ভুল করেছেন। বাজপক্ষী কোনদিন

শারসের সঙ্গ করে না। আধম খাঁ যেন তাকে পাবার আশা ত্যাগ করেন।'

বললেন বটে, কিন্তু আহমদ-উল-উমরি তাঁর কাহিনীতে বলেছেন—রূপমতী বুঝলেন যে এভাবে আধম খাঁকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। সকলের অলক্ষে তাই ফুলওয়ালীর ছদ্মবেশে বেগমমহল থেকে বেরিয়ে পড়লেন রূপমতী। কিন্তু যাবেন কদ্দুর? কতটুকু চেনেন পথঘাট? মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত আর রূপমতী গিয়ে উঠলেন বাপের বাড়ী। বাপ যদুরায়ের তখন দেহাবসান হয়েছে। মা খল্লতাতের অঙ্কশায়িনী। ভায়েরা বেরিয়ে এল বোনের সম্মানরক্ষায়। কিন্তু রূপমতীকে খোঁজবার জন্যে আধম খাঁ যে বিশ্বস্ত পনরজন অশ্বারোহী পাঠিয়েছিলেন তাদের কাছে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলে না তারা। প্রাণ দিল। রূপমতী নিজে আহত হয়ে ফেরৎ চললেন মাণ্ডুতে।

রূপমতীর এই আহত হওয়ার কাহিনীটা আবুল ফজল বলেছেন তাঁর আকবরনামায়। তবে অন্যভাবে। আবুল ফজল বলছেন যে, বাজবাহাদুর যুদ্ধে যাওয়ার আগে আদেশ দিয়ে গিয়েছিল যে ফলাফল তার বিপক্ষে গেলে হারেমের বেগম বাঁদীদের যেন হত্যা করা হয়। রূপমতীকে হত্যা করার সময় নাটকীয়ভাবে মুঘল বাহিনী এসে পড়ে। তবে রূপমতী আঘাত পায়।

সে কথা যাক! আহমদ-উল-উমরি বলছেন যে মাণ্ডুতে পেঁৗছেই রূপমতী আবার অনুরোধ পেলেন কামার্ত আধম খাঁর। এই সময়ে এক পত্র লেখেন রূপমতী। লেখেন—'হে বিজয়ী বীর, বিজয়ীর আদেশ শিরোধার্য করা ছাড়া বিজিতের আর গতি কি? কিন্তু পরাজিতের প্রতি মহানুভবতা দেখান কি বিজয়ীদের চিরাচরিত আদর্শ নয়? বাজিদ খাঁর সঙ্গে আমার প্রেম—আমার গর্ব, আমার গৌরব। তার প্রেমের গর্বেই তার বহু মাইফেলে আমি গান করেছি। অন্য কোন কারণে নয়। কাজেই মহানুভব মুঘল সেনাপতির কাছে আমার অনুরোধ বাঁদীর প্রতি করুণা করে তাকে মুক্তি দিন।'

আধম খাঁ তার জবাবে লেখেন—'সুন্দরি, আমায় বিজয়ী বলেছ। কিন্তু দেখত চেয়ে, জয় করেছে কে? আমার প্রেম যদি পরিমাপ করতে পারতে, সুন্দরি, কামনার যে তরঙ্গ আমার মনে আলোড়ন তুলেছে তা যদি অনুভব করতে, তাহলে ঐভাবে আমায় কষ্ট দিতে না। তোমার প্রেমের একটি মুহূর্তের জন্য সারা পৃথিবীর অন্য সুখ আমি বিসর্জন দিতে তৈরী আছি।...'

রূপমতী বুঝলেন, আধম খাঁর হাত থেকে তাঁর রেহাই নেই। চিঠিটা নিয়ে যে বাহক এসেছিল তার হাত দিয়েই তিনটি দিন সময় চাইলেন। তিনটি দিন পরে আধম খাঁকে তাঁর ছত্রীতে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত থাকবেন তিনি।

আধম খাঁ উল্লসিত। রূপমতীর স্বপ্নে বিভোর। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় বাজবাহাদুরের সব কয়টি প্রাসাদ সুন্দর করে সাজাবার হুকুম হ'ল। আর সেই সন্ধ্যায় একটি সঙ্গীতসভার আয়োজন করলেন তিনি। আহমদ তাঁর দীর্ঘ কাহিনীতে বলেছেন যে, সুলিমান খাঁ স্বয়ং এই মাইফেলে হাজির ছিলেন। অনেকেই আধম খাঁকে তার পাশব উল্লাস এমনি উগ্রভাবে প্রকাশ করতে বারণ করেছিল। সে সব ছেঁদো কথায় কান দেবার মত বান্দা আধম খাঁ নন।

মালব রাজসভার ছোট বড় সব গায়কের উপস্থিতিতে মাইফেলটা ভারী জমে উঠেছিল। আলোর রোশনাই, ফুলের সমারোহ, রাজনর্তকীর নূপুর-নিক্কণে সে এক এলাহী ব্যাপার। রাত যেন দিন হয়ে গিয়েছিল। সাকী বারবার রঙ্গীন সুরায় সুধাপাত্র ভরে দিয়ে যাচ্ছিল। অকস্মাৎ মদমত্ত আধম খাঁ বাজবাহাদুরের সবচেয়ে প্রিয় গায়ক রায়চাঁদকে বল্লেন গান ধরতে। একটুও প্রতিবাদ না করে রবাবে সুর চড়াতে ইঙ্গিত করলেন ওস্তাদ। মিঠি বোলে মৃদঙ্গ বেজে উঠল। ভরাট গলায় গান ধরলেন মালবের সুর-সম্রাট। গানে গানে এটাই বল্লেন রায়চাঁদ—'হায়রে মরণশীল মানুষ, এই অনিত্য পৃথিবীতে মানুষের জন্য কত দুঃখই না তুই ডেকে আনছিস। ভাবিস কি তুই? অত্যাচারী শোন, তোর বিচারের দিনও আগত।' ওস্তাদ রায়চাঁদ দেহাতী ভাষায় তাঁর জীবনের বিষন্নতম গান গাইলেন। সে দুঃখের গান, সে গানের দুঃখ বারবার অনন্ত ব্যোম স্পর্শ করে তার ব্যথার বোঝা আকাশের কোলেও ছড়িয়ে দিয়ে এল।

আর সেই মাইফেল থেকে অনেক দূরে রূপমতীছত্রীর বিলাসগৃহে বসে তাঁর বীণায় সুর তুলে গাইছিলেন রূপমতী। সেদিন তাঁর সে কি সাজের ঘটা। বারবার দীর্ঘশ্বাস চেপে, চোখের জল বুকে মুছে রূপমতী পরলেন সেই লাল মখমলে সোনার জড়ি দেওয়া হীরার চুমকি বসান সাজ—যে সাজে বাজবাহাদুরের সঙ্গে প্রথম মিলন হয়েছিল তাঁর। গন্ধদ্রব্যে কেশ সুবাসিত করে, বাঁদী বেণী বেঁধে দিয়েছিল। তাঁর গভীর কালো চোখের ভাষা গভীরতর করে তুলেছিল সুর্মার টানে। মেহেদীর রঙ্গে রাঙ্গিয়েছিল করপল্লব। হীরামুক্তো মাণিক্যের অলংকারে নববধূর মত দেখিয়েছিল রূপমতীকে। আর তাঁর মখমল বিছান শয্যায় বসে সেদিনের সাঁঝতারাটিকে সাক্ষী রেখে ইমনকল্যাণে গান ধরেছিল রূপমতী।

গান ত নয়। সে যেন আহত হৃদয়ের বাণীবন্ধ রক্তঝরা বেদনা। একুশটি বসন্তে উজ্জ্বল একটি জীবনের অকালে ঝরে পড়ার শোক-গাথা শুনতে শুনতে রাত কালো জমাট হয়ে উঠল।... আর সেই ব্যথাভরা রাত দুঃখহর প্রভাতের সোনারঙা আলোর প্রসন্ন স্পর্শে এক-সময়ে তার যমযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল।

আধম খাঁ এতক্ষণে রায়চাঁদের গানের অর্থ বুঝতে পেরেছেন। সুরাসিক্ত স্নায়ুজালে কামনার দাবদাহ। সবাইকে শাসালেন তিনি। কঠিন শাস্তির ভয় দেখালেন। কিন্তু সে সব দণ্ড পালনের জন্যে অপচয় করার মত সময় তাঁর হাতে নেই। তিনটি দিন কেটে গেছে। তাঁর অধীর প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। প্রভাতের ফুরফুরে হাওয়ায় ঘোড়া ছুটিয়ে আধম খাঁ নামলেন একেবারে রূপমতীরছত্রীর সিং দরজায়। ছত্রীর নিদ্রাকাতর প্রহরিণী শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ করলে।

আর তাঁর দ্রুত পদধ্বনি ঠিক কানে গেল রূপমতীর। দেরী করলেন না তিনি। বীণায় ভৈরবীর সুরবিস্তার

মাঝপথে থামিয়ে পাশে রাখা সোনার পাত্রে হীরার গুঁড়োর মারাত্মক বিষ তাম্বুলরাঙা অধরে তুলে ধরলেন রূপমতী। একটুও কাঁপল না হাত।

একটু পরেই কামনাজর্জর হৃদয় নিয়ে রাতজাগা চোখে আধম খাঁ ধীরে ধীরে ঢুকলেন রূপমতীর বিলাসগৃহে। মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, 'বেগম রূপমতী। বেগম সাহেবা।'

কোথায় বেগম সাহেবা? বিলাসগৃহের চার দেওয়ালে সেই কামনাপীড়িত কণ্ঠের ডাক প্রতিধ্বনি তুলে গেল। আধম খাঁ মনে করলেন মানিনীর এও এক বৈচিত্র্যময় কামকলা। আরও এগিয়ে গেলেন খাঁ সাহেব। সাদা পেলব হাত দুটিকে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন আবার ডাকলেন, 'রূপমতী।'

বার দুই ডেকে অকস্মাৎ যেন সব বুঝতে পারলেন আধম খাঁ। ঠান্ডা হাত দুটো সশঙ্কে ছেড়ে দিলেন। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন—'বাঁদী, বাঁদী—ই ক্যা হ্যায়?' সেই চিৎকার রূপমতী-ছত্রীর চারদিকে এক আর্ত হাহাকারে ভেঙে পড়ল—'ই ক্যা হ্যায়।'

আহম্মদ-উল-উমরির যে পুঁথিটি পাওয়া গেছে তার লিপিকারের নাম মীরজাফর আলি। তারিখ—ষোলশ' তিপান্ন। গোয়ালিয়রের রিজেন্ট ক্রাম্প সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় মুন্সী বশিরুদ্দিন এটি সংগ্রহ করেন। ক্রাম্প সাহেব নায়িকা রূপমতীর নামে প্রচলিত ছাব্বিশটি কবিতাও সংগ্রহ করেন। কবিতাগুলি পড়লে উজ্জয়িনীরই আর এক রাজসভার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমের হংসপদিকার গান। কবিতাগুলি পড়ে মনে হয় যে হংসপদিকার দুষ্মন্তের মত 'মধু লোভী মধুকর' বাজবাহাদুর অন্যকুসুমেও আসক্ত হয়েছিলেন। রূপমতীর গানগুলির সেই বেদনাই মূল সুর। বিরহের যে তুষানলে তিনি নিজে জ্বলেছিলেন, প্রেমের যে আস্বাদ রূপমতী নিজের জীবনে গভীর বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন তারই সুর কবিতাগুলিতে বাজছে। ফার্সী এই প্রেমের রুবায়েৎগুলিতে উত্তরকালের প্রক্ষেপ পড়লেও মহাকালের নিকষ পাষাণে রূপমতীর কবিমন খাঁটি সোনার স্বাক্ষর রেখে গেছে। প্রেমহীন জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখছেন রূপমতী—

প্রিয় দেয় হৃদে বাঞ্ছিত সুধাশান্তি
তুমি নাহি, হায়, রূপমতী তায়
কেমনে লভিবে বল?
পলায়িত তুমি—জীবনের আর মূল্য
কি আছে মোর?
আসুক নামিয়া মৃত্যুর ঘন কাল।

সারঙ্গপুর যুদ্ধে বাজবাহাদুরের পলায়নের পর কবিতাটি লেখা বলে মনে হয়। অপর কয়েকটি কবিতায় রয়েছে রূপমতীর প্রতি বাজবাহাদুরের গভীর অবজ্ঞার বেদনা। যেমন—

নেইত সেদিন যেদিন ছিলে আমারই
প্রিয় আমার
(আর) ছিলাম আমি, তোমারই আহা
তোমার।

এখন আমি ত আমি
তুমি ত শুধু তুমি
নিয়তি কহ চরণে তব কি ছিল অপরাধ,
সাধিলে এই বাদ?
কিংবা—বেদনা কিংয়ে সহিতে হবে প্রেমের
তরে

হায়রে যদি জানতেম,
বাজিয়ে কাড়ানাকাড়াটা বিদায় দিতেম
তারে
হায়রে যদি জানতেম।

প্রেমের গভীর প্রত্যয়ও বহু কবিতায় ধ্বনিত—

সিংহিণীর শাবক আর
সাচ্চা মানুষের জবান একটাই।
কদলীবৃক্ষের ফল ধরে একবারই।
আর আমার অন্তরে প্রিয়তম
তারও দ্বিতীয় নাই।

কিন্তু আহমদ-উল-উমরির লেখা রূপমতীর কাহিনীতে বাজবাহাদুরের মধুকর বৃত্তির কোন অভিযোগ নেই। ইঙ্গিত আছে যে রাজ্যের কল্যাণে রূপমতী নিজেকে বাজবাহাদুরের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তবে রূপমতীর কবিতায় প্রেমিকের অবজ্ঞায় একটা হতাশার সুর এল কেন? রূপমতী-রহস্যের এটা একটা দিক। এছাড়াও আছে। রূপমতী কি হিন্দু রাজার কন্যা ছিলেন? রূপমতীর বলে সনাক্ত ষোলটি কবিতা মালবের হিন্দু পরিবারে পাওয়া গেছে। তাঁর অনেক কবিতায় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর উপমাও উল্লেখ আছে। কিন্তু আহমদ বলছেন যে রূপমতীর মা তাঁর কাকাকে বিবাহ করেছিলেন। তবে?

ফারিশ্তা বলে রূপমতী রাজনটী। তবাকত-ই-আকবরই তাঁকে বাজবাহাদুরের পাটরাণীর সম্মান দিয়েছেন। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ায় বলা হয়েছে রূপমতী ছিলেন 'মিস্ট্রেস'। আহমদের গল্পে রূপমতীকে খ্যাতনামা গায়িকা বলে মনে হয়। অনেকে মনে করেন ভূপকল্যাণ রাগের তিনিই স্রষ্টা। রূপমতী তাঁর চিঠিতে নিজেকে বাজবাহাদুরের বহু মাইফেলের গায়িকা বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর আসল পরিচয় কি? রূপমতী-রহস্যের এই দিকগুলি নূতন আলোকপাতের অপেক্ষা রাখে। রূপমতীর কবর নিয়েও সেই সমস্যা। সেটা কোথায়, কেউ বলে মাণ্ডুতে। কেউ বলে সারঙ্গপুরে। উজ্জয়িনীর কথা কেউ কেউ বলে থাকেন।

রূপমতীকে নিয়ে প্রাচীন রাজপুত রাজচিত্রকরদের ছবি আছে বেশ কয়েকটি। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি ত আঁকা মুঘল রাজসভার চিত্রকর—গোবর্ধন, সানওয়ালা ও চিতারমনের। কোন নাম-না-জানা শিল্পীর আঁকা অশ্বপৃষ্ঠে রূপমতী-বাজবাহাদুরের ছবি আছে কয়েকটা। আহমদের গল্পে আবার তেমন কোন ঘটনা নেই। তাহলে? রূপমতী-রহস্য যে তিমিরে সেই তিমিরেই। তার কোনই সুরাহা করা যায়নি। বলা যায়নি কবিনায়িকা রূপমতীর কতটা কল্পনা আর কতটা ইতিহাস। কিন্তু কি আসে যায় তাতে? রূপমতী কবিশিল্পীর চিরকালের নায়িকা। কাব্যের প্রেরণা, কল্পনার উৎস। মধ্যযুগের রসস্বর্গের চিরযৌবনা অপ্সরী!
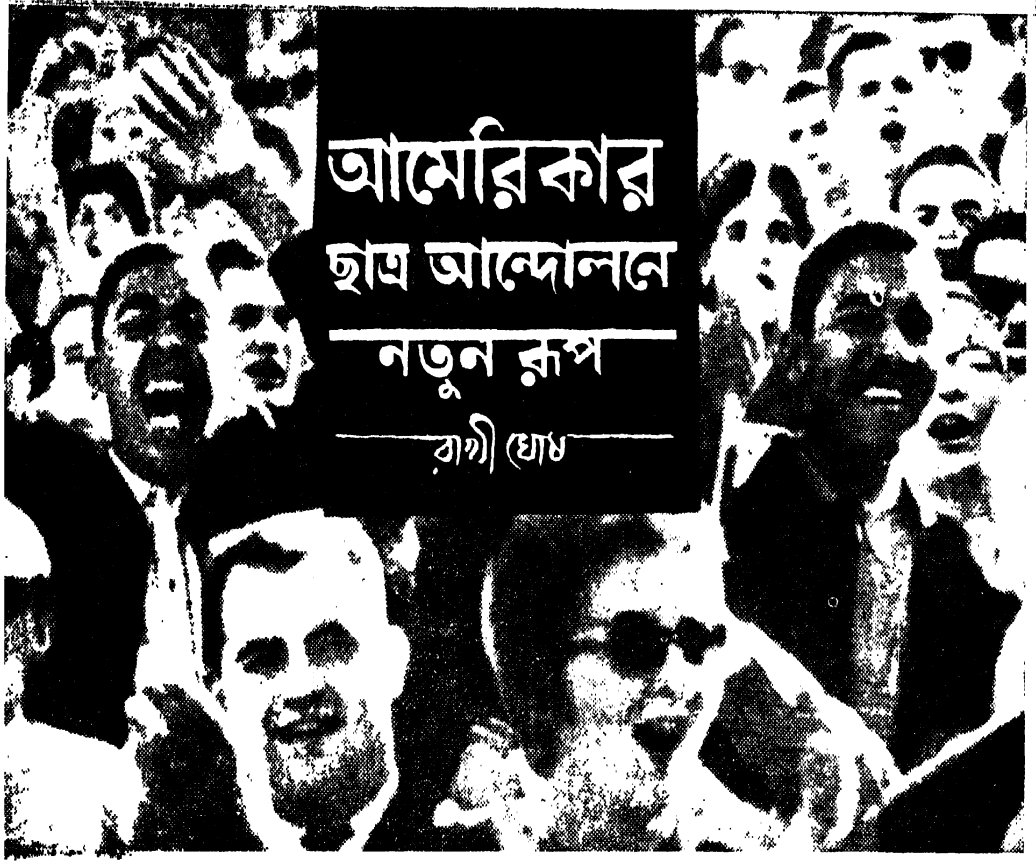
লণ্ডন—আজকাল বৃটেনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনের খবরে প্রায়ই আমেরিকান নিগ্রোদের নিরস্ত্র সত্যাগ্রহের ছবি থাকে। ইদানীং বহু শ্বেতাঙ্গই তাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। পুলিশ নিগ্রোদের ওপর কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছে—এ-ছবি যেমন ছাপা হয়েছে, তেমনি টেলিভিশনে দেখেছি, নিগ্রোদের ঢুকতে মানা এমন এক রেস্তোরার সামনে পিকেটিং করার জন্য ক্রুদ্ধ মালিক এক শ্বেতাঙ্গ ছাত্রের মাথায় গরম পানীয় ঢেলে দিলেন, আর একজন শ্বেতাঙ্গ সত্যাগ্রহীর কপালে জুটলো পদাঘাত। নিরস্ত্র যুবক সত্যাগ্রহীদের শরীরে তাজা রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে উঠেছিল কিনা জানি না, তবে মুখের রেখার কোন পরিবর্তন হয়নি দেখেছি।

যাঁরা নিগ্রোদের সমান অধিকারের জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং আজ যাঁরা বর্ণনির্বিশেষে এর পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই হলেন ছাত্র। এ আন্দোলন একদিনেই গড়ে ওঠে নি। বহু ছাত্রেরই বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের এর জন্য মানসিক প্রস্তুতির দরকার হয়েছে, অনেক সংস্কার—অনেক ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে আসতে হয়েছে।

১৯৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 'লিট্‌ল রক' শহরে যখন এই আন্দোলন শুরু হয় তখন শ্বেতাঙ্গরা এটাকে খুব সুদৃষ্টিতে দেখে নি। এই শহরের শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্য রক্ষিত সেন্ট্রাল স্কুলে সেদিন জেমস মেরেডিথ কাহিনীরই ছোটখাটো মহড়া হয়ে যায়। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী নয়টি নিগ্রো ছাত্র-ছাত্রীকে বাধা দেওয়ার জন্য তখনকার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ওরডাল ফবাশ তাঁর প্রাদেশিক সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নির্দেশে আর এক দল সশস্ত্র কেন্দ্রীয় সৈন্য আসে নিগ্রোদের নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। সেদিন কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা নিগ্রোদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন নি। বরং গভর্ণর ফবাশ জগতে শ্বেত প্রভুত্বের প্রতীকরূপে তাঁর প্রদেশে বিপুল সংবর্ধনা পান। শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের সমর্থনও ছিল তাঁর পিছনে। তাই নিগ্রোদের প্রতি তাদের ঠাট্টা ও টিট্‌কারীর অত্যুচ্ছ্বাস আঘাতে শেষ পর্যন্ত সৈনিকদের হস্তক্ষেপ করতে হয়।

কিন্তু ১৯৬০ সাল থেকে সমগ্র আন্দোলনের প্রকৃতিটাই যেন বদলে গেল। '৬০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো আন্দোলনের এক স্মরণীয় দিন। সেই দিন থেকেই জনমত সচকিত হয়ে উঠলো। ঐদিন চারটি নিগ্রো ছাত্র উত্তর ক্যারোলিনার একটি শ্বেতাঙ্গদের জন্য রক্ষিত রেস্তোরায় গিয়ে বসে এবং খাবার চায়। রেস্তোরার কর্তৃপক্ষ যথারীতি তাদের প্রত্যাখ্যান করে। নিগ্রো ছাত্ররা উঠল না। রেস্টুরেন্ট বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানেই অপেক্ষা করল।

বলা বাহুল্য, প্রতিবাদের এই সহজ ও সরল ভঙ্গী সারা আমেরিকার ছাত্রদের মর্মস্পর্শ করল। মানুষ হয়ে মানুষের সাধারণ সম্মানটুকু অস্বীকার করার মধ্যে যে এক বিরাট লজ্জাকর দিক রয়েছে, নিগ্রো ছাত্ররা তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

এর পর সত্যাগ্রহ বিরাট রূপ নিয়েছে। দু' বছরের মধ্যে প্রায় সত্তর হাজার জন ছাত্র-ছাত্রী সত্যাগ্রহে অংশ নিয়েছেন,—তার মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন তিন হাজার জন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাল্টিমোরে একটি সিনেমাগৃহের সামনে পিকেটিং করার অপরাধেই চারশো পনেরো জন ছাত্রের কারাদণ্ড হয়। পুরো ছ' দিন ধরে এই পিকেটিং চলেছিল এবং

পিকেটিং বন্ধ হবার পর কর্তৃপক্ষ নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার দিতে স্বীকৃত হয়।

১৯৬১ সালের সেই রক্তক্ষরা দিনগুলি আজও আমেরিকান ছাত্ররা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে। বিশেষ বাসে করে মুক্তিবাহিনী বা ফ্রীডম রাইডার্সের ছেলে-মেয়েরা ঘুরলো দক্ষিণের প্রদেশে-প্রদেশে। উদ্দেশ্য ছিল মিসিসিপি ও আলাবামার কোচ স্টেশন-সংলগ্ন বিশ্রাম ও আহার-কক্ষগুলির বৈষম্য-নীতি তুলে দেওয়া। শাসকবর্গ এই নিরস্ত্র তরুণ-তরুণীদের আটকানোর জন্য ব্যাপক ধরপাকড়, মারপিট চালালেন। 'মার্শাল ল' জারী হল। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এই দক্ষিণের রাজ্যগুলির অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতি।

এই ছাত্ররা আজ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছড়িয়ে আছে। উত্তর আমেরিকার প্রদেশে দক্ষিণের এই বৈষম্যমূলক নীতি নিয়ে প্রতিবাদ উঠেছে। সত্যাগ্রহীদের সাহায্যের জন্য ছাত্ররা মুক্তহস্তে চাঁদা দিয়েছে। বিখ্যাত ব্যবসায়ী 'উলওয়ার্থে'র দোকানগুলি বর্জিত হয়েছে, কারণ ঐ প্রতিষ্ঠান তার দক্ষিণের বিপণিগুলিতে বর্ণবৈষম্যের প্রশ্রয় দেয়।

নিগৃহীত সংখ্যালঘুদের এই সংগ্রাম আজ আমেরিকার যুবসমাজকে সমাজের সমস্ত অবিচারের বিরুদ্ধে আশ্চর্যভাবে সচেতন করে তুলেছে। গত বছরের এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে, প্রত্যেক দিন শতকরা এক থেকে দশটি ছাত্র-সংগঠন সামাজিক ও রাজনৈতিক কোন না কোন অন্যায় ও অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে লড়ছে। একদিক থেকে এ হল সমস্ত রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মুক্ত মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টির অভিযান। তাই যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে যেখানে অন্ধ অচলায়তনের রাজত্ব, সে খা নে ই ছাত্র-আন্দোলন বেশী জোরালো।

তবে শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের নিগ্রোদের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও তারা এই সমস্যার মানবিক দিক সম্পর্কেই বেশী সচেতন। নিগ্রো ছাত্রনেতা লেস্টার কারসন এ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ আন্দোলনের সামাজিক দিকটা তারা বুঝবে না এটাই স্বাভাবিক। তারা তো জানে না প্রতি পদে পদে প্রত্যাখ্যাত হবার কি জ্বালা! রেস্টুরেন্টে আমাদের আলাদা আসন, সমান যোগ্যতা সত্ত্বেও

১৯৫৭। লিটিল রক সেন্ট্রাল হাই স্কুলে সশস্ত্র প্রহরায় নিগ্রো ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবেশ করছে।

১৯৫৭। শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা নিগ্রোদের উদ্দেশ্যে টিটকারী দিচ্ছে

১৯৬২। দক্ষিণের এক হোটেলে নিগ্রো ছেলেরা পিকেটিং করছে

শুধু গায়ের রঙের জন্য সেরা বিদ্যালয়-গুলির দরজা আমাদের সামনে বন্ধ, ভোট দেবার সময় আমাদের বেশব অদ্ভুত প্রশ্ন করা হয়, তাতে আর যাই হোক, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে খুব শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না। সমাজের কোথাও আমরা এই অপমান এড়াতে পারি না। তাদের তো এই নিত্য অপমানবোধে ভুগতে হয়নি।"

লেস্টার কারলানের বন্ধু শ্বেতাঙ্গ ছাত্র ওয়েন কিঙের কথা থেকেই বোঝা যায়, তাদের মানসিকতায় মূল প্রভেদ কোথায়। কিং এবং তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'দি ডেলি টার হিল' বরাবরই নিগ্রোদের পক্ষে। গত বছর 'মেরেডিথের' মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ-ঘটনা সরেজমিনে দেখে আসার জন্য কিং সবান্ধবে সেখানে উপস্থিত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ও মিসিসিপি গভর্ণর রস ব্যারেটের এই সংঘর্ষে দুজন লোক প্রাণ হারায়, দুশো জন জখম হয় এবং ১৬০০০ সৈন্যের জন্য আমেরিকার ট্যাক্সদাতাদের পকেট থেকে ১৫০,০০০ ডলার গচ্চা যায়।

একটি ব্যাপটিস্ট চার্চে সমবেত উপাসনা। এই চার্চের মিনিস্টার নিগ্রোদের সমানাধিকার আন্দোলনের অন্যতম কর্মী। চার্চটি ইউনিভারসিটি এলাকায় অবস্থিত এবং সব ছাত্র-ছাত্রীর জন্য খোলা। চ্যাপেল হিলের একটি ছাড়া আর সব চার্চই আজ নিগ্রোদের জন্য খোলা।

আমেরিকার যে কোন স্থানীয় ছাত্র-মুখপাত্রের মত 'টার হিল'-ও যথেষ্ট প্রভাবশালী সংবাদপত্র। 'টার হিল' এই ঘটনার সবটা দায়িত্ব গভর্ণর ব্যারেটের কাঁধে চাপালেও, মিসিসিপির ছাত্রদের এবং তাদের পত্র-পত্রিকাদেরও ছেড়ে কথা বলে নি। ওয়েন কিংয়ের মতে শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা এবং তাদের মুখপাত্র-গুলি তাদের দায়িত্ব পালন করে নি।

কিন্তু কিং বহু শ্বেত ছাত্রের মতই ক্রমবাদী। সে নিগ্রোদের একটি পৃথক জাত হিসেবে না দেখে তাকে একটি মানুষ হিসাবে দেখার পক্ষপাতী। দয়া নয়, অনুকম্পা নয়, ভিক্ষে নয়। সে বলে, নিগ্রোকে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখতে হবে, যেখানে তার সঙ্গে আমাদের কোন পার্থক্য নেই। তার মতে এই একীকরণ বা সমন্বয়বাদীদের উদ্দেশ্য সাধু হলেও, তাঁদের এই দ্রুততা মানুষের মনকে আমূল পরিবর্তনের সুযোগ দিচ্ছে না। নিগ্রোদের সে সমান মনে করে বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই একদিন পূর্ণ অধিকার অর্জন করবে। কিং ইচ্ছে করলে নিগ্রোদের এই সমানাধিকার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে পারত। কিন্তু সে মনে করে, এই আন্দোলনের বাইরে থাকাই তার এবং তার পত্রিকার পক্ষে আন্দোলনকে সাহায্য করার শ্রেষ্ঠতম পন্থা।

কিন্তু মানসিকতার এই প্রভেদটুকু বাদ দিলেও, এই আন্দোলন আজ আমেরিকার তরুণদের সমাজ-সচেতন করে তুলেছে। যুদ্ধ-পরবর্তী বছরগুলিতে দেশের রাজনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থায় আমেরিকান ছাত্রদের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। আমাদের দেশে রক-এন-রোলের ছন্দে মাতোয়ারা হুজুগে আমেরিকান ছাত্রের বহুল প্রচারিত ধারণার কথা ছেড়েই দিলাম। বৃটেনের মত দেশ যেখানে ছাত্ররা অত্যন্ত বেশী সমাজ-সচেতন, সেখানেও আমেরিকান ছাত্রদের অত্যন্ত অপরিণত, ব্যক্তিত্বহীন এবং আহ্লাদে বলে মনে করা হত। আজ আমেরিকান ছাত্রদের সম্পর্কে স্বদেশে-বিদেশে সে সব ধারণাকে পাল্টাতে হয়েছে। তাদের দেশীয় সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস্ই এই স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বকে কয়েকটি কথায় প্রকাশ করেছে—'মৌন যুগ আজ তার ভাষা খুঁজে পেয়েছে।'

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

কিন্তু সেই অবস্থাটা যে একদিন তাঁর দোরেও এসে উপস্থিত হ'তে পরে তা একবারও ভাবেন নি শ্যামা। চালের দাম উত্তরোত্তর বাড়ছে দেখেও অতটা ধরতে পারেন নি। অবশ্য সে খবরও তিনি তেমনভাবে পান নি। কিছু চাল কেনা ছিল ঘরে—বহুদিনের মধ্যে কেনবার দরকারও হয়নি। যা ভাসা-ভাসা খবর পেয়েছেন পাড়াঘরে অধমর্ণ-দের কাছে, সেটা তত মাথাতে যায় নি।

চাল তেল আর নুন, এই লাগে তাঁর উটনোর মধ্যে। আর তার সঙ্গে সামান্য কিছু হলুদ। লঙ্কা তাঁর উঠোনেই তের হয়। অন্য মশলা—ধনে জিরামরিচ আজকাল কমিয়ে দিয়েছেন একেবারে, একবার এক-এক ছটাক ক'রে আনিয়ে রাখলে তার ছ'মাস চলে যায়। ফোড়নও ব্যবহার করেন না বিশেষ, বলেন, 'যেটুকু তেল খরচ করব তা যদি ঐ লঙ্কা পাঁচফোড়ন কি তেজপাত ধোঁয়াতেই চলে গেল তো ব্যন্নে রইল কী? আমরা তো বড়লোকদের মতো পলাপলা তেল ঢালতে পারি না, আমাদের অত ফোড়নের যাখ ক'রেও দরকার নেই। ফোড়ন তো গন্ধ করার জন্যে, বলি ওর তো কোন স্বদ নেই গা—মিছিমিছি গুচ্ছের পয়সা নষ্ট ক'রে লাভ কি?'

সুতরাং দোকানে যাবার দরকার হয় আজকাল তিন মাসে একদিন। কিম্বা আরও বেশীদিন পরে। নিজেই যান অবশ্য। বলাই কোথাও বেরোতে চায় না। তিনি বলেনও না। দোকানে যেতে গেলেও নাকি ফুলবাবু সেজে বেরোতে হবে। এই তো নাকের ডগায় দোকান। সেখানেও কি একটু ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরে যাওয়া যায় না? না যায় না যাক। দরকার নেই গিয়ে। এখনও তো ভগবান শ্যামাকে 'অক্ষ্যাম' করেন নি একেবারে। একবার গুটি গুটি গিয়ে দোকানীকে বলে আসা—এই তো। সে তিনি খুব পারেন। একেবারে এক বস্তা ক'রে চাল নেন তিনি, তাতে নাকি কিছু ওয়াস্ক হয়। কিছু ঢলতাও বাদ পান। দোকানীরা নাকি বস্তা পিছু পাঁচ পো ঢলতা বাদ পায়—তিনি তাদের কাছ থেকে এক সের আদায় করেন। এই চাল—আর সেই সঙ্গে পাঁচ পো তেল, আড়াইসের নুন, পাঁচ ছটাক হলুদ। এইতেই তাঁর দু'মাস চলে যায় আজ-কাল। চাল তখনও থাকে, কাজেই শুধু তেল আর নুন আর হলুদ—মাঝে একবার নিয়ে যেতে হয়। তার সঙ্গে দুটি পাঁচ-ফোড়ন আর দুখানা তেজপাত চেয়ে নেন দোকানীর কাছ থেকে। কোনদিন কিছু একটা ভাল ক'রে রাঁধতে হলে কাজে লাগে।

চাল ঘরে ছিল অনেক দিনের মতো—দুজনে কতই বা খান—তাই চালের দাম বাড়ছে শুনেও অত গা করেন নি। একেবারে বাড়ন্ত হ'তে যখন গিয়ে শুনলেন চাল পঁচিশ টাকায় উঠেছে ইতিমধ্যে—তখন একেবারে চোখে অন্ধ-কার দেখলেন। প্রথমটা বিশ্বাস হয় নি কথাটা। তামাশা মনে ক'রে দোকানীকে দুটো মিষ্টি গালিগালাজও করেছিলেন (দিদি নাতি সম্পর্ক পাতানো তার সঙ্গে) কিন্তু শেষে যখন দেখলেন তা নয়, তখন তাঁর মুখ শুকিয়ে উঠল। তখনকার মতো আড়াই সের চাল নিয়ে চলে এলেন। বলরাম বলল, 'এই বেলা নিয়ে যান দিদিমা—এর পর আরও চড়বে। আমার তো ঠাওর হয় আর পাবেনই না. গোটা দেশের লোককে উপোস ক'রে শুকিয়ে মরতে হবে!'

কিন্তু তা আসেন নি শ্যামা। একে-বারে অতটা উঠতে পারেন নি। ভরসায় কুলোয় নি। তাছাড়া তিনি ভেবেছিলেন, এটা একটা সাময়িক ব্যাপার, সে যুদ্ধেও বেড়েছিল কিন্তু এত বাড়েনি। এতটা বাড়া স্বাভাবিক নয়। সরকার যা হোক একটা ব্যবস্থা করবে।...

তিনি খাওয়াটাই কমিয়ে দিলেন। তিনি নিজে নিয়ম-রক্ষার মতো এক গ্রাস ভাত খেতে শুরু করলেন। বাকিটা বাগানের ডুমুর কাঁচকলা থোড় পেঁপে খেয়ে পেট ভরাতে লাগলেন। বলাইকে পুরোপেটা ভাতই দেন তবে সেও এক-বেলা। বিকেলটা তার জন্যে ঐ শাক-আনাজ সেদ্ধ ব্যবস্থা। বলেন, 'কী করবি মুখপোড়া, যেমন বরাত ক'রে এসেছিস তেমনি তো হবে। বরাত খারাপ না হ'লে এমন হবে কেন?'

তাই কি বাগানের ফসলই শান্তিতে ভোগ করতে পারেন। অভাব দুর্দশা শুধু তাঁরই নয়—আরও অনেকের। তাঁর তো তবু সংগতি আছে কিছু—বেশির ভাগই থালা বাসন বেচতে শুরু করেছে। সুতরাং ফল ফুলুরি আনাজ সব চুরি যেতে শুরু হ'ল। চোর সামলাবার মতো ব্যবস্থা কিছু নেই। বেড়া কি পগারে গরু আটকায়—তার বেশী কাউকে ঠেকাবার শক্তি নেই। শ্যামা শেষ পর্যন্ত নিজেই পাহারা দিতে শুরু করলেন রাত্রে। ঘুমই বন্ধ হয়ে গেল তাঁর প্রায়। নিঃশব্দে প্রেতিনীর মতো অন্ধকারে ঘুরে বেড়ান—একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে ক'রে। সামান্য কোন শব্দ পেলেই—অনেক সময় দেখা যায় তা বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ ছাড়া কিছু নয়—তিনি চিৎকার ক'রে গালাগাল দিতে দিতে তেড়ে যান। লাঠি ঠোকেন ঘন ঘন। যেদিক থেকে শব্দ আসছে ঠাওর ক'রে সেই দিকেই ছুটে যান।

অবশ্য তাতে কাজও হয়—চোর যারা চুরি করতে আসে অনেক সময়ই তাদের সে চেষ্টা ত্যাগ ক'রে পালাতে হয়।

শ্যামা সেদিন দোকান থেকে এসে হেমকে একটা চিঠিও লিখেছিলেন। বাজারের এই অবস্থা, কিছু টাকা না বাড়ালে চলছে না। তার উত্তরে হেম কিছু রূঢ় সত্য কথা লিখে পাঠাল। সে মাইনে পায় মাত্র তিয়াত্তরটি টাকা। তা থেকে ফাণ্ডে কেটে নেয়, মাকে পাঠায় কুড়ি টাকা। বাকী যা থাকে তাতে এত-গুলি প্রাণীর ভরণপোষণ করা সস্তার দেশেও দুঃসাধ্য। দাম সেখানেও বাড়ছে। ভাত তো কবেই ছেড়ে দিয়েছে ওরা, দুবেলা রুটি খায়। তাও বোধহয় দুদিন পরে মিলবে না। রেল কোম্পানী যদি ওদের জন্যে বিশেষ কোন ব্যবস্থা না করে তো শুকিয়ে মরতে হবে। হেম আগে পুরো সংসারের জন্য যেটাকা দিত এখনও তাই দেয়, হয়ত আর বেশী দিন তা দিতে পারবে না। শ্যামার হাতে যা আছে—যা তিনি তেজারতিতে খাটান—এখন কিছু দিন তাই ভাঙিয়েই খান তিনি!

আর যা-ই হোক, এতটা স্পষ্ট ভাষণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না শ্যামা। তাঁর খুব ভরসা ছিল অন্তত গোটা-চার পাঁচ টাকা হেম বাড়িয়ে দেবেই। তিনি আরও একবার চোখে অন্ধকার দেখলেন।

এবার অগত্যাই পঁচিশটা টাকা হাতে ক'রে চাল কিনতে গেলেন আবার। কিন্তু দেখলেন ততক্ষণে—এই ক'দিনের মধ্যেই সে চাল ছত্রিশ টাকায় পৌঁচেছে!... সুতরাং এবারও কেনা হ'ল না চাল। ছত্রিশ টাকা দরের চাল তিনি কিনে খেতে পারবেন না। সে ভাত তাঁর গলা দিয়ে নামবে না। তিনি নাতির মতো আড়াই সের চাল কিনে সেবারের মতোই, বসে বসে—বুকে ক'রে বয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তার বেশী কিনতে যেন সাহস হ'ল না তাঁর। অথচ এও থাকবে না—বলরাম বার বার সাবধান ক'রে দিল, একেবারেই লোপাট হয়ে যাবে চাল বাজার থেকে—তা শ্যামাও বুঝলেন। বলরামের কথাটা আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হ'ল না তাঁর। তবু ছত্রিশ টাকায় এক মণ চাল কেনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁর পক্ষে যা সম্ভব তাই করলেন। নিজে একেবারেই ছেড়ে দিলেন ভাত। শাক কচু আনাজ সেদ্ধ ধরলেন। বলাইকেও এক গাল ক'রে ভাত দিতে লাগলেন—নইলে হয়ত তার পেট ছাড়বে এই ভয়ে। অত দুটিখানি ভাত রাঁধতে অসুবিধা হয় বলে একদিন ফুটিয়ে পরের দিনের জন্য জল দিয়ে রাখতে লাগলেন। নিতান্তই সে পাখীর মতো এত কটি—সত্যিই হাতের একগালে ধরবার মতো। বাকীটা ডুমুর আছে শুষনি শাক আছে। একটা কুমড়ো হয়েছিল—তাতে তিন চার দিন চলে গেল সেজন্য ভাবনা নেই তাঁর। নাতিকে বলেন প্রায়ই, 'এমন এক আধ দিন নয় —বুঝলি, গুপ্তিপাড়ায় মাসের পর মাস আমরা এই শাক আনাজ সেদ্ধ খেয়ে কাটিয়েছি। তোর দাদামশাই কোন্ এক যজমানের দু'মহল বাড়িতে তুলে দিয়ে ডুব মারল, তিনটে মেয়েছেলে আমরা —সঙ্গে একটা বাচ্ছা—একটা পয়সা নেই হাতে। সে যে কী দিন গিয়েছে! এখন তো তবু বয়স হয়েছে, অনেক শক্ত হয়েছি, তিনটে বেটাছেলের কাজ একা করতে পারি। তখন কিছুই জানতুম না, ছেলেমানুষ—তবু দিন কেটে তো গেছে, বেঁচেও তো আছি!'

বলতে বলতেই বোধ হয় মনে পড়ে খাওয়া-দাওয়ার ঐ অনিয়মেই তাঁর শাশুড়ির শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেই যে পেট ছাড়ল, আর সামলাতে পারলেন না কিছুতেই। অবশ্য বুড়ো মানুষ বলেই—। কিন্তু, তিনিও বুড়ো হয়েছেন এখন। সে সময় শাশুড়ীর যা বয়স ছিল, তার চেয়ে তাঁর বয়স এখন অনেক বেশী। তিনিই কি পারবেন সামলাতে?...স্তব্ধ হয়ে যান—শ্যামা কথাটার মাঝখানেই। কেমন যেন আতঙ্ক বোধ হয় তাঁর।...আবার একটু পরেই জোর ক'রে উড়িয়ে দেন চিন্তাটা। শাশুড়ী সুখী মানুষ ছিলেন, চিরকাল প্রাচুর্যেই অভ্যস্ত—তাই সহ্য করতে পারলেন না, শ্যামার শরীর অনেক পাক', অনেক দুঃখকষ্ট অনিয়ম সহ্য ক'রে পেকে গেছে দেহ—তাঁর কিছু হবে না। শুধু একটা ভয় তাঁর—শাক আনাজও অফুরন্ত নয়, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সেও —এবার কি করবেন?

অনেক ভেবে একদিন কিছু আটা কিনতে গেলেন। না হয় দু'বেলা রুটি খেয়েই থাকবেন। কিন্তু তাঁদের বাজারে তখন আটা ময়দাও উধাও হয়েছে। কবে আসবে তবে পাওয়া যাবে আবার তা বলরাম, রামকমল কেউ বলতে পারলে না। শ্যামা এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন। কতকটা দিশাহারা ভাবেই সের দুই গোটা ছোলা কিনে বাড়ি ফিরলেন। কলকাতায় নাকি চিঁড়ে অঢেল পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু সেও পাঁচসিকে সের। জলসা জিনিস চিঁড়ে—এতটার কম পেট ভরে না, গায়ে গত্তিও লাগে না। তার চেয়ে ছোলা ভাল। হিন্দুস্থানীরা খায়, ওদের গায়ে জোর কত!......

কিন্তু ছোলার ধাক্কা দিদি-নাতি কেউই সামলাতে পারলেন না। অবিরাম শাকপাতা খেয়ে খেয়ে অনভ্যস্ত পেটে বহুদিনই, গোলমাল দেখা দিয়েছিল, এবার ভেঙে পড়ল একেবারে। তবে দৈব সহায় এর মধ্যেই একদিন মহাশ্বেতা এসে পড়ল মার খবর নিতে।

অভয়পদর চাকরি যাওয়ার পর থেকে আসা-যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল মহাশ্বেতা—ন্যাড়ার দোকান উঠে যাবার পর বন্ধই ক'রে দিয়েছে প্রায়। বাড়ি থেকে বেরোতেই যেন লজ্জা করে তার আজকাল, "কালা মুখ নীলে করে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।" যে উৎসাহ যে মনের জোরে সে ঘুরে বেড়াত—সে জোর সে উৎসাহের উৎসটাই শুকিয়ে গেছে তার। এ বাড়িতেও আসে ন'মাসে ছ'মাসে একদিন। এবার তো তবু কিছু ঘনঘনই এসেছে বলতে গেলে। এসেছে কতকটা এই মন্বন্তরের কথা ভেবেই।

'মা যা কেপ্পন মানিষ্যি—মা কি আর এই বাজারে চাল কিনে খাচ্ছে? দ্যাখো গে যাও হয়ত খাড়া ওপোস দিয়ে পড়ে আছে।' বলেও এসেছে সে তরলাকে সে কথা। তরলার উৎসাহেই, এতকটি চালও পেট-কাপড়ে ক'রে বেঁধে এনেছে ও বাড়ি থেকে। পাড়া-ঘরে যার যা হোক, ওদের ঘরে এখনও এ বস্তুটির অভাব হয়নি। অম্বিকাপদ দূরদর্শী লোক, সে বাজারের গতিক বুঝে অনেক আগে থেকে সতর্ক হয়েছে। তাদের চাষের চালও কিছু কিছু আসে—তবে তাতে 'সোম্বচ্ছর' চলে না। কিনতে হয় সাত আট মাসের মতোই। সাধারণত নতুন চাল ওঠার সময় সে কেনে না, দুচার মাস গেলে ফাল্গুন-চৈত্র নাগাদ সে একেবারে যতটা দরকার কিনে ঘরে তোলে। আগে কেনে না তার কারণ নতুন চালের রস মরে অনেকটা ওজনে কমে যায়, তাছাড়া তাতে পোকাও ধরে তাড়াতাড়ি। আবার খুচরো খুচরো কেনাও লোকসান, বর্ষার মুখে দাম বাড়ে। তাই চোত-কিস্তির আগে, যখন চাল সস্তা থাকে তখন একেবারে কিনে নেয়।

কিন্তু এবার, যেন বাতাসের মুখে খবর পেয়েই, চাল ওঠার সময়ই পুরো বছরের মতো চাল কিনে রেখেছে। বরং একটু বেশীই কিনেছে। নিজেদের ধানটা অন্য বছর একেবারে ভানিয়ে ঘরে তোলে—এবার এমনিই তুলে রেখেছে, তাতে হাত দিতে দেয়নি কাউকে। রেখেছেও তেমনি কায়দা ক'রে—এমন কি মহাশ্বেতাও তার বুদ্ধি আর বুকের পাটা দেখে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারে না—নিচের ভাঁড়ার ঘরটা খালি করিয়ে তাতেই একেবারে ঠেসে পুরেছে সমস্ত ধান—তারপর আগাগোড়া ইট দিয়ে গেঁথে দিয়েছে তার দোর জানলার ফাঁকগুলো। মিস্ত্রী ডাকেনি তা বলা বাহুল্য, সেটা বড়কর্তার ওপর দিয়ে গেছে—দুভাইতে মিলেই করেছে

অবিশ্যি—মিস্ত্রী ডাকলে জানাজানি চাউর হয়ে যাবে কথাটা, সেও সত্যি; কিন্তু রেখেছে তো বাপু, চারদিকে এই হাহাকার, একটু ফ্যানের জন্যে কী হ্যাংগালি জ্যাংগালি, রাস্তদুপুর পর্যন্ত হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব, কার বাগানে কচু কার বাগানে ওল এই খুঁজে খুঁজে—কিন্তু ওদের তো এতটুকু চিন্তাও রাখেনি মেজকর্তা। শুধু এ বছর নয়—ও বছরেও বেশ কিছুদিন বসে খেতে পারবে, সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। ও বছরে বোধহয় আর কিনতেই হবে না, নিজেদেরটা এসে পড়লে পুরো বছর চলে যাবে।

'মেজকর্তা কিপ্পন হোক আর যা হোক বাপু' মার কাছে স্বীকার করে মহাশ্বেতা, 'এদান্তে তো রাত্তির বেলা দু চোখের পাতা এক করে না, সন্ধ্যে থেকে খালি গেলাস গেলাস চা খায় আর ঠায় সারারাত কান খাড়া ক'রে জেগে বসে থাকে। মধ্যে মধ্যে উঠে ভূতের মতো ঘুরেও বেড়ায় গোটা বাড়িটা। আগে যেমন চায়ের পাট দেখলে জ্বলে যেত—ছোট ভাইকে বকত অষ্টপ্রহর—এখন তেমনি নিজেই চোদ্দ পনেরো কাপ চা খায় পেত্যহ। আরও নাকি ভয় তার ঐ ধান চালের জন্যেই। আঠারো গণ্ডা তালা দিয়েও নিস্তার নেই—বলে যা আকাল, টাকার চেয়ে ধান-চালেই বেশী টাঁক লোকের!'

আবার একটু থেমে বলে, 'আমাদের এ'র তো দিনেরেতেই ঘুম নেই, ওর মতো ঘুরে বেড়ায় না বটে, তবে সারা রাতই সে জেগে থাকে তা দালানে বেরোলেই টের পাই। এমন ক'রে কদিন বাঁচবে কে জানে। খাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছে—দুবেলা ভাতে বসে ঐ অবুদি। যেন ঐকটা চাল বাঁচলেই গেরস্তর সব সুসার হয়ে যাবে!... ওর আরও ভাবনা হয়েছে পাঁটাগুলোর জন্যে। মুখে কিছু না বলুক—বলি ওরই তো ছেলে গা। একটা কারও কোন গতি হ'ল না— সব বসে বসে খাচ্ছে, একি কম ভাবনার কথা। একটা যা হোক দোকানদারী ক'রে দিলে মেজকর্তা, তা এমন গাধা সব—দুদিনে মোট মোট টাকার মাল ধার দিয়ে যথাসব্বস্ব ফুঁকে বসে রইল। আবার যে কে সেই—গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর গেরস্তর অন্ন ধ্বংসাচ্ছে!... বড়টার দু-দুটো ছানা হয়ে গেল,—তবু তো একটা আঁতুড়ে গেল তাই—নইলে তিনটে—তাই কি তার একটু হুঁশপব্ব কি ভয়ডর আছে। উলটে এখন আর মাগের পাছ-তলা ছেড়ে নড়ে না এক মিনিট। দিনরাত পাহারা দিচ্ছে বৌকে—মুয়ে আগুন!... আর করবেই বা কি বলো, ওর হয়েছে সেই—দ্যাখ্ তোর না দ্যাখ মোর, চোর ডাকাতের ভয় পেটে পুরলেই রয়—ভেয়েরা থেকে শুরু ক'রে গুরুজন পর্যন্ত—সবাই যদি টানাটানি করে ফাঁক পেলেই, ও-ই বা কি ভরসায় নিশ্চিন্তি থাকে বলো!'

কিন্তু এ সব কথা অনেক পরে উঠেছিল। কথা প্রসঙ্গে। মহাশ্বেতা বাপের বাড়ি ঢুকে মা আর বোনপোর অবস্থা দেখে প্রথমে তো কেঁদেই আকুল। দুজনেই কঙ্কালসার হয়ে গেছে। ঘন ঘন পাইখানা যাচ্ছে আর ফিরে এসে মাদুরে পড়ে ধুঁকছে।

কান্না থামতে একেবারে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয় মহাশ্বেতার। যেন জ্বলে ওঠে সে। যাকে চিরকাল ভয় ক'রে এসেছে সে কিন্তু এখন তাঁর প্রতি আন্তরিক টানেই আর সে ভয় থাকে না।

'মরণ তোমার! গলায় দড়ি। মা হও—গুরুজন, বলতে নেই—কিন্তু তোমার এবার মরাই উচিত।... পয়সার আণ্ডিলের ওপর বসে আছ তাও দর দেখে পেছিয়ে এলে, ভাত খাবার চাল দুটো—যা খেয়ে প্রাণ বাঁচবে—সে জিনিসও ভরসা ক'রে কিনতে পারলে না! গুচ্ছের ঘাসপাতা খেয়ে মরতে বসেছ! পয়সার এত মায়া। পয়সা কি তোমার সঙ্গে যাবে? ছালা বেঁধে নিয়ে যেতে পারবে পয়সা? এ যা অবস্থা—শ্বাস উঠতে যা বাকী, আর দুদিন এইভাবে চললেই তো টেঁসে যাবে—তারপর? ছেলেরা তো খবরও পাবে না, তার আগেই তো পাড়ার বারো ভূতে এসে লুটপাট ক'রে নিয়ে সরে পড়বে—তোমার এত কষ্টের বুকে ক'রে জমানো পয়সা! সেইটেই খুব ভাল হবে—না? তবু প্রাণে ধরে প্রাণ বাঁচাবার জিনিসটা কিনতে পারবে না। হাত্তোর পয়সার মায়া রে! নিজে তো মরছই—ঐ একরত্তি ছেলেটাকে পর্যন্ত না খাইয়ে মারতে বসেছ!... ছোলা! ছোলা খেয়ে জীবন-ধারণ করবে! ছোলা খায় ঘোড়ারা, ঐ খেয়েই অমন বিশ পঞ্চাশ ক্রোশ দৌড়য় তারা ভারী ভারী মাল নিয়ে। তোমাদের কি ঘোড়ার পেট--না অত দৌড়ঝাঁপ করো তোমরা?... আর এতই বা কি, এক মাসে তো তোমাদের আধমণ চালও লাগে না—না হয় কুড়ি টাকার চালই খেতে! শুধু ভাতও তো খাওয়া যায়, নুন দিয়েও ভাত ওঠে ক্ষিদের সময়। দুধ নয়, ঘি নয়—কেনা আনাজ নয়—কোন খরচই তো নেই—একগাছা ক'রে ট্যানা পরে তো থাকা, দুটো পেটের ভাতের জন্যেও পয়সা খরচ করতে পারো না? এ টাকা তোমার কী কাজে আসবে শুনি? নিজের ছেরাদ্দের জন্যে জমাচ্ছ, না ছেলেমেয়েদের ছেরাদ্দের জন্যে?'

এক নিঃশ্বাসে ঝাঁ ঝাঁ ক'রে বলে যায় মহাশ্বেতা। এই উপলক্ষে নিজের কিছু পূর্বসঞ্চিত জ্বালাও বোধহয় বেরিয়ে আসে তার।

কিন্তু শ্যামাও আজ রাগ করেন না। হয় রাগ করার অবস্থা নেই, নয়তো তিনি নিজেই মনে মনে অনুতপ্ত হয়েছেন এই দুর্দিনে। তিনি বরং একটু অপ্রস্তুতভাবেই চিঁ চিঁ ক'রে বলেন, 'তা তাই না হয় বাপু কিনব এবার।...মুশ-কিল, বাজারে তো পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় পাওয়া যাবে—মেজকত্তা তো ঘাঁৎঘোঁৎ জানে শোনে—তাকেই না হয় বলিস না কিছু চাল যদি কিনে দিতে পারে। যা দাম হয় দোব—'

মহাশ্বেতা নিজেই উনুনে পাতা জেলে সঙ্গে-আনা চাল কটি চাপিয়ে দেয়। সবটা চাপায় না—মরা পেট, বেশী ভাত সইবে না—বরং দুটি থাকলে কাল খেতে পারবে। দুটো কাঁচকলাও যোগাড় করে অতিকষ্টে। তারপর সেই প্রায় সন্ধ্যাবেলা নিজে বসে থেকে ওদের দিদি-নাতিকে খাইয়ে বাড়ি আসে।......

অম্বিকাপদকে চালের কথা বলতে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বলল, 'এখন তো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আছে যাদের কাছে, তারাও সহজে বার করবে না। কেননা—একবার খবর পেলে হয়ত লুঠপাট হয়ে যাবে। তা না হ'লেও—লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি ক'রে, এতকাল নেই নেই বলে এসেছে!... তা এক কাজ করো নাহয়, তোমার ছেলেদের বলো—পারে তো খানিকটা চাল এখনকার মতো পৌঁছে দিয়ে আসুক। ওর আর দাম দিতে হবে না তাঁকে। আপাতত তো ঐ চলুক। তারপর—শুনেছি গবর্মেণ্ট থেকে চাল দেবার ব্যবস্থা করছে—মাথা পিছু এক সের না দেড়সের ক'রে—তাহ'লে ও'দের খুব অসুবিধা হবে না। আর না দেয়—তখন খোঁজখবর করা যাবে বরং!'

দুর্গাপদ একটু সন্দেহ প্রকাশ করে, 'হ্যাঁ, গবর্মেণ্ট চাল ছাড়ছে, তুমিও যেমন! ওসব কথা রেখে বসো দিকি! ওরাই তো মিলিটারীর জন্যে চড়া দামে কিনে কিনে চাল পাচার করলে দেশ থেকে, আমাদের জব্দ করবে বলে—তবে আবার ছাড়বে কিসের জন্যে?'

'ছাড়বে আরও বেঁধে রাখার জন্যে। তাদের হাতে চাল থাকা মানেই তো টিকি বাঁধা পড়া তাদের কাছে!... আর সবাই যদি সরেই গেল তো ওরা রাজত্ব করবে কাকে নিয়ে। জব্দ করতে চেয়ে-ছিল—জব্দ হয়ে গেছে। যারা ইংরেজ তাড়াতে চেয়েছিল তারাই এখন হামলে পড়েছে চাকরির জন্যে। চাকরি দিচ্ছেও দুহাতে। আমি তো ন্যাড়াকে বলেছি—চট্ ক'রে ড্রাইভারীটা শিখে নিতে—তাহ'লে হয়ত একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারব। এখন মিলিটারীতে

চুকতে পারলে চাল ছিলি এসব ব্যাপারে নিশ্চিন্ত!'

তারপর একটু থেমে অম্বিকা আমার ভাইকে বললে, 'আর এরাই সব চাল টেনে নিয়েছে বলে চাল উবে গেছে—সেটাও ঠিক নয় হয়ত। এ দেশের চালে এ দেশে কুলোতে না কখনই। জাহাজ জাহাজ চাল আসত রেঙ্গুন থেকে, তোমরা তার খবরও রাখতে না। সেইটে বন্ধ হয়েই এত দুর্ভিক্ষ হয়েছে। আমি জানি—আমি দেখেছি, আমাদের এক অফিসের বন্ধুর চালের কারবারও ছিল। আমড়াতলার মুসলমানদেরই একচেটে ছিল প্রায় কারবারটা, জাহাজ জাহাজ চাল আনাত, মোটা চাল—পৌনে তিন টাকা দরে সে চাল বিকোত এখানে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে চাল খালাস করতে হ'ত জাহাজ থেকে—তা গুদোম টুদোমের ধার ধারত না তারা। একটা চৌকী পেতে ডকে বসে যেত, চাট্টি চাট্টি নমুনা নিয়ে, খবর পেয়ে ব্যাপারীরাই হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ত—মুখে মুখে কারবার—মোটা মোটা টাকার মাল, কেউ বিশ গাড়ি কেউ চল্লিশ গাড়ি পাক্কা ক'রে নগদ টাকা জমা দিয়ে আসত, রসিদ নেই পত্তর নেই, পুরনো মক্কেল হ'লে ঠিকানাও জিজ্ঞেস করত না, নতুন হ'লে একটা চিলতে কাগজে ঠিকানাটা লিখে নিত বড় জোর। বিশ্বাসের ওপর কারবার—কিন্তু ঠিক সময়ে মাল পৌঁছে যেত—এক চুল এদিক ওদিক হ'ত না। প্রথমবার যে বার যাই, আমার সন্দেহ হয়েছিল, বিকেলে পাঠাবার কথা, আমি সকাল ক'রে অফিস থেকে বেরিয়ে দেখতে গিছলুম মালটা পৌঁছয় কিনা। তা চারটেয় পৌঁছবার কথা—পৌনে চারটেয় গিয়ে দেখি সার সার মোষের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তখনই।'

চাল, দুই ছেলে ধনা আর ন্যাড়ার হাতে আন্দাজে দু পুঁটুলি বেঁধে দিলে মেজকর্তা—মহাশ্বেতার মনে হ'ল আধ-মণের কম নয়। যতই যা বলুক সে, এতদিন মুখের সামনেই নানা কটু কথা বলে এসেছে—গালাগাল-মন্দও কম দেয়নি—কিন্তু এখন এতটা উদারতার সামনে নিজেকেই যেন ছোট মনে হ'তে লাগল। মনে হ'ল—বড়কর্তা খুব ভুল করেনি হয়ত এত বিশ্বাস ক'রে—দোষ-গুণে মানুষটা সত্যিই খুব খারাপ নয়।

সত্যি-সত্যিই এর দিনকতক পর থেকেই কণ্ট্রোলে চাল দেওয়া শুরু হ'ল। মাথা পিছু একসের ক'রে চাল—লাইন বেঁধে দাঁড়াতে হবে তার জন্যে। সে লাইন শুরু হয় আগের রাত থেকে। ক্রমশ আগের দিন বিকেল থেকে লাইন দেওয়া শুরু হ'ল। প্রথম দিকে না থাকতে পেলে ভরসা থাকে না চাল পাবার। কোন দোকান একবস্তা কোন দোকান বড় জোর দুবস্তা চাল পায়—এক সের ক'রে দিলে আড়িজন কি একশ জাই জনেই মাল কাবার হয়ে যায়। ভোর থেকে যে দাঁড়াল সে হয়ত বেলা বারোটার সময় শুনল যে চাল ফুরিয়ে গেছে সেদিনের মতো—আবার সেই পরের দিন কি অমুক দিন দেওয়া হবে। সেইজন্যেই সবাই চেষ্টা করে অপরের চেয়ে আগে বসতে। সকলের সময় নেই এত, তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না লাইনে দাঁড়ানো। ফলে যারা দাঁড়ায় বারো চোদ্দ ঘণ্টা আগে থেকে। বসবাস করে সেখানে বসতে গেলে। তারা ছ' আনা সেরে কেনা চাল বারো আনা চৌদ্দ আনা—একটাকা পর্যন্ত দরে বিক্রী করে অনায়াসে। এ একটা যেন নতুন ব্যবসা শুরু হয়ে গেল।

খবরটা শ্যামার কানেও পৌঁছল বৈকি!

লোভে তার স্তিমিত দৃষ্টি জ্বলে উঠল। তিনি বলাইকে ডেকে বললেন, 'বসেই তো থাকিস, একটা আসন পেতে বসে থাক্‌না ওখানে—তবু দুচারটে পয়সা আসবে!'

সে সংক্ষেপে উত্তর দিলে, 'আমি পারব না!'

'কেন পারবিনি শুনি। বসে বসে তো খাচ্ছিস। এটুকু পারিস না? খোরাকীটা আসে কোত্থেকে?'

'না পারো দিও না খেতে। তুমি নিজেই খাও গে।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় বলাই।

ডাক পেড়ে গালাগাল দেন শ্যামা, 'আ মর্‌ মুখপোড়া! বাক্যির ছিরি দ্যাখো না! লেখাপড়া শেখা নেই, এক পয়সা রোজগারের চেষ্টা নেই—খাচ্ছেন আর বসে আছেন থুম্‌ হয়ে—কিন্তু চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যির বেলায় তো ঠিক আছে!... হবে না কেন, কেমন বংশে জন্ম! বেউড় বাঁশের ঝাড় যে! হারাম-জাদার ছেলে হারামজাদাই হবে। এ তো জানা কথা। আমারই দুর্বুদ্ধি, দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি!' ইত্যাদি—

কিন্তু যতই গালাগাল দিন আর যাই করুন বলাইয়ের অবিচল স্থৈর্য নড়াতে পারেন না। মনে পড়ে যায় নিজের ছোট ছেলের কথা, মায়ের চোটেও তাকে এক বিন্দু টলাতে পারেন নি। চোরের মার সহ্য ক'রেও বসেছিল চুপ ক'রে ঠায়—এই জানলাতেই। নরানাং মাতুলক্রম—না কি যেন বলে লোকে—সেই মামারই তো ভাগ্নে।

শেষ পর্যন্ত তোষামোদেরও আশ্রয় নেন। ভাল নতুন কাপড় দায় করে দেবেন, এমন প্রস্তাবও করেন কিন্তু বলাইয়ের সেই এক কথা, 'আমি পারব না।'

শেষে রাগ ক'রে নিজেই একদিন যান লাইন দিতে। আগের দিন থেকে দাঁড়াতে পারেন না—রাত চারটেয় রাজগঞ্জের ভোঁ বাজতেই উঠে গিয়ে লাইনে দাঁড়ান, কিন্তু তবু চাল পান না। তাঁর থেকে ছ' সাতজন লোক আগে থাকতেই চাল বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে শুয়ে পড়েন। দুঃখে ক্ষোভে চোখে জল এসে যায় তাঁর। আর একদফা গাল দেন নাতিকে। ও মুখপোড়া গেলে আগের দিন রাত থেকেই গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহ'লে আর এমন শুধু হাতে ফিরতে হয় না!

চাল তো মেলেই না—উলটে কথাটা প্রচার হয়ে যায় পাড়ায় পাড়ায়। ক্রমশ এ বাড়িতেও পৌঁছয় খবরটা। অম্বিকা অবাক হয়ে তার বৌদিকে বলে, 'সে চাল এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল আঁবুই মার? না আগে থাকতে সঞ্চয় করতে চাইছেন? তা বলাই থাকতে উনিই বা দাঁড়াতে গেলেন কেন? বলাই যদি না-ই পারে, আমাদের তো বলতে পারতেন, না হয় এরাই কেউ গিয়ে দাঁড়াত!... যাই হোক, মাকে বলে এসো, চাল ফুরোলে যেন আমাদেরই খবর দেন, ওঁকে আর এই বয়সে ঐ সস্তিকজাতের সঙ্গে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে না!'

মহাশ্বেতার মুখ অপমানে কালো হয়ে যায়। সে আবারও মায়ের কাছে এসে ঝাল ঝাড়ে এক চোট।

'বলি আর কত আমার মুখখানা পোড়াবে! এততেও কি শান্তি হ'ল না? আমি বেশ বলতে পারি চাল নয়—পয়সার লোভে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে তুমি, চড়া দামে বেচবে বলে! ছিঃ ছিঃ! পয়সার এত লালস তোমার? এ পয়সা কাকে দেবে তুমি, প্রাণে ধরে তো জ্যান্তে কাউকে দিতে পারবে না। এতো দেখছি তোমায় যক করতে হবে। তাই না হয় করো, ছাতের কাছে নাতিটা আছে—ওকেই যক্‌ করে দাও—পয়সা আগলে বসে থাকবে চার যুগ!'

এই প্রথম বোধ করি শ্যামা কোন কথা কইতে পারলেন না—বিশেষত বড়-মেয়ের কথার জবাবে—মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

বাংলা মহাকোষের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের ইতিহাস আজ নতুন করে রচিত হচ্ছে। আজকের দিনের শিক্ষা ও সংস্কৃতিসেবীর প্রধান সুবিধা তাঁরা পৃথিবীর ৫ হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও সাধনার ফল একটি মাত্র গ্রন্থের মধ্যে পুঞ্জীভূত আকারে নিত্য-নিয়ত হাতের কাছে পাচ্ছেন।

জাতির চলমান জীবনের সহস্র ভাঙ্গাগড়া ও পরিবর্তনের মধ্যেও বেঁচে থাকে তার সাহিত্য, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সভ্যতার ইতিহাস। একদল নীরব সাহিত্যসাধক আছেন যাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে জাতির এই সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর চতুঃষষ্টিকলাকে ধরে রাখেন একটি মাত্র গ্রন্থের মধ্যে। তাঁরা হলেন অভিধানকার আর মহাকোষ-প্রণেতা। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ঘটে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, শব্দসম্পদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার। আর সেই ক্রম-প্রসারমান সম্পদরাশি যথাযথ আহরণ করে নিয়ত জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলার মধ্যেই প্রকাশ পায় জাতির সজীবতা ও প্রাণশক্তি। সাহিত্য ও জ্ঞান-রাজ্যে নব নব সৃষ্টি-প্রতিভার সঙ্গে এই মাধুকরী বৃত্তিতে যে জাতি যত কর্মতৎপর সে জাতিই তত বেশী সংস্কৃতিমান ও প্রাণবান। এ বিষয়ে ইউরোপীয়রাই আজ সারা দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। ইউ-রোপীয় ভাষায় আজ বিশ্বের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা নিয়ে সংকলিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের অভিধান, ছোট মাঝারি কোষগ্রন্থ এবং বিরাটাকার মহাকোষ বা এন-সাইক্লোপিডিয়া। আরো উল্লেখযোগ্য যে, শুধু একখানি বিরাট কোষগ্রন্থ প্রকাশ করেই সেখানকার প্রকাশকগোষ্ঠী আত্ম-সন্তুষ্টি নিয়ে নিশ্চেষ্ট বসে থাকছেন না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্য নিয়ত প্রসারমান। তার স্রোতধারাকে অব্যাহত রাখার জন্যও তাই তাঁরা সদা সচেষ্ট। এজন্য সদ্য আবিষ্কৃত সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং গবেষণালব্ধ প্রতিটি অভিনব তথ্য সংকলিত করে প্রতি বৎসর তাঁরা প্রকাশ করে চলেছেন এনসাইক্লো-পিডিয়ার একখানি করে সর্বাধুনিক সংযোজন সংখ্যা। আজ ইউরোপীয় ভাষার মহাকোষ যে পৃথিবীর সমস্ত সুধী-সমাজের প্রশংসার্হ তার কারণ তার পিছনে রয়েছে অগণিত সাহিত্যসেবীর অনলস নিষ্ঠা আর অবিচ্ছিন্ন সংযোজন ও সংকলন তৎপরতা।

কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই দ্রুত গতিশীল যুগে আমরা আজ কোথায়! ইউরোপীয়দের তুলনায় আমরা যে আজও কত পশ্চাদপদ সে কথা ভাবতেও আমাদের লজ্জা বোধহয়। 'আ মরি বঙ্গভাষা' বলে আমরা বাংলা ভাষার গৌরব করি। ভারতের আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা বলে গর্বে স্ফীত হই। আমাদের মাইকেল নবীনচন্দ্র মহাকবি, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসম্রাট, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষারই পূজারী বলে বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার বড়াই করে বেড়াই। কিন্তু সেই কৃতী পুরুষ-দের গড়া বাংলা ভাষাকে মর্যাদার আসনে তুলে ধরবার জন্য, সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য আজ পর্যন্ত আমরা কতটা কি করতে পেরেছি বা কতটা সচেষ্ট হয়েছি, তার কোন খতিয়ান রাখা দরকার মনে করি না। গল্প উপন্যাসে আজ আমাদের বাজার ছেয়ে গেছে কিন্তু সে অনুপাতে প্রবন্ধ সাহিত্য বা গবেষণামূলক গ্রন্থ ক'খানাই বা প্রকাশিত হচ্ছে! মোট কথা, কাল-জয়ী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগ থেকে বর্তমান যুগে আমরা যে অনেক পেছিয়ে পড়েছি এ সত্য আজ প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তিই উপলব্ধি করবেন। কতগুলি গল্প উপন্যাস ছাড়া, যার অধিকাংশই নিম্নমানের, বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন আমরা কতটুকু করতে পেরেছি? পেরেছি কি আমরা আজ পর্যন্ত ইংরেজী চেম্বার্স বা ওয়েবস্টারের মত একখানি নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গসুন্দর অভিধান রচনা করতে? —না পেরেছি আজ পর্যন্ত ইংরেজি এনসাইক্লোপিডিয়ার মত সংকলন করতে একখানি পূর্ণাঙ্গ মহাকোষ? অভিধান রচনায় ইদানীং কিছুটা তৎপর হলেও মহাকোষ সংকলনে আমরা একেবারেই পশ্চাদপদ। এ বিষয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের মধ্যে কোন চেষ্টা বা উদ্যম নেই। পরাধীনতার যুগে বে-সরকারী উদ্যমে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টায় পূর্বাচার্যেরা বাংলা ভাষার যে ভিত্তি-টুকু গড়ে গেছেন, তাকে যতটা সমৃদ্ধ করে গেছেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সরকারী অর্থানুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষক-তার প্রভূত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, নতুন কিছু গড়ে তোলা দূরে থাক, সেই গড়া জিনিসগুলোকে রক্ষা বা সংস্কার করার সামর্থ্যও আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এর চেয়ে লজ্জা আর পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে! এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বহুকাল পূর্বে হিতবাদী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি প্রকাশকগণ বাংলা ভাষায় অতি সস্তা দামে যেসব গ্রন্থমালা প্রকাশ করে গেছেন, পুনর্মুদ্রণের অভাবে ইদানীং সেগুলি একে একে লুপ্তপ্রায়। কোন লেখক বা প্রকাশকগোষ্ঠী এগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য আজ আর তেমন-ভাবে উদ্যোগী নন। ফলে পুরনো যুগের লেখকদের কর্মকৃতি এবং অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য ইদানীং একেবারে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। আজকেরদিনের তরুণ সমাজ তো এঁদের Old Fossils বলে নাসা কুঞ্চিত করছেন। খ্যাতিমান প্রবীণদের মধ্যে একদল কর্মব্যস্ত বৈষয়িক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে, আর একদল মসগুল সিনেমা স্টান্টযুক্ত গল্প উপন্যাস রচনায়। সুতরাং বিগতের স্মৃতি নিয়ে আজকের দিনে কে আর মাথা ঘামায়! সাম্প্রতিককালে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক পরলোক গমন করলে সদ্য সদ্য পত্রিকা মারফত তাঁর দু'একটা স্মৃতিসভার আয়োজন হয়, পত্র-পত্রিকায় 'অপূরণীয় ক্ষতি' শীর্ষক দু'একটা শোক প্রবন্ধ বেরও হয়—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপর সব চুপচাপ। দুই এক বৎসরের মধ্যেই তিনি তলিয়ে যান একেবারে বিস্মৃতির অতলে। একটু যাঁরা পুরনো আমলের তাঁদের তো কথাই নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নাট্য-কার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ঐতি-হাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ খ্যাতি-মান বাঙালী সাহিত্যিকদের নাম করা যেতে পারে। আজও পর্যন্ত যাঁদের স্মৃতিরক্ষার কোন যথাযোগ্য ব্যবস্থা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ বাংলা সাহিত্যে এঁদের অসামান্য অবদানের কথা সর্বজনস্বীকৃত।

বাঙ্গালী শুধু আত্মবিস্মৃত জাতিই নয়। আত্মবিস্মৃতির জড়তা এবং মূঢ়তা আজ তাদের এমন এক স্তরে নামিয়ে এনেছে যে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে পুত্র পর্যন্ত আজ কৃতী পিতার বা পিতামহের স্মৃতিরক্ষায় উদাসীন। বাইরের লোক এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে এগিয়ে এলেও তাঁদের ভিতরে কোন সাড়া নেই, তাঁরা সম্পূর্ণ নির্বিকার। জাতির এই সর্বনাশা আত্মবিস্মৃতি আর জড়তার ফলেই বাংলা আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হয়েও ধীরে ধীরে সকল দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে।

আজ বাঙ্গালী শিক্ষিত ও সাহিত্য-সেবী মাত্রেই জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে যে অসুবিধা ভোগ করছেন তা হল একখানি পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্স বইয়ের। বিগত যুগের কোন একটি কৃতী বাঙ্গালী বা ভারতীয়ের জীবনালেখ্য, কোন একটি স্মরণীয় ঘটনা

বা তার সাল তারিখ, কোন একটি প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু—পুঙ্খানুপুঙ্খ বা বিস্তৃতভাবে দূরে থাক অন্ততঃ তার সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু জানবার মত একখানি তথ্যগ্রন্থ আজ আমাদের হাতের কাছে নেই। নিতান্ত অসহায়ের মত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে সেই তথ্যের জন্য অন্ধকারে হাতড়াতে হয়, লাইব্রেরীর পর লাইব্রেরী ঘুরে বেড়াতে হয় গ্রন্থসমুদ্র মন্থন করে। হাল আমলের নব আবিষ্কৃত কোন তত্ত্ব বা তথ্য জানতে হলে তো ইংরেজি বইয়ের সাহায্য ছাড়া গত্যন্তরই নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের পথে নিয়ত এই যে দৈন্য ও অভাব, এ দূর করতে হলে চাই আমাদের একখানি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাধুনিক মহাকোষ। কিন্তু বাংলা মহাকোষ বলতে আজও আমাদের একমাত্র অবলম্বন ৫২ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত সেই পুরনো বিশ্বকোষ।

কঙ্কাবতী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা খ্যাতনামা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা মহাকোষ রচনায় উদ্যোগী হয়ে ১২৯১ সালে তাদের জন্মভূমি ২৪ পরগণা জেলার রাহুতা গ্রাম থেকে বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণের প্রথম সংখ্যা এবং তারও দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৯৩ সালে আরো কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করে প্রথম সংস্করণের অ-কার সম্পূর্ণ করেন। তারপর ১২৯৪ সাল থেকে এর সংকলন ভার গ্রহণ করেন প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। দীর্ঘ ২৫ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় অবশেষে ১৩১৮ সালে ২২ খণ্ডে বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ সম্পূর্ণ করে বাংলা ভাষার একটা নিদারুণ অভাব পূরণ করেন। বাংলা ভাষায় প্রথম মহাকোষ সংকলয়িতা হিসাবে তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই পরম শ্রদ্ধার পাত্র। এর পর হিন্দী বিশ্বকোষ রচনাও তাঁর আর একটি প্রশংসনীয় কাজ। প্রথম সংস্করণের প্রায় ২৫ বৎসর পর ১৩৪০ সাল থেকে তিনি আবার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ সংকলনে ব্রতী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি আর তা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। ৪ খণ্ডে স্বরবর্ণ সমাপ্ত করে ব্যঞ্জনবর্ণের আদ্য অক্ষর 'ক' এর কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করার পর তাঁর পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে অনুরূপ আর একখানি মহাকোষ সংকলন আরম্ভ করে দু' একটি সংখ্যা প্রকাশ করেন। কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই মহাকোষের প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায়। তারপর প্রায় দীর্ঘ ৩০ বৎসর অতিবাহিত হল কিন্তু আজও পর্যন্ত কেউ আর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে কিংবা নতুন করে আর একখানি মহাকোষ রচনায় উদ্যোগী হননি। সুতরাং বাংলা ভাষায় সামগ্রিক মহাকোষ বলতে আজও আমাদের একমাত্র অবলম্বন সেই ৫২ বৎসরের পুরনো বিশ্বকোষ।

কিন্তু ইতিমধ্যে দুইটি মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবে পৃথিবীর রূপটা গেছে স্বাভাবিক গতিতে পাল্টে। রূপকথার পক্ষীরাজও আজ গতিবেগে হার মেনেছে আধুনিক বোমারু বিমানের কাছে। কামান, গোলা, মর্টারের রাজ্যে ঘটেছে বিশ্বগ্রাসী অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমার আবির্ভাব। রকেট দৈত্যের ভীম পদক্ষেপে পৃথিবী আজ টলটলায়মান। স্পুটনিকের পিঠে চড়ে মানুষ এখন চন্দ্রলোকের অভিযাত্রী। সুতরাং ৫২ বৎসর পূর্বের সংকলিত বিশ্বকোষ যে এমন দিনের জ্ঞানান্বেষীর ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে না একথা বলা বাহুল্য মাত্র। অথচ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের পথ অনুসরণ করে নতুন আর একখানি মহাকোষ সংকলন দ্বারা জাতির এই নিদারুণ অভাব পূরণে আজ পর্যন্ত কোন শিক্ষাসংস্থা, সাহিত্য সংগঠন বা প্রকাশকগোষ্ঠী এগিয়ে আসছেন না। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে!

ইতিমধ্যে সরকারী অর্থানুকূল্যে হিন্দী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাভাষীরা নিজ নিজ ভাষায় মহাকোষ সংকলন সমাপ্ত করে যে নিষ্ঠা ও তৎপরতায় পরিচয় দিয়েছেন, অনুরূপ সুযোগ সুবিধা সত্ত্বে আমরা আজও তা পারিনি। সম্প্রতি সরকারী অর্থানুকূল্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক ৪ খণ্ডে ভারত মহাকোষ নামে যে কোষগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ হয়েছে তাতে যদিও বা কিছু আশার সঞ্চার হয়েছিল কিন্তু তার অস্বাভাবিক শ্লথগতি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই নিরাশ করবে। তা ছাড়া যত দীর্ঘদিনেই সমাপ্ত হক, এরূপ একখানি ৪ খণ্ডের ক্ষুদ্র কোষ-গ্রন্থ দ্বারা আমাদের আংশিক চাহিদা মিটবে মাত্র, সামগ্রিক অভাব অপূর্ণই থেকে যাবে। প্রকৃত অভাব পূরণ করতে হলে চাই আমাদের একখানি পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাধুনিক মহাকোষ। আর শুধু সেই মহাকোষ সংকলন সমাপ্তিই তার শেষ কথা নয়। ঐ সঙ্গে ঠিক ইংরেজি এনসাইক্লোপিডিয়ার মত প্রতি বৎসর তার একটি সংযোজন সংখ্যাও যথারীতি প্রকাশ করে যেতে হবে। তবেই সার্থক হবে মহাকোষ সংকলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

বাংলা ভাষার এই দৈন্য ও অভাব পূরণ করার জন্য সরকারী বেসরকারী প্রতিটি শিক্ষাসংস্থা ও প্রকাশকগোষ্ঠীর নিকট নিবেদন, আর কালবিলম্ব না করে তাঁরা একক বা সম্মিলিতভাবে এ কাজ সম্পাদনে এগিয়ে আসুন। এরজন্য যদি সাময়িকভাবে অন্যসব প্রকাশনা বন্ধও রাখতে হয় তাতেও ইতস্ততঃ করা উচিত নয়। কারণ বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে হলে, তাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে একখানি পূর্ণাঙ্গ বাংলা মহাকোষ সংকলন আজ অপরিহার্য।

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সর্বদেশের, সর্বযুগের সাহিত্যরসিক অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে 'দান্তের' নাম স্মরণ করে থাকেন। যাঁর 'ডিভাইন কমেডী' এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ইতালির মাটিতে ধ্রুপদী সাহিত্যের যে ফসল ফলেছে তার ঐশ্বর্য ঈর্ষার বস্তু। দূরদূরান্ত থেকে বিশেষজ্ঞরা ইতালিতে আসেন ক্লাসিকস্রষ্টাদের বিষয়ে গবেষণা করতে। বহু অজানা জিনিস আবিষ্কৃত হয় তাঁদের গবেষণার ফলে। 'বার্গেলো চ্যাপেলের' দেয়াল থেকে আবিষ্কৃত 'দান্তের' প্রতিকৃতি এমনি একটি গবেষণার ফল। ঐ আবিষ্কারের কাহিনী গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর।

১৮১৭ সালে। ইতালির ফ্লোরেন্স। ইউরোপের অভিজাত মহলে তখন ফ্লোরেন্সের খুব সুখ্যাতি। এর জলবায়ু নাকি সর্বরোগহর। সেমুর টোকার কার্কাপ, বিখ্যাত চিত্রকর স্যার টমাস লরেন্সের অন্যতম সুখ্যাত ছাত্র ফ্লোরেন্সে এলেন হৃতস্বাস্থ্য উদ্ধারে। তাঁর বয়স তখন কুড়ি বৎসর। তিনি যে বাড়ীতে এসে উঠলেন তার নাম 'কাসা কারুয়ানা'। বাড়ীটি অতি প্রাচীন, ১৩৫০ সালে নির্মিত। স্বাস্থ্য-অন্বেষণে এলেও, কার্কাপ এই ঐতিহাসিক, মধ্যযুগের নাইটদের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ীতে তাঁর ষ্টুডিও খুলে বসলেন। স্যার টমাস লরেন্সের কৃতি ছাত্র। অনেকেই আসতে লাগলেন তাঁকে দিয়ে তাঁদের প্রতিকৃতি আঁকাবার জন্য। কার্কাপ আঁকতে লাগলেন ফরমায়েসী ছবি। কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগল তাঁর মৌলিক চিত্রসৃষ্টি। 'দান্তে' ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। দান্তের বিভিন্ন লাইন অবলম্বনে

দান্তের সেই হারানো ছবিটি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

*

১৮৪০ সালের ২০ জুলাই বার্গেলো চ্যাপেলে বসে রাতের অন্ধকারে কার্কাপ চুরি করে দান্তের যে ঐতিহাসিক ছবিটি নকল করেছিলেন। এই ছবিটিতেই গিয়োত্তোর আঁকা সমস্ত বৈশিষ্ট্য বজায় রয়েছে

*

তিনি ছবি আঁকতে শুরু করলেন—কোন 'মডেলে'র সাহায্য না নিয়েই। ক্রমশঃ তিনি 'দান্তের' ভিতর ডুবে গেলেন। দান্তেই হয়ে উঠলেন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। ইতালির সাহিত্য-ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং মূল্যবান নিদর্শন-সংগ্রহেই তাঁর সমস্ত অর্থ ব্যয় করে ফেললেন। 'কাসা কারুয়ানা' যেন এক মিউজিয়ামে পরিণত হল। কার্কাপের ঘরের চারিদিকে সমস্ত জিনিস ছড়ানো পড়ে থাকত। মেঝেতে কিছু, কিছু টেবিলে, কিছু চেয়ারের উপর। মূল্যবান জিনিসগুলিকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার ব্যাপারে তাঁর এক শিল্পী-সুলভ পরম উদাসীনতা ছিল। তাঁর এই দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সংগ্রহশালায় দান্তের চারখানি পাণ্ডুলিপি ছিল—তার মধ্যে একটি ১৩৬০ সালের প্রাচীন 'ডেকা মরনে'র মূল সংস্করণ। আর একটি দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ ছিল 'মাকেয়াভেলিকে' সামনে রেখে তৈরী তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি। বিভিন্ন দেশের 'দান্তে গবেষক'রা ফ্লোরেন্সে এলেই—'কাসা কারুয়ানা' খুঁজে বের করে কার্কাপের এই মূল্যবান সংগ্রহশালা দেখতে আসতেন।

কার্কাপের শ্রুতিশক্তি ক্রমশই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল, হঠাৎ তিনি একেবারে বধির হয়ে গেলেন। বন্ধু-বান্ধবদের আলাপ-আলোচনা, প্রিয়জনের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ, পাখীর কলকাকলী সবকিছুই তখন তাঁর কাছে অর্থহীন। শব্দহীন এক বিরাট প্রশান্তির মাঝে তিনি উত্তীর্ণ হলেন। অধ্যয়নই হল তখন তাঁর একমাত্র সময় কাটাবার উপায়। আর সে অধ্যয়নের বিষয়বস্তুই হল 'দান্তে' এবং দান্তের উপর লেখা বিভিন্ন পুস্তক। পড়তে পড়তে হঠাৎ তিনি এক জায়গায় উল্লেখ পেলেন—গিয়াত্তো বার্গেলো চ্যাপেলের দেয়াল-চিত্রে অন্যান্য ছবির সঙ্গে দান্তেরও একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। কিন্তু কার্কাপ এর কোন প্রমাণ পেলেন না। এই সময়েই কার্কাপ 'ডিভাইন কমেডির' 'লর্ড ভার্নো' সংস্করণের সমস্ত ছবিগুলি এঁকেছিলেন।

দীর্ঘ উনিশ বছর কেটে গেল। ১৮৩৬ সাল। ফ্লোরেন্সে এলেন দান্তে-গবেষক আমেরিকান পণ্ডিত শ্রীরিচার্ড হেনরী ওয়াইল্ড। তাঁর আবাসস্থল হল 'পালাজ্জো ভারনাচ্চিও'। বাড়ীর চারপাশ ঘিরে, সুন্দর বাগান। এই মনোরম পরিবেশে ওয়াইল্ড তখন একখানি বই লিখছিলেন 'The life and time of Dante'. এই রচনাটিকে দান্তের উপর লেখা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে পরিণত করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। 'ষ্টেট আরচিভে' বসে তিনি সারাদিন পড়াশুনা করতেন। তাঁর এই পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা বিফল হল না। তিনি ভাসারির

সেণ্ট মেরী ম্যাগডালেন-এর স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত বার্গেলো প্রাসাদের চ্যাপেলের অংশ। এখানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীরা তাঁদের শেষমুহূর্ত অতিবাহিত করতেন।

কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেন—'বারগেলো চ্যাপেলেই' গিয়োত্তোর আঁকা 'দান্তের' ফ্রেসকো আছে এবং সে ছবি প্রত্যক্ষ করতে হ'লে দেয়ালের উপর থেকে এক পুরু পলেস্তারা উঠিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় কে এখন ঘণ্টা বাঁধে। এই নির্দেশকে কার্যে পরিণত করতে হলে 'Grand Duke'-এর অনুমতির প্রয়োজন এবং একজন বিদেশীর পক্ষে এইরকম একটি পরীক্ষামূলক প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া মানেই প্রত্যাহৃত হবার ষোল আনা সম্ভাবনা। সুতরাং একজন ইতালিয়ানের সাহায্য নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে তিনি মনে করলেন।

ওয়াইল্ড অনেক চিন্তার পর তাঁর শিল্পী-বন্ধু রেজ্জির সাহায্য নেওয়াই স্থির করলেন। রেজ্জি তিনজনের নাম করেই 'Grand Duke'-এর অনুমতি নেওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। তিনজন হলেন—ওয়াইল্ড, কার্কাপ ও রেজ্জি স্বয়ং। প্রস্তাব গৃহীত হল। 'গ্র্যান্ড ডিউক' অনুমতি দিলেন তবে কার্য-পরিচালনার জন্য তিনি 'ফ্লোরেন-টাইনস'কে নিযুক্ত করলেন এবং রাজা হুকুমজারি করলেন—যখন কাজ চলবে তখন কোন বিদেশীর সেখানে থাকা চলবে না। এ হল ১৮৪০ সালের কথা।

আস্তরণ ওঠাবার কাজ শুরু হল। জায়গায় জায়গায় পলাস্তারা প্রায় এক ইঞ্চি পুরু। কাজে সূক্ষ্মতার ছাপ বিন্দুমাত্র ছিল না—যা-তা ভাবে কাজ শেষ করা হল। দেয়ালের এক জায়গায় কোন এক সময় একটি পেরেক পোঁতা হয়েছিল। পেরেকটি ওঠাতে গিয়ে 'দান্তে'র ছবির একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল। ১৮৪০ সালের ৬ই জুলাই ছবিটি পৃথিবীর আলোর সামনে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হল। দান্তে-প্রেমিক কার্কাপ স্থির থাকতে পারলেন না। ছবিটি উদ্ধারের পূর্বেই তিনি তার একটি প্রতি-লিপি করে নিতে চাইলেন, কিন্তু কর্তৃ-পক্ষ তাঁকে ঢুকতে দিলেন না। 'বার্গেলো চ্যাপেল' তখনও একটি কারা-গার। কারারক্ষী কিন্তু কার্কাপের একজন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কার্কাপের মনস্কামনা পূর্ণ করার এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন। কার্কাপকে তিনি রাতের অন্ধকারে কারাগারে প্রবেশ করার সুযোগ দিলেন। তন্ময় শিল্পী সারারাত আঁকতেন তারপর ভোরবেলা দিনের আলো ভালো করে ফোটার আগেই চুপিচুপি বেরিয়ে যেতেন।

এই ভাবে কার্কাপ পুরো ছবিটিই নকল করে নিলেন। গিয়োত্তো সবুজ, সাদা এবং উজ্জ্বল লাল রঙ ব্যবহার করেছিলেন। বিয়েত্রীচ নাকি এই তিনটি রঙই আগে পরিধান করতেন। কিন্তু শিল্পী 'মারিনি' যখন সরকারী নির্দেশে ছবিটির অঙ্গ-সজ্জায় নিযুক্ত হলেন তখন তাঁকে আদেশ করা হল সবুজ রঙটিকে চকোলেট বাদামী রঙ করে দেবার। এই আদেশের কারণ ছবির আসল রঙ তিনটি দান্তের সময়ে বিপ্লবী দলের প্রতীক ছিল। সুতরাং একমাত্র কার্কাপের ছবিতেই গিয়োত্তো-ব্যবহৃত আসল তিনটি রঙয়ের নিদর্শন রয়ে গেল।

লণ্ডনস্থ 'আরুণ্ডেল সোসাইটি' কার্কাপের ছবিটির অনুসন্ধানে ছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল ছবিটির রঙীন মুদ্রণ প্রকাশ করেন। সৌভাগ্যের বিষয় ছবিটিকে সম্প্রতি বৃটিশ মিউজিয়ামে আবিস্কার করা গেছে—ছবিটি এই রচনার সঙ্গে আমরা মুদ্রিত করছি।

কার্কাপের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং দান্তের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের ফলেই আজ বৃটিশ মিউজিয়ামের সংরক্ষণশালায় এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি সংরক্ষিত হতে পেরেছে। কার্কাপ নিজেও ছিলেন এক ঐতিহাসিক চরিত্র। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞানী এবং গুণীজন ফ্লোরেন্সে আসতেন শুধু তাঁর সংগ্রহ-শালা নয় স্বয়ং মানুষটিকেও দেখার জন্যে। কার্কাপ ক্রমে উপন্যাসের চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন। 'হথর্ণ' তাঁর তিনটি উপন্যাসে কার্কাপকে ব্যবহার করেছেন 'The Marble Faun', 'Doctor Grim-shaw's Secret' এবং 'The Dolliver Romance'-এ। Isa Blagden তাঁর 'Nara and Archibald Lee' গ্রন্থে কার্কাপের ফ্লোরেন্সের বাসভবনের বর্ণনা দিয়েছেন। ১৮৭০ সালে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ইতালির শিল্প এবং চিত্রকলার প্রতি কার্কাপের অমর দানের স্বীকৃতি দেবার জন্যে তাঁকে Knight of the order of St. Maurice মনোনীত করেন।

কার্কাপের জীবন ছিল নাটকীয় এবং বর্ণাঢ্য। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫ সালে সাতাশি বছর বয়সে অত্যন্ত নাট-

কীয় পারিস্থিতির মধ্যে তিনি বিবাহ করলেন বাইশ বছর বয়সের এক তরুণীকে, নাম পাওলিনা কারবোনি, রোমের বৃটিশ কন্সালের মেয়ে। বিবাহের পর তিনি আরো পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৮৮০ সালের ৩রা জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয় এবং লিভোর্নোর ইংরেজদের সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সেমুর স্টোকার কার্কাপের জীবন-দীপের সঙ্গে এক ঐতিহাসিক সাধনার অবসান সূচিত হয়েছে। যে তিনজনের অধ্যাবসায়ের ফলে আমরা আজ এক মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শনের উত্তরাধিকারী, তাঁদের অন্যতম ওয়াইল্ড তাঁর সহযোগী কার্কাপের আগেই দেহ রাখেন। আজ আমরা এই গবেষক-ত্রয়ীর উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

সেকালের পাতা : একালের চোখ

রত্নাকর

রাজা রামমোহনের মৃত্যু হ'ল। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভা হ'ল। স্মৃতি-রক্ষার আয়োজনও চলল। চাঁদা ঠিক করা হ'ল। চাঁদার সেই তালিকা শুধু মাত্র ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান নয়। সাধারণ পাঠকদের কাছেও তার অনেক দাম। সমাচার দর্পণ থেকে সেই তালিকা প্রকাশ করা হ'ল।

'প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের স্বজন পরজনগণ গুণকারি গুণগণ যাহাতে উপযুক্ত মতে চিরস্মরণীয় হইতে পারে তদ্বিবেচনাকরণার্থে গত শনিবারে তাঁহার বন্ধুগণ টৌন হালে এক সভা করিলেন।

তাহাতে শ্রীযুত সার জন গ্রান্ট সাহেব সভাপতি হইয়া অত্যন্ত বাকপটুতাপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেন। আমারদের খেদ হয় যে তদ্বিবরণসকল স্থানাভাব প্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ করিতে পারিলাম না। তিনি স্বীয়োক্তির শেষে কহিলেন এইক্ষণে আমি যৎকার্য্যে নিযুক্ত আছি ইহা অপেক্ষা অধিক অনুরাগ বা সম্ভ্রমের কার্য্যে কখন নিযুক্ত হই নাই।

তৎপরে শ্রীযুত পাটল সাহেব এই প্রস্তাব করিলেন রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও পরহিতৈষিতা গুণের বিষয়ে এবং নীতি ও বিদ্যা বিষয়ে স্বদেশীয় লোকেরদের অবস্থার সৌষ্ঠবকরণার্থ এবং সামান্যতঃ স্বদেশীয় লোকের মঙ্গলবৃদ্ধিকরণার্থ যে বহুতর উদ্যোগ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে এই সভাগত মহাশয়েরা যে মহানুভব করেন সেই অনুভব যে উপায়েতে উত্তমরূপে প্রকাশ পায় এমত উপায়ের দ্বারা রাজা রামমোহন রায়কে চিরস্মরণীয় করা উচিত এমত আমারদের বোধ হয়।

এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রসিকলাল মল্লিক অত্যুত্তম বক্তৃতাপূর্ব্বক পৌষ্টিকতা করিলেন এবং সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন।

এই বৈঠকের অভিপ্রেত সিদ্ধকরণার্থ এক চাঁদা করা যায় এবং উত্তরকালে ধনদাতৃবর্গের নিকটে যে নিয়মের প্রস্তাব হইবে তাহার ছয় সপ্তাহের পরে তাঁহারা স্বয়ং বা অন্যের দ্বারা যেমত জ্ঞাপন করিবেন তদনুসারে কার্য্য হইবে।

তৎপরে শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত ব্রামলি সাহেব সর্ব্বসম্মত পোষকতা করিলেন।

তাহা এই যে নীচে লিখিতব্য সাহেব লোকেরা কমিটিরূপে নিযুক্ত হইয়া টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং তাবৎ ভারতবর্ষ হইতে চাঁদার টাকা সংগ্রহের উপযুক্ত সময় গত হইলে তাঁহারা স্বাক্ষরকারিরদের এক বৈঠক করিয়া তাহার শেষ করিবেন।

সার জন গ্রান্ট। জন পামর। জেম্স পাটল। টি প্লৌডেন। এচ এম পার্কার। ডি মাকফার্লন। টি ই এম টর্টন। রস্তমজি কওয়াসজি। মথুরানাথ মল্লিক। জেমস সদর্লণ্ড। কর্নল ইয়ং। জি জে গর্ডন। এ রাজর্স। জেমস কিড। ডবলিউ এচ স্মোল্ট। ডি হের। কর্নল বিচর। দ্বারকনাথ ঠাকুর। রসিকলাল মল্লিক। বিশ্বনাথ মতিলাল।

শুনিয়া অত্যাপ্যায়িত হইলাম যে ঐ বৈঠকের সময়েই পাঁচ ছয় হাজার টাকা পর্য্যন্ত চাঁদায় সাক্ষর হইয়াছিল।

(স· দর্পন। ২৬ মার্চ, ১৮৩৪)

ইঙ্গলিশম্যান সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণার্থ চাঁদার যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৮০০০০।

(স· দর্পণ। ২৩ এপ্রিল, ১৮৩৪)

'প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণার্থ এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা সাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর	১০০০
মথুরানাথ মল্লিক	১০০০
রস্তমজি কওয়াসজি	২৫০
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	১০০০
রায় কালীনাথ চৌধুরী	১০০০
রামলোচন ঘোষ	১০০
রমানাথ ঠাকুর	২০০
উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	১০০
চন্দ্রমোহন চাটুয্যে	৫০
মথুরানাথ ঠাকুর	৫০
দক্ষিণানন্দ মুখুয্যে	৫০
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	২
অখিল চন্দ্র মুস্তোফী	৫
চন্দ্রশেখর দে	১৬
ক্ষেত্রমোহন মুখুয্যে	৮
ভৈরবচন্দ্র দত্ত	৮
রাধানাথ মিত্র	৩০
প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডু	৪
রামগোপাল ঘোষ	১৬
ভোলানাথ সেন	১০
বেনীমাধব ঘোষ	৫
পূর্ণানন্দ চৌধুরী	৫
কৃষ্ণানন্দ বসু	৫
মধুসূদন রায়	৫
গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী	২
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ	৫
বলরাম সমাদ্দার	১০
আনন্দচন্দ্র বসু	৫
গোমান সিংহ রায়	৫
কালীপ্রসাদ চাটুয্যে	৫
নন্দকুমার ঘোষ	২
দুর্গাপ্রসাদ মিত্র	২
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র লালা	৫
রামকৃষ্ণ সমাদ্দার	৫
নিমাইচরণ দত্ত	২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০০
পূর্ণানন্দ সেন	৫০
মদনমোহন চাটুয্যে	২৫
রামপ্রসাদ মিত্র	৫
রামচন্দ্র গাঙ্গুলি	২৫
কালীপ্রসাদ রায়	৫
কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী	৫
অক্ষয়চাঁদ বসু	১০
রামরতন হালদার	৫
বংশীধর মজুমদার	৫
অভয়াচরণ চাটুয্যে	২
কৃষ্ণমোহন মিত্র	৫
বলরাম হড়	১৬
রামকুমার ঘোষ	৪
গোকুলচাঁদ বসু	৪
নবীনচাঁদ কুণ্ডু	১০
গঙ্গানারায়ণ দাস	৫
ব্রজমোহন খাঁ	২৫
গঙ্গাচরণ সেন	৫
নবকুমার চক্রবর্ত্তী	৩
ঈশ্বরচন্দ্র শাহা	২
রামচন্দ্র মিত্র	২
রামতনু লাহুং	২
তারাকান্ত দাম	২
বিশ্বনাথ মতিলাল	১০০

স. দর্পণ। ৩০ এপ্রিল, ১৮৩৪)

অবগত হওয়া গেল যে 'প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণীয় কোন চিহ্ন নির্দ্ধার্য্যকরণার্থ যে চাঁদা হয় তাহাতে শ্রীল শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টীক সাহেব ৫০০ টাকা সহী করিয়াছে এবং কথিত হইয়াছে যে ঐ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চিরস্মরণার্থ যদ্যপি বিদ্যালয়ে কোন অধ্যাপকতা পদ নির্দ্ধার্য্য হওনের যে কল্প হইয়াছে তাহা সফল হইলে তাঁহার চাঁদায় শ্রীল শ্রীযুত ইহা অপেক্ষাও অধিক টাকা প্রদান করিবেন।

(স, দর্পণ। ২১শে জুন, ১৮৩৪)

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৯)

সাধুজী আসার পর থেকে নিত্য-নূতন লোক এবাড়ীতে আসতে লাগল তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সকাল দুপুরে, বিকেলে, কোন সময় বাদ নেই। লোকের পর লোক আসছে। আমার কাছে অদ্ভুত মনে হত। এতদিন এবাড়ী দেখেছি নির্জন, নিস্তব্ধ, অতি অল্প পরিচিত-জনের যাতায়াত, অথচ একটিমাত্র মানুষের আগমনে একি অভাবনীয় জনসমাগম। এ'রা কেউ নিমন্ত্রিত নন, শুধু মাত্র খবর পেয়েই দেখা করার জন্যে দলে দলে ছুটে এসেছে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগত এ দেখা করতে আসা কার সঙ্গে, এবাড়ীর বড় ছেলে স্বদেশরঞ্জন যে একদিন লোক-প্রিয় ছিল তারই খবর নিতে তারা আসছে, না আজকের যিনি সাধুজী তাঁর দর্শন অভিলাষেই এদের আগমন। আবার কে বলতে পারে এ হয়ত নিছক কৌতূহল, বহুদিন বাদে স্বদেশরঞ্জন বাড়ী ফিরেছে বলে তার সন্ন্যাসীরূপে দেখার কৌতূহল এরা চেপে রাখতে পারেনি।

কারণ যাই হোক আমার বেশ ভাল লাগছিল, কত লোক আসে, কত কথা হয়, সাধুজী বাইরের বড় হলঘরে সকাল থেকে বসে থাকেন, দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে আলাপ করেন, সব সময় মুখে তাঁর প্রশান্ত হাসি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে উপদেশ দিচ্ছেন ভগবৎ চিন্তা করার জন্যে। ওঁর কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে, হলঘরের দরজার কাছে আমি দাঁড়িয়ে থাকি, অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্যে। কিন্তু কান আমার খাড়া থাকে উনি কাকে কি বলছেন তা শোনবার আশায়।

এক বৃদ্ধা এসেছিলেন, বয়েস নিশ্চয় ব্রজবালা দেবীর চেয়েও বড়। সাধুজীকে দেখে থেকে অঝোরধারে কাঁদছিলেন।

শুনতে পেলাম সাধুজী তাঁকে বলছেন, কেন কাঁদছ মা?

বৃদ্ধা বললেন, কাঁদছি তোর জন্যে। ব্রজর দুঃখটা বুঝতে পারলি না। মা যে তোকে কত ভালবাসে।

সাধুজী হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, মায়ের স্নেহ থেকে তো বঞ্চিত হইনি। তা যদি হতাম তোমরা আসতে কেন আমার কাছে। মাতৃরূপেই তো তোমাদের সকলকে পেয়েছি।

বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন, তুই এখানে আসিস না কেন?

—সময় পাই না মা। সেখানেও যে অনেক কাজ।

—সেইজন্যে সব ছেড়ে দিতে হবে।

সাধুজী আবার হাসলেন, না ছাড়লে যে কিছুই পাওয়া যায় না। একটা বাড়ী ছেড়েছি তার বদলে কত বাড়ী পেয়েছি বল তো? ভগবানের সবচেয়ে বেশী করুণা মানুষের উপর। সে মানুষ যে কত বড় হতে পারে তার প্রমাণ আমরা কত-বার পেয়েছি। বুদ্ধদেব, চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, অথচ কি আশ্চর্য বল তো সেদিকে আমরা তাকাতে চাই না, মানুষ কত ছোট হতে পারে সেইটাই শুধু দেখি, দৈনন্দিন জীবনে, দমবন্ধ করা আবহাওয়ায়, আত্মম্ভরিতার স্বার্থপর প্রকাশে, প্রতিষ্ঠাভিলাষী জননায়কের রণোন্মত্ততায়, কত সময় আমরা দেখেছি, মানুষের মধ্যে জঘন্য পশুশক্তির প্রকাশ, দেখেছি দানবতার উল্লাস। হতাশায় মন আমাদের ভেঙে গেছে, তাই ত কবিকে আক্ষেপ করতে হয়েছে, ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে, এই দয়াহীন সংসারে এসে তারা শান্তির বাণী শোনাতে চেয়েছে, কিন্তু আমরা শুনিনি, মানুষ জাত হিসেবে এতে কি আমরা লাভবান হয়েছি। তুমিই বল মা। তোমার কোন ছেলে যদি সেই শান্তির সন্ধান পেয়ে থাকে তুমি কি তার জন্যে অসুখী হবে?

সাধুজী এমন সুন্দর ভাবে কথাগুলি বুঝিয়ে বললেন যে, দেখলাম সেই বৃদ্ধা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেললেন, বললেন, আমারই ভুল হয়েছিল বাবা, ঠিকই বলেছ, বয়েস তো কম হল না, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কিন্তু শান্তি তো পেলাম না। ছেলেমেয়ে ঘর-সংসার টাকা-কড়ি সবই আছে তবু যেন কি নেই।

সাধুজী মধুর কণ্ঠে বললেন, এই কথাটাই আমি অল্পবয়েসে বুঝতে পেরেছিলাম, তাই তো সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছি। ছেড়েছি বলেই পেয়েছি, কি পেয়েছি তা তো বলে বোঝাতে পারব না, যে পায়নি সে বুঝতে পারবে না, এ পাওয়ার অর্থ কি।

সেদিন দুপুরে বেলা লোকজনের ভিড় চলে যাবার পর আমি সাধুজীকে একান্তে পেয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, সাধুজী, সংসারে থেকে মানুষ কি শান্তি পেতে পারে না?

—নিশ্চয়ই পারে। ঠাকুর কি বলতেন জান? যদি ঠিকে ঝি-এর মত সংসারে থাকতে পার যে মনিব-বাড়ীতে কাজ করছ, তার ছেলেমেয়েদের আদর করছ, মনে করছ যেন তারা তোমারই ছেলেমেয়ে, কিন্তু আসলে তোমার মন পড়ে থাকবে যেখানে তোমার নিজের ছেলেমেয়েরা আছে, সংসারে থেকেও যদি সব সময় মনে রাখতে পার তোমার আসল ঘর ভগবানের রাজ্যে, এখানে তিনি পাঠিয়েছেন দুদিনের হাসি-খেলার জন্যে, যখনই তিনি ডেকে পাঠাবেন,

হাসিমুখে তুমি চলে যাবে, তাহলেই তুমি নিশ্চয় শান্তি পাবে।

কথাগুলো যে আমি খুব পরিষ্কার বুঝতে পারলাম তা নয়, সাধুজী সেই-জন্যেই বোধ হয় আরো বললেন, মা, সত্যিই যদি শান্তি চাও, যত পার চাওয়াটাকে কমাও, তাহলেই তুমি পাবে। যে যত চায়, সে তত দুঃখী, আর যে না চাইতে পায় সে তত সুখী, তাই না?

বললাম, কি যে চাই তাই তো বুঝতে পারি না।

সাধুজী হাসলেন, প্রতিদিন নিয়ম করে ঠাকুরের 'কথামৃত' পড়। মনে যে প্রশ্ন জাগছে, তার সব উত্তর সেখানেই পাবে। ঐ বইখানাকে আঁকড়ে পড়ে থেকো। সব বিপদ কেটে যাবে।

—আমি কিনে আনব।

—এ বাড়ীর লাইব্রেরীতে পাবে। পশ্চিম দিকের ছোট তাকে থাকত। ঐ পাঁচখানা বই আমার জীবনের ধারা বদলে দিয়েছে।

তাঁর কথামত লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতেই বইগুলির সন্ধান পেলাম। অনেক দিনের পুরোন বই। জায়গায় জায়গায় লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া। কেন জানি না, হয়ত বা সাধুজীর কথা শুনেই, ঐ পাঁচখানা বই হাতে নিয়ে আমার মনে হল এক অমূল্য সম্পদের সন্ধান পেয়েছি।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, সাধুজী আসার পর থেকে গগন সেন রোজই এ বাড়ীতে এসেছে। তার সঙ্গে বেশি কথা বলার সুযোগ আমার হয়নি, তবে বুঝতে পেরেছিলাম ও আর আজ-কাল কলকাতায় ফেরে না। ব্যান্ডেলের বাড়ীতেই থাকে। সকাল দুপুর বিকেল বেশীর ভাগ সময়ই কাটায় সাধুজীর সঙ্গে।

একদিন বিকেল বেলা ব্রজবালা দেবীর ঘরে বসে আমরা চারজনে চা খাচ্ছি। সাধুজী বললেন, আর নয়, এবার আমায় ফিরে যেতে হবে।

গগন সেন জিজ্ঞেস করল, এত তাড়াতাড়ি?

—ওখানকার কাজ সব পড়ে আছে।

—এখানকার কাজ সে শুরু হল না?

সাধুজী হাসলেন, সে দায়িত্ব তোমাদের। স্কুল করতে চেয়েছ আমি সম্মতি দিয়েছি, আমার তো আর কিছু করার নেই।

আমি প্রশ্ন করলাম, আবার কবে আসবেন?

—জানি না।

—কোথায় আপনার দর্শন পাব?

—আশ্রমে এস।

ব্রজবালা দেবী চুপ করে বসেছিলেন, মুখ দেখে মনে হল অত্যন্ত চিন্তিত। বোধহয় বড় ছেলে চলে যাবে বলে মন খারাপ হয়েছে।

হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠলেন, কাগজপত্র রেজিস্ট্রি হবার আগেই চলে যাবে?

সাধুজী বললেন, তাতে কি হয়েছে মা! আমার সই-এর তো কোন দরকার নেই, তুমি করে দিলেই হবে।

—তবু, কি জানি।

ব্রজবালা দেবী উঠে পড়ে বিছানার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, এত সহজে কি মুক্তি পাওয়া যাবে?

—স্কুলটা হতে দাও, বাচ্চারা আসুক তারাই মুক্তির গান গাইবে।

—একমাত্র সেইটুকুই আশা। কি জানি কি হয়, ভেবেই বা কি করব। তোমাকে তো আর ধরে রাখতে পারব না।

সাধুজী কোন উত্তর দিলেন না, চুপ করে বসে রইলেন। আপনা থেকে চোখ
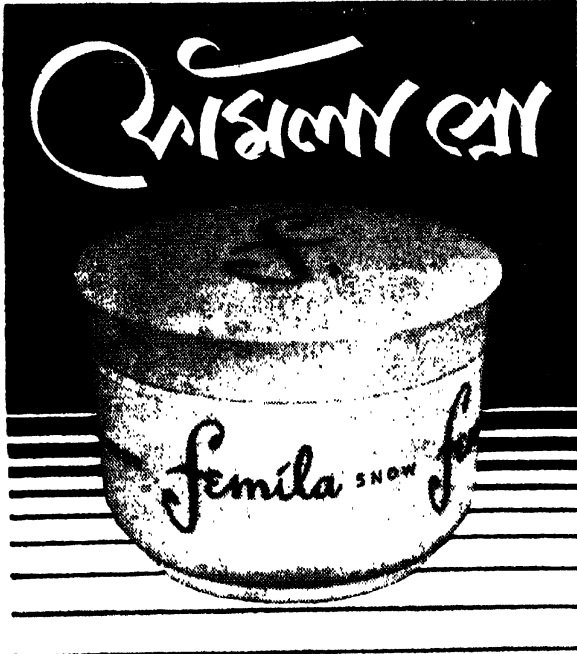
বন্ধ হয়ে এল, বললেন, বিশ্বাস রাখো, তাছাড়া কিছুই হয় না।

তারপরেই গগন সেনের দিকে তাকিয়ে ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, বাচ্চাদের যা শিক্ষাই দাও, তারা যে অমৃতের পুত্র এইটা জানাতে ভুলো না। ছোটবেলা থেকে যদি ওদের মনে ভগবৎ বিশ্বাসের বীজ বুনে দিতে পার বড় হয়ে দেখবে কি ফল পাবে।

গগন সেন উত্তর দিল, আমি সিলেবাস তৈরী করে আপনাকে দেখিয়ে আনব। অনেকগুলো জিনিস ভেবে নতুন ধরনে এই শিক্ষাপ্রণালী তৈরী করতে চাই। আশা করি আপনি দেখে খুশী হবেন।

—তোমার ওপর সে ভরসা আমার আছে।

এরই মধ্যে তুব্ড়ী একদিন আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, বড়মামা এখানে কতদিন থাকবে?

আমি ওর কথার ধরনে অবাক হলাম, কেন, তুমি চাও না উনি এখানে থাকেন?

—না।

—কেন?

তুব্ড়ী স্পষ্ট উত্তর দিল, বড়মামা আমায় ভালবাসে না।

—কি করে জানলে?

—কই, আমার সঙ্গে তো কথা বলে না।

ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বোকা ছেলে, কত লোক আসছে ও'র সঙ্গে দেখা করতে, সময় পান না তাই।

তুব্ড়ী মাথা নাড়ে, না, বড়মামা কাউকে ভালবাসবে না, তাই তো এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে।

কেমন যেন সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলাম, একথা তোমায় কে বলেছে?

—মা।

—দিদিমণি! আমি ভেবে পেলাম না, দিদিমণির কি প্রয়োজন ছিল তুব্ড়ীকে একথা বলার।

তুব্ড়ী কিন্তু ভোলেনি, আবার প্রশ্ন করল, বড়মামা কবে যাবে অপুদি?

বললাম, আমি তো ঠিক জানি না, তবে শুনছি দু'একদিনের মধ্যেই বোধহয়।

দুপুরবেলা তুব্ড়ী আমার কাছ থেকে একটা পোস্টকার্ড চেয়ে নিল, বুঝতে দেরী হল না সে দিদিমণিকে চিঠি লিখবে।

জিজ্ঞেস করলাম, মা জানতে চেয়েছেন বুঝি বড়মামার কথা।

—হ্যাঁ।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে গগন সেনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। বাইরের হলঘরে ভিড়, সাধুজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, ব্রজবালা দেবী ঐ ঘরের মধ্যেই বসে। বাইরের বারান্দায় আমি আর গগন সেন দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছিলাম লোকজনের ভিড়ের মধ্যে গগন সেন কিছুতেই গিয়ে বসতে চায় না। সাধুজীর সঙ্গে সে দেখা করত হয় ব্রজবালা দেবীর ঘরে, না হয় লাইব্রেরীতে। আজ এ সময় লোকজন এসে পড়বে গগন সেন ভাবেনি। কিন্তু এখানে এসে জনসমাবেশ দেখে ফিরে যেতে
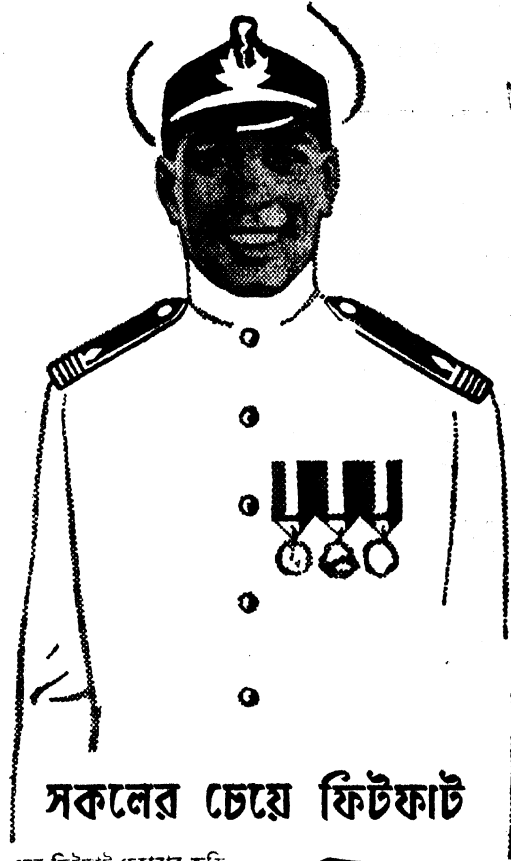
চাইছিল। আমি বাধা দিয়ে বললাম, চলে যাবে কেন, দাঁড়াও না।

গগন সেন চোখের কালো চশমাটা পরিস্কার করতে করতে বলল, ভিড় আমি সহ্য করতে পারি না।

আমি ঠাট্টা করলাম, তোমারই বরং সন্ন্যাসী হওয়া উচিত ছিল।

গগন সেনও হাসল, মনেপ্রাণ তো আমি সন্ন্যাসীই। শুধু একটু সেজে-গুজে ঘুরে বেড়াই, এই যা। জান অর্পিতা, আজকের দিনে সন্ন্যাসী হওয়া খুব শক্ত। আগেকার মত ফস্ করে যে জঙ্গলে চলে যাব তার উপায় নেই, কারণ জঙ্গল সব কেটে ফেলছে, পাহাড়ে যাও, সেখানে ঘর বাড়ী তৈরী হচ্ছে। গাছে একটা ফল পাবে না, মূলগুলিও সব বাজারে। অতএব বনে গেলেও সন্ন্যাসীকে অনশনে মারা পড়তে হবে।

বললাম, সেইজন্যেই তো আশ্রমের সৃষ্টি হয়েছে।

—ও আশ্রমে থাকাও যা, সংসারে থাকাও তা। সারাক্ষণই লোকজনের ভিড়, নির্জনবাসের কোন উপায় নেই।

প্রসঙ্গ পালটে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা সাধুজী আসছেন জেনেও তুবড়ীর মা কেন এল না বলতে পার?

গগন সেন ঠোঁট উল্টে বলল, আমি কি করে জানব, তিনিও নিশ্চয় ব্যস্ত আছেন।

—উহুঁ, আমার মনে হয় ভাই বোনে তেমন ভালবাসা নেই।

—কি করে জানলে?

তুবড়ীর সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তা আমি গগন সেনকে জানালাম। সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ওই বাচ্চাটারই দুর্ভাগ্য। এরকম মামাকে যদি সে ভালবাসতে না পারে লোকসানটা তারই, মামার নয়। তুবড়ীকে আমি অনেক বুঝিয়েছি, শুধরেওছি অনেক, কিন্তু বেচারীর মনে এমন কতগুলো ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে যা উপড়ে ফেলা শক্ত।

—কে দিয়েছে?

—তোমাদের দিদিমণি।

—আমি বুঝতে পারি না মা হয়ে ছেলের সর্বনাশ কেন করে।

গগন সেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ওটা স্বভাবের দোষ, কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে। বড় সত্যি কথা। তোমাদের দিদিমণিকে আমি দেখিনি, কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে কথা শুনে আর তুবড়ীকে দেখে বুঝতে পেরেছি, উনি এক জাঁদরেল ভদ্রমহিলা। তার উপর বোধহয় মানসিক বিকারগ্রস্ত।

আপত্তি করে বললাম, অতটা কিছু নয়, হয়ত একটু অন্য ধরনের এই যা।

গগন সেন বলল, বেশ, তুবড়ীকে ওর মা যে চিঠি লিখেছে সেটা ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এস একসময়। আমি নিশ্চিত বলতে পারি লাইনের পর লাইন পড়ে দেখিয়ে দেব তোমাদের দিদিমণি সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তা মিথ্যে নয়।

সাধুজীর দর্শনার্থী আরো কয়েকজন এসে পড়ায় আমি তাদের অভ্যর্থনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, গগন সেনের সঙ্গে আর কথা হল না।

ইচ্ছে থাকলেও তুবড়ীকে লেখা দিদিমণির সে চিঠি উদ্ধার করার সময় আমি পেলাম না। পরের দিন ভোরবেলা লক্ষ্মীর মা এসে আমার দরজায় ধাক্কা মেরে ঘুম ভাঙ্গাল। জানাল ব্রজবালা দেবী আমাকে এখুনি ডেকে পাঠিয়েছেন। সবে ঘুম থেকে উঠেছি, ঠিক বুঝতে পারলাম না কি এমন হতে পারে যার জন্যে এত ভোরে উনি আমায় ডাকাডাকি করছেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ব্রজবালা দেবী আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন, বললেন, আজ সকালবেলাই তোমাকে একবার কলকাতায় যেতে হবে।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, কোথায়?

—তোমাদের বাড়ীতে।

আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল, কেন, কি হয়েছে?

—তোমার মেজদির অসুখ বেড়েছে। তোমার দাদা থানায় টেলিফোন করে খবর পাঠিয়েছেন। তারা আমায় জানিয়ে গেল। তুমি দেরি কোর না মা, চলে যাও।

বললাম, মেজদির শরীরটা বরাবরই খারাপ। অনেক সময় ঠিকমত ওষুধ খায় না। প্রায়ই এরকম বাড়াবাড়ি হয়।

—তবু তুমি ঘুরে এস, যখন ওরা খবর পাঠিয়েছেন।

—সাধুজী রয়েছেন, ওঁর দেখাশুনো করা।

—সে আমি দেখব। তুমি ঘুরে এস।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তৈরী হয়ে বাড়ী থেকে বেরবার আগে আমি সাধুজীকে প্রণাম করতে গেলাম। তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, মা, বিপদকে কখনও ভয় কোর না। যদি নির্ভয় হতে পার সকল দুঃখের হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে। আর সব সময় ভরসা রেখ ঠাকুরের উপর। তিনি মঙ্গলময়।

ব্রজবালা দেবীর গাড়ী আমাকে ষ্টেশনে ছেড়ে দিল। দেখি টিকিটঘরের সামনে গগন সেন দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি?

গগন সেন উত্তর দিল, সাধুজী আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন, তোমাকে কলকাতায় পৌছে দেবার জন্যে।

বললাম, ওনারা খুব ভয় পেয়েছেন, কিন্তু আমি যে জানি মেজদির শরীর প্রায়ই এরকম খারাপ হয়। হয়ত আমরা যখন কলকাতায় গিয়ে পৌছব, দেখব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

—আমারও তাই মনে হয়।

—কিন্তু সাধুজী বড় ভাল লোক, তা না হলে হঠাৎ তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে বলবেন কেন?

গগন সেন বলল, ওঁকে যত দেখবে ততই ভাল লাগবে। আশ্চর্য মানুষ।

ট্রেন এসে গেল। আমরা উঠলাম। একটার পর একটা ষ্টেশন ছাড়িয়ে চলেছি কলকাতার দিকে। এক একবার মনে প্রশ্ন জাগছে, মেজদি কেমন আছে, হঠাৎ কেন বাড়াবাড়ি হল। আবার সাধুজীর কথা মনে পড়তে মনে শান্তি পাচ্ছি। বিপদকে ভয় করলে চলবে না, যে রূপেই দেখা দিক না কেন নির্ভয়ে তার সামনাসামনি দাঁড়াতে হবে।

বললাম, সাধুজী যে আশ্চর্য মানুষ তা আমি বুঝতে পেরেছি। ঐ বাড়ীর বড়ছেলে যেখানে গুপ্তধন লুকোন আছে বলে লোকে বিশ্বাস করে, যে বাড়ীর ইতিহাস এ অঞ্চলের সকলের মুখে মুখে ফেরে সেই বাড়ীর উত্তরাধিকারী হয়েও কোনদিন তাকে এসব নিয়ে কথা বলতে শুনলাম না। অথচ এই বাড়ীর লাইব্রেরী ঘরে রাখা একটি অমূল্য সম্পদের কথা ঠিক তার

মনে আছে। ঠাকুরের কথামৃত আজকাল আমি রোজ রাত্রে পড়ি।

গগন সেন যেন নিজের মনেই বলল, তাহলে আর ভাবনা নেই।

কথাটা অদ্ভুত শোনাল, জিজ্ঞেস করলাম, কি বললে?

গগন সেন দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করে, যে ঠাকুরের উপর ভরসা রাখতে পারে, তার আর কিসের ভাবনা।

আমরা যখন বাড়ীতে পৌঁছলাম তখন প্রায় ন'টা বাজে। ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি। কয়েকজন আত্মীয়স্বজন দাঁড়িয়ে, কারুর মুখে কোন কথা নেই। আমাদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। কেন জানি না ঢোকবার আগে একটা অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল। শুনতে পেলাম কে না বলছে, অপু এসেছে, অপু এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বৌদি একরকম ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। বলল, ভোর রাত্রেই সব শেষ হয়ে গেছে, যতক্ষণ জ্ঞান ছিল শুধু তোমার নাম করেছে ঠাকুরঝি। যদি সেই সময়টিতে তোমায় একবার নিয়ে আসতে পারতাম।

কান্না আমার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল, মেজদি নেই, এ আশঙ্কা কিন্তু আমি একবারও করিনি।

বৌদি আমায় টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল, মেজদির প্রাণহীন দেহটা খাটের উপর পড়ে রয়েছে। মাথার কাছে সেজদা, চোখগুলো জবাফুলের মত লাল। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। আমি পায়ে পায়ে মেজদির খাটের কাছে এগিয়ে গেলাম। বেচারীর শীর্ণ শরীর খাটের সঙ্গে প্রায় মিশে রয়েছে। আমি তার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। কাঠের মত পা দুটো, কোন স্পন্দন নেই, বোধহয় সোচ্ছ্বাসে ডাকলাম, মেজদি, আমি অপু এসেছি, চোখ মেলে চাও। সে শুনল না। মুখ বুজে কাঁদলাম, কতক্ষণ জানি না, কেঁদে কেঁদে বুকটা হাল্কা হল। চোখের জল মুছে মুখ তুলে তাকালাম, ঘরময় লোক। তারা বোধহয় এতক্ষণ আমাকেই দেখছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে মেজদির মাথার কাছে বসলাম, সেজদা তখন উঠে গেছে। আগের মত মেজদির চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিলাম। এক-দৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, মনে হল মুখে তার শান্তির প্রলেপ। শেষের দিকে সবসময় ওর চোখে মুখে দেখতাম ক্লান্তির ছাপ, আজ মৃত্যু সে ক্লান্তি চিরদিনের মত ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে। মনে হল মেজদি বোধহয় মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। নির্ভয়ে সে তাকে বরণ করেছে।

একথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন শান্তিতে ভরে গেল। বললাম, ঠাকুর, তুমি ভাল করেছ। আমার চিরদুঃখিনী মেজদিকে তুমি নিজের কাছে ডেকে নিয়েছ, আমার আর কি ভাবনার আছে। জীবনে যে শান্তি সে পায়নি, তোমার আশ্রয়ে তাঁর আত্মা সে শান্তি পাবে।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

কলারসিক

রেডক্রস শতবার্ষিকী উপলক্ষে চিত্রভাস্কর্যের প্রদর্শনী

এ-বৎসর আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির শতবর্ষ পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে আর্টস এণ্ড প্রিন্টস গ্যালারীর উদ্যোগে বঙ্গীয় রেডক্রস সোসাইটির সহযোগিতায় পার্ক স্ট্রীটের আর্টিষ্ট্রি হাউসে এক সর্বভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য কলার মনোরম প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির গত ১৪ই অকটোবর এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন।

শিল্পী ঃ রামকিংকর

এই প্রদর্শনীতে বাঙলাদেশসহ বাঙ্গালোর, দিল্লী, অন্ধ্র, আমেদাবাদ, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, রাজামুন্দ্রি, বোম্বে, ইন্দোর, বরোদা, হায়দ্রাবাদ, গুজরাট, বিহার, বেনারস, বেজওয়াদা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজকোট প্রভৃতি স্থানের খ্যাতিমান প্রবীণ ও তরুণ শতাধিক শিল্পীর দুই শতাধিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের নিদর্শন স্থান পেয়েছে। এমনকি প্যারিস থেকেও ভারতীয় শিল্পী কৃষ্ণ রেড্ডি দুখানা চমৎকার গ্রাফিক চিত্র পাঠিয়েছেন এই প্রদর্শনীর জন্য। সুতরাং বলা যায়, রেডক্রসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ একটি সর্বভারতীয় সমকালীন চিত্র ও ভাস্কর্যকলার প্রদর্শনী দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করেছে।

দুঃস্থ মানবের সেবাব্রতে শতাব্দীব্যাপী রেডক্রস যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, মানবাত্মার কারুকর্মী শিল্পীরাও সে-ব্রতে অংশ গ্রহণ করে এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করলেন এই প্রদর্শনীর জন্য তাঁদের চিত্র ও ভাস্কর্যকলা দান করে। প্রদর্শনীর আহবায়ক শ্রীনৃপেন মজুমদার জানালেন যে, এই প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ শিল্পীরা স্বেচ্ছায় রেডক্রস ভাণ্ডারে দান করতে সম্মত হয়েছেন। আমরা শিল্পীদের এই মহানুভবতাকে শ্রদ্ধা জানাই।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে জলরঙ, তেল-রঙ, গ্রাফিক প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পীর চিত্রকলা দর্শন করে আমরা খুশী হয়েছি। এর মধ্যে চিত্রকলার বেশ কয়েকখানি ইতিপূর্বে আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেছে। বিশেষ করে বাংলা দেশের শিল্পী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন চৌধুরী, তারাদাস চট্টোপাধ্যায়, অমল চাকলাদার, হরেন দাস, পাঁচুনারায়ণ গুপ্ত, গোপাল ঘোষ, প্রকাশ কর্মকার, রমেন মিত্র, রবীন মণ্ডল, দিলীপ রায়, সুভাষ সিংহরায়, গণেশ হালোই, শামু লাহিড়ী প্রভৃতি সমকালীন শিল্পীদের কাজ আমাদের একাধিকার দেখা। এই প্রদর্শনীতে এঁরা এঁদের পুরনো চিত্র-নিদর্শনই উপস্থিত করেছেন। কিন্তু পুরনো হলেও প্রদর্শিত চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে শিল্পীবৃন্দের প্রতিনিধিত্বমূলক সৃষ্টিগুলির অন্যতম। আশা করি দর্শকেরা পুনর্বার এগুলি দর্শন করে খুশী হবেন।

প্রদর্শিত নতুন চিত্রগুলির মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ দালালের প্রতিকৃতিচিত্র (ডি—৫, ৬), ডি. কে দাশগুপ্তের 'মসজিদ' (ডি—৭), কে. কে. হেব্বার স্কেচ (এইচ—১), কে. এন. কাক্কার 'রাত্রির দৃশ্য' (কে—১), সতীশ মার্কণ্ডের 'হায়দ্রাবাদের গ্রাম' (এম—৪), বিচারপতি পি বি. মুখার্জির প্রতিকৃতিচিত্র (এম—১৬), কার্তিক পাইনের 'ধর্ম-সঙ্গীত' (পি—৭), কে পার্বতীসমের 'মা ও ছেলে' (পি—১৭), কৃষ্ণ রেড্ডীর গ্রাফিক চিত্র 'ঢেউ' (আর—২৬), 'নদী' (আর—২৭), রঞ্জন-রুদ্রের বিমূর্ত-চেতনার সৃষ্টি 'খেলা' (আর—৩২), এম. রাজাজীর 'তিন বোন' (আর—৩৬), গোপাল সান্যালের 'গায়ক' (এস—১১), আদিনাথ মুখার্জির 'বেনারস' (৪), শামু লাহিড়ীর 'বিড়াল ও বিড়াল বাচ্চা' (৬) প্রভৃতি চিত্রগুলির কম্পোজিশান এবং চমৎকার রঙ-প্রয়োগ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য-নিদর্শনের মধ্যে চিন্তামণি করের টেরাকোট্টার কাজ 'বুদ্ধ' (কে—৭), সুরেন দের প্লাস্টারের 'টরসো' (ডি—১৫), ফণীভূষণের টেরাকোট্টা 'মা ও ছেলে' (পি—২), রামকিংকর বেইজের 'বিনোদিনী' (আর—৩০), শর্বরী রায়-চৌধুরীর 'উপবিষ্টা মহিলা' (আর—৩৪) প্রভৃতি দর্শকদের ভাল লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাঙলার প্রখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে মুকুল দের কয়েকখানি স্কেচ এই প্রদর্শনীর মূল্য যেমন বৃদ্ধি করেছে, তেমনি অনেক প্রখ্যাত শিল্পীর অনুপস্থিতিও এই প্রদর্শনীর পক্ষে খুব দৃষ্টি-সুখকর নয় বলেই মনে হল। এ-সব সত্ত্বেও উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতা এবং একটি মহৎ কাজে তরুণ শিল্পীদের ব্যাপকভাবে যোগদান এই প্রদর্শনীকে যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে সে-বিষয়েও

আমরা নিঃসন্দেহ। উদ্যোক্তাদের আমরা অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই। প্রদর্শনীটি আগামী ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যহ বেলা ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

।। শিল্পী সতীশ রায়ের প্রদর্শনী ।।

ক্যাথেড্রাল রোডের আকাডেমী অব ফাইন আর্টস-ভবনে গত ৭ই অক্টোবর থেকে ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত তরুণ শিল্পী সতীশ রায়ের প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী চলার পর শেষ হয়েছে। কোনো শিল্পকলার স্কুলে শিল্পী রায় কোনো-দিন কিছুই না শিখে গ্রাম-বাঙলার চির-কালীন সম্পদ—লোক-শিল্পের সহজাত চেতনাকে যেভাবে তাঁর চিত্রপটে বিধৃত করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। বাঙলা দেশের লোক-শিল্প যখন আজ প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখী তখন শিল্পী সতীশ রায়ের মত তরুণ শিল্পী ময়মনসিং গীতিকা, ব্রত-পার্বণ কিংবা লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে যে চিত্র-রচনায় উৎসাহিত হতে পারেন, এটাই আশার কথা। প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়ের পরে এদিকে বাঙলার শিক্ষিত শিল্পীরা বিশেষ কোন নজর দেননি। শিল্পী সতীশ রায় এ-দিক থেকে শ্রদ্ধেয় যামিনী রায়ের উত্তরসাধক। বাঙলার নৌকা বাইচ, মহুয়াকাব্য, মৈমনসিং গীতিকা, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী, গোকাল ব্রত প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত তাঁর চিত্রগুলিতে সত্যি এক দক্ষ পটুয়া শিল্পীকে আবিষ্কার করা যায়। অধিকাংশ এইদেশীয় রঙে, চমৎকার নক্সায় এবং লৌকিক চেতনায় রঞ্জিত। এই চিত্রগুলির পাশাপাশি শিল্পী রায় টেম্পারার মাধ্যমে অঙ্কিত কিছু চিত্র-নিদর্শন উপস্থিত করে-ছিলেন। এই চিত্রগুলিতে বিমূর্ত-চেতনার স্বাক্ষর বিদ্যমান থাকলেও গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রভাব এত বেশিমাত্রায় উপস্থিত যে, সেগুলিকে অনায়াসে শিল্পীর অনুকরণপ্রিয়তার উদাহরণ রূপে চিহ্নিত করা যায়।

শিল্পী সতীশ রায় মনে-প্রাণে গ্রাম-বাঙলার ঐতিহ্যে পুষ্ট। সুতরাং তাঁর কাছে আমাদের অনুরোধ তিনি যেন তাঁর নিজস্ব পথ পরিত্যাগ করে অনু-করণের পশ্চাতে না ধাবিত হন। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত শিল্পীর কাব্যগ্রন্থ 'উড়ানী পাতার নাও'-তেও তাঁর যে মনের আমরা পরিচয় পেয়েছি, সে-মনও লোক-শিল্পীর। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীর প্রতীক্ষায় রইলাম।

কলারসিক

রেডক্রস শতবার্ষিকী উপলক্ষে
চিত্রভাস্কর্যের প্রদর্শনী

এ-বৎসর আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির শতবর্ষ পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে আর্টস এণ্ড প্রিন্টস গ্যালারীর উদ্যোগে বঙ্গীয় রেডক্রস সোসাইটির সহযোগিতায় পার্ক স্ট্রীটের আর্টিষ্ট্রী হাউসে এক সর্বভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য কলার মনোরম প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির গত ১৪ই অক্টোবর এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন।

শিল্পী : রামকিংকর

এই প্রদর্শনীতে বাঙলাদেশসহ বাঙ্গালোর, দিল্লী, অন্ধ্র, আমেদাবাদ, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, রাজামুন্দ্রি, বোম্বে, ইন্দোর, বরোদা, হায়দ্রাবাদ, গুজরাট, বিহার, বেনারস, বেজওয়াদা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজকোট প্রভৃতি স্থানের খ্যাতিমান প্রবীণ ও তরুণ শতাধিক শিল্পীর দুই শতাধিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের নিদর্শন স্থান পেয়েছে। এমনকি প্যারিস থেকেও ভারতীয় শিল্পী কৃষ্ণ রেড্ডি দুখানা চমৎকার গ্রাফিক চিত্র পাঠিয়েছেন এই প্রদর্শনীর জন্য। সুতরাং বলা যায়, রেডক্রসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ একটি সর্বভারতীয় সমকালীন চিত্র ও ভাস্কর্যকলার প্রদর্শনী দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করেছে।

দুঃস্থ মানবের সেবাব্রতে শতাব্দী-ব্যাপী রেডক্রস যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, মানবাত্মার কারুকর্মী শিল্পীরাও সে-ব্রতে অংশ গ্রহণ করে এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করলেন এই প্রদর্শনীর জন্য তাঁদের চিত্র ও ভাস্কর্যকলা দান করে। প্রদর্শনীর আহ্বায়ক শ্রীনৃপেন মজুমদার জানালেন যে, এই প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ শিল্পীরা স্বেচ্ছায় রেডক্রস ভাণ্ডারে দান করতে সম্মত হয়েছেন। আমরা শিল্পীদের এই মহানুভবতাকে শ্রদ্ধা জানাই।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে জলরঙ, তেল-রঙ, গ্রাফিক প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পীর চিত্রকলা দর্শন করে আমরা খুশী হয়েছি। এর মধ্যে চিত্রকলার বেশ কয়েকখানি ইতিপূর্বে আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেছে। বিশেষ করে বাংলা দেশের শিল্পী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন চৌধুরী, তারাদাস চট্টোপাধ্যায়, অমল চাকলাদার, হরেন দাস, পাঁচুনারায়ণ গুপ্ত, গোপাল ঘোষ, প্রকাশ কর্মকার, রমেন মিত্র, রবীন মণ্ডল, দিলীপ রায়, সুভাষ সিংহরায়, গণেশ হালোই, শামু লাহিড়ী প্রভৃতি সমকালীন শিল্পীদের কাজ আমাদের একাধিকার দেখা। এই প্রদর্শনীতে এঁরা এঁদের পুরনো চিত্র-নিদর্শনই উপস্থিত করেছেন। কিন্তু পুরনো হলেও প্রদর্শিত চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে শিল্পীবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব-মূলক সৃষ্টিগুলির অন্যতম। আশা করি দর্শকেরা পুনর্বার এগুলি দর্শন করে খুশী হবেন।

প্রদর্শিত নতুন চিত্রগুলির মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ দালালের প্রতিকৃতিচিত্র (ডি—৫, ৬), ডি, কে দাশগুপ্তের 'মসজিদ' (ডি—৭), কে, কে, হেব্বার স্কেচ (এইচ—১), কে, এন, কাক্কার 'রাত্রির দৃশ্য' (কে—১), সতীশ মর্কণ্ডের 'হায়দ্রাবাদের গ্রাম' (এম—৪), বিচারপতি পি বি, মুখার্জির প্রতিকৃতিচিত্র (এম—১৬), কার্তিক পাইনের 'ধর্ম-সঙ্গীত' (পি—৭), কে পার্বতীসমের 'মা ও ছেলে' (পি—১৭), কৃষ্ণ রেড্ডীর গ্রাফিক চিত্র 'ঢেউ' (আর—২৬), 'নদী' (আর—২৭), রঞ্জন-রুদ্রের বিমূর্ত-চেতনার সৃষ্টি 'খেলা' (আর—৩২), এম, রাজাজীর 'তিন বোন' (আর—৩৬), গোপাল সান্যালের 'গায়ক' (এস—১১), আদিনাথ মুখার্জির 'বেনারস' (৪), শামু লাহিড়ীর 'বিড়াল ও বিড়াল বাচ্চা' (৬) প্রভৃতি চিত্রগুলির কম্পোজিশান এবং চমৎকার রঙ-প্রয়োগ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য-নিদর্শনের মধ্যে চিন্তামণি করের টেরাকোটার কাজ 'বুদ্ধ' (কে—৭), সুরেন দের প্লাস্টারের 'টরসো' (ডি—১৫), ফণীভূষণের টেরাকোটা 'মা ও ছেলে' (পি—২), রামকিংকর বেইজের 'বিনোদিনী' (আর—৩০), শর্বরী রায়-চৌধুরীর 'উপবিষ্টা মহিলা' (আর—৩৪) প্রভৃতি দর্শকদের ভাল লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাঙলার প্রখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে মুকুল দের কয়েকখানি স্কেচ এই প্রদর্শনীর মূল্য যেমন বৃদ্ধি করেছে, তেমনি অনেক প্রখ্যাত শিল্পীর অনুপস্থিতিও এই প্রদর্শনীর পক্ষে খুব দৃষ্টি-সুখকর নয় বলেই মনে হল। এ-সব সত্ত্বেও উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতা এবং একটি মহৎ কাজে তরুণ শিল্পীদের ব্যাপকভাবে যোগদান এই প্রদর্শনীকে যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে সে-বিষয়েও

আমরা নিঃসন্দেহ। উদ্যোক্তাদের আমরা অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই। প্রদর্শনীটি আগামী ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যহ বেলা ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

।। শিল্পী সীতেশ রায়ের প্রদর্শনী ।।

ক্যাথেড্রাল রোডের আকাডেমী অব ফাইন আর্টস-ভবনে গত ৭ই অক্টোবর থেকে ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত তরুণ শিল্পী সীতেশ রায়ের প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী চলার পর শেষ হয়েছে। কোনো শিল্পকলার স্কুলে শিল্পী রায় কোনোদিন কিছুই না শিখে গ্রাম-বাঙলার চিরকালীন সম্পদ—লোক-শিল্পের সহজাত চেতনাকে যেভাবে তাঁর চিত্রপটে বিধৃত করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। বাঙলা দেশের লোক-শিল্প যখন আজ প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখী তখন শিল্পী সীতেশ রায়ের মত তরুণ শিল্পী ময়মনসিং গীতিকা, ব্রত-পার্বণ কিংবা লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে যে চিত্র-রচনায় উৎসাহিত হতে পারেন, এটাই আশার কথা। প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়ের পরে এদিকে বাঙলার শিক্ষিত শিল্পীরা বিশেষ কোন নজর দেননি। শিল্পী সীতেশ রায় এ-দিক থেকে শ্রদ্ধেয় যামিনী রায়ের উত্তরসাধক। বাঙলার নৌকা বাইচ, মহুয়াকাব্য, মৈমনসিং গীতিকা, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী, গোকাল ব্রত প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত তাঁর চিত্রগুলিতে সত্যি এক দক্ষ পটুয়া শিল্পীকে আবিষ্কার করা যায়। অধিকাংশ এইদেশীয় রঙে, চমৎকার নক্সায় এবং লৌকিক চেতনায় রঞ্জিত। এই চিত্রগুলির পাশাপাশি শিল্পী রায় টেম্পারার মাধ্যমে অঙ্কিত কিছু চিত্র-নিদর্শন উপস্থিত করেছিলেন। এই চিত্রগুলিতে বিমূর্ত-চেতনার স্বাক্ষর বিদ্যমান থাকলেও গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রভাব এত বেশিমাত্রায় উপস্থিত যে, সেগুলিকে অনায়াসে শিল্পীর অনুকরণপ্রিয়তার উদাহরণ রূপে চিহ্নিত করা যায়।

শিল্পী সীতেশ রায় মনে-প্রাণে গ্রাম-বাঙলার ঐতিহ্যে পুষ্ট। সুতরাং তাঁর কাছে আমাদের অনুরোধ তিনি যেন তাঁর নিজস্ব পথ পরিত্যাগ করে অনুকরণের পশ্চাতে না ধাবিত হন। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত শিল্পীর কাব্যগ্রন্থ 'উড়ানী পাতার নাও'-তেও তাঁর যে মনের আমরা পরিচয় পেয়েছি, সে-মনও লোক-শিল্পীর। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীর প্রতীক্ষায় রইলাম।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুখ ধুতে গিয়ে কলকুচো আর ফুরোয় না অংশুর। এ-সব কী করছে। কতক্ষণ আর মিথ্যে দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবে লিপিকাকে। যখন অধৈর্য হয়ে পড়বে, কী বলে সামলাবে। কী বলে বিদায় করবে। চোখ বন্ধ রেখে একটা দিবাস্বপনকে কতক্ষণ লালন-পালন করবে। ভপ্তা বা শঙ্কর বা অমল বা আর কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে, আচম্বিতে তাকে অংশু বলে ডেকে ফেলে, তখনই বা কী হবে। তাকে চিনে ফেললে তখনই বা কী ভাবে নেবে লিপিকা।

হোক। যা হবার হোক। যতক্ষণ স্বপ্নের বৃত্তে ঘুরতে পারা যায়, যতক্ষণ অমৃতের সান্নিধ্য লাভ করতে পারা যায়, যতক্ষণ অপ্রাপণীয়ের অনধিকার আস্বাদন করা যায়, অংশু ততক্ষণই খুশী, লাভবান।

সারা আকাশটা যেন বুনো মোষের মত গোঁ গোঁ করছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত ঝড়বৃষ্টি দাবী জানাচ্ছে। সসাগরা পৃথিবীর সিকিভাগ দখল করবার দাবী। বন্যার বৈজয়ন্তী উড়ছে। আসুক বান। আসুক প্রলয়। দোরগোড়ায় এসে জানিয়ে দিক অংশুকে—বহির্জগতের সমস্ত আশ্রয় ভেসে গেছে, সমস্ত পথ ডুবে গেছে। স্থানান্তরে যাবার ক্ষমতা এবং অধিকার দুই-ই হারিয়েছে বুদ্ধিমান মানব জাতি। কোনো গ্রহে যাওয়ার কল্পনা তো দূরের কথা, কোনো গৃহে যাওয়াও এখন অসম্ভব।

বেশ হয়। লিপিকা তাহলে এই ছয়ের দুই ডাক্তার লেন থেকে কোথাও বেরুতে পারে না। কয়েক যুগের জন্য না পারে যেন। লিপিকার পুরো পরমায়ু পর্যন্ত হলে তো কথাই নেই।

লিপিকা অনেকক্ষণ থেকে ছটফট করছে। উঠছে বসছে। জানলার ছাট থেকে মুখ ভেজাচ্ছে। এমন কি

অজিত মুখোপাধ্যায়

জামাটাও ভেজাল। দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘরে গিয়ে পেঁছিল।

'কই, তোমার অংশুবাবুর দেখা নেই যে। কলকাতার রাস্তাঘাট যে এতক্ষণ খাল-বিল হয়ে গেল।' লিপিকা বলল।

অংশু কোথায় ছিল আড়ালে আড়ালে। ঘরের আনাচে-কানাচে লিপিকার আন্তর স্পর্শ, আচ্ছন্নকারী সৌরভ ছড়িয়ে পাড় ভরিয়ে দেবার সুযোগ দিচ্ছিল যেন, যাতে লিপিকা চলে যাবার পরেও ঘরটা সংরক্ষণ করবার যোগ্য হয়। যাতে ঘরটা নিজেই নতুন সৌরভ বিলোতে পারে।

'কী জানি, কেন যে এত দেরি হচ্ছে বুঝতে পারছি না। আপনারও তো খুব দেরি করে দিলাম। একটুকু দেখে যান, আর কী করবেন। আমি চা করে দিই।' অংশুর চোখে চাকরের মত অনুনয়!

'আর নয়। আমি চলি। তুমি মিঃ বিশ্বাসকে বলে দিও—বোলো কিন্তু—' লিপিকার গলায় করুণ আবেদন ঝরল।

'কী বলব?'

'বোলো—না, তোমায় কিছু বলতে হবে না। সেটা খারাপ দেখাবে। আমিই বলব। তুমি শুধু বলবে আমি এসেছিলাম।'

'আপনি বরং চিঠি লিখে যান।'

'চিঠির দরকার নেই। আমার আবার আসতেই হবে।'

'আসবেন! কবে! বলুন, আমি সেদিন অংশুবাবুকে নিশ্চয় করে থাকতে বলব।'

'পরশু—'

কেন কালই আসুন না?'

'কাল—আচ্ছা, না পরশুই আসব।'

দরজার দিকে ফিরল লিপিকা। দরজার পাশে পুরনো ট্রাঙ্কের উপর খবর কাগজে মোড়া কতকগুলি প্যাকেট। ভিতর থেকে লাল-নীল কাপড় উঁকি মারছে।

'বাচ্চাদের জামা-প্যান্ট?' লিপিকা শুধলো।

'হ্যাঁ।' অংশুর মনে ভেসে উঠল তিনটি অপুষ্ট শিশুর ও তাদের মায়ের মুখ।

'তোমার ছেলেমেয়ের?' নিরাবেগ প্রশ্ন।

হ্যাঁ।'

কাও।

'অনেকগুলো। চলুন বাসস্টপে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

লিপিকার বয়েস এখন কত। উনত্রিশ কি ত্রিশ। আর তেত্রিশেই অংশুমান ফতুর। এমন এক নারীর সম্পালাভে অংশুর জীবন কি বদলে যেতে পারত না। নিস্তব্ধ ডোবার চৌপাড় চুরমার হয়ে ভেসে যেতে পারত না বন্যার বিক্ষোভে!

পরদিন কাজে গেল না অংশু। চেনা অফিসে কারখানায় সারাদিন ঘুরে ঘুরে খবর নিল, কোথাও কোনো লোকের প্রয়োজন আছে কিনা। সকাল সাতটায় রাস্তার টিউবওয়েলে চান করে বেরিয়েছিল, ফিরল রাত এগারোটায়। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, ঝিমসানো দেহের স্তরে স্তরে প্রগাঢ় ক্লান্তি জমল, প্রকট ভাঙ্গ পড়ল। কোথা থেকেও কোনো আশা-ভরসা পেল না।

রাত্রে ফিরে এসে দেখল কারখানা থেকে লোক এসে বসে আছে। পুজোর সময়। এখন একজন মিস্ত্রীর অভাব যে প্রচণ্ড লোকসানের। লোকটিকে আসছে কাল কারখানা যাবে বলে বিদেয় করে চৌকির উপর এলিয়ে পড়ল অংশু। জুতো খোলবার, হারিকেন জ্বালবার, দরজা বন্ধ করবার ইচ্ছেও হচ্ছিল না।

আকাশের রং এখনো নীল হয়নি। তারার আলোক এবং চাঁদের উজ্জ্বলতা মেঘেদের চলাফেরায় এখনো ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে। জোড়া-তাড়া লেগে জোরদার হতে আরো কয়েক দিন সময় লেগে যাবে। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত অংশু অন্ধকারের এক কোণে পড়ে থেকে আশপাশের, নগরীর উদ্ভাসিত বস্তুতা নিরীক্ষণ করতে লাগল।

কী করে কাল দুপুরের মধ্যে লিপিকার স্বামীকে চাকরি জোগাবে। কী করে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এমন অসম্ভব সম্ভব করবে। চেষ্টা করলে হয়তো চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর চব্বিশটা খুন করতে পারে, একটাও চাকরি জোগাড় করতে পারে না—এ কথা কি আজ কোনো লোকের অজানা!

যদি পাওয়া যায়।

নেপোলিয়ান বলেছেন : অসম্ভব বলে কোনো কাজ নাকি নেই। এ-ও কানাইবাবুর মুখে শোনা। অংশুর হাসি পেল, কারণ, অকারণ অবাস্তব দাইস

এল মনে। যদি সত্যিই না ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব। কিছুক্ষণের জন্য এটাকে সম্ভব ভাবলে কার কী ক্ষতি।

অংশু যেন কল্পনার মদে মাতাল হয়ে গেছে।

ধরা যাক, অংশু চাকরিটা পাইয়ে দিল। তখন কত কৃতজ্ঞতা জানাবে কত আগ্রহ প্রকাশ করবে লিপিকা। সে একজন মিস্ত্রী বলে কি ভদ্রতাবোধেও লিপিকা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না। মিস্ত্রী বলে কি তার উপকার ছোট হয়ে যাবে। মিঃ বিশ্বাসকে না-ই চিনুক, উপকারীকে চিনতে ক্ষতি কী। অংশুর নতুন জন্মকেই চিনুক, নতুন রূপকেই চিনুক। আসুক না কেন লিপিকা এই নবরূপে অংশুর কাছে.........

অসম্ভব। এ সব কী ভাবছে অংশু। মিঃ বিশ্বাসের এমন দুরবস্থা হয়েছে জানলে লিপিকা কখনোই অংশুকে নিজেদের সমপর্যায়ে, সমমর্যাদায় সম্মান দেবে না। লিপিকার শিক্ষায় সমাজে সৌন্দর্যবোধে একটা মিস্ত্রীর আসঙ্গ-লিপ্সার স্থান অবশ্যই নেই। শুধু মিস্ত্রী বলে নয়, এমন ফুরিয়ে-যাওয়া নিঃসাড় আগুনকে নিয়ে লিপিকার কোন উপকার হবে, কোন মোক্ষলাভ ঘটবে।

'কই, অংশুবাবু আসেন নি?'

ফুটন্ত ছাতিম গাছের মত আজ ছন্দোবদ্ধ মেয়েরও লিপিকা।

চিন্তার ভারে ঘুমিয়ে পড়েছিল অংশু। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

'শুনুন, অংশুবাবুকে আপনার সব কথাই বলেছি। বলেই ফেলেছি। আসতে পারবেন না কিনা, ভাবলাম আপনার আবার দেরি হয়ে যাবে, সেজন্যে আমি আর থাকতে পারলাম না। বলে ফেললাম। অংশুবাবু শুনলেন। খুব কষ্ট পেলেন মনে হল। চোখের কোল চিকচিক করছিল। থ মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। বললেন : কেষ্ট, যে করেই হোক আমি একটা চাকরি জোগাড় করে দেব। পাতাল খুঁড়তে হলেও আমি তাই করব। তুই বলিস, আমার সঙ্গে দেখা হল না বলে উনি যেন দুঃখ না করেন। তুই একটা দরখাস্ত করিয়ে আনতে বলবি। বলে অংশুবাবু নিজেই একটা খসড়া করে দিয়েছেন।' অংশু দেয়াল-আলমারী ঘেঁটে একটা কাগজ বের করল। মেলে ধরল কাগজটা লিপিকার সামনে।

'কিন্তু কেষ্ট, তাঁর সঙ্গে আমার যে দেখা করার ভীষণ ইচ্ছে ছিল, দরকারও

ছিল। চাকরি তিনি জোগাড় করে দেবার চেষ্টা করতে থাকুন, তাঁর সঙ্গে যে দেখাই হচ্ছে না।'

দু চোখ ভরে দেখছে অংশু। শুধু দেখছে। ঘিয়েরঙের জামা, শাড়ি ঘিয়ে রঙের। ঘিয়ে রঙের টিপ কপালের মাঝখানে। ঘিয়ে রঙের স্লিপারটা পর্যন্ত। ছন্দোবন্ধ ফুটন্ত ছাতিম গাছ। অংশু দেখছে, একটা স্বপ্নের জগৎ অথচ কী বাস্তব। এমন জীবন্ত পার্থিব সচল গম্য স্বপ্নের কথা কে কবে ভাবতে পেরেছে। লিপির কণ্ঠধ্বনি শুনে অংশুর স্নায়ুতে গতকালের বাত্যা ফিরে আসছে যেন। বোধকরি আর সে থাকতে পারবে না। আর সে লুকিয়ে রাখতে পারবে না নিজেকে দুরারোগ্য গোপনীয় রোগের মত। এবার হয়ত বোকার মতন সে চীৎকার করে উঠবে : লিপি, তোমার অংশুমান তোমার সম্মুখে। মৃত অপদার্থ। সে কিছুই করতে পারেনি, সে কিছুই হতে পারেনি। দুরন্ত নদীর স্রোত থেকে পালিয়ে এসে একটা দুর্গন্ধ শ্মশানের গায়ে গেঁথে লেগে গেছে। একটা বাকল-ওঠা বুড়ো গাছের মতন মৃত্যুর গর্ভে পোঁতা হয়ে চলেছে।

কী ভেবে কিছুই বলতে পারল না অংশু।

বলল, 'অংশুবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলেছেন। বলেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই তো হল। এ কয়টা দিন বেশ চেপে তল্লাশ করে নিই। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, জিগ্যেস করছিলেন উনি, আপনার সব কথা। আমি তো কিছুই বলতে পারলাম না। জিগ্যেস করলেন : আপনি দেখতে কেমন হয়েছেন। কে কে আছে। কোথায় থাকছেন এখন। আমি আপনাকে খাতির করেছি কিনা। ভাগ্যিস আপনাকে খাতির করেছিলাম সেদিন। কী বললেন জানেন? বললেন : দেখিস কেষ্ট তার যেন কোনো অশ্রদ্ধা না হয়। আসুন—আপনি বসুন। আপনার জন্য হাত-পাখা কিনে এনেছি। হাওয়া করে দেব? বিষ্টিটা ধরতেই কেমন বিচ্ছিরি গরম পড়েছে দেখেছেন?'

'না না না। পুরুষমানুষের হাওয়া মেয়েদের নিতে হয় না'—বলে পাখাটা অংশুর হাত থেকে টেনে নিল লিপিকা। নতুন ফুলপাতা ছাপা বেড-কভারে আরাম করে বসল। ওই একই ঘর, কিন্তু অংশু ঝাড়পোছ গোছগাছ করে বেশ ছিমছাম করে তুলেছে। লিপিকার চোখেরও অনেকটা আরাম হচ্ছে।

হাসল অংশু লিপির কথা শুনে। লিপিকাও হাসল।

অংশুর হাসিটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেল। বলল, 'আমরা আবার পুরুষমানুষ। পুরুষও নই, মানুষ তো নই-ই। মানুষ আর হতে পারলাম কোথায়। বলতে গেলে বস্তিতেই থাকি। বরং এই আধা বস্তি-বাড়িতে না থেকে বস্তিতে থাকলে এর চেয়ে অনেক সুখে থাকতাম। আর যারা দেশের বাড়িতে থাকে, তাদের কথা শুনে আর কী হবে।' অংশুর চোখ ছলছল করে উঠল। নিজের দুঃখের কথা পরাজয়ের কথা বলতে গিয়ে সামলে নিল। যতটুকু পুরুষ-মন আজও বেঁচে আছে তার পুরুষত্বে লাগল। বলতে গিয়েও, কাঁদতে গিয়েও—বলতে বা কাঁদতে পারল না।

'ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখো, বুঝলে কেষ্ট। তাহলেই সুখ। তার চে বড় সুখ আর কিছু নেই। তাছাড়া তোমার মতন এমন ভালো মানুষের সুসময় ভগবান নিশ্চয় দেবেন। ও'র চাকরি যেতে এক-একবার ভগবানের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছিলাম। আবার মনে হচ্ছিল, গতজন্মের কোনো পাপের হয়তো ফলভোগ করতে হচ্ছে। জানি না, কত পাপ যে করেছিলাম! নইলে এমন দুরবস্থা হয়। অসময়ের জন্য একটা পয়সাও জমাইনি। যা এসেছে, খেয়ে-দেয়ে, দুঃস্থ আত্মীয়দের বিলিয়ে দিয়েছি। আর আজ! আমার জন্যে কে বিলোয় কে জানে।' লিপিকার দীর্ঘশ্বাস চাপা থাকে না, 'যাক গে। অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে মাথা ধরে যাচ্ছে বলে আর ভাবি না।'

দুঃখ দুজনকে কাছে এনে ফেলল। যন্ত্রণার হাত বাড়িয়ে দিল যন্ত্রণার উদ্দেশে।

'ভাববেন না অতশত।' সীমাছাড়া দুঃখে যেমন উত্তাল হাসে মানুষ, তেমনি উত্তাল হাসি কেন যেন অংশুর মনের মধ্যে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। যাকে সে কত উচ্চের, কত সম্মানের ভেবেছিল, তাকে অংশুর মত লোক সান্ত্বনা দিচ্ছে।—'অংশুবাবু যখন বলেছেন, তখন একটা না একটা উপায় হবেই। অংশুবাবু হিল্লে না করে ছাড়বেন না।' অদৃশ্য হতাশার পাশ থেকে সশব্দ সান্ত্বনার বরাভয়ে অংশুকে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। কঙ্কালের কাঠামোয় দেহ আরোপ করার অসাধ্য প্রয়াস। ফকির যেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দুঃখ করতে বারণ করছে।—'আপনি দরখাস্তটা রোববার নিয়ে আসবেন। ভুলবেন না।'

রবিবার দরখাস্ত নিয়ে আসবে লিপিকা। অংশু তাকে হপ্তা অন্তর অন্তর খোঁজ নিতে বলবে। লিপিকাও ঠিক খবর নিয়ে নিয়ে ফিরে ফিরে যাবে। তারপর? তারপর যখন বেশ কয়েক হপ্তা কেটে গিয়ে মাসে পড়বে, তখন কোন্ অজুহাতে আবার কবে লিপিকাকে আসতে বলবে।
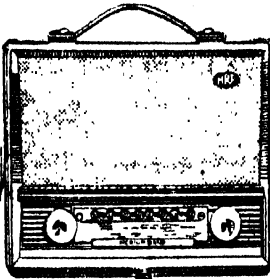
শেষ পর্যন্ত যখন কোনো চাকরি দিতে পারবে না অংশু, কী কৈফিয়তে লিপিকাকে বারবার ডাকবে। তখন বলবার কারণ ফুরোবে। দেখবার পথও বন্ধ হবে। তারচেয়ে, দূরের বস্তু দূরে রাখলেই কি ভালো ছিল না। স্প্রিং-এর মত যতই তাকে কাছে টেনে কাছের করা যাক, সে কি কখনো বরাবরের জন্য কাছের হবে। মাখামাখিতে যে অন্যায় আশা লোভে পুষ্ট হয়ে বেড়ে চলেছে, সেই আশাকে যখন নিজের হাতেই হত্যা করতে হবে—সহ্য করতে পারবে কি অংশু।

দরখাস্ত দিয়ে গেল লিপিকা।

পরের রবিবার কেটে গেল খোঁজে খবরে।

একদিন লিপিকা বলল, 'আর যে চলে না কেষ্ট। এবার যে আমাদেরকে মাসিমার বাড়ি ছাড়তে হবে। মাসিমারও এমন ক্ষমতা নেই যে আমাদের চিরকাল পোষেন। তাঁর নিজেরই সংসার বেশ সচল নয়।'

একটা যেন প্রচণ্ড ভুল করেছে অংশু এমনি ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ওঃ হো, অংশুবাবু বলেছেন, চাকরির যা বাজার, দু-চারদিন দেরি হতে পারে। আপনার জন্য তিন শো টাকা রেখে গেছেন অংশুবাবু।' হুটপাট করে অংশু ট্রাঙ্ক থেকে এক তাড়া নোট বার করে লিপিকার হাতে গুঁজে দিল।—'যদি মাসিমা একেবারেই টানতে না পারেন, এইগুলো দেবেন।'

লিপিকার নরম শরীর হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল। বলে উঠল, 'এ হতেই পারে না কেষ্ট। আমি তো অর্থ-সাহায্য চাইতে আসিনি।' বলতে বলতে সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দিল অংশুকে। জোর করে অংশুর হাতে গুঁজে দিল। লিপিকার হাত ধরে থাকল অংশু। নিভন্ত উনুনের মত নিরুত্তাপ লিপির হাত, হাতের আঙুলগুলো। অংশুর তালু যেন জ্বলছে।

'কিন্তু অংশুবাবু দুঃখ পাবেন।' অংশু বলল ফিসফিস করে।

'যার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তার দান কি নেওয়া যায় কেষ্ট। তুমিই বল। বুঝলাম তিনি অতি মহৎ। কিন্তু আমরাও তো কিছু ভিখিরী নই!'

যার দিকে সকাতর চেয়ে আছে কটি অভুক্ত জীব—অংশুর সেই পুজো বোনাস হয়ত কোনো অসম্ভব সম্ভব করতে চেয়েছিল। সে সম্ভাবনা বিফল হতে বসেছে। অভুক্ত কটি শিশুকন্যা পরিবারকে মনে মনে অবচেতনে ভয় করছিল। অনেক লড়াই করে সে ভয় ও অপরাধবোধ জয় করে ফেলেছিল অংশু। ভেবেছিল তাদের দুশ্চিন্তার জগদ্দল সরিয়ে হালকা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে বাষ্পের মতন। সব বিফল করে দিল লিপিকা।

পরক্ষণেই অংশুর কর্তব্যবোধ জেগে উঠল।

কটি ক্ষুধার্ত কীটের চোখগুলিকে, যাই হোক, আনন্দে উজ্জ্বল তো করতে পারবে। বৎসরান্তে অন্তত একটিবারের জন্যেও পৃথিবীর রসাস্বাদের স্মৃতি ঝালানো হবে।

সবই বোঝে অংশু।

সব বুঝেও বুকের তলায় আবার মৃত্যুর নখর অনুভূত হয়। আমার একটা রন্ধ্রকারক যন্ত্র অনুভবের পাতাল থেকে কেটে কেটে ফুঁড়ে ফুঁড়ে অস্তিত্বের কেন্দ্রে উপচে উঠছে। যন্ত্র নয়—যেন মৃত্যুর ফলা।

'বরং আমাকে দশটা টাকা দাও। আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব।'

হাত মেলে ধরল অংশু। বলল, 'যটা টাকা খুশী নিন।' অংশুর যেন নড়বার ক্ষমতা নেই আর।

বিকেলের রোদ লাল ফিতের মতন এসে জড়িয়েছে লিপিকার চারু কণ্ঠে। মাথার ঘোমটা কখন সরে গিয়েছিল। নকল চুনীর মতন ম্লান গালে এসে লাগছিল রোদের আভা।

অংশুর উৎসাহে দৈবাৎ বজ্রাঘাত হয়েছে। তাই সে অনড়। তার শিথিল ভঙ্গিতে নাগাসাকির ছায়া এসে পড়েছে যেন।

লিপিকার চলে যাবার সময় হচ্ছে। লিপিকা এবার চলে যাবে। চলে তো যাবে, কিন্তু ফিরে গিয়ে যখন তার মাসিমাকে বলবে : আজও হল না। তখন যদি লিপিকাকে পথে বার করে দেয় মাসিমা? লিপিকা কোথায় যাবে। কোন আশ্রমে গিয়ে ঠেকতে হবে। লিপিকা হয়ত এসবের কিছুই জানে না। কিছুই বোঝে না।

'দেখুন—' ডাকল অংশু। —'আমি নিজে যদি তিনশো টাকা দিই। গরীবরা তো উপকার করতে পারে না। এটা উপকার না। উপকার মোটেই ভাববেন না।'

লিপিকার চোখে অগাধ বিস্ময়, 'তোমার চলবে কী করে? কবে ফেরত দেব তার কি ঠিক আছে।'

'চলে যাবে। কষ্টের শেষটা শুধু জানি না, আর সব তো জানা আছে। ও চলে যাবে।'

'তুমি যে বললে, এটা মিঃ বিশ্বাস দিয়েছেন। জট পাকিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'যদি আমার টাকা না নেন—মিথ্যে কথা বলেছি। অংশুবাবু দেন নি।'

লিপিকা তবু ইতস্তত করল। সবটাই তার কাছে গোলকধাঁধা ঠেকছে। বলল, 'কিন্তু আমার কি নেওয়া উচিত হবে।'

'সে সব আপনারাই ভালো বোঝেন। আমরা কুলি মিস্ত্রী লোক। আমাদের যে দুঃখ, সে দুঃখই থাকবে। আপনারা কখনো দুঃখে থাকেন নি। থাকা অভ্যাসও নেই। আপনাদের যদি কোনো কাজে লাগতে পারি, আমাদের যে কী আনন্দ হয়—' অংশু ভাষা খুঁজে পেল না। আবেগে গলাও রুদ্ধ হয়ে গেল।

'তুমি যখন এত করে বলছ, না নিলে তোমার খুব দুঃখ হবে। অথচ নিতেও মন সরছে না। কী যে করি...কী যে করি...আচ্ছা, আজ থাক। খুব দরকার হলে নেব। হল তো? খুশী হলে?'

দু চোখ বেয়ে জল গড়াল অংশুর।

'সে কী। কাঁদছ নাকি। কী পাগল।' অপত্রক নারীর মাতৃস্নেহে এগিয়ে গেল লিপিকা। —'কেঁদো না কেষ্ট। ছি। জানি না আমাকে যে তোমার কী ভালো লেগেছে।'

'বলছি। জানবেন।' লিপিকার হাত চেপে ধরল অংশু। তার ব্যাকুলতা লিপিকার মর্মে পৌঁছতে মুহূর্ত দেরি হল না। অজ্ঞাত পত্রের স্পর্শের সোহাগে লিপিকার হৃদয় পূর্ণিমা হয়ে গেল।

'বলছি। জানবেন।' বিড় বিড় করে বলল অংশু। যেন দূরে কোনো লোক পথ হারিয়ে বিপদে চীৎকার করছে। —'হ্যাঁ, তখন কি তুমি আমার কাছ থেকে কিছু নেবে লিপিকা?'

'মানে!' লিপিকা স্খলিত নক্ষত্রের মত ছিটকে পড়ল। ধপ করে বসে পড়ল

ধুলোয়। চৌকির কানায় লেগে কাঁচের চুড়িগুলো গুঁড়িয়ে গেল। হাতটা কেটেও গেল বোধহয়।

'মানে বুঝতে পারছ না লিপি। আমি যদি অংশুমান বলে—না না—তার প্রেত বলে পরিচয় দিই—তাহলেও কি তুমি আমার কাছ থেকে কিছু নেবে না?'

'অংশুদা, তুমি—'

অনেক...অনেকক্ষণ, কতক্ষণ কেউ বলতে পারবে না, ঘরের ফিকে আলো কখন অন্ধকার হল। অন্ধকারের দেহে ঈষৎ রঙের সাজ চড়ল আশপাশ থেকে ছুটে-আসা আলোর সাহায্যে। মানব মূর্তি দুটি ভূত হয়ে গেল। আবার মনে অচেনার ভয় জমাট বাঁধতে থাকল। বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই দুজনে ক্রমেই বিমূঢ়তর হতে লাগল।

'আমি খুবই লজ্জিত লিপিকা—' অংশু যেন অলৌকিক কণ্ঠ।

'না না লজ্জার কী—' লিপিকা যেন দৈববাণী।

'আমি মানুষ হতে পারিনি—'

'সংসারে মানুষ কে—'

'বড় হতে পারিনি—'

'মানুষ কিসে বড়—'

'তোমার স্বামীকে আমি কী চাকরি দেব? আমাকে তুমি মাপ কোরো লিপিকা।'

লিপিকা ভাবল অংশুর মত দুর্দান্ত তেজের যদি এই ধরণের মৃত্যু ঘটতে পারে, তাহলে তারাই বা দাঁড়াবে কোথায়। অগাধ জলের মধ্যে খড়কুটোর মত অংশুকে আঁকড়ে ধরল। লিপিকার ভাবনা চিন্তা লোপ পেয়ে গেল। লিপিকার এমন আমূল আত্মসমর্পণ অংশুকে হঠাৎ শনিগ্রহের মত ভয়ঙ্কর করে তুলল। লিপিকা যেন লাবণ্যের বালা হয়ে অংশুকে জড়িয়ে থাকল।

আবেষ্টনীটা কখন শিথিল হয়েছে, লিপিকা নিঃশব্দে চলে গেছে, অংশু সতের বছর আগেকার যৌবনে দর্পিত হয়েছে। হ্যারিকেন জেবলে দেখেছে ভাঙা আরশিটায়—অনাজনের মুখ! গালে হাত বুলিয়েছে, খাঁজগুলোর আঁকিবুঁকি কোথায়। গোটা মুখময় গভীর ছায়াগুলি কোথায়। আলো-ঠিকরনো আয়নাটার মতই অংশুর মুখ ঝকঝক করছে।

তারপর সারা শরীরে আনন্দের একটা কঠিন বর্ম পরে পদাতিক সৈন্যের ভঙ্গিতে ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ পায়চারি করে ফিরেছে।

না, লিপি তিনশো টাকাটা ফেলে যায়নি। নিয়েই গেছে।

কোথায় এক বৃদ্ধার আচরণ শৈশবের দিকে ফিরে যাচ্ছিল—খবর কাগজের সংবাদ।

যে দিনটা চলে যায়, যে উদ্দীপনা নিভে যায়, আবার কি তাকে নতুন করে পাওয়া যায় না। যে অভিজ্ঞতা পেয়েছে অংশু সেই অভিজ্ঞতাগুলি হাতে থাকবে, অথচ নতুনভাবে আবার পেছন থেকে, কৈশোর থেকে যদি শুরু করা যেত! যে দিনগুলি চলে যাচ্ছে, বিজ্ঞানীরা হয়তো কোনোদিন, কোনো উপায়েও সেগুলির পুনরাবৃত্তি করাতে পারবে না, অংশু কিন্তু মনোবলে আস্তে আস্তে পেছনের শক্তিতে ফিরে যাচ্ছে এবং স্ফুরিত হচ্ছে। লিপির স্বামী ভদ্রলোকের জন্য অংশু চাকরি খুঁজছে উন্মাদের মত। আর নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবে, কারখানা করবে, তারও চেষ্টা করছে উন্মাদের মত। টাকা, টাকা কোথায় পাবে। ঋণের জন্য দরখাস্ত নিয়ে ছোটাছুটি করছে সরকারের দরজায়। নিজেকে বড়, বিরাট করতে হবে। রাজা হবার স্বপ্ন দেখেছে ফকির, আর যায় কোথা।

বিদ্যুৎবেগে মুহুর্মুহু ভোর ছিটকে পড়ছে। একদিন রাত্রে ফেরবার সময় হিসাব করল অংশু দুটো মাস কেটে গেছে, যেন কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলার ক্ষণটুকু।

ঘরে হ্যারিকেন জেবলে বিছানা ঝাড়তে গিয়ে দেখে একটা চিঠি। ধক্ করে উঠল বুকের ভিতরটা। সরকার কি ঋণ দেবে তাহলে? এই না বলছিল, স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক না দিতে পারলে ঋণ মেলে না। অর্থাৎ যাদের আছে তাদেরকেই ঋণ। যাদের কিছুই নেই তাদের ঋণ দিলে ফেরত পাবার নিশ্চয়তা কোথায়। কী চমৎকার সব যুক্তি। যাদের কিছু নেই ঋণ তবে তাদের জন্য নয়!

না, অন্য চিঠি। হাতে-লেখা পোস্ট-কার্ড।

আমাকে তুমি মাপ করো লিপিকা

প্রিয় কেষ্ট, তোমার দেওয়া তিনশো টাকা পেয়ে আমাদের খুবই উপকার হয়েছে। সুবিধা হলেই ওটা তোমাকে ফেরত দিয়ে দেব। তোমাকে ও'র চাকরির জন্য চেষ্টা করতে হবে না। তুমি তো জানো না উনি কত উঁচু দরের চাকরি করতেন। তুমি তাঁর উপযুক্ত চাকরি কী করে জোগাড় করবে। অতএব থাক।

আর তোমাকে আমি কেষ্ট বলেই চিনব। অংশুবাবুকে আমি মনে মনে কিছুতেই হত্যা করতে পারছি না। কুশল কামনা করি। ইতি লিপিকা। ২৫।৯।৬২

পুঃ ডানকুনীতে আমরা বেশীদিন থাকব না। তোমাকে টাকাটা একসময় আমি নিজেই দিয়ে আসব।

সমাপ্ত

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৩য় বর্ষ
৩য় খণ্ড

২৬শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ নয়া পয়সা

শুক্রবার, ১৪ই কার্তিক, ১৩৭০
Friday, 1st November, 1963. 40 Naya Paise.

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪	বিদেশী সাহিত্য		
৫	সম্পাদকীয়		
৬	অলমিতি		—শ্রীজৈমিনি
৭	সমকালীন সাহিত্য		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
১২	অ্যাসিড	(গল্প)	—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত
১৮	ভজহরি চাকলাদার ও আমি	(গল্প)	—শ্রীতারাপদ রায়
২১	পৌষ ফাগুনের পালা	(উপন্যাস)	—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
২৫	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৩৬	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
৩৮	খেলার কথা		—শ্রীঅজয় বসু
৩৯	নাম তিলোক চক্রবর্তী	(গল্প)	—শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়
৪২	ঝাড়লণ্ঠনের তেকোনা কাচ	(গল্প)	—শ্রীরমানাথ রায়
৪৫	মৃতের সহিত সাক্ষাৎকার	(গল্প)	—শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়
৪৮	শিকার	(গল্প)	—শ্রীআশিস ঘোষ
৫১	কালো হরিণ চোখ	(উপন্যাস)	—শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগী
৫৪	বাতিল টিনের ঘর	(গল্প)	—শ্রীগণেশ নন্দী
৫৯	হরবিলাসের মৃত্যু	(গল্প)	—শ্রীসুভাষ সিংহ

বিদেশী সাহিত্য

।। আফ্রিকার কবিতা ।।

নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুক থেকে যে অঙ্গুলার রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে শুরু করে তার জ্যোতি আশ্চর্যতম উজ্জ্বল। শ্বেত-প্রভুত্বের কৃষ্ণ আফ্রিকা আজ সেই দ্যুতি নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর বুকে সমুপস্থিত। তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃতি আজ আর উপেক্ষিত নয়। আজকের বিশ্ব-মানস কৃষ্ণ আফ্রিকার বিস্ময়কর রূপাবলোকনে বিমুঢ়।

সমস্যাজর্জর আফ্রিকার আদিম আত্মা স্বকীয় দম্ভের আত্মশ্লাঘিতে পৃথিবীর সামনে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হতে বদ্ধ-পরিকর। পাশ্চমের প্রভাব সত্ত্বেও তার স্বীয় চারিত্রধর্ম অক্ষুন্ন রয়েছে। য়ুরোপীয় চিন্তা ও ভাবধারার বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র প্রভাবে আফ্রিকার গণমানস প্রভাবিত। কিন্তু তারো ঊর্ধ্বে সেখানে বিরাজ করছে নতুন স্বতন্ত্র আফ্রিকার স্বপ্ন। দীর্ঘদিনের বিদেশী শাসনে যে স্বপ্ন ছিল অবদমিত। আফ্রিকার সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট সমগ্র জাতীয় চরিত্রের অন্য কোথাও তেমন দেখা যায় খুব কমই। বিদেশী শাসক আফ্রিকার সভ্যতায় এক বৈচিত্র্যময় স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করে সরে আসছে—যার সঙ্গে আফ্রিকার আদিম আত্মার সংযোগ ক্ষীণ।

'একটা উলংগ সূর্য, একটা হলুদ সূর্য
সূর্যটা ভোরের প্রথমেই
উদোম ন্যাংটো হয়ে
নদীর তীরে সোনার ঢেউগুলি
ঢেলে দেয়
হলুদ নদীর তীরে।'

(বিরাগো দিও)

অনুবাদ : সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

আফ্রিকার সন্তান সূর্যস্নাত পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আজ আর আত্মগ্লানিতে মগ্ন নয়, আত্মসচেতনতায় আপ্লুত অন্তরে সে বলে ওঠে :

"...নিজ ভূমিতে বাস করেও
আমাদের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছায় না
মদ খেয়ে লোকগুলো আয়ু ফতুর করে
মৃত্যুর ভয়াল বাদ্যধ্বনিতে তারা
নিজেদের সঁপেছে
তোর সন্তান সন্ততি
যারা ক্ষুধিত
যারা—তৃষ্ণার্ত
যারা—তোকে মা ডাকতে
লজ্জা পায়
যারা—খোলা রাস্তায় পা বাড়াতে
ভয় পায়
যারা—লোক দেখলে ভয় পায়
আমাদের মধ্যেই—
জীবনের আশা আবার গড়ে
উঠবে।"

(আগোস্তিনহো নেতো)

অনুবাদ : সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

নতুন আফ্রিকা আজ অশান্ত—তার স্বর আজ বিপ্লবাত্মক। য়ুরোপীয় সভ্যতার বহিরাঙ্গিক মাধুর্যে আফ্রিকার সত্য রূপ আজ আর তমসাচ্ছন্ন নয়। স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তজাল উত্তীর্ণ হয়ে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে এগিয়ে এসেছে আফ্রিকা।

।। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ।।

সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী গ্রীকদের ভাগ্যে নোবেল পুরস্কার-লাভের ঘটনা এই প্রথম। জর্জ সেফারিয়েডস্ নামে পরিচিত হলেও এই তেষট্টি বৎসর বয়স্ক গ্রীক কবি ও কূটনীতিবিদের নাম গিয়রগস সেফারিস। ইনি সাফারিজ নামে লিখে থাকেন।

সফারিজ ১৯৬০ সালে উইলিয়ম ফয়লী কবিতা পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে গ্রীসের এই শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য-স্বভাব হল গীতি-কবিতার মাধুর্য।

আমার দেহের গভীরে যেসব
শিরা-উপশিরা
সেখানে লুকিয়ে রাখতেই হবে তাকে—
আমার পিতামহের বজ্র-বিদ্যুতে
জ্বালাময় ঝোড়ো চামড়া,
আমার জান্তব রক্ষক,
তাকে যে আমার লুকিয়ে রাখতেই হবে
যাতে আমি কুৎসার প্রাচীরকে
ভেঙে না দিই।
সে যে আমার বিশ্বস্ত শোণিত
একান্ত নিষ্ঠাই যার দাবি—
যে রক্ষা করবে আমার নগ্ন
অহংকার-কে,
আমার আর অধিকতর ভাগ্যবান
যে-সব পুরুষ
তাদের তিরস্কারের কবল থেকে।

(লেওপোল্ড সেভার সেংগর)

অনুবাদ : অতীন্দ্র মজুমদার

ঔপনিবেশিক সভ্যতার শিকারী-মানসিকতা আফ্রিকার কৃষ্টি, আফ্রিকার ঐশ্বর্য, আফ্রিকার সোনার সম্পদ ভস্ম করে দিয়েছিল। তার আদিমতম সত্তাকে আঘাতে আঘাতে করেছে লুপ্ত—করেছে বিকৃত। কিন্তু শতাব্দীর অভিশাপ বুকে নিয়ে আফ্রিকার মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বাদ পেয়েছে। কঙ্গো, কেনিয়া, ঘানা, গাম্বিয়া, নাইজেরিয়া মাডাগাস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকা, মোজাম্বিক প্রভৃতি অঞ্চলের কবিদের কণ্ঠে আফ্রিকার যে সত্য রূপ উচ্চারিত তা বিশ্ব-পাঠকের দরবারে আজ উপস্থিত। এঁদের অনেককেই রাজনৈতিক কারণে জীবন কাটাতে হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে। তবুও তাঁরা মাতৃভূমির চিন্তা থেকে একদিনের জন্যও সরে যায়নি। আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষগুলি চোখের সামনে থেকে দূরে সরে যায়নি। তার আদিম বলিষ্ঠতা প্রতিটি কবির চিন্তা ও রূপকল্পনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। নিজেকে নিগ্রো বলতে তার লজ্জা নেই। কৃষ্ণকায়তার জন্য সে আজ গর্বিত ও উদ্ধত কিন্তু প্রশান্ত। অ্যাজিমিস্ট আফ্রিকার ধ্যান-ধারণা আজ বিবর্তিত। আফ্রিকার প্রাণপ্রচুর্যময় জীবনধর্ম মানবিক চেতনার প্রসারে কল্পনার বিকাশে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে করেছে বিস্মিত। নিগ্রো-মানস আজ আর বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী নয়। কৃত্রিম বিভেদ উত্তীর্ণ হয়ে সমগ্রতার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াই তার অভীপ্সা। সে চায় এমন কোন সত্য—জীবন—আঙ্গিক যা সকলের আকাঙ্ক্ষিত এবং বোধগম্যও বটে। যা প্রতিটি মানুষের মনের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে আন্তরিকভাবে সহকারী হবে। আত্মানুসন্ধান বা আত্মসচেতনতার মধ্য দিয়ে জীবন-সত্যের অর্থোপলব্ধিতে আজ সে তৎপর ও উন্মুখ। নিগ্রো লেখক আজ এমন একটি ভিত্তি চাইছেন যেখানে তাঁর আসন হবে স্থায়ী। যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর জীবনোপলব্ধি সমস্ত গণমানসে ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে সে দেখবে তার শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা, যেখানে সে পাবে আত্মাবিকিরণের আশ্চর্যতম সুন্দর সর্বজনপ্রিয় রূপটিকে।

সম্পাদকীয়

জাতিগঠনের মূলসূত্র ভুলভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের ভিতরে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আহরণের ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত। জগতের ইতিহাসে যে সকল জাতির অভ্যুত্থান ও প্রগতি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে তাহাদের প্রত্যেকটিকেই বৈফল্য ও পরাজয়ের কঠোর অভিজ্ঞতা দৃঢ়চিত্তে গ্রহণ করিয়া সকল বাধাবিঘ্ন ও বিপদকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। এবং সকল ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে জাতির নেতৃত্ব ও পথনির্দেশ যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকটি ভুলভ্রান্তি, প্রত্যেকবারের ভাগ্যবিপর্যয়ে নিজেদের ভুল বা অভিজ্ঞতার অভাব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সচেতন থাকিয়া ভুল সংশোধন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেষ্টা সক্রিয়ভাবে করিয়া গিয়াছেন।

অন্যদিকে যে সকল জাতির নেতৃবর্গ নিজেদের ভুলভ্রান্তি বা অভিজ্ঞতার অভাব স্বীকার করিতে অক্ষম এবং সকল বৈফল্য ও বিপদাপদের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য কেবলমাত্র অন্যের উপর দোষারোপ করিতে বা দৈবের বিরোধিতা দেখাইতে পটু ছিলেন সে সকল জাতির দুর্ভোগ দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল; ইহাও ইতিহাসের লিখন।

আমাদের জাতীয় জীবনের আরম্ভ অতি অল্পদিনই হইয়াছে। এই ষোল বৎসরের পথচলার মধ্যে প্রায় প্রতি পদেই বাধাবিপত্তি আসিয়াছে এবং সেই সকলের তিক্ত অভিজ্ঞতা দেশের জনসাধারণের দেহমনপ্রাণে অবসাদ ও বিকার আনিয়াছে। সেই অবসাদ ও বিকার দেশের শত্রুদলকে উৎসাহিত করিয়াছে ও দেশের ভিতরে যাহারা রাষ্ট্রধ্বংসে ব্যস্ত তাহাদেরও সম্মুখের ছিদ্রপথ দেখাইয়াছে।

কিন্তু এক বৎসর পূর্বে যখন দেশের সম্মুখে অগ্নিপরীক্ষা আসিল, বাহিরের দুই কুটিল শত্রু যখন এদেশের স্বাধীনতা বিপদগ্রস্ত করিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রের প্রচণ্ড বিপর্যয়ে সমস্ত দেশকে আলোড়িত করিল, তখন দেখা গেল যে নেতৃদলের আহ্বানে সারা দেশ সাড়া দিয়াছে এবং সেই সঙ্গেই দেখা গেল যে সারা দেশে পৌরুষের জাগরণ এবং অদম্য সাহস ও উদ্যমের স্ফুরণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে। শত্রুদল বুঝিল এদেশে নবজীবনের প্রাণস্রোত প্রবলভাবেই বহিতেছে এবং এদেশের সন্তানগণ যুদ্ধদানে পশ্চাদপদ হইবে না বরঞ্চ যুদ্ধের পরীক্ষায় ক্রমেই কঠোরতরভাবে অগ্রসর হইবে। যুদ্ধে পরাজয়ের এই অভাবনীয় প্রতিক্রিয়ায় শত্রু চিন্তিত হইল এবং আমাদের মিত্রদল আগাইয়া আসিল অস্ত্রবল যোগাইতে।

তারপর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে এবং চীনা সৈন্যের সেই অতর্কিত আক্রমণের দিনকে আমরা ভারতীয় সংহতি দিবসরূপে অনুষ্ঠিত করিয়াছি। সেই দিনে সারা দেশে বিরাট সভায় সংহতির শপথ উচ্চারিত ও গৃহীত হইয়াছে। শপথ ছিল এইরূপ :—

"সংগ্রাম যত দীর্ঘ ও কঠোর হোক না কেন এবং যতখানি ত্যাগস্বীকার করিতে হোক না কেন, আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও ঐক্যরক্ষার জন্য আমার দেশবাসী যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, আমিও সেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতেছি......"

"জাতির শক্তি ও সংহতি রক্ষা করিবার জন্য আমি দৃঢ়সংকল্প লইয়া কাজ করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি......"

সংহতির সঙ্কল্প গ্রহণ ও সেই সঙ্গে সারা দেশকে যেভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে আপৎকালীন অবস্থার এখনও অবসান হয় নাই, ইহা ঠিক যথাযথ কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতির অভ্যুত্থান ও প্রগতি যদি পূর্ণরূপে সঞ্চালিত করিতে হয়, এবং যে শত্রুবেষ্টিত অবস্থার মধ্যে এ দেশ ও জাতি রহিয়াছে সেই অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার আয়োজন যদি সম্যকভাবে করিতে হয় তবে ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি না হওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

যে অসংখ্য ভুলভ্রান্তির ফলে দেশের সন্তান-সন্ততি নিপীড়িত হইয়া নিঃস্ব ও নিষ্পিষ্ট হইতেছে সেই ভুলভ্রান্তি কি আমাদের নেতৃবর্গ বুঝিতে ও ধরিতে পারিয়াছেন ? এই যে চাউলের অভাব ঘোষণার ফলে দেশের যাবতীয় শস্যব্যবসায়ী ন্যায়, নীতি ও মনুষ্যত্বের সকল অনুভূতি বিসর্জন দিয়া দরিদ্র জনসাধারণের নিকট হইতে কোটি টাকার মত অতিরিক্ত মুনাফা লুটিল, সেই ব্যাপারে কি নিদারুণ ভুল করা হইয়াছিল সেটা কি আমাদের কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন?

দেশের লোকের উপর ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের প্রতিজ্ঞা আরোপ যখন করা হইয়াছে তখন তাহাদের স্বার্থ দেখা ও তাহাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করার প্রতিজ্ঞা কর্তৃপক্ষের লওয়া প্রয়োজন। নহিলে যে লোক নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রানির্বাহে চতুর্দিকে মার খাইতেছে সে দেশের ও দশের কি কাজে লাগিতে পারে। আমাদের নেতৃবর্গের একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আগে একবার এই উপলক্ষ্যে নমস্কার জ্ঞাপন করেছি। তখন চালের দুশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু তারপর অন্নাভাবে এত উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছিলাম যে

বিজয়ার নমস্কার

আগমনী না গাইতেই বিসর্জনের বন্দনা বেজে ওঠার উপক্রম হ'য়েছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সরকারী এবং বেসরকারী প্রয়াসে দু বেলা মোটামুটি দুটো এখন জুটছে। কাজেই বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ জানাতে একটু বেশি উৎসাহই বোধ করছি এখন। একটা বড় রকম অসুখ থেকে সেরে উঠলে পৃথিবীকে যেন অনেক বেশি স্পৃহনীয় ও সুন্দর মনে হয়, দুঃখ-দুশ্চিন্তার ধকল কাটার পর বিজয়া-সম্ভাষণও আমার কাছে তেমনি আনন্দদায়ক মনে হচ্ছে।

আশাকরি আপনারাও সকলে অপেক্ষাকৃত কম দুশ্চিন্তায় আছেন। পুনরায় নমস্কার গ্রহণ করুন।

•
• •

পুজোর আগে একদিন কাগজে একটি সংবাদ পড়ে মজা লাগল। সংবাদের শিরোনামা হল 'অস্তিত্বহীন পদে প্রমোশন'। নিচে জানানো হ'য়েছে—

কলিকাতা পৌর কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন এমন একটি পদে জনৈক কর্মচারীকে প্রমোশন দিয়াছেন যে পদটির বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নাই।......

এতে অনেকের হয়তো খুব হাসি পাবে, কিন্তু জৈমিনির হাসি পাচ্ছে না। প্রথমত, মাথা না থাকলেও যে মাথা ব্যথা হ'তে পারে এ তো আমরা সকলেই জানি।

থাকা না থাকার পুরণো স্বন্ধ

দ্বিতীয়ত, যা নেই সেইটেই আছে বলে মনে করতে পারে বলেই মানুষ কল্পনামূলক রচনা—যথা, শিল্প-সাহিত্য—ইত্যাদিতে উৎকর্ষ অর্জন করতে পেরেছে।

অন্যদিকে ব্রহ্মসাধনাও এই না-থাকার জন্যেই ব্যাকুলতা। ব্রহ্মের যতোগুলি গুণবাচক বিশেষণ আমাদের পরিচিত তার সবগুলিই যে নঙর্থক আশাকরি সে বিষয়ে দ্বিমত হবে না। সেই অনাদি, অনন্ত, অসীম, অচিন্ত্য ব্রহ্মের সাধনপথেই মানুষ অর্জন করেছে বেদ-বেদান্ত উপনিষদের পরম জ্ঞান।

কিন্তু ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলছি দেখে যাঁরা নিরুৎসাহ বোধ করছেন, তাঁদের জন্যেও আমার অন্য কাহিনী আছে।

আমি শুনেছি, গত মহাযুদ্ধের সময় কলকাতার কাছে একটি এরোড্রাম তৈরি করার আদেশ দেওয়া হ'য়েছিল। বছর খানেকের চেষ্টায় পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে তৈরি হল এরোড্রাম। মিলিটারী বড় কর্তা এলেন সেটা পরিদর্শন করতে। এসে তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। কিন্তু তারপর কী যেন ঘটল, তাঁর বিস্ময়ের মাত্রা ভয়ঙ্কর রকম কমে গেল। বিমানক্ষেত্রটি জঙ্গী বিমানের অব্যবহার্য ব'লে তিনি সেটা ভেঙে নতুন করে তৈরি করতে আদেশ দিলেন। ভাঙার জন্যে খরচ হল এক লক্ষ টাকা, এবং নতুন করে তৈরি করতে ছ' লক্ষ।

এ কাহিনীর একটা ফুটনোট আছে। তাতে জানা যাবে যে, প্রথম যখন মিলিটারী অফিসার এরোড্রাম দেখতে এসেছিলেন তখন তিনি তার চিহ্নমাত্রও দেখতে পাননি, সবই ছিল বন-বাদাড়। অথচ সেটা তৈরি করা হ'য়েছে বলে পাঁচ লক্ষ টাকা সরিয়ে নেওয়া হ'য়েছে রাজকোষ থেকে। এরপর হল একটা মিটমাট—মানে ইয়ে—। জঙ্গী-কর্তা অস্তিত্বহীন এরোড্রামকে ভেঙে ফেলার আদেশ দিলেন। তার খরচেরও হল একটা ইয়ে! তারপর বর্ধিত খরচে নতুন এরোড্রাম। সেখানেও ইয়ে।

আমি জানি, কর্পোরেশানের চাকরীর সঙ্গে এ-সব ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই খুঁটিনাটির দিকে নজর দেবেন না। শুধু আসল ব্যাপারটা লক্ষ্য করুন। অর্থাৎ, না থাকলেও কিছু এসে যায় না, আমাদের সেই প্রথম প্রতিপাদ্যটির কথা ভাবুন। আরো অনেক দৃষ্টান্ত পাবেন হাতের কাছেই।

বাড়ির বাজার গৃহ-পরিচারকের হাতে ছেড়ে দেখবেন, যে জিনিস কেনা হয়নি তার জন্যেও দাম ধরছে সে হিসাব দেবার সময়। অনেক টু্রিং অফিসারকেই জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন, যে-সব জায়গায় তাঁরা যান নি কিম্বা ট্রেনের যে ক্লাসের টিকিট তাঁরা কাটেননি এবং যে হোটেলে তাঁরা বসবাস ক'রেনি, তার প্রত্যেকটির জন্যেই তাঁরা বহুবার বিল আদায় করেছেন উপরওয়ালার কাছ থেকে। এমনি আরো কতো কি!

এ সবের তুলনায় কর্পোরেশান যে একজন দরিদ্র কেরাণীর পদোন্নতির জন্যে চেষ্টা করেছেন—যদিও সে চেষ্টা প্লাস-মাইনাসে মাইনাস হয়ে গেছে—তবু সেটা প্রশংসনীয়ই বলতে হবে।

এই আরম্ভ শুভ হোক!

•
• •

শেক্‌সপীয়ার যদিও বলেছেন নামে কী আসে যায়, তবু নামে যে বিলক্ষণ আসে যায় তা আমরা হামেশাই হৃদয়ঙ্গম করি।

সম্প্রতি কাগজে পড়লাম, এফ. এ. ও-র জনৈক পুষ্টি-বিশেষজ্ঞ লাতিন আমেরিকায় গিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, মাছ-কেনার ব্যাপারে সেখানকার মানুষ

নামে কতো আসে যায়

নাম নিয়েই বেশি মাথা ঘামায়। এক ধরনের মাছের নাম ছিল 'ক্যাট ফিস', সে মাছ কেউ কিনত না। কিন্তু যেই তার নাম বদলে রাখা হল 'কাটলেট ফিস' অমনি তার সে কি সমাদর! আরেক জাতের মাছের নাম ছিল 'ডগ ফিস', তার দিকে কেউ ফিরেও চাইত না। তারপর মার্কিনী কায়দায় তার নাম রাখা হল 'ফিস নং ৪৫', ব্যস্, মাছের জন্যে লাইন পড়ে গেল!

বাস্তবিকই তাই! আমার ব্যাপারটাই দেখুন না। নিজের নামে আমাকে ক'জনই বা কেয়ার করতেন, কিন্তু যেই আমি জৈমিনি হলাম অমনি সাত থেকে সত্তর পর্যন্ত সকলের হ'য়ে উঠলাম ভাই-বেরাদার!

ভারত দর্শন

সমকালীন গদ্যচিন্তা

অভয়ংকর
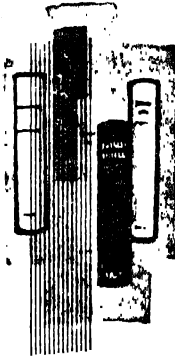
এবারকার মত দুর্গোৎসব শেষ। দুরকম মত অনুসারেই দুবার দেবীর বিসর্জন হয়েছে। দেবীর আগমন দোলায়—ফলং মড়কম্, হাতে হাতে ফলেছে, হাইতি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, আগরতলা ইত্যাদি। আর গজে গমন ফলে—শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। সেটাও মিলবে কারণ চাল চড়তে চড়তে পঞ্চাশোর্ধে যখন পোঁছেচে তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গে আগামী বৎসরে চাউলের অবস্থা আশাপ্রদ, "৫০ লক্ষ টন আমন চাউল উৎপন্ন হইবে"—চাউলের মূল্যে অবশ্য হ্রাস পাবে বলে মনে হয় না—যাই হোক দেবীর আগমন এবং বিজয়া শেষ হয়েছে। ফলাফল বিচার করুন জ্যোতিষশাস্ত্রার্ণবের দল, আমরা বৎসরান্তে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, মিত্র, শত্রু নির্বিশেষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, প্রীতি ও যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ছুটি কিভাবে কাটালাম। অর্থাৎ অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেছি কিনা, এর জবাবে আমি বুক ফুলিয়ে বলতে চাই "ভারত দেখে এলাম"—কোথায় যাই, জুড়াইতে যে চাই, ইত্যাদি মনোভঙ্গি নিয়ে পথে বেরিয়ে দেখা গেল ট্রাফিক জ্যাম, পদব্রজে পথ-পরিক্রমা অসম্ভব, চারিদিকে খোঁদল ইংরাজী নামটা বরং ভালো "পটহোল"। বৃষ্টি, কাদা। যাদের পথ ছাড়া আর আস্তানা নেই, তারা পথেই দুখানা ইট জড়ো করে কাঠ কুটো জেবলে রাঁধছে। গাছের তলায় পরমানন্দে ঘুমাচ্ছে, অনেক অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন কাচ্চাবাচ্চা এদিক ওদিক কুকুর-ছাগলদের দলে ভিড়ে খেলা করছে। গায়ে কাদা মাখছে, একটা ছ' বছরের মেয়ে সমানে হাঁচছে আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ওদিকে যে বুড়িটা ইটের উনুনে রান্না চড়িয়েছে সে প্রচণ্ড বেগে কাশছে, নিশ্চয়ই খুব অসুস্থ। আর মাঝে মাঝে চোখ মেলে বাচ্চাদের এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা দেখছে। শহরের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশের এই ছবি। এই মহানগরীর বুকে পীচঢালা পথের ধারে, রেডিয়ো-গ্রামো মুখরিত, মোটর-ঝঙ্কৃত উঁচু মহলের পাড়ার ছবি। ঘরে ফিরে এলাম—

ফিরে দেখি একটি যুবক বিজয়ার অভিবাদন জানাতে এসেছে, অল্পবয়সী যুবক, কোথাও না কোথায় একটা চাকরী করা উচিত। বি-এটা পাশ করেছে অনেকদিন। দুঃখের বিষয় আরো অসংখ্য ভারতবাসীর মত এ ছোকরাও বেকার। ছেলেটা যে গবেট তা নয়, শরীর খারাপ, টি, বি, কেস। একটা দাতব্য আশ্রয় থেকে আশ্রয়ান্তরে ঘুরে তার যৌবন কাটছে, যখন সে অর্থ সাহায্য চায় না তখন সে একটা না একটা হাসপাতালে আশ্রয় পেয়েছে। হাসপাতাল বেশীদিন রাখতে পারে না, ছেড়ে দিলেই সে আবার চাঙ্গা হয়ে অফিসের দোরে দোরে ঘোরে। রুগ্ন মানুষকে কে কাজ দেবে, সবাই বলে—'সরি—'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। হাতের কাছে ছিল ভারত সরকারের 'India' প্রায় দুশ' পাতায় নানাবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। এই আমার দেশ, কি বিচিত্র দেশ। কোনো চালাকি নয়, লোহিয়ার অনুমান নয়, সরকারি এই গ্রন্থ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক রচিত, প্রতিটি তথ্য এবং পরিসংখ্যান একেবারে নির্ভেজাল, নির্ভুল। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পরিচ্ছেদটি খুলে চমকে উঠলাম—প্রতি বছর আমাদের দেশের ২৫ লক্ষ লোক টি বিতে ভোগে, প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লক্ষ মারা যায়। ১৯৫৯-এর সংখ্যানুসারে এদেশে ৭০টি বিশেষ হাসপাতাল, স্যানাটোরিয়ম .৭১টি এবং রোগীদের শয্যা ২৫,০০০ মাত্র।

তারপর কুষ্ঠ, ১৯৫৩—কুষ্ঠের কবলে পড়েছে ১৫ লক্ষ লোক। ১৫টি কুষ্ঠ কেন্দ্র আছে সারা ভারতে। যৌন-ব্যাধি, পশ্চিম বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে শতকরা ৫ থেকে ৭ জন এই ব্যাধিতে ভোগে। তাছাড়া ম্যালেরিয়া, ক্যানসার, কালাজ্বর, কলেরা ইত্যাদির জন্য ভারত সরকারের তথ্যপুস্তক না ওলটালেও চলে। পথে পথে একটু চোখ চেয়ে ঘুরলেই স্বচক্ষে দেখা যাবে। দারিদ্র্য, রোগ ইত্যাদি আমাদের সয়ে গেছে, আর একজন ভারতীয় মারা গেল, —মারা গেল না বেঁচে গেল এই প্রশ্ন! আর একজন হাসপাতালে প্রবেশ করল, আর একজন ভূমিষ্ঠ হোল। কি এসে যায়, একজন কমল, একজন বাড়ল, হিসাব ঠিকই রইল।

সরকার সংগ্রাম করছেন এইসব সর্বনাশা শক্তির বিরুদ্ধে। অনেক সংকর্ম সরকার করছেন, তার হিসাব বছরে বার বার শুনি আমরা—তার জন্য অনেক ফাইল, অনেক কর্মচারী, অনেক স্টেশনারী ব্যয় হয়। তথাপি অনেক ছোট-খাটো ব্যাপারেও সরকারকে ব্যস্ত থাকতে হয়। উত্তর-প্রদেশের সরকারকে স্কুলের ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে বিব্রত করে তুলেছিল কিছুকাল আগে। তখন চরিত্র গেল, ধর্ম গেল, সব গেল বলে তাঁদের যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। সরকার নীতিগতভাবে মদ্যপানবিরোধী, টম্যাটো জুস পান করাই কর্তব্য। কিন্তু ক'জনে তা পালন করছে কে জানে!

বিদ্যালয় এখন না ধর্মক্ষেত্র, না কুরুক্ষেত্র। শিক্ষা ছাড়া আর সবই সেখানে হয়ে থাকে, কর্তৃপক্ষেরা হৈ হৈ করেন, শিক্ষকরাও ধর্মঘট করেন, ছাত্ররা পড়াশোনা বাদে আর সব করে থাকেন। না টেনিসকোর্ট, না ফুটবল, না ব্যায়ামাগার—না পড়াশোনা। ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের পণ্ডিতমশাই বলতেন—

'বেঞ্চি ভাড়া', ছেলেদের অভিভাবকরা নিয়মিত 'বেঞ্চি ভাড়া' দিচ্ছেন। কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিক অবনতি যাতে না ঘটে তার দিকে লক্ষ্য রাখছেন। একদল মাননীয় মন্ত্রী কিংবা ভীপ (VIp) বাহাদুরের মতিগতি ও মনোভঙ্গি আপনার আমার বিপরীত। তাই তাঁরা কেউ চান নাচ-গান-হল্লা, কেউ চান তা রোধ করতে। ছোট ছেলেমেয়ের নাচগান শুনে কোন পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির যৌন-জবালা জাগ্রত হয় কিনা জানি না, সরকারের কিন্তু নিজস্ব 'কীনসে রিপোর্ট' আছে, তাঁরা সেই মতে কাজ করেন।

খাদির পোশাক পরে অতি বিনীত ভঙ্গিতে পরস্পর 'নমস্তে' বিনিময় করা যাক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিরাম-বিহীন বক্তৃতা দেওয়া যাক, সেই বক্তৃতায় দেশবাসীর, মানে আদর্শ দেশবাসী হতে হলে কি কর্তব্য তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক। এ'রা সকলেই মহৎ মানুষ, সৎ ব্যক্তি, এ'রা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বরকে ভয় করেন, তাই তাঁরা আমাদের সৎ হতে উপদেশ দেন, সুনীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে বলেন। আমাদের চেয়ে মহৎ এই মানুষ-দের হাতেই আমাদের ভার, ভাগ্যিস্ ভুবনের ভার নেই।

India—1963 নিশ্চয়ই প্রকাশপথে, তার তথ্যসম্ভার আরো বিচিত্র, এবং আরো চমকপ্রদ হবে। দেশের জন্য খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, গবেষণা কর্ম ইত্যাদির জন্য আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন পরিকল্পনা হবে, সময় নেই, টাকা নেই, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই। কিন্তু সবই আবার হবে। আগামী বছর এই সময় অবস্থা ভালোর দিকে যাবে, চাল বাড়বে, আয় বাড়বে, লোকের জীবনের মান বাড়বে, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।

এই আমাদের ভারত, ধ্যানের ভারত, যে ভারতকে বিবেকানন্দ ভুলতে বারণ করেছেন, ছুটির অবসরে সেই ভারতেরই পথে পথে পরিক্রমণ করে এলাম, এক-খানি মাত্র তথ্য পুস্তকের মাধ্যমে 'India—1962' এর তথ্য সব নিখুঁত, নির্ভুল এবং স্বদেশে বিদেশের প্রয়ো-জনে সংকলিত।

আবার সকলকে অভিবাদন জানিয়ে এইবারকার বিজয়ার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দনের পালা শেষ করছি।

নতুন বই

।। রবীন্দ্র-দর্শন ।।

ডঃ সুধীরকুমার নন্দী প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক, এ ছাড়া তাঁর "নন্দনতত্ত্ব" নামক গ্রন্থটি সাহিত্য সমাজে সমাদর লাভ করেছে। "রবীন্দ্র-দর্শন অন্বীক্ষণ" নামক তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থে রবীন্দ্র-দর্শনের স্বরূপ নিরূপণ ও সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-দর্শন বিশেলষকরা সকলে একমত নন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র-দর্শনের বিচার করা হয়েছে। এই জাতীয় একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরা 'অমৃতে' ইতিপূর্বে সেই গ্রন্থের বিশদ আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ দ্বৈত-বাদী, কি অদ্বৈতবাদী, সুখবাদী বা শ্রেয়োবাদী, মানবতাবাদী না ভগবদবাদী এই সব প্রশ্নের চুলচেরা বিচার সহজসাধ্য নয়। মুর, মারসেল প্রভৃতি প্রবর্তিত ধারানুসারে ডঃ নন্দী রবীন্দ্র-দর্শনের স্বরূপ বিশেলষণে প্রয়াসী হয়েছেন। এই গ্রন্থের আলোচনার সূত্র ঊনবিংশ শতকে রে'নেসাসের কাল থেকে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা, রবীন্দ্র-দর্শনের মৌল-প্রত্যয়, তাঁর শিক্ষাদর্শন, শিল্পদর্শন এবং তাঁর মানবতাবাদ আলোচিত হয়েছে। তাঁর কাব্য অনুসৃত দর্শনচর্চা ও নাটক অনুসৃত দর্শনচর্চাও বিশেলষিত হয়েছে কয়েকটি অধ্যায়ে। লেখক যুক্তি শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং রস-শাস্ত্রের নির্দেশ স্মরণে রেখে সমগ্র বিষয়টি আলোচনা করেছেন আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে এবং নিঃসন্দেহে অভূত-পূর্ব সাফল্য লাভ করেছেন। রবীন্দ্র-দর্শন বিভাগে 'রবীন্দ্র-দর্শন অন্বীক্ষণ' তাই একটি মূল্যবান সংযোজন। ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

রবীন্দ্র-দর্শন অন্বীক্ষণ— ডঃ সুধীরকুমার নন্দী। শ্রীভূমি পাব্লিশিং কোং। ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম আট টাকা।

●

।। গার্হস্থ্য উপন্যাস ।।

বর্তমানের পটভূমিতে রচিত গার্হস্থ্য উপন্যাস। সেকালে গার্হস্থ্য উপন্যাস মানে ছিল বড়জা-ছোটজার কলহ। একালে ধনী বাপ, আলট্রা-মর্ডার্ণ সিনেমা-মার্কা কন্যা, পিতার দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষণশীল, মেয়েদের তা অপছন্দ, শেষ পর্যন্ত তারা সিনেমার তারকা হওয়ার জন্য আত্ম-বলিদান করে। 'জীবন সৈকতে' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসটির এই প্রতিপাদ্য। লেখকের কল্পনা শক্তি নিখুঁত, ভাষাও স্বচ্ছ। গ্রন্থের মধ্যে তিনি বর্তমান সমাজের একটি ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্যলাভ করেছেন।

জীবন-সৈকতে— (উপন্যাস) হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক— শ্রীগোপাল প্রকাশনী। টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৩৩। দাম আড়াই টাকা।

●

।। পুরাতনী ।।

বি-এ বাঙলা সম্মানিক শ্রেণীর পাঠক্রম অনুসারে রচিত সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অবহট্ট ও প্রাক-বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে "প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য সাহিত্য" গ্রন্থটি রচনা করেছেন নৈহাটি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। গ্রন্থটিতে ভারতীয় আর্য সাহিত্য, বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ-ইতিহাস, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান ধারা, পদ-কাব্য, গদ্য সাহিত্য, চম্পু কাব্য, নাট্য-সাহিত্য প্রভৃতি প্রথম খণ্ডে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যভারতীয় আর্য সাহিত্য আলোচিত হয়েছে। প্রাকৃত সাহিত্য এবং অবহট্ট ও প্রাক-বাঙলা সাহিত্য বিষয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিন্যাস ও পরিকল্পনার দিক থেকেও গ্রন্থটি সুন্দর হয়েছে। লেখকের ভাষা মধুর সেই কারণে ভাষাতত্ত্বের এমন গুরু বিষয়ের আলোচনাও পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হবে। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুন্দর।

প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য সাহিত্য— শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—সাত টাকা।

●

।। জীবনসংগ্রামের সৈনিক ।।

যষ্ঠিমধু সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ সরস-রচনার জন্য সুপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু গুরুত্বের বিষয়েও তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে 'নীল ঢেউ, সাদা ফেনা' নামক তাঁর উপন্যাসে। একটি লোক পাণ্ডুলিপি নিয়ে সম্পাদকের কাছে এসে-ছিল, তার মলিন বেশ এবং বুভুক্ষিত রূপ দেখে শ্রদ্ধা জাগেনি সম্পাদকের মনে, পরে পাণ্ডুলিপিতে সেই দরিদ্র লেখকের তথাকথিত আত্মজীবনী পাঠ করে সম্পাদক মোহিত হলেন। জীবন সংগ্রামের এক বিচিত্র কাহিনী এই উপন্যাস। বর্তমান সমাজজীবনের পট-ভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে শক্তিমান লেখক জীবনের এক অতি-পরিচিত এবং

অতি-অবহেলিত দিকের প্রতি সন্ধানী রশ্মি নিক্ষেপ করেছেন। বেণু চরিত্রটি আশ্চর্য ফুটে উঠেছে, নার্স বেণু আর আর মানবী বেণু জীবন্ত চরিত্র। শেষ অংকে জীবনসংগ্রামের অক্লান্ত সৈনিক উপন্যাসের নায়ক এই বেণুকে চিঠি লিখে পালায়—জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার উদ্দেশ্যে। আত্মহত্যা তার উদ্দেশ্য নয়। তাকে বাঁচতে হবে, সে যে এ দেশের হাজারো মানুষের প্রতীক। কুমারেশ ঘোষকে ধন্যবাদ তিনি এমন নিচিত্র বাস্তব চিত্রের সার্থক রূপায়নে সাফল্য-লাভ করেছেন। ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

নীল ঢেউ সাদা লেখা— (উপন্যাস)। **কুমারেশ ঘোষ। প্রকাশক—গ্রন্থগৃহ। ৮এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম চার টাকা।**

●

।। স্বদেশী সংগীত ।।

শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্তের কয়েকটি প্রচলিত জাতীয় সংগীতের সংকলন 'মুক্তির গান'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই গানগুলির মধ্যে 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা', 'হমারে লিয়ে বস হমারে' এবং 'হামারা সোনেকি হিন্দুস্থান' এই তিনটি গান বর্জন করলেই সংকলক সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। ভারতের ১৫টি ভাষায় এমনই অনেক জাতীয় সংগীত আছে, সেগুলির অপরাধ কি? বঙ্কিমচন্দ্র, কামিনী ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, সরলাদেবী, অতুলপ্রসাদ, কামিনী রায়, কাজী নজরুল প্রভৃতির অসংখ্য গান একত্রে পাওয়ার সুযোগ দান করার জন্য সংকলক আমাদের ধন্যবাদযোগ্য। একুশ সংখ্যক গানটির রচয়িতার নাম 'বিজয়রত্ন' নয় 'বিজয়চন্দ্র মজুমদার'। শেষাংশে কয়েকটি গানের স্বরলিপিও দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটিকে স্বদেশীগানের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন বলা চলে। ছাপা ও প্রচ্ছদ ভালো নয়। দামটাও কিঞ্চিৎ বেশী।

মুক্তির গান— (সংকলন)—শ্রীসতীশ **চন্দ্র সামন্ত। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম-দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।**

●

"দেশ সেবার মুখোস"

সর্বজনপ্রিয় দেশসেবক শ্রীকৃপাশংকর রায় মুক্তিসংঘের একজন প্রধান। তাঁর প্রাণহানি করার চেষ্টায় অভিযুক্ত সুবীর চৌধুরী। মুক্তিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সর্বেশ্বর মহারাজের দুজন সেরা শিষ্য সুবীর চৌধরী আর কৃপাশংকর রায়। সুবীর ফুটবলের পাকা সেন্টার ফরোয়ার্ড। কাহিনীর সূত্রপাত আদালতকক্ষে উকীলের জেরার মুখে আর শেষ হয়েছে 'মুক্তিসংঘে' সর্বেশ্বর মহারাজের প্রত্যাবর্তনে বাসন্তী ও সুবীরের মিলনের সম্ভাব্য মুহূর্তে। কৃপাশংকর বাসন্তীকে চুরি করেছিলেন। বাসন্তীকে সুবীর তার দুর্দিনে মাতুলালয়ে এনে তোলে, কিন্তু সেখানে আশ্রয় পায়নি ভট্চাজ আশ্রয় দেয়। 'মুক্তিসংঘ' ত্যাগ করার মুখে তার ভার দিয়েছিলেন সর্বেশ্বর মহারাজ সুবীরকে, কৃপাশংকর সে সংবাদ চেপে যায়। কৃপাশংকর বাসন্তীকে চুরি করে নিয়ে গিছল, সুবীর উদ্ধার করতে গিয়ে বিপদে পড়ে, শেষ দৃশ্যে সর্বেশ্বর মহারাজের প্রত্যাবর্তন এবং কৃপাশংকরের অন্তর্ধান। কাহিনীটি চিত্র-নাট্যের প্রয়োজনে লিখিত হলেও কুশলী শিল্পীর শক্তিমত্তার পরিচয় উপন্যাসটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

পতাকা যারে দাও— (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। **প্রকাশক—এস, সি, সরকার এ্যান্ড সন্স্ লিঃ, ১সি, কলেজ** স্কোয়ার, **কলিকাতা-১২। দাম—চার** টাকা **পঞ্চাশ নয়া পয়সা।**

●

।। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ।।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল একটি বৃহৎ গ্রন্থাগারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। এই বিভাগে তাঁর অধিকার ও অভিজ্ঞতা সর্বজন-স্বীকৃত। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার' নামক গ্রন্থটি গ্রন্থাগার সংক্রান্ত স্বল্প-সংখ্যক পুস্তকা-বলীর মধ্যে বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করবে। সাধারণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের নিঃশুল্ক বিশ্ববিদ্যালয়, এই বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সুযোগ আছে সকলের, আর সেখানে অবাধে সকল বিষয়ে পুস্তক-পাঠের সুবিধা গ্রহণ করে ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান ও শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে। সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে গ্রন্থাগারের মূল্য অসাধারণ। অভিজ্ঞ লেখক আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ সমাজ, সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগারে সেই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন দ্বিতীয় প্রবন্ধে। তৃতীয় প্রবন্ধটি কলিকাতা পাবলিক লাই-ব্রেরী সম্পর্কে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার বিশেষ দান এই লাইব্রেরী, এ ধরণের গ্রন্থাগার ভারতে এর আগে আর ছিল না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল এই গ্রন্থা-গারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন, পরবর্তী প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্রের গ্রন্থাগারিক জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'ট্রিবিউনে'র কাজ ছেড়ে তিনি এই পদ গ্রহণ করেন। কোষগ্রন্থের কথা প্রবন্ধে লেখক কোষ-গ্রন্থসংকলনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকরণ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া 'বাংলা বই-এর একাল ও সেকাল' 'জাতীয় সাহিত্যের উন্নয়নের পরিকল্পনা' 'আমাদের পাঠ্যপুস্তক', 'অশ্লীলতা নিবারক আইন' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিও মূল্যবান এবং তথ্যসমৃদ্ধ। 'রবীন্দ্র-রচনার সমকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্য', 'পাশ্চাত্য সাহিত্যের একশত বই,' এই দুটি প্রবন্ধ রচনায় লেখকের নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। 'গান্ধীজীর পাঠ-চর্চা, প্রবন্ধটিতে গান্ধিজীর জ্ঞান-পিপাসার নিদর্শন ছাড়াও যে জিনিসটি পাওয়া যায় সেটি হল গান্ধিজীর মানসিক আবহাওয়া সৃষ্টিতে কি জাতীয় গ্রন্থ সাহায্য করেছে তার বিবরণ। শেষ প্রবন্ধটিতে আছে 'ভারতের বাংলাভাষী' সম্পর্কে এক পরিসংখ্যানমূলক আলো-চনা। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও গ্রন্থাগার পরিচালকদের পক্ষে অপরি-হার্য মনে করি, আর সেই কারণে লেখককে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার— **চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি-কাতা-১৩। দাম-পাঁচ টাকা॥**

●

বিশ্বসাহিত্যের লেখক

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যের জগতে একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসাবে তাঁর নাম সর্বজনবিদিত। সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি কম নয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের 'বিশ্বসাহিত্যের লেখক' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। উনিশ ও বিশ শতকের বিশ্বসাহিত্যে যে সমস্ত সাহিত্যিকের প্রতিভাময় ব্যক্তিত্ব নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে এসেছে বর্তমান গ্রন্থে তাঁদের শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ আছে। আলবেয়র কামু, হেমিং-ওয়ে, এলিয়ট, টমাস মান, ডস্টয়ভস্কি, পাস্টারনাক, র‍্যাঁবো, টলস্টয়, মায়াকো-ভস্কী, সমরসেট মম, ফ্রাংক হ্যারিস, চেস্টারটন এবং আরো কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা আছে। শেক্সপীয়ার রহস্য, রূপকথার যাদুকর এণ্ডারসন, উইম-পোল স্ট্রীটের কবি রবার্ট ব্রাউনিং, দুর্দমনীয় দ্যানুনংলিও প্রভৃতি আলো-চনাগুলি গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। মোটামুটিভাবে বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে যাঁরা সংক্ষেপে কিছু জানতে চান এই

গ্রন্থখানি তাঁদের সব থেকে বেশি সাহায্য করবে।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এই ক্ষুদ্রাকৃতির মূল্যবান গ্রন্থখানি বাঙলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করল।

বিশ্বসাহিত্যের লেখক—(প্রবন্ধ)— ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম পাঁচ টাকা।

●

।। বিশ্বকবির রেখাচিত্র ।।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ এবং আলোচনার লেখক। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেছে। ইংরাজী ভাষায় রচিত তাঁর এই গ্রন্থটি সম্প্রতি বোম্বাই য়ুনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশ করেছেন। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে কয়টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই গ্রন্থে তা সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী তৃতীয় পুরুষের দলে বুদ্ধদেব বসু, এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গীর সঙ্গে অনেকখানি সমমর্মিতা অনুভব করেন একথা বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—

"He was a marvel of a man, a peer of da Vinci and Goethe, handsome, powerful in physique, abundant, versatile, superbly poised in himself a veritable God among men" এইভাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব আলোচনা করেছেন বক্তা বুদ্ধদেব বসু। বক্তৃতা হিসাবেই প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। বুদ্ধদেব বসু ভক্তিবাদী লোক নন, তিনি প্রবলভাবে যুক্তিবাদী; তাঁর এই যুক্তিনিষ্ঠ ভাবাবেগহীন নিস্পৃহ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এক সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি প্রকাশিত। বাঙলা যাঁদের মাতৃভাষা নয় রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারে গ্রন্থটি তাঁদের সহায়ক হবে। ছাপা এবং বাঁধাই চমৎকার।

TAGORE — Portrait of a Poet— Buddhadeva Bose, University of Bombay, Bombay. Price — Rupees eight seventy-five only.

●

।। চীনের আক্রমণ ।।

ভারতের চৈনিক আক্রমণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন শ্রীকালোবরণ ঘোষ। গ্রন্থটির নাম CHINESE INVASION OF INDIA—। এই অশোষিত যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক প্রকার পুস্তিকা ও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে; ভারত সরকার এই অভিযানে কিভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন এবং প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় উদ্যোগী হয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। প্রথম অধ্যায়ে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় থেকে কৃষ্ণ মেননের বিদায়কাল পর্যন্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে ক্যারিবিনের পটভূমিকা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রতিরক্ষামন্ত্রী চৌহানের আগমন ও যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় জনগণ এবং আলাপ-আলোচনায় ভারত সম্পর্কে দুটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে এবং সর্বশেষে 'চীন ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র' শীর্ষক পরিচ্ছেদে চৈনিক সম্প্রসারণ অভীপ্সার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক সমকালীন সংবাদের সূত্রে এই সাম্প্রতিক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি ইংরাজী ভাষায় রচিত, তাই আশা করা যায় বিদেশী পাঠকের কাছেও এই গ্রন্থ সমাদৃত হবে, তবে ছাপা ও বাঁধাই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হবে না, এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল।

CHINESE INVASION OF INDIA —Kalobaran Ghosh, Publisher, Banachaya Ghosh, 15/6, Deodar Street, Calcutta-19. Price Rs. 5/- only.

●

।। মার্কিন সংবিধান ।।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতিপদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই পদের ক্ষমতা ও তার প্রয়োগ, ব্যক্তিগত পরিচয় ও সমস্যাবলী সম্পর্কে **The American Presidency—** নামে ক্লিনটন রসিটার মূলে ইংরাজীতে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তার বঙ্গানুবাদ করেছেন জ্যোতিভূষণ দাশগুপ্ত। এই গ্রন্থে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতিত্বের সীমা, পদের ঐতিহাসিক ভূমিকা, আধুনিক রাষ্ট্রপতিত্ব, রাষ্ট্রপতিগণ, রাষ্ট্রপতি বিনিয়োগ, পদচ্যুতি, অবসরগ্রহণ ও মৃত্যু, ভবিষ্যৎ এবং সংবিধানে রাষ্ট্রপতিত্ব এই কয়টি পরিচ্ছদ আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। অনুবাদ সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি— ক্লিনটন রসিটার। অনুবাদ—ডঃ জ্যোতিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী। ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম ৫ টাকা।

।। ভাগ্য-গণনা ।।

নম্বর বা সংখ্যার সাহায্যে সহজে আপন ভাগ্যগণনার এক সহজ পাঠ 'সাংখ্য-জ্যোতিষ' নামধেয় পুস্তিকাটি। জ্যোতির্বিশারদ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য জানার সংকেত দান করেছেন, সেই হিসাবে তাঁর এই গ্রন্থ অভিনব। একটি সংখ্যা আরেকটি সংখ্যার মিত্র বা বিরোধী হতে পারে। এই সাংখ্যজ্যোতিষ একদা মিশরে প্রচলিত ছিল। আপন ভাগ্যের রহস্য জানার লোভ মানুষ মাত্রেরই প্রবল, এই গ্রন্থটি তাঁদের কৌতূহল মেটাতে সক্ষম হবে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে গ্রন্থটি বোঝার কোনও অসুবিধা নেই।

সাংখ্য জ্যোতিষ—সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, সেকপুরা—মেদিনীপুর। দাম ২·২৫ নঃ পয়সা।

●

॥ শারদীয় পত্রিকা ॥

● **বসুধারা** ।। এই বৃহদায়তন সংখ্যাটিতে লিখেছেন—প্রফুল্লকুমার সেন, নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার দত্ত, নির্মলকুমার বসু, দীপ্তি ত্রিপাঠী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লীনা নন্দী, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, পশুপতি ভট্টাচার্য, বনফুল, প্রবোধকুমার সান্যাল, আশাপূর্ণা দেবী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, গৌরী আইয়ুব, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণধন দে, হরপ্রসাদ মিত্র, গোবিন্দ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, দিলীপ দত্ত, দেবনারায়ণ গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী এবং আরো কয়েকজন। শ্রীসুকুমার দত্তের সম্পাদনায় পত্রিকাটি ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৬ থেকে প্রকাশিত হয়। দাম তিন টাকা।

● **উত্তর-কাল** সতীন্দ্রনাথ মৈত্র ও প্রসূন বসুর সম্পাদনায় ১৭।১ মদনগোপাল লেন, কলিকাতা—১২ থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—সুশোভন সরকার, অশোক রুদ্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রদ্যোৎ গুহ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়তোষ মৈত্রেয়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, গোপাল ভৌমিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, চিত্ত ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ

চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ধনঞ্জয় দাশ, অরুণ সান্যাল, রাম বসু, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অসীম রায়, আশিস সান্যাল, তুষার চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন বসু, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পান্নালাল দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। দাম দু টাকা।

● **বিচার**-এর বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন যামিনীকান্ত সোম, গোপাল ভৌমিক, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ কোলে, ভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকে। প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের সম্পাদনায় ১১ হেম চক্রবর্তী লেন, হাওড়া থেকে বিচার প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

● **আশ্চর্য**। এই অভিনব পত্রিকাটি ইতিমধ্যে পাঠকসমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান বিশেষ সংখ্যায় যাঁদের লেখা আছে তাঁরা হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, জন স্টাইনবেক, সমরজিৎ কর, নারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীধর সেনাপতি, আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য, বিন্দু দাস, গৌরীশংকর দে, মনোরঞ্জন দে, বারট্রান্ড রাসেল, নরেন্দ্র দেব, পিটার হুরোকস, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনিরুদ্ধ। আকাশ সেন সম্পাদিত এই পত্রিকাটি আলফা-বিটা পাবলিকেশনস্, পোস্টবক্স ২৫৩৯, কলকাতা—১ থেকে প্রকাশিত। দাম আড়াই টাকা।

● বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত **গণবার্তা-র** শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন—অরবিন্দ পোদ্দার, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অন্নদাশংকর রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ত্রিদিব চৌধুরী, রামমনোহর লোহিয়া, অরুণ ভট্টাচার্য, ভবানী সেন, আলবার ক্যামুর নাটক (অনুবাদ : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), প্রেমেন্দ্র মিত্র, অতীন্দ্র মজুমদার, ভবানী মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, আশিস সান্যাল এবং আরো অনেকে। দাম আড়াই টাকা।

● **মৌচাক** সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত দীর্ঘকালের ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা। বর্তমান শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন—কালিদাস রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, মনোজ বসু, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুখলতা রাও, স্বপনবুড়ো, ইন্দিরা দেবী, প্রবীর বিশ্বাস ও দুর্গাদাস সরকার। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলকাতা বার থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির দাম পঁয়তাল্লিশ নয়া পয়সা।

● **তরুণ তীর্থ**। ৩৭ রিপণ স্ট্রীট, কলকাতা—৬ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকায় লিখেছেন—জরাসন্ধ, ইন্দিরা দেবী, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, পুষ্প বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, সুখলতা রাও, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী রায়-চৌধুরী, বিশু মুখোপাধ্যায়, হিমানীশ গোস্বামী, সতীকুমার নাগ এবং আরো অনেকে। দাম এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

● শ্রীসুবোধ ঘোষ সম্পাদিত **ঋতুপত্র** পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যা কয়েকটি সুনির্বাচিত রচনা সমাবেশে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই সংখ্যায় যাদের লেখা আছে—সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, তাপস বসু, অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, কালিদাস রক্ষিত, শ্রীচক্রবর্তী এবং কয়েকজন। প্রকাশনস্থান : ১৫এ, অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জি লেন, কলকাতা—১০। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

● **ফসল** পত্রিকায় লিখেছেন : অরুণ সেন, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, নিতাই বসু, দিলীপ মিত্র, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। আফ্রিকার ছটি নিগ্রো কবিতার অনুবাদ করেছেন সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ৩৭ কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া, হাওড়া থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

● স্বগত সাহিত্য পরিষদের পরিচালনায় এবং মৃণালকান্তি ঘোষের সম্পাদনায় **স্বগত** ই.এল—২। ১০৯, স্টীল টাউন, দুর্গাপুর—৪ থেকে প্রকাশিত। এবারের শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধীরানন্দ ঠাকুর, অরুণ সোম, সুখেন্দু রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অশোক পালিত, অনন্ত দাশ, আশিস সান্যাল, আশিস পাঠক এবং আরো কয়েকজন। দাম এক টাকা।

● **মোহনা** অরুণ বসাকের সম্পাদনায় বজবজ, ২৪-পরগণা থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাঁদের এই বিশেষ সংখ্যায় লিখেছেন : নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মিহির আচার্য, কৃষ্ণ ধর, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুবন্ধু ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। দাম এক টাকা।

● **রূপসী বাংলা**-য় লিখেছেন : নরেন্দ্র দেব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীমন্ত সওদাগর, আশা দেবী, বোম্মানা বিশ্বনাথম, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ফাদার ফাঁলো, ফাদার দ্যতিয়েন, রাম বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল বসু চৌধুরী এবং আরো অনেকে। 'রূপসী বাংলা' শ্রীমন্ত সওদাগরের সম্পাদনায় বারো ফেরীঘাট স্ট্রীট, তেলিনীপাড়া, হুগলী থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। দাম এক টাকা।

● পোস্টাল কলোনী, কলকাতা—৩২ থেকে প্রকাশিত **আধুনিক কবিতা** পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন শ্রীরেখা দত্ত। বর্তমান দশম সংকলনে লিখেছেন—গোপাল ভৌমিক, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার দত্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, বুদ্ধদেব গুহ এবং আরো কয়েকজন। দাম পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

● প্রশান্ত গুহ সম্পাদিত **মঞ্চ** পত্রিকায় লিখেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য, অলোক সেন, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুবিমল রায়, মমতাজ আমেদ খাঁ, মহম্মদ জাকারিয়া, সরোজ ঘোষ, বিমল গুপ্ত এবং আরো কয়েকজন। ১০৯।২৩, হাজরা রোড, কলকাতা—২৬ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির দাম এক টাকা।

● **মহিলামহল**। সমাজ-কল্যাণে নিবেদিত বাঙালী মেয়েদের মাসিকপত্রের সপ্তদশ বর্ষের শারদ সংখ্যায় লিখেছেন : রমা চৌধুরী, উমা দেবী, সন্ধ্যা ভাদুড়ী, হেমপ্রভা দেবী, ঊষা দেবী, কুন্তলা দত্ত, পুষ্পদল ভট্টাচার্য, সাবিত্রী দত্ত, অন্নপূর্ণা ভাদুড়ী, মীনাক্ষী চৌধুরী, অনামিকা রায়, জয়ন্তী সেন, অরুণা মুখোপাধ্যায়, সুরুচি সেনগুপ্ত, ভক্তি দত্ত, কনকলতা ঘোষ, সাধনা দেবী, অমিতা দেবী, অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, সুষমা দাশগুপ্ত, শেফালি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাকুমারী বসু, মায়া বসু, জ্যোতির্ময়ী দেবী, ছবি গুপ্ত, রেণুকা দেবী, মণিমালা দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকে। অঞ্জলি বসুর সম্পাদনায় ৫৪-বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

● **সাহিত্যের খবর**। মনোজ বসু সম্পাদিত সাহিত্য-ভাবনায় প্রোজ্জ্বল মাসিক পত্রিকাটি শারদ সংখ্যা একাদশ বর্ষে পদার্পণ করল। এই বিশেষ সংখ্যায় লিখেছেন : শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, রাণা বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত সিংহ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু ঘোষ এবং অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। ১৪ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা : ১২ থেকে প্রকাশিত এই বিশেষ সংখ্যাটির দাম : ৭৫ নয়া পয়সা।

অ্যাসিড

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউ জানে না অঞ্জনা কোথায় চ'লে গেছে তার স্বামীকে নিয়ে। ইচ্ছে ক'রেই কাউকে সে জানিয়ে যায়নি। সহস্র রকমের উপদেশ আর প্রশ্ন তাকে শুধু পাগল ক'রতেই বাকি রেখেছে। এর জন্যে নিজেকেই অঞ্জনা অনুযোগ দেয়। প্রশ্ন আর উপদেশ বর্ষণের রাস্তা সে নিজেই দেখিয়েছে। আর সেই রাস্তাটাই তাকে সহস্র পাকে জড়িয়ে জড়িয়ে শ্বাসরোধ ক'রে মারতে উদ্যত হ'য়েছে। মৃত্যুকে একদিন অঞ্জনা কায়মনে চেয়েছিল। একটা প্রকাণ্ড সমস্যার হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আজ আর সে তা চায় না। বরং সকল প্রকার বাধার বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়িয়েছে। জীবনযুদ্ধে পিছু হ'টতে সে আজ কিছুতেই পারবে না। যে অতীত তার গলা টিপে ধরেছিল তাকে জীবনের পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেলে বর্তমান আর ভবিষ্যতের ক্যান-ভাসের উপর অঞ্জনা ছবি আঁকবে জীবনের ছবি। স্নেহ, মমতা আর প্রেম-প্রীতির রং দিয়ে সুন্দরের সৃষ্টি ক'রবে।

তারই সাধনায় সে আজ মগ্ন। আত্ম-সমাহিত। লোকে বলে, দেবী। মানুষের দেহে দেবতা আশ্রয় নিয়েছে। নইলে আজকের এই অসংযত দুনিয়ায় এতবড় নিষ্ঠা আর প্রেম কেমন ক'রে সম্ভব হ'তে পারে। আইন যেখানে হাতের মুঠোয়—সমাজ যেখানে বাঁধন শিথিল ক'রে দিয়েছে রাষ্ট্রের কানুনে, সেখানে এমন দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র কল্পনা।

অঞ্জনার কানে এসব কথা প্রতিদিনই আসে। রীতিমত পল্লবিত হ'য়েই আসে, কিন্তু সে প্রতিবাদ ক'রতে পারে না। ওরা যা খুশি বলুক। প্রশ্ন আর উপদেশ, নিন্দা আর হেনস্তার চেয়ে এ বরং সে সহ্য ক'রে নেবে। যদিও এত স্তব-স্তুতির সে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

আনন্দকে অনুযোগ দিয়ে অঞ্জনা বলে, আমার অন্য কোন উপায় নেই বলেই চুপ ক'রে থাকি। কিন্তু দোহাই তোমার আশে পাশের লোকগুলিকে তুমি আর এভাবে মিথ্যে ক্ষেপিয়ে তুলো না। এতে যে আমি কত কষ্ট পাই তা কি তুমি বোঝ না?

আনন্দ ম্লান হেসে বলে, কিন্তু আমি যে সুখ পাই অনু—তাছাড়া মিথ্যে তুমি কাকে বলছো। আমার মত একটা অন্ধ অক্ষম মানুষকে তুমি স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছো। তার সেবায় যত্নে নিজেকে......

থামো...বাধা দেয় অঞ্জনা, তাহ'লে কেন এ কাজ ক'রেছি সে কথাটাও সকলকে শুনিয়ে দিও। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো?

কি?

তুমি ইচ্ছে করেই আমাকে দুঃখ দিচ্ছ।

অঞ্জনার কণ্ঠস্বর ভিজে ভিজে মনে হ'লো আনন্দর। সে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে ডাকল, তুমি আমার কাছে একটু সরে এসো অনু।

না...অঞ্জনা জবাব দেয়।

লক্ষ্মীটি রাগ ক'রো না—আনন্দ বলতে থাকে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমি সুখ পাই এ কথা তুমি ভাবতে পারলে কেমন ক'রে! আমি চোখে দেখতে পাই না তাই মনে মনে তোমাকে যেভাবে দেখি সেই কথাই আমি দশজনার কাছে বলি। আমার বুক ভ'রে ওঠে। এতে যদি তুমি ব্যথা পাও তাহ'লে না হয় চুপ ক'রেই থাকব। আমার মন শুধু একটি লোককেই দেখতে পায় যে...

চমকে উঠে এগিয়ে আসে অঞ্জনা। আবেগভরে অঞ্জনা স্বামীর মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে। কাঁপা গলায় ফিস ফিস করে বলে, আর কখনও এসব কথা ব'লবো না। কিন্তু আমি যে কিছুতেই সেসব কথা ভুলতে পারছি না। তোমার এই দুর্দশার—

অঞ্জনার মুখ চেপে ধরে আনন্দ। উত্তেজনায় সে কাঁপছে। তারপরে সে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে থাকে অঞ্জনার পিঠে, মাথায় আর গালে।

বলে, তুমি দিন দিন রোগা হ'য়ে যাচ্ছ অনু...

অঞ্জনা বাধা দেয়, তোমার ভুল।

আনন্দ মাথা নাড়তে নাড়তে বলে আমার হাত মিথ্যে বলে না অনু। আর সেই জন্যেই তুমি আমার কাছে আসতে চাও না। দূরে দূরে থাক।

তুমি পাগল।

আনন্দ জবাব দেয় না। সঙ্গোপনে একটি নিঃশ্বাস চেপে যায়।

আনন্দর একখানি হাত নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে অঞ্জনা বলে, এর চেয়ে চেহারা আমার মোটা ছিল কবে..

তোমার কণ্ঠার হাড় বার করা ছিল না কিন্তু।

আর কিছু ব'লবে?...

আজকাল তুমি আমার সঙ্গে লুকো-চুরি খেলতে শুরু ক'রেছো—

অঞ্জনা মনে মনে একটু চমকে উঠল। প্রকাশ্যে আনন্দর কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে মিষ্টি করে বললে, নইলে তুমি আমায় কাছে ডাক না যে...

কত কাজ তোমার। প্রত্যেকটি মুহূর্ত তোমার মূল্যবান।

আমার প্রত্যেকটি মুহূর্ত তোমার। অনু.........

তোমার বিশ্বাস হয়?

হয়। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তুমি দিলে না অনু।

কোন প্রশ্নের? শরীর খারাপ হ'লো কেন তাই? ও কিছু না। নিতান্তই সাময়িক। কথা দিচ্ছি, সত্যি সত্যি শরীর খারাপ হ'লে তোমার কাছে লুকোবো না।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে আনন্দ বলে, অবশ্য আমি জেনেই বা কতটুকু কাজে আসবো।

আবার বাজে কথা...অঞ্জনা সস্নেহ ধমক দেয়।

খানিক নিঃশব্দ থেকে আনন্দ পুনরায় কথা ক'য়ে ওঠে, তুমি নিজেই বলো যে, আমাদের অতীত বলে কোনদিন কিছু ছিল না। হাতের মুঠোয় আছে বর্তমান আর সামনে র'য়েছে ভবিষ্যৎ।

তাই তো, অঞ্জনা জবাব দেয়।

তবুও বলবে ইচ্ছে করে তোমাকে আমি কষ্ট দিই!

এ কথার কোন জবাব দেয় না অঞ্জনা, শুধু তার একখানি হাত আস্তে আস্তে আনন্দর বিপর্যস্ত চুলগুলির মধ্যে আনা-গোনা করতে থাকে।

এমনি করেই অঞ্জনার দিনগুলি সুখে দুঃখে কেটে যাচ্ছিল। স্কুলে ছাত্রীদের নিয়ে, বাড়ীতে আনন্দকে নিয়ে আর স্কুল আর বাড়ীর বাইরে স্কুল সেক্রেটারী বিমানকে নিয়ে। বিমান সজ্জন ও ভদ্র ব্যক্তি। পয়সা কড়িও আছে আর হাতে প্রচুর, সময়ও আছে। বিয়ে থা করেনি। শোনা যায় বিবাহে তার আগ্রহ নেই। সমস্ত গ্রামটাই তার সংসার। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা তার পোষ্য। কেমন করে একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা যায় এই নিয়ে যত সে চিন্তা করে আর কথা বলে, তার চেয়ে ঢের বেশী করে কাজ। কাজের মধ্যেই বিমান তার জীবনের আদর্শকে খুঁজে পেয়েছে। গ্রামের মধ্যে এই মেয়ে-দের স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র তারই চেষ্টা ও উদ্যমে সম্ভব হ'য়েছে। এই স্কুলেরই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অঞ্জনা। বিমানই তাকে নিয়োগ ক'রেছে।

স্কুল পরিচালনার ভালমন্দ নি'য়ে আলোচনা করতে অঞ্জনাকেও যেমন মাঝে মাঝে বিমানের বাড়ীতে যেতে হয় তেমনি প্রয়োজন বোধে বিমানকেও ছুটে আসতে হয়। কিন্তু প্রথম দিন অঞ্জনার স্বামী আনন্দকে দেখে সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল, অঞ্জনা দেবী......

অঞ্জনা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমার স্বামী—তারপরে আনন্দকে উদ্দেশ করে বলল, আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী এসেছেন।

আনন্দ দু'হাত যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে একটু হেসে বলল, আপনার কথা কত যে শুনেছি···...শুনেই আনন্দ পাই। কিছু ক'রবার নেই......ভাগ্যের দোষে চোখ দুটো খুইয়েছি নইলে আপনার এই মহৎ প্রচেষ্টায় হয়তো......

বিমান বাধা দেয়, অঞ্জনা দেবী বাড়িয়ে বলেছেন। কি আর ক'রতে পেরেছি।

আনন্দ বলে, কি যে আপনি বলেন বিমানবাবু। যে কাজে আজ অনেকের এগিয়ে আসা উচিত ছিল কিন্তু আসেনি, আপনি......

আবার বাধা দিল বিমান, বলল, সেই পথে শুধু পা বাড়িয়েছি। বিশেষ কিছু করে উঠতে পারিনি।

ঐ একটি দিনই। তারপরে যতবার বিমান এ বাড়ীতে এসেছে আনন্দর কাছাকাছিও যায় নি। অঞ্জনাই তাকে নিষেধ করে দিয়েছে। বলেছে, চোখ হারিয়ে আনন্দ বড্ড স্পর্শকাতর হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান চেহারা নিয়ে কেউ ওকে কোন প্রশ্ন করে এটা সে চায় না।

এমনকি ওর সম্বন্ধে অঞ্জনাকেও কেউ কোন প্রশ্ন ক'রলে সে হাসিমুখে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। বলে, কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আগ্রহ না দেখানই ভাল। তাছাড়া সকলের বিচার বুদ্ধি একরকম হয় না যে।

বিমানের কি একটা প্রশ্নের উত্তরেও ঠিক একই জবাব দিয়েছিল অঞ্জনা। কিন্তু আর সকলের মত বিমানকে এক কথায় থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। সে লজ্জা পে'য়েও পাল্টা প্রশ্ন ক'রল, ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আগ্রহ দেখান ভদ্রতাবিরুদ্ধ তা জানি তবুও এটা আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না যে, এমনটি কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো? আপনার মত একজন শিক্ষিতা রুচিসম্পন্না...মানে এটা আমার নিছক একটা কৌতূহল......

বিমানকে থামিয়ে দিয়ে একটুখানি হেসে অঞ্জনা জবাব দিয়েছিল, মেয়েদের

চরিত্র দেবতারাও সঠিক বোঝেন না একথা কি আপনি শোনেননি? আমি কিন্তু, আর একটু বাড়িয়ে বলি। মেয়েদের চরিত্র শুধু দেবতা কিংবা মানুষের কাছেই দুর্জ্ঞেয় নয় তাদের নিজেদের কাছেও অস্পষ্ট।

বিমান চুপ করে চেয়ে থাকে। অঞ্জনা আস্তে আস্তে বলতে থাকে. আনন্দকে নিয়ে অনেকের মত আপনার মনেও একটা কৌতূহল দানা বেঁধে উঠেছে। খুবই স্বাভাবিক এটা। আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন। আপনার অনুগ্রহেই আমি আমার অক্ষম স্বামীর.........

বিমান বাধা দিল. এসব কথা কে শুনতে চেয়েছে আপনার কাছে অঞ্জনা দেবী।

অঞ্জনা থামতে পারে না। বলতে থাকে, কি যে আপনি শুনতে চান্ তা কি আমি বুঝি না বিমানবাবু? এখানে এসে অবধি অনেকের মধ্যেই আমাদের বিবাহিত জীবন নিয়ে একটা অনুকম্পার প্রকাশ পেতে দেখেছি। আপনার কৌতূহলটাও কি ঐ অনুকম্পার নামান্তর নয়? কিন্তু কেন? আমি কি কোনদিন কারুর কাছে নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়েছি...··কেনইবা যাব বিমানবাবু। আমার স্বামীকে নিয়ে আমি ত' বেশ সুখেই আছি। আনন্দর মত উঁচু মন কজনা লোকের আছে আমি জানি না, কিন্তু আমার চোখে আজও পড়েনি ভবিষ্যতে পড়বে বলেও আমি বিশ্বাস করি না।

আনন্দবাবু কিন্তু অন্য কথা বল্লেন। তিনি বল্লেন......

আবার বাধা দিল অঞ্জনা, আমি জানি বিমানবাবু। ওর কন্ঠস্বর গভীর হ'য়ে উঠল, আনন্দ বর্তমান, আনন্দ ভবিষ্যৎ আর আমি অতীতকে মূলধন ক'রে বর্তমান আর ভবিষ্যতের ছবি এ'কে চলেছি। ও'র মত মুক্ত আর সচ্ছন্দ মন আমার নয়। এর জন্যে আমি কষ্টও যেমন পাই আনন্দও বড় কম পাই না বিমানবাবু।

বিমান বল্লে, বুঝলাম না।

অঞ্জনার মুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল। বলল, বেশ যা হোক বুঝবার মত ক'রে বললে তো আপনি বুঝবেন। কিন্তু এসব কথা থাক তারচেয়ে স্কুলের বিষয় কি জরুরী আলোচনা আছে জানিয়েছিলেন......

বিমান বলে, স্কুলের বিষয় আর কি আলোচনা করবো অঞ্জনা দেবী। আপনি বেশ ভালই চালাচ্ছেন। সেক্রেটারী হিসেবে একটু খোঁজ খবর করা এই আর কি......

অঞ্জনা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, ঐ দেখুন শুরু হয়ে গেছে। দেখে আমি কেন আবার আনন্দ ডাকছে। সে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল। নিঃশব্দে এস আনন্দর কাছাকাছি দাঁড়াল। তার মুখের পানে খানিক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অঞ্জনা মনে মনে বলতে থাকে. ওরা কেউ তোমাকে চেনে না আনন্দ, তাই হিসেবে ভুল করে।

আনন্দ জানালার দিকে মুখ করে চুপচাপ বসে ছিল। সহসা ঘুরে বসে স্মিত হেসে বলল, তুমি এতক্ষণে এলে অনু। বিমানবাবু চলে গেলেন বুঝি।

অঞ্জনা আরও একটু এগিয়ে এসে আনন্দর পিঠের উপর একখানি হাত রেখে জবাব দেয়, না যাননি এখনও। অনেকক্ষণ তুমি একলা আছো তাই দেখতে এলাম।

আনন্দ ডাকে, অঞ্জু—

কি বলছো?

মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো?

না।

বললে তুমি হয়তো রাগ করবে—

তাহলে বলতে হবে না।

সেই ভাল। তুমি বরং কাজ সেরেই এসো। আজ আমার বড্ড গল্প করতে ইচ্ছে হচ্ছে অনু।

অঞ্জনা চলে গেল। বিমান তখনও চুপ ক'রে বসে আছে। নিমগ্ন হয়ে হয়তো কিছু ভাবছিল সে। অঞ্জনার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাতেই সে বলল, একটু দেরী হ'য়ে গেল।

না দেরী আর কি---বিমান বলল।

অঞ্জনা চুপ করে থাকে।

বিমান আবার বলে, আমি তখন থেকেই ভাবছিলাম অঞ্জনা দেবী—যাঁর চতুর্দিকে এমন সজাগ দৃষ্টি তিনি নিজের সম্বন্ধে একটা উদাসীন কেন?

অঞ্জনা একটু হেসে জবাব দিল, আপনার কথাটা ঠিক হ'লো না বিমান-বাবু। আসলে নিজের সম্বন্ধে একটু বেশী সতর্ক আর সজাগ বলেই সবসময় আমি দুচোখ খুলে চলি। ও ভাল কথা আপনি একজন রান্না করার লোক পাঠিয়েছিলেন কি?

আপনি তো রাখেননি শুনলাম। বিমান জবাব দিল।

কেমন করে রাখি বলুন। অঞ্জনা বলল, ও যে বললে মাইনের জন্য আমাকে ভাবতে হবে না সেটা আপনিই দিয়ে দেবেন। আপনার অনেক দয়া। তাই বলে পাওনার বেশী আমরা নিতে যাব কোন অধিকারে। এটা সম্মানজনক নয়। তাছাড়া আমরা মাত্র দুটি প্রাণী—এর জন্যে আবার রান্নার লোক রেখে কি হবে।

বিমান রীতিমত কুণ্ঠিত হলো। কথা কটি যত ভদ্রভাবেই বলা হোক না কেন অঞ্জনার বক্তব্যের মধ্যে যে অনেকখানি অনুযোগের সুর লুকিয়ে আছে তা বুঝে নিতে বিমানের দেরী হলে না। তাই ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটা চাপ দেবার জন্য সে উঠে দাঁড়াল। বলল আজ আর বসবো না। পারেন তো কাল একবার দেখা করবেন। বলেই আর উত্তরের অপেক্ষা না করে বিমান দ্রুত প্রস্থান করল।

বিমান চলে গেলেও অঞ্জনা তখুনি আনন্দর কাছে ফিরে যেতে পারল না। আজ ছ'মাসের উপর তারা এখানে এসেছে। ভালই কাটছিল এতদিন কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিমানের ছোট-খাট ব্যবহারে আর কথায় এমন একটা অন্তরঙ্গতার সুর ফুটে উঠছে যা অঞ্জনাকে ব্যথিত, বিব্রত এবং শঙ্কিত করে তুলেছে। একটা সহজ আর সুন্দর সমাধানের পথ সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিমানকে গত কমাস ধরেই দেখে আসছে। প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করছে —সাহায্য নিচ্ছে। প্রয়োজনীয় নয় এমন বহুবিষয় নিয়ে তারা আলোচনাও করেছে। বিমান নানাভাবে তার মনকে উন্মুক্ত করে দেখাবার চেষ্টা করলেও অঞ্জনা মুহূর্তের জন্য তাকে প্রশ্রয় দেয়নি। প্রশ্রয় দেবার প্রশ্নও ওঠে না। বিমান ভদ্র, সে অর্থবান, সে হৃদয়বানও বটে--কিন্তু সে যে রক্তমাংসের মানুষ এই কথাটাই যেন ইদানিং তার ব্যবহারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। অঞ্জনা তাই থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে বসেছে।

সামান্য বেতনে সে নিয়োগপত্র পেয়েছিল কিন্তু আজ তাকে যোগ্যতার অতিরিক্ত দেওয়া হচ্ছে। এই দেওয়ার মধ্যে যে অন্য কিছু লুকিয়ে আছে এ কথাটা অঞ্জনার কাছে আর অস্পষ্ট নয়। তাই সে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। কন্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে প্রচ্ছন্ন অনুযোগের সুর। বিমান যেন বুঝেও বুঝতে চাইছে না। এক অদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে অঞ্জনা। বিমানের চলায় বলায় এমন কোন অসংযম কিংবা অভদ্রতা প্রকাশ পায় না যার জন্যে প্রকাশ্য অনু-যোগ কিংবা প্রতিবাদ করা যেতে পারে, অথচ সে মনেপ্রাণে অনুভব ক'রছে যে জল ঘোলা হবার আগেই তার একটা কিছু করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিছুদিন ধরেই অঞ্জনা ভিতরে ভিতরে একটা তীব্র অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু এ নিয়ে কারুর সঙ্গে পরামর্শ করবারও উপায় নেই। যার সঙ্গে করা চলে সেই আনন্দকেই অবস্থার বিপর্যয়ে তাকে এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। ও'কে কিছু বলতে যাওয়া মানেই জেনে শুনে আনন্দর ক্ষত-স্থানে নতুন করে আঘাত করা।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে অঞ্জনা। সে ভাবছে, শুধুই ভাবছে।

তন্ময় হ'য়ে ভাবছে। বহুক্ষণ পরে হয়তো একটা পথ খুঁজে পেল অঞ্জনা। তার চোখে-মুখে খানিক খুশীর দীপ্তি ফুটে উঠল। তাই ভাল, অঞ্জনা নিজেকে নিজে বলে। যাকে নিয়ে আজ সে বিব্রত তার সংগেই পরামর্শ করবে সে। বুদ্ধি চাইবে। তারই শরণাপন্ন হয়ে অঞ্জনাকে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার নির্দেশ দিতে ব'লবে। হায় সে মানবে না। তার স্বপ্ন ইতিমধ্যেই সার্থকতার পথে পা বাড়িয়েছে। অঞ্জনার কল্পনা তার জীবনের ক্যানভাসে রেখায়িত হ'য়ে উঠেছে। আর সে তার মনের তুলিতে রং নিয়ে··

আনন্দ ডাকছে।

অঞ্জনার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। সে ধীরে ধীরে আনন্দর পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, ডাকছিলে কেন?

এই বুঝি তোমার তক্ষুনি ফিরে আসা? বিমানবাবু ত বহুক্ষণ চলে গেছেন।

আনন্দর একখানি হাত নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে অঞ্জনা বলল, বড্ড ছেলে-মানুষ তুমি। আমার বুঝি কোন কাজ থাকতে নেই?

আনন্দ একটু লজ্জা পেল। বলল, সব সময় মনে থাকে না অনু—নইলে তোমার যে কত কাজ তা কি আমি জানি না।

অঞ্জনা আনন্দর দুটো পাথরের চোখের পানে খানিক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে পরিপূর্ণ কণ্ঠে ডাকল, আনন্দ.........

কেন অঞ্জু—

আমাকে একটা ভিক্ষা দেবে আনন্দ?

তোমার কি হ'য়েছে অনু! তুমি কি অসুস্থ?

আমার কথার উত্তর দাও—

আনন্দ দুখানা হাত বাড়িয়ে অঞ্জনার মাথাটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে আবেগ-চাপা কণ্ঠে বলে, তোমার প্রশ্নের উত্তর শুনতে পাচ্ছ অঞ্জু?

অঞ্জনা বলে, পেয়েছি—আমাকে অদেয় আনন্দর কিছু নেই।

আনন্দ অঞ্জনার চুলের উপর আর গালের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলে, ঠিক তাই অনু—

অঞ্জনা বলল, তোমার একটা পাথরের চোখ আমাকে দেবে আনন্দ? আর আমার একটা.........

আর্তনাদ ক'রে ওঠে আনন্দ, অঞ্জনা... প্রবল উত্তেজনায় ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে থাকে সে।

অঞ্জনা বলতে থাকে, তুমি উত্তেজিত হ'য়ো না আনন্দ। আমি ত' কোন অন্যায় কথা বলিনি! আমার সুখ আর দুঃখকে সমানভাবে ভাগ ক'রে নিতে বলছি। বিশ্বাস করো—নইলে কিছুতেই আমার অপরাধী মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না।

আনন্দ বিহ্বল কণ্ঠে বলতে থাকে, তুমি পাগল অঞ্জু......একেবারেই পাগল তুমি।

তোমার যা খুশি বলতে পার। অঞ্জনা শান্তভাবে বলে, পাগল আমি একদিন সত্যিই হ'য়েছিলাম আনন্দ, কিন্তু আজ আমার চেয়ে সুস্থ মস্তিষ্কের লোক খুব বেশী পাবে না। নইলে এ ভাবে কি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে পারতাম। আমি যে আবার তোমাকে নতুন ক'রে ফিরিয়ে আনতে চাইছি আনন্দ। তোমার সন্তানকে তুমি দেখতে পাবে না এ যে আমি ভাবতে পারছি না আনন্দ।......

তুমি অনু......তুমি এসব...... কথাটা ভাবতে পারে না আনন্দ। তার দেহের সংগে সংগে কণ্ঠস্বরও থর থর করে কাঁপছে।

অঞ্জনা বলতে থাকে, হ্যাঁ আনন্দ, এ কথা সত্যি। কিন্তু আমাদের সন্তান যদি কোনদিন তার মার কাছে কৈফিয়ৎ চায় আমি তাকে কি জবাব দেব?

আনন্দ এক আসুরিক উত্তেজনায় অঞ্জনাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। তার পরে একসময় বাঁধন শিথিল করে দিয়ে গভীর আবেগের সংগে বলতে থাকে, আমাদের সন্তানকে আমি আমার স্পর্শ দিয়ে দেখব। আর কৈফিয়ৎ যদি চায় তার জবাব দেব আমি......একি তুমি কাঁদছ অঞ্জু! ছিঃ, এই কি তোমার কাঁদবার সময়......আচ্ছা অঞ্জু, তোমার সেদিনের সেই সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ছে না...... সেই যে তোমাদের বাড়ীর ছাদে......শুধু তুমি আর আমি......কি চমৎকার সুন্দর যে সেদিনের সন্ধ্যাটা ছিল। চাঁদের আলো গলে গলে পড়ছিল......তোমার খোপায় জড়ান ছিল টাটকা যুঁই ফুলের মালা... মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। আজও ঠিক তেমনি একটা গন্ধ আমি পাচ্ছি। তোমার সর্বাংগে সেই মিষ্টি

গন্ধ। সেদিন কত তারিখ ছিল তোমার মনে আছে অঞ্জু?

আছে—

আমারও আছে। সে কি ভুলবার! আমরা দুজনা দুজনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লাম। আনন্দ ব'লতে থাকে, তোমাকে কথা দিলাম যে, আমাদের জীবনে যদি কোন সন্তান আসে তাকে মানুষ ক'রে তুলবার সকল দায়িত্ব নেবে তুমি......

আনন্দর মুখ চেপে ধরে অঞ্জনা। বলে, এসব কথা বলে তুমি আমাকে দুঃখ দিচ্ছ আনন্দ। এ আমি শুনতে চাই না—আমি শুনতে চাই না।

আনন্দ যেন শুনতে পায়নি এমনি-ভাবে বলতে থাকে, আজ সেই তারিখ। সেই বার। আজও কি পূর্ণিমা অনু?

হ্যাঁ।

আমাদের দুজনের মধ্যে হয়তো বা সেদিন কিছুটা ব্যবধান ছিল। আজ আমরা অভিন্ন। আমার মধ্যে তুমি আর তোমার মধ্যে আমি একাকার হ'য়ে গেছি। আজকের দিনে বিমানবাবুকে তুমি এমনি যেতে দিলে! নিজে হাতে কিছু রান্না ক'রে খাওয়ালে না? তাঁকে ডেকে পাঠাও অনু—

আনন্দর এ অনুরোধ উপেক্ষা করে না অঞ্জনা। চিঠি লিখে চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিল তখুনি। এই উপেক্ষা না করার মধ্যে অঞ্জনার আর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। কিছুক্ষণ পূর্বে যে চিন্তাটা তার মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছিল তারও একটা মীমাংসা করে নিতে চায় সে।

অঞ্জনা জানে বিমান আসবে। এলোও যথা সময়। দেখা হ'তেই বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল, কি ব্যাপার বলুন দেখি। এই তো খানিক আগে এখান থেকে গেলাম, এরই মধ্যে কি এমন বিপদে পড়লেন যে এখুনি জোর তলব ক'রলেন!

অঞ্জনা জানে যে, এমনি একটা প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে হ'তে হবে। তার জন্যে সে প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। বলল, বিপদটা আমার না হ'লেও আমারই। আমার এক অন্তরঙ্গ বান্ধবী বিপদে পড়ে বুদ্ধি চেয়ে পাঠিয়েছে। আনন্দকে ব'ললাম, সে এককথায় আপনাকে দেখিয়ে দিল। তাছাড়া আপনাকে আজ আমার এখান থেকে খেয়ে যেতেও হবে।

হঠাৎ আপনার এখানে খেতে হবে কেন? আর সে কথা লিখে জানালেই হ'তো?

লিখে জানালে কি আপনি আসতেন না?

দেখুন অঞ্জনা দেবী, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সত্যিই আমি অত্যন্ত হিসেব ক'রে চলি।

কথাটা আর একদিনও আপনি ব'লে-ছিলেন। আমার মনেও ছিল, কিন্তু আনন্দ কিছুতেই শুনল না। আমাদের সত্যিকারের ফুলশয্যার দিন আজ। অঞ্জনা আস্তে আস্তে বলল।

বিমান অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে উঠল।

অঞ্জনা তা লক্ষ্য করেই অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, খাওয়ায় সত্যিই যদি আপনার আপত্তি থাকে তা'হলে দ্বিতীয়বার আপনাকে অনুরোধ করবো না। আনন্দ হয়তো দুঃখ পাবে, কিন্তু আমি তাকে

"আজও কি পূর্ণিমা অনু"?

বুঝিয়ে বলবো। তার চেয়ে আমার বান্ধবীর সমস্যার কথাটা শুনুন।

বিমান একটু নড়ে-চড়ে স্থির হয়ে বসল।

কোন প্রকার ভূমিকা না ক'রে সোজা-সুজি ব'লতে শুরু ক'রল অঞ্জনা। আমার বান্ধবী মিনু ভালবাসল সদানন্দকে। সদানন্দ সত্যিকারের ভাল ছেলে। শিক্ষায়, ভদ্রতায়, আচারে-আচরণে কোথাও তার ত্রুটি ছিল না। তার উপর তুলনাহীন চেহারা। এমন ছেলেকে ভালবাসতে কে না চায়। অনেকের দৃষ্টি ওকে ঘিরে ছিল। মিনু এমন কিছু আহামরি মেয়ে নয়। তাই সে প্রথম সারিতে কোনদিন এসে দাঁড়ায়নি।

বিমান বাধা দিল, দেখুন, এসব কথা শুনে আমি—মানে আমি বড্ড অস্বস্তি বোধ করছি।

অঞ্জনা একটুখানি হেসে বলল, আগে থেকে একটু ধরিয়ে না দিলে পরে অসু-বিধায় পড়তে পারেন তাই। হ্যাঁ যা বল-ছিলাম—সকলের দৃষ্টির প্রহরা থেকে পালিয়ে এসে সদানন্দ একদিন মিনুর কাছে এগিয়ে গেল। ওরা দুজনেই দুজনার অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠল। ওদের ভালবাসার মধ্যে কোন ফাঁক এবং ফাঁকি নেই এ কথা বড় গলায় ওরা বলতে শুরু ক'রলো। বিশেষ করে মিনু একটু মাত্রা-ধিক উচ্চকণ্ঠে। কিন্তু বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার যে কত অভাব ছিল মিনুর ভালবাসায় তা ধরা পড়লো তাদের মাঝে ছন্দার আবি-র্ভাবে। ছন্দার সঙ্গে মিনু নিজেকে বার বার মিলিয়ে দেখতে লাগল। উগ্র আধু-নিকা ছন্দা, ওর কথাবলা, হাসি, চাহনি সাজ-সজ্জা সব কিছুই চোখ-ধাঁধান। ছন্দা সব সময় জ্বলছে রূপের আগুনে। মিনুর নিজেকে বড্ড ম্লান আর জ্যোতি-হীন মনে হ'তে লাগল ওর পাশে। মিনু সাবধান হয়ে উঠল—সজাগ হ'য়ে রইল।

সদানন্দকে চুপি চুপি বলল, তুমি ঐ মেয়েটাকে অত বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন সদানন্দ।

সদানন্দ উপেক্ষার হাসি হেসে জবাব দিল, দিলেই বা তাতে ভয় কি...

মিনু বলেছিল, আমার কিন্তু সত্যিই ভয় করে।

সদানন্দ অনেকক্ষণ ধরে হেসেছিল। তারপরে একসময় মিনুর কানে কানে বলেছিল, তোমার মনের মধ্যে এখনও বিস্তর খাদ রয়ে গেছে মিনু। দিন কয়েক অ্যাসিডে ভিজিয়ে রেখ।

কথার ছলে কি যে বলে বসল সদানন্দ—প্রতিশোধ গ্রহণের কথা মনে হতেই ঐ অ্যাসিডের কথাটাই সর্বপ্রথম মনে পড়ল মিনুর।

একটু থেমে অঞ্জনা পুনরায় বলতে লাগল, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে

খুব অবাক হ'য়ে গেছেন। অবাক হবার কথাও। নইলে এই মিনুই কেমন ক'রে মনে ক'রতো যে তার মত নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসতে কজনা পারে। অথচ ওদের মাঝে ছন্দার আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই মিনুর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লো। আসলে মিনু নিজেকেই ভাল-বাসত। আর নিজের জন্যেই সে জ্ঞান হারাল। একটা অন্ধ ঈর্ষা তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে লুপ্ত ক'রে দিল।

অঞ্জনা থামল। একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তার চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। দেহের সবটুকু রক্ত এসে মুখে জমা হ'য়েছে।

বিমান হতবুদ্ধির মত খানিক চেয়ে থেকে বিহ্বলকণ্ঠে বলে, কিন্তু আপনি অমন ক'রছেন কেন অঞ্জনা দেবী। হ'লো কি আপনার!

অল্পেই সামলে নিয়ে অঞ্জনা জবাব দিল, তার কারণ আমিও মেয়ে আর মিনু আমার একান্ত আপন জন। সত্যি বিমানবাবু, মানুষের চরিত্র কি বিচিত্র! কদিন আগেও যাকে মিনু চোখে হারাত —যার মুখের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে বিশ্বসংসারকে ভুলে যেত—যাকে বাদ দিয়ে নিজের কোন অস্তিত্ব আছে বলেই ভাবতে পারত না, নিছক একটা সন্দেহের বশে তার এতবড় সর্বনাশটা মিনু নিজে হাতে ক'রে বসলো! তুমি বড় সুন্দর সদানন্দ...... তুমি ভেবেছো ঐ সৌন্দর্য আর অভিনয়-চাতুর্য দিয়ে যা খুশি তাই ক'রে বেড়াবে ...তুমি মিনুকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছন্দাকে বিয়ে......

অঞ্জনা হাঁপাতে লাগল। তার পরে থেমে থেমে বলল, জানেন বিমানবাবু, মিনু কি কাণ্ড ক'রে বসল!

ভিজে উঠল অঞ্জনার কণ্ঠস্বর—চোখ দুটিও বেদনায় টনটন ক'রতে লাগল। সে রুদ্ধ স্বরে বলল, সদানন্দর অমন সুন্দর চেহারা—শুধু চেহারা কেন তার সমস্ত জীবনটাকেই বরবাদ ক'রে দিল। সদানন্দ অ্যাসিড দিয়ে মিনুকে তার মনের খাদ দূর ক'রতে উপদেশ দিয়েছিল আর মিনু সেই অ্যাসিড দিয়ে সদানন্দর......

অঞ্জনা ককিয়ে উঠল। একটা অব্যক্ত বেদনায় সে বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। বিমান স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে।

অঞ্জনা অশ্রুবিকৃত গলায় বলতে থাকে, সদানন্দর চরম সর্বনাশ করেই কিন্তু মিনুর জ্ঞান ফিরে এলো। আর জ্ঞান ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

থানা পুলিশ আর খবরের কাগজ হৈহৈ করে উঠল। কিছু গোপন ক'রল না মিনু। অকপটে সব কথা স্বীকার করল, কিন্তু সদানন্দ পুলিশকে সম্পূর্ণ মিথ্যেকথা বলল। মিনু নাকি নির্দোষ। জীবনে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে সে নিজেই অ্যাসিড পান ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিল আর মিনু তাকে বাঁচাতে গিয়ে অতবড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। আশ্চর্য মানুষ সদানন্দ। ভালবাসার জন্য এত বড় ক্ষতিটাকেও সে সহজে মেনে নিল। আর মিনু...

বিমানের মুখ থেকে তার অজ্ঞাতে বার হ'য়ে এল একটিমাত্র কথা, সত্যিই আশ্চর্য—

অঞ্জনা ব'লতে থাকে, ঠিক তাই, কিন্তু মিনু কোন কিছুতেই আর আশ্চর্য হয় না—তবে চুপ ক'রে থাকতেও সে পারে না। আজ আর বিকৃতদেহ সদানন্দ'কে সে তার জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। মিনু সোজা হ'য়ে মাথা তুলে দাঁড়াল মিনুর মা বাবা আত্মীয়স্বজন সকলের বিরুদ্ধে। কারুর কথায় সে কান দিলে না। নিজের জীবনের সঙ্গে বেঁধে নিলে ঐ অসহায় লোকটিকে।

কিন্তু তারপর?

মিনু শিক্ষিতা। তার শিক্ষায় কিছু গলদ থাকলেও সদানন্দর ভালবাসায় তার অগ্নিশুদ্ধি হ'লো। সে স্বামীর সকল ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে হাসিমুখে অগ্রসর হলো।

অনেকটা পথ মিনু অগ্রসর হ'য়ে এসেছে। সদানন্দর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে দিনরাত সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। প্রার্থনা জানাচ্ছে যেন তাদের সন্তান আগাগোড়া সদানন্দর রূপগুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সদানন্দই যেন আবার নতুন করে ফিরে আসে। মিনু জেগে স্বপ্ন দেখছে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে।... কিন্তু...একটু ইতস্ততঃ করে অঞ্জনা পুনরায় ব'লতে থাকে, আবার ওদের জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব দেখা দিয়েছে। তার চোখের পরে চোখ পড়লেই মিনু ইদানিং ভয়ে আর ভাবনায় আড়ষ্ট হ'য়ে উঠছে। তার দৃষ্টির ভাষা সে সঠিক বুঝতে পারছে না। এ কি মমতা না প্রীতি, সহানু-ভূতি না প্রেম? মিনু তাই ... চেয়েছে এখন সে কি ক'রবে? আ... নতুন করে পথ খ'ুজবে কি?

অঞ্জনা থামল। তার কথা শেষ হ'য়েছে। কিন্তু বিমান বহুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইল। অঞ্জনার বক্তব্যটা বিমানের কাছে আর অস্পষ্ট নয়। যার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ তারই কাছে সে প্রকারান্তরে নালিশ জানাচ্ছে। মিনু আর অঞ্জনা অভিন্ন।

অঞ্জনা বলল, মিনুকে কি জবাব দেব ব'ললেন না তো বিমানবাবু? মাত্র তিনদিনের সময় সে আমাকে দিয়েছে। এর মধ্যে আমার কাছ থেকে একটা জবাব না পেলে সে নাকি অন্যত্র চলে যাবার ব্যবস্থা ক'রবে।

এতক্ষণ পরে বিমান মুখ তুলে তাকাল। একটুখানি শুকনো হেসে বলল, তাকে জানাবেন যে, মানুষই ভুল করে আবার মানুষই ভুলকে সংশোধন করে। চলে গিয়ে তিনি যেন ভুলটাকেই বড় ক'রে তোলেন না। কিন্তু আজ আর না—অনেক রাত হ'য়ে গেল অঞ্জনা। তারচেয়ে কি খেতে দেবে তাই দাও। মিনুর ফুলশয্যার রাতটি অক্ষয় হোক।

আপনি মহৎ—

ঠিক হ'লো না। তারচেয়ে মানুষ বলো অঞ্জনা। আমি শুধু ঐ নামের মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র।......

অঞ্জনার চোখ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

কি করিয়া কি হইল এখন গুছাইয়া লেখা সম্ভব নহে। তবে যাঁহারা আমাকে মহালয়ার দিন বিকালে গড়িয়া-হাট মোড় হইতে ডবলডেকারে উঠাইয়া দিয়া নিশ্চিত ধরিয়া আছেন যে, আমি এখন রাঁচীতে মাতুলালয়ে মনোরম পরি-বেশে শারদীয় অবকাশ অতিবাহিত করিতেছি তাঁহাদের অবগতির জন্যে জানাই রাঁচী পোঁছাইতে পারি নাই, এমন কি কলিকাতা ত্যাগ করিতেও পারি নাই। নারিকেলের দড়িতে বাঁধা বিছানা এবং পদ্মফুল-আঁকা উৎপলের বাড়ির চাকরের স্যুটকেশ হারাইয়া এই শহরেরই একটি হাসপাতালে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে শুইয়া শুইয়া যাহারা ক্রাচ্ ব্যবহার করে তাহাদের পদধূলি কেহ পায় না এইরূপ বিষয়াদি ভাবিয়া সান্ত্বনা খুঁজিতেছি।

শ্যামল এবং ভাস্কর আমাকে যখন বাসে উঠাইয়া দিল তখন বিকাল পাঁচটা সতেরো, সাড়ে সাতটায় ট্রেন। সময় যথেষ্টই ছিল, কিন্তু রাস্তায় ভয়ঙ্কর ভিড় এবং তদুপরি আমার ডবল্‌ডেকারটির ড্রাইভার বোধহয় পূর্বে ট্রামের ড্রাইভারি করিতেন, তাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল একই লাইনে ট্রামকে ওভারটেক্ করা সম্ভব নহে। তিনি একটি মন্দগতি ট্রামের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিলেন। অবশ্য হলফ করিয়া বলিতে পারিব না যে, সেই ট্রামের জানালায় ঠিক আর কোনো আকর্ষণ ছিল না। শিয়ালদহের মোড়ে পৌনে সাতটা বাজিতে আমি সিট ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া ড্রাইভারের তারের জালের ভিতর দিয়া নাক গলাইয়া কহিলাম, 'দাদা, একটু দ্রুত করা কি সম্ভব? একটা গরুকে পেট্রল খাওয়াইলে ইহা অপেক্ষা দ্রুত যাইত।' দাদা একটু হাসিলেন, তাহার পর খাকি সার্টের আস্তিনে হাসিটুকু মুছিয়া নির্লিপ্তভাবে বলিলেন, 'কিন্তু আমি তো পেট্রল খাই নাই।'

শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম; কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় মিনিট পনেরো-কুড়ি অতিবাহিত হইল, তখনো বাস বড়বাজার পর্যন্ত আসে নাই। হাতে আর সময় নাই, হাঁটিয়া গেলে তবু ট্রেন ধরা যাইতে পারে কিন্তু এই বাসে অসম্ভব। অবশ্য বাস হইতে অবতরণ সে আরো অসম্ভব; কেন যে ট্রান্সপোর্ট-কর্তৃপক্ষ বাসগুলির প্রত্যেক জানালায় ফায়ার ব্রিগেডের দড়ির সিঁড়ির বন্দোবস্ত করেন না!

আমি বিছানা এবং স্যুটকেশ লইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলাম। করুণ কণ্ঠে 'একটু পথ' 'একটু পথ' প্রার্থনা করিলাম। সর্বত্রই রসিক যাত্রী থাকেন, তাঁহাদেরই কেহ ভিড়ের মধ্য হইতে প্রশ্ন করিলেন, 'এই ভিড়ে পথ আবার কি? আপনাকে গার্ড অফ অনার দিতে হইবে নাকি?' সম্মুখে প্যাঁটরাদি হাতে আমারই মত আরেকজন নামিবার চেষ্টায় ছিলেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহার পদাঙ্কন অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

এই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। পিছন হইতে ভীষণ চাপ পড়ায় আমি ক্রমশঃ সম্মুখে হেলিয়া পড়িতেছিলাম। লেডিস সিটের প্রান্তবর্তী হইবা মাত্র একটি জোর ধাক্কায় হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলাম। লোকের শরীরে যাহাতে গুঁতা বা ধাক্কা না লাগে, সেইজন্য স্যুটকেশ এবং বিছানা এতক্ষণ দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া আসিতে-ছিলাম, এইবার ঐ দুইটি ছিটকাইয়া গেলো। সম্মুখবর্তিনী দণ্ডায়মানা একটি যুবতীর পৃষ্ঠদেশ বিছানার সহিত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কর্কশ নারিকেল দড়ি লাঞ্ছিত হইয়া রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ অতখানি উন্মুক্ত না থাকিলে যে পরিধেয় বস্ত্রের উপর দিয়াই ঘটনাটা ঘটিয়া যাইত, তাহার দেহে আঁচড়মাত্র পড়িত না ইহা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু সেই স্বল্প বাদিনী যদি স্বল্পভাষিনীও হইতেন, তবে আমার চতুর্দশপুরুষ সেইদিন কিঞ্চিৎ অন্যায় অভিযোগ হইতে অব্যা-হতি পাইতেন, এইটুকু বলিতে পারি। স্যুটকেশটি কি হইয়াছিল বলিতে পারি না। যদি ধ্বনি দ্বারা অনুমান সঠিক হয় তবে উহা কোনো হ্রস্ব ব্যক্তির শিরো-পরি অধঃপতিত হইয়াছিল। সেই ব্যক্তিটি কিন্তু টু শব্দটি করেন নাই; হয় বাক-রোধ হইয়া গিয়াছিল কিংবা জন্ম হইতেই বোবা। অবশ্য এমনও হইতে পারে উক্ত যুবতীর রোমহর্ষক বাক্যাদি শ্রবণ করিয়া তিনি আর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে সাহসী হয়েন নাই।

ইতিমধ্যে কি এক অজ্ঞাত কারণে (আমার উৎক্ষিপ্ত মালপত্রাদিও অবশ্য ইহার কারণ হইতে পারে) সমস্ত বাসের মধ্যে দারুণ গৃহবিপ্লব দেখা দিল। যাঁহারা ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া ছিলেন তাঁহারা বাসের ভিতর দিকে চাপ দিতে লাগিলেন এবং ভিতরে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা প্রত্যুত্তরে অধিকতর চাপ দিতে লাগিলেন। যাঁহারা কলিকাতার বাসে যাতায়াতে অভ্যস্ত তাঁহাদের অবশ্য এই ধরণের আন্দোলন সম্পর্কে কিছু ধারণা রহিয়াছে। এইরূপ নিঃশব্দ বিপ্লব পৃথিবীতে সচরাচর দেখা যায়। পরস্পর পরস্পরকে কনুইয়ের ধাক্কা দিতেছে এবং সহ্য করিতেছে। কিন্তু কাহারো মুখে কোনো শব্দ নাই। অবশেষে একটি প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে চলন্ত বাস হইতে আরো জন পনেরো লোকের সহিত আমারও পতন হইল। ভাগ্য ভাল, বাসটি দ্রুত সঞ্চরমান ছিল না ফলে পরস্পর পরস্পরের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িলে যতটুকু আঘাত লাগে তাহার অপেক্ষা কেহই বেশী আহত হইল না। উপরন্তু এই আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে বাস হইতে নামিবার সুবিধা হওয়ায় সকলেই অল্প-বিস্তর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন, অন্ততঃ তাহাই মনে হইল।

কিন্তু ততক্ষণে বিপরীত ফুটপাথে একটি প্রলয়ংকর কাণ্ড শুরু হইয়াছে। প্রথমে কিছু বোঝা গেল না, একটি তাঁতের শাড়ির দোকানের সামনে হুলুস্থুল কাণ্ড। মনুষ্যমাত্রেই গোলমাল পাকাইতে এবং জমাইতে ভালবাসে। আমিও স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসায় অগ্রসর হইলাম। বহু পরিশ্রমে নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম দুইটি অসম আকৃতির ব্যক্তি প্রবলভাবে নড়িতেছে। একজন অতি শীর্ণ, বেঁটে, অপরজন গাট্টাগোট্টা, লম্বা-চওড়া ধরণের। প্রথম ব্যক্তির তেজ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির বিক্রম বেশী বলিয়া মনে হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম জনকে দুই পায়ের ফাঁকে ফেলিয়া পিষিয়া ধরিয়াছে এবং শীর্ণ ব্যক্তিটি এই অবস্থায় তড়িৎ গতিতে হস্ত, পদ এবং মুখ চালনা করিতেছে।

বেশীক্ষণ এই দৃশ্য দেখিতে হইল না। শীর্ণ ব্যক্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিল; এই সময় একজন বলশালী দর্শক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আগাইয়া গিয়া প্রথমোক্ত গাট্টাগোট্টা ব্যক্তিটিকে ধরিয়া এক ঝাপটা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ২নং ব্যক্তি পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া রাস্তার উপর দুম্ করিয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু পদচ্যুত হইবামাত্র ২নং ব্যক্তির তেজ যেন আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সে এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ১নং ব্যক্তিকে পুনরায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আস্ফালন করিতে লাগিল। আমি

দুই পায়ের ফাঁকে ফেলিয়া

এই ২নং ব্যক্তিটির নিকটেই দাঁড়াইয়া দিলাম এবং অন্যান্য দর্শকের মতই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ২নং ব্যক্তিটি বেশী লাফালাফি করিলে আবার প্রচণ্ড মার খাইবে। আমি কর্তব্যবোধবশত তাহাকে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করিলাম। আমি যদিও খুব সবল নহি কিন্তু ২নং ব্যক্তি এতই দুর্বল যে যে কোনো বালকও তাহাকে আটকাইতে সক্ষম।

১নং ব্যক্তিটি বলশালী ব্যক্তির বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া এতক্ষণ ফুঁসিয়া চলিয়াছে। আমি যে ব্যক্তিকে ধরিয়াছি সে দুর্দান্ত চীৎকার শুরু করিল,

'আমাকে এই মুহূর্তে ছাড়িয়া দিন, আমি উহাকে ঐ কৃষ্ণ কুকুর-শাবকটিকে শেষ না করিয়া ছাড়িব না, ছাড়িয়া দিন বলিতেছি......'

শীর্ণ ব্যক্তির গর্জনে আমার কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। এই সময় লক্ষ্য করিলাম যে নিঃশ্বাস লইবার অবসরে লোকটি চাপাস্বরে আমাকে কি যেন বলিতেছে, সে আরেকবার চীৎকার করিয়া তারপরে আমার পেটে কনুইয়ের খোঁচা দিয়া আবার ফিসফাস্ করিল। এইবার শুনিতে পাইলাম,

'অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দিবেন না স্যার। ছাড়িয়া দিলে ঐ ষণ্ডা আমাকে মারিয়া ফেলিবে।' এইটুকু অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াই, শীর্ণ ব্যক্তি আবার প্রচণ্ড গর্জন করিতে লাগিল।

এই রকম মিনিট পাঁচেক চলিল, মধ্যে মধ্যে ভীষণ চীৎকার আস্ফালন এবং নিঃশ্বাস লইবার ছলে ক্ষীণ কণ্ঠে ছাড়িয়া না দিবার জন্য করুণ আকুতি। এই শীর্ণ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিটির এইরূপ তেজ ও আত্মসম্মানবোধ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। রাজপথে অনুরূপ অবস্থায় সকলেই হয়তো এইরূপ করিয়া থাকে, কি জানি, আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। চতুর্দিকে জনতা, বিশেষত পথিক-ললনাদের দৃষ্টির সম্মুখে কে আর কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতে চায়।

অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দিবেন না......'

ইতিমধ্যে ১নং ব্যক্তিটি যে কি কৌশলে বলশালী রক্ষকের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুহূর্তের মধ্যে এক ঝাপটায় আমার বাহুপাশ হইতে এই ২নং ব্যক্তিটিকে ছিনাইয়া লইয়া গেল সে রহস্য ঈশ্বর জানেন তবে আমি রাস্তায় গড়াইয়া পড়িলাম।

কে একজন আমাকে টানিয়া তুলিলেন, দেখিলাম ১নং ব্যক্তিকে যিনি ধরিয়াছিলেন তিনিই আমাকে তুলিয়াছেন। তুলিয়াই প্রশ্ন করিলেন,

'মহাশয়ের বুঝি পথ-কলহ নিবারণের অভ্যাস নাই?'

নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিলাম।

তিনি বলিলেন,

'ইহারা মারামারি করিবে সে তো ভালো কথা, তাহাতে আমাদের কি; আমরা শুধু দেখিব যাহারা মারামারি দেখিতে ভিড় করিয়াছে তাহারা যেন নিরাশ না হয়। সুতরাং আমাদের কি করিতে হইবে?'

এমতাবস্থায় কি করিতে হয় জানা না থাকায় চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিতে লাগিলেন,

'লক্ষ্য রাখিতে হইবে মারামারি বন্ধ না হইয়া যায়। যখন মারামারি চলিতে থাকিবে ধরিতে যাইবেন না, তাহাতে নিজেরও আহত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যেই মাত্র থামিয়া আসিবে তখন দুই-জনকেই ধরিতে হইবে, কিছুক্ষণ এই-ভাবে ছাড়াইয়া তাহাদের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া রাখুন। আবার আস্ফালন, গালিগালাজ হইতে হইতে যেই প্রবল উত্তেজিত হইল ছাড়িয়া দিন, আবার এক রাউণ্ড, আবার আটকান আবার সামনাসামনি দাঁড় করাইয়া রাখুন, আবার লাগ্-লাগ্‌লাগ্ আরেক রাউণ্ড। টাইমিং ঠিক করিতে পারিলে উপযুক্ত আম্পায়ার ঘণ্টার পর ঘণ্টা দর্শক-সাধারণকে নির্দোষ আনন্দ দান করিতে পারেন।'

তাঁহার কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম, তিনি হঠাৎ 'গাড়ি', 'গাড়ি', 'এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং আমি কিছু বুঝিবার পূর্বেই তিনি এক ধাক্কায় আমাকে ফেলিয়া দিলেন; আমি এ্যাম্বুলেন্স চাপা পড়িলাম।

যখন জ্ঞান হইল বুঝিলাম স্ট্রেচারে শুইয়া আছি, সম্ভবত এ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই। চারিদিক অন্ধকার, হাঁটুর নিচে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। ইহারই মধ্যে কে যেন নিচের স্ট্রেচার হইতে আমাকে অল্প অল্প খোঁচাইতে শুরু করিয়াছে। আমি 'উঃ, উঃ', করিতে লাগিলাম। নীচ হইতে কে বলিল,

'স্যার, আমিও আছি।'

'আমি, আমি কে?' আমি প্রশ্ন করিলাম, যদিও অনুরূপ ব্যাক্যালাপোচিত শরীরের অবস্থা তখন নয়।

'আমি ভজহরি চাকলাদার।' উত্তর আসিল।

'কে ভজহরি চাকলাদার?' এই নামে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে পূর্ব পরিচয় আছে বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না।

'স্যার, সেই রাস্তায়।'

এইবার কণ্ঠস্বর যেন কিঞ্চিৎ পরিচিত মনে হইল। পথিমধ্যে আর দুই-জনে কোনো কথা হইল না। হাসপাতালে পৌঁছিয়া ভজহরি চাকলাদারকে দেখিলাম, সেই কলহপরায়ণ, শীর্ণ ২নং ব্যক্তি।

হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে শুইয়া চাকলাদার মহাশয়ের সহিত আলাপ হইল। তিনি অমিতভাষী ব্যক্তি। তাঁহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত যেমন বিচিত্র তেমনই জটিল।

জানা গেল তাঁহারা পূর্বে চাকলাদার ছিলেন না পুরোপুরি মনসাদার ছিলেন, শতাব্দী দেড়েক পূর্বে গ্রাম-প্রতিনিধিদের কি এক চক্রান্তে তাঁহারা তাঁহাদের উত্তরাধিকারগত উপাধি হইতে বিচ্যুত হন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, এখনো ধমনীতে প্রবলপরাক্রান্ত মনসাদার বংশের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহাদের এক পূর্বপুরুষ কি নাম, বোধহয়, বজ্রগর্জন মনসাদার দুইটি হাতীর লেজে এমন গিঁট বাঁধিয়া দেন যে গিঁট কাটিয়া অপারেশন করিয়া (ষাট বৎসর পরে) তাঁহাদের জেলার প্রথম ভেটারিনারি সার্জন সাহেব হস্তী দুইটিকে আলাদা করিয়া দেন। সেই গিঁট-বাঁধা লেজ দুইটি এতকাল তাঁহাদের ঘরে গৌরবের সঙ্গে বিরাজ করিত, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে যেদিন রাত্রিতে গ্রামের মনসাঠাকুরটি বারোয়ারি-তলা হইতে চুরি যায় সেই রাত্রি হইতে গিঁটবদ্ধ লেজ দুইটি পাওয়া যাইতেছে না। বিলাতে নাকি এইসব জিনিস আজকাল বহুমূল্যে বিক্রয় হয়, অবশ্য এই প্রসঙ্গে তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা হাবুল চাকলাদারকেই যে তাঁহার সন্দেহ তাহাও জানাইলেন।

কলিকাতা হইতে বত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হুগলি জেলার কলাগ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান। কলাগ্রাম যে আসলে চাকলাগ্রামেরই অপভ্রংশ তিনি তাহাও জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিলেন।

অতদূর হইতে আসিয়া কি করিয়া কলিকাতায় বড়বাজারে মারামারিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাও বলিলেন। বহু ধরাধরি করিয়া এতদিনে জমিদারীর কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়াছেন। স্ত্রীর বহুদিনের শখ একটি তাঁতের ভালো শাড়ি। সেই শখ পূরণ করিতে আসিয়াই বিপত্তি। গ্রামস্থ এক বিষয়ী ব্যক্তি পরামর্শ দিয়াছিলেন বড়বাজারে গিয়া দেবেন্দ্রমণ্ডল বসাক এন্ড কোং-তে ক্রয় করিতে। বহু খুঁজিয়া, সারাদিন ভিড়ে ঘুরিয়া ক্লান্ত ঘর্মাক্ত অবস্থায়, দেবেন্দ্রমণ্ডলের দোকান আবিষ্কার করিলেন। যখন ভিতরে ঢুকিতে যাইবেন দেখিলেন সামনে সাইনবোর্ডে দোকানের নামের নিচে লেখা 'এই বাড়ির দোতলায় আমাদের কোন ব্রাঞ্চ বা শাখা নাই।'

ভজহরি চাকলাদার মহাশয়ের খটকা লাগিল। তিনি দোতলাতেই আগে যাইবেন স্থির করিলেন, তিনি উপরে তাকাইয়া দেখিলেন দোতলাতেও একই রকম সাইনবোর্ড, তবে তাহাতে লেখা, 'এই বাড়ির একতলায় আমাদের কোনো ব্রাঞ্চ বা শাখা নাই।' কিন্তু স্থির করিবার পূর্বেই দুইদিক হইতে দুইটি লোক আসিয়া তাঁহার দুই হাতে দুইটি হ্যাণ্ডবিল গুঁজিয়া দিল। দুইটিরই ভাষা মারাত্মক; সারাংশ এইরকমঃ

'ভদ্রমহোদয়গণ, সাবধান! দালালদের দ্বারা প্রতারিত হইবেন না। এই বাড়ির একতলায় (ভিন্ন হ্যাণ্ডবিলে দোতলায়) যাহারা তাঁতের শাড়ি বিক্রয় করিতেছে তাহা বৈধ নহে। পূজায় আনন্দের জন্য শাড়ি কিনিয়া জেল খাটিবেন না।'

ততক্ষণে হ্যাণ্ডবিলদাতাদ্বয় হাতাহাতি শুরু করিয়া দিয়াছে। একতলা এবং দোতলা হইতে ক্রমাগত লোক নামিয়া আসিয়া যে যাহার পক্ষে সম্ভব যোগ দিয়াছে। ভজহরিবাবুকে লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল, এই এক পক্ষ টানিয়া তিন সিঁড়ি উপরে লইয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে অপর পক্ষের আর এক হ্যাঁচকায় রাস্তায় ছিটকাইয়া পড়েন। জামার আস্তিন এবং কলার ছিঁড়িয়া গেল। জুতা হারাইয়া ফেলিলেন, টানাটানিতে হাত কিঞ্চিৎ লম্বা হইয়াছে বলিয়া তিনি এখন মনে করেন।

'তাহার পর কি হইল?' আমি প্রশ্ন করিলাম।

প্রশ্নের উত্তরে ভজহরিবাবু ম্লান হাসিলেন,

'কি হইল, আমিও জানি না। একটু পরে দেখিলাম দেবেন্দ্রমণ্ডলের দোকানের সামনে আমি একটি অপরিচিত ব্যক্তির দুই পায়ের ফাঁকে আটকাইয়া আছি। তাহার পরের ঘটনা সবই আপনি জানেন।'

আমিও ম্লান হাসিলাম।

আপাদমস্তক ব্যাণ্ডেজবাঁধা ভজহরিবাবু এবং আজানুমস্তক (পাঠক ভুল ধরিবেন না, এখন আমি পদচ্যুত) ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা আমি দুইজনে এখন কড়িকাঠ গুনিতেছি।

ইনস্টলমেণ্টে কোথায় ক্রাচ পাওয়া যায় কেহ কি খবর দিতে পারেন?

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এদেশকে অনেক জিনিস শিখিয়েছে, অনেক জিনিস দিয়েছে—বেশীর ভাগই মন্দ—তার মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক যেটা সেটা হ'ল ফালতু, আলটপ্‌কা টাকা পাওয়ার লোভ। খেটে যা পাওয়া যায় তাতে আর খুশী রইল না এদেশের মানুষ, আরও কিছু তার চাই। যে টাকার আশা ছিল না, হিসেবে যা ধরা নেই, যার হিসেব রাখতেও হবে না—এমন খানিকটা টাকা। এই লোভের পথ ধরেই এল বহু জিনিস— চুরি-জুচ্চুরি, কালোবাজারী, চোরাকারবার, নিষিদ্ধ মাল পাচার, ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া, জালিয়াতি—আরও অনেক। আরও বেশী, অনেক বেশী। অনেক জঘন্য অনেক ঘৃণ্য জিনিস। যে সবের কল্পনা করেও আগে শিউরে উঠত ভদ্র শিক্ষিত মানুষরা। এই টাকার জন্য, এই লোভের জন্য সে না করল এমন কাজ নেই, দিল না এমন জিনিস নেই। এই টাকার জন্য সে বেচল তার সততা, তার সত্য-নিষ্ঠা, তার বিবেক, তার ন্যায়-অন্যায়-বিচার—তার আত্ম-সম্মান, তার সন্তুষ্টি—এমন কি তার অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকাও। টাকা চাই তার—বাড়তি টাকা, ফালতু টাকা, যে টাকা নিয়ে সে যা খুশি করতে পারবে, তার সাধ্যের অতীত, তার প্রাপ্যের অতীত সুখে থাকতে পারবে।

ইংরেজ সরকারও তা জানতেন। মানুষ চিনতেন তাঁরা। এদেশের মানুষ-কেও চিনেছিলেন। তাই তাঁরা এদের আনুগত্য আর এদের মনুষ্যত্ব কিনতে কিছু টাকা উড়িয়ে দিলেন বাতাসে। কার্নিভালের দিনে আকাশে ওড়ানো কাগজের কুচির মতো নোট উড়তে লাগল চারিদিকে। সে টাকা যারা পারল ধরে নিল। 'যুদ্ধের বাজারে দু পয়সা করেছে' সেই ভাগ্যবানদের সম্বন্ধে এই-টুকু বলেই নিবৃত্ত হল দেশের বাদবাকী ভাগ্যহীন লোকেরা। কীভাবে সে দু পয়সা করেছে, যুদ্ধের বাজারে কে কি ভাবে উপার্জন করল—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। সহজ সত্যটাকে সহজেই মেনে নিল। ঈষৎ ঈর্ষা বোধ করল হয়ত, কেউ কেউ 'চুরির পয়সা' এই অভিধা দিয়ে সে ঈর্ষা চরিতার্থও করল—কিন্তু সে চুরি ধরিয়ে দিতে, মানুষের সমাজে এই অমানুষদের মুখোশ খুলে দিতে চেষ্টা মাত্র করল না। কারণ যারা গাল দিচ্ছে তারাও আশা রাখে যে তাদের সামনেও একদা এই 'চুরির পয়সা' উপার্জনের পথ উন্মুক্ত প্রসারিত হয়ে যাবে।......

পয়সা উড়ছে বাতাসে। যারা ভাগ্য-বান আর যারা বুদ্ধিমান তারাই ধরে নিচ্ছে। হরেনও ধরল সে টাকা। স্বর্ণর বর হরেন—মহাশ্বেতার জামাই। নানা বিচিত্র পথ দিয়ে ধরল সে। তার অফিসের ক্যাশ ছিল তার হাতে—তারই কিছু হেরফের করে টাকা খাটাতে লাগল। কিসে খাটাল তা কেউ জানে না। স্পষ্ট করে সে বলল না কাউকেই। ভাইয়েরা বড় হয়েছে, তাদেরও বিয়ে হয়েছে, সংসার হয়েছে। প্রধানত তারাই কৌতূহলী। পয়সার আভাস পাচ্ছে, কিন্তু তার চেহারাটা ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। সেটা আসবার পথটাও খুঁজে পাচ্ছে না। দূরের মানুষ পায় সে আলাদা কথা। এ ঘরের মানুষ—এর এই ধনী হবার পথটা তাদের জানবার কথা—আর জানলে তারাও সে পথে যেতে পারে। কিন্তু অনেক প্রশ্ন করেও তারা বার করতে পারল না সে পথের সন্ধানটা।

তাদের আরও কষ্ট—তারা সে পথের ইঙ্গিতটা পাচ্ছে। কারা সব আসে দাদার কাছে, দোর বন্ধ করে কী সব শলা-পরামর্শ আঁটে—আবার বেরিয়ে চলে যায়। অনেক সময় হরেনও চলে যায় তাদের সঙ্গে। হয়ত বা তাদের সঙ্গে করেই নিয়ে আসে। শিবপুরের এই সংকীর্ণ গলিতে বড় বড় মোটরগাড়ি এসে দাঁড়ায়। সে গাড়ি থেকে নামে নানা জাতের নানা বর্ণের লোক। এরা সবাই হরেনের লোক, হয়ত বা তার কারবারের অংশীদার।

হরেন আজকাল ফেরে বহু রাত্রে। সন্ধ্যা রাত্রে ফিরলে লোক সঙ্গে করে নিয়ে আসে, আবার তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ছুটি পেতে প্রত্যহই গভীর রাত হয়ে যায় তার। কোথায় ঘোরে তা কে জানে। কাউকে বলে কিছু কিছু ঠিকা নিয়েছে সে অপরের সঙ্গে ভাগে। কিন্তু কিসের ঠিকা তা কখনও বলে না। আবার কাউকে বলে, 'সাপ্লাইয়ের কাজ ধরেছি কিছু কিছু, সময় তো নেই, তাই আপিসের পর ঘুরতে হয়।' কিসের সাপ্লাই, কাকে

সাপ্লাই দেয় তা অবশ্যই কেউ জানতে পারে না। ওর কাছে যাঁরা আসেন তাদের কাছে ঘেঁষতে পারে না ভাইয়েরা। বেশীর ভাগই আসেন পাঞ্জাবী সিন্ধী ভদ্রলোক। মারোয়াড়ীরাও আসেন কেউ কেউ। তাঁরা সহজে কাউকে পাত্তা দেবার মানুষ নন। তাঁদের পেটের কথা টেনে বার করা ওদের অন্তত সাধ্যাতীত। তাঁরা সকলেই অবস্থাপন্ন লোক। খাতিরও করে হরেন যথেষ্ট। তাঁদের মুহুর্মুহু চা যোগাবার জন্য একটা আলাদা ঝিই রেখেছে সে ইদানীং।

তবে যা-ই করুক, টাকা যে বেশ কিছু আসছে তার, আকাশে ওড়ানো টাকা যে ধরছে সে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে-টাকা গোপন করতে পারে না সে, করতে চায়ও না হয়ত। তাকে কেন্দ্র ক'রে যে একটা প্রাচুর্য উছলে উঠছে সেটা স্পষ্ট, এবং প্রত্যক্ষ, তা চেপে রাখা সম্ভবও নয়। তবে একটা জিনিস তার ভায়েরা আঁচ করে ঠিকই, আর তাই থেকে তাদের ঈর্ষাবিষদগ্ধ হৃদয় কিছু সান্ত্বনাও লাভ করে। হরেনের হাতে এমন কোন মূলধন নেই যাতে যুদ্ধের ঠিকা নিয়ে সামাল দিতে পারে। এ টাকা আসছে ওর অফিস থেকেই নিশ্চয়। হয়ত ওর সঙ্গে আর যারা ক্যাশে থাকে—কিছুকিছু ঘুষ দিয়ে কিম্বা ভাগ্যাংশের লোভ দেখিয়ে মুখ বন্ধ করেছে তাদের। কিন্তু একথা চাপা থাকবে না। একদিন না একদিন ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই। আর তহবিল তছরূপ ঘোরতর অপরাধ, ধরা পড়লে বাছাধনের এই হঠাৎ বড়মানুষী বেরিয়ে যাবে চিরকালের মতো।

কিন্তু সে সান্ত্বনা বা আশ্বাস কোন কাজেই লাগে না বেচারাদের। ধরা পড়বার আগেই ভাঙ্গা ক্যাশ পূরিয়ে দেয় হরেন। মোটা মোটা টাকা বার লাভ হচ্ছে তার সেটা পূরিয়ে দেওয়া কিছু আশ্চর্যও নয়। সুতরাং অফিসে কোন গোলমালই হয় না—বরং টপাটপ মাইনে বাড়ে। মেজভাই জীবনেও ঐ অফিসে কাজ করে, সে-ই সে উন্নতির সাক্ষী দেয়। কালো মুখ আরও কালো হয়ে যায় আত্মীয়দের।

এই সব হুল্লোড়ে—টাকা এবং তার আনুষঙ্গিকে—বেচারী স্বর্ণলতার কথাটা বিশেষ আর মনে থাকে না হরেনের। সে তো আছেই। তার সংসার তার ছেলেমেয়ে নিয়ে সে ব্যস্ত আছে। সবাইকে তো সে-ই দেখে। তাকে আবার দেখতে হবে কেন? বরং সে ভালই থাকবে এবার—সংসার ভাল করেই চালাতে পারবে—অভাব যখন আর কিছু নেই কোন দিকে। নিশ্চিন্ত হয়ে সংসার করুক। মাস গেলে শুধু মাইনের টাকা নয়—আরও অনেক টাকা, প্রায় মাইনের দ্বিগুণ টাকা ধরে দেয় সে স্ত্রীকে। দিন-রাতের ঝি রেখে দিয়েছে হরেন জোর ক'রে। ঠাকুরের রান্না খেতে ঘেন্না করে বলেই রাখেনি। তাদের সংসারের বহু বিচিত্র রান্না মাইনে-করা লোক দিয়ে হওয়াও শক্ত—তবু প্রয়োজন হলে তাও রাখতে পারবে। সে কথা তাকে বলেই রেখেছে হরেন। কোন রকম কষ্ট করার আর দরকার নেই স্বর্ণর। এ সব ছাড়াও কাপড় গয়নার জন্য মাঝে মাঝে দমকা মোটা টাকা ধরে দেয় হরেন। সময় নেই বলেই নিজে কিনে দিতে পারে না। কিন্তু তাতে তো স্বর্ণরই সুবিধা, পছন্দ মতো মাল কেনার স্বাধীনতা থাকে।......

—

এই সব সহৃদয় বিবেচনা এবং অবাধ স্বাধীনতায় স্ত্রীদের ভাল থাকবারই কথা। যে কোন স্ত্রীই এমন বন্দোবস্তে সুখী থাকে। স্বর্ণও ভাল আছে নিশ্চয়। অন্তত হরেন তাই ধরে নিয়েছে।

আসলে আজকাল স্বামী-স্ত্রীর দেখাই হয় কম। অত রাত ক'রে ফেরা নিয়ে প্রথম প্রথম স্বর্ণ কিছু অনুযোগ করেছিল কিন্তু হরেন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের জীবনে সুযোগ বেশীবার আসে না। তার মতো কেরানীর জীবনে যে সুযোগ এসেছে তা কল্পনাতীত। এই বেলা ভাগ্য ভাল থাকতে থাকতে, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে এর পর আপসোসের সীমা থাকবে না। সুতরাং মিছিমিছি মূর্খ অজ্ঞ স্ত্রীলোকের মতো স্বর্ণ যেন এই তুচ্ছ কথা নিয়ে অশান্তি না করে। দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবন তাদের—এতগুলো ছেলেমেয়ে হয়ে গেল—মরে-হেজে গিয়েও পাঁচটা—এখনও কি স্বর্ণ স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করে?...মদ ভাঙ যে খাচ্ছে না তা তো দেখতেই পাচ্ছে স্বর্ণ—সে গন্ধ তো আর ঢাকা থাকে না। রাত্রে বাইরেও থাকছে না, যখনই হোক, যত রাত্রেই হোক—বাড়িতে ফিরছেই প্রত্যহ—তখন আর অত ভয় কিসের?

স্বর্ণও কথাটা বুঝল। স্বামীর ওপর চিরকালই তার অগাধ বিশ্বাস। হরেন তাকে ভালবাসে ঠিকই। হয়ত একটু বেশীই বাসে। কখনও কখনও সে স্বার্থপরের পর্যায়ে পড়ে যায় বরং। সে বিষয়ে স্বর্ণ নিশ্চিন্ত। সুতরাং হরেনের কথাগুলো সে নিজে তো ষোল আনা বিশ্বাস করেই, অপরে কোন সংশয় প্রকাশ করলে কোমর বেঁধে ঝগড়া করে তাদের সঙ্গে। এ শ্রেণীর সংশয় বা আশঙ্কা প্রকাশ করে তার জায়েরাই বেশী। মেজ জা শোভনা তো প্রকাশ্যেই বলে, 'পুরুষমানুষের রাশে অতটা ঢিল দেওয়া ভাল নয় দিদি। অতটা নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো না। সত্যি কথা বলতে কি—ভাসুর গুরুজন, বলতে নেই কিছু—কিন্তু ওঁর ভাবভঙ্গীগুলো আমার বাপু আর ভাল লাগছে না কিছুদিন থেকে। তুমি একটু চোখ-কান খুলে রেখো।'

তাতে স্বর্ণ বিষম চটে যায়। বলে, 'তোমাদের চোখ-কান ভাই এত খোলা আছে যে, আমার আর খোলা না রাখলেও চলবে।...পুরুষমানুষ, যদি একটু ইদিক-ওদিক করেই — তাতে এমন মহাভারত অশুদ্ধই বা হয়ে গেল কি? আর তাতে কার কি এলো-গেলোই বা? বলি ক্ষেতি হলে তো আমারই হবে—বরটা তো আমার, না আর কারুর? অপরের এত মাথাব্যথা কেন তাতে?'

অগত্যা শোভনা চুপ ক'রে যায় তখনকার মতো। কিন্তু হিতৈষী বলতে শোভনা শুধু একা নয়—এমন উৎকণ্ঠা আরও দু'চারজন প্রকাশ করে। সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করে স্বর্ণ। বলে, 'মা না বিয়োলো বিয়োলো মাসী, ঝাল খেয়ে মল পাড়া প্রতিবেশী! তা তোদের হয়েছে তাই। বলি আমার চেয়ে তো সে তোদের আপন নয়, তবে তোদের এত চিন্তা কেন? মার চেয়ে ব্যেথিনী, তারে বলে ডান—তা জানিস না?'

আবার হয়ত কাউকে হাসতে হাসতে—একটু বা চোখ-টিপে বলে, 'ওলো, অনেক দিন ঘর করেছি—আমারও অরুচি ধরে গেছে, ওরও। আমার মুখ বদলাবার উপায় নেই তাই, নইলে কি আমিই ছেড়ে কথা কইতুম? যার উপায় আছে—সে দিন-কতক বদলে আসুক না!...আমার অত ভাতার ভাতার বাই নেই তোদের মতো। ভোগও

করে নিয়েছি তো ঢের দিন—এখন আর ওতে আছে কি? রসকষ যা ছিল তা তো সব শুষে গেছে এ্যাদ্দিনে—কিছু কি আর আছে? এখন তো শুধু পড়ে আছে ছোবড়া-খানা, তা ও যে যা পারে নিক, ওর জন্যে অত আঁচলে গেরো দিয়ে রাখার দরকার নেই।...বরং মানুষটাকে নিয়ে কেউ আর চাট্টি টাকা দেয় তো দিক, আমার টাকাটা এলেই হ'ল!

কিন্তু ক্রমশ স্বর্ণলতা নিজেও যেন সে অখণ্ড বিশ্বাসটা রাখতে পারে না। ফিরতে রাত হয় বলে শুধু নয়—আজকাল অধিকাংশ দিনই বাড়িতে খায়ও না হরেন। স্বর্ণলতা এমন বহুদিন খাবার সাজিয়ে বসে থেকেছে দীর্ঘরাত পর্যন্ত—নিজের এবং হরেনের দুজনের খাবারই শোবার ঘরে এনে গুছিয়ে রেখে দিয়েছে—কিন্তু রাত দেড়টা কি দুটোর সময় এসে হয়ত হরেন জানিয়েছে যে কোন বিলিতি হোটেলে কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, সে জোর করে ডিনার খাইয়ে দিয়েছে। অথবা গুরুবচন সিং জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে, সেইখানে খেয়ে এসেছে। ফল হয়েছে এই যে, স্বর্ণরও খাওয়া হয়নি আর। অত রাত অবধি বসে বসে ঢোলবার পর এই সংবাদ শুনে একা বসে আর খেতে ইচ্ছা করেনি। হরেনের খাওয়ার নানা নটখটি, অনেক রকম রান্না না হলে সে খেতে পারে না। বহু দুঃখে বহু মেহনতে প্রস্তুত সে সব খাদ্য হরেনের ভোগে এল না—সেটাও কম দুঃখের হেতু নয়। তখন সেগুলো নিজে নিজে গিলতে স্বর্ণর চোখে জল এসে যেত।

তবু—তখন যদি হরেন সামনে বসে দুটো কথা কইত কি গল্প করত, কি খাবার জন্য পীড়াপীড়িও করত তো আলাদা। সে এতই ক্লান্ত হয়ে আসে যে স্বর্ণর খাওয়া হল কি হল না, সেটাও চেয়ে থাকবার ধৈর্য থাকে না তার তখন। কোনমতে জামা-কাপড় ছেড়েই শুয়ে পড়ে। এমন কি সকালে কোন ছেলে-মেয়ের অসুখ দেখে গেলেও কেমন আছে জিজ্ঞাসা করার কথা মনে থাকে না তার। পরের দিন সকালে তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়।

অবশেষে হরেনই প্রস্তাব করল যে, স্বর্ণ যেন তার জন্য জেগে বসে না থাকে। খাবারও না আর শোবার ঘরে এনে রাখে। সারাদিন খাটা-খাটুনির পর স্বর্ণর এমনভাবে জেগে বসে থাকার কোন অর্থই নেই। খাবারটাও এ ঘরে রাখার দরকার নেই—এসে ঢাকা খুলে খাবার খেতে গেলেই স্বর্ণর ঘুম ভেঙে যাবে, স্বভাবতই সে ব্যস্ত হয়ে উঠে এসে বসবে, বাতাস করতে চেষ্টা করবে—ফলে রাত্রিজাগরণ তার বন্ধ হবে না কোনদিনই। সুতরাং বাইরের ঘরের টেবিলে ভারী লোহার ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেওয়াই ভাল, খেতে ইচ্ছা হলে খাবে, নয় তো খাবে না—এক সময় শুধু গিয়ে চুপি চুপি শুয়ে পড়বে হরেন। একবার উঠে দোর খুলে দেওয়াটা এমন কিছু হাঙ্গামা নয়। আর—যেদিন খুব বেশী রাত হবে, আড়াইটে কি তিনটে—সেদিন অত ঝামেলাও করবে না—বাকী দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ঐ বাইরের ঘরের ইজী চেয়ারে বসেই কাটিয়ে দিতে পারবে।

স্বর্ণ অবশ্যই খুব সহজে এ প্রস্তাবে রাজী হয়নি। এ তার সমস্ত জীবন-সংস্কারের বিরোধী। স্বামী সারাদিন খেটেখুটে এসে বাইরের ঘরে ঢাকা খুলে একা বসে খাবে—আর সে নিশ্চিন্ত হয়ে খাটে শুয়ে ঘুমোবে—এ কেমন করে হয়?...কিন্তু হরেনই জেদ করতে লাগল ক্রমাগত। এবং হয়ত বা কথাটাকে জোর দেবার জন্যেই, পর পর দু-তিন দিন আড়াইটেরও পর ফিরল সে, অত রাত্রে যে খেতে বসল না তা বলাই বাহুল্য। অগত্যাই রাজী হতে হল স্বর্ণকে। তার বুদ্ধিমতী জায়েরা আর একবার বিজ্ঞের হাসি হাসল আড়ালে।

এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর যেটুকু যোগ ছিল এতদিন—সেটুকুও ছিন্ন হয়ে গেল। আজকাল প্রায়ই শেষ রাত হয়ে যায় হরেনের ফিরতে। ফলে শুধু খাওয়া নয়, শোওয়ার ব্যবস্থাটাও পাকাপাকিভাবে বাইরের ঘরেই ক'রে নিল সে।

কিন্তু রাত হওয়াটাই কি তার একমাত্র কারণ।

বুকের মধ্যে একটা শীতল হতাশা অনুভব করেও স্বীকার করতে হয় স্বর্ণকে শেষ পর্যন্ত যে—তা নয়।

বহুদিন আত্মপ্রতারণার চেষ্টা করেছে সে, দিদিমার ভাষায় 'মনকে আঁখি ঠারতে' চেয়েছে—কিন্তু প্রতারিত করা যায়নি শেষ পর্যন্ত। মনের অগোচর পাপ নেই—মনে মনে মানতেই হয়েছে এক সময়ে যে, তার জায়েদের উপদেশই ঠিক, রাশ অনেক আগেই টানা উচিত ছিল। রাত্রে দেখা হয় না আজকাল আর কোনদিনই কিন্তু সকালে হয়। চা এনে স্বর্ণকেই ঘুম ভাঙ্গাতে হয় প্রত্যহ। বিলাতী সুরার গন্ধ দেশী মদের মতো অত উগ্র নয় হয়ত—তবু পরের দিন সকাল পর্যন্ত তার স্মৃতি রাখায় পক্ষে পর্যাপ্ত। গন্ধটা ঠিক না চিনলেও অনুমান করতে পারে। পথে-ঘাটে আসা-যাওয়ার সময় মাতাল দু-একজন পাশ দিয়ে গেছে—সে কথাটাও মনে পড়ে যায় এ গন্ধ থেকে।

আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না স্বর্ণ। সকালে ঘুম ভাঙ্গবার সময় কলহ-কেজিয়া করতে নেই বলে—কিম্বা তারই বা আর অবসর কই এ সময় ছাড়া। অগত্যাই তাকে সেই সময়েই কথাটা তুলতে হয়, 'হ্যাঁ গো, কাজ কাজ বলে তুমি এই সব্বনাশ শুরু করেছ! এই ছাই-ভস্ম ধরেছ! এই জন্যেই বুঝি আলাদা শোওয়ার ব্যবস্থা? এই তোমার ব্যবসা করা? কাজ নেই আর আমার এমন ব্যবসা ক'রে। যাও বা ছিল রয়ে বসে তাও যাবে বদ্যি এসে, এ নেশা একবার ধরলে পথে বসতে দেরি হবে না। তুমি

যেমন চাকরি করছিলে, তেমন সময়মত সন্ধ্যেয় বাড়ি আসছিলে তাই এসো—আমার অত বড়মানুষ হয়ে দরকার নেই আর!'

অপ্রিয় সত্য সকল অবস্থাতেই অরুচিকর, এমন নেশা ভাঙবার পরের অবস্থার তো কথাই নেই। তবু হরেন কোন রাগারাগি করে না। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, 'এই দ্যাখো! তবে আর মুখ্যু বলেছে কেন! ওরে পাগল, সাহেবী ডিনারের এ একটা প্রধান অঙ্গ, বিশ্বাস না হয়, যে লোক একটু লেখাপড়া জানে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রো। আমি কি আর নেশা করার মতো খাই—যেটুকু না খেলে নয়, সেইটুকুই খাই।'

'কই—এর আগেও তো সাহেবী ডিনার খেয়ে এসেছ কতদিন। তখন তো এমন গন্ধ পাই নি।'

'পাবে কি, মধ্যে যে ও জিনিস একেবারে মিলছিলই না। না দিতে পারলে আর খেতে বলবে কী ক'রে? বোতল বোতল জল খেতে বলবে কি?'

'তা অত তোমার রোজ রোজ ডিনার ফিনার খাবার দরকারই বা কি! রোজ রোজ পরের ঘাড়ে চেপে খেতে লজ্জা করে না!'

'পরের ঘাড়ে কী গো। অর্ধেক দিন তো আমাকেই সব খরচা দিতে হয়। এই তো কালই—একটা ডিনার দিতে সাড়ে আটশো টাকা খরচা হয়ে গেল!'

'ওমা। কারুরে বে-পৈতেতেও তো এত খরচা হয় না। এমন ক'রে পয়সা ওড়ালে কদিন চালাতে পারবে। এইভাবে বাজে পয়সা উড়িয়ে কত রাজা-মহারাজা ফতুর হয়ে গেছে জানো? তুমি তো কোন ছার!......না না, তোমাকে আর অত ডিনার ফিনার দিতে হবে না! ফের যদি শুনি তুমি এমনি ইয়ার বক্‌শি নিয়ে মাইফেল ক'রে টাকা ওড়াচ্ছ, তাহ'লে আমি মাথামুড়ে খুঁড়ে রক্তগঙ্গা করব বলে দিচ্ছি!'

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে হরেন। বলে, 'তুমি একটা আস্ত আবর, মাইরি! ওরে বাবা, ওটা পয়সা ওড়ানো নয়, পয়সার সুতোয় খেলানো। বেনোজল ঢুকিয়ে ঘরোজল বার করতে হয় শোননি কখনও? এও সেই রকম। আমার আধেক কাজ তো ঐ ডিনার-লাঞ্চ খেতে-খেতেই হয়। এসব বিলিতি দস্তুর। এই যে ব্যারিস্টার হ'তে সব বিলেতে যায়—কটা ডিনার আর কটা লাঞ্চ খেলেই পড়া শেষ। সেও গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে খেতে হয়—তা জানো!'

অত শত বোঝে না স্বর্ণ, তবু স্বামীকে অবিশ্বাসও ঠিক করতে পারে না, ম্লান মুখে বলে, 'কে জানে বাপু, ও যা জিনিস, ওর নাম শুনলেই ভয় করে। কত লোকের সব্বনাশ যে হ'তে দেখলুম তার কি কিছু ইয়ত্তা আছে! ঐ একটু আধটু থেকেই শুরু হয়—সব্বাই বলে প্রেথম প্রেথম যে ও কিছু নয়—তারপর নেশা যখন ঘাড়ে চেপে বসে তখন আর জ্ঞান থাকে না কারুরই! এ পোড়ার লড়াই যে কবে শেষ হবে—এই সব কাণ্ডকারখানা বন্ধ হবে—যুদ্ধ শেষ হ'লে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসব খাড়া-খাড়া!'

হরেন তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দেয়, 'ওসব অলক্ষুণে কথা মুখে এনোনা বলে দিচ্ছি, খবরদার। যদ্দিন যুদ্ধ চলে তদ্দিনই লাভ। যুদ্ধই লক্ষ্মী আমার!'

তা সত্যি। স্বর্ণ ভাবে, শুধু হরেনের কেন, আরও অনেকের কাছেই এ-যুদ্ধ লক্ষ্মী। ওর ভাইয়েরা যে কেউ কোন-কালে রোজগার-পাতি করবে, পয়সা ঘরে আনবে—তা একবারও ভাবেনি সে। এই যুদ্ধের দৌলতেই তা সম্ভব হ'ল। সেজ ধনা ড্রাইভারী শিখে মিলিটারীতে নাম লিখিয়েছে, সে নাকি কেল্লার লরী চালাচ্ছে আজকাল। শুধু মাইনেই নয়, এদিক ওদিকও বেশ দু' পয়সা কামাচ্ছে নাকি। মাল স্টেশনে, জাহাজ-ঘাটায় পৌঁছে দেবার পথে এক বস্তা চিনি কি এক বস্তা সিগারেট নামিয়ে দিয়ে যায়—মোট-মোট টাকা পায় তাতে। অবিশ্যি ভাগ দিতে হয় তা থেকে অনেককে—তবু দিয়ে থুয়েও ঢের থাকে। ধনা এর মধ্যে রেডিও কিনেছে, আবার পাখা নেব নেব করছে। মেজকা তো তারও বে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। ন্যাড়াও কি যেন লেদ্ না কী একটা কাজ শিখে কোন্ পাঞ্জাবীর কারখানাতে ঢুকে পড়েছে। বাকী দুটো ভায়েরও হয়ত কিছু কিছু গতি হয়ে যাবে—লড়াইটা আর কিছুদিন চললে। কিছু হ'ল না শুধু বুড়োরই। আর হবেও না কোনদিন তার কিছু। চিরকালই কাকাদের ভায়েদের হাত-তোলায় জীবন কাটাতে হবে। মুখপোড়া!......স্বর্ণ মনে মনে সাধারণভাবে গুরুজনদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বড়ভাইকে গাল দেয়।......মুখপোড়ার যে আবার সন্দ-বাই ধরেছে। দিনরাত নাকি বৌকে পাহারা দেয় আজকাল, আঁচল ধরে ধরে ঘোরে। বৌটারই শ'তক ক্ষোয়ার। বিয়েন তো অগুন্তি—কটা জন্মাচ্ছে কটা মরছে আর কটা রইল তা বোধকরি ওরাও হিসেব রাখে না। সেদিন মেজকাকে জিজ্ঞেস করেছিল স্বর্ণ, সেও বলতে পারেনি। অথচ এ গোটা ভূ-ভারতের হিসেব তার নখদর্পণে সে কথা কে না জানে!...... এক মাসও বোধ হয় জিরোতে পারে না বেচারী, বারোমাসই পেটে বোঝা নিয়ে ঘুরছে আর সংসারের খাটুনি ষোল আনা বজায় দিচ্ছে।

'মেয়ে জন্মের শতেক জ্বালা। মুয়ে আগুন মেয়ে জন্মের।' মনে মনে বারবার বলে স্বর্ণ। হয়ত নিজের কথাটা মনে ক'রেই বলে। একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে।

(ক্রমশঃ)

'দেয়া নেয়া' চিত্রে তনুজা ও উত্তমকুমার

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

প্রেক্ষাগৃহের অগণিত পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীকে বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সমালোচকের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে হয়ত কখনও কখনও কোনো কোনো নাট্য-সংস্থা, চিত্র-প্রযোজক, শিল্পী এবং কলা-কুশলীর মনোবেদনার কারণ হয়েছি। আজকের দিনে তাঁদের সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে এই কথাটা বিশেষ-ভাবে জানিয়ে রাখতে চাই যে, আমাদের আলোচনার লক্ষ্য বরাবরই শিল্পকর্ম; তাকে উপলক্ষ্য ক'রে কোনো দিন কোনো ব্যক্তিকে আমরা সরাসরি আঘাত করবার কথা চিন্তাতেও স্থান দিই না। সর্ববিদ্যার আধার, সর্বশক্তিসমন্বিতা, বিশ্বাত্মিকা, বিশ্বধাত্রী সেই মহাদেবীর চরণে প্রার্থনা জানাই, বাঙলার রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্র জগতের সকল শিল্পকর্ম যেন অতঃপর রসোত্তীর্ণ হয়ে চরম সার্থকতা লাভ করে।

চিত্র সমালোচনা

সূর্যশিখা (বাঙলা) : ছায়াছবি প্রতিষ্ঠান-এর নিবেদন : ৩,৯৬১ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী, চিত্রনাট্য, প্রযোজনা এবং পরিচালনা : সলিল দত্ত; চিত্রনাট্য-তত্ত্বাবধান : বিনয় চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়; গীত-রচনা : শৈলেন রায়; চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ; শব্দানুলেখন, সঙ্গীতগ্রহণ এবং শব্দপুনর্যোজনা : সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা : গোপী সেন; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণ : উত্তমকুমার, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, গঙ্গাপদ বসু, উৎপল দত্ত, তরুণকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ধীরাজ দাস, পারিজাত বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ, সুপ্রিয়া চৌধুরী, শোভা সেন, আরতি দাস, সবিতা সিন্‌হা প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল মহাসপ্তমীর দিন, ২৪-এ' অক্টোবর থেকে রাধা, পূর্ণ এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

'সূর্যশিখা'তে সেই চিরন্তন সত্যটিই আর একবার নতুন ক'রে আলোচিত হয়েছে, যা অবলম্বন ক'রে একদা গ'ড়ে উঠেছিল প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'মুক্তি'। পুরুষ নারীকে ভালোবাসে এবং ভালোবেসে তাকে বিবাহ করে; কিন্তু এই ভালোবাসা থেকেও তার কাছে যা বড়ো, সে হচ্ছে তার কর্মজীবন। অপরপক্ষে নারী পুরুষকে ভালোবাসে এবং ভালোবেসে তাকে বিবাহ করে একটি সুখের নীড় রচনা করবার জন্যে। এই নীড়টিই হচ্ছে তার জগৎ এবং এই জগৎকে নিখুঁত ক'রে তোলবার জন্যে সে অনায়াসে বাইরের জগৎকে উপেক্ষা করতে, এমন কি, ভুলে যেতে প্রস্তুত।—এই স্বাভাবিক ব্যবস্থাকে যে পুরুষ ও নারী মেনে নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে, তাদের দাম্পত্য-জীবন মোটামুটি সুখের, একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু যারা তা' পারে না? যে-পুরুষ চায়, তার সহধর্মিণী তার কর্মময় জীবনে নিয়ত তার পাশে থেকে তার কর্মসাধনার সহায়ক হবে, কিংবা যে-নারী চায়, তার স্বামী বহির্জগতে নিজের কর্মসূচীকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ক'রে তার সুখনীড়ের দোসর হয়ে তার ভালোবাসার জগৎকে ভরিয়ে তুলবে, তাদের দাম্পত্য-জীবন? তাদের দাম্পত্য-জীবনে প্রতিনিয়তই সংঘাত ওঠে এবং সেই সংঘাত সময়ে সময়ে এমনই উত্তাল হয় যে, দু'জনের মধ্যে অসামান্য ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

ঠিক এমনটাই ঘটেছিল 'সূর্যশিখা'র নায়ক-নায়িকা ডাক্তার দীপ্ত রায় এবং ও-টি নার্স অচেনা রায় (বসু)-এর

'সিঁদুরে মেঘ' চিত্রে মাধবী মুখার্জি ফটো : অমৃত

দাম্পত্য-জীবনে। অপারেশনে সাহায্য-কারিণী অচেনা বসু ডাক্তার দীপ্ত রায়ের শল্য-চিকিৎসার পক্ষে এমনই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল যে, সহকর্মিনীকে পাকা-পাকিভাবে নিজের চিকিৎসক-জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবার জন্যে তাকে করে নিল সহধর্মিণী। কিন্তু এতেই বাধল গোল। যদিও রেজেস্ট্রী ক'রে হোলো ওদের শুভ-পরিণয়, তবু উভয় পক্ষের শুভানুধ্যায়ী এর সামাজিক দিকটাকে বাদ দিতে চাইল না। অথচ ফুলশয্যার সকল আয়োজন সত্ত্বেও যখন দীপ্ত একটি জরুরী 'কেশ'-এ আটক প'ড়ে প্রায় শেষ রাত্রে বাড়ী ফিরল, তখন অচেনা তার আগমনের অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে ব'সেই ঘুমে অচেতন। দীপ্ত যখন ওকে জাগিয়ে নিজের অনিচ্ছাকৃত দেরীর জন্যে দুঃখপ্রকাশ করতে উদ্যত, তখন অচেনার ক্ষুব্ধ হৃদয় থেকে যেন আপনি কথা বেরিয়ে আসে : "ভাবছি, কাগজে সইকরা বিয়েতে কি ফুলশয্যা হয়?" এই হ'ল অনর্থের সূচনা। এর পরও কিন্তু অচেনা নিজের সুখনীড় গ'ড়ে তোলবার জন্যে তার নার্সের কাজ থেকে ক্রমেই স'রে আসতে লাগল এবং স্পষ্টই বলল, ঘরই তার কাছে বড়ো। এক সহকর্মী ডাক্তারের বাপের ব্রেন-টিউমার অপারেশন করতে গিয়ে দীপ্ত যখন অচেনার সাহায্য না পাওয়ার দরুণেই বোধ হয় রোগীকে বাঁচাতে অসমর্থ হল, তখন সে ক্ষোভে দুঃখে অচেনাকে বলতে বাধ্য হ'ল : গৃহলক্ষ্মী ক'রে সাজিয়ে রাখবার জন্যে সে অচেনাকে বিয়ে করেনি, সে ভালোবেসেছিল নার্স অচেনাকে, তাকে বিয়ে করেছিল তার অপা-রেশন টেবিলের পাশে চিরকাল বেঁধে রাখবার জন্যে—"বাট্ শী ইজ্ ডেড টু মি।...... আমি তোমার কাছ থেকে মুক্তি চাই।"—অপারেশন টেবিলের ওপর রোগীর মৃত্যু ঘটায় দীপ্ত এমনই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তার স্ত্রী অচেনা তাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কেন যে অপারেশন টেবিলের ধারেই সহসা সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল, এ-সম্পর্কে কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদের কথাও তার মনে উদিত হয়নি। প্রকৃত তথ্য অবগত হয়ে যখন সে অচেনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার জন্যে ছুটে গিয়ে-ছিল, তখন অচেনার মনের অভিমান দু'জনের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।—এর পর দীর্ঘ চব্বিশ-পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হ'লে কি নাটকীয়ভাবে আবার দু'জনে এক হয়, তাই নিয়েই ছবির শেষ অংশ রচিত হয়েছে। যুক্তি-বাদী মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক তার হাস-পাতালের কাজ নিয়ে যতই মত্ত থাকুক না কেন, তাঁর নিজের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, এ সংবাদ তার কাছে অজ্ঞাত থাকে কি ক'রে? এবং এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর ছবির মধ্যে অনুপস্থিত।

ছবিটির প্রধান সম্পদ হচ্ছে নায়ক ডাঃ দীপ্ত রায়ের ভূমিকায় উত্তমকুমারের বলিষ্ঠ অভিনয়। যে-আশ্চর্য নাট-নিপুণতার সঙ্গে তিনি চরিত্রটিকে প্রাণ-বন্ত ক'রে তুলেছেন, তাতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, তিনি ভূমিকাটিকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। নির্দ্বিধায় বল'তে পারা যায়, উত্তমকুমারের অভি-নেতৃ-জীবনে ডাঃ দীপ্ত রায় একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। প্রযোজক-পরিচালক সলিল দত্ত তাঁরই রচিত কাহিনী চল-চ্চিত্রায়ণে ডাঃ দীপ্ত রায়কেই দর্শকসমক্ষে প্রায় সর্বক্ষণ রেখে বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছেন। নায়িকা অচেনার চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরীর সংবেদনশীল অভিনয় সহজেই দর্শকমনকে প্রভাবিত করে। জমিদার শিবদাস ধরের ছোট্ট ভূমিকায় পরলোকগত ছবি বিশ্বাসের ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন অভিনয় আমাদের মাত্র এই কথাই

জানিয়ে দিল যে, এমনটি আর হবে না। অপরাপর চরিত্রে অসিতবরণ (প্রশান্ত), উৎপল দত্ত (মিঃ সান্যাল), পারিজাত বসু (সুবিমল), গঙ্গাপদ বসু (ডাঃ চক্রবর্তী), তরুণকুমার (মিঃ পাকড়াশী), জহর রায় (ডাঃ চক্রবর্তীর ভাগ্নে), শোভা সেন (নার্স প্রমীলা গুহ), আরতি দাস (নার্স), শৈলেন মুখোপাধ্যায় (অন্যতম ডাক্তার), দেবনারায়ণ (পঙ্কজ) প্রভৃতি প্রশংসনীয় নাট-নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চমনের পরিচয় পাওয়া গেছে। বিশেষ ক'রে বহির্দৃশ্য এবং আভ্যন্তরীণ দৃশ্যগুলিতে যে আশ্চর্য সমতা রক্ষা করা হয়েছে, তাতে চিত্র-শিল্পী বিজয় ঘোষের শিল্প-চাতুর্যের অজস্র প্রশংসা করতে হয়। শব্দানুলেখন এবং শব্দপুনর্যোজনায় সত্যেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুনামকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদনার মাধ্যমে কাহিনীগত প্রয়োজনীয়তার অনুসরণে ছবির গতিরক্ষা করেছেন। ছবির গান তিনখানি কিন্তু কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হ'তে পারেনি; মনে হয়েছে, ও-গুলিকে অযথা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। সুরিধর্মী আবহ-সঙ্গীত ঘটনার ভাবপ্রকাশে বহু-ক্ষেত্রেই সহায়তা করেছে।

উত্তমকুমার অভিনয়দীপ্ত 'সূর্যশিখা' চিত্ররসিক দর্শকদের কাছে একটি নতুন আবেদন পৌঁছে দেবে, এ-কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি।

কাঞ্চন-কন্যা চিত্রে শান্তি দাস, অরুণ মুখার্জি ও কণিকা মজুমদার

কাঞ্চন-কন্যা (বাঙলা) : চলচ্চিত্র-প্রয়াস-সংস্থার নিবেদন; ৩,৬৪২ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : সুখেন্দু চক্রবর্তী; সঙ্গীত-পরিচালনা : ভি. বালসারা; গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত; চিত্রগ্রহণ : দেওজীভাই; শব্দানুলেখন : জে. ডি. ইরাণী; সঙ্গীত-গ্রহণ ও শব্দপুন-র্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা : মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : গোপী সেন; রূপায়ণ : কণিকা মজুমদার, সুমিতা সান্যাল, ইরা চক্রবর্তী, সুমিত্রা ঘোষ, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, অময় গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, বঙ্কিম ঘোষ, ধীরাজ দাশ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল দুর্গাসপ্তমী, ২৪এ অক্টোবর থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

কাঞ্চন চিত্রে নায়িকা সন্ধ্যা রায়

পরীক্ষার পড়া ফেলে জেঠামশাইয়ের ইচ্ছামত তাঁর ব্যবসায়ের হিসেবপত্র শিখতে না চাওয়ার অপরাধে দশ বছরের ছেলে পূর্ণেন্দু যেদিন অমানুষিকভাবে লাঞ্ছিত হয়, সেদিন সে তাঁর আশ্রয় ছেড়ে পথে বেরিয়ে প'ড়ে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়। দীর্ঘদিন ধ'রে বহু রকম অভিজ্ঞতা লাভের পর আবার যখন সে দেখা দেয়, তখন সে মালয়-এর বাসিন্দা এবং বন্ধু সুদর্শনের সঙ্গে একত্রে বাস করছে। কলকাতা থেকে একজন এটর্নী চিঠি লিখে তাকে জানালেন, তার জেঠামশাই হরনাথ চৌধুরী মশাই মারা যাবার সময়ে তাকে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি দান ক'রে গেছেন একটি শর্তে—তাঁর মনোনীত পাত্রী উমা ওরফে খাঁদুকে বিবাহ করতে হবে; যদি সে অসম্মত হয়, তাহলে বিষয়-সম্পত্তি পাবেন জমিদারীর নায়েব বিশ্বনাথ। খাঁদুকে পূর্ণেন্দুর বেশ মনে আছে; সেই একরত্তি মেয়েটা জেঠামশাইয়ের কথায় তার কান মলে দিয়েছিল। কিন্তু ষোল বছর বাদে সেই নাকে-কান্না মেয়েটা কেমন হয়েছে, তার মেজাজ বা চেহারা কেমন, তা' না জেনেই তাকে বিবাহ করতে সম্মত হওয়া যায় কি ক'রে? কিন্তু বন্ধু সুদর্শন তার সঙ্গী হ'তে রাজী হয় এবং বলে, সরেজমিনে তদন্ত ক'রে আসতে দোষ কি? যদি পছন্দ না হয়, ফি'রে এলেই চলবে। যে-প্লেনে পূর্ণেন্দুর যাবার কথা ছিল এবং যে-প্লেনে শেষপর্যন্ত সে যায়নি, দুর্ঘটনায় সেই প্লেনটি বিধ্বস্ত হয় এবং সংবাদ বেরোয়, পূর্ণেন্দু চৌধুরী মারা গেছে। (ব্যাপারটি অবশ্য একেবারেই অসম্ভব; কারণ প্লেনে চাপবার জন্যে কোনো যাত্রী হাজির না হ'লে তার নাম বাতিল হয়ে যায়।) পরের প্লেনে পূর্ণেন্দু এবং সুদর্শন রওনা হয় এবং অকুস্থলে হাজির হয়ে দেখে মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদের ওপর নির্ভর ক'রে পূর্ণেন্দুর শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। অতএব মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বেনামীতে পূর্ণেন্দু জেঠামশাইয়ের এস্টেট ম্যানেজারের চাকরীটা জোগাড় করে সুদর্শনের তদ্বিরের ফলে এবং নন্দগোপাল নাম নিয়ে কাজকর্ম চালাতে থাকে। কর্মস্থলে উমার সান্নিধ্যে আসবার সুযোগও হয় তার; কিন্তু দেখে, তার প্রতি উমার ব্যবহার চাকরের প্রতি মনিবের মতো। অথচ সুধীন ডাক্তারের সঙ্গে তার কি হাসিখুশী ভাবে মেলামেশা! কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, উমা নন্দগোপালের প্রতিই অনুরক্ত। এতে অত্যন্ত অসুবিধে বোধ করেন উমার মামা অবিনাশ; কারণ নন্দগোপাল ইতিমধ্যেই তার দুর্নীতিগুলো ধ'রে ফেলেছে এবং তার প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট নয়। অতএব শ্যালক কুঞ্জর সাহায্যে তিনি আমদানী করেন এক জাল-পূর্ণেন্দুর এবং তাকেই আসল পূর্ণেন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তার সঙ্গে উমার বিবাহকে ত্বরান্বিত করবার জন্যে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করতে লাগলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণেন্দুরূপে আত্মপরিচয় দেওয়ায় নন্দগোপালকে করলেন এক নির্জন স্থানে বন্দী। এরপর সুদর্শন কিভাবে দৈবানুগ্রহে ও পুলিশের সহায়তায় সকল রহস্য ভেদ ক'রে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করল এবং শেষ পর্যন্ত আসল পূর্ণেন্দু ও উমার মিলন সম্ভব হ'ল, এই নিয়েই ছবির শেষের দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে।

এই ঘটনাপ্রধান কাহিনী অবলম্বনেই 'কাঞ্চন-কন্যা' ছবিটি গ'ড়ে তুলেছেন সুখেন্দু চক্রবর্তী। মালয়ের পরিবেশে ছবিটিকে আরম্ভ ক'রে ছোট্ট একটি ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সাহায্যে পূর্ণেন্দুর বাল্যজীবনকে দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরে তিনি আবার বড়ো পূর্ণেন্দুতে ফিরে এসেছেন এবং বন্ধু সুদর্শন সমেত তাকে এনে হাজির করেছেন মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদের ওপর নির্ভর-করা পূর্ণেন্দুর শ্রাদ্ধবাসরে। এর পর বিশেষ পরিস্থিতির সুযোগে নন্দগোপাল, এই ছদ্মনামে পূর্ণেন্দুর এস্টেট ম্যানেজারীর পদলাভ এবং উমার সঙ্গে কর্মব্যপদেশে তার কথার আদান-প্রদান থেকে শুরু ক'রে তার প্রতি উমার আসল মনোভাব প্রকাশ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই তিনি সহজ এবং সুষ্ঠুভাবে চিত্রায়িত করেছেন। এরই মধ্যে উমা এবং পূর্ণেন্দুর পরস্পরকে সুযোগমত "আমি নোটবুক নই, মানে ব'লে দেওয়া আমার কাজ নয়"—এই ব্যঙ্গোক্তিটির ব্যবহার অত্যন্ত উপভোগ্য। ছবির পরিস্থিতিকে জটিল করবার জন্যে জাল-পূর্ণেন্দুর আমদানী এবং শেষ পর্যন্ত তার রহস্যভেদের ব্যাপারটি ছবির দুর্বলতম অংশ এবং অপরিচ্ছন্নও বটে। অবশ্য এর জন্যে পরিচালকের দায়িত্ব কতটুকু, তা নির্ণয় করা কঠিন।

ছবির অভিনয়াংশে প্রত্যেক শিল্পীই প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করেন নি। এরই মধ্যে কণিকা মজুমদার (উমা), পাহাড়ী সান্যাল (বিশ্বনাথ), অমর গাঙ্গুলী ((জাল-পূর্ণেন্দু ওরফে বিমলেন্দু দাশগুপ্ত), তৃণাঞ্জন মিত্র ও অরুণ মুখোপাধ্যায় (ছোট ও বড়ো পূর্ণেন্দু), অনুপকুমার (সুদর্শন), গঙ্গাপদ বসু (অবিনাশ), সুমিতা সান্যাল (উমার ভগ্নী), কুমার রায় (কুঞ্জ) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি সাধারণ মান বজায় থেকেছে। ছবির তিনখানি গানের মধ্যে দু'খানি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং একখানি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন। "ওগো রাত যেও না" গানখানির আরম্ভভাগ অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী। আবহ-সঙ্গীত যথাযথ।

মেরে মেহবুব (হিন্দী) : রাহুল থিয়েটার্স (ইণ্ডিয়া)-র নিবেদন; ১৮ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ও পরিচালনা : এইচ, এস, রাওয়েল; কাহিনী ও সংলাপ : বিনোদকুমার; চিত্রনাট্য : এইচ, এস, রাওয়েল ও বিনোদকুমার; সঙ্গীত-পরিচালনা : নৌশাদ; গীত-রচনা : শকীল বাদাউনী; চিত্রগ্রহণ : জি, সিং; শব্দানুলেখন : ওয়াই, এম, ওরাগল, নাসির এবং এস, এল, পাঠক; সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : কৌশিক; নৃত্য-পরিচালনা : বি, হীরালাল এবং বি, সোহনলাল; শিল্প-নির্দেশনা : সুধেন্দু রায়; সম্পাদনা : কৃষ্ণ সচদেব; রূপায়ণ : অশোককুমার, রাজেন্দ্রকুমার, সাধনা, নিম্মী, জনি ওয়াকার, প্রাণ, সুন্দর, অমিতা, মমতাজ, মুরাদ, সতীশ প্রভৃতি। অমরজ্যোতি পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল মহাষ্টমীর দিন, ২৫-এ অক্টোবর থেকে ওরিয়েণ্ট, ম্যাজেস্টিক, কৃষ্ণা, দর্পণা, প্রিয়া, ইণ্টালী, ভবানী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"মেরে মেহবুব" অর্থাৎ "ওগো প্রিয়তম"! ইস্টম্যান কালারে তোলা এই ছবিখানি নৃত্যে, গীতে, সংলাপে, দৃশ্য-বৈচিত্র্যে এবং অসামান্য চিত্রগ্রহণনৈপুণ্যে হিন্দী ছবির সাধারণ দর্শককে যে মাতিয়ে তুলবে কিংবা ইতিমধ্যেই তুলেছে একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারা যায়।

খানদানি ঘরের অর্থাৎ বড়লোকের (অশোককুমার) বোনের (সাধনা) সঙ্গে যে অজ্ঞাতকুলশীল শিক্ষিত, সচ্চরিত্র যুবকের (রাজেন্দ্রকুমার) প্রেম, তারই দিদি (নিম্মী) হচ্ছে সেই বড়লোকের হৃদয়েশ্বরী, নৃত্যগীতকুশলা অভিনেত্রী হয়েও প্রেমপাত্রী। প্রণয়ের পথ অত্যন্ত কুটিল। তাই বহু বাধাবিঘ্নকে অপসারিত করবার পরেই যুবক আনোয়ার মিলিত হ'তে পেরেছিল সুন্দরী হাসনার সঙ্গে।

অভিনয়ে অশোককুমার, রাজেন্দ্রকুমার, সাধনা, নিম্মী, জনি ওয়াকার, প্রাণ, অমিতা প্রভৃতি প্রত্যেকটি শিল্পীই নিজ নিজ ভূমিকায় পারদর্শিতা দেখাতে ত্রুটি করেননি। সাধনা এবং অমিতা—দুজনেই অভিনয় ছাড়াও নৃত্যে নিজেদের জনচিত্তবিমোহিনী ক'রে তুলেছেন। নৌশাদের দ্রুতলয়ের সঙ্গীত এই নৃত্যগুলিকে সাবলীল ক'রে তুলেছে।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। চিত্রগ্রহণে, বিশেষ ক'রে সাধনার ক্লোজ-আপ গ্রহণে জি, সিংহ যে অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তার তুলনা নেই। এবং বহির্দৃশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে বিরাট সেট পরিকল্পনা করেছেন শিল্প-নির্দেশক সুধেন্দু রায়, তাও ভারতীয় ছবিতে সচরাচর চোখে পড়ে না। সঙ্গীতগ্রহণ এবং শব্দানুলেখনের কৃতিত্ব সমানভাবে প্রশংসা পাবার যোগ্য।

নয়নাভিরাম ইস্টম্যান কালারে তোলা "মেরে মেহবুব" একটি জনচিত্তজয়ী চিত্র।

মঞ্চাভিনয়
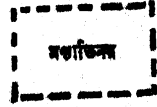
শারদীয়া পূজার তিনদিন রাস থিয়েটার্স নামে সুপরিচিত নাট্যসংস্থা আকাদামী অব ফাইন আর্টস্ হলে একটি সুন্দর অভিনয়-আসর বসিয়েছিলেন। এ'রা প্রতিদিন দু'বার ক'রে

'অশান্ত ঘূর্ণি' চিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও প্রশান্তকুমার

তিন দিনে তিনখানি নাটক মঞ্চস্থ করেন। প্রথম দিন নিকোলাই গগেল প্রণীত "ইনস্পেক্টার জেনারেল"-এর প্রমথনাথ বিশীকৃত অনুবাদ "গভর্ণমেণ্ট ইনস্পেক্টার"; দ্বিতীয় দিন বীরু মুখোপাধ্যায় প্রণীত "চার প্রহর" এবং তৃতীয় দিন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়কৃত একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ।

"গভর্ণমেণ্ট ইনস্পেক্টার" অভিনীত হয় কোনো রকম আঙ্গিকের সাহায্য ব্যতিরেকেই পশ্চাদ্‌পট হিসেবে পর্দার সামনে। "চার প্রহর" একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত সেটে তাপস সেন পরিকল্পিত আলোকপ্রক্ষেপণের সহায়তায় মঞ্চস্থ করা হয় এবং "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের সংক্ষেপিত সংস্করণ কিছুটা ইঙ্গিতধর্মী দৃশ্যপট এবং ভাব ও নাট্যমুহূর্তসৃষ্টিকারী আলোকসম্পাতের সাহায্যে চিরাচরিত সাজপোশাকে বিভূষিত শিল্পিসমন্বয়ে অভিনীত হয়।

পরিচালক-অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় তিনটি নাটকেরই প্রাণস্বরূপ। তাঁর অভিনীত ম্যাজিস্ট্রেট (গভর্ণমেণ্ট ইনস্পেক্টার), সুশান্ত মুখোপাধ্যায় (চার প্রহর) এবং চাণক্য (চন্দ্রগুপ্ত) তাঁর অসামান্য নাট্যনৈপুণ্যের পরিচায়ক।

বিভিন্ন পুরুষ চরিত্রে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন রসরাজ চক্রবর্তী, সিধু ভট্টাচার্য, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, রণজিত রায়, সোমনাথ সরকার, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্ত্রী-চরিত্রে কল্যাণী অধিকারী, শুক্লা দাস, রমা চৌধুরী, সবিতা মুখোপাধ্যায় এবং গীতা সেন নিজ নিজ ভূমিকায় সাধ্যমত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সমগ্রভাবে বলতে পারি, মাস থিয়েটার্সের শিল্পিবৃন্দের মধ্যে

প্রশংসনীয় ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা আছে। অধিকতর অনুশীলন এবং অঙ্গক্ষেপণকৌশল বিষয়ে সাধনা করলে এ'রা অভিনয়ক্ষেত্রে আরো বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন এবং নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে জাতির সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের প্রকৃত দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবেন।

বিবিধ সংবাদ
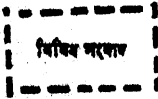
সরোজ সেনগুপ্ত প্রোডাকসন্স-এর "সিঁদুরে মেঘ"

গেল ১৩ই অক্টোবর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীর স্কোরিং থিয়েটারে গান রেকর্ড করলেন "সিঁদুরে মেঘ" চিত্রের সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সরোজ সেনগুপ্ত প্রযোজিত এবং সুশীল ঘোষ পরিচালিত চিত্রটির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন—অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, গীতা দে, অর্পণা দেবী, সুরুচি সেনগুপ্তা, জীতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, রমেন বসু, শুভেন্দু সেনগুপ্ত, সুনীল আঢ্য এবং রমা গুহঠাকুরতা।

চিত্রটির পরিবেশনার দায়িত্ব পেয়েছেন কিনে কর্ণার প্রাইভেট লিমিটেড।

চিত্রনিপুণিকার শুভমহরত:

নিপুণা বিশ্বাসের প্রযোজনায় ও রণজিৎ বিশ্বাসের পরিচালনায় ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত-এর কাহিনী 'স্বর্ণ-মৃগ' অবলম্বনে নবগঠিত এই চিত্রপ্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবির শুভমহরত গেল ১৮ই অক্টোবর ১৯৬৩, ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কালিপদ সেন-এর সঙ্গীত পরিচালনায় এবং সুচিত্রা মিত্রের উপস্থিতিতে দু'টি রবীন্দ্রসঙ্গীত দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন-এর কণ্ঠে গৃহীত হয়। এই ছবির চিত্রনাট্য ও গান রচনা করেছেন যথাক্রমে রাজেন তরফদার ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। মুখ্যচরিত্রগুলি রূপায়িত করছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সুশীল মজুমদার ও রমা গুহঠাকুরতা।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ
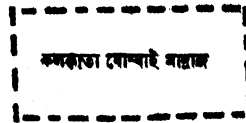
কলকাতা

আধুনিক স্বনামধন্য চিত্রকর ও, সি, গাঙ্গুলী এই প্রথম চলচ্চিত্র পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন। সন্তোষকুমার ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে 'কিনু গোয়ালার গলি' চিত্রটির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে রাধা ফিল্মস্ ও টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয়। কমল ঘোষ প্রযোজিত কে, জি, প্রোডাকসন্সের এ কাহিনী-চিত্রে অভিনয় করছেন সুমিত্রা দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, জীবেন বসু, দিলীপ রায়, প্রশান্তকুমার, গীতা দে ও ছায়া দেবী। সলিল চৌধুরীর পরিচালনায় এর মধ্যে কয়েকটি গান গৃহীত হয়েছে। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় রয়েছেন বিমল মুখোপাধ্যায়, দুলাল দত্ত এবং রবি চট্টোপাধ্যায়।

সিলভার স্ক্রীন প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্র 'অশান্ত ঘূর্ণী'-র চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্তির পথে। মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি রহস্যঘন প্রেম-কাহিনীকে চিত্রে রূপ দিচ্ছেন পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, প্রশান্তকুমার, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায় ও গীতা দে। রাজেন সরকার এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক।

জালান প্রোডাকসন্সের নির্মীয়মান ছবিটি 'দীপ নিভে নাই' টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কনক মুখোপাধ্যায়। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন তরুণকুমার, বিকাশ

রায়, সন্ধ্যারাণী, পদ্মা দেবী, গীতা দে, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশুশিল্পী পিংকী। রবীন চট্টোপাধ্যায় কৃত এ ছবির সঙ্গীত-গ্রহণ সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে।

স্কাপস্ ফিল্মস্-এর পরবর্তী মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবিটির নাম 'কাল-স্রোত'। বিনয় চট্টোপাধ্যায় রচিত এ চিত্রকাহিনীটি পরিচালনা করেছেন সুশীল মজুমদার। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ ছবির সুরকার। প্রধান চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, সন্ধ্যারাণী, মঞ্জু দে ও অনুভা গুপ্তা। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে সন্তোষ গুহরায়, দুলাল দত্ত এবং সুনীতি মিত্র।

বোম্বাই

পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি যে ছবিটি শেষ করলেন, তার নাম 'সাঁজ অউর সবেরা'। প্রধান ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন

মীনাকুমারী, গুরু দত্ত, মেহমুদ, শুভা খোটে, মনমোহনকৃষ্ণ ও কানু রায়। বর্তমানে সম্পাদনার কাজ শেষ হচ্ছে। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

রূপকলা পিকচার্সের 'পূর্ণিমা'-র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মীনাকুমারী, নাজির হুসেন, বিজয়া চৌধুরী, প্রাণ ও মেহমুদ। পণ্ডিত ইন্দ্র রচিত এ কাহিনীর সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এস এম আব্বাস। চিত্রগ্রহণে রয়েছেন জে পি কাপাডিয়া। কল্যাণজী-আনন্দজী সুরকৃত এ ছবিটির নির্দেশক-পরিচালক নরেন্দ্র সুরী।

প্রবীণ পরিচালক ফণী মজুমদার কৃত 'কাজল' চিত্রের চিত্রনাট্যে অভিনয় করছেন মীনাকুমারী, রাজকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, ধর্মেন্দ্র, দুর্গা খোটে, মেহমুদ, মুমতাজ ও শৈলেশকুমার। এই রঙিন চিত্রটির পরিচালনা করবেন রাম মহেশ্বরী। সঙ্গীতে সুরসৃষ্টি করছেন রবি।

উত্তমকুমার

সুপ্রিয়া চৌধুরী

ছবি বিশ্বাস
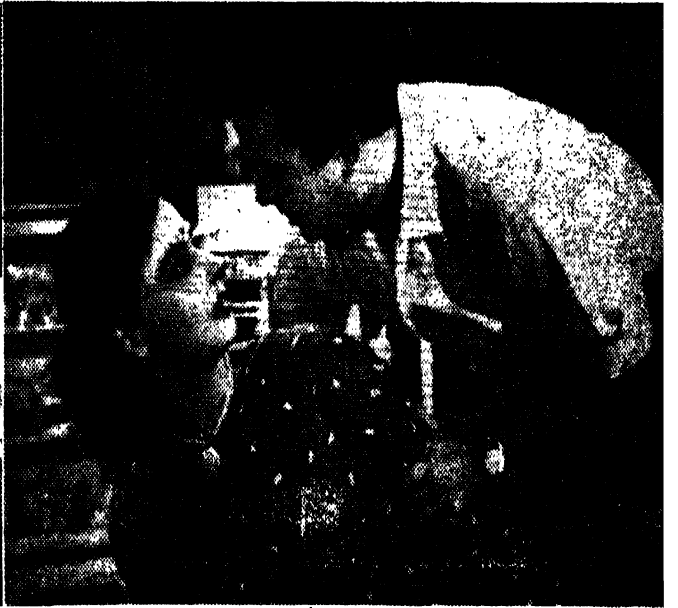
কিরণ প্রোডাকসন্সের রঙিন চিত্র 'নীলা আকাশ'-এর সম্প্রতি সঙ্গীত-গ্রহণ শেষ হল। সঙ্গীত-পরিচালনা করলেন মদনমোহন। মোহনকুমার রচিত এ চিত্রকাহিনীর মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন মালা সিন্‌হা, ধর্মেন্দ্র, মেহমুদ, শশিকলা ও রাজ মেহরা। প্রযোজনা ও পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেছেন রাজেন্দ্র ভাটিয়া।

মাদ্রাজ

এ ভি এম স্টুডিও থেকে এই প্রথম একটি চিত্রের তিনটি ভাষায় চিত্রগ্রহণ সুসম্পন্ন হল। তামিল ও তেলেগু ভাষায় গৃহীত এ ছবির নাম 'নানুম অরু পেন্ন'। রজত-জয়ন্তীর সাফল্যের পর বর্তমানে হিন্দী চিত্ররূপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মীনা-কুমারী ও ধর্মেন্দ্র। সঙ্গীত-পরিচা[illegible] করবেন চিত্রগুপ্ত।

—চিত্রদূত

কাঞ্চনমূল্য চিত্রে অরুণ মুখার্জি ও তৃপ্তি মিত্র

স্টুডিও থেকে বলছি

ছবির ইতিকথা শুরু করার আগে স্টুডিও থেকে 'বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই। পুজোর ছুটি শেষ হয়েছে। এখন শুভেচ্ছার আলিঙ্গন-মাখা দিনগুলো বড় আত্মীয় বলে মনে হচ্ছে। কলাকুশলীর কুশল সংবাদে মুহূর্তগুলোও ব্যস্ত। বাংলা ছবির সময়টা আশীর্বাদের সফলতায় উত্তীর্ণ। এ বছর বাংলা চিত্রের প্রায়ই রজত-জয়ন্তী সপ্তাহে সাফল্য। এর মধ্যেই নতুন ছবির পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। আগামীবারে সে সংবাদ পেশ করার ইচ্ছে রইলো। ছুটি উপভোগের পর কর্তব্যের পরিক্রমা-পথ পার হতে বেশ ভার-ভার ঠেকছে। কিছুটা আলস্য বলতে পারেন।

স্টুডিও থেকে ছবি এসেছে সম্পাদনা বিভাগে। সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ শেষ হলে ছবি-মুক্তির আসন্ন দিনটি ক্রমশঃই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। শুভ-মুক্তি-প্রতীক্ষিত এক মহান্ জীবন-আদর্শের একটি সার্থক চিত্রের কাহিনী আর কলাকুশলীর কিছুটা পরিচিতি আপনাদের জানিয়ে রাখি। মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবিটির নাম 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।' প্রবীণ পরিচালক মধু বসু এ চিত্রের নির্দেশক। নামভূমিকায় বিবেকানন্দের যথার্থ চরিত্রে রূপদান করেছেন অমরেশ দাস।

স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ জীবন-আলেখ্য সকলেরই জানা আছে। তাই বিস্তারিত জীবনী সংক্ষেপে জানাচ্ছি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বিরচিত এ জীবন-চিত্রের যথাযথ দৃশ্যমান করে তুলেছেন চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক মধু বসু।

শৈশব থেকেই মূল চরিত্রের আরম্ভ। বিবেকানন্দের তখন নাম নরেন্দ্র। ডাক নাম 'বিলে'। ভীষণ দুরন্ত কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল। সবকিছু জানা তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। কোন নিষেধ মানতেন না। হুঁকোর মুখ দিয়ে

জগতের অস্তিত্ব বজায় থাকে কিনা, তা পরখ করে দেখতেন। স্কুল-জীবনের আরম্ভেই বক্তৃতা আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে লড়াই শুরু হয়। এণ্ট্রান্স পাশের পর নরেন কলেজ জীবনে প্রবেশ করলেন। সেই সময় হঠাৎ তাঁর পিতা মারা গেলেন। সমস্ত সংসারের দায়িত্ব এসে পড়লো। অনভিজ্ঞ জীবনের বাস্তব জীবনযাত্রা শুরু হল। শেষে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে এসে ঠাঁই হল। ঠাকুর নরেনকে দেখে পাগল। নরেন কিন্তু ঠাকুরকে পরীক্ষা করে নেন ষোল আনা। শেষপর্যন্ত ঠাকুরের নির্দেশে অর্থ চাইতে গিয়ে জ্ঞান, বিবেক আর বৈরাগ্য প্রার্থনা করেন নরেন।

সেই থেকে ঠাকুরকে গুরু করেন নরেন দক্ষিণেশ্বরে। গুরুভাইদের সঙ্গে ধর্ম এবং জ্ঞান অর্জনে ঠাকুরকে ব্যস্ত করে রাখতেন। ঠাকুর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সমস্ত সাধনার ফল একদিন নরেনকে দিয়ে ঠাকুর দেহ রাখলেন। নরেন বুঝলেন যার মধ্যে যতখানি ঈশ্বর বিকাশ, তার ততখানি মনুষ্যত্ব' মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর। মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা।

নরেন হলেন বিবেকানন্দ। বরানগর আশ্রম থেকে গেরুয়া বসন আর দণ্ড নিয়ে বিবেকানন্দ মুক্তির জন্য 'বাহিরকে' আপন করলেন। সারা ভারত পর্যটনের পর তিনি জানলেন—'যত্র জীব তত্র শিব'। স্বামী বিবেকানন্দ চরম সত্যকে উপলব্ধি করলেন। বেদ, উপনিষদ, কোরান আর বাইবেল পড়ে ধর্মের এক নতুন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করলেন। বীর বিবেকানন্দ তাঁর ধর্মকে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। কর্মপাগল বীর ঘুরলেন সর্বত্র। পর্ণ-কুটীর থেকে রাজপ্রাসাদে। দেখলেন দুঃখ-দারিদ্র্যের ভারতবাসীকে। অশিক্ষায় নিপীড়িত সব দেশের মানুষকে। কৃচ্ছ্র-সাধন আর আত্মনিপীড়নের মধ্যে বিবেকানন্দ জানতে চাইলেন ঈশ্বরকে। সর্ব অবস্থার মধ্যে অনুভব করলেন বৈষম্যকে। ধর্মের মধ্য দিয়ে কর্মের সমন্বয়-সাধন করতে চাইলেন বীর বাঙালী বিবেকানন্দ। আপন দেশের মানুষকে জেনে তিনি বিদেশের কথা জানতে উদগ্রীব হলেন। সুযোগ হল। শিকাগোর ধর্মসভায় যাত্রার উদ্দেশে সাধারণের সামান্য দানে বিবেকানন্দ আমেরিকার বিশ্বসভায় নিমন্ত্রিত হলেন।

বিবেকানন্দের জীবন-চরিত্রের সংক্ষিপ্ত এ কাহিনী চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, বিবেকানন্দ—অমরেশ দাস, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দত্ত—বিপিন গুপ্ত, ভুবনেশ্বরী—মলিনা দেবী, গিরিশচন্দ্র—জহর গাঙ্গুলী, সুরেন মিত্র—বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রামলাল—মিহির ভট্টাচার্য ও ডাঃ সুরেশ সরকার—গঙ্গাপদ বসু। কলাকুশলী বিভাগে চিত্রগ্রহণ সম্পাদনা ও সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন অজয় মিত্র, অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং অনিল বাগচী। ভবতারিণী পিকচার্স এ ছবির পরিবেশক।

—চিত্রগুপ্ত

ভিন্ দেশী ছবি

"হ্যামলেট"এর চলচ্চিত্ররূপ

সোভিয়েট চলচ্চিত্র-পরিচালক গ্রিগরি কোজিন্তসেফ-এর পরিচালনায় মস্ফিল্ম স্টুডিওজ্-এ শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের যে শুটিং চলছে, সে সম্বন্ধে সোভিয়েট চলচ্চিত্রামোদীদের মধ্যে গভীর আগ্রহ-ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই ছবির সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন দ্মিত্রি শোস্তাকোভিচ এবং বেশভূষার পরিকল্পনা করেছেন খ্যাতনামা শিল্পী সোলিকো ভিরসালাদ্জে।

হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করছেন শক্তিমান তরুণ অভিনেতা ইনোকেন্তি স্মোক্তুনোভ্স্কি—যিনি মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে কতকগুলি ট্রাজিক চরিত্র অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। একজন 'তাস'-প্রতিনিধিকে স্মোক্তুনোভ্স্কি গত সপ্তাহে এক সাক্ষাৎকারে বলেন : "হামলেটের চরিত্রকে আমি যেভাবে উপলব্ধি করেছি, তাতে তাকে একজন অসহায় দর্শক হিসাবে আমি চিত্রিত করব না—যেটা করেছেন পূর্ববর্তী বহু অভিনেতা। শেক্সপীয়রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই চরিত্রটিকে আমি তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন দৃঢ় চরিত্রের একটি মানুষ বলে কল্পনা করি : হ্যামলেটের মন যেমন বিশ্লেষণ-নিপুণ, তেমনি সে সহৃদয়—যদিও অন্যায়কে ক্ষমা করতে সে রাজী নয়। হ্যামলেটের ট্র্যাজেডি অবশ্যম্ভাবী ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ একজন নিষ্ক্রিয় দর্শকের ট্র্যাজেডি নয়।"

ছবিটি ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়।

খেলাধূলা

দর্শক

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবল টেনিস

ক'লকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার উত্তরাঞ্চলের খেলায় দিল্লী পুরুষ বিভাগে এবং বিক্রম মহিলা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রে প্রতিযোগিতার মূল ফাইনালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিপক্ষে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করে।

উত্তরাঞ্চলের খেলায় পুরুষ বিভাগের সেমি-ফাইনালে আগ্রা ৩—১ খেলায় জব্বলপুরকে এবং দিল্লী ৩—১ খেলায় ক'লকাতাকে পরাজিত করে। ফাইনালে দিল্লী ৩—১ খেলায় আগ্রার বিপক্ষে জয়ী হয়। পুরুষ বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে জব্বলপুর ৩—২ খেলায় গত বছরের উত্তরাঞ্চলের বিজয়ী যাদবপুরকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করেছিল। মহিলা বিভাগের একদিকের সেমি-ফাইনালে পাঞ্জাব ৩—২ খেলায় রাজস্থানকে এবং বিক্রম ৩—০ খেলায় দিল্লীকে পরাজিত করে। ফাইনালে বিক্রম ৩—০ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

দক্ষিণাঞ্চলের পুরুষ বিভাগের ফাইনালে ৩—২ খেলায় মাদ্রাজকে এবং মহিলা বিভাগের ফাইনালে ৩—১ খেলায় ওসমানিয়াকে পরাজিত ক'রে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল প্রতিযোগিতার উভয় বিভাগেরই মূল ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

প্রতিযোগিতার মূল ফাইনালে বোম্বাই ৩—২ খেলায় দিল্লীকে পরাজিত ক'রে ছাত্র বিভাগের চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। ছাত্রী বিভাগের ফাইনালে বিক্রম ৩—২ খেলায় বোম্বাইকে পরাজিত করে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ান বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় দলের উষা পোট্‌কার এবং মৃণালিনী খোটে। বিক্রম দল মূল ফাইনালে ৩—২ খেলায় বোম্বাইকে পরাজিত করে। ফটো : শান্তিময় সান্যাল

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ১৯৫৮-৫৯ সালে আরম্ভ হয়েছে। সেই সময় থেকে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বিভাগে মোট পাঁচবার আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় খেতাব লাভ করেছে।

॥ ডি সি এম ফুটবল ফাইনাল ॥

দিল্লীর কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে প্রখ্যাত দিল্লী ক্লথ্ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে (১৯৬৩) ই এম ই সেণ্টার দল (ইলেকট্রিক্যাল এ্যাণ্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সেণ্টার) ৩—১ গোলে পাঞ্জাব পুলিশ দলকে পরাজিত করেছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়।

১৯৬১ সালের রোভার্স কাপ বিজয়ী ই এম ই সেণ্টার দল আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় ১—০ গোলে আম্বালা হিরোজকে, ৪—২ গোলে গোয়ার সালগায়োকার ক্লাবকে এবং সেমি-ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে ১—১ ও ৫—৩ গোলে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকে পাঞ্জাব পুলিশ ফাইনালে উঠেছিল রুরকির বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপকে ১—১ ও ২—১ গোলে, মাদ্রাজের উইমকো দলকে ১—১ ও ২—০ গোলে, গত বছরের রাণার্স-আপ মফতলাল গ্রুপকে (বোম্বাই) ২—১ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে মহীশূর একাদশ দলকে ০—০ ও ২—০ গোলে পরাজিত ক'রে।

ডি সি এম ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৯৪৫ সালে। প্রথম বছরের ফাইনালে নিউ দিল্লী হিরোজ দল জয়লাভ করে। রাণার্স-আপ খেতাব পায় কিংস ওন ইয়র্কসায়ার লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি দল। তারপর উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৪৬-৪৮) প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। ক'লকাতার এই চারটি ক্লাব এ পর্যন্ত ডি সি এম ট্রফি জয় করেছে—ইস্টবেঙ্গল ক্লাব চারবার (১৯৫০, ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬০), মহমেডান স্পোর্টিং দু'বার (১৯৫৮ ও ১৯৬১), রাজস্থান (১৯৫৯) এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে (১৯৫৪)।

প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার (৪ বার) ট্রফি জয় করার গৌরব লাভ করেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

॥ জাতীয় স্কুল গেমস ॥

কটকে অনুষ্ঠিত শরৎকালীন নবম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের ফুটবল প্রতিযোগিতায় গত বছরের বিজয়ী বাংলা দল শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফুটবল প্রতিযোগিতার এক নম্বর গ্রুপে বাংলা দলের খেলা পড়ে। বাংলা দল এই গ্রুপে পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের বিপক্ষে ১—১ গোলে খেলা ড্র করায় মূল প্রতিযোগিতায় সেমি-ফাইনালে উঠতে পারেনি। এক নম্বর গ্রুপে পাঞ্জাব শীর্ষস্থান লাভ করে।

বাংলা দল সাঁতারের বালক এবং বালিকা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। বালক বিভাগের প্রতিটি অনুষ্ঠানে বাংলা প্রথম স্থান লাভ করে এবং বালিকা বিভাগের মোট চারটি অনুষ্ঠানে বাংলা এবং গুজরাট সমানভাবে প্রথম স্থান পায়।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফাইনাল

সাঁতার (বালক বিভাগ) : ১ম পশ্চিম বাংলা (৩৯ পয়েণ্ট), ২য় গুজরাট (১০) এবং ৩য় উড়িষ্যা (৩)।

সাঁতার (বালিকা বিভাগ) : ১ম পশ্চিম বাংলা (২৪ পয়েণ্ট), ২য় গুজরাট (১৯) ও ৩য় ত্রিপুরা (২)।

খো-খো : মধ্যপ্রদেশ ২০—৭ পয়েণ্টে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে। তৃতীয় স্থান পায় গুজরাট।

কাবাডী : উড়িষ্যা ৩৯—৩৬ পয়েণ্টে উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে। তৃতীয় স্থান পায় পাঞ্জাব।

ফুটবল : উড়িষ্যা ১—০ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে। তৃতীয় স্থান লাভ করে বিহার।

টেবল টেনিস : বালক বিভাগে বাংলা ৩—০ খেলায় মণিপুরকে পরাজিত করে। বালিকা বিভাগে গুজরাট ৩—০ খেলায় মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করে।

॥ ইংল্যাণ্ড বনাম বিশ্ব একাদশ ॥

ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লণ্ডনের উইম্বলি ষ্টেডিয়ামে ইংল্যাণ্ড বনাম বিশ্ব একাদশ দলের প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় ইংল্যাণ্ড ২—১ গোলে জয়লাভ করেছে। ইণ্টারন্যাশানাল ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃপক্ষের হাতে বিশ্ব একাদশ দল গঠনের ভার দেওয়া হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড খেলার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একই খেলোয়াড় নিয়ে খেলেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় বিশ্ব একাদশ দলে পাঁচজন বদলী খেলোয়াড় নেমেছিল। এইভাবে খেলোয়াড় পরিবর্তন নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ দেখা দেয়। ইণ্টারন্যাশানাল ফুটবল ফেডারেশনেরই আইনে আছে, একমাত্র আহত খেলোয়াড়ের স্থানেই বদলী খেলোয়াড় নামানো চলতে পারে এবং তাও প্রথমার্ধের খেলায়। বিশ্ব একাদশ দলের অধিনায়ক পদ লাভ করেছিলেন রিয়েল মাদ্রিদ দলের আলফ্রেডো ডি স্টিফানো। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ইংল্যাণ্ড প্রথম গোল দেয়। বিশ্ব একাদশ দলের পক্ষে ডেণ্টস ল (স্কটল্যাণ্ড) গোলটি শোধ দেন। খেলা ভাঙ্গতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে ইংল্যাণ্ড জয়সূচক দ্বিতীয় গোলটি দেয়।

টোকিওর প্রাক্-অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ম্যারাথন রেস বিজয়ী নিউজিল্যাণ্ডের জেফ জুলিয়ান।

কনরাড হান্টকে ধন্যবাদ। ভারত পর্যটনে এসে ভারতীয় ক্রিকেটের উদ্দেশে তিনি অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন।

ক্রিকেটার হান্ট নৈতিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সাধুবাদ উচ্চারণে নৈতিক পুনরুজ্জীবনের কাজ যে সহজ হয়ে দাঁড়ায় এ বিশ্বাস তাঁর আছে। তাই ভারতীয় ক্রিকেটের মনোবল উজ্জীবনে তিনি যা যা বলেছেন সবই উৎসাহব্যঞ্জক।

সামনেই এম-সি-সি'র ভারত সফর। সেই সম্ভাব্য সফরের পরিপ্রেক্ষিতেই হান্ট জানিয়েছেন যে, এই পর্যায়ের টেস্টে ভারত জিততে পারবে যদি ভারতীয় দল 'স্বভাবসিদ্ধ খ্যাতি অনুযায়ী ক্যাচ ধরিতে এবং ফিল্ডিং করিতে সমর্থ হয়।'

ভদ্রলোকের কথা ভদ্রজনোচিতই হয়েছে। তবে ওই 'যদি'টির কথা ভেবেই আমরা কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি! ম্যাচ জিততে হলে ক্যাচ ধরতে হয়, উচ্চ পর্যায়ের ফিল্ডিং করতে হয়। কিন্তু উঁচু দরের ফিল্ডিং বলতে যা বোঝা যায় তার সঙ্গে ভারতীয় দলের সম্পর্ক কতটুকু!

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন যে ক্যাচ ধরায় নয় ক্যাচ ফেলাতেই যেন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা বেশী করেই রপ্ত। শুধু তাই নয়। বল ধরে এলোমেলোভাবে তা ছুঁড়ে দেওয়ায় বা ফিল্ডিং করতে নেমে কিছুটা ঢিলেঢালা মেজাজে ইতস্ততঃ বিচরণ করাই যেন তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

হান্টের পিঠচাপড়ানি সত্ত্বেও যে অচিরেই ভারতীয় ক্রিকেট এই 'বৈশিষ্ট্যের' ঊর্ধ্বে উঠে যাবে তা মনে হয় না। উঠতে পারে যদি সময় থাকতে ফিল্ডিংয়ের দোষ-ত্রুটি শুধরে নেওয়ায় বস্তুকৃত মহড়ার আয়োজন করা যায়। কিন্তু কোথায় সেই আয়োজন?

আমরা ক্রিকেট নিয়ে যতোটা মাতামাতি করেছি সেই অনুপাতে কিন্তু দক্ষতা বাড়াতে সাধনা করিনি। আর ক্রিকেটের আসল দক্ষতা তো ফিল্ডিংয়ের ওপরই নির্ভরশীল। বোলার আর ব্যাটসম্যান হিসেবে যাঁর ভূমিকায় ঘাটতি ঘটে, শুধু ফিল্ডিংয়ের জোরেই তিনি অনেক-কিছু পুষিয়ে দিতে পারেন। অথচ ফিল্ডিংয়ের ওপর আমাদের দেশে কোনো দিনই তেমন জোর দেওয়া হয়নি।

হান্ট বলেছেন যে স্পিনার সেলিম দুরানী ও চান্দু বোরদে আর ব্যাটসম্যান পাতৌদির নবাব, মঞ্জরেকার, আব্বাস আলি বেগ, নাদকারনি, জয়সিমা যখন দলে রয়েছেন তখন আর ভাবনা কিসের?

ভাবনা যে কিসের তা কনরাড হান্ট ভাল করেই জানেন। বছর দুয়েক আগে তাঁর স্বদেশের মাঠেই ওই সব ভারতীয় যে কোন্ ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন তার প্রত্যক্ষদর্শী হান্ট নিজেই। ভাগিস্ সে যাত্রায় উমরিগড় হাজির ছিলেন, নইলে ভারতীয় দলকে যে সেবার কতো তলায় তলিয়ে যেতে হোতো তা ঈশ্বরই জানেন!

তবু হান্টকে আজ দোষের ভাগী করবো না। বরং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলবো যে তিনি তাঁর খেলোয়াড়-চরিত্রের প্রতি সুবিচারই করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটকে উৎসাহ জানিয়ে। এখন তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করতে ভারতীয়েরা সত্যিই যদি সফল হয়ে ওঠেন তাহলেই সবদিক বজায় থাকে।

ডেক্সটার, কাউড্রে, ট্রুম্যান, স্ট্যাথাম বর্জিত ইংলণ্ডকে পরাজিত করা ভারতের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়। তবে শীর্ষ পর্যায়ের ভারতীয়দের সম্পর্কে সাধারণ মনে যে প্রত্যাশা রয়েছে তা কিন্তু তাঁদের মিটিয়ে দিতে হবে। নইলে সাধ্যায়ত্ত কাজটিও সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়াবে।

একটি কথার উল্লেখ রাখতে কিন্তু কনরাড হান্ট ভুলে গিয়েছেন। হয়তো এ বিস্মৃতি ইচ্ছাকৃত। কারণ তিনি শুধু ভদ্রই নন, বিচক্ষণও। তাঁর পক্ষে একথা বলা শোভন নয় বলেই তিনি বলতে পারেন নি যে দল পরিচালনার ক্ষেত্রেও ভারতীয় অধিনায়ককে দক্ষতা দেখাতে হবে।

এই দক্ষতা যে কোন ভারতীয়ের অধিগত তা আজ বলা কঠিন। কারণ অবিসম্বাদী নেতা পলি উমরিগড় অবসর নিয়েছেন। এক বৃষস্কন্ধ খেলোয়াড়কে নেতা হিসাবে খুঁজে বার করার কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। এ কাজ মস্তো কাজ। এগারোজন টেস্ট খেলোয়াড় নির্বাচনের চেয়েও একজন উপযুক্ত দল-নায়কের সন্ধান পাওয়া কঠিন।

ভারতীয় ক্রিকেটের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা অতীতে এ কঠিন কাজটিকে কঠিনতর করে তোলার জন্যে কসুর করেন নি। যোগ্যতম অধিনায়ক কর্নেল সি কে নাইডুকে ডিঙিয়ে তাই তাঁরা পোরবন্দরের মহারাজা, পাতিয়ালার যুবরাজ, ওয়াজির আলি ও বিজয় মার্চেন্টকে দলপতির আসনে বসিয়েছিলেন।

উত্তরপর্বে মার্চেন্ট যখন অধিনায়ক-পদে একমাত্র ভাগীদার তখন পতৌদির নবাবকে জায়গা জুড়তে ডেকে আনা হয়েছিল। অমরনাথের বেলায় হাজারেকে, উমরিগড়ের বেলায় গোলাম আমেদ ও নরি কন্ট্রাকটরকে দিয়ে একই কাণ্ড বাধিয়ে তোলা হয়েছে। নায়কের পদে নির্বাচিত হওয়ার যাঁর উপযুক্ততা প্রশ্নাতীত তেমন জন অতীতে ভারতীয় দল পরিচালনার অধিকার পেয়েছেন কদাচিৎ।

ভাবছি, এবারেও তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে! তবে এবারের পরিস্থিতি ভিন্নতর এই যা ভরসা। বর্তমানে নায়ক হিসেবে কেউই সর্বস্বীকৃত নন। সুতরাং বাদবিচার করে নিতে হবে। আশা করি, নতুন নায়ক নির্বাচনের সূত্রে ভারতীয় ক্রিকেট আজ যখন পথের বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে তখন অন্ততঃ ক্রিকেট বোর্ডের কর্ণধারেরা তাঁদের অনুসৃত সাবেকী রাজনীতির মায়া ত্যাগ করতে পারবেন।

রাজনীতি ত্যাগ করে তাঁরা বরং একজনকে এক মরশুমের পাঁচ পাঁচটি টেস্ট খেলায় দল পরিচালনার অধিকার দেওয়ার রীতি আঁকড়ে ধরুন। নতুন নায়ক যদি এ যাত্রায় উৎরে যান তাহলে পরের বার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে এবং তারও পরে আরও কটি খেলায় তিনিই পারবেন মুস্কিল আসানের ভূমিকা নিতে।
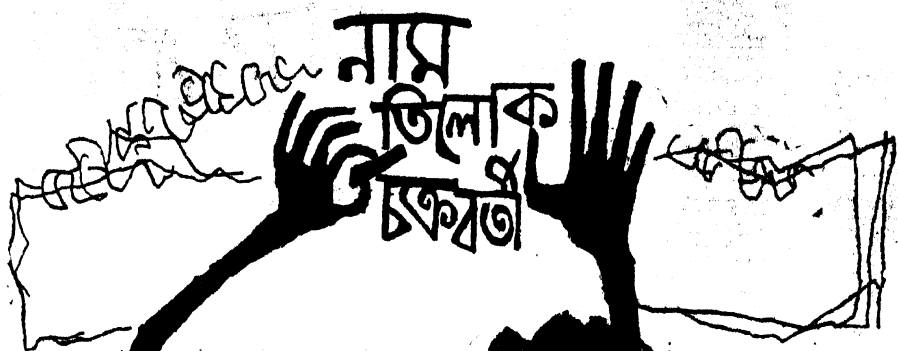
আদিঅন্ত ছিল না বয়সের, মানুষটাও কি এই কালের। দিন মাস তো কোন্ ছার বছর ধরে হিসেব করতে গেলেও কূল মেলে না। হিমসিম খেয়ে থেমে যেতে হয়। মনে হয় কোন্ পুরাণ ত্রেতা যুগের মানুষ বুঝি বা। প্রবাদ-বাক্যির কেউ হবে হয়ত। মুখে ও কপালের শিথিল ভাঁজগুলোয় তার ছায়া আঁকা।

এই শ্মশানে কেটে গেল অনেক কাল। মৌলাসিনীর মহাশ্মশান। কোন মান্ধাতার আমলে এসে উঠেছিল, আজকে তা দিশা পাওয়া ভার। কোন দিন, কি বার, মাসের নাম কি বার করা কঠিন। আবছা অসংলগ্ন ছবির মতই স্মৃতিতে মিশে আছে।

ঘন দুর্যোগের মত ছিল সেদিন। বোধকরি বর্ষাকালের কোন কৃষ্ণপক্ষের যোগ। শেষবেলার সূর্যকে ঢেকে কালো পারাপারহীন আকাশ ভেঙে পড়েছিল সোজা উত্তর মুখে। ঝোড়ো হাওয়াও কম ছিল না। বাঁধভাঙা ঘোলা ঘূর্ণির পাকে মাতাল হয়ে উঠেছিল নদী। লাল-কালোয় মেশান ছায়ায় নাচছিল হিংস্র বিসর্পিল সেই নদী। ছায়া ঠেলে বেঁকে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল মান্ধাতার কালের বট-তেঁতুল-অশ্বত্থের ঘাড়গোঁজা ছায়াগুলো সব। হয়ত ছন্নছাড়া সেই বেলার কিনারায় দাঁড়িয়ে অলৌকিক কোন বিধাতাপুরুষের দিকে জোড়হাতে ঝুঁকে শিউরে উঠছিল বারবার। কাকপক্ষীও বার হয় নি দুর্যোগে। ভাঙাচোরা বাসায় চুপচাপ পড়েছিল আতঙ্কে। ঝড়ের টানে বুকছেঁড়া হাহাকারে মেঘ ভেঙে পড়ছিল ভাঙা তীক্ষ্ন নীল রঙ চুরমার করে। মাথা ঝাঁকিয়ে আবার নুয়ে পড়ছিল সামনে তাল-শিমুল-বটের ছন্নছাড়া ছায়াগুলো সব। রক্তাক্ত ফিনকিতে জ্বলে পড়ছিল আলগা পাথুরে লাল মাটির স্তর। কয়েকটা উঁচু জায়গা কেবল কাটা ধড়ের মত লাল কাঁধ তুলে ভিজছিল বৃষ্টিতে। শ্মশান-মশান একাকার হয়ে উঠেছিল সেদিন। ভাঙা দেওয়ালের কোল ঘেঁষে শ্মশানকালীর খোড়ো কাঠমোটা কাত হয়ে ভাসছিল জলে। বাঁধ ভেঙে পড়ার অবিশ্রান্ত শব্দ, পাতার গোঙানী, বুনো মেঘের বুকফাটা হাঁকে প্রলয়কান্ড চলছিল দশদিক জুড়ে। শ্মশানের পোড়ো ঢলে-পড়া চালাঘরটুকু মাথা নুইয়ে ভিজছিল একনাগাড়ে। সেইখানেই এসে উঠেছিল মানুষটা, আর নড়ে নি তারপরে। সহায়সম্বল যাই বল না কেন, ওই একখানি টিন ভাঙা আর অস্থিসার নিজের শরীরটি কেবল।

সাঁঝ বেলার ছায়াছায়া কানা অন্ধকারে অষ্টাবক্র তলা গুড়িমারা একখানা দেহ বনতুলসী বিছুটি আর কাঁটামনসার ডাল-আবডালের কোলে ভেসে থাকত অস্ফুট আঁচড়ের মত। নজরে পড়লে, অন্তত একবারের মত কেঁপে উঠত না বুক, এমন দেমাকওয়ালা ডাকাবুকো সাতখানা গ্রাম ঘুরলেও পাওয়া ভার। শিমুল-বট-বুড়ো নিমগাছের ভারী ছায়ার আড়ালে অলৌকিক আধজাগা মুখের ভঙ্গিমায় রক্তের ছোপধরা শুকনো দুচোখ জ্বলজ্বল করত, পৈতার ধূসর প্রান্তটুকু নড়ে উঠত বুকের উপর। মনে হত মানুষটা একালেরই নয়। পুরাণ প্রবাদকালের কেউ জেগে বসে রয়েছে জন্ম-জন্মান্তরের ঘুম ভুলে। হাটফেরত দূর-গ্রামের কেউ সামনাসামনি ছিটকে পড়লে আতঙ্কে পলক পড়ত না চোখের। নিঃশ্বাসের সঙ্গে নড়ে উঠত বুকের ঠাণ্ডা রক্ত। হনহন করে প্রায় এক ছুটে পার হয়ে আসত নদীপারটুকু। অচেনা মানুষজন সামনে পড়লেই সাবধান করে দিত, খবোদ্দার শালা, নোয়া না ছুঁয়ে

পার হবি নে ও পথ। কি ইচ্ছে মনের তুই টের পাবি কি করে বল।

সত্যি বীভৎস চেহারা মানুষটার। অস্থিসার পলকা দেহই ছিল হাত পাঁচ-ছয় লম্বা। খড়িতোলা শিথিল চামড়ার উপর হাড়-পাঁজরের অজস্র জটিল রেখা স্পষ্ট জেগে থাকত সব সময়। লম্বাটে চোয়াল বসা মুখ, বাঁকা নাক, মোটা ছিন্ন উপরের ওষ্ঠের ফাঁকে লাল মাড়িবারকরা মুখে অপ্রাকৃতিক হাঁ মেলে কাঁপত সব সময়। রুক্ষ বিবর্ণ একমাথা ঝাঁকড়া কাঁচা-পাকা চুলের ছায়ায় গর্তে বসান তীক্ষ্ন গোল ফোলা মণিদুটো দেখলে মনে হত বেলাশেষের রোদ জ্বলছে ধিকিধিক। ভাঁজপড়া চামড়ার নিচ থেকে। লোল চর্ম, বাঁকানো হাড়ের সেই ভয়ঙ্কর মুখ যেন কেউ দক্ষ হাতে এ'কে রেখে পালিয়েছে রোদআড়ালকরা শাল, বট, আকন্দ, মাদার, বনতুলসীর ঘন ঝাপসা অন্ধকারের পিঠে।

জনমানুষহীন ফাঁকা নদীর বালি ছু'ড়ে আধচাপা হিংস্র হাওয়া ছিঁড়ে পড়ত থেকে থেকেই। ডালপালার নিরবয়ব স্তব্ধ জমাট ছায়াগুলো ভূতের মত দুলে উঠত একসঙ্গে। ভ্যাপসা নোংরা দুর্গন্ধে ঝিঁঝি পোকাদের কান্নার দীর্ঘ রেশ ঘুরপাক খেত জলার পাশে, খানকয়েক মরা পাতা, আকন্দ কল্কের বাসী ফুল উড়ে বেড়াত বাতাসে। জটপাকান ছেঁড়া পৈতায় প্রান্ত মুঠোয় ধরে কাঁপা রুদ্ধকণ্ঠের গায়ত্রী স্তব করত মানুষটাই। পথচলতি অচেনা লোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত টান হয়ে, মুখ চাওয়াচাওয়ি করত নিজেদের মধ্যে। তারপর উড়ত যেন ডানায় ভর দিয়ে।

সেদিন প্রায় মাঝরাতের দ্বিতীয় প্রহর নাগাদ চাঁদ সরে এসেছিল মন্দিরের চূড়া পার হয়ে। দীর্ঘ ডালের মাথায় মস্ত সেগুন পাতার পিছনে দাঁড়িয়ে অপলক চেয়েছিল তার দিকে, থমকান মুখ আড়াল করে। নীল তীর জ্যোৎস্না হেলে পড়েছিল চিতাগুলোর চারপাশে। সেই তীক্ষ্ন নীলচে আলোয় বিস্ফারিত ভাসাভাসা শ্মশানটাকে বড় বেশী বাস্তব আর জাগ্রত দেখায় তখন। তরল মদের থেকেও এক ধরণের ঘন নেশায় অন্ধ বুকের শিরাগুলো ঠাণ্ডা বোবাটে মেরে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। ঝিঁঝি পোকাদের ম্লান দীর্ঘস্থায়ী কান্নার রেশ শীতল আবর্তের মত দুকানের নিচে ভাসছিল, জ্বলছিল দু চোখের পাতা। যেন গোটা শ্মশানটাই ঘুরছিল তার শরীরের চারদিকে।

নির্বাপিত-প্রায় চিতাগুলোর কোল থেকে দমকা ঝাপটায় উড়ে-যাওয়া আবছা ছাই দেখে মনে হচ্ছিল সূক্ষ্ন শাদা শরীরের কেউ তিনপুরুষের ঘুম কাটিয়ে আচমকা মিশে যাচ্ছিল জ্যোৎস্নার বুকে। বনবাদাড় ঠেলে-আসা মেঠো হাওয়ায় অমন বুকও খাঁখাঁ করে উঠেছিল যন্ত্রণায়। অকৃপণ তরল জ্যোৎস্নায় জেগে থাকার বিচিত্র নেশায় বিভোর হয়ে উঠেছিল সে। অথচ ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল সেই সময়। আকণ্ঠ মদের ঘোরে দূরের অস্পষ্ট রঙীন আকন্দের ঝোপঝাড় দেখে মনে হচ্ছিল স্বপ্নের কেউ কেউ তাজা বুক এগিয়ে ফিসফাস শব্দ করছিল বাতাসে। পুবপারের একটু কালো সোমথ মেঘ মায়াবিনীর মত ঘাড় কাত করে পলক না পড়া নজরে চেয়েছিল তার দিকে।

সারিবন্ধ বৃক্ষের প্রাচীন ছায়া ঢলে পড়েছিল চিতাগুলোর চারধারে। উগ্র বন-চাপার গন্ধে বাতাস ঝিম মেরে আসছিল বুকের মাঝে, নিঃশ্বাস নেশার মত আটকে আসছিল গলায়। দুপারের শরবন পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় থমথম করছিল। ধূসর ভাঁজপড়া শক্ত কপাল জুড়ে ঘাম ফুটে উঠেছিল, যেন কপালভর্তি অজস্র ধারালো চোখ মেলে চেয়েছিল সে। ঘাটঘাট ঠেলে উঠে-আসা হাওয়ায় শিরশির করছিল গায়ের চামড়া। তাছাড়া নেশার ঘোরে জেগে থাকার কোন কুহক উত্তেজনায় গোল হয়ে উঠেছিল সারা দেহের রক্ত। নীলচে আভাসে জ্বলজ্বল করছিল গাছভরা কল্কের ঝাঁক, সিঁথির মত আলপথ। পাহাড়ের মত ঘন কৃষ্ণকায় মেঘ মস্ত ছায়া ঢেলে উঠে আসছিল সেই চাঁদ, জ্যোৎস্না, আকন্দের ঝোপ, চিতা, সরু আলপথ ঢেকে দিতে। বনচাঁপার উগ্র গন্ধ, তাড়ির নেশায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল বুকের নিচে। তেমনি ফাঁপা রুদ্ধ গলায় সামনে যদুর দিকে চেয়ে ঘড়ঘড় করে উঠল একবার।

শ্মশানের উত্তর কোণে প্রায় নিভে আসা চিতার পিছনে দাঁড়িয়ে আঁচটাকে মোটা বাঁশ দিয়ে উল্টেপাল্টে দিচ্ছিল যদু, শ্মশানের চন্ডাল। দুহাত ছড়ান ফাঁকা বুক জুড়ে মস্ত ছায়া ফেলে মেঘ এসে দাঁড়াল মাথার উপর। ফে'পে-ওঠা ধোঁয়ার নিচ থেকে দমকা লালচে আগুনের ভাপ ঠিকরে কাঁপছিল হাওয়ায়। উড়ন্ত দুদশটা ফুলকির টানে মনে হচ্ছিল সারা অন্ধকারটাই মুচড়ে নড়ে উঠল। বারকয়েক, উত্তর থেকে দক্ষিণে হেলে।

চিতার পিছন থেকে ঘাড় নুইয়ে ঝুঁকেছিল যদু। ভয়ঙ্কর অপরিচিত দেখাচ্ছিল তাকে। বিশাল পাথরের শরীরে, দুকাঁধ জুড়ে মেঘ ভর করেছিল। পাকান ধোঁয়ার পিছন দিক থেকে আগুন হেলে পড়েছিল বুকে, মুখে। উত্তাপে আধজাগা আধমোছা শরীরটার সঙ্গে যেন এ পৃথিবীর কোন যোগ ছিল না। ওমনি কঠোর আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল ধোঁয়া আর আগুনে ভেসে-ঢাকা যদুর ভাঙাচোরা মুখ। দুহাতের অর্ধেক দেখা যাচ্ছিল না এত সামনে থেকেও। বুঝি কোন শবদেহ কোলে করে পাতালে দুপা নামিয়ে চিতার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে দুচোখ বন্ধ করছিল আস্তে আস্তে, মুখের একদিক অপ্রাকৃতিক হাসি নিয়ে হেলে পড়েছিল চিতার উপর। আগুনের সেই শরীর মেলেধরা ফণার মত দপদপ করে ঝাঁকিয়ে উঠছিল। কপালে চওড়া সিঁদুরের রঙ নিষ্ঠুর চাউনিতে জ্বলজ্বল করছিল। অলৌকিক আলোয় নেচে-ওঠা শ্মশানের গায়ে জড়ান অন্ধকার দাঁত টিপে শক্ত হয়ে আসছিল স্তব্ধতায়। কোন কান্নার শব্দ ছিল না, খালি নদীপথ পার-হওয়া বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ছিল শিস তুলে। ঝিঁঝির ডাকে উড়ছিল অন্ধকার জড়িয়ে ক্ষীণ পাতলা রেশ ছড়িয়ে। তীর ঘেঁষে বুড়ো বট-গাছের ঝাঁকড়া মাথায় অজস্র বোবা চোখে

জোনাকি চমকাচ্ছিল, ফাঁকা হাওয়ার আগনের ঝিরিঝিরি শব্দ শনতে শনতে বোঝার মত ভারী হয়ে এলেছিল মাথার রক্তরাশি। দমকা আগুন আর বনবাদাড় থেকে ছুটে-আসা বাতাসে যেন জন্ম-জন্মান্তরের বাসী কথাগুলো হাহা করে এল বুক কামড়ে। শিউরে উঠেছিল মানুষটা, না আছে কোন সঙ্গী, না কোন আপনজন।

কয়েকটা কুত্তার হাঁকাহাঁকিতে ঘুমটা ধরে এল আবার। অবাক বোবাটে দৃষ্টিতে জ্বলন্ত চিতা লক্ষ্য করছিল মানুষটা। মেঘ কেটে গিয়েছিল, আবার জ্যোৎস্না ভেঙে পড়ছিল এদিকসেদিক। ভোজের আশায় শ্মশানের বেওয়ারিশ কুত্তাকটা চিতার আশেপাশে ঘুরছিল। ঝুলে-পড়া জিভ, সোনালী সবুজ চোখ, সামনের উঁচু দাঁত জ্বলজ্বল করছিল। শরীর ভাঙছিল আর ঠাণ্ডা গলায় হাঁক দিয়ে উঠছিল মাঝে মাঝে। শৃগালের ডাক ভেসে আসছিল থেমে থেমে।

বাজে পোড়া এক হেলান তাল-গুঁড়ির পিঠে ঠেস দিয়ে আধশোয়া ঢঙে উঠে বসেছিল মানুষটা। অষ্টাবক্র শরীর সামলাতে শিরদাঁড়া কুঁজো করে দুহাত মাটিতে রেখে ঝুঁকে পড়েছিল সামনে, ঝাঁকড়া এলোমেলো চুলের ছায়ায় ঢাকা পড়েনি পাঁজরের গভীর ছায়াটানা দাগ। অস্ফুট নীল আলোয় সমস্ত মুখ নিরেট নির্বিকার মনে হচ্ছিল। এক চিলতে রক্তাভ আলোর দাগ উপরের কাটা ঠোঁটের উপর ঠিকরে পড়েছিল। লাল মাড়ি বার-করা মুখ বড় বেশী অপ্রাকৃতিক ভঙ্গী করে ঝুলে পড়ছিল সামনে। চওড়া বেসামাল হাড়ের গায়ে একরত্তি মাংস ছিল না কোনখানেও। বেঁকে-ওঠা চোয়াল শক্ত করে কোটরাগত তীক্ষ্ম নজর মেলে-ছিল চিতার দিকে।

—শালা শ্মশানের ভূত কুথাকার।

বিড়বিড় করে গাল দিয়ে উঠল দলেরই বাউণ্ডুলে এক ছোকরা। বিড়িটা দুঠোঁটে সামলাতে যেয়ে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিল তাকে। কথা শুনে প্রায় হাতখানেক জিভ বার করে ধমকে উঠে-ছিল যদু।

—এই বাবা, ও কথা বোলে নি গো, সাক্ষাত বামুনের ব্যাটা। তিনবেলা মন্তোর না পড়ে মুখে জলটুকুন ঠ্যাকায় না গো।

—হেই শালা থাম দিকিনি তুই। ভাঁড় ভাঁড় তাড়ি ফাঁক করে দিতে দেখলাম সেই যেবার লন্দর লাশ এনেছিলাম। গত বর্ষায়, এ্যাঁ।

পল্টা গরম মেজাজে ঝাঁকিয়ে উঠল সেই ছোকরাই। তারপরে হাততিনেক লম্বা বাঁশে ঠেলে ঠেলে আধপোড়া শরীরের অবশিষ্ট অংশগুলো জড় করতে করতে হাঁকরে উঠল, বিড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে,

—লেত্যাদা, বিষ্টু মাইরী এসে থেকে মালে মুখ ডুবিয়ে পড়েছে কিন্তুন। সামলা ও হতভাগাকে, লইলে ও ব্যাটা-কেও চিতেয় তুলে দিতে হবে বলে দিলুম, হুঁ।

—খবোদ্দার খামোখা বদলাম দিবি নি, হুল্লেই যাবে একহাত তোর সঙ্গে, বলে আচমকা রুখে উঠতে গিয়ে আরো নেতিয়ে ঢলে পড়ল, বিষ্টু নাম যে ছোকরার। এদিকে বাতাস পেয়ে, শেষ-মুখে আবার তেজালো হয়ে উঠল আগুন। পাশে দাঁড়ায় সাধ্যি কি যদুর। কাঁধ, বুক থেকে দরদর ঘাম ছুটছিল। সরে বসল দূরে। টকটকে আঁচে শবযাত্রী দলটার কারুর মাথা, কারো কপাল, দোমড়ানো বিশ্রী চোয়াল আধমোছা আবছা ছবির মত ফুটে ছিল ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নার গায়ে। কেউ কেউ ঝুঁকেছিল চিতার উপর। একজন হাঁটু দুহাতে মুচড়ে বুকটান করে সোজা বসেছিল বোধহয়, কপালটুকু চেনা যাচ্ছিল কেবল। জটধোনা লম্বা কাত-হওয়া ছায়াগুলো মাটি পার হয়ে পিছনের দেওয়াল পর্যন্ত উঠে এসেছিল। টাল মাটাল টলে বেড়াচ্ছিল এবড়ো-খেবড়ো দেয়াল ঘিরে। খানকয়েক জোনাকি মগ ডাল থেকে খসে পড়ে নেচে বেড়াতে লাগল নিচু ঝোপের চারপাশে। অবসাদে হাত-পা ভারী হয়ে আসছিল মানুষটার, ছিঁড়ে পড়ছিল দুচোখ। ধুলোয় জ্বালা করছিল হাতের পাতা। হল্কায় হল্কায় ভেঙে-পড়া অজস্র ফুলকি উড়ে যাচ্ছিল শবযাত্রীর মুখের চারপাশ দিয়ে। জ্যোস্নায় কাঁপা ধোঁয়ার দিকে তাকালে মনে হয় খানিকটা আকাশ ঝুলে এসেছে চিতার উপরে। ধনুকের মত পিঠ ঠেলে বসেছিল সে। শক্ত অলস হয়ে উঠেছিল হাত-পায়ের পেশী। খান দুই ভুষোপড়া কাঁচ-ফাটা হ্যারিকেন একটু তফাতে নামান ছিল। স্থির থাকতে থাকতে মধ্যে মধ্যে হাওয়ায় দপদপ করে দুলে উঠছিল আলোগুলো। চিলেমিতে টলছিল মাঠঘাট আকাশ। মদের গন্ধে ঘোলাটে নিঃসাড় হয়ে উঠল জায়গা। শবযাত্রীদের দেখা যাচ্ছিল না আর। জলঢালা চিতার চারপাশ মুছে দিয়েছিল ধোঁয়ায়। সবদিক জুড়ে কেবল ঘন পাকানো ধোঁয়া ফেঁপে উঠছিল তখন। শবযাত্রীদের কে একজন, মোটা কর্কশ গলায় হেঁকে উঠল হঠাৎ,

—এই লেত্যা, লিখে আয় দেওয়ালে। নাম তিলোক চক্রবর্তী, ধাম......শোনামাত্র আচমকা চাপ দিয়ে যেন ঠেলে উঠল সারা বুকের রক্ত। নড়ে-ওঠা শিরাগুলো বোবাটে ঠাণ্ডা মেরে গেল আতঙ্কে। হাট-মাঠ পার হয়ে উড়ে-আসা হাওয়ায়, ধোঁয়ায় নিভে গেল দশদিক। ছিঁড়ে পড়তে চাইল রগের দুপাশ। অসাড় অবশ হাত-পা। হিম হয়ে গেল গোটা বুকের রক্ত। ভাঁজপড়া সারা মুখের শিথিল চামড়া বিশ্রী ভঙ্গীতে বেঁকে গেল। চীৎকার করতে যেয়ে, স্বর বেরোল না গলা দিয়ে। অবশ দুহাঁটু ঝুলে পড়ল সামনে। দুচোখের রক্তশোষা ঘন রঙ পানসে মেরে গেল নিমিষে। নেশায়, আচ্ছন্নতায় জেগে ওঠার মত সবকিছু ভুলে গেল পলকেই। যেন ঝড় হচ্ছিল চারদিকে, বৃষ্টির ছাটে কানা করে দিয়েছিল দুচোখ। রক্ত দুল-ছিল মাথায় ছিটকে এসে। ছাট ওড়ার তীক্ষ্ম ঝাপসা রেখা বিদ্যুতের আলোয় ছিঁড়ে পড়ছিল মুখের উপর। আর যেন অনেক দূরে, প্রায় জন্মেরও আগেকার কোন স্মৃতি, স্বপ্ন, ঝাপসা হাঁটুসমান কাদাজল, অন্ধকার চাপা কোন গাছ, পোড়োঘর অথবা নিজের মেয়েমানুষের দিকে চেয়ে ধরা অবসন্ন গলায় ফিসফিস্ করে উঠল যেন—কুথায় চললি গো?

—ওম্মা, তাও জাননি না কি। মঙ্গল চণ্ডীর পুজো যে গো আজকেই, পিদিম জ্বালব নি।

—আমার নামেও একটা জেলে দিস বউ।

ঝাড়লণ্ঠনের তেকোনা কাচ

রমানাথ রায়

এটা এমন একটা বয়স, যখন চোখে চালশে পড়তে শুরু করে, আর মনে হয়, এই সময় একটা ঝাড়লণ্ঠনের তেকোনা কাচ পেলে বেশ ভাল হত। কেননা, এই বয়সে যখন পৃথিবীটা বিস্বাদ লাগে, মনে হয় জীবনের কাছ থেকে নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই, যখন রাস্তায় নামলেই কেবলই জনস্রোত চোখে পড়ে, বন্ধুদের কাছে গেলে কতকগুলো বাঁধা-ধরা বিষয় সম্পর্কে একই আলোচনা প্রতিদিন শুনে যেতে হয়, কিংবা নিজের বাড়িতে পা দিলেই শুনতে হয় বাবার কাশির শব্দ, মা'র চীৎকার ছেলেগুলোর একঘেয়ে কান্না এবং স্ত্রীর একই ধরণের অভিযোগ, তখন প্রত্যেকেরই কোন না কোন সময়ে তেকোনা কাচের কথা মনে পড়ে, দেখতে ইচ্ছে করে সেই রঙীন পৃথিবী, যা একমাত্র ঐ কাচের ভেতর দিয়েই আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

স্পষ্ট মনে আছে, ছেলেবেলায় আমার সঙ্গে সবসময় ঝাড়লণ্ঠনের একটা তেকোনা কাচ থাকত। সেটা কোত্থেকে পেয়েছিলাম তা ঠিক মনে নেই, শুধু মনে আছে সেটা ছাড়া আমার একদণ্ড চলত না। কাচটা আমার কাছে একটা মহামূল্যবান বস্তু ছিল। তাই ওটা কাউকে কোনদিন কোন মুহূর্তের জন্যে ভুলেও দেখাইনি, দেখাতে সাহস করিনি। ভয় ছিল, পাছে ওটা কেউ কেড়ে নেয়। যখন স্কুলে কিংবা বাড়িতে খুব মার খেতাম, পিঠটা ব্যথায় টনটন করত, কিছু ভাল লাগত না, সমস্ত কিছুর ওপর রাগ হত, ইচ্ছে হত এখান থেকে পালিয়ে যাই, ঠিক সেই সময় তেকোনা কাচটার কথা মনে পড়ত, আর তখন পিঠে গ'লে অসহ্য ব্যথা নিয়ে একটা নির্জন জায়গায় চলে যেতাম। তারপর খুব সাবধানে প্যাণ্টের পকেট থেকে তেকোনা কাচটা বের করতাম। বের করে চোখের সামনে তুলে ধরতেই চারদিকের চেহারাটা সম্পূর্ণ পাল্টে যেত। দেখতে পেতাম, গাছপালা, ঘরবাড়ি, লোকজন, সবকিছু কেমন পাল্টে গেছে, একেবারে চেনাই যায় না। পৃথিবীটা যেন হঠাৎ নানা রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। সেই রঙীন পৃথিবীটার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে ভীষণ ভাল লাগত। এই রঙীন পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে আমি আমার সমস্ত দুঃখ ভুলে থাকতে পারতাম। তাই আমি কাচটা এক মুহূর্তের জন্যে কাছছাড়া করতাম না। সব সময়ে প্যাণ্টের পকেটে লুকিয়ে রাখতাম। তবে মাঝে মাঝে সন্দেহ হলে পকেটে হাত দিয়েই দেখে নিতাম ওটা আছে কিনা।

কিন্তু একদিন কখন যেন আমার একটু বয়স হতেই কাচটার কথা ভুলে গেলাম। আর ভুলে যেতেই, কোথায় যেন ওটা হারিয়ে গেল। এবং কি করে যে ওটা হারাল তা ভেবে পেলাম না। তবে যখন টের পেয়েছিলাম যে কাচটা হারিয়ে গেছে, তখন একটু দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু পরে আস্তে আস্তে কাচটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন আবার এই বয়সে নতুন করে ঐ কাচটার কথা মনে পড়ছে।

আজকাল প্রতিদিন সকাল বেলায় ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই সেই তেকোনা কাচটার কথা ভেবে বড় দুঃখ হয়, আর ভাবি, এখন এরকম একটা কাচ পেলে

বেশ ভাল হত। প্রতিদিনের পৃথিবীকে একটু নতুন করে দেখা যেত।

আমি একদিন কাচটার জন্যে তন্নতন্ন করে সমস্ত ঘরগুলো হাতড়ে বেড়ালাম। কুলুঙ্গি, আলমারির মাথা, খাটের তলা কোন কিছুই বাদ দিলাম না। কিন্তু ওটা কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

শেষে নতুন, পুরোন কাচ বিক্রীর দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ালাম, যদি ঐরকম একটা তেকোনা কাচ পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ ও রকম কাচ আমাকে দিতে পারল না। তারা প্রত্যেকেই বলল, আজকাল ঝাড়লণ্ঠন কেউ ব্যবহার করে না। তাই ওরকম কাচ আর পাওয়া সম্ভব নয়।

একবার ভাবলাম, বন্ধুদের কাছে গিয়ে এরকম একটা কাচের কথা জানালে ওরা হয়ত জোগাড় করে দিতে পারবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের কাছে 'এটা' জানাতে পারিনি। কেন যেন মনে হল, আমার কথা শুনে ওরা হয়ত হো হো করে হেসে উঠবে। আমি সেই অপমানের কথা ভেবে ওদের কাছে যেতে পারিনি।

কিন্তু এদিকে দিনে দিনে আমি যখন প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছি, হঠাৎ একদিন সকালবেলায় খুব আকস্মিক-ভাবে আমার বড় ছেলের হাতে একটা তেকোনা কাচ দেখতে পেলাম।

মা'র কাছে ভীষণ বকুনি খেয়ে ছেলেটা ছাদে গিয়ে একা একা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আমি ঘরে বসে তার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। শেষে থাকতে না পেরে ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এলাম। আর সেই সঙ্গে চোখে পড়ল, ছেলেটা হঠাৎ কান্না থামিয়ে পকেট থেকে একটা তেকোনা কাচ বের করে চোখের সামনে তুলে ধরেছে। সেটা দেখেই আমি চমকে উঠলাম। তারপর খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে সেদিকে এগোতে লাগলাম। কিন্তু ছেলেটা আমাকে দেখতে পেয়েই কাচটা নিমেষের মধ্যে প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে জিভ দিয়ে খুব অনায়াস ভঙ্গিতে ঠোঁট চাটতে লাগল। একটু আগে যে ও কাঁদছিল, তা ওর মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না।

আমি ওর কাছে এসে দাঁড়াতেই ও সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। বুঝলাম, ও ইতিমধ্যে বেশ ভীত হয়ে পড়েছে।

আমি সটান ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ কাচটা কোত্থেকে পেয়েছিস?

'শ্যামল অঙ্গে ঝরিছে অমল শোভাতে' ফটো : সুকুমার রায়

ও প্রশ্নটা শুনে যেন খুব অবাক হয়েছে, এমন ভাব করে বলল, কই কাচ?

—একটু আগে যেটা চোখে লাগিয়ে দেখছিলি। ও নিপুণভাবে সেটা অস্বীকার করে বলল, কই, আমিত কিছু দেখিনি।

আমি এবার একটু ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম, তুই মিথ্যে কথা বলছিস।

—না ত।

—ঠিক বলছিস?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা বেশ, কাছে আয়, তোর প্যাণ্টের পকেট দেখি।

কথাটা শুনেই বুঝতে পারলাম, ও প্রায় আঁতকে উঠেছে। তবুও ও খুব স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করল, পকেটে পয়সা আছে। আমি একটু হেসে বললাম, সেই সঙ্গে তেকোনা কাচটাও আছে।

ও এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, না, নেই।

আমি বুঝলাম, কাচটা দেখাতে ও একেবারেই অনিচ্ছুক। এবং যেহেতু এর পর জোরজার করলে ভবিষ্যতে ওটা হাতে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই আর থাকবে না, তাই আস্তে বেশ নরম সুরে অনুরোধ করে বললাম, একটু দেখানা কাচটা।

ও তখন গম্ভীর হয়ে বলল, দেখাতে পারি, তবে আমার কাছ থেকে আরো দূরে তোমায় সরে যেতে হবে।

আমি বাধ্য হয়ে বেশ দূরে সরে গেলাম। আর ও তখন পকেট থেকে কাচটা বার করছে একরকম ভান করে নিমেষের মধ্যে ছাদ থেকে ছুটে পালাল।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তবে এর পর আমি রীতিমত সজাগ হয়ে রইলাম। আমার দৃষ্টি সব সময় ওকে অনুসরণ করতে লাগল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম সেই দুর্লভ মুহূর্তটির জন্যে, যখন ও কাচটা অন্যমনস্ক হয়ে কোথাও ফেলে রাখবে। কিন্তু দিনের পর দিন এভাবে অপেক্ষা করে কিছু ফল হল না। আমি ওকে কোন মুহূর্তের জন্যেও কাচটাকে ওর কাছছাড়া করতে দেখলাম না। সব সময় কাচটাকে ও পকেটে রেখে দিত।

এদিকে ওই তেকোনা কাচটাকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে ধীরে

জানি না। আমাকে ছেড়ে দাও

ধীরে আমি প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম। একদিন ঠিক করলাম, রাত্রে ও যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন নিঃশব্দে ওর পকেট থেকে কাচটা বের করে আনব। বাস্তবিক, এ ব্যাপারে আমি প্রায় সফল হয়েছিলাম। কিন্তু সামান্যের জন্যে সমস্ত কিছু ভণ্ডুল হয়ে গেল।

ও রাত্রে পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে কাচটা রেখে দিত। আমি ওর মুঠো পকেটের ভিতর থেকে খুব সন্তর্পণে বের করে এনেছিলাম। কিন্তু মুঠোটা খুলতে গিয়ে ও হঠাৎ জেগে উঠল। আর জেগে উঠেই আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে চীৎকার শুরু করল, যাতে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম।

এর পর ও ভীষণ সতর্ক হয়ে উঠল। আমাকে সব সময় এড়িয়ে চলতে লাগল। আমি যেখানে থাকি, তার কাছ দিয়ে আর যাতায়াত করত না। ওর এই ব্যবহারে আমার সমস্ত আশা আস্তে আস্তে নির্মূল হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, কাচটা ওর কাছ থেকে কিছুতেই পাওয়া যাবে না। তবে আমি জানতাম, একটু বয়স হলে ও কাচটার কথা ভুলে যাবে, আর তখন কাচটা আমার পক্ষে জোগাড় করা হয়ত অসম্ভব হবে না।

তারপর এক অদ্ভুত কণ্টকময় বুক-চাপা উদ্বেগে, আশঙ্কায় দিন গুনতে গুনতে যখন আমার দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে এল, আর ওদিকে ছেলেটি যখন দেখতে দেখতে দিব্যি যুবক হয়ে উঠল, তখন একদিন তাকে ডেকে বললাম, খোকা, সেই তেকোনা কাচটা আমায় দিবি?

কথাটা শুনে ও খুব বিস্মিত হল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কি হবে ওটা দিয়ে?

—আমার দরকার। আছে তোর কাছে?

বিস্ময়ের সঙ্গে ও খুব আস্তে জবাব দিল, না।

—তোর কাছে যেটা ছিল, সেটা কি করলি? কাউকে দিয়ে দিয়েছিস্?

—না, কাউকে দেইনি।

—তবে?

—ওটা কবে কোথায় হারিয়ে গেছে, তার ঠিক আছে নাকি!

আমি এর পর আর কোন কথা ওকে জিজ্ঞেস করলাম না। ও আমার দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল। বুঝলাম, এই বয়সে ওই কাচ দিয়ে আমি কি করব তা ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

ওর কাছ থেকে কাচটার সন্ধান না পেয়ে, নিজে প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত সারা বাড়ি খুঁজে বেড়ালাম। এমন কি যেসব জায়গায় কাচটা থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই, সেসব জায়গাও বাদ দিলাম না। কিন্তু কেন যেন, কাচটা আর পাওয়া গেল না। শেষে তাই ভেবেছিলাম, কাচটা আর কোনদিন পাওয়া যাবে না। মাঝে মাঝে এই জন্যে খুব দুঃখ হত আমার। বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হত।

কিন্তু হঠাৎ জীবনের সেই সময়টায়, যখন মানুষ রীতিমত বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, ভাল করে দাঁড়াতে পারে না, হাঁটতে গেলে বেশ কষ্ট হয়, তখন একদিন শীতের দুপুরে একটা তেকোণা কাচ আমি চকিতের জন্যে শেষবারের মত দেখতে পেলাম। ছাদে রোদ পোহাতে গিয়ে চোখে পড়ল, আমার দশ বছরের ছোট নাতি সেই কাচ চোখে লাগিয়ে মাথাটা চারিদিকে ঘোরাচ্ছে। কাচটা দেখতে পেয়ে খুব আনন্দ হল আমার। আর মনে হল, ওর কাছে কাচটা চাইলে হয়ত পাওয়া যাবে। কেন না আমার ধারণা ছিল, ও আমাকে বুঝি ভীষণ ভালবাসে।

আমি তাই হাসতে হাসতে ওর কাছে এসে মিনতি করে চাইলাম, কাচটা আমায় দিবি?

ও আমার কথা শুনে এমনভাবে চমকে উঠল যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। আর তখন মুহূর্তের মধ্যে তেকোনা কাচটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ছাদ থেকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল।

আমি হঠাৎ তার একটা হাত ধরে ফেলে বললাম, পালাচ্ছিস কেন?

—আমার কাজ আছে।

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কি কাজ?

—জানি না। আমাকে ছেড়ে দাও।

—কাচটা না দিলে দেব না।

কথাটা শুনে ও ভয়ংকর চটে গেল। কিন্তু কিছু বলল না।

আমি এবার আদেশের সুরে বললাম, দে ওটা।

আর ঠিক সেই সময় ও একটানে তার হাতটা আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাল। আমি তখন দৌড়ে ওকে ধরবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ মনে হল, আমি আর বালক নেই, এখন আমি রীতিমত বৃদ্ধ।

সেই সন্ধেবেলা ছাতে উঠেছে স্বপ্না। এখন রাত হলো। ডিসেম্বর মাস, ডিসেম্বর মাস বলে হিমে সমস্ত ছাতটা বৃষ্টিধোয়া ও ভিজে মনে হয়। পায়ের শিলপারটা এক পাশে খুলে রেখে স্বপ্না পায়চারি করতে থাকে। দূরে গঙ্গাঘাট থেকে স্টিমারের আওয়াজ কানে আসে তার। আকাশের পানে তাকিয়ে, না কোনো তারা নয়, এমোড়-ওমোড় আকাশটাকে দেখায় ঘোলা, ধুলো আর ধোঁয়ায় ভরা। স্বপ্না সন্ধেবেলাতেই উঠে এসেছে ছাতে। এই ছাতেই যা সামান্য নির্জন হতে পারে সে, বন্ধুর বাড়ি? অর্থাৎ মায়া? মায়ার বাড়িতে মায়া ছাড়াও আছে অনেকে। তার চেয়ে এ-যথেষ্ট ভালো, যথেষ্ট আপনার মনে করে স্বপ্না। নিচে, নাঃ, তার নিজের বলতে আজ আর কেউ নেই। এমনকি ওরা কাল পর্যন্ত ওর, কত আপনারই না ছিলো। স্বপ্না কিছুতেই বুঝতে পারছে না হঠাৎই কয়েক ঘণ্টার তফাৎ আর এ-ক ঘণ্টাতেই সবাই তার পর হয়ে গেলো। এমনকি ললিতও।

আপিস থেকে হন্তদন্ত হয়ে ফিরলো ললিত। তখন বেলা দুটো। স্বপ্নার মা রান্নাঘর মুক্তো করছেন। ও সবেমাত্র খেয়েদেয়ে ওর ঘরে এসে বিছানায় আধাশোয়া হয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। ললিত ঢুকলো ঘরে। ছোড়দি?

ধড়মড় করে উঠে পড়ে স্বপ্না। কী রে? তুই এখন?

রান্নাঘর থেকে মা-ও ছুটে এসেছেন, ললিত এশ্চিস—ললিত? কী হয়েছে? দুপুরবেলাই চলে এলি?

বলছি মা, তুমি এখন যাও। ললিত স্বপ্নার ঘরের ভেতর ঢুকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে—ওর চোখে জল, চুল উস্কোখুস্কো, মুখচোখ বসে গেছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে—কী হয়েছে বলবি তো? স্বপ্না পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে থরথরিয়ে ওঠে।

কী বলবো তোকে?

মানে?

মানে কি তুই বুঝতে পারছিস না।

মানে? কী বলছিস তুই—তপনের—

ললিত দুহাত দিয়ে জাড়িয়ে ধরে স্বপ্নাকে, এ তুই কী কল্লি ছোড়দি—ছিঃ

স্বপ্না আর দাঁড়াতে পারে না। খাটের ওপর গিয়ে বসে, আপন মনেই বলতে থাকে, এ আমি জানতুম—এ আমি—পরমুহূর্তে বিছানার ওপর মুখ ঢেকে পড়ে থাকে। বিশ্বাস হতে চায় না—হঠাৎই কিছু বিশ্বাস করা যায় না। ললিতকে ঢুকতে দেখেই স্বপ্না যেন সমস্ত টের পেয়ে গিয়েছিলো।

স্বপ্নার মা এতক্ষণে দরজা ফাঁক করে বলে ওঠেন চেঁচিয়ে, ও আমার মেয়ে নয়, ডান। জীবনে সুখী হবি না—রাক্কুসি—মর্ মর্ তোর গলায় দড়ি জোটে না রে—

মা!! দাবড়িয়ে ওঠে ললিত। তুমি যাও তো।

হ্যাঁ রে বাবা, আমি তো যাবোই। আহা, সোনার চাঁদ ছেলে—

স্বপ্না হঠাৎই উঠে বসে আলসের ওপর। এখনই যদি কেউ পেছন থেকে দিতো ঠেলে—তাহলে এই চারতলার ছাত থেকে পড়ে অনুকৃতা হতে পারতো তপনের। স্বপ্না ভাবতে থাকে আর তখনি গোলমাল হয়ে যায় সবই। না না, সকলেই আছে, অথচ তপন বেঁচে নেই স্বপ্না কিছুতেই ভাবতে পারছে না।

ললিতকে ও অবুঝের মতো শুধিয়েছিলো, তুই জানিস ঠিক?

পাল্টা ললিত প্রশ্ন করেছিলো, তুই জানিস না?

উত্তর দিতে পারেনি স্বপ্না। হু হু করে চোখের জল ঝরে পড়েছিলো তার। তবু একি করলো ললিত, ছি—

তুই তো দোষী। ললিত ওর হাত চেপে ধরে বলেছিলো।

ললিতদের সংসারে মা বাবা আর পাগল বড়দাদা, স্বপ্না আর ললিত। ললিত নিজে কেরানি, ওর বাবার পেনসন আছে। স্বপ্না পড়ায় কলেজে। ওর রোজগারেই সংসার চলে ওদের বলতে গেলে।

হরিমোহন ফিরলেন পার্ক থেকে বেড়িয়ে। বাড়িতে সারাদিন বসে তাঁর ভালো লাগে না। স্বপ্নাই বলেছে, বাবা, আপনি তো বিকেলের দিকে একটু বেড়িয়ে আসলে পারেন দেশবন্ধু পার্ক থেকে।

শুধু বেড়িয়ে কি হবে মা, একটা ছোটখাটো কাজ যদি পেতুম।

সারাজীবনই তো কাজ করলেন বাবা —এখন না হয় আমরা একটু করি—

তা তো বললি, এদিকে সংসারের অবস্থা দেখলে কান্না পায়। দেড়শটা টাকাই তো বেরিয়ে যায় খোকার জন্যে। স্বপ্নার বড়দাদাকে ওরা একটা ক্লিনিকে রেখেছে। স্বপ্নাই জোর করে রেখেছে। —ললিত মাঝেমাঝেই বলে, ছোড়দি, দাদাকে বাড়ি আনা এ-মাসে। অযথা কত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে—

স্বপ্না বোঝায় ললিতকে। বাড়ি এলে কতো বিপদ। বিপদ আর অশান্তি। তাছাড়াও—যদি সারে কোন-দিন। বাড়িতে আনা মানে তো চির-জীবনের জন্যে একটা সেরে-ওঠার সম্ভাবনা নষ্ট করে দেওয়া। যত কষ্ট আর অসুবিধা হোক স্বপ্না তা কখনো পারবে না। কেননা, এই বড়দাদাই ওকে ছোটবেলায় মানুষ করেছে—বাবা তো থাকতেন আজ জামালপুর, কাল সেনী, পরশু চক্রধরপুর। বড়দা ভালো থাকলে আজ ওদের আর অভাব কিসের? না, স্বপ্নাকে খাটতে হয় এতো!

পার্ক থেকে ফিরে হরিমোহন সোজা স্বপ্নার ঘরের দিকে চলে আসেন আজ। স্বপ্না মাথা না তুলে বিছানা-বালিশে গুঁজে থাকে। ছেলেটাকে একেবারে মেরে ফেললি খুকি!

স্বপ্না আর থাকতে পারে না। আপনারা সবাই আমার দোষ দেখছেন বাবা, যে মরলে তার কোনো দোষ নেই!

হরিমোহন মেয়ের মুখের এ-অভি-যোগের যাথার্থ্য কিছুতেই বুঝতে পারেন না।

তোর ভালো হবে না কখনো খুকি—ছিঃ!

স্বপ্না স্থাণুর মতো বসে থাকে ঘরের ভেতর। তার মনে হয় মুখের ওপর একটা কালো পর্দা এসে পড়েছে তার। এ-বাড়িতে কেউই তাকে চেনে না। এ কোথায় বসে আছে সে?

গত সোমবার এসেছিলো তপন আর আজ হলো বৃহস্পতিবার। সোমবার কলেজ থেকে দেড়টা নাগাদ দুজনেই বেরিয়েছে—গিয়েছে সিনেমা দেখতে। তপন বলেছিলো, দ্যাখো অনেকদিন দুজনে মিলে সিনেমা দেখতে যাইনি। সেই প্রথম প্রথম কি সিনেমাটাই না দেখতুম।

সিনেমা দেখতে, না ছাই।

ঐ হলো। উপলক্ষ্য সিনেমা, লক্ষ্য ছিলো পাশাপাশি নির্জনতা।

কি অসুস্থই না ছিলে তখন!

তুমিই বা কি সুস্থ ছিলে? শুধোলো তপন।

প্রথমটায় বেশ ছিলুম, ক্রমশঃ অসুস্থের কাছাকাছি এসে—

ওরা হাসতে-হাসতে ট্রাম-লাইনের দিকে এগিয়ে চললো।

সত্যিই যাবে?

সত্যি না তো কি মিথ্যে? চলোই না দেখা যাক, পুনরাবৃত্তি করে সেদিনগুলো স্মরণ করি।

লাভ?

লোকসানই বা কি? দেখছো না কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছি। বলেছিলো তপন।

বুড়োলাম, তো? জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকিয়েছিলো স্বপ্না ওর দিকে।

তপন উত্তর না দিয়ে ইঙ্গিতে দেখিয়েছিলো মরা দীঘল গাছ গোল-দিঘির ভেতর। পাতা নেই।

সেদিন সিনেমা থেকে ফিরে তপন বললো, চলো আমার হোটেলটা ঘুরে যাই একটু। কলেজের ধড়াচুড়োটা ছেড়ে নেবো।

তারপর?

এরপর, তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি যাবো। ললিতের সঙ্গেও অনেকদিন দেখা হয় না। ও যা ব্যস্ত।

তাহলে আমি উদ্ধার পাচ্ছি কখন? স্বপ্না শুধিয়েছিলো।

পেতে চাও?

স্বপ্নার সমস্ত অন্তর 'না না' করে উঠে। এতক্ষণে ধীরে ধীরে তার অন্ত-করণে তপনের অনুপস্থিতি উপলব্ধি হয়। দুচোখ ভরে জল আসে। বলে গেলে না তপন, আমি তো উদ্ধার পেতে চাইনি। তুমি মুখের একটা কথাকে এত বড় করে দেখলে? আসলে ভেতরে-ভেতরে তুমিই চাইছিলে উদ্ধার। আমি উদ্ধার চাইবো কোন্ সুবাদে। তুমি যে অমন করে বেঁধে রেখেছিলে, তাই ছিলো আমার সত্যি-কারের আনন্দ।

সেদিন সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তপন আর ও দুজনে ছিলো ছাতে। সেদিনও এমনি হিমে ভিজে গিয়েছিলো ছাত। আকাশে ইতস্তত তারা ছিলো! অর্ধেক চাঁদ দেখা যাচ্ছিলো মাথার কুজরুজে।

তপন স্বপ্নার মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে বলেছিলো, হিম লাগছে যে। কিছু-ক্ষণ বাদে ভারি মাথার যন্ত্রণা হবে।

ধ্যোৎ—মাথা থেকে কাপড়টা ফেলে দিয়ে, অদ্ভুতভাবে হেসে উঠেছিলো সে।

এসো বরং তোমার মাথা ঢেকে দিই। তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো স্বপ্না, নিজের মাথাটাও মাথা তপনু।

অনেকক্ষণ কোনো কথাবার্তা বলেনি তপন। স্বপ্নাও মনে মনে, সামান্য একটা বিষয় থেকে, কতদূর বিষয়ান্তরে গেলো ব্যাপারটা ভেবে সত্যিকার মর্মাহত হয়। কিন্তু তখন আর চারা নেই। ভেবেও কোনো লাভ হবে না দেখে কথা ঘোরাবার জন্যে শুধোয়, কাল একবার দাদাকে দেখে আসি চলো। এ-মাসে একদিনও যাওয়া হলো না। ভারি স্বার্থপরের মতন লাগছে।

তপন কোনো উত্তর দেয়নি বটে, মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

কি, ভাবছো কী? অমন চুপচাপ আমার মোটে ভাল লাগে না। স্বপ্না আলসে থেকে হঠাৎই উঠে দাঁড়ায়। তপন ওর দিকে তাকিয়ে আবার দূরের শ্যাম-বাজার-মোড়ের লাল ও নীলাভ আলোক-সজ্জার পানে তাকিয়ে থাকে।

কী দেখছো অতো মনোযোগ দিয়ে? ওদিকে কী দেখার আছে?

একরকম ধমকিয়েই ওঠে স্বপ্না। তপন আর একবার ওর দিকে তাকিয়ে হাতঘড়ি দ্যাখে।

আহা, ঢঙ।

তপনও দাঁড়িয়ে পড়ে। সিঁড়ির দিকে কয়েক পা গেছে, চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে স্বপ্না অস্বাভাবিকভাবে, কী? আমার কথার উত্তর দিলে না যে বড়!

কী পাগলামি করছো, চুপ করো, নিচে শুনতে পাবে যে।

শুনুক। আমি তো শোনার জন্যেই বলছি। আমি কী করেছি যে তুমি আমায় গালাগালি দেবে অমন করে?

কী বলছো স্বপ্না?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। তোমার মতো ছোটলোক—নিঃশ্বাস নেবার জন্যে থামে।

তপন এগিয়ে গিয়ে বোঝাতে যায়, হাতদুটি ধরতে যায় স্বপ্নার আর বিদ্যুতের মতো ঝট্‌কা মেরে আরো জোরে চেঁচিয়ে বলে, কী! তুমি আমাকে মারবে?

তপন কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎই অট্টালিকা যায় ধ্বসে!

আমার ক্ষমা করো তপু। আমার অপরাধের আর ক্ষমা নেই। হঠাৎ কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়লুম। আমি যে প্রলাপ বকছি, আমি যে তোমাকে কোনরকমে, স্বপ্নেও অপমান করতে পারি না তা তুমি কেন বুঝতে পারলে না? তুমি এতবড় ভুল কেন করলে তপু। আজ আবার আমি সেদিনের মতো ছাতে উঠে এসেছি। সেদিন ছিলুম দুজন, আজ আমি একা। তোমার কাছে ক্ষমা চাইবারও আমার মুখ নেই। সেই ভালো, তুমি আমায় ক্ষমা করো না। সেই ভালো, আমি এই আলসের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি আমাকে ঠেলে ফেলে দাও—প্রতিশোধ নাও তপু, আমার ওপর; নচেৎ আজীবন আমি শান্তি পাবো না। আজীবনই আমাকে এমন কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে।

একসময় গভীর রাতে ছাত থেকে নিচে নামতে নামতে স্বপ্না একটা বন্ধ দরোজার সামনে এসে দাঁড়ালো। নাঃ, কেউ তাকে ডাকতে আসেনি। তার মাথা হিমে জব্‌জব্ করছে। গায়ের কাপড় ভিজে এক্‌সা। শরীর আশ্চর্য ঠাণ্ডা, বরফের মতন।

ছাতের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে চাঁদ আড়চোখে, নিমগাছের চুড়োয়। ইট-খোলা থেকে পেঁচা ডেকে উঠছে থেকে থেকে। শ্যামবাজারের রাস্তায় ট্যাক্সি হঠাৎ ব্রেক কষলো—কোথায় ছ্যার্‌ছ্যার্‌ করে গঙ্গাজল ট্যাঙ্ক থেকে উপচে পড়ছে গলির ভেতর। স্বপ্না সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা ভেজানো দরোজার সামনে এসে পড়লো। এ-জায়গাটা তার খুবই চেনা। হ্যাঁ, দরজার পাল্লাতে লেখাও

"হিম লাগছে যে"।

রয়েছে তার চেনা নাম—আছে, ভেতরেই আছে। এক চিলতে আলো জানলা দিয়ে গলে পাশের বারান্দার গায়ে পড়েছে। এতো রাতেও আলো জ্বলা। তার পুরোনো ভঙ্গিতে দরোজায় তিনটে টোকা মারে স্বপ্না।

ভেতরে এসো।

দরোজার পাল্লা ফাঁক করে দ্যাখে শুয়ে আছে তপন। একটু ওঠার চেষ্টা করে বলে, কী ব্যাপার? এতো রাতে?

একটুও চমকায় না স্বপ্না। খাটের কাছে এগিয়ে যায় পায়ে-পায়ে।

একি চেহারা হয়েছে তোমার? বিষ্টিতে কোথা থেকে ভিজে এলে? বাইরে বিষ্টি হচ্ছে নাকি?

উঠে বসার চেষ্টা করে তপন।

উঠছো কেন? স্বপ্না বাধা দেয়। আমি তোমার ধুতিটা জড়িয়ে নিচ্ছি গায়ে।

তাই নাও চট্‌পট্‌। আমি ওদিকে ফিরে আছি। ছিঃ ছিঃ, এই রাতে এলেই বা কী করে?

স্বপ্না ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তপনের দিকে।

কী দেখছো? শুধোয় তপন হঠাৎ।

শিউরে ওঠে স্বপ্না।

ভয় নেই, মারবো না তোমাকে।

কী যে বলো। সত্যি, সেদিন থেকে—বলতে যায় স্বপ্না।

যেতে দাও, যেতে দাও—ওসব ভেবে আর লাভ কি—?

স্বপ্না এগিয়ে গিয়ে দুটো হাত জড়িয়ে ধরে তপনের। আমায় তুমি ক্ষমা করো তপু।

তোমায় আবার ক্ষমা করার হলোটা কী? হো-হো করে হাসতে থাকে তপন।

না না, আমায় তুমি ক্ষমা করো তপু। তোমার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। কেন এ-কাজ করলে তুমি? কেন করলে? তপনের বুকের ওপর ভেঙে পড়ে স্বপ্না। ওর চোখের জলে ভিজে যায় তপনের বুক। স্বপ্নার মাথার এলো চুলের ভেতর হাত ভরে বলে তপন, তোমার কোনো দোষ নেই— সেদিন তোমার ওখান থেকে ফিরে সত্যিই একেকবার মনে হয়েছিলো, কী হবে বেঁচে। কিন্তু বাঁচবো না বললেই কি আর না-বাঁচা যায়! দুদিন কলেজ গেলুম না, তুমি জানো তা। ভাবলুম, আসবে তুমি। এলে না। হয়তো লজ্জাই করছিলো তোমার আসতে। ভাবলুম, আচ্ছা কালদিনটা দেখি। ওদিনও কামাই করলুম কলেজ।

তারপর? রুদ্ধশ্বাসে শুধোয়।

তারপর? তারপর কী যে হলো হঠাৎ—গত দুদিন থেকে মাঝেমাঝেই ফিস্‌ফিসিয়ে উঠছে কানের কাছে, কই রে, এতো ভয় তোর? আয় না, এদিকে আয়। মনে হলো বারান্দার দিকে কে আমার আগে আগে সরে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত। দড়াম্‌ করে দরোজাটা বন্ধ করে দিই। মঙ্গলবার রাত্তিরে হলো কি—হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনে হলো ঘরের পাখা-ঝোলানো 'এস'-টা থেকে কে যেন দোল খাচ্ছে। দেয়ালে পায়ের পাতা দাপিয়ে একবার যাচ্ছে পুব, ফিরে আসছে পশ্চিম। পিঠ উল্টে শুয়ে রইলুম মুখ গুঁজে। সে-রাত্তিরটা কোনক্রমে কাটলো। সে যে কি রাত গেছে আমার জীবনে!

তারপর? স্বপ্না দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে তপনের শরীর।

তারপর বুধবার রাত্তিরে, আমায় হাত ধরে তুললো টেনে।

ফাঁসটা পর, গলায়। পর্‌ পর্‌।

দোল্‌ খা—দোল্‌ খা।

তপন? আমার ভয়ানক ভয় করছে! গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না স্বপ্নার। হাত পা জমে গেছে।

তপন? তপন? তপন?

নাঃ, আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। স্বপ্না বিদ্যুতের মতো ছিট্‌কে পড়লো খাট থেকে হঠাৎ মেজের ওপর। কোমরের তলা থেকে পা পর্যন্ত অবশ, অসাড়। মাথার ভেতর চড়াৎ চড়াৎ করছে রক্তস্রোত। বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেলো তার সহসা। হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে দরোজার কাছে পৌঁছুলো সে। তারপর সিঁড়ি ভেঙে তপনের থেকে ক্রমাগতই দূরে চলে যেতে লাগলো।

সবাই ভাবত বড় হয়ে আমি খুব নামী লোক হবো। পাড়ার রতনবাবু একদিন হাত দেখে বলেছিলেন, তিরিশ বছর বয়স পেরোলে, আমি খুব সুখী হ'তে পারব। আর এক সন্ন্যাসী একবার বলেছিলেন, আমি বেশী দিন বাঁচব না কারণ, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে বেশী দিন থাকেন না।

তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী কতটা সফল হয়েছে জানি না, তবে এ'টুকু বুঝতে পেরেছি যে, আমি আর কোনদিন সুখী হ'তে পারব না। আমার আর কোন পরিবর্তিত নেই। এক প্রচণ্ড আবর্তে পড়ে আমি ক্রমাগত পাক খাচ্ছি। এবং তারপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে...

এই পর্যন্ত লিখে অমিত কলম থামাল। জানলার বাইরে অন্ধকার। আকাশে ক্রমশঃ মেঘ জমতে থাকায় কেমন যেন গুমোট লাগছে। আশপাশের বাড়ী থেকে ক্রমাগত উঠে আসা ধোঁয়া, রাস্তার ড্রেনে উৎকট পচা গন্ধ, একটুও বাতাস নেই, মশা উড়ছে সশব্দে:—সব কিছু মিলিয়ে কেমন যেন বিস্বাদ আর বমি বমি লাগছে। খুব ক্লান্ত মনে হওয়ায় চেয়ারে গা এলিয়ে দিল অমিত। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো আজকেও সকালে উঠেই ডায়েরী নিয়ে লিখতে বসেছিল। কিন্তু শরীরটা ঝিম্ঝিম্ করতে থাকায় কিছুই ভাল লাগছে না। কাল রাতে বোধ হয় একটু জ্বর হয়েছিল। আজকাল প্রায়ই জ্বর হয়। শরীরে সব সময় একটা তীব্র অবসাদ আর ক্লান্তি থাকায় সব কিছুকেই বিস্বাদ মনে হয়। কিছুই ভাল লাগে না.........ডায়েরীতে আজ কি লেখা যায় অমিত অই ভাবছিল।

বাবা খুব ভোরে উঠে স্নান করার পর প্রতিদিন গীতা পাঠ করেন। আগে বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনতো অমিত। ভারী গলায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শুনতে ভাল লাগত। দেশে থাকতে বাড়ীর কাছের মস্‌জিদে ভোররাতে আজান শুনতে পেত। আবছা অন্ধকারে তখনো আকাশে শুকতারা দপ্‌দপ্ করছে, সবেমাত্র কাক ডাকতে শুরু করেছে বোধ হয়,—ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আজানের সুর ভেসে আসত। এখনো মাঝে মাঝে এই কলকাতা শহরের ইঁট-কাঠ-পাথরের অরণ্যে যখন ভোর হয়,—হয়তো পথ ভুলে কোন ভিখারী-বৈষ্ণব এই কানা গলিটায় ঢুকে পড়লে দূর থেকে ভেসে আসা কোন আশাবরীর সুর মনটাকে কেমন যেন উদাস আর বিষণ্ণ করে দেয়। পুরোন স্মৃতি মনে পড়ে বারবার।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে, চোখ বুজে গীতার শ্লোক শুনতে থাকল অমিত। থেমে থেমে কাঁপা কাঁপা গলায় বাবা পড়ে যাচ্ছেন। গলার স্বরটা বেশ

আশিস ঘোষ

ভারী। অনেক দিন পর বাবা বাড়ী এসেছেন। বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন। তারপর মধুপুরে এক পিসীর বাড়ীতে। চেঞ্জে গিয়ে স্বাস্থ্যটা একটু ফিরেছে এবার। কঠিন অসুখ হয়েছিল। সমানে তিনদিন অক্সিজেন দিতে হয়েছে। দ্বিতীয় স্ট্রোক। এরপর তৃতীয়বারে আর বাঁচান যাবে না বলে ডাক্তাররা রায় দিয়ে দিয়েছে। পরিশ্রম করা একেবারেই নিষিদ্ধ।

এই সকালবেলা বাবাকে খুব ভাল লাগে। বিশুদ্ধ উচ্চারণে গীতার সংস্কৃত শ্লোক শুনলে, সারাটা সকাল মন ভাল থাকে। কেমন যেন একা একা মনে হয়। ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আসতে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অমিত। সকাল হয়েছে অনেকক্ষণ। এক ফালি নরম রোদ পড়েছে বিছানায়। একটা চড়ুই পাখী জানালার কপাটে বসে বার-কয়েক চিরিক্ চিরিক্ করে উড়ে গেল।

বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল অমিত। রান্নাঘরের সামনে বসে মা তোলা উনুন ধরাচ্ছে। পাশের ঘর অন্ধকার দেখে বুঝতে পারল, বাদল এখনো ওঠেনি। বাবাকে কোথাও দেখতে পেল না। সোজা গিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়াল।—বাবা কোথায়?

—কে জানে, এতক্ষণ তো ছিল। এই তো বেরোল।

—আবার সেখানে গেছে?

—আমি কিছু জানি না বাবা।

অমিতের ইচ্ছে হ'লো উঁচু গলায় একটা খিঁস্তি দেয়। এ'সব আদৌ ভাল লাগে না। বুড়ো মানুষ, তায় আবার শরীর অসুস্থ। কী দরকার তোমার অতদূর হেঁটে গিয়ে রোজ দু'বেলা আড্ডা দেওয়ার? অফিসের তাড়ায় অমিতের পক্ষে সকালে বাজার করা সম্ভব নয়। কতদিন বলেছে ওখানে না গিয়ে সকাল সকাল বাজার করে আনতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! বুড়ো হলে মানুষ যেন আরও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। অমিত একদিন দেখেছে গৌড়ীয় মঠে বসে ধর্মসভা করতে। ওখানে কী হয় জানে না। তবে এ'টুকু বুঝেছে যে, সারাজীবন কাজ করে বার্ধক্যের প্রচুর অবসরে মানুষ ঐভাবে সময় কাটায়।

রাগে দুপ্‌দাপ্ পা ফেলতে ফেলতে অমিত বাইরে এসে দাঁড়াল। পাশের বাড়ীর শিবমন্দিরের লাগোয়া শিউলি গাছটার একটা ডাল পাঁচিলের ওপর দিয়ে ঐপাশের রাস্তায় ঝুঁকে পড়ায় ইতস্ততঃ কিছু ফুল রাস্তায় ছড়িয়ে আছে। বাচ্চা একটা মেয়ে ঝুঁকে পড়ে খুঁটে খুঁটে ফুল তুলছে। ওকে দেখতে দেখতে ছেলেবেলার কথা হঠাৎ মনে পড়লো। রোজ ভোরে উঠে পার্কে ফুল তুলতে গেছে। আর সকালে পড়তে বসতে দেরী হওয়ায় কতদিন বাবার হাতে চড় খেয়েছে। একবার স্কুল পালিয়ে লেকে সাঁতার কাটতে যাওয়ায় এবং বাবা সে-খবর জানতে পারায় অমিত তিনদিন লজ্জায় মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। অথচ আশ্চর্য, কিছু না বলে বাবা শুধু গম্ভীর হয়েছিলেন। এমন আরও কতো তুচ্ছ ঘটনা টুকরো স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদের মতো মনে ভাস-ছিল। আজকে, ঠিক এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে—হায়রে ছেলেবেলায় কত সুখী ছিলাম! সত্যি সেসব দিন আর আসবে না! অমিতের মনে হ'লো, ফেলে-আসা দিনগুলি যেন বারবার পিছু ডাকছে।

নিজেকে খুব বিমর্ষ মনে হ'লো। একটা ফাঁকা ফাঁকা নিঃসঙ্গ অনুভূতি মনটাকে উদাস করে দিয়েছে। অমিত জানে রোগটা যদি একবার ভূতের মতো ঘাড়ে চেপে ধরে তো সারাদিনটাই খারাপ যাবে। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে ও-পাশের কলের দিকে এগিয়ে গেল মুখ ধুতে।

ইতিমধ্যেই কলে ভীড় জমতে শুরু করেছে। অমিতদের বাড়ীতেই কল আছে। আর যাই হোক মা-কে এসে এদের সঙ্গে রাস্তায় লাইনে দাঁড়াতে হয় না। পাড়ায় ওদের তেমন ঠাট নেই। ভাড়ার বাড়ী, তাকায় না কেউ, অথচ নিজেদের যদি অতি পুরোন একটা ঝরঝরে বাড়ীও থাকত, তা'হলেও লোকে বনিয়াদী বলতো। পাড়ার পুজো কমিটিতে প্রতিবার ডাক পড়তো। এমনিই হয়। আচমকা হাতের দাঁতনটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেললো অমিত।

গলির মোড়ের আলো এখনো নেবানো হয়নি। বড় রাস্তায় মিষ্টির দোকানের সামনের ফুটপাতে গত রাতের বাসী মিষ্টি খাওয়ার লোভে একপাল পায়রা আর কাকের গাদাগাদি ভীড় জমেছে। রাস্তা পেরিয়েই ও-পাশে চওড়া পার্ক। তারপর সাহেববাগান। অনেক দিনের পুরোন গোরস্থানে এখন আর নতুন কোন কবর দেওয়া হয় না। বহুদিনের ফাটলধরা কবরগুলিতে পুরু শ্যাওলা জমেছে। মাঝে মাঝে মন ভাল না থাকলে সকালবেলা অমিত এখানে এসে বসে থাকে। রেলিঙ টপকে পার্কে ঢুকে আজকে আর ও-দিকে গেল না অমিত। সামনেই একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে বসে পড়লো। খুব ক্লান্ত লাগছে নিজেকে।

বেশ কিছুদিন হ'লো বাড়ী নিয়ে একটা গোলযোগ চলছে। এবার বোধহয় বাড়ীটা ছাড়তে হবে। আর তা'ছাড়া সংসারের অশান্তির সঙ্গে বাড়ীরও অশান্তি থাকলে আরও খারাপ লাগে। কিন্তু এই বাজারে এতদিনের পুরোন বাড়ী ছেড়ে কোথায় যে যাওয়া যায়,—অমিত কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারেনি। অমিতরা পাঁচ ভাইবোন। বড়দা বিয়ে করে অনেক দিন আলাদা হয়েছে। মেজদির সংসার বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে। একমাত্র চিঠিপত্রের সম্পর্ক ছাড়া আর কোন যোগাযোগ নেই। সুতরাং বাড়ীর কর্তা বলতে অমিত নিজেই। আর বাদল সংসারের একমাত্র বোঝা।

কতদিন হয়ে গেছে পাশের ঘরে একবারও ঢোকেনি অমিত। ও ঘরে ঢুকলেই কেমন যেন মনটা খারাপ হয়ে যায়। শ্বাসকষ্টের অসুখ হয়েছে মনে হয়। পাশাপাশি দু'টো ঘর। অথচ পারতপক্ষে কখনো ও-ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে যায় না। আজ প্রায় পাঁচ বছর হ'লো বাদল পাগোল হয়ে আছে। প্রথমে সাধ্যমতো অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সারানো অসম্ভব জেনে এখন হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে। বাদল অমিতের চেয়ে ছয় বছরের ছোট। জোয়ান ছেলে। পড়াশুনোও কিছু করেছিল। কিন্তু যেমন ভাগ্য! সব সময় গুম্ হয়ে বসে থাকে। কখনো আপন মনে বকে যায়। আবার কখনো বা হঠাৎ চীৎকার করতে শুরু করে। যাকে সামনে পায় তাকেই মারতে চায়। ধরে রাখা মুশকিল। তখন যত কাজই থাক বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় অমিত।

........বাড়ীর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ট্রামডিপোয় সকাল সাতটার ঘণ্টা বাজতেই উঠে দাঁড়াল অমিত। পার্কের পেছনের রাস্তায় জল দিচ্ছিল একটা লোক। আশে-পাশের কোন একটা বাড়ীতে একটি মেয়ে চীৎকার করে গলা সাধছে। ও-পাশের ট্রামলাইনে হুহু ক'রে ট্রাম ছুটে যাওয়ার শব্দ। ধীর পায়ে অলস-ভঙ্গীতে রাস্তা পেরিয়ে ও-দিকের ফুটপাতে গিয়ে উঠলো অমিত। কাল রাতে ঘুমের মধ্যে একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছে। তারপর আবার সকাল থেকেই মনটা বিগড়ে আছে। আজকে আর অফিসে যাবে কিনা ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

সামনে পথ অফুরন্ত জেনে যাত্রার গোড়াতেই অশ্রান্ত পথিকের যেমন স্তিমিত হতাশা জাগে একটা ভারবোধ যে-ভাবে তাকে দমিয়ে রাখে,—ঠিক তেমন একটা চেপে-ধরা কষ্টের মতো অনুভূতি নিয়ে অন্যদিনের মতো অমিত আজকেও অফিসে আসে। প্রায় অন্ধকার ঘরটায় আলো নেই, কেমন যেন স্যাঁত-সেঁতে গুমোট। লোকগুলো ফাইলের মধ্যে মাথা গুঁজে কাজ করে যাচ্ছে—

আর অবিরাম টাইপমেশিনের শব্দ। কাঠের পার্টিশানের ও-পাশে মাঝে মাঝে বড়সাহেবের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে শোনা যায়। ঐসব বড় বেশী একঘেয়ে মনে হয়। বড় বেশী একঘেয়ে আশ্চর্য, লোকগুলোর যেন একটুও প্রাণশক্তি নেই। সারাদিন অফিসে কাজ করা, অপরের মন জুগিয়ে চলা কিংবা কাজ না থাকলেও কাঠের পুতুলের মতো হাত-পা গুটিয়ে চেয়ারে বসে থাকা বড় ক্লান্তিকর।

অমিত বুঝতে পারছিল বিরক্তিতে ওর সমস্ত শরীর শিরশির করছে। মাঝে মাঝে এ'ধরণের একটা অনুভূতি ওকে অস্থির করে তোলে। অমিত বুঝতে পারে না ও ঠিক কি চায়, কিংবা এই অস্থিরতাই বা কেন? অফিসের বারান্দায় পায়চারী করতে করতে কতদিন ভেবেছে, ও বোধহয় পাগল হয়ে যাবে একদিন। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এখন আবার সেই কথাটাই মনে হ'লো,—'একদিন হয়তো আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব।'

ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অমিত ভাবছিল : আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। গতকাল অনন্তদা'র একটা চিঠি পেয়েছে, ও'র বাড়ীতে একবার যাওয়া দরকার। কয়েকদিন হ'লো চিকাগো থেকে ফিরেছে অনন্তদা। সত্যি, লোকটা কত বড় হয়ে গেল, চার বছরে চেহারা কেমন পাল্টেছে কে জানে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আগের দিনের কথা ভাবতে থাকল অমিত। ভাবতে বেশ ভাল লাগছে......'কফি-হাউস' কিংবা ছুটির দিনে 'ওয়াই-এম-সি-এ' ক্লাবে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা। কখনো বা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ক্যান্টিনে বসে সত্যজিৎ রায়ের ছবির আলোচনা। সত্যি সে-সব দিন আর আসবে না। মলয় বিজন, সুজয় ওরা এক একজন এক একদিকে চলে গেছে। বিনয়টা এখন ভিলাইতে, প্রায়ই চিঠি লেখে। কলকাতা ছেড়ে ও প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছে। বেচারা। ...অমিত নড়েচড়ে বসলো। চলে-যাওয়া দিনগুলো আর ফিরে পাওয়া যাবে না তবু পুরোন স্মৃতি ভেবে যতটা সুখ পাওয়া যায়। ড্রয়ার থেকে প্যাড বার করে অমিত অনামনস্কভাবে হিজিবিজি আঁকতে থাকল।—'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না'—লাইনটা হঠাৎ লিখলো। একবার পড়লো, তারপর আবার কেটে ফেললো।

এমন সময় ও-পাশ থেকে হিতেন বাবু ডাকলো,—"অমিতবাবু, আপনার ফোন।" অমিত ঠিক বুঝতে পারলো না এখন কে ডাকতে পারে। এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরলো।

: হ্যালো।

: কে? অমিত? ও-দিক দিয়ে মঞ্জুশ্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

: কী ব্যাপার, হঠাৎ এ-সময়ে ফোন করলে যে?

: কিছু না, এমনি। ওর হাসির শব্দ শোনা গেল।

: কী করছো?

: এই দিবা-নিদ্রা সেরে আড়মোড়া ভাঙছি আর কী। আবার হাসির শব্দ শুনতে পেল অমিত।

: ফোন কেন করলে বলছো না তো। অমিত কিছুটা বিরক্ত হয়েছে। এ'ভাবে অফিসে সবার মধ্যে ফোন করতে নিষেধ করেছে অনেকদিন, তা-ও আবার বিনা প্রয়োজনে ফোনে ডেকে ন্যাকামি ভাল লাগে না। রিসিভারটা নামিয়ে রাখবে কিনা ভাবছিল অমিত।

: কী ভাবছো? ওপাশ থেকে আবার মঞ্জুশ্রীর কণ্ঠস্বর।

: কই, কিছু না তো।

: কথা বলছো না কেন?

: আমি আর কি বলবো, তুমিই-ই তো ডাকলে।

: আচ্ছা, বেশ মশাই। এবার হ'লো তো? আজ আমার জন্মদিন। বাড়ী আসবে, মা বারবার বলে দিয়েছে।

: তাই বলো। অমিত শব্দ করে হাসলো এবার।

কিছু একটা বলতে গিয়ে মঞ্জুশ্রী থেমে গেল।—এসো কিন্তু তাড়াতাড়ি।

অমিত কোন উত্তর দিলো না। আবার মঞ্জুশ্রীই ও-দিক থেকে বললো,— কি আসছো তো?

—আসবো। আর কোন কথা না বলেই অমিত ফোন নামিয়ে রাখলো।

একটা চোখ ছোট করে হিতেনবাবু ওর দিকে তাকিয়ে হাসছিলো।—কী ভাই, ও-দিকের খবর সব ভালো?

একটু হেসে ঘাড় নাড়লো অমিত। তারপর ইচ্ছে করেই মুখটা গম্ভীর করে নিজের চেয়ারে এসে বসলো।

লোকটা একেবারেই অসহ্য। সামনের চেয়ারেই বসে। এমনি হাসিঠাট্টা করতো তা'তে অমিতের আপত্তি ছিল না। কিন্তু সব ব্যাপারেই নাক গলানো কেন? এত উৎসাহ ভাল নয়। ওর চোয়ালের হাড় দু'টো এতো উঁচু যে, অনেকদিন অমিতের ইচ্ছে হয়েছে মুখে খুব জোর একটা ঘুসি মারে। কেন জানি না, ওর চেহারা দেখেই মনে হয় ও কোনদিন বউয়ের ভালবাসা পায়নি।

আবার শুনতে পেল অমিত হিতেনবাবু বলছে,—কি দাদা, প্রেমে পড়েছেন বুঝি? খুব যে মেজাজ দেখছি।

অমিত এবার ইচ্ছে করেই নিষ্প্রাণ হাসি হাসলো।—যা' মনে করেন। আপনার মর্জি'। —বলেই মুখ ঘুরিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লো।

—বাবু, সাহেব ডাকছে।

—আমাকে? ঘাড় তুলে তাকিয়ে বেয়ারাকে দেখলো অমিত। হিতেনবাবুর দিকে তাকিয়ে একবার চোখ টিপলো। তারপর ধীরে ধীরে সাহেবের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে, সুয়িংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

অমিতকে দেখে একটু হাসলেন মিঃ মিত্র।—কী করছেন এখন?

—মানে, এখন বিশেষ কোন কাজ নেই স্যার,—কিছুই করছি না। মাথা চুলকে বিড়বিড় করলো অমিত, ইচ্ছে হচ্ছিল বলে দেয়,— আসলে আজ আর কাজ করতে ইচ্ছে করছে না।

গম্ভীরভাবে ওর দিকে একবার তাকালেন মিঃ মিত্র। তারপর টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা কয়েকটা কাগজ তুলে সামনের দিকে এগিয়ে ধরলেন।— এগুলোর উত্তর দিয়ে দিন।

—এখুনি।—আজকেই দেব স্যার?

—খুব আরজেণ্ট। মিত্র মাথা নাড়লেন একবার।—যান, দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

কাঁপা-কাঁপা হাতে কাগজগুলো নিয়ে বেরিয়ে এলো অমিত। চেয়ারে বসতে বসতে একবার কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলো,—চারটে বেজে গেছে। এখন যদি এগুলোর উত্তর দিতে হয় তো, অনেক দেরী হয়ে যাবে। মঞ্জুশ্রীরা অপেক্ষা করে করে হতাশ হবে। কলমটা খুলে টেবিলের উপর পড়ে-থাকা প্যাডের কাগজে কয়েকটা সরলরেখা আঁকল অমিত। বাঁ হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাস তুলে জল খেল খানিকটা। তারপর গ্লাসটা আবার রাখতে গিয়ে দেখতে পেল, জানালার ফাঁক দিয়ে সোনালী গমের মতো এক ফালি রোদ এসে পড়েছে টেবিলে, তিরতিরিয়ে কাঁপছে। কিছুক্ষণ অনামনস্কভাবে ও-দিকে তাকিয়ে থাকল অমিত। তারপর জলে আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে ওই রোদটুকুর চারপাশে জলের বৃত্ত আঁকল কয়েকটা।

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩০)

অন্যদের তুলনায় আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম।

দেখলাম চোখের সামনে দিয়ে মেজদির দেহটা নিয়ে ওরা শ্মশানে চলে গেল দাহ করতে। যে কান্নার রোল কিছুটা থেমে ছিল আবার তা বেড়ে উঠল। আমি কিন্তু তাতে জোর দিইনি। শব-যাত্রীদের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে না নেমে উপরের চিল-কোঠার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে পাপিয়া। আত্মীয়-স্বজন ছাড়া পাড়ার বন্ধু-বান্ধবও কম হয়নি, সবাই মিলে মেজদির শবদেহ খাটিয়ায় তুলে নিয়ে চলে গেল।

ক্রমশঃ তারা দূরে চলে যাচ্ছে। এক-জনকে চিরকালের মত নিয়ে গেল, আর সে ফিরবে না। এ বাড়ীতে আমরা কম-দিন থাকিনি, যেদিন থেকে এসেছি, ঐ কোণের ঘরখানায় মেজদির জন্যে খাট পাতা থাকত। কখনও তার শরীর ভাল থাকত, কখনও মন্দ। কিন্তু এ বাড়ীর কথা ভাবতে গেলে ঐ কোণের ঘরের খাটটার কথা ভাবতে হয়। এত বছরের মধ্যে এমন একটা দিনও হয়নি যে বাড়ী ফিরে মেজদিকে দেখতে পাইনি। হয়ত কোনদিন তার মুখে হাসি দেখেছি, কোন-দিন দেখেছি কষ্টের ছাপ, কিন্তু তাকে আদৌ দেখিনি, এমন কখনও হয়নি। মেজদিকে ছাড়া এ বাড়ীর কথা ভাবা যায় না।

পাপিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এ কান্না বোধ হয় মেজদির জন্যে নয়। কারণ মেজদির সঙ্গে তার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সে কাঁদছে আমার জন্যে। ঐটুকু মেয়ে হলে হবে কি, পাপিয়া জানে আমার হৃদয়ের সবটুকু জুড়ে আছে মেজদি।

কে যেন ডাকল, অর্পিতা এস। তোমার বৌদি কিরকম করছে।

আমি নেমে এলাম, ঘরে গিয়ে দেখি মেজদির খাটের উপর পড়ে বৌদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কেউ তাকে সামলাতে পাচ্ছে না।

আমি বৌদির কাছে বসলাম, বললাম, এ কি করছ। নিজেকে সামলে নাও।

বৌদি বিহ্বল কণ্ঠে বলল, মেজ চলে গেল—

বললাম, একরকম ভালই হয়েছে বৌদি, বড্ড ভুগছিল।

বৌদি আস্তে আস্তে উঠে বসল, দু'চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছে, বলল, আমি এ বাড়ীতে একলা থাকতে পারব না। কার সঙ্গে কথা বলব, কেন, মেজ চলে গেল, আমি কি তাকে খুব জ্বালিয়েছি, কষ্ট দিয়েছি।

আমি বৌদির পিঠের উপর হাত রাখলাম, সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কেন এসব কথা ভাবছ? শেষপর্যন্ত তুমিই তো ওকে দেখেছ বৌদি, আমরা তো কিছুই করতে পারিনি।

বৌদি আমাকে জড়িয়ে ধরল, তুমি আর যেও না, এখানে থাক।

বললাম, তা কি করে হবে, আমায় যে চাকরি করতে হয়।

—চাকরি ছেড়ে দাও। আর আমি তোমায় কষ্ট দেব না। তুমি ফিরে এস।

—ক'দিন যাক, দেখনা সব ঠিক হয়ে যাবে।

সারা দুপুর আমি প্রায় বৌদির কাছে ছিলাম। সত্যিই সে ভেঙে পড়েছে। যত-ক্ষণ ওকে সান্ত্বনা দিয়েছি আশ্চর্য লেগেছে ভাবতে, এই মেয়েটির সঙ্গেই আমার কত না ভুল বোঝাবুঝি, কত না ঝগড়া হয়েছে। আমি চিরকাল মনে ক'রেছি বৌদি স্বার্থপর। হয়ত সে তাই কিন্তু তাই বলে ভাবা ভুল, স্বার্থপররা ভালবাসতে জানে না। আমাকে না হলেও মেজদিকে বোধহয় সে নিজের অজান্তে ভালবেসে ছিল। মৃত্যু এসে মেজদিকে মুক্তি দিলেও বৌদিকে মুক্তি দেয়নি, সে মনে করতে পারেনি যে, চিররুগ্না ননদের ভারমুক্তা হয়েছে, বরং অনুভব করছে অতি প্রিয়জনের বিয়োগবেদনা।

মৃত্যুই সবচেয়ে বড় কষ্টি-পাথর, যার উপর আঁক কষে মানুষের চরিত্র বোঝা যায়। খাঁটি সোনা না খাদ মেশানো। বৌদি হয়ত খাঁটি সোনা নয়, কিন্তু এত-দিন তাকে যে গিল্টি-করা ভেবে ভুল করেছিলাম তা আজ বুঝতে পারছি।

বৌদি একসময় বলল, মেজ চ'লে যাওয়া মানে আমি জানি তুমিও আর এ বাড়ীতে আসবে না।

কথাটা বড় করুণ শোনাল। বললাম, কথা দিচ্ছি বৌদি, ঠিক আগে আমি যে-রকম আসতাম, তেমনই আসব তোমার কাছে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সেজদা আর তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে।

কথাটা বলতে গিয়ে আমি কেঁদে ফেললাম। বৌদিও কাঁদল। কতক্ষণ আমরা এভাবে বসেছিলাম জানি না, মনে পড়ছিল কত রাত কতদিন মেজদি আর আমি এই ঘরে বসে এমনি নীরবে চোখের জল ফেলেছি। মেজদি শেষপর্যন্ত চেষ্টা করেছে বৌদির সঙ্গে আমার মিল করিয়ে দেবার। জীবনে যা সে পারল না, মৃত্যুর পর আমাদের সে মিলিয়ে দিয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর শ্মশান-যাত্রীর দল বাড়ী ফিরে এল। সেজদাও নিজেকে অনেক সামলে নিয়েছে। শুনেছি শ্মশানে গেলে শোকের মাত্রা অনেকখানি লাঘব হয়। প্রিয়জনের দেহ অগ্নি-সংযোগের ফলে ভস্মে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোকের উচ্ছ্বাস কমে যায়, তা' রূপান্ত-রিত হয় দার্শনিক চিন্তায়, দেহের নশ্ব-রতার কথা ভাবতে ভাবতে সে বাড়ী ফিরে আসে। সেজদাকেও তাই দেখলাম। চোখ-মুখ শুকনো, কিন্তু নিজেকে শক্ত করে নিয়েছে। চলমান জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কাল থেকে আবার অফিস আছে, ছেলেদের ইস্কুল, দৈনন্দিন বাজার। আরও কত কাজ। চলতে চলতে যে থেমে পড়ে বা হারিয়ে যায় তার কথা ভাববার অবসর কোথায় এ জগতে। পৃথিবী ঘুরছে, তার সঙ্গে তাল রেখে আমরা চলেছি, যে চলতে পারবে না, তাকে হারিয়ে যেতেই হবে, এই হল জগতের নিষ্ঠুর নিয়ম. একে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেজদা জিজ্ঞেস করল, তুই দু'একদিন থাকতে পারবি তো অপু?

বললাম, বেশিদিন নয়, ওখানে সাধুজী এসেছেন।

—জানি। তবু—যদি পারিস বৌদিকে—.

বাধা দিয়ে বললাম, তোমার ভাবতে হবে না, আমি বৌদিকে সামলে দিয়ে তারপর যাব। আর যদি যেতেও হয় আসা-যাওয়া করব।

সেজদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, হ্যাঁ সেই ভাল। ও যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে আমি ভাবিনি। বড় সাধ ছিল তোর কাছে একবার চুঁচুড়োয় ঘুরে আসবে! সুযোগও হল না, সময়ও হল না।

বললাম, সেরকম কত কথাই তো মনে পড়ছে।

সেজদা বলল, যে ভারমুক্ত তার আর ভাবনা কি, ও তো চলে গেল। আর স্মৃতির বোঝা নিয়ে আমাদের পড়ে থাকতে হয়!

সে রাত্রে মেজদির ঘরে আমি বৌদি আর সেজদা তিনজনেই শুয়েছিলাম। মেজদির খাট খালি পড়েছিল, সন্ধ্যে থেকেই ঘরের মেঝেতে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়, আমি শুয়ে শুয়ে সেই প্রদীপটা দেখছিলাম, তিনজন এক ঘরে রয়েছি, কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। কত কথা মনে পড়ছে। প্রদীপের শিখাটা নড়ছে, সেই সঙ্গে আমার মন, হয়ত অন্যদেরও! কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই।

দেখছি মেজদি খাটের উপর বসে রয়েছে। আমি চুঁচুড়ো থেকে ফিরলাম, হাতে একটা ব্যাগ। আমাকে দেখে মেজদির মুখ খুশীতে ঝলমল করে উঠল, অপু এসেছিস, আমি তোকে খবর পাঠিয়েছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার শরীর কেমন আছে?

—খু-উ-ব ভাল। অনেক দিন এত ভাল থাকিনি।

—তবে হঠাৎ ডেকে পাঠালে কেন?

মেজদি আমাকে কাছে বসিয়ে বলল, তোর জন্যে বড় মন কেমন করছিল। হাঁরে অপু, আমার কথা আজকাল তোর মনে পড়ে না, দূরে থাকিস, সেখানে কত কাজ করতে হয়, কত আর করবি। এ বাড়ীর দিদিদের জন্যে তোকে কি কম সহ্য করতে হয়েছে।

আমি অনুযোগ করে বললাম, এ তুমি কি বলছ মেজদি। যদি তোমার অসুবিধে হয়, আমাকে বল না কেন। হয় আমি তোমাকে নিয়ে যাব, নয়ত চাকরি ছেড়ে তোমার কাছে চলে আসব।

মেজদি বলল, নারে, তার দরকার নেই। বৌদি আজকাল আমার জন্যে খুব করছে। ও বদলে গেছে রে অপু, তুই দেখিস। আমি একটা খাতায় হিজি-বিজি মনের কথা অনেক লিখেছি, আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে আছে, একবার সময় করে পড়ে দেখিস।

আমি উঠে পড়ে বললাম, এখুনি পড়ব, দেখি তুমি কি লিখেছ।

মেজদি আমার হাতটা ধরে বাধা দিয়ে বলল, এখন নয়, আমি মরে গেলে তার পরে পড়িস।

বললাম, কি অলক্ষুনে কথা বলছ। কিন্তু আশ্চর্য, মুখ ফিরিয়ে দেখি মেজদি নেই, শূন্য খাট। খাঁ খাঁ করছে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, মেজদি, মেজদি।

বৌদি আমায় ঠেলে দিল, কি হয়েছে ঠাকুরঝি?

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম, তখনও আমি হাঁপাচ্ছি, বললাম, তবে বুঝি স্বপ্ন দেখছিলাম।

—মেজকে?

—হ্যাঁ। মেজদি বললে—

কথা শেষ না করে আমি বিছানা থেকে নেমে মেজদির ট্রাঙ্কটার কাছে এগিয়ে গেলাম, ঘর অন্ধকার, প্রদীপ কখন নিভে গেছে। আলো জ্বালাতেই সেজদা উঠে পড়ল, কি খুঁজছিস অপু?

আমি ততক্ষণে ট্রাঙ্কটা খুলে ফেলেছি, জামা-কাপড়ের ভেতর থেকে একটা নীল খাতা টেনে বার করলাম।

—ওটা কি?

বললাম, মেজদির খাতা।

—হঠাৎ এত রাত্রে কি ব্যাপার?

বললাম, মেজদি আমাকে পড়তে বলেছে।

স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলাম।

ওরা দুজনেই বলল, আশ্চর্য।

মেজদির খাতায় কিন্তু নতুন কিছু আমি পেলাম না। সবই পুরোন কথা, যে কথা ওর মুখে আমি বহুবার শুনেছি। ওর ভগবৎ বিশ্বাস, মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা, অসুস্থ শরীরের যন্ত্রণা, তাছাড়া বাড়ীর লোকজনের বিষয় মামুলী দু-চারটে কথা। মুখে সে যাও বলতে পারত, ভাষায় তাও ফোটাতে পারেনি। তবু, ঐ খাতা পড়তে পড়তে চোখ আমার বার বার ঝাপসা হয়ে এসেছে, মনে হয়েছে, মেজদি যেন আমার কাছটিতে বসে ঠিক আগের মতই সস্নেহে কথা বলছে।

গগন সেন প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। আমি ওকেও মেজদির খাতাটা দিয়েছিলাম, ও উল্টে-পাল্টে দেখে নিজের মনে আবৃত্তি করল,—

জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি
তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি।

বললাম, ঠিক এই কথাই মনে হচ্ছে। কত ছোটখাট ঘটনা। যখন আমার মন খারাপ হ'ত ঐ সিঁড়ির ধারটায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম। মেজদি এক একবার এসে এই বারান্দা থেকে উঁকি মেরে আমায় দেখে যেত। বাড়ীতে আছি না বেরিয়ে গেছি। তখন কত সময় ওর উপর বিরক্ত হয়েছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আর তো ও দেখতে আসবে না, আমি কি করছি না করছি। জানি এসব কথা ভাবার কোন অর্থ হয় না, তবু মনটা খারাপ লাগছে।

গগন সেন আগের মতই গম্ভীর গলায় কবিতার দুটো লাইন বলল,—

কেন এই আনাগোনা
কেন মিছে দেখাশোনা,
দু'দিনের তরে,
কেন বুকভরা আশা কেন এত ভালবাসা
অন্তরে অন্তরে।

গগন সেনের কাছেই আমি খবর পেয়েছিলাম সাধুজি সামনের রবিবার আশ্রমে ফিরে যাচ্ছেন।

আমি বললাম, রবিবার সকালে আমি চুঁচুড়োয় যাব, তা না হলে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

গগন সেন বলল, যেতে পারলে ভালই, তবে এখানকার কাজকর্মও তো আছে।

—অন্ততঃ ঘুরে আসব।

গগন সেনের কাছে ব্রজবালাদেবী এবং সাধুজী মেজদির মৃত্যুর খবর পেয়েছিলেন, আমাকে তাঁরা বলেও পাঠিয়েছেন তাড়াহুড়ো করে কাজে ফিরে যাবার দরকার নেই, সুবিধে মত এক সময় গেলেই হবে।

ইতিমধ্যে একদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অলকা এসে হাজির হল আমাদের ফ্ল্যাটে। মেজদির মৃত্যুর খবর পেয়েই সে ছুটতে ছুটতে এসেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, তুই কোত্থেকে খবর পেলি?

অলকা বল্‌ল, গগন সেন কাল আমার কাছে গিয়েছিল। তোদের স্কুলের বিষয়ে আলোচনা করতে, ওর মুখে শুনলাম।

আমার সঙ্গে মেজদির সম্পর্ক যে কতখানি নিবিড় ছিল তা অলকার চেয়ে ভাল কেউ জানত না। সে ছিল আমার দুঃখের দিনের সাথী। তাকে তখন কত কথাই বলে ছিলাম, এক দিনের মধ্যে শোকের মাত্রা অনেকখানি কমে এসেছিল। ক্রমশঃ স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসছে। অফিস, ইস্কুল, সংসারের কাজ, রান্না, সবই আগের মত চলছে। সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ছে নিজের নিজের কাজে। একমাত্র আমিই এ-বাড়ীতে ফালতু লোক, নেহাতই দর্শকের মত সবকিছু লক্ষ্য করছি। বেশির ভাগ যারা সমবেদনা জানাতে আসে তারা ভেবে পায় না কি কথা বলবে। বেশীর ভাগই জিজ্ঞেস করে অসুখের বিষয়। আমি বৌদিকে ডেকে দিই, সে বেশ গুছিয়ে রোগের বর্ণনা করতে পারে। অনেককে একই কথা বলতে বলতে বর্ণনার ভাষাও একরকম তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে।

আমি চুপচাপ শুনি কিন্তু আলোচনায় যোগ দিতে বিশেষ ইচ্ছে করে না। মনে হয় সবটাই কেমন যেন লোক-দেখানো।

কিন্তু অলকাকে দেখে আমি খুশী হলাম। ও যখন আমার হাত দুখানা ধরে পাশে বসল আমি ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলাম। অলকারও চোখে জল। বলল, অনু, তোর কথাগুলো আমার কানের কাছে এখনও বাজে। প্রায়ই তখন বলতিস, এ-বাড়ীর সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক সবই মেজদির জন্যে।

বললাম, সত্যিই তাই রে অলকা। এখন থেকে আর একটা নতুন জীবন আমার শুরু হবে। একদিক থেকে ভালই হল, কোনরকম পিছুটান রইল না। একেবারে একা।

অলকার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তুই আর আমি বোধহয় একই নৌকোয় ভাসছি। আমিও তো একা।

বললাম সেইজন্যেই বোধহয় তোকে এত ভালবাসি।

অলকা জিজ্ঞেস করল, চুঁচুড়োতেই থাকবি?

হ্যাঁ। এইবার স্কুলের কাজ শুরু হবে, সেই সব নিয়েই মেতে থাকব।

—সেদিক দিয়ে তুই সুখী। কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোর জন্যে অপেক্ষা করছে বিরাট জীবন। এক এক সময় মনে হয় তোর মেজদি বোধহয় এটা বুঝতে পেরেছিল। তাই ইচ্ছে করেই সরে গেল তোর জীবনে বাধা হয়ে না দাঁড়িয়ে।

বললাম, আশ্চর্য কিছু নয়, মেজদিকে তুই ঠিক চিনতে পেরেছিলি, পাছে অন্যদের অসুবিধে ঘটায় এই চিন্তাতেই বেচারী সব সময় সংকুচিত হয়ে থাকত।

অলকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মেজদিকে তুই বলেছিলি গগন সেন তোকে ভালবাসে?

—এ প্রশ্নে আমি চমকে উঠলাম, অলকা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছল কি করে? আমার সঙ্গে গগন সেনের সম্পর্ক ভালবাসার পর্যায়ে পৌঁছেছে কিনা তা অলকার পক্ষে জানা তো সম্ভব নয়। উত্তর দেবার আগে ভাল করে অলকার চোখের দিকে তাকালাম কিন্তু সে চোখে কোনরকম মিথ্যা কৌতূহল নেই। যে কারণেই হোক সে স্থির ধরে নিয়েছে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি।

তাই বললাম, হ্যাঁ, মেজদি জানত।

—সেইজন্যেই সে নিশ্চিন্তে যেতে পেরেছে। তোকে যে একলা থাকতে হবে না, তোর দায়িত্ব আর একজন নেবে এটা বুঝতে না পারলে সে কিছুতেই মায়া কাটিয়ে যেতে পারত না। খুব ভাল করেছিস অনু, আমিও গগন সেনকে তাই বলছিলাম, ওর পছন্দের প্রশংসা করতে হয়। ও যা চায় তোর কাছে তা সবটুকুই পাবে।

অলকার কথা শুনে কেন জানি না আমার মনে হল ও আজ একটু বেশী মাত্রায় ভাবপ্রবণ। তাই জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের স্কুলে তুই যোগ দিচ্ছিস তো অলকা?

অলকা বল্‌ল, না রে, পারছি না।

—কেন?

—আমি বোধহয় কানপুরে চলে যাব।

—হঠাৎ?

—একটা কাজ পেয়েছি। মাইনে মোটামুটি, কোয়াটার্স দেবে, নতুন পরিবেশে একরকম করে কেটে যাবে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, চাকরিই যখন করবি একটা আদর্শ নিয়ে স্কুল চালাতে দোষ কি ছিল?

অলকা ম্লান হেসে বলল, না রে অনু, সেজন্যে নয়। আমার বোঝা তোরা কেন বইবি, আগে স্কুল দাঁড়িয়ে যাক, তখনও যদি আমার দরকার মনে করিস, খবর পেলে ফিরে আসব। গগন সেনকে সেকথা আমি জানিয়ে দিয়েছি।

—কানপুরে যেতে হবে কবে?

—দু' একদিনের মধ্যেই যাবার কথা। এর মধ্যে আর বোধহয় তোর সঙ্গে দেখা হবে না, আমি কানপুর থেকে তোকে চিঠি দেব।

বললাম, তুই ঠিকই বলেছিস, এক নৌকোতেই আমরা ভাসছি। কানপুরে তোরও নতুন জীবন শুরু হবে, আমারও স্কুলের কাজ নিয়ে। প্রায় একই সঙ্গে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত আমরা কোন তীরে গিয়ে উঠি। অলকা ঠিক আগের মতই খেয়ালী ধরণের আছে। বলল, আমি তোর জন্যে একটা জিনিস নিয়ে এসেছিলাম। নিতে হবে কিন্তু। ফেরত দিতে পারবি না। আবার কবে দেখা হবে কে বলতে পারে। আমার জিনিসটা তোর কাছে থাকলে আমার কথা তবু তোর মনে পড়বে।

—কি বকছিস?

অলকা ব্যাগ থেকে একটা ঘড়ি বার করল, এই হাতঘড়িটা তুই পরে ক্লাস নিবি।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না, না। এত দামী জিনিস—.

অলকা কিন্তু কিছুতেই আমার কথা শুনল না। জোর করে ঘড়িটা আমার হাতে পরিয়ে দিল। যাবার সময় বলল, মেজদির ছবি যদি থাকে আমায় একটা দিবি।

ইচ্ছে করেই বললাম, হাতের কাছে নেই, কাল দুপুরের মধ্যে তোর ফ্ল্যাটে গিয়ে দিয়ে আসব।

অলকাকে নিচে পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে এলাম। ও একটা ট্যাক্সী নিয়ে চলে গেল। আমি বসে বসে অলকার দেওয়া হাতঘড়িটা দেখছি। কাঁটা দুটো নড়ছে, সময় চলছে, তার সঙ্গে তাল রেখে পৃথিবী ঘুরছে, যদি বেঁচে থাকতে হয় আমাদেরও তালে তালে পা ফেলে চলতে হবে। আমি থাকব চুঁচুড়োয়, অলকা কানপুরে, যেখানেই থাকি চলার গতি থামালে চলবে না!

কিন্তু যে থেমে গেছে?

মেজদির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল, তার মুখে মৃদু হাসি। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশঃ অতীতের গহ্বরে।

(ক্রমশঃ)

বাইরে টিনের ঘর

গনেশ নন্দী

গীতার কথায় ঝাঁজ অনুভব করল সুব্রত। তীব্র।

দু মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে। বাড়িওয়ালীর পোষ্য ছেলে রঞ্জিত কাল এসেছিল। পরশুও অন্তত তিনবার। ঘর বয়ে অনেক কথা ব'লে গেছে। আর পাঁচজন ভাড়াটেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে,—'ভাড়া দিতে না পারে, এবার দয়া ক'রে ঘরটা খালি ক'রে দাও। তোমাদের চেয়ে অনেক ভালো ভাড়াটে তারা, আর ভাড়াও দিতে চায় তোমাদের ডবল।

চুপ করে থেকেছে গীতা। মনে মনে ভেবেছে, আজ বাড়ি এলেই যা হয় একটা হেস্তনেস্ত ক'রে তবে ছাড়বো। তাই বলছিল সুব্রতকে। বলার আগেই আঁচ করেছে সুব্রত, আর বুঝতে পেরেছে এরপর রঞ্জিতবাবুকে আর কিছু বলতে যাওয়া মানেই দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার অপমান হ'য়ে ফিরে আসা।

: তুমি কি বললে? এবারে একটু নড়ে চড়ে ভিজে গলায় বললে সুব্রত।

: বলবো আবার কি। বলার নতুন আর তুমি কি রেখেছ? এ-ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চল।

: কোথায়? ক'লকাতার গাছ-তলাটাও তো করপোরেশনের অধিকারে।

: নিমতলাটাতে তো নিজেদের অধিকার আছে।

: না। ওটা আরও মারাত্মক। জীবন্ত অথবা মৃত, যেমন অবস্থাতেই ওখানে থাকতে চাইবে—বিনা ট্যাক্সে রেহাই নেই।

: ব'সে ব'সে আর নাটক ক'রোনা বাপু! যা হয় একটা ব্যবস্থা করো। দু-বেলা ইতরের মতন মুখ আর আমি শুনতে পারবো না।

অনুতাপ মনে উত্তপ্ত স্পর্শ পেল সুব্রত গীতার কথায়। কিন্তু কি করবে সে। দিনরাত্রির জাঁতাকলে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে দু-বেলা পেটের অন্ন জোগাতেই হিমসিম খেয়ে উঠছে, তার ওপর বাসা রদবদলের একটা কিছু ভাবলেই পায়ের তলার মাটি সরে গিয়ে ব্রহ্মতালুটা ব'সে যায়। সুব্রতর মনে হয়েছে যেন এই বন্ধ্যা পৃথিবীর গা বেয়ে বেয়ে দশটা পাঁচটার কাঁটায় প্রদক্ষিণ করছে সে তার ঘর, বাড়ি, দেশ আর এই আধমরা পৃথিবীটাকে।

: কি গো, তুমি যে একেবারে মৌনি সাধুমহারাজ হ'য়ে চুপ ক'রে গেলে?

: ভাবনাটা চেঁচিয়ে করতে হয় এটাতো জানতাম না।

: যুক্তি পরামর্শটাতো হয়?

: একদিন তাই হ'ত অবিশ্যি—

: আর আজ?

: এবারে চোখ তুলে তাকাল সুব্রত।

: মনে মনে কি মতলব এ'টেছ সত্যি ক'রে বলত? সুব্রতর চোখের ওপর চোখ রেখে বললে গীতা।

: সেই মতলবের ফানুসটাইতো বারবার ফে'সে যাচ্ছে।

: বেশ, তাহ'লে বসে বসে তোমার মতলবের ফানুস ফোলাও আর নিজের মনে যত খুশি ফাটাও, তবে আমার শেষ কথা, রাত পোয়ালেই আর আমি এখানে নেই। ঘর থেকে রান্নাঘরে গেল গীতা, আর জন থেকে জনান্তিকে হারানো চিন্তার খেই ধরল সুব্রত।...... খোশামুদে বড়বাবুদের খোসামোদ ক'রে অফিসেই রোজের বাড়তি কাজটুকু নিতে না পারলে, মাসের মাপা চালেই ভাটা পড়ে যায়। হায়রে! পাড়ার লোকে,

দেশের লোকে ভাবে, কত টাকাই না কামাচ্ছে সুব্রত! পাশের ঘরে সোনালীর মা, অবকাশ পেলে এ-কথা কতবার শুনিয়েছে সুব্রতকে। শুনিয়েছে তার সেকসনের অমিয়বাবুও। কতদিন বলেছে,—'সুব্রতবাবু, কাঁচা বয়েস আর তাজা রক্তের চাপে এখনও বুঝছেন না,—'সীসে বিষ' কি মারাত্মক! আপনি যেদিন বুঝবেন—সেদিন দেখবেন, 'সীসে বিষের' নীল পোকাগুলো ভেতরে ভেতরে কুরে কুরে সবটুকু খেয়ে আপনাকে ছিবড়ে করে ফেলেছে। প্রেসের কম্পোজিটরদের এইটেই জীবনের পাকা সড়ক। একটা ছাপার ওপর চোখ রেখে আর একটা ছাপার হরফ সাজাতে সাজাতে হেসে উত্তর দিয়েছে সুব্রত,—

তবুও বিশ বছর আগের চেয়েত উন্নত হয়েছি আমরা!

অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় যেন নিমেষে বোবা হ'য়ে যান। চল্লিশ বছর ধরে এই প্রেসে কম্পোজিটারী করতে করতে আজ সে সেকসনের সবচাইতে বড় হয়েছে, সেকসন হোল্ডার। জীবনের পঁয়ষট্টি বছরে পা দিয়েছেন অমিয়বাবু। 'কন্তু কৈ! অভিজ্ঞতার ঝুলি ঝেড়ে একটি একটি করে যেসব মুখ মনে পড়ে, তারাতো ......হ্যাঁ—জীবনবাবু। বিজ্ঞাপনের হরফ সাজাতো ভদ্রলোক। যৌবনের প্রান্ত-সীমায় পেঁাছুতে না পেঁাছুতেই জীবনের প্রান্তসীমা ছুঁয়ে সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। আর মোহিতবাবু,—গল্পটা বলতে বলতে অমিয়বাবুর ছানি কাটান পঁয়ষট্টি বছরের চোখে যেন নোনা জলের ছানি প'ড়ে গেল নতুন করে। হরফের কোটেশনটা হঠাৎ কেমন যেন উল্টে গিয়েছিল সেদিন সুব্রতর হাতে। মনে হ'য়েছিল সুব্রতর যেন সীসে বিষের বিষাক্ত বীজাণুগুলো অমিতবিক্রমে সজীব হ'য়ে উঠেছে, আর ছুটে আসছে তার দিকে। ভয় পেয়েছিল সেদিন সুব্রত। তবে কি......

ঃ উনুন তো ধরে উঠল—বাজার হবে?

আশ্চর্য! একটুও চমকাল না সুব্রত। যেন সদ্য ঘুমভাঙা ঘুমলাগান চোখে আবছা আর এলোমেলো লাগল একটু।

ঃ বাজার হবে না? আবার বললে গীতা।

ঃ একটু চা খেয়ে যাবো ভাবছিলাম—

ঃ আনছি, হ'য়ে এসেছে।

সুব্রত মুখ তোলার আগেই চলে গেছে গীতা।

নিজের মনেই ফিক ক'রে হেসে ফেললে সুব্রত। সত্যি, ভাবলে কষ্ট হয়? বেচারা গীতা! এ সংসারে আসার আগে আর পরে কতই না ভেবেছিল! এইতো চারটে বছর আগে। ধরতে গেলে এখন বিয়ের গন্ধই যায়নি গা থেকে।

সুব্রতর মনে পড়ে বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গীতার মনে সে কি স্বপ্নসাধ। সুব্রতর কামনা আর গীতার ইচ্ছে-মেশান যৌবনের স্বপ্ন রূপ নিচ্ছে। যেন ওদের দুটো জীবনে এক মহামিলনের সেতুবন্ধ হ'য়ে আসছে এক আকাঙ্ক্ষিত অতিথি।

নিজেদের প্রাণাবেগের গতিচঞ্চলতায় নিজেরাই যেন অবাক হ'য়ে গিয়েছিল সেদিন। সূর্যদেবের মতন যেন সাত-ঘোড়ার রথ চালিয়ে কি এক দুর্দম শক্তিতে চলেছে সুব্রত। কোথাও যেন আর তাকাবার ফুরসুৎ নেই, শুধু দ্রুত, আরও দ্রুতগতিতে চলতে ছুটতে হবে তাকে। এ পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ সবটুকুকে সে ছিনিয়ে নেবে নিজের জন্যে—তার গীতার জন্যে। আর গীতা! যেন রাতারাতি রামধনুর সাত রঙে রাঙিয়ে দিলে ঘরদুয়োর, ঘর বিছানা মায় দেওয়ালের ছবিগুলো পর্যন্ত। তারপর......সুব্রতর মনে পড়ে, সেদিনের সেই প্রথম কান্নায় চমকে উঠেছিল সে। কি এক অদ্ভুত উন্মাদনা আর অব্যক্ত আনন্দের ঢেউ ভাঙল দেহমনে। সেদিনই প্রথম অনুভব করেছিল সুব্রত। অনুভব করেছিল, এ-পৃথিবীতে কান্নাও কত সুন্দর, কত প্রাণজুড়ান মধুময়।

নবজাতকের প্রথম কান্না কি এক নব রোমাঞ্চের অনুভূতি জাগায় দেহমনে। সুব্রত জানল এ দুঃখ আর বেদনাজর্জরিত পৃথিবীতে কান্নাও কত সুন্দর।

টুনু যেদিন কাঁদল, সেদিন কি এক অকারণ লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে উঠেছিল গীতা।

কাঁদছে টুনু—আর হাসছে সুব্রত। একটা অনন্ত উচ্ছ্বাসের হাসি দুজনের চোখেমুখেই যেন উঠছে পড়ছে।

শুধু কি তাই; ঘরের পাশে সোনালীর মা আর অফিসের ছোট বড় অনেককে ধার করেও মিষ্টি মুখ করিয়ে শেষে তিন মাস সময় লেগেছিল তার ধাক্কা সামলাতে।

ঃ আশ্চর্য পুরুষ তুমি! ঠায় মেয়েদের মতুন ঘরের কোণে ব'সে ব'সে কি অত ভাবছ বলত? নাও চা খাও।

সুব্রত চা নিল। ভাবনার জাল ছিঁড়ল; কিন্তু জোট পাকাল অন্যদিকে। বাজার যেতে হবে। একটা রুক্ষ আর রূঢ় বাস্তবতা যেন চাবুক উঁচিয়ে দাঁড়াল—অবসর নেই, অবকাশও নেই পাশ কাটাবার।

ঃ ভেবেই কি কুলকিনারা করতে পাচ্ছি।

ঃ তবে আর ভাবছ কেন?

ঃ ভাবতে হয় ব'লে। ভাবনার ভাগ নেবার দোসর কেউ নেই ব'লে। কিসের যেন একটা আকস্মিক ধাক্কা খেল গীতা। চোখ কুঁচকে অস্ফুটস্বরে বললে গীতা।

ঃ দোসর?

ঃ হ্যাঁ, দোসরই তো ভাবনার দোসর।

গোপনে একটা পেঁচান নিঃশ্বাসকে নিজের মধ্যে চেপে নিয়ে বললে গীতা।

ঃ তা ঠিক। জ্ঞানটা একটু আগে পাকলে না হয় চেষ্টা করা যেত হাঁড়ি-

ঠেলা বৌকে বাতিল করা যায় কিনা, কি বল?

মুখ তুলে, তাকাল সুব্রত। হ্যাঁ, কপালটাও কুঁচকে উঠেছে গীতার। বাঁ দিকের ঠোঁটের নীচের পাতাটাও কাঁপছে তির তির ক'রে।

রাগলে অমন হয় গীতার। হাসলে যেমন টোল পড়ে ওর গালে, তেমনি রাগলে ওর ঠোঁটের নীচের পাতাটা কাঁপে।

ভারি সুন্দর লাগত সুব্রতর—একদিন তাই কারণে অকারণে রাগাতেও কসুর ক'রত না। কিন্তু কি যেন হয়েছে। খর রোদের উত্তাপে যেন ঝলসে গেছে খ'ড়ো চাল; আর সেই উত্তাপের

এমন সময় ডাক এল। ডাক দিল রঞ্জিতবাবু। বাড়িওয়ালীর পোষ্যপুত্র। পেয়াদার মতন গলির মুখে দাঁড়িয়েই উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলেন রঞ্জিতবাবু।

ঃ ভদ্দর ভাড়াটে কি বাড়িতে আছেন?

কচুর পাতার জলের মতন শেষ চুমুকের চা'টা একটু চল্কে উঠল সুব্রতর হাতে। ওটা গলায় ঢেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বললে সুব্রত—

ঃ যাওনা লক্ষ্মীটি, গিয়ে আর মাত্র পাঁচ ছ'টা দিন সময় চেয়ে নাও। তীক্ষ্ন চোখে বিদ্যুৎ কটাক্ষে তাকাল গীতা, যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ল তার

"হ্যাঁ, দোসরই তো ভাবনার দোসর"।

ঝলকে যেন রোদপোড়া আর ঝলসে উঠেছে দুজনে। সুব্রত আর গীতা।

ঃ পুরুষজাতটাই খুব নিঘিন্নে বুঝলে?

ঃ তাই নাকি! কতগুলো পুরুষের সংস্পর্শে এলে? সুব্রত তাকালো—

ঃ যতগুলো তুমি মেয়েদের সংস্পর্শে এসেছ। তীরের মতন তীক্ষ্ন জবাব দিল গীতা।

ঃ তাই নাকি! তাহলে বলছি—

চোখে। দলিত ফণিনীর মতন তীব্র রোষে ফুঁসে উঠে বললে—

ঃ লজ্জা করছে না তোমার ঘরের কোণে চোরের মতুন ব'সে থেকে বৌকে এগিয়ে দিতে?

ঃ আঃ একটু আস্তে। ইতরের মতুন চেঁচিও না।

ঃ ইতরের মতুন কথা বলছ তুমি। বৌয়ের রূপ দেখিয়ে এবারে পাওনাদার আর বাড়িওলার কাছ থেকে গা ঢাকা

দিতে চাইছ? যেন দেহের সবটুকু রক্ত চোখ-মুখ দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল গীতার।

তির তির ক'রে কেঁপে উঠল ঠোঁটের পাতা দুটো।

ঃ কি বললি হারামজাদী। অসহ্য আক্রোশে চাপা গর্জনে ফেটে পড়ল সুব্রত—তার বন্যপৌরুষ। কিন্তু থামল না গীতা। উন্মত্তের ঘূর্ণিপাকে যেন ঘূরন্ত চাকার পারদ উঠছে তির তির করে—পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর।

সমগুণে চিৎকারে বললে গীতা—

ঃ বলছি গলায় দড়ি দাওগে। নিজের বৌকে এগিয়ে দিয়ে—

দপ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল সুব্রতর মাথায়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মত্ত বন্যতায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ল গীতার ওপর। দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে আছড়ে ফেলে দিলে মাটিতে। বন্যবিক্রমে কীল, চড়, লাথি সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল। আচমকা কোল থেকে ছিটকে মাটিতে পড়েছে টুনুটা, ককিয়ে নীল হ'য়ে আঁৎকে উঠেছে—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সুব্রতর, আদিম হিংস্রতায় যেন উন্মত্ত বন্যজন্তু।

অবশেষে একসময় নিজেই হাঁফাতে হাঁফাতে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল সে।

হারামজাদী মাগি সতী হয়েছে! টলতে টলতে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সুব্রত। শুনতে পেল বাড়িওয়ালীর পোষ্যপুত্র রঞ্জিতবাবুর গলা তখন সপ্তমে চ'ড়েছে।

আর জন্ম-যন্ত্রণার মতন আর্ত গোঙানির করুণ কান্নায় মুখ থুবড়ে প'ড়ে রইল গীতা।

আউটট্রাম ঘাটের নির্জন তীরে গোটা দুপুরটা কেটে গেছে সুব্রতর।

মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য—চোখের সামনে উদ্দাম উত্তালের ঢেউ ভাঙছে চরায়। মনের মধ্যে আথালি পাথালি চিন্তার জট। খেই হারানো আর দলা-পাকান। অবিশ্রান্ত আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মতন জোটপাকান টুকরো টুকরো ভাবনার পাকে পাকে শুধু জড়িয়ে পড়েছে সুব্রত, আর ক্লান্ত মস্তিষ্কে ভাবতে ভাবতে একসময় অবসন্ন হ'য়ে ঢলে পড়েছে ওখানেই।

একটা নতুন জাহাজ ভিড়ল জেটিতে। ভোঁ বাজল। পড়ন্ত সূর্যের মুখোমুখি অবসন্ন দেহে স্বপ্নোত্থিতের মতন উঠে বসল সুব্রত। চোখ কচলে তাকাল, শুধু উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস—জল, আর জলে জলে ভাসা অসংখ্য বোট,

জাহাজ আর স্টীমার। টলছে মাথাটা। মনে পড়ছে নিজেকে, ক্লান্তিকর অতীতকে ফেলে-আসা বিভৎস সকালকে।

সন্ধে হয়েছে তখন। শ্রান্তদেহে অবসন্ন মনে পায়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করলে সে আউটট্রাম ঘাট ছেড়ে।

সন্ধ্যে উৎরে গেল।

চৌরঙ্গীর জনবহুল পথের উপর দিয়ে হাঁটছিল সুব্রত।

নিজের ওপর বিতৃষ্ণায় আর বিরূপতায় কানায় কানায় ভরে উঠেছে মনটা। একটা ব্যর্থ জীবনের ধিকৃত পৌরুষ যেন পুড়ছে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে।

হ্যাঁ—সেকশানে অবনীবাবুই চেঁচাতেন, এই সেদিনে পাঁচটার পর অন্যান্য দিনের মতন সেদিনও ওভার-টাইমে কাজ করছিল সুব্রত। একটা অঙ্ক বইয়ের হরফ সাজাচ্ছিল। গাণিতিক রাশি...... কি যেন হ'ল? হ্যাঁ মনোজের বউটা হাসপাতালে ছিল। ছেলে হবে। মনোজ আসেনি সেদিন।

অমিয়বাবুই প্রথমে খবর দিলেন। প্রায় সন্ধ্যা, মনোজ টেলিফোন করেছে হাসপাতাল থেকে। সুব্রত ও আরও অনেকে ওঁৎ পেতে আছে, এবারে দশ-টাকার ওপর ঘা দিতে হবে মনোজকে। প্রথম ছেলে ফাঁকি দিলে......

: শুনছ হরিপদ—অমিয়বাবু বললেন—'মনোজের একটা মরা ছেলে হয়েছে। আর—

হাতের কম্পোজ-স্টীকটা হঠাৎ কেমন অন্যমনস্কতায় সুব্রতর হাত ফসকে প'ড়ে গেল মাটিতে।

: হ'লত? তিনটি ঘণ্টার পরিশ্রমের দফা-রফা করলে তো? বাড়ি যাও, বাড়ি যাও, অত চনমনে হলে অঙ্কের কাজ হয় না। লজ্জিত হ'য়েছিল সুব্রত। সত্যিই তাই—। মনোজের বৌ মরা ছেলে প্রসব করেছে, তাতে কি পৃথিবীর বিবর্তনের গতিপথে কোথাও একটুও পরিবর্তন ঘটেছে! শুধু তাই নয়, আবার বলছিলেন অমিয়বাবু, ওর বৌটারও অবস্থা ভাল নয়......অথচ এত কাজ...... সত্যিই তাই। পৃথিবীর রঙটাই এই—একপিঠ সাদা আর একপিঠ কালো।

......অসহ্য এক দমফাটা উত্তেজনায় ছটফট করে উঠল সুব্রত। ইচ্ছে করল প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যায়, এ পরিবেশ—এ দেশ— এ মানুষের কাছ থেকে। কিন্তু কোথায় পালাবে সুব্রত? জীবন থেকে পালিয়ে কোথায় গিয়ে সে বাঁচবে! তাছাড়া,—টুনু.........মন কেমন করে সুব্রতর টুনুর জন্যে। ওই এক ফোঁটা মেয়েটা কি আশ্চর্যভাবে বাবাকে ভালবাসে। বাবার কণ্ঠলগ্ন না হ'য়ে কিছুতেই কোথাও ঘুমুবে না মেয়েটা। ভীষণ মনকেমন করছে টুনুটার জন্যে। ইচ্ছে করছে—

অপূর্ব মূর্চ্ছনায় একটা বেহালার সুর কাঁকিয়ে উঠল। ঠিক যেন টুনুর মায়ের সকালের কান্নার মতন।

মিড়-গমকে সে কান্না যেন চৌরঙ্গীর পাথুরে প্রাসাদে মাথা কুটে মরছে।

: একটা পয়সা দেবেন বাবু? একটা নয়া পয়সা?

চৌরঙ্গীর বিচিত্র জনারণ্যে এও এক বিচিত্র আর্তি।

পথ চলতি মানুষ জমেছে দু'চারজন।

আত্মমগ্ন সেই বেহালাদার রঙ-চটা নিজের বেহালার ওপর সুরের ছড় টেনেই চলেছে।

: দিন না একটা পয়সা—একটা নয়া পয়সা দিন!

এতক্ষণ থমকে দাঁড়িয়েছিল সুব্রত, এবার তাকাল।

একটা ভিখারী মেয়ে। শাসন-বৈরাগ্যে নবনীতা যৌবন—উদ্দাম আর উচ্ছৃঙ্খল। চোখের ওপর চোখ পড়তেই চোখটা নামিয়ে নিলে সুব্রত। অপাঙ্গে চটুল কটাক্ষ ক'রে চকিতে নিজের দৃষ্টিও নত করলে। একটা চাপা আর ভারি নিশ্বেস যেন পথ হারিয়ে বুকের মধ্যে ফুসফুসে ধাক্কা দিতে লাগল।

মনকেমন করছে টুনুর জন্যে, আর টুনুর মার জন্যেও। সত্যি ইদানিং কেমন রোগা আর পাংশু হয়ে গেছে বৌটা। পরশুদিন তো অফিস থেকে ফিরে তাই শুনল সুব্রত।

হাসপাতালের মেয়ে ডাক্তার বলেছে—'এবারের মতন যা হয়, এরপর কিন্তু সাবধান না হ'লে আর বাঁচবেন না। স্বামী কি করেন?

লজ্জায় নাকি মুখ তুলতে পারেনি গীতা। শেষমেশ বলেছে, প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ করেন।

ওঁকে বলবেন যেন দেখা ক'রে।

লজ্জায় মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল গীতা। লজ্জারই কথা! দুটো বছর পুরো না হ'তেই আবার মা হ'তে......

: দিন না বাবু। একটা নয়া পয়সাই দিন না। সুব্রত আবার তাকাল।

: তুমি ভিক্ষে কর' কেন? একটু দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে প্রশ্ন করলে সুব্রত। চটুল কটাক্ষে মুখটেপা হাসি হেসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে মেয়েটা,—

: কি করবো তাহলে—আপনি খাওয়াবেন?

: এ-সব রাস্তাঘাটে, এই বয়সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করা—

: যা! আচমকা সুব্রতকে থামিয়ে দিয়ে টানা-চোখে বিদ্যুৎ হেনে চকিতে অন্যদিকে চলে গেল ভিখিরি মেয়েটা।

হঠাৎ যেন হুঁস হ'ল সুব্রতর। দারিদ্র্য মোচনের বাণী দিতে গেল নাকি!

: শোন—সুব্রত ডাকতে গেল মেয়েটাকে। কিন্তু ততক্ষণে অন্য এক সাহেববাবুর কাছে করুণ মিনতিতে ভেঙে পড়ে বলছে মেয়েটা,—

: ওয়ান পাইস প্লিজ—ওয়ান পাইস!

আশ্চর্য! অবাক হ'ল সুব্রত। একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে প্যান্টের পকেটে হাত পুরে থমকে দাঁড়ালেন এক সাহেববাবু। কুণ্ডলী পাকানো সিগারেটের ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে এল মেয়েটার মুখটা।

বিচিত্র এক হাসির ভঙ্গিমায় এক-মুঠো পয়সা মেয়েটার হাতে দিতে দিতে বললেন সাহেব,—

নটি! কাম অন্!

—আবার যেন চমকে উঠল সুব্রত। একটা উষ্ণ প্রবাহের ঢেউ ভাঙল সর্বাঙ্গে। মেয়েটা কি.........

ঝলমলে নিয়ন আলোর বন্যায় প্লাবিত রূপবতী চৌরঙ্গী। ঠাসা ঠাসা বিচিত্র মানুষের বিচিত্র গতি এখানে। কাম অন্!

চোখের পলকে মিলিয়ে গেছে সাহেব-বাবু—ভিখিরি মেয়েটাও। একবার চার-দিকে তাকালো সুব্রত। এদিক-ওদিক, এপাশে ওপাশে। না! কেউ নেই, কোথাও নেই তারা। তাই হয়! এটা পরিণতি। ভীড়ের চাপে হারিয়ে যায় অনেকে।

মনোহর সন্ধ্যায় মানুষের মেলা বসে এখানে। মানুষ চায়, মানুষ পায়। বিকি-কিনির বিচিত্র পণ্যের সম্ভার। দরের ওঠানামা হয় এখানে।

সুব্রত ভাবল। এই মানুষ আর মানুষের চাপে সেও যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। আলোর রোশনাই আর রঙের জৌলুষে যেন ঝলসে যাচ্ছে তার দেহটা, মনটা। বিচূর্ণ ঝংকারে একটা আর্তনাদ ক'রে এবারে বন্ধ হ'ল বেহালা-দারের বাজনা। সুব্রত দেখল। মাথাটা ঘুরছে, পাটাও। পায়ে পায়ে লোকের পাশ কাটিয়ে আবার চলতে শুরু করলে সুব্রত।

তির-তির ক'রে বাতাসে সুরের কম্পনের মতন তখনও যেন কেঁপে কেঁপে ভাসছে সেই মেয়েটার আর্তি। যেন দেখতে পাচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়ায় আবছা আবছা মুখটা। কি ভীষণ করুণ! 'একটা পয়সা দিন না, নয়া পয়সা!' 'ওয়ান পাইস প্লিজ, ওয়ান পাইস'! 'নটি! কাম অন্'।

হঠাৎ যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসবে সুব্রতর। চোখের সামনে ম্লান হ'য়ে এল উগ্র নিয়ন আলোর উজ্জ্বলতা। একটা দম-বন্ধকরা ধোঁয়াটে অন্ধকারে কে যেন সাঁড়াশীর মতন দুহাতে ওর গলাটা টিপে ধরেছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। অসহ্য! এক বুক নিশ্বেস চাই এখুনি। মনে হ'ল যেন বিষাক্ত সীসে বিষগুলো প্রাণ পেয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে। উলঙ্গ। একটা মৃত্যুনীল বিযাক্ত সর্পিল সরীসৃপ যেন পাকেপাকে গ্রাস করছে তাকে। একবুক নিশ্বেস চাই এখুনি। তাকে বাঁচতে হবে। সুব্রত যেন দেখতে পাচ্ছে, কালসিটে দাগের পাকেপাকে—অপমানে আর বেদনায় গীতার ফ্যাকাশে করুণ মুখটা মরণ-যন্ত্রণায় তির-তির করে কাঁপছে। কোল থেকে ছিটকে পড়ে ককিয়ে নীল হ'য়ে দাপাচ্ছে টুনুটা। বিভৎস সকালের সেই ছবিটা বারবার ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে।

উত্তপ্ত উত্তেজনায় হঠাৎ যেন ছুটতে ইচ্ছে করল সুব্রতর। ইচ্ছে করল, ছুটতে ছুটতে সেই অন্ধকার আর স্যাঁৎ-স্যাঁতে ঘরে টুনুর মাকে জড়িয়ে ধরে বলে......

*　　*　　*

ল্যাম্প-পোষ্টের ঝাপসা আলোয় ঘুপসি গলির জটপাকানো অন্ধকার কিছুটা ফিকে হ'য়েছে, তার দীর্ঘ লম্বা সেই ঘুপসি গলির ব্যাঁকে ব্যাঁকে গাঢ় অন্ধকার যেন ঠাহর করা যায় না কিছু। চলতে পারে তারাই, যারা এই অন্ধকারের মুখোমুখি জরাজীর্ণ বন্ধা গলির বাহু-বন্ধনে জীবনের মিতালী পাতিয়েছে দীর্ঘদিন।

সেই অন্ধকারের বুকচিরে পায়েপায়ে যেন সব মাটি মাড়িয়ে চলছিল সুব্রত। তখন রাত হয়েছে। কি এক পৌরুষহীন লজ্জায় পা সরছিল না তার। কি বলবে সুব্রত। কোন লজ্জায় মাথা তুলে দাঁড়াবে টুনুর মার কাছে? হয়ত, ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষনে টুনুটা—আর কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে অভুক্ত টুনুর মা—গীতা টুনুর পাশেই বেদনাক্লিষ্ট অবসন্নতায় দেহ এলিয়ে শুয়ে আছে।

কে কে আসে?

বাঁ দিকের ব্যাঁক ঘুরতেই গলির মাথালিতে ওরা বসেছিল। জটলা কর-ছিল। এমনিই চলে। হয় তাসের না হয় দাবার—এমনিই জমে ওঠে আড্ডা। নেশা ভাঙ যে করে না, তা নয়—; করে। মাঝে মাঝে দস্তুরমতো করে আর মাতলামির হল্লা চলে।

এবার আর পা কাঁপল না সুব্রতর কিন্তু মনটা কাঁপছিল। একটা অহেতুক আর অজানা আশঙ্কায় শির্-শির্ করছে বুকের ভেতরটা। কেন জানি একট আহত পৌরুষ ধাক্কা দিচ্ছে বারবার পালাবে নাকি? এখুনি, এখান থেকে—দৌড়ে—এক ছুটে? কিন্তু তার আগেই তার কাছে ছুটে এসেছে জন-দশেক মানুষ। ওর মধ্যে মহিতোষ এবস্তির মুরুব্বি। রাতের হল্লায় পানাহারের মাত্রাটা মাঝে মাঝে একটু বেশীই হয় তার। সুব্রত কিছু বলার আগেই—মহীতোষ ওকে ঝাঁকানি দিয়ে বললে,—

ঃ তুই একটা গাধা, রাস্কেল, একটা অমানুষ—আস্ত অমানুষ। কাজ কাজ করে সংসারটা সব্বোনাশ করে ফেললি

অশান্ত উত্তেজনা যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

মহীতোষের গলা পেয়ে কোথা থেকে যেন ছুটে এল সোনালীর মা—। থম থমে রাতের বুক চিরে কান্নার সুরে আছড়ে পড়ল।

ঃ দাদা'গো—তুমিও বেইরে গেলে, আর বৌদিদি আমার.............. কান্নার দমকে স্বররুদ্ধ হ'ল সোনালীর মার।

তড়িতাহতের মতন চমকে উঠল সুব্রত। টলছে মাথাটা। চোখের সামনে একটা কুণ্ডলী পাকান ঘনায়মান অন্ধকার যেন থক-থকে জমাট বেঁধে উঠ'ছে। অবশ হ'য়ে আসছে পা, হাত—সর্বাঙ্গ।

কান্না-কাঁদা গলায় বিনিয়ে বিনিয়ে তখনও সমানে বলে চলেছে—

বৌদিদির পেটে বাচ্চা ছিল গো দাদা। কুথায় কমনে পড়ে গিয়ে......... ডাক্তার-বদ্যিকে আর চোখে-কানে দেখতে হলুনি, প্রাণটা তেক্ষুনি ধরফুইরে বেইরে গেল।

বস্তির প্রায় সকলে এসে তখন জড়ো হয়েছে ওদের ঘিরে।

ঘরের দাওয়ার ওপর প্রাণহীন দেহটাকে আঁকড়ে ধরে নির্বাক হ'য়ে শুধু চেয়ে আছে সুব্রত। মৃত্যুশীতল গীতার চোখে-মুখে এখনও পৈশাচিক বিভৎসতার স্পষ্ট চিহ্ন। সুব্রত তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখছিল।

হরবিলাসের মৃত্যু
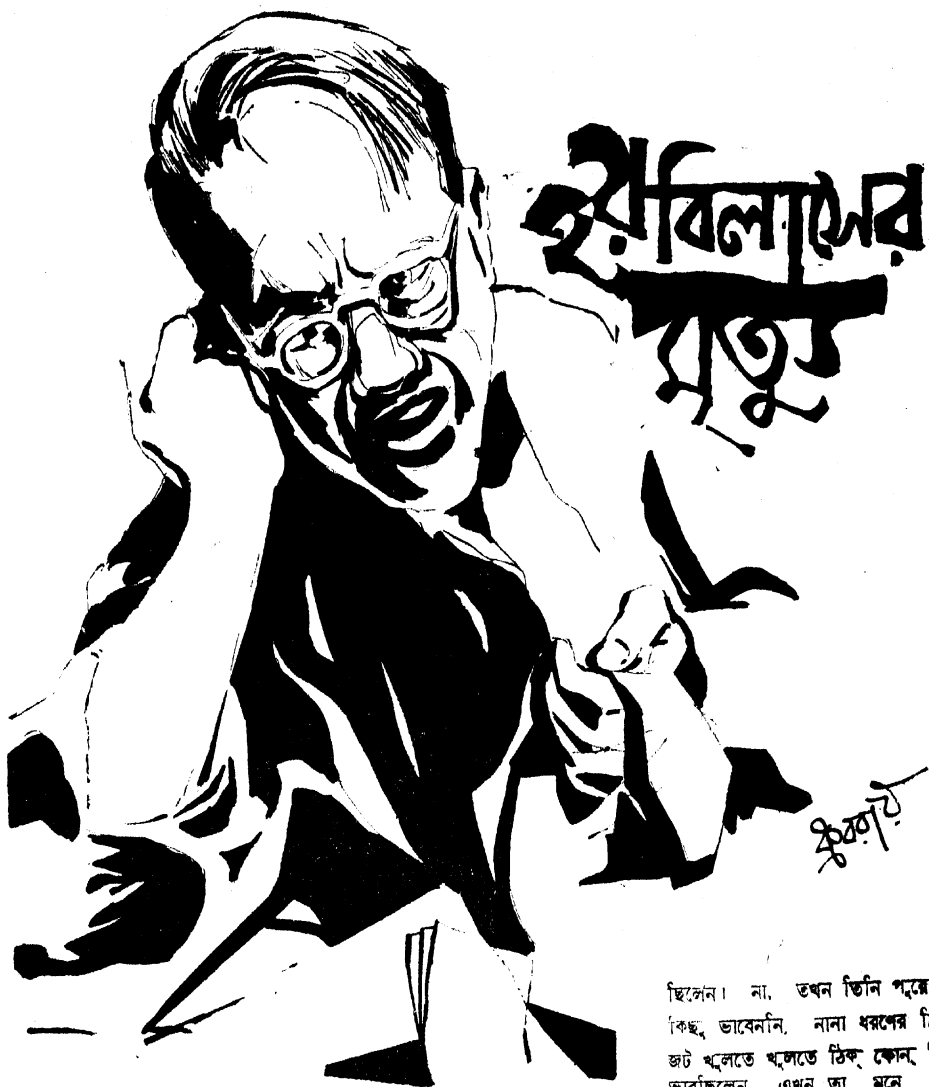
সুভাষ সিংহ

পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় থমকে দাঁড়ালেন: ফুটপাতের ধার ঘেষে জনতার জটলা, কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই. অথচ এদিকে হাতে সময় নেই. আরো আধঘণ্টা হাঁটলে তবে অফিসে পৌঁছুতে পারবেন: অতএব এখন কোন হুজুগের মধ্যে গা মেশানো উচিত নয়. তবু লোকজন হাত পা নেড়ে কী সব বলছে, কোন লোক চাপা-টাপা পড়লো নাকি, আচ্ছা না হয় এক পলক দেখাই যাক্—ইত্যাদি সব ভেবেচিন্তে অদম্য কৌতূহলকে দমন করতে অপারগ হয়ে হরবিলাস এগিয়ে গেলেন। কয়েক পা এগোতেই পথচারীদের বিচ্ছিন্ন মন্তব্য কানে ভেসে এল. "ইস্, একদম মরে গেছে? আ-হা-হা! বুড়ো লোকটা—বলবেন না মশাই, আজকাল স্টেটবাসগুলি যা হয়েছে না, কি বলবো মশাই, সাক্ষাৎ যম! আরে মশাই আমাদের জীবনের কোন দাম আছে নাকি? না খেতে পেয়ে মরছি, বাসে চাপা পড়ে মরছি, আত্মহত্যা করছি—না, না, মশাই, আজকের যুগে বেঁচে থাকাটাই একটা মস্ত সমস্যা!" হরবিলাস আরো একটু এগিয়ে এলেন। ইতিপূর্বে কোন এক দার্শনিক পথচারীর মৃত্যু সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলির কিছু তার কানে ঢুকেছিল, কিছু ঢোকেনি; আসলে তিনি তখন অন্য কথা ভাবছিলেন। না, তখন তিনি পুরোপুরি কিছু ভাবেননি, নানা ধরণের চিন্তার জট খুলতে খুলতে ঠিক্ কোন্ বিষয়ে ভাবছিলেন, এখন তা মনে করতে পারছেন না। আশ্চর্য, একটু আগে আমি তন্ময় হয়ে কী ভাবছিলাম? দুর্ঘটনার কথা শুনে প্রথমেই আমার লোকটাকে দেখবার প্রবল ইচ্ছে হয়। এই তো এক্ষুনি দেখলাম। ভীড় ছেড়ে হরবিলাস এগিয়ে যান। কিছুদূর হাঁটবার পর একবার পিছন ফিরে তাকান। ভীড়টা একটু পাতলা হয়েছে। একটু পরে ভীড়টা একদম কমে যাবে। সহরে বাসের তলায় মানুষের মৃত্যু একটা দৈনন্দিন ঘটনা। এতে অবাক হবার কিছু নেই. দুঃখ করবার কিছু নেই। হরবিলাস একটা পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এক বাণ্ডিল বিড়ি কেনেন। না, দেশলাইটা আছে। বিড়িটা দড়ির আগুনে ধরিয়ে এক পলক আয়নায় মুখটা দেখলেন। সঙ্গেসঙ্গে একটা আর্ত্ত চিৎকার করে ক'পা পিছিয়ে গেলেন। কখন বিড়িটা মুখ থেকে পড়ে গেছে, দু'চারজন করে লোক

জন্মেছে। একটু সম্বিত ফিরলে চারুপাশের মানুষজনের দিকে তাকালেন। তারা কেমন অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। পানঅলা বললে, "বাবু, আপনার কী শরীর খারাপ?" "না, না, ও কিছু নয়!" বলে যেন শরাহত হরিণের মত এক রকম ছুটেই এগিয়ে গেলেন। শুনলেন কে যেন বলছে তাকে লক্ষ্য করে, "দেখলেন তো মশাইরা, কলকাতার পাগলের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে! সব নিউরোটিক হয়ে উঠছে!" না, এসব কথা শুনবো না। এসব শুনলে সুস্থ লোকেরও পাগল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। দু'হাত দিয়ে কান চেপে হরবিলাস এক রকম ছুটে চললেন। আমাকে ওরা পাগল ভাবল? নিউরোটিক? তোমরা সুস্থ লোককে পাগল বানাতে চাও? সাংঘাতিক লোক সব। এরা কি না করতে পারে? কিন্তু কেন ওরা পাগল ভাবল আমাকে? একটু আগে বিড়িটা ধরিয়ে আয়নার দিকে তাকাতেই আমার মুখটা শুকিয়ে গেল, চোখদুটি যেন ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল, আর মনে হল যেন একটা বাস এসে আমার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল, আমি বাসের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে রইলাম; নাক, কান, মুখ দিয়ে ছলকে ছলকে রক্ত উঠল, তারপর আমি মরলাম! একটু আগে যে লোকটাকে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি, যার দুটো চোখ ভয়ে আর আতঙ্কে অস্বাভাবিকভাবে খোলা—সেই লোকটাই যেন আয়নার ভেতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল, দেখছিল। তার চোখের দৃষ্টি ছিল মরা মাছের মণির মত—অপলক, অনড়, চাহনী; ভৌতিক রোমাঞ্চকর গায়ের লোম ফুলে ওঠার মত শীতল অথচ ভয়ঙ্কর তার তাকানোর ভঙ্গী! লোকটা আমার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়েছিল।

অথচ এখন বুঝতে পারছি ওটা আমার মতিভ্রম। দুটো লোকের চেহারার সাদৃশ্য হুবহু এক হতে পারে কী? পারে না। অসম্ভব। তবু চিৎকার করলাম কেন? হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি যে, সেই লোকটার, (আহা, লোকটার অপমৃত্যু হ'ল!) সাথে আমার চেহারার সাদৃশ্য কিছু পরিমাণে আছে। চোখ বুজে হরবিলাস যেন কিছুক্ষণ আগের দেখা দুর্ঘটনায় নিহত প্রৌঢ় লোকটার চেহারার খুটিনাটি দিকটা মনে করতে চাইলেন। চেহারাটা অনেকটা এই রকম : শ্যামবর্ণ গায়ের রং রোগা লিক্‌লিকে চেহারা, বয়স প্রায় বছর পঞ্চাশ মনে হ'ল, (কমও হতে পারে, ভাল খাওয়া-দাওয়া জোটেনি, তাই বুড়োটে দেখাচ্ছিল) নাকটা বেশ খাড়া, চোখের তারা দুটি স্তিমিত, গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, পরনে ধুতি আর লংক্লথের পাঞ্জাবী, পায়ে অল্প-দামী চটি। এই হ'ল মোটামুটি চেহারা। জানি, আমার সাথে ঠিক ঠিক মিল নেই চেহারার। বয়স হয়ত সমান সমান, জামাকাপড়ও হয়ত তদনুরূপ; কিন্তু আমি তো শ্যামবর্ণ নই, গৌরবর্ণ; আর নাকটা আমার মোটেও খাড়া নয়, কিছুটা ভোঁতা ইত্যাদি! আসলে লোকটাকে দেখে প্রথমে আমার যা যা মনে হয়েছিল তা হচ্ছে এই,—(১) লোকটার বয়স হয়েছে, যদিও বৃদ্ধ বলা চলে না, তবে আমাদের দেশের কথা ভাবলে বুড়ো বললেও অন্যায় কিছু হবে না। তারপর লোকটা অপঘাতে মরল! উ, এই বাসগুলি যেন এক একটা নরখাদক জন্তু! এরা মানুষের রক্তে রঞ্জিত না হলে তৃপ্ত হয় না! (২) আচ্ছা, লোকটা কিভাবে মরল? হয়ত বাসটায় খুব ভীড় ছিল, লোকটা হ্যান্ডেল ধরে ঝুলেছিল, ভেতরে ঢোকবার কোন উপায় ছিল না। তারপর লোকটা কাতোরক্তি করেছে, অনুরোধ করেছে সহযাত্রীদের কাছে একটু ভিতরে যেতে দিতে; কিন্তু আমি জানি, জানবো না কেন, রোজ দু'বেলা বাস-ট্রাম ঠেঙিয়ে লোকে অফিসে যাচ্ছে-আসছে তা যখন দেখছি; তাই বলছি, লোকটার অনুরোধে কেউ কর্ণপাত করেনি, বরং বিরূপ মন্তব্য করেছে—এই যেমন অনেকটা এই ধরণের, যা আমরা পথে চলতে হামেশাই শুনতে পাই, লোককে আমরা কখনও বলি, কখন বা শুনি—"যান্, যান্ মশাই! অত তাড়া থাকলে ট্যাক্সি করে যেতে পারেন না? সরুন, সরুন, করছেন যে, কোথায় সরবো বলতে পারেন? আপনার মাথায় উঠবো নাকি?" তারপর লোকটা একদম চুপসে যায়, হয়ত তখন তার চোখ দুটো ছল্‌ছল্ করে ওঠে, অপমানে আর শংকায় লোকটা যেন মৃতপ্রায় হয়ে যায়। লোকটা ভাবছিল, যাক্‌গে, দুঃখ করে কী হবে, এই তো এসে পড়লাম বলে, আর ক'টা স্টপেজই বা আছে। তারপর? তারপর আমি যেন চোখ বুজেই দেখলাম, বাসটা হঠাৎ ব্রেক কষে, ব্রেকটা বেশ জোরেই কষে, সামনের একটা ধর্মের ষাঁড়কে বাঁচাতে গিয়ে। আর ব্রেক কষার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা, হয়ত তখন সে অন্য কিছু গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করছিল, অথবা কোনো কিছু চিন্তা নাও করতে পারে, আসলে কোন কিছু চিন্তা না করাই এক ধরণের চিন্তা—হ্যাঁ, সে যাই হোক, মোদ্দা কথাটা হ'ল, তার হাতটা রড থেকে পিছলে যায়; এবং কেন কিছু চেষ্টা করবার আগে, কেউ চিৎকার করবার আগে, কেউ ধরবার আগে, লোকটা একেবারে সরাসরি বাসের চাকার তলায়! কিছু লোকের তারপর সম্মিলিত চিৎকার, বাসটার একটা বুনো-জন্তুর মত গোঁ গোঁ শব্দ করে থামা, যাত্রীদের আনাগোনা, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা একটা মানুষ, চাপ চাপ রক্ত বিস্ফারিত দুটো চোখ—তাতে যুগপৎ ভয় আর আতঙ্ক মেশানো।

হরবিলাস চোখ মেলেন। ভীষণ গরম—সারা গাটা ঘামে জবজব করছে। দশটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী আছে। এখনো অনেকটা পথ বাকী! হ্যাঁ, এরপর লোকটার সম্বন্ধে আরো কিছু চিন্তা করা যাক্। (৩) আচ্ছা, যখন লোকটার বাড়ীতে খবর যাবে যখন শুনবে অমুক নামে এক ব্যক্তি আর ইহলোকে নেই, তখন তার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র (যুবক পুত্র কী?) কেমন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে কেমন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে; আচ্ছা, কাঁদবে কী? আজকাল কাঁদাকাটা যেন দিনকে দিন কমে যাচ্ছে; হায়, যুগ বদলে গেছে, প্রিয়জনের শোকে কাঁদতে অনেকের আজকাল লজ্জাবোধ হয়, কাঁদাটাকে নাকি অনেকেই বলে কাপুরুষতার লক্ষণ, অথচ......যাক্‌গে, মরুক গে, আমার কি, আচ্ছা, আমি এত ভাবছি কেন; আমার লোকটার সাথে কোন্ সম্পর্ক; কত লোক তো রোজ মরছে, কে কার খবর রাখছে, কার অত দায় পড়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি! অতএব হরবিলাস যেন এতসব চিন্তা করতে চাইলেন না। তিনি যেন মুক্তি খুঁজতে চাইলেন—কিন্তু কার হাত থেকে, কীসের হাত থেকে? আমাকে তো কেউ বন্দী করেনি, তবে মুক্তির কথা কেন? কিন্তু ভাবতে হবে, না ভাবলে আমি বাঁচবো না, আমার জীবনটা যেন অসার্থক হয়ে যাবে, তাই ভাবা দরকার; লোকটা আমাকে যেন ভর করেছে, ওর হাত থেকে নিস্তার নেই, ও তার জীবনেতিহাস আমাকে শোনাবেই! কিন্তু কেন? তুমি মরেছো, বেঁচেছো—আর আফশোস কেন? আমাকে টানছো কেন? আমি কী অপরাধ করলাম? আমাকে রেহাই দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, হরবিলাস মুক্তি চাইলেন, একটা অদৃশ্য আত্মার কঠিন আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন! অথচ আমি জানি বাইরের পৃথিবী থেকে মুক্তি পেলেও মনের হাত থেকে রেহাই নেই। আমার হৃৎপিণ্ডটাকে যদি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে পারতাম, আহা, যদি পারতাম, তবে আমি বাঁচতাম! এই যে এই মুহূর্তে লোকটা, আহা লোকটা মরে গেল, অপঘাতে মরল, লোকটা বুড়ো ছিল, অপঘাতে মরল—আমিও বুড়ো, অথচ আমি বেঁচে, দিব্যি বেঁচে আছি; আমি কী আজকে ঠিক ওই ভাবে; লোকটার মত চিৎ হয়ে, চোখ দুটো খোলা রেখে তাতে যুগপৎ ভয় আর আতঙ্ক মেশানো......দূর ছাই, দাদা, দেশলাইটা দেবেন? হরবিলাস জনৈক

পথচারীর বিড়ির আগুন থেকে বিড়িটা ধরাল। আসলে বিড়ি ধরাবার কথাটা আমার এই মুহূর্তে মনে ছিল না। বিড়িটা ধরালাম এই জন্যে যে, ওইসব চিন্তাগুলিকে, ঠিকই তো, কেন মরবো, কী জন্যে শুনি, কে বললে আমি বুড়ো: না. না, আমাকে বৃদ্ধ বলবেন না...... হরবিলাস নিজের মনেই কথা বলতে থাকেন। যাক্‌গে, আসলে লোকটা, সেই লোকটা বাসের তলায় চাপা পড়ে মরল! মরুক গে, আমি কেন......উঃ ছেলেটা ধাক্কা দিয়ে গেল ; ওহে যুবক —তুমি আজ বুঝবে না পৃথিবী কোন্‌-দিকে চলেছে! আমার বড় ছেলেটি—কী যেন নাম. আহ্‌ মনে পড়েছে, অশোক—হায় অশোকটা কোথায় গেল! কবে যেন অশোক একদিন রাগ করে চলে গেল। আমার একমাত্র ছেলে, বেশ বড়-ছেলে, এতদিনে বয়স কত হ'ত? মনে পড়ছে না, হাসব না কাঁদব, আপাততঃ ভেবে পাচ্ছিনে; আমার একমাত্র ছেলে অশোক—"ফিরে এস। টাকার দরকার থাকলে —জানাও।" সে আর ফিরে আসেনি। আসবে না আর। সে জেনেছে যে সংসারে বেকার অবস্থায় বেশীদিন থাকলে মানুষের করণীয় দুটি কাজ থাকে—(১) পাগল হয়ে যাওয়া: (২) চুরি, ডাকাতি করা! জানি না এতদিনে অশোক কোন্‌ পথ ধরেছে। কিন্তু হঠাৎ এতদিন পরে আজ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তাকে মনে পড়ছে কেন? তাকে তো ভুলতে চেয়েছি। সে আমার কাছে মৃত! তার চেহারাটা। পর্যন্ত ভুলে গেছি। কী নাম ছিল তার? অশোক —কে বললে? অশোক না হয়ে কিংশুক তো হতে পারে—আরও কত কী?

হরবিলাস প্রায় ছুটে পথ চলছিলেন। ফুটপাতে অসংখ্য লোকের ভীড়। তাড়া-তাড়ি হাঁটা রীতিমত কষ্টকর। প্রায়ই তো কোন না কোন লোকের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ছেন। পথচারীরা বিরক্তিতে অস্ফুট মন্তব্য করতে করতে চলে যায়! হরবিলাস লজ্জিত হন। রাগ হয় তাঁর। এতক্ষণ ধরে কেন তিনি নিজের কথা ভাবছেন না? তিনি কী নিজেকে ভুলে গেলেন? লোকটা, আহা, বুড়ো লোকটা অপঘাতে মরল: মরুক গে, আমার কী, আমার তাতে কী এসে যায়, আমি তো বেঁচে আছি, সবাই আজকাল 'আমি' 'আমি' করে। সব্বাই—ভাবখানা যেন, আমি ভাল খাব, আমি ভাল পরব, আমি ভাল থাকব; আর সবাই, মরুক গে, আমার তাতে লোকসান কোথায়, আমি বাঁচলেই হ'ল। হরবিলাস ভাবলেন এমনি ক'রে আজকের যুগটা বড় বেশী স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। অথচ আমাদের কালে...... আহা রে, হায় রে! আমি একটা বুড়ো শয়তান, একটা বুড়ো লম্পট। কেন নয়? এই হেতু যে, এই মুহূর্তে সেই লোকটার কথা আমার ভাবা দরকার, কেন সে মরল, তার পারিবারিক অবস্থা কেমন, স্ত্রীটি তার দজ্জাল কিনা, উপার্জনক্ষম পুত্র আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশ তো একটু ভাবলেই বা এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে—মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে—বা, কি মজার কথা, হঠাৎ মনে পড়ল আমার, কবে যেন, অনেকদিন আগে, সুধার সাথে ঝগড়ার সময় (সুধা আমার স্ত্রী। এককালে সুন্দরী ছিল : বর্তমানে বয়স এবং পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে, প্রথম পুত্রের আকস্মিক নিরুদ্দেশে, পরপর কয়েকটা মাঝারি চেহারার কন্যার জন্ম দিয়ে, সুধা, আমার স্ত্রী—থাক্‌, সে আজ টাকার জন্যে ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করেছে, আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে; থাক্‌, অভাব অনটন, বুড়ো বুড়ো ধুমসী মেয়ে, বিয়ে হচ্ছে না. ছেলেরা আজকাল বিয়ে করতে চায় না; কেন না ইকোনমি-ক্যাল ক্রাইসিস: তাই মেজাজটা একটু আধটু বিগড়ে গেলে, এমন কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে: ওই যা, কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল! থাক্‌, সুধা... আমার স্ত্রী......ধুমসো মেয়ে...) উপরি-উক্ত কথাটি—হি হি হি, চিন্তা করলে আজ হাসি পায়—ব্যবহার করেছিলাম। তারপর আজ্ঞ করলাম একটু আগে। লোকটার কথা ভাবতে গিয়ে। আমার একটা নাটকের কথা মনে আসছে। কিন্তু সময় হবে কী? আমার আবার ঠিকমত অফিসে পোঁছুনো চাই। কেননা আমি অফিসের বড়বাবু। হেডক্লার্ক। ছোক্‌রা কেরাণীরা আমাকে দেখেই নিয়মানু-বর্তিতা শিখবে, ওদের চোখে আমি আদর্শস্থল। রোজ একবার করে আমাকে চেম্বারে ডেকে মল্লিক সাহেব বোঝান, উপদেশ দেন। মল্লিক সাহেবকে মাঝে মাঝে একটা স্টেটবাসের মত মনে হয়। এই তো কদিন আগে মল্লিক সাহেব কী একটা কাজ ঠিকমত না করার দরুণ (দোষটা আমার ছিল না। ফাইল সই করতে দেরী করলে আমি কী করতে পারি?) বকাবকি করছিলেন। রাগে তাঁর চোখদুটো জ্বলছিল, মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করছিলেন, বিরাট বিরাট থামের মত পা দুটো দিয়ে মেঝেতে দুম্‌দাম্‌ লাথি মারছিলেন—সেই সময় মল্লিক সাহেবকে একটা নরখাদক স্টেটবাস ভেবে অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিলাম। ওই যা নাটকটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। নায়ক লোকটা। আহা বুড়ো লোকটা, বাসের চাপায় অপঘাতে মরল—আহারে, হায় রে, ইস্‌, উ, হায় হায়, ইত্যাদি ইত্যাদি!

হরবিলাস নাটকটা মনে মনে কল্পনা করতে থাকেন। অথচ কেন এই নাটক, আমাকে সুধা, আজ সকালে অফিসে যাবার পূর্বে, ধুমসো মেয়েটা পান নিয়ে (আমার বড় মেয়ের বয়স হয়েছে। এখনো বিয়ে দিতে পারছি না। মেয়ে যে খুব কুচ্ছিৎ তা নয়; আসলে কত কুশ্রী মেয়ে-রই তো আজকাল বিয়ে হচ্ছে। এই যেমন শেফালীর কথাই ধরা যাক্‌—মেয়েটি আমাদের অফিসের টাইপিষ্ট। লিক্‌লিকে চেহারা—ওই কাঠামোতে যতদূর সম্ভব ঝলমলে পোষাকই উঠতো, ঠোঁটে রং মাখত; আর হ্যা, মেয়েটির উর্ধাঙ্গ প্রায় সময়ই, বিশেষ করে সেই ছেলেটির সাথে, কী যেন নাম, মনে এসেও আসছে না, বেশ দেখতে ছেলেটি, বেশ চটপটে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছেলেটির; কেন আমার মেয়ের ভাগ্যে অমন একটি ছেলে; থাক্‌, না হয় মেয়েটি পোষাক আষাকে ছেলেটির সামনে একটু বেসামাল হয়েই উঠতো—তাতে কী হয়েছে, আসলে মেয়েটি পাকড়ালো তো ছেলেটিকে, আসলে কপালে সিঁদুর উঠলো কিনা সেটাই দেখতে হবে: আমার বড় মেয়েটি, রোজ বিকেলে সাবান মেখে মুখ ধোয়, পাউডার স্নোর প্রলেপ লাগায়, ছাদেও ওঠে, রেলিংয়ে দুটো কনুই-এর ভর দিয়ে ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে রাস্তার মানুষ-জন দেখে: আচ্ছা, ও একটু পার্কে টার্কে যায় না কেন, গেলে হয়ত ও সেই ছেলেটির মত, কোন চট্‌পটে ছেলে, কয়েকদিনের চোখাচোখি, ফিক্‌ ক'রে একটু হাসা—থাক্‌, আসলে, মানে সবার দ্বারা সব কিছু হয় না, হ'তে পারে না—তাই, আমার মেয়েটির বয়স বাড়ছে, পাত্রপক্ষ আসে, পানটান খায়, মিষ্টিমুখ করে 'পরে জানাব' এমনি গোছের মুখ-ভঙ্গী ক'রে চলে যায়: আর জানায় না, ওরা ভুলে যায় ওদের কথার উপর প্রায় চব্বিশ বছরের প্রায় কুশ্রী মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন: সবই কপাল, নইলে আজকালকার মেয়েরা, তারা কত চালাক, হায় হায়, নিজেদের স্বামী তারা কত কৌশলে, কত সহজে জোগাড় করে নেয়: আর আমার মেয়েটা, বুড়ো ধুমসী মেয়ে, খালি আয়নায় মুখ দেখে; আজকালকার মূর্খ লেখকদের অপাঠ্য উপন্যাস পড়ে পড়ে দেখে শুধু রাজপুত্তুরের স্বপ্ন; আহা, দেখুক, জীবনটা যাদের ফাঁকা প্রান্তরের মত, তারা একটু-আধটু স্বপ্ন যদি দেখেই; আহা, মেয়েটারে আমি কী করতে পারি, আমি একটা বেসরকারী অফিসের বড়বাবু, পাঁচটি মেয়ের বাপ, দেড়শো টাকা মাইনে পেয়ে বাড়ীভাড়া চল্লিশ দিয়ে; কত হাতে থাকে, বল সুধা, চালাতে পারবে, এখনো মাসের সাতদিন বাকী আছে ইত্যাদি!) এসেছিল: পান দেবার পূর্বে ওর দিকে তাকিয়ে মনটা খিঁচড়ে উঠেছিল; ওদের দিকে তাকাতে পারি না, তাকালেই আমার মাথা ঘোরে। হায়, পাঁচটা সোমত্থ মেয়েকে নিয়ে, এত মেয়ের জন্ম কেন দিলে সুধা, আমাকে জ্বালাবার জন্যে? জীবনভর তো আমাকে কী ক'রে জব্দ করবে, সুধা চুপ ক'র থেকো না, বল, কেন ছেলে হ'ল না আমাদের; অশোক আজ থাকলে, সাতাশ

বছরের সক্ষম যুবক; আমি কত স্বস্তি পেতাম, আমার রাতে ঘুম হ'ত, বুকে সর্বদা ধড়ফড় করতো না; না, না, অশোক কেন, কিংশুকই বা কেন নয়, সে তো মৃত, কেন মিছে আশা, কাপুরুষ সে—সংসারের নানাবিধ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে, বেকার ছিল, কেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলু বিক্রী করল না; সম্মান যেত, হায় রে মধ্যবিত্ত সম্মান! থাক্ দায়িত্বকে কাঁধে নিতে যে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, সে তো মৃত, তাকে আজ ভুলে গেছি; সুধা তুমি কেঁদো না, একটা কল্পিত মোহের জন্যে কেঁদো না; আঃ কেঁদো না, কেঁদো না। হরবিলাস মনকে যেন ধমক দিলেন। আচ্ছা এসব কী হচ্ছে, শুধু আমি, আমার বউ, আমার ছেলেমেয়ে সংসার! 'আমি' ছাড়া আজকাল অন্যকিছু ভাবা যায় না। আমি তো লোকটার কথা, সেই বুড়ো লোকটা, দৈত্যের মত স্টেট বাস, চাপ চাপ রক্ত, চোখ দুটো খোলা, তাতে যুগপৎ ভয় আর আতঙ্ক মেশানো......।

আচ্ছা, নাটকটা কেমনভাবে সুরু করা যায়? হরবিলাস ভাবছিলেন, নিজের কথা এই মুহূর্তে বেশী করে মনে পড়ছে। দূর ছাই, নাটক ফাটক আবার কেন, আমার নাটক দেখবে তোমরা, বল তো প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এখনই সুরু করতে পারি। অফিসে আজকাল নাটকের মহড়া হচ্ছে। তারও ভূমিকা আছে, বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা; নাটকের নাম ঠিক হয়নি, তাতে কী এসে যায়, ও একটা হলেই হ'ল; আসলে......এই বুড়ো বয়সে আমাকে তোমাদের সাথে পাগলামি করতে হবে? মল্লিক সাহেবকে তোমরা অপদস্থ করতে চাও, জানো না, এই বাজারে চাকরী গেলে; না, না, সুধা—তোমার কোন ভয় নেই, আমি সহেবকে বলেছি যে, আমি ওসব ধর্মঘটে যোগদান করবো না; সুধা ভয় পেয়ো না, জানি পাঁচ পাঁচটি মেয়ের জনক জননী আমরা, আমি আজ পথে বসলে; হায় রে, আহা রে—সুধা, তুমি ভয় পেয়ো না, আমি ধর্মঘটে যোগদান করবো না। সুধাকে কথা দিয়েছি, তবু ওর বিশ্বাস হয় না, আমাকে ঠাকুরের পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে; অহো ঠাকুর, ভগবান, ধর্ম......যত সব ইয়ারকী! সুধাকে বলেছি যে, অফিসের সহকর্মীরা ক্ষেপে গেছে, ওরা আমাকে মেরে ফেলতে পারে, ওদের সাথে যোগদান না করলে·...না, না, আমি কিছুতেই ধর্মঘটে যোগ দেব না, মারুক ওরা আমাকে, কত লোকই তো মরছে; সেই বুড়ো লোকটা, স্টেট বাসটা, চাপ চাপ রক্ত চোখদুটো খোলা, তাতে ভয় আর আতঙ্ক মেশানো! হরবিলাস এই মুহূর্তে অফিসের কথা একটু বিশদভাবে চিন্তা করতে চান। এই মুহূর্তে সেই লোকটার অস্তিত্ব ভুলতে চান। আমরা আসলে সবাই নিজেদেরকে বড় বেশী ভালবাসি। আত্মরতি আমাদের মধ্যে প্রবল। তাছাড়া নিজেদের কথা এত বেশী ভাবি বলেই অন্যের কথা ভাবতে পারি—কেননা নিজেদের জীবনটা যখন অর্থহীন হয়ে ওঠে অথবা সার্থক হয়, তখন চারপাশে তাকাই, দেখতে ইচ্ছে করে অন্যেরা কেমন আছে, কেমনভাবে তারা বাঁচে। অতএব এই মুহূর্তে না হয় অফিসের কথাটাই একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক্। এই বে-সরকারী দপ্তরে হরবিলাস প্রায় তিরিশ বছর চাকরী করছেন। প্রথমে ঢুকেছিলেন কুড়ি টাকার মাইনেতে, আজ বাড়তে বাড়তে দেড়শো হয়েছে। আগের যুগটা থাকলে এই মাইনেতে, আহা, চিন্তা করতেও মজা লাগে; যাক্‌গে, আসলে আজকাল জিনিষপত্রের যা দাম, তার উপর পাঁচ পাঁচটা ধুমসো অনুঢ়া মেয়ে, তাদের আবার ক'টির লেখাপড়া; সুধা, কেন তুমি এতগুলি মেয়েকে সংসারে টেনে আনলে! বাড়ীভাড়া চল্লিশ টাকা, বাকী থাকে কত, সুধা, পারবে তো চালাতে? হরবিলাস চোখদুটো মুদে বাড়িটার চেহারা, ঘরগুলির চেহারা মনে করতে চাইলেন। পারলেন না, আজকাল তার বড় ভুলো মন হয়েছে; নিজের একটা ছেলে ছিল, কী যেন নাম তার, অশোক......না, না, কিংশুক, একটা কিছু হবে, কেন তিনি আস্তে আস্তে সব কিছু ভুলতে বসেছেন, ধীরে ধীরে বিস্মৃতির জাল যেন আমাকে জড়াচ্ছে......! এই দেখ, কোথায় অফিসের কথা একটু ভাববো, তা নয়, সব নিজের ঘরসংসারে কথা এসে পড়ছে। আজকাল যেন সব সময়, যেখানেই থাকি না কেন, সিনেমা দেখতে দেখতে ও; অবশ্য সিনেমায় খুব কম যাই—প্রথমতঃ পয়সার অভাব; দ্বিতীয়ত, আজকালকার বাংলা সিনেমা—একেবারে ডাষ্টবিন, কেবল ইনিয়ে বিনিয়ে নায়ক-নায়িকার অর্থহীন প্রেম; কোন্ একটা সিনেমায় যেন দেখেছিলাম, নামটা মনে পড়ছে না, সেই বিস্মৃতি, একটা লোক বাসের তলায় চাপা পড়ল, লোকটা মরল না, কেননা, সে যে নায়ক ছিল, নায়কের মৃত্যু বাংলা ছবিতে খুব কম দেখা যায়, নায়ক মরলে সিনেমা আর হবে কী করে—সিনেমায় যা সম্ভব অর্থাৎ বাসের তলায় চাপা পড়েও যদি বাঁচা যায়; আহা সেই লোকটা, বুড়ো লোকটা, চাপ চাপ রক্ত, চোখদুটো খোলা, তাতে ভয় আর আতঙ্ক মেশানো, লোকটা বাঁচলো না কেন? সিনেমার নায়কের মত?

হরবিলাসের গতকাল অফিসের কথা মনে পড়ল।' এখানে সেখানে কেরানীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে জটলা করছে। প্রত্যেকের মুখভাব সাংঘাতিক, একটা অদ্ভুত দহনে সবাই জ্বলছে; যেন এই মুহূর্তে সেই লোকটা, না, বুড়ো লোকটা নয়, সে তো গতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিল, সে ভাবতেই পারেনি যে, তারপর দিন সকাল বেলায়, বাসের চাপায় তাকে......থাক্, বুড়ো লোকটা, হায় রে, ওর পারিবারিক অবস্থা কেমন কে জানে ......স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে! (যুবক পুত্র কী? কী নাম তার? বেকার, না কি কাজ করে? বাসায় আছে তো, না, পালিয়ে গেছে? বয়স কত? আমার অশোক, না, কিংশুক; আহা, দূর ছাই—কেন এমন ভাবি? একটা বিস্মৃতির জাল আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে!) হ্যাঁ, গতকাল অফিসের আবহাওয়া থম্‌থমে ছিল। ভীষণ কান্ড—হৈ-হৈ ব্যাপার। কী হয়েছে অতুল? ছোকরা গরম হয়ে বললে, "বিচার চাই, বিলাসদা, আমরা এর প্রতিকার চাই! উনি দু'হাজার টাকা মাইনে পেতে পারেন, সেই জোরেই কী বিনা অপরাধে বনমালীকে চড় মারবেন? কেন বনমালী পিয়নের কাজ করে বলে কী সামান্য আত্মসম্মান জ্ঞানটুকুও নেই? সাহেবকে ক্ষমা চাইতে হবে বনমালীর কাছে—তবে আমরা সবাই কাজ করবো, নইলে কাল থেকে ধর্মঘট! তুমিও আমাদের সাথে থাকবে, বুঝলে বিলাসদা?" হরবিলাস চুপ, একদম টু শব্দটি পর্যন্ত তার নেই। ছোকরা ধরে নিল যে, আমিও ওর সাথে পাগলামীতে যোগ দেব। অসম্ভব, আমার সংসার আছে, পরিবার আছে, পাঁচ পাঁচটা অবিবাহিতা মেয়ে আছে—আমি দেড়শো টাকার কেরানী। বাড়ীভাড়া চল্লিশ, বাকী থাকে কত সুধা, মাসের এখনো সাতদিন বাকী আছে, চালাতে পারবে তো; না, না, সুধা মুখটা অমন ক'র না, সংসারের হালটাকে ঠিকভাবে ধরে থাক। সুধা, আমাকে ওরা, অফিসের লোকেরা ভয় দেখাল—একদম মেরে ফেলবে; ফেলুক, তবু সুধা, আমি ওদের কথায় রাজী হলাম না, রাজী হওয়াটা যে আমার কাছে আত্মহত্যার সামিল। মাঝে মাঝে আমার মরতে ইচ্ছে হয়। কতভাবে মরা যায়, এই সেদিন একটা লোক, আমার সামনে আত্মহত্যা করল; সবাই বুঝল গাড়ী চাপায় মরেছে। লোকটার কোন দোষ ছিল না, অত ভীড়, আজকাল সহরে ক্রমশঃ মানুষজন বেড়ে যাচ্ছে, দুর্ঘটনার হিড়িক বেড়ে গেছে, অতএব লোকটার মৃত্যু শ্রেফ দুর্ঘটনা। কবে যেন লোকটা মরল? আরে, সে তো আজকেই মরল, এই তো খানিকটা আগে, শ্যামবাজা'রর মোড়ে; স্টেটবাসটা, চাপ চাপ রক্ত, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা একটা লোক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা ধুতি, পাঞ্জাবি, চোখদুটি খোলা, তাতে যুগপৎ ভয় আর আতঙ্ক মেশানো! হরবিলাস আতঙ্কে চিৎকার করতে চাইলেন, কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না, শুধু খানিকটা গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া। যতবার চান খানিক আগের বীভৎস ছবিটাকে

মনে না আনতে; ততবার তাকে যেন ভয় দেখাবার জন্যে; কিন্তু কেন আমি ভয় পাব, কে না কে মরেছে, হলেই বা আমার মত অনেকটা চেহারা, আমি কেন, আমি কেন, অহেতুক আতঙ্কে ভেবে মরছি! আজকে অফিসে ধর্মঘট, আমার তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, মল্লিক সাহেব তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন; আমি ধর্মঘটে যোগ দেইনি; অতুল, কানাই, ওরা সব গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে, শাসিয়েছে আমাকে ঢুকতে দেবে না; ইস, দেখি তোদের কত ক্ষমতা, চাকরীটা গেলে তোরা আমার সংসার দেখবি? আমার সংসার, হায় সুধা তুমি আর অমন করে চোখের জল ফেলো না, এত জল এই ছোট্ট ঘরে ধরবে না; এ'জন্মে যখন আর বড় ঘরে স্থান পেলে না, তখন সুধা, চোখের জলটা কম করে ফেলো; তোমার কান্না দেখে মাঝে মাঝে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে; কাঁদলে বুকটা অনেকটা হাল্কা হয়, তবু তুমি চুপ কর; বলেছি তো ধর্মঘটে যোগ দেব না; নাও এবার কান্না থামাও—জেনে রাখ, সব দুঃখেরই শেষ একদিন না একদিন হয়!

দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হরবিলাস আঁৎকে উঠলেন। পথটা যেন আর শেষ হতে চায় না। রোজই তো হেঁটে যান, তাতে যে পয়সাটা বাঁচে তার মূল্য হাড়ে হাড়ে হরবিলাস অনুভব করেন; যদিও রোজ খাওয়া দাওয়ার পর এতটা পথ হাঁটতে তাঁর বেশ কষ্ট হয়, তবু সুধারা রয়েছে, অতএব হাঁটা ছাড়া উপায় কী; বিড়িটা এখন ত্যাগ করতে পারলেই হয়, কিন্তু বহুদিনের অভ্যাস, মনে করলেই বুঝি ছাড়া যায় না; আহা, ছাড়তে পার'ল মাসের শেষে ধার কর্জটা একটু কম হ'ত। একটু আগে বিড়িটা ধরালেন, তার কিছুক্ষণ আগে যখন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে, আয়নায় মুখটা দেখতে দেখ'ত, বিড়িটা মুখে ছিল, একটা কি দুটো টান দিয়েছিলেন......হঠাৎ কী যেন হয়েছিল, একটা লোক, চিৎ হয়ে পড়ে থাকা, চাপ চাপ রক্ত, চোখদুটি খোলা, তাতে যুগপৎ ভয় আর আতঙ্ক মেশানো......! অতএব মোট এক ঘন্টায় দুটো বিড়ি নষ্ট করলেন, না পান করলেন, ওই একই কথা, সবই ধুয়ো হ'য় যাওয়া; অতএব মানেটা দাঁড়ালো যে, আমার এভাবে পয়সা নষ্ট করা অন্যায়, ভীষণ অন্যায়! সেই লোকটা, কোন লোকটা, আশ্চর্য, ধেৎ কী অন্যায়, কেন যে তাকে ভুলতে পারছিনে; লোকটা কি বিড়ি খেত, ঠোঁট দুটোয় কালচে ছাপ ছিল; হ্যাঁ, বিড়ি খেত, একশো বার খেত, হাজারবার খেত; তাতে আমার কী, এই দেখ, আবার এসব বাজে চিন্তা মনে আসছে; কী সংঘাতিক, লোকটা মরে গিয়ে শত্রুতা শুরু করেছে! যাকে জীবনে কখনও দেখিনি, তার জন্যে এত মাথা ব্যথা কেন, হলেই বা প্রায় বৃদ্ধ—আহা রে, ইস কী হবে; এত লোক ঝুলেছিল, ব্রেক কষতে সেই একমাত্র হাত ফস্‌কে, না, না, এর মধ্যে দারুণ ষড়যন্ত্র আছে; ষড়যন্ত্র মানে, লোকটা ইচ্ছে করেই, সেই নাটকটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো দেখছি; কী জ্বালাতন! ....

[স্থান : কলকাতা শহরের আশেপাশে গলির ভিতরে একটা দোতলা বাড়ীর নীচের তলার ছোট্ট একখানা ঘর। সময় : সকাল আটটা। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের আসবাব যা হওয়া উচিত; দরোজার দুটো পাল্লা অসমান। এক-কালে খিল ছিল, বর্তমানে নেই, বিকল্পে একটুকরো কাঠ ব্যবহার। ঘরে দুটি জানালা, খুব ছোট্ট; একটি শয্যাস্থানের প্রায় সমভাবে বিদ্যমান, অন্যটি পেছনের দিকের দেয়ালের অনেক উঁচুতে, মনে হয় এটির দ্বারা ঘুলঘুলির কাজও হয়।

চৌকির উপর এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তামাটে গায়ের বর্ণ, যৌবনে ফর্সা ছিল, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরনে ময়লা লংক্লথের ধুতি-পাঞ্জাবি। লোকটির দৃষ্টি নত, মুখের চেহারা বিষণ্ণ। একটু দূরে লোকটার স্ত্রী মেঝের উপর বসে আছেন—বার মাস এ'ঘরের মেঝে আর্দ্র থাকে। ভদ্রমহিলার বয়স আনুমানিক চল্লিশ—স্বামীর চেয়ে দশ বছরের ছোট, অথবা কিছু কমও হতে পারে। তিনি ফুলে ফুলে কাঁদছেন। দরজার কপাটে ভর দিয়ে দাঁড়ানো একটি তরুণী। বয়স বছর পঁচিশ, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, চেহারাটি মাঝারি গোছের, স্বাস্থ্য তদনুরূপ। মেয়েটির চোখে-মুখে একটা বন্যভাব। বুকটা তার বারে বারে ফুলে উঠছে, সারা দেহটা মাঝে মাঝে থরথর করে কাঁপছে।]

লোকটি : [স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে] রোজ রোজ এই কান্না অসহ্য! সারা জীবনটা তো জ্বালিয়ে খেলে! এই শেষ বয়সে ক'টা দিন শান্তিতে থাকতে দাও......!

লোকটির স্ত্রী : [কান্না থামিয়ে রোষ-কষায়িত দৃষ্টিতে] কী বললে? সারাটা জীবন জ্বালিয়েছি? বলতে পারলে এ'কথা? তোমার মুখে যেন কুষ্ঠ পড়ে! হে ভগবান! কত-জনে কত অপঘাতে মরে, আমাকে নাও না কেন? স্ত্রী, কন্যাকে খাওয়াতে পার না, তাদের লজ্জা ঢাকবার কাপড় জোগাড় করতে পার না; তোমার লজ্জা করে না, মরতে পার না কেন? এমন সোয়ামীর চেয়ে না থাকাই ভাল! বুড়ো, বেকার কোথাকার!

লোকটির কন্যা : [আর্তস্বরে] মা! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, চুপ কর! কী নিষ্ঠুর তুমি! [বাবাকে লক্ষ্য করে] বাবা, আপনি উঠুন, তো—চলুন ঠাঁই করেছি, খেয়ে নেবেন। আর ভাল লাগে না, সংসারটা দিন দিন......।

লোকটি : [হঠাৎ রেগে] সংসারে আর মন বসে না রাজকন্যের! বেরো হারামজাদী! তোর চেহারা দেখলে আমার সারা শরীর জ্বলে ওঠে! তোর জন্যই আজ আমার এই দশা, নইলে আমার ভাবনা ছিল কি? রাক্ষসী, দূর হ' আমার সামনে থেকে!

লোকটির স্ত্রী : [সচিৎকারে] খবরদার বলছি, মেয়েকে চামারের মত গাল দিয়ো না! ছি, ছি, বাপ হয়ে মেয়েকে বেরিয়ে যেতে বলছো! মেয়ে আমার বেশী লেখাপড়া শেখেনি, মেয়ের আমার রূপ নেই, মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না—এর জন্যে দায়ী কে? বল, চুপ করে থেকো না! মাথা হেঁট করলে চলবে না, উত্তর দাও। বাপের কোন কর্তব্যটা করেছো শুনি? তুমি একটা জানোয়ার—নইলে একটা লম্পটের কাছে মেয়েকে বিক্রী করতে চাও? গলায় দড়ি দাওগে! এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল। [মেয়ের দিকে তাকিয়ে] মা আমার, কাঁদিস না! ওরে গরীবের ঘরে কুরূপা মেয়ে হয়ে জন্মানো যে মস্ত অপরাধ! ওকি, কোথায় যাচ্ছিস্, ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয় বলছি!

লোকটির কন্যা : [যেতে যেতে] আমাকে যেতে দাও। বাইরের দুনিয়াটা ঘুরে দেখবো—দেখি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি কিনা। আমাকে বাধা দিয়ো না, আমাকে যেতেই হবে! [মেয়েটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়]

লোকটি : [নিজের প্রতি অসীম বিতৃষ্ণায়] চলে গেল! কোথায়? আমিও যাব—একেবারে জন্মের মত যাব। বুঝলে গিন্নী, ঠিকই বলেছো, আমার বেঁচে লাভ কী? এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল! হ্যাঁ, এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল! বড় ভাল পথ দেখালে, গিন্নী! বড় ভাল পথ...! [লোকটি টলতে টলতে বেরিয়ে যায়]

হরবিলাস যখন অফিসে পৌঁছলেন, তখন দশটা বেজে গেছে। দেখলেন গেটের সামনে কেরানী, পিয়নরা দাঁড়িয়ে জটলা করছে। অতুল, কানাই আর বনমালী দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে, ভেতরে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। হরবিলাস ভাবলেন, এরা আমাকেও ঢুকতে দেবে না; কিন্তু আমি ধর্মঘটে যোগ দিলে সুধা, পাঁচ পাঁচটা মেয়ে......সেই লোকটা......চাপ-চাপ রক্ত......চিৎ হয়ে পড়ে থাকা......চোখদুটি খোলা......ভয়......আতঙ্ক!!

হরবিলাস এসব ভেবে ঘেমে উঠলেন। একবার ওদের দিকে তাকালেন। ওরা

সব গম্ভীর, থমথম্ করছে ওদের মুখচোখ। যেন একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ওরা অটল, স্থিতধী। না, না, ওদের সাথে যোগ দেব না। কিছুতেই না। এবং হরবিলাস সাহসে ভর করে এগোলেন।

অতুল এগিয়ে এসে বলল, "বিলাসদা, ঢুকবেন না। ছি, ছি, কালকের এত অনুরোধ সত্ত্বেও......জানেন, আপনার মত লোকের শাস্তি হওয়া দরকার!"

"তুমি ভয় দেখাচ্ছ নাকি অতুল? জানো আমার ঘাড়ে কত বড় সংসার। তোমাদের মত বয়স থাকলে আর কথা ছিল না। পথ ছাড়ো, আমাকে যেতে দাও। তোমাদের এসব ব্যাপারে বুড়ো-মানুষকে জড়াচ্ছ কেন?" এই বলে যেমনি হরবিলাস এক পা এগিয়েছেন, কানাই ছুটে এসে এক ধাক্কায় তাকে দূরে সরিয়ে দিল। ধাক্কার বেগটা সামলাতে না পেরে তিনি পড়ে গেলেন, মাথায় আঘাত পেলেন। চারিদিক থেকে হাসির রোল উঠলো। একজন পিয়ন বলল, "ঠিক হয়েছে শালার? শালা দালাল কোথাকার! মারো বিশ্বাসঘাতককে, আমাদের ধর্মঘটকে বানচাল করে দিতে চায়!"

চারিদিক থেকে হৈ হৈ রব ওঠে। সবাই ক্ষেপে গেছে। সংসার কার না আছে? সবাই পেটের দায়ে এখানে দুটো পয়সা কামাতে আসে! কিন্তু তাই বলে কী লাথি চড় খেয়ে কাজ করতে হবে? অসম্ভব। মানুষের মত বাঁচতে হবে। তাই এই ধর্মঘট—এটি ওদের সম্মিলিত আঘাত ওই অন্যায়ের বিরুদ্ধে! কোথায় সবাই একত্র হবে, না, হরবিলাস বিশ্বাসঘাতকতা করছেন? সংসার যেন তার একারই আছে?

হরবিলাসকে সবাই ঘিরে ধরেছে। যেন এই মুহূর্তে ওকে শেষ করে দেবে! হরবিলাস আতঙ্কে চোখ বুজলেন। চিৎকার করলেন—আর্ত চিৎকার। একজন তাঁর মুখ বন্ধ করে দিল। তাঁর মৃত্যু এদের হাতে অনিবার্য ছিল। কিন্তু একটা পুলিশের ভ্যান আসতেই যে-যার ছিটকে পড়ল। ভ্যান থেকে মল্লিক সাহেব নামলেন, সাথে পুলিশ অফিসার।

"অ্যাই, তোমরা কাজ করবে কিনা? জানো তো কাজ না করার ফল কী হতে পারে? ওহে ছোকরা, এদিকে শোন; খুব যে লেকচার মারছো—নাম কী?" মল্লিক সাহেব হুংকার দিলেন।

"অতুল।"

"বেশ, বেশ, এবার ভাল ছেলের মত কাজে যাও দেখি। একি বিলাসবাবু, আপনি এখানে? ব্যাপারটা যেন গোলমেলে লাগছে। আপনার তো এখানে থাকবার........"

"স্যার, দেখুন এরা আমাকে কী করেছে। আমাকে মেরেছে স্যার! এই দেখুন, কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে। আমার অপরাধ, কাজ করতে চেয়েছি।" হরবিলাস হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন।

"চুপ করুন! মেয়েছেলের মত কাঁদবেন না! আসুন আমার সঙ্গে।" মিঃ মল্লিক এগোলেন, পিছনে গুটিগুটি পায়ে হরবিলাস। দরোজার কাছে কেউ নেই। পুলিশ অফিসার আগেই সাবধান করেছেন যে, কাউকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দিলে এ্যারেষ্ট করা হবে। মিঃ মল্লিকের পিছনে হরবিলাস অফিসে ঢোকেন। আর পিছনে অতুল, কানাই এবং বনমালীরা পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত নিষ্ফল আক্রোশে গজরাতে থাকে! ওদের মুখ-চোখ যেন অসহায় হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে ওদের যেন অত্যন্ত দুর্বল লাগে!

সন্ধ্যের সময় হরবিলাস বাড়ী ফিরছেন। সাহেব দয়া করে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়েছেন। মনটা আনন্দে ভরপুর। মেয়েদের জন্যে কাপড়চোপড় কিনেছেন। ফুটপাথময় অসংখ্য লোক। সুধাকে আজ চমকে দেব। ওর জন্যেও কাপড় কিনেছি। আমি ধর্মঘটে যোগ দিলাম না, মল্লিক সাহেব খুশী হয়ে আমাকে অগ্রিম টাকা দিলেন। অতুল, কানাই আর বনমালীর কাজ খতম হয়েছে। বাকী সবাই শেষে কাজ করতে শুরু করেছে। অতুল ওরা শুকিয়ে মরবে, পচে মরবে! আমি বাঁচবো, আমি ভাল খাবো। সবাই আজকাল 'আমি' 'আমি' করে—স-ব্বা-ই! যুগটা বড় স্বার্থপর হয়ে উঠেছে! কিন্তু আমি একি করলাম? হায় সুধা, তোমাদের জন্যে, আমাকে, হরবিলাসকে, কত নীচে নামতে হল। হরবিলাসের মনে হল কারা যেন তার পিছু নিয়েছে। এদিক ওদিক তাকালেন; কেউ নেই, তবে যে মনে হল, অতুল ছোরা উঁচু করে আমার পিছনে হেটে আসছে। দূরে ছাই, ওসব মনের ভুল; সুধা, আজ তোমার মুখে হাসি ফুটবে, আজ একটু ভাল করে রান্না করো, মাছটা ভাল করে রেঁধো! আর বেশী দেরী নেই, এক্ষুনি আমি পৌছে যাচ্ছি—ক'মিনিট লাগবে বল? হরবিলাস একটা পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আজ প্রথম, বহুদিন বাদে, এক প্যাকেট পাসিং শো সিগারেট কিনলেন। এককালে এই সিগারেট খেতেন। সিগারেট ধরাতেই মনে হল যেন পিছনে কারা কাঁদছে—করুণ স্বরে; নারীর কণ্ঠস্বর, বালক বালিকার কণ্ঠস্বর; কারা কাঁদছে, আমার গাটা কেমন ছম্‌ছম্ করে উঠলো। আজ সন্ধ্যেটা ধূসর মনে হচ্ছে, শহরের এত আলো, এত রূপ সব যেন ম্লান, দ্যুতিহীন। হরবিলাস একটু তাড়াতাড়ি হাঁটেন। আজ কাজ না করলে, সেই লোকটার মত; কোন্ লোকটা, আহা, বুড়ো লোকটা, অপঘাতে মরল, চাপ চাপ রক্ত......খোঁচাখোঁচা দাড়ি......চোখ দুটি খোলা, তাতে যুগপৎ ভয় আর আতঙ্ক মেশানো...। না, না, এই বীভৎস স্বপ্ন, আমি দেখতে চাই না, আমাকে সুধা বল না 'বেরিয়ে যাও', 'গলায় দড়ি দাও' ইত্যাদি......।

একটা অজানা আতঙ্কে হরবিলাস, অথচ ভয়টা কী তা সে ভাল করে জানে না; তবে মনে হ'ল কারা যেন ছোরা উঁচু ক'রে ওর দিকে ছুটে আসছে, কারা যেন শকুনির মত কাঁদছে; কারা যেন ওর টুঁটি চেপে ধরতে আসছে......কারা কারা......কে কে না না, আমাকে মেরো না......আমি বাঁচবো, আমি বাঁচতে চাই! হরবিলাস ছুটলেন। ছুটতে ছুটতে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। তারপর একটা চলন্ত বাসের সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর গোঁ গোঁ শব্দ ক'রে বাসটার ইঞ্জিন থামানো, ভীড়, চাপ চাপ রক্ত, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা একটা লোক, গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, চোখদুটি খোলা—তাতে যুগপৎ ভয় আর আতঙ্ক মেশানো! এবং কোন এক দার্শনিক পথচারীর সরস উক্তি—"লোকটা বেঁচে গেল!!!"

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পান্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৩য় বর্ষ

৩য় খণ্ড

শুক্রবার, ২১শে কার্তিক, ১৩৭০

Friday, 8th November, 1963. 40 Naya Paise.

সাপ্তাহিকী

।। জাতীয় সংহতি দিবস ।।

গত ২০শে অক্টোবর ভারতের সর্বত্র জাতীয় সংহতি দিবস পালিত হয় এবং ঐ দিনটিতে দেশবাসী নতুন করে জাতীয় সংহতির সংকল্প গ্রহণ করে. একই দিনে রাজ্যে রাজ্যে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী (এন্-সি-সি) দিবসও সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

সংহতি দিবসের প্রাক্কালে (১৯শে অক্টোবর) প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দেন। তাঁর দৃঢ় দাবী : সংগ্রাম যতই কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী হোক, চীনা হানাদারদের বিতাড়নে জাতিকে নতুন প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। রণাঙ্গন শান্ত আছে বলে আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব গ্রহণ করলে চলবে না। উক্ত দিবসে কলিকাতা ময়দানের বিশাল জন-সমাবেশে জাতীয় সংকল্প-বাক্য উচ্চারণ করান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। ঐ সভায় রাজ্য কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ দেশবাসীর প্রতি চীনা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান।

।। কাশ্মীর প্রশ্ন ও পাকিস্তান ।।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়—ইতোমধ্যে পাকিস্তান কাশ্মীর প্রশ্নটি কেন্দ্র করে ভারতের বিরুদ্ধে জোর প্রচার অভিযান চালিয়েছে। এমন কি, কাশ্মীরের যুদ্ধ-বিরতি সীমা-রেখায় পাক সৈন্য সমাবেশ ও সমর-প্রস্তুতির মাত্রা বেড়ে চলেছে ক্রমেই। নয়াদিল্লীর ২২শে অক্টোবরের এক সংবাদ অনুসারে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান যুদ্ধ-বিরতি সীমানা সন্নিহিত ভারতীয় গ্রাম চাকনটের অতি নিকটে ফৌজ মোতায়েন করেছে এবং গ্রামটি বলপূর্বক দখলে উদ্যত হয়েছে। দিল্লীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাক সরকারের এই ক্রিয়াকলাপ ও দুরভিসন্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং চাকনটের ওপর পাকিস্তানী দাবী সরাসরি নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

ওদিকে কাশ্মীরের পাক অধিকৃত এলাকার প্রেসিডেন্ট মিঃ খুরশীদ রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সহিত শলাপরামর্শ করে দম্ভ সহকারে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর সরকার যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা (কাশ্মীরের) স্বীকার করেন না। পরন্তু কাশ্মীরী জনসাধারণ ঐ ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য নয়। (রাওয়ালপিণ্ডি, ২২শে অক্টোবর) পাকিস্তানী হুমকীর সমুচিত জবাব দিয়েছেন দিল্লী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাশ্মীরের নতুন প্রধানমন্ত্রী শামসুদ্দীন। শ্রীনগরে ২৩শে অক্টোবর তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা : কাশ্মীরের যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে সমগ্র জাতি একসঙ্গে রুখে দাঁড়াবে এবং পাকিস্তানী আক্রমণ মুহূর্তে পর্যুদস্ত করবে।

।। ভাকরা বাঁধের উদ্বোধন ।।

৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পাঞ্জাবে যে বিস্ময়কর ভাকরা বাঁধটি নির্মিত হয়েছে, গত ২২শে অক্টোবর বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীনেহরু তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। এইটি হলো এশিয়ার সর্বোচ্চ ও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধ—উচ্চতা ৭৪০ ফুট (কুতুব মিনারের তিন গুণ)। প্রধানমন্ত্রী বাঁধটিকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন এবং উদ্বোধনী ভাষণে ঘোষণা করেন যে, 'ভাকরা বাঁধ ভারতের অগ্রগতির প্রতীক'। বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শতদ্রুর জলরাশি বাঁধের বিভিন্ন দরজা দিয়ে বেগে প্রবাহিত হতে থাকে।

।। পঃ বঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ।।

এবারে শারদীয় উৎসবের দিনগুলিতে শুধু কলকাতায় কেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। অনভিপ্রেত বর্ষণের দরুণ পূজার উৎসব-আনন্দ স্বভাবতঃই ম্লান হয়েছে।

ইতোমধ্যে ২৫শে অক্টোবর বর্ধমান থেকে সংবাদ পাওয়া যায়—অজয় নদের জলাগম অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী বারিপাতের দরুণ অজয়ের জল স্ফীত হয়ে উঠে এবং ভেদিয়া স্টেশনের অনতিদূরে ৮০০ ফুট বাঁধ ভেঙ্গে পড়ায় বর্ধমান ও কাটোয়া মহকুমার অন্ততঃ ১৫টি গ্রাম প্লাবিত হয়। এই বিপর্যয়ে ছয় হাজার একরের অধিক জমিতে ধান ফসল বিনষ্ট এবং অসংখ্য মাটির ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে বলেও জানা যায়। ২৬শে অক্টোবরের সংবাদ : প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিণতিতে কান্দি মহকুমারও (মুর্শিদাবাদ) বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যা-প্লাবিত হয়েছে। অন্যদিকে অবিরাম বারিপাতের ফলে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথে ট্রেণ চলাচল বিঘ্নিত হয় বলেও সংবাদ পাওয়া যায়।

।। কায়রণ প্রসঙ্গ ।।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রণের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ যে-সব অভিযোগ আনয়ন করেছেন, দিল্লীর ২৮শে অক্টোবরের সংবাদ অনুসারে এবারে সেই সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা হচ্ছে। এর ভেতর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আলোচ্য তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট একখানি সুপারিশ সম্বলিত লিপি পাঠিয়েছেন। তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছে—১৯৫২ সালের তদন্ত কমিশন আইন অনুসারে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দ্বারা গোপনে এই তদন্ত চালানো হোক। এদিকে পাঞ্জাবের বিরোধী দলগুলির যুক্ত ফ্রন্ট কায়রণ প্রসঙ্গ তদন্তকার্য প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠানের জন্য দাবী জানিয়েছেন। (চন্ডীগড়, ৩০শে অক্টোবর)।

।। কয়েকটি বিশেষ নিয়োগ ।।

বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে গত ১৮ই অক্টোবর ঘোষিত হয়—রাণী এলিজাবেথ মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের (পদত্যাগী) স্থলে লর্ড হিউমকে (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন। ২০শে অক্টোবর নূতন বৃটিশ মন্ত্রিসভাও গঠিত হয়ে গেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হয়েছেন মিঃ রিচার্ড এ বাটলার। নতুন প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে লর্ড পদবী ত্যাগ করেছেন—এখন থেকে তাঁর পরিচয় স্যার আলেক ডগলাস হিউম নামে।

বন থেকে পরিবেশিত ১৬ই অক্টোবরের সংবাদ : ডাঃ এডেনুয়েরের স্থলে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক লুডইগ এরহার্ড। পশ্চিম জার্মান পার্লামেন্টেই (বুন্দেস্তাগ) এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ইতোমধ্যে ২১শে অক্টোবর নয়াদিল্লীর প্রেসনোটে বলা হয়—রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী বি পি সিংহের স্থলে বিচারপতি শ্রী পি বি গজেন্দ্র গদকারের নিয়োগ অনুমোদন করেছেন। বিচারপতি শ্রীগদকার নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে। অপর দিকে শ্রীআর কে নেহরুর স্থলে ভারত সরকারের বৈদেশিক বিষয় দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীএম জে দেশাই।

।। চীনের প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘ ।।

তাইওয়ানের কুওমিন্টাং সরকারকে বাদ দিয়ে কম্যুনিষ্ট চীনকে রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য আবারও চেষ্টা হয়। এবারে প্রস্তাব এনেছিল আলবেনিয়া ও কাম্বোডিয়া যুক্তভাবে। কিন্তু সাধারণ পরিষদ গত ২১শে অক্টোবর ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছেন। প্রস্তাবের পক্ষে অন্যান্যদের মধ্যে ছিল ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বৃটেন এবং বিপক্ষে প্রধানতঃ আমেরিকা ও ফ্রান্স।

।।গ্রীক কবি সোফারিস ।।

স্টকহোমের ২৪শে অকটোবরের সংবাদ : গ্রীক কবি জি সোফারিস (৬৩) এই বছর (১৯৬৩) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। সোফারিসই প্রথম গ্রীক, যিনি এই আন্তর্জাতিক সম্মানের অধিকারী হলেন। একজন কূটনীতিবিদ্ হিসাবেও সোফারিসের খ্যাতি আছে।

সম্পাদকীয়

একনায়কত্বের, বিশেষতঃ মার্কিন ধনবল ও অস্ত্রবলে লালিত পালিত, পোষিত ও সংরক্ষিত একনায়কত্বের, স্থায়িত্ব বা স্থিরতা বিশেষ নাই দেখা যাইতেছে। তুর্কির মেণ্ডেরেস বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও চক্রান্ত চাতুর্যে পটু, এবং জলের স্রোতের ন্যায় মার্কিন ডলার ও অস্ত্রসাহায্য টানিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে জীবন দিলেন। ধনমান, অধিকার, কোনকিছুই বিক্ষুব্ধ, বঞ্চিত ও দমননীতিতে জর্জরিত জনগণের ক্রোধ ও প্রতিহিংসাকে ঠেকাইতে পারে নাই। দক্ষিণ কোরিয়ার বৃদ্ধ সিংমান রি দীর্ঘদিন মার্কিনি অর্থ ও অস্ত্রবলের সাহায্যে ঐ অভাগা দেশের স্কন্ধে সিন্ধবাদের উপাখ্যানে কথিত বৃদ্ধের মতই বিরাজ করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচান। আরোও আগে, পরোক্ষভাবে মার্কিন সাহায্যে পুষ্ট, ইরাকের ভাগ্যনিয়ন্তা নুরি এস-সাইদ এবং তাঁহার শিক্ষাদীক্ষায় চালিত নৃপতি দ্বিতীয় ফাইজল কিভাবে অধিকারচ্যুত ও সবংশে নিহত হইয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ এখানে করা যায়। সবশেষে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট নো দিন দিয়েম ও তাঁহার "জবরদস্ত" ভ্রাতা নো দিন নু-ও ঐ একই পথে জীবন হারাইলেন।

কলিকাতার একটি দৈনিক কয়দিন পূর্বে এক মার্কিন দেশ হইতে প্রেরিত সংবাদে জানাইয়াছিলেন যে মার্কিন সরকার এই সকল অশুভ লক্ষণে চিন্তিত হইয়া পাকিস্তানের একনায়কত্বের অধিকারি আয়ুব খাঁকে নাকি হুঁশিয়ার থাকিতে বলিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে জনগণের অনুযোগ-অভিযোগ বা তাহাদের ন্যায্য দাবীকে একেবারে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। জানি না এই সংবাদের মধ্যে কতটা প্রকৃত তথ্য এবং কতটা ইচ্ছাপ্রসূত কল্পনা।

প্রকৃত তথ্য কিছুটা আছে নিঃসন্দেহ, কেননা তার কয়েক দিন পরেই নিউইয়র্ক হইতে এক টেলিভিশানে প্রদত্ত আয়ুব শাহি সাক্ষাৎকারের বিবৃতি প্রেরিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভারতের উদ্দেশে বিষোদ্গার যথারীতি আছে অবশ্যই। কিন্তু সেই সঙ্গে রহিয়াছে মার্কিন ও লালচীনের মধ্যে "সমঝোতা" ও মিতালির দৌত্য করার প্রস্তাব এবং সবশেষে রহিয়াছে সাফাইয়ের গান!

কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানি দাবীর সমর্থনে তিনি মার্কিনি ভালমানুষদের বুঝাইয়াছেন যে তাঁহার দাবীর প্রধান কারণ কাশ্মীর পাকিস্তানকে প্রদত্ত তিনটি সিন্ধুনদের উপনদীর পরিবাহক্ষেত্র Catchment area। অবশ্য ঐ একই অজুহাতে পাকিস্তান তিব্বতের উপর দাবী চালাইতে পারে কেননা তিব্বতের পশ্চিম ভাগ সিন্ধুনদের পরিবাহক্ষেত্র ও পূর্বাঞ্চল ব্রহ্মপুত্রের। অর্ধেক উত্তরপ্রদেশ সায় হিমাচল প্রদেশের এক অংশ—বিহারেরও প্রায় অর্ধেক এবং সমস্ত পশ্চিম বাংলার উপর দাবী তো প্রস্তুত করা আছেই। অপেক্ষা শুধু কাশ্মীর দাবীর স্বীকৃতি ও সমর্পণ। এ সেই উট ও আরবের গল্পই নূতনভাবে বলা!

লালচীনের প্রশ্নে আয়ুব খাঁ বলেন যে মার্কিন-চীন মিতালি সকলের পক্ষেই ভাল— কি চীন, কি মার্কিন দেশ, কি পাকিস্তান। এ কথার অবশ্য ওজন আছে, কেননা লালচীন সোভিয়েট সাহায্য বঞ্চিত হইয়া বিপদে পড়িয়াছে, তাহার মার্কিনি সাহায্যলাভে মহা উপকার হইবে। পাকিস্তানের তো মার্কিন সাহায্য বিনা দিন গুজরান অসম্ভব, সুতরাং এই মিতালিতে সেটাও নিশ্চিত হইবে। সবশেষে এতগুলি মহাশয় ব্যক্তির—অর্থাৎ মাও সে-তুঙ, চু এন-লাই, লিউ শাও-চি, আয়ুব খাঁ, ভুট্টো প্রমুখ ভদ্রজনের—উপকার করিলে মার্কিন সরকারের মঙ্গল নিশ্চয়ই হওয়া উচিত।

নিজের সম্পর্কে বিনীতভাবে আয়ুব বলেন যে তিনি দীন ও সামান্য ব্যক্তি। তবে তিনি নিজেকে ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ন, মার্শাল ফস এবং জেনারেল আইজেনহাওয়ারের সমকক্ষ মনে করেন, কেননা তিনি তাঁহাদেরই মত সমানে যুদ্ধ ও রাষ্ট্র চালনায় দক্ষ!

এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে আয়ুব তাঁহার পাকিস্তানের রাষ্ট্রাধিকার দখলের সময় শ্রীনেহরুর মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীনেহরু বলিয়াছিলেন পাকিস্তানে সামরিক একনায়কত্বের নগ্নরূপ দেখা দিয়াছে এবং এই সাক্ষাৎকারে আয়ুব বলেন যে শ্রীনেহরুর একনায়কত্বও সমান নগ্ন—তবে এখন উহার নগ্নরূপের উপর কিছু আবরণ পড়িয়াছে!

জয়পুরের শীত বেশ প্রখর। সেই কারণেই হউক বা অন্য কোনও প্রয়োজনে বা প্রেরণায় হউক সেখানে শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রচালনায় একাধিপত্যের প্রশ্নের উপরও কাঁথাচাপার চেষ্টা হইয়াছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তর্কের বায়বাস্ত্রে অনেক কিছুই আবরণমুক্ত হয়। একনায়কত্ব তো দূরের কথা, আমলাতন্ত্রের অধিকারেও টান পড়িয়াছে। বোধহয় ইহাই আয়ুব খাঁর মতে নগ্নরূপ!

জৈমিনি

বাংলা ভাষার প্রসারের জন্যে শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবদের নাম প্রাতঃস্মরণীয় হ'য়ে আছে। গঙ্গার পশ্চিম কূলে অবস্থিত অনেকগুলি শহরই তখন সংস্কৃতির দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গঙ্গার পূর্ব তীরে স্থাপিত হল কলকাতা। আর ক্রমে এই শহর কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতেই গ্রহণ করল অদ্বিতীয় স্থান।

বাস্তবিক, কলকাতা বড় বিচিত্র শহর। এই শহরের প্রতিষ্ঠা যদিও নেহাত ব্যবসার প্রয়োজনেই, তবু ইট-লোহা-সিমেন্টই তার একমাত্র পরিচয় নয়, এর বাইরেও সে গড়ে তুলতে পেরেছিল একটা সাংস্কৃতিক আবহাওয়া। সেজন্যে আমরা গর্বিত। উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন মহাপুরুষের সাধনা, এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিজয়ী কীর্তির জন্যে কলকাতা আজ সারা পৃথিবীর বিস্ময়!

ঝিন্ ঝিন্
তাকা তাকা

কিন্তু বিদেশীদের যতো কৌতূহলই হোক, কলকাতাবাসী আমরা জানি এ শহরের এখন পড়তি দশা। ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে আজ যেমন তাকে পিছিয়ে আসতে হচ্ছে, সংস্কৃতির জগতেও তেমনি তার পিছু হটার পালা। আর এই অবক্ষয়ের যুগে সংস্কৃতির চেয়ে বেশি মূল্যবান হ'য়ে উঠেছে বিকৃতি।

নাহলে যে বাংলাদেশ ছিল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নব্য ভারতের ভগীরথ, তার সাধনাকেন্দ্র এই কলকাতা শহরে তাশা নাচের মতো একটা অশ্লীল দুঃস্বপ্ন কী করে প্রকাশ্য রাজপথে আত্মপ্রকাশ করতে পারে! এনিয়ে অনেককেই দুঃখ প্রকাশ করতে শুনেছি, কেউ কেউ লিখেছেনও কাগজে, কিন্তু বলা বাহুল্য কিছু ব্যতিক্রম ঘটেনি তাতে। পুজোর পর প্রতিমা বিসর্জনের সময় একই নিয়মে জগঝম্প বেজেছে রাস্তায়, চোঙা-প্যান্টপরা ছেলেরা মাথায় টুপি, হাতে রুমাল নিয়ে অসহ্য কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে নাচতে নগর-পরিক্রমা করেছে।

এইটেই ছিল নিয়তি। নিরীহ দর্শকের ভূমিকায় আমরা এ নিয়তি বছরের পর মেনে নিয়েছি। অন্য কিছু রাস্তা আছে তা ভাবতে পারিনি।

কিন্তু রাস্তা ছিল। আমরা কলকাতার লোক সে রাস্তা দেখতে পাইনি, তার হদিশ পাওয়া গেল পূর্বালোচিত ঐ শ্রীরামপুর থেকে। মিশনারীদের মতো স্মরণীয় ব্যাপার না হোক, রুচিবিকারের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বরণীয় পথনির্দেশ যে শ্রীরামপুর থেকেই এসেছে তা স্বীকার করতে হবে।

সেখানকার সরকারী কর্তৃপক্ষ পুজোর আগে এক নির্দেশ জারী করে জানিয়েছিলেন যে, পুজোর সময় যেমন মাইক-ব্যবহার হবে সীমিত, তেমনি বিসর্জনের দিনেও তাশা ইত্যাদি বাজনার সঙ্গে নাচ-গান হবে নিষিদ্ধ।

আর কি আশ্চর্য, পুজোর পরে খবরের কাগজে দেখলাম—

"......বিজয়ার দিনে তাশা বাজনা বাজাইয়া টুইস্ট ও রক এন্ড রোল বর্ণিত অশ্লীল ভঙ্গিতে নৃত্য করিবার ও যান-বাহন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটাইবার অপরাধে থানা অফিসার ৯ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন।......"

আশাকরি, শ্রীরামপুরে যে উপায় অবলম্বিত হ'য়েছে তার প্রয়োগক্ষেত্র কলকাতা পর্যন্ত প্রসারিত হতে এক বছরের বেশি সময় লাগবে না, এবং আগামী বছর আমরা আরো একটু নির্ভয়ে প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে পারব। কারণ এ বছর যা ঘটেছিল তা ভয়াবহ। বাড়িতে ফিরেই শিশুপুত্রটি দরজার পাল্লা বাজিয়ে বলে উঠল 'ঝিন-ঝিন তাকা-তাকা,' এবং একটু পরেই বায়না ধ'রে বসল—বাবা আমায় একটা তাশা কিনে দাও—।'

বিষ কতোদূর ছড়িয়েছে, বুঝে দেখুন তাহলে?

• • •

দমদমের লোকেরা দেখছি আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবেন না। শান্তি অবশ্য একটা কথার কথা। দৈনন্দিন দুশ্চিন্তার বেড়া-আগুনে কোনোরকমেই আমাদের ঠিক ভালো থাকবার কথা নয়। মানসিক আনন্দের কথা বাদ দিলেও

নেহাত শারীরিক অস্তিত্ব বজায় রাখাই এখন সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্বভাব দুর্মর। চাল-চিনি-মাছ নিয়ে যতো নাজেহালই হই না কেন, নিজের চেষ্টায় সে বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার মতো উৎসাহ আমাদের এতটুকুও নেই। নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নিলে যেটুকু কর্মিৎকর্মতা দরকার তার ঝামেলার চেয়ে গয়ংগচ্ছভাবে কালাতিপাত করাই আমাদের চিরদিনকার অভ্যাস।

মৎস্যস্থানেভ্য এবচ

এই পটভূমিতে দমদমের মানুষেরা যদি হঠাৎ খুব কর্তব্যনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেন, তবে সেটা কি আমাদের পক্ষে একটু বেশি অশান্তিজনক হ'য়ে ওঠে না? 'আপনি আচরি ধর্ম' ও'রা 'পর'কে যা শেখাচ্ছেন, সেটা আমাদের যে সমুচিত শিক্ষাই দিচ্ছে তা অস্বীকার করা যাবে কী করে?

চালের দাম কমানোর জন্যে দমদমের ক্রেতা-সাধারণই প্রথম প্রতিরোধের রাস্তা দেখান (আর তার ফল আমরা সকলেই ভোগ করছি!), এবার তাঁরা এগিয়ে এসেছেন মাছের দাম কমানোর দিকে। খবরে দেখা যাচ্ছে, ক্রেতাদের চাপে গোরাবাজারের মৎস্য-বিক্রেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কেনা দামের উপর প্রতি-কিলো আট আনা মাত্র লাভ রেখে তাঁরা বাজারে মাছ বিক্রি করবেন। এবং সেই অনুসারে কাজও শুরু হ'য়ে গেছে।

অর্থাৎ এবার আমাদের পালা। আমাদেরও ঐভাবে একজোটে মাছ-না-কেনার প্রস্তাব কার্যকর করতে হবে। তার মানেই ঝামেলা। নিজেরা উদ্যোগী হ'য়ে অন্যদের বোঝাতে হবে, এবং সেই অনুসারে কয়েকদিন মৎস্য ত্যাগ করতে হবে। অবশ্য মাছ আমরা অনেকেই ঠিক প্রতিদিন কিনতে পারিনে, কিন্তু সেটা নেহাতই নিয়তির ব্যাপার। সচেতনভাবে মাছ কিনব না মানেই, সেটা একটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ল। আর, কে না জানে, কর্তব্যকাজে আমাদের ঐকান্তিক অনীহা।

দমদমে মাছের দর কমেছে শুনে একটুও আনন্দবোধ করছি না। আমাদের তাশের দেশে এ ব্যতিক্রম বড়ই অশান্তিজনক।

শিল্পকলা ও উদ্ভিজ্জ কলা

কিছুকাল আগে খবর বেরিয়েছিল, ইউরোপের বাজারে ভারতের প্রত্নদ্রব্য এবং শিল্পকলার চাহিদা খুবই বেড়ে গেছে। মন্দিরগাত্র এবং বিভিন্ন সংগ্রহশালা থেকে শিল্পকলার নিদর্শন জোগাড় করে ইউরোপে চালান দেওয়া নাকি যথেষ্ট লাভজনক ব্যবসা। কিন্তু এখন খবর পাওয়া যাচ্ছে ইউরোপ কেবল ভারতের পাথরে শিল্পকলারই সমাজদার নয়, নবনী-কোমল গৃহপালিত কলারও গুণগ্রাহী হ'য়ে উঠেছে। এই কলা যাকে সাধু-ভাষায় বলে কদলী, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্যে এখন প্রেরিত হবে সাতসমুদ্র চৌদ্দ নদীর পারে, এবং এইভাবে কলা বেচেই আমরা রথ দেখার আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলব।

খবরে দেখা যাচ্ছে, বার শ' টন কলার প্রথম চালান ইতিমধ্যেই জাহাজে করে রওনা হ'য়েছে রাশিয়ার দিকে। রুশরা যদি এই ভারতীয় কলার রসগ্রাহী হয় তবে আগামী বছরে আরো দশ হাজার টন চালান দেওয়া হবে সেদেশে। তাছাড়া আগামী মাসে ইতালীতে পাঠানো হবে চৌদ্দ শ' টন কলা, আর ফ্রান্সে বিশ হাজার টন কলা পাঠানোর জন্যে আলাপ-আলোচনা চলছে। সুসংবাদই বলতে হবে।

ইউরোপের যুদ্ধকলার ক্রমবিকাশে সারা জগৎ তটস্থ। ভারতের বিশুদ্ধ কলার আস্বাদনে সেখানে যদি সাত্ত্বিক ভাব দেয়া দেয় তো সে বড় কম কথা হবে না।

কলারসিক ইউরোপের শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক।

মহম্মদ আলি ও পাকিস্থান

দিল্লী থেকে লোহ
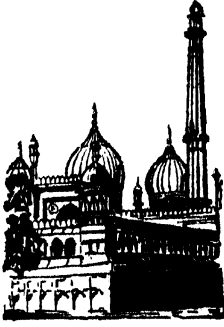
নিমাই ভট্টাচার্য

মধ্যরাত্রির কিছু পরেই টেলি-প্রিন্টারে এক ফ্লাশ মেসেজ এলো। "....Pakistan's newly appointed Prime Minister, Mr. Mohammad Ali, will pass through Calcutta early this morning on his way from Karachi to Dacca."....

ইংরেজি মতে তখন ক্যালেন্ডারের তারিখ বদলেছে। আর্লি দিস্ মর্নিং বলতে রাত একটা না দুটো, তিনটে না চারটে, তার কোন ইঙ্গিত ছিল না ফ্লাশ মেসেজে। কোন বিমানে তাঁর আগমন, তারও হদিশ নেই পি-টি-আই ফ্লাশে। এর মাত্র কদিন আগে নিতান্ত নাটকীয়-ভাবে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী পদে মহম্মদ আলি নিযুক্ত হয়েছিলেন। লিয়াকত আলি খানের আকস্মিক মৃত্যুর পর জনাব নাজিমুদ্দীন গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে নেমে এসে প্রধান-মন্ত্রী হওয়ায় রাজনৈতিক দুনিয়ায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও সেটা অচিন্তনীয় ছিল না। কিন্তু প্রৌঢ়বয়স্ক নবীন রাজনীতিবিদ মহম্মহ আলির পক্ষে মার্কিন মুল্লুকে রাষ্ট্রদূত হওয়াই যথেষ্ট ছিল। তাইতো অপ্রত্যাশিতভাবে প্রধানমন্ত্রীপদে তাঁর নিয়োগে সারা দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

সুতরাং দমদম বিমান বন্দরে সেই সৌভাগ্য চূড়ামণির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের লোভ কলকাতার রিপোর্টাররা কর্তব্য ও আগ্রহের আতিশয্যে সম্বরণ করতে পারেন নি।

নাইট ডিউটির সব রিপোর্টাররা নানান মহলে খোঁজ-খবর করে জেনে-ছিলেন, প্রত্যুষে পাঁচটা নাগাদ বি-ও-এ-সি বিমানে তাঁর আগমন হচ্ছে দমদমে।

......তখনও এক সপ্তাহ হয়নি। করাচী রেল স্টেশনে নিয়মিত যাত্রীদের আগমন-নির্গমন সেদিনের মত শেষ হয়ে গেছে। ভোরের আগে আর কোন বাষ্পীয় শকটের আবির্ভাব হবার কথা নয় করাচী স্টেশনে। হঠাৎ মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা ট্রেন স্টেশন প্লাটফর্মে প্রবেশ করল। অভ্যাসমত কুলির দল ঘুম থেকে চট-পট উঠে পড়ল; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল এটা কোন সাধারণ যাত্রীগাড়ী নয়। আবার তারা গামছা বিছিয়ে লুটিয়ে পড়ল। প্রাইম মিনিস্টার্স স্পেশ্যাল প্লাটফর্মে থামল। কর্তা-ব্যক্তিদের ত্বরিত গতিতে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা, ছুটোছুটি। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন যাবেন লাহোর না রাওয়াল-পিন্ডি। তাঁরই শুভাগমন প্রত্যাশায় উচ্চপদস্থ সরকারী ও রেল কর্মচারীর দল অপলক নেত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।... হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। ......কর্তা-ব্যক্তির দল মন্থর গতিতে স্টেশন পরিত্যাগ করলেন; শান্ত্রীর দল রাইফেল কাঁধে করে শিথিল পদক্ষেপে ফিরে গেল তাদের ব্যারাকে। সিগ্‌নালের লাল আলো নীল হলো; প্রাইম মিনিস্টার্স স্পেশ্যাল প্রাইম মিনিস্টারকে না নিয়েই স্টেশন ত্যাগ করল। করাচী স্টেশন আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

করাচী মহানগরীও তখন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে শুধু আরব সাগর পাড়ের করাচী বন্দর থেকে আত্মীয়-বন্ধুহীন প্রমত্ত নাবিকদের চীৎকার ভেসে আসছিল। রাষ্ট্রীয় তরণীর নাবিকরাও সে রাত্রে ঘুমুতে পারেন নি। সারা রাত্রি চলেছিল শলা-পরামর্শ আর মন্ত্রণা। বার্থতার দোহাই দিয়ে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে মুক্তি দিলেন জনাব নাজিমুদ্দীনকে। আর সেই তখৎ-এ-তাউসে বসিয়েছিলেন মহম্মদ আলিকে।

দেশ বিভাগের প্রাক্কালে কিছু কালের জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন মহম্মদ আলি। অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর ঐতিহাসিক রাজত্বকালে সাময়িকভাবে অর্থমন্ত্রী ছিলেন ইনি। সেকারণে কলকাতার রিপোর্টার মহলের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মধ্য-রাত্রির অনেক পরে খবর পেয়েও ভোর পাঁচটায় দমদম বিমান বন্দরে কার্পণ্য হয়েছিল না রিপোর্টারদের উপ-স্থিতিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী ও পাকিস্থান ডেপুটি হাইকমিশনের পদস্থ কর্মচারীর দলও দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য হাজির ছিলেন। আর বিশেষ কেউ ছিলেন না।

ভোরের আলো তখন সবে ছড়িয়ে পড়লেও সূর্যরশ্মি তখনও ঠিকরে পড়েনি দমদমের লম্বা রানওয়েতে। ঠিক সময় বি-ও-এ-সি প্লেনটি এলো। বিমানের দরজা খুলতেই ভিতর থেকে 'এয়ার হোস্টেস' ইঙ্গিত করে জানালেন, বিমানে ভি-আই-পি রয়েছেন। নিম্ন-কর্মচারীর পরিবর্তে পদস্থ কর্মচারীর দলই অধিকতর উৎসাহী হয়ে বিমানে সিঁড়ি লাগালেন। নেহরুর মত ব্যাটন হাতে সহাস্য বদনে বেরিয়ে এলেন মিঃ আলি।

বিমান থেকে নেমে মিঃ আলি এলেন ভি-আই-পি রুমে। পিছন পিছন এলেন প্রধানমন্ত্রীর একজন ব্যক্তিগত

কর্মচারী। তরুণ বাঙালী যুবক। আগে রাইটার্স বিল্ডিং'এ ষ্টেনোগ্রাফার ছিলেন। আর এলেন খ্যাকি প্যান্ট ও মোটা শোলার হ্যাট পরে পাকিস্থান সরকারের দেশরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ ইস্কান্দার মীর্জা। মীর্জা আর ঘরে ঢুকলেন না। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঘরের ভিতর মিঃ আলির চারপাশে বসে-দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা রিপোর্টারের দল। একজন বাঙালীকে প্রধানমন্ত্রী-রূপে পেয়ে একটু চাপা উত্তেজনা, একটু চাঞ্চল্য। প্রধানমন্ত্রী হয়েও মহম্মদ আলির মুখের হাসিকে অহেতুক গাম্ভীর্য গ্রাস করেনি, দেখে সবাই খুশী। ষ্টেটসম্যান-এর চীফ রিপোর্টারের দিকে ফিরে বল্লেন, "হাউ আর ইউ মিঃ ডাসগুপ্টা?" অমৃত-বাজারের যতীনদার দিকে ফিরে বল্লেন, খবর ভাল তো? কলকাতার স্মৃতি রোমন্থন করে জানতে চাইলেন নানা-জনের কথা। ডাঃ রায়ের সংবাদ।

তারপর শুরু হলো কাজের কথা। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে মহম্মদ আলি জানালেন, ভারত ও পাকিস্থানের মৈত্রী-বন্ধন শিথিল হতে পারে না, বরং সে বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। নেহরুজীকে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত শ্রদ্ধা করেন জানিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার অভিপ্রায়ও মিঃ আলি জানালেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাক রাষ্ট্রদূত ছিলেন মিঃ আলি। রাষ্ট্রদূতে পদ থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী! কেমন যেন খটকা লেগেছিল অনেকেরই। পেন্টাগন বা ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের কোন হাত ছিল না তো এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে! রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের রিপোর্টারদেরও এই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় থাকলে যেমন তান্ত্রিক সাধনা সম্ভব নয়, তেমনি আজকের দিনে রিপোর্টার হওয়াও অসম্ভব। তাইতো নির্বিকার চিত্তে প্রশ্ন করা হলো, Is it not but natural that the United States would enjoy some special favour during your Prime Ministership?.... সব সন্দেহ ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। এমন দরদ দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বল্লেন যে, তা অবিশ্বাস্য মনে হলো।

সুদীর্ঘকাল পূর্বপাকিস্থানে কল-কাতার অধিকাংশ সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। যুগান্তরের চীফ রিপোর্টার অনিল ভট্টাচার্যই সে কথা পাড়লেন। ঢাকা গিয়েই এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন মিঃ আলি।

সিঁড়ি দিয়ে বিমানে চড়তে গিয়ে হঠাৎ নেমে এলেন। ফটোগ্রাফারদের অনুরোধ করলেন দমদমে গৃহীত ফটো-গুলির কপিগুলো যেন তাঁকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সম্মতি জানালেন তারক দাস, শ্যামল বোস ও অন্যান্য ফটোগ্রাফারের দল।

● পরদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রগুলির প্রথম ও প্রধান সংবাদরূপে বেরিয়েছিল মহম্মদ আলির সঙ্গে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারের বিবরণী। ঢাকা সফরের খবরও নিয়মিত বেরুল। ঢাকা থেকে করাচী উড়ে যাবার পথে আবার দমদম আসবেন বলেও খবর ছাপা হলো।

এবার একটু বেলাতেই মিঃ আলির প্লেন দমদম এলো। এয়ার পোর্টে কিছু উৎসাহী লোকও জমেছিল।

'প্রটেকটেড এরিয়া' থেকে বেরিয়ে ভি-আই-পি রুমে যাচ্ছেন মিঃ আলি। পাশে ভীড়ের মধ্য থেকে আধময়লা হাফসার্ট-পায়জামা পরে একটা ছোকরা এগিয়ে এলো।

—"কাকা, কাকাবাবু", ছেলেটি ডাকল।

মিঃ আলি পিছন ফিরলেন। ছেলেটি এগিয়ে এলো। চিনতে পারেননি আলি সাহেব। ছেলেটিই উৎসাহী হয়ে নিজের কাকার নাম করল। বগুড়ার বাসিন্দা। অতীত জীবনে ছেলেটির কাকার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন মিঃ আলি। ফেলে-আসা দিনের বন্ধুর খোঁজ করলেন প্রাইম মিনিস্টার। জানালেন, বন্ধু উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বাসিন্দা। ত্রুটি করলেন না সংসারের আরো পাঁচজনের কুশল বার্তা নিতে। ছেলেটিকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন; করাচীতে চিঠি দিতেও বল্লেন।

গদীর গুণে সারল্য বিসর্জন দেননি মিঃ আলি। দেখে সবাই খুশী।

দলবল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভি-আই-পি-রুমে ঢুকলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আতিথেয়তা রক্ষার জন্য। এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াস হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন সেই চেনা মোটা শোলার হ্যাট পরে মিঃ ইস্কান্দার মীর্জা। দেশ বিভাগের আগে থেকেই দেশরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদে বহাল ছিলেন মীর্জা। লম্বা-চওড়া চেহারা; মুখখানা বিশাল-কায়। স্যার আশুতোষকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলা হতো; মীর্জাকে বল্লেও অন্যায় বা অত্যুক্তি হবে না অন্ততঃ শারীরিক দিক বিবেচনা করে। বারান্দার একপাশে সরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু-ক্ষণের জন্য আলাপ করলাম। বুঝতে দেরী হলো না, মিঃ মীর্জা একজন জাঁদরেল অফিসার। কেন জানি না, এঁর কাছে মহম্মদ আলিকে কেমন যেন অসহায় মনে হয়েছিল।

আমাদের কৃষ্ণমেননের মত স্বদেশী সাংবাদিক দেখলে ভ্রূ কুঞ্চিত করতেন না মহম্মদ আলি। প্রেস সাইনেসের বালাইও ছিল না তাঁর। এবারও রিপোর্টারদের কাছে মধুমাখা এক বিবৃতি দিলেন আগের দিনের সুরে।

নির্দিষ্ট সময় বিশ্রাম করে হাতের সুইস্‌-মেড ছাতিটিকে স্পোর্টস স্টীকের মত ঘোরাতে ঘোরাতে প্লেনে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন মিঃ আলি। আমরা পাশেই ছিলাম। আমাদের আগের দিনের আশংকার মূলে কুঠারাঘাত করে বল্লেন, "জেন্টলম্যান অফ্ দি প্রেস! নেভার মাইন্ড, দিস ইজ নট অ্যান আমেরিকান রাইফেল, যাষ্ট অ্যান অর্ডিনারী আমব্রেলা।"

সকলের মুখে হাসি ফুটিয়ে বিদায় নিলেন মিঃ আলি।

উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার প্রায় মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে করতোয়া নদী। করতোয়ার পশ্চিমে শেরপুর পরগনার কুন্দগ্রামের জমিদার ছিলেন নবাব আবদুল সোহবান চৌধুরী। নবাব-নন্দিনী আল-তাফান্নেসার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল নবাব আলি চৌধুরীর। (রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে ইনি এককালে মন্ত্রীত্ব করেছেন বাংলাদেশে।) এঁদেরই পুত্র হলেন মহম্মদ আলির পিতৃদেব নাবাব-জাদা আলতাফ আলি চৌধুরী।। এক ময়মনসিংহ দুহিতার সঙ্গে আলতাফ আলির প্রথম বিয়ে হয়। তাঁরই গর্ভে পাঁচটি পুত্রের প্রথমটি হলেন মহম্মদ আলি।

সাধারণভাবে ভদ্র ও বিনয়ী থাকলেও আলতাফ আলি শনিবারের বারবেলায় বা

রবিবারের প্রাক্-গোধূলিতে খিদিরপুরের ঘোড়দৌড়ের মাঠের সংগে গাটছড়া না বে'ধে থাকতে পারেননি। লক্ষ লক্ষ টাকা ঘোড়ার খুরের ধুলোয় উড়িয়েছেন। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে হস্তান্তরের দলিলে দস্তখতের সংগে সংগে কলকাতার বহুবাড়ী চৌধুরী পরিবারের হাতছাড়া হয়েছে। 'স্লো হর্স এ্যান্ড ফাস্ট উইমেনের' কৃপায় মৃত্যুকালে লক্ষাধিক টাকা দেনা রেখে গিয়েছিলেন শোনা যায়। সম্ভবতঃ আরো পাঁচজন ধনীর মত সে অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।

যাই হোক, করাচী থেকে দীর্ঘপথ উড়ে মহম্মদ আলি নয়াদিল্লী এসেছিলেন। শ্রীজওহরলালকে দাদা বলে ডেকেছিলেন। কাশ্মীরের ফয়সালা করার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু শুধু মুখের হাসি দেখিয়েই করাচী ফিরেছিলেন। কাজের কাজ কিছু হয়েছিল না।

মহম্মদ আলির নিয়োগকালীন আশংকার বুদবুদ শুধু মধুমাখা বিবৃতিতেই তিরোহিত হয়নি। পলাশীর আম্রকুঞ্জে যেমন একদিন ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল, মহম্মদ আলির প্রধানমন্ত্রীত্বকালেও তেমনি মার্কিনী আধিপত্যের বীজবপন ও তাকে পল্লবিত করার দুর্নিবার প্রচেষ্টায় পাকিস্থান 'সিয়াটো' ও 'বাগদাদ' প্যাক্টে দস্তখত করেছিল। অনাগত ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা 'গান এ্যান্ড গোল্ডের দেশ' আমেরিকার সংগে পাকিস্থানের মৈত্রী কিভাবে গ্রহণ করবেন তা সবার অজ্ঞাত হলেও, একথা নিশ্চিত যে মহম্মদ আলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকৃত হবে না।

এ'রই রাজত্বকালে পাকিস্থানের উর্বরা ভূমিতে 'সিভিলিয়ান' পলিটিসিয়ানদের জন্ম হয়। খাকি পোষাক, মোটা শোলার হ্যাট ও মেজর জেনারেল উপাধিকে নির্বাসন দিয়ে দেশসেবার ঝুটা নামাবলী গায়ে জড়িয়ে পূর্ব-বাংলাকে সায়েস্তা করবার জন্য ইস্কান্দার মীর্জা লাট সাহেব হয়েছিলেন।.........স্বাস্থ্যের অজুহাতে অতীত নেতৃবৃন্দের মত কায়েদী আজমের স্মৃতিবিজড়িত গদীতে আসান দিতে হয়েছিল গোলাম মহম্মদকে। মহম্মদ আলিও বেশীদিন সুখে কাল কাটাতে পারেননি। মীর্জার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য ও মুসলিম লীগের অন্তর্কলহ ঈশান কোণের মেঘের মত মহম্মদ আলিকে নিত্য আশংকিত করে তুলেছিল। পাকিস্থানী রাজনীতির অন্যান্য বহু আশংকার মত এ আশংকাও সত্য হলো! মীর্জা গভর্ণর জেনারেল হলেন! মার্কিনী রাষ্ট্রদূতের সংগে মধুর বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে মীর্জা সিয়াটো প্যাক্টের প্রিমিয়াম দিলেন।

মহম্মদ আলিও 'বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া'র মত প্রথমা বেগমকে তালাক দিলেন। এক বিদেশিনীকে গাউন ছাড়িয়ে শাড়ী পরিয়ে হৃদয় স'পে দিলেন। জীবন-যৌবন নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন মহম্মদ আলি। জীবনের পট পরিবর্তনের সংগে সংগে ঘরবাড়ীর নতুন চেহারা সৃষ্টিতে মন দিলেন। সারাবাড়ী লাইট লাইমজুস কলারে ডিসটেম্পার করা হলো। ভিতরের লনে সুইমিং পুল তৈরী আরম্ভ হলো। কিন্তু রাজমিস্ত্রীদের কাজ শেষ হতে না হতেই রাজত্বের পরিবর্তন ঘটল। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীত্বর ধ্বজা আর একবার নড়ে উঠল। উড়ে এসে জুড়ে বসলেন 'সিভিলিয়ান' কম-পলিটিসিয়ান চৌধুরী মহম্মদ আলি।

মহম্মদ আলি আবার পাক রাষ্ট্রদূত হয়ে ডালেস-তীর্থে ফিরে গেলেন।

পৃথিবীর মধ্যে পাকিস্থান একমাত্র দেশ যেখানে সব আশংকা বাস্তবে দেখা দেয়। তাছাড়া আর একদিক দিয়ে পাকিস্থান পৃথিবীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের মন্ত্রিত্ব বদলের ইতিহাসের সংগে পাল্লা দিয়েছে একমাত্র পাকিস্থান। প্রায় মিস (?) কিলারের প্রমোদসংগী পরিবর্তনের মত পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিবর্তন হয়ে আসছে। তাইতো ইস্কান্দার মীর্জাকেও আর্মি অফিসারদের রিভলবারের নিঃশব্দ ইসারায় গভর্ণর জেনারেলের গদী ত্যাগ করে লণ্ডনে শাম্মীকাবাব-মোরগা মোসল্লামের দোকান খুলে বসতে হয়েছিল। কানপুর ক্যান্টনমেন্টের একদা বাসিন্দা আয়ুব খাঁ এবার পাকিস্থানী রঙমহলে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

সৈন্যবাহিনীকে দিয়ে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়েছেন আয়ুব খাঁ। তাইতো ধুরন্ধর আয়ুব ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ইংগিত উপলব্ধি করেছেন। পাকিস্থান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুসাকে আয়ুব সুনজরে দেখেন না বলে জনশ্রুতি আছে। ছায়ার মত অনুসরণ করার মহান দায়িত্ব দিয়ে আয়ুব নিজ পুত্রকে জেনারেল মুসার এ-ডি-সি করে রেখেছেন। তাছাড়া পাকিস্থান আর্মি মুভমেন্ট কন্ট্রোলের যিনি হর্তাকর্তাবিধাতা, তিনি নাকি আয়ুবের ছাত্রজীবনের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু। সুতরাং জেনারেল মুসার এক পা নয়, দু' পা বাঁধা।

যাহোক কালক্রমে আবার পাক রাজনীতিতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলেন মহম্মদ আলি। আয়ুব-ভ্রাতা সর্দার বাহাদুর খানের কথা যদি সত্য হয়, তবে অতলান্তিক পারের রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমেই এইসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পাকিস্থানে সম্ভব হয়।

তারপরের কাহিনী দীর্ঘ নয়। স্বয়ং খোদাতালার ইঙ্গিতেই মহম্মদ আলি এবার আয়ুব-ক্যাবিনেট থেকে বিদায় নেন।

মহম্মদ আলীর শূন্য গদী দখল করলেন পাকিস্থানের ইতিহাসের সবচাইতে আগ্রেসিভ ফরেন মিনিস্টার মিঃ জেড্, এ, ভুট্টো।

॥ যুদ্ধবিরতি ॥

মরক্কো-আলজিরিয়া সীমান্তে যুদ্ধ-বিরতির সংবাদে সকলেই আশ্বস্ত হবেন। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত ও শক্তিশালী দেশগুলি যখন নিজেদের যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তি করে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় তৎপর, সে সময় এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত ও সদ্যস্বাধীন দেশগুলির কলহ খুবই অবাঞ্ছিত। অথচ দুঃখের বিষয় যে, পূর্ব এশিয়ায় , মালয়-ইন্দোনেশিয়া বিরোধ, পশ্চিম এশিয়ায় আরব দেশগুলির বিরোধ, উত্তর আফ্রিকায় মরক্কো-আলজিরিয়া সীমান্ত সংঘর্ষ এখন সংবাদ-পত্রের প্রতিদিনের সংবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের অন্তহীন বিরোধও অবশ্যই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, কারণ সম্প্রতি কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য পাকিস্তানের শাসকমহলে বিশেষ তৎপরতা দেখা দিয়েছে।

বলা বাহুল্য, অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে এরচেয়ে সর্বনাশা নীতি আর কিছুই হতে পারে না। যে অর্থ তাদের বৈষয়িক উন্নতিতে ব্যয় হওয়ার কথা সেই অর্থ যদি প্রতিবেশীর সঙ্গে হানাহানিতে ব্যয় হয় তবে শুধু উন্নতিই ব্যাহত হয় না, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ঐ দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর সুদূরবিস্তারী প্রভাব প্রয়োগের পথও আরো সুগম হয়ে পড়ে। একারণে অনুন্নত দেশগুলির প্রত্যেকটি বিরোধের সঙ্গেই বৃহৎ শক্তিগুলি ওত-প্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। মরক্কোর পেছনে আছে ফ্রান্স, আলজিরিয়ার পেছনে আছে রাশিয়া ও বৃটেন। মালয়েশিয়ার পেছনে আছে বৃটেন ও পশ্চিমী শক্তিজোট, ইন্দোনেশিয়াকে প্ররোচিত করছে চীন। দেশগড়ার ব্যাপারে তাদের যত না সমর্থন পাওয়া যাবে, দেশভাঙার ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিদের সমর্থন ও সহ-যোগিতা পাওয়া যাবে অনেক বেশী। এই বিষয়ে যতদিন না অনুন্নত দেশগুলি সজাগ হবে ততদিন তাদের অশান্তির শেষ হবে না। মরক্কো ও আলজিরিয়ার সীমান্তবর্তী যে এলাকাগুলি নিয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে

বিশ্বের প্রথম নভশ্চারিনী তেরেসকোভা ও নভশ্চর নিকোলায়েভের শুভ-বিবাহ ৩রা নভেম্বর সম্পন্ন হয়েছে।

সেই এলাকাগুলি খনিজসমৃদ্ধ, এবং বিরোধের তীব্রতার প্রকৃত কারণও ঐ সব প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা। কিন্তু এটা আজ মরক্কো ও আলজিরিয়া উভয়েরই বোঝা দরকার যে ঐসব অঞ্চলের উন্নয়ন তাদের কারও পক্ষেই একা সম্ভব নয়। সাহারার বালুরাশির নীচে যে অফুরন্ত ঐশ্বর্য রয়েছে তা ঐ অঞ্চলের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকেই অমেয় ঐশ্বর্যের অধিকারী করে তুলতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এরজন্যে সব বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, লিবিয়া ও মালিকে একটি সংঘবদ্ধ উন্নয়ন সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। আফ্রিকার রাজ্যগুলি রাষ্ট্রসংঘের সহায়তা ছাড়াই যেভাবে নিজেদের বিরোধের মীমাংসা করে নিতে পারছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। সুতরাং ভবিষ্যতে তাদের পক্ষে আরও একটু অগ্রসর হয়ে সম্মিলিত উদ্যোগে বৈষয়িক উন্নয়নে আত্ম-নিয়োগ করাও নিশ্চয়ই অসম্ভব হবে না।

॥ দাহোমের সামরিক শাসন ॥

পঃ আফ্রিকার একটি প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ দাহোমে। দেশটির আয়তন কিঞ্চিদধিক সাতচল্লিশ হাজার বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা মাত্র আঠের লক্ষ। রাজ-ধানী পোর্টোনাভো, কিন্তু প্রধান শহর কউনু। ১৯৩০ সালের ১লা আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পর দাহোমেয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হয়। সত্তরজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় তার জাতীয় পরি-ষদ ও বারোজন সদস্য নিয়ে তার মন্ত্রি-পরিষদ। অনুন্নত দেশ, খনিজ সম্পদ নগণ্য। প্রধান কৃষিজ পণ্য—ভুট্টা, জোয়ার, মিষ্টি আলু। বিদেশে চালান যায় নারকেল শাঁস ও নারকেল তেল। সমগ্র দেশে মাধ্যমিক স্কুল আছে মাত্র নয়টি, উচ্চতর শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান নেই। বলাবাহুল্য, এই সকল দেশেই সামরিক

মরোক্কোর রাজা দ্বিতীয় হাসান

শাসন বা ঐ জাতীয় কোন চরমপন্থী একনায়কতন্ত্রের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

দাহোমের সৈন্যাধ্যক্ষ ও বর্তমান অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল সোগ্‌লো অবশ্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই দেশে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা যাতে অনতিবিলম্বে ফিরে আসে তারজন্য তাঁর সরকার যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকবেন। পদচ্যুত সরকারের সকলেই এখন বন্দী, কিন্তু কর্ণেল সোগ্‌লো আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে না এবং অবস্থা স্বাভাবিক হলেই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রাক্তন সরকারের যাবতীয় আন্তর্জাতিক চুক্তিও অপরিবর্তিত থাকবে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শুধু ক্ষমতা দখলের জন্যই এইসব অভ্যুত্থান, এবং জনগণের রাজনৈতিক অশিক্ষাই এইসব অভ্যুত্থানকারীদের ক্ষমতা দখলের প্রধান সহায়। দেশের উন্নয়নকল্পে কোন কর্মসূচী হাতে নিয়ে তাঁরা ক্ষমতা দখল করেননি। সুতরাং বর্তমান সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও ভাগ্য পরিবর্তনের যাঁরা আশা করেছেন, তাঁরা একটু বেশীই আশা করেছেন।

॥ দিয়েমের পতন ॥

সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে দিয়েম সরকারের পতন ঘটেছে। ১লা নভেম্বর শুক্রবার এই অভ্যুত্থান ঘটে এবং তার নেতৃত্ব করেন ভিয়েৎনাম সৈন্যবাহিনীর অন্যতম অধ্যক্ষ জেনারেল ডাং ভ্যান মিন। চল্লিশ বৎসর বয়স্ক এই সেনাপতি এক সময় প্রেসিডেন্ট দিয়েমের সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন।

স্বাভাবিক কারণেই অভ্যুত্থান অতর্কিত ছিল, কিন্তু তবুও তার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট দিয়েমের অনুগত সৈন্যবাহিনী প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সংগ্রাম করে বিপর্যয় রোধের চেষ্টা করেছিল, তাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পরেই প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও তাঁর ভ্রাতা নো দিন নু গ্রেপ্তার

মাদাম নু

ও ভবিষ্যতের লাঞ্ছনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সংগ্রামী নেতারূপেই দিয়েম ১৯৫৫ সালে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু তাঁর অত্যাচার ও ধর্মবিদ্বেষী শাসন সেদেশে এমন অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি ক'র যে তাঁর বিরুদ্ধে এই জাতীয় একটি অভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে পড়ে। একারণে প্রেসিডেন্ট দিয়েমের পতনে কেউই বিস্মিত হননি, কারও কাছে তা বেদনার কারণ হয়নি। ভিয়েৎনামের অগণিত নরনারী সাইগনের পথে পথে উল্লাসধ্বনি দিয়ে দিয়েমের পতনকে সমর্থন জানিয়েছে। ভিয়েৎনামের নতুন শাসকরা সব বন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন।

॥ সর্দারজীর বিচার ॥

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ এখন সারা দেশের রাজনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও স্বেচ্ছাচারের নানা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে, অথচ পাঞ্জাবের কংগ্রেস ও পরিষদীয় দলকে তিনি এমনই কুক্ষিগত করে রেখেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাবলম্বই সহজ নয়, পাঞ্জাব কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাঁর বিরোধী দল নিতান্তই নগণ্য, অন্যান্য বিরোধী দলগুলি সম্মিলিত হয়েও তাঁর শক্তির কাছে তুচ্ছ। এমনকি কংগ্রেস সভাপতি

প্রেসিডেন্ট দিয়েম (ডানদিকে) এবং তাঁহার ভ্রাতা দিন নু (বামদিকে)

শ্রীসঞ্জীবায়া স্বয়ং প্রকাশ্যে সর্দার কায়রোঁর সমালোচনা করেও তাঁকে বিচলিত করতে পারেননি, বা সুপ্রীম কোর্টের বিরূপ মন্তব্যও তাঁর আসন টলাতে পারেনি।

বিরোধী দলগুলিও অবশ্য বারংবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিচলিত বা ভগ্নোদ্যম হননি এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁরা প্রতিকারের প্রার্থনা জানান। বোধহয় তাতেই শেষপর্যন্ত ফল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু গত ২৮শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতিকে লিখিত একপত্রে কায়রোঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির তদন্তের জন্য সুপারিশ করেছেন। তবে বিরোধী দলগুলির দাবীমত তিনি সর্দার কায়রোঁর পদত্যাগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি বা প্রকাশ্য তদন্তের দাবীও গ্রহণ করেননি। একজন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত হবে এবং তদন্ত-পদ্ধতি সেই বিচারপতিই স্থির করবেন। কিন্তু তদন্ত হবে গোপনে। সর্দার কায়রোঁর পদত্যাগের দাবী প্রধানমন্ত্রী এই যুক্তিতে সমর্থন করেননি যে তার ফলে মনে হতে পারে যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি আপাতদৃষ্টিতে সত্য।

কোন পদস্থ ও দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি বারবার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে তবে অবশ্যই সে সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। একারণে বিলম্বে হলেও সর্দার কায়রোঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির তদন্তের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই।

অর্থনৈতিক

কমনওয়েলথ অর্থনৈতিক কমিটির সম্প্রতি প্রকাশিত বিবরণীতে ভারতের বাণিজ্যিক ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২—এই পাঁচ বছরে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির রপ্তানি ৮৯৯ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডে। আর এই বৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ দায়ী ভারত, বৃটেন ও কানাডা। এই তিনটি দেশেরই রপ্তানি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের ১৯৫৮ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড; ১৯৬২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫০ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড।

ভারতের রপ্তানি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, আমদানিও সেইভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬১ সালে ভারত আমদানি করেছিল ৮০ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ডের পণ্য, গত বছরে তা হ্রাস পেয়ে ৭৯ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ইউরোপের খোলা বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি থেকে ভারতের আমদানি সবচেয়ে বেশী হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬২ সালে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি থেকে ভারত ২২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য আমদানি করেছে যেটা তার মোট আমদানির প্রায় ২৮ শতাংশ। বহির্বিশ্বে ভারতের সবচেয়ে বড় বাজার বৃটেনে ভারতের রপ্তানি '৬২ সালে ১০ কোটি পাউণ্ড হ্রাস পেয়ে ১১৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে। এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিতেও ভারতের রপ্তানি কমেছে। কিন্তু রপ্তানি বেড়েছে অষ্ট্রেলিয়ায় ও কানাডায়। অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯৬২ সালে ভারত ৩২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার পণ্য চালান দিয়েছে।

বৃটেন থেকে ভারতের আমদানি তার মোট আমদানির ১৭ শতাংশ। এই পরিমাণও পূর্বের তুলনায় দুই শতাংশ কম। পাকিস্তান ও সিংহল ছাড়া অন্যান্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশ থেকেও ভারতের আমদানি পূর্ব বৎসরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

* * *

পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট দেশ হাঙ্গেরীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাতে ভারতের লাভের অংকও ক্রমে স্ফীত হচ্ছে। ১৯৬১-৬২ সালের বাণিজ্যে ভারত হাঙ্গেরীর কাছে ঋণী হয়েছিল ৭৫ লক্ষ টাকার। কিন্তু গত বছরে ভারতের ঘরেই জমা পড়েছে ৩·৪১ কোটি টাকা। দুইদেশের মধ্যে গত বছর ৯·২৩ কোটি টাকার পণ্যের আদান-প্রদান হয়েছিল।

জর্জ সেফারিজ

মৃগাঙ্ক রায়

আধুনিক কাব্যপ্রসঙ্গে গ্রীসের নাম আমাদের পত্রপত্রিকা বা আলোচনায় কখনো উল্লেখিত হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এমন নয় যে জাতিগত ঔদাসিন্যের ফলে আধুনিক গ্রীসের প্রতি আমরা চোখ ফেরাই নি। আসলে সাম্প্রতিক গ্রীক সাহিত্য আমাদের দেশে প্রায় পৌঁছয় নি। দুই দেশের মধ্যে মনোগত ঐক্য গড়ে তোলার পক্ষে যে সামান্য দু' একখানা বই পাওয়া যায় তা অবশ্যই অকিঞ্চিৎকর, এবং তা অচিরাৎ শোষিত হয়ে বিস্মৃতির মত বালুকাবিস্তারের মধ্যে তলিয়ে যেতে বাধ্য। অবশ্য প্রাচীন গ্রীসের স্বর্ণাভা এখনো আমাদের চোখকে উজ্জ্বল করে রেখেছে, কিন্তু তার পরেই দীর্ঘকাল-প্রসারী শূন্যতার অন্ধকার। সে শূন্যতা প্রধানতঃ আমাদের মনে, কেননা গ্রীসের মনন ত আর তারপরেই থেমে যায় নি, রক্ত প্রবাহিত হয়ে আর দশটা জাতির মত কালক্রমের চূড়া ও খাদ বেয়ে ওঠা-নামা করেছে এবং অগ্রসর হয়েছে। সেই সময়টা আমাদের প্রধান তরণী ইংরেজী ভাষা তার ফসল বহন করে আনে নি। সুতরাং আমাদের মন তার স্বাদশূন্য ছিল। কয়েকদিন আগে গ্রীক কবি জর্জ সেফারিজ-এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশিত হলে আমরা তাই অজ্ঞতাবশতঃ প্রথমটা একটু চমকে উঠলাম, কিন্তু পরে গ্রীসের প্রাচীন জ্যোতিঃপুঞ্জের সঙ্গে রেখালগ্ন করে ওই সাফল্যকেই স্বাভাবিক মনে হল।

গ্রীসে ধ্রুব সাহিত্যের পরবর্তীকালে কথ্যভাষায় রচিত সব সাহিত্যই সাধারণতঃ 'আধুনিক' বলে পরিচিত। ফলে তার কালপরিধি বহুদূর বিস্তৃত। আধুনিককালকে তিন পর্যায়ে ভাগ করলে বর্তমান কাল তার তৃতীয় পর্যায়। প্রথম পর্যায়ের সবটুকু জুড়ে আছে স্বতোৎসারিত লোককাব্য—তার জন্ম হয়ত হয়েছিল বহুদূরে অতীতে ধ্রুব সাহিত্যের সমকালে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফরাসী এবং ইটালিয়ান প্রভাবে রচিত কাব্যের আবির্ভাব হল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার আয়ু নিঃশেষিত হল। তারপর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়।

গ্রীক কাব্যে কথ্যভাষার প্রচলন খুব সহজে হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভাষাসমস্যা প্রবল হয়ে দেখা দিল। একদিকে ধ্রুব সাহিত্যের ভাষা অন্যদিকে বাইজান্টিয়ামের 'শুদ্ধতা-বাদ' আর আর একদিকে কথ্য-ভাষা। কথ্যভাষাকে অবলম্বন করে এই ত্রিকোন সমস্যার সার্থক সমাধান করল আইওনিয়া দ্বীপ এবং পশ্চিম অধিবাসীরা। কবি আইওনিস ভিলেরাস-এর (১৭৭১-১৮২৩) কাব্যে কথ্যভাষার চর্চা শুরু হল এবং তার পরে আধুনিক গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ডিয়নিসিয়স সোলোমস কথ্যভাষাকে কাব্যের বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সোলোমস-এর মৃত্যুর পর কথ্যভাষা কাব্যের মত গদ্যেও প্রতিষ্ঠালাভ করল। দুই যুগের মধ্যবর্তীকালে গদ্যরচনা যেমন ফলবান হয়ে উঠল তেমনি হল কবিতা এবং কবিতা যাঁদের হাতে এই ঐশ্বর্যলাভ করল তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য এ্যান্জেলস সিকেলিয়ানস এবং জর্জ সেফারিজ।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্মার্ণায় জর্জ সেফারিজ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকাল কাটে আইওনিয়ার কৃষক এবং নাবিকদের মধ্যে। আঠারো বছর বয়সে তিনি প্যারিসে আইনবিদ্যা অধ্যয়ন করতে এসে ভালেরি ও তাঁর অগ্রজ কবিদের, বিশেষ করে লাফার্গের কবিতা পড়ে মুগ্ধ হলেন এবং ফরাসী প্রতীকী আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক রাষ্ট্র-দূত হিসেবে সেফারিজ লণ্ডনে এলেন। সেখানে টি, এস, এলিয়টের কবিতা গভীরভাবে নাড়া দিল তাঁর মনকে। ফল যা হল তাতে অনেকে মনে করলেন যে সেফারিজ এলিয়টকে অনুকরণ করছেন। সেফারিজের মত এলিয়টও লাফার্গের কবিতার অনুরাগী। সুতরাং দুজনের মধ্যে মনোভঙ্গীর কিছু মিল থাকাই স্বাভাবিক এবং হয়তো সেই কারণেই এলিয়ট প্রভাবিত করেছেন সেফারিজকে। সেফারিজ সে-প্রভাবকে তাঁর নিজের ধ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কবিতার কাজে লাগিয়েছেন, নিছক অনুকারীতে পরিণত হন নি। সেফারিজের সঙ্গে যে আর একজন কবির কিছু মিল চোখে পড়ে তিনি হচ্ছেন আইরিশ কবি ডব্লু, বি, ইয়েটস।

সেফারিজ গ্রীক পুরাণ, বিশেষ করে ওডেসি এবং ইলিয়ডের কাহিনীকে বার বার তাঁর কবিতার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পোশাকী বা কবিতার গঠন সম্পর্কিত প্রয়োজনে নয়, পুরাণের অন্তর্গত প্রতীককে আধুনিক যুগ-যন্ত্রণার গভীর অর্থের বাহক করেছেন তিনি। পুরাণের চরিত্রকে এযুগের বেদনায় সিক্ত করেছেন। পৌরাণিক প্রতীকের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য এবং অনুভবের গভীরতা সহজে উন্মোচিত হয়েছে এবং অতীতে ও ভবিষ্যতে প্রসারিত হয়ে দেশকালহীন বিশালতা লাভ করেছে। পৌরাণিক চরিত্র ওডিসিয়ুসের সঙ্গে কখনো তিনি মিলে এক হয়ে গেছেন, কখনো তাঁর বাল্য-কালের পরিচিত নাবিকরা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক তাঁর জন্মভূমি আক্রমণ

করে যখন সেখানকার সব গ্রীকদের নির্বাসিত করল সেফারিজ তখন প্যারিসে। নিজের দেশ বলতে আর কিছু থাকল না তাঁর। এই ঘটনা ওডিসিয়ুসের সঙ্গে একাত্ম করল তাঁকে। ওডিসিয়ুসের মত তিনিও তখন গৃহ-হীন। এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে তাঁর আত্মার পরিক্রমণ। এই ব্যক্তিগত বেদনাবোধ একালের ছিন্নমূল মানবতার যন্ত্রণায় পরিণত হয়ে তাঁর বহু কবিতায় বিষণ্ণতার সঞ্চার করেছে। জীবনকে তাঁর মনে হয়েছে এক অন্তহীন যাত্রা, এক সমাপ্তিহীন সংগ্রাম। ওডিসিয়ুসের মনে তার দেশ ইথাকায় ফিরে যাবার যে তীব্র বাসনা সেফারিজের কাব্যগ্রন্থ 'পৌরাণিক গল্পে'র 'আমি'-কে তা বার বার নাড়া দিয়ে যায়। গৃহহীন বর্তমান থেকে তাঁর দেশের স্বর্ণচূড় উজ্জ্বল অতীতে ফিরে যেতে চান তিনি।

এই অতীতমুখীনতা এবং একালের ছিন্নমূল মানবতার বেদনা সেফারিজের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা 'এসিনির রাজা'-তেও প্রকাশিত, যদিও প্রকাশের অবলম্বন ভিন্ন, প্রতীক নতুন। এখানে তিনি ইলিয়ডের কাহিনীকে আশ্রয় করেছেন। কবিতার পটভূমি রাজার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। কবির কাছে কিন্তু তা হৃত স্বর্গের প্রতীক। আধুনিক ওডিসিয়ুস সেখানে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল।

সেফারিজের অধিকাংশ কবিতাই, বিশেষ করে 'পৌরাণিক গল্পে'র সব কবিতা মিলে একটি বড় কবিতা, একালের ওডেসি। তাঁর সব কবিতায়ই একজন নায়ক বা প্রবুদ্ধ সত্তার দেখা মিলবে যার নাম কবি কখনো দিয়েছেন 'স্ট্র্যাটিস দি ম্যারিনার' কখনো 'আমি'। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রের বা সত্তার উপ-স্থিতি কবিতাগুলির আন্তরিক বন্ধন নিহিত ঐক্য; এবং প্রাচীন নায়ক ওডিসিয়ুসের প্রতিনিধি। তার কণ্ঠেই ওডিসিয়ুসের মত হৃতস্বর্গের সন্ধানী এযুগের শিকড়হীন যন্ত্রণাকাতর মানুষের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে।

সেফারিজের কবিতায় এক নারী-প্রতিমা বার বার দেখা দিয়েছে। ১৯৩০-এ লেখা 'প্রেমের গান' কবিতায় প্রথম আবির্ভূত হয়েছে সে। তার ছায়াশরীর অতীত থেকে উঠে এসে কবির নায়কের মনে তীব্র দৈহিক মিলনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। সে মিলন স্থায়ী না হলেও তার স্মৃতি আধুনিক ওডিসিয়ুসের দেশ-দেশান্তর পরিক্রমার মধ্যেও থেকে থেকে বাজছে। 'পৌরাণিক গল্পে' সেই নারী-প্রতিমা আবার আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু আরও ক্ষীণতর ছায়া হয়ে। কবি তাকে ছুঁতে পারছেন না, মুহূর্তেই সে আবার ছায়ার জগতে ফিরে যাচ্ছে :

> তোমার ছায়া বেড়ে ওঠে, ক্ষীণ হয়
> নিজেকে মিলিয়ে দেয় আরও অনেক
> ছায়ার শরীরে, অন্য জগতে
> সে জগত তোমাকে মুক্ত ক'রে
> ফের ধরে রাখে।

সেই নারী-প্রতিমা শরীর এবং শরীরহীনতা, বাস্তব এবং অবাস্তবের মিশ্রণ। আধুনিক ওডিসিয়ুসের কাছে সে শ্রেষ্ঠ প্রেমের প্রতীক, অন্য এক জগত — এক হৃতস্বর্গের প্রতিমা। সেখানে বোধহীনতা এবং হতাশা হৃদয়কে পাথরে পরিণত করেনি। কবি সেই জগতে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল, কিন্তু পারছেন না।

প্রাইজ' পেয়েছিলেন। এই পুরস্কার সেই প্রথম একজন বিদেশীকে দেওয়া হল। নোবেল পুরস্কারও ইতিপূর্বে গ্রীসের আর কোন কবি পান নি।

নিচে সেফারিজের দুটি কবিতার অনুবাদ দিলাম। প্রথম কবিতাটি গৃহহীন কবির দেশ থেকে দেশান্তরে অবিরাম যাত্রার আত্মিক ইতিহাস, দ্বিতীয় কবিতাটি প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে কবির একাত্মতা এবং বিচ্ছেদের প্রকাশ। প্রাচীন গ্রীস স্বপ্নের মধ্যে তাঁর কাছে এল এবং তাঁর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। সে জীবিত নয়, কিন্তু মৃতও নয়। কবি তাকে ধরে রাখতে পারলেন না, সে চলে গেল এবং কবির হাত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ফিরে এল।

(এক)

তিনটে পাহাড়, কয়েকটা পোড়া পাইন গাছ, একটা জনশূন্য গীর্জা
এবং আরও ওপরে
আবার সেই একই দৃশ্যভূমির পুনরাবৃত্তি;
তিনটে পাহাড় যেন তোরণের আকৃতি, জংধরা,
কয়েকটা পোড়া পাইন গাছ, কালো আর হলুদ,
এবং একটা চতুষ্কোন ঘর শ্বেতনিমজ্জিত
এবং আরও ওপরে স্তর থেকে স্তরান্তরে
দিগন্তরেখা অবধি, কালো আকাশ অবধি
সেই একই দৃশ্যভূমির পুনরাবৃত্তি।

এখানে আমরা জাহাজ বাঁধলাম ভাঙা দাঁড়গুলো সারাব বলে
জল খাব এবং ঘুমবো বলে।
যে সমুদ্র আমাদের ক্লান্ত এবং তিক্ত করেছে
তার জল গভীর, অজানা
চারদিকে অশেষ নৈঃশব্দকে উন্মোচন করেছে সে।
এখানে পাথরের নুড়ির মধ্যে একটা কড়ি পেলাম
এবং জুয়ো খেলতে বসলাম কড়িটা দিয়ে।
আমাদের মধ্যে সব চেয়ে যে ছোট সে জিতল এবং উধাও
হয়ে গেল তারপর।

ভাঙা দাঁড় নিয়ে আমরা আবার পাড়ি দিলাম।

(দুই)

পাথরের একটা মুণ্ড হাতে নিয়ে আমার ঘুম ভাঙল
আমার কনুই দুটো ভেঙে পড়ছে, কোথায় রাখব একে জানি না।
আমার স্বপ্নের মধ্যে, স্বপ্ন থেকে যখন বেরিয়ে আসছি
নেমে এল মুন্ডটা
এবং লগ্ন হল আমার জীবনের সঙ্গে।
একে আর খোলা যাবে না সহজে।

আমি তাকালাম তার চোখের দিকে;
চোখ খোলা নয়, বন্ধও নয়
কথা বললাম তার মুখের কাছে,
যেন কথা বলতে চাইছে তার মুখ
হাত দিয়ে ধরলাম তার গণ্ডদেশ,
চামড়া ভেদ করে গেল সে
আর শক্তি নেই আমার শরীরে।

আমার হাত দুটো হারিয়ে গেল, ফিরে এল আবার
ক্ষতবিক্ষত, অঙ্গহীন।

গ্রীসের জীবিত কবিদের মধ্যে সেফারিজের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। সমগ্র গ্রীক সংস্কৃতির অতীত এবং বর্তমান, তার পূর্ণ পরিমণ্ডল সেফারিজের কবিতায় বিধৃত। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে সেফেরিজ 'উইলিয়াম ফয়েল পোয়েট্রি

নিজের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে সেফারিজ এক জায়গায় বলছেন, 'আমি মানুষটা অত্যন্ত একঘেয়ে আর একগুঁয়ে। গত কুড়ি বছর ধরে আমি বার বার ঘুরে ঘুরে একই কথা বলে চলেছি।'

বিদেশী সাহিত্য

*** পরলোকে ক্লিফোর্ড ওডেট্‌স্‌ ***

বাঙলাদেশের মানুষের কাছে সুপরিচিত ক্লিফোর্ড ওডেট্‌স্‌-এর নাম। ও'নীলের পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ এই নাট্যপ্রতিভা আমেরিকা ও বিশ্ব রঙ্গ-মঞ্চের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের জোয়ার নিয়ে আসে। গ্রুপ থিয়েটারের অসামান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে ওডেট্‌স্‌-এর নাম স্মরণীয়। **'অ্যাওয়েক অ্যান্ড দি সিং', 'ওয়েটিং ফর লেফটি', 'টিল দি ডে আই ডাই'** নাট্যজগতে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। ওয়েটিং ফর লেফটি-র বাঙলা রূপান্তর বাঙালী জনসাধারণের বিশেষ পরিচিত।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে উদ্ভূত গ্রুপ থিয়েটারের অন্যতম কর্তা ছিলেন ওডেট্‌স্‌। স্টানিস্লাভস্কির সমষ্টিগত অভিনয়ের সার্থকতম অনুকৃতি গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। **ওয়েটিং ফর** লেফটি-র নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের সঞ্চার হয়েছিল। একটি ইউনিয়নের সভা—সেখানে উপস্থিত জনগণের মানসিকতা— চিত্তচাঞ্চল্য— নেতাদের চিত্তবিক্ষোভ—প্রকৃতি অত্যন্ত সরলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাটকখানির আবেদন সম্পর্কে আজও কোন প্রশ্ন উঠতে পারে বলে মনে হয় না। ওডেট্‌স্‌ কখনও মঞ্চকে প্রাধান্য দিয়ে নাটক রচনা করেননি। নাট্যকার হিসাবে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব ভাষার ক্ষেত্রে। কথ্যভাষার এমন নিখুঁত ব্যবহার নাটকের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে আর কেউ তত উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত করতে পারেননি। সংকলনের অনন্যসাধারণ ঋজুতা বা জীবনচিত্রণের সার্থকতম শিল্প-প্রযুক্তি মার্কিনী নাট্যকার ও রঙ্গালয়ের জগতে নতুন প্রাণ নিয়ে আসে।

ওডেট্‌স্‌ পরবর্তী জীবনে চিত্র-জগতের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। যদিও রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ কোন-দিন ছিন্ন হয়নি। ওডেট্‌স্‌ রচিত অধি-কাংশ নাটকের মঞ্চসাফল্যই তাঁকে একালের মার্কিনী নাট্যসাহিত্যের ইতি-হাসে এক শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করেছে।

*** পরলোকে সোভিয়েত লেখিকা ***

সোভিয়েত লেখিকা গালিনা নিকোলায়েভা হৃদরোগে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বাহান্ন বৎসর বয়সে। নিকোলায়েভার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত কবি হিসাবে। তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। তখন তিনি সামরিক বিভাগের একজন ডাক্তার হিসাবে রণক্ষেত্র থেকে সবে গৃহে ফিরেছেন। অবশ্য তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে 'হার্ভেস্টিং' ও 'দি ব্যাটল অব দি রোড' এই দুইখানি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর। ঐ উপন্যাস দুইখানিতে চিত্রিত হয়েছে কৃষক ও যন্ত্রবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের জীবন। পাঠকমহলের কাছে গ্রন্থদ্বয়ের প্রধান আকর্ষণ বিষয়-বস্তুর ব্যাপকতা ও চরিত্রগুলির বিচিত্র জটিল সংঘাত।

*** পাণ্ডুলিপির হস্তান্তর ***

ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসের বিতর্কমূলক চরিত্র ডি এইচ লরেন্সের **সন্স অ্যান্ড লাভারস**-এর মূল পাণ্ডু-লিপির এতকাল মালিক ছিলেন নিউইয়র্কের ডঃ এডমণ্ড ব্রিল। সম্প্রতি এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপি হস্তান্তরিত হয়েছে ক্যালিফোর্ণিয়া লাইব্রেরীকে। বিক্রিত অর্থের পরিমাণ অত্যন্ত সচেতন-ভাবে গোপন রাখা হয়েছে।

*** হাউফ্‌টমানের নূতন সংস্করণ ***

দশখণ্ডে সম্পূর্ণ গেরহার্ট হাউফ্‌ট-মানের রচনাবলী জার্মানীতে প্রকাশিত হচ্ছে। এই নতুন সংস্করণে বহু অপ্রকাশিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনা স্থান পাবে। হাউফটমান ১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন সাহিত্যে। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই সংস্করণে বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হবে বলে সম্পাদকমণ্ডলী জানিয়েছেন।

কমনওয়েলথের পুস্তক প্রদর্শনী

কুড়িজন বৃটিশ প্রকাশক সম্প্রতি একত্র হয়ে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী শিক্ষামূলক বইয়ের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্টিটিউট অব এডুকেশনে এই প্রদর্শনী হয়।

মার্লবরো হাউসের কমনওয়েলথ ইনফরমেশন সেণ্টারে কমনওয়েলথ সংক্রান্ত ৯০০টি বই প্রদর্শিত হয়। "বইয়ের মধ্য দিয়ে কমনওয়েলথ"— প্রদর্শনীটি কমনওয়েলথ রিলেশন্স অফিসের সহযোগে ন্যাশনাল বুক লীগের দ্বারা আয়োজিত হয়। যে-সব প্রকাশক এই প্রদর্শনীতে বই পাঠিয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন এইসব বিখ্যাত প্রকাশকেরা— অস্ট্রেলিয়ার অ্যাঙ্গাস্‌ অ্যান্ড রবার্টসন, কানাডার ম্যাকক্লিল্যাণ্ড অ্যান্ড স্টুয়ার্ট, ভারতবর্ষের এশিয়া পাবলিশিং হাউস।

কমনওয়েলথ লেখকবৃন্দ

এই প্রদর্শনীতে একটি মনোরম পাঠাগারের ব্যবস্থা রাখা হয়; প্রদর্শনীটি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হয়, যথা— 'কমনওয়েলথের পরিপ্রেক্ষিতে ছোটদের বই', 'স্কুলে যেভাবে ভূগোল পড়ানো হয়' 'প্রাত্যহিক জীবন', 'চলতি ঘটনা'। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছিল 'কমনওয়েলথ সংক্রান্ত নূতন ও ক্লাসিক রচনা'। এখানে যাঁদের লেখা বই ছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভি, এস, নইপল, প্যাট্রিক হোয়াইট, ডোরিস লেসিং, সাইপ্রিয়ান একোয়েন্সি।

শরৎকালে প্রদর্শনীটি যাবে এডিন-বরায়, লণ্ডনের মত সেখানেও এটি সাফল্যমণ্ডিত যে হবে, তা নিশ্চিত।

প্রকাশক সমিতির সঙ্গে একযোগে কাজ করে এই ইন্‌স্টিটিউট এই প্রদর্শনীকে একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষভাবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলির ছাত্রদের ও শিক্ষকদের কি কি বই আজ লভ্য তা জানতে সাহায্য করা।

টেক্‌সট বই, বিজ্ঞানের বই, গল্পের বই ইত্যাদি ম্যাপ ও পোস্টারের সাহায্যে এখানে প্রদর্শিত হয়। দর্শকদের জানানো হয় যে তাঁরা নির্বাচিত যে-কোনো বইয়ের অর্ডার দিলে তা তাঁদের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁদের দেশেও পাঠানো যাবে।

গত বছরের প্রকাশক সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ জন বুন-এর নেতৃত্বে একদল প্রকাশক লণ্ডনের সেণ্ট্রাল অফিস অব ইনফরমেশন পরিদর্শনে আসেন। এখানে এসে তাঁরা জানতে পারেন যে, ব্রিটেনে স্বল্পমূল্যের পুস্তক সরবরাহ সম্পর্কে দায়ী ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ বুক সোসাইটি (ই, এল, বি, এস) ১৫টি এশীয় দেশের জন্য ৮০টিরও বেশি বই বের করেছেন।

বর্তমানে এর পাঁচটি সিরিজ আছে। "ইউনিভার্সিটি টেক্‌স্‌ট্‌ বুক" সিরিজে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং ও অর্থনীতির বইই বেশি ছাপা হয়। এর জনপ্রিয়তা খুবই। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-নীতি বিভাগের প্রধান জানিয়েছেন যে, তাঁর ছাত্ররা এখন সহজেই তাদের নির্ধারিত বিষয় পাঠ করতে পারে এবং লাইব্রেরি থেকে বই আনা ও ফেরৎ দেও-য়ার হাঙ্গামা থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছে। "এডস্‌ টু লার্নিং ইংলিশ" সিরিজ থেকে ইংরেজির শিক্ষকেরা প্রভূত সাহায্য পেয়েছেন—এর বিক্রি এখন কয়েক লক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর তালিকায় সহজ ইংরেজি অভিধানও আছে।

"সায়েন্স টুডে" সিরিজে আছে— ফ্রেড হয়েলের 'ফ্রন্টিয়ার্স অব অ্যাস্ট্রনমি, এবং সহজতর বই, যথা 'বায়োলজি ফর দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড', 'ফিজিক্স ফর মডার্ন ওয়ার্ল্ড', 'কেমিস্ট্রি ফর মডার্ণ ওয়ার্ল্ড' —প্রত্যেকটিরই ভূমিকা লিখেছেন ভারত-বর্ষের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাধাকৃষ্ণন। 'প্র্যাকটিকাল বই'য়ের মধ্যে আছে মোটর-গাড়ির মেরামতি থেকে টাইপরাইটিং পর্যন্ত।

সাহিত্য জগৎ

॥ ঐক্যের সন্ধানে ॥

'অমৃতে' ইতিপূর্বে একটি প্রসঙ্গে লিখেছিলাম,

'পারস্পরিক চিন্তা-চেতনা ভাব-ধারার মিলনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক জগতের যে যোগসাধন হবে তার দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারতের ভিত্তিভূমি আরও দৃঢ় হবে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে বিদ্বেষ ও পারস্পরিক হিংসার ভাব দূর হবে। সাম্প্রতিক কালে সাহিত্য, আকাদমিই একমাত্র এই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতীয় ঐক্যের পথকে আরও বলিষ্ঠ ও বাস্তব রূপ দিতে পারেন।' সম্প্রতি এ প্রসঙ্গে নতুন করে চিন্তা করবার সুযোগ ঘটেছে। পরমেশ্বরণ নায়ার এবং সুকুমার সেন রচিত **মলয়ালম** এবং **বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস** সাহিত্য আকাদমি প্রকাশ করেন। কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে মায়াধর মানসিংহ-এর ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস। এর থেকে মনে হয় সাহিত্য আকাদমি প্রতিটি ভারতীয় ভাষার ইতিহাস রচনা করবেন ঐ সমস্ত ভাষার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যে। যে তিনখানি গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ঐ তিনখানি গ্রন্থই পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

মায়াধর সিংহ যে ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন তার মধ্যে ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবকাল ও ক্রমবিকাশ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীসিংহ বহু ক্ষেত্রে বলিষ্ঠভাবে সমালোচনার সাহায্যে দোষ-ত্রুটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

আমরা বাঙলা ভাষাভাষী মানুষেরা উড়িষ্যার নিকট প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও ঐ প্রদেশের ভাষা ও মানুষ সম্পর্কে অত্যন্ত নীরব। পার্শ্ববর্তী এই রাজ্যের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা অতিশয় স্বল্প। স্বাধীনতা উত্তরকালে উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক জীবনে যে বিবর্তন দেখা দেয় সে সম্পর্কে আজকের বাঙালী সচেতন হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় লাভে সাহিত্য আকাদমির এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ভারতবাসী যদি সমগ্র ভারতবর্ষের জীবন সম্পর্কে পরিচিত না হয় তাহলে এই বিশাল ভারতের ঐক্য দৃঢ় করার সর্বপ্রকার চেষ্টাই বিনষ্ট হবে। আকাদমি এই গ্রন্থগুলি প্রকাশ করে প্রতিটি ভারতবাসীকে নিকট-আত্মীয়ে পরিণত করবেন।

এ প্রসঙ্গে একটি আবেদন, প্রকাশিত গ্রন্থগুলি যদি সর্বভারতীয় ভাষাসমূহে অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে গ্রন্থ প্রকাশের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। সাহিত্য আকাদমি অভূতপূর্ব কর্তব্য সম্পাদনে সার্থক হবেন বলে মনে হয়। ইতিপূর্বে সাহিত্য আকাদমির কাছে আমাদের যে আবেদন ছিল পুনরায় সে সম্পর্কে নিবেদন রাখছি।

সোভিয়েট প্রাচ্যবিদের প্রকাশিত গ্রন্থ

তাজিকিস্তানের গিসার উপত্যকার অধিবাসী একটি জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষার নাম "পারিয়া" এবং এই পারিয়া হল একটি ভারতীয় উপভাষা। রুশ প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত ইওসিফ ওরানস্কি সর্বপ্রথম এই ভারতীয় উপভাষা অনুশীলন করেন। এ সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণা করে তিনি যে বইটি লিখেছেন, তা খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

১৯৫৪ সালে ওরানস্কি প্রথম আবিষ্কার করেন যে, এই "পারিয়া" ভাষাটি হল একটি ভারতীয় উপভাষা। এই ভাষার কোন লিখিত রূপ (বর্ণ-মালা) নেই। যে জনগোষ্ঠী এই ভাষা ব্যবহার করে, তারা দেখতে তাজিক বা উজবেকদের মতোই। কিন্তু তারা এই ভাষায় কথাবার্তা বলে শুধু নিজেদের মধ্যেই। এদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ভারতীয়—অনেক কাল আগে উত্তর ভারত থেকে আফগানিস্থানের মধ্যে দিয়ে এঁরা মধ্য-এশিয়ায় এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। এই জন্যেই স্থানীয় তাজিক ও উজবেকরা এদের বলে "আফঘোন"। কালক্রমে এই আফ-ঘোনদের পরবর্তী পুরুষেরা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেলেও পুরুষানুক্রমে তারা নিজেদের ভাষাতেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে আসছে। বলা বাহুল্য, কালক্রমে সেই পারিয়া ভাষাও স্থানীয় ভাষার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় উপভাষা হিসাবে তার মূল চরিত্র অক্ষুণ্ণই আছে।

একজন "তাস" প্রতিনিধিকে ওরানস্কি বলেন : "তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মাবলী প্রয়োগ করে আমি প্রমাণ পাই যে, এই আফঘোনদের ভাষার সঙ্গে পাঞ্জাবী ও ওই অঞ্চলের কয়েকটি উপ-ভাষার খুব ঘনিষ্ঠ মিল আছে। রাজস্থানী ভাষার সঙ্গেও এর অনেকাংশে মিল আছে। তারপর, খুব শ্রমসাপেক্ষ গবেষণা করে এই জন-গোষ্ঠীর যে ইতিহাস উদ্ধার করি, তার থেকে জানতে পারি যে, এদের পূর্ব-পুরুষেরা ভারতের ওই অঞ্চল থেকেই আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।"

ওরানস্কির বইটিতে পারিয়া ভাষায় কথিত ১৯টি কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া এই বইটিতে "আফ-ঘোন'দের সম্পর্কে তাঁর নৃকুলতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ ফলাফলও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বর্তমানে ওরানস্কি এই উপ-ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে কাজ করছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : তাশখন্দ ও ফেরগানা সীমান্ত-অঞ্চলের অধিবাসী আরেকটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরেকটি ভারতীয় উপভাষা চালু আছে। ওরা-নস্কি এই উপভাষাটিও খুঁটিয়ে অনু-শীলন করেছেন। গত শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও নৃবিজ্ঞানী আলেক-জান্দার ভিলকিনস ১৮৭০ সালে এই ভাষার ২০০টি শব্দ লিপিবদ্ধ করেন ও রুশ ভাষায় সেগুলির অর্থ লিখে রাখেন। আফঘোনদের ভাষা ও এই ভাষার তুলনামূলক অনুশীলন করে ওরানস্কি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, দুটি উপভাষারই উৎস হল উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের ভাষাসমূহ— কিন্তু তাদের গোষ্ঠী ভিন্ন।

আগামী জানুয়ারী (১৯৬৪) মাসে দিল্লীতে যে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে ওরানস্কি এই সোভিয়েট নাগরিকদের ভারতীয় পূর্বপুরুষ ও তাদের ভাষা সম্পর্কে এক নিবন্ধ পাঠ করবেন।
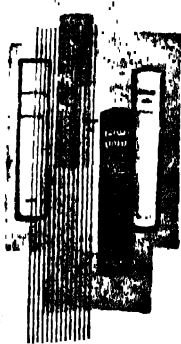
যাঁরা ইতিহাসের বোঝা দ্বারা আক্রান্ত ইতিহাসের সূক্ষ্মরস উপলব্ধি করা তাঁদের পক্ষে সহজ নয়,—ভারবাহীর পক্ষে যেমন বোঝা সম্ভব নয় তার বোঝার ভিতর কি মূল্যবান পদার্থ আছে। তথাপি এই বোঝার বিষয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেন তাঁরাই। অতীতের ইতিহাস সংগ্রহ করতে তাই পিছনে তাকিয়ে ঘাড়ে ব্যথা হয়, পেশী কুঞ্চিত, আর অর্থহীন চিন্তা বা অনুমানের কবলে পড়ে তাঁরা জর্জরিত। এক হিসাবে ইতিহাসকে একটা মজাদার কল্পনা-বিলাসের খেলা বলা যায়, যথা—মহিষাসুরকে। এই নিয়ে পাতার পর পাতা লেখা যায়, শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে। কেউ বলেন গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার মহিষের শিং-এর মুকুট বা শিরস্ত্রাণ মাথায় ধারণ করতেন। পুরু প্রভৃতি উত্তর অঞ্চলের নৃপতিরা তাঁকে বাধা দিতে পারেন নি, কিন্তু এই প্রবল পরাক্রান্ত গ্রীক যোদ্ধা পূর্বাঞ্চলে অভিযান চালাতে গিয়ে পরাজিত হন, পরে মৃত্যু হয়। এই পরাভব দৈব-লীলা বলে মনে করা হয়, আর আনুমানিক তারই চারশত বৎসর পরে 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' রচিত হয়। পুষ্যমিত্রের নব-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে অভ্যুদয় ঘটে তার সঙ্গে চণ্ডী উপাখ্যানের অনেক মিল পাওয়া যায়। চণ্ডীতে অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে মহিষাসুরের দলে মৌর্যদের উপস্থিতির কথা আছে, তারা ছিল বৌদ্ধ-ধর্মের পোষক, বৌদ্ধরা তাই ছিল হিন্দুদের কুনজরে। এই সব কারণে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন আলেকজাণ্ডারের অভিযান ও পরাজয় কাহিনী 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'তে উত্তরকালে 'দেবী-মাহাত্ম্যের আখ্যায়িকার রূপগ্রহণ করেছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কৃত 'বৃহত্তর বঙ্গ' নামক গ্রন্থটিতে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে।

সম্প্রতি আলোচিত হয়েছিল এক বিদগ্ধ সভায় এই সব ঐতিহাসিক অনুমান সম্পর্কে নিছক কল্পনা-বিলাস মাত্র। ইতিহাসের অনুমানে যা হয়নি তা হওয়া সম্ভব বলে অনুমান করে যুক্তি দ্বারা তাকে বিশ্লেষণ করে একটা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, কিন্তু ইতিহাসে যা হতে পারত তা নিয়ে অনুমান করলে কেমন হয়, অবসর বিনোদনের এমন মজার খেলা আর নেই। যেমন ধরা যাক যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ না ঘটত, তাহলে ইতিহাসের গতি কি অন্যপথে চালিত হত না? যাঁরা সদা-স্বাপ্নিক কিংবা ক্ষীণ স্মরণ-শক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই সুবিধার্থে হয়ত আরো বিশদ ব্যাখ্যা করে বলা হল, পাণ্ডব এবং কৌরবরা পরস্পর যুদ্ধ না করে একটা 'সমঝাওতায়' বা বোঝাপড়া করে আপোসে ঝগড়াটা মিটিয়ে নিতে পারতেন, তাহলে অবস্থাটা একেবারে অন্য প্রকারের হত।

এই জাতীয় সিদ্ধান্ত অবশ্য কৌতুকপ্রদ, এবং বিষয়বস্তু এমন যে করিৎকর্ম এবং ক্ষিপ্র-লেখনী চালনায় অভ্যস্ত পণ্ডিতগণ এই নিয়ে দীর্ঘকাল বিতণ্ডায় মেতে থাকতে পারেন, অনেক বাদানুবাদের পর, শেষে সম্পাদক একদিন বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করবেন—"এই বিষয়ে অতঃপর আর কোনও আলোচনা প্রকাশিত হইবে না।" বিতর্কের অবসান ঘটতে আর বিলম্ব হত না। তার স্বাভাবিক ফল অবশ্য না উত্তাপ না আলোক। ধরুন ক্লিওপেট্রার নাসিকা যদি সিকি সেণ্টিমিটার হ্রস্ব (বা দীর্ঘ হত)—এ একটা অতিশয় সাধারণ বিতর্কের বিষয়বস্তু—কিংবা জুলিয়াস সীজারের দ্বিতীয় ঘাতক যদি তাঁকে বুকে আঘাত না করে কাঁধে আঘাত করতেন (তেইশটি আঘাতের মধ্যে এই দ্বিতীয় আঘাতের ফলেই সীজারের মৃত্যু ঘটে) তাহলে রোমের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়ে যেত। অন্যান্য বিশিষ্ট জাতিসমূহেরও অনেক কাহিনী আলফ্রেড ও তাঁর কেক, মেরী আঁতনেতের কেক, বোস্টনের চায়ের আসর, কিংবা কলিঙ্গে সম্রাট অশোক যা করেছিলেন।

যদি ধরুন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিমান ফোরমোসায় জাপান-যুদ্ধের শেষদিকে অমনভাবে ধ্বংস না হত, তাহলে কি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাসের রূপ পরিবর্তিত হত?

এ এক আশ্চর্য বিষয়বস্তু যা নিয়ে কল্পনাবিলাস সম্ভব, বিশেষ করে আমরা সবাই যখন সুভাষচন্দ্র এবং সরকারী গান্ধীতান্ত্রিক কংগ্রেসের মধ্যে যে ভাবগত বিরাট অনৈক্য ছিল সেই বিষয়ে ওয়াকিবহাল। হয়ত অদৃষ্টপুরুষ জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটা বিরোধ এড়ানোর জন্যই অমনভাবে বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন। জয়ের ফসল ঘরে তোলার সময় স্বাধীনতা-যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত অনুপস্থিত। হয়ত যদি সুভাষচন্দ্র থাকতেন, তাহলে দেশাত্মবোধ আরো প্রবলতরভাবে কার্যকরী হত এবং উভয় পক্ষ শত্রুতার আঁচড় মুছে নতুন করে আবার দেশগঠনের কাজে লাগতেন। কিন্তু তাহলে কি একটা খাপে দুটি ধারালো তরবারি রাখা যেত, ভাবগত অনৈক্যের মূলে ছিল ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯২৯-এর ডিসেম্বর মাসের লাহোর কংগ্রেসের সভা-মণ্ডপ থেকে সুভাষচন্দ্র মাদ্রাজের নেতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সঙ্গে একসঙ্গে বেরিয়ে আসেন। তাঁদের প্রতিবাদের কারণ ছিল কংগ্রেসে— "The father, the Son and the Holy Ghost'-এর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব। তখনও মোতিলাল নেহরু জীবিত, আর তাঁর দুপাশে পুত্র জওহরলাল আর মহাত্মা গান্ধী। এঁরাই প্রবল এবং প্রধান। তাই শুধু সুভাষচন্দ্র ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার নয়, আরো অনেকে সেদিন বেরিয়ে এসেছিলেন। যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তাঁরা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন বা আবার দলে ভিড়ে গেছেন। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার অবসর গ্রহণ করলেন এবং পরে দেহত্যাগ করলেন, আর সুভাষচন্দ্র তখনও তাঁর বয়স চল্লিশ পার হয়নি, আ-জীবন সংগ্রাম করছেন, বিরামহীন এবং আপোসহীন, একা সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বদেশ ত্যাগ করেছেন।

ইতিহাসের 'যদি' বড়ই চটকদার, যদি ক্লিওপেট্রার নাসিকা কিঞ্চিৎ হ্রস্ব হত কিংবা আদম শ্রীমতী ইভের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ না করতেন, কিংবা দণ্ডকারণ্যে ভগবান রামচন্দ্র স্ত্রীর তাড়নায় স্বর্ণমৃগের সন্ধানে না ছুটতেন, স্ত্রীকে একা রেখে—তাহলে? তাহলে আধুনিক ইতিহাসের

ধারা নিঃসন্দেহে অন্য খাতে প্রবাহিত হত।

জনৈক জার্মান জেনারেল যদি লেনিনকে একটি সীল আঁটা ওয়াগনে জার্মানী অতিক্রম করতে না দিতেন, তা'হলে কি রুশ-বিপ্লব ঘটত? শোনা যায় ট্রটস্কি যদি প্রচণ্ড হৈ চৈ করে লেনিনের শবযাত্রায় যোগদান করতে অস্বীকার করতেন তা'হলে রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হত না কোনোদিন।

তিরিশের দশকের গোড়ায় দিকে ডঃ ডলফসের নিয়ামকতন্ত্র সম্ভব হয়েছিল একটি মাত্র কারণে, এক সংকটময় ভোট-দান মুহূর্তে জনৈক ডেপুটি 'ক্লোক-রুমে' ঢুকেছিলেন। এক রহস্যময় অজ্ঞাত কারণে হিটলার তাঁর অভিজ্ঞ জেনারেলের পরামর্শ না মেনে পলায়নপর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে ডানকার্কের পর বিমান আক্রমণ করতে বাধা দেন। যদি দিতেন, তাহলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরে যেত।

১৯৩১-এ ব্রিটেনে লেবার পার্টির যে বিপর্যয় ঘটে তার ফলে নিরীহ, নম্র ক্লিমেণ্টস্ এ্যাটলিকে পিছনের সারি থেকে সামনের সারিতে এগিয়ে আসতে হয়। এই গ্ল্যামার-বিহীন ব্যক্তিটি ইতি-হাসের পৃষ্ঠায় ব্রিটেনের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রনেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরকরণে তাঁর অবদান সর্বত্র প্রশংসিত।

সুতরাং মানুষ কাল, অদৃষ্ট এবং ঘটনাচক্রের সম্পূর্ণ অধীন, কালের হাতের পুতুল একথা অস্বীকার করা যায় না।

যা ইতিহাস হিসাবে খাঁটি তা বেশী মোচড় সহ্য করতে পারে না।

কারণ বিকৃত হলে ইতিহাস উপকথা হয়ে ওঠে। যাঁরা কল্পনা-বিলাসে মত্ত হয়ে মনে করেন আহা, যদি এমনটি ঘটত, তাহলে কি হত, তাহলে ইতি-হাসের শিক্ষা থেকে তিনি লাভবান হতে পারেন না। তবে ইতিহাসের বা ঘটনা-প্রবাহের যা শিক্ষা তা ক্রমশই সীমিত হয়ে উঠছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে মানুষ এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে, যেখান থেকে তার ফিরে আসার আর কোনো সম্ভাবনা নেই, আর একদিক থেকে মানবিক জীবনে এমন এক পরিবর্তন ঘটেছে যে সেই পরিবর্তিত জীবনে পূর্ব-অভিজ্ঞতা বা অতীতের শিক্ষা নিরর্থক হয়ে পড়ছে। প্রকৃতির পরিবর্তন যদি একটা গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপার বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়, যা শূন্য থেকে পূর্ণতার উত্তাল উন্মত্ততায় প্রগতির পথে, আবার প্রগতি থেকে ক্রমে নির্বাণের পৌনঃপুনিক আবর্তচক্রে যে জীবন পরিভ্রমণশীল, সেই জীবনের পক্ষে ঘন ঘন পিছন পানে তাকানো নিরর্থক।

মহাভারতের মহাকাব্যের যুগে ফিরে আসা যাক, এবং যদি সেই কুরুক্ষেত্রের 'মহাসমর' না ঘটত তাহলে কি 'গীতা' কোনোদিন রচিত হত? তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা প্রমাণিত ইতিহাসকে 'যদি'র আবরণে ঢেকে কল্পনাবিলাসে মত্ত হওয়া নিছক অলীক রাজ্যে পরিক্রমন ছাড়া আর কিছু নয়, বুদ্ধি বা বাহুবলে ইতি-হাস পরিবর্তিত করা যায় না। ইতি-হাসের পৃষ্ঠায় এই হল চরম শিক্ষা। দেখা যাচ্ছে যে, চতুর্দিকে নতুন ইতিহাস গড়ে উঠছে, প্রতিদেশে, প্রতিটি মুহূর্তে। আমরা যাঁরা এ কালের মানুষ, আমরা সেই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত, একথা অস্বীকার করে 'যদির'র কল্পনা জালে জড়িয়ে না পড়ে বরং অনুমানের আবর্তে পড়াই শ্রেয় এবং বুদ্ধির পরিচায়ক।

শারদীয় সংকলন

● **গন্ধর্ব**। বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত নাটক-বিষয়ক পত্রিকার মধ্যে গন্ধর্বের স্থান বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। বর্তমান শারদ সঙ্কলনটিতে তিনটি বিদেশী নাটকের বাঙলা রূপান্তর করেছেন কুমার রায়, উৎপল দত্ত ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। অন্যান্য নাটক লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য। প্রবন্ধ লিখেছেন ও আলোচনা করেছেন নৃপেন্দ্র সাহা, মলয় রায়চৌধুরী, কুমার রায়, অমর ঘোষ, গৌতম সান্যাল, গুরুদাস ভট্টাচার্য, সুবীর রায়-চৌধুরী ও আরো অনেকে। নৃপেন্দ্র সাহার সম্পাদনায় পত্রিকাটি ১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা।

● **নন্দন** পত্রিকাটি সত্য গুপ্তের সম্পাদনায় ৪এ রামানন্দ লেন কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। বর্তমান সংখ্যাটিতে লিখেছেন সাধনকুমার ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ রাম বসু, মিহির আচার্য, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, সত্য গুপ্ত, মিহির সেন, বোম্মানা বিশ্বনাথন, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, সুবোধ ভট্টাচার্য, পুর্ণেন্দুশেখর পত্রী, করুণাসিন্ধু দে, সুশীল জানা এবং আরো কয়েকজন। দাম দুই টাকা।

● **অরুণিমার** শারদীয় সংখ্যায় লিখে-ছেন—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দক্ষিণা-রঞ্জন বসু, কালিদাস রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হরেন্দ্র-নাথ সিংহ, অখিল নিয়োগী, নরেন্দ্র দেব, মৃণালকান্তি দাশ-গুপ্ত, বিজয়া সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র দত্ত, সাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশা দেবী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, মহাদেবপ্রসাদ সাহা এবং আরো অনেকে। ৪০।১ বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ থেকে প্রকাশিত ও হরিদাস ঘোষ সম্পাদিত এই পত্রিকাটির দাম দুই টাকা।

● **অধুনাতনের** শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন — অজিতকুমার ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, দিনেশ দাস, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বোম্মানা বিশ্বনাথম, শান্তনু দাশ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। ২১৯ বহুবাজার স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির দাম এক টাকা। (সম্পাদক : অসিত রায়, প্রভাস মল্লিক ও রূপক সেনগুপ্ত)।

● **পরিচয়-এ** লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায়, দেবেশ রায়, নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখো-পাধ্যায়, প্রদ্যোৎ গুহ, চিত্ত ঘোষ, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অসীম রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, মৃগাঙ্ক রায়, তরুণ সান্যাল, মানস রায়চৌধুরী, সুপ্রিয় মুখো-পাধ্যায়, তারাপদ রায় এবং আরো অনেকে। এই সংখ্যাটিতে পরিচয় তার পূর্বখ্যাতি অক্ষুন্ন রেখেছে। গোপাল হালদার ও মঙ্গল-চরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির দাম দুই টাকা।

● **অন্বয়** বিমলেন্দু মজুমদারের সম্পাদনায় নেতাজী সুভাষ রোড আসানসোল থেকে প্রকাশিত। কয়েকটি সুনির্বাচিত রচনার সমাবেশে পত্রিকাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দাম এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

● **দাক্ষিণী** গণনাথ মণ্ডলের সম্পাদনায় ডায়মণ্ড হারবার থেকে প্রকাশিত। গল্প, উপন্যাস, কবিতার সংকলন। দাম দুই টাকা।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কবির গান

(১৩)

ভোলানাথের বাঁধনদার

কবিগানের ইতিহাসে ভোলানাথের নামটাই সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী প্রচার লাভ করেছে। বিধাতা তাঁকে প্রতিভা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল গুরুর হাতে। "কবির গুরু হরু ঠাকুর"কে তিনি গুরুরূপে পেয়েছিলেন। সেটাও তাঁর খ্যাতির একটা কারণ হতে পারে।

যাঁদের সঙ্গে ভোলা ময়রার কবিতার লড়াই বেধেছিল, যাঁরা নিজেরা পরাজিত হয়ে কবিকে জয়মাল্য পরিয়েছিলেন, তাঁদের দানও কম নয়।

পেশার প্রসঙ্গে যে সকল দোহার এবং বাঁধনদারদের সম্পর্কে এসেছিলেন, তাঁরাও নিশ্চয় এই কবিওয়ালার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কিছুটা সহায়ক হয়েছিলেন। পূর্বে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছি। আজ দুজনের কথা বলব।

ভোলার প্রথম এবং প্রধান বাঁধনদার ছিলেন স্বয়ং তাঁর গুরু হরু ঠাকুর। গুরু-শিষ্যের জীবনী প্রসঙ্গে সে-কথা পূর্বে বলেছি।

সাতু রায়

ভোলা ময়রার বাঁধনদারদের মধ্যে সাতু (সাতকড়ি) রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সাতু রায় জন্মেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে এবং তাঁর মৃত্যু হয় আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে। ইনি আসরে দাঁড়িয়ে কখনো গান করেন নি। কিন্তু যারা গান করত, তাদের অনেকেই তাঁর কাছ থেকে গান লিখিয়ে নিত। জন্মেছিলেন শান্তিপুরে এবং প্রথম জীবনে শান্তিপুরের জমিদারদের বাড়িতে চাকরি করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

এই জমিদার-বাড়িতে একদিন ভোলা ময়রা এলেন কবি গাইতে। সাতু রায়ের সঙ্গে এইখানেই তাঁর প্রথম পরিচয়। সাতু রায়ের কবি-খ্যাতিও তাঁর কানে এল। ওই অঞ্চলের দু-একটি শখের কবিদল ছিল, সাতু রায় সে-সব দলে গানের যোগান দিতেন। ভোলা ময়রার তা অজ্ঞাত ছিল না। সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়ার পর থেকে ভোলা ময়রাও তাঁর দলের জন্যে গান নিতে আরম্ভ করলেন। ভোলা ময়রার সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্ক কতদিন বজায় ছিল তা বলা যায় না। বোধ হয় দীর্ঘকাল ছিল না।

সাতু রায়ের গান যা সংগৃহীত হয়েছে, তার সংখ্যা বেশী নয়। সখী-সংবাদই তাঁর গানের প্রধান উপজীব্য। তাঁর একটি বিখ্যাত গান দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করছি :

এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গো সই।
যদি ত্যজি গো কুল তবে হাসে গোকুল।
যদি রাখি গো কুল, কৃষ্ণে বঞ্চিত হই।
উভয়সংকট সম্প্রতি, সসম্ভ্রমে বল কিসে রই।।

সীতার হরণে মারীচ যেমন
গেলে বধে শ্রীরাম না গেলে রাবণ।
ইচ্ছি ততোধিক শ্রীকৃষ্ণ প্রাণাধিক
সই আবার কুটিলে গঞ্জনা দেয় সয়ে রই।।
হাঁগো বন্দে শ্রীগোবিন্দের পায়
করে প্রাণ সমর্পণ
হল এ গোকুল আমার প্রতিকূল
অনুকূল কেবল শ্যামধন।
সে ধন সাধনে হই বুঝি নিধন।
সই চারিদিকে গঞ্জনা পাপ-লোকে তা বুঝে না
কৃষ্ণধন কি ধন।
আমার মন চাহে রাখি কুল
প্রাণ তাহে হয় ব্যাকুল সই।
পাইনে অকূল পাথারে কূল শ্রীকৃষ্ণ বই।।
ওকি করব তা ত বুঝতে নারি।
শ্যামের প্রেম ত্যাগ করব কি কুল ত্যাগ করব
সই আমি কুলে থাকি কুলের নারী।
আমার মিথ্যাবাদ অপবাদ,
দেয় কালার পরিবাদ।
আমি কিরূপে গৃহমাঝে তিষ্ঠে রই।।

সাতু রায়ের আর একটি গান বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তার বিষয়বস্তুটি বড় সুন্দর।

কৃষ্ণবিচ্ছেদে শ্রীমতী কাতর। কৃষ্ণচিন্তায় দিন গুনছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন নেই। তাই—

কৃষ্ণরূপ করিয়ে মনন
অতি নির্জনে শ্যামধনে
দেখবার হলো আকিঞ্চন।

দর্শনের সাধ পূর্ণ হয় কেমন করে? কোনো উপায় না দেখে রাধিকা ভূমিতে শ্রীঅঙ্গ অঙ্কন করলেন। কিন্তু

কি ভেবে, কি ভাবে, কি ভয়ে লিখে
লিখলেন না যুগল চরণ।

তাই দেখে সখিরা বললেন, রাই এ তোমার কি রঙ্গ?

অপরূপ একি রূপ, কৃষ্ণের রূপ
লিখেছ গো, রাই।
যে চরণদেবের পূজ্যধন গতি নাই সে চরণ বই
সে চরণ কই গো কই, রাই, রাই গো।
ওগো ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই।

*　　*　　*

যে চরণ সাধন কারণ
সদাশিব যোগধর্ম করেছেন আশ্রয়।
ত্রিভঙ্গের সর্বাঙ্গের সারাৎসার সেই পদদ্বয়।
যদি সেই চরণ লিখতে হলি বিস্মরণ,
দুঃসহ বিরহ কিশোরী কিসে করবি নিবারণ।

যদি এড়াতে যন্ত্রণায়, লিখেছ কৃষ্ণে কায়
রাই, রাই গো।
যাতে বিপদ যায় সেই পদ
কই গো দেখতে পাই।।

রাধা উত্তরে বললেন, ভুল করে নয়, ইচ্ছে করেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণ দুটি আঁকেন নি।

নিরদয় পদদ্বয় লিখি নাই সেই আশঙ্কায়।
সই, সময় যখন মন্দ হয় চিত্রময়ূরে গেলে হায়।
বিচিত্র কি গো তার,
যদি চিত্র-শ্যাম মধুপুরে চলে যায়।।
গোবিন্দের পদারবিন্দে বৃন্দে গো
হৃদয়ে করেছি ধারণ।
অন্য সব অবয়ব ভূমেতে করেছি লিখন।।
লিখে লিখি নাই ত্রিভঙ্গের সেই চরণ।
কি কারণ, বিবরণ, শুন গো,
তার চরণের কি আচরণ।
শ্যামকে লয়ে গেল মথুরায়
আনলে না আর পুনরায়।
সই সই গো
রইল সচল গিয়ে অচল হয়ে মথুরায়।।

সাতু রায় গান লিখে টাকা নিতেন না। ভাল লাগত বলেই গান লিখতেন, বাইরের তাগিদে নয়, অন্তরের তাগিদে। তাই তাঁর রচনা কাব্য-সৌন্দর্যে অত্যন্ত সমুজ্জ্বল না হলেও, গানগুলির মধ্যে একটি হৃদয়াবেগের স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য

সেকালে কবির গান লিখে যাঁরা সুনাম করেছিলেন, কৃষ্ণমোহন তাঁদের মধ্যে একজন। এঁর নিজের কোনো দল ছিল না। অন্যের দলের জন্যে গান লিখে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ভোলা ময়রা এঁর কাছ থেকে গান নিতেন। শোনা যায়, নীলু ঠাকুরের দলেও কৃষ্ণমোহনের গান গাওয়া হত। কৃষ্ণমোহনের যে কটি গান পাওয়া গেছে, সবই 'সখী-সংবাদ'। সবগুলিরই বিষয়বস্তু রাধার বিরহ। কোনোটিতে সখী রাধাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কোনোটিতে দেখা যায়, বৃন্দা মথুরায় গিয়ে রাধার পক্ষ নিয়ে কৃষ্ণকে ভৎসনা করছেন, আবার কোনো পদে রাধাই স্বয়ং তাঁর বিরহদাহের কথা সখিদের কাছে ব্যক্ত করছেন। একটি গান শোনাই :

করিয়ে পিরীতি যুবতী সকলের
না হয় সুখোদয়।
কেউ বা করে প্রেমে সুখলাভ
কারো বা দুখে অঙ্গ দয়।
তা বলে সই মনে দুখ ভেব না।
পাইবে সে কান্ত হবে দুখ অন্ত
চিরদিন দুখ থাকবে না।
দেখ শ্রীরাম বিহনে জানকী বনে
যে দুখ পেয়েছিলেন সই
পুন পেয়ে রাম সে দুখ তাঁর রইল না।
পতির বিচ্ছেদে ওগো প্রাণসই
বিষাদ মনে ভেব না।
পাবে সময়ে সে পতি জুড়াবে যুবতী
ঘুচিবে রতিপতির যন্ত্রণা।
প্রেমের দুঃখ অনেক সখী সইতে হয়
তাকি জান না?
দেখ দময়ন্তী নলের তরে,
কত দুখ সহিয়ে পুন নাথে পেয়ে
জুড়ালেন তাপিত অন্তরে।
আর পাণ্ডবের মোহিনী যাজ্ঞসেনী
হইয়া বিপিনবাসিনী
পুন রাজ্যধন পেলেন পাণ্ডব-অঙ্গনা।

কৃষ্ণমোহনের গানে তেমন কোনো বিশেষত্ব দেখা যায় না। তাঁর গানের যে খ্যাতি হয়েছিল, সেটা কতখানি রচয়িতার, আর কতখানি গায়কের, তা আজ আর বলা যাবে না।

ভোলানাথের বাঁধনদারদের মধ্যে আর দুজনের নাম পাওয়া যায়—গদাধর মুখোপাধ্যায় আর ঠাকুরদাস চক্রবর্তী। —এঁদের কথা আগে বলেছি।

ঘর

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

আমার বিশ্বস্ত ঘরে ভোরের নিশ্চিত রৌদ্র আসে,
আসে দক্ষিণের মৃদু হাওয়া,
জানালায় অক্লান্ত সবুজ।
যেসব খেলনা নিয়ে খেলা ছিল নিতান্ত অবুঝ
প্রেম, প্রতারণা, ঘৃণা, হৃদয়ের তুচ্ছ দাবীদাওয়া
সমস্ত উধাও অবিশ্বাসে।

জীবনে বিশ্বাস পেতে হয়—
যা নাকি প্রেমের মতো কাচপাত্র নয়,
নিসর্গের মতো যা অটল।
তা আমার ঘর, ক্লান্ত মানুষের দল
চলেছে আবহমান জয়ের আহ্বানে।
আমার এ-ঘর আজ পায় তাই মন্দিরের মানে ॥

শেষ রঙ্গ

দিব্যেন্দু পালিত

হুলুস্থুল বেঁধে গেল চতুর্দিকে—
দেয়ালে, চৌকিতে
রমণী লুকালো মুখ :
ছিন্ন বুক, আলীঙ্গন বাহু।

কিন্তু তার স্নেহের অসুখ
ছুঁয়ে গেল একে-একে ছা-পোষা কেরাণী, ভৃত্য,
ধুরন্ধর কবি—

সর্বোপরি বলিষ্ঠ প্রেমিক
পাপোষে জুতোর ধুলো ঘ'ষে ঘ'ষে
শব্দে, জাগরণে
জ্যা-বদ্ধ উপোস ছিঁড়ে হাসলো হি-হি ক'রে।

সহানুভবে

করুণাসিন্ধু দে

মাত্র চোখে দৃষ্টি হেনে ওজন মেপে নিজে
পৌরুষের প্রসারতার বুকের পটভূমি
কেমন দৃঢ় অট্টালিকা, নিষ্ঠি ভালোবাসা,
এক ঝলকে ঠাহর হ'ল কপালে পোড়াকাঠ.
আকাল আয়ু, শুষ্ক মাটি পায় কি কোনদিন
বৃষ্টি ফুল পাখির ডাক সজল আঙিনায়—
কে আর থাকে প্রতীক্ষায়? সময়ে সাবধানী
তড়িৎ গতি ফেরালে মুখ খিন্ন তাড়ণায়!

যেন রঙ্গ নিপুণ খেলা অবাক চতুরতা
মগজে ছিল স্বভাবে জেনে, ত্রস্ত পায়ে পায়ে
সম্ভাষণে রীতি রক্ষা প্রণয় প্রীতি দায়,
ভ্রূকুটি করে পরস্পর শোনানো অভ্যাসে
কিংবা নেশা মূল্যায়নে বিরহ অনুরাগ
হৃদয় পাওয়া হৃদয় দেওয়া হৃদয় পোড়ে থাক—
কে আর থাকে প্রতীক্ষায়? সময়ে সাবধানী
সহানুভবে মেলাবে মুখ খিন্ন তাড়ণায়!

নক্ষত্রের জিজ্ঞাসা

জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী

শেষবেলার হলদে সূর্যটা একসময় নিচু নিচু হয়ে অরণ্য-শিয়রে ঢলে পড়ল। অরণ্যের একাংশ নরম আলোর ঘায়ে শিউরে উঠে আস্তে আস্তে ডুবে গেল প্রাক-সন্ধ্যার লাজুক লাজুক ছায়ায়।

পশ্চিমের সীমান্ত থেকে ধেয়ে এল ঝলক ঝলক বাতাস মাঠঘাট ছাপিয়ে খেতখামার ডিঙিয়ে গাছ-গাছালির গায়ে শিউরোণি তুলে। মেঘমায় কালো ঢেউজাগা জল কলকল করে ছুটে এল, লুটিয়ে পড়ল আমার নিস্তরঙ্গে ডুবিয়ে রাখা পা জোড়ায়। আমার ভাল লাগল। সমগ্র সত্তা দিয়ে সেই ভাললাগা আমি উপলব্ধি করলাম। সেই মুহূর্তে একটা চঞ্চলতার স্রোত বয়ে গেল আমার ভেতর দিয়ে। আমার মনে হল কার কাজল টানা টলটলে চোখ স্থাপিত হয়েছে আমার গায়ে। এত দিনের একটা রুদ্ধ যন্ত্রণা প্রকাশের আবেগে মাথা কুটে মরতে লাগল আমার মনের দেয়ালে। জোর করে চেপে রাখা সেই অব্যক্ত বেদনা আমাকে আমার বন্ধ চোখ জোড়া উন্মুক্ত করে দিল। শোভা (আজ এই নামেই তোমাকে সম্বোধন করলাম; নাহলে তুমি ত আমার কাছে দীপই ছিলে।) তোমাকে আমার মনে পড়ল, গভীর ভাবে। চিঠি লিখে তোমাকে সব জানানো আমার অনেক আগেই উচিত ছিল: আমি কাপুরুষ নই, সুযোগ-অন্বেষী মধুকর নই। শোভা, আমি মানুষ।

কিছুক্ষণ আগের রঙের ঝিলিমিলি লাগা অবাক অবাক আকাশটাকে আমার সামনে দেখার প্রয়াস পেলাম। সূর্যের দারিদ্র্যে ক্লান্ত বিষণ্ণ আকাশে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম বিগত দিনের একটি প্রাণময় ছবিকে, যাকে তুমি একদিন তপনদা বলে ডাকতে।

বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছিল। গাছগুলো মাতালের মত দুলছিল, নদীর ঢেউ পাগল-পারা হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ. অরণ্যের ধারে এ নির্জনতাটুকু গ্রাস করছিল ঘরমুখো পরিশ্রান্ত পাখির ডাক। এই অশান্ত উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশে আমার এই মগ্নতার মাঝে কার খলখল হাসির শব্দ তীক্ষ্ণ একটা শিসের মত আমার কানে এসে বাজল। আমার ভেতরটা এলোমেলো ছন্দহীন হয়ে গেল। সবচে সাজানো সব কিছু যেন তছনছ হতে লাগল। না-পাওয়া না-বোঝা এক অসহায়তার তাণ্ডব নৃত্যে।

আর শোভা, তখনই আমি উঠতে উঠতে বাড়ী ফিরে এলাম। খুঁজলেম ভেতর এই তৃতীয়বার আমার নিজেকে অসুস্থ অসুস্থ লাগল।

খুপখুপে করে চুলে চোখে মুখে কিছু জল দিয়ে যখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি বারান্দার এক পাশে, আচ্ছন্নতা তখন কিছুটা কেটে এসেছে। আকাশের নীলে ভাঙা রাঙা চাঁদ। অসংখ্য নক্ষত্রের মিছিল। পোড়খাওয়া হৃদয়ের রক্তাক্ত ছবির মত ওদের দেখাচ্ছিল।

আমি ভাবলাম, তোমাকে আমার কিছু লেখা উচিত ছিল। কিছুই না-জানানোর অপরাধে সত্যিই আমি অপরাধী। তোমার ত কোন দোষ ছিল না।

যখন লিখতে বসেছি, রাত হয়েছে মন্দ না। টেবিল-ঘড়ির কাঁটা দশটার খুব কাছে। বাইরেটা নিঝুম, শব্দহীন।

শোভা, গ্রামেই আমি বড় হয়েছি। তাই আধুনিক মনের মানুষেরা যাকে কুসংস্কার বলে, সেই সংস্কারমুক্ত আমি হতে পারিনি। অবিশ্যি চেষ্টাও করিনি।

ছোটবেলায় সেই মেঘের ঘনঘটার অবিশ্রাম ধারাপতনে সন্ধ্যা যখন রাতের নাম নিয়ে নেমেছে গ্রামের বুকে, তখন পড়াশুনা আমরা করিনি। আমরা মানে, আমি আমার আরও দুই বোন, দুই মামাত ভাই। ঠাকুমা আমাদের ছিল। গল্পও তিনি জানতেন। এবং সেই ঠাকুরমার ঝুলির গল্প। ওই গল্প শুনেই আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। (আশ্চর্য হয়ো না, বিজ্ঞান তখন দিকে দিকে অভিযান চালালেও আমাদের গ্রামটা গ্রামই ছিল, আমাদের অপরিণত বয়সী ছেলেমেয়েদের পরিণত বুদ্ধি হয়নি।) জলো বাতাসের দোলায় দোলায় আমাদের নাকে আসত আতপ চাল আর মুগের ডালের খিচুড়ির গন্ধ, বেগুন আর আলু ভাজার জিভে জল-আসা ঘ্রাণ। হ্যারিকেনের পলতে ঈষৎ কমিয়ে দেওয়া, ঠাকুমার সুরেলা কণ্ঠের গল্প, আকাশ-ভাঙা ঘুম ঘুম বৃষ্টির মাদল— আমাদের দু' চোখ ভরে নেমে আসত ঘুম। ঠিক তখনি ডাক আসত খেতে যাওয়ার।

গল্প শুনে খিচুড়ি খেয়ে আমরা যখন ঘুমুতে গিয়েছি, তখন বাইরে অঞ্চলে বোধহয় সন্ধ্যা-রাত। ছোট ছোট মনে তখন বোধহয় বড় বড় সমস্যা থমথম করছে।

বাবা ত্রি-সন্ধ্যা কোনদিনই বাদ দেননি। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের 'ও' জবা-কুসুম সংকাশং কানে এলেই আমাদের শয্যা ছেড়ে উঠতে হত। একটু দেরী হলেই খেতে হত কানমলা। মা ছিলেন ঠিক উলটো। এত স্নিগ্ধতা এত মায়া এত করুণা শান্ত স্থির ভাব, সবসময়ই ইচ্ছে করত মাকে জড়িয়ে ধরে মুখটা চেপে রাখি ওঁর বুকে। মাকে লাগত

রাজকন্যার মত। মেঘবর্ণ চুল, পিঠের প্রান্তরে প্রসারিত। কাঁঠালের কোয়ার মত গায়ের রং, হাসলে পরে ঝরে যেন অমৃত অমৃত মুক্তো। মমতা-মাখা মার চোখে কি যেন এক বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা তখন বুঝতে পারিনি। আজ মনে হয়, তখন সেটা বুঝতে না পেরে ভালই হয়েছে।

বাবা মানুষটা যেমনি অদ্ভুত ছিলেন (তাঁকে কোনদিন হাসতে দেখিনি, উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে শুনিনি, বেশীক্ষণ বাড়ীতে পাইনি।) তেমনি অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করতেন আমাদের। আর মনমত উত্তর না পেলেই চড়চাপড় এসে পড়ত।

হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'বল্ দেখি অশোক, তোর চোখের সামনে কি সৌন্দর্য তুই দেখতে পাচ্ছিস?'

অশোক আমাদের মামাত ভাই। সেও জানে, উত্তর তাকে একটা কিছু দিতে হবেই। বলল, 'সামনে কিছুই সুন্দর নেই পিশেমশাই, আমাদের মনটাই সুন্দর!'

বাবা চাপা গর্জন করে উঠলেন, 'তুই দেখতে পাচ্ছিস?'

'আজ্ঞে না!' অশোকের সংশয়হীন স্বীকারোক্তি।

'অকালপক্ক!' একটা চড় এসে পড়ল অশোকের গালে। আমি কাঁপছিলাম। ভেতরে ভেতরে সাহস সঞ্চয় করছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম।

'তপু, বল্!'

'আজ্ঞে, আমাদের ডোবাটার এক পাশে সবুজ হয়ে পড়ে আছে অনেক অনেক হেলেঞ্চা, তার ওপর বসেছে এসে কয়েকটা লাল ফড়িঙ। আমি চোখের সামনে তাই সুন্দর দেখতে পাচ্ছি।'

'আর?' বাবার চোখ যেন ঝলসে উঠল।

আমি ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিলাম। 'আর? আজ্ঞে, মা এইমাত্র চান করে এসেছেন। পরনে তাঁর কালো পাড় দেওয়া সাদা মিলের শাড়ি। মার গা থেকে লাক্স সাবানের গন্ধ বেরুচ্ছে ভুর ভুর করে। (ওফ্, আমি জিভে কামড় দিলাম, ও ত নাকের কাজ, চোখের নয়।) আজ্ঞে, মার কপালে সিঁথিতে মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ আর রেখা। মাকে আমার সুন্দর লাগছে।'

শারদীয়া প্রতিমার মত মা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখ টিপে হেসে চলে গেলেন। বাবা আলতো করে আমার পিঠটা চাপড়ে দিলেন। আমি পুলকিত হচ্ছিলাম। তখনই শুনলাম, তিনি বলছেন, 'যাও, পাকামো করতে হবে না, পড়তে বসো গে!'

কম্পিত চরণে ফিরে এলাম ঘরে। আমরা তখন ক্লাশ এইটে পড়ি। কাঁদতে পারি না, আবার বেদনাকে ধরে রাখার শক্তিও নেই।

এই ভাবেই দিন চলছিল। নদীর তলে তলে যে নিঃশব্দ ভাঙন চলছিল, তা বুঝতে পারিনি। আকাশের নীলে কখন কোন্ সময় যে কালো মেঘ হানা দিল, তা বুঝবার অবকাশ আমাদের ছিল না।

যে নির্বাক প্রাণটি সহজ সুন্দর মমতায় ঢেকে রেখেছিল কয়েকটি ছেলে-মেয়েকে, যে অন্নপূর্ণা দিনের পর দিন অতি যত্নে স্নেহে জুগিয়ে এলেন সুস্বাদু সব সুখাদ্য, যাঁর নিঃশব্দ কাজের সাক্ষী হয়ে প্রতিটি ঝকঝকে তকতকে বস্তুই যেন মুখর হয়ে উঠত নবরঙের উল্লাসে, সেই ছবির প্রাণটি একদিন নিঃশব্দেই মিলিয়ে গেল বাতাসের স্তরে স্তরে। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে কত প্রাণই যে এভাবে নিত্যই অবহেলা অযত্নে চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে, তার হিসেব কে রাখে। মৃত্যুপথযাত্রী মা বাঁচবার ব্যাকুলতায় বারবার বাবাকে ডাক্তারের কথা বলেছেন। বাবা নড়েন নি! কেন, তা তিনিই ভাল জানেন! অসহ্য হয়ে হাত, কামড়েছি, চোখের সামনে দেখেছি মার গলায় ঘড়-ঘড় শব্দ উঠেছে, আর চোখে একটা পর্দা নেমেছে, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্বক্ষণে সকলকে শেষবারের মত দেখার প্রচেষ্টায় চোখ বড় বড় করে চেয়েছেন চারদিকে, তারপর আস্তে আস্তে চোখের পাতা এক হয়ে এসেছে। শোভা, সেই দিন থেকে বাবার প্রতি একটা অশ্রদ্ধা, বিরূপ মনোভাব আমার ভেতরে গড়ে উঠতে লাগল। যে মানুষ জীবনের প্রচণ্ড আঘাতেও নির্বিকারচিত্ত, যার কাছে মানুষ আর কুকুরে বেড়ালে কোন ফারাক নেই, তাকে শ্রদ্ধা জানানো নিজেই নিজেকে অশ্রদ্ধা করা।

শোভা, বলতে পার এত সব কথা ঘটা করে তোমাকে শোনান জানান কি প্রয়োজন! প্রয়োজন আছে!

ম্যাট্রিক পাশ করে আমারই এক বন্ধুর বাবার সুপারিশে তোমাদের বাড়ীতে জায়গা পেলাম। যাকে বলে 'লজিং'। কলেজে পড়ব। অনেক আশা উদ্দীপনা স্বপ্নের আনাগোনা আমার প্রাণে। কত কথা ভাবি! ঠাকুমা, মিনি, টুনী, অশোক! খাওয়া শেষে লেজ-কাটা কুকুরটা এখনও হয়ত কলা-বাগানের এক পাশে অপেক্ষা করে। ভর-দুপুরের নির্জনতায় রোদে গা ডুবিয়ে এখনও হয়ত ঝগড়া করে ময়লা-রং ধেড়ে শালিখেরা। মিনি টুনী এখনও হয়ত 'এক্কা দোক্কা' খেলতে খেলতে ঝগড়ায় মেতে ওঠে। কাকেরা এখনও হয়ত ভিড় করে কলের পাড়ে জমিয়ে রাখা এঁটো থালা-বাসনে। মার মায়া-মায়া চোখ দুটি ছলছলিয়ে ওঠে কোন্ অব্যক্ত বেদনায়। আমার সামনে।

তোমার ছোট দুই ভাই অমল শ্যামলের একবেলার পড়ার ভার পড়ল আমার ওপর। তার বদলে থাওয়া-থাকা। আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে। তোমার বাবা সুরেনবাবু সদাশয় ব্যক্তি। মাঝে মাঝে আমার ঘরে এসে সান্ত্বনা দিতেন, আশ্বাস দিতেন, উৎসাহ দিতেন।

আমি গ্রামের নিতান্তই গোবেচারা ছেলে। আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ডোবার বুকে হেলেঞ্চা শাকের দোলায়, কম্পিত জলের ওপর সুপুরীর আঁকা-বাঁকা প্রতি-ফলনের আর চাষী ছেলের পেটের সঙ্গে পিঠের একাকার হওয়ায়। আর হরেক-রকম বইয়ের। আর আমাদের বাড়ীর মুষ্টিমেয় প্রাণীর।

তোমাদের বাড়ীতে এসে আমি অনন্ত প্রসারের, হৃদয়-গভীরতার সন্ধান পেয়ে-ছিলাম। আমার চোখ ধীরে ধীরে রোদ-লাগা কুমুদের পাপড়ির মত খুলছিল। অপূর্ব সব বৈচিত্র্য, ঘটনা, মানুষ প্রত্যক্ষ করে আমি নতুন অনুভূতির তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিলাম।

ঠিক দশটার সময় আমি কলেজে যেতাম। চান সেরে চুল পাট করে খাওয়ার জন্যে যখন ভেতরে আসি, কখন তোমার জায়গা করা হয়ে গিয়েছে। যত্ন আর আন্তরিকতা ছড়ানো থাকত সেখানে। জল ছিটিয়ে দিয়ে সুচারুরূপে মুছে ফেলা স্থান, তেমনি পরিষ্কার পিঁড়ি, ঝক-ঝকে ইসলামপুরী গেলাশ, যার ভেতরে ডাবের জলের মত জল টলমল করছে।

তুমি আসতে ভাত নিয়ে।

মনে আছে একদিন। সেই শুরু। তুমি বললে, 'বেগুন ভাজার সঙ্গে ডাল খাবেন!'

আমি তোমার দিকে তাকালাম না। চোখ মাটিতে ফেলে বলেছিলাম, 'দিন।' খুব অস্পষ্ট একটা হাসির ঢেউ আমার কানে এসে ভেঙে পড়েছিল। আমি চোখ তুলে চেয়েছিলাম। দরজার ফাঁকে তোমার নীল শাড়ির আঁচল মিলিয়ে যাচ্ছিল।

সেদিনই বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে শুনতে পেলাম তুমি তোমার বড় বোন আভাকে বলছ, 'মাস্টারটা কি বোকা, দি দি! আমাকে বলে কিনা আপনি। ছি ছি ছি!'

আমি ক্রুদ্ধ অথবা ক্ষুব্ধ হলাম না। ঠিক, আমি ত বোকাই! শোভা আমার ছোটই হবে। এত সম্মান করে কথা না বললেও চলত।

'কোন লোক সম্পর্কে' আগেই একটা বাজে কথা বলে ফেল না। উনি এসেছেন সেদিন, ঠিক সহজ এখনও হতে পারেন নি, তাই।' আভা তোমাকে শাসনের সুরে কিছু উপদেশ দিল। আমি সেই উপ-দেশের সুরে নতুন এক সুর শুনতে পেলাম। সে সুর অন্তরঙ্গতার সুর। অন্যকে নিজের কাছে নিজের একান্তে টেনে নেওয়ার সুর—সে সুরে আমি যেন বুঝতে পেলাম একান্ত আপনজনের সুর।

তার পরদিন। তুমি কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলাম, 'একটু নুন দেবে!'

সেদিনও সে কথায় তুমি হেসে উঠলে। এবং আমার সামনেই নীল শাড়ি নয়, আজ লাল শাড়ির কিছু অংশ দিয়ে তোমার হাসিটাকে তুমি চাপা দেবার চেষ্টা করছিলে! ব্যর্থ চেষ্টায় তোমার ষোল-সতেরোর দেহটা শুধুই কেঁপে উঠছিল, তুমি হাসির দমকে দুলছিলে কেবল। তোমার রূপ আমি দেখলাম! তোমার চোখে জল। হাসির জল। ঠিক সেই মুহূর্তে আভা এসে ঘরে ঢুকেছিল।

ধমকে উঠেছিল কঠিন কণ্ঠে, 'এত হাসি কিসের?' তার চোখ জ্বলছিল, কথায় যেন বিষ মেশান ছিল। বুকে কাপড়টা ঠিক সাজান ছিল না।

হাসি-মাখা চাপা সুরে তুমি বললে, 'মাষ্টারমশাই আমাকে তুমি বললেন!'

'তাতে হাসির কি হল? বড় হচ্ছ আর দিনকে দিন ছাগল হচ্ছ! ছ্যাবলামির একটা সীমা আছে, জান!'

আশ্চর্য হয়ে আমি মুখ তুললাম। কোন বাইরের লোকের সামনে এত বড় কথা এত বড় একটি মেয়েকে কেউ বলতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। আমি লজ্জিত হলাম, দুঃখিত হলাম, অনুতপ্ত হলাম। তুমি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে!

কলেজে যাওয়ার মুখে কলমটা পকেটে গুঁজে খাতাটা সবে হাতে নিয়েছি, আভা এসে দাঁড়াল। আমার বিছানার ওপর গিয়ে বসল।

'মাস্টারমশাই, আপনাদের কলেজে গল্পের বই দেয় না?' আভা বললে।

'দেয় তো!'

'আপনি আনেন না?'

'আনি।'

'বেশ তো! একা একা পড়েই বুঝি ফেরত দিয়ে দেন।'

'মানে, বই আনি। পড়া হলে দিয়ে দিলেই আরেকটা পাওয়া যায়।'

'সে জানি! কিন্তু এর পর আমাকেও পড়াবেন কিন্তু!'

'আচ্ছা।'

'বই আছে এখন আপনার কাছে?'

বই ছিল না। বললাম, 'এখন নেই। কলেজ থেকে আনব আজকে!'

আভা উঠতে চাইছিল না। কেমন অলস ভঙ্গিতে বসে বসে ঘরটা দেখছিল। যেন এ ঘরে সে নতুন। যেন এ ঘরে পৃথিবীর সব শান্তি লুকিয়ে আছে।

আস্তে আস্তে বলল, 'ঘরটা কেমন নিরিবিলি নয়!'

'হ্যাঁ, বেশ লাগে!'

'আপনি নিরিবিলি খুব ভালবাসেন, না!'

'জানেন তো, আমি গ্রামের ছেলে। নিরিবিলিই আমাদের পছন্দ!'

'আমারও। যদিও আমি শহরের মেয়ে!' ও হাসল।

'আমার কলেজের সময় হয়ে গেছে, যাই!'

আভা আমার দিকে চাইল। বলল, 'যাবেনই ত! কলেজ যখন আছে, যেতে ত হবেই।'

আমি পালালাম।

শোভা, একটু বেশী বয়সেই আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। ফল বেরুবার আগে প্রচুর নাটক নভেল আমি পড়েছি। যে জল-সঞ্চয় বদ্ধতার আড়ালে চাপা পড়েছিল, হঠাৎ বুঝি নির্গমনের পথ পেয়ে গতি আর আবিষ্কারের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কলেজে অনেক ছেলের রঙ-মাখা অনেক কাহিনী আমার শ্রবণে ছিটকে এসেছে। আমার বদ্ধ দুয়ার ধীরে ধীরে অর্গলমুক্ত হয়েছে। ঠিক তখনই শোভা, যৌবনের সূর্যালোক আমার শীতল অন্ধকার হৃদয়-তলকে উষ্ণ আর আলোকিত করে দিয়েছে।

দিন পনের কুড়ি হল তোমাদের বাড়ী এসেছি, বাড়ীর বড় মেয়ের এভাবে অন্য ছেলের কাছে অবান্তর কথার জাল সৃষ্টি করার কারণ কি থাকতে পারে, তা আমি ভেবেছি অনেক সেদিন। কোন সিদ্ধান্তে আসা আমার সীমিত বুদ্ধিতে কুলায় নি সেদিন।

আমার সর্বদিকেই একটা পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল। সমস্ত নির্জীবতা স্থবিরতা থেকে মুক্তি পেয়ে এক শিহরণের স্পর্শে আমি উন্মাদনা অনুভব করছিলাম।

অনেক ছেলের দেখাদেখি কলেজ কমন-রুমে অনেকক্ষণ টেবিল-টেনিস অভ্যাস করে ক্লান্ত হয়েছিলাম। তাই বাড়ী এসে চুপচাপ শুয়েছিলাম ঘরে। পশ্চিমের জানালাটা ছিল খোলা। তাই বিদায়ী সূর্যের রক্তাভা পড়েছিল এসে ঘরে। ঘরের দরজাটা ছিল ভেজান। তাই ঘরটা হয়ে উঠেছিল আলো আলো, ছায়া ছায়া। তখন।

আভা তখন ঘরে এল। খুব কাছে এসে বলল, 'বই এনেছেন?'

উঠে বসলাম। টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে বইটা নিয়ে এগিয়ে দিলাম। ও আমার হাতসুদ্ধ বইটা ধরল। আমি ওর ঘাম-ঘাম হাতের উষ্ণতা থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম।'

'শুয়ে আছেন যে!'

'এমনই। শরীরটা ক্লান্ত লাগছে।'

আভা নড়ছিল না। আমার অস্বস্তি লাগছিল। অবশেষে আমিই উঠলাম।

'কোথায় যাচ্ছেন?' আভা শুধাল।

'যাই, হাত মুখটা ভাল করে ধুয়ে আসি!'

এমনি করেই দিন যাচ্ছিল। ভাইদের সকালবেলাকার পড়া, তোমার পরিবেশনে আমার ভাত খেয়ে কলেজে যাওয়া, আভার সহসা আবির্ভাব, তোমার হাসি হাসি মুখ—আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিলাম।

হঠাৎ একদিন আভা ভাত নিয়ে এল। আমি তখন অনেকটা সহজ হয়ে এসেছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি যে!'

আভার চোখে হাসি, 'কেন আমাকে দিতে নেই নাকি!'

'কোনদিন তো দেন নি, তাই বলছিলাম!'

'শোভাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরেছে।'

আমার বুকটা কেঁপে ওঠল। চকিতে মুখটা তুলেই নামিয়ে নিলাম।

তোমাকে ছদিন দেখলাম না। বন্ধখাঁচা-পাখির মত আমি ছটফটিয়ে ওঠেছি। ইচ্ছে করেছে প্রতি মুহূর্তে তোমার পাশে গিয়ে বসি, আমার সবকিছু নিত্যকার বাঁধাধরা কাজ গোলমাল হয়ে গেল। আমি বুঝলাম, তুমি আমার সব। বুঝলাম তোমার মনেও নিশ্চয়ই একটা টান আছে। যে টানে জোয়ার খেলে ভাটা বয়, যে টানে রাজা ফকির হয়, সমুদ্র পাহাড় হয় অতিক্রম্য।

দুই ভাই থাকে স্কুলে। সুরেনবাবুর দুপুরে ঘুমানর অভ্যাস। তুমি শয্যা-শায়িনী। আমার কলেজ প্রায়ই আড়াই-টেয় ছুটি হয়। সবকিছুর পূর্ণ সুযোগ নিল আভা।

সেদিনও কলেজ থেকে এসে ঘরে আছি শুয়ে।। দুপুরটা নিঝুম। বাসাটা নিঃশব্দতার প্লাবনে ডুবে আছে।

আমার চোখমাত্র লেগে এসেছে, আভা এসে ঘরে ঢুকল। শিকারের ওপর দৃষ্টি রাখা শ্বাপদ-পদসঞ্চারে। চোখ ঈষৎ ফাঁক করে আমি লক্ষ্য করলাম, অতি সন্তর্পণে ও দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছে। আমি এত দুর্বল-দুর্বল বোধ করতে লাগলাম। সত্যি কথা কি জান, ওকে আমার ভয় করত সর্বদা। ওর লোভী লোভী দৃষ্টি আমি সহ্য করতে পারতাম না। ঘৃণাও করতাম বুঝি!

আমি চোখ বুজে অসাড়ের মত পড়ে রইলাম। দেখি ও কি করে!

ওর পদশব্দ আমার মাথার কাছে এসে থামল। একটা বোঁটকা পুরুষালি ঘামের গন্ধ আমার নাকে লাগল। এটা ওর বৈশিষ্ট্য ছিল।

চাপা সুরে আভা ডাকল, 'এই, ঘুমিয়েছ!'

আমার বুকে আলোমালো ঝড় গর্জমান। আমি চুপ করে আছি। ও আরও কাছে এল। একপাশে বসল। আমার শরীরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। ওর নিঃশ্বাস আমার গলা ছুঁয়ে যাচ্ছিল। কপালে সুরসুড়ি দিচ্ছিল চুল।

নিদারুণ অস্বস্তিতে আমি চোখ খুললাম। দেখলাম, এক জোড়া উদগ্র লোভের চোখ চকচক করছে। মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে, একটা আদিম লালসার ছবি যেন নিদাঘ-নির্জনে আমার বুক আর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

'কি ব্যাপার? আপনি!' আমি উঠতে চাইলাম, পারলাম না। আমাকে লতার মত বেষ্টন করে ও বলল, 'আপনি নয় তুমি। তপন, তমি নিষ্ঠুর!'

আভা ঘামছিল। নিজেকে মুক্ত করে বললাম, 'আপনি অসুস্থ, ঘরে যান।'

'তুমি আমাকে অপমান করছ তপন!'

'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'তপন!'

'না।'

আভা আরেকবার ঝুঁকে পড়ার চেষ্টা করল। আমি ওর হাতটা ধরলাম। বললাম, 'জানেন মানুষ দেবতা নয়। আমি আপনাকে সম্মান করি। ঘরে যান!'

আমার হাতটা আভা তুলে নিল, ধীরে ধীরে ওর ঠোঁট জোড়া স্থাপন করল তার ওপর।

তারপর আভাকে দেখলাম অন্য এক রূপে। সংযত, স্থির, অচপল মতি।

তুমি ভাল হয়ে পথ্য করলে ছদিন পর। আমি যে কত খুশী হয়েছিলাম।

আভাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। সেই অভিশাপেই হয়ত অথবা সে-ই আমার ভেতর পরম প্রিয়াকে কাছে টানার ইচ্ছা প্রবলতর করে তুলেছিল। তোমার বিদ্যুৎ-গর্ভ কটাক্ষ, হাসি হাসি মুখের ইশারা আমাকে আশান্বিত করেছিল।

সুযোগও এসে গেল। খাওয়ার পরে আমার বমি বমি ভাব করছিল। কলতলায় কিছুক্ষণ ওয়াক ওয়াক করে ঘরে এসে বিশ্রাম করছিলাম।

তুমি এলে লবঙ্গ হাতে।

একটু ইতস্ততঃ করে দুঃসাহসে ভর দিয়ে আমি তোমার হাত তুলে নিলাম আমার হাতে, তুমি নড়লে না। আমার চোখ তোমার চোখে আটকে রইল।

বললে, 'কি!'

বললাম, 'শোভা শোভা!'

'কেন?'

তোমার হাতে চাপ দিলাম একটু, তুমি কাছে এসে আমার কপালে হেলে-পড়া কিছু চুল তুলে দিলে মাথায়। আস্তে আস্তে বললে, 'এ কথা বলতে এত সময় লাগে!'

'শোভা, ভয় হয়!'

'কি ভয় হয়!'

'যদি, যদি তুমি প্রত্যাখ্যান কর। যদি তুমি খারাপ ভাবো!'

'বোকা!' তুমি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে লবঙ্গ ক'টা দিলে! কলেজে এত দেরী কর কেন? তাড়াতাড়ি ফিরতে পারো না?'

'ফিরব, শোভা, ফিরব!'

সেদিনের সেই বিপর্যয়ের পর আমি বিকেল নামলে বাড়ী ফিরতাম। তুমি সেটা লক্ষ্য রেখেছ। অনির্বচনীয় এক পুলকে আমি শিউরে ওঠলাম।

পরদিন যে সূর্য দেখা দিল পূবে আকাশে, তার অবয়বে কি এক রোমাঞ্চ মাখা ছিল, যে বাতাস বইল তার সুরে কি এক যাদু মেশান ছিল; সকালে ঘুম ভাঙতেই আমার শরীরটা লেহন করল রোদ, আদরের কোমলতায় বহে গেল বাতাস। আমি আবিষ্কার করলাম নিজেকে।

খেতে বসেছি, তুমি কিছু একটা নিয়ে আসছ ওপাশের দরজা দিয়ে, আভা কাছে এসে বসল একটা জলচৌকির ওপর।

'মাষ্টারমশাই, গল্পের বইটা দিয়েছেন সাতদিন হল, ফেরত নিচ্ছেন না যে!'

'ফেরত দিলে ত নেব!'

'নিলে ত দেব!'

'বাঃ, আমার দোষ হয়ে গেল। বেশ তো আপনি!'

আভা হাসছিল, আমি হাসছিলাম। নির্মল সে হাসির রেশে অন্তরঙ্গতার অভাব ছিল না।

'আমি মনে করেছিলাম বইটা আপনার পড়া হয়নি!'

'পড়া হয়ে গেছে কবে! আজকে একটা ভাল বই আনবেন।

'আজকে ত আমাদের বই আনার তারিখ নয়, কালকে!'

'তাহলে আজকে কি করব! দুপুরে মোটে কাজ নেই!'

'ঘুম দিন!'

'এলে তো!'

হঠাৎ আমার নজরে এল, তুমি দরজার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ। স্থির প্রতিমার মত। দু'চোখ ঈর্ষার বিষে কুঞ্চিত। তুমি ফুলছ।

আমি অপ্রস্তুত হলাম। হঠাৎই অশোভনভাবে আলাপটা থামিয়ে দিয়ে কিছু নুন টেনে নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আভা কি বুঝল, সে-ই জানে। আস্তে আস্তে ওঠে চলে গেল। কয়েকদিন বাদে আবার ওর এই দুর্বলতার ছবি আমার চোখের সম্মুখে ফুটে ওঠল। ওর হৃদয়ের বুভুক্ষার রূপটি চোখে মুখে যে প্রকট হয়ে উঠছিল দিনের পর দিন, তা ও কেমন করে বুঝবে! নদীর কূলে কূলে এসেছে প্লাবন, অথৈ জলের বাসনা কাছাড় ভেঙ্গে নেমে আসবে, ভাসিয়ে ডুবিয়ে দেবে যত স্বপ্নের সুন্দরের সম্ভাবনাকে!

তুমি ধীরে ধীরে মাছের ঝোল দিয়ে চলে যাচ্ছিলে, আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাষ আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম, বললাম মৃদু স্বরে, 'দেখা করো!'

তুমি কলেজে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে এলে!

তুমি চাইলে মুখ উঁচু করে। তোমার চোখে মুখে রোদ-বৃষ্টির ঝিলিমিলি।

'কথা দাও, আর কোনদিন এমন করবে না!'

'না!'

'কি, কথা দেবে না!'

'তুমি পাজী, অসভ্য, চোর!' আবেগ-জড়িত কণ্ঠে বিশেষণ ক'টা উচ্চারণ করে তুমি সরে গেলে জানলার কাছে।

'তবে তাই!' আমি এগিয়ে তোমার কাঁধে হাত রাখলাম।

অনেকদিন বাদে বাবার চিঠি পেলাম। তোমাদের বাসার ঠিকানা বাবা জানতেন না। কলেজ-হোস্টেলে আমার এক গ্রামের বন্ধুর ঠিকানায় চিঠি। সেই অধিকাংশই তর্জন-গর্জনে ভরা, কিছু উপদেশমূলক।

তুমি ত জানই, মার মৃত্যুর পর আমি যেন মনের দিক থেকে ভিন্ন এক মানুষে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলাম। বাবাকে দেখলেই আমার ভেতরটা জ্বলতে থাকত আগুনের মত। ও'র উপস্থিতিটা পর্যন্ত সহ্য হত না। আমি কেন, বাড়ীর সকলেরই একটা বিতৃষ্ণা বীতশ্রদ্ধা ভাব এসে গিয়েছিল।

লোক পরম্পরায় শুনেছিলাম, বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চাইছেন। আশ্চর্য! কথাটা শুনে ছিছি করে উঠেছিলাম। একা একাই। আমার দুগ্ধ-পোষ্য অথবা নাবালক কোন ভাইবোন নেই, বাড়ীতে কাজকর্মের কোন অব্যবস্থা বা বিশৃঙ্খলা নেই যার জন্যে পঞ্চাশোত্তর একটি লোকের বিয়ে করার প্রয়োজন হতে পারে! বাবার সঙ্গে যাও কিছুটা বন্ধন ছিল, তাও ছিঁড়লাম কথাটা শোনার পর। বাবার চিঠির উত্তর আমি দিইনি।

"কলেজে এত দেরী কর কেন?"

তোমাকে আমি পেয়েছি আরও অনেকভাবে। তুমিও আমাকে গ্রহণ করে নিয়েছ একান্ত করে। পরিতৃপ্তির আস্বাদে আমি মগ্ন।

তোমাদের ঘরের পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটা ন্যাড়া হল, যেন একটি কঙ্কাল আছে দাঁড়িয়ে। লাল লাল ফুলের

কল্যাণে আবার ঐশ্বর্যময়ী হল, যেন একটি যৌবনধন্যা সপ্তদশী কার ধ্যানে নিমগ্ন। আকাশের মেঘে মেঘে যে জল উঠেছিল জমে তাই মাটির বুকে রস ঢেলে দিল। কুয়াশার বিস্তারে ভার হল আকাশ, আবার একদিন নীল চাপা পড়ল কালোর আড়ালে।

যেদিন আই-এ পরীক্ষার ফল বেরুল সেদিন তুমি খুশী হয়েছিলে অত্যধিক। মাত্রাতিরিক্ত তোমার লম্ফঝম্ফে সন্দেহ না করার কোন কারণ ছিল না।

তোমার বাবা সুরেনবাবু এসে বললেন, 'পাশ করলে, বি-এতে এ্যাডমিশন নিচ্ছ ত!'

আমার দু'কাঁধে ও'র হাত পড়েছিল। জড়োসড়ো হয়ে বললাম, 'ইচ্ছে তো রাখি!'

'হু'। ভর্তি হয়ে যাও। তোমরা না পড়লে পড়বে কে! সব তো গরু ভেড়া আজকাল পাশ করে বেরুচ্ছে। একটা সাধারণ পিটিশান লিখতে দিলে মহাশয়দের কলম ভাঙে তিনবার! তা, বাবাকে জানিয়েছ ত!'

'জানিয়েছি!' মিথ্যার আশ্রয় নিলাম!

'গুড। আজকে তোমার এই সুসংবাদে মাংস রান্না হবে। তোমার পক্ষ থেকে আমিই আনছি কিনে।' হা হা করে তিনি হেসে উঠলেন। অনাত্মীয় এই সদালাপী সজ্জন মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল।

সারাটা বিকেল বাইরে হৈ হুল্লোড় করে কাটিয়ে বাড়ী ফিরলাম সন্ধ্যার মুখে মুখে।

ঝকঝকে চিমনী, তার ভেতরে তৃতীয়ার চাঁদের মত সলতে হলদে আলো ছড়াচ্ছে। ঘরটাকে আমার একান্ত নিরাপদ আরামপ্রদ স্থান বলে মনে হল।

আরেক বিস্ময় বুঝি অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে।

হ্যারিকেনের ঠিক সামনেই পাতলা সাদা কাগজে মোড়া দামী সুদৃশ্য একটি কলম। আমি আনন্দে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল ভাল একটি কলমের।

তুমি কোথাও হয়ত ছিলে কাছেপিঠে। মিটমিটে হাসিতে মুখটাকে ভরে দিয়ে কাছে এলে।

'কি সুন্দর কলমটা!' আমি বললাম।

'কত দিয়ে কিনলে!' তুমি যেন কিচ্ছুটি জান না। তোমার ঠোঁটের নদীতে চাপা হাসির ঢেউ ফুলে ফুলে উঠতে দেখে আমি এক মুহূর্তে সব বুঝে নিলাম।

খুশী খুশী মনে আতিশয্য লুকিয়ে রেখে গলায় গাম্ভীর্য ঢেলে দিলাম প্রচুর, 'এত দামী কলম দিতে তোমাকে কে বলেছিল!'

'বারে, কলমই বা কার, দিলই বা কে!'

'তুমি কিছু জান না, না।'

'নাঃ!'

'তাহলে কলম রইল এখানে। আমার মাথার......' সেই মুহূর্তে তোমার ডানহাতটা আমার কথাটাকে চাপা দিল।

'ছিঃ! কেন, তোমাকে সামান্য কিছু দেবার অধিকার আমার নেই?' তোমার চোখ ছলোছলো।

'আছে, আছে! আমি এমনিই বলছিলাম। তোমার এ উপহার আমার কাছে অসামান্য হয়ে রইল।'

কলেজে ভর্তি হয়ে ক্লাশ করতে লাগলাম নিয়মিত। তোমাদের দু' বোনের নিঃশব্দ প্রতিযোগিতা আমাকে নিয়ে, আমি আমোদ পাচ্ছিলাম।

আভাকে প্রথম প্রথম আমি সম্মান করতাম। ওর লোভ, হ্যাংলামো দেখে ঘৃণা এল মনে। ওর অসহায়তা, দুর্দম ইচ্ছার নিরুপায় অবস্থা দেখে আমার মনে করুণা এল। সে যদি আমার সঙ্গে দুটো কথা বলে, আমার কাজ করে মনের শান্তি পেতে পারে, তবে হোকনা তাই।

অমল আর শ্যামলকে সেদিন পড়াতে বসেছি, সুরেনবাবু বসলেন একটা চেয়ার টেনে।

বললেন, 'কি খবর মাণ্টার! ছেলেদের কেমন বোঝ!'

'ভালই ত!' আমি খাতা থেকে মুখ তুললাম, 'অমল থার্ড হয়ে উঠেছে সেভেনে. হাফ ইয়ার্লিতে ওকে ফার্ষ্ট করে দেব!'

'আর ওই বানরটা?'

'কে শ্যামল? ওর মাথাটা কিন্তু খুব পরিষ্কার। এত ছটফট করে! একটু সুস্থির হয়ে বসতে পারে না!'

'মারবে ধরে বেদম। জানত. বেত্র ছাড়লেই ছাত্র গেল!'

আমরা দুজনেই হাসলাম। সুরেনবাবুর হাসি এত প্রাণখোলা ছিল! মনটা সাদা থাকলে নাকি লোকে ওভাবে হাসতে পারে!

'হ্যাঁ হে মাণ্টার, এদ্দিন আছো, বাড়ী যাওনি কেন?'

এ ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হবার আশঙ্কা আমি করছিলাম সব সময়ই। তার জন্যে তৈরীও করছিলাম। বাড়ী গেলে যে আমার মনের সমতাটুকু ভালটুকু ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, তা কি কাউকে বলা যায়! না, কেউ বিশ্বাস করে! বাবাও কোন খোঁজ করলেন না বেঁচে আছি, না মরে গেছি! হয়ত আমাকে তিনি মৃত বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

বললাম, 'যাব পরীক্ষা দিয়ে। বাড়ীতে গেলে পড়াশুনার ক্ষতি হয়। বাবা ঠিক পছন্দ করেন না!'

'না, না এ তো ভাল কথা নয়। ঘরের ছেলে ঘরে যাবে তাতে আবার পছন্দ-অপছন্দের কি আছে!'

'জানেন, আমার মা নেই।' আমার এতদিনকার চোখের জলে ভেজা কথাটা, আমার কান্না-কাতর হৃদয়ের ছবিটা তুলে ধরলাম ও'র সামনে। আমার কথায় নিশ্চয়ই কিছু ছিল, আমার সুরে নম্র কিছু তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। সরাসরি চাইলেন আমার দিকে। অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে পূর্ণ।

ধীরে ধীরে বললেন, 'তা ঠিক তা ঠিক। ঘরে মা না থাকলে কিই বা রইল. শ্রী নেই শান্তি নেই, স্নেহ দয়া মায়া কিছু নেই, আভা শোভা দেখো না কেমন থাকে। মায়ের স্নেহ থেকে ওরা অনেকদিন বঞ্চিত। নাও, পড়াও। তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম। মাণ্টার, বাড়ী যেও একবার, বাবা আছেন তো!'

মানুষটার সংস্পর্শে যতই আসছিলাম ততই আশ্চর্য হচ্ছিলাম, অভিভূত হচ্ছিলাম। জীবনের দর্শন লাভ করে তিনি একক।

যাক সে কথা। মনে আছে সেদিন ছিল শনিবার। সময়টা ছিল সন্ধ্যা। আরে চারধারে ছিল শীত কুয়াশার গন্ধ।

তুলসীতলায় হরির লুট দিচ্ছিলে তুমি। বাতাসা। আমি আছি। আভা অমল শ্যামল আছে। সুরেনবাবু আছেন। প্রসাদ নিয়ে জল খেয়ে তখনও আছি দাঁড়িয়ে। আভা রান্নাঘরে, ভাই দুটি পড়ার ঘরে, বাবা কাচারী ঘরে। শুধু আমি আছি তুমি আছ তুলসীমঞ্চের সামনে।

কি এক আবেগে আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছিলাম, কি এক খেয়াল হয়েছিল, তোমাকে বললাম, 'তুলসীতলার মাটি নিয়ে আজ এই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করতে পারো?'

'কি!'

'আমি তোমার স্বামী!'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা, ওদের পড়ার শব্দ আসছে। আভার হাত থেকে বুঝি খুন্তিটা পড়ে গেল। কাচারী-ঘর সরগরম।

'পারি।' তুমি বললে অকম্পিত কণ্ঠে।

'তবে করো।'

'এখুনি?'

'হ্যাঁ।'

তুমি এগিয়ে গেলে তুলসীমঞ্চের দিকে। আঙুলের ডগায় মাটি নিয়ে ছোঁয়ালে কপালে পরম নিশ্চিন্তে। বললে অস্ফুট স্বরে, 'প্রতিজ্ঞা করলাম তুমি আমার স্বামী।'

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি, তুমি ডাকলে, 'তপনদা!'

'কি!'

'না, কিছু না!'

শোভা, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা একদিনের হঠাৎ-জাগা ভালবাসা নয়। প্রহরের পর প্রহর, আমার প্রতি ইচ্ছার গায়ে গায়ে রক্তের কণায় কণায় সঞ্চারিত হয়েছিল যে অনুভূতি, তাই তুমি। চোখ নয়, হৃদয়ে তার জন্ম।

মানুষের ভাগ্য যে কিভাবে বাঁক নেয়, আমরা যে অদৃষ্টের হাতে অসহায় পুতুলের মত, তাই ভাবি মাঝে মাঝে। যার জন্যে যেটা সোজা আছে শত চেষ্টা করেও কি তা কোনদিন এড়ান যায়? যায় না। তবু পৃথিবীতে রোজ সূর্যোদয় হয়, পাখি গায়, মনে মনে জানাজানি হয়, অবশ্যম্ভাবী পরিণতির হা হা হাসি যদি আমরা শুনতে পেতাম আগেই, তাহলে এত হাসি গান স্বপ্ন থেমে যেত এক মুহূর্তে। কান্না আর দুঃস্বপ্নের প্রাবল্যে মূর্ছিতা হত পৃথিবী।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া হলে সব শুয়ে পড়লে তুমি এলে আমার ঘরে। নিদ্রা-ক্রান্ত সব, নিঃশব্দতা বিরাজমান।

তুমি এসে আমার বুকের ওপর পড়লে, 'তপনদা!'

তোমার আশ্চর্য হাবভাবে আমি বিস্মিত হলাম, 'কি!'

'তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না তপনদা।'

'এই কথা! তোমাকে ত আগেই বলেছি আমাকে বিশ্বাস কর। আমিই কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব!'

অকস্মাৎ আমি চমকে ওঠলাম। কার পদশব্দ যেন আমার দরজার এক পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তুমিও পেয়েছ। আমার বুকের ওপর তুমি কাঁপতে লাগলে। দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিলাম। কেউ নেই কোথাও, চাপ চাপ অন্ধকার। কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। দোষী মন সর্বদাই সন্ত্রস্ত, ভাবলাম।

তোমাকে বললাম, 'না, কেউ নেই। শোভা, এটুকু জেনো, আমি তোমার পাশেই আছি। কথা দাও।'

'কথা ত তোমাকে দিয়েছি। আর কি বলব!'

'আবার বলো!'

'তুমি আমার স্বামী এটাই চিরসত্যি।'

'শোভা শোভা!'

'কি!'

'ঘরে যাও!'

অনেক বেলায় সেদিন ঘুম থেকে ওঠলাম। রোদে ভেসে গেছে চারদিক। তিন ঘণ্টার রোদ। কলতলায় হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে দেখলাম সুরেনবাবু বসে আছেন বিছানার ওপর। মুখটা ভার ভার। রাত্রি জাগরণ চিহ্ন চোখেমুখে।

'বসো তপন।' তিনিই প্রথম কথা বললেন। আমি কেঁপে ওঠলাম অমঙ্গলের আশঙ্কায়।

'তপন, তুমি আমার ছেলের মত। তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইব।'

আমি কথা বলতে পারছিলাম না। আমার সর্ব অঙ্গ যেন অবশ হয়ে এসেছিল।

'তোমাকে আমি কোন দোষ দিই না, শোভাকেও না। এ সবই আমার ভাগ্য! দেখো বাবা, ছোটবেলাতেই ওদের মা মারা যান। তারপর থেকে আমার চোখের ওপর বড় হয়েছে। কোন অন্যায় আচরণ বা অসঙ্গত কিছু ওদের কাছ থেকে আমি পাইনি। তাই আশ্চর্য হয়েছি কাল রাতে। তপন, তোমাকে স্নেহ করি, শোভাকে ভিক্ষে দাও আমায়!' সুরেন-বাবুর চোখের কোণে জল বুঝি উপচীয়মান।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার ভেতরে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। এ লোকের সামনে চোখ তুলে কিছু বলা যায় না, বিদ্রোহ করার অমানুষিক প্রবৃত্তি হয় না। বিমূঢ় আমি কর্তব্যের পীড়নে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম।

উত্তরের অপেক্ষায় সুরেনবাবু চেয়ে-ছিলেন আমার মুখের দিকে। আস্ত আস্তে বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি চলে যাচ্ছি।'

'তুমি চলে যাবে? তোমার পড়াশুনা!'

'আপনার আশীর্বাদ রইল আমার সঙ্গে।' আমার মুখটা বুঝি বিকৃত হল।

তোমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে এলাম। অরণ্য-বেষ্টিত গ্রাম, গ্রাম এ জায়গায়, মেঘনার পাড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এত ঘটনা ঘটে গেল, চলে আসার সময় তোমাদের কারও ছায়া পর্যন্ত আমি দেখলাম না। মেয়ে বলে হয়ত! তাই না!

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আরোগ্যলাভ করে ভাত পথ্য করলাম এক মাস পর। শরীর সুস্থ হতে লাগল আরও কিছুদিন।

আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, যে অশান্তি অস্বস্তি আর স্মৃতির প্রহারে আমি জর্জরিত, বাড়ী গেলে হয়ত তার কিছুটা উপশম হতে পারে। দুর্নিবার সেই আকর্ষণ আমি আমার টালমাটাল অবস্থায় বিধ্বস্ত মনে উপেক্ষা করতে পারলাম না কোনমতেই।

তখন কার্তিকের শেষ। গ্রামের মাটিতে পা দিয়েই বুকটা আমার কেমন করে ওঠল! মনে হল, মা বুঝি চোখে কাপড় দিয়ে সরে গেলেন বড় আম গাছটার আড়ালে! মসলিনের মত পাতলা কুয়াশার বিস্তার। কিছু কিছু শিশির গায়ে জড়িয়েছিল ঘাম। সন্ধ্যা হব হব। সেই চিরপরিচিত পথ ধরে আমি কম্পিত পায়ে অপরিচিতের মত এগিয়ে চললাম। আমাদের বাড়ীর সামনে যে কড়ই গাছ দুটো ছিল, তা নেই। বিরাট আলু খেত। মুলো আছে, ফুলকপি আছে।

তুলসীতলায় মাটির পিদিম জ্বলছিল, ঠাকুরঘরের বারান্দায় একটা "কুপী"। ঠাকুমা জপ করছিলেন, ডাকতেই এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে হাউহাউ করে উঠলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে কত বিলাপ আলাপ। কত অভিযোগ, অনুযোগ!

জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা কোথায়?'

'বাজারে গেছে', ঠাকুমা বললেন, 'পঞ্চায়েতের সভা আছে।'

রান্নাঘর থেকে বড় ঘরে যাচ্ছিল ঘোমটা টানা এক বধূ! ঠাকুমাকে ইশারা করতেই জোর করেই যেন একগাল হাসলেন, 'তোর নতুন মা! ও বউ, এসো তো এদিকে একবার! শোন্ তপু, প্রণাম করিস!'

বধূ এগিয়ে এল। অনেক পরিচিত সেই চলার ভঙ্গি দেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ত চাইলাম ওর দিকে। মাথায় তার ঘোমটা গিয়েছিল সরে।

আমার কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এল, 'আভা!'

ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'তপন!' কার চাবুকে আমি যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলাম। বললাম, 'ঠাকুমা, যাই!'

'কোথায় যাবিরে? কি সব বলছিস পাগলের মত!'

'মিনি টুনীর সঙ্গে দেখা করবি না?' ঠাকুমা যেন কেঁদে ফেললেন।

'ওরা কোথায় ঠাকুমা?'

'ঠাকুরবাড়ীতে বউ দেখতে গেছে।'

'থাক। ওদের বলো আমার কথা ঠাকুমা!'

'তুই এত পাষাণ হয়েছিস তপু?'

'ঠাকুমা!' কান্নায় আমার মুখটা বুঝি বেঁকে গেল!

একটু নীচু হয়ে ঠাকুমাকে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সাদা থান কাপড়ের মোড়কে ঠাকুমাকে দেখাচ্ছিল দেবতা-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মত। আভাকে দেখাচ্ছিল একটি বিদ্রূপের প্রতিহিংসার ছবি।

নির্জন মেটে পথ ধরে মার-খাওয়া কুকুরের মত আমি এগিয়ে চললাম। তাবৎ জগৎ-সংসার আমার কাছে মূল্যহীন আলোহীন হয়ে গেল, আশ্চর্য, এমন ঘটনাও, মানুষের জীবনে ঘটে!

শোভা, আমি আর যা-ই হই না কেন, গ্রামের জলবায়ুতে গড়া আমার শরীর, বুদ্ধি, সংস্কারকে অস্বীকার করতে আমি পারি না!

আমার শুভেচ্ছা জেনো। বিশ্বাস কর, আমি কাপুরুষ নই, সুযোগ-অন্বেষী মধুকর নই! শোভা, আমি মানুষ।

দুমুখো ট্যাংক !

এই অস্ত্র
চলবেনা
পণ্ডিতজী !
কাইরন ট্যাঙ্ক
বিরোধী
দল
চীন
পূর্ব পাঞ্জাব

দেশও
দশের জন্য
পথে
বসেছি !
লর্ড
হোম
বৃটীশ
প্রধান মন্ত্রী
স্যার হোম

অয়স্কান্ত
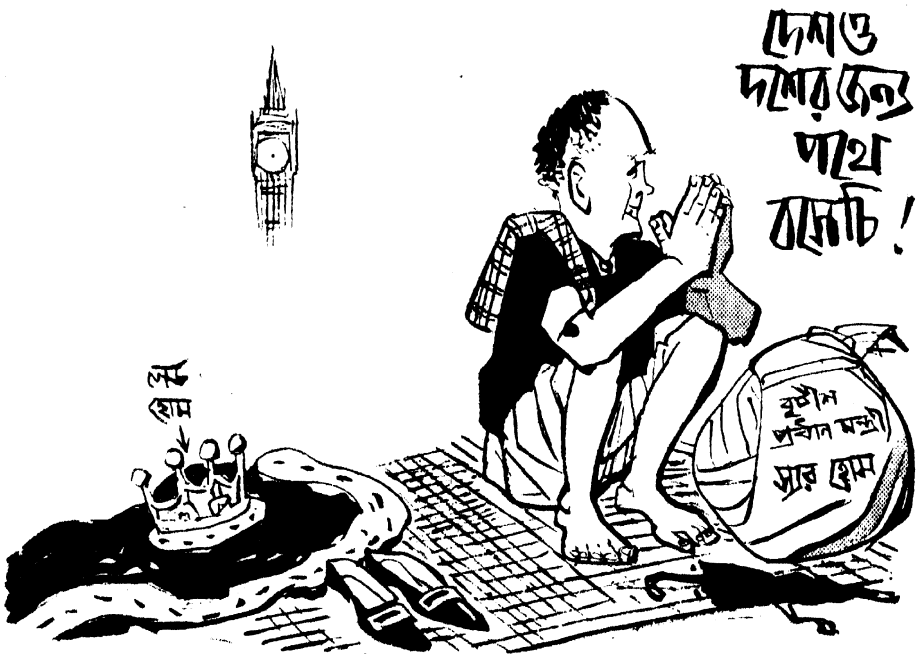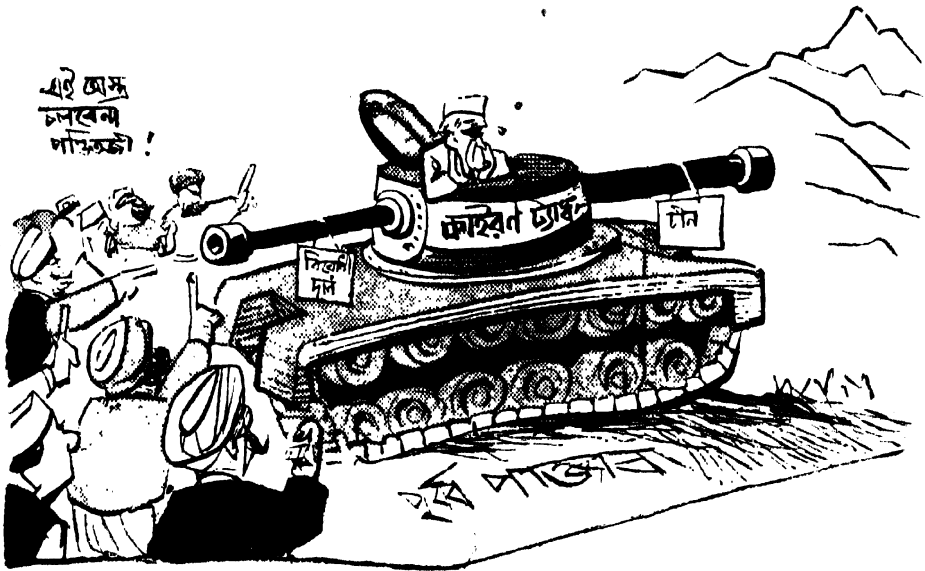
সংখ্যাগণনার অতীতে

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে কতকগুলো তারিখ স্মরণীয় হয়ে ওঠে। জন্মের তারিখ, হাতেখড়ির তারিখ, স্কুলে ভর্তি হবার তারিখ, পরীক্ষায় পাশ করার তারিখ, চাকরিতে যোগ দেবার তারিখ ইত্যাদি। এই তারিখগুলোকে কেন্দ্র করেই আমাদের জীবনযাত্রায় এক-একটি নতুন পর্ব শুরু। কিন্তু এসব বাদ দিলেও অন্তত আরো একটি তারিখ আছে যা প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকা উচিত কিন্তু যা কেউ-ই মনে করে রাখে না। তা হচ্ছে এক-দুই গুণতে শেখার তারিখ। আমরা সকলেই অ-আ-ক-খ শেখার অনেক আগেই এক-দুই গুণতে শিখেছি। আমাদের বাড়ির বাচ্চারা এখনো তাই শেখে। ভবিষ্যতেও তাই শিখবে। অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও, এক-জন মানুষের চলে যেতে পারে। কিন্তু এক-দুই গুণতে না শিখলে জীবনযাত্রা পদে পদে অচল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অথচ, জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য এই জ্ঞানটুকু কোন্ তারিখটিতে আয়ত্ত হল, তা কেউ-ই মনে করে রাখে না।

আর শুধু ব্যক্তি-মানুষ নয়, সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কেও এ-কথাটি সত্যি। আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি, এমন সময়ও ছিল যখন মানুষ গুণতে জানত না। এমনকি সংখ্যা সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু কবে থেকে মানুষ গুণতে শিখেছে তা জানার এখন আর কোনো উপায়ই নেই। আমরা শুধু অনুমান করতে পারি, সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদেই এক সময়ে না এক সময়ে মানুষকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল 'কটা?' বা 'কতগুলি?' শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতিভাই এই প্রশ্নের জবাবে একটি একটি করে সংখ্যা আবিষ্কার করেছে, সঙ্গে সঙ্গে গণনাপদ্ধতিও। আমরা যদি স্বীকার করে নিই যে, বিজ্ঞানের সমগ্র অগ্রগতির মূলে রয়েছে গণিত, তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সমগ্র গণিতের ভিত্তিতে রয়েছে মানুষের এই প্রাথমিক সংখ্যাজ্ঞান। সেক্ষেত্রে সংখ্যার আবিষ্কারককে চিরকালের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের মর্যাদা অবশ্যই দিতে হবে। তা সত্ত্বেও, এই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক কে বা কারা, তা কোনোদিনই আমরা জানতে পারব না।

তবে এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, এই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কোনো বিশেষ প্রতিভাবান মানুষের একক কৃতিত্ব। এটি একটি প্রক্রিয়া। বহু মানুষের বহু আয়াসে লব্ধ ক্রমরূপায়িত একটি সাফল্য। বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা হতে পারে যদি আমরা আদিবাসীদের ভাষার দিকে তাকাই। পৃথিবীতে এমন আদিবাসীর গোষ্ঠী এখনো থেকে গিয়েছে যাদের ভাষায় চারের বড়ো সংখ্যা নেই। এমন গোষ্ঠীও আছে, যাদের ভাষায় দুয়ের বড়ো সংখ্যা নেই। প্রথম ক্ষেত্রে পাঁচ বা ততোধিক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিন বা ততোধিক হলেই বহুবাচক কোনো একটি শব্দের আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে।

আদিবাসীদের ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দের অল্পতা সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে একজন মার্কিন গণিতজ্ঞ একটি অদ্ভুত ঘটনা বলেছেন। ঘটনাটি এই:

ফসলের ক্ষেতে পাখির বড়ো উপদ্রব। পাখির উপদ্রব বন্ধ করবার জন্যে একদিন দুজন মানুষ বন্দুক হাতে ক্ষেতে হাজির হয়। বন্দুকধারী মানুষ দুজনকে দেখে পাখির ঝাঁক আত্মগোপন করে একটা ঝোপের আড়ালে। মানুষ দুজনও অন্য একটা ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। পাখির ঝাঁক তবুও বেরিয়ে আসে না। তখন একজন মানুষ ঝোপ থেকে বেরিয়ে চলে যায়। কিন্তু কোনো ফল হয় না। তারপরে দ্বিতীয় মানুষটিও বেরিয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাখির ঝাঁকও বেরিয়ে আসে ঝোপের আড়াল থেকে। পরদিন হাজির হয় তিনজন বন্দুকধারী মানুষ। সেদিনও একই ব্যাপার। প্রথম জন বেরিয়ে চলে যায়। তারপরে দ্বিতীয় জন। পাখির ঝাঁক তবুও সেই ঝোপের আড়ালেই। তারপরে তৃতীয় জন বেরিয়ে যেতেই পাখির ঝাঁকে সাড়া জাগে। ঝাঁকসুদ্ধ বেরিয়ে আসে বাইরে। তৃতীয় দিন হাজির হয় চারজন বন্দুকধারী মানুষ। সেদিনও প্রথম দুজন একে একে বেরিয়ে যাবার পরেও পাখির ঝাঁক থেকে যায় ঝোপের আড়ালেই। কিন্তু তৃতীয় জন বেরিয়ে যেতেই (চতুর্থ জন তখনো অপেক্ষা করছে) ঝাঁকসুদ্ধ পাখিও বেরিয়ে আসে বাইরে।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, পাখির সংখ্যাগত ধারণার সীমানা হচ্ছে তিন। এক ও দুয়ের তফাৎ তারা বুঝতে পেরেছে, দুই ও তিনের তফাতও, কিন্তু তিন ও চারের তফাৎ ছিল তাদের ধারণার বাইরে। ধারণার এই সীমাবদ্ধতার জন্যে পাখিদের কতখানি মূল্য দিতে হয়, তা সহজেই অনুমান করা চলে।

আদিবাসীদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর সংখ্যাগত ধারণাও এখনো পর্যন্ত এই পাখির স্তরেই থেকে গিয়েছে।

আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। অনেকগুলো পাখিকে একসঙ্গে বোঝাবার জন্যে আমি বলেছি 'ঝাঁক'। কখনো বলব না এক 'পাল' পাখি। বলতে পারি এক পাল 'গোরু'। কখনো বলব না এক 'গুচ্ছ' গোরু। বলতে পারি এক 'গুচ্ছ' আঙুর। এমনি বহুবাচক শব্দ আমাদের ভাষায় আরো আছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষাতেই আছে। কিন্তু বহুবাচক শব্দের বেলায় প্রয়োগক্ষেত্রের এতখানি বাছাবিচার সত্ত্বেও সংখ্যাবাচক শব্দগুলোকে কিন্তু আমরা নির্বিচারেই ব্যবহার করে থাকি। আমরা অনায়াসেই বলতে পারি একটি মানুষ দুটি মানুষ, একটি পাখি দুটি পাখি, একটি ফুল দুটি ফুল ইত্যাদি। অর্থাৎ সংখ্যাবাচক শব্দগুলো আমাদের কাছে নৈর্ব্যক্তিক। এটি আধুনিক কালের লক্ষণ। কিন্তু আমাদের ভাষার মধ্যেই এমন সাক্ষ্য থেকে গিয়েছে, যা থেকে বোঝা যায়, সংখ্যাগণনার অতীতে সমষ্টিকে বোঝাবার জন্যে আদিমানুষ যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করত, তার প্রয়োগ ছিল পাত্রনির্ভর। অনেকটা বিশেষণ শব্দের প্রয়োগের মতো।

সাক্ষ্য আছে আরো অনেক কিছুরই। যেমন, আমাদের ব্যাকরণে বচন আছে তিনটি : একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। ইংরেজি ভাষায় দুটি : একবচন ও বহুবচন। চার বা পাঁচ বচন বিশিষ্ট ভাষাও পৃথিবীতে আছে। আবার পাত্রভেদে সংখ্যাবাচক শব্দের রূপ পাল্টায়—এমন নজিরেরও অভাব নেই। পোলিশ ভাষায় দ্বিবাচক শব্দটির চারটি রূপ আছে—দুজন পুরুষ হলে একটি রূপ, দুজন

স্ত্রীলোক হলে অন্য একটি রূপ, একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হলে অন্য আরেকটি রূপ, দুটি নিষ্প্রাণ বস্তু হলে অন্য আরেকটি রূপ।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দগুলো আচমকা এক-একদিনে তৈরি হয়ে যায়নি। প্রত্যেকটি শব্দ দীর্ঘ এক-একটি প্রক্রিয়ার ফল।

আবার এই ভাষাকে বিশ্লেষণ করেই এই প্রক্রিয়া সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা করা চলে। পৃথিবীর বহু ভাষাতেই এমন সাক্ষ্য রয়েছে যে, একই শব্দের সাহায্যে সংখ্যা ও আঙুল বোঝানো হয়ে থাকে। সংখ্যাবাচক শব্দ তৈরি হবার আগে বহুকাল পর্যন্ত মানুষের হাত-পায়ের আঙুলই ছিল গণনার উপায়। বিশেষ করে কোনো কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষায় সংখ্যার সঙ্গে হাত-পায়ের আঙুলের সরাসরি সম্পর্কটা খুব স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

তামানাকাস নামে আদিবাসীদের এক গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায় যাদের ভাষায় চার পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ আছে। পাঁচ বোঝাতে হলে তারা বলে,, একটি পুরো হাত। ছয় বোঝাতে হলে বলে, অন্য হাতের একটি। দশ বোঝাতে হলে বলে, দুটি পুরো হাত। এগারো বোঝাতে হলে বলে, পায়ের একটি। পনেরো বোঝাতে হলে বলে, একটি পুরো পা। ষোল বোঝাতে হলে বলে, অন্য পায়ের একটি। কুড়ি বোঝাতে হলে বলে, এক মানুষ। একুশ বোঝাতে হলে বলে, অন্য মানুষের একটি। চল্লিশ বোঝাতে হলে বলে, দুই মানুষ। ষাট বোঝাতে হলে বলে, তিন মানুষ।

বলা বাহুল্য, শুধু এক-দুই গুণতে বা বোঝাতে শেখাটাই যথেষ্ট নয়। লেন-দেনের প্রয়োজনে কিছু কিছু আঁক কষতে শেখাটাও জরুরি। মিশরের পুরাণ-কথায় বলা হয়েছে, গণিত সৃষ্টি করেছেন বাণিজ্যের দেবতা। পুরাণ-কথার ওপরে নির্ভর না করেও বলা চলে, বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই গণিতের সৃষ্টি।

গুণতে শেখার মতো আঁক কষতে শেখাটাও ছিল সময়সাপেক্ষ দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়া। গত শতাব্দীতে আফ্রিকায় ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্তে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যা থেকে এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হতে পারে। একটি ঘটনা বলি।

ঘটনাটি ঘটেছিল দামারা নামে একটি উপজাতির একজন মানুষের কাছ থেকে ভেড়া কিনতে গিয়ে। দর ঠিক হয়েছিল একটি ভেড়ার জন্যে দু-আঁটি তামাক। ক্রেতা দুটি ভেড়া নিয়ে একসঙ্গে চার আঁটি তামাক দিয়ে লেন-দেনের ব্যাপারটা চুকিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু উপ-জাতীয় মানুষটির কাছে সেটাই হয়ে ওঠে সমস্যা। প্রথমে সে একটি ভেড়ার জন্যে দুটি আঁটি তুলে নেয়। তারপরে অবাক হয়ে আবিষ্কার করে আরো দুটি আঁটি পড়ে থাকছে। তারপরে অন্য ভেড়াটির দাম হিসেবে এই দুটি আঁটিকে হিসেব করতে গিয়ে গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে কেমন গোলমেলে ঠেকে। তখন সে আবার দুটি আঁটি নিয়ে প্রথম ভেড়াটার সঙ্গে মেলাতে শুরু করে। তখনো চোখে পড়ে, আরো দুটি আঁটি বাকি থাকছে। সে কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তাকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করে ক্রেতাই। এবারে ক্রেতা করে কি, প্রথমে দুটি আঁটি মানুষটির হাতে দেয় আর একটি ভেড়া টেনে নেয়। তারপরে বাকি দুটি আঁটি মানুষটির হাতে দেয় ও অন্য ভেড়াটি টেনে নেয়। এবারে আর মানুষটির হিসেবে কোনো গোলমাল হয় না।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, দুয়ে দুয়ে যে চার হয় এই সহজ হিসেব-টুকুও মানুষটির জানা ছিল না। এই সামান্য বিদ্যেটুকু আয়ত্ত করবার জন্যেও তাকে অনেক বার ঠেকতে হবে, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

মানবজাতি সম্পর্কেও একই কথা। অনেক ঠেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাকে এক-দুই গুণতে শিখতে হয়েছে। অনেক ঠেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাকে দুয়ে দুয়ে চার করবার বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয়েছে। আজকের দিনের ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের যুগে বাস করে অতীতের এই কষ্টসাধ্য প্রয়াসকে হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষের এই আশ্চর্য সভ্যতা গড়ে উঠেছে এমনি কতকগুলো সামান্য সামান্য বিদ্যে আয়ত্ত করবার জন্যে মানুষের দুরূহ আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টার সাফল্যের মধ্যে দিয়েই।

একজন ভারতীয় গণিতজ্ঞ সম্পর্কে প্রচলিত একটি গল্পের উল্লেখ করে আজকের আলোচনা শেষ করছি।

ভাস্কর পণ্ডিত ও লীলাবতী

ভারতীয় গণিতজ্ঞ ভাস্কর (১১১৪-১১৮৫?) রচিত গণিতগ্রন্থ সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় আলোচনার সূত্রপাত করেন উলউইচের রয়েল মিলিটারি আকাদেমির গণিতের অধ্যাপক চার্লস হাটন (১৭৩৭—১৮২৩)। তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর এই আলোচনা-গ্রন্থটি তৎকালে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই ভাস্কর পণ্ডিত সম্পর্কেই একটি গল্প।

ভাস্করের গ্রন্থটির নাম 'লীলাবতী'। এই গ্রন্থটি প্রথম অনূদিত হয় পারসিক ভাষায়। এই গ্রন্থেরই রচনা সম্পর্কে কাহিনী প্রচলিত আছে :

ভাস্কর পণ্ডিতের মেয়ের নাম ছিল লীলাবতী। জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্রের বিচার থেকে জানা যায় যে, লীলাবতীর ভাগ্যই হচ্ছে চিরকুমারী থাকা। ভাস্কর পণ্ডিত গণনার দ্বারা আরো জানতে পারলেন যে, লীলাবতীর এই ভাগ্য পরিবর্তিত হতে পারে যদি বিশেষ একটি শুভ মুহূর্তে লীলাবতীর বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। সেক্ষেত্রে লীলাবতীর স্বামীবতী ও সন্তানবতী হতে বাধা থাকবে না। যথাসময়ে ভাস্কর পণ্ডিত লীলাবতীর বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করলেন ও শুভ মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্থাপন করলেন একটি জলঘড়ি এবং একজন জ্যোতিষীকে বললেন যে, জলঘড়ির জলের উপরে ভাসমান পাত্রটি যেই মুহূর্তে জলের মধ্যে ডুবে যাবে সেই মুহূর্তেই যেন লীলাবতীর বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। এইভাবে সুনিশ্চিত বন্দোবস্ত করার পরে ভাস্কর পণ্ডিত নিশ্চিন্ত বোধ করে স্থানত্যাগ করলেন।

কিন্তু এতখানি আয়োজন করার পরেও ভাস্কর পণ্ডিত ভাগ্যের লিখনকে খণ্ডাতে পারেননি। বধূবেশে সজ্জিতা লীলাবতী ও ভাবী বর অপেক্ষা করছিলেন জলঘড়ির সামনে। লীলাবতীর হঠাৎ কৌতূহল হল, তিনি জলঘড়ির ওপরে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি জানতেও পারলেন না যে,, তাঁর সজ্জা থেকে একটি মুক্তা খসে গিয়ে পড়েছে ভাসমান পাত্রটির মধ্যে। পাত্রের নিচে যে ছিদ্রটি দিয়ে পাত্রে জল ঢুকছিল, মুক্তাটি সেই ছিদ্রপথকেই বন্ধ করে দেয়। পাত্রের ভেতরে আর জল ঢুকতে পারে না। ফলে পাত্রটি ভাসতেই থাকে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও পাত্রটি ডুবছে না দেখে ভাস্কর পণ্ডিতকে খবর পাঠানো হল। ভাস্কর পণ্ডিত এসে দেখলেন, মুক্তায় পাত্রের ছিদ্র বন্ধ হয়ে রয়েছে। পাত্রটি তাই ডোবেনি। ওদিকে বিবাহের নির্দিষ্ট শুভলগ্ন পার হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই।

ভাস্কর পণ্ডিত তখন লীলাবতীকে বলেছিলেন, দুঃখ করিস নে মা। স্বামী-পুত্র না হোক, আমি তোকে এই পৃথিবীতে অমর করে রেখে যাব।

ভাস্কর পণ্ডিত তাঁর গণিত-গ্রন্থটির নাম রাখলেন 'লীলাবতী'।

গোধূলিবেলা চিত্রে বিশ্বজিৎ। [ফটো : অমৃত

নান্দীকর

আজকের কথা :

বাঙলা চলচ্চিত্র প্রযোজনার ব্যবসায়িক পরিস্থিতি

আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশের স্বাধীন চলচ্চিত্র প্রযোজকরা জিনিসটাকে কিভাবে নিয়েছেন, তা সঠিক পরিষ্কারভাবে আমাদের জানা নেই। ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র প্রযোজনার তিনটি মূলকেন্দ্র—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতার মধ্যে মাদ্রাজের মিঃ ভাসান, মিঃ বি এন রেড্ডী, মিঃ মায়াপ্পা প্রমুখ চিত্র-প্রযোজকরা চলচ্চিত্র প্রযোজনাকে একটা ব্যবসায়িক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার জন্যে যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, এটা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু বোম্বাই এবং কলকাতার অধিকাংশ চলচ্চিত্র-প্রযোজকই যে জিনিসটাকে স্রেফ রেস-খেলার মতো জুয়ার সামিল ব'লেই গণ্য করেন, তা' তাঁদের কথাবার্তা, চালচলন এবং হাবভাবে বেশ প্রকাশ পায়। বোম্বাইয়ের কথা বা দিয়ে বাঙলা দেশের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের একজন সাধারণ চিত্র-প্রযোজকের কথাই ধরি। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, একটি বাঙলা ছবি থেকে সবচেয়ে কত বেশী এবং সবচেয়ে কত কম আয় আশা করা যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা নেই। এমন কি, পশ্চিমবঙ্গে বাঙলা ছবি দেখবার কতগুলি কেন্দ্র আছে এবং বাঙলা দেশের বাইরেই বা কোথায় কোথায় বাঙলা ছবি দেখানো সম্ভব, সে-খবরও তাঁর জানা নেই। অথচ একজন দ্রব্য-প্রস্তুতকারক তাঁর উৎপন্ন দ্রব্যের কোথায় কি রকম কাটতি এবং মোট কত বিক্রী হ'তে পারে, এ সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু ধারণা না নিয়েই কাজে নামেন কি? ওয়াকিবহাল মহলে জানা আছে যে, একটি বাঙলা ছবিতে দেড় লাখের ওপর 'নেগেটিভ কস্ট' (প্রথম মুদ্রণ পর্যন্ত ছবি তোলার খরচ) হওয়া উচিত নয়; অথচ এও কারুর অজানা নেই যে, মাত্র নায়িকার ভূমিকাতেই অভিনয় করবার জন্যে কোনো কোনো চিত্র-প্রযোজক ঐ দেড় লাখ টাকা না হোক্ অন্ততঃ লাখ টাকার ওপর দিয়ে থাকেন একজন অভিনেত্রীকে। অনুমান করা কঠিন নয়, এ-ক্ষেত্রে ছবিটি সম্পূর্ণ করতে ব্যয় গিয়ে দাঁড়ায় অন্ততঃ চার পাঁচ লাখ টাকায়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, কি ভরসায় প্রযোজক এই টাকা খরচ করতে প্রবৃত্ত হন। আরও স্পষ্ট ক'রে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, কোন্ ব্যবসাবুদ্ধিতে ভদ্রলোক এই অর্থ ব্যয় ক'রে থাকেন। এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে—ভাগ্য পরীক্ষা; অর্থাৎ 'কপাল' মাত্র ভরসা কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি নেই এতটুকু। যে-জুয়াড়ী মনোবৃত্তি-চালিত হয়ে লোকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে 'উইন'-এর টিকিট কেনে, পুরো-পুরি সেই মনোবৃত্তির বশেই বাঙলা ছবির অধিকাংশ প্রযোজক তাঁদের ছবির নায়িকার ভূমিকাভিনেত্রীকে লাখ টাকা পারিশ্রমিক দেবার কথা চিন্তা ক'রন। সব ছবিই যে 'হিট' ছবি হয়না, বা 'হিট' ছবির পক্ষেও পঁচিশ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রী হওয়া আদৌ সহজ নয়, এ-সব কথা ভেবে দেখবার মতো তাদের মনই নেই। 'শ্রীমতী' অমুককে আমার ছবির নায়িকা হিসেবে চাই-ই চাই, এই জিদ বহু ছবির প্রযোজককে প্রায় নেশার মতো পেয়ে বসে। এবং এ ব্যাপারে ইন্ধন জোগান, ছবির পরিবেশক-গোষ্ঠী। যে-কোনোও পরিবেশকের কাছে ছবির পরি-বেশনা সংক্রান্ত কথা কইতে গেলেই তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবেন, ছবির নায়ক-নায়িকা কারা। যদি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারেন, অমুক 'কুমার' এবং 'শ্রীমতী' অমুক আছেন, তা'হলেই তিনি প্রযোজকের সঙ্গে পরিবেশনা সম্পর্কে কথা কইতে অগ্রসর হবেন এবং যদি তা' না পারেন, তাহলে তিনি বিজ্ঞের মতো পরামর্শ দেবেন, 'বিজিনেস' করতে চান

'কালস্রোত' চিত্রে সুস্মিতা সান্যাল

তো ঐ দুজনকে নিদেন পক্ষে ঐ দুজনের একজনাকে আগে বুক্‌ করে ফেলুন, তারপর আসবেন কথা কইতে। পরিবেশকের গূঢ় উদ্দেশ্য কি, তা' প্রযোজক বেচারা ধরতেই পারেন না। পরিবেশক সব সময়েই চাইবেন, প্রযোজকের ছবিতে আগাম হিসেবে তিনি যে-টাকা লগ্নী করবেন, সেই টাকাটা ফিরে আসা সম্পর্কে তিনি যেন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এবং তিনি জানেন, তিনি যদি তাঁর পরিবেশিত ছবিতে বাঙলা দেশের সেরা নায়ক-নায়িকা দুজনেই বা অন্ততঃ একজনও আছেন ব'লে ঘোষণা করতে পারেন, তাহলে চিত্রগৃহের মালিকের বা প্রদর্শকেরা সেই ছবি দেখাবার আশায় আগাম টাকা নিয়ে তাঁর দরজায় ভীড় করতে বাধ্য। অর্থাৎ 'স্টার' ভ্যালুওয়ালা ছবির ক্ষেত্রে আজও আগাম ব্যবসা এই বাঙলা দেশে বেশ ভালো ভাবেই চলে। প্রদর্শক, পরিবেশক এবং প্রযোজক এ-বিষয়ে একমত যে, বাঙলা দেশের সেরা নায়ক-নায়িকার মধ্যে অন্ততঃ একজনকেও ছবিতে রাখতে পারলে ছবি শেষ পর্যন্ত যাই দাঁড়াক না কেন, প্রথম দু'টো সপ্তাহ বেশ জোর টিকিট বিক্রী হবেই হবে এবং তাতেই 'ভবপারাবার পার হওয়া' একেবারে সুনিশ্চিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, তিনজনের অবস্থা তিন রকম। প্রদর্শক তো যেদিন থেকে তাঁর চিত্রগৃহটি চালু করেছেন, সেদিন থেকে তাঁর লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে আছেন; অবশ্য কোনো ছবিতে কম, কোনো ছবিতে বেশী। এমন কি, ছবি খারাপ হ'লে তিনি এক সপ্তাহের জন্যে ছবি 'বুক' ক'রেও তিনদিন বাদেই 'ক্যান'-ভর্তি ছবি ফেরত পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। পরিবেশক যে-টাকা প্রযোজককে 'অগ্রিম' হিসেবে দেন, তার বেশীরভাগই বিভিন্ন প্রদর্শকের কাছ থেকে ছবি মুক্তি পাবার আগেই আদায় ক'রে নেন; যেটুকু টাকা বাকী থাকে, তা' ছবি চলার কালে প্রায়ই উসুল হয়ে যায়। যদি ছবি খারাপ হওয়ার দরুণ তা' না হয়, তা হ'লেও আগাম এবং কমিশনের টাকা এক ক'রে তাঁর 'অগ্রিম' দেওয়া টাকার অংক পূরণ হয়ে যায়। ছবি একান্ত খারাপ হ'লে কচিৎ কদাচিৎ কয়েক হাজার টাকা আদায়ের কোনো সম্ভাবনা না থাকলে তিনি প্রযোজককে ঐ টাকাটা দেবার জন্যে প্রায়ই বাধ্য করেন। কিন্তু প্রযোজক? তিনি ছবির প্রযোজক সাজবার জন্যে নিজের সিন্ধুক থেকে বা পরের কাছ থেকে ঋণ ক'রে যে-টাকাটা—সেটি প্রায়ই লাখ খানেকের কম হয় না—ব্যয় করেছেন, সেটি ফেরত পান মাত্র তখনই, যখন তাঁর ছবি 'হিট' করে অর্থাৎ জনপ্রিয় হয়। কিন্তু ছবি মাঝারি গোছের, চলনসৈ বা খারাপ হ'লে তিনি একটি নয়া পয়সারও মুখ দেখতে পান না। ছবি দারুণ 'হিট' করেছে যখন, তখনও প্রযোজক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর নিজের সম্পূর্ণ টাকা ফেরত পেতেই নাজেহাল হয়ে যান এবং যদিই বা কখনও কিছু লভ্যাংশের মুখ দেখতে পান, সেটা যত গর্জায়, ততটা বর্ষায় না অর্থাৎ 'হিট'-এর তুলনায় সামান্যই। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, বিক্রয়লব্ধ ১০০্ টাকার মধ্যে প্রযোজকের অংশে পড়ে মাত্র ২০্।২১্ টাকা।

আজ চিত্র প্রযোজনার ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঁচা ফিল্ম, রসায়নদ্রব্য, সেট নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঠ, কাপড়, রং, পেরেক, স্ক্রু প্রভৃতি, সাজ-পোশাক, মেকআপ দ্রব্যাদি প্রভৃতি সব জিনিসের দামই গগনস্পর্শী। শিল্পী, কলাকুশলী এবং অপরাপর কর্মী—সকলেই আজ অধিক পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। কাজেই বর্তমানে একটি ছবি নির্মাণ করতে অন্ততঃ দেড় লক্ষ থেকে দু'লক্ষ টাকা ব্যয় হ'তে বাধ্য। এই দেড় বা দু'লক্ষ টাকা অন্ততঃ শতকরা ছ'টাকা ব্যাজ সমেত যাতে ছবির প্রযোজক ফেরত পেতে পারেন, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। ছবি যাতে তার কাহিনী, চিত্রনাট্য, অভিনয়, কলাকৌশলের অপরাপর বিভাগ প্রভৃতির একটি সর্বজনগ্রাহ্য নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে পারে, সে সম্পর্কে বাঙলা দেশে চলচ্চিত্র-শিল্প সংক্রান্ত একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রযোজনা-বিভাগের অবহিত হওয়া উচিত। প্রয়োজন বোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে একটি "স্ট্যাটুটরী ফিল্ম কাউন্সিল" গঠন ক'রে তার ওপর চলচ্চিত্র প্রযোজনা, পরিবেশনা এবং প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধিনিষেধ ও নিয়মাবলী প্রবর্তনের ব্যবস্থা করতে পারেন।

চলচ্চিত্র প্রযোজনাকে জুয়াখেলা থেকে ব্যবসায়ে পরিণত না করতে পারলে এই শিল্পকে প্রকৃত সাহায্য করার কোনো পথই আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশন :

১৯৫১ সালে প্রকাশিত ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটির (চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতির) রিপোর্টে একটি সুপারিশ ছিল : প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো চলচ্চিত্র প্রযোজনায় অর্থসাহায্য করা। সকলেই জানেন, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে লগ্নী করবার জন্যে সচরাচর ধার পাওয়া যায় না; যদিই বা পাওয়া যায়, সে অত্যন্ত চড়া সুদে। শুনেছি, কোনো কোনো চিত্র-প্রযোজক মাসিক শতকরা ছ' টাকা অর্থাৎ বাৎসরিক শতকরা বাহাত্তর টাকা সুদ দিতে রাজী হয়ে টাকা ঋণ করতে বাধ্য হয়েছেন ছবি তৈরীর ব্যবসায়ে টি'কে থাকবার জন্যে। পৃথিবীতে সম্ভবতঃ অন্য কোনো ব্যবসা নেই, যাতে এত বেশী হারে সুদ দেওয়ার রেওয়াজ আছে। সৌভাগ্যক্রমে এই অসহনীয় আর্থিক পরিস্থিতিটা এনকোয়ারী কমিটির সদস্যদের নজরে পড়েছিল এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়—চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এই শিল্পের প্রযোজনাক্ষেত্র অর্থের অভাবে মরুভূমিতে পরিণত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে সরকারকে একটি ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশন স্থাপন করবার জন্যে সুপারিশ করেন। কোনো কৃতী প্রযোজক যাতে অর্থের অভাবে তাঁর ছবিকে অর্ধ পথ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য না হন, যাতে তিনি অল্প সুদে সরকারের কাছ থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন, এই সাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই তাঁরা এই সুপারিশ করেছিলেন। কমিটির সুপারিশকে কার্যকরী করবার শুভেচ্ছা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬১ সাল থেকে ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু কিছু চলচ্চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠান এই কর্পোরেশনের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যও পাচ্ছেন। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, যে-সব প্রযোজক প্রতিষ্ঠান এই অর্থসাহায্য পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই চলচ্চিত্র-প্রযোজক রূপে নবাগত এবং অতীত কৃতিত্ব বলতে তাঁদের কোনো মূলধন নেই। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই আর্থিক সাহায্য করবার ব্যাপারে কতকগুলি নিয়মাবলী রচনা করেছেন। সেই নিয়মাবলীতে নিশ্চয়ই নূতন পুরাতন ভেদাভেদ নেই, কিম্বা পুরাতন প্রতিষ্ঠিত প্রযোজকেরা সরকারী সাহায্যের ভিখারী নন। এবং সেই কারণেই কর্পোরেশনের সাহায্যপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত চিত্র-প্রযোজকদের নাম অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে অনুপস্থিত। শোনা গিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সাহায্য লাভে সুবিধা করবার জন্যে বাঙলা চিত্র-প্রযোজকদের হয়ে 'জামিন' দেবার (গ্যারান্টার দাঁড়ানোর) জন্যে সম্মত হয়েছিলেন। জানি না, এ ব্যাপারে আমাদের রাজ্য সরকার কোনো কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করেছেন কিনা।

'স্বর্গ হ'তে বিদায়' চিত্রে অনুভা গুপ্তা

বিবিধ সংবাদ

বেতার সংগীত সম্মেলন :

২রা নভেম্বর থেকে শুরু ক'রে ১০ই পর্যন্ত বেতার-কর্তৃপক্ষ সারা ভারত বেতার সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত করছেন বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রের উদ্যোগে। লক্ষ্য করবার বিষয়, উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান যেখানে মাত্র বারোটি অধিবেশনে সম্পন্ন হবে, সেখানে দক্ষিণ ভারতীয় অর্থাৎ কর্ণাটকী সংগীতানুষ্ঠানের জন্যে কুড়িটি অধিবেশন বরাদ্দ হয়েছে। বেতার-কর্তৃপক্ষের এ ধরনের পক্ষপাতিত্বের কারণ কি, জানলে খুশী হতুম। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ বলেন, সারা বিশ্বে যখন নৈতিক অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তখন সংগীত, বিশেষ ক'রে ধর্ম-সংগীতই আমাদের আশান্বিত ক'রে তুলতে পারে। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি এম এস শুভলক্ষ্মীর ধর্মসংগীতের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন, "এ'র আশ্চর্য মধুর কণ্ঠ আমাদের যুগের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।"

বেতার-কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সারা ভারতে যে সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন, তাতে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম নীচে দেওয়া হল :—

(ক) উত্তর ভারতীয় সংগীত

উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসংগীত : (১) কুমারী প্রভাতী মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা); (২) কুমারী জয়শ্রীনারায়ণ

'মেরে মেহবুব' চিত্রের তিনজন শিল্পী—প্রাণ, অমিতা এবং রাজেন্দ্রকুমার। ফটো : অমৃত

পতকার (বোম্বাই) এবং রাজশেখর এম মনসুর (ধারওয়ার)।

লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীত : (১) কুমারী লতাং লিমায়ে (পুণা); (২) কুমারী উত্তরা ঘোষ (কলিকাতা)।

লঘু কণ্ঠসংগীত : কুমারী প্রভাতী মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা); (২) কুমারী এস রাজেশ্বরী আয়ার (দিল্লী)।

যন্ত্রসঙ্গীত (সেতার) : (১) পুরস্কার প্রদত্ত হয়নি; (২) কুমারী ছায়া গোস্বামী (কলিকাতা)।

বৃন্দগান (লোকসংগীত) : (২) শশিকান্ত ত্রিবেদী ও সম্প্রদায় (রাজকোট)।

(খ) কর্ণাটক সংগীত

উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসংগীত : (১) কুমারী এম আর বিজয়া (কলিকাতা); (২) কুমারী জি কে রাজেশ্বরী (ত্রিচুরপল্লী) এবং এন রামচন্দ্রন পিল্লাই (ত্রিবান্দ্রম)।

লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীত : (২) আর এন ত্যাগরাজন (বাঙ্গালোর)।

যন্ত্রসংগীত (বেহালা) : (১) এল সুব্রহ্মণ্যম (মাদ্রাজ)।

যন্ত্রসংগীত (বীণা) : (১) কুমারী আর মীণাক্ষী (ত্রিচুরপল্লী)

যন্ত্রসংগীত (মৃদঙ্গ) : (১) আর মণি (মাদ্রাজ); (২) মল্লপুরী শ্রীরামমূর্তি (বেজওয়াদা)।

বৃন্দগান (রাগপ্রধান) : (২) কুমারী সি আর প্রেম ও সম্প্রদায় (মাদ্রাজ)।

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের সাহায্য :

ইউ-এন-আই-এর সংবাদে প্রকাশ, ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া সম্প্রতি দু'খানি হিন্দী এবং দু'খানি বাঙলা ছবির জন্যে মোট বারো লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। বাঙলা ছবি দুটি হচ্ছে : দিবিত্রি ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেড প্রযোজিত এবং মঞ্জু দে পরিচালিত "স্বর্গ হতে বিদায়" (সাহায্যের পরিমাণ দু' লক্ষ টাকা) এবং চিলড্রেন্স ফিল্ম ফাউণ্ডেসন প্রযোজিত এবং রবি বসু পরিচালিত "রাজার রাজা" (সাহায্যের পরিমাণ দেড় লক্ষ টাকা)।

ক্ল্যারিয়ন অ্যাডভার্টাইজিং-এর সামাজিক সম্মেলন :

প্রথম বার্ষিক সামাজিক সম্মেলন উপলক্ষে স্টার রঙ্গমঞ্চে দুটি নাটক অভিনয় করলেন ক্ল্যারিয়ান অ্যাডভার্টাইজিং রিক্রিয়েশন ক্লাব ২৯এ অক্টোবর তারিখে।

নাটক দুটি ছিল রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'কৃপণের ধন' এবং সৌম্যেন রায়-কৃত নাট্যরূপ পরশুরামের 'সরলাক্ষ হোম'। নাটক দুটি পরিচালনা এবং সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীমনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবারীন চট্টোপাধ্যায়।

কৃপণের ধন নাটকে অমলাংশু মৈত্র, কনক মুখো, অমল ঘোষ, মোহিত

ভট্টাচার্য এবং ফণী মজুমদার যথাক্রমে হলধর হালদার, মন্মথ, মধু-খুড়ো, পুরোহিত এবং হাবার ভূমিকায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

সরলাক্ষ হোম-এ অমলাংশু মৈত্র, দীপক রায়, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, মোহিত ভট্টাচার্য এবং কমল শুর যথাক্রমে সরলাক্ষ হোম, বরুণ বিশ্বাস, বটুক সেন, বড়বাবু এবং অধঃস্তন সহকারী হিসেবে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান।

অনুশীলন সম্প্রদায়ের নিয়মিত অভিনয় :

বিশিষ্ট নাট্য গোষ্ঠী অনুশীলন সম্প্রদায় তাঁদের বহুপ্রশংসিত নাটক 'শেষ সংবাদ' গত ৯ই অক্টোবর থেকে মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে নিয়মিতভাবে প্রতি বুধবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করছেন। নির্দেশনায় আছেন শ্রীমমতাজ আহমেদ খাঁ এবং মঞ্চনির্দেশনায় শ্রীমদন গুপ্ত ও সুবিমল রায়।

অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছেন চারু-প্রকাশ ঘোষ, বীরেশ্বর সেন, মমতাজ আহমেদ খাঁ, সুব্রত সেন, বিশ্বেশ্বর সেন, অমল কর, আদিত্য পাল, সুবিমল রায়, সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুন্দর সরকার, ননী নাগ, মুরারী ভট্টাচার্য, অরুণ দে, রাধা রায় ও অণিমা দাসগুপ্ত।

বাটানগরে 'নৃত্যনাট্য' :

বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাবের সৌজন্যে ১৮ই অক্টোবর (শুক্রবার) সন্ধ্যা ৬টায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব-হলে নৃত্য-শিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের সম্পাদক শ্রীঅসিত চক্রবর্তী। কণ্ঠ-সংগীতে ও যন্ত্র-সংগীতে অংশগ্রহণ করেন—নির্মলেন্দু বিশ্বাস, তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না সেনগুপ্তা, অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, কেশব শীল ও শংকর পাণ্ডিত। নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, চিত্রা সরকার, পূর্ণিমা হালদার, আলো বাগচী, সুতপা দত্ত, বেদানা রায়চৌধুরী, কৃষ্ণা রায়, পাপড়ী বসু ও সাথী গুপ্তর নৃত্যকলা দর্শনে দর্শকমণ্ডলী মুগ্ধ হন।

'বিদ্যাপতি' চিত্রে বোম্বাইয়ের অভিনেত্রী সিমি।

ফটো : অমৃত

বোকারোতে বিজয়া সম্মিলনী :

ডি ভি সি বোকারো থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের 'নাটাম' সংস্থার সভাবৃন্দ আসছে ১০ই নভেম্বর বৈকাল সাড়ে ছ'টায় বোকারো ক্লাবে বিজয়া সম্মিলনী উৎসবে মিলিত হবেন। এই উপলক্ষে তাঁরা পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত' নাটকটি মঞ্চস্থ করিবেন। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন : সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু রক্ষিত, চাণক্য চক্রবর্তী, সুবীর রায়, বিশ্বনাথ মজুমদার, বিমল সেন, মৃণাল জানা, হেলারাম গুই, সুনীল মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল দাস, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তমোনাশ দাস ও গোপালচন্দ্র দে এবং স্ত্রী-চরিত্রে শুভ্রা মুখোপাধ্যায় (তপতী) মমতা ঠাকুর (বাণী) এবং জ্যোৎস্না ঠাকুর (মা)।

শ্রীসংঘের বিজয়া সম্মিলনী

উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত সংস্থা শ্রীসংঘের পরিচালনায় বাদুড়বাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব অন্তে বিজয়া-দ্বাদশীর সন্ধ্যায় (২৯শে অক্টোবর ১৯৬৩) শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের পৌরোহিত্যে ও শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরীর প্রধান আতিথ্যে বিজয়া সম্মিলনী হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথি নাতিদীর্ঘ ভাষণে বিজয়া-উৎসবের তাৎপর্যর ওপর আলোকপাত করেন। তারপর শুরু হয় বিজয়া সম্মিলনীর আনন্দ অনুষ্ঠান। জনপ্রিয় কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত শিল্পীরা স্থানীয় পল্লীবাসীদের আনন্দবর্ধন করেন। উপস্থিত শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'অংগীকার'-এ শোভা সেন ও মুকুল

উল্লেখ্য হচ্ছেন : শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, দ্বিপেন সিংহ, শিবনাথ দাস, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু চৌধুরী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধুরী মুখোপাধ্যায়, রীণা চক্রবর্তী, যন্ত্রসংগীতে ভি বালসারা ও তাঁর সম্প্রদায়, হাস্যকৌতুকে সুশীল চক্রবর্তী ও শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়। নানাভাবে সংগতে সহায়তা করেন : রাধাকান্ত নন্দী, পার্থসারথী বসু, কমল সেনগুপ্ত, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ দাশ, রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমুদ ঘোষ ও লক্ষ্মী সিংহ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিমল বসু।

একটি ভিন্ন স্তরের ছবি :

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার সৌজন্যে সেদিন একখানি রুশ ছবি দেখলুম। ছবিটির নাম—"আইভ্যানস চাইল্ডহুড" (আইভ্যানের ছেলেবেলা)। আন্দ্রে তার্কোভোস্কি নামে যে পরিচালকটি এই ছবিখানির পরিচালনা করেছেন, তাঁর বয়েস মাত্র একুশ বছর। এইটিই তাঁর প্রথম ছবি এবং ছবিখানি ১৯৬২ সালের ভেনিস ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার স্বরূপ গ্র্যান্ড প্রিক্স লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন বার্লিনের পতন ঘটে, তখন একটি বিধ্বস্ত প্রাসাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজপত্রের ভিতর থেকে জার্মান কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিহত বহু রুশ নাগরিকের আলোকচিত্রসংবলিত জীবনীপঞ্জী থেকে আইভ্যান নামে একটি বছর চোদ্দ বয়েসের ছেলের বিবরণ হস্তগত হয়। তাতে দেখা যায়, জনৈক গ্রাম্য নারীর এই একমাত্র সন্তান কোন্ আশ্চর্য দেশপ্রেমে প্রেমিক হয়ে ঐ অল্পবয়েসেই গুপ্তচরবৃত্তি অবলম্বন ক'রে অসমসাহসিকতার পরিচয় দেয়; কয়েকজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সৈনিকের সৎ পরামর্শকে অগ্রাহ্য ক'রে সে ছাত্রজীবনে ফিরে না গিয়ে ঐ যুদ্ধের বর্বরতার মধ্যেই নিজেকে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ক'রে তুলতে সর্বদাই উৎসুক থাকে এবং শেষ পর্যন্ত জার্মানদের হাতে নিগৃহীত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

একটি ফুলের মতো সুন্দর কিশোর অকস্মাৎ যুদ্ধের বিভীষিকার সম্মুখে

কেমন ক'রে একটি দৃঢ়চেতা বয়স্ক পুরুষের মতো ব্যবহার করতে পারে এবং জীবনের উপভোগ্য কৈশোরকে দূরে ঠেলে দিয়ে দেশপ্রেমিক সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তাকেই একটি কবিতার মতো রূপায়িত করেছেন তরুণ পরিচালক তার্কোভোস্কি। যুদ্ধের বর্বরতার এমন কাব্যমূর্তি পৃথিবীর আর কোনো চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে ব'লে জানা নেই। যে ছেলে ঘুমন্ত অবস্থায় তার সেই স্নেহময়ী মাকে স্বপ্নে দেখে 'মা' 'মা' ব'লে চীৎকার করে, সেই আবার জাগ্রত অবস্থায় একটি কঠিনহৃদয় কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিক। বাস্তব এবং ভাবপ্রবণ—উভয় ভাবধারার আশ্চর্য সমাবেশে 'আইভ্যানস চাইল্ডহুড' একটি ভিন্ন স্তরের চিত্র রূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আগামী ছবির খবর

জতুগৃহ : উত্তমকুমার প্রযোজিত। পরিচালনা তপন সিংহ। সুর আশীষ খাঁ। অভিনয়ে উত্তমকুমার, বিকাশ, অনিল, বিনতা রায়, কাজল গুপ্ত ও অরুন্ধতী দেবী।

বিভাস : পরিচালনা বিনু বর্ধন। সুর হেমন্ত মুখার্জি। অভিনয়ে উত্তমকুমার, বিকাশ, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, জ্ঞানেশ মুখার্জি, সুমিতা সান্যাল ও ললিতা চ্যাটার্জি।

প্রতিনিধি : পরিচালনা মৃণাল সেন, সুর হেমন্ত মুখার্জি। অভিনয়ে সৌমিত্র, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, সত্য ব্যানার্জি, বাণী গাঙ্গুলী ও অনুপকুমার।

একই অঙ্গে এত রূপ : পরিচালনা হরিসাধন দাশগুপ্ত। সুর আলী আকবর খাঁ। অভিনয়ে সৌমিত্র, মাধবী ও বসন্ত চৌধুরী।

প্রেয়সী : পরিচালনা শ্যাম চক্রবর্তী। সুর মানবেন্দ্র মুখার্জি। অভিনয়ে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত, অসিতবরণ, কমল মিত্র, পাহাড়ী, জহর রায়, বিনতা রায়, তরুণ, ভারতী, দীপিকা, বিশ্বনাথন ও সবিতা চ্যাটার্জি।

জয়নাস্ত : পরিচালনা সন্ধানী গোষ্ঠী। সুর সলিল চৌধুরী। অভিনয়ে সৌমিত্র, সুপ্রিয়া চৌধুরী, শম্পা, বিশ্বনাথন, সুচন্দ্রা দেবী।

'সপ্তর্ষি' চিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও কাজল গুপ্ত

গোধূলি বেলায় : পরিচালনা চিত্ত বসু। সুর মানবেন্দ্র মুখার্জি। অভিনয়ে বিশ্বজিৎ, বিকাশ, সন্ধ্যারাণী, সুমিতা সান্যাল, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, বিপিন গুপ্ত ও মাধবী মুখার্জি।

অগ্নিবন্যা : পরিচালনা শ্রীজয়দ্রথ। সুর গোপেন মল্লিক। অভিনয়ে বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, অসিতবরণ, মঞ্জু দে, কমল মিত্র, জহর রায়, অমর মল্লিক, শিশির বটব্যাল, ভারতী, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ ও কল্পনা ব্যানার্জি।

সপ্তর্ষি : পরিচালনা উমাপ্রসাদ মৈত্র। সুর শ্যামল মিত্র। অভিনয়ে দিলীপ, কালী ব্যানার্জি, নিরঞ্জন রায়, কাজল গুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জি, রবি ঘোষ, জীবন ঘোষ ও অনু দত্ত।

অশান্ত ঘূর্ণী : পরিচালনা পিনাকী মুখার্জি। সুর রাজেন সরকার। অভিনয়ে দিলীপ, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অনিল চ্যাটার্জি দীপক মুখার্জি, জীবেন বসু, রেণুকা রায়, গীতা, শ্যাম লাহা, জহর রায় ও মানবেন্দ্র মুখার্জি।

তাহলে : পরিচালনা গুরু বাগচী। সুর সুধীন দাসগুপ্ত। অভিনয়ে দিলীপ, বিকাশ, পাহাড়ী, অনুপ, শীতল, মলিনা, রেণুকা, অমর বিশ্বাস, অমিত দে ও সন্ধ্যা রায়।

'শ্রেয়সী' চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গ হতে বিদায় : পরিচালনা মঞ্জু দে। সুর হেমন্ত মুখার্জি। অভিনয়ে দিলীপ মুখার্জি, সুমিতা সান্যাল, পাহাড়ী, বিকাশ, অনুভা, দীপক, অতনু, রবীন ব্যানার্জি, জহর রায় ও মাধবী মুখার্জি।

কালস্রোত : পরিচালনা সুশীল মজুমদার। সুর মানবেন্দ্র মুখার্জি। অভিনয়ে অনিল চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, সুমিত সান্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, সন্ধ্যারাণী, বিকাশ, অনুভা ও ললিতা চট্টোপাধ্যায়।

বাদশা : পরিচালনা অগ্রদূত। সুর হেমন্ত মুখার্জি। অভিনয়ে কালী ব্যানার্জি, তরুণকুমার, সন্ধ্যারাণী, বিকাশ, অসিতবরণ, প্রেমাংশু চ্যাটার্জি ও শংকর।

দীপ নেভে নাই : পরিচালনা কনক মুখার্জি, সুর রবীন চ্যাটার্জি। অভিনয়ে বিকাশ, তরুণ সন্ধ্যারাণী, বিমান, ও সুমিতা সান্যাল।

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ : পরিচালনা মধু বসু। সুর অনিল বাগচী। অভিনয়ে অমরেশ দাস, গুরুদাস ব্যানার্জি, মলিনা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, পঞ্চানন ও জীবন ঘোষ।

মরুতৃষা : পরিচালনা সুরেশ রায়। সুর কালোবরণ। অভিনয়ে সাবিত্রী, অসিতবরণ, সবিতা, রবীন, তপতী, বিপিন, নীতিশ, জহর রায়, পদ্মা, জয়শ্রী সেন।

প্রভাতের রঙ : পরিচালনা অজয় কর। সুর হেমন্ত মুখার্জি। অভিনয়ে বিশ্বজিৎ, শর্মিলা, বিকাশ, মঞ্জু দে, রবি ঘোষ ও লিলি চক্রবর্তী।

রাধাকৃষ্ণ : পরিচালনা অর্ধেন্দু মুখার্জি। সুর রথীন ঘোষ। অভিনয়ে উত্তর ব্যানার্জি, সপ্তিতা ব্যানার্জি, শীলা পাল, রেণুকা রায়, কেতকী দত্ত, বীরেশ্বর, প্রতিমা চক্রবর্তী ও অসিতবরণ।

মহাতীর্থ কালীঘাট : পরিচালনা ভূপেন রায়। সুর রথীন ঘোষ। অভিনয়ে শংকরনারায়ণ, শম্পা, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, মিহির, অমর মল্লিক, অমরেশ দাস, শিপ্রা দেবী, বাণী গাঙ্গুলী, কৃষ্ণা বসু, উত্তর ব্যানার্জি ও নটরাজ গোপীকৃষ্ণ।

কিনু গোয়ালার গলি : পরিচালনা ও সি গাঙ্গুলী। সুর সলিল চৌধুরী। অভিনয়ে সুমিত্রা দেবী, শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী ব্যানার্জি, জহর রায়, জীবেন বসু ও গীতা দে।

সিঁদুরে মেঘ : পরিচালনা সুশীল ঘোষ। সুর হেমন্ত মুখার্জি। অভিনয়ে অনিল, মাধবী মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, গীতা দে, সুরুচি সেনগুপ্তা ও রমা গুহঠাকুরতা।

নতুন তীর্থ : পরিচালনা সুধীর মুখার্জি। সুর হেমন্ত মুখার্জি। অভিনয়ে উত্তমকুমার, সুলতা চৌধুরী, সীতা দেবী, মলিনা দেবী, ভারতী দেবী, গঙ্গাপদ, কালী ব্যানার্জি।

'কিনু গোয়ালার গলি' চিত্রে সুমিত্রা দেবী

বর্ণালী : পরিচালনা অজয় কর। সুর কালিপদ সেন। অভিনয়ে শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী, কমল, বিশ্বনাথন।

কষ্টিপাথর : পরিচালনা অরবিন্দ মুখার্জি। সুর মানবেন্দ্র মুখার্জি। অভিনয়ে সন্ধ্যা রায়, বসন্ত চৌধুরী, লিলি চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, জহর রায়।

নষ্টনীড় : পরিচালনা ও সুর সত্যজিৎ রায়। অভিনয়ে সৌমিত্র, মাধবী, গীতালি রায়।

কলকাতা

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী নতুন ছবি 'নষ্টনীড়'-এর প্রথম দৃশ্যগ্রহণ গত সপ্তাহ থেকে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বরে শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এ গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন শ্রীরায়। কাহিনীর তিনটি প্রধান অমল, চারু ও ভূপতির চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং শৈলেন মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া পার্শ্ব দুটি চরিত্রে রয়েছেন শ্যামল ঘোষাল ও গীতালী রায়। আর ডি

'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রে সঞ্চিতা ব্যানার্জি

অয়নান্ত চিত্রে—সুপ্রিয়া চৌধুরী

বনসল প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ চিত্রটির আলোক-চিত্র গ্রহণ, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনায় নিযুক্ত হয়েছেন সুব্রত মিত্র, বংশীচন্দ্র গুপ্ত এবং দুলাল দত্ত।

দিবিত্রি ফিল্মস প্রযোজিত-পরিবেশিত ও মঞ্জু দে পরিচালিত 'স্বর্গ হতে বিদায়' চিত্রটির সম্পূর্ণ অন্তর্দৃশ্য সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে কলাকাতায় কয়েকটি বহির্দৃশ্য গৃহীত হল। শেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, সুস্মিতা সান্যাল, আশা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, জহর রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, অতনু-কুমার, বিপিন গুপ্ত, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকুমার, সুশীল দাস, রথীন ঘোষ ও সুখেন। কলাকুশলী বিভাগে চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনার দায়িত্ব পালন করছেন অনিল গুপ্ত, অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং রবি চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

প্রযোজক-পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রথম যে পূর্ণাঙ্গ চিত্রটির উপহার দিচ্ছেন তার নাম 'একই অঙ্গে এত রূপ'। ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় এ চিত্রের চিত্রগ্রহণ অর্ধসমাপ্ত হতে চলেছে। সম্প্রতি শ্রীদাশগুপ্ত সঙ্গীত নাটক একাডেমী প্রযোজিত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও বড়ে গোলাম আলির সঙ্গীত-জীবনী তথ্যচিত্র দুটির পরিচালনায় ব্যস্ত রয়েছেন! অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত 'একই অঙ্গে এত রূপ'-

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'নষ্টনীড়' চিত্রের সেটে গীতালি রায়, পরিচালক সত্যজিৎ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখার্জি। ফটো ঃ অমৃত

এর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, দোলন-চাঁপা দাশগুপ্ত, হরেন চট্টোপাধ্যায় ও ছায়া দেবী। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও সংগীত-পরিচালনায় রয়েছেন দীনেন গুপ্ত, তরুণ দত্ত এবং আলি আকবর খাঁ।

বোম্বাই

সীমান্ত-যুদ্ধের কাহিনী-পরিবেশে রচিত 'হাকিকাৎ' চিত্রের বহির্দৃশ্য সম্প্রতি লড়াক অঞ্চলে শেষ করলেন প্রযোজক-পরিচালক চেতন আনন্দ। গত সপ্তাহ থেকে মেহেবুব স্টুডিওয় এ ছবির অন্তর্দৃশ্য গৃহীত হচ্ছে। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন যথাক্রমে বলরাজ সাহনি, ধর্মেন্দ্র, বিজয় আনন্দ, প্রিয়া ও সুলচনা।

পরিচালক নিতীন বসুর 'দুজ কা চাঁদ' চিত্রের সপ্তাহকালীন চিত্রগ্রহণ শেষ হল কমল স্টুডিওয়। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন বি, সরোজা দেবী, অশোককুমার, ভারতভূষণ, চন্দ্রশেখর, প্রীতিবালা ও আগা। রোসন এছবির সংগীত-পরিচালক।

ফলী মিস্ত্রী প্রোডাকসন্সের রঙিন চিত্র 'সজন কী গলিয়াঁ'-র বহির্দৃশ্য কাশ্মীর অঞ্চলে গৃহীত হল। রাজ-খোসলা চিত্রটি পরিচালনা করছেন। প্রধান অংশে রূপদান করছেন দেব-আনন্দ, সাধনা, জাহিদা, উল্লাস, রাজমেহরা, রাজেন্দ্রনাথ, মোহনচটি ও পরভিন চৌধুরী। শঙ্কর-জয়কিষণ সুরকৃত ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তির পথে।

সম্প্রতি রঙিন চিত্র 'জিদ্দি'র ছত্রিশ ঘন্টাব্যাপী চিত্রগ্রহণ ফিল্মস্থান স্টুডিওয় শেষ করলেন প্রযোজক-পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী। এছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন জয় মুখার্জি, আশা পারেখ, মেহমুদ, শুভা খোটে, ধুমল ও রাজমেহরা। শচীনদেব বর্মণ সুরকৃত এছবির আলোকচিত্র পরিচালনা করছেন ভি কে কৃষ্ণমূর্তি। ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত।

মাদ্রাজ

ন্যাশনাল পিকচার্সের 'রক্ত তিলকম' চিত্রটির হিন্দী চিত্ররূপ দেবার পরি-কল্পনা সম্প্রতি গ্রহণ করা হয়েছে। শিবাজী গণেশন ও জি সাবিত্রী এছবির দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। দাদা মিরাসী এছবির পরি-চালক। মুভি মন্দির প্রযোজিত এচিত্রটির শুভমহরৎ জয়ন্তী স্টুডিওয় সুসম্পন্ন হয়েছে। —চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি
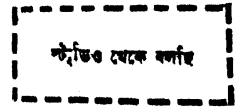
আতঙ্ক এবং বিস্ময়-রোমাঞ্চিত এ কাহিনীর শুরু একটু ভিন্নধর্মী। পিতার অপরাধকে চাপা দিতে পুত্রের ফেরারী-জীবন কিভাবে গ্রহণ করতে হয় তারই বাস্তব অভিজ্ঞতা। সে এক দুঃসহ রজনী। আতঙ্কিত মুহূর্তটি মনে পড়লে আজও প্রতিটি শিরা শিহরিত হয়ে ওঠে। রাধামোহনের পুত্র হল স্বপন। সহকর্মী বিনয় অধিকারীকে হত্যা করার অপরাধে রাধামোহন বিব্রত।

প্রতিহিংসার এ অপ্রত্যাশিত অপরাধে পুত্রের সাক্ষাতেই রাধামোহনকে ধরা দিতে হল। পূর্বের কোন ঘটনায় ফেরারী-পিতার এতদিন কোন সন্ধান স্বপন পর্যন্ত পাইনি। হঠাৎ হোস্টেল কক্ষে আকস্মিক বন্দুকের গুলিতে রাধামোহন বিনয়কে খুন করতে বাধ্য হল। স্বপনের হঠাৎ আবির্ভাব রাধা-মোহনের কাছে বেশ অপ্রত্যাশিত বলা চলে। এক দিন চেক জাল করার মিথ্যা অপবাদে রাধামোহনের দীর্ঘবছর জেল হয়। এবং এ পরিক্রমার সফল পরামর্শদাতা ছিলেন বিনয় অধিকারী। বহু দিন পর আবার পরিবারের সুখ-সান্নিধ্যের কথা মনে পড়তে অপরাধী রাধামোহন দুর্বল হয়ে উঠলেন। পিতার এমন বিপদ দেখে সেই মুহূর্তে স্বপন বোস নিজেই ফেরারী হল। পুলিশ জানলো স্বপন অপরাধী। রাধামোহন মুক্তি পেলেন।

পিতার সেই করুণ আর্তনাদ এখনও সে ভুলতে পারে না। ছদ্মবেশী স্বপন অনেকখানি পাল্টিয়ে গেল এ জীবন সন্ধ্যায়। বৈধব্যের বেশ ঘুচিয়ে দিয়ে মায়ের আশীর্বাদ মাথায় রেখে স্বপন অনেক চরিত্র-পরিক্রমায় আত্ম-গোপন করলো। পিতার অপরাধ নিজেই বহন করে সে নীলকণ্ঠ হল। কর্তব্য-পরায়ণ স্বপন মায়ের পছন্দকরা পাত্রী চিত্রার সংগে দেখা করতে আসে। মা জানতে পারলেন তার স্বপন হত্যাকারী' আদর্শবাদী মাতা পুলিশে খবর দেন। কিন্তু সখী-কন্যা চিত্রার সাহায্যে স্বপন পালিয়ে গেল গ্রাম থেকে।

পুলিশ দল ছদ্মবেশী স্বপনকে সর্বদাই চোখে-চোখে রেখেছে। কল-কাতার তরুণ পুলিশ অফিসার বিজন জজসাহেব এবং তাঁর মেয়ে সুচিরাকে সগর্বে জানিয়েছিল, স্বপন ধরা পড়বেই। কারণ এই স্বপন বোস তার শুধু সহপাঠীই নয়, তার অংগের একটা ত্রুটির কথা সে জানে যা সে কোন দিনই রূপসজ্জায় লুকতে পারবে না। সুচিরার সংগে বিজনের বিবাহ প্রায় স্বীকৃত।

পরিশ্রান্ত স্বপনের আর এমনি পলাতক জীবন ভাল লাগে না। এবারে তার যে কোন একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের প্রয়োজন। তাই ঘটনাচক্রে জজসাহেবের ছোট ছেলেকে পড়াতে স্বপন শিক্ষকতার জীবন বেছে নিল। এখানে স্বপনের নতুন নামে পরিচয় হল। অমিতাভ রায়। চারিত্রিক গঠনে সে ঈষৎ-পঙ্গু। স্পষ্ট-ভাষী ও উদ্ধত। প্রথম দর্শনেই সুচিরার কেমন সন্দেহ হয়েছিল স্বপনবেশী অমিতাভকে দেখে। কিন্তু কেন জানি আবার করুণাও হয়েছিল অকারণে। এর মধ্যে কখন যে এক দিন তার হৃদয়ের কোণে অমিতাভ স্থান পেয়েছে তা সে নিজেই জানতে পারেনি। যেদিন

> এক সংবাদে প্রকাশ শ্রীসত্যজিৎ রায় পরিচালিত এবং শ্রীআর ডি বনশাল প্রযোজিত 'মহানগর' চিত্রটি বার্লিনে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হ'য়েছে।

নিঃসহায়া সুচিরাকে এক দুর্বৃত্ত দলের অভদ্র আচরণ থেকে রক্ষা করলো সেদিন সুচিরার মনে হল অমিতাভের এ রূপ মুখোশ-পরা। যৌবনের প্রতীক অমিতাভ ধরা পড়ে গেল সুচিরার কাছে। পূর্ব-রাগের সে-রামধনু তখন দুজনের হৃদয় জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বিজনের সন্দেহজনক দৃষ্টির জন্য অমিতাভ সন্ত্রস্থ হয়ে রইলো। এমনি সময় গ্রাম থেকে খবর এল তার মা অসুস্থ। স্বপন পালিয়ে আসে মায়ের কাছে। পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। চিত্রা বাঁচাতে চাইলো। কিন্তু স্বপনকে শেষপর্যন্ত পুলিশের হাতে আত্ম-সমর্পণ করতে হল।

বহু চেষ্টার পর পুলিশ যে হত্যা-কারীকে ধরতে পেরেছে সে কথা কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। এ খবর চোখে পড়ায় রাধামোহন ছুটে এলেন। মনুষ্যত্ব হারিয়ে পংগু হলেও তিনি তার অপ-রাধকে অস্বীকার করে পুত্রের জীবনকে আর নষ্ট করবেন না বলে ঠিক করলেন। রাধামোহন আদালতে বিনয় অধিকারীর হত্যার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে স্বপনকে মুক্তি দিলেন। রাধামোহনের জেল হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি সুখীই হলেন। অশ্রুসিক্ত চোখে তাঁর গোধূলি বেলা একটু করুণ বলে মনে হল।

সংক্ষিপ্ত এ কাহিনীর নাম 'গোধূলি বেলায়'। পরিচালক চিত্ত বসুর নির্দেশনায় সম্প্রতি এ কাহিনীর চিত্ররূপ সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের জনপ্রিয় 'বধূ'র অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রে স্থান পেয়েছে। মুক্তি-প্রতীক্ষিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে যথার্থ অভিনয়

বিবেকানন্দ শতবর্ষ উপলক্ষে মধু বসু পরিচালিত সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চিত্রের একটি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করছেন অজয় মিত্র।

করেছেন বিশ্বজিৎ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, বিকাশ রায়, সুমিতা সান্যাল, তরুণকুমার, দিলীপ রায় ও বিপিন গুপ্ত। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইকনমিক প্রোডাকসন্সের এ চিত্রটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত। —চিত্রদূত

ভিন দেশী ছবি
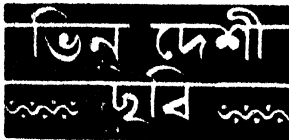
॥ খ্যাতি অখ্যাতির নায়িকা ॥

দুবার তিনি জনপ্রিয়তার মঞ্চে আসীন হয়েছিলেন, আবার দুবারই তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল অখ্যাতির অন্ধকারে নেপথ্য নির্বাসনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে জার্মানীর প্রথম নায়িকা ছিলেন হিল্ডেগার্ড নেফ। ব্রড-ওয়েতে কোলপোর্টার-এর 'সিল্ক স্টকিং' নামক সঙ্গীতমুখর নাটকেও মুখরিত ছিলেন শ্রীমতী হিল্ডেগার্ড। তাঁর অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মার্লিন ড্রিয়াট্রিচ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে অভি-নন্দন জানিয়েছিলেন। বাস্তবিক মার্লিনের পর আর কোনো জার্মান অভিনেত্রী আমেরিকা বিজয় করতে পারেননি তাঁর মতো। কিন্তু জার্মানীতে তাঁর নিন্দুকেরও অভাব ঘটেনি। জনৈক পূর্বতন নাৎসী সামরিক কর্মচারীকে বিয়ে করে তিনি দেশত্যাগ করেছিলেন, ফলে জনতাও ত্যাগ করেছিল তাঁকে। বিয়েটা অবশ্য বেশী দিন টেঁকেনি, আবার দেশে ফিরে এসেছিলেন হিল্ডেগার্ড। আশা ছিল চলচ্চিত্র জগতেও তাঁর পুরোনো খ্যাতিতে ফিরতে পারবেন তিনি। নতুন চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান উফাতে যোগদানও করলেন প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে। কিন্তু খুব বেশী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পেলেন না, কারণ বছরে খুব কমই ছবি তুলতে পেরেছিল

হিল্ডেগার্ড নেফ

চিত্র প্রতিষ্ঠানটি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য উঠেই গিয়েছিল 'উফা'। উফার অব-লুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হিল্ডেগার্ডেরও পুনপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসে। আবার নতুন করে তাঁকে ছোট ছোট ভূমিকায় চলচ্চিত্রজীবন শুরু করতে হয়। কিন্তু ছোট ভূমিকাকেও বড় করতে জানতেন 'হিল্ডেকেন' (জার্মানীতে এই নামেই চেনে তাঁকে জনসাধারণ)। 'ডেরমান ডের সিক ডেরকাউফ্‌টে' ছবিতে অভিনয় করে তিনি ফেডেরেল ফিল্ম পুরস্কার পান। তবু সমালোচকরা কিছুতেই তাঁকে নেকনজরে দেখতে পারেননি। তাঁদের ভাষায় হিল্ডেকেন হলেন 'পাপাত্মা'। একটি ছবিতে তিনি একটি পাপী মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সেই থেকে সমালোচকদের কলমেও তাঁর অভিনীত চরিত্রটি স্থায়ী হয়ে গেল। কিন্তু সমালোচকদের প্রবল নিন্দা তাঁর সম্বন্ধে নতুন আগ্রহেরই সঞ্চার করেছিল জার্মানীতে। এবং নিন্দার হাতে তিনি নিজেও কখনো পরাস্ত হতে চাননি। প্রতিকূল জগতের সঙ্গে আপোসহীন সংগ্রাম করেই টিকে থাকবার চেষ্টা করে এসেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে হিল্ডেগার্ড নেফ অনুপম চরিত্রের অধিকারিণী। যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তাঁর অমায়িক, সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। অভিনেত্রীসুলভ কোনো রকম সংস্কার তাঁকে কখনও আচ্ছন্ন করতে পারেনি। যে কোনো উষ্ণহৃদয় জার্মান মহিলার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য শুধুমাত্র প্রতিভার অধিকারে। হিল্ডেগার্ড-এর মতন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী পশ্চিম জার্মানীতে আজো অঙ্গুলিমেয়। শুধু চলচ্চিত্রেই না, টেলিভিশনেও আত্মপ্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁ কক্‌তোর টেলি-ভিশন নাটক 'দি হিউম্যান ভয়েস'-এ তাঁর অভিনয়সাফল্য দেখে ইংল্যাণ্ডের টেলিভিশন থেকেও অভিনয়ের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাঁকে। ইংল্যাণ্ডে এসে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন হিল্ডেকেন। স্বামী ডেভিড ক্যামেরণ নিজেও অভিনেতা। স্বামীর সঙ্গে একটি নাটকের দল নিয়ে আবার স্বদেশে ফেরেন হিল্ডেকেন। এই নিয়ে তৃতীয়বার খ্যাতির জন্যে সংগ্রাম করেছেন শ্রীমতী নেফ। ম্যাক্স অফুয়েলস-এর 'রেইগেন-সিরটিগ্লি' ছবিতে মুখ্য ভূমিকার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এ ছাড়াও আরো তিনটি জার্মান এবং ভিনদেশী ছবিতেও তাঁকে দেখা যাবে।

গায়িকা হিসেবেও হিল্ডেকেনের খ্যাতি জার্মান জুড়ে। অথচ তেমন বিশেষ সুকণ্ঠের অধিকারিণী নন তিনি। তাঁর সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলে-ছিলেন, "গলা না থেকেও যে এত ভাল গাইতে পারে বিশ্বাস করা যায় না।" সম্প্রতি তাঁর একটা গানের রেকর্ড নিয়ে জার্মানীতে ভীষণ হৈ-চৈ হয়। রেকর্ডের গানের একটি চরিত্রের নাম ছিল 'ওরৎজেন'। ওরৎজেন উপাধির এক ভদ্রলোক গানটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এই বলে যে গানটিতে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে অপমানিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। রেকর্ডটির বিক্রী বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু এই হৈ-চৈ'র ফলে গায়িকার অন্যান্য রেকর্ডের বিক্রী যথারীতি বেড়ে গেছে।

হিল্ডেগার্ড নেফের চলচ্চিত্র-সাম্রাজ্যে তৃতীয় অভিযান সফল হবে কিনা সমগ্র পশ্চিম জার্মানীর চলচ্চিত্র-মহলে এই নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই আজকে।

দর্শক
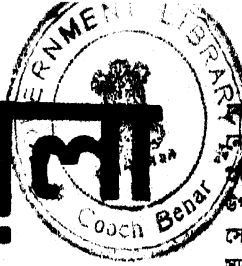
দু'তিন বছর আগে কৃষ্ণানের খেলায় যে ধার ছিল এখন তার বিশেষ কিছুই নেই। প্রখ্যাত উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস খেলায় কৃষ্ণান উপর্যুপরি দু'বছর (১৯৬০-৬১) সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন। ১৯৬১ সালের সেমি-ফাইনাল খেলায় তিনি ঐ বছরেরই সিঙ্গলস বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার রড লেভারের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি প্রভূত উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে উইম্বলেডনের বাছাই তালিকায় চতুর্থ স্থান পান। ১৯৬১ সালে পেয়েছিলেন ৭ম স্থান। টেনিস খেলার অভিজ্ঞ মহলের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, তিনি অনায়াসেই ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় সেমি-ফাইনালে উঠবেন। এমন কি তাঁর ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কেও অনেকে আশা পোষণ করে-

ডেভিস কাপ আঞ্চলিক ফাইনাল

বোম্বাইয়ের ক্রিকেট ক্লাব অব্ ইণ্ডিয়ার টেনিস কোর্টে ভারতবর্ষ বনাম আমেরিকার ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইনাল খেলার দ্বিতীয় দিনেই আমেরিকা ৩—০ খেলায় অগ্রগামী হয়ে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে গত চার বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ফলে প্রতিযোগিতার একমাত্র নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া, তৃতীয় দিনের বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলার কোন প্রয়োজন ছিল না। স্বদেশের মাটিতে এবং অতি পরিচিত পরিবেশে খেলবার সুযোগ পেয়েও ভারতবর্ষের খেলোয়াড়রা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। একমাত্র তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ভারতবর্ষের ডাবলসের জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল।

ডেভিস কাপের খেলায় ভারতবর্ষের বিপক্ষে আমেরিকার এই দ্বিতীয় খেলা এবং দ্বিতীয় জয়। ইতিপূর্বে দিল্লীতে ১৯৬১ সালের আঞ্চলিক সেমি-ফাইনাল খেলায় আমেরিকা ৩—২ খেলায় প্রথম জয়ী হয়েছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে এই পরাজয় খুব অগৌরবের হয়নি। ১৯৬১ সালের এই আঞ্চলিক সেমি-ফাইনাল খেলায় আমেরিকার 'চাক' ম্যাকিনলের বিপক্ষে কৃষ্ণানের জয়লাভে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক টেনিস খেলায় একটি সম্মানিত স্থান লাভ করেছিল। এই ম্যাকিনলের হাতেই পূর্বের দুটি ভিন্ন টেনিস প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণান পরাজিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণান সম্পর্কে দেশ-বিদেশের টেনিস খেলার অভিজ্ঞ মহল অনেক উচ্চাশা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য উপযুক্ত সহযোগীর অভাবে কৃষ্ণান ভারতবর্ষের কণ্ঠে জয়মাল্য এনে দিতে পারেননি। ভারতবর্ষ উপর্যুপরি দুবছর (১৯৬২-৬৩) ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেও শেষরক্ষা করতে পারলো না। এই আঞ্চলিক ফাইনাল খেলার পরই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা—যা এশিয়া মহাদেশের একমাত্র দেশ জাপান একবার মাত্র খেলেছে ১৯২১ সালে। সুদীর্ঘকালের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণানই ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। নিকট ভবিষ্যতে তাঁর অভাব পূরণ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আর্থিক কারণই এই পথের প্রধান অন্তরায়।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে ডেভিস কাপের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলায় আমেরিকার ডেনিস র‍্যালস্টন প্রথম দিনের সিংগলসে রমানাথন কৃষ্ণানের বিপক্ষে এবং ডাবলসে ('চাক' ম্যাকিনলের জুটিতে) ভারতবর্ষের জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেন।
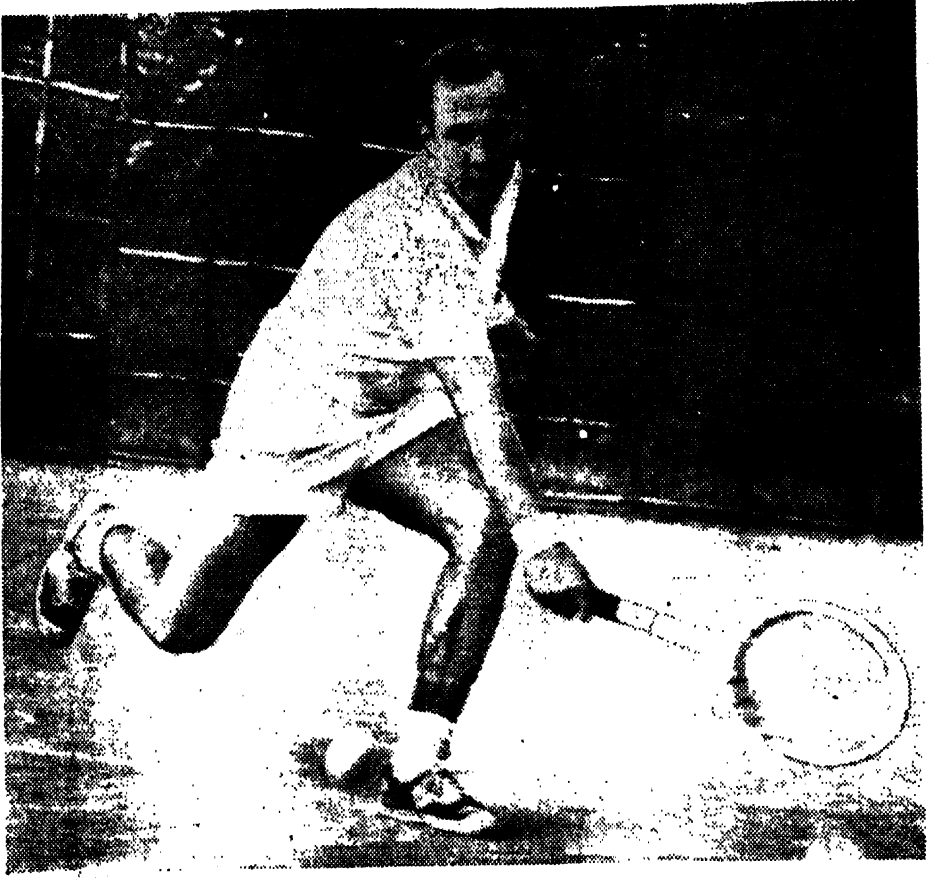
ভারতবর্ষ বনাম আমেরিকার ডেভিস কাপের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলায় যোগদানকারী আমেরিকার 'চাক' ম্যাকিনলে। তিনি দুটি সিংগলস (প্রেমজিৎলাল এবং রমানাথন কৃষ্ণানের বিপক্ষে) এবং ডাবলসের খেলায় (জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলালের জুটির বিপক্ষে) জয়লাভ করেন।

ছিলেন। কিন্তু তাঁর এবং ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে, তিনি তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় অবসর নেন। এই তৃতীয় রাউন্ডের খেলার আগের দিন ডাবলসের খেলায় তিনি পায়ে জোর চোট খান। সেই আহত পায়ে তাঁর পক্ষে তৃতীয় রাউন্ডের খেলার শেষ পর্যন্ত খেলা সম্ভব হয়নি, তিনি খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন।

১৯৬৩ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইনালে যেভাবে আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের খেলার তালিকা তৈরী হয়েছিল তাতে অনেকেই আশা করেছিলেন ভারতবর্ষের শোচনীয় হার হবে না—১৯৬১ সালের খেলারই পুনরাবৃত্তি হবে অর্থাৎ ভারতবর্ষের পরাজয় ঘটলেও তা বিশেষ অগৌরবের হবে না। ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষক ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত কোচ স্ট্যানলি এডওয়ার্ডস। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন, প্রথম দিনের খেলার ফলাফল সমান যাবে অর্থাৎ উভয় দেশেরই একটা ক'রে সিংগলস খেলায় জয়। প্রথম দিনে খেলা পড়েছিল ১৯৬৩ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস জয়ী 'চাক' ম্যাকিনলের বিপক্ষে প্রেমজিৎলালের এবং রমানাথন কৃষ্ণানের বিপক্ষে ডেনিস র‍্যালস্টনের। এই বছরই উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে কৃষ্ণান ৬—৩, ৬—৩, ৩—৬ ও ১২—১০ গেমে র‍্যালস্টনকে পরাজিত করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য খেলায় কৃষ্ণানের জয় সম্পর্কে সকলেরই দৃঢ় ধারণা ছিল। কিন্তু কৃষ্ণান এবং প্রেমজিৎলাল উভয়েই স্ট্রেট সেটে পরাজিত হ'ন। ফলে প্রথম দিনের খেলায় আমেরিকা ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। তখন বাকি তিনটি খেলার মধ্যে আমেরিকার পক্ষে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলবার যোগ্যতা লাভের জন্যে মাত্র একটা খেলায় জয়লাভের প্রয়োজন হয়।

১৯৬৩ সালের উইম্বলেডন বিজয়ী 'চাক' ম্যাকিনলের বিপক্ষে প্রেমজিৎলাল প্রথম সেটে ৪ এবং দ্বিতীয় সেটে ৩টে গেম পেয়েছিলেন, কিন্তু তৃতীয় সেটে একটা গেমও পাননি। তৃতীয় সেটে তাঁর খেলার দম ছিল না। উইম্বলেডন বিজয়ী ম্যাকিনলে নির্দয়ভাবেই তৃতীয় সেটে প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেছিলেন।

প্রথম দিনের দ্বিতীয় সিংগলস খেলার সুরু থেকেই কৃষ্ণানও তাঁর স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে পারেননি। প্রথম সেটে তিনি ৪—৬ গেমে পরাজিত হন। দ্বিতীয় সেটে কৃষ্ণানের খেলা সাধারণ খেলোয়াড়ের পর্যায়ে নেমে যায়। মাত্র ২০ মিনিটের খেলায় তিনি ১—৬ গেমে দ্বিতীয় সেট হাতছাড়া করেন। তৃতীয় সেটের খেলায় কৃষ্ণান যা কিছুটা খেলেন। এই সময়ের খেলায় লাইন্সম্যানের দুটি সিদ্ধান্তে দর্শকদের গ্যালারীতে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাঁদের ধারণায় লাইন্সম্যানের সিদ্ধান্তে কৃষ্ণান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পরিবেশ বেশ গরম হয়ে উঠে এবং প্রায় পাঁচ মিনিটের মত

খেলা বন্ধ থাকে। কৃষ্ণানের বিপক্ষে বিজয়ী র্যালস্টন বেশ শান্ত মেজাজ নিয়ে খেলেছিলেন। তৃতীয় সেটের খেলায় তাঁর একবার যা মেজাজ বিগড়ে ছিল। এইদিন র্যালস্টনের খেলায় যে সব ভুল-ভ্রান্তি হয়েছিল কৃষ্ণান তার সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। তাঁর খেলায় উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব ছিল। র্যালস্টনের জয়লাভের প্রধান মূলধন ছিল 'ড্রপ সট', যা কৃষ্ণানের পক্ষে খণ্ডন করা অসাধ্য ছিল। র্যালস্টন ৬—৪, ৬—১ ও ১৩—১১ গেমে জয়ী হন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলায় আমেরিকান জুটি ম্যাকিনলে এবং র্যালস্টন ৬-৮, ৬-৩, ১২-১০ ও ৬-৪ গেমে ভারতবর্ষের জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করেন। মুখার্জি এবং লাল অপ্রত্যাশিতভাবে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তাঁদের প্রাণপণ ক'রে খেলার দরুণই আমেরিকার পক্ষে ডাবলসের খেলায় জয়লাভ অতি সহজ হয়নি। তাছাড়া এইদিন র্যালস্টন তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেননি। কৃষ্ণানের বিপক্ষে তাঁর প্রথম দিনের সিংগলস খেলায় যথেষ্ট ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় ছিল; কিন্তু ডাবলস খেলায় তিনি অনেক সময় এলোপাতাড়ি বল মেরে খেলার সৌষ্ঠব নষ্ট ক'রে দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। র্যালস্টনের এই ত্রুটিপূর্ণ খেলা ভারতীয় জুটি অতি দক্ষতার সংগে কাজে লাগিয়ে লাভবান হন। আজ ভারতীয় দর্শকদের আপশোষ করার কিছু ছিল না। তাঁদের অর্থ আজ আর জলে পড়েনি। শক্তিশালী আমেরিকান জুটির বিপক্ষে ভারতীয় জুটির এই রকম বীরত্বব্যঞ্জক খেলা কেউ আশা ক'রে খেলা দেখতে আসেননি।

তৃতীয় দিনের প্রথম সিংগলস খেলায় র্যালস্টনের বদলী খেলোয়াড় হিসাবে মার্টি রিসেন ৬-৩, ২-৬, ৬-০ ও ৬-১ গেমে প্রেমজিৎলালকে এবং শেষ সিংগলস খেলায় ১৯৬৩ সালের উইম্বলেডন বিজয়ী 'চাক' ম্যাকিনলে ১০-৮, ৬-৮, ৬-২, ২-৬ ও ৬-০ গেমে রমানাথন কৃষ্ণানকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পরাজিত করেন। ফলে ভারতবর্ষের বিপক্ষে আমেরিকা ৫-০ খেলায় জয়যুক্ত হয়।

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে এই নিয়ে আমেরিকার ৪২ বার খেলা হবে। তাদের বিগত ৪১ বারের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় আমেরিকার ডেভিস কাপ জয় হয়েছে ১৮ বার। ১৯০০ সালে অর্থাৎ ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে আমেরিকা ডেভিস কাপ জয় করেছিল। ১৯০১ সালে আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি; ফলে কোন খেলা হয়নি। কিন্তু প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে ১৯০১ সালেও ডেভিস কাপ জয়লাভের তালিকায় আমেরিকার নাম দেওয়া হয়। সুতরাং আমেরিকার ডেভিস কাপ জয়ের সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৯ বার।
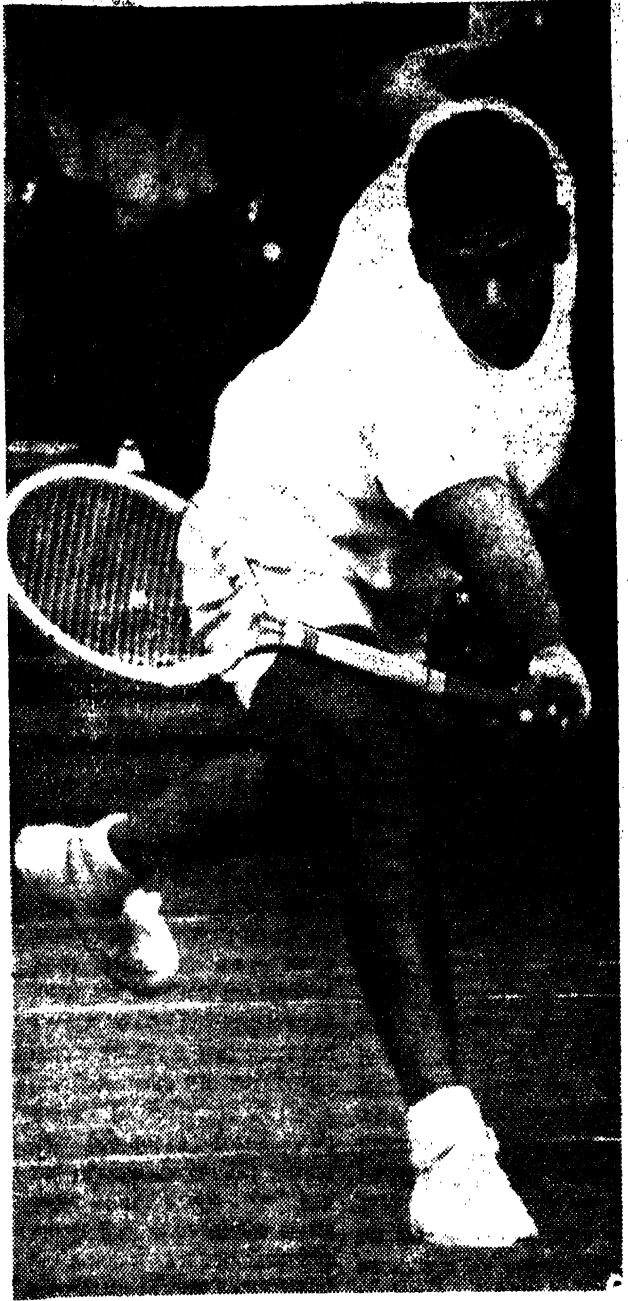
আমেরিকার বিপক্ষে ডেভিস কাপের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলায় ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান।

১৯৬৩ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার এই

আমেরিকার বিপক্ষে ডেভিস কাপের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলায় যোগদানকারী ভারতবর্ষের জয়দীপ মুখার্জি (বাম দিকে) এবং প্রেমজিৎলাল (ডান দিকে)।

নিয়ে ৩২ বার চ্যালেঞ্জ রাউন্ড খেলা হবে। অস্ট্রেলিয়াও আমেরিকার সমান ১৯ বার ডেভিস কাপ জয় করেছে। ১৯০৯ সালের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়াকেও ১৯১০ সালে চ্যালেঞ্জ না করায় অস্ট্রেলিয়া ১৯১০ সালে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। ১৯২২ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড যুগ্মভাবে অস্ট্রেলেসিয়া নামে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। এই সময়ের মধ্যে তারা ৭ বার ডেভিস কাপ জয় করে। ১৯২৩ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়া পৃথকভাবে ডেভিস কাপের খেলায় যোগদান করছে। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত (যুদ্ধের দরুণ ১৯৪০-৪৫ খেলা বন্ধ ছিল) দীর্ঘ একটানা ১৬ বছর ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলেছে মাত্র এই দুটি দেশ—আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া। এই ১৬ বছরের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৯ বার এবং আমেরিকা ৭ বার ডেভিস কাপ জয় করেছে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ সালের পরও ৩ বার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলে ৩ বারই ডেভিস কাপ জয় করেছে (১৯৬০-৬১ সালে ইতালীর বিপক্ষে এবং ১৯৬২ সালে মেক্সিকোর বিপক্ষে)।

অস্ট্রেলিয়ার কৃতিত্বের দিক থেকে আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, অস্ট্রেলিয়া ১৯৩৮ সাল থেকে প্রতি বছরই (যুদ্ধের দরুণ চার বছর বাদে) ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে মোট ১৯ বার খেলে ১২ বার ডেভিস কাপ জয় করেছে, বাকি ৭ বার পেয়েছে আমেরিকা। কেবল অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলা সীমাবদ্ধ ছিল ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত। পরবর্তী তিন বছর (১৯৬০-৬২ সাল) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলে ইতালী (১৯৬০-৬১) এবং মেক্সিকো (১৯৬২) পরাজিত হয়। তিন বছর পর পুনরায় ১৯৬৩ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলায় দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা মিলিত হয়েছে। আগামী ২৬শে ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার এডিলেডে ১৯৬৩ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলা শুরু হবে। অস্ট্রেলিয়া গত চার বছর (১৯৫৯-৬২) ডেভিস কাপ জয় ক'রে যে বিশ্ব খেতাব নিয়ে পাকাপোক্তভাবে বসে আছে, তার থেকে গদিচ্যুত করা আমেরিকার পক্ষে খুব সহজ হবে না। আমেরিকা সর্বশেষ ডেভিস কাপ পেয়েছে ১৯৫৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এবং ডেভিস কাপ হাতছাড়া করেছে অস্ট্রেলিয়ারই কাছে ১৯৫৯ সালে।

এ পর্যন্ত ডেভিস কাপ জয় করেছে মাত্র এই চারটি দেশ—অস্ট্রেলিয়া (১৯ বার), আমেরিকা (১৯ বার), ইংল্যান্ড (৯ বার) এবং ফ্রান্স (৬ বার)।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিণ্টন

বোম্বাইয়ে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার দক্ষিণাঞ্চলের খেলায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল ছাত্র এবং ছাত্রী বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। বোম্বাই ছাত্র বিভাগের আঞ্চলিক ফাইনালে ৩—০ খেলায় ওসমানিয়াকে এবং ছাত্রী বিভাগের আঞ্চলিক ফাইনালে ৩—০ খেলায় পুণাকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার মূল ফাইনালে উঠেছে। ছাত্র বিভাগের মূল ফাইনালে খেলবে বোম্বাই এবং উত্তরাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান দিল্লী দল; অপরদিকে ছাত্রী বিভাগের মূল ফাইনালে বোম্বাইয়ের বিপক্ষে খেলা পড়ছে উত্তরাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাব দলের।

কানপুরে এই প্রতিযোগিতারই উত্তরাঞ্চলের খেলায় ছাত্র বিভাগের ফাইনালে দিল্লী ৩—০ খেলায় রাজস্থানকে পরাজিত ক'রে এবং ছাত্রী বিভাগের ফাইনালে পাঞ্জাব ৩—০ খেলায় রাজস্থানকে পরাজিত করে বোম্বাইয়ের বিপক্ষে মূল ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ ক'রেছে।

ভারত সফরে বিদেশী হকি দল

আগামী ২৮শে ডিসেম্বর বৃটিশ হকি দল ভারত সফরের উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ে পৌঁছবে। এই বৃটিশ দলটি ভারত সফরে পাঁচটি টেস্ট খেলাসহ মোট ১০টি খেলায় যোগদান করবে। টেস্ট খেলার স্থান এবং তারিখ : ১ম টেস্ট (২৯শে ডিসেম্বর)—আমেদাবাদ; ২য় টেস্ট (২রা জানুয়ারী) দিল্লী; ৩য় টেস্ট (৪ঠা জানুয়ারী)—জলন্ধর; ৪র্থ টেস্ট (৫ই জানুয়ারী)—লক্ষ্ণৌ এবং ৫ম টেস্ট (৯ই জানুয়ারী)—মাদ্রাজ। বৃটিশ হকি দল আগামী বছরের ৭ই জানুয়ারী বাংলার বিপক্ষে খেলবে।

জাপানের একটি শক্তিশালী হকি দল প্রায় এক মাস (৩রা ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর) ভারত সফরের উদ্দেশ্যে ৩রা ডিসেম্বর ক'লকাতায় পৌঁছবে। ভারত সফরে এই জাপানী হকি দলটি পাঁচটি টেস্ট খেলা নিয়ে মোট ২১টি খেলায় যোগদান করবে। টেস্ট খেলার স্থান এবং তারিখ : ১ম টেস্ট (কলকাতা), ৪ঠা ডিসেম্বর; ২য় টেস্ট (মাদ্রাজ), ৮ই ডিসেম্বর; তৃতীয় টেস্ট (আমেদবাদ), ১৭ই ডিসেম্বর; ৪র্থ টেস্ট (দিল্লী), ২০শে ডিসেম্বর এবং ৫ম টেস্ট (কর্ণাল), ২৫শে ডিসেম্বর।

খেলার কথা

অজয় বসু

ছাব্বিশ বছরের নিগ্রো জোয়ান আর্ণি নক্সের জীবনাহুতির নজীর সুস্থ মানুষের চিন্তালোকে আবার নতুন আলোড়নের সৃষ্টি ঘটিয়েছে।

হতভাগ্য আর্ণি নক্স! মুষ্টিযুদ্ধকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে পেট তো ভরেই নি। উপরন্তু পেশাগত সর্বাত্মক চাহিদা মেটাতে তাঁকে জীবন পর্যন্ত বলি দিতে হয়েছে।

ভারী করুণ এই নিগ্রো তরুণের বিফল জীবনকাহিনী।

দেহের ওজনে আর্ণি নক্স হেভী-ওয়েট পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। তবু পয়সা কামাতে তাঁকে হেভীওয়েটেই সাজতে হোলো। তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হোলো সংগঠকদের যোগসাজস। বুট-স্যুট, ধড়া-চূড়া আঁটা আর্ণি নক্সকে তুলাদণ্ডে-দাঁড়াবার সুযোগ দিল এই যোগসাজস। নকল হিসেবে নক্সের ওজন দাঁড়ালো ১৮৪ পাউণ্ড।

নক্সের আসল ওজন ছিল কিন্তু আরও একত্রিশ পাউন্ড কম। আসলের সঙ্গে সাজপোশাকের নকল ওজন মিশে গেল। এই নকল কারবার এক জঘন্য চক্রান্ত। মার্কিন মুলুকে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে এমন চক্রান্ত অভিনবও নয়।

নকল হিসেবে হেভীওয়েট সেজে আর্ণি নক্স লড়তে গেলেন বাল্টিমোরে ওয়েন বেথিয়ার সঙ্গে। বেথিয়ার মূলধন নকল নয়। খোলা গায়েই তাঁর ওজন ছিল ২০৫ পাউণ্ড। তাছাড়া বেথিয়া সময় সময় সনি লিসটন, এজার্ড চার্লস প্রমুখ বিশ্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধাদের অভ্যাস-সঙ্গীও ছিলেন।

মারাত্মক ঘুষির ঘায়ে ডেভি মুরের শেষ অবস্থা

সুতরাং ২০৫ পাউন্ডের সঙ্গে ১৫৩ পাউন্ডের প্রত্যক্ষ লড়াই জমে ওঠার অবকাশ পেলো না। মুষ্টাঘাতে অচৈতন্য হয়ে আর্ণি নক্স নবম রাউণ্ডে ঢলে পড়লেন। পরের কঘণ্টা কাটলো হাসপাতালে। তারপরই সব শেষ। ছাব্বিশ বছরের ফুটন্ত জীবন এইভাবেই খতম হয়ে গেল।

আর্ণি নক্স বনাম ওয়েন বেথিয়ার এই লড়াই শেষে নক্সের 'আড়াইশ' ডলার পাবার কথা ছিল। আড়াইশ ডলারের দামই বা কি? মার্কিন মুলুকে তা দিয়ে একজনের অন্ত্যেস্টিক্রিয়ার খরচও কুলোয় না! তবুও তারই জন্যে মার্কিন মুলুকে এক একটি তরুণ জীবন বিসর্জিত হয়।

শুধু মার্কিন মুলুকেই বা বলি কেন? মুষ্টিযুদ্ধে জীবন বলি দেবার নজীর অন্য অঞ্চলেও গড়ে উঠেছে। মুষ্টিযুদ্ধের চল্ যেসব অঞ্চলে বেশী প্রায় সেইসব অঞ্চলেই এই অনুষ্ঠানের সূত্রে জীবন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন বেশী, তাই সেদেশে রিংয়ে মৃত্যুর হারও আশঙ্কাজনক।

সব মিলিয়ে সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে চারশরও বেশী তরুণ মুষ্টিযুদ্ধে মৃত্যু-বরণ করেছেন। তবুও মুষ্টিযুদ্ধ ক্রীড়া-নুষ্ঠানের সার্টিফিকেটেই চালু হয়ে রয়েছে সমাজে ও সভ্য দুনিয়ায়।

১৯৬২ সালে ওয়েল্টার ওয়েটে বিশ্ব-প্রাধান্য প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে এমিল গ্রিফিথের ঘুষির ঘায়ে কিড্ বেনি প্যারেট এবং পরের বছর ফেব্রুয়ারীতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াইয়ের সূত্রে ডেভি মুর 'সুগার' রামসের মুষ্ঠাঘাতে প্রাণ হারাবার পর মুষ্টিযুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে অনেক কণ্ঠেই সরব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও মুষ্টিযুদ্ধের অনুষ্ঠান আজও বন্ধ হয়নি।

ফলে যা অনিবার্য তাই ঘটে চলেছে। ডেভি-মুর মারা যাবার পর কমাসের মধ্যে আরও প্রায়-দশজনকে তাঁর পদাঙ্ক অনু-

স্মরণ করতে হয়েছে। এই দশজন যে পেশাদার তাও নয়। পেশাদার-অপেশাদার সবাই আছেন এই হতভাগ্যের দলে।

যাঁরা মুষ্টিযুদ্ধের অনুরাগী তাঁরা হয়তো এইসব মৃত্যুবরণের নজীর নজরে আনেন না। নজীরগুলিকে দুর্ঘটনা গণ্য করে তাঁরা বলতে পারেন যে কোন্ খেলাতেই বা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটছে না? রাগবী মাঠে, ফুটবল মাঠে, মোটর রেসকোর্সে, মায় যুক্তরাষ্ট্রের বেসবল ও বাস্কেটবল কোর্টেও তো প্রতি বছর কোনো না কোন খেলোয়াড় মারা পড়েন?

অন্যত্র যে দুর্ঘটনা ঘটে মানি। কিন্তু অন্য ক্রীড়ানুষ্ঠানকেন্দ্রে কি একজন ক্রীড়াবিদকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরেধরে নাজেহাল করে তোলার রীতিটি বিধি-সম্মত? মারধোর যেখানে অবাধে চলে সেখানে মারাত্মক পরিণতি অপ্রত্যাশিত নয়। তাই মুষ্টিযুদ্ধে মৃত্যুবরণ একটি ঘটনার সামিল। আর মারামারি যেখানে বে-আইনী সেখানে সেই নজীর অতর্কিত দুর্ঘটনার বেশী কিছু নয়।

তবে তার চেয়ে বড় কথা এই যে মুষ্টিযুদ্ধ ক্রীড়ানুষ্ঠানের মূলে আদর্শের বিরোধী। কাজ করতে, মানসিক সুস্থতা আনতেই ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন ঘটানো হয়। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের প্রভাব সেই আদর্শের সঙ্গে সুসমঞ্জস কি?

কল্পনা করুন, মুষ্টিযোদ্ধারা পরস্পরকে আঘাত করে চলেছেন। আঘাতে প্রত্যাঘাতে কারুর ভ্রূ কেটেছে, নাক ফেটেছে। অবিরাম রক্তমোক্ষণে যোদ্ধাদের মুখমণ্ডল প্লাবিত। রীতিমত বীভৎস পরিবেশ। আর তারই মাঝখানে উৎসাহে কোমর বেঁধে দর্শককুল আরও ঘুষি চালাতে যোদ্ধাদের উসকানি যোগাচ্ছেন।

একটি ঘুষির ঘায়ে একযোদ্ধা যেমনই ঢলে পড়লেন অমনি দর্শকেরা তারস্বরে চীৎকার জুড়লেন, আবার মারো বলে। দয়া মায়া, করুণাবোধ সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে ছেলে-বুড়ো, নর-নারী-নির্বিশেষে সব দর্শকের মেজাজ সেই মুহূর্তে চড়া পর্দায় বাঁধা। লড়াই দেখতে দেখতে সাধারণ মানুষের মনও তখন যুদ্ধের মানসিকতায় প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। তাঁরা অন্যের অসহায় অবস্থা দেখে নিজেরা মনে মনে মজা লুটছেন।

অন্যের বিপর্যয়ে যে মন হাসতে পারে সে মন কি সুস্থ এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর? এমন মনের দাপাদাপি ঘটতো সেইকালে যেকালে সম্রাটদের মনোরঞ্জনে অসহায় মানুষ বন্ধ সীমানায় খালিহাতে লড়াই চালাতো ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে।

ইতিহাসের রায়ে সেইকাল বর্বর বলে নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু বর্বরতার উচ্ছিষ্টটুকু বোধহয় এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। একেবারে নিশ্চিহ্ন হলে সভ্য সমাজ, মার্জিত বিংশ শতাব্দী মুষ্টি-যুদ্ধ নিয়ে এমন মাতামাতি করতে পারতো না।

কথাগুলো শুনে হয়তো মুষ্টিযুদ্ধ-প্রেমিকেরা রাগ করবেন। তাঁদের যুক্তি, ঃ মুষ্টিযুদ্ধ আত্মরক্ষায় রপ্ত করে তোলে, শরীরকে মজবুত করে, মনে জোগায় অফুরন্ত সাহসের পুঁজি। তাছাড়া মারাত্মক আঘাত এড়াবার চেষ্টায় আজ-কাল নিয়মকানুনেরও সংশোধন করা হচ্ছে। কিন্তু এতো করেও কি মুষ্টি-যুদ্ধের মারমুখী চরিত্রে বিপ্লব ঘটানো সম্ভবপর হবে?

হবে না। কারণ এই প্রক্রিয়ার মূলেই রয়েছে অপরপক্ষকে আঘাত হানার উসকানি। এবং সেই উসকানি বিধিসম্মত। অন্য কোনো খেলায় আঘাত হানার রীতি নেই। কুস্তি, ভারোত্তোলন ইত্যাদিও গায়ের জোরের খেলা। কিন্তু তা খেলাই। যেহেতু কুস্তি বা ভারোত্তোলনের আসরে প্রতিপক্ষকে আঘাতে ঘায়েল করার সংবিধানিক নির্দেশ নেই।

এককথায় মুষ্টিযুদ্ধের অনুষ্ঠান খেলাধুলোর কল্যাণকর প্রভাবকেই ঘায়েল করে তুলছে। এই অনুষ্ঠানের বাহ্যিক চাকচিক্য বা 'গ্ল্যামার' অবশ্যই কিছু আছে। আর আছে পেশাদারদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিযোগ। কিন্তু বিশুদ্ধ আনন্দ উপ-ভোগের সুযোগ আছে কিনা সন্দেহ। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের আনন্দ অনা-বিল নয়। যাঁরা লড়েন তাঁদের উপলব্ধিও কি আনন্দময়?

গ্ল্যামার আর প্রাপ্তিযোগের আক-র্ষণে রিংয়ের ধারে যাঁরা এসে পড়ছেন তাঁদের কেউ কেউ ওই আর্ণি নক্সের ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। যাঁদের ভাগ্য ততোটা ক্ষমাহীন নয় তাঁদেরও কেউ কেউ সামান্য অথবা স্থায়ী আঘাত চিহ্ন শরীরে এঁকে অবসর নিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ তাঁদের অক্ষতসত্তা অক্ষুণ্ণও রাখতে পেরেছেন।

কিন্তু অক্ষত সত্তা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি মুষ্টিযুদ্ধে তেমন নেই। শরীরে আঁচড় যদিও না পড়ে, মনে কিন্তু দাগ পড়বেই। তা সে মন মুষ্টিযোদ্ধা-দের হোক বা দর্শকদের হোক্।

সবমিলিয়ে মুষ্টিযুদ্ধ এক আদর্শ ও কল্যাণকর নজীর নয়। এই অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে বিংশশতাব্দীর সভ্য সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে। কিড্ বেনি প্যারেট, ডেভি মুর, আর্ণি নক্স এবং আর ও চারশতাধিক হতভাগ্যের কাহিনীতে চিন্তাশীল মানুষের মন আজ বিচলিত। বিশ্বাস করি, শহীদসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মুষ্টিযুদ্ধে অবিচল অনু-রাগ ও ভক্তি আজ যাঁদের রয়েছে তাঁরাও একদিন বিচলিত হয়ে উঠবেন। সব চিন্তাই সেদিনে সামগ্রিক মানবকল্যাণে একখাতেই প্রবাহিত হবে।

সেদিন কতোদূরে?

লণ্ডন থেকে বলছি

ইংলণ্ডের ষড়ঋতু

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘ কুড়ি বছর বৃটেনে বাস করার পর টনি মায়ার নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক বৃটিশ জীবন সম্পর্কে একটি উপভোগ্য বই লেখেন—La Vie Anglaise.

আবহাওয়া সম্পর্কে ইংরাজদের মনোভাব সম্পর্কে তিনি লেখেন,—আবহাওয়ার বিরুদ্ধে ইংরাজদের আলাপ-আলোচনায় চিরকাল অভিযোগ সত্ত্বেও তারা হেমন্তের কুয়াশায় ট্রেণ দুর্ঘটনা বন্ধের জন্য কিম্বা প্রতি বছর শীতে বরফ জমে জলের পাইপ ফাটা বন্ধের জন্যে কিছুই করে না। বসন্তে তাদের নদীগুলো উপচে ওঠে, গ্রীষ্মে জল সরবরাহে টান পড়ে। আর টুইডের পোষাক আগষ্টে নিতান্ত ভারী ও ঝকমারী এবং ডিসেম্বরে নিতান্ত পাৎলা হলেও বারো মাস ওই পরে ঘুরে বেড়ায়।

যদিও এদেশে আমার প্রবাস মসিয়ে মায়ারের অর্ধেক কাল তবু আবহাওয়া সম্পর্কে ইংরাজদের মনোভাব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের সবখানি মেনে নিতে আমি নারাজ। বস্তুত, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের এই দ্বীপপুঞ্জে ঋতুচক্রের আবর্তন এতই চাঞ্চল্যকর যে, সে-সম্পর্কে সচেতন না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু তা নিরবচ্ছিন্ন অভিযোগের নয়। তা হর্ষের ও বিষাদের, আনন্দের ও আতঙ্কের, ক্রন্দনের ও উল্লাসের।

নগরে সবুজ

আমাদের কোলকাতার চারপাশ থেকে জল-জঙ্গল খেত-খামার, গ্রাম ও গরুচরা মাঠ ক্রমশ পেছু হঠতে হঠতে অনেক দূরে চলে গেছে। তাই কালবৈশাখীর ঝড়ে বনস্পতির আর্তনাদ, জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্নে ফাটলধরা মাঠের উপর উত্তাপ-স্বচ্ছ বাতাসের ঝিম-ঝিম কাঁপন, কিম্বা বর্ষণমুখর শ্রাবণ-সন্ধ্যায় অবিশ্রান্ত ব্যাঙের ডাক, অথবা ফাগুনের ক্ষণ-বসন্তে পলাশবনে রঙের আগুন,—কোলকাতাবাসীদের কাছে শুধু পুঁথির পাতার বর্ণনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঋতুচক্রের আবর্তন তারা শুধু চর্ম দিয়ে অনুভব করে, মর্ম দিয়ে নয়। কিন্তু ইউরোপের নগরগুলির সঙ্গে প্রকৃতির ওরকম বিচ্ছেদ ঘটে যায় নি। লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে ট্রাফালগার স্কোয়ারে নেলসন-স্মৃতিস্তম্ভের উচ্চতা ১৪৫ ফিট। কটিদেশে কোষবদ্ধ তরবারি নিয়ে সেই স্তম্ভের শীর্ষে দাঁড়িয়ে সেনানায়ক নেলসনের কৃষ্ণ মর্মরমূর্তি বৃটেনের দক্ষিণ-সমুদ্রে অটল পাহারা দিচ্ছে।
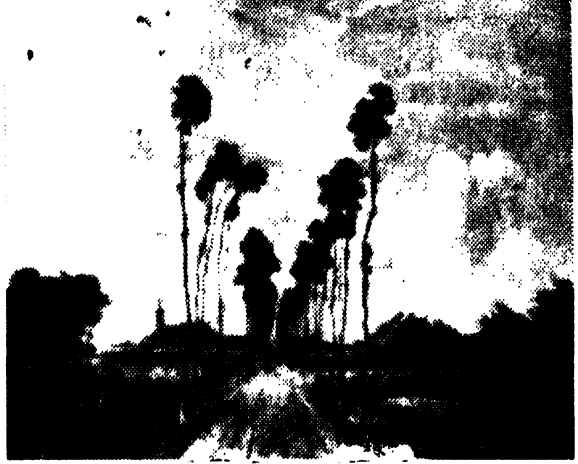
শিল্পী হোরেমার 'গ্রামের পথ'

শীতের ক'মাস ছাড়া, কেউ যদি সেই স্তম্ভের অর্ধেক পর্যন্ত উঠে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন তা হলে তিনি দেখবেন তিন দিকে এসেক্স ও মিডল সেক্সের বণরাজিনীলা আর দক্ষিণে সারে জেলার নম্র পাহাড়ের অনুত্তাল ঢেউ! রোমের ভিক্‌তর ইমানুয়েল স্তম্ভের পাদদেশ থেকে প্রায় পায়চারি করতে করতে বনানীর নিস্তব্ধতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া যায়। আর প্যারিসের নগর তোরণ পর্যন্ত এসে প্রকৃতি যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে!

শুধু পরিবেশেই নয়, নগরগুলির অন্তর্দেশে সবুজের বিস্তীর্ণ অধিকার। আর ইউরোপের নগরগুলির মধ্যে সম্ভবত লণ্ডনের উদ্যান পরিকল্পনাতেই নগরী ও প্রকৃতির মিতালীর সুন্দরতম প্রকাশ। প্যারিসের উদ্যানগুলি যেন অতি সজ্জায় প্রগলভা। বোঁয়া-দা-বুঁলো প্রেমিক-প্রেমিকাদের নন্দনকানন হতে পারে, কিন্তু লণ্ডনের কিউ গার্ডেন আরো রোমাণ্টিক! সেণ্ট জেমস পার্কের সুচারু-বিন্যাস-সুষমা অথবা পুষ্পোভরণ-হীনা গ্রীণ পার্কের শ্যামল অরণ্যাভাষের তুলনা নেই।

ক্লাব-সিনেমা - নাট্যশালা - নাচঘরের মতই এ নগরীর অধিবাসীদের জীবনের সঙ্গে এই পার্কগুলি ও চারিপাশের পাহাড়-বন-মাঠের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

শিল্পী ভেলডে ইসায়েস ভ্যান ডের 'শীতের নিসর্গ দৃশ্য'।

অকাল-বসন্ত

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এরই মধ্যে শীতের নিষ্করুণ মুঠি শিথিল হয়ে গেল। তাপমান-যন্ত্রের পারদরেখা স্মরণ-কালের মধ্যে সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহেই আটষট্টি ডিগ্রির নিশানা ছুঁয়ে এলো। শীতের নিষ্করুণ বন্দীশালায় বসন্তের এই অতর্কিত মুক্তি-পরোয়ানা সবাইকে নিতান্ত বিহ্বল ও বিভ্রান্ত করে দিয়েছে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী হাওয়া অফিসের ঘোষণায় জানা গিয়েছিল উত্তরে, স্কট-ল্যান্ডের খর্ব পর্বতশ্রেণীর চূড়ায়-চূড়ায় নিশীথের বাতাস তুষারাকিরীট পারিয়ে দিয়েছে। এক সময়ে, সমারসেট ও মিড-ল্যান্ডের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তুষার-ঝঞ্ঝা তাই তাঁরা সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন বিলম্বে হলেও দক্ষিণ বৃটেনে শীত আসছে, ভীষণ শীত! কিন্তু সর্বদেশেই বোধহয় হাওয়া অফিসের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটা একটু পরি-হাসের। তাই সূর্য-নিভে-যাওয়া, বরফ-ঝরা দিনের পরিবর্তে এলো সূর্যের ঝলমল আলো। ক'দিন আগেও প্রায়ই ঘন কুয়াশার আবরণে অম্বর ও ধরণী আবৃত হয়ে যেত। এখন অতি প্রত্যুষেও কুয়াশার দেখা নেই।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষকদের বিবরণীতে প্রকাশ, বাদুড়েরা নির্ধারিত সময়ের অন্তত দুমাস আগে তাদের হিমশয়ন থেকে জেগে উঠেছে। কচ্ছপেরা অসময়ে প্রান্তরে পদচারণা করছে। মশকেরা বেরিয়েছে রক্তের সন্ধানে। লন্ডন জুতে এক জোড়া কর্মরান্ট পাখি এরই মধ্যে ডিমে তা দেবার আয়োজন করছে। আর মৌমাছিরা তো একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত! অনেক প্রাণীর চেয়েই তারা এ দ্বীপ-পুঞ্জের আদি বাসিন্দা। তবু আজো তারা এ খামখেয়ালী ঋতুপ্রকৃতির হদিস পেল না। এই তো ক' বছর আগেই আর একবার শীতের উগ্রতা এমনিভাবেই অসময়ে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। তাই দেখে তারা ভেবে বসলো বুঝি অকাল-বসন্ত এসে হানা দিয়েছে। উৎফুল্ল হয়ে তারা চাকের সবখানি মধু নিঃশেষে পান করে ফেললো। কিন্তু তার পরেই এলো প্রচন্ড শীত—সঙ্গে ঝড়-কুয়াশার দুরন্ত সঙ্গী। লক্ষ লক্ষ মৌশাবক অনাহারে মারা গেল। প্রকৃতিবিদদের খাতায় সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার যে বিবরণী লেখা আছে তা প্রকৃত দুর্ঘটনার আভাষ মাত্র। কিন্তু এবার আর ভয় নেই। চারিদিকে ফুলেরাও জেগে উঠছে! চ্যানাল দ্বীপ-পুঞ্জের চালানী-ফুলের সমারোহে এরই মধ্যে ফুলের দোকানগুলির অভ্যন্তর-ভাগকে নানা রঙের অচঞ্চল ঝর্ণাধারার মত মনে হচ্ছে। শুধু এই পরিবর্তিত দৃশ্যপটে পল্লবহীন বৃক্ষগুলিই বিসদৃশ-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

(মার্চ, ১৯৫৭)

বিলম্বিত বসন্ত

মনে হয়েছিল এবার এপ্রিল শেষেও বুঝি বসন্ত আর এলো না। ২১শে এপ্রিল বর্ষপঞ্জীর হিসাবে বসন্ত শুরু। সেদিন নির্দিষ্ট নিয়মে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে গেল। তবু দিনের আলোর উত্তাপ ও ঔজ্জ্বল্য বাড়লো না। বরং ধূসর আকাশ থেকে ঘন-ঘন ইলসে-গুঁড়ি বৃষ্টি, তাপমান যন্ত্রের পারদ-রেখার চল্লিশের কোঠাতেই ওঠা নামা,—সব কিছুতেই শীত প্রলম্বিত হবার নৈরাশ্যজনক লক্ষণ!

এমন সময় দেওয়ালপঞ্জী থেকে এপ্রিলের পাতাটা ছিঁড়ে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে নাটকীয়ভাবে স্বর্গ-মর্ত-ব্যাপ্ত কুয়াশার ধূম্র যবনিকাটা সরে গেল! আর তার অন্তরাল থেকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সূর্যের আলোকদীপ্ত আনন্দ-মুখর কয়েকটা দিন! বড় দিনের পর থেকে মেঘ ও কুয়াশার আড়ালে-আড়ালে যে দিনের আয়ু অনেকখানি বেড়ে গেছে, তা এই প্রথম উপলব্ধি করার সুযোগ হলো! আর এলো ঘর ছেড়ে বেরোনোর পালা।

এখন আর ঘরের আলো জেলে সকালে বেরোবার জন্যে তৈরী হতে হয় না। এখন উষা আর সন্ধ্যার মেঘে-মেঘে দিগজোড়া সোনার আলো। সেই মায়াবী আলোয় আমার এই নিরালা ঘর থেকে দিগন্ত-বিলীন লন্ডন মহানগরীকে আকাশকক্ষা একটা বিপুল খেলাঘরের মত মনে হয়।

তবু দীর্ঘায়মান দিনগুলি এই আকাশজোড়া আলো-মায়া নয়। পৃথিবীর এই প্রান্তে তার আবর্তিত আবির্ভাব সবচেয়ে বাস্তব, তার অনুভব সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত। তার স্পর্শে কন্দরে-কোটরে মৃত্তিকার গর্ভে শীতশাপে নিমগ্ন অগণিত প্রাণ জাগছে। ভাঙছে উদ্ভিদের ঘুম। জ্বলছে চেরীশাখার গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে ফুলের কুঁড়ির ফুলকি!

এই আলোকের পুলকে হয়তো এরই মধ্যে স্কটল্যান্ডের তরাইয়ে লাল হরিণেরা বার-বার মুখ তুলে চাইছে, নিদাঘ দিনে তাদের শৈলাবাসগুলির প্রতি। হয়তো এ আলোর বার্তা দূরে দক্ষিণ আফ্রিকায়, মাদাগাস্কারে, মিশরে, কাশ্মীরে, বৃটেনের শীতে প্রবাসী পাখিদের ঘরে ফেরার জন্যে উন্মনা করে তুলেছে।

কিন্তু তবু তাদের গৃহমুখী হতে এখনো কিছু দেরী। কারণ তারা তো আর আমাদের এই গ্রহের আবহাওয়ার খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করে না। তারা চলে দ্যুলোকের ঘড়িতে, আকাশের ডায়ালে, চন্দ্র-সূর্যের কাঁটায়-কাঁটায় সময় দেখে।

(৫ই মে, ১৯৫৯)

নিদাঘ-প্রারম্ভে

নিরাভরণ গাছগুলির কাঠি-কাঠি ডালগুলি থেকে সবুজ কিশলয়ের ঝালর নেমেছে। দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে পাখিরা ফিরে এসেছে। কণ্ঠে ও পাখায় তাদের অভিসারের রঙ ও সুর। নগর-উদ্যানগুলিতে দীপ্ত-বসনা নর্তকীদের মত একে-একে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে মরশুমী ফুলেরা,—পলিয়ানথাস্, ড্যাফডিল, টিউলিপ ও আজেলিয়ারা।

পথে-পথে এখন অগণ্য জনতার ভিড়। মেয়েরা বেরিয়েছে ক্রমেই বেরুচ্ছে সিল্ক কিংবা পপলিনের সংক্ষিপ্ত পোশাক প্রায়-পরিধান করে। পুরুষেরা নিতান্ত ভারী ও ঝকমারী ওভারকোট ও ম্যাকের ভারমুক্ত হয়ে।

এখন পার্কগুলিতে ও সমুদ্রতীরে পাতা হয়েছে শত-সহস্র হাল্কা আরাম-কেদারা। অবসর পেলেই যুগলে-যুগলে নরনারীর দল চলে যাবে, পার্কে কিম্বা সমুদ্রতীরে। তৃণশয্যায়, উপল উপকূলে কিম্বা কেদারায় শুয়ে তারা কাটিয়ে দেবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নয়তো দীঘির জলে মরাল-মরালীর ভিড়ের মধ্যে বইবে তরণী অথবা মুঠি-মুঠি খাদ্যকণা ছড়িয়ে আলাপ জমাবে পাখিদের সঙ্গে। চাঁদনী-রাতে যখন সিলভার আশ অথবা বার্চের পাতায় লক্ষমাণিক ঝিলমিল করবে তখন পার্কের ভিড় ভাঙতে প্রতি রাত্রে তারিখ বদল হয়ে যাবে।

(২৮শে জুন, ১৯৫৯)

সে-দিন ছোটনাগপুরের ভাঙা হাটের জনতার মত আকাশের এখানে-ওখানে-সেখানে বিচ্ছিন্ন মেঘের জটলা। তবে তারা তখন ক্ষান্ত-বর্ষণ। তারই মধ্যে আমরা একটি দিনের আউটিংয়ে বেলা দশটা নাগাদ নর্থ ডরকিং পৌঁছলাম।

সারে জেলার এই অঞ্চলের নয়না-ভিরাম নম্র পাহাড়, লক্ষ ডেজির জোনাকী-জ্বালা প্রান্তরের ঢেউ এবং সযত্নরক্ষিত বনভূমির শ্যামলশ্রী বহুদিন থেকেই শিল্পী, কবি ও ভাবুকদের এক প্রবল আকর্ষণ। এখানে এমনি উতলা নিদাঘ দিনে কবি কীট্‌স্ প্রায়ই আসতেন তাঁর ক্লান্ত দেহ ও বিষণ্ণ মন নিয়ে। আর এই আশ্চর্য পরিবেশের মধ্যে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন থেকে "দেবদূতের অশ্রুর" মত একটি করে দিন ঝরে যেত।

ইংল্যান্ডের প্রায় সমস্ত গ্রামাঞ্চলের মতই এ অঞ্চল সর্বত্র মোটরে ভ্রমণের উপযোগী এবং বিদ্যুৎ ও ফোন-টেলিভিশনযুক্ত। খাঁটি ইংরাজ গ্রামের মতই বাড়ীগুলি নাতিবৃহৎ, রমণীয় ও আপাতদৃষ্টিতে জনমানবহীন। গ্রামেরই মত পরিবেশের বনভূমি নিথর ও নিস্তব্ধ। তারই মাঝে আমরা নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াই।

তারপর একসময় উত্তর ইউরোপের দীর্ঘজীবী দিনান্তও দিগন্তে লুটিয়ে পড়ে। জাফ্রীকাটা মেঘের মিনারে কনে-দেখা আলোর বর্ণবহুল দীপালী নিবু-নিবু হয়। আমরা বিশ্রামস্থলের দিকে যাত্রা করি। সেই বিজন বনভূমি এবং বিরল ও নিষ্পন্দ গ্রামের পাশ কাটিয়ে, ঘনবিন্যাস তরুবীথিকার পল্লবঘন শাখা বাহুর নীচে দিয়ে দীর্ঘ বিসর্পিল পাহাড়ী পথে চলি। আর সেই অবাক স্তব্ধতার মধ্যে নিজেদের ক্লান্ত পদ-শব্দের প্রতিধ্বনি শুনি। ওদিকে দূরে ওক-পাইন ও বার্চের বনে অন্ধকার জমাট বাঁধে। আরেকটু পরেই মহাকাশ থেকে জ্যোতির্ময় সূর্যের শেষ রশ্মি-রেশটুকুও মুছে যায়। শুধু অম্লান হয়ে থাকে স্মৃতির মণিকোঠায় আনন্দে-আলোকে-সৌন্দর্যে-সৌহার্দ্যে উজ্জ্বল একটি দিন।

(২১ আগস্ট, ১৯৫৮)

হেমন্তের বিপুল নিশ্বাস

আজ প্রায় তিন মাস হতে চললো সূর্য-সারথি তাঁর প্রভুর সপ্তাশ্ববাহিত রথকে দক্ষিণ আয়নে উধাও করে দিয়েছেন। সেই বিপুল রথচক্রের বিরাম-বিহীন আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উত্তরভাগের দিনের আয়ু ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে। আর কিছুদিনের মধ্যে একেবারেই হারিয়ে যাবে আকাশের দুর্লভ নীল। গাছের পাতায় দেখা দেবে জরার-চিহ্ন। ম্লান হয়ে যাবে সবুজ ঘাসের গালিচা। পার্কে পার্কে ফুলশয্যাগুলির রঙের আগুন হয়ে যাবে নিভু-নিভু। ডালিয়ার ভিড় যাবে ভেঙে, কিসানথিমামরা পড়বে ঝড়ে, ডি-হাইড্রেজের কলরব হয়ে যাবে শান্ত। দিকে দিকে ফুটে উঠবে বসন্ত-বিদায়ের বিষণ্ণতা।

তখন আর পথে বেরুলেই ভ্রমণ-কারীর দল চোখে পড়বে না। হোয়াইট হলের সামনে বিরাট ঘোড়ার ওপর জমকালো পোষাকপরিহিত সোয়ারের প্রতি গ্রাম্য ইংরাজ জনতাকে আর অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখা যাবে না। দীর্ঘদেহ আমেরিকান তরুণের দল তাদের স্কন্ধলম্বিত ক্যামেরা ও বুকভরা সুখ-স্মৃতি নিয়ে ততদিনে দেশে ফিরে যাবে। তখন হঠাৎ কোন পথের বাঁকে তন্বী ফরাসী তরুণী এসে পথের নিশানা জিজ্ঞাসা করে পথিকজনের চিত্তে চমক জাগাবে না।

গরীব গৃহস্থেরা আজো যারা গ্রীষ্মের ছুটি নেয়নি, শেষ পর্যন্ত তারাও তা নিচ্ছে। সাধ্যে কুলালে চলে যাচ্ছে কোন সমুদ্রতীরে অথবা শৈলশিরে। নয়তো মফস্বলপল্লীর সন্নিধিতে অপরিচিত জনতার মাঝে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিচ্ছে অবসর-বহুল কয়েটা দিন।

(১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯)

জন কনস্টেবলের প্রখ্যাত 'দি হে-ওয়েন'—একটি নিদাঘ দিনে ইংল্যাণ্ডের গ্রাম।

কানন-প্রান্তর, উপবন-উদ্যান দিগ-দিগন্তে জাগছে সোনার সিম্ফনী। মাঝে মাঝে হেমন্তের বিপুল নিশ্বাসে দূর-প্রক্ষিপ্ত ঝঙ্কারের মত স্বর্ণ-বর্ণ-পত্রাবলী উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

পার্কগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ জনহীন হয়ে পড়েনি। পাখির প্রতি এদেশের জন-সাধারণের ভালোবাসা অগাধ, আগ্রহ অসীম। তাই যে-সব জলচারী পাখিদের বিভিন্ন পার্কের দীঘি ও হ্রদে রাখা হয় তাদের-পালিত পারাবতদের এবং উত্তরের আরো শীতের দেশ থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী পাখিদের খাদ্যকণা বিতরণের জন্যে বালবৃদ্ধবণিতার হামেশাই আনাগোণা।

(১০ই অক্টোবর,১৯৫৯)

বাঙলাদেশের আকাশ জুড়ে যখন হেমন্তের সোনালী আলো তখন এখানে দিনগুলি আলোক-হারানো, আঁধার-জড়ানো। সেই স্বর্গমর্তপরিব্যাপ্ত ভিজে, ভ্যাপসা, নিরন্ধ্র ও নৈরাশ্যজনক কুয়াশায় কলরুদ্ধ এই শহরে, মনের বিষাদে, দিবসে বাতি জ্বালিয়ে কলম-মজুরী করি।

একদিন তারই মধ্যে আকাশে নিষ্প্রভ সূর্য দেখা দিল। আমি বসন্তদিনের রিজেন্ট পার্কের আমার সেই প্রিয় কোণটিতে এসে দাঁড়ালাম। ধূসর আকাশে ম্লান পটভূমিকায় উদ্যানটির উত্তরের সারিবদ্ধ পত্র ও বল্কলহীন তরুশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন কোন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তুদের কঙ্কালের মিছিল স্তব্ধ হয়ে আছে।

অদূরে একটি সর্পিল দীঘি। তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। গ্রীষ্মের সূর্যের উদার আলো-উত্তাপে সেই দ্বীপে ঝলমল করতো একটি উপবন। সেখানে জাগতো প্রাণের উচ্ছ্বাস; বিচিত্র পাখিদের কাকলি। আজ সেই রিক্ত উপবনে সর্ব-ব্যাপ্ত নীরব বিষণ্ণতা।

হায়! —এ যেন সেই বেশবিলাসিনীর মুখদেখার আয়নায় কাঁচখানা খসে গেছে। দেখতে দেখতে গামছার মত হয়ে গেছে তার বেনারসী।

সেদিন দীঘিতে দৃপ্ত গ্রীবাভঙ্গি করে প্রমোদবিহার করতো মরালী-পরিবৃত মরাল। আজ দেখি তারাই শীতার্ত সঙ্কুচিত হয়ে একটি পত্রহীন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কোন সামন্ত যুগের এক রাজ্যহারা রাজ-পরিবার চরম লাঞ্ছনায় ম্রিয়মাণ হয়ে মুষ্টিমেয় অনুচরপরিবৃত হয়ে পথ-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই চরম দুর্দশার লজ্জা নিবারণের জন্যে তাদের কেউ কেউ পক্ষপুটের মধ্যে মুখ ঢেকে আছে।

হঠাৎ আবিষ্কার করি আমি একা নই। এক তরুণী শিল্পী ইজেলের পাশে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রাণের আদি উৎস সূর্যের করুণালাভের জন্যে কঠোর তপস্যামগ্ন প্রকৃতির ছবি আঁকছেন।

তাই তো! স্টুডিওর বিবস্ত্রা মডেলের মত এই নগ্নতরুদেরও একটি আবেদন আছে। বছরের আর কোন সময়েই তাদের অঙ্গের গড়ন ও ছন্দ এমন করে প্রকাশ পায়? ধূম্র আকাশের পটভূমিতে বল্কলহীন বৃক্ষের শাখা ও কাণ্ডের ফিকে হলুদ ও রক্তাভ পীতের সমন্বয়টাও কি কম আকর্ষণীয়? একটি নিষ্পত্র উপবন কিংবা বনভূমির অবাক, নিশব্দ রিক্ততারই বা তুলনা আর কি আছে? (২০শে নভেম্বর, ১৯৬২)

যৌবনকে ভালো করে না চিনে যাঁরা যৌবন সম্পর্কে যে-কোন মন্তব্য করেন, যৌবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়েও তাঁদের প্রতি আমার মন বিরূপ। অক্টোবর মাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনৈকা মহিলা মন্তব্য করেছিলেন, 'বসন্তপ্রেমের মৃত্যু ঘটে হয় অক্টোবরে নয় বিবাহে!'—এতবড় একটি পল্লবগ্রাহী মন্তব্যকেও

এখানের একটি বিশিষ্ট কাগজ সেই সপ্তাহের স্মরণীয় মন্তব্য বলে প্রকাশ করেছিলেন। মন্তব্যের দ্বিতীয়াংশ সম্পর্কে আমার কিছু বলা সমীচীন নয়। কিন্তু প্রথমাংশ যে সর্বৈব ভিত্তিহীন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ নিবিড় মিলন-সুখী প্রেমিক-প্রেমিকাদের হয়তো আর পার্কে, সরসী-তীরে কিংবা টেমসের ওপর নৌকাবিহারে, সর্বত্রই চোখে পড়বে না। কিন্তু অক্টোবর গতায়ু হবার বহু পরেও যদি আপনি কোন পাড়ার মধ্যে দিয়ে গভীর রাত্রেও যান তো দেখবেন, তারা প্রায় প্রতিটি বারান্দায় মিলনমগ্ন। বাধা হয়তো আছে, তবে তা শীতের নয়। শীত-নিবারণী বস্ত্রের অপরিহার্য প্রাচুর্যের।

(৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৯)

বড়দিন

ঘড়ির ডায়ালের সেকেণ্ডের কাঁটার মত বর্ষশেষের সপ্তাহগুলি দ্রুততালে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। আর ক্রমেই এগিয়ে আসছে ইউরোপের মহত্তম উৎসব—দীনদয়াল প্রভু যিশুখৃষ্টের জন্মলগ্ন।

আমাদের শ্রেষ্ঠতম উৎসবের প্রধানা হলেন প্রকৃতি। তিনি সাদা মেঘের জাফ্রীকাটা নীল আকাশের শামিয়ানা টাঙিয়ে, কাশফুলের চামর দুলিয়ে, ভরা নদীর ক্ষুরধারায় জলতরঙ্গ বাজিয়ে, শিশিরস্নিগ্ধ প্রভাতে শিউলী ফুলের মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে, এমন একটা আনন্দময় পরিবেশ রচনা করে দেন যে মানুষের মন আপনি মেতে ওঠে। কিন্তু এখানে করুণাহীনা প্রকৃতিই মানুষের উৎসবের প্রধান বাধা। উৎসবের দিন যতই এগিয়ে আসছে বাতাস ততই হিম-স্পর্শ হয়ে উঠছে, ধূসর আকাশ থেকে ততই ঘন ঘন বৃষ্টি নামছে অথবা গাঢ় কুয়াশা এসে ম্লান ও ক্ষণজীবী দিবসের মধ্যাহ্নে আঁধার সৃষ্টি করছে।

তবুও প্রকৃতির বিরূপতাকে জয় করে মানুষের উৎসব আয়োজন যে কি বিপুল হতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় এখন লণ্ডনে এলে।

(১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬০)

হোয়াইট খৃষ্টমাস বা শ্বেত বড়দিন বৃটেনবাসীর পরম আকাঙ্খিত। এবছরে তাদের সে অভিলাষ চরিতার্থ হয়েছে। স্মরণকালের মধ্যে এ দিনে এমন তুষার-পাত নাকি আর হয়নি।

প্রকৃতির রঙ ও রূপকে যতভাবে, যত অবস্থায় কল্পনা করা যায় তার মধ্যে চিমনীর উত্তাপে কবোষ্ণ কক্ষে বসে শাশীর ওপারে বিরামবিহীন তুষারপাত দেখার তুলনা নেই। যেন ধূসর আকাশের সারিবদ্ধ আঙ্গিনায় বসে লক্ষ-কোটি ধুনুরী পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের স্তূপের প্রান্তে ধনুতে আঘাত হানছে আর উড়ু-উড়ু, পেঁজা-পেঁজা তুলোয় মর্তলোক ছেয়ে যাচ্ছে!......কখনো তা ঝরছে সঘন বর্ষণে অযত্নে শিউলী ফুলের মত। কখনো দমকা হাওয়ায় দোল খেয়ে খেয়ে। কখনো স্বচ্ছতর আলোয় লঘু অভ্রকণার মত উড়ে-উড়ে, ঘুরে-ঘুরে।

তুষার ও সূর্যকিরণের সমাবেশ এক দুর্লভ সৌভাগ্য। আজ সকালে সেই অতুল আশীর্বাদ আকাশ থেকে ঝরে পড়েছে। যেন উত্তর-আয়নে ঘোরবার বাঁকে সূর্যের জ্যোতির্ময় রথের চূড়ার একঝলক আলো। মেঘের শামিয়ানা ভেদ করে মহানগরীর বুকের ওপর এসে পড়েছিল। আর সেই আলোয় বাড়ীর কার্নিশে, চলমান গাড়ীর হুডে, পথে, ফুটপাথে সর্বত্র সঞ্চিত তুষার ঝলমল করে উঠেছিল। পথের মোড়ে ছোট্ট তেকোণা পার্কের নিষ্পত্র গাছের ডালে ডালে জড়ানো বরফে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে যেন মনে হচ্ছিল অকস্মাৎ অগণ্য ঝর্ণা ও ফোয়ারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে!

রাত্রি এলো। চাঁদ উঠলো! লক্ষ্মী-পূর্ণিমার মত উজ্জ্বল চাঁদ। আর ক্ষান্ত তুষার বর্ষণ, শ্বেতাম্বরা, নীরব, নিথর, পথ-জনহীন মহানগরীকে যেন মনে হলো শৈশবের স্বপ্ন থেকে মূর্ত রূপ-কথার কোন এক স্ফটিক নগর।

(২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬২)

দেখতে দেখতে শীত নিষ্করুণ ও হিংস্র হয়ে উঠলো। ১৮৯৫ সালের পর নাকি এমন দুর্দৈব আর ঘটেনি।

শোনা যাচ্ছে মেরু দেশের এস্কিমোরা তাদের উন্নততর 'কেন্দ্রীয় উত্তাপযুক্ত' ঘরে বসে রেডিওতে শীতে বৃটেনবাসীর নাস্তানাবুদ হবার বর্ণনা শুনে বৃহৎ আফশোস করছে। হিমাঙ্কের ৩০ ডিগ্রি নীচে-নামা শীতে বাস করে মস্কোবাসী হিমাঙ্কের ১৬-২০ ডিগ্রি নীচে-নামা শীতে কাহিল বৃটিশদের কথা শুনে পরিহাস করছে। প্রাভদায় বৃটেনের শীতের দিনে গৃহসমস্যা নিয়ে তীব্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

আর এখানে? —এখনো কি করে যে টিঁকে আছি তাই ভেবে অবাক হচ্ছি। শুধু যে আমাদের বাড়ীটি সমেত শতকরা ৯০টি বাড়ী কেন্দ্রীয় উত্তাপ-হীন তাই নয়, সার্বজনীন লোলুপ ব্যবহারে বিদ্যুৎ ও গ্যাসে এমনি টান পড়ে যে ক'দিন লণ্ডনের বিস্তীর্ণ এলা-কায় লোকে অন্ধকারে রাত কাটাচ্ছে। মোমবাতি জ্বেলে হাসপাতালের কাজ চলছে। পুরোনো প্রথা মত জলের পাইপ এখনো অধিকাংশ বাড়ীর বাইরে। তাই পাইপে জল জমে জলের হাহাকার পড়েছে। কোথাও কোথাও কাউন্টি কাউন্সিলের কর্মীরা এসে তাতিয়ে-খুঁচিয়ে পথের কলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু সেই পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত বরফ ভেঙে জল আনার চেয়ে আগুন তাতা বালিচরের ক্লেশ ভেঙে জল আনা সহজ।

অন্তরীক্ষ থেকে নাকি এই দ্বীপ-পুঞ্জকে অতলান্তিক সমুদ্রে ভাসমান এক বিশাল হিমশৈলের মত মনে হচ্ছে। হ্রদ-সরোবর, এমন কি টেমসের জলস্রোত, মাইলের পর মাইল জমে গেছে। শত-শত গ্রাম ও ক্ষেত-খামার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হেলিকপ্টারে করে সেই সব অঞ্চলের মানুষ ও পশুদের জন্যে রসদ সরবরাহ হচ্ছে। এরই মধ্যে ডার্টমুরের কয়েদ-খানা থেকে এক আসামী সটকে পড়েছে। চিন্তিত পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলেছেন, "আসামীকে গ্রেপ্তার করার চেয়ে উদ্ধার করাটাই হচ্ছে এখন আমাদের প্রাথমিক চিন্তা।" (জানুয়ারী, ১৯৬৩)

তখন ফেব্রুয়ারী যায়-যায়। লোকে শীতের হিংস্র মুঠি থেকে মুক্তির দিন গুনছে। এমন সময় হাওয়া এলো হাওয়াঅফিসের হুঁসিয়ারী। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ব্লিজার্ড আসছে, ব্লিজার্ড। ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঢেউএ চেপে আসছে বৃষ্টি ও তুষার। তুষার ও বৃষ্টি।

দীর্ঘ স্থলভূমি পার হয়ে, প্রাসাদ ও অট্টালিকায়, গীর্জায় ও গম্বুজে ধাক্কা খেয়ে; মাথা ঠুকে, ছিন্নভিন্ন ও এলো-মেলো হয়ে সেই ব্লিজার্ড যখন লণ্ডনের বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো, তখন তার দুরন্ত দাপট অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তার নাড়া খেয়ে সমস্ত শহরটা কী নাস্তানাবুদ ও নাজে-হালই হলো!

তবু জানি আরেক দোলাও আসছে! বসন্তের দোলা! তখন এই জানালা দিয়েই দেখ'বা মরা গাছের ডালে-ডালে, তালে-তালে নবীন কিশলয়ের শিখা, ড্যাফডিলের হর্ষে ধরার শিহরণ।

(২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩)

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

স্বর্ণলতার শরীর ভেঙেছে অনেকদিন; তার স্বাস্থ্য অসাধারণ রকমের ভাল বলেই এতদিন সে তথ্যটা কারও নজরে পড়ে নি। তার প্রসঙ্গে বিশ্রাম বা কর্মহীনতা কেউ কল্পনাও করতে পারে না; সে দিনরাত এই সংসারে খাটবে সেইটেই যেন স্বাভাবিক। সেই কথাই সবাই জানে। সে খাটুনিও উদয়-অস্ত। শাশুড়ী অথর্ব হয়েছেন, অন্ধ হয়ে গেছেন প্রায়—তবু তাঁর খোরাকটি ঠিক বজায় আছে। সে বিচিত্র খাদ্য-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তনই হয় নি। আর তার আয়োজনের ভারও স্বর্ণরই ওপর চেপে আছে এতাবৎ কাল। অন্য বৌ এসেছে বটে কিন্তু তাদের রান্না তাঁর মুখে রোচে না। তারা নাকি সব মেলেচ্ছও, তাদের হাতে খেলে বামুনের বিধবার জাতজন্ম থাকে না। তারা নাকি হাত ময়লা হবার ভয়ে গোবরে হাত দিতে চায় না, হাজা হবার ভয়ে হাত ধোয় না। চা খেয়ে কাপটা নামিয়ে রেখেই টপ্ করে ভাঁড়ারে হাত দেয় তারা। তাঁর পৌনে-চারকাল কেটে গেছে, এখন কি আর এসব অনাচার তাঁর সয়? না হয় না-ই খাবেন তিনি। এ তো আর অল্পবয়সী ছুকরীদের মতো 'নোলার' জন্যে খাওয়া নয়—তাঁর খাওয়া এখন 'পেট ব্যাগলতা'—জীবনধারণের জন্যে। তা আর বাঁচার দরকারই বা কী তাঁর? বাঁচতে চানও না তিনি। কেউ যদি দয়া করে খানিক বিষ খাইয়ে দেয় তো তাকে আশীর্বাদই করবেন প্রাণভরে।

অর্থাৎ সেই এধারে বেলা তিনটে এবং ওধারে রাত এগারোটা পর্যন্ত হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে বসে থাকা অব্যাহত আছে তার। উপরন্তু ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে—তাদের জন্যে আরও ঢের খাটুনি বেড়ে গেছে তার। জায়েরা এসেছে বটে একে একে কিন্তু তাতে কোন সুবিধা হয়নি। একটু-আধটু ফায়ফরমাশ খাটা ছাড়া কোন কাজ পায় নি তাদের দ্বারা। তাও, তারা কদিনই বা ঝাড়া হাত-পা থেকেছে। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো প্রায় আঁতুর-ঘরের ব্যবস্থা। তারপর এখন তো কথাই নেই—যে যার আলাদা সব। বুড়ো শাশুড়ীকে কোন বৌ-ই নিতে চায় নি। তিনিও যেতে চান নি কারুর ভাগে। তিনি ভালভাবেই জানেন যে, তাঁর এত ঝামেলা, এত দাপট আর কোন বৌ সহ্য করবে না।

অবশ্য স্বর্ণ বলেও নি কাউকে কিছু। নিজেই নিঃশব্দে বহন করেছে এ-বাড়ির জোয়াল। বধূর যতকিছু দায় দায়িত্ব। শাশুড়ীকে ঘাড় থেকে নামাতে চায় নি। নিজেই মুখ বুজে সহ্য করেছে এই অমানুষিক খাটুনি আর অমানুষিক হৃদয়হীনতা।

কিন্তু এবার শুধু তার মন নয়—দেহও বিদ্রোহ করল। আর নয়, আর পারবে না কিছুতেই এ বোঝা বইতে, এ ভার টানতে। তার সহ্যশক্তি সহনশীলতার শেষ সীমা লঙ্ঘন করেছে এবার। দড়িতে টান পড়তে পড়তে তার শেষ তন্তুটিও ছেঁড়বার উপক্রম হয়েছে। আর সে পারবে না নিত্য নানা লোকের বিবিধ জুলুম সহ্য করতে। এবার পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে দীর্ঘদিনের এই একটানা জীবনযাত্রায়।

জ্বর হচ্ছিল কিছুদিন থেকেই। প্রত্যহই জ্বর আসছিল একটু একটু। বিকেলের দিকে আসত আবার রাত্রে ছেড়ে যেত। কিন্তু ক্রমশ ছাড়াটা বন্ধ হয়ে গেল, সামান্য জ্বর নাড়িতে লেগেই থাকে সারা দিনরাত। উলটে নূতন উপসর্গ দেখা দিল—কাশি। অষ্টপ্রহরই অল্প অল্প খুক্‌খুকে কাশি লেগে থাকে। ইদানীং সে কাশির বেগও বেড়েছে।

জ্বরের কথা স্বর্ণ কাউকেই বলে নি এতদিন। বিশেষ যে সাবধানে থাকত তাও নয়। স্নানও করত মাঝে মাঝে। ভাত তো খেতই।

অবশ্য সে না খাওয়ারই মধ্যে। ভাতের কাছে বসত শুধু। কিছুই খেতে ইচ্ছে করত না তার। দারুণ বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছিল সর্বপ্রকার খাদ্যবস্তুতে। খাওয়া কমার ফলেই হয়ত দেহটাও শুকিয়ে যেতে লাগল দিন দিন। সে বেঁটে হলেও, চিরদিনই তার গোলালো গোলালো নরম নরম গড়ন, সেজন্যে একটু মোটাই মনে হত তাকে হঠাৎ দেখলে—কিন্তু এখন একেবারেই কঙ্কালসার হয়ে উঠল। ওর সেই মেমসাহেবদের মতো ফরসা রঙেও বিবর্ণতা ঢাকা পড়ল না—স্বভাবগৌরবর্ণ ছাপিয়ে উঠল রক্তহীনতার চিহ্ন।

স্বর্ণ না বললেও এসব লক্ষণগুলো অপরের চোখে পড়তে পারত। কিন্তু কার চোখে পড়বে? শাশুড়ী দেখতে পান না, পেলেও লক্ষ্য করতেন কিনা সন্দেহ। আর যার চোখে পড়ার কথা সবচেয়ে বেশী, তার সঙ্গে তো দেখাই হয় না আজকাল ভাল করে। সকাল-

টুকুই যা বাড়িতে থাকে শুধু—ঘণ্টাদুই বড়জোর—সে সময়েও সর্বদা ব্যস্ত থাকে। লোক আসার বিরাম নেই কোন সময়েই, যদি বা কোন সময় একটু ফাঁক রইল তো কাগজপত্র হিসাবনিকাশ আছে। তাতেই সময় কেটে যায়। কোন-মতে এক সময় উঠে মাথায় জল ঢেলে খেতে বসে। তাও, অন্যমনস্কভাবেই খায়, কেউ কথা কইলে অন্যমনস্কভাবেই জবাব দেয়। কারও দিকে ভাল করে তার তাকাবার অবকাশ নেই।

তবু এক সময় তাকাতে হল। একদিন আর কোনমতেই উঠে দাঁড়াতে পারল না স্বর্ণলতা। মুখ গুঁজড়ে পড়ল একেবারে।

এরকম এ সংসারের ইতিহাসে কখনও ঘটে নি, এক স্বর্ণলতার আঁতুড়ে ঢোকবার সময় ছাড়া। সে সময় তবু কিছু প্রস্তুতি থাকত আগে থেকে, অন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা থাকত। কিন্তু এর কোন প্রস্তুতি ছিল না। মাথাতে আকাশ ভেঙে পড়ল সকলকার। কে মুখে জল দেয় তারই লোক নেই। ছেলেরা কিছুই পারে না, এ বাড়িতে কোন বেটাছেলের জল গড়িয়ে খাওয়ারও রীতি নেই। পারত এক মেয়ে—কিন্তু স্বর্ণর বড় মেয়েটিরই বয়স এই সবে বছর দশেক। সে একটু-আধটু ফায়-ফরমাশ খাটতে পারে মাত্র। তাকে দিয়ে রান্নার কোন কাজ কখনও করায় নি স্বর্ণ, ওদিকেই যেতে দেয় নি। তাছাড়া এখন ইস্কুলে পড়া রেওয়াজ হয়েছে, পাড়াঘরের অধিকাংশ মেয়েই ইস্কুলে পড়ে—রেবাকেও দিতে হয়েছে। স্বর্ণলতার কতকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। সুতরাং সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে চলে যায়—তাকে কাজকর্ম শেখাবেই বা কখন?

হরেন এতকাল সংসারের দিকে মন দেয় নি—দেবার দরকার হয়নি বলে। এখন আর মন দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। সে দস্তুরমতো বিরক্তও হয়ে উঠল। সেজন্যে—এটা যেন তার ওপর একটা অবিচার বলেই মনে হ'তে লাগল তার। বললে, 'কৈ, তোমার এমনধারা অসুখ হয়েছে—এতকাল ধরে ভুগছ, আমাকে বলো নি তো?'

এর উত্তরে অনেক কিছু বলতে পারত—কিন্তু কখনই কোন কটু উত্তর, কথার দ্বারা কোন মর্মান্তিক আঘাত কাউকে দিতে পারে না স্বর্ণ। আজও পারল না, ম্লান হেসে শুধু বলল, 'কী আর বলব, তুমি ব্যস্ত থাকো—তুমিও তো খাটছ ভূতের মতো, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করব?'

'সামান্য আর কোথায়—এ তো বেশ ভাল রকমই বাধিয়ে বসে আছ। দেখতে পাই!'

'বেশ ভাল রকম বলে কিছু তো তেমন বুঝতে পারিনি, তা'হলে বলতুম!'

ঈষৎ যেন লজ্জিতভাবে, কৈফিয়তের সুরেই বলে স্বর্ণলতা।

সে যেটা বলতে পারে না, সেটা বলে দেয় জীবন, ওর মেজ দেওর। বলে, 'এতদিন ধরে ভুগছে, এই চেহারা হয়ে গেছে—তবু মুখ ফুটে বলতে হবে যে অসুখ, তবে তুমি ডাক্তার দেখাবে? বাধিয়েছে সে তো বৌদির দিকে চাইলেই বোঝা যায়।...... তুমি কি একবারও বৌদির দিকে চেয়ে দ্যাখো নি এই একটা বছরে?'

ওর মা অবশ্য দমবার পাত্র নন, সমান ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দেন, 'আমি কি চোখে দেখতে পাই যে, কী দশা হয়েছে তা টের পাব?......না কি তোমার বৌই আমাকে ব'লে কখনও—কী হচ্ছে না হচ্ছে! দাসী বাঁদী পড়ে থাকি, যখন হোক দয়া ক'রে দুটো খেতে দেয় ভিক্ষের ভাত—এই পর্যন্ত। ...আমাকে কি গুরু-জন আপনার জন বলে মনে করে?...... আর আমি যদি বুঝতেই পারতুম—তোর টিকি দেখতে পাচ্ছি কখন যে বলব। বছরে একদিন দেখা হয় কিনা সন্দেহ।... আর আমাকেই বা এমন চোখ-মুখ রাঙিয়ে তেড়ে এসেছিস কিসের জন্যে? তোর মাগ, রোজ রাত্তিরে গলা জড়িয়ে শুচ্ছিস, তুই টের পাস না?...আ মল যা! আমার কাছে এসেছেন—বৌয়ের কেন অসুখ করল, কেন সে অসুখের কথা ওঁকে জানানো হ'ল না তার কৈফিয়ৎ চাইতে!...বেহায়া বেইমান কমনেকার!'

কিন্তু বকাবকি অনুযোগ অভি-

"কিছুতো তেমন বুঝতে পারিনি, তাহলে বলতুম!"

যোগের সময় বেশী নেই হাতে। সেদিনের মতো অবশ্য ভাইয়ের বৌরাই চালিয়ে দেবে—একবাড়িতে থাকা—সেটুকু চক্ষু-লজ্জা এখনও আছে ওদের—তার পর?

হরেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করে না সহজে, 'তা তোরা তো দেখেছিলি, তোরাও তো বলতে পারতিস। দেখছিস তো আমার নাবার খাবার সময় নেই—এদিকে রাত দুটো আড়াইটেয় ফিরি, ওদিকে নটা না বাজতে বাজতে বেরুই। আমার কি কোন দিকে চাইবার ফুরসুৎ আছে?......এক-বার কথাটা কানে তুলতে কি হয়েছিল? তোদেরও তো কম করেনি তোদের বৌদি!'

মাকে গিয়েও তিরস্কারের সুরে প্রশ্ন করে হরেন, 'ওর এমন দশা হয়েছে তা আমাকে একবার বলতে পার নি!'

অগত্যা ডাক্তার ডাকারও আগে ঠাকুরের খোঁজ করতে বেরোতে হয়। অফিস কামাই ক'রে সারা বেলা ঘুরে প্রায় ডবল মাইনে কবুল ক'রে শেষপর্যন্ত এক বামুন ঠাকরুণকে ধরে নিয়ে আসে হরেন।...

অল্প-বয়সী বিধবা একটি, তবে অনেকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে। পাড়াঘরে যে-সব রাঁধুনী দেখা যায়

সে রকম নোংরা নয়। বামুনের মেয়েও বটে—জনাশুনা জায়গা থেকে নিয়ে এসেছে। সেই সুদূরে বেহালার কাছে সোরশুনো না কী এক জায়গা আছে, সেইখানে বাড়ি—সেখান থেকে আসতেই নাকি আট টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হয়েছে হরেনকে—আত্মীয়স্বজন অনেক আছে সেখানে, তাদের সংগে দেখা ক'রে খোঁজ-খবর ক'রে এনেছে। মার জন্যেই এত কাণ্ড করা—ঠিক সৎ ব্রাহ্মণের মেয়ে না জানলে তিনি ওর হাতে খাবেন না।

ব্রাহ্মণের মেয়ে, পরিষ্কার কাপড়-জামা, কথাবার্তা ভাল—সবই ঠিক, তবু স্বর্ণর এতকালের ঘরকন্না, তার অতি-প্রিয় ও অতিপরিচিত হেঁশেলের মধ্যে একটা অপরিচিত মেয়েছেলে গিয়ে ঢুকল—বহুকাল হয়ত বা চিরকালের জন্যই; তার পরিপাটি ক'রে নিজের হাতে সাজানো ভাঁড়ার—কী আগোছালো নোংরা ক'রে তুলবে তা-ই বা কে জানে, কী রেঁধে দেবে তার স্বামীপুত্রকে, হয়ত মুখেই তুলতে পারবে না কেউ—না খেয়ে খেয়ে রোগা হ'তে থাকবে বাচ্চারা;—এই সব সাত-পাঁচ ভেবে স্বর্ণলতার দুই চোখের কূল ছাপিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল। তার শোবার ঘরের একটা জানলার মধ্য দিয়ে তাদের রান্নাঘরটা দেখা যায়, বামুনমেয়েকে সেখানে ঢুকতে দেখবার পর থেকে আর ওদিকে একবারও চাইতে পারল না সে, দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে রইল সমস্তক্ষণ।......

রাঁধুনী ঠিক হ'তে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ওর চিকিৎসার কথা ভাবতে বসল হরেন। সকালে অবশ্য পাড়ার ডাক্তার—যিনি ওর ছেলেপুলেদের অসুখ হ'লে দেখেন—তাঁকে খবর পাঠিয়েছিল, তিনি এসে দেখে কীসব ওষুধ-ইঞ্জেকশ্যানও দিয়ে গেছেন, কিন্তু তারপর তাঁর সংগে দেখা করার আর ফুরসুৎ হয়নি। অবশ্য সেজন্য খুব ক্ষতিও বোধ করেনি কেউ। কারণ তাঁকে দিয়ে যে শেষ অবধি চলবে না সে বিষয়ে সকলে নিশ্চিত। খুব সাংঘাতিক কিছু না হলে স্বর্ণ এমনভাবে শুয়ে পড়ত না—এটুকু হরেনও বোঝে।

ভায়েরা পরামর্শ দিল, কোন বড় বত্রিশ টাকা ফীয়ের ডাক্তার ডাকতে। জীবন বলল, 'স্যাকরার ঠুক-ঠাক, কামারের এক ঘা, এসব ডাক্তার দেখিয়ে কোন লাভ হবে না, মিছিমিছি ভোগান্তি। অল্পে যাবার মতো কিছু হয়নি বৌদির। মানুষটা পাশে থাকলে তোমারই ক্ষতি, আর ওসব ঢিমেতেতালা চিকিৎসায় শেষ অবধি খরচ কম পড়ে না—মিছিমিছি এখন সামান্যর জন্যে ও দৃষ্টি-কৃপণতা না করাই ভাল!'

হরেনের মা কিন্তু কথাটা শুনে হেসে খুন হলেন। বললেন, 'পোড়া কপাল! ও ওর শুকনো সূতিকা হয়েছে—কম বিয়েন তো আর বিয়োলো না এই বয়সে। শরীরের বাঁধুনি ভাল, তোয়াজে আছে, ভাল-মন্দ খাচ্ছে তাই—নইলে কবেই পড়ত।......তা ডাক্তারীতে ওর কী করবে? কোন পুরোনো বিচক্ষণ দেখে কবিরাজ দেখা—নয়ত হোমিওপাথী কর। হোমিওপাথীতে এসব রোগ আজকাল খুব চটপট আরাম হচ্ছে!'

কথাটা অবশ্য উপস্থিত কারুরই ভাল লাগল না। তাঁর ছোট ছেলে অতুলই জবাব দিল, 'তবে মা সেবার তোমার সামান্য আমাশায় সময় দাদা হোমিও-পাথিক ডাক্তার এনেছিল যখন—তুমি বেঘোরে মেরে ফেললে বলে ডাক ছেড়ে কেঁদেছিলে কেন?'

'সে কি আমার সামান্য রোগ হয়ে-ছিল! আমাশা! সে তো আধা-কলেরা হয়েছিল বলতে গেলে। সে কি সহজ রোগটি বেধেছিল আমার।......তার সংগে এর তুলনা!......বৌ বে! আসলে আমার এ ক্ষেত্রে কথা কইতে যাওয়াই ভুল হয়েছে। বুড়ো মার জন্যে ডাক্তার ডাকা বাজে খরচা—কিন্তু বোন্দের বেলা তো আর তা নয়। তাদের যে মহামূল্য জীবন।......বেইমান, বেইমান না হ'লে আর এত দুর্দশা হয়। মা না থাকলে সব এক একটা বৌ পেতিস কী ক'রে আজ? এত বড়ডা হ'তিস কী করে!... বলে অসৈরণ সইতে নারি শিকে দাঁড় বেঁধে ঝুলে পড়ি।......ডাকো বাবা.. ডাকো তোমাদের যাকে খুশি, আমার এই নাকে কানে খৎ যদি কোন কথা বলি আর। বিলেত থেকে সায়েব ডাক্তার আনাও না, সেই তো ভাল! পয়সা হয়েছে দুটো—খরচ করতে হবে বৈ কি। আধুনিকের ধন হ'লে সে পয়সা ডাক্তার-বদ্যি আর উকীল-ব্যারিস্টারেই খায় চির-কাল—এ তো জানা কথা!'

যাই হোক—শেষ পর্যন্ত বত্রিশ টাকা ফীয়েরই ডাক্তার একজন এলেন। তিনি কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষার পরই গম্ভীর হয়ে উঠলেন, আরও খানিকক্ষণ ভাল ক'রে দেখে বাইরে গিয়ে হরেনকে বললেন, 'এ তো দেখছি মোক্ষম রোগ ধরিয়ে বসে আছেন। টি-বি। .. খাওয়া-দাওয়ার ওপর নজর রাখেন নি আপনারা—হয় কিছু খাননি, নয় খাওয়া হজম হয়নি। দারুণ অপুষ্টি—তার ওপর সাত-আটটি সন্তান প্রসব এবং আমানুষিক খাটুনি—এই জন্যেই এটা হয়েছে। এ রোগ অবশ্য আজকাল আর আয়ত্তের বাইরে নয়—কিন্তু ঘরে রেখে কি পারবেন আপনারা চিকিৎসা করতে? ওষুধের চেয়েও এ রোগে বড় কথা শুশ্রূষা আর পথ্যি।......বরং যদি যাদবপুরে কি মদনাপল্লীতে নিয়ে যেতে পারেন তো দেখুন!'

অক্ষর দুটো শুনেই হরেনের মুখ শুকিয়ে উঠেছিল। সে কোনমতে বার দুই ঢোক গিলে শুষ্ককণ্ঠে বললে, 'টি-বি?......ঠি-ঠিক বলছেন? মানে ভাল ক'রে দেখেছেন তো? ভুল হয়নি?...... মা বলছিলেন যে শুকনো সূতিকা না কি একরকম রোগ আছে—ওরও তাই হয়েছে।'

'সেও একরকমের কন্‌জাম্পটিভ্ ডিজীজ—কিন্তু না, ভুল হয়েছে বলে মনে হয় না। টি-বি তো বটেই, বেশ অনেক-দিনই হয়েছে। উনি কাউকে কিছু বলেন নি, রোগ চেপে চেপে রেখেছেন।...... অবশ্য এক্স্‌রে তো করাতেই হবে, আরও কিছু কিছু পরীক্ষা আছে—কিন্তু সে যাই করান, আমার বিশ্বাস ঐ একই রেজাল্ট পাবেন। আমি ওষুধ ইন্‌-জেকশন লিখে দিয়ে যাচ্ছি—শুধু রক্ত-পরীক্ষা এক্স্‌রে—এসব কোথায় কী ভাবে করাবেন তাও লিখে দিয়ে যাচ্ছি, তবে সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল ওঁকে কোথাও সরানো। বাড়িতে রেখে এ চিকিৎসা করানো শক্ত। তা-ছাড়া ছেলেমেয়েদের এখনই সিগ্রিগেট করা উচিত—সে কি পেরে উঠবেন?

হরেন তাঁর সব কথা শুনলেও না ভাল করে যন্ত্রচালিতের মতোই প্রেস্‌-ক্রিপশানগুলো নিল তাঁর হাত থেকে। তার তখন মাথা ঘুরছে। সে যে এত ভীতু তা এতকাল বোধকরি সে নিজেও জানত না। রোগটার নাম শোনা পর্যন্ত তার হাত পায়ের জোর চলে গেছে। খুব স্পষ্ট কোন ধারণা নেই বটে, তবে রোগটা যে সাংঘাতিক তা জানে। মারাত্মক রকমের ছোঁয়াচে। যদি ওর থেকে আর কারুও হয়? ছেলেমেয়েদের— কিম্বা তার নিজেরই? এতদিন পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া সব ওর হাতেই হয়েছে, শোওয়াও—রোজ না হোক, মাসে মধ্যে এক আধদিন এর পাশে শুয়েছে বৈকি। কতদিন ধরে ঐ রোগ ঢুকেছে ওর মধ্যে তার ঠিক কি,

ডাক্তার চলে গেলে তেল [illegible]—[illegible] জার কণ্ঠাও যদি শুধু থাকে, [illegible] [illegible] [illegible] তাই যথেষ্ট, [illegible] [illegible] [illegible] নিঃশব্দে ছাড়ার নাকি। [illegible] [illegible] [illegible] ঝিম করতে লাগল হরেনের।

চল আতঙ্ক— যেমন [illegible] লোকের হয়ে থাকে—শিগগিরই একটা বিজাতীয় আক্রোশের আকার ধারণ করল। ডাক্তার চলে যেতে সে ভেতরে এসে সেই আক্রোশের বিষ প্রায় সমস্তটাই উদ্‌গীরণ করল তার স্ত্রীর ওপর।......কেন সে এতকাল ধরে এই রোগ ভেতরে ভেতরে পুষে রেখে দিয়েছে—কেন জানায়নি যে রোজ ওর জ্বর আসছে একটু ক'রে—এমনভাবে শরীর ভেঙে যাচ্ছে।...... হরেন কি চিকিৎসা করাত না শুনলে? না কি সে এতই কৃপণ যে ওর অসুখ হয়েছে শুনেও পয়সা খরচের ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে যে বসে থাকত? কখনও কি ডাক্তার ডাকে নি সে স্ত্রীর জন্যে? তার এত কি পয়সার মায়া দেখল স্বর্ণ। কী এমন কৃপণতা করেছে সে এতকালের মধ্যে? এমনভাবে এই রোগটি বাড়িয়ে এখন এইভাবে চারিদিক জ্বালাবার কি দরকার পড়ল? এত আড়ি কার ওপর ওর? মরতে তো নিজের ছেলেমেয়েরাই মরবে—না কি অপর কেউ?......ইত্যাদি, ইত্যাদি—

কথাগুলো শুনতে খুবই ভাল, আপাত-বিবেচনায় মনে হয় স্ত্রীর জন্য উদ্বেগই এ উষ্মার মূল কারণ কিন্তু যে দীর্ঘকাল এই স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছে তার তা মনে হবার কোন কারণ নেই। স্বর্ণরও তা হল না। সে মুখে কিছু বলল না বটে কিন্তু তার দুই চোখ দিয়ে দর-বিগলিত ধারায় জল ঝরে পড়তে লাগল। হরেন যে কী পরিমাণ ভয় পেয়েছে এবং সেইজন্যেই যে এমন দিশা-হারা হয়ে উঠেছে,—একটা আপদ একটা বোঝার মতো মনে হচ্ছে এখন স্ত্রীকে—কোন মতে দূর করে দেবার আশু কোন পথ দেখতে না পেয়েই যে এতটা ক্ষেপে উঠেছে—তা বুঝতে বাকী রইল না তার একটুও।

প্রাথমিক ঝাঁঝটা কেটে যাবার জন্যেই হোক—আর স্ত্রীর চোখের জল লক্ষ্য করেই হোক, অনেকটা প্রকৃতিস্থ হল হরেন। বোধহয় নিজের ভুলও বুঝতে পারল খানিকটা। রাগারাগি করলে ঝগড়া-বিবাদ করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে কিছুটা দেরি হয়—বরং মিষ্টি কথায় কাজ হয় অনেক সহজে, এটা এই কিছুকাল ব্যবসা করার ফলে বেশ বুঝেছে সে। তাই খানিকটা চুপ করে থেকে অনেকখানি নরমগলায় আবার বলল, 'না—রাগ কি আর মানুষের সহজে হয়? দেখছ আমি কী বকম ব্যস্ত থাকি সুর্দ্দা—নাইবার-খাবার সময় নেই—আমাকে একটু মুখ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিবি। ছেলেমেয়েদের কথা ভেবেও তোমার একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কতই বলছ বাঁক—তাদের অসুখ হলে আমাকে তো ঠিক বলেছ, আমিও তার ব্যবস্থা করেছি—নিজের অসুখের কথাটা একবার কানে তুলতে পারোনি? সেটা বুঝি চক্ষুলজ্জায় বেধেছিল তোমার?—না কি?......আমি কি তোমার কুটুম, না দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছি বাড়িতে যে এত চক্ষুলজ্জা?'

খুবই ন্যায্য কথা। শুনলে যে কোন স্ত্রীরই পুলকিত হওয়া উচিত। কিন্তু স্বর্ণ তা হ'ল না। জবাবও দিল না কিছু। পরবর্তী আক্রমণটার জন্যই অপেক্ষা করতে লাগল শুধু।

সেটা আসতেও অবশ্য আর দেরি হ'ল না। হরেনের ধারণা যে তার স্ত্রী নির্বোধ, অনেকটা ছেলেমানুষ এখনও। তাই বেশী প্রস্তুতির প্রয়োজনও বোধ করল না। একবার সামান্য কেশে, গলাটা সাফ্ করে নিয়ে মাথার পিছন দিকটা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'দ্যাখো একটা কথা ডাক্তার তো বারবার বললেন হাস-পাতালে পাঠাবার কথা—আর যতদিন তা না হয়—অন্তত এবাড়ি থেকে ঠাঁইনাড়া করে অন্য কোথাও রাখার কথা। বেশ জোর দিয়েই বললেন—এ রোগ নাকি বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা কঠিন—হাসপাতালেই পাঠাতে হবে। এ রোগের হাসপাতালে খরচা অনেক—তা তাতে আমি ভয় পাই না—কিন্তু যুদ্ধের বাজার, বুঝতেই তো পারছ—অনেক সইসুপারিশ না করলে হাসপাতালে বেড পাওয়া যাবে না। তা আমি বলছিলুম কি ততদিন না হয়—তোমাকে খোড়ীতে রেখে আসি না—'

'না।' হরেনের কথা শেষ করতে না দিয়েই দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল স্বর্ণলতা। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম কথা কইল সে—কিন্তু তার চোখের জলের সঙ্গে কণ্ঠের এই অস্বাভাবিক দৃঢ়তা একে-বারেই বেমানান মনে হ'ল হরেনের কাছে। সে বেশ একটু চমকেই উঠল।

'না।' গলায় যথাসম্ভব জোর দিয়ে বলল স্বর্ণ, 'তোমার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বাড়ীতে নেই?......তোমার ছেলেমেয়েদের কথা, ভাই-ভাইপোদের কথা—নিজের কথাই ভাবছ শুধু। তোমাদের প্রাণের দাম আছে, আর তারাই একেবারে এত [illegible]—না? [illegible] বা তারা বইবে এ দায়? [illegible] [illegible] করে না একথা তুলতে? তারা একগাদা টাকা খরচ ক'রে যে দিয়েছে [illegible] লোক-লৌকিকতা করায় ত্রুটি রাখেনি কখনও—তার পরি-[illegible] এ-বাড়িতে এসে [illegible] [illegible]

[illegible] থেকে [illegible]—একাধারে [illegible] [illegible] রাঁধুনীর কাজ করেছি এতবছর সংসারে। উদয়-অস্ত [illegible] খাটছুম—তার [illegible] থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। বারোমাস তিরিশ দিন পঁয়ষট্টি দিন একভাবে খেটে শরীর পাত করেছি তোমার এখানে—এখন এই রোগ ধরেছে বলে আর এক-দণ্ডও সহ্য হচ্ছে না?...বাড়ির পুরনো ঝিকেও এত সহজে লোকে বাড় থেকে নামাতে পারে না। আজ আমি কাজের বার হয়ে গেছি বলেই যেখানে হোক বাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে নামিয়ে রেখে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ!......কেন যাব আমি—কিসের জন্যে? এ বাড়িতে আমার কোন জোর নেই! তোমার এ অসুখ করলে আমি কোথাও দূরে পাঠাবার কথা ভাবতে পারতুম? না কোন ছেলেমেয়ের অসুখ করলে তুমি একথা মুখে উচ্চারণ করতে পারতে?'

কাশির ধমকেই চুপ করতে হয় একটু। বোধহয় এতখানি উত্তেজনায় অপরিসীম ক্লান্তও হয়ে পড়ে। খানিকটা চুপ করে থেকে একটু সামলে নিয়ে প্রায়-রুদ্ধকণ্ঠে আবার বলে, 'বেশ তো, বাড়িতে যদি রাখার এতই অসুবিধে হয় তো—দূর করার অন্য উপায়ও তো আছে। কড়িকাঠও আছে, পরনের ছেঁড়া শাড়িও জুটবে একখানা।......তাতেও যদি মনে করো— পুলিশফুলিশ নানান হাঙ্গামে পড়তে হবে—কোনমতে একখানা রিকসা ডেকে গঙ্গার ধারে পাঠিয়ে দাও, আর কোন দায় বইতে হবে না তোমাদের, কোন ভাবনাও ভাবতে হবে না।......এত পয়সার জোর দেখাও যখন তখন—পয়সা ফেললেও হাসপাতালে জায়গা হয় না? না অনর্থক জেনেই সে বাজে পয়সাটা খরচা করতে চাইছ না? না কি—ভয় পাচ্ছ যদি হাসপাতালে গিয়ে ভাল হয়ে আসি? ঠিক ঘর করতেও সাহস হবে না—অথচ সে ক্ষেত্তরে আর একটা বৌ আনতে চক্ষুলজ্জায় বাধবে!......তাই যদি হয় তো—দুটো দিন সবুর করো—খোরাকী বন্ধ করলে আপনিই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে!'

হরেন অপ্রতিভের মতো চুপ করে বসে থাকে। তখনই যেন কোন কথা যোগায় না তার মুখে। তারপর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'ঐ নাও! দ্যাখো একবার কাণ্ডখানা। বলে যার জন্যে চুরি করি—সেই বলে চোর। তোমার ভালর জন্যেই বলতে গেলুম—'

ততক্ষণে আবারও অশ্রুর বন্যা নেমেছে স্বর্ণর চোখে। সে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে 'থাক—আমার ভাল আর ভাবতে হবে না তোমাকে। জীবনভোরই তো ভেবে এলে—আর কেন!'

(ক্রমশঃ)

নবজাগ্রত মিশর

আজও ঐশ্বর্যের প্লাবনে সিক্ত হয়নি মিশরের মরুপ্রান্তর বা শিক্ষায়, শিল্পায়নে ও জাতীয় চেতনায় জেগে ওঠেনি সারা দেশ। অর্থনীতির বিশেষভাবে এখনও মিশর অনুন্নত। কিন্তু যে শোষণজীর্ণ সমস্যাক্লিষ্ট মরুরূপ দেশের ভাগ্যোন্নয়নের দায়িত্ব দশ বছর আগে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এক দুঃসাহসী সেনাপতির হাতে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যে অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেছেন, সে বিষয়ে তাঁর তীব্রতম সমালোচকের পক্ষেও দ্বিমত হওয়ার উপায় নেই।

নাসেরের দশ বছরের শাসনে কি পেয়েছে মিশর, তা জানতে হলে আগে জানতে হবে কি ছিল মিশর। কেমন ছিল তার ভূপ্রকৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি দশ বছর আগে, বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী শাসন কায়েম হওয়ার প্রাক্-মুহূর্তে।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস আড়াই হাজার বছর আগে যা বলেছিলেন, মিশর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে সর্বপ্রথম সেই কথাটাই মনে পড়ে। সেদিনের মত আজও মিশর নীলনদের দান—'গিফ্‌ট্‌ অফ দি নাইল'। ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ১৯৮ বর্গ মাইল আয়তন যে দেশের, সেদেশে চাষ ও বাসযোগ্য স্থান

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

মাত্র ১৩ হাজার ৫ শত বর্গ মাইল। শুধু নীল নদীর দুই পার, সাগরমুখের কয়েকটি বদ্বীপ ও এখানে-ওখানে কয়েকটি মরূদ্যানের বাইরে আর কোথাও জনপদ নেই মিশরে। অর্থাৎ মিশরের আটাশ ভাগ জমির মধ্যে সাতাশ ভাগ জলের অভাবে শুষ্ক, জনপরিত্যক্ত মরুভূমি। আর ঐ বাকি একভাগে বাস করে দু কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষ ও সেই সংকীর্ণ ভূমিখণ্ডটুকুতেই উৎপাদিত হয় তাদের খাদ্য ও বাণিজ্য পণ্য। তাই আয়তন ও লোকসংখ্যার সোজাসুজি হিসাবে মিশরে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব মাত্র ষাট হলেও, প্রকৃতপক্ষে সেখানে লোক বাস করে প্রতি বর্গমাইলে দুই হাজার বা তারও বেশী। এমন ঘন লোকবসতি পৃথিবীতে খুব কম দেশেই আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা

প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের

হল যে, এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কোন বিরতি নেই। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে মিশরের জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

অথচ এই দ্রুত হারে বেড়ে যাওয়া জনসংখ্যার খাদ্য অথবা জীবিকার সংস্থান এতদিন ছিল না মিশরে। সীমিত সামর্থ্যে যতটা সম্ভব নীল নদীর জল তারা খাল কেটে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল, তার বাইরে এক ইঞ্চি জমিও কর্ষণযোগ্য ছিল না। অথচ কায়রো আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি শহরগুলিতে যে শিল্প গড়ে উঠেছিল, তাতে মিশরীয়দের ভাগ ছিল অতি সামান্য। ইতালীয়, গ্রীক, মাল্টিজ, প্রভৃতি বিদেশীরাই ছিল মিশরের প্রধান শিল্পপতি এবং ১৯৪৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, মিশরের শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের শতকরা ৬১ ভাগ ছিল বিদেশী, আর বাকি উনচল্লিশ ভাগের মালিক ছিল মিশরী খৃষ্টান, ইহুদি ও বিত্তশালী পাশার দল। তাদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল মিশরের অভিজাত সমাজ। আর মিশরের সাধারণ মানুষ জীবিকার সন্ধানে শহরে এসে ভারাক্রান্ত করে তুলত বস্তীগুলি। এই কারণেই শিল্পে অনুন্নত হওয়া সত্ত্বেও মিশরের অধিবাসীদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ শহরবাসী, আরও ঠিকমত বলতে গেলে বস্তীবাসী। তাদের জীবিকা, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সরকারের যে কিছু করণীয় আছে, এ-কথা কর্ণেল গামাল আবদেল নাসের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে

মিশরের ভবিষ্যৎ কর্ণধার

হাজার বছরের মধ্যেও মিশরের কোন শাসক চিন্তা করেনি।

দশ বছর আগে এমনি একটি দেশের শাসন দায়িত্ব যখন নাসের ও তাঁর তরুণ সহকর্মীরা গ্রহণ করেন, তখন দুর্জয় দেশপ্রেম ও অমেয় আত্মপ্রত্যয় ছাড়া আর কিছুই মূলধন ছিল না তাঁদের। গোড়ার দিকে নাসেরের চিন্তাধারা এমনই মার্কিণ-অনুসারী ছিল যে, কায়রোর বিদেশী সমাজ তাঁর নাম দিয়েছিল জিমি। তারপর যখন এংলো-ইজিপ্‌সিয়ান চুক্তি স্বাক্ষর হল, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, নাসের সোজাসুজি পশ্চিমী জোটেই যোগ দেবেন। কিন্তু তারপর থেকেই ইতিহাসের ধারা ভিন্নগতি হল। ১৯৫৪ থেকে '৫৮ সালের মধ্যে, বাগদাদ চুক্তি, বান্দুং সম্মেলন, চেক অস্ত্র-সাহায্য চুক্তি, হাইড্যামে প্রস্তাবিত এ্যাংলো-মার্কিণ সাহায্য প্রত্যাহার, সুয়েজ সংকট, লেবানন সংকট ও সর্বশেষে ইরাকী বিপ্লব মিশরকে এমন সব পরিস্থিতির সম্মুখীন করল যে, একটা জঙ্গী নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ ভিন্ন নাসেরের গত্যন্তর রইল না। আজও নাসেরের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা নিরপেক্ষতা। তবুও পূর্ব ছত্রে নিরপেক্ষতার আগে জঙ্গী কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে নেহরুর নিরপেক্ষতার সঙ্গে নাসেরের নিরপেক্ষতার যে পার্থক্যটুকু আছে, তা বোঝানোর প্রয়োজনে। নাসের যত সহজে অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত, নেহরু তা নন। এই পার্থক্যটুকুর জন্য দায়ী দুই দেশের ইতিহাস ও রাজনীতি এবং দুই নেতার চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্য। তবুও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নাসেরই ভারতের সবচেয়ে বড় বন্ধু। এবং এক-এক সময় এ বন্ধুত্ব যে ভারতের কতখানি সহায়ক হয়েছে, তা বলে শেষ করা যায় না।
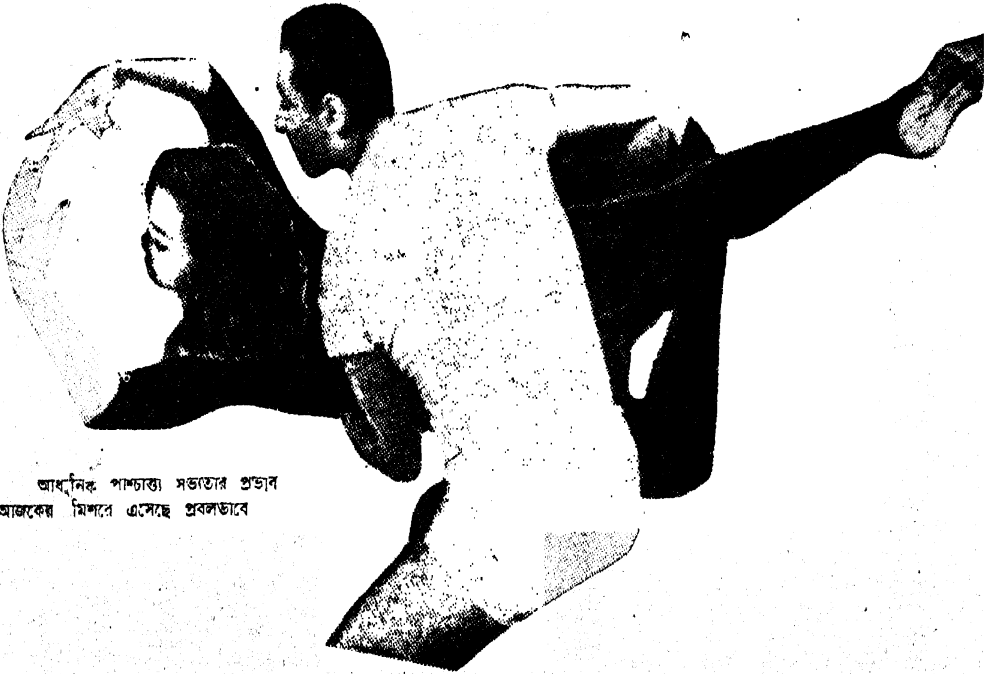
আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আজকের মিশরে এসেছে প্রবলভাবে

দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সমস্ত দেশবাসী সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছে

নাসেরের নীতির বলিষ্ঠতা ও অকপটতা শুধু তাঁকে আরব দুনিয়ারই অদ্বিতীয় নেতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেনি, সুদূর লাতিন আমেরিকার অনগ্রসর দেশগুলির তরুণ সেনাপতিদের কাছেও নাসের এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন নাসেরবাদী বলে। নাসেরবাদের অর্থ—জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ ও সতর্ক নিরপেক্ষতা।

নাসেরের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬২ সালের মে মাসে তিনি যে জাতীয় সনদ ঘোষণা করেন, তার মূলকথা ছিল জাতীয়করণ। সব মূল ও গুরু শিল্প এবং বাণিজ্যকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনতে হবে। আমদানি বাণিজ্যের শতকরা একশ' ভাগ ও রপ্তানি বাণিজ্যের অন্তত শতকরা পঁচাত্তর ভাগ হবে রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পঁচাত্তর শতাংশ বে-সরকারী পরিচালনায় ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তার নীতি ও মান নির্ধারণ করে দেবে রাষ্ট্র। ব্যাঙ্ক ও বীমা হবে রাষ্ট্রের সম্পত্তি। বাড়ীঘর ও কৃষি-ব্যবস্থা বে-সরকারী পরিচালনাধীন থাকলেও, বাড়ী ভাড়া বা জমির মালিকানার পরিমাণ স্থির করে দেবে রাষ্ট্র। যেমন, সরকারী নির্দেশে স্থির হয়েছে, দুই ঘরের একটি আধুনিক ফ্ল্যাটের মাসিক ভাড়া হবে তিন পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ টাকা। এখন মিশরে এমন কোন লোক নেই যার বাৎসরিক আয় পাঁচ হাজার পাউণ্ডের বেশী, বা যার সম্পত্তির মূল্য দশ হাজার পাউণ্ডের বেশী। এখন একজন শ্রমিকের আয় সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড, পণ্যমূল্যের বিচারে যা লণ্ডনের দশ পাউণ্ডের সমান। তার ঘরে অবশ্যই গ্যাস চুল্লি আছে এবং হয়ত আছে একটি টেলি-ভিশন। যে ঘরে সে বাস করে, সেটি 'নিজের ঘর নিজে বানাও' নীতি অনুসারে পনের কি কুড়ি বছরের মধ্যে তার নিজের হয়ে যাবে। মিশরে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার নেই এবং ট্রেড ইউনিয়ন যা আছে, তা সরকারের শ্রম দপ্তরেরই একটি শাখার নামান্তর মাত্র। কিন্তু তবুও এ-কথা সত্য যে, মিশরের শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট নয় এবং শিল্পায়নের প্রাথমিক অবস্থাতে তারা এর চেয়ে বেশী সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাশা করে না।

এখনই মিশর আফ্রিকার দ্বিতীয় শিল্পসমৃদ্ধ দেশ, প্রথম স্থান দক্ষিণ আফ্রিকার। কিন্তু এই অবস্থাতেই মিশর সন্তুষ্ট থাকবে না। তুলা ও বস্ত্রশিল্প, খাদ্য প্রস্তুত, ইস্পাত ও তামা প্রস্তুত, সার, রাসায়নিক, কৃত্রিম রবার, ফিল্ম ইত্যাদি মিশরের পুরাতন ও ক্রমবর্ধিষ্ণু শিল্প। কিন্তু অন্যান্য শিল্পতেও মিশর এগিয়ে চলেছে। মিশরী গৃহস্থরা মিশরে নির্মিত সামগ্রীর উপযোগিতা ও স্থায়িত্বে সন্দিহান ছিল অনেকদিন এবং বিদেশে নির্মিত সামগ্রীর উপর তাদের আস্থা ছিল সীমাহীন। কিন্তু সুয়েজ সংকটে নাসের ও মিশরবাসীদের সফল উত্তরণ ও সুয়েজ খাল পরিচালনায় তাদের অপ্রত্যাশিত দক্ষতা মিশরের সকলের মনের সব দুর্বলতা ও হীনমন্যতা দূর করে দিয়েছে। আজ তারা অন্তর থেকেই বিশ্বাস করে যে, মিশরবাসীদের অসাধ্য কোন কাজ নেই।

মিশরের ফেলাহিন অর্থাৎ কৃষক সমাজের অবস্থার উন্নতি হতে অবশ্য

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় মিশরের যুবক-যুবতী গভীরভাবে আলোড়িত

আরও কিছুটা সময় লাগবে। খর রৌদ্রের নীচে হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবিয়ে দু' কোটি ফেলাহিনকে আরও কয়েক বছর দিনে দশ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই তাদের জল-কষ্ট দূর হয়েছে, খাজনা অনেক কমেছে, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, রোগে চিকিৎসার সুযোগ মিলেছে। মিশরের শতকরা তিনভাগ মাত্র জমির উপর নির্ভর করে আছে মিশরের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোক। সুতরাং আরও শিল্পপ্রসার ও উন্নত জলসেচ ব্যবস্থার দ্বারা আরও মরুকল্প জমি কর্ষণযোগ্য করে তোলা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান ভগবানেরও সাধ্যায়ত্ত নয়, এ-কথা বোঝে মিশরের কৃষিজীবীরা। তাই অধৈর্য তারা হয়নি। আরও হয়নি এই কারণে যে, তারা দেখেছে, অনতিবিলম্বে যে সুযোগ-সুবিধাগুলি পাওয়া সম্ভব, তার ব্যবস্থা করতে নতুন সরকার এতটুকুও বিলম্ব করেনি। আর সেই সঙ্গে চোখের সম্মুখে দেখছে তারা বিরাট হাইড্যাম প্রকল্পের দুর্নিবার অগ্রগতি। ১৯৭০ সাল নাগাদ হাইড্যামের কাজ যখন শেষ হবে, তখন মিশরে চাষের জমির পরিমাণ আরও এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে যাবে, আর তা থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে, তাতে শুধু দ্রুত সম্প্রসারিত শিল্পেরই শক্তির চাহিদা পূরণ হবে না, কৃষিক্ষেত্রে ও গার্হস্থ্য জীবনেও তা আনবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

শিল্প-শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার, কারিগর ও বিজ্ঞানীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে মিশরে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব তাদের চলনে-বলনে ও সাজপোষাকে আনছে অনিবার্য পরিবর্তন। এ কারণে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্ট সইদ, সুয়েজ প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির চোখ-ঝলসানো প্রভাব। যখন সাহেবরা ছিল মিশরে, তখনও সাহেবীয়ানা এত প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি মিশরী যুবকদের মধ্যে। কিন্তু নাসের এ অগ্রগতিকে বাধা দেননি, শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পোষাকাদির পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্য বলেই মনে করেন তিনি। আজানুলম্বিত আলখাল্লার মত গালাবিয়া নিশ্চয়ই কারখানার উপযোগী পোষাক নয়।

নারীদের সাজপোষাক ও চিন্তা-ধারাতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। এক যুগ আগেও বোরখা যাদের দেহ আপাদমস্তক আবৃত করে রাখত, আজ তারা অবাধে পিঠকাটা লেস-লাগানো ফ্রক, গাউন পরে শহরে ঘুরে বেড়ায়, অফিস-আদালতে কাজ করে, হোটেল-বার প্রভৃতিতে সান্ধ্য উৎসবের আসর সরগরম করে তোলে। মিশরের সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ হিকমেত আবু জইদ একজন মহিলা। মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও শিল্প-শ্রমিক আজ আর মিশরের সামাজিক জীবনে কোন চোখ-ধাঁধানো ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু এ ব্যাপারেও নাসের মৌন সমর্থক, উৎসাহী উদ্যোগী নন। যা স্বাভাবিকভাবে ঘটে যাচ্ছে, তাকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোঝেননি। তাছাড়া আতাতুর্কের সমাজ-সংস্কারে অতি ব্যস্ততার পরিণতি থেকেও শিক্ষালাভ করেছেন তিনি। তুরস্কে কুড়ি বছর আগের চেয়ে আজকে বোরখাপরা মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশী। নারী-সমাজের প্রগতিশীল অংশ রাষ্ট্রপতি নাসেরের কাছে আরও অনেক পরিবর্তনের প্রত্যাশী, কিন্তু খুব সঙ্গত কারণেই তাঁর গতি এক্ষেত্রে মন্থর ও প্রতি পদক্ষেপ সুচিন্তিত। তবুও পরিবার পরিকল্পনার কথা বলেছেন তিনি এবং জনসাধারণ তার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছে। আর বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে উন্নততর আইন হয়ত এই অক্টোবরেই প্রবর্তিত হবে।

শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে মিশরের অগ্রগতি দীর্ঘদিনের। তার আজ আজ্-হার বিশ্ববিদ্যালয় সহস্র বৎসরের পুরাতন ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আরবী ভাষা ও ঐস্লামিক সংস্কৃতির শিক্ষাকেন্দ্র। আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেদেশে। তাছাড়া কিণ্ডারগার্টেন স্কুল আছে চার শতাধিক, প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে প্রায় সাড়ে সাত হাজার, মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে প্রায় সাতশত, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষালয় আছে ৮৭টি, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ আছে ১১৪টি, অন্যান্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষণকেন্দ্র আছে ১২৯টি, কলাকেন্দ্র আছে দুটি। দশ বছরের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে মিশরে। কিন্তু শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি পেলেও অনিবার্য কারণে তার গভীরতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তার প্রধান কারণ, মিশরের যোগ্য শিক্ষকরা আজ ছড়িয়ে গেছেন সারা আরব দুনিয়ায়। ১৯৫২ সালে মিশরের বাইরে মিশরী শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৪৫০, বর্তমান তাদের সংখ্যা ৩৫০০। এক হাজারেরও বেশী শিক্ষক শীঘ্রই যাত্রা করবেন আলজিরিয়ায়, এবং ইয়েমেনে যাবেন কয়েক শ'। তাছাড়া বিভিন্ন আরব দেশ থেকে মিশরে এসেছে সাড়ে তের হাজার শিক্ষার্থী। আলজিরিয়া, ঘানা, সোমালিয়া, গিনি প্রভৃতি দেশ থেকে অনেক যুবক মিশরে এসেছে সামরিক শিক্ষা নিতে।

মিশরেই এখন শত শত যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন, কিন্তু তবুও যে মিশরীয় শিক্ষকদের এভাবে বিভিন্ন আরব রাজ্যে ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশে পাঠানো হচ্ছে তার কারণ সহজবোধ্য। আরব দুনিয়া তথা সমগ্র আফ্রিকার অবিসম্বাদিত নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চান কর্নেল গামাল আবদেল নাসের তাঁর সেবা ও সামর্থ্য দিয়ে, তাদের সমাজ-বাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। মিশরের জাতীয় সনদে যে আরব সোশ্যালিস্ট ইউনিয়নের কথা বলা হয়েছে তা গঠিত হবে সকল আরব রাজ্য নিয়ে, এবং তার প্রতিটি প্রতিনিধিমূলক সংস্থার অর্ধেক আসন সংরক্ষিত থাকবে কৃষক ও মজুরদের জন্যে; কারণ, নাসের বলেছেন, যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত তারা। শুধু মিশরী ও আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, নাসেরের ঐক্য ও সমাজবাদের আদর্শে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়াকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে নাসেরের ব্যক্তিগত দূতরূপেই ঐ সকল শিক্ষাব্রতীরা ছড়িয়ে পড়েছেন সকল দেশে।

লাদাকের লোকগীতি

প্রভাতকুমার দত্ত

লাদাকের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। এখানকার প্রথম অধিবাসীরা হচ্ছে দার্দ (Dard)। এরা আর্য জাতির এক শাখা এবং তিব্বতের মঙ্গোলয়েড অধিবাসী-দের সঙ্গে এদের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বের অব্যবহিত কাল পরে কাশ্মীর থেকে লাদাকে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। তিব্বত থেকে লাদাকে এই সময়ে বৌদ্ধ-মতের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ রাষ্ট্র হিসাবে তিব্বতের উৎপত্তি সপ্তম শতাব্দীতে। অষ্টম শতাব্দী থেকে লাদাকে বৌদ্ধ-ধর্মের ক্ষীয়মাণতা পরিলক্ষিত হয় এবং হিন্দুধর্মের প্রভাব আবার মাথাচাড়া দেয়। এখানেই লাদাকী ইতিহাসের প্রথম পর্বের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখি লাদাকের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিলোপ। নবম-দশম শতাব্দীতে লাদাক তিব্বতের করতলগত ছিল। এ সময়ে এখানে লামাতান্ত্রিক বৌদ্ধমতের প্রসার ঘটে। তিব্বতীদের সঙ্গে দার্দ উপজাতি লোকেদের বিবাহাদি ঘটে। ফলে লাদাকীদের মধ্যে তিব্বতীয় প্রভাব বৃদ্ধি পায়। যদিও দশম শতাব্দীর পর লাদাক তিব্বতের রাজনৈতিক শাসনমুক্ত হয় তবু লামাতন্ত্রের প্রভাবটা থেকে যায়। স্থানীয় বৌদ্ধরা লাসাকে বৌদ্ধজগতের রোম হিসাবে গ্রহণ করে। অবশ্য এধরনের আধ্যাত্মিক সংযোগ অস্বা-ভাবিক কিছু নয়। এতে লাদাকীদের স্বাজাত্যবোধ কিছু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

তৃতীয় পর্বের আরম্ভ দ্বাদশ শতাব্দীতে। এ সময়ে লাদাক কাশ্মীর রাজ্যের অংশীভূত হয়। ভারতে মুসলমান আগমনের অল্পকাল পরেই এস্থানে তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে লাদাক মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঔরংজীব কাশ্মীর অভিযানে গিয়ে লাদাকে নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া Leh শহরে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করে স্থানীয় রাজাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে শিখেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। শিখেরা যে রাজ্য গড়ে তোলে তারই এক সৈনিক গুলাব সিং পরে জম্মুতে নিজের আলাদা এক রাজ্য স্থাপন করেন। গুলাব সিং ছিলেন জাতে ডোগরা ও অমিতপরাক্রমশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ক্রমে কাশ্মীর তিনি নিজের রাজ্যের করতলগত করেন। ১৮৪২ সালে গুলাবের প্রধান সেনাপতি জোরাভার সিং লাদাক জয় করেন। সেই থেকে লাদাকের আর রাজনৈতিক হাত-বদল হয়নি।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে লাদাকের সাংস্কৃতিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্যটি আশা করি উপলব্ধি করা যাবে। এখানকার মানুষের উপজীবিকা নির্ভর করে একমাত্র নানা জীবজন্তু প্রতি-পালনের উপর। মেষ ও পাহাড়ে ছাগল Ibex) বেশী চোখে পড়ে। লাদাকী-দের সবসময়ে তৃণভূমির উপর নজর রাখতে হয়। অরণ্যের বিচিত্র সম্পদ আহরণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এস্থানে ঋতু মাত্র তিনটি—গ্রীষ্ম, শরৎ আর শীত। শীত বছরের বেশীটা জুড়ে রয়েছে। তাই গ্রীষ্ম-শরতের স্বল্প অবকাশে শস্য যা কিছু ঘরে তুলতে হয়। পাহাড়ে জায়গা তাই চাষের পরিশ্রম বেশী। দেশের প্রায় সমস্ত মানুষকে বন-ক্ষেত উপত্যকায় খেটে জীবনধারণ করতে হয়। ধর্মভীরু এরা এবং ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান নিষ্ঠায় সঙ্গে পালন করে। এদের ধর্ম আদিবাসী ক্রিয়াকর্মে হিন্দু ও বৌদ্ধ-মতের মিশ্রণ ঘটেছে।

লাদাকের লোকগীতিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, দরবার-প্রশস্তি সঙ্গীত (Court Song)। এই সমস্ত গানে রাজা ও অন্যান্য উচ্চপদাধিকারীদের প্রশস্তি-বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলি মিত্রাক্ষর রচনা নয় তবে তালের রেশটি ঠিকই উপস্থিত। দ্বিতীয়—নৃত্য-সঙ্গীত। পার্বত্য লাদাকীরা নৃত্যপ্রিয় জাতি। নৃত্যের তালে তালে তারা গলার স্বরও মেলায়। নৃত্যসঙ্গীতগুলিতে ধর্মীয় ভাবের কোন স্থান নেই। এখানে শুধু আটপৌরে ভাষায় মনের বিভিন্ন আবেগ বাণীরূপ লাভ করেছে। তৃতীয়—বিবাহের গান। এগুলি সংলাপের ভিত্তিতে রচিত, একদল কতকগুলি প্রশ্ন করে, অপর দল তার উত্তর দেয়—এই হোল গানের বাহিরঙ্গ রূপ। লাদাকে প্রাক্ বৌদ্ধযুগের ধর্মে প্রশ্নোত্তর রীতিক্রমে উপদেশ দেওয়ার চলন ছিল। বিবাহের গান সেই ঐতিহ্যেরই সাক্ষ্য বহন করছে। চতুর্থ—পানোৎসবের গান। বিবাহের গানের অনুষ্ঠান হিসাবে এগুলি গাওয়া হয়। যে কোন ধরনের পালপার্বণে এ গান চলতে পারে। ভঙ্গী সেই প্রশ্নোত্তর রীতি।

এ পর্যন্ত যত লাদাকী লোকসঙ্গীত সংগৃহীত হয়েছে তার প্রাচীনত্ব নিয়ে অনেকের মনে সংশয় আছে। কেউ কেউ বলছেন এগুলি একশো-দুশো বছরের বেশী পুরোনো নয়। কারণ এতে যে সমস্ত ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে তাঁরা হালের লোক। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে গানের মোটামুটি রূপ এক থাকলেও যুগে যুগে ব্যক্তির নাম গায়কের মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। লোকগীতিকাররা সব সময় চেষ্টা করেছেন পুরানো নাম বর্জন করে সমসাময়িক মান্যগণ্যদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে। অন্যথায় প্রশস্তিসঙ্গীতের কোন মূল্য থাকে না। আরেকটা কথা বলা দরকার। লাদাকী গানে প্রাক্ বৌদ্ধযুগের স্থানীয় ধর্মরীতির উল্লেখ আছে। এটাও গানের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে।

প্রশস্তিসঙ্গীতে রাজার বাগান, অভিজাত ব্যক্তি, লামা, মঠ-গোম্ফা ইত্যাদির মনোরম বর্ণনা আছে। এ প্রশস্তি মোটেই পার্থিব স্বার্থসাধনের জন্য নয়। স্বতোৎসারিত ভক্তির প্রকাশ এর মূল প্রেরণা। মন্ত্রী রহিম খাঁর পোলো খেলা নিয়ে রচিত কবিতাটিতে আমরা এর প্রমাণ পাই। রচয়িতা প্রভুর খেলার বর্ণনা দিয়ে শেষকালে বলছেন: 'তুমি একগুচ্ছ ফুলের মত, তোমার রক্ষাকারী বর্মের পেছনে আমরা বেঁচে

আছি, তোমার উপস্থিতিতে চারিদিক খুশীতে ঝলমল করছে।' মনের ভাবের কোন কৃত্রিমতা এখানে চোখে পড়ে না।

নাচের সঙ্গে যে গান গাওয়া হয় তার দু' একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। শস্য কাটার উৎসব লাদাকের জনজীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই উৎসবে, গ্রামের যে সমস্ত বালকেরা মেষপালক হিসাবে দূর-দূরান্তের পাহাড় উপত্যকায় সারা গ্রীষ্মকালটা কাটিয়েছে, তারা ফিরে এসে যোগদান করে এবং গানের তালে তালে নাচে। তাদের হাতে থাকে পাহাড়ী ফুলে শোভিত লাঠি। নাচে যোগদানকারী মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের কাব্যে উত্তর-প্রত্যুত্তরের পাল্লা চলে। পাহাড়-উপত্যকা থেকে সদ্য ফিরে আসা ছেলেদের মেয়েরা পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিমের খবর জিজ্ঞাসা করে। ছেলেরা এইভাবে উত্তর দেয় : পূর্বে রাজার শিরস্ত্রাণ খুব উঁচু; দক্ষিণে শস্যের প্রাচুর্য; উত্তরে লবণ ও পশমের প্রাচুর্য এবং পশ্চিমে নানাবর্ণে জিনিস রঙ করা হয়। আরেকটি গানে নৃত্য-পটিয়সী মেয়েদের নাচে আহ্বান করা হচ্ছে। শাল জড়িয়ে ও মুখে প্রসাধন দিয়ে দেহসৌন্দর্য বাড়াবার কথা বলা হচ্ছে তাদের।

এরপর বিবাহের গান। লাদাকে যারা কন্যা কেনে তাদের 'নিয়োপা' বলা হয়। বিবাহের দিনে কনের বাড়ীতে প্রবেশ করলে 'নিয়োপা'দের প্রথমে কার্পেটে বসতে অনুমতি দেওয়া হয় না, যতক্ষণ না তারা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেয়। উঁচু আকাশ, হিমবাহ, প্রস্তর, সমুদ্র, দুর্গ, পৃথিবী ইত্যাদির নাম করে প্রশ্ন করা হয় এগুলি কার এবং কিসের কার্পেট। নিয়োপারা উত্তর দেয় এগুলি যথাক্রমে চন্দ্র-সূর্য, শুভ্র-কেশর সিংহ, পাহাড়ে ছাগল, স্বর্ণ চক্ষু মাছ, মহৎ মানুষ, চীনের রাজা প্রভৃতির কার্পেট। এরপর নিয়োপারা আসন গ্রহণ করে।

যৌবন ও প্রেম সম্পর্কিত কবিতা-গুলিও অনবদ্য। যৌবনের একটি লোক-গীতের ভাববস্তু এরকম : উঁচু যাঁরা তাঁরা উচ্চস্থানে বাস করেন। আকাশের একেবারে উপরে পাখীর রাজারাই উড়তে পারে। তিনমাস স্থায়ী যে গ্রীষ্মকাল তাতে যত ফুল ফোটার সব ফোটে। গ্রীষ্মের তিনটি মাস ছাড়া আর ফুল পাওয়া যায় না। একই মায়ের সন্তানরূপে দ্বিতীয়বার আমি জন্মাব না। জগতে যা কিছু আনন্দের হতে পারে সবই আনন্দিত। সুতরাং জীবন যতটা পারো উপভোগ করে নাও। প্রেমের গীতটি ভাবগাম্ভীর্যে আরো মহীয়ান। সেটির ভাবানুবাদ এরকম : উচ্চ উপত্যকায় একটি ফুল ফুটেছে। ফুলটির গড়ন অপূর্ব। হে বন্ধু, অপূর্ব গড়নের সুন্দর ফুলটিকে সংগ্রহ করো। যদি তুমি হাতে করে সংগ্রহ করতে যাও তবে তা মলিন হয়ে ঝরে পড়বে। তোমার সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে তাকে তোলো; তোমার মনের সঙ্গে তাকে গেঁথে দাও। বলা বাহুল্য ফুল বলতে এখানে এক নবযৌবনাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

নববিবাহিত বধূ কাব্যের চির-কালের এক মধুর বিষয়বস্তু। একটি লাদাকী লোকগীতের বিষয় কন্যার প্রথম পতিগৃহে যাত্রা। কনে মায়ের ঝলমলে টার্কীজ পোশাকটি বাঁধা সম্পূর্ণ করে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উপত্যকার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। এরপর কবিতাটির দুটি লাইন ইংরাজীতে ছন্দোবদ্ধভাবেই আমরা উল্লেখ করছি :

> Father and mother, to whom
> I was born, thought I would
> come back and I looked back
> The friends, with whom I was
> together, thought so, and
> I looked back.

এখানেই গীতটির সমাপ্তি। ছোট্ট কবিতা কিন্তু ভাবে সমুজ্জ্বল। পরের গীতটি কনের মঙ্গল কামনা করে রচিত। এতে সুন্দরী যুবতীকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে : যখন তুমি জন্মেছিলে তখন স্বর্গে কত না বাদ্যধ্বনি করা হয়েছিল! মর্ত্যে কত না শঙ্খে ফুঁ পড়েছিল! সুন্দরী যুবতী, তোমার গর্ভে যেন বীরপুত্রের জন্ম হয়। তখন কিন্তু আমাকে সোনার পোশাক উপহার দিও। আর যদি বীর পুত্র না জন্মায় তাহলে আমার ভাগ্যে জুটবে 'জো' নামক জন্তুর একটা বাঁকা শিঙ। কৌতুক করার জন্যই বাঁকা শিঙের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

উপদেশমূলক লোকসঙ্গীতও কিছু কিছু আছে। একটিতে দরিদ্র মেয়ে ধনীর মেয়ের সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করছে। ধনী মেয়ের মুখে সব সময় দুধ মাখন উঠছে, পরনে তার সিল্কের পোশাক, কোলে এক ফুটফুটে ছেলে। কিন্তু দরিদ্র মেয়ের মাছ, এমন কি সাধারণ জল জিনিসটাও জোটে না কারণ চারিদিকের নদী জমে গেছে। তার কোলে ছেলের বদলে রয়েছে একটি বিড়াল। দরিদ্র মেয়েটির এজন্য অবশ্য দুঃখ করবার কিছু নাই। অপর মেয়েটির বাপ-মা সুখের কথা চিন্তা করে সন্তানের বিয়ে দিয়েছেন বড়লোকের ঘরে তবে নেকড়ের কথাটা মোটেই ভেবে দেখেননি। এখানে নেকড়ে বলতে শাশুড়ী মহাশয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপদেশ হচ্ছে বাহ্য সুখটা জীবনে আসল সুখ নয়।

লোকগীতিতে উপকথার স্থান থাকা স্বাভাবিক। লাদাকের একটি কবিতার বিষয় জগৎ সৃষ্টির উপকথা। এতে বলা হচ্ছে জল থেকে তৃণভূমির উৎপত্তি। এই তৃণভূমির উপর তিনটি পাহাড় সৃষ্টি হয়—সাদা, লাল ও নীল জহরতের পাহাড়। তিনটি পাহাড়ের উপর তিনটি গাছ দেখা দেয়—সাদা, নীল ও লাল চন্দনের গাছ। তিনটি গাছে তিনটি পাখীর উপস্থিতি ঘটে—সাদাতে বুনো ঈগল, নীলে বীরু জোলমো এবং লালে মুরগী। এইভাবেই জগৎ সৃষ্টি হয়।

প্রবন্ধের শুরুতে আমরা বলেছি যে লাদাকের প্রাচীনতম অধিবাসীরা দার্দ (Dard) নামে পরিচিত। এরা গিলগিট অঞ্চল থেকে আগত। দার্দদের গ্রামে প্রতি তিন বছর অন্তর 'বোনা-না' নামে একটি উৎসব প্রতিপালিত হয়। এই উৎসবে একজন প্রধান মন্ত্রোচ্চারক থাকেন। এঁর শরীরে ভগবান সাময়িক-ভাবে অধিষ্ঠিত হন। অনুষ্ঠানে বহু মেষ উৎসর্গ করা হয়। এটি প্রাক্-বৌদ্ধযুগের ধর্মানুষ্ঠান। 'বোনা-না' উৎসবে গীত গানগুলি থেকে দার্দ জাতির প্রাচীন পরিচয় বিস্তৃত জানা যায়।

অত্যন্ত দুঃখের কথা এপর্যন্ত লাদাকী লোকগীতের যা কিছু নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে তা করেছেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা। অবশ্য সম্প্রতি কাশ্মীরের সদর-এ-রিয়াসত যুবরাজ করণ সিং কাশ্মীরের যে লোকগীতের সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাতে লাদাকের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। লাদাক যে চিরকাল ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল একথা প্রমাণ করার জন্য আজ আমাদের মধ্যে অনেকে অনেক যুক্তি দেখাচ্ছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা একটা সহজ উপায় বিস্মৃত হচ্ছি। সেটি হচ্ছে লাদাকের লোকগীত। এতে বিজাতীয় কিছুই আমাদের চোখে পড়ে না। লোকগীত-গুলি লাদাকীদের নিজস্ব মনোরম সৃষ্টি। যার মধ্যে ভারতীয়ত্বের আমেজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩১)

রবিবার এসে গেল।

আমি চুঁচড়ায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। সকালের গাড়ী ধরব। গগন সেন আমার জন্যে অপেক্ষা করবে স্টেশনে।

এ ক'দিনের মধ্যে বৌদি নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, তুমি আবার কবে আসবে ঠাকুরঝি?

বললাম, চেষ্টা করব সামনের সপ্তাহে আসবার। তবে যদি তোমাদের দরকার পড়ে খবর পাঠিও। আমি তখনি চলে আসব।

ব্রজবালা দেবী গগন সেনের হাত দিয়ে কিছু টাকা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এই সময় যদি আমার দরকার লাগে সেই কথা বিবেচনা করে। সেজদাদের অনেক টাকাই খরচা হয়েছিল, আমি যাবার সময় বৌদির হাতে শ'খানেক টাকা দিয়ে বললাম, এটা তুমি রেখে দাও।

বৌদি টাকা দেখে অবাক হল, কি হবে?

—দরকার লাগবে। থাক।

বৌদি বুঝতে চাইল না, না, না, না, তোমার দাদা রাগ করবে।

—কেউ রাগ করবে না। আমি নিজে যখন রোজগার করছি দরকারের সময় বাড়ীতে সাহায্য করব না?

বৌদি তা'তেও নিতে রাজী না হওয়ায় বললাম, তার মানে তুমি আমাকে এখনও পর মনে কর।

অগত্যা বৌদি টাকাটা নিল। বলল, তোমার দাদার হাতে দিয়ে দেব। কিন্তু কথা দিয়ে যাও, আমার কাছে নিশ্চয় আসবে, ঠিক আগে যেমন আসতে মেজ'র কাছে।

কথা দিলাম আসব।

বৌদি আমার কপালে সস্নেহে আদর করল, ওর ব্যবহারে সত্যিই আমি খুশী হলাম।

ট্যাক্সী চড়ে স্টেশনে যাচ্ছি। সঙ্গে একটা ছোট ব্যাগ, আর হাতে অলকার দেওয়া ঘড়ি। ঠিকই বলেছিল অলকা, ঘড়িটা দেখলেই ওর কথা মনে পড়বে।

অলকা যেদিন আসে তার পরদিনই আমি ওর বাসায় গিয়েছিলাম। অলকা বাড়ীতে ছিল না, দেখা হয়নি। ঝি দরজা খুলে দিল, দেখলাম জিনিসপত্র বাঁধা হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা আজকে যাচ্ছ?

ঝি জানাল, আজ নয় কাল সকালে।

—তুমি দিদিমণির সঙ্গে যাচ্ছ তো?

—হ্যাঁ, তা না হলে দিদিমণি একলা থাকবেন কি করে।

—আমি অলকার বাড়ী যাবার পথে দোকান থেকে একটা লকেট কিনেছিলাম ওঁকে উপহার দেব বলে, জিনিসটা যে খুব দামী তা নয়, কিন্তু দেখতে ভাল। তাছাড়া বরাবরই দেখেছি, অলকা লকেট পরতে ভালবাসে। তাছাড়া এই তাড়াহুড়োর মধ্যে কি জিনিসই বা কিনব।

লকেটটা বার করে ঝি-এর হাতে দিলাম, এটা দিদিমণি এলে দিও।

—কি বলব?

—বোল আমি দিয়ে গেছি। আর এই খামখানা, এতে একটা ছবি আছে। কানপুর থেকে দিদিমণি যেন আমাকে চিঠি লেখে।

অলকার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হত, কিন্তু কখন সে ফিরবে তার ঠিক নেই, তাই দেখা না করেই চলে আসতে বাধ্য হলাম।

ট্যাক্সী করে যাচ্ছি আর মনে হচ্ছে, ক'লকাতার বন্ধন একটা একটা করে কেটে গেল। মেজদি নেই, অলকা চলে গেছে। ক'লকাতায় আমার আর কোন বিশেষ আকর্ষণ থাকবে না। আর পাঁচটা শহরের মত কলকাতাকে একটা শহর মনে হবে।

স্টেশনে গগন সেন টিকিট করে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। লোকাল ট্রেন ছাড়তে দেরী আছে। দু'জনে গিয়ে ঢুকলাম রিফ্রেশমেণ্ট রুমে।

বললাম, শুধু কফি আনাও, আর কিছু না।

গগন সেন টেবিলে বসে ফাইলের পাতা ওলটাচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, ওটা কিসের ফাইল! উত্তর দিল, স্কুলের কাগজপত্র।

—কাজ এগুচ্ছে?

—বসে থাকলে চলবে কেন? যখন ভার নিয়েছি করতে তো হবেই।

আমি কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, তুমি যখন আমায় বোঝাতে তুমি একা, কেউ তোমার জন্যে চিন্তা করে না, তোমাকেও কারুর জন্যে ভাবতে হয় না। আমি সত্যিই ঠিক বুঝতে পারতাম না তুমি কি বলতে

চাইছ। কিন্তু আজ তোমার আর আমার কোন পার্থক্য নেই। আমিও একা।

গগন সেন বলল, অর্পিতা, শিক্ষা, স্কুল-কলেজে খানিকটা হয় নিশ্চয়, কিন্তু সেটা ওপর ওপর। ওখানে শুধু থিওরি শেখা যায়। কিন্তু আসল শিক্ষা আমরা কোথায় পাই জান, জীবনের ইস্কুলে। ও জায়গাটা বড় কড়া, বেশির ভাগই ঠেকে শিখতে হয়। যাকে আমরা বলি অভিজ্ঞতা। জীবনকে উপলব্ধি করতে না পারলে সত্যি কিছু শেখা যায় না।

বললাম, তোমার কথা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, যেটা আগে ধাঁধার মত মনে হত।

গগন সেন হাসল, তার মানে এতদিন আমার কথা কিছুই শুনতে না?

অকপটে স্বীকার করলাম, শুনেছি, কিন্তু বুঝিনি।

"শুধু কফি আনাও, আর কিছু না।"

গগন সেন কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, কতদিন যে আমাদের মন ছেলে-মানুষিতে মেতে থাকে তা আমরা নিজে-রাই বুঝতে পারি না। তাই খেলনা নিয়ে ভুলে থাকি। ভাবতেও চেষ্টা করি না, যখন খেলনা রয়েছে তখন নিশ্চয় আসল জিনিসটাও আছে। যদি ছায়া পড়ে একটা কায়াতো থাকবেই, কিন্তু সেই কায়াটার সন্ধান কি আমরা করি।

জিজ্ঞেস করলাম, এসব কথা কি তুমি ছোটবেলা থেকেই ভাব?

—ভাবতে হয়েছে বলেই ভাবি। না হলে বোধহয় আর পাঁচটা ছেলে-মেয়ের মত খেলনা নিয়ে ভুলে থাকতাম। জীবন আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে অর্পিতা, আমার হাত ধরে সে এতদূর নিয়ে এসেছে। দুঃখ, কষ্ট, বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে, কিন্তু তাতেও আমি আনন্দ পেয়েছি। এ আনন্দও বোধহয় নিজেকে বোঝার, পূর্ণতার স্বাদ পাওয়ার।

—তুমি তো সে-সব দিনের কথা আমাকে কখনও বল না?

—বলব, যখন সময় হবে। চল। এখন বোধহয় গাড়ী পাব।

চুঁচড়োর বাড়ীতে পোঁছে ব্রজবালা দেবীকে গিয়ে প্রণাম করলাম কিন্তু কথা বলার বিশেষ সুযোগ পেলাম না। তুবড়ী আমাকে টানতে টানতে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। তার চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, সে আমাকে দেখে খুব খুশী হয়েছে। আমাকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার ফিরতে এত দেরী হল কেন অপুদি?

বললাম, আমার বাড়ীতে বড় বিপদ হয়েছিল।

—তোমার দিদি মরে গেছে, না?

—হ্যাঁ।

তুবড়ী নিজের মনেই বলল., শুনে আমারও দুঃখ হয়েছিল। খুব কেঁদেছি, আমি তুবড়ীর মাথায় হাত বোলাচ্ছিলাম, সে এক সময় নিজের মনেই প্রশ্ন করল, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, না অপুদি?

বললাম, হ্যাঁ।

—আমি যদি মরে যাই তোমার কষ্ট হবে? কথাটা বলতে গিয়ে তুবড়ী কেঁদে ফেলল।

আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, এ আবার কিরকম কথা? ছিঃ, এসব বলে না।

তুবড়ী তবু বলল, আমি মরে গেলে কি হয়েছে? কেউতো আমায় ভালবাসে না।

—কে তোমায় এসব কথা বললো?

—আমি জানি।

—তুমি কিছু জান না। আমি তোমায় কত ভালবাসি।

জলভরা চোখে তুবড়ী মুখ তুলে তাকাল, সেতো শুধু তুমি, আর কেউ নয়।

আমিও ইচ্ছে করে কথা বাড়ালাম না। কিছুক্ষণ ওকে নিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

তুবড়ী একসময় বলল, মা আবার একখানা চিঠি লিখেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ওদের খবর সব ভালতো?

—কি জানি? সে সব কথা আমায় লেখে না। জানতে চেয়েছে তুমি কেন কলকাতায় গেছ। গগনবাবু কিরকম লোক, বড় মামা এখানে কি করছে? এই সব কথা।

—তুমি উত্তর দিয়েছো?

তুবড়ী উৎসাহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ লিখে দিয়েছি, তোমার দিদি মরে গেছে, গগনবাবু খুব ভাল লোক, আমাকে অপুদির মত ভালবাসে। আর বড়মামা একটা ইস্কুল খুলেছে।

—স্কুলের কথা তুমি জান?

—জানব না কেন? নিচে কত কাজ হচ্ছে তুমি দেখনি বুঝি, চল না আমার সঙ্গে।

তুবড়ী আমাকে নিচে নিয়ে গেল। দেখলাম ছুতোরের কাজ চলছে, তারা তৈরী করছে উঁচু-নীচু বেঞ্চী, চেয়ার-টেবিল, যাবতীয় স্কুলের আসবাবপত্র। সরকার মশাই তদারক করছেন। নিচের এঘরটা সাধারণতঃ বন্ধই থাকে, কর্ম-ব্যস্ততায় এখন মুখর হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন কাজ হচ্ছে।

তুবড়ী জানাল, বুধবার থেকে। তুমি এসব জান না বুঝি। বাচ্চাদের স্কুল হবে তো? তাই পাড়ার কত লোক দাদনের সঙ্গে দেখা করতে আসে, বাচ্চাদের ভর্তি করতে চায়। সেদিন গগনবাবু বলেছিল দাদনকে মাস দু'য়েকের মধ্যে এখানে স্কুল বসে যাবে। তাহলে খুব মজা হবে, না অপুদি?

বললাম, হ্যাঁ। আমাদের আর একলা থাকতে হবে না, হৈ হৈ-এর মধ্যে দিন কেটে যাবে, কি বল তুবড়ী।

তুবড়ী কি উত্তর দিল আমি শুনিনি, কারণ ঠিক সেই সময় লক্ষ্মীর মা এসে জানাল উপরের ঘরে সাধুজী আমাকে দেখা করতে বলছেন। আমি বোধহয় এই ডাকটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, দ্রুত পায়ে উপরে উঠে গেলাম।

ঘরের মেঝের উপর আসন পেতে সাধুজী একা বসে রয়েছে। পরনে গেরুয়া বস্ত্র, তাঁর গৌরবর্ণ রঙ আরও যেন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে গড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম।

. উনি কি বলে আমায় আশীর্বাদ করলেন আমি শুনতে পেলাম না। তারপর স্মিত হেসে বললেন, বোস মা। তোমার সঙ্গে দু-একটি দরকারি কথা আছে।

অদূরে একটি আসন পাতা ছিল, কিন্তু আমি মাটিতেই বসে পড়লাম। সাধুজী প্রশ্ন করলেন, সামলে উঠেছ মা?

মাথা নিচু করেই বললাম, হ্যাঁ। সব সময় আপনার কথা আমার মনে পড়েছে। আপনি বলেছিলেন, বিপদকে ভয় না করতে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি ভয়কে জয় করার।

সাধুজী মন দিয়ে আমার কথা শুনছিলেন, বললেন, কঠিন কাজ। কিন্তু চেষ্টা করলে নিশ্চয় পারবে, আর তোমাকে পারতেই হবে।, ঠাকুর তাঁর কাজ করবার জন্যে এক-একজনকে বেছে নেন, ধর তুমি যদি সেই বাছাই করা লোকের মধ্যে পড়ে থাক, যদি সত্যিই ভাগ্যবতী হও তাহলে জেন একের পর এক বিপদ আসবে। এই জগতের নিয়ম। ভগবান যাকে দিয়ে কাজ করাতে চান, শয়তান তাকে এসে বাধা দেয়। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তারপর শুরু হয় যুদ্ধ বাইরের জীবনে। শেষপর্যন্ত সত্যের জয় হয়। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত যে সংশয়ের মধ্যে দিন কাটে তা এক এক সময় দুর্বিসহ মনে হয়। যদি সেরকম দিনও আসে, ধৈর্য হারিও না, সাহসে বুক বেঁধ, আর ঠাকুরে বিশ্বাস রেখ। এইটুকু জেন যা ঘটবে সবই তোমার মঙ্গলের জন্য।

সাধুজী এত কথা কেন আমাকে বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, আজ আমি আশ্রমে ফিরে যাচ্ছি।

—সেই জন্যেই তো সকালবেলা চলে এলাম।

—ভাল করেছ। দেখা হয়ে গেল, এ কথাগুলো তোমাকে বলা দরকার ছিল। প্রয়োজন বোধ করলে আমাকে চিঠি লিখতে পার। যথাযথ নির্দেশ পাবে।

বললাম, নিশ্চয় লিখব। আমি ভেবেই ছিলাম আপনাকে চিঠি লেখার অনুমতি চেয়ে নেব। কারণ আমাকে যে সবচেয়ে ভালবাসত সেই মেজদিই চলে গেল। এখন আমি বড় একা। কেউ নেই, যার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারি।

সাধুজী সহজ গলায় বললেন, মা, আমরা সকলেই একা। আমরা ভাবি,

আমাদের অনেক আপনার লোক আছে, বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখবে কেউ কারুর নয়, সবই মায়া। একটাই মিলন সম্ভব সে হোল একাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন।

বললাম, আমার জ্ঞান অত্যন্ত অল্প, আপনার সব কথা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু বলুন কি করে শান্তি পাব।

—মন দিয়ে কাজ কর মা, শান্তি আপনা থেকেই আসবে। এই স্কুলটা চালু হোক, বাচ্চারা আসুক, তুমি আর গগন তাদের মুখে হাসি ফোটাও, তারা যত হাসবে, তোমরা ততই আনন্দ পাবে।

—আশীর্বাদ করুন যেন সবকিছু ভুলে গিয়ে এই কাজ নিয়েই মেতে থাকতে পারি।

সাধুজী সস্নেহে বললেন, পারবে মা নিশ্চয় পারবে। তোমার কপালে এমনই একটা চিহ্ন আমি দেখেছি যাতে বুঝেছি তুমি ভাগ্যবতী।

আর কথা হ'ল না। ব্রজবালা দেবী একটা বড় খাম হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখে বললেন, অর্পিতা, তুমি এখানে।

আমার হয়ে উত্তর দিলেন সাধুজী, আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

আমাকে সরিয়ে দেবার জন্যেই বোধ-হয় ব্রজবালা দেবী বললেন, দেখতো মা একবার লক্ষ্মীর মা কি করছে, ওকে বলে এসেছি—

সাধুজী থামিয়ে দিয়ে বললেন, অর্পিতা থাক না, একজন সাক্ষীরও তো দরকার।

ব্রজবালা দেবী আর আপত্তি করলেন না, আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম বলে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

সাধুজী জিজ্ঞেস করলেন, উকিলবাবু কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন?

বৃদ্ধা খামের ভেতর থেকে বড় বড় খান কয়েক কাগজ বার করলেন, এখুনি দিয়ে গেল।

এ একরকম ভালই হ'ল, আমি সই করে দিয়ে যেতে পারব, তা না হলে তোমাদের আবার আশ্রমে পাঠাতে হ'ত।

সাধুজী কাগজপত্রের ওপর উপর উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিচে নাম সই করে দিলেন। আমাকে বললেন, অর্পিতা তুমিও একটা সই কর সাক্ষী হিসেবে। এ কিছুই নয়। এক ধরনের চুক্তিপত্র। তোমরা যেখানে স্কুল করবে, বাড়ীর ওয়ারিশ হিসেবে আমি তাতে সম্মতি দিলাম। চাও তো একবার পড়ে নিতে পার।

আমি মাথা নিচু করে উত্তর দিলাম, পড়বার দরকার নেই, কোথায় সই করতে হবে বলুন।

ব্রজবালা দেবী আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যেখানে সাক্ষী বলে লেখা আছে, আমি তার উপর নাম সই করে দিলাম।

সাধুজী বললেন, এবার তোমরা কাজ শুরু করে দাও, আমার যেটুকু কর্তব্য আমি করে দিয়েছি।

ব্রজবালা দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কাগজপত্রগুলো কি উকিল বাবুর কাছেই পাঠিয়ে দেবে?

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, না। আমার কাছেই থাকবে।

—সাবধানে রেখ।

—সে মিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

আমি মাঝখান থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের স্কুলের কি নাম হবে?

সাধুজী স্মিত হেসে বললেন, শিশু-ভারতী। কি নাম পছন্দ হয়?

সোচ্ছ্বাসে বললাম, খুব সুন্দর নাম।

ইচ্ছে করেই একটু পরে আমি উঠে পড়লাম, হয়ত মাতাপুত্রের আরও কিছু আলোচনা করার আছে। আমি বসে থাকলে তা' করতে পারেন না।

—এখুনি আসছি, বলে বাইরে চলে এলাম।

ঢুকলাম আমার ঘরে। জানালাগুলো বন্ধ রয়েছে। ক'লকাতা থেকে ফিরে পর্যন্ত এ ঘরে আসার সময় পাইনি। ঘর অন্ধকার, এগিয়ে গেলাম জানালা খুলে দিতে। কে যেন মৃদু কণ্ঠে বলল, থাক্ না।

প্রথমটা আমি চমকে উঠলাম, কে কথা বলল। কই কেউতো কোথাও নেই, এ কণ্ঠস্বর পুরুষের নয়, নারীর। অন্ধ-কারের একটা মোহ আছে। যা অতি সহজে মনের উপর এক ধরনের আবেশ সৃষ্টি করে। সেইজন্যেই ভাবতে ইচ্ছে করল, কার এ কণ্ঠস্বর। মনের কোণে প্রশ্নের ঝিলিক মেরে গেল, মেজদির কি? যার এখানে আসবার ইচ্ছে ছিল, যার আসা হ'ল না, সেই কি মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছে।

আমি বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করলাম, মেজদি তুমি? কোথায়? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।

কোন উত্তর এল না, তবে কি আমার মনের ভুল, হবেও বা, আশ্চর্য কি? আস্তে আস্তে জানালা খুলে দিলাম, হুড়মুড় করে আলো এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। অন্ধকারের মোহ এক নিমেষে কেটে গেল।
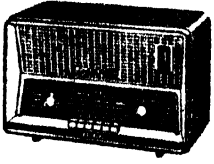
জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম বাগানে গগন সেন আর তুবড়ী কি একটা জিনিস নিয়ে টানাটানি করছে। কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো টিনের বোর্ড বেশ বড়, নিশ্চয় ভারি। অনেক কষ্টে তারা খাড়া করল, দেখলাম লেখা রয়েছে, শিশু-ভারতী।

তবে আগে থেকেই সব ঠিক হয়ে-ছিল। স্কুলের পূর্ণ প্রস্তুতি চলেছে। জানালায় দাঁড়িয়ে নতুন জীবনের পদ-ধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। গগন সেন আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল। আমিও হাত নাড়লাম।

এ যেন উজ্জ্বল প্রভাতের আহ্বানে সাড়া দেওয়া।

(ক্রমশঃ)

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

'জানাতে পারেন' বিভাগটিতে নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টি পাঠাচ্ছি।

ক। ভারতের সব থেকে উ'চু বাড়ী কোন্‌টি?

খ। কাচ প্রস্তুত করবার সময় ব্যাচের সংগে কোন রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে অভ্যন্তরে কাচ কি তৈরী করা সম্ভব? এর্নালিং প্রণালী দ্বারা কাচদ্রব্য কতদূর শক্ত করা সম্ভব?

গ। পশ্চিমবংগে এখন বিজ্ঞান-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকা কে কে?

ঘ। "আমি নাই বা গেলেম বিলেত,
আমি নাই বা পেলেম রাজার খিলেত,
............"

—রবীন্দ্রনাথ সঠিক কবার বিলেত গিয়েছিলেন? 'বিলেত' কথাটির উৎপত্তি কোথা থেকে?

সলিল পঞ্চানন
মালিগাঁও—
কামরূপ (আসাম)

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের "জানাতে পারেন" বিভাগে প্রশ্ন পাঠালাম।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সিনেমা হাউস কোনটি? এবং সেটি কোন দেশে অবস্থিত।

শ্রীভোলা অধিকারী
বিরাটী-মহাজাতি—২
কলিকাতা-৫১।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ৪ঠা অক্টোবর '৬৩ "অমৃত"-এর ২২ সংখ্যার "জানাতে পারেন" বিভাগে প্রকাশিত শ্রীধনঞ্জয় হালদারের ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর নীচে দিচ্ছি :

(৩) বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে "ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ"। লেখক—দোম আন্তোনিও।

(৪) বাংলা দেশের প্রথম সংবাদপত্র হিকি'র "বেঙ্গল গেজেট"। এটি ইংরেজী ভাষায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

শ্রীকিরণময় গঙ্গোপাধ্যায়
৩৭, হালদার পাড়া
বজবজ
২৪-পরগণা

সবিনয় নিবেদন,

গত ১১ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত 'অমৃতে'র 'জানাতে পারেন' বিভাগে লিখিত শ্রীগোপাল মুখার্জি'র প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি.........।

(১) আপনার প্রশ্নের সেই বিভিন্ন প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিটি তো আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি হ'লেন রবীন্দ্রনাথ।

শুধু তাই নয়, আপনি যে চারটি বিশেষ বিভিন্ন প্রতিভার উল্লেখ করেছেন, তার থেকেও বেশী গুণের অধিকারী ছিলেন আমাদেরই রবীন্দ্রনাথ। আপনার প্রশ্নটির মধ্যে পড়ে, যথা : (১) ছোটগল্প : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রবর্তনই তো করেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। (২) ঔপন্যাসিক : বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচয়িতার সম্মানের অধিকারীও আমাদেরই রবীন্দ্রনাথ। "গোরা" (১৯০৮)। (৩) কবি : সমগ্র বিশ্ববাসীই যখন তাঁকে 'বিশ্বকবি' বলে স্বীকার করেছেন, তখন এ প্রসঙ্গ তোলাই বোধ হয় আমার পক্ষে বাতুলতার নামান্তর মাত্র। তাই নয় কী......? (৪) নাট্যকার : হ্যাঁ তিনি নাটকও লিখেছেন অনেকগুলি। এবং সেই নাটক যে শুধুমাত্র ভারতবাসীদেরই মন আকৃষ্ট করতে সক্ষম হ'য়েছে তাই নয়। কিছুদিন আগেও লণ্ডনে তাঁর 'ডাকঘর' নাটকটি অভিনীত হ'য়ে প্রচুর সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'রাজা' (১৯০৭), 'ডাকঘর' (১৯০৭) ও 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নাটকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
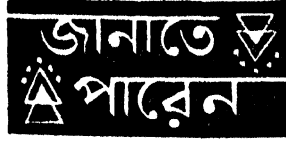
আপনার প্রশ্নের যোগ্যতা ছাড়াও আর তিনি যে-সব বিভিন্নতম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সেগুলি হ'ল (৫) চিত্রশিল্পী : ১৯৩০ সালে একাদিক্রমে তাঁর আঁকা ছবি প্যারিস, বার্লিন, ইউরোপ, নিউইয়র্ক এবং সর্বশেষে কলকাতায় প্রদর্শিত হ'তে সারা বিশ্ববাসীই বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন। (৬) সুরকার : তিনি নিজে একজন বিখ্যাত সুরকারও ছিলেন। আমরা যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতগুলি শুনি এগুলির সুর তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন।

এ ছাড়া তিনি নিজেও একজন ভালো 'গাইয়ে' ছিলেন ও অত্যধিক পরিমাণে 'রসিক' ছিলেন এ 'সন্দেশ রাখেন কী......?

(২) 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামটি দিয়েছিলেন 'শের শাহ'।

শ্রীনন্দকুমার চক্রবর্তী
৬৩ রায় বাহাদুর রোড,
কলিকাতা—৩৪।

সবিনয় নিবেদন,

গত ১১ই অক্টোবর, '৬৩ অমৃত-এর জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত কমলকৃষ্ণ কুণ্ডু মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি :—

বাস্তবিক দুর্গাপূজার সময় দেখি গণেশের পাশে কলাবউ থাকে। অনেকে তাঁকে গণেশের পত্নীও বলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তা'র প্রকৃত নাম নব-পত্রিকা'।

কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক মান ও ধান্য—এই ন'টি বৃক্ষের সমন্বয়ে নব-পত্রিকা গঠন করা হয়। উল্লিখিত ন'টি বৃক্ষের মধ্যে কদলী বৃক্ষই প্রধান এবং তা'কেই বউ-এর আকারে গঠন করা হয়। তাই এর নাম কলাবউ। দুর্গাপূজার সময় নবপত্রিকারূপিণী দুর্গাদেবীতে আবাহন ও অধিবাস করা হয়।

প্রবোধকুমার দত্ত
ময়ূরাই, বীরভূম।

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ৪ঠা অক্টোবর 'অমৃত'-এর 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীচিন্ময় চৌধুরী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর :

(১) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ লাইব্রেরী ফ্রান্সের বির্বালওথিক ন্যাশ্‌নেল। এখানে প্রায় ৮,০০০,০০০ প্রকারের পুস্তক আছে। পুস্তক সংখ্যা একশত কোটির বেশী।

(২) সর্বপ্রথম আমেরিকা সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ছায়াচিত্রটির জন্য বেশী সম্মান প্রদর্শন করে।

(৩) বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড্‌ রাসেল্‌।

ঐ সংখ্যাতেই প্রকাশিত ধনঞ্জয় হালদার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরও জানাচ্ছি :—

(১) চন্দ্রবংশে 'বলি' নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। গৌতম ঋষির বরে তাঁর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্র হয়। এই পাঁচ ভাইয়ের নামেই ভারতের পাঁচটি জনপদের নাম দেওয়া হয়—অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ, কলিঙ্গদেশ, সুহ্মদেশ ও পুণ্ড্রদেশ। সেকালে বঙ্গদেশ বলিতে বর্তমান পূর্ব পাকিস্থানের ঢাকা বিভাগটি বোঝাত। ক্রমে আরও অনেক দেশ বঙ্গদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বঙ্গদেশ নামেই পরিচিত হয়। অতএব বলিরাজার পুত্র বঙ্গ-এর নাম অনুসারে আমাদের দেশের নাম হয়েছে বঙ্গদেশ।

আবার কেহ কেহ বলেন, মৌখরী বংশীয় গৌড়জয়ী রাজা ঈশান বঙ্গের নাম অনুসারে আমাদের দেশের নাম বঙ্গ হয়েছে। কণিষ্কের সময় থেকে (বোধহয়) বাংলা সাল গণনা আরম্ভ হয়।

শ্রীচিন্ময় চৌধুরী
ও
শ্রীহৃষিকেশ সোম
ডানকুনি—হুগলী।

সেকালের পাতা : একালের চোখ

রত্নাকর

স্ত্রী-শিক্ষা চালু হয়েছে। কিন্তু তা বড় ঘরে সীমাবদ্ধ। অথচ সাধারণ ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে চায়। নূতনভাবে বাঁচতে চায় তারা। শাস্ত্রে যখন স্ত্রী-শিক্ষা নিষিদ্ধ নয় তখন কেনই না তারা বঞ্চিত হবে?—দুই বৌ'এর কথা হচ্ছে অন্দর মহলে। ঘরের বাইরে না এলে কি হবে: সমাজের চাপ সংস্কারের ধাক্কা, প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ সব তারা বুঝতে পারে। তারা জানে যে যারা স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে সমাজকে তাতিয়ে তুলছে তারা কিন্তু নিজের বাড়ির মেয়েদের বিবি করে তুলছে। সংবাদ সাধুরঞ্জন থেকে দুই বৌ-এর আলাপ সঙ্কলিত করা হল।

১৮৬০ সালের দিকে কমে এসেছে বুলবুলি লড়াই-এর রেওয়াজ। আর নেই কলকাতার বনেদী বাসিন্দা শেঠ বসাকদের গৌরব। থাকল না রাজা রাজনারায়ণ রায়ের বড়াই। প্রমথনাথ দেব মারা গেলেন। কিন্তু বুলবুলি লড়াই যাতে বন্ধ না হয় তার জন্যে উইল করে গেলেন তিনি। আশুতোষ দেবও চালিয়ে গেলেন। এখন দয়ালচাঁদ মিত্রের কাল। কিন্তু তারপর?—সংবাদ প্রভাকরের বক্তব্য আজও পড়তে ভাল লাগবে।

স্ত্রী-বিদ্যা বিষয়ে দুইজন স্ত্রীলোকের কথপোকথন।

প্রশ্ন : ওগো দিদী, কি শুনেছি, মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার তরে নাকি একটা স্কুল হয়েছে।

উত্তর : হ্যাঁলো, বোন, তুই কি এতদিন তা শুনিস নি? একমাস হোল ছোট২ মেয়ে সকল সেখানে যেতেছে।

প্রং। দিদী, তারা সব কি শিখতেছে?

উং। ছেলেদের মত কাগজ লিখতেছে, বই পড়ছে, বাড়ার ভাগ আবার দর্জ্জির কর্ম্ম শিখতেছে। আহা! বোন ক্ষুদে২ মেয়ে গুলীন কেমন টুপি সেলাই করে, দেখে অমনি চক্ষু জুড়ায়। আমি সেদিন গঙ্গাজলের বাড়িতে সাধের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ছিলেম, সে পাড়ার একটি বামুনের মেয়ে তোর ওই রাখালীর চেয়ে কিছু বাড়ন্ত গড়ন, কেমন হাসি হাসি মুখখানী কোরে বল্লে লো, একটা বুড়ো সাহেব, সে বড় ভাল মানুষ, গাড়ী কোরে নিয়ে যায়; গাড়ী কোরে, রেখে যায়। সেখানে ব্যাটাছেলে যেতে পায় না, মাঝে২ মেয়েদের বাবা মিন্সেরা গিয়ে দেখে আসে, একটি সমস্ত বিবি রোজ এসে যত্ন করে সেলাই শেখায়। একজন বড়ো আর একজন আধবুড়ো বামুন লেখাপড়া শেখায়, তাদের রীতিনীতি বড় ভাল।

প্রং। ওগো দিদী, আমাদের বাড়ীর এই মেয়েগুলীনকে সেই স্কুলে পাঠালে ভাল হয় না? বাছারা গুণ শিখতে পারলে পরে ঘরকন্নার কত ভাল হবে। আমরা চুণের ফোটা আর দড়ির গেরো দিয়ে হিসাব রাখি, একখানা ছেঁড়া কাপড় যোড়া দিতে পারিনে, এরা হিসাব রাখবে, [illegible] [illegible], টুপি, চাদর [illegible] সেলাই কর্ব্বে। দেখ্ দিদী, বছরে কত টাকা দর্জ্জির পেটে যায়, এটাকা ঘরে থাকলে সংসারের কত আয় দেখবে।

উং। আরে, বোন, ওকথা বলিস নে, বলিস নে, বলিসনে। চুপ কর, চুপ কর, ক্ষমা দে, আমাদের তেমন কপাল নয়, পাড়ার কালামুখোরা একথা শুনলে পরে এখনি কানে শিশে ঢেলে দিবে কালনাগিনী রাইবাঘিনী ননদিনীর ব্যাখ্যানায় দেশে থাকা ভার হবে, এখনি নোলোক নাড়া দিয়ে সাতপাড়া মাথায় কোরে বেড়াবে। তুই কি শুনিসনি, ওদের বাড়ীর নিনেমো পোড়াকপালে লক্ষ্মীছাড়া ড্যাকরা বুড়ো এ পাড়ার ফসিক্ সেনের জাত মেরেছে, বোসদের বাড়ী নেমন্তন্ন বারণ করেছে। আহা, বোন, বলতে বুক ফাটে, ওবাড়ীর খুড়শেশের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেম, তাদের বাড়ীর একটি প্রাচিন্নী মেয়ে নাইতে এসেছিল, ডুব দিয়ে মাথা পুঁচিতে২ কাঁদো২ হোয়ে আমাকে সকল কথাই বল্লে।

প্রং। দিদী, এতে কি শাস্ত্রে কোন দোষ আছে, সে কালের মেয়েরা কি লেখাপড়া শিখতো না।

উং। বোন, আমি কথক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, তিনি বল্লেন, "হাঁ শাস্ত্রে লেখা আছে, সকল কালেই মেয়েরা বিদ্যে শিখবে, সরস্বতী যিনি লেখাপড়ার কর্ত্তা, তিনিই মেয়েমানুষ, রুক্মিনী, সত্যভামা, দ্রৌপদী, অহল্যা প্রভৃতি ঠাকরুণেরা সকলেই বিদ্যাবতী ছিলেন, হ্যা দে, এই কলিকালে বড় ঘরের অনেক মেয়ে বিদ্যে শিখছে। খোণা, যার মতে পাঁজি চলে সে মেয়েমানুষ ছিল।

প্রং। তবে দিদী, যদি শাস্ত্রে দোষ নাই, তবে আমরা কেন শিখব না, মেয়েরা কেন না শিখবে, হতভাগা পুরুষরা যদি রাজী না হয়, আমি তো বাপের বাড়ী চোলে যাব, আমার মেয়েরা লেখাপড়া শেখাবে।......তুমি কেন বটঠাকুরকে বল না, এত ভয় কেন, তিনি রাজী হোলে আমাদের এ মিনসে কোন কথা কইতে পার্ব্বে না। আজ আমি রেতের বেলা বুঝিয়ে বলব, রাজী হয় ভাল, নইলে এবারে ভাত খেতে চাইলে উনুনের ছাই পাঁস বেড়ে খেতে দেব....।

উং। হাঁলো ছুড়ী......আমি তো নিতান্ত কচি খুকী নই, সকলি জানি-শুনি, কি করি; "বেঁধে মারে সয় ভাল।" আমাদের সময় ভাল নয়, পুরুষেরা দিন আনে দিন খায়, কর্ত্তাটির ইচ্ছে না আছে এমন নয়, সেদিন (কোথাকার) মর ছাই, তার নাম আমার মনে পড়ে না, ঐ যে, অমুক ঘোষ, এসেছিল, তার সঙ্গে কে, একটি রাঙ্গাপানা টুপি মাথায় সাহেব২ বাবু এসেছিল, তখন ঠাকুরপো কর্ত্তার কাছে বসেছিলেন। তোর রাখালীকে ও আমার ত্রিপুরাকে স্কুলে দেবার কথা হোয়েছিল। আমাদের এই পাড়ার হাড়হাবাতে ফোগলা বুড়ো, মর, তার নাম করলাম, অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর, মহাভারত, বোন আজকেরদিন কপালে অন্ন আছে কি না বলতে পারি নে, সেই ড্যাকরা, আর বড়বাড়ীর জামায়ের খুড়ো নাদুসনুদুস ভুঁড়ো মিনসে বোলে পাঠালে, "তোমরা যদি মেয়ে পড়তে দেও তবে একঘোরে করব, জাত মারব চাকরি ছাড়াব, তাদের কি গুণ জ্ঞান নেই—ভরা রস, মেগের কাছে পেগের বড়াই" বড়লোকের কিছুই করতে পারে না, কেবল দুঃখিদের নিয়ে টানাটানি করে।

প্রং। দিদী, হাসিও পায়, কান্নাও পায়, "বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলপনা চক্র" আপনারা ঘরে সকলি করে, পরের বেলায় দোষ। হাঁ গো, এর কি কোন উপায় হোতে পারে না; বড়২ বাড়ীর মেয়েরা কি পুরুষদের কিছু বলে না।

উং। ......বোন বড় মানুষের কথাই নাই, সরকার আছে, গুরু আছে, পণ্ডিত আছে, পুরুৎ আছে, চাকর-বাকর, দাস-দাসী বাঁদী আর২ লোকজন কত আছে, বাড়ীতে সাহেব আসে বিবী আসে, তাদের ভাবনা কি লো, আমাদের মত দুর্ভাগা নয়, কোন দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, কত দেখে, কত শুনে, স্বচ্ছন্দে ঘরে বোসে নানা প্রকার সুখ ভোগ করে, গতর বাড়ায়, আর লেখাপড়া করে, কেমন সুর কোরে পুঁতি পোড়ে, কত ছড়া বলে, তারা নানান বিদ্যায় মূর্ত্তিমন্ত। এক২ জন গুরুলোকের নামে নাম হওয়াতে সে সকল বাড়ীর কর্ত্তাদের নাম করতে পারিনে।

প্রং। ছি দিদী, বুড়া হইলেই কি বিদ্ধিশুদ্ধি সকলি যায়? ইসারা কোরে বল না, যেমন "গঙ্গারাম ফঙ্গারাম। কাশীপ্রসাদ খাশীপ্রসাদ।"

উং। ভাল ছোট বউ, আচ্ছা বলেছিস, তবে বোন, বলি শোন। রৌরব ঘোষ। মালিকেশ্ট। অসময়। গাধাকান্ত। প্রমত্ত-নাথ। প্রেতনাথ। ভ্রষ্ট ফিঙ্গি ইত্যাদি তাবতেই আপন বাড়ীর মেয়েদের বিদ্যে শেখায়, তাতে কোন দোষ হয় না, এই অভাগিনী দুঃখিনীদের ক্ষুদে২ দুধে মেয়েদের স্কুলে দিলেই একঘোরে করে, এ পোড়াকপালে শতেক্ষরেরা দেশ নষ্ট করলে, কালী দিন দেন্ত আশা পুরাব।

(সংবাদ সাধুরঞ্জন। ১৬ জৈষ্ঠ ১২৫৮। ২৮শে মে ১৮৪৯।)

বর্তমান বর্ষে বুলবুল যুদ্ধের বিবিধানুষ্ঠান কিছুই অবলোকন করা যায় না। উক্ত সংগ্রামামোদি বাবুবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই পরলোক গমন করিয়াছেন। আমারদিগের স্মরণ হইতেছে যে ইতিপূর্বে বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বশাখ, যিনি রাজধানী মধ্যে বিখ্যাত, তিনি এই বুলবুল যুদ্ধের একজন বিশেষামোদী ছিলেন। মৃত রাজা রাজনারায়ণ রায়ের পক্ষিদের সহিত তাহার পক্ষিদের সংগ্রাম হইত. উভয় পক্ষের আয়োজন বড় অল্প ছিল না। একপক্ষ সমস্ত শেঠ, বশাখ, অন্যপক্ষ প্রায় সমস্ত সুবর্ণ বণিককুল, পক্ষিদিগের অনুবেল হইতেন। পঞ্চবাবুর বাবুআনা বহুদিন স্থায়ী হয় নাই. সুতরাং তিনি সমস্ত সম্পদ শূন্য হইয়া একপ্রকার গোপনাবস্থায় আছেন, রাজা রাজনারায়ণ রায় অল্পকালের মধ্যে পরলোক গমন করেন. তাঁহার পোষ্যপুত্র যদিও অবিবেচনাপূর্বক বহুব্যায়ী হইয়া পিতৃ-সম্পদ বিনষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু বুল-বুল সংগ্রামের আমোদ পরিত্যাগ করেন নাই। যতদিবস জীবিত ছিলেন ততদিবস অতি যত্নে পক্ষিদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় গতবর্ষে পর-লোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার পালিত পক্ষিরাও নাই।

মৃত বাবু প্রমথনাথ দেব মহাশয় বুলবুল যুদ্ধের একজন আমোদী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি পরলোক গমন সময়েও আপনার উইলপত্রেও লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার সঞ্চিত সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে প্রতি বৎসরে বুলবুলির পালুই হইবেক; ঐ নিয়ম তাঁহার মৃত্যুর পর অবধি যথানিয়মে প্রতিপালিত হইতেছে বটে কিন্তু আর পূর্বোরূপে আমোদপ্রমোদ নাই।

'প্রমথনাথ দেব পরলোক গমন করিলে উদারস্বভাব বাবু আশুতোষ দেব পৈত্রিক বিভবাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ঐ বুলবুল সংগ্রামের আমোদ জাগরূক রাখিয়াছিলেন। প্রকাশ্যরূপে বুলবুল যুদ্ধের আমোদ প্রকাশে ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণে বিশুদ্ধ স্বভাব পরম ধার্মিকবর শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র মহাশয় ঐ বুলবুল যুদ্ধের সম্যাগনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিযোগি পক্ষ কোথায় তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এবারের সংগ্রাম কিরূপ হয় তাহা বলা যায় না।

(সংবাদ প্রভাকর। ৫ মাঘ, ১২৬৬। ১৭ জানুয়ারী ১৮৬০।)
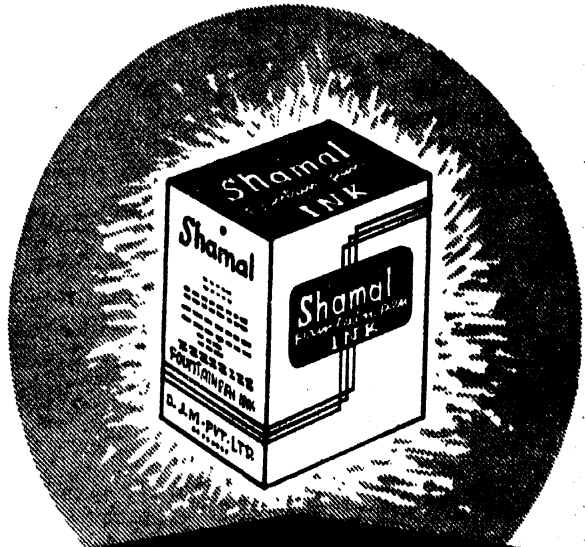
সুখ ও শাড়ি

হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মত; অজস্র রঙ চারদিকে; পাঁচটি মহিলা পথের মোড়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালে যেন সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের একটি স্তবক। একবার না তাকিয়ে উপায় নেই। প্রতিবছর পুজোর সময় কলকাতায় এমনি রঙের বিন্যাস দেখা দেয়। শাড়ি ডিজাইন পাল্টে নতুন মনোহারী শাড়ি আসে এবং সেই সঙ্গে পাল্টায় পরবার ভঙ্গি। কপালের টিপ থেকে স্যাণ্ডেলের লাল ফুলটি পর্যন্ত সজ্জার আশ্চর্য একক ভঙ্গিমা। ব্লাউজের ছাটের

চাতুর্যে কখনো নিটোল বাহুমূলের সৌন্দর্য উন্মোচিত, কখনো তা আবরিত হয়ে সুন্দর। বাঙালী মেয়েদের এই অপরূপ পোশাক বিদেশীদের বিস্মিত করেছে।

শুক ও সারীর দ্বন্দ্ব দেশখ্যাত। তেমনি সুখ আর শাড়ির মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। মেয়েরা হয়ত তাই বারবার শাড়ির ধরণ পাল্টে সুখের সন্ধান করেন, আর তাই নতুনতর ডিজাইনের চাহিদা আসে এবং প্রতি বছরের শরৎকাল নতুন নতুন রঙের সমারোহে চমকে ওঠে।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

রবিবার

যীশুখৃষ্টকে আমি ভজনা করি না কিন্তু তাঁকে ধন্যবাদ দিই সপ্তাহের এই একটা দিনই। যীশুভক্তরা যীশু প্রেমের মহিমায় করুণায় বিগলিত হয়ে পৃথিবীর অখৃষ্টানদের সঙ্গে খৃষ্টসুলভ ব্যবহার না করলেও, এই একটা দিনকে ত' প্রতিষ্ঠা দিয়েছে; আর আমাদের মত পৃথিবীর ওপর তিতিবিরক্ত মানুষের জন্যে অন্ততঃ কিছুটা স্বস্তি পাবার অবকাশ এনে দিয়েছে, এতেই আমরা সুখী।

হ্যাঁ আমি রবিবারের কথা বলছি। গ্রহমণ্ডলী থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেও সূর্যের চারদিকে আটক, তবু পৃথিবী যেমন স্বাধীন তেমনি ছ'ছটা দিনের প্রাণান্তকর শাসনের মধ্যে হঠাৎ এই একটা শাসনমুক্ত অথচ আগামী দিনের ক্লেশকর চিন্তায় খণ্ডিত; এই স্বাধীন দিনটা একটা কামনা করবার মত জিনিস।

কেন কামনা করার জিনিস, তার জনে জনে নানা কারণ পেশ করবেন। অভিজাত, অনভিজাত, কেরানী, ব্যবসায়ী সবাইয়ের কাছে রবিবার কেন কাম্য তার পৃথক পৃথক যুক্তি থাকলেও, আসলে একটি কারণই সোজার। তা হল বিশ্রাম এই কথাটি। রবিবারের বিশ্রাম।

এইচ জে ওয়েলস বলে এক খ্যাত-নামা ভদ্রলোক বলেছিলেন, সময়টাকে বাঁধো, দেখবে পৃথিবীটাই তোমার হয়ে গেছে। আমরা যারা রবিবারের ভক্ত তাঁদের কাছে কিন্তু এহেন অমৃত ভাষণের কোন মূল্য নেই। আমাদের মতে সময়টাকে সময় বলে গ্রাহ্য না করার মধ্যেই পৃথিবীটাকে ভাল লাগার একমাত্র রাস্তা। সেই রাস্তায় ঘড়ির কাঁটা যেন আমার দৃষ্টিকে কখনোও সঙ্কুচিত করে না। জাতীয় সড়কের যেমন সামনে অনির্দিষ্টের ইসারা, ঘড়ির কাঁটারও তেমনি কোন অর্থ না থাকাই উচিত।

রবিবারের এই বিশেষ দিনটিতে তাই সাতটা আর নটার তফাৎ নেই। বিশেষ করে যদি গিন্নীর বাজার করে আনার তাগাদা উপেক্ষা করতে পারি। রবিবার এমন একটি মাত্র দিনই যে দিনে পা-ফেলার জায়গা হয় না বাজারের রাস্তায়, যে বাজারের রাস্তায় ষাঁড়েদের উপদ্রব রীতিমত আতঙ্ককর নয় শুধু, অক্ষত অবস্থায় শাক-পাতা বাড়ীতে বয়ে আনায় বেশ কিছু কসরৎ দরকার; সেই বাজারে দিনটার শুরু এমনিভাবে সারা করা নেহাৎ বোকামী ছাড়া আমি অন্য কিছু ভাবতে পারি না। তাই চাকরের সাহায্যে এ কাজ চালিয়ে নিতে গিয়ে, চাকরে বাজার করতে গিয়ে পয়সা সরায় কিন্তু রাজমিস্ত্রীদের কাজ শেষ হতে না শনিবার রাত্রেই বাজার সেরে রেখে আসছি।

তার বদলে যখন অনেকে বাজার করতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছেন, তখন আমি মাথার আর পায়ের তলায় দুটো বালিশ ঠেকিয়ে শরীরটাকে এবং মনটাকে বিশ্রাম দিচ্ছি। না ঘুমোন, অথচ ঘুম-ঘুম অবস্থায় ঘন্টা-তিনেক জানলার বাইরে নীল আকাশ (কাব্যি-রোগ আমার নেই সত্যি বলছি) বা নিদেনপক্ষে ঘরের মধ্যে চড়াই পাখীর হুটোপাটিতে (বাপ-ঠাকুর্দা ঘরের বাহারের জন্যে বর্গার খিলেন রেখে গেছেন যে!) চোখ রাখি।

নীচে এক গণ্ডা ছেলেমেয়ে, ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে দাদারা এবং বৌয়েরা সাংসারিক কর্তব্যবোধেই বাড়ী মাথায় করলেও, আমার এই সর্বাঙ্গীণ বিশ্রামে (মাথা থেকে পা পর্যন্ত; মনটা মাথায় কি বুকে কোথায় থাকে জানি না, সেই মনটা শুদ্ধু) কোন বাধা হয় না।

একবার কষ্ট করে উঠতে হয় খাওয়াটুকু সারতে। তারপর আবার বিশ্রাম। জানি রবিবারের দুপুরে ম্যাটিনী শোয়ে টিকিট পাবার জন্যে ছুটি-পাওয়া অনেকের ব্যস্ততার সীমা নেই। কিন্তু এমন একটা অবকাশকে কোন ব্যস্ততার মাঝেই হারিয়ে দিতে আমি রাজী নই। কেউ বিনি পয়সার আমন্ত্রণ জানালেও নয়।

অবশ্য গৃহিণী সরবেই আমাকে বিশ্বকুঁড়ে বলে গাল দেন (ছুটির দিনে তাকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাইনি বলে!), ছেলেমেয়েগুলো তাদের বাবা কেন অন্য বাবাদের মতো, প্রাণপুত্তলীদের চিড়িয়া-খানায় নিয়ে যাবার জন্যে গা-ও করে না ভেবে ভেবে কূল পায় না, তবু রবিবারে নিজের সৃষ্টি এই কিছু না করার জগতের অধীশ্বর হয়ে মনে হয় ভাগ্যি কোথায় আমরা বাস করছি সেই পৃথিবী-টাকে দেখবার মত রবিবার বলে একটা দিন আমাদের ছিল।

বলতে পারেন, বদ্ধ ঘরে কুয়ো ব্যাঙের মত পৃথিবী দেখার দেমাকট হাস্যকর নয় কি? ক্ষমা করবেন, রো ছ'দিন যে পৃথিবীটা দেখি, তার চে নতুন কিই বা আমরা দেখতে পে পারি এই অল্পক্ষণের ছুটিতে? তা বলে, পৃথিবী দেখব বলে আপনাদে মত বোটানিক্যাল গার্ডেনে বা 'জু' গিয়ে ভিড়ে গুঁতোগুঁতি করে অ পৃথিবী দেখতে চাই না। তার চে আমার বিছানাটাকে যদি রবিবারে দুপুরে কোন নির্জন ষ্টেশনের প্ল্যা ফর্ম ভেবে চোখ বুজে আনন্দ পাই, সেটাই আমার ভালো। কারণ তা বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় না, এবং শূ পকেট শূন্যেতর হবার ভয় থাকে না।

মুক্তামালা

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

দু মাস আগেও শ্রাবণ সংক্রান্তির মেলা কবে আসবে বলে বসে বসে দিন গুনেছে টগর।

আজ যেন অর দিন গোনার কাল শেষ হয়েছে। সে আকর্ষণ আর নেই মেলায়। দুপুরে যখন উদাস-করা মেঠো হাওয়া বয়ে আনে দক্ষিণের বসন্ত-সুরভি, যখন বৌদি আর গীতা ঘুমিয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে, একা তখন জেগে থাকে টগর কার কথা মনে করে। মুক্তোর মালা না সেই মানুষটি, যে তার জন্য মালার পসরা সাজিয়ে বসে থাকবে তার মনোহারী দোকানে।

তবু যাবে টগর মেলায়। তার ঘরের মানুষকে আসতে বলে দিয়েছে মেলার নাম ক'রে। সেও হয়ত আজই এসে যাবে এক সময়। এবারে আর সংগে বৌদি বা গীতা নয়। এবারে দুজনে যাবে মেলাতলায় বেড়াতে।

অথচ এই মেলাতেই টগর পর পর দু বছর গিয়েছে ওদের নিয়ে। প্রথম বার গিয়েছিল নিতান্তই বৌদির পাল্লায় পড়ে। সংসারের টুকিটাকি জিনিস চাই। মেলায় পাওয়া যায় সস্তায় আর নেওয়া যায় দেখে-শুনে।

বুড়ী মায়ের বায়না ছিল একখানা মুড়ি-ভাজা খোলার। বাড়ীর কাছে কুমোরবাড়ী। তা হবে না বুড়ীর। ওদের খোলা নাকি ভেঙে যায় তাড়াতাড়ি আর দামও দু পয়সা বেশী। দু-চারটে পয়সা সুবিধার জন্য দু মাইল বয়ে আনতে কোনদিন কষ্ট হয়নি মা'র। বাতে পংগু না হ'লে হয়ত সেও যেত ওদের সংগে।

প্রতিবারই মেলা বসে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে। এই দিনে পুজো হয় মা মনসার। মনসার ছোট্ট ভাঙা ঘরটায় সেদিন ফুল আর দুধ-গংগাজলের ঢেউ বয়ে যায়। দু-চার মাইলের মেয়ে-পুরুষ ভেঙে পড়ে এখানে। পুরুষের চেয়ে ভিড় বেশী মেয়েদের।

তবু এই ভিড় জেনেও গিয়েছিল সে বৌদি আর বোনের হাত ধরে। বোনের চাই পুতুল আর বৌদির চাই কুলো, পাখা, চাকা-বেলুন এই সব আর কি? এগুলো দু' চক্ষে দেখতে পারেনা টগর। কেবল বয়ে বেড়াও।

মুড়ি-ভাজা খোলার সংগে ঝাঁটা বাড়ুন কয়েকটা নিয়ে এতটা পথ যেতে যে কি কষ্ট তা টগরও বুঝেছে হাড়ে হাড়ে। বৌদিই বেশী বয়ে মরে। বাঁজা মেয়েমানুষ। তাই শক্তিও খুব। টগর দুবার বৌদির কষ্টের কথা ভেবে চেয়ে নিয়েছিল মুড়ির খোলা। পরদিন কাঁকালের ব্যথায় মরে যায় আর কি।

মা-বৌদির মত তার নিজেরও একটা শখ ছিল বৈকি। অন্য কিছুই নয় শুধু এক ছড়া মুক্তোর মালা। এর জন্যে টগর সমস্ত মেলাটা ঘুরেছিল বার বার। বৌদির বকুনি খেয়ে আর ঐ মুড়ির খোলার বোঝা বয়েও নিরস্ত হয়নি। খুঁজেছে আর খুঁজেছে। শহরে গিয়ে কোন কলেজের মেয়ের গলায় দেখে এসেছিল ঘিয়ে রং-এর মুক্তোর মালা। ভারী পছন্দ টগরের ঐ মালা। কি চমৎকার মানিয়েছিল মেয়েটিকে।

কাদায় কাদায় একাকার। মানুষের পায়ে পায়ে একহাঁটু কাদা। তবু কাপড় তুলে কাদা ভেঙে টগর গিয়ে কেবলই খুঁজেছে মনোহারী দোকান। কোথায় সে দোকান? হাড়ি-কলসীর দোকানের ভিড় একদিকে। অন্যদিকে আম, লেবু, নারকেল, ফুল গাছের দোকানের সারি। এ-ছাড়া মাছ ধরার সরঞ্জামে মেলাটা জমজমাট। বর্ষাকালের মেলা তাই ছিপ-সুতো-বঁড়শি বার বিক্রিতে বোঝাই। নয়ত

খাবারের দোকান। তেলেভাজা পাঁপড়ের গন্ধে মেলা ভরপুর। পোড়া ভেজাল তেলের গন্ধ পাওয়া যায় দূরে থেকে।

—ও বৌদি! তোমার মুড়ি-ভাজার খোলা কিনতেই যে বেলা কাবার! তাড়াতাড়ি কর না!

ছোট বোনটা কথা বলতে পারছে না। সে পাঁপড় ভাজার দোকানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে।

—দিদি, পাঁপড় কির্নাবনে? কেমন সোন্দর গন্ধ বেরিয়েছে।

—থাম মুখপুড়ি! কেবল খাই খাই!

খুঁজতে খুঁজতে শেষে ওরা হাজির হয়েছে মনোহারী দোকানের সুমুখে। ইতিমধ্যে গীতার পাঁপড় আর বৌদির ঝাঁটা মুড়ির খোলা কেনা সারা। বৌদির বেজায় খুশী। তার মনের মত জিনিস পেয়েছে সে।

দু দোকান ঘুরে শেষ বৌদির অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসে দাঁড়িয়েছে অন্য দোকানের সুমুখে। ছোট্ট দোকান, ভিড় কমে এসেছে বেলা পড়ে আসার জন্য।

—কি চাই? ছোকরা দোকানী উঠে এল ওদের কাছে।

জিনিস চাইবে কি? টগরী দেখছে দোকানীকে। সুন্দর মুখ ছেলেটার। সাধারন দোহারা চেহারার মধ্যেও একটা লাবণ্য আছে।

বৌদির কাঁখে মুড়ির খোলার বোঝা। বুঝি টন্-টন্ করছে কোমর।

—কি নেবে নাওনা ঠাকুরঝি! দেরী করছ কেন?

দোকানীর তৎপরতা ছিল বন্ধ। সেও এখন সচকিত।

—কি নেবে?

—পুঁথির মালা আছে?

—আছে।

পছন্দ হয়না টগরের কোনটাই। যে মালা সে দেখে এসেছিল শহরের মেয়ের গলায় তার মত কোনটাই নয়।

দোকানী একটি একটি করে পরম যত্নে তার বেসাতির সব কিছু খুঁজে এনেও মন পায়না টগরের—অন্য কিছু নেবে না?

—যা চাই তাই-ই নেই! আর কি নেব?

—কিছুই নেবে না! আলতা, সিঁদুর, টিপ, কুমকুম!

বৌদি ততক্ষণে তার মুড়ির খোলা নামিয়ে রেখে সহজ হয়েছে।

মুখ টিপে হেসে বলে—সিঁদুর নাও ঠাকুরঝি! আজ না হোক দুদিন পরেও তো লাগবে।

দোকানের সিঁদুরের রং লাগে বুঝি ঠাকুরঝির গালে। দোকানীর দিকে চোখ তুলেই লজ্জায় নামিয়ে নেয় দৃষ্টি। দোকানীও হাসছে মুখ টিপে।

টগর অপ্রস্তুত হ'য়ে আবার একগাছা পুঁতির মালা তুলে নেয় হাতে। এর চেয়ে ভাল মালা আনতে পার না? মক্তোর মালা?

—ভাল মালা বিক্রী হয়না তো এসব মেলায় তাই আনিনি।

দোকানটার দিকে ভাল করে চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় টগর। সত্যিই দোকানের মাল কিছুই বিক্রী হয়নি মনে হয়। পাশের দোকানগুলো বড়। তাদের জিনিস অনেক খালি হয়েছে। শুধু এর দোকানে ভরা মাল।

—এ মালাটায় কিন্তু মানাবে ভাল। এটা তো খারাপ নয়? মালাটা তুলে দিয়েছে ওর হাতে দোকানী।

বুঝি মায়া হয় টগরের, বেচারীর বেচা-কেনা হয়নি ভাল। কোথা থেকে এসেছে দুটো পয়সার জন্য। ফিরে যাবে হতাশ হ'য়ে।

—নাও না ঠাকুরঝি : কি নেবে নাও তাড়াতাড়ি।

কি নেবে বোঝেনা টগর। এ মালা সে নিতে পারবে না। অনেক কষ্টে মায়ের কাছে আদায় করেছে মালার পয়সা। যা তা কিনে নিলে পরে আর পারবে না কিনতে। তাই ইতস্ততঃ করে।

দোকানী কিন্তু গলদঘর্ম। তার সারা দোকানের জিনিস এনে হাজির করেছে টগরের সুমুখে। একটির পর একটি জিনিস তুলে ধরছে সে। কোনটা পছন্দ করবে খরিদ্দার। অধীর আগ্রহে চেয়ে চেয়ে দেখছে টগরের মুখের দিকে। কোন জিনিসটা পেয়ে মুখে ফুটছে তার হাসি।

কিন্তু এ সে মেয়ে নয়। পয়সা মাত্র কটা। যা দেখাচ্ছে তার দোকান উজাড় করে তা সে কিনবে কি দিয়ে।

বৌদি বিরক্ত আর অন্যমনস্ক। একটা কুমকুমের শিশি তুলে দিয়েছে দোকানী টগরের হাতে। করুণ মিনতিতে তার আঁখিদুটি ছলছল। মায়া লাগে টগরের।

একটা কুমকুম কিনে চলে যায় ওরা। মেলার বাইরে এসে বসে। যার যা জিনিস গুছিয়ে নেয়। খিদে পেয়েছে। এবারে কিছু মুখে দিয়ে চলতে হবে দু মাইল পথ। কিছু জিলিপি আর পাঁপড় খাওয়ার পর টগর উঠে পড়ে বলে—বস বৌদি, আমি আর একবার দোকান থেকে ঘুরে আসি।

—কি কিনবে! তোমার পছন্দসই জিনস তো নেই!

—দেখি! তোমাদের তো হয়েছে।

—ও ঠাকুরঝি! বড় বড় চোখ করে বলে এবারে বৌদি : মানুষটাকে পছন্দ হয়নি তো?

—যাঃ, তবে যাব না! যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে ও।

—যাও! যাও! ঠাট্টা করলাম তাও বুঝি বোঝনা।

দোকানী নিরঞ্জন বুঝি খরিদ্দারই খুঁজছিল এতক্ষণ। টগরকে আবার আসতে দেখে উৎসুক হ'য়ে ওঠে। অন্য একজন এক কৌটা সিঁদুর কিনেছে। টগর আবার কি নেবে।

যদি কিছু নাও নেয় তবু খুশী ওকে দেখে নিরঞ্জন। —এসো, কি নেবে বল?

—কি আবার নেব। কি আছে তোমার দোকানে?

আবার ঐ মালাগুলোই হাতে নিয়ে দেখে টগর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

—একটাও কি ভাল জিনিস রাখতে নেই! দেখি অন্য দোকানে যাই!

—তুমি বস। আমি দেখছি।

নিজে দোকানদার ঠকবে না। টগরকে যদি ঠকিয়ে নেয়। তা ছাড়া দুটো পয়সা লাভ করতে হয় তো করবে সেই-ই।

—তুমি আমার দোকান পাহারা দাও। দুজনে চোখাচোখি হতে হাসে।

দুগাছা মালা নিয়ে আসে নিরঞ্জন কিন্তু তার একটাও পছন্দ নয় টগরের। সে মালাই নয়।

অনেক আগ্রহে ওর মুখের দিকে চেয়েছিল নিরঞ্জন যদি খুশীর ধমকে কালো চোখের তারাগুলো নেচে ওঠে। না ভ্রূ দুটো আগের মতই কুঁচকে উঠেছে। ফুলের পাঁপড়ির মত পাতলা ঠোঁটটা অবহেলায় উল্টে যায় বুঝি।

মেলা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। সবই দূরের লোক। সন্ধ্যা লাগবার আগেই

ফিরেছে বাড়ীর দিকে। দু-এক দোকানে কাছের লোকদের আনাগোনা।

—আর কি আছে তোমার দোকানে?

—সবই তো দেখিয়েছি, বাকী চুড়ি।

চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে টগরের। ঠিক হয়েছে চুড়িই পরবে কিন্তু পয়সা। যদি দাম বেশী লাগে। তার কাছে তো তিন আনা পয়সা মাত্র। তাই ইতস্ততঃ করে। দোকানী নিরঞ্জন বুঝি ক্লান্ত আর বিষণ্ণ। এ কেমন মেয়ে। কেবল দেখে সব, কিনতে চায় না কিছু। চুড়ি দেখেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে না।

টগর একবার আঁচলের খুঁট হাতড়ায় আর চুড়ির দিকে চায় আড়চোখে।

নিরঞ্জন বুঝতে পারে পয়সার জন্য টগরের দোমনা। গ্রাহ্য করে না। ক্ষতি তো হয়েছেই তার। তাই তাড়াতাড়ি চুড়ির বাক্স খুলে প্রলুব্ধ করে টগরকে।

টগরের কেনা না কেনার দ্বন্দ্বের অবসান হয় এইভাবে। ঝুঁকে পড়ে চুড়ির ওপর। রং-বেরং-এর নানা রকম চুড়ি। চাকচিক্য আর ঔজ্জ্বল্যে ঝকমকে।

বোন গীতার মত বয়স কমে যায় টগরের।

—দেখি দেখি—সত্যি কেমন সোন্দর এগুলো!

একটার পর একটা হাতে তুলে নেয়। কাঁচের চুড়ির টংটাং আওয়াজ ওঠে।

দুজোড়া চুড়ি বেছে নেয় টগর।

—কত দাম!

—দামের কথা থাক, পছন্দ হয়েছে তোমার!

ঘাড় নাড়ে ও।

আরও একজোড়া ওর হাতে তুলে দেয় দোকানী।

—না, না, আর নেব না!

—নাও না, আমি দিচ্ছি ভাল জিনিস!

এবারে বসে পড়েছে টগর। তার নিটোল হাত দুটি বাড়িয়ে ধরেছে দোকানীর সম্মুখে।

—পরিয়ে দাও!

নিরঞ্জনের নিজের ইচ্ছা ছিল ঐ সুন্দর আর নরম হাত দুটিতে সে পরিয়ে দেবে কাঁচের কঙ্কন একজোড়া। মকর-মুখো কঙ্কনের মুখোমুখি দুটি মকরের মুখ। ঠিক তেমনি করে দুটি মুখ সামনা-সামনি ঝুঁকে পড়েছে। মুখোমুখি বসে দুজনে। দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ শুনছে পরস্পর।

আত্মসমর্পণ করেছে যেন টগর। হাতটাকে নিয়ে যেমন খুশি খেলা করছে দোকানী নিরঞ্জন। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চুড়ি পরাচ্ছে না দেখছে বোঝা যায় না। যেন নরম কাদার তৈরী একখানা হাত।

এক একবার ছটফট করছে টগর। মুখ ঘুরিয়ে দেখছে আর ভাবছে বৌদির কথা। বড় দেরী হয়ে গেল। তাড়া দিতে ইচ্ছা। কিন্তু নিপুণ শিল্পীর মত কোন বাধা না দিয়ে সন্তর্পণে যেভাবে চুড়ি পরাচ্ছে নিরঞ্জন তাতে যেন আরাম পাচ্ছে টগর। ধীরে ধীরে পরম যত্নে হাত বুলাচ্ছে আর তার মৃদু স্পর্শে শির-শির করছে সারা দেহ।

—হোলো? তাড়াতাড়ি কর না একটু!

মুখ না তুলেই জবাব দেয় দোকানীঃ এ সব কি তাড়াতাড়ির জিনিস!

—না, না, আমার দেরী হয়ে গেল যে, বাড়ী যেতে হবে না! বৌদি বকবে।

এক হাত ছেড়ে অন্য হাত টেনে নেয় নিরঞ্জন। যেন এ হাতের মালিক সাময়িক-ভাবে সেই-ই। সে কোন খরিদ্দারকে চুড়ি পরাচ্ছে না, পরাচ্ছে এমন একজনকে যার ওপর তার দাবী অনেকখানি। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কোন কথা নেই। সে যেন পুতুল, তাকে মনের মাধুরী মিশিয়ে সে সাজিয়ে চলেছে। এ সময় অন্য কোন খরিদ্দার এলে যে সে তার দিকে মন দেবে এমন সম্ভাবনা নেই একটুও।

ওরা চুড়ি পরায় ব্যস্ত। কোন সময় বৌদি এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে জানে না কেউ

ওমা! আমরা খুঁজে সারা হচ্ছি! মেয়ের এদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে চুড়ি পরা হচ্ছে!

যেন চোর ধরা পড়েছে এমনি মুখের ভাব টগরের।

—তা এতক্ষণ ধরে চুড়ি পরতে লাগেঃ আজ আর বুঝি বাড়ীর কথা মনে নেই!

একটু নড়ে-চড়ে বসতে চায় টগর। নিরঞ্জন 'উঁহু' শব্দ করে আবার মন দিয়েছে চুড়ি পরাতে।

—এই দেখ না বৌদি! তাড়াতাড়ি করতে বলছিঃ আটকে যায় বাকী কথাটা। একটু থেমে বলে—দোকানদারের বা কি দোষ! আমার হাতের মুঠো এত শক্ত বুঝলে বৌদি! এবারে কৃত্রিম রাগে চোখ রাঙিয়ে ঘন ঘন ঘাড় নাড়ে বৌদি—হুঁ, তোমার হাত বড় শক্ত নয় ঠাকুরঝি! তাই বুঝি নরম হাতের লোক নিয়ে এতক্ষণ ধরে চুড়ি পরাচ্ছিলে?

আর বুঝি বসে থাকা যায় না। লজ্জা শুধু তাকেই স্পর্শ করে না দোকানীকেই বুঝি ছুঁয়ে যায় আবীর রঙের আভাসে।

—চল বৌদি হয়ে গিয়েছে! কত দাম?

কি বলবে ভেবে পায় না দোকানী। বৌদি না থাকলে সে এক পয়সাও হয়ত

শিশিরের দিন ফটো : সুকুমার রায়

[illegible] দিতে পারত না। এখন তো না দিলেই নয়। তাই বলে—তিন আনা।

ওমা! এত সস্তা এই কঙ্কন আর চুড়ির দাম! সাঁঝ না লাগলে আমিও পরতাম!

—আর আমি—গীতাও সুরে সুর মেলায় বৌদির।

এবার ফেরার পালা। উঠে পড়েছে টগর। বৌদি শুরু করেছে হাঁটতে মুড়ির খোলা কাঁধে নিয়ে। সবার পিছনে টগর।

—আসছেবারে আমার ভাল মুক্তোর মালা চাই! আনবে তো!

—আনব! যেখানেই থাকি তোমার জন্য দোকান নিয়ে আসব আর চমৎকার মালা আনব!

—ঠিক তো : মনে থাকবে?

—থাকবে! তারপর দু পা এগিয়ে এসে গলার সুর নামিয়ে বল্লে—তোমার কথা কি ভুলতে পারি?

হাসিমুখে বিদায় নেয় টগর। পায়ে পায়ে পথ চলে আর চায় ফিরে ফিরে। পা যেন চলে না। যে মেলায় পথ চলা ছিল দুষ্কর, মেয়েপুরুষের গাদাগাদি, কোন ভেদাভেদ ছিল না, মেয়েদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে গেলেও উপায় ছিল না গায়ে গা না দিয়ে চলার, সেই মেলাতলা ফাঁকা। কেবল দোকানীরা বসে দোকানে। বাতি জেলেছে অনেকেই। গ্রামের কুকুরেরা এ'টো রসলাগা শালপাতা চাটছে একমনে। গ্রাম থেকে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে গ্রাম্য বধূদের ঘরে ঘরে শংখধ্বনির আওয়াজ আসছে ভেসে।

তবু পথ চলতে কে যেন টেনেছে পিছন দিকে।

—কি হোলো গো ঠাকুরঝি! না হয় থেকেই যাও আজকের মত! কাল মালা বদল করেই না হয় বাড়ী যেও—খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ে বৌদি।

অনেক দূরে গিয়েও দেখে দোকানী চেয়েই আছে তার যাওয়া পথের দিকে।

এবারে মেলার আগে থেকেই বায়না ধরেছে টগর মেলায় যাবার। গতবারেও মুড়ির খোলা বইবার ভয়ে প্রথমে রাজী হয়নি ও। এবারে অন্য কোন কথা নেই তার। শুধু মনে আছে একটি কথা। পুঁথির মালা আনবে দোকানী।

মেলার দিনে সেজেগুজে টগর বৌদিকে আর গীতাকে নিয়ে মেলায় হাজির। মেলায় ঢুকেই ব্রহ্মাণীর পুজো দেওয়ার ব্যাপার। সেটা সারতেই হয় প্রথমে। তারপর কেনাকাটা। বৌদি আর বুড়ী মায়ের বায়না। সেগুলো মেলায় ঢুকেই গেলে। কিন্তু তারটা।

—কই বৌদি, হোলো না তোমার?

—দাঁড়াও বাপু : অত তাড়া কিসের! দেখেশুনে নিতে হবে না। মাটির জিনিস তো!

দেরী সয় না টগরের। মনোহারী দোকান মেলার শেষ প্রান্তে। এইটুকু যেতেই সময় লাগবে আধ ঘণ্টা।

এবারে আবার মায়ের বায়না বেশী। টুকিটাকি কত কি। বৌদি কেনে আর টগর ছটফট করে।

বৌদির কেনা শেষ হলো তো শুরু গীতার। সে এবার নিজেই পয়সা জমিয়ে এসেছে মেলায়। তার পুতুল। এ দোকান ও দোকান। পছন্দ আর হয় না। টগর তাড়া দেয় ওকে। যা নেবার তাড়াতাড়ি নে না গীতা।

—অমন করছ কেন ঠাকুরঝি! বেচারী ছেলেমানুষ বলে কি পছন্দ অপছন্দ নেই!

সকলের সব কেনা শেষ করে এবার চলে টগর তার মনোহারী দোকানের পট্টীতে। তাড়াতাড়ি করে কিন্তু উপায় নেই।

পিছল পথ। সকালে বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা। তাছাড়া লোকে লোকারণ্য। সকলেই যেন তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে।

অবশেষে অনেক কসরত করে দুবার পিছলে পড়তে পড়তে সামলে শাড়ীতে কাদা লাগিয়ে যখন হাজির হলো মনোহারী দোকানের পট্টীতে তখন এই-দিকটায় ভিড় কম। কিন্তু কই! কোথায় গেল তার দোকান। কোথায় বসেছে সে।

তন্ন তন্ন করে খোঁজে টগর। প্রত্যেকটা দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে খোঁজে টগর তাকেই।

—এই যে মা কি নেবে?

—কি চাই খুকি?

—দেখুন না একবার।

কে দেখবে? টগরের দৃষ্টি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রত্যেকটি দোকানদারের মুখের উপর দিয়ে। কোথায় তার সেই

—আচ্ছা, গেল বছরে যে লোকটা এসেছিল দোকান নিয়ে সে আসেনি?

—কে নিরঞ্জন? দোকানীর মুখে দেখা দেয় বিদ্রূপের হাসি। ভ্রূ কুঁচকে বলে—তাকে আর দোকান করতে হবে না। সে এখন মুনিষ খাটছে মাঠে।

ভাল লাগে না মেলার ওই হাসি উৎসবকে। মনে হয় লোকটাকে যদি একবার সে পেত জিজ্ঞাসা করত কেমন করে উঠে গেল তার দোকান। আর কোনদিন সে আসবে না দোকান নিয়ে? আনবে না তার মুক্তার মালা? সে যে কথা দিয়েছিল মুক্তার মালা আনবে তার জন্য।

ধীরে ধীরে বাড়ী চলেছে। কোন আকর্ষণ নেই তার আর মেলায়।

—চোর! চোর! মার শালাকে!

বেজায় ভিড় জমেছে চোরকে ঘিরে। মেলার অর্ধেক লোক ভেঙে পড়েছে সেখানে।

—চোর ধরা পড়েছে! শালা যা মার খেয়েছে সাংঘাতিক।

—কি চুরি করেছে গো?

—মেয়েছেলের গহনা নিয়ে পালাচ্ছিল।

চোরের কথা বলারও ক্ষমতা নেই। মারের চোটে চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। জামা কাপড় ছিঁড়ে কুটি কুটি। রক্ত গড়াচ্ছে ঠোঁটের পাশ দিয়ে অল্প অল্প।

যার গলার হার ছিঁড়ে নিয়েছে সেই মেয়েটি এসে হাজির। চোরের পকেট হাতড়িয়ে বার হয় এক ছড়া মুক্তোর মালা!

—এটা কি আপনার?

—না তো ঃ মেয়েটি ঘাড় নাড়ে।

—তবে—

—সে বোধ হয় অন্য লোক ঃ চোর চোর পালাবার সময় 'চোর চোর' করতে করতে পালিয়েছে। এ বেচারী সামনে পড়ে চোর বনে গিয়েছে।

—ছিঃ ছিঃ ঃ ভারী অন্যায়! ঠিক হয়নি এমন করে একটা ভাল লোককে মারা।

"তোমার কথা কি ভুলতে পারি?"

[চে]না মুখ। যাকে দেখবে বলে সে ছুটে [আ]সছে দলবলকে পিছনে ফেলে দদ্রান্তের মত।

মনোহারী পট্টীর সব কটা দোকান [দে]খা সারা। কোথাও নেই নিরঞ্জন। গত [বছ]রে সে যে যায়গায় দোকান পেতেছিল [সে]খানে নতুন লোক বসেছে দোকান [নি]য়ে।

লোকটার নির্মম বিদ্রূপে জ্বলে ওঠে টগর। কিন্তু পরক্ষণেই নিরঞ্জনের কথা মনে করে মুষড়ে পড়ে দুঃখে আর বেদনায়। অমন সুন্দর চেহারার মানুষটা রোদে পুড়ে জলে ভিজে কাজ করছে হয়ত এখন মাঠে।

যে উৎসাহ নিয়ে মেলায় এসেছিল টগর তার দ্বিগুণ অবসাদে ভেঙে পড়ে।

—না, মশাই, এই চোর! দলের লোকের হাত দিয়ে পাচার করে দিয়েছে মাল।

—যাঃ! তাই কি হয়।

—তবে এ মুক্তোর মালা কার?

ভিড় দেখে কৌতূহলী হয়ে উঁকি মারে টগর। চমকে ওঠে হঠাৎ চোর

দেখে। এ যে তার দোকানী। চেনাই যায় না মানুষটাকে।

—মালা কোথায় পেয়েছ কত্তা ঃ কার মালা?

—আমার? ভিড় ঠেলে একেবারে চলে গিয়েছে টগর নিরঞ্জনের কাছে। তারপর হঠাৎ তার হাত ধরে টানতে টানতে ভিড় ঠেলে বাইরে এসেছে ওকে নিয়ে। ভিড়ের চাপে ওর অত সাধের মুক্তোর মালা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।

—আমার মালা? মালা কি হলো? এতক্ষণ মার খেয়েও কথা বলেনি নিরঞ্জন। হতভম্ব হয়ে সব সহ্য করেছে। সহ্য করেছে টগরকে এই মেলায় খুঁজে মুক্তোর মালা দিতে পারবে এই ভরসায়।

এখন মালা ছিঁড়ে যাওয়ায় বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে ও।

ততক্ষণে টগর ওকে নিয়ে এসেছে মেলার বাইরে ফাঁকা মাঠে। গীতার কেনা খেলার ভাঁড়ে করে জল এনে ওর চোখেমুখে দিয়েছে ছিটিয়ে। হাওয়া করেছে বাড়ীর জন্য কেনা পাখা দিয়ে।

—জানো! আমি অনেক কষ্টে তোমার জন্য মালাটা কিনেছিলাম! এত মার খেয়েও নিরঞ্জনের চোখে জল ঝরেনি, এবারে মরদ ব্যাটাছেলে কেঁদে ফেলে।

—ছিঃ, কাঁদতে নেই। তুমি আবার দোকান কর। সামনের মেলায় দোকান নিয়ে এসো আর আমার জন্যে নিয়ে এসো এর চেয়েও ভাল মুক্তোর মালা।

—তুমি আসবে আবার ও মেলায়?

—আসবো! মালা না পাওয়া পর্যন্ত আমি আসবো! তুমি দোকান সাজিয়ে রাখবে আমার জন্য।

টগরের উৎসাহে সেইদিনই খাড়া হয়ে দাঁড়ায় নিরঞ্জন। এক বছরের মধ্যে সে খেটেখুটে আবার দোকান নিয়ে আসে পরের মেলায়। টগর অপেক্ষা করেছিল এক বছর ধরে মুক্তোর মালার জন্য।

মেলায় এসেছে টগর। খুঁজে বার করেছে নিরঞ্জনের দোকান। বেশ চমৎকার সাজিয়েছে দোকানটা। আগের চেয়েও ভাল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখ।

—এসো! এসো!

এক মুখ হাসি নিয়ে নিরঞ্জন সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

—কই আমার মালা কই? বলেই নিরঞ্জনের দেওয়ার অপেক্ষা না করেই পুঁথির মালা ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেয়ে যায় চমৎকার এক মুক্তার মালা সযত্নে আলাদা এক কৌটায় রাখা।

এতক্ষণে চোখ পড়েনি নিরঞ্জনের টগরের দিকে। হঠাৎ ওর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। এ সে টগর নয় তো। মাথায় তার ঘোমটা, গা ভরা সোনার গহনা, পরিপাটী করে বাঁধা খোঁপা, মুখের হাসিতে বাঁধভাঙা খুশীর বন্যা। কপালে কাঁচপোকার বদলে সিঁদুরের টিপ। সিঁথিতে জ্বল জ্বল করছে রক্তের রং। সঙ্গে না আছে বৌদি না বোন। এতক্ষণ পিছিয়ে থাকা সুবেশ যুবকটা দাঁড়িয়েছে পাশে এসে।

—দেখ, কেমন চমৎকার মুক্তোর মালাটা!

নিরঞ্জনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক বছরের আগের মেলায় আসা টগরকে। নিরাভরণ দেহ, আধ ময়লা কাপড় পরনে, তেল কুচকুচে মুখ। তার মার খাওয়ার পর ব্যথা আর সহানুভূতিতে ছল ছল দুটি করুণ চোখ, যে চোখে ছিল বরাভয়।

না, একে চেনে না নিরঞ্জন। এ ষড়ৈশ্বর্যময়ী হাস্যে লাস্যে ভরা স্বামী-সোহাগিনী নারীকে চেনে না সে তো।

—দেখি মালাটা? নিরঞ্জন হাত বাড়িয়েছে।

টগর এগিয়ে দেয় মালাটা।

—দেখুন আমি ভারী দুঃখিত, এ মালাটা অনেক আগে বিক্রী হয়ে গিয়েছে আমি ভুলে বিক্রীর জায়গায় রেখে-ছিলাম এটা!

—সে কি? এগিয়ে আসে যুবকটি। কত দাম চান বলুন না?

—না, এটা দাম দিলেও পাবেন না।

—ওঃ! বুঝেছি! বিশেষ কারও জন্য, তাই বলুন? ভদ্রলোক নিজের রসিকতায় হেসে ওঠেন হো হো করে।

কিন্তু তার পাশের যে মানুষটি এতক্ষণ হাসি আর উচ্ছলতায় খুশীর ফোয়ারা ছুটিয়েছিল সে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। তার সুর্মা টানা চোখের কোণটা চিক্ চিক্ করে ওঠে অকারণেই।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৩য় বর্ষ

৩য় খণ্ড

২৮শ সংখ্যা

মূল্য

৪০ নয়া পয়সা

শুক্রবার, ২৮শে কার্তিক, ১৩৭০

Friday, 15th November, 1963 40 Naya Paise.

সূচীপত্র

সাপ্তাহিকী

।। কংগ্রেসের বৈঠক ।।

৩রা ও ৪ঠা নভেম্বর জয়পুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশন হয়ে গেছে এবং এই অধিবেশনে কমিটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও গ্রহণ করেছেন। প্রথম দিনেই 'কামরাজ পরিকল্পনা' ও তার বাস্তব রূপায়ণ সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিবরণ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় আর সেই সঙ্গে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ-আই-সি-সি'র আলোচ্য বৈঠকে আন্তর্জাতিক ব্যাপার সম্পর্কেও একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছে: জোটনিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে ভারত এখনও আস্থাশীল। তবে চীন ও পাকিস্তানের দিক থেকে কোন আক্রমণ ঘটলে তা প্রতিহত করার জন্য জাতির সম্যক প্রস্তুতি চাই।

অধিবেশনের প্রাক্কালে জয়পুরের বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন—গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ভারতের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অভিমুখে ধীরে ধীরে হলেও ভারতবাসী সুনির্দিষ্টভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। ৩রা নভেম্বর অধিবেশনে কংগ্রেস-সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়াও ঘোষণা: কংগ্রেসের লক্ষ্য দেশে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে দলের প্রতি কংগ্রেসসেবীদের অকুণ্ঠ নিষ্ঠা থাকতে হবে।

।। মৎস্য পরিস্থিতি ।।

খন্দোর পর মাছের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৎপর হয়ে উঠেছেন। মাছের সর্বোচ্চ দর (খুচরা) বেঁধে দিয়ে একটি আদেশ বলবৎ করা হয়েছে গত ১লা নভেম্বর। এই আদেশ অনুসারে কাটা মাছ কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলসমূহের বাজারে কিলো প্রতি চার টাকার বেশি বিক্রি করা চলবে না। রাজ্যের মৎস্য পরিস্থিতি নিয়ে ৩১শে অক্টোবর মৎস্যমন্ত্রী মিঃ ফজলুর রহমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন এবং ঐ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই আদেশটি জারী হয়।

সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় মাছের বাজারে রকমারী প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কলকাতার বাজারগুলিতে হঠাৎ মাছের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সংবাদে প্রকাশ, মাছের পাইকারী ব্যবসায়ী ও সাধারণ বিক্রেতাদের মধ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বানচাল করার জন্য একটা চক্রান্ত চলেছে। সরকারও অবশ্য ঘোষণা করেছেন—মাছের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণাদেশ বানচালের অপচেষ্টা হলে শুধু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, ব্যবসায়ের লাইসেন্সও বাতিল করা হবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় নির্দেশলঙ্ঘনকারী কয়েকজন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানা যায়।

।। কায়রণ প্রসঙ্গে তদন্ত ।।

দিল্লী থেকে গত ১লা নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে: পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রণের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য সরকার ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশের ওপর ভারার্পণ করেছেন। তদন্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সুপারিশ অনুসারে সর্দার কায়রণকে তদন্তের সময় মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করতে হবে না। সরকার গঠিত আলোচ্য তদন্ত কমিশনকে (একজন সদস্য সমন্বিত) ১৯৬৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

।। ভারতের জনসংখ্যা ।।

নয়াদিল্লীর ৫ই নভেম্বরের সংবাদ: ভারতের মোট জনসংখ্যার বিচারে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুদের আনুপাতিক হার এক দশকের (১৯৫১—৬১) মধ্যে হ্রাস পেয়েছে এবং শক্তিশালী ধর্মান্তর আন্দোলনের ফলে বৌদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তথ্যটি প্রকাশ পেয়েছে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্তৃক সদ্য প্রচারিত 'ধর্ম' সম্পর্কে ১৯৬১ সালের আদমসুমারী পুস্তিকায়। আলোচ্য দশ বছরে প্রায় ১১ লক্ষ মুসলমান পাকিস্থান থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে বলেও ঐ পুস্তকে তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। আদমসুমারী অনুসারে ১৯৬১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৭১।

।। রাষ্ট্রপতির সফর ।।

নেপালে চারদিন সফর করার উদ্দেশ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন গত ৪ঠা নভেম্বর বিমানযোগে কাঠমণ্ডুয় উপস্থিত হন। বিমানবন্দরে একুশটি তোপধ্বনি দ্বারা তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয়। প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে রাজা মহেন্দ্র ভারতীয় রাষ্ট্রপতিকে মাল্যভূষিত করেন।

ঐদিন নেপালের রাজা ও রাণী ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে এক ভোজসভায় আপ্যায়ন করেন এবং সেখানে রাজা মহেন্দ্র ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, নেপাল ও ভারতের ক্রমবর্ধমান মৈত্রী উভয় দেশের জনসাধারণের সহায়তায় আরও দৃঢ় হবে এই বিষয়ে তিনি আস্থাবান। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন ঘোষণা করেন—নেপাল ও ভারত দুইটি দেশেরই লক্ষ্য এক। সুতরাং উভয়ের মৈত্রীর বন্ধন অটুট থাকবেই। ৫ই নভেম্বর নেপাল-ভারত মৈত্রী সঙ্ঘের আয়োজিত সম্বর্ধনা-সভাতেও ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধানের কণ্ঠে একই আশার বাণী ধ্বনিত হয়।

।। দঃ ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গ ।।

সিঙ্গাপুর থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রথম জানতে পারা যায় যে, গত ১লা নভেম্বর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে—প্রেসিডেন্ট নো দিন দিয়েম গদীচ্যুত হয়েছেন আর সৈন্যবাহিনী প্রাক্তন চীফ অব ষ্টাফ জেনারেল ডাং ভ্যানের নেতৃত্বে ক্ষমতাদখল করেছে। সায়গনের পরবর্তী সংবাদ: প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও তাঁর ভ্রাতা নু একটি গির্জায় বন্দী হওয়ার পর আত্মহত্যা করেছেন। অন্য সূত্রে এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করা হয় এবং বলা হয় যে, একখানি সাঁজোয়া-গাড়ীতে বাইরে থেকে সায়গনে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। লস এঞ্জেলেসের সংবাদ অনুসারে শ্রীমতী নু (দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বৌদ্ধ নির্যাতনের নায়িকা ও প্রেঃ দিয়েমের ভ্রাতৃবধূ) একে নৃশংস হত্যাকাণ্ড বলেই মনে করেন।

ওদিকে সায়গনের ৫ই নভেম্বর সংবাদ: ক্ষমতাসীন বিপ্লবী পরিষদের উদ্যোগে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছে এবং রাজ্যে একটি অস্থায়ী সংবিধানও চালু হয়েছে। অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নুয়েন নক থু।

।। একটি শুভবিবাহ ।।

মস্কোয় গত ৩রা নভেম্বর বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী ভেলেন্তিনা তেরেস্কোভার (২৬) সঙ্গে সোভিয়েট অপর মহাকাশচারী মেজর নিকোলায়েভের (৩৩) শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়েছে। রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নব দম্পতিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রথম মহাকাশচারী গাগারিন দম্পতিকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছেন: আমার নিশ্চিত ধারণা—এঁরাই হবেন সবচেয়ে সুখী পরিবার।

নোবেল পুরস্কার সংবাদ

১৯৬৩ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হান্স ডি জেনসেন, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউজিন পি উইনগার ও কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সারিয়াজিও পার্ট মেয়ার—এই তিনজন।

১৯৬৩ সালে রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পশ্চিম জার্মানীর অধ্যাপক কার্ল জিয়েগলার ও ইতালির অধ্যাপক জিউলিও নাত্তাকে।

সম্পাদকীয়

জয়পুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে অনেক সার কথা বলা হইয়াছে। নৈতিক অবনতি রোধ না করিতে পারিলে, মুনাফাবাজী দূরে না করিতে পারিলে দেশের লোকের অবস্থা উন্নত হইতে পারে না এবং এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বৃথা হইবে একথা অনেকে অনেকভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু কার্যতঃ ঐসব তত্ত্বকথা কতটা বাস্তবের রূপ লইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত।

এই দুর্নীতি ও মুনাফাবাজীর শিকার যদি কেহ হইয়া থাকে তবে সে অভাগা বাঙালী। এবং ইহার প্রতিকার কঠোর হস্তে করা হইবে একথা মাঝে মাঝে শোনা যায় কিন্তু সেই মধুর বাণী বাতাসে মিলাইয়া যাইবার পর তাহার প্রতিক্রিয়া কিছু কোথায়ও দেখা যায় না। অন্ন, বস্ত্র, খাদ্য, আশ্রয় এ সবকিছু হইতেই বাংলার সন্তানগণ বঞ্চিত হইয়া চলিয়াছে। এবং এই লুণ্ঠন ও প্রতারণা যাহারা চালাইতেছে তাহাদের সঙ্গে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মচারীর যোগ না থাকিলে তাহারা এইরূপ নিশ্চিন্ত মনে দেশের অসহায় লোকের রক্তশোষণ করিতে পারিত না। অন্নের কথাই দেখা যাউক। কলিকাতার এক দৈনিকের সংবাদে ছিলঃ—

৮ই নভেম্বর—আজ জাতীয় পরিষদে বক্তৃতাকালে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র উড়িষ্যা ও পঃ বঙ্গের মধ্যে সরকারী পর্যায়ে চাউল ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, উড়িষ্যা এখনই পঃ বঙ্গকে মণ প্রতি ১৬।১৭ টাকা দরে চাউল সরবরাহ করিতে পারে। বর্তমানে ব্যবসায়ীরা উড়িষ্যা হইতে ১৬।১৭ টাকা দরে চাউল কিনিয়া পঃ বঙ্গে ৩২, টাকা দরে বিক্রয় করিতেছে। সরকারী পর্যায়ে ব্যবসায় হইলে মানুষের ক্ষুধাকে বেসাতি করিয়া যাহারা টাকা মজুত করিতেছে তাহাদের বিলোপ ঘটিবে এবং দরিদ্র ক্রেতাদের দুর্গতির লাঘব হইবে।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক শ্রীনীলরতন ধর কয়দিন পূর্বে বাঙালীর খাদ্যবিচার লইয়া কতকগুলি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে যেখানে একজন বয়স্থ লোকের দৈনিক ২৮০০ ক্যালরির খাদ্য প্রয়োজন সেখানে এদেশের লোক পায় বড়জোর ১৬০০ ক্যালরি। এর মূল কারণ তিনি ঠিকই বলেন যে এদেশের লোক প্রজনন করিয়া চলিয়াছে ব্যাক্টেরিয়ার মত কিন্তু খাদ্য উৎপাদন মোটেই বৃদ্ধি পাইতেছে না। সেই সঙ্গেই তিনি এদেশের লোককে অনুযোগ দিয়া বলেন যে পুষ্টিকর খাদ্যের দিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত, সুস্বাদু বা কোনও বিশেষ রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিলে দেহ পুষ্টি না পাইতে পারে। ইহা খুবই সত্য কথা কিন্তু সেই পুষ্টিকর খাদ্যই বা পাওয়া যায় কোথায়।

বাঙালীর পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে মাছই প্রধান এবং রোগের প্রতিরক্ষার কাজেও এই খাদ্য শ্রেষ্ঠ। সেই মাছের বাজারে লুটপাট ও প্রবঞ্চনার কাহিনীও সেই দৈনিকেই ছিল যথা ঃ—

কলিকাতা, ৮ই নভেম্বর—রাজ্য সরকার কর্তৃক কলিকাতায় মাছের দর নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার ফলে অন্যান্য রাজ্যের মৎস্য রপ্তানীকারকরা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিতেছেন। প্রকাশ, স্থানীয় আমদানীকারকদের ষড়যন্ত্রে দর নির্দিষ্ট করিবার পর বিভিন্ন রাজ্য হইতে কলিকাতার দৈনিক মৎস্য সরবরাহ ৮৫০ পেটি হইতে হ্রাস পাইয়া ৬০০ পেটিতে পরিণত হয়। কিন্তু বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং গতকল্য ৭৮০ পেটি সরবরাহ আসে।

মৎস্য-মন্ত্রী শ্রীরহমন জানান, এতদিন কলিকাতার আমদানীকারকরা অন্যান্য রাজ্য হইতে সুলভে মৎস্য ক্রয় করিয়া এখানে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিত। ফলে রপ্তানীকারকরা ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেন। কিন্তু বর্তমানে রাজ্য সরকার দাম বাঁধিয়া দেওয়ায় তাঁহারা কলিকাতার দর অনুযায়ী ন্যায্য মূল্যে পাইতেছেন, ফলে কলিকাতায় সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দেখা যাউক আশা কতদূর ফলপ্রসূ হয়। কড়াহাতে যদি ব্যবস্থা হয় তবে সুফল হইবেই।

জৈমিনি

শব্দব্রহ্ম কথাটা শুনতে যেমন সুন্দর, আসলে ব্যাপারটা ঠিক তেমন মনে হয় না। এই কলকাতা শহরে মানুষের তৈরি যতোরকম অমানুষিক শব্দ প্রতি-নিয়ত আমাদের স্নায়ুকে উৎপীড়িত করে তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা এক অন্তহীন শব্দ-সমুদ্রের মধ্যেই বাস করছি। এর আওতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ আমাদের অজ্ঞাত।

তবু চেষ্টা করাই নাকি মানুষের স্বভাব। তাই অযথা বাস-মোটর-লরীর হর্ন বাজানো যেমন অনেকটা সীমিত করা হ'য়েছে তেমনি সুপরিকল্পিতভাবে শহর থেকে কল-কারখানা সরানোর প্রস্তাব ও শোনা যাচ্ছে আজকাল। মাইক এবং রেডিওর বিষয়েও আপত্তি এখন বিশেষ জোরালো হ'য়ে উঠেছে। এমন কি মৃতদেহ বহনের সময় হরি-ধ্বনির অত্যুৎসাহও আজকাল অনেকটা স্তিমিত বলে মনে হয়।

এতোটুকু যন্ত্র থেকে অতোবড় শব্দ!

কিন্তু বিপদ আসছে এখন অন্য দিক থেকে।

শোনা যাচ্ছে হাওয়াই যাত্রীদের সুবিধার জন্যে দমদম থেকে কলকাতা পর্যন্ত হেলিকপ্টার সার্ভিস খোলা হবে। এতে কলকাতায় পৌঁছতে যাত্রীদের সময় খুব কম লাগবে, ভ্রমণও হয়তো অনেক নির্বিঘ্ন হবে। কিন্তু শব্দ? হেলিকপ্টারের শব্দ যাঁরা স্বকর্ণে শুনেছেন তাঁরাই জানেন এতোটুকু যন্ত্র থেকে অতোবড় শব্দ বার করার প্রতিযোগিতায় গাধাকে তা অনায়াসেই লজ্জা দিতে পারে। ইউরোপের যেদেশে এই ধরনের হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু আছে সেখানে নাগরিকগণ ইতিমধ্যেই কাগজে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন, কিন্তু উচ্চমার্গের যাত্রীদের সুবিধার জন্যে আমরা স্বেচ্ছায় ঐ যান্ত্রিক যন্ত্রণাকে বরণ করে নিতে উদ্যত হ'য়েছি নিজের মাথার উপরে। একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নাকি ইতিমধ্যেই অনেকটা অগ্রসর হ'য়েছেন। কর্তৃপক্ষের শলাপরামর্শ সাঙ্গ হ'লেই তাঁরা হয়তো হাওয়ায় ভেসে পড়বেন। কিন্তু আমরা? কলকাতার আকাশে এত বড় একটা ব্যাপার ঘটবে অথচ শহরবাসী আমাদের তাতে কোনোই বক্তব্য থাকবে না? কানে আঙুল দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হেলিকপ্টারের যাতায়াত লক্ষ্য করাই কি আমাদের নিয়তি!

• • •

ভেজাল নিরোধ কী এবং কেন

খাদ্যে ভেজাল নিয়ে অনেকেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন, আমিও করেছি। কিন্ত সম্প্রতি মনে হচ্ছে, ঐ দুশ্চিন্তার বিষয়টি নিয়ে পুনরায় একটু চিন্তা করা আবশ্যক।

প্রথম প্রশ্ন হল, খাদ্যে ভেজাল থাকলে আমরা এত চিন্তিত হই কেন? তার কারণ নিশ্চয়ই মৃত্যুভয়! অর্থাৎ আমাদের মনে এমন একটা ধারণা করিয়ে দেওয়া হ'য়েছে যে, ভেজাল-দেওয়া খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

এর উত্তরে আমি ভেবে দেখেছি, মানুষের খাদ্যের কোনো ধরাবাঁধা শ্রেণী-বিভাগ নেই। ভূপৃষ্ঠ এবং সমুদ্রগর্ভের এমন অনেক জিনিস মানুষ এখন খায় যা, কয়েক শতাব্দী আগে খাদ্য ছিল না। আবার এমনও দেখা যায় যে এক অঞ্চলের মানুষের কাছে যা অখাদ্য, অন্য অঞ্চলের লোক তা সাগ্রহে গলধঃকরণ করে।

কাজেই খাদ্যাখাদ্য-বিনিশ্চয় অনেকটাই আমাদের মনগড়া এবং বেশির ভাগই অভ্যাসগত।

তবে হ্যাঁ, ভেজাল মানে যদি হয় কোনো বিষ, তাহলে ভয় পাওয়ার কারণ আছে বৈ কি! কিন্তু, আমার যতোদূর ধারণা, গুরুতর ব্যক্তিগত শত্রুতা না থাকলে ও-ধরণের মারাত্মক বিষ কেউ খাদ্যের সঙ্গে মেশায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, অল্প পরিমাণে বিষ আছে এমন জিনিস খাদ্যের সঙ্গে মেশানো। এটা একটা সমস্যা বটে। কিন্তু তার জবাবে বলা যায়, অল্প মাত্রায় গ্রহণ করলে বিষাক্ত জিনিস যে সব সময় ক্ষতিকারক হ'য়ে উঠবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং বিষাক্ত ভেজাল দেওয়া খাদ্য সামান্য মাত্রায় গ্রহণ করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত শরীরের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে এইটেই শুনেছি বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

তা-ছাড়া আরো কথা আছে। ভেজাল নিয়ে এত বিতর্কের আগে আমি যদি জিজ্ঞাসা করে বসি, বিশুদ্ধ খাদ্য কী, আশাকরি সেটা আমার বেয়াদবী হবে না! কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন খাদ্য আছে যা নির্বিচারে গ্রহণ করা চলে? যদি বলেন, ভাত, তাহলে তার উত্তরে জিজ্ঞাসা করব, ভাত যদি এতই নির্দোষ খাদ্য, তাহলে ডায়েবেটিসের রুগীকে ভাত দিতে বাধা কীসের? তেমনি দুধ ডিম মাংস ইত্যাদিও কোনো-না-কোনো অবস্থায় বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

আবার এমনও দেখা যায়, বাজার থেকে 'বিশুদ্ধ' খাদ্য আনলাম, কিন্তু আহার করার আগে নিজেরাই তাতে প্রচুর ভেজাল মিশিয়ে নিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে মাছ, ডিম, মাংস এবং অন্যান্য আনাজ আমরা তেল-মশলা-পেঁয়াজ দিয়ে যেভাবে চর্চিত, ভর্জিত এবং বিমথিত করি তাতে সেগুলোর খাদ্যমূল্য এবং খাদ্যপ্রাণ আহারের বহু পূর্বেই পঞ্চভূতে বিলীন হ'য়ে যায়। কাজেই একে ভেজাল ছাড়া আর কী বলব? অথচ আমরা এতোই অভ্যস্ত যে, একে ভেজাল বলেই মনে হয় না।

•

সেইজন্যেই বলছিলাম, ভেজালের ভয়টা বেশির ভাগই মনগড়া। এই কাল্পনিক দুশ্চিন্তায় অধীর না হ'য়ে আমরা যদি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তাহলে ভেজালের মধ্যেও কিছু সারবস্তু আবিষ্কার করা হয়তো কঠিন হবে না। সকলেই জানেন, ভেজাল দিতে গেলে যে বস্তু প্রথমে দরকার তা হল বুদ্ধি। ক্রেতাদের মনস্তত্ত্বের বিষয়ে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা না থাকলে ভেজাল দিতে গিয়ে ধরা পড়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় প্রয়োজন হল, উদ্ভাবনী-প্রতিভা। কার সঙ্গে কোন্ জিনিস বেমালুম মিশে যায়, সে বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেই ভেজাল মেশানো হয়, নাহলে সব আয়োজনই পণ্ড। তৃতীয়ত, শিল্পরুচি। এক-এক সময় এমন আর্টিস্টিক উপায়ে ভেজাল দেওয়া হয় যে দেখলে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। আর তখন সত্যিই মনে হয় যে, সোনার সঙ্গে খাদ না মেশালে যেমন ভালো গয়না তৈরি হয় না, তেমনি আসলের সঙ্গে নকল না মেশালে বোধহয় আসলেরও মাধুর্য ফুটে ওঠে না।

জানি না, ভেজালের স্বপক্ষে আমার এই ওকালতীতে আপনারা আমাকে পাগল মনে করছেন কিনা, কিন্তু আমি পাগল নই, নিছক একজন বাস্তববাদী মানুষ। মনে মনে আমি হয়তো আপনাদেরই মতো ভেজালের বিপক্ষে, আমিও চাই ইউরোপ-আমেরিকার মতো আমাদের দেশেও খাদ্যের ভেজাল অবলুপ্ত হোক, কিন্তু আমি জানি কঠিন অপরাধে অল্প শাস্তি দেওয়া মানেই অপরাধকে টিকে থাকতে দেওয়া—তাই ভেজাল ধরে সামান্য শাস্তি দেওয়ার চেয়ে ভেজাল না ধরাই শ্রেয় মনে করি।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, খাদ্যে ভেজাল-নিরোধ আইনের সংশোধন করে প্রথম অপরাধের জন্যে ছয় মাস কারাদণ্ডের সুপারিশ করা হয়েছে। ভেজালকারীরা একথা শুনে নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত বোধ করছে। করবেই। এবং ফলাফলও হবে সেইরকমই। সাপকে সামান্য আঘাত দিয়ে ছেড়ে দিলে যা হয়, ভেজালবাবুরাও নিশ্চয় ছয় মাস জেল খেটে সেই মনোভাব নিয়েই ফিরে আসবে সমাজে।

সেই ভয়েই আমি ভেজাল-নিরোধের বিপক্ষে। নয়তো মোক্ষম শাস্তি দেওয়ার প্রস্তাব হলে সকলের আগে দেখবেন আমি হাত তুলে বসে আছি!

• • •

কায়রোর এক সংবাদে জানা গেছে, দড়ির অভাবে সেখানে ৭০ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী কয়েকমাস ধরে ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে পারছে না। লোকে বলে ঘোড়া হলে নাকি চাবুকের অভাব হয় না। কিন্তু কায়রোতে দেখা যাচ্ছে বিপরীত অবস্থা। ফাঁসির আসামী আছে, কিন্তু দড়ি নেই। ভাবছি, ঐ ৭০ জন ব্যক্তিকে যদি কোনো রকমে একবার কলকাতায় আনা যেত, দড়ির চিন্তা করতে হত না। কলেরা,

ফাঁসির বিকল্প সন্ধানে

বসন্ত, যক্ষ্মা, ডেঙ্গু বা স্টেটবাস— এর যে-কোনো এক টি পদ্ধতিকে অবলম্বন করে তারা অনায়াসে সেই সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করতে পারত! সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চিন্তা করে দেখতে পারেন।

নেপালে নব-আবিষ্কৃত চর্যাপদ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবারের লাইব্রেরি হইতে চর্যাপদের একখানি হাতেলেখা পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহার প্রায় দশ বৎসর পর ১৯১৬ সালে ঐ পদগুলি শাস্ত্রী মহাশয়েরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। চর্যাপদের আবিষ্কার ও প্রকাশ ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহাকবি হোমারের মৃত্যুর পর সাতটি দেশ তাঁহার জন্মভূমিত্ব দাবি করিয়াছিল। চর্যাপদের ক্ষেত্রেও দেখা গেল, অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা ইহার দাবিদার। চর্যাগুলিকে অবলম্বন করিয়া সকলেই আপন আপন ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণে উদ্যোগী হইল।

চর্যাপদ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলার বাহিরে, এমনকি বিদেশেও ইহার সম্পর্কে আলোচনা ও চর্চার সূত্রপাত ঘটিল। ১৯২০ সালে বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁহার **The History of the Bengali Language** নামক গ্রন্থে চর্যাপুঁথির ভাষা লইয়া আলোচনা করেন। ১৯২৬-এ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থের প্রামাণিক ভাষাতাত্ত্বিক স্বরূপ নির্ধারণ করেন। ইহার ধর্মতত্ত্ব লইয়া সর্বপ্রথম আলোচনা করিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁহার **Les Chants Mystiques de Kanha et de Saraha** (১৯২৭) নামক গবেষণা-গ্রন্থে। তাহার পর ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত **Obscure Religious Cults and Background of Bengali Literature** (১৯৪৬) নামক তাঁহার প্রামাণিক গবেষণা-গ্রন্থে সহজযান প্রসঙ্গে চর্যাগীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত **Journal of the Department of Letters**-এ (২৮শ খণ্ড) দোহাকোষ প্রকাশ করিয়া চর্যার কয়েকজন কবি ও দোহাকোষের পরিচয় দেন। ১৯৩৮ সালে উক্ত জার্নালের ৩০শ খণ্ডে **Materials for a Critical Edition of the old Bengali Charyapadas** নামক সংকলনে সংগৃহীত চর্যাপদ বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত করেন এবং তৎসহ সংস্কৃত অনুবাদ দেন ও তিব্বতী অনুবাদের উল্লেখ করেন। চর্যাপদের আলোচনা ধারায় পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি বহু গ্রন্থে ও প্রবন্ধে দোহাকোষ ও চর্যাগীতি সম্বন্ধে নূতন নূতন তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সাংকৃত্যায়নের চর্যাগীতি সম্পর্কিত গবেষণার কিয়দংশ ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া ১৯৩৪ সালের **Journal Asiatique** -এর অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত ডঃ শহীদুল্লাহ **Buddhist Mystic Songs** প্রবন্ধে, ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার 'চর্যাগীতি-পদাবলী'তে এবং মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁহার 'চর্যাপদ' গ্রন্থে চর্যাগীতিকার পাঠসংস্কার এবং অর্থনির্দেশের বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত **The old Bengali Language and Text** (১৯৬৩) গ্রন্থে চর্যাপদের শব্দতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সম্প্রতি নেপাল রাজ্য হইতে একশোটি নূতন চর্যাপদ আবিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন। এই নবাবিষ্কৃত পদগুলি বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বাকের নিকট হইতেও তিনি প্রায় কুড়িটি চর্যাসংগীত সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং সেগুলির টেপরেকর্ড করিয়া আনিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা বিভাগের বাৎসরিক পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষ্যে মৎ-সম্পাদিত একটি স্মরণিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (৮ এপ্রিল, ১৯৬৩)। এই পুস্তকে প্যারিস হইতে ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে লিখিত (২৫।৩।৬৩) ডঃ দাশগুপ্তের একটি পত্র মুদ্রিত করি। সেই পত্রের শেষাংশে লেখক লিখিয়াছেন,

"একটি অত্যন্ত শুভ সংবাদ আছে। নেপালে মুখেমুখে বজ্রাচার্যগণ এখনও চর্যাসংগীত গান করেন। এ জাতীয় প্রায় ২০টি সংগীত লণ্ডন হইতে যোগাড় করিয়াছি। স্থানে স্থানে চর্যাগুলির সঙ্গে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে মিলিয়া যায়। একই ভাব ও ভাষা। গানগুলিও সংগ্রহ করিয়াছি এবং সবগুলিই টেপরেকর্ড করিয়া আনিয়াছি...।"

ডঃ দাশগুপ্তের আবিষ্কারের বিষয়টি এই মুদ্রিত পত্রটির মাধ্যমেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পর পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়। গত ৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে প্রাপ্ত নূতন পদগুলি সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন।

নেপালে ডঃ দাশগুপ্ত প্রায় আড়াই শত পদের সন্ধান পান, তাহার মধ্যে প্রায় কুড়িটি পুঁথি হইতে বাছিয়া একশতটি চর্যা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। পুঁথিগুলির অধিকাংশই বিকৃত। বহু পাঠান্তর মিলাইয়া পাঠ নির্ণয় করিতে হইয়াছে। পুঁথির নানা স্থানে 'ত' ও 'ট' বর্গের এবং 'র' ও 'ল'-এর মধ্যে স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে। নেপালে এই গানগুলি 'চচা'-সংগীত বলিয়া প্রচলিত।

এই চর্যাসংগীতগুলি নেপালে বজ্রাচার্যগণের দ্বারা এখনো নৃত্যসহযোগে গীত হয়। বজ্রাচার্য হইল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পুরোহিত। গীতানুষ্ঠানের সঙ্গে পুঁথিরও ব্যবহার হইতেছে এবং জীর্ণ হইলে পুনরায় নকল করা হইতেছে। তুলোট কাগজে নেওয়ারী (নেপালী) অক্ষরে পুঁথিগুলি লিখিত। তবে লিপির ঢং অনেক স্থানে দেবনাগরী হরফের ন্যায়। বজ্রাচার্যগণ মন্ত্র হিসাবে এই পদগুলি পুরুষানুক্রমে গাহিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গানের অর্থ বা মর্মটি কি, তা তাঁহারা কেহই জানেন না। বিষয়গত অর্থের সহিত পরিচিত না থাকিবার দরুন পুঁথি নকল করিতে গিয়া কিরূপ পাঠ পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত চরণটি হইতে বুঝা যাইবে—

কৈ রে মনসা বাজেরে বীণা

অনহত শবদে ত্রিভুবন লীনা।

পাঠান্তরে দেখা যাইতেছে 'শবদে' কোথাও 'সবদেবে' এবং কোথাও বা 'সর্বাদেবে'তেও রূপান্তরিত হইয়াছে।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার সংগৃহীত একশোটি পদকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন।

একশোটির মধ্যে ১৯টি পদ প্রাচীন ও চর্যাপদের সমগোত্রীয়। দ্বিতীয় বিভাগে ৪৫টি পদকে ফেলা হইয়াছে। এই পদগুলি চর্যাপদের অনুসরণে খ্রীঃ দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন সময়ে রচিত। তবে কোন্ অঞ্চলে বসিয়া এগুলি লিখা হইয়াছিল, তাহা এখনো জানা যায় নাই। অবশিষ্ট পদগুলি আরও পরবর্তী কালের লিখা এবং এগুলি নেপাল অঞ্চলেই লিখিত। দেবদেবীর বর্ণনা এবং বহু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ইহাতে দেখা গিয়াছে।

মোট একশতটির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দার্শনিক পদ পাওয়া

গিয়াছে। এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ একটি পদ আমরা এখানে উদ্ধার করিয়া দিতেছিঃ

এ মহিমণ্ডল মেরুসমুদ্রা
জনধন জউবন উদবিন্দুচন্দ্রা
পেখুরে অনুদিন লোঅনে গঅনে
ফুল্ল পরিহাসই জিণ গুণ বঅনে।
স্কন্ধে ধারী ইন্দিবিষয়, সর্ব একা
সমুদ্র তরঙ্গ জিম একু অনেকা।
পবন দুই ভেদিআ।
ডিঢ় থিরে চিআ।
জ্বলই বজ্রানল দহদিহ ডাহিআ
সুগত! ভেদ ভাবইআ নহোইরে শোধা
সুগত ভণই অচিন্তালয় বোধা।

দার্শনিক তত্ত্ব সমন্বিত কিছু সংখ্যক পদ লৌকিক রূপকের মধ্য দিয়া বিবৃত হইয়াছে। দেব-দেবী বা যোগী-যোগিনীর বাহ্যিক মিলন দৃশ্যের মধ্য দিয়া চর্যাকারেরা অনেক সময় গভীর কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে এই আদর্শের প্রভাব পড়িয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে লৌকিক রূপক অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গভীরে বৈষ্ণব দর্শনতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি পদেই বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ঃ

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে

কিংবা,

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ

অথবা,

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ
বাসলীচরণে।। ইত্যাদি

কেহ কেহ বলেন, এই বাসলী শব্দটি বিশালাক্ষী হইতে আসিয়াছে, আবার কাহারো কাহারো মতে বিশালাক্ষী নহে, ইহা বজ্রেশ্বরী হইতে আসিয়াছে —

বজ্রেশ্বরী—বাজসলী—বাঅসলী—বাউসলী—বাসলী।

বর্তমান চচা বা চর্যা সংগীতের কোন কোন পদে 'বাচ্ছলী' নামক একটি দেবীর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ডঃ দাশগুপ্ত অনুমান করিতেছেন, বাসলী শব্দটি বাচ্ছলী হইতে আসা সম্ভব। আর বাচ্ছলী শব্দটি কোথা হইতে আসিল? তাহার আগমন বৎসলা হইতে। ভক্তবৎসলা কোন প্রাচীন দেবীই হইলেন বাচ্ছলী।

কয়েকটি চর্যায় পরবর্তীকালের ব্রজবুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীর পদে সর্বত্রই কোমল ও মধুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পদগুলির ভাষা, শব্দচয়ন ও বিন্যাস এবং ছন্দ-কৌশল বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে, প্রাচীন বাঙগলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এবং সর্বোপরি চর্যাগীতিকার ধারাবাহিকতা নির্ণয়ে এই নবাবিষ্কৃত চর্যাপদগুলির মূল্য অসীম।
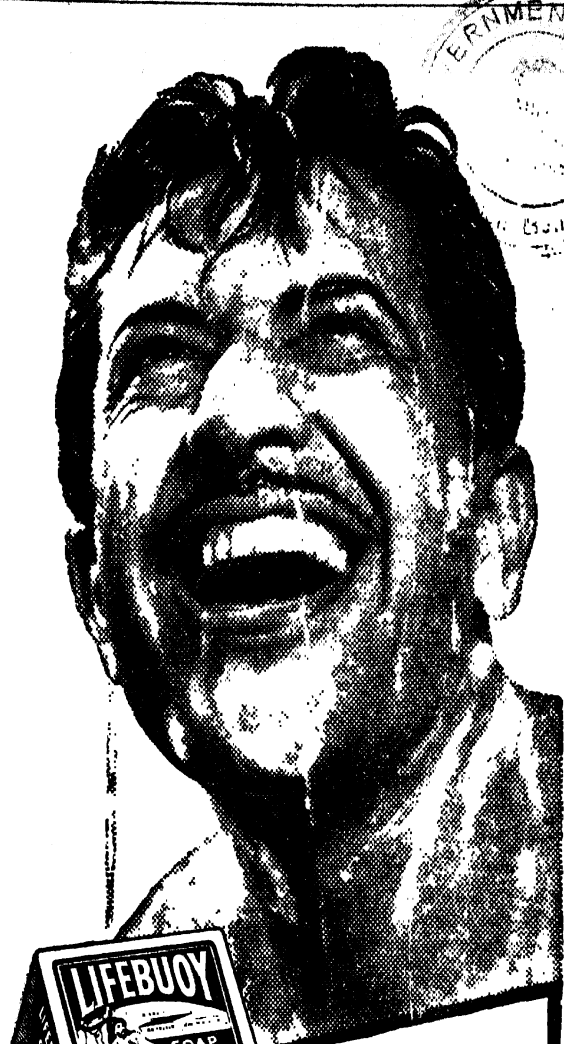
দেশে বিদেশে

॥ গণতন্ত্র ও সমাজবাদ ॥

জয়পুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দেশের শাসকদল গণতন্ত্র ও সমাজবাদকে তাদের আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, গণতন্ত্রের প্রতি দেশবাসীর আস্থা যদি অবিচল রাখতে হয় তবে অবিলম্বে সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। দেশে আজ যে ঐশ্বর্যের ব্যবধান রয়েছে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে রয়েছে যে বিপুল পার্থক্য গণতন্ত্রের পক্ষে তার চেয়ে বড় বিপদ আর কিছুই নেই। উড়িষ্যার জননেতা শ্রীবিজু পট্টনায়েক এই প্রস্তাবের উপর আলোচনাকালে দেশের আরও ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিত্তশালী পুঁজিপতিরা তাদের ঐশ্বর্যের বলে প্রায় একটা পাল্টা সরকারই গড়ে তুলেছে দেশে, যারা সরকারের কোন আইন বা নিষেধাজ্ঞার পরোয়া করে না। যারা বেপরোয়াভাবে চালায় দুর্নীতি, অন্যায় ও অসৎ পথে উপার্জন করে লক্ষ লক্ষ টাকা।

বলা বাহুল্য, এই পরিবেশ সমাজতন্ত্রের অনুকূল নয়, এবং যতদিন না কঠোর আইনবলে ঐ দুর্নীতিপরায়ণ পুঁজিপতিদের সংযত করা হবে বা তাদের হাত থেকে প্রধান শিল্পগুলি ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হবে, ততদিন সমাজতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নেই। কিছুদিন আগে সংসদের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে, এদেশের শতকরা ষাট জন লোকের আয় দৈনিক ছয় আনার বেশী নয়। আপন ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার অর্জনের সতেরো বছর পরে এই সংবাদ যে মোটেই উৎসাহকর নয় তা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এ অবস্থা থেকে খুব সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। তৃতীয় যোজনাকালে পরিকল্পনাকারদের লক্ষ্য ছিল প্রতি বছরে পাঁচ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি। কিন্তু সাম্প্রতিক হিসাবে প্রকাশ, দু'বছরের চেষ্টাতেও এক বছরের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ১৯৬১-৬২ সালে জাতীয় আয় বেড়েছিল ২·৫ শতাংশ, আর ১৯৬২-৬৩ সালে তা আরও কমে বেড়েছে মাত্র দুই শতাংশ। অর্থাৎ দুই বছরে বেড়েছে মোট সাড়ে চার শতাংশ। ...দিকে দেশে লোকসংখ্যা বাড়ছে প্রতি বছরে ২·৮ শতাংশ। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জাতীয় আয় সমভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না, আর তার ফলে লোকের

জয়তু জওহরলালজী ॥ ১৪ই নভেম্বর

মাথাপিছু আয় না বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। যেমন গত বছরে মাথাপিছু আয় হ্রাস পেয়েছে ০·২৩ শতাংশ। যে দেশের অধিকাংশ লোকের দৈনিক আয় মাত্র ছয় আনা, তাদের সে আয়ও যদি এইভাবে বছরে বছরে হ্রাস পায় তবে শেষ পর্যন্ত আমরা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব তা ভাবতেও ভয় হয়। গণতন্ত্র ও সমাজবাদই যে এই ভয়াবহ অবস্থার একমাত্র প্রতিকার সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

॥ ভিয়েৎনামে নয়া শাসন ॥

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে নো দিন দিয়েমের শাসনের উচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও তাঁর ভাই নো দিন নু উভয়েই প্রাণ হারিয়েছেন। তবে সেটা জনতার হাতে হারিয়েছেন না নিজেরাই নিজেদের জীবনের শেষ টেনেছেন তা জানা যায় নি। কিন্তু তাঁদের মৃত্যু যে ভিয়েৎনামবাসীদের মনে এতটুকুও বেদনা বা সহানুভূতির উদ্রেক করেনি তা ভিয়েৎনামবাসীদের আনন্দোৎসবেই বোঝা গেছে। মাদাম নু চোখের জল ফেলছেন আমেরিকায় বসে, আর শাপান্ত করছেন মার্কিন শাসকদের তাঁদের একান্ত অনুগত দিয়েম-পরিবারকে রক্ষা না করার জন্য। ক্ষমতার নিষ্ঠুর আনন্দে যে নারী নিজেকে অসীম শক্তিশালিনী ভেবেছিলেন তিনি আজ কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে বুঝতে পারছেন, কত অসহায় তিনি। জনতার রুদ্ররোষে মুহূর্তের মধ্যে তাসের ঘরের মত ভেঙে গেছে তাঁর সুখী পরিবার।

অভ্যুত্থানের নায়ক মেজর জেনারেল ড্যাঙ ভ্যান মিন নিজেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অস্থায়ী সরকারের প্রধান বলে ঘোষণা করেছেন এবং দিয়েম সরকারের উপরাষ্ট্রপতি বৌদ্ধধর্মী নুয়েন নোক থোকে নিযুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। অবিলম্বে নূতন সংবিধান প্রণীত হবে বলে জেনারেল মিন জানিয়েছেন। কিন্তু তা বলবৎ না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লবী পরিষদই হবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ভাগ্যনিয়ন্তা।

॥ আততায়ীর তৎপরতা ॥

জাপানের প্রধানমন্ত্রী হায়াতো ইকেদা ও বর্মার প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নে উইনের উপর আততায়ীদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে। উত্তর জাপানের কোরিয়ামা শহরে প্রধানমন্ত্রী ইকেদার সফরকালে হঠাৎ একটি যুবক তাঁকে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে। কিন্তু তার হত্যাপ্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। প্রধানমন্ত্রীর দেহ স্পর্শের আগেই পুলিশ ঐ যুবককে গ্রেপ্তার করে।

কিন্তু বর্মার কর্ণধার জেনারেল নে উইনকে খুবই গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। গত ২৬শে অক্টোবর থাইল্যান্ড সীমান্তের নিকটবর্তী সোহাদাত নামক স্থানে জেনারেল নে উইনের উপর দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালানো হয় এবং আততায়ীদের গুলী তাঁর দক্ষিণ বাহুতে লাগে। আক্রমণকারীদের সংখ্যা ছিল ছয়, তার মধ্যে দুইজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়, আর সকলকে সেইখানেই গ্রেপ্তার করা হয়।

॥ শিক্ষায় অরাজকতা ॥

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা যে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতেছেন তা শিক্ষার্থী অভিভাবক ও শিক্ষাব্রতীদের কাছে রীতিমত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে এগারো ক্লাসের প্রবর্তন করা হয়। একটি দীর্ঘকালের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে গেলে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এবং এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমোন্নয়নের পক্ষে যাঁরা, তাঁদের কাছে এই সমস্যাগুলিই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তাঁরা আশা করেছিলেন, কর্তৃপক্ষ ক্রমে ক্রমে ঐসব সমস্যার সমাধান করবেন এবং এগারো ক্লাসের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা যাতে সম্পূর্ণ সার্থক হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সর্বভারতীয় কর্তৃপক্ষ 'অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেন্ডারী এডুকেশন' সম্পূর্ণ বিপরীত পথে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের সাম্প্রতিক বৈঠকে স্থির হয়েছে, এগারো ক্লাসের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও এক ক্লাস বাড়িয়ে তাঁরা বারো ক্লাসে পরিণত করবেন! কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তে এইরকম ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, দশ ক্লাসের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রেখে এগারো ক্লাসের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে কাউন্সিলের বিজ্ঞ সদস্যরা এতটুকুও অবহিত নন। তা না হলে এগারো ক্লাসকে বারো ক্লাসে পরিণত করার কথা চিন্তা না করে তাঁরা আবার দশ ক্লাসের ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় কিনা সেই কথাই গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

অর্থ ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, আর কোন দশ ক্লাসের মাধ্যমিক স্কুলকে আপাতত এগারো ক্লাসের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত করা হবে না। ফলে দেশের অধিকাংশ স্কুলেই অনির্দিষ্টকাল ধরে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। অথচ এক একটি এলাকার চার পাঁচটি স্কুলের মধ্যে একটি স্কুল এগারো ক্লাসের উচ্চ মাধ্যমিক বহুমুখী (মাল্টিপারপাস) স্কুলে উন্নীত হওয়ায় সেই অঞ্চলের সব ভাল ছেলেরা ঐ স্কুলটিতে গিয়ে ভিড় করছে। এর ফলে গত কয়েক বছরে দশ ক্লাসের স্কুলগুলির পরীক্ষার ফল শোচনীয়ভাবে খারাপ হচ্ছে। এর ফলে ঐ সকল স্কুলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মনে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অথচ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে যে ভাল ছেলেরা গিয়ে ভিড় করছে তাদের পক্ষেও আশানুরূপ শিক্ষালাভ সম্ভব হচ্ছে না। তার কারণ

স্কুলগুলিতে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব। স্কুলগুলিতে ছাত্রের এত ভিড় যে সকলের পক্ষে ভাল করে বসার স্থানটুকু সংগ্রহ করাও সময় সময় কঠিন হয়ে পড়ে। আর তার ফলে কলেজের ছাত্রদের তুলনায় স্কুলের ছাত্রদের উপর যে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার সেটা কিছুতেই সম্ভব হয় না। তার পরেও আছে লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটারীর অভাব, যে কারণে শিক্ষকদের অনেক সময় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলতে হয়, সাপোজ দিস ইজ এ টেস্ট টিউব'। কলকাতার অধিকাংশ স্কুল-বাড়ীই ভাড়া, একারণে সরকার ল্যাবরেটরীর জন্য বরাদ্দ টাকা তাঁদের দিতে রাজী নন। পরিবেশের এই প্রতিকূলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যোগ্য শিক্ষকের অভাব। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ২৩০ টাকা মাইনের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রী প্রভৃতি বিষয়ের সেকেন্ড ক্লাস এম-এ পাওয়া সম্ভব নয়। হিউম্যানিটিজ সাবজেক্টগুলিতে তবু পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁদের সব সময় নজর থাকে কলেজের দিকে এবং সুযোগ পেলেই তাঁরা অন্তর্ধান করেন। অথচ যখন দশ ক্লাস স্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার ব্যবস্থা ছিল তখন ঐ বিষয়গুলিই ছেলেরা কলেজে অধ্যাপকদের কাছে পড়ার সুযোগ পেত।

এই সব বাস্তব সমস্যার কোন সমাধান না করে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা কেন যে এগারো ক্লাসকে বারো ক্লাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন তা তাঁরাই ভাল জানেন। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, এর ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে অরাজকতা আরও বাড়বে এবং উল্লিখিত সমস্যাগুলি আরও জটিল ও মারাত্মক হয়ে উঠবে।

অর্থনৈতিক

ইস্পাত রাষ্ট্রদেহের মেরুদণ্ড, জাতির ঐশ্বর্য ও উন্নয়নের প্রতীক। কোন দেশের শৈল্পিক অগ্রগতি কতখানি তা বিচারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি সে দেশের ইস্পাত উৎপাদনের সামর্থ্য। যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বৈষয়িক অগ্রসরতার পার্থক্য আমরা এই থেকেই উপলব্ধি করতে পারি যে, আমাদের মাথাপিছু ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ মাত্র ৯ কে জি, যে জায়গায় যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের ব্যবহারের পরিমাণ ৬০০ কে জি। কল-কারখানা, রেল, ওয়াগন, গাড়ী, জাহাজ, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি নির্মাণের জন্য প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টন ইস্পাতের প্রয়োজন, আর যতদিন কোন রাষ্ট্রের পক্ষে তা উৎপাদন করা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সেই পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রকে অনগ্রসর ও অনুন্নত বলেই মনে করা হবে। ইস্পাতের অভাবে তার বৈষয়িক মানোন্নয়ন হবে সুদূরপরাহত। এ কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই আমরা ইস্পাতের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য তৎপর হই।

স্বাধীনতার আগে ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র দশ থেকে পনের লক্ষ টন। তারপর রউরকেলা, ভিলাই, দুর্গাপুরে ইস্পাতের কারখানা গড়ে ওঠে এবং টাটা, মার্টিন বার্ণ প্রভৃতি ইস্পাতের কারখানাগুলিরও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাবে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে চোদ্দ বছরের মধ্যে ভারতের ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। তৃতীয় যোজনাকালে ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ১৬ লক্ষ টন। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে এই উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ এই ৬৮ লক্ষ টনের মধ্যে বোকারো ইস্পাত প্রকল্পের সম্ভাব্য ৩০ লক্ষ টন উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনাকারদের লক্ষ্য, চতুর্থ যোজনার শেষে ১৯৭০-৭১ সালে ১৮০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন। এ কারণে ভিলাই, দুর্গাপুর ও রউরকেলা ইস্পাত কারখানার বর্তমান দশ লক্ষ টন উৎপাদন শক্তিকে বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৩৫ লক্ষ, ৩০ লক্ষ ও ২৫ টন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। টাটা ও ইণ্ডিয়ান আয়রণের উৎপাদন-ক্ষমতাও দশ লক্ষ টন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হবে ভারতের মোট ইস্পাত উৎপাদন-শক্তি দাঁড়াবে ১৪০ লক্ষ টন। বাকি ৪০ লক্ষ টন পূরণের ব্যবস্থা করা হবে বোকারোর ২০ লক্ষ টন উৎপাদন ও আরও দুটি প্রস্তাবিত কারখানার ২০ লক্ষ টন উৎপাদন দিয়ে। বিশাখাপত্তনম ও গোয়ায় নতুন দুটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সরকারই এদেশের উৎপাদিত ইস্পাতের প্রধান ক্রেতা। সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত কল-কারখানা, রেল, জাহাজ প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনেই অধিকাংশ ইস্পাত ব্যয় হয়, এ কারণে জনসাধারণের গৃহাদি নির্মাণের প্রয়োজনে ইস্পাত এখনও এত দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু ১৯৭০-৭১ সালে ১৮০ লক্ষ টন ইস্পাত হলেও জনসাধারণের প্রয়োজনে তা কতটুকু পাওয়া যাবে তা বলা শক্ত। কারণ সরকারের চাহিদা ক্রমবর্ধমান এবং ব্যাপক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনে সে চাহিদা আরও বেড়েছে।
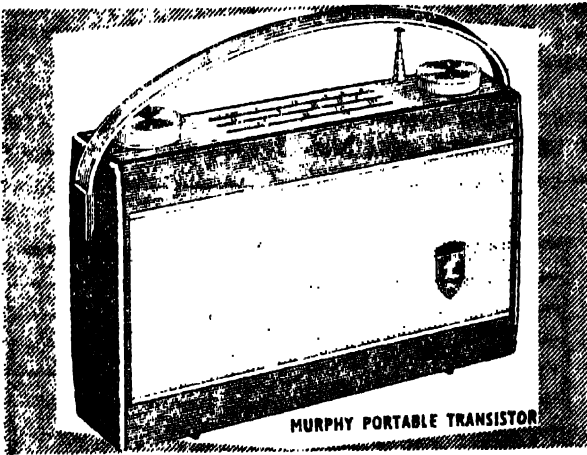
সাহিত্য জগৎ

আকাদেমি পুরস্কার

সঙ্গীত নাটক আকাদেমি প্রদত্ত নাট্যপ্রযোজনা ও নাটক রচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে চারজন পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক শ্রীমতী লীলা মজুমদার। তাঁর রচিত 'বকবধপালা' পুরস্কার লাভ করেছে। এই পুরস্কারপ্রাপ্তির ঘোষণার পর তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ঃ

"আমার ত মনে হয়, 'মোহিনী'র এই পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল। 'বকবধ পালা'র ইতিহাস আছে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক বালক-বালিকাদের অভিনয়ের একটি পালা শিখবার জন্য শান্তিদেব ঘোষ আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। লিখেছিলাম তখনই, সে অন্ততঃ প্রায় পাঁচ বছর আগে। নানা কারণে শান্তিনিকেতনে সেটি অভিনীত হয়নি। ওটির প্রথম অভিনয় আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের মঞ্চে। অভিনয় করে ছয় থেকে বারো বছর বয়সের ছেলেমেয়ে। কাহিনী সেই পুরাতন মহাভারতের কথা।"

বর্তমানকালের শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে তিনি আরও বলেন ঃ

"সেদিনের তুলনায় অর্থাৎ আমাদের ছোটবেলার তুলনায় আধুনিককালে রচনার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাও অনেক; কিন্তু ভালো রচনার অভাব ঘোচেনি। যাঁরা অক্ষম তাঁরাই আসেন শিশু-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে। মনে হয় অভাব তাঁদের অনুপ্রেরণার: অভাব শিশু-মন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার। কারণ আরও আছে; বিচার সম্পর্কে প্রচলিত মানদণ্ডও বোধহয় সত্যিকারের শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল নয়।"

শ্রীযুক্তা মজুমদার শিশুদের জন্যই কেবলমাত্র বহু গ্রন্থ রচনা করেননি, বহু গল্প উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন। বর্তমানে তিনি ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ'র সঙ্গে যুক্ত আছেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যান্য তিনজন ঃ কলকাতার রূপকার গোষ্ঠী, মণিমেলা মহাকেন্দ্র এবং শ্রীউৎপল দত্ত।

অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত

সাহিত্যে অশ্লীলতা ও অশ্লীলতা নিয়ে বিতর্কের সীমা নেই। দেশে দেশে যুগে যুগে পক্ষে ও বিপক্ষে বহুবিধ যুক্তি নিয়ে এক প্রচণ্ড বিতর্ক চলেছে এই বিষয়টি নিয়ে। আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের আদালতে যে কয়েকটি বিখ্যাত বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে অনেকেই অবহিত। লেডি চ্যাটারলিজ লাভার নিয়ে যে দীর্ঘ বাদানুবাদ ও আইনের বিতর্ক চলেছিল তার ধোঁয়া এখনও সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

সম্প্রতি আর একখানি বই নিয়ে এমনই একটি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে লণ্ডনে জন ক্লেল্যাণ্ড ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ বিক্রি করে দিয়েছিলেন ২১ পাউণ্ডে। গ্রন্থটির নাম 'ফ্যানি হিল ঃ মেময়ার্স অব এ ওম্যান অব্ প্লিজার'।

লণ্ডনের মে ফ্লাওয়ার বুকস-এর এই পেপার ব্যাক সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে ২৫০,০০০। পুলিশ গ্রন্থটি প্রকাশ নিষিদ্ধ করবার পর দোকানে হানা দিয়ে বেশ কয়েক হাজার বই আটক করেছে।

১৯৫৯ সালের 'অবসিন পাবলিকেশনস অ্যাক্ট' অনুযায়ী গ্রন্থটি বে-আইনী ঘোষণা করে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ভার পুলিশকে দেওয়া হয়েছে।

বাঙলা অনুবাদ

ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙলা সাহিত্য অনুবাদ শাখার পুষ্টি সম্পর্কে বাঙালীর গর্ব চিরকালের। এমন সময় গেছে যখন এর প্রতিবাদ করবার সাধ্যই কোন উপায় ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময়ের বইয়ের বাজার এবং পাঠকের চাহিদার দিকে তাকালে মনে হয় সে গৌরবের দিন আর নেই।

অনুবাদ যে কোন ভাষার সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে নিঃসন্দেহে। বাঙলা সাহিত্যে যে পরিমাণে বিদেশী ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ হয়েছে ঠিক সমপরিমাণে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গ্রন্থ অনূদিত হয়নি। বাঙলাদেশের মানসিকতা রুচি প্রভৃতি বিবিধ কারণে এই জিনিস ঘটেছিল। যাইহোক গত কয়েক বছরের মধ্যে বাঙলায় অনেকগুলি প্রতিবেশী ভাষাসমূহের গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে।

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়ও বর্তমান সময়ে আর বিশেষ অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে না অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় পরিমাণ অনেক কম। অনুবাদগ্রন্থ বলতে বাঙলাদেশে উপন্যাসেরই সমাদর ছিল সব থেকে বেশী। প্রবন্ধ বা উল্লেখযোগ্য দর্শন ও রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ নিতান্তই কম। অথচ বিশ্বসাহিত্যের বহু উল্লেখযোগ্য মূল্যবান গ্রন্থগুলি আজও বাঙলাদেশের পাঠকদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতই থেকে গেছে। এই শ্রেণীর বেশ কতকগুলি অন্যান্য—প্রতিবেশী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

এই অনুবাদ সম্পর্কে সম্প্রতি একটি বিদেশী পত্রিকায় আশ্চর্য অভিযোগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে অতিরিক্ত অনুবাদ হলে সমস্ত মানুষের মধ্যে বিদেশী ভাষা শিক্ষার আগ্রহ কমে যায়। বিদেশী ভাষা শিক্ষা ও চর্চা করা বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা নিবিড় হওয়া। সমস্ত জাতিই গৌরবের বলে মনে করে থাকে। কিন্তু অনুবাদক যে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা করে এক্ষেত্রে তার তুলনা নেই।

এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আবার বলা যায় যে অনুবাদের মাধ্যমেই অনেকে বিদেশী ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাযুজ্য লাভ করে থাকে। অনুবাদ ও অনুবাদককে অযথা গালাগালি করলে কিছুটা ভুল করা হবে।

ভারতীয় ভাষা চর্চা

আমেরিকায় ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃত চর্চাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সে প্রায় এক শতাব্দী আগেকার কথা। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে সংস্কৃতে সর্বাপেক্ষা পুরণ চেয়ার। অন্যান্য যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে গবেষণা করা হয় তাদের মধ্যে আছে ঃ পেনসিলভানিয়া, হার্ভার্ড, মিচিগান, ক্যালিফোর্ণিয়া, প্রিন্সটন, কলাম্বিয়া, চিকাগো, মিনেসোটা এবং ভার্জিনিয়া।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষা বিভাগের পত্তন হয় ১৮৯০ সালে। অগ্রগণ্য মার্কিণী ভারতবিদ অধ্যাপক এইচ এইচ ইংগলস হার্ভার্ডে প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে হিন্দী এবং উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাঙলা, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম এবং কানাড়ী শেখারও ব্যবস্থা কোথাও কোথাও আছে। বার্কলে, উইসকনসিন এবং জর্জটাউন প্রভৃতি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাষাগুলি চর্চা হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে ভারত-চর্চা বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃত মাত্র নয় সমগ্র ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার প্রবর্তন করে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। পেনসিলভানিয়া প্রতি বছর গ্রীষ্মে ভারতে ভাষা শিক্ষার একটি পরিকল্পনা নিয়েছে।

সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী বা পরিকল্পনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিভাগ সমস্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর একটি সুবৃহৎ ভারত সম্পর্কিত সংগ্রহ আছে। এখানে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সংগৃহীত রয়েছে যা এখনও অনুবাদ করা হয়নি।

বিদেশী সাহিত্য

।। হাইনরিশ বল ।।

জার্মান সাহিত্যাকাশে 'গ্রুপ-৪৭'—একটি বিস্ময়কর নাম। তরুণ ও তরুণতর সাহিত্যসেবীদের অধিকাংশই এই বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত। গ্রুপ ৪৭-কে বাদ দিয়ে কোন সাহিত্য-সেবী নিজের প্রতিষ্ঠাকে বলিষ্ঠ করতে পারে না এমনই অনেকে বিশ্বাস করে থাকে। এই গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য লেখকমণ্ডলীতে আছেন : ইলসে আই-কিনগির, ইগর্গের বাখমান, হাইনরিশ বল, আড্রিয়েন মরিয়েন, গুনটার গ্রাস। —এঁরা সকলেই গ্রুপ ৪৭-এর প্রতি আনুগত্য নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করেছেন।

হাইনরিশ বল

এঁদের মধ্যে হাইনরিশ বল ও গুনটার গ্রাস সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচিত।

বর্তমান জার্মান সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে যে কোন দেশের যে কোন পরিবেশে দুজন লেখকের নাম সকলেই একবাক্যে করে থাকেন। এঁরা দুজন হলেন হাইনরিশ বল এবং গুনটার গ্রাস। দুজনের বয়সের পার্থক্য মাত্র দশ বৎসর। রাইনের মানুষ বল-এর বর্তমান বয়স ছেচল্লিশ এবং ডানজিগের গ্রাস-এর চলেছে ছত্রিশ বছর। বয়সের এই পার্থক্য সত্ত্বেও দুজন সমানভাবেই রাজনীতি বা বহির্বিশ্বের বহু ঘটনার সঙ্গে নিজেদের চিন্তাজগৎকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

দুজন লেখকেরই অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা কম নয়। সমালোচকেরাও সমালোচনার ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত। কেউ কেউ সীমাতীত প্রশংসায় মুখর আবার কেউ উগ্র সমালোচনায় তৎপর। দুজনেরই রচনা দেশে এবং দেশের বাইরে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়ে থাকে। বল্-এর বই প্রায় বারটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় গ্রাস-এর রচনার আশাতীত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

বল সম্পর্কে বলা হয়েছে :

Boll is a devout Catholic, but has strong personal reservations vis-a-vis the Church and confessionalism. He rejects any mixing of creed, religion and politics on principle. His present-day figures and subjects appeal exphatically to the heart and the emotions, but critical discernment is not eliminated. He is at home in particular in the world of the average citizen, the minor employee. He knows all about the "man in the street" and his worries—both the outward and the private ones. His latest novel, the "Views of a Clown", deals with the fate of one who has been disinherited. He began life as the child of wealthy parents, but is constantly jeopardizing his own living voluntarily."

বল-এর চরিত্রগুলি অস্তিত্বের অনুসন্ধানে গভীরতর জিজ্ঞাসায় সর্বদাই উদ্‌ভ্রান্ত। সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে বল নিজেকে এভাবে যুক্ত রাখবার চেষ্টা করেছেন। আধুনিকতার সঙ্গে এভাবে যুক্ত রাখতে পেরেছেন বলেই বল সর্বাগ্রে সার্থকতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বল-এর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম হল তাঁর ক্ষুদ্র স্যাটায়ারগুলি। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : **ভো হ্বারস্‌ট ডু আডাম** (যুদ্ধকালীন উপন্যাস), **হাউস ওনে হুয়েটের, উন্ত জাগটে কাইন আইনৎসিগেস হ্বর্ট, বিল্লার্ড উম্ হালপ্‌জেহন, ডাস্ ব্রট ডের ফ্রুহেন য়াহ্‌রে।** বল-এর রচনার অংশ বিশেষ 'দি ব্রেড অব আওয়ার আর্লি ইয়ার্স', লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ইংরাজি সংস্করণ। এখানে উদ্ধৃত করছি—এর থেকে তাঁর রচনাশৈলী ও চিত্রনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

"The arithmetical unit is the bread, the bread of those early years, which lie in my memory as though beneath a deep fog, the soup which was issued to us rumbled dully in our bellies: it rose hot and sour in us, when we rattled home at night in the tram. It was belching of impotence and the only fun we had was the hatred—the hatred, "I repeated softly, "which has long since flown out of me as when a belcher presses hard on his belly. Ah Ulla", I said directly, looking into her eyes for the first time, "do you really want to persuade me, to make me believe that it was all done with soap and a little extra wages—is that what you want?"

বিরুণীর 'ভারতেতিহাস'

অল্‌বিরুণীর (৯৭৩ - ১০৪৮ খৃঃ) **ভারতের ইতিহাস** গ্রন্থটির রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আরবী ও ফার্সী ভাষা বিশেষজ্ঞ সোভিয়েত ইতিহাসবিদ ভিক্তর বেলিয়ায়েফ-এর নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বিরুণীর এই গ্রন্থটি এই সর্বপ্রথম টীকা-ব্যাখ্যাসহ রুশ ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনূদিত হল। ১৮৮৭ খৃঃ জার্মান প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত এডুয়ার্ড সাখাউ লণ্ডন থেকে বিরুণীর এই গ্রন্থের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য যে আরবী পাঠ প্রকাশ করেন, এই রুশ অনুবাদ করা হয়েছে সেই আরবী পাঠ থেকে। উজবেক বিজ্ঞান আকাদমি অল্‌বিরুণীর সম্পূর্ণ রচনাবলী আট খণ্ডে প্রকাশ করছেন। এই **ভারতের ইতিহাস** হল তার দ্বিতীয় খণ্ড।

সমকালীন সাহিত্য

নেহরু: পিতা ও পুত্র

অভয়ংকর

শ্রীযুক্ত বি আর নন্দ ভারত সরকারের রেল বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ইতিপূর্বে মহাত্মা গান্ধীর একখানি প্রামাণ্য জীবনী লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বহুল-আলোচিত গ্রন্থ THE NEHRUS: Motilal and Jwaharlal, এই গ্রন্থটিতে অবশ্য পিতা নেহরুর কথাই পুত্র নেহরু অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আলোচিত। লেখক বলেছেন—

"it was impossible to understand or interpret his life without dealing in detail with the ideas and activities of his son."

সুতরাং এই গ্রন্থে জওহরলালের বাল্য ও যৌবনের অনেক কথা পাওয়া যাবে। গ্রন্থটির সমাপ্তি ঘটেছে ১৯৩১-এ মোতিলাল নেহরুর মৃত্যুর সঙ্গে এবং সেই কারণে তাঁর পুত্রের জীবনের সর্বাপেক্ষা সাফল্যজনক কালের কথা কিছুই পাওয়া যাবে না এই গ্রন্থে। পিতা-পুত্রের জীবনের পারস্পরিক এবং তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনেই পুত্র নেহরুকে এই যুগ্ম-জীবনী গ্রন্থে অনেকখানি স্থান দিতে হয়েছে, আসলে এই গ্রন্থ মোতিলাল নেহরু ও তৎকালীন ভারতের পরিচয়গ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত নন্দ অনেক মূল এবং অপ্রকাশিত তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন, গোপনীয় সরকারি নথিপত্র এবং গান্ধী-সপ্রুর কাগজপত্র। এর ফলে গ্রন্থটি একটি আকর-গ্রন্থের মর্যাদালাভ করেছে, অনেক তথ্য ও ঘটনা সমাবেশে পরিপূর্ণ। তবে লেখকের পক্ষে যে সুবিধা এবং সুযোগ লাভের ব্যবস্থা ছিল তিনি তার যথোচিত সুযোগ গ্রহণ করেন নি বলে মনে হয়।

গান্ধীজী একদা বলেছিলেন—"Motilal's love for India was derived from his love for Jwaharlal—" কথাটি কতখানি সত্য তার বিচার প্রয়োজন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সাতাশ বছরের মোতিলাল এলাহাবাদ কংগ্রেসের ডেলিগেট হয়ে যোগদান করেন। তাঁর সমকালীন অন্যান্য আইনজীবিদের মত তিনিও ছিলেন মডারেট, কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের প্রতি তাঁর কোনও সহানুভূতি ছিল না। থাকা সম্ভব নয় কারণ তিনি ছিলেন তাঁদের দলে যাঁরা কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ এবং সম্মান উপার্জন করেছেন।

To one who had worked his way up the hard way, it was also an irritation that some of this young fire brands had no recognisable profession — except perhaps that of patriotism.

মোতিলাল দুঃখবোধ করলেন যে, এই সব চরমপন্থীদের ভাবাদর্শ ইউ পি'র যুবকমহলে সমর্থন লাভ করেছে। তখনও তিনি বুঝতে পারেন নি যে এই সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণশক্তি অসীম এবং নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত তাঁর হ্যারো স্কুলস্থিত পুত্রকেও আক্রমণ করেছে। জওহরলাল অতি অল্পবয়স থেকেই রাজনীতিতে আগ্রহান্বিত হন। নয়া ক্যাবিনেট সদস্যদের (ক্যাম্বেল-ব্যানার ম্যান) সকলের নাম এই একটি মাত্র ছাত্রই বলতে পেরেছিলেন। যখন তাঁর পিতৃদেব রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ তখন জওহরলাল পিতাকে লিখলেন—

"You may not agree with the ways of new Extremist Party but I do not think that you are such a slow and steady sort of person as you make yourself out to be."

সুচতুর উক্তি সন্দেহ নেই। এই কালে জওহরলাল কংগ্রেসের সম্পূর্ণ সমর্থক। আয়র্লাণ্ডে ভ্রমণ করতে গিয়ে জওহরলালের মাথায় একটা নতুন ভাবধারার উদ্ভব হল। পিতাকে তিনি প্রশ্ন করলেন—"আয়র্লাণ্ডের সিন ফিন দলের নাম শুনেছ কি?" ভারতের চরমপন্থী দলের সঙ্গে এই সিন ফিনদের মিল সমান্তরাল খাতে প্রবাহিত। ফলে পিতা-পুত্রে বিতর্ক শুরু হল, একজন মডারেট বা নরমপন্থী অপরটি তরুণ উগ্র চরমপন্থী। এমনকি পুত্র একদিন পিতাকে লিখে বসলেন—

"The Government must be feeling very pleased with you at your attitude, I wonder if the insulting offer of a Rai Bahadurship, or something equivalent, would make you less of a moderate."

পিতা এই পত্র পেয়ে রেগে আগুন, পরে অবশ্য পুত্র ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন।

জওহরলাল ফিরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই পিতা ও পুত্র বাঁকীপুর কনফারেন্সে যোগদান করে নিরাশ হলেন। ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ কিঞ্চিৎ বিরতি সৃষ্টি করল। আনী বেসান্তের "হোম রুল" আন্দোলন পুত্রের কাছে প্রীতিকর হলেও পিতার কাছে তা হল না। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আনী বেসান্তকে দণ্ডিত করায় মোতিলাল কিন্তু আন্দোলনে যোগ দিলেন আরো অনেক উদারনীতিকদের সঙ্গে। মোতিলাল অতিশয় উদারনীতিক—

"They fail to realise how deeply interested we are in the maintenance and permanence of the British connection in India."

কিন্তু যে ব্রিটিশকে তিনি বিশ্বাস করতেন সেই ব্রিটিশ তাঁকে কাবু করে ফেলল। যুদ্ধোত্তর সংস্কার তাঁকে গভীর হতাশায় মগ্ন করল এবং যে সব উদারনীতিক নেতা তা গ্রহণ

করলেন তিনি তাঁদের দল ত্যাগ করলেন। পিতার স্বপ্নভঙ্গ কিন্তু পুত্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি ত' অনেক আগেই হ্যারো থেকে পিতাকে লিখেছিলেন—

"as regards John Bull's good faith I have not so much confidence in him as you have."

এই কালে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন—'Holy Ghost', ত্রিমূর্তি একত্র হলেন। সত্যাগ্রহ জওহরলালকে আকর্ষণ করল, মোতিলালকে নয়। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পেল, মোতিলাল গান্ধীজীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন আর গান্ধীজীও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন—"এমন কিছু করা কর্তব্য নয়, যা তোমার পিতাকে পীড়িত করবে।"

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মোতিলাল এবং আরো অনেককেই চরমপন্থীদের দলে ভিড়িয়ে দিল। শ্রীযুক্ত নন্দ বলেছেন যে, বোম্বাই সরকার একবার জিন্না, গান্ধী ও সরোজিনী নাইডুকে বর্মায় চালান দিতে মনস্থ করেছিল। এই মনোভঙ্গীই জালিওয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করেছে। অবশেষে মোতিলাল অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন।

"Motilal prided himself on his objectivity, but it is a strange paradox that in the greatest decision of his life he was guided as much by his heart as by the head. It was love of his son that enabled him to take the last crucial step over the precipice."

সংগঠনী মনোভাব মোতিলালের মনে মনে ছিল, তাই আন্দোলনের ব্যর্থতার পর তিনি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। গয়া কংগ্রেসে পরাজিত হয়ে তাঁরা স্বরাজ্য পার্টি গঠন করে গান্ধীর দল থেকে সরে গেলেন। সব-শ্বেত সাইমন কমিশন তাঁকে আবার উৎপীড়িত করল। বার্কেন হেডের সদম্ভ চ্যালেঞ্জ যে ভারতীয়রা তাদের কনষ্টিটিউশন গঠন করুক তিনি গ্রহণ করলেন এবং সংগঠন কমিটির চেয়ার ম্যান হলেন। নেহরু রিপোর্ট প্রকাশিত হলে উগ্রপন্থীরা 'ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস গ্রহণে আগ্রহ দেখে হতাশ হলেন। মুসলিম লীগ এই রিপোর্ট গ্রহণ করলেন না। জিন্নার দাবী 'সংরক্ষিত নির্বাচন'। মোতিলাল ও জিন্নার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। এদিকে ব্রিটিশ আবার সাহায্য করল—তারা বলল, না—ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাসও হবে না। মোতিলাল তখন বললেন— "The need of hour is the head of Gandhi and voice of Jwahar."

লাহোর কংগ্রেসের পুত্রের সভাপতিত্ব পিতা দেখলেন। মোতিলাল এখন পুরোপুরি গান্ধীবাদী। এমন কি গান্ধীর চাইতেও তিনি উগ্র, কারণ গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট তাঁর মনঃপূত হত না। তখন অবশ্য মোতিলাল আর ইহজগতে নেই। লেখক বলেছেন—

The love of his son, turned the last years of his life from a placid pool into a raging torrent, but it also lifted him from the position of a prosperous lawyer to the apex of national leadership."

পিতা তাই এই গ্রন্থে সর্বপ্রধান ভূমিকায় পুত্র তাঁর পরিপূরক মাত্র।

মাইকেল এডওয়ার্ডস সম্প্রতি নেহরুর একটি সচিত্র জীবনী প্রকাশ করেছেন। এটিকে ছবির পারিবারিক এলবাম বলা যায়। ১৯১৯ থেকে যে মানুষটি ভারতের মর্মকেন্দ্রে বিচরণশীল এই গ্রন্থে সেই জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর পারিবারিক জীবনের অসংখ্য চিত্রাদি সন্নিবেশিত। ১৬৩টি ফটোগ্রেভিয়ার পন্থায় মুদ্রিত ছবি এই গ্রন্থের সম্পদ। এই গ্রন্থের চিত্রাদি নেহরুজী এবং তাঁর পরিবারবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত। পারিবারিক চিত্র ছাড়া ভারতের গ্রাম ও মানুষের অনেক ছবিও এই গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থেও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস আছে এবং সেই সংগ্রামে "the relative roles played by Nehru himself, his father Motilal, Gandhi and Jinnah."

ভারতের সাম্প্রতিক এবং সমসাময়িক ইতিহাসে যাঁরা আগ্রহশীল এই দুটি গ্রন্থ তাঁদের কাছে অতিশয় মূল্যবান বিবেচিত হবে। *

THE NEHRUS — Motilal & Jwaharlal: By B. R. Nanda George Allen & Unwin—30 Shillings

NEHRU: A Pictorial Biography: By Michael Edwards: Asia Publishing: Rs 15/-.

বাংলা ভাষায় প্রয়োগ-বিজ্ঞান

হাওড়া উন্নয়ন সংস্থার মুখ্য বাস্তুকার শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রয়োগ-বিজ্ঞানের কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় একটি অতি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মশততম পূর্তি বৎসর উপলক্ষে। ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

"...বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন বঙ্গ ভাষায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, প্রয়োগবিজ্ঞান বিষয়ের চর্চার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী। বর্তমান পুস্তক সেই অভিযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ —অভীষ্টের পথ বহুদূরে। এই পুস্তকে বিভিন্ন সাধারণ প্রয়োগবৈজ্ঞানিক বিষয়ের প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। জনগণের কিঞ্চিৎ হিতে ও জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ এবং উদ্বুদ্ধ করিলে শ্রমসার্থক মনে করিব।"

গ্রন্থটিতে যে-যে বিষয়ে আলোচনা তোলা হয়েছে তা এই : (১) পানীয় জল, (২) পয়ঃপ্রণালী বা গন্ধনালা, (৩) ময়লা পরিশোধন, (৪) সেতুর কথা, (৫) সেচ, (৬) নগরীর অভ্যুদয় ও ভারতীয় নগরীর বিবর্তন ধারা, (৭) গৃহনির্মাণ, (৮) আলোক ব্যবস্থা, (৯) সুড়ঙ্গ-বিদ্যা ও (১০) ধূলি।

বিষয়গুলো এমনই যে আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার অতি ঘনিষ্ঠ যোগ। অথচ আমরা অনেকেই তার বৈজ্ঞানিক কারিগরী ও কৃতিত্ব সম্পর্কে অনবহিত। অতিসাধারণ একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে হাওড়া ব্রিজের উল্লেখ করা চলে। হাওড়া ব্রিজের নির্মাণকৌশল ও তৎসম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্য সম্ভবতঃ আমাদের অনেকেরই অজানা। তেমনি, ভারতের তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে যে বিপুল সেচব্যবস্থা রূপায়িত হয়ে উঠেছে সে-সম্পর্কেই বা কতটুকু আমাদের জ্ঞান? আলোচ্য গ্রন্থে এমনি কতকগুলো অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

গ্রন্থকারের আলোচনার ভঙ্গী মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল। অজস্র চিত্রের সাহায্যে আলোচ্য বিষয়কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রতিশব্দ রচনার প্রয়াস প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। বিজ্ঞানের ছাত্ররা তো বটেই, এমন কি শিক্ষকরাও গ্রন্থটি পাঠ ক'রে উপকৃত হবেন।

গ্রন্থের অন্য একটি আকর্ষণও আছে। আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মশাস্ত্র পুরাণ এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য থেকে অজস্র প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি চয়ন করা হয়েছে। ফলে অবৈজ্ঞানিক পাঠকের কাছেও এই বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থটি হৃদয়গ্রাহী মনে হতে পারে।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রয়োগ-বিজ্ঞান কথা—সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন। কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

।। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ।।

ডঃ পরিমল রায় শিক্ষাজগতে স্বনামধন্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে তাঁর গভীর জ্ঞান। রাষ্ট্রসংঘের ট্রাস্টি-সীপ কাউন্সিলের তিনি উপদেষ্টাও ছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বিবর্তনের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তিনি 'সাম্রাজ্য-বিস্তার', 'স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক সংঘ' নামে তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সাম্রাজ্য-লালসায় বিভিন্ন জাতি ও দেশ কিভাবে বিজিত ও শৃংখলিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক শক্তিসংঘের প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক পটভূমি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়েছে বিদগ্ধ লেখক তার সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের স্নাতক-পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি মূল্যবান বিবেচিত হবে। সাংবাদিকদের কাছেও রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে এই মূল্যবান গ্রন্থ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে। গ্রন্থটি সুন্দরভাবে ছাপা এবং বাঁধানো।

সাম্রাজ্য বিস্তার, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক সংঘ— ডঃ পরিমল রায়। প্রকাশক ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

•

।। মার্কিন রাষ্ট্রপতির জীবনকথা ।।

জেফারসনের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এণ্ড্রু জ্যাকসন এবং উড্রো উইলসন এই দুজনের নাম উল্লেখযোগ্য। দুজনেই ছিলেন ডেমোক্রাট দলভুক্ত। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই উইলসন প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য মনোনীত হন, ৪ঠা নভেম্বর তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন, ৪ঠা আগস্ট, ১৯১৪, জার্মানীর বিরুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণা আর ১৮ই আগস্ট উইলসন-এর নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেন। ১৯১৬-তে তিনি পুনর্বার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন, ১৯১৭—২রা এপ্রিল তাঁকে শেষ পর্যন্ত জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর যুদ্ধবিরতি, ১৯২০-তে হার্ডিং প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯২৪-এ উইলসনের মৃত্যু হয়। ক্লিফোর্ডস্মিথ-কৃত এই কর্মবহুল জীবনের কথা অনুবাদ করেছেন জগদানন্দ বাজপেয়ী। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

উড্রো উইলসন— ক্লিফার্ড স্মিথ। অনুবাদ—জগদানন্দ বাজপেয়ী। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী। ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম—২·৫০ নয়া পয়সা।

শারদীয় সংকলন

● ভবানী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা বার থেকে প্রকাশিত **বৈতানিক**-এর শারদ সংকলনে লিখেছেন — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিশু মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, মনীশ ঘটক, দিনেশ দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, রাম বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্র মজুমদার, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, আদিত্য ওহদেদার, সুধীর করণ, গোপাল ভৌমিক, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র পাল এবং আরো কয়েকজন। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

● **অব্যয় সাহিত্য।** লিখেছেন— তারাপদ রায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, মৃণাল বসু চৌধুরী, অতীন্দ্রিয় পাঠক, উৎপলকুমার বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, তপনলাল ধর, সুভাশিস গোস্বামী, চিত্ত দেব, অপূর্বকুমার সাহা প্রভৃতি কয়েকজন। তপনলাল ধর ও মনোজকুমার ঘোষের সম্পাদনায় ৪৫ সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির দাম ত্রিশ নয়া পয়সা।

● কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত **যষ্ঠি-মধু**-তে লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর রায়, নরেন্দ্র দেব, আশাপূর্ণা দেবী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল রায় এবং আরো অনেকে। ৪৫।এ গড়পার রোড থেকে প্রকাশিত। পত্রিকাটির দাম এক টাকা প'চাত্তর নয়া পয়সা।

● **সমাচার** (১৩৭০)—অনিল ভট্টাচার্য ও সত্যব্রত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। লিখেছেন বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, গোরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, উৎপল কুমার বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সত্যব্রত চক্রবর্তী, অশোকবিজয় রাহা, সুশীল রায়, চিত্ত ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, বিনতা রায়, ধ্রুব দে, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ, কিরণকুমার রায়, কৃষ্ণ ধর, চিরঞ্জীব সেন, বিমল চৌধুরী, কার্তিক লাহিড়ী, অর্ধেন্দু দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন। দাম এক টাকা প'চাত্তর নয়া পয়সা।

● **মানব মন** ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় ১৩২।১ বিধান-সরণি কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম দুই টাকা। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার দেব, পরিতোষ গুপ্ত, সন্তোষকুমার দাস, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী, ভি বনশিকভ, সর্বাণী গুহ সরকার, আই পি পাভলভ।

● **সমকালীন** আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সম্পাদনায় ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন--ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অমৃতময় মুখোপাধ্যায়, চণ্ডী লাহিড়ী, অজিত দাস, রণজিৎকুমার সেন, নরেন্দ্রকুমার মিত্র, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, বাসুদেব দেব, রবি মিত্র, দেবব্রত চক্রবর্তী, বিমানবিহারী মজুমদার। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

● জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত **ডার্লপিটেদের সমাচার**-এ ছোটদের উপযোগী বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় রচনা সংকলিত হয়েছে। দাম এক টাকা।

● **চতুষ্পর্ণা** (১৩৭০)—অরুণ ঘোষের সম্পাদনায় ২০এ রাধানাথ মল্লিক লেন কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। নতুন পত্রিকা হ'লেও লেখক নির্বাচনে চতুষ্পর্ণা ইতিমধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। বর্তমান সংখ্যায় চারটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও কবিতা সিংহ। গল্প লিখেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দিবোন্দু পালিত, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন —বিষ্ণু দে, দিনেশ দাস, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আলোক সরকার, শরৎ মুখোপাধ্যায়, সুনীল নন্দী, তারাপদ রায়, মানস রায়চৌধুরী, কমলেশ চক্রবর্তী, শামসুল হক, সুখেন্দু মল্লিক, প্রণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও অরবিন্দ গুহ। অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, সন্দীপণ চট্টোপাধ্যায়, মতি নন্দী, জ্যোতির্ময় বসু রায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুদ্ধ থেকে ফিরে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম;
বিজয় গৌরব নিয়ে ফিরে এসেছি।
পৃষ্ঠে আমার কোনো ক্ষতকলঙ্ক নেই,
যা কিছু আঘাত সবই সম্মুখে।

রণাঙ্গনে আমি অনেক শিখেছি।
কী অদ্ভুত প্রশান্তির সঙ্গে মৃত্যুকে ওরা
বন্দনা করে, আলিঙ্গন করে ধন্য হয়!
প্রয়োজন হলে আমিও তেমনি ভাবেই
মৃত্যুকে চুম্বন করে কৃতার্থ হবো।

সীমান্তে এখন নিস্তব্ধতা,
কিন্তু কখন আবার শত্রুর কামান
গর্জে উঠবে কে জানে? জীবনটা তো আর
শুধুই কবিতা নয়, সংগ্রামও। এবং আমিও
সতর্ক সেনানী, শান্তি চাই বটে কিন্তু
যুদ্ধের জন্যেও সর্বদা প্রস্তুত!

এখন সাময়িক বিশ্রাম।
নদীর ঘাটে একটু বেড়াতে এসেছিলাম।
ফেরবার পথে ঘাটের শেষ সিঁড়িতে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই নদীরই স্বচ্ছ নীলে
বার বার নিজেরই অবিকৃত ছায়া দেখছিলাম,
আর আপন মনে পরম আনন্দে হাসছিলাম।
ওপারেও তখন অস্তরাগে সূর্য-হাসি।

কেবল মায়ের কথা

অতীন্দ্র মজুমদার

সকালে গ্রামের নদী হব বলে পথে নেমে এসে
অনেক পথের ধূলি পায়ে পিষে যত আগে যাই—
রৌদ্রের চাবুক তত নগ্ন গায়ে উন্মত্ত নিষ্ঠুর
দৈত্যের প্রহার হয়ে বর্বর কৌতুকে অবশেষে
নিয়ে আসে দগ্ধ মাঠে, বন্ধ্যা মাঠে; কোন ছায়া নাই
সেই সব পত্রহীন বৃক্ষের কঙ্কালে; কোন সুর
ওঠে না হাওয়ায় শুধু দস্তুর সূর্যের কিরণ
দুই চোখ অন্ধ করে, মাংস খায় চামড়াকে ছিঁড়ে
শবলুব্ধ হায়নার মত। সেই মায়ের দুপুরে
আহত সমস্ত সত্তা দুই ঠোঁটে বিড়বিড় করে
কেবল মায়ের কথা কেবল মায়ের কথা
কেবল মায়ের কথা বলে ক্লান্ত ঝাউয়ের মর্মরে ॥

সকালে সমস্ত নদী আলো হবে এই কথা ভেবে
ধূসর বিকেলে এই পথে নামি। কখন সন্ধ্যায়
বিকেলের আলোগুলি অন্ধকার-দৈত্যের নখরে
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়—রাত্রির রজনীগন্ধায়
ধুলো কাদা নিষ্ঠীবন ছুঁড়ে দিয়ে বীভৎস কৌতুকে
নরকের প্রেতগুলি খেলা করে, প্রহরে প্রহরে।
তীক্ষ্ন তীব্র অন্ধকার নগ্ন দেহ চাবুকে চাবুকে
রক্তাক্ত বিক্ষত করে, হতাশার শাণিত ছুরিকা
দুই চোখ অন্ধ করে, রক্ত শোষে লোলুপ জিহ্বায়,
তখনও সমস্ত সত্তা দুই ঠোঁটে বিড়বিড় করে
কেবল মায়ের কথা কেবল মায়ের কথা
কেবল মায়ের কথা বলে রিক্ত ঝাউয়ের মর্মরে ॥

শিল্পের অন্বয়ে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বহু পথ ঘুরলাম ইতস্তত স্বপ্নের ভিতরে।
দেখি যদি কোনো গৃহে সহজ বিশ্বাসে সমর্পণ
করা যায় শরীর, হৃদয়। ফুলগুলি ফোটে ঝরে
বৈশাখে, আশ্বিনে, মাঘে; দুহাতে যৌবন

আকাশ বিলিয়ে দিল শূন্যে শূন্যে, খরধার নদী
নিবিড় রোমাঞ্চ আনে উপকূলে, তৃষিত উপলে;
কী এক নিবিড় প্রেম ভুলে গিয়ে স্বকীয় পদ্ধতি
দলিত আশার স্তূপে জোনাকির মতো নেভে জ্বলে।

বহু পথ ঘুরলাম। একবার কোথাও অন্তত
দেখবো প্রত্যাশা ছিল অন্তরালে নৈঃশব্দের হাতে
একটি উল্লেখযোগ্য প্রতীক্ষায় অভিষিক্ত, নত
জন্ম-মৃত্যু-ক্লান্তিহরা বিম্বাধরা মায়াবী গোলাপ।

কিন্তু, না, কোথাও কোনো প্রবাহিত স্বরে
ঘনিষ্ঠ স্নিগ্ধতা নেই, গোলাপের বর্ণ কোনোখানে
অনন্য আলোকরেখা ফোটায়নি ক্ষুধিত পাষাণে,
অনেক অপরিণত ইচ্ছাভ্রূণ অঙ্কুরেই লীন।

বহু পথ ঘুরলাম ইতস্তত স্বপ্নের ভিতরে।
স্বপ্নগুলি ছায়ামূর্তি, সুদুর্লভ নারীর শরীর;
নিরাময় হব আমি, একদিন ফিরে যাব ঘরে—
এই আশা জেগে থাকে নিরন্তর শিল্পের অন্বয়ে।

মহাহেনোর আতঙ্ক

এস ডব্লু আর ডি
বন্দরনায়ক

সিংহলের পরলোকগত প্রধান-মন্ত্রী এস-ডব্লু-আর-ডি বন্দর-নায়ক একজন শুধু প্রথম শ্রেণীর আইনজীবী ও রাষ্ট্রনেতা ছিলেন না, ইংরেজী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি।

রহস্য-কাহিনীটি কলম্বোর ইংরেজী দৈনিক "টাইমস অফ সিলোন" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

তখন সন্ধ্যা। ক্লাবে টেনিস খেলাটা বেশ জমে উঠেছিল। আমি রীতিমত হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। বাড়ী ফিরে গরম জলে স্নান সেরে খানিকটা আরাম বোধ করলাম। তারপর বারান্দায় গিয়ে আরাম-কেদারায় এলিয়ে দিলাম। নিজেকে। পাশে রইল ঠাণ্ডা সরবতের গ্লাস। আর হাতে সান্ধ্য সংবাদপত্র।

সারাদিনের খাটুনির পর সন্ধ্যাবেলাটা এভাবে কাটাতে আমার বেশ লাগে। অবশ্য কাজকর্মের কথা—বিশেষ করে ভোর-বেলাকার পাখী আর পোকা-মাকড়দের কথা আলাদা। নবারুণ সূর্যের বর্ণচ্ছটার প্রতি তাদের রয়েছে সহজাত আকর্ষণ। আমার কিন্তু মনে হয়, সন্ধ্যার সুখকর পরিবেশের পাশে কিছুই যেন দাঁড়াতে পারে না।

কেননা, সন্ধ্যার কালো যবনিকা যখন ছায়াঘন গাছপালার মাথায় নেমে আসে আর পাখীরা যখন নিদ্রাজড়িত সুরে কিচ-মিচ শব্দ করে ওঠে, সারাদিনের কর্ম-কোলাহল আর কড়া চোখ-ঝলসান রোদের পর তখন বিরাজ করতে থাকে সুস্নিগ্ধ প্রশান্তি। এক অনির্বচনীয় পরম তৃপ্তি দান করে সে আমায়। আমি কি তখন ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে আগামী দিন-কয়েকের মধ্যে আমাকে আর আমার বন্ধু রাতসিংকে ভয়াবহ এক দুঃসাহসিক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে?

খবরের কাগজের উপর আমি চোখ বুলোতে লাগলাম। খেলার পাতাটায় আকর্ষণীয় তেমন কিছু নেই। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন কোন মারাত্মক খুন-খারাপিও ঘটে নি যার খবর ফলাও করে প্রকাশ পাবে সংবাদপত্রের পাতায়। দেশের স্টার্লিং ব্যালেন্স সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটাও যেমন নীরস, তেমনি তথ্যহীন।

কলিংবেলটা সহসা বেজে উঠল। ডাক-পিওনের ঘণ্টা শোনা গেল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ডাকে-আসা চিঠিগুলি থেকে একখানা চিঠি হাতে করে আমি সিধে হয়ে বসলাম। খামের উপর পরিষ্কার ক্ষুদে ক্ষুদে হস্তাক্ষরে লেখা আমার নাম ও ঠিকানা। আর মহাহেনা ডাকঘরের ছাপ। আমার এক দূর-সম্পর্কিত মাসতুতো বোন লীলারই লেখা চিঠি। সিংহলের অভিজাত শ্রেণীর ছন্দহীন

জীবনযাত্রার মধ্যে যদি সোসাইটি গার্ল বলতে বিশেষ কাউকে বোঝায়, লীলা পেরেরা ছিল তাই। একদা কোন এক কৃষ্টিসম্পন্ন বিদেশী পর্যটক এক সিংহলকে যদি সাংস্কৃতিক মরুভূমি বলে

অভিহিত করে যেতেন, তবে তিনি বুঝি অধিকতর ভালো করতেন।

লীলা স্কুলে পড়াশুনায় খুবই ভালো ছিল। টেনিস খেলাতেও পারত ভালো। দেখতেও ছিল সে বেশ সুন্দর। স্কুল ছাড়ার পর আমাদের আর সব সাধারণ সোসাইটি মেয়ের মত লীলাও হয়ে উঠল ফ্যাসানেবল 'সমাজ সেবা সমিতি'র সভ্যা। চোখ-ঝলসানো মোহিনী শাড়ী পরে যেতে শুরু করলে সে রেস-এর মাঠে আগস্ট মাসে। যথারীতি প্রতি বছর গিয়ে দাঁড়াতে লাগলো সে ক্যামেরার মুখে। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের বৈচিত্র্যহীন পার্টিতেও নিয়মিত যোগদান করতে লাগল। আর কোন সিনেমাও বাদ গেল না।

এক সময় লীলাকে আমি ভালবাসতাম। এ আশাও পোষণ করতাম যে সে হয়ত একদিন আমার গলায় বরমাল্য অর্পণ করবে। কিন্তু এমন সময় মূর্তিমান ধূমকেতুর মত রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলো স্মরণীয় নায়ক আনন্দ লিভেরা, আর লীলার চিত্ত জয় করে প্রচণ্ড ঝড়ের মত ফিরে গেল মহাহেনার গভীর অরণ্যে।

আনন্দ ছিল একজন পয়লা নম্বরের খেলোয়াড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ক্লাশ বিজ্ঞানের ছাত্র। ইচ্ছে করলে রাজনীতি বা আইনের ব্যবসায়ে অথবা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সে সেরা স্থানই অধিকার করতে পারত। অবশ্য যদি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তাকে শেষ পর্যন্ত সম্মত করানো যেত।

কিন্তু কোনটাই সে করল না। মহাহেনার গভীর বনজঙ্গলকেই সে বরং বেছে নিল। শিকার করে সে বেড়াত বন্য জন্তু-জানোয়ার। বছর দুই তারপর কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন সে এসে উপস্থিত হল রাজধানী কলম্বোয়। দেখা করল লীলার সঙ্গে। প্রেমে পড়ল তারা। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বিয়ে করে উধাও হোল লীলাকে নিয়ে মহাহেনার শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যবাসে।

স্মৃতির তার গেল ছিন্ন হয়ে।

'রিচার্ড, আমি কিন্তু কখনো আশা করিনি যে মেয়েদের মত তুমিও চিঠির খামটা না ছিঁড়ে অমনি করে ভাবতে বসবে?'

আমি রীতিমত চমকে উঠলাম। মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, জন রাতসিং কখন এসে বারান্দায় খাড়া দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে তার চির-পরিচিত সেই ঝাফন্ সিগার। মার্জারের মত নিঃশব্দ পদক্ষেপে জন এসে কখন পিছনে দাঁড়িয়েছে, আমি টেরই পাইনি।

'এসো জন, এসো।' আমি হেসে উঠলাম, —'অমন করে তুমি চুপিচুপি পেছনে এসে দাঁড়ালে আমার বুকের ধুক-ধুকিটাই দেখছি একদিন বন্ধ হয়ে যাবে।'

লীলার খামটা আমি তারপর একটানে টেনে ছিঁড়ে ফেললাম। আর ডুবে গেলাম তার মধ্যে। লীলা লিখছে :

মহাহেনা
জুন, ১৯—।

প্রিয় রিচার্ড,

আমাকে তুমি এখন কি ভাবছো জানি না, তবে পুরনো বন্ধুদের আমি একেবারে ভুলে গেছি কখনো ভেবো না। প্রথমে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। তোমাকে তাই লিখে উঠতে পারি নি। রিচার্ড, আজ আমি বড় বিপন্ন। আমি জানি, যথাসাধ্য সাহায্য আমায় তুমি করবে। কিছুকাল থেকে আমাদের এখানটায় এক রহস্যজনক হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত তিন মাসে একটি মেয়ে ও দুটি বালককে এভাবে প্রাণ হারাতে হয়েছে। হতভাগা তিন জনেরই দেখা গেছে গলাটা থেৎলানো, ছিন্নভিন্ন। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ধস্তা-ধস্তি ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের ছাপ রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মৃতদেহের সর্বাঙ্গে কোথাও এক ফোঁটা রক্ত নেই। মাটিতেও পড়েনি এক ফোঁটা। পুলিশ আর এখানকার সবাই এ-রহস্য উদ্ঘাটনে তৎপর হয়ে উঠেছে। কলম্বো থেকে জনকয়েক সি-আই-ডিরও বুঝি আগমন হয়েছিল। দিন কয়েক তাঁরা এদিক-ওদিক অনুসন্ধান করে বেড়ালো। কিন্তু সবই বৃথা; রহস্য যেমন ছিল তেমনি থেকে গেছে। এখনও কোন সমাধান হয়নি। আনন্দও ওদের সঙ্গে খুব মেতে উঠেছিল। সব রকমের সাহায্য করলে পুলিশকে। আমি তো বুঝতে পারি, মুখে কিছু না বললেও সেও কম অবসন্ন হয়ে পড়ে নি। গাঁয়ের লোকেরা এদিকে ভয়ানক আতঙ্কিত। বলাবলি করেছে, এসব রীরী যক্ষেরই আক্রোশ। কি করব জানি না। নিজেও তেমন সুস্থ নই। খুব ভেঙ্গে পড়েছি। রিচার্ড, সেদিন তোমার বন্ধু মিঃ জন রাতসিং-এর অনুসন্ধিৎসু অভিযান-কাহিনীর বিবরণ পড়ছিলাম। তিনি কি আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন না? দিন কয়েকের জন্য তাঁকে নিয়ে তুমি এখানে এসো, লক্ষ্মীটি। তোমাকে আমি যা লিখলাম, আনন্দকে তা জানতে দিয়ো না। ও হয়তো ভাববে, মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। তুমি শুধু একটা তার করে দিয়ো যে এক বন্ধুকে নিয়ে তুমি এখানে সপ্তাহ শেষে আসছো। আনন্দও তাতে খুশী হবে। বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য ও সাহচর্য সব সময় ভালোবাসে। এ শুক্রবারেই তুমি বরং এসো। দোহাই, ভুলো না, লক্ষ্মীটি!

তোমারই একান্ত
লীলা লিভেরা

বার দুই চিঠিখানা পড়লাম। তারপর নিঃশব্দে তুলে দিলাম জনের হাতে। সেও পড়লে নিবিষ্টমনে। তাকে কিছুটা বিচলিত লক্ষ্য করলাম। ঠোঁটের সিগারেটটা সে খালি দাঁতে চেপে ধরতে লাগল। ঠোঁটের এপাশ থেকে ওপাশে নিতে লাগল বার বার। এ বুঝি আবিষ্টতারই লক্ষণ।

'বেশ রহস্যময় বলে যেন মনে হচ্ছে রিচার্ড।' জন চিঠিখানা আমাকে ফিরিয়ে দিল।

বলল : 'অনেকগুলি সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে। আমাদের বরং যাওয়াই ভালো, কি বলো?'

'সত্যি, ভারী চমৎকার হয় তা হলে।' আমি এক্ষুনি তার করে দিচ্ছি। তা শুক্রবার কখন রওনা হচ্ছো?'

'দাঁড়াও, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এ শুক্রবার আমার একটা ছোট মামলা আছে।' জন জবাব দিলে। 'লাঞ্চের পর দুটো নাগাদ যাওয়া যেতে পারে, কি বলো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। শ'খানেক মাইল তো মাত্র পথ। আমার ফোর্ড মারকারীখানিই নেওয়া যাবেখ'ন। শুক্রবার দুটো নাগাদ আমি তোমাকে তোমার বাংলো থেকে তুলে নেবো, কেমন?'

সমুদ্র-নিকেতন

জন রাতসিং তার সীটে বসে চোখ বুজে রইল। গাড়ী আমাদের নিয়ে চলল দক্ষিণমুখো মহাহেনার দিকে।

রাতসিংকে দেখে মনে হবে, সে বুঝি ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ এক সময় সে লীলার চিঠিখানা চেয়ে নিলে আমার কাছ থেকে। চিঠিখানা আবার পড়লে সে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে। আমরা যখন মহাহেনা গ্রামে এসে পৌঁছলাম তখন পাঁচটা বেজে গেছে। বিরাট ফটক পার হয়ে আমরা মহাহেনা স্টেটে ঢুকে পড়লাম। গাড়ী চালাচ্ছি আমি, সারি সারি নারিকেল গাছ পাশে রেখে। বাংলোখানা বিপুল আয়তনের। সমুদ্রের উঁচু পাড়েই। সাদা ধবধবে খিলান আর দেয়ালের উপর সান্ধ্যসূর্যের স্বর্ণাভা পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছে।

'কি নয়নাভিরাম দৃশ্য'; মুগ্ধ কন্ঠে আমি বলে উঠলাম। 'এ যেন রক্ত দিয়ে লেখা দৃশ্যপট।'

'কি ভয়ঙ্কর উপমা।' জন বলে উঠল বিড়বিড় করে। আমিও আঁতকে উঠলাম।

'বুঝলে রিচার্ড,' জন বলে উঠল ধীর সমাহিত কন্ঠে '—অনেক সময় সুন্দর আর অসুন্দরের—ভয়ঙ্করের—মধ্যে খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না, কিন্তু?'

ইতিমধ্যে আমরা এসে পড়লাম বাংলোয়। লীলা আর আনন্দ দুজনই বারান্দায় নেমে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। লীলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল আমায় দেখে। আনন্দও কম গেল না। জন রাতসিংয়ের সঙ্গে আমি ওদের আলাপ করিয়ে দিলাম। রাতসিং-এর নাম শুনে আনন্দর চোখদুটি জ্বলজ্বল করে উঠল। বললে :

'আসুন, আসুন। মিঃ রাতসিংকে পেয়ে আমি আরও খুশী হলাম। আপনার কথা কত শুনেছি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমার অনেকবারই ইচ্ছে হয়েছে। এখানকার একঘেয়ে জীবনযাত্রায় দম আটকে আসছিল।'

আনন্দ হেসে উঠল উচ্চস্বরে। আবার বলল : 'আশা করি, আপনাদের তা হবে না।'

'না হবারই তো কথা।' জন জবাব দিল মিষ্টিভাবে। '—এমন এক সুন্দর স্থানে তা কল্পনা করাও কঠিন।'

'আপনাদের অনেকখানি পথ আসতে হয়েছে গাড়ীতে। নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।' লীলা বললে বাধা দিয়ে। '—ইলিয়াস আপনাদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। যান, হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। বাগানে বসে তারপর চা খাওয়া যাবে।'

ছোকরা ইলিয়াস এক গাল হাসি-মুখে সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে তার আমাদের ব্যাগ। ওপরে আমাদের ঘর সে দেখিয়ে দিল। ঘরখানি বেশ খোলামেলা। প্রশস্ত। সামনেই দেখা যায় সমুদ্র। আসবাবপত্র বেশ সৌখীন। আরামদায়ক।

হাত-মুখ ধুয়ে আমরা বাগানে নেমে এলাম। চা-পান করা গেল।

'এ এক আদর্শ বাগান দেখছি।' চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল জন।—'একাধারে সুরক্ষিত লন, ফুলের বাগিচা আর ছায়াঘন পুষ্পময় তরুরাজি।'

'আমিও তাই বলি', আনন্দ বললে। —কিন্তু লীলার তাতে আপত্তি।'

'বাগানখানি ফুলে ফুলময় হয়ে উঠুক, আমি যে তাই চাই সব সময়।' লীলা বুঝি সাফাই গাইলে।

'কিন্তু খুব বেশী রঙ-চঙ আর সুন্দরের সমাবেশ অনেক সময় ফ্যাকাশে ঠেকে না কি?' জন শুধালে। '—দেখুন না ঐ গোলাপটার দিকে। ওখানটায় যদি একগাদা গোলাপ ফুটে থাকত, তাহলে কি তেমন সুন্দরটি দেখাতো? ভিড়ের মধ্যেই হয়ত হারিয়ে যেত। সমষ্টির চাইতে একক সৌন্দর্যের আমি হলাম পক্ষপাতী।'

উঠে জন দুগ্ধফেননিভ বড় একটি গোলাপের নিকট এগিয়ে গেল। ফুলটি ফুটে আছে একক গৌরব-মহিমায়। গোলাপটির উপর সে একবার হাতখানি বুলালে। তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল: 'কি রমণীয় ফুলটি। তবু কিন্তু একদিন তাকে ফ্যাকাশে হয়ে ঝরে পড়তে হবে। সত্যি, কি অপচয় সৌন্দর্য আর সৌরভের!'

'আপনি দেখছি একজন রীতিমত কবি।' আনন্দ হেসে উঠল।

'না, না,' জন পাল্টা জবাব দিল। '—কবি হোল আমাদের রিচার্ড। আমি হলাম কাঠ-খোট্টা মানুষ, মশাই।'

'এ জাতের গোলাপ কিন্তু সাধারণতঃ খুব বেশী চোখে পড়ে না।' লীলা বলে উঠল। 'ওর নাম হোল—'

'দোহাই, উদ্ভিদতত্ত্বের ফিরিস্তি গেয়ে আজকের অমন সুন্দর সন্ধ্যাটিকে মাটি করে দেবেন না, প্লিজ?' জন তাকে থামিয়ে দিলে। বলল, 'জানি, গালভরা বিলেতী নাম তার আছে একটা। কিন্তু নামে কি এসে যায়, বলুন তো?'

সবাই হেসে উঠল। তারপর মেতে গেলাম নানান গল্পে। আনন্দ আর লীলার মুখে যে রুক্ষ বিষণ্ণতার ছাপ প্রথমে লক্ষ্য করেছিলাম, এখন বুঝি তা অনেকটা উবে গেল। পশ্চিম দিগন্তের কোল ঘেঁষে ঢলে পড়ল সূর্যদেব সোনা-মাখা একরাশ উজ্জ্বলতা নিয়ে। আকাশ ধীরে ধীরে হয়ে উঠতে লাগল ফ্যাকাশে —ক্রমশঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

'এখন চলুন ভিতরে যাই', লীলা বললে একসময়। 'ডিনার তো সেই আটটায়। আপনারা গিয়ে বরং একটু বিশ্রাম করে নিন।'

ডিনার খেয়ে আমরা চারজন ব্রীজ খেলতে বসলাম। একটু পরে আনন্দ আর লীলা দুজনেই কেমন উসখুস করতে লাগল। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠল। জন পাকা ব্রীজ খেলোয়াড়। খেলতে বসে অন্যমনস্ক হওয়া মোটেই পছন্দ করে না সে। তাই বার দুই গোহারার পর আনন্দ যখন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল; জনও যেন স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, লক্ষ্য করলাম।

'মাপ করবেন,' আনন্দ ফিরিস্তি গাইলে। '—এ সময় আমি একবার বেরুই। পাহারাদাররা ঠিক সময় হাজির হয়েছে কিনা নিজে গিয়ে তা একবার দেখে আসি।'

তাই আমরা দুজন উপরে যার যার ঘরে চলে গেলাম। একটু পরে জন এসে বসল আমার ঘরে। মুখে তার ঝাফনা চুরুট। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'ঝাফনা সিগারেটের কড়া ধোঁয়ায় মিসেস লিভেরাকে আমি ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চাইনি। তাই উপরে ছুটে এলাম আমার লেডি নিকোটিনের ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে।'

খোলা জানালায় হেলান দিয়ে আমি ঝুঁকে দাঁড়ালাম। চাঁদনি রাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। পূর্ণিমার মাত্র দিন তিনেক আর বাকী। বাহির-বিশ্ব যেন জ্যোৎস্না-স্নাত সৌন্দর্যময়।

'কি সুন্দর প্রশান্ত রাত্রি!' আমি বলে উঠলাম মুগ্ধকণ্ঠে। 'বীভৎসতা এখানে কিছু ঘটতে পারে, কল্পনা করা যায় না।'

'এখানেই তুমি ভুল করলে,' জন বাধা দিল। বলল: 'কেতাবী জীবনাদর্শ তোমার। নিজের চোখ-কান আর অভিজ্ঞতার উপর তোমার কোন আস্থা নেই দেখছি। জানি, রহস্য-উপন্যাসের লেখক মাত্রই মনে করে পৃথিবীটা যেন তাদের দাস, কুটিল লোমহর্ষণ চক্রান্তের বেড়াজাল যে আশেপাশে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, তুমি তা দেখেও দেখনি বলে যেন মনে হচ্ছে।'

জন আবার শুরু করল: 'আমার কি মনে হয় জানো? এক জাতের লেখক আছেন যাঁরা ভয়ংকর ও বীভৎস রসসৃষ্টি করতে গিয়ে বরং উল্টোটাই করে বসেন। এমনিতরো শান্ত আর অশান্ত, ভালো আর মন্দ, সাধারণ আর অসাধারণ পরিস্থিতির বারবার সংমিশ্রণেই তো উদ্ভব হয় প্রকৃত আতঙ্ক আমাদের বাস্তব-জীবনে। দুর্যোগময় রাত্রির চাইতে আমি কিন্তু এমনিতরো শান্ত-সমাহিত রাত্রিকে ভয় করি বিশেষ করে।'

জনের কথা মিলিয়ে যেতে না যেতে—তারই সমর্থনে বুঝি—ঠিক এ সময় দূরাগত এক বিকট আর্ত-ধ্বনি শোনা গেল রাত্রির নিঝুম নিরন্ধ্র নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে। পর পর এমনিধারা আর্তনাদ অনুরণিত হতে লাগল রাত্রির নিথর আকাশে-বাতাসে।

অনুসন্ধিৎসু চোখদুটি তুলে জন তাকালে আমার দিকে।

'ও কিছু না। শেয়ালেরই ডাক।' আমি নিজের মনে বলে উঠলাম। 'আশ-পাশের এসব বন-জঙ্গলে কি শেয়াল থাকতে পারে না?'

'শেয়াল? তাই বলো?' জন জবাব দিল। 'কিন্তু অনেক শেয়াল যে ক্ষুদে নেকড়ে বাঘের মূর্তি ধরে থাকে, রিচার্ড, তুমি কি বইতে পড়ো নি? অতিকায় বাদুড়ের কাহিনীতে এমনি অনেক নেকড়ে বাঘের কথারও উল্লেখ রয়েছে। এ ত অনেকটা অতিকায় বাদুড়ের মতো।'

আমি আঁতকে উঠলাম। অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। মিনিট কয়েক পর আবার সেই আর্তনাদ শোনা গেল। একবার দূরে, একবার কাছে। কিন্তু তেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি তীব্র। আমার অভিজ্ঞতায় কখনও এমন ঘটেনি।

আর্তনাদটা হঠাৎ থেমে গেল।

আমরা নিঃশব্দে ধূমপান করে চললাম। রাত্রির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সহসা আবার সেই দূরাগত হুক্কাধ্বনি শোনা গেল। আর এমনই ভয়ংকর ও ভয়াবহ সেই হুক্কাধ্বনি যে জীবনে আমি তা কখনো শুনি নি। শুনবো কিনা কল্পনাও করতে পারি না। 'ও কিসের ডাক, জন। দোহাই তোমার, বলো না?'

'এখন বোঝা যাচ্ছে শেয়ালের মতো এ ডাক কোন মানুষেরই।' নিস্পৃহকণ্ঠে জবাব দিল সে।

'চলো, আমরা নীচে যাই।'

আমরা নীচে নেমে এলাম। হলঘরে চাকরবাকর সব এসে জড় হয়েছে। ভীত চাপাকণ্ঠে কি সব ওরা বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে।

'কি হয়েছে?' জন শুধালো, সে বুঝি ব্যাপারটা জানতে চাইল।

'আমরা কিছু জানি না, হুজুর।' জবাব দিলে ইলিয়াস।

'তোমাদের কর্তা কোথায়?'

'সাহেব এখনো ফেরেন নি।'

কি করা কর্তব্য আলোচনা করতে লাগলাম। ঠিক করলাম, আনন্দ না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষাই করা যাক। মিনিট কুড়ি পর দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। আর হাঁপাতে হাঁপাতে আনন্দ এসে উপস্থিত হোল হলঘরে। দেহ তার ধুলি-ধুসরিত।

'হুঙ্কারধ্বনিটা তোমরাও তাহলে শুনতে পেয়েছ?' সে জিজ্ঞেস করল।

'স্টেটে টহল দিতে দিতে আমিও শুনতে পেলাম। তাই তো তাড়া-তাড়ি ছুটে এসেছি। চাকর-বাকর নিয়ে এক্ষুণি বেরুতে হবে তদারক করতে।'

'হ্যাঁ, আমরাও সবাই শুনতে পেয়েছি।' জন জবাব দিলে।

'কোন্ দিক থেকে আসছিল বলে আপনার মনে হয়?'

'এত রাত্রে শুধুমাত্র শব্দ শুনে দূরত্ব ঠিক করা একটু মুস্কিল বইকি।' আনন্দ জানালে। 'এ বোধহয় আমাদের স্টেটের মধ্যে কোথাও নয়। সিকি মাইল দূরে আর কোথাও হবে হয়তো। আপনারা দুজনও আসুন না গাড়ীতে। গিয়ে দেখা যাক। ওদিক থেকেই আর্তনাদটা এসে-ছিল বলে মনে হচ্ছিল।'

আনন্দ এবার ইলিয়াসের দিকে ফিরে তাকাল। বলল : 'ইলিয়াস, আমার দুনালা বন্দুকটা নিয়ে আয়। সঙ্গে কিছু কার্তুজও। আর ড্রাইভারকে বলে দে, গাড়ী নিয়ে আসতে।'

'লীলা ভয় পায়নি তো?' আমি প্রশ্ন করলাম উৎকণ্ঠার সঙ্গে।

'বোধ হয় না,' আনন্দ জবাব দিল। 'গেল কিছুদিন থেকে ঘুমটা তার ভাল হচ্ছিল না। ডাক্তার তাই কি একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন। প্রতি রাত্রে সে তাই খায়। তা হোক, আমি উপরে গিয়ে নিজে একবার দেখে আসি।'

কয়েক মিনিট পর আনন্দ ফিরে এল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জানালে, লীলা ঘুমুচ্ছে বেহুঁসের মত।

হিলম্যেন গাড়ীখানায় আমরা সবাই চেপে বসলাম গাদাগাদি করে। পেছনের সীটে রইলাম আমরা তিনজন। আর সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল ইলিয়াস ও অপর একজন ভৃত্য।

'আমাদের এখানকার ছোটখাট এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আপনাদের ছুটির দিনগুলো মাটি করতে চাই না, মিঃ রাতসিং।' আনন্দ বলে চলল—'কিন্তু যখন এসেই পড়েছেন তখন আর বলতে বাধা কি? কিছুদিন থেকে এ অঞ্চলে গোটাকয়েক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। একটু আগে যে হুঙ্কারধ্বনিটা শোনা গেল তার সঙ্গে আর একটা দুর্ঘটনা জড়িত না হলেই মঙ্গল। এ রহস্য উদ্ঘাটনে আপনারা নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন, আশা করতে পারি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যথাসাধ্য করবো বৈকি?' জন জানালে আনন্দকে। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে। আনন্দ কিন্তু সহসা চিৎকার করে উঠল। গাড়ী থামাতে বলল ড্রাইভারকে। সিকি মাইলটাক আমরা প্রায় এসে পড়েছিলাম। আনন্দ গাড়ী থেকে সহসা একরূপ লাফিয়ে নেমে পড়ল। তারপর ছুটে গেল রাস্তার পাশে নর্দমার দিকে। নর্দমায় ঝুঁকে পড়ে কি যেন সে দেখতে লাগল। ওর দেখাদেখি আমরাও নেমে পড়লাম। দেখলাম, নর্দমায় মুখ থুবড়ে কি যেন একটা পড়ে আছে। আনন্দ তার পকেট থেকে একটা ইলেক-ট্রিক টর্চ বের করলে। আলো জ্বলে উঠলে দেখলাম, কাত হয়ে পড়ে আছে হতভাগা এক যুবকের মৃতদেহ।

'ড্রেনে কি যেন একটা পড়ে আছে দেখতে পেয়েছিলাম। তাই গাড়ী থামাতে বললাম ড্রাইভারকে।' আনন্দ সাফাই গাইলে।

যুবকের দেহটা আমরা উলটিয়ে দেখলাম। না, মারাই গেছে। গলাটা তার বিশ্রীভাবে থেতলানো। আর মহা-আতঙ্কের ছাপ লেপটে আছে তার চোখে-মুখে। শরীরের অপর কোথাও কিন্তু কোন জখমের চিহ্ন দেখা গেল না।

'শেয়ালের ডাক শুনছিলাম। ওরা মেরে যায় নি তো?' আমি বললাম।

'তা অসম্ভব নয়।' আনন্দ জবাব দিল। 'আজকাল এদিকে শেয়ালের সংখ্যা ভয়ানক বেড়ে উঠেছে। অনেকটা বে-পরো-য়াও হয়ে উঠেছে ক্ষুধার্ত বলে।'

'খালি গলাটা ছাড়া আর কোথাও কিন্তু কোন ক্ষতচিহ্ন দেখছি না?' জন বলে উঠল সহসা।

'লক্ষ্য করেছেন ঘটনাটা ঘটেছে কিন্তু ঠিক রাস্তার পাশেই?' আনন্দ বলে চলল। 'শেয়ালগুলো হয়ত ভেগেছে কোথাও আমাদের সাড়া পেয়ে। ছোকরা-টাকে আমি কিন্তু চিনি। নাম তার বেম্পী। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে ওদের বাড়ী। বাপ-মার সঙ্গেই ও থাকে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। গাড়ীটা নিয়ে আমি একটা খবর দিয়ে আসি পুলিশকে। আর তার সঙ্গে ওর বাবা-মাকেও!'

জন আর আমি সম্মত হলাম। আনন্দ গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল।

'ভালই হোল,' জন বললে একসময়ে। 'ব্যাপারটা এবার তলিয়ে দেখা যাবে।' এই বলে জন বেম্পীর মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়লে। একান্ত নিবিষ্ট মনে কি যেন দেখলে পরখ করে। অবাক বনে গেল সে, বুঝি কি একটা যেন আবিষ্কার করে! কিন্তু কিছুই বলল না মুখ ফুটে।

একটু পরে দারোগাবাবু, জন-দুই কনস্টেবল আর গ্রামের একজন লোককে নিয়ে হাজির হোল আনন্দ।

'ইনি হলেন ইনেসপেক্টর ঈদিরী সিং।' আনন্দ দারোগাবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। 'আর এঁরা আমার বন্ধু। মিস্টার পেরেরা ও মিস্টার জন রাতসিং। আমার এখানে ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন।'

আমরা হ্যান্ডসেক করলাম।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম।' দারোগাবাবু জনকে বললে। 'আপনার কথা কত শুনেছি। কত পড়েছি। আশা করি এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এ অঞ্চলে আরও এরকম গোটা কয়েক খুন-খারাপী হয়ে গেছে। আমরা কিছুই করে উঠতে পারলাম না। আপনি যদি—'

'মিস্টার পিন্তেরাকে এইমাত্র বল-ছিলাম, আপনাদের সাহায্য করত পারলে আমিও খুব খুশী হতাম।' জন জবাব দিলে।

দারোগাবাবু মৃতদেহটা পরীক্ষা করে দেখছিলেন। আনন্দ তখন গাঁয়ের সেই বুড়ো লোকটিকে কাছে ডাকলো। বলল :

'এ ছেলেটার বাপ। সিলিন্দু, তোমার যা জানা আছে বলো।'

'আমি কিছু জানি না, হুজুর।' ভাঙা ভাঙা গলায় জবাব দিলে বেম্পীর বাপ। '—এক মারামারি মামলার সাক্ষী দিতে বেম্পী সকালে গিয়েছিল ইন্দুরার হাকিমী আদালতে। আপনি তো জানেন হুজুর পথ তো কম নয়। মাইল

পনেরো হবে প্রায়। ফিরতে ওর দেরী হচ্ছিল দেখে আমি ভাবছিলাম, বেম্পী বুঝি রাতটা ইন্দুরায় কাটিয়ে বাড়ী ফিরবে সকালের দিকে।'

'তোমরা কি একটা আর্তনাদ শুনতে পাও নি?' জন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ হুজুর, শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা তাতে কোন কান দিই নি। লিভেরা হামুই এসে প্রথম বললেন, বেম্পী রাস্তায় পড়ে আছে জখম হয়ে। তাই শুনে আমি তো পড়লাম আকাশ থেকে।' বেম্পীর বাপ বলে চলল।

'আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে সিলিন্ডু, বেম্পী বুঝি আর বেঁচে নেই।' আনন্দ বললে ধরা গলায়।

বুড়ো এবার কেঁদে উঠল চিৎকার করে: 'হায় রে পোড়া কপাল! কেউ আমাদের কি রক্ষা করবার নেই রে এ-সব অভিসম্পাতের হাত থেকে? আমাদের সত্যি সত্যিই গাঁ ছাড়তে হবে দেখছি।

দারোগাবাবু পরীক্ষা সাঙ্গ করে আমাদের সঙ্গে ফিরে এলেন। বললেন:

'আপনাদের সকলের স্টেটমেণ্ট কিন্তু আমার দরকার।' তিনি আরও বললেন: 'লাশটার পাহারায় আমি একজন পুলিশ কনস্টেবলকে এখানটায় মোতায়েন রাখছি। ডাক্তারবাবু খুব সকালে এসে পড়বেন। একটু বেলা হলে ময়না তদন্ত শুরু করা যাবে। যত শীঘ্র সম্ভব আমি আপনাদের জানিয়ে যাবো।'

জন, আনন্দ আর আমার বিবৃতি তারপর লিখে নেওয়া হোল। ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছিল, এ তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। আমরা আবার ফিরে এলাম। দারোগাবাবু ফেরবার পথে বৃদ্ধ সিলিন্ডুকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দেবেন বলে জানালেন। রাত তখন প্রায় একটা। বাড়ী পৌঁছে বিছানার মধ্যে আরাম করে শুয়ে পড়তে দেরী হোল না।

বলতে লজ্জা নেই, আমি কিন্তু সে রাত্রে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিলাম। সৌভাগ্যের কথা, অতিকায় কোন বাদুড় কি দানব এসে হানা দেয়নি বুঝি আমার ঘুমের মধ্যে। ঘুম ভাঙল দরজায় সশব্দ করাঘাতে। দেখি, ইলিয়াস গরম চা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সহাস্যমুখে।

'কটা বাজল?' ঘুম-জড়ানো গলায় আমি শুধালাম।

'সাতটা, হুজুর।'

'আর সবাই জেগেছেন?'

'রাতসিং সাহেবকে আমি চা দিয়ে এসেছি। আর আমাদের সাহেব তো খুব ভোরে উঠেই বেরিয়ে গেছেন।'

'আচ্ছা ইলিয়াস, এ-সব খুন-খারাপী সম্পর্কে গাঁয়ের লোকেরা কি ভাবছে কিছু জানো নাকি? পর পর তিনটে খুন হয়ে গেল না?'

'প্রথম প্রথম গাঁয়ের লোকে মনে করত, ওরা বুঝি বন্য জন্তু-জানোয়ারের হাতে প্রাণ হারিয়েছে।' ইলিয়াস জবাব দিল। 'এখন সবাই অবশ্য বলছে: তা নয়। এ নির্ঘাৎ রীরী যক্ষেরই কারসাজি। তাই-তো সবাই 'থৈইলা' পূজার আয়োজন করছে।'

চা দিয়ে ইলিয়াস বেরিয়ে গেল। একটু পরে জন এসে ঢুকল ঘরে। পরনে তার বেরুবার পোশাক। মুখে জ্বলন্ত ঝাফনা সিগার।

'জন শুনেছো, ইলিয়াস বলছিল এখানকার লোকেরা নাকি বিশ্বাস করে রীরী যক্ষই এ-সব হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। তাই ওরা রীরী যক্ষকে তুষ্ট করতে 'থৈইলা' পূজার আয়োজন করছে।' আমি বললাম।

আরও জানালাম, 'লীলাও তার চিঠিতে এমনি কি যেন একটা লিখে-ছিল। আচ্ছা, রীরী যক্ষটা আবার কে?'

'সিংহলের রীরী যক্ষ অনেকটা মধ্য-ইউরোপ ও বলকান অঞ্চলের পৌরাণিক যুগের অতিকায় বাদুড় বিশেষ। প্রাচীন পুঁথিপত্রে এ-সব অতিকায় ভয়ংকর দানবের বহু উল্লেখ রয়েছে। আর তা থেকে জানা যায়, রীরী যক্ষ লংকার দক্ষিণে কোন এক দেশের রাজপুত্র। তার মা হোল থৈইলী নামে এক যক্ষিণী। থৈইলী যক্ষিণীর ছেলে থৈইলী যখন বড় হলো, নররক্ত পান করার জন্য সে তখন হয়ে উঠলো মরিয়া। তার এই অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করতে সে তখন গিয়ে ধর্ণা দিল দৈত্যরাজের কাছে। দৈত্যরাজ তার কথায় তুষ্ট হয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। তারপর থেকে আজ এখানে; কাল সেখানে এমনি করে রীরী যক্ষ শিকার করে বেড়াতে লাগল। শোনা যায়, তার নাকি অষ্টাঙ্গ আকৃতি ধারণ করবার ক্ষমতা আছে। অতিকায় বাদুড় আকৃতি তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দৈর্ঘ্যে সে প্রায় ছয় ইঞ্চি। এ দানবের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য থৈইলা' পূজার উল্লেখ আছে। আমি তাই বিন্দু-মাত্র বিস্মিত হই নি, গ্রাম্য লোকেরা যখন ঐ রীরী যক্ষকেই এসব হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে ধরে নিয়েছে।'

জন থামল। আমিও পোশাক পরে নিয়ে নীচে নেমে এলাম। লীলা এরই মধ্যে নেমে এসেছে প্রাতরাশের তদারক করতে। পাণ্ডুর তার মুখখানি। রুগ্নও দেখাচ্ছে।

'রিচার্ড,' লীলা আমায় ডাকল। বলল, 'গত রাত্রের ঘটনা সব আমি শুনেছি। এসব ভয়ংকর কাণ্ড-কারখানার কবে অবসান হবে কে জানে?'

লীলা বুঝি ভেঙে পড়ল কান্নায়।— 'মিস্টার রাতসিং, আপনাকে কিন্তু নিশ্চয় সাহায্য করতে হবে আমাদের।'

'আমি জানি মিসেস লিভেরা, আপনাদের খুব সংকটের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে এখন।' জন ধীরকণ্ঠে জবাব দিলে। '—কিন্তু বিপদে নুয়ে পড়লে তো চলবে না। সাহসে বুক বাঁধতে হবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যথাসাধ্য আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না।'

'লীলা, জন যখন বলছে তুমি তখন নিশ্চিন্ত হতে পারো।' আমিও সায় দিলাম।

লীলা বুঝি খানিকটা আশ্বস্ত হোলো। বলল, 'খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠে-ছিলাম কিনা তাই। আমার যদি কোন প্রয়োজন বোধ করেন, মিস্টার রাতসিং আমায় জানাবেন। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব। এ বিপদের সময় আপনাদের দুই-জনকে পেয়ে কতখানি খুশী যে হলাম।'

'ঠিক বলেছো লীলা,' উৎফুল্ল হয়ে আমিও বলে উঠলাম। 'জনের উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো।'

'হপারসটা আমার কাছে কিন্তু ভারী উপাদেয়,' জন বলে উঠল সহসা। '—ও পেলে আর আমার প্রাতরাশের প্রয়োজন হয় না, মিসেস লিভেরা। মাখন, চীজ, কলা—সবকিছু দিয়েই ও খাওয়া যায়।'

'কি উপাদেয় সহযোগিতা।' লীলা হেসে উঠল। 'বেশ, আপনার কথামত তারই ব্যবস্থা করছি।'

'হপারস' খাওয়া গেল। খাদ্যটা সত্যি উপাদেয়। লক্ষ্য করলাম, লীলার দিকে তাকিয়ে জন কি যেন লক্ষ্য করছে ভুরু কুঁচকে।

আমাদের প্রাতরাশ সমাপ্ত হল। জন লীলার সঙ্গে বসে গল্পগুজব করতে লাগল।

'আচ্ছা মিসেস লিভেরা, আপনাকে কিন্তু বড় কাহিল আর রোগা দেখাচ্ছে। আমার আর সব উপাধি ছাড়া আমি কিন্তু একজন ডাক্তারও। আপনার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আপনার কি অসুখ বলুন তো?'

'কৈ, তেমন তো কিছু মনে হয় না, দ্বিধাভরা কণ্ঠে লীলা জবাব দিলে। 'ডাক্তারবাবুও বলেছিলেন, আমার তেমন কিছু হয় নি। এখানকার এ-সব ঝামেলাই আমার স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান কারণ। রাত্রিতে ভাল ঘুমোতে পারি না। তাই ডাক্তারবাবু আমাকে ঘুমের ওষুধ একটা দিয়েছেন। কিন্তু এতই দুর্বল বোধ করি যে সকালে বিছানা ছেড়ে উঠবারও শক্তি পাই না। তা ছাড়া, রাত্রে মশাগুলি এমন কামড়ায় যে তাতেই বড় কাবু হয়ে পড়েছি। রীতিমত মশারী খাটিয়েও দেখছি রেহাই নেই ওদের হাত থেকে। গলাটা দেখুন না এখনো ফুলে আছে।'

'কই দেখি গলাটা।' জন যেন সহসা আগ্রহে ফেটে পড়ল।

লীলা অনুগত বালিকার মত তার ঘাড়টা বেঁকিয়ে দিল। জন চেয়ার ছেড়ে

'না না,' লীলা জবাব দিলে। 'আমার বাবাও সিগার খেতেন।'

'লীলা, জনকে তুমি কিন্তু বাঁচালে।' আমি হেসে বললাম। 'তুমি তো জানো না, বেচারা ঝাফনা ছাড়া এক মুহূর্ত বাঁচতে পারে না। তোমার খাতিরেই ও খালি এতক্ষণ ধূমপানে বিরত ছিল।'

সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল। লীলা বললে, 'এস আনন্দ, তোমার প্রাতরাশ সেরে নাও।'

'আপনারা কিন্তু আচ্ছা কুঁড়ে!' জন আর আমায় উদ্দেশ করে বলে উঠল আনন্দ। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে 'হপারস' খেতে লেগে গেল সে। খেতে খেতে বলল : 'আমি উঠেছি সেই সকাল ছয়টায়। উঠেই ছুটে গেলাম শব-ব্যবচ্ছেদ

সময় নি'ল না। আনন্দ, জন আর আমি সংক্ষেপেই আমাদের নিজ নিজ জবানবন্দী সারলাম। জানালাম : আর্তনাদ, নর্দমায় মৃতদেহের সন্ধান আর পুলিশকে যথারীতি সংবাদ দেওয়ার কথা সব। এও জানালাম যে, সেদিন শেয়ালের ডাকও আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। দারোগাবাবু আর সিলিন্ডুও সাক্ষ্য দিলে।

আমরা সবাই তারপর বাড়ি ফিরলাম। জনের মুখে কিন্তু কোন কথা নেই। আনন্দ আর আমার কথা শুনে ও বুঝি মাঝে মাঝে বিরক্ত হচ্ছিল।

'ওকে খানিকক্ষণ একা থাকতে দাও,' আমি চুপি চুপি বললাম আনন্দকে। '—মাঝে মাঝে ও এমনিধারা গম্ভীর হয়ে পড়ে।'

জনের মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ আনন্দকে শুধালে : 'আজ শনিবার না?

'খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম কিনা তাই।'

উঠে পড়ল। লীলার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে আপাতদৃষ্টিতে আমার কাছে যা মশার কামড় বলে প্রতীয়মান হয়েছিল সেই ক্ষুদে ক্ষুদে দাগগুলি সব নিবিষ্ট হয়ে পরখ করতে লাগল। জন তার চেয়ারে আবার ফিরে গেল। মুখখানি তার ঝুলে পড়ল খানিকটা। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি। এক সময় বলল :

'যদি সিগার ধরাই, আপনার কোন আপত্তি আছে? খুব পুরনো অভ্যাস কিনা, তাই।'

কেন্দ্রে। দেখলাম, এক গলার কাছটা ছাড়া আর কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই হতভাগা ছেলেটার। শুধু কণ্ঠনালীটাই ছিন্নভিন্ন। দশটায় ময়না তদন্ত হবে। আপনাদের দু'জনকে দারোগাবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদের নিয়ে যাবো বলেছি।'

জনকে দেখলাম চিন্তাক্লিষ্ট। কথা কইলে খুব কম। ময়না তদন্তের স্থানে আমরা এসে পৌঁছলাম, বেঁটে-খাটো এক ভদ্রলোক ময়না তদন্ত করছিলেন। তাঁর নাম বীরসিংঘি। তদন্তের কাজ বেশী

সোমবার হবে পূর্ণিমা, দেখাই যাক। এর আগে প্রতিটি হত্যাকাণ্ড কিন্তু ঘটেছে পূর্ণিমার রাত্রে, তাই না?'

আনন্দ এক মুহূর্ত কি ভাবলে। তারপর জবাব দিলে : 'কেন? তাই তো মনে হচ্ছে।' তারপর খানিকটা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে : 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'এমনি।' জন জবাব দিলে। তারপ সে চুপ করে রইল। কোন কথা বলতে না। আমরা যথাসময়ে বাড়ী ফিরে এলাম। (আগামীবারে সমাপ্য
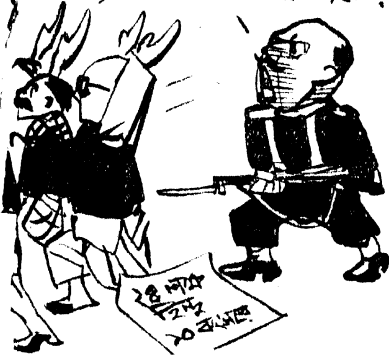
সংগ্রাম সিংহ!

৭·১১·৬৩

জিম্মি লোগ,
পাকিস্তান সে ভাগো!
২৫ লাখ হিন্দু ১০ বৎসরে

বঙ্গালী মুসলমান ভাগো
বাঙ্গালা আসামমে!
তুঁয়া বন্দুক খানা পিনা মিলেগা!

১০ লাখ ১০ বৎসরে

ইয়ে ক্যা হ্যয়?
তোমারা এডুকেসন হ্যয়?
পূর্ব পাক ছাত্র আন্দোলন
পশ্চিম পাক ছাত্র আন্দোলন
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

আচ্ছা!
আভি হামারা
এডুকেশন
দেখো!

আভি হমারা বাড়ন্ডারি
বচানে হোগা!

হুজোর!
আভি
ক্যা হুকুম হ্যয়?

প্যারিস থেকে বলছি

দিলীপ মালাকার

প্যারিস। অক্টোবর মাসটাকে ফরাসীরা বলে "রন্ত্রে" অর্থাৎ পুনরাগমন। ছুটি-ছাটা শেষ করে ছেলে-বুড়ো সকলে প্যারিসে এসে নতুন কর্ম-ব্যস্ততায় শহরটাকে কোলাহলমুখর করে তোলে। তাই অক্টোবর মাসটা ধরে চলে প্রদর্শনীর পর প্রদর্শনীর উদ্বোধন, সভা-সম্মেলন, সান্ধ্য সম্মেলন। যেন ভিড় করে শহরটাকে ছেয়ে ফেলে। প্রদর্শনীর পর প্রদর্শনীর ভিড় লেগেই আছে। প্যারিসিয়ানদের ফুরসৎ নেই।

অক্টোবরের গোড়ায় তিন তিনটে বিরাট প্রদর্শনী ও সম্মেলন হয়ে গেছে। প্রথমটা ছিল আন্তর্জাতিক মহাকাশ বিজ্ঞানীদের সম্মেলন। ইন্টারন্যাশনাল এ্যাস্ট্রোনটিক ফেডারেশনের বাৎসরিক সম্মেলনে প্যারিসে এসেছিলেন রুশ-মার্কিন মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের মহারথীরা। স্পুৎনিক যিনি আকাশে ওড়াতে সফল-কাম হন সেই রুশ বিজ্ঞানী সেদভ এবং মহাকাশে স্পুৎনিক সহযোগে মানুষের অভিযান পরিকল্পনা করেছিলেন যিনি আকাডেমিশিয়ান শিশকিয়ান এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বৈঠক গরম করে রাখেন। আবার মার্কিনদের তরফ থেকে ছিলেন সামারফিল্ড, হেলে, সিঙ্গার এবং আরও বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর দল। কিন্তু সম্মেলনটা জমে ওঠে গাগারিনকে নিয়ে। প্রথম মহাকাশচারী মানুষ গাগারিনকে দেখতে সর্বত্রই ভিড় লেগে গেল। সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে এলে গাগারিনকে ছেঁকে ধরত তাঁর সই নিতে। গাগারিন ছিলেন প্যারিসে প্রায় এক সপ্তাহ। এ্যাস্ট্রোনটিক সম্মেলনে গাগারিনের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয় তিন চার বার। গাগারিনকে বলতে শুনেছি যে, আকাশে ওড়ে বিমান। সে বিমান চালনা করে বৈমানিক। কিন্তু মহাকাশে রকেট-স্পুৎনিক চালাবার মতন এখনও অবস্থা আসেনি। মাটি থেকে সেটাকে চালনা করে বৈজ্ঞানিকরা। যখন বৈমানিকরা রকেটে বসে সেটাকে চালনা করতে পারবে তখন এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টায় পৃথিবীর এপাশ থেকে ওপাশে ভ্রমণ করা যাবে। যাবে তখনই চাঁদ কি মঙ্গল বা শুক্রগ্রহে যাওয়া।

মহাকাশ সম্মেলন শেষ হতে না হতেই প্যারিসে শুরু হল আন্তর্জাতিক চিত্রপ্রদর্শনী। প্রতি এক বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসের 'বিয়েনাল' চিত্র-প্রদর্শনী। এটির বৈশিষ্ট্য যেমন আন্ত-র্জাতিক তেমনি অল্প বয়স্ক শিল্পীদের জন্যেই। পঁয়ত্রিশ বছরের নিচের শিল্পী-দের শিল্পকলাই এখানে দেখান হয়। অন্যবারের মতন 'মুসজেদার মদার্ণ' সংগ্রহশালায় চলে বিয়েনাল প্রদর্শনী। জগতের প্রায় প্রতিটি দেশের তরফ থেকেই চিত্রপট দেখান হয়। তবে অধিকাংশ শিল্পীর বাস এই প্যারিস শহরেই। অথবা যে-সব তরুণ শিল্পী এসেছেন প্যারিসে শিক্ষালাভ করতে তাঁদের আঁকা চিত্রপটই এখানে দেখান

ছবি অঙ্কণরত সম্প্রতি পরলোকগত সাহিত্যিক ও শিল্পী জঁ ককতো

হয়েছে। যে ক'জন ভারতীয় শিল্পীর চিত্রপট এখানে দেখান হচ্ছে তাঁদের সবাই প্যারিসেই হয় বাস করেন নয়তো তাঁরা এখানে ছাত্র।

প্যারিস বিয়েনালের প্রধান আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য হল একালের এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট। অধিকাংশ চিত্রপট, ভাস্কর্যই এ্যাবস্ট্রাক্টপন্থী। এ্যাবস্ট্রাক্ট-পন্থী ছোকরা শিল্পীরা মিউজিয়ামের এক কোনায় যা করেছিল তা অনেককাল মনে রাখার মতন। তাদের প্রদর্শনীতে তারা রেখেছে খাঁচায় বন্দী বাঁদর, পাখি, জলে লাল মাছ, ইঁদুর এবং আরও এমন সব যন্ত্র যা হচ্ছে একালের বিদ্রোহের চিহ্ন। তার সঙ্গে তারা বাজিয়েছে জাজ বাজনা। বিয়েনাল প্রদর্শনীতে শুধু চিত্রপট আর ভাস্কর্যই ছিল না, ছিল আরও অনেক কিছু। যেমন আলোর খেলা। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন আলোকরশ্মির বিকীরণ দেখবার মতন। একদল জার্মান শিল্পী এটা করে। আর্টের সঙ্গে টেকনিকের মিলন হলে যা হয় তার অফুরন্ত দৃষ্টান্ত ছিল বিয়েনাল প্রদর্শনীতে। যাঁরা আধুনিক বা এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট একেবারে দেখতে পারেন না তাঁদের বিয়েনাল প্রদর্শনী দেখা উচিত। তাহলে তাঁরা আরও বেশী করে চটবেন এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের ওপর।

বিয়েনালের পর যে প্রদর্শনীটি খোলা হয় সেটি আন্তর্জাতিক হলেও ফরাসীদের জন্যেই। মোটরগাড়ীর বাৎসরিক প্রদর্শনী। এখন প্রতিটি ছয় কি সাতজন ফরাসীর একটি করে মোটর-গাড়ী আছে। বাড়ীর পরেই হল গাড়ীর সমস্যা। মেছুনি হতে কয়লাওয়ালা সবাই গাড়ী করে তাদের কাজ সারে। কাজের পর বিকেলে বেড়াতে বেরোয় গাড়ী করে। মোটরগাড়ী এদের কাছে এখন বিলাসিতা বা একটা সাংঘাতিক বস্তু নয়। কারখানার শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি অনেকেরই এখন মোটরগাড়ী রয়েছে। অর্থাৎ প্রায় সকলেরই মোটরগাড়ী কেনার ক্ষমতা আছে। গাড়ীর দামও যেমন সাংঘাতিক নয় তেমনি গাড়ীর দাম মাইনে থেকে মাসে মাসে এক বছরে কেটে নিয়ে শোধ দেওয়া চলে। এইভাবেই বেশীর ভাগ লোক এখানে গাড়ী কেনে। তাই প্রতিবছর নতুন কি কি মোটর-গাড়ী বেরুল বা গাড়ীর নতুন কি সংস্করণ হল তা দেখতে লাখ লাখ লোকের ভিড় হয় মোটরগাড়ীর প্রদর্শনীতে। শুধুই কি মোটরগাড়ী! লরী, ট্রাক, ট্রাক্টর, সাইকেল, মোটর-সাইকেল, স্কুটার সবই দেখান হয়। তাই দেখতে আর কেনা-বেচা করতে লাখ লোকের ভিড়।

ফরাসী শিল্পী মঃ নিকি দ্য সাঁ-ফাল্-এর এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প

এডিথ পিয়াফের সঙ্গে নাচছেন গায়ক শার্ল আজনাভুর

কোনো জীবিত গায়কের সঙ্গীত নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো দেশে গবেষণা এবং তার ওপর 'ডক্টরেট' ডিগ্রী কেউ লাভ করেছেন বলে আমার জানা নেই। একালের ফরাসী গায়ক জর্জ ব্রাসেন-এর গানের ওপর থিসিস লিখে এক ফরাসী মহিলা ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছেন। ডক্টরেট ডিগ্রীটাই বড় কথা নয়। বড় হচ্ছে বিষয়বস্তু। জর্জ ব্রাসেনের গলা তেমন সুমধুর নয়। বরং গলা চলে আধা-হেঁড়ে গলায় গান। তাতে আবার একটি মাত্র সঙ্গত। গীটার। কিন্তু তার মধ্যে শ্রোতারা পায় মাধুর্য। ক্ষণকালের জন্য তারা কান পেতে শোনে। শোনার পর হয় বিগত দিনের স্মৃতি জেগে ওঠে নয় তো নতুন চিন্তা এসে ভিড় করে। জর্জ ব্রাসেন শুধু গায়ক নন তিনি নিজে তাঁর গান রচনা করেন। একাধারে তিনি গায়ক ও কবি। গানগুলো প্রায়ই দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে। কখনো বা একটু দার্শনিক। খানিকটা করুণ রসের। তবে অধিকাংশই হল মফস্বল শহর বা প্যারিসের আশে-পাশের ছোট শহরের সাধারণ নরনারীর প্রেম-ভালোবাসা-বিরহ ও নিয়তির নির্যাতনের ইতিহাস। অনেকটা সেকালের চারণ কবিদের মতন গান গেঁথে গান গাওয়ার মতন।

জর্জ ব্রাসেনের গানের ওপর থিসিস লিখে শ্রীমতী আনি গিও একালের ফরাসী গায়কদের ইতিবৃত্ত যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে ব্রাসেনের রেকর্ড বাজিয়ে শোনান এই জন্যে যে, ফরাসী ভাষা শেখার পক্ষে তাঁর গান হবে প্রধান সহায়ক। কারণ প্রতিটি কথা অতি স্পষ্ট ও সহজ।

একালের ফরাসী গায়করা খুব বেশী যন্ত্র-সঙ্গীতের ব্যবহার করে না। কারণ গানের কথায় প্রতিটি কলিতে যে ভাব রয়েছে তা ফুটিয়ে তুলতে হয় কথার মাধুর্যে। জর্জ ব্রাসেন ধরনের গায়করা চিন্তাশীল মহলে যেমন খ্যাত তেমনি একালের তরুণ মহলে। এই ধরনের আরো যে ক'জন ফরাসী গায়ক অতি পরিচিত তাঁরা হলেন — ইভ্ মঁতা, লেওফেরে, শার্ল আজনাভুর, মুলুজি, এডিথ পিয়াফ এবং আরও জনা দশেক। ইভ্ মঁতা, শার্ল আজনাভুর ও এডিথ পিয়াফ লণ্ডন-নিউইয়র্কে অতি-পরিচিত।

মহিলা গায়কদের মধ্যে এডিথ পিয়াফ সর্বজনপ্রিয়। এডিথ পিয়াফের

গলা সুমিষ্ট বা কিন্নরকণ্ঠ নয়। কিন্তু তেজ আছে। সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে এ'র গান। মফস্বল অঞ্চলেই এ'র জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশী। গত বিশ-ত্রিশ বছর ধরে ফরাসী গায়িকাদের রানীর পদ পেয়ে এসেছেন এডিথ পিয়াফ। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এডিথ পিয়াফের মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ। এডিথ পিয়াফের মৃত্যুসংবাদ ছড়াতেই আমি প্যারিসে দেখেছি ট্রামে-বাসে সবার মুখে বিষাদের আলোচনা। এডিথ পিয়াফের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজার হাজার লোক এসেছিল তার বাড়ীতে। এর থেকেই বোঝা যায় কতখানি জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। বছর দুই-তিন আগে এডিথ পিয়াফের একটি গান সবার মুখে শুনতাম:—'রিয়াঁ দা রিয়াঁ, জ্য ন রগ্রেট দা রিয়াঁ' (বিগত দিনের কোনো আক্ষেপ আমার নেই)। যা হবার তা হয়েছে আবার নতুন করে জীবন শুরু করা যাক। এই কথাগুলো সাধারণ হলেও দার্শনিক। তার ওপর বেশ জোর গলায় গাওয়া গানটি রেডিও, রেকর্ড এবং এখানে সেখানে সর্বত্র শোনা গেছে।

যেদিন এডিথ পিয়াফ মারা গেছেন ঠিক তারই কয়েক ঘন্টা পর ফরাসী সাহিত্যের দিক্‌পাল জ' কক্‌তোর জীবনাবসান হয়েছে। সাহিত্যিক-শিল্পী জ' ককতোর বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর। মাসকয়েক ধরে তিনি ভুগছিলেন। এডিথ পিয়াফের মৃত্যুসংবাদ তাঁকে জানানোর পরেই এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। বছর পঁচিশেক আগে জ' ককতোর এক ছবিতে কাজ করেছিলেন এডিথ পিয়াফ। একে তিনি অসুস্থ তার ওপর হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ তাঁর কাছে বিরাট ধাক্কার মতনই আসে।

একালের ফরাসী সাহিত্য-নাটক-কবিতা-সিনেমা ও মডার্ণ আর্ট আলোচনা করতে গেলেই জ' ককতোকে স্মরণ করতে হবে। একালের ইংরেজী সাহিত্যে টি, এস, এলিয়ট প্রভৃতির যে স্থান ঠিক তেমনি জ' কক্‌তোর ফরাসী সাহিত্যে। একালের আর্টে সুররিয়ালিজম-এ্যাবস্ট্রাক্টইজম আন্দোলনকালে জ' ককতো ছিলেন তাঁদেরই এক নেতা। পিকাশোর যৌবনকালে পিকাশো আর্টের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন জ' কক্‌তো। সিনেমা ও থিয়েটারে আধুনিকত্ব যাঁরা এনেছেন তাঁদের নেতৃত্ব করেছেন জ' কক্‌তো।
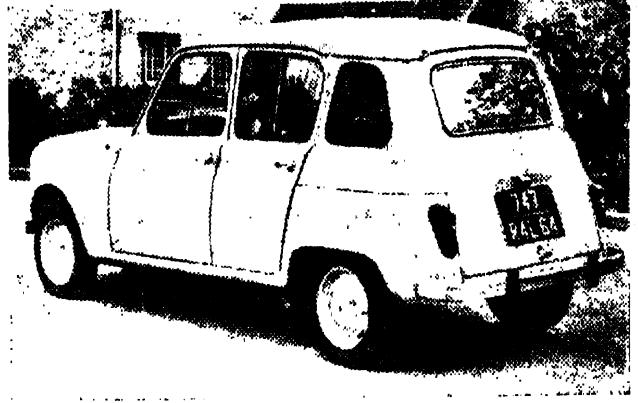
নতুন মডেলের 'রেনো' গাড়ী

জর্জ ব্রাসেন

জ' কক্‌তোর বয়স হয়েছিল কিন্তু তাঁকে দেখলে ও তাঁর লেখা পড়লে সব সময় মনে হবে তিনি যেন চিরযুবা। বছর চারেক আগে প্যারিসের এক সান্ধ্য সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হয়। তখনও দেখেছি তিনি চির নতুন। নতুনের সন্ধানী জ' কক্‌তো তাই ফরাসী সাহিত্যে নয় ফরাসী জীবনে ছিলেন যৌবনের অগ্রদূত। জ' কক্‌তোর 'লা ভোয়া হিউমাঁ', 'আঁফ' তেরিব্‌ল', 'টেস্টাম' দ্য ফে'' পরিচয় দেয় মানবিকতার। জ' কক্‌তোর সাহিত্য-শিল্পের কোনো জাতীয় গণ্ডী নেই। সবটাই আন্তর্জাতিক। সাহিত্যিক-শিল্পী নিজেই আবার নাটক ও ছায়াছবি পরিচালনা করেছেন। তাঁর শেষ ছবি 'টেস্টাম' দ্য ফে'' ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পূর্ণ সার্থক না হলেও পেয়েছিল শিল্পীর স্বীকৃতি। এছাড়া তাঁর নিজের হাতে আঁকা দেয়াল-চিত্র তিনটি গির্জায় দেখবার মতন। এমন কি ফরাসী ডাকটিকিটের নমুনা পর্যন্ত। এইসব মিলিয়ে এই প্রমাণ করে যে একটি পূর্ণ শিল্পীর বিকাশ একমাত্র সম্ভব হয়েছিল জ' কক্‌তোর দার্শনিক জীবনে। শুধু ফরাসী সাহিত্যে নয় জগতের আর কোনো সাহিত্যে অমন নিদর্শন সচরাচর দেখা যায় না। যা একমাত্র সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বেলায়।

সংগীত শিক্ষক ও শিল্পী

ধ্রুব পাণ্ডা

সঙ্গীতের বিপুল প্রসারতার মূলে যন্ত্র, শিক্ষক ও শিল্পীর ক্রমানুপাতিক অবদান স্বীকৃত। বিংশ শতাব্দীর চক্রগতিতে তাল রেখে যন্ত্রের একাধিপত্য ক্রমশ শীর্ষাভিমুখী। তার শক্তিক্ষয়ী সর্বতোমুখী প্রভাব দেশ, সমাজ ও পরিবেশের অন্তরে যেমন বিস্তৃত ও ক্ষয়দুষ্ট হয়েছে, শিক্ষক ও শিল্পীর আত্মাকে অভিভূত ও জর্জরিত না করে অব্যাহতি দেয়নি। আশ্রমিক সঙ্গীত সাধনায় গুরু একাধারে শিক্ষাদাতা ও শিল্পী। একদিকে জ্ঞানসঞ্চয় ও দান, অন্যদিকে শিষ্যাসনে সৃষ্টির লীলায় তন্ময়। 'গুরুমুখী নাদম্, গুরুমুখী বেদম্'। গুরুমুখ নিঃসৃত 'নাদম্' ও 'বেদম্' শিষ্যের পরম সম্বল 'শ্রুতি'। (শুনে শুনে অধিগত গ্রন্থ)। গুরুর ভূমিকা ও কর্তব্য তখন সর্বোপরি, প্রকাশ্যে। শিক্ষক ও শিল্পীরূপে গুরুর সঙ্গীত-প্রতিভা ও সাধনা শিষ্যের চেতনায়, সমগ্র সত্ত্বায় ধীরে ধীরে অনুরণিত ও সম্পৃক্ত হচ্ছে, শিষ্যকে সাধনার প্রেরণা দান করে। শিষ্যের অন্তরে ভাবিষ্যৎ গুরু ও শিল্পী-ভাবের প্রসুপ্ত বীজটি উপ্ত হয়ে উঠে। শিষ্য শিল্পীর মর্যাদার আসন পায়।

বহুদিনের পর আশ্রমের সঙ্গীত-সাধনা সভ্য সমাজের ও শহরের ঘরে, বৈঠকে, জলসায়, সম্মেলনে, শিক্ষালয়ে, বেতারে, চলচ্চিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। গুরুর পদ নিয়েছে যন্ত্র। শিক্ষকও যন্ত্রানুসারী। শিল্পী নিয়েছেন মঞ্চের পুরোভাগ—দর্শক ও শ্রোতৃ-সমাজের মধ্যমণি। যে গুরু ছিলেন সঙ্গীত, সংস্কৃতির আদ্যমধ্যঅন্তে, শিষ্য পরিবৃত প্রতিভাবান শিল্পী, নির্মল প্রভাত-আকাশে রক্তিম অরুণ সদৃশ, তাঁর স্থান কালচক্রে সঙ্গীতজগতের নেপথ্যভূমিতে, অন্তরালে। শিষ্যের স্থান শূন্যপ্রায়। সঙ্গীত-মণির ছোঁয়ায় দৈবাৎ 'শিল্পী'-খ্যাত হয়ে মঞ্চাবতরণ, মানুষ সঙ্গীতে বৃহৎকে পেয়ে গেছে বলে গর্বিত ও শিল্পীখ্যাতি নাম যশ করতালিতে বিমুগ্ধ; সেখানে শিক্ষাসাধনার কঠোরতায় আত্মবিসর্জনের হেতুই বা কি?

সঙ্গীত আয়াসীর বিলাস দ্রব্য, সঙ্গীত-চর্চা তথাকথিত 'অভিজাত্য', সেখানে 'শিক্ষণীয় সাধনার সম্পদ', 'সঙ্গীতে ভূমানন্দ' ইত্যাদি ত্রয়োদশ বা তৎপূর্ব শতাব্দীর ভাবগম্ভীর কথা বিলাসী ধনী বা বণিকের কাছে অস্পৃশ্য নিচুজাতের কাতরোক্তির মত। সঙ্গীতের বর্তমান প্রবলায়তন বিস্তৃতি উত্তাপে অল্প পরিমাণ দুগ্ধের স্ফুটোন্মুখ বৃহৎ এক 'বলক' তুল্য। সঙ্গীতের প্রসার-প্রাচুর্যে বেশির ভাগ ফোলানো ফাঁপানো ফেনায়িত কৃত্রিমতা, আলুথালু সচকিত চমক ঝলক।

শিক্ষালয়ে শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা সঙ্গীত বিষয়টির চরিত্র আলাদা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী, রাজা থেকে শুরু করে বালক বৃদ্ধ রাখাল কাঠুরে কুমোর মজুর অবধি সকলেরই সঙ্গীতের প্রতি স্বাভাবিক অনুরক্তি আছে। সুরের প্রকাশ কণ্ঠে সম্ভব হোক বা না হোক তবুও সঙ্গীত-শিক্ষকের দরজায়, সঙ্গীত শিক্ষালয়ে কতজনের নিয়ত আনাগোনার স্রোত। আসলে সঙ্গীতে নৃত্য-গীত-বাদ্য একত্রে মিলে একটি (আলংকারিকদের পরিভাষায়) 'সমূহালম্বনাত্মক রঞ্জনা'র সৃষ্টি হয় এবং কেবল গান বা গীত 'রঞ্জক স্বর সন্দর্ভ' বা রঞ্জক স্বর সমষ্টি। "প্রত্যেক মানুষের অধ্যাত্মের মধ্যে রাগ নামক একটি সংস্কার (ইনস্টিংট) আছে যার বশে কোনও বস্তু বা বিষয়ের প্রতি মানুষের প্রবৃত্তি হয় বা আকর্ষণ হয়। এই রাগ সংস্কারটি উদ্বোধিত হলে মানুষ প্রত্যক্ষ বস্তু বা বিষয়ের দিকে প্রবৃত্ত হয়।.........কোনও বস্তুবিশেষের সংস্পর্শে (যথা—সঙ্গীত, কলা প্রভৃতি) জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল কতকগুলি অনুভবমাত্রকে সঞ্চয় করে অন্তঃকরণের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। এই অনুভবসমষ্টি যদি অন্তঃকরণের মধ্যে বুদ্ধির আশ্রিত স্বাভাবিক রাগ-সংস্কারকে উজ্জীবিত করে তাহলে সমগ্র অন্তঃকরণের মধ্যে একটি আলোড়ন হতে আরম্ভ করে। এই আলোড়ন অবস্থাই হল 'রঞ্জনা'।১" মানুষের শক্তি শিক্ষিত ও আয়ত্বাধীন না হলে 'রঞ্জনা'র প্রতিক্রিয়া শুভপ্রদ হয় না। সঙ্গীত-চরিত্রের প্রধান গুণটি আবশ্যকবোধে উদ্ধৃত হল।

প্রাচীনকালে 'গুরু' শব্দটি আচার্য, শিক্ষক, অধ্যাপকের আসনে অধিষ্ঠিত পণ্ডিত ব্যক্তিকে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় সম্বোধন। এবং শিক্ষারত সতীর্থবৃন্দকে বলা হত শিষ্য। গুরু শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা, সান্নিধ্য, পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তিগত মতামতের আদান-প্রদান, গুরু ও শিষ্যের পরস্পরের আচার-আচরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি মূল্যবান ও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গুরু আচার্য পণ্ডিত অধ্যাপক শিক্ষক প্রভৃতি শিক্ষাদাতার নীতি আদর্শ ও কর্তব্য মূলত এক নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত। গুরু বা আচার্যরূপে সেকালের সমাজ ও শিষ্যের কাছে প্রাপ্ত সম্মান মর্যাদা একালের সমাজ ও ছাত্রের কাছ থেকে এ যুগের শিক্ষাদাতা শিক্ষক বঞ্চিত ও অবহেলিত। সঙ্গীতের শিক্ষাক্ষেত্রে, প্রাচীনের তুলনায়, সঙ্গীত-শিক্ষক ও অধ্যাপকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান, শিক্ষায়তন গৃহের চতুষ্পার্শ্বে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট 'আদর্শ' শব্দটি যেন হাস্যকর ভূয়ো অক্ষর সমষ্টি মাত্র। আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ ছাত্র বলতে যে সংজ্ঞা পাই, তদনুসারে অবধারিত কর্তব্যের প্রতি কর্মশক্তির শৈথিল্য ও স্বাভাবিক দৃষ্টি সংকুচিত হয়ে আসছে।

সঙ্গীতের মনোহরণকারী গুণপনায় সঙ্গীত-শিক্ষার জন্য আজকাল সঙ্গীত শিক্ষায়তনে ভীড় লেগেছে। শিক্ষার্থীর মনে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলা, উদ্যমের শিহরণ। সঙ্গীত-শিক্ষক সর্বোপরি জীবিকার্জনের তাগাদায় ও কিছুটা সঙ্গীতে অনুরক্তিতে শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। অর্থনৈতিক দুর্গতিতে শিক্ষকদের (কিছু কিছু ছাত্রদেরও) বহির্মুখীনতার আশ্রয় নিতে হয়েছে, যার ফলে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ বিষম ব্যাঘাতপুষ্ট হয়ে উঠছে। শিক্ষকের কর্মপদ্ধতি ছাত্রসমাজ ও তার গণ্ডির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী নয়। তবু দাতা ও গ্রহীতার সান্নিধ্য যেখানে দীর্ঘকালের সেখানে মৌখিক বা পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়াও ব্যক্তিত্বের প্রভাব সে পরিবেশে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক এবং সে প্রভাব যেমন উভয়কেই আলোকিত ও আহ্লাদিত করে, এবং পরস্পরের একাত্ম চিন্তায় ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত করে, তৎসঙ্গে প্রদত্ত শিক্ষাধারা অব্যাহত রেখে চিত্তক্ষেত্রে এক পদ আরও অগ্রবর্তী হওয়ার সুযোগ আসে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ফাদার ডি পেনেরাণ্ডার কথা সুন্দর করে বলেছেন,—"তাঁহার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ

হইত। তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ছিল না, কিন্তু আমার কাছে তাহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন, অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ......আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম; আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।' এই যেন সত্যিকার গুরুর রূপ ও গুরুদর্শন। শিক্ষকের অন্তরে সাধনার আন্তরিক স্পৃহা, চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্রের অন্তঃকরণে সে-মহৎ ভাব অলক্ষ্য বিদ্যুৎ-গতির ন্যায় সঞ্চারিত হয়। রামতনু লাহিড়ী শিক্ষকতা কার্যে অসাধারণ কৃতকার্যতা লাভ করতে সমর্থ হওয়ার ভিতরকার কথা,—তিনি নিজে চিরজীবন আপনাকে শিক্ষাধীনে রেখেছিলেন। সংগীত-শিক্ষকের পক্ষেও এ কথার ব্যত্যয় নেই।

রবীন্দ্রনাথের গুরু ও বর্তমান শিক্ষকের দীর্ঘ তুলনামূলক আলোচনাটি এখানে উল্লেখযোগ্য এবং সর্বশ্রেণীর শিক্ষকের ও অভিভাবকের গভীর চিন্তার বিষয়।

"গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম, শিক্ষকের কাছে নহে,...... গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক, জ্ঞান-শিক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন। শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্তু গুরু তো ফর্মাশ দিলেই পাওয়া যায় না।...... আমরা যাহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়-মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফনোগ্রাফের যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরী করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়-মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে।...... আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন—এইখানেই ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এই শিক্ষক গুরুর আসনে বসিলে তাঁর জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার করে, তাঁর জ্ঞানের দ্বারা ছাত্রের জ্ঞানের বাতি জ্বালে, তাঁর স্নেহের দ্বারা কল্যাণ সাধন করে, এইভাবে তিনি গুরুর গৌরব লাভ করেন।......... তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত। সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তি গ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন।...... এই শিক্ষা-দোকানদারির নীচতা হইতে দেশের শিক্ষককে ও ছাত্রগণকে কি আমরা রক্ষা করিব না?"

"যাঁরা শিক্ষক হবেন তাঁরা মুখ্যত হবেন সাধক।"।......গুরুর অন্তরের ছেলে-মানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তাহলে তিনি ছেলের ভার নেবার অযোগ্য হন।......আমরা যদি মনে করি যে, আমরা বালকদিগকে শিক্ষা দিব, আমরাই তাহাদের উপকার করিব, তাহা হইলে আমরা নিতান্ত সামান্য কাজই করিব। এভাবে যন্ত্র গড়া যায় এবং সে যন্ত্র ভাঙিয়া ফেলিতেও হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, বালকদিগের সাধনার এবং গুরুর সাধনার একই সমতল আসন—এখানে গুরুশিষ্য সকলে একই ইস্কুলে মহাগুরুর ক্লাসে ভর্তি হইয়াছেন, তখন আপনা হইতেই কাজ হইবে। যখন আমরা মনে করি আমরা দিব, অন্যে নিবে, সাধনা কেবল ছাত্রদের এবং আমরা তাহাদের চালক ও নিয়ন্তা, সেইখানেই আমরা কোন সত্য পদার্থ দিতে পারি না।" মানুষের মধ্যে যখন মানুষ না থাকে তখন সে মাষ্টারমশায় হতে চায়, তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দান করে। "গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত-স্রোতের মত চলাচল করিতে পারে। ......আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাক-যন্ত্রের জারকরস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে।...... আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন, চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষ চাই।"

বর্তমান কালের শিক্ষায়, সংগীত-সাধনায় তেমন গুরুর আবশ্যক পলে পলে অনুভব করি যখন দেখি ছাত্রদের ফাঁকি-বাজি, মিথ্যাচার, দুর্ব্যবহারের চেয়ে শিক্ষকের ঐ গুণগুলি সময় বিশেষে প্রকট, উৎকট ও নির্মম হয়ে শান্ত সরল-বুদ্ধি ছাত্রদের বিবেকে পুনঃপুনঃ উৎপীড়ন শুরু করে। সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথোক্ত কথাগুলি সর্বাগ্রে শিক্ষক-দের পুনরায় স্মরণীয় ও পালনীয়। "Art is not a pleasure trip, it is a battle." সংগীত-শিল্প সম্পর্কে মূল্যবান ক্ষুদ্র বাক্যটি প্রযোজ্য হলেও বর্তমান সংগীত-শিক্ষার রীতি-নীতি, প্রচার-ব্যবহার ও সমাজ-সকাশে তার বিচিত্র প্রকাশ অবসর-বিনোদনের অনুকূলে ঘরোয়া আর পাঁচটি বিলাস সামগ্রীর সমপর্যায়ে—ধারণাটি মনের ভিতর তাগাদা দিয়ে স্থান করে নিচ্ছে।

সংগীত সাধারণ পাঠ্যপুস্তক অধিগত করার মত সাবলীল দৈনন্দিন ব্যাপার নয়। সংগীতের মনস্তত্ত্ব সূক্ষ্ম ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রয়োগ-ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণ ও নিয়ম-নীতি বিচারে সংগীত-চরিত্রটিকে হৃদয়ানুগ করা সম্ভব।
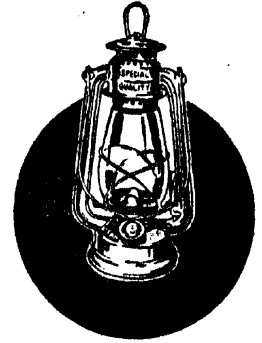
জীবন ও সঙ্গীতের অনিবন্ধ যুগল-প্রভাবে সঙ্গীতের মনের দিকটা জীবন-দর্পণে সহজে প্রতিফলিত হয়নি, হয়েছে তার দেহের দিক। তার ফল দাঁড়ায়, জীবনের ক্ষুধা সঙ্গীতের জৈবিক পর্যায়ে এসে সম্বৃত ও চরিতার্থ হবার চেষ্টা করে, আত্মিক শীর্ষে উন্নীত হয় না। সঙ্গীত ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তার মুক্তি প্রতিহত হয়।

"শহুরেপনা নামক একধরনের যে জড়তা আধুনিক আলোকপ্রাপ্তদের আত্মসন্তুষ্টির লোভনীয় পরিপার্শ্বে তুলোর পুতুলের মত নিক্ষেপ করেছে, শিল্প নামক মানুষের চরম চিৎপ্রকর্ষকে তার ছোঁবার সাধ্যি নেই,—যেহেতু শিল্প একটা পবিত্র জ্যোতি; সাচ্চা মনের সহজ চোখ ছাড়া দেখতে পাওয়া দুঃসম্ভব।...... শিল্প মানে জটিলতা নয়, প্রকাশ। জটিলতা যেটুকু, তা বিকার। ফলে দিনে দিনে মানসিক জাড্য যত বাড়ছে, শিল্প তত দূরে সরে যাচ্ছে।" ২ সঙ্গীতের আধুনিক ব্যাপ্তির অর্থ তাকে আপন করে কাছে পাওয়ার গৌরবজনক পরিস্থিতি নয়, প্রাণহীন মূর্তির প্রতি লোক-দেখানো অতিভক্তি ও শ্রদ্ধার বিকৃত যথেচ্ছাচারের মত।

সুর, সৌন্দর্য ও দুর্লভকে সহজে পাওয়া ভ্রান্তি, সহজে ভালো লাগা মোহ। সাধনার ক্লেশকর স্তর উত্তরণ করে সুর-সুষমার সন্ধান পাওয়া সত্যিকারের পাওয়া। দেবতার পূজা ফুল-চন্দন-ধূপ-দীপ-উপকরণে সম্পূর্ণ নয়, দেবোভাব ও আরাধনা থাকা চাই। আরাধনা সহজে হবার নয়, তার পশ্চাতে চাই সাধনার আয়োজন। পূজক হওয়া যায়, সাধক হওয়া সহজে হয় না। শিল্পের উপাসনা সাধকের সাধনা। মোহাচ্ছন্ন, আচারভ্রষ্ট বিলাসীরূপে সেখানে সম্পূর্ণ অপাংক্তেয় ও প্রবেশ অবৈধ।

শিল্পীর রূপ নয়নমুগ্ধকর দেহভঙ্গি-সর্বস্ব নয়; তার হৃদয়ই রূপ—অধ্যাত্মভাবপ্লুত অন্তরের বহিঃপ্রকাশই মুখ্য, যা মানুষের রূপদর্শন নিরপেক্ষ, সাধারণ চক্ষু-দ্রষ্টব্য নয়। অন্তরের শিল্পানুভূতি প্রকৃত অন্তরঙ্গের সহজ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। শিল্পীর শিল্পসত্তা বেশবাসের ন্যায় বাহ্যিক দৃশ্যবস্তু নয়, হৃদয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্মিলিত। তবু সহজ বেশবাসে, অনাড়ম্বর অকৃত্রিম ব্যবহারে, সারল্যে নিষ্ঠায়, সেই শিল্পী-সুলভ ভাবের অভিব্যক্তি। শিল্পী যেন অন্তরকে সর্বাঙ্গে ছড়িয়েছে। আধুনিক কায়দায়, বেশ ও কেশবিন্যাসে, সুরভি-সুবাসে, চটকদার চলন কথন ও উপবেশন ভঙ্গিমায় সঙ্গীত পরিবেশন দর্শকের দৃষ্টিরঞ্জনে সহায়তা করে, আপাত শ্রুতিরোচকও বটে; চিত্তরঞ্জক হয় কিনা শ্রোতার মন-সমীক্ষণ সাপেক্ষ। দর্শক-শ্রোতার অতি প্রিয়জন শিল্পী। শিল্পীর পবিত্র সাহচর্যে যদি শিল্পের প্রতি যথার্থ ভাল লাগা না জন্মায়, ভক্তি-অনুরাগ উন্মাদনায় বিপর্যস্ত হয়, মানুষকে সহজে 'শিল্পী' আখ্যা দিয়ে মহৎ শিল্প ও শিল্পীর মূল্য ও মর্যাদাবোধকে সমাজ সমক্ষে দলিত পঙ্গু করা সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে অবমাননাসূচক ও নিম্নগামীতার পরিচায়ক।

সাধারণকে কেবল সঙ্গীত শিক্ষাদানই শিল্পীর কর্তব্য নয়। জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ মূলতঃ সঙ্গীত। জীবনের পদক্ষেপ ছন্দ সুর ও ভাবভাষা বিনিময়ে সুষম সমন্বয়, জীবনে সঙ্গীতপ্রকৃতিকে সুন্যস্ত করা, সংকীর্ণ গন্ডীবদ্ধ জীবনকে গতিশীল করে সাচ্চা মানুষ হওয়া, সত্য ও আনন্দের দিকে আপনাকে দৃঢ়তায় ও নির্ভয়ে পরিচালিত করা সঙ্গীত ও শিল্পীর লক্ষ্য।

দুঃখের বিষয়, নাম-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তি-পাবলিসিটি-ভিখারীর যুগে তদানীন্তন শিক্ষক, ছাত্র ও শিল্পীর কামনা-স্থূল ঘাত-প্রত্যাঘাতে স্খলন ও সংকুচিত। মহৎ প্রেরণা, শিল্পচিন্তা উপহাস্যকর ব্যাপার। চারিদিকে ব্যস্ততা, ক্ষুব্ধতায় জনারণ্য উৎক্ষিপ্ত ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা নির্মূল। কিন্তু সংস্কৃতির প্রাণ-মর্যাদা রক্ষা করতে গেলে গুরু ও শিল্পীর সঙ্গীত-ব্যসন পরিত্যাগ করে সঙ্গীত-সাধনে কঠোর, সচেতন হওয়া উচিত। সমাজ গঠনের দায়িত্বও তাঁদের; ভাববিলাস কি সঙ্গীতের সংজ্ঞা? শিল্পীর অন্তরের অকপট দান তাঁর সঙ্গীত সমাজকে শিক্ষিত, উন্নত, রুচিবন্ত ও উজ্জীবিত করুক। সমাজ তেমনি সঙ্গীতের অনুশীলনে শ্রদ্ধায় তৎপর হোক। চিত্তের আপাততৃপ্তির জন্য সঙ্গীতের ব্যবহার থাকতে পারে। কিন্তু গুরু ও শিল্পীর দায়িত্ব সঙ্গীতের আদর্শকে, সত্য লক্ষ্যকে শত বিপদ-বাধায় সর্বসমক্ষে ঊর্ধ্বমুখী করে রাখা। সুকণ্ঠই শিল্পী নয়। সুকণ্ঠের সঙ্গে যে ব্যক্তিটির সম্পর্ক, তার চেয়ে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ, গভীর। শিল্পকৃতিতে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মানুষ-শিল্পীর চিত্ত ও চরিত্র-প্রকৃতি উন্মোচনে সহায়ক, কিন্তু বিশ্লেষণে শিল্পীর চতুঃপার্শ্বস্থ শুভানুধ্যায়ীগণ অপরিহার্য। কেননা শিল্পীর জীবনপথ নিষ্কণ্টক কুসুমাকীর্ণ নয়।

যেখানে উপকরণ-বাহুল্য সেখানে আছে যন্ত্র। যেখানে মানুষ, সেখানে যন্ত্রের গুরুত্ব কম, প্রাণের প্রাচুর্য আছে। কারবার-ব্যবসায়ে দেনা-পাওনার ভীড়, সেখানে প্রাণ নাই, ধন আছে। শিল্পকলার অস্তিত্ব যেখানে, সেখানে প্রাণ আছে, মান আছে, ধনাড়ম্বর নেই। সঙ্গীত-শিল্প ব্যবসায়ের সামগ্রী হয়ে উঠেছে, সেখানে ধন আছে, প্রাণ মন অপ্রতুল। বিদগ্ধজন উপলব্ধি করেছেন, শিল্পক্ষেত্র থেকে ব্যবসায়ের বাজারে সঙ্গীতের উত্তরণ শিক্ষক ছাত্র শিল্পী ও সমাজকে কতখানি দুষ্প্রভাবিত করেছে এবং তার আর্থিক উন্নতির অন্তরালে আত্মিক পরিণতি কোন্ চরমে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গীতে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, অত্যাধুনিকা ও তার দিক-বিদিক সংজ্ঞা-রহিত উগ্র স্ফূর্তি, প্রাণস্পন্দন নির্বাপিত হবার পূর্ব-অস্থিরতা।

সভ্যতার সংকটময় পরিস্থিতিতে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষক ও শিল্পীর কেবলমাত্র সঙ্গীত প্রচারকের ভূমিকা অপেক্ষা গভীরভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করবার অবসর এসেছে যে, সঙ্গীতের শিল্পোচিত বৈশিষ্ট্য লোক-মানসে কতখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সমাজ-কল্যাণে কতদূর সহায়তা করেছে। কেননা 'Perversion of the best is worse'. মহতের বিপথগামীতা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকট ডেকে আনে। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এখানে আরেকটুকু উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না : সংস্কৃতি জাতির 'চিত্তের ঐশ্বর্য', 'মনুষ্যত্বের আদর্শ'। যতই 'সংস্কৃতি' (কালচার) বলে আন্দোলন অনুষ্ঠান চলুক না কেন শিক্ষা ও শিল্পচর্চা থেকে সংস্কৃতি ক্রমশ স্খলিত হয়ে পড়ছে। অভিভাবক শিক্ষক শিল্পী ছাত্র ও সমাজের কেবল পাণ্ডিত্য-চর্চায় নয়, একক ও সমবেত পৌরুষচর্চায় ও 'নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়' সংস্কৃতি ও তৎসহ শিল্পশ্রীর আমন্ত্রণ সফল হতে পারে।

আমার অন্তরের বিশ্বাস : সঙ্গীতের ভাববিহ্বলতা, সংকীর্ণ আমোদ-উচ্ছ্বাস, অত্যধিক প্রচার-লিপ্সা পুরোমাত্রায় সচল থাকার প্রয়োজন কমে আসতে বাধ্য। বিশেষ ধরনের বানানো এই আধুনিকতার পরিধিটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। আর শিল্প তার বিকাশের স্বাভাবিক পথটা খুঁজে পাবেই। সময় এসেছে, শ্রোতা ও দর্শকের মননশীলতায় :—এই দুর্দশাগ্রস্ত, শত লাঞ্ছনায় পীড়নে জর্জরিত জীবনে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা, দান ও মূল্য কতটুকু। তার সমাধান সহজে মিলতে পারে যাঁর কাছে, সেই মহৎ মানুষ চাই, গুরু চাই, শিল্পী চাই।

১ অমিয়নাথ সান্যাল
২ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথাঃ

বাংলা ছবি ঃ

কয়েকটি জনপ্রিয় কাগজের শারদীয় সংখ্যায় বাংলা ছবির শিল্পগত এবং ব্যবসায়িক অসাফল্য নিয়ে বহু গুণী ও জ্ঞানী সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, এই অসাফল্যের কারণ দর্শাতে গিয়ে কোনো দুজন এক কথা লেখেননি। কেউ বলেছেন, বাংলা ছবির প্রদর্শনক্ষেত্রের অপ্রতুলতা ও সীমাবদ্ধতাই এর মূল কারণ। কেউ বলেছেন, ছবি সৃষ্টির মূলে সামগ্রিক সমন্বয়সাধনের অভাবই ছবিকে ব্যর্থ করছে। আবার কারুর মতে, নতুন পরিচালকদের আগমনে যে চ্যালেঞ্জের আভাস দেখা দিয়েছিল, তা দিয়ে একটা আন্দোলনের আবহাওয়া তৈরী করতে পারলে বাংলা ছবির সুদিন আসা সম্ভব ছিল; কিন্তু তা হয়নি বলেই যত ব্যর্থতা। অন্য আর একজন মন্তব্য করেছেন, কাহিনীর অবাস্তবতা এবং চলচ্চিত্রশিল্পসম্মত প্রকাশের অভাবই বেশীর ভাগ বাংলা ছবিকে জনপ্রিয় হতে দিচ্ছে না। ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রবন্ধ-লেখকেরা প্রত্যেকেই চিন্তাশীল এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট সারবত্তা আছে। অধিকাংশ বাংলা ছবিই কেন অসাফল্য লাভ করে, এসম্পর্কে এঁদের প্রত্যেকেরই মতামত নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, বাংলা ছবির ব্যর্থতার কারণ একটি দুটি নয়, অনেকগুলি। এই কারণগুলির মধ্যে যেটিকে আমাদের প্রধান বলে মনে হয়, সেইটি নিয়ে আমরা অতঃপর একটু বিস্তারিত আলোচনা করব।

সকলেই জানেন, চলচ্চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে দুটি বিশিষ্ট এবং ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী একযোগে কাজ করে; এক, স্রষ্টা বা পরিচালকের শিল্পদৃষ্টি এবং দুই, প্রযোজকের বা মূলধনী বিনিয়োগকারীর ব্যবসায়িক দৃষ্টি। পরিচালকের মনের ভাবনা হচ্ছে, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি কি করে এমন একটি অখণ্ড রসমূর্তির সৃষ্টি করবেন, যা দর্শকের চোখে জাগাবে বিস্ময়, মনকে করবে আপ্লুত।

যবসে তুমহে দেখা হ্যায় চিত্রে গীতাবালী

অপর দিকে প্রযোজকের বা অর্থ-বিনিয়োগকারীর চিন্তা এবং একমাত্র চিন্তা হচ্ছে, তাঁর প্রযোজিত চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাওয়ার সংগে সংগে কি করে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করবে, যাতে প্রতিটি দর্শনীতেই প্রেক্ষাগৃহের সামনে "হাউস ফুল" বোর্ডটি সগৌরবে ঝুলতে থাকে। উল্লেখ করা প্রয়োজন অনুভব করছি, কোনো প্রযোজককে স্পষ্টই বলতে শুনেছি, আর্ট-ফার্ট বুঝি না মশাই, টাকা কি রকম আসবে, তাই বলুন। অথচ, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, পরিচালক এবং প্রযোজক — দুজনেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শককে খুশী করা, দর্শকচিত্তের প্রমোদবিধান করা। চলচ্চিত্রের প্রধান কর্তব্যই হল তাই। তা যদি না হত, তাহলে ছবির প্রদর্শনীর ওপর প্রমোদকর চাপানো চলত না কোনো অজুহাতেই। আমাদের কথার প্রতিবাদ করে কোনো পরিচালক হয়তো বলতে পারেন, আমি সৃষ্টি করি নিজের প্রেরণার বশবর্তী হয়ে আপন আনন্দে, কোনো দর্শকের ভালো লাগবে, কি না লাগবে, তা আমার ধর্তব্য নয়। সত্যিই যদি এমন কোনো চলচ্চিত্র-পরিচালক থাকেন, যিনি নিজের অর্থ ব্যয় করে ছবির পর ছবি তৈরী করেন এবং নিজেই তা পর্দায় প্রতিফলিত দেখে আনন্দে মশগুল হন, তাহলে সসম্ভ্রমে বলব, তিনি আমাদের আলোচনার-বহির্ভূত। আমরা ডি ডবল্যু গ্রিফিথ এবং চার্লি চ্যাপলিন থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত সেই সব সৃষ্টিধর্মী পরিচালকের কথা বলছি, যাঁরা তাঁদের চলচ্চিত্র পৃথিবীর অগণিত নরনারী দ্বারা প্রশংসিত হবে বলে আশা করেন। আর চলচ্চিত্র-প্রযোজক যে কস্মিন-কালেও মাত্র নিজেকে খুশী করবার জন্যে চিত্র-প্রযোজনায় ব্রতী হন না, এ কথা সম্ভবতঃ না বললেও চলে।

কিন্তু দর্শক-মনোরঞ্জন উভয়েরই উদ্দেশ্য হলেও পরিচালক এবং প্রযোজকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অধিকাংশ সময়েই ব্যবধান দুস্তর। যেখানে প্রশংসার বরমাল্য হচ্ছে পরিচালকের একমাত্র কাম্য, প্রযোজক সেখানে চান অজস্র অর্থবৃষ্টি। বলা যেতে পারে, ছবি যদি অগণিত দর্শকের প্রশংসাধন্য হয়, তাহলে সংগে সংগে সেই ছবি স্বাভাবিকভাবেই অপরিমেয় অর্থও তো আমদানি করবে। কারণ, যে-অগণিত দর্শক ছবিটির প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবে, তারা ছবিটি দেখবার প্রবেশাধিকার লাভের জন্যে চিত্রগৃহের টিকিট-ঘরের সামনে গিয়ে অর্থের বিনিময়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ না করে পারবে না। অথচ কে না জানে, আর্টিস্টিক সাকসেস বা শৈল্পিক সাফল্য এবং কমার্শিয়াল সাফল্য বা ব্যবসায়গত সাফল্য বেশীর ভাগ সময়েই এক জিনিস হয় না? অর্থাৎ একটি ছবির শিল্পগত উৎকর্ষের জন্যে পরিচালক যখন অজস্র সাধুবাদে ভূষিত হন, প্রযোজক তখন ব্যবসায়িক অসাফল্যে জর্জরিত হয়ে চিত্র-জগত থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবার কথা চিন্তা করছেন, এমন ঘটনা প্রচুরই ঘটতে দেখা যায়। এবং এইখানেই যত বিপত্তি। পরিচালকের শিল্পদৃষ্টি এবং প্রযোজকের ব্যবসায়িক দৃষ্টির মধ্যে একটা সমন্বয়সাধন, যাকে ইংরেজীতে বলে Striking a balance না হচ্ছে, ততদিন আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্প সংকটমুক্ত হবে না।

অবশ্য কথাটা যতখানি সহজে বলা গেল, কাজে ঠিক ততখানি সহজ নয়। কারণ আমাদের দুর্ভাগ্য, চলচ্চিত্রের প্রযোজকের মধ্যে যে সর্বনিম্ন (Minimum) শিল্পচেতনা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেটুকুও আমাদের অধিকাংশ চলচ্চিত্র-প্রযোজকের মধ্যে অনুপস্থিত। অর্থ তাঁদের নিজেদের আছে কিম্বা সংগ্রহ করবার ক্ষমতা আছে এবং তার সংগে আছে এই বিশ্বাস যে, চলচ্চিত্রের প্রযোজনায় লাভ হয় শতকরা তিন, চার, পাঁচ বা তারও বেশী গুণ। এই মূলধন নিয়ে চিত্র-প্রযোজনায় ব্রতী হন বলে তাঁরা চলচ্চিত্র-প্রযোজনার শিল্পগত এবং ব্যবসায়িক— এই উভয়বিধ বুদ্ধিরই অনধিকারী। প্রায়ই দেখা যায়, তাঁদের যে ব্যবসায়-বুদ্ধি, তা তাঁরা তাঁদের 'তথাকথিত' বন্ধুবর্গ, পরিবেশক এবং প্রদর্শকদের কাছ থেকে ধার করেন এবং সেই ধার-করা বুদ্ধির জোরেই জোর করে বলেন, কাহিনীর মধ্যে প্রেমের দৃশ্য বড় কম, রিলিফ সীনের অর্থাৎ হাল্কা হাসির দৃশ্যের অভাব, গান অন্ততঃ পাঁচখানা থাকা চাই। নাচ একখানাও না থাকা অন্যায় এবং নায়ক-নায়িকা হিসেবে অমুক অমুক শিল্পীকে চাই-ই চাই, সে যত টাকাই লাগুক না কেন।—ফল যা হয়, তা আপনি, আমি এবং তিনি অর্থাৎ প্রযোজক-মশাই নিজেও জানেন। তবু ভবী ভোলবার নয় অর্থাৎ এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে আমাদের চলচ্চিত্র-জগতে। কারণ, আমাদের এই ছবির জগতে যিনি একবার প্রযোজক হয়ে মার খেয়েছেন, তিনি আর এ রাজ্যে থাকেন না এবং তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করবার লোকের এখনও তেমন অভাব ঘটেনি। চলচ্চিত্রের রুপালী রাজ্যের রূপ এবং রূপার মায়ায় এখনও আকৃষ্ট হবার মত অগুন্তি লোক আমাদের পৃথিবীতে সুযোগের অপেক্ষায় বিচরণ করছে। তাই আজ সবচেয়ে প্রয়োজন হয়েছে, চলচ্চিত্র-প্রযোজক হবার ন্যূনতম গুণাবলী বিধিবদ্ধ করে সরকার কর্তৃক তা চালু করা; অপর দিকে যেমন প্রয়োজন হয়েছে, চিত্র-পরিচালক রূপে যোগ্যতা অর্জনের জন্যে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া।

বিবিধ সংবাদ

॥ মিস প্রিয়ংবদা ॥

ইউনাইটেড টেকনিসিয়ান্সের অফুরন্ত হাসির ছবি দুষ্মন্ত চৌধুরী বিরচিত "মিস প্রিয়ংবদা"র চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি জহর রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী,

তপতী ঘোষ ও নবাগত কিরণকুমারকে নিয়ে একটি পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এই ছবিতে বাংলার সব কয়জন কমেডিয়ানদের দেখতে পাওয়া যাবে।

প্যার কিয়া তো ডরনা ক্যা

বি এস রঙ্গ পরিচালিত ও প্রযোজিত বিক্রম প্রোডাকশন্সের (মাদ্রাজ) 'প্যার কিয়া তো ডরনা ক্যা' চিত্রটি ১৫ই নভেম্বর রক্সী ও শহর-শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাম্মি কাপুর, পৃথ্বিরাজ, বি সরোজা দেবী, প্রাণ, আগা, হেলেন, ওমপ্রকাশ এবং আরো অনেকে। সংগীত-পরিচালনা করেছেন রবি।

'অস্কার' পুরস্কারের জন্য মনোনীত

সুচিত্রা সেন অভিনীত ও উত্তমকুমার প্রযোজিত 'উত্তরফাল্গুনী' ছবিটিকে ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন আমেরিকার 'অস্কার' পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠানোর জন্য মনোনীত করেছেন বলে জানা গেল।

এই সংবাদ লেখার পর আর একটি খবরে জানা গেল, সত্যজিৎ রায়কৃত এবং আর ডি বনশল প্রযোজিত 'মহানগর' চিত্রটিও এই পুরস্কারের অন্যতম প্রতিযোগীচিত্ররূপে মনোনীত হয়েছে।
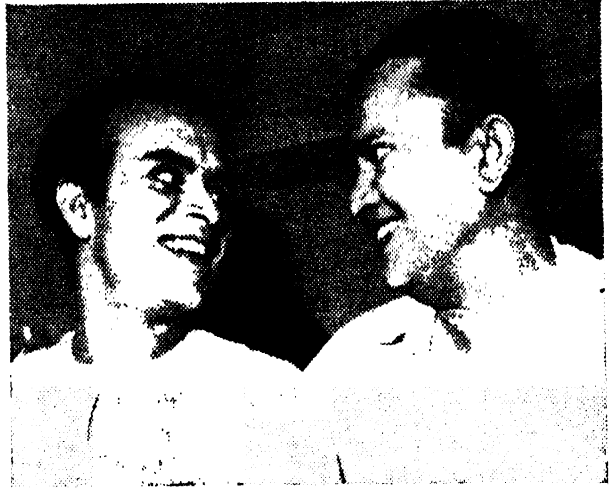
সাধক রামপ্রসাদ

রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির প্রমোদ বিভাগ কর্তৃক গত ১লা নভেম্বর বাগবাজার পল্লী পূজামণ্ডপে "সাধক রামপ্রসাদ" যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন এবং নববৃন্দাবন মন্দিরপ্রাঙ্গণে এই নাটকের অভিনয় হয় ও জনসমাদর লাভ করে। এই দিনকার তৃতীয় অভিনয়-রজনীতে নাটকখানি আরও সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয়ে দর্শকচিত্তকে মুগ্ধ করে। বাংলার শ্রেষ্ঠ মাতৃসাধক রামপ্রসাদ সেনের বৈচিত্র্যময় জীবন-আলেখ্য এই নাটকের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে ওঠে। অভিনয়ে দলগত সংহতি ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক চরিত্র স্ব স্ব ভূমিকায় দক্ষতার ছাপ রাখেন। রামপ্রসাদের ভূমিকায় শ্রীপ্রভাত-কুমার দাশঘোষ সঙ্গীতে ও অভিনয়ে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করেন। অন্যান্য চরিত্রগুলি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত ও গতি অনুযায়ী দর্শক-চিত্তকে অভিনয় দ্বারা আকৃষ্ট করেন।

'সিঁদুরে মেঘ' চিত্রে অসিতবরণ

দুই জনপ্রিয় অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। ফটো : অমৃত

ও সি গাঙ্গুলী পরিচালিত 'কিনু গোয়ালার গলি'র সেটে কালী ব্যানার্জী, ও সি গাঙ্গুলী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর

'স্বর্গ হতে বিদায়' চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

সংগীত-পরিচালনায় শ্রীপ্রভাতকুমার দাশ-ঘোষ ও নাট্য পরিচালনায় শ্রীগৌরকমল মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শ্রীদুলালচন্দ্র ঘোষ ও সতীশ দত্ত নাট্য সম্পাদনায় মুন্সীয়ানার পরিচয় দেন।

সামগ্রিকভাবে সংগীত ও অভিনয়ে নাটকখানি জনচিত্তে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

॥ লোকমঞ্চের নির্মীয়মান নাট্যপ্রচেষ্টা ॥

আগামী ১৮ই নভেম্বর, সোমবার হতে প্রতি সোমবার ৬॥টায় লোকমঞ্চ নাট্যগোষ্ঠী মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'চন্দ্রা' উপন্যাসের নাট্যরূপ নিবেদন করবেন মুক্তঅঙ্গন রঙ্গমঞ্চে।

সিপাহী বিদ্রোহের রক্তআলেখ্য অবলম্বনে এ নাটকটির পরিচালনা করবেন শ্রীনিমাই চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চ-পরিকল্পনা করেছেন শ্রীবিমল চক্রবর্তী ও আলোয় শ্রীস্বরূপ মুখার্জি। নাট্যরূপ দিয়েছেন গিরিশশঙ্কর।

॥ বেঙ্গলী ক্লাব-এর অনুষ্ঠান ॥

গত ২৩শে হইতে ২৭শে অক্টোবর লখনৌর বেঙ্গলী ক্লাবে শ্রীশ্রী'শারদীয়া' দুর্গাপূজো অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ক্লাবপ্রাঙ্গণে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী পরিতৃপ্তিসহকারে মহা-মায়ার ভোগ ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। ষষ্ঠীর রাত্রে ক্লাবের ব্যায়াম-বিভাগ কর্তৃক বহু অল্প বয়স্ক বালক-বালিকা দ্বারা 'জিমন্যাস্টিক' অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক-বৃন্দের মনোরঞ্জন করে। সপ্তমীর রাত্রে বেঙ্গলী ক্লাবের সভ্যবৃন্দ স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয় করেন। অষ্টমীর নিশীথে স্থানীয় আর্মি মেডিক্যালস কর্তৃক শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' অভিনীত হয়। নবমীর রাত্রে বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির সদস্যরা অভিনয় করেন তাঁদের স্বরচিত নাটক শ্রীঅমল ভট্ট বিরচিত 'ধ্রুপদ'। প্রতিটি নাট্যাভিনয়ই সুঅভিনীত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়। নীলদর্পণ ও ধ্রুপদ পরিচালনা করেন শ্রীসমীর সিংহ। 'বিন্দুর ছেলে' পরিচালনা করেন ডঃ গোষ্ঠ ভট্টাচার্য।

॥ সানফ্রান্সিস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে 'বেনারসী' ॥

এবারের সানফ্রান্সিসকো আন্ত-র্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১৮টি দেশের ২৩ খানি চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। এর মধ্যে ভারত থেকে পাঠানো হয়েছে তিনখানি ছবি। এই ভারতীয় চিত্রত্রয় হ'ল : অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত 'বেনারসী' এবং ফিল্ম ডিভিশনকৃত অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'লাদাক' ও একটি সংবাদচিত্র। ছবি তিনখানি এই সপ্তাহেই আমেরিকায় দেখানো হচ্ছে। এই উৎসব উপলক্ষে বেনারসী ছবিটির পরিচালক শ্রীঅরূপ গুহঠাকুরতা ও নায়িকা শ্রীমতী রুমা গুহঠাকুরতা (ব্যক্তিগত জীবনে ইনি পরিচালকের স্ত্রী) সানফ্রান্সিসকো গেছেন।

শিমুলতলা কিশোর নাট্য সংস্থার অগ্নিকুসুম

গেল ১০ই কার্তিক, সোমবার বনগ্রাম প্রফুল্লনগর পূজামণ্ডপে শিমুলতলা নাট্য সংস্থা কর্তৃক অন্নপূর্ণা সান্যালের "অগ্নিকুসুম" নাটকখানি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। সর্বশ্রী অশোক আচ্য, জয়ন্ত গুহ, সমর মুখো-পাধ্যায়, রাধারমণ হালদার, উমা হালদার ও সুরেন সাহা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। সঙ্গীত-পরিচালনা করেন কীর্তনসুধাকর শ্রীরাধেশ্যাম ঘোষ ও নাটকটি পরিচালনা করেন দৈনন্দিন সম্পাদক বিশ্বনাথ মৈত্র।

রবীন্দ্র কলা-কেন্দ্রের নৃত্য-গীতি অনুষ্ঠান "বসন্ত-মল্লার"

অল্প দিনের হ'লেও 'রবীন্দ্র কলা-কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাসহকারে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। গত ১২ই অক্টোবর তারিখে রবীন্দ্র-ভারতীতে এ'দের 'বসন্ত-মল্লার' নৃত্য-গীতি অনু-ষ্ঠানের পরিকল্পনা নতুন ক'রে প্রমাণ করল যে, শুধু রবীন্দ্রনাথের গানে নয়, তাঁর সাহিত্য ও দর্শনের প্রতিও এ'দের গভীর অনুরাগ রয়েছে। কবিগুরুর ঋতু-সংগীতে বর্ষা ও বসন্তের মূল

অভিব্যক্তি যে এক—তা' সুরে ও ছন্দে এ'রা সেদিন প্রকাশ ক'রতে সক্ষম হয়েছেন।

অনুষ্ঠানের সূচনায় কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের শরতের গানগুলি নিষ্ঠা-সহকারে অনুশীলনের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। অনুষ্ঠানে দেবব্রত বিশ্বাসের একক কণ্ঠের গান, সলিল মিত্রের বেহালায় রবীন্দ্রসংগীতের সুর শ্রোতা-দের প্রভূত আনন্দ দেয়। 'নৃত্যের তালে তালে' গানটির সাথে মঞ্জুশ্রী সরকারের (চাকী) নাচ অনবদ্য।

খাটের মঞ্চে নাচের সাথে গানের জন্য মাইক স্থাপন উদ্যোক্তাদের অনভিজ্ঞতার প্রমাণ। এ ব্যবস্থায় সুন্দর-ভাবে পরিবেশিত হলেও শ্রোতাদের অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। শৈলেন দাস, অর্ঘ্য সেন, অরবিন্দ চক্রবর্তী, বাদল চক্রবর্তী, পূর্ণিমা চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী, সোনালী ঘোষ দস্তিদার কণ্ঠসংগীতে ও আরতি গুপ্ত, শিপ্রা সেন নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন।

উদয়াচলের 'হ্যামলেট'

গেল ২রা নভেম্বর রাজাবাজারস্থ প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে উদয়াচলের সভ্যবৃন্দ শেক্সপীয়রের অমর ট্রাজেডি 'হ্যামলেট'-এর বাংলা নাট্য রূপান্তর সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

শিল্পী মহলের 'সুর্যস্বাদ'

গেল ১১ই নভেম্বর মিনার্ভা মঞ্চে শিল্পীমহল তাঁদের নতুন নাটক শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সুর্যস্বাদ' নাটকটি বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করেন।

রূপদক্ষের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব

গেল মঙ্গলবার ১২ই নভেম্বর থিয়েটার সেণ্টার হলে দক্ষিণ কলকাতার বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা রূপদক্ষের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সুকুমার রায়ের 'চলচিত্তচঞ্চরী' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' অভিনীত হয়।

সাম্প্রতিকের 'একটা খুনের গল্প' 'ওয়েটিং ফর গোডো'

গেল শুক্রবার ৮ই নভেম্বর মিনার্ভা মঞ্চে সাম্প্রতিকের সভ্যবৃন্দ স্যামুয়েল বেখেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'-র কৌশিক সান্যাল অনূদিত বাংলা রূপ এবং অমল মুখোপাধ্যায় রচিত 'একটা খুনের গল্প' সাফল্যের সহিত অভিনয় করেন।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা

পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার মৃণাল সেন-এর 'প্রতিনিধি' মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি। বর্তমানে ইণ্ডিয়া ল্যাবের সম্পাদনা ও শোধনাগারে শেষ কর্মটুকু পালিত হচ্ছে। অধুনা বাস্তব পরিবেশে সামাজিক একটি দ্বন্দ্ব-মধুর কাহিনী। অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের একটি কাহিনী অবলম্বনে সাম্প্রতিক বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যামূলক সমকালীন ঘটনাসমূহে রচিত চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রে স্থান পেয়েছে। প্রধান তিনটি চরিত্রে যথার্থ রূপ দিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রসেনজিৎ। বিভিন্ন পরিবেশে কাহিনী পার্শ্বচরিত্রে রয়েছেন অনুপ-কুমার, জহর রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাণী গাঙ্গুলী। দুটি জনপ্রিয় রবীন্দ্র-সংগীত এছবির প্রধান আকর্ষণ। কণ্ঠ দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বেলা মুখোপাধ্যায়। আবহসংগীত ও সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

অগ্রদূত পরিচালিত ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাদশা' সম্প্রতি মুক্তি প্রকাশের দিন ধার্য হতে চলেছে। সমাজের অব-হেলিত ফেরারীর জীবনকাহিনী এ ছবির আখ্যানবস্তু। একটি শিশুর সান্নিধ্যে তার জীবনের কি সৎ পরিবর্তন আসতে পারে তারই জীবনচিত্র বিধৃত। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতি লাহার চিত্রগ্রহণে এচিত্রের অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন তাঁদের অন্যতম অসিতবরণ, বিকাশ রায়, সন্ধ্যা-রাণী, তরুণ মিত্র, প্রেমাংশু বসু, রথীন ঘোষ ও শ্রীমান শিবশঙ্কর। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এছবির সুরকার।

সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে 'বর্ণালী' চিত্রের মুক্তিদিন সমাসন্ন। অজয় কর পরিচালিত-এ প্রেম-মধুর কাহিনী চিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, বিশ্বনাথন ও ছায়া দেবী। কলাকুশলী বিভাগের চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্প-নির্দেশনা ও সংগীতপরিচালনায় যুক্ত রয়েছেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, কার্তিক বসু এবং কালীপদ সেন। জি আর প্রোডাকসন্সের এ ছবিটি পরিবেশনা করছেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস।

পরমহংস বাণীচিত্রের 'নবারুণরাগে' ছবির পুনরায় চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয়। গত সপ্তাহে একটি নৃত্যদৃশ্য প্রচুর অর্থব্যয়ে গৃহীত

তাহলে চিত্রের নায়িকা সন্ধ্যা রায়

গীতাঞ্জলি পিকচার্সের 'কোহারা'-র সম্প্রতি সম্পূর্ণ-দৃশ্য সমাপ্ত হল। নায়ক-নায়িকার দুটি চরিত্রে রয়েছেন জনপ্রিয় বিশ্বজিৎ ও ওয়াহিদা রেহমান। পার্শ্বচরিত্রে রূপদান করেছেন চাঁদ ওসমানি, মদনপুরি, মনোমোহন কৃষ্ণ, অভি ভট্টাচার্য, অসিত সেন, তরুণ বসু, জামাল ও ললিতা পাওয়ার। মন ভরানো নায়কের মুখের গানগুলি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন। নায়িকার কণ্ঠে লতা মঙ্গেশকর। পরিচালনায় রয়েছেন বীরেন নাগ।

সুবোধ মুখার্জী প্রোডাকসন্সের 'এপ্রিল ফুল'-র বহির্দৃশ্য সম্প্রতি মহীশূরে গৃহীত হয়েছে। বিশেষ ক র বৃন্দাবন বাগানে এছবির মুখ্যদৃশ্যগুলি অভিনীত হয়। প্রধান চরিত্রে জয় মুখার্জী ও সায়রা বানু। স্বনামধন্য ও বিশেষ জনপ্রিয় শঙ্কর-জয়কিষণ এছবির সঙ্গীতপরিচালক। ইস্টম্যান কলারে ছবিটি মুক্তি পাবে।

এ জি ফিল্মসের রঙিন চিত্র 'মহাভারত' পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন বাবুভাই মিস্ত্রী। প্রযোজক এ এ নাদিয়ালা এ ছবির প্রযোজনাভার নিয়েছেন। মডার্ন স্টুডিওয় নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে গত সপ্তাহ থেকে। পুরাণ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন অর্জুনের চরিত্রে প্রদীপকুমার। ভীম চরিত্রে দারা সিং। যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় ঈশ্বরলাল। শকুনির চরিত্রে জীবন। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় সাহু মোদক। এবং কর্ণ হচ্ছেন রাজপ্রকাশ। সম্ভবতঃ দ্রৌপদীর চরিত্রে স্বাক্ষর করবেন বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সুচিত্রা

হয়। অভিনেতা অতনুকুমার ছবির নায়ক ও পরিচালক। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সবিতা বসু, অতনুকুমার, অসিতবরণ, কমল মিত্র, জহর রায়, তরুণকুমার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও অপর্ণাদেবী। চিত্রগ্রহণ, শিল্প-নির্দেশনা ও সঙ্গীতপরিচালনায় রয়েছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত, গৌর পোদ্দার এবং তি বালসারা। হিরন্ময় দত্ত এছবির প্রযোজক।

বোম্বাই

ভারতীয় চলচ্চিত্রের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগামী ২৯শে নভেম্বর ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি প্রদর্শনী ও আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু এউৎসব উদ্বোধন করলেন। সম্ভবতঃ এউৎসবে পৃথিবীবিখ্যাত প্রধান অভিনেতা ও পরিচালক চার্লি চ্যাপলিন, গ্রেটা গার্বো ও গ্রেস কেলি প্রভৃতি স্বনামধন্য শিল্পীরা যোগদান করছেন। এছাড়া সিনেমাশিল্পের বহু গুণীজন এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

হেমন্তকুমার প্রযোজিত ও সুরকৃত

রাধাকৃষ্ণ চিত্রে লীলা পাল ও কেতকী দত্ত

সেন। সঙ্গীত-পরিচালনায় থাকছেন চিত্রগুপ্ত।

চিত্রলোক নিবেদিত 'কাজল'-এর নায়িকার ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন বাংলার শর্মিলা ঠাকুর। নায়ক চরিত্রে রয়েছেন ধর্মেন্দ্র। সম্প্রতি এই রঙিন চিত্রের মহরৎ সুসম্পন্ন হয়। কাহিনীর মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করছেন মীনা-কুমারী। প্রযোজক রাম মহেশ্বরী এছবির পরিচালক। সঙ্গীত-পরিচালনার ভার নিয়েছেন রবি। এমাস থেকে চিত্রগ্রহণ শুরু হল।

মাদ্রাজ

এমজিয়ার পিকচার্স সম্প্রতি 'ভবানী' চিত্রটির চিত্রস্বত্ব স্বস্তিক ফিল্ম সংস্থার কাছ থেকে ক্রয় করলেন। এ ছবির নতুন নাম রাখা হয়েছে 'কুমারী মাগ্নন'। প্রযোজনা, পরিচালনা ও নায়ক চরিত্রে থাকছেন এম জি রামচন্দ্রন। নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন অঞ্জলী দেবী, পি এস ভিরাপ্পা, এম এন নামবিয়ার, এস এস রাজেন্দ্রন, নাগেশ ও আর বিজয়াকুমারী। সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন এস এস সুব্বিরা নাইডু।

স্টুডিও থেকে বলছি

সংসারে এমন এক ধরণের বিত্তশালী সম্প্রদায় আছেন যাঁদের অর্থের দৌলতে দৈনন্দিন জীবিকার কোন দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয় না। অর্থ আছে। কোন কাজ নেই। কিন্তু গৃহবশতঃ ধনীপুত্র ভূপতিকে এক্ষেত্রে যেন একটু ব্যতিক্রম দেখা গেল। সহস্র স্তুতিবাদে ভূপতি দ্রুত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত উকিল শ্যালক উমাপতির কথায় একটা খবরের কাগজ প্রকাশ করার দায়িত্ব নিলেন ভূপতি। সম্পাদকের দায়িত্বে একদিন বালিকা-বধূ চারুলতা যে যৌবনে পদার্পণ করলো তার কোন খবর রাখলেন না ভূপতি—যে সময়ে স্বামী-স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনতুন হয়ে প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যূষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হয়ে গেল কেউ জানতে পারল না। নূতনত্বের স্বাদ না পেয়ে উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হয়ে গেল।

চারুলতার দিনগুলো শূন্য হলেও লেখাপড়ায় শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হল। স্ত্রী-সঙ্গের অভাবকে পূর্ণ করার জন্য ভূপতি শ্যালকজায়া মন্দাকিনীকে আনালেন। কিন্তু চারুর এ নিঃসঙ্গতা পূর্ণ হল না। বরং ভূপতির পিসতুত ভাই অমল তার অভাবকে কিছুটা লাঘব করলো। অমল থার্ড ইয়ারের ছাত্র। চারুর পড়াশুনোর ভার সে নিল। ক্রমশঃ অমলের সান্নিধ্যে চারুলতা সহজ এবং সুন্দর হল। অমলের অনেক প্রার্থনা বৌঠান পালন করে খুশী হলেন। সাহিত্যচর্চা আর নানান নতুন কর্মের পরিকল্পনায় শূন্য দিনগুলো আবার ভরে উঠলো। সহজ-সরল দুটি আত্মীয় জীবন এমনিভাবে সরলতায় একজন আর একজনের বন্ধুত্বে গভীরে পৌঁছল। একদিন চারুর প্রেরণায় অমল সাহিত্যরচনায় অংশ নিল। অমলের প্রথম লেখার সে শিহরণে চারুর সফলতা উৎসাহ জাগিয়েছিল। 'আমার খাতা' প্রবন্ধে অমলের প্রথম লেখা—'হে আমার শুভ্র খাতা, আমার কল্পনা এখনও তোমাকে স্পর্শ করে নাই। সূতিকাগৃহে ভাগ্যপুরুষ প্রবেশ করিবার পূর্বে শিশুর ললাট পট্টের ন্যায় তুমি নির্মল, তুমি রহস্যময়। যেদিন তোমার শেষ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে উপসংহার লিখিব সেদিন আজ কোথায়! তোমার এই শুভ্র শিশুপত্রগুলি সেই চিরদিনের জন্য মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা আজ স্বপ্নেও কল্পনা করিতেছি না।'

অমলের লেখা নিয়েই এখন চারুর সময় কাটে। এতদিন দুজনে যে আকাশ-কুসুমের চয়নে নিযুক্ত ছিল, আজ তা কাব্যকুসুমের চাষে সমস্ত কিছু চাপা পড়েছে। অমল লেখক। এবং চারু পাঠক। মাঝে মাঝে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গল্পের প্রশংসাপত্র আসতে শুরু করলো। ভূপতির প্রশংসায় চারু খুশি হল সবচেয়ে বেশী। অমল ভূপতির আশ্রিত, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তার প্রভেদ অনেক। একথা চারু বুঝেছিল বলেই তার ভাবটা ছিল—'অমলকে কেন যে আমি এতটা স্নেহ করি, আদর করি, এতদিনে তোমরা তাহা বুঝিলে; আমি অনেকদিন আগেই অমলের মর্যাদা বুঝিয়াছিলাম, অমল কাহারও অবজ্ঞার পাত্র নহে।'

পাঠকসমাজে অমলের নাম জনপ্রিয় হয়েছে। সাহিত্যজগতে প্রতিপত্তি লাভ করায় তার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঝেমাঝে সাহিত্য-সভায় যোগদান, মুগ্ধ পাঠকের নিমন্ত্রণ আর সভাপতি হবার অনুরোধে অমল আত্মীয়স্বজনের চোখে অনেক বড় স্থান দখল করে নিয়েছে। মন্দাকিনী এতদিনে তার প্রতি সুপ্রসন্না। পূর্বকৃত অবহেলা সে সুদে-আসলে শোধ দিতে উদ্যত। হঠাৎ মন্দার এ পরিবর্তনে চারুর বিরক্তিবোধ দেখা গেল। তার ধারণা পাঁচজনের হাতে পড়ে অমলের সমূহ বিপদ শুরু হবে। আহা সরল অমল! মায়াবিনী মন্দা।

ঘটনা পরিক্রমায় মন্দা স্বামী উমাপদর সঙ্গে এবাড়ী ত্যাগ করলো। কিন্তু অমলের সন্দেহ বৌঠানের ওপর। হয়তো তার পরামর্শে ভূপতি এদের চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। ভূপতি তার পত্রিকা প্রায় পরিত্যাগ করেছে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত আর উমাপদর বিশ্বাস-ঘাতকতায়। এতদিনে চারুর প্রতি তার ভালবাসা দানা বাঁধলো। কিন্তু চারুর সে

জীবন কাহিনী চিত্রে অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়

স্বামী-প্রেম আর দ্বিতীয়বার জাগ্রত হল না। জোয়ার এখন ভাটায় পরিণত হয়েছে।

ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলে দিতে হল। ভূপতি আর খরচ বহন করতে পারলেন না। বারো বছরের একটানা জীবনে এবার জিরিয়ে নেবার সময় এলো। সংসারে ফিরে দেখার সময় হল ভূপতির। অমলের বিয়ের জন্য সম্বন্ধ আনলেন বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে। তাঁদের ইচ্ছে বিয়ের পর অমলকে বিলেত পাঠাবেন। প্রথম-প্রথম চারু অমলকে ঠাট্টা করেছিল। কিন্তু অমল এবিয়েতে মত দিল। বিয়ের দিন স্থির হল। ভূপতি বর্ধমানে অমলের বিবাহ-

শ্রেয়সী চিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

অন্তে তাকে বিলেত পাঠিয়ে আপন গৃহে ফিরলেন। নানা দিক থেকে ঘা খেয়ে ভূপতির বহিঃসংসারের প্রতি একটা বৈরাগ্য উদয় হল। ভেবেছিল চারুর ভালবাসায় বাকী দিনগুলো ভরে উঠবে। কিন্তু বাস্তব মনে হল—'বারো বৎসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া স্ত্রীর সঙ্গে কি করিয়া গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছি।'

অনেক চেষ্টার পরেও যখন চারুর মন পাওয়া গেল না তখন ভূপতি আবার পত্রিকার নেশায় মেতে উঠলেন। মৈশুরে একটা খবরের কাগজে সম্পাদকের আমন্ত্রণ তিনি পেয়ে গেলেন। বিদায়কালে চারুকে বলে গেলেন—তোমার যদি একলাবোধ হয় আমাকে লিখো, আমি চলে আসবো। হঠাৎ চারুর কি পরিবর্তন হল যেন সেই

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ চিত্রে অমরেশ দাস ও মলিনা দেবী

মুহূর্তে। ছুটে এসে ভূপতির দুহাত ধরে বলে ওঠে—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না। ভূপতি ভাবলেন অমলের বিচ্ছেদ-স্মৃতি ভুলতে এ বাড়ী থেকে পালাতে চায় চারু। যে আশ্রয় চূর্ণ হয়েছে, ভেঙ্গে গেছে তাকে কিভাবে জোড়াতালি দেবে। ভূপতির অমত হলে চারু কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ভূপতি সঙ্গে নিতে রাজী হলেন, কিন্তু চারু রাজী হল না।

কাহিনীর ঘটনা এখানেই সমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পের সংক্ষিপ্ত

বর্ণালী চিত্রে শর্মিলা ঠাকুর ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

পাধ্যায়, নবাগতা সুচন্দ্রা

মরুতৃষ্ণা চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অসিতবরণ

একাহিনী। সম্প্রতি সত্যজিৎ রায় একাহিনী অবলম্বনে চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। সম-কালীন কাহিনী-পরিবেশ, চরিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ বজায় রেখে এছবির কাজ নিয়মিত পালিত হচ্ছে। কাহিনীর ভূপতি, অমল এবং চারুর চরিত্রে অভিনয় করছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র, ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। পার্শ্ব দুটি চরিত্রে রয়েছেন শ্যামল ঘোষাল এবং গীতালি রায়। আর ডি বনশল প্রযোজিত ও পরিবেশিত এছবির বিভিন্ন কুশলী-বিভাগে দায়িত্বপালন করছেন চিত্রগ্রহণে সুব্রত মিত্র, শিল্প-নির্দেশনায় বংশীচন্দ্র গুপ্ত ও সম্পাদনায় দুলাল দত্ত। চিত্র-নাট্য, সঙ্গীত ও চিত্রপরিচালক শ্রীরায়।

—চিত্ররঙ্গ

অন্তরীক্ষ চিত্রে দিলীপ মুখার্জি বিশ্বজিৎ রায় ও কাজল গুপ্ত

কালস্রোত চিত্রে মঞ্জু দে

জার্মাণীর সঙ্গীত জগত

বর্তমানে জার্মাণীতে সঙ্গীতের স্থান কোথায়? আজ ১৫ বৎসর হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এখানে সাংস্কৃতিক পুনরোদ্ধার হয়। ভয়াবহ ক্ষতিপূরণ সত্যিই বর্তমানে এক কঠিনতম কার্য। জার্মাণীর বহু সংখ্যক শিল্পীকে নাজি রাজত্বকালে নির্বাসিত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বারা বড় বড় যন্ত্রসঙ্গীতশালার প্রচুর ক্ষতি হয় এবং বড় বড় যন্ত্রসঙ্গীতশালাগুলি যুদ্ধে ধূলিসাত হয়ে যায়।

জার্মাণীকে সেই সমস্ত সাংস্কৃতিক পুনরোদ্ধার কার্যে অর্থ ও সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে অনেক শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও জার্মাণ সঙ্গীত বিনষ্ট হয়নি। যুদ্ধের পূর্বে সে সমস্ত বিখ্যাত যন্ত্রসঙ্গীতদল (অর্কেস্ট্রা) নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তা আবার নূতন করে গড়ে উঠেছে—নূতন যন্ত্রসঙ্গীতদলের উত্থান হয়েছে, যন্ত্রসঙ্গীত-গৃহ, অপেরা-গৃহ নূতন করে তৈরী হয়েছে। বিদেশ থেকে পুনরায় মান এবং পুরস্কার অর্জন করেছে। বহু অপেশাদার যন্ত্রশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। বর্তমানের বিখ্যাত যন্ত্রসঙ্গীতদল ঃ উদাহরণ স্বরূপ বার্লিন ফিলহারমোনিকা ও বামবার্গের সঙ্গীত-রচয়িতা পৃথিবীর মধ্যে পুনরায় নিজের সম্মানআসন লাভ করেছে। কামার সঙ্গীতের দান রেনেসাঁ-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। স্টুটগার্টের কামার যন্ত্র-সঙ্গীত তার আন্তর্জাতিক সুনাম এক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে। বর্তমানের যন্ত্রসংগীত যা যুদ্ধের পরবর্তীকালে জার্মাণ রেডিও বেতারে উত্থিত হয়েছে তা সঙ্গীত-জীবন ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে দেয় না। বার্লিন, হামবুর্গ, কোলন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মিউনিক, স্টুটগার্ট এবং বাদেন-বাদেন-এর বেতার সিম্ফনি যন্ত্রসঙ্গীত আন্ত-র্জাতিক সুনাম অর্জন করে আসছে।

*** আধুনিক ও পুরাতন সঙ্গীত ***

পুরাতন সঙ্গীত সম্বন্ধে আজ পৃথিবীর লোকেরা এক নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। জার্মাণ দেশে তা পুরাতন এবং নিজস্ব সঙ্গীত যা ঐতিহাসিক সত্য খুঁজতে চেষ্টিত। এই বিষয়ে পশ্চিম জার্মাণের বেতার-বিভাগ Capella Coloniesis যথেষ্ট পুনরুদ্ধার করেছেন, এই বেতার-বিভাগ পুরাতন বিলুপ্ত রচনার পুনরোদ্ধার করেছেন। এ পুরান সঙ্গীতের এক অংশ উদ্ধার করেছে। বিলুপ্ত সঙ্গীত-যন্ত্রের স্বরলিপি নূতন করে বাজান হয়েছে। একদিকে মধ্যযুগের ও ব্যারক যুগের সঙ্গীত-এর নূতন রচনা আর অন্যদিকে আধুনিক বৈদ্যুতিক সঙ্গীত-যন্ত্রের রচনার মধ্যবর্তী কালের নূতন ও পুরান সঙ্গীত যা ইতিমধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পরিণত হয়—তা সর্বসাধারণের দ্বারা সমাদর লাভ করেছিল। এরা জার্মাণীর কনসার্ট অনুষ্ঠানে অনেকখানি অংশ গ্রহণ করে থাকে। তা ছাড়াও সমসাময়িক সঙ্গীতকেও অগ্রাহ্য করা যায় না। অধিকাংশ যন্ত্রসঙ্গীত ও কামার-সঙ্গীত তাদের অনুষ্ঠানে একে অনেকখানি আসন দেয়। আধুনিক সঙ্গীত ডোনাও সঙ্গীতজ্ঞের দ্বারা শহীদ-দিবসে সমাদৃত হয়, জার্মাণ বেতার বিভাগ নিয়মিতভাবে সমসাময়িক সঙ্গীত

স্টুডিও থেকে প্রচারিত করেন। এর জন্য প্রচুরভাবে আধুনিক সংগীত বহু স্থানে সমাদৃত হয়। সমসাময়িক সংগীত ছাড়া কনসার্ট-এর কোন মূল্যই নেই। ক্রমে এই মতটি প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে সমসাময়িক জার্মাণ সংগীত-রচয়িতাদের নাম যথা বোরিস ব্লাসার, যাঁর বয়স এই দিনে ৬০ বৎসর পূর্ণ হবে এবং হান্স্ হেবরনার হেনজ এবং হেবরনার এগক্ বিদেশে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন।

বিখ্যাত সংগীত সম্পাদক-এর নাম বিদেশে প্রসার লাভ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ জার্মাণ সংগীত পরিচালক ও Solisten Kavajan, Sawallisch, Klempevev, Schmidt - Isserstedt, Backhous, Kempff এবং Seemann প্রভৃতির নাম প্রতিটি কনসার্ট ভক্ত ও গানের রেকর্ড-এর বন্ধুবর্গদের কাছে অজানা নয়। জার্মাণ • কলা-সংগীতের দোভাষী শিল্পীদের নাম যথা— —Dietvich Fischer-Dieskan, Erna Berger, Elisapeth Schwarz-Kopf, Irmgard Seefried, Rita Streich এবং Erika koth বিশ্ববিখ্যাত হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

*** অপেরা ***

অপেরা জার্মাণ জনসাধারণের দ্বারা সর্বসময় সমাদর লাভ করে আসছে। কিন্তু পুনরায় সমস্ত অপেরা ভাল তৈয়ারী ও অপেরাজীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অধিকাংশ জার্মাণ ক্ষুদ্র শহরগুলিতে নিজ নিজ অপেরা-ভবন ছিল কিন্তু ১৯৪৫ সালে সমস্ত দেশে একটিও অপেরা-ভবনের চিহ্ন ছিল না। তাই যখন তারা নতুন করে অপেরা-ভবন তৈয়ারীর কার্য আরম্ভ করে তার জন্য তাদের নতুন ও মূল্যবান চিন্তাধারা নতুনভাবে উন্নত অপেরা-জীবনকে স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্মাণ শহরই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অতি আধুনিক ও উচ্চাঙ্গের অপেরা-ভবন নির্মাণ করেছে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে আমন্ত্রণ করে নতুন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সুযোগ দিতে।

পূর্বের মত অপেরামঞ্চে কাজ চালাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সর্বোচিত প্রশংসা ভবিষ্যত জীবনের সার্থকতার আলোকপাত করে। উদাহরণ স্বরূপ Hindemith, Schoenberg, Von Einem, Blacher, Fortnev, Egk, Henze এবং Klece-দের রচিত সংগীত জনসাধারণের কাছে বিশেষ আসন লাভ করছে এবং তাদের লিখিত অপেরা প্রায়ই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অপেরার রচনায় বহুদিন বহু বৎসর কেটে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ মোৎজার্ট ও হেবৃগনার-এর রচনা— জার্মাণ মঞ্চে বহুভাবে অভিনীত হয়ে দর্শকদের সমাদর লাভ করেছে। বিদেশে সবচেয়ে সমাদৃত হয়েছে য়ুইল্যান্ড হেবৃগনার-এর বেইরুট উৎসবে রচনা কার্য : পূর্বকালের আসল মূলটি আবার পাওয়া গিয়েছে যা কালের প্রারম্ভে পুনরায় অতীতের মত উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। যদিও বর্তমানের সমালোচনায় উন্নতির যথেষ্ট গতিরোধ হয়েছিল কালক্রমে তা অপসারণ হবে।

জার্মাণ থিয়েটার যুদ্ধের পর থেকে জার্মাণ নৃত্য-নাট্যের উন্নতিকল্পে সর্বোতোভাবে চেষ্টা করছে। সর্বদিক থেকে অর্থ সাহায্য এই উন্নতির সার্থকতার পথে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন দেশগুলি সংগীত এবং অভিনয় জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করছে। জার্মাণ নৃত্য-নাট্যের মধ্যে সর্বপ্রথম বৈদেশিক ছাপ বা ভাবকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না। তার সম্বন্ধেও শুধুমাত্র বলা যায় পরবর্তীকালে জার্মাণ ও বিদেশী শিল্পিবৃন্দ সংযুক্ত হয়ে শুধু জার্মাণ জীবনের নৃত্যকলা ও সংস্কৃতি নৃত্য-নাট্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনবে।

আকলা সংগীত অতি অল্প সময়ে নিজের ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে। এর শিল্প ধর্মজীবনে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যার ফলে রাজনৈতিক বাধা এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি ও এর প্রগতিও নষ্ট হয়নি। প্রতি পদক্ষেপে—গ্রামের গির্জা থেকে শহরের বড় গির্জায় গির্জা-সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে বিখ্যাত রচয়ক : Bach, Schutz Telemann, Buxtehude এবং অন্যান্য গির্জা-সংগীত রচয়িতাদের প্রতি গির্জা-প্রচলিত। পরিচালকবৃন্দ গির্জা-সংগীতের নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বায়রণের আনসডাক-এ বাখ-সপ্তাহ পালন আন্তর্জাতিক সংগীতজীবনকে যথেষ্ট সাহায্য করছে।

বর্তমান জার্মাণ সংগীতজীবনের প্রতিটি অধ্যায় অসমাপ্ত হত যদি না জার্মাণ সংগীতজীবনে লেইয়েন মুজিক-এর আলোকসম্পাত না থাকত। লেইয়েন গীর্জাসংগীত এবং যন্ত্রসংগীত সংঘ এত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যে বৈজ্ঞানিক মাধ্যমে সংগীত যথা রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি সংগীত প্রগতির কোন বাধাদান করতে পারেনি। চার্চ-সংগীত ছাড়া জার্মাণীতে কমপক্ষে ১৫০০০ হাজার লেইয়েন (অপেশাদারী) সংগীতদল আছে, তা ছাড়া অগুন্তি গ্রাম্য ও নাগরিক সংগীত সংঘ, পজায়েন গীর্জা সংগীত সংঘ, যুবক ও শিক্ষা নিকেতন সংগীত সংঘ, সংগীত ফেরাইন ও যুবক সংগীত সংঘ যারা লেইয়েন সংগীতের চর্চা করছে। এদের মধ্যে অনেকে যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করেছে।

"জার্মাণীর সংগীত জীবন" এই অধ্যায়ে প্রকাশ করতে চায় যে সংগীত-শিল্প বর্তমান জার্মাণ জীবনে জাগ্রত শিল্প। যদিও রেকর্ড, রেডিও, টেলিভিশন সত্যকারের অপেরা ও কনসার্টের উৎসাহ কমিয়ে দেবে কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কোন ক্ষতি করতে পারেনি বরং এই বৈজ্ঞানিক মাধ্যমে সংগীত প্রচুর জনসাধারণের হৃদয়কে গানের প্রতি আকৃষ্ট করেছে—তার প্রমাণ যে বর্তমানে কনসার্ট হলে ও অপেরা হলে প্রচুর জনতা দেখতে পাওয়া যায়।

মাধব মুখোপাধ্যায়

খেলাধূলা

দর্শক

জয়দীপ মুখার্জি

॥ ভারতীয় টেনিস খেলা ॥

বোম্বাইয়ে সম্প্রতি ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার মধ্যে ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইনাল খেলা হয়ে গেল। ফুটবল, বাস্কেটবল, টেবিল টেনিস, বক্সিং প্রভৃতির মত অপেশাদার লন টেনিস খেলায় বিশ্ব প্রতিযোগিতার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই নিয়ে অপেশাদার খেলোয়াড়দের মনে কোন ক্ষোভই নেই। ডেভিস কাপ আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতাই বে-সরকারীভাবে দলগত বিভাগের বিশ্ব প্রতিযোগিতার পদ মর্যাদা লাভ করেছে, যেমন ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে রয়েছে ইংল্যাণ্ডের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতা। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ প্রথম যোগদান করে ১৯২১ সালে। সেই সময় থেকে ভারতবর্ষ নিয়মিত যোগদান করেনি; মাঝে মাঝে বাদ পড়েছে। আগে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় দুটি অঞ্চল নিয়ে খেলা হত—ইউরোপীয়ান জোন এবং আমেরিকান জোন। ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান জোনের বিজয়ী দেশ মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মিলিত হ'ত। এবং এই আঞ্চলিক ফাইনালের বিজয়ী দেশই প্রতিযোগিতার শেষ খেলা—চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে পূর্ব বৎসরের ডেভিস কাপ জয়ী দেশের বিপক্ষে খেলতো। এই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলাই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা।

ভারতবর্ষের খেলা পড়তো ইউরোপীয়ান অঞ্চলে। ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলির বিপক্ষে ভারতবর্ষ কোন সময়েই পেরে উঠতো না। ভারতবর্ষকে প্রতিযোগিতার প্রায় প্রথমদিকের খেলায় বিদায় নিতে হত। ১৯৫৩ সাল থেকে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় একটা নতুন জোনের খেলা আরম্ভ করা হয়েছে, নাম ইস্টার্ণ জোন। ভারতবর্ষ এই জোনের খেলায় নাম লিখিয়েছে। গত তিন বছর ভারতবর্ষ তার নিজের অঞ্চলের খেলায় জয়ী হয়ে মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ১৯৬১ সালে মূল প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক সেমি-ফাইনালে আমেরিকার বিপক্ষে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ভারতবর্ষ ২—৩ খেলায় পরাজয় স্বীকার করে। পরবর্তী দু বছর (১৯৬২—৬৩) ভারতবর্ষ মূল প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইনালে খেলেছে। ১৯৬২ সালের ফাইনালে মেক্সিকোর কাছে ০—৫ খেলায় এবং ১৯৬৩ সালের ফাইনালে আমেরিকার বিপক্ষে ০—৫ খেলায় ভারতবর্ষের শোচনীয় হার হয়েছে। নিজের জোনে ভারতবর্ষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ বলতে কেউ নেই। জাপান একবার এশিয়া মহাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবার গৌরব লাভ করলেও বর্তমান সময়ের ভারতীয় টেনিস দলের বিপক্ষে হার স্বীকার করেছে। উপর্যুপরি দু'বার মূল প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইনালে উঠে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের সিংহদ্বারের সামনে উপস্থিত হয়ে ভারতবর্ষকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। ১৯৬৩ সালের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলায় ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আমেরিকা। ১৯৫৯ সাল হলে আমেরিকাকে বলতাম প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। কারণ সেই সময়ে আমেরিকা উপর্যুপরি ১৪ বার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ৬ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তী তিন বছরে (১৯৬০—৬২) আমেরিকার টেনিস খেলার মান অনেক নেমে যায়—তারা এই তিন বছরে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠতে পারেনি। এমন কি ১৯৬২ সালে আমেরিকা নিজের জোনের খেলায় চ্যাম্পিয়ান হতেই পারেনি; প্রথমদিকের খেলায় মেক্সিকোর কাছে পরাজয় বরণ করে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়।

অনেকে আশা করেছিলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা উপযুক্ত কোচের হাতে পড়লে আমেরিকার বিপক্ষে আঞ্চলিক ফাইনাল খেলায় উতরে যাবে। সময়ে সময়ে খেলায় অনেক কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে থাকে এবং অনেক সময়ই এই রকম ঘটনার মূলে বিশেষ কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এইদিক থেকে যাঁরা আমেরিকার বিপক্ষে ভারতবর্ষের জয়লাভের শুভেচ্ছা করেছিলেন বা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁরা খুবই মুষড়ে পড়েছেন।

আমেরিকার বিপক্ষে ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলার তিন সপ্তাহ আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত টেনিস কোচ স্ট্যানলী এডওয়ার্ডসের শিক্ষাধীনে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের রাখা হয়েছিল। আমাদের দেশের বহু লোকের মুখে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার আশু সুফল লাভের কথা শুনেছিলাম। তাঁদের ধারণা ছিল, ভাল শিক্ষকের হাতে যখন শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে তখন ফল ভাল না হয়ে যায় না। তাঁরা ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের কাছ থেকে আশু সাফল্যের জন্যে উদগ্রীব হয়েছিলেন। স্বয়ং এডওয়ার্ডস সাহেবও অভিজ্ঞ শিক্ষকের দৃষ্টিতে প্রথমদিকে আমাদের আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও ভারতীয় দলের ফলাফলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। উইম্বলেডন, অস্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান প্রভৃতি প্রখ্যাত লন টেনিস প্রতিযোগিতায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে যোগদানকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতা বিচার ক'রে খেলোয়াড়দের নামের বাছাই তালিকা প্রতিবারই প্রকাশ করা হয় এবং প্রতিবারই এই তালিকা অনুযায়ী খেলার ফল পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তালিকার নীচের দিকের খেলোয়াড়রা শীর্ষস্থানের খেলোয়াড়দের অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করেন অথবা তালিকায় স্থান পাননি এমন খেলোয়াড়ও ফাইনাল খেলা পর্যন্ত উঠে যান। সুতরাং আঞ্চলিক ফাইনালে আমেরিকার বিপক্ষে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়ান কোচ মিঃ এডওয়ার্ডস যে আশার বাণী দিয়েছিলেন তার প্রতি কটাক্ষপাত করে লাভ নেই। খেলার শেষে মিঃ এডওয়ার্ডস ভারতবর্ষের শোচনীয় পরাজয়ের কারণ এবং ভারতীয় খেলোয়াড়দের দুর্বলতা ও সমস্যার কথা উল্লেখ করে বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ নতুন করে আমাদের ভবিষ্যতের কর্মসূচী তৈরী করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষ টেনিস খেলায় খুবই অনগ্রসর

দেশ। উন্নতির পথে তার বহু বাধা। প্রধান বাধাগুলি এইরূপঃ

প্রথমতঃ জনপ্রিয়তার অভাব। দীর্ঘ ৫০ বছর সময়ের মধ্যেও টেনিস খেলা ভারতবর্ষে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। ভারতবর্ষের স্কুল-কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় টেনিস খেলার বিশেষ কোন স্থান নেই। টেনিস ব্যয়সাধ্য খেলা; ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে টেনিস খেলায় যোগদান করা সেই কারণে সম্ভব নয়। ফলে ভারতীয় টেনিস খেলা উচ্চ স্তরের সম্ভ্রান্ত সমাজে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। সেই কারণে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়রা দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক থেকে অন্য দেশের খেলোয়াড়দের তুলনায় খুব বেশী অপটু। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের টেনিস খেলার পরিবেশ কিন্তু ভারতবর্ষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই সব দেশে সর্ব-শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ এবং ক্লাবে টেনিস খেলার অবাধ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে তীব্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতার মধ্যে দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান এবং ক্রীড়াচাতুর্যে পারদর্শী এমন খেলোয়াড়রাই শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার লাভ করেন। টেনিস খেলায় অস্ট্রেলিয়ার নামডাক খুব বেশী। যুদ্ধোত্তর কালের বিশ্ব টেনিস খেলায় তারাই আসর জমিয়ে রেখেছে। পেশাদারী টেনিস মহল তাদের বিশ্বখ্যাত সখের টেনিস খেলোয়াড়দের দলে টেনে নিয়েও অস্ট্রেলিয়ার ভান্ডার শূন্য করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া যেন প্রতিভাবান টেনিস খেলোয়াড় তৈরীর এক অফুরন্ত উৎস। টেনিস এবং ক্রিকেট খেলা অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জীবনের ধ্যান ও স্বপ্ন! এই দুই খেলার মাধ্যমেই অস্ট্রেলিয়া তার জাতীয় শক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। ঠিক এই ধরণের সাধনা ভারতীয় টেনিস মহলে নেই।

ভারতীয় টেনিস খেলার সব থেকে করুণ চিত্র—খেলায় বলিষ্ঠতার অভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণানের খেলা উল্লেখ করা যাক। কৃষ্ণান একজন খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়। তাঁর খেলায় যথেষ্ট সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে, কিন্তু বলিষ্ঠতা নেই। এই সজীবতার অভাবেই তাঁর খেলা ক্রমশঃ ঝিমিয়ে পড়ে। ফলে প্রতিপক্ষের আধিপত্য বিস্তারে সুবিধা হয়। প্রতিপক্ষকে আক্রমণে কাবু অথবা বিচলিত করার মত মারণাস্ত্র কৃষ্ণানের তূণ থেকে কদাচিৎ নিক্ষিপ্ত হয়। প্রতি-পক্ষের উদ্দেশে শেষ বা কঠিনতম আঘাত দিতে তিনি বড় বেশী দ্বিধাবোধ করেন। এই ধরণের খেলা জয়লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভারতীয় টেনিস খেলা আরও বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা নিজেদের মানসিক অবস্থা ঠিক রাখতে পারেন না। সামান্য কারণেও তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে থাকে এবং তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে খেলা হাত-ছাড়া করেন। সাহসিকতা এবং দৃঢ়তার যথেষ্ট অভাব থাকায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা দীর্ঘ সময়ের খেলায় শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

মাদ্রাজের প্রদর্শনী টেনিস খেলায় আমেরিকার 'চাক' ম্যাকিনলের বিপক্ষে ভারতবর্ষের জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ান রমানাথন কৃষ্ণান। এই খেলায় কৃষ্ণান ৬—৪ ও ৬—১ গেমে ম্যাকিনলেকে পরাজিত করেন।

॥ প্রদর্শনী টেনিস খেলা ॥

কলকাতার সাউথ ক্লাবের হার্ডকোর্টে আমেরিকার ডেভিস কাপ দলের দুজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়-দের যে তিনটি প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করা হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা জয়লাভ করেন। আমেরিকার পক্ষে এই প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করেছিলেন আমেরিকার ৪নং জাতীয় খেলোয়াড় ফ্র্যাঙ্ক ফ্রোয়েলিং এবং ৮নং জাতীয় খেলোয়াড় ইউজিন স্কট। জয়দীপ মুখার্জি মাত্র ৩৯ মিনিটের মধ্যে ৬-২ ও ৬-২ গেমে ফ্রোয়েলিংকে পরাজিত করেন। অপর সিঙ্গলস খেলায় প্রেমজিৎ লাল ৪-৬, ৭-৫ ও ৬-৪ গেমে স্কটকে পরাজিত করেন। ডাবলসের খেলায় ভারতবর্ষের ডেভিস কাপ জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লাল ৬-৪ ও ৬-১ গেমে ফ্রোয়েলিং এবং স্কটকে পরাজিত করেন।

মাদ্রাজের এক প্রদর্শনী টেনিস খেলায় ভারতবর্ষের জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ান রমানাথন কৃষ্ণান ৬-৪ ও ৬-১ গেমে উইম্বলেডন টেনিস চ্যাম্পিয়ান আমেরিকার 'চাক' ম্যাকিনলেকে পরাজিত ক'রে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলায় তাঁর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন। কিন্তু কোয়েম্বাটুরে অনুষ্ঠিত পরবর্তী প্রদর্শনী খেলায় 'চাক' ম্যাকিনলে দু

কটকের বারবাটী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কলিঙ্গ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী ইস্টার্ণ রেল দল।

ঘণ্টার খেলায় শেষ পর্যন্ত ৭-৫, ৫-৭, ৬-২ ও ৭-৫ গেমে কৃষ্ণানকে পরাজিত করে নিজের বিশ্ব সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেন।

জাপানী হকিদলের ভারত সফর

আগামী ডিসেম্বর মাসে জাপানী হকি দলের ভারত সফরে আসার যে কথা ছিল তা সাময়িকভাবে বাতিল হয়েছে। আগামী বছরের মার্চ মাসে তাদের ভারত সফরে আসার কথা আছে।

মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

জব্বলপুরে মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী মহীশূর রাজ্য দল ৫—০ গোলে গত বছরের রাণার্স-আপ মাদ্রাজকে পরাজিত করে চতুর্থবার লেডি রতন টাটা ট্রফি জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। প্রথমার্ধের খেলায় মহীশূর দল ৪—০ গোলে এগিয়ে ছিল।

সেমি-ফাইনালের খেলায় মহীশূর ৩—০ গোলে দিল্লীকে এবং মাদ্রাজ ২—০ গোলে মহাকোশলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। কোয়ার্টার ফাইনালে মহারাষ্ট্র বনাম মহাকোশল দলের খেলাটি চারদিন অমীমাংসিত ছিল। শেষে টসের সাহায্য নিতে হয়। মহাকোশল টসে জয়ী হয়ে সেমি-ফাইনালে যায়। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলার মহিলা হকি দল ০—২ গোলে গত দু বছরের রাণার্স-আপ মাদ্রাজ দলের কাছে পরাজিত হয়ে প্রতি-[illegible]
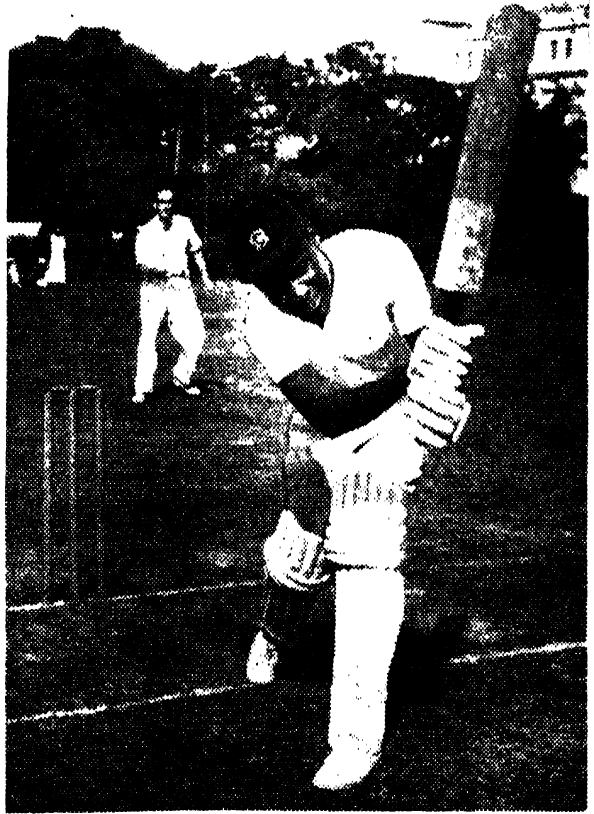
কলকাতার কালীঘাট ক্লাব মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সহ-অধিনায়ক প্রখ্যাত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কনরাড হান্ট। তিনি ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব বনাম ইউনিয়ন স্পোর্টিংয়ের এক প্রীতি-ক্রিকেট খেলায় ইউনিয়ন স্পোর্টিং দলের পক্ষে অংশ গ্রহণ করে মাত্র ৪৭ মিনিট সময়ে ৬৭ রাণ করেন এবং ৩৫ রাণে ২টো উইকেট পান।

খেলার কথা

অজয় বসু

চার বছর অন্তর বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজনের সূত্রে ব্যারণ পিয়ের ডি কুবারটিনের নাম আপনা হতেই সবাকার মনে এসে পড়ে। কারণ নবযুগের অলিম্পিক ক্রীড়ার জনক তিনিই। অলিম্পিকের পরবর্তী আসর বসতে এখনও বারো মাস বাকী। তবু আজ এই বিশেষ মুহূর্তে কুবারটিনকে স্মরণ করছি এই কারণে যে আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী।

মহাপ্রাণ কুবারটিনকে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য। কারণ তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা মানবকল্যাণেই নিয়োজিত থেকেছে। এই কর্তব্যসচেতনাই আন্তর্জাতিক কল্যাণমূলক সংস্থা ইউনেসকোকে কুবারটিন স্মরণ-সভা আয়োজনে প্রেরণা জুগিয়েছে। সেই সভা সম্প্রতি কুবারটিনের জন্মভূমি প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

ইউনেসকো আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত থেকে যাঁরা কুবারটিনের বাণী পুনরুচ্চারণ করেছেন, সামাজিক কল্যাণে তাঁর অবদানের যথার্থ মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন তাঁরা যেমন চিন্তাশীল ও স্বপ্নদর্শী তেমনি বাস্তবানুগ বুদ্ধিজীবী।

এই দলে ক্রীড়াবিদেরা ছিলেন। শিক্ষাবিদেরা ছিলেন। ছিলেন চিন্তানায়কেরাও। অভিভাষণে ও অভিনন্দনে তাঁরা কুবারটিনের বোধ ও বোধিকেই উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, যে বোধ ও বোধিতেই নতুন চেতনার বীজ বপন করেছেন কুবারটিন নিজে।

ব্যারণ কুবারটিন হলেন আধুনিক দুনিয়ায় প্রাচীন ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রবর্তক এবং চিন্তার ক্ষেত্রে এক অবিসম্বাদী নায়ক। খেলাধুলাকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক; মৈত্রী-বন্ধন প্রসারিত হোক, শুভেচ্ছা, ভালবাসা, বোঝাপড়ার পাকা বুনিয়াদ রচিত হোক—এই ছিল কুবারটিনের পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনা সফল হলে সুস্থ, উদার সমাজ গড়ে উঠবে। ক্ষুদ্রতা, নীচতা বিসর্জিত হবে। সুখে-স্বস্তিতে, তৃপ্তি-উপলব্ধিতে মনপ্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। মানুষের মানুষ হওয়ার সাধনা এই পথেই সফল হবে জেনেই ব্যারণ কুবারটিন অলিম্পিক ক্রীড়ার পুনরুজ্জীবনে নতুন দুনিয়াকে নতুন মতে দীক্ষা দিয়ে গিয়েছেন।

ব্যারণ পিয়ের ডি কুবারটিন

তাঁর মতে, অলিম্পিকই হলো সভ্যতার অবিমিশ্র প্রতীক। অলিম্পিক আসরে এসে তরুণ মন ও প্রাণ সংগ্রামের মাধ্যমে জয়লক্ষ্মীর প্রসন্নতা অর্জন করে। বিজয়পথে জীবনকে চেনজানার কাজটিও সুসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কুবারটিনের বাণী শাশ্বতবাণী : সংগ্রাম ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব নেই।

ব্যারণ কুবারটিনের কাছ থেকে শিক্ষিত ও সভ্য দুনিয়া এই মহৎ শিক্ষা-লাভ করতে পেরেছে যে, 'জীবনে বড় কথা বিজয়লাভ নহে—সংগ্রাম।...সততার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই লক্ষ্য।' তাই তিনি সামাজিক ক্ষেত্রেও শিক্ষাগুরু। তিনি শুধু স্মরণীয়ই নন, শ্রদ্ধেয়ও। তাঁকে স্মরণ করার দায়িত্বও তাই ইউনেসকো নিজের হাতেই তুলে নিতে দ্বিধাবোধ করেননি।

অলিম্পিক ক্রীড়ার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে ব্যারণ কুবারটিন চেয়েছিলেন একটি সর্বজনীন মিলনভূমি গড়ে তুলতে। যেখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বমানব রাখিবন্ধন উৎসবে মাতবে। দৈহিক ও আত্মিক উন্নয়নে নিরলস সাধনা করবে। এবং সেই আসর থেকে মহৎ শিক্ষার উপকরণ সঞ্চয় করে বৃহত্তর সমাজ-জীবনে তা ছড়িয়ে দেবে।

শুধু চাওয়াতেই তাঁর কাজ শেষ হয়নি। চাওয়া-পাওয়ার সমঞ্জস ঘটাতে তিনি যে বাস্তব পরিকল্পনা রচনা করে দিয়েছেন সেই পরিকল্পনা আজ অর্ধ-শতাব্দী পরও সমাজের শিরোধার্য হয়ে আছে। শুধু তাও নয়। বিদগ্ধমণ্ডলীও কুবারটিনের চিন্তায় অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। তাই ১৯২৮ সালে কুবারটিনকে নোবেল পুরস্কারের শিরোপা পরিয়ে তাঁর কল্যাণপ্রসূ চিন্তার মাহাত্ম্যকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়।

ব্যারণ কুবারটিনের চিন্তা, পরিকল্পনা, বাস্তব কর্মপদ্ধতি, সবকিছুই মহৎ—'নোবল'। তাই 'নোবল' পুরস্কারের মাধ্যমে তাঁকে নীতিগতভাবে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উত্তরকাল কর্মক্ষেত্রে কুবারটিন-ভাবনাকে অবিকৃতভাবে অনুসরণে সফল হয়েছে কিনা সন্দেহ।

ঠিক ঠিক হিসাবে হয়নি। আর হয়নি বলেই বিশ্ব ক্রীড়াভূমি অলিম্পিক আসর থেকেও সময় সময় সামাজিক মানুষের পক্ষেও ফসল ঘরে তুলে আনা সম্ভবপর হচ্ছে না। দু একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখে বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেওয়া যেতে পারে।

প্রাগৈতিহাসিক ও ইতিহাসস্বীকৃত-কালে গ্রীসে অলিম্পিক ভূমিতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ক্রীড়াদ্বন্দ্ব বাধতো। সেই সুস্থ প্রতিযোগিতা ব্যক্তিজীবনের উন্নয়ন ঘটিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে তুলতো।

ব্যষ্টির উন্নয়নই সমষ্টি-উন্নয়নের আসল পথ—একথা উপলব্ধি করেই ব্যারণ কুবারটিন আধুনিক অলিম্পিক উপলক্ষ্যেও ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু একালের প্রচারধর্মী ঠুনকো মন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে চায়নি। তাই ব্যক্তির বিকল্পে রাষ্ট্রকে প্রতিযোগীর আসনে জাতীয়তা-বোধের পরাকাষ্ঠা দেখাতে চেয়েছে।

ফলে স্বাজাত্যবোধ আন্তর্জাতিকতার মাথায় চড়ে বসে সর্বক্ষণই এক মনো-বিকারে ভুগছে। পরিস্থিতি এমনই চরমে পৌঁছেচে যে অলিম্পিক আসরে কোন্ দিক্‌পাল ক্রীড়াবিদ জিতলো তা নিয়ে আমরা তেমন মাথা ঘামাই না। আমাদের যতো মাথাব্যথা, সেই আসরে কোন্ দেশ সবার সেরা ভূমিকা নিতে পারলো তার হদিশ জানার চেষ্টায়।

স্বর্ণপদক কে বেশী পেলো? রাশিয়া না আমেরিকা? কোন দেশের জাতীয় পতাকা বেশীবার উত্তোলিত হলো পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানে, বিজয়-মঞ্চে মাথা তুলে দাঁড়ালেন কোন্ দেশের প্রতিনিধিরা বেশী, সেই তথ্য উদ্ধারেই আজ আমরা হিমশিম খাচ্ছি। জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নটিকে নিয়ে আমরা টানাহ্যাঁচড়া করছি অশোভনভাবে।

ভুয়ো জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নটি বড় হয়ে ওঠায় দেশে দেশে রেষারেষি বেড়েছে। সে রেষারেষি সবসময়ই সুস্থ নয় বলেই সময় সময় নানা অজুহাতে অলিম্পিক-আসরে প্রতিবাদের ঝড়ও বয়ে যায়। ব্যারণ কুবারটিন দেশে দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা করতে চাননি। যখন তিনি কার্যক্ষম ছিলেন তখন জাতীয় মর্যাদাকে ঘিরে এমন দাপা-দাপিও শুরু হয়নি। তবু 'ব্যারণ'কে তাঁর জীবনসায়াহ্নেই দেওয়ালের অনিবার্য লিখন পাঠ করে অস্থির হতে হয়েছিল।

খুব স্পষ্ট করে দেওয়ালে আঁক কষার কাজ এগিয়ে দেন নাৎসী-নায়ক হিটলার ১৯৩৬ সালে বার্লিনে অলিম্পিক আয়োজন উপলক্ষ্যে। সর্বজনীন মিলনভূমি গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নাৎসী জার্মানী সেদিন কাজেকর্মে ও চিন্তায় জার্মানীই যে সর্বশ্রেষ্ঠ একথা বোঝাতে নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা রচনা করেছিল।

এর ফল ভাল হয়নি। কতকটা এরই পরিণামে একদিকে অলিম্পিকের সুমহান আদর্শের ওপর বিকৃত মানসের অশুভ ছায়াপাত ঘটছে জেনে চিন্তাভারে অবনমিত কুবারটিন এক বছরের মধ্যে (১৯৩৭ সালে) দেহ রাখেন, অন্যদিকে তেমনি জাতীয়তাবোধে অতিসক্রিয় জার্মান প্রচারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠতে এগিয়ে আসে উত্তরকাল। উত্তরকালে তাই অলিম্পিক ক্রীড়াসংগঠনে এবং অলিম্পিকে স্বর্ণ সঞ্চয়ে একে অন্যকে টেক্কা দিতে যত্নকৃত চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে অলিম্পিক আন্দোলনের পথ জুড়ে প্রতিরোধ গড়তে আর একটি সবল পক্ষের আবির্ভাব ঘটেছে। এই পক্ষটি হলো রাজনীতি।

রাজনৈতিক বিশ্বাস, মত ও পথের আড়াআড়িতে বিশ্বমানব আজ ভিন্ন-মুখী দুটি পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই দুটি স্বতন্ত্র পথ অভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুতে মিশতে পারছে না। পারতো খেলাধুলার আসরে এসে। কিন্তু সেখানেও রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাবে একাত্ম হতে চাইছে না। বরং চেষ্টা করছে একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বজায় রাখতে নিছক রাজনৈতিক তাগিদেই।

এই চেষ্টা চিন্তানায়ক ব্যারণ কুবারটিনের বোধ ও বোধির বিরোধী। আশ্চর্যের কথা এই যে ব্যারণ কুবারটিনের সুস্থ চিন্তার সুফল নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েও তাঁর চিন্তাপ্রসূত পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা অনুসরণে আমরা অবিচল থাকতে পারছি না।

অথচ অলিম্পিক ক্রীড়া পরিকল্পনার ওপর অখণ্ড আস্থা রেখে প্রাগৈতিহাসিক গ্রীস হিংসা, দ্বেষ, রেষারেষি ভুলে সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে পেরেছিল। কিন্তু সুসভ্য, সুশিক্ষিত বিংশ শতাব্দী সেই রেষারেষি, যা রাজনৈতিক মতবিরোধে পর্যবসিত, তা ভুলতে পারেনি। এবং অলিম্পিক আসরে স্নায়ুযুদ্ধও থামাতে চায়নি।

কাল থেকে কালান্তরে এসে দুনিয়া নাকি সভ্য ও শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই কি সভ্যতা ও শিক্ষার নমুনা? বরং অভিযোগ এই যে, প্রাগৈতিহাসিক গ্রীস যা করেনি, শিক্ষিত এই শতাব্দী তাও করেছে অলিম্পিক-ভূমিতে রাজ-নীতি আমদানির অপচেষ্টা ঘটিয়ে।

এটা আফসোসেরই কথা যে, বিংশ শতাব্দীতে জীবনের চেয়ে রাজনীতিকে বড় করে দেখা হচ্ছে। যেন জীবনের প্রয়োজনে রাজনীতি নয়, রাজনীতির সর্বাত্মক যূপকাষ্ঠে জীবনকেও বুঝি বলি দেওয়া চলে!

সুস্থ সমাজ, বেগবান, বিবেকবান প্রাণ গড়ে তুলতে ব্যারণ কুবারটিন অলিম্পিকের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন বিংশ শতাব্দী সেই শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে আত্মস্থ করতে পারেনি। সেই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে আজ যদি শতাব্দীর ভাবনায় ব্যারণ-নির্দেশিত চেতনার নব-জাগরণ ঘটে তবেই তাঁর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে উদযাপিত হবে। অন্য কোনোভাবেই যে তা হতে পারে না, তাতে সন্দেহ নেই।

এই শতকের দাহ

আবদুল আজীজ আল-আমান

আবার ঢল নামল।

বরুতের বিলের ঘোলা জল পাক খাচ্ছে। ফুলে উঠছে। ওপর থেকে আউশ আমনের খেত ছাপিয়ে ঝোরা জল নামছে। মাথায় গাঁজলা নিয়ে বিলের জলে লাফিয়ে পড়ছে হু হু শব্দে।

ছপ ছপ করে পোলো চাপতে চাপতে দ্রুত এগিয়ে গেল কওসর। তালপাতার পেকেয়ে বাদলের মাতাল ঝাপটা আছাড় খেয়ে গুমরে উঠল। আকাশে মেঘ জমছে। ঘন হচ্ছে। পদ্মার প্রচণ্ড আবর্তের মত ঘন অন্ধকার পাক খাচ্ছে আকাশে। পাঁচ-কালো আঁধারে বিলের ঘোলা জল আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। সেই ভয়ংকর জলের ওপর কয়েকটা আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। দখিন পাড়ার রহিম বিশ্বাস আর সে দুজনে এসেছিল প্রথমে। দুটি আলো ঘুরছিল তখন। এখন অনেকগুলি আলো অনিয়মিত দ্রুত চঞ্চল বক্ররেখায় ছুটোছুটি করছে। লোক বাড়ছে। আরো বাড়বে। তর্জনী দিয়ে চোখের জল মুছে ভাল করে তাকালে কওসর। রসুনগাছা, চারুশিমুলে, কাদপুরের কোল থেকে আরো অনেক-গুলো আলো ছুটে আসছে। দৌড়ে আসছে। এসে মাতালের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে বিলের বুকে।

মাছগুলো আজ মাতাল হয়েছে। পাগলের মত দল দল বিল ছেড়ে ঝোরা জল বেয়ে ওপরে ঠেলে উঠছে। লাফাচ্ছে। লাফিয়ে পড়ছে আলে। মরবে। মরার জন্যে ব্যাকুল। মাছের ভাষা কেউ বুঝলে সে শুনতে পেত সারা বিল জুড়ে বিচিত্র ঐকতানে ওরা গান ধরেছে। মরণের গান। মাছের আজ উৎসব। মরণোৎসব।

আবার একটা ঝাপটা এসে লাগল প্রচণ্ড বেগে। বিলটা অকস্মাৎ শিউরে উঠে যেন শিস দিল। আকাশের বহু দূরে দিগন্তে বন্যার ডাক শুরু হয়েছে। গুম্ গুম্ করে এক গম্ভীর ক্ষীয়মাণ আওয়াজ কত দূ—উ—উ—র থেকে ভেসে আসছে।

ছপ ছপ! পোলো চাপার তালে তালে আওয়াজ উঠছে। এগিয়ে যাচ্ছে কওসর। বাঁধের ধার দিয়ে এগুচ্ছে। হঠাৎ পোলোটা দু হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরল। দারুন আবেগে ঝটপট করে লাফাচ্ছে মাছটা। বিরাট এক রুই। কার পুকুর ভেসে গেছে।

রূপোলী গাটা ঝিকমিকিয়ে উঠল টর্চের আলোয়।

বৃষ্টির ঝাপটা আর তুফানের বুক চিরে চিরে দোলাইত হয়ে একটা ডাক ভেসে আসছে। কওসর ভাই—ই—ই।

উৎকর্ণ হয়ে তাকাল কওসর। পূব থেকেই ভেসে আসছে ডাকটা। প্রথমে মনে হয়েছিল অনেক দূরে—তা নয়। রয়নগাছার শরাফৎ। কাছে এসে শুধাল, দেশলাই আছে?

ঝাপটায় হারিকেন নিভে গেছে। ধরাবে। না পেলে টর্চের আলোয় কওসরের পাশাপাশি পোলো চাপতে চাপতে এগিয়ে যাবে। তাতে ক্ষতি হবে দুজনারই। তাই জবাব না দিয়ে শরাফতের সঙ্গ এড়িয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল পশ্চিমের দিকে।

আকাশে মেঘ আরো বাড়ছে। বিলের ঘোলা জল পাক খাচ্ছে সমানে। ওপর থেকে ঝোরা জল নামছে কলকল করে। বাতাসের বেগ আরো বাড়বে। সামনে দিয়ে হারিকেন হাতে কাদপুরের ক'জন মেছুড়ে নামল জলে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা বড় শোল মাছ লাফিয়ে আকাশমুখো হয়ে শূন্য বাতাসে একটা অর্ধ প্যারাবোলা রচনা করেই সশব্দে জলে আছাড় খেল। ক'জন শিকারীর ক'জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ তীক্ষ্ণ কঠোর হল সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর পোলো নিয়ে ক'জনে প্রায় এক-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাছটার ওপর। কওসর পা তুলেও ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ও মাছ ধরা যাবে না। পানসী নৌকোর মত জল কেটে তীরের বেগে কোন দিকে ছুটে পালাবে।

মাছটা পেল না কেউ। কেবল এক-জনের পা কাটল শামুকে। একেবারে তরমুজ-ফালি হয়ে গেছে। লাল রক্ত ফোয়ারার মত এসে মিশছে ঘোলা জলে। হারিকেন নিভল আর একজনের।

ছপ ছপ। পোলো চাপতে চাপতে এগিয়ে গেল কওসর। ওসব দিকে তাকালে চলবে না। যার সাবধান তার কাছে। হারিকেন নিভবে আরো অনেকের। আকাশের ঘন অন্ধকার মেঘ-পুঞ্জের পাক-খাওয়া আবর্তে তুফান ওঠার ইশারা। টর্চের সুইচ টিপল কওসর। মুহূর্তে কতদূর পর্যন্ত অন্ধকারের বুকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল এক গুচ্ছ আলোর ফলা। ঘোলা জলের ওপরটা হেসে উঠল ঝক করে। ঝড় আসুক, তুফান আসুক—কত সুবিধে। কোথায় আলো থাকে মাঝে মাঝে দেখার চেষ্টা করে কওসর। দুটি ব্যাটারী—স্পর্শ কর হাত দিয়ে একটুও গরম নয়। অথচ টিপলেই আলো। মানুষের কি হেকমত! কি কৌশল!!

কোমরে বাঁধা খারাটা ক্রমেই ভারী হচ্ছে। পাঁচ সের? তা হবে। সের আড়েকের মত হলে কাল শিশিরবাবুর হাটে নিয়ে যাওয়া যাবে মাছগুলোকে।

ছপ ছপ। দ্রুততালে হাত ওঠা-নামা করে। কত করে সের বিকোবে হাটে কে জানে। আমদানি তো কম হবে না।

নীল রঙের বেসরকারী বাসগুলো একটা বিরাট আকর্ষণে টানে কওসরকে। খুব সুবিধে হয়েছে হাটে যাওয়া। হাঁটতে হবে না এক পাও। রংমহলের পোলের ওখানটায় গিয়ে দাঁড়াও। বাসটা এসে থামবে। একটা লোক নেমে হাঁকবে, রইপুর, আমডাঙ্গা, খেলে, মিরহাটী, বারাসত। মাত্র কুড়িটা নয়া পয়সা নিয়ে চোখের পলকে নামিয়ে দেবে শিশিরবাবুর হাটে। আনন্দে পুলকিত হয় ও। মানুষ আরো কত কি করবে। কি বুদ্ধি! কি হেকমত! খবরের কাগজে কারা সব লিখেছে—ঐ আকাশ ফুঁড়ে চাঁদের গায় ঠোকর খাবে মানুষ।

আর—

পরেশবাবুর ঝাড়ীর মেয়েদের মত রাঙা রাঙা ডাগর মেয়েগুলো কোথা থেকে যে বাসে ওঠে, আর কোথায় যায়। চৈত্র-দুপুরের বিবসা রিক্ত প্রান্তরের চরম নৈঃশব্দের মত মনটা উদাস হয়ে যায় কওসরের।

আল্লামোন! ওদের পাশে একটু নিষ্প্রভ মনে হয় বৈকি। তা হোক। পা থেকে একটা পেটো জোঁক ছাড়িয়ে দিয়ে তৃপ্তির শ্বাস ফেলল কওসর। এই ক বছরে সংসারের হাল ফিরিয়ে দিয়েছে ও।

ছপ ছপ। আকাশে মেঘ বাড়ছে। পাক খাচ্ছে। ঘোলা জল ফুলছে। থৈ থৈ করছে। মাছের উন্মত্ততা বাড়ছে সমানে। জল ক্রমেই বেশী হচ্ছে। পোলোর গলা পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। কেন? এত জল! কোন দিকে এলাম?

ঘোলা জল আলো করে টর্চ জ্বলে উঠল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিউরে উঠল কওসর। ভীত-বিহ্বল দেহটা উল্কাপিণ্ডের মত পাতালের দিকে গড়িয়ে পড়ছে। আলো পেয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে এক বিরাট কাল কেউটে। ছোট কুলোর মত ফণা। রাগে গর্জাচ্ছে জলের উপরেই। সঙ্গে সঙ্গেই আলো নিভিয়ে দিল কওসর। কয়েক পা সরে এসে আলো জ্বালল আবার। একটা দু' হাত মোটা দাঁড় যেন এঁকেবেঁকে দ্রুত চলে যাচ্ছে জলের ওপর দিয়ে। গিয়ে উঠল খড়ের ঘাটে। তারপর অদৃশ্য হলে গেল ঘাস-লতাপাতার ভেতর।

প্রায় খড়ের ঘাটের কাছে এসে পড়েছে কওসর। বিলের কিনারায় পোকা-মাকড়ের জঙ্গল। সেও বুঝি মাছেদের মত মাতাল হয়ে উঠেছে। জ্ঞান হারিয়েছে। নইলে—

ছপ ছপ।

হাওয়ার বেগ বাড়ছে। অন্ধকার ঘনতর হচ্ছে। ঘূর্ণি ঝাপটা আছড়ে

পড়ছে সমানে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরছে। মাঝে মাঝে শিস দিয়ে উঠছে বিলের ঘোলা জল। ঘাটের পাশ কাটিয়ে দখিন দিকে এগুলো কওসর। সাপের আড়ং সন্তর্পণে পিছনে ফেলে একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও।

একটা বড় মাছ ঝাপটা দিল পোলোর ভেতর। দু হাতে চেপে পোলোর আগাটা ভাল করে বসিয়ে দিল মাটিতে। তারপর ডান হাতটা ভিতরে চালিয়ে দিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পোলো ছেড়ে পিছনে ছুটে পালাল ক' হাত। হাতে নরম তেলতেলে ঠেকল কি? জমাট সন্দেহটা চোখের তারায় স্তব্ধ হয়ে রইল। কাল কেউটের মূর্তি এখনো স্পষ্ট হয়ে ভাসছে। এই পোলোর মধ্যেই সেবার দংশাল নঈমদ্দিকে। ক' মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল অতবড় লোকটা।

আস্তে আস্তে আবার সরে এসে টর্চের আলো ফেলল কওসর। পোলোর ভিতরে জলের ওপর কিছুই দেখা গেল না। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফোঁটায় জলটা নাচছে। আর কিছু নয়।

বিলের ঘোলা জলে ভেসে ওঠা অসংখ্য দীর্ঘায়িত তরঙ্গের মত কয়েকটা চিন্তার ভাঁজ পড়ল কপালে। সাপ হলে তো—

কুতকুতে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল কওসর। কাল কেউটে, মাছ আর জীবন যেন থমকে দাঁড়িয়েছে পোলোর মধ্যে। সংশয়। মাছ অথবা জীবন। চোখে আজ নেশা লেগেছে। পাক-খাওয়া জলের উন্মত্ততা আজ গর্জন করছে শিরায় শিরায়। তা'হলে—

একটা মাগুর মাছ ধরে খারায় রাখল কওসর। আরো একটা আছে। ওটা যেন মাটির ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে। মুখটা লুকুতে চাইছে মাটিতে। সিঙি কি মাগুর তার ঠিক কি। কাঁটা দিতে পারে। খুব সন্তর্পণে হাত চালাল ও। এবং ওটাকে ধরতে গিয়েই হাতে ঠেকল সেই আশ্চর্য জিনিসটা। মুখটা সরু। মাটির মধ্যে যেন পোতা আছে। শক্ত। কঠিন।

পোলোটা ফেলে দু' হাত দিয়ে মাটি সরিয়ে তুলে ফেলল জিনিসটা। জলের ওপরে এনে টর্চের আলোয় দেখে একেবার নির্বাক হয়ে গেল কওসর। রুপো! গলান রুপোর দলা! এতদিনে এতটুকুও ম্লান হয়নি। ঝকমক করছে। হাসছে।

এই তো মাত্র ক বছর আগে। যুদ্ধের সময় একটা উড়োজাহাজ পড়েছিল মাঠের পাশটায়। পাটের জমি নিড়ুতে নিড়ুতে দেখেছিল সকলে। অনেক ওপরে উড়ছিল জাহাজটা। কেমন যেন বিটকেল শব্দ করতে করতে হঠাৎ-ই নীচেয় নামতে নামতে শেখ-পাড়ার ঘরের চাল ছুঁয়ে এসে পড়ল বিলের মাটিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ, আগুন, ধোঁয়া, গন্ধ। আধ বেলা কেউ কাছে যেতে পারেনি। মাটির তলা থেকে প্রচণ্ড শব্দে কি সব কলকব্জা ফেটেছে। আগুন জ্বলছে। তুষের মত মাটিকে গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে কুণ্ডলী-পাকান ধোঁয়া ঘুরপাক খেয়েছে আকাশে। অনেক রুপো, নোট আর কাপড়-চোপড় ছিল জাহাজটায়। কত দূর থেকে ওসব ফেলতে ফেলতে এসেছে। হাল্কা করে বাঁচাতে চেয়েছিল জাহাজটাকে। মিলিটারী সাহেবেরা যখন এল তখন সে সব নোটের তাড়া রুপোর দলা হজম হয়ে গেছে। কতজন কোটা-ঘর বাঁধল। আজো কতলোক হন্যে হয়ে ঘোরে আশেপাশে।

আনন্দে ব্যাকুল হয়ে কাঁপল কওসর। তারপর অতি সন্তর্পণে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বাঁধের দিকে এগিয়ে গেল ও।

মানুষসমান পাটের ডগাগুলো ঝাপটায় নুয়ে পড়ছে। অবিরল জলের ধারায় পাটের পাতায় শব্দ উঠছে—শম্ শম্, শম্ শম্।

পিছন ফিরে তাকাল কওসর। বিলের ভয়ঙ্কর ঘোলা জলের ওপর তখন অসংখ্য আলো ছুটোছুটি করছে।

হারিকেনের আলোয় অবাক হয়ে মোচার মত সেই রুপোর মসৃণ পিন্ডের দিকে তাকাল আঞ্জামোন। তারপর ঈষৎ ফোটা গোলাপকলির মত মনোরম মধুর হাসি মুখে নিয়ে দারুণ আবেগে স্বামীর বুক জড়িয়ে ধরে বলল, খোদা এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছে।

এ কি—তুমি কাঁপছ?

চেক-কাটা বিচিত্র-বর্ণ লুঙ্গিটা এনে দিল, গামছা এনে দিল, ফতুয়া এনে দিল। আগালে পাকাটি ভেঙে আগুন জ্বালাল রোয়াকের ওপর।

আহ্—ছাড়, হাত-পা সেঁকে নাও। আহ্—কি কি মুস্কিল, ছাড়। শীতে যে বরফ হয়ে গেছ একেবারে। আহ্—ছাড়, কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে। আরো এক গোছা পাকাটি ভেঙে ধরিয়ে দিল আঞ্জামোন। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। সেই আগুনের ঝাঁজের ওপর দুটি লোমশ বলিষ্ঠ হাত প্রসারিত করে দিল কওসর। কোমল স্বপ্নবিছানো দুটি তরুণ মনের আশা-আনন্দেও যেন আগুন ধরেছে। দাউদাউ করে জ্বলছে। শিখা বিস্তার করছে। আগামী সোনালী দিনের আশা-আনন্দ যেন বিলের পাক-খাওয়া ঘোলা জলের মত ফুলে উঠছে। ফেঁপে উঠছে। আউশ-আমনের খেত ছাপিয়ে চারদিক থেকে ঝোরা জল নামছে বন্যার বেগে। উদ্দাম-উচ্ছ্বাসে একটি পরম আনন্দকে নিদারুণ আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ দিল কওসর, ঐ রুপো গলিয়ে পরেশবাবুর মেয়ের মত একটা—

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আধুনিক বর্বর সভ্যতার সমগ্র অভিশাপ আগুনের পাশে রাখা ঐ রুপোর পিন্ডের ভিতরে উত্তপ্ত হয়ে একান্ত অতর্কিতে মহাবেগে ধূমায়িত গর্জনে ফেটে গেল। সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দুটি কোমল প্রাণ তুলোর মত ফেঁসে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল কোথায়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শেখ-বাড়ী থেকে সদ্যজাত শিশুর কান্না শোনা গেল। দিদার শেখের বৌ প্রসব করেছে। ফুলের মত কোমল একটা নিষ্পাপ শিশু এই অভিশপ্ত পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করে হেসে উঠল মধুরে।

ইউজীন ও'নীল প্রসঙ্গে

রণেন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক হাওয়ার্ড ফাস্টের লেখার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন পীকস্কিলের সেই গানের আসরে তিন সারি জীবন্ত মানুষের প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দশ হাজার নিপীড়িত মানুষকে যে মানুষটি তাঁর উদাত্ত গলায় বেদনা ও আশার গান শুনিয়েছিলেন কু ক্লক্স ক্লান কেন পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যাকারী সংস্থারও তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা নেই। আমেরিকার সেই কৃষ্ণকায় নট ও সঙ্গীত-শিল্পীর নাম পল রোবসন। গায়ক রোবসন কিন্তু আবিস্কৃত হয়েছিলেন এক দৈবঘটনায় এমন কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। এমপারার জোনস নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন রোবসন। মহড়া চলছে। জঙ্গলের মধ্যে শত্রুতাড়িত নিগ্রো বীর শিষ দিচ্ছেন আপন মনে। শিষ দেওয়াটা পরিচালকের মনঃপূত হচ্ছে না কিছুতেই। অভিনেতাও ব্যর্থ হচ্ছেন বার বার চেষ্টা করে। শেষে অভিনেতা প্রস্তাব করলেন দু'লাইন গান যদি খালি গলায় করি তাহলে কেমন হয়। পরিচালক রাজি হলেন অগত্যা। নাটকের অভিনয় হল পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। পৃথিবীর লোক সন্ধান পেল এক অনবদ্য গায়কের। পরবর্তীকালের রোবসনকে যে নাটকের মাধ্যমে আমরা প্রথমবার চিনলাম তারই রচয়িতা ইউজীন ও'নীল। আমেরিকার নবীন সাহিত্যকে যাঁরা বিশ্বের দরবারে সম্মুখের সারিতে নিয়ে গিয়েছিল নাটকের ক্ষেত্রে, তার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব ও'নীলের একথা সর্বজন-স্বীকৃত। ১৯১৩ থেকে '৫৩ দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নাট্যসাহিত্যের চর্চা করেছেন তিনি। ইংলণ্ডে বসে শ' যে কাজ করেছেন হাস্যরসের মাধ্যমে, বা জার্মানী থেকে টলের যে কাজ করেছেন আমেরিকা থেকে ও'নীলের কাজ তার সমগোত্র। আধুনিক জীবন তার সমস্ত জটিলতা তুচ্ছতা এবং মহত্ত্ব নিয়ে আমাদের কাছে এক পরম বিস্ময়ের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে। গ্রীক নাটকে দেখেছি ভাগ্যের বা নিয়তির দাম মানুষের মর্মন্তুদ পরিণতি—এলিজাবেথীয় নাটকের সম্রাট শেক্সপীয়রে দেখেছি চরিত্রের কী বিরাট-গভীরতা যা জীবনকে দিয়েছে মহতী এক করুণ মর্যাদা। ও'নীলের নাটকে অন্তত তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলিতে দেখি তেমনি বাস্তব জীবনের জটিলতা। তাঁর অন্তর্জগতের লেলিহান অগ্নিশিখায় সংকট-জর্জরিত মানুষের এক করুণ অথচ মহৎ প্রতিচ্ছবি। আধুনিকযুগের মানুষ কেউই মহাকাব্যের এমনকি শেক্সপীয়রীয় নায়কের মত বিরাট ঐশ্বর্যবান নয় কিন্তু সেই সাধারণ পরিচিত মানুষই কী অনন্ত রহস্যময়, কী করুণ তার নিয়তি-তাড়িত অন্তর্লোক, তার সন্ধান পেয়েছি আমরা ও'নীলের নাটকে।

জীবনের ছোট ছোট বৈচিত্র্যভরা অংশ একাঙ্ক নাটকের উপজীব্য। ১৯১৩ থেকে ছয় বৎসর ও'নীলের লেখনীতে জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিল একাঙ্ক নাটক হয়ে উঠেছে। '১৯ খৃষ্টাব্দে সে পালার শেষ, এই পর্যায়ে একাঙ্কগুলির বেশির-ভাগই ও'নীল নির্মমভাবে নিজের হাতেই নষ্ট করে ফেলেছিলেন আর অনেকগুলি ছাপাখানার কালি থেকে ছিল দূরে। 'বিয়ণ্ড দি হরাইজন' রচনার পূর্বের উল্লেখযোগ্য একাঙ্কগুলির মধ্যে "থার্স্ট" 'বাউণ্ড ইস্ট ফর কার্ডিফ', 'দি লং ভয়েজ হোম' এবং 'দি মুন অফ দি ক্যারিবিজ' বিখ্যাত। প্রত্যেক শিল্পীরই একটা শিক্ষানবিশী অধ্যায় থাকে। মনস্তাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকের কাছে শিল্পীসত্তার ক্রমঃবিকাশের নথির একটা বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু মহৎ শিল্পীরা অনেকেই নিজের প্রথমযুগের হাত-মক্স-করা মুসাবিদাগুলি সম্বন্ধে নির্মম। প্রথম প্রেমের মত সেগুলিও থেকে যায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে। পরবর্তীকালের পথিকের পক্ষে তাতে যত প্রয়োজনই থাক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলির সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। ও'নীলের ক্ষেত্রেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে কয়খানি একাঙ্ক নাটক টিকে আছে সেগুলি কতটা সার্থক সে বিচারের প্রশ্ন না তুলেও অনুসন্ধিৎসুর চোখে ক্রমঃবিকাশের ধারাটি চোখে পড়বেই এগুলি পড়তে পড়তে। ট্রাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের রচয়িতা হিসাবেই ও'নীল জগৎবিখ্যাত। চরিত্রের রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের রূপায়ণও ও'নীলের লেখনীতে একটা বিশিষ্ট রূপ ধরছিল তা এখান থেকেই বুঝতে পারা যায়।

১৯১৯-এর পর দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ও'নীলের কাছ থেকে আমরা একের পর এক বৃহৎ নাটক পেয়ে এসেছি। একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে ১৯২০তে 'বিয়ণ্ড দি হরাইজন' মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানবিশী অধ্যায়ে যবনিকা নেমে এল। অবশ্য একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে একেবারে সরাসরি বড় নাটক লিখতে শুরু করেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। স্বীয় স্বপ্নের বলি রবার্ট মেয়ো। কাকার সঙ্গে সমুদ্রযাত্রার প্রক্কালে তার বিশ্বাস এল যে ভাই এ্যাণ্ড্রুর প্রেমিকার প্রতি প্রেমের আকর্ষণে সে নিজে জড়িয়ে পড়েছে। এ্যাণ্ড্রুকে ত্যাগ করে মেয়েটি গ্রহণ করলে রবার্টকে। রবার্টের বদলে এ্যাণ্ড্রুই পাড়ি দেয় সমুদ্রে। অল্পদিনের মধ্যেই রুথ তার ভুল বুঝতে পারে। রবার্টও মোহমুক্ত হ'ল তিন বৎসরের মধ্যে। খামার পরিচালনার কাজে নিজের ব্যর্থতাও সে বুঝতে পারে। এক শিশুসন্তান ব্যতীত কোথাও তার সান্ত্বনা নেই। এ্যাণ্ড্রু ফিরে আসে। বিড়ম্বনা তাতে বাড়ে বই কমে না। রুথ বুঝতে পারে যে সে তার রবার্টকে ভালবাসে না, ভালবাসে সে এন্ড্রুকেই। এ্যাণ্ড্রুর বস্তুসর্বস্ব হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে রবার্ট মর্মাহত হয়। মোহ-মুক্ত হয়ে জীবন কারও কারও কাছে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এক জাতের মানুষ থাকে যারা কোন একটি মোহকে আশ্রয় না করে টিকে থাকতেও পারে না। এ নাটকের প্রতিটি চরিত্রই এমন এক স্বপ্নের স্রষ্টা যে স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবে রূপায়িত হবে না। দিগন্ত সব সময়েই সোনালী। সেই সোনালী দিগন্তের দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই এদের কারো। জীবনের এই অন্তঃসারশূন্য করুণ পরিণতির পটভূমিতে আমাদের সকলেরই পদচারণ ঘটে। নাটকে এমন করে তুচ্ছতা আর সেই কারণে ট্রাজেডি এর আগে অন্য কোন নাট্যকারের লেখনীতে ফুটে ওঠে নি। তবু এ নাটকের চরিত্রগুলি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নিজেদের বিকশিত করেছে এমন কথা বলা যায় না। এই নাটক মঞ্চস্থ হবার অল্প কিছুদিন পরেই পুলিটজার পুরস্কার পেলেন ও'নীল। জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, জীবন বোধের স্বীকৃতি পেলেও নাট্যকার ত্রুটিহীন এমন কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় না।

পুরস্কারের হাজার ডলারে ঋণ শোধ করলেও নাটকের চাহিদার কাছে এখনও ঋণীই রইলেন ও'নীল। পরের নাটক 'দি স্ট্র' মঞ্চে অসার্থক।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাটক 'দি এমপারার জোন্স' প্রভিন্সটাউনে অবস্থানকালে রচিত। ১৯২০-তে মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক ও সমালোচকদের কাছে নাট্যকারের দাবী চিরকালের জন্য স্বীকৃত হ'ল। আমেরিকার কৃষ্ণকায় সন্তানদের মহতী বিয়োগান্ত মহাকাব্য বললেও অত্যুক্তি হয় না এমনি এ নাটকের আবেদন। অর্ধশিক্ষিত এক নিগ্রোর বিতাড়িত ও ভয়ার্ত জীবনের করুণ ছবি ভেসে ওঠে নাটকের মাধ্যমে যে ছবিকে রোবসন অমর করে রেখেছেন তাঁর অনবদ্য অভিনয়ে। বর্ণবিদ্বেষের নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির সঙ্গে যারা পরিচিত তাদের কাছে তাই এ নাটক কেবলমাত্র নাটক নয়, জীবনের এক শিল্পসম্মত রূপায়ণও বটে। তাত্ত্বিকের কাছে 'ডিজায়ার আন্ডার দি এল্‌মস' বা 'মোর্ণিং বিকামস ইলেকট্রার' সমগোত্রীয় না হলেও নিটোল নাটকের সমস্ত গুণই এতে বর্তমান।

সোনার সন্ধানে মানুষের উন্মত্ত আচরণ ও জীবনযাত্রা একাধিকবার মহৎ শিল্পের বিষয়বস্তু হলেও ও'নীলের পরবর্তী নাটক 'গোল্ড'এ তা যথাযথভাবে ফুটে উঠল না। ট্রেজার আইল্যাণ্ড বা গোল্ডরাশের সঙ্গে তুলনা না করেও বলা যায় যে বঞ্চনার প্রকৃত রূপ বর্ণনায় ও'নীল এখনও অসমর্থ। বাস্তবতার পটভূমিতে অসমসাহসিক এক নাবিকের কাহিনী সেই কারণে এক্ষেত্রে অবাস্তব এবং কিছুটা করুণ হয়েই মনে রয়ে গেল আমাদের।

শিল্পীকে মাঝে মাঝে এক অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়। এ্যানা ক্রীষ্টিতে ও'নীল তার মুখোমুখি। সরাইখানায় গণিকার জীবিকাবলম্বী মেয়ের সত্যরূপের সাক্ষাৎ পায় পিতা। উপবাসী আত্মাকে শুদ্ধ প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ করে এ্যানার প্রতীক্ষাশেষে দেখা দিল সেই প্রেমিক। প্রেমে গোপনীয়তা নেই; জটিলতার সূত্রপাতও সেইখানে। কাহিনী আর চরিত্রের মাঝে দেখা দিল দ্বন্দ্ব। একের বিকৃতি না ঘটিয়ে অপরের বিকাশ অসম্ভব। বাস্তবে এই অবস্থায় হয়ত নায়ক-নায়িকার বিবাহ ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেমে গণিকার এই বিশুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়ায় গতানুগতিকতার কাছে আত্মসমর্পণ। বার্ক ও এ্যানার বিয়ে হল। কিন্তু মানবহৃদয়ের যে জটিল গ্রন্থির আভাস আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল এ্যানার মাধ্যমে তার প্রতি বুঝি অবিচার করা হল। এ্যানা ক্রীষ্টি তাই এ্যানার কাহিনী না হয়ে ক্রীষ্টির কাহিনী হয়েই রইল।

পরবর্তী নাটক 'ডিফারেন্ট' এ ও'নীলের বাস্তবপ্রীতি আরও গভীর। মুখস্থ করা পার্ট বলার বদলে যেন জীবন থেকেই কয়েকটি মানুষ তুলে এনে মঞ্চের ওপর এসে পড়েছে এমন কথা বার বার মনে পড়বে পাঠক বা দর্শকের। অতিনাটকীয় সমাপ্তির জন্যে রসোত্তীর্ণ হওয়ার পথে বুঝি কাঁটাও একটু রয়ে গেল। কালেব এবং এম্মা দুজনেই আত্মহত্যা করছে নাটকের শেষ অঙ্কে। কিন্তু বাস্তবানুগ হওয়া সত্ত্বেও কেন যে ও'নীল এই অতিনাটকীয়তায় অবতারণা করলেন ভেবে আমাদের আফশোস হয়।

চরিত্র ও কাহিনীর এই দ্বন্দ্বই সম্ভবতঃ পরবর্তী কিছুকালের জন্য ও'নীলের রচনারীতিকে বিড়ম্বিত করেছিল। স্ট্রীন্ডবার্গ ও নীট্‌শের প্রভাব তখন য়ুরোপে। টলের প্রমুখ নাট্যকারেরা ইতিমধ্যে যে আন্দোলন শুরু করেছেন ইতিহাসের পাতায় তার নাম এক্সপ্রেসেনাজিম। কিন্তু টলের বা কাইজারের নাটক দেখার আগেই দেখা দিল 'হেয়ারি এপ'। প্রকৃতি অর্থাৎ আদিম স্তর থেকে বন্ধন ছিন্ন হয়েছে অথচ সভ্য মানুষের কোঠাতেও উঠতে পারে নি এমন একটি চরিত্র ইয়াঙ্ক। ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা হলেও নাটক হত না। দ্বন্দ্ব সেখানে যে সে যেদিকেই যায় পায় আঘাত। সভ্য মানুষের দুয়ার থেকে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যায় সে গরিলার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে। ভাগ্যে জোটে মৃত্যু। প্রতীক ধর্মী এই নাটকে শিল্পীর স্বাক্ষর থাকলেও ও'নীল যে স্বীয় বক্তব্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন এমন কথা মনে করতে সমালোচকরা এখনও কুণ্ঠিত। চিন্তার জাল থেকে মুক্তি না পাওয়ায় শিল্পীর যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত অবাধ সঞ্চার সম্ভব নয় তা চোখে পড়ে এই যুগের 'ওয়েল্ডেড' বা 'দি ফাস্ট ম্যান' নাটক থেকে।

১৯২৩ এ রচিত 'অল গডস চিলান...' নাটকের প্রথম অভিনয়রাত্রে দেখা দিল বাধা। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণদের বিবাহিত জীবনের বিড়ম্বনা মার্কিন জীবনের নিষ্ঠুর করুণ এক সত্য। অনেক পণ্ডিত অবশ্য ও'নীল রাজনীতির ঊর্ধ্বে বা শিল্পের জন্য শিল্পরীতির উপাসক ইত্যাদি মত পোষণ করলেও এ প্রশ্ন মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে যৌবনের এই অধ্যায়ে ও'নীল কেন বার বার বর্ণবিদ্বেষের পটভূমিতে তাঁর নাটকের কাহিনীকে বেঁধেছেন? বিশুদ্ধ শিল্পেরই ব্যাপার যদি তবে প্রথম দৃশ্যে শিশুদের অভিনয় বন্ধ করার জন্য পুলিশকে অত তোড়জোড় করতে হয়েছিল কেন? নিগ্রো সন্তান জিম ও শ্বেতাঙ্গ নারী এলার অন্তর্জগতের বিচিত্র ঘাত-সংঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে।

ট্র্যাজিক সুরের চরম পরিণতি 'ডিজায়ার আন্ডার দি এল্‌মস' নাটকে। ১৯২৪-এর এই নাটকে জমি আর নারী এই দুই প্রচণ্ড মোহিনী শক্তির দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত এক চাষীপরিবারের ছবি
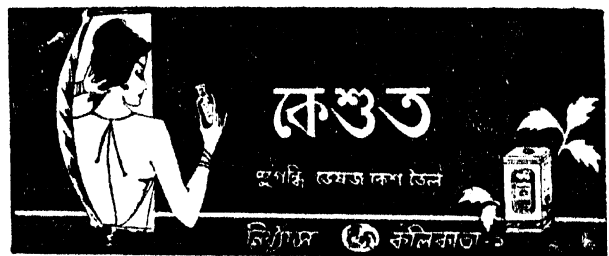
জীবনের সেই গভীরতায় মুখোমুখি আমাদের এনে দাঁড় করিয়ে দেয় যেখানে বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে ভাবি 'এ কী ভয়ানক করুণ প্রক্রিয়া যাকে নাম দিয়েছি জীবন।' নিউ ইংলণ্ডের ধনী কৃষক ক্যাবট তার অর্ধেক বয়সী এক সুন্দরী পুটনামকে ঘরে নিয়ে আসে তৃতীয়া স্ত্রী হিসাবে। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান এবেন সংমাকে সম্পত্তির প্রতি-দ্বন্দ্বী জ্ঞানে ঘৃণা করে। রূপ-সচেতন এ্যাবি তাকে যৌনআকর্ষণের ফাঁদে ফেলে গর্ভবতী হয়। এবেন বাপকে সবকিছু জানায়। যে যৌনআকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে এ্যাবি স্বার্থসিদ্ধি করবে ভেবেছিল তারই জালে সে নিজে আটক পড়ে। প্রেম যে কোন পথে আসবে কেউ তা জানে না। এবেনের প্রতি নিজের প্রেমকে প্রমাণ করার তাগিদে সদ্যজাত শিশুটিকে হত্যা করে সে। এবেনের দ্বিধা দূর হয়, কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পুলিশকেও জানায়। পুলিশের কাছে দুজনেই আত্মসমর্পণ করলেও প্রেমের স্বীকৃতি ঘটে পরস্পরের কাছে। জনপ্রিয়তার শিখরে উন্নীত হবার আগে বিরূপ সমালোচনার আবর্ত ওঠে সারা আমেরিকায়, শেষ পর্যন্ত অবশ্য জুরীরা এতে তেমন বিপজ্জনক কিছু পান নি। ট্রাজেডি রচনায় সিদ্ধিলাভ ঘটলেও স্বীয় লক্ষ্যে ও'নীল তখনও পৌঁছাতে পারেন নি।

পরবর্তী নাটক 'ফাউন্টেন' দু সপ্তাহের জন্য চলল। ১৯২৫-এ নতুন আঙ্গিকের সন্ধানে ব্যস্ত নাট্যকার; 'দি গ্রেট গড ব্রাউন'এ তার স্বাক্ষর। আধুনিক প্রতীকধর্মী নাটকের জন্য মুখোশের ব্যবহার এর পর থেকে স্বীকৃত হ'ল। ব্যক্তিত্বের হস্তান্তর প্রক্রিয়ার রূপদানে মুখোশের প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন দ্বিধা ছিল না ও'নীলের মনে। মুখোশ নাটকের বিস্তারিত আলোচনা ব্যতিরেকে এ নাটকের সম্যক ব্যাখ্যা অসম্ভব। 'ডিজায়ার' রচনার পর সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি 'স্ট্রেঞ্জ ইন্টারলুড।' ১৯২৬-২৭-এ রচিত এই নাটকটি ও'নীলকে সারা পৃথিবীর সম্মান দিয়েছে। দীর্ঘ আটাশ বছরের বিস্তীর্ণ অবকাশে চারটি মানব-হৃদয়ের অনুভূতির জগতের দ্বন্দ্ব ও সংকট এই নাটকের বিষয়বস্তু। অধ্যাপকের কন্যা নিনা তার প্রণয়ীকে হারায়। নার্সের বৃত্তি অবলম্বন করে নিনা এবং ক্রমে অন্যান্য চিত্তবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। মাতা, বধূ, দ্বিচারিণী, বস্তুবাদী, আদর্শবাদী সব-কিছুর সংমিশ্রণে এই চরিত্রটি নাটকের মূল আখ্যানভাগে প্রবেশ করার সময় নারী জাতির প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। মার্সডেন, স্যাম, এডমন্ড ডারেল, গর্ডন প্রত্যেকেই তার সাথে জড়িত। তাকে কেন্দ্র করেই যেন এদের প্রত্যেকের সত্তা বিকশিত। এদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়েই নিনা তার জীবনকে ধরতে চায়, ভরাতে চায়। কোন একজনকে নিয়েই তার তৃপ্তি নেই। কালের হাতে ছাড়া অন্য কারও কাছে তার পরাজয় নেই। ঘটেও তাই। জীবনের যে নিরন্তর স্রোতে আমরা ভাসমান এবং কোন কোন মুহূর্তে বারেকের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে একমাত্র মহাকালের গর্ভেই এই স্রোতের অবলুপ্তি। তার পূর্বে আশা নিরাশা সংকটের বিচিত্র এক উর্ণনাভ এই জীবন। কখনও মনে হয় বুঝি অপরূপ সুন্দর এই প্রক্রিয়া। পরক্ষণেই অর্থহীন মাতালের প্রলাপের মত, কি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মত আরেক বাঁকের মুখে আছড়িয়ে পড়ে। নাটকে এই ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে প্রকাশ করার চেষ্টা অনেকেই করেছেন, কিন্তু ও'নীলের মত এমন সুচারু প্রকাশে সক্ষম মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন। নাটকের গতানুগতিক লক্ষণের মাপকাঠিতে পন্ডিতেরা কি বলেন জানি নে, কিন্তু আধুনিককালের জীবনবোধকে রূপায়িত করতে না পারলে যে আধুনিক নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া অসম্ভব একথা সকলেই স্বীকার করেন।

জীবনবোধ এবং কল্পনার সংমিশ্রণে 'ল্যাজারস লাফ্‌ড' নাটকে এক অনবদ্য সৃষ্টি। জীবন এবং পরলোকের মাঝে বিরাট এক ব্যবধান রচনা করেছে মৃত্যু। ভীতির এই প্রাচীরকে উল্লঙ্ঘন করার একমাত্র উপায় হাসি। জীবনকে যারা চোখের জলে পিচ্ছিল পথ হিসাবে দেখে সেই খৃষ্টানদের স্পর্ধিত প্রতিবাদ ল্যাজারস। জীবনের জয়গানে মুখর ল্যাজারস রোমান সম্রাট টিবেরিয়সকেও জয় করার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যু-দন্ডে দন্ডিত। কিন্তু মৃত্যুকে যে জয় করেছে, মৃত্যুর ভীতি যার নেই তার কাছে কালিগুলোর বীভৎস আক্রোশও পরাস্ত। মৃত্যু এক বিরাট 'না'। জীবনই সত্য, হাসিই সত্য। চরিত্র-চিত্রণ অপেক্ষা জীবনের ধারণাকে চিত্রিত করাই এ নাটকে ও'নীলের প্রিয়তর অন্বিষ্ট।

'ল্যাজারসের' সঙ্গে সঙ্গেই এল 'ডাইনামো'। পুরাতনের অন্ধ গোঁড়ামি থেকে মুক্ত রুবেন নাস্তিকতার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের পূজারী হয়ে ওঠে। নতুন দেবতা ডাইনামোর কাছে নিজেকে নিবেদন করে সে শেষ দৃশ্যে। আদা ফিফের সঙ্গে প্রণয় নাটককে দ্বন্দ্ব-মুখর করে তুলতে সাহায্য করে। প্রমিথুসের যন্ত্রণা নিয়েও রুবেনের কাহিনী আধুনিক মানুষের যন্ত্রণাপিষ্ট মনের কথা হয়ে উঠতে পারে নি। ও'নীলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এখনও সম্ভাবনার অঙ্কুর মাত্র। গ্রীক পুরা-কাহিনীর যুগে ফিরে গিয়ে তবে সেই অঙ্কুরের মহতী পরিণতি। ১৯৩১-এ দেখা দিল 'মোর্নিং বিকামস ইলেকট্রা'। আপন আবেগে অধীর ক্যাপ্টেন ব্রান্ট স্বীয় আবেগের বন্দী। লাভিনিয়ার আকর্ষণ তার মায়ের আকর্ষণী শক্তির চেয়েও তীব্র। মা আত্ম-হত্যা করে, ভাই উন্মাদ হয়ে সেই পথেরই যাত্রী। কিন্তু লাভিনিয়ার প্রেমে অভিশাপ দিয়ে যায় ভাই। অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত লাভিনিয়ারও পরিণতি আত্মহত্যায়। দীর্ঘ পথসন্ধান সার্থক। শিল্পীর শ্রেষ্ঠ পরিণতি ধরা দিল এই নাটকে। এর পরের রচনা নিখুঁত হলেও একে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। 'মোর্নিং' এর রচয়িতা শেকসপীয়র থেকে কাইজার সকল শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সঙ্গী। এঁদের সকলের কাছে ঋণী হয়েও ও'নীল বিশিষ্ট। ১৮৮০-র ১৬ই অক্টোবর যে প্রাণবিন্দু নিউ ইয়র্কের এক ত্রিতল গৃহকোণে জন্মলাভ করেছিল তার সার্থক পরিণতি ঘটল এতদিনে। প্রথম যুগে রিপোর্টার আর নাবিকের কাজ এবং নীচের তলার মানুষদের সঙ্গে দুঃসাহসী জীবন-যাত্রায় শরীর যেদিন ভেঙ্গে পড়ল তাকে যেতে হল স্বাস্থ্যাবাসে। সেখানকার নির্জন গৃহকোণে কেবল স্বাস্থ্যেরই সন্ধান করলেন না তিনি। নিজের চিন্তাশক্তি এবং জীবনবোধকে শিল্পসম্মত রূপ দেবার আগ্রহ থেকে শুরু হল নব-পর্যায়। সম্ভবতঃ রক্তে পিতার নাট্য-প্রতিভার বীজও কিছুটা সাহায্য করে-ছিল। পথসন্ধানীর কাছে পথ ধরা দেবেই একথা প্রবাদ হয়ে উঠেছে শিল্পীদের জীবনে। ও'নীলের পথ-সন্ধান তাঁকে শুধু মহৎ নাট্যকারই করে নি, আমেরিকার সদ্যোজাত নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এত বড় নাম আর নেই।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ৩ ॥

বাপের বাড়িতেও যেমন সরানো গেল না স্বর্ণকে—তেমনি হাসপাতালেও না। কোন হাসপাতালেই নাকি 'বেড' নেই। অর্থাৎ যতটা উদ্যম থাকলে এই যুদ্ধের বাজারে ভর্তি করানো সম্ভব হ'ত—ততটা উদ্যম হরেনের ছিল না। তার নিজের অবসর কম—এ সব ব্যাপারে তাকে বন্ধু-বান্ধবদের ওপরই নির্ভর করতে হয় বেশী। তাদেরই বা কী এত গরজ যে, দিন-রাত ঘুরে তদ্বির-তদারক করে বেড-এর ব্যবস্থা করবে অপরের স্ত্রীর জন্য?

সুতরাং কিছুই করা গেল না—পাড়ার এক সাধারণ ডাক্তারকে দিয়ে মামুলী চিকিৎসা ছাড়া। জীবেন বলেছিল নার্স রাখতে কিন্তু তাও হয়ে ওঠে নি। দিন-রাত নার্স রাখতে গেলে অনেক খরচা—খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, দুটি নার্স দিনে চার টাকা ও রাত্রে আট টাকার কমে হবে না। প্রত্যহ এই বারো টাকা খরচা ছাড়াও তাদের খাওয়ার খরচ এবং ঝঞ্ঝাট আছে। মনে মনে তার একটা আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব ধরেই 'হ্যাঁ—এই চেষ্টা করছি' 'অমুককে বলে রেখেছি' 'সুবিধে মতো লোক দেখতে হবে তো—বাড়ির মধ্যে ঢোকানো' বলে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে নিশ্চিন্ত হল। কারণ তারপর আর কথাটা কেউ তুলল না, ভুলেই গেল সকলে।

এধারে স্বভাবতই বাড়ির লোক সন্ত্রস্ত ও সতর্ক হয়ে উঠেছে। প্রাণপণে নিজেদের ছেলেমেয়ে সামলাচ্ছে সকলে। ছোট ভাই শাশুড়ীর অসুখের অজুহাতে সপরিবারে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠল। তার শ্বশুরদের অবস্থা ভাল কিন্তু বাকী দুজনের সে সুবিধা নেই। তারা যতটা সম্ভব এই ঘরখানা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগল। নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই জায়েরা একবার করে বাইরে থেকে 'আজ কেমন আছ দিদি' জিজ্ঞাসা করে যেত। সেইটুকুর জন্যও সতর্কতার অন্ত ছিল না অবশ্য। মেজ-বৌ দুই নাকে ইউক্যালিপটাস তেল দিয়ে তবে ওদিকে যেত। সেই রকমই জীবেনের নির্দেশ। ও রোগের বীজাণু নাকি নিঃশ্বাসেই বেশী আসে।

ওঘর—স্বর্ণদের ঘর সকলেই পরিহার করেছে। স্থানাভাবে হরেনের ছেলেমেয়েরা ঠাকুমার ঘরেই শোয় এখন। তাঁর অবশ্য প্রবল আপত্তি ছিল কিন্তু হরেন এ ব্যাপারে মায়ের কোন কথাই শোনে নি। পরোক্ষে আভাস দিয়েছে যে তেমন কোন অসুবিধা বোধ করলে তিনি অনায়াসে তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর ঘরে গিয়ে শুতে পারেন। প্রায় সত্তর বছর বয়স হতে চলল তাঁর—এত আর এখন জীবনের মায়া কিসের?

ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের কাছেও যেতে পায় না। হরেনের কড়া নিষেধ। শুধু বড় মেয়ে রেবা মধ্যে মধ্যে দুপুরে বা বিকেলে এক-আধবার লুকিয়ে মার ঘরে যায়, এটা ওটা হাতের কাছে যুগিয়ে দিয়ে আসে।

আগে স্বর্ণ নিজেও বারণ করত ওদের আসতে। ইদানীং আর করে না। এর মধ্যে একদিন ওর খাবার ঘটির জল ফুরিয়ে গিয়েছিল—বার বার ক্ষীণকণ্ঠে 'একটু জল' 'ওগো তোমরা কেউ আমাকে একটু খাবার জল দিয়ে যাও না গো' বলে হেঁকেছে—কিন্তু কেউই আসেনি বা জল দিয়ে যায়নি। জায়েরা সামনের উঠোন পেরিয়ে কলঘরে গেছে—তারা শুনতে পায়নি, অথবা শোনেনি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে শুকনো কাশিতে বেচারার দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো হয়েছিল। মরেই যেত হয়ত—রেবার জন্যেই বেঁচে গিয়েছে সেদিন। কি একটা উপলক্ষে রেবার সকাল করে ছুটি হয়েছিল, বাড়ি ফিরে মার ঐ অবিরাম খকখকে কাশি শুনে সে নিজে থেকেই আগে ছুটে এ ঘরে এল। তখন আর জল চাইবার মতোও শক্তি ছিল না স্বর্ণর—সে শুধু ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছিল জলের গেলাসটা। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার পরে আর স্বর্ণ কাউকে নিষেধ করেনি ওর ঘরে ঢুকতে।

নার্স রাখা তো হয়ইনি—এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিল কোন হাসপাতালের আয়া বা দাইকে বেশী মাইনের লোভ দেখিয়ে এনে রাখতে, তাও হয়ে ওঠেনি। নিহাৎ স্বর্ণর অদৃষ্টে বেঘোরে মৃত্যু নেই বলেই বোধহয়—ওদের বুড়ী ঝি আয়না দিনকতক পরে এ ঘরের কাজ নিজের হাতে তুলে নিলে। রাত্রেও ওর ঘরে শুতে শুরু করল। তার একটি মেয়ে আছে গিরিবালা বলে, দেশে থাকে সে—কদাচিত

কখনও দেখা হয়—তার জন্যেই বুড়ীর আরও চাকরি করা,—সে নাকি কতকটা স্বর্ণর মতোই দেখতে। তার মায়াতেই কতকটা আয়নার টান স্বর্ণর ওপর। হয়ত এতাবৎকাল স্বর্ণর সস্নেহ ভদ্র ব্যবহারও একটা বড় কারণ।

আয়না স্বর্ণর ভার নিতে হরেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। নিশ্চিন্তও হল অনেকটা। যতই যা হোক—এই দেড় মাস দু মাস ধরে বিবেকের একটা খোঁচা ভেতরে ভেতরে কোথায় ছিলই তার। স্বর্ণর অস্তিত্বটা একবারে ভুলে থাকা কোন মতেই সম্ভব হচ্ছিল না। এবার সে খোঁচাটুকু আর রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েই পিছন ফিরল স্ত্রীর দিকে। ডাক্তার দেখাচ্ছে, সেবা করার জন্য ঝি রেখেছে—তার কর্তব্যে কোন ত্রুটি আছে এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না আর। সে সংসারের জন্য আর একটি ঝি বহাল করল, যাতে আয়নার আর এদিকে কোন দায়-দায়িত্ব না থাকে। বাকী লোকের নিরাপত্তার জন্যও সেটা আরও দরকার অবশ্য, কিন্তু হরেন তা স্বীকার করল না। আয়নার মাইনে দু টাকা বাড়িয়ে দিল সে নিজে থেকেই। অর্থাৎ খরচের জন্য সে ভাবছে না একবারও, কার্পণ্য করছে না কোন দিকেই। শুধু একদম সময় নেই বলেই—এইসব কারণে আয় বৃদ্ধির দিকে আরও বেশী মনোযোগ দিতে হয়েছে বলেই—স্ত্রীর দিকে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তার।

এই অসুখে পড়ার পর, বা অসুখটা কী ধরা পড়ার পর স্বর্ণরও অন্তরের দিকটা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। এসব কোন কিছুই আর তাকে স্পর্শ করতে পারত না—আঘাত দিতে পারত না। এক কল-কল্লোলা স্রোতস্বিনী হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে কোন অনুযোগ কোন নালিশ করত না কারও কাছে। এ বাড়িতে ঢুকে পর্যন্ত স্বার্থের চেহারা সে অনেক রকম দেখেছে—স্বামীর সম্বন্ধেও বিশেষ মোহ তার ছিল না—তবু ঠিক এরকমটা, এতটা জানত না, এমন যে হ'তে পারে তা কখনও ভাবেনি। সারা জীবনটা পাত করেছে সে —সমস্ত শক্তি সমস্ত স্বাস্থ্য—শেষ বিন্দু রক্ত ঢেলে দিয়েছে সে এই সংসারে, তার বিনিময়ে এতটা ঔদাসীন্য সে আশা বা আশঙ্কা করেনি। মানুষের এ চেহারাটা তার কল্পনার বাইরে। এই আঘাতেই সে এমন স্তব্ধ হয়ে গেছে বোধহয়। পৃথিবীতে কারও কাছ থেকে কিছু চাইবার প্রবৃত্তি আর তার নেই।

শুধু একটা বিষয়ে সে এখনও অনমনীয়।

হরেন তার বাপের বাড়িতে খবর দিয়েছিল ওকে না জানিয়েই। অর্থাৎ তারা যদি এসে নিয়ে যায় তো যাক। এসেছিলও তারা। বাবা মেজকাকা মা সবাই এসেছিল। এমন কি ওর ভায়েরাও এসেছিল সকলে। নিয়ে যাবার প্রস্তাব অবশ্য তারা করেনি। করেনি ছোঁয়াচে অসুখের ভয়ে নয়—ওখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসা হবে না সেই ভয়ে। মেজকাকা সে কথা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে জামাইকে। তবে মা থাকতে চেয়েছিল মেয়ের কাছে। এভাবে পড়ে থাকলে হয়ত একটু তেষ্টার জলও পাবে না সময়মতো—এই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছিল মহাশ্বেতা। কিন্তু স্বর্ণ কিছুতেই রাজী হয়নি সে প্রস্তাবে। বলেছিল, 'তাহ'লে আমি মুখে জল দেব না, দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকব।...ওপোস ক'রে শুকিয়ে মরব। কেন, কিসের জন্যে তুমি এসে আমার কষ্ট করতে যাবে তাই শুনি! দেহটা পাত করেছি যাদের জন্যে তাদের শখে পোরে তারা দেখবে; না হয় তো মরে পড়ে থাকব—ঠ্যাং ধরে টেনে ফেলে দেবে এরা—ব্যস্ চুকে যাবে ল্যাটা!...যদ্দিন পেরেছে আমাকে ঘানিগাছে ফেলে সব রক্ত নিংড়ে বার ক'রে নিয়েছে, এখন এই ছিবড়েটাতে কোন কাজ নেই, ঘর-জোড়া ক'রে পড়ে আছি বলে বুঝি বাপেদের কথা মনে পড়েছে?...বাবার অমন সব্বনাশের দিনেও একবেলা যেতে দেয়নি এরা— নিদিনিদিখ্যেতে পঞ্চাশ বামুন রান্নার অসুবিধে হবে বলে—এদের ঝিগিরি বামনীগিরির কাজ আটকে যাচ্ছিল বলে—সে কথা আমি ভুলিনি, কাঁটার মতো বিঁধে আছে বুকে। এখন কেন যাব? আমিও যাব না, তোমরাও এসো না কেউ। জেনে রাখো তোমাদের মেয়ে মরে গেছে!'......

অবশ্য এসেছে তার পরেও। মহাশ্বেতা এসেছে, তরলা এসেছে। মেজকাকীও এসেছে দু একবার। কিন্তু থাকতে দেয়নি স্বর্ণ কাউকেই। বাপের বাড়ি যেতেও রাজী হয়নি। বলেছে, 'এদের বাড়ির রোগ তোমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঢোকাব কিসের জন্যে গা—সুখ-সোমন্দা! এদের বাড়ির রোজগার তো এটা, এখানেই খরচ ক'রে যাই!'

তবু, স্বামী যে ঠিক তাকে এইভাবে একেবারে পরিহার করে চলবে—অতটা বোধহয় মনে করেনি স্বর্ণ। মনের মধ্যে কোথায় একটা ক্ষীণ আশা ও আশ্বাস ছিল যে এতদিনে একটুখানি মায়াও অন্তত পড়েছে তার ওপর। সামান্য একটা বনের পাখী পুষলেও মানুষের মায়া পড়ে তার ওপর—গোরু-কুকুর পুষলে তো কথাই নেই। কিন্তু সে আশ্বাস আর রাখা যায় না। দিনের পর দিন যায়,—একটা সপ্তাহের সঙ্গে আর একটা সপ্তাহ যুক্ত হয়, হরেন এসে ওর ঘরের সামনেও দাঁড়ায় না একবার। জায়েরা পরের মেয়ে—কথায় বলে দেইজী শত্রু, তবু তারাও তো একবার করে, বাইরে থেকে হ'লেও, দিনান্তে যখন হোক খবরটা নিয়ে যায়—'কেমন আছ দিদি?'...দেওররা চৌকাঠের মধ্যেও ঢোকে এক-আধবার! জীবেন বেশ খানিকটা ভেতরে এসেই দাঁড়ায়। হরেন কি একবারও খোঁজ করতে পারে না? তার কি এতই প্রাণের মায়া?...না কি সত্যিই তার এত কাজ?

শেষেরটা বিশ্বাস করতে পারলে হয়ত বেঁচে যেত স্বর্ণ। মানুষের ওপর এমনভাবে আস্থা হারাত না। মনের মধ্যে একটা শেষ অবলম্বন থাকত অন্তত। কিন্তু তাই বা পারে কৈ? সে ভেতরে আসছে, মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা কইছে—এইখান দিয়েই কল-ঘরে ঢুকছে, বামুন ঠাকরুণকে বিবিধ রান্নার ফরমাশ করছে—এসব তো ঘরে শুয়ে শুয়েই টের পাচ্ছে স্বর্ণ, দেখছেও কতক কতক। এর মধ্যে এইখান দিয়ে চোদ্দবার যাতায়াতের সময় কি একবারও একটু থমকে দাঁড়িয়ে তার খোঁজ নিতে পারে না সে?...আয়নাকে ডেকে নাকি তত্ত্ব নেয় মাঝে মাঝে, ডাক্তারের কাছেও নাকি খোঁজ নেয় অসুখের ও চিকিৎসার। কিন্তু আসল মানুষটার খবর নিতে কি হয়? ও যে এইখানেই কাঙালের মতো তার মুখ চেয়ে পড়ে থাকে তা কি একবারও ভেবে দেখে না সে?...বিশ্বাস হয় না ওর, কিছু বিশ্বাস হয় না। আয়না মিছে ক'রে বানিয়ে বলে, তাকে মিথ্যা স্তোক দেয়। পুরনো চেনা ডাক্তার —সেও ভদ্রতার খাতিরেই মিথ্যে কথা বলে নিশ্চয়।

দিন গোনে একটা একটা ক'রে স্বর্ণ। হরেন শেষ কবে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে তার খবর জিজ্ঞাসা করেছে—সে তারিখটি মনে ক'রে রেখেছে সে স্থান-কালপাত্র একাকার করা ব্যাধির এই প্রবল বিভ্রান্তির মধ্যেও। পনেরো, ষোল, সতেরো—কুড়িও হয়ে যায় একসময়ে। ...আগে একটা তীব্র অভিমান, একটা

দিকদিশাহীন উষ্মা, প্রচণ্ড চিত্তক্ষোভ ঠেলে ঠেলে উঠত তার মনের মধ্যে, মনে মনেই সহস্র অনুযোগ তুলত, উত্তর প্রত্যুত্তর মহড়া দিত। তীক্ষ্ম বাক্যবাণে প্রতিপক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করতে চাইত। কিন্তু ক্রমশঃ সে অভিমানটুকু রাখার মতোও মূলধন যেন খুঁজে পায় না এখন। একেবারেই দেউলে হয়ে গেছে সে, নিঃস্ব হয়ে গেছে। এখন শুধু তাই একটা অসহায় কান্নাই বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে ওঠে। তার দাম কারুর কাছে ছিল না কখনও—আজও নেই। হয়ত একদিন ছিল তার শৈশবে কৈশোরে—তার মা কাকা কাকীদের কাছে, হয়ত বাবার কাছেও—আর সেই দীন অনাথ ছেলেটা—সেই অরুণের কাছেও, কিন্তু এখানে যেটুকু তার দাম তা শুধু তার কাজের। যতদিন কাজে লেগেছিল ততদিনই তার কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল এ বাড়িতে। আজ তার সে শক্তি গেছে ফুরিয়ে—আজ আর তাই মূল্যও কিছু নেই।

যত কাঁদে, যত মনের মধ্যে মাথা কোটে—ততই অসুখও বাঁকা পথ ধরে। প্রথম প্রথম চিকিৎসাতে মন্দ ফল হয়নি। বিবর্ণ মুখে একটু রক্তাভা দেখা দিয়েছিল, অবশ হাত-পাতেও একটু বল ফিরে এসেছিল কিন্তু তারপরই আবার যেন কোথায় কী একটা গণ্ডগোল বাধে, ওর প্রাণশক্তি সাড়া দেয় না আর কোন ওষুধেই। বরং অবস্থার যেন দিন দিন অবনতিই ঘটতে শুরু করে।

ডাক্তার সে কথা হরেনকে জানান। প্রাণপণে হাসপাতাল ঠিক করতে বলেন। হরেন চিন্তিত হয়, বিরক্ত হয়—কিন্তু তবু তোড়জোড় ক'রে হাসপাতালে বেড্ ব্যবস্থা করতে পারে না।

ডাক্তার অবশ্য আশ্বাস দেন স্বর্ণকে, 'ওঁকে বলেছি—দরকার হ'লে ঘুষ দিয়েও ব্যবস্থা করতে—এবার মনে হচ্ছে একটা সীট পাওয়া যাবে। হাসপাতালে না গেলে সারতে অনেক দেরি হবে কিন্তু। আপনি যেন আবার হাসপাতাল শুনে কাঁদতে শুরু ক'রে দেবেন না।'

স্বর্ণ ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আমি কাঁদব না। আমি এখান থেকে বিদেয় হতে পারলেই বেঁচে যাই—কিন্তু হাসপাতালে যাওয়াও আমার হবে না ডাক্তারবাবু, আমি এই আপনাকে বলে রাখলুম!'

'কেন—উনি তো চেষ্টা করছেন খুব—!'

'মিছে কথা। হাসপাতালে গিয়ে যদি আমি বেঁচে ফিরে আসি আমাকে নিয়ে ও কি করবে বলতে পারেন? ভরসা ক'রে ঘরে নিতে পারবে না—অথচ আর একটা বিয়ের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এ এমনি ক'রে পড়ে থাকলে শিগ্‌গিরই সব পথ খুলে যাবে—বুঝছেন না!...ওর এখনও ঢের বিয়ের বয়স আছে, আমার চেয়ে ঢের ভাল বৌ জুটে যাবে।'

হা হা ক'রে হেসে ওঠেন ডাক্তার।

'এ তো আপনাদের মান অভিমানের কথা হ'ল। ও কোন কাজের কথা নয়। ...হচ্ছে, হচ্ছে—ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই এর মধ্যে।'

এ-কথার কোন উত্তর দেয় না আর স্বর্ণ। চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকে। হায়রে! মান অভিমানের কথা বলে যদি এই মর্মান্তিক সত্যটাকে সেও উড়িয়ে দিতে পারত!...কিন্তু সে সব আর এই নিরীহ লোকটাকে বলে লাভ কি? সে প্রাণপণে শুধু ওঁর সামনে থেকে চোখের জলটাকে গোপন করার চেষ্টা করে।

তা হ'লেও, স্বামী সম্বন্ধে স্বর্ণ যতই মোহমুক্ত হোক, হরেন যে আর দুটো দিনও সবুর করতে পারবে না, এত শিগ্‌গির এই কেলেঙ্কারী ক'রে বসবে, তা কল্পনাও করতে পারেনি সে।

সন্দেহ করেছিল অবশ্য প্রথম দিন থেকেই। চোখের আড়ালে গেলেও তার মনের আড়ালে যেতে পারেনি হরেন একবারও। স্বর্ণর একটা চোখ আর একটা কান সর্বদা পাতা থাকত হরেনের দিকে, তার মন যেন ছায়ামূর্তি ধরে অনুগমন

করত স্বামীকে, বিশ্রামে-অবসরে সমস্ত সময়—ঘরে বাইরে সর্বত্র। ঘরে শুয়ে শুয়েও ওর প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করত সে।...কাজেই হঠাৎ একদিন হরেনের সকাল ক'রে বাড়ি ফেরাটা অগোচর রইল না তার। কোনদিনই যে রাত দুটো-আড়াইটের আগে আসছিল না, বারোটায় আসা তার পক্ষে অপ্রত্যাশিত সকাল।

বিস্মিত হলেও বিচলিত হয়নি। নিয়মের ব্যতিক্রম ভেবেছিল।

কিন্তু তার পরের দিনও যখন ঘড়িতে বারোটা বাজবার সংগে সংগে দরজায় এসে ট্যাক্সি দাঁড়াবার শব্দ হ'ল এবং কড়াটা নড়ে উঠল খুব মৃদুস্বরে, তখনই সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠল স্বর্ণ। এমন তো হয় না, অন্তত বহুদিন হয়নি। ব্যতিক্রমটা নিত্য ঘটতে থাকলে সেটা আর ব্যতিক্রম থাকে না, এ বুদ্ধিটুকু তার এতদিনে হয়েছে। এর অন্য অর্থ আছে কিছু।

সে সম্বন্ধে সজাগ এবং কৌতূহলী হয়ে ওঠার সংগে সংগেই আবছা কুটিল সন্দেহটা স্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করল মনের মধ্যে। দুই আর দুইয়ে চারের মতোই সহজ হয়ে এল অঙ্কটা। নতুন যে অল্প বয়সী ঝিটি এসেছে সে শ্যামাঙ্গী হ'লেও লাবণ্যবতী। তবু তার সম্বন্ধে কোন কথা হয়ত এত চট্ ক'রে ভাবত না যদি না কদিন আগেই অত্যন্ত বেমানান রকমের ফরসা এবং এই যুদ্ধের বাজার হিসেবেও বেশ মাঝারি দামের কালাপাড় শাড়ি একখানা পরতে দেখত তাকে। একখানা নয়—এক জোড়াই এসেছে মনে হ'ল—কারণ একখানা কেচে আর একখানা পরা চলছে।...

সবাই ঘুমোচ্ছে, গোটা বাড়িটাতে নেমে এসেছে একটা শান্ত নিস্তব্ধতা। অতি সামান্য সামান্য শব্দ—কিন্তু সেগুলোও প্রগাঢ় সুষুপ্তিই সূচিত করে। জীবেনের নাক ডাকে, সেটা এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে অল্প অল্প। পাশের বাড়ির তিনতলায় রমার ছেলেই বোধ হয় —খুং খুং ক'রে কাঁদছে সেই থেকে। আয়নার নাক ডাকে না—কিন্তু দাঁতপড়া তোবড়ানো মুখে ঠোঁটের বাধা ঠেলে বেরোতে নিঃশ্বাসেরই একটা অস্ফুট শব্দ হয়। সেটাও নিয়মিত—সুতরাং তা আর কানে বাজে না।

নিয়মিত এসব শব্দে কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে সামান্য যেটি অস্বাভাবিক, নতুন, সেটি ঠিকই কানে এসে পৌঁছয়। দরজা খুলে ভেতরে এল হরেন। কলঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এল। ফিসফিস ক'রে কাকে কি বলল। বোধহয় ঝিকেই বলল কিছু—কিম্বা রাঁধুনীকে। বামুনঠাকরুণ যে এতরাত পর্যন্ত জেগে আছেন তা মনে হয় না। ...এবার বোধহয় ঘরে ঢুকে ঢাকা খুলে খেতে বসল। আবার এল ভেতরে। সম্ভবত আঁচাতে এল এবার।

এ সবই যথাসম্ভব সন্তর্পণে করে হরেন—চিরকাল খুবই সতর্ক সে, আর কারও ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁশিয়ার। কিন্তু তবু যে জেগে কান পেতে আছে তার কাছে সে শব্দ না পৌঁছবার কথা নয়।...

কিন্তু কলঘর থেকে ফিরে গেল—সেও তো প্রায় মিনিট পাঁচেকের কথা। দরজা বন্ধ করার শব্দ হ'ল না কেন?

স্বর্ণ আর থাকতে পারল না। প্রাকৃতিক কাজের সুবিধার জন্য কদিন আগে সে-ই ব্যবস্থা ক'রে নিচে মেঝেয় বিছানা করিয়েছে। সুতরাং উঠে হামা দিয়ে দিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে যাওয়ায় খুব অসুবিধা হ'ল না স্বর্ণর। বেশী দূরে যেতেও হ'ল না তাকে অবশ্য। চৌকাঠের কাছে যেতেই দৃশ্যটা নজরে পড়ল।

ওর এই সারেরই শেষ ঘরখানা হ'ল বৈঠকখানা ঘর। আজকাল পাকাপাকি-ভাবেই ঐ ঘরে থাকে হরেন। এই রকের ওপরই সে ঘরের দরজা। একটু উঁকি মারলেই শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সে ঘরের দরজা ছাড়িয়েও—ওদিকের দেওয়াল পর্যন্ত। আর দেখতেও পেল সে! নিঃশব্দে একটা টানাটানি চলছে ঐ দরজারই সামনে। একজন আর একজনকে হাত ধরে টানছে বোধ হয়।...অন্ধকারে মুখ চোখ ঠাওর হবার কথা নয়। হ'লও না। কিছুই ঠাওর হ'ত না এই কৌটোর মতো বাড়িতে, যদি না রাস্তার আলোর একটা আভাস রমাদের সাদা বড় বাড়িটার দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে একটা ঝাপসা রকমের আবছায়ার সৃষ্টি করত। যুদ্ধের আগে আরও ভাল আলো পাওয়া যেত অবশ্য, গ্যাসের আলোর অনেকটা এসে পড়ত ওদের দেওয়ালে। কিন্তু এখন ঠুলি-পরা আলো অতদূরে পৌঁছয় না। এখন যেটুকু আলোর মতো নামে এ বাড়িতে, তাতে অভ্যস্ত চোখ না হ'লে কিছুই দেখতে পেত না।

কিন্তু মুখ চোখ ঠাওর না হ'লেও চলবে। সাদা ধবধবে শাড়িটাই যথেষ্ট। হরেনের পাটকরা ধুতিটাও।

অল্প কিছুক্ষণের টানাটানি। ধস্তাধস্তি কিছু নয়। যে-পক্ষকে টানা হচ্ছে তার যে খুব একটা অনিচ্ছা তাও নয়। বাধাটা খুবই ক্ষীণ, ক্ষীণতর চক্ষুলজ্জার একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কারণ কয়েক মুহূর্তেই সে প্রতিরোধ শেষ হয়ে গেল। দুজনেই নিঃশব্দে গিয়ে ঘরে ঢুকল। আর সংগে সংগেই প্রায় নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

আর কিছু দেখতে পেল না স্বর্ণ। আর কিছু দেখতে পারল না।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারী

অমিয় দত্ত

।।এক।।

প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই একটা নিজস্ব জীবন-বোধ বা জীবন-দর্শন থাকে। জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা ও ধারণা ধীরে ধীরে তাঁর মনে ঐ বোধকে ঐ দর্শনকে গড়ে তোলে। আর তারপর সাহিত্যিক এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়ে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ঐ জীবন-দর্শনের মাপকাঠিতে সব কিছুর বিচার করার প্রয়াস পান। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ কথা তো সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য। এখন রবীন্দ্রনাথের জীবন-সম্পর্কীয় অন্যান্য ধারণার কথা বাদ দিয়ে নারী সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিচয় নেওয়া যাক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত জীবন-দর্শনের আলোকে নারীর দ্বিবিধ রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। "এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।" (১) —"একজনা উর্বশী, সুন্দরী,। বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী,। স্বর্গের অপ্সরী,। অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,। বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,। স্বর্গের ঈশ্বরী," (২) রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই দ্বৈত নারী-সত্তার অস্তিত্ব-সমৃদ্ধ। তাঁর ছোটগল্পেও প্রধানত এই দুই ধরণের নারীই তাদের যা কিছু ভালো—যা কিছু মন্দ--সেই সমস্ত কিছু নিয়েই সমুপস্থিত। এখানে কখনো তারা হেসেছে-কেঁদেছে, কখনো ভালোবেসেছে—হিংসা করেছে, আবার কখনো বা নীচতা-স্বার্থপরতা এবং মহত্ত্ব-ঔদার্য,—এই দুই প্রবৃত্তির হাত ধরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর আমরা তাদের এই দুই বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তি-ঢেউয়ের দোলায় উঠতে নামতে দেখেছি; দেখেছি তাদের হৃদয়-সমুদ্রের তুফানকে—সেই তুফানের আলোড়িত আবর্তিত রূপকে। প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে যদিও এই দ্বৈত নারী-সত্তার প্রকাশ ঘটেছে তথাপি একটু পুংখানুপুংখভাবে গল্পগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করলে নারীর মোট চার প্রকারের রূপ-মূর্তি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট রেখায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেগুলি হোল ঃ

(ক) সংসার, সমাজ এবং ব্যক্তি-বিশেষের যূপ-কাষ্ঠে আত্ম-বিসর্জিতা নারীর রূপ। এখানে নারী বিরুদ্ধ-শক্তির কাছে মাথা নত করে অধীনতা, পরাজয় এবং অবমাননাকে স্বীকার করে নিয়েছে; প্রতিবাদ যা করেছে তা সরব নয়, নীরব। নারীর মৃত্যুই যেন এই প্রতিবাদ।

(খ) নারী-ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনে নারীত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিতা এবং উগ্র ব্যক্তি - স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল নারীর রূপ। নারী এখানে কুসংস্কার এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে; সে এখানে উনিশ শতকীয় স্ত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজা-বাহী।

(গ) নারীর মাধুর্য-মণ্ডিত কল্যাণী রূপ। এবং

(ঘ) নারীর স্বার্থ-সংকুল ও কামনা-কুটিল দানবী রূপ।

এখন এই রূপ-বিভাগীকরণের সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য-স্বীকার্য। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প থেকে অপহৃত কয়েকটি নারী-চরিত্রকে দৃষ্টান্ত হিসেবে অবলম্বন করে তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা নারীর পূর্বোক্ত চার প্রকার রূপ-পরিচয়ে যত্নবান হচ্ছি।

।।দুই।।

প্রথম শ্রেণীর নারী-চরিত্র হিসেবে 'দেনাপাওনা', 'কঙ্কাল', 'মহামায়া', 'হৈমন্তী', 'শাস্তি' এবং 'প্রগতি-সংহার' গল্প ছয়টির নায়িকা-চরিত্রগুলিতে গ্রহণ করা যায়। প্রতিটি গল্পেরই নায়িকা-জীবন ট্রাজেডি-কারুণ্যে ভরপুর। কোন নায়িকারই কোন দোষ ছিল না, পাপ ছিল না। অথচ তাদের জীবন সার্থকতার ফলে-ফুলে-পাতায় ভরে ওঠবার আগেই সমাজের নিষ্ঠুর কষাঘাতে ও নিপীড়ন-নির্যাতনে অকালে শুকিয়ে গেল। তারা সকলেই নীরব হয়ে সমস্ত অবাঞ্ছিত অত্যাচার মাথায় পেতে নিয়েছে;—অবশেষে মৃত্যুকেও। এতটুকু টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। ঐ নীরবতাই যেন তাদের প্রতিবাদ। তাই দেনাপাওনার নিরুপমাকে নিরুপায় নীরবতার মধ্যে শ্বশুরবাড়ীর লোকজনদের অজস্র কটূক্তি ও নির্যাতন সহ্য করতে দেখি। অথচ মানবিকতার বিচারে দোষটা তার কিছুই নয়। বিয়ের সময় নিরুপমার বাবা পণের টাকার সমস্তটা মেটাতে পারেননি। অবশেষে একসময়ে যখন তিনি বাড়ী বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়ে তাঁর ছেলে ও নাতিকে পথে বসিয়ে টাকাটা শুধে দিতে এসেছিলেন তখন নিরুপমা প্রবল বিরোধিতা ও আপত্তি প্রকাশ করে তাঁকে টাকাটা দিতে দেয়নি। শ্বশুরবাড়ীর লোকের কানে এ কথা পৌঁছবার পর নিরুপমার ওপর নির্যাতনের মাত্রাটা আরো বেড়ে গেল। অনেক অসম্মান, আঘাত ও অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে নীরব থেকে আত্ম-নিগ্রহের মধ্য দিয়ে সে মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গনের মধ্যে শান্তি খুঁজে পেতে চাইলো। নিরুপমার মৃত্যু হোল।

দ্বিতীয় গল্প কঙ্কালের নায়িকা সুন্দরী এবং আত্মপ্রেমমুগ্ধা। অল্প-বয়সেই সে বিধবা হয়েছিল। যৌবনে সে ভালোবাসলো তার দাদার বন্ধু শশি-শেখরকে। শশিশেখরেরও তাকে ভালো লেগেছিল। কিন্তু তাদের মাঝখানে মিলনের বাধা সৃষ্টি করেছিল সমাজ-শাসিত বৈধব্য-বিধিনিষেধ। এই নিষেধের কঠিন নিগড় ভেঙে ফেলে দিয়ে নায়িকা একবারও শশিশেখরকে ভালোবাসার কথা মুখ ফুটে বলতে পারলো না। সামাজিক সংস্কারের কাছে তার এই-খানেই নতি-স্বীকার। শেষপর্যন্ত সে ভীরুর পন্থা অবলম্বন করে শশি-শেখরকে বিষ খাওয়ালো এবং নিজেও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলো।

এ পর্যায়ের তৃতীয় গল্পে মহামায়া তার প্রেমাস্পদ রাজীবের ঘরে যাবে বলে কথা দিলেও তার পরিপূর্ণ রূপ-মূর্তি নিয়ে যেতে পারেনি। একটি অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অগ্নিদগ্ধ আত্মরূপকে গোপন রেখে সে, রহস্যমণ্ডিত হয়ে রাজীবের ঘরে এসেছিল; —এ মহামায়াকে রাজীব চেনে না, —তার এ ভীষণ রূপকে সে কল্পনাও করতে পারে না কিন্তু মহা-মায়ার এই রূপ পরিবর্তনের কারণ কি? মহামায়ার এ দুরবস্থা ঘটেছে সামাজিক কুসংস্কার প্রথার কাছে তার নির্বিচার আত্মসমর্পণে। যদি সে তার মামার কথা না শুনে মৃতপ্রায় কুলীন (?)

(১) র-রচনাবলী—জন্মশতবার্ষিকী সং, ৯ম খণ্ড, পঃ বঃ সরকার, পৃঃ ৭৯৭

(২) বলাকা ঃ দুই নারী (২৩ নং পদ্য)।

শ্মশানযাত্রীকে বিয়ে না করতো এবং যদি সে সহমরণ প্রথাকে অস্বীকার করার সাহস দেখাতে পারতো তা হলে নিশ্চয়ই তার এমন দশা ঘটতো না। রাজীবের ঘরে আসার আগে সামাজিক কুপ্রথার খড়্গাঘাতে পূর্বে মহামায়ার যেন যথার্থই মৃত্যু ঘটেছে বলে মনে হয়।

হৈমন্তীর নায়িকা হৈমর অবস্থাও অনেকটা দেনা-পাওনার নিরুপমার মত। সে সব বোঝে, সব জানে; সত্যকে সে আশ্রয় করে বাঁচতে চায়। কিন্তু সমাজ তাকে সে সুযোগ দেয়নি। শ্বশুরবাড়ীর নিন্দা-নির্যাতনের হাত এড়িয়ে তাকে পরাস্ত করে মাথা তুলে দাঁড়াবার মত উপযুক্ত সাহস ও বলিষ্ঠতার অভিপ্রকাশ হৈমন্তী-চরিত্রে ঘটে নি। তার ঐ চারিত্রিক দুর্বলতাই শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুর অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে দিয়েছে—তার স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছে মৃত্যুতে।

পঞ্চম গল্পের নায়িকা চন্দরা সম্পূর্ণ নিরাপরাধ হয়েও সমাজের অন্ধ বিচারে খুনী সাব্যস্ত হয়েছে। সে একটিবারও এর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ না করে ফাঁসির দড়ি নিজের গলায় তুলে নিয়েছে। প্রতিবাদ যা করেছে তা তার নীরব ঘৃণার মধ্য দিয়েই করেছে। চন্দরার এ ঘৃণা তার স্বামীর প্রতি, সমাজের প্রতি। কিন্তু তার ঘৃণার বহিরঙ্গ-বিস্ফোরণ বড়একটা ঘটে নি। সমস্ত সমাজ তার কাছে শেষদিকে বিষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সমাজের উৎপীড়নের ঊর্ধ্বে আপন ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে বাঁচবার মত বলিষ্ঠতা চন্দরা-চরিত্রে নেই। সমাজকে ত্যাগ করে বাঁচবার কথা সে একবারও কল্পনা করতে পারেনি' এইখানেই চন্দরা-চরিত্রের দুর্বলতা [এই পর্যায়ের অন্য সব নায়িকাদের মতই] এইজন্যই সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে; নির্দ্বিধায় তার ওপর আরোপিত মিথ্যে অভিযোগকে স্বীকার করেছে।

আলোচ্য পর্যায়ের সর্বশেষ গল্প [যা রবীন্দ্রনাথেরও সর্বশেষ গল্প] প্রগতি-সংহারের নায়িকা সুরীতিও ব্যক্তি-বিশেষ নীহারকে ভালোবেসে এবং প্রতিদান হিসেবে কিছু না পেয়েও মুখ বুজে মৃত্যু-রোগের অসহ্য কামড়কে সহ্য করেছে। তার অর্থের, তার ভালো-বাসার, তার জীবনের শেষ কড়িটি পর্যন্ত দেউলে হয়ে গেছে এই নির্লিপ্ত, নির্বিকার, উদাসীন ও স্বার্থপর নীহারের জন্য! নীহারের সর্বগ্রাসী লোলুপতার মধ্যে তার এই আত্ম-বিসর্জনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই আমরা খুঁজে পাই না।

।। তিন ।।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নারীরূপের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে 'দিদি', 'মানভঞ্জন', 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর', 'বদনাম' প্রভৃতি গল্পে। এই গল্পগুলির প্রধান নারী-চরিত্রগুলি প্রথম শ্রেণীর নারী-চরিত্রগুলির তুলনায় অনেক-অনেকখানি স্বতন্ত্র। সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, প্রাপ্য বস্তুর জন্য এরা অন্যায়, মিথ্যা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরবে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এর জন্য এরা সমাজ, সংসার আত্মীয়-স্বজন সমস্ত কিছুকেই ভেঙেচুরে তচ্‌নচ্ করে বাইরে চলে আসতে প্রস্তুত। আপনার ব্যক্তিত্বকেই এই নারীরা সবচাইতে উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়; এর অমর্যাদাকে তারা কখনোই স্বীকার করতে নারাজ। এই ব্যক্তিত্বের কাছে আর সব কিছুই তুচ্ছ,—এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত।

দিদি গল্পে ভাইকে ভালোবাসার পথ বেয়েই শশিকলার চরিত্রে উপরিউক্ত ব্যক্তিত্ব এবং সত্য-নিষ্ঠার আগমন ঘটে-ছিল। তাই সে তথাকথিত বাঙালী নারীর স্বামী-ভক্তিকে অস্বীকার করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল—ভাইকে রক্ষা করার জন্য কাতর কণ্ঠে ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে আবেদন-নিবেদন করেছিল। স্বামীর শাসনের রক্তচক্ষুকে শশিকলা এতটুকু ভয় করেনি। মৃত্যু শেষ পর্যন্ত তার ঘটেছে বটে কিন্তু তাতে করে তার নারীত্বের বা ব্যক্তিত্বের এতটুকু হানি হয়েছে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় গল্পে গিরিবালা স্বামীর কাছ থেকে অনাদর-অপমান পেয়ে আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছে। আপনার মূল্য আপনি বুঝে শেষ পর্যন্ত সে স্ব-মহি-মায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। গিরিবালার সমস্ত কিছু সার্থকতার মূলে রয়েছে তার অন্তর্নিহিত অনমনীয় চারিত্র্যশক্তি —তার ব্যক্তিত্ব। স্বামী তাকে চাইছে না বলে 'চন্দরা'র মত অভিমান-বশে সে তাই মৃত্যু কামনা করেনি [চন্দরার সঙ্গে গিরিবালার অবস্থাগত পার্থক্য স্মরণ রেখেও এ মন্তব্য করা চলে নাকি?] বরং জেদের বশে আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয়েছে।

স্ত্রীর পত্রের মৃণাল তো স্পষ্টই তার 'মেজবউত্ব'-কে অস্বীকার করেছে। পুরীর অনন্তনীল সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরে অসীম-আকাশের কোলে আষাঢ়ের ঘন-কালো মেঘপুঞ্জকে রেখে তার মাখন বড়াল লেনের সুদীর্ঘ যন্ত্রণা-কাতর একঘেয়ে গার্হস্থ্যজীবনের হাত থেকে বন্ধন-মুক্তির বাণীকে সোচ্চারে ঘোষণা করেছে মৃণাল। নারীর প্রখর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে এই চরিত্রে; সে আর কোন মতেই মুখ বুজে সব অত্যা-চারকে সহ্য করতে রাজী নয়। মেয়েদের ওপর সমাজ-আরোপিত অহেতুক বাধা-নিষেধের পাষাণ-ভারকে ব্যক্তিত্বের আঘাত-প্রাবল্যে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চায় সে। মুক্তির আলোক-স্বপ্নে মৃণালের মন-প্রাণ চঞ্চল!

আলোচ্য চতুর্থ গল্প পয়লা নম্বরেও অনিলা আপন ব্যক্তি-স্বাধীনতায় আস্থা স্থাপন করে নারীত্বের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য সমাজ-সংসার-স্বামী সব কিছুকে ত্যাগ করে গেছে। অনিলার ঘর ছাড়ার পিছনে তার মুক্তি-কামনা প্রবল-ভাবে তাগিদ দিয়েছে; সে মুক্তি, সংসারের তুচ্ছতার হাত থেকে মুক্তি—তা সামাজিক কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার হাত থেকে মুক্তি।

বদনাম গল্পে সৌদামিনী তথা-কথিত বাঙালী সতীত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। সে একদিকে তার স্বামীকে 'প্রাণপণে' সেবা করেছে 'ভালোবেসে' অন্যদিকে তাকে 'বঞ্চনা' করেছে 'কর্তব্য-বোধে'। ব্যক্তিগত ভাব-ভালোবাসার চাইতে দেশের স্বাধীনতা-মুক্তিই সদুর কাছে বড়ো এবং অধিকতর কাম্য। আর এই স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রশস্ত রাজপথেই তার মনের উদার-লোকে ব্যক্তিত্বের অনু-প্রবেশ! এই শ্রেণীর আলোচিত নারী-চরিত্রগুলির সবচাইতে বড় কথা হোল তাদের চরিত্রগত বলিষ্ঠতা। বিদ্যুতের দীপ্তি এবং বজ্রের কাঠিন্য যেন তাদের অঙ্গে অঙ্গে। এরা সগৌরবে গর্বোন্নত শিরে একথা বলবার দাবী রাখে :

"আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-
বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা
ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল-ফোটা।" (৩)

।। চার ।।

এই পর্যায়ের গল্পে নারীর মাধুর্য-মণ্ডিত, কোমল-মধুর কল্যাণীরূপের প্রকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে 'মেঘ ও

(৩) 'পলাতকা' : মুক্তি।

রৌদ্রে'র গিরিবালা, 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী, 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'র দাক্ষায়ণী এবং 'রবিবার' গল্পের বিভাকে মনে পড়ে। এরা সবাই নম্র ও মধুর, ধীর, স্থির, শান্ত ও সংযত [এ মন্তব্য করছি গিরিবালা ও মৃন্ময়ীর পরিণত বয়সকে মনে রেখে।] গিরিবালা হৃদয়ের মাধুর্য প্রেমে-প্রীতি নিয়ে জেল থেকে সদ্যমুক্ত শশিভূষণকে ডাক দিয়েছে। শ্রান্তচিত্ত শশিভূষণকে তার কবোষ্ণ হৃদয়ে আশ্রয়ের ইঙ্গিত দিয়ে গানের সুরে যেন বলেছে,—

"এসো আমার ঘরে এসো, আমার
ঘরে।" বা—
"এসো এসো ফিরে এসো নাথ হে,
ফিরে এসো!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত,
বঁধু হে, ফিরে এসো!" (৪)

মৃন্ময়ীও শেষ পর্যন্ত তার "সুকোমল বাহুপাশের" সুকঠিন বন্ধনে অপূর্বকে অপূর্ব-আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে বেঁধে ফেলে পূর্ব-কুণ্ঠিত চুম্বনের অজস্র ধারায় তাকে অভিষিক্ত করেছে; নবোন্মেষিত মধুর প্রেমকে অপূর্বর কাছে নিঃসংকোচে নিবেদন করেছে।

তৃতীয় গল্পের সমাপ্তিতে দাক্ষায়ণীর যদিও মৃত্যু ঘটেছে তথাপি স্বামীর প্রতি তার অকৃত্রিম অনুরাগ-ভালোবাসার সলজ্জ মধুর কল্যাণী ছবিটি চিরকালের জন্যে আমাদের মনের তটে গভীর রেখায় দাগ কাটে।

আর রবিবার গল্পের নায়িকা বিভার শান্ত, সংযত প্রেমিকা-মূর্তি তো অভীককে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতেই উদ্বুদ্ধ করেছে!

।। পাঁচ ।।

চতুর্থ শ্রেণীর নারীরূপের দৃষ্টান্ত হিসেবে মণিমালা [মণিহারা], কিরণলেখা [হালদারগোষ্ঠী], কলিকা [সংস্কার] এবং অমিয়ার [নামঞ্জুর-গল্প] নাম উল্লেখ করা যায়। নারী-চরিত্রের অন্ধকার-কুটিল দিকটা এদের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই যে যার হীন স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত; স্বার্থসিদ্ধিই এদের পরমতম কাম্য। মণিমালা তার স্বামীর ভালোবাসাকে বোঝে না; বোঝে কেবল গয়নাগাটিকে। গয়না নিয়ে সে নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসে, সিন্দুকে থাকের পর থাক গয়না সাজিয়ে তোলে। তার কাছে প্রেম সত্য নয়, অলংকার সত্য।

কিরণলেখার মহত্ত্বকে বোঝবার মত সহজ ও স্বচ্ছ দৃষ্টি ছিল না। সংকীর্ণ মনের মালিক হয়ে মেকি আভিজাত্যের মুখোস এঁটে সে বসে থাকতে ভালোবাসে। দুঃস্থ মানুষ তার কাছে অবজ্ঞার পাত্র। তাই স্বামীর সংকাজে সে এতটুকু উৎসাহবোধ তো করেই নি,—বরং বাধা দিয়েছে, বিরক্ত হয়েছে। কিরণলেখা কেবল হালদারগোষ্ঠীর একজন;—সমগ্র মনুষ্য-সমাজের একজন হিসেবে তাকে চেনবার কোন উপায়ই নেই।

কলিকা সংকীর্ণচেতা। মুখে সে বড় বড় কথা বলে, সমাজতত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতা শুনতে যায়। কিন্তু আসলে মনের ময়লা তার দূর হয়নি। অন্ত্যজ-শ্রেণীর মানুষকে সে ঘৃণা করে। তাই স্নান করা—শুচি-শুভ্র কাপড় পরা একটা মানুষকেও সে তাদের গাড়ীতে উঠতে দিতে নারাজ; কারণ মানুষটার মস্ত দোষ যে সে জাতে মেথর!

আর অমিয়াও ঐ একই ধরণের। স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুখে তার দেশপ্রেমের বুলি, কিন্তু মনের মধ্যে তার কালি-ঝুলির আর অন্ত নেই। এমন কি, সামান্য একটা দাসীকেও সে হিংসে করে।

।। ছয় ।।

ওপরের চরিত্র-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকাশিত মোট চার শ্রেণীর নারী-রূপকেই তুলে ধরতে চেয়েছি। কিন্তু এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গল্পে কদাচিৎ বিচিত্র ধরণের নারী-চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। একজনের সম্বন্ধে আমরা দু-চার কথা বলতে চাই। যেমন 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী। সোহিনীকে নিয়ে এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বহু আলোচনা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সোহিনীর মধ্যে ভবিষ্যৎ নারীচরিত্রের রেখা-চিত্রের সন্ধান পেয়ে বলেছেন: "সোহিনী ভবিষ্যৎ নারীর পাশ হইতে দেখা মুখের চিত্র। কতকগুলি ইঙ্গিত-সংকেতের রেখায় ঈষৎ-আভাসিত। সম্পূর্ণ মণ্ডল ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত মুখাবয়ব এখানে ফুটিয়া উঠে নাই।" (৫) আর অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ঠিক এর বিপরীত ধারণা পোষণ করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে সোহিনীকে তিনি আকস্মিক বলে মনে করেন নি। অনিলা [পয়লা নম্বর] ও মৃণালকে [স্ত্রীর পত্র] তিনি সোহিনীর "অস্পষ্ট পূর্বাভাস ও অযোগ্য পূর্বসূরী" (৬) বলে ধরে নিয়ে সোহিনী-চরিত্রের দীর্ঘ পূর্ব-সূত্রের অনুসন্ধান করেছেন। সোহিনী-চরিত্রের পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে ইনি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু আমাদের মনে হয় সোহিনী কোন প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র নয়—কোন সাধারণ সত্যের প্রকাশ নয়—এ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র একটি চরিত্র। এ বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছে; সোহিনী একটি 'টাইপ ক্যারেক্টার'। সে জায়া নয়, জননী নয়, প্রচলিত অর্থে সতী রমণী-রূপেও তার দৃষ্টান্ত স্পৃহনীয় নয়—সোহিনীর মধ্য দিয়ে সোহিনীই ফুটে উঠেছে; অন্য কারো সঙ্গেই তার তুলনা চলে না। তার ব্যক্তিত্বটাই বড়—'ক্যারেক্টারে'র তেজে সে 'ঝকঝক' করছে। ঠিক এই ভাব রবীন্দ্রনাথের আর কোন চরিত্রে প্রকাশিত হয়নি। সোহিনীকে অনিলা ও মৃণালের মত ঘর ছাড়তে হয় নি—সে বাংলাদেশের মেয়ে নয়। তাই তার কোন সমাজ নেই। সোহিনীর মধ্য দিয়ে তার বিচ্ছিন্নতাই কেবল প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাকে 'রেভোলিউশনারী ক্যারেক্টার' করে গড়ে তোলেন নি। সে আইডিয়ালিস্টিক রিয়ালিস্ট। সব মিলিয়ে সোহিনী রবীন্দ্র-সাহিত্যে সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন চরিত্র—একটি অনন্য চরিত্র।

সুতরাং একথা বলতে কোন বাধা নেই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটো চোখ দিয়েই নারীকে দেখেছেন—তাকে বিচার করেছেন। পৃথিবীতে অবিমিশ্র ভালো বা খারাপ বলে কিছু নেই,—ভালো-মন্দ দুই নিয়েই জগৎ। রবীন্দ্রনাথও নারীকে বিশেষ একটা নির্দিষ্ট রূপের বৈচিত্র্য-হীনতায় আবদ্ধ করে সৃষ্টি করেন নি। বাস্তব অভিজ্ঞতা-লব্ধ জীবনদর্শনের নিরিখে নারীকে যতরূপে দেখা সম্ভব তিনি ততরূপেই দেখেছেন আর তারপর ছোটগল্পে নাটকে, উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রকাশ করেছেন। অন্তত তাঁর ছোটগল্পের নারী যে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতারই ফসল সে কথার বড় প্রমাণ কবির এই নিজের উক্তিটি: "আমি বলব, আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি, যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।" (৭) আর গল্পকার রবীন্দ্রনাথের আঁকা সব রকমের নারী-চরিত্রের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক-নিরপেক্ষ নারীর রূপ-অঙ্কনে এবং তার ব্যক্তি-চিত্তের উদ্বোধনেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সমধিক। এবং কবির দৃষ্টিতে আদর্শ নারী হোল সেই যার মধ্যে আলো-কালো একসঙ্গে মিশেছে—যার মনের মধ্যে 'উর্বশী' এবং 'লক্ষ্মী' একাসনে বসেছে—এবং যার মধ্যে বলিষ্ঠতা আছে, অথচ মাধুর্য নম্রতারও এতটুকু অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে এই আদর্শ নারীর সন্ধান খুব বেশি স্পষ্টভাবে না পাওয়া গেলেও বিভা [রবিবার] ও পরিণত মৃন্ময়ীর [সমাপ্তি] মধ্যে তার অস্পষ্ট আভাস মেলে। এ আলোচনা প্রসঙ্গান্তর সাপেক্ষ।

(৪) মেঘ ও রৌদ্র, গল্পগুচ্ছ

(৫) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।
(৬) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প।

(৭) র-রচনাবলী: ১৪, গ্রন্থ পরিচয়।

শোভন আচার্য

॥ লেখকের জীবন দর্শন ॥

॥ ২ ॥

কথাটা উঠেছিল সাহিত্যিকের জীবনদর্শন নিয়ে। সেদিনকার সাহিত্যের মেনুতে সেইটেই ছিল দামী খাদ্য। বন্ধু বটব্যাল জীবনদর্শন বস্তুটিকেই সিগ্রেটের ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিল। ওর বিজ্ঞ অভিমতে ওটা একটা বাজে কথা। জীবন এবং দর্শন নিয়েই সব সাহিত্যিকের কারবার। কাজেই কথাটির ভিন্ন মর্যাদা কোথায়। আমাদের উড়েপাড়া লেনের নীলমণিদা— তিন যুগের সাহিত্যিকদের দোসর এবং ভয়ংকর আড্ডাবাজ। বললেন, 'আছে ভাই আছে। জীবনদর্শন মানে জীবনও নয় দর্শন নয়, তার অতিরিক্ত কিছু। যার দ্বারা কোনো সাহিত্যিক-মানসকে জানা-যায়।' বলেই তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, পরে বললেন, 'বলো দেখি কার কবিতা?' আমরা সমস্বরে কোরাস গাইলাম : রবীন্দ্রনাথ। 'কি করে বুঝলে?' নীলমণিদার জিজ্ঞাসা। বললাম : 'শুনলেই বোঝা যায়।' নীলমণিদা বললেন : 'বাস পেয়ে গেছ।' কি পেয়ে গেছি জিগ্যেস করবার আগেই তিনি বললেন : 'রচনা পড়ামাত্র যার মুখ ফুটে ওঠে তিনিই লেখক এবং এই চিনতে পারার যন্ত্রই হচ্ছে তার জীবন-দর্শন। একে লেখকের ব্যক্তিত্বও বলতে পারো। কি জানো, সুগঠিত নারীর শরীরে যে আলগা শ্রী লেগে থাকে, যা রূপ নয়, সুষমা বলতে পারো, রচনা-শরীরের সঙ্গে জীবনদর্শনের সম্পর্কও ততখানি।' বললাম : 'আরো বিশদ করুন।' নীলমণিদা বললেন : 'বিশদ না করলে তোমরা নবীন যুবকেরা আজকে কিছুই বুঝতে পারো না। এইটে তোমাদের ট্রাজিডি।' বটব্যাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'স্রেফ বুদ্বুদ।' নীলমণিদা এক টিপ নস্য নিয়ে বললেন, 'তোমরা আজকের লেখকেরা কেবল কাহিনীকার, স্টোরিটেলার। যে যত নিপুণ গল্প বুনতে পারবে সে তত বড় লেখক। আরে, গল্পই যদি পড়তে হয় ঠাকুরমার ঝুলিই যথেষ্ট। পারো অমন দিব্য গল্প লেখতে! সার্থক জীবনায়ন কোথায়। কোথায় সেই তৃতীয় নয়ন, যার কাজ মনন। তোমরা খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছ, বাস্তব চরিত্রায়ন করবার ঝোঁকও দেখিয়েছ। ব্রাদার, জীবনকে যথাযথ দেখাই সাহিত্যের কাজ নয়। বাস্তবেও আমরা সব দেখি না। যাকে আমরা রিয়্যাল বলি তার অস্তিত্ব কোথাও নেই। ব্যাপারটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাই। জানালা দিয়ে যখন আকাশ দেখি তখন পুরো আকাশটা কি দেখতে পাই? দৃশ্যের বাইরের আকাশটাকে কল্পনা করে নিই। সাহিত্যিকের কাজ গোটা আকাশ দেখানো নয়। তার জন্যে চাই জানালা। দেখার জানালা। এই জানালাই হচ্ছে একেকজন সাহিত্যিকের দেখার কোণ। আমরা সকলেই একরকম করে দেখিনে। তুমি একরকম, আমি একরকম, সে একরকম। দেখার কায়দা এই রকমই। অর্থাৎ নিরপেক্ষ-বাস্তব বলে কিছু নেই। আমরা দেখি বলেই তা বাস্তব। আবার একেকজন একেক রকম করে দেখি বলে একেক রকম বাস্তব। কর্তিত টুকরো-টুকরো বাস্তব।' একটু দম নিয়ে নীলমণিদা আবার সরব হলেন : 'আমি-তুমি-সে এক-একটি ঘটনায় একেক রকম প্রতিক্রিয়ায় ভুগি এবং এই প্রতিক্রিয়ার শেকড়ে রয়েছে জীবনদর্শন। অভিজ্ঞতা জীবনদর্শনকে বর্ধন করে। লেখকের বংশগতি, পরিবেশ এবং শিল্প তাঁর সহায়ক।' বটব্যাল নাকউঁচু ঢঙে বললে, 'দাদাকে আজ মৌতাতে পেয়েছে।' নীলমণিদা বলে চললেন : 'প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ লেখকেরই একটি জীবনদর্শন আছে। যা তাঁর রচনায় সৌন্দর্যের মতো পরিস্ফুট। রবীন্দ্রসাহিত্যে দেশকালপাত্র নির্বিশেষে উদার স্বাধীন মানবতার জয়গান। এইটিই তাঁর জীবনদর্শন, তাঁর ব্যক্তিত্ব। জীবনদর্শন ব্যতিরেকে লেখক হওয়া যায় না, গল্প-কার হওয়া চলে। তোমরা আজকের দিনের লেখকরা তাই। আবার ইদানীং ফ্যাশন হয়েছে ধার-করা জীবনদর্শন বহন করে আনা। অস্তিত্ব-বাদ এমনি একটি বস্তু। এই সমস্ত বাঁধা দর্শনের অসুবিধে এই যে লেখকের বিশেষ ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করে। মনে হয় সে একটি বিশেষ দর্শনের দাস মাত্র। ফ্রয়েডবাদ মার্ক্সবাদ এককালে লেখকদের এইভাবে খর্ব করেছে। তার কারণ কি জানো? লেখকরা এ দুটিকে তত্ত্ব বলে ভুল করেছে, আসলে এগুলি জীবন-দেখার কৌশল মাত্র। ফ্রয়েড-দর্শন যৌনতাকেই জীবনের সব কিছু মনে করে না, মার্ক্সবাদও অর্থনীতিকে সব ব্যাপারে কাজে লাগায়নি। অথচ কখনো যৌনতা কখনো অর্থনীতি মানবকে আবিষ্কার করার যান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসল কথা, সব লেখককেই নিজস্ব আলোকে জীবন দেখতে হবে, এবং দেখতে-দেখতেই অভিজ্ঞতার পায়ে পায়ে তার দর্শন গড়ে উঠবে। সে-দর্শন ফ্রয়েডবাদও হতে পারে, মার্ক্সবাদও হতে পারে, অস্তিত্ববাদও হতে পারে, আবার কোনো নতুন দর্শনও গড়ে উঠতে পারে। সংসারে দেখা শেষ হয়ে যায়নি, দেখার কায়দাও নয়, বিশিষ্ট হতে হলে নিজের দর্পণ চাই, চাই ব্যক্তিত্ব। শেষকথা জীবন-দর্শন ছাড়া জীবনের কারুকর্মী হওয়া যায় না।' নীলমণিদা সেদিনকার মতো আসরে ভঙ্গ দিলেন।
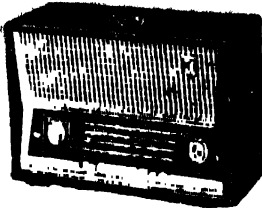
কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩২)

বেশ কয়েক দিন কেটে গেল।

সাধুজি চলে যাবার পর থেকে এ বাড়ী আবার ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। দর্শনার্থীর ভিড় নেই, সন্ধ্যেবেলা নাম-গান হয় না। বড় বড় ঘরগুলো আগের মত খালি পড়ে আছে।

কিন্তু তাই বলে ঘরগুলো অন্ধকারে পড়ে থাকে না। সাধুজি যাবার সময় থেকে এ পরিবর্তন এসেছে। দিনের বেলা দরজা জানালা খোলা হয়, সন্ধ্যের পর আলো জ্বলে। ঘরে ঘরে কাজ হচ্ছে। কাঠের মিস্ত্রীরা তৈরী করছে বাচ্চাদের চেয়ার, ডেস্ক, শিক্ষকদের টেবিল। আর এক ঘরে কিনে এনে জড় করা হচ্ছে, বাচ্চাদের মনভোলানো খেলনা, যা খেলতে খেলতে তারা সংখ্যা গুনতে শিখবে, চিনতে শিখবে ইংরেজী, বাংলা বর্ণমালা। এ ঘরের দায়িত্ব নিয়েছেন ব্রজবালা দেবী স্বয়ং, আমি অবশ্য তাঁর কাজে সাহায্য করি।

ভদ্রমহিলাকে যত দেখছি আমার আশ্চর্য লাগছে। প্রথম যখন এ বাড়ীতে আসি শুয়ে থাকতে দেখি ওঁর ঘরে, তখন মনে হয়েছিল জীবনের বেচাকেনা সর্বস্ব খুইয়ে উনি পরপারের খেয়া নৌকার জন্যে দিন গুনছেন। একথা ঠিক মরতে কেউ চায় না, জানি বাঁচার আনন্দে মৃত্যুকে আমরা ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু এমনও দুর্ভাগা আছে বেঁচে থাকা যার কাছে যন্ত্রণা, মৃত্যু এসে তাকে মুক্তি দেয়, কেন জানি না, ব্রজবালা দেবীকে আমার ঐরকমই একজন দুর্ভাগিনী মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল দম ওঁর ফুরিয়ে এসেছে, জল থেকে তুলে নেওয়া মাছের মত ছটফট করছেন।

কিন্তু এই শেষের ক'দিন তাঁকে দেখে আমার ধারণা বদলাতে বাধ্য হয়েছি। যে নদীর ধারা শুকিয়ে গিয়েছিল তা যেন বর্ষার জল পেয়ে নতুন উদ্যমে চলতে শুরু করেছে, পুষ্পপত্রহীন যে গাছের শুকনো শাখা দেখেছিলাম, প্রকৃতির যাদুকাঠীর স্পর্শে সেই শাখাই পত্রশ্যাম পুষ্পোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি তাই সবিস্ময়ে ব্রজবালা দেবীর এই নতুন কর্মজীবন লক্ষ্য করি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত স্কুল ছাড়া অন্য কোন চিন্তা নেই, হয় নীচের অফিসে বসে আছেন, দলে দলে অভিভাবকরা আসছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, নয়ত বেরুচ্ছেন সরকারী দপ্তরে উর্ধতন কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। দুপুরবেলা আমি ওঁর হয়ে চিঠি লিখি, প্রতিদিন অন্তত খান-কুড়ি হবে। আজকাল স্কুলের জন্যে একজন নতুন লোক নেওয়া হয়েছে, সে ইংরেজী চিঠিগুলো টাইপ করে দেয়।

আমি ব্রজবালা দেবীকে সাবধান করে বলেছি, বড় বেশী খাটছেন। দেখবেন, শরীর না খারাপ হয়।

উনি হেসে উত্তর দিয়েছেন, এত দিন কুঁড়ের মত বসেছিলাম, সন্ধ্যে তো ঘনিয়ে আসছে দেখি মা একটু কাজ করে।

—আপনার বয়েসে বোধ হয় আমরা এত খাটতে পারব না।

—পারবে বৈকি মা, তবে কাজটা যদি মনের মত হয়। বাচ্চাদের স্কুলের জন্যেই বোধ হয় কাজ করে এত আনন্দ পাই। শিক্ষা দিতে গেলে ঐ শিশু বয়েস থেকেই দিতে হয়। বয়েস হয়ে যাবার পর তুমি যাই পড়াও না কেন, সে শুধু পাখী পড়ার মত শিখবে, দাঁড়ে বসে সেইগুলোই কপচাবে। কিন্তু মনের ভেতরে আর রসটা নিতে পারবে না। এ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

ব্রজবালা দেবী চুপ করে গেলেন, বোধ হয় ডুব দিলেন অতীতের রাজ্যে। মৃদুস্বরে বললেন, এ ধরনের স্কুল ছিল না বলেই শম্ভুকে আমি মানুষ করতে পারিনি। সে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তুবড়ীকে তো দেখছ মা, কি রকম বেয়াড়া ধরনের ছেলে, অথচ তোমার কাছ থেকে ভালবাসা পেয়ে সে ক্রমশঃ যেন মানুষ হয়ে উঠছে। লেখাপড়া করছে।

—আপনি কি করে জানলেন?

—সব দিকেই আমার নজর আছে অর্পিতা, সেদিন রাত্রে ওর ঘরে গিয়েছিলাম, ঢুকেছিলাম আলো জ্বলছে দেখতে পেয়ে। তুবড়ী তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, বুকের উপর খোলা রয়েছে একখানা ইংরিজী বই। পাশে ডিকসিনারী, আমার কৌতূহল জাগল, ওর টেবিলের উপর রাখা জিনিসপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখলাম। কত রকম বই, মেকানো দিয়ে কী তৈরী করেছে,

অথচ আগে এ টেবিলে খেলনার জিনিস-পত্রে ভর্তি থাকত, জামার পকেট হাতড়ালে পাওয়া যেত বাজী, পটকা, তুবড়ী, যে জন্যে ঐ নামকরণ হয়েছিল।

বললাম, সত্যিই তুবড়ী বদলে গেছে, গগন সেনকে জিজ্ঞেস করলে আরও জানতে পারবেন, জানবার ইচ্ছে ওর প্রবল।

বৃদ্ধা ছোট্ট উত্তর দিলেন, গগনও তুবড়ীকে ভালবাসে, আগে তুবড়ী আমার কাছে আসত না, ভয় পেত, এখন কিন্তু রোজই আসে, গল্প করতে চায়, আমাকে সাহায্য করে। এ পরিবর্তন কি সম্ভব হত, তুমি তাকে ভালবেসে শিক্ষা দিতে শুরু না করলে। তাই ত এই শিশু-ভারতী নিয়ে এত মেতে উঠেছি। যদি সত্যিই একটা ভাল স্কুল গড়ে ওঠে, এ অঞ্চলের একটা অভাব ঘুচবে। কত ছেলে এখানে মানুষ হবে, এখন এই আমার স্বপ্ন।

বললাম, গগন সেনও ঠিক এই স্বপ্ন দেখে।

ব্রজবালা দেবী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার ঐ জায়গাটায় খুব মিল আছে।

মাত্র ক' মাস আমি এখানে কাজ করছি। এই অল্পসময়ের মধ্যে ব্রজবালা দেবীর ভেতর কত পরিবর্তন দেখলাম। তিনি যেন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বেঁচে থাকার নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। তাই চোখে-মুখে চিরনতুন উদ্দীপনা। মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শরীরকেও ছুটতে হচ্ছে। কিন্তু বয়েসের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সে পেরে ওঠে না, মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে পড়ে। কিন্তু বুঝতে পারি এ ক্লান্তির মধ্যেও আনন্দ আছে। সারাদিন তাঁর সঙ্গে কাজ করে তাঁকে অত্যন্ত কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। ক্রমশঃ তাঁর প্রতি ভালবাসা আমার গভীর হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতে শিখছি।

ইতিমধ্যে আমি একদিনের জন্যে কলকাতায় গিয়েছিলাম। সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসি। রাত্রে সেখানে থাকিনি, থাকার প্রয়োজন বোধ করিনি বলেই বোধ হয়। মেজদির খাটটা ইচ্ছে করেই সেজদা খুলে রেখেছে। ঐ জায়গায় পাতা হয়েছে বাচ্চাদের পড়বার টেবিল আর চেয়ার। প্রথমটা ঘরে ঢুকে আমি চমকে উঠেছিলাম। এ ঘরের সঙ্গে ঐ খাট আর মেজদি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। মেজদি নেই জানতাম, কিন্তু খাটটাও থাকবে না ভাবিনি। পরে অবশ্য মনে হল সেজদা ঠিকই করেছে। স্মৃতির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে পড়ে থেকে কি লাভ? তবু জায়গাটা ব্যবহার হবে, একখানা ঘর যখন খালিই পাওয়া গেছে বাচ্চাগুলো কেন আর শোবার ঘরে গোঁতাগুঁতি করবে। আস্তে আস্তে ওরা বড় হচ্ছে, পড়ার জন্যে, খেলার জন্যে আর একখানা ঘর তো দরকারই। যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝালাম, কিন্তু এমনই অবুঝ সে মন, যতবার ঐ ঘরে ঢুকতে গেছি, খাটের অভাব অনুভব করেছি ততই। কেন জানি না মনে হল এই ক'দিনের মধ্যে মেজদিকে আমরা মুছে ফেললাম এই বাড়ী থেকে। ক্রমে একদিন মনের মধ্যেও তাকে খুঁজে পাব না। সে উধাও হয়ে যাবে ভাবতেই আমার চোখে জল এল।

বৌদি আমায় বলল, তোমায় দেখলেই ঠাকুরঝি মেজ'র জন্যে আমার বুকটা কেঁদে ওঠে।

কথাটা শুনলাম, কোন উত্তর দিতে পারলাম না। বেচারী হয়ত না বুঝেই বলেছে, কিন্তু কিরকম যেন নিষ্ঠুর শোনাল। আমি না এলে মেজদির কথা আর এদের মনেই থাকে না।

বৌদি আমার জন্যে যত্ন করে মাছ-মাংস রেঁধেছিল, কিন্তু আমি ভাল করে খেতে পারিনি। খিদে ছিল না।

বৌদি জিজ্ঞেস করল, রান্না ভাল হয়নি ঠাকুরঝি?

ওকে খুশী করার জন্যে বেশী করেই বললাম, খুউ-ব চমৎকার রেঁধেছ।

—কই কিছুই তো খেলে না।

—খিদে নেই বৌদি।

—শরীর ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ।

বৌদি বলল, আজ রাত্রে তোমার জন্যে ছানার ডালনা করব। তোমরা ভাই-বোনে ছানার ডালনা তো খুব ভালবাস।

বাধা দিয়ে বললাম, রাত্রে তো আমি থাকছি না, বিকেলের গাড়ীতে ফিরে যাব।

বৌদি ব্যথিত হল, সে কি? মাত্র এই ক'ঘন্টার জন্যে এখানে বেড়াতে এলে?

বললাম, কি করব বল, চাকরি করতে হয় তো? বললেই কি ছুটি পাওয়া যায়?

—না, না, তা হয় না ঠাকুরঝি। রাত্রিটা কাটিয়ে কাল সকালে যেও।

—ব্রজবালা দেবীকে বলে আসিনি, উনি চিন্তা করবেন।

আমি কিন্তু থাকব বলেই এসেছিলাম। এখানে এসে থাকতে ইচ্ছে করল না। মনে হল কাদের কাছে যেন বেড়াতে এসেছি। আমার ঘর-বাড়ী সব চুঁচুড়োয়। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। আমি সকলের অজান্তে এক সময় সিঁড়ির ঘরে গিয়ে চুপ করে বসলাম, ভাববার চেষ্টা করলাম এ কি করে সম্ভব হল। ক'দিন আগেও যে জায়গাটা শুধু আমার কর্মস্থল ছিল, কেমন করে তা নিজের বাড়ীতে রূপান্তরিত হল। আর কি করেই বা কলকাতার এই ফ্ল্যাট, যেখানে এতগুলো বছর আমি কাটিয়েছি তা মনে হচ্ছে নিতান্তই একটা বাসাবাড়ী, সেজদা বৌদি, তাদের ছেলেমেয়ে এদের মনে হচ্ছে বন্ধুজন, তার বেশী আর কিছু নয়।

পাপিয়া আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু তাকে মনে হল অনেক আড়ষ্ট। আগের মত সহজে আমার কাছে আসতে পারছে না। এই ক'দিনের অদর্শনে, আগের সে সম্পর্ক চলে গেছে। আমি তাকে কাছে ডাকলাম। পাশে বসালাম, আদর করলাম। পয়সা দিয়ে মুড়ি তেলেভাজা আনালাম, কিন্তু কিছুতেই আগের মত জমল না। মনে হল আমরা অভিনয় করছি। কথা বলছি, হাসছি, সবই ওপর-ওপর। সেখানে হৃদয়ের সাড়া নেই।

সেইজন্যেই আর কলকাতায় থাকতে ইচ্ছে করল না। ছোটবেলা থেকে মিথ্যেটাকে সহ্য করতে পারি না, যত বড় হচ্ছি আরোই যেন পারি না। যে সম্পর্ক মিথ্যে হয়ে যায়, তাকে সত্যি মনে করে কি করে মানুষ পথ চলে আমি বুঝতে পারি না। মিঃ দত্তর সঙ্গে ঝগড়া করে আমি চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলাম, বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলাম জীবনের উপর। কিন্তু অলকা আর আমার সম্পর্ক মিথ্যে হয়নি। আমি কলেজে থাকতে যে রকম তাকে ভালোবেসেছিলাম, আজও সেইরকমই ভালোবাসি। তার জন্মরহস্য আমি জেনেছি, জেনেছি মিঃ দত্তর কাছে পোষাপাখী হয়ে থাকার কাহিনী, জেনেছি প্রেমের জীবনে তার প্রতারিত হওয়ার কথা। কিন্তু তবু আমি তাকে ভালোবাসি। ভালোবাসি কারণ অলকা কখনও মিথ্যাকে মূলধন করেনি। সে সত্যের উপর পা রেখে দাঁড়াতে চেয়েছে, হয়ত পারেনি, জীবনযুদ্ধে হয়ত সে পরাজিত হবে, কিন্তু আমার ভালবাসা সে কোনদিন হারাবে না।

কানপুর থেকে আমি অলকার চিঠি পেয়েছি, সে সেখানে মন দিয়ে কাজ করছে। আমার দেওয়া লকেটটি পেয়ে সে খুশী হয়েছে, লিখেছে সারাক্ষণই পরে থাকে, আর হাত দিয়ে সেটি

স্পর্শ করলেই আমার কথা তার মনে পড়ে। জিজ্ঞেস করেছে, ওর ঘড়িটা আমি ব্যবহার করছি কিনা। ঘড়ির দিকে তাকালে ওর কথা আমার মনে পড়ে কিনা।

অলকার চিঠি পড়ে আমি হেসেছি, বেচারী এখনও ছেলেমানুষ! আগে আমার মনে হত অলকা খুব প্র্যাকটিকাল মেয়ে, এখন বুঝেছি সবটাই ওর সেণ্টিমেণ্টে ভরা। সেইজন্যেই বোধহয় পুরুষেরা এত সহজে ওর উপর সুযোগ নিয়েছে।

আমি ওকে চিঠিতে জানিয়েছি ভারতের দু'প্রান্তে আমরা দু'রকম কাজ নিয়ে মেতে আছি। বেশ কিছুদিন পরে কোন এক ছুটিতে কলকাতায় বা দিল্লীতে যখন আমরা মিলব আবার আগের মত হৈ হৈ করা যাবে।

চিঠি লিখলাম বটে কিন্তু মনে হল সত্যিই যদি কয়েক মাস বাদে আমাদের দেখা হয় আর কি সেই আগের দিন

ফিরে আসবে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যে বদলে যাচ্ছি। এখন আর বাজে গল্প করে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না। কাজ ছাড়া পড়তে ইচ্ছে করে ভাল বই, শুনতে ইচ্ছে করে জ্ঞানের কথা। সেইজন্যে হয় আমি ব্রজবালা দেবীর সঙ্গে কাজ করি না হয় লাইব্রেরী-ঘরে বসে পড়ি। অথবা আলোচনা করি গগন সেনের সঙ্গে। যা জানি না তাই জানতে চাই ওর কাছ থেকে। মানুষটার পড়াশুনো প্রচুর। শুধু তাই নয় পড়াতে সে জানে, বোঝাতে সে পারে।

নিজের জীবন দিয়ে বুঝতে পারছি প্রকৃত আলাপ হবার আগে পর্যন্ত একজন মানুষের কতটুকু আমরা জানতে পারি। মিঃ দত্তর বাড়ীতে যে গগন সেনকে আমি দেখেছিলাম, তাকে আমার মনে হয়েছিল মামুলী পয়সাওয়ালা শ্রেণীর একজন মানুষ, মেয়েদের নিয়ে খেলা করতে সে ভালবাসে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে আমার মিশতে হয়েছিল, নেহাতই একটা চাকরি পাবার আশায়। অথচ সেই গগন সেনকে যখন আরও বেশী দেখলাম, খানিকটা চিনলাম, মনে হল সে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের মানুষ, বুঝলাম ঐ লোকটার মধ্যেও ফাঁকি নেই, সেও আমার মত মিথ্যেকে এড়িয়ে চলতে চায়। চায় বলেই আর পাঁচটা মানুষের মত সমাজের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যেই লোকে ওদের ভুল বোঝে। আমিও ভুল বুঝেছিলাম।

অনেকদিন পরে খাওয়া-দাওয়ার পর আজ দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আজকাল বড়একটা শুই না, নীচে বসে কাজ করি। কিন্তু আজ ব্রজবালা দেবী আর গগন সেন দুপুরে থেকে বেরিয়ে গেছেন, সরকারী অফিসে কারুর সঙ্গে দেখা করতে। বলে গেছেন ফিরতে দেরী হবে।

হাতে কাজ ছিল না, ভাবলাম বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ি। তুবড়ীকে দু' একবার ডাকাডাকি করলাম, সেও বুঝি কোথায় বেরিয়েছে। ঘুমবার ইচ্ছে আমার ছিল না, ঠিক করেছিলাম কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ব। কিন্তু দুপুরে ঘুমবার অভ্যেস থাকলে তা কাটিয়ে ওঠা মুস্কিল। একেবারে বিছানার দিকে না গেলে হয়ত জেগে থাকা যায়। কিন্তু একবার শুলে চোখের পাতা খুলে রাখা অসম্ভব।

আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙ্গল প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে বাইরের আকাশে তখনও আলো রয়েছে কিন্তু ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। শীতের বিকেল তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ঘুমের মধ্যেই কখন পায়ের কাছে রাখা চাদরটা টেনে নিয়েছিলাম। বেশ করে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে আরাম লেগেছে। উঠতে ইচ্ছে করল না। একবার ঘাড় উঁচু করে দেখলাম, ব্রজবালা দেবীর ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে কোন আলো দেখা যাচ্ছে কিনা। না, অন্ধকার। মনে হয় এখনও উনি ফেরেননি। আর একটু শুয়ে থাকি, কিছুক্ষণ বাদে উঠব। মুখ ধুতে হবে, চুল বাঁধতে হবে, শাড়ীটাও বদলান দরকার। অনেক কাজ। ততক্ষণ আর একটু গড়িয়ে নিই, কুড়েমি করি, প্রথম শীতের আমেজ, বেশ লাগছে উপভোগ করতে।

কে যেন দরজায় টোকা মারল।

নিশ্চয় তুবড়ী, জিজ্ঞেস করলাম, কে?

কোন উত্তর নেই।

আবার দরজায় টোকা পড়ল।

বুঝলাম তুবড়ী আমার সঙ্গে রসিকতা করছে, বললাম, তুমি যেই হও ভেতরে এস।

লঘু পদশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল, জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে না বলেকয়ে দুপুরবেলা কোথায় পালিয়েছিলে?

তুবড়ী তখনও নিরুত্তর।

বললাম, দাঁড়াও না দিদিমণিকে চিঠি লিখে দেব, তখন তুমি জব্দ হবে।

—দিদিমণি আমার কিছু করতে পারবে না।

গলার স্বর শুনে আমি চমকে উঠে বসলাম, এ ত তুবড়ী নয়, গগন সেন। আমার খাটের কাছে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমি লজ্জিত স্বরে বললাম, ও মা, তুমি? আমি ভেবেছিলাম।

—কি ভেবেছিলে জানি। যেই আমরা বেরিয়েছি, অমনি ঘুমিয়ে নেওয়া হল তো, একেবারে কুড়ের বেগম।

—কখন ফিরলে তোমরা? আমি খাট থেকে উঠতে যাচ্ছিলাম। গগন সেন বারণ করল, উঠো না, বোস।

ফিরে তাকালাম, কেন?

—তোমায় দেখছি। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। অন্য সময় তো সেজেগুজে থাক, এই রূপ তো দেখতে পাওয়া যায় না।

লজ্জায় আমার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল, আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

গগন সেন জিজ্ঞেস করল, কই আমায় বসতে বললে না?

আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল, ভয়ে ভয়ে বললাম, বোস।

গগন সেন আমার পাশে এসে বসল, ফিরে না তাকালেও বুঝতে পারছি সে একদৃষ্টে আমাকে লক্ষ্য করছে। তার বলিষ্ঠ ডান হাত দিয়ে আমাকে সে কাছে টেনে নিল। তার এলোমেলো কথা আমার কানে আসছে, অর্পিতা, তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ, নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমার জীবন কেটেছে। বই-এর মধ্যে দিয়ে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনদিন বুঝতে পারিনি একটি নারীর এতখানি আকর্ষণ থাকতে পারে। ভাবতাম সঙ্গিনী হিসেবে নারীকে পেতে ভাল লাগে, আর টাকা দিলেই তা পাওয়া যায়। কিন্তু তুমি আমার সমস্ত ধারণা বদলে দিয়েছ। তোমার ঐ চুলের যে সৌন্দর্য আমি দেখেছি, ঐ কালো হরিণ চোখে যে ভাষা আমি পড়েছি। অব্যক্ত মনের যে শান্ত পরশ আমি পেয়েছি তার তো কোন তুলনা আমি ভাষায় খুঁজে পাচ্ছি না। তাই তো তুমি অনন্যা।

গগন সেনের কথাগুলো আমার মনের উপর এক অদ্ভুত মোহ বিস্তার করল। তার চোখের দিকে আমি ফিরে তাকালাম। তার কোমল আহ্বানে আমি সাড়া দিলাম।

সে আমাকে আদর করল।

মনে হল কে আমার শরীরে সোনার কাঠি বুলিয়ে দিল, যে রাজকুমারী ঘুমিয়ে ছিল আমার মধ্যে যাদুকাঠির স্পর্শে সে আজ হাসিমুখে জেগে উঠল। যৌবনের প্রথম উন্মেষে এই রাজকুমারীকে আমি দেখেছিলাম, ক্ষণে ক্ষণে চকিত মুহূর্তে সে আমার মধ্যে বেরিয়ে আসত, মাত্র কয়েক মাস কিম্বা কয়েক বছর তাকে নিয়ে মহা-আনন্দে আমার দিন কেটেছে। কিন্তু সংসারের অত্যাচার, পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি, সে সহ্য করতে পারেনি। আমি ভেবেছিলাম সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু আজ গগন সেনের সোনার কাঠির স্পর্শে বুঝতে পারলাম, সে আমার মধ্যেই ঘুমিয়ে ছিল। সে চোখ মেলে যাকে দেখল এ সেই, চিরকেলে অচিনপুরের রাজকুমার, যার জন্যে সে এতদিন শবরীর মত প্রতীক্ষা করেছে।

(ক্রমশঃ)

অমরেন্দ্র দাস

একটু অবাক লাগে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আবার আলোচনা কেন? নিজেদের কেউ মরলে দাহ করবার জন্যে ওখানে তো যেতেই হয়। কাটাতে হয় কয়েক ঘণ্টা, তারপর ফিরে এলে আর কিছু মনে থাকে না। মনে থাকে না শবদাহের স্থানটিকে, কিন্তু মনে থাকে পরিজনের কান্নার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সেই মানুষটিকে। মানুষটিকে কতবার দেখেছি, কতবার কথা বলেছি, তারই একটি হিসাব মনের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। তারপর একদিন সব স্তব্ধ।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থানটিও যেমন মনে থাকে না, মনে থাকে না সেখানে আমি কোনদিন গিয়েছিলুম, কিম্বা কোনদিন আবার যাবার প্রয়োজন হবে।

সেদিন তাই একটু অবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ নিজের কোন প্রিয়জন-বিয়োগ না হতেই চলে এসেছি। পাড়ায় একটি শবদাহ দল ছিল, সেই দলটি সমস্ত পাড়ার মানুষগুলোকে দাহ করবার জন্যে তৈরি। তাদের সঙ্গেই কেমন করে জানি, বেমক্কা চলে এসেছি। তবে কি মরবার আগেই চিতায় ওঠবার পরিকল্পনা মাথার মধ্যে জেগেছে? কিন্তু সে চিন্তার চেয়ে নিমতলার ঘাটে দাঁড়িয়েই তিনটি চিতার অগ্নিলোলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে মনে জাগলো—আমিও একদিন এই চিতায় শুয়ে ঐ বীভৎস আগুনে দগ্ধ হব? আমার এই বুদ্ধিতে গজগজে মাথাটি কে এক অর্বাচীন ডোম চ্যালা কাঠের বাড়ি দিয়ে মেরে মেরে ভেঙে দেবে। আর আমি আমার একান্ত নিকট-পরিজনদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখবো। তারা হয়ত আমার বিহনে রোদন করবে কিন্তু তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে জ্বালা অনুভব করবো।

শুনেছি মানুষ মরে গেলে সব অপরাধের মুক্তি পায়। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, মানুষের দেহের শেষচিহ্ন লীন হবার সময় এই স্থানটিতে এলে। এই নিমতলা ঘাটেরই কথা বলি। এ ঘাটে কত মনীষীর সমাধি দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীতে যিনি অমর, বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ এখানেই শুয়ে আছেন। কেওড়াতলা শ্মশানের পাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন নিশ্চয়, মাথা উঁচু করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সমাধি-স্তম্ভ তাঁর স্মৃতি সগর্বে ঘোষণা করছে। এই সব স্থানেই আছে হারিয়ে যাওয়া মানুষের উপস্থিতি, এরই মাটিতে আছে কত মনীষীর চিহ্ন।

কখনও শ্মশানের চুল্লি নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে না। মানুষের মৃত্যুরও কখনও শেষ নেই। তাই নিমতলা ঘাটের অফিসের সর্বদা কর্মচাঞ্চল্য। অথচ এই স্থানটি নির্মাণের পূর্বে বহু আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮২৬ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৮২৮ সালের ২২শে মার্চ পর্যন্ত সংবাদপত্র তার প্রমাণ। সব কিছু নির্মাণের পূর্বে একটি আন্দোলন। সে ভাল বা মন্দ হোক্। তাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত স্থানের জন্য আন্দোলন হয়েছিল, এতে আর অবাক হবার কিছু নেই। উদ্ধৃতটুকু লক্ষ্য করুন :—

“......শবদাহ বিষয়ে চন্দ্রিকা ও আর ২ বাঙ্গলা কাগজে এত পত্র প্রকাশ হইয়াছে যে তদ্বিষয়ে ক্লেশের বর্ণনা বা তন্নিবারণার্থে কোন উপায় দেখান প্রায় বাকী নাই কিন্তু সকলের মৃত্যু এককালে হয় না প্রতিদিন কেহ না কেহ মরে যে মরে তাহারি পরিবার বা যে ঐ শব লইয়া দাহ করিতে যায় তাহারা তৎকালে ক্লেশের বিবেচনা করে কিন্তু পরে বিস্মৃত হইয়া থাকে এই প্রকারে এ শহরবাসি হিন্দুলোক সকলেই এক ২ বার দায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন ও হইতেছেন বা হইবেন বিশেষতো যাঁহারা বর্ষাকালে মরেন তাঁহারদিগের পরিবারেরা বিশেষরূপে ক্লেশ বোধ করিতে পারেন এ শহরে হিন্দু লোক দুই লক্ষ হইতে পারে প্রতি মাসে আন্দাজ তিনশত লোক মরিয়া থাকে কাশি মিত্রের ঘাটে গড়ে ১০ দশ জনের দাহ হয় কোন ২ সময়ে প্রতিদিন ২০ কুড়ি ২৫ পঁচিশ জন মরে আর ওলাউঠা হইলে ইহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ মরিয়া থাকে শবদাহ স্থানের পরিমাণ আন্দাজ লম্বা ৪০ হাত চৌড়া ১৬ হাত জোয়ার হইলে ইহারো অল্পতা হয় গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইতেছে কিছু দিনের মধ্যে ইহাও জলমগ্ন হইবে ভাটা না পড়িলে দাহকর্ম্ম হইবেক না জোয়ার কালে মৃত শরীর আসিয়া জমা হইবেক ভাটার অপেক্ষায় সে স্থলে অনাবৃত স্থানে কেহ ৬ কেহ বা ১২।১৮ ঘড়ী বসিয়া থাকিবে ভাটা পড়িলে উন্নত বড় ধনি মরা ঐ অল্প স্থানে রাজা হইবেন অর্থাৎ তাঁহারা অগ্রেই স্থান পাইবেন অভাগায় অভাগারা অপেক্ষা করিবেক।”

এর পর ১৮২৭ সালের ২৭শে জানুয়ারী ও ১৮২৮ সালের ২২শে মার্চ তারিখের দুটি সংবাদ লক্ষ্য করবার মত। “আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আমারদিগের অনির্ব্বচনীয় যে ক্লেশ আছে তাহা নিবারণার্থে কোন ২ মহানুভব মহাশয়েরদিগের চেষ্টা দ্বারা উপযুক্ত উপায় হওনোদ্যোগ হইয়াছে শুনিলাম যে নিমতলা হইতে বাগবাজার পর্যন্ত তিনটা শবদাহের নিমিত্তে স্থান হইবেক তাহা সম্পন্নার্থে এই শহরের ভাগ্যবান লোকেরদিগের মধ্যে একটা চান্দা হইয়াছে।......”

“অবগত হওয়া গেল যে মোং নিমতলার ঘাটে যে অন্ত্যোষ্টি ক্রিয়ার স্থান নির্ম্মাণ হইতেছিল তাহা এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ গত সোমবার অবধি ঐ স্থানে শবের সৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে অনেকের পরিশ্রম দূর হইয়াছে।”—তিং নাং

তাহলে দেখা যাচ্ছে নিমতলা ঘাটের শ্মশানক্ষেত্রের স্থান নির্দিষ্ট হয় ১৮২৮ সাল থেকে। অবশ্য এর বহু পূর্বে থেকে কাশী মিত্রের ঘাটের উৎপত্তি। ঢাকার নায়েব রাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয় এই কাশী মিত্র। ১৭৭৪ সাল থেকে কাশী মিত্রের নামে এই শ্মশানক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই শ্মশানক্ষেত্রের রেজিষ্টার হইতে দেখা যায়, ১৯১৩—১৪ সালের মধ্যে ৪,৭১৬টি শবদাহ করা হয়েছে। অবশ্য ঐ একই সালে নিমতলা ঘাটে ১০,৩৪৪টি শবদাহ হয়েছিল। নিমতলা ঘাট শ্মশানক্ষেত্র সেদিনের চেয়ে বর্তমানে আরো প্রসার লাভ করেছে। তবে তার জন্ম থেকে বহু সংস্কারের পর বর্তমানের এই রূপ। ১৮৫৭ সালে

তার নতুন ব্যবস্থা লক্ষ্য করুন। কর্পো-রেশনের কমিশনাররা ৬১৮০ টাকা ব্যয় করে এই ঘাটের আমূল পরিবর্তন করেন। বাবু রামনারায়ণ দত্ত তার মধ্যে ২৫০০ টাকা কমিশনারদের হাতে অর্পণ করেন।

এই অঞ্চলের তিনটি স্থানকে ঘিরে এই শ্মশানক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল। তিনটি পার্শ্বে পনেরো ফুটের সমান উঁচু দেয়াল দিয়ে গঙ্গার দিকের অংশটি খোলা রাখা হয়েছিল। প্রতিটি স্থানের অংশ ছিল দৈর্ঘ্য×প্রস্থ= ১৬০×৯০।

আরও বারবার অনেক পরিবর্তন হয়েছিল, তার মধ্যে ১৮৬৮ সালে ডোমেদের থাকবার জন্যে কতকগুলি নতুন ঘর হয় ও গঙ্গার দিকে নতুন দেয়াল দেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ১৮৭৫ সালে পোর্ট কমিশনাররা জানান যে, এই শ্মশানঘাট থাকার জন্যে তাঁদের কাজকর্মের বড় অসুবিধা হচ্ছে। যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। সেইজন্যে এক বছরের মধ্যে পোর্ট কমিশনারদের চেষ্টাতে একটি সম্পূর্ণ নতুন শ্মশানঘাট প্রস্তুত হয় এবং পূর্বের ঘাট সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়। এই নতুন ঘাটটি প্রস্তুত করতে কনট্রাক দেওয়া হয়েছিল, মেসার্স ম্যাকিনতোষ (Messers Mackintosh), বার্ণ এণ্ড কোং (Burn & Co.)কে। ব্যয়ভার পড়েছিল মোট ৩০,০০০ হাজার টাকা। তারমধ্যে পোর্ট কমিশনাররা ২৫,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। এই ঘাট এর-পর বহুবার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে। তার ব্যয় পড়েছিল ১৭০০০ টাকা। বাৎসরিক হিসাব দাখিল করলে দাঁড়ায়—১৮৯১—৯২ সালে ৪৫৮২ টাকা; ১৮৯২—৯৩ সালে ১৮৯৪ টাকা; ১৮৯৪—৯৫ সালে ১৭০০ টাকা; ১৯০৫—৬ সালে ৫১৪৪ টাকা; ১৯১২—১৩ সালে ২৩৭৯ টাকা; ১৯১৩—১৪ সালে ২০৭৯ টাকা।

আজকের এই শ্মশানক্ষেত্রটির কোন অভাব নেই। এক বিঘা জায়গার ওপর একটি বৃহৎ শ্মশানক্ষেত্র কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ হয়ে গেছে শুধু, যে সব মহাত্মারা এখানে দেহরক্ষা করেছেন তাঁদের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার জন্যে। এখন এখানে এলে বহু মনীষীর বিলীয়মান স্মৃতি মাটির স্পর্শের মধ্যে আবার জেগে ওঠে।

শ্মশানক্ষেত্র কখনও নিঃসঙ্গ থাকে না তাই নিমতলার ঘাটেও লোকের শেষ নেই। সারাদিন থেকে সারারাত্রি। চোখে যদি কখনও ঝিমুনি আসে, ওমনি আচমকা ঘুম ভেঙে যাবে 'বল হরি হরিবোল' স্বর শুনে। এ স্বরের মধ্যে কি আছে জানি না—কিন্তু প্রাণের অন্তঃস্থলে আচমকা কিসের যেন সজাগ চমকানির ধাক্কা লাগে। এখানে একটি অফিস আছে, সে অফিস কখনও বন্ধ হয় না। সেখানে সর্বদা কাজ। কাজ আর কাজ। অবিরাম গতি তার। সেখানে সর্বদা ভিড় আছে শবদাহযাত্রীদের। তাদের কোমরে গামছা হাতে প্যাকাটির বাণ্ডিল চোখেমুখে মৃতের জন্যে কাতরতা। এই দৃশ্য এখানে সর্বত্র। তবে পাড়ার শবদাহদলেরা এলে একটু অন্য কোলাহল। কিংবা কোন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা দেহত্যাগ করেছে। খুব একটা শোকের ছায়া কারো মুখে চোখে ফুটে ওঠে না। তবে মাঝে মাঝে নারীকন্ঠের চীৎকারে স্তব্ধক্ষেত্র যেন আচমকা কেঁপে কেঁপে ওঠে। আর দেখা যায় ধোঁয়ার কুন্ডলী। একসঙ্গে অনেকগুলি চুল্লি জ্বলে উঠলে মনে হয় বুঝি এ শ্মশান-ক্ষেত্র ধ্বংসের মুখে পড়ে শেষ হবার মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে।

মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাটি হয় মৃত-দেহের জামাকাপড় ও তার খাটের শয্যাবস্তু নিয়ে। ডোমেদেরই প্রাপ্য, ডোমেরাই নেয়। কলহ যেটা হয় সেটা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে বড় বেশী সীমা ছাড়িয়ে যায়।

বিচিত্র মনে হয় সবকিছু। মানুষের মাংস পোড়া গন্ধ। সে গন্ধে মাঝে মাঝে বমনোদ্রেগ হয়। আর কান্না। বিচিত্র স্বরে ও সুরে বিচিত্র কথার যোজনায় বহু রমণীর কন্ঠের শব্দ শোনা যায়। কার অল্পদিন বিবাহ হয়েছে, সে ভাগ্য-হীনা হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, জোরে কাঁদতে পারছে না—লজ্জায়। এখনও তার লজ্জা দেখে আশ্চর্যই মনে হয়। আশ্চর্য মনে হয় যে রমণীটি স্বামীবিহনে পরিত্রাহি চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে বিচিত্র ছন্দসুরে কবিতার কলকাকলি—'ওগো আমার কি হলো গো'?

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এখানে পুড়েছে, পুড়ছে আরও পুড়বে। হয়ত একদিন দেখা যাবে সংখ্যাতীত হয়ে গেছে। কর্পো-রেশনের রেজিস্টার-বইতে আর জায়গা নেই আর খাতা বানানো যাচ্ছে না। যাচ্ছে না রাখা আর কোন হিসাব।...... যদি কখনও এমন দিন আসে। অবশ্য এসব উদ্ভট চিন্তা। এমনও তো হতে পারে—যে একদিন শ্মশানক্ষেত্র সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে সঙ্গী অভাবে গালে হাত দিয়ে কাঁদতে বসবে।

প্রতিদিন যত শবদাহ করা হয় তার সমস্ত ছাই আগে নৌকায় করে গঙ্গায় দেওয়া হত। দেওয়া হতো এইজন্যে যে, গঙ্গারই প্রাপ্য হিন্দুর ধার্মিক দেহের অবশিষ্ট। আজ অবশ্য অন্য ব্যবস্থা। আজ অনেক কিছুরই কড়াকড়ি, ডেথ সার্টিফিকেট না হলে শবদাহ স্থগিত—আর যদি মনে হয় সহজ উপায়ে মৃত্যু হয়নি, তাহলে আপনার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। পুলিশ সর্বদা খোঁজ নিয়ে চলেছে শ্মশানক্ষেত্রে।

সেই পাড়ার শবদাহদলের সঙ্গে বেরিয়ে এসে ট্রামরাস্তার মোড়ে দাঁড়ালুম। অনেক রাত, ট্রাম নেই পথে, লাইন আছে শুয়ে। নিঝুম নিস্তব্ধ প্রান্তর। অন্ধকারকে কিছু হালকা করবার জন্যে মাথার ওপর কটি বৈদ্যুতিক আলোর চেষ্টার অন্ত নেই। আমি তখন ভাবছিলুম, আচ্ছা, এই শ্মশানক্ষেত্রে এলে মানসিক অবস্থা এত দ্রবীভূত হয় কেন? মনে হয় যেন আমি এই জীবনের রঙ্গমঞ্চে এতদিন ধরে বাঁচবার জন্যে—অধিকারের জন্যে যে চেষ্টা করেছি, সব তুচ্ছ, সব তুচ্ছ।

একটি মাতাল হঠাৎ আমার চিন্তা-জাল ছিন্ন করে দিয়ে চীৎকার করে বলল—'সব তুচ্ছ, সব তুচ্ছ। সবারই গতি ঐ, একই পথ। একই মঞ্চে আরোহণ—শ্মশান। খি-খি করে মাতালটা হাসতে হাসতে টলায়মান দেহ নিয়ে চলে গেল। আমি অভিভূতের মত শুধু সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ পাড়ার শবদাহদল তাড়া দিল—'কি হে যাবে না? না-কি এখানকার মায়া কাটাতে মন ছটফট করছে?'

যাত্রা নাটক ও তার অভিনয়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সম্প্রতি কোলকাতায় যাত্রার আসর নাট্যমোদী জনসাধারণের কাছে খুব সহজলভ্য হয়েছে। আগে যে কোলকাতায় যাত্রা হতো না—একথা বলছি না। বিরাট সহর কোলকাতা, বিচিত্র এখানকার আমোদপ্রমোদ ব্যবস্থা এবং বারো মাসে তেরো পার্বণ এখানে লেগেই আছে। এর মধ্যে যাত্রা যে কতকাংশে আমোদের খোরাক জোগাচ্ছিল—তা বলাই বাহুল্য।

আগে বাজারে বারোয়ারী পুজো উপলক্ষে যাত্রা অনুষ্ঠিত হতো, তিন-চার রাত ধরে খ্যাতনামা তিন-চারটি দল এসে গান করতো। তাছাড়া বৈশাখ মাসের দিকে শীতলা পুজোর আসরে, কখনো সখনো সার্বজনীন দুর্গাপুজোর মন্ডপে, কালীপুজোর রাত্রে বা শিবরাত্রি উপলক্ষে যাত্রাভিনয় হতো। সারারাতের আসর এবং উন্মুক্ত আসর, প্রবেশাধিকারে কোন বাধানিষেধ নেই; ফলে নিরীহ, নির্ঝঞ্ঝাট এবং আয়েসী মানুষদের পক্ষে যাত্রাভিনয়ের আনন্দরস পান করা খুব আরামের ছিল না। তাছাড়া, সারারাত ধরে যাত্রার পালা শোনার কায়িক ক্লেশটুকুও অনেকের পক্ষে সহ্য হতো না। তাই যাত্রার আসর অনেকের কাছেই out of bounds ছিল।

সম্প্রতি যাত্রা উৎসবের আনন্দকর প্রচেষ্টায় যাত্রাজগতের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছে। উৎসবে অনুষ্ঠিত যাত্রাভিনয় সারারাত্রব্যাপী নয়—(অবশ্য শনিবারের রাত্রের আসরগুলি বাদে), আর আসনসংখ্যা এখানে মোটামুটি সীমিত থাকে বলে জনসাধারণের শোনার ব্যবস্থা কিছুটা সন্তোষজনকভাবে নিয়ন্ত্রিত। ফলে যাত্রার রস নতুন করে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করছে।

তবু আমার বিশ্বাস, যাত্রা কিন্তু শিক্ষিত রুচিবান মধ্যবিত্তদের জন্যে পরিবেশনোপযোগী সামগ্রী নয়। শিক্ষিত মনের কাছে যে আবেদন সহসা সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে, যাত্রা পালায় কিন্তু তেমন সূক্ষ্ম রস আমরা পাই না। মোটামুটি একটা ছকে যাত্রার পালা তৈরী বিশেষতঃ আজকের দিনে যেসব যাত্রার নাটক লেখা হচ্ছে—সেগুলি ত বটেই।

চিরদিনই যাত্রায় ন্যায়ধর্মের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। গোড়ায় যত আর যেমনই বিপর্যয় ঘটুক না কেন—অবশেষে ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় হবেই। মানবতার সুমহান ঘোষণাই যাত্রার প্রতিপাদ্য বিষয়। এর কারণ হলো যাত্রা আমাদের দেশে কিছুটা লোকশিক্ষার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমেই একদা আমাদের গ্রামীণ জীবনে আনন্দ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার কাজটুকুও সেরে নেওয়া হতো। তাই যাত্রাকে ধর্মের জয়গান শোনাতে হতো, নীতিকথা বলতে হতো।

এই কারণেই যাত্রার নাটককে একটি ছক ধরে এগোতে হতো। নাট্যরসের পক্ষে প্রয়োজন নেই, এমন ঘটনাও অনেক সময় লোকশিক্ষার জন্যে নাটকে গ্রথিত করতে হতো। ছকের অনুকরণটা আজো যাত্রা-নাটকে বড্ড বেশী পীড়াদায়কভাবে উপস্থিত রয়েছে। এই ছকের সঙ্গে হসপিটাল মিক্সচার-এর তুলনা দেওয়া চলে। হাসপাতালে দাতব্য চিকিৎসা হিসাবে শুনেছি এমন মিক্সচার তৈরী করা থাকে—যার নাম হসপিটাল মিক্সচার — তা কিছুটা ম্যালেরিয়া, কিছুটা অম্ল ও অজীর্ণতা ঘটিত রোগ, কিছু আমাশয়, কিছুটা টায়ফয়েড, কিছুটা টি-বি রোগ প্রভৃতি নিবারক ভেষজাদি দিয়ে তৈরী, যে ব্যাধিই হোক না, যে রকম বিধিবিধানই দেওয়া থাক না—একশিশি ওই মিক্সচার খেতে দেওয়া হয় আউট-ডোর রোগীকে; অবশ্য রোগীদের মানসিক দ্বিধা দূর করার জন্যে উক্ত মিক্সচারকে নানা রঙে ছুপিয়ে নেওয়া হয়, কোনোটা লাল, কোনোটা বা ফিকে সবুজ। আমার মনে হয় আধুনিক যাত্রাগানের পালাও এই মিক্সচারের সামিল।

রাজাকে প্রায়শঃ মহান, উদার এবং ন্যায়নিষ্ঠ বানাতে হবে। তবে নানা ঘটনার নানা আবর্তে তিনি রাজ্যের সব ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন না। তাঁর রাজ্যে অন্যায়, অধর্ম ও অরাজকতা চললেও তিনি দায়ী নন—বোঝানো হয়। এই রাজারই অধীনস্থ কোনো শঠ, নিষ্ঠুর দুর্জন চরিত্র আছে, সে যেমন চতুর তেমনই কৌশলী। রাজাকে নিজের স্বরূপ বুঝতে দেয় না, আবার সাধারণের কাছে এই শঠ চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নিজের শাঠ্য ও নৈষ্ঠুর্য নিয়েই উদ্ঘাটিত। হয় রাজপুত্র, না হয় অনুরূপ কোনো চরিত্র যোদ্ধা, ন্যায়ধর্ম রক্ষার জন্য লড়ছে। এই চরিত্রের পরিণামে হয় মৃত্যু, না হয় আত্মোৎসর্গের দ্বারা মহান্ আদর্শ স্থাপন। রাজার স্ত্রী চারিত্র্যে ধর্মমতী এবং রাজার দুঃখসুখ নিজের বলে মেনে নিয়েছেন। রাজার যদি দুনম্বর পত্নী থাকে—অর্থাৎ সুয়োরাণী, তবে সে কুটিল, স্বার্থপর এবং ব্যক্তিক সুখ-সুবিধার জন্য রাজাকে নিয়ন্ত্রিত করে, এমন কি রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত পর্যন্ত করতেও সে নির্দ্বিধ। শঠ চরিত্রের পরামর্শদাতা বা সাহায্যকারী হিসেবে আছে একজন সাধারণ মানুষ, যে অর্থের লোভে শাঠ্য ও চক্রান্তে পা দিয়েছে। এই সাহায্যকারীর স্ত্রী আবার সততা ও ন্যায়ধর্মের পরীক্ষায় ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট। বিবেক, কর্মফল বা ঐ জাতীয় গায়ক সর্বদাই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে যেতে থাকবে। রাজকন্যা বা নায়িকা প্রিয়তমের জন্য প্রথমে বিরহকাতরা, এবং তাদের মিলনের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা ও অন্তরায়ের সৃষ্টি; পরে স্বভাবকবির কাব্যের মিলের মতোই নায়ক-নায়িকার হয় মিলন, না হয় নায়কের মৃত্যুতে শোকাহত নায়িকার চূড়ান্ত বিষাদ-ভোগ! মোটা রকমের হাস্যরস জোগাবার জন্যে দু একটি চরিত্র অবশ্য আধুনিক যাত্রানাটকে দেখা যায়। এই হাস্যরসের স্থূলতা এমনই অশালীন ও গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট, যা অভদ্র সমাজেও উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করতে কণ্ঠ কম্পিত হয়! কোন্ একটি পালায় আগা খাঁ নামটিকে নিয়ে কমিক একটি চরিত্র যেসব উক্তি করেছে—তার মধ্যে হাস্যরস ত' নেইই, এমনকি ভাঁড়ামোটুকুও অনুপস্থিত।

হসপিটাল mixture-এ রঙের রকমফের আছে; আধুনিক যাত্রা-নাটকেও পালাগানের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আছে। ইদানীংকালে যাত্রা-নাটকে আধুনিক জীবন ও সাধারণ মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন ঘরসংসারের চিত্রও উপস্থাপিত হচ্ছে। Crime story-ও আছে। অর্থাৎ বাঙালীর যাত্রাগানে যে দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল—তা একটু নষ্ট হতে বসেছে, থিয়েটারের পালা-বৈচিত্র্যের মতো ভোজের আসরে নানা ব্যঞ্জনাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছেন। অনেক আগে যাত্রার আসরে ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক পালারই চল ছিল বেশী, এবং ইতিহাস ও পুরাণের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আনুগত্য দেখিয়ে দর্শকদের সামনে ইতিহাস ও পুরাণের কাহিনীকে বাস্তব করে তোলার প্রয়াস ছিল। এখনো ঐতিহাসিক কাহিনী আছে, পৌরাণিক কাহিনী আছে, কিন্তু এইসব কাহিনীর সঙ্গে একটা চমক দেবার প্রয়াস আছে, অর্থাৎ মঞ্চনাটকের কায়দায় একটা প্যাঁচ বা স্টান্ট দেবার চেষ্টা চলছে।

আধুনিক যাত্রানাটকে অনুকরণ জিনিসটাও যে কত অনায়াসে চলে—তা আমার আগে জানা ছিল না। গত বৎসর

কয়েকটি পালায় তা লক্ষ্য করেছি। বাংলা-নাট্যজগতের অতি বিখ্যাত একটি সামাজিক ট্র্যাজেডিকে যাত্রা-নাটকেব ছকে ঢেলে সাজানো হয়েছে; সেই পালাটির নামটি কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ—জালিয়াৎ। একের নাট্যকাহিনী এমন করে অন্যে কি করে গ্রহণ করতে পারেন—তা বলতে পারি না। আবার কোনো নাট্যকারকে দেখেছি নিজেরই অন্য নাটক থেকে কাহিনী আহরণ করে কিংবা একই নাটককে পাত্রপাত্রীর নাম বদলে ও পুস্তকের মলাট বদলে ভিন্ন নামে চালিয়েছেন।

এইসব ঘটনা নিঃসন্দেহে উপযুক্ত যাত্রা-নাটকের অভাব সূচিত করে। যদি ভালো নাটক না পাওয়া যায়, তবে যাত্রার দলগুলি কেন পুরনো দিনের ভালো নাটকগুলির অভিনয় করেন না? এখনো শ্রদ্ধাস্পদ ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মশাই যাত্রাজগতে উজ্জ্বল ভাস্কররূপে বিরাজমান রয়েছেন; তাঁর বিবিধ ও বিচিত্র নাটকাবলী রয়েছে—সেগুলি যথার্থ ভালো নাটক—সেগুলির অভিনয় হতে পারে—তাঁকে দিয়েও নাটক লেখানো যেতে পারে। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী কিংবা ফণিভূষণ রায় প্রমুখ নাট্যকারের নাটকের অভিনয় আমার মনে হয় আজো আসর জমিয়ে রাখবে। বর্তমান যুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভালো লোকও আছেন, মন্দলোকও আছেন, একজন মুসলমান হিন্দু-বিদ্বেষী, একজন মুসলমান আদর্শ মানবপ্রেমিক, এবং খোদা ও ভগবান এক—আজকের নাটকের এই প্রতিপাদন অবশ্যই ভালো, কিন্তু এর চেয়ে পুরাণের কাহিনী কম জমকালো নয়।

গত বছর রবীন্দ্রকাননে যখন যাত্রার উৎসব হয়েছিল তখন আমি দু একটি বিখ্যাত দলের কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তাঁরা পালা নির্বাচনে পুরানো নাটকের কথা কেন ভাবেন না? প্রায় সকলেই উত্তর দিয়েছিলেন—আগেকার পালা সব Blank verse-এ লেখা, এখনকার অভিনেতাদের কাছে তা খুব রুচিকর ঠেকবে না! আমিও লক্ষ্য করলাম, বর্তমান যাত্রানাটক গদ্যে লেখা এবং তাতে আছে কাটা কাটা ডায়ালগ। কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারলুম না যে, এখনো বড় ফণিবাবু, ছোট ফণিবাবু, ভোলাবাবু প্রমুখ নটেরা রয়েছেন— এঁদের Blank verse আবৃত্তি আমরা বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছি, আজো সেই স্বরবৈশিষ্ট্য-সমন্বিত অভিনয় স্মৃতিপটে জাগ্রত আছে—বিশেষ করে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে কালীঘাটে দুধওয়ালা পার্কে বড় ফণিবাবু ও ছোট ফণিবাবুর অভিনয়—'মায়াচক্র' নাটকে, আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে। এঁরা Blank verse-এ রচিত নাটক অভিনয় করেই সকলকে মুগ্ধ করে রাখতেন। 'চন্দ্রধর' নাটকে চাঁদসদাগর যখন দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে ক্লান্ত ও হতোদ্যম হয়ে নিজের পুরীতে ফিরে এসেছেন—এবং তস্করভ্রমে চন্দ্রধরকে যখন তাঁর স্ত্রী সনকার আদেশে প্রহরীর দ্বারা বেত্রাঘাত করা হচ্ছে, সেই আবেগঘন মুহূর্তে চাঁদসদাগর Blank verse-এ অভিনয় করছেন—তা যেমন শ্রুতি-মনোহর, তেমনই চিত্তচমৎকার। আসল কথা, খেলোয়াড় যদি যথার্থ প্রতিভাবান হন—তবে ক্যাম্বিশের বলেও তিনি ভাল মারতে পারেন।

আজকের নটেরা Blank verse বলতে পারেন না—এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না; তাঁদের অভিনয়ে কৌশল এবং কণ্ঠস্বরের ওঠানামার বাহাদুরি অত্যন্ত প্রশংসার জিনিস। Blank verse-এ নাটকই বোধহয় লেখা হয় না, আর যা-ও একআধটি নাটকে ছিটেফোঁটা Blank verse আছে (যেমন অভিমন্যুবধ নাটকের প্রস্তাবনা অংশে)—তাও ঈষৎ দুর্বল মনে হয়। যাত্রার নাটকে গতি যদি ক্ষুণ্ণ হয়—তবে নাটক জমানো মুস্কিল; কারণ আলোক-সম্পাত ও দৃশ্যসজ্জার সাহায্য এখানে পাওয়া যায় না। নাটক নিজের চলমানতার ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যাবে—এবং নাটকের গল্পকে অভিনেতারা রূপদান করে দর্শকদের অভিভূত করবেন। কিন্তু নাটকের গতি ও টেম্পো বজায় রাখার পক্ষে Blank verse বিশেষ করে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে যেমন কার্যকর, সাধারণ গদ্য তেমন নয়; এমনকি কাব্যাত্মক গদ্য—যা উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকরণের ফোড়ন দিয়ে সুরভিত করা হয়, তাও নাট্যীয় গতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। সামাজিক নাটকে গদ্যের ভাষা ছাড়া উপায় নেই, তবু চরিত্রানুগ করে যদি Blank verse বসানো যায়—তাহলেও মন্দ হয় না। হাস্যরসের ক্ষেত্রে বা অন্য কয়েকস্থানে গদ্য বসাতেই হবে, সেগুলির কথা স্বতন্ত্র। Blank verse পুরনোকাল থেকে চলে আসছে বলেই তাকে বাতিল করতে হবে, তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে হবে—এ যুক্তি ঠিক নয়। মা-কে প্রাচীনকাল থেকে মা বলা হচ্ছে বলেই অন্য অভিধায় যেন মা-কে ডাকা না হয়—আমার এইটুকুই অনুনয়।

যাত্রা-নাটকে গানের সংখ্যা কমে এসেছে। যাত্রা থেকে জুড়িগান উঠে গেছে। জুড়িগান থাকা ও না-থাকা সম্পর্কে আমার কোনো বক্তব্য নেই; কারণ আমার জন্মের বহু আগেই জুড়ি-গান বন্ধ হয়েছে যাত্রায়। আমরা শিশুকাল থেকেই যাত্রাকে গীতাভিনয় বলে শুনে আসছি। বিভিন্ন রাগরাগিনী সমন্বিত গানের ভিয়েনে যাত্রার মিষ্টান্ন বেশ কড়াপাকের রূপ নিয়ে থাকে। এখনো যাত্রাদলে গাইয়ে আছেন যথেষ্ট; কি সুন্দর দরাজ তাঁদের গলা, রাগ-রাগিনী মিলিয়ে গান করার কৌশলও কত সুন্দর, কিন্তু গানের রচনা অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল। গানের মাধ্যমে আবেগ প্রকাশের সুযোগ অনেকটা বেশী, এবং যাত্রায় গান নাটকের গতিকে রুদ্ধগতি করেই না—বরং এগিয়ে দেয়। যাত্রার ক্ষেত্রে গানের বাণী নাটকের মূল বক্তব্য যা—তাকে কেন্দ্র করে রূপ লাভ করবে; আর সেই বাণীতে কাব্যস্বাদ থাকবে। এখনকার যাত্রা-নাটকের গানগুলিও বক্তব্যকেন্দ্রিক, কিন্তু কাব্যের মতো স্বতন্ত্রভাবে তা আস্বাদ্য নয়।

তবু কি ইদানীংকালে ভালো যাত্রা-পালা আদৌ রচিত হচ্ছে না? হচ্ছে বৈকি! শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে মশায়ের কয়েকটি পালা আমার অতি সুন্দর লেগেছে। কবি চন্দ্রাবতী, কি উপেক্ষিতা আধুনিক যুগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাটক। এ ছাড়া শ্রীকানাইলাল নাথ ও শ্রীনন্দলাল রায়চৌধুরী প্রমুখ নাট্যকার-একাধিক পালাও রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

এবার যাত্রার অভিনয় সম্পর্কে দু-একটি কথা বলবো। যাত্রার অভিনয়-শিল্প হলো মোটা তুলির কাজ। চারিদিক ফাঁকা, মাঝখানে আসর, ঘুরে ঘুরে অভিনয়। অনেকদূর অবধি বিস্তৃত দর্শকবৃন্দ। সুতরাং অভিনয়কলায় সূক্ষ্ম কারুকার্যের অবকাশ খুব নেই। তাছাড়া, পল্লীগ্রামে বহুস্থানে যেখানে হ্যাজাক জেলে অভিনয় করতে হয়—সেখানেও মুখের কুঞ্চন কিংবা এক চোখে হিংসা ও অন্য চোখে মূঢ় বিশ্বাসের প্রতিভাস ফুটিয়ে তোলার

ব্যঞ্জনা দূরে পর্যন্ত যায় না, তাই অভিনেতাকে অংগসঞ্চালনের পাঁবর কৌশল অবলম্বন করতে হয়; তাতে effect হয় চমৎকার। উদাহরণ হিসেবে অনেক খ্যাতনামা অভিনেতার অভিনয়ের কথাই মনে হচ্ছে। শ্রীযুক্ত সুজিত পাঠকের রাজা দেবীদাসের অভিনয়ের কথাটি মনে করা যাক। যে দৃশ্যে তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন—সেই দৃশ্যে তিনি মঞ্চ থেকে প্রথমে বেরিয়ে যেতে থাকেন; তাঁর মনে রয়েছে—তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু আর হয়তো ফিরবেন না, তবু দেশপ্রেম তাঁকে যুদ্ধে যেতে প্রণোদিত করছে। তিনি ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছেন—স্বল্পদূরে গিয়ে মুহূর্তকালের মধ্যেই তিনি আবার আসরে প্রবিষ্ট হলেন। প্রবিষ্ট হয়ে তিনি বসে পড়লেন, দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং আকর্ষণ জানাবার জন্যে দেশের মাটিতে মাথা ঠেকালেন, দুমুঠো মাটি তুলে নিয়ে কপালে ঠেকালেন—তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। অভিনেতার চোখের কাজও সুন্দর, কিন্তু তাঁর এই যে অংগসঞ্চালনের মূক অথচ মোটা কাজ—তা আসরশুদ্ধ সকলকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে রেখেছিল। উপেক্ষিতা নাটকে ছোট ফণিবাবুরও এই জাতীয় বহু অংগসঞ্চালনের অত্যাশ্চর্য মুগ্ধ করবার ক্ষমতা দেখেছি। বর্গী এল দেশে নাটকে পঞ্চুবাবুর আলিবর্দির ভূমিকা বোধহয় দর্শকমাত্রেরই স্মরণ থাকবে—কারণ যতবার যতক্ষণ ধরে তিনি আসরে থেকেছেন, ততবার ততক্ষণ ধরে তাঁর বার্ধক্যজনিত অংগভঙ্গি—যা বহুদূরাবস্থিত দর্শককেও মুগ্ধ করতে পারে—এমন মস্তকসঞ্চালন বজায় ছিল।

যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত দিলীপ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সুজিত পাঠকের প্রশংসনীয় নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। দিলীপবাবুর অংগসঞ্চালন এবং কণ্ঠস্বরের যাদু শ্রোতা ও দর্শকদের মুগ্ধ করে। আমি একবার মাত্র একটি খল দুর্জনের ভূমিকায়—সোনাইদীঘির ভাবনাকাজী চরিত্রে — তাঁর অভিনয় দেখেছি। শ্রীযুক্ত পাঠকের কণ্ঠস্বরও আমাকে মুগ্ধ করেছে। —যে চরিত্রে তিনি রূপ দেন—তাকে সার্থক করে তোলেন, কোথাও আড়ষ্টতা থাকে না তাঁর অভিনয়ে, কিংবা কোনোরকম ম্যানারিজমও তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। গত বছর 'কবি চন্দ্রাবতী' পালায় কয়েকজন বিশিষ্ট অভিনেতার অভিনয় সত্যিই প্রশংসনীয় হয়েছিল। কাসেম আলি ও হাসেম আলির ভূমিকায় যে দুজন অভিনয় করেছিলেন—শ্রীযুক্ত পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বিজন মুখোপাধ্যায়—তাঁদের অংগসঞ্চালন এবং কণ্ঠস্বরক্ষেপণ বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষ করে বিজনবাবুর অভিনয়কৌশল অতি উচ্চাংগের। তিনি কণ্ঠস্বরকে ধীরে ধীরে উচ্চমার্গে তোলেন—তারপর এমনই সুষ্ঠুতার সংগে সহসা নামিয়ে ফেলেন—যাতে মন বাহবা না দিয়ে পারে না।

এ ছাড়া স্বপনকুমার, সর্বশ্রী ভোলা পাল, নন্দ ঘোষাল, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ননী ভট্ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আরও অনেক অভিনেতার অভিনয় ভালো লাগে, কিন্তু সব সময় তাঁদের নাম জানতে পারা যায় না, এবং কাজের সময় তা আবার মনেও পড়ে না।

ইদানীংকালে যাত্রা-নাটকে যুদ্ধ কমে এসেছে। শৈশবে যাত্রা দেখতে যাওয়ার মজাই ছিল ওই যুদ্ধের দৃশ্যে; কিন্তু এখনকার যুদ্ধে সেই রস নেই। যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে যায়, বিজিত চরিত্রের হাত থেকে ঝপ করে তরবারি খসে পড়ে। যুদ্ধ দেখার শৈশব-বাসনা অতৃপ্তই থেকে যায়। 'বর্গী এল দেশে' নাটকের শেষের দিকে একটি যুদ্ধের দৃশ্য আছে—যেখানে যুদ্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী। নায়ক যুদ্ধে এসেছেন—তার পিছনে কিছু কাহিনী আছে, এবং ঘটনাচক্রে যার সংগে তাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে—সেই তার প্রেমিকা, সুতরাং মানসিকতার দ্বন্দ্ব তাকে ভেতরে ভেতরে রীতিমতো পীড়িত করছে। মেয়ে যোদ্ধারও অনুরূপ মনোভাব, দেশপ্রেমের ডাকে সে বর্গী দস্যু রুখতে এসেছে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেখে যে, যার সংগে সে যুদ্ধরত,—সেই তার প্রেমিক—সবচেয়ে প্রিয়জন! এই যুদ্ধে অসিচালনার কায়দা অপেক্ষা মানসিক দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তিই বেশী ফুটেছে। তাই নাট্যগত উৎকর্ষ এখানে জমেছে ভালই। এই যুদ্ধকে সাধারণ যুদ্ধের দৃশ্য বলা ঠিক হবে না।

যাত্রা-নাটকের স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আজকাল স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় অনেক ক্ষেত্রে অভিনেত্রীরাই করছেন। এর ফল ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে—তা চট করে বলা যাবে না। কারণ আমি এই অভিনেত্রীদের চরিত্র-চিত্রণ যে-সব যাত্রা-নাটকে দেখেছি—তা সৌভাগ্যবশতঃ আসরের অতি কাছে বসেই। দূরাবস্থিত দর্শকবৃন্দের কাছে এ'দের কণ্ঠ কতটা পৌঁছয়—সে সম্পর্কে আমার চেয়ে আরো বেশী ওয়াকিবহাল সমালোচক বলতে পারেন। যাত্রাভিনয়ের প্রথম সূত্র হলো, কণ্ঠস্বর সকল শ্রোতাকে শোনাতেই হবে—তারপর সেই কণ্ঠস্বরে চরিত্রানুগ অভিভাব ফুটিয়ে তোলার প্রশ্ন আসবে। নারী-চরিত্রে কিন্তু পুরুষেরা যে অভিনয় করেন—যেটি বরাবরের যাত্রার ঐতিহ্য——তা আমার মন্দ লাগে না।

রামপ্রসাদ নাটকে রামপ্রসাদের মায়ের পার্ট যিনি বলেন—সেই নিতাইরাণীর অভিনয় ত' চমৎকার। কবি চন্দ্রাবতীর ভূমিকায় বিনোদরাণীর অভিনয় দেখেছিলাম—তাও অতি সুন্দর। কাননরাণী, বাবলিরাণী শতদল—এ'দের সাবলীল অভিনয় এমনই উচ্চাংগের যে, সহসা এ'দের পুরুষ বলে বোধ হয় না। বিশেষ করে শতদলকে অনেক দর্শকই নারী বলে ধরে নেন। তাঁর চলন-বলন, বসা-দাঁড়ানো, তাকানো হাত-ঘোরানো—সবই এমনধারা মেয়েলি—যে আমাদেরই অনেক সময় সংশয় জাগে—শতদল সত্যিই পুরুষ ত'!

নারী-চরিত্রের মাধ্যমে যে কোমল ও স্নেহসিক্ত অন্তরের প্রকাশ আমরা দেখতে চাই—তা এই সব নারী-বেশী পুরুষ-অভিনেতা অত্যন্ত গৌরবের সংগেই অভিব্যক্ত করেন; এমন কি যে-সব অভিনেত্রী যাত্রাদলে নিয়মিত অভিনয় করছেন—তাঁদের স্বভাবসুলভ নারীত্বের প্রকাশ অপেক্ষা উক্ত পুরুষ অভিনেতারাই নারী-চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশী প্রতিফলিত করেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। শতদলকে মানায়ও চমৎকার, তাঁর চলন-বলনও নারীত্বমাখা। কাননরাণীর ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু আর দু'চারজন আছেন—যাঁদের চেহারায় ঠিক মানানসই নারীত্ব আসে না; বরং কোমল নারীচরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রথম দর্শনে কিঞ্চিৎ হাস্যরসের উদ্রেক করেন—কিন্তু অভিনয়গুণে মুহূর্তকালের মধ্যে তাঁরা দর্শকহৃদয় জয় করে নেন। এ কি শুধু তাঁদের কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রামের গুণেই?

যাত্রা নাটকের অভিনয় প্রসংগে আমি একটি কথা বলে ক্ষান্ত হচ্ছি। ঘোষিত সময়ে যাত্রা-নাটক শুরু হয়েছে—এমন ঘটনা কখনো আমার গোচরীভূত হয় নি। ছটায় যাত্রা শুরু হবে বললে সাড়ে ছটায় কনসার্ট শুরু হয়। রাত দশটায় আরম্ভ হবে ঘোষণা থাকলে সাড়ে এগারোটায় কনসার্ট আরম্ভ হয়—এবং একাধিক গৎ বাজানো হয়ে থাকে। কেন এমন হয়? দেরীতে শুরু হওয়ার কৈফিয়ৎ অবশ্য অনেক আছে—তবু আমার জিজ্ঞাসা—যাত্রাভিনয়ে সময়-নিষ্ঠা পালিত হলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়?

যুক্ত বিমান মহড়া

বৃটিশ গ্লস্টার জ্যাভেলিন জঙ্গী

চাবন
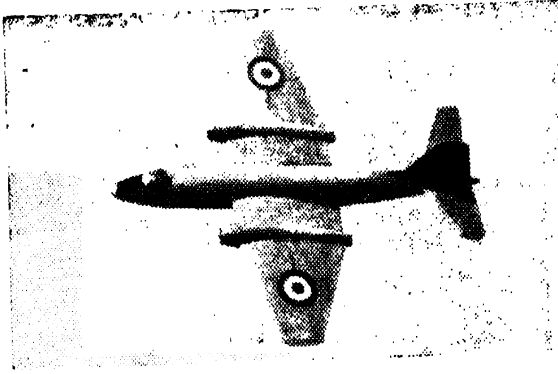
অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা বোমারু
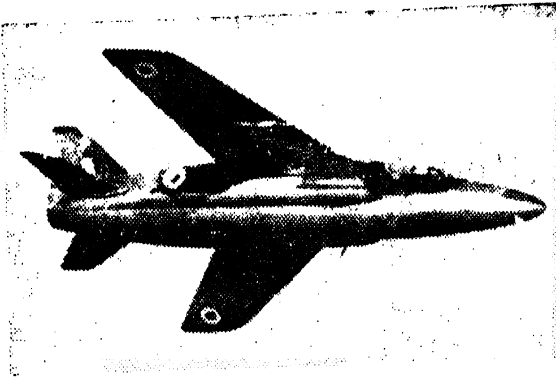
ভারতীয় বিমান বহরের ন্যাট বিমান
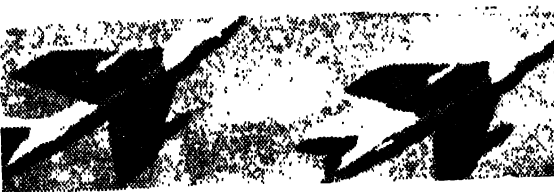
ভারতীয় হান্টার জঙ্গী বিমান

আকস্মিক চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি হিসাবে পূর্ব ও উত্তর ভারতের দুটি ঘাঁটি থেকে বৃটেন, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিমানবহরের সহযোগিতায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর শিক্ষা-মহড়ার প্রথম পর্যায় পূর্বাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পূর্বাঞ্চলের মহড়া চলে ৯, ১৩ ও ১৪ই নভেম্বর। পশ্চিমাঞ্চলের মহড়া ১৪, ১৭, ১৮ ও ১৯-এ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পশ্চিমাঞ্চলের ভারতীয় বিমানবাহিনীর সঙ্গে থাকবে ১৮ খানা আমেরিকান সুপার স্যাবার্স জঙ্গী বিমান। এইগুলির নেতৃত্ব করবেন আমেরিকান বিমান-বাহিনীর ৩৫৪তম ট্যাকটিক্যাল ফাইটার উইং-এর কম্যান্ডার কর্ণেল জোসেফ ক্রুজেল। কর্ণেল ক্রুজেল দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় ইউরোপীয়ান থিয়েটারে একজন সেরা পাইলট ছিলেন।

পূর্বাঞ্চলের মহড়ায় ভারতীয় বিমান-বাহিনীর সঙ্গে এক স্কোয়াড্রন (১২ খানা) ব্রিটিশ জ্যাভেলিন বিমান। ১৩ নভেম্বর পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় দিনের মহড়ায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী চ্যাবন এবং ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর

আকাশে উড্ডীয়মান দুইখানি মার্কিণ এফ—১০০ সুপার স্যাবার্স জেট জংগী বিমান।

আকাশে উড্ডয়নকালে শূন্যপথে তৈলবাহী বিমান হইতে এফ—১০০ স্যাবার্স বিমান পেট্রল নিচ্ছে।

'ফাইটার কম্যাণ্ডের' সর্বাধিনায়ক এয়ার মার্শাল ডগলাস মরিস উপস্থিত ছিলেন। পূর্বাঞ্চলের মহড়ায় জ্যাভেলিন বিমান-গুলির নেতৃত্ব করবেন ব্রিটিশ বিমান-বাহিনীর উইং কম্যাণ্ডার বেল। ১২ খানা জ্যাভেলিনের সঙ্গে ছিল ভারতীয় বিমান-বাহিনীর ৩৩ খানা ক্যানবেরা, ন্যাট ও হান্টার বিমান। এগুলি সবই জংগী বিমান। এই মহড়ার সর্বাধিনায়ক হলেন সেন্ট্রাল এয়ার কম্যাণ্ডের সর্বাধিনায়ক এয়ার ভাইসমার্শাল শিবদেব সিং।

পশ্চিমাঞ্চল থেকে ভারতীয় ও অস্ট্রেলিয়ান বোমারু বিমানগুলি নকল আক্রমণের ভূমিকা নিয়ে পূর্বাঞ্চলের আকাশে আসে এবং পূর্বাঞ্চলের জংগী বিমানগুলি রেডার যন্ত্রে ঐ 'আকাশসীমা লংঘন' টের পাওয়া মাত্র বোমারুগুলির পশ্চাৎধাবন করে।

যুক্ত প্রতিরক্ষামহড়ায় বৃটেনের জ্যাভেলিন বিমানগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমান বিজ্ঞান বিমানে যতগুলো গুণ সমন্বিত করতে সমর্থ হয়েছে জ্যাভেলিন বিমান তার সবগুলো গুণের অধিকারী একথা বলা যেতে পারে। জ্যাভেলিন বিমান দিনে-রাত্রে যে কোনো আবহাওয়ায় যুদ্ধক্ষম জংগী এবং এর আরেকটা বিশেষত্ব এই যে, আকাশে ট্যাংকার-বিমান থেকে এ পেট্রল নিতে পারে। ফলে খুব দূরপাল্লায় যাওয়ার সামর্থ এ রাখে।

যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনীর এফ—১০০ জেট জংগী। বিমান মহড়ায় এরূপ ১৮ খানি বিমান অংশগ্রহণ করে।

সেকালের পার্ক স্ট্রীটের মোড়

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে তাকালেই চোখে পড়বে এক বিরাট ইমারত-গড়ার কাজ। বাড়ী উঠছে—যেস্থানে কয়েক বছর আগে ছিল একটি পেট্রল পাম্পিং-স্টেশন। পাথরবিছান পথের উপর দিয়ে ঢুকতো গাড়ী। পাম্পিং-স্টেশনের কোণে ছিল একটি বড় ঘড়ি আর সারি সারি নানা-রকম বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড যা পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। আর ছিল লতানে গাছের সবুজ পর্দা। সবুজ পর্দার গায়ে ফুটে থাকতো ফুলের স্তবক। সুন্দর করে সাজানো ছিল কেয়ারিকরা জমিতে নানারকম ফুলের গাছ। তা ছাড়া ছোট ছোট মাটির গামলায় পাতাবাহারী গাছও শোভাবর্ধন করতো। পার্ক স্ট্রীটের দিকে ছিল সাদা রঙকরা প্রায় একহাত উঁচু ইটের পাঁচিল। অনেকে সেই পাঁচিলে বসে রাস্তা দেখতেন। কয়েকটি নিম গাছও ছিল রাস্তার দিকে। দুপুরে অনেকে গাছের তলায় বসে একটু আরাম করে নিতেন। এই পথ দিয়ে চলাফেরা করলেই চোখে পড়তো পার্ক স্ট্রীটের এই কোণটি।

পার্ক স্ট্রীটের মোড় অর্থাৎ এশিয়াটিক সোসাইটির ভবন জ্ঞানী-গুণীদের পবিত্র তীর্থস্থান। ঐতিহ্যের গৌরব আজও বহন করে চলেছে মোড়ের এই বাড়ীটি। তাই আজও দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বিদগ্ধ পণ্ডিতরা মহানগরীতে আগমন করলে একবার এই বিদ্যাভবনে পদার্পণ করেন। কয়েক বছর আগে দলাইলামা পর্যন্ত এখানে আসেন। এই বাড়ীতে বহুদিন বাস করে গেছেন হাঙ্গেরী দেশীয় তিব্বতী ভাষার পণ্ডিত আলেকজান্ডার জোমাদি করোস এবং তাঁর মূর্তি সোসাইটি-ভবনে রক্ষিত আছে।

প্রায় সাইত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখন পেট্রল-পাম্পিং স্টেশন হয়নি। সে সময় এই কোণটি ছিল ফুলের বাগান। শুধু ফুল কেন নানারকম পাতাবাহারী গাছও ছিল এই বাগানটিতে। তা ছাড়া ছিল চার-পাঁচটি নারিকেল গাছ, কয়েকটি সুপারি গাছ, বড় বড় কয়েকটি নিম ও আম গাছের সবুজ ঝোপ-ঝাড়। এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান গেটের মত আর একটি গেট ছিল চৌরঙ্গীর দিকে। সেই গেট দিয়ে গাড়ী ভিতরে ঢুকে গাড়ী-বারান্দার নীচে থেমে পার্ক স্ট্রীট দিয়ে গাড়ী বার হয়ে যেতো। বর্তমানে এই গাড়ীবারান্দাটি নেই। নতুন বাড়ী তৈরীর জন্য গাড়ীবারান্দাটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

বর্তমান ১নং পার্ক স্ট্রীটের গেটের গায় ছোট্ট করে লেখা আছে "এশিয়াটিক সোসাইটি"। প্রাচ্যের প্রাচীনতম বিদ্যা-ভবন—এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন বাড়ী গড়ে উঠছে পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে। এই প্রতিষ্ঠান দেশের গৌরবের বস্তু। সারা পৃথিবীর বিশ্বজ্জনদের পীঠস্থান।

পার্ক স্ট্রীটের এই কোণটি এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পত্তি। ১৭৮৪ সালে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতার ত্রিশজন ইউরোপীয় সংস্কৃতি-অনুরাগীদের এক সভায় প্রতিষ্ঠা হয় এই বিদ্যাভবন। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়ম জোন্স। তিনি ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি। সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফার্সী ও অন্যান্য ভাষায় ছিলেন মহাপণ্ডিত।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রায় বিশ বছরের মধ্যে সোসাইটির বাড়ী বলতে কিছুই ছিল না। সে সময় সভার কাজ হতো পুরনো সুপ্রীম কোর্টের গ্রাণ্ড জুরী রুমে। ১৮০৫ সালে গভর্ণমেন্টের দেওয়া জমিতে সোসাইটির বাড়ী তৈরী হয়। বাড়ীর নক্সা তৈরী করেন ক্যাপ্টেন লক্, তৎকালীন বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ার। বাড়ী তৈরীর কাজ ১৮০৮ সালে শেষ হয়। এই বাড়ীটি কলকাতা মহানগরীর এক প্রাচীনতম ঐতিহাসিক ভবন। এককালে এই জায়গায় ছিল ঘোড়াচড়া শেখার স্কুল।

অশ্বারোহণের শিক্ষালয়টি গড়ে-ছিলেন ম. আন্তোয়ান দে লেতাং। তিনি তৎকালীন কলকাতার একজন বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক সময় ফরাসী দেশের রাণী মেরি এন্টোনিয়েট-এর পার্শ্বচর, সম্রাট ষষ্ঠদশ লুই-এর দেহরক্ষী দলের একজন এব অর্ডার-অফ সেন্ট লুই-এর নাই ছিলেন। তাছাড়া রাণীর প্রাসাদরক্ষণা ভার ছিল তাঁর উপর। এবং রাণ বিদায়কালীন উপহারস্বরূপ তাঁ একটি ক্ষুদ্র আলেখ্য প্রদান করেন বিপ্লবের জন্য তিনি তাঁর স্বদেশ ফ্রান্স ত্যাগে বাধ্য হয়ে ভারতের পণ্ডিচেরীতে আসেন। দক্ষিণ ভারতে ঘটনাবহুল জীবনযাপনের পর তিনি ১৭৯৬ সালে কলকাতায় আসেন। অধুনা যে স্থানে এশিয়াটিক সোসাইটির ভবন এবং যে স্থানে সোসাইটির নতুন বাড়ী গড়ে উঠছে উক্ত পার্ক স্ট্রীট এবং চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে তিনি অশ্বারোহণের শিক্ষালয় স্থাপন করেন। ধর্মতলায় তাঁর একটি ঘোড়া রাখার আস্তাবল ছিল (পরে উক্ত স্থান কুক কোম্পানীর হাতে যায়।) ধর্মতলার আস্তাবলে প্রতি সপ্তাহে ঘোড়া নিলাম হতো। তাঁর নিলাম প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপন ১৮০৭ সালের "ক্যালকাট গেজেটে" প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপন এইরকমঃ—

"এ, দেলেতাং কর্তৃক প্রকাশ্য বিক্রয়। ঘোড়া, গাড়ী, কুকুর এবং গবাদি। স্থান রিপ্‌সজিটরী রাইডিং স্কুল। প্রতি সপ্তাহে বুধ এবং শুক্রবারে।"

নিলামের প্রচারপত্র কলিকাতায় এবং নিকটবর্তী স্থানসমূহে বিলি করা হতো। এবং বিক্রয়ের জন্য ঘোড়া ও অন্যান্য পশুর বিস্তারিত বিবরণ থাকতো। ১৮৪০ সালে বকসারে তিরাশি বৎসর বয়সে আন্তোয়ান দে লেতাং পরলোকগমন করেন।

চৌরঙ্গী ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আউট্রামের অশ্বারূঢ় মূর্তি কয়েক বছর হলো উক্ত স্থান থেকে সরান হয়েছে এবং সেই স্থানে স্থাপন করা হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি। যা ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকালের ঐতিহাসিক দাণ্ডী অভিযানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের "একলা চল রে" গান। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি নির্মাণ করেছেন স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। আউট্রামের মূর্তি প্রসঙ্গে অনেকে বলেন গত শতাব্দীতে নির্মিত পৃথিবীর সর্বাঙ্গ-সুন্দর অশ্বারূঢ় মূর্তিগুলির অন্যতম ছিল সেই মূর্তিটি। এবং উক্ত মূর্তিটির ভাস্করের নাম জন্ হেনরী ফোলী (১৮১৮—১৮৭৪) তিনি ছিলেন রয়েল একাডেমির ছাত্র, এ-আর-এ (১৮৪৯), আর-এ (১৮৫৮)। এই ভাস্করের নির্মিত অনেক মূর্তি বিলাতে আছে যেমন—লর্ড ক্যানিং, লর্ড হার্ডিঞ্জ, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য বাগ্মী বার্কে-এর মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

মেঘনা পারের কন্যা

মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

মেঘনা পারের বকুল গাছটা থেকে এইমাত্র ডেকে উঠল নিদহারা নিশার প্রহর-জাগা পাখিটা। আর কোন শব্দ নেই স্তব্ধ রাত্রির বুকে। কেবল মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মহাজনী নৌকার মাঝিদের বৈঠা বাওয়ার শব্দ ঝুপ-ঝাপ......ঝুপ-ঝাপ......

দূরে হেলে-পড়া বন্য গাছের বলাক-শুভ্র পুষ্পমঞ্জরীর ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি জোনাকি জ্বলছে মাঝে মাঝে। তারই স্নিগ্ধ আলোর ঝলক এসে প্রসন্ন ক'রে দিচ্ছে অজগর রাত্রিটাকে ক্ষণেকের জন্য। ঝাপুরে নদীর থেকে ঢাকা ষ্টীমারের সার্চ লাইটের আলো এসে পড়েছে এপারে সাহেবের চরে। চরা নদীর স্নিগ্ধ সৈকতের 'পর দিয়ে হু হু করে নেমে গেল একটা মাতলা ঢেউ। মেঘনার উদ্দাম ক্ষ্যাপামির সঙ্গে সঙ্গে দুলতে দুলতে ষ্টীমারটা এগিয়ে আসতে লাগল এদিকেই।

আঞ্জা একটা বেতঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। কিন্তু ষ্টীমারটা এগিয়ে আসতে আত্মগোপন করবার জন্য বসে পড়ল সে। বসন্তের আলতো বাতাসে কাঁচা ধানবনের মত কাঁপছে তার বুকটা. শালকাঠের জ্বলন্ত শিখার মত মাঝে মাঝে যেন বনবাদাড়ের কুহক পাহাড়টার ওধার থেকে হাতছানি দিচ্ছে তার কড়ামেজাজী চাচার ছেলে শালিম। মেঘনার পাড় ভাঙ্গার শব্দে চনমন করে উঠছে আঞ্জার দেহের নবোদ্গত স্তবক-গুলি। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সে বনের মধ্যে। বেজির চোখের মত সন্ধানী দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে তাকায় পেছনে।

কিন্তু না, কোন সাড়া শব্দ নেই তার বাঞ্ছিত পুরুষটির। দুঃসহ লাগে। অসহ্য হয়ে ওঠে তার অন্ধকার রাত্রির নীরবতা। ভয়ংকর মনে হয় গহন অরণ্য-বেষ্টনী। আবার শালিমের কথা স্মরণে আসতেই দৃঢ় ও সতেজ হয়ে উঠে যৌবনবন্ধ বুকটা। চোখের কোণে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলতে থাকে একটা ঘৃণার আগ্নেয় উচ্ছ্বাস। এ রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে গেলেও আর সে ফিরে যাবে না ঘরে। এই আবরণহীন আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকেও সে প্রত্যক্ষ করতে প্রস্তুত। তবুও শালিমের প্রবৃত্তির কুৎসিত প্রার্থনাকে আর সে মঞ্জুর করতে পারে না। সে বন্দিনী জীবন বড় ঘৃণিত। বড় অসহ্য। তার থেকে এ ছায়াঘন বন-পথটা ভয়ের হলেও অনেক শান্তির। অনেক তৃপ্তির।

শালিম মোল্লাহাটের নামকরা চালের ব্যাপারী। আজ তিনদিন হলো সে বাড়ীতে নেই। সওদা করতে গিয়েছে বাখরগঞ্জে। এ তল্লাটজোড়া তার পরি-চিতি। দরগা থেকে সাধারণ মেহনতী চাষী মজুরের বাঁখারীর ঘর অবধি তার অবারিত পথ।

এক সময় উত্তরের বিরাট বাঁশবন থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। চমকে উঠল আঞ্জা। ভীরু কণ্ঠে বলে ঃ "কে?"

কোন জবাব নেই। দূরের নিঃসীম নীল আকাশ থেকে কয়েকটা প্যাঁচা এসে দমকা বাতাসের মত আন্দোলিত ক'রে দিল বেতস ঝাড়টাকে। আঞ্জা ফিরে তাকাল পিছনে। সহসা পাখিগুলি কয়েকটা মৃত্যুভয়াল চিৎকারে তাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করে আবার উড়ে গেল পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে।

এই ঘন-বিথার অরণ্য-বেষ্টনের মধ্যে একটা অপরিচিত শব্দ কয়েকটা পরিচিত দিনকে ঠেলে দিল তার স্মরণের লগ্নে। একদিন এমনি একটা শব্দসঞ্চারের মধ্যে দিয়েই সে শুনতে পেয়েছিল আজকের রাত্রির আহ্বান। তার চেতনার সমুদ্র থেকে সেদিন অপসৃত হয়ে গিয়েছিল নিশীথের যৌবন। বাড়ীর পথটা উঠেছিল অসহনীয় হ'য়ে। মন্থর হয়ে এসেছিল পদসঞ্চার! জীবনদেউলের দুয়ার খুলে দিতে একটু কার্পণ্য করেনি আঞ্জা। হৃদয়ের বাসর-শয্যার বনফুল আর মন-মাধুরী ছড়িয়ে দিয়েছিল মনের খুশিতে।

সহসা চমকে উঠে আঞ্জা। তার অতীতের স্মরণ দলিলখানা অভিমানের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল যেন। বেত-ঝোপটার দক্ষিণ দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। অবাধ্য উত্তেজনায় ফেটে পড়ল আঞ্জা, "এত দেরী করলা কেন বোকাটার লাখন! আমার বুঝি ভয় ডর কিছু নাই?"

নীরব থাকে হুদু। কিন্তু তা বলে ক্ষমা পেল না সে। তীক্ষ্ন ছুরির ফলার মত আঞ্জার কথাগুলি তার অন্তরকে বিদ্ধ করতে চাইল। "আমার উপর গোসা হইতে হইবে না। এখন নায় ওঠো।"

হুদু নৌকা খুলে দিল, তাকিয়ে রইল অসহায় চোখে আঞ্জার দিকে। কিছুটা সময় চলে গেল। অভিমানের বোঝা একটু হাল্কা হলো। আঞ্জা বলে, "আমার উপর রাগ করলা? রাইত ভোর হইয়া গেলে শালিমটায় মেঘনা জল তরে উঠাইয়া ফেলাইব না—সে খেয়াল আছে?"

হুদু সবিনয়ে জবাব দেয়, "এখনো অনেক রাইত আছে আঞ্জা। তুই ভাবিস না। ঠিক পারুম রাতা-রাতি সাইবের চর ত্যাগ করতে।"

আঞ্জা এবার লজ্জিত হলো। মনে মনে সে নিজের রূঢ় ব্যবহারের জন্য নিজেকে তিরস্কার করল। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "এক সিলুম তামুক খাইয়া লও। সাজুম?"

এক গাল হাসি হৃদের সমস্ত আবিলতা মুছে দিয়ে গেলো। ড্যাবা ড্যাবা চোখে তাকাল সে। আবেগস্পন্দিত অন্তরে বলল, "এইজন্যই তো মানুষ তার মনের মানুষ খোঁজে—যেমন তুই আমার!"

বৈঠা হাতে মেঘনার উজান ঠেলে এই মানুষটাই একদিন আঞ্জার যৌবন-রাজ্যের সম্রাট হয়ে দেখা দিয়েছিল। শৈশবের লীলানীল প্রত্যূষে যৌবনের উপকূলে দাঁড়িয়ে দেখেছিল হৃদু, দেখেছিল পথে চলতে চলতে সন্ধ্যার সিঁদুরমাখা মদির গোধূলিতে আঞ্জাকে।

জিজ্ঞাসা করেছিল হৃদু, "নাম কি তোমার?"

ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল সে, "আঞ্জা।"

"ঘর?"

কোমল মসৃণ একখানা হাত তুলে ঘরের সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিল আঞ্জা, "ঐ চরে। মজিদ মিঞা আমার চাচু হয়। তারে চিনতে পারলা?"

মাথা কাত করে সম্মতি জানিয়েছিল হৃদু। বলেছিল ছোট্ট করে, "তারে চিনতে পারব না, সে না চাউলের ব্যাপারী?"

"ঠিক ধরছ। নামকরা চাউলের ব্যাপারী।"

হৃদু বিস্ময়াবিষ্টের মত জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি এ কাজ কর ক্যান?" ঠিক সেই সময় আঞ্জার ইচ্ছে হচ্ছিল দুঃখের অধ্যায়টা খুলে ধরতে। কিন্তু কি ভেবে যেন সব কথা গোপন করে মাত্র একটি কাতর প্রার্থনা নিবেদন করেছিল, "পার আমাকে এইখান থিকা পার করতে? তোমার ঘরে কাম করমু। দুই ব্যালা দুই গ্যারাস ভাত দিও।" অধীর আগ্রহে হৃদু আর একটু এগিয়ে এসেছিল আঞ্জার কাছে। একটা অবাধ্য উত্তেজনায় আঞ্জার হাতখানা মুঠোর মধ্যে ধরে মৃদু একটা চাপ দিয়ে বলেছিল, "পাগলি নাকি রে! তোর মরাইর ধান খাইবে কে তার নাই ঠিকানা, আমি খাওয়ামু তোরে। এইটা কি একটা কথা কইলি?"

আঞ্জা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, "না, না, আমারে তুমি মেঘনার ওপারে নিয়া চল। চাচুর ছাওয়ালটা বড় মন্দ মানুষ। আমারে রোজ মারে। সকাল হইলে ক্ষেতে পাঠাইয়া দেয়। আমি না যাইতে চাইলে হাত-পা বাইন্দ্যা বান্দীর লাখান ঘরে আটকাইয়া রাখে। এক ফোঁটা জলও দেয় না খাইতে।"

ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞেস করেছিল হৃদু, "তোর উপর সেইটায় এত খ্যাপা কেন?"

আঞ্জা কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে জবাব দেয়, "সেইটায় আমারে সাদির লোভ দ্যাখায়। আমার মুখের কথা চায়। হাত ধইরা টানাটানি করে। কিন্তু সেইটার চরিত্রের বড় দোষ। আমার একটুও ভালো ঠেকে না।"

একটা বজ্র পতন হয়েছিল তখন। নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হৃদু। বলেছিল তারপরে, "আমার সঙ্গে তুমি যাবা কোথায় আঞ্জু?"

"যেখানে খুশি নিয়া চল। শয়তানটায় আমারে টিকতে দিব না ঘরে।"

"কিন্তু তোমারে নিয়া আমি কি খাওয়ামু? রাখমু কোথায়? এমন পিক্তিওমা নিয়া কোথায় বসামু আমি!"

দুজনেই নীরব। সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছিল আঞ্জা। হৃদু নির্বাক প্রহরীর মত অপলক আঁখিপাতে প্রত্যক্ষ করেছিল আঞ্জাকে।

বলেছিল এক সময় আঞ্জা, "তোমার ঘরে আর কেটা আছে?"

সহসা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চমকে উঠেছিল হৃদু। তার জীবনের স্বর্ণ-গেহগুলির পেছন থেকে আরো কয়েকটি পেছনের দিন উঁকি মেরেছিল তখন। একটা আহত পাখির মত দু'হাতে চুলগুলো এলোমেলো করতে করতে বলেছিল, "আর কেউ নাই।"

আঞ্জা আরও ঝুঁকে পড়ল। সে যেন তখনই যেতে পারলে মহা নিরাপদ হয়ে যায়। তার বেদনাহত অন্তরের সমস্ত আবেগ উজাড় করে দিয়ে বলেছিল সে, "একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিও। আর কিছু চাই না আমি।"

থরথর করে কাঁপছিল তখন আঞ্জার দেহখানা। চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছিল। ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল ওষ্ঠ-যুগল। অজ্ঞাত জীবনটার পর একটা তীব্র ঘৃণায় সে নির্মম হয়ে ছুটে যাচ্ছিল মেঘনার কিনারে।

মেঘনার উদার পরিধি ক্রমে ঘন হয়ে এল। এক-মাল্লাই ডিঙির ঢেউ-ভাঙা পাড়ি মেঘনা মোহনাকে আড়ষ্ট করে দিল। নীরব ঘন অরণ্যের ছায়া-মেদুর পল্লব-মর্মরে ওদের মনের গহিন গাঙে জেগে উঠল মেঘনার উচ্ছল যৌবন। আঞ্জা আর হৃদু এক অপরের পরিপূরক হয়ে দেখা দিল।

সেই মানুষটার সঙ্গে চলছে আজ আঞ্জা তার স্বপ্নের দেশে। যেখানে ওদের কেউ চিনবে না। কেউ ওদের হদিস জানবে না। সুখের ঘর বাঁধবে। দিন কাটিয়ে দেবে নিভৃতে, নিরালায় পরম আনন্দের সঙ্গে। শালিমের পীড়নের উদ্ধত আঘাতে ফেটে রক্ত বের হবে না আঞ্জার

দেহ থেকে। চোখের জলে ভিজে যাবে না ঢেঁকিঘরের মাটি। সে আজ মুক্ত। উদ্দাম—এই মেঘনার মতই।

হুদু প্রাণপণ করে শক্ত হাতে বৈঠা টেনে চলল। এই নিশি রাত্তিরেই তাকে পেঁাছে যেতে হবে মেঘনার ওপারে। আপ্পা এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে।

সারা রাত্রি কেটে গেল। রূপতলির খালটার মুখে এসে নৌকো লাগলো হুদুর। আর ভাবনা নেই। শালিমের চিন্তারও বাইরে এসে পড়েছে ওরা।

বিলিতি মানুষ ব্রাউন সাহেবের বিশাল সম্পত্তি এখানে। ছোট ছোট জমিদারের আজন্মের সঞ্চয়ের 'পর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল সাহেবের সাম্রাজ্যটার। দিনমজুর স্থায়ী কর্মীর নিত্যপ্রয়োজন এখানে। কর্ম-সন্ধানী হুদু এ খবরটা শুনেছিল অনেকদিন পূর্বেই। কিন্তু এ গাঁয়ে হুদু একেবারেই নতুন। হাল নেই। বলদ নেই। আছে তার শক্ত দেহটার রক্তের অশ্রান্ত প্রবাহ আর থাকবার মধ্যে সম্বল করে এসেছে একখানা ডিঙি নাও। দেশের বাড়ীতে নৌকা বেয়ে জীবিকার সংস্থান করত সে। এখানে ও কি করবে? কেমন করে ব্যবস্থা করবে দানা-পানির।

দুটো রাত্রি কেটে গেল মহা দুর্ভাবনার মধ্য দিয়ে। এবারে পারে উঠল হুদু।

কাঁচা রোদ্দুরের সোনালী আলো উজ্জ্বল করে দিয়েছে ধানবন আর সর্ষে ক্ষেত। পরিশ্রমী মানুষ পথে নেমে পড়েছে। হুদু নৌকা থেকে উঠে সটান চলে গেল সাহেবের কাছারীর দিকে।

কাছারীর নায়েব শশি সামন্ত। একটা হাতবাক্স নিয়ে বসে আছে। লাল টকটক করছে তার কোটরগত চোখদুটো। প্রশস্ত বক্ষ। কালো হাঁড়ির মত মস্ত মাথা, দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটা আদিম জিজ্ঞাসা। বাঘে-মোষে জল খায় এক ঘাটে তার হুকুমে। এইজন্যই সাহেব তাকে ভালবাসে।

হুদু প্রথমটা সাহস পাচ্ছিল না তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু তার প্রয়োজনের নদীতে উত্তাল তরঙ্গ। সে কেমন করে বসে থাকবে আর? পা টিপে টিপে ঢুকল নায়েবের ঘরে। প্রণাম করল। দাঁড়াল বিস্তৃত বক্ষটা ফুলিয়ে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল নায়েব। দেখল হুদুর দেহখানা। ঠিক এমনি একজন লোকের প্রয়োজন ছিল তার। বহুদিন ভেবেছেও। জিজ্ঞাসা করল শশি সামন্ত, "তোমার নাম কি?"

আড়ষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল হুদু, "আইগ্যা আমার নাম হুদু বয়াতী।"

"কাছারী দেখতে এসেছো?"

"না হুজুর। একটা কাম কম্ম চাই।"

শশি সামন্ত বসতে বলল তাকে। বসল হুদু। জিজ্ঞাসা করল নায়েব, "কে আছে তোমার সঙ্গে?"

"হুজুর আমার বউ আছে।"

"কোথায় সে?"

"নায়ে।"

"তোমার নৌকো?"

"আইগ্যা হ।"

"মেঘনায় পাড়ি ধরছো কোন দিন? ঝড়ে পড়েছো?"

একটু হেসে বলল, "আপনার আশীর্বাদে হুদুরে হাতে বৈঠা থাকতে —সে কাইতানের ডর করে না।"

আত্মতৃপ্তির আবেগে বুকটা উঁচু হয়ে ওঠে হুদুরে। নায়েবের মনটা ভরে যায় খুশীতে। বলে দেয় সে, "কালকে থেকে তোমার কাজ হলো, আজ বউকে নিয়ে বাঁশবাড়িতে থাকগে যাও।"

তহশিলদার ওমরালীকে ডেকে বলে শশি বাঁশবাড়িটা দেখিয়ে দিতে হুদুকে।

ঘরখানা কাছারীর দৃষ্টিগন্ডীর মধ্যে। হেলে-পড়া বাঁশবন-বেষ্টিত একটি ছাতিম গাছ। তার নীচে কাঠা পাঁচেক জমি জুড়ে বাড়িখানা। ঘরের পেছনে তিন চারটি নারকেল গাছ। বাড়ির চতু-র্দিকে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে আট দশটি সুপারী গাছ। পাশেই নদীর শাখা। জোয়ার এলে হুদুরে আঙ্গিনা পর্যন্ত জল ওঠে। নৌকাখানা একটা আমগাছের গুঁড়িতে বেঁধে রাখে হুদু। জল নেমে গেলে নৌকাখানাও নেমে যায় অনেক নীচে।

নিজের স্বপ্নের সঙ্গে সব কিছুরই একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পায় সে। আঞ্জাকে ডেকে বলে হুদু, "বউ, ভগ-বানের দয়ায় এমুনে পাইলা। জিগাই, এমুন মানুষ তুমি আর দ্যাখছ জীবনে? এ যেন ঠিক আমাগো দশরথের পুত্তুর রামচন্দর।"

চপলমতি আঞ্জা একটু মুচকি হেসে বলে, "কাজ পাইলা। ঘর পাইলা। এখন আমারে দিবা কি?"

হুদু একটু এগিয়ে এসে বলে, "তোরে আমার সব দিমু। তুই আমার আসমানের চাঁন্। ক' কি চাই তোর?"

আঞ্জা কানের কাছে মুখখানা নিয়ে বলে, "আমার নাকের বেশরটা চাচার ছাওয়ালটায় খুইল্যা নিছে। তুমি আমারে একটা বেশর দিও। বেশর পরতে আমার খুব জুইত লাগে।"

কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে হুদু বয়াতী তার স্বপ্নের স্বর্গ রচনা করবার জন্য জীবনটা অন্ত করে দেয়। কাজ পেয়েছে সে। মাঝির কাজ। সকালে পানি-ভাত খেয়ে ডাঁশিলে বের হয়। ফিরে আসে সন্ধ্যার পরে। তারপর দু-একটা কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে সে। আঞ্জা মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় হুদুরে। বাতাস করে তালপাতার পাখা দিয়ে। গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে তার হাতের পাখাখানাও পড়ে যায় এক সময়।

দুপুরের সূর্যটা চলে গিয়েছে পশ্চিম দিগন্তে। মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছে ধূসর গোধূলি। শশি সামন্ত বেড়াতে বেরিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে বাঁশবাড়ীতে চলে এলো। ডাকল হুদুর বউকে। হন্তদন্ত হয়ে বাইরে এলো আঞ্জা। শশি দরদী সুরে শুধায়, "কেমন লাগছে এ জাগায়?"

মাথা কাত করে ইঙ্গিতে বলে আঞ্জা, "ভালো।"

"অসুবিধা হচ্ছে না তো কিছু?"

এক মাথা ঘোমটার মধ্য থেকে ছোট্ট একটা উত্তর দেয় আঞ্জা, "না।"

গাঁয়ের বধূ। পদ্মা-মেঘনার দেশের মেয়ে। সহজ সরল মন নিয়েই সেদিন বসতে দিয়েছিল নায়েবকে ঘরে। সানকি-খানা এগিয়ে দিয়েছিল পান ভরে। তামুক সাজিয়ে হাতে হাতে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়েছিল আঞ্জা। বলেছিল, "তামুক কিন্তুক ক্ষেতের।"

একটু হেসে শশি সামন্ত বলেছিল তখন, "তোমার হাতের ছোঁয়ায় এ যে মিঠে হয়ে গেছে বউ।"

শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে ভরে গিয়েছে আঞ্জার বুকটা। বারে বারে প্রণাম জানিয়েছিল। অন্তরের অজস্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছে, "আপনার দোয়ায় কত্তা বাইচ্যা গেলাম।"

শশি একটা উদাস ভাব নিয়ে শান্ত অথচ কম্পিত কন্ঠে তখন বলেছে, "মানুষ কি করতে পারে। সবই খোদার ইচ্ছা। তোমাকে এত রূপ গুণ দিয়ে এ ঘরে পাঠান কি ঠিক ছিল খোদার? তাঁর কাজ বুঝতে পারি এমন সাধ্য কার?"

দেখতে দেখতে লাল হয়ে গিয়েছিল সেদিন নায়েবের মুখখানা। কাঁপছিল হুঁকো-ধরা হাতখানা। বারে বারে শুকিয়ে আসছিল তার কন্ঠ। জল চেয়েও খেয়েছিল তখন। আঞ্জার রূপের গহনে অতলায়িত হয়ে গিয়েছিল সে। তবুও সহজ-মন আঞ্জা বুঝে উঠতে পারেনি তাকে। হুদু বয়াতীর স্বপ্নসাধনার পিছু পিছু নায়েবের মনটা খ্যাপা হাতির মতই ধেয়ে চলছিল তখন। বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল শশি সামন্ত আঞ্জার রূপ দেখে। ভালো লেগেছিল তার চোখে আঞ্জার নিশার মত কালো এক গোছা চুল। শ্বেতচন্দনের মত শুভ্র দেহের রং। আয়ত আঁখি। রক্ত রঙ্গিন অধর। ভাল লেগেছিল আঞ্জার চপল মধুর চাহনিটুকু। সে চোখের মায়ায় পাগল করে দেয় পুরুষচেতনাকে। এনে দেয় রক্তের মধ্যে একটা অবাধ্য নর্তন। নায়েব তখন নিয়তই ভাবছিল "মাঝি-মাল্লার ঘরে আঞ্জা বেমানান।"

এমনি করে নায়েবের যাতায়াতটা ঘন হয়ে এলো ক্রমে। কোনদিন ক্ষণেকের জন্যও আঞ্জা নায়েবের দুষ্ট মনের গুঞ্জ-রণ শুনতে পায়নি। তার সরল মনের কাছে গরলও গিয়েছে অমৃত হয়ে। নায়েবের ভ্রূকুটি-কুটিল লুব্ধ চাহনিকে সংশয়হীন চিত্তেই মেনে নিয়েছিল সে এতদিন। কিন্তু অঘটন ঘটল সেদিন, যে-দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকী আঞ্জাকে ঘরে পেয়ে নায়েব অলক্ষ্যে প্রবেশ করে বলেছিল, "তোমাকে এ ঘরে মানায় না বউ। কাছারীতে যেও মাঝে মাঝে।"

আঞ্জার বুকটা দুরুদুরু করে উঠেছিল তখন। তার অন্তরায়তনে আভা-সিত হয়েছিল শালিমের কদর্য চেহারাটা। সংগে সংগে নায়েবের তামুক খাওয়া, জল চাওয়া এবং সময়ে অসময়ে এসে তত্ত্ব-তালাফি করবার কারণটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেদিন। ঘৃণায় বিষিয়ে উঠেছিল সে। ছোট্ট করে একটা নালিশ জানিয়ে-ছিল সে হুদু বয়াতীর কাছে, "নায়েব মানুষটা মোটেই ভালো নয়।"

কিন্তু ফল হয়েছিল উলটো। হুদু চোখ রাঙ্গিয়ে তিরস্কার করে উঠেছিল আঞ্জাকে, "তোর কিন্তুক বড় রূপের দেমাক্। কারে কি কস দিশা থাকে না।"

অনেকগুলি দিন কেটে গেছে। নায়েব আর আসে না। আঞ্জার আগমন প্রত্যাশায় অনেকগুলি গোধূলিকে সে প্রত্যক্ষ করেছে নীরবে বসে বসে। ভেবেছিল নায়েব আঞ্জা তার ডাকে সাড়া দেবে।

কাছারীর জরুরী কাজে হুদু বেরিয়ে গিয়েছে সকালে। বলে গেছে আঞ্জাকে, "বউ জিগাই, রাত্তিরে ডর করব নাকি? আইজ কিন্তুক ফিরমু না। সাব-ধান মত থাইক্যো।"

আঞ্জা জিজ্ঞাসা করেছিল, "কখন আসবে?"

জবাব দিয়েছিল হুদু, "তা প্রায় ভোর হইয়্যা যাইবো।" একটু নীরব থেকে আবার বলেছিল, "বউ, ও বউ, একটা কথা শুনছো?"

ভীরু ভাবনায় দুরুদুরু করে উঠেছিল আঞ্জার বুক। বলেছিল, "কি কথা?"

"শোনলাম শালিম নাকি তোমার খোজে গ্যারামে গ্যারামে লোক পাঠাইছে। মোজাম্মেল সরদারকে খবর পাঠাইছিল, সে যায় নাই। এইখানে আসতে পারব না। এইটা খাস বিলাতি সাইবের তালুক।"

গর্বে বুকটা উঁচু হয়ে গিয়েছিল হুদুর। এক ঝলক প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার মুখখানা। আঞ্জাকে আশ্বাস দিয়েই বলেছিল, "আইজ তোমার বেশর দিবে, কামারে কইছে।"

বেশরের নাম শুনে পরিতৃপ্তিতে ভরে গিয়েছিল আঞ্জার বুক। হুদুর কাছে এগিয়ে গিয়েছিল, একটু হেসে বলেছিল, "সাবধানে যাইও। আকাশে কাইত্তানে মেঘ দেখলে গাঙে পাড়ি দাও বুঝি! সাবধান, আমার মাথা খাও। মনে থাকে যেন্।"

সন্ধ্যার সিঁদুরমাখা গোধূলি। রক্তলোহিত আকাশ। পশ্চিম দিগন্তটা সূর্যের বিদায়-বিষাদে ম্লান। বাঁখারীর বেড়ার ফাঁক দিয়ে তারই ক্ষীণ রশ্মিটুকু এসে পড়ছে আঞ্জার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের 'পর। মোজাম্মেলের কথা সে ভাবছিল তখন। শালিমের বন্ধু মোজাম্মেল। আঞ্জার পরিচিত। শুধু পরিচিতই নয়—একটা সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল তার সংগে। আঞ্জাকে সে ছোট বোনের মত স্নেহ করে। কিন্তু টাকার লোভে হয়ত অতীতকে সে তীব্র কটাক্ষ হেনে কার্যটা সমাধান করে ফেলবে। সত্যি ভাবতে বড় ভয় লাগছিল আঞ্জার। চাচুর ছাওয়ালটায় যে তাকে কোনদিন ভুলতে পারবে না, এক কথা আঞ্জা জানে। মনটা সহসা রোষদীপ্ত হয়ে উঠে। ঘৃণায় বিদ্বেষে মনটা ভরে যায়। ইচ্ছে হয় তার এ কলঙ্কিত জীবনটা বিসর্জন দেয় মেঘনার গহিনে।

নায়েব কাছারীর পথে ফিরতে ফিরতে আর একবার ভালো করে দেখে নিল আঞ্জাকে। তার বাসনা-বিলোল মনটা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। কামনার সমুদ্রে এসে পড়েছে একটা উত্তেজনার ঢেউ। আয়োজন পূর্ণ। চান্দখালির নামকরা সরদার মোজাম্মেল আসছে আজ। একশত টাকার বিনিময়ে এমন একটা নারী-দেহ। সে অনেক লাভের। নায়েব গর্বিত অন্তরে ধীরে ধীরে ফিরে গেছে কাছারী-বাড়িতে।

মোজাম্মেল এলো। এলো শালিমের হুকুমনামা নিয়ে নয়—নায়েবের ফরমাসে। একশত টাকা বায়না। দু-মাসের সংস্থান। এ রাত্রিটার সম্রাট আজ মোজাম্মেল সরদার।

রাত্রির অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে আসে। ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রাম। নিশীথের বুক চিরে ভেসে আসছে দূরতম মেঘনার ঢেউয়ের উত্তাল ধ্বনি। মোজাম্মেল এক সময় এসে পৌঁছে যায় বাঁশবাড়িতে। তার কাপড়ের খুঁটে একশত টাকার একখানা নোট শক্ত করে বাঁধা। মুখে আঁটা কালো একখানা রুমাল। চামরার কোষে চক্চক্ করছে ছেনদাখানা।

"কখন আসবে?"

বাঁখারীর বেড়াটা টান দিতেই একটা শব্দ হলো। উঠে বসল আঞ্জা।

মোজাম্মেল ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে ঘরে। চিৎকার দেওয়ার সময় পেলো না আঞ্জা। মুখের 'পর গামছাটা চেপে ধরে চাপা গলায় বলল সরদার, "চিল্লাও তো একেবারে খুন কইরা ফেলুম।"

থরথর করে কাঁপতে থাকে আঞ্জা। মোজাম্মেল বগবদাবা করে বাইরে বেরিয়ে আসে তাকে নিয়ে।

কাছারীর সামনে এসেই চমকে উঠে মোজাম্মেল। অতর্কিতে তার কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে আসে, "তুই! আঞ্জা!"

মুহূর্তে একটা বিবর্তন ঘটে গেল। আঞ্জার মুখ থেকে সরিয়ে আনল গামছাখানা মোজাম্মেল। চকচকে ছেনদাটা বাম হাতে তুলে দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে যায় মোজাম্মেল। খালপাড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল একশ টাকার নোটখানা। তারপর নিক্ষেপ করলো জলে। অন্ধকার রাত্রির সংগে মোজাম্মেল তার কলঙ্কিত জীবনটা মিলিয়ে দিতে চেয়েছিল তখন।

কাছারীর অন্দরে নায়েবের ঘরটা আজ যেন একটা বাদসাজাদার বিবির মহলের ন্যায় রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিছানার ফুলঝুরি চাদরের 'পর বন্দিনী আঞ্জাকে জাপটে ধরতে উদ্যত হয়ে বলল শশী, "কত বড় সতীর বিটি! চাক্কু না দেখলে তেজ মরে না বুঝি?"

বিষধর সর্পের মত উদ্ধত ফণায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আঞ্জা। ঝকঝকে ছেনদাটা রক্তের আস্বাদে অনেকটা বসে গেল। নীরব রাত্রির অন্ধকারে রক্তসিক্ত হাতখানা ঝেড়ে এতক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে আঞ্জা খালটার মুখে। এইমাত্র হুদুর নাওখানা ভিড়ছিল। সদাগাড়া লগিটা টেনে তুলল হুদু।

সাহেব-কাছারীতে রক্তাক্ত লাশটা নিয়ে নিশ্চয়ই হট্টগোল পড়ে গেছে এতক্ষণে।।

সবিনয় নিবেদন,

আমি আপনার অমৃত পত্রিকার একজন নূতন পাঠক। পত্রিকাটি আমার মোটামুটি বেশ ভালই লাগে। বিশেষকরে 'জানাতে পারেন' বিভাগের প্রশ্ন-উত্তরগুলির জন্য আমার মন প্রতি আগামী সপ্তাহের দিকে উৎসুকসহকারে অপেক্ষা করে। সত্যি, আপনার পত্রিকার এই 'জানাতে পারেন' বিভাগটি আমার যে কত ভাল লাগে তা লিখে প্রকাশ করা যায় না। তবে হাঁ অন্যান্যগুলোও যে ভাল লাগে না তা নয়। তবে পাঠকসমাজের সুবিধার্থে আপনি যে এই 'জানাতে পারেন' বিভাগ প্রকাশ করেন তা বোধ হয় সকল পাঠকের কাছে, অন্যান্য বিভাগের চাইতে খুব কম উপকারী নয় বলে আমার বিশ্বাস। কারণ এটাতে যে কত নানান রকম জিনিস সম্বন্ধে জানা যায় ও প্রশ্ন করা যায়, তা যে সমস্ত পাঠক একটু গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন তাঁরাই বলতে পারেন। আমি অন্যান্য অনেক রকম নামধারী পত্রিকা পড়েছি, তবে এই সিস্টেমটি সবগুলোতে দেখতে পাইনি। বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন তা যথেষ্ট নয়। তাই ছাত্ররা যে শিক্ষা স্কুল, কলেজ থেকে পায় তা একটা নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার পরিধি খুবই সংকীর্ণ। আর শিক্ষা যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে আমরা তাঁদের জ্ঞান সম্বন্ধে কতটুকুই বা আশা করতে পারি। সেইজন্যে আমার বিশ্বাস যদি তাঁদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি স্কুলে পুস্তকের মধ্যে আটকে পড়ে থাকলে চলবে না। পড়তে হবে অন্যান্য অনেক রকম বই। মিশে যেতে হবে বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে, পরিচিত হতে হবে প্রকৃতির রাজ্যের সঙ্গে। আর এইগুলোর বাহন হিসাবে আসে আজকাল নানান রকম পত্রিকা ও পুস্তকের মাধ্যম। তাই আমার মনে হয় যাঁদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ তাঁরা ও অন্যান্য সকলেই যদি এই পত্রিকায় উক্ত বিভাগটি পড়েন তাহলে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেন তাঁদের জ্ঞান-ভান্ডারে। এবং আমারও মনের আসল গোপন কথাটিও তাই। সেইজন্যই আমার মনে আপনার ঐ বিভাগটি আমার অজান্তে কখন যে তার রুচিমত করে
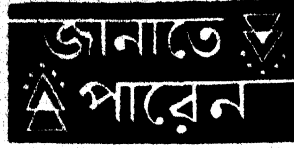
স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছে তা টের পাইনি। তবে এর ক্রিয়া বুঝতে পারি তখন, যখন আগামী সংখ্যা প্রকাশ হবার সময় হয়ে পড়ে।

যাই হোক, আজ আর বেশী কিছু লিখব না। জানি না আপনি আমার এই হীন কলেবর কথাগুলির প্রতি মনোযোগ দেবেন কি না। বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আপনার কাছ কয়েকটি বিষয়ে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। প্রথমতঃ আমি একজন স্কুলের ছাত্র। তাই এই লেখার মধ্যে কোন ভুল বা অপ্রীতিকর কোন কিছু লেখা যদি থাকে তাহলে মাপ করবেন। দ্বিতীয়তঃ আপনার কাছে হয়ত অনেক অনধিকার চর্চা করে ফেলেছি এবং এছাড়াও যদি কোন ভুল করে থাকি তার জন্য।

নিতাই মন্ডল।
মল্লিকপুর

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের অতি চিত্তাকর্ষক বিভাগ 'জানাতে পারেন'-এ দুটি প্রশ্ন পাঠালাম। আশা করি সদুত্তর পাব।

(ক) ভারতের জাতীয় পতাকা কবে, কার পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছে।

(খ) যানবাহন চলাচল উপযোগী কোন্ কোন্ রাস্তা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ এবং বিস্তৃত।

শ্রীপ্রতাপকুমার সেন,
২৩।৩, গড়িয়াহাট রোড,
কলিকাতা—১৯।

সবিনয় নিবেদন,

আমার দুইটি প্রশ্ন 'জানাতে পারেন' বিভাগে পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরছি, হয়তো এঁদের কাছ থেকেই এদের সঠিক জবাব পেয়ে যাব।

(ক) 'সুখ' কথাটির সংজ্ঞা কি?

(খ) শিক্ষিত বেকার পৃথিবীর কোন্ দেশে বেশী, পশ্চিমবঙ্গেই বা কত?

বিভূতি চৌধুরী
১৩।১, রামনগর,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'জানাতে পারেন' বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে যদি কিছু কেউ জানাতে পারেন ত বিশেষ বাধিত হ'ব।

'ছুলী' জাতীয় চর্মরোগের হাত হ'তে অব্যাহতি পাওয়ার কি কোন প্রতিষেধক আছে? যদি থাকে ত সে প্রতিষেধকের নাম কি?

আব্দুল মজিদ,
হিরাজুলী চা-বাগান, পোঃ পানবাড়ী,
দারাং (আসাম)।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ৪ঠা অক্টোবর 'অমৃতে' প্রকাশিত শ্রীচিন্ময় চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তর পাঠাচ্ছি।

(১) বর্তমান কালের পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ লাইব্রেরী সোভিয়েৎ রাশিয়ায় অবস্থিত। ১৯৫৮ সালের হিসাবে এই লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৭৮ লক্ষ।

(২) চিন্ময়বাবু তাঁর ২নং প্রশ্নে 'কোন দেশ' বলতে সম্ভবত 'কোন বিদেশ' বোঝাতে চেয়েছেন। পশ্চিমের ইংরেজী ভাষাভাষীর লোকেরাই সর্বপ্রথম সত্যজিৎ রায়কে সম্মান প্রদর্শন করে। সত্যজিৎ রায়ের প্রথম প্রয়াস 'পথের পাঁচালি' লন্ডনে এত জন-সমাদর লাভ করে যে, একটি সিনেমা হলে একাদিক্রমে ৫৬ সপ্তাহ চলে

(৩) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কে এমন প্রশ্নের উত্তর এক কথায় কারও নাম বলা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে নোবল পুরস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকাবাসী বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত কর্মী বার্নার্ড রাসেল যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তাতে দ্বিমত নেই।

—শ্রীমানবেন্দ্র নাগ,
জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ,
জলপাইগুড়ি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি • আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি • আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি • আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি •

প্রতি মাসের ৭ই আমাদের নতুন বই প্রকাশিত হয়

৭ই আশ্বিনের বই

অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা কথাশিল্পী

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

অসাধারণ উপন্যাস

অমৃত সঞ্চয় ৮·৭৫

[১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লিখিত জাগ্রত জনগণের জীবনবেদ]

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি

৭ই আশ্বিনের বই

বিনয়জীবন ঘোষের

চকিতচমকে ২·৭৫

[গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখেছেন : ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ জীবনে অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে। চলার পথে নির্মল হাস্য-কৌতুকের যে-সব টুকরো চোখে পড়েছে, তারই কিছু কিছু কুড়িয়ে সাজিয়ে এখানে বিতরণ করেছি]

৭ই কার্তিকের বই

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নবতম সুবৃহৎ উপন্যাস

বাসর লগ্ন　৮·৭৫

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গল্প ও উপন্যাসের বই

'বনফুল'এর
হাটে বাজারে
৩·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মৌসুমি
৩·০০

নবেন্দু ঘোষের
পাপুই দ্বীপের কাহিনী
৩·৩০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
তুমি আর আমি
২·৩০

প্রশান্ত চৌধুরীর
স্বগতোক্তি
৩·২৫

সত্যপ্রিয় ঘোষের
গান্ধর্ব
৩·৫০

বিমল মিত্রের
কন্যাপক্ষ
৩·২৫

দীপক চৌধুরীর
নীলে সোনায় বসতি
৩·৫০

সন্তোষকুমার ঘোষের
পারাবত
৩·০০

শচীন্দ্র মজুমদারের
লীলা মৃগয়া
৩·০০

চিত্তরঞ্জন মাইতির
অগ্নি কন্যা
৩·০০

দেবেশ দাশের
রোম থেকে রমনা
৩·৫০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৩য় বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৯শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭০
Friday, 22nd November, 1963 40 Naya Paise.

সূচীপত্র

সাপ্তাহিকী

॥ জাতীয় উন্নয়ন ॥

নয়াদিল্লীতে গত ৮ই নভেম্বর জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুই দিবস-ব্যাপী বৈঠকের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রিগণকে কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অনুরোধ জানান। তাঁর দৃঢ় উক্তি : কৃষি হচ্ছে উন্নতির চাবিকাঠি—সর্বরকম অগ্রগতির ভিত্তি। বৃহৎ কারখানা স্থাপনের মাধ্যমেই দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে—এ একটি অলীক স্বপ্ন। সোজা কথায় কৃষিক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে শিল্পক্ষেত্রেও আমরা অনিবার্যরূপে ব্যর্থ হব।

৯ই নভেম্বরের বৈঠকে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ রাজ্য সরকারগুলি যেন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হবার পূর্বেই ভূমিসংস্কার কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করেন, সেভাবে আহবান জানান। বৈঠকের সমাপ্তি মুহূর্তে শ্রীনেহরু ভূমি সংস্কার-ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি নিয়োগ বিষয়ে ঘোষণা করেন। আলোচ্য কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ।

॥ চতুর্থ যোজনার লক্ষ্য ॥

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সাম্প্রতিক দিল্লী বৈঠকে চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার লক্ষ্য এবং তা রূপায়ণের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একটি খসড়া পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছে : সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ গঠনই জাতীয় পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধীরে ধীরে এই উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা করা হবে। নতুন সমাজ এমনিভাবে গড়ে তোলা চাই, যেখানে সর্বনিম্ন আয় সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকবে, ক্রমিক পর্যায়ে বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা থাকবে, জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মানের উন্নতি হবে এবং উৎপাদন এমন পন্থায় হবে, যাতে করে অল্পসময়ের মধ্যে দেশের পক্ষে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মতে সকল প্রচেষ্টার পরও যদি দেখা গেল—মানুষ খেতে-পরতে পাচ্ছে না, তার দুর্গতিই চলেছে, তাহলে সেই উদাম ব্যর্থ বুঝতে হবে। মানুষের উন্নতি ও কল্যাণই হলো পরিকল্পনা রচনার আসল লক্ষ্য।

॥ বিমান মহড়া ॥

ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি সুদৃঢ় ও জোরদার করার কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে ৯ই নভেম্বর পূর্বাঞ্চলে যৌথ বিমান মহড়া (শিক্ষণ) আরম্ভ হয়। আমেরিকা, বৃটেন ও অস্ট্রেলিয়ার বিমান বাহিনীর বিমানের সহযোগিতায় এই অভিনব মহড়া চলে। সূচনা দিবসে কলকাতার সন্নিহিত কোন বিমান-ঘাঁটি থেকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ১১ ঘন্টাকাল নকল বিমান 'আক্রমণ' ও তা প্রতিরোধ সংক্রান্ত মহড়া হয়। ১৪ই নভেম্বর থেকে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে এই 'শিক্ষণ' বিমান মহড়া চলে এবং উভয় ক্ষেত্রেই মহড়ার নেতৃত্ব করেন এয়ার ভাইস মার্শাল অর্জন সিং।

॥ বেরুবাড়ী জরীপ ॥

৯ই নভেম্বর জলপাইগুড়ি থেকে প্রাপ্ত সংবাদ : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বেরুবাড়ী জরীপের কাজ আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু বেরুবাড়ী হস্তান্তর (পাকিস্তানকে) প্রতিরোধ কমিটি এই কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে চলেন গোড়া থেকেই। ওদিকে ৫ই নভেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ পায়—বেরুবাড়ীর সহিত আরও দুই বর্গমাইল অঞ্চল (চিলা-হাটি মৌজা) পাকিস্তানকে হস্তান্তরের ব্যবস্থা হচ্ছে। হস্তান্তর প্রতিরোধ কমিটি সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জনসভা করে এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঐ সভা থেকে একজন এম-এল-এ (শ্রীঅমরনাথ রায় প্রধান) সহ চারজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

বেরুবাড়ী হস্তান্তর বিরোধী আন্দোলনের মাত্রা এর ভেতর তীব্রতর হয়ে ওঠে। প্রতিরোধ কমিটির স্বেচ্ছা-সেবীদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনি উত্থিত হয় : জান দেব, প্রাণ দেব, বেরুবাড়ী ছাড়ব না; জরীপ দল ফিরে যাও, ফিরে যাও। বেরুবাড়ীর ১০ই নভেম্বরের সংবাদ অনুসারে চিলাহাটি গ্রামে পুলিশ এক স্বেচ্ছাসেবিকা দলের উপর লাঠি চালনা করে, যার ফলে ১১ জন মহিলা আহত হন। জরীপ কার্যে বাধা দানের জন্য ১১ই নভেম্বরও নারী ও পুরুষ সত্যা-গ্রহীরা দলে দলে অগ্রসর হয়ে যান। ঐ দিন পুলিশের নির্মম লাঠি চার্জে ২৫ জন সত্যাগ্রহী আহত হন বলে জানা যায়। বহুসংখ্যক সত্যাগ্রহীকে পুলিশ গ্রেপ্তার পর্যন্ত করে।

॥ নভশ্চারীর সফর ॥

সোভিয়েট মহাকাশচারিণী ভ্যালে-ন্টিনা তেরেশকোভা ও তাঁর স্বামী রুশ নভশ্চারী মেজর নিকোলায়েভ দশ-দিনব্যাপী ভারত সফর উদ্দেশ্যে দিল্লী আগমন করেন গত ১০ই নভেম্বর। একই সঙ্গে সফরে আসেন রাশিয়ার অপর মহাকাশচারী লেঃ কর্ণেল ভ্যালেরী বিকোভস্কি ও তাঁর পত্নী ভ্যালেন্টিনা বিকোভস্কি। রাজধানীতে পৌঁছিবামাত্র সম্মানিত অতিথিগণকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিমানঘাঁটিতে অভ্যাগতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির। রামলীলা ময়দানে বিশাল সম্বর্ধনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন—সোভিয়েট নভশ্চারী দল ভাবী যুগের প্রতিনিধি ও প্রতীক। এদিকে শ্রীমতী নিকোলায়েভের কণ্ঠে ঘোষিত হয় : মানুষের গ্রহান্তরে ভ্রমণের দিন আর দূরবর্তী নহে। ১১ই নভেম্বর অপর একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মেজর নিকোলায়েভও বলেন—সোভিয়েট মহা-কাশ যান শীঘ্রই গ্রহান্তরে যাত্রা করবে।

॥ পাঞ্জাব পরিস্থিতি ॥

পাঞ্জাব রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রণের বিরুদ্ধে জনমত ইতোমধ্যে আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। এমন কি, পাঞ্জাব কংগ্রেস পরিষদ দলের ১৬ জন সদস্য কায়রণের বিরোধিতা হিসাবে কংগ্রেস দল ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (চণ্ডীগড়, ৭ই নভেম্বর)। সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা চুপ করে বসে থাকেন না। চণ্ডীগড়ের ১৪ই নভেম্বরের সংবাদ : উক্ত ১৬ জন (কংগ্রেসের কায়রণ-বিরোধী উপদলভুক্ত) সদস্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়ার নিকট যুক্তভাবে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই উপদলের বিশিষ্ট নেতা শ্রীহরদোয়ারি-লালের এক বিবৃতিতেই সংবাদটি জানা যায়।

॥ যৌথ ইস্তাহার ॥

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের চার-দিনব্যাপী নেপাল সফর শেষ হলে পর গত ৮ই নভেম্বর তিনি ও নেপালরাজ মহেন্দ্র একটি যৌথ ইস্তাহার প্রচার করেছেন। কাঠমন্ডু ও দিল্লী দুই রাজ-ধানী থেকে যুগপৎ ইস্তাহারটি প্রচারিত হয়েছে। তাতে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে—কল্যাণ, স্বাধীনতা ও সংহতির জন্য ভারত ও নেপাল পরস্পরের প্রতি আগ্রহশীল। উভয় রাষ্ট্রের সুপ্রাচীন মৈত্রীবন্ধন ক্রমে আরও জোরদার করে তুলতে হবে।

॥ জাপানে দুর্ঘটনা ॥

টোকিও থেকে ৯ই নভেম্বর একই দিনে জাপানে দুইটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে সংবাদ পাওয়া যায়। তার একটি খনি বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা ও অপরটি তিনখানি ট্রেনের সংঘর্ষ। ১০ই নভেম্বর সরকারীসূত্রে বলা হয় যে, ঐ দুই শোচনীয় দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ছয় শতাধিক এবং আহতের সংখ্যাও দাঁড়াবে কয়েক শত। অনেকেরই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

সম্পাদকীয়
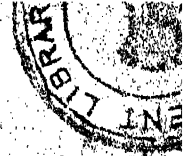
বিগত ১৫ই ও ১৬ই নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নেহরু তিনটি বিরাট কারখানার উদ্বোধনের কার্য সম্পন্ন করেন। সর্বপ্রথমে, রাঁচির নিকটে জগন্নাথপুরের হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের (ভারি যন্ত্রনির্মাণশালা) বিরাট কারখানার উদ্বোধন তিনি করেন। এইটিই ভারত সরকার স্থাপিত শিল্পোদ্যোগের মধ্যে বৃহত্তম হইল। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন যে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই এখন দেশের প্রধান কর্তব্য। শিল্প ও কৃষি দুইয়ের উপরই সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন কেননা কৃষি উৎপাদনই হইতেছে শিল্পায়নের মূলভিত্তি। শিল্প পরিচালনে শ্রমিকদের অংশদানে আবেদন জানাইয়া তিনি বলেন যে, শ্রমিকদের ডাইরেক্টোরেট-এ বেশী সংখ্যায় নেওয়া তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন। অন্যদিকে ধর্মঘট ও হরতাল যাহারা করায় তাহাদের নিন্দা করিয়া তিনি বলেন, ঐক্যের জন্যই ইউনিয়নের সৃষ্টি। শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধাইয়া দেওয়ার জন্য নয়। এবং সেই কারণে যাহারা গোলমাল পাকায় শ্রমিক ইউনিয়ন হইতে তাহাদের বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

ঐদিন ছিল দেওয়ালীর পুণ্যতিথি এবং সেদিন ছিল প্রধানমন্ত্রীর ৭৪ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৫ বর্ষের প্রথম দিন। সেই কারণে সেইদিনে নানাস্থানের সভা ও উৎসবের অনুষ্ঠানে সকলে তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

পরের দিন, ১৬ই নভেম্বরে তিনি দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত কয়লাখনির যন্ত্রনির্মাণ কারখানার উদ্বোধন করেন। কারখানা অবশ্য পূর্ণরূপেই চালু হইয়াছে, তবে এতাবৎ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন কেহ করেন নাই। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, এই কারখানা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আর একটি সোপান। তিনি বলেন দারিদ্র্যমোচন ও দেশ-গঠনের জন্য সর্বাগ্রে চাই বিজ্ঞানসাধনা ও পরিশ্রম। বিজ্ঞানকে খাটাইয়া এবং বেশী পরিশ্রম করিয়া ক্ষেত ও কারখানার উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে পারিলে উন্নতি অনিবার্য।

ঐখান হইতে ইস্পাত কারখানায় রেলের চাকা তৈরির কর্মশালায় গিয়া সেখানের কাজ দেখিয়া প্রধানমন্ত্রী বিস্ময় ও উল্লাস প্রকাশ করেন; পরে একটার সময় চিত্তরঞ্জন রওয়ানা হ'ন। সেখানে বিকালে চিত্তরঞ্জন কারখানায় তিনি ভারতে নির্মিত সর্বপ্রথম এ-সি বৈদ্যুতিক রেল এঞ্জিন আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেন। এঞ্জিনটির স্বর্গত ডাক্তার রায়ের নামে "বিধান" নামকরণ হয়। এখানের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, জনগণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রয়াস এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ ছাড়া কোনও দরিদ্র দেশের অবস্থা বদল হয় না। সেদিক দিয়া চিত্তরঞ্জন কারখানা জাতীয় প্রগতির প্রতীক।

এই নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে জয়পুরে যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয় তাহাতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও অন্য অনেক নেতা বলিয়াছিলেন যে, দুর্নীতি দমন না করিতে পারিলে সকল উদ্যোগ সকল যোজনা বিফল হইবেই। একথার প্রতিধ্বনি সম্প্রতি লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে শোনা গিয়াছে। সেখানে বিরোধীদল এবার দুর্নীতি দমন ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি এই দুইটি বিষয়ে প্রবলভাবে আলোচনা চালাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন শোনা যায়। তাঁহাদের মতে দুর্নীতি সম্বন্ধে লোকসভায় বা সরকারি মহলে কথা তুলিলেই সরকারি তরফ বলেন যে, নিম্নস্তরের কর্মচারীদিগের মধ্যেই ইহার প্রাদুর্ভাব আছে এবং সরকার তাহা নির্মূল করিতে চেষ্টিত। মাঝে মাঝে দু-চারজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীর শাস্তিবিধানও হয় দেখা যায়। কিন্তু জনসাধারণের মতে উচ্চ অধিকারিবর্গের এবং রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যেই দুর্নীতির প্রসার আরও প্রবল। লোকসভায় সোস্যালিষ্ট দল এবিষয়ে পণ্ডিত নেহরুকে পত্র দিয়াছেন শোনা যায়।

নয়াদিল্লিতে গত ১০ই নভেম্বর যে শিক্ষামন্ত্রী এবং উপাচার্যদিগের তিনদিনব্যাপী সম্মেলন হয় তাহার উদ্বোধনীভাষণে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, শিক্ষাই জাতীয় প্রগতি ও উন্নতির একমাত্র সোপান। শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি বিনা দেশের উন্নতি অসম্ভব একথার উপর গুরুত্ব আরোপ আরও অনেকে করিয়াছিলেন। ঐ সম্মেলনের আলোচনা ও ভাষণ ইত্যাদিতে এদেশে অর্থাৎ সারা ভারতে শিক্ষার বিষয়ে নিদারুণ অবহেলার ফলে দেশ ও জাতির কি বিষম ক্ষতি হইয়াছে তাহার নির্দেশ স্পষ্টই পাওয়া যায়।

বিগত ১৭ই নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের (পন্থনগর) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন মন্তব্য করেন যে, ভারতে কৃষি-উৎপাদনের অবনতির কারণ বিজ্ঞ নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক যোগ্যতার অভাব ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাহা হইলে সহজ বিচারে বলা যায় যে, দুর্নীতি দূর করা, শিক্ষার মান উন্নত ও প্রসার বৃদ্ধি করা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা এখন সর্বাপেক্ষা জরুরী কাজ। নহিলে রাঁচি, দুর্গাপুর ও চিত্তরঞ্জন সবই বৃথা চেষ্টার ও জাতীয় ব্যর্থতারই প্রতীক হইয়া থাকিবে। কেননা যে উদ্যোগ বা যোজনা দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নে কাজে না আসে, তাহার ব্যর্থতাই প্রকট হইতে থাকে—যেমন হইতেছে বহু বিরাট শিল্পযোজনার ফল।

সংবাদে দেখা যাচ্ছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী নন্দ পাটনায় বলেছেন, দেশ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদের জন্যে ঐকান্তিক প্রয়াস দরকার; এবং এই প্রসঙ্গে যারা ঘুষ নেয় তাদের সঙ্গে যারা ঘুষ দেয় তাদেরও শাস্তি দেওয়ার কথা তিনি বলেছেন।

ভালো কথা। রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ, ছেলেবেলা থেকেই আমরাও শুনে আসছি,

অন্যায় যে করে আর
অন্যায় সে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন
তৃণ সম দহে।

কিন্তু নীতিবাক্যের দ্বারা এ অপরাধের কোনো ইতরবিশেষ ঘটেনি।

ফুটপাত্রে জল ঢেলে তৃষ্ণা মেটানো

ঘুষগ্রহণকারীর বুভুক্ষা যেমন উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে, ঘুষদাতার আত্মাহুতিও সেইরকম হ'য়ে উঠেছে স্বচ্ছন্দ। প্রকৃত প্রস্তাবে, ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয় এ ধারণাই এখন লুপ্ত হওয়ার দিকে।

পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষ সামাজিক জীব। হয়তো কোনো আদিমকালে তা হয়তো ছিল মানুষ। কিন্তু এখন আর সে সামাজিক নেই। সমাজে বাস করলেও এখন সে চূড়ান্তরকম অসামাজিক।

সমাজের বনিয়াদ হল পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা, পরস্পরের প্রতি ভালো-বাসা। কিন্তু এখন সমাজের মূলসূত্র হল অসহযোগিতা এবং বিদ্বেষ। সেই জন্যে কেউ আমরা কারো জন্যে চিন্তিত নই, কেউ কারো ভালো দেখলে সুখী হই না। নিছক আত্মস্বার্থ ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়েই আমাদের চরম অনীহা। ফলে মাস মাইনের বিনিময়ে কাজ করতে বসেও চোখ থাকে ঐ আত্ম-স্বার্থের দিকে। যে কাজের জন্যে বেতন পাচ্ছি, সেই কাজ করতে গিয়েও ছলে-বলে-কৌশলে আরো কিছু বেশি হাতানোই আমাদের পরম লক্ষ্য। এবং কাজ উদ্ধার করানোর আশায় আমরাই যখন আবার অন্য কাউন্টারের এ-পাশে দাঁড়াই, তখন কাউন্টারের ওপাশের লোকটিকে আমরাও এইভাবে বেশি হাতানোর সুযোগ দিতে বাধ্য হই।

অতএব এ হল যাকে বলে দুষ্টচক্র, এ থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। তাছাড়া ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় এ অসাধুতার উচ্ছেদ ঘটবে এমন মনে করারও কারণ নেই। পিয়ন-কেরানী-বড়বাবু-ছোট সাহেব-বড় সাহেব পর্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন জাল এমনভাবে ছেঁকে ধরে থাকে যে সেই সিস্টেমের মধ্যে কাজ করতে হলে ঘুষ না নিয়ে চাকরী বজায় রাখাই কঠিন, অন্যদিকে ঘুষদাতাদেরও শ্রেণীবিভাগ আছে। একটা সিগারেট, রেস্টুরেন্টে এক কাপ চা, একটা সিনেমার টিকিট, পিকনিকের জন্যে বাগান বাড়ি, পারিবারিক প্রয়োজনে মোটরগাড়ি ইত্যাদি থেকে বউয়ের গহনা এবং কড়কড়ে কারেন্সী নোট পর্যন্ত হরেকরকম উপায়ে ঘুষ দেওয়া সম্ভব। এর মধ্যে নিছক 'হে' হে'' করে হেসে যে কাজ উদ্ধার হবে এমন আশা শিশুতেও পোষণ করে না।

এ দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ অবশ্যই প্রশাসনিক দক্ষতা এবং শাস্তির ভয়। ঘুষগ্রহণকারীর সঙ্গে যারা অন্যায়ভাবে ঘুষ দিতে চেয়ে প্রলোভন দেখায় তারাও দণ্ডার্হ বই কি! কিন্তু উভয়দিকে এই দণ্ডের খড়্গ উদ্যত রাখার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ভাবাদর্শগত একটা পরিবর্তন না ঘটানো যায় তাহলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবার সম্ভাবনা। আমার ধারণায়, দেশাত্মবোধই একমাত্র সে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। আমরা ধনী-দরিদ্র ছোটবড় সকলে যে একই দেশের মানুষ—বাঁচলে একসঙ্গেই বাঁচব, ডুবলে একসঙ্গেই ডুবব, এই ধারণাটিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারলে, তবেই আমাদের মুক্তি। নাহলে এই ফুটো পাত্রে জল ঢেলে তৃষ্ণা মেটাবার আশা নিতান্তই দুরাশা!

•
• •

'মশা-ই কি ডেঙ্গু জ্বরের কারণ?' খবরের কাগজের একটি সংবাদের শিরোনামা এইরকম। কিন্তু সংবাদটি পাঠ করে যে প্রশ্ন মাথায় এল, তাহল, 'ডেঙ্গু জ্বরই কি আমাদের দুর্ভোগের কারণ?'

সকলেই জানেন, কয়েকমাস হল কলকাতায় একধরণের জ্বর হ'চ্ছে, যাতে কমপক্ষে ৩৭ জন রোগী প্রাণ হারিয়েছে। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল (এই ধারণা অবশ্য বিশেষজ্ঞদেরই আমদানী, আমরা নেহাতই আদার ব্যাপারী!) জ্বরটা ডেঙ্গু জাতীয়, এবং

দোষী জানিল না দোষ

'ইডিস' নামক এক জাতীয় মশাই এর বাহন। তারপর ঐ ইডিস মশা শহরের কোন কোন এলাকায় বসবাস করে তাও নাকি খুঁজে বার করা হয়েছে। কিন্তু মশাগুলিকে উচ্ছেদ করার আগে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ মশাই ডেঙ্গু জ্বরের (?) কারণ কিনা।

পাঠক, পূর্ব অনুচ্ছেদে ডেঙ্গু জ্বর কথাটার পাশে বন্ধনীর মধ্যে একটি

প্রশ্নবোধক চিহ্ন লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই? এবার সে সম্বন্ধে আলোকপাত করা যাক। (সব তথ্যই সংবাদপত্র থেকে গৃহীত।)

প্রথমত, বীজাণুবাহী মশার কামড় থেকে এই রোগ সৃষ্টি হচ্ছে এমন কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ অদ্যাবধি বিশেষজ্ঞরা পান নি। কলকাতা ও পুণায় গবেষণাগারে এই নতুন ধরণের রোগের কারণ নিয়ে যে পরীক্ষা করা হ'য়েছে তাতেও এ রোগের সঠিক কারণ নির্ণীত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, মশার কামড় থেকে 'ডেংগু' জ্বর হয়—এই সন্দেহ কতখানি সত্যি তা বার করতেই নাকি বিশেষজ্ঞরা এখনও ব্যস্ত আছেন।

তৃতীয়ত, ডেংগুর সংজ্ঞা কী, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় ডেংগু আর ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের মধ্যে পার্থক্য কতোটুকু তা স্পষ্ট করে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

কাজেই বুঝতে পারছেন, ব্যাপারটা এখনো বেশ গোলমেলে। এই অজ্ঞাত অসুখের নাম-ধাম-গোত্র সবই যেমন অনুমানের গর্ভে তেমনি এর স্বভাব-চরিত্রও অস্পষ্ট। কিন্তু ইতিমধ্যে ইনি মৃত্যুরূপে এর রাজকর সংগ্রহে শিথিলতা দেখাচ্ছেন না। আর আমাদের অবস্থা হ'য়েছে সেই, 'দোষী জানিল না দোষ, হ'য়ে গেল বিচার তাহার' সেইরকম! কেন মরলাম, এটা না জেনেই ভবলীলা সংবরণ করতে হবে।

ইতিমধ্যে মশাগুলো মারতে শুরু করলেও তবু যাহোক একটা কাজ হত। কিন্তু মশাই যে এই জ্বরের কারণ তারও তো কোনো নিশ্চয়তা নেই? অতএব সবকিছুই এখন চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নট্ নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছুটি!

•
• •

নিচে একখানি চিঠি তুলে দিলাম। পাঠকবর্গ এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখতে পারেন।

শ্রদ্ধেয় জৈমিনি,

'অলমিতি' বিভাগের আমি একজন নিয়মিত পাঠক। আপনার বুদ্ধিদীপ্ত লেখনীর বিদ্যুৎ-ঝলক মনের খোরাক জুগিয়ে চলে সপ্তাহব্যাপী।

কোলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি কটকে। কিন্তু আপনাকে ভুলতে পারিনি। তাই স্টেশনেই 'অমৃত' কিনলাম। 'তাশা' নাচের দৌরাত্ম্যে আমিও অস্থির। স্বভাবতই আপনার লেখনীতে আমার মনের কথা ভাষা পেয়েছে। আপনার সদা-জাগ্রত দৃষ্টি এদিকে পড়েছে দেখে উৎসাহ বোধ করছি। রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতিকে বিশ্ব স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছেন তার উচ্চমান রক্ষার দায়িত্ব আপনাদেরই। কিন্তু 'ড্রেইন-পাইপ' প্যান্ট আর 'টুইস্ট' নাচের বন্যায় নগর-জীবন আজ প্লাবিত।

শ্রীরামপুর পুলিশ বিভাগ পুরাতন ঐতিহ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তাদের এ প্রচেষ্টা সহস্রগুণ কার্যকরী হবে যদি আমরাও এ বিষয়ে সচেষ্ট হই। এখন কথা হচ্ছে কি ভাবে আমরা সাহায্য করব। আমি যে উপায় ভেবেছি তা আপনাকে জানাচ্ছি। আপনার মতামত জানালে সুখী হবো।

কোলকাতার অধিকাংশ পুজোই পল্লীভিত্তিক। যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তার বেশীর অংকটাই দিয়ে থাকেন পাড়ার ধনীব্যক্তিরা। বাকীটা আসে সাধারণ পল্লীবাসীর কাছ থেকে। তবে পুজোর চাঁদা আদায় থেকে নিরঞ্জন পর্যন্ত সমস্ত কাজটাই সেরে থাকেন পাড়ার উৎসাহী যুবকেরা—যাদের মধ্যে কেউ কেউ বিকৃত রুচিতে আস্থাবান। তাদেরই নেতৃত্বে পুজো উপলক্ষ্যে প্রকাশ পায় অশালীন, উচ্ছৃংখল আচরণ।

পুজোর পরিবেশকে আনন্দ-মুখর করতে হলে একটি কাজ করতে হবে। আর সে কাজে নেতৃত্ব করবেন পাড়ার বিত্তশালী লোক, সহযোগিতা থাকবে সকলের। যুবকদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে হবে পুজো উপলক্ষ্যে কোন প্রকার উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। সে রকম কিছু হলে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর প্রতিক্রিয়া দু-রকম হতে পারে।

(১) স্বাভাবিক পুজো-অনুষ্ঠান (২) কর্মীর অভাবে পুজানুষ্ঠানে বিঘ্ন। প্রথম প্রতিক্রিয়া সর্বান্তকরণে সমর্থন যোগ্য। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ার হতাশ হবার কোন কারণ নেই। সেক্ষেত্রে পাড়ায়-পাড়ায় পুজো না হয়ে কয়েক পাড়া মিলিয়ে পুজো হবে। আমার এটুকু বিশ্বাস আছে কোলকাতায় এমন কোন পাড়া নেই যেখানে 'তাশা' নাচিয়েদের অভাবে পুজো বন্ধ থাকবে। যদি থাকে তবে বুঝতে হবে কোলকাতার সাংস্কৃতিক জীবন সামগ্রিকভাবে বিকারগ্রস্ত।

নমস্কার জানবেন।

রূপক মহলানবীশ,
অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ,
দমদম মতিঝিল কলেজ।

প্রতিভাময়ী

নিমাই ভট্টাচার্য

মাই ডিয়ার মিস চ্যাটার্জী,

অসংখ্য ধন্যবাদ। কলকাতা ফিরেই যে আপনি এমনভাবে চিঠি লিখে আমাকে স্মরণ করবেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। মুখে প্রকাশ করতে পারিনি যে আমি আপনার রূপ, যৌবন ও সর্বোপরি ব্যবসায়িক বুদ্ধি দেখে আগেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, এহ বাহ্য। আপনার চিঠি পড়ে মনে হলো, আপনি যদি সেলস প্রমোশন অফিসার না হয়ে সাহিত্যিক হ'তেন, তাহলে অনেক সাহিত্যিকই বহুদিন আগে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় গতায়াত বন্ধ করতে বাধ্য হতেন। শরৎ চাটুজ্যে কলমের জোরে মানুষের মন ভিজিয়েছেন। আপনার মিষ্টি হাতের ঐ সুন্দর চিঠিটা পড়ে মনে হলো, সার্থক সাহিত্যিক ছাড়া যদি অন্য কেউ কলমের জোরে মানুষের মন ভেজাতে পারেন তবে সে আমাদের মিস চ্যাটার্জীর মত সার্থক সর্বজনধন্য সেলস্ প্রমোশন অফিসার!

আপনাকে এবার দেখে ও পরে চিঠি পেয়ে ক'বছরের অতীত কাহিনী আজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। বিশ্বাস করুন মিস চ্যাটার্জী, আজ নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। মনে পড়ে বছর তিনেক আগের ভোরবেলায় দমদম এয়ারপোর্টের কাহিনী?

......কদিন ধরে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ছিলাম। তারপর ডিসেম্বরের শেষে দিল্লীর শীতকে অগ্রাহ্য করে ভোর পাঁচটায় পালামে গিয়ে স্পেশ্যাল প্লেন ধরবার জন্য মেজাজটা আরো খারাপ ছিল। কিন্তু মিনিস্টার আমারই সংশ্লিষ্ট এক অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতা যাচ্ছিলেন বলে বাধ্য হয়েই আমাকে তাঁর সঙ্গী হতে হয়েছিল। সকালবেলায় দমদমের একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া ও মিষ্টি রোদ বেশ লেগেছিল। আরো ভাল লেগেছিল একদল নিরেট গদ্যের মত অফিসারদের ভিড়ের মধ্যে আপনাকে দেখে। লাইট স্কাই কলারের ফ্রেঞ্চ শিফন শাড়ী পড়েছিলেন আপনি। তাই না? আধেক আবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গে ছিল লাইট ক্রিম কলারের ওয়ান-পিস ব্লাউজ, অধরে ন্যাচারাল কলারের একটু ছোঁয়া আর কপালে অরেঞ্জ টিপ। একেই তো আপনার চোখ দুটো অমন চমৎকার এবং

...আপনি নিশ্চয়ই হেলেন অফ্......

তার উপর ঘন কালো টানা ভ্রূ। একটান সুরমা লাগিয়ে আসবার কোন দরকার ছিল না, কিন্তু তবু বলব, ভালই করেছিলেন।

জানেন মিস চ্যাটার্জী আপনাকে দেখে প্রথমে কি ভেবেছিলাম? ভেবেছিলাম ছাত্রী-জীবনে আপনি নিশ্চয়ই হেলেন অফ ট্রয়-ক্লিওপেট্রার মত অসংখ্য ছাত্রের জীবনে মহাবিপর্যয় ঘটিয়ে এক অপদার্থ অথচ ভাগ্যবান অফিসারের জীবনসঙ্গিনী হয়েছেন। কথাটা ভেবেই সারা মনটা রি রি করে উঠেছিল। প্লেন থেকে নামার পর মিনিস্টারের হাতে আপনি যখন পেরুভিয়ান লিলির তোড়াটা দিয়ে নিজেকে মিস চ্যাটার্জী বলে পরিচয় দিলেন তখন যে কি প্রশান্তি মনে মনে উপভোগ করেছিলাম সেকথা হয়ত আপনাকে ঠিকভাবে বোঝাবার কোন অবসর আমার জীবনে আসবে না।

কিন্তু কি অদৃষ্ট বলুন তো? বিধাতাপুরুষের নিদারুণ রসিকতার ভিকটিম হয়েছিলাম দুজনেই! সবার সামনে আপনাকে আমার অনেক অপ্রিয় কথা বলতে হয়েছিল। আপনিও অবশ্য আমাকে ইংরেজী ভাষার চাবুক মারতে কার্পণ্য করেননি সেদিন সকালে। বিশ্বাস করুন, আমি নিরুপায় হয়েই সেদিন মিনিস্টারকে আপনাদের ফ্যাক্টরী যেতে দিইনি। সাধারণতঃ কোন বিশেষ স্বার্থের জন্যই ব্যবসায়ীরা মিনিস্টারদের তাঁদের কল-কারখানা দেখাতে নিয়ে যান। মিনিস্টাররা কল-কারখানায় যান, কিন্তু তার জন্য আগে থেকে নিমন্ত্রণ করে ব্যবস্থা করা দরকার। বাংলাদেশের অত বড় একজন বিখ্যাত শিল্পপতি হয়েও আপনার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের এই সামান্য সৌজন্য-জ্ঞানের অভাবে আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন আপনার মত সুন্দরী সেলস্ প্রমোশন অফিসার পাঠালে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে মিনিস্টারকে ধরে আনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। আমার কাছে সমস্ত জিনিসটা 'সিলি' লেগেছিল এবং সেজনাই মিনিস্টারকে আমি যেতে দিইনি।

সেদিন হয়ত আমি ঠিকই করেছিলাম। কিন্তু আপনার সঙ্গে প্রথম দর্শনের দিন কথা কাটাকাটি হওয়ায় আজ ভীষণ দুঃখ হচ্ছে।

এরপর আপনার সঙ্গে দেখা হয় নাগপুর এয়ারপোর্টে। নাইট এয়ারমেল সার্ভিসে আমি যাচ্ছিলাম কলকাতা আর আপনি চলেছিলেন কলকাতা থেকে বম্বে। মধ্যরাত্রিতে সারা দেশের বিমানযাত্রীদের মিলন-মন্দির নাগপুর এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টে আপনি আর আমি

...আপনি আর আমি মুখোমুখি বসে...

মুখোমুখি বসে কফি আর ভেজিটেবল চপ খেয়েছিলাম আই-এ-সি'র পয়সায়। কিন্তু তখনও আপনার রাগ কমেনি; শুধু শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছিল। মনে পড়ে মিস চ্যাটার্জী?

কামরাজ প্ল্যান বা ডেমোক্র্যাসী এ্যান্ড সোস্যালিজম প্রস্তাবের জন্য নয়, জয়পুর আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রইবে বাংলার বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সেলস্ প্রমোশন অফিসার মিস সুমিত্রা চ্যাটার্জীর জন্য। ফর গডস্ সেক বিলিভ মি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না, জয়পুরে আপনার স্মার্টনেস, আপনার ফ্রাঙ্কনেস, আপনার ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও নৈপুণ্য দেখে বাঙালী মেয়েদের সম্পর্কে আমার জ্ঞান গভীরতর হলো।

এক্সকিউজ মি, আপনার কোম্পানীর কর্তা কেমন যেন বোকা বোকা। নিতান্ত পরিচয় না থাকলে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না বাংলাদেশের এতবড় একজন শিল্পপতি এমন হতে পারেন। কর্তা আপনাকে কত মাইনে দেন, জানি না; তবে তিনি আপনার জন্য চৌরংগীর ফ্ল্যাট, গাড়ী, ফ্রি ট্রাভেল ও আনুষংগিক খরচ করে যে অন্যায় করেন না, তা আমি মনে প্রাণে বুঝেছি জয়পুরে। বাঙালী ব্যবসাদারের পক্ষে ফরেন কোলাবোরেশনের ব্যবস্থা করে বাংলার বাইরে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তা আমি একটু-আধটু বুঝি। কিন্তু ঐ স্টেটের অতগুলো মিনিস্টারের সংগে আপনার যা ঘনিষ্ঠতা দেখলাম তাতে মনে হলো সুমিত্রা চ্যাটার্জীর মত সেলস্ প্রমোশন অফিসার থাকলে যে-কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সারা দেশে ফ্যাক্টরী গড়ে তোলা সম্ভব। জনৈক ওপরওয়ালাকে যেভাবে আপনার সংগে মেলামেশা করতে দেখলাম, তাতে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। একজন বাঙালী মেয়েকে সুদূর আর এক প্রদেশের মিনিস্টারদের সংগে এমনভাবে দহরম-মহরম করতে আর দেখেছি বলে মনে হয় না। স্বয়ং চীফ মিনিস্টারই তো কংগ্রেস প্যান্ডেলে ঢোকার পথে আপনার গালে টোকা মেরে গেলেন। তাই না? আপনি হয়ত খেয়াল করেন নি, কিন্তু আমি সব দেখেছি।

মিস চ্যাটার্জী, আপনার প্রশংসা করে যেন মন ভরাতে পারি না। এই যে এতবড় ফরাসী প্রতিষ্ঠানের সংগে আপনাদের কোম্পানীর কোলাবোরেশন পাকাপাকি হলো তা কি শুধু আপনার জন্যই নয়? আপনার কোম্পানীর কর্তা পারত ঐ দুই ফরাসী ছোঁড়াকে সামলাতে? সার্টেনলি নট। রামবাগ প্যালেস হোটেলে জায়গা না পেয়ে দুজন ফরাসী অতিথিকে নিয়ে কর্তা পারত জয়পুরের ঐ অখ্যাত হোটেলে ঢুকতে? হলপ করে বলতে পারি এই দুঃসাহস বাঙালীর মেয়ে মিস সুমিত্রা চ্যাটার্জী ছাড়া আর কারোর হতো না।

প্রথম দিন এ-আই-সি-সি'র পর বেশ রাত্রে খেতে গিয়েছিলাম মীর্জা ইসমাইল রোডের ঐ রেস্টুরেন্টটায়। এক কোণে আবিষ্কার করলাম এক গেলাস ড্রিংক নিয়ে বসে আছেন আপনাদের মনিব। উনি দেখেননি, আমিই এগিয়ে গেলাম। টেনে নিয়ে বসালেন পাশে। অর্ডার দিলেন ডিনারের। খেতে খেতে অনেক কথা বল্লেন উনি। কিন্তু সে-সবই আপনাকে কেন্দ্র করে। বল্লেন, আট বছর আগে আপনাকে উনি আবিষ্কার করেছিলেন; দিয়েছিলেন অফিসে এক সাধারণ চাকরি। কিন্তু আপনার কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় পেতে ও'র দেরী হয়নি। দু'বছর পর নাকি আপনি মাত্র কুড়ি বছর বয়সে এই বিখ্যাত শিল্পপতির প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। চিকেন রোস্ট পাশে সরিয়ে রেখে কর্তা বল্লেন, 'কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝলাম সুমিকে ছাড়া আমার এক পা চলাও অসম্ভব। দু' দু'বার ফ্রান্সে কোলাবোরেশনের জন্য জার্মানী ও আমেরিকা মিলে যে সাক্সেসফুল হয়েছি তা ঐ মেয়েটার [illegible] জন্যই।' এক টুকরো মাংস মুখে দিলেন উনি। আবার বল্লেন, জানেন মশাই, সুমির বয়স আজ পঁচিশ-ছাব্বিশ হলে কি হবে, মনটা এখনও ভীষণ কাঁচা। এখনও আমি পাশে না বসলে ওর ঘুম আসে না। রোজ অফিস থেকে ফ্যাক্টরী হয়ে সন্ধ্যার পর যাই সুমির ফ্ল্যাটে। বিজিনেসের কাজকর্ম সেরে খাওয়া-দাওয়া করে ওকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমার ছুটি।'

আমি কি বল্লাম জানেন মিস চ্যাটার্জী? বল্লাম, গভীর ভালবাসার সম্পর্ক না হলে কখনও মিস চ্যাটার্জী আপনার কোম্পানীর জন্য এত করতেন না।

এবার গর্বের সংগে কর্তা বল্লেন, 'সুমি ইজ এ ফার্স্ট ক্লাশ ডান্সার টু... এই ত মিঃ গানার বলছিলেন, কাল রাত্রে সুমি এমন চমৎকার ফিক্সট্ পয়েন্ট ডান্স দেখিয়েছেন যা প্যারিসেও সব সময় পাওয়া যায় না।'

আচ্ছা মিস চ্যাটার্জী, আমাদের নির্গুণ করে ভগবান আপনাকে সব গুণ এমন উজাড় করে কেন দিলেন বলুন তো? আরো কিছু বাঙালী মেয়েকে ভগবান কেন আপনার মত করলেন না বলুন তো? কয়েক ডজন সুমিত্রা চ্যাটার্জী থাকলে বাংলাদেশে কত কল-কারখানা হতো, কত বেকার বাঙালী ছেলে-মেয়ে চাকরি পেতো বলুন তো? ডক্টর সঞ্জয়ের মত দুষ্টু অফিসারকে হাত করে বাংলাদেশের জন্য আরো কিছু কনট্রাক্ট, কিছু পারমিট, কিছু লাইসেন্স, কিছু টেন্ডার জোগাড় করতে পারে, এমন সুমিত্রা চ্যাটার্জী কি দুটো নেই বাংলাদেশে? মনে হয়, নেই। আপনি একমেবাদ্বিতীয়ম।

বাংলার এক বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ডি-ফ্যাক্টো ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়েও আপনি এই হতভাগ্য কলমজীবীকে হাজার মাইল দূরে গিয়েও ভুলতে পারেননি, তারজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কলকাতা গেলে টেলিফোন করব। দারোয়ান ঢুকতে দিলে দেখা করার চেষ্টা করব। *

প্রীতিমুগ্ধ
'দিল্লী থেকে বলছি'

* রচনার চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক।
—লেখক।

** দিপালীর কলকাতা **

ফটো : সুকুমার রায়
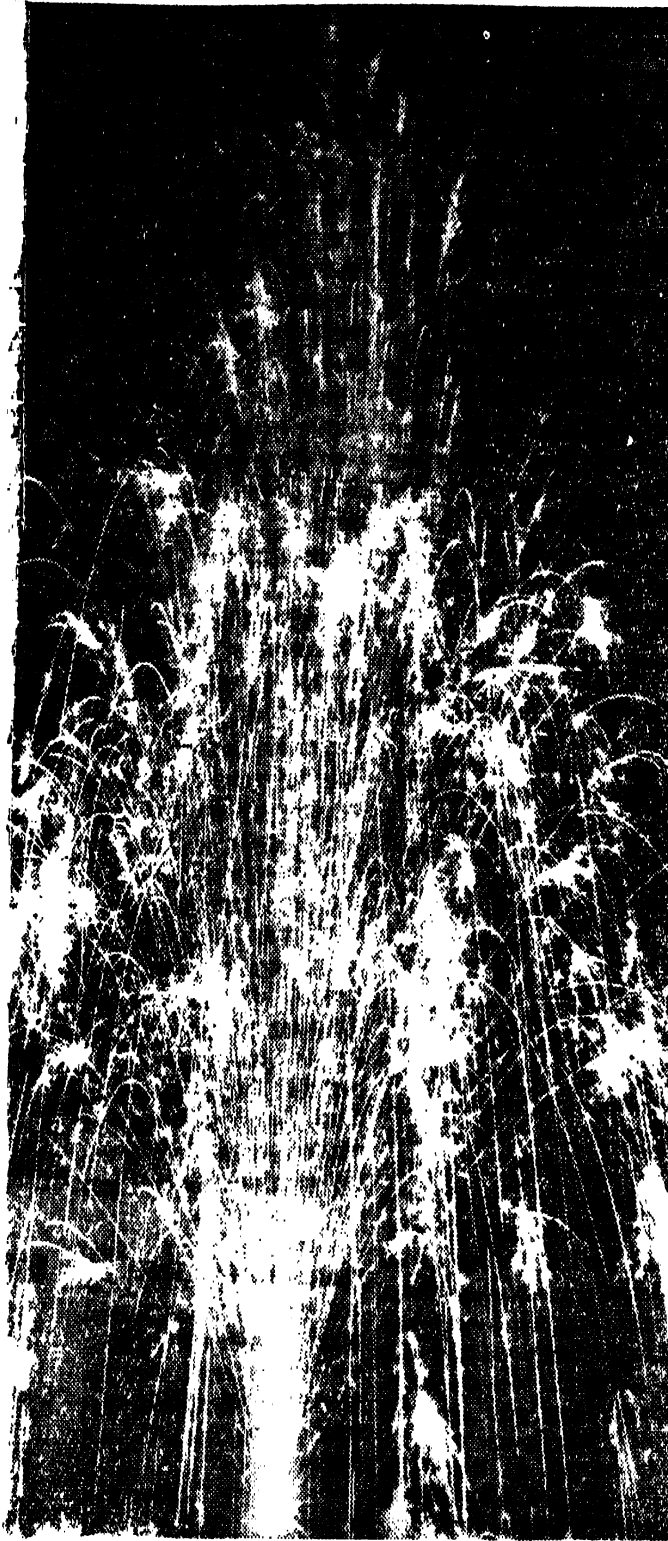
দেশে বিদেশে

॥ রাজ্যশিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন ॥

মত-পার্থক্য সত্ত্বেও রাজ্যশিক্ষা-মন্ত্রী সম্মেলনে শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবমত সারা ভারতে ১২ ক্লাসের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বলা হয়েছে, আগে ছাত্ররা কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ে যা শিখত ভবিষ্যতে স্কুলেই তাদের তা শেখানো হবে। আর ষোল বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কেউ কলেজে পড়তে পাবে না। কলেজে ডিগ্রী কোর্স পড়ানো হবে তিন বছর। সুতরাং স্কুল-কলেজ মিলিয়ে আগে যেখানে ১৪ ক্লাস পড়তে হত, নতুন ব্যবস্থায় সেখানে পড়তে হবে ১৫ ক্লাস; আর বুদ্ধিমান ছেলেরা এত-দিন যে অল্পবয়সে পরীক্ষা পাশের সুযোগ পেয়ে এসেছে ভবিষ্যতে সে সুযোগ আর থাকবে না। এইভাবে এক বছর শিক্ষাকাল কেন বাড়ানো হল, এবং অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের কেন একটি বিশেষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হ'ল—এসম্বন্ধে নূতন প্রস্তাবের সমর্থকরা কিছুই বলেননি। এবং এ সম্বন্ধেও তাঁরা কিছু জানাননি যে, এতদিন অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের দিয়ে কলেজে যে ইন্টার-মিডিয়েট কোর্স পড়ানো হ'ত, কোন সুবিধার কথা বিবেচনা করে সেটাকে তাঁরা স্কুলের এক্তিয়ারে আনার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১২ ক্লাসের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল উপযুক্ত শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। এসম্বন্ধে প্রস্তাবের সমর্থকদের কি বক্তব্য ছিল তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু এদুটি অভাব যে কি সাংঘাতিক অভাব তা ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের অজানা থাকার কথা নয়, এবং সে অভাব পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথাও তাঁদের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে কলেজ-গুলি আছে তাদেরই যথেষ্ট অর্থের অভাবে কোন উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় না। এমন বহু কলেজ আছে যাদের বায়োলজী পড়ানোর ব্যবস্থা নেই বলে সেই অঞ্চলের ছেলেরা বরাবরই ডাক্তারী পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। এই রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ স্কুলকে এখনও অর্থের অভাবে উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। অথচ আজ নতুন সিদ্ধান্ত অনু-সারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় দুই হাজার স্কুলকে ইন্টার-

মিডিয়েট মানের প্রিয়োজনে পরিণত করার দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়া এক কথা, আর সে দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করা সম্পূর্ণ অন্যকথা। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে শীঘ্রই হয়ত কয়েকটি স্কুলকে ১২ ক্লাসের স্কুলে পরিণত করা হবে, কিন্তু সব স্কুলকে ১২ ক্লাসের স্কুলে পরিণত করা বিশ বছরের মধ্যেও সম্ভব হবে না। সুতরাং কয়েক বছর বাদে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি স্কুল ১২ ক্লাসের, কতকগুলি ১১ ক্লাসের আর বাকিগুলি ১০ ক্লাসের। শিক্ষাব্যবস্থায় এমন অরাজকতা কল্পনাতীত।

ঘন ঘন পাঠ্য বই বদলানো অনুচিত

রাজ্যশিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির বলেন : ক্রমাগত পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের যে রেওয়াজ আছে,

তার অবসান হওয়া উচিত। প্রতি বৎসর যাতে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তিত না হয়, তার প্রতি আমার রাজ্যসহকর্মীরা লক্ষ্য রাখলে তাঁরা জনগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। প্রত্যেক মাতাপিতা বা অভিভাবক প্রতি বৎসর পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের ব্যাপারে তীব্র অভিযোগ করে থাকেন। একবার পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হলে তা অন্যূন পাঁচ বৎসর চালু থাকা উচিত।

॥ বাজার দর ॥

চালের দর যখন পঞ্চাশ টাকা মণ দাঁড়ায় এবং জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে চালবিক্রেতাদের সস্তা দরে চাল দিতে বাধ্য করেন তখনই সরকার এবিষয়ে সচেতন হন এবং চালব্যবসায়ীদের সঙ্গে 'ভদ্রলোকের চুক্তি' করে স্থির করেন ভাল চাল পঁয়ত্রিশ টাকা মণ দরে ও সাধারণ চাল বত্রিশ টাকা মণ দরে বিক্রি করা হবে। এই বছরে শেষপর্যন্ত ঐ ব্যবস্থা চালু থাকবে—একথা সেদিন রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়। কিন্তু এই ঘোষণার পর পক্ষকাল অতিক্রান্ত না হতেই চালের বাজারের অবস্থা প্রায় আগের মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বত্রিশ টাকা মণের চাল কোনদিনই বাজারে পাওয়া যায়নি, এবং খাদ্যোপযোগী চাল মাত্রেরই বর্তমানে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা মণ। সীতাশাল, বাঁকতুলসী, চামরমণি ইত্যাদি একটু ভাল জাতের চাল মাত্রেরই মণ পঁয়তাল্লিশ টাকার উপরে। অথচ উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বাঙলার চালব্যবসায়ীরা উড়িষ্যা থেকে মাত্র ষোল টাকা মণ দরে চাল কিনে এনে কলকাতায় বত্রিশ টাকা মণ দরে বিক্রি করছে।—বাজারের এই অবস্থা সম্বন্ধে কি রাজ্যসরকার সচেতন নন? না, সচেতন থাকলেও এব্যাপারে তাঁদের কিছু করণীয় আছে বলে মনে করেন না?

ওদিকে মাছের বাজারের অবস্থা আর এক রকম। যেসময় মাছের বাজারে চরম অরাজকতা চলছিল সেই সময় নিষ্ক্রিয় থেকে রাজ্যসরকার দর বাঁধলেন শীতের মুখে, যখন এমনিতেই মাছের দাম সস্তা হয়ে যাওয়ার কথা। ফলে এখনই বাজারে এমন অনেক মাছ পাওয়া যাচ্ছে যার দাম সরকারের বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে কম। এ কারণে রাজ্যসরকার মাছের মূল্যতালিকা সংশোধনের কথা চিন্তা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

॥ লোকসংখ্যা ॥

বিশ্বের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য ইতিপূর্বে 'দেশে-বিদেশে'য় প্রকাশ করা হয়েছে। এ-সম্বন্ধে আরও কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য এবার দেওয়া হল। এশিয়ার লোকসংখ্যা বর্তমানে ১৪০ কোটি, যা সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ। বিশ্বের সর্বাধিক জনাকীর্ণ দশটি দেশের মধ্যে পাঁচটি এশিয়ায়। লোকসংখ্যাধিক্যের বিচারে ভারতের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। এব্যাপারে যেমন তার কোনদিন প্রথম হওয়ার সম্ভাবনা নেই তেমনি দ্বিতীয় স্থান থেকেও কেউ তাকে কোনদিন বিচ্যুত করতে পারবে না। জনসংখ্যায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী চীনের বর্তমান লোকসংখ্যা ৭৩ কোটি ১০ লক্ষ। তারপর ভারতের লোকসংখ্যা ৪৬ কোটি ১০ লক্ষ। তৃতীয় স্থানাধিকারী সোভিয়েট ইউনিয়নের লোকসংখ্যা ২২ কোটি ৫০ লক্ষ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯ কোটি; ইন্দোনেশিয়ার ১০ কোটি; পাকিস্থানের ৯ কোটি ১০ লক্ষ; জাপানের ৯ কোটি ৬০ লক্ষ; ব্রেজিলের ৭ কোটি ৮০ লক্ষ; পশ্চিম জার্মানীর ৫ কোটি ৫০ লক্ষ; দশম স্থানাধিকারী বৃটেনের লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ।

॥ বৃটেনের রাজনীতি ॥

বৃটেনের রাজনীতির গতি-পরিবর্তন লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্যার উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে বৃটেনের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তারপর হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দল আরও একবার উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু একটানা বারো বছরের রক্ষণশীল শাসনে বৃটেনের অধিবাসীরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। সম্প্রতি কিলার কেলেংকারী রক্ষণশীল দলের মর্যাদা আরও ক্ষুণ্ণ করে। একারণে পর পর কয়েকটি উপনির্বাচনে রক্ষণশীল দলকে খুবই মার খেতে হয়েছে। রক্ষণশীল

দলের নতুন নেতা ও বৃটেনের নব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী স্যার ডগলাস হিউম কিনরস কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়লাভ করলেও সে জয়কে তাঁর ব্যক্তিগত জয় বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, ঐদিনই লুটন পার্লামেন্টারী কেন্দ্রের আসনটি শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। রক্ষণশীল দল যেভাবে শ্রমিক দলের কাছে হারতে শুরু করেছেন, এ অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে, নির্বাচন-বিশেষজ্ঞদের অনুমান, একবছর পরে বৃটেনে যে সাধারণ নির্বাচন হবে তাতে রক্ষণশীল দলের পক্ষে কিছুতেই পরাজয় এড়ানো সম্ভব হবে না। শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলের চেয়ে অন্তত চল্লিশটি বেশী আসন পাবেন। এমনকি দুশটি আসন বেশী পেলেও কোন কোন নির্বাচন-বিশেষজ্ঞ বিস্মিত হবেন না বলে জানিয়েছেন।

॥ সিরিয়া-ইরাক সংবাদ ॥

নাসেরপন্থীদের উৎখাতের পর সিরিয়া ও ইরাকে বাথ পার্টির পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম হওয়ায়, ঐ দুই দেশের সংযুক্তি ও শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা কিছুদিন আগেও উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু ঐ দুটি আরব রাজ্যের একমাত্র রাজনৈতিক দলটির মধ্যে অন্তর্বিরোধ শুরু হওয়ায় সে সম্ভাবনা প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে এবং আবার তাদের শাসনব্যবস্থায় ভাঙা-গড়া শুরু হয়েছে। গত মার্চ মাসে সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটার পর তিনবার মন্ত্রিসভার রদবদল হয়। কিন্তু প্রবীণ বাথ নেতা সালাল রিতার তিনটি মন্ত্রিসভারই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এবার তিনি বিদায় নিয়েছেন এবং তাঁর জায়গায় চব্বিশ জন সদস্য নিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন মেজর জেনারেল আইমিন হাফেজ।

ইরাক সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত সংবাদ এই প্রসঙ্গ রচনা পর্যন্ত জানা যায়নি। শুধু এইটুকু জানা গেছে যে, সেখানে একটি সামরিক অভ্যুত্থান অল্পের জন্য ব্যর্থ হয়েছে। তারপরেই শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং বাগদাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে।

(১৪।১১।৬৩)

অর্থনৈতিক

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতের কাজু বাদামের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে দেড় লক্ষ প্যাকেট কাজু বাদাম বিদেশে চালান গেছে যার মোট দাম প্রায় এক কোটি উনচল্লিশ লক্ষ টাকা। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে এই চালানের পরিমাণ ছিল ৯৭ হাজার প্যাকেট এবং তার দাম ছিল ৮৭ লক্ষ টাকা। প্রতি প্যাকেটে বাদাম থাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড।

এই বছর জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে কাজু বাদাম চালানের মোট পরিমাণ ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার প্যাকেট, গত বছরের এই সময়ের চেয়ে ২ লক্ষ ৬০ হাজার প্যাকেট বেশী। উল্লিখিত নয় মাসের চালানের মোট-মূল্য ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, গত বছরের নয় মাসে যা ছিল ১৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা।

এখনও পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রই কাজু বাদামের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। এই বছরের প্রথম নয় মাসে যুক্তরাষ্ট্রে কাজু বাদাম চালান গেছে ৯ লক্ষ ৩৯ হাজার প্যাকেট; দ্বিতীয় খরিদ্দার সোভিয়েট ইউনিয়নে গেছে ৩ লক্ষ প্যাকেট। তারপর পূর্ব জার্মানীতে গেছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার প্যাকেট, বৃটেনে ৮১ হাজার প্যাকেট, অস্ট্রেলিয়ায় ৬১ হাজার প্যাকেট, কানাডায় ৫৪ হাজার প্যাকেট, চেকোস্লোভাকিয়ায়ও ৫৪ হাজার প্যাকেট, পশ্চিম জার্মানীতে ৩৮ হাজার প্যাকেট ও হল্যাণ্ডে প্রায় ১৬ হাজার প্যাকেট।

* * *

আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারতের ১৯৬২-৬৩ সালের বাণিজ্যিক লেনদেনের মোট পরিমাণ ১১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। ভারত থেকে আফগানিস্থানে চালান গেছে ৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার পণ্য, আর ভারত ঐ দেশ থেকে এনেছে ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার পণ্য। সুতরাং এই লেনদেনে ভারতের লাভের ঘরে জমা পড়েছে ৮৯ লক্ষ টাকা।

ভারতের রপ্তানিকরা পণ্যগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য—তিন কোটি এক লক্ষ টাকার কাপড়, দুই কোটি আট লক্ষ টাকার চা, কফি ইত্যাদি বাগিচা-জাত পণ্য ও প্রায় এগারো লক্ষ টাকার জুতো। আর আফগানিস্থান থেকে ভারত এনেছে পাঁচ কোটি এক লক্ষ টাকার ফল।

* * *

জাপানের সঙ্গে ভারতের গত আর্থিক বছরে বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ ৯৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার, এবং তাতে ভারতের কাছে জাপানের পাওনা হয়েছে ২৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। ভারত জাপানে চালান দিয়েছে ৩৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার পণ্য আর সেদেশ থেকে এনেছে ৬২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার পণ্য।

ভারত জাপানে যেসব পণ্য রপ্তানি করেছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হল ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার খনিজ আকর ও পুরানো লোহা, ১১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার তুলো, ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার সার ও ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার চিনি। এছাড়াও জাপানে চালান গেছে চামড়া, পশুখাদ্য, মাংস, বস্ত্র ইত্যাদি। আর জাপান থেকে ভারত যেসব পণ্য আমদানি করেছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হল ২৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি, ১৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার ইতর ধাতু, ৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার পরিবহন সরঞ্জাম, ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্য ও ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার প্রস্তুত সার। এছাড়াও আছে বিভিন্ন রাসায়নিক, রং প্রস্তুত চামড়া, রূপা, প্লাস্টিক, দামী পাথর ইত্যাদি।

* * *

সিংহলে খাদ্যের আমদানি ক্রমেই বাড়ছে। গত বছরের প্রথম সাত মাসে সিংহল বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করেছিল ৩১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার; এবছরের প্রথম সাত মাসে তার আমদানি ৩৬ কোটি ৮ লক্ষ টাকার।

* * *

পূর্ববঙ্গে কৃষকদের দুরবস্থা এক ভয়াবহ চিত্র ঐ প্রদেশের কৃষি কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্র পাকিস্থানের ৯ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ বাস করে পূর্ব পাকিস্থানে। এই জনবাহুল্য সেখানে এখন গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ২,৮৮২ বর্গমাইল আয়তন-বিশিষ্ট ঢাকা জেলায় বর্তমান লোক-সংখ্যা প্রায় ষাট লক্ষ, অর্থাৎ, ঐ জেলায় প্রতি বর্গমাইলে এখন লোকবসতির ঘনত্ব ১৭৮৬; এমন জায়গাও আছে পূর্ব পাকিস্থানে যেখানে প্রতি বর্গমাইলে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশী লোক বাস করে।

পূর্ব পাকিস্থানের অধিবাসীদের শতকরা ৭৭ জন কৃষিজীবী। কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা ৩৪ জনকে সারা বছর বেকার থাকতে হয়, আর শতকরা ৬৬ জন পাঁচ মাস প্রায় কোন কাজই করে না। এর ফলে তারা সকলেই অতি-কষ্টে দিন কাটাতে বাধ্য হয় এবং তাদের মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ৯৩ কোটি টাকা।

পূর্ব পাকিস্থানের লোকদের মাথা-পিছু আয়ের কোন সরকারী হিসাব নেই। তবে মোটামুটি হিসাবে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্থানের লোকদের মাথাপিছু বাৎসারিক আয় ২১৩ টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্থানের ৩১৫ টাকা। কিন্তু এই পার্থক্যে পাকিস্থানের দুই শাখার অধিবাসীদের অবস্থায় প্রকৃত পার্থক্য বোঝা যাবে না। পশ্চিম পাকিস্থানের গমভোজী লোকেরা গম পান ষোল টাকা মণ দরে; আর পূর্ব পাকিস্থানের লোকদের চাল কিনতে হয় চল্লিশ টাকা মণ দরে।

সাহিত্য জগৎ

*** তরুণ লেখক ***

ইদানীং বাঙলা ভাষায় বিবিধ গ্রন্থপ্রকাশ পরিমাণে অনেক বেড়েছে সরকারী ও বেসরকারী তথ্য থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। গদ্য পদ্য নাটক সব ক্ষেত্রেই তরুণ লেখকেরা নিজেদের সৃষ্টি-ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ খুঁজে পাচ্ছেন বলে মনে হয়। তাছাড়া পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু একথা সত্যি এসমস্ত রচনায় মনের তৃপ্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক সময় মন খুলে তারিফ করা যায় না।

নতুন লেখকদের রচনায় আমাদের এই অতৃপ্তির কারণ কি? ব্যক্তিগতভাবে যা মনে হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা তুলে ধরছি। যে কোন লেখার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় সচেতনতা বা আন্তরিকতার। এদের অনুপস্থিতিই পাঠকদের ও নতুন লেখকদের মধ্যে কেমন যেন একটা ভেদ-রেখার সৃষ্টি করেছে।

গদ্যই বলুন আর পদ্যই বলুন যে কোন রচনাই শব্দনির্ভর। শব্দ-সচেতন শিল্পীমন একালে নতুন লেখক-দের ক্ষেত্রে প্রায়ই অনুপস্থিত। শব্দের সুপ্রয়োগে দৈন্যের তুলনা নেই। যে কয়েকজন তরুণ লেখক এক্ষেত্রে নিজের চিন্তাশক্তির দৃঢ়তা প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা খুবই কম।

বিশেষ করে গদ্য লেখকদের সম্পর্কে বলা যায় যে তাঁরা অনেক সময়ই ভুলে যান গদ্যের একটা ছন্দ আছে। এই ছন্দটা বড় কথা। তা না হলে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে যে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাই-ই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শন হয়ে দাঁড়াতে পারত। রচনাকে সাহিত্যগুণান্বিত করে তোলবার জন্য প্রয়োজন হয় ছন্দের, প্রয়োজন হয় সুষমার। যে সুষমার দৈন্য তরুণ লেখক-দের লেখায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত।

শব্দ ছন্দের দিকে নজর দিয়ে কিছু লিখতে গেলেই যে সেটা বড় শিল্প হবে একথাও সত্য নয়। তারপরও প্রয়োজন বুদ্ধির দীপ্তির। সবকিছু মিলেমিশে এরা এমনভাবে থাকবে যা আলাদা করে দেখা যাবে না—মনে হবে একটা সার্থক পূর্ণাঙ্গ রচনা। যা সকলকে তৃপ্তি দেবে।

নতুন লেখকদের প্রত্যেকে সাধারণ-ভাবে বলবার মত ক্ষমতা আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু গুছিয়ে বলবার জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষার বা চর্চার বা বহু-পঠনের। এই জগৎ থেকে তরুণ লেখকরা সরে পড়ছেন বলে মনে হয়। প্রতিটি লেখায় তাঁদের লেখবার জন্য চিন্তার স্রোত-এর একটা স্বাভাবিক গতি লক্ষ্য করা যায়। এ জিনিসটা যত সুস্পষ্ট হবে লেখকের ক্ষমতাহীনতার পরিচয়ও তত প্রকট হয়ে উঠবে।

এমন অনেক তরুণ লেখক আছেন যাঁরা দু-পাঁচ বছর ধরে প্রতিনিয়ত লিখে আসছেন। লেখার মধ্যে তাঁদের সার্থক ক্ষমতার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তারা যে এক কেন্দ্রবিন্দুতে

ডাঃ ফেতি টেভেটোগলু

দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রথম-সৃষ্টির দিনে তার থেকে অধিকতর সত্যের জগতে উত্তো-রণের প্রয়োজন আছে তা কি তাঁরা মনে করেন না? চিন্তা বিষয়বস্তু আঙ্গিক একটি ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। আরও উন্নত মননশীল বুদ্ধিদীপ্ত অভিনব চেতনার প্রবাহ এখানে অনুপস্থিত। কিন্তু স্বীকার করার প্রয়োজন রয়েছে যে তাঁদের রচনায় চেষ্টাকৃত প্রচেষ্টার ছাপ প্রবল। তার থেকে দূরে সরে যেতে হবে। এখানে লেখকের স্বতন্ত্র জীবনদর্শনের প্রশ্ন ওঠে। আজকের লেখকের জীবনদর্শন অন্বেষণ করতে গিয়ে অনেকে ব্যর্থ হবেন।

সাধারণভাবে এ আলোচনায় আরও বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

*** তুরস্কের কবি ***

কিছুদিন আগে লেবাননের দুজন সাহিত্যিক এসেছিলেন ভারতদর্শনে। ভারতের সাংস্কৃতিকজীবনের গভীর সান্নিধ্য লাভের আশা পোষণ করে তাঁরা ভারতভূমি ত্যাগ করেন। সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন তুরস্কের বিখ্যাত কবি ও রাজনীতিবিদ ডঃ ফেতি টেভেটোগলু। এশিয়ার কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করে ভারত সরকারের অতিথি-রূপে তিনি কলকাতায় আসেন। তিনি কলকাতা ছাড়াও আলীগড়, আগ্রা, জয়পুর ও দিল্লী সফর করবেন। ভারতে তাঁর অবস্থানকাল মাত্র এক সপ্তাহ।

এই তুর্কী কবি রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, কাব্য-গ্রন্থ, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ তিনি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল গীতাঞ্জলি, গোরা, ডাকঘর, চিত্রা প্রভৃতি। তুরস্কে তাঁর উদ্যোগে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচার আরম্ভ হয় রবীন্দ্র-নাথেরই জীবিতাবস্থায়। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে আনন্দিত হয়ে ১৯৩৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তাঁকে পত্র দেন। ১৯২৮ সালে ইউরোপ সফর শেষ করে রবীন্দ্রনাথ জলপথে তুরস্কে গিয়ে-ছিলেন।

তুরস্কের সেনেটের সদস্য ডঃ টেভেটোগলু কলিকাতায় এক বিবৃতিতে বলেন যে ভারত যদি কম্যুনিস্ট চীনের আক্রমণের শিকার হয়, তাহলে সারা এশিয়া ধ্বংসের মুখে দাঁড়াবে। তিনি আরও বলেন যে "ভারত পৃথিবীর দুটি শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। সুতরাং ভারত যদি কোন গুরুতর বিপদের মধ্যে পতিত হয়, তাহলে তা বিপর্যয়কর হবে।"

* * *

শ্রীবুদ্ধদেব বসু বর্তমানে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সম্প্রতি তিনি চিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চারটি পর্যায়ে ভাষণ দিয়াছেন ঊনিশ ও বিশশতকের বাঙলা সাহিত্যের ওপর।

বিদেশী সাহিত্য

*** অসবর্ণ-এর নাটক ***

আধুনিক ইংরিজি নাটকে ইবসেনের প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। বর্তমান শতকেই ইবসেনের প্রভাবের সার্থকতম রূপ হল আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ। শ নাটকে বিতর্কমূলক বিষয় বা সমস্যা উপস্থাপনের পক্ষপাতী বলেই অধিকাংশ নাটকে স্বীয় সামাজিক রাজনৈতিক বা জীবন সম্পর্কিত বহুবিধ সমস্যাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। শ'র তীব্র বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ বা হাস্যরসাত্মক বাগ-বৈদগ্ধ্য বিশ শতকের সাহিত্যক্ষেত্রে পরম বিস্ময়। অপর ক্ষমতাশালী নাট্যকার জন গলসওয়ার্দি সমাজসমস্যামূলক ভাবাবেগপূর্ণ কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। এই সঙ্গে ইয়েটস-এর অবদান কম নয়। কাব্যগুণান্বিত নাটক রচনায় টি এস এলিয়ট বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের অন্যতম। তাঁর **মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল, দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন, দি ককটেল পার্টি, দি কনফিডেনসিয়্যাল ক্লার্ক**— নাটকগুলি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে বহু শক্তিশালী নাট্যকার এলিয়ট-এর দ্বারা প্রভাবিত।

নাটকীয় গদ্য ও সংলাপসৃষ্টিতে টেরেন্স রেটিগান-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টি এস এলিয়ট এবং তাঁর **মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল**-এর সঙ্গেসঙ্গে জন মেসফিল্ড, চার্লস উইলিয়মস, ডরোথি শেয়ার্স এবং ক্রিস্টোফার ফ্রাই-এর নামও খুব সহজেই এসে পড়ে। এ'দের মধ্যে এলিয়টই হলেন শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। নাটক, কাব্য এবং সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁর অবদান সমানভাবেই উল্লেখযোগ্য। কাব্য-নাটক রচনায় **মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল**-এর সার্থকতাই তাঁকে **দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন** রচনায় অনুপ্রাণিত করে।

সঙ্গেসঙ্গে প্রতিভাধর নাট্যকার ক্রিস্টোফার ফ্রাই সাম্প্রতিককালের কাব্য-নাট্যের জগতে নতুন সুর যোজনা করেন। তাঁর **দি লেডিজ নট ফর বার্নিং, ভেনাস অবজারভড, এ স্লিপ অব প্রিজনারস** উল্লেখযোগ্য নাটক।

১৯৫০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে চিন্তা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। নতুন ভাবে নতুন কিছু বলবার আন্তরিক প্রচেষ্টা পূর্বের তুলনায় অধিক প্রকাশ পেতে শুরু করল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই যুগে দাঁড়িয়ে তরুণ নাট্যকারগণ নিজেদের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সার্থক শিল্পসম্মত রূপ দিতে সক্ষম না হলেও মোটামুটিভাবে আন্তরিকতার সুরটি নিয়ে ধরা দিতে পেরেছেন। এ'দের মধ্যে জন অসবর্ণ, অ্যানি জেলিকো, জন আর্ডেন, আর্নল্ড ওয়েসকার, এবং আরো অনেকেই ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। হ্যারল্ড পিনটার নামক অপর একজন নাট্যকার এ'দের থেকে কিছুটা ভিন্নপথে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু জনপ্রিয় হতে পারেননি।

জন অসবর্ণ সাম্প্রতিক ইংরিজি নাট্যসাহিত্যের জগতে একটি বিতর্ক-মূলক চরিত্র। তাঁর **লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার** বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নাটকের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা করেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই নাটকখানি অভিনীত হবার পর অন্যান্য তরুণ নাট্যকাররা নিজেদের চিন্তাকে প্রসারিত করবার সুযোগ পেলেন। পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুরটি আরও প্রবল হয়ে উঠল। নাটকের বিষয় ও চিন্তা স্বাতন্ত্র্য বিস্ময়করভাবে উল্লেখযোগ্য। জিমি পোর্টার হল কাহিনীর নায়ক। লেখাপড়া জানা উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করাই তার অভিপ্রেত। সে একজন শ্রমিকের জীবনযাত্রাকে স্বীকার করে নিল। কিন্তু উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান স্ত্রী অ্যালিসন-এর প্রতি তার ঘৃণা ও শ্লেষের সীমা নেই। অ্যালিসন যখন পিতৃগৃহে গেল জিমি অ্যালিসন-এর বন্ধু হেলেনার সঙ্গে বাস করতে থাকে। অ্যালিসন ফিরে এলে হেলেনা চলে যায় আর জিমি অ্যালিসন আগের মতই জীবনযাপন শুরু করে।

নাটকটি অভিনয়ের সূচনায় সাদর অভিনন্দন লাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হল। এর চরিত্র-কল্পনা এবং সংলাপের সংযোগে যে বিশিষ্টতার ছাপ সুস্পষ্ট তা অন্য কোন আধুনিক নামধেয় নাটকে দেখা যায়নি। সমস্ত চরিত্রকে ম্লান করে নায়কের ব্যক্তিত্ব সমস্ত নাটকটিতে জীবন্ত। অধিকাংশ পার্শ্বচরিত্র অত্যন্ত অস্পষ্ট। ক্রমশঃ নাটকটি উঁচুদরের পত্রিকাগুলির সমাদর লাভ করে এবং চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়।

নায়ককে প্রধান করে অসবর্ণের অধিকাংশ নাটক পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। এর থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে নাট্যকার নায়কের প্রতি তাঁর শিল্পীকল্পনানুভূতি আরোপ করেছেন। একজন বিক্ষুব্ধ তরুণের অন্তরের কাহিনী হল **এপিটাফ ফর জর্জ ডিলন**। এ'র সঙ্গে জিমির মিল রয়েছে। অন্তর্জগত ও বহির্জগতের অন্তর্দ্বন্দ্বের সমস্যা নিয়ে রচিত হয়েছে **দি এন্টারটেইনার**। **লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার**-এর নায়কচরিত্রের সার্থক রূপায়ণের পাশে অন্যান্য নাটকের নায়কের চরিত্র উল্লেখযোগ্যরূপ সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। চরিত্রসৃষ্টিতে যে শিল্পানুভূতির দুর্বল রূপ পরিস্ফুট তাই নাটকগুলিকে কোথাও কোথাও ব্যর্থ করে তুলেছে।

কিন্তু অসবর্ণ বুদ্ধিমান নাট্যকার। নিজের এ ব্যর্থতা নিশ্চয়ই তাঁর চোখে ধরা পড়ে। তাই আত্মরক্ষার জন্য নতুনতর শিল্পধারা খুঁজতে গিয়ে ইতিহাসেই আশ্রয় নেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তাঁর সার্থকতা সাম্প্রতিককালের নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিস্ময়কররূপে সফল। মার্টিন লুথার চরিত্রের যে অসামান্য ব্যক্তিত্ব সুনিপুণ শিল্পরূপ লাভ করেছে **মার্টিন লুথার** নাটকে তা একমাত্র স্মরণ করিয়ে দেয় **লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার**-এর মৌলিক সৃজনী-প্রতিভাকে।

*** মৃত্যু শতবর্ষ ***

জার্মান নাট্যকার, কবি এবং সমালোচক ক্রিশ্চিয়ান ফ্রিডারিশ হেবেল মারা যান ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর জন্ম ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে। তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রাম করে হেবেলকে লেখাপড়া শিখতে হয়। ডেনমার্কের রাজার কাছ থেকে বৃত্তিলাভ করে তিনি কিছুকাল প্যারিসে ও ইতালিতে বাস করেন। তারপর ভিয়েনার এক অভিনেত্রীকে বিবাহ করে সেখানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেন মোটামুটি স্বচ্ছল ও স্বাভাবিকভাবে। প্রথমদিকের নাটকগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে জীবনারম্ভের সূচনাকালের তীব্র সংগ্রামের কথা এবং পরবর্তী রচনায় ট্রাজিক চিত্রায়ণ অনেকটা শান্ত হয়ে উঠেছিল।

হেবেল-এর বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, সমকালীন জীবনযাত্রা এবং বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অবলম্বনে। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে জুডিথ (১৮৪০), **মেরিয়া ম্যাগ্ডালেনা** (১৮৪৪), **হিরোডেস এ্যান্ড মেরিয়ামনে** (১৮৫০), **গিজেস অ্যান্ড হিজ রিঙ্**-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত রচনায় জীবনের বিচিত্র দিক—তার ট্রাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিণতি—আধুনিক ও বিগত জীবনের সমস্যা ও পরিণতি রূপায়িত হয়েছে। প্রথমদিককার অধিকাংশ নাটকের ভাষা হল নিতান্ত সাধারণ গদ্য। কিন্তু শেষদিকে রচিত হয়েছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে। স্বাভাবিক মাধুর্যে বা চমৎকারিত্বে উজ্জ্বল বহু অসামান্য লিরিক কবিতা পাওয়া যাবে হেবেলের কবিতাবলীতে। নাটকের সঙ্গে সঙ্গে কবিতায় তাঁর দানও বিবেচনা করা হয়ে থাকে গুরুত্বপূর্ণরূপে। ডায়েরী বা পত্রাবলীতে হেবেল জীবন ও শিল্পের সমস্যা নিয়ে যে আলোচনা করেছিলেন সমালোচনা-তত্ত্বের ইতিহাসে অমর স্থান খুবই উচ্চে।

অভয়ঙ্কর
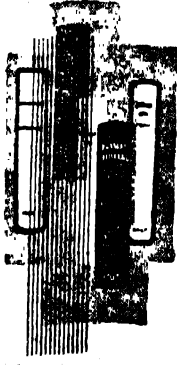
নিজের মাথা লক্ষ্য করে যে মানুষ বুলেট ছোঁড়ে, কিংবা শয়নকালে ঘুমের ওষুধের মাত্রাটা বৃদ্ধি করে দেয়, সে কি পৃথিবীকে ভালোবাসে না, কিংবা জগতের প্রতি নিদারুণ অশ্রদ্ধাবশতঃ কদলীপ্রদর্শনে সহসা সকল উৎসাহ ব্যয় করে বসে? কিংবা মনোভঙ্গি 'দেখব এবার জগৎটাকে' নয়, সে জগতের প্রবল পরাক্রমে পরাজিত হয়ে নতিস্বীকার করে? ইতালীর উপন্যাস-লেখক সীজার পাভিসের মত এই চিন্তায় আর কোনো লেখক ইদানীংকালে এতখানি জর্জরিত হননি। যখন স্কুলের ছাত্র তখনই সীজার একবার প্রায় আত্মহত্যা করে বসেছিলেন। সেই সময় তাঁর আর দুজন বন্ধু জীবনটাকে অকালে শেষ করে দেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বারবার শেষবিদায়ের পালা গাইবার চরম মুহূর্তের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনবার প্রেমে পড়েছেন, এবং প্রতিবারেই তাঁর হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। শেষ মেয়েটি যখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল তখন সেই ১৯৫০-এর এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় প্রিয়তমার উপেক্ষার গ্লানি সইতে না পেরে সীজার পাভিস আত্মহত্যা করলেন। এই সিদ্ধান্ত বীরত্ব না কাপুরুষত্বের নিদর্শন? তাঁর পক্ষে অবশ্য এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। এমন একদিন ছিল যখন তিনি মনে করতেন আত্মহত্যা আর অন্তর্ধান একই বস্তু—বিভিন্ন আকৃতিতে, এই কর্মটিকে একটি বিশেষ ক্রিয়া না বলে আত্মসমর্পণ বলা চলে। আবার এমন দিনও গেছে যখন এই আত্মহননের অভিপ্রায়কে নিয়তির একটা নির্মম চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয়েছে। তাই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে—

"Why not seek death of one's own free will, asserting one's right to choose, giving it some significance? Instead of passively allowing it to happen? Why not?"

এই "হোয়াই নট" লেখকের আপন মনের সংশয় ঘোচাতে পারেনি। তিনি জানতেন যে, অবাধ-ইচ্ছাপূরণের একটা পথ এ হয়ত নয়, বিশেষ করে যখন মানুষকে অর্থানিয়তি এইদিকেই তাড়িয়ে নিয়ে যায় তখন আর অবাধ-ইচ্ছাপূরণের অবকাশ কোথায়? সীজার পাভিসের জার্ণাল বা দিনপঞ্জীর ইংরেজী অনুবাদ কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে "The Business of Living" এই নামে। এই জার্ণালের শেষতম অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছেন—All it needs is a little courage — কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন, আর তারপরই তিনি তাড়াতাড়ি সংশোধন করে নিয়েছেন এই উক্তি, বলেছেন—"Weak women have done it, it needs humility, not pride." অহংকার নয়, চাই কিঞ্চিৎ দীনতা, দুর্বল নারীরাও একাজ করে থাকে।

কিন্তু দীনতাই কি সব, কিঞ্চিৎ দিক্-ভ্রান্তিসূচক মনোভঙ্গিরও প্রয়োজন। "The more the pain grows clear and definite, the more the instinct for life asserts itself" যতই পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে বেদনার আকৃতি জীবনের দাবী ততই প্রবল হয়ে ওঠে। লেখকের নিজেরও এতটুকু সন্দেহ হয়নি যে শেষের সেই ভয়ংকর দিন এতখানি নিকটে এগিয়ে এসেছে। মৃত্যুর কয়েকটি দিনমাত্র পূর্বে তিনি জার্ণালে লিখছেন—

"Why die? I have never been so much alive as now, never so young". কেন মরব? এদিনের মত এত সজীবতা এতখানি তারুণ্য ত' আমার কোনদিনই ছিল না। এইকালে লেখক আপন শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে। ইতালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুরস্কারে সম্মানিত, সমসাময়িককালের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান এবং সম্ভাবনাময় লেখক হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। কিন্তু অকস্মাৎ জীবনের এই উজ্জ্বল দীপশিখা, কামনা-বাসনা তাঁর মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। জীবনের সাফল্য, জীবনের সুদূরপ্রসারী মরুভূমিতে অতি সামান্য সান্ত্বনা, ক্ষীণতম স্বস্তিও আনতে পারেনি। কোনো 'বনলতা সেন' সেদিন তাঁকে দুদণ্ডের শান্তিদান করতে পারেননি, সেই বেদনাই লেখকের বুকে গভীর হয়ে বেজেছিল।

এর পরের কয়দিন কি নিদারুণ যন্ত্রণা যে তাঁকে সইতে হয়েছে তা আমরা কোনোদিন জানতে পারব না।

"Why should it amaze you that other men brush past you, unaware of all this ferment, when you yourself rub shoulders with so many and do not know, do not care, what their anguish may be, their secret cancer?"

আমরা যাঁরা তাঁর ভালোবাসার ধনদের কারো মুখ পর্যন্ত দর্শন করিনি, আমরা কি করে বলব এই প্রশ্নের কি উত্তর? তিনি প্রথমার পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন—"the girl with husky voice" আর শেষতমার পরিচয় হল—"a flower from the lovliest valley of the P O."

এই মেয়েটির প্রেমেই পরাজিত হয়ে তিনি আত্মহনন করেছেন কিনা তা পাঠক জানতে পারে না। এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট—

"One does not kill oneself for love of a woman, but because love — any love — reveals us in our nakedness, our misery, our vulnerability, our nothingness".

সীজার পাভিস শেষপর্যন্ত যে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন তার কারণ প্রেম তাঁর প্রতিরোধ-শক্তি হরণ করেছিল।

এই সমগ্র কালটুকুর প্রতিদিনের ইতিহাস লেখক লিপিবদ্ধ করে গেছেন, আত্মচিন্তনের প্রতিলিপিতে দেখা যায় যে, প্রেম কিভাবে তাঁর মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, ইঁদুরে যেমন করে কাগজ কাটে। আপন প্রেমের কথা মনে পড়তে মাঝে মাঝে তিনি ভাবাবেগে কাতর হয়ে উঠছেন। কিন্তু তিনি যে আকাশের চাঁদ চাইছেন এই মনোভঙ্গির প্রকাশ নেই। তিনি লিখছেন :

"To love some one is like saying: from now on she will think more of my happiness than of her own" এই কারণেই প্রেমিকেরা কবিদের মতো এক কল্পলোকে বিচরণ করেন—

"A man in love .... creates symbols for himself, as a superstitious man does from a passion for conferring uniqueness on

things or persons. A man who knows nothing of symbols is one of Dante's Sluggards" দীর্ঘক্ষণ সীজার পাভিস প্রেম ও কবিতা নিয়ে চিন্তা করেছেন তার ফলে দুইটি বিষয় পরস্পরকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছে। যখন মাত্র কুড়ি বছর বয়স তখন তিনি লিখলেন—

"Writing poetry is like making love; no one will ever know whether one's pleasure is shared..... love and poetry are mysteriously linked, because both are a desire for self-expression, for talk and communication, no matter with whom. An orgiastic desire for which there is no substitute"

বিশ্বলোক 'সত্য এবং ন্যায়ে'র সমন্বয়সাধন করতে পারে এই ধারণাকে বা তার বিশ্লেষণ-চেষ্টাকে তিনি কুসংস্কার মনে করেন, নিজেও তা বিশ্বাস করেন না। কবিতা কিন্তু এই কুসংস্কারকে একটা নাম দেওয়ার চেষ্টা করে, তাকে উপলব্ধি করে যথাসম্ভব নির্দোষ করে তোলে, এইখানেই তার আসন প্রেমের ওপরে—

"It participates in everything that conscience fobids — intoxication, personal love, sin — but redeems itself by its need for contemplation, that is for knowledge".

এই সূত্র নিয়ে সীজার নিজেই অনেক চিন্তা করেছেন, তিনি স্বয়ং যখন কবিতার মধ্যে একটা পলায়নের পথ খুঁজে নিচ্ছেন তখন সেই জগৎ যে কল্পলোকের এক অবাস্তব জগৎ সেই বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে অবহিত। তিনি দেখছেন যে জীবন-যন্ত্রণার তীব্রতা উপশমে প্রেমের মত সর্বরোগহর আমোঘ ঔষধ আর নেই, সাহিত্য, তাঁর মতে, জীবনের বিরুদ্ধে সকল প্রকার আক্রমণের একটা প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা মাত্র। জীবনকে তাই আর্টের সঙ্গে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ভুল করতে তাই তিনি নারাজ। আর যখন তা করে ফেলছেন তখনই আত্মজিজ্ঞাসার দংশনে বিরত হয়ে প্রশ্ন করছেন—

"Am I a Poet or a Sentimentalist?"

তিনি ভাবাবেগ-চালিত মানুষ নন, কারণ আপন থেকে বাহির হয়ে—বাইরে দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখার সততা তাঁর আছে। নিজের বিষয় সীজার পাভিস আশ্চর্যরকম স্পষ্টভাষী। তিনি এক জায়গায় বলেছেন—

"Living is like working out a long sum, and if you make a mistake in the first two totals you will never find the right answer"

নির্ভুল উত্তর কে জানতে পেরেছে? এক জায়গায় ভগবান বুদ্ধের প্রথম উপদেশের মত তিনি বলেছেন—
"Loneliness is pain! love making is pain; piling up possessions or herding into a crowd is pain."

এত সব বেদনার মধ্যে দায়িত্বের কথা বলা নিরর্থক। নিজের অজ্ঞাতসারেই মানুষ নিউরোটিক হয়ে ওঠে—
"Where is then the freedom of choice? Where does responsibility lie?"

মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় অসম্ভবের ক্ষুধা মনে নিয়ে আর যা সৎ এবং যা অসৎ এই দুয়েরই 'মোটিভ ফোর্স' একই, মানুষ দুই বৈপরীত্যের মধ্যে ঝড়ের মুখে পাখির পালকের মত উড়ে বেড়ায়। ভার্জিনিয়া উলফেরও এই অবস্থা হয়েছিল, জীবন-ধারণের বেদনা তাঁর অসহ্য মনে হয়েছিল তাঁর কাছে, তাই—
"Beauty is part ugliness; amusement is part disgust, pleasure is part pain". তাহলে কি করা যায়? দাঁতে দাঁত দিয়ে সহ্য করব? নয় পরাজয় মানব! সীজার পাভিসকে প্রশ্ন করে লাভ নেই, তিনি তাঁর শেষ কথা বলে ফেলেছেন। তাই এই জার্ণাল পাঠে মন বিষাদে ভরে ওঠে, প্রাণ রাখা যে প্রাণান্তকর তা বোঝা যায়।

THIS BUSINESS OF LIVING: By CEASRE PAVESE (Peter Owen — 30 Shillings)

॥ মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ ॥

তখনো রবীন্দ্রনাথ জীবিত। একদিকে তাঁর অব্যাহত সৃষ্টিধারা ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে রূপময় সমৃদ্ধি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য অধ্যায়ের পরিণতি রচনা করে চলেছে। আর অন্যদিকে, আলোর পদাশ্রয়ী ছায়ার মতো বিরাজিত রয়েছেন রবীন্দ্রানুসারী কবিসংঘ। মোহিতলালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণে স্বকীয়তাহীন ব্যর্থ পদ্যরাশি রচনা করে চলেছেন।

ঠিক এসময়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করে কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তির প্রয়াস তথা আধুনিকতার সূত্রপাত করলেন কিছু তরুণ সাহিত্যকর্মী। ত্রিশের দশকের প্রারম্ভে তা আন্দোলনের আকার লাভ করে। বাংলা কবিতায় এক নতুন অধ্যায়ের উজ্জ্বল সূচনা দৃষ্ট হোল। এই নবীন কাব্যপ্রয়াস বাংলা কবিতাকে পৃথিবীর কবিতার ইতিহাসের সমকালীন অধ্যায়ে নিয়ে এলো। ক্রমশ এক নবতর কাব্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করে তুলল।

এই আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যকৃতি এ প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয়। আধুনিকতার প্রবক্তা হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি আধুনিকতার ব্যাখ্যায়, বিরোধিতার সঙ্গে সংগ্রামে, আধুনিক কবিদের সাহচর্য এবং আনুকূল্যদানে তাঁর উৎসাহ কখনো পরাঙ্মুখ হয়নি। সর্বদিক থেকেই বুদ্ধদেববাবুর সাহিত্যপ্রয়াস বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রোত্তর পর্যায়ে ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময়।

কোন গ্রন্থের প্রচ্ছদে বুদ্ধদেব বসুর নাম মুদ্রিত দেখলে স্বভাবতই এ-কথাগুলি স্মরণ হয়, কেননা কথাগুলি ঐতিহাসিক এবং স্মরণীয়।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি বুদ্ধদেববাবুর কোন নবতর গ্রন্থ নয়। ভূমিকানুসারে, এ-গ্রন্থে 'দময়ন্তী' ও 'দ্রৌপদীর শাড়ি' —পূর্বতন কাব্যগ্রন্থদ্বয় থেকে যেসব কবিতা 'এখনো চলনসই' বলে কবির মনে হয়েছে, সেগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'অন্যান্য কবিতা' অংশে সংকলিত হয়েছে 'বিদেশিনী', 'বন্ধু', 'কবির স্ত্রী' 'উদ্বাস্তু'—এ ক য় টি আখ্যান-অবলম্বী কবিতা। কোন কোন কবিতা এ-বইয়ে ছাপা হবার আগে সংক্ষেপিত বা পরিশোধিত হয়েছে।

আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠকের কাছে এ-গ্রন্থের কবিতাগুলি অপরিচিত নয়। এই কবিতাগুচ্ছের অনেকগুলি 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা' শীর্ষক সংকলনেও প্রকাশিত হয়েছে। স্বভাবত এসব কবিতা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা অনেকাংশে বাহুল্য বলে মনে হবে।

তবু বইটি পড়তে পড়তে কিছু কথা আলোড়িত হয়। প্রথমত, বুদ্ধদেববাবুর কবিতা আত্মবিষয়ক হলেও, তা জীবনানন্দের মতো আত্মগত নয়। জীবনানন্দের উদ্দেশ্যে একটি উৎসর্গ-কবিতায় বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন 'সে পথ নির্জন, যে পথে তোমার যাত্রা'—জীবনানন্দ সম্পর্কে যথার্থ এবং সুন্দর এই পংক্তি। আবার সাথে সাথেই মনে হয়, এ-পথ কিন্তু বুদ্ধদেবের নয়। তাঁর পথ জনবহুল নাগারিক পথ—কোলাহলের মধ্য দিয়ে একাকী তিনি এগিয়ে চলেছেন কিন্তু যে-কোন সময়ে চলমান

জনতার মধ্য থেকে একটি পরিচিত মুখ বেরিয়ে আসতে পারে—কেউ এসে কুশল প্রশ্ন করতে পারে, সে অনুরাগী অথবা বন্ধু যে কেউ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধদেববাবুর কবিতার উৎসে রয়েছে হৃদয়াবেগসঞ্জাত সহজ অনুভব। এর ফলে কবিতা লাভ করেছে স্বচ্ছতা এবং প্রায়শই তাঁর কবিতার আবেদন মননে নয়, হৃদয়ে। এসব কারণে অনেক সময় তাঁকে তাঁরই সমকালীন কয়েকজনের তুলনায় কিছুটা কম আধুনিক বলে বোধ হয়। অবশ্য এ-কথা বলা হচ্ছে না যে, আধুনিকতার উপরই কবিতার সিদ্ধি একান্তভাবে নির্ভরশীল। এছাড়া সরলতা, আবেগাত্মক অনুভব, শিল্প-নৈপুণ্য, সর্বোপরি দ্যুতিময় কবিত্ব তাঁর কবিতায় একটি আকর্ষণীয় পাঠ্যতা সঞ্চারিত করেছে। এসব চিন্তা তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'যে আঁধার আলোর অধিক' সম্পর্কে অনেকাংশে এবং পূর্ববর্তী কবিকৃতি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য।

বুদ্ধদেববাবুর কবিতার পরিণতির ইতিহাসে তথা বাংলা কবিতার আধুনিক ধারার বিবর্তনের গতিপথ নিরূপণে 'দময়ন্তী : দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা'-র কবিতাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ কবিকর্ম হিসেবে বিবেচ্য। রচনা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এ-কথা গভীরভাবে মনে হয়।

অবশেষে এরূপ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশককে সাধুবাদ জানাই। কেননা, যখন বাংলা কবিতার আধুনিকতার আন্দোলনের সার্থকতা এবং সমৃদ্ধি দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃত, ঠিক এই সময়েই পুরোধা আধুনিক কবিদের বর্তমানে অপ্রাপ্য কাব্যগ্রন্থগুলি পুনরায় প্রকাশ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। আশা করি প্রকাশকগণ এ ব্যাপারে প্রয়াসী হবেন। ফলতঃ এরূপ প্রকাশনা আধুনিক কবিতার ক্রমবর্ধমান পাঠকের কাছে মূল্যবান এবং অভিনন্দনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং নতুন পাঠক সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

দময়ন্তী: দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা— বুদ্ধদেব বসু। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—চার টাকা।

●

একই অলিন্দে : দুই স্বতন্ত্র চিন্তা

তরুণ কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্ত এবং অমিত রুদ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম দিনের সূর্য' যুক্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম অলিন্দের কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্তের কবিতাগুলি সংযত উচ্ছ্বাসে, ছন্দ ও রচনার সৌকর্যে আমাদের স্নিগ্ধ করে। দুঃখের আর্তি, প্রেমের উত্তাপ, সর্বোপরি জীবনের ব্যাকুলতাকে আত্মস্থ করার জন্য তাঁর যন্ত্রণাময় স্বীকৃতি, কখনও পয়ার বা অসমমাত্রিক অক্ষরবৃত্তে, মাত্রাবৃত্তে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় অলিন্দের কবি অমিত রুদ্রর কবিতাগুলি গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশে মনে হয়, তিনি অকালে কবিযশপ্রার্থী। অসমপংক্তিতে কবিতাগুলি সাজিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন; যেমন—

একটু প্রেম
একটি নারী—
একটুখানি নীড়—
এসব নিয়ে কালের ঘরে
একটুখানি ভীড়,

●

আধুনিক বাংলা কাব্যান্দোলনের দীর্ঘ ত্রিরিশ বছর পরেও এই 'নীড়', 'ভীড়'-র মিল দেওয়া সংযতহীন পংক্তি পড়ে আশ্চর্য হতে হয়। 'পরাজিত', অচেনা', 'পুনর্বিজয়' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা বাদ দিলে, অধিকাংশ কবিতা'তে মহৎ কোনো ব্যঞ্জনা নেই, এমনকি কবির মানসিক বিন্যাসও অত্যন্ত হাল্কা, আপাতরম্য।

প্রথম দিনের সূর্য—(কবিতা গ্রন্থ) মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, অমিত রুদ্র। পরিবেশক : গ্রন্থনিলয়; দাম দু'টাকা।

●

রোমান্টিকতায় ভাস্কর কবি

আধুনিক বাংলা কবিতা আপন সৌকর্যে ও বৈশিষ্ট্যে উত্তরোত্তর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এর একদিকে আছে প্রবীণ কবিদের আত্মনিষ্ঠ, স্থিতিস্থাপক প্রচেষ্টা, অন্যদিকে তরুণ কবির পরীক্ষামূলক প্রয়াস।

ত্রিরিশের কবিদের লক্ষণীয় আলো বদলের পর, চল্লিশের কবিরা তাতে স্নাত এবং স্থিত হলেন। কিন্তু তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলন এই স্থিতাবস্থাকে চঞ্চল এবং সমাজমুখী করে তুলেছিল। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ কয়েকজন, আমার মনে হয়, সেই সামাজিকতায় নাম লেখান নি। পারিপার্শ্বিক বৈপরীত্যে তিনি আপন মনীষায় নিবিষ্ট ও অভীষ্ট ছিলেন।

'অবতামসী, আবার রাত্রি' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'নিরন্ত নির্ঝর', 'আকাশিনী ও মৃন্ময়ী'র পর, তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'অনুলেখ' প্রকাশিত হয়েছে; 'অনুলেখ', 'চূর্ণ পদাবলী', 'অমিল পঞ্চক', 'অবতামসী', 'আরো রাত্রি', 'বর্গীর তৃতীয় বর্গ' ইত্যাদি অংশে কাব্যগ্রন্থখানি বিভক্ত। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিক কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থে তদানীন্তন উত্তেজনা এবং সাময়িক যন্ত্রণা স্পর্শ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি রোমান্টিকতায় ফিরে এসেছেন।

কবিতার আঙ্গিকচর্চার ছন্দের বৈচিত্র্য, মিল-প্রয়োগের নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়। আঙ্গিকের প্রতি আত্যন্তিক নিষ্ঠার জন্যই হয়ত, কবিতার আত্মাকে তিনি অনেক সময় উপেক্ষা করেন; ফলে চূর্ণ পদাবলীর অনেক কবিতাকেই জোলো বা ফিকে মনে হয়।

অনুলেখ— (কবিতাগ্রন্থ) বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থনিলয়, কলকাতা। দাম—তিন টাকা।

●

॥ শারদ সংকলন ॥

● অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবিতা-সঙ্গীত-শিল্পচর্চা ও সমালোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র উত্তর সূরীর বর্তমান বিশেষ সংখ্যায় লিখেছেন অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, রাম বসু, লোকনাথ ভট্টাচার্য, অরবিন্দ গুহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, আলোক সরকার, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, শোভন সোম, পবিত্র মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। সাহিত্য-ভাবনায় প্রোজ্জ্বল এই বিশেষ সংখ্যার দাম দেড় টাকা।

● আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত এবং হরিদাস চক্রবর্তী ও চিদানন্দ গোস্বামী সম্পাদিত শুভায় পত্রিকার শারদ সংখ্যায় লিখেছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বাণী রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, চিদানন্দ গোস্বামী এবং আরো অনেকে। দাম এক টাকা।

● শিশির মজুমদার সম্পাদিত আঞ্চলিকীর শারদ সংকলনে লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, প্রমথনাথ বিশী, জাহ্নবী চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, রত্নেশ্বর হাজরা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু এবং আরো অনেকে। দাম পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

● অমিতাভ সেনের সম্পাদনায় ৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিঃ—১৩ থেকে প্রকাশিত ক্রান্তি-এর শারদ সংকলনে লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সত্যজিৎ রায়, শোভা সেন এবং আরো কয়েকজন।

দিল্লীর দিনযাপন থেকে

মানস রায়চৌধুরী

তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কুয়াশা লেগেছিল একবার
অবিশ্বাস্য এপ্রিলেও, দিল্লীর স্টেটবাস থেকে দিল্লীর রোদ্দুরে
খুব সকালের নীলচে হাওয়ার ভিতর দিয়ে দ্রুত সঞ্চারিত সময়ের
পাখার উড্ডীন অন্তঃশীলতায়, যাত্রাপথে, তোমাকে বিচ্ছিন্ন
করার কুয়াশা এই ফিরে এসে কলকাতায়। অনুত্তীর্ণ সকালে সন্ধ্যায়।

কেন যে উৎসাহ জেগেছিল, ভাবি কেন বাদামের কেন্দ্র থেকে বাইরে খোসায়
বিপরীত অভিজ্ঞতা পেতে গিয়ে সংবেদনশীল নখে মমতা বিদ্বেষ হয়ে গেল.........
কেন যে তোমার চোখ উদ্ভিন্ন শরীর থেকে ভিন্ন হয়ে স্কুটারে অচেনা চলে যায়,
কেন যে তোমার পায়ে লৌকিক আলতার ছোপ কোনদিন লাগবে না, তুমি
কোনদিন সিঁদুরের রক্তরেখা, প্রাচুর্য জানবে না
তুমি চিরদিন ম্লান নিস্তেজ ফেনানো খোঁপা ছুটন্ত সাইকেলে—
তবু কেন উৎসাহ জেগেছে, কেন সব জেনে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উচ্চাশা।

সব্জির খেতের থেকে খরমুজ বাজার অবধি অবিরাম বিছানো ক্ষুধায়
তোমাকে দেখার ভ্রম, যে কদিন দিল্লী প্রান্ত থেকে আমি যে কদিন অপরিচয়ের
রসুনবিহ্বল গন্ধে, যে কদিন রুটির দোকানে, নিচু পানের দোকানে দাঁড়িয়েছি
"ছুটে গেল, ছুটে গেল ওই" ভেবে তোমার চোখের মত ভ্রান্তিতে অথবা
অলীক দ্রাক্ষার বনে অসীম মদির দিনগুলিতে, তোমাকে
সমস্ত কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন করার কুহেলিকা লেগে ডুবে আছি দৃশ্যের নিঃশ্বাসে।

দুঃসময়

শান্তি লাহিড়ী

সব কথা বলা হয়ে গেছে,
এখন নীরব কিছু দুঃসময় বয়ে নিয়ে যাই,
প্রস্রবণে যে বিপদ দেখা দিয়েছিল
সেটুকু নিঃশেষে ওই তৃণে গেঁথে স্মৃতি হয়ে থাক।
ওষ্ঠে যে সাম্রাজ্য পেতে ছিলাম শান্তিতে,
হৃদয়ের সুপ্তিময় যে বিহঙ্গ নীড় বেঁধেছিল,
কুন্তলে স্বপ্নের ফুলে যে রাখাল মুগ্ধ হয়েছিল,
যে বাঁশির সুরে রক্ত ঝরেছিল দক্ষিণ আকাশে
ওখানে কি সব ধরা আছে?
তটিনী কি সব শব্দ একা একা
তরঙ্গ কি আবৃত্তির সব অধিকারে?
স্বপ্নে-জাগরণে কাটে তমসার মসৃণ ভূমিকা
নিকুঞ্জে দোয়েল ডাকে, সে কেমন জাগে বিভাবরী।

বনানীকে একটি কবিতা

গণেশ বসু

স্মৃতিই একান্ত যদি বেঁচে থাকে তাহলে এখন
তোমাকে ভুলিতে দাও। হেমন্তের হিমার্ত বেলায়
বিরহ চাহি না আর, অথবা সে ঘৃণার কারণ
রূপেতে বাঁচিয়া রবো ভাবি নাই কোনদিন। হায়
তোমার বিহনে এই অসহায় যুবক চতুর
ধূসর আকাশে কভু তাকাবে না; প্রবীণ-স্মৃতির
সুতীব্র যন্ত্রণা নিয়ে ম্লান কিংবা বিষাদে আতুর
কখনো হবে না আর, ভুলে যাবো উজ্জ্বল শরীর
করুণ রেখার মতো তোমাদের। ভুলে যাবো নারী
জ্যোৎস্নার নীলাভ রোদ কিংবা কোন বন-হরিণীর
উত্তম চিতল-আশা করতলে। যদি আমি পারি
স্মৃতির কবরে ভুলে হাঁটিব না, কখনো গভীর
হৃদয়ের অন্বেষণে। দিনশেষে মৃত্যুকেই যদি
প্রেমিক ভাবিতে হয়, হায় নারী স্মৃতি-সত্তা-নদী।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুপুরে খেতে বসে আনন্দ জানালে, 'আজ রাত্রে নাকি গাঁয়ের লোকেরা 'থৈইলা' পূজো করছে গ্রীরী যক্ষের তুষ্টিসাধনে। অন্ধ বিশ্বাস বলেই মনে হয়। তবু বেশ দেখবার মতো। আপনারা যাবেন নাকি?'

লীলা প্রস্তাবটা লুফে নিলে। জনও সম্মত হোল। বললে ঃ 'ঐ সব দেখতে আমার ভারী শখ। রিচার্ডেরও ইচ্ছে আছে নিশ্চয়। ইতিপূর্বে আমি ও-সব কখনও দেখি নি।'

'সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমাদের তা হলে রওনা হতে হবে।' আনন্দ জানিয়ে দিলে '—থৈইলা পূজো আরম্ভ হয় সন্ধ্যে ছয়টা নাগাদ। আর সকাল দুটা পর্যন্ত পূজো চলে। তবে হ্যাঁ, সারাক্ষণ আমাদের বসে থাকতে হবে না।' মধ্যাহ্ন [illegible] আমরা [illegible] [illegible] মাথাধরার নাম [illegible] [illegible]টা খেতে পারল না। [illegible] [illegible]গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর এক-নাগাড়ে টেনে চলল সিগারেটের পর সিগারেট। সারাটা মেঝে ছাইয়ে ভরে গেল। সেদিকে একটুও খেয়াল নেই।

'চাকর-বাকর আর কাছারীবাড়ির সবাই 'থৈইলা' পূজো দেখতে যেতে চাইছে।' আনন্দ চায়ের টেবিলে বসে বললে। '—আমার তো মনে হয় ওদের যেতে দেওয়া উচিত, তোমার কি মত লীলা, ঘরে ইলিয়াস থাকলে চলবে, সেও অবশ্য যেতে চাইছে। কিন্তু উপায় কি বলো?'

•

আমরা সবাই পল্লীতে এসে উপস্থিত হলাম।

দেখলাম এক খোলামাঠে গাঁয়ের অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে। আমাদের দেখে গাঁয়ের মোড়ল আর বুড়ো সিলিন্ডু এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল।

তারপর নিয়ে গিয়ে আমাদের জন্য বিশেষ-করে-রাখা খানকয়েক চেয়ারে বসালে। আমাদের বসবার জায়গা থেকে অনুষ্ঠানের স্থান দেখা যায় সবটা ভাল করে।

আনন্দ চেয়ারে বসে বুড়ো সিলিন্ডুকে বললে ঃ 'তুমিও থেকো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করল। বলল ঃ 'ওখানে [illegible] তার নাম 'ধিদিয়া'। ঐ ধিদিয়ায় 'পরেই থৈইলা পূজো অনুষ্ঠিত হবে।'

ওখানকার এক প্রবেশপথ দেখিয়ে আবার বলল ঃ 'ওর নাম আইল। আর তার চারপাশে বড় বড় যে-সব গাছপালায় ডাল পোঁতা দেখছেন তাকে বলা হয় 'গোরকো'।

ঘেরাটার একপাশে ছোট উঁচু মত খানিকটা স্থান দেখিয়ে জন জিজ্ঞেস করলে ঃ 'ওটাকে কি বলে তোমাদের শাস্ত্রে?'

'ওর নাম 'সিদেসী', সিলিন্ডু জবাব দিল। গুটি কয়েক কাঁঠালপাতায় চুপড়ি দেখিয়ে সে আবার বলল ঃ 'ওসব হোল কর্তা, 'জোতুঁ' বা যক্ষের খাবার। ওদের একটাতে রয়েছে লাল মোরগের রক্ত, একটাতে আছে পাঁচ রকমের বীজ-ধান, তৃতীয়টাতে আছে খানিকটা মাংস, চতুর্থটাতে আছে কাঁচা মাছ, পঞ্চমটাতে আছে বিশেষ করে তৈরী করা পরমান্ন আর ছয়েরটাতে আছে মিষ্টান্ন। প্রকাণ্ড একটা নারকেলও রয়েছে দেখুন কর্তা, মাঝ-খানটায়।'

গাঁয়ের লোকজন ছেলেমেয়ে বুড়ো সবাই ঘেরার চারপাশে গিয়ে বসে পড়ল।

এস ডব্লু আর ডি বন্দরনায়ক

একটু পরেই ঢাক-ঢোল হৈ-উল্লাসের মধ্যে 'কর্তাদিয়া' (পুরোহিত) এসে প্রবেশ করল 'ধিদিয়া'য়। পরনে তার লাল কাপড়। মাথায় জড়ান লাল পাগড়ি। হাতে তার দুটো জ্বলন্ত মশাল। ঢাকীরা বেদীর চারপাশে দাঁড়িয়ে ঢাক পিটোচ্ছে

লাগল। 'কর্তাদিয়া' তখন শুরু করল তাণ্ডব নৃত্য। সমস্বরে উচ্চারণ করতে লাগল মন্ত্রধ্বনি ঘুরে ঘুরে। সিলিণ্ডু জানালে এক সময়ে যে উনি নাকি রীরী যক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

আমি আশেপাশে তাকালাম। এ মনোরম দৃশ্য কিন্তু সহজে ভুলবার নয়। দূর চক্রবাল ঘিরে রাত্রির নিবিড় ছায়া যেন সমাহিত হয়ে আছে শুভ্র-জ্যোৎস্নার ঘোমটা পরে। আর মশালের জোরাল আলোগুলি উৎসুকে বিহ্বল সমবেত গ্রামবাসীদের মুখের উপর ঠিকরে পড়ে যেন চিকচিক করছে। ঢাকের একঘেয়ে গুরুগম্ভীর আওয়াজ দূর বনজঙ্গলের শিয়ালের ডাককে যেন ছাপিয়ে তুলছে। 'কর্তাদিয়া'র আত্মভোলা তাণ্ডব নৃত্য—বিশেষ করে তার সম্মোচ্চারিত মন্ত্রপাঠ—সবকিছু মিলে বুঝি সৃষ্টি করেছে এক সমাহিত পরিবেশ। কিছুক্ষণ পর পুরোহিতের কণ্ঠস্বর নেমে এল। বিড়বিড় করে কি যেন তিনি আওড়াতে লাগলেন।

'কর্তাদিয়া এবার মন্ত্রপাঠ করছেন। যক্ষকে অর্ঘ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। মিনতি করছেন তিনি যেন এবার গাঁয়ের লোকজনদের রেহাই দেন।' সিলিণ্ডু বুঝিয়ে বলতে লাগল ফিসফিস করে।

আমরা আরও কিছুক্ষণ এমনি মন্ত্র উচ্চারণ শুনে চললাম বসে বসে। আনন্দ এবার ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল: 'এখন দশটা বাজে। চলুন, আমরা এবার চলি। 'থৈইলা' পুজো শেষ হতে সেই সকাল।'

আমরা নিঃশব্দে গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম সিলিণ্ডু আর গাঁয়ের মোড়লের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।

'আশা করি এবার থেকে সব বিপদের অবসান হবে।' লীলা বললে একসময়।—'মিস্টার রাতসিং, আপনার কি মনে হয়? পুজোআর্চায় কি কোন কাজ হয় না?'

'হবে না কেন?' জন বললে। '—এসব প্রাচীন সংস্কার উড়িয়ে দেবার মতো আধুনিক এখনো আমি হয়ে উঠিনি। যাই বলুন, যুগ যুগ ধরে লোকে যে এসব মেনে আসছে তার মধ্যে একটা কিছু আছে বৈকি।'

'কিন্তু—', জন এবার মুচকি হাসল। —'কিন্তু এখানকার এ ব্যাপারে রীরী যক্ষের হাত কতখানি তা একবার তলিয়ে দেখা দরকার।

বাড়ী ফিরে আমরা রাত্রির আহার সমাপন করতে বসলুম। জন তার পূর্বের প্রফুল্লতা যেন আবার ফিরে পেল, খাবার টেবিলটা জমিয়ে রাখল পাঁচমিশালী নানান আলোচনায়। যে বিষয়টা এ কয়দিন আমাদের মনকে পেয়ে বসেছিল, জন ইচ্ছে করেই তা এড়িয়ে যেতে লাগল। খাওয়া-দাওয়ার পর আনন্দ ইলিয়াসকে ডেকে পাঠাল। বেচারী থৈইলার উৎসবে যোগদান করতে পারেনি বলে খুব মনমরা হয়ে পড়েছিল। আনন্দ তাকে বলল:

'এই, যদি যেতে চাস, তবে এখন যেতে পারিস।'

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গল দরজায় প্রবল করাঘাতে। দরজা খুলে দিতেই আনন্দ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। মহা উত্তেজিত সে। বলল:

'রিচার্ড, আবার সেই ভয়ংকর কাণ্ড। আহা, বেচারী ইলিয়াস্। আর সবার মতো—'

'কি?' বিছানা ছেড়ে আমি সটান উঠে দাঁড়ালাম। '—এ্যাঁ, কি বলছেন?'

'কুলীরা কাজে আসছিল, ওরাই প্রথম সন্ধান পেলে ইলিয়াসের শব এক ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে। ওরা ছুটে এসে আমায় খবর দিয়ে গেল।'

'জনকে জানিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি তাড়াতাড়ি কোন রকমে পোশাকটা পরে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। জনও প্রস্তুত হয়ে ছিল। মৃতদেহের সন্ধানে আমরা তখন বেরিয়ে পড়লাম। ইলিয়াসের শব প্রথম যে কুলীটি দেখেছিল, তাদের একজন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। জমিদারী স্টেটের এক প্রান্তে রাস্তা থেকে কিছু দূরে এক ঝোপের মধ্যে নাকি পাওয়া গেছে ইলিয়াসের শবটি। বড় জঙ্গলের পাশে স্টেটের এদিকটা বেশ নির্জন ও পরিত্যক্ত স্থান। মৃতদেহে আঘাতের চিহ্নও অনেকটা বেম্পীর অনুরূপ। ইলিয়াসের শবের দিকে আমরা সবাই অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সামান্য কয়দিনেরই বা পরিচয়? ওকে কিন্তু ভালবেসে ফেলেছিলাম। ইলিয়াস ছিল সত্যি খুব চটপটে, চালাক আর সুনিপুণ ভৃত্য। আনন্দকে দেখা গেল মহা অভিভূত হয়ে পড়তে। জন সহসা নত হয়ে মৃতের মুখের মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগল অনুসন্ধিৎসু চোখে। সে এবার সিধে হয়ে দাঁড়াল। মুখ থেকে তার একটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল। মুখে কিন্তু কোন কথা না। মৃতদেহের উপর একখানা কাপড় টেনে দিয়ে আমরা নিঃশব্দে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম।

'লীলাকে এ খবর কি করে দেবো, তাই ভাবছি।' আনন্দ এক সময় বলে উঠল। '—ও কিন্তু ভয়ানক দুঃখিত হবে।'

'সে ভার আমার উপর ছেড়ে দিন।' জন বলল সংক্ষেপে। '—পুলিশকে খবর পাঠান। আর ছেলেটার বাবা-মাকেও একটা খবর দিন।'

আনন্দ এসব ফরমাস খাটতে বেরিয়ে গেল। লীলাও এ সময় নীচে নেমে এল। সে আমাদের মুখের দিকে বারবার তাকাতে লাগল। বলল: 'খারাপ কিছু ঘটেনি তো?'

'আপনি একবার এদিকে আসুন, মিসেস লিভেরা'। জন তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একখানা সোফার উপর বসাল। আমিও গেলাম তাদের পিছু পিছু। কিন্তু কোন কথা বললাম না।

'আচ্ছা, আপনি না আমাদের সাহসী হতে বলেছিলেন?' কথাটা জন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। 'আমি জানি, আপনি আপনার কথা রাখবেন। আমাদের সাহায্য করবেন।'

'আমি নিশ্চয় চেষ্টা করব।' লীলা জবাব দিলে। ঠোঁট দুটো তার কাঁপতে লাগল। বলল: 'কিন্তু কি হয়েছে—বলুন তো?'

'দুঃখিত, মিসেস লিভেরা; ইলিয়াস আর নেই।' জন কথাটা ফাঁস করলে, 'আর সকলের মত তাকেও মৃত পাওয়া গেছে। আমি তবে শপথ নিলাম, অভিশপ্ত এ ঘটনার এখানেই শেষ করবো।'

অবাক হয়ে আমি জনের মুখের দিকে তাকালাম। ইতিপূর্বে আমি কখনও তার মুখে অমন কথা শুনিনি। অমন শপথও কোনদিন করেনি সে। মুখে পড়ল তার চিন্তার ভাঁজ। সুস্পষ্ট ছাপ অটুট সংকল্পের।

'আপনার উপর আমার একান্ত বিশ্বাস আছে, মিস্টার রাতসিং। লীলা রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। 'আপনি যা বলবেন, তাই করব।'

'অনেক ধন্যবাদ।' জনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'আমার উপর আপনার আস্থা থাকলেই যথেষ্ট। আমি যদি এমন একটা কিছু বলি বা করি, আপনি তাতে বিস্মিত হবেন না, আমাকে সমর্থন করবেন।'

রবিবারটি আমাদের সবাইয়ের এমনি করে মাঠে মারা গেল। পুলিশ ছিল খুবই বিবেচক। অনুসন্ধান, ময়না-তদন্ত যাবতীয় সবকিছু সমাধান করলে অনতিবিলম্বে। বেচারা ইলিয়াসের মৃতদেহটি কবর দেয়ার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনের নিকট অর্পণ করা হোল। রাত্রিতে খেতে বসে আনন্দ বললে:

'কাল সকালেই আমি কিন্তু শেয়াল মারার আয়োজন করছি। এখানকার আশপাশের বনজঙ্গলে অমন ভয়ংকর প্রাণীর অস্তিত্ব আর রাখবো না। আপনারাও সঙ্গে থাকবেন নাকি?'

'রিচার্ড সব সময় শিকারে যেতে ভালবাসে।' জন জানাল। 'আমি অবশ্য শিকার-টিকার করতে পারি না। তবে, আপনাদের সঙ্গে যেতে পারলে খুশী হবো।'

পরদিন সকালবেলা আমরা সবাই—বেরিয়ে পড়লাম। আনন্দ তার কুলী-মজুর আর গাঁয়ের কয়েকজন বন-

তাড়াবার জন্য সঙ্গে নিলে। আমাকে একটা বন্দুকও দিলে। আমরা একসঙ্গে জমিদারী স্টেটের পেছনে দিকটার জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম।

'শেয়ালগুলো তাড়া খেয়ে জমিদারী স্টেটের মধ্যে ঢুকে পড়বে বলে মনে হয় না।' আনন্দ বললে এক সময়। 'ও পাশে জঙ্গলের শেষে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে, রিচার্ড আর আমি ওখানে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকি গে। বন-তাড়ানোর দল আমাদের মিনিট পনের সময় দেবে। তারপর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বন-তাড়ানো শুরু হবে।'

মিনিট পনেরো জঙ্গল ভেঙে আমরা একটা ঢিপির উপর এসে পেঁছলাম। নির্দেশমত এক ঝোপের আড়ালে আমি

তাড়া খেয়ে বেরিয়ে এল। আমি অমনি গুলী করলাম। আনন্দের দিক থেকে আরও দুটি গুলীর আওয়াজ কানে এল। আরও দু-পাঁচটি শেয়ালকে তাড়া খেয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। একটু দূরে ছিল বলে আমি আর গুলী করলাম না। বন-তাড়ানোর দল এবার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। পাশাপাশি চারটি শেয়ালকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তারা খুশীই হোল।

'আপনি খুব কটা মেরেছেন, হুজুর।' একজন বলে উঠলে।

—'আনন্দ কটা শিকার করেছেন গিয়ে দেখা যাক'। আনন্দ যেখানটায় ছিল আমরা সেদিকে গেলাম। দেখলাম, সেও আসছে আমাদের দিকে।

"খারাপ কিছু ঘটেনি তো?"

আমার ঘাঁটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। জনকেও আমার সঙ্গে থাকতে বলা হয়েছিল। সে কিন্তু ঘাসের উপর বসে আরাম করে একটা ঝাফনা চুরুট ধরালে। আনন্দ বিপরীত-মুখো তার ঘাঁটির দিকে চলে গেল।

দূর থেকে বন-তাড়ানো দলের কেনেস্তারা পিটানো আর হৈ-হল্লা ভেসে আসতে লাগল। সে শব্দ ক্রমশঃ হতে লাগল নিকটবর্তী। ঘন সন্নিবেশিত এক ঝোপের অগ্রভাগ সহসা আন্দোলিত হয়ে উঠল। আমার চোখ গিয়ে পড়ল সেদিকে। একটু পরেই দুটি শেয়াল বাঁ আর ডান পাশে ছিটকে বেরিয়ে গেল। আনন্দের দিক থেকে পরপর দুটি আওয়াজ ভেসে এল।

বন-তাড়ানোর দল আরো কিছুদূরে এগিয়ে আসতেই আর এক জোড়া শেয়াল

'আমি কিন্তু তিনটে মেরেছি', আনন্দ চিৎকার করে উঠল। '—আপনি কটা মারলেন?'

'চারটে'। সগর্বে আমি জবাব দিলাম।

একটা বাজপাখী আকাশে খালি চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছিল, আমি তাই দেখছিলাম। আমরা চলে গেলেই মরা শেয়ালগুলোকে দিয়ে আজকের প্রাতরাশটা সমাধান করবে বুঝি বাজপাখীটা।'

বন-বাদাড় ভেঙে আমরা সবাই বাড়ী ফিরছিলাম। জন সহসা যন্ত্রণায় গোঙিয়ে উঠল। আমরা থমকে দাঁড়ালাম। জন তার বাঁ হাতখান বাড়িয়ে দিল। দেখলাম, তার একটা আঙুল কেটে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়াচ্ছে। বলল : 'ধারালো কাঁটায় আঙুলটা কেটে গেল বেশ খানিকটা।'

রক্ত দেখে আনন্দ বাস্ত হয়ে উঠলো। বলল :—'এখানকার কোন কোন কাঁটা

কিন্তু খুবই বিষাক্ত। দাঁড়ান, আপনার ক্ষত স্থানটা আমি চুষে নিই।'

ক্ষতস্থানটায় আনন্দ তার মুখ লাগাল। বলল : 'এখানটায় দেখছি। রক্তটা চুষে বার করে নিচ্ছি। বাড়ীতে গিয়ে একটু আইডিন লাগিয়ে দিলেই সেরে যাবে।'

আনন্দ তাই করল। জন কিন্তু সহসা মাতালের মত টলতে শুরু করলে। আমি প্রশ্ন করলাম : 'কি হোল?'

'মাথাটা ঘুরছে। আমায় একটু বিশ্রাম করতে দাও'। জন বিড়বিড় করে উঠল।

একটা পোড়া কাঠের গুড়িতে হেলান দিয়ে জন চোখ বুজে রইল। আমরা পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। সিগারেট টানতে লাগলাম।

'যাঁরা কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখে অমন করে মূর্চ্ছা যায়, আমি কিন্তু তাঁদের দলে পড়ি না।' আনন্দ ব্যঙ্গ করে উঠল।

বন্ধুর জন্য কিছুটা লজ্জাবোধ করলাম। কৈফিয়তের সুরে বললাম : 'কড়া রোদের জন্য হয়তো মাথা ঘুরছে। আপনি তো জানেন, জন বড় একটা বাইরে ঘোরাফেরা করে না।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে জন কিছুটা সুস্থ বোধ করলে। আমরা তারপর ভালোয় ভালোয় বাড়ী ফিরে এলাম।

দুপুরে খেতে বসে জন আমাদের সবাইকে অবাক বানিয়ে দিলে। বললে :

'কলম্বোয় একটা জরুরী কাজের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আজই আমাকে রওনা হতে হবে। আমি অবশ্য খুব দুঃখিত এজন্যে।' জন একটু থামল, আবার বলল : 'তা ছাড়া, এখানকার এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি এমন কিছু নেইও। 'থৈইলা' পুজোর কথা ছেড়ে দিলেও এখানটার টহল আর শিয়াল মারার যে ব্যবস্থা হয়েছে আশা করি তাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এর পরও যদি হাঙ্গামা না কমে, আপনি আমায় তখন জানবেন, মিস্টার লিভেরা, আমি তখন আবার চলে আসবো।'

লীলার মুখে কালিমার মসিরেখা নেমে এল। কিন্তু মুখফুটে কিছু বললে না। জনের কাছে তার পূর্বপ্রতিশ্রুতির কথাটা বুঝি মনে পড়ে গেল।

'আপনাকে যদি জরুরী কাজে যেতে হয় তা'হলে বাধা দেবো না।' আনন্দ জবাব দিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আবার বলল : 'তবে আরও দিন কয়েক এখানে থেকে গেলে ভালই হোত। আপনার সঙ্গে আমিও এক বিষয়ে একমত যে, ঘটনাটা এখন হয়ত আর অচল অবস্থার সৃষ্টি করবে না। আর যদি করে, আমি অতি অবশ্য আপনাদের দুজন'কই জানাবো।'

'আচ্ছা, দিন কয়েকের জন্য লীলা কোথাও গিয়ে একটু বেড়িয়ে এলে ভালো হোত না?' আমি সাহস করে কথাটা

পাড়লাম। 'দেখে মনে হয় ওর শরীরটা ভালো না। তারপর এসব খুন-খারাপীর ব্যাপারে তার স্বাস্থ্য আরো নিশ্চয় ভেঙে পড়বে।'

'আমিও আপনার সঙ্গে একমত।' আনন্দ জবাব দিলে। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, জন বুঝি আমার প্রস্তাবে মোটেই খুশী নয়। বলল : 'না, আমার কিন্তু মনে হয়, ওর এখানে থাকাই ভালো, বিশেষ করে এ সময়টা। তা ছাড়া' —জন একটু থেমে আবার বলল : 'তাছাড়া, এখন যদি উনি কোথাও যান, আপনার জন্য তাঁর মনটি চিন্তিত হয়ে থাকবে। অবশ্য, উনি যদি যেতে চান, তা বিবেচনা করা উচিত বই কি?'

আমি কিছু বললাম না, যদিও অনুভব করলাম জনের কৈফিয়তটা দুর্বল।

দুপুরে খাওয়ার পর আমরা শীঘ্র বেরিয়ে পড়লাম। অদম্য কৌতূহলে আমি ফেটে পড়লাম। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম, জনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বৃথা, যতক্ষণ না সে আপনা থেকে কিছু বলছে। মাইল ত্রিশ প্রায় গাড়ী হাঁকিয়ে যাবার পর জন সহসা প্রস্তাব করলে, নিকটবর্তী রেস্ট-হাউসে গিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে হবে।

'সে কি! তোমার না কলম্বোয় যাবার কথা? যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই তো ভাল।'

'ওঃ, তা অত তাড়া কিসের?' জন জবাব দিলে।

মাইল কয়েক আরো যাবার পর একটা রেস্ট-হাউস পাওয়া গেল। আমরা যখন রেস্ট-হাউসে এসে পৌঁছলাম, জন শান্তভাবে জানালে, সে এখন খুব ক্লান্ত! একটু ঘুমিয়ে নেবে সে। গাড়ী থেকে বিছানা-পত্র নামাতে বয়কে হুকুম করলে জন। একটু বুঝি বিরক্ত হয়ে বললাম : 'তুমি কিন্তু আচ্ছা লোক, জন। সব কিছুই তোমার হেঁয়ালি!'

'কারণ আছে রিচার্ড!' জন জবাব দিলে গম্ভীরভাবে। '—আমি নিজেই জানি না কি যে করতে চলেছি। ঝুঁকি নিলাম কিন্ত অনেকখানি। খুব বিপদজনক এক্সপেরিমেণ্ট। যেন প্রকৃত কৃতকার্য হই, ভগবান যেন আমায় সাহায্য করেন।'

এর পর কিছুক্ষণ আমি নীরব হয়ে রইলাম। কোন কথা বললাম না। বারান্দায় ইজিচেয়ারে নিজেকে দিলাম এলিয়ে। মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করলাম একখানি বইয়ের মধ্যে। কিন্তু এক বিন্দুও পারলাম না বুঝতে। মনটা নানান সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হতে লাগল।

বেলা চারটা নাগাদ জন তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মুখে তার হাসি-খুশী ভাব। চাঙ্গা ও প্রফুল্ল। চা খেয়ে নিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে আমরা কিছু-দূরে এগিয়ে চললাম। আমি কিন্তু আগাগোড়া উত্তেজিত হয়ে রইলাম। জন আলাপ জমাবার চেষ্টা করলে। আমি কিন্তু টুকিটাকি কথায় কান দিলাম না। জনকেও অগত্যা চুপ করতে হোল।

নৈশ ভোজ সেরে নিয়ে আমরা সান্ধ্য-পত্রিকাখানা টেনে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করলাম। কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখলাম জন তার ঘড়ির দিকে বার বার তাকাচ্ছে।

সহসা সে উঠে পড়ল। বলল : 'সাড়ে দশটা বাজে। গাঁয়ের লোকেরা সকাল সকালই কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে।'

রেস্ট-হাউসের বিল চুকিয়ে বিছানা-পত্র গাড়ীতে চাপিয়ে আমরা আবার ফিরে চললাম।

'রিচার্ড, ড্রাইভারকে গাড়ী ফেরাতে বলো,' জন হঠাৎ বলে উঠল। '—আমরা আবার মহাহেনায় ফিরে যাবো।'

মহাহেনা স্টেটের সিকি মাইলের মধ্যে এসে পড়লে, জন গাড়ী থামাতে নির্দেশ দিলে। তারপর তার ছোট্ট ব্যাগটি খুলে একটা ইলেকট্রিক টর্চ ও ডাণ্ডা বের করলে। বললে : 'আমি কোনদিন রিভলবার সঙ্গে নিই না। এই আমার অনেক কাজে আসে।'

ড্রাইভারকে বলা হোল আমরা না ফেরা পর্যন্ত গাড়ির আলো নিভিয়ে সে যেন অপেক্ষা করতে থাকে।

'এস রিচার্ড,' জন বললে।

আমরা মহাহেনা স্টেটের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গাড়ীখানা তফাতে রেখে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

'বার-ঘরের পাশে ওটা কি? মই না?' জন ফিসফিস করে বলে উঠল। 'ওটার প্রয়োজন হতে পারে।'

আমরা মইখানা কুড়িয়ে নিলাম। ঘাড়ে করে ওটাকে আমি নিয়ে চললাম। তারপর নিঃশব্দে পা ফেলে এগোতে লাগলাম বাড়ীর দিকে। সৌভাগ্যবশতঃ আশে-পাশে কেউ ছিল না কোথাও।

'রোঁদে বেরিয়েছে নিশ্চয়'। জন বলে উঠল ব্যঙ্গ করে।

আমরা তারপর বাড়ীর কাছে এসে পড়লাম। জন চোখ তুলে তাকাল। সতর্ক চোখদুটি এবার ফেললে জানালার দিকে। সহসা জন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে মইখানা দেয়ালের ওপর রাখতে আমায় নির্দেশ করলে হাত নেড়ে। জন মই বেয়ে প্রথম উঠল। পিছু পিছু আমিও উঠলাম। জানলার কাছাকাছি এসে জন একটুখানি বুঝি ইতস্ততঃ করলে কি ভেবে। তারপর খুট করে মৃদু শব্দ জানালা খুলে ফেললে। জানালার নীচু কাঠের রেলিং টপকে ঠিক করে সে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আমিও দেখাদেখি তাই করলাম। দেখলাম আমরা লীলার শোবার ঘরে এসে পড়েছি।

লীলা দেবী দেখলাম ঘুমিয়ে আছেন বিছানায়। স্বচ্ছন্দ তার নিঃশ্বাস-পতনে বোধ হল তিনি গভীর নিদ্রামগ্ন। জন ঘরের এদিক-ওদিক তাকাল। প্রকাণ্ড একটা দেয়াল-আলমারির লাগোয়া পর্দা ঝুলতে দেখে ইসারায় সে আমাকে সেদিকে অগ্রসর হতে বললে। আমরা দুজনে তার আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। একটু পরেই বাইরে দূরাগত পদধ্বনি শুনতে পেলাম। জন খাড়া হয়ে দাঁড়ালে। একখানা হাত রাখল আমার কাঁধের উপর। একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল নিঃশব্দে। পদধ্বনি শোনা গেল ঘরের মধ্যেই। নিঃশব্দ, চুপ-চাপ সব কিছু। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করার মত একটা শব্দ ভেসে এল কানে। জন একটানে পর্দাটা সরিয়ে ফেলল।

তারপর চকিতে লাফিয়ে পড়ল সামনে। বিছানার উপর ঝুঁকে পড়া দেহাবয়বটি আমার নজরে পড়ল এইবার।

মূর্তিটি মুখ ফিরাল। য়্যাঁ! আমার লোমকূপগুলি সহসা খাড়া হয়ে উঠল। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম আনন্দের মুখখানি! কুঞ্চিত ঠোঁট-দুটি থেকে তার অস্ফুট একরূপ শব্দ বুঝি বেরিয়ে এল। মুখখানিতে টাটকা রক্তের ছোপ। জন হাতের রবারের ডাণ্ডাটা দিয়ে সহসা এক ঘা বসিয়ে দিল ওর মাথায়। একতাল মাংসপিণ্ডের মত মেজের উপর আনন্দর দেহটা লুটিয়ে পড়ল। জন মুহূর্তখানেক স্থির ঘুমন্ত অসাড় লীলার দেহখানার দিকে একবার তাকিয়ে নিল ঝুঁকে পড়ে।

'না, বড় একটা জখম হয় নি।' হাঁফ ছেড়ে জন বলে উঠল।

বিছানাটা সে একবার তল্লাশ করে দেখলে। কি একটা কুড়িয়ে নিয়ে আপন পকেটে রাখল সে।

বললে, 'হ্যাঁ, আমি যা ভেবেছিলাম।'

'চল রিচার্ড, ওকে ধরাধরি করে ওর ঘরে নিয়ে যাই।' এবার বলল সে।

আমি আনন্দের ঘাড়ের দিকে ধরলাম। জন ধরল ওর পায়ের দিকটা। তারপর আমরা দুজনে ওকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম বিছানায়।

জন একখানি চেয়ারের মধ্যে বসে পড়ল। পকেট থেকে রুমালটা বের করে সে একবার মুখ মুছলে। তাকিয়ে দেখলাম, ও ঘেমে রীতিমত নেয়ে উঠেছে। পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে নিয়ে সে ওটাকে ধরালে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকাতে লাগলাম এদিক-ওদিক। কি করব ঠিক করে উঠতে পারলাম না। আনন্দ তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে পড়ে আছে নির্জীবের মত।

কয়েক মিনিট পর আর্ত এক শব্দ করে আনন্দ উঠে বসল। জন দৃষ্টিতে সে একবার তাকালে আমাদের দিকে। হাতের

তালু দিয়ে সে মুখখানি মুছে নিলো। দেখলো রক্তের দাগ লেগে আছে হাতে। আগাগোড়া সব ব্যাপারটা ভেসে উঠল বুঝি তার মনের পর্দায়। দু'হাতের তালুর মধ্যে সে মাথাটাকে গু'জলো। তারপর কে'দে উঠল ফু'পিয়ে। অমন আস্ত একটা মানুষকে কাঁদতে দেখা এক ভয়ংকর দৃশ্য। কিছুক্ষণ পরে কান্না থামালো সে। আনন্দ তাকাল এবার জনের দিকে।

'আন্দাজ করছি আপনি সব জানতে পেরেছেন,' রুদ্ধ কণ্ঠে শুধাল সে।

'সবটা নয়', জন বলল ধীরেসুস্থে। 'তবে বেশ কিছুটা নিশ্চয়ই। কতদিন থেকে এমনধারা মানুষের রক্তপানের নেশা আপনাকে পেয়ে বসেছে?'

আনন্দ মুহূর্তখানিক ভাবল। বলল: 'আমি একবার এক বুনো মোষের পিছু নিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ধাওয়া করার পর আমি ওটাকে গুলী করি। জন্তুটাকে ঘায়েল করলাম বটে, কিন্তু নিজেও হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। সঙ্গের শিকারীরা মোষের মাথাটাকে কেটে ঝুলিয়ে নেবার জন্য খু'টি কাটতে গিয়েছিল। আমি তখন করলাম কি, আমার শিকারের ছোরা খানা বার করে জন্তুটির মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে ফেললাম। ঘাড়ে ছোরা বসিয়ে দিতেই অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত-ধারা ছুট্‌লো। তৃষ্ণার চোটে আমার ছাতিটাও ফেটে যাচ্ছিল। খেয়ালের ঝোঁকেই বুঝি চোঁচোঁ করে খানিকটা রক্ত পান করে বসলাম। রক্তটা মন্দ লাগ্‌লো না; সুস্বাদু বোধ হলো। তারপর থেকে জন্তু-জানোয়ারের উষ্ণ টাটকা রক্ত পান করার নেশা আমায় পেয়ে বসল। আশ-পাশে কেউ কোথায় না থাকলে আমি তখনই রক্ত খেতাম।

'তারপর হয়েছে কি, একদিন আমি একা একা জঙ্গলে শিকার করছিলাম। দেখলাম, ছোট একটা ছেলে বনের মধ্যে জ্বালানী কাঠ কুড়োচ্ছে। রক্তপানের এক অদম্য স্পৃহা আমায় তখন সহসা পেয়ে বসল। ছেলেটাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে তার কণ্ঠনালীতে আমার দাঁত দুপাটি বসিয়ে দিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গেলো।'

'আপনি তাহলে এখানকার সব ক'টি মৃত্যুর জন্যই দায়ী?'

'হ্যাঁ'।

'আর ইলিয়াসের?'

'সেদিন রাত্রে আমরা সবাই ফিরে আসার পর আমি ভাবলাম, আর এক-দিনের মতো সেদিন একবার রোঁদে বেরোই না কেন সবকিছু ঠিক আছে কিনা তদারক করতে। আপনার হয়তো মনে আছে ইলিয়াসকে আমি 'খেইলা' অনুষ্ঠানে যোগদান করতে অনুমতি দিয়েছিলাম। রোঁদে বেরিয়ে দেখলাম, পথ ধরে একলা যাচ্ছে সে। আমার মধ্যে আবার সেই অদম্য বাসনাটা চাড়িয়ে উঠলো। দেখলাম আসেপাশে কেউ কোথায় নেই। সবাই গেছে খেইলাতে।'

'আর—আর—,' জন খানিকটা ইতস্ততঃ করে বলে উঠলো। —'আর আপনার স্ত্রীর?'

আনন্দ দু'হাতে মুখ ঢাকলো। গোঙিয়ে উঠল সে এবার:

'ওঃ, সে ভারী ভয়ংকর' ওকে আমি গভীরভাবেই ভালবাসি। ওকে দেখলে পর, যখনি আমার সেই বাসনাটা জেগে ওঠে, তখনি আমি নিজেকে গুলী করায়

কথা ভেবেছি। পাছে ওর কোন ক্ষতি হয়...... আমি খুব সতর্ক হয়েছিলাম। ওর খুব একটা ক্ষতি করা আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না.....মাত্র সামান্য কয়েক ফোঁটা তো রক্ত!'

'আপনি আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে সূঁচ ব্যবহার করতেন বোধহয়? ওঁর বিছানাতে আমি এটি কুড়িয়ে পেলাম কিনা।' জন তার পকেট থেকে একটি সূঁচ বের করল।

'হ্যাঁ।'

আনন্দ সহসা মাথা তুলল। গম্ভীর-স্বরে বলল: 'আর এখন একটি কর্তব্য মাত্র বাকী আছে। দয়া করে একবার পুলিশকে টেলিফোন করুন।'

জন ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আনন্দের কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে বলল, 'অন্য উপায় আছে লিভের।' জন একটু থেমে আবার বলল: 'অপরের কথাও এক্ষেত্রে আপনাকে ভেবে দেখতে হবে, আপনি তো বড় বড় জন্তু-জানোয়ারও শিকার করে থাকেন। তাদের শিকার করতে গিয়ে অনেক সময় তো বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।'

কলম্বোতে পৌঁছে আমি জনকে তার বাংলোয় পৌঁছে দিলাম। তারপর বাড়ী গেলাম। দিন দুই পরে একদিন সকাল-বেলাকার কাগজখানা তুলতেই একটি শিরোনামার উপর আমার চোখদুটি গিয়ে পড়ল:

নামজাদা শিকারীর মৃত্যু

নামজাদা শিকারী মিঃ আনন্দ লিভেরার শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ সম্প্রতি পাওয়া গেছে। প্রকাশ, তিনি শিকারে বেরিয়ে এক মস্ত হাতীর সামনে পড়েন। হাতীটাকে লক্ষ্য করে তিনি কয়েকবার গুলী ছোঁড়েন। হাতীটি জখম হলেও ঘায়েল হয় নি। সে বরং পাল্টা আক্রমণ করে শিকারীকে তার পায়ের নীচে পিষ্ট করে ফেলে।

গাড়ী নিয়ে তখনি আমি জনের বাংলোর দিকে ছুটলাম। কাগজখানাও নিলাম।

'বোস রিচার্ড', জন বলল শান্ত গলায়। তারপর নিজে চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। সযত্নে ধরালো একটি ঝাফনা চুরুট। বলল: 'এবার তাহলে বলি আমার কথা যা তোমাকে এতদিন বলা হয় নি।'

'তোমার কাছে লেখা মিসেস লিভেরার চিঠিখানা যখন পড়লাম তখনি আমার মনে বিপুল সন্দেহ জাগে। চিঠি পড়ে মনে হল, এই জাতীয় ঘটনা সাধারণতঃ ঘটে না। আমি তাই চোখ-কান খোলাই রাখলাম। এমন কি অতি-প্রাকৃতিক শক্তিকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে ইতস্ততঃ করি নি। ইতিপূর্বে যে তিনটি খুন-খারাপি হয়ে গেল তা থেকে অবশ্য বিশেষ কিছু মূল্যবান সূত্র পাওয়া যায় নি। কিন্তু মহাহেনায় আমরা যে দিন গিয়ে পৌঁছিলাম, সেদিন রাত্রেই সৌভাগ্যবশতঃ একটি ঘটনা ঘটল। হুক্কা-হুয়া করে শিয়ালের দল ডেকে ওঠার পর বেম্পীর মৃত্যুতে কেমন যেন খটকা লাগল। সত্যি, আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলল, ঐ শিয়ালগুলিই কি পর পর এতগুলি মৃত্যুর জন্য দায়ী? কিন্তু শিয়ালগুলি যদি মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে তবে মৃত-দেহ অমন অটুট অক্ষতই বা থাকে কি করে? ক্ষুধিত এক দঙ্গল শিয়ালের অমন ব্যবহার কিন্তু আদৌ কল্পনা করা যায় না। শিকার মারার পর শিয়ালগুলো ভয় পেয়ে পালিয়েছে বলে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তাও দুর্বল। আরো তাজ্জব ঘটনা, কণ্ঠনালী ছিন্ন হবার পরও আশে-পাশে কোথাও এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন নেই! এই থেকে বুঝতে বেগ পেতে হল না, যে কারণেই মৃত্যু হোক না কেন, শিয়ালের দল এর পেছনে নেই বরং অপর কোন প্রাণী রক্ত পান করে গেছে। আগে-কার ঘটনা থেকেও এই অনুমানের প্রমাণ পাওয়া গেল। সুতরাং দেখতে হল এটা কোন্ প্রাণীর কীর্তি? অতিকায় বাদুড়ের কথা মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু কোন অতিকায় বাদুড় কর্তৃক এই জাতীয় হত্যা সম্ভব নয়। অতিকায় বাদুড় বা রীরী যক্ষের কাহিনী মহাহেনায় কি সত্যি সত্যি শুরু হয়েছে? কিন্তু আমি শুধু খোস-গল্পে বিশ্বাস করে আমার সূত্র খাড়া করতে প্রস্তুত নই। বিশেষ করে যদি কোন প্রকৃত ব্যাখ্যা দুরূহ হয়ে না ওঠে। সহসা আমার মনে হল, নররক্ত-পায়ী কোন মানুষের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়নি কি? তাই যদি হয়, তাহলে অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলিকে বিশ্বাস না করেও প্রকৃত রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করতে পারা যাবে।

"আমি তখন ভাবতে বসলাম, এ কান্ড কার দ্বারা সংঘটিত হতে পারে। মিসেস লিভেরার গলায় তথাকথিত পোকার কামড় আমার সন্দেহের সীমানাকে অনেকখানি কমিয়ে গন্ডীবদ্ধ করে দিল। ঐ 'পোকার কামড়গুলি' পরীক্ষা করে স্পষ্ট দেখলাম সেগুলি আদৌ কোন পোকা-মাকড়ের কামড় নয়। কোন হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের সরু সূঁচ বিঁধিয়ে দেবার চিহ্নমাত্র। মিসেস লিভেরার ধূসর পাণ্ডুর মুখ আর দুর্বলতা তার রক্তহীনতারই লক্ষণ। সুতরাং আমার তা থেকে অনুমান করে নিতে বেগ পেতে হল না যে তিনিও এ ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত।

"মিসেস লিভেরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করে এমন কেউ এর সঙ্গে তাহলে জড়িত। আমার সন্দেহ তখন আনন্দের উপর পড়ল। মনে আছে তোমার বেম্পী যখন মারা গেল আনন্দ তখন বাইরেই ছিল। মিসেস লিভেরার কাছে গতিবিধিও তার সহজ-লভ্য, বিশেষ করে রাত্রিবেলা। আরও মনে আছে আশা করি, রাত্রে মিসেস লিভেরা ঘুমের ওষুধ খেতেন। কাজেই বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কি? ইলিয়াসের মৃত্যুর পর আমার সন্দেহ আর সন্দেহ রইল না। আমি তার মুখখানি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম, বেম্পীর মত মুখে ওর আতঙ্কের কোন ছাপ নেই। বরং মহা-বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। এ কেবল সম্ভব যদি ওর আততায়ী ওর খুব পরিচিত হয়ে থাকে।

"তবে আমি ধ্রুবনিশ্চিত হলাম শিয়াল-শিকারের দিন। আমি ইচ্ছা করেই ধারাল কাঁটায় আমার আঙ্গুলের খানিকটা চিরে ফেললাম। ভাবলাম হাতে-নাতে একটা পরীক্ষা করেই দেখা যাক্ না। সত্যি রিচার্ড, তাতে কাজ হল খুব। তুমি হয়ত লক্ষ্য করনি, কিন্তু আমি করেছিলাম। আমার আঙ্গুলের ক্ষত-স্থানের রক্তটা চুষে আনন্দ তা ফেলে দিল না। আশ্চর্য, গিলেই ফেলল। বিশেষ করে যখন আমাদের জানাল যে, এ জাতীয় কাঁটা ক্ষত দূষিত হতে পারে। রক্ত চুষে নেবার সময় ওর চোখমুখে আনন্দে চুলবুলে করে উঠেছিল দেখলাম। আমি তখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম আর নিশ্চিত হয়ে আতঙ্কে উঠলাম রীতিমত। ওই-জন্যই ত আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম সেদিন।

"কিং অতঃপরম্! অপরাধটি ওকে সমঝিয়ে দিতে হবে আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওকে যদি আমি তখন অভিযুক্ত করতাম, ও তাহলে সরাসরি তা অস্বী-কার করে বসত। আর আমিও তা প্রমাণ করতে পারতাম না। হাতে-নাতেই ওকে ধরতে হবে ঠিক করলাম।

"ঝুঁকি নিলাম মস্তবড়। সম্পূর্ণ ইচ্ছা করেই মিসেস লিভেরাকে দিয়ে টোপ ফেললাম। সোমবারই ছিল পূর্ণিমা রাত্রি। আমি জানতাম, পূর্ণিমা রাত্রেই অমনতর আক্রমণ ঘটে থাকে। তুমি ত জান রিচার্ড, কোন কোন লোক আর জন্তুকে চাঁদে পেয়ে বসে। চাঁদের প্রভাব পড়ে তাদের উপর গভীরভাবে। আনন্দকেও তখন রক্তপানের নেশায় পেয়ে বসে। লোকজন সবাই সজাগ ও সতর্ক হয়ে পড়ায়, বিশেষ করে ও মহলে টহল-কার্য জোর চলতে থাকায়, বাইরে কোথাও তার আর শিকারের আশা নেই। কাজেই সে মিসেস লিভেরার প্রতি ধাওয়া হল। তারপর কি ঘটল সে ত' তুমি জানই!"

অনুবাদ: নিখিল সেন

—সমাপ্ত—

অপরাধ প্রবৃত্তির উৎস-সন্ধানে

সন্ধ্যা ভট্টাচার্য

অপরাধ বলতে সমাজবিরোধী কাজকেই বোঝায়। সমাজের ইতিহাসের গোড়া থেকেই এই সমাজবিরোধী কাজের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক গোষ্ঠীতে, প্রত্যেক সমাজে এই সমাজবিরোধী কার্যকলাপের কারণ অনুসন্ধান চলে আসছে। কেন মানুষ অপরাধ করে? কত রকমের অপরাধ আছে? অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উচিত কি না—ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানা গবেষণা, বিধি-নিষেধ, শাস্তির প্রচলন হয়ে আসছে।

অপরাধমূলক কার্যাবলী যারা করে তাদের বলা হয় অপরাধী—সুতরাং অপরাধের কারণ নির্ণয় করার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে অপরাধীর স্বরূপ নির্ণয় করা। কেন এই বিশেষ লোকটি এরূপ অপরাধ করে বসলো—সমাজের অন্য আরও পাঁচজন লোক যখন সেই কাজটা করছে না তখন সে কেন ঐ রকম বিকৃত আচরণ করে ফেললো?

প্রত্যেক মানুষের জীবনই বংশানুক্রম এবং পরিবেশ এই উভয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তবে গড়ে ওঠে। তার প্রত্যেক ব্যবহারের ওপরেই এই দুটির প্রভাব থাকবেই। সুতরাং আমরা যখন অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করতে বসবো তখন অপরাধীর জীবনে এই দুটির প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার হবে।

ইতিহাসের মধ্যযুগে এবং বর্তমান যুগের গোড়ার দিকে অপরাধের কারণ সম্বন্ধে যে সব মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তার বেশীর ভাগই বংশানুক্রমকেই অপরাধের কারণ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। যে সব মনীষীরা এই নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লোম্ব্রোসোর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, অপরাধী জন্ম থেকেই অপরাধীর লক্ষণ নিয়ে জন্মায়। তিনি কতকগুলি শারীরিক লক্ষণ ও বিকৃতি দেখে অপরাধী নির্ণয় করতেন।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে অপরাধের কারণ নির্ণয় শুধু আংশিক বা একতরফাই নয়—এটা অসম্পূর্ণ, এমন কি বহুক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় হাস্যকর; কারণ অপরাধপ্রবণতা কতখানি বংশানুক্রমিক সেটাই যখন ভাল করে জানা সম্ভব নয় তখন শুধু বংশানুক্রমের ভিত্তিতে অপরাধ নির্ণয় করাটা ঠিক নয়। আর অপরাধের বহিঃপ্রকাশ এত বিভিন্ন প্রকারের আর তার ক্ষেত্রও এত বিস্তৃত যে তার মধ্যে বাপের অপরাধপ্রবণতা সন্তানের মধ্যে কি নিয়মে আর কতটা দেখা দিয়েছে তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিছুই ঠিক করা যায় না। পিতা অপরাধী হলেই যে তার সন্তানকেও অপরাধী হ'তেই হবে কিংবা সন্তান যদি কোন অপরাধ করে তবে তার কারণকে পৈত্রিক বলে মেনে নেওয়া আজকের দিনে বাতিল হয়ে গেছে। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সমসাময়িক একদল নীতিবিদ ছিলেন যাঁরা অপরাধ সম্পর্কে হেডোনিসম মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের মতে প্রত্যেক মানুষের একটা স্বাধীন ইচ্ছা থাকে এবং সে তার সেই ইচ্ছাকে খুশিমত কাজের মধ্যে প্রকাশ করে—আর এর মূলে থাকে আত্মসুখানুভূতি বা আত্মতৃপ্তি (Hedonism)।

অতঃপর আমরা পরিবেশকে অপরাধমূলক কার্যের কারণ স্বরূপ ধরে নিয়ে আলোচনা করে দেখতে পারি। পরিবেশকে এই রকম দুটি ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে :

(১) একেবারে গোড়াকার শিশুজীবনের পরিবেশ;

(২) পরবর্তী শৈশবকালের পরিবেশ।

শৈশবের প্রাথমিক অবস্থায় শিশুর পরিবেশ তৈরী করেন প্রধানতঃ তার পিতামাতাই। সুতরাং এই সময়ে শিশুর চরিত্র গঠনের মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি হ'লে সেটা তাঁদের কাছ থেকেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এ সময়ে শৃংখলার অভাব, পরস্পরবিরোধী শিক্ষার ফল খুবই ভয়ংকর রূপে দেখা দিতে পারে। যেমন, পিতামাতা শিশুকে শেখাচ্ছেন যে সত্যকথা বলা উচিত, অথচ যদি তার সামনে নিজেরাই অসত্যের আশ্রয় নেন তবে এই শিক্ষা এবং কাজের অসংগতি শিশুর পরবর্তী জীবনে বড় ভয়ংকর পরিণতি নিয়ে দেখা দিতে পারে।

এই প্রাথমিক অবস্থায় মাতার লালনের অভাব; মাতা অথবা মাতৃস্থানীয়া কোন ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ না গড়ে ওঠা; কিংবা মোটামুটি জীবনের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই মাতৃস্নেহ গঠনের উপযুক্ত পাত্রীর বার বার পরিবর্তন;—এগুলি শিশুর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে প্রায়ই হয়ে ওঠে ক্ষতিকর। তবে কত ছোট বয়সে এই স্নেহের অভাব মানবশিশুকে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠতে সাহায্য করে সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। সে যাই হোক, মোটামুটিভাবে দেখা যায় শিশুর গোড়ার জীবনে যদি সে তার পিতা অথবা মাতাকে অত্যধিক সমাজবিরোধী কার্যে রত বা নিষ্ঠুর কার্যরত দেখতে অভ্যস্থ হয় তবে তারপক্ষে পরবর্তী জীবনে অনুরূপ কার্যগুলির অনুশীলন করা অসম্ভব নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা ঘটতে দেখা যায়।

এইসব কারণে বর্তমানকালের অধিকাংশ মনীষীর মত হচ্ছে পারিপার্শ্বিকতাই শিশুর সুপ্ত মানসিক প্রবৃত্তিগুলি বিকশিত করতে সাহায্য করে এবং সে এই পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকেই ভাল বা মন্দ আচরণ করতে প্রবৃদ্ধ হয়। সুতরাং একজন অপরাধীর অপরাধমূলক কার্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে বলা যায় এটা হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়া যেটা আশেপাশের সমাজগোষ্ঠীর সংগে তার ব্যবহারের কি রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

একজন সহজ স্বাভাবিক মানুষ পারিপার্শ্বিক সমাজগোষ্ঠীর আওতায় পড়ে কি ভাবে এক ভয়ংকর অপরাধীতে রূপান্তরিত হ'তে পারে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা একমতও বটে আবার ভিন্নমতও বটে। অর্থনৈতিক মতবাদীরা মনে করেন আর্থিক অভাব-অনটনই অপরাধী হ'তে প্রলুব্ধ করে এবং এটাই একমাত্র কারণ বলা যায়। আবার অনেকে জনসংখ্যার আধিক্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মধ্যেও অপরাধের কারণ নির্দেশ করেছেন।

বর্তমানের একদল মনোবিজ্ঞানী বলছেন যে, আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার মধ্যে ভাবসাম্যের অভাবই নাকি অপরাধমূলক বা খাপছাড়া কার্য বা মনোবৃত্তির জন্য দায়ী। তবে কারণ যা-ই হোক, এইসব অস্বাভাবিক আর স্বাভাবিক কার্যের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্যই নাকি নেই। প্রত্যেক মানুষেরই, তার কাজকর্মের প্রেরণার মধ্যে বাধা পাবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই বাধা তাকে বিপথগামী করতে পারে এবং তখন সে তার রুদ্ধ কর্ম-উদ্দীপনাকে হয় মানসিক বিকৃতিরূপে না হয় উন্মাদরূপে অথবা অপরাধের মাধ্যমে প্রকাশ করবেই।

শকুন ও চোরাবালি

দম পরীক্ষা

পারিবারিক শাসনের অবসান
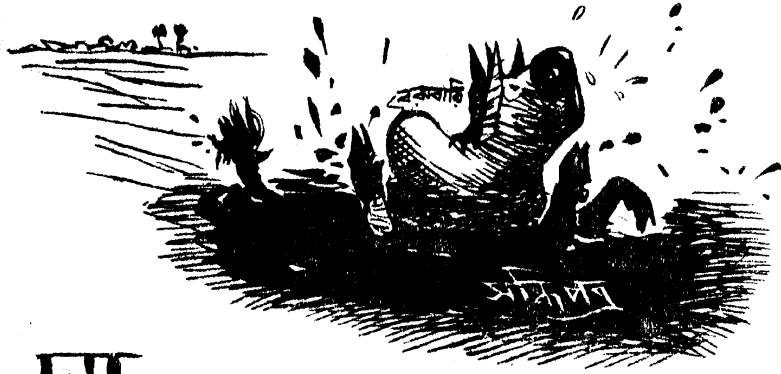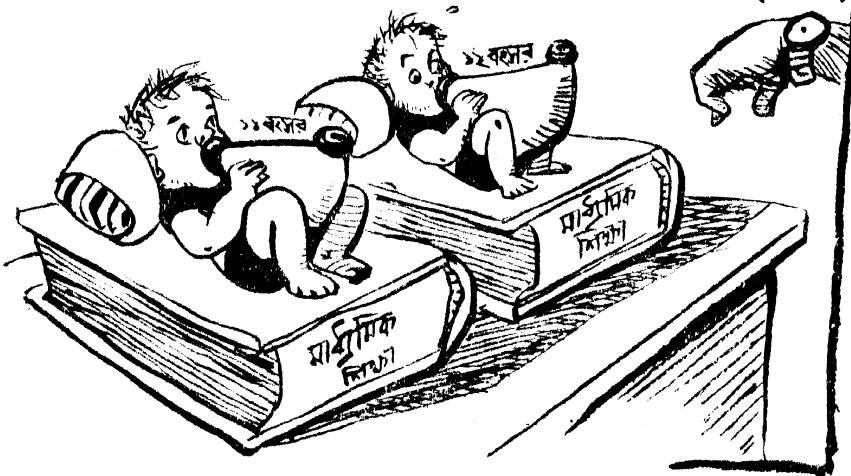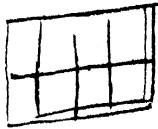
যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

সায়গনের সেন্ট জোসেফ হাসপাতালের খোলা মাঠে সশস্ত্র প্রহরাধীনে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে প্রেসিডেন্ট দিয়েম ও তাঁর ভাই নুর ক্ষত-বিক্ষত শব। কয়েকশত গজ দূরে জা লই প্যাগোডায় সমবেত হয়েছে কয়েক সহস্র উৎসবমত্ত বৌদ্ধ নরনারী। আর সুদূর লস এঞ্জেলসের এক ক্ষুদ্র হোটেল প্রকোষ্ঠে অশ্রুভরা চোখে শ্রীমতী নু আর্তনাদ করে বলছেন—নরকের সব শয়তান আজ আমাদের বিরুদ্ধে এক জোট হয়েছে।

৩রা নভেম্বরের এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য মাত্র দুদিন আগেও প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল সারা বিশ্বের কাছে। যাদের তর্জনী সংকেতে শংকিত ছিল সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, যাদের প্রচন্ড পীড়নে রুদ্ধ ছিল অগণিত বিক্ষুব্ধ মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠ, মুহূর্তের মধ্যে সেই মানুষগুলির এই হৃদয়বিদারক পরিণতি বোধ হয় কোন নাটকের দৃশ্যেও অতি-নাটকীয়তা বলে মনে করা হত।

কিন্তু ইতিহাসের দৃশ্যপট চিরকালই নাটকের চেয়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল। বাইশ বছর ধরে ইতালীর কন্ঠরুদ্ধ করে রেখেছিলেন যে মুসোলিনি, ইতালীর মানুষ তাঁর কণ্ঠ চিরকালের মত রুদ্ধ করে দেয় মাত্র দশ মিনিটের বিচারে। যে হিটলার একদিন ক্ষমতায় মত্ত হয়ে ভেবেছিলেন, কাঁপে পৃথ্বী তাঁহার শাসনে, সেই দুর্জয় নিষ্ঠুর ব্যক্তিটিকেও শেষ পর্যন্ত কঠিন বিচারের কাঠগড়া এড়াতে গ্যাসোলিনের আগুনে আত্মঘাতী হতে হয়েছিল।

কিন্তু অত্যাচারের মত্ততা যখন পেয়ে বসে কোন রাষ্ট্রের ধারককে তখন ধৃতরাষ্ট্রের মতই বোধহয় তার অন্তর ও বহির্দৃষ্টি লোপ পায়। নইলে যে পথে পা বাড়িয়েছিলেন নো দিন দিয়েম ও সমগ্র নো পরিবার তার সর্বনাশা পরিসমাপ্তি পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়েও কেন তাঁরা দেখতে পেলেন না? কেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মনে হল তাঁদের যে, মৃত্যুও তুচ্ছ তাঁদের কাছে? যে ভয়ংকর পরিস্থিতিতে দিয়েমের পারিবারিক শাসনের অবসান হল দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এবং রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক ও সর্বশক্তির ধারক হয়েও সাধারণ দুর্বৃত্তের মত প্রাণ হারাতে হল দিয়েম ও তাঁর অনুজকে, তার জন্য ঐ অভিশপ্ত পরিবারের মানুষগুলি নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই দায়ী করতে পারবেন না। ১৯৫৫ সালের ২৬শে অক্টোবর নো দিন দিয়েম যখন সম্রাট বাও দাইর শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্রী ভিয়েৎনামের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন তখন তাঁর চেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি সমগ্র ভিয়েৎনামে আর একজনও ছিলেন না। অথচ আট বছর বাদে গত ১লা নভেম্বর যখন তাঁর বিরুদ্ধে সৈনাবাহিনীর অভ্যুত্থান হল তখন দেখা গেল, কর্তব্যরত কিছু প্রাসাদরক্ষী সৈন্য ছাড়া আর কেউই তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য তৎপর হল না।

নো দিন নুর বিধবা পত্নী মাদাম নু ক্যালিফোর্ণিয়ার বেভার্লি হিলসের উইল্টশায়ার হোটেলে সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতি দিচ্ছেন। এইদিন মাদাম নু বলেন যে, তাঁর স্বামী মিঃ নু এবং প্রেসিডেন্ট দিয়েমের হত্যা নিছক খুন ছাড়া আর কিছুই নয়।

শাসনক্ষমতায় যখন অধিষ্ঠিত হন প্রেসিডেন্ট দিয়েম, তখন তিনি ছিলেন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জাতীয় অভ্যুত্থানের অবিসংবাদিত নেতা। আর সে নেতৃত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি কঠিন মূল্য দিয়ে। দিয়েমের বাবা ছিলেন ভিয়েৎনামের শেষ সম্রাট বাও দাইর বাবা সম্রাট থাই দিন-এর অন্যতম প্রধান রাজ-

কর্মচারী। এ কারণে বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন নো দিন ভ্রাতারা। দিয়েম নিজেও তাঁর কর্ম-জীবনের শুরুতে ছিলেন একজন পদস্থ সিভিলিয়ন, ১৯২৯ সালে এক প্রদেশের গভর্ণর পদেও নিযুক্ত হন তিনি; তারপর ১৯৩২ সালে হন ফরাসী তাঁবেদার ভিয়েৎনাম সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু তিন মাস বাদে তিনি সে পদ ত্যাগ করেন। ক্রমে তাঁর ফরাসী-বিরোধী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে এবং সমগ্র পরিবার ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তার জন্য ফরাসী সরকার দিয়েম পরিবারের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেন। কিন্তু দিয়েম পরিবার তাতে এতটুকুও বিচলিত হন না। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে একসঙ্গে জাপানী ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এবং কমিউনিস্ট প্রসারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দিয়েম ও তাঁর ভায়েরা অপূর্ব বীরত্ব ও জাতীয় চেতনার পরিচয় দেন। ১৯৪৫ সালে ভিয়েৎনামের কমিউনিস্ট গেরিলা বাহিনী ভিয়েৎমিনের হাতে দিয়েম ও তাঁর ভ্রাতৃবধূ মাদাম নু ধরা পড়েন ও চার মাস তাঁদের বন্দী থাকতে হয়। ঐ সময় দিয়েম ভ্রাতাদের সর্বজ্যেষ্ঠকে ভিয়েৎমিন গেরিলারা জীবন্ত অবস্থায় কবর দেয়। ১৯৪৭ সালে দিয়েম স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভিয়েৎনাম রাষ্ট্র-গঠনের উদ্দেশ্যে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ও কমিউনিস্ট বিরোধী শক্তিগুলিকে নিয়ে জাতীয় ইউনিয়ন ফ্রন্ট গঠন করেন। কিন্তু ফরাসী সরকারের আদেশে সঙ্গে সঙ্গে দলটি বেআইনী ঘোষিত হয়। দিয়েম সেই সময় দেশত্যাগ করেন ও আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে ইন্দোচীনের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলেন।

১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফুর পতনের পর ঐ বছর ১৫ই জুন তারিখে ফরাসী সরকার নিরুপায় হয়ে দিয়েমকে ভিয়েৎনামের শাসন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান এবং অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার শর্তে দিয়েম সেই আহ্বানে সাড়া দেন। এর পর ১৯৫৫ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখের গণভোটে শতকরা আটানব্বই জন নাগরিকের বিরোধিতায় সম্রাট বাও দাইর শাসনের অবসান ঘটে এবং নো

মিঃ নু ও প্রেসিডেন্ট দিয়েম

দিন দিয়েম প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

নো দিন দিয়েমের ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘ সংগ্রামে

স্বামীসহ মাদাম নু

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অনুজ নো দিন নুর পত্নী মাদাম নুর। এক ঐশ্বর্যশালী ভূম্যধিকারীর কন্যা ও ফরাসী ভাষায় সুশিক্ষিতা মাদাম নু আঠারো বছর বয়সে নো দিন পরিবারে বধূ হয়ে আসেন এবং প্রথম জীবনে রাজ-নীতির সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না তাঁর। কিন্তু ভিয়েৎমিন গেরিলাদের হাতে বন্দী ও লাঞ্ছিত হওয়ার পর তাঁর জীবন ও চিন্তাধারায় আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ফরাসী শাসন ও কমিউনিস্ট প্রসারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি নো দিন পরিবারের সকল সন্তানের মত আত্মনিয়োগ করেন।

নো দিন দিয়েম ১৯৫৪ সালের জুন মাসে ভিয়েৎনামের অন্তর্বর্তী-কালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর যখন ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শক্তি অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হয়, সেই সময় উত্তর ভিয়েৎনামের উদ্বাস্তুদের এক বিরাট শোভাযাত্রা দিয়েম সরকারের সমর্থনে পরিচালিত করে তিনি বিরোধী দলগুলিকে সম্পূর্ণ শক্তিহীন করে দেন।

এই ঘটনার তের মাস পরে চিরকুমার নো দিন দিয়েম যখন প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন তখন ভ্রাতৃবধূ ঘোষিত হন রাষ্ট্রের প্রথম মহিলা—'ফার্স্ট লেডী'। আর তাঁর স্বামী নো দিন নু হন রাষ্ট্রপতির উপ-দেষ্টা ও নিরাপত্তাবাহিনীর প্রধান। মাদাম নুর বাবা ত্রান ভ্যান চুয়াঙ নিযুক্ত হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের রাষ্ট্রদূত ও মা রাষ্ট্রসংঘে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের স্থায়ী পর্যবেক্ষক।

যুক্তরাষ্ট্রস্থ প্রাক্তন ভিয়েৎনামী দূত ও মাদাম নুর পিতা ট্রান ভান চুয়ং

দিয়েমের অগ্রজ নো দিন থান হিউর আর্চবিশপ ও সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ক্যাথলিক ধর্মগুরু। তৃতীয় ভাই নো দিন ক্যান সরকারীভাবে কোন দায়িত্বে অধিষ্ঠিত না থাকলেও তিনি ছিলেন ভিয়েৎনামের মধ্যবর্তী প্রদেশের সামন্ত-প্রভুস্বরূপ। বর্তমানে নো ভ্রাতাদের মধ্যে শুধু ক্যানই জীবিত অবস্থায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অবস্থান করছেন এবং তাও আছেন নয়াশাসকদের হাতে বন্দী অবস্থায়। চতুর্থ ভাই নো দিন লুয়েন ছিলেন বৃটেনে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রদূত, দিয়েমের পতনের পর তিনি পদত্যাগ করেছেন।

এইভাবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সমগ্র শাসন-দায়িত্ব একটি পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত হলেও দিয়েম কিন্তু স্বজন-পোষণের অভিযোগ স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন, তাঁর ভাইয়েরা সকলেই কৃতী, এবং তিনি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধান শাসক নিযুক্ত হওয়ার আগেও তাঁরা বড় বড় দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু দিয়েম যাই বলুন, তাঁর পরিবারভুক্ত লোকেদের, বিশেষ করে নো দিন নু ও তাঁর স্ত্রী মাদাম নু-র অত্যাচার ও দুর্বিনীত ব্যবহারে সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। আর যে কোন কারণেই হোক, পরিবারের লোকেদের এই অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বন্ধ করার কোন ইচ্ছা বা সামর্থ্য প্রেসিডেন্ট দিয়েমের ছিল না। একমাত্র মাদাম নু-র বাবা ও মা কন্যা-জামাতার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে পদত্যাগ করে তাঁদের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। এমন কি অভ্যুত্থানের প্রাক-মুহূর্তে মাদাম নু যখন দর্পিত পদক্ষেপে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বিচরণ করছিলেন তখনও তাঁরা কন্যার মুখদর্শন করেন নি।

পঁয়ষট্টি হাজার বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বর্তমান লোকসংখ্যা এক কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ। তার মধ্যে ক্যাথলিক-ধর্মী খৃষ্টানের সংখ্যা দশ লক্ষের বেশী নয়। অথচ খৃষ্ট-ধর্মী নো দিন পরিবার ঐ দশ লক্ষের কর্তৃত্ব চাপাতে চেয়েছিলেন অবশিষ্ট এক কোটি সাঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের উপর। সংখ্যালঘুর এই অন্যায় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যখনই কেউ প্রতিবাদ জানিয়েছে তখনই দিয়েমের পারিবারিক শাসনের নির্মম নির্যাতন নেমে এসেছে তার উপরে। লক্ষ লক্ষ বিক্ষুব্ধ বৌদ্ধকে এক কথায় কমিউনিষ্ট আখ্যা দিয়ে তাদের কণ্ঠরুদ্ধ করেছেন নো দিন নু-র নিরাপত্তা-বাহিনী। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শতকরা পঁয়ষট্টিজন লোককে দিয়েম সরকার বন্দী করে রেখেছিল চারে-ঘেরা গ্রামে। অজুহাত ছিল সন্ত্রাসবাদ দমন, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ নির্যাতন ও বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর অভ্যুত্থান সম্ভাবনা নিরোধকল্পে সক্রিয় ব্যবস্থাবলম্বন। সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাতে দিয়েম সরকারই সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামে। সায়গনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না, প্রত্যেকটি টেলিফোন ট্যাপ করা হত ও প্রত্যেকটি চিঠি খুলে পড়া হত।

মাদাম নু-র জগতে কমিউনিষ্ট ও কমিউনিষ্ট-বিরোধী শিবিরের বাইরে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না। ভিয়েৎনামের বৌদ্ধ সমাজ, নিরপেক্ষ লাওস ও কম্বোডিয়া এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও

নু যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসক দল ও বিশেষ করে কেনেডিকে কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে বর্ণনা করেছিলেন। আর এই বিশ্বজোড়া কমিউনিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল তাঁর ধর্মীয় জেহাদ। সায়গনের ধনিকশ্রেণী, ভিয়েৎনামের সৈন্যবাহিনী ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিলেন বলেই ন'বছর আগে ভিয়েৎনামের শতকরা আটানব্বই জন নাগরিকের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন দিয়েম। কিন্তু নু দম্পতির ঔদ্ধত্য ও ধর্মান্ধতা দিয়েমের শক্তির ঐ সব কটি প্রধান স্তম্ভকে একে একে অপসারিত করে দেয়।

র্থন আছে তার পিছনে এবং লক্ষ লক্ষ লোক সায়গনের পথে শোভাযাত্রা করে সে কথা জানিয়েছে নতুন সরকারকে। পশ্চিমী শক্তিবর্গও যথাসময়ে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু অনতিবিলম্বে যে বেদনাদায়ক কঠিন সত্যের সম্মুখীন এই নতুন সরকারকে হতে হবে তা হল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট গেরিলা ভিয়েৎকং বাহিনীর সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। প্রতি মাস চার হাজারেরও বেশী মানুষ আহত বা নিহত হচ্ছে এই অঘোষিত সংগ্রামে। সায়গণের নতুন সরকারের সম্মুখে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে, এই অবাঞ্ছিত ও অর্থ-

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের চেয়ারম্যান জেনারেল ডা ভান মিন

ভিয়েৎনামে অভ্যুত্থান। দিয়েমের প্রাসাদ আক্রমণের পরে তিনজন প্রাসাদরক্ষী সৈন্য আহত অবস্থায় [illegible] শায়িত রয়েছে। দুইজন ভিয়েৎনামী ছাত্রী সৈন্য তাদের দেখছে। প্রাসাদরক্ষীদের আত্মসমর্পণের পরই দিয়েমের ভাগ্যলিপির অবসান ঘটে।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকাও মাদাম নু-র মতে কমিউনিস্ট শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়া সফরকালে মাদাম

দিয়েমকে অপসারিত করে আজ যে সরকার কায়েম হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, দিয়েম-বিরোধী সকল শক্তিরই সম-

হীন রক্তপাত তাঁরা বন্ধ করতে পারবেন কিনা। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এ-পর্যন্ত পাঁচ শত কোটি ডলার সাহায্য পেয়েছে এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানে যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে। আজ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুখ্যত ঐ টাকাটার লোভেই দিয়েম সরকার ন বছরেও ভিয়েৎকং সমস্যার কোন সমাধান করেননি।

পীযূষকান্তি কুণ্ডু

রেডক্রশ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা জিন হেনরি ডুনান্ট

মানবজাতির সেবাব্রতে নিয়োজিত এবং মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রেডক্রশ। আজ থেকে একশ' বছর আগে দুঃখ এবং বিপর্যয়ের মধ্যে বিশ্বসৌভ্রাত্র প্রচার করেছিল এই রেডক্রশ। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইতালির লম্বার্দি প্রান্তরের রক্তবন্যা ও আহত সহস্র সহস্র সৈনিকের আর্ত ক্রন্দনের মধ্যে জন্ম হয়েছিল এক মঙ্গলময় শিশু প্রতিষ্ঠানের—রেডক্রশের প্রথমাবস্থায় এর লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করা। সেই স্বল্পতম প্রয়াস থেকে এক বিরাট লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে এ সংস্থা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে ও জাতীয় সীমারেখার গণ্ডী অতিক্রম করে যুদ্ধ ও অশান্তি উভয় অবস্থার মধ্যে মানবজাতির স্বাস্থ্যোন্নয়ন, রোগ, শোক ও দুঃখ নিবারণের বহুবিধ কার্যসূচী নিয়ে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে এগিয়ে চলেছে। দুঃস্থ ও আর্তের দুর্গতিমোচনের জন্য রেডক্রশ বিভিন্ন দেশ থেকে নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে সেবা এবং কল্যাণব্রতকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার উপায় উদ্ভাবন করেছে। প্রয়োজন দেখা দিলেই সহৃদয়তার হাত সে এগিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর নিভৃততম কোণে, দূরে—দূরান্তরে।

বিশ্বের মনীষী, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দও রেডক্রশের মহান উদ্দেশ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মহাত্মা গান্ধী একসময় রেডক্রশের সৈনিক ছিলেন। ভারতীয় রেডক্রশ সমিতি গঠনের মূলে গান্ধীজি উদ্যোক্তাদের প্রেরণার উৎস। আমাদের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছেন যে, রেডক্রশই আজ বিশ্বের একমাত্র স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যে জাতীয় গন্ডী অতিক্রম করে এবং সমগ্র মানবজাতিকে বক্ষে ধারণ করে সেবার মাধ্যমে শান্তির উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে চলেছে।

রেডক্রশ আন্দোলনের সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করে শ্রীনেহরু বলেছেন যে, যুদ্ধকালে সাহায্যের সর্বাধিক প্রয়োজন দেখা দেয়। রেডক্রশ সকলকে সাহায্য করে থাকে। ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি শান্তিকালেও অনেক কল্যাণমূলক কাজ করেছে। বস্তুতঃপক্ষে এই প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে কাজ করে চলেছে।

প্রতিষ্ঠানের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা

সুইজারল্যান্ডের যুবক পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ী হেনরি ডুনান্ট এই বিরাট আন্দোলনের প্রবর্তক। ছোটবেলা থেকেই তাঁর প্রাণ ও কর্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সেবাধর্মে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উত্তর ইতালি পরিভ্রমণকালে সলফেরিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি উপনীত হন। একপক্ষে ইতালিকে অস্ট্রিয়ার শাসনমুক্ত করার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়সংকল্প দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল; অপরপক্ষে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্স জোসেফ। ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক তৃতীয় লুই নেপোলিয়ন ছিলেন ইমানুয়েলের পক্ষে। শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনিও উপস্থিত লম্বার্দি প্রান্তরে।

সর্বস্ব পণ করে উভয় পক্ষই মেতে উঠেছে মরণ মহোৎসবে। মাত্র পনের ঘণ্টার মধ্যেই পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য ভূমিশয্যা গ্রহণ করল। যারা গতায়ু হল তারা রেহাই পেল যন্ত্রণার হাত থেকে। কিন্তু যারা আহত হল তাদের অবস্থা হয়ে উঠল মর্মান্তিক। সহস্র সহস্র আহত ও মুমূর্ষু সৈন্যকে উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ডুনান্টের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং রণাঙ্গণে আহত সৈনিকদের ক্লেশ ও যন্ত্রণা দূর করার জন্য তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেন। সলফেরিনোর রণাঙ্গনে আর্তসেবার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন হেনরি ডুনান্ট তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরিকল্পনা। তাঁর 'অ ন সুভেনির ডি সলফেরিনো' নামক গ্রন্থে এবং পরে ইউ-

রোপের বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি যুদ্ধের সময় জাতিধর্ম নির্বিশেষে আহতদের সাহায্য করবে এরূপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাতীয় সমিতি গঠনের সুপারিশ করেন। তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত হ'ল রেডক্রশের প্রাথমিক সম্মেলন, সন ১৮৬৩ সালে। চূড়ান্ত বিচার-বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জেনেভায় এক কূটনৈতিক সম্মেলন হয় এবং এই সম্মেলনে সতেরোটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও পীড়িত সৈন্যদের ত্রাণকার্যই ছিল জেনেভা সম্মেলনে সম্পাদিত চুক্তির মূল আদর্শ। বারোটি সরকারের প্রতিনিধিগণ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

পঁচিশজন সুইস নাগরিক নিয়ে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান— রেডক্রশের আন্তর্জাতিক কমিটি (আই, সি, আর, সি)। জেনেভায় নির্ধারিত নীতি নামে সাধারণতঃ পরিচিত আন্তর্জাতিক চুক্তির উন্নতিসাধন ও প্রচারকল্পে রেডক্রশের আন্তর্জাতিক কমিটি চেষ্টা করে চলেছেন অবিরাম। পর পর দুটো বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রতিক ঠাণ্ডা লড়াই সবই রেডক্রশ দেখেছে। প্রয়োজনে সর্বাত্মক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে সে এসেছে। কোরিয়া-কঙ্গো-কিউবা-বার্লিন সব জায়গাতেই রেডক্রশ ছুটে এসেছে করুণার পরম পরশ নিয়ে।

রেডক্রশের 'যুদ্ধকালীন' কাজ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই; কিন্তু এগুলিই রেডক্রশের সব কাজ নয়। একথা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের দুঃখ-দুর্গতির সীমা থাকে না। এরূপ অবস্থায় মানুষের ক্লেশ নিবারণ উপযোগী কার্যসূচীও রেডক্রশ উত্তরোত্তর গ্রহণ করছে। বিশ্বের আজ প্রায় দশ কোটি মানুষ সময়, অর্থ বা কাজকর্ম দ্বারা রেডক্রশের মাধ্যমে দুঃস্থ নরনারীর সেবা করছেন। আজ বিভিন্ন দেশের প'চাত্তরটি জাতীয় রেডক্রশ সোসাইটি মানবসেবায় ব্রতী। লীগ অব রেডক্রশ সোসাইটির নির্দেশে তাদের সমবায়মূলক প্রচেষ্টা পরিচালিত। ১৯১৯ সালে লীগ অব রেডক্রশ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি জাতীয় রেডক্রশ সোসাইটিগুলির একটি সংঘ এবং সুইজারল্যাণ্ডে এর প্রধান কার্যালয় রয়েছে। জাতীয় ভিত্তিতে রেডক্রশ সোসাইটিগুলির উন্নতিসাধন এবং এগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সুযোগসুবিধা করে দেওয়াই এই সংঘের উদ্দেশ্য।

ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি

ভারতের রেডক্রশ সোসাইটি প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে ভারতীয় আইন পরিষদের এক আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের এটি একটি শাখা। স্বাস্থ্যোন্নয়ন, রোগনিবারণ এবং দুঃখ-দুর্গতি দূরীকরণ—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যসাধনে ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির কার্যকলাপ পরিচালিত। গত দশ বৎসরে ভারতের রেডক্রশ সোসাইটির কাজ দূরে-দূরান্তরে বিস্তৃত হয়েছে। সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী, প্রসূতি ও শিশু-মঙ্গল, স্বাস্থ্যশিক্ষা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি অবিরাম সেবা ও ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির উদ্যোগে অক্ষম ও অসমর্থ প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য বাঙ্গালোরে যে রেডক্রশ হোম স্থাপিত হয়েছে এশিয়ার মধ্যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম বলা যেতে পারে। ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর বন্যার্তদের মধ্যে দুধ, ওষুধ, পথ্য, ভিটামিন ট্যাবলেট, কডলিভার অয়েল ও অন্যান্য বহু দ্রব্য বিতরণ করা হয়।

ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'জুনিয়রদের' কাজ। সোসাইটির জুনিয়র সদস্যদের সংখ্যা সতের লক্ষের অধিক। জুনিয়র রেডক্রশের সহায়তায় দেশের বালক-বালিকারা পল্লী-উন্নয়ন, প্রাথমিক শুশ্রূষা, মহামারী রোগ প্রতিরোধ এবং যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র গঠনের সুযোগ পেয়ে থাকে।

রেডক্রশের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে জাতির জনক গান্ধীজির কথা উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য। অনেকেই হয়ত জানেন বা শুনেছেন যে তেষট্টি বৎসর পূর্বে বুয়োর ও নুবু যুদ্ধে আহত ও পীড়িত সৈনিকদের জন্য রেডক্রশের স্বেচ্ছাসেবকরূপে গান্ধীজি কাজ করেছিলেন। ১৮৯৯ সালে বুয়োর যুদ্ধের সময় তিনি ১১০০ জন লোক নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্সবাহিনী গঠন করেছিলেন।

কাশ্মীরে রেডক্রশের সাহায্য

১৯৪৭ সালে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য যখন হানাদারগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয় তখন ভারতীয় রেডক্রশের নিকট আর্তত্রাণ এবং সেবাকার্যের জন্য জরুরী আহ্বান জানান হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মে মাসে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ত কাশ্মীরবাসিগণকে তাদের সঙ্কটকালে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে ভারতীয় রেডক্রশ।

কোরিয়ায় সাহায্য

ভারতীয় রেডক্রশ কোরিয়ার যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালে এক বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সেদিন ডাক এসেছিল ভারতীয় রেডক্রশের, সে ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়েছে সে। শুরু হয় বিমানযোগে ঔষধপথ্যাদি প্রেরণ। ১৯৫৩ সালে ৮ই জুন কোরিয়ার যুদ্ধবন্দী বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আগষ্ট মাসের প্রথমভাগে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের তদানীন্তন সেক্রেটারী আর, কে নেহরুর নেতৃত্বে ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির সেক্রেটারী জেনারেল সর্দার বলবন্ত সিং পুরী সহ পুরোগামী একটি দল কোরিয়ায় যান। সর্দার পুরী কোরিয়ায় রেডক্রশের প্রয়োজনীয় সাহায্যের পরিমাণ নিরূপণ করেন এবং ১৮ই আগষ্ট তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৫৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে অফিসার, কারিগর, কেরানী, ষ্টোরম্যান ও অ্যাম্বুলেন্সর যোলজন সহ ১১৩ জনকে নিয়ে গঠিত রেডক্রশের একটি দল কোরিয়ায় অসামরিক এলাকায় উপস্থিত হয়। তাদের কর্মসূচী ছিল ব্যাপক। কোরিয়ায় ভারতীয় রেডক্রশ সেবা ও কল্যাণের যে মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে তা নিঃসন্দেহে ভারতের গৌরবের বস্তু।

এ যাবৎ ভারতীয় রেডক্রশের কাছে সাহায্যের আবেদন এসেছে চুয়ান্নবারেরও বেশী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে আর্থিক সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কখন কখন ঔষধপথ্যাদিও পাঠিয়েছে। কোরিয়ায় অবশ্য সে যুদ্ধক্ষেত্রেই সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রায় তেত্রিশটি দেশ ভারতীয় রেডক্রশের সাহায্য পেয়েছে। সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে আছে— আফগানিস্থান, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, বর্মা, চীন, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ব্রিটেন, হাঙ্গেরী, ইন্দো-চায়না, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, যুগোশ্লাভিয়া, ইরাক, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, জাপান ইত্যাদি।

বর্তমান কালে যে কয়টি সংস্থা বিশ্বব্যাপী মানব-কল্যাণে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে চলেছে তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সোসাইটির স্থান সকলের পুরোভাগে। তার কর্মসূচী ধীরে ধীরে আরও ব্যাপ্ত হচ্ছে। আজ সেবা, শান্তি ও শুশ্রূষার সে অবিসংবাদী ও অমোঘ প্রতীক।

দু'জনেই আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছেন, তখন এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েও লাভ নেই।

সকলেই জানেন, শিশিরকুমারের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও নাটক আকাদামীর প্রতিষ্ঠা বন্ধ থাকেনি। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রায় বছর পাঁচেক চলবার পর সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। একটি সুনির্বাচিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের এখানে যে-ভাবে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে শিক্ষান্তে তারা যে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেই উপাধিপত্র লাভ করে, এ কথাও অনস্বীকার্য। দক্ষিণ কলকাতার 'মুক্ত-অঙ্গন'-এ যে 'শৌভনিক' সম্প্রদায় অভিনয় ক'রে থাকেন, এর অনেকগুলি সদস্যই যে আকাদামীর ভূতপূর্ব ছাত্রছাত্রী, এ সংবাদ হয়ত' অনেকেই রাখেন না। শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীই নয়, এমন কিছু শিল্পনির্দেশক, দৃশ্যসংগঠক, আলোকসম্পাতকারী বা বেশকারী (মেকআপ্‌ম্যান) আজ কলকাতার বিভিন্ন নাট্যপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাঁরা একদা এই আকাদামীর ছাত্র ছিলেন।

সঙ্গীত, অঙ্কন, ভাস্কর্য, নৃত্য প্রভৃতির মতো অভিনয়ও শিক্ষা-সাপেক্ষ কলাবিদ্যা। আজ নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করার সুযোগ আছে। সাম্যবাদী রাশিয়ায় নাট্যকলা অনুশীলনের জন্যে বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে নাট্য ও অভিনয়কলা শিক্ষা দেবার জন্যে বিশেষ বিভাগ আছে; সেখানে ছেলেমেয়েরা সাধারণ বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ কলায় শিক্ষিত হবার সুযোগ লাভ করে। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার মেইম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ভ্রাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠীর কি-ভাবে নাট্যপ্রযোজনা করা উচিত, সে সম্পর্কে আমাদের সামনে একটি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন। অনুসন্ধান নিয়ে জেনেছিলুম, ওখানকার ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককে, অভি-নয় ছাড়াও মঞ্চপ্রযোজনা সংক্রান্ত অন্য যে-কোনোও একটি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করতে হয়।

'অসমাপ্ত' চিত্রের সুপ্রিয়া চৌধুরী

ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা :

নাটক আকাদামী এবং নাট্যশিক্ষা :

শোনা যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন রবীন্দ্রনাথের ভবন প্রাঙ্গণে নৃত্য সঙ্গীত নাটক আকাদামী স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি নাটক আকাদামীর ভার গ্রহণ করবার জন্যে শিশিরকুমারকে আহ্বান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, নাটক-অভিনয় ইত্যাদির শিক্ষা ব্যাপারে একটি ব্যাপক পাঠ্যক্রম রচনা ক'রে এই বিভাগের নিরঙ্কুশ এবং সর্বময় কর্তা হ'তে। দুঃখের বিষয়, শিশিরকুমার ডাঃ রায়ের এই সহৃদয় খোলা প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল, সাধারণ রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্যে একটিও সাহায্য-অঙ্গুলি প্রসারিত না ক'রে এই ধরণের আকাদামী প্রতিষ্ঠা করা 'গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা'র সামিল; তিনি আরও বলেছিলেন, সাধারণ রঙ্গালয় সংশ্লিষ্ট বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী যখন কর্মাভাবে দৈনন্দিন জীবনযাপনে প্রতিনিয়তই আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হ'তে বাধ্য হচ্ছে, তখন আকাদামীতে শিক্ষা দিয়ে নূতন অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরী ক'রে সমস্যাকে আরও সঙ্গীন ক'রে তোলা হবে না কি? জানি না, ডাঃ রায় এ প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছিলেন এবং আজ যখন বিধানচন্দ্র ও শিশিরকুমার,

প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ না থাকলে সার্থক শিল্পী হওয়া যায় না। এ কথা যেমন সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, ভাস্কর প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনই অভি-নেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কেও। এ সত্ত্বেও বলব, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে নাট্য ও অভিনয়কলা এমনই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী যে, আজ নটনটী-রূপে প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছু মাত্রকেই জগতের নাট্য ও অভিনয়কলা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হ'তে হবে। আঙ্গিক, বাচিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকারভেদ থেকে শুরু ক'রে উচ্চারণ পদ্ধতি, স্বর-ক্ষেপণ, সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে সম্মিলিত অভিনয়ের স্বরূপ, মঞ্চে প্রবেশ, প্রস্থান, অবস্থানরীতি প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আয়ত্ত করতে হবে। কোন্ নাটকে কি ধরণের অভিনয় করা উচিত, কোন্ চরিত্রে কি রকম অঙ্গ-ভঙ্গীর সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করতে হবে, কেমন বেশবাস গ্রহণ করলে গৃহীত চরিত্রের উপযোগী হবে, এ সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষাগ্রহণের অবকাশ আছে। অবশ্য এম. বি. বি. এস পাশ করলেই যেমন সাফল্যমণ্ডিত চিকিৎসক হওয়ার গ্যারাণ্টি পাওয়া যায় না, বা বি. এল (আইন) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেই কোনো ব্যক্তি যে ব্যবহারজীবী হিসেবে রাসবিহারী ঘোষের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়বেন, এমন আশা করাও বাতুলতা

বীরেশ্বর বসু পরিচালিত 'এরা কারা' চিত্রে তুলসী চক্রবর্তী, সুশীল রায় এবং অন্যান্য অভিনেতা

মাত্র, ঠিক তেমনই নাটক আকাদামীর পাঠক্রম শেষ করবার পরে কোনো ছাত্র শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসাপত্র লাভ করলেই যে মঞ্চে অভিনেতা হিসেবে গিরিশচন্দ্র বা শিশিরকুমারের খ্যাতি লাভ করবে, এমন নিশ্চয়তা নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু এও ঠিক যে, শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসার অধিকারী ছাত্রটির নাটক এবং অভিনয় সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যন্ত সুবিস্তৃত ও গভীর এবং এই জ্ঞানের মূল্যে সামান্য নয়। এও জানা কথা যে, যে-কেউ যে-কোনো বিদ্যায় শিক্ষালাভ করতে পারে না; প্রত্যেক বিষয়েই অধিকারী-অনধিকারীর প্রশ্ন আছে। কাজেই যাঁরা নাট্য ও অভিনয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করতে চাইবেন, কর্তৃপক্ষকে নিশ্চয়ই দেখতে হবে, তাঁদের মধ্যে সহজাত অভিনয়ক্ষমতা অন্ততঃ সুপ্ত অবস্থাতেও আছে কিনা; নইলে বিচার না করে যে-কোনো ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উভয়তঃ পণ্ডশ্রমের নামান্তর হবে।

শাস্ত্রসম্মতভাবে শিক্ষিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্পর্কে সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সজাগ থাকতে অনুরোধ করি। প্রকৃত শিক্ষিতদের সমাগমে রঙ্গালয়ের আবহাওয়া হবে উন্নত, অভিনয় হবে সুসংস্কৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ, নাট্যপ্রযোজনা হবে সুপরিকল্পিত এবং নাট্যালয় পরিচালনা হবে সহজতর—এ কথা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে অশিক্ষিত পটুত্বের নিদর্শন মেলে ভুরি-ভুরি—মাত্র একজন গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, অমৃতলাল বা শিশিরকুমার কালেভদ্রে বাঙলা রঙ্গালয়ে শোভা পাওয়া থেকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষিত শিল্পী ও কলাকুশলীর ঢের বেশী প্রয়োজন বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়কে বিশ্বের দরবারে সুউচ্চ স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে।

বিবিধ সংবাদ

।। মুক্তিপ্রাপ্ত বহুরাণী ।।

ভেনাস পিকচার্স (মাদ্রাজ)-এর 'বহুরাণী' চিত্রটি আজ ২২শে নভেম্বর প্যারাডাইস, প্রভাত, খান্না, ভবানী, আলোছায়া প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। টি প্রকাশরাও পরিচালিত এই চিত্রের শ্রেষ্ঠাংশে আছেন গুরু দত্ত ও মালা সিনহা।

সি-এল-টির "অবন মহল"-এর ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা :

১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৩ শিশু রংমহলের (সি-এল-টির) জীবনে একটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তারিখরূপে সূচিত হবে। ঐদিন অপরাহ্নে সি-এল-টির বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী এবং অগণিত ছাত্র-ছাত্রীদের সোৎসুক দৃষ্টির সামনে ভারত সরকারের সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর বালক-বালিকাদের নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব গৃহের ভিত্তিস্থাপনা করেন এবং ভিত্তিফলক সন্নিবিষ্ট করেন। শুভ শঙ্খ ও উলুধ্বনি এই ক্ষণটিতে একটি পবিত্রতার গাম্ভীর্য আনয়ন করেছিল। প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন সভাপতি সর্বশ্রী নৃপেন্দ্র বসু এবং কালিদাস নাগ সময়োচিত ভাষণ দান করেন; এছাড়া সৌম্যেন ঠাকুর ও সুকোমলকান্তি ঘোষ সি-এল-টির সার্থকতা বিষয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভূস্বরূপ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী সুধিবৃন্দকে সি-এল-টির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা সংক্ষেপে শুনিয়ে একটি অনাস্বাদিত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল। ভিত্তি-স্থাপনাকার্য সমাপ্ত হবার পরে চা-পানের বিরতি হয়। পরে "সঙ অফ ইন্ডিয়া" মঞ্চস্থ করে সি-টল-টির সভ্য-সভ্যাবৃন্দ এবং তারও পরে হয় আতস-বাজীর আনন্দানুষ্ঠান।

অস্কার প্রতিযোগিতার জন্যে 'মহানগর' :

প্রতি দেশ থেকে একখানি মাত্র ছবিই অস্কার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে। আর. ডি. বনশল প্রযোজিত এবং সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'মহানগর' ছবিখানি ভারতের হয়ে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে গেছে, এ সংবাদ পাঠকেরা গেল হপ্তাতেই পেয়েছেন।

"সাত পাকে বাঁধা"র কর্মিবৃন্দ পুরস্কৃত :

"সাত পাকে বাঁধা"র আন্তর্জাতিক সাফল্যের জন্যে প্রযোজক আর. ডি. বনশল ছবিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল

কর্মী ও কলাকুশলীকে এক মাসের পারিশ্রমিক বোনাস হিসাবে পুরস্কার দিয়েছেন। মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবিটির নায়িকারূপে সুচিত্রা সেন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করার ফলে ইটালী, জার্মানী, জাপান, ইংলন্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ছবিখানিকে তাঁদের দেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেখাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সিংহলে ইতিমধ্যেই ছবিখানি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিউইয়র্কে মহাকবি ভাসের 'বাসবদত্তা':

ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন দি থিয়েটার অফ আর্টস্ (IASTA) প্রতিষ্ঠানটির পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব শুরু হয়েছে গেল ১৮ই নভেম্বর। আমেদাবাদের নৃত্যনাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাত্রী এবং পরিচালিকা মৃণালিনী সারাভাই ও তাঁর সহকর্মিণী রূপান্ডে সার যুগ্ম-পরিচালনায় ৩৪জন মার্কিণ অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিউ ইয়র্কের একটি প্রসিদ্ধ থিয়েটারে মহাকবি ভাস রচিত প্রসিদ্ধ নাটক "বাসবদত্তা" মঞ্চস্থ করেছিলেন। এঁরা নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে এই নাটকখানিকে সর্বসমেত পনেরোবার উপস্থাপিত করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

নিউ এম্পায়ারে "কৃষ্ণকান্তের উইল":

রঙ্গতীর্থ নামে নতুন একটি প্রগতিশীল নাট্যসম্প্রদায়ের প্রযোজনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসের নাট্যরূপ আসছে ২৪-এ নভেম্বর সকাল ১০টায় সর্বপ্রথম নিউএম্পায়ার মঞ্চে অভিনীত হবে। এছাড়া ১লা, ২৫-এ ও ২৯-এ ডিসেম্বরও প্রতিদিন সকাল ১০টায় নাটকটির পুনরভিনয় হবে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন সিদ্ধেশ্বর সেন। সুরসৃষ্টিতে রয়েছেন প্রবীণ সুরকার অনিল বাগচী। নাট্যসম্পাদক ও উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছেন স্বনামধন্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

আলোকসম্পাত ও শিল্পনির্দেশনায় রয়েছেন যথাক্রমে অনিল সাহা ও জলু বড়াল। তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মিহির বসু।

এই অবিস্মরণীয় কাহিনীটির নাট্যরূপের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন—সুলতা চৌধুরী, সবিতা বসু, জহর গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, নবকুমার, উত্তর বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, চন্দ্রশেখর, প্রতিমা চক্রবর্তী, লীলাবতী দেবী, সমরকুমার প্রমুখ মঞ্চ ও চিত্রজগতের জনপ্রিয় বহু শিল্পী।

যাত্রীর অনুষ্ঠান:

আজ ২২শে নভেম্বর '৬৩, শুক্রবার, মহারাষ্ট্র নিবাস হলে সন্ধ্যা ৭টায় 'যাত্রী'র ১৮তম প্রতিষ্ঠা উৎসব প্রতিপালিত হবে। এই উপলক্ষ্যে 'যাত্রী'র বিশিষ্ট সদস্য শ্রীপঙ্কজ বসু রচিত 'ভূত-ভবিষ্যৎ' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। প্রবেশ-পত্র 'যাত্রী' ক্লাবে পাওয়া যাবে।

একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান:

গত বাইশে অক্টোবর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (চৌরঙ্গী স্কোয়ার) কর্মচারীবৃন্দকর্তৃক নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট' স্টার থিয়েটারে

বাদশা চিত্রের কালী ব্যানার্জি ও বাপী ভট্টাচার্য

সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে উচ্চশ্রেণীর শিল্পকুশলতার পরিচয় দিতে না পারলেও সামগ্রিকভাবে তাঁদের অভিনয়ের মধ্যে আন্তরিকতার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন শ্রীগোকুল মুখোপাধ্যায় (মিঃ মুখার্জী), লক্ষ্মী কাপুর (বংশী), ত্রিলোকী ট্যান্ডন (নন্দুয়া), সন্তোন মজুমদার (প্রবীর), গৌরাঙ্গ পাল (সতীশ), নির্মল ভট্টাচার্য (যদুপতি), গায়ত্রী চক্রবর্তী, মিতা চ্যাটার্জি, সবিতা মুখার্জি। কেরালা কেন্দ্রমের নৃত্যাঞ্জলি, সারি এবং মহিষাসুরমর্দিনী উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দদান করে।

কলকাতা

চলচ্চিত্র প্রযোজনার ইতিহাসে এক বলিষ্ঠতম প্রয়াস-সংস্থার নাম 'সাজ ও আওয়াজ সিনে এন্টারপ্রাইজার্স।' এই মহৎ প্রচেষ্টার প্রথম চিত্র-প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের একটি সুখ্যাত কবিতা ও একটি ছোটগল্পের চলচ্চিত্র। 'দেবতার গ্রাস' ও 'শুভা' অবলম্বনে এই দুঃসাহসী চিত্র-প্রচেষ্টার চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সর্বকনিষ্ঠ চিত্র পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী, 'ছায়া-সূর্য'-এ যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চিত্র-প্রযোজক হিসেবে ভি, বালসারা এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন। এমাসের তেইশ তারিখ থেকে ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় এছবির দৃশ্যগ্রহণ শুরু হবে। সম্মিলীত চরিত্রলিপিতে অভিনয় করছেন শর্মিলা ঠাকুর, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, লিলি চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নিভাননী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, বঙ্কিম ঘোষ, গীতা দে প্রভৃতি। 'দেবতার গ্রাস'-এর রাখাল চরিত্রে শ্রীমান সৌমিত্র নামে একজন নবাগত প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যাবে। এ-ছাড়া কলাকুশলী বিভাগে কাজ করছেন চিত্রগ্রহণে সৌমেন্দু রায়, সম্পাদনায় তরুণ দত্ত, শিল্পনে কার্তিক বসু এবং রূপনে অনন্ত দাস। পরিবেশনা-ভার গ্রহণ করেছেন জি আর পিকচার্স।

'যাত্রিক' গোষ্ঠীর অন্যতম তরুণ মজুমদার এই প্রথম স্বনামে বনফুলের 'আলোর পিপাসা'র এ সপ্তাহ থেকে নিউ থিয়াটার্স স্টুডিওয় চিত্রগ্রহণ শুরু করলেন। ডি আর প্রোডাকসন্সের এচিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে সন্ধ্যা রায়, বসন্ত চৌধুরী, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অসিতবরণ, অনুভা গুপ্তা ও সবিতা সিংহ। কাহিনীর রোশন বাঈজির জীবন-আলেখ্যে এচিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রী মজুমদার। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় সৌমেন্দু রায়, দুলাল দত্ত এবং বংশী চন্দ্রগুপ্ত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এছবির সঙ্গীত পরিচালক।

'বিদূষক' সংস্থা প্রযোজিত ও উৎপল দত্ত পরিচালিত 'ঘুম ভাঙার গান' চিত্রটি সম্প্রতি ছাড়পত্র পেয়েছে। সেন্সর বোর্ড কয়েকটি শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনবিরোধী আক্রমণ ও বিভৎসতার দৃশ্য বাদ দিয়েছেন। মেহনতী মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ওপর এচিত্রনাট্য রচিত। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন ও নীলিমা দাস। সঙ্গীত ও চিত্রগ্রহণ সম্পন্ন করেছেন রবিশঙ্কর এবং রামানন্দ সেনগুপ্ত।

পরিচালক গুরু বাগচী বর্তমানে আশাপূর্ণা দেবীর হাস্যরসাত্মক 'তাহলে' কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন। গল্পের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন সন্ধ্যা রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অমিত দে, বিকাশ রায়, মলিনা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্রা মন্ডল। চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন অনিল গুপ্ত এবং সুধীন দাশগুপ্ত।

বোম্বাই

প্রযোজক-পরিচালক কমল অমরোহী, দীর্ঘ তিন বছর পর নায়িকা মীনাকুমারীর বিপরীতে নায়কচরিত্রে মনোনীত করলেন রাজেন্দ্রকুমারকে।

সম্প্রতি ফিল্মিস্তান স্টুডিওয় চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। সিনেমাস্কোপ ও রঙিন ছবিতে নায়ককে বিশেষ জনপ্রিয় করবে বলে আমাদের ধারণা।

মীনাকুমারী ও ধর্মেন্দ্র অভিনীত 'এ রাত ফির না আয়েগী' রঙিন চিত্রটির সংগীতপরিচালনা করছেন সি. রামচন্দ্র। এমাসের শেষে ফেমাস স্টুডিওয় এছবির চিত্রগ্রহণ করছেন পরিচালক কিশোর সাহু। এ-ছাড়া কয়েকটি পার্শ্ব-চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন শশিকলা, উল্লাস ও মনমোহন কৃষ্ণ।

আর, কে, স্টুডিওয় সম্প্রতি সিংহের সংগে এক সাথে অভিনয় করলেন রাজেন্দ্রকুমার। মোহনকুমার পরিচালিত এই রঙিন চিত্রটির নাম 'আই মিলন কি বেলা।' নায়িকা-চরিত্রে সায়রাবানু। সুর-সৃষ্টি করছেন শংকর-জয়কিষণ। ওমপ্রকাশ এছবির প্রযোজক।

প্রযোজক-পরিচালক চেতন আনন্দ বর্তমানে যুদ্ধের পরিবেশে যে চিত্রটি আরম্ভ করেছেন তার নাম 'হ্যাকিকাৎ।' লাডাক অঞ্চলে মুখ্য দৃশ্যগুলো গৃহীত হয়। সম্পাদনা ও আবহ-সংগীতের কাজ রাজকমল কলা-মন্দিরে সম্প্রতি সুসম্পন্ন হল। প্রধান চরিত্র রূপায়ণে বলরাজ সাহনী, ধর্মেন্দ্র, বিজয় আনন্দ ও প্রিয়া।

মাদ্রাজ

এ, ভি, এম স্টুডিওয় তামিল ছবি 'কমুদাম'-এর হিন্দী চিত্ররূপ প্রায় সমাপ্ত হতে চলেছে। অশোককুমার এবং প্রাণ এছবির দুটি মুখ্য চরিত্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

কে. শংকর পরিচালিত 'ভরসা' সমাপ্তপ্রায়। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন গুরু দত্ত, আশা পারেখ, সুদেশকুমার, লীলা, ললিতা পাওয়ার ও ওমপ্রকাশ। প্রযোজনা ও সংগীত-পরিচালনায় রয়েছেন ভাসুদেব মেনন। —চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

খোঁচা-খোঁচা চেহারার বাড়ি। সারি-সারি চুন-খসা বালির হাঁ-করা দেওয়ালের পাশ কাটিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে দেখা যায় কিনু গোয়ালার গলি। পাশাপাশি হাঁটলে দেওয়াল ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গুঞ্জ-কুঞ্জ এ খঞ্জ গলি। কিন্তু নির্জীব নয়। কোন রকমে গুণ টেনে পৌঁছনো। তেমন তেজী নয়। কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে চলা। স্বল্প পরিসর আর স্বল্পতর পরিবেশের মধ্যেও নীলার

সম্প্রতি কলকাতায় প্রদর্শিত বিশিষ্ট জার্মান তথ্যচিত্র 'দি রাশিয়ান মিরাকেল'-এর একটি দৃশ্য।

চরিত্র কিছুটা চঞ্চল। প্যারিস জুয়েলারীর সর্বাধক্ষ প্রমথনাথ পোদ্দার একটা ভিন্ন ধর্মের নিখুঁত চরিত্র। সহজে বোঝা যায় না আটত্রিশ না আটান্ন। অন্ধ-কানাঘরে শিকে-ঘেরা দরজার আড়াল থেকে এ গলির সমস্ত জীবন তার কণ্ঠস্থ। নিজের মনে সারা-দিন মাথা নীচু করে কাজ করে কিন্তু রাস্তায় কারুর পায়ের শব্দ পেলে তার নজর আগে ছোটে। খুশি হলে আলাপও শুরু করে দেয়—এমন চরিত্রের মানুষ প্যারিস জুয়েলারীর মালিক প্রমথনাথ।

একে একে কিনু গোয়ালার গলি আবার মুখরা হল। নীলারা এসেছে নতুন। দাদা-বৌদি আর মা-বাবা। সেকেন্ড ইয়ারে নীলা পড়ে। দারিদ্রের তাপে আজ তারা পপুলার পার্কের রঙিন জীবন ফেলে কোন রকমে বাঁচতে এসেছে। সিঁড়ির নীচে কোণের ঘরটায় আবার নতুন সংসার এসেছে। স্বামী-স্ত্রী। স্বামীর নাম সাহিত্যিক মণীন্দ্র সান্যাল। স্ত্রী—শান্তি। সারাদিন ঘরের এক পাশে বসে তিনি লেখেন এবং সেই রচনার অর্থে তাদের জীবিকার জীবন প্যালিত হয়।

নীলার দাদা দেবব্রত তখনও বেকার। বৌদি অমিতা ধনীঘরের কন্যা। ছাই তুলে তুলে দিনগুলো রাত করতেন। বৌদির কাকা অবিনাশ বন্ধ হলেও নীলার প্রীতি টান ছিল প্রথম থেকেই। সিনেমার পাস থেকে শুরু করে গান শেখার মাইনে পর্যন্ত তিনি শুধু নীলার জন্য খরচ করেছেন। কিন্তু নীলা তাঁর আনাড়িপনায় হেসেছে। বিপত্নীককে খুশি করতে দেবব্রত আর শান্তির কি তদবির। শেষ পর্যন্ত নীলার বিপত্তি। রাগ করে দাদা-বৌদি আলাদা হল। নীলার বাবা শিবব্রতবাবু তখন রিটায়ার্ড হয়েছেন। প্রমথর সংগে দাবা খেলে তার দিন কাটে। কোন রকমে কলেজটাকে বজায় রেখে নিজের হাতে ঘরকন্না বজার রেখেছে নীলা।

ধন্যবাদ

দিল্লীর সংগীত নাটক আকাদমি কর্তৃক গত ১০ই নভেম্বর ফেরারী ফৌজের জন্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান হিসাবে পুরস্কার গ্রহণের জন্য শ্রীউৎপল দত্ত ও লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপকে অভিনন্দন জানিয়ে অগণিত দর্শক ও শুভানুধ্যায়ীরা চিঠি দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে ও সমস্ত দেশবাসীকে আমরা অভিভূত চিত্তে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

প্রসংগত আমরা শ্রীউৎপল দত্তের সর্বাধুনিক নাটরূপ তিতাসের বিস্ময়কর প্রযোজনা মিনার্ভায় দেখবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অংগার ও ফেরারী ফৌজের পর নাট্যপ্রযোজনায় শ্রীদত্তের এ আর এক নতুন পরীক্ষা।

গুরু দত্ত, শ্যামা, মালা সিন্‌হা এবং অন্যান্য কয়েকজন

শান্তিকে প্রথমটা বুঝতে পারা যায় নি। দিব্যি স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে দিন কাটে। ক্রমশঃ কবি ইন্দ্রজিতকে শান্তি যেন বেশী প্রাধান্য দিতে শুরু করলো। ওপর থেকে সবই লক্ষ করে নীলা। শেষে শান্তির ঘরে বেড়াতে এসে একদিন কবির সঙ্গে পরিচয় হল। আধুনিক কবি। মণীন্দ্র-বাবুর বন্ধু। রাত্রে জুয়া খেলে হারেন। আর বন্ধুরা জেতে। অবশ্য সকাল হলে ওরা জেতার টাকা সব চুপি-চুপি শান্তি বৌদিকে দিয়ে যেত। এমনিভাবে প্রতি-দিন অনিশ্চিত গল্প লেখার টাকার ভরসায় বাদ সেধে শান্তি সংসার চালাতো। হিসেবী হলেও শখ আহ্লাদকে সে বিসর্জন দিতে পারে নি। মাঝে মাঝে তাই ইন্দ্রজিতের সঙ্গে শান্তি সিনেমা দেখে বেশ রাতে বাড়ি ফিরতো। এখবর সব রাখতো ঐ প্রমথনাথ। কারণ শান্তির শখ মেটাতে একদিন ইন্দ্রজিতের আংটি বেচে টাকা নিতে হয়েছিল। বেকার হলেও তরুণ কবি হেরে জেতে রাজী নয়।

ক্রমশঃ কিনু গোয়ালার গলিতে পার্টিসন আর চটের পর্দা টাঙিয়ে নতুন-নতুন ভাড়াটের সংখ্যা বাড়তে শুরু করলো। নার্সের দলপতি শকুন্তলা শেষ পর্যন্ত সেবাসদন খুলে বসে। কিন্তু নানান কুৎসা রটানোর ফলে এ প্রতিষ্ঠান বন্ধপ্রায় হল।

প্রথম আলাপের পর থেকে নীলার যেন একটা করুণা উদয় হল ইন্দ্রজিতের ওপর। রোগশয্যার দীর্ঘ দিনের উপস্থিতিতে কিসের যেন এক মায়া জন্মায় নীলার। ইন্দ্রজিতকে সেই থেকে তার ভাল লাগে। কিন্তু শান্তি বুঝতে পারে এদের নতুন শিহরণ মুহূর্তে।

সাহিত্য ছেড়ে নাটক শুরু করে মণীন্দ্র। নাটকের মহলায় তার গতি স্ত্রী-সঙ্গ থেকে অনেক বিচ্যুত। নায়িকার সঙ্গে প্রায় দিনগুলো তার অতিক্রান্ত হয়। শান্তি ক্ষুব্ধ। প্রতিশোধের পথ খোঁজে। শান্তির সর্বনাশা মোহের জাল থেকে ইন্দ্রজিতকে নীলা বাঁচাতে চেষ্টা করে। রোগমুক্ত হয়ে ইন্দ্রজিৎ সামান্য প্রেসের কাজে জীবন পরিক্রমার পথ বেছে নিল। প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধে সফল হয়ে একদিন নীলাকে বিয়ের প্রস্তাব জানালো ইন্দ্রজিৎ। যদিও তখন এ আহ্বান নিতান্তই ছেলেমানুষী। কারণ বহু আগেই দুজনে পরস্পরকে সর্বকিছুই বিলীন করে দিয়েছিল।

'লাল-পাথর'-এর একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার

এখন নীলার সম্মানার্থে আর সমাজের চোখে কুলীন সাজতে ইন্দ্রজিতের সব-চেয়ে বড় দায়িত্ব এক-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া।

কিনু গোয়ালার গলি আবার নির্বাক হল। শান্তিরা চলে যাচ্ছে নতুন বাড়ীতে। মণীন্দ্র এখন নামী ব্যক্তি। অর্থ প্রচুর। ইন্দ্রজিত রইলো পড়ে একা। একদিন যে শান্তি তার হৃদয় জুড়ে ছিল, আজ তাকে অহঙ্কারী, অন্তঃসার-শূন্য মনে হয়।

কয়লা ফুরোলে যেমন ইঞ্জিন চলে না, তেমনি কিনু গোয়ালার জীবন কেন জানি নিস্তেজ হয়ে গেল। একে একে অনেকেই নতুন বাড়ীতে পা বাড়াল। এখন শুধু অবশিষ্ট এরা কয়েকজন।

হঠাৎ কিসের ভুল-বোঝা নিয়ে নীলা-ইন্দ্রজিতের আসন্ন আত্মীয়তাটুকু মাঝপথে এসে থেমে পড়লো। কিসের যেন এক মনোমালিন্যে নীলা বেঁকে বসে। ইন্দ্রজিৎ শেষ পর্যন্ত হার মানলো।

কানা-ঘুষা চলছিল। কিন্তু এর মধ্যে সত্যি-সত্যি একদিন ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নির্মম আঘাতে কিনু গোয়ালার গলি হারিয়ে গেল। গলি ভেঙে প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হবে।

সন্তোষকুমার ঘোষ বিরচিত একাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিবেশ ও চরিত্র নিয়ে আলোচনা হল। এ গল্পাবলম্বনে চিত্ররূপ দিচ্ছেন ও, সি, গাঙ্গুলী। চিত্রের নাম 'কিনু গোয়ালার গলি'। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন নীলা—শর্মিলা ঠাকুর, ইন্দ্রজিৎ—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তি—সুমিত্রা দেবী, মণীন্দ্র—কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত—প্রশান্তকুমার, অমিতা —গীতা দে, শিবব্রতবাবু—পাহাড়ী সান্যাল, প্রমথনাথ—জহর রায় ও অবিনাশ—জীবেন বসু। কলাকুশলী-কর্মে চিত্র-গ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনার দায়িত্ব পালন করছেন বিমল মুখো-পাধ্যায়, দুলাল দত্ত এবং রবি চট্টো-পাধ্যায়। সংগীত-পরিচালনা সলিল চৌধুরী। মেগা ফিল্মস্ এ ছবির প্রযোজক ও পরিবেশক। বর্তমানে চিত্রগ্রহণ নিয়মিত সম্পন্ন হচ্ছে।

—চিত্রদূত

বহুরূপিনী

একুশ বছরের মেয়ে গার্গি লোরেনৎস বার্লিনের বহুরূপিণী। হাজার হাজার রেকর্ড-প্লেয়ার আর রেডিওগ্রামে তার ছবি দেখা যায় তবু লোরেনৎসের আসল চেহারা অল্প লোকেই দেখেছে এবং অতি অল্প লোকেই তার নাম জানে। গান-বাজনা না করেও লোরেনৎসই বোধহয় রেকর্ড জগতের একমাত্র তারকা। তার বহুবিচিত্র রূপধারণের অসামান্য ক্ষমতার দৌলতে সে বহু রেকর্ডের খামের ওপর নানারকম ছবি ছাপিয়েছে। তার ছবি দিয়ে ছাপানো রেকর্ড-কভারের সংখ্যা অর্ধশতেরও বেশী। জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের সমস্ত বড় বড় রেকর্ড কোম্পানী তাদের রেকর্ড-কভার গার্গির ছবি দিয়ে ছাপানর জন্যে সর্বদা প্রস্তুত। যে ছবি কভারে ছাপান হবে তার আইডিয়া, সঙ্গীতের বিষয়বস্তু থেকে

গার্দি নিজেই নির্বাচন করে নেয়। তার প্রসাধন কামরা ছোট-বড় লাল কালো সোনালী নানা বর্ণের পরচুল প্রচুর রূপসজ্জার উপকরণ ইত্যাদিতে বোঝাই। মাঝে মধ্যে সে আয়নায় নিজের চেহারা নিজেই চিনতে পারে না। এছাড়া অপরের চলাফেরা-হাবভাব ইত্যাদি নিখুঁত অনুকরণ করতে তার জুড়ি নেই। সে বলে, ঠিকমত সংগীত পরিবেশ পেলে একাজে তার নাকি অনেক সুবিধে হয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন বিক্রি বাড়াতে গেলে বিক্রয়ের বস্তুটি নয়নলোভন হওয়া দরকার। যারা রেকর্ড কেনে তারাও নাকি অনেক সময় জ্যাকেট দেখেই কেনে সুতরাং হাজার হাজার কভারে গার্দির ছবি যে ছাপা হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই......।
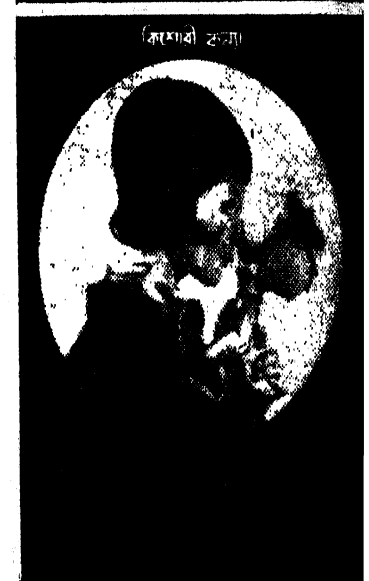
মার্লেন ডিয়েট্রিচ রূপে

হাওয়াই এর পুষ্পময়ী বেশে

কিশোরী কন্যা

সপ্তর্ষি চিত্রে কাজল গুপ্ত ও দিলীপ রায়

নষ্টনীড়-এর দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফটোচিত্র-চক্রে অংশকারত। ফটো : অমৃত

ভিন্ দেশী ছবি

॥ সাম্প্রতিক ফরাসী ছবি ॥

গত কয়েক বছর ধরেই ফরাসী চলচ্চিত্র-নির্মাতারা 'নবতরঙ্গ' রীতিতে মানবিক অবস্থাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করে আসছিলেন। কিন্তু নবতরঙ্গের নতুন রীতি আজকে এমন এক অবস্থায় এসেছে যে নব-তরঙ্গের মৌল উদ্দেশ্যই তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন আজকে। ইদানীং তাঁরা ভঙ্গী এবং টেকনিককেই পুরোধা করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন কিছু কিছু সমালোচক। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, গল্প বা মনোগ্রাহিতার ওপরে আর তেমন নজর দিচ্ছেন না ফরাসী চিত্র-পরিচালকরা। এমন কি আঙ্গিককে প্রাধান্য দিতে দিতে ফরাসী পরিচালকরা স্টাইলের নৈরাজ্য এনে ফেলেছেন তাঁদের ছবিতে। নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যে সমস্ত ছবি দেখানো হয়েছিল চিত্র-সমালোচকদের মতে তার অধিকাংশই নৈরাজ্যবাদী ছবি। ফেস্টিভ্যালের ছবি ছাড়াও ব্যবসায়িক দিক দিয়ে যে সমস্ত ছবি ফরাসী দেশের বাইরে এসেছে সম্প্রতি; তাদের প্রত্যেকটিই আঙ্গিকের সঙ্গে যুদ্ধ করে ম্রিয়মাণ। "লাপুনি" ছবির মূল উপাদান ছিল সামাজিক ব্যঙ্গ। কিন্তু পরিচালক উচ্ছৃঙ্খল আঙ্গিকের রীতি অনুসরণ করায়

ছবিটির মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েছে। "মাই লাইফ টু লীভ" ছবিটি পরিচালনা করেছেন "ব্রেথলেস" ছবির পরিচালক জাঁ-লুক গর্ডাড। গর্ডাডও কি আঙ্গিকের দিক দিয়ে কি বিষয়ের দিক দিয়ে দর্শক-সমালোচকদের বিরক্তিই ঘটিয়েছেন। একটি অল্পবয়সী গণিকার করুণ জীবনকাহিনীকে উপজীব্য করেছেন গর্ডাড তার এই ছবিতে। বিষয়গত দিক দিয়ে বিচার করলে কাহিনীটি ফরাসী চলচ্চিত্রের পক্ষে নেহাৎই পুরোনো। তার ওপর গর্ডাড এই চিত্রে মেয়েটির চরিত্রকে নিজে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা না করে কেবলমাত্র তার শরীরের প্রতি ক্যামেরাকে লেলিয়ে দিয়ে নায়িকার মনোজগৎকে ধরবার বিফল চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘ সংলাপ দিয়ে, পর্দায় ক্রমাগত নায়িকার মুখ ধরে ছবির যাবতীয় ভাবাবেগকে জুড়িয়ে জল করে ছেড়েছেন পরিচালক। এমন কি আনাকারিনার মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীও পরিচালকের এবম্বিধ চালনায় চলতে পারেননি। ডানিয়েল-ডালকোজ-এর "দি ফ্রেঞ্চ গেম" চিত্রটিকেও দর্শকদের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন। অতি সামান্য বিষয়বস্তুর নৌকোয় তিনি আঙ্গিকের ভার এত বেশী চাপিয়েছেন যে দু'তিন রীলের পরেই ভরাডুবি হয়েছে ছবিটার। রিভিয়েরাতে ছুটি উপভোগ করতে-আসা দুটি অবিবাহিত যুবক-যুবতীর অন্তরঙ্গ বসবাসকে কেন্দ্র করে ছবির কাহিনী গেঁথেছেন পরিচালক।

নবতরঙ্গের সুনাম খানিকটা তবু রেখেছেন নীয়ের এতে। এতে 'দি সুটার' ছবিটির কাহিনীকার, পরিচালক এবং নায়ক। 'দি সুটার' কৌতুকপ্রধান ছবি এবং এতে তাঁর অভিনয়ে চার্লি চ্যাপলিন, বাস্টার কীটন এবং হ্যারি ল্যাংডনের দৃষ্টিনির্ভর কৌতুকসৃষ্টিকেই বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন। পরিচালকের ভঙ্গী নিশ্চয়ই অতি পুরোনো, আবার অতি পুরোনো বলেই যেন নতুন বলে মনে হয়।

চুখরাইয়ের নতুন ছবি

"ব্যালাড অফ এ সোলজার" এবং "দি ক্লিয়ার স্কাই"-এর পরে, গ্রিগরি চুখরাইয়ের সাম্প্রতিকতম ছবিটির কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে। এই ছবিটির নাম: "এক যে ছিল বুড়ো-বুড়ী"।—অতি সাধারণ এক কৃষক-দম্পতি এই বৃদ্ধ গুসাকফ আর তার স্ত্রী। জীবনে তারা এমন কোনো বীরত্বপূর্ণ কাজ করে নি যাতে তারা বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। এমন কি, নিজের গ্রামের বাইরে কেউ তাদের চেনেই না। কিন্তু এই সাধারণ মানুষরাই তাদের সততা, সহৃদয়তা আর মানবতার জোরে সমাজকে পরিবারকে দাঁড় করিয়ে রাখে এক দৃঢ় ভিত্তির ওপরে; এরাই সমাজের আসল খুঁটি। —এই হল চুখরাইয়ের সাম্প্রতিকতম চলচ্চিত্রটির বিষয়বস্তু।

ছবিটির কাহিনীও খুব সাধারণ। সংক্ষেপে তা হল এই: গুসাকফ আর তার স্ত্রী এই প্রথম তাদের গ্রাম ছেড়ে তাদের একমাত্র মেয়েকে দেখতে এসেছে উত্তরাঞ্চলের এক ছোট কয়লাখনি-শহরে। কিন্তু মেয়ের বাড়ি এসে শুনল সে তার স্বামী আর সন্তানকে ছেড়ে চলে গেছে আরেকজন পুরুষের সঙ্গে। গুসাকফ-দম্পতি তাদের শ্রমিক জামাইয়ের কাছে থেকে গেল কিছুদিনের জন্যে, তাকে আরেকজন মেয়ের সঙ্গে নতুন করে সংসার গড়ে তুলতে সাহায্য করল, তারপর নাতিকে চুমো খেয়ে বুড়ো-বুড়ী হাত-ধরাধরি করে খাসে চাপল নিজেদের গ্রামে ফিরে আসার জন্যে।

এই সামান্য কাহিনীকে এক অসাধারণ কাব্যসুষমামণ্ডিত চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন চুখরাই। তিনি আগাগোড়া গল্পটি বলেছেন রূপকথার ধরণে—কিন্তু কোথাও ফ্যান্টাসি-র আশ্রয় নেননি বা বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। এই চলচ্চিত্রের কাহিনী ও চিত্রনাট্য-রচয়িতা ইউলি দুনস্কোই ও সেমিয়ন ফ্রিদ।

—চিত্রকূট

খেলাধূলা

দর্শক

॥ রোভার্স কাপ ফুটবল ॥

বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খ্যাতি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৮৯১ সালে। ১৯২২ সাল পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় কোন বে-সামরিক দলের যোগদানের অধিকার ছিল না। ১৯২৩ সালে রোভার্স কাপ টুর্ণামেণ্ট কমিটির বিশেষ আমন্ত্রণে মোহনবাগান ক্লাব প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে প্রতিযোগিতায় যোগদান করে এবং এই বছরই প্রথম বে-সামরিক ও প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। এই ফাইনাল খেলায় মোহনবাগান ৪৫ মিনিট সময় পর্যন্ত এক গোলের ব্যবধানে অগ্রগামী থেকেও শেষ পর্যন্ত সেই সময়ের দুর্ধর্ষ ডারমস মিলিটারী দলের হাতে পরাজয় স্বীকার করেছিল।

১৯৩৭ সালে রোভার্স কাপ জাতি-ভ্রষ্ট হ'ল। ১৯৩৭ সালের ফাইনালে বাঙ্গালোরের মুসলীম দল ১—০ গোলে ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত ক'রে প্রথম ভারতীয় হিসাবে রোভার্স কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে। তারা পরবর্তী ১৯৩৮ সালেও রোভার্স কাপ জয় করে। শেষ বিদেশী সামরিক দল রোভার্স কাপ জয় ক'রে গেছে বৃটিশ বেশ রেজিমেণ্ট ক্যাম্প, ১৯৪৬ সালে। ১৯৪৮ সালে বাঙ্গালোর মুসলীম দল তৃতীয়বার রোভার্স কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে। রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রেকর্ড, হায়দরাবাদ পুলিশ দলের উপর্যুপরি পাঁচবার (১৯৫০—৫৪) রোভার্স কাপ জয়। এ রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ক'লকাতার আই এফ এ শীল্ড এবং দিল্লীর ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই রকম উপর্যুপরি পাঁচবার জয়লাভের রেকর্ড নেই।

এ পর্যন্ত ক'লকাতার এই চারটি দল রোভার্স কাপ পেয়েছে : মহামেডান স্পোর্টিং (১৯৪০, ১৯৫৬ ও ১৯৫৯), বাটা স্পোর্টস ক্লাব (১৯৪২), ইষ্টবেঙ্গল (১৯৪৯ ও ১৯৬২ সালে অন্ধ্র পুলিশ দলের সঙ্গে যুগ্মভাবে) এবং মোহনবাগান (১৯৫৫)।

১৯৬৩ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা গত ১৪ই অক্টোবর থেকে আরম্ভ হয়েছে। অলিম্পিক ফুটবল খেলার তালিকা তৈরীর রীতি অনুসরণ ক'রে ১৯৬৩ সালের রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউণ্ড পর্যন্ত খেলাগুলিকে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা হিসাবে ধরা হয়েছে। •

চতুর্থ রাউণ্ড থেকে মূল প্রতিযোগিতা আরম্ভ। তৃতীয় রাউণ্ড পর্যন্ত খেলার তালিকায় ৩০টি দলের নাম আছে। সরাসরি চতুর্থ রাউণ্ডে খেলা দেওয়া হয়েছে এই ৮টি দলের—অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ (১৯৬২ সালের যুগ্ম বিজয়ী), মফতলাল গ্রুপ মিলস (বোম্বাই), ক্যালটেক্স (বোম্বাই), মোহনবাগান (কলকাতা), বি এন আর (ক'লকাতা), মহমেডান স্পোর্টিং (ক'লকাতা), সেণ্ট্রাল রেলওয়ে (বোম্বাই) এবং ইস্টবেঙ্গল (ক'লকাতা, গত বছরের যুগ্ম বিজয়ী)। কোয়ার্টার ফাইনালে ৮টি দল খেলবে। এ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ, পাঞ্জাব পুলিস, মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইস্টবেঙ্গল। এখনও চতুর্থ রাউণ্ডের চারটি খেলা বাকি। ক'লকাতার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ১—০ গোলে মাদ্রাজ ফুটবল এসোসিয়েশনকে, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১—০ গোলে টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত ক'রে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। চতুর্থ রাউণ্ডে মফতলাল গ্রুপ মিলস বনাম ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং সালগাওকার (গোয়া) বনাম বি এন আর দলের খেলা ২—২ গোলে ড্র গেছে।

॥ সুব্রত মুখার্জি ফুটবল কাপ ॥

দিল্লীর কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে সর্বভারত স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাটানগর হাইস্কুল ৪—২ গোলে গত ১৯৬১ সালের বিজয়ী রাণী রাসমণি স্কুলকে পরাজিত ক'রে সুব্রত মুখার্জি স্মৃতি ফুটবল কাপ জয় করেছে। প্রথম ভারতীয় এয়ার মার্শাল স্বর্গগত সুব্রত মুখার্জির স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে এই সর্বভারতীয় বাৎসরিক স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের ফুটবল অনুরাগী মহলে এই প্রতিযোগিতাটি 'সুব্রত ডুরাণ্ড কাপ' নামেও সুপরিচিত। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই প্রতিযোগিতার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ফাইনাল খেলার দিনে মাঠে উপস্থিত ছিলেন। খেলার বিরতির সময় উভয় দলের খেলোয়াড়রা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন এবং খেলার শেষে তাঁরই হাত থেকে পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য লাভ করে।

গত বারের বিজয়ী রাণী রাসমণি স্কুল সেমিফাইনালে হায়দরাবাদের বহু-মুখী সরকারী বিদ্যালয়কে ১—০ গোলে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল। অপর দিকে বাটানগর হাই-স্কুল সেমিফাইনালে ৬—০ গোলে ডি এ ভি স্কুলকে পরাজিত করেছিল।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় বাটানগর স্কুল দল ৯—০ গোলে এ্যাংলো-অ্যারাবিক স্কুলকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক গোলের ব্যবধানে জয়লাভের গৌরব লাভ করে। তা'ছাড়া তারা কোয়ার্টার ফাইনালে গত বারের রানার্স-আপ গুর্খা মিলিটারী স্কুলকে ৬—০ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে ডি এ ভি স্কুলকে ৬—০ গোলে পরাজিত করে। বাটানগর স্কুল দল প্রতিযোগিতায় মোট ২৫টি গোল দিয়ে ফাইনাল খেলায় যা দুটো গোল খায়। প্রতিযোগিতায় হ্যাট-ট্রিক করার সম্মান লাভ করে বাটানগর স্কুল দলের পক্ষে দিলীপ ব্যানার্জি (গুর্খা মিলিটারী স্কুলের বিপক্ষে) এবং রাণী রাসমণী স্কুলের পি দে (ইউনিয়ন এ্যাকাডেমির বিপক্ষে)।

ফাইনালে বাটানগর স্কুল প্রথমার্ধের খেলার ১২ মিনিটে এক আত্মঘাতী গোল খায় এবং কয়েক মিনিট পর রাণী রাসমণি দ্বিতীয় গোলটি দিয়ে ২—০ গোলে অগ্রগামী হয়। কিন্তু খেলার তারা শেষ রক্ষা করতে পারে নি। প্রথমার্ধের খেলার ২৫ মিনিটে বাটানগর স্কুল একটা গোল শোধ দেয় (১—২)। খেলার বিরতির সময় রাণী রাসমণি স্কুল ২—১ গোলে অগ্রগামী ছিল।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় বাটানগর স্কুল দল আরও ৩-টে গোল দিয়ে শেষ পর্যন্ত ৪—২ গোলে জয়ী হয়।

১৯৬০ সালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বৎসরে কেবল দিল্লীর স্কুলগুলি যোগদান করেছিল। ১৯৬১ সাল থেকে প্রতিযোগিতাটি সর্বভারতীয় গুরুত্ব লাভ করেছে। ১৯৬১ সালের ফাইনালে ক'লকাতার রাণী রাসমণি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ২—০ গোলে দেরাদুনের গুর্খা মিলিটারী হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলকে পরাজিত ক'রে ফুটবল খেলায় বাংলার যে যোগ্যতা প্রমাণ করেছিল আলোচ্য বছরের

ফাইনালের খেলায় পশ্চিম বাংলার দুটি স্কুল উঠে তা অক্ষুন্ন রেখেছে। ১৯৬২ সালে দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিযোগিতাটি বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

॥ ডুরান্ড ফুটবল কাপ ॥

১৯৬৩ সালের প্রখ্যাত ডুরান্ড ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার খেলা গত ১৬ই নভেম্বর থেকে আরম্ভ হয়েছে। দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ভারতবর্ষের ফুটবল খেলার ইতিহাসে এই ডুরান্ড ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতাই প্রথম নক্ আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। ভারতবর্ষের ফুটবল মহলে দিল্লীর ডুরান্ড কাপ, বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ এবং ক'লকাতার আই-এফ-এ শীল্ডের ঐতিহ্য সব থেকে বেশী উল্লেখযোগ্য। ডুরান্ড কাপ আরম্ভ হয়েছে ১৮৮৮ সালে, রোভার্স ১৮৯১ সালে এবং আই-এফ-এ শীল্ড ১৮৯৩ সালে। বয়সের দিক থেকে ছোট-বড় হলেও কুল-মর্যাদায় এই তিনটি সমান। বরং ভারতীয় মহলে আই-এফ-এ শীল্ডের মর্যাদা বেশী ছিল। কারণ ডুরান্ড এবং রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল এমন কি বে-সামরিক ইউরোপীয় দল সুদীর্ঘকাল এক-ঘরে হয়েছিল। রোভার্স কাপের খেলায় একমাত্র বে-সামরিক দল ছিল বোম্বাই-য়ের ওয়াই-এম-সি-এ এবং তারা প্রতিযোগিতার সূচনা থেকেই যোগ-দানের অধিকার পেয়েছিল। সুদীর্ঘকাল পর এই দুই প্রতিযোগিতার পরিচালক-দের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ নিমন্ত্রণে মোহনবাগান ক্লাব ১৯২৩ সালে রোভার্স কাপ এবং ১৯২৪ সালে ডুরান্ড কাপ প্রতি-যোগিতায় যোগদান করেছিল। প্রথম ভারতীয় এবং বে-সামরিক দল হিসাবে মোহনবাগানই এই দুই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার লাভ করে।

ভূতপূর্ব ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী সার হেনরী মার্টিমার ডুরান্ড ফুটবল খেলায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষের মাটিতে নক্-আউট ফুটবল খেলার ভিত্তি স্থাপনা করেন। তাঁরই পৃষ্ঠ-পোষকতায় ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৮৮৮ সালে আরম্ভ হয়। এই প্রতিযোগিতায় শেষ বিজয়ী দলের উদ্দেশ্যে যে কাপটি তিনি দান ক'রেছিলেন তার নাম ডুরান্ড কাপ। হাইল্যান্ড লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রি সামরিক দল উপর্যুপরি তিন বছর (১৮৯৩-৯৫) ডুরান্ড কাপের ফাইনালে জয়ী হয়ে বরাবরের জন্যে ডুরান্ড কাপ পেয়ে যায়। ফলে মার্টিমার ডুরান্ডকে দ্বিতীয় দফায় আর একটি কাপ দিতে হয়। কিন্তু এই কাপও বেহাত হয়ে যায় ১৮৯৯ সালে। উপর্যুপরি তিন বছর (১৮৯৭-৯৯) ডুরান্ড কাপ জয়লাভের স্বীকৃতি হিসাবে ব্ল্যাক ওয়াচ সামরিক দলকে বরাবরের জন্যে ডুরান্ড কাপটি ছেড়ে দিতে হয়। ফলে যে সমস্যার উদয় হয় তার থেকে উদ্ধার পেতে প্রতি-যোগিতার পরিচালকমণ্ডলীকে কোন বেগ পেতে হয়নি। মার্টিমার ডুরান্ড ভারতীয় ফুটবল খেলার সংস্পর্শে এসে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন তারই স্বীকৃতি হিসাবে তিনি তৃতীয় দফায় আর একটি কাপ দান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে মার্টিমার ডুরান্ডের

হাওড়া স্টেশনে ১৯৬৩ সালের সুব্রত মুখার্জি ফুটবল কাপ বিজয়ী বাটানগর হাইস্কুল দলের সম্বর্ধনা।

আন্তঃ রেলওয়ে দশম ভলিবল প্রতিযোগিতায় ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে বনাম ডিজেল এল ডব্লু ওয়েস্টার্ণ রেল দলের খেলার একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত। ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ফাইনালে ইন্টিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরী দলকে পরাজিত ক'রে তৃতীয়বার ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করে।

নাম চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ সাল থেকে প্রতিযোগিতার এই নিয়ম করা হ'ল যে, উপর্যুপরি তিনবার ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালের বিজয়ী দলকে চিরদিনের জন্যে ডুরান্ড কাপ ছেড়ে দেওয়া হবে না।

ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতা ১৮৮৮ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুণ ১৫ বছর (১৯১৪-১৯ ও ১৯৪১-৪৯) প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। তাছাড়া গত বছর (১৯৬২) প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখতে হয়েছিল চীনাদের ভারতের সীমানা আক্রমণের ফলে দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। মোট ১৬ বার প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে প্রথম বে-সামরিক দল খেলেছে—ইস্ট-ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ১৯২৭ সালে। কিন্তু তারা ইয়র্ক এ্যান্ড ল্যাংকাসায়ার রেজিমেন্ট দলের হাতে পরাজিত হয়। প্রথম বে-সামরিক এবং ভারতীয় দল হিসাবে ডুরান্ড কাপ জয় করেছে ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিং দল ১৯৪০ সালে। সামরিক দলের পক্ষে শেষ ডুরান্ড কাপ পেয়েছে এস ডব্লু বডার্স, ১৯৩৯ সালে। যুদ্ধের দরুণ ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ডুরান্ড কাপের খেলা বন্ধ ছিল। পুনরায় যখন ১৯৫০ সালে ডুরান্ড কাপের ভাঙ্গা আসর জোড়া লাগানো হ'ল তখন ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে ইংরেজ গোরা দল স্বদেশে ফিরে গেছে। সুতরাং ১৯৫০ সাল থেকে ভারতীয় ব-সামরিক এবং সামরিক দলই ডুরান্ড কাপ পেয়ে আসছে। গত ১২ বছরের খেলায় (১৯৫০-৬১) ডুরান্ড কাপ পেয়েছে মাত্র এই পাঁচটি ক্লাব—হায়দরাবাদ পুলিস (১৯৫০, ১৯৫৪ ও ১৯৫৭), ইস্টবেঙ্গল (১৯৫১-৫২, ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালে মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্মভাবে), মোহনবাগান (১৯৫৩, ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্মভাবে), মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার (১৯৫৫ ও ১৯৫৮) এবং অন্ধ্র পুলিস (১৯৬১)—ভূতপূর্ব হায়দরাবাদ পুলিস দল। ১৯৬১ সালের ফাইনালে অন্ধ্র পুলিস দল ১—০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত ক'রে শেষ ডুরান্ড কাপ পেয়েছিল।

১৯৬৩ সালের প্রতিযোগিতায় মোট ৩০টি দল যোগদানের জন্যে প্রবেশপত্র পাঠিয়েছে। কলকাতা থেকে নাম দিয়েছে—মোহনবাগান (১৯৬১ সালের রানার্স-আপ), ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং বি এন আর।

রাজ্য জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতা

১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতার দলগত বিভাগে ক'লকাতা পুলিস জিমনাসিয়াম দল ১৩০ পয়েন্ট অর্জন ক'রে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে দিলীপ ওঝা (চাঁপাতলা ওয়াই এম সি)।

খেলার কথা

অজয় বসু

বছর ষাটেক পর সেই জানালাটি একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদের মর্যাদা নিয়ে খবরের কাগজের পাতায় আবার আত্ম-প্রকাশ ঘটিয়েছে।

ভারী তো জানালা! পুরানো, শার্সিভাঙ্গা, ক্ষতবিক্ষত। তা হোক্। জীর্ণ, চূর্ণপ্রায় সেই জানালাটিকেই অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-অনুরাগীরা আজও আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। শ্রদ্ধা ও আবেগ তাঁদের বজ্রমুঠির দু বাহু।

ভাঙ্গা জানালা অমূল্য স্মারক। ভাঙ্গনের পথে পা বাড়িয়েও জানালাটি এক টুকরো অটুট স্মৃতি ধরে রেখেছে। ষাট বছর আগে, ১৯০২-৩-এর ক্রিকেট মরশুমে এক খেলোয়াড় ব্যাট চালিয়ে বলের ঘায়ে জানালার শার্সি টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়েছিলেন। আর সেই থেকেই জানালাটির ভাঙ্গা কপালও ফিরে গেল।

সিড্‌নীর রেডফ্রেন ওভাল মাঠের পাশের বাড়ীর জানালা ওটি। বাড়ীর মালিক শিল্পপতি। অর্থভাগ্য তাঁর প্রশস্ত ছিল। তবু ভাঙ্গা কাঁচে জোড়া লাগাতে তাঁর মন চায় নি। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বুঝিয়েছেন কতো। কিন্তু বাড়ীর মালিক অবুঝ। বারে বারে উত্তর দিয়েছেন 'থাক্ না, ভাঙ্গা। তবু তো ওতে ভিক্টরের হাতের ছোঁয়া লেগে আছে।'

ভিক্টর! ভিক্টর ট্রাম্‌পার! নামটি ভাবতে ভাবতে ভদ্রলোক হয়তো ভাঙ্গা জানালাটিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে আলাদা করে রেখে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেন নি। ভিক্টরের নামমাহাত্ম্য এমনই যে কালে ভাঙ্গা জানালাযুক্ত সেই বাড়ীটাই অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-মহলের কাছে এক তীর্থক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সেখানে আজও লাইন পড়ে। লোক জমে। দলে দলে মানুষ এসে গাল-গল্পে স্মরণ করে লোকান্তরিত নায়ক ভিক্টর ট্রাম্‌পারকে। শ্রদ্ধার নৈবেদ্য সাজায় তাঁরই উদ্দেশে।

জানালা-আঁটা বাড়ীটির সম্প্রতি হাতবদল ঘটেছে। কিন্তু বাড়ীর নতুন মালিকের মন পালটায় নি। তিনিও ইতিহাসের পাদপূরণ করতে চাইছেন যত্নে ও চেষ্টায় জানালাটির ভাঙ্গা চেহারাকে অবিকল ধরে রেখে। আর সেই সূত্রেই পুরানো খবর আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

১৯০২-৩ মরশুমের যে দিনে ভিক্টর ট্রাম্‌পার পাশের বাড়ীর জানালা ভেঙ্গেছিলেন সেই অপরাহ্নে তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয় পৌঁছেছিল ৩৩৫-এর কোঠায়।

কতোক্ষণই বা উইকেটে ছিলেন! বড়জোর ১৬৫ মিনিট। ক্রিকেটের আইনে সেদিন ওভার-বাউণ্ডারীতে ছটি রাণ পাওয়া যেতো না। কুড়ানো যেতো পাঁচটি করে রাণ। তবু পাঁচ পাঁচ করেই একশ দশ রাণ করেছিলেন ট্রাম্‌পার। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উনত্রিশটি বাউণ্ডারীর সংগ্রহ একশ ছাপ্পান্ন। বাকী উনসত্তর রাণ ট্রাম্‌পার স্রেফ ছুটেই সংগ্রহ করেছিলেন!

ভিক্টর ট্রাম্‌পার

রীতিমতো সংহার মূর্তি ধরেছিলেন সন্দেহ নেই। বিপক্ষের এগারো-জন খেলোয়াড়ই বল হাত-ছাড়া করে এবং সময় বিশেষে বল ছুঁড়েও উইকেটে ট্রাম্‌পারের ১৬৫ মিনিটব্যাপী অস্তিত্বের মূল নড়াতে পারেন নি। বরং ট্রাম্‌পারই তাঁদের হার মানিয়েছেন। সবলে, সরোষে ব্যাট হাঁকিয়ে বার ছয়েক বল পাঠিয়েছিলেন এমন অজানা মুলুকে যেখান থেকে বল খুঁজে আনা ফিল্ডস-ম্যানদের সাধ্যে কুলোয় নি। জানি না, আর কখনো এক ইনিংসে সাত সাতটি নতুন বলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কিনা!

শার্সি ভাঙ্গলে মালিকের রুষ্ট হওয়ারই কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি হলেন খুশীই। খেলা ভাঙ্গাতে সমাদরে হাত ধরে ট্রাম্‌পারকে নিয়ে গেলেন নিজের খানাঘরে। তারপর পাদ্য-অর্ঘ্য বীরপূজায় ভিক্টরের অপরাধের শাস্তি-বিধান সারলেন।

ঘটনাটি টেষ্ট খেলার মাঠে ঘটে নি। আসর ছিল অল্পখ্যাত। তবুও সেই আসরের ছোট্ট এক কাহিনী আজ ইতিহাসের মর্যাদা পেয়েছে। টুক্‌রো টুক্‌রো এমন কতো কাহিনীই যে ট্রাম্‌পার নিজের হাতে গড়েছেন! সব মিলিয়ে তিনি তাই ক্রিকেটের ইতিহাস-স্বীকৃত পুরুষই নন, তিনি যেন কিংবদন্তীর নায়কও।

ট্রাম্‌পার যে কে ছিলেন তা বোঝার চেষ্টায় পরিসংখ্যান কেতাবে উঁকি মারলে ভুল করা হবে। কার্ডাসের কথাই ঠিক 'রেকর্ড-বুক্ তো আস্তো একটি গাধা! গর্দভের সাক্ষ্যে তাই ক্রিকেটের সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে চেনা যাবে না। তাঁকে জানতে হলে তাঁর ক্রীড়া-রীতি, প্রকরণগত ঐশ্বর্য, তাঁর ষ্টাইলের হদিশ পেতে হবে। তবে সে কাজও রীতিমতো দুরূহ। ট্রাম্‌-পারের ষ্টাইল তাঁর নিজস্ব শ্রী। যা অন্যের অধিগত নয় এবং যার তুলনাও নেই।

সবাই বলে, ট্রাম্‌পার কি খেলতেন? না, ট্রামপার ব্যাট হাতে মাঠে নেমে সবুজ আঙিনায় রেখা-চিত্র আঁকতেন। মুগ্ধ হতেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তৃপ্তির আনন্দসায়রে অবগাহন করতেন। অর্ধ-স্ফুট কণ্ঠে ধ্বনি উঠতো, 'আহা! কি দেখলাম!'

আহা! কি দেখলাম! বলতে বলতে ক্রিকেটের অপরাজেয় কথাশিল্পী নেভিল কার্ডাসও উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, 'ট্রাম্‌পারের শিল্পকৃতি একমাত্র উড়ন্ত বলাকার সঙ্গেই তুলনীয়! পাখা-মেলা বলাকার সহজ ও সাবলীল, ছন্দিত ও প্রাণস্পন্দিত গতিতে যে পরিচ্ছন্ন শিল্প-কর্ম প্রতিভাত হয়, সেই কর্মই ছিল ট্রাম্‌পারের সহজাত ও অধিগত। তেমনি স্বাভাবিক ও সহজ, তেমনি ছন্দোময় ও প্রাণময়!'

এই ট্রাম্‌পারকে দেখে কবির কল্পনা প্রসারিত হতো। রং, তুলি, ইজেল ঘিরে শিল্পীর ব্যস্ততা বাড়তো। সবার চেষ্টা, প্রত্যক্ষ স্মৃতিকে দৃষ্টি-পথে ধরে রাখা। আফসোস এই যে, তাঁর কালে ক্যামেরা যন্ত্রটি একালের মতো সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। তবু ট্রাম্‌পারের ছবি অষ্ট্রেলিয়ার ঘরে ঘরে টাঙানো আছে।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট মেন্‌জিসের দপ্তরের দেওয়ালেও ঝুলছে সেই ছবি : পা বাড়িয়ে ট্রাম্‌পার ড্রাইভ

করছেন! প্রধানমন্ত্রী মেন্‌জিস বলেন, যখন কাজের চাপে হাঁফিয়ে উঠি, যখন ফুরিয়ে যাই তখন তাকাই ছবির দিকে। উৎসাহ পাই। মূলধন জোগাড় হয়ে যায়। ও তো শুধু ছবিই নয়, ও হলো বেগবান প্রাণের প্রতীক। ক্রিকেট অমন সরল পথে, সহজ আনন্দেই খেলতে হবে। জীবন-খেলাতেও যদি আমরা সবাই ওমনি ক্রিকেট খেলতে পারতাম!

কিন্তু সবাই পারে না। পারেন ট্রাম্‌পাররাই, মাঠের যাঁরা রাজা। মেজাজে যাঁরা অভিজাত। এই মেজাজ ট্রাম্‌পারকে ঝুড়ি ঝুড়ি রাণ জড়ো করতে নিষেধ করেছিল। মনের মতো মার মেরে কিছুক্ষণ খেলতে পারলেই তিনি হতেন খুশী—যদিও সেই কিছুক্ষণের চেষ্টায় সময় সময় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় জমা পড়তো দুশো বা তিনশো'রও অঙ্ক। তবে সেগুলো ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রমের নজীর। নিয়মের অকাট্য সমর্থন রয়েছে ১৯০২ সালে তাঁর ইংলণ্ড-পরিক্রমার বিবরণে।

সেবার ইংলন্ড বর্ষণসিক্ত, স্যাঁত-সেঁতে। উইকেট প্রতিকূল। নামী ব্যাটস-ম্যানদের কেউই সুবিধে করতে পারছেন না, শুধু ট্রাম্‌পার ছাড়া। খেলার আনন্দে মেতেই তিনি মাঠ-ময়দান আলো করে রাখছেন। দেখতে দেখতে মোট রাণ ২৫৭০-র ঘরে পৌঁছলো। সেঞ্চুরী করলেন এগারোটি। কিন্তু ব্যক্তিগত স্কোর কোনো ক্ষেত্রেই ১২৮-এর গন্ডী ছাড়িয়ে গেল না।

একশ'র পর দুশো বা তিনশর লক্ষ্যে পৌঁছতে কোমর কষে বাঁধা ট্রাম্‌পারের জীবনাদর্শ নয়। সে লক্ষ্য অন্যদের। তার জন্যে ব্র্যাডম্যান-পনস-ফোর্ড, হ্যামন্ড-হাটনেরা আছেন। অন্যেরা অন্য জগতের মানুষ, ট্রাম্‌-পারের দুনিয়া স্বতন্ত্র। তাঁর নিজস্বই।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, কেতাব-নির্দেশিত সব কটি মারই ছিল ট্রাম্‌-পারের হাতে। বাড়তি ছিল নিজস্ব দু-চারটি স্ট্রোক। যে বলের যা প্রাপ্য তা তো তিনি মেটাতেন। উপরন্তু যা প্রাপ্য নয় তা মেটাতেও তিনি সফল হতেন। ড্রাইভের বল ড্রাইভ করতেন। আবার কাট করে, এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মার গ্লান্স মারতেও তাঁর কুন্ঠা জাগতো না। এতো মূলধন ছিল বলেই না ভিক্টর ট্রাম্‌পার টেস্ট আসরে মধ্যাহ্নভোজনের আগেই সেঞ্চুরী করার পথিকৃতের ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন?

সমকালীন উইকেট-রক্ষক হ্যান্স কার্টারের খ্যাতি ছিল ক্রিকেট-বোদ্ধা হিসেবে। তাঁর মত 'খবরদার, কেউ যেন ট্রাম্‌পারের সঙ্গে কারুর তুলনা না করে! না ব্র্যাডম্যানের, না জ্যাক হবসেরও!

ক্রিকেটের পণ্ডিতপ্রবর সি বি ফ্রাইয়ের অভিমত: 'আসুন, সমবেত কণ্ঠে আমরা একবার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটস-ম্যানের কল্যাণকামনা করি। জয়ধ্বনি তুলি, ভিক্টর ট্রাম্‌পারই সর্বশ্রেষ্ঠ!'

ইংলন্ডের প্রাক্তন ও পরলোকগত অধিনায়ক স্যার পেলহাম ওয়ার্ণার ছিলেন ত্রি-কালদর্শী। ডব্লিউ জির সঙ্গে তিনি খেলেছেন। ক্রিকেটের 'স্বর্ণ-যুগেই' মাঠে মাঠে তার যৌবন কেটেছে। স্বচক্ষে দেখেছেন রণজি, হবস, ব্র্যাড-ম্যান, হ্যামন্ড, পনসফোর্ড, হাটন, কম্পটনদের। অনেক দেখেছেন। অনেক চিন্তাও করছেন এবং চিন্তা করেই বলছেন: 'দ্বিতীয় ভিক্টর আর দেখতে পাওয়া যাবে না!'

ক্রিকেট-পঞ্জিকা-গোঁড়া উইজডেন সহজে কারুর প্রশংসা করতে চায় না। কিন্তু ট্রাম্‌পারের বেলায় তারও মেজাজ অকৃপণ: 'ট্রাম্‌পারের আশেপাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। না, অননুকরণীয় রণজিও নন্। ভিক্টরের মতো ব্যাটিংয়ের অমন কার্যকর এবং চোখজুড়োনো ছবি আর কেউই আঁকতে পারে নি!'

আরও আছে। প্রশস্তিতে আরও উচ্চকণ্ঠ শত্রুপক্ষ ইংলণ্ডের দুর্ধর্ষ বোলার জর্জ হার্স্ট।

টেস্ট খেলায় ট্রাম্‌পার অস্ট্রেলীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে আসছেন। এমন সময় ইংলন্ডের অধিনায়ক ওয়ার্ণার হার্স্টের হাতে নতুন বল দিয়ে শুধালেন,

'জর্জ, ফিল্ডসম্যানদের কোথায় দাঁড়াতে বলবো?'

হার্স্ট বল্লেন, 'আপনার যেখানে খুশী। আপনি যা খুশী করুন। তবে ভিক্টরও যা খুশী ওর তাই করে যাবে। ব্যাট চালাবে, রাণ তুলবে। কেউ ওকে আটকে রাখতে পারবে না।'

কতো আর বলবো? ট্রাম্‌পারের খেলার কথা বলে শেষ করা যায় না। আর মানুষটিও ছিলেন তেমনিই, আদর্শ ক্রীড়ারীতির সঙ্গে একাত্ম। মিতবাক, নিরভিমান, অজাতশত্রু। প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতে তাঁর যেন কোথায় বাধতো। এমন সোজা মন ও সরল পথ যাঁর, অসহজ ও বক্র বাস্তবে সফল হওয়া তাঁর পক্ষে শক্ত। তাই বুঝি ব্যবসায়িক জীবনে ট্রাম্‌পার লক্ষ্মীর প্রসন্নতা তেমন লাভ করতে পারেন নি।

ট্রাম্‌পারের খোলা মন জানতে হলে সেই অস্ট্রেলীয় তরুণটিকে খুঁজে বার করতে হয়। তরুণটি সবে খেলার সাজ-সরঞ্জামের দোকান বসিয়েছে। ট্রাম্‌পারের নিজের ব্যবসাও তাই। তবু ছোকরা একদিন ট্রাম্‌পারকে ধরে বসলো।

'এই ব্যাটটায় একটা সই দেবেন?'

ট্রাম্‌পার ধরাচুড়ো পরে হাত-ব্যাট সঙ্গে নিয়ে মাঠমুখো হচ্ছিলেন। খেলা ইংলন্ডের সঙ্গেই টেস্ট ম্যাচ। এমন সময় ছোকরার এই অনুরোধ।

'দেখি তোমার ব্যাট।' হাত বাড়িয়ে নিলেন। তারপর নিজের হাত-ব্যাট ফেলে রেখে ছোকরার ব্যাটটি বগল-দাবা করে মাঠে নেমে পড়লেন।

হাঁ-হাঁ করে আঁতকে উঠলেন ভিক্টরের সঙ্গীরা, 'করছো কি! নিজের অভ্যস্ত ব্যাটে খেলো। আর ওটা ব্যাট না গদা! বাড়াবাড়ি করো না ভিক্টর, মনে রেখো এটা টেস্ট ম্যাচ!'

কিন্তু যাঁর উদ্দেশে বলা তিনি কথাটা কানেই নিলেন না। চেলা-কাট হাতে নিয়েই তিনি মাঠে নামলেন, ফিরলেন সাতাশী করে। হয়তো সেঞ্চুরীই করতেন। কিন্তু সেই দুর্বহ গদাটি ঘোরাতে ট্রাম্‌পারের কপালে স্বেদবিন্দুর আবির্ভাব ঘটেছিল।

এ কাহিনীর ইতি সেখানেই নয়। তাঁবুতে ফিরেই 'গদাটির' গায়ে ট্রাম্‌পার কলম চালালেন।

'এমন সুন্দর ব্যাট আর হয় না। আমার সুপারিশ, সবাই এই ব্যাটেই খেলুক। স্বাঃ ভিক্টর ট্রাম্‌পার।'

ছোকরা নাচতে নাচতে চলে গেল। ট্রাম্‌পারের সার্টিফিকেটের জোরে তার ব্যবসারও বাড়-বাড়ন্ত ঘটলো যেদিন সেদিন ট্রাম্‌পারও যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

'যাক্, তাহলে অন্ততঃ একজনেরও উপকার করতে পেরেছি!'

এমন মানুষকে ভাল না বেসে উপায় বা কি?

সেই ভালোবাসাতেই সেদিন ক্রিকেট-দুনিয়া ফুঁপিয়ে উঠেছিল। দিনটি ছিল ১৯১৫ সালের ২৮শে জুন। থমথমে গলায় কে যেন দুঃসংবাদ শোনালে, ভিক্টর নেই! মাত্র আটত্রিশ বছরেই সব শেষ!

শুনেই সারা সিড্‌নী শহর পথে বেরিয়ে পড়লো। এতো মানুষ আগে কোনোদিন জড়ো হয় নি। সবাই আকুল, শবাধারে কাঁধ দেবার প্রার্থনায়। এই প্রার্থনা ঘিরে কতো কাড়াকাড়ি, কতো কাঁদাকাটি। শেষ পর্যন্ত শবাধার বাহকের ভূমিকা পেলেন অস্ট্রেলিয়ার এগারোজন টেস্ট ক্রিকেটার। মাঠের রাজা রাজসিক আভিজাত্যেই বিদায় নিলেন।

স্বল্পায়ু তিনি সন্দেহ নেই। তবে খাঁটি জিনিষের আয়ু বোধহয় এমনি অল্পস্বল্পই হয়।

সেই ভালবাসার জের আজও চলেছে। ভাঙ্গা জানালাকে জাতীয় সংগ্রহশালায় সাজিয়ে রাখায় অস্ট্রেলিয়ার এই যে অবিচল নিষ্ঠা তা কি সেই ভালবাসারই পরিচায়ক নয়?

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একবিংশ পরিচ্ছেদ

।। ১ ।।

আয়নাই ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে প্রথম দেখতে পেয়েছিল। তার চেঁচামেচিতে অবশ্য আরও অনেকে ছুটে এল। নতুন ঝি-ই সর্বাগ্রে। গায়ে মাথায় কাপড় জড়াতে জড়াতে এসে দাঁড়াল সে। বাকী যারা এল তারপর, তারা ওর এই আগমনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করল না। কোনখান থেকে উঠে এল সে তা তো নয়ই। ওরই নিশ্চয় আগে ঘুম ভেঙেছে—এই কথাই বুঝল সকলে।

আয়না ভেবেছিল অন্য ব্যাপার। আরও খারাপ কিছু ভেবেই অমন চেঁচিয়ে উঠেছিল। শয্যাশায়ী রুগীকে ঐভাবে চৌকাঠের ওপর মুখ থুবড়ে নিথর হয়ে পড়ে থাকতে দেখলে সাধারণত যা মনে হয় আগে—তাই মনে হয়েছিল তার। কিন্তু গায়ে হাত দিয়ে একটুখানি আশ্বস্ত হ'ল সে। গা তখনও গরম। একেবারে প্রাণটা বোধহয় যায়নি এটা ঠিক। তবু, ভয়ানক একটা যে কিছু ঘটেছে তাতেও সন্দেহ নেই। এমনভাবে দাঁতে-দাঁত লেগে ভিরমি যেতে স্বর্ণকে কখনও দেখেনি আয়না, এই দু'তিন মাসে একদিনও।

আয়নার চেঁচামেচিতে হরেনকেও এসে দাঁড়াতে হ'ল। কিছু দেরি ক'রেই এল সে—এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে সেটা জানাবার জন্যে। ব্যাপারটা শুনে বলল, 'তাই তো—বিছানা ছেড়ে এখানেই বা এল কী করে? কলঘরেটরে যাবার চেষ্টা করেছিল নাকি?...তাহ'লে তো বড় অন্যায় কথা। বাড়ির সব জায়গায় রোগ ছড়িয়ে বেড়ানো তো ঠিক নয়।'

জীবেনই ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে তাকে, 'আচ্ছা, সেসব নিকেশ পরে নিলেও চলবে। আগে ডাক্তারবাবুকে খবর দেবার ব্যবস্থা করো তো!'

অগত্যা ডাক্তারের কাছেও যেতে হ'ল।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

'কোন শক্-টক্ লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। হার্টের যা অবস্থা—এটা খুব খারাপ হ'ল।...কিন্তু কী ক'রে হ'ল—কেউ জানেন না আপনারা?'

হরেনের সুগৌর মুখ অকারণেই লাল হয়ে উঠল। বার দুই ঢোক গিলে বলল, 'সেটা আমরা ঠিক—। মানে আমি তো এ ঘরে থাকি না আজকাল। মাঝরাত্রে উঠে কখন যে—। আয়না মানে আমাদের পুরনো ঝি অবিশ্যি ছিল—তবে জানেন তো সার্ভেণ্টরা য়্যাজ এ ক্লাস ইরেস্পন্সিব্‌ল্।'

ডাক্তারের চেষ্টায় কিছু পরেই জ্ঞান হ'ল স্বর্ণর, কিন্তু কী ক'রে যে এমন হ'ল তা জানা গেল না। সে কিছুই বলতে
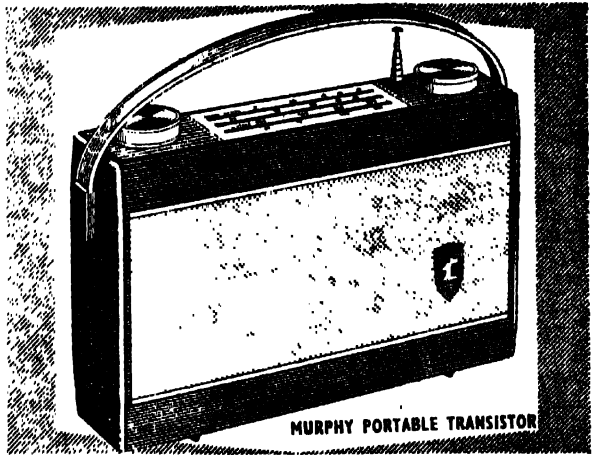
চাইল না। তার নাকি কিছুই মনে নেই। কেন উঠে অমনভাবে দোরের দিকে গিয়েছিল তাও বলতে পারল না। কথা কইলও না বিশেষ। দু একটা কথা বলার পরই সে ক্লান্তভাবে চোখ বুজল আর খুলল না কিছুতেই। এমন কি তার এত প্রত্যাশিত, এত পথ-চাওয়া স্বামী তার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে—তাও যেন দেখতে পেল না সে।

বোধ হয় তার উপস্থিতি টের পেয়েই আরও দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরল।

ডাক্তারও বেশী কথা বলতে চাইলেন না। ওদেরও বারণ করলেন বেশী প্রশ্ন ক'রে বিরক্ত করতে। এরকম ফীটের পর অপরিসীম ক্লান্তি আসে, সেইটেই স্বাভাবিক। এখন বরং যেটা সর্বাগ্রে দরকার, সেইটেই করুক তারা—কিছু গরম পানীয় বা পথ্য এনে দিক।

কিন্তু সেইখানেই একটা বড় রকমের গণ্ডগোল বাধল। কিছুই খেতে চাইল না সে—একবিন্দু কিছু মুখে তুলতে রাজী হ'ল না। তার এক কথা—'আমার কিছু ভাল লাগছে না—আমাকে একটু ঘুমোতে দাও তোমরা, তোমাদের পায়ে পড়ি!'

প্রথমে ঝি পরে জা-দেওররা এল। অনুরোধ অনুযোগ—শেষে কিছু ধমক-ধামকও করল তারা। স্বয়ং শাশুড়ী, প্রাণপণে নিজের শুচিতা ও স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে, বাইরে থেকে নাকি সুরে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে গেলেন। কিন্তু স্বর্ণ সেই যে দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়েছিল—এদিকে ফিরলও না, কথাও বলল না। খেলও না কিছু।

আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার—এই উপলক্ষে বাড়ির প্রায় তাবৎ লোকই এল, খাওয়ার জন্য উপরোধ-অনুরোধ, পীড়াপীড়ি করল, কেবল যার সর্বাগ্রে আসবার কথা সেই হরেনই—একবারও এল না বা কেন তার স্ত্রী কিছু খাচ্ছে না—এ প্রশ্ন করল না। বরং সে যেন চেষ্টা করেই একটু আড়ালে আড়ালে রইল। ভাইয়েরা ডাকতে গেলে বলল, 'তোমরা সবাই বলছ তাতে যখন খাচ্ছে না, আমি বললেই কি খাবে? তা নয়, এইসব অসুখে মাঝে মাঝে একটা অকারণ অভিমান হয়। এই ধরনের মনোভাব থেকেই ফীটটাও হয়েছে। এখন আর বেশী বকিয়ে লাভ নেই বরং খানিকটা ঘুমোতে দাও, ঘুম ভাঙ্গলে মাথা ঠান্ডা হ'লে আপনিই খাবে!'

হরেন নিজেও সেদিন বাড়িতে খেল না। দেরি হয়ে গেছে, এই অজুহাতে তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে এক গ্লাস সরবৎ খেয়ে বেরিয়ে গেল। অত্যন্ত নাকি জরুরী কাজ আছে অফিসে, কী সব হিসেবের গোলমাল হয়েছে ক্যাশে—সাহেবরা আসবার আগে সেটা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে—অকারণেই সবাইকে শুনিয়ে কৈফিয়ৎ দিয়ে গেল।

কিন্তু খানিকটা ঘুমিয়ে উঠেও অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হ'ল না। কোন খাদ্যই—জল ছাড়া অন্য কোন পানীয়ও মুখে তুলতে রাজী হ'ল না স্বর্ণ। এমন কি কোন ওষুধও না। যাকে বলে দাঁতে দাঁত দিয়ে থাকা—তাই রইল সে।

জা-দেওরদের মধ্যে জীবেনই চিরদিন বৌদির একটু বেশী অনুগত, আজও সে টানটা তার সম্পূর্ণ যায়নি। অফিসের ফেরৎ সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে ওর এই কঠোর উপবাসের কথা শুনে অফিসের পোশাকসুদ্ধই বৌদির ঘরে এসে ঢুকল। ঝিকে সরিয়ে দিয়ে একেবারে কাছে এসে প্রশ্ন করল, বলি মতলবটা কি বল তো বৌদি, তুমি কি আত্মহত্যে করতে চাও?

এবার কথা বলল স্বর্ণ, ওর দিকে মুখও ফেরাল। দেওরের চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'বাঁচব না বেশী-দিন—এটা তো ঠিক? সে তোমরাও বুঝছ, আমিও বুঝছি। মিছিমিছি এই পেরেমায়টা অনর্থক কটা দিন টেনে বাড়িয়ে লাভ কি? নিজেরও দগ্ধানি—তোমাদেরও জ্বালাতন। আমি বিদেয় হ'লে তোমার দাদা একটা বিয়ে করতে পারবে—সে তবু ভাল। তার দুর্দশা আমি আর চোখে দেখতে পারছি না ঠাকুরপো। তাই—যেতেই যেকালে হবে—যাওয়াটা একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির করতে চাই।......কটা দিন কোনমতে একটু চোখ-কান বুজে থাকো—তারপর আমারও পোড়ানির শেষ, তোমরাও সব দায়ে নিশ্চিন্তি! আর কারুর জন্যে ভাবতে বসতে হবে না!'

কী বুঝল জীবেন, কে জানে, খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলল শুধু, 'যার দুর্দশা বরাতে আছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না বৌদি। পাঁকের মাছ পাঁকেই ভাল থাকে। কিন্তু তুমি শুধু দাদার কথাই ভাবছ কেন, ছেলেমেয়ে-গুলোর কথাও ভাবো। একটা সৎমা এসে ঘাড়ে চেপে বসলে কি ওরা মানুষ হবে—না বাঁচবেই কেউ?'

'আমি আর কারুর কথাই ভাবব না ঠাকুরপো', স্বর্ণ দৃঢ়স্বরে বলে, 'সোয়ামী-পুত্তুর-সংসার সবেতে আমার ঘেন্না হয়ে গেছে। এবার আমি ছুটি চাই তোমাদের কাছে শুধু। ব্যাগত্তা করি আমাকে ছেড়ে দাও!'

জীবেন এবার চুপ ক'রে গেল। ভাল মানুষ স্বর্ণর এ চেহারা, কণ্ঠের এ দৃঢ়তা তার কাছে একেবারে নতুন। সে হাত-পা নেড়ে চেঁচায়, কথায় কথায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, পীড়াপীড়ি ক'রে বকে-ঝকে লোককে খাওয়ায়, খাওয়া নিয়ে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে—সেই স্বর্ণই জীবেনের পরিচিত। সেই সরল, স্নেহ-কোমল মানুষটার এই রূপান্তর কতখানি আঘাতে সম্ভব হয়েছে—তা বুঝেই আর বৃথা কথা বাড়াতে চাইল না সে। এ আঘাত যার কাছ থেকে এসেছে সে নিজে এসে ক্ষমাপ্রার্থনা না করলে, অনুতাপে প্রতিশ্রুতিতে এই নিদারুণ বেদনা মুছে নেবার চেষ্টা না করলে—কোন লাভ হবে না অপর কারুর অনুরোধ-উপরোধ পীড়াপীড়িতে। তার চেয়ে দাদা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। সে এলে তাকে বুঝিয়ে বলে, প্রয়োজন হয় তো জোর ক'রেই তাকে এ ঘরে পাঠাবে। তার জন্যে দরকার হ'লে তাকে ভয় দেখাতেও পশ্চাদপদ হবে না জীবেন। নতুন ঝি সম্বন্ধে দাদার দুর্বলতাটা বাড়িসুদ্ধ সবাইকার চোখেই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে। জীবেনের অনুমান, বৌদির আজকের এই আচরণের সঙ্গে সেই অশোভন পক্ষপাতের কোন নিগূঢ় যোগাযোগ আছে। ঐ দিক দিয়েই হরেনকে জব্দ করতে হবে, লোকলজ্জা কেলেঙ্কারীর ভয় দেখিয়ে।........

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অত কিছু করতে হ'ল না। তার আগেই, সন্ধ্যার সময় একেবারে অপরিচিত একটি আগন্তুক এসে উপস্থিত হ'ল ওদের বাড়িতে ওদের জীবনে।

কেউই তাকে চিনত না এ বাড়িতে। কেউই দেখেনি। দামী সাহেবী পোশাক-পরা রীতিমতো সম্ভ্রান্ত চেহারার একটি ভদ্রলোক মোড়ের মাথায় প্রকান্ড একটা গাড়ি থেকে নেমে হরেনবাবুর বাড়িটা কোন দিকে খোঁজ করছেন—এ খবর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ বাড়ি পৌঁচেছিল। স্বর্ণরই বড় ছেলে ভুতু ইস্কুল থেকে ফুটবল খেলে ফিরছিল, সেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে মেজকাকে খবরটা দিলে। সে স্পষ্ট শুনেছে হরেনবাবুর নাম—তবে তার সাহস হয়নি এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দেবার বা সঙ্গে ক'রে ডেকে আনবার। অতবড় গাড়ি থেকে অমন ফীটফাট দামী পোশাক পরে যে নেমেছে—সে ভুতুর সঙ্গে কথা কইবে বা ভুতু কথা কইলে জবাব দেবে—এমন ভরসা তার হয়নি। ওদের সংকীর্ণ চার হাত গলি, তার মধ্যে গাড়ি ঢুকবে না, কিন্তু বাইরের যে রাস্তায় গাড়িটা দাঁড়িয়েছে সেও যথেষ্ট চওড়া নয়। ও গাড়ি সালকে-শিবপুরের সব রাস্তাতেই বেমানান। তাই শুধু গাড়ি-খানা দেখতেই বহু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে—ভুতু সে খবরটাও দিল কাকাকে।

জীবেন শুনে কৌতূহলী হয়ে বাইরে যাচ্ছে—এমন সময় সদরে কড়া নড়ে উঠল। সে ভদ্রলোক এসেছেন।

জীবেন দেখল ভুতুর বর্ণনা আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। সে নিজেও একটু শৌখীন, মোটামুটি ভালো চাকরিই করে—পোশাক-আশাকের দর সম্বন্ধে তার ধারণা অনেকটা নির্ভুল। ভদ্রলোকের গায়ে যে পোশাক—সত্যিই তার দাম

অনেক। লোকটি যে অবস্থাপন্ন তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেখতেও বেশ সুপুরুষ, বয়স জীবেনের চেয়ে কমই হবে, যদিচ এই বয়সেই ছোকরা এমন একটা শান্ত গাম্ভীর্য আয়ত্ত করেছে যে দেখামাত্র সম্ভ্রমের উদ্রেক হয় মনে—বেশ সমীহ ভাব জাগে।

মিনিটখানেক দুজনেই দুজনকে চেয়ে দেখল নীরবে। তারপর জীবেন যেন একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই আপনার?'

'এটা কি হরেনবাবুর বাড়ি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হরেনবাবু বাড়িতে আছেন?'

'না। আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

'বলছি। তিনি কখন ফিরবেন বলতে পারেন?'

'রাত বারোটা একটার আগে নয়। দুটো-আড়াইটেও হ'তে পারে।'

একটু হাসির ভঙ্গী ক'রে উত্তর দিল জীবেন।

'ও, তাই নাকি? ...তা অত রাত্রে তো আর—। তাঁকে অন্য কোন্ সময় বাড়িতে পাওয়া যায়?'

'সকালে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত।'

একটখানি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবলেন ভদ্রলোক, তারপর বললেন, 'আচ্ছা ব'চি—মানে হরেনবাবুর স্ত্রী কেমন আছে বলতে পারেন?...... একটু—একটু ভালর দিকে কি?'

জীবেন ক্রমেই বেশী বিস্মিত হয়ে উঠছে।

'মধ্যে একটু ভালর দিকেই গিয়েছিল কিন্তু আবার এই দিনকয়েক হ'ল—।... আজ তো খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। কিন্তু—আপনি, মানে আপনাকে তো চিনতে পারছি না ঠিক?'

'আমি ওর সম্পর্কে ভাই হই। ওকে বললেই চিনতে পারবে। আপনার চেনবার কথা নয়, আপনার দাদাও—হরেনবাবু আপনার দাদা তো?—চাক্ষুস চেনেন না আমাকে, পরিচয়ে চেনেন হয়ত, ব'চি মানে স্বর্ণলতার মুখে শুনে থাকবেন।... আমি একটু ওকে দেখতে চাই, আসলে ওকে দেখতেই আমি এসেছি—ওর এই অসুখের খবর শুনে। আপনি আপনার বৌদিকে গিয়ে বলুন যে, তার অরুণদা এসেছে—তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

আজ কি আর চমকের শেষ হবে না? —জীবেন ভাবে। তার বৌদির ভাই বলতে এতাবৎ কাল যাদের দেখে আসছে—ময়লা খাটো কাপড় আর কোঁচ-কানো সস্তা দামের ছিটের জামা পরা কতকগুলি নিরক্ষর গ্রাম্য ছোকরা—তাদের সঙ্গে এই সুবেশ সুশ্রী কেতা-দুরস্ত ভদ্রলোকটির কোন সম্পর্ক আছে, তা কেউ একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও বিশ্বাস করা শক্ত।

'কিন্তু এখন তো তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, বৌদির শরীর খুব খারাপ,—এখন কথাবার্তা বলা উচিত নয় তার পক্ষে—' এইটেই বলতে যাচ্ছিল জীবেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, যে অসহ্য গুমোট আবহাওয়া চলছে, তাতে বাইরের এই দমকা বাতাস লাগলে কিছু উপকারই হ'তে পারে। বাপের বাড়ির লোককে দেখলে কিছু নরম হয়ে পড়বেই—আর এখন সেইটেই সবচেয়ে দরকার।

সে বাইরের ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিয়ে বললে, 'আপনি বসুন একটু—আমি দেখছি তিনি জেগে আছেন কি না!'

স্বর্ণ বহুক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসই করতে পারল না কথাটা, 'কী বলছ তুমি! অরুণদা! কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে—সে যে বহুকাল দেশ-ভুঁই ছাড়া। সে-ই আমার বের পরদিন উধাও হয়েছে —আজ অবধি আর কোন খবর নেই। সে কি বেঁচে আছে এখনও? বেঁচে থাকলে এতকালের মধ্যে আমার উদ্দিশ নিত না একবারও?...... না, না, নিশ্চয়ই তুমি ভুল শুনেছ ঠাকুরপো, আর কাউকে খুঁজছে দেখগে যাও, অন্য কোন অমুক বাবুর বৌকে খুঁজতে এসেছে, লোকে এই বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছে!'

'কিন্তু তোমার নাম বলছে যে, মায় তোমার ডাক-নাম সুন্দ!'

'ও মা, সে কি কথা! সত্যি অরুণদা এসেছে তা'হলে—?'

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই, স্বর্ণর স্তিমিত নিঃশেষিতপ্রায় সত্তায় যেন একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়েছিল। এখন তার প্রতিক্রিয়া শুরু হ'ল। দুর্বল দেহে সামান্য উত্তেজনাই যথেষ্ট—এ তো একটা ঢেউয়ের মতো এসে পড়েছে সংবাদটা। অরুণদা মানেই তার বাল্যের কৈশোরের সহস্র স্মৃতি। সুখের না হোক আনন্দের স্মৃতি। বাপের বাড়িতে সকলের আদরে প্রশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়া, সর্বত্র সমস্ত ব্যাপারে অখণ্ড প্রতাপ, তার বিয়ে, উৎসব সমারোহ—কত কী আশায় স্বপ্ন দেখা সেই প্রাণোচ্ছল দিনগুলি—একসঙ্গে যেন ভিড় ক'রে ঢুকতে চাইছে তার মাথায়।... ঐ ছেলেটিও, মুখচোরা লাজুক ভীরু ছেলেটি—স্বর্ণর স্নেহচ্ছায়া-প্রত্যাশী, একান্তভাবে নির্ভরশীল অসহায় অনাথ ছেলেটি। যাকে খুঁজে আনতে হ'ত বাঁশবন ডোবার ধার থেকে, জোর ক'রে ধরে না খাওয়ালে যে খেত না।... সে সব স্মৃতি—বিশেষ ক'রে আজকের এই মোহভঙ্গের ও সর্বপ্রকার আশা-ভঙ্গের দিনে বুকে যেন কী এক অদ্ভুত বেদনাভরা চাঞ্চল্য জাগিয়েছে, সে চাঞ্চল্য তার দুর্বল বুকে গিয়ে সজোরে আঘাত করছে। বুকের মধ্যে কী একটা তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে।.........

সে প্রাণপণে বুকটা চেপে ধরে চোখ বুজে পড়ে রইল কিছুক্ষণ, আগের মতোই স্থির নিশ্চল হয়ে।.........

তার সেই যন্ত্রণাবিকৃত বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে জীবেন ভয় পেয়ে যায়, বলে, 'তবে যাক গে। আমি বলে আসি বরং অন্য একদিন আসতে, আজ তোমার শরীর ভাল নেই—'

'উঁহু, উঁহু', চোখ বুজে বুজেই ইঙ্গিতে নিরস্ত করে স্বর্ণ—কিন্তু তখনও কোন কথা বলতে পারে না।

ফলে জীবেনও বিপন্নমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। কী করবে, কি করা উচিত ভেবে পায় না। এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও নিরাপদ নয়; একটু আগেই এ ঘরে এত ঘন ঘন আসার জন্য স্ত্রীর কাছে বকুনি খেয়েছে। ছেলেমেয়েগুলোকে সুন্দদ না মজালে তোমার চলছে না বুঝি? চৌদ্দ-বার ঘরে ঢুকে ঐ রুগীর গায়ের ওপর পড়ে ঢলাঢলি না করলে বুঝি আর বৌদির ওপর সোহাগ জানানো হয় না? যার পরিবার সে কত ঢুকছে ঘরে?' ইত্যাদি। তখন কাপড়-জামা বাইরে ছেড়ে রেখে ভাল ক'রে গা-হাত-পা ধুয়ে তবে ঘরে ঢুকতে পেয়েছিল। এখন আবার এ ঘরে এতক্ষণ থাকতে দেখলে হয়ত বাড়ি মাথায় করবে। আর কিছু নয়—কথাগুলো স্বর্ণর কানে না ওঠে, এই ভয় জীবেনের। মেয়েদের এ সব বিবেচনা নেই, কিন্তু পুরুষদের কাছে এগুলো লজ্জা ও পরিতাপের কারণ হয়ে ওঠে!

কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে দাঁড়াতে হ'ল না আর। স্বর্ণ একটু সামলে নিয়েই চোখ খুলে বলল, 'আচ্ছা, যে লোকটা এসেছে—কেমন দেখতে বল দিকি? পোশাক-আশাক কেমন দেখলে?'

'সুন্দর চেহারা। আর পোশাকও খুব দামী, ভাল সায়েববাড়ির স্যুট মনে হ'ল। বিরাট গাড়ি ক'রে এসেছে—'

'ধুস্! হতাশভাবে মুখে একটা শব্দ করে স্বর্ণ, 'ও তবে অন্য কেউ। এক কাপড়ে বেরিয়ে গেছল সে, তিন কুলে কেউ নেই—কোথায় দাঁড়াবে, কী খাবে তারই ঠিক ছিল না—সে অত পয়সা কোথায় পাবে?'

'তা কি বলা যায়! যুদ্ধের বাজারে পয়সা উড়ছে। কে কমনে দিয়ে কী ধরে নিচ্ছে তা কেউ জানে না। তবে অত কথায় দরকারই বা কি, ডেকেই আনি না, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাক।'

'আনবে? কিন্তু আমার এই ব্যয়রামের মধ্যে আনা ঠিক হবে?......তাকে বলেছ আমায় এই রোগ ধরেছে?'

'সে সব জানে। জেনেই দেখতে এসেছে। অন্তত তাই তো বললে।'

'জানে? জেনে দেখতে এসেছে?...... কিন্তু তা কী ক'রে হবে? সে কি এ রাজ্যিতে ছিল? কে জানে বাপু, আমার মাথার মধ্যে যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে!...... তা আনো না হয় তাকে ডেকে। ভুল হয়তো চলেই যাবে। বুঝব আমার নামে পাড়াঘরে আরও লোক আছে।...... কিন্তু তিন-তিনটে নাম কি মিলে যেতে পারে এমন করে?.........

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজা

নির্মল দত্ত

কৃষ্ণনগর আর চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার ধূমধাম ও জাঁকজমক বাঙলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের পূজার থেকে খুবই বেশী। আবার কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজার একটা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। কারণ, কৃষ্ণনগর থেকেই জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম প্রচলন হয়েছিল ব'লেই জানা যায়। জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম প্রবর্তন সম্বন্ধে এখানে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পুরাণে জগদ্ধাত্রীর রূপ বর্ণিত থাকলেও জগদ্ধাত্রীর পূজা পূর্বে প্রচলিত ছিল না। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন ঘটে। তাই হয়ত আজও কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পূজার জাঁকজমক কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। এখানকার পূজার এবং প্রতিমা নিরঞ্জনে বেশ একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বাঙলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষ্ণনগরে বহু দর্শকের সমাবেশ হ'য়ে থাকে। বিশেষ ক'রে এখানকার প্রতিমা-নিরঞ্জন মিছিল বহুদিন থেকেই কৃষ্ণনগরের বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আসছে। কৃষ্ণনগরে রাজবাড়ীতে আজও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে মূর্তির পূজা করেছিলেন সেই মূর্তিরই পূজা হ'য়ে আসছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর বিভিন্ন নামাবলীর মধ্যে জগদ্ধাত্রী নামের কথাও উল্লেখ আছে। এখানে জগদ্ধাত্রী অর্থে জগৎকে যিনি ধারণ ক'রে আছেন। দেবীপুরাণে জগদ্ধাত্রীর যে রূপ বর্ণিত আছে, তা একটি বিশেষ রূপ বা মূর্তি। পুরাণে উল্লিখিত জগদ্ধাত্রীর এই মূর্তিরই পূজা শুরু হ'ল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে। কি ক'রে হ'ল, সে এক কাহিনী। সে কাহিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণনগরের প্রাচীন অধিবাসীদের মুখে মুখে। অবশ্য নদীয়ার ইতিহাসে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ নেই। কৃষ্ণনগরের বয়স্ক ও প্রাচীন অধিবাসীদের কারো কারো কাছ থেকে এ কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। এ কাহিনী অবশ্য ইতিহাসের ওপর ভিত্তি ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে। হয়ত লোকের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে এর রূপ কিছুটা অদল-বদল হ'তে পারে। কিন্তু মূল যে ঘটনা, তা ঠিকই আছে। তার আসল কথা হ'চ্ছে এই যে, জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম প্রবর্তনের কাহিনী যদি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা না যায় তা হ'লে এই কাহিনী হয়ত একদিন লোকে সম্পূর্ণ ভুলেই যাবে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তদানীন্তনকালে বাংলার সমাজ-প্রধান। তাই তাঁর প্রবর্তিত জগদ্ধাত্রী পূজা বাঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়তে বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

'ঘোড়া-দাবা' জগদ্ধাত্রী মূর্তি

নবাব মীরকাশিম তখন বাংলার মসনদে। খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় নবাব একবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পুত্র শিবচন্দ্রকে মুঙ্গের কারাগারে বন্দী ক'রে রাখলেন। তখন শারদীয়া দুর্গাপূজার সময়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভয়ানক সাত্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন এবং তিনি প্রতি বছরই যেখানেই থাকুন স্বগৃহে এসে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করতেন। তাঁর বন্দিত্বের কয়েকদিন পরেই কৃষ্ণনগর থেকে নবাবের কাছে খাজনা গিয়ে পৌঁছুল। কৃষ্ণচন্দ্র মুক্তি পেলেন। মুক্তি পেয়ে তিনি আঠারো দাঁড়ের পানসি বেয়ে কৃষ্ণনগরের পথে পাড়ি দিলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, মহাপূজার পূর্বেই তিনি কৃষ্ণনগর পৌঁছান এবং মায়ের পূজা করেন। কিন্তু তাঁর মনের ইচ্ছা পূর্ণ হল না। বহু চেষ্টা ক'রেও তিনি মহাষষ্ঠীর দিন কৃষ্ণনগর পৌঁছুতে তো পারলেনই না, দশমীর দিনও না। দুঃখভারাক্রান্ত মহারাজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। মহামায়ার পায়ে অর্ঘ দিতে না পারা তিনি বিশেষ পাপকার্য বলেই মনে করতে লাগলেন। এই সব চিন্তা করতে করতে তিনি দশমীর দিন ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে তিনি দেখলেন—মহামায়া এসে যেন বলছেন, 'কি করবি বল্! পূজা হ'ল না ব'লে দুঃখ করিস নে! বাড়ী ফিরে যা। বাড়ী ফিরে তপস্যায় বসবি। তপস্যার দ্বিতীয় দিনে বহু বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হবে। কিন্তু এতে ভয় পেয়ে পেছন দিকে চাইবি না। এই নিয়ম যথাযথ পালন করলে সন্ধ্যার সময় বাকসিদ্ধ লাভ করবি এবং এই সময় সম্মুখে

শোলার সাজে জগদ্ধাত্রী মূর্তি

যে মূর্তি দেখবি, সেই মূর্তিরই পূজা করবি। তা হ'লেই আমার পূজা হবে। শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে এই পূজা হবে এবং একদিনেই সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী—এই তিন পূজোই করা চলবে। এই মূর্তিতে আমার যে পূজা তা তুই প্রচার করবি।' এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাকসিদ্ধ হবার জন্যে পূর্ব থেকেই সাধনা করছিলেন এবং এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটলে তিনি সিদ্ধ-পুরুষ হ'তে পারবেন—এই ছিল তাঁর আশা।

একাদশীর দিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগর পৌঁছুলেন।

তারপরই স্বপ্নে প্রাপ্ত মহামায়ার আদেশমত রাজবাড়ীর 'বিষ্ণু মহলে' তপস্যায় বসলেন। প্রথম দিন গেল। দ্বিতীয় দিনে পেছন থেকে ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির এমন ভীতিজনক ও বিভীষিকাময় শব্দ হতে লাগল যে, তিনি পেছন দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। কিন্তু পেছন দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে যেমনি সম্মুখ দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, অমনি দেখেন, শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ধারিণী পুরাণোক্ত জগদ্ধাত্রী মূর্তি। 'ঘোড়া-দাবা' হ'য়ে সিংহের উপর আরূঢ়া। মহারাজা এই মূর্তি গড়েই পূজা করলেন। সেই থেকে আজও কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে জগদ্ধাত্রীর এই মূর্তিই পূজিতা হ'য়ে আসছে।

মতান্তরে আর একটি কাহিনীও শুনতে পাওয়া যায়ঃ

সে কাহিনী হচ্ছেঃ নবাব মীরকাশিম এক সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পুত্র শিবচন্দ্রকে মুঙ্গের কারাগারে বন্দী ক'রে রাখেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্রকে 'ষড়যন্ত্রকারী' অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের কোতল করা হবে। তখন শারদীয়া পূজার সময়। মহারাজ অত্যন্ত সাত্ত্বিকভাবাপন্ন। তিনি মৃত্যুকে বরণ করবেন, সেও ভাল—তবুও কারাগারে জলস্পর্শ করবেন না। এই রকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তিনি শাস্ত্রাদি পাঠ করতে লাগলেন এবং মায়ের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ধ্যান মাঝে তিনি ভাবতে লাগলেন—'এখন মহাপূজো আরম্ভ হয়েছে। অথচ আমি এমনি হতভাগ্য যে, বাড়ীতে গিয়ে মায়ের পূজা করতে পারলাম না। যদি মুক্তি পাই তা হ'লে মায়ের পূজা করতে পারি। এমন কোন বিধান নেই, যাতে মায়ের তিন পূজোই একদিনে করতে পারা যায়। ইত্যাদি।' ধ্যানের মধ্যে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং মহানবমীর দিন শেষ রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে, দেবী যেন বলছেন,—'কৃষ্ণচন্দ্র, কাল সকালেই তোমার মুক্তি হবে। মুক্তি পেয়ে জগদ্ধাত্রীর যে রূপ-কল্পনা দেবীপুরাণে আছে, সেই মূর্তিতে আমার পূজা করবে এবং তিন পূজোই একদিনে হবে।'

সত্যিই পরদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মুক্তিলাভ ঘটে এবং তিনি নৌকাযোগে দেশে ফিরে আসেন। কৃষ্ণনগরে ফিরে তিনি পণ্ডিতমণ্ডলী ডেকে শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে পুরাণে উল্লিখিত জগদ্ধাত্রী মূর্তির পূজা করেন।

কৃষ্ণনগরের বয়স্ক ব্যক্তিদের মুখে মুখে যে কাহিনী আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে হয়ত কিছু ঐতিহাসিক ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। কিন্তু স্বপ্নে আদিষ্ট হ'য়েই যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পূজা করেছিলেন এ বিষয়ে কোন মতান্তর নেই এবং সেই থেকেই বাংলাদেশে জগদ্ধাত্রী পূজা চলে আসছে।

জগদ্ধাত্রীর যে পৌরাণিক বর্ণনা রয়েছে তার কাহিনী এই রকম ঃ একসময়
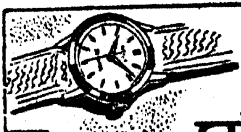
দেবতাদের মধ্যে অহং, তমঃ ভাব দেখা দিল। ফলে, প্রত্যেকেই নিজেদের স্ব স্ব প্রধান মনে করছিলেন। মহামায়া এই কথা জানতে পেরে দেবতাদের ঔদ্ধত্যকে দমন করার জন্যে অস্ত্র ছাড়লেন। তখন দেবতারা মহামায়ার স্তব শুরু করলেন। দেবী দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন। চতুর্হস্তসমন্বিতা, ত্রিনয়না, সিংহারূঢ়া, শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ধারিণী, পরিধানে রক্তবস্ত্র, দেহ নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা, জ্যোতির্ময়ী সে মূর্তি! দেবতারা সংযত হলেন। দেবীর এই মূর্তির রূপ বর্ণনা পুরাণে ছিল বটে, কিন্তু পূজার কোন প্রকাশ ছিল না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেই পূজার প্রকাশ করেন।

জগদ্ধাত্রী পূজা শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার পরবর্তী শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন পূজাই একদিনে হয়। দেবীর ধ্যানে যে মূর্তি প্রকাশিতা সেই মূর্তিতেই তিনি পূজিতা হয়ে থাকেন। একে 'জগদ্ধাত্রীর ধ্যান' বলা হয়। দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় এই ধ্যানের মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। সেই ধ্যানের মন্ত্র হ'ল:

ওঁ সিংহস্কন্ধ সমারূঢ়াং নানালঙ্কার-
ভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞো-
পবীতিনীম্।।
শঙ্খশার্ঙ্গ সমাযুক্ত বামপাণি-
দ্বয়ান্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঞ্চবানাংশ্চ-দধতীং দক্ষিণে করে।
রক্তবস্ত্র পরিধানাং বালার্ক-
সদৃশীতনুম্।
নারদাদৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভব-
সুন্দরীম্।।
ত্রিবলীবলয়ো পেতনাভিনাল
মৃণালিনীম্।।
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন
সমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভব-
গেহিনীম্।।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নে জগদ্ধাত্রীর যে মূর্তি দেখেছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে এখনও ঠিক সেই মূর্তিরই পূজা হয়ে থাকে। এই মূর্তির সিংহ শ্বেতবর্ণ ও অনেকটা ঘোড়ার মত দেখতে এবং দেবী সেই সিংহের মুখের দিকে মুখ রেখে 'ঘোড়া-দাবা' হয়ে ব'সে আছেন। কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নে যে মূর্তি দেখেছিলেন ও পুরাণে যে মূর্তি বর্ণিত আছে, উভয় মূর্তি একই এবং এই হ'ল ধ্যানোক্ত মূর্তি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দেবী পুরাণে বর্ণিত মূর্তেরই পূজা করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। আর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মাধ্যমেই বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচারিত হ'য়ে ওঠে।

জানা যায় চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার আরম্ভ নাকি এর অনেকদিন পরে। অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্রের আমল থেকে। সেও প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা। চন্দননগরের অধিবাসী ও নবলব্ধ নদীয়া জমিদারীর

স্বত্বাধিকারী নদীয়া রাজ এস্টেটের আইনজীবীদের মাধ্যমে জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যবস্থা অতি ধূমধামের সঙ্গে চন্দননগরেও প্রবর্তিত হয়।

'ঘোড়া-দাবা' জগদ্ধাত্রী মূর্তির পূজা বর্তমানে একমাত্র কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রের স্বপ্নে দৃষ্ট মূর্তির পূজা অন্যত্র আর কোথাও দেখা যায় না। তবে খানিকটা এই ধরনের মূর্তি কৃষ্ণনগরের প্রাচীন কয়েকটি গৃহস্থবাড়ীতে কিছু দেখা যায়। মানুষের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির রূপেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এখন মোটামুটি রূপটা ঠিক রেখে স্ব স্ব ইচ্ছা-মত দেবী মূর্তি গড়ে সকলেই পূজা ক'রে থাকেন। সর্বজনীন পূজার ক্ষেত্রেই এই রকম হ'য়ে থাকে। এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হলুদবর্ণ প্রায় কেশরযুক্ত সিংহের ওপর দেবী শঙ্খ-চক্র-ধনুর্বাহিনী রূপে বসে আছেন। তা ছাড়া অনেক সিংহকে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধরত বা দুই সিংহের মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেবীকেও দেখা যায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন রূপেও দেবী-মূর্তি গড়া হয়।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতির সঙ্গে জগদ্ধাত্রী মূর্তির খ্যাতি আজও অক্ষুণ্ণই আছে। প্রতিমার ডাকের সাজ বা চাল বিশেষ দ্রষ্টব্যবস্তু হয়। শুধু

বাঘ ও সিংহে লড়াইরত জগদ্ধাত্রী মূর্তি
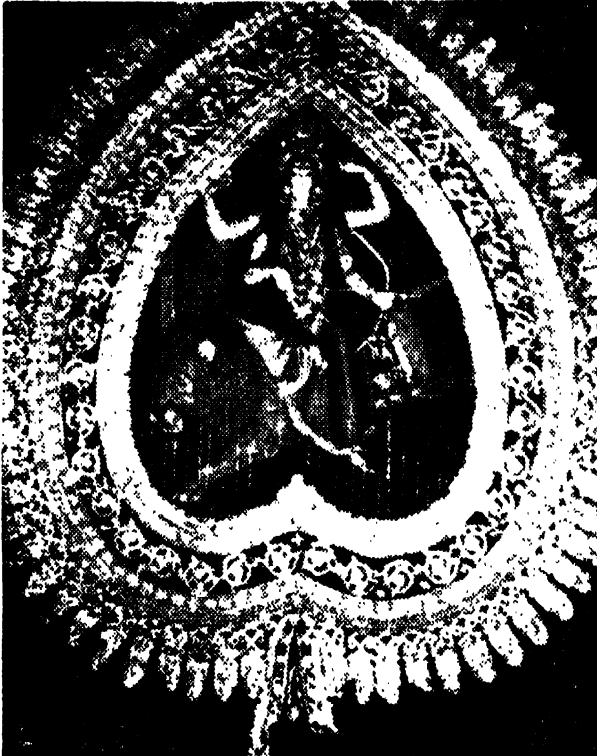
আধুনিক সজ্জায় জগদ্ধাত্রী মূর্তি

ডাকের সাজই নয়, শোলার সাজেও প্রতিমাকে এমন সুনিপুণভাবে সজ্জিত করা হয় যে, দর্শকের বিস্ময় না জেগে থাকতে পারে না।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নে যে মূর্তি দেখেছিলেন তার একটি 'মডেল' কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর 'বিষ্ণু মহল'-এ রক্ষিত আছে। মডেলটি হাতীর দাঁতের তৈরী। জগদ্ধাত্রীর এই মূর্তির কোন প্রচার-ব্যবস্থা বর্তমান রাজবাড়ী থেকে নেই। ফলে, মূল মূর্তির পূজা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে বললেই হয়।

কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজার জনপ্রিয়তা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। জগদ্ধাত্রী পূজার আদি প্রবর্তনস্থল কৃষ্ণনগর ব'লেই এখানকার জনপ্রিয়তার এই হয়ত কারণ। পূজা থেকে শুরু ক'রে প্রতিমা-নিরঞ্জন পর্যন্ত এত জাঁক-জমক ও আয়োজনের বৈশিষ্ট্য এবং এত বেশী সংখ্যক পূজা একমাত্র চন্দননগর ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। প্রতিমা-বিসর্জন তো সারারাত্রি ধরেই চলে। আনন্দ-উৎসবও কম হয় না। আলোর রোশনাইয়ের আর বাজনাবাদ্যি কোলাহলে নিরঞ্জন শোভাযাত্রা একটা দেখবার জিনিস। অগণিত নর-নারী, বালক-বালিকা ভিড় করে পথের দু'ধারে। এমনি ক'রেই আকর্ষণ করে আসছে কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে।

তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কলকাতার এক বিদ্বজ্জন-সভায় আহূত হয়ে এসেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী যুবক ও কীর্তিমান অধ্যাপক উপস্থিত। সভারম্ভের পূর্বে নানারকম খোশগল্পের মধ্যে একজন আমাকে বললেন যে এবারকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতামালা দেবার ভার আমার উপর অর্পিত হবে বলে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করেছেন।

সংবাদটা শুনেই পাশের বন্ধুদের কাছে বললাম 'আমি তো গিরীশচন্দ্র সম্বন্ধে বলবার অধিকারী নই, এ-আহ্বানে আমি কি করে সাড়া দেবো? সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মহলের লোক ছিলেন, তাঁরা বললেন, 'গিরীশচন্দ্র সম্বন্ধেই বলতে হবে, এ বাধ্যবাধকতা এখন নেই; বর্তমানে বক্তার খুশিমতো বলতে পারেন।' কথাটা শুনে আশ্বস্ত হলাম। মনের অবচেতনে একটা কথা বোধহয় বহুকাল থেকে চাপা ছিল—তাই মুখ থেকে হঠাৎ বের হয়ে গেল—আমি যদি বলি, তবে আমার বিষয় হবে 'তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়'। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর গত বিশ বৎসরের মধ্যে, এমন কি তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকে তাঁর সম্বন্ধে এত তথ্য ও তত্ত্ব বের হচ্ছে—যা তাঁর জীবনকালে তিনি জানতে পারলে বিস্মিত হতেন বলেই আমার তো মনে হয়। যাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয়েছে, একখানা পত্রের বিনিময় হয়েছে, তিনিই কবির অন্তরের কথা লিখছেন। তাঁর অন্তরঙ্গরাও তাঁকে রেহাই দিচ্ছেন না, তাঁরা তথ্য পরিবেশন করছেন বলে গর্বিত। কিন্তু তথ্য তো প্রতিদিনই জমেছে; যে লোকটি আশী বছর বেঁচেছিলেন—তাঁর প্রত্যেকটি দিনে কত ঘটনা ঘটছিল, সেগুলো তো সকলের জীবনেই ঘটে, কবির মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব সেইসব তুচ্ছ আবর্জনাপুঞ্জের উপর নির্ভর করে কি? এসব জড় করে তত্ত্বও একদিন সৃষ্ট হবে। কিন্তু সেটা কবির সত্য-মূর্তি হবে না। এইসব কথা বহুদিন থেকে মনের মধ্যে জমছিল বলেই বোধহয় মুখ থেকে হঠাৎ বের হয়ে গেল—'তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ বিচার' বিষয়ে বলবো।

আমি তথ্যবাদী ঐতিহাসিক; তাই বোধহয় সাহিত্যিক-জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক পারম্পর্য ও সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতি স্থূল পদার্থের উপর জোর দিয়েছি। কবিদের রচনার বিচারে আমরা 'মনগড়া তত্ত্বের' উপর অতি নির্ভরশীল হলে সত্যনির্ণয়ের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ ও আবিল হয়ে উঠবে।

দূরেকালের ঘটনাকে যদি আমাদের কালের অর্থাৎ বিংশ শতকের ছয় দশকের গজকাঠিতে মাপতে বসি, তবে হিসাব ঠকতে হবে। তবে প্রশ্ন ঠকবে কে। যাঁর আলোচনা করছি, তাঁকে তো ঠকান হবেই, আর যে আমি সমালোচনা করছি সে-ও ঠকবে। কারণ আমার দৃষ্টিকোণ বিশেষ মতামত বোঝার চাপে গেছে বেঁকে। তাই মন-মুকুরের উপর ছবিটা বিকৃত হয়ে পড়েছে। যাক, মোট কথা এ-ধরনের আলোচনাকে কখনই বিজ্ঞান-সম্মত বলতে পারবো না। খৃষ্ট-বাণী থেকে সমাজতন্ত্রবাদের বুলি সংগ্রহ করা বা গীতাকে বুর্জোয়াসি অবক্ষয় (decadant) যুগের ভাবনারাশির সংগ্রহ-পুস্তক বলে অবজ্ঞা প্রদর্শন প্রভৃতির মধ্যে লেখক তাঁদের শাণিত বুদ্ধির কসরত ও মতবাদের গোঁড়ামি দেখাতে পারেন। কিন্তু তার মধ্যে থাকবে না সম্যক্ দৃষ্টির স্বচ্ছতা, সদ্ ধর্মবোধ এবং বিবেচনা।

বুদ্ধাদি মহাপুরুষেরা পৃথিবী ও সৌরজগৎ তথা বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সব ধারণা পোষণ করতেন, তার স্থূলতা ও মূঢ়তা নিয়ে এ-যুগের অতিআধুনিকের দল যদি তাঁদের তিরস্কার করেন তবে তাতে করে আপন মূঢ়তারই পরিচয় দেওয়া হবে। সূর্যের কলংক থাকলেও সে সূর্য। এক যুগের বিজ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে অন্য যুগের বিজ্ঞানী-বুদ্ধিকে ধিক্কৃত করা যায় না, মানুষ প্রতিনিয়ত ঠেকে ঠেকে শিখছে। আবার বিশেষ দেশের কোনো কবি-মনীষীর বিচারের জন্য যখন কোনো সমালোচক অন্য যুগের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের তত্ত্বকথার আলোকে তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় চড়ান তখন সে বিচার ও আলোচনাকেও বিজ্ঞানসম্মত বলতে পারবো না। বাংলাদেশের বাউল, ভাটিয়ালী ও উত্তর-পশ্চিমের দোহা ও গীত থেকে টুকরো টুকরো মণি-মুক্তা চয়ন করে রামমোহনকে সেই শাশ্বত বাণীর বাহক ও ধারকরূপে প্রচার করা যায় না। তাতে করে তাঁর বাণী আচ্ছন্ন ও রূপ অস্পষ্ট হয়। এখনকার সমাজসেবা, আর্তত্রাণ প্রভৃতি ব্যাপারকে প্রিয়দর্শী অশোকের শিলালিপির সঙ্গে যোগযুক্ত করবার চেষ্টাকে সত্যদৃষ্টিজাত বুদ্ধি বলবো না। গ্যালিলিও, কপার্নিকাসকে টাইকোব্রাহির উত্তরসাধক বলা চলে না। কারণ, পার্থক্য গুণগত—পার্থক্য পদার্থগত। এঁদের চিন্তাধারার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা পটলেমি, টাইকোব্রাহি থেকে বিভিন্ন।

আলোচনার বুনিয়াদ খাড়া হবে কট্টর তথ্যের উপর। তথ্য যেখানে নিয়ে যাবে—সেখান থেকেই তত্ত্ব আপনা থেকে প্রকাশ পাবে। কবি-সাহিত্যিকের নানা বয়সের রচনা চুনে চুনে আমার অনুকূলের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে পণ্ডিতম্মন্যতা বা Sophistry থাকতে পারে—তবে তা' বিজ্ঞানী মনের পরিচায়ক হবে না। তথ্যের আঘাতে সর্ফিস্ট্রির তত্ত্ব-সৌধ ভূমিসাৎ হবে। বিশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, যখন আমরা কোমর বাঁধি, সন্ধি-সমাস নিয়ে কসরতি করি তখন তথ্য বিকৃত হয়। Zigsaw puzzle-এর কাটা ছবি যদি ঠিকমতো বসাতে পারি, তবেই জন্তুটা বা বস্তুটার পুরো ছবি ফুটে উঠবে; তা' না হলে হাঁসজারু, বকচ্ছপ গড়ে শিশুর মনে কৌতুক সৃষ্টি
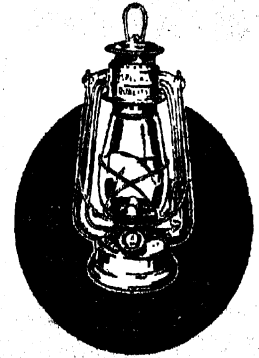
করতে পারবো; গবেষণা দেখে জহুরী মুচকে হাসবে।

তথ্য কি—এ প্রশ্নের জবাবটা চাই পহেলা। যাকে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়ে যাচাই করা যায় ও মন নামে ষষ্ঠ অন্তর ইন্দ্রিয় অনেক যাচাই-এর পরে যার দাম ও মান সাব্যস্ত করেন—তাকেই বুদ্ধিমানরা তথ্য—ইংরেজীতে বলা যেতে পারে facts, objective data। যাকে নিয়ে পরীক্ষা করা যায় এবং যার ফলাফল সম্বন্ধে সাধারণ বুদ্ধিমান লোকেও একমত হতে পারে সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান। সোজা কথায় বিজ্ঞানীর তথ্যের পরীক্ষা-ফল সর্বত্র একই হবে। তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে আনাগোনা চলে—জোয়ার-ভাটার স্রোতের মতো—কেউ কাউকে বাদ দিতে পারে না। মেনডেলীফ্ তথ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। মেনডেলীফ্ তারপর ভবিষ্যৎবাণী করে গেলেন যে পদার্থরাশির অনেকগুলো ঘর-পূরণ এখনো করা গেল না, কিন্তু একদিন ঐসব ঘরে নূতন পদার্থ পাওয়া যাবেই যাবে। সেই তত্ত্বকথা শুনে গবেষকরা লেগে থাকলেন নূতন পদার্থ বা এলিমেন্ট আবিষ্কার করবার জন্য; বের হলো একের পর এক অনেকগুলি অজানা পদার্থ। গণিতশাস্ত্রের সংখ্যা থেকে কাটা-ছেঁড়া করতে করতে দুই দেশের দুই বিজ্ঞানী বললেন, আকাশের ঐ একটা কোণে নূতন একটা গ্রহ দেখা যাবে : দূরবীন চোখে দিতেই সেটা ধরা পড়ে গেল। এখানে তত্ত্ব জেনে হাতড়াতে হাতড়াতে নয়া তথ্য জানা গেল। তাইতো ভাবি কোন্‌টা সত্য—তথ্য না তত্ত্ব!

তথ্যপ্রকাশের দুটো ভাষা—একটা বিজ্ঞানীর ব্যাকরণ—আরেকটা আর্টিস্টের ভাষা। সেই আর্টিস্টের ভাষায় কত রকম-ফেরই হয়। হার্বার্ট রীড একবার জ্বল-জ্যান্ত গাছকে আঁকতে বলেন দশজন চিত্র-শিল্পীকে। দেখা গেলো দশজনেরই দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক—দশ-জোড়া চোখ-ক্যামেরার মধ্যে একই রূপ ধরা পড়েছিল। কিন্তু প্রকাশের বেলায় তুলিতে তার দশ রূপ হলো। বিজ্ঞানীর ক্যামেরাতে একই রূপ হবে। স্থান-কালের সূক্ষ্ম-বিচারের কথা বাদ দেওয়া যাক।

একই ঘটনা বিভিন্ন খবরের কাগজে—নিজেদের গোষ্ঠীর বা দেশের বা সম্প্রদায়ের অনুকূলে বা প্রতিকূলে ছাঁট্‌ করে অথবা ফলাও করে ছাপতে দেখা যায়। যে-সব মহাযুদ্ধ আমাদের জীবনকালে দেখেছি অর্থাৎ যাদের সংবাদ ও বক্তব্য কাগজে পড়েছি অথবা শত্রু-মিত্র পক্ষের রেডিও থেকে শুনেছি বা নিছক সত্যাসত্যমনগড়া নিজে নিজে প্রচারিত হয়েছে—কখনো দু'পক্ষের সংবাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। Truth has been the first casualty in a war— যুদ্ধে সত্যের বলি হয়ে থাকে সর্বাগ্রে। স্বয়ং যুধিষ্ঠির যে war bulletin দ্রোণের কাছে পাঠালেন তা-ও নিজকা সত্য নয়; —অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই মরেছে, তবে তা' দ্রোণের পুত্র নয়, মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার হাতী। সুতরাং তথ্য যাচাই একটা বড় সমস্যা। তথ্য-নির্ণয়ের জন্য অসংখ্য পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে আসছে Oath, fine or deal, চালপড়া, জলপড়া—কত কি? বর্তমান জগতে যন্ত্রপাতির কষ্ঠি-পাথর মানুষ বানিয়েছে। একটা লোক আদালতের কাঠ-গড়ায় খাড়া হয়ে হলপ করেও সত্য-কথা বলছে না, ইনিয়ে-বিনিয়ে মিথ্যা কথা বানাচ্ছে—তা যন্ত্র লাগিয়ে, রক্তের চাপে দপ্‌দপানি দেখে ধরা পড়ে যায়। পেটের মধ্যে লুকানো সোনা বা জামার আস্তরের তলায় সোনার চাক্‌তি বাঁধা আছে কিনা, তা metal ditector যন্ত্র লাগালেই যে ঝন্‌-ঝনিয়ে জানিয়ে দেবে 'আছে গো আছে, চোরাই মাল আছে'। এই তথ্যকে সদর সড়কের উপর টেনে বের করাই হচ্ছে আজ দুনিয়ার এক নম্বর শিরঃপীড়া। Statistical Department বা সংখ্যায়ন বিভাগ সকল দেশেই খোলা হয়েছে—তথ্য থেকে তত্ত্ব তোলাই করবার জন্য অর্থাৎ টুকরো সংবাদ বা টুকরো সংখ্যা থেকে একটা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার গাণিতিক কসরত! কিন্তু শুনেছি তথ্য নিয়ে অনেক জাগ্‌লারি বা বুজরুকি চাল দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানাবার এমন অপ-বিজ্ঞান আর দুটো নেই। তবে কট্টর যন্ত্র-নবীশ ছাড়া সে-সব বিভ্রান্তিকর তত্ত্বর ফাঁকি বড় কেউ ধরতে পারে না। প্রশান্ত বিজ্ঞান-বুদ্ধি মনের আবর্জনা নির্মল করে দেয়।

যাকে আমরা তথ্য বলছি, তা হচ্ছে প্রতিদিনের সংবাদপত্রের অসংখ্য খবর। অগণিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোট-বড় ঘটনা, সংখ্যাবিদ্‌দের স্তূপীকৃত সংখ্যা। কিন্তু এ-সব সমকালীন তথ্য-রাজির পনেরো আনা তিন-কড়া তিন ক্রান্তির হিসাব মাসান্তে আর মেলে না: বৎসরান্তে কোনো Annual বা বার্ষিকীর একটা পৃষ্ঠার পাদদেশে ক্ষুদ্রকাকারে স্থানলাভ করতেও না পারে। দশক ঘুরতে না ঘুরতে সবই হাওয়া। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে যে তথ্যকে মনে হয় অত্যন্ত জরুরী—মহাকালের মাপে তারা দূরে নীহারিকামণ্ডলের জ্যোতিষ্কণার মতই অদৃশ্য।

টুকরো টুকরো ঘটনা কখন কিভাবে জট পাকিয়ে জট ছিঁড়ে আওয়াজ তেকে, ফিরেছে এসে বিস্ময় ঘটিয়ে ইতিহাসের পাতায় তথ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করলো—সেই জয়যাত্রার পদচিহ্ন দেখতে পাইনে, পদ-ধ্বনিও শুনতে পাইনি। বিভিন্ন সংবাদ, বিরুদ্ধ ঘটনা বলে যা দৈনিক কাগজে জমেছিল—তার থেকে বের হয়ে এলো ইতিহাস। কখন কিভাবে আফ্রিকার কালো মানুষরা আলো পেলো ও বিশ্ব-রাজনীতির দাবাবোড়ে নাড়ানাড়ির মধ্যে কখন স্বাধীনতা পেলো এবং ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিল, তার ধাপগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেছে এখন। সকালবেলায় কোন্ মুহূর্তে অন্ধকার গেলো, কোন্ সময়টিতে চারদিক আলোকময় হয়ে উঠ্‌লো—সেই সন্ধিক্ষণকে কেউ আঙুল দিয়ে দেখাতে পারে না। বিশেষ স্থানের, বিশেষ মুহূর্তের পবিত্রতার বুদ্‌বুদ বুদ্ধিমানদের কাছে অসার হয়ে আসল।

পৃথিবীর ইতিহাসে কত রকমের তথ্য-রাশি যুগে যুগে জমা হয়েছে; মনে হয়েছিল সেগুলি মহাসত্য। এক একটা শতাব্দীর পাতা উল্টেছে—আর বুদ্বুদের মতো রাজ্য-সাম্রাজ্য ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। রোমান এম্পায়ারের তত্ত্ব ও তথ্যের খোঁজ কে রাখে আজ? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, সসাগরা ধরার রানী সে—কোথায় যাচ্ছে? প্রতিদিনের তথ্য-রাশি জমতে জমতে কখন যে তত্ত্বের বোঝা ঘন হয়ে উঠছে তা' বুঝতে না বুঝতেই নূতন তথ্যরাশি এসে নূতনতর সমস্যার সৃষ্টি করছে। আরও উদাহরণ চাই? অলমতি বিস্তারেণ।

একটা প্রশ্ন মনে উদিত হচ্ছে তথ্য বলে কি কোনো পদার্থ আছে? না প্রকাশের দ্বারাই তার অস্তিত্বের প্রমাণ? যখন কোনো বস্তুকে কেউ দেখেনি, কোনো বিষয়কে জানে নি—তখনও কি তার অস্তিত্ব ছিল? একদল বলেন, আমার জ্ঞানের মধ্যে আসা থেকেই তার অস্তিত্ব। অন্যেরা বলেন, সে তো আছেই। তোমার বোধের মধ্যে তো অনেক জিনিসই নেই —তোমার মত যাকে কখনো দেখোনি, জানোনি, এই তোমার না-জানা, না-বোঝার মধ্যে বিষয় বা বস্তুর অস্তিত্ব অনস্তিত্ব নির্ভর করবে কেন? এ-তর্কের শেষ নেই।

তথ্য নিয়ে যেমন, তত্ত্ব নিয়েও তার থেকে কম বাদানুবাদ হয়নি, এবং এখনো

কি তার শেষ হয়েছে? মতবাদের ভেদ নিয়ে যত অশান্তি। মিথ্যা তত্ত্ব প্রচার করলে পাল্টা জবাবে পাথুরে প্রমাণ দিয়ে দুর্বৃত্তের মুখ বন্ধ করা যায়। কিন্তু সুঁচ দিয়ে উঁচ কাটতে না পারলে চলে কাগজে খিস্তি, আর আদালতে ডিফামেশন মামলা।

কিন্তু তত্ত্ব নিয়ে মতভেদ হলে সেটা মারাত্মক হয়ে ওঠে। শূলে চড়ানো, ক্রুশে টাঙানো, ফাঁসিতে লটকানো, জ্যান্ত পোড়ানো, গ্যাস-চেম্বার প্রভৃতি করেও যখন সব মত নিশ্চিহ্ন হলো না, তখন চলে ধর্মযুদ্ধ, জেহাদ।

বর্তমান যুগে ideological মতভেদ নিয়ে সবাই মারমূর্তি। মতবাদ নিয়ে মতভেদের প্রধান উপলক্ষ্য হচ্ছেন ঠাকুর-দেবতারা, নূতন নূতন অবতাররা আর আছেন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বেচারা ভগবান—যার দোহাই শত্রু-মিত্র সমস্বরে পাড়ছে, নিজ নিজ ভাষায় আওয়াজ দিচ্ছে। কেউ তার দেবতার কাছে বলছে কাফের মারো, কেউ বলছে ম্লেচ্ছ মারো। মরণশীল মানুষকে দেবতা বা অবতার বা ভগবানের পোষ্যপুত্র বলে স্বীকার না করলেই বিপদ। এঁরা সকলেই এক একটি তত্ত্ব নিয়ে বেসাতি করছেন। ঈশ্বর-অতিরিক্ত ধর্মহীন আদর্শবাদ নিয়েও কোঁদল কিছু কম হচ্ছে না। মার্কসকে নিয়ে কি কম মারামারি হয়েছে এবং এখনো কি তার শেষ হয়েছে? কিন্তু নদীর দুই তীরে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষই বলছে—সত্য সেই বুঝেছে। কম্যুনিজম্ বোঝা নিয়ে খেউড় শুরু হয়ে গেছে। তন্ত্রেরও এই দশা।

গ্রামের চেড়াভূতের দেয়াসী মেয়ে বা ডেল্ফির ওরাকেল যে-সব কথা বলেন, তার অর্থ নিয়ে মারামারি। ওরাকেলের বাণী শুনে থেমিস্টক্লিস এথেন্সবাসীদের বললেন, কাঠের জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। শহরবাসীরা বলে, কাঠের খোঁটা-ঘেরা শহরের মধ্যে বসে থাকতে হবে। বাঁচলো যারা জাহাজে উঠলো, ম'লো যারা কাঠের আড়ালে লুকোলো। উভয় দলই কিন্তু দেবাংশী ওরাকেলের দোহাই পাড়লো। এখানে তথ্য ও বুদ্ধির বিরোধ বেধেছিল।

তন্ত্রের গুটি বা সূত্র বানিয়ে বাদরায়ণ মুনি কি কাণ্ডটাই না করে গেছেন। তিন-চারটে শব্দের অর্থসন্ধান করতে গিয়ে প্যাণ্ডোরার পেঁটরা থেকে মতবাদের ভূত নিয়ে পিলপিলিয়ে বেরিয়ে এলেন পণ্ডিতের দল। কী ভেবে বাদরায়ণ মুনি শব্দের শিলগুলি বানিয়েছিলেন, তা কেউ জানে না। তাই হরেক রকম ব্যাখ্যা চলছে —রাতকে দিন, দিনকে রাত করে চালাবার মতোই। একটা পাঁচ শব্দের সূত্র নিয়ে কেউ বললেন এর তত্ত্ব অদ্বৈত। অপরজন সেই পাঁচটা শব্দের সমাস-সন্ধির ছেদ-বিচ্ছেদ করে হেঁকে বললেন কখনো নয়, তত্ত্ব দ্বৈত। একজন পাড়লেন শ্রুতির দোহাই, অপরজন পুরাণের। দুই দলকে তালপত্রে মসী-লিপ্ত করতে দেখে অপর দল উঠে বললেন—এও সত্য, ও-ও সত্য; তত্ত্ব হচ্ছে দ্বৈতাদ্বৈত। আর একজন নিষ্ঠাবান শান্তভাবে বললেন, ওটা শুদ্ধাদ্বৈত......আর একজন সমস্ত কোলাহল থামিয়ে বলে উঠলেন, শিবোহং, শিবোহং;—তত্ত্বটি শিবাদ্বৈতবাদ। অপরজন ক্ষীণ স্বরে বললেন—সব ঝুটা হ্যায়—আসলে বাদরায়ণের সূত্র পূর্ব-মীমাংসার পরিশিষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে সূত্রের উদ্দেশ্য। শক্তিভাষ্য বানালেন বাঙালী মস্তিষ্কের অদ্ভুত কসরতের নমুনা।

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের সংখ্যাভাষ্যকার থেকে ভাষ্যকরের আলাদা দেখা যাচ্ছে। আবার নিজের অনুকূলে ঝোল টানবার জন্য একটা সূত্রকে দুটো করে অথবা গোটা দুই শব্দ পরের সূত্র-মধ্যে ঢুকিয়ে অর্থের ওলটপালট করেছেন তত্ত্ববিদ। তথ্যকে বিকৃত করে তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করাই উদ্দেশ্য।

হিন্দুদের শাস্ত্র—শোনা কথা—শ্রুতি ও মনে করা কথা—স্মৃতি। এর মধ্যে ভেজাল হতেই পারে। কিন্তু বাইবেল, কোরাণ? তারা তো লেখা গ্রন্থ—Scripture। তবুও সেখানে লেখা-কথার তত্ত্ব ব্যাখ্যা নিয়ে কী রক্তারক্তি হয়েছে—সে তো কারো অজ্ঞাত নয়।

এই মতান্তরের দড়ি টানাটানি অনাদিকালের ঘটনা; চিরকাল চলে আসছে ও চিরকালই চলবে—চরম ধ্বংসের ক্ষণ পর্যন্ত। আসলে কোনো তথ্য বা তত্ত্বকে চিরন্তনীর আসনে বসানো যায় না। একমাত্র মৌমাছির দল একই ভাবে চাক বানিয়ে আসছে। আর অ-ঘরপন্থী বানরদল পরের ঘরের উপর নৃত্য করে আসছে যুগ-যুগান্ত থেকে। মানুষ কোথাও আসেনি, গাছের উপরে বা পাহাড়ের গর্তে বাস সে চিরকাল করেনি। আর যে আপনপন্থী হয়ে বসছে, আর [illegible]

তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে জানা যায় ধর্ম সম্বন্ধে যত গ্রন্থ ও পুস্তিকা এই ব্যাবেলটাওয়ারের কলম-পেষারা লিখে আসছেন তার সঠিক বা সার্থক খবর বোধ হয় কেউ দিতে পারবে না। এত সব কাগজের ফানুস কোথায় যে গিয়েছে, তার খবর রাখে না কেউ। পুরনো গ্রন্থাগারের কোণে কোণে অস্পৃশ্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে; ক্বচিৎ কোনো অনুসন্ধিৎসু তাদের পীতবর্ণ পত্র-পিঞ্জর হাতড়ে তথ্য ও তত্ত্ব নিংড়িয়ে বের করেন। যাঁরা গীবন্-এর রোমান সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস পড়েছেন, উইলিয়ম জেমস্-এর ভ্যারাইটিজ অব্ রিলিজাস্ এক্সপিরিয়েন্স ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বইটা ঘেঁটেছেন, অথবা এন্সাইক্লোপিডিয়া অব্ রিলিজন এণ্ড এথিকস্ গ্রন্থমালার পাতা উলটেছেন, তাঁরাই অতীতকালের অসংখ্য তত্ত্বের 'মমি' দেখতে পাবেন। এককালের তথ্যপুষ্ট, তত্ত্বমোদিত মতবাদ শাশ্বতের স্বীকৃতিলাভ করেনি। সব তত্ত্বই যদি সত্য হয়, সব ধর্মই যদি শাশ্বতবাণীর ধারক ও বাহক হয়, তবে তারা কেন লুপ্ত হয়ে গেল। বিজ্ঞানীদের বহুমতের সমাধি হয়েছে, বিজ্ঞান ইতিহাসের পাতামোড়া কফিনে তারা পড়ে রয়েছে।

কৌটিল্য থেকে ম্যাকিয়াভেলি, হিটলার, মাও পর্যন্ত সকলেই পরস্ব-পহরণ অর্থাৎ পরের দেশ দখল সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেছেন। দস্যু-বৃত্তির দর্শনশাস্ত্রের নাম হয়েছে পলিটিকস্। ডাকাতের কালীপুজোর সামিল!

মানুষ পেটের দায়ে দুনিয়ার দরিয়ায় ভেসে ভেসে ব্যবসা-বাণিজ্য করে দেশ-বিদেশ থেকে লুঠ-করা ধন লুটে আনে; সেই সব টুকরো টুকরো ঘটনা জোড়া-তালি দিয়ে পরস্বাপহরণের দার্শনিক ব্যাখ্যা বা তত্ত্বকথার জন্ম হয় Economics নামে।

(ক্রমশঃ)

মা এ-বছরে দুবার এলেন। এর পর থেকে মনে হয়, আরও ঘন ঘন আসতে থাকবেন। আর আসবেন নাই বা কেন? চিরটাকাল সেই ভারী বেনারসী আর পুরোনো প্যাটার্নের ভারী ভারী গয়না পরে এসেছেন। আজকাল কত রকমারি পোশাকই না উঠছে গায়। নাইলন, কাঞ্জিভরম—পরে কত আরাম। গয়নাও সূক্ষ্ম কাজের, হাল্কা আধুনিক প্যাটার্নের। এর নেশা কি কম? এই নভেম্বর মাসেও পাখা চালাতে হচ্ছে। এ সময় ক্ষেত্রবিশেষে অতি আধুনিকাদের মতো প্রায় নিরাবরণ, নিরাভরণ। ধূপের ধোঁয়ায় চোখ একটু জ্বললেও, ঘেমে নেয়ে উঠতে হয় না। এত স্বাচ্ছন্দ্য কি আগে ছিল? এখন কথা হল, মা আসতে চাইলেও বাবা মহেশ্বর এত ঘন ঘন ছাড়বেন কি? নিশ্চয়ই ছাড়বেন। তাঁরই কি ওই এক ভাব দেখে দেখে 'মনোটনী' ধরে যায়নি বলতে চান? উর্বশী, মেনকা, রম্ভা যাঁর মন টলাতে পারলো না, মায়ের এই নব নব রূপে তাঁর যা অবস্থা হয়েছে, একটু চোখ বুজে ভাবলেই দেখতে পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন কি, বাবা ভোলানাথ বাঘের ছাল ছেড়ে, এক বিঘৎ-ধাক্কা পাড়ের কোঁচানো ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে, হাতে সিগারেটের টিন নিয়ে কিম্বা ধরুন নর্দমা ব্র্যান্ডের (ড্রেন পাইপ) প্যান্টের ওপর রঙিন নাইলন শার্ট গায় চাপিয়ে স্মিতমুখে মা ফিরে গেলে, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে অপেক্ষা করছেন? চির-প্রাচীনাকে চির-নবীনা-রূপে পেয়ে নিজেও নবযৌবন অনুভবে উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন।

কিন্তু মাগো অসুরদলনী! তুমি বছরে দশবার এলেও, তোমাকে আমরা ফ্যাশান প্যারেডের প্রথম পুরস্কারের বেশে সাজাবো কথা দিচ্ছি। কিন্তু মহাসুরে যে দেশ ছেয়ে গেল মা। সুজলাং সুফলাং বাংলাদেশের দ্বারে বিপদ উপস্থিত। বিদ্যাদায়িনী! ছেলে-মেয়েরা বইপত্তরের ধারেকাছে ঘেঁষতে চায় না—এসব দিকেও একটু নজর রেখো। যাত্রা, তরজা, যেখেনেসেখেনে [illegible] হয়ে পড়েছিলে, সে জায়গায় রকমারি নাটক, থিয়েটার, জলসার ব্যবস্থা করে তোমাকে খুশী করবার জন্যে আমরা কি যত্নই না করছি। কানের কাছে [illegible] হিন্দী ছবির গান শুনিয়ে মন-প্রাণ তোমার শীতল করে দিচ্ছি। ফিরে গিয়ে বাবার কাছে কত জাঁক করেই না সব গল্প করা হয়, কিন্তু আমাদের জন্যে কি করছো মা?

তবে হ্যাঁ, লক্ষ্মী, সরস্বতী তোমার কন্যে দুটিকে খুব খুশী করতে পারছিনে। তাঁরা কটাক্ষে একবার তোমার দিকে, একবার দর্শকদের নজরের দিকে চেয়ে দিন দিন বেশ মনমরা হয়ে পড়ছেন। এর পর আর তোমার সঙ্গে আসতে চাইবেন তো? কার্তিকঠাকুরটি সহজে তোমার আঁচল ছাড়বেন না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারা যায়। কারণ, তাঁর দিকে আমাদের নজর আছে। অমুক কুমারের মতো চুলের ছাঁট দিয়ে, মুখখানিও তাঁরই গঠনে তৈরী করছি। আর তোমার তো কথাই নেই। কোথাও অমুক সেন, কোথাও বা অমুক রেহমানের সঙ্গে মুখের আদল হুবহু মিলিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে আমাদের চোখ খারাপ হবার যোগাড়। সে যাই হোক, তুমি বার বার এসো। আমরা বার বার তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবো। শেষে স্তুতিসহ প্রণাম জানাই—

যা দেবী সর্বভূতেষু ফিল্মস্টাররূপেন
সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ
নমঃ নমঃ।

অভ্যর্থনা করার জন্যে অপেক্ষা করছেন
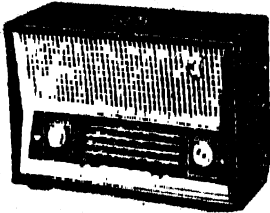
আধুনিক রবিনহুড

পুষ্পাদল ভট্টাচার্য

বিদেশে ডাকাত, বন্ধু ডাকাত [illegible] রবিনহুডের গল্প অনেকেই জানেন। আধুনিক যুগের ডাকাত মানসিংহও পুলিশের গুলীতে মারা যাবার আগে পর্যন্ত গরীবের বন্ধু বলে পরিচিত ছিলেন। বিদেশে এই বিংশ শতাব্দীতেও এমন অনেক শিক্ষিত নরনারী আছেন যাঁরা দান করার জন্য চুরি, জালিয়াতি ও তহবিল-তছরূপ করে ধরা পড়ে জেলে গিয়েছেন। এই রকম কয়েকজন নরনারীর কথা কিছুদিন আগে একটি ইংরাজি পত্রিকাতে পড়েছিলাম।

আমেরিকার এক শহরের সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের ম্যানেজার ছিলেন হেনরি বার্টন। অনেক স্টোর্সের নিয়ম আছে বছরের শেষে খুঁতগ্রস্ত বা খারাপ হয়ে যাওয়া জিনিসপত্র ক্রেতাদের অল্প দামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। হেনরিদের স্টোর্সে ঐ সব জিনিস বিক্রি না করে গরীবদের মধ্যে দান করা হত। হেনরি ম্যানেজার হবার পর নিয়ম করলেন ঐ সব জিনিস গরীবদের বিতরণ না করে স্থানীয় চার্চের পাদরী-

মশায়ের হাতে দেওয়া হবে। পাদরী-মশায় ঐগুলি বিক্রি করে যে টাকা পাবেন তা চার্চের আর গরীবদের অবস্থা উন্নত করার জন্য খরচ করবেন। চার্চ গরীবদের সাহায্য করার জন্য জিনিস বিক্রি করছেন জেনে লোকে খুঁতগ্রস্ত বা খারাপ হয়ে যাওয়া দ্রব্যাদিও বেশী দামে কিনে নিত।

কিছুদিন বাদে স্টোর্সের জিনিসপত্র ও বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষার সময়ে ধরা পড়ল হেনরি স্টোর্সের খুঁতগ্রস্ত জিনিস ছাড়াও অনেক ভালো জিনিসও চার্চকে দান করে স্টোর্সের কোয়ার্টার মিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতি করেছেন। কাজেই হেনরিকে জেলে যেতে হল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল স্টোর্সের চোরাই মাল হেনরি কখনো নিজের কাজে লাগান নি, বরং নিজের সম্পত্তি বাঁধা রেখেও দান করেছেন। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে হেনরি বলেন, "আমি সমাজের সম্মান-ভাজন ব্যক্তি হতে চাই বলেই ঐভাবে দান করেছি।"

এক দল নরনারী আছেন যাঁরা জিনিস কেনার ছলে নানা দোকানে গিয়ে জিনিস চুরি করে এনে গরীবদের দান করে পুণ্য সঞ্চয় করেন। এই রকম একজন বৃদ্ধা বিভিন্ন দোকান থেকে প্রায় পনের হাজার ডলারের জিনিস চুরি করে ছেলে-মেয়েদের, নাতি-নাতনীদের, বন্ধু ও প্রতিবাসীদের উপহার দিয়েছিলেন। ইনি বলেন, 'আমি আত্মীয় বন্ধুদের উপহার দিতে ভালো-বাসি। কিন্তু উপহার কেনার টাকা নেই আমার। তাই দোকানের জিনিস বিনামূল্যে উপহার দিয়ে থাকি।'

রোজ নামে আরেকজন মহিলা ছোটবেলায় এত গরীব ছিলেন যে, [illegible] পুতুল কেনার সামর্থ্য ছিল না। [illegible] বড় হয়েও তিনি ভোলেননি। তাই নানা দোকান থেকে পুতুল চুরি করে গরীব ছেলে-মেয়েদের দান করে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে আনন্দ পেতেন তিনি।

দোকানের মালিকের আর কর্মচারীর চোখে ধুলো দিয়ে ট্রাইসাইকেল চুরি করা সহজ নয়। অথচ এক ভদ্রমহিলা বহুবার অনায়াসে ঐ কাজই করেছেন। নতুন ট্রাইসাইকেল চুরি করে এনে এমন-ভাবে রং করতেন যে সেটা পুরোন ট্রাই-সাইকেলের মতন দেখাত। তিনি তখন কোন গরীব লোকের কাছে তার ছেলের জন্যে নামমাত্র দামে গাড়ীটা বিক্রি করে সেই টাকা রেডক্রশে দান করে দিতেন।

সব দেশের তরুণ-তরুণীরাই বিখ্যাত খেলোয়াড়, অভিনেতা ইত্যাদির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যগ্র হয়। আমেরিকার এক তরুণী নানা দোকান থেকে দামী ব্যাগ, রুমাল ইত্যাদি চুরি করে তার প্রিয় খ্যাতিমান পুরুষদের উপহার পাঠাত। এঁদের একজন ছিলেন বিবাহিত। তরুণী তাঁকে বেনামীতে উপহার পাঠাত কারণ তার ধারণা ছিল স্বনামে উপহার পাঠালে হয়তো ঐ খেলোয়াড়ের স্ত্রী বিরক্ত হবেন। তরুণী

বলেন, "আমি আমার প্রিয় টেনিস খেলোয়াড়ের দাম্পত্য-জীবনে অশান্তি ঘটাতে চাই না। তাই বেনামীতে উপহার পাঠাই।"

কোন ব্যাঙ্কের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিজের ব্যাঙ্কের টাকাই অল্প-অল্প করে চুরি করছেন একথা ভাবতে পারেন কি? আমেরিকার এক ব্যাঙ্কের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিস্টার স্মিথ তাই করেছিলেন। চোরাই টাকার অতি সামান্য অংশই নিজের জন্য ব্যবহার করেছিলেন তিনি। বাকি, প্রায় ৯৩,৬৭৪ ডলারের অধিকাংশই তিনি দান করেছেন। তিনি গ্রেপ্তার হলে তাঁর প্রতিবেশী ও পরিচিতরা তো কিছুতেই বিশ্বাস করে না যে স্মিথ অপরাধী। কেউ বলে স্মিথ না থাকলে অমুকের ছেলের কলেজে লেখাপড়া করা হত না। আরেকজন বলে দয়ালু স্মিথ তমুকের দোকানের ঋণ শোধ করে তাকে রক্ষা করেছিলেন বলেই সে আজও রোজগার করে খাচ্ছে, না হলে সে সপরিবারে ভিক্ষা করত।

জন নামের একজন ব্যাঙ্ক-ক্যাশিয়ারও ছিলেন রবিনহুড। একবার ব্যাঙ্কের বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষার সময়ে দেখা গেল জন নিজের মাথায় গুলী করে আত্মহত্যা করেছেন। একজন বিশ্বাসী কর্মচারীর আত্মহত্যা কর্তৃপক্ষকে সন্দিগ্ধ করে তুলল। ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতাপত্রে কোথাও কোন গলদ পাওয়া গেল না কিন্তু ক্যাশে এক মিলিয়ন ডলার কম। শহরের লোকেরা শুনে অবাক। তারা দয়ালু জনকে শান্ত ও সৎ প্রকৃতির লোক বলেই জানত। মদ, মেয়েমানুষ অথবা কোন-রকম জুয়া খেলায় জনের আসক্তি ছিল না। তবে এত টাকা তিনি কিসে খরচ করলেন? অবশেষে ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষকে লেখা জনের একটা চিঠিতে ঐ টাকার হদিস পাওয়া গেল।

অনেক সময়ে ব্যাঙ্কের কোন কোন আমানতকারী তাঁর একাউন্টে যত টাকা জমা আছে তার থেকে বেশী টাকা চেক মারফৎ তুলে নিতে চান। সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক থেকে তাঁর একাউন্টের প্রকৃত হিসাব জানিয়ে যত টাকা তাঁর নামে আছে তার থেকে এক পয়সাও বেশী দিতে অস্বীকার করে ঐ চেক বাতিল করে দেয়। ক্যাশিয়ার জন কোন লোককে দুঃখ দিতে পারতেন না। আমানতকারী যত টাকা তুলতে চাইত তত টাকাই দিয়ে দিতেন। কেননা তাঁর ধারণা ছিল নিতান্ত অভাবে না পড়লে কোন লোক ভুয়া চেক ভাঙাতে চাইবে না। জন ঐ রকম প্রতারকদের টাকা দেবার পর তাদের হিসাপত্রে গোঁজামিল দিয়ে এমন-ভাবে লিখে রাখতেন যাতে খাতাপত্রের হিসাবে কোন গলদ না পাওয়া যায়। এইভাবে তথাকথিত অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করেই ব্যাঙ্কের এক মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিলেন জন। অথচ এই দানের ফলে একদিনও মানসিক শান্তি পাননি তিনি। সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতেন কখন না জানি খাতাপত্রের হিসাবের সঙ্গে ক্যাশের টাকার গোল-মাল ধরা পড়বে। অবশেষে হিসাব পরীক্ষা আসন্ন বুঝে তিনি অপমানের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যা করেন।

তহবিল তছরুপ করে দান করার ব্যাপারে নারী রবিনহুডেরও অভাব নেই। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক তাঁর কর্মচারীদের বর্ধিত হারে বেতন দিতে অস্বীকার করায় ঐ প্রতিষ্ঠানের মহিলা বুককিপার বা হিসাবরক্ষক মনিবের বিনা অনুমতিতেই সহকর্মীদের বর্ধিত হারে বেতন দিতে থাকেন। এই কাজে তিনি প্রতিষ্ঠানের ত্রিশ হাজার ডলার খরচ করে শেষ পর্যন্ত তহবিল-তছরুপের অপরাধে কারারুদ্ধ হন।

আরেকজন মহিলা বুককিপার তাঁর সহকর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের বিনা বেতনের ছুটির সময়েও বেতন তো দিতেনই, অফিসের টাকা খরচ করে তাদের ঔষধপথ্য, এমন কি চেঞ্জে যাবার খরচও দিতেন। তারপর হিসাবের খাতায় গোঁজামিল দিয়ে হিসাব ঠিক করে রাখতেন।

মিনি নামের এক মহিলা একটি ফার্মের দায়িত্বশীল কর্মী ছিলেন। তিনি দীর্ঘ একুশ বছর ধরে ফার্মের টাকায় নানারকম দাতব্য কর্ম করেছিলেন, ঐ টাকায় তিনি তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুদের মোটরগাড়ী আর অন্যান্য দামী উপহার কিনে দিয়েছিলেন। কয়েক ব্যক্তি মিনির অর্থসাহায্যে ব্যবসা করে নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বড়দিনের সময়ে অফিসের টাকা দিয়ে সহকর্মীদের নানা উপহার কিনে পাঠাতেন মিনি। সহকর্মীরা কেউ সামান্য সর্দি-জ্বরে ভুগলেও মিনি তাদের দামী ওষুধ-পথ্য কিনে পাঠাতেন। কত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যে মিনির কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেত তিনি নিজেও তার সঠিক হিসাব রাখতেন না। অবশেষে মিনি যখন ধরা পড়লেন তখন দেখা গেল তিনি সবসুদ্ধ ৫,০০০,০০০ ডলার তহবিল তছরুপ করেছেন। ঐ টাকার মাত্র ২,০০০,০০০ ডলার মিনির কাছ থেকে পাওয়া গেল। বাকি সবই গেছে দানে। তহবিল তছরুপের অপরাধে মিনির কুড়ি বছরের জেল হয়।

মিনি কেন এই রকমে চুরি করে দান করতেন তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর এক বন্ধু বলে, মিনি শৈশবে খুব আর্থিক অসাচ্ছল্যের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। তাই তিনি চাইতেন না যে তাঁর কোন পরিচিত ব্যক্তি টাকার অভাবে কষ্ট পায়। তাছাড়া মিনি জীবনে কখনো কারো ভালোবাসা পাননি। তাই তিনি লোকের টাকার অভাব দূরে করে তাদের ভালোবাসা পেতে চাইতেন। লোকের কৃতজ্ঞতাকেই তিনি ভালোবাসা বলে মনে করতেন।

এতক্ষণ চোর, জালিয়াত, আর তহবিল - তছরুপকারী রবিনহুডদের কথা বললাম। এবার একজন দুঃসাহসিকা ঠাকুরমা চোরের গল্প বলে লেখাটি শেষ করব।

সত্তরের কাছাকাছি বয়স, পুরু চশমার আড়ালে চোখ দুটি মিটমিট করছে, সদয় হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল, ধপধপে সাদা পোশাক, সাদা জুতা মোজা আর হ্যাট পরিহিতা ঐ বৃদ্ধাকে দেখে সকলেই সম্ভ্রান্ত মহিলা বলে সম্মান করত। পুলিশের লোকেরা এগিয়ে এসে বৃদ্ধার হাত ধরে রাস্তা পার করে দিত।

ভদ্রমহিলার আসল নাম ছিল ফ্লোরেন্স ডেভিস, কিন্তু কুড়ি বছর ধরে আমেরিকার কুড়িটিরও বেশী স্টেটে চুরি করে বেড়াবার সময়ে তিনি বিভিন্ন ছদ্মনামে পরিচিত হতেন। কোন শহরের লোকেরা তাঁকে ডারত গ্র্যান্ডমা র‍্যাফল বলে, কোথাও গ্র্যান্ডমা স্মিথ। যে শহরেই তিনি যেতেন সেই শহরেই দুটি আলাদা আলাদা পাড়ায় দুটি ঘর ভাড়া নিতেন। একটি ভাড়াটে ঘরে ঠাকুমার চোরাই মাল থাকত, অন্য পাড়ার ঘরে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য আগত ধনী মহিলা পরিচয়ে বাস করতেন তিনি।

এই ঠাকুরমা চোর প্রত্যেক শহরের অভিজাত ধনীগৃহগুলিতে দিনদুপুরে গিয়ে সেখান থেকে নানা জিনিস, টাকা-কড়ি চুরি করে এনে ঐ শহরের গরীব লোকেদের আর অনাথ আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের দান করতেন। এইভাবে দিনদুপুরে চুরি করতে গিয়ে ঠাকুরমা চোর মাঝে মাঝে গৃহকর্ত্রীদের কাছে হাতে হাতে ধরা পড়ে যেতেন কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি উপস্থিত-বুদ্ধির জোরে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে ভাব করে তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে করতেই জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়তেন। এই রকমের দু দিনের ঘটনা শুনলেই বুঝবেন ঠাকুরমা রবিনহুড কিভাবে চুরি করতেন।

ঠাকুরমা তখন সেন্ট পিটার্সবার্গে বাস করছিলেন। একদিন তিনি ঐ শহরের এক ধনী পাড়ায় গিয়ে সুবিধা-জনক একটি বাড়ী বেছে নিলেন। বার-কয়েক দরজা-সংলগ্ন ঘন্টাটি বাজিয়েও কারো সাড়া না পেয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। তবু কেউ দরজা খুলে দিতে এল না। বৃদ্ধা দরজার কাঁচের মধ্য

দিয়ে উঁকি মেরে বুঝলেন বাড়ীতে কেউ নেই। তিনি তখন তাঁর সাদা কাপড়ের হ্যাণ্ডব্যাগটির ভেতর থেকে কয়েক থোলো নানা আকারের চাবি বের করে তারই একটির সাহায্যে অল্প একটু চেষ্টা করেই দরজা খুলে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লেন।

প্রথমেই হলঘর। তারপর হলের সংলগ্ন কয়েকটি শয়নকক্ষ। সব দেখে নিয়ে ঠাকুরমা গৃহকর্ত্রীর শোবার ঘরের ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে দ্রুত হস্তে দেরাজের পর দেরাজ খুলে টাকাকড়ি, দামী গহনা, জামা, যা কিছু দিনের আলোতে লোকের চোখের সামনে দিয়ে থলের মধ্যে ভরে নিয়ে যাওয়া যায় সব কিছুই তাঁর সাদা হ্যাণ্ডব্যাগটির মধ্যে ভরতে লাগলেন। কিন্তু বাইরের দরজায় একটা শব্দ হতেই ঠাকুরমা সাবধান হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি সব দেরাজ বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের গাউনের তলার দিকটা অনেকখানি লম্বালম্বিভাবে ছিঁড়ে ফেলে যেন হঠাৎই গাউনটা ওভাবে ছিঁড়ে গিয়েছে আর সেই ছেঁড়া গাউন নিয়ে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছেন এই রকমে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন। দরজার দিকে ফিরে দেখলেন সেখানে এক যুবতী তাঁরই দিকে চেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যুবতী অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে?"

বাঁধান দাঁতের ঝিলিক দিয়ে বৃদ্ধা হাসলেন—"অনধিকার প্রবেশ করেছি বলে আমার দোষ নিও না বাছা। নিতান্ত দায়ে পড়েই এসেছি। দেখ না, আমার গাউনের তলার দিকটা হঠাৎ কতটা ছিঁড়ে গিয়েছে। এই ছেঁড়া গাউন পরে পথ চলি কেমন করে বল? কাজেই তোমার ঘরে এসে দেখছিলাম যদি কোন পিন-টিন পাই তো এখনকার মতন কাজ চলা গোছ গাউনটা আটকে নেব। আশা করি বিপদে পড়ে তোমার ঘরে আসতে বাধ্য হয়েছি বলে তুমি রাগ করনি।"

গৃহকর্ত্রী আত্মসংবরণ করে বললেন, "না, না, রাগ করব কেন? দাঁড়ান ছেঁড়াটা সামলে দিচ্ছি।"

বৃদ্ধার অন্যান্য পরিচিত লোকেদের মতই এই গৃহকর্ত্রীও দু-চার কথার পরই হাস্যমুখী মিশুক স্বভাবের ঠাকুমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। ছেঁড়া গাউনটা পিন দিয়ে আটকে ঠিক করে দিয়ে তিনি ঠাকুরমাকে চা খেয়ে যেতে বললেন। ঠাকুরমা উত্তর দিলেন, ধন্যবাদ বাছা। কিন্তু এখন তো আমার চা খাবার সময় হবে না। একটু পরেই যে ট্রেনটা আসছে তাতে আমার মেয়ে আর নাতিনাতনীরা আসবে। কাজেই এখনি না গেলে সময়মতন স্টেশনে পৌঁছতে পারব না।"

গৃহকর্ত্রী অতিথিকে বাইরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি তো বাইরের দরজায় চাবি দিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি বাড়ীর ভেতর এসেছিলেন কোন পথে?"

"না, বাছা। সামনের দোর খোলাই ছিল। তোমার উচিত আরো সাবধান হওয়া। আজকাল চারদিকে যে রকম চুরি হচ্ছে।"

বাড়ীর বাইরে পথে এসে দ্রুতপদে চলতে চলতে বৃদ্ধা নিজের মনে বললেন, "যাক বাবা, খুব বেঁচেছি। আরো সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে, নইলে ধরা পড়ব।"

রাস্তার কনস্টেবলটি এগিয়ে এল বুড়ী ঠাকুরমাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করবে বলে। কিন্তু তিনি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজেই দ্রুতপদে রাস্তা পার হয়ে অপরদিকের ফুটপাথে উঠলেন।

"আপনি কে?"

খানিক দূর গিয়ে ঠাকুরমা আরেকটি পছন্দ মতন বাড়ীর সামনে দাঁড়ালেন। এ বাড়ীর প্রবেশদ্বার খোলা থাকলেও পরের দুয়ারটি ভেতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে আটকান ছিল। অদম্য বৃদ্ধা তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটা বোনার কাঁটা বার করে কাঁটাটা দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে বিশেষ কায়দায় অল্পসময়ের মধ্যেই ছিটকিনি খুলে মুক্তদ্বার পথে ঘরে ঢুকলেন। ঘন্টাখানিক পরে তিনি যখন ঐ বাড়ী থেকে বেরুলেন তখন তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগটি লুটের মালে ভরা। ছোটদের নানারকম খেলনা-পুতুলের একটা বড় প্যাকেটও তাঁর বাঁ হাতে।

এই ভাবে আরেকদিন আরেকটা বাড়ীতে চুরি করার সময়ে ঠাকুরমা ধরা পড়ে যান। তিনি যখন গৃহকর্ত্রীর ড্রেসিংটেবিল থেকে জিনিস নিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগে ভরছিলেন ঠিক সেই সময়ে গৃহকর্ত্রী বাড়ী ফিরলেন। চতুর বৃদ্ধা তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন, "যাক, এতক্ষণে আপনি বাড়ী ফিরলেন। আমি সেই কখন থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করে বসে রয়েছি। শুনেছিলাম এই পাড়ায় কোন বাড়ীর খানিকটা ভাড়া দেওয়া হবে। আমি তো এ শহরে নতুন এসেছি কিনা তাই ঠিক বাড়ীটা খুঁজে নিতে পারছি না।"

গৃহকর্ত্রী বললেন, "আপনি ঠিক বাড়ীতেই এসেছেন। আমরাই এ বাড়ীর ওপরতলাটা ভাড়া দেব। চলুন ওপরে।"

বৃদ্ধা নিজের বুকে হাত রেখে বললেন, "ওপরতলায়? তবে তো বাছা এ বাড়ী ভাড়া নিতে পারব না। আমার হার্টের অসুখ, সিঁড়ি ওঠা বারণ।"

উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বাড়ীর বাইরে নিরাপদে এসে পথ চলতে চলতে বৃদ্ধা আপন মনে বললেন, "জীবনে কখনো আমার হার্টের অসুখ হয়নি।"

কেবল ধনীগৃহ থেকেই নয়, চার্চে উপাসনা করতে গিয়েও ঠাকুরমা চুরি করতেন। লোকে জানত তিনি অতি ভক্তিমতী নারী। প্রত্যেক রবিবারে নিয়মিত চার্চে গিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব রকম উপাসনায় আর ভজনে একাগ্র হয়ে যোগ দিতেন তিনি। কিন্তু মজা এই যে, উপাসনার পরেই ঠাকুরমা চুপিচুপি চার্চের ক্লোক-রুমে গিয়ে সেখানে রাখা কোটগুলির পকেটে হাত ঢুকিয়ে, ফাউন্টেনপেন ইত্যাদি হাতাতেন

সবই তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগে ভরে নিয়ে চার্চের বাইরে এসে গরীবদের মুক্তহস্তে অর্থ-সাহায্য করতেন।

ঠাকুরমা ধনীগৃহ থেকে খেলনা, পুতুল, মিষ্টি, শিশুদের জামা-কাপড় চুরি করে এনে অনাথ আশ্রমে আর গরীব শিশুদের দান করতেন। তাঁর কাজ ছিল পালা বাঁধা। একদিন ধনী পাড়ায় গিয়ে চুরি করে পরদিন গরীবপাড়ার অধিবাসীদের তাদের প্রয়োজন মতন নানা জিনিস, টাকাকড়ি দান করা। তাঁকে দেখলেই গরীব ছেলে-মেয়েরা ঘিরে ধরে ঠাকুমা এসেছেন বলে আনন্দে নাচত। ঠাকুরমা তখন তাদের প্রত্যেককে মিষ্টি, খেলনা আর পয়সা দিতেন।

"আমরাই ঐ বাড়ির ওপরতলাটা ভাড়া দেব।"

পুলিশ যখন তাঁর লুটের মাল রাখবার ঘর সার্চ করে তখন তারা সেখানে চুরি করা বাইবেল, গল্পের বই, দামী পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা, শিশুদের দুধ খাওয়াবার বোতল, নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধাদি, হটওয়াটার বোতল, বাসন-কোসন, এমন কি কয়েক ডজন নেবুও পায়। পুলিশ অফিসার অবাক হয়ে বলেন "এমন অদ্ভুত চোর আমি জীবনে দেখিনি।" ঠাকুরমা উত্তর দেন, "এ সব জিনিসই গরীবদের দান করার জন্যই আমি সংগ্রহ করেছি।"

ঠাকুরমা যখন এক স্টেট থেকে আরেক স্টেটে এইভাবে চুরি করে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময়ে পুলিশও তাঁকে খুঁজছিল। যে সব গৃহকর্ত্রীরা ঠাকুরমাকে দেখেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে ঠাকুরমার চেহারায় আর সাজ-পোশাকের বর্ণনা পুলিশের লোকেরা পেয়েছিল, তবু তাঁরা ঠাকুরমাকে ধরতে পারছিল না। কারণ ঐ বয়সী অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ঘরের বৃদ্ধারাই ঐ ধরণের দেখতে আর ঐ রকম সাজপোশাক পরতে অভ্যস্ত। কাজেই চোর ধরতে গিয়ে পাছে কোন অভিজাত বৃদ্ধার অপমান করে বসেন এই ভয়ে পুলিশ অফিসাররা ঠাকুরমাকে সামনে দিয়ে যেতে দেখেও গ্রেপ্তার করতে সাহস পেতেন না। শেষ পর্যন্ত দুজন ডিটেকটিভ-অফিসার ১৯৪১ সালের পয়লা ডিসেম্বর কেবল-মাত্র সন্দেহে নির্ভর করে পথ-চলতি ঠাকুরমাকে আটকে অনুরোধ করলেন "আপনার টুপিটা একটু খুলবেন কি?"

ঠাকুরমা তাঁদের দিকে মিটমিট করে চেয়ে টুপি খুললেন। ছেলেদের ধরণের ঘাড় ছেঁটে বব করা একমাথা সাদা চুল দেখে গোয়েন্দাদের সাহস আরো বাড়ল। কারণ ঠাকুরমা রবিনহুডের মাথার চুলের ঐ রকম বর্ণনাই তাঁরা শুনেছিলেন অভিযোক্তা গৃহকর্ত্রীদের মুখে। গোয়েন্দারা বললেন, "আপনি দয়া করে একবার আমাদের সঙ্গে থানায় যাবেন কি?"

"বেশ তো চলুন যাই। আমার কোন আপত্তি নেই।" ঠাকুরমা গোয়েন্দাদের সঙ্গে থানায় গেলেন। গোয়েন্দাদের কাছে তখনো পর্যন্ত ঠাকুরমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না। কাজেই তাঁরা তাঁকে খুব সাবধানে প্রশ্ন করতে লাগলেন। গোয়েন্দারা পরে বলেছিলেন "মহিলাটি যদি সে সময়ে কান্নাকাটি করতেন কিংবা দৃঢ় কণ্ঠে আমাদের কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর পাদরীকে খবর দেবেন অথবা আমাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবেন বলে ভয় দেখাতেন তাহলে আমরা তক্ষুনি ক্ষমা চেয়ে তাঁকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু ঠাকুরমা রবিনহুড সে রকম কিছু না করে থানার একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে গভীর আরামের নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "এতদিনে আমার চাতুর্যপূর্ণ জীবনের অবসান হল। আমার জীবনের শেষ দিনও তো এগিয়ে আসছে। আমার কাজের যা শাস্তি তা নেবার জন্য আমি প্রস্তুত।" এরপর তিনি একে একে তাঁর দীর্ঘ চৌর্যজীবনের কাহিনী বলে গেলেন। তিনি যে কত বাড়ীতে চুরি করেছেন এখন আর তা মনে নেই তাঁর। যাদের দান করেছেন তাদেরও কারো নাম তিনি স্মরণ করতে পারেন না।

ফোটোগ্রাফাররা ঠাকুরমার ফোটো তুলতে এলে তিনি বললেন, "এই বিশ্রী পোশাকে ছবি তোলাব না। পরে যখন ভালো পোশাক পরব তখন ছবি তুল।"

মামলার সময়ে তিনি বিচারকদের বলেন, "আমি কারো সহানুভূতি চাই না। আমি সাধারণ চোর কিংবা ক্লেপটো-ম্যানিয়াগ্রস্ত নই। কারণ কখনো কোনো আত্মীয় বা পরিচিতের বাড়ী থেকে কোন জিনিস আমি চুরি করিনি। কখনো কোন চুরি করা জিনিস নিজের জন্যে ব্যবহারও করিনি। কেবল যাদের প্রচুর আছে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাদের কিছু নেই তাদের দান করেছি।"

একজন বিচারক বলেন, "মনে হয় আপনার মাথার গোলমাল আছে।"

ঠাকুরমা উত্তর দেন, "না জজমশায়, আমার মাথার অবস্থা আপনার থেকে বেশী খারাপ নয়। আমাদের দুজনের মধ্যে তফাৎ এই যে, আমরা একই জিনিস দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখি।"

বিচারকরা ঠাকুরমা রবিনহুডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে বলেন, "আপনি সাধারণ পুরান পাপী (habitual criminal) ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আপনাকে তাদের সমান দণ্ডই দেওয়া হল।"

বিচারকদের কথা শুনে ঠাকুরমার চোখে জল এসেছিল। তিনি স্তম্ভিত হয়ে বারবার বলতে লাগলেন, "আমি সাধারণ চোর?" কিছুক্ষণ পরে আত্ম-সংবরণ করে আবার আগের মতই হাসি-মুখে প্রহরীদের সঙ্গে কারাগারের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। পথে প্রহরীদের বললেন, "এতদিন পরে ছুটি পেলাম। বহুদিন থেকে যে সব কাজ করার শখ ছিল কিন্তু সময়াভাবে করতে পারিনি এবার আমি মনের সাধে সেইসব কাজ করব। আমাদের সৈন্যদের জন্য দেদার সোয়েটার বুনব। কিন্তু তার আগে যে-সব গোয়েন্দারা আমাকে গ্রেপ্তার করেছে তাদের জন্য সোয়েটার আর জেলখানার মেয়ে প্রহরীটির জন্য একটা স্কার্ফ বুনব। এরা সবাই আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছে।'

ঠাকুরমা রবিনহুড এইভাবে জেলে বসেও নানা জিনিস বুনে সময় দান করতেন।
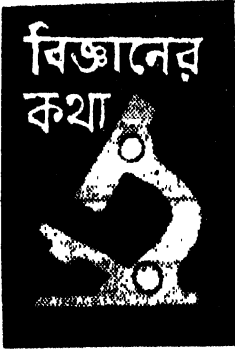
অয়স্কান্ত

॥ মহাকাশ-বিজয়িনী ॥

এই লেখাটি যেদিন প্রকাশিত হবে তার আগেই ভালেন্তিনা তেরেশকোভা, আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ ও ভালেরি বিকোভস্কি কলকাতায় এসে গিয়েছেন। সঙ্গে আছেন আরো একজন সোভিয়েট নারী—শ্রীমতী বিকোভস্কি। এই চারজন বিশিষ্ট অতিথিকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য কলকাতায় অনেক আগে থেকেই উদ্দীপ্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

বিশেষ করে ভালেন্তিনা তেরেশকোভার জন্যে আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ও আবেগ নিয়ে অপেক্ষা করছি। মহাকাশ-জয়ের কীর্তিতে এই বিশ্বে তিনিই প্রথমা। ১৯৬৩ সালের ১৬ই জুন তারিখে মস্কো সময় দুপুর সাড়ে বারোটায় ছ-নম্বর ভোস্তোকের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার চিহ্নরেখা পৃথিবীকে আটচল্লিশটি প্রদক্ষিণেই শেষ হয়ে যায়নি, বিশ্বের নারীসমাজকে নতুন মহিমায় ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছে। আমাদের অনুরাগ ও আবেগের আরো বিশেষ কারণ এই যে, এই অতুলনীয়া নারী প্রস্ফুটিত নারীত্বের পরিচয়ও দিতে পেরেছেন। আমরা যাঁকে দেখব তিনি শুধু মহাকাশ-বিজয়িনী নন, ব্রীড়ানম্রা নববধূও। বিশেষ করে বাংলাদেশে নববধূকে আমরা অকৃপণ ভালোবাসায় অভিষিক্ত করে থাকি। এই মহাকাশ-বিজয়িনী নববধূও অনায়াসেই বাংলাদেশের হৃদয় জয় করে নিতে পারবেন।

॥ নিকোলায়েভ-তেরেশকোভা ॥

নিকোলায়েভের সঙ্গে পরিণয়ের পরে ভালেন্তিনাকে আর তেরেশকোভা বলা চলে না। সাধারণ নিয়মে তাঁর নাম হওয়া উচিত ভালেন্তিনা নিকোলায়েভা। তবে মাদাম কুরীর স্বামীর মতো নিকোলায়েভও যদি স্ব-উপাধি ত্যাগ করতে রাজি থাকেন তবে তেরেশকোভা নামটি বেঁচে যেতে পারে। এই দুজনের বিবাহ-বাসরে উপস্থিত থেকে স্বয়ং ক্রুশ্চেভও নাম নিয়ে খানিকটা রসিকতা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তেরেশকোভা ও নিকোলায়েভা দুই-ই বজায় রাখার পক্ষপাতী। এবং নিকোলায়েভকে তিনি এই বলে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নিকোলায়েভ যেন তাঁর নামের সঙ্গে তেরেশকোভার নামও যুক্ত করে নিয়ে নারী-পুরুষের সমানাধিকারকে পুরোপুরি মেনে চলেন।

এ-প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভের আরো একটি রসিকতার উল্লেখ এখানে করা চলে। বিবাহ-বাসরে উপস্থিত হয়েই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, নবদম্পতির জন্যে তিনি প্যারাম্বুলেটর বা চুষিকাঠি উপহার আনতে পারেননি বলে তিনি দুঃখিত; তবে তাঁর বিশ্বাস আছে যে এ-দুটো বস্তুর যখন প্রয়োজন হবে তখন তার অভাব ঘটবে না।

এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন, বিবাহিত জীবনে পা দেবার পরে নভোচারণার জীবনে ভালেন্তিনাকে পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে। ভালেন্তিনা তাঁর ঐতিহাসিক কক্ষ-পরিক্রমার পরে পৃথিবীর

ভালেন্তিনা তেরেশকোভা

মাটিতে ফিরে এসেছিলেন ১৯শে জুন তারিখে। আর ২৫শে জুন তারিখে তিনি মস্কাতে উপস্থিত হয়েছিলেন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে। এই সম্মেলনে একজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার যদি স্বামী থাকত, ছেলেমেয়ে থাকত, পরিবার-পরিজন থাকত, তাহলেও কি আপনার নভোচারণায় ছেদ পড়ত না?' ভালেন্তিনা বলেছিলেন, 'আমার নভোচারী বন্ধুদের মধ্যে অনেক কমরেডেই রয়েছেন যাঁদের পরিবার-পরিজন আছে, ছেলেমেয়ে আছে, তা সত্ত্বেও তাঁরা ট্রেনিং নিয়েছেন ও মহাকাশে যাত্রা করেছেন। আমার তো মনে হয়, একেত্রে নারী-পুরুষে ভেদ নেই এবং নারীরা কখনো পুরুষদের থেকে পিছিয়ে থাকবে না।' অন্য একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার ভবিষ্যৎ জীবনকে আপনি কি-ভাবে গড়ে তুলতে চান?' ভালেন্তিনা জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার সমস্ত জীবন আমি উৎসর্গ করতে চাই মহাকাশের গবেষণায় ও অনুশীলনে। আমার সমস্ত জ্ঞান আমি ব্যয় করতে চাই মানবজাতির কল্যাণে।' এই উক্তি যখন তিনি করেছিলেন তার আগে থেকেই নিকোলায়েভের সঙ্গে তাঁর পূর্বরাগের পালা চলছিল এবং সম্ভবত তিনি বিয়ে করার কথাও ভাবছিলেন।

ভালেন্তিনার কক্ষ-পরিক্রমার সময়ে মস্কোতে বিশ্ব নারী সম্মেলন শুরু হয়েছিল। মহাকাশ থেকে ফিরে এসে ভালেন্তিনা এই সম্মেলনে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আমি যখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছিলাম সে-সময়ে আমার মনে একটি চিন্তার উদয় হয়েছিল। আমি ভাবছিলাম, এই ভোস্তোক—৬ ব্যোমযানটি, যার মধ্যে আমি রয়েছি, আর সেই কারণেই যেটিকে বলতে পারি নারীত্বে মণ্ডিত, তা যদি অদৃশ্য অথচ অচ্ছেদ্য একটি সূত্রের মতো বিশ্বের সকল নারীর মধ্যে যোগস্থাপন করতে পারে তাহলে কী ভালোই না হয়!'

ভারতের পক্ষ থেকে ভালেন্তিনাকে আমরা নিশ্চয়ই এই আশ্বাস দিতে পারি যে, অদৃশ্য অথচ অচ্ছেদ্য একটি সূত্রের মতো ভোস্তোক ছয়ের জয়যাত্রা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের সকলকেই এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে ও এক নতুন উপলব্ধির ক্ষেত্রে সম্মিলিত করেছে।

মহিলা বিজ্ঞানীর নোবেল পুরস্কার লাভ

মাদাম কুরীর ষাট বছর পরে আরো একজন মহিলা বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। তিনি হচ্ছেন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মারিয়া গোয়েপার্ট-মায়ার। মাদাম কুরী পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯০৩ সালে, তাঁর স্বামীর সঙ্গে। অধ্যাপিকা গোয়েপার্ট-মায়ারকেও ১৯৬৩ সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারকে আর দু-জনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউগেন ভিগ্নার ও হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডি ইয়েনেজেন। অধ্যাপক ভিগ্নার পাবেন পুরস্কারের অর্ধ-পরিমাণ অর্থ। বাকি অর্ধ-পরিমাণ অর্থ অন্য দুজনের মধ্যে ভাগ হবে।

অধ্যাপক ভিগ্নারকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পারমাণবিক নিউ-

অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত ক্যানবেরার স্যার জন একলেস। ইনি অপর দুজন ইংরাজ ডাক্তারের সহিত এ বৎসরে ওষুধ বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন

ক্লিয়স তত্ত্বে তাঁর অবদানের জন্যে। তাঁর গবেষণা বিশেষ করে মৌল কণিকার ক্ষেত্রে এবং তাঁর আবিষ্কার ও প্রয়োগ এই মৌল কণিকার ক্ষেত্রে একটি বিন্যাস-গত তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে।

অধ্যাপিকা গোয়েপার্ট-মায়ার ও অধ্যাপক ইয়েন্‌জেন সম্মানিত হয়েছেন নিউক্লিয়র শেলের গড়ন সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে।

অধ্যাপিকা গোয়েপার্ট-মায়ারের জন্ম ১৯০৬ সালে, জার্মানিতে। গোয়েটিন্‌গেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি দেশত্যাগ করে আমেরিকায় চলে আসেন। তাঁর দুটি সন্তান আছে।

একষট্টি বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক উিগ্‌নারের শিক্ষালাভ বুদাপেস্ত ও বার্লিনে। ১৯৩০ সাল থেকে তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত আছেন।

ছাপ্পান্ন বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক ইয়েন্‌জেন ১৯৪৯ সাল থেকে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন।

॥ মহাকাশ জয়ের খতিয়ান ॥

১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল থেকে ১৯৬৩ সালের ১৬ই জুন—এই দু-বছর দু-মাসের মধ্যে মোট দশজন নভোচারী (সোভিয়েত ইউনিয়নের ছ-জন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারজন) মহাকাশকে জয় করে ফিরে এসেছেন। পৃথিবীর প্রথম নভোচারী য়ুরি গাগারিন। তিনি মহাকাশে ছিলেন মাত্র ১·৮ ঘণ্টা আর দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন মাত্র ৪১,০০০ কিলোমিটার। তারপরে মাত্র চোদ্দ মাসের মধ্যেই তাঁরই একজন স্বদেশবাসী (ভালেরি বিকোভস্কি) মহাকাশে ১১৯ ঘণ্টা অবস্থান করে এসেছেন ও দূরত্ব অতিক্রম করেছেন তেত্রিশ লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি। আর তারপরেও ঘটেছে মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে কল্পনাতীত একটি ঘটনা—ভালেন্তিনা তেরেশ্‌কোভার মহাকাশ-যাত্রা। এই ছাব্বিশ মাসের চিত্রটি যদি একটি ছকের মধ্যে তুলে ধরে চোখের সামনে রাখা যায় তাহলে একটি বিপুল অগ্রগতি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা হতে পারে এবং কল্পনা করা যেতে পারে যে আগামী মাস ও বছরগুলিতে কী বিপুলতর অগ্রগতি হতে পারে।

কলকাতায় মহাকাশ-গবেষণার সাজসরঞ্জামের প্রদর্শনী

গত ১১ই নভেম্বর তারিখে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে মহাকাশ-গবেষণার সাজ-সরঞ্জামের একটি অভিনব প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান ও মহাকাশ সংস্থা এবং ভারতের পারমাণবিক শক্তি বিভাগ। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন কলকাতার সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়র ফিজিক্স-এর অধ্যক্ষ ডঃ বি ডি নাগ-চৌধুরী। তাঁর ভাষণ থেকে জানা যায় যে, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারতের ত্রিবান্দ্রম থেকে একটি দুই-পর্যায় বিশিষ্ট অনুসন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। এই রকেটের সাহায্যে ভূ-চৌম্বক বিষুব অঞ্চলের উষ্ণমণ্ডলস্থিত বায়ুর প্রবাহ ও গতি-বেগ সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হবে। রকেটের অভ্যন্তরস্থ মাপ-জোখের যন্ত্রপাতির ওজন হবে পঞ্চাশ পাউণ্ড। এই যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছেন আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের ভারতীয় পদার্থবিদরা।

প্রদর্শনীতে মহাকাশ-গবেষণার যে-সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম উপস্থিত করা হয়েছে তার মধ্যে আছে মার্কিনী বিজ্ঞানীদের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত বিভিন্ন রকেট, উপগ্রহ ও ব্যোমযানের মডেল ও নানা ব্যাখ্যামূলক আয়োজন।

মহাকাশ-অভিযানের খতিয়ান

উৎক্ষেপণের তারিখ	ব্যোমযান	নভোচারী	দেশ	কক্ষ-আবর্তন	কক্ষ-আবর্তনের মোট সময়	অতিক্রান্ত দূরত্ব
						কিলোমিটার
১২ই এপ্রিল, ১৯৬১	ভোস্তোক—১	ওয়াই· গাগারিন	সোভিয়েত ইউনিয়ন	১	১·৮ ঘণ্টা	৪১,০০০
৬ই আগস্ট, ১৯৬১	ভোস্তোক—২	এইচ· তিতোভ	”	১৭	২৫·৩ ঘণ্টা	৭,০০,০০০
২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২	ফ্রেন্ডশিপ—৭	জে· গ্লেন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩	৪·৯ ঘণ্টা	১,২৫,০০০
২৪শে মে, ১৯৬২	অরোরা—৭	এস· কার্পেণ্টার	”	৩	৫ ঘণ্টা	১,২৫,০০০
১১ই আগস্ট, ১৯৬২	ভোস্তোক—৩	এ· নিকোলায়েভ	সোভিয়েত ইউনিয়ন	৬৪	৯৫ ঘণ্টা	২৬,০০,০০০
১২ই আগস্ট, ১৯৬২	ভোস্তোক—৪	পি· পোপোভিচ	”	৪৮	৭১ ঘণ্টা	২০,০০,০০০
৩রা অক্টোবর, ১৯৬২	সিগ্‌মা—৭	ডবলু· শিরা	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬	৯·২ ঘণ্টা	২,৫০,০০০
১৫ই মে, ১৯৬৩	ফেইথ—৭	ডবলু· কুপার	”	২২	৩৪ ঘণ্টা	৯,৫০,০০০
১৪ই জুন, ১৯৬৩	ভোস্তোক—৫	ভি· বিকোভস্কি	সোভিয়েত ইউনিয়ন	৮১	১১৯ ঘণ্টা	৩৩,০০,০০০
১৬ই জুন, ১৯৬৩	ভোস্তোক—৬	ভি· তেরেশ্‌কোভা	”	৪৮	৭১ ঘণ্টা	২০,০০,০০০

* ভোস্তোক তিনের সংগে ভোস্তোক চার এবং ভোস্তোক পাঁচের সংগে ভোস্তোক ছয় যুগল-পরিক্রমা করেছিল।

শোভন আচার্য

কাঁদুনে বাঙালী

একদা স্বর্গত সর্দার প্যাটেল মন্তব্য করেছিলেন : 'বাঙালী শুধু কাঁদতে জানে।' কথাটার রূপক করে না-বললেও আমাদের নীলমণিদার মতে চমৎকার ভাবগর্ভ। এমন ব্যাপক সত্য বাঙালীর সম্পর্কে কেউ বলেছেন বলে নীলমণিদা জানেন না। 'কি জানো—' নীলমণিদা শুরু করলেন : 'এ যেন গোষ্পদে নভোদর্শন।' বটব্যাল বিরক্ত গলায় বললে, 'এই আরম্ভ হল নামকীর্তন।' নীলমণিদা যেন লুফে নিলেন এইভাবে বললেন : 'হ্যাঁ, কীর্তনের কথাই ধরো। এমন অপার্থিব কান্না বাঙালী ছাড়া কে কাঁদতে পেরেছে। কীর্তন কেন আরো এগিয়ে যাও। চর্যাপদের কথা ধরো, তারও সারবস্তু এই কান্না। তারপর এসো মঙ্গলকাব্যে, দ্যাখো বারমাস্যার নাম করে নায়িকা ইনিয়ে-বিনেয়ে কেঁদেই চলেছে। আরে, উনিশ শতকের সেই সিংহোপম মানুষটির কথা ভেবে দ্যাখো। তোমাদের বিদ্যেসাগরের কথা বলছি : অমন শ্রেষ্ঠ কাঁদুনে বড় দেখা যায় না। অথচ কে জানত বিদ্যেসাগরীয় সংস্কার-কার্যের জন্ম অই কান্না থেকেই। মাইকেল? বীররস? বাদ দাও ব্রাদার, মেঘনাদবধ কাব্যের ফল্গুশ্রুতি কান্নার বিরাট মেঘপুঞ্জ। শরৎ চাটুজ্যের কথা তো তোমরা জানই।' তারপর একটু থেমে : 'কান্না বাঙালী জাতির গৌরব, তার চরিত্রের মূলকান্ড। কে পেরেছে এই চরিত্রধর্মকে অস্বীকার করতে। বাঙলার মাটি কাঁদে, আকাশ কাঁদে, গাছ কাঁদে, নদী কাঁদে, মন কাঁদিবে না? প্রাকৃতিক আবহাওয়া মনের স্বভাবকে প্রভাবিত করবে না? হাজার বার করবে। যে যাই বলুক, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। বাঙালী আর যাই হোক পাঞ্জাবী হতে পারবে না, পারা উচিতও নয়। বরং পাঞ্জাবীকে আমরা বাঙালী বানাব, রবীন্দ্রনাথ কাবুলিঅলাকে কি বানালেন! কৃত্তিবাস ওঝা আর্য রামসীতাকে কান্নার ভিজে ন্যাতা করে ফেললেন। এতে লজ্জার কি আছে, কান্না মাত্রই ভিখিরী নয়, পরুষ-পুরুষের কান্নাও দেখবার মতো। রাবণের মতো দশাসই জোয়ান কাঁদছে দেখলেই মনে হয় পাথরে-কুঁদা বলিষ্ঠ এক ভাস্কর্য দেখছি। স্টেজে শিশির ভাদুড়ির রামকে কাঁদতে দেখেছ? দেখলে বুঝতে পারতে।' বটব্যাল সিগ্রেট ধরিয়ে বললে, 'কান্নার 'পরে এ আপনার এক বিশুদ্ধ গবেষণা দেখছি।' 'যথার্থই বলেছ, নবীন অধ্যাপকদের আমি এই উপদেশই দিই 'মাইকেল মহাকবি ছিলেন কিনা' আবিষ্কার করতে গিয়ে না কেঁদে-ককিয়ে কান্নার 'পরেই স্বচ্ছন্দে গবেষণা করে দেখুক। কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কারের চেয়েও বেশি আনন্দ পাবে।' বললেন নীলমণিদা : 'কান্না আমাদের জাতীয় সম্পদ, মহান ঐতিহ্য। আমরা এ-সম্পর্কে সজ্ঞান থাকি বা না-থাকি আমরা কদাপি এ-সত্য থেকে বিচ্যুত হব না, হতে পারব না। এই দেখো না তারাশঙ্করবাবু পর্যন্ত এই বয়েসে কান্নার ঐতিহ্য হৃদয়ঙ্গম করে গল্পের ছোটো পরিসর থেকে কান্নাকে উপন্যাসের আকাশে মুক্তি দিলেন। তোমরা বলবে এটা আকস্মিক যোগাযোগ, মোটেই তা নয়, তারাশঙ্করবাবু ভারতীয় ঐতিহ্যেরই উত্তরসাধক।' এক টিপ নস্য নাকে গুঁজে : 'ভালো কথা, সেদিন এক লেখকের উপন্যাস পড়লাম (মানে আমাকেই উৎসর্গ করেছে কিনা), লেখে মন্দ নয়, এলেম আছে, তবে দেখলাম ক্রন্দনরত অর্থে 'ক্রন্দসী' শব্দ ব্যবহার করেছে। আমরা প্রাচীন লোক, কানে বেঁধে, ক্রন্দসী মানে তো ক্রন্দনরত নয়, দ্যাবাপৃথিবী। এই শব্দ বেদে আছে কিনা এবং ঋষিদের মুখগহ্বর থেকে নির্গত। তাই শব্দতত্ত্বের etymology বা লোকনিরুক্তি ব্যাপারটাই আমার কাছে বাজে ব্যাপার মনে হয়। দেখেছ, ধান ভানতে মহীপালের গীত গাইছি, বটব্যাল এবার নিশ্চয়ই আমার মতিভ্রম নিয়ে কটাক্ষ করবে।' বটব্যাল বললে, 'আমার কাজ আছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের টিকিট কাটা আছে।' নীলমণিদা বললেন, 'আরে ব্রাদার বোসো। যা বলছিলাম, কান্না আমাদের চরিত্রের একটি উপাদেয় জিনিস। শিশু যখন মাতৃগর্ভের অন্ধকারা থেকে পৃথিবীর আলোকে প্রথম চোখ মেলে তখন সে কান্না দিয়েই তার অভ্যর্থনা জানায়। কান্না শিশুর জীবন-স্পন্দনের প্রাথমিক শর্ত। আদি ভাষাও বলতে পারো। শিশুদের পক্ষে কান্না স্বাস্থ্যকর ব্যাপার। চিকিৎসকরা বলেন : কান্নার ফলে শিশুদের ফুশফুশের জোর বাড়ে, হৃৎপিন্ড মজবুত হয়। আর, পৃথিবীর পথে নেমে মানবশিশুকে প্রথম থেকেই উত্তরকালের লড়ায়ের মহড়া দিতে হয়। জীবন একটা রণক্ষেত্র, সৈনিককে প্রস্তুত হতে হবে। কান্না তাই বিশুদ্ধ মানবিক ব্যাপার। জন্তুরাও হয়তো কাঁদে, কিন্তু মানুষের মতো তার পেছনে সজ্ঞান প্রয়াস নেই। তাই মানুষের কান্না বৌদ্ধিক ও আবেগীয় প্রক্ষোভ। আমার বিবেচনায় কান্না প্রসঙ্গে আমাদের বিন্দুমাত্র লজ্জিত হবার কারণ নেই। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মতোই উচ্চাঙ্গ কান্না, হৃদয়-মনকে বিকশিত করে। একেক জাতি একেক-ভাবে এগোয়, আমরা কান্নার পথেই এগোব। উপস্থিত হয়তো কারুর এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই, বটব্যাল তুমি কি বলো ভায়া?' বটব্যাল বললে, 'দাদা, আপনাকে একেক সময় এক আশ্চর্য বিদূষকের মতো লাগে।' নীলমণিদা কান্নার প্রসঙ্গ শেষে, এবার একটু হাসলেন।

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৩)

সত্যিই আমি যেন ঘুম থেকে উঠলাম।

মনে হল এ এক নতুন দেশে এসেছি। এখানে গাছে গাছে ফুল। ফুলে ফুলে মধু। প্রভাত-সূর্যের আলো বন্ধুভাবে হেসে এ দেশের বাসিন্দাদের ঘুম থেকে তোলে। এরা হাসে, খেলে, কাজ করে। সংবতেই আনন্দ। এ আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে বেড়ায় মধুর মলয় পবন।

এ দেশেও বেলা বাড়ে, রৌদ্রের রঙ বদলায়, গাছপালা, জল, মাটি, আকাশের বুকে কে যেন গলা সোনার রঙের তুলি বোলায়। চারদিক ঝলমল করে ওঠে। এ রোদের আলো আছে কিন্তু তাত নেই। দূর থেকে রাখালিয়া বাঁশীর মিষ্টি সুর ভেসে আসে। সবাই কান খাড়া করে শোনে। কাজের লোকও আনমনা হয়ে যায়।

ঝাঁক ঝাঁক পাখীরা আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তারা পাক খেয়ে নীচে নেমে আসে, পুকুরের জল লক্ষ্য করে। কিন্তু কিসের আকর্ষণে। আবীর-মাখানো জল কি তাদের টেনে এনেছে না, ঐ রাখালিয়া বাঁশীর পাগল-করা সুর। ক্রমশঃ বাঁশীর সুর চড়ছে, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইছে হাওয়া। শাখায় শাখায় একি দোলন, পাতায় পাতায় একি কানাকানি। শিশুদের কলরব, পাখীদের কূজন, জনপদের কলতান সবে মিলে যখন এক বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে, তারই মধ্যে কখন না বলে কয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ক্লান্ত সূর্য বিদায় নেয়, কিছুক্ষণের জন্য গোধূলির রক্তমাখা আলোর পৃথিবীকে আরো সুন্দর দেখায়। সেই গাছ, সেই মাঠ, সেই আকাশ মধুময় হয়ে ওঠে। এ আলোর বার্তা গিয়ে পৌঁছয় যুবক-যুবতীর অন্তরে। যৌবরাজ্যে প্রবেশের উদার আহ্বান। কিন্তু সেও তো বেশীক্ষণ নয়, অন্ধকার এসে তাদের ভয় দেখায়, ধরা পড়ার আশঙ্কায় তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, নিজেদের লুকোতে চায় আঁধারের আবরণে, কিন্তু লুকোতে পারে না, আলোক ফুটে ওঠে। প্রতিদিন সে বিস্ময় জাগায় এদের মনে। এ আলো চাঁদের, কখনও ফিকে, কখনও গাঢ়। এ আলোয় কিসের যেন মোহ আছে। কোন এক মায়া-রাজ্যের অবতারণা করে এই হঠাৎ-জেগে-ওঠা যুবক-যুবতীর মনে।

তারা জিজ্ঞেস করে, এ কি স্বপ্ন?

উত্তর আসে, না। এ সত্য।

প্রশ্ন ওঠে, জীবন কি এত মধুর?

উত্তর দেয়, নির্ভর করে তোমাদের উপর।

—তবে এত দুঃখ কেন?

—দুঃখ তোমাদের কাতর করতে পারবে না। যদি তোমরা প্রেমে ধন্য হতে পার।

প্রশ্ন চিরন্তন, কিন্তু কে এর উত্তর দেয়! তাকে দেখা যায় না। শুধু স্বর শুনতে পাই। অতি দরদী, শান্ত কণ্ঠস্বর। এ স্বর আমিও শুনেছি। শুনেছি এই নতুন রাজ্যে প্রবেশ করার পর।

আমি আর গগন ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্কুলের জন্যে কাজ করি, কিন্তু ক্লান্ত হই না। হাজারো লোকের মাঝে যখন চকিতে তার সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়, মনে হয় আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। পেয়েছি, যা চাইছিলাম, আমি পেয়েছি। কাজের সময় আরো দীর্ঘ হলেও আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়ব না।

আবার অবসর সময়ে দুজনে চুপচাপ বসে থেকেছি লাইব্রেরী ঘরে। বই পড়িনি, কথা বলিনি। সামনা-সামনি বসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। সময়ের পরিমাণবোধ রহিত, অনুভব করেছি অব্যক্ত আনন্দের অনুভূতি।

দিনের পর দিন আমি আর গগন গঙ্গার জলে নেমে স্নান করেছি। জ্যোৎস্না রাতে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। গভীর অমাবস্যায় ছাদে উঠে হাজার হাজার তারার দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি। তারই মধ্যে শুনেছি গগন মৃদু স্বরে আবৃত্তি করছে,

বিস্ময়ে ভাবি, তুমি আর আমি
করেছি কি?
যতদিন ভালবাসিনি, ছেলেমানুষিতে
ভরা ছিল নাকি মন?
গ্রাম্য সুখের সরলতা যেন করেছি
পান,
ঘুমে ঢুলে পড়া প্রাসাদেতে যেন
কেটেছে ক্ষণ।
তাই হোক তবু সুখের সৃষ্টি
কল্পনা থেকে জানি,
কোন রূপ যদি কোন দিন
থাকি দেখে,
চেয়েছি দেখতে, পেয়েছি যা কাছে
তোমারই স্বপ্নে রানী।

জিজ্ঞেস করলাম, কার কবিতা?

গগন বলল, জন ডন।

—তুমি অনুবাদ করেছ?

—আমার বন্ধু, SEEKER। কবিতাটা কি সুন্দর বলত? এর পর বলছে—

আমাদের এই জেগে ওঠা প্রাণে
বন্দনা করি আজ
নতুন এ প্রাণ নির্ভয় চায়,
ভয় মাখা নয় দৃষ্টি।
প্রেমের পরশ ভুলিয়ে দিয়েছে
অনুভূতি সব, আর
জগতের সব সম্পদে ভরা
ছোট নীড় করে সৃষ্টি,
আবিষ্কারক যাক দূরে দূরে
নতুন জগৎ খুঁজুক
মানচিত্রের ওপরে দেখাক
নতুন দেশের সীমা
আমাদের থাক একটি জগৎ,
তোমার আমার শুধু।

গগন যে এত ভাল আবৃত্তি করে আমি জানতাম না। ওর গম্ভীর সুরেলা কণ্ঠস্বরে এ কবিতা আরো সুন্দর শোনাল। আমি বললাম, অপূর্ব।

নতুন জীবন নিয়ে যখন আমরা এমনি বিভোর হয়ে আছি, ব্রজবালা দেবীর টেবিল পরিষ্কার করতে করতে দিদিমণির লেখা একখানা চিঠি দেখতে পেলাম। কেন জানি না দিদিমণি কি লিখেছেন জানবার কৌতূহল হল। জানি

অন্যের চিঠি পড়া অন্যায় তবু খাম থেকে চিঠিখানা বার করলাম।

ঘরে কেউ ছিল না। কিন্তু সেখানে বসে পড়তে চাইলাম না। যদি হঠাৎ কেউ ঘরে এসে ঢোকে। চিঠিখানা নিয়ে নিজের ঘরে এসে আলোর সামনে খুলে ধরলাম।

চিঠির ভাষা অত্যন্ত কঠোর। এক জায়গায় দিদিমণি লিখছেন—

"এটি আমার সপ্তম পত্র।

আগের ছ'খানা চিঠির তুমি কোন উত্তর দাওনি। আমি জানতাম তুমি দিতে পারবে না। কিন্তু এই আমার শেষ চিঠি। যদি উত্তর না পাই, আমি তোমাকে না জানিয়ে চুঁচুড়োয় গিয়ে উপস্থিত হব।

গতবার আমি যখন চুঁচড়োয় যাই, তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে বেশ কিছুদিন যেন আমি পাটনাতেই থাকি, চুঁচড়োয় গিয়ে তোমাকে বিরক্ত না করি। আমি তোমার কথা রেখেছি, এ ক'মাসের মধ্যে একবারও যাইনি। কিন্তু যে-সব কথা শুনতে পাচ্ছি, তা'তে আর বোধহয় এখানে বসে থাকা চলে না। তোমাদের মতলব কি আমি বুঝতে পারছি না। কেন তুমি আমাকে জানাও নি?... আসছে তোমার কাছে। জানতে পারলে আমিও সে সময় উপস্থিত থাকতাম। তার মানে তুমি চাওনি আমি সে সময় চুঁচড়োয় গিয়ে পড়ি। শুনছি আমাদের বাড়ীতে তুমি স্কুল বসাচ্ছ, এ অধিকার তোমাদের কে দিল, আর কেনই বা করতে চাইছ জানতে পারি কি? শুনছি গগন সেন নামের এক ভদ্রলোক তোমাদের নাচাচ্ছে, সেইমত তোমরা নাচছ, এ লোকটা কে? হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসল কেন? আমি জানতে চাই।

এ চিঠি লেখার পর আমি তিন দিন অপেক্ষা করব। যদি তোমার কাছ থেকে সদুত্তর না পাই আমি নিজে গিয়ে সব-কিছু দেখতে চাই। প্রয়োজন হলে স্কুলের পরিকল্পনা বন্ধ করে দিতে আমি বাধ্য হব। তোমার পাগলামীকে অনেক প্রশ্রয় দিয়েছি, আর দেব না।"

এ চিঠি পড়ে আমার বুক ধড়-ফড় করতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলাম, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড় উঠবে। যে নির্মল আকাশ দেখে আমি আর গগন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম, নূতন সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়েছিলাম সে আকাশকে ক্ষুব্ধ করে তোলার জন্যে দিদিমণি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এ চিঠি পড়ার কৌতূহল আমার এমনি হয়নি। মনে আছে এ চিঠি যেদিন ডাকে আসে ব্রজবালা দেবী তা পড়েই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। আমি তাঁর কপালেও লক্ষ্য করেছি চিন্তার রেখা। পরদিন সকালে দেখেছি চোখের তলায় রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তির ছাপ। আমি বুঝেছিলাম, এ চিঠিতে এমন কিছু লেখা আছে যা ঐ বৃদ্ধাকে এতখানি বিচলিত করেছে। সেইজন্যেই হঠাৎ হাতের কাছে পেয়ে এ চিঠিখানা না পড়ে আমি পারি নি।

চিঠিখানা খামের মধ্যে ভরে আবার ব্রজবালা দেবীর ঘরে ফিরে গেলাম। উনি তখনও ঘরে ফেরেন নি। চিঠিপত্র গুছিয়ে দেরাজের মধ্যে রেখে পালকের ঝাড়ন দিয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করলাম,বেশি ময়লা এখানে জমতে পারে না। কারণ এই পালক নিয়ে হাতের কাছের জিনিসগুলো পরিষ্কার করা ব্রজবালা দেবীর অভ্যাসের মধ্যে। অবসর সময় উনি আসবাবপত্রের ধুলো ঝেড়ে ফেলেন। টেবিলের উপর রাখা ব্লটিং পেপারের বড় প্যাডখানায় কয়েকটা আলপিন গোঁজা ছিল, আমি ভাবলাম ওর ভেতরে যদি ময়লা থাকে পরিষ্কার করে দিই। হাতে করে বারান্দায় নিয়ে এসে ঝাড়তে গিয়ে ব্লটিং প্যাডের ভেতর থেকে একখানা খালি খাম মাটিতে পড়ে গেল। হয়ত দরকারী কাগজ হবে ভেবে তুলে নিলাম। কিন্তু খামের উপর হস্তাক্ষর দেখে চমকে না উঠে পারলাম না। এ হস্তাক্ষর আমি চিনি। এরই লেখা চিঠির উপর নজর রাখার জন্যে দিদিমণি আমায় বার বার অনুরোধ করে গিয়েছিল। আমার ধারণা যে ভুল নয় তা মিলিয়ে দেখার জন্যে ব্লটিংপ্যাড যথাস্থানে রেখে খালি খামখানা নিয়ে ঘরে এসে দেরাজ খুলে দিদিমণির দিয়ে যাওয়া খাম বের করে দেখলাম, একই লোকের হস্তাক্ষর। একটার উপর ব্রজবালা দেবীর নাম লেখা, আর একটার উপর দিদিমণির।

বুঝলাম দিদিমণি যা সন্দেহ করেছিল তা ঠিকই, পত্রলেখক যেই হোক না কেন, মা ও মেয়ে দুজনকেই সে চিঠি লিখছে। কি চিঠি, কেন লিখছে যদিও আমি জানি না, তবে নিশ্চয় তার মধ্যে এমন কোন রহস্য লুকোন আছে যার জন্যে দিদিমণিকে চিঠি পড়ে অতখানি বিচলিত হতে আমি দেখেছি। স্বাভাবিক ভাবেই একটি প্রশ্ন আমার মনে জাগল, কে এই পত্রলেখক?

মনে হল গগন সেনের সঙ্গে এখুনি আলোচনা করা দরকার। সত্যিই যদি দিদিমণি এসে পড়েন, স্কুলের কাজে বাধা দেন, তখন আমরা কি করছি। এসব কথা ব্রজবালা দেবীকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই, একেই নানা ঝামেলায় তিনি বিব্রত হয়ে আছেন, তার উপর সম্ভব, অসম্ভব নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করে কি হবে? অথচ জানি গগন আজ আসবে না। সে ব্যাণ্ডেলের বাড়ী থেকেই চলে যাবে কলকাতায়। ফেরবার কথা কাল বিকেলে। প্রায় দু' দিন তার জন্যে আমার অপেক্ষা

করে থাকতে হবে, অথচ তা ছাড়া উপায়ই বা কি?

আগে যখনই কোন চিন্তায় পড়তাম, ভাবতাম কার সঙ্গে পরামর্শ করব। মেজদিকে ভাবাতে ইচ্ছে করত না, ওঁর শরীর খারাপ ছিল বলে। নিজের মনেই চিন্তা করতাম। কত সময় কোন সমাধানই খুঁজে পেতাম না। দুশ্চিন্তায় মন আমার অবসন্ন হয়ে পড়ত। শরীর হ'ত ক্লান্ত। কিন্তু এখন, আমার সবচেয়ে বড় ভরসা গগন। কত সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি, এতটুকু বিচলিত হয় না, ধীরভাবে আমার কথা শোনে, তারপর নিজস্ব মতামত দেয়। কত সহজে সে সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমি জানি দিদিমণির চিঠি পড়ে যে আমি এত ভাবছি, গগন হয়ত হেসে উড়িয়ে দেবে। বুঝিয়ে দেবে যে, ভয় পাবার কিছু নেই। ওর ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে উত্তেজনা চেপে বসে থাকতেই হবে। এ ছাড়া আর উপায় কি?

ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগল না। চেষ্টা করেও মনের ছটফটানি থামাতে পারছি না। লক্ষ্মীর মার কাছে জিজ্ঞেস করে জানলাম ব্রজবালা দেবী পাড়াতেই কারুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, এখনও ফেরেন নি। তুবড়ীও আছে ওঁর সঙ্গে। নীচে নেমে এসে বাগানে খানিকটা বেড়ালাম। সূর্যের তেজ আজ খুব প্রখর নয়, পাঁজা তুলোর মত মেঘের আবরণে সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে। কত বেলা হয়েছে কে বলতে পারে। বাগানের ঘাসগুলো অনেকদিন ছাঁটা হয়নি বোধহয়, বেশি বড় হয়ে গেছে। ব্রজবালা দেবী আর আগের মত বাগানের পেছনে সময় দিতে পারেন না। তাই মালিটাও ফাঁকি দেয়। কিন্তু পূবদিকে মৌসুমী ফুলের বিছানায় কত রঙের সমারোহ, লাল, নীল, বেগুনে, সবুজ, হঠাৎ দেখলে যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ফুল দেখতে আমার ভাল লাগে, কিন্তু কিছুতেই নামগুলো মনে থাকে না। আমার দোষ কি? ক'লকাতায় থাকতে ফুলের সঙ্গে তো কোনও সম্পর্ক ছিল না। এক চিনতাম রজনীগন্ধা, যা হাতে করে নিয়ে গিয়ে কাউকে উপহার দেওয়া যায়। আর পুজোয় লাগে গাঁদা ফুল যা ছিঁড়ে ছিঁড়ে স্কুলে সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিয়েছি। আর দেখেছি কাগজের তৈরী পাতার মধ্যে সাজানো গোলাপ, পেরেক মেরে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়, ঝরে পড়ার ভয় নেই, অনেক দিন ধুলো পড়ে পড়ে পরে আর রঙটা বোঝা যায় না। তবু মনে হয় কোন একটা ফুল নিশ্চয়। তাই ত এখানে এসে এত রকমের ফুল দেখে আমাদের মাথা গুলিয়ে যায়। তবু ভাল লাগে। যা সুন্দর তাকে ভাল না লাগাই আশ্চর্য, যে নামেই তাকে ডাকো না, তাতে তার সৌন্দর্য কমে না।

বাগানে এই অংশটার পর থেকে ধাপে ধাপে মাটি নেমে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। নীচু জমিতে লাগানো আছে ফলের গাছ, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, পেঁপে, নারকেল, কলা—গাছগুলো ফলন্ত, অনেকদিন পোঁতা হয়েছে, বেশ কিছু
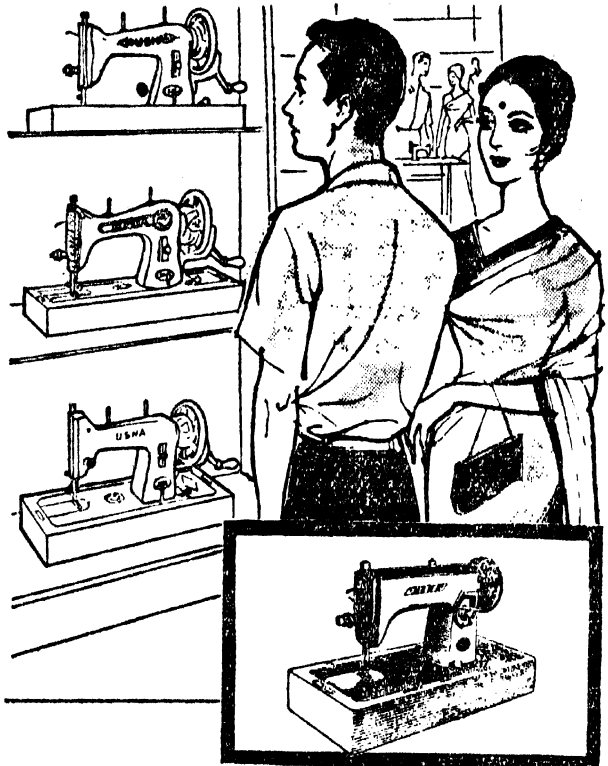
জায়গায় জঙ্গলের মত ঘন, তবু তারই ফাঁক দিয়ে গঙ্গার জল চিক-চিক করে, আমি সেইদিকে তাকিয়ে ছিলাম। একটা ছোট নৌকো ভাসতে ভাসতে চলে গেল, গঙ্গার জলের উপর তরঙ্গের সৃষ্টি করে। ছোট ছোট ঢেউ গুড়ি মেরে পাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে, অতি চঞ্চল তার ছন্দ, ঢেউ-এর মাথায় মাথায় আলোর চিক-নাই কে যেন জরীর পাড় বসিয়ে দিয়েছে। মনে হল চান করে আসি।

এখানে এসে পর্যন্ত বহুদিন আমি গঙ্গাস্নান করেছি। গগন থাকলে তো ধরে নিয়ে যায়ই। না থাকলেও আমি একলা গেছি, কখনও বা তুবড়ীকে সঙ্গে নিয়ে। এ বাড়ীর সঙ্গে লাগোয়া যে ঘাট তা বহুদিনের পুরোন। সেই জন্যেই বোধ হয় বেশি ভিড় হয় না। আমারও তাই ভাল লাগে। একগাদা লোকের মাঝ দিয়ে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে বাড়ী ফিরতে কেমন যেন আমার লজ্জা করে। মনে হয় শত উৎসুক দৃষ্টি, আমার দেহে ছুঁচ ফোটাচ্ছে। বোধ হয় আমি শহরের মেয়ে বলেই এখনও এটাকে ঠিক সহজভাবে নিতে পারি না।

উপরে এসে শাড়ী বদলে হাতে একটা গামছা নিয়ে স্নান করার জন্যে বেরলাম। লক্ষ্মীর মাকে বললাম, আমি এখুনি গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসছি, যদি ওঁরা কেউ আমার খোঁজ করেন বলে দিও।

লক্ষ্মীর মা বলল, দিদি একলা যাবে?

বললাম, কেন, আমি তো একলাই যাই?

—বল তো আমি সঙ্গে যেতে পারি।

বাধা দিয়ে বললাম, না লক্ষ্মীর মা, দুজনেরই যাওয়া ঠিক হবে না, যদি উনি এখুনি ফেরেন—

আর লক্ষ্মীর মাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি খিড়কীর দরজা খুলে গঙ্গার দিকে রওনা হলাম। আমি কাউকেই আজ সঙ্গে নিতে চাইনি। বাজে কথা বলতে ভাল লাগছে না। দিদিমণির কথাগুলো মাথায় পাক খাচ্ছে, সেই সঙ্গে অজ্ঞাত পত্রলেখকের রহস্য। গগন সেনের অনুপস্থিতিতে কিছুতেই যেন নিজেকে সহজ করতে পারছি না, তাই তো এই স্নান করতে যাওয়া। গঙ্গার ঘাটে এসে দেখি কেউ তখন স্নান করছে না। ফাঁকা দেখে মনটা খুশী হল। অদূরে দুটো নৌকো বাঁধা, মাঝিরা বোধ হয় রান্না চাপিয়েছে। জলের কাছে আসতেই গগনের কথা মনে পড়ল। জল দেখলেই ওর চোখ-মুখ ছেলেমানুষের মত খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কথা বলতে বলতেই ঝপ করে লাফিয়ে পড়ে জলের মধ্যে, তার পরেই মাছের মত সাঁতার দেয়। গগনের মুখ দেখে ওর দেহের রঙ বোঝা যায় না, রোদে পুড়ে মুখের রঙ ওর তামাটে হয়ে গেছে। কিন্তু একদিন যে তার রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল তা ওর দেহ দেখলেই বোঝা যায়। ওর কাঁধ চওড়া, পেশীবহুল সুঠাম শরীর, জলের তলায় তাকে ভাসতে দেখলে মনে হয় অল্পবয়সী এক যুবক। হাত দিয়ে টেনে যখন জল সরাতে থাকে মনে হয় সমস্ত বাধা কাটিয়ে সে এগিয়ে যাবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তার সাঁতারকাটা দেখি। আবার সেই একই রূপের সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যখন দেখি গগন চিৎ হয়ে শরীরের কোন অঙ্গ না নাড়িয়ে জলের উপর ভাসে, শান্ত অথচ সবল একটা দেহ জীবন দেবতার কাছে যেন নিজেকে সমর্পণ করেছে, চার দিকে জল, মাথার চুল আর দাড়ী জলে ভিজে শরীরের সঙ্গে লেগে রয়েছে, তারই মধ্যে ওর উজ্জ্বল হাসিভরা মুখ, তাতে প্রতিভাত হচ্ছে সমর্পন করার আনন্দ।

আস্তে আস্তে জলে নামলাম। অভ্যাসমত হাতে জল নিয়ে মাথায় ঠেকালাম। আঃ, কি পরিষ্কার, ঠান্ডা জল। এখন আর আমার ডুব দিতে ভয় করে না। কয়েকবার ঘন ঘন ডুব দিয়ে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। এতক্ষণের চিন্তা যেন মাথা থেকে নামল। সত্যিই তো এত কি ভাববার আছে, যদি গগন আমার সঙ্গে থাকে নাই বা এখানে স্কুল খুলতে পারলাম। হয়ত অন্য কোথাও হবে। গগন ঠিকই বলে, যা পাচ্ছ তাকে অবহেলা কর না অপু, শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কর। একদিন হারাবার ভয়ে নিজেকে কৃপণ কর না লক্ষ্মীটি।

না, না, আমি কৃপণ হব না।

দূরে জুবিলী ব্রীজ, শব্দ করে একটা ট্রেন চলে গেল। এটা কোন ট্রেন। রোজ আমি যখন স্নান সেরে ব্রজবালা দেবীর জন্যে বারান্দায় বসে ফুলের মালা গাঁথি সেই সময় একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ব্রীজের উপর দিয়ে যেতে দেখি। এটা কি সেই ট্রেন। তবে তো বেলা হয়েছে, এখুনি ফেরা উচিত। ওঠবার জন্যে ডুব দিয়ে নিলাম, তখনও মুখের উপর দিয়ে জলের ধারা নামছে। চোখ খুলে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। মনে হল নৌকো থেকে মাঝিরা চেঁচিয়ে কি বলছে। প্রথমটা বুঝতে পারিনি, একটু অবাকই হলাম ওদের উত্তেজিত হতে দেখে, ধারে কাছে কেউ নেই, তবে কার সঙ্গে এত চেঁচিয়ে কথা বলছে। হাওয়ায় বোধ হয় ওদের কথাগুলো কেঁপে কেঁপে সরে যাচ্ছিল, তাই আমি খুব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ কানে গেল ওরা চেঁচাচ্ছে শিগ্‌গির উঠে যান বান আসছে।

এখানে এসে পর্যন্ত বহু দিন পাড়ে দাঁড়িয়ে, কি বাড়ীর ছাদ থেকে গঙ্গায় বান আসতে দেখেছি। বেশ উঁচু হয়ে জল এগিয়ে এসে পাড়ের উপর পড়ে। শুনেছি জলের টান খুব বেড়ে যায়, অনেক স্নানার্থীকে টানতে টানতে নিয়ে যায় আঘাটায়।

বানের কথা শুনেই বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাড়াতাড়ি পাড়ের দিকে যাবার চেষ্টা করলাম।

তখনও মাঝিরা সাবধান করছে, ঐ এল ঐ এল।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমি পাড়ে গিয়ে পৌঁছতে পারলাম না, হঠাৎ যেন জল বেড়ে গেল। ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে দিল, আমি যত দাঁড়াবার চেষ্টা করছি, তত জল আমাকে টানছে। পায়ের তলায় আমি মাটি খুঁজে পাচ্ছি না। উঃ, এ কি দুর্নিবার আকর্ষণ। গঙ্গার পাড়, ঘাট, গাছ-পালা, বাড়ী সব ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে আমি অসহায় অবস্থায় জলের মধ্যে ভেসে চলেছি পুরো শরীরটা জলের মধ্যে একবার চাকার মত ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। মৃত্যুর হিমশীতল হাত যেন ক্রমশঃ আমাকে জড়িয়ে ধরছে। দম নেবার জন্যে আমি মুখ তুলবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পরছি না।

একবার আমার মুখখানা ভেসে উঠল, প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলাম, বোধ হয় চেঁচিয়ে উঠলাম, ঠাকুর, রক্ষা কর।

তারপর, তারপর!

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

কলারসিক

॥ তিনটি চিত্র প্রদর্শনী ॥

পুজোর অবকাশে কিছুকাল নীরব থাকার পর নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কলকাতার প্রদর্শনী-ভবনগুলো আবার সরব হয়ে উঠেছে। ক্যাথেড্রাল রোডের আকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্‌ ভবনের প্রতিটি কক্ষ ও পার্ক স্ট্রীটের দুটি প্রদর্শনী-ভবন জুড়েই চলেছে চিত্রকলার নানা রীতির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচিত্র প্রদর্শনী। সমস্ত প্রদর্শনী সম্পর্কে একসঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয় বলে আমরা এবার তিনটি প্রদর্শনী নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করছি।

আকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের দুটি কক্ষে গত ১৪ই নভেম্বর নেহরুজীর জন্মদিনে শিশু-শিল্পীদের অংকিত দুটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এর একটির উদ্যোক্তা পশ্চিম জার্মান সরকারের পৃষ্ঠ-পোষিত কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবন, অন্যটির আয়োজন করেছেন ফিলিপস ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ। এই দুটি চিত্র-প্রদর্শনী ছাড়া আর-একটি প্রদর্শনীর

সর্বভারতীয় শিশু-চিত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত একটি চিত্র

আয়োজন করেছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত। শ্রীদাশগুপ্তের প্রদর্শনীটি পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে সপ্তাহকাল চলার পর গত ১৩ই নভেম্বর শেষ হয়েছে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের শিশু-শিল্পীদের চিত্রকলা

পশ্চিম জার্মানীর শিশু-শিল্পীদের চোখ দিয়ে দেখা, অনুভূতির রঙে রাঙানো ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের বিচিত্র রূপ একশো পঞ্চাশখানি চিত্রের সাহায্যে কলকাতায় বসে যদি কেউ উপভোগ করতে চান তাঁকে অবশ্যই যেতে হবে ক্যাথেড্রাল রোডের প্রদর্শনী-ভবনে। ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের দৃশ্যাবলী, তার গির্জা, গম্বুজ, প্রবহমান নদী, গগনচুম্বী প্রাসাদ, কল-কারখানা, স্টেশন, ট্রাম-বাস, বিমান-বন্দর, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, সেতু, স্টেডি-য়াম, বাজার, চিড়িয়াখানা, ট্রাফিক পুলিশ, এর সবকিছুই শিশু-শিল্পীদের চিত্রাঙ্কনের বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। মাত্র আট বছর বয়স থেকে ষোল বছরের শিশু ও কিশোর-দের হাতে রঙে আর রেখায় যে বিচিত্র চিত্রাবলী রূপায়িত হয়েছে তার মধ্যে শিশুসুলভ কৌতূহল যেমন আছে, তেমনি শিল্প-দক্ষতা তথা আঙ্গিক-নৈপুণ্যেও তা উজ্জ্বল। এমন অনেক-গুলি চিত্র জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত হয়েছে যার চিত্র-সংস্থাপন, রঙের বৈপরীত্য সৃষ্টি যে-কোন বয়স্ক ও পরিণত শিল্পীকেও ঈর্ষান্বিত করে তুলতে পারে। গ্রাফিক চিত্ররূপে যে কয়টি নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে উপ-স্থিত করা হয়েছে তার মধ্যেও আশ্চর্য শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বিদ্যমান। প্রদর্শিত কোন চিত্রেই উজ্জ্বল রঙের ছড়াছড়ি নেই। এর অন্যতম কারণ বোধ-হয় দেশজ প্রকৃতি। যে-দেশ বছরের অধিকাংশ সময় বরফ আর বৃষ্টিতে ভেজা থাকে সে দেশের ছেলে-মেয়েকে আনন্দোচ্ছল রঙ কি করে মুগ্ধ করবে?

জার্মান চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত একটি চিত্র

এই প্রদর্শনীর চিত্রাবলীতে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করা গেল। ফ্রাঙ্ক-ফুর্টের রাস্তাঘাট প্রায় জনবিরল রূপে চিত্রিত করেছে শিশু-শিল্পীরা। শুধু

তাই নয়, অধিকাংশ চিত্র স্থাপত্য-রীতি-ভিত্তিক। নর-নারীর দেহাবয়ব জার্মান শিশু-শিল্পীদের কাছে খুব আকর্ষণীয় বলে মনে হল না। ফ্রাংকফর্টের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান বহু চিত্রেই স্থান পেয়েছে। ঐ-থেকে শিশু-শিল্পীদের একটি প্রবণতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। জার্মান-জাতীয় জীবনে ইতিহাস-সচেতনতার বীজ কত গভীরে প্রোথিত তা এই প্রদর্শনীতে এসে দর্শকেরা অনায়াসে বুঝতে পারবেন। মোটকথা, এই প্রদর্শনীর অনেকগুলি চিত্রে তার ভাবী শিল্পীদের সঙ্গে যেমন পরিচিত হলাম, তেমনি ভবিষ্যৎ জার্মানীর মানস-প্রবণতারও কিঞ্চিৎ সন্ধান পেলাম বলে মনে করছি। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের তাই ধন্যবাদ জানাই। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের কাছে শুনলাম, কলকাতার শিশু-শিল্পীদের অঙ্কিত কলকাতার দৃশ্যাবলীর একটি চিত্র-প্রদর্শনী ঠিক একই সময়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দুই দেশের ভাবী নাগরিকদের এই সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা সত্যিই আনন্দিত। আশা করি ভবিষ্যতে এই সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

ফিলিপস ইণ্ডিয়ার শিশু-শিল্পীদের প্রদর্শনী

ফিলিপস ইণ্ডিয়া একটি সর্ব-ভারতীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। সারা ভারত-বর্ষ জুড়ে এর কর্মচারীরা ছড়িয়ে রয়েছেন। এই সব কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যে শিল্পী-প্রতিভা লুকিয়ে আছে তাকে বিকশিত করার বাসনা নিয়েই পণ্ডিত নেহরুর জন্ম-দিনে সর্বভারতীয় শিশু দিবসে ফিলিপস ইণ্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ শিশু-শিল্পীদের যে চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন নিঃসন্দেহে তা অভিনন্দন-যোগ্য।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে আটচল্লিশ জন শিশু-শিল্পীর প্রায় একশো ষোলটি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। জার্মান শিশু-শিল্পীদের চিত্র-প্রদর্শনী যেমন একটি শহরকে ভিত্তি করে রচিত ফিলিপস ইণ্ডিয়ার শিশু-শিল্পীদের প্রদর্শনী তেমন কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। বিভিন্ন স্থানের নিসর্গ দৃশ্য, নর-নারী, জীব-জন্তু, ফুল-পাখি আর বিচিত্রতর অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন ক'রে শিশু-শিল্পীরা রচনা করেছে তাদের চিত্রের জগৎ। ভারতীয় শিশুরাও যে উৎসাহ ও সহযোগিতা পেলে শিল্পকলার মাধ্যমে নিজেদের বিকশিত করে তুলতে পারে এই প্রদর্শনীর অনেকগুলি চিত্র তার স্পষ্ট আভাস রয়েছে। পার্থসারথি দত্তের 'বর্ষা' (১), গুর্দমীত সিং শেঠীর 'ভাঙ্গরা নৃত্য' (৫), রামস্বামী ভেংকটেশ-এর 'দোলনা' (১৬), রামস্বামী রমানাথের 'পর্যাপ্ত ফসল' (১৮), নীতা সরকারের 'সাঁওতাল নারী' (৩৬), 'পার্বত্য নিঃসর্গ' (৩৯), জেনী জোস্পেনীলের 'আমার বাড়ী' (৪৫), অভীজিৎ ভট্টাচার্যের 'বিশ্বযুদ্ধ' (৫১), ইভা দত্তের প্রকৃতি' (৬৩), জেমস ইহো-র 'ভালবাসা' (৮৩), কল্যাণী আঢ্যির 'দেশের বাড়ী' (৮৬) এবং অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিহির ঘোষের স্কেচ দর্শকমনকে শিশুদের কৌতূহল ও শিল্প-নৈপুণ্যের প্রতি আকর্ষণ করবে বলে আমার বিশ্বাস। পণ্ডিত নেহরুর প্রতিকৃতি অঙ্কনে ইভা দত্ত ও কল্যাণী আঢ্যি বেশ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে।

ফিলিপস ইণ্ডিয়ার 'পরিচয়' পত্রিকা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভবিষ্যতে তা আরও সার্থক হয়ে উঠুক, আমরা এই কামনা করি। শিশু-শিল্পীদের চিত্র-প্রদর্শনী দুটি আগামী ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যহ বেলা ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

শিল্পী ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের একক প্রদর্শনী

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ধর্ম-নারায়ণ দাশগুপ্তের প্রথম একক প্রদর্শনী পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে গত ১৩ই নভেম্বর শেষ হয়েছে। শিল্পী দাশগুপ্তের এই প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ শান্তিনিকেতনের শিল্পী বলতে আমরা আচার্য নন্দলাল, মুকুল দে প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত শিল্পীদের প্রভাবপুষ্ট ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের অনুসারী শিল্পীর কথা মনে করে থাকি। অবশ্য শান্তিনিকেতনে রাম-কিঙ্কর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মত শিল্পীও আছেন। কিন্তু শান্তি-নিকেতনে শিক্ষাসমাপান্তে আমরা যে-সব শিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়েছি তাঁদের মধ্যে রাম-কিঙ্কর বা বিনোদবিহারী মুখো-পাধ্যায়ের প্রভাব কদাচিৎ খুঁজে পেয়েছি। সে-দিক থেকে শিল্পী দাশ-গুপ্ত আমাদের নতুনতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করলেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীর তিরিশখানি চিত্রের মধ্যে আটখানির মাধ্যম তেলরঙ এবং বাইশখানির মাধ্যম জলরঙ। শিল্পী দাশগুপ্ত তেলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রের মধ্যেই সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর চিত্রে বাস্তবধর্মী চেতনা যেমন নেই তেমনি বিমূর্ত শিল্প-চেতনার স্বাক্ষরও স্পষ্ট নয়। এ-দুয়ের সংমিশ্রণে জ্যামিতিক বিভাজনে, চ্যাপ্টা রঙ প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্পী তাঁর চিত্র-বক্তব্য উপস্থিত করতে চেয়েছেন। ক্যান-ভাসে চমৎকার জমিন সৃষ্টি, অবয়ব ভাঙ্গা এবং চিত্রে তার সুসম উপস্থাপনা কিংবা রঙপ্রয়োগপদ্ধতি—এ সব কিছুর মধ্যে শিল্পী দাশগুপ্তের নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠ শিল্প-চেতনা খুঁজে পাওয়া যায়। কয়েকখানি চিত্রে রঙ পেষা ছুরিতে কেটে চিত্রে বিচিত্র জমিন সৃষ্টির মুন্সিয়ানাও প্রশংসনীয়। প্রদর্শিত চিত্রের মধ্যে 'ত্রয়ী' (৩), 'গুঞ্জন' (১), মধ্যবিত্ত' (৪) প্রভৃতি নিঃসন্দেহে উল্লেখ-যোগ্য সৃষ্টি।

জলরঙের চিত্রগুলিতে শিল্পী বিমূর্ত চিত্ররচনার চেষ্টা করেছেন। সব ক্ষেত্রে সেগুলি উত্তীর্ণতার ছাড়পত্র পায়নি সত্যি কিন্তু শিল্পীর রঙ-প্রয়োগ-পদ্ধতিকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। কয়েকখানি নিসর্গ দৃশ্য অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কয়েকখানি চিত্রের নামকরণ একটু বিদঘুটে মনে হল। আশা করি শিল্পী প্রথম প্রদর্শনীতে যে-ভাবে আমাদের মন আকর্ষণ করেছেন ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীতে তা আরও প্রখর করে তুলতে পারবেন। আমরা শিল্পীর ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীর অপেক্ষায় রইলাম।

।। বিষণ্ণ বেদনার স্মৃতি ।।

সেদিন বাঙ্গালোরে রাষ্ট্রপতি একটি কফি হাউসের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। এই দ্বারোদ্ঘাটনের দৃশ্যটি অনেকেই ইণ্ডিয়ান নিউজ রিভিয়ুতে দেখে থাকবেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় যে দ্বার-বন্ধ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তার সাক্ষী এই ভূমধ্যে ক'জনই বা। মনে পড়ে মধ্য-সেপ্টেম্বরের সেই সন্ধ্যায় কফি হাউসে উপস্থিত সকলেরই চোখ করুণাঘন ছিল। কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের শেষ সন্ধ্যা ছিল সেদিন। অ্যালবার্ট হল আর পরদিন থেকে খুলবে না এই নিদারুণ শোকসংবাদ আমরা শ্মশান-বন্ধুর মত গ্রহণ করে টেবিলের চারপাশে মুহ্যমান ছিলাম। চৌদ্দ বছরের কিশোর কফি হাউস তার চতুর্দশ জন্মদিন (১-৯-৪৪ তারিখে প্রথম খোলা হয় কলেজ স্ট্রীট কফি হাউস) পালন করে মাত্র পনেরো দিনের মধ্যেই অকাল প্রয়াণে যাচ্ছে—ভাবতে গিয়ে অনেক চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে আসছিল। শোক-মুহূর্তে স্মৃতি অমোঘ হয়, আমরাও স্মৃতিকে সস্নেহে ডেকে এনেছিলাম সেদিন।

আমরা কে কবে প্রথম কফি হাউসে এসেছি? প্রেসিডেন্সীতে যারা পড়ত ফুটপাত পারাপার তাদের যোলো-সতেরো বছর বয়সেই সাঙ্গ হয়েছিল, দূর-কলেজের বন্ধুরা হয়ত আরো দু-এক বছর পরে প্রথম চিনেছিল কফি হাউসকে। কফি হাউসের রাজসভায় মন্ত্রী উপমন্ত্রী ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকবৃন্দ। কিন্তু বয়সকে সকলেই দরজার বাইরের পাপোশে জুতোর ধুলোর সঙ্গে রেখে ভেতরে ঢুকত। নইলে এম-এ পাশ-করা চাকরীর জন্যে হন্যে যুবক কি করে প্রথম বার্ষিকীর এক কাপ-ডিসের ইয়ার হয়। না, কফি হাউসে কারো বয়স ছিল না, জীবিকাগত এবং বিদ্যাগত সম্মানও না। কতদিন দেখেছি জনৈক ডক্টরেটের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক তর্ক করে এক অর্বাচীন—'আপনি ঘোড়ার ডিম জানেন' বলে কাপ উল্টে চলে গেছে এবং পুরোনো তর্কের সুতোর আবার গিঁট ফেলেছে পরদিন দুজনে মিলে। কতদিন এখানে হেড অফ দি ডিপার্টমেণ্ট ছাত্রদের মধ্যে সিগেরেট বিলিয়ে তাদের কাছ থেকে হিন্দী ছবির গল্প শুনেছেন।

কফি হাউসের জনতা আহ্নিক গতির সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। কফি হাউস
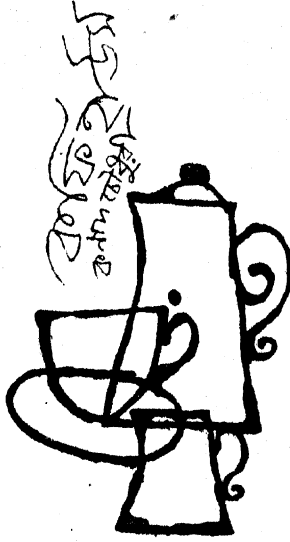
খোলার পর থেকে দুটো তিনটে পর্যন্ত কফি হাউস শাড়ির রঙ ঝিলমিল। অফ পিরিয়ড-ছুট ছাত্ররা ওই শাড়ির মধ্যে যেন জামদানী বুটি হয়ে ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করে। তখনকার কফি হাউসে আড্ডা জমে দু-তিন টেবিল জুড়ে। কিন্তু দুপুরের দিকে আড্ডার বিষয় সীমিত। অধ্যাপকদের সংক্ষিপ্ত নাম নিয়ে, ইউনিয়নের ইলেকশন নিয়ে, কলেজীয় কথা ছাড়া গীত নেই এই সময়ে। কফি হাউসের সন্ধ্যার লোক কেউ দৈবাৎ এই সময়ে ঢুকে পড়লে তাকে মনে মনে অন্ততঃ 'এলেম নতুন দেশে' গানটি গাইতে হবে। অবশ্য এমন অনেক ত্রিকালপুরুষও আছে যারা সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে—সব সময়ের সঙ্গী কফি হাউসের। দু-একজন কফি হাউস খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে, বন্ধ হলে যায়। কিন্তু তাতে কারো কিছুই এসে যায় না, বেয়ারাকে মাত্র কয়েক গ্লাস বেশী জল সরবরাহ করতে হয়। কফি হাউস সম্বন্ধে আরেক আশ্চর্য তথ্য হচ্ছে এখানে কথায় কথায় প্রেম হয় না, আবার হলে, শুধু কথায় কথায়ই প্রেম শেষ করতে হয়। অশরীরী প্রেমের পক্ষে কফি হাউস অনির্বচনীয় স্থান। মুখ-ভাব স্থির রেখে প্রেম, অপ্রেম অথবা অভিমান এখানে সকলের মধ্যেই বসে ব্যক্ত করা সম্ভব—তৃতীয়পক্ষ কিছুই জানবে না। প্রণয়িনীদের পক্ষে কফি হাউস স্বস্তির কারণও এই জন্যে যে লেকে কিংবা রেস্টুরেন্টের পর্দা দেওয়া কেবিনে প্রেমিকের পুরুষে হাতটিকে সামলানোর কষ্ট এখানে করতে হয় না এবং নির্জনতার গ্লানিও এখানে অনুপস্থিত।

কমন্স কফি হাউস (ইণ্ডিয়া কফি হাউস)

বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন-গুলোর হেড অফিসও এই এ্যালবার্ট হল কফি হাউস। সন্ধ্যের দিকে খালি সিগেরেটের প্যাকেট দলা পাকিয়ে যে কোনো একদিকে ছুঁড়লে হয় কোনো বেয়ারার গায়ে লাগবে কিংবা কোনো কবি-গল্পলেখকের গায়ে। ছোট ছোট পত্রিকার সম্পাদকরা নবারীতির লেখক-দের ধরবার জন্যে মফস্বল থেকেও আসেন কফি হাউসে। পুজো সংখ্যার প্রাক্কালে কবিরা প্রায় হ্যান্ডবিলের মত কবিতার পাণ্ডুলিপি বিলোতে থাকেন এখানে। এবং কফি হাউসে সাহিত্যের অথবা সাহিত্যিকের কোনো শ্রেণী বিভাগও নেই। কোনো কবিই কফি হাউসে কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠতর না। যে সব গল্পলেখকরা কদাচিৎ আসেন, কোথাও নতুন গল্প লিখলেই একবার না একবার তাঁদের এই দোতলায় উঠতে হয় পঞ্চ-মুখের প্রশংসা শুনবার আশায়।

এই এ্যালবার্ট হল আমাদের যৌবনের চারদিকে জড়িয়েছিল। দিল্লীর লোকসভার সদস্য আমরা হতে পারিনি, কিন্তু কফি হাউসের অলৌকিক সভার সদস্য হতে পেরে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছিলাম, হয়ত আজো করি। তাই শেষের সেদিন ভয়ংকর ছিল আমাদের চোখে। মনে হয়েছিল দৈনন্দিনের প্রলয়পয়োধিজলে নোয়ার নৌকোটাও ডুবে যাচ্ছে চোখের সামনে।

তখন আটটার সময় কফি হাউস বন্ধ হত। বিকেল চারটে থেকেই অতঙ্কিত চিকিৎসকের মত মুমূর্ষু কফি হাউসের নাড়ী ধরে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম আমরা।

পাঁচটা।

ছটা।

সাতটা।

অতিরিক্ত স্নায়ুপীড়ায় কাতর হয়ে কোণের চেয়ার থেকে কে যেন দৈববাণীর মত বলল,

—এখানে পাটের গুদাম হবে। ঐ কাউণ্টারের পেছনের দেয়ালে তেল সিঁদুর দিয়ে 'শুভলাভ' কথাটা লেখা হবে, ঘোড়ার নাল পেরেক দিয়ে মারা থাকবে দরজায়। এই ঘরে অন্ততঃ, অন্ততঃ দশ হাজার বেল পাট ধরে।

এই দৈববাণীর কেউ উত্তর দিল না, কলেজ স্ট্রীট পাড়া কখনো পাট-রাজ্যে অভিষিক্ত হতে পারে কিনা এই নিয়েও তর্ক করল না কেউ, জনৈক কবি-বন্ধু শুধু স্বগতোক্তিতে টেবিলে সাহস আনবার চেষ্টা করল।

—আমি বিপিন পালের গলা শুনতে পাচ্ছি।

আমরা সকলে চকিতে কাউণ্টারের বাঁ দিকের কোণটার দিকে তাকালাম। ওখানে অনেক আগে বক্তৃতা দেবার একটা ডায়াস ছিল।

অবশেষে ভয়ঙ্কর রাত আটটা এসে একে একে কফি হাউসের আলোগুলো নিভিয়ে দিল। পাখাও বন্ধ। দ্বাররক্ষী রজ্জু মিয়া মাথার খাকি টুপিটা এঁটে কফি হাউসের দরজার একটা পাট বন্ধ করে দিল। হঠাৎ অন্ধকার কোন এক কোণ থেকে যেন কে আজান দিল

—বন্দরের কাল হল শেষ!

কয়েকটা টেবিল কিন্তু সেই পনেরোই সেপ্টেম্বরের রাত্রিকে চির-কালের সন্ধ্যা করে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কয়েকটি মোমবাতি-জ্বলা টেবিলকে সেই বিরাট হলের অন্ধকার জলে দীপ্ত দ্বীপের মত ভাসিয়ে দিল কারা যেন। গোটাকয়েক মোমবাতি, কিছু ঈষদালোকিত মুখ, দেয়ালে মেঝেতে শোকার্ত শরীরের বিস্ফারিত ছায়া কফি হাউসটিকে সেদিন যে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, আজ বলা যাবে না, সেদিনও বলা যেত কিনা সন্দেহ। রাত আটটার পর আমরা কথা বলে শোক তাড়াবার চেষ্টা করিনি। সেদিন আমাদের ঐশী ক্রন্দনের একমাত্র ভাষা রবীন্দ্রসঙ্গীত। প্রথম গান, 'মোদের সব হতে আপন' আমরা সবাই মিলে গেয়েছিলাম।

রাত নটা সাড়ে নটার মধ্যে মোমের শরীর জ্বলে, গলে, পাত হল টেবিলে। শ্মশান-বন্ধু জনতা অন্ধকারের কবরে অ্যালবার্ট হল কফি হাউসের শবদেহ নামিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সিঁড়ি অন্ধকার। ছোট ছোট দেশলাইয়ের কাঠিকে একেকজন মশালের মতন জ্বালিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। নামতে নামতে শেষ শোকগাথা শুনলাম কালীপদর মুখে। কালীপদ হাবড়ায় মাস্টারী করে, লাল খেরো বাঁধানো খাতায় পদ্য লেখে, চীৎকার করে হাসে এবং প্রতি শনিবার একটা মরুভূমি আঁকা টিনের সুটকেস নিয়ে কলকাতায় আসে। 'কলকাতায়' আসে বলা ভুল হল, কফি হাউসেই আসে। হাবড়া থেকে বাক্স-প্যাটরা নিয়ে সোজা কফি হাউসেই এসে ওঠে, আটটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে ভবানীপুরে দিদিমার কাছে যায়। তিন বছর ধরেই চলছিল এরকম। কোনো শনিবার কালীপদ না এলে আমরা ওর শরীর সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হতাম। সেই কালীপদ যথারীতি একটি চীৎকৃত হাসির পর বলল।

—কফি হাউস বন্ধ হয়েছে, আর কোন শালা আমায় পায়। দেখি কেমন পয়সা জমে না এবার। হাবড়া থেকে আসার জন্যে ফি শনিবার আমার অন্তত পাঁচ টাকা বেরিয়ে যায়। এবার আমি ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কিনবো মাসে কুড়ি টাকার। সাড়ে বারো বছরে অনেক সুদ পাবো।

১৫ই সেপ্টেম্বর কফি হাউস বন্ধ হবার পর প্রথম কয়েকদিন কফি হাউসের তলার রকে বসে অ্যালবার্ট হলের স্মৃতিরক্ষার অমানুষিক চেষ্টা করেছিলাম আমরা। আমাদের মধ্যে আবার অনেকে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, আর কলেজ স্কোয়ারে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়িয়ে যেন হারিয়ে যাওয়া বাড়ির ঠিকানা খুঁজত। কেউ কেউ হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে না ভালবেসে কলেজ স্ট্রীটমুখো হওয়াই ছেড়ে দিয়েছিল।

কে যেন এই সময়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ কফি হাউসে বসবার প্রস্তাব করেছিল। প্রস্তাবটি নাকচ হয়েছিল সেই মুহূর্তেই। অ্যালবার্ট হল কফি হাউসের লোকদের পক্ষে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর কফি হাউসে যাওয়া অসম্ভব। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কে কবে অতুলপ্রসাদের সুরে গাইতে পারে! চিত্তরঞ্জন এভিনিউর ইণ্ডিয়া কফি হাউসে শ্রেণীহীন সমাজ নেই। 'হাউস অফ লর্ডস', 'হাউস অফ কমন্স'-এর দ্বিধায় কে যাবে ভাসতে? কিংবা হয়ত আমরা ভাসতামও কিন্তু ইতিমধ্যে অ্যালবার্ট হল কফি হাউসের আবার জীবনপ্রভাত হল। আমাদের সেই অনৈসর্গিক ভোর দেখালেন 'ইণ্ডিয়া কফি ওয়ার্কার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি' অর্থাৎ বন্ধ কফি হাউসের প্রাক্তন কর্মচারীবৃন্দ। আমাদের মধ্যে যারা পুনর্জন্মবাদে অবিশ্বাসী ছিল, তারাও ১৯৫৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর সকাল নটার পর থেকে হঠাৎ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। কারণ ঐদিন আবার আমরা আমাদের অলৌকিক সভাটিকে ফিরে পেয়েছিলাম। কফি হাউসের প্রাক্তন কর্মচারীরা সমবায়

সমিতি করে কফি হাউসের ভার নিজেরা গ্রহণ করলেন। সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে ভারতীয় কফি কর্মচারীদের এই সমবায় সমিতির নাম লেখা থাকবে। যে রজ্জু মিয়া ১৫ই সেপ্টেম্বর শেষবারের মতন রাত আটটায় কফি হাউসের দরজা বন্ধ করেছিল, সে আজকাল রাত নটায় কফি হাউসের দরজা বন্ধ করে। কফি বোর্ডের সময়ে তার খেতাব ছিল দারোয়ান কিন্তু আজকের রজ্জু মিয়া অ্যালবার্ট হল কফি হাউসের অন্যতম ডিরেক্টর। ইন্ডিয়া কফি বোর্ডও এই নবগঠিত সমবায় সমিতিকে স্নেহসিঞ্চিত করেছিলেন মাত্র সাত হাজার পচানব্বই টাকার বিনিময়ে কফি হাউসটি তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে। ১৯৫৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর সকালে আইনমন্ত্রী অশোক সেন এসে শুধু 'ইন্ডিয়া কফি ওয়ারকার্স কো-অপারেটিভ'-এর কফি হাউসটিরই দ্বারোদ্ঘাটন করলেন না, অনেক হৃদয়কেও হাজারদুয়ারী করলেন।

সাম্প্রতিক খবর আরো সুখের: যাদবপুরেও সমবায় সমিতির আরেকটি কফি হাউস নির্মিত হচ্ছে। সেই নতুন দিনের দাক্ষিণ্যের খবর একটি চৌকো ইস্তাহার কফি হাউসের দরজায় এখনো টাঙানো।

।।কফি হাউসের ইতিহাস।।

ভারতবর্ষ ইংরেজদের কাছ থেকে শুধু পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসি আর ক্রিকেটই পায়নি, কফি হাউসের উত্তরাধিকারও আমরা পেয়েছি ইংরেজদের কাছ থেকে। ইংরেজরা পেয়েছিল ইতালীর কাছ থেকে। যদিও পৃথিবীর প্রথম কফি হাউসটি স্থাপিত হয় পঞ্চদশ শতকের তুরস্কে, কিন্তু বৈঠকী কফি হাউসের আদি নিবাস ১৬৪৫ সালের ইতালী। ইতালীর পর ইংল্যাণ্ডের কর্ণহিলে ১৬৫২ সালে কফি হাউসের দরজা প্রথম খোলে। ইংল্যাণ্ডের ফ্লিট স্ট্রীটে দ্বিতীয় কফি হাউস প্রতিষ্ঠিত হলে ১৬৫৭ সালের মে মাসের পাবলিক এ্যাডভার্টাইজারে কফির গুণ-কীর্তন প্রকাশিত হয়:

The drink called coffee, which is very wholesome and physical drink, Quickening the spirits and making the heart lightsome.

ইংল্যাণ্ডের পর ১৬৭২ সালে প্যারিসে, ১৬৮০ সালে হামবুর্গে, এবং ১৬৮৩ সালে ভিয়েনায় কফি হাউসের

যাদবপুরে নতুন কফি হাউস নির্মিত হচ্ছে

আসর বসতে শুরু করে। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে কফি হাউসের সাঁতাকারের জন্মকাল বলা যেতে পারে। ইংল্যাণ্ডে কফি হাউস প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনে কফি হাউসের প্রভাব লক্ষিত হল। সেদিনেও কফি হাউস ইংরেজ তরুণদের ভালবাসার ধন ছিল। কফি হাউস গড়ে উঠল কেবল লণ্ডনেই না, লণ্ডনের বাইরেও। লম্বার্ড স্ট্রীটের এডওয়ার্ড লয়েডস কফি হাউস স্থাপিত হয় ১৬৯২। কফি হাউসটি জাহাজ-ব্যবসায়ীদের তীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল একসময়। জাহাজের খবর দিতে এই কফিখানাটিই ছিল তখনকার ইংল্যাণ্ডে একমাত্র আদার-ব্যাপারী। এখানে জাহাজীরা কফির পেয়ালায় পেয়ালায় জাহাজ চলাচল সম্পর্কিত নানা ধরনের সংবাদ আদান-প্রদান করতেন। এর ফলেই একদিন গড়ে উঠেছিল 'সোসাইটি অফ লয়েডস'—জাহাজী বীমা ব্যবসায়ের বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান।

প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডে কফি হাউসগুলির সুনাম ও দুর্নাম দুই-ই সমান ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস কফি হাউসকে কোনোদিন সুনজরে দেখেন নি। কারণ তাঁর সময়ে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল কফি হাউসগুলি। দ্বিতীয় চার্লস-এর মতে কফি হাউসগুলি ছিল 'রাজ-নিন্দুকদের আস্তানা'। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই সব কফি হাউস অনন্য সম্মান লাভ করে। আঠারো শতকের কফি হাউসগুলি, নাট্যকার ও কবি অলিভার গোল্ডস্মিথ, অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক, শিল্পী স্যার জসুয়া রেনল্ডস, অভিধান-রচয়িতা ডাঃ স্যামুয়েল জনসন ও তস্য জীবনীকার জেমস বসওয়েল প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের জ্যোতিতে আলোকিত ছিল।

হাল আমলে ইংল্যাণ্ডে কফি হাউসগুলির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। চ্যারিং ক্রশের একটি আধুনিকতম কফি হাউসে নিয়মিত শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন কর্তৃপক্ষ। তবে ইংল্যাণ্ডের তরুণরা কখনও কোনো একটা বিশেষ কফি হাউস আঁকড়ে পড়ে থাকতে চান না। কখন কোনটির জন্যে তাঁরা আকর্ষণ বোধ করবেন বলা কঠিন। তবে স্বভাবতঃই যেখানে চেনামুখ বেশী, ভিড়ও সেখানে বেশী।

কলকাতাই ভারতবর্ষে প্রথম কফি হাউসের নেশায় পড়ে। ১৭৮০ সালে কলকাতায় প্রথম কফি হাউসটি স্থাপিত হয়। কোম্পানীর সৈন্যরাই শহর কলকাতার প্রথম কফি-প্রেমিক জনতা। কফি হাউসে সেকালে মদ, হুঁকো এবং খবরের কাগজ পাওয়া যেত। 'পাঞ্চ', 'হরকরা'তে খবর কুড়োতেন কফি হাউসের খদ্দেররা। জাহাজের খবরের জন্যে ইংল্যাণ্ডের লয়েডস কফি হাউসের অনুকরণে কলকাতায় কফি হাউস স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন ওয়েদারিল নামে জনৈক ইংরেজ। 'ইস্ট ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিন'-এর ১৮৩৬ সালের একটি সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল:

COFFEE-HOUSE — Notice has been taken in the public prints of a scheme of Mr. Wetherill to open a coffee house in Calcutta. The plan is to connect with Spen-

কফি হাউস (কলেজ স্ট্রীট)

হয় 'কি চাই?' চাওয়া-পাওয়া শেষ হলে আর বলবার উপায় নেই, ডিশে বিল, মশলা আর খড়কে-কাঠি দিয়ে বিসর্জনের সংকেত আসবে, তারপরেও থাকলে, পাখা বন্ধ। এহেন জগতে বাঙালীর আপনপ্রিয় হেতে দেরী হয়নি কফি হাউসের। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও স্বীকার্য—বাঙালী কফি হাউসকে যতটা ভালবেসেছে, কফিকে ততটা নয়। কফি হাউসের আরেক কৃতিত্ব সে নিজে ঘেরা আলোয়, চিত্রিত দেয়ালে সেজে কলকাতার সাধারণ রেস্টু-রেন্টগুলোকেও সাজতে শিখিয়েছে।

কফি হাউসের উৎপত্তি ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর কাহিনী হলেও কফি ভারতবর্ষে এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ভারতবর্ষে কফির আবি-র্ভাবের সঙ্গে একটি কিংবদন্তী জড়িত। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে বাবাবুদান সাহেব দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রগিরি পাহাড় জয় করে সেখানে সানন্দে বসবাস করতে থাকেন। একদিন তিনি পরিচরদের ডেকে জানা-লেন যে, তিনি পুণ্যনগরী মক্কাতে তীর্থ-যাত্রায় যাবেন। সংবাদটি জানিয়েই তিনি একটি পর্বত-গুহায় ঢুকে গেলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং ভক্তরা গুহার মুখে মাসের পর মাস বাবাবুদান সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল পরে ভক্তবৃন্দের অপেক্ষা সার্থক হল। বাবাবুদান সাহেব বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে। ভক্তদের জানালেন যে, তিনি পুণ্য মরুভূমি থেকে তাদের উপহার দেবার জন্যে আশ্চর্য একটি গাছের সাতটি বীজ এনেছেন। এই বীজ আহার্য এবং পানীয়ের দু-কাজই করতে পারে। বীজটি সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রগিরি পাহাড়ে উপ্ত হল এবং পাহাড়টির নামও সঙ্গে সঙ্গে বদলে দেওয়া হল 'বাবাবুদান পর্বত।'

দাক্ষিণাত্যে বাবাবুদান পাহাড় আজো কফি উৎপাদনের অন্যতম অঞ্চল।

ces Hotel an establishment similar to that of the Jerusalem Coffee house in London, when all kinds of shipping intelligence will be procurable and letter bags will be made up, and those who want refreshments may have them at a moment's notice. The idea is good, and we are glad to find the scheme strongly supported by the mercantile community ......

প্রাচীন কলকাতার কফি হাউসগুলি প্রধানতঃ লালবাজার পাড়াতেই ছড়িয়ে ছিল। 'লন্ডন ট্যাভার্ন', 'হারমোনিক হাউস', 'ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ কফি হাউস' প্রভৃতির খ্যাতি ছিল সেকালে। কলকাতার হাল আমলের কফি হাউসের জন্মলগ্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। ইণ্ডিয়া কফি বোর্ড কলকাতায় প্রথম কফি হাউস স্থাপন করেন চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনউএ। কফি হাউস হবার আগে খাটাল ছিল ওখানে। যুদ্ধের সময় তৎকালীন সরকার কফি হাউসটি নিয়ে নেন। ফলে আরেকটা কফি হাউসের জন্যে জায়গা খুঁজতে থাকেন কফি বোর্ড। অ্যালবার্ট হলটি ভাড়া নিয়ে ১৯৪৪ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে কফি হাউস খোলা হয়।

চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউর কফি হাউস যখন প্রথম খোলা হয়, কফি প্রায় বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। তখন কফিতে ছারপোকার গন্ধ পেত। কিন্তু তবু ধীরে ধীরে চিত্তরঞ্জন এ্যাভি-নিউ-এর কফি হাউসটি জমে উঠল। কারণ বিশ্রাম নেওয়ার মতন, লোকজনের সঙ্গে দেখা করবার মতন, যতক্ষণ খুশী বসে আড্ডা দেওয়ার মতন আলো-পাখা-যুক্ত এমন হর্ম্যমন্দির কবে দেখেছে কল-কাতা কফি হাউস হওয়ার আগে? অন্যান্য রেস্টুরেন্টে ঢুকলেই প্রথমেই বেয়ারার বেয়াড়াপনার সম্মুখীন হতে

লর্ডস্ কফি হাউস (ইণ্ডিয়া কফি হাউস)

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(১২)

পশ্চিমের আবহাওয়ায় গ্রীষ্ম ঋতুর অসহ্য গরম ও শীত ঋতুর অত্যধিক ঠাণ্ডা মাতাঠাকুরাণীর ভগ্নস্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী না হওয়ায়, তিনি তাঁর কাশীধামের পৈতৃক ভবন ত্যাগ ক'রে পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চরণাশ্রয়ে স্থায়ীভাবে বাসের জন্য পুরীযাত্রা করেন। সেখানে তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হয়। ঐ সময় ইষ্টগুরু স্বর্গীয়া সাধুমাতা দেবী-পুরীর চক্রতীর্থে সুবর্ণ-গৌরাঙ্গের অপূর্ব মূর্তি ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠায় আমার মাতাঠাকুরাণীর ব্যক্তিগত অর্থোৎসর্গ যৎসামান্য ছিল না। মন্দিরে তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণ অবস্থান করতেন; সাধুমাতাদেবী ও তাঁর উত্তরসাধক শিষ্য শ্রীমৎ কিশোরানন্দ স্বামী ভজনের ক্ষেত্রে কীর্তনের যথেষ্ট মূল্য দিতেন এবং কলিকাতা থেকে গণেশ কীর্তনীয়া ও অন্যান্য মহাজনগণ মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রায়ই কীর্তন পরিবেশন করতেন। আমার মাতাঠাকুরাণী নিজ অবস্থানের জন্য গৌরাঙ্গমন্দিরের পাশেই একটি বাড়ী নির্মাণ করেন এবং তার নাম দেন শুভদ্রামন্দির। সেখানে জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রামূর্তি স্থাপন ক'রে নিত্যসেবার ব্যবস্থা তিনি ক'রেছেন; আজও সে ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। মাতাঠাকুরাণী পুরীক্ষেত্রে বাসের ফলে স্থায়ীভাবে তাঁর সঙ্গে সর্বদা অবস্থানের সুযোগ আমার রইল না। কেননা কলিকাতাই আমার বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত স্থানরূপে নির্ণীত হয়েছিল। যদিও প্রতি ছুটিতেই মাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য পুরীধাম-দর্শনের সৌভাগ্য আমার বরাবরই ঘটে এসেছে। কলিকাতায় ১৯১৮ সনে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর আমি মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনে ভর্তি হই। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপেই আমি ১৯২০ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। ঐ সময় অভিভাবকরূপে দেশের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ আমার শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য নিযুক্ত হন। পিতাঠাকুরের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে বৈষয়িক লোকদিগের অতিরিক্ত সমাগম হ'ত ব'লে আমার জন্য বিদ্যাশিক্ষার অনুকূলবর্তী একটি স্বতন্ত্র ছোটবাড়ী ভাড়া করা হয়। এখানে আমার অভিভাবকগণ ও একজন কর্মচারী আমার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিপূর্বে পিতাঠাকুর আমার এস্রাজ শিক্ষার যে ব্যবস্থা ক'রেছিলেন—তা এ সময়ে স্থগিত রাখা হয়। প্রসঙ্গক্রমে এ ক্ষেত্রে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

আমি বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে, সুকিয়া স্ট্রীটে অবস্থানকালে গয়ার ওস্তাদ সোণীপ্রসাদজী ও শীতলবাবুর নিকট খেয়ালগান ও এস্রাজ বাদনের যে সামান্য শিক্ষালাভ ক'রেছিলাম—তাতে সুরের সহজ জ্ঞানে আমার দক্ষতা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত সংগীত সমাজে এক বৈঠকে বাবা আমাকে নিয়ে যান। সেখানে আমি এস্রাজে ইমন ও পুরিয়া বাজিয়েছিলাম। পরে জানতে পেলাম যে ঐ বৈঠকে স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন এবং সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বারবার আমাকে দেখেছিলেন। তিনি নাকি আমার ভবিষ্যৎ সাংগীতিক সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর কোনও বন্ধুর নিকট মন্তব্য প্রকাশ করেন।

কিন্তু তখনকার দিনে পণ্ডিতসমাজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষার স্থলে সংগীত জিনিসটা ব্যসনরূপেই বিবেচিত হ'তো। অবশ্য ব্রহ্মসংগীত, স্তোত্র বা ভজন, ধার্মিকসমাজে আদৃত হ'তো। কিন্তু রাগসংগীত নাট্য-কাব্যসংগীত প্রভৃতি ছাত্রজীবনের বিশুদ্ধির পক্ষে অনুকূলরূপে কখনই বিবেচিত হতো না। এই কারণেই আমার বিদ্যালয়ে প্রবেশের সঙ্গেসঙ্গে সংগীতের চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। বাবার আন্তরিক আগ্রহ থাকলেও— পণ্ডিতসমাজের অনুশাসন আমার ক্ষেত্রে তিনি স্বীকার ক'রে নেন।

সংগীত-বিষয়ে সে যুগের মনোভাব বর্তমান সময়ে অত্যন্ত অযৌক্তিক, এমনকি হাস্যাস্পদরূপে বিবেচিত হবে। আজকাল কি কেহ একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ ক'রলে বা তাঁর সংগীতের চর্চা ক'রলে ছাত্রসমাজের অধঃপতন ঘটবে? এখন রবীন্দ্রনাথের কাব্য, গীত, নাটক, নৃত্য সম্বলিত বিরাট সংস্কৃতির ভিত্তিতে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আর তখনকার দিনে স্কুল ও কলেজের ছেলে-মেয়েরা অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে সঙ্গোপনে রবীন্দ্রকাব্য ও সংগীতের অনুশীলন ক'রতেন। রবীন্দ্রসংস্কৃতি সে যুগে বিশিষ্ট ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ ভিন্ন অন্যত্র নিষিদ্ধ ফলরূপেই বর্জনীয় ছিল। আমাদের মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনের লাইব্রেরীতে একটি ছাত্র রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী" গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার ফলে, তাকে কর্তৃপক্ষের শাসনের ভাগী হ'তে হয়েছিল। অবশ্য আমার অভিভাবকগণ ভক্তিমূলক সংগীতের পক্ষপাতী ছিলেন। আমার বিদ্যাভবনের তত্ত্বাবধায়ক স্বর্গীয় যোগেশ ভৌমিক ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অধিবাসী ছিলেন। আমার কাজের ভার গ্রহণের পূর্বে তিনি গৌরীপুর ও পার্শ্ববর্তী জমিদারদিগের কর্মচারীরূপে সংগীত শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। ধ্রুপদ, টপ্পা ও ভজন গানে তিনি সুদক্ষ ছিলেন, এবং স্বর্গীয় বিপিন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বিশ্বনাথ রাওয়ের নানা গান শিক্ষার সুযোগ লাভ তিনি করেছিলেন। আমার বিদ্যাভবনটি ছিল সুকিয়া স্ট্রীটের সংলগ্ন কালু ঘোষ লেনে অবস্থিত। এখানে প্রতি রবিবার আমাদের পাঠকক্ষে হরিসভার অনুষ্ঠান হ'তো। এখানে মদীয় অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ (যিনি নবদ্বীপে বেদান্তদর্শনের প্রধান প্রামাণিক পণ্ডিতরূপে স্বীকৃত), স্বনামধন্য দার্শনিক অধ্যাপক স্বর্গীয় রামদয়াল মজুমদার, বরিশালের সর্বপূজ্য দেশনেতা স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রিয়তম ছাত্র অধ্যাপক স্বর্গীয় শশীভূষণ ভট্টাচার্য প্রতি সপ্তাহেই অতি মনোজ্ঞরূপে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতার আরম্ভে ও শেষে যোগেশ ভৌমিকের ভক্তিসংগীত পরিবেশিত হ'তো। যোগেশবাবুর মাধ্যমেই আমার প্রাথমিক ছাত্রজীবনে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সহিত একটি যোগসূত্র বজায় রাখা সম্ভবপর হ'য়েছিল। তবে আমাদের পাড়াটিতে নানা বিচিত্র সংগীতের ধ্বনি সর্বদাই মুখরিত হ'তো। আমাদের বাসার সামনে একটি বড় বাড়ীতে অভিজাত বংশের সুশিক্ষিত এক ব্রাহ্ম পরিবারের অবস্থিতি ছিল। এই পরিবারের অন্তর্গত কয়েকটি তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তাঁরা প্রতি সন্ধ্যায়ই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতের সুরতরঙ্গে সারা পাড়াটি জীবন্ত ক'রে তুলতেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন স্কটিশচার্চের হোস্টেলে দুটি ছেলে ক্ল্যারিওনেট ও ফ্লুটের সহযোগে ঐ সকল গানেরই প্রতিধ্বনি তুলতো। তাছাড়া কাছাকাছি আর একটি বাড়ীতে বাংলার নাট্যজগতে সুখ্যাতা কঙ্কাবতী ও তাঁর ভগিনী চিত্রতারকা চন্দ্রাবতী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে ওস্তাদী গানের চর্চা ক'রতেন। তাঁদের পিতা প্রায়ই পশ্চিমদেশীয় ওস্তাদদের নিয়ে জলসার আয়োজন করতেন। আমাদের পার্শ্ববর্তী আর একটি বাড়ীতে একটি গৃহস্থ পরিবারের মালিক বাংলা ধ্রুপদের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে মিলিতভাবে

তিনি মৃদঙ্গসঙ্গতের সহিত ভজনমূলক বাংলা ধ্রুপদের চর্চার অবসর সময় কাটাতেন। এইভাবে আমার ছাত্র জীবনের চারপাশে সংগীতের আয়োজনের কোনও অভাব ছিল না; এবং সুরের স্পর্শ থেকে আমাকে কখনও বঞ্চিত হ'তে হয় নাই।

আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছু পরে ভারতের এক বিখ্যাত [illegible] যন্ত্র-শিল্পীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। ইনি ছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত স্বরোদী আমীর খাঁর পিতা আবদুল্লা খাঁ। আবদুল্লা খাঁর সহিত আমাদের যোগাযোগ ঘটেছিল শীতলবাবুর মাধ্যমে। বাবা যখন থেকে আমীর খাঁ'র কাছে শিক্ষা আরম্ভ করলেন, তার কিছুকাল পরেই শীতলবাবুকে দ্বারভাঙ্গায় পাঠানো হয়; —আবদুল্লা খাঁর নিকটে আলাপ, গৎ প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য। কেননা আমীর খাঁ ব'লেছিলেন যে পারিবারিক কারণে তিনি প্রথমযৌবনে পিতার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে অর্থ উপার্জনের জন্য রাজশাহী চ'লে আসেন। কিন্তু তাঁর বিদ্যা,—পিতার এক-চতুর্থাংশেরও বেশী নয়। তিনি শীতলবাবুকে দ্বারভাঙ্গায় যাওয়ার পরামর্শ দেন। আবদুল্লা খাঁ দ্বারভাঙ্গার মহারাজার দরবারে শ্রেষ্ঠ যন্ত্রশিল্পীরূপে সারাজীবন কাটিয়ে গেছেন। শীতলবাবু দ্বারভাঙ্গায় অবস্থানকালে বাবার নিকট হ'তে মাসিক বৃত্তি পেতেন,—শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যয়-কল্পে। সেখানে তিনি ভারতের দুইজন প্রসিদ্ধ সংগীতশিল্পীর সংস্পর্শে আসেন। একজন ছিলেন স্বরোদী আবদুল্লা খাঁ ও অপরজন কিরাণা ঘরানার খেয়ালী-শ্রেষ্ঠ আজিম খাঁ। এ'দের তালিম আজও আমাদের নিকট সুরক্ষিত রয়েছে। যাই হোক শীতলবাবুই আবদুল্লা খাঁকে কলিকাতায় নিয়ে আসেন কোন প্রধান চিকিৎসকের দ্বারা বৃদ্ধ ওস্তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা-কল্পে। সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে স্থানাভাববশতঃ, আমার কালু ঘোষ লেনের বিদ্যাভবনের একতলায় একটি ঘরে তাঁকে কয়েক দিনের জন্য রাখা হয়।

●

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

'জানাতে পারেন' বিভাগে আমার অজানা অনেক প্রশ্নের উত্তর পাই বলে খুব ভালো লাগে এই বিভাগটি। আমার দুটি প্রশ্ন তুলে ধরছি। উত্তর পেলে আনন্দিত হ'ব।

(১) পৃথিবীর কোন দেশে সর্ব-প্রথম গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হয়?

(২) 'শিলালিপি', 'লালমাটি', 'উপনিবেশ' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আদি নাম ছিল তারক গঙ্গোপাধ্যায়। এই তারক গঙ্গোপাধ্যায় এবং 'স্বর্ণলতা'র লেখক,—বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের ঔপন্যাসিক তারক গঙ্গোপাধ্যায় কি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি?

প্রবীর মিত্র,
তৃতীয় বর্ষ বি-এ
বিদ্যাসাগর কলেজ।
সিউড়ী, বীরভূম।

সবিনয় নিবেদন,

(১) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট গল্প কোনটি এবং তার রচয়িতা কে?

(২) ক'লকাতা শহরের বুকের ওপর বাস চল্‌তে সুরু হয় কবে থেকে?

(৩) ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন রেলওয়ে ষ্টেশন কোনটি?

অনেক খোঁজ ক'রেও উপরোক্ত প্রশ্নগুলির ঠিক ঠিক জবাব পাই নি। আপনাদের 'জানাতে পারেন' অতীব চিত্তাকর্ষক বিভাগটিতে বিভিন্ন প্রশ্নের আলোচনা পড়ে খুবই আনন্দ পাই। তবে এ'কথাও ঠিক, কতিপয় সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে আমার প্রশ্নগুলির জবাব অবশ্য মিল্‌বে।

কুমারেশ সেন,
১৪৬, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড,
নূতনপাড়া, বেহালা।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ১১ই অক্টোবর "অমৃত"-এর 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত নেপালের কাঠমণ্ডু হইতে প্রেরিত লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর :

(১) এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আমি ধূমপায়ী নই। তবে এক বন্ধুর নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে সিগারেট জ্বলা অবস্থায় আগুনের তাপমাত্রা ৫' হইতে ৭' সেন্টিগ্রেড এবং টানা অবস্থায় ৩' হইতে ৫' সেন্টিগ্রেড্ থাকে।

(২) ডাক-টিকিটের প্রথম প্রচলন হয় ইংল্যান্ডে—১৮৪০ সালে। এই ডাক-টিকিট কালো কালিতে ছাপা হতো আর পেনীর হিসাবে বিক্রী করা হতো বলে, তার নাম হ'য়েছে 'পেনি ব্ল্যাক ষ্ট্যাম্প' (Penny Black Stamp)। এই ডাক-টিকিটকেই বলা হয় ডাক-টিকিটের আদিপুরুষ। এই ডাক-টিকিটের নক্সা তৈরি করেন 'বেকন' (Bacon) আর 'পেচ্' (Petch) বলে দুই শিল্পী, আর এই টিকিট ছাপার ব্লক তৈরী করেন 'চার্লস হিথ্' (Charle's Hith)।

সেই খৃষ্টাব্দে (১৮৪০)-র শেষার্ধে স্যার রোল্যান্ড হিল কর্তৃক ভারতে প্রথম ডাক-টিকিটের প্রচলন আরম্ভ হয়।

বিগত ১৮ই অক্টোবর অনুপম ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রশ্ন দু'টির উত্তর :

(১) ক্রিকেট খেলা শুরু হয় কবে, ঠিক্ করে তা' বলা যায় না, তবে যতদূর জানা যায় তা' হ'তে বলা হয় ১৭০০ সালে ইংলন্ডের ক্লাপহামের সাধারণ একটি মাঠ হ'তে ক্রিকেট খেলার সূত্রপাত হয়। তবে সেকালের ক্রিকেট খেলা আর একালের ক্রিকেট খেলার মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে। 'ডন ব্রাড্‌ম্যানকে' ক্রিকেটের 'জনক' বলা হ'য়। প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হ'য় অষ্ট্রেলিয়ায় ইংল্যান্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে—১৮৭৬ সালে।

(২) অলিম্পিক ক্রীড়ায় হকির প্রচলন হয় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। এন্টয়ার্পের সেই খেলায় ভারত প্রথম যোগদান ক'রে বিশ্বজয়ীর খেতাব অর্জন ক'রে।

শ্রীচিন্ময় চৌধুরী,
নন্দন-কানন,
ডানকুনি,
হুগলী।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৩য় বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩০শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ নয়া পয়সা

শুক্রবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

Friday, 29th November, 1963 40 Naya Paise.

সূচীপত্র

সাপ্তাহিকী

।। শ্রীনেহরুর জন্মদিবস ।।

গত ১৪ই নভেম্বর সমারোহ সহকারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ৭৪তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন দিল্লীতে তাঁর বাসভবনে যেয়ে প্রথমেই তাঁকে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন, উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়া।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও শ্রীনেহরুর পুণ্য জন্মদিনটি 'বিশ্ব শিশু দিবস' হিসাবে পালিত হয় ভারতের প্রতিটি রাজ্যে। প্রধানমন্ত্রীও ঐ দিন অনেকটা সময়ই রাজধানীতে শিশুদের মাঝে কাটান। শত শত শিশু ফুল, মালা ও অন্যান্য উপহার নিয়ে নির্ভয়ে তাঁর নিকট হাজির হয়। একজন নিতান্ত আপনার মানুষকে পেয়ে তারা উচ্চ জয়ধ্বনি তোলে— 'চাচা নেহরু জিন্দাবাদ।'

সমগ্র ভারতের সঙ্গে কলকাতাতেও ১৪ই নভেম্বর নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশু দিবস ও 'চাচা নেহরুর জন্মদিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের উক্তি: আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী (শ্রীনেহরু) শুধুমাত্র শিশুদের ভালবাসেন না, বিশ্বের শিশুদের কল্যাণে নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেছেন।

।। পূর্বাঞ্চল পরিষদ ।।

ইতোমধ্যে গত ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর পাটনায় পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠক হয়ে গেছে। পরিষদের এই অষ্টম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ। আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং নেফা ও নাগাভূমি নিয়ে পূর্বাঞ্চল পরিষদটি গঠিত।

পূর্বাঞ্চলীয় সরকারী নেতৃবৃন্দকে হুঁশিয়ার করে আলোচ্য বৈঠকে শ্রীনন্দ বলেন যে, চীনারা সরে গিয়েছে, এই ভেবে সন্তুষ্টির মনোভাব গ্রহণের আদৌ কারণ নেই। পরন্তু, চীনা সামরিক বাহিনী এখন অবধি ভারতীয় সীমান্তের নিকটেই রয়েছে। পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে যে নতুন আঁতাত গড়ে উঠেছে, তা-ও উপেক্ষা করা চলতে পারে না।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি বিশেষ ঘোষণা: পাকিস্তান থেকে আসামে (ভারত) আগত ব্যক্তিদের বহিষ্কারের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার জন্য দুইটি ট্রাইবুনাল গঠন করা হবে এবং এতে সদস্য থাকবেন আসামের কয়েক জন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ। পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত: ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা ত্রিভাষিক 'ফর্মুলা' গ্রহণ করবে। উভয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় শ্রীসেন (পশ্চিমবঙ্গ) ও শ্রীবীরেন মিত্র (উড়িষ্যা) এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিয়েছেন, সংবাদে এ-ও জানা যায়।

।। ভারী যন্ত্র কারখানা ।।

রাঁচীর সন্নিহিত হাতিয়ায় সুবৃহৎ ভারী যন্ত্রপাতির কারখানাটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৫ই নভেম্বর। অতিমাত্রায় গুরুত্ববহুল এই কারখানাটি তিনি উৎসর্গ করেন জনগণের উদ্দেশে। ভারতের বৃহত্তম শিল্পসংস্থা হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশনের যে চারটি প্রকল্প সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সাহায্যে রূপায়িত হচ্ছে, হাতিয়ার আলোচ্য কারখানাটি তার অন্যতম।

এই উপলক্ষে ভারত-সোভিয়েট ও ভারত-চেক সহযোগিতার স্মারক হিসাবে নির্মিত পঁচিশ ফুট উঁচু প্রতীকস্তম্ভের আবরণও শ্রীনেহরু জয়ধ্বনির মধ্যে উন্মোচন করেন। প্রধানমন্ত্রীকে 'স্বাগত' অভ্যর্থনা জানান বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়। এদিকে ১৬ই নভেম্বর প্রাতে শ্রীনেহরু দুর্গাপুরে (পশ্চিমবঙ্গ) এসে নতুন তৈরী কয়লাখনি যন্ত্র নির্মাণ কারখানাটিও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর মতে এ হলো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে আর একটি বৃহৎ সোপান।

ঐ তারিখেই (১৬ই নভেম্বর) অপরাহ্নে শ্রীনেহরু চিত্তরঞ্জনে যেয়ে কর্মযোগী ডাঃ বিধানচন্দ্রের নামাঙ্কিত প্রথম বৈদ্যুতিক এ-সি রেলইঞ্জিনটি ('বিধান ইঞ্জিন') 'জয়হিন্দ' ধ্বনিসহকারে চালু করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন, রেলমন্ত্রী শ্রীদাসাপ্পা ও ইস্পাতমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রাহ্মণ্যম্।

।। ব্রহ্মে ধরপাকড় ।।

গত ১৬ই নভেম্বর জেনারেল নে উইনের বিপ্লবী সরকার ব্রহ্ম দেশের সর্বত্র হানা দিয়ে কম্যুনিস্টদের ব্যাপক ধরপাকড় করেন। প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে এপর্যন্ত ৪৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ধৃত ব্যক্তিরা সকলেই (কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ সমেত) চীনাপন্থী। প্রকাশ, কম্যুনিস্ট বিদ্রোহী ও সরকারের মধ্যে শান্তি আলোচনার চব্বিশ ঘন্টার ভিতরই ঐ ধরপাকড় করা হয়। একমাত্র রেঙ্গুণেই ২৮৭ জনকে ধরা হয়েছে। জেনারেল নে উইনের মন্তব্য: কম্যুনিস্টরা আন্তরিকভাবে শান্তি চায় না।

।। মন্ত্রিসভায় রদবদল ।।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদল সম্পর্কে নয়াদিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে গত ১৯শে নভেম্বর একটি ইস্তাহার প্রচারিত হয়েছে। এই ইস্তাহার অনুসারে শ্রীএম সি চাগলা শিক্ষামন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েছেন। সংসদ সদস্য শ্রীভক্তদর্শন এবং উপমন্ত্রী শ্রীএ এম টমাসকে যথাক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ও খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের বর্তমান মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির পেট্রল ও রাসায়নিক দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন এবং ইস্পাত ও ভারী শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুব্রাহ্মণ্যম নিযুক্ত হয়েছেন ইস্পাত, খনি ও ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং মন্ত্রী।

অপর দুইটি বিশেষ নিয়োগ: আসামের রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণু সহায়কে নাগাভূমিরও রাজ্যপাল নিয়োগ করা হয়েছে। জেনারেল শ্রীনাগেশের স্থলে অন্ধ্রপ্রদেশের অস্থায়ী রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীপি চন্দ্র রেড্ডি।

।। 'অবন মহলে'র ভিত্তি ।।

শ্রীনেহরুর জন্মদিনে (১৪ই নভেম্বর) গড়িয়াহাটা রোডে (কলকাতা) শিশু রঙমহলের পরিকল্পিত স্থায়ী ভবন 'অবন মহলের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামেই এইটি উৎসর্গ করা হয়েছে। শিশু রঙমহলের সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সেন (কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী) এই উপলক্ষে এক ভাষণে বলেন—পরিকল্পিত 'অবন মহলের' শীর্ষে অগ্নিশিখার যে প্রতীক স্থাপিত হবে, তা অনির্বাণ আনন্দময় জীবনশিখারই হবে দ্যোতক।

।। 'ডেঙ্গু' জ্বরের প্রকোপ ।।

কিছুকাল ধরেই কলকাতায় একটি নতুন ধরণের জ্বর চলেছে। 'ফ্লু'র অনেক লক্ষণ থাকলেও 'ফ্লু' অপেক্ষা এ সমধিক মারাত্মক—ক্ষেত্রবিশেষে রোগীর রক্তবমনও হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর একে ডেঙ্গু জাতীয় জ্বর বলছেন—অবশ্য মহানগরীর হাসপাতালগুলির অভিমত সেরূপ নিশ্চয়ার্থক কিছু নয়। কারো কারো মতে এক শ্রেণীর মশা 'ইডিস' এই রোগের বাহন। 'ডেঙ্গুর' প্রকোপে এযাবত প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীকে শয্যা নিতে হয়েছে—মৃত্যুকবলিত হয়েছেন বেশ কিছুসংখ্যক লোক—যার মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশী। ১৬ই নভেম্বরের এক সংবাদে বলা হয় উক্ত ব্যাধির কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ের জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছেন।

সম্পাদকীয়
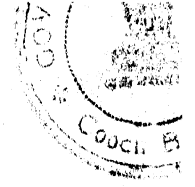
প্রেসিডেন্ট কেনেডির পরলোকগত আত্মার প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করি।

সপ্তদশ শতকের আরম্ভে ইংলন্ডে এক নূতন খ্রীষ্টিয় ধর্মসম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতা স্থির করেন যে, তাঁহারা মহাসাগরের ওপারে, নূতন দেশে যাইয়া নিজেদের মনোমত ও ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী সমাজ স্থাপন করিবেন। সেই উদ্দেশ্যে ইঁহারা উত্তর আমেরিকায় এক প্রশস্ত ভূমিখণ্ড ব্রিটিশরাজ সরকার হইতে ইজারা লইয়াছিলেন। এবং সেই উদ্দেশ্যে ইঁহাদের প্রথম দলের আটাত্তর জন পুরুষ ও চব্বিশ জন স্ত্রীলোক, ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বরে "মে ফ্লাওয়ার" নামক জাহাজে নূতন দেশের ও নবজীবনের আশায় মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়াছিলেন। সেই যুগের পালখাটানো জাহাজের নির্ভর ছিল বায়ুস্রোতের উপর এবং সেই কারণে ঝড়ঝাপ্টার ঠেলায় সাড়ে তিন মাস ঘুরিয়া শেষে ২১শে ডিসেম্বর ইঁহারা মাসাচুসেট্‌সের সমুদ্র-উপকূলে নামিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই স্থানটি ইঁহাদের ইজারার জমি, নিউ জারসি, হইতে অনেক দক্ষিণে। এই দুই অঞ্চলই বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং ঐ কঠোর শুদ্ধাচারী ধর্মপ্রাণ দল—যাঁহারা মার্কিন ইতিহাসে "তীর্থযাত্রী পিতৃগণ," (Pilgrim Fathers) নামে খ্যাত—যে সভ্যতা ও কৃষ্টির আদর্শ মাসাচুসেট্‌সে স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই ধারায় ঐ অঞ্চলের প্রধান নগর, বষ্টন, এখনও মার্কিন দেশে কৃষি-সংস্কৃতির প্রধান নগর বলিয়া খ্যাত। উত্তর আমেরিকার আদিম অসভ্য দেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিস্থাপনের জন্য "পিলগ্রিম ফাদার্স" ও তাঁহাদের ক্ষুদ্র জাহাজ "মে ফ্লাওয়ার" মার্কিন দেশে ও উত্তর আমেরিকায় চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

সেই পিতৃগণের আগমনের পর আরও তিন শতাব্দী অতীত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে ঐশ্বর্যে, যন্ত্রকৌশলে এবং পার্থিব শক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথাকথিত সভ্যজগতের শীর্ষস্থানে আরোহণ করে। কিন্তু এই সকল ধনদৌলত, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের সরঞ্জাম, সবকিছুই ছিল একান্তভাবে শ্বেতাঙ্গদিগেরই জন্য। কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো ও তখনকার দিনের তাম্রবর্ণ "ইণ্ডিয়ান" ছিল আদিম অন্ধকারে নিমজ্জিত ও প্রায় সকল রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর মার্কিন দেশের এই বঞ্চিত ও প্রতারিত নাগরিকগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সেই কারণে তাহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে আন্দোলন ও আলোড়ন আরম্ভ হয়। এই অতি মৃদুমন্দ আন্দোলনের প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাহাদের শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশীদিগের মধ্যে, বিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের "দক্ষিণ" অঞ্চলে। সেখানকার শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে হিংসাদ্বেষের আগুন এমনই প্রচণ্ডভাবে জ্বলিতে থাকে যে তাহার বশে শ্বেতাঙ্গের দল নানা গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া—যথা কু-ক্লক্স-ক্লান (Ku-Klux-Klan)—পশুবৃত্তির চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতে লাগিল। এই ব্যাপার চূড়ান্তে উঠে যুক্তরাষ্ট্রের "হিরন লেকস্‌" (Heron Lakes) নামক অঞ্চলে সেখানে একদল শ্বেতাঙ্গ পশু স্থানীয় অসহায় নিগ্রোদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে এবং কয়েকজনকে জীবন্ত পোড়াইয়া মারে। সেই সংবাদে সারা জগৎ বিচলিত হইয়া উঠে।

লন্ডনে এক সাংবাদিক জর্জ বার্ণাড শ'কে এই সংবাদ সম্পর্কে তাঁহার কি মন্তব্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "আবার 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজটাকে ঠিক করা প্রয়োজন হয়েছে। ঐ অসভ্য বর্বরদের দেশে কিছু সভ্যতা নিয়ে যাওয়া দরকার।" জগৎব্যাপী এইরূপ নিন্দাবাদের ফলে মার্কিন দেশের উন্নত সমাজের লোকে এই পাশবিক অত্যাচার দমন করিতে অগ্রসর হন এবং তাঁহাদের দৃঢ় চেষ্টার ফলে সেই অত্যাচার বন্ধ হয়।

তারপর আরও চল্লিশ বৎসরের অধিক চলিয়া গিয়াছে। "রক্তাভ" ইণ্ডিয়ানদিগের জন্য যে সকল অঞ্চল রক্ষিত ছিল, সেখানে পেট্রোল খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহাদের আর্থিক উন্নতি হইয়াছে। অন্যদিকে ঐ দুর্দান্ত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি, সাহস ও কঠোর অনমনীয় ভাবের জন্য শ্বেতাঙ্গদিগের প্রশংসা পাইত। সুতরাং অর্থসঙ্গতির সঙ্গে সভ্যতার বহিরাবরণ পাওয়ার কারণে তাহারা জাতে উঠিল। কিন্তু নিগ্রো রহিল যে তিমিরে সেই তিমিরে। এবং এক শ্রেণীর মার্কিন শ্বেতাঙ্গের—বিশেষে দক্ষিণ অঞ্চলে—অন্তরে সেই আদিম পশু রহিল প্রচ্ছন্ন।

সম্প্রতি মার্কিন নিগ্রো তাহার জন্মাধিকার উদ্ধার করার জন্য অহিংস সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে এবং সেইসঙ্গে মার্কিন দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ মুখোশ খুলিয়া সেই পশুমূর্তি প্রকাশ করিয়াছে। এবং সেই পশুবৃত্তির চরম নিদর্শন দেখা দিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যায়। কেনেডি নিগ্রোর রাষ্ট্রীয় অধিকারকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

ভারতের নতুন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা একজন সুবিবেচক ব্যক্তি। তিনি কার্যভার গ্রহণের পর এক ভাষণে বলেছেন যে, সকলকে যথাসম্ভব ফাইলের কাজ কমিয়ে প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থাকে 'কাগজপত্রের যুগ' বলা হয়; কাগজপত্রের বিড়ম্বনা কমে গেলে জীবন-যাত্রা অনেক হাল্কা ও সুখপ্রদ হবে।

কথাগুলো সত্যিই চিন্তা করার মতো। কিন্তু কিছুক্ষণ সমস্ত দিক বিবেচনা করে বুঝতে পারলাম, 'কাগজের যুগ' থেকে বেরিয়ে আসা এখন আমাদের পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য।

'কাগজের যুগ' এবং হুজুগ

লিখিত কাগজ মানেই হল কোনো না কোনো রকম রেকর্ড। আজকাল প্রশাসনিক ক্ষেত্র এত ব্যাপক ও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে রেকর্ড ছাড়া এক পাও চলা অসম্ভব। মানী ব্যক্তিদের মুখের কথার খুবই দাম বটে, কিন্তু আইন বা নজিরের ক্ষেত্রে লিখিত প্রমাণ ছাড়া পার পাওয়া কঠিন। তাই সময়কালে আমরা খুঁজি কেবল এক টুকরো কাগজ—যে কাগজ না দেখাতে পারলে লক্ষ টাকার কনট্রাক্ট থেকে বসতভিটেটুকু পর্যন্ত উবে যেতে পারে।

কাজেই কাগজের অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসা এখন আর সম্ভব নয়, সম্ভব শুধু সেই অরণ্যকে বাসযোগ্য করা।

সকলেই জানেন, যুদ্ধবিগ্রহের প্রধান উপকরণ হল ইস্পাত। তরবারী থেকে বোমা পর্যন্ত সব কিছু তৈরী করতেই ইস্পাতের দরকার। ফলে কেউ হয়তো বলতে পারেন, ইস্পাতই মানুষের সমস্ত রকম অশান্তির মূল কারণ। কিন্তু তা বললে কি সত্যি বলা হবে? কলেজী ডিবেটের ঢঙে প্রতিপক্ষ তো তৎক্ষণাৎ লাঙ্গলের ফলা থেকে রেলগাড়ি, ঘর-বাড়ী পর্যন্ত ইস্পাতের অনেক উপকারী ব্যবহার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারেন?

অতএব কথাটা হল প্রয়োগ। ভালো জিনিসকেও খারাপভাবে প্রয়োগ করলে তার ফল বিষময় হয়ে উঠতে পারে। কাগজের অপব্যবহার তার অন্যতম নিদর্শন। প্রাণহীন কাগজের উপর ততোধিক নিষ্প্রাণ ব্যক্তি যখন মসিচালনা করেন তখন তার চরম লক্ষ্য থাকে শুধু ফাইল বৃদ্ধির দিকে, কিন্তু সেই কাগজই সহৃদয় ব্যক্তির লেখনীস্পর্শে যখন প্রাণ-চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন তার লক্ষ্য থাকে কাজের দিকে।

আসলে কাগজ একটা উপলক্ষ মাত্র। মূল কথা হল মন। সেই মন নামক বস্তুটি যার সংবেদনশীল নয়, তার পক্ষে 'কাগজের যুগ' আর 'কাজের যুগ' একই কথা, কারণ সবটাই তার কাছে হুজুগ মাত্র।

নতুন শিক্ষামন্ত্রী যদি এ বিষয়ে আমাদের মনকে শিক্ষিত করতে পারেন, তবে তা হবে জাতির মহৎ উপকার।

•

• •

এক খবরে জানা যাচ্ছে, শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী নামে জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী শেঠ সুখলাল কারনানী হাস-পাতাল থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। অনেকদিন ধরে তিনি ভুগছিলেন। কয়েক মাস আগে তাঁর একবার অপরেশনও হয়েছিল। কিন্তু তাতে অসুখ না কমায় তিনি এই নামকরা হাসপাতালে নিরাময় হতে এসেছিলেন। ঘটনার দিন তাঁকে এক্স-রে রুমে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করা হয়। তারপর তাঁকে স্ট্রেচারে করে বেডে নিয়ে যাবার সময় তিনি নাকি বলেন যে তিনি হেঁটেই যেতে পারবেন। কিন্তু সেই যে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল তারপর থেকে তাঁকে পাওয়া যায়নি। (পরে কী হয়েছে তা অবশ্য বলা কঠিন, ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত তাকে পাওয়া যায়নি আমরা এই খবরই জানি।)

হাসপাতালে গমন, না পাতাল প্রবেশ?

এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই পরে তদন্ত হবে। সেই তদন্তের সাহায্যের জন্য আমি কয়েকটি পয়েন্ট এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

১। শ্রীচক্রবর্তী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকেই যে এক্স-রে করা হয়েছে তার নিশ্চয়তা কী? এমনও হতে পারে যে তিনি আগেই চলে গিয়েছিলেন, এক্স-রে করা হয়েছে অন্য ব্যক্তিকে?

২। যদি শ্রীচক্রবর্তীকেই এক্স-রে করা হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন এই যে, যে ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থ এবং যাঁকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যেতে হয়, তিনি পায়ে হেঁটে কতোদূর যেতে পারেন?

৩। যদি তিনি বেশি দূর যাওয়ার মতো শারীরিক অবস্থায় না থাকেন তবে এমন কি হতে পারে না যে, তিনি স্ট্রেচারে চেপেই গেছেন, কিন্তু বেডের দিকে নয় গেটের দিকে?

৪। যদি তা গিয়ে থাকেন, কিম্বা যদি তা না গিয়ে পায়ে হেঁটেই গিয়ে থাকেন তাহলেও হাসপাতালে চিকিৎসা করতে এসে একজন বয়স্ক কর্মচারীর পক্ষে হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক বলা যায় না কি?

৫। এই অস্বাভাবিক কাজের জন্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কতোখানি দায়ী?

বিদেশে লোকে একটু অসুস্থ বোধ করলে হাসপাতালে যায় চেক-আপ করতে, কিন্তু এদেশে হাসপাতালে যাই আমরা নেহাৎ বাধ্য হয়ে। সেই একান্ত নিরুপায় অবস্থাতেও মানুষ যখন হৃদয়হীন ব্যবহার পায়, তখন কোথাও আর তার

কিছু আশা করার মতো থাকে না। এই রকম অবস্থাতেই হয়তো কেউ কেউ হাসপাতালে থেকে বেরিয়ে যান। কেন না তাঁদের চোখে হাসপাতালে ঢোকা আর পাতালে প্রবেশ করা হয়তো এক কথা হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীচক্রবর্তীকে পাওয়া গেলে হাসপাতাল পলাতক ব্যক্তিদের সঠিক মনোভাব কী রকম এ বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করা যেত।

•
• •

সেদিন হিন্দী নিয়ে লোকসভায় আরেক রাউণ্ড লড়কে লেংগে হয়ে গেল। বিষয়টা আর কিছুই নয়, জনৈক সদস্য হিন্দীতে প্রশ্ন করার পর শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন ইংরেজিতে তাঁর উত্তর দিতে শুরু করলে হিন্দীপ্রেমিকেরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাঁদের দাবি, লোকসভায় হিন্দীতে প্রশ্ন করলে তার উত্তর হিন্দীতেই দিতে হবে। বলা বাহুল্য, অহিন্দীভাষীরা এ আবদারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু তাতে অবস্থার যে কিছু উন্নতি ঘটবে তা মনে হয় না।

উলট পুরাণের মূর্তিযোগ

হিন্দীওয়ালাদের অসহিষ্ণুতার কারণ আছে। বহু রকম চেষ্টা করে অজস্র টাকা খরচ করেও হিন্দীভাষাকে তাঁরা আকর্ষণীয় করতে পারেন নি। আজ পর্যন্ত হিন্দীতে এমন সাহিত্য রচিত হয়নি যার জন্যে একজন বাঙ্গালী, মারাঠী বা তেলেগুভাষী অন্তরের রসপিপাসায় হিন্দী শিখতে আগ্রহী হয়। অথচ হিন্দী এক বিশাল ভূমিখণ্ডের ভাষা এবং ভারতীয় রাজনীতিতে যেমন সে-অঞ্চলের প্রভাব পূর্ব নির্ধারিত, ভারতের অর্থনীতিতেও তেমনি তার অবদান ক্রমবর্ধিষ্ণু। এ হেন অঞ্চলের ভাষা যদি সারা ভারতে প্রাধান্য অর্জন করতে না পারে তবে সেখানকার প্রতিনিধিদের মনঃকষ্টের কারণ ঘটে বই কি!

হিন্দী সংক্রান্ত এই ক্রনিক সমস্যার সমাধানে জৈমিনি এখন দুটি প্রস্তাব পেশ করছে। এর যে কোনো একটি মেনে চললে অবস্থা আয়ত্তাধীনে আসতে পারে। (কারণ এ হল স্টীম রোলারের ব্যবস্থা, সব কিছু প্লেন করাই এর উদ্দেশ্য!)

প্রথম হল, সংবিধানের মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা করা যাতে লোকসভার প্রার্থী হতে গেলেই হিন্দী জানাটা হবে আবশ্যিক। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটা পরীক্ষা নিয়ে হিন্দীর ডিপ্লোমা দেওয়া হোক। এ পরীক্ষায় যাঁরা ফেল করবেন তাঁরা যতো যোগ্যই হোন, এম-পি পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে পারবেন না। (অ-হিন্দীভাষী ও হিন্দী-বিরোধীদের এই উপায়ে সহজেই জব্দ করা যেতে পারে।)

কিন্তু যদি এতে চক্ষুলজ্জা দেখা দেয়, তাহলে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কাজ করা যেতে পারে। কারণ এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটা অনেক বেশী গণতান্ত্রিক।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটা হল লোকসভার অধিবেশন পর্যায়ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বসানো এবং যখন যে অঞ্চলে অধিবেশন বসবে তখন ইংরেজি ছাড়া সেই অঞ্চলের ভাষাকে দেওয়া হবে অগ্রাধিকার। আঞ্চলিক গণতন্ত্রের এই মোক্ষম দাওয়াই পড়লে হিন্দীপ্রেমীদের অত্যুৎসাহ কতোদিন টেকে দেখা যাবে। মাতৃভাষায় সোরগোল করা আর অপরের ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ তা তাঁরা কোনোদিন হাড়ে হাড়ে টের পাননি বলেই অন্যের মাথার উপর হিন্দীর বোঝা চাপাতে চান। একবার দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার যাঁতাকলে পড়লে ভাষার ব্যাপারে আর দস্তস্ফুট করতে হবে না!

তালকোটরা-কথা

দিল্লী থেকে বলছি

নিমাই ভট্টাচার্য

প্রীতিভাজনেষু ক খ গ-বাবু,

ছাত্রজীবনে হেডমাষ্টারমশাই'কে যা ভয় করতাম, তার চাইতে অনেক বেশী ভয় করি আজ হাফ-লেখক, হাফ-সাংবাদিক হিসেবে আপনার মত ব্যক্তিকে এবং পাঠকদের। প্রতি সপ্তাহে একটি করে নৈবেদ্য পাঠিয়ে আপনাদের অধরে হাসি ফুটোবার চেষ্টা করি; কিন্তু জানি না গৃহ-দেবতার মত আপনারা সে সামান্য নৈবেদ্যে সন্তুষ্ট হন কিনা। এ সপ্তাহে আমার অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। সামান্যতম নৈবেদ্য দেবার মত একমুঠো আতপ চাল বা একটি কলা-বাতাসাও নেই। অদৃষ্ট নেহাতই খারাপ; নয়ত আমার এমন দুর্মতি হবে কেন? দিল্লীর অন্যান্য বুদ্ধিমান ও আধুনিক যুবকদের মত কদিন এই রাজধানীর তালকোটরা গার্ডেনে শ'পাঁচেক ছেলে আর শ'দুই মেয়ের ভীড়ের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে আজ আমার এমন পোড়াকপাল হবে কেন?

আপনি তো সবই জানেন। প্রত্যেক বছর শরতকালের শেষাশেষি রাজধানীতে ছাত্র-ছাত্রীদের একটা সর্ব-ভারতীয় ককটেল হয় এডুকেশন মিনিষ্ট্রীর উদ্যোগে। সরকারী ভাষায় এই মহোৎসবের নাম 'ইউথ ক্যাম্প'। পুরো এক সপ্তাহ ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির পাঁচ-সাত শ' ছেলে-মেয়ে মিলে থাকে। কুরুক্ষেত্রের ঐ ফাঁকা মাঠে পাঁচ হাজার বছর আগে কুরু-পান্ডবদের জ্ঞাতি-লড়াই'এর সময় যেমন অসংখ্য তাঁবু পড়েছিল, আমাদের রাজধানীর তালকোটরা গার্ডেনেও তেমনি অসংখ্য তাঁবু পড়ে এই শত শত যুবক-যুবতীদের জন্য। ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের জন্য যতগুলি দাওয়াই দরকার, তার সবই এই উৎসবে পাওয়া যায়। নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, বিতর্ক-সভা ও এমনি আরো অনেক কিছু। এডুকেশন মিনিষ্ট্রী এমন একটা ভাব দেখায় যে এই উৎসবের পর ছেলেমেয়ের দলের 'সেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী-ভারতবর্ষ' ছাড়া আর কোন চিন্তা মানসপটে ফুটে উঠবে না। বেশ ক'বছর ধরে এই উৎসব হচ্ছে এবং এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কতদূর এগিয়েছে সে-খবর তো সবাই রাখেন।

গতবার মাও-সে-তুং আর চৌ-এন-লাই'এর জন্য এমন সুন্দর উৎসবটা হতে পারেনি। এবার আবার হলো। শেষের দিন সন্ধ্যায় কমিউনিটি কিচেনে মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে ছেলেমেয়ের দল পংক্তি ভোজন করল। চালু ছেলেমেয়ের দল শুধু তেলে ভাজা আর প্যাঁড়াই খেলো না, পোজ দিয়ে ছবিও তুলে নিয়েছে নেতাদের সঙ্গে। অনেকের অটোগ্রাফ-খাতা ধন্য হয়ে গেছে এই উৎসবের কদিনে। সব শেষে সাতশ' ছেলেমেয়ে আর কয়েক ডজন অধ্যাপক-কাম-অভিভাবকের দল জনতা এক্সপ্রেসের শ্লিপিং কোচ বোঝাই করে দিল্লী ত্যাগ করল।

যত সহজে এই সপ্তাহব্যাপী উৎসবের বর্ণনা দিলাম, ঠিক এত সহজে কিন্তু কাজ হয় না বা হয়নি। সেক্রেটারী-জয়েন্ট সেক্রেটারী - ডেপুটি সেক্রেটারীর দলের গলদঘর্ম হয়ে গেছে। ডাইরেক্টর-ডেপুটি ডাইরেক্টরদের তো বোধকরি পিতৃপুরুষের নাম স্মরণ করে হাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। হাজার খানেক যুবক-যুবতীকে পৃথিবীর সব আকর্ষণ থেকে ভুলিয়ে এনে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের দাওয়াই খাওয়ান সহজ ব্যাপার নয়। তবে আজকাল কলেজ - ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা বেশ বুদ্ধি রাখে, বেশ সমঝদার। তাই তারা জাতির মুখ চেয়ে তালকোটরা গার্ডেনে কদিন হেসেছে, গেয়েছে, বিতর্ক করেছে, অভিনয় দেখিয়েছে। কলেজ বা ইউনিভার্সিটির জীবনে অধ্যাপকদের ভয়ে একমাত্র ক্যান্টিন, কফি হাউস বা অনুরূপ কোন তীর্থস্থানে ভিন্ন ছেলেমেয়েদের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন করার উপায় নেই। এখানে তেমন কোন শাসন নেই। স্বয়ং অধ্যাপকরাই ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধুরূপে আসেন। যে-সব অফিসারদের মনস্তুষ্টি করে কলেজ - ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ সরকারী সাহায্য জোগাড় করেন, এই উৎসবে সে-সব অফিসারের দল ছেলে-মেয়েদের তাঁবুর দড়ি টানেন, কিচেনের চেয়ার-টেবিল ঠিক করেন। সুতরাং হাওয়াটাই বদলে যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, এইসব শত শত ছেলেমেয়ের মধ্যে দুষ্টু ছেলেমেয়ে যে থাকে না, তা নয়। তবে আপনি জানেন তো আজকালকার ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপকদের বা সরকারী কর্মচারীদের কেমন ভয় করে; তাই ইচ্ছা থাকলেও এইসব দুষ্ট ছেলেমেয়ের দল বিশেষ দুষ্টুমি করতে পারে না। মধু থাকলেই যেমন মৌমাছি এসে জড়ো হয়, তেমনি এই উৎসবের সময় তালকোটরা গার্ডেনের কয়েক শ' ছাত্রীর জন্য দিল্লীর কিছু মৌমাছি যে জড়ো হয় না, তা নয়। ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল মৌমাছি তাড়াবার ব্যাপক ব্যবস্থা থাকলেও শুনি নাকি দু'একটা 'ইন্সিডেন্ট' হয়ে যায় বা তার সম্ভাবনা থাকে। এবারও হয়ত হয়েছে; ঠিক জানি না। তবে কানাঘুষা শুনছিলাম ক্যাম্প অফিসারদের কেউ কেউ প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন দু'একটা খবর যাতে মিনিষ্টারের কানে না পৌঁছায়। কে যেন বলছিল, একজন যুবককে একলা গাড়ী চালিয়ে ক্যাম্প ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেখা গেলেও ফেরার সময় তিনি নাকি ঐ গাড়ীতে করে তাঁর 'স্ত্রী'কে নিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গেলেন। হয়ত ভদ্রলোকের স্ত্রী আগেই একলা একলা ক্যাম্পে এসেছিলেন, হয়ত বা অশ্বত্থামা হত ইতি গজ; ঠিক জানি না। শুনছিলাম, পূর্ব ভারতের এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর

ফটো তুলে জনৈক ফটোগ্রাফারের সঙ্গে ঐ ছাত্রীটির নাম একত্রে উচ্চারিত হচ্ছিল কি না কি এক মুখরোচক আলোচনার জন্য। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এসব বিশ্বাস করি না; কারণ বিশ-পঁচিশ বছরের যে-সব যুবক-যুবতী একত্রিত হয়, তারা সবাই শিক্ষিত এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের মত একটা জরুরী কর্তব্য পালন না করে অন্য কোন দুষ্টুমি করবে, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

আগামী বছর ইউথ ক্যাম্প দেখে-শুনে ভাল করে লিখব বলে অঙ্গীকার করছি। এবার তালকোটরা গার্ডেনে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের এমন পুণ্য যজ্ঞ দেখতে না যাবার জন্য আমার অপরাধ নিজ গুণে মার্জনা করবেন।

ভবদীয়
হযবরল

লেঃ জেঃ বিক্রম সিং

মেঃ জেঃ নানাবতী

ব্রিঃ এস আর ওবেরয়

॥ শোচনীয় দুর্ঘটনা ॥

ভারতীয় বিমান ও সামরিক বাহিনীর পাঁচজন উধর্বতন অফিসার ২২-এ নভেম্বর কাশ্মীর অঞ্চলে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

ওয়েস্টার্ণ কম্যাণ্ডের সৈনাধ্যক্ষ (জি ও সি) লেঃ জেনারেল দৌলত সিং, এয়ার ভাইস মার্শাল পিন্টো (ওয়েস্টার্ণ কম্যাণ্ডের বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ), ওয়েস্টার্ণ কম্যাণ্ডের কোর কম্যাণ্ডার লেঃ জেনারেল বিক্রম সিং, মেজর জেনারেল এন কে ডি নানাবতী ও ব্রিগেডিয়ার এস আর ওবেরয় এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

হেলিকপ্টারের পাইলট ফ্লাঃ লেঃ এস এস সোন্ধিও নিহত হয়েছেন।

হেলিকপ্টারটি সীমান্ত থেকে মাত্র আড়াই মাইল দূরে বিধ্বস্ত হয়েছে। হেলিকপ্টারটি ফ্রান্সে নির্মিত।

দুর্ঘটনার শোকাবহ সংবাদটি বেলা প্রায় একটার সময় পুঞ্চ থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে। দুর্ঘটনার সংবাদে স্থলবাহিনীর সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল জে এন চৌধুরী তাঁর সমস্ত কার্যসূচী বাতিল করে দেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচাবন চণ্ডীগড়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নূতন কেবল ফ্যাক্টরী উদ্বোধনের ব্যবস্থা বাতিল করে দেন।

নিহত অফিসারদের মৃতদেহ গ্রহণের জন্য পালাম বিমানবন্দরে স্থল ও বিমানবাহিনীর শত শত অফিসার ও অন্যান্য শ্রেণীর সামরিক কর্মচারী সমবেত হলে সেখানে বিষাদের ছায়া নেমে আসে।

মৃতদেহগুলি নিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একখানি ডাকোটা বিমান পালাম বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করা মাত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রীপি ভি আর রাও এবং বিমানবাহিনীর সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল ইঞ্জিনীয়ার পুষ্পমাল্য অর্পণের জন্য এগিয়ে যান। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকেও পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

মৃতদেহগুলি পৃথক পৃথক কাল রঙের কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা হয় এবং রেডক্রশের এ্যাম্বুলেন্স ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনটি বাহিনীর সৈন্যগণ নিহত অফিসারদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চাবনের নিকট প্রেরিত এক শোকবার্তায় বলেন, "পুঞ্চ এলাকায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ায় জেনারেল দৌলত সিং, এয়ার ভাইস মার্শাল পিন্টো, জেনারেল বিক্রম সিং, মেজর জেনারেল নানাবতী, ব্রিগেডিয়ার ওবেরয় এবং স্কোয়াড্রন লীডার সোন্ধির মৃত্যুতে আমি অতীব ব্যথিত হইয়াছি। এই সকল অফিসাররা তাঁহাদের কার্যে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এইভাবে এতগুলি অমূল্য জীবনের অবসান এক শোকাবহ ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে এবং সামরিক বাহিনীর চরমতম ক্ষতি হইয়াছে। মৃত অফিসারদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

লেঃ জেঃ দৌলত সিং

দেশে বিদেশে

॥ কলকাতার বাজার ॥

কলকাতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজারে চরম অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গ রচনাকালে কলকাতার অধিকাংশ মুদিখানা, মিষ্টির দোকান, কাপড়ের দোকান বন্ধ ছিল, কারণ ক্রেতাসাধারণ যে দামে ঐসকল দোকান থেকে চাল ডাল তেল আলু ইত্যাদি কিনতে চেয়েছিলেন দোকানের মালিকরা সে দামে বেচতে সম্মত হননি। মালিকদের বক্তব্য, জনতার দাবীমত জিনিস বিক্রি করতে হলে তাঁদের লোকসান দিয়ে কারবার চালাতে হবে, যা অনির্দিষ্টকাল

শুক্রবার হেলিকপ্টার বিমান দুর্ঘটনায় নিহত এয়ার ভাইস-মার্শাল ডব্লিউ পিণ্টোর জীবিতাবস্থায় গৃহীত শেষ আলোকচিত্র। চিত্রে এয়ার ভাইস-মার্শাল পিণ্টোকে 'শিক্ষা' বিমান-মহড়ায় অংশগ্রহণকারী ভারতীয় ও মার্কিন বৈমানিকদের নিকট বক্তৃতা দিতে দেখা যাচ্ছে।

ধরে চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে একটা স্থায়ী নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অকারণ বাদবিতণ্ডা ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়াতে তাঁরা দোকান বন্ধ রাখবেন।

কাপড় বা মিষ্টির দোকান যদি দুচারদিন বন্ধ থাকে তবে সেটা হয়ত খুব বেশী ক্ষতিকর হবে না। কিন্তু চাল ডাল তেল নুন আলু ইত্যাদি যদি অনির্দিষ্টকাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে তাহলে অনতিবিলম্বেই যে এক মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ক্রেতা, বিক্রেতা বা সরকার কোন পক্ষ থেকেই বলপ্রয়োগ করা হয়নি। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় বেপরোয়া মানুষ যখন এরপর জোর করে নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকানগুলি খুলতে চেষ্টা করবে তখন নিশ্চয়ই শান্তিরক্ষকদের পক্ষে নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা সম্ভব হবে না। কারণ শান্তিরক্ষার দায়িত্ব থাকলেও অশান্তির কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব তাদের নেই, শান্তিভঙ্গকারীদের দমন ও গ্রেপ্তারেই তাদের দায়িত্ব শেষ। সুতরাং অশান্তির কারণ অনুসন্ধানের জন্য যাঁরা আছেন, তাঁরা যদি অবিলম্বে তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন না হন, এবং আপাতত একটা ফয়সালা করার মনোভাব ত্যাগ করে স্থায়ী সমাধান অন্বেষণে উদ্যোগী না হন তবে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের এ আশঙ্কা প্রকাশ করতে হবে যে, কলকাতার দুর্ভাগ্যপীড়িত লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের আর একদফা অশ্রুপাতের দিন খুব বেশী দূরে নেই।

আমরা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, 'অবস্থা এখন সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে', 'চালের কিঞ্চিৎ ঘাটতি ছাড়া কোন খাদ্যাভাব নেই', ইত্যাদি স্বয়ংকল্পিত সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাসলাভের বা দায়িত্ব এড়ানোর কোন উপায় আর নেই। ক্রেতা-বিক্রেতার দড়ি-টানাটানির মধ্যে একটা আপোস-দাম সব বাজারেই স্থির হয়ে যাবে, এই ভেবে ক্রেতা-প্রতিরোধ আন্দোলনকে নৈতিক সমর্থন জানানোর ফল আরও মারাত্মক হবে, যার অশুভ ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং সঙ্কট যত গুরুতরই হোক এবং তার সমাধান আপাতদৃষ্টিতে যত দুঃসাধ্য বলেই মনে হোক সেই সমাধানকে বাস্তব ও স্থায়ী সত্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা বা দুর্মূল্যতা যে অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য নয় তার অনেক প্রমাণই ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, উড়িষ্যা থেকে ষোল টাকা মণের চাল কিনে এনে কলকাতার ব্যবসাদাররা বত্রিশ টাকা বা তার চেয়েও বেশী দামে কলকাতায় বিক্রি করেছে। একথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অজানা থাকার কথা নয়। তারপর ক্রেতা-প্রতিরোধের ফলে দশ পনেরো টাকা কিলোর সন্দেশ যখন মুহূর্তের মধ্যে পাঁচ টাকা কিলোয় নেমে এল তখনই কাগজে এক প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনে দেখা গেল, 'জনতার দাবী মত' পাঁচ টাকা কিলো দরে তাঁরা সন্দেশ বিক্রি করবেন। নিশ্চয়ই তাঁরা লোকসান দিয়ে কারবার চালাবেন না। সুতরাং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি অতি গম্ভীর কণ্ঠে নানা পরিসংখ্যানের সাহায্যে যে সব হিসাব দাখিল করেন তা সব সময় অভ্রান্ত বলে মনে নেওয়ার কোন কারণ নেই। মোট কথা, অবস্থা চরমে উঠেছে। সুতরাং এখনই যদি কিছু না করা যায় তবে পরে হয়ত খুব বেশী দেরী হয়ে যাবে।

॥ ইরাকে আবার অভ্যুত্থান ॥

ইরাকে আবার একবার ক্ষমতার হাতবদল হয়ে গেল, এবং কাশেম-বিরোধী অভ্যুত্থানের নায়ক কর্ণেল আরেফ, যিনি ইরাকের প্রেসিডেণ্ট হয়েও এতদিন ক্ষমতাহীন ছিলেন তিনিই এবার সৈন্যবাহিনী ও জন-গণের নামে ইরাকের পূর্ণ শাসন কর্তৃত্ব

সোভিয়েট আকাশচারীদ্বয় কলিকাতায় নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় সম্মিলিতভাবে হাত তুলে অনুষ্ঠানের হোতাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। চিত্রে (বাম থেকে ডানে) সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত বেনেডিকটভ, ভ্যালেন্টিনা, নিকোলায়েভ, বিকভস্কী ও তাঁর পত্নীকে দেখা যাচ্ছে।

গ্রহণ করেছেন। বাথ-সোস্যালিস্টরা সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। এর ফলে সিরিয়া-ইরাক মৈত্রী যেমন টুটবে, মিশর-ইরাক সম্পর্ক তেমনি নিকটতর হবে।

মহাপ্রয়াণে শ্রীদুর্গাপুরী দেবী

আটষট্টি বছর বয়সে সারদেশ্বরী আশ্রমের অধ্যক্ষা শ্রীদুর্গাপুরী দেবী সম্প্রতি মহাসমাধি লাভ করেছেন। মাত্র এগার বছর বয়সে তিনি শ্রীশ্রীমা'র নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীমা, বিবেকানন্দ, গৌরীমার স্নেহচ্ছায়ায় তিনি গড়ে ওঠেন। গৌরীমা প্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রম ছিল তাঁর প্রাণস্বরূপ। নানাবিধ কাজে জড়িত থেকেও তিনি নিজের চেষ্টায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১৩৪৪ সালে গৌরীমার মহাপ্রয়াণের পর থেকে তিনি সারদেশ্বরী আশ্রমের অধ্যক্ষার কাজ করে আসেন তিরোধানকাল পর্যন্ত। দুর্গামা 'গৌরীমা' গ্রন্থে নিজের জীবন-কথার উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচিত 'রামকৃষ্ণ'। এই গ্রন্থখানি বাঙলা দেশের প্রায় সর্বত্রই সমানভাবে আদৃত।

অর্থনৈতিক

চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ছয় মাসে, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারত ৩৬৬ কোটি টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী করেছে। গত আর্থিক বছরের প্রথম ছয় মাসের চালান এর চেয়ে ৪০ কোটি টাকা কম ছিল।

ভারতের এই রপ্তানী-বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে তামাক, বনস্পতি, খইল, চিনি, ডাল, চামড়া, পাটজাত পণ্য, লোহ আকর, ধাতু ও কারিগরী মাল-পত্রাদি। চিনি ও পাটজাত পণ্যের চালান গত বছরের তুলনায় প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শুধু চিনি থেকেই এই আর্থিক বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ১৭ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাটজাত পণ্য চালান গেছে গত আর্থিক বছরের প্রথম পাঁচ মাসের চেয়ে ১০ কোটি টাকা বেশী।

যে সব পণ্যের চালান কমেছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য, কফি, মশলা, লাক্ষা, তুলোর ছাঁট, ম্যাঙ্গানিজ ও অভ্র।

ভারতীয় পণ্যের চালান সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, তারপরে সোভিয়েট ইউনিয়ন, সিংগাপুর, জাপান ও মালয়েশিয়ায়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতেও ভারতীয় পণ্যের চালান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্পেন, আলজেরিয়া, চিলি, সাইপ্রাস, কিউবা, জামাইকা, লিবিয়া, মাস্কাট ও ওমান, মোজাম্বিক ও পেরুতে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ সাম্প্রতিক, কিন্তু দ্রুত-বর্ধিষ্ণু।

রপ্তানী কমেছে ইন্দোনেশিয়া, জর্ডন, নরওয়ে, প্যারাগুয়ে, রোডিসিয়া ও নিয়াসাল্যান্ডে। ভারতের বৃহত্তম রপ্তানীর বাজার বৃটেনেও চালান পূর্বের তুলনায় কম।

১৯৬৩—৬৪ সনে ভারতের রপ্তানীর লক্ষ্য ছিল ৭৪৫ কোটি টাকা। কিন্তু প্রথম ছয় মাসের রপ্তানী যে রকম উৎসাহজনক তাতে বিশেষজ্ঞ-দের আশা, অবশিষ্ট ছয় মাসে ভারতের রপ্তানী লক্ষ্যসীমা অতিক্রম করে যাবে। কারণ বরাবরই আর্থিক বছরের দ্বিতীয়ার্ধের রপ্তানী প্রথমার্ধের তুলনায় বেশী হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম রাষ্ট্রপতি জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি গত ২২-এ নভেম্বর অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। ১৯০১ সালে উইলিয়াম ম্যাকিনলে গুলিতে নিহত হবার পর মিঃ কেনেডিই প্রথম আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিলেন। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা যাওয়ার পর এই প্রথম একজন প্রেসিডেন্ট কার্যকালীন সময়ে মারা গেলেন। কেনেডিই সব থেকে কম বয়সে রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে তিনিই সব থেকে কম বয়সে মারা গেলেন।

রাষ্ট্রপতি কেনেডির এই অকাল মৃত্যু প্রতিটি মানুষকেই প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক সংকট প্রশমনে কেনেডির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বিশ্বের প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের সুপরিজ্ঞাত। ভারতদরদী এই বয়ঃকনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ ভারতের সংকটের সময়ে নানাভাবে এগিয়ে এসেছেন।

প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভাইস-প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন বেইনস্ জনসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

ডালাস এয়ার পোর্ট থেকে একটি জনসভায় ভাষণ দান করতে যাওয়ার কালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সঙ্গে ছিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনসন এবং গভর্ণর কনোলী। কনোলীও গুরুতরভাবে আহত হন। পার্কল্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই প্রেসিডেন্ট পরলোকগমন করেন। প্রেসিডেন্টের শেষ ধর্মীয় কৃত্য সম্পাদন করেন দুজন ধর্মযাজক। আহত হওয়ার পর তিনি মাত্র পঁচিশ মিনিটকাল জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছেচল্লিশ বছর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগে প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় নাগরিক অধিকার বিল নিয়ে। তিনি এই সমস্ত অঞ্চলে সমর্থনলাভের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। গত ২১-এ তারিখে তিনি টেকসাসের ডেমোক্রাট সদস্যদের সমর্থনলাভের জন্য সপত্নীক সেখানে গমন করেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি একখানি খোলা গাড়িতে করে মোটর-শোভাযাত্রায় ডালাস বিমানবন্দর থেকে শহরের ব্যবসাকেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন।

জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মী; সাহিত্য এবং সাংবাদিকতায় ছিল তাঁর আন্তরিক অনুরাগ। সাহিত্যে তিনি তাঁর সার্থকতার চিহ্ন রেখেছিলেন একটিমাত্র গ্রন্থ রচনা করে এবং তাতেই তিনি পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন। আমেরিকার একটি খ্যাতিবান পরিবারে জন্ম। তাঁর পিতা জোসেফ পি কেনেডি প্রচুর বিত্তের অধিকারী। এই বিত্তবান পরিবারে কেনেডির জন্ম হয় ১৯১৭ সালের ২৯-এ মে। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি গ্রাজুয়েট হওয়ার পর লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির কাছে পড়তে যান। ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বরে নেভীতে যোগ দেন। সোলোমন দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় একটি পি-টি বোর্ডের দায়িত্ব লাভ করেন ১৯৪৩ সালে। দুটি জাপানী ডেস্ট্রয়ার দ্বারা মারাত্মক ভাবে তাঁদের বোট বিধ্বস্ত হয়। কেনেডিও ভীষণ ভাবে জখম হলেন। আহত সমস্ত সৈন্য ও কর্মীদের নিয়ে নয় দিন সংগ্রামের পর কেনেডি তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এর জন্য তিনি নৌবিভাগীয় ডেসপ্যাচে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে উল্লিখিত ও পুরস্কৃত হন।

কিছুকাল বাদে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কিন্তু তখন রাজনীতির সঙ্গে কেনেডি ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছেন। ১৯৪৬, ৪৮ এবং ৫০-এ প্রতিনিধি সভার সদস্য মনোনীত হন। ক্যাবট্ লজকে ৭১,০০০ ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত করে ১৯৫২ সালে তিনি সিনেটের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫০

স্মরণীয় তিনজন
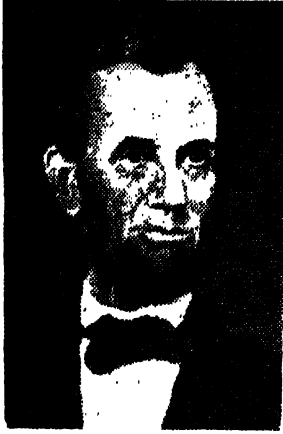
আব্রাহাম লিংকন ॥ ১৮৬৫

দাসপ্রথাবিরোধী আব্রাহাম লিংকন ১৮৬০ সালে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। বিরুদ্ধবাদী দক্ষিণাঞ্চল বিচ্ছিন্নতার দাবীতে স্বাধীনতা ঘোষণা করায় গৃহ-যুদ্ধ শুরু হয়। এই আত্মঘাতী সংগ্রাম লিংকনের দৃঢ়তায় এবং পরাক্রান্ত দক্ষিণী নায়ক রবার্ট লীর আত্মসমর্পণে ১৮৬৫ সালের ৯ই এপ্রিল বন্ধ হয়। ইতিমধ্যে লিংকন দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ১৪ই এপ্রিল ১৮৬৫ ওল্ড ফোর্ডস থিয়েটার 'হলে' অভিনেতা জন ওইলকিস বুথের দ্বারা নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে ছাপান্ন বছর বয়সে ষোড়শ মার্কিণ প্রেসিডেন্ট লিংকনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ।
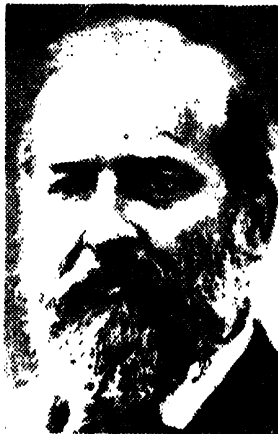
জেমস আব্রাহাম গারফিল্ড

১৮৮১

অল্প বয়স থেকে সংগ্রাম করে আব্রাহাম গারফিল্ড উচ্চশিক্ষা লাভ করে শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ সালে সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ক্রীতদাসপ্রথার বিরোধী ছিলেন। সেনা-নায়ক হিসাবে ১৮৬২ সালে কয়েকটি যুদ্ধে যোগ দেন। ১৮৬৩ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন রিপাবলিকান সদস্য হিসাবে। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন ১৮৮০ সালে। ১৮৮১ সালের ২রা জুলাই বাল্টিমোর পোটোম্যাক ষ্টেশনে প্রবেশ করবার মুখে গারফিল্ডের উপর আততায়ী কর্তৃক গুলী বর্ষণের দশ সপ্তাহ বাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিংশশতিতম প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড পঞ্চাশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

উইলিয়াম ম্যাককিনলি

১৯০১

ম্যাককিনলি কলেজ জীবনেই গৃহ-যুদ্ধে যোগদান করেন। ১৮৯১ সালে ওহাইওর গভর্ণর এবং ১৮৯৬ সালে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ম্যাক-কিনলি-ও দাস-প্রথার বিরোধী ছিলেন। ১৯০১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর প্যান-আমেরিকান প্রদর্শনীতে ম্যাককিনলি আততায়ীর হস্তে গুলীবিদ্ধ হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর চুয়ান্ন বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চবিংশতিতম প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলির জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

সালে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসাবে ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী হন। ১৯৫৮ সালে পুনরায় সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে ডেমোক্রেটি পার্টি কেনেডিকে প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করে। নভেম্বরের আট তারিখে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন এবং জানুয়ারীর ২০-এ তারিখে (১৯৬১) রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হন।

রাজনীতিবিদ হিসাবে কেনেডির সার্থকতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। তাঁর বৈদেশিক নীতি বিষয়ে প্রধান পরামর্শ-দাতা হলেন মিঃ চেষ্টার বোলজ। বোলজ এখন ভারতে মার্কিনী রাষ্ট্রদূত। আইজেনহাওয়ার শাসনকালে - অনুসৃত বৈদেশিক নীতি অপেক্ষা কেনেডি অনুসৃত নীতি আরও উদার এবং সরল।

ভারত সম্পর্কে তিনি ছিলেন আন্ত-রিক ভাবে উৎসাহী। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণ কালে তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ভারতে সাহায্য পাঠান। তাছাড়া মিঃ হ্যারিম্যান-এর নেতৃত্বে ভারতের প্রয়োজনীয় সাহায্যের সম্পর্কে অনু-সন্ধানের জন্য একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

শাসন পরিষদে এবং সেনেটরদের সভায় বহু ভাষণে কেনেডি বার বার ভারতের প্রয়োজনীয় সাহায্য সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অনুন্নত এবং ক্রমোন্নতিশীল দেশগুলিকে সাহায্যের জন্য তিনি সবসময় তৎপর ছিলেন।

কেনেডির শাসনকালের সঙ্গে পূর্ব-বর্তী শাসনকালের তফাৎ সূচিত করে। কেনেডি বিশ্ব-পরিস্থিতির এক অভূত-পূর্ব এবং বিস্ময়কর সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে এসেছিলেন। কিউবা সংকটের সমাধান কেনেডির রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন। যে দ্রুততার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন তা বহু প্রবীণ রাজ-নীতিবিদকে বিস্মিত করেছে। ১৯৬২ সালের অক্টোবরে ক্যারিবিয়ান পরিস্থিতিই কেনেডির সুযোগ্যতা এবং সুনাম বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়। কিউবায় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন নিয়ে যে গোলযোগের সূচনা হয় কেনেডির স্থিরচিন্তা সে বিষয়ে যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয় তা কিউবা থেকে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণ করতে বাধ্য করে।

কেনেডির রাষ্ট্রশাসনকালে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব হল বর্ণসংকট দূরী-করণের চেষ্টা। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি রাজ্যে দৃঢ়ভাবে হস্তক্ষেপ করে তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পূর্ববর্তী শাসনকালে এরূপ দৃঢ়তার পরিচয় খুব কমই দেখা গেছে।

সংবাদে প্রকাশ যে প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত লী হার্ভে অসওয়াল্ডকে কাউণ্টি জেলে লওয়াকালে জ্যাক রুবি নামে এক ব্যক্তির দ্বারা নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে নিহত হয়েছে।
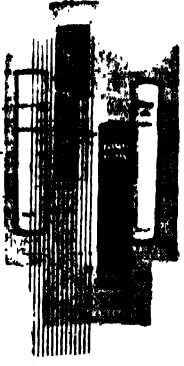
অভয়ঙ্কর
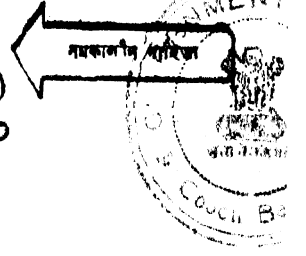
নতুন কোনও মানুষ চোখে পড়লেই যাঁরা রাজনীতি করে থাকেন সেইসব 'পাব্লিক ম্যান'দের প্রথমতম মানসিক প্রতিক্রিয়া বড়ই চমকপ্রদ। যে মতবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি অধিষ্ঠিত, এবং যে বিষয়ে তাঁর নিজস্ব জ্ঞান তেমন সুস্পষ্ট নয়, তারই দক্ষিণে বা বামে নতুন মানুষটিকে তিনি ঠেলে দিতে চেষ্টা করেন, সেইভাবেই চিহ্নিত করেন। কবি বা কলাবিদদের সেই বালাই নেই, তাঁদের ভোট-ভিক্ষা করে ঘুরতে হয় না, যে-ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে নেই সে যে তাঁর বিরোধী হবে সাধারণতঃ এমন কোনো আশংকাও নেই। কিন্তু 'পাব্লিক ম্যানে'র চোখে যেমন প্রতিটি নতুন মানুষ হয় ডাইনে নয় বামে, সমালোচক ও কবি স্টীফেন স্পেণ্ডারের বিচারে প্রতিটি লেখকই হয় 'আধুনিক' নয় 'সমকালীন' এই লেবেলে চিহ্নিত। অন্ততঃ তাঁর সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ "The Struggle of the Modern"-এর এই হল' প্রতিপাদ্য তার সকল যুক্তির এই হল অস্থি ও মজ্জা।

যাঁরা আধুনিক (বা স্পেণ্ডারের ভাষায় Recognisers) তাঁরা ভাবেন আমাদের কাল অতীত থেকে একেবারে মুক্ত, বিচ্যুত, যার ফলে শুধুমাত্র এক নতুন ধরণের সাহিত্যই এই যুগকে প্রভাবিত করতে পারে। যারা 'কনটেমপরারী' বা 'নন-রেকগনাইসার্স' তাঁরা কিন্তু তা মনে করেন না এবং আধুনিকত্বকে ততটা নতুন ভাবতে পারেন না। যাঁরা আধুনিক বা মডার্ন তাঁরা বিজ্ঞান বা প্রগতিমূলক মূল্যবোধকে আমল দেন না, কিন্তু যাঁরা সমকালীন তাঁরা তা গ্রহণ করেন। বার্নাড শ বা এইচ জি ওয়েলসের মত যাঁরা 'কনটেমপরারী' তাঁদের ক্ষেত্রে ভলটেয়রীয় 'উত্তমপুরুষ' ঘটনার ভিত্তিতে কাজ করেন আর র‍্যাঁবো, জয়েস, এলিঅট প্রভৃতি যাঁরা 'মডার্নস' তাঁরা ঘটনার ভিত্তিতে চালিত হয়ে কাজ করেন। যাঁরা 'মডার্ন' তাঁরা আধুনিক জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করে তাতে সামগ্রিকভাবেই মাতিল করতে চান। যাঁরা 'কনটেমপরারী' তাঁরা দেখেন আংশিক দৃষ্টিতে এবং সেই কারণেই
"they are partisans in the sense of seeing an[illegible] supporting partial attitudes".

এই যুক্তি কিন্তু আগাগোড়াই শিথিল। যে সামগ্রিকতার স্বপ্ন শ্রীযুক্ত স্টীফেন স্পেণ্ডারের দৃষ্টিতে আধুনিকতার শ্রেষ্ঠতম মার্কা হিসাবে মনে হয়েছে আসলে আধুনিক জগতের সঙ্গে তার সংযোগ অতি অল্প, বিশেষতঃ যে যুগ এবং কালের মানুষ সর্বদাই নতুন নতুন ঘটনা-প্রবাহের চাপে সশঙ্কিত। তথাকথিত আধুনিককে যা উৎপীড়িত করছে তা আধুনিক জীবন নয়, তা হল বাস্তব জীবন। সারত্রের যাঁরা নায়ক তারা বিবমিষায় ভারাক্রান্ত পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটেছে বলে নয়, তাঁদের যন্ত্রণার কারণ পৃথিবীর নিবিড়ঘন রূপ, এবং কোনো কিছুর দ্বারাই তার অর্থভেদ সম্ভব নয়। কামুর যাঁরা নায়ক তাঁরা হতাশায় জর্জরিত, অতীত এবং বর্তমানের ব্যবধানের জন্য নয়। তাঁদের যন্ত্রণার কারণ প্রকৃত কোনো ব্যবধান হওয়া সম্ভব নয়, সবকিছুই 'এবসার্ড' হয়ে গেছে যা চিরদিনই হয়ে আসছে। একটা নতুন জগৎ, যার সঙ্গে অতীতের একফোঁটা মিল নেই সেই জগতে জন্ম নিয়েছে বলে ফ্রানৎস কাফ্‌কার হিরো-বিরোধীরা যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে তা নয়, তাদের বিভ্রান্তির কারণ জীবনের জটিল রহস্যজাল, যা ভেদ করা তাদের সাধ্যাতীত।

মানুষ নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। মানুষ নির্বাসিতের মত নিরালা। মানুষ সহিষ্ণু। মানুষ তার নিজের কাছেই এক অচেনা ব্যক্তিত্ব। মানুষ বন্ধ্যা-শ্রমের চরমদণ্ডে দণ্ডিত। মানুষ প্রেম-বিরহিত। মানুষকে কেউ বোঝে না। এই সব বাক্-প্রতিমা মানুষের মতই প্রাচীন। বিজ্ঞানের যুগে তাদের করণীয় কিছু নেই, তারা বেকার। তারা মানুষের মনের অবস্থা নিয়েই ব্যস্ত। প্রুস্তক বিজ্ঞানের দ্বারা বিরক্ত নয়, বিরক্ত সে নিজের ওপর। তার এই আত্ম-করুণা প্রায় আত্ম-হননের মত।

আমার মনে হয় মহাত্মা কবীর এলিঅটের উত্তরকালের কবিতার মর্ম উপলব্ধি করতেন এবং এলিঅটি ভঙ্গীতে জীবনের ফলশ্রুতি যে শুধু জন্ম-প্রজনন ও মৃত্যুর অলাতচক্র তা স্বীকার করতেন। মহাত্মা কবীরও এই ধরণেরই একটা উক্তি করেছিলেন। এমন কি সেকস্‌পীয়রও আধুনিকদের মধ্যে হতাশা ও বিভ্রান্তির একটা নতুন সুরের সন্ধান পেতেন। কারণ আলবেয়র কামু নয় উইলিয়াম সেকস্‌পীয়রই বলেছিলেন—
"Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing".

এই কথাগুলি শ্রীযুক্ত স্টীফেন স্পেণ্ডারের মনে পড়লে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এমন একটি তীক্ষ্ণ রেখা তিনি নাও টানতে পারতেন, যা যা তাঁর মতে সামগ্রিক মনন বা একপেশে মনোভঙ্গী।

আসল সীমারেখা হল আশা ও নিরাশার মাঝখানে। তবে, মাঝে মাঝে লেখক হতাশার ব্যূহ-ভেদ করে বেরিয়ে আসেন হয় এলিঅটের মত ধর্মীয় বিশ্বাসে নয় সারত্রের মত সামাজিক কর্মকাণ্ডে। এইসব ক্ষেত্রে সীমারেখা টানতে হয় দুই জাতের বিশ্বাসে—একটি হল অন্তর্নিহিত পরিবর্তন যা মানুষকে ত্রাণ করতে পারে, আর অপরটি হল সামাজিক পরিবর্তন যা আবার একটা নতুন মানুষকে গড়তে পারে।

শ্রীযুক্ত স্পেণ্ডার যে আঙ্গিকের কথা উল্লেখ করেছেন সেই 'experience of modern life' সম্পর্কে কোনো কিছু বলা অবান্তর এবং অবাস্তব। জেমস জয়েসের "টোট্যাল অবজেকটিভিটি" বিষয়ে যা তিনি বলতে চান আসলে তা "টোটাল সাবজেকটিভিটি"। ব্লুম একটি দিনে মানুষ সারাজীবন ধরে যা করে উঠতে পারে তা হয়ত করেছে। কিন্তু এই দিনটি ত' ব্লুমের নিজস্ব। আচার্য বিনোবা ভাবের জীবনের একটি দিন আবার সম্পূর্ণ বিভিন্নতর হবে। এই সামগ্রিক অবজেক্টিভিটি সম্পর্কে কিছু বলা প্রকৃতপক্ষে অনাধুনিক। কারণ, আধু-

নিকদের প্রকৃত অভিযোগ হল এই যে কোনো মানুষই 'অবজেকটিভ' হতে পারে না, কেউ তার নিজের দেহ-কারার বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে পারে না, নিজের দেহের খোলসটা জামার মত খুলে ফেলে ঝাঁপ দিয়ে বাইরে চলে আসতে পারে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য এক চরম অবস্থা, অপরের সঙ্গে কোনো সংযোগ না রাখা, কিংবা অভিজ্ঞতা বিনিময় না করার অর্থ সকল প্রকার রচনাকে বন্ধ্যা বলে অভিহিত করা। স্যামুয়েল বেকেটের মত মানুষ অবশ্য বলবেন যে এতস্বারাই মানুষ যা কিছু করে যাকে তার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণিত হয়। কিছুই বলার নেই জেনেও তাঁর পক্ষে চুপচাপ থাকা কঠিন। কিন্তু এই এইজাতীয় সর্বগ্রাসী হতাশায় শ্রীযুক্ত স্পেণ্ডারের প্রয়োজন নেই। আধুনিকদের সম্পর্কে এত আগ্রহান্বিত হওয়া সত্ত্বেও যে সামগ্রিক স্বপ্নের বশে মানুষের দুর্দশারও শেষ দেখা যায় সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। যা মানুষকে কিছু স্বস্তি দিতে পারে, তা তার জ্বালা বৃদ্ধি করে, তাই তার পক্ষে আঁস্তাকুড়ে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করা কিংবা অস্ট্রিচের মত বালুকাস্তূপে দেহ ডুবিয়ে রাখা ছাড়া আর উপায় কি!

শ্রীযুক্ত স্পেণ্ডার হতাশায় ভেঙে পড়ার মানুষ নন, যারা নতুনতম নন্দনতাত্ত্বিক স্বপ্নে বিশ্বাসী তিনি সান্ত্বনার জন্য তাদের দিকে তাকান। 'কনটেমপররীজ'দের প্রতি করুণাবশতঃ তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন পৃথিবীর জড়জীবনের প্রয়োজন বিজ্ঞান মেটাতে পারে। কিন্তু তাদের দল ত্যাগ করে তিনি যে জায়গাটায় আধুনিকদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ছেন সেখানে তিনি আঙুল দেখাচ্ছেন **"to the great spiritual danger of judging individual lives as units in the progressive society, that is, as social units which ought to be statistically happier and to live statistically better lives because statistically they are better fed."** স্পেণ্ডার তাই চীৎকার করে বলছেন—মিছিমিছি এলিঅটকে দোষ দাও কেন? সে ত' আর বুভুক্ষুর মুখের রুটি কেড়ে নেয়নি। তিনি শুধু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন— "to the spiritual crisis which results from beneficial materialism"

এই আধ্যাত্মিক সংকট সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়েই, কল্যাণমূলক জড়বাদ বলে বোঝাতে গিয়ে শ্রীযুক্ত স্পেণ্ডারের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তিনি বলতে চান যে **"the real benefits accomplished by the welfare state have produced an unprecedented spiritual malaise".** ধরুন তাঁর দাঁতের যন্ত্রণা একজন মহানুভব ব্যক্তিকে যে বস্তিতে তিনি বাস করেন সেই বস্তিবাসীদের দুর্দশার কথা ভুলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু দাঁতের ব্যথা সেরে যাওয়ার পর একথা বলা কি ঠিক হবে যে দাতব্য দন্তচিকিৎসাই তাকে দারিদ্র্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতন করে তুলেছে? কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র ধর্মীয় আবর্ত সৃষ্টি করেনি, সেই অবস্থা বরাবরই ছিল। শুধু যা ছিল ভিতরে কল্যাণরাষ্ট্র তাকে চোখের উপরে নিয়ে এসেছে। কল্যাণরাষ্ট্রের পর নয়, আগেই এলিঅট লিখেছিলেন— "we are the hollow ones!" তবে খুব কমসংখ্যক মানুষই আগে একথা জানত, পরে অনেকেই জেনেছে।

সবচেয়ে মজা এই যে শ্রীযুক্ত স্পেণ্ডারও স্বয়ং তেমন বিশ্বাস করেন না যে 'আর্ট' সর্বদা অবজেকটিভ সত্যই বলে থাকে, তাই এক জায়গায় বলছেন— **"Art expresses the truth that despite all our systems of knowledge and analysis to grasp, to get the feeling of our world! We are driven to ourselves, our own feelings".** আমাদের অনুভূতি, নিজস্ব অনুভূতি। আমরা সকলেই জানি অখণ্ড আশা বা সামগ্রিক নিরাশার সমতুল নয়। আমরা তাই ঘরেরও নয়, পরেরও নই, আমাদের স্থান সেই মাঝখানে, আশা ও নিরাশার মাঝের দেশ। *

* **THE STRUGGLE OF THE MODERN:** By Stephen Spender: Publishers: Hamisu Hamilton: 25 Shillings.

নতুন বই

আশ্চর্য শহর

কোলকাতা এক আশ্চর্য শহর, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভঙ্গীমায় যখন কোলকাতা সেজে থাকে, তখন তাকে তিলোত্তমার মতনই মনে হয়। আবার এর মাঝেই দেখা যায় এক পঙ্কিলময় বীভৎস নগ্নরূপ। কোলকাতার পটভূমিতে লেখা এই তরুণ গ্রন্থকারের **'পটভূমি'র** মাঝে আমরা যেমন কোলকাতার রূপ দেখতে পাই, তেমনি পাই অনিন্দ্যসুন্দর ঘটনা। সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে দ্রুততা আর শিল্পীমনের সুন্দর, সার্থক উপস্থিতি। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ শোভনীয়।

পটভূমি— কমল ঘোষ। প্রকাশক : পার্শানি প্রকাশনী, ৩০।১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম : দু' টাকা।

●

ছিন্নমূল সমাজ-জীবন

মাঝে মাঝে দু'-একখানা উপন্যাস আমাদের চিন্তাজগতে গভীর আলোড়ন তুলতে না পারলেও, হৃদয়ক হরণ করতে সক্ষম হয়। এরকম একটি উপন্যাস **'প্রিয়া ও জায়া'**। বর্তমান ছিন্নমূল সমাজ-জীবনের একটি করুণ দিক লেখক সাবলীল ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলেছেন বর্তমান উপন্যাসে। কাহিনীবিন্যাসে এবং চরিত্র-চিত্রণে লেখকের দক্ষতা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে নিখিল, মনোরমা, হীরেন প্রভৃতি চরিত্রগুলি বেশ প্রাণবন্ত।

প্রিয়া ও জায়া (উপন্যাস)—সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : নব বলাকা প্রকাশনী, কলিকাতা-৬। দাম : তিন টাকা।

●

ছোট গল্পের সংকলন

আঠারোটি ছোটগল্পের সংকলন **'জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি'** পেয়ে ভেবেছিলাম হয়তো কোন নতুন বক্তব্য উপস্থাপনের সম্ভাবনা নিয়েই লেখক পাঠক-সমাজে উপস্থিত হচ্ছেন। তাই অত্যন্ত আগ্রহসহকারে এই গ্রন্থখানা এক নিঃশ্বাসে পড়বার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি হতাশ হয়েছি—মনের গভীরে দাগ কাটার মতন কোন গল্প না পেয়ে। ভবিষ্যতে লেখক সুন্দর গল্পগ্রন্থ উপহার দেবেন বলে আশা করি।

ধ্রুব রায়ের অঙ্কিত প্রচ্ছদ **'জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি'র** ভাবকে সুন্দরভাবে ব্যঞ্জিত করতে সমর্থ হয়েছে।

জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি— নারায়ণ চক্রবর্তী। প্রকাশক : আ্যাল্‌ফা বিটা পাব্লিকেশনস্‌। দাম : সাড়ে চার টাকা।

●

হাতের লেখা কি করে সুন্দর এবং সহজপাঠ্য করা যায়, সে সম্পর্কে শিশু সাহিত্য সংসদের বর্তমান পুস্তিকা **হাতের লেখা** শিশুদের কাছে এবং অভিভাবকগণের কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। শৈশবে প্রথম লেখা শেখার সময়ে কেমন করে লিখলে, কোন্ অক্ষরটা কোথা থেকে আরম্ভ করে কোন্ দিক দিয়ে ঘুরিয়ে লিখলে সুবিধা এবং সুন্দর হয়, তাই হোল এ-পুস্তিকার বিষয়।

হাতের লেখা — নরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রকাশক : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৯। দাম : আট আনা।

দুইজন তরুণ কবি

ইদানীন্তনকালে বঙ্গভাষার তরুণ কবিরা যেন আত্মসম্মুখীন হইতে প্রয়াসী নহেন। তাঁহারা নির্দিষ্ট মানের প্রকাশ-নৈপুণ্য আয়ত্ত করিয়াছেন এবং তদাশ্রয়ে কাব্য রচনা করেন। যদিও বহিরঙ্গ বিবেচনায় সেই সকল কাব্য স্বতঃই আধুনিক বলিয়া প্রতিভাত হয়, তথাপি উহাতে উপলব্ধির গভীরতা এবং মনীষার আলোড়ন বর্তমান থাকে না। বলা বাহুল্য, ইদানীং কবিতা কিয়ৎ পরিমাণে যান্ত্রিক নির্মাণের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে। আত্মস্থ হইয়া চেতনাকে বিশ্লেষণ করা এবং শিল্পে তাহাকে বিধৃত করা অত্যন্ত কঠিন—একাগ্র সাধনসাপেক্ষ। এবং ইহাতে শ্বাসরোধকারী আত্মিক পরিশ্রম নিয়োজিত করিতে হয়। তরুণ কবিরা কি এবম্বিধ প্রয়াসে অনীহ অথবা তাঁহাদের অভিলাষ কি প্রচলিত প্রথার (ফ্যাশানের) অনুবর্তী হইয়া সহজলভ্য যশের জন্য উদ্গ্রীব? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা বর্তমান লেখকের অজ্ঞাত। কিন্তু অধুনাতম কাব্যপাঠে এই প্রকার চিন্তা স্বতঃই জাগ্রত হয়। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থদ্বয় পাঠ করিতে গিয়া কথাগুলি আরও একবার মানসে উদিত হইল।

'কবিতা ১৯৫৬—১৯৬১', বোধ করি, কবি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কবিতা-গ্রন্থ। গীতিপ্রবণতা কবির বিশেষত্ব এবং এই গীতিপ্রবণতা তাঁর কাব্যশরীরকে নম্র করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ এই গীতিময়তার নিমিত্ত পুস্তকের অনেকগুলি কবিতা, যা শুদ্ধ লিরিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, আধুনিক কবিতার তথাকথিত বিরোধীদেরও প্রীতি উৎপাদনে ক্ষম হইবে। গ্রন্থকার অনস্বীকার্য কবিত্বের অধিকারী। স্থানে স্থানে শব্দ-যোজনায় কোমলতার প্রতি আসক্তি কবিতাকে অতি-লালিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রেম এবং জীবননিষ্ঠাই কবির কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু।

অতঃপর আলোচ্য শ্রীযুক্ত আশিস সান্যালের 'মৃত্যুদিন জন্মদিন' গ্রন্থটি। স্মরণ হয়, ইতঃপূর্বে কবির 'শেষ অন্ধকার প্রথম আলো' শীর্ষক একটি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বন্ধুকে নিয়ে', 'রমণীয় দৃশ্য বলে', 'মৃত্যুদিন জন্মদিন' ইত্যাদি বহু কবিতাই কবির কবিত্ব এবং উপস্থাপনা-কৌশলের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। শব্দ ব্যবহারে কবি কিঞ্চিৎ অমনোযোগী তথা প্রথানুগামী। কবিতার মননের ঋদ্ধি লক্ষণীয়। বিষাদ, দুঃখ এবং হতাশা পার হইয়া আশাবাদই কবির অবলম্বন।

পরিশেষে এ মন্তব্য অনাবশ্যক নহে যে, আধুনিক বাংলা কবিতার চর্চা ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা অথবা সাধারণ কাব্যপ্রিয় উভয়েরই আলোচিত গ্রন্থদ্বয় পঠনীয়।

কবিতা ১৯৫৬-১৯৬১ : দেবী-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশভবন, কলিকাতা-২৬। মূল্য—চার টাকা।

মৃত্যুদিন জন্মদিন : আশিস সান্যাল। সম্প্রতি প্রকাশনী, সালকিয়া, হাওড়া। মূল্য—দুই টাকা।

॥ সংকলন ও পত্রপত্রিকা ॥

রাষ্ট্রবিজ্ঞান তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। সম্পাদক—অধ্যাপক নির্মল বসু।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র। আলোচ্য সংখ্যাটিতে লিখেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডঃ নির্মল বসু রায়-চৌধুরী, অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত চিন্তাশীল লেখকগণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে আলোচ্য সংখ্যাটি সমাদরের দাবী রাখে।

।। শারদ সংকলন ।।

শৈলেন দত্ত সম্পাদিত এবং অমরাবতী শিশু উদ্যান থেকে প্রকাশিত **পাথেয়** শারদ সংকলনে **লিখেছেন** ধনঞ্জয় দাশ, বোম্মানা বিশ্বনাথম, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বসু, ধীরেন্দ্রলাল ধর, মৃণাল বসুচৌধুরী এবং আরো অনেকে। দাম—এক টাকা।

তুমি নারী

দিনেশ দাস

তোমাকে দূরের থেকে আকাশ-আকাশ মনে হয়
কাছে এলে নিয়ে আসো সমুদ্রের ঊর্মিল বিস্ময়,
তুমি তো দাঁড়াও দেখি পাহাড়-চূড়ার সমারোহে
কখন ঘুমিয়ে পড়ো প্রশান্তির সমতল হ'য়ে।

তুমি যেই চোখ তোলো ভোর হয় ঃ
নামালে চোখের পাতা রাত্রি নামে, করে ভয়-ভয়।
তবু সেই মুদিত চোখের নীচে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি
পৃথিবী ঘুমোয়।

তোমার হৃদয়বৃন্তে যে গোলাপ ফুটেছে নিমেষে
কে তাকে তুলবে বলো? কালে কালে দেশে দেশে
তোমার মনের বোঁটা ফোটায় গোলাপ ঃ
তোমার তুলনা তুমি—কবির উপমা যত অস্ফুট প্রলাপ।

উৎসর্গ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

দিন আমার, রাত আমার, সকল অনুভব—
উজাড় করে দিলাম পায়ে যা-কিছু কামনা
ফুলের মত, ঝরে তা হলো ভোরের বাসি শব ঃ
সারা জীবন খুঁজে হে প্রেম, তল পেলাম না!

তটের বুকে ভাঙে ঢেউয়ের ভীরু ছলাৎছল—
ভেবেছি তাই প্রেমের ভাষা; শুনেছি আহ্বান
গভীর রাতে, ঝিঁঝির স্তব ছাপিয়ে কল্লোল
বেজেছে বুকে; প্লাবনে করে ভেসেছে সেই গান।

হৃদয় তবু বেঁধেছি এই খরস্রোতের ধারায়—
তুফান তাকে দোলাক, তাকে করুক খান্‌খান্‌,
মকর-মুখ তরঙ্গেরা সূর্য আর তারায়
আড়াল করে দু'ধারে তার থাকুক বহমান।

জাগতে হবে এ-রাতে, নেই সঙ্গী কোনো দিকে
যদিও; পুড়ে ভস্ম হয় সকল কামনাও,
যদি সে আসে অন্ধকার যখনি হবে ফিকে—
তাকেই দেব এ-বুকে যত রক্তঝরা দাহ।

চিরকালীন

অরুণকুমার চক্রবর্তী

স্মৃতির জোনাকি জ্বলে হৃদয়ের অতীত আঁধারে।
'কে তুমি রুপোলী রাতে শুয়ে আছো নদীর শরীরে,
তুমি কি আমার সেই হারানো স্বপ্নের ভালোবাসা?'
সে কিছু বলে না, শুধু প্রতিধ্বনি শূন্য হয়ে জ্বলে।

ভিজে চাঁদ কথা বলে ঃ 'মায়াবতী মেঘের আলোকে
তোমার হৃদয় রাখো। নদীর শরীর হয়ে তুমি
গভীর স্রোতের চিহ্ন এঁকে দিও স্বপ্নের আঁধারে,
যেখানে অতীত প্রেম।' অন্ধকার তোমার শরীরে।

স্মরণ জ্বলুক শুধু অনির্বাণ সন্ধ্যাতারা হয়ে॥

কয়েকটি শব্দ

অশোককুমার দত্ত

শব্দ শ্রুতিগম্য, কিন্তু শব্দমাত্রই তা নয়। আলোর বেলায় যেমন। রামধনুর সাতটা আলোকে ছাড়িয়ে অতিবেগনি অবলোহিত এক্স-রে, গামা-রে, রেডিও-রশ্মি আমাদের চোখের সামনে অদৃশ্য জগতের এক পর্দা ঝুলিয়ে রাখে। শব্দের বেলায়ও তেমন। শব্দ কম্পনজাত। কোন কিছু কাঁপলে তার স্পন্দন স্প্রীংয়ের দোলার মত আশেপাশে ছড়ায়। একে আমরা বলি শব্দ-তরঙ্গ। বাতাস বা অন্য কিছুর মাধ্যমে তা কানে এসে পৌঁছায়। আমাদের শ্রবণযন্ত্র কিন্তু প্রতিটি শব্দের ডাকে সাড়া দেয় না। স্পন্দনের সংখ্যা যদি হয় সেকেণ্ডে দশ কি বারো বার কিংবা আরো কম, তবে তা হলো অবশব্দ (ইনফ্রা-সাউণ্ড), এই অবশব্দ আমরা শুনতে পাই না; অপরপক্ষে স্পন্দন-সংখ্যা খুব বেশি হলে ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে উঠলে, সে শব্দও আমাদের কাছে নীরব। দ্বিতীয় জাতের এই শব্দ অতিশব্দ (আলট্রা-সাউণ্ড), বিজ্ঞানের রাজ্যে তার প্রয়োগ ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছে।

শব্দের এই তিনটি রূপ আমরা পেলাম। স্পন্দনের সংখ্যার হেরফেরেই তার প্রকাশ। সা থেকে নি পর্যন্ত এই হিসাব, নীরব অতিশব্দের মধ্যেও সেই একই তরঙ্গভঙ্গ। স্পন্দনের সংখ্যা গুণে তার বিচার। সাধারণ শব্দ অবশব্দ অতিশব্দ,—সম্প্রতি আরো কয়েক জাতের শব্দের ধারণা এসেছে, প্রকৃতির এক বিশেষ ক্ষেত্রে তারা ধরা দিয়েছে। দ্বিতীয় শব্দ, তৃতীয় শব্দ, চতুর্থ শব্দ—বিশেষ এ কয়টি শব্দ। তাপমাত্রা যখন অত্যন্ত কম তরল অবস্থায় হিলিয়ামের মধ্যে তা পরিস্ফুট হয়েছে।

হিলিয়াম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এক আশ্চর্য জিনিস। তার জন্মের ইতিহাসও খুব বিচিত্র। পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব প্রমাণের অনেক আগেই সূর্যের বিস্ফোরণে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। তাপমাত্রা কমিয়ে গ্যাস তরল হয় আমরা জানি,—এই তাপমাত্রা কমানোর একটা প্রাকৃতিক সীমারেখা রয়েছে। হিলিয়াম এই চরম তাপমাত্রার কাছাকাছি এসে তরল হয়। জলের যে হিমাঙ্ক তাপের এই বিশেষ মাত্রাটি তার ২৭৩ ডিগ্রী নীচে। এই নীচু মাত্রার তাপের প্রভাবে হিলিয়ামের নানা আশ্চর্য ব্যবহার। গত পঞ্চাশ কি বাহান্ন বছর ধরে তা বিজ্ঞানের রাজ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা রহস্যের মায়ালোক সৃষ্টি করেছে।

স্থানাভাববশতঃ বনবিবি উপন্যাসটি প্রকাশিত হল না।

তরল জিনিস যেভাবে ফোটে, হিলিয়ামও সেভাবে টগবগিয়ে ফুটে ওঠে, তার মানে তার সমস্ত স্তর থেকে গ্যাস বুদ্‌বুদের আকারে বার হয়। বিশেষ এক তাপমাত্রায় বুদ্‌বুদের এই বিক্ষোভ বন্ধ, গ্যাস তখনো বার হচ্ছে বটে কিন্তু তরল হিলিয়ামের স্তরে তার কোন আভাস নেই। আসলে হিলিয়ামের তাপ পরিবহনের মাত্রা তখন বহুগুণ বেড়ে গেছে, বিভিন্ন স্তরে তাপমাত্রার পার্থক্য থেকেই বুদ্‌বুদের জন্ম। এই পার্থক্য যেখানে লোপ পেয়েছে, গ্যাস তখন সরাসরি উপরকার স্তর থেকেই বেরিয়ে আসে। তরঙ্গহীন সমুদ্রের মত স্ফুটনের এই শান্তরূপ অবশ্যই আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু মূলে যে কারণ—উত্তাপের পরিবহন সহসা এভাবে লক্ষ গুণ বেড়ে গেলো কেন।

তরল হিলিয়ামের একটি সূক্ষ্ম ফিল্ম জ্যান্ত জিনিসের মতই পাত্রের গা বেয়ে এগিয়ে চলে। বিকারে হিলিয়াম থাকলে কিছুক্ষণ পরে তাই তলদেশে ছড়িয়ে যায়। খুব সূক্ষ্ম নলপথে হিলিয়ামের গতি বাধা মানে না। আরো বিচিত্র ব্যাপার, সামান্য আলোর স্পর্শে এই বিশেষ তরল জিনিসটি নলের সূক্ষ্মপথে পিচকিরির ধারায় ছুটে চলে। এ সমস্ত ব্যবহার বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রে ব্যাখ্যা হয় না। তাই

কল্পনা করা হলো তরল হিলিয়ামের মধ্যে যেন দুটি পৃথক উপাদান রয়েছে। একটি সাধারণ হিলিয়াম, অপরটি তার বিশেষ অংশ—অতিপদার্থ। এই অতি-পদার্থ বা বিশেষ পদার্থের জন্যই হিলিয়ামের এ সমস্ত আশ্চর্য ব্যবহার। বসু-আইনস্টাইনের তত্ত্বে ঘনত্বহীন, আয়তনহীন বিশেষ এক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছিল (বসু-আইনস্টাইন কনডেনসেশন)। হিলিয়ামের ক্ষেত্রে সে বিশেষ গুণগুলি আরোপ করা হয়েছে। তবু এই বিশেষ উপাদানটি সাধারণ বিচারে কেমন যেন কষ্টকল্পনা। তাছাড়া এর সাহায্যে পুরোপুরি ব্যাখ্যাও প্রস্তুত হয় না। হিলিয়াম তরল অবস্থাতেও গ্যাসের ধর্ম কিছুটা বজায় রাখে, আদর্শ গ্যাসের নিয়ম তা পুরোপুরি মেনে চলবে এ-কথা আশা করা যায় না।

এ সমস্ত বিচার করে রুশ বিজ্ঞানী লান্দাও বিষয়টিকে এক নতুন তত্ত্ব-ধারণায় প্রকাশ করলেন। হিলিয়ামের মধ্যে যেন রয়েছে দু'ধরনের পরমাণু, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তারা কাজ করে। তাপমাত্রা যখন খুবই নীচু, তখন রয়েছে ফোনন পরমাণু। তরল হিলিয়ামের পট-ভূমিকায় এই ফোনন গ্যাসের কণার মতই বিচরণ করে। মাত্রা আর একটু বাড়লে রোনন এসে দেখা দেয়। ক্রমে সমস্ত ফোনন রোনন হয়ে ওঠে। ফোনন-রোননের পরস্পর সম্পর্ক ব্যাখ্যার এক নতুন ক্ষেত্র রচনা করেছে। নতুন এক শব্দ-প্রকৃতির মধ্যে সম্প্রতি তার যাচাই হয়েছে। এই বিশেষ শব্দ হলো দ্বিতীয় শব্দ।

শব্দের প্রভাবে পরিবাহী জিনিস স্থানে স্থানে সংকুচিত, স্থানে স্থানে প্রসারিত হয়। তরল হিলিয়ামের মধ্যে বিশেষ জাতের পরমাণুগুলি এভাবে ঘনবদ্ধ থাকে। তার মাঝে মাঝে যে ফাঁক রইলো, ধরা যাক, আর একটি শব্দের প্রভাবে সেখানে এসে জমলো সাধারণ পরমাণু। হিলিয়ামের ঘনত্ব পূর্ববৎ বজায় থাকছে, তবে দু' ধরনের পরমাণু আলাদা হয়ে আছে। ফলে তাপের মাত্রায় একটা পরিবর্তন দেখা দিল—যেখানে সাধারণ পরমাণু, সেখানে তাপের আধিক্য, আর বিশেষ পরমাণু-গুলির জায়গায় তাপের মাত্রা একটু নেমে এসেছে। তাপমাত্রার এই পার্থক্য এভাবে তরঙ্গভঙ্গের মত ছড়ানো রয়েছে। শব্দের তরঙ্গে জিনিসের ঘনত্ব বদল না হয়ে দেখা দিল তাপমাত্রার তারতম্য। সাধারণ শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেও যা অন্যবিধ, তাই তা দ্বিতীয় শব্দ। এই দ্বিতীয় শব্দের কি গতি। তা মাপতে গিয়েই হিলিয়ামের রহস্য জমাট বেঁধে উঠেছে। পুরানো মতে তার একভাবে হিসাব কষা হলো, আর লান্দাও তাঁর অভিনব তত্ত্বটি থেকে প্রায় বিপরীত কথা বললেন। অবশেষে ওসবর্ণ-এর পরীক্ষায় দেখা গেলো গণনা লান্দাওয়ের কথাতেই সায় দিচ্ছে। বিষয়টির অবশ্য এখানেই শেষ হলো না। বসু-আইনস্টাইনের মৌলিক ধারণাকে কিভাবে গ্রহণ করা যায়, আজো অনেকে তা চিন্তা করে দেখছেন। এ হলো বিষয়টির একদিক। সম্প্রতি স্বল্পগতি নিউট্রনের আঘাত হেনে ফোনন-রোননের যেন সমর্থন মিলেছে। পরমাণুর কণাগুলি বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, এর উত্তর লান্দাওয়ের তত্ত্ব থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

এখানেই শেষ নয়। তরল হিলি-য়ামের মধ্যে আবার শব্দের আবর্তন উঠেছে। দ্বিতীয় শব্দের পর তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের শব্দ। আভাসে ইঙ্গিতে তা ফুটে উঠেছে—এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। তৃতীয় শব্দ নাকি সাধারণ ও দ্বিতীয় শব্দের সমবায়। সাধারণ শব্দে জিনিসের শুধু ঘনত্বের পরি-বর্তন, দ্বিতীয় শব্দে শুধু তাপমাত্রার

পরিবর্তন, তৃতীয় শব্দ এ দুয়ের যোগফল—একসঙ্গে ঘনত্ব ও তাপমাত্রার অদল-বদল। চতুর্থ শব্দ খুবই অস্পষ্ট। এক মতে বলছেন, সমুদ্রের তরঙ্গের মতই এই শব্দতরঙ্গ। তরল হিলিয়ামের যে সূক্ষ্ম কম্পনের কথা বলছি, তাতে যেন বিচিত্র এক তরঙ্গের বিস্তার রয়েছে। এটিই চতুর্থ তরঙ্গ, এর তাৎপর্য যে কি সমুদ্রের মতই, তা আজো রহস্যময় রয়েছে।

এককালে সাগর-মন্থনের ফলে নাকি অমৃত উঠে এসেছিল। হিলিয়ামের স্পন্দনের মধ্যে তেমনি বিশেষ শব্দ জেগে উঠেছে। সাধারণ শব্দের অতীত দ্বিতীয়, তৃতীয় আর চতুর্থ শব্দ। শব্দ আমরা তাদের বললাম কিন্তু অভিধানে যেমন অবশ্যই যেমন, সে বিচারে তারা শব্দ নয়। তবে শব্দের সঙ্গে মিল কিছু কিছু রয়েছে। তাদের প্রয়োগের ফলে হিলিয়ামের প্রকৃতি আজ মানুষের কাছে ধরা পড়েছে।

সাহিত্য জগৎ

সিদ্ধার্থ

আধুনিক বটতলার সাহিত্য

বটতলার সাহিত্য বলতে গিয়ে আমরা অনেক সময়ই নাসিকাকুঞ্চন করে থাকি। হাল আমলের সাহিত্যের পাশে বটতলার সাহিত্য ম্লান। যখন বাঙলা দেশে ভাল করে মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা ছিল না, ছাপাবার মত টাইপও ছিল না এদেশে; সেই সময়ে উদ্ভূত এই সাহিত্য-জগৎ দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। আজকের আহিরীটোলা আর চিৎপুরে তারই ভগ্নাবশেষ কদাচিৎ কখনও চোখে পড়ে। অথচ এই বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল চারশো চুরোনব্বই পাতার কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দাম দেড় টাকা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বেতাল পঞ্চবিংশতি চার আনা; মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল এক টাকা; কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদি-পর্বের দাম ছিল দু আনা। এ-কথা সত্যি বটতলাই বাঙলা দেশের মানুষের মনে সাহিত্যরসপিপাসা জাগিয়ে তুলেছিল। এই ঐতিহ্যের দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। কালক্রমে এই সমস্ত অঞ্চল থেকে এমন সমস্ত অশ্লীল গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে যা আজকের পাঠকের চোখ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী এবং আরও কয়েকটি বৃহৎ পুরানো লাইব্রেরীতে এ ধরনের কতকগুলি গ্রন্থ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এই অশ্লীল সাহিত্য প্রকাশ তৎকালীন সরকারকে চিন্তান্বিত করে তোলে। অবশেষে আইনের সাহায্যে এই বিকৃত রুচির সাহিত্য প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। বটতলার এই রুচিবিকারের জন্য সেকালের সমাজের দায়িত্ব কম নয়। তৎকালীন সমাজ-জীবনে যে অসংলগ্নতা, রুচিহীনতা, বিকৃত চিন্তার রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, সাহিত্য তার থেকে বাদ পড়েনি।

বটতলার সাহিত্যকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করে প্রথম ভাগকে গৌরবময় যুগ এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম দেওয়া যায় পতনের যুগ। যদিও আজও 'পতনের যুগ' কলকাতায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অলিতে-গলিতে শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আজকাল এমন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে যার সঙ্গে বিকৃত বটতলার সাহিত্যের কোন প্রভেদ নেই। অথচ এ-সমস্ত গ্রন্থের জন্য প্রিয়জনকে দেওয়া যায় না। কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় এমন অনেক প্রকাশক দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা কোন সুখ্যাত সাহিত্যিকের গ্রন্থ প্রকাশ করেন না—কেবলমাত্র এই সমস্ত 'বিকৃত সাহিত্য' প্রকাশ করে চলেছেন। বটতলার পুরনো ঐতিহ্য হয়ত এঁরা জানেন না। এঁরা স্বল্পশিক্ষিত মানুষের মনের সঙ্গে মিলিয়ে এমন সমস্ত রচনা প্রকাশ করছেন, যা ঐ সমস্ত মানুষের রুচিবোধকে আরও নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। এই সমস্ত প্রকাশকরা বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রন্থবিক্রেতাদের উচ্চ কমিশন দিয়ে বই বিক্রী করে থাকেন। সাহিত্যের জগতে এই রুচিহীনতার পরিচয় সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আমাদের দেশের চিৎপুর, গরানহাটায় এককালে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আধুনিক এই বটতলার সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত চিন্তাশীল পাঠকদের বিবেচনা করবার সময় এসেছে। বিজ্ঞানধর্মী আধুনিক সভ্যতায় জগতে বাস করে আমরা যদি নিজেদের চিন্তাশক্তির অপ-ব্যবহার করি, তাহলে হয়ত একদিন সৎ-সাহিত্যের গতি সত্যিই রুদ্ধ হয়ে যাবে।

এই বিকৃত রুচির পরিচয়ধর্মী কয়েকখানি উপন্যাস আমার পড়বার সুযোগ হয়েছে। অধিকাংশ গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। বিক্রয়স্থল কলেজ স্ট্রীটের 'বইপাড়া'। এই সমস্ত বই-এর কাহিনী নিতান্তই প্রেমোপাখ্যান, যা অত্যন্ত চটুল ভঙ্গীতে রচিত। কুৎসিত ইঙ্গিত-ময় এই সমস্ত রচনায় কোন শিল্প-কুশলতার আশা করা সম্ভব নয়। ভাষা অত্যন্ত জোলো। প্রচ্ছদপটে কোন মহিলার ছবিই এঁরা যথেষ্ট মনে করেন। চিৎপুরের সাহিত্য-জগতে বাহিরঙ্গে বিশেষ নজর দেওয়া হত না। আজকের দিনে গ্রন্থের ভিতরে ও বাইরে সমান কদর্য রুচির পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সমস্ত বই যাঁরা লেখেন তাঁদের মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। কিন্তু সাহিত্য কি—সে সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় সুলভে গ্রন্থকার হওয়ার মোহে জাতির বিরাট ক্ষতি সাধন করছেন তা বোধ হয় তাঁরা একবারও চিন্তা করে দেখেন না।

যে-কোন রচনার পক্ষে যে সংযমের প্রয়োজনীয়তা চিরকাল সমালোচক ও স্রষ্টা শিল্পী বা লেখকরা বার বার স্বীকার করে এসেছেন, আধুনিক বট-তলার সাহিত্যসেবীরা তা স্বীকার করেন না। সংযম বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নেই বললেই চলে।

শ্লীলতা বা অশ্লীলতার বিচারে এ সমস্ত সাহিত্যিক কোনদিকে যেতে চেয়েছেন, তা বিচার করা একান্তই অসম্ভব। বক্তব্যহীন রচনায় এক-একখানি বৃহদায়তনের গ্রন্থ প্রকাশ করে সাহিত্যের খেতাব ধারণ করাই এঁদের মূল উদ্দেশ্য। হাল্কা প্রেমের উপাখ্যান অধিকাংশ সময়েই এঁদের কাহিনীর উপজীব্য। এঁদের লেখা একশ'খানি গ্রন্থ পাশাপাশি রেখে বিচার করলে মনে হবে, এ ভাষায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও পরিক্রমা ব্যর্থ হয়েছে। অত্যন্ত সচেতনভাবে এই তথাকথিত লেখকরা যৌনজীবন নিয়ে নর-নারীর আদিম প্রবৃত্তির মূল কেন্দ্রে নাড়া দিতে চান। রচনায় অক্ষমতায় ভাষায় অজ্ঞতায় এঁদের এই চিত্রাঙ্কন কুৎসিত রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে।

আজকাল এমন এক ধরনের রচনাও দেখা যাচ্ছে, যা দেখে অনেকে বিস্মিত হবেন। নমুনা হিসেবে উল্লেখ করছি:

"হাসি। কান্না। জ্বর। মৃত্যু।
শান্তি। অসহ্য। ঈশ্বর। চাল।
স্ত্রী। ওষুদ। দয়া। কান্না। বিবেক।
হাহাকার। মন্ত্রিত্ব। নির্বাচন। রক্ত।
পুঁজ। বেদনা।........"

একখানি উপন্যাসের কাহিনী পাতার পর পাতা এভাবেই এগিয়ে গেছে। অথবা কেউ যদি পঞ্চাশবার পর পর 'গড়িয়ে যায়'—উল্লেখ করতে থাকেন, তাহলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই।

এই যে সাহিত্যনামধেয় বিচিত্র পদার্থটি তৈরী হচ্ছে, তার শেষ কোথায়। বিগত কয়েক বছর ধরে এর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অক্ষম এই সমস্ত সাহিত্যের 'চোরাকারবারী'রা কিছুকালের জন্য হলেও যে উৎপাত শুরু করেছে, তার পঙ্কিল ছায়া যে থেকে যাবে ভবিষ্যতের সার্থক শিল্পের জগতেও। প্রাচীন বটতলার ঐতিহ্যময় দিকটি আজ অন্তর্হিত। যে কুৎসিত রচনাগুলি একদা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল দেশের বিরাট গণমানসে তার থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব কাদের? সৎ-সাহিত্যসাধকেরা, সমালোচকেরা এই সমস্ত দুর্বল চরিত্রভ্রষ্ট নায়কগুলিকে যত দ্রুত বিতাড়িত করবেন, ততই জাতির মঙ্গল।
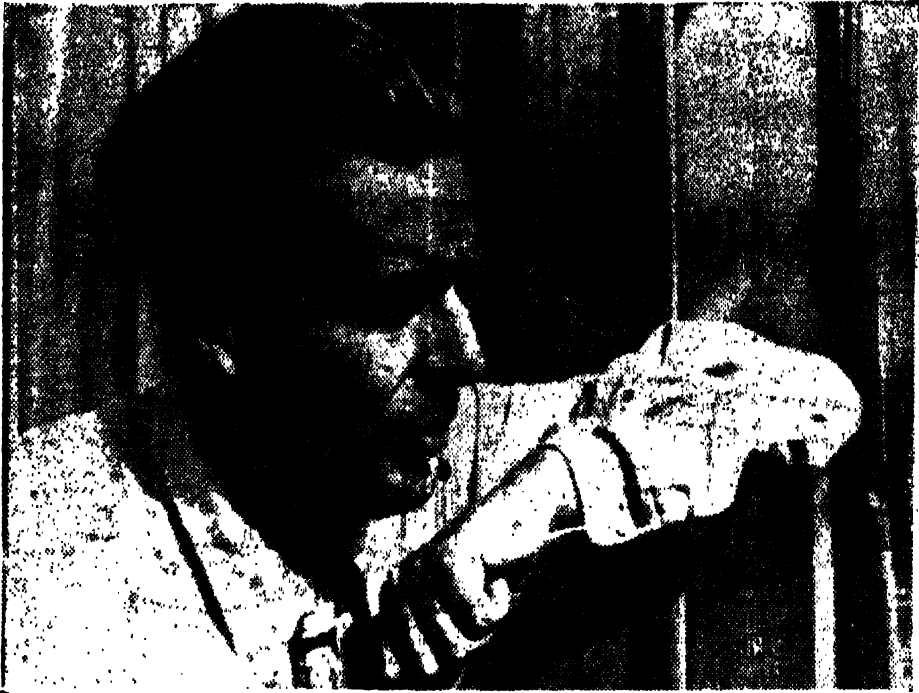
অলডাস হাক্সলি

লস এঞ্জেলস থেকে খবর পাওয়া গেছে অলডাস হাক্সলি উনসত্তর বছর বয়সে হলিউড-এ মারা গেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যে সব নবীন ঔপন্যাসিক পুরনো সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাব নিয়ে যে স্বতন্ত্র সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন হাক্সলি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ভিক্টোরিয়ান যুগের আদর্শবাদের যে সামান্যতম অস্তিত্ব তখনও ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় অবশিষ্ট ছিল—তরুণ বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক সমাজের আবির্ভাবে তার তিরোধান ঘটল। ইংরিজি সাহিত্যে নতুন পর্বের সূচনা হল। হাক্সলির উপন্যাসের উপজীব্য নব-আহৃত বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী। নিতান্ত আত্মিক-সঙ্কটের তাগিদেই অলডাস হাক্সলিকে শিল্পসৃষ্টিতে এবং সমাজবিশ্লেষণে নব্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তনকারীরূপে আবির্ভূত হতে হল। যদিও তিনি ছিলেন ভিক্টোরিয়ান যুগের নৈতিক সুচিতার প্রতীক প্রখ্যাত লেখক টমাস হেনরি হাক্সলির নাতি।

১৮৯৪ সালে ইংলণ্ডে হাক্সলির জন্ম। সতেরো বছর বয়সে সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যান। পরে পড়াশুনা করে অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট হন। যুদ্ধকালে সরকারী অফিসে চাকরি করেন। এই চাকরি ছেড়ে স্কুলমাস্টারী সুরু করেছিলেন। যুদ্ধ হাক্সলির মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারেনি। অবশ্য তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসে যুদ্ধোত্তরকালের হতাশায় বিহ্বল, দায়িত্বজ্ঞানশূন্য একটি জগৎ প্রতিবিম্বিত। যুদ্ধের সংঘাতে ধূলিসাৎ পুরনো মূল্যবোধ সম্পর্কে হাক্সলির পাত্র পাত্রী সন্দেহাকুল। পুরনো নিমজ্জমান আদর্শবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের মুখে এক অবিশ্বাসের পরিহাসদীপ্ত হাসি ফুটে উঠেছে। যুদ্ধ শেষে মিডিলটন ম্যারের 'এথেনিয়াম' [illegible] যোগ দেন এবং ক্রমশঃ ক্ষমতা-[illegible] কথাশিল্পী হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে [illegible] থাকেন।

১৯২০ সালে প্রকাশিত ছোটগল্প-গ্রন্থ লিম্বো থেকে সুরু করে মর্টাল কয়েলস, ক্রোম ইয়েলো, পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট, দোজ ব্যারেন লিভস, জেস্টিং পাইলেট, জেডা—পর্যন্ত হাক্সলির সাহিত্যসাধনার প্রথম পর্ব। যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়ী সমাজজীবনের হাল্কা মানুষদের নিয়ে এ সমস্ত গ্রন্থের কোথাও কোথাও যে বিদ্রূপ করেছেন, তা কখনও কখনও তীক্ষ্ণাতর হয়ে উঠেছে। পুরনো মতের গোঁড়ামিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন হাক্সলি গল্পের মধ্যে শিক্ষা, শিল্প, যৌনতত্ত্ব, চাষবাস, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি প্রসঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করে। কখনও স্বীয় মত প্রচারের জন্য লেখক নিজের স্বপক্ষে বক্তৃতা করেছেন।

লরেন্সের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বই হাক্সলির সামাজিক মানুষের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন আসে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে। এই পরিবর্তনের ফলেই 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' উপন্যাসে বলা হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে মানবিক সহানুভূতির বন্ধন না ঘটলে মানবসমাজের সমূহ বিপদ। হাক্সলির মত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে বিশ্বনিয়মের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রতি ধাবিত হওয়া এবং যুক্তবাদী মনকে মিস্টিক জগতে অভিসারিত করা নিতান্তই বিস্ময়কর। কিন্তু হাক্সলির মিস্টিকবিশ্বাস তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিসম্মত।

চল্লিশের যুগে হাক্সলি আমেরিকায় চলে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু যন্ত্র-সভ্যতার ক্রমপ্রসারে তিনি ক্ষুব্ধ। যন্ত্রসভ্যতার যান্ত্রিকতায় বিক্ষুব্ধ হাক্সলি বিজ্ঞানের যুগকে ব্যঙ্গ-কটাক্ষবিদ্ধ করেছেন। ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড তারই প্রমাণ।' আফটার মেনি এ সামার সমাজজীবনের এক চিরন্তন সত্য ও প্রশ্নকে অবলম্বনে রচিত।' সভ্যতার দ্বন্দ্বময় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারার আত্মিক সংকটের কথা টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ—গ্রন্থে' সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এজ এ্যান্ড এসেন্স হাক্সলির বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে বক্তব্যসমৃদ্ধ ও স্বাক্ষর-চিহ্নিত। বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত নতুন নতুন মারণাস্ত্র মানব সভ্যতায় সঙ্কট নিয়ে আসবে—তিক্ত হতাশায় হাক্সলি বারবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন।

পুনরাগমনায় চ
সরিষার তেল
চাউলের দোকান
এখানে তেল চিনি পাওয়া যায়
তেল
চিনি
"হে চন্দ্র! আমাদের বাঁচাও!"
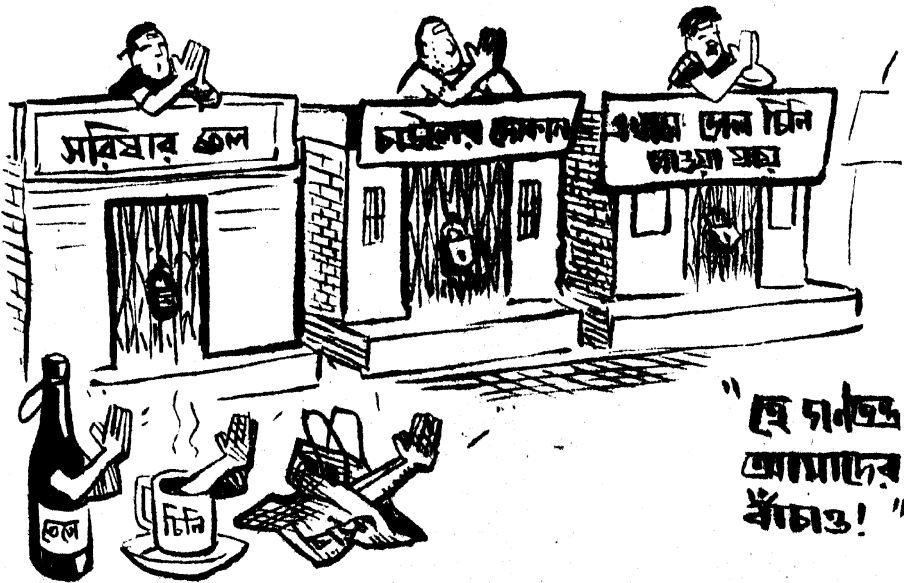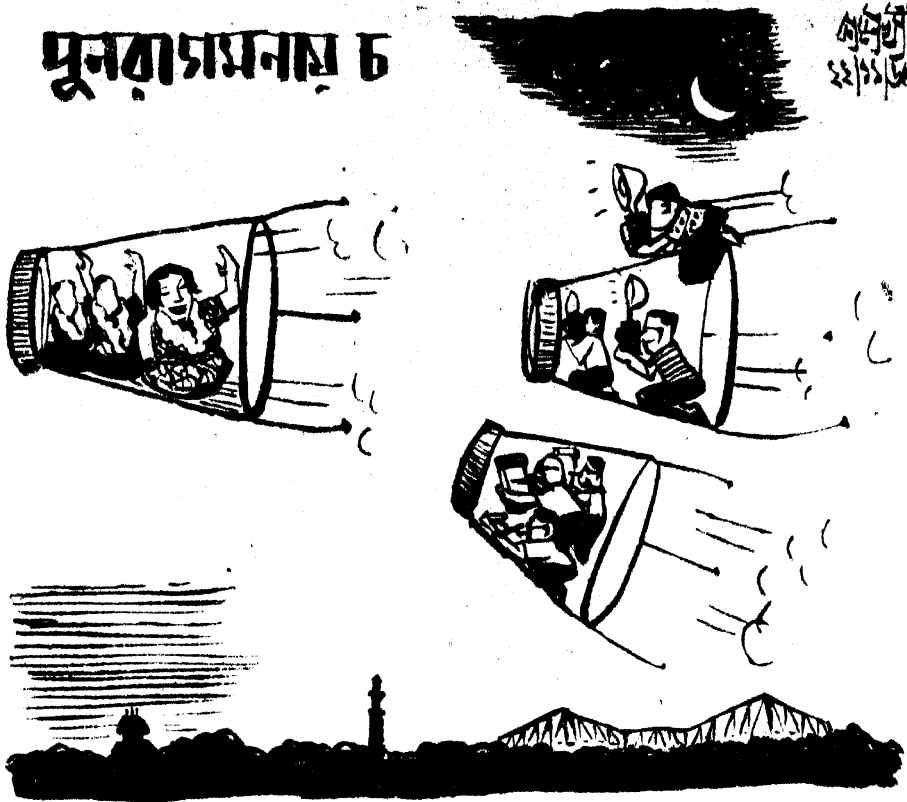
আধুনিক পোশাকে নিত্যরতা নিকোবরের তরুণীবৃন্দ।

নিকোবরের মেয়ে

বন্দনা গুপ্ত

জ্ঞানে বিজ্ঞানে কর্মজগতে নারী আজ পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলছে। নারীজাতির এই অগ্রগতির যুগে সভ্য কর্মব্যস্ত পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত নিকোবরের নারীসমাজের জীবনধারাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। যদিও আজ তাদের বিশেষ ক'রে কার নিকোবরের মেয়েদের জীবনধারা অনেকটাই পাল্‌টে গেছে বাইরের জগতের সংস্পর্শে এসে কিন্তু রাশিয়ার মেয়ে তেরেসকোভার মহাকাশে ভ্রমণ তাদের কাছে এখনো রূপকথা।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির খবর তারা না জানতে পারে কিন্তু নিকোবরী সমাজে নারীর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। নিকোবরী নারী ঘরে বাইরে, কাজে কর্মে আমোদে প্রমোদে সব সময় পুরুষের সমান অংশীদার—। স্বামী সংসারের কঠিন কঠিন কাজগুলি করে—যেমন ক্যানো তৈরী করা, কুঁড়েঘর বানানো, অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা, শিকার করা ও মাছ ধরা, আর স্ত্রী করে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজগুলো—যেমন ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো, রান্নাবান্না, গৃহপালিত পশুর দেখাশোনা করা, সমুদ্রতীরে শেল ও কাঁকড়া সংগ্রহ করা, বাগানের কাজ—এবং ঝুড়ি ও পোশাক তৈরী ইত্যাদি। এই নারিকেল-দ্বীপের শূকররাও নারকেল খায়। নারকেলগুলো শক্ত খোলা থেকে বের করে ঝুড়িবোঝাই করে দেয় নারীরা আর সেগুলো পুরুষরা বহন করে নিয়ে যায় জঙ্গলের ধারে শূকরকে খাওয়াতে। বাগিচা ও জঙ্গল থেকে নারী ও পুরুষ ফলমূল সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। কাজকে এরা খুব সহজভাবে নেয়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নিকোবরী মেয়ে যখন দিনের শেষে ঘরে ফেরে স্বামীর পাশে পাশে তখন সারাদিনের ক্লান্তির রেশও থাকে না তাদের দেহে ও মনে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে তাদের। উদার উন্মুক্ত সমুদ্রের উচ্ছলতা তাদের দেহে ও মনে এনে দিয়েছে প্রাণবন্যা। এরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাদের নাচে ও গানে। নাচগান নিকোবরীদের মেয়েদের মজ্জায় মজ্জায়। চাঁদনীরাতে জ্যোৎস্নার আলপনা আঁকা সমুদ্রতটে নিকোবরী মেয়েদের সঙ্গীতধ্বনি মিশে যায় সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে। এমনি করে নেচেগেয়ে সমুদ্রের বালুকাবেলায় খেলে বেড়িয়ে নিকোবরী মেয়ে কাটায় তার শৈশব ও কৈশোর কাল। তারপর যখন তার বয়ঃসন্ধিক্ষণ আসে আর সে বিবেচিত হয় বিবাহযোগ্যা বলে তখন জীবনের এই পরমলগ্নটি অবহেলিত হয় না নিকোবরী নারীর—এই সময় কন্যার পিতামাতা একটি ভোজের আয়োজন করে—আমন্ত্রণ করে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং বিবাহযোগ্য যুবকদের। এর উদ্দেশ্য কন্যা যে বিবাহযোগ্যা হয়েছে তা ঘোষণা করা সাধারণতঃ এইসব যুবকদের মধ্যে কেউ একজন পছন্দ করে কন্যাকে পাত্রী হিসাবে। কিন্তু এই সকল নিমন্ত্রিত অতিথিরা ভোজ-উৎসবে উপস্থিত হওয়ার আগেই তাদের অদ্ভুত রীতি অনুসারে কন্যার মা বা অন্য কোন আত্মীয়া কেটে নেয় পাত্রীর মাথার চুল এবং তার মা এই চুলগুলো এক টুকরো কাপড়ে বেঁধে সযত্নে বাক্সে তুলে রাখে। নারীজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তার সৌন্দর্যের সহায়ক কেশরাজি বাক্সবন্দী হয়ে থাকলেও তার রূপমুগ্ধ পাণিপ্রার্থীর অভাব হয় না কখনো। মেয়েটার বাপমার কাছে তাদের মধ্যে কেউ তার পাণি প্রার্থনা করলে তারা তার যোগ্যতা সম্বন্ধে নানাভাবে যাচাই ক'রে দেখে তার হাতে মেয়ে দিলে মেয়ে সুখী হবে কিনা—এবং তবেই তার হাতে মেয়েকে দেয়। এই ভোজ-উৎসবকে নিকোবরী ভাষায় বলে "উইং আইচ"। উইং আইচ প্রত্যেক মেয়ের জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ, এরপর থেকে সে নারী। এই ভোজে যোগদানকারী আত্মীয়রা আনে মেয়ের জন্য নানা উপহার—তার মধ্যে একটি অন্ততঃ নূতন স্কার্ট থাকা চাই। দু'দিন ধরে চলে এই ভোজ।

নৌবাইচের পরে জয়ী দলকে অভ্যর্থনার জন্য নিকোবরী তরুণীদ্বয় অপেক্ষা করছে।

সমস্তদিন ধরে খাওয়া এবং নাচগান চলে। মেয়েটি এই সময় ঘরের মধ্যে থাকে এবং মুখছাড়া সর্বশরীর কাপড়ে আবৃত করে রাখে। ঘরও লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয়—সপ্তাহকাল পর্যন্ত। সে কয়দিন সারারাত সারাদিন ধরে চলে নৃত্যগীত—মাঝে মাঝে বিরতি হয় পান-ভোজনের জন্য। উইং আইচ্ অনুষ্ঠানের পর থেকে মেয়েরা বড় চুল রাখে মাথায়।

বিবাহযোগ্যা হ'লে আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা ঘোষণা করলেও বিয়েতে কিন্তু এদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই—একমাত্র চাওরা দ্বীপ ছাড়া। এমনকি এই উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন ভোজও হয় না। মেয়েকে বাপ-মা কোন যৌতুক দেয় না—পাত্রই বস্ত্রালংকার পাত্রীকে পাঠিয়ে দেয়—। বরের দেওয়া এই বস্ত্রালংকার পরলে বোঝা যাবে সে বিবাহিত এবং পাত্র যে পাত্রীকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্য রাখতে পারবে তাও প্রমাণিত হয় এতে এবং অভিভাবকরাও নিশ্চিন্ত হন। বিয়ের পর পাত্রীকে যে পাত্রের বাড়ী যেতেই হবে তেমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। পাত্রীর আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হলে অনেক সময় পাত্রও পাত্রীর পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে। কিন্তু চাওরা দ্বীপে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে বিয়ের পর মেয়ে বরের বাড়ী গিয়ে বাস করবেই এবং ছোটখাট ধর্মীয় অনুষ্ঠানও রয়েছে তাদের—কিন্তু নিকোবরের দক্ষিণাঞ্চলের টেরেসা ইত্যাদি দ্বীপে বিয়ে বলেই কিছু নেই! যার যাকে পছন্দ তাকে নিয়ে ঘরসংসার পাতে আবার ঝগড়াঝাটি মনোমালিন্য হ'লে তাকে ছেড়ে আবার মনোমত সংগী বেছে নিয়ে ঘর করে। এর ফলে একটি নারীর জীবনে অনেক সময় বারকয়েক পতি বদল হয়তো হয় কিন্তু একসংগে এরা কখনো একজনের বেশী স্বামী বা স্ত্রীর সংগে সম্পর্ক রাখে না।

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সাধারণতঃ নিকোবরীদের বিয়ে হয় না। খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো, মামাতো, মাসতুত ভাইবোনে বিয়ে হওয়া বারণ। কিন্তু একেবারে দক্ষিণের গ্রেট্ নিকোবরের সমপেনদের মধ্যে এরকম বিয়ে হয়। বিবাহিত দম্পতির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নারিকেল বাগান, শূকরের পাল প্রভৃতি স্বামীস্ত্রী উভয়েরই যৌথ সম্পত্তি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রী। বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় সবকিছু তাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

বিধবাদের সমাজে হীন হয়ে থাকতে হয় না—আবার বিয়ে করতে চাইলেও তারা বিয়ে করতে পারে। তবে স্বামী মারা যাওয়ার পর যে আমাদের বাংসরিক শ্রাদ্ধের মত ওদের কা-না-হানি উৎসব আছে সেটা অন্ততঃ দুই-তিনবার হ'য়ে গেলে অর্থাৎ মৃত্যুর দুই-তিন বৎসর পর তবে বিয়ে করে।

নিকোবরী নারীর স্বামী বিদেশে গিয়ে হয়তো অন্য কোন নারীকে নিয়ে ঘর বাঁধলো—আর দেশে ফেরার গরজ নেই তখন তার স্ত্রীও শুধু কেঁদেকেটে পথ চেয়ে চেয়ে জীবন নষ্ট করে না—সেও উপযুক্ত জবাব দেয় এই নিষ্ঠুর আচরণের। এদের সমাজে এ অবস্থায় স্বামীর সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিধান আছে। নিকোবরী নারী যখন সম্পর্ক ছিন্ন কর'বে বলে মনস্থ করে তখন সর্বপ্রথমে সে সেইসব পোশাকগুলো পরিত্যাগ করে যেগুলো স্বামী বিদেশে যাবার সময় তার পরনে ছিল। নতুন বস্ত্র অলংকার পরে সে আবার কুমারী সাজে এবং এতে বুঝা যায় যে, সে অতীত জীবনকে মুছে ফেলে আবার নতুন ক'রে জীবন শুরু করতে প্রস্তুত। এরকম ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য কোনরকম বিধিনিয়ম নেই—মোড়লকে না জানালেও চলে।

নিকোবরের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক উভয়ই। নিকোবরের কোথাও কোথাও স্বামী স্ত্রীর পরিবারভুক্ত হয়ে বাস কর'তে পারে আবার স্ত্রীও স্বামীর পরিবারের সংগে বাস করে। যে পরিবারে বাস করে সন্তানসন্ততিরাও সেই পরিবারের নামেই পরিচিত হয়। কিন্তু চাওরাতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এখানে বিয়ের পর কনেকে বরের বাড়ী গিয়ে বাস করতেই হয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে স্ত্রীর পুরো অধিকার। বিয়ে করেই কোন পুরুষ স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। স্ত্রী নিজের খুশিমত তার নিজের সম্পত্তি বিক্রী দান বা হস্তান্তর করতে পারে—তবে আদর্শ দম্পতির কথা আলাদা তারা পরস্পর পরস্পরের সম্পত্তি ভোগ করে।

নিকোবরী নারীর পোশাক "নঙ"-এর ব্যবহার আজকাল কার নিকোবরের মেয়েদের মধ্যে প্রায় উঠে গেছে। এই পোশাক কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত নারকেল পাতার তৈরী ঘাগরার মত। ঊর্ধ্বাঙ্গ থাকত অনাবৃত। চাওরা দ্বীপে তো এখনো মেয়েরা ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু ব্যবহার করে না বললেই হয়। "নঙ" এখনো উৎসবে অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে নিকোবরীরা। কার নিকোবরের অর্ধেক লোকই প্রায় খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে এবং পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তনও এখানেই সবচেয়ে বেশী হয়েছে। এখানকার মেয়েরা ব্লাউজ ও লুঙ্গী পরে, মাথায় রঙীন রুমালও বাঁধতে ভালবাসে। স্কার্ট এবং ব্লাউজও কেউ কেউ পরে। তবে বেশীর ভাগ মেয়েরাই পরে লুঙ্গী ও ব্লাউজ। অনেকের মতে নিকোবরীরা এবং বর্মীরা একই বংশ থেকে উদ্ভূত। লুঙ্গী ও ব্লাউজ পরে মাথায় রুমাল বেঁধে তামাটে বর্ণের নিকোবরী মেয়েরা যখন নিরলসভাবে কাজ করে যায় তখন তাদের বর্মী মেয়ে বলে ভুল করলে অন্যায় হয় না বরং বর্মীদের স্বজাতীয় বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নিকোবরের মেয়েরা কর্মচঞ্চলতায় ও সপ্রতিভতায় বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সভ্য জগৎ থেকে অনেক দূরে অশিক্ষার অন্ধকারে থেকেও এদের নারীজাতি অন্য কোন দেশের নারী থেকে হীন নয়। তারা জড় পুঁটুলির মত পুরুষের ভারস্বরূপ নয়—নয় শুধু গৃহের শোভাবর্ধনের উপকরণ। কাজে কর্মে, আমোদে-প্রমোদে নারী চলে এদের পুরুষের পাশে সমান তালে পা ফেলে— প্রকৃত অর্ধাঙ্গিনীরূপে। সারাদিন পুরুষরাও যেমন পরিশ্রম করে নারীরাও বসে থাকে না। সমস্ত নিকোবরে একমাত্র চাওরা দ্বীপেই মৃৎশিল্পের প্রচলন আছে এবং এই শিল্পকর্ম সম্পূর্ণভাবে এখনকার নারীসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ। নারীদের এরা চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেনি, সর্বত্র তাদের অবাধ গতি। নারী ও পুরুষে গোড়া থেকেই মেলামেশায় বিধিনিষেধের কড়াকড়ি না থাকায় তাদের মধ্যে একটি সহজ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কোন মেয়ে তার জীবন-সঙ্গীকে বেছে নিলে অভিভাবকদের চক্ষু রক্তবর্ণ হয় না। নারীজাতির এরকম অবাধ স্বাধীনতা ও স্ত্রীপুরুষে এমন সহজ সম্পর্ক তথাকথিত অনেক সভ্য সমাজেও বিরল। সমস্ত দিনই নিকোবরী গৃহিণীকে সংসারের নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয় কিন্তু তা'বলে আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে তারা মোটেই নিস্পৃহ নয়। কোন উৎসবই তাদের বাদ দিয়ে হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত বেলাভূমি চাঁদের রুপালী আলোর বন্যায় ভেসে যায় তখন কোন যুবক বা যুবতী হঠাৎ নাচের জন্য উচ্চস্বরে জানায় আহ্বান—রাত্রির নিস্তব্ধতা খানখান্ করে সে ডাক পৌঁছে যায় কুটীরে কুটীরে নিদ্রিতদের কানে। তখন শুধু যুবক যুবতীই নয় বয়স্কা গৃহিণীরাও সে ডাকে সাড়া দিয়ে জমায়েত হয় বেলাভূমিতে নাচগানে যোগদানের জন্য।

নিকোবরী দম্পতি কাজের শেষে ঘরে ফিরছে।

নিকোবরী মেয়েরা নারিকেল তেল তৈরী করছে।

* আলোকচিত্রগুলি অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মতবাদের ফ্রাংকেনস্টাইনের তৈরী জীব ত' এখন দুনিয়াকে গিলে খেতে যাচ্ছে। সেই অতিকায় দানবকে দেখা-শোনা যায় না, ধরা-ছোঁয়া যায় না, অথচ তার অষ্টপাশ বাহুর চাপে ধনী, নির্ধন, আরামী-ব্যারামী সকলেরই দম বন্ধ হয়ে আসছে। মতবাদের, পরমতবাদের দানব সৃষ্টি হচ্ছে গত দু'শো বৎসর ধরে। রিকার্ডো, অ্যাডাম স্মিথ থেকে কেইনিস্ এবং তারপর কেইনিস্-বিরোধীর দল মতের ঢেউ তুলে কাগজের পাতা ভরিয়ে দিয়েছেন। এখন মার্কস-এংগেলসের নূতন ধন-তত্ত্ব বিশ্ব-মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রাকৃত লোককে ধাপ্পা দেবার জন্য দুটো মত খাড়া হয়েছে—ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ। মানুষ মনে করছে এইবার চরম তত্ত্বকথা পাওয়া গেল: কারণ এমন তথ্য-সমৃদ্ধ যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব তো কেউ বাংলায়নি এতকাল। অতএব এবার 'সব পেয়েছির দেশে' নিশ্চয়ই তরী ভিড়বে। ইউটোপিয়া—রামরাজ্য! কিন্তু হায়রে মহাকাল—তোমার যে কারো প্রতি মমতা নেই—তা অধম মানুষে বোঝে না। কত নেয়ে মতের নৌকা সাজিয়ে-গুছিয়ে হাটের ঘাটে ভিড়িয়েছে, তার পিছু পিছু এসেছে মনোহারী বচন নিয়ে নয়া বজরা। এসেই পুরনো নৌকোটা ঠেলে দিল; সে নৌকা মতের বোঝা নিয়ে ডুবলো কি ভাসলো, তা কেউ ফিরেও তাকালো না। অসংখ্য মতামতের ভরাডুবি হয়েছে ঘাট থেকে বের হবার আগে। তথ্যের ভুল ছিল, তাই তত্ত্ব টিকলো না। এই ভুলের বোঝা মানুষ চিরকাল বইছে।

"তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে
ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের
অর্থলুপ্ত অবশেষ।
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ
তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।"

কোণারকের সূর্য-মন্দির বাইরের কোনো শত্রু ভাঙেনি—ভুলের ভারে সে ধ্বসে পড়েছিল। ছন্দ-পতন হয়েছিল—তালভঙ্গ হয়েছিল ব'লে সৌন্দর্যের বিসর্জন হয়েছিল অমরাপুরী থেকে। তথ্য নির্ভুল হলেই অমর হয় মানুষ।

"আজকালের ছাত্রেরা দেয়/আজকালের দোহাই/
আজকালের মুখরতায়/তাদের
অটুট বিশ্বাস/
হায়রে আজকাল/কত ডুবে গেল
কালের মহাপ্লাবনে/
মোট দামের মার্কামারা/পসরা নিয়ে
যা চিরকাল এর/তা আজ যদি বা
ঢাকা পড়ে/
কাল উঠবে জেগে।"......

(শেষ সপ্তক ৪২ সংখ্যক।

মানুষের এক বুদ্ধি যেমন প্রকৃতিকে মুচড়ে মুচড়ে (torture) তার গুপ্ত-ধন নিষ্কাশিত করেছে, তেমনি মানুষের অপর শক্তি তার মনের গহনে প্রবেশ করে দেখেছে, সেখানে আরেকটা তৃতীয় পদার্থ রয়েছে সবার অন্তরালে—তাকে বলে রস। রসতত্ত্ব আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, যোগ্যতাও নেই কথা কইবার। মোটকথা, যখনই আমরা কোনো দৃশ্যকে 'সুন্দর' বলে প্রশংসা করেছি, কাউকে সুন্দর মনে করে ভালোবেসেছি, পর্বতপ্রমাণ তথ্য ও আকাশচুম্বী তত্ত্ব-রাশি দিয়ে আমার সে-ভালোবাসার, সে-ভালোবাসার কেন-র উত্তর দিতে পারিনি। অবশ্য জীবতাত্ত্বিক জবাব আছে, কিন্তু তাতে মন ভরে না। চরম বস্তুবাদী—যখন তার নিরীশ্বর আদর্শবাদকে ভালো-বেসেছে—তখনই তবে অজানতেই মেনে নিয়েছে রস-পদার্থকে—যে তার তথা-কথিত শুষ্ক-হৃদয়ে তার মনগড়া বা মনোমত আদর্শকে ভালোবাসবার শক্তি যোগান দিয়েছে।

আমরা কবি মনীষীর সাহিত্যিক রচনা বা শিল্পীর আর্ট-সৃষ্টির 'অর্থ' সন্ধান করি, এই অর্থ বোঝবার জন্য তথ্য ও তত্ত্ব বিচার করি সর্বাগ্রে—তারপর তার রসের বিচার ও উপভোগের কথা আসে। ইতিমধ্যে সমালোচক দিগ্‌-নাগদের বৃংহতি ও কাদামাটি ছড়ানির পরও আর্টিস্ট বেচারা যদি টিকে যায় তো বলবো তার কলজে শক্ত। তা' না হ'লে কীটসের দশা, অথবা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের জয়-পরাজয়ের কবির অবস্থা হয়।

প্রশ্ন উঠছে ভালো-মন্দর বিচারকটি কে? এখানে সেই পুরাতন কথাই এসে পড়ছে। আমি ব্যক্তি-পুরুষের কাছে 'তথ্য' কিভাবে প্রকাশ পাচ্ছে এবং সেই 'আমি' ব্যক্তিটি কী ভাবে তা' গ্রহণ ও ব্যক্ত করছেন। অনেক সময় অন্ধের হস্তীদর্শন বা হস্তী অনুভবটাই হস্তীর বর্ণনা বলে কীর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল পড়ে 'মিঠে-কড়া' লিখলেন একজন, অপরজন 'কবি-মানসী'কে পেলেন। একজন পেলেন আখের ছিবড়ে, অপরজন উপভোগ করলেন তার গাঁজালো রস। কবির সৃষ্টিকে কবির বয়োধর্মের দৃষ্টিতে দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা না করে, নিজের মতের অনুকূলে তাকে টেনে আনবার লোভ সামলানো বড়ই শক্ত।

আমরা যারা বিচারকের আসনে বসি সকলেই individual; বংশগত, সমাজ-গত, শিক্ষা ও পারিবেশগত, ধন ও মানগত বহু উপাদান দিয়ে তার দেহ-মন রচিত। রুচি ও সৌন্দর্যবোধও কিছুটা acquired বা অর্জিত সম্পদ, কিছুটা বংশগত দৌলত। যে এর স্বত্বাধিকারী হয়নি সে বঞ্চিত হয়েছে। সে ব্যক্তি তথ্যবাদী, তত্ত্ববিদ্ হতে পারে—কিন্তু রসবিদ্ না হওয়াতে রুচি-বোধের দৈন্য হেতু দুনিয়ার সুন্দর, অসুন্দর, ন্যায়, অন্যায় প্রভৃতির অনেক কিছুরই মূল্যায়ন করতে পারবে না। বিচারকের নানা গুণাগুণের সঙ্গে অনেক সময় তার আশেপাশে দানা বাঁধে তার রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক মতবাদ। এই মিশ্র মনকে নৈর্ব্যক্তিক বিশুদ্ধ নিরাসক্ত বিজ্ঞানী করা কি সম্ভব? জানি না। হার্বার্ট রীড্-এর ছবি আঁকানোর পরীক্ষা স্মরণীয়। স্থান-কালের অদল-বদল হলেই রূপের তো একচোট পরিবর্তন হয়, তা ছাড়া পাত্রের শিক্ষা, দৃষ্টিশক্তি ও রুচিবোধের উপর বস্তুর ও বিষয়ের প্রকাশতা অনেকখানি নির্ভরশীল।

বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানবিষয়ক বিচারের বেলায় পদ্ধতি বস্তুমূলক বলে মোটামুটিভাবে মতের ঐক্য দেখা যায় এবং সেইজন্য বিজ্ঞানীদের কোনো জাত নেই, তাদের মধ্যে একটা সমঝোতা বা understanding হওয়া সহজ। কিন্তু আর্টের বা সাহিত্যের বিচারে বারো চোকে তো তেরো চোকার মত হয়। প্রত্যেকের শিক্ষা ও বুদ্ধির উপর বিচারের মান বা (excellence) উৎকর্ষ এবং প্রত্যেকের রসবোধ বা সমঝোতার উপর বিচারের সূক্ষ্মতা নির্ভর করে। রসের বিচার কতদূর সূক্ষ্ম হ'তে পারে, তা আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্য ও অলংকারের গ্রন্থগুলি দেখলেই জানা যায়; আর বিচারের বেলায় বুদ্ধির খেল্ ও কসরত কতদূর হতে পারে, ন্যায়-শাস্ত্রের নামাবলী স্পর্শ করলেই তা' জানা যাবে। কিন্তু বিচার যত রস-সিক্ত হোক্ অথবা তর্ক-সহা হোক্—তা সে সূক্ষ্ম হোক্ আর স্থূলই হোক্—কবি বা আর্টিস্টের মনের গভীরে প্রবেশদ্বার থেকে তা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

"তথ্যের সুবিধা এই যে, তার পরীক্ষা সহজ। ঘোড়ার ছবি যে ঠিক ঘোড়ার মতোই হয়েছে, তা প্রমাণ করতে দেরী লাগে না। ঘোর অরসিক ঘোড়ার কানের

উগা থেকে আরম্ভ করে, তার লেজের শেষ-পর্যন্ত হিসাব করে মিলিয়ে দেখতে পারে।"

"সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ, সে বস্তু যদি এমন একটি রূপ-রেখা-গীতের সুষমাযুক্ত ঐক্যলাভ করে যাতে করে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য বলে স্বীকার করে, তা হলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা' যদি না হয়, অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁত হয় তা হলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জন করেন।" (তথ্য ও সত্য, সাহিত্যের পথে—পৃঃ ৫৫, ৫৬)।

রসবোধ ছিল বলে গ্যেটে শকুন্তলার অনুবাদের অনুবাদ পাঠে নাটকের অন্তঃস্থলের কথাটি বুঝতে পেরেছিলেন। এমার্সন ভারতের ব্রহ্মবাদ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

আমাদের মধ্যে রসজ্ঞ ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য বিচিত্র ভাষার রসাস্বাদন করেন ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে।

কিন্তু সাহিত্য-অতিরিক্ত অন্যান্য কলা বা আর্টের রসগ্রহণের জন্য ভাষার প্রয়োজন গৌণ। চিত্র-ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি চৌষট্টি কলার আবেদন সর্বমানব-গ্রাহী—ওদের কোনো জাত নেই; শ্রেষ্ঠ কলার দেশ নেই এবং বোধহয় কালও নেই। মিশরের সাহিত্যে কি ছিল, তার খোঁজ দু-চারজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের জানা থাকতে পারে—তা-ও 'রসে'র জন্য তাঁরা তা পড়েন না, তাঁরা পড়েন 'বিদ্যা'র জন্য। কিন্তু মিশরের পিরামিড ও অসংখ্য স্থাপত্য ভাস্কর্য, প্রাচীর-চিত্র এখনো প্রতিদিন শত শত ভ্রমণ-বিলাসীকে আকর্ষণ করছে। তাজমহলের কোনো ভাষা নেই—তাই তার আবেদন Universal। এরা কথা না বলেও মানুষের দর্শন-ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে বিচিত্র আবেগ সৃষ্টি করছে। চোখে দেখা তথ্য-রসের কোঠায় গিয়ে পৌঁছায়।

কিন্তু পণ্ডিতের দল Venus of milo-র ভাঙা হাত কিরকম ছিল সেই তথ্য নিয়ে কলহে মত্ত। তা নিয়ে রসজ্ঞ দর্শকের কোনো শিরঃপীড়া নেই। মোনা-লিসার হাসি ভালো লাগে—এইটাই যথেষ্ট নয় কি? কিন্তু রসের সম্ভোগে পণ্ডিতের তৃপ্তি নেই। সে মহিলা কে ছিলেন, কার স্ত্রী, কি বৃত্তান্ত না জানলেও রসানুভূতি কম হয় না।

শুধু কি চিত্র, স্থাপত্যাদি আর্ট বস্তু মানুষের মনে রস সৃষ্টি করে? গ্রামোফোন, রেডিও, ফিল্ম, টেপ্-রেকর্ড আজ নানাভাবে মানুষের মনকে স্পর্শ করছে। এতকাল মানুষের কণ্ঠস্বর, তার অভিনয়ই শ্রোতা, দর্শকদের আনন্দআবেগ বর্ধন করে এসেছে; এখন সেখানে মেকানিক্যাল যন্ত্র-উৎপাদিত সঙ্গীত, বাদ্য ও দ্রুত চলমান ফিল্ম স্ট্রিপের উপর ফোটো আমাদের মনে হর্ষ-বিষাদের বিচিত্র তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। এখানে তথ্য বা রস সৃষ্টির উপাদান যোগাচ্ছে মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি। কিন্তু এই চলমান চিত্র দেখে এখনো Ode to the Greecian Urn-এর মতো কবিতা লিখিত হয়নি; ভবিষ্যতে হবে না যে—তা বলতে পারি নে।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে, চোখে-দেখা আর্ট-বস্তু, কানে-শোনা সঙ্গীতাদি এবং চক্ষু ও কর্ণ দিয়ে উপভোগ্য নৃত্য ও নাট্যাভিনয়—আমাদের মনে বিচিত্র রসের পরিবেশ রচনা করছে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সাহিত্য বুঝতে হলে যেমন ভাষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, রস, অর্থ প্রভৃতি বিচিত্র বিদ্যার সাধনা করা দরকার, আর্ট-এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলেও মনের শিক্ষার প্রয়োজন। চিত্রাদির জন্য চোখের ও সঙ্গীতাদির জন্য কানের শিক্ষা এবং সর্বোপরি মনঃশিক্ষা চাই। চোখে দেখা ও কানে শোনা তথ্যরাজি তখনই তত্ত্ব অথবা রসে উত্তীর্ণ হতে পারে। সুরুচি-সম্পন্ন সাহিত্য, কুৎসিত আর্ট, অশ্রাব্য গান প্রচারের দ্বারা জনতাকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা, তা বিচার করতে আমরা চাইনে, কারণ বাস্তবতার নামে যা পরিবেশন করা হয়; তার থেকে মোটা পয়সা ঘরে আসে। তবে এ-কথা কেন প্রশ্ন করবো না, মানুষের মন সত্যই কি সরল, সুন্দর হচ্ছে? আমরা চাই অভিজাত কলা সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস দিয়ে তাকে বীর্যবান করে তুলতে। যে নেমে যাচ্ছে—তাকে ঠেলে দিলে নামার কাজটা ত্বরান্বিত হয় কিন্তু তাতে করে সমগ্র সমাজ ও ভাবী-বংশধরদেরও রসাতলের পথে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা ভুললে চলবে কেন?

তত্ত্ব বা রস ছাপিয়ে বিকৃত তথ্যের দাবী জয়যুক্ত হতে দিলে চলবে না।

আপাতদৃষ্টিতে তথ্য বা data মিললেই যে পরিণামে সবার ক্ষেত্রে ফল সমানভাবে ফলতে দেখা যাবে তা হয় না। সূক্ষ্ম, অদৃশ্য এত বস্তু ও বিষয় প্রত্যেকটি জীবের সৃষ্টি-মূলে এবং গঠন বা বৃদ্ধিকালে স্তরীভূত হয়, জীবনের স্তরে স্তরে আকস্মিক ঘটনা ও ভাবনার অনুপ্রবেশ হয়, এবং প্রত্যেক স্তর থেকে স্তরান্তরে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যৌগিক সংশ্লেষণে এমন জটিলতা সৃষ্টি করে যে, তাদের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীর করায়ত্ত বা কলের আয়ত্তে আসেনি। প্রতি মুহূর্তে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে কত ধ্বনি, কত ঘটনা, কত দৃশ্য আঘাত করছে, তার হিসাব কেউ দিতে পারে না। স্তরের পর স্তর জমছে, তলিয়ে যাচ্ছে তথাকথিত বিস্মৃতির অতলে। তারপর কখন অবচেতনের রসাতল থেকে বাসুকির বংশধরেরা যে আমার মনের মধ্যে কোন্ এক দুর্বল রন্ধ্র বেয়ে প্রবেশ করে, তা আর জানতে পারে না। অহল্যাভূমির উপর পলিমাটি জমলে তবে সেখানে সোনার ফসল ফলে; অকর্ষিত মনের উপর বহুজনের মনের স্পর্শে ভাবনার পলি পড়লে তবে সেখানে জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত পল্লবিত হয়।

একটা প্রকাণ্ড রহস্য রয়ে গেছে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই অজানার রহস্য যেদিন থাকবে না, সেদিন জীবনটাকে টাইম্‌টেবিলের ছক-কাটার মধ্যে দেখা যাবে—সেদিন জীবনের সমস্ত স্বাদ, সৌন্দর্য, রোমান্স অন্তর্হিত হবে। জীবন থেকে প্রশ্ন, সন্দেহ, বিস্ময় অন্তর্হিত হলে কি নিয়ে মানুষ থাকবে? পশুজীবনে এ-তিনটা উপদ্রব নেই।

এই অজানার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য যেমন তথ্যবাদীরা ব্যোমচারী হচ্ছেন, অপরদিকে তত্ত্ববিদ্‌রা মনের গহনে অনুপ্রবেশের পথ খুঁজছেন। চারদিকে তাকালে এই প্রশ্নই জাগে, মানুষ সত্যই কি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়? সে কি rational জীব? সে তো তার আদিম স্বভাবের উপর বুদ্ধির প্রলেপ দিয়ে চলেছে। জ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধি শাণিত হয় মাত্র; আদিম স্বভাবের মানের বদল হয়। তখন সেই rationalised অবস্থাটি হয় তত্ত্ব, কাম হয় প্রেম, যৌন-আকাঙ্ক্ষা হয় বিবাহ, হিংসা হয় দেশ-প্রেম, রণোন্মাদ থামাবার ওষুধ হয় হিরোশিমার উপর এটম বোমা বর্ষণ, স্থূল তথ্য মনোরম নাম নিয়ে সমাজে বরমাল্য পায়। আবার কালান্তরে এদের মান যায় বদলে—প্রেম হয় একটা সাময়িক মোহ; বিবাহটা চিরকালের বন্ধন নাও হতে পারে। দেশপ্রেম থেকে বিশ্ব-মানবতা বড় ইত্যাদি।

বুদ্ধি ও অনুভূতি (intelligence ও emotion) নাগর-দোলায় ঘুরপাক খাচ্ছে; সরু মোটা দুটো তার রয়েছে জড়িয়ে। তেমনি তথ্য ও তত্ত্ব আছে অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা সায়ামিজ টুইন (Siamese Twin) আমাদের মূল বক্তব্য তথ্য বা তত্ত্ব কেউই একচ্ছত্র সম্রাটের আসন পেতে পারে না; এবং যখন সাহিত্যিকদের বিচার করি, তখন এই সহজ কথাটাই মনে রেখে চলা উচিত।

ছিল দুই—তথ্য ও তত্ত্ব, তারপর আসে রস। এবার এলো সত্য নামে চতুর্থ পদার্থ। সত্য বা Truth শুনেই, তো জেস্টিং পাইলেটের দল বিদ্রূপ করে শুধোবেন— What is truth. সত্য

আবার কি? সত্য কি চিরন্তন, সত্য কি শাশ্বত। হাঁ, সত্য চিরন্তন। যার বদল হয় কালান্তরে, যার রূপান্তর হয়, তা তথ্য ও তত্ত্ব। মহাকাল তথ্যরাশি ধ্বংস করে আসছেন। তত্ত্বরাশিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছেন—কিন্তু সত্যকে স্পর্শ করতে পারেন নি।

জীবনের বুনিয়াদ বিশ্বপ্রাণ বা শক্তির প্রতীক মহাতেজস্ক সূর্য: তা থেকেই আমাদের দেহবস্তুর জন্ম। আবার জীবনের নিগূঢ় তত্ত্বের উৎস সেই অদৃশ্য মহাশক্তি। আমাদের তেজঃ ওজঃর জন্ম সেখানেই। জীবের অস্থি, মাংস, রস, বর্ণ—সবই facts বা তথ্য: এ-সবের নিয়ন্তা প্রাণ বা তেজ—জীবনের তত্ত্ব। সমস্ত মিলিয়ে যা পাই তা হচ্ছে জীবনের সত্যরূপে যা অনাদিকাল থেকে বহমান। জন্ম-মৃত্যুর তরঙ্গে দোলায়িত হয়ে এই রূপ-অরূপে গড়া জীবন, তথ্য ও তত্ত্বের বোঝা নিয়ে চলে আসছে। এই জীবনই সত্য—যা তথ্য ও তত্ত্বকে অঙ্গাঙ্গীভাবে বহন করে এবং যুগপৎ তাদের অতিক্রম করে সত্যরূপে প্রকাশমান।

রবীন্দ্রনাথ 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে সত্য কি সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ ভিক্ষার তথ্য নিয়ে যে সমালোচনা করেছিলেন তা সুপরিচিত। এই আলোচনাশেষে কবি লিখেছিলেন.........

"রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্য-জগতের যে আলোক-রশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রস-জগতের সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ ক'রে অনায়াসে পার হয়ে যায়: তাকে মিস্ত্রী ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না।"

"কাব্যের বা চিত্রের ক্ষেত্রে যারা সার্ভে বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের চার-দিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিলপে গেঁথে তুলতে চায়, গুণীরা চিরকাল তাদের দিকে তাকিয়ে বিধাতার কাছে দরবার করছে—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।" তথ্য ও সত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ what is truth-এর উত্তর দিয়েছেন 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়—

বাল্মীকি রামচরিত লিখবেন, তথ্য চাইছেন নারদ মুনির কাছ থেকে।

"নারদ কহিলা হাসি সেই সত্য
যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব
মনোভূমি
রামের জন্ম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে
সত্য জেনো।"

'কৃষ্ণচরিত্র'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন সেটাও এখানে উদ্ধৃত করছি :—

'তথ্য, যাহাকে ইংরাজিতে ফ্যাক্ট কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্য স্তূপ হইতে যুক্তি এবং কল্পনা বলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসের শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য কবির প্রতিভা বলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ফ্রু সাহেব বলিয়াছেন—সেই কারণেই কবি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।' মহৎ ব্যক্তির কার্য-বিবরণ কেবল তথ্যমাত্র, তাহার মহত্ত্বটাই সত্য, সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিবার জন্য ঐতিহাসিকদের গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।"

মনে আছে বহু বৎসর পূর্বে একদিন কবির কাছে একজন মনীষী এলেন একখানি বই নিয়ে 'In search of Jesus Christ'. তিনি বাইবেলের ঐতিহাসিক সমালোচকদের বই থেকে উদ্ধৃত তুলে তুলে প্রমাণ করেছেন যে ঐতিহাসিক যীশুখৃষ্ট একটা myth। কবি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে যা বলছিলেন তার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিল পেলাম Schweitzer-এর মন্তব্যের সঙ্গে। Schweitzer তাঁর **'The quest of the Historical Jesus'** গ্রন্থে শেষ-পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন, সেটা উদ্ধৃত করছি। তিনি যীশু সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ, বহু তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করে ঐতিহাসিক যীশুকে পেলেন না, কারণ এত বিরুদ্ধ ঘটনা জমে আছে যে তার থেকে সত্য উদ্ঘাটন করা অসম্ভব। চারখানা Gospel যা তাঁর শিষ্যদের রচনা বলে ধরে নেওয়া হয়, তার মধ্যে ঘটনার সামঞ্জস্য করা যায় না। চারশ পাতার গ্রন্থে আলোচনা করে গ্রন্থে শেষ পাতায় বলছেন—

"We can find no designation which expresses what He is for us. He comes to us as one unknown, without a name . . . . He came to those men who knew Him not He speaks to us the same word follow thou me!' and sets us to the tasks which He has to fulfil for our time. He commands and to those who obey Him . . . He will reveal himself in the foils, the conflicts, the sufferings which they shall pass through in His fellowship, and as an ineffable mystery, they shall learn in their own experience who He is." (P. 401).

কিন্তু মানুষের মনগড়া idol কি একদিন লুপ্ত হয় না? অতীত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে এর ভূরিপ্রমাণ কি পাইনে? কত তত্ত্বকথা দিয়ে তাদের গড়া ও ভক্ত শিষ্য-শিষ্যাদের সংখ্যা দিয়ে তাদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা: কিন্তু কালের বুদ্বুদ্-গোলকে সপ্ত-রঙের খেলা খেলে তারপর একদিন মহাকালের ফুৎকারে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, গ্রন্থাগারের ইস্পাতের মঞ্চে তারা ফসিল হয়ে এখন খাড়া, মূক স্তব্ধ হয়ে আছে। কত তত্ত্বের murmury তথ্যবাদীদের তথ্যবার্তার পাশাপাশি আলমারিতে শোভা পাচ্ছে: যাত্রীদল পাশ দিয়ে চলে যায়—শুধোয় না পর্যন্ত, কার চিন্তারাশি মূক হয়ে আছে ঐ আশীর আড়ালে।

তথ্য ও তত্ত্বের বাইরে তবুও আছে সত্য -

মরে না মারে না কভু সত্য যাহা,
শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে
নাহি মরে উপেক্ষায় অপমানে,
না হয় অস্থির, আঘাতে না টলে।

কিন্তু সে সত্য কি, কে সেই সত্যের মূলে আসীন?

কে সে। জানি না কে, চিনি নাই
তারে,
শুধু এতটুকু জানি, তারি লাগি
রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী, যুগ হতে, যুগান্তর
পানে

.....শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক
পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়াছে সে
বিশ্ব বিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি। মৃত্যুর
গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।

এ তথ্য নয়, তত্ত্ব নয়—এ হচ্ছে সত্য —যে সত্যকে কোনো জেস্টিং পাইলেট What is truth বলে প্রশ্ন করতে পারে না। Voltaire বলেছেন, 'He who seeks truth, should be of no country.' না। আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর। কঠিন দুঃখের মধ্যে সত্যের প্রকাশ হয়।

তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ বিচার করতে গিয়ে আমরা দেখলাম—এ-দুটি অচ্ছেদ্য-বন্ধনে বাঁধা। যে বলে পরাবিদ্যা সত্য, সে-ও ভ্রান্ত—যে বলে অপরাবিদ্যা সত্য—সে-ও ভ্রান্ত। সত্য অখণ্ড Seamless Coat—তাকে ব্যবহারিকতার জন্য খণ্ড দৃষ্টিতে দেখতে হতে পারে কিন্তু ব্যবহারিকতার বাইরেও যদি কোনো জগৎ থাকে, এবং যার জন্য যদি কখনো মুহূর্তের তরেও মনে আকুতি জাগে—যদি There was box র চঞ্চল জীবনযাত্রার মাঝে স্তব্ধ হয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে থাকার অবসর কখনো কারো হয়ে থাকে—তবে এই অমৃতময়, জ্যোতির্ময় বিশ্বকে অখণ্ড সত্য বলেই অনুভব করবেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে এই তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

(ক্রমশঃ)

রাজনৈতিক হত্যা

অকস্মাৎ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিবর্ষণের ফলে নিহত হয়েছেন। এই নিয়ে চারজন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আততায়ী কর্তৃক নিহত হলেন। রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশিষ্ট জননেতা অথবা রাষ্ট্রনেতার মৃত্যু নূতন নয়। এই ধরণের শোকাবহ মৃত্যুর ঘটনা আমাদের দেশেই একদা ঘটেছিল, ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী, যেদিন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী নিহত হন।

বর্তমান সংখ্যা থেকে 'রাজনৈতিক হত্যা' পর্যায়ে 'অমৃত'তে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যনিষ্ঠ রচনা প্রকাশিত হবে।

বিমল রায়চৌধুরী

[জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল। এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন মাইকেল ওডায়ার। ইংরেজী মতে ১৩ সংখ্যাটি যে সত্যিই অশুভ, নিরীহ চারশজন ভারতীয়কে হত্যা করে, বারোশোজনকে আহত করে, প্রমাণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ভাগ্যচক্রে শুধু জীবন নিয়েই নয়, জীবন দিয়েও মাইকেল ওডায়ারকে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে, তেরোর মত অশুভ তারিখ ক্যালেন্ডারের পাঞ্জীয় আর নেই। ১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ ক্যাক্সটন হলে বন্দুকের গুলিতে নিহত হন স্যার মাইকেল ওডায়ার। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে প্রায় দেড়শজনেরো বেশী। ক্যাক্সটন হলে তাঁরা এসেছিলেন আফগানিস্থান বিষয়ক বক্তৃতা শুনতে। সভার মূল বক্তা স্যার পার্সি সাইকস, রয়েল এশিয়ান সোসাইটির সেক্রেটারী। এবং অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল ওডায়ার; লর্ড জেটল্যান্ড, ভারত সরকারের রাষ্ট্রসচিব; বম্বের ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড ল্যামিংটন; স্যার লুইস ডেন, পাঞ্জাব সরকারের ভূতপূর্ব আন্ডার সেক্রেটারী। সভা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল বেলা তিনটের সময়। বৃটেনের 'দি প্রেস এ্যাসোসিয়েশন' এই সভার কার্যবিবরণী সংগ্রহের জন্যে ফিলিপ ব্লমবার্গ নামক জনৈক সাংবাদিককে পাঠিয়েছিলেন ক্যাক্সটন হলে। ব্লমবার্গের বিবরণটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসেবে মূল্যবান এবং কৌতূহলোদ্দীপক।

ইস্ট ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আহূত একটি সভায় গত রাত্রে মাইকেল ওডায়ার বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছেন। ওডায়ার যখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন তখনই বিখ্যাত 'অমৃতসর সুটিং-এর ঘটনাটি ঘটেছিল।

ওডায়ার ছাড়াও গুলিতে লর্ড জেটল্যান্ড সামান্য আহত হয়েছেন, সার লুইস ডেনের হাত ভেঙ্গে গেছে এবং লর্ড ল্যামিংটনও অল্প আঘাত পেয়েছেন। সভা শেষ হয় হয়, ঠিক এমনি সময় পর পর পাঁচবার বন্দুকের আওয়াজ হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়স্ক ওডায়ার বুকে দুটো গুলি লেগে সঙ্গে সঙ্গেই আসন থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান; সভাপতি লর্ড জেটল্যান্ড চেয়ার থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন এবং লর্ড ল্যামিংটনের হাতে গুলি লাগে, স্যার ডেনের গুলি লাগে বাহুতে।

সভার প্রধান বক্তা ছিলেন পার্সি-সাইকস, বক্তৃতার বিষয় : আফগানিস্থান এবং বর্তমান অবস্থা। দেড়শজনেরো বেশী শ্রোতা দোতলার এক কাঠের প্যানেল-দেওয়া বড় টিউডার আমলের হলে বসেছিলেন। এছাড়াও অনেকে বসবার জায়গা না পেয়ে দেয়ালের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন। হলের শেষপ্রান্তে তিন ফুট উঁচু একটা মঞ্চের ওপরে একটা ছোট টেবিল ছিল। মঞ্চের মাঝখানে সভাপতি লর্ড জেটল্যান্ড বসেছিলেন, তাঁর বাঁ দিকে ছিলেন পার্সি সাইকস।

ঠিক তিনটের সময় সার পার্সি তাঁর লিখিত বক্তৃতা পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে পড়লেন তিনি। তারপর ছোট একটি ভাষণ দিলেন সভাপতি। সভাপতির বক্তৃতায় স্বাধীনতাকামী আফগান জনসাধারণের প্রসঙ্গ উল্লেখ ছিল। তারপর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গীতে কিছু বললেন স্যার মাইকেল ওডায়ার। অল্প সময়ের মধ্যেই উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্যার মাইকেল তাঁর বৈঠকী কথকতায় মুগ্ধ করে ফেলেছিলেন। তিনি যখন বক্তৃতা শেষ করলেন, করতালিধ্বনিতে ক্যাক্সটন হল ফেটে পড়ল। সেই সম্বর্ধনার শেষ শব্দটি থামবার খানিক পরেই পর

পর পাঁচবার মৃত্যুর কাল শব্দ শোনা গেল হলে। স্যার মাইকেলকে চেয়ার থেকে মেঝেতে রক্তাপ্লুত বক্ষে পড়তে দেখা গেল। লর্ড জেটল্যান্ড তাঁর সভাপতির আসনের বাঁ দিকে ছিটকে পড়ে গেলেন। লর্ড ল্যামিংটন এবং স্যার লুইস দুজনেই আঘাত পেয়েছেন বোঝা গেল। একটি লোক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে 'সরে দাঁড়াও' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ভিড় ঠেলে দরজার দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ দুজন লোক ভিড়ের মধ্যে থেকে এসে লোকটির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং লোকটিও ধাক্কা সামলাতে না পেরে সটান মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। লোক দুজন তাকে মাটিতে চেপে ধরে রইল এবং তৃতীয়জন এসে তার বন্দুকটা কেড়ে নিল। উপস্থিত জনতার মধ্যে কয়েকজন ডাক্তারও আহতদের পরিচর্যার জন্যে ওষুধপত্র আনতে ছুটে বেরিয়ে গেল। পুলিশকে খবর দেয়া হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিরাট বাড়িটা থেকে বেরোবার সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল—প্রহরী বসল বাড়ির সব কটি টেলিফোনের কাছে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাড়ির প্রত্যেকটি লোক বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। এমন কি ঐ বাড়িতে অবস্থিত খাদ্যনিয়ন্ত্রণ অফিসের কেরানীরাও বন্দী হয়েছিলেন তাঁদের অফিসের মধ্যে। বাইরের সংগে যোগাযোগ কাউকেই করতে দেয়া হয়নি। পরে পুলিশ সুপারেনটেনডেন্ট স্ট্যাডস এসে তদন্তের ভার গ্রহণ করেন। ছোট একটি পুলিশ বাহিনী এসে সভাস্থ প্রত্যেকের জবানবন্দী নিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেকের জবানবন্দী নেওয়া শেষ হবার পর প্রত্যেককে পুলিশ টেলিফোন ব্যবহার করতে কিংবা ঘটনাস্থল ত্যাগ করবার অনুমতি দেয়। প্রায় সাড়টার সময় দর্শকরা ছাড়া পান ক্যাক্সটন হল থেকে। দর্শকদের মধ্যে দুজন ডাক্তার ছিলেন তাঁরাই স্যার মাইকেল ওডায়ারকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

[স্যার মাইকেল ওডায়ার তাঁর মৃত্যুর বেশ খানিকক্ষণ পরেও বাইরের পৃথিবীর কাছে জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও হয়ত তাঁর গৃহে তাঁর জন্যে ডিনার সাজানো হয়েছিল। এমনকি সাহেবের বাড়ি ফিরতে দেরী হওয়া নিয়েও ভাবনার ছিল না কিছু, দুর্ঘটনা ঘটলে ত জানতে পারতেন তাঁরা আধ-ঘণ্টার মধ্যেই। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঋণ শোধ করতে সাহেব যে সভা শেষ করেই চিরকালের মত চলে গেছেন এ খবর জানা যায় স্যার মাইকেলের মৃত্যুর অন্ততঃ আড়াই ঘণ্টা পরে।]

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

'জানাতে পারেন' বিভাগের জন্য দুইটি প্রশ্ন পাঠালাম, উত্তর পেলে বাধিত হব।

১। সমস্ত দেবালয়ে দেবতার মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু শিবমন্দিরে শিবের মূর্তি নেই কেন? শিবলিঙ্গ পূজা কেন করা হয়?

২। ভূমণ্ডলের মানচিত্র (ম্যাপ) সর্বপ্রথম কে তৈয়ারী করেন এবং তা কিভাবে করা হয়? ভাস্ক-ডা-গামা যখন ভারতে আসেন, তিনি কি মানচিত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন?

শ্রীসৌরেন মিত্র
কালিকাপুর
বারাসত
২৪ পরগণা

সবিনয় নিবেদন,

আমি 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক। আপনাদের "জানাতে পারেন" বিভাগটির জন্য আমি অমৃত পত্রিকার সম্পাদক এবং কর্মিবৃন্দকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আপনাদের "জানাতে পারেন" বিভাগটিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্ন পাঠাচ্ছি—

১। (ক) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আয়তনে বড় এবং সবচেয়ে উৎপাদন-শক্তি বেশী গবেষণা কেন্দ্র কোনটি? এবং সেটি কোন দেশে অবস্থিত?

(খ) শ্রেষ্ঠত্ব এবং পারিশ্রমিকের বিচার করে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম দশজন চিত্র-পরিচালক এবং আলোকচিত্রশিল্পীর নাম ও পারিশ্রমিক জানতে চাই।
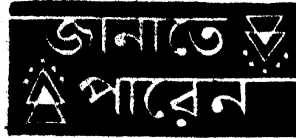
২। (ক) মুষ্টিযোদ্ধা "জো-লুই"কে "মুষ্টি-জগতের বিস্ময়" বলা হয় কেন?

(খ) পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফিল্ম স্টুডিও কোনটি এবং কোথায় অবস্থিত?

স্বপনকুমার মিত্র
দুর্গাপুর, বর্ধমান

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতর গত ২৪শ সংখ্যাতে প্রশান্ত দাস মহাশয়ের প্রথম প্রশ্নের ও রমেশ-চন্দ্র গাইন মহাশয়ের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

(ক) নগরীগুলিকে সাজিয়ে দিলাম : টোকিও, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো, ওয়াশিংটন, প্যারিস, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ।

(খ) গেরিলা যুদ্ধ আধুনিক যুদ্ধ-বিদ্যারই একটি অতি-প্রয়োজনীয় অংশ। গেরিলা বাহিনী হঠাৎ শত্রুদলকে আক্রমণ করে এবং বিপর্যস্ত করে তোলে। এই বাহিনী সাধারণতঃ লুকিয়ে থাকে এবং সুযোগ পেলেই শত্রুপক্ষের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়।

শ্রীরতনকুমার মণ্ডল,
শ্রীচণ্ডীচরণ মণ্ডল,
শ্রীঅজিতকুমার মণ্ডল
পোঃ বাদুড়িয়া, ২৪-পরগণা

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৮ই অক্টোবর 'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীপ্রশান্ত দাসের প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর হ'ল লণ্ডন।

শ্রীঅনুপম ভট্টাচার্য,
তারা ভৈষজ্য আশ্রম,
কোচবিহার

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ৮ই নভেম্বর 'অমৃত'-এর 'জানাতে পারেন' বিভাগের শ্রী ভালা অধি-কারীর প্রশ্নের উত্তর জানাচ্ছি।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সিনেমা হাউস হল নিউইয়র্কের রক্সি সিনেমা হাউস। এখানে একসংগে ৭,০০০ লোক বসতে পারে।

অর্পণা চন্দ
কোন্নগর, হুগলী
নবগ্রাম
(বি-ব্লক)

সবিনয় নিবেদন,

২১শে কার্তিকের অমৃতে "জানাতে পারেন" বিভাগে শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে—"গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামটি শেরশাহ দিয়েছিলেন"—এই কথাটি দেখে কৌতুকসহ দুঃখ অনুভব করছি। এই রাস্তাটি শেরশাহ নির্মাণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামটি তাঁর দেওয়া নয় এটা বুঝতে বেশী মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয় না।

রাস্তাটির নাম অবশ্য "শেরশাহ সরণী"—হওয়া উচিত বলে মনে করি এবং আশা করি সকলেই একমত হবেন। নমস্কার ইতি

কুন্তলা দত্ত।
৪৬।২ সেন্ট্রাল রোড,
যাদবপুর।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা:

চলচ্চিত্রের দর্শক:

সাধারণ শ্রোতাদের জন্যে মার্গসংগীত নয়, সাধারণ দর্শকের জন্যে নয় আর্ট এক্জিবিসন। বড়ে গোলাম আলী, সরস্বতীবাঈ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, হীরাবাঈ বরোদকার প্রভৃতির কণ্ঠনিঃসৃত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শোনবার মতো এবং শুনে তারিফ করবার মতো কান থাকা চাই, যামিনী রায়, অতুল বসু, মুকুল দে, রমেন চক্রবর্তী প্রভৃতির আঁকা ছবি দেখবার মতো এবং দেখে বাখান করবার মতো চোখ থাকা চাই। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত গাইয়েদের সুকণ্ঠ ও গিটকিরি শুনে সাধারণ শ্রোতা বড় জোর বললেন—"বাঃ! বাহবা!" এবং স্বনামধন্য আর্টিস্টদের আঁকা ছবিতে রঙের খেলা বা মোটের ওপর একটা সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখে সাধারণ শ্রোতা হয়ত বলবেন—'চমৎকার!' কিন্তু এই "বাঃ, বাহবা, চমৎকার" ধ্বনি করলেই দেখা বা শোনা হ'ল না—সমঝদারের সভায় কল্কে পাওয়া গেল না। সমঝদার শ্রোতা বলে পরিগণিত হ'তে হলে আপনার বলতে পারা চাই, দরবারী কানাড়ার মধ্যে খাঁ সাহেব কোমল রেখাবের পর্দাটা কেমন আলতো করে ছুঁয়ে গেলেন, বোদ্ধা দর্শক হতে হলে আপনাকে বলতে হবে, শিল্পি ঐ যে ছবিটির মধ্যে ধূসরের প্রলেপের ভিতর লালের একটি বিন্দু বসিয়েছেন, তা কোন্ বিশেষ শিল্প-পদ্ধতি অনুসারে রক্তক্ষরা প্রেমের দ্যোতক। এ যদি না পারেন, তাহলে সঙ্গীতের আসরে বা প্রদর্শনী-কক্ষে অবস্থান করবার অধিকারী নন আপনি।

জনপ্রিয় অভিনেত্রী কণিকা মজুমদার। ফটো : অমৃত

আশঙ্কা হচ্ছে, এই কম অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন শিগ্‌গিরই এসে উপস্থিত হবে চলচ্চিত্র দর্শনের ক্ষেত্রেও। এতদিন চলচ্চিত্র প্রধানতঃ জনসাধারণের প্রমোদোপকরণ বলেই পরিগণিত হত। লোকে যেমন যাত্রা, থিয়েটার, সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতি দেখে আমোদ পায়, তেমনই আমোদ পেতেই তারা সিনেমা হাউসেও ভীড় করে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে একটি বিশেষ ধ্বনি আমাদের কানের পাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, যার নাম হচ্ছে—ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েসন (Film Appreciation)— চলচ্চিত্রের প্রকৃত গুণাবধারণ বা তারিফ। কি করে চলচ্চিত্র দেখতে হয়, তার প্রকৃত গুণাগুণের পরিচয় গ্রহণ করতে হয়, এও একটা রীতিমত শিক্ষণীয় ব্যাপার এবং শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউটে "Film Appreciation" সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ক্লাশ শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের গুণাবধারণ সম্পর্কিত জ্ঞান যথেষ্টভাবে আহরণ না ক'রে ছবি দেখতে যাওয়া চীনেমাটির বাসনের দোকানে একটি মহিষের উপস্থিতির সামিল বলে পরিগণিত হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত নয়। অতঃপর চলচ্চিত্র দেখবার মতো চোখ তৈরী করবার পরেই চিত্রগৃহের দিকে পা বাড়ানো যাবে। যাঁরা সাধারণভাবে কয়েক ঘণ্টা চিত্ত বিনোদনের জন্যে সিনেমায় যান এবং যাঁরা এই সাধারণ দর্শকদের কথা ভেবেই চলচ্চিত্র প্রযোজনার ব্যবসায়ে ব্রতী আছেন, এই উভয় দলই আমার কথা শুনে আঁৎকে উঠবেন নিশ্চয়। কিন্তু আমি নাচার। দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র—কানাডা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স,

ইতালী, সোভিয়েট দেশ, জাপান প্রভৃতি বহু স্থানের চিত্র-প্রযোজক এবং পরিচালকেরা এমন সব চলচ্চিত্র জগৎকে উপহার দিতে শুরু করেছেন, যা দেখে রসাস্বাদন করতে গেলে দর্শকের শুধু হৃদয় থাকলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে বেশ খানিকটা ক'রে ঘিলুও থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। মনে পড়ে, বহুকাল আগে "লাইট হাউস" সিনেমায় অর্সন ওয়েলস-এর "সিটিজেন কেন"-এর *শেষ প্রদর্শনী দেখতে গেছি। কয়েক মিনিট দেরী হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এমন দেরী নয় যে, টিকিট-ঘর বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে গিয়ে দেখি তাই। টিকিটঘর বন্ধ দেখে ভাবলুম;* সর্বনাশ, নিশ্চয়ই 'হাউস ফুল' হয়ে গিয়েছে! অথচ এমন একখানা আলোড়ন সৃষ্টিকারী (আমাদের দেশে নয়, আমেরিকায়—আলোড়ন সম্পর্কিত বিষয় জেনেছিলুম বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে) ছবি না দেখে ফিরে যাব। যা থাকে কপালে ভেবে দরজা খুলতেই বেরিয়ে এল এক দ্বাররক্ষী; তার হাতে পাঁচ টাকার একখানি নোট গুঁজে দিয়ে অনুরোধ জানালুম, ছবিখানা আমাকে দেখতে দিতেই হবে, না হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখব। ভদ্রলোক অবাক! বললে, এ ছবি দেখবার জন্যে এত ঝোঁক কেন? কাছাকাছি আর যে সব সিনেমা হাউস রয়েছে, তার যে-কোনোটায় এর থেকে ঢের ভালো ছবি হচ্ছে, তুমি তাই দেখগে। কথায় কথায় আরও দেরী হয়ে যাবে দেখে আমি এক রকম জোর করেই তাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলুম; তখন সবে 'সিটিজেন কেন'-এর টাইটেল শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পরে চোখের সামনে অন্ধকার যখন পাতলা হয়ে এল, তখন কাছেই একটি খালি সীট দেখতে পেয়ে তাতেই গিয়ে বসলুম এবং বলা বাহুল্য, একাগ্রচিত্তে তন্ময় হয়ে ছবিখানি দেখতে লাগলুম; দ্বাররক্ষী ওরই মধ্যে কখন যে এসে আমার হাতে একখানি টিকিট এবং টাকার চেঞ্জ গুঁজে দিয়ে গিয়েছিল, তা আমার খেয়ালই ছিল না। ছবি শেষ হ'তে যখন প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে উঠল, তখন কি আবিষ্কার করেছিলুম জানেন? বললে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন না, সারা হাউসে মাত্র কুড়ি, কি বাইশজন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। মনে হয়, এই 'সিটিজেন কেন'ই আমার জীবনে দেখা প্রথম ছবি, যা দেখতে হৃদয়ের চেয়ে মস্তিষ্কের প্রয়োজনটা বেশী অনুভব করেছিলুম। সম্প্রতি 'লা দোল্‌চে ভিতা', 'আইভানস্ চাইল্ডহুড' প্রভৃতি ছবি দেখতে দেখতেও মনে হয়েছে, সাধারণ দর্শক এই সব ছবির রসাস্বাদন করতে পারবে কি? পরিচালকের বক্তব্য বোঝবার মতো বুদ্ধি যার নেই, সে তো এই ধরণের ছবি দেখে আনন্দ পেতে পারে না। ইদানীং চেষ্টা চলছে, চলচ্চিত্রকে সাহিত্যের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। চিত্রকলা বা মার্গ-সঙ্গীত যদি রঙ-তুলি বা রাগ-রাগিণীকে আশ্রয় করেই নিজেদের বিকশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে থাকতে পারে, তাহলে চলচ্চিত্রও কেন নিজের প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাবে না? কি প্রয়োজন তার গল্প বলবার? চলচ্চিত্র-পরিচালক কেন পারবেন না মাত্র গতিশীল ছবি এবং ধ্বনি ও যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে আনন্দলোকের সৃষ্টি করতে? একটি দু রীলের ছবি দেখেছিলুম; একটি বিন্দু ক্রমে বেড়ে উঠে একটি ছোট বলের আকার ধারণ করল; সেই বলটি নাচতে নাচতে হঠাৎ কখন দুটি বল হয়ে গেল; তারপর দুটি থেকে চারটি, আবার মিলে গিয়ে একটি; কখনও বড়ো, কখনও ছোট; কখনও অল্প লাফাচ্ছে, কখনও বেশী; এমনইভাবে নৃত্যছন্দ সৃষ্টি ক'রে এবং এক থেকে বহু ও বহু থেকে এক হওয়ার পর হঠাৎ কখন ফুরিয়ে গেল মনের মধ্যে গভীর একটি আনন্দের রেখাপাত করে। এমনই দেখেছি একটি 'চেয়ার'-এর কাহিনী; তবে তাতে বেশ একটি সুন্দর মান-অভিমানে ভরা ছোট গল্পের পরিষ্কার ইঙ্গিত ছিল এবং সঙ্গে ছিল রবিশঙ্করের আবহ-সঙ্গীত।

গল্প সাহিত্যমুক্ত চলচ্চিত্রের নির্দিষ্ট রূপ কি হবে, তা এখনও অনুমাণ সাপেক্ষ; তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। এবং "সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য যেমন প্রয়োজন সাহিত্য অনুধাবনের সৎ প্রচেষ্টা, এই ধরণের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তেমনই প্রয়োজন শিক্ষার্থী-মন দর্শকের। নিরলস অনুশীলন ও চর্চার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র দর্শনের বিশেষ দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলতে হয়। এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ না থাকলে সৃষ্টিধর্মী চলচ্চিত্রের আবেদনে সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়।"

চিত্র সমালোচনা

বহুরাণী (হিন্দী): ভেনাস পিকচার্স (মাদ্রাজ) এবং মীনা পিকচার্স-এর নিবেদন; ৪,০৭০·৩৭ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা টি প্রকাশ রাও; সংলাপঃ ইন্দররাজ আনন্দ; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ সি রামচন্দ্র: গীত-রচনাঃ সাহির লুধিওনবী; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনাঃ মার্কাস বার্টলে; শব্দানুলেখন ঃ নরসিংহ মূর্তি; সঙ্গীত-গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনাঃ বি এন শর্মা; শিল্প-নির্দেশনাঃ এস কৃষ্ণরাও; সম্পাদনা ঃ এন এম শঙ্কর; নৃত্য-পরিচালনাঃ গোপীকৃষ্ণ; রূপায়ণঃ মালা সিংহ, শ্যামা, ললিতা পাওয়ার, মনোরমা, গুরু দত্ত, ফিরোজ খাঁ, নাজির হোসেন, আগা, বদরীপ্রসাদ প্রভৃতি। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২২-এ নভেম্বর থেকে প্যারাডাইস, শ্রী, প্রিয়া, প্রভাত,

খাম্বা, ভবানী, আলোছায়া প্রভৃতি চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

প্রখ্যাত আইনবিদ এবং ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একদা 'পাগল' নামে একটি মনোরম গল্প লেখেন। সেই গল্পেরই ধারা অনুসরণ করে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করে 'স্বয়ংসিদ্ধা', যা আজ প্রায় কুড়ি বছর আগে নরেশচন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেই গল্পেরই ছায়া দেখতে পেলুম মাদ্রাজের মীনা পিকচার্সের "বহুরাণী" ছবিখানিতে। গরীব বৈদ্যের শিক্ষিত মেয়ে জমিদারের পরলোকগতা প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পাগল ছেলের বৌ হয়ে এল; এসে দেখল, জমিদারের ঈর্ষাপরায়ণা দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং তার উদ্ধত সন্তানের হাতে তার পাগল স্বামীর হেনস্তা। দুশ্চর তপস্যায় সে ব্রতী হল নিজের পাগল স্বামীকে সুস্থমন ও শিক্ষিত করবার অভিপ্রায়ে এবং সক্ষমও হল নিরলস সাধনায়। এর পর সহৃদয় শ্বশুরের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় সৎশাশুড়ীর চক্রান্তে সে স্বামীর সঙ্গে বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে নিজের বাবার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। শেষে উদ্ধত অসচ্চরিত্র সন্তানের দ্বারা তার সৎশাশুড়ী কিভাবে লাঞ্ছিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত কেমন করে তারা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই নিয়েই ছবির উত্তেজনাপূর্ণ শেষাংশ গড়ে উঠেছে।

সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যে মাদ্রাজে নির্মিত হিন্দী ছবিতে নাচ,

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের কাছ থেকে রূপকার গোষ্ঠীর সবিতাব্রত দত্ত আকাদমি পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের কাছ থেকে উৎপল দত্ত আকাদমি পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

বিমল বর্মন পরিচালিত বিভ্রাট চিত্রে অনুভা গুপ্তা ও নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়

গান এবং বিরাট সেই-সেটিং-এর যে সব চমকপ্রদ উপকরণ সন্নিবিষ্ট হয়, এ ছবিতেও তার অপ্রতুলতা নেই। কিন্তু ওরই মধ্যে শিক্ষিতা এবং অসাধারণ মনোবলে দৃপ্তা এক নারীর চরিত্র সমস্ত কাহিনীটিকে একটি অনন্যসাধারণ মর্যাদাদানে সমর্থ হয়েছে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই নারীর বিচিত্র কার্যকলাপ দর্শকবৃন্দকে অভিভূত রাখতে সমর্থ হয়। এবং এইখানেই পরিচালক টি প্রকাশ রাও-এর কৃতিত্ব।

অভিনয়াংশে নিঃসন্দেহে 'বহুরাণী'র চরিত্রে মালা সিংহ দর্শকহৃদয় জয় করেন তাঁর সাবলীল ও বলিষ্ঠ চরিত্র-চিত্রণের গুণে। তাঁর সুবিস্তৃত অভিনেত্রী জীবনে এই ভূমিকাটি একটি বিশেষ দিগ্‌দর্শক হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বহুরাণীর স্বামীর ভূমিকায় গুরু দত্ত তাঁর অভিনয় প্রতিভার নিদর্শন রেখেছেন; বিশেষ করে পাগলের বেশে তিনি যে অপরূপ চরিত্রাভিনয় করেছেন, তা' অসামান্য।

সহৃদয় এবং অনুতপ্ত জমিদার রূপে নাজির হোসেন অত্যন্ত সুঅভিনয় করেছেন। উদ্ধত ছোট ভাইয়ের ভূমিকায় ফিরোজ খাঁকে জীবন্ত মনে হয়েছে। এবং তার প্রণয়াকাঙ্খী বাঈজী রূপে শ্যামা নৃত্য-গীত এবং অভিনয়ে দর্শক মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় ললিতা পাওয়ার, মনোরমা, বদ্রীপ্রসাদ প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

কলাকৌশলের সকল বিভাগেই উন্নত মানের পরিচয় আছে। বিশেষ করে সি রামচন্দ্র সৃষ্ট সুর এবং মার্কাস বার্টলের চিত্রগ্রহণ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের।

"বহুরাণী" হিন্দী ছবির দর্শককে এক নূতন রসাস্বাদনে তৃপ্ত করবে।

উগেৎসু মোনোগাতারি (ইংরেজী সাব টাইটেল সহ জাপানী চিত্র): দেই মোশান পিকচার্স লিমিটেড-এর নিবেদন; ২,৭২৬.৪৪ মিটার দীর্ঘ এবং ১০ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা: মাসাইচি নাগাতা; পরিচালনা: কেঞ্জি মিজোগুচি; কাহিনী: আকিনারি উয়েদা; চিত্রনাট্য: মাৎসুতারো কাওয়াগুচি এবং গিহেন ইয়োদা; চিত্রগ্রহণ: কাজুও মিয়াগাওয়া; সঙ্গীত-পরিচালনা: ফুমিও হায়াসাকা; রূপায়ণ: ম্যাচিকো কিয়ো, কিনুয়ো টানাকা, মাজয়ুকি মোরি, সাকায়ে ওসাওয়া প্রভৃতি।

পরিচালক কেঞ্জি মিজোগুচির শেষ ছবি 'উগেৎসু মোনোগাতারি' ১৯৫৩ সালে ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয়েছিল। 'আসাজি গা ইয়াদো' এবং 'জাসেই নো ইন' নামে দুটি প্রায় অলৌকিক গল্পের সমন্বয়ে গঠিত এই ছবিখানি অসাধারণত্বেরই পর্যায়ে পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের পটভূমিকায় রচিত ছবিখানিতে অর্থের প্রতি অন্যায় লোভ যে কি নিদারুণ অনর্থের কারণ হয়, তাই কিছুটা বাস্তব, কিছুটা অলৌকিক এবং কিছুটা রূপকথার অসামান্য সমন্বয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

ইংরেজী সাব-টাইটেলের সাহায্যে বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, কি অদ্ভুত সত্যাশ্রয়ী সংলাপে ছবিটি প্রাণবন্ত। প্রতিটি চরিত্রচিত্রণ হয়েছে কিছুটা জাপানী 'নো' নাটকসুলভ স্টাইলাইজড্ অভিনয়রীতির মাধ্যমে। চিত্রগ্রহণের পদ্ধতিতেও একটি অদৃষ্টপূর্ব নূতনত্ব দেখা গেল; বিশেষ করে কুয়াশার মধ্যে নদীর ওপর চলন্ত নৌকায় দৃশ্যগুলি অবিস্মরণীয় সুষমামণ্ডিত এবং ওরই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলগুলি।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিকে ধন্যবাদ এমন একটি অসামান্য চলচ্চিত্র দেখবার সুযোগ দেবার জন্যে।

আলোর পিপাসা চিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
ফটো : অমৃত

আইভ্যানস চাইল্ড (সোভিয়েত চিত্র): পরিচালনা : আঁদ্রে তার্কোভস্কি। একত্রিশ বছর বয়সের তরুণ পরিচালক আঁদ্রে তার্কোভস্কি তাঁর প্রথম ছবি "আইভ্যানস্ চাইল্ডহুড" (আইভ্যানের ছেলেবেলা)-তে যে আশ্চর্য ও অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন দেখিয়েছেন, তা একান্তই দুর্লভ। একটি ছোট বছর চোদ্দ বয়সের ছেলে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে পড়ে কি বিচিত্রভাবে তার বালকত্বকে দূরে পরিহার ক'রে একজন পূর্ণবয়স্কের মতো গুরু-গম্ভীর (সিরিয়াস-মাইন্ডেড) ও কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে এবং যুদ্ধ সংপৃক্ত কাজ তার মনে বিভীষিকা সৃষ্টি না করে একটি মোহময়ী আকর্ষণের সৃষ্টি করতে পারে, তারই এক অসামান্য আলেখ্য এই ছবিটির মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে। আইভ্যান যুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্যে একজন কর্তব্যরত বয়স্ক পুরুষ, আবার যখন সে যুদ্ধের কাজ না করে ঘুমুচ্ছে কিংবা অলস মনে স্বপ্ন দেখছে, তখন সে শিশুপ্রকৃতির—এই দুই বিরুদ্ধ চিত্র সুকৌশলে পাশাপাশি উপস্থিত করে পরিচালক তাঁর কাব্যধর্মী শিল্প মনের পরিচয় দিয়েছেন। "আইভ্যানস্ চাইল্ড"-এর মতো ছবিকে সহজ মনে স্বীকার ক'রে নেওয়া কঠিন হলেও এর বিচিত্র কাব্যধর্মিতা উপেক্ষণীয় নয়।

মঞ্চাভিনয়

রঙ্গতীর্থ'-এর 'কৃষ্ণকান্তের উইল':

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বহুবার বহুজন দ্বারা নাট্যাকারে গ্রথিত হয়ে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ এবং সৌখীন সম্প্রদায় দ্বারা সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এমন কি, নির্বাক এবং সবাক—দুভাবেই চলচ্চিত্রেও রূপান্তরিত হয়েছে। সেই কারণে বহুদিন পরে আবার রঙ্গতীর্থ নাট্যগোষ্ঠী উপন্যাসখানির কি নব নাট্যরূপ দান করেন, সে সম্পর্কে নাট্যামোদীদের মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। রঙ্গতীর্থের হয়ে হারু রায় যে নাট্যরূপ দান করেছেন, তাকে অনেকটা পুরাতনপন্থীই বলতে হবে; কারণ পাঁচ অঙ্কে এবং তিরিশটি দৃশ্যে তিনি নাটকখানিকে সম্পূর্ণ করেছেন। অভিনয়েও বিশেষ কোনো নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া গেল না। শিল্পীদের মধ্যে রোহিণীর ভূমিকায় সুলতা চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয় সবচেয়ে বেশী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। ভ্রমর বেশে সবিতা বসুর অভিনয় যথেষ্ট আন্তরিকতাপূর্ণ। কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় প্রবীণ অভিনেতা জহর গাংগুলী একটি বিশেষ রূপসৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এ ছাড়া নবগোপাল (গোবিন্দলাল), বীরেন চট্টোপাধ্যায় (হরলাল), রবীন মজুমদার (নিশাকর), লীলাবতী (ক্ষীরি) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

অবশ্য গেল ২৪-এ নভেম্বর নিউ এম্পায়ারের প্রথম অভিনয়ে প্রস্তুতির যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা গেল। আশা করা যায়, ১লা ডিসেম্বরের অভিনয়ে এ-ত্রুটি থাকবে না।

বিবিধ সংবাদ

শুভ মহরৎ:

যাত্রিক গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য তরুণ মজুমদার অতঃপর স্বনামে এবং স্বাধীনভাবে চলচ্চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। গেল শুক্রবার, ২২-এ নভেম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে তাঁর প্রথম ছবি "আলোর পিপাসা'র শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হয় বিশিষ্ট চিত্র-সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে। বনফুল রচিত একটি কাহিনী অবলম্বনে ছবির জন্যে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীমজুমদার নিজেই। ছবির বিভিন্ন

ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্তা, সবিতা সিংহ, অনুপকুমার, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি। ছবিটির সুরসৃষ্টি, চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে হেমন্তকুমার, সৌমেন্দু রায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত এবং দুলাল দত্ত।

মেট্রোতে আলফ্রেড হিচককের "দি বার্ডস্" :

আজ শুক্রবার, ২৯শে নভেম্বর থেকে স্থানীয় মেট্রো সিনেমায় মুক্তি পাচ্ছে রড টেলার, জেসিকা ট্যান্ডি, সুজানে প্ল্যাশেটে এবং "টিপী" হেড্রেন অভিনীত এবং আলফ্রেড হিচকক্ পরিচালিত ইউনিভার্সাল ইন্টারন্যাশনালের রহস্যচিত্র "দি বার্ডস্"। বলা বাহুল্য, হিচককের ছবি মাত্রই ইংরাজী ছবির দর্শকদের মনে রহস্যোভরা নতুন-কিছু দেখবার জন্যে যে-আশা জাগিয়ে তোলে, এই ছবিটির বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

এলিট সিনেমায় "জেসিকা" :

এলিট সিনেমায় এ হপ্তার ছবি হচ্ছে "জেসিকা"। ফ্লোরা স্যান্ডস্ট্রম রচিত উপন্যাস "দি মিডওয়াইফ অব পণ্ট ক্লেরি" অবলম্বনে এডিথ সোমার যে-চিত্রনাট্য প্রস্তুত করেছেন, তাকেই চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করেছেন প্রযোজক পরিচালক জাঁ নেগুলেস্কো। ছবিটির প্রধান ভূমিকাগুলিতে আছেন মরিস সিভ্যালিয়ে, অ্যাঞ্জি ডিকিনসন এবং নোয়েল-নোয়েল। "জেসিকা" মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রদর্শিত হবার ছাড়পত্র পেয়েছে।

নটনটামএর "পাখীর বাসা" এবং "দায়ে পড়ে দার পরিগ্রহ" :

সাঁতরাগাছির বিশিষ্ট নাট্য সম্প্রদায় "নটনাট্যম্" গেল ২৫শে নভেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে জগমোহন মজুমদার রচিত ও পরিচালিত "পাখীর বাসা" এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "দায়ে পড়ে দার পরিগ্রহ" নাটিকা দুটিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন।

সুন্দরম্-এর "সপ্তর্ষি" :

সুন্দরম্-এর প্রথম চিত্রার্ঘ "সপ্তর্ষি" খুব শিগ্‌গিরই দিবাকর চিত্রম-এর পরিবেশনায় দর্পণা, প্রিয়া এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে। স্বরচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনা করেছেন উমাপ্রসাদ মৈত্র এবং এতে অবতীর্ণ হয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, রবি ঘোষ, দিলীপ রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় শ্যাম লাহা, মাস্টার রাজা, কাজল গুপ্ত, গীতা দে, রেণুকা রায় প্রভৃতি শিল্পী। ছবিটির সংলাপ ও গান রচনা, সঙ্গীত-পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল মিত্র, দীনেন গুপ্ত ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি বেংগলী ক্লাব (বোম্বাই) দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান মঞ্চস্থ করে। এই অপেশাদারী সংস্থা অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। অভিনয়ে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচয় দেন সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (জাহানারা), জীবন সিংহ (সাজাহান), মদন কর্মকার (দারা)। চিত্রে তাঁদের দেখা যাচ্ছে।

শৌভনিক-এর "ঝাঁসীর রাণী" :

সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সেই শৌর্যময়ী নারীর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠনিঃসৃত "মেরি ঝান্সী নহী দুংগী" আজও আমাদের কানে ঝঙ্কার তোলে। তাঁরই অমর চরিত্র অবলম্বনে নিবেদিতা দাস রচিত "ঝাঁসীর রাণী", বাঙলা রঙ্গমঞ্চের পক্ষে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ হেরাসিম লেবেডেফ এবং মুক্তঅঙ্গন-এর প্রতিষ্ঠা দিবস

২৭শে নভেম্বর সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হবে শৌভনিকগোষ্ঠী দ্বারা। ২৭শে, ২৮শে এবং ৩০শে নভেম্বর মাত্র আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে অভিনীত হবার পর ১লা ডিসেম্বর থেকে নাটকটি নিয়মিত-ভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার শনি, রবিবার এবং ছুটির দিনে নাট্যামোদী জন-সাধারণের সামনে অভিনীত হবে।

উমেশ মল্লিক

ট্রিজন অ্যাণ্ড ট্রাম্পেটস্

বিলাতের ইংরাজী চিত্রের লেখক এবং প্রযোজক শ্রীউমেশ মল্লিক কলকাতায় সম্প্রতি এসেছেন তাঁর ব্যয়-বহুল রঙিন ইংরাজী চিত্র ট্রিজন অ্যাণ্ড ট্রাম্‌পেট্‌স্‌ সম্পর্কে এখানকার কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য। গত ১৬ই অক্টোবর শ্রী মল্লিক লণ্ডন থেকে বোম্বাই আসেন এবং এই চিত্র সম্বন্ধে তাঁর প্রাথমিক কাজ শুরু করেন। শ্রী মল্লিকের সঙ্গে তাঁর সহকারী শ্রীনরম্যান কোহেন মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে ট্রিজন অ্যাণ্ড ট্রাম্পেটস-এর লোকেশান-এর খোঁজ-খবর করেন এবং ইতিমধ্যেই তাঁরা এই ছবির ভারতীয় অংশের আবহ-সঙ্গীত সৃষ্টির জন্য প্রথিতযশা বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়-কে দায়িত্ব দিয়েছেন বলে জানা যায়। শ্রী মল্লিক বর্তমানে টেরেন্স ইয়ং কর্তৃক লিখিত ফাইনাল স্ক্রীপ্ট-এর জন্য অপেক্ষা করছেন এবং প্রাপ্তি মাত্রই তিনি দিল্লীতে যাবেন ভারত সরকারের কাছে এই ছবি তোলার অনুমতি গ্রহণের জন্য। এই ছবিতে বর্তমানে পিটার ফিঞ্চ, জিন সিমন্স, জর্জ স্যাণ্ডার্স যথাক্রমে লর্ড ক্লাইভ, লেডী ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসন চরিত্রে অভিনয় করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ছবিটি টেকনিকালার এবং ৭০ মিলি-মিটারে গৃহীত হবে। ছবিটি দশ সপ্তাহ ভারতবর্ষে এবং ছয় সপ্তাহ বিলাতে গৃহীত হবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ছবিটি পরিচালনা করবেন ডক্টর নো এবং জামাইকা চিত্রের প্রথিতযশা পরি-চালক টেরেন্স ইয়ং।

দ্রুত সমাপ্তি পথে "কিনু গোয়ালার গলি":

কে জি প্রোডাকসন্স-এর প্রথম চিত্রার্ঘ কমল ঘোষ প্রযোজিত এবং প্রখ্যাত কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ও সি গাঙ্গুলী পরিচালিত "কিনু গোয়ালার গলি"র চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্ত হতে চলেছে রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে। ছবিটিতে অভিনয় করছেন সুমিত্রা দেবী, শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, জীবেন বসু, প্রশান্তকুমার, গীতা দে প্রভৃতি শিল্পী। ছবির সুরযোজনা, চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা এবং সম্পা-দনায় রয়েছেন সলিল চৌধুরী, বিমল মুখোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায় এবং

দুলাল দত্ত। মেগা পিকচার্স-এর পরিবেশনায় ছবিখানি আসচে বছরের গোড়ার দিকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কলকাতায় আমেরিকার লোকসংগীত গায়ক পিটার সীগার :

আমেরিকার প্রখ্যাত লোকসংগীত গায়ক পিটার সীগার কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় এসে পৌঁছুচ্ছেন। আস্‌চে ১লা ডিসেম্বর পার্ক সার্কাস ময়দানে তিনি সর্বসাধারণের সামনে যে-সংগীত পরিবেশনের আসর বসাবেন, তাতে তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন বাংলার লোকসংগীত গায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করবেন সুমিত্রা মিত্র এবং দেবব্রত বিশ্বাস। তাঁর অপরাপর আসরে থাকবেন আলি আকবর খাঁ, জেরাল্ড নীল-ওরেগ, ডঃ আদি গজদার প্রভৃতি সংগীতশিল্পী ও রসিকবৃন্দ। পিটার সীগার মাত্র যে আমেরিকারই লোকসংগীত আয়ত্ত করেছেন, তাই নয়; তিনি আফ্রিকা, জাপান, এমন কি ভারতেরও লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন। আমরা তাঁকে আমাদের শহরে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

দুখানি বাঙলা ছবির মুক্তি :

কয়েক সপ্তাহ বিরতির পর আজ শুক্রবার, ২৯-এ নভেম্বর দুখানি বাঙলা ছবি একসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে। এক

সন্ধ্যারাণী
বিকাশ রায়
কালী ব্যানার্জী
অসিতবরণ
মাস্টার শংকর
ও
ল্যাসি

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড নিবেদিত এবং অগ্রদূত পরিচালিত "বাদশা"। দুই, ডি আর প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং অজয় কর পরিচালিত "বর্ণালী"। "বাদশা" ছবিখানির কাহিনীকার হচ্ছেন ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরসমৃদ্ধ ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, তরুণকুমার, নবাগত মাস্টার শংকর এবং সন্ধ্যারাণীর সঙ্গে রিং মাস্টার নামে একটি বাঁদর এবং মোতিয়া নামে একটি ছাগলকে। ছবিখানি দেখতে পাওয়া যবে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং শহরতলীর অপরাপর চিত্রগৃহে।

চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত "বর্ণালী" চিত্রের কাহিনীকার হচ্ছেন সুবোধ ঘোষ এবং এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, এন বিশ্বনাথন, ছায়া দেবী প্রভৃতি

পাহাড়ী সান্যাল
কমল মিত্র
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
ও
শর্মিলা ঠাকুর

দিল হি তো হ্যায় চিত্রের একটি মুহূর্তে রাজকাপুর ও নূতন

প্রথিতযশা শিল্পী। কালীপদ সেন সুর-সমৃদ্ধ এই ছবিখানি মুক্তি পাচ্ছে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে।

।। যাত্রীর অভিনয় ।।

গত ২২শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় মহামান্য তিলক সভাগৃহে ভবানীপুরের প্রখ্যাত সংস্থা "যাত্রী" ১৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পংকজ মুকুল বসু রচিত ও পরিচালিত 'ভূত ভবিষ্যৎ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

নবীন নাট্যকার এই নাটকে বর্তমান বেকার সমস্যায় জর্জরিত যুবকদের জীবনের নৈরাশ্যের একটি কাহিনীর অবতারণা করেন। নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনেও যে মানুষের মনে সমাজসেবার আদর্শ বর্তমান থাকে তার প্রমাণ এই নাটকে আছে।

চরিত্র সৃষ্টিতে ঘেটুর ভূমিকায় সুবিমল দাসের অভিনয়-চাতুর্য আছে। অন্যান্য ভূমিকায় জ্যোতি মিত্র, শচীন দেব, রজত ঘোষ, তপন মিত্র, বিনয় পালের অভিনয় চলনসই। নীধের ভূমিকায় নির্মল ভট্টাচার্যের অভিনয় মোটামুটি। সব চাইতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন স্বয়ং পরিচালক ভজার ভূমিকায় এবং গুণ্ডার ভূমিকায় অজিত মিত্র। আবহসংগীতে কিছু নতুনত্ব আছে। পরিচালনা করেন অজিত মিত্র।

পরিচালকের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নাট্যরূপ আশানুরূপ সফল হয়নি।

রূপান্তরীর "কর্ণিক" :

গেল ২৬শে নভেম্বর রূপান্তরী নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের আধুনিকতম নাট্যোপহার "কর্ণিক" মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ
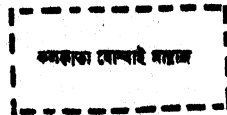
কলকাতা

বম্বের পরিচালক ফণী মজুমদার সম্প্রতি জরাসন্ধ রচিত 'বাদী' বাংলা চিত্রটির পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন। প্রযোজক-অভিনেত্রী প্রণতি ভট্টাচার্যের প্রযোজনায় এছবির কাজ শিগ্গিই এখানে শুরু হবে। বম্বের জনপ্রিয় নায়ক ধর্মেন্দ্র এই প্রথম বাংলা ছবির নায়ক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। পার্শ্ব দুটি উল্লেখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন অভি ভট্টাচার্য ও প্রণতি ভট্টাচার্য। সঙ্গীত-পরিচালনায় থাকছেন সলিল চৌধুরী।

বম্বের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মিনু মমতাজও পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তীর আগামী ছবি 'কে তুমি'-র জন্য মনোনীত হয়েছেন। প্রণব রায় লিখিত এ কাহিনী চিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যা, জহর রায় ও বম্বের আর এক অভিনেত্রী সবিতা চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

মহাঅষ্টমীর পুণ্য লগ্নে দুটি বাংলা ছবির প্রথম চিত্রগ্রহণ শুরু হল। প্রথমটির নাম 'মধুমিতা'। এটি পরিচালনা করছেন অগ্নিমিত্র নামে একদল কলাকুশলীগোষ্ঠী। মহানগরীর এক স্ট্রীট সিঙ্গারের জীবন অবলম্বনে এ-কাহিনী বিধৃত। প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী, কমল মিত্র ও জহর রায়।

যুব-মানস সংস্থার প্রথম চিত্রার্ঘ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রথম প্রেম'। বাংলার এক তরুণতম পরিচালক অজয় বিশ্বাস সর্বপ্রথম এছবিটি পরিচালনায় অগ্রসর হয়েছেন। মহাষ্টমীর শুভদিনে এছবির বহির্দৃশ্য প্রথম আরম্ভ হয়। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন বিশ্বজিৎ, প্রদীপকুমার, সুমিত্রা দেবী, সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যা রায়, নমিতা সিংহ এবং

লিলি চক্রবর্তী। এছবির সংগীত সৃষ্টি করবেন অমল মুখোপাধ্যায়।

বোম্বাই

জে, বি, প্রোডাকসন্সের নতুন রঙিন ছবি 'দো বদন'-এর সপ্তাহকালীন দৃশ্য-গ্রহণ রঞ্জিত স্টুডিওয় শেষ হল। রাজ খোসলার পরিচালনায় এছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুত সমাপ্তির মুখে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন আশা পারেখ, মনোজ-কুমার, মোহন চটী, ললিতা কুমারী, বাজিদ খান, ধুমল ও নবাগতা রুক্সানা। সংগীত-পরিচালনায় রবি। প্রযোজনা করছেন হৃন্দাবিহারী।

সম্প্রতি জয় মুখার্জি একসঙ্গে ছত্রিশ ঘণ্টা অভিনয় করলেন 'জিদ্দি' ছবিতে নায়িকা আশা পারেখের বিপরীতে। সম্পূর্ণ দৃশ্যগ্রহণ শেষ করেই জয় মুখার্জি 'আও পেয়ার করে' ছবির জন্য গত সপ্তাহে স্পেনে রওয়ানা হয়ে গেছেন। প্রমোদ চক্রবর্তী পরিচালিত 'জিদ্দি'-র অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন মেহমুদ, শুভা খোটে, ধুমল, রাজমেহরা ও নাজিমা। শুধু একটি নৃত্যের দৃশ্য ছাড়া এছবির সম্পূর্ণ দৃশ্য-গ্রহণ শেষ হয়েছে। বর্তমানে সম্পাদনার কাজ চলেছে। সংগীত পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ করেছেন এস. ডি. বর্মণ এবং ভি. কে. মূর্তি।

নটরাজ প্রোডাকসন্সের সংগীত-বহুল চিত্র 'গজল'-এর চিত্রগ্রহণ একসঙ্গে বহুদিন ধরে গুরু দত্ত স্টুডিওয় শেষ হল। প্রযোজক-পরিচালক ভেদ-মদনের পরিচালনায় এছবির রোমাঞ্চমধুর দৃশ্য-গুলিতে অভিনয় করলেন মীনাকুমারী, সুনীল দত্ত এবং পৃথ্বিরাজ কাপুর। এছবির সুরসৃষ্টি করেছেন মদনমোহন।

প্রযোজক-আলোকচিত্রশিল্পী ফলি মিস্ত্রী সম্প্রতি তাঁর ছবি 'সজন কি গলিয়াঁ'-র বহির্দৃশ্য কাশ্মীর অঞ্চলে শেষ করে ফিরেছেন। এই রঙিন ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন যথাক্রমে দেব আনন্দ, সাধনা, জাহিদা, উল্লাস, ধুমল ও মোহন চটী। ছবিটির কাজ সমাপ্তির মুখে।

প্রযোজক-পরিচালক ভি, শান্তারাম সম্প্রতি তাঁর নতুন ছবি 'গীত গয়া পাথারুনে'-এর বহির্দৃশ্য ব্যাঙ্গালোরে আরম্ভ করেছেন। মগধ অঞ্চলের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে এছবির মূল দৃশ্য-গুলি বর্তমানে গৃহীত হচ্ছে। প্রধানতঃ এছবির নায়িকা রাজশ্রীর প্রধান অংশ-গুলি চিত্ররূপ পাচ্ছে। কে. নারায়ণ রচিত একাহিনীর অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন নবাগতা শোভনা, সুরেন্দ্র ও সি. এইচ. আত্মা। এস. পি. রামলাল এছবির সংগীত-পরিচালক।

মাদ্রাজ

প্রযোজক-অভিনেতা এস. ভি. রঙ্গা-রাও তাঁর নতুন ছবি 'ম্যাঁয় ভি লেড়কি হুঁ'-র সংগীতগ্রহণ সম্প্রতি এ. ভি এম স্টুডিওয় সুসম্পন্ন হল। সংগীত-পরিচালক চিত্রগুপ্তের অধীনে কণ্ঠদান করেন লতা মঙ্গেসকর, আশা ভোঁশলে, মহম্মদ রফি এবং পি. বি. শ্রীনিবাস। তামিল ছবি 'নানুম অরু পেন্ন'-র হিন্দী চিত্ররূপ। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন মীনাকুমারী, ধর্মেন্দ্র, ওমপ্রকাশ, রঙ্গা রাও, ভগবান এবং বলরাজ সাহনী। ছবিটি পরিচালনা করছেন এ. সি. তিরুলোগাচন্দর।

—চিত্রদূত

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির শিশু রংমহলের নিজস্ব ভবন **জবনমহল**-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন।

স্টুডিও থেকে বলছি

'মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।'

চণ্ডীপুর গ্রামের মেয়ে সুভা। নদীর ধারেই তাদের ঘর। পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁর অন্য মেয়েদের অপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন কিন্তু মাতা তাকে নিজের গর্ভের কলংক মনে করে সর্বদাই বড় বিরক্ত থাকতেন। বড় দুই বোনের বিয়ের পর সুভার জীবন বিধাতার অভিশাপস্বরূপ আরও করুণ হয়ে ওঠে।

সুভা নির্বাক হলেও তার ভাব-গম্ভীর বড় বড় দুটি কালো চোখে ব্যথিত জীবনের ছায়া পড়তো। মুখের ভাষা হারিয়ে গেলেও তার চোখের ভাষা অসীম ছিল। মনে হয় এই বাক্যহীন বালিকার মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ বলেই সুভার ছোট ছোট বন্ধুরা ভয় পেতো। তাই খেলায় তার সঙ্গে কেউ রাজী হত না। নির্জন দুপুরের মত শব্দহীন এবং সংগীহীন সুভা একাকী বোবা প্রকৃতির সাথেই মিতালি পাতিয়েছিল। অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে গোয়ালের দুটি গরু সর্বশী ও পঙ্গুলি তার নিকটতম সংগী ছিল। ভোমরা-ডাকা দুপুরে আদর-সোহাগে সুভা তাদের রোমাঞ্চিত করে তুলতো। সেইসঙ্গে কখনো কখনো সুভার ঐ দীর্ঘপল্লব কালো চোখে ব্যথার অশ্রু গড়িয়ে নামতো।

দেখতে দেখতে সুভার বয়সের ছায়া আরও লম্বা হল। গোঁসাইদের ছোট ছেলে প্রতাপ তার অকর্মণ্য জীবনে ছিপ ফেলে মাছ ধরতো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সংগীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তেঁতুলতলায় বসতো। প্রতাপ অনতি-দূরে ছিপ ফেলে জলের দিকে চেয়ে থাকতো। শুধু প্রতাপের একটি পান বরাদ্দ ছিল, তা সুভা নিজে সেজে আনতো। নির্বাক ভালবাসার মহত্ত্ব বুঝতে পেরেই হয়তো প্রতাপ আর একটু সোহাগের সঙ্গে সভাকে 'সু' বলে ডাকতো।

পায়ে পায়ে সুভার বয়স এসে ঠেকলো যৌবনে। কন্যাভারগ্রস্ত পিতা-মাতা চিন্তিত হয়ে বিয়ের তোড়জোড় করতে শুরু করলেন। বিদেশযাত্রার উদ্যোগ এগিয়ে আসে। কলকাতায় যাবার দিন স্থির হল। এই অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের কোন হদিস না পেয়ে সুভা কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মত ঝাপসা আর সিক্ত হল। যাবার আগের দিন প্রতাপ বলে—'কী রে সু, তোর নাকি বর

অশান্ত ঘূর্ণি' চিত্রের একটি দৃশ্য

পাওয়া গেছে। তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস আমাদের ভুলিস নে।' সুভার জীবনে কি কোন উত্তর নেই বাকহীন হলেও তো হৃদয় বলে একটা জিনিস আছে। নির্বাক সেই অশ্রুসিক্ত চোখে সুভা যেন বলতে চায়—'আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছিলাম?'

প্রকৃতিও সুভাকে ধরে রাখতে পারলো না।

কলকাতার এক বাসায় একদিন সুভার মা তাকে খুব সাজিয়ে দিলেন। স্বাভাবিক শ্রী দেহে ফুটে উঠলেও বিচ্ছেদের অশ্রুজলে দুচোখ পরাধীনতার করুণ মিনতি জানালো। কিন্তু মাতার বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত সুভার কোন আপত্তি বজায় রইলো না। বন্ধুসঙ্গে বর স্বয়ং সুভাকে দেখে পছন্দ করলেন। বরপক্ষের গুরুজনেরা বালিকার ক্রন্দন দেখে স্পষ্টই ভেবে নিলেন এর হৃদয় আছে।

পঞ্জিকা মিলিয়ে মূক-বালিকা বধূ-বালিকা হল। সুভা বরের সঙ্গে বিয়ের পর পশ্চিমে চলে আসে। কিন্তু সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই সকলে বুঝতে পারলো নববধূ বোবা। সুভার দুই চোখে সেদিন কোন প্রতারণার চিহ্নই সুস্পষ্ট ছিল না। তার সজল দীঘল চোখ সবকথাই অশ্রু ভরে জানিয়েছিল। সুভা নির্দোষী হলেও বিধাতার কোন অভিশাপে সে অপরাধী হল। কারণ সুভার স্বামী আর একটি ভাষাবিশিষ্ট সবাক কন্যাকে বিয়ে করে ঘরে তুললেন।

কাহিনী আর দীর্ঘ না করে ছোট গল্পের রসে উত্তীর্ণ এই বোবা বালিকার পরিসমাপ্তি 'সুভা' নামের গল্পে রবীন্দ্রনাথ যবনিকা টেনেছেন। চলচ্চিত্রে এ ক্ষুদ্র গল্পের চিত্ররূপ দিচ্ছেন বাংলার কনিষ্ঠ পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। এগল্পের সঙ্গে কবিগুরুর একটি কবিতা 'দেবতার গ্রাস' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দুটি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস আমাদের নজরে পড়েছে। গত শনিবার ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় 'সুভা'-র প্রথম চিত্রগ্রহণ শুরু হল। সুভার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন শর্মিলা ঠাকুর। 'দেবতার গ্রাস' ও 'সুভা' চিত্রে সম্মিলিত চরিত্র-অংশে অভিনয় করবেন বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও গীতা দে। দেবতার গ্রাসের রাখাল চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন শ্রীমান সৌমিত্র।

চলচ্চিত্র প্রযোজনার ইতিহাসে রবীন্দ্র-গল্প ও কবিতা সমন্বয়ে এচিত্র-প্রয়াস 'সাজ ও আওয়াজ সিনে এণ্টারপ্রাইজার্স' সংস্থার এক বলিষ্ঠতম পদক্ষেপ বলবো। ছবিটির পরিবেশনা ভার গ্রহণ করেছেন জি, আর, পিকচার্স'। এছবির প্রযোজক ও সঙ্গীত-পরিচালক ভি, বালসারা। কাহিনী সম্প্রসারণ ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক পার্থপ্রতিম। পরীক্ষামূলক এ চিত্রসৃষ্টির শুভেচ্ছা কামনা করি। —চিত্রদূত

ভিন্ দেশী ছবি

॥ একটি আত্মহত্যার ছবি ॥

সাম্প্রতিক ফরাসী চলচ্চিত্রজগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে যে কজন তরুণ পরিচালক কীর্তিত লুই মল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইতিপূর্বে তিনি দুটি ছবি তুলে সমালোচকদের উচ্চ প্রশংসার কারণ হয়েছিলেন। 'লোজআমাঁ' এবং 'জ্যাজি দাঁ ল্য মেত্রো' এই দুটি ছবিই পরিচালক মলের পরীক্ষামূলক ছবি। প্রথমটির বিষয়বস্তু ছিল অবৈধ প্রেম এবং দ্বিতীয়টি লঘু ফ্যান্টাসী। লুইয়ের নবতম ছবি 'লা ফ্যু ফোলে'-এর বিষয়বস্তু হল আত্মহত্যা। ফরাসী চিত্রসমালোচক-সমাজ ছবিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনয়ের জন্যে প্রশংসিত হয়েছে। আত্মহত্যাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখেছেন পরিচালক তাঁর এই পরীক্ষামূলক চিত্রে।

ছবির প্রধান চরিত্রটি জড়তা এবং আলস্যের ভারে ক্লান্ত। তার চারপাশের লোকজনও এমনই শূন্যগর্ভ এবং মোমের পুতুলের মত যে মনে হয় তারাও বোধহয় দীর্ঘদিনের ক্লান্তিতে ভুগে ভুগে মারা গেছে সকলে। চিত্রের নায়কের জীবনের শেষ দুদিন ছবির ঘটনাকাল। নার্সিং হোমে নায়ক ছিল বিবক্রিয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। ছবির শুরু হয়েছে নায়ক নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে আসার পর। আরোগ্য নিকেতন থেকে বেরোবার পর নায়কের সব কিছুই কেমন নিরর্থক মনে হতে থাকে। ওর গোটা অস্তিত্বটাই যেন ফাঁকা এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হয় ওর কাছে। জীবনকে পাওয়ার জন্যে বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে থাকে সে। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা যত বাড়িয়ে দেয় জীবনের যাবতীয় অর্থই যেন তত ওর কাছে ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে আসে। অবশেষে একদিন একটি পানশালা থেকে আকণ্ঠ মাতাল হয়ে ভোজসভায় যায় আর সেখান থেকে শহরের নোংরা পল্লীর উচ্ছৃঙ্খলতায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফিরতে হয় তাকে। ফিরতে হয় তার আরোগ্য নিকেতনে। ফিরে বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করল নায়ক।

নায়কের আত্মহত্যায় কিন্তু পরিচালক দুঃখবোধকে প্রশ্রয় দেননি। টুর্গেনিভের সেই আপ্তবাক্যটিকেই পরিচালক লুই মল তাঁর এই পরীক্ষামূলক ছবিতে অনুসরণ করেছেন। টুর্গেনিভ আত্মহত্যা প্রসঙ্গে একদা লিখেছিলেন যে, যে লোক আত্মহত্যা করবে বলে শাসায় তাকে কেউ কখনও বিশ্বাস করে না। এবং লোকটি যদি আত্মহত্যা করেই শেষ পর্যন্ত, বড়জোর লোকে বিস্মিত হয়, দুঃখিত হয় না।

দি আইল্যান্ড অফ ব্লু ডলফিন

স্কট ওডেল লিখিত 'দি আইল্যান্ড অফ ব্লু ডলফিন' উপন্যাসটি আমেরিকান শিশু-সাহিত্যে বিশিষ্ট সংযোজন হিসেবে 'নিউবেরী মেডেল' পুরস্কার লাভ করেছিল। রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চারের এই উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রায়িত করছেন রবার্ট র‍্যাডনিজ ইউনিভার্সাল চিত্র-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়। র‍্যাডনিজ ইতিপূর্বে 'মিস্টি' এবং 'এ ডগ অফ ফ্যান্ডারস' চিত্রদুটির প্রযোজক। শেষোক্ত চিত্রটি ভেনিস চিত্র উৎসবে গোল্ডেন লায়ন পুরস্কার লাভ করেছিল। র‍্যাডনিজ জানিয়েছেন তাঁর এই নবতম ছবিটি অপর ছবি দুটোর ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবে। একটি ভারতীয় বালিকার অভিযান-কাহিনী এই চিত্রের মূল উপজীব্য। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বেড শেরডোম্যান এবং জেন রোডে। ভূমিকালিপি এখনো স্থির হয়নি। —চিত্রকূট

নর্তক

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—

আমেরিকার ডেভিস কাপ দলের মনপ্লেয়িং ক্যাপটেন বব্ কেলহার বোম্বাইয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে গেছেন। এরকমের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল এবং আমাদের দেশের খেলাধূলোর পরিচালক-মহলের ধারণার অতীত। কেলহারের সজাগ কর্তৃত্বে ডেভিস কাপের আন্তঃ জোন ফাইনালে আমেরিকা ৫—০ খেলায় ভারতবর্ষকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ক'রে তিন বছর পর পুনরায় ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠেছে। আমি এখানে আমেরিকার এই সাফল্যের কথা বেশী করে বলছি না। টেনিসে আমেরিকা জাত-খেলোয়াড়। বর্তমান বিশ্বের টেনিস খেলায় আমেরিকার সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার মত কব্জির শক্তি রাখে একমাত্র অস্ট্রেলিয়া। সুতরাং আমেরিকার কাছে ভারতবর্ষের পরাজয়ে দেশবাসীর লজ্জা পাওয়ার খুব বেশী কারণ নেই। যেখানে টেনিস বড়লোকের খেলা এবং ভারতবর্ষ গরীব দেশ সেখানে আর কথা কি! আমেরিকা ধনীর দেশ বলে সেখানে সর্বশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পক্ষে টেনিস খেলার ঢালাও সুব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। ফলে ক্রীড়ানৈপুণ্যে পারদর্শী এবং দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান এমন যোগ্য খেলোয়াড়ই কেবল শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমেরিকার জাতীয় টেনিস দলে স্থানলাভ করেন। এইখানেই ভারতীয় টেনিস খেলার উন্নয়নের পথে একটা বড় অন্তরায়। কিন্তু যে বস্তু বিনা অর্থব্যয়ে পাওয়া যেতে পারে, তার অভাব আমাদের দেশে কেন হবে? খেলাধূলোয় অর্থের খুবই প্রয়োজন, কিন্তু অর্থই সাফল্যলাভের একমাত্র পথ নয়। অর্থের সংগে আরও কয়েকটি বস্তুর সমন্বয় দরকার এবং সেই বস্তুগুলি দুর্লভ নয়। প্রচুর অর্থব্যয় করেও আশানুরূপ সাফল্য লাভ হয়নি, এমন দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে প্রচুর আছে। আসলে নিষ্ঠা এবং কর্তব্য-বোধের অভাবই অসাফল্যের মূল কারণ। আমি আমেরিকার অধিনায়ক কেল-হারের কর্তব্যবোধের দৃষ্টান্তের কথা এখানে বলছি। বিদেশের জলবায়ুতে দলের খেলোয়াড়দের অসুস্থ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায় তিনি স্বহস্তে নানারকমের প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, অপরের হাতে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেননি। আমেরিকার ডেভিস কাপ টেনিস দল বোম্বাইয়ে যে বিখ্যাত হোটেলে অবস্থান করছিলেন সেই হোটেল থেকেই পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের সুব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মিঃ কেলহার এই জল সম্পর্কে আরও বেশী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দেখা গেল, তাঁর বিস্তীর্ণ শয়নকক্ষটি একটি পাকশালায় পরিণত হয়েছে। তিনি হোটেলের পরিস্রুত পানীয় জল পুনরায় চোলাই করার ব্যবস্থা করেছেন। দলের এতগুলি লোকের প্রতিদিনের পানীয় জল তিনি স্বহস্তে আগুনের উত্তাপে সিদ্ধ ক'রে চোলাইয়ের ব্যবস্থা করেন। আহার্য সামগ্রী সম্পর্কেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এই কাজে তিনি দুটি রিফ্রিজারেটার ব্যবহার করে-ছিলেন। বিদেশের জলবায়ু এবং আহার্য বস্তুর সমন্বয়ে শরীরের যে গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, মিঃ কেলহার তার প্রতিটি প্রতিরোধক ব্যবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন অন্য নানা কাজের মধ্যেও। এইখানেই আমাদের দেশের খেলাধূলোর পরিচালকমণ্ডলীর সংগে বিদেশের কর্তাব্যক্তিদের বিরাট ব্যবধান। আমাদের দেশের খেলোয়াড় এবং দলের পরিচালকদের মধ্যে এইরকমের নিষ্ঠা এবং কর্তব্যবোধের অভাবই সব থেকে বেশী চোখে পড়ে। এই দুটি সম্পর্কে আমরা অনেক পিছনে পড়ে আছি। এবং এই দুটিকে প্রাধান্য না দিলে, খেলাধূলোয় উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা বৃথা হবে।

।। আন্তঃ আঞ্চলিক স্পোর্টস ।।

আগামী ২০ ও ২১শে ডিসেম্বর তারিখে আজমীরে (রাজস্থান) প্রথম বার্ষিক সর্বভারতীয় আন্তঃ আঞ্চলিক এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্যোক্তা অল-ইণ্ডিয়া এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডা-রেশন। এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের মান-উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই ফেডারেশন এই আন্তঃ আঞ্চলিক স্পোর্টস অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম—এই তিনটি অঞ্চল নিয়ে আন্তঃ আঞ্চলিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ। প্রথমে প্রতিটি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দলের মধ্যে পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা হবে। এবং প্রত্যেক অঞ্চলের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী নিজ নিজ অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে মূল আন্তঃ আঞ্চলিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের যোগ্যতা লাভ করবেন। অনুষ্ঠানের তৃতীয় স্থানাধি-কারীকে অতিরিক্ত হিসাবে রাখা হবে। পূর্বাঞ্চলের অনুষ্ঠান হবে লক্ষ্ণৌতে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। পূর্বাঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, সার্ভিসেস, রেলওয়ে এবং পুলিশ দল। প্রতিটি অঞ্চলেই সার্ভিসেস, রেলওয়ে এবং পুলিশ দলকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম বাংলার এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন বাংলা দল গঠনের উদ্দেশ্যে যে ট্রায়ালের ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে মাত্র ৬ জন যোগ্যতার মাপকাঠিতে পুরুষ বিভাগে নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলা দল পুরুষ বিভাগের প্রতিটি অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি দিতে পারেনি—মাত্র সাতটি অনুষ্ঠানে নাম দিয়েছে। ফলে শতকরা ৭০টি অনুষ্ঠানে বাংলা দলের কোন প্রতিনিধি থাকবে না। বাংলার পুরুষ বিভাগ থেকে মূল আন্তঃ আঞ্চলিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে বেরী ফোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করার বা কিছুটা সম্ভাবনা আছে। বাংলার পুরুষ দলের তুলনায় মহিলা দলটি বেশী শক্তিশালী। তাছাড়া পূর্বা-ঞ্চলের মহিলা বিভাগে বাংলার বিপক্ষে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত অন্য কোন রাজ্য দল নেই। বাংলার পুরুষ বিভাগে নির্বাচিত ছয়জনের মধ্যে তিনজন বাঙ্গালী এ্যাথলিট স্থান পেয়েছেন—লং জাম্পে প্রণব ব্যানার্জি ও শিশুতোষ মুখার্জি এবং ২০ কিলোমিটার ভ্রমণে বিবেকানন্দ সেন। মহিলা বিভাগে বাংলা ৯টি অনুষ্ঠানে যোগদান করবে। মোট পাঁচজনকে নিয়ে বাংলার মহিলা দল গঠন

* বিশেষ প্রস্তুতি *

রঞ্জি স্টেডিয়ামে বাংলার ক্রিকেট খেলোয়াড়রা রঞ্জি ট্রফি এবং দলীপ সিংজী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদানের প্রস্তুতি হিসাবে অনুশীলন আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন।

চিত্র-পরিচিতি

বাঁ দিক : ক্রিকেট খেলার সাজ-পোষাক পরিধানরত ভারতবর্ষের প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)।

নীচের ছবি (বাঁ দিক থেকে) : অম্বর রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) এবং শ্যামসুন্দর মিত্র (এরিয়ান্স)।

ফটো : অমৃত

করা হয়েছে। এই পাঁচজনের মধ্যে আছেন এই তিনজন বাঙ্গালী—রুবি নন্দী, অণিতা মুখার্জি এবং নমিতা ঘোষ। সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ের এ্যানি রিচসন একাই তিনটি অনুষ্ঠানে—সটপুট, জ্যাভেলিন এবং ডিসকাস নিক্ষেপে বাংলার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধি :

পুরুষ বিভাগ

১০০ ও ২০০ **মিটার দৌড় :** বেরী ফোর্ড (রেঞ্জার্স)।

৮০০ ও ১,৫০০ **মিটার দৌড় :** পি হাউ (মেটাল বক্স)।

লং জাম্প : প্রণব ব্যানার্জি (মোহনবাগান) ও শিশুতোষ মুখার্জি (ইস্টবেঙ্গল)।

২০ **কিলোমিটার ভ্রমণ :** বিবেকানন্দ সেন (মোহনবাগান)।

ম্যারাথন : ডি এন সিং (ইস্টার্ণ রেলওয়ে)।

মহিলা বিভাগ

১০০ **মিটার দৌড় :** মরিন হোল্ডার (রেঞ্জার্স), রুবী নন্দী (বেহালা স্পোর্টস এসোঃ) ও অণিতা মুখার্জি (সিটি এ সি)—অতিরিক্ত।

২০০ **মিটার দৌড় :** মরিন হোল্ডার, অণিতা মুখার্জি ও রুবী নন্দী (বেহালা)—অতিরিক্ত।

৮০০ **মিটার দৌড় :** মরিন হোল্ডার ও অনিতা মুখার্জি।

লং জাম্প : রুবী নন্দী, অণিতা মুখার্জি ও নমিতা ঘোষ (২৪-পরগণা)—অতিরিক্ত।

৮০ **মিটার হার্ডলস :** নমিতা ঘোষ।

সটপুট, জাভেলিন, ডিসকাস : এ্যানি রিচসন (এস ই রেলওয়ে)।

পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

১৯৬৩ সালের পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা সম্প্রতি শেষ হল। প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল ক'লকাতার ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের ইনডোর স্টেডিয়ামে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রখ্যাত ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় ছাড়াও এই প্রতিযোগিতায় মালয়ের প্রখ্যাত ইউ চেং হো, তান ই খান এবং এন জি বুন বী যোগদান ক'রে যথেষ্ট আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছিলেন। মালয়ের এই তিনজন খেলোয়াড়ই নিউজিল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত এবছরের টমাস কাপের খেলায় ভারতবর্ষকে ৮—১ খেলায় পরাজিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের একমাত্র জয়—মালয়ের ইউ চেং হো'র বিপক্ষে নান্দু নাটেকারের সাফল্য। সুতরাং মালয়ের এই তিনজন খেলোয়াড়ের খেলা সম্পর্কে আমাদের খুবই আগ্রহ ছিল।

পূর্বভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী মালয়েশিয়ার ইউ চেং হো, তান ই খান এবং এন জি বুন বী
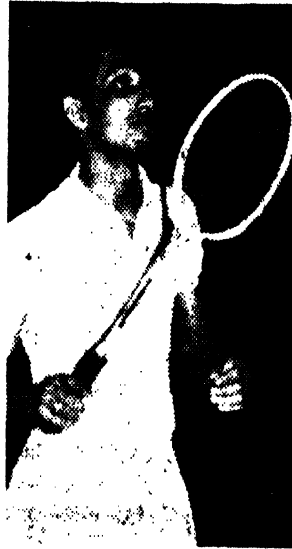
দীপু ঘোষ

আলোচ্য প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউণ্ডে ভারতীয় রেলদলের রমেন ঘোষ ৫—১৫ ও ১৮—১৬ পয়েণ্টে মালয়ের বুন বীকে পরাজিত করেন। বুন বী অসুস্থতার কারণে তৃতীয় সেটে আর নামেননি, খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের ২নং খেলোয়াড় দীপু ঘোষ (ভারতীয় রেলওয়ে) ১৫—৬ ও ১৫—৮ পয়েণ্টে মালয়ের এক নম্বর খেলোয়াড় ইউ চেং হোকে পরাজিত করেন। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) ৯—১৫, ১৫—৮ ও ১৫—১০ পয়েণ্টে মালয়ের তান ই খানকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন।।

মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়দের বিশ্ব জুড়ে নামডাক। কিন্তু তাঁরা সিঙ্গলস খেতাব নিতে পারেননি। প্রতিযোগিতায় তাঁরা দুটি বিভাগে খেতাব পেয়েছেন—পুরুষদের ডাবলস এবং ভারতীয় জুটির সহযোগিতায় মিক্সড ডাবলস খেতাব। পুরুষদের ডাবলস জুটি তান ই খান এবং এন জি বুন বি-কে বিশ্বের এক নম্বর জুটি হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রতিযোগিতায় দুটি ক'রে খেতাব পেয়েছেন—মালয়েশিয়ার এন জি বুন বি (পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস) এবং সুনীলা আপ্তে (মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস)।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) ১৮—১৬, ১৫—১২ ও ১৫—৯ পয়েণ্টে দীপু ঘোষকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : তান ই খান এবং এন জি বুন বি (মালয়েশিয়া) ১৫—৪ ও ১৫—৬ পয়েণ্টে নান্দু নাটেকার এবং সি ডি দেওরাসকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : সুনীলা আপ্তে ১১—৪ ও ১২—১০ পয়েণ্টে সরোজিনী আপ্তেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : সুনীলা আপ্তে এবং এন জি বুন বি ১৭—১৬ ও ১৫—৬ পয়েণ্টে সরোজিনী আপ্তে (রেলওয়ে) এবং এ আই শেখকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

ঝুড়ি ঝুড়ি রাণ জড়ো করে আর টপাটপ্ উইকেট নিয়ে ব্যাটস্ম্যান ও বোলাররা ক্রিকেট-নিয়ন্ত্রণকদের কি মুস্কিলেই না ফেলেছেন!

যতোই রান উঠছে এবং উইকেট পড়ছে, ততোই ক্রিকেটের পালকদের দুশ্চিন্তা বাড়ছে। তাঁদের ভাবনা যেন, রান তোলা আর উইকেট পাওয়া যদি এতো সহজই হয়ে গেল, তাহলে আইনের বজ্র-আঁটুনির শাসানি বজায় রইলো কোথায়!

অতএব আবার আইন বদলাও। এম সি সি বেশ আটঘাট বেঁধেই অতঃপর এগিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা এম সি সি। সেই সংস্থারই নির্দেশে সম্প্রতি ক্রিকেটের আইনের একটি অনুচ্ছেদ সংশোধিত হয়ে পরীক্ষামূলকভাবে সংশোধিত বিধানের প্রয়োগ চলছে। এবং অপর একটি ক্ষেত্রে নিয়ম সংশোধনে তাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করছেন।

মজার কথা এই যে, আইন সংশোধনের প্রশ্ন ঘিরে এম সি সি-র আজকের যে চিন্তা, তার দুটি ধারার ধর্ম কিন্তু একেবারেই ভিন্নমুখী, পরস্পরবিরোধী। আইনের একটি ধারা সংশোধন করে তাঁরা বোলারদের কিছু সুবিধা দিতে চাইছেন যেমন, তেমনি অপর একটি আইন সংশোধনের চিন্তায় তাঁরা আবার বোলারদের দমিয়ে ব্যাটস্-ম্যানদের প্রয়োজনে অনুকূল অবস্থা গড়ার কাজে হাত দিতে চাইছেন।

জানি না, রান ওঠাতে এবং উইকেট পড়াতে ও'রা অমন আতঙ্কিত হচ্ছেন কেন! রান ওঠা আর উইকেট পড়ার দৃষ্টান্তই তো আসল ক্রিকেট। আইন করে উইকেট পড়া ও রান ওঠার গতি রুদ্ধ করার প্রয়াস পাওয়া হলে কি ক্রিকেটের জীবনটুকু কেড়ে নেওয়ার কাজে হাত দেওয়া হবে না? রান যদি না উঠলো এবং উইকেট যদি না পড়লো, তাহলে আর ক্রিকেট খেলায় রইলো কি?

যাক্, কি যে থাকলো আর কিই বা থাকবে, তার হিসেবনিকেশ না হয় এম সি সি করুন। আমরা আপাততঃ এম সি সি-অনুসৃত রীতিনীতির সূত্রে ক্রিকেটে যে পরিবর্তন ঘটতে চলছে, দু'-চার কথায় তার আলোচনা সেরে নিই।

এম সি সি বলেছেন, বোলারের সামনের পা পপিং বা ব্যাটিং ক্রিজ বা লাইন অতিক্রম করতে পারবে না, তা স্পর্শ করাও চলবে না। পপিং বা বোলিং লাইন ডিঙ্গানো তথা ছোঁয়াছুয়িই নো-বল হয়ে যাবে।

অর্থাৎ রিচি বেনো বা ওয়েসলে হলের মতো যাঁরা দীর্ঘকায়, তাঁদের যথাসম্ভব পা বাড়িয়ে বল করার চেষ্টাকে দমিয়ে দেওয়া হলো। আকৃতি-গত দৈর্ঘ্যের মূলধনে তাঁরা আইন মেনেও যে সুবিধে এতোদিন গ্রহণ করছিলেন, এম সি সি তাতে বাদ সাধলেন। এম সি সি-র সংশোধনী প্রস্তাবের বাস্তব প্রয়োগও ঘটানো হয়েছে। পরীক্ষান্তে ভবিষ্যতে একদিন এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু ভবিষ্যতের সেদিনে যদি দীর্ঘকায় বোলাররা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, দীর্ঘ আকৃতি কি আমাদের অপরাধ? যদি তাই হয়, তাহলে দীর্ঘকায় ব্যাটস্ম্যানদের সম্পর্কে আইনের বাঁধনকে শক্ত করে তোলা হচ্ছে না কেন? তাহলে এম সি সি-কর্তৃপক্ষ কি সদুত্তর দিতে পারবেন?

কি জবাবই বা দেবার আছে! এম সি সি-র আইনে তো ব্যাটস্ম্যানদের পা দুটিকে আটকে রাখার ব্যবস্থা নেই। ব্যাটস্ম্যানেরা যেমন খুশী এগোচ্ছেন, পেছোচ্ছেন। পপিং বা ব্যাটিং লাইনের মধ্যে তাঁদের কোনো পাকে বেঁধে রাখার কোনো নির্দেশও নেই। দীর্ঘকায় ব্যাটস্ম্যানেরা পা বাড়িয়ে খেলার সুযোগ-সুবিধে বিধানমতোই গ্রহণ করছেন। আপত্তি শুধু বোলারদের বেলাতেই।

নিরপেক্ষ আইন কি এক্ষেত্রে এক-চোখো হয়ে গেল না?

মনে হয়, কিছু গোলমাল রয়েই গেলো। বোলারদের সামনের পা বাঁধতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ যেন তাঁদের নিরপেক্ষ মনোভাবে তালগোল পাকিয়ে বসলেন। জট ছাড়ানো সহজসাধ্য হবে মনে হয় না।

আরও একটি আইন সংশোধনের কথাও এম সি সি ভাবছেন। একটি আইন সংশোধন করে তাঁরা বোলারদের রুখতে চেয়েছেন। আর একটি পরি-কল্পনার খসড়া হাতে নিয়ে তাঁরা ঠেকাতে চাইছেন ব্যাটস্ম্যানদের প্রভাব।

খসড়া পরিকল্পনা হলো, তিনের জায়গায় চারটি স্টাম্প পুঁতে দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থেও উইকেটের আয়তন কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে দেওয়া। মতলব এই যে, বড়সড় উইকেট পেলে স্টাম্প ছিটকে ফেলতে বোধহয় বোলারদের আর কোনো অসুবিধে হবে না।

কিন্তু তিনের জায়গায় চারটি স্টাম্পের আবির্ভাব সত্ত্বেও পরিকল্পিত সংশোধনী ব্যবস্থা বোলারদের বাড়তি কোনো সুবিধে দিতে পারেনি। এ বছরের গোড়ার দিকে লর্ডস মাঠে চারটি স্টাম্প পুঁতেই যে পরীক্ষার আয়োজন ঘটানো হয়েছিল, সে আয়োজনের অভিজ্ঞতা নাকি বোলারদের এবং আইন-প্রণেতাদের পক্ষে স্বস্তি ও সান্ত্বনার কারণ হয়ে উঠতে পারেনি।

আদ্যিকালের ক্রিকেটের আসরে তিনটি করেও স্টাম্প ছিল না। ছিল মাত্র দু' কাঠির স্টাম্প। তাও আবার স্টাম্পের মাথা ছিল বেলশূন্য। বোলার-দের সুবিধে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই একদিন বেলের ব্যবস্থা করা হলো। তারপর দুয়ের জায়গায় তিনটি খুঁটি পুঁতে উইকেটকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা হলো।

উইকেটের পুরোপুরি চেহারা আনতে আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। ১৭৯৮ সালে তিনটি স্টাম্পের মিলিত আয়তন ছিল ২৪×৭ ইঞ্চি। ক্রমে ক্রমে সেই চেহারা দাঁড়ালো ২৬×৭, ২৬×৮, ২৭×৮। কিন্তু তাতেও ব্যাটস্ম্যানদের দাপট কমেনি। বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে দেখে ১৯৩১ সালে আঁকজোক কষে উইকেট বানানো হলো ২৮×৯ ইঞ্চির।

আগের তুলনায় রীতিমতো চওড়া উইকেট। কিন্তু তাতেই বা বোলাররা বাড়তি সুবিধে কি পেয়েছেন? চওড়া উইকেটের আমলে ব্র্যাডম্যান, পনসফোর্ড, হ্যামন্ড, হাটন, কম্পটন, হার্ভে, ওরেল, উইক্স্, ওয়ালকট, সোবার্স, মার্চেন্ট, হাজারেদের ব্যাট আরও চওড়া হয়ে গিয়েছে। আবার সেই আমলেই বোলার বেডসার, স্ট্যাথাম, ট্রুম্যানেরা টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত উইকেট সংগ্রহে নজীর রেখে এবং সেই নজীর ভেঙ্গে নতুন রেকর্ডও গড়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আইনের চরিত্র যতোই পরিবর্তিত হোক না কেন, জাত খেলোয়াড়দের দক্ষতার পুঁজি সামান্য নয়। খাঁটি মূলধন হাতে থাকলে কি ব্যাটস্ম্যান, কি বোলার, উভয় পক্ষই আইনকে বেসামাল করে দিতে পারেন।

অনুমান করা যায় যে, আইন-প্রণেতাদের নিজেদের মনেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। তাঁরা কি চান? তাঁরা রান চান না। উইকেট পড়ুক, তাও নয়। তাহলে? তাঁরা কি কিছুই চান না?

[উপন্যাস]

।। ২ ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অরুণ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতে জীবেনের ইঙ্গিতে আয়না একটা টুল এগিয়ে দিল বিছানার কাছাকাছি। অরুণ কাছে এসেই দাঁড়িয়েছিল কিন্তু টুলটা দেখতে পেল না। সে তখন একদৃষ্টে তাকিয়েছিল বিছানার দিকে অথবা বিছানার ওপর শাড়িতে-জড়ানো যে কঙ্কালটা পড়ে আছে, তার দিকে।

ঘরে ষাট বাতির আলো, ভেতরের ঘর বলে ঠুসি পরাবার দরকার হয়নি—বেশ জোরালোভাবেই এসে পড়েছে ওদের ওপর, দুজনেই দুজনকে কাছ থেকে দেখছে—তবু কেউ-ই যেন চিনতে পারছে না কাউকে। চিনতে পারার হয়ত কথাও নয়, কারণ দুজনেরই সেই শেষ দেখার পর অবিশ্বাস্য রকমের পরিবর্তন ঘটেছে।

অরুণদা বলতে সেই ওর বিয়ের দিনের চেহারাটাই মনে আছে স্বর্ণর। ফরসা সে বরাবরই, কিন্তু সে যে এত ভাল দেখতে তা একবারও মনে হয়নি তখন। হয়ত অত রোগা ছিল বলেই বোঝা যেত না। আসলে অরুণের চেহারার কোন বৈশিষ্ট্য অত লক্ষ্যও করেনি স্বর্ণ কখনও। যে মানুষটা শুধু আত্মীয় অথচ নিকট-সম্পর্কের কেউ নয়, যে আরও অনেকের মধ্যে একজন হয়ে মিশে থাকে, কখনও সামনে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে না, তার চেহারা ঠিক কেমন তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না বোধহয়। অত কাছাকাছি ছিল বলে ভাল করে তার মুখচোখের দিকে তাকিয়ে দেখার কথা মনেও হয়নি কোনদিন।

কিন্তু তবু, আদল একটা মনে আছে বৈকি! স্বর্ণ এখন এই গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ মানুষটার মধ্যে সেই ভীরু লাজুক ছেলেটির আদলই খুঁজতে লাগল প্রাণপণে। মানুষে মানুষকে চেনে বেশির ভাগই চোখ দেখে, কিন্তু তাও যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে সদা-সঙ্কোচ-বিনম্র চাহনির চিহ্নমাত্রও নেই এই স্থির আত্মপ্রত্যয়ী দৃষ্টিতে।...

পরিবর্তন হয়েছে স্বর্ণরও।

আজকের এই রুগ্ন কঙ্কালসার প্রায় মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটির মধ্যে সেদিনের সেই প্রাণচঞ্চলা বালিকাটিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে অরুণের একেবারে চিনতে না পারার কথা নয়। কারণ সে তার আপাত-নত চোখে সেদিন স্বর্ণকে খুঁটিয়েই দেখেছিল। শুধু স্বর্ণকেই দেখেছে বোধ করি জীবনে, অপর কোন মেয়ের দিকে কোনদিন তাকাবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই স্বর্ণের দেহের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য তার পরিচিত। বিশেষত ওর কটা চোখ—সে চোখ আজ কোটরগত হতে পারে, স্তিমিতদ্যুতি হতে পারে কিন্তু তার বর্ণান্তর ঘটা সম্ভব নয়।

অবশেষে চিনতে পারল দুজনেই।

দুজনেরই দুজনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দুই চোখ জ্বালা করে জল ভরে এল। দুজনের অবশ্য দুই ভিন্ন কারণে। স্বর্ণর বহু স্মৃতি বহু বেদনা নিংড়ানো জল এ। তার অশ্রুর উৎস অতীতে। অরুণের অশ্রুর উৎস বর্তমানে। স্বর্ণর এই পরিণাম দেখেই তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ওর চোখেও ছিল সেই বিয়ের আগের দিনগুলোর স্মৃতি। সর্বশেষ স্মৃতি বিয়ের সময়কারই। গোলগাল গড়নের স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির ছবিই এতকাল মনে ছিল তার। সেই চেহারাটাই মনে করে রাখার চেষ্টা করেছে সে, সেই চেহারারই স্বপ্ন দেখেছে অবসর সময়ে। সে স্বাস্থ্য ও লাবণ্যর এমন পরিবর্তন হতে পারে তা কখনও ভাবেনি।......

বহু কষ্টে গলার কাছের ঠেলেওঠা ডেলাটাকে দমন করে স্বর্ণ প্রায় চুপিচুপি বলে, 'এতদিন পরে মনে পড়ল তাহলে বুঁচিকে অরুণদা! ওঃ, কী কষ্টটাই দিয়েছিলে আমাদের তুমি। বাব্বাঃ! তোমার মনে এত ছিল তা কে জানত, তাহলে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে জোর করে সঙ্গে নিয়ে আসতুম শ্বশুরবাড়ি। কতদিন ভেবেছি তোমার কথা, দুপুরবেলা একা কাজকর্ম করে বেড়াতে বেড়াতে কিম্বা রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলেই তোমার কথা মনে পড়ত। কেবলই মনে হত যে, কোথায় আছ, কী করছ, মাথার ওপর একটু আচ্ছাদন জুটছে কিনা, দুবেলা খেতে পাচ্ছ কিনা—এই সব কথা।...মনে হত তুমি বুঝি এখনও তেমনি মুখ-চোরাই আছ। কেউ খেতে না দিলে তো খেতে না কোনদিন, তাই, মনে হত হয়ত কোনদিনই পেট ভরে খেতে পাচ্ছ না।...সত্যি, বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, এই কদিন বিছানায় পড়ে পড়ে বহুবার তোমার কথা ভেবেছি। ভেবেছি যাবার দিন তো ঘনিয়ে আসছে—মরবার আগে যদি জানতে পারতুম যে, তুমি বেঁচে আছ, ভাল আছ, তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতুম!'

অরুণের উত্তর দিতে সময় লাগল। এ-কথা শোনবার কখনও আশা করেনি সে। এ তার সুদূর কল্পনারও অতীত। দুরাশা—একান্তই দুরাশা। তাই তার পক্ষে উত্তর দেওয়া আরও কঠিন। সে স্বর্ণর দিকেও চাইতে পারল না আর, জলটা বাইরে যদি উপচে পড়ে তো সে

বড় লজ্জার কথা হবে। ওপাশের পিকদানিটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

স্বর্ণই কথা বলল আবার, 'হ্যাঁ অরুণদা, তুমি নাকি আমার এই অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছ?—ঠাকুরপো বলছিল। তুমি আমার অসুখের খবর পেলে কি করে?...এ টহরণে ছিলে নাকি তুমি?'

এবার অরুণ উত্তর দিল, 'আমি যেখানেই থাকি, তোমার খবর ঠিক পৌঁছয় আমার কাছে। তোমার কোন খবর আমার অজানা নেই।'

আরও অনেক কিছু বলতে পারত সে। বলতে পারত যে, 'আমার একটা চোখ ও একটা কান, মন আর মাথার আধখানাও আমি সর্বদা তোমার কাছেই রেখে দিই। আমার গোচরসীমার বাইরে তুমি একটুখানির জন্যেও যেতে পারনি কোনদিন। আমি দূরে থাকলেও আমার একটি অতন্দ্র সত্তা দিনরাত তোমার কাছে প্রহরায় থাকে।' কিন্তু নাটক করা অরুণের কোনকালেই অভ্যাস নেই, আজও পারল না। হৃদয়াবেগ সে দমনই করল বহু চেষ্টায়।

'ওমা, তাই নাকি!...কী হবে মা। অথচ তোমার একটা খবরও দাওনি কখনও! কী ছেলে বাবা তুমি। ধন্যি, পাষাণপ্রাণ তোমার!'...

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'যাক, তবু যে এখনও এলে দয়া করে সে-ও ভাল। নইলে মরবার আগে শেষ-দেখাটাও হত না। এ তবু নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব।'

অরুণ কেন গলাটাকে কিছুতে আয়ত্তে আনতে পারে না? নিজের ওপরই রাগ হয়ে যায় তার। এত চেষ্টা করেও গলার মধ্যেকার কাঁপনটাকে সংযত করতে পারে না কেন?...

বেশ খানিকটা পরে, প্রায়-বিকৃত কণ্ঠে বলে, 'তোমাকে মরতে দিচ্ছে কে এরই মধ্যে? তোমাকে আমি জোর করে বাঁচিয়ে রাখব—সারিয়েও তুলব!'

সেই পুরাতন হাসি ফুটে ওঠে স্বর্ণর মুখে, আর সেই সময়েই চকিতে অরুণের মনে হয়—যাকে সে চিনত, যে তার পরিচিত, এ সেই পুরনো বঁুচি।

স্বর্ণ হেসে বলে, 'কত গেল রথা-রথী, শেওড়া গাছে চক্রবর্তী!...তুমি আমাকে বাঁচিয়ে তুলবে? তবেই হয়েছে! বলি মন্তরতন্তর, দৈব ওষুধবিষুধ কিছু জানো নাকি? না কি ঝাড়ফুঁক শিখেছ? এত জোরের সঙ্গে কথা বলছ?'

অরুণ এ বিদ্রূপের কোন উত্তর দেয় না। বোধ করি এর অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গটা ওকে স্পর্শও করে না। সে সহজ শান্ত-কণ্ঠে বলে, 'আমি পাহাড়ের ওপরে ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়ামে ঘর ঠিক করেছি, তোমাকে নিয়ে যাব সেখানে। সেইজন্যেই এসেছি আজ, হরেনবাবুকে বলতে। খরচপত্র সব আমি জমা করে দিয়েছি—তাঁর কোন অসুবিধে বা অমত হবে বলে মনে হয় না। তা আজ তো আর দেখা হল না, কাল সকালে এসেই দেখা করব। সময়ও নেই বেশী হাতে, ওদিকে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি, পরশুর ট্রেনে রিজার্ভেশান করা আছে। ...হরেনবাবুর এতে আপত্তি হবার কথাও নয়—উনি তো অনেক চেষ্টা করেও এখানে বেড যোগাড় করতে পারেন নি কোন হাসপাতালে, এটা যখন পাওয়া গেছে, তখন নিশ্চয় খুশীই হবেন উনি। ...টাকাকড়ি ওখানে যা কিছু ও'র নামেই জমা দিয়েছি। উনি যদি যেতে চান—তিনটে বার্থই রিজার্ভ করেছি আমি, কাঠগুদাম পর্যন্ত।'

ঠিক এ উত্তরের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না স্বর্ণ। তার মুখে ব্যঙ্গের হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সে জায়গায় ফুটে উঠল একটা সুগভীর বিস্ময়। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে অরুণের মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবারও সেই আগের মতো চুপিচুপি বলল, 'তুমি আমার জন্যে হাসপাতালে ঘর ঠিক করেছ? তুমি আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে? নিজের খরচায়?...কেন কেন এ ছিষ্টি করতে গেলে অরুণদা, আমার যে আর মোটে দেরি নেই মরবার! বাঁচতেও আমি চাই না যে। বাঁচায় আমার ঘেন্না হয়ে গেছে চিরদিনের মতো। আমি যে—আমি আজ মরব বলেই সারাদিন ওপোস করে পড়ে আছি যে। আমার জন্যে অনর্থক কেন এত পয়সা খরচ করতে গেলে অরুণদা! ছি ছি। কেন এসব করলে তুমি!'

এবার অরুণ ভরসা করে আবার ওর চোখের দিক চাইল। তেমনি শান্ত-স্বরে বলল, 'কিন্তু ইচ্ছে করলেই মরতে পার তুমি—এমন কথাই বা কে তোমার মাথায় ঢোকাল! যা খুশি তুমি করবে, আর আমরা চুপ করে বসে দেখব সবাই, এ তুমি ভাবলে কী করে?...তুমি সুখে থাকবে , ভাল থাকবে—এই আশা করেই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছিলুম, ধরে রাখার চেষ্টা করিনি। সেইজন্যেই এত-কাল সরে ছিলুম, কখনও সামনে আসবার চেষ্টা করিনি। তোমার সুখের পথে, শান্তি পথে আমার দুর্ভাগ্যের ছায়া না কোনদিন পড়ে, ভগবানের কাছে নিত্য এই প্রার্থনাই করেছি দিনরাত। কিন্তু তাই বলে দুঃখের দিনেও সরে থাকব, এত সহজে তোমাকে ছেড়ে দেব—এ তুমি মনে করো না একবারও। এবার জোর করেই ধরে রাখব তোমাকে দরকার হয়তো। এত সহজে রেহাই পাবে না আমার হাত থেকে।'

এবার আর চোখের জল বাধা মানে না স্বর্ণর। দুই চোখের কোল উপচে দরদর ধারে ঝরে পড়ে। এ কতকটা কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আনন্দেরও। এখনও তার প্রাণের এত মূল্য আছে তাহলে কারুর কাছে! পৃথিবীর সবাই তাহলে স্বার্থপর নয়, নির্মম নয়—অকৃতজ্ঞ নয়। এখনও অন্তত এমন একটি লোক আছে যে কোন প্রতিদানের আশা না রেখেই তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতে চায়। তার সুখের জন্যই তাকে ধরে রাখতে চায়!

অরুণকে পোঁছে দিয়েই ওরা পরস্পরের পরিচিত এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হবার পরই জীবেন বেরিয়ে গিয়েছিল। শুধু আয়না ওধারের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল এদের দিকে। অরুণ তাকে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করল, 'কিছু খেয়েছে ও?' আয়নাও ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না, কিছুই মুখে দেয়নি।'

অরুণ তখন স্বর্ণ শুনতে পায় এমনভাবেই বলল, 'ওকে দুধ না হর্লিকস্ কি দেবে গরম করে দাও দিকি। আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

আয়না ব্যস্তেব্যস্তে গরম জলের সন্ধানে ছুটল। ধড়ে যেন প্রাণ এল তার।...সারাদিন তারও খাওয়া হয়নি। বুড়ো মানুষ সমস্ত দিন অনাহারে কান্নাকাটি করে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

অরুণ এবার স্বর্ণর দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'সত্যি সত্যিই তুমি খাওনি সারাদিন?...এ পাগলামি তোমার ঘাড়ে চেপেছিল কেন? ও মানুষটাকেও তো খেতে দাওনি দেখছি!'

'ওসব কথা এখন থাক অরুণদা', অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে উত্তর দেয় স্বর্ণ, সজল চোখে একটু হাসি ফোটাবারও চেষ্টা করে, 'এখন আর ওসব কথা বলব না। ভাববও না।...অন্য কথা বল। তোমার কথা।...আচ্ছা, তাহলে মেজঠাকুরপো যা বলছিল তাই সত্যি? তুমি খুব বড়-লোক হয়েছ?...খু-উ-ব? অনেক পয়সা হয়েছে তোমার?'

'কে বললে এসব কথা? এত সব আবার কবে শুনলে? তবে যে বলছিলে আমার খবর পাওনি—'

'মেজঠাকুরপো বলছিল এই মাত্তর। তুমি নাকি এত বড় মটরগাড়ি করে এসেছ যে, রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে গেছে? আমার ছেলেও দেখে এসেছে—ভুতু। এত পয়সা কি করে কামালে অরুণদা? চাকরি করছ বুঝি আজকাল মোটা মাইনের?'

'দূর পাগল। চাকরি করে কি কেউ বড়লোক হয়? যত বড় চাকরিই করুক। ও গাড়ি আমার নয়—যে সাহেবের সঙ্গে কাজ করি, তাঁরই গাড়ি।'

'সাহেবের সঙ্গে কাজ করো? সে আবার কী কাজ?'

একটুখানি চুপ করে থেকে অরুণ বলে, 'সে এক রকমের ব্যবসাই। এই যুদ্ধের নানা জিনিস যোগানো গভর্ণমেণ্টকে। আমি আর কী করে করব। ম্যাকগ্রেগর ডানকান কোম্পানীর বড়-সাহেব একা গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন, আসানসোলের কাছে অ্যাকসিডেণ্ট হয়—এক লরীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে। সে লরী পালিয়ে আসে, গাড়িসুদ্ধ পাশের খানায় পড়েছিলেন সাহেব। আমি সাইকেল করে আসছিলাম ঐ পথে—ঐ অবস্থা দেখে গাঁয়ের লোকজন ডেকে সাহেবকে গাড়ি থেকে বার করে কোন-মতে একটা গাড়ি যোগাড় করে হাস-পাতালে নিয়ে আসি। সেই আলাপ সাহেবের সঙ্গে। আমার ওপর তাঁর একটু মায়াও পড়ে যায় বোধহয় ঐ ব্যাপারে। তাছাড়া বিশ্বাসী লোকও খুঁজছিলেন একজন—অনেকদিনই ও'র
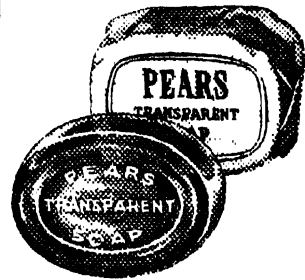
এই সাপ্লায়ের কাজে নামার ইচ্ছা কিন্তু চাকরি করে সোজাসুজি তো আবার কারবার করতে পারেন না, তাই আমাকে অংশীদার করে নিলেন। উনিই তদ্বির করে অর্ডার যোগাড় করেন, টাকাও ওঁর—আমি শুধু খাটি; লেখাপড়ার কাজ, মাল তৈরী করানো, ঠিক সময়ে পেঁছি দেওয়া, এই সবই আমার। খুবই পরিশ্রমের কাজ, অন্য লোকও ছিল না। এতদিন পরে আমিই আর একটি ছেলেকে যোগাড় করে নিয়েছি, বিশ্বাসী ছেলে—সে অনেকটা বুঝে নিয়েছে। তাই তো এখন কদিনের ছুটি পেয়েছি। নইলে তোমার সঙ্গে যাওয়াও হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। এখন আমি তোমাকে পেঁছে দিয়ে দিন-পনেরো-কুড়ি থেকেও আসতে পারব।'

ইতিমধ্যে আয়না এক কাপ হর্লিকস না কি একটা পানীয় তৈরী করে নিয়ে এসেছে। স্বর্ণ আর কোন আপত্তি করল না এবার, অরুণের মুখের দিকে চেয়ে একটু অপ্রতিভভাবে হেসে সেটা খেয়ে ফেলল ভালমানুষের মতো। তারপর অভ্যাসমতো আয়নাকে একটা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'এবার তুমি দয়া করে মুখে কিছু দিয়ে কেদাত্ত করো আমাকে।...হল তো গেলানো—আজকের মতো প্রাণটা তো ধরে রাখা গেল, এবার নিজের প্রাণটা বাঁচাও গে।'

আয়না চলে গেলে অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল।

স্বর্ণ যেন এখনও ব্যাপারটা ঠিক ধারণা করতে পারছে না। বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। পাহাড়ের ওপর হাসপাতালে যাবে সে, সেখানে গিয়ে ভাল হয়ে উঠবে? কিন্তু এ রোগ কি ভাল হয়? ভাল হওয়া সম্ভব? সত্যি সত্যিই তাকে সারিয়ে তুলতে পারবে অরুণদা?

আচ্ছা, এত জায়গা থাকতে পাহাড়ের ওপরই বা হাসপাতাল করতে গেল কেন? সেখানের হাওয়া ভাল বলে? কী রকম হাওয়া সেখানকার? এই হাওয়াই তো—হাওয়া কি আবার দুরকম আছে নাকি?...সে পাহাড় কতদূর তাই বা কে জানে। কোন্ দিক দিয়ে যেতে হয়, রেলগাড়িতে যাওয়া যায় নাকি সবটা? পাহাড়ে তো নাকি হেঁটে উঠতে হয়, সে কি পারবে অতটা হাঁটতে! মরুক গে, সে-ই বা ভেবে মরছে কেন! অরুণদা নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবে। পাহাড়ে যেতে পারার, সেইটেই বড় কথা। এতখানি বয়স হল, পাহাড় কখনও দেখল না সে—ছবিতে ছাড়া। চোখে দেখেনি, তবু আকর্ষণও কম নয়। ছবিতে দেখেই তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, এই সবুজ গাছপালায় ঢাকা আকাশ-ছোঁয়া মাটির ঢিপিগুলোর মধ্যে না জানি কি এক গভীর রহস্য আছে লুকিয়ে। কে জানে, বুঝি ঐসব জায়গাতেই দেবতারা থাকেন, মুনি-ঋষিরাও বোধ হয় ওখানে তপস্যা করেন বসে। সে শুধু তাঁদেরই জায়গা। আবার মনে হয় তাই বা কেন, শুনেছি তো পাহাড়ের ওপর এখন বড় বড় শহর হয়েছে, রেলগাড়ি যায়, মটরগাড়ি যায়—বড়লোকেরা গরমের সময় যায় হাওয়া খেতে। হরেনও একবার গিয়েছিল, জষ্টি মাসে শাল, দোশালা গরম কোট, লেপ নিয়ে গেল। ভারী হাসি পেয়েছিল স্বর্ণর সে সময়, এই গরমে গরম জামা। মেজদা তাকে বুঝিয়েছিল, পাহাড়ে শহর যেসব খুব উঁচুতে, সেইজন্য বারোমাস ঠাণ্ডা। শীতকালে সেখানে ঘাসের ওপর শিশিরগুলো সুদ্ধ জমে বরফ হয়ে থাকে।

কিন্তু ওসবই তার কাছে গল্পকথার দেশ হয়ে ছিল এতকাল। ছবিতে দেখা কল্পলোক মাত্র। সে সব দেশ দেখার সুযোগ কখনও হয়নি, হবে বলেও মনে হয়নি। আজ এই মরণের দিকে পা করে—যমের বাড়ির দোরগোড়ায় পেঁছে বুঝি সেই সুযোগ এল তার জীবনে। কিন্তু যাওয়া কি হবে শেষ পর্যন্ত? পেঁছতে কি পারবে সেখানে? কিছুতেই যে বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা।

কোথাও কখনও যেতে পায়নি সে। বাইরে যাবার মধ্যে একবার বড় নন্দাইয়ের দেশে গিয়েছিল। দক্ষিণ দেশ কি আছে সেইখানে। গঙ্গাসাগর যাবার পথে পড়ে বুঝি। তাও তাঁরা বারোমাস সেখানে কেউ থাকেন না, এই ঠাকরুণবাড়ির কাছে টালিগঞ্জ বলে কি এক জায়গা আছে—সেইখানেই তাঁদের বাড়িঘর, কি এক কারখানা—সেইটেই আসল বাড়ি। দেশে যান কদাচিৎ কখনও। সেবার পুজোর পালা পড়েছিল বলে গিছলেন। সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই যা যাওয়া—'জম্মের মধ্যে কম্ম'।

আর কখনও কোথাও বেরোতে পারেনি। বাপের বাড়ি তাই যেতে দিত না এরা। নমাসে ছমাসে, ক্রিয়াকর্ম পড়লে তবে। তাও এক রাতের সই দু রাত নয়। এ বাড়িতে ঢুকে পর্যন্ত এই চার দেয়ালে ঘেরা কৌটোর মধ্যে বন্ধ আছে। একটা বড় রাস্তার কি গাড়ি-ঘোড়া মানুষজনের পর্যন্ত মুখ দেখতে পায় না। সামনে পাঁচ হাত চওড়া ইঁট-বাঁধানো গলি, রিক্সাই আসতে চায় না। ওদিকে বড় রাস্তা, সে-ই বা কতটুকু, দুখানা গাড়ি দুদিক থেকে এলেই সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। সামনে তবু এই যা একটু ফাঁকা—পিছনে রমাদের তিনতলা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মতো। দুপাশেও তিনতলা না হোক, ওদের মতোই দুতলা বাড়ি এক-একটি মোতায়েন আছে। হাওয়াবাতাস বলতেই বিশেষ কিছু নেই। অবকাশের মধ্যে এই এক ফালি উঠোন আর ছাদ। আকাশ দেখতে হলে হয় ছাদে উঠতে হয়, নয়তো উঠোনে নামতে হয়। জন্মাবধি সে গাছপালা, বাঁশঝাড়, পুকুর দেখে মানুষ—গাছপালা ছাড়া যে বাড়ি হয়, তাই তো জানত না। এখানে এসে চারিদিকে এই ইঁটের পাঁচিল দেখে হাঁপিয়ে উঠত প্রথম প্রথম। তারপর অবশ্য সবই সয়ে গেছে, একটু একটু করে সইয়ে নিতে হয়েছে—এই চার দেয়ালের বাইরে যে বিশাল বিস্তৃত বসুন্ধরা পড়ে আছে, তার কথা আর মনেও পড়ে না বোধহয়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টাই। এই দোতলা বাড়ির মোট সাতখানা ঘরেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে ওর জগৎ।

তবু এক এক সময় হঠাৎ মনে পড়ে যায় বৈকি।

কোন নতুন ক্যালেণ্ডারে কি ছেলেমেয়েদের পড়ার বইতে ছবি দেখলে মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় যে পৃথিবীতে সবুজ শস্যে ভরা মাঠ আছে, ঘন গাছপালায় ভরা বাগান আছে, পুকুর আছে ডোবা আছে, খানা-খন্দ আছে। সেই সব মুহূর্তগুলোতে ওদের বাগানের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তের সেই গো-হাড়গোলে ভরা পগার এবং বাঁশবনের ধারে শিয়ালের গর্তও ভাল লাগে। মন লোভাতুর হয়ে ওঠে সেই বিশেষ গন্ধটার জন্যে, সেই ছায়াঘন স্নিগ্ধ ভূমিখণ্ডটুকুর জন্যে। সন্ধ্যাবেলা—এক একদিন বা বেশ বেলা থাকতেই—কুড়ি পঁচিশটা শিয়াল এসে জড়ো হয় ওদের রান্নাঘরের নর্দমাটার ধারে, এক একটা নির্ভয়ে এগিয়ে আসে দরজা পর্যন্ত, একেবারে গায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। সে সময় ভয় ভয় করত, ঐসব বেদনাবিধুর স্মৃতিমন্থর মুহূর্তগুলিতে তাদেরও পরম বন্ধু বলে মনে হয়।

আরও মনে হয়। দেখেনি সে, তবে কল্পনা করতে পারে। পাহাড় পর্বত নদী সমুদ্র—নিজের মতো ক'রে একটা ছবি খাড়া ক'রে নিয়েছে মনে মনে। নিঃসীম নীল সমুদ্র—ছবি দেখে তাকে ধারণা করা যায় না, তবু সে চেষ্টাও করে মধ্যে মধ্যে। পাহাড়ের ছবি অবশ্য দেখেছে অনেক। দার্জিলিঙের খুব একখানা বড় ছবি বাঁধানো আছে মেজ ঠাকুরপোর ঘরে। অনেকদূরে পশ্চিমে কোথায় সিমলে পাহাড় আছে তার কতকগুলো পোস্টকার্ডে ছাপা ছবি দেখেছে সে, কে যেন পাঠিয়েছিল—হয়ত এখনও প্যাঁটরার মধ্যে খুঁজলে কাপড়ের তলায় পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও নানান পাহাড়ের ছবি চোখে পড়ে মধ্যে মধ্যে। বায়স্কোপে গিয়েও

দেখেছে সে। পাহাড়ের ছবি ঝর্নার ছবি। কোন্ দেশে পাহাড়ে বরফ জমে তাতে সব মেয়েরা পায়ে কাঠ বেঁধে খেলা করে—একবার দেখেছিল ছবিতে।

সেসব ছবি সেসব দৃশ্য ঐ উন্মনা মুহূর্তগুলোতে যেন একসঙ্গে ভিড় ক'রে মনের পর্দায় ফুটে ওঠে. আর তারই মায়া যেন দুর্নিবার আকর্ষণে টানতে থাকে ওকে। মনটা ছটফট ক'রে ওঠে—একটু ফাঁকায়, দুটো গাছপালার মধ্যে—আর কিছু না হোক নীল আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে।...

সেই দুর্লভ সুযোগ আজ এতদিন পরে হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়িয়েছে ওর—একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে।... কিন্তু তবু, এমনভাবেই কি যেতে চেয়েছিল সে? এমনি রুগ্ন অসহায় ভাবে,—সকলের অস্পৃশ্য হয়ে—ঘৃণিত অবজ্ঞাত বিতৃষ্ণার পাত্র হয়ে? স্বামী-পুত্র-কন্যা—সকলকে ছেড়ে?...

একেই বুঝি বলে অদৃষ্টের পরিহাস। নইলে এই পরম ঈপ্সিত ক্ষণে, এই চার-দেয়ালে-ঘেরা, শ্বাসরোধ করা সংসারটার আকর্ষণ এমন দুর্নিবার বলে মনে হবে কেন? তাকে ছেড়ে যেতে মনের মধ্যেকার বেদনার তন্ত্রীগুলোতে এমন টান পড়বে কেন?...

কানে গেল, অরুণদা আস্তে আস্তে বলছে, 'অত ভাবছ কেন? বড়জোর দু তিন মাস, তার মধ্যেই সেরে গিয়ে আবার তোমার ঘরকন্নার মধ্যে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু এখানে থাকলে কিছুতেই তোমাকে বাঁচাতে পারব না। লক্ষ্মীটি, তুমি আর অমত ক'রো না।'

স্বর্ণ শিউরে ওঠে। অরুণদা কি অন্তর্যামী? এমন ক'রে মনের নিভৃত কথা টের পায় কি ক'রে?... ওর অসুখের খবরই বা তাকে কে দিলে!... নিশ্চয় কোন সন্ন্যাসী টন্ন্যাসীকে ধরে কোন দৈবক্ষমতা পেয়েছে অরুণদা, এত পয়সাও তাই থেকে। ওসব সায়েব-টায়েব বাজে কথা।...

কিন্তু সে যাই হোক—অরুণদা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে। দীন উৎসুক চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। যেন ও দয়া ক'রে সেরে উঠে তাকে কৃতার্থ করবে।...

সে কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিয়ে বলে. 'হ্যাঁ—ঘরকন্নায় ভাবনায় তো আমার ঘুম হচ্ছে না একেবারে। সংসারে আমার ঘেন্না ধরে গেছে—এককড়ার টান নেই কারও ওপর আর।... কিন্তু তুমি এই ঘাটের মড়ার বোঝা ঘাড়ে তুলছ—সেই কথাই ভাবছি। হয়ত বাঁচাতেও পারবে না শেষ পর্যন্ত, মিছিমিছি এই খরচান্ত আর ব্যতিব্যস্ত হওয়া!'

আস্তে আস্তে বলল অরুণ. 'ওসব আর না-ই ভাবলে এখন, ওসব ভাবার সময় ঢের পড়ে রইল সামনে। এখন চলো তো!'

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে স্বর্ণ বলল, 'আমি তো বেঁচে যাই। এদিকে বাঁচব কিনা জানি না, মনে মনে বাঁচি অন্তত। কতদিনের শখ আমার পাহাড় দেখার।'

তারপর একটু সলজ্জ হেসে বলে, 'খুব উঁচু পাহাড়—হ্যাঁ অরুণদা? আচ্ছা, কত উঁচু হবে?'

(ক্রমশঃ)
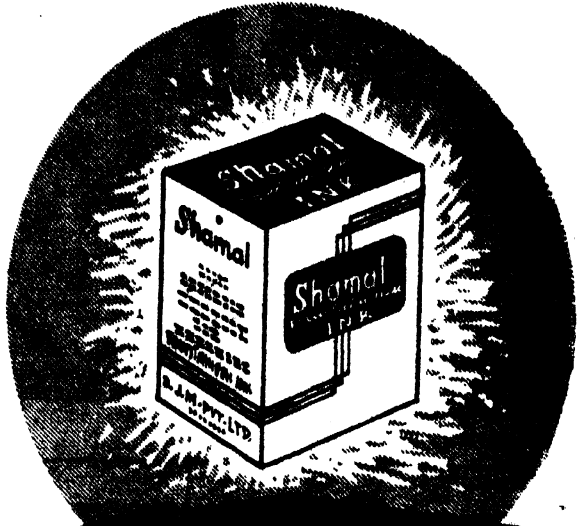
সিংগাপুরের প্রায় গায়ে লেগে আছে জোহোর, মালয়ের বৃহত্তম রাজ্য। কেদা ও কেলাণ্ডন রাজ্যের মত জোহোরে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী, ভারতীয় ও চীনাদের সংখ্যা ক্রমশ কমের দিকে। সিংগাপুর থেকে জোহোর যেতে একটানা মেটাল রোড, দেখলে মনে হয় যেন শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগরের রাস্তাটি। দুদিকে নারকেল, কাঠবাদাম, কাঁড়, শিশু, বোগনভিলা, জারুল ইত্যাদি গাছের আড়ালে জনবিরল বসতি। দক্ষিণ ভারতীয় মানুষের সংগে কিছু সংখ্যক পাঞ্জাবের সর্দারজী, বিহারী ভায়া এবং উত্তরপ্রদেশের পাঁড়েজীরাও এই অঞ্চলে সহাবস্থান করে। অনেকেই দেশের মত বহু ছুৎমার্গীতা বাঁচিয়ে আমিষ বর্জন করে মোটা রুটী আর অড়হর ডাল খেয়ে ভুঁড়ি বেশ দোলায়মান করে ফেলেছে। স্কুলের নানা শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে এইখানে দেখা যায় পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে, কাউকে বা 'বাস সেকুল্লা' অর্থাৎ স্কুল বাসের জন্য অপেক্ষা করতে। স্কুলে পড়া মালয়ী মেয়েদের পাদযুগল পাদুকাহীন অথবা মাথা বব-হীন দেখেছি বলে মনে হয় না।

জোহোরের দিকে এগিয়ে যেতে সিংগাপুর দ্বীপের অশহর অঞ্চলে দাঁড়িয়ে আছে এক ছোট্ট পাহাড়। এত গাঢ় গেরুয়া রঙের যে চোখ ঝলসে যায়। এ দিকটা মূলতঃ চীনাবসতিপূর্ণ। সিংগাপুরের মত এখানে রাজসিকতা নেই, তবু স্বতশ্চল যান্ত্রিকতা এবং শহরের জীবনছন্দ সবই বর্তমান। দোকান-গুলিতে পল্লীছাপের চাইতে পাশ্চাত্য-দেশীয় দোকান সাজাবার কায়দাই প্রকট। একটু এগিয়ে চোখে পড়ে একটি শীর্ণ-কায়া পল্লীতটিনী। রাবার গাছের বন-শ্রেণীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে প্রায়

অয়েল পাম বৃক্ষ।

মালয়েশিয়ার জোহোর

সুরেশচন্দ্র সাহা

নির্জলা তনু নিয়ে জোহোর প্রণালীতে পড়েছে।

জোহোর প্রণালী মূলত একটি নদীর মত, প্রসারতায় কলকাতার কাছের গংগার বেশী হবে না। মালাক্কা প্রণালীর শেষ বিন্দুতে হঠাৎ সিংগাপুর দ্বীপটি মাথা তোলা দেওয়ায় প্রণালীর একটি অংশ তৃতীয়ার চাঁদের বঙ্কিম রেখার মত জোহোরের গা ঘেঁসে গিয়ে পড়েছে সিংগাপুর প্রণালীতে। এর নাম জোহোর প্রণালী। এর সৃষ্টি না হলে জোহোর আর সিংগাপুর হত একই রাজ্য—গংগার এপারে কলকাতা ওপারে হাওড়ার মত সিংগাপুর আর জোহোরের স্বতন্ত্র সত্তা থাকত না। জাপানী দখলের সময় ভারী পাথরের টুকরো পাহাড়ী মাটি ইত্যাদিতে ভরাট করে আড়াআড়িভাবে পুল তৈরী করে জোহোরকে যুক্ত করা হয়েছে সিংগাপুরের সংগে।

সিংগাপুর থেকে এসে পুল পার হওয়ার খানিকটা আগে এক যত্ন-না-নেওয়া মন্দিরে অবাক হয়ে দেখেছিলাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাটিতে-গড়া রঙে-চমকানো মূর্তি; হাতে মোহনবাঁশী, গলায় বনমালা। মনে হল যেন বড় নিঃসংগ, সমস্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অত্যন্ত বেমানান। এ মূর্তি দেখলে কল্পনা করা শক্ত, ইনিই ভক্ত ও ভাগবতের ভগবান, মথুরা ও বৃন্দাবনলীলার নায়ক, কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথি।

পুল পার হয়ে এসে জোহোরের মাটি স্পর্শ করার সংগে সংগে চোখে পড়ে বিরাট এক সাইনবোর্ড, তাতে লেখা রয়েছে—'জোহোর বাহারু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।' প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের যে কোন দেশ থেকে এসে সিংগাপুরে নেমে মালয়ে প্রবেশের যেন এটি সিংহ-দ্বার। তাই বিদেশীকে এই বন্ধুত্বময় দেশের প্রবেশ-তোরণে জানানো হয় সাদর সম্ভাষণ। মালয়ী মানুষের প্রীতির স্পর্শে গভীর।

জোহোর বাহারু ধনেজনেমানে পরি-বর্ধমান; নতুন শহর, জোহোর রাজ্যের

রাজধানী। আর সব মালয়ী শহরের মত জোহোর বাহারুও ধনাঢ্য। বাহারু শব্দের অর্থ নয়া। সত্যি নয়া শহর জোহোর বাহারু। আরও তটিতে জোহোর প্রণালী যেখানে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে সবুজ ঘাসের গালিচা মোড়া টুকরা টুকরা ভূমিখণ্ড বিধৌত করে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে চীন সাগরের দিকে, সেই বনসবুজ প্রান্তরের একান্তে এক সুউচ্চ ভূমিতে তৈরী হয়েছে জোহোর সুলতানের ইস্তানা বা রাজপ্রাসাদ, স্বপ্নরাজ্যের ছবিটির মত।

পর্তুগীজরা মালাক্কা দখল করলে মালাক্কার সুলতান মামুদ পালিয়ে গেলেন পাহাড় রাজ্যে ১৫১২ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে ইনিই প্রতিষ্ঠা করেন জোহোরের সুলতান বংশ।

সুলতান আবুবকর মসজিদ মালয়ের বৃহত্তম ইসলামী ভজনালয়। ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত। সবুজ উদ্যানময় বহুবিস্তৃত ভূমিতে নির্মিত জোহোর সুলতানের সরকারী ভবনের অনতিদূরে এই মসজিদটিতে মুরীয় স্থাপত্যকলার চাইতে মনকে বেশী স্পর্শ করে এর পরিপার্শ্বের শান্ত সমাহিত সুরটি। পেনাঙ কুয়ালালামপুরেও মসজিদ অনেক দেখেছি। সর্বত্র এই বৈশিষ্ট্যটি থাকলেও জোহোরের মসজিদের যেন একটি নিজস্ব সুর আছে। একেবারে দরজার গোড়ায় গাড়ি থেকে নেমে জুতো খুলে প্রথম প্রকোষ্ঠে ঢুকে নমস্কার বিনিময় হল ইমাম ও মৌলনাদের সঙ্গে। আমার করজোড়ে নমস্কারের প্রত্যুত্তরে তাঁরাও তেমনি করজোড়ে প্রত্যভিবাদন করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, মৌলানাদের অধিকাংশই ছিলেন অনতিবয়স্ক। দাড়িহীন। পরনে ঈষৎ গেরুয়া রং-এর অতি মহার্ঘ প্লেন লুংগী। গায়ে একই কাপড়ের কোর্তা। দেখলে মনে হয় যেন বুদ্ধযুগের শ্রমণ-সন্ন্যাসী, গোঁড়ামি ঝেড়ে ফেলে সত্য ও সুন্দর নিয়ে তন্ময়। বয়স ও দাড়ির গৌরবে মহিমান্বিত আমাদের মৌলানাদের কঙ্কাল উন্মোচিত হবে না এ'দের মধ্যে। মসজিদ চত্বরে ফুলবাগিচার পুষ্প প্রাচুর্যের মত মৌলানাদের আচরণও উদার; আগাছা আর ঘেঁটুফুলের স্থান সেখানে হয় না।

মালয় সরকারের নতুন হাউসিং স্কীমে জোহোর শহরতলীর শেষ প্রান্তে মালয়ীদের উপনগরে ৫৬৩ খানা বাড়ি তৈরী হয়েছে। দু'চারটি ধনীর গৃহের পাশে পাশে ডেরা বেঁধেছে মেহনতী জনতা। টুকরো টুকরো জমিতে ছোট ছোট ঘর। টীনের চাল। কাঠের দেওয়াল। ঘরগুলির প্রথম তল মাটি থেকে হাত পাঁচেক শূন্যে তৈরী। তক্তার ফ্লোরিং; অনেকটা টং বেঁধে মাচার ধরনে তৈরী করা ঘরের মত। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মত মালয়ের অনেক জায়গাতেই গৃহনির্মাণ-পদ্ধতি এই। শূন্যতল। হিংস্র জন্তু ও সমুদ্রের আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই এর প্রথম প্রবর্তন হয়েছিল, হয়ত স্মরণাতীত কালে।

এই কলোনীর দিনমজুরের ছোট্ট ঘরের প্রবেশপথে সিঁড়ির পাশে দু-একটি ফুলের টব আছে। পাঁচশতাধিক বাড়ির মধ্যে কোনটিরই জানালা পর্দাহীন দেখি নি। দীনতমের বাড়িতেও আঙিনায় ফুলের টব আর জানালায় পর্দা থাকে, তা সে যত সস্তা কাপড়েরই হোক। মালয়ের সর্বত্র এ দৃশ্য চোখে না পড়ে যায় না। এমনকি পাড়াগাঁয়েতেও। একই ঘরকে নানা কক্ষে বিভক্ত করে থাকার ঘর, খাওয়ার ঘর বৈঠকখানা তৈরী করা এদেশে রেওয়াজ। বৈঠকখানা একটি চাই-ই চাই। মজুরের ঘরেও পার্টিশন খাড়া করে গোটা দুই সস্তা চেয়ার আর ছোট্ট একটা টেবিল ফেলে বৈঠকখানার রূপ দেওয়ার চেষ্টা প্রকট।

মালয়ে সরকারী মজুরদের মাথাপিছু দৈনিক বেতন কমপক্ষে ৪ ডলার। মালয়ের ১ ডলার আমাদের ১·৫৬ নয়া পয়সার সমান। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মজুরদের বেতনের হার আরও বেশী। হাউসিং স্কীমের বাড়িগুলি সরকারী খরচে তৈরী। সুদমুক্ত। বসবাস আরম্ভ করার পর ১৪ বছরের মধ্যে সহজ কিস্তিতে পরিশোধনীয়। ধনাঢ্য লোকেরাও বিনা সুদে ঋণ নিয়ে গাড়ি কিনে টাকা পরে কিস্তিতে শোধ দিতে পারে।

একটি জিনিস আমাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। মালয়ে সর্বস্তরে বেতনের হার যেমন বেশী, জিনিসপত্রের দাম সে অনুপাতে অনেক সস্তা। পেনাঙ সিংগাপুর ইত্যাদি শুল্কমুক্ত শহরে সোনার দাম ৭৫্ তোলা। একটা ভাল ঘড়ি ৮০্ টাকায় মেলে, ভারতীয় বাজারে যার দাম ২৫০্ টাকা। জামা-কাপড় ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী ত খুবই সস্তা। বিস্কুট মাখন পনির ঘড়ি কলম সিল্ক টেরিলিন ওষুধ তেল সাবান ব্লেড স্নো পাউডার হিটার রেডিও বা সোনাদানা—এইসব জিনিসগুলি সৌখিন সামগ্রীর মত শোনালেও মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে এর সবগুলি প্রায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। কোন কোনটি বা নেহাত অপরিহার্য।

শুল্কমুক্ত শহরের কথা বাদ দিলে মালয়ের অন্যান্য স্থানে ঐ সব জিনিসের দাম সামান্য একটু বেশী, শতকরা প্রায় দশ ভাগ। তাছাড়া সমগ্র মালয়ে চাল ডাল নুন তেল মাছ দুধ চিনি তরিতরকারী ইত্যাদি জিনিসের দামও এমন কিছু বেশী নয়; দামের অনুপাত প্রায় বাংলাদেশেরই মত। সুতরাং রোজগারের বাড়তি টাকা দিয়ে মালয়ের মানুষেরা তাদের জীবনের মান বাড়িয়ে তুলতে পেরেছে।

মালয়ের একটি মানুষকেও আমাদের স্বাধীনোত্তর যুগের বিপর্যস্ত মানুষের মত বলতে শুনিনি—'এর চাইতে আমরা বৃটিশ যুগেই ভাল ছিলাম।' অথচ মজার কথা, ভারতের তুলনায় মালয়ের সর্বসাধারণ লোক অনেক বেশী বৃটিশভক্ত।

বিলেত-ফেরতী মর্যাদা সৃষ্টি হয়েছিল বৃটিশ যুগে। বৃটিশ-রাজের দেশ থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এলেই ভাল চাকুরি; আর একটা আলাদা ধরনেরও সামাজিক মর্যাদা ছিল। ইংরেজদের দেশে বাস করে একটু লেখাপড়া শিখে ফিরে এসেছে, এটাই যেন মস্ত গুণ—তা ব্যক্তিগত জীবনে তাদের যত দোষই থাক। সুশিক্ষা মাত্রই ভাল, তা সে বিলেত জাপান ফিজি ফিলিপাইন—যে কোন দেশেরই হোক না কেন। শুধু আমাদের আরোপিত ফেরতী-মর্যাদা বোধটাই মারাত্মক।

মালয়ের ভারতীয় সমাজে যে তাদের এক কালের মাতৃভূমিতে সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দেওয়ার বাসনা জেগেছে, মনে হয় আমাদের দেশ তার পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করার কথা চিন্তা করে দেখে নি। আসন সংখ্যার কড়াকড়ি কমিয়ে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের জন্য মালয়ের লোকদের আকর্ষণ করতে পারলে বৃটেনের মত ভারতও বহুমুদ্রার্জনের সুযোগলাভ করতে পারবে। তখন চুসান, হিমালয়া, স্ট্রাথমোর জাহাজের মত স্টেট অব মাদ্রাজ, স্টেট অব বেঙ্গল ইত্যাদি জাহাজগুলি মালয়-ভারত ছাত্রছাত্রী পারাপার করবে; হয়ত তার সঙ্গে আরও কত কি!

জোহোর রাজ্যের খ্যাতি রাবারের জন্য। বিস্তৃত রাজ্য জুড়ে রাবার চাষ দেখার আগে জোহোর বাহারু থেকে মাইল দশেক দূরে দেখতে গিয়েছিলাম একটি আনারস কারখানা। রাবারের পরেই বিখ্যাত এখানকার আনারস চাষ। একসঙ্গে শত শত বিঘা জমিতে শুধু আনারস আর আনারস। আনারস টীনজাতকরণের (ক্যানিং) মালয়ের বৃহত্তম কারখানা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন মিঃ নন্দ। আনারসের ক্যানিং আজ অনেক জায়গাতেই হয়ে থাকে। মালয়কেই বলা চলে এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আগেই মালয় ইউরোপের নানাদেশে টীনজাত আনারস রপ্তানী করে এক উল্লেখযোগ্য বাজার সৃষ্টি করে ফেলেছিল। মালয়ের শতকরা ৯০ ভাগ আনারসের ক্রেতা বৃটেন।

বিরাট এই কারখানাটি স্থাপিত হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর আগে। এর কর্মীসংখ্যা শ ছয়েক; অধিকাংশ চীনা মহিলা। নানা আকারের এন্তার আনারস কারখানার সামনের শেডে ঝুড়ি ঝুড়ি পড়ে থাকে; পাকা, আধপাকা এবং বেশীর ভাগই কাঁচা। কিউপাইন জাতীয়

মালয়ের আনারস ক্ষেত।

আনারসই বেশী, বড়গুলি দেখতে প্রায় আস্ত এক-একটি কাঁঠালের মত। খোসা ছাড়িয়ে গোল চতুষ্কোণ ইত্যাদি নানা সাইজে কেটে ধুয়ে ছোট বড় মাঝারি টীনে পুরে আনারসগুলি ষ্টীমে সেদ্ধ করা হচ্ছে। তারপর চিনির শিরায় ডুবিয়ে টীনের মুখ বন্ধ করা হচ্ছে, লেবেল আঁটা হচ্ছে। প্যাকিং হচ্ছে। কাটা-ছোলার কাজ বাদে সবই মেশিনে। চীনা মেয়েগুলির ছুরি চালনার ক্ষিপ্রতা, দস্তানা-পরা-হাতে ঝেঁকে ঝেঁকে ধুয়ে টীনে ভরার কুশলতা দেখে মনে পড়ল বিলেতের এক মৎস্য-শহরের ফিশ-ডকে কারখানাগুলির কথা, যেখানে বেশীর ভাগই বিয়ের বয়সী মেয়েরা মাছের কাটা-ছেঁড়া-ধোওয়া থেকে স্মোকিং-ড্রাইং-কুইক-ফ্রিজিংয়ের কাজ তীক্ষ্ম নিপুণতায় সমাপ্ত করে ফ্যাক্টরির চালায়, আর চালায় সেই সঙ্গে নিজেদের পেট পোশাক আর প্রাক্-বিবাহ প্রস্তুতি। চীনা শিল্পপতিরা এই আনারস কারখানাটির মালিক, মালয়ের অধিকাংশ শিল্প-বাণিজ্যের মত। ফ্যাক্টরির নিজস্ব জমি ছড়িয়ে আছে নানা জায়গায়। সেখানে উৎপন্ন আনারসেই ফ্যাক্টরি চলে। মিল-মালিকের নিজস্ব জমির আখে চিনির কল চলার মত।

জোহোর শহরের সীমা ছেড়ে এগিয়ে চলেছিলাম। গ্রামীণ এলাকায় এক বিরাট জনপদ দেখে অবাক হলাম। সেখানে চীনাবসতি প্রায় নেই-ই। শুধু মালয়ীদের বাড়ি। ঘরের পর ঘর, একটার গায়ে আর একটা, পায়ে পায়ে শত্রুর মত। উঠোন বলতে কিছু নেই। বাড়িঘরগুলি গাছপালার ছায়ায় আচ্ছন্ন। বনময় ভূমির ঢালে হাউসিং স্কীমের ছোট ছোট বাড়িঘরগুলি দেখতে একেবারে শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মত। আরও একটু এগিয়ে খাঁটী গেঁয়ো অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত মানুষদের সাদা-মাটা বাড়িঘর। অধিকাংশ বাড়িতেই একখানা ঘর, প্রয়োজন মত পার্টিশন করা। অজ-পাড়াগাঁয়ের ঘরগুলি সব পাতায় ছাওয়া। মালয়ে ছন নেই। ঘর-ছাওয়া পাতার নাম এটাপ, আর গাছগুলিকে বলা হয় নীপা পাম। দেখতে অনেকটা ফলন-সুরু-হওয়ার আগে নারকেল গাছের মত। গুঁড়িহীন। পাতাও প্রায় নারকেলের ডালের পত্রাবলীর মত।

আজ অনেক দেশেই বন কেটে বসত হচ্ছে। আবাদী জমিরও ব্যবহার হচ্ছে বসত নির্মাণে। শোচনীয় হারে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে একই সঙ্গে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়া শক্ত। বৈজ্ঞানিকেরা নাকি হিসেব করে দেখেছেন আগামী ন'শ বছর পরে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহে সকলের জন্য শুধু দাঁড়িয়ে থাকার মত স্থানটুকুই থাকবে। জানি না ততদিনে দূর-গ্রহে কলোনীগিরি চালু হবে কিনা এবং তার ধরন দমদমের দাগা কলোনীর মত হবে কিনা।

জোহোর থেকে মালাক্কা কুয়ালালামপুর হয়ে ক্ল্যাং পর্যন্ত পথের দুদিকে যে রাবার গাছের চাষ চোখে পড়ে, তা থেকে মালয়ের অর্থবৈভবের উৎস উদ্ঘাটন সহজ হয়ে পড়ে। রাবার গাছগুলি দেখবার মত। নিবিড় রাবার বনে প্রতিটি গাছ যেন একে অন্য থেকে বিশিষ্ট হয়ে নিজের বিশেষ বৃক্ষ-মূর্তিটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গাছভরা জমি একেবারে অনেকদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দৃশ্যগোচর। চার-পাঁচ হাত পর পর লাগানো গাছগুলির কান্ড প্রায় দশহাত উচ্চতা পর্যন্ত মসৃণ-সরল, ডালপালাহীন, সাদাটে রঙ। তার পরই শুরু হয় ডালপালা। একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চারদিকে একেবারে ছ'সাতখানা শাখা-প্রশাখা গজিয়ে উঠে সতেজ পত্র-সম্ভারে একটা নিটোল বৃক্ষরূপ সৃষ্টি করে ফেলে। ডালপালাহীন নিম্নকান্ডই রস-সংগ্রহের স্থান।

পথের ধারে বনে বনে এক একটি গাছ প্রায় চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থেকে আপন দেহের রসে দেশকে পুষ্ট করে, পথচারী মানুষকে দেয় শীতল ছায়া, আর জীবনান্তে রন্ধনের ইন্ধন। জীবজগতে গোজাতির মত রবার গাছ সর্বাবস্থায় মানুষের সেবক। রাবার গাছের জন্য চল্লিশ বছরে চাষ করতে হয় মাত্র একবার, যত্নও যা নিতে হয় তা এমন কিছু রাজসিক নয়—অন্তত কর্ষণ-সেচ-সার এবং নিড়ানির পর্যায়ক্রমে প্রতি

বছরে আবাদ করা ব্যয়বহুল জমিতে ফলনীয় ফসলের তুলনায়। জোহোর রাজ্যের লাল মাটীতে রাবার বনের রস-সম্পদ উৎপাদন-প্রাচুর্যে সমগ্র মালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। দ্বিতীয় স্থান সেলাংগার রাজ্যের। মালয়ে রাবার ফসল শ্রেষ্ঠ কৃষিসম্পদ হওয়াতে বাংলা দেশের ধান-পাট এবং চৈতালী শস্যের আবাদের মত এলাহি কারবার গড়ে উঠতে পারে নি। কোন মালয়ী কবিও গীত রচনা করে নি— গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

মালয়ে ঋতু পরিবর্তন নেই, প্রতি ঋতুতে প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যে উদর পূরণের হরেক রকম শস্যও জন্মে না। এখানে কালবৈশাখীর ঝড় নেই। সুতরাং তাণ্ডবোন্মত্ত দিনে রাবার বৃক্ষের উৎপাটন ঘটে না। চলার পথে কোথাও কোথাও চোখে পড়ে রাবার বনে আগুন দেওয়া হয়েছে। চল্লিশোত্তর নি-রস গাছগুলিকে আগুনে নিশ্চিহ্ন করে তারই চিতাশয্যায় নববংশের উত্থানের জন্য এই ব্যবস্থা। রাজার মৃত্যু না হলে কি হয় যুবরাজের রাজ্যাভিষেক?

জোহোর ছেড়ে অনেকদূর এসে পড়েছিলাম। দূরে পাহাড়ের হাতছানি; সঞ্জীববাবুর দেখা পালামৌ পাহাড়ের মত, কাছে আর আসছে না এত কাছের পাহাড়টি। আমাদেরও দূরকে নিকট করার তাগিদ ছিল না। দূর থেকে বরং আরও দূরে সরে গিয়ে পাহাড়ের হাতছানি এড়িয়ে চলেছিলাম।

ক্রমে রাবার বন পাতলা হয়ে এলো। তারপর শুরু হল ঘনবসতিময় পল্লী-গ্রাম, উদার মাঠ। চাষীরা লম্বা পাতলুন পরে মাথাল-মাথায় সবজি ক্ষেতে কাজ করছে। একটানা রাবার বনের শেষে মানুষের বসতি বসিয়ে যেন মাঝে মাঝে একটু করে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। রাবার বনের শেষে আরও একটি জিনিস চোখে পড়ল। খেজুর-গাছের-মত দেখতে অগণিত গাছের বন দেখা যেতে লাগল অনেকটা জায়গা জুড়ে। এই গাছগুলি আরও একটু মোটা, পাতা আরও সতেজ, সবুজে কালোয় মেশানো রঙ। কোথাও আট-দশ মাইল পর্যন্ত মাঠ জুড়ে প্রায় একই সাইজের এমনি প্রাণোচ্ছল গাছ-গুলি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই বাড়ায় নি, মালয়ের আর্থিক সম্পদের নতুন পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে এর প্রতি পত্র-মর্মরে। এ গাছের নাম অয়েল পাম ট্রী।

অয়েল পাম ট্রী থেকে প্রচুর তেল সংগ্রহ করে তা থেকে রসায়ন শাস্ত্র-সম্মত কায়দায় তৈরী হচ্ছে সাবান, ম্যার্জারিন ইত্যাদি। অনেক দেশের লোকের কপালেই রোজ মাখন জোটে না। মাখনের বিকল্প হিসেবে অনেকে ব্যবহার করে ম্যার্জারিন। এই নতুন কৃষি-সম্পদের আশীর্বাদ মালয়ীরা পুরোপুরি গ্রহণ করছে। শুধু বৃক্ষ রোপণে নয়, বহু সম্ভাবনাময় অয়েল পাম গাছ থেকে নতুন শিল্পায়নের সম্ভাব্যতার নানা দিক নিয়ে নব প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরিতেও গবেষণা শুরু হয়ে গেছে।

মাঠের পর মাঠ, রাবার গাছের ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম, অয়েল পাম গাছের বন-ভূমি আর ধান ক্ষেতের আলপথ বেয়ে মালয়ের অনেক অঞ্চলে চলার পথে কিন্তু মনে হয়েছে বাউলের গান, বৈষ্ণবের পদ-কীর্তন, সংকীর্তনের জয়যাত্রা বাংলা দেশের পলিমাটীর পেলবতার মধ্যেই যেন একমাত্র সম্ভব। শ্রীচৈতন্যের লীলা, রাম-কৃষ্ণের সাধনা, রামপ্রসাদের শ্যামা-বন্দনা মালয়ের মাটীতে কখনও সম্ভব হতে পারত বলে মনে করতে পারি নি।

সিংগাপুর ও মালাক্কার মাঝখানে আইতাম একটী বর্ধিষ্ণু পল্লী।

আইতামের অনতিদূরে বাতু-পাহাত, আমাদের একটি জেলা শহরের মত। বাতু শব্দের মানে শিলা, যদিও বাতুপাহাত শৈল শহর নয়। মালয়ে কোন কোন স্থানের নাম আরম্ভ হয়েছে 'বাতু' 'কুয়ালা' ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। বাতুপাহাত, বাতুফিরিংগী, কুয়ালাকাংসার, কুয়ালালামপুর ইত্যাদি। কুয়ালা শব্দের মালয়ী নাম নদী-মোহনা। অথচ কুয়ালালামপুরের অবস্থান মোটেই নদী-মোহনায় নয়। এ যেন আমাদের দেরাজবক্স,—বাক্স-ডেক্স কিছুই নেই, তবু নামে বহুবাক্সের বৈভবমাখা।

এই ছোট শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট নদী। নাম বাতুপাহাড়, বাংলা দেশের একটি খালের মত। পড়েছে গিয়ে দু'শ গজ দূরে মালাক্কা প্রনালীতে। মালয়ে শহরের নামও হয়েছে তার পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদীর নামে। যেমন জোহোর, বাতুপাহাত, মলাক্কা, ক্ল্যাঙ। অনেক রাজ্যের নামও হয়েছে নদীর নাম অনুসারে : জোহোর, কেদা, কেলান্তন, ট্রেংগানু, পাহাঙ। কয়েকটি বাদে এদেশের অধিকাংশ নদী ক্ষীণতনু, দেখলে মনে না জাগে কোন রকমের কবিত্ব, না জাগে বিহ্বলতা। এদিক দিয়ে এদের মিল বিলেতের নদীগুলির সঙ্গে।

পেটালিং জয়াতে শহর সম্প্রসারণের মূল অংশ

বন্যায় ভীষণতা, ঘূর্ণি-কেন্দ্র চপলতা, উৎপাটিত বৃক্ষলতা ভাসিয়ে নেওয়া দুর্বার স্রোত এদের নেই। ধলেশ্বরীর দুধালতা, পদ্মার প্রমত্ততা, মেঘনার ভয়ালতা অথবা বংশাই-কোপাই-তিতাসের নাচের ছন্দ মালয়ের নদীগুলিতে নেই। বিলেতের নদীতেও নয়। বিলেতের ডি, টে, টেমস, টুইড্ অথবা মালয়ের বাতুপাহাত, ক্ল্যাঙ, মালাক্কা নদী ভাগীরথী ধলেশ্বরীর মত প্রসন্নসলিলাও নয়। মালয়ের নদীতে জলের অপ্রসন্নময়তা, পাটকেলী আবিলতায় ক্ষীণ আবর্ত পীড়াদায়ক, অন্তত আমাদের চোখের পক্ষে।

আকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে লণ্ডনে পার্লামেণ্ট ভবনের পাশে টেমসকে নদীর মতই দেখায় বটে। আরও উজিয়ে রাজা জনের স্মৃতি বিজড়িত রুনী মেডের কাছে চিপেনহামের মাঠের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে শীর্ণ টেমসের ছন্দহীন নদীপ্রবাহ, পাট পচানো জলের মত। এ্যাভনের অবস্থা আরও শোকাবহ। যে এ্যাভন নদীর কথায় মনে কবিত্ব জাগে, শেক্সপীয়রের কবর দেওয়া গীর্জার পাশেই তার যা একটু স্রোত ও সামান্য প্রসারতা। দু'দিকে সারিবন্ধ উইলো গাছ ঝুঁকে পড়ে এ্যাভনকে এমন ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে যাতে করে আসল নদীখাদটিকে মনে হয় যেন আরও ছোট। একটু দূরে এ্যাভন নদী ত একরকম লাফিয়েই পার হওয়া যায়। এইসব জলপ্রবাহে নদীত্বের সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুটিত হত না বলেই বোধ হয় মহাকবি মাইকেল কপোতাক্ষের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে যেতেন। মালয়ের অনেক নদী দেখে আমাদের মনের অবস্থা মাইকেল মধুসূদনের চাইতেও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

টে, টেমস্, টুইডের গভীরতা আমার জানা নেই। তবে মালয়ের নদীগুলি বেশ গভীর, অতি অপরিসর হওয়া সত্ত্বেও। মাছও যথেষ্ট। মালাক্কা নদীতে ডিংগী নৌকা আর জাল দিয়ে জেলেদের দেখেছিলাম অপিমুক্ত বড় বড় মাছ ধরতে। এত ছোট নদীতে বড় বড় এত মাছ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

মালয়ে বোধহয় কোন নদীই সর্বনাশা খরার দিনে শুকিয়ে যায় না, আর শুকিয়ে গেলেও কারও কিছু এসে যায় না। বাংলা দেশে কোন নদী শুকিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার তীরবর্তী জনপদে হাজার হাজার মানুষের জীবনী-শক্তির উৎসটি শুকিয়ে যায়। নদী গেলে সব যায়—মৎস্যের উৎস, বাণিজ্যের সুবিধা, স্নানের আরাম, সবকিছু। নদী ভাঙে ত সেই সঙ্গে ভাঙে মানুষের কপাল—বাড়ী-ঘর, খেত-খামার, সব যায় ছত্রছান হয়ে। নদীর সঙ্গে এ[illegible] নিবিড় সম্পর্কিত আমাদের জীবন।

আজ গঙ্গা নদী শুকিয়ে গেলে ষাট লক্ষ লোক অধ্যুষিত কলকাতা শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। ক্ল্যাঙ্ নদী শুকিয়ে গেলে কুয়ালালামপুরে থোরাই কেয়ার করবে। প্রাচীন মিশরে নদীর বন্যায় নাকি অতি সমৃদ্ধ একটি শহর রাতারাতি জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ-ভরাট-হয়ে-আসা গঙ্গায় বন্যার ফলে কলকাতার অবস্থাও তেমনি বিপর্যয়কর হতে পারে বলে একবার স্বর্গতঃ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

মালয়ের বাতুপাহাত শহরের সঙ্গে ভারতের আজাদী সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাসের একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেদিন মালয়ে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগদানের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। নবনিযুক্ত মানুষদের সামরিক শিক্ষার জন্য সারা মালয়ে অনেকগুলি শিক্ষা-শিবির স্থাপন করতে হয়েছিল। মেজর জেনারেল শা নওয়াজ ছিলেন বাতুপাহাত শিক্ষা-কেন্দ্রের অধিনায়ক।

বাতুপাহাত নদী পার হলাম। পেনাঙ সিঙ্গাপুর ইত্যাদি পোতাশ্রয়ে দেখা যায় অগণিত স্পীড্ বোট; এমনকি সেকেলে গোছের নৌকাগুলিতে পর্যন্ত মোটর এনজিনযুক্ত। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম বাতুপাহাতে মোটর বোটের সংখ্যাধিক্য। অথচ এখানে বন্দর-গঞ্জের কিছুই নেই, মাল ও যাত্রী বহনের গুরুদায়িত্বও নেই। মালয়ের উন্নত আর্থিক মানের এ হচ্ছে আর একটি পরিচয়। কলকাতার বান-ডাকা গঙ্গায় যেখানে মোটর-বোট সর্বাপেক্ষা নিরাপদ, সেখানে কোন নৌকাই এনজিনযুক্ত নয়, এমনকি জাহাজ ভেড়ানো কাজে নিযুক্ত পোর্ট কমিশনার্সের বোটগুলো পর্যন্ত নয়।

বাতুপাহাত থেকে মুয়ার শহরের দূরত্ব প্রায় ৩০ মাইল। বাতুপাহাত এবং মুয়ার নদীর কিনারায় পারাপারের জন্য একটা ভাসমান সেতুর মত খেয়াগাড়ী এসে দাঁড়ায়। এরই উপর সরাসরি উঠে পড়ে মোটর গাড়ী এবং যাত্রীভরা দূরপাল্লার বাসগুলি। তারপর মোটর বোট এসে গাড়ীসহ ভাসমান সেতুটাকে টেনে নিয়ে যায় ওপারে। আমাদের দেশে যেমন গাড়ীটাকে গাদাবোটে চড়িয়ে লগি বৈঠার টানে আর ছেঁড়া পালের বেগে কালনা নবদ্বীপের মত স্থানে বর্ষায়-ভয়াল গঙ্গা পারাপার করা হয়, সেই কথা মনে পড়ল মুয়ার নদী পার হওয়ার সময়।

মুয়ার মূলত দক্ষিণ ভারতীয়দের অধ্যুষিত অঞ্চল। তিনটি নদীপ্রবাহ মুয়ারকে বেষ্টন করে অবশেষে গিয়ে পড়েছে মলাক্কা সাগরে। তামিল ভাষায় মুন্ শব্দের অর্থ তিন এবং আর্ শব্দের অর্থ নদী। সুতরাং ভারতীয় শব্দসূত্রে মুয়ারের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে তিন নদীর দেশ।

বাতুপাহাতের পর চারদিকের জমি ক্রমেই সমতল, বাড়ীঘরগুলি বেশ পরিচ্ছন্ন ও সম্পন্ন। নারকেল, কলা, সুপারি বাগানের পাশে পাশে ছোট ছোট বসতবাড়ী; জবা, মালতী, করবী, পাতাবাহারে সাজানো। এদেশে কোন বাড়ীই চক মেলানো নয়। কাঠা-কাঠা জমিতে তৈরী করা বাড়ীর আনাচে কানাচে মালয়ীরা লঙ্কা, বেগুন, শশা গাছ লাগায় না। কলা, নারকেল বা সবজি ক্ষেত সবই বাড়ীর চতুঃসীমার বাইরে।

গ্রামে গ্রামে দেখা যায় সারুং-পরা কোর্তা-গায়ে মুসলমান মেয়েরা অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে এসে নিঃশঙ্ক স্বাধীনতায় যে যার কাজে ব্যস্ত। জোয়ান জোয়ান মেয়েদের অনেককেই দেখা যায় সাইকেল চড়ে যেতে। এই দূর পল্লীগ্রামেও।

মালয়ের শহরগুলিতে বাস স্টপ অনেক দূরে দূরে, বোম্বাই মাদ্রাজের মত। অথচ দূর অঞ্চলে প্রসারিত অনেক রাজপথে যেন তত দূরে নয়। প্রতি স্টপে লেখা থাকে 'বেরহেন্তি', আমাদের বিরতি শব্দের মালয়ী রূপ। বিগত পাঁচ বছরের স্বাধীনতায় মালয় এগিয়ে গিয়েছে দ্রুতভাবে। এদেশের নিত্যনূতন নির্মিত শহরগুলি দেখলে মনে হয় না ঠিকাদাররা এস্-ডি-ওর হাতে খান কয়েক নোট গুঁজে দিয়ে রাস্তার মালমসলা কম খাটায়। কোন কোন রাস্তার বাঁকে বাঁকে আছে ক্যাট্‌স আই; চলমান গাড়ীর আলোকে জ্বলজ্বল করা কাচের বিড়াল চোখগুলি দুর্ঘটনা নিবারণে সহায়ক। শহরের রাস্তাগুলিতে এরা পিচ, পাথর কুচি ইত্যাদির সঙ্গে রাবার ব্যবহার ক'রে রাবার-রন্দায়ন। এই সব রাস্তাকে বলা হয় রাবারাইজড্ রোড।

আলোকচিত্রগুলি মালয় সরকারের বৈদেশিক দপ্তর থেকে প্রাপ্ত।

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৪)

মেঘ মেঘ, তার উপর আরো মেঘ। সাদা মেঘ, আকাশ থেকে উপচে পড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঘর ভরে গেল মেঘে। ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। আবছা আবছা কার চেহারা যেন দূরে দেখতে পাচ্ছি। চিনি চিনি মনে হচ্ছে। একবার মুখখানা কাছে ভেসে আসছে, আবার চলে যাচ্ছে দূরে। লোকটার মুখে দাড়ি রয়েছে কি?

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা করলাম. পারলাম না। আমার চোখের পাতাদুটো কে যেন খড়খড়ির মত টেনে বন্ধ করে দিল।

আশ্চর্য, কোথায় মেঘ, কত আলো, সূর্যের সাত রঙ কাঁচের মধ্যে দিয়ে ঢুকে চারদিকে ছিটকে পড়ছে। কিন্তু তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওগুলো কি? আলোর ফুলকি না জোনাকিরা উড়ছে। না না বুঝতে পেরেছি তুবড়ী ফোটাচ্ছে কেউ। আলোর ফুলঝুরি কাটছে উপরে, উঃ কত উঁচুতে উঠছে, একতলা, দোতলা, তিনতলা ছাড়িয়ে। আলোর ফুলকি গিয়ে আকাশ ছুঁল. কিন্তু কই ঝরে তো পড়ল না। ফুলঝুরি চুপসে গেল। আকাশ থেকে কে যেন সোনার দড়ি নীচে ঝুলিয়ে দিয়েছে কার জন্যে. না না, আমি উঠতে পারব না। আকাশের মধ্যে কোথায় যাব? কাউকে তো চিনি না সেখানে। কে যেন বলল, উঠে এস ভয় নেই। কার কন্ঠস্বর? অতি পরিচিত অথচ মনে করতে পারছি না।

সে বলল, এই যে আমি এখানে।

কিছুতেই তাকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু বুঝলাম এ নিশ্চয় গগন। নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়ে দড়িটা ধরতে যাব, কে যেন সেটা উপরে তুলে দিল। আমি হতাশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম।

সবুজ মখমলের মত ঘাস, আঃ শুতে কি আরাম! কেউ কোথাও নেই, দিব্যি শুয়ে আছি। মাঝে মাঝে তেষ্টা পাচ্ছে, একটু জল খেলে হোত। কোথায় পাব জল? কি বোকা আমি। মাটি খুঁড়লেই তো জল পাওয়া যায়। আমি মাটি খুঁড়তে শুরু করলাম। ভস্ ভস্ করে মাটি কোদালের মুখে উঠে আসছে, আমি নেমে যাচ্ছি। নীচে নীচে, আরো নীচে, কি দুর্নিবার গতি। লিফট-এ করে ঠিক যেন একেবারে নীচে নেমে পড়লাম। এই কি পৃথিবীর শেষ? হবেও বা। কিন্তু কি খুঁজতে এসেছিলাম। কিছুতেই মনে পড়ছে না। উপরে উঠব কি করে? সে লিফট্ কই! ভয়ে ভয়ে চারদিকে ছুটতে লাগলাম। চেঁচালাম, লিফট্, লিফট্।

কানের কাছে কে বলল, কি হয়েছে? কি হয়েছে? শব্দ লক্ষ্য করে আমি অদৃশ্য মানুষের হাতটা চেপে ধরলাম. উষ্ণ হাতের স্পর্শে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইলাম। আমার সামনে বসে গগন সেন মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

আমি একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। এও কি সম্ভব? গগন কোথা থেকে আমার কাছে এল? ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কোথায়?

উত্তর দিল গগন. তোমার ঘরে।

চারদিকটা ভাল করে দেখলাম, সত্যিই তো নিজের খাটে শুয়ে রয়েছি।

গগন বলল, কোন ভয় নেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে, এখনও শরীরটা দুর্বল আছে, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

গগন আর কি বলেছিল আমি শুনিনি। ওর হাতখানা আঁকড়ে ধরে বললাম, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, আমার ভয় করছে।

—কোন ভয় নেই অর্পিতা, আমি তোমার কাছেই আছি।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে বোধহয় চব্বিশ ঘন্টারও বেশি লেগেছিল। বেশির ভাগ সময়ই আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। যখনই চোখ মেলে চেয়েছি, দেখেছি হয় গগন নয়ত ব্রজবালা দেবী কিম্বা লক্ষ্মীর মা আমার কাছে বসে আছেন, তুবড়ীকেও দেখেছি মুখ-শুকিয়ে খাটের কাছে ঘোরাঘুরি করতে, আমি তাদের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসেছি, তারাও হেসেছে, কিন্তু বিশেষ কথা হয়নি।

পরের দিন অনেকটা সামলে উঠলাম, খাটে হেলান দিয়ে বসে আছি, ভাবছি গত কয়েক ঘন্টার কথা, অনাত্মীয়ের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, কিন্ত এদের আন্তরিক ব্যবহার সহজেই আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। লক্ষ্মীর মা আমার কাছে বসে ছিল, আমাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখেই বোধ হয় বলতে শুরু করল গত দিনের কথা।

—সত্যি দিদি, কি কান্ডই বাঁধিয়েছিলে, বাড়ীতে তখন কেউ নেই, ওদিকে ঘাট থেকে সবাই হল্লা করছে, ডুবে গেল, ডুবে গেল। তোমাকে তো চান করতে যেতে দেখেছিলাম, তাই শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠল, শুধোলাম কে ডুবে যাচ্ছে গো? তারা বললে, তোমাদের বাড়ীর দিদিমণি,—ভয়ে ভয়ে ছুটে গেলাম গঙ্গার ধারে, তখন ওরা তোমায় ডাঙ্গায় তুলে ফেলেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কারা?

লক্ষ্মীর মা অবাক হল, সেকি, তুমি কিছু জান না?

—বানে আমায় টেনে নিয়ে গেল, তারপর আর কিছু মনে নেই, নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

লক্ষ্মীর মা বলল, জলে তো তোমায় হুড়-মুড় করে টেনে নিয়ে গেছে, আমাদের এই ঘাট থেকে প্রায় ঐ শিববাবুদের নতুন ঘাট পর্যন্ত, ভাগ্যিস নৌকার মাঝিরা তোমায় দেখতে পেয়েছিল, তারা লাফিয়ে পড়ে কোনরকমে তোমায় টেনে ধরে, কম জল খেয়েছিলে, বাবাঃ. চেহারা দেখে আমি তো কাঁদতে শুরু করেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, অনেক লোক জমা হয়েছিল!

—তা জন পঞ্চাশ হবে বৈকি। তারাই তো ধরাধরি করে তোমায় বাড়ীতে দিয়ে গেল। ততক্ষণে মাও এসে পড়েছেন।

—ব্রজবালা দেবী কি বললেন?

লক্ষ্মীর মা হাত দিয়ে কপালে একটা চাপড় মেরে বলে মা আর কি বলবেন, মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তাড়া-

তাড়ি ডাক্তার ডাকিয়ে আনলেন। গগন-বাবুকে খবর পাঠালেন, উঃ বাড়ীতে সে কি হৈ-চৈ।
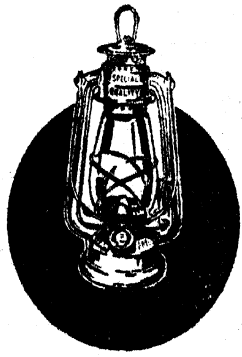
অজান্তে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আশ্চর্য, আমাকে নিয়ে এত ব্যাপার হয়ে গেছে, অথচ আমি কিছুই টের পাইনি।

লক্ষ্মীর মা হঠাৎ বলল, মা কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসে।

কারণ জানবার জন্যে আমি ওর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম।

—তোমাকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে সেই যে নিজের কোলের উপর তোমার মাথা তুলে নিয়ে বসলেন, ডাক্তার-বাবু না আসা পর্যন্ত একবারও ওঠেন নি। আমরা কতবার বলেছি কষ্ট হবে এভাবে বসে থাকতে, উনি কোন কথাই কানে তোলেন নি।

লক্ষ্মীর মা আরো কত কথা বলে গেল, সব আমি মন দিয়ে শুনিনি। কিন্তু ব্রজবালা দেবী যে আমাকে আন্তরিক স্নেহ করেন তা এই অসুস্থতার মধ্যে আমি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি।

একসময় তাঁকে একলা পেয়ে আমি বললাম, আমি অত্যন্ত লজ্জিত, আপনাদের এ-রকম বিপদে ফেলেছিলাম বলে।

উনি স্মিত হেসে বললেন, তুমি তো আর ইচ্ছে করে বিপদ ডেকে আননি। তবে ভয় আমি পেয়েছিলাম সত্যিই। যদি মন্দ কিছু হ'ত, আমি যে তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতাম না।

মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, শুধুই কি তাই।

কথাটা বুঝতে পেরে উনি আমার চোখের দিকে তাকালেন, বললেন, ঠিক ধরেছ মা, এই ক'মাসের মধ্যে তুমি যে আমার মনের অনেকখানি অধিকার করে ফেলেছ তা আমি নিজেও বুঝতে পারি নি। তোমাকে হারাবার ভয়েই এতটা বিচ-লিত হয়ে পড়েছিলাম। যা আমি কখনও করি না তাই করেছি তোমার জন্যে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি?

—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলাম, তোমার আরোগ্য চেয়ে। চাইতে নেই, ঠাকুরের কাছে কিছুই চাইতে নেই, তবু মা তোমার জন্যে না চেয়ে পারলাম না।

দেখি বৃদ্ধার গাল বেয়ে টস টস করে জল পড়ছে। আমি হাত বাড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। তিনি আমাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে কপালের উপর চুমু খেলেন।

তুবড়ী সময় পেলেই আমার কাছে ছুটে এসেছে, বার বার জিজ্ঞেস করেছে একেবারে ভাল হয়ে গেছ তো অপুদি? আর কোন কষ্ট নেই তো?

হেসে বলেছি, সব ঠিক হয়ে গেছে।

তুবড়ী আমার হাতটা ধরে টানে, শাসিয়ে বলে, খবর্দার আর একলা চান করতে যাবে না। আমার জন্যে তুমি অপেক্ষা করলে না কেন?

হেসে বললাম, সত্যিই আমার ভুল হয়ে গেছে।

—আর কক্খনো যাবে না কিন্তু।

—না, যাবো না। পরে বললাম, ধর যদি তুই আমার সঙ্গে থাকতিস, বানের জল যদি আমায় টেনে নিয়ে যেত তুই আমাকে রক্ষা করতিস্ কি করে?

তুবড়ী সঅভিমানে বলল, ইস্, আমি সাঁতার জানি না বুঝি? তোমাকে ঠিক টেনে নিয়ে আসতাম। মাঝিদের আর জলে নামতে হত না।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, বেশ তো, আর একদিন আমি বানের জলে পড়ি, তখন দেখব তুবড়ীবাবু কেমন আমাকে বাঁচাতে পারে।

একথায় কিন্তু তুবড়ী খুব উৎসাহ প্রকাশ করল না, বলল, বাঁচাতে আমি পারব ঠিকই, তোমার আর কায়দা দেখাতে বানের মধ্যে চান করতে হবে না। উঃ, যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

—কিসের ভয়?

—যদি তুমি—, তুবড়ী কিন্তু কথা শেষ করল না, ইচ্ছে করে ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। বুঝতে বাকী রইল না আমার মৃত্যুর আশংকা ওর ছোট্ট মনকে প্রচন্ড নাড়া দিয়েছে।

আর একজন কিন্তু নির্বিকার, কিছুতেই স্বীকার করবে না যে সেও ভয় পেয়েছিল। গম্ভীর গলায় বলে, আমি জানি তুমি মরতে পার না, কারণ তাহলে যে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত।

জিজ্ঞেস করলাম, এ তোমার অন্তরের বিশ্বাস গগন?

গগন একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আগের মতই অবিচলিত কণ্ঠে বলল, একটা শুভ কাজ আমরা শুরু করতে যাচ্ছি, তার গোড়াতেই এরকম একটা বাধা পড়তে পারে না। ব্রজবালা দেবী যখন কলকাতায় আমার বন্ধু Seeker-এর অফিস-এ ফোন করে খবর দিলেন তোমার এই বিপদের কথা, বিশ্বাস কর আমি এতটুকু বিচলিত হইনি। ছুটে এসেছি পাছে তুমি ভয় পাও, এই চিন্তায়। অপু, তোমাকে আমাকে দুজনকেই বাঁচতে হবে, দুজনের জন্যেই। এরকম বিপদ আরো আসতে পারে, আমরা তাতে ভয় পাব না, মাথা নোয়াব না, বুক ফুলিয়ে তার সামনে দাঁড়াব। পারবে না?

মন্ত্রমুগ্ধের মত বললাম, পারব।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে আরো কয়েকদিন সময় আমার লাগল। এ ক'দিন বেশীর ভাগ সময়ই আমি বিছানায় শুয়ে থাকতাম, হয়ত চেয়ার টেনে নিয়ে জানালার কাছে বসতাম, কিন্তু ঘরের বাইরে যেতাম না। ডাক্তারের এই নির্দেশ ছিল। ব্রজবালা দেবী ঐ ভাবেই থাকতে বলেছিলেন।

ঘরে কোন লোক না থাকলে আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়তাম। উপন্যাস, গল্প, কিম্বা হাতের কাছে পেলে ছবির পত্রিকার পাতা ওল্টাতাম। কিন্তু তারই মধ্যে Seeker-এর লেখা পড়ার জন্যে সব সময় আমার মন উৎসুক হয়ে থাকত। আরো এই জন্যে ও'র লেখা পড়ে ব্রজবালা দেবী এবং গগন দুজনের সঙ্গে আলোচনা করার সুবিধে হত।

মঙ্গলবার লক্ষ্মীর মাকে দিয়ে ব্রজবালা দেবীর কাছ থেকে খবরের কাগজ চেয়ে পাঠালাম। আজ Seeker-এর লেখা বেরবার কথা, তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে ওর লেখা পড়ে আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। Seeker লিখছে—

সাধারণতঃ বানের জলকে আমরা ভয় করি। একবার বেনো-জল ঢুকে পড়লে তাকে বার করা কঠিন হয়ে পড়ে। বানের জলে যে ভেসে যায় তার প্রতি মমতা থাকলেও তাকে ফিরে পাবার আশা বিশেষ থাকে না। একথা মানলেও বানের জল যে শুধু ক্ষতিই করে আমি স্বীকার করি না। পাঠক তোমার মানস-চক্ষু উন্মিলন কর। তুমি গঙ্গার নির্জন পাড় দিয়ে আপন মনে হেঁটে চলেছ। এমন সময় বানের জল এক অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে ভাসিয়ে নিয়ে এল তোমার কাছে, কিম্বা তুমি দেখলে সে ভেসে যাচ্ছে। বহু কষ্ট তুমি তাকে উদ্ধার করে নদীর পাড়ে টেনে তুললে, তোমার

কি তখন মনে হবে না এ কোন অবলা-কন্যা, জলের টানে তোমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, অজ্ঞাতকুলশীলা জেনেও তোমার হৃদয় কি তাকে গ্রহণ করতে চাইবে না। তুমি বলবে না, হে অপরিচিতা, তুমি যেই হও তুমি আমারই, এতদিন ধরে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি। তুমি এসেছ, চল আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে নিয়ে নীড় রচনা করতে চাই?

এরপর Seeker প্রসঙ্গ বদলে রাজনীতির ক্ষেত্রে চলে গেছে, কিন্তু এ লেখা পড়ে আমার মনে হল Seeker আমার অপরিচিত নয়। তাকে আমি চিনি, জানি। তার এ ধরনের কথা আমি কত না নিজের কানে শুনেছি।

এক অকারণ পুলকে আমার মন খুশীতে ঝলমল করে উঠল। আমি মনে মনে বললাম, এবার তোমায় ধরে ফেলেছি Seeker। আর তোমাকে পালাতে দেব না।

সেদিন গগন সেন আসতেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, মিথ্যেবাদী! প্রথমটা সে চমকে উঠলেও আমার চোখের হাসি দেখে বোধ হয় আশ্বস্ত হল। স্বভাবসুলভ স্বরে জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ এ অভিযোগ কেন?

আমি উত্তেজিত স্বরে বললাম, তুমিই Seeker। আগে আমার সন্দেহ হত, কিন্তু আজকের লেখা পড়ে আমি তা ধরে ফেলেছি। বল সত্যি কিনা?

গগন সেন কোন কথা বলল না, আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

—আমাকে একথা আগে বলনি কেন?

—প্রয়োজন হয়নি বলে। তাছাড়া তুমিও তো আমায় জিজ্ঞেস করনি।

বললাম, চল ব্রজবালা দেবীর কাছে যাই, উনি শুনলে খুশী হবেন।

গগন নিশ্চিন্ত গলায় বলল, উনি জানেন।

অবাক হলাম, কি করে?

—যে একটু ভাববার চেষ্টা করবে সেই বুঝতে পারবে। তোমার সরল মন তাই জানতে কখনও চাওনি আমার চলে কি করে। Seeker নাম নিয়ে লিখি, ওইটেই আমার রোজগার। একদল বোকা পাঠক-পাঠিকা আছে যারা আমার এই আবোল-তাবোল কথাগুলো পড়তে ভালবাসে, তাই কাগজের আরো বোকা মালিক মোটা মাইনে দিয়ে আমায় রেখেছে, এই সব হাবি-জাবি লেখার জন্যে।

স্বীকার করলাম, সত্যিই তো, আমি কখনও ভাবিনি তুমি কি কাজ কর।

—তা জানি, জানি বলেই তোমায় এত ভালো লাগে। টাকা আনা পয়সার হিসেব কষে তুমি কখনও আমায় বোঝবার চেষ্টা করনি। কিন্তু অন্য মেয়ে হলে তাই করত।

আমি মন দিয়ে গগনের কথা শুনছিলাম, ও দুষ্টুমিভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল, এতদিনে বাদে Seeker-কে যখন ধরে ফেলেছ, সেই সঙ্গে নিশ্চয় বুঝেছ তুমি মৎস্য-কন্যা। তাহলে আমার প্রস্তাবে রাজী তো? ভরসা দাও তো জোড়ে গিয়ে তোমার মালিকানের কাছে দরবার করি।

আমি সলজ্জে বললাম, আমার লজ্জা করছে।

—বিয়ে করবে তাতে লজ্জার কি আছে। আমার তো মনে হয় উনি একথা শুনলে খুব খুশী হবেন।

—হয়ত হবেন।

—তবে কি ভাবছ?

—না কিছু ভাবিনি। যদি উনি কোন আপত্তি তোলেন। তুমি জান না গগন, তুমি আমাকে কি দিয়েছ, এ আমার আশাতীত পাওয়া, সেইজন্যেই তো হারাবার ভয়। তার চেয়ে বোধহয়—

গগন আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল, বোকা মেয়ে, অত তোমার ভাবতে হবে না। আমি যা বলছি তাই কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বেশ, বল কি করব?

—চল আমরা দুজনে ব্রজবালা দেবীর কাছে যাই।—

ভয়ে ভয়ে বললাম, আজ থাক।

গগন হাসল, তাহলে কাল সকালে?

সম্মতি দিলাম। হ্যাঁ যাব।

কীভাবে সে যে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবে আমি ভাবিনি। আমার দিক থেকে আপত্তি করার কি আছে? এ আমার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু মনের কোণে লুকোনো ভয় জমা হয়েছিল, সে বোধহয় নিজের জীবনের কথা ভেবে, সারাটা জীবন শুধু হেরেই এসেছি, কোথাও জিততে পারিনি। যেখানে পাওয়ার কথা সেখানে হারিয়েছি, নিজের উপর আর আমার আস্থা কোথায়, অতীতের দিকে তাকালে সেখানে তো কোন আনন্দোজ্জ্বল ছবি দেখতে পাই না, আনন্দের বার্তা বয়ে এনেছে গগন। সে আমাকে বিকশিত করেছে, আজ তার আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে আমি যে উন্মুখ হয়ে আছি।

সারা রাত বিছানায় ছটফট করে বোধহয় ভোরের দিকেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দরজায় কে ধাক্কা মারছে।

আমি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে পড়লাম, নিশ্চয় বেলা হয়ে গেছে আমার উঠতে, ছি, ছি, কি লজ্জা, গগন নিশ্চয় তৈরী হয়ে এসে আমার দরজা ঠেলছে।

......চল আমরা দুজনে......

গগন আমার হাতের উপর চাপ দিয়ে বলল, অপু, কাল ভোরবেলা আমি আসব। ব্রজবালা দেবীর সম্মতি নিয়ে যাব তোমাদের কলকাতার বাড়ীতে, কি খুশী তো?

—খুশী।

সেরাত্রে আমি ঘুমতে পারলাম না। আমি জানতাম গগন আমায় ভালবাসে, আমিও তাকে আপনার করে পেতে চাই, কিন্তু তবু এত তাড়াতাড়ি এমনি নাট-

শাড়ীটা গুছিয়ে নিয়ে লঘু পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত উচ্ছ্বাস একমুহূর্তে শুকিয়ে গেল। গগন নয় তার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দিদিমণি। থমথমে গম্ভীর মুখ, চোখে কোন অভ্যর্থনার হাসি নেই, অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, মুখ ধুয়ে আমার ঘরে এস, কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

(ক্রমশঃ)

কলকাতার প্রথম হাসপাতাল

নকুল চট্টোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের ক'লকাতা।

ইংলণ্ড থেকে ক'লকাতার বিয়ের বাজারে তখনও মেমসাহেবদের আসা শুরু হয়নি। শহরের চারিদিক নালা, অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও বনজঙ্গলময়; এককথায় ম্যালেরিয়ার ডিপো। এই পরিবেশে নবাগতরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর "পাঞ্চ হাউসে" বসে মদ্যপান করে নেশায় বিভোর হয়ে আস্তানায় ফিরত ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে। কোনক্রমে বিছানায় শুয়ে পড়ত। সারারাত্রি মশারি-বিহীন খোলা জায়গায় শুয়ে থাকার দরুণ—ভোর হ'লে দেখা যেত সমস্ত শরীরটা তাদের মশার কামড়ে লাল হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন কেটে যেত—একদিন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসত—তারপর কয়েকদিন ভুগে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিতে হত তাদের। এই প্রসঙ্গে একজন সৈনিকের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"What with hum of the mosquito above, and the bug in the bed below, I am regularly humbugged out of my night's rest".

তখনও ক'লকাতায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শহরে মাত্র একজন সাহেব ডাক্তার। ম্যালেরিয়া শহরে দেখা দিল মহামারীরূপে। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ম্যালেরিয়া চরম রূপ ধারণ করল। মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই চারশো বাট জন ইংরেজ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (তখন ক'লকাতায় বসবাসকারী ইংরেজ অধিবাসীর মোট সংখ্যা ছিল বারোশো)।

ক'লকাতার অধিবাসীরা, ইংরেজ সৈনিক ও নাবিকরা একত্রিত হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে প্রার্থনা জানাল একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য। তৎকালীন কোম্পানীর বেতনভোগী ডাক্তাররাও যখন একই মর্মে কোম্পানীর কাছে আবেদন জানাল, তখন ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর কোম্পানী এক আদেশে জানালেন যে, "কলকাতা দুর্গের আশেপাশে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে সেখানে হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। এই নির্মাণকার্যের জন্য ২০০০ টাকা মঞ্জুর করা হ'ল। যে সমস্ত ইউরোপীয় জাহাজ ও দেশীয় পণ্যবাহী নৌকো ক'লকাতা বন্দর অতিক্রম করবে তাদের মালিকরা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য চাঁদা দিতে বাধ্য থাকবে। শহর ক'লকাতার অধিবাসীরাও চাঁদা দিতে বাধ্য। চাঁদা আদায় ও হাসপাতাল-গৃহ নির্মাণকার্য তদারক করবেন কোম্পানী নিযুক্ত বক্সী মিঃ আডাম।"

বর্তমানে আমরা যাকে গার্স্টিন প্লেস্ বলে জানি সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক'লকাতার প্রথম চিকিৎসাগৃহ বা হাসপাতাল। হাসপাতালটি সেন্ট জন চার্চ অর্থাৎ যেখানে জব চার্ণক ও বেগম জনসন প্রভৃতির সমাধি আজও রক্ষিত আছে তারই উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল। মূল বাড়ীটি ১৭৫ ফিট দীর্ঘ ও ৬০ ফিট প্রস্থবিশিষ্ট ছিল। প্রথমাবস্থায় হাসপাতালটি দোতলা ছিল না। কারও কারও মতে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ক'লকাতার সেই হাসপাতালটিই হচ্ছে ইউরোপীয়দের জন্য প্রথম জেনারেল হাসপাতাল।

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। রোগীরাও রোগমুক্ত সুস্থ জীবন-

যাপনের আশা নিয়ে এসে ভিড় করল এই হাসপাতালে। সুস্থ হয়ে প্রিয়জনের কাছে ফিরে যাওয়া অনেকের ভাগ্যেই ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :
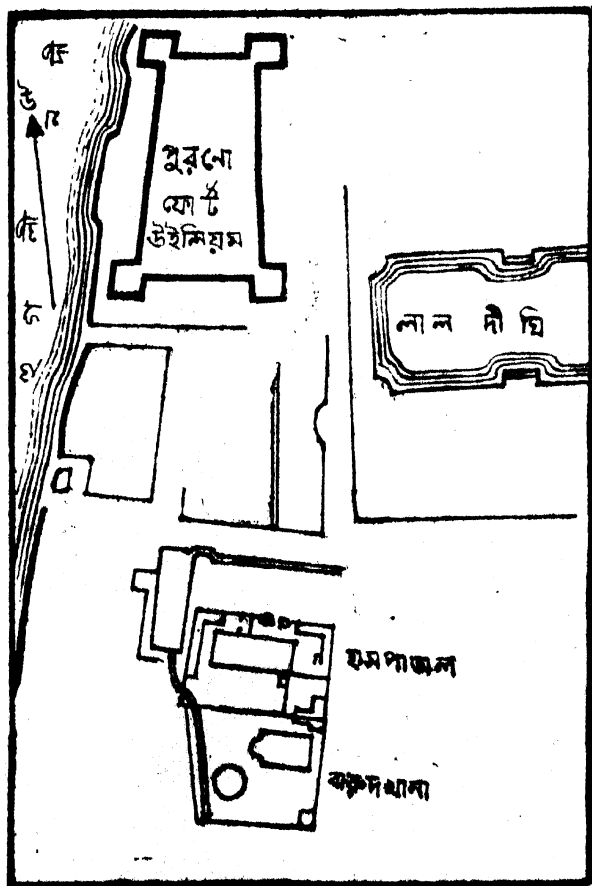
কোম্পানীর দেয় দু'হাজার টাকা ছাড়াও এক বৃহত্তর অঙ্কের টাকা ক'লকাতাবাসীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিল। ইংরেজ অধিবাসীরাই কেবলমাত্র এই হাসপাতাল নির্মাণকার্যে চাঁদা দেয়নি—দেশীয় জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়রাও এই কাজে সাহায্য করেছিল। দেশীয়দের স্থান কিন্তু এই হাসপাতালে হয়নি।

"The Company has a pretty good hospital at Calcutta where many go into undergo the penance of

physik, but few come out again to give account of its operation".

অসুস্থ সৈনিক ও নাবিকদের প্রতি যাতে যথাযথভাবে নজর রাখা যায় এবং যাতে তারা হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে শহরের সুস্থ পরিবেশকে কলুষিত না করতে পারে, তার জন্য হাসপাতালটিকে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। এই দেওয়ালের বাইরে অসুস্থ সৈনিকদের যাবার হুকুম ছিল না।

হাসপাতালটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট কয়েকটি নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন ডাঃ উইলিয়াম হ্যামিল্টন ও ডাঃ রিচার্ড হার্ভে। বিধান কয়টি নিম্নে দেওয়া হল:

প্রথমতঃ কোম্পানী হাসপাতালের জন্য তিরিশটি তক্তপোশ—প্রয়োজনীয় বিছানা এবং কুড়িজন রোগীর উপযোগী জামা-কাপড় সরবরাহ করবে।

দ্বিতীয়তঃ অবিবাহিত সৈনিক অসুস্থ হলেই তাদের হাসপাতালে থাকতে হবে।

তৃতীয়তঃ প্রত্যেক সৈনিককে পথ্যাদির ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রতিদিন চার আনা করে দিতে হবে। একজন করপোরাল ও সারজেন্ট যথাক্রমে ছয় আনা ও আট আনা হিসেবে দেবে।

চতুর্থতঃ অসুস্থ ব্যক্তিরা যাতে অন্যত্র চলে না যেতে পারে—সেইজন্য একজন সৈনিক পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত থাকবে।

পঞ্চমতঃ হাসপাতালে যাতে মাদকদ্রব্যের প্রবেশ না ঘটে তাও এই সৈনিককে দেখতে হবে।

ষষ্ঠতঃ রোগীদের প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদাদি সরবরাহের জন্য তিরিশ টাকা বেতনে একজন স্টুয়ার্ট নিযুক্ত করা হ'ল। এই ব্যক্তি জ্বালানী কাঠ ও তেলের জন্য স্বতন্ত্র কোন ভাতা পাবে না।

কারও কারও মতে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দেই হাসপাতালে তক্তপোশের ব্যবহার শুরু হয়নি। তখন জাহাজের হ্যামক বা রেলগাড়ীর বাঙ্কের মত এক ধরনের বিছানা ব্যবহৃত হ'ত বলে অনুমিত হয়। অনেকের মতে ঐ হাসপাতালে রোগীদের জন্য তক্তপোশের ব্যবহার আরম্ভ হয় ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের পর থেকে। হাসপাতালের বাড়ীটি ১৭০৭-১৭০৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হলেও কয়েক বৎসর অর্থাৎ ১৭৩০ খৃষ্টাব্দেই ঐ বাড়ীর কড়ি-বর্গা পাল্টাবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই কাজে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ব্যয় হয় ১০২০ টাকা ৭ আনা ৬ পাই।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হাসপাতালের ডাক্তার সর্বসময়ের জন্য হাসপাতালে থাকতেন না, আর ডাক্তারদের জন্য ভিন্ন কোন বাসস্থানও হাসপাতালের মধ্যে ছিল না। ঐ বৎসর হাসপাতালের দু'তলা নির্মাণ করা হয়। মেডিক্যাল অফিসারের ঘর ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের জন্য একটি ডিসপেন্সারী ঘর নির্মিত হয়।

মেডিক্যাল অফিসারের মাসিক বেতন ও ঔষধের ব্যয়ভার বহন করত কোম্পানী,—পথ্যের খরচ দিত রোগীরা; তবুও দেখা যেত যে প্রকৃতপক্ষে খরচ যা হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ করা হয়েছে। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই সন্দেহজনক খরচ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টার্স'রা স্থির করলেন যে, কাউন্সিলার একজন সভ্য এই বিষয়ে নজর রাখবেন এবং প্রতি সপ্তাহে বোর্ডকে ওয়াকিবহাল করবেন। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ ফ্রাঙ্কল্যান্ড হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন। তিনি ডাক্তার ও রোগীদের অবস্থা দেখে যত না হতাশ হয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশী মর্মাহত হয়েছিলেন হাসপাতালের বাড়ীটির দুর্দশাজনক অবস্থা দেখে।

পরবর্তীকালে বাড়ীটির আমূল সংস্কার হয়েছিল। অনেক নিয়মকানুনের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। বেশী দিনের কথা নয়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন সিরাজদৌল্লা কলকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে হাসপাতালটি ধ্বংস হয়ে যায়। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত হাসপাতালটির সংগে যে কয়জন ডাক্তারের নাম জড়িয়ে আছে, তন্মধ্যে উইলিয়াম জেমস, উইলিয়াম হ্যামিল্টন, রিচার্ড হার্ভে, উইলিয়ম ক্লাটন ও জর্জ গ্রে'র নাম উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী সাহিত্য

আকাদমি অব আমেরিকান পোয়েটস-এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন সাতাত্তর বয়স্ক কবি এজরা পাউন্ড। উল্লেখযোগ্য কাব্যকৃতির স্বীকৃতির নিদর্শন হল এই পুরস্কার। এর আর্থিক পরিমাণ হল পাঁচ হাজার ডলার। কবিতা, সমালোচনা অনুবাদ সব মিলিয়ে পাউণ্ড প্রায় পঞ্চাশখানি গ্রন্থের রচয়িতা। যুদ্ধকালে ইটালী থেকে বেতার-ঘোষকের কাজ করতে গিয়ে পাউণ্ড যে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব করেছিলেন—পরবর্তীকালে সেজন্য তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। মানসিক বিভ্রান্তির জন্য আদালতে তাঁর কোন বিচার হয়নি। কিন্তু তাঁকে রবার্ট ফ্রস্ট প্রভৃতি কয়েকজন কবি এই অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি ইটালীতে বাস করছেন।

*   *   *

তৃতীয় আন্তর্জাতিক কবিতা সম্মেলন এবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল পোল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল নোপটে-এ। চব্বিশটি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে। উনচল্লিশ জন অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং গায়ক আবৃত্তি বা গান করেন। নব্বইটি কবিতা এবং সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়েছিল। রুশ কবিতা **লেট দি সান অলয়েজ শাইন**—প্রথম পুরস্কার লাভ করে। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে ইস্রায়েল।

*   *   *

ইটালীর পুলিশকে এমন একটি সমস্যায় পড়তে হয়েছে যা এতকাল বৃটেনেই সব থেকে বেশী দেখা যেত। উগো ডা কোমো ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরীটি হল ব্রেসিকায়। সম্প্রতি এদের লাইব্রেরী থেকে একশতখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ চুরি গেছে। এর মধ্যে আছে দান্তের ডিভাইন কমেডির একটি ১৪৮৭ সালের সংস্করণ। চোরেরা একটি মই দিয়ে লাইব্রেরীর স্টীল আলমারীর ওপর দিক খুলে ফেলে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বই নিয়ে চম্পট দেয়। তিন দিন বাদে দান্তে এবং অন্যান্য পঁচাত্তরখানি গ্রন্থ কোলন স্টেশনে সুটকেসে করে পাওয়া যায়। অপর গ্রন্থগুলির সন্ধান এখনও মেলেনি।

*   *   *

একাশি বছর বয়সে মিস ফিলিস বোটোমি (মিসেস এ ই ফোর্বস ডেনিস) হাম্পস্টেডে মারা গেছেন। তিনি চৌত্রিশখানি উপন্যাস রচনা করেন। এর বেশীর ভাগ সাতটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর পিতা ছিলেন আমেরিকান—আর জন্ম ইয়র্কশায়ারে। ফিলিস কখনও আমেরিকায়, কখনও ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়াতে বাস করেছেন। কর্ণওয়ালে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে অবশেষে লণ্ডনে শেষ-জীবন কাটান। তার **প্রাইভেট ওয়র্লর্ডস** এবং **দি মর্টাল স্টর্ম** চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। আলফ্রেড এডলারের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন এবং তাঁর একখানি জীবনী লেখেন ১৯৩৯ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ফিলিস মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশনে লেকচারার-এর কাজ করেন। শেষ জীবনে শারীরিক কারণে লেখা ছেড়ে দিতে হয়। তাঁর বাইশটি গল্প দাফনে দ্য মরিয়েরে-এর সম্পাদনায় ফেবার থেকে প্রকাশিত হয়।

*   *   *

সাহিত্য বা শিল্পজগৎ নিয়ে যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করে থাকেন অধিকাংশ সময়েই তাঁরা তত্ত্বমূলক বই পড়তে ভালবাসেন। সম্প্রতি এমন ধরনেরই কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থগুলি এদেশের পাঠকদের বিশেষ মনোরঞ্জনে সক্ষম হবে বলে মনে হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন চিন্তার একটি গভীর তথ্যমূলক ও সুলিখিত গ্রন্থই হল রেনে ওয়েলেক ও অস্টিন ওয়ারেন লিখিত **দি থিওরি অব লিটারেচার**। এইচ কোম্বেসে-এর **লিটারেচার অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম** গ্রন্থখানি পশ্চিমী পাঠকমহলে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। জন রাসেল টেইলর-এর **অ্যাংগার অ্যাণ্ড আফটার** বিগত দশ বছরের ব্রিটিশ নাট্যসাহিত্য-জগতের একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরেছে। জন অসবর্ণের **লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার** প্রকাশের পর ইংরেজি নাটকের গতি কোন দিকে প্রবহমান তা পাওয়া যাবে বর্তমান গবেষণাধর্মী তথ্যমূলক গ্রন্থে।

*   *   *

কুড়ি বছর বাদে সুখ্যাত সমালোচক ল্যাসলি অ্যাবারক্রম্বির **রোমান্টিসিজম** গ্রন্থখানি পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনটি বক্তৃতা নিয়ে রচিত এই গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। অ্যাবারক্রম্বি ছিলেন লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বেডফোর্ড কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। বিশ শতকের সাহিত্য-সমালোচকমূলক গ্রন্থ পর্যায়ে অ্যাবারক্রম্বির **প্রিন্সিপলস অব লিটারেরি ক্রিটিসিজম** সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আজ সন্ধ্যায় আমাদের বিয়ে। বহু শতাব্দীর সঞ্চিত সংস্কার তোমার মন থেকে আজও সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়নি বলে বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে তোমার মনে একটু খুঁতখুঁতানি ছিল। ফুল-আলো-সানাইয়ের মাঝে শালগ্রামশিলার সাক্ষ্য আর সপ্তপদীর কাব্যিক ছন্দ—এ সবের পরিবর্তে অল্প কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুর উপস্থিতিতে বিবাহ-আধিকারিকের কাছে বিয়ের শপথ নেওয়ার ব্যাপারটা যেন এখনও তোমার কাছে ঠিক বিয়ে-বিয়ে বলে মনে হয় না। তবুও যুক্তি দিয়ে তুমি সব ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছ। শুধু নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়তায় অনুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আজ ভোরে তোমার নিজস্ব একটু অনুষ্ঠান ছিল।

আমার ওপর আদেশ ছিল, ভোর-বেলা উঠে কিছু না খেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবার। তুমি অত ভোরে চান করে নিয়েছিলে। ভিজে চুল ছড়িয়ে-ছিল তোমার পিঠের ওপর। বাসে করে শহর ছাড়িয়ে, শহরতলী ছাড়িয়ে আমরা অনেক দূর চলে গেলাম। সরু সরু পীচের রাস্তা, সারি সারি ঝাঁপ-বন্ধ দোকান-পাট, রাস্তায় মর্নিং স্কুলের দু-চারজন ছাত্রী; মাঝে মাঝে সরু গলির ফাঁক দিয়ে হালকা জল-রঙ-রোদ বড় রাস্তায় এসে পড়েছে। এসব ছাড়িয়ে আমরা এসে পড়লাম ফাঁকা মাঠের মাঝ-খানে। পূর্বদিকের নারকোল গাছ-গুলোর মাথায় তখন সোনা-রঙ লেগেছে। তুমি ঈষৎ আনমনা হয়ে ওদিকে তাকিয়েছিলে। এলোমেলো বাতাসে তোমার চুলগুলো মুখের ওপর এসে পড়ছিল। তুমি কি ভাবছিলে জানি না। তোমার ভাবনার স্রোতে বাধা দিতে ইচ্ছে করে নি। আমি শুধু আলগোছে তোমাকে দেখছিলাম। কত কনে-দেখা আলোয় তোমাকে দেখেছি। তবু আজ চৈত্রের এই ভোরের আলোয় তোমার শুচি-স্মিত মুখের যে রূপরেখাটি

দেখলাম, তা যেন তোমায় নতুন করে দেখা।

বাস থেকে নেমে আমরা হেঁটে এলাম গঙ্গার ধারে, মন্দিরে। সেখানে একটা দোকান থেকে পূজোর উপকরণাদি তুমি কিনলে। হাত-ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা ঘটি বার করে গঙ্গা থেকে জল তুলে আনলে। পুজো দেওয়া হল। তারপর তোমার কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়ালাম। তুমি ঘটি থেকে জল ঢাললে বিগ্রহের ওপর। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি।

আমি ঈশ্বর নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাই নি। ওটা আমার বিষয়ের বাইরে। তবে তোমার বিশ্বাসে আঘাত দেবার কোন অধিকার বা ইচ্ছে আমার নেই। বরং তোমার বিশ্বাসকে মর্যাদা দিলে তুমি যদি খুশী থাক, সেই খুশীটুকুই আমার লাভ। তাই তোমার সঙ্গী হয়েছিলাম।

মন্দির থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ঢালু পাড়ে বটগাছের ছায়ায় এসে আমরা বসলাম। জনকয়েক লোক দড়ি পাকাচ্ছিল। ঘাটের কাছে কয়েকটা নৌকা ঢেউয়ের আঘাতে মৃদু মৃদু দুলছিল। কতক্ষণ আমরা সেই প্রবাহের দিকে তাকিয়েছিলাম। তারপর তুমি আমার দিকে ফিরে ঈষৎ অভিমানের সুরে বললে, "তুমি কিচ্ছু জান না।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন?"

"একটা সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিতে হয়।"

আমি অপ্রস্তুত বোধ করলাম।

"এখন পরিয়ে দেব?"

"দাও। কপালে যেখানে আমার টিপ রয়েছে, সেখানে ছোট্ট করে পরিয়ে দেবে।"

আমি সেই প্রসাদী সিঁদুর নিয়ে তোমার কপালে ছুঁইয়ে দিলাম। কি অদ্ভুত সেই ছোট্ট মুহূর্তটি। যেন চিরন্তন জীবনের একটা স্রোত গতি-রুদ্ধ হয়ে থেমে পড়েছিল। গঙ্গার অনন্ত কলরোল, গাছের ডালে পাখীর কলরব, আকাশ-বাতাসে আলোর বাঁশী, কর্মরত সেই লোকগুলি, তরঙ্গের অভি-ঘাতে নৃত্যপরা নৌকা—এরা যেন কত-দিন ধরে আমাদের পরিবেষ্টন করে কালের খসে-পড়া এই মুহূর্তটিকে আমাদের দুজনের কাছে অক্ষয় করে রেখেছে।

শ্বেতা, এই সময়ে তুমি বলে উঠলে, "আমার বড় ভয় করে।"

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকালাম।

"আমাদের জীবনে কারোর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়বে, এটা যেন ভাবতে আমার ভয় করে।"

হঠাৎ তোমার এই কথায় হিম-শীতল জল-স্পর্শের ন্যায় আমি শিহ-রিত হয়ে উঠলাম। কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্তকে অতিক্রম করে ধীর কণ্ঠে বললাম, "একথা কেন বলছ?"

"কি জানি কেন, আজ শর্মিলার কথা বারবার মনে পড়ছে।"

"তুমি কি আমায় দোষী সাব্যস্ত করলে শ্বেতা।"

"ছি ছি, একি কথা আজকের দিনে! আমি তো মোটেই বলতে চাই নি। আজ আমার সুখের দিনে, যার জন্য আমার সব কিছু আনন্দ, তার জন্যই যদি কেউ জীবনে দুঃখকে বরণ করে নেয়, তার কথা মনে পড়বে না!"

শ্বেতা, আজ ভোরবেলা থেকে আমার মনের বাঁশীতে যে রাগিণীর আলাপ চলছিল, তাতে ছেদ পড়ল। কিন্তু আমরা যে পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলাম তাতে বিদ্যুতেই যেন শর্মিলার প্রসঙ্গ ভুলতে পারছিলাম না। তুমি অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বারবার ঐ কথাটাই ঘুরে-ফিরে দুজনের মনে খোঁচা দিতে লাগল।

বাড়ী ফিরে ভাবলাম, তোমাকে আজ সন্ধ্যের আগেই এ চিঠি পৌঁছে দেওয়া দরকার। বিশ্বাস আছে, আজ সন্ধ্যায় সাহানার আলাপে আর তাল-ভঙ্গ হবে না।

বৈশাখের এক দীর্ঘ অপরাহ্নে আমি ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস-এর এক রাজকীয় গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। উর্দি-পরা দারোয়ান আমাকে দেখে বিরাট এক সেলাম করল। তারপর হাত বাড়াল, বোধহয় কার্ডের জন্য। আমি ঈষৎ অপ্রস্তুত বোধ করে সমরেশের নাম করলাম। দারোয়ান আর এক সেলাম করে গেট খুলে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। লাল নুড়ি-বাঁধানো পথে আমার পদক্ষেপে যেন বেখাপ্পা শব্দ উঠতে লাগল।

ঝুল-বারান্দার তলায় পৌঁছতেই এক মহাকায় কুকুর আলস্য পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল এবং গলা দিয়ে গরগর করে একটা আওয়াজ বার করে প্রস্তুত হবার ভঙ্গী করল। আশপাশে বিরাট বাগান। দূরে একটা মালি রবারের নলে করে মেহেদী গাছের বেড়ার ওপর জল দিচ্ছে। চীৎকার করে মালিটাকে ডাকব না সমরেশকে ডাকব, সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম না, পরিবেশগত নিস্তব্ধতার জন্য। কয়েকটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত কাটল। তারপর একে একে কলিং-বেল ও কুকুরের গলায় চেন দেখতে পেলাম। আন্দাজে হিসেব করে মনে হল চেনের দৈর্ঘ্য কলিং-বেল অবধি পৌঁছবে না। তখন বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে বেল টিপলাম।

ভেতরে মধুর শব্দে বেল বাজতে লাগল। ততোধিক মধুর এক তরুণী কণ্ঠ সুরেলা গলায় কাকে যেন ডাকল। তারপরই সমরেশের গলার আওয়াজ পেলাম, "না রে, বোধহয় অজিতদা।"

সিঁড়িতে দ্রুত পদধ্বনি শুনলাম।

"আমি ঠিক ধরেছি, অজিতদা আপনি। ঘড়ির কাঁটার মত এসে হাজির হয়েছেন। চলুন ওপরে।"

আমার রিসার্চের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তাই সমরেশের জোর-জবরদস্তিতে রাজী হয়েছিলাম ওকে পড়াবার জন্য। সমরেশ কলেজে আমার চেয়ে বছর তিনেকের জুনিয়ার ছিল। ওর এইটুকু পরিচয়ই আমি জানতাম। কলেজ স্ট্রীট, সায়েন্স কলেজ, পটল-ডাঙ্গার চৌহদ্দির বাইরে ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস্-এর সেই দুর্ধর্ষ লৌহ-দরজা অতিক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার যেন মনে হল, আমি আমার পরিচিত পৃথিবী থেকে ছিটকে এক অপরিচিত দ্বীপে গিয়ে পড়লাম।

পড়ার ঘরে কম-বেশী করা আলো, ঘেরা-টোপ দেওয়া আলোছায়া, চেয়ার-টেবিল-কার্পেট, রুমকুলার ইত্যাদির মাঝে পড়ে আমার ভয় হল, আমি ঘণ্টা দেড়-দুই রসায়ন নিয়ে বক্তৃতা করতে পারব কিনা; কেননা আমার তখনই ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল।

পড়ানোর শেষে আমি উঠলাম। সমরেশ উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন একটা বলবে বলে ইতস্ততঃ করছিল। এমন সময় ঘরে ঢুকল একটি তরুণী। আমার দিকে একবার তির্যক দৃষ্টিপাত করে সমরেশকে বলল, "এই দাদা, বল।"

আমি তরুণীটিকে তখনও ভালো করে দেখিনি। মেয়েদের এক নজরে দেখে নেওয়ায় আমি তখনও অভ্যস্ত ছিলাম না।

"অজিতদা, মা বলে পাঠালেন, আপনি চা খেয়ে যাবেন।"

সমরেশ অনেক কষ্টে ঘাড় চুলকে বলল।

"আবার ওসব কেন?"

আমি একটু সঙ্কুচিত বোধ করলাম।

"দাদা, ওঁকে ওঘরে বসতে বল," ঈষৎ চাপা একটা মিষ্টি কণ্ঠস্বর।

পাশের ঘরে অর্থাৎ চায়ের টেবিলে গিয়ে বসলাম। ভাবতে লাগলাম, মেম-সাহেবের সঙ্গে কি প্রসঙ্গে কথা বলব। এমনিতে আমি মেয়েদের সঙ্গে কথা-বার্তায় তেমন পটু নই। মিস্—এই সেরেছে, সমরেশের পদবীটা জানা নেই। কি বিপদ!

কিন্তু পর্দা সরিয়ে খাবারের থালা হাতে যিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমাদের জগতের মা-মাসীমা। আমি অজ্ঞাতসারেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

"বোসো, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাচ্ছিলে যে।"

মনে হল, এ স্নেহের আদেশ এ'কেই মানায়।

"খেয়ে নাও। কিছু ফেলবে না। মিলু, চা-টা নিয়ে আয়।"

চায়ের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে সেই তরুণীটি প্রবেশ করল।

"এই আমার মেয়ে শর্মিলা।"

দেওয়ালের খাঁজে নিয়ন-সাইনের নীলচে আলো, জানলায় তার দিয়ে ঝোলানো বাঁশের টবে ছোট্ট বাহারি অর্কিড, ঘরের কোণে জয়পুরী কাজ-করা পেতলের ফুলদানিতে হাসনু-হানার স্তবক, দেওয়ালে নন্দলাল বসুর স্কেচ, গদী-আঁটা সেট-মেলানো ঝকঝকে চেয়ার-টেবিল, সামনে উপবিষ্টা স্নেহময়ী মাতৃসমা এক মহিলা, তাঁর পেছনে চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা সুসজ্জিতা, সুস্মিতা একটি মেয়ে।

শ্বেতা, শর্মিলার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

সমরেশের মা একে একে আমার সমস্ত খোঁজখবর নিতে লাগলেন। আমার মা-বাবা কতদিন আগে মারা গেছেন, কে কে আছেন, মেসের খাওয়া-দাওয়া কিরকম ইত্যাদি, পরিচয়কে নিকটতর করে নেবার জন্য যা যা প্রশ্ন করা যায়, সবই করলেন।

আমি সত্যিই বেশ সহজ বোধ করলাম। ফেরবার সময়ে এক বিস্ময়-মুগ্ধ মনের সেতু রচনা করতে করতে সেই দ্বীপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

শ্বেতা, তুমি একদিন বলেছিলে, আমি নাকি খুব চমৎকার গল্প করতে পারি। অথচ আত্মীয়স্বজন কম থাকায় আমি মেয়েদের সঙ্গে খুব কম মিশেছি। কলেজে পড়াশোনায় সাহায্য পাবার আশায় উৎসুক সহপাঠিনীদের যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গেছি। শর্মিলাকেও আমি ভীতচিত্তে এড়িয়ে যেতে চাইতাম। অথচ শর্মিলা ছিল ভারী মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে, কোনো অহংকারের বাষ্প ওকে স্পর্শ করে নি। অত্যন্ত মিশুক, কথা-বার্তায় সহজ-সরল, আচার-ব্যবহারে সাধাসিধে। অল্প হাসির কথায় হেসে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। অথচ আমি ওর সামনে মুখ খুলতে পারতাম না।

পড়াতে এসে রোজ রোজ চা-টা খেতে আমার সংকোচ বোধ হত। দু-একদিন পর আমি মৃদু আপত্তি জানালাম। সমরেশ মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইল। শর্মিলা মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল। আমি যেন এক মহা অপরাধ করে ফেলেছি, এমনিভাবে বসে রইলাম।

একটু পর সমরেশের মা ঘরে ঢুকলেন।
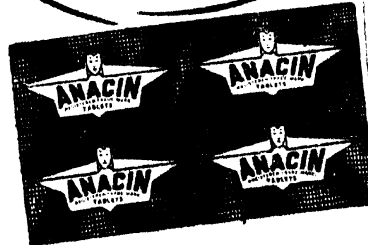
"সমরেশ বুঝি ঠিকমত পড়ছে না? তাই ওর ওপর রাগটা আমাদের ওপর চাপাচ্ছ।"

মৃদু হেসে উনি বললেন। আমি অপ্রস্তুতের একশেষ!

"শর্মিলা আজ আবার চা করতে দেয় নি, গরম বেশী পড়েছে বলে কাঁচা আম পুড়িয়ে সরবত করে রেখেছে। তুমি খাবে না বলাতে মেয়ে তো মুখ হাঁড়ি করে চলে গেল।"

উনি এর পর গলাটা নীচু করে কিরকম যেন অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, "পড়াতে এসেছ বলে কি সম্পর্কটাকে একটু সহজ করে নেওয়া যায় না!"

আমি মুখ নীচু করে বসে রইলাম।

"কই রে মিলা, নিয়ে আয়। অজিত আবার সেই কতদূরে ফিরবে।"

ট্রে-তে সরবতের সরঞ্জাম সাজিয়ে শর্মিলা আবার ঘরে প্রবেশ করল। কিন্তু সেই সুস্মিত মুখে একবিন্দু হাসি ছিল না। অভিমানস্ফুরিত ওষ্ঠে একটি কথাও না। শুধু কতকগুলি অনুচ্চারিত শব্দ কালো মেঘের মত মুখটিকে ঘিরে রেখেছিল।

শ্বেতা, সেইদিন প্রথম আমি অনুভব করলাম, একটা বিশ্রী রকমের অস্বস্তি। তুমি কোনদিন আমাকে সে অস্বস্তি ভোগ করতে দাও নি। সেদিন রাত্রে আমার মনে হয়েছিল, মেসের ঘরটার একটুও হাওয়া নেই, মনে হচ্ছিল তক্তাপোষের ছারপোকাগুলো যেন হঠাৎ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। কোন এক বিদেশিনী রাজকন্যার মনোজগতে যে ঈষৎ বিশৃঙ্খল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তার উপশম নাকি তার বহুবিধ প্রমোদ-উপকরণের ওপর নির্ভর না করে আমার মত এক অকিঞ্চিৎকর যুবকের ওপর নির্ভর করছে—ভীতিচিত্তের এই ধরনের এক ভাবনাকে বার বার চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে হচ্ছিল।

এক একদিন সমরেশের মা থাকতেন না। আমি মহা অসুবিধায় পড়তাম। সমরেশকে টেনে আনতাম চায়ের টেবিলে। কিন্তু শর্মিলা একাই আমার সমস্ত সংকোচ অতিক্রম করে আপন উচ্ছল প্রাণবন্যায় চায়ের আসর সাবলীল করে রাখত।

একদিন শর্মিলা বলে উঠল, "অজিতদা, দাদা কিরকম পড়ছে?"

সমরেশ রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "তুই আমার গার্জেন নোস।"

"মা তো আজ বেরিয়ে গেছে। তাই আমাকে বলে গেছে, আপনার কাছ থেকে দাদার পড়ার খবরটা নিতে।"

"এঃ! মা ওকে পাওয়ার অফ এ্যাটর্ণী দিয়ে গেছে। এক গাঁট্টা মারব।"

"ইস, মেরে দেখ না অজিতদার সামনে। অজিতদার এক্সাইজ-করা চেহারা—একটা থাপ্পড় খেলে তোর ঘি-দুধ খাওয়া ননীর পুতুলের মত চেহারা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।"

"তবে রে মুখপুড়ী—"

"দাদা, ভালো হবে না বলছি।"

"এই সমরেশ, শোনো, শোনো—"

আমাকে মাঝে পড়ে ঝগড়া মেটাতে হয়। ছোটবেলায় আমার এক দিদি ছিল। তার সঙ্গে আমার ঠিক এইরকম ঝগড়া হত।

ঝগড়া যেরকম ভাবেই মেটাই না কেন, শর্মিলা আমাকে ঠিক বলত, "আপনি ভীষণ একচোখো, ছাত্রের দিক টেনে কথা বলছেন।"

এক একদিন আমি একলা পড়ে যেতাম। সেদিন শর্মিলা খুব মজা পেত। প্রথমেই শুরু করত, "আপনাকে আজ এই কেটলীটার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কেননা আজ আর কোন লোক নেই।"

হয়তো অনেক সাহস সঞ্চয় করে বলতাম, "কেন, তুমি তো রয়েছ।"

গালে আঙুল দিয়ে অপরূপ এক নাটকীয় ভঙ্গী করে শর্মিলা বলত, "হা ঈশ্বর, আপনি আমাকে মানুষ বলে মনে করেন নাকি।"

হয়তো এইসব মুহূর্তে বইতে-পড়া অনেক সাজানো কথা আমার বলতে ইচ্ছে হত। কিন্ত কথাগুলো একবার ভাবলেই লজ্জায় আমি সংকুচিত হয়ে পড়তাম।

একদিন ওদের একটা নতুন গাড়ীর ট্রায়াল দেবার জন্য আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম। বজবজ ছাড়িয়ে বাটা-নগর ছাড়িয়ে, আমরা এসে পড়লাম গঙ্গার ধারে। চমৎকার একটা বাঁধানো ঘাট রয়েছে সেখানে। আমরা বসলাম।

অল্প ক'য়কটা দোকান; খেয়া নৌকা পারাপার করছে। গঙ্গার ওপারে একটা দুটো করে আলো জ্বলে উঠল। পশ্চিম আকাশে পরতে পরতে নীলের ওপর লাল রঙ ছড়িয়ে পড়েছে। গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গশীর্ষ প্রতিফলিত রক্ত-রশ্মিতে ঝিকমিক করছে।

ঈষৎ গুনগুন করে সমরেশ গাইছিল মুলতানীতে—সুদূর মেঘের স্বর্ণ-লিখায় রঙ ছড়ানো সন্ধ্যা। দুচার কলি গেয়ে ও উঠে গেল হয়তো একটু ধূমপানের ইচ্ছেয় কিংবা চায়ের খোঁজে। আমরা দুজনে নীরবে বসে রইলাম। এই নীরবতা অস্বস্তিকর নয়। দুজনেই কোন না কোন চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। আমি রঙ-ছড়ানো সন্ধ্যায়, গঙ্গার ঢেউয়ে, গানের কলিতে বিচিত্র সুন্দর এক দিবাবসানের আমেজে মগ্ন ছিলাম। শর্মিলা নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, "আচ্ছা পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু আনন্দ বিতরণ করে চলেছে। কিন্তু আমরা প্রতি মুহূর্তের আনন্দকে সংগ্রহ করতে পারছি না। হয়তো এই মুহূর্তের আনন্দের ক্ষণটি পরমুহূর্তের বিষাদ-সাগরে ডুবে যাবে।"

শর্মিলার দার্শনিক চিন্তার হদিশ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আন্দাজে বললাম, "বিষাদ-সাগরের কথা ভাবছ কেন?"

"কেন জানেন, আমার এই জীবনটায় আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। এমনকি এর ভবিষ্যৎটাও আমার কাছে অতিমাত্রায় স্পষ্ট, ছকে বাঁধা। আমি এই চেনা-জানা জীবনের ছক-বাঁধা আনন্দের বাইরে যেতে চাই, কিন্তু কেউ—"

শর্মিলা কথা শেষ করল না।

আমি বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকালাম। শর্মিলা গঙ্গার ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। একবারও ফিরে তাকাল না।

সে রাত্রে এক অজানা আশঙ্কায় বার বার আমি আতঙ্কিত হলাম। প্রশ্রয়-দেওয়া চিন্তা-বিলাসকে বারবার ধিক্কার দিয়ে বললাম, মূর্খ।

একটু একটু করে আমি, শর্মিলা, সমরেশ পড়ার ঘরের গণ্ডীটুকুর বাইরে একটা ক্ষুদ্র জগৎ গড়ে তুলতে লাগলাম। সমরেশের মার স্নেহের দাক্ষিণ্য আমাদের এই জগতে প্রাচুর্যের মত ছড়িয়ে রইল।

প্রতিদিন রাত্রে মেসে ফিরে প্রতিটি সন্ধ্যা-যাপনের স্মৃতিতে অবগাহন করার নেশায় আমাকে পেয়ে বসল। শর্মিলার প্রতিটি কথা, কথা বলা, অঙ্গ-ভঙ্গী, মোহ-মদির দৃষ্টিভঙ্গী তীব্র সুরার মত আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার অস্বস্তিতে আমি অধীর হয়ে উঠতাম। কিন্তু নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারতাম না সে কল্পনা

থেকে। রোজ দিন গুনতাম, কবে সমরেশের পরীক্ষা শেষ হবে, এ যন্ত্রণার হাত থেকে আমি বাঁচব। অথচ ক্ষীয়মাণ সময়ের হিসেব করে এক শূন্য বিবর্ণতায় অভিভূত হয়ে মোহগ্রস্তের মত চুপচাপ বসে থাকতাম।

সমরেশের পরীক্ষা যেদিন শেষ হয়ে গেল, সেদিন ও হাসতে হাসতে বলল, "অজিতদা, মিলা কেন কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়েছে জানেন? আপনার কাছে পড়বে বলে।"

"আমার পক্ষে পড়ানো সম্ভব হবে না। আমার রিসার্চের বড় ক্ষতি হচ্ছে।"

চট করে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অপ্রস্তুতের লজ্জায় সমরেশের মুখটা লাল হয়ে গেল।

একটু পর ওর মা এলেন।

"এবার তোমার ওপর ভার থাকবে মিলার পড়াশোনার।"

"দেখুন, আমার পক্ষে আর পড়ানো সম্ভব হবে না।"

"ওমা, সে কি! তাও কখনও হয়! তোমার কোন কথাই আমি শুনব না।"

"আমাকে মাপ করবেন।"

অহেতুক কাঠিন্যের বর্মে কোন-রকমে আত্মরক্ষা করে আমি পালিয়ে এলাম।

একদিন কাটল, দুদিন কাটল, তিন-দিন কাটল। আমি যেন এক ছোটবেলায় পড়া রূপকথার গল্পের নেশায় মশগুল হয়ে রইলাম। রাতের অন্ধকারে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ট্রেন থেমে গিয়েছিল। তারপর চলে গেছে। শুধু নিঃসীম নিঃশব্দ প্রান্তরে রেখে গেছে একটা আলোকউজ্জ্বল কামরার স্মৃতি।

তিন দিন পর আমার মেসের দরজায় মৃদু করাঘাত হল। আমি তক্তপোষের আলসেমি ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। আষাঢ়ের বিষণ্ন দুপুরে মেঘ-চোঁয়ানো স্বল্পালোকে চৌকাঠের ফ্রেম ধরে দাঁড়িয়ে শর্মিলা!

শিহরিত হলাম। বন্যার তরঙ্গ-প্রবাহের প্রচণ্ড স্রোতাবেগে বিলীয়মান হয়ে যাবার আগে শেষবারের মত আমি আকুলকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলাম, আমার চেতনাকে বিলুপ্ত হতে দিও না!

শর্মিলা দরজার গোড়া থেকেই রুদ্র-কণ্ঠে প্রশ্ন করল,

"পড়াবেন না কেন?"

কণ্ঠে ওর ঝড়ের পূর্বাভাস।

আমি শুষ্ক কণ্ঠে বললাম, "বোসো।"

"হ্যাঁ বসব।" বলেই তক্তপোষে বসে পড়ল। তারপর আমার হাতটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তক্তাপোষে বসিয়ে দিয়ে বলল, "বসুন। তারপর বলুন, কেন পড়াবেন না।"

"শর্মিলা, তুমি বুঝছ না। আমার কাজের ক্ষতি—"

"সেসব জানি। অন্য আর কি কারণ আছে?"

"শর্মিলা, আর না পড়ানোই ভালো। নয় কি?"

"না।" তীব্র প্রত্যুত্তর।

"শর্মিলা, অনর্থক একটা জটিলতা সৃষ্টি করে লাভ কি। তার চেয়ে—"

"না, না, না।—বিনা কারণে জীবনে আমি যন্ত্রণাকে বরণ করে নিতে পারব না। বলো পড়াবে, বলো পড়াবে, বলো—"

"শর্মিলা!"

...আপনি আমাকে মানুষ বলে মনে করেন নাকি?

আমি আর কি বলেছিলাম জানি না। শুধু মনে আছে, দুটি কাজল-কালো চোখের দৃষ্টি সজল পর্দায় প্রতিসরিত হয়ে আমাকে ভাসিয়ে নেবার জন্য এগিয়ে আসছে।

বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘ কেটে গিয়ে যখন আকাশে উঠেছিল সপ্তর্ষি, তখন মেসের ঘরে বসে বসে আমি একটা আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম। এই ঘরে শর্মিলা এসেছিল, এত ঘনিষ্ঠভাবে। আমার বাহুদুটোকে দুর্মূল্য মনে হচ্ছিল। ওরা কি নিষ্ঠুরভাবেই না শর্মিলাকে বন্দী করেছিল। আবেগ-মথিত শর্মিলার তপ্ত নিশ্বাস যেন এখনও কিছুটা উষ্ণতা রেখে গেছে আমার বুকের মাঝখানে; যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে কত সহজে ছোট্ট এক পাখীর নির্ভরতায় আশ্রয় নিয়েছিল শর্মিলা। প্রাপ্তির নিবিড়তায় নিমীলিত পক্ষ্মরাজির প্রান্তে মুক্তাবিন্দুগুলি কেমন সুন্দরভাবে বিরাজ করছিল। অনাঘ্রাতা পুষ্পের উন্মুখতায় বারবার কেমন কোমল কম্পিত ওষ্ঠদুটি প্রস্ফুটিত হতে চাইছিল।

যথেষ্ট গাম্ভীর্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে আমি পড়ানো শুরু করলাম। কিন্তু প্রথম দিনেই বিপত্তি। গভীর মনো-যোগের সঙ্গে নোট দিচ্ছিলাম, হঠাৎ সমরেশ ঘরে প্রবেশ করল। কাছে এসে শর্মিলাকে শুনিয়ে নীচু গলায় বলল। "অজিতদা হেরে গেলেন।"

আমার অপ্রস্তুত ভাব প্রকাশিত হবার আগেই ও ঘর ছেড়ে চলে গেল. শর্মিলার চোখের কোণে দুষ্টু হাসির আভাস। ঠিক যেন মনে হল, ও বলতে চাইছে, কেমন জব্দ!

একটি কি দুটি কথা, বক্র ভ্রূভঙ্গী, অনুরাগ দৃষ্টির ঈষৎ ব্যঞ্জনা, আমার সমস্ত অস্বস্তির উপশম করে দিত। একটু একটু করে আমি যেন ভেসে গেলাম। মন যেন মৌমাছির মত এই দু ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত থেকে সৌরভ সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে রাখত, বাকি সময়কে সুরভিত করে রাখবার জন্য। পড়ানোর শেষে শর্মিলা যখন বলত, পরশু আসবেন তো, আমার যেন মনে হত

রামগিরির উত্তুঙ্গ হিম-শিখর থেকে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আমাকে গ্রাস করছে। আবার কবে দেখা হবে তার যেন কোন স্থিরতা নেই। 'অ'সব' এই কথাটুকু বলে আমি যেন একটা আশাকে আঁকড়ে ধরতে চাইতাম।

শ্বেতা, বইতে পড়া প্রেম প্রথম অনুভব করলাম আমি, সমগ্র জীবন দিয়ে। শ্বেতা, এ প্রেম একবারই আসে মানুষের জীবনে, একজনকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র সত্তা তখন ভালোবাসার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। কাকে ভালোবাসছি সেটা বড় হয়ে ওঠে না। আমি ভালোবাসছি এই চেতনাটাই তখন মনকে আচ্ছন্ন করে। মনের সমস্ত শুষ্কতাকে অভিসিঞ্চিত করে এ প্রেম আসে জোয়ারের মত, ভাবায় না; ভাসায় শুধু।

।। দুই ।।

শ্বেতা, তোমার সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত থেকেই তোমাকে কল্পনা করেছি আমার স্ত্রীরূপে। চেয়েছি, তুমি এস আমার জীবনে কল্যাণীরূপে। কিন্তু শ্বেতা, শর্মিলা আমাকে বহুদিন এভাবে ভাবায়নি।

একদিন পড়াচ্ছি, হঠাৎ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে শর্মিলাকে বললেন, "মিলা, তোর কেমিস্ট্রির বই একটা দেখি।"

মিলা জানতে চাইল, কোন কেমিস্ট্রি। ভদ্রলোক একটু চিন্তিত হলেন। তারপর হঠাৎ যেন আমাকে দেখতে পেয়েছেন এমনিভাবে বললেন, "এই যে আপনি তো রয়েছেন। আচ্ছা, 'মেটানীল' বস্তুটা কি বলুন তো।"

আমি জানালাম, ওটা একটা ডাই অর্থাৎ রং। ভদ্রলোক আমাকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলেন; মেটানীল বিষাক্ত কিনা, বিষাক্ত হলদে রং আর কি কি আছে। কোন কোন রং বিষাক্ত নয়। এই ধরনের নানা প্রশ্ন। আমার মনে হল ভদ্রলোক বোধহয় রং তৈরীর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। দু' একখানা বইয়ের নামও লিখে নিলেন উনি।

ভদ্রলোক চলে যেতে আমি শর্মিলাকে প্রশ্ন করলাম, "উনি কে?"

মৃদু হেসে শর্মিলা জবাব দিল, "বাবা।"

আমি একটু কৌতূহলী হলাম। বিশেষ করে রং আমার গবেষণার বিষয়-বস্তু বলে। তাই একটু ইতস্ততঃ করে জানতে চাইলাম, "উনি কি করেন?"

"বাবার মশলার ব্যবসা।"

পরের দিন উনি এসে বললেন, আমি যেন পড়ানোর পর ও'র সঙ্গে দেখা করি। আমি শর্মিলার কাছে জানতে চাইলাম, কি ব্যাপার। শর্মিলা নিরুৎসুক ভাবে জানালো, ও ঠিক জানে না।

পড়ানোর পর আমি ও'র সঙ্গে দেখা করলাম।

"এসো, এসো, বোসো," উনি সাগ্রহে আমার হাত ধরে একটা কৌচে বসালেন। তারপর আমার সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন; আমার পাঠ্য, গবেষণার বিষয়, ভবিষ্যতের কার্যসূচী। খাদ্যে রং প্রয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেন। তারপর হঠাৎ ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, "তোমরা সবাই 'বুকিশ', অর্থাৎ পুঁথি-ঘেঁষা। তোমাদের জ্ঞানকে তোমরা কোনদিন কাজে লাগাতে পারবে না।"

আমিও ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিলাম, "আপনাদের এই ধারণাটা নেহাতই নেতাদের বক্তৃতা-সুলভ। ওটা সত্যি নয়।"

আমি আশা করেছিলাম উনি উত্তেজিত হয়ে উঠবেন, কিন্তু উনি একই ভাবে বললেন, "সত্যি কথাটা কি শুনি।"

"আমার এক বন্ধুর একটা প্রচেষ্টার কথা বলি শুনুন। যদি পারেন, তার থেকে সত্য ছবিটা পেতে চেষ্টা করবেন।

আমেরিকানরা রঙিন মশলা খাবারে ব্যবহার করতে বিশেষ পছন্দ করে না। ওরা চায় শাদা মশলা। গোলমরিচ ওরা খুব ব্যবহার করে। আমার এক বন্ধু গোলমরিচ ব্লীচ করে তাকে শাদা করেছে, তার ফ্ড-ভ্যালু বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয়নি। একটি গুজরাটি ফার্ম টাকা দিয়ে তাদের নামে পেটেন্ট নিয়ে নিতে চাইছে, কিন্তু ওর ইচ্ছে—"

"খবরদার," ভদ্রলোক গর্জন করে উঠলেন।

বুঝলাম, এবারে কাজ হয়েছে।

"বাঙালী ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসার্ণ গড়ে তুলতে হবে," উনি উত্তেজিতভাবে বললেন, "ছেলেটিকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো। ওকে দিয়ে আমি চমৎকার একটা ইউনিট গড়ে তুলতে পারব।"

ছোট্ট ছোট্ট শাদা গোলমরিচের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মার্কিন ডলারের চিন্তায় শর্মিলার বাবা বোধহয় আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই একটু অন্যমনস্ক থাকবার পর হঠাৎ যেন আমার কথা মনে পড়েছে এমনিভাবে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ ভালো কথা, তোমাকে আমার বিশেষ দরকার। কাল একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?"

দেখা করবার সময় ঠিক করে আমি চলে এলাম। পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ের আগে হাজির হলাম। ইচ্ছে ছিল, শর্মিলার সঙ্গে দেখা করে ওকে একটু অবাক করে দেব। কিন্তু সাধনবাবু সোজাসুজি আমাকে ও'র গাড়ীতে তুলে ফেললেন। আমি আড়চোখে একবার বারান্দাটা দেখে নিলাম। সেখানে কেউ ছিল না।

মিঃ চৌধুরী বার-এ্যাট-ল'র চেম্বারে ও'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন সাধনবাবু। এরপর যা কিছু কথাবার্তা সব হল মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে।

উনি প্রথমেই আমার পদমর্যাদা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন। তারপর আমার গবেষণার বিষয় জানতে চাইলেন। আমার যে সব রিসার্চ-পেপার বেরিয়েছে তার কোন প্রতিবাদ হয়েছে কিনা খোঁজ নিলেন। খাবারে কি কি রং মেশানো চলতে পারে, জিগ্যেস করলেন। আমি জানালাম, প্রত্যেক সভ্য দেশেই সরকার থেকে খাবারের রঙের একটা অনুমোদিত তালিকা প্রকাশ করে। আমরা সাধারণতঃ ইউ, কে বা ইউ, এস, এ-র তালিকাই অনুসরণ করি। এক-আধটা রং নিয়ে অবশ্য এই দুটি তালিকার মতপার্থক্য আছে।

এরপর ব্যারিস্টারসাহেব কয়েকটি রঙের নাম করে বললেন, এগুলি অনুমোদিত তালিকায় আছে কিনা। আমি জানালাম, আছে। ব্যারিস্টারসাহেব তখন বললেন, "আচ্ছা, আপনার এইসব বক্তব্যের কেউ যদি প্রতিবাদ করে, আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?"

আমি একটু বিরক্তভাবে বললাম, "এগুলো আমার মনগড়া কথা নয়। বইতে পড়া এবং পরীক্ষা করে দেখা। সুতরাং প্রমাণ করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না।"

আমার বিরক্তি লক্ষ্য করে উনি হেসে বললেন, "আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত থাক। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। নমস্কার।"

সাধনবাবু বললেন, "অজিত তুমি বাড়ী চলে যাও। গাড়ী তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আগামীকাল সন্ধ্যায় তুমি বইপত্র, রিসার্চ-পেপার এসব নিয়ে আমার বাড়ীতে এসো।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করে ঘাড় নাড়লাম।

কাল আর শর্মিলাকে পড়ানো হবে না। তা না হলেও ওর বাবার তো কাজে লাগছি। এই চিন্তাটা আমাকে পুলকিত করে তুলল। আমার মত একজন অকিঞ্চিৎকর মানুষ, এতবড় একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কাজে লাগছে—এটা ভাবতে পারায় সে রাতে মেসের তক্তপোষে ছারপোকা আমাকে কম কামড়ালো। শর্মিলার বাবা যদি খুশী হন তাহলে ও'র তো বিরাট কনসার্ণ—কোন একটা ফ্যাক্টরীতে যদি কেমিস্টের কাজের ভার দেন—আর মনে হচ্ছে তো আমার লাইনেরই ব্যাপার—তাহলে তো চমৎকার হয়। বিদেশী রঙের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রঙ তৈরী করব। সমস্ত ফার ইস্টের মার্কেট আমাদের হাতে চলে আসবে। রেঙ্গুন, সিলোন, সিঙ্গাপুর, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা, বোর্ণিও, বালি, বাটাভিয়া—আমি তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, ভারত মহাসাগরের কূলে কূলে প্রতিটি বন্দরে

জাহাজ থেকে পেটি পেটি রঙ খালাস হচ্ছে। আর বছরের শেষে সাধনবাবু চুরুট টানতে টানতে বার্ষিক হিসেবের অডিট রিপোর্ট দেখছেন।

আচ্ছা, তখন যদি আমি শর্মিলাকে বিয়ে করতে চাই, সাধনবাবু কি আপত্তি করবেন? শ্বেতা, সেই প্রথম সংসার পাতবার একটা চমৎকার চিন্তা লঘু পক্ষ বিস্তার করে আমার ওপর নেমে এলো। সেই প্রথম আমি সচেতন হলাম, শর্মিলা আমার সামাজিক বৃত্তের বাইরে অবস্থিত একটি অত্যুজ্জ্বল আলোক-বিন্দু। ভাবলাম, আমার যোগ্যতার বিনিময়ে এবং শর্মিলার বাবার আনুকূল্যে আমি কত সহজেই না আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারি। এই পৃথিবী তার যাবতীয় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমার আর শর্মিলার কাছে এসে পৌঁছল তার নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি।

পরপর কয়েকদিন আমি সাধনবাবু আর মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে কাটালাম। ওঁদের কথাবার্তায় যা বুঝলাম তাতে মনে হল ওঁরা দুজনে হয়তো একটা রঙের কারখানা খুলবেন। শর্মিলার সঙ্গে কদিন দেখা হল না।

আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম শর্মিলার সঙ্গে দেখা করে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনার কথা জানাতে। কিন্তু এই অনুপস্থিতির পর প্রথম সাক্ষাতের দিন ওর কঠিন ঔদাসীন্য আমাকে আঘাত করল। আমি ক্ষুব্ধ হলাম। কয়েকবার সেই ঔদাসীন্যের বর্ম ভেদ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ঠিক করলাম পড়িয়েই চলে আসব। পড়ানো শেষ হল। আমি উঠতে পারলাম না। দুজনেই চুপচাপ বসে রইলাম। শেষে আমিই আবার প্রশ্ন করলাম, "এত উদাসীন কেন?"

"নিজেকে তৈরী করছি।" ধরা গলায় শর্মিলা জবাব দিল।

"কিসের জন্য?"

"বড় একটা আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য।"

আমি অবাক হয়ে দেখলাম শর্মিলার চোখে জল।

শ্বেতা, শর্মিলার চোখের জল আমাকে পাগল করে তুলল। আমি সবলে ওকে আকর্ষণ করে এনে বাহুমূলে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "কেন? কেন একথা বলছ?"

শর্মিলা কোন জবাব দিল না। শুধু মাথা নাড়া দিয়ে আমার বাহু-বেষ্টনীর মধ্য থেকে বেরোবার মৃদু চেষ্টা করল। আর একটি একটি করে মুক্তো-বিন্দু ওর গালের ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগল।

"শর্মিলা, আমাদের বিয়ের পথে কি কোন বাধা আছে", আমি মৃদুকণ্ঠে জিগেস করলাম।

"বাধা একমাত্র তুমি।"

"কেন?"

"তুমি যদি আশ্রয় না দাও।" বুকের কাছে মুখ রেখে পরম নিশ্চিন্তে শর্মিলা বলল।

এবার আমি হেসে ফেললাম।

"রাজকন্যার খেয়াল হয়েছে, ভোর-বেলা উঠে যার মুখ দেখবে তার গলাতেই মালা দেবে। তাই না শর্মিলা।"

"না গো না। তুমি তো জান না, কি এক আতঙ্ক আমাকে সব সময়েই ঘিরে রয়েছে, পাছে তুমি একদিন আমার ওপর বিরক্ত হয়ে চলে যাও।"

আচ্ছা ছেলেমানুষ তো!

"বেশ, তোমার মাকে তাহলে বলি?"

"আজ নয়। আজ আমার মনটাকে একটু গুছিয়ে নেবার সময় দাও। কাল এসো। আমি কিন্তু কাল বাড়ী থাকব না।"

শ্বেতা, সেদিন রাত্রে প্রাপ্তির এক নিবিড়তা আমার মনকে ভরিয়ে রেখে-ছিল। সমস্ত ভাবনা-চিন্তা যেন আমার শেষ হয়েছিল।

পরদিন সকালে মিঃ চৌধুরীর নোট পেলাম; সন্ধেবেলায় জরুরী কাজে দেখা করবার জন্য। ঠিক করলাম, শর্মিলার মায়ের সঙ্গে দেখা করে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করব। তারপর ভাবলাম, না। পরেই শর্মিলার মায়ের সঙ্গে দেখা করব। তাহলে ওঠবার তাড়া থাকবে না। ধীরে-সুস্থে বলা যাবে। বলা তো যায় না, উনি আমার কথা কি ভাবে নেবেন।

দুপুরে শর্মিলার চিঠি পেলাম চাকরের মারফৎ। উৎকণ্ঠিত চিত্তে চিঠি খুললাম।

"জানো, কাল রাত্রে কি হয়েছিল। আমি একটা বই হাতে নিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছি। পুবের কালো আকাশের ঝিকমিক তারা-গুলোর দিকে তাকিয়ে কি যে ভেবে চলেছি নিজেই জানি না। এমন সময় মা ঘরে ঢুকলেন। আমি টের পাইনি। মা আমার পাশে এসে বসতে আমি চমকে উঠলাম। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মায়ের চোখে-মুখে একটা উদ্বিগ্ন ভাব। মা তীব্র স্বরে জিগেস করলেন, "তোর কি হয়েছে বল তো?"

আমি চোখ নামিয়ে নিয়ে অস্ফুট স্বরে বললাম, "কিছু তো হয়নি।"

"কিছু হয়নি। দেখ মিলা, আমি তোর মা। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না।"

তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন, "বলবি না আমাকে! জ্বলে পুড়ে মরবি, তবু বলবি না। চোখের কোলে কালি পড়ে পড়ে কি চেহারা হচ্ছে, আর আমি মা হয়ে কিছু বুঝতে পারব না। হ্যাঁরে, ছোটবেলায় তো মাকে সব কথা বলা না হলে ঘুম হত না। এখন বুঝি মস্ত বড় হয়ে গেছিস। মাকে আর সব কথা বলা চলে না।"

জানো, আমি আর পারলাম না। তুমি হয়তো হাসবে। আমি মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেললাম। কাল আমার কি হয়েছিল জানি না।

সব কথা শুনে মা কি বললেন। উঃ তোমার সে কি—না, মশাই, কিছু বলব না। আর নিজের প্রশংসা শুনতে হবে না। আজ আসছো তো। আমি তোমার কাজ সবই প্রায় করে রেখেছি। দয়া করে তুমি এসে একবার আনুষ্ঠানিকভাবে বলবে, কেমন!

মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত আমার বাকি সময়টা অবলীলায় কেটে গেল। পশ্চিম আকাশে ফাগ-আবীরের মাতা-মাতি শুরু হতে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। আজ হঠাৎ নিজের পোশাকের পারিপাট্যের দিকে একটু সযত্ন দৃষ্টি দিয়ে ফেললাম এবং পরে লজ্জিত হলাম।

মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে সাধনবাবু ছিলেন। উনি আমাকে একটা নির্জন কক্ষে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "অজিত, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।"

"বলুন।" দুরুদুরু বক্ষে বললাম।

"তোমাকে অনেকদিন ধরেই দেখছি। আমি ব্যবসাদার মানুষ। লোক চিনতে আমার ভুল হয় না। তুমি যে কাজ করতে চাও তার ব্যবস্থা আমি করে দেব। কিন্তু তোমাকে দুটি ভার বহন করতে হবে।"

শুষ্ক কণ্ঠে বললাম, "কি বলুন।"

"আমার অর্ধেক ব্যবসার ভার এবং আমার একমাত্র মেয়ে শর্মিলার যাবতীয় দায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।"

যেখান থেকে সবচেয়ে বড় বাধা পাবার আশঙ্কায় আমি শর্মিলার মায়ের সাহায্য চাইছিলাম, এত সহজে সে দুর্গের তোরণ-দ্বার ধূলিসাৎ হয়ে গেল!

"আমি নিশ্চিন্ত হলাম অজিত। তুমি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে কাজের কথাটা সেরে বাড়ী চলে যাও।"

সাধনবাবু আর দাঁড়ালেন না। আমি মিঃ চৌধুরীর ঘরে আসতে আসতেই ওনার গাড়ীর আওয়াজ পেলাম।

"বোসো।" মিঃ চৌধুরী স্মিতহাস্যে শুরু করলেন, "প্রথমেই আমার অভি-নন্দন জানিয়ে রাখি। তুমি সাধনবাবুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হতে চলেছ। হ্যাঁ ভালো কথা, সাধনবাবুর একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য দরকার।"

"বলুন, আমি কি করতে পারি।"

"ব্যাপারটা হল—আমি সংক্ষেপেই বলি—সাধনবাবুর সম্মানরক্ষার দায়িত্ব এখন তোমার ওপরই নির্ভর করছে।"

মিঃ চৌধুরী যেন আমাকে কথাটা বোঝবার সুযোগ দেবার জন্য একটু থেমে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

"কি রকম?" বিস্মিত কণ্ঠে বললাম।

"তুমি বোধহয় জানো সাধনবাবুর ব্যবসার বিরাট একটা অংশ খাবারের মশলা প্রস্তুত সংক্রান্ত। ওঁর কারখানায় তৈরী নানারকমের লাখ লাখ টাকার মশলা দেশ-বিদেশে চালান যায়। উনি ওঁর ফ্যাক্টরীর কেমিস্টের পরামর্শে কয়েকটা নতুন ধরনের মশলা বাজারে ছেড়েছেন। সাধনবাবুর কিছু শত্রু বাজারে রটিয়ে দিয়েছে, ওগুলো মশলাই নয়, রং। সরকারী দৃষ্টিও এগুলির প্রতি পড়েছে। ওরা ফুড-এ্যানালিস্টকে দিয়ে এ্যানালিসিস করিয়ে অভিযোগ করছে যে ওগুলো রং মাত্র; মশলা মোটেই নয়। এখন আমাদের বক্তব্য, প্রথমতঃ, আমরা যে জিনিসটা দিচ্ছি সেটা ক্ষতিকারক নয়। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্য রং করবার জন্য যেমন জাফরান বা অন্য রং পাওয়া যায়, এগুলি সেই জাতীয়। তৃতীয়তঃ, একটা প্যাকেটের গায়ে হলুদ লেখা থাকলে সেটাকে যে হলুদ নামক মশলা হতেই হবে, হলুদ নামক রং হলে চলবে না, এমন কথা আইনের বইতে লেখে না।"

মিঃ চৌধুরী একটু থামলেন।

"এখন তোমাকে কোর্টে সাক্ষী দিতে হবে এই মর্মে যে, জিনিসটা ক্ষতিকারক নয়। বলা বাহুল্য, তুমি সাক্ষী দেবে আমার কথায় নয়। তুমি কেমিস্ট। জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখে নেবে। খাবারে যে সমস্ত রং ব্যবহার করা হয়, এগুলিতার মধ্যেই পড়ে। এই মামলার ওপর সাধনবাবুর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায়িক সুনাম, সব কিছু নির্ভর করছে।"

নিশ্চিন্ত মনে মিঃ চৌধুরী চেয়ারের পেছনে হেলে পড়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

"কিন্তু মশলার নামে রং বিক্রী করে লাভ কি?"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমি প্রশ্ন করলাম।

"লাভ-লোকসানের ব্যাপারটা ইক-নমিকস্-এর প্রশ্ন। তুমি কেমিস্ট, সেটা ঠিক বুঝবে না।"

মুচকি হেসে মিঃ চৌধুরী নাক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বার করতে লাগলেন।

একটু একটু করে এক ঘৃণিত, বিকৃত ভারতবর্ষের চেহারা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। তার হাতে ভিক্ষাপাত্র, কি অসহ্য রিক্ততায় সে আমার কাছে মনুষ্যত্ব ভিক্ষা করছে!

গুহা-যুগের অন্ধকারে বসে ওরা এখনও ব্যবসা করে চলেছে। ওরা জানে না গোটা দুনিয়ার পসারীরা আজ আলোর তলায় তাদের পসরার ডালা মেলে ধরেছে। মানুষের চলার পথ যখন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে প্রসারিত হচ্ছে, তখন আপন গ্রহেই পথের বাধা সৃষ্টি করে অচল অবস্থায় বসে আছে এক অবি-মৃষ্যকারী! সে-সব দেশের ব্যবসায়ীরা আপেলের ঋতুতে, আপেলকে আলুর চেয়ে শস্তা করে দেয়। বেদ-বেদান্তের দেশের লোকেরা বোধহয় শীতকালে আম খাওয়ানোর জন্য আমকে সযত্নে ঠাণ্ডা ঘরে সরিয়ে রাখে। বিজ্ঞান কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে এদেশের ছেলেরা দল বেঁধে চলে যায় বিদেশে। আর ফিরতে চায় না।

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি কখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। মিঃ চৌধুরী বোধ হয় ব্যস্তভাবে কি যেন বলেছিলেন। আমি শুনতে পাই নি। আমি হন-হন করে হাঁটতে হাঁটতে ফির-ছিলাম। আমার মনের সমগ্র চিত্রপট জুড়ে একটি রিক্ত মানচিত্র আর দু'টি কাজল চোখের সজল চাহনি সমানে ভেসে চলেছিল।

পরদিন শয্যাত্যাগ করে আমার নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হল। মনে হল, একটা মস্ত ষড়যন্ত্রের জাল থেকে যেন অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়েছি। কিন্তু শর্মিলাকে আমার ভীষণ অসহায় মনে হতে লাগল। ও যেন গতকাল সন্ধ্যা থেকে বারাণ্ডায় থামে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

শ্বেতা, তুমি হয়তো বলবে, এর জন্য শর্মিলা কেন শাস্তি পাবে? আমি কারোকেই শাস্তি দিতে চাই নি।

সেদিন ল্যাবরেটরীতে আমাদের পুরোনো বন্ধু বীরেশ এসেছিল। জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় কাজ করছিস এখন?"

ও একটা বিলিতি ফার্মের নাম করল।

"তুই আগে একটা দিশি ফার্মে ঢুকেছিলি না?"

"সাধন দত্তর ফ্যাক্টরীতে। এক নম্বরের শয়তান! আমার সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ের ঠিক করে ফেলেছিল, জালিয়াতির কারবার চালাবে বলে। আমিও কম ঘুঘু নই। মেয়েটাকে দুদিন খেলিয়ে স্রেফ কেটে পড়লাম।"

সে কি! এইটাই ওদের রেওয়াজ নাকি! শর্মিলাকে পুরোপুরি সন্দেহ করতে পারলে বেঁচে যেতাম। তীব্র একটা বিতৃষ্ণায় ওকে আমি ভুলতে চাইতাম। কিন্তু বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সন্দেহ এল ধীরগতিতে। একটু একটু করে সন্দেহ যত গ্রাস করতে লাগল আমাকে, ততই নিজেকে আমি ধিক্কার দিতে লাগলাম। মানুষের প্রথম প্রেমের সুযোগ নিয়ে ওরা আমাকে আমার কাছে ছোট করে দিল।

অশান্ত মন নিয়ে সায়েন্স কলেজের সিঁড়ি দিয়ে নামছি, হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে শর্মিলা।

সিঁড়ির মাথায় দুজনের দেখা হল। কতদিন পরে যেন ওকে দেখছি! যেন ও কত অপরিচিত হয়ে গেছে!

"কি ব্যাপার! সেদিন গেলে না কেন?" উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করল শর্মিলা।

আমি নীরবে নামতে লাগলাম।

"আমি ভাবলাম বুঝি শরীর খারাপ হয়েছে। কি ব্যাপার বলো তো? কথা বলছ না কেন? নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।"

শ্বেতা, শর্মিলার সে কণ্ঠে অনুরাগ ছিল।

"না, কিছু হয় নি। সেদিন যেতে পারি নি, বিশেষ একটা কাজে। আর তার পরেও যাওয়া হয় নি—ইয়ে—আর একটা কাজে—মানে—"

"বুঝেছি। চলো তো, কোথাও বসা যাক।"

"আমি এখন কোথাও বসতে পারব না।"

আমি যেন রুখে উঠলাম।

"কেন, কাজ আছে?

"হ্যাঁ।"

আমরা তখন সার্কুলার রোডের ফুট-পাথে এসে দাঁড়িয়েছি।

"বেশ এখানে দাঁড়িয়েই বলি। তুমি বোধহয় বিয়ের কথাটা নিয়ে খুব ভাবছ, তাই না।" শর্মিলা কোমল কণ্ঠে বলল, "হয়তো ভাবছ, বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে কি ঝামেলাতেই না পড়বে। একটা কথা বলি। আমি তো বাবার অর্ধেক সম্পত্তি পাব। তোমার অত ভাবনার কি আছে শুনি।"

শর্মিলা যেন অভিমান করে কথা শেষ করল।

রি রি করে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কি স্পর্ধা! তিক্তকণ্ঠে বলে ফেল-লাম, "তুমি কি শেষ পর্যন্ত পথে দাঁড়িয়ে বেসাতি শুরু করলে! আমার সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রেখ না।"

অভিভূত শর্মিলা অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পথের

মাঝে। আমি ওর দিকে দৃক্‌পাত না করে চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়লাম।

শ্বেতা, আর একটু আছে। মাস কয়েক পর সমরেশের একটা চিঠি পাই। ও লিখেছিল, "বাবা আপনার কাছে যে প্রস্তাব করেছিলেন তা আমরা অনেক পর জানতে পারি। বাবার বরাবরের ঝোঁক, ব্যবসায়ে সহকারী কোন একজনের সঙ্গে মিলার বিয়ে দেওয়া। মা কিংবা মিলার তাতে আপত্তি। কেন বুঝতেই পারছেন। আপনাকে মিলা সত্যিই ভালবেসেছিল; মা এক কথায় মত দিয়েছিলেন। মায়ের আশঙ্কা ছিল, পাছে আপনার সঙ্গে বাবার সংযোগ ঘটে। যোগাযোগ হতেই আমরা সবাই ভয় পেয়েছিলাম। কেননা, আপনাকে চিনতে আমাদের একটুও ভুল হয় নি। শুধু মিলা ভুল করেছিল শেষ দিনে আপনার কাছে ওকথা বলে। ও স্বীকার করেছিল, পাছে আপনি আর্থিক কারণে পেছিয়ে যান তাই আপনাকে নিঃশঙ্ক করতে চেয়েছিল। মুখে ওকথা বললেও ও কোনদিন পিতৃ-সম্পত্তি গ্রহণ করত না। করবেও না। স্কুলে বা কলেজে কাজ নিয়ে ও ওর বাকি জীবনটা কাটাবে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ও খুব সুখী। হয়তো এই অভিনয়টুকুই ওর সম্বল। এইভাবেই হয়তো ও বাবার ওপর সমগ্র জীবন ধরে প্রতিশোধ নেবে।

আপনাকে আমার কিছুই বলার নেই। শুধু, আমার বোনের সম্বন্ধে একটু ভুল ধারণা নিয়ে চলে যাবেন, এ আমার মনঃপূত হল না। তাই মিঃ চৌধুরীর মুখে আপনার ব্যাপারটা শুনে সব বুঝতে পারলাম। ভবিষ্যতে আপনাকে আর চিঠি লিখব না।"

এ চিঠি পাবার পরই আমি ফোন করেছিলাম। ফোন ধরেছিল শর্মিলাই। আমি কম্পিত কণ্ঠে বলেছিলাম, "শর্মিলা, আমি অজিত কথা বলছি।"

"ও আপনি! ভালো আছেন?" সেই চমৎকার অনুরণিত কণ্ঠস্বর।

"হ্যাঁ। তোমাদের খবর?"

"সব ভালো।"

"তোমার পড়াশোনা?"

"ভালোই চলছে।"

আর কি বলা যায় ভেবেই পাচ্ছিলাম না। ওদিক থেকে মিষ্টি কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল, "আর কিছু বলবেন?"

"না—মানে—"

"ঠিক আছে, তাহলে ছেড়ে দিচ্ছি। আর একটা কথা—"

আমি উন্মুখ হয়ে উঠলাম।

"আর কোনদিন আমাকে ফোন করবেন না, কেমন।"

যেন কত অনুরাগ-ভরা নির্দেশ।

শ্বেতা, শর্মিলার সেদিনকার কণ্ঠস্বরে যাদু ছিল কিনা জানি না। সে কণ্ঠস্বর আজও আমার কানে বাজছে।

বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। মরীচিকা মিলিয়ে গিয়ে আমার রিক্ত জীবনে শুধু জেগে রইলো আকণ্ঠ তৃষ্ণা।

মহাশ্বেতা, তুমি কি আসবে না আমার জীবনে করুণা-সুশীতল ঝর্ণাধারা নিয়ে। আজ সন্ধ্যায় মিলনের লগ্নে যখন মনের মধ্যে সানায়ের সাহানার মূর্ছনা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তখনও কি তুমি অপেক্ষা করে থাকবে অভিমানের বেড়ার ওধারে।

কল্লোল মজুমদার
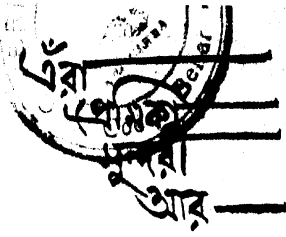
১৬১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম থেকে ক্রমাগত ত্রিশ বছরের যুদ্ধ ইউরোপের সমাজ-জীবনকে রুক্ষ-বিকৃত-একঘেয়ে করে তুলেছিল। বিভিন্ন ভূখণ্ডের মধ্যে একের পর এক যুদ্ধের উন্মাদনা মনুষ্যত্বের অসহ অবস্থানের সৃষ্টি করে চলেছিল। বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হত শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যশক্তি বৃদ্ধির জন্য। ইতিহাসের সেই দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায়ে অন্তত কয়েকজন মহিলার কথা উল্লেখযোগ্য। এ'রা নারীর পোশাক খুলে ফেলে পুরুষের ছদ্মবেশে যুদ্ধে যোগদান করতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্থ হন নি। গার্হস্থ্য জীবন এবং সৈনিক-জীবনের মধ্যে কোন মিল স্বভাবতই নেই। যুদ্ধক্ষেত্রের জীবন রুক্ষ এবং মরুময়। খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতায়, তীব্র শীতের উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবে, নিদারুণ মানসিক দুশ্চিন্তায় শিবির-জীবন ক্ষত-বিক্ষত ছিল। যে যুগে 'স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকই' নামের প্রবাদ-বাক্যটি সাধারণের কাছে বিশেষ প্রচলিত ছিল, সে যুগেও একাধিক মহিলা পুরুষের ছদ্মবেশে যুদ্ধে যোগাযোগ করতে পশ্চাদপসরণ করেনি। একটু আশ্চর্যের বিষয় বৈকি। অধিকাংশের উদ্দেশ্য ছিল, স্বামী অথবা প্রণয়ীর সন্ধান। এ'দেরই দুজনের কথা সমগ্র ইউরোপে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়েছে। একজন ক্রিস্টিয়ান ডেভিস, অপরজন হ্যানা স্নেল।

ক্রিস্টিয়ান ডেভিস :

এক সরাইখানার অধিকারিণী ক্রিস্টিয়ান ডেভিস বিবাহ করেছিলেন নিজেরই এক কর্মচারীকে। বিবাহের চার বৎসর পরে স্বামী রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করেন। এর এক বছর পর তিনি স্বামীর এক পত্র পান। পত্র পাঠের পর তিনি জানতে পারলেন যে, স্বামী সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য হয়েছেন এবং মার্লবোরোর পক্ষে চতুর্দশ লুই-এর বিরুদ্ধে ফ্লেন্ডার্সে যুদ্ধে রত। অবিলম্বে ক্রিস্টিয়ান বন্ধু-বান্ধবের হাতে শিশুসন্তান এবং সরাইয়ের দায়িত্ব অর্পণ করে ক্রিস্টোফার ওয়েলসের পদাতিক সৈন্যবাহিনীতে পুরুষের ছদ্মবেশে যোগদান করেন। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে ক্রিস্টিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হন এবং সাময়িকভাবে যুদ্ধ-বন্দী থাকেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে রিসউইকের শান্তি মিশনের পর অবরোধ ভেঙে গেলে তিনি ডাবলিনে প্রত্যাবর্তন করেন। চার বৎসর পর আবার যুদ্ধ শুরু হল এবং তিনি পুনরায় সেনাদলে যোগদান করলেন। ১৭০৪ সালে ব্লেনহিমে যুদ্ধ ঘোরতর আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যে ক্রিস্টিয়ান তিনবারেরও বেশী আহত হন।

অবশেষে তের বছরের প্রতীক্ষার পর তিনি স্বামীর সন্ধান পেলেন। তাঁর অনুরোধে স্বামী রিচার্ড স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করেন নি। তিনি শিবিরে স্বামীর বহুদিনের হারানো-ভাই রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। অল্পদিন পরেই বোমার শেলের আঘাতে ক্রিস্টিয়ানের মাথার খুলি চরমভাবে ক্ষত হয়। উক্ত ক্ষতের অপারেশনের সময় অকস্মাৎ তাঁর নারী-পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অতঃপর সাময়িকভাবে তিনি বরখাস্ত হন। পরে রিচার্ডের পত্নী হিসাবে পুনরায়

হ্যানা স্নেল

ক্রিস্টিয়ান ডেভিস

শিবিরে আশ্রয় পান। ১৭০৯ সালে ম্যাল্‌পাকোটের যুদ্ধে রিচার্ডের মৃত্যু হয়। রণক্ষেত্রের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের মধ্য থেকে তিনি নিজেই স্বামীর ক্ষতবিক্ষত দেহ সনাক্ত করেন। এই খ্যাতনামা মহিলা-যোদ্ধার শোকার্ত বিলাপে সেদিন শিবিরের প্রতিটি প্রাণীর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল।

তিন মাসের মধ্যেই তিনি পুনর্বার বিবাহ করেন এবং তাঁর দ্বিতীয় স্বামীও এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। দু বছর পরে বর্তমান জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। রাণী অ্যানা এই মহিলা-যোদ্ধার প্রতি সদয় হয়ে প্রতিদিন এক শিলিং পেনসন মঞ্জুর করেন। দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য ডাবলিনের সম্পত্তির পুনরুদ্ধার অসম্ভব ছিল। পুরুষালী কাঠিন্য থাকা সত্ত্বেও ক্রিস্টিয়ান আকর্ষণীয় ছিলেন। অবশেষে ডেভিস নামক একটি সৈনিক মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন, তাঁর পরবর্তী পঁচিশ বছরের জীবন সুখপ্রদ হয়নি। অমানুষিক দৈহিক পরিশ্রমে তিনি স্কার্ভি ও ড্রপ্‌সি রোগে আক্রান্ত হলেন, তাঁর দারিদ্র্যই তাঁকে উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ দিতে অক্ষম হল। ঐতিহাসিক চেলশা হাসপাতালের একটি কক্ষে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেও অসুস্থ স্বামীকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এর চারদিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর অনুরোধে মৃতদেহ চেল্‌শা হাসপাতালের সমাধিস্থলে চিরনিদ্রায় শায়িত হয় এবং তাঁর সম্মানকল্পে তিনবার তোপধ্বনি শহরের আকাশ-বাতাসকে করুণ রসে সিক্ত করেছিল।

হ্যানা স্নেল :

হ্যানা স্নেলের জীবনের সামরিক কার্যে যোগদানের অংশটুকু ক্রিস্টিয়ান ডেভিসেরই প্রায় অনুরূপ। শিশুকে পরিত্যাগ করে স্বামীর সন্ধানে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ওলন্দাজ-স্বামী লজ্জাকরভাবে হ্যানার জীবনকে নিপীড়িত করেছিল। হ্যানার সামরিক জীবন খুব দীর্ঘ নয়। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্‌ গ্রে নামে পুরুষের ছদ্মবেশে পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে তিনি কার্লিস অভিমুখে গমন করেন। পথে কোন একটি কারণে বাহিনীর জেনারেলের কাছে দোষী সাব্যস্ত হন। ফলে সামরিক নীতি অনুযায়ী ছ'শো বেত্রাঘাতে জর্জরিত হ'ন। পথের অবশিষ্ট অংশ তাঁর নিদারুণ মানসিক দ্বন্দ্বে অতিবাহিত হয়। পোর্টস্মাউথে পৌঁছে হঠাৎ তিনি সামরিক বাহিনী পরিত্যাগ করে একটি নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অভিমুখে গমন করেন। ১৭৪২—৪৮-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার জয়লাভের সময়ে ভারতের ফরাসী উপনিবেশের উপর হ্যানার বাহিনী আক্রমণ চালায়। কিন্তু সে আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় নৌ-বাহিনী আরাপঙ্‌-এর নিকটবর্তী সৈন্যশিবিরে সৈন্যশক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রেরিত হয়। মার্চ মাসে হ্যানা হঠাৎ পণ্ডিচেরীতে গুলিবিদ্ধ হন। এ' এক নূতন সমস্যা। সেনাবাহিনীর সার্জন-এর দ্বারা অপারেশন করাতে গেলে নারী-পরিচয় প্রকাশের সম্ভাবনা। তিনি গোপনে এক ভারতীয় মহিলার সন্ধান করলেন এবং তাঁর সাহায্যে নিজের ক্ষতের যথাসাধ্য চিকিৎসা সম্পন্ন করেন। এরপর বিভিন্ন জাহাজে নাবিক-রূপে তিনি কার্য গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী-সুলভ চাহনির জন্য সহকর্মী পুরুষেরা তাঁকে বিরক্ত করতো এবং উপহাস করে "মলি" নামকরণ করেছিল। তবুও তাঁর গোপনীয়তার অন্ধকারে প্রবেশ করতে কেউই সক্ষম হয় নি। ইতিমধ্যে 'জেনোয়া'য় তাঁর স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি নাবিক-জীবন পরিত্যাগ করতে বদ্ধ-পরিকর হন। তাঁর বর্তমান জাহাজটি গ্র্যাভেসেণ্ডে গমন করার পর তিনি পুরুষের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করেন এবং কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা লিখিত-ভাবে প্রকাশ করতে মনস্থ করেন। ১৭৫০-এর জুন মাসে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। পুস্তকের নাম ছিল 'দ্য ফিমেল্‌ সোলজার' বা 'দ্য সারপ্রাইজিং অ্যাডভেঞ্চার অব্‌ হ্যানা স্নেল'। অবসর জীবনে তিনি সরকার থেকে পেনসন পেয়েছিলেন, চেল্‌শা থেকেও তাঁর ক্ষতের জন্য একটা ধারাবাহিক বৃত্তি হত। ওয়েপিং-এ দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে তাঁর পরবর্তী কয়েকটি বছর অতিবাহিত হয়।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মানসিক রোগে আক্রান্ত হ'ন। যুদ্ধক্ষেত্রের রক্ত-লোলুপতা, বীভৎস জীবন-দর্শন এবং পাশবিক কার্যকলাপই সম্ভবত এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্য করেছিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী এক মানসিক হাসপাতালে উনসত্তর বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর নিজের ইচ্ছায় চেল্‌শা হাসপাতালের সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁর মৃতদেহ চিরশান্তিতে শায়িত।

গেরাসিম লেবেডেফ

মিখাইল মেড্‌ভেডেভ

... আট বছর আগে এ্যাডমিরাল এ এস মিসকোভের বিভিন্ন কাগজপত্র দেখতে দেখতে একটি সুন্দর চামড়া-বাঁধাই খাতা আমার নজরে এসেছিল। বিদেশী ভঙ্গিতে অভিজ্ঞাত ভাষায় সেই খাতার প্রথম অঙ্কে কয়েকটি শব্দ লেখা ছিল, তার নীচেই ছিল শব্দগুলির রুশ অনুবাদ :

"বইটি 'বিড সুন্দর' নামে পরিচিত। এর অর্থ 'জ্ঞানের সৌন্দর্য'।" বীর সিংহের কন্যা বিলড সুন্দরের বিবাহ-উৎসব উপলক্ষ্যে ভরতচন্দ্র রায় এটি রচনা করেছিলেন।

"কলকাতায় এটির অনুসরণে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন গেরাসিম লেবেডেফ।"

পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত কাল অনুযায়ী বোঝা যায় যে, লেবেডেফ এটি ১৭৯৪-৯৫ সালে অনুবাদ করেন। অর্থাৎ আফানাসি নিকিতিনের কালে কোন ব্যক্তি ভারত-পরিভ্রমণ করেন এবং বইটি সর্বপ্রথম বাংলা থেকে রুশ ভাষায় তর্জমা করেন। সে মানুষটি কে ছিল?

স্বভাবতঃই এই প্রসঙ্গে আমি গেরাসিম লেবেডেফ নামে এক সঙ্গীতজ্ঞের জীবন অনুধাবনে সচেষ্ট হলাম। বহু প্রতিভাধারী সুপণ্ডিত এই ভদ্রলোকের বহু পরিলেখ ছিল। যেমন—একাধারে তিনি ছিলেন চমৎকার উদার ব্যক্তি, সুরকার, নাট্যপণ্ডিত ও ভৌগোলিক তেমনি অপরদিকে অনুবাদক, প্রাচ্যদেশবিশেষজ্ঞ এবং ক্লান্তিহীন জ্ঞানান্বেষী পর্যটক।

১৭৮৫ সালের ২৮শে জুলাই "রডনি" নামক এক জাহাজ তাঁকে মাদ্রাজের বিস্তৃত বালুকাপোতে নামিয়ে দেয়। সেই সুন্দর ধুলো-বালির মাটির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লেবেডেফ মনে মনে প্রায় নিশ্চিন্ত হলেন যে, তিনিই বোধহয় প্রথম রুশ-বাসী যিনি সর্বপ্রথম ভারতের মাটি স্পর্শ করছেন। আর তাই তখন থেকেই এই মহান দেশের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক উৎসধারা আবিষ্কারের স্বপ্নে তিনি মশগুল হয়ে পড়লেন।

মাদ্রাজে প্রথম দু' বছর সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করে তাঁকে কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে হয় কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য পরিপূরণের জন্য অর্জিত অর্থ যথেষ্ট ছিল না। যা হোক, কাজের ক্ষেত্রে ইউরোপ আগন্তুক ও স্থানীয় অধিবাসীদের নানান বাধা ও অবজ্ঞার এক অসহনীয় দুর্ভেদ্য প্রাচীর তাঁর গতিধারাকে বাধা দিতে লাগল। এমনকি এই বাধা সুন্দর ভদ্রতার মুখোশেও নিহিত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার সাংকেতিক লিপি শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ এমন একজন ভারতীয় পণ্ডিত পেতে তাঁর দু' বছর লাগল।

বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতের সুপণ্ডিত শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পূর্বমুহূর্তেও তিনি প্রায় তাঁর সব আশাই ত্যাগ করেছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ গোলকনাথের সঙ্গীতের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল, ঠিক যেমনটি লেবেডেফের ছিল ভারতীয় ভাষাশিক্ষার আকুল তৃষ্ণা।

বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ ও ভারতীয় পাটীগণিত শিখতে তিনি ছ' বছর ব্যয় করলেন।

ভারতীয়দের সুরসিক মন ও রসের প্রতি তীব্র আসক্তি দেখে তিনি গিওড্রেলার কৌতুক নাটক 'প্রিটেন্স' বাঙলাতে তর্জমা করা স্থির করলেন। নাটকের ঘটনার স্থান স্পেন থেকে ক'লকাতায় এবং চরিত্রাবলীর নামকরণ ভারতীয়দের মত করলেন। তর্জমার সমস্ত কাজ সমাপ্ত করে তিনি মনে মনে বুঝলেন যে, অনূদিত কৌতুককর স্থানসমূহ অত্যন্ত রসপ্রাঞ্জল হয়েছে। পণ্ডিত গোলকনাথ তর্জমাটি পড়ে হাসিতে ফেটে পড়লেন। তিনি বললেন যে, যদি তিনি এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার ইচ্ছা রাখেন তবে সেই মত অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনুসন্ধান তিনি করতে পারেন।

লেবেডেফ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কালক্ষেপ না করে তখনই তিনি তাঁর ইংরেজী পরিচয়কের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করলেন। কিন্তু তিনি জানতে পারলেন যে, এই ধরনের কাজ করা হতাশাব্যঞ্জক রূপ নিতে পারে, এমনকি বিপজ্জনকও হতে পারে। কেননা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাট্য প্রযোজক এটি ক্ষতিকর পদক্ষেপ বলে মনে করতে পারেন এবং তাদের গভীর লক্ষ্যও লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যেতে পারে ইত্যাদি।......

অগত্যা লেবেডেফ স্থির করলেন নিজের অর্থেই এবং নিজের নক্সা-মাফিকই ক'লকাতার বুকে একটি রঙ্গালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন।

তখন তাঁর প্রয়োজন এক স্থপতি, কর্মাধ্যক্ষ, মঞ্চ-পরিচালক এবং ইংরেজী ব্যঞ্জনায় অনভিজ্ঞ সুরকার ও সঙ্গীত-শিক্ষক। লেবেডেফ নিজেই রঙ্গালয়ের দৃশ্যাবলী আঁকলেন। মস্কোর রঙ্গালয়ে কাজ করার সময় বন্ধু ফিওডের ভলকভকে এই ধরনের কাজ করতে দেখেছেন। ......

শীঘ্রই ডুমতোলা স্ট্রীটের নব-নির্মিত রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হল। অনেক দূরবর্তী গ্রাম থেকেও দর্শক ভিড় করে এল। দর্শকদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকেই সেই নাটক পরিপূর্ণ করল। দর্শকদের জন্য তিনশত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু আসলে উপস্থিত দর্শকদের এক-তৃতীয়াংশও আসন পায়নি। ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর ইউরোপীয় প্রতিকৃতিতে ভারতীয় থিয়েটারের জন্মদিন।

এই শুভ উদ্যোগ ভারতীয়দের অন্তঃস্থল নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছিল এবং তাঁর সামনের দুস্তর বাধা-সমূহও সরে গেছিল। সুপরিচিত সংখ্যা-তত্ত্ববিদ ও গণিতজ্ঞ ভারতীয় জীবন-ধারার রহস্য রুশ দিনপঞ্জীতে এঁকে রাখলেন। পণ্ডিতও তার বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে তাঁদের দেশীয় সংস্কৃতির ধারা আর গোপন রাখলেন না। লেবেডেফ লিখে রাখলেন তাঁর একটি ডায়েরীতে: "ইংরেজী নয় হিন্দুস্থানী ভাষার জন্যই ভাবীকালের উত্তরাধিকারীরা আমাকে স্মরণ রাখবে—এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম...।"

তাঁর সাফল্য ইংরেজী রঙ্গালয়ের মালিকদের ঈর্ষা উৎক্ষিপ্ত করল ও ইংরেজী আদর্শবাদীদের মধ্যে মন্দ ধারণার উন্মেষ ঘটাল।

তাঁর শত্রুরা তাঁকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ শুরু করল। তাঁর অভিনেতৃ-বর্গকে থিয়েটার পরিত্যাগ করতে প্রলুব্ধ করতে লাগল। তাঁর সম্পর্কে জঘন্য কুৎসা রটনা করতে লাগল এবং তাঁর মঞ্চ-পরিকল্পনাকারী জোসেফ বাটলকে নিজেদের দলে বিচ্ছিন্ন করে আনবার হীন চেষ্টা করতে লাগল। এবং পরিশেষে কয়েকজন তাঁর রঙ্গালয়ে অগ্নিসংযোগ করল।

* * *

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "লর্ড থারলভ্" জাহাজের ক্যাপ্টেন গঙ্গা নদীতে ক'লকাতার উপকণ্ঠে অবস্থান করছিলেন। খোলা খামে, নিভাঁজ একটি পত্র পেলেন গভর্ণর জেনারেলের কাছ থেকে :

"ক্যাপ্টেন উইলিয়ম টমসন, কমাণ্ডার 'লর্ড থারলভ।"

"মহাশয়, ইউরোপ-পরিভ্রমণের জন্য গেরাসিম লেভেডেফকে জাহাজে গ্রহণ করা ও তাঁর প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে সাহায্য করার জন্য অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।"

"বৃদ্ধ গভর্ণর মনে করেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি সর্বহিতৈষী সংস্থা", ক্যাপ্টেন তাঁর সহকর্মী উইলসনকে আক্ষেপ করে বললেন। ভাবতে বললেন যে, তাঁদের খরচায় আর একজন অচেনা লোককে নাকি স্থান দিতে হবে।

ভারতবর্ষে তাঁর বারো বছর জীবনের অমূল্য দলিলতথ্যের ছোট্ট তল্পিটা নিয়ে লেবেডেফ কেবিনের এক কোণায় আশ্রয় নিলেন। আর গত কয়েক বছর যাবৎ ইংরেজরা তাঁর বিরুদ্ধে যে সব কর্মকাণ্ড করেছিল তা অনুসরণ করতে লাগলেন। রঙ্গালয় বিক্রি করে যাবতীয় ব্যয়ের পর এখন তিনি কপর্দকশূন্য। এমন কি ইউ-রোপে যাওয়ার ভাড়া পর্যন্ত তাঁর নেই। দেনার দায়ে আইনজ্ঞরা একমাত্র তাঁর বই ও ডায়েরীগুলিই রেহাই দিয়েছিল।

১৭৯৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর 'লর্ড থারলভ' ভারত মহাসাগরের উপর
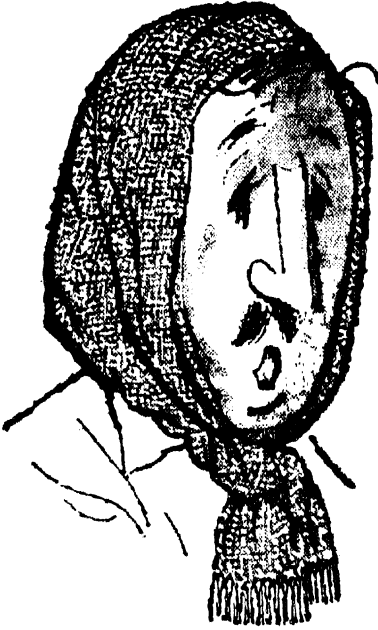
দিয়ে ভাসল। আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে চার মাস পরে জাহাজটি ইংলণ্ডে পৌঁছাল কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, "গেরাসিম লেবেডেফ" যাত্রী-তালিকার কোথাও নেই।

* * *

"আমরা ১০ই ডিসেম্বর যাত্রা করলাম।" লেবেডেফ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন। "১১ই, ১৭ই ও ১৯শে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অফিসারদের সঙ্গে খেলা করার আমন্ত্রণ আমি পেলাম। ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আমি জাহাজের খালাসী বিলিকে আমরা কত দ্রাঘিমাংশে অবস্থান করছি তা জিজ্ঞাসা করলাম।

আমাকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেখে ক্যাপ্টেনের প্রথম সহকারী অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে আমাকে এ রকম বাজে কথা জিজ্ঞাসা করার কারণ জানতে চাইল। আমি যেহেতু তার সঙ্গে কথা বলছিলাম না সেই হেতু তার প্রশ্নের জবাব দিতে কালক্ষেপ করছিলাম এবং তাকে একই প্রশ্ন পুনরায় করলাম।

"আশা করি এই প্রশ্ন করে আপনাকে নিশ্চয়ই অপমানিত করিনি?"

"আদৌ না।" তিনি বললেন কিন্তু পরমুহূর্তেই অতর্কিতে মিঃ উইলসন আমাকে ঘুসি মেরে ফেলে দিলেন। যাত্রীরা আমাকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছিল কিন্তু তিনি আমাকে এলোপাথাড়ি মেরে টানতে টানতে এনে ফেললেন ডেকের উপর। আমাকে এভাবে অমানুষিক নির্যাতন করতে না করার অনুরোধ করতেই উল্টে তিনি আমাকে শাসালেন যে, আমাকে শিকল দিয়ে আটকে রাখা হবে।

"ক্যাপ্টেন টমসন এ ব্যাপারে প্রায় কিছুই বললেন না। এ রকম নির্যাতনের কোন কারণ দর্শালেন না। উপরন্তু আমাকে ডেকের কোয়ার্টারে যেতে নিষেধ করা হল। তারপর থেকে আমার উপর যে সব অকথ্য ব্যবহার করা হতে লাগল তা আমি বর্ণনাও করতে পারব না।"

উত্তমাশা অন্তরীপের পথে লেবেডেফ ওষুধ-পথ্য চিকিৎসাবিহীন ও প্রায় অনাহারে ছয় সপ্তাহ কেবিনে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্যাপ্টেন মিঃ টমসনের মাধ্যমে লেবেডেফের প্রতিভাদীপ্ত জীবন ধ্বংসের চেষ্টা যে কোন লোকেরই অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হওয়া স্বাভাবিক। এর কারণ কি? এর কারণ তিনি জাতিতে রুশ, এবং ভারতবর্ষ থেকে আহরিত অভিজ্ঞান ও কাগজপত্র হস্তচ্যুত করতে তিনি রাজী হননি।

১৭৯৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী, 'লর্ড থারলও' কেপটাউনে নোঙর করল। পরদিন, যদিও লেবেডেফ অসুস্থ এবং কপর্দকশূন্য তবু তাঁকে সেই অবস্থায় সেখানে নামিয়ে দেওয়া হল। ক্যাপ্টেন টমসন তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করলেন যে, যদি আবার তিনি জাহাজে চাপার চেষ্টা করেন তবে তাঁকে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হবে।

চৌদ্দ মাস অতিবাহিত হল।

১৭৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক প্রত্যুষে দিল্লি থেকে আগত একটি কোচ লণ্ডন স্ট্রীটে এসে থামল। দীর্ঘকায় রৌদ্রদগ্ধ এক ভদ্রলোক তা থেকে নামলেন এবং সরাইখানার একটি ঘর ভাড়া নিলেন। তিন দিন সেখানে অতিবাহিতের পর লণ্ডনের সংবাদপত্রসমূহে তাঁর পৌঁছানো সংবাদ প্রচার করল।

"এক রুশ সংগীতকার ভারত থেকে সর্বশেষ আগত জাহাজে এসে পৌঁছেছেন। হিন্দুস্থানী ও বাঙলা তথ্য ও লোককলা তিনি লণ্ডনে প্রচার করতে ইচ্ছুক। ঐ ভাষাগুলি সম্পর্কে আমরা প্রায় অজ্ঞান। তিনি সেই ভাষা ও সংগীত সম্পর্কে সুজ্ঞানী। চারুকলার দিক থেকে ঐ ভাষাগুলির সুর ও আবেগ ইটালীয় ও স্কটিশ সংগীতের সংমিশ্রিত সুরের মতন।"

লণ্ডন থেকে লেবেডেফ প্রথম জার প্যাভেলকে একটি পত্র লিখলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, জার তাঁকে পুনরায় আহ্বান করবেন। গ্রীষ্মাবকাশে লেবেডেফ কিন্তু আমন্ত্রণ পেলেন ইউরোপের বিভিন্ন শহরের সংগীতপ্রিয় নাগরিকদের কাছ থেকে। প্যারিস, স্ট্রাসবার্গ, র্যার্লিস ও বুসেল্‌স, ডানকার্ক ও আমস্টারডাম থেকে তিনি প্রচুর আমন্ত্রণ পেলেন।

এই ধরণের আনুষ্ঠানিক সফলতা এর পূর্বে তিনি ভারতবর্ষ ও কেপটাউনে লাভ করেছিলেন এবং কিছু অর্থও উপার্জন করেছিলেন। এবং তা থেকেই এক বছরকাল তিনি আফ্রিকাতে অবস্থান করতে পেরেছিলেন—সে দেশের রীতিনীতি ও উপজাতীয়দের আদবকায়দা সম্পর্কে গবেষণা করতে পেরেছিলেন।

তাঁর প্রিয়ভূমি রাশিয়ার উপকণ্ঠে লণ্ডনে তিনি অবস্থান করছিলেন, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য স্বদেশবাসীরা আন্তরিক সাহায্য করবে এই ধারণা মনে পরিপোষণ করেছিলেন।

কিন্তু তাদের সাহায্যের অপেক্ষায় থেকে থেকে তিনি ব্যর্থ হলেন।

জারের রাজদূত কাউন্ট ভোরণ্টসন্ তাঁর জন্য কিছুই করতে পারলেন (না, করলেন না?) না। কিন্তু যে মুহূর্তে উন্মাদ বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু-সংবাদ লণ্ডনে এসে পৌঁছাল, লেবেডেফ সেই মুহূর্তে কোন ভ্রুক্ষেপ না করেই সেণ্টপিটার্সবুর্গ অভিমুখে রওনা হলেন।

* * *

বাড়ীতে অনলস পরিশ্রমে বৈদেশিক ব্যাপার গবেষণায় নতুন জীবন শুরু করলেন।

দিনে দিনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ও স্বাস্থ্য অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসছিল। বিশেষ করে স্বদেশবাসীদের ভারতীয় দর্শন ও পৌরাণিক তত্ত্বের কাহিনী বলতে বলতে আরো দুর্বল হয়ে আসতে লাগলেন। তাঁর অদম্য ইচ্ছা ছিল ভারতীয় রূপকথা, গাথা যেমন 'হিতোপদেশ' ইত্যাদি পাণ্ডুলিপির রুশ তর্জমা করেন। কিন্তু তাঁর জীবিকা-পোযোগী আয় এত ক্ষীণ ছিল যে, পরিবার চালিয়ে ছাপাখানা তৈরীর কোন বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ছিল না। এগারো বছর অতীত হয়ে গেল আর তাঁর আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল।

রাতে যখন তিনি জ্বরাগ্রস্থ অবস্থায় অনিদ্রায় ভোগেন, তখন অতীতের ভ্রমণ অভিজ্ঞান সঞ্চয়ের সমস্ত স্মৃতি ভুলতে নিরন্তর চেষ্টা করেন।

নবতম রুশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডারকে তিনি পত্র লিখে জানালেন যে, রুশ দেশের জন্য তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার সঞ্চয় করে রেখেছেন। "সেণ্টপিটার্সবুর্গে অবিলম্বে একটি ভারতীয় ভাষাশিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন আর আমার সঞ্চয়িত পাণ্ডুলিপিগুলিও প্রকাশ করা প্রয়োজন। ছাপার জন্য সেগুলি প্রস্তুত আছে।"

* * *

গেরাসিম লেবেডেফ......এই নাম পড়ে ওঠা নতুন রাশিয়াতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই উচ্চারিত হয়। এই রুশজ্ঞানীর জীবন-গবেষণাকালে আমার সহযোগী বন্ধু চলচ্চিত্র-শিল্পী মাডাম দেবিকারাণী বললেন যে, গেরাসিম লেবেডেফের নাম প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ই অবগত। সম্প্রতি বিখ্যাত চিত্রকর স্ভ্যাতোস্লাভ রিউরিচ-এর মারফৎ লেবেডেফের ভারতে লেখা সর্বশেষ পত্রটি আমি পেলাম। এই বছর তাঁর বহু রচনা ও পত্রাবলী ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক মৈত্রী উপলক্ষে প্রকাশিত হবে।

তাঁর সমাধির প্রস্তরফলকে তাঁরই লেখা এই কথাগুলো খোদিত ছিলঃ

'রুশ সমাজকে একমাত্র আনন্দদান বা নিছক মানবতার খাতিরেই জীবনে এত কাজ করিনি, রচনা সংস্কৃতির সার্বিক উন্নয়নই ছিল আমার সবকিছু কাজের লক্ষ্য।'

অনুবাদ : চিররঞ্জন দাস

কলারসিক

॥ একটি ঐতিহাসিক চিত্র-প্রদর্শনী ॥

কলকাতার শিল্পরসিক মানুষের কাছে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ, অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র-নন্দলালের পর যে শিল্পী বাঙলার শিল্প-জগতে একদা খ্যাতি ও সম্মানের শীর্ষচূড়ায় অবস্থান করেছেন, যিনি পেয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ, দীর্ঘকাল পরে তাঁর চিত্রকলার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন পার্ক স্ট্রীটের আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীর কর্তৃপক্ষ। ১৯২৮ সালের পর বাঙলার প্রবীণ শিল্পী মুকুল দে'র 'ড্রাই পয়েন্ট এচিং' ও কিছু স্কেচের এই প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়ে তাই কলকাতার শিল্পরসিক মানুষ সত্যিই খুশী হয়েছেন।

একদা 'বেঙ্গল স্কুল অফ পেন্টিং' বলে যে রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল শিল্পী মুকুল দে তারই ঐতিহ্যবাহী। শুধু তাই নয়, বাঙলা দেশে 'ড্রাই পয়েন্ট এচিং'-এরও তিনি প্রবর্তক। ১৯১৬ সাল থেকে তিনি একটি তীক্ষ্ন হীরক-বিন্দু বিশিষ্ট কলমের সাহায্যে তামার পাতে রচনা করে চলেছেন যে চিত্রমালা তারই মুদ্রিত চিত্রলিপিই এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। শিল্পী মুকুল দে রেখার শিল্পী। তাঁর অনবদ্য রেখার ছন্দিত টানে ১৯১৬ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত রূপায়িত হয়েছে অসংখ্য বিষয়বস্তু। ১৯১৬ সালে অঙ্কিত 'গঙ্গার উপর' (৬৩), ১৯১৭ সালে অঙ্কিত 'জোড়াবাগান' (৮৭), ১৯২০ সালে অঙ্কিত 'অজন্তার পথে' (৪৯), ১৯২৬ সালে অঙ্কিত 'আইনে-স্টাইন' (৯৬), ১৯২৮ সালে অঙ্কিত 'সবরমতী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধী' (৭১), ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'গৃহহীন' (৪৫) কিংবা ১৯৬৩ সালে রচিত 'সিদ্ধার্থ গণেশ' (৬৫)—এই জাতীয় বিষয়বস্তু নিয়েই তাঁর শিল্প-মনের চিন্তা-ভাবনা প্রধাবিত। অর্থাৎ, প্রতিকৃতি, নিসর্গদৃশ্য, লোক-কাহিনী কিম্বা ভারতীয় মহাকাব্যের বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা নিয়েই শিল্পী মুকুল দে 'বেঙ্গল স্কুল অফ পেন্টিং'-এর ঐতিহ্যে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন। এই বিশেষ রীতি-পদ্ধতি নিয়ে আজ হয়তো প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। এর ভাল-মন্দ নিয়েও বিচার-বিশ্লেষণ হয়তো অযৌক্তিক হবে না। অথবা, বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে যাঁরা বিমূর্ত শিল্প-চেতনায় স্নান করেছেন তাঁদের কাছে শিল্পী মুকুল দে 'সেকেলে' বলে অভিহিতও হতে পারেন। কিন্তু একটা কথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। শিল্পী মুকুল দে যে-যুগে শিল্প-চর্চায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, সে-যুগের প্রেক্ষা-পটেই তাঁর সৃষ্টি-কর্ম বিচার্য। এবং সেই বিচারে আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারি তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। শিল্পী মুকুল দে তাই শিল্প-চর্চার ইতিহাসে যেমন উল্লিখিত হবেন, নানা কারণে তাঁর চিত্রকলাও ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে আমাদের কাজে লাগবে। এ-কথা বিবেচনা করেই আমরা এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই। সম্ভব হলে ভবিষ্যতে শিল্পী মুকুল দে'র বিভিন্ন মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রমালার মধ্য থেকে বাছাই করে একটি নির্বাচিত চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করতে আমরা উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করছি।

॥ শ্রীমতী শানু লাহিড়ীর চিত্রকলা ॥

শিল্পী শানু লাহিড়ীর নাম কলকাতার শিল্পরসিক মানুষদের কাছে বেশ পরিচিত। অবশ্য প্রায় সাত বছর আমরা শ্রীমতী লাহিড়ীর কোন প্রদর্শনী দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। বিশেষ করে দীর্ঘকাল প্যারিসে শিল্পশিক্ষান্তে ফিরে আসার পর তিনি নীরব ছিলেন। সেই নীরবতা ভঙ্গ করে গত ১৬ই নভেম্বর ক্যাথেড্রাল রোডের আকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে তাঁর বত্রিশ-খানা চিত্র নিয়ে তিনি সশরীরে আমা-দের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে দেখে খুশী হয়েছি কিন্তু যে আশা নিয়ে তাঁর চিত্রকলা দেখতে গিয়েছিলাম, সত্যি কথা বলতে কি তা দেখে ততটা খুশী হতে পারিনি। এর কারণ এই নয় যে, শ্রীমতী লাহিড়ীর চিত্ররচনায় মুন্সিয়ানা নেই কিংবা যে-চিত্র তিনি প্রদর্শন করেছেন তার মান খুব সাধারণ স্তরের। না, আমার বক্তব্য তা নয়। কিন্তু শ্রীমতী লাহিড়ীর যে চিত্রকলা দেখলাম, আমার বারংবার মনে হচ্ছিল, তা যেন ইতিপূর্বে আমি অন্ততঃ একাধিকবার দেখেছি। অন্য কোথাও নয়, তাঁরই স্বনামধন্য শিল্পী-ভ্রাতা শ্রীনীরোদ মজুমদারের প্রদর্শনীতে। শুধু তাই না, নীরোদ-বাবুর ভক্ত-শিষ্য তরুণ শিল্পী বিজন চৌধুরী ও প্রকাশ কর্মকারের চিত্র-প্রদর্শনীতেও এরই রকমফের দেখার সুযোগ ঘটেছে একাধিকবার। সেই রামায়ণ-মহাভারত-ভিত্তিক বিষয়বস্তু, সেই একই রেখার জাল শ্রীমতী লাহিড়ীর চিত্রকলার পরম অন্বিষ্ট বলে কেন মনে হল তা আমার জানা নেই। তবে মোটামুটি একই রীতি-পদ্ধতির

শিল্পী : মুকুল দে

অনুকরণ না হলেও অনুসরণ যে শ্রীমতী লাহিড়ীর কাছে প্রত্যাশা করিনি—এ-কথা বলতে পারি।

অবশ্যই শ্রীমতী লাহিড়ী তাঁর চিত্ররচনায় আঙ্গিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নীরোদবাবুর বৃত্তজাল নয় শ্রীমতী লাহিড়ী উপর থেকে নীচে টানা লম্বমান ও হেলানো রেখার জাল বিস্তার করে এবং প্রতিটি রেখার পরিসরে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল বর্ণ-সম্পাতের কৃতিত্ব দেখিয়ে তাঁর প্রাচীন কাহিনী-ভিত্তিক নর-নারীকে ব্যঞ্জনা-ময় অভিব্যক্তিতে আমাদের সম্মুখে

উপস্থিত করেছেন। কিন্তু প্রায় সব চিত্রের রচনা-পদ্ধতি এক রকম হওয়ায় চোখ ও মন ক্লান্ত হয়েছে দর্শকদের, এ-কথা না বললে অন্যায় হবে। তবে শ্রীমতী লাহিড়ীর চিত্রের চমৎকার জমিন এবং নানা রঙের আবরণ ভেদ করে উঠে আসা ঔজ্জ্বল্য এবং বিভিন্ন চিত্রের রঙ প্রয়োগ-পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট নিপুণতার চিহ্ন বিদ্যমান। আমার ধারণা শিল্পী নীরোদ মজুমদার যদি ইতিপূর্বে এ-পথ পরিক্রমা না করতেন তবে শ্রীমতী লাহিড়ীর চিত্র নিঃসন্দেহে নতুন রীতি-পদ্ধতির স্মারক হয়ে থাকতো। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন শ্রীমতী লাহিড়ীকে অন্য পথ অন্বেষণ করতে হবে বলেই আমার বিশ্বাস। প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে 'দাবা খেলা' (৩)-র কম্পোজিশান, 'ছাগপৃষ্ঠে যক্ষী'—(২৬), ও 'প্রভু কৃষ্ণ' (৩১)-র রঙ আর রেখার সমন্বিত রূপ আমাদের ভাল লেগেছে।

আমরা শিল্পীর নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার চিত্র-সম্পদ দেখার জন্য অপেক্ষা করছি।

॥ শ্রীমতী চিত্রা দত্তের চিত্রকলা ॥

শ্রীমতী চিত্রা দত্ত ইওরোপ-প্রবাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে যে চিত্রসম্ভার রচনা করেছেন তারই চল্লিশটি নিদর্শন উপস্থিত করা হয়েছে। পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসের প্রদর্শনীতে। গত ২১শে নভেম্বর প্রদর্শনীটি শুরু হয়েছে, শেষ হয়েছে ২৭শে নভেম্বর।

প্রদর্শিত চল্লিশটি চিত্রের মধ্যে একত্রিশটির মাধ্যম তেলরঙ বাকী নটি রচিত হয়েছে প্যাস্টেলের মাধ্যমে। শিল্পী দত্তের প্রবাস-জীবনে ইওরোপীয় আধুনিক বিমূর্ত চিত্ররীতি যে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি—এই প্রদর্শনীর প্রতিটি চিত্রই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এক দিক থেকে এই প্রভাব-হীনতা শিল্পীর সততা ও নিষ্ঠার পরিচায়ক। শ্রীমতী দত্ত মূলতঃ প্রথাগত শিল্পী। নর-নারীর প্রতিকৃতি এবং নিসর্গ-দৃশ্য অঙ্কনের বাইরে তাঁর অন্য কোন অন্বিষ্ট নেই। সেই হিসাবে প্রদর্শিত চিত্রগুলিও বিচার করা উচিত।

কিন্তু এই প্রদর্শনীতে অনেকগুলি প্রতিকৃতি-রচনার মধ্যে আমরা শিল্পীর অ্যাকাডেমিক দক্ষতার বাইরে অন্য কিছু পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর প্রতিকৃতিগুলির ড্রয়িং নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন ব্যক্তিত্ব-হীন নিষ্প্রাণ বলে মনে হয় সেগুলিকে। বিশেষ করে তেলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত প্রতিকৃতি-চিত্রগুলির অধিকাংশই যেন নিষ্প্রাণ। ব্যতিক্রমের মধ্যে ১নং ও ৯নং প্রতিকৃতি-চিত্র দুটির কথা উল্লেখ্য। অবশ্য প্যাস্টেলের মাধ্যমে অঙ্কিত প্রতিকৃতি-চিত্রগুলির রঙ আর রেখার মাধুর্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর।

শিল্পী শ্রীমতী দত্তের কয়েকটি চিত্রের কম্পোজিশান ও রঙ-প্রয়োগ পদ্ধতি সত্যি প্রশংসনীয়। আমার মনে হয়েছে ইওরোপের সেতু, ঘরবাড়ী, পথ-ঘাট এবং কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য রচনার মধ্যে শিল্পী যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিকৃতি-রচনার থেকে এগুলিতেই তাঁর শিল্পদক্ষতা সমধিক প্রকাশিত। তাঁর 'সীন নদীর সেতু' (৫), 'কোত্যে দ্যজুর' (২১), 'তোলেদো' (২৬), 'আমস্টার্ডাম' (২৮), 'রাতের জুরিখ' (২৯) এবং 'লাইসান, সুইজার-ল্যান্ড' (৩০) প্রভৃতি চিত্রের সংস্থাপন, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল রঙের বৈপরীত্য সৃষ্টি নিঃসন্দেহে মনোমুগ্ধকর।

আমরা আশা করি, শিল্পী তাঁর ইওরোপ-প্রবাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে বাঙলার নর-নারী ও নিসর্গদৃশ্যকে অতঃপর আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

শিল্পী : চিত্রা দত্ত

শিল্পী : শানু লাহিড়ী

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস. ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং তৎ সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৩য় বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩১ সংখ্যা
মূল্য
৪০ নয়া পয়সা

শুক্রবার, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭০
Friday, 6th December, 1963. 40 Naya Paise.

সূচীপত্র

সাপ্তাহিকী

॥ ভারতের সন্ধানী রকেট ॥

ত্রিবান্দ্রামের নিকটবর্তী থুম্বা রকেট-ঘাটি থেকে গত ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যায় ভারতের প্রথম মহাকাশ-সন্ধানী রকেট (দুই পর্যায়ের) উৎক্ষিপ্ত হয়। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের এই পরীক্ষা বিজ্ঞানীমহলের নিবিড় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আলোচ্য রকেট উৎক্ষেপণ অনুষ্ঠানে ভারতীয় আণবিক কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীএইচ জে ভাবা উপস্থিত ছিলেন। তাঁর দাবী অনুসারে পরীক্ষাকার্য সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ ভারসমেত উৎক্ষিপ্ত রকেটটির ওজন ছিল ১,৬০০ পাউন্ড। রকেটটি সরবরাহ করেন মার্কিন জাতীয় বিমানচালনা ও মহাকাশ গবেষণা সংস্থা।

॥ কলিকাতায় নভশ্চারী দল ॥

বারোদিনব্যাপী ভারত-সফরের একটি পর্যায়ে গত ২১শে নভেম্বর সোভিয়েট মহাকাশবিজয়ী বীরাঙ্গণা শ্রীমতী ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা এবং সেই সঙ্গে তাঁর স্বামী রুশ মহাকাশ-চারী মেজর আঁদ্রে নিকোলায়েভ ও সপত্নীক অপর নভশ্চারী লেঃ কর্ণেল বিকোভস্কি কলকাতা মহানগরী পরিদর্শনে আসেন। সফরকারী এই মহাকাশবিজয়ী দলের প্রতি মহা-নগরীর পক্ষ থেকে নানা অনুষ্ঠানে বিপুল অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। নাগরিক সম্বর্ধনা ছাড়াও রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে এক বিশেষ সমা-বেশে কলকাতার শত সহস্র নারী বিশ্বের নারীজাতির গৌরব রুশ-তনয়া ভ্যালেন্তিনাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সোভিয়েট মহাকাশচারী-দলকে ২২শে নভেম্বর মহাজাতি সদনে ভারত-সোভিয়েট সংস্কৃতি সমিতির পক্ষ থেকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই প্রতিভাষণে রুশ মহাকাশচারীত্রয় ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর জয়গান করেন। তাঁরা এই আশা ও আস্থাই প্রকাশ করে যান যে, সংশ্লিষ্ট দুইটি রাষ্ট্রের মৈত্রীবন্ধন ও সহযোগিতা বিশ্বশান্তির সহায়ক হবে।

॥ নতুন কংগ্রেস সভাপতি ॥

মাদ্রাজের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকে কামরাজ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষণাটি করেছেন কংগ্রেস রিটার্ণিং অফিসার শ্রীজগন্নাথ রাও চান্দ্রিকি গত ২০শে নভেম্বর। ঐ দিনই নাম-প্রত্যাহারের শেষ দিবস নির্ধারিত ছিল। রিটার্ণিং অফিসারের ঘোষণা অনুসারে কংগ্রেস সভাপতিপদের জন্য শ্রীকামরাজের নাম ছাড়া আর কারো নাম প্রস্তাবিত হয় নি।

॥ বিমান দুর্ঘটনা ॥

২২শে নভেম্বর নয়াদিল্লীর সংবাদে বলা হয়—ঐ দিন বেলা দ্বিপ্রহর নাগাদ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পুঞ্চের নিকট ভারতীয় বিমানবাহিনীর এক-খানি হেলিকপ্টার বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ভারতীয় বাহিনীর পাঁচজন উচ্চপদস্থ সেনানায়ক ও বিমানের পাইলট নিহত হয়েছেন। বিমানখানি কাশ্মীরের যুদ্ধ-বিরতি রেখার সংলগ্ন এলাকায় তদা-রকী সফরে গিয়েছিল।

রাজধানীতে (নয়াদিল্লী) এবং দেশের অন্যান্য স্থলেও বীর সেনা-নায়কদের এমনি শোচনীয় মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য সংসদের উভয় শাখারই অধিবেশন ঐ দিন (২২শে নভেম্বর) মুলতুবী রাখা হয়। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীচ্যবন শ্রদ্ধা জানাতে যেয়ে বলেছেন—সেনানীদের মৃত্যুতে ভারতের সামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গুরুতর আঘাত পড়ল। আলোচ্য হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাটি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ২৪শে নভেম্বর পার্লামেন্টে মন্তব্য করেছেন : পুঞ্চের নিকট হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার মূলে কোন নাশকতামূলক কার্য আছে, এইরূপ মনে করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। যতটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায় যে, হেলিকপ্টারটি টেলিগ্রাফের তারে জড়িয়ে গেছল। দুর্ঘটনায় পদস্থ সামরিক অফিসারদের মৃত্যু একটি বিরাট আঘাত এবং অত্যন্ত দুঃখের।

॥ স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিল ॥

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী গত ২৬শে নভেম্বর লোক-সভায় একটি নতুন বিল উত্থাপন করেছেন, যাতে স্বর্ণালংকারের সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত স্বর্ণা-লংকার থাকলে সরকার যাতে সে সম্পর্কে ঘোষণা তলব করতে পারেন, সেই ক্ষমতা লাভ করাও এই বিলের লক্ষ্য। এ ছাড়া বিলে এইরূপ নির্দেশও রয়েছে যে, লাইসেন্স গ্রহণ করেন নি, এমন স্বর্ণ-ব্যবসায়িগণকে নিজ নিজ নাম রেজিষ্ট্রি করতে হবে।

॥ বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল ॥

পূর্ব রেলপথের শিয়ালদহ-রাণা-ঘাট সেকশনে গত ২৩শে নভেম্বর থেকে যাত্রীবাহী বৈদ্যুতিক ট্রেন চলা-চল আরম্ভ হয়েছে। এই উপলক্ষে এক সাংবাদিক বৈঠকে শিয়ালদহের ডিভিশন্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট (রেল) শ্রী এম এন মাথুর বলেন যে, চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শিয়ালদহ বিভাগে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু করা সম্ভব হয়েছে। তিনি এ-ও জানান যে, অল্পকালের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট রেল-কর্তৃপক্ষ শিয়ালদহ-বনগাঁ লাইনের বারাসত পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেন চালা-বার সিদ্ধান্ত করেছেন। শিয়ালদহের দক্ষিণ বিভাগের রেলপথ বৈদ্যুতি-করণের কাজও পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

॥ বিশ্ব সহযোগিতা ॥

রাষ্ট্রসংঘ মহলের ২২শে নভেম্বর সংবাদ : রাষ্ট্রসংঘ ১৯৬৫ সালকে বিশ্ব সহযোগিতা বছর বলে ঘোষণা করেছেন। ঐ বছরেই রাষ্ট্রসংঘের বিংশতি বর্ষ পূর্তি হবে। ১৯৬৫ সালকে বিশ্ব সহযোগিতা বর্ষ হিসাবে যেন চিহ্নিত করা হয়, সেইজন্য ভারতই প্রস্তাব আনয়ন করেছিল। প্রস্তাবটি রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ২১শে নভেম্বর তারিখের অধিবেশনে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন অবশ্য সেই সঙ্গে প্রস্তাব রেখেছে যে রাষ্ট্রসংঘের ১৯৬৫ সালের অধিবেশনে (সাধারণ পরিষদে) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র-নায়কদের যোগদান করা উচিত। এই ব্যবস্থায় সদস্য রাষ্ট্র-গুলির মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে, রুশ প্রতিনিধি এই অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।

॥ চাঁদপুরে হাঙ্গামা ॥

গত ২২শে নভেম্বর পূর্ব পাকি-স্থানের চাঁদপুরে এক উত্তেজিত জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণে দুই ব্যক্তি নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছে বলে ঢাকা থেকে পরিবেশিত এক সংবাদে জানা যায়। বলা হয়েছে যে, পূর্ব পাক গভর্ণর মিঃ আব্দুল মোমেন খান চাঁদপুরে একটি অনুষ্ঠানে ঢাকা-চাঁদপুর হেলিকপ্টার সার্ভিসের উদ্বোধন করে যাবার পরই স্থানীয় ছাত্রগণ কৃষ্ণপতাকা সহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং গুলী-বর্ষণের ঘটনাটি হলো তারই জের। সঙ্গে সঙ্গে শহরে ১৪৪ ধারাও জারী করা হয়। সরকারী ভাষ্য অনুসারে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলী চালায়।

॥ নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ॥

আততায়ীর আক্রমণে প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গত ২২শে নভেম্বর ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ লিন্ডন জনসন সংবিধান অনুযায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। শপথ নেওয়ার পর তাঁর প্রারম্ভিক ঘোষণা : কেনেডির শাসন-আমলের পররাষ্ট্র নীতিই নতুন আমলেও অব্যাহত থাকবে।

সম্পাদকীয়

প্রত্যেকটি নগরের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে একথা বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকমাত্রেই বলেন। এই বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে প্রত্যেকটির নাগরিকগণের সমষ্টিগত চারিত্রিক দোষ-গুণের সমন্বয়। কথাগুলি শুনিতে খটমট মনে হয় কিন্তু যাঁহারা হুতোমের "আজব শহর কোল্‌কাতা"র বর্ণনা পড়িয়াছেন বা ছড়ায় "উলোর মেয়ের কুলকুলুটি—শান্তিপুরের খোঁপা" / "গুপ্তিপাড়ার নথনাড়া"—ইত্যাদি শুনিয়াছেন বা আধুনিককালের লেখকদের বর্ণনায় দিল্লী তথা নয়াদিল্লীর বিবরণ পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন এই নগর ও নাগরিকদের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য কিরূপ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যদি কেহ বিভিন্ন নগরের ধরণ-ধারণ একটু চোখ খুলিয়া লক্ষ্য করেন।

সম্প্রতি আমাদের এই "আজব শহর কোলকাতা" আবার তাহার আজবত্বের পুনরাভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। এ সময়ে ও এই বাজারে চড়া দামের প্রতিরোধ লইয়া যে হুজুগ চলিয়াছে তাহার মধ্যে এবং কলিকাতা পৌর সংস্থার কর্মীদের যে ধর্মঘট শেষ মহূর্তে প্রত্যাহার করা হইল তাহার মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছিল।

এই বৈশিষ্ট্য শুধু মাত্র হুজুগপ্রবণতা নয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন কলিকাতা শোভাযাত্রা ও মিছিল চলার শহর। এই উক্তি একদিকে সত্য—কেননা ঐ বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ প্রধানতঃ মিছিল বা জৌলুসের আকৃতিতে হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যদিকে উহার পিছনে অনেক ক্ষেত্রেই অসহায় জনগণের সহনসীমা পার হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়; অবশ্য আরও নানাসময় ও নানাক্ষেত্রে চতুর রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবর্গের লোক ক্ষেপাইবার বা ভূত নাচাইবার উপায় হিসাবে এইরূপ মিছিল অযথা বাহির করা হয়। কিন্তু ভাগ্যান্বেষীর রাষ্ট্রনৈতিক চাল হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও এইরূপ জুলুস বা মিছিল—যাহা কলিকাতার বিশেষত্ব—জনবিক্ষোভের নিদর্শন হিসাবেই স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং সেই হিসাবে উহা যে অনাচার ও অত্যাচারের প্রতিকার দাবী করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে সে বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান ও বিচার সময়মত করা উচিত। অন্যথায় ঐ জনবিক্ষোভ বিশেষ ক্ষতিকর রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে যেরূপ এই আজব শহরে বহুবার ঘটিয়াছে। এই শহর বহুসংখ্যক রাষ্ট্রনৈতিক, দল ও উপদলের কর্মক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রনৈতিক দলের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেরই দায়িত্বজ্ঞান সামান্য। যদি কর্তৃপক্ষের, যাহা শাসনকার্যের বা পৌর প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘসূত্রতা বা অদূরদর্শিতার ফলে তাঁহাদের "দাঁও" মারিবার সুযোগ জুটে তবে তাঁহারা সকল ক্ষেত্রে দরিদ্রসাধারণের স্বার্থের কথা ভাবিয়া দেখেন না। জনসাধারণের মধ্যে দায়িত্বহীন এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা ঐরূপ ধ্বংসকাণ্ডে মাতিয়া ওঠে যদি উত্তেজনার মাত্রা ও উস্কানির রকম যথেষ্ট প্রবল হয়।

ঐ মূল্য-প্রতিরোধ আন্দোলনে রাজ্যসরকারের গাফিলতির সুযোগ লইয়া একদল ঐভাবে ভূত নাচাইয়া ফিরিতেছিলেন। সরকারি পক্ষ শেষ মুহূর্তে সতর্ক হওয়ায় এবং ব্যবসায়ী দল সাময়িকভাবে ত্রস্ত হওয়ায় ব্যাপারটা আয়ত্তের বাহিরে যায় নাই। তবে ন্যায্যমূল্য বিষয়ে যে বিচার চলিতেছে তাহাতে আবার যদি ভুল হয় বা বেশী দেরী হয় তবে রাজ্য-সরকারের উপর জনসাধারণ আস্থা হারাইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে দায়িত্বহীনদেরই ফসল তোলার মরসুম আসিবে।

ন্যায্যমূল্য নির্ণয়ে ব্যবসায়ীদের হিসাব কখনও যথাযথ হইবে না—একথা বলা হয়ত ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যবসায়ীদের সততার মান যে কত নীচে নামিয়া গিয়াছে তাহা এখন সকলের কাছেই জানা। যে চাউল আজ ৩২্ টাকায় মণ পাওয়া যাইতেছে তাহাই ৪৫্ হইতে ৪৯্ টাকায় এই অল্প কিছুদিন আগে বিক্রয় হইয়। ঐ উচ্চমূল্যে দরিদ্র সাধারণকে যাহারা ক্ষুধার অন্ন যোগাইয়াছে সেই রক্তশোষকদের সততার মান কোথায় পৌঁছিয়াছে।

চিনি লইয়া তো তিন দল জুয়া খেলিতেছেন—হার অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই দরিদ্র সাধারণের। প্রথমতঃ ইক্ষুচাষীগণ উঁচু দাম যতই পাইতেছেন তাঁহাদের লোভ ততই বাড়িতেছে এবং আখের ফলন ততই কমিতেছে। উত্তরপ্রদেশে আখের ফলন একর প্রতি ১৪ হইতে ১৭ টনের বদলে এখন ১১ হইতে ১৩ টনে দাঁড়াইয়াছে। বিহারে হইয়াছে ১৩।১৪ স্থলে ১০।১১। এবং শর্করার পরিমাণও কমিতেছে। কেননা যদি ফলন কম হইলে ফসলের মোট দাম কম হইত তবে চাষীর টনক নড়িত। কিন্তু যেখানে ৩২্ টাকা টন হিসাবে একর প্রতি ১৫ টনে পাওয়া যাইত ৪৮০্, সেখানে বর্তমানে সরকারি রেটে ৫৬্ টাকা হিসাবে ১১ টনে যখন ৬১৬্ টাকা আসে, তখন চাষী কেন মিছে পরিশ্রম ও সার-সেচ দিয়া ফসল বাড়াইবে? আবার চাষীর পিছনে আছেন চোরাকারবারি মিল-মালিক ও চিনি-ব্যবসায়ী। জনসাধারণ যায় কোথায়?

শিক্ষকদের সম্বন্ধে অনেক ভালো কথা শোনা যায় আজকাল। তাঁরা নাকি মানুষ গড়ার কারিগর—জাতির ভবিষ্যৎ নাকি গড়ে ওঠে তাঁদেরই হাতে। সেজন্য সুবিধা পেলেই আমরা তাঁদের প্রশস্তি জানাই। আর তাঁরাও এসব প্রশংসাবাক্য শুনে হয়তো কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই প্রশংসা ও আশ্বাসের ভিত্তি খুব ঘাতসহ নয়।

দিল্লিতে সম্প্রতি জাতীয় পুরস্কার গ্রহণের জন্যে সারা দেশ থেকে ৮৭ জন শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মানুষ গড়ার কারিগরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনের এই ব্যবস্থাতে সকলেই আমরা গর্ববোধ করতে পারি। কিন্তু রাজধানীতে ডেকে এনে তাঁদের যে পরিবেশের মধ্যে রাখা হয়েছিল এবং তাঁদের দুর্দশার জন্যে যে উপদেশ শোনানো হয়েছিল, তাতে যে-কোনো সভ্য মানুষই লজ্জায় অধোবদন হবার কথা।

শিক্ষক-সম্মানের ষৎকিঞ্চিৎ

সংবাদে জানা যাচ্ছে, আগত শিক্ষকদের মধ্যে ৭৬ জনকে হুমায়ুনের সমাধির কাছে তাঁবুতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল এবং দিল্লিতে যেহেতু শীতকালে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় আর যেহেতু তাঁবুতে ফুটো ছিল, সেইহেতু শীতের রাতে বৃষ্টির জলে ভিজে ঐসব সম্মানপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ বিলক্ষণ আপ্যায়িত হতে থাকেন।

এতে কোনো কোনো শিক্ষক হয়তো যথেষ্ট পরিমাণে সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে পারেন নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারীদের কাছে কেউ কেউ হয়তো অস্ফুটভাবে একটু আপত্তিও জ্ঞাপন করেছিলেন। ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে, আবেগকম্পিত কণ্ঠে নেমে এল লোকাচারের বন্যা—শিক্ষকদের 'সরল ও কষ্টসহিষ্ণু জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া উচিত।...ইত্যাদি।

অবশ্যই। সেই সঙ্গেই বক্তা এ-কথাও শিক্ষকদের মনে করিয়ে দিতে পারতেন যে, শিক্ষকদের যে হুমায়ুনের কবরের কাছে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, তাও ইঙ্গিতপূর্ণ। কারণ ইতিহাসে বলে, সম্রাট হুমায়ুন খুব বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং তাঁর লাইব্রেরীর সিঁড়িতে পা ফসকে পড়ে গিয়েই তাঁর অপমৃত্যু ঘটে।

যাই হোক, শিক্ষামন্ত্রী নিজে এই অবিচারের বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। কাজেই আশা করা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতে আর শিক্ষকদের সম্মানিত হওয়ার জন্যে দিল্লিতে গিয়ে অশিক্ষিত কর্মচারীর কাছে সহিষ্ণুতা শিক্ষা করতে হবে না!

• • •

আমি বরাবরই জানতাম, মাছ খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। তা নাহলে সারা পৃথিবীতে মাছ ধরার যতো বিচিত্র আয়োজন, তার ছলনাজালকে ছিন্ন করে এতদিনে একটি চুনো পুঁটিও টিঁকে থাকতে পারত না জলের রাজ্যে। আর মাছের বুদ্ধি থাকার দ্বিতীয় প্রমাণ হল এই যে, মাছের মস্তিষ্কে যদি বুদ্ধির অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে সে মস্তিষ্ক চর্বণ করে আমাদের মস্তিষ্ক বৃদ্ধিও হত অসম্ভব ব্যাপার।

যাক সে-কথা। আমার বর্তমান বক্তব্য হল, মাছ কেবল বুদ্ধিমান প্রাণী নয়, হৃদয়বানও। মাছের হৃদয়বৃত্তির বিষয়ে এ যাবৎ অবশ্য আমরা খুব বেশি তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি, তবু একেবারে হাল আমলে যে একটিমাত্র নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি, তার ওজন শতাধিকের চেয়েও বেশি।

সকলেই জানেন, কিছুকাল ধরে কলকাতার মাছের বাজারে এক রহস্যময় ব্যাপার ঘটে চলেছে। ব্যাপারটি মাছের বিষয়ে, কিম্বা আরো সূক্ষ্মভাবে বললে বলা যায়, মাছ না-থাকার বিষয়ে।

কেশবধৃত মীন-শরীর

সাধারণত কোনো জিনিস বাজারে বেশি থাকা বা কম থাকার দ্বারাই তার বাজার-দর নির্ধারিত হয়। কিন্তু মাছের বেলায় দেখা যাচ্ছে, সে-

নিয়ম উল্টো পাকে ঘুরে যাচ্ছে। বাজারে যখন স্বাভাবিক মতো মাছ পাওয়া যেত, তখন তার দাম ছিল অস্বাভাবিক রকম বেশি। কিন্তু যেই বাজারে মাছের দাম 'স্বাভাবিক' করা হল, অমনি তার আমদানি গেল অস্বাভাবিক রকম কমে।

এ-বৈষম্যের ব্যাখ্যা কী? পরিসংখ্যান বা অর্থনীতির দ্বারা এ-রহস্যের অর্থ-ভেদ করা যাবে না। এর ব্যাখ্যা হল, মাছের হৃদয়বৃত্তি। মৎস্য-ব্যবসায়ীদের প্রতি করুণাবশত এখন কম পরিমাণে মাছ জালবন্ধ হচ্ছে বলেই মাছের বাজারে এই অনর্থনৈতিক হাহাকার।

প্রকৃত প্রস্তাবে মাছদের পক্ষে এইভাবে মৎস্য-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সহ-যোগিতা করা খুব অস্বাভাবিক নয়। ভেবে দেখতে গেলে, মাছ তো নিছক একটা জলজ প্রাণী, মানুষের ইতিহাসে তার কোনো স্থানই হত না, যদি নাকি ধীবরকুল তাদের ডাঙায় তুলে না আনত। কাজেই ইতিহাস-বিখ্যাত হওয়ার জন্যে মৎস্যগণ যদি ধীবরদের প্রতি একটা গোপন অনুরাগ বোধ করে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তাছাড়া কেবল অনুরাগ বা কৃতজ্ঞতাই বা কেন, মাছেরা হয়তো উদারতার জন্যেও কম পরিমাণে ধরা দিচ্ছে জালে। পরম আশ্রিতপালক ব্যক্তির মতো মৎস্য-ব্যবসায়ীদের দুর্দিনে তারা হয়তো সহানুভূতিসূচক হরতালই পালন করছে!

এবং এইসব কারণেই বাজারে আজ-কাল মাছের অনটন।

নাহলে মাছ নিয়ে এত হৈ-চৈ-এর কারণ কী? এমন তো হতে পারে না যে, কোনো কোনো মৎস্য-ব্যবসায়ী নিজেরাই হয়ে পড়েছেন গভীর জলের মাছ এবং সময়োচিত পুচ্ছতাড়নায় আমাদের পুনঃ পুনঃ সর্ষেফুল দেখাচ্ছেন!

●

শোনা গেল, কয়েক মাসের মধ্যেই নয়া পয়সার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটবে। একদা আমরা যাকে পয়সা বলতাম, ঠিক সে জিনিসটা না হলেও, সেই নামটি আবার পূর্ণ মহিমায় ফিরে আসবে হিসাবের খাতায়।

জীবজগতে দেখা যায়, ব্যাঙাচি-গুলোর ল্যাজ থাকে এবং একটু বড় হলে সে ল্যাজ খসে পড়ে। আগেকার পয়সার মাপে নতুন পয়সা দামেও যেমন কম ছিল (এক টাকায় ৬৪টির বদলের ১০০টি), তেমনি আকারেও ছিল ছোটো।

পয়সা—নয়া পয়সা—পয়সা।

সেইজন্যে ব্যাঙাচির মতো তার একটা ল্যাজ জুড়ে দিয়ে আমরা বলতে শুরু করেছিলাম, নয়া পয়সা। এতদিনে ল্যাজ-টুকু খসে গিয়ে তার স্বকীয় প্রজাতির আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল।

ভালই হল। সংক্ষেপে কাজ হলে আর জটিলতার মধ্যে কে যায়! কিন্তু আমরা যারা একেবারে হাল আমলে জন্মাইনি এবং পুরনো আমলের পয়সা দিয়ে কাজকারবার করেছি, তাদের পক্ষে নয়া পয়সার এই পয়সাত্ব-প্রাপ্তিতে কিছুটা চিন্তা-বিভ্রাট ঘটার সম্ভাবনা। মুখে আমরা যাই বলি, মনে মনে এখনো অনেকে আমরা হিসাব কষি পুরনো পয়সা এবং আনার মাপে। ফলে সময়টা আমাদের ভালোই কাটবে বলা যায়।

মুখে চার পয়সার জিনিস চাওয়া এবং মনে মনে ছয় নয়া পয়সার জিনিস আকাঙ্ক্ষা করার মধ্যে যে তফাৎ, তার ফলে হাটে-বাজারে মাঝে মাঝে দু-একটা হাতাহাতি ঘটবে না, এ-কথা কেউই হলপ করে বলতে পারে না। অবশ্য ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে, সে রকম দু-একটা ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা যাবে না, এ-কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না।

দিল্লী থেকে বলছি

নিমাই ভট্টাচার্য

আগে ছিল সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ণ এখন হয়েছে ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম। পশ্চিমী দুনিয়ার ডেমোক্রাসী, পূর্ব দেশের সোস্যালিজম অব ইণ্ডিয়ান অরিজিনালিটির ককটেল করে সৃষ্টি হয়েছে ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম। হাজার হলেও আমরা ইণ্ডিয়ান; আমাদের কালচার আছে, ট্র্যাডিশন আছে, আছে পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার ব্যাকগ্রাউন্ড। তাইতো আমরা ডাইনিং-টেবিলে বসে কাঁটা-চামচ দিয়ে ডাঁটাচচ্চড়ি খাই।

জয়পুরের রাজবাড়ীর সামনের ময়দানের সূতিকাগৃহে 'ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম'এর জন্ম হলেও, দিল্লীই হলো এর পিতৃভূমি। দিল্লী থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের বাণী সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স মারফত নেতাদের বাণী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরিবেশিত হয়ে দেশবাসীর সামনে হাজির হয়। দিল্লীর রামলীলা ময়দানে নেতার বক্তৃতার সমর্থনে বিজ্ঞ সম্পাদকের দল এডিটোরিয়াল লেখেন, চেলা-চামুণ্ডার দল সভার আয়োজন করেন কলকাতার ময়দানে, বোম্বের জুহু-বীচে, শিবাজী পার্কে বা চৌপাট্টির মাঠে। জনসাধারণ হাততালি দেয়, বাহবা করে নেতার।

এদিকে সমাজতন্ত্রবাদের ছাতি মাথায় দিয়ে দিল্লীর এক শ্রেণীর ভাগ্যবান বেশ প্রেমসে লাইফ কাটিয়ে চলেছেন।... হাজার হলেও বড় অফিসার। ব্রেনের কাজ অনেক। ফাইলে অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাঁপিয়ে পড়তে হয়; লাইব্রেরিয়ান ফ্রেমের মোটা চশমা নামিয়ে রেখে ডেপুটি-আন্ডার সেক্রেটারীর পালকে হাই পলিসি বোঝাতে হয়। শুধু কি তাই? ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম'এর বীজকে ভারতবর্ষের মাটিতে বট-অশ্বত্থ গাছের মত পল্লবিত করবার জন্য ডজন ডজন সক্সন অফিসারের দলকে ধমক দিয়ে তাদের প্যান্টলুন ঢিলা করে দিতে হয়; অ্যাসিসটেন্ট, আপার ডিভিশন, লোয়ার ডিভিশনদের দিল্লীর নিদারুণ গ্রীষ্মে শীতের কাঁপুনি ধরাতে হয় দেশের জন্য! দেশ স্বাধীন হবার পর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ বেড়েছে হাজার ধরনের; তার উপর এসেছে পাঁচ শালা পরিকল্পনা। আগে যে অফিসারের অটোগ্রাফে পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর হতো, আজ তারই লক্ষ লক্ষ টাকার প্ল্যান, প্রোগ্রাম স্যাংশন করতে হাঁপিয়ে পড়ছেন। তাইতো স্যারের আজ গলদঘর্ম হতে হচ্ছে। কাশ্মীরী কার্পেটের উপর চরণযুগল রেখে আর এয়ার-কণ্ডিশনার চালিয়েও কর্মক্লান্ত দেহ আজ শান্তি পায় না। সে চায় আরো কিছু। ছোট ঘরে বসে স্যারের দৃষ্টিভঙ্গীটাই সংকীর্ণ হবার উপক্রম হয়েছিল; তাইতো ছোট ঘর ছেড়ে বড় ঘরে গেলেন। পুরোনো ফার্ণিচার ত্যাগ করে হাজার মাইল দূর থেকে নাকি ফার্ণিচার আনানো হলো। আমরা-আপনারা বেশী পরিশ্রম করি না, তাই বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তাও ঠিক উপলব্ধি করতে পারি না! স্যার হাড়খাটুনি খাটতে খাটতে শেষ হয়ে যান; তাইতো নিজের অফিসঘরের পাশে একটা বেডরুম ভালভাবে নিজের পছন্দমত সাজিয়ে নিয়েছেন। নবাব-দেশের লোক স্যার; তাই স্যারের আইডিয়াও আমাদের চাইতে অনেক উন্নত, অনেক ভাল। স্যার তাঁর এই বেড-রুমে বুঝি একটা ছোট্ট ফোয়ারা লাগিয়েছেন। বলুন তো কি ওয়াণ্ডারফুল আইডিয়া? আসত আমার-আপনার মাথায়? ছাই আসত! এমন আইডিয়া থাকলে আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার হতাম না আর আমার বন্ধুবান্ধব বি-এ—

এম-এ পাস করে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চৌকাঠে হোঁচট খেতেন না।

দিল্লীর আঁধি আর ডেমোক্রাটিক সোস্যালিজম'এর ঝড়ের মধ্যে এইসব সামান্য ঘটনা নজরে না পড়াই স্বাভাবিক। তবে একথা সত্য যে, রাজধানীর সোস্যালিজম'এর স্ট্যান্ডার্ড'ই আলাদা। দিল্লীতে গান্ধীবাদী কোন ভাব-ভোলা সন্ন্যাসীর বাংলো সাজাবার জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় যেমন সি-পি-ডবলিউ-ডি'র কাছে জলবৎ তরলং ব্যাপার, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন অফিসার'দের আবাসভূমিতে চিরবসন্ত বজায় রাখতে কার্পেট ফার্ণিচারওয়ালাকে সত্তর-প'চাত্তর কি আশি হাজারের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চেক দেওয়াও খুব একটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। কলকাতার রাজভবন কম্পাউন্ডে চীফ মিনিস্টারের সাদাশিধে ফ্ল্যাট দেখে যাঁরা স্তম্ভিত হন, তাঁরা হরিদ্বারের তীর্থ-যাত্রার পথে দিল্লী ঘুরে যাবার সময় প্যানডারা রোড-ওয়েলেসলি-মোতিবাগে আন্ডার ও ডেপুটি সেক্রেটারীর ফ্ল্যাট দেখলে বাকশক্তি হারালেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জয়েন্ট সেক্রেটারী, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী, স্পেশ্যাল সেক্রেটারী ও সেক্রেটারীর বাংলো তো ছোট-খাট অনেক স্টেটের লাটসাহেবের কুঠির মত। সোস্যালিস্ট কারখানার কারিগরদের এটুকু শান্তি না পেলে তাঁরা তিতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ কোটি মূঢ় ম্লান মূক মুখে কিভাবে ভাষা দেবেন? কিভাবে 'এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা ধ্বনিত করে তুলবেন?

প্রেসিডেণ্টের ঘোষণা

বুধবার ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে প্রথম রাষ্ট্রীয় ভাষণে নূতন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জনসন পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির লক্ষ্য ও আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণে এবং তাঁর সকল প্রতিশ্রুতি পালনের দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করে বলেন, 'সারা বিশ্বকে আজ জানিয়ে দিতে হবে যে, নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আমরা আমাদের প্রিয় নেতাকে হারালেও, আমরা দুর্বল হইনি। আমাদের মনোবল আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, আমরা তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করতে পারব এবং এখনই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।"

নূতন রাষ্ট্রনায়ক বলেন, মার্কিন জাতি আজ প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। এই সংকট মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের ও আমার প্রধান কর্তব্য হল—সকল দ্বিধা মুছে ফেলা। বিশ্ববাসীকে দেখাতে হবে যে, আমরা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পশ্চাৎপদ নই।

প্রেসিডেণ্ট জনসন বলেন, ১৯৫৭ সালে এবং পুনরায় ১৯৬০ সালে যা বলেছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি করে বলব, নাগরিক অধিকার আইন গ্রহণ করে আমাদের মার্কিন জাতির মধ্যে জাতি বা বর্ণের জন্য সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতনের অবসান ঘটাতে হবে।

প্রেসিডেণ্ট জনসন বলেন, এ যুগের ঘৃণ্যতম অপরাধের জন্য আজ আমরা আমাদের প্রিয় নেতাকে হারিয়েছি। জন ফিজজেরাল্ড কেনেডি তাঁর অমর বাণী ও কাজের জন্য আজ বিশ্ববাসীর মনে ও স্মৃতিতে অমর হয়ে আছেন। মার্কিনবাসীর হৃদয়ে কেনেডির স্থান চির-অবিচল থাকবে।

প্রতিনিধিদের উদ্দেশে রাষ্ট্রনায়ক বলেন, 'আসুন, আমরা সকলে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করি যে, জন ফিজজেরাল্ড কেনেডি বৃথাই আত্মদান করেন নি। ভগবানের নিকট মার্কিন জাতির কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন দিবসের পূর্বাহ্নে আমরা এই প্রার্থনা করি 'আমেরিকা, আমেরিকা ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হোক, সমুদ্রকূল থেকে সমুদ্রকূল পর্যন্ত সমগ্র দেশবাসীর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হোক।

দেশে বিদেশে

॥ বিশ্বব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস ॥

একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যু কোন নতুন সংবাদ নয়, এমনকি আততায়ীর হাতে তাঁদের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনতেও বিশ্ববাসী অভ্যস্ত। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মৃত্যুতে যেভাবে বেদনাহত বিশ্ব আর্তনাদ করেছে, যেভাবে কোটি কোটি মানুষ একান্ত প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় চোখের জল ফেলেছে তার কোন তুলনা নেই। একটিমাত্র রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসকের অকস্মাৎ অপসারণে শতাধিক রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী কখনও এমন উদ্বিগ্ন-চিত্তে চিন্তা করেননি, এর-পর কি হবে।

পূর্ণ তিন বছরও শাসনকার্য পরিচালনার সুযোগ পাননি কেনেডি। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটনের দুর্জয় সাহস, জেফারসনের প্রজ্ঞা, আব্রাহাম লিংকনের মহৎ মানবতাবোধ ও রুজভেল্টের বিশ্বজনীন চিন্তাধারার মূর্ত প্রতীক এই অনন্যসাধারণ মানুষটি তারই মধ্যে সারা বিশ্বের শত্রু মিত্র সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। ভগবানে অবিচল অটুট বিশ্বাস আছে যাঁদের, তাঁরা হয়ত একথা ভেবে সান্ত্বনা পাবেন যে, মহত্তর

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৯৬১ সালে যখন ওয়াশিংটন যান, তখন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। চিত্রে মিঃ জনসন, সম্বর্ধনা ভাষণরত প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে দেখা যাচ্ছে।

কোন কল্যাণের প্রয়োজনে বিশ্বের অধীশ্বর ফিরিয়ে নিলেন তাঁর এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সন্তানকে। কিন্তু ভগবৎ ইচ্ছাকেই শেষ ইচ্ছা বলে ভাবতে পারেন না যাঁরা, সেই কোটি কোটি মানুষের কাছে প্রেসিডেন্ট কেনেডির এই মৃত্যু এক বিরাট অমঙ্গলের অশুভ ইঙ্গিত বলেই মনে হবে। প্রায় দুই কোটি কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীকে পূর্ণ সামাজিক অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সবচেয়ে বড় সামাজিক কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি, সে কাজ তাঁর অসমাপ্ত থেকে গেল। বিশ্বকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু এক নিষ্ঠুর চক্রান্তে মুহূর্তের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের ঐ বিপুল সম্ভাবনাময় বলিষ্ঠ

প্রেসিডেণ্ট কেনেডির শেষ বাণী

"আসুন আমরা আন্তরিক ও বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, যেখানে যত দুঃখদুর্দশা আছে তাহার অবসানের, দেশে দেশে বোঝাপড়া সৃষ্টির এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মহান অসমাপ্ত কাজে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

২৮শে নভেম্বর ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি জাতির উদ্দেশে উপরোক্ত বাণীটি রচনা করেছিলেন।

অভিযান বিপর্যস্ত হয়ে গেল। তাই গভীর বেদনা নিয়ে ক্রুশ্চেভ বলেছেন, কেনেডির হত্যা বিশ্বশান্তির উপর বিরাট আঘাত। তরুণ রাষ্ট্রপতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সাধারণ মানুষের হৃদয়ও যে কতখানি জয় করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের স্বতস্ফূর্ত শোকোচ্ছ্বাসে। অথচ কেনেডি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রবল প্রতিপক্ষ বলেই জানতেন সোভিয়েট জনগণ। কতবড় ব্যক্তিত্ব ও কতখানি আন্তরিকতা থাকলে তবে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এতখানি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব করা যায় তা সাধারণ মানুষে ত দূরের কথা, সাধারণ রাষ্ট্রশাসকদের পক্ষেও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দুই প্রবল প্রতিপক্ষ শিবিরের মধ্যে এই মৈত্রীবন্ধন গড়ে তোলার কাজে সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভের অবদানও কম নয়। কিন্তু তাঁর কোন প্রয়াসই সফল হত না, যদি না ঠিক একই সময়ে কেনেডির মত

১৯৬১ সালের মে মাসে প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন বি জনসন (তখন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শুভেচ্ছা সফর উপলক্ষে ভারতে আসেন এবং রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।

একজন সদাহাস্যময়, সরলপ্রাণ ও দৃঢ়চেতা মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার হতেন। কিউবা সংকট তাই সোভিয়েট-মার্কিন সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন না করে আরও দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। যুদ্ধের ভয়ংকর আশংকায় শংকিত হয়ে উঠেছিল যে পৃথিবী অনতিবিলম্বেই সে শুনল পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের পরম স্বস্তিকর সংবাদ।

পরম নির্ভরশীল বন্ধুর আকস্মিক তিরোধানে ভারত যেভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে, সেইভাবেই দুঃখপ্রকাশ করেছে জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রগুলি। এই জাতীয় শোকোচ্ছ্বাসের ভাবগত মূল্যের চেয়ে রাজনৈতিক মূল্য কিছু কম নয়। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির নীতি অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বিশ্ববাসীর হৃদয় কতখানি জয় করেছিল তা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেই তাঁরা কেনেডির নীতি থেকে বিচ্যুত হবেন না। ইতিমধ্যেই প্রেসিডেণ্ট জনসন জানিয়েছেন, মহান রাষ্ট্রনায়ক কেনেডির নীতিই হবে তাঁর নীতি। ভারতকে জানিয়েছেন তিনি, ভারতের সকল প্রয়োজনে উদার হস্তে সাহায্যদানে তিনি প্রেসিডেণ্ট কেনেডির নীতিই অনুসরণ ক'রে চলবেন।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মহান স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা প্রেসিডেণ্ট জনসনকে স্বাগত

রোটান্ডায় প্রার্থনা-সভার পরে শ্রীমতী কেনেডি তাঁর কন্যা ক্যারোলিন ও পুত্র জনকে নিয়ে ক্যাপিটল ভবন ত্যাগ করছেন। ক্যাপিটলের রোটান্ডায়ই প্রেসিডেণ্ট কেনেডির শবদেহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শায়িত ছিল। শ্রীমতী কেনেডির সংগে তাঁহার দেবর মিঃ রবার্ট কেনেডি এবং দুই ননদ মিসেস্ স্টিফেন স্মিথ (বামে) ও পিটার লফোর্ডকে (চলচ্চিত্র অভিনেতার পত্নী) দেখা যাচ্ছে।

জানাচ্ছি। তাঁর শাসনকালে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গরা যদি পূর্ণ নাগরিক অধিকার অর্জন করে, বিশ্বশান্তির ভিত্তি যদি আরও দৃঢ় হয় এবং অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়ন প্রয়াসে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা যদি অব্যাহত থাকে তবেই আজকের এই গভীর দুঃখের কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যাবে।

বেদনাহত বিশ্ব

রাষ্ট্রপুঞ্জ সংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেন এই হত্যাকাণ্ড মানব সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ। শুধু যুক্তরাষ্ট্র কেন—সমগ্র বিশ্বই বেদনাহত হয়েছে। তিনটি সংক্ষিপ্ত বৎসরে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি তাঁর উচ্চ আদর্শ, সংকল্প, শুভেচ্ছা বোঝাপড়া ও সক্রিয়তার জাজ্বল্য প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর দূরদৃষ্টির ব্যাপ্তি, আদর্শের বিশালতা, বিচার-বুদ্ধির অভ্রান্ততা, শক্তিমত্তা, তারুণ্য, মানবতা বোধ, মহাত্মা ও সর্বোপরি ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের গুণগত মূল্যে অগাধ বিশ্বাস এবং শান্তির জন্য তাঁর ঐকান্তিকতা তাকে পৃথিবীর ইতিহাসে নশ্বর করে রাখবে। মানবসমাজ তাঁর উজ্জ্বল ও মধুর স্মৃতি স্মরণে রাখবে।

শ্রীমতী পণ্ডিত বলেন যে, তিনি রাষ্ট্রসংঘ ও রাষ্ট্রসংঘের আদর্শের অবিচল সমর্থক ও সুহৃদ ছিলেন।

॥ বিমান দুর্ঘটনা ॥

ঘনঘন বিমান দুর্ঘটনা রীতিমত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬২ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভারতে বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে বারোটি এবং ঐসব দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন মোট ২৩৬ জন। বিমানগুলির কোনটি গিয়ে ভেঙেছে পাহাড়চূড়ায়, কোনটি গিয়ে পড়েছে সাগরজলে। কোনটি আবার নিখোঁজ বিমানের সন্ধান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। এই বছর জুলাই মাসে আরব সাগরে একটি ভারতীয় বিমানের সলিলসমাধি হওয়ায় ষাটজন আকাশচারী জলে ডুবে প্রাণ হারিয়েছেন।

শুধু বিমান দুর্ঘটনায় অবশ্য খুব বেশী বিচলিত হওয়ার কারণ নেই. ভারতের চেয়ে অনেক বেশী বৈমানিক-পটুতাসম্পন্ন দেশেও মাঝে মাঝে বিমান দুর্ঘটনা হয় এবং সেসবেও যথেষ্ট প্রাণহানি ও সম্পত্তিবিনাশ ঘটে। যন্ত্রের উপর নির্ভর করতে হলে যান্ত্রিক গোলযোগের যাবতীয় ঝুঁকি অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু গত ২২শে নভেম্বর সীমান্তবর্তী উপদ্রুত রাজ্য কাশ্মীরে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার ও একটি ডাকোটা বিমান যেভাবে ধ্বংস হয়েছে সেটা শুধু দুঃখেরই কারণ নয়, যথেষ্ট দুশ্চিন্তা ও পরিতাপেরও কারণ আছে তাতে। ঐদিন পুঞ্চ এলাকা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ভারতের স্থল ও বিমানবাহিনীর ছয়জন শীর্ষস্থানীয় অফিসার একটি হেলিকপ্টারযোগে যাত্রা করার কিছুক্ষণ পরেই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন ও ঘটনাস্থলেই সকলে প্রাণ হারান। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, টেলিগ্রাফের তারে হেলিকপ্টারটি আটকে যাওয়ার ফলে ঐ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার কারণ যাই হোক, দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতি যা হ'ল তা অপূরণীয়। একটি যুদ্ধে যে ক্ষতি হয় না, মুহূর্তের দুর্ঘটনায় ভারতকে তা স্বীকার করে নিতে হল। একসংগে প্রাণ হারালেন দুজন লেফটেনান্ট জেনারেল, একজন ভাইস এয়ার মার্শাল ও একজন ফ্লাইট লেফটেনান্ট। আরও দুঃখের কথা হল যে, এতবড় ক্ষতির কোন সান্ত্বনা নেই। সামরিক বিভাগে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, একই বিমানে বা হেলিকপ্টারে কখনও যেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি একসংগে ভ্রমণ না করেন। এমন কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব পুঞ্চ এলাকায় হয়নি যার জন্য ঐ নির্দেশ লংঘন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পাক-অধিকৃত কাশ্মীর এলাকার সন্নিকটে এই দুর্ঘটনা ঘটায় অনেকে নাশকতামূলক কার্যকলাপেরও আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কিন্তু সরকার সে আশঙ্কার কোন কারণ নেই বলে জানিয়েছেন।

একই দিনে বানিহাল গিরিবর্ত্মে যে ডাকোটা বিমানটি ধ্বংস হয় তাতেও ভারতীয় বিমানবাহিনীর চারজন অফিসার ও চারজন অসামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। দুদিন পরে এক খাড়া পাহাড়ের গায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানটির সন্ধান পাওয়া যায়।

মিঃ ক্রুশ্চেভের ভারত সফর

সিংহল ও নেপাল গমনের পথে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর ভারত পরিদর্শনের সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রীনেহরু পূর্বেই সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীকে ভারত পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং মিঃ ক্রুশ্চেভ ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণও করেন।

জানা গেছে যে, মিঃ ক্রুশ্চেভ সম্ভবতঃ আগামী জানুয়ারী মাসের শেষার্ধে অথবা ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত পরিদর্শনে আসবেন।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের আগামী মার্চ মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরের কথা আছে। এখন এর পূর্বেই মিঃ

ক্রুশ্চেভ ভারত সফরে আসছেন। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি সোভিয়েট পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদল ভারত সফরে আসবেন। এই সকল বিষয় দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সফর আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে অথবা ফেব্রুয়ারী মাসে নির্দিষ্ট হবে।

পরলোকে মুখ্যমন্ত্রী কান্নামোয়ার

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এম এস কান্নামোয়ার গত ২৪শে নভেম্বর অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে মহারাষ্ট্রের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচাবন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় শ্রীকান্নামোয়ার তাঁর স্থলাভিষিক্ত

এস, এস, কান্নামোয়ার

হন। তাঁর পূর্বেও তিনি চাবন মন্ত্রিসভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও মহারাষ্ট্র কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সহকারী নেতা ছিলেন।

একজন সামান্য ট্রাম কন্ডাক্টররূপে শ্রীকান্নামোয়ারের কর্মজীবন শুরু হয়। কিন্তু তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায়, বিদ্যানিষ্ঠা ও দেশপ্রেম অনতিবিলম্বেই তাঁকে জনজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার তিনি কারাবরণ করেন। সাংবাদিক ও শিক্ষাব্রতীরূপেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

অর্থনৈতিক

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পি-এল ৪৮০ আইন অনুসারে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে গম কেনার ব্যাপারে ভারতকে প্রতি বছর ওয়াশিংটনে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। ঐ আলোচনার ভিত্তিতে গত কয়েক বছর ধরে ভারত অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার কাছ থেকে মোট ৪ লক্ষ টন গম কিনছে।

কিন্তু এই বছর ভারত জানিয়েছে যে, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে অত গম কেনা ভারতের পক্ষে খুবই অসুবিধাকর। সুতরাং অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার অত গম কেনার জন্য যেন তার উপর চাপ দেওয়া না হয়। এবিষয়ে এখন আলোচনা চলছে ওয়াশিংটনে, এবং আশা করা যায় যে শেষ পর্যন্ত আপোষে অস্ট্রেলিয়ার বিক্রয় কোটা কিছু কমানো হবে।

* * *

বিদেশে ভারতের কাপড়ের বাজার খুবই মন্দা। ১৯৬২ সালে মোট ৫২ কোটি ১৯ লক্ষ ৩ হাজার মিটার ভারতীয় কাপড় বিদেশে বিক্রি হয়েছে। এটা ১৯৬১ সালের বিক্রির চেয়ে ৮·৯ শতাংশ কম ও গত ১২ বছরের বিক্রির মধ্যে ন্যূনতম। ১৯৬২ সালে যত কাপড় উৎপন্ন হয়েছিল এদেশে তার মাত্র ১১·৬২ শতাংশ বিদেশে চালান গেছে। ভারতীয় কাপড়ের প্রধান ক্রেতা বৃটেন ১৯৬২ সালে কিনেছে ভারতের মোট রপ্তানির ২৬·৪ শতাংশ; তারপর সুদান কিনেছে ১৩·১২ শতাংশ; বৃটিশ পূর্ব-আফ্রিকা ৮·৭ শতাংশ ও অস্ট্রেলিয়া ৫·৮ শতাংশ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার লক্ষ্য ছিল বছরে ৭৭ কোটি ৭০ লক্ষ মিটার (৮৫ কোটি গজ) কাপড় রপ্তানি। সুতরাং লক্ষ্যের চেয়ে ভারত প্রায় ২৫ কোটি মিটার পিছিয়ে আছে।
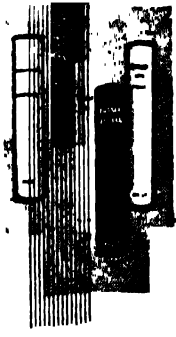
অভয়ংকর

কয়েক বছর আগে বেহালায় বীরেন রায়ের বাড়ি দুর্গাপূজোর মহাষ্টমী দিবসে এক মুণ্ডিতকেশ, দীর্ঘদেহ, গৈরিকভূষিত জার্মান সাধুকে শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ করতে দেখেছিলাম, তাঁরই নাম লিওপোলড ফিসার, অর্থাৎ পূর্বাশ্রমের নাম, বর্তমান নাম, স্বামী অগেহানন্দ ভারতী। এই স্বামীজিকেই আবার ভারত সরকার বহিস্কৃত করে দিয়েছেন, সে কথা হয়ত অনেকের স্মরণে নেই, এই বহিস্কারের পিছনে যে কোনো রাজনৈতিক কারণ বর্তমান সে-কথা বলা বাহুল্য। স্বামী অগেহানন্দ ভারতী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে অস্ট্রিয়ায় সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু আলোচনাও ভারতে থাকাকালে করেছেন, বিরূপ মন্তব্যই বেশী।

এই স্বামীজী গৈরিক বসন পরিধান করে, মস্তক মুন্ডন করে হিন্দু সন্ন্যাসী হিসাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন, সংস্কৃত ভাষায় তিনি যে সুপণ্ডিত সে পরিচয় ব্যক্তিগতভাবে আমি পেয়েছি, হয়ত সংস্কৃত ভাষাই তাঁকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করেছে। The Ochre Robe নামে একটি আত্মজীবনী লিখেছেন এই গৌরাঙ্গ জার্মান সন্ন্যাসী। সাংবাদিকের ভঙ্গীতে স্বামীজী যে শুধু নিজের আত্মকথা লিখেছেন তা নয়, হিন্দু ধর্মের বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে তিনি নতুন আলোকসম্পাত করেছেন। পারিবারিক জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে স্বামীজী মাত্র তেরো বছর বয়সে ভিয়েনাস্থ ইণ্ডিয়ান ক্লাবে যোগদান করেন, এবং ভারতের দেব-দেবী, মঠ-মন্দির, সাধু-সন্ত সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল হয়ে পড়েন। তিনি বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, ভাষাবিজ্ঞানেও তাঁর আগ্রহ কম নয়, তাই তিনি সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। পনের বছর বয়স হতে না হতেই হিন্দু-ধর্ম সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হয়।

স্কুলের পাঠ শিক্ষায় স্বামীজীর ঘোরতর বিতৃষ্ণা। একদিকে ক্যাথলিক গোঁড়ামি অপরদিকে নাৎসী নীতি তাঁকে পীড়িত করে তোলে। ষোড়শতম জন্মদিবসে ১৯৩৯-এর ২০শে এপ্রিল স্বামীজী হিন্দু-ধর্ম গ্রহণ করে শ্রীরামচন্দ্র নাম ধারণ করলেন। ইণ্ডিয়ান লিজিয়নে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার বিষয়ে তিনি দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। শিখদের সংস্পর্শে এসে তিনি দেখলেন যে তাঁদের ধর্ম অনেক সহজসাধ্য এবং বিশেষ করে তাঁদের কীর্তনে তিনি অংশগ্রহণ করলেন। পরিশেষে, স্বামীজী এক হিন্দু-মন্দির স্থাপনা করে নিজেই তার পুরোহিত হলেন, ইণ্ডিয়ান লিজিয়নে পুরোহিত হওয়ার যোগ্য সংস্কৃত জ্ঞান আর কারো ছিল না। এই সময়েই হিন্দু সন্ন্যাসীর জীবন তিনি গ্রহণ করবেন স্থির করলেন।

১৯৪৭-এর ২৭শে জানুয়ারী স্বামীজী যুদ্ধবন্দীদের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে ভিয়েনায় ফিরে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-তত্ত্ব এবং দর্শন শিক্ষা করতে শুরু করলেন আর সেই-সঙ্গে ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি করে বিভিন্ন সাধু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯৪৮-এর বড়দিনের সময় বার্ণ-এর ভারতীয় দূতাবাস থেকে তিনি সংবাদ পেলেন যে ভারতীয় ভিসা তাঁকে দান করা থির হয়েছে। ক্রীসমাস দিবসেই তিনি 'তরিনীয়া' জাহাজে পাড়ি দিয়ে ১৯৪৯-এর ৩০শে জানুয়ারীতে ভারতে পদার্পণ করলেন, সে তাঁর জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে তিনি দণ্ডি-কাটার ভঙ্গীতে ভারতভূমিকে প্রণতি জানালেন। সামান্য কয়েকদিন বোম্বাই শহরে বাস করে, সেখানকার খর অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে গেলেন, তারপর সেখান থেকে বেলুড় মঠের অদ্বৈত আশ্রমে, সেখানে চার মাস ব্রহ্মচারী হিসেবে কাটানোর পর লোহঘাটের অদ্বৈত মঠে হিমালয়ের স্পর্শলাভ করলেন। এইখানে তিনি চার বছর স্বামী যোগেশ্বরানন্দের অধীনে যোগভ্যাস করেন এর প্রায় আরও চার বছর পরে তাঁর বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হিসাবে গৃহীত হওয়ার কথা, কার্যতঃ তা আর হল না, কারণ দীক্ষার পূর্ব-মুহূর্তে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার হিসাবে স্বীকার করতে পারলেন না।

স্বামীজী তাই হিমালয়ের শীতলধাম ত্যাগ করে সমতলে নেমে এলেন, নতুন পথের সন্ধানে। বারাণসী পৌঁছে তিনি গুরু খুঁজতে লাগলেন, অবশেষে মণিকর্ণিকা ঘাটে স্বামী বিশ্বানন্দের কাছে দীক্ষালাভ করলেন, জ্বলন্ত চিতাগ্নির সম্মুখে মধ্যরাত্রে দীক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে তিনি হলেন স্বামী অগেহানন্দ ভারতী। সেখান থেকে তিনি দক্ষিণ ভারতে পদব্রজে ভ্রমণে গেলেন, পথের সম্বল ভিক্ষান্ন।

তীর্থ-পরিক্রমার পর স্বামীজী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কর্ম গ্রহণ করে জার্মান ভাষা শিক্ষাদান শুরু করলেন, তারপর সেখান থেকে হরিদ্বার, হর-কি-পুরী, ভোলাগিরির আশ্রম এবং শাস্ত্রবাক্য এবং উপদেশ শ্রবণে কালাতিপাত করে চললেন উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রীর পথে শেষ শিবির। শংকরাচার্যের দর্শনের ভাষ্যকার স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দকে তাঁর খুব ভালো লাগল। রাজস্থানে গিয়ে স্বামীজী অসুস্থ হলেন, সেখান থেকে ফিরে দেখা হল পণ্ডিত গোবিন্দ মালবীয়ের সঙ্গে দিল্লীতে, তাঁর আহ্বানে তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন, সেইসঙ্গে সঙ্গীত-চর্চাও শুরু করলেন।

স্বামীজী অম্বালায় সৎসঙ্গমণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ, ডালহৌসীর কাছে রক্ষণশীল দশনামী সম্প্রদায়ের স্বামী হরিগিরি দর্শন, দক্ষিণ ভারতে স্বামী আগমনানন্দের সঙ্গে আলোচনা, এলাহাবাদের কুম্ভমেলা দর্শন, গোবর্ধন মঠে জগদগুরু শংকরাচার্যের দর্শনলাভ, এবং সিদ্ধমাতা রামেশ্বরীর দর্শনলাভ, তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা মনে করেন।

নালান্দা, শ্যামদেশ ও জাপানে ভ্রমণকালে স্বামীজী হিন্দু-ধর্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম ও খৃষ্ট-ধর্ম সম্পর্কে একটা তুলনামূলক আলোচনা করে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ উপভোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুসারী ধর্ম-সমাজের বিরুদ্ধে স্বামীজী বিশেষ মন্তব্য করেননি বটে, আধুনিক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে যেসব সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকা উচিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের তা আছে, প্রশংসনীয়ভাবে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বেশ ভালোভাবেই সুদক্ষ পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত, তার নিয়মনিষ্ঠা প্রশংসনীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের আহার-বিহারে ব্যভিচার দেখা যায় না। গৈরিকবাসকে তাঁরা কলঙ্কিত করেন না। তথাপি মিশনের সাধকরা তেমন পণ্ডিত নন, তাঁরা গভীরভাবে জাতীয়তা-বাদী এবং স্বামী বিবেকানন্দের মত বিশ্বাস করেন যে পাশ্চাত্য দেশ বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলে পৃথিবীকে উন্নত করবেন আর ধর্মীয় নীতি ভারতবর্ষই রপ্তানি করবে। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের বিশ্বাস যে সব ধর্মই একই নীতি প্রচার করেন, আর সেবা দ্বারাই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সম্ভব। এই ঐতিহ্যগত হিন্দু-বিশ্বাসের প্রতি স্বামীজীর মতৈক্য নেই, পাশ্চাত্য জগৎ যে শুধু জড়দ্রব্যের সরবরাহ করতেই সক্ষম এই মত তিনি পোষণ করেন না। তাঁর ধারণা ভারতও খৃষ্টীয় পাশ্চাত্যের কাছ থেকে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের পাঠ গ্রহণ না করলেও মানবিক পাশ্চাত্য জগতের কাছ থেকে অনেক কিছু নিতে পারে। মানবিক দিক সম্পর্কে ভারতীয় সাধকরা তেমন ওয়াকিবহাল নন। তিনি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাবাদ সম্পর্কে কোনোরকম পড়াশোনা করেছেন বলে মনে হল না। এছাড়া পৃথিবীর সব ধর্ম এক বস্তুর সন্ধান দান করে না, ধর্ম বিভিন্ন, মত বিভিন্ন, পথ বিভিন্ন, যে যার সে তার। তাদের লক্ষ্য বিভিন্ন। তাই প্রত্যেক মানুষের স্ব স্ব রুচি এবং মর্জিমাফিক ধর্মনীতি গ্রহণ করা কর্তব্য। ভারতীয় সাধুদের 'অধিকার ভেদ'-তত্ত্বেও তিনি বিশ্বাসী নন। ধর্মের পথ তাই বিভিন্ন, তাই সেই বাঁধাধরা পথে কোনো মানবিক স্পর্শলাভ সম্ভব নয়। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে হিন্দুধর্মের উদার আশ্রয়ে বাঁধাধরা বিধি-নির্দেশ নেই। যাঁরা ধর্মতত্ত্বের আলোচনা পাঠে আগ্রহ-শীল, তাঁরা এই সুপণ্ডিত ব্যক্তির আত্মজীবনী পাঠে আনন্দ পাবেন সন্দেহ নেই। *

THE OCHRE ROBE: Swami Agehanand Bharati. Publisher: George Allen & Unwin London. Price 2 shillings. (Pp. 294).

।। তুলনামূলক রামচরিত ।।

আগরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পী-এচ-ডি উপাধির জন্য স্বীকৃত এই হিন্দী প্রবন্ধ-গ্রন্থের জন্য ভারতীয় সাহিত্য আলোচকেরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ডঃ রমানাথ ত্রিপাঠী মহাশয় কানপুর এস ডী কলেজে অধ্যাপনার মধ্যে যে তুলনামূলক নিবন্ধ-গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন তাহাতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস রামায়ণ রচনা-ক্ষেত্রে কি ধরণের অভিনবত্ব ও চিরন্তনগুণে আবালবৃদ্ধ-বণিতার শ্রদ্ধা ও আনন্দের উৎস হিসাবে পূজিত হইতেছেন তাহার চমৎকার আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থটি নয়টি অধ্যায়ে ও একটি পরিশিষ্টে বিভক্ত। এছাড়া গ্রন্থের দুইটি ভূমিকাও বিশেষ মূল্যবান। একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। অপরটির লেখক কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাসুদেব শরণ অগ্রবাল। দ্বিতীয় ভূমিকা-লেখক শ্রীঅগ্রবাল ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ-বিষয়ক আলোচনা-ক্ষেত্রে শ্রীসাধু কামিল বুল্কের নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করিয়াছেন এবং বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেড়শ বছরের ব্যবধানে আবির্ভূত বাংলার কৃত্তিবাস ও পরবর্তী তুলসীদাস বিষয়ক আলোচনার জন্য ডঃ রমানাথ ত্রিপাঠীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রথম ভূমিকাটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডঃ দাশগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'আনন্দ রামায়ণ' 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ-গুলিকে কৃত্তিবাসের উৎস বলা কতখানি সঙ্গত তাহা বিচার্য। দস্যু রত্নাকর "মরেতি" (মরা+ইতি) জপ করিতে করিতে রাম নাম উচ্চারণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া সংস্কৃতে এ কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' গ্রন্থে মৃত অর্থে এই যে 'মরা' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে তদ্ভব। 'মরা' (মৃত অর্থে) শব্দের ব্যবহারযোগে "উপাখ্যান রচনার কৃতিত্ব কৃত্তিবাসকেই অধিক দিবার পক্ষপাতী" বলিয়া ডঃ দাশগুপ্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ডঃ দাশগুপ্তের অভিমত যদি ঠিক হয়, অর্থাৎ 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' হইতে কৃত্তিবাস বাংলায় কাহিনী সংগ্রহ করেন নাই, অনেক ক্ষেত্রে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' গ্রন্থে কৃত্তিবাসের বা লৌকিক কাহিনীর সংস্কৃত রূপান্তরণ ঘটিয়াছে—তাহা হইলে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাসের মধ্যে আর একদিক দিয়া যোগসূত্র পাওয়া যায়। তুলসীদাস 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' হইতেও কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন (ঐ, ভূমিকা : শ্রীঅগ্রবাল)। এ বিষয়ে আমাদের কয়েকটি জিজ্ঞাসা আছে—

(ক) তুলসীদাস কৃত 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' কাহিনীর উৎস কোথায়?

(খ) তুলসীদাস সংস্কৃত প্রাকৃত এবং 'ক্বচিদ্ অন্যতোঽপি' কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন। ভাষা রামায়ণ ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস সর্বপ্রথম। এছাড়া কাহিনী আছে ভাষা রামায়ণ ব্যাপারে তুলসীদাস বাঙালী মধুসূদন সরস্বতীর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে তুলসীদাসের রামায়ণের কোনও যোগ হইয়াছিল কি?

(গ) তুলসীদাস অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন 'পূর্ববর্তী সুকবি প্রভু শম্ভু বিরচিত রামায়ণ' ("যৎ পূর্বং প্রভুণা কৃতং সুকবিনা শ্রীশম্ভুনা") হইতে। এখানে 'শম্ভু' শব্দের অর্থ মহাদেব করা হয়। কৃত্তিবাস শব্দের অর্থও তাই। অপভ্রংশ রামায়ণকার স্বয়ম্ভু বিরচিত 'পদ্ম চরিউ' গ্রন্থের সঙ্গে তুলসীদাসের যোগসূত্র বিষয়ে ডঃ ত্রিপাঠী এই গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়া-ছেন। কিন্তু তুলসীদাসের সম্ভাব্য উৎস ও কৃত্তিবাস বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যায় কিনা তাহা চিন্তনীয়। ডঃ ত্রিপাঠী অবশ্য 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'কে কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে রামচরিত আলোচনায় ডঃ ত্রিপাঠী যে গভীর অধ্যবসায়, তথ্যানুসন্ধিৎসা ও বিচারক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'অলকা তিলকা' ও 'হুলুধ্বনি' বিষয়ে লেখক যে বিচার করিয়াছেন তাহা হিন্দী সমালোচকদিগকে দিক্ নির্ণয়ে সাহায্য করিবে। গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে উভয় লেখকের বিষয়বস্তুগত তুলনা। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে চরিত্রচিত্রণগত তুলনা। সপ্তম পরিচ্ছেদে উভয়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ভক্তিভাব বিষয়ে আলোচনা। অষ্টম পরিচ্ছেদে উভয়ের কাব্যসৌষ্ঠবের তুলনাত্মক আলো-চনা। এই অধ্যায়গুলি হিন্দী ও বাঙালী সমালোচকদিগকে গভীরভাবে অনু-প্রাণিত করিবে। গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি ছাপার ত্রুটি আছে, কিন্তু লেখক যে নিষ্ঠা, অন্তর্দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্যসহকারে রামচরিতকার কৃত্তিবাস ও তুলসীদাসের তুলনাত্মক অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি ভারতীয় সাহিত্য গবেষকদের নিকট চিরন্তন অভিনন্দন লাভ করিবেন।

—সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

কৃত্তিবাসী বঙ্গলা রামায়ণ ঔর রামচরিত মানস কা তুলনাত্মক অধ্যয়ন— ডঃ রমানাথ ত্রিপাঠী। ভারত প্রকাশ মন্দির। আলীগড়। দাম : দশ টাকা।

।।শেখভ-এর উপন্যাস।।

পুশকিন, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি প্রমুখ যে-সকল দিকপাল রুশ সাহিত্যিক কালজয়ী সাহিত্য রচনা করে গেছেন তাঁদের সঙ্গে একই পঙক্তিতে শেখভের আসন।

জারের আমলের রাশিয়ায় সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় রচিত তাঁর একটি বেদনা-করুণ কাহিনীকে ১৯৪০-৪১ সালে বাংলায় অনূদিত ক'রেন কবি গোপাল ভৌমিক "আমার জীবন" এই অভিধায়। দীর্ঘকাল পরে পুস্তকাকারে প্রকাশকালে অনুবাদক-এর নামকরণ করেছেন "বেদনাহত"।

শহরের এক স্থপতির পুত্র মিশেল এই কাহিনীর নায়ক। পিতা তার প্রতি বিরূপ, সংসারে পিতৃস্নেহবঞ্চিত এই তরুণের একমাত্র আকর্ষণ বোন ক্লিওপেট্রা। পরিবার প্রতিপালনের জন্যে শেষপর্যন্ত মিশেলকে গ্রহণ করতে হ'ল শ্রমিকের কাজ। এই সময়ে তার জীবনে আবির্ভাব হল এক নারীর—ইঞ্জিনিয়ারের মেয়ে মারিয়া ভিক্টোরোভ্নার (মাসা) প্রতি গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত হল মিশেল। বিয়ের পর তারা দুজনে গিয়ে নীড় বাঁধল ডুবেক্নিয়ায়। অনতিকাল পরেই কিন্তু মিশেলকে পরিত্যাগ করে আমেরিকার পথে পাড়ি জমাল মাসা। ওদিকে পিতৃগৃহের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে গেল মিশেলের নিকট। এদিকে অচিরেই একটি কন্যাসন্তানের জন্মদান করে মারা গেল মিশেলের বোন ক্লিওপেট্রা। মা-মরা মেয়েটির দায়িত্ব এসে পড়ল এই স্বজন-পরিত্যক্ত হতভাগ্য তরুণের উপর। প্রতি রবিবারে মেয়েটাকে নিয়ে সে যায় বোনের সমাধিস্থানে—সেখানে রোজই তার দেখা হয় কিছুকাল পূর্বের পরিচিতা অ্যানিউটা ব্লাগোভা নাম্নী একটি তরুণীর সঙ্গে—যার প্রতি অনুভব করে সে দুর্নিবার আকর্ষণ। মেয়েটি কিন্তু কাছে এসেও ধরা দেয় না। সমাধিক্ষেত্র পরিত্যাগ করে পাশাপাশি নীরবে পথ চলে দুজনে। কচি মেয়েটি অ্যানিউটার দিকে বাড়িয়ে দেয় তার ছোট দুটো হাত। এই ছোট মেয়েটিকে উপলক্ষ্য করেই কি নূতন বন্ধনের ডোরে বাঁধা পড়বে ভাগ্য-বিড়ম্বিত মিশেল? এই প্রশ্নটিকে অনুচ্চারিত রেখেই কাহিনীর ইতি করেছেন সুনিপুণ কথাশিল্পী।

সত্তর বছর আগে রচিত এই কাহিনীর মধ্যে এমন কিছু আছে যার আবেদন সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন। তাই কাহিনীটি আজকেরদিনের পাঠকের মনকেও অভিভূত করে। বাংলায় এর অনুবাদ করে শ্রীযুক্ত ভৌমিক একটি প্রশংসনীয় সাহিত্য-কৃত্য সম্পাদন করেছেন।

বেদনাহত—আ্যান্টন শেখভ। অনুবাদক: গোপাল ভৌমিক। প্রকাশক জ্ঞানতীর্থ। ১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম: চার টাকা।

●

বিজ্ঞানভিত্তিক বাঙলা গল্প

বাঙলা দেশ মাত্র নয়, সমগ্র ভারতে বিজ্ঞান এখনও প্রতিটি মানুষের চিন্তা-জগতকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। অথচ আজকের বিশ্বসভ্যতা ঠাকুমার ঝুলি থেকে বেরিয়ে মহাকাশের শূন্যপথে মানুষকে নিয়ে পাড়ি দিচ্ছে অহরহ। ইউরোপ বা আমেরিকায় মানুষ যেভাবে বিজ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়েছে, আমরা তা পারিনি। এর পেছনে হয়ত অনেক কারণই থাকতে পারে। কিন্তু আমরা এখনও অনেক পেছনেই পড়ে আছি—এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।

ইউরোপে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে যে সমস্ত জনপ্রিয় কাহিনী প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে, তার প্রবল সমাদর আমাদের অনেকেরই জানা। এর কারণ বিজ্ঞান বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে একটি প্রাথমিক জ্ঞান রয়েছে। এটি না থাকলে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী সাধারণের পক্ষে বোঝা মুস্কিল। এই জিনিসের অভাব থাকার ফলে আমাদের দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীগুলি এখনও সর্বসাধারণের মধ্যে সমাদৃত হচ্ছে না।

বাঙলা ভাষায় শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প রচনায় যে ধারার প্রবর্তন করেন, এখনও বাঙলা দেশের তরুণ সাহিত্যসেবীদের অনেকেই এই পথে অগ্রসর হচ্ছেন না। ক্ষমতা-দৈন্য হয়ত এর কারণ নয়। এখানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন আন্তরিকতা।

'জন্মকল্পে'র লেখক সমরজিৎ করের মধ্যে শিল্পসৃষ্টির এই আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে রচিত তাঁর এই গ্রন্থের কাহিনীগুলি বাঙলা সাহিত্যে এক অসামান্য সংযোজন। দৈন্যের মাঝখানে তাঁর এই কাহিনী বাঙলা দেশের পাঠকসমাজে কতদূরে সমাদৃত হবে জানি না। তবে পাঠককে বিজ্ঞানের রহস্যময় জগৎ সম্পর্কে আকৃষ্ট করবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

শ্রীযুক্ত কর বিজ্ঞানের আধুনিকতম তথ্যগুলিকে নিপুণভাবে তাঁর গল্পে উপস্থিত করেছেন। সর্বসাধারণের উপলব্ধিগম্য করে প্রকাশ করবার জন্য তাঁর ভাষা বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। হাল্কা ও নিরাভরণ ভাষা-ভঙ্গী অত্যন্ত আকর্ষণীয়। রচনার গতিধারা কোথাও রুদ্ধ হয়নি। কিন্তু বিজ্ঞানের কয়েকটি তথ্য সাধারণের পক্ষে বোঝা হয়ত কঠিন হবে। লেখক ঐ বিষয়ে সতর্ক হলে তাঁর সার্থকতার পথে হয়ত কোন বাধা থাকবে না।

শ্রীযুক্ত কর তাঁর এই অসামান্য গ্রন্থ রচনায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, আশা করি ভবিষ্যতেও তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারবেন।

জন্মকল্প— (গল্প-সংগ্রহ)—সমরজিৎ কর। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম তিন টাকা।

●

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

গঙ্গোত্রী (বিশেষ সংকলন): সম্পাদক: দুর্গাদাস সরকার, শান্তনু দাস। দাম: ৫০ নয়া পয়সা।

ত্রৈ-মাসিক কবিতাপত্র গঙ্গোত্রীর পরিচয় সুবিদিত। বর্তমান সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাসের তিনটি অপ্রকাশিত কবিতাম্বারা সমৃদ্ধ। এছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, কৃষ্ণ ধর, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী, গণেশ বসুর কবিতা; চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এবং ভবানী মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, আলোক সরকার, দুর্গাদাস সরকারও শান্তনু দাসের অনুবাদ কবিতা এ-সংখ্যাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

সম্প্রতি (ষষ্ঠ সংকলন)। সম্পাদক: অশোক চট্টোপাধ্যায়। দাম: ৬০ নয়া পয়সা।

সম্প্রতির বর্তমান দেয়ালী সংখ্যায় রমানাথ রায়ের গল্প এবং অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত মেরুকেন্যার বেণী উল্লেখযোগ্য। কবিতা লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, শঙ্খ ঘোষ, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অশ্রুকুমার সিকদার, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্র ভৌমিক, মৃণাল বসুচৌধুরী, সমীরণ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

মহেঞ্জোদারো: সম্পাদক—সমীর রায়।

শিল্প ও সাহিত্যের ত্রৈমাসিক পত্রিকা মহেঞ্জোদারো। কয়েকটি প্রবন্ধ, সমালোচনা, কবিতা এবং একটি গল্প এ-সংখ্যায় স্থানলাভ করেছে। লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, বার্ণিক রায়, সমীর রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ দাস, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, গণেশ বসু এবং আরো অনেকে।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় মাসীপিসীর মুখে মুখে শুনিতাম, "বন্দে মাতা সুরধুনী—পুরাণে মহিমা শুনি—পতিতপাবনী পুরাতনী।" সেই সঙ্গে শুনিয়াছিলাম, সুরধুনী গঙ্গার অন্য এক নাম দ্রবময়ী। তারপর যখন শব্দার্থ বুঝিতে শিখিলাম, তখন এই দ্রবময়ী নামের অর্থ বুঝিলাম যে বা যাহা দ্রব অর্থাৎ তরল পদার্থে পূর্ণ। কিন্তু নদীমাত্রেই তো সহজ অবস্থায় তরল পদার্থ অর্থাৎ জলে পূর্ণ। তবে গঙ্গার এই নামের বিশেষত্ব কি? অভিধানে গঙ্গার এক জন্মকাহিনী পাইলাম। উত্তর বোধহয় তাহারই মধ্যে রহিয়াছে। কাহিনী এইরূপঃ—

দেবর্ষি নারদ নিজেকে রাগরাগিণী-যুক্ত সংগীতে অভিজ্ঞ মনে করিতেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান কালের অনেক তথাকথিত ওস্তাদের মতই তিনি নিজের ত্রুটি বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন। তাঁর তাল-জ্ঞান ছিল না কিন্তু সে-কথা বুঝাইবে কে? শেষ পর্যন্ত রাগ-রাগিণী সকলে বিকলাঙ্গ নর-নারীর রূপ ধারণ করিয়া পথের পাশে পড়িয়া থাকে। নারদ তাহাদের এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায় নিজের অনভিজ্ঞতা ও ত্রুটির কথা জানিতে পারেন। এই বিকলাঙ্গতা দূর করার উপায় জিজ্ঞাসা করায় দেবর্ষি জানিলেন যে, মহাদেব স্বয়ং আসিয়া সংগীত শুনাইলে তাহারা পূর্ব-দেহ ফিরিয়া পাইবে। নারদ মহাদেবকে সে-কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি সম্মতি দিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে বলিলেন, উপযুক্ত শ্রোতা উপস্থিত না থাকিলে তিনি সংগীতচর্চা করিবেন না। এবং একথাও তিনি সোজাসুজি বলিলেন যে, শ্রোতা হইবার যোগ্যতা নারদের নাই। যোগ্যতা কাহার আছে—এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু।

নারদের তাল-জ্ঞান না থাকুক, তপস্যার পুণ্যবল পর্যাপ্ত ছিল। তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আনিলেন এবং মহাদেব সংগীত আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রাগ-রাগিণীদের পূর্বরূপ ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ওদিকে ঘটিল আর এক কাণ্ড।

ব্রহ্মা বোধহয় ত্রিভুবনের বিষয়ে সাত-পাঁচ ভাবিতেছিলেন, কাজেই মহাদেবের সংগীতের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে তিনি পারেন নাই। কিন্তু বিষ্ণু সেই সংগীতের মর্ম কিছুটা গ্রহণ করিতে পারেন, যাহার ফলে তিনি নিজে দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সংগীত শোনেন নাই, তাই তিনি অবস্থা দেখিয়া দ্রবীভূত বিষ্ণুকে তাঁহার কমণ্ডলুতে গ্রহণ করিতে পারিলেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত।

গঙ্গা নামের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রার কথা সহজেই মনে হয় এবং সেই সঙ্গে মনে হয়, যম ও যমলোকের কথা। ঐ সকল ভীতিপ্রদ কথা ও চিন্তার প্রতিষেধক হিসাবে মনে পড়ে যমদ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার কথা, যে শুভতিথিতে বোনের হাতে আহার করিলে ভাইয়ের সর্বপ্রকার মঙ্গল হয়। সেই সঙ্গে মনে পড়ে ভাই-ফোঁটার দিনে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করিয়া বোন ফোঁটা দিবার সময় বলে, ভাইয়ের কপালে ফোঁটা যেন যমের দোরে কাঁটা দেওয়ার মত হয়। যদি সত্যই তাই হয়, তবে যমরাজার চার হাজার যোজন দীর্ঘ ও দুই হাজার যোজন বিস্তৃত পুরীর স্বর্ণময় প্রাচীর তোরণগুলির সম্মুখে সমস্ত পথই এতদিনে কণ্টকাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যমদ্বিতীয়া মানেই কি যমের দোরে কাঁটা দিবার ব্যবস্থা? অভিধানে বলে অন্য কথা।

তাহাতে—মহাভারতের নজীরে—লিখিত আছে যে, যমের সহোদরা ভগিনী যমুনা কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভ্রাতা যমকে নিজের গৃহে আনিয়া পূজা করেন ও আহারে পরিতৃপ্ত করেন। এবং সেইজন্যই ঐ দিনে ভগিনীরা ভ্রাতাদিগকে আহারে পরিতৃপ্ত করে। যমুনা যে ভাইকে ভূরিভোজনে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারই গৃহ বা রাজ-পুরীর দ্বারে কণ্টক আরোপনের উদ্দেশে তাঁহার কপালে ফোঁটা দিয়াছিলেন, এ-কথা তো অভিধানে পাওয়া গেল না। অভিধানে যাই থাকুক বা না থাকুক, বাংলার বোনেদের এই সংকল্প অতিশয় প্রশংসনীয় এ-কথা তাঁহাদের ভাইরা মুক্তকণ্ঠে বলিবেন।

তবে যমের শত্রুর অভাব ছিল না এবং তাঁহার প্রবল প্রতাপ খর্ব করার ক্ষমতা মুনি-ঋষিদের ছিল—এ-কথাও অভিধানে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে অণীমাণ্ডব্যের কাহিনী দেওয়া যাইত, কেননা ঐ ধার্মিক মৌন ব্রাহ্মণের শাপে যম দাসী-গর্ভে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। উপাখ্যানটি এখানে বিবৃত করা গেল না, কেননা উহার আদিম ভাব পুরাণে, মহাভারতে বা অভিধানে চলে কিন্তু কথা-সাহিত্যে বা সমালোচনায় উহার সমাদর সুনিশ্চিত নয়।

অভিধানকার পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনীগুলিকে তত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। উহাতে কাহিনী-উপাখ্যানগুলিতে সুদূর অতীতের সমাজধর্ম ও লোকাচার ইত্যাদি অবিকৃতরূপে উপলব্ধি করা যায়। এবং সেই কারণেই ঐ সকল উপাখ্যানে মানব-প্রকৃতির ও মানবসমাজের প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস এবং মানসিক আবেগের গতি যে [illegible] বিচিত্রভাবে ফলিত হইতে পারে, তাহার বিবরণ আমাদের বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা ইত্যাদিতে যেভাবে সহজ আকারে দেওয়া আছে, সেইভাবেই অভিধানে দেওয়া হইয়াছে এবং সেই কারণেই এই অভিধান* একদিকে মহাকাব্য, বেদ, পুরাণ ইত্যাদি হইতে গৃহীত বিবিধ বিষয়ের সংগ্রহ-গ্রন্থ ও অন্যদিকে যে জাতি-সমষ্টি হইতে আমাদের ভারতীয় জাতির উদ্ভব, সে সকল জাতির আদি উষাকাল হইতে ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভকালীন সময় পর্যন্ত সমাজ-সংস্কৃতির অপরূপ ও পরিবর্তনশীল চিত্রাবলীর সমাবেশ। সুতরাং অভিধান হিসাবে ইহার মূল্য যেমন অশেষ, সমাজ ও মনুষ্য-প্রবৃত্তির বিচিত্র প্রদর্শনীরূপেও ইহার মূল্য অসীম।

অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণেও সামান্য কিছু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। নামের বানান সর্বত্র একভাবে হয় নাই, যথা—সূচীতে ও মূল বিবরণে যে নাম শূর্পনখা, সেই নামই সীতার বিবরণে সূর্পনখা দেওয়া হইয়াছে; মূল বিবরণের সালকটংকটা ঐভাবে সুকেশের বিবরণে সালকটাংকটা হইয়া গিয়াছে।

অনেকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকা ভিন্ন নামের বিবরণে একাধিকবার বিবৃত হইয়াছে, যথা—অগস্ত্য, ইলল ও বাতাপিতে, অনিরুদ্ধ ও উষায়, উদ্দালক ও শ্বেতকেতুতে, ধুন্ধু ও ধুন্ধুমার ইত্যাদির বিবরণে ঐরূপ পুনরুক্তি রহিয়াছে। ঐ পুনরুক্তিগুলির স্থলে শুধু সংক্ষিপ্ত নির্দেশ—যথা, অগস্ত্য দেখ—দিলে অভিধানে অন্য তথ্য দিবার স্থান পাওয়া যাইবে। অভিধানে কয়েকটি নামের পরোক্ষভাবে উল্লেখ আছে, যাহার পূর্ণ বিবরণ ঐ নামের সঙ্গে যথাস্থানে নাই। যথা ললিতা ও সুষেণ এই দুই নামের উপাখ্যানে নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র নামের সঙ্গে শুধু কুরুকুলের ধৃতরাষ্ট্রের বিবরণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ধিত ও চিত্রশোভিত। এই অভিধানে তথ্যের ঐশ্বর্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহা তথ্যাভিলাষীর নিকট অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক হইয়াছে।

***পৌরাণিক অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার, প্রকাশক : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : দশ টাকা।**

সাহিত্য জগৎ

সিদ্ধার্থ

বাঙলা গল্প, লেখক ও পাঠকের সমস্যা

আমাদের জীবনে সমস্যার শেষ নেই। অতীতেও এর শেষ ছিল না—, হয়ত ভবিষ্যতেও থাকবে না। কিন্তু সমস্যার রূপে ভিন্ন। অতীতের সমস্যার সঙ্গে আজকের অনেক পার্থক্য। আবার ভবিষ্যতেও হয়ত একথা বলব যেমন আমরা অতীত সম্পর্কে বলে থাকি। এই সমস্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখার সমস্যাও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এযাবৎ তাই-ই হয়ে এসেছে। এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বর্তমান শতকের পঞ্চম দশক পর্যন্ত প্রতিটি দশককে আলাদা-ভাবে ধরে বিচার করলে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি দশকের মধ্যে সমস্যা কত দ্রুত বিবর্তিত হয়েছে। স্থানীক বা সীমাবদ্ধ চেতনা আজ সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ; আজকের সমস্যা বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে প্রবাহ চলেছে তার সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

আজকের লেখকের কাছে লেখাটা বড় সমস্যা নয়। যে কোন বিষয় নিয়ে লেখা সম্ভব। সমস্যা হল জীবনানুসন্ধানের। মানুষের আত্মপ্রতিকৃতি উপলব্ধিতে আজকের লেখক গভীরভাবে ভাবিত। আজকের সভ্যতা বা মানুষের চিন্তাজগৎ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে আখ্যায়িকা বা উপাখ্যাননির্ভর কাহিনীবিন্যাসে লেখকের তৎপরতা মৃত্যুরই সামিল। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের এই বিবর্তিত চেতনার সঙ্গে বাঙলা দেশের গল্প-পাঠকের চিন্তাধারার বৈসাদৃশ্য সুস্পষ্ট। অন্ততঃ আজকের পাঠক পরীক্ষাধর্মী কোন রচনা পাঠে নিজেকে বিব্রত করতে চান না। অনেক সময় তাই মনে হয়েছে।

আজকের লেখক মানুষের জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাহিনী বিন্যাস করেন না। তিনি বলতে বসেন না জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে (ঘটনার পর ঘটনার সজ্জায়) লোকটি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল (ঘটনার পুনরাবৃত্তি)। তিনি দেখাতে চান মুহূর্তের চিন্তার মধ্য দিয়ে একটি মানুষের স্বরূপকে। ক্ষুদ্র মুহূর্তের মধ্য দিয়ে কোন সমস্যাকে। কাহিনীর অতিবিস্তার নেই। আছে শব্দের সজ্জা, বিশ্লেষণ। যে সব পাঠক কাহিনী মাত্র আস্বাদন করতে চান তাঁরা বলবেন এসব লেখা জটিল। নতুন লেখকের লেখা সম্পর্কে এটি অভিযোগ হলেও একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কারণ যুগপ্রবাহে যুগের সমস্যায় ঐ শিল্পের আধার ও আধেয় পরিবর্তিত হচ্ছে। লেখক কখনও একটি মানুষের প্রতিকৃতি আঁকতে চান না, তার জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরতে চান না। লেখক এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত বলেই তিনি একটি মুহূর্তের প্রেক্ষণায় তুলে ধরতে চান একটি মানুষের সম্পূর্ণ জীবনের সমস্যাকে—তুলে ধরতে চান জীবনের অর্থ—তুলে ধরেন মানুষটি কেমনভাবে বেঁচে আছে। ফলে প্রতীকের মধ্য দিয়ে চিন্তার বিকাশ ঘটছে। এই প্রতীকধর্মী গল্প উপলব্ধির জন্য পাঠকের রুচিবদলের প্রয়োজন আছে।

ফলে পাঠককে প্রয়োজন হবে সমকালীন চিন্তাপ্রবাহকে উপলব্ধি করা। একটি বস্তি— তার মানুষ—বিচিত্র জীবন-জটিলতা-প্রেম-গুন্ডামি এ স ব প্রত্যক্ষ সত্যকে আজকের লেখক তুলে ধরতে চান না। এই বাস্তবের চিত্র অংকনে তিনি তৎপর নন। এই জীবনের চরিত্র বা তার সত্য রূপটিকেই লেখক তুলে ধরতে চান। ফলে ঘটনা হয়ে যাচ্ছে গৌণ—মুখ্য রূপে হল চরিত্রগুলির মানসিক প্রবাহ।

ফলে আধুনিক গল্পে মনোবিশ্লেষণের প্রবাহ অতি সুস্পষ্ট। চরিত্রের স্বরূপকে তুলে ধরবার জন্য লেখককে মানুষটির সম্পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করে তার মুহূর্তের চিন্তায় সামগ্রিক সত্যকে অবিকৃতভাবে তুলে ধরাটাই বড় কথা। মনঃসমীক্ষণে অতি-বার্থ কিছু লেখক নতুন গল্প সৃষ্টির পথে এক হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব করেছেন। বাঙলা দেশের পাঠকও ঠিক এই সমস্ত লেখকদের জন্য ভ্রান্তপথে পরিচালিত হচ্ছেন।

গল্পের নতুন গতিপথকে উজ্জ্বল করবার জন্য একালের ক্ষমতাশালী লেখকরা নিজেদের ক্ষমতার পরিপূর্ণতার জন্য আরও তৎপর হবেন। জীবনটাকে যদি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি না করা যায় তাহলে শিল্পী হিসাবে তাঁদের ব্যর্থতা প্রতিদিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বাঙলা ছোটগল্পে এখন মোটামুটি-ভাবে দুটি ভাগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক ধরনের গল্প হল মিষ্টি গল্প। যা গল্পই। অপর শ্রেণীর গল্প নিয়ে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। সুখকর মিষ্টি গল্প পাঠে পাঠক তৃপ্তি পান। নতুন লেখকদের বিরুদ্ধে যে জটিলতার অভিযোগ তা কতটা তাঁদের লেখা পড়বার ফলে গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে।

তরুণ লেখকদের রচনাপাঠের প্রতি অনাসক্তিও আজকের সাহিত্যের একটা সমস্যা। কঠোর অধ্যবসায় ও সাধনায় যে সিদ্ধির দিকে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন তা আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। এই তো স্বাভাবিক। সৃষ্টিশীল লেখক তো যুগের প্রবাহে প্রবাহিত হবেন। পাঠকেরা রুচির দিকে তাকিয়ে তাঁরা এক শতাব্দীতে পেছিয়ে যেতে পারেন না। বরং এগিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে গত দশ-পনের বছরে কোন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হয়নি। অথচ কোন প্রবীণ লেখক তাঁদের সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করেননি। তাঁরা যদি তরুণদের প্রতি কিছুটা প্রসন্ন হন তাহলে বাঙলা সাহিত্যেরই মঙ্গল হবে। এবং দেখা যাবে আজকের রচনা ভুইফোঁড় নয়। বাঙলা সাহিত্যের বিগতকালের সঙ্গেও তার সাযুজ্য রয়েছে। একেবারেই দুর্বোধ্য জটিল 'হিং টিং ছট' জাতীয় কোন ব্যাপার নয়।
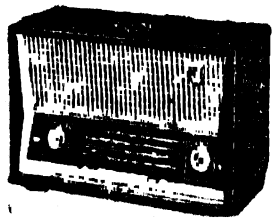
বিদেশী সাহিত্য

মার্ক টোয়েন

মার্কিনী সাহিত্যে মার্ক টোয়েন সম্ভবতঃ ওয়াল্ট হুইটম্যান অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী এবং অধিক লোকপ্রিয়ও বটে। আধুনিক মার্কিন সাহিত্যের একজন দিকপাল আর্নেস্ট হেমিংওয়েও মার্ক টোয়েনের কাছে যথেষ্ট ঋণী। হেমিংওয়ে লিখেছিলেন : "সমস্ত মার্কিন সাহিত্যের উদ্ভব মার্ক টোয়েনের লেখা 'হাক্‌লবেরী ফিন' নামক একটি গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থটিই সমস্ত মার্কিন রচনার উৎস। এর পূর্বে আর কিছুই ছিল না। এর পরেও এর মত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর হয়নি।"

মার্ক টোয়েনের জন্ম ১৮৩৫ সালের ৩০-এ নভেম্বর। হাস্যরসসৃষ্টিতে আমেরিকার এই অদ্বিতীয় লেখক টম সইয়ার এবং হাক্‌লবেরী ফিন নামে দুটি পুস্তক রচনা করেন। দূর পশ্চিম অঞ্চলের অঙ্গরাজ্য নেভাদা ও ক্যালিফোর্ণিয়ায় মার্ক টোয়েন যখন সাংবাদিকরূপে কাজ করছেন তখনই তিনি হাস্যরসাত্মক গল্পের রচনা শুরু করেন। এই রকমই একটি গল্প দি সেলিব্রেটেড জাম্পিং ফ্রগ অব ক্যালাভেরাস কাউন্টি ১৮৬৫ সালে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। গল্পটি তিনি প্রথম শোনেন খনি-শ্রমিকদের এক শিবিরে। ১৮৬৭ সালে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যভ্রমণ সম্পর্কে তিনি সংবাদপত্রে যে সকল চিঠিপত্র লিখেছিলেন, সেগুলিই পরে দি ইনোসেন্টস অ্যাব্রড নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি জনসাধারণের হাতে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে একজন বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় হাস্যরসস্রষ্টারূপে টোয়েনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রচুর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং বহু বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে ও হচ্ছে।

অধিকাংশ পাঠকের কাছে টোয়েনের প্রধান আকর্ষণ তাঁর হাস্যরস। তবে বিদেশী পাঠকের পক্ষে এই ধরণের হাস্যরস হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। কারণ এর উদ্ভব হয়েছে আমেরিকার মাটিতে, আমেরিকার দেশাচার, লোকাচার ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার যোগ রয়েছে। তাঁর অধিকাংশ হাস্যরসের লক্ষ্য হল মিথ্যা ভান ও আভিজাত্যবোধ।

কিন্তু মার্ক টোয়েন শুধু যে হাস্যরসের কারবারী ছিলেন তা নয়, আর তাঁর সকল রসিকতা একমুখীও নয়। শুধু যে অপরকে লক্ষ্য করেই তিনি তাঁর হাস্যরসের বাণগুলি ছুঁড়েছিলেন তা নয়, তিনি নিজেও এর লক্ষ্য হয়েছিলেন। কারণ তিনি যে শুধু মানবজাতির ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কেই সচেতন ছিলেন তা নয়, নিজের দোষ-ত্রুটিগুলিও কদাচ তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রচনাসম্ভার বিশ্লেষণ করে সমালোচকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, টোয়েনের হাস্যরসসৃষ্টির মূল উৎস হল সামাজিক সংস্কারক ও দার্শনিক দিক থেকে নৈরাশ্যবাদীরূপে তাঁর নিজের ভূমিকা। টোয়েনের দি ইনোসেন্টস অ্যাব্রড গ্রন্থের মধ্যেই তাঁর নৈরাশ্যবাদ সুপরিস্ফুট। দি গিলডেড এজ নামক ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসের মধ্যে এই ভাবটি আরও অধিক পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং তাঁর আত্মজীবনীগ্রন্থটিতে তা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

মার্ক টোয়েনের মানসিক গঠনই এরূপ ছিল যে, কখনও তাঁর মনে জাগত বিপুল আশা, কখনও বা তাঁর মনটি ভরে উঠত গভীর হতাশায়। এই মানসিক প্রকৃতিটি আরও বেশী মাত্রায় প্রকট হয়ে উঠল তাঁর পত্নী ও দুটি কন্যার মর্মান্তিক মৃত্যুর পর। তাছাড়া শিল্পোন্নতির পথে একটি সভ্যতার মধ্যে যে নৈতিক অবনতি দেখা দেয়, তার ফলেই তিনি অধিক পরিমাণ ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার নিন্দা করেছেন, বিদেশে ঔপনিবেশিকতার সমালোচনা করেছেন এবং যখনই মানুষের প্রতি মানুষের বর্বরতা ও অমানুষিক অত্যাচার দেখেছেন, তখনই তার প্রতিবাদ করেছেন।

একাজে তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল ব্যঙ্গের আকারে হাস্যরস—তর্ককণ্টকিত গ্রন্থ বা নীতিগর্ভ সন্দর্ভ রচনা করে তিনি তার মাধ্যমে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাক্‌লবেরী ফিন গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করা যায়। বাহ্যতঃ গ্রন্থটি একটি দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনীমাত্র বলেই মনে হবে। কিন্তু এর মধ্যেই দাস-প্রথা জিইয়ে রাখার নির্বুদ্ধিতার দৃষ্টান্ত মিলবে অনেক।

'রাফিং ইট' গ্রন্থে যে সমস্ত হাস্যরসাত্মক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় তা অতি-উৎকৃষ্ট। অর্থ উপার্জনের প্রতি আমেরিকানদের একটা মোহ আছে। গৃহযুদ্ধের পরবর্তীকালে বড়লোক হওয়ার জন্য এক প্রাণান্তক প্রচেষ্টায় সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে দি গিলডেড এজ উপন্যাস। এই আপাতরম্য গ্রন্থখানির শৈল্পিকদৈন্য প্রকট। এ কনেকটিকাট ইয়াঙ্কী গ্রন্থখানিও এ গোত্রের। তবুও এ গ্রন্থটিতে টোয়েনের হাস্যরসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী কোথাও ম্লান হয়নি।

টোয়েনের রচনার আঞ্চলিকতা অন্যতম আকর্ষণ। সেখানে তা নিরাভরণ সরল, গ্রাম্যতায় মিলত, আবেগে উচ্ছল ও স্ফূর্তিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। জীবনের শৃঙ্খলাহীন প্রবাহের গতিধারায় তিনি আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাছাড়া সমগ্র মার্কিনী সাহিত্যে টোয়েনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও উজ্জ্বল। তাঁর চিন্তাধারায় কারও হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করেননি, প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে যে শিল্পরূপকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে স্বীয় ভাবনাই উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। কথাশিল্পীকে বিচিত্র চরিত্রের মানুষ নিয়ে শিল্পজগতে আনাগোনা করতে হয়। তিনি যদি স্বীয় মতবাদকে চরিত্রের ওপর সুস্পষ্ট ও নির্মমভাবে আরোপ করেন তাহলে চরিত্র ও শিল্পসৃষ্টি ব্যর্থ হবে। টোয়েন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মতই এর থেকে যদিও দূরে ছিলেন তবুও তাঁর রচনার মধ্যে এই দুর্বলতার পরিচয় যে একেবারেই মেলে না তা নয়।

মার্ক টোয়েনের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত সার্থক গদ্যরচনারীতির অভাব ছিল আমেরিকায়। টোয়েন এই গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন। "তাঁহার হস্তে হাস্যোদ্দীপক অপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা সাহিত্যসৃষ্টির একটি সুসংস্কৃত মাধ্যমে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার এই ভাষা স্বতোৎসারিত, দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং আপাতসরল—শুনিতে মুখের কথার ন্যায়; কিন্তু ঠিক মুখের কথা নহে। হাওয়েলস্ বলিয়াছিলেন যে সর্বজনগ্রাহ্য কুশলী সাহিত্য-শিল্পীদের দ্বারা লিখিত চিরাচরিত ইংরাজী ভাষা একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আত্মসচেতন বস্তু; নিজের ঠাকুরদাদা যে কে তাহা ইহার ভাল করিয়াই জানা আছে। মার্ক টোয়েনের বেলায় 'নিম্নবর্গভুক্তে' আমরা দেখিতে পাই একটা বর্ণশঙ্করের অসঙ্গতি; কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট 'শিল্পরূপ' হইতে একটা সম্পূর্ণ বংশলতিকার উদ্ভব হইয়া তাহা পরিশেষে হেমিংওয়েতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" (মার্কাস কানলিফ)

করুণাক্ষ !
(সেই বাদুড়ের গল্প)
আমিও তোমার সঙ্গে একমত! আমেরিকা আমারো শত্রু!
প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত
এই মরেছে !
ভুলে গেলে ভাই জনসন? আমি যে তোমার সেই পুরানো বন্ধু আয়ুব!
প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যুতে নূতন প্রেসিডেন্টের
কাফী খাঁ
২৮.১১.৬৩

সুকুমার ঘোষ

গ্যেটে একদা একারম্যানকে বলেছিলেন, এখন থেকে বিশ্বসাহিত্যের শুরু, সাহিত্য আর দেশগণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবে না। কথাটা খাঁটি, কোনো দেশের সাহিত্যই এখন, শুধু এখন কেন গ্যেটের সময় থেকেই, দেশীয় বৈদগ্ধ্যের ফসল নয়। হয়তো কতকটা সেই কারণেই আমার আলোচ্য কবিদের ভূমধ্যসাগরীয় বলে আখ্যায়িত করেছি। উদ্দেশ্য আমার য়ুরোপীয় সাহিত্যে একটি বিশেষ প্রবণতার মূল্যায়ন। স্পেন, ইতালি বা গ্রীসের সাহিত্য-পর্যালোচনা নয়। পাশ্চাত্য কবিতার এখন যা কিছু সারাৎসার ওই কটি দেশেই এবং ফরাসী দেশে। ইংলণ্ডে ডাইলান টমাসের পরে কোনো মহৎ কবি-সম্ভাবনা লক্ষ্য করি না। এলিয়ট ও তাঁর 'ফোর কোয়ার্টেটস্'এর পরে আর এগোন নি। লাতিন আমেরিকা এবং জর্মনীতে নতুন কাব্যোন্মেষের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তবু লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ মুখ্য কবিই পরবাসী হিস্পানী। ভূগোলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর কথা আছে, পড়েছি সেই জলবায়ু ফলবৃক্ষের পক্ষে হিতকারী। কিন্তু কাব্যফল বিশেষ জলবায়ুর সহায়তা কামনা করে না। ভূমধ্যসাগরীয় মুরদের কথা জানি আর টলেমি-শাসন-পূর্ব মিশর, উভয় দেশই ঐহিক সুখকে পরম পুরুষার্থ মেনেছে। তবু কে না জানে আফ্রিকার এই উত্তরাংশে প্রাচ্যভাবনাসমৃদ্ধ নিয়তির প্রভাব দুর্বার? ভর্জিলের নায়ক ঈনিয়স, খুব সম্ভব, কার্থেজ থেকেই 'ফাতুম' (নিয়তি) সঙ্গে এনেছিলেন রোমে। য়ুরোপীয় প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্র গ্রীস, তবু নবজাগরণের আগে পর্যন্ত কোন য়ুরোপবাসী সে-সম্পর্কে অবহিত ছিলো? আর নবজাগরণের পরেও তারা যা জেনেছে তাও ওই মুরদেরই কল্যাণে। হিস্পানী সংস্কৃতিতে যেমন গভীর প্রাচ্যছাপ পড়েছে এক গ্রীস ছাড়া আর কোনো দেশেই তেমন নয়। বিশেষ করে আন্দালুসিয়া আর গ্রানাদা প্রদেশে মুর-সংস্কৃতি তার অক্ষয় ছাপ রেখে গেছে। উত্তরের কাস্তিল অঞ্চলে এই প্রভাব অবশ্য কম, এবং সাহিত্য ভাষা হিসেবে এই অঞ্চলের ভাষাই বিশেষ প্রতিপত্তি পেয়েছে, সেই দিক থেকে স্পেন কিছুটা মুর-প্রভাব কাটিয়ে উঠলেও আন্দালুসিয়া গ্রানাদার লোকাচার লোকব্যুৎপত্তির দান কখনো অস্বীকার করতে পারবে না। তাছাড়া এই দক্ষিণাঞ্চল থেকে একাধিক কবি হিস্পানী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পেয়েছেন। লোর্কার জিপ্সীগাথা আর কাসিদাগজলের জন্মভূমি এই আন্দালুসিয়া। হিমেনেথ ও আন্তোনিয়ো মাচাদো কাস্তিলের লোক হলেও তাঁদের, বিশেষ করে শেষোক্ত জনের গীতিকবিতার মর্মান্ত নির্মাণে আন্দালুসিয় বিষণ্ণচেতনা সুস্পষ্ট। যাঁরাই হিস্পানী সাহিত্য পাঠ করেছেন বা আলোচনা করেছেন তাঁরাই এই প্রাকৃতিক দ্বৈরথ সম্পর্কে অবহিত। কাস্তিল অঞ্চলের ন্যাড়া মালভূমি এতদ্দেশীয় কবিদের রূপবন্ধ সম্পর্কে আরো সচেতন করেছে, অন্যপক্ষে আন্দালুসিয় কবিদের ধ্যানধারণা ঐহিক ইষ্টাপূর্তের মধ্যে মুক্তি-প্রয়াসী। হিস্পানী কাব্যে যেখানেই জলপাইকুঞ্জ, লেবুকুঞ্জ, দ্রাক্ষাকুঞ্জ সেখানেই আন্দালুসিয়া এবং আরো আশ্চর্য, মৃত্যুও সেখানেই। লোর্কা যাকে 'ডুয়েন্ডে' বলেছেন, বলেছেন একজন শিল্পীর সব আছে অথচ 'ডুয়েন্ডে' নেই, তার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সেই 'ডুয়েন্ডে' কী? লোর্কা এর ইতিবাচক উত্তর দেন নি, বোধহয় কারো পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়। আমার মনে হয় ডুয়েণ্ডে দৈব-সমর্থক।' ফেদেরিকো গার্থিয়া লোর্কার (১৮৯৯-১৯৩৬) কবিতায় এই দৈবপ্রভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত 'সওয়ারের গানে'র শেষ দুই স্তবক মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ধারণায় তাৎপর্যবহ :

> দ্যাখো এ পথ কী দীর্ঘ অশেষ!
> টাট্টুটাও কী দুঃসাহসী!
> হায়, কর্দোবা ছোঁয়ার আগেই
> ছোবল মারবে, ওৎ পেতে
> আছে যম!
>
> হায়, কর্দোবা
> নির্জন, দূরে অস্তু।

অন্যত্র :

> চড়কের গান
> মরণদূত
> ঢোকে বেরোয়
> শুঁড়িখানা দিয়ে।
>
> একতারাটার
> গূঢ় গভীর পথে
> যায় আসে বদ
> মানুষ কালো ঘোড়া।
> নদীর ধারের
> আমার যাওয়া কল্কি ফুলে
> নুনের গন্ধ,
> রক্ত মেয়ে লোকের।
> মরণদূত
> ঢোকে বেরোয়
> বেরোয় ঢোকে
> মরণদূত
> শুঁড়িখানা দিয়ে।

আবার আন্দালুসিয়ার কথা যেখানেই উঠেছে সেখানেই লোর্কা কান্নার কথা পেড়েছেন; ষাঁড়ের লড়াইয়ে হত তাঁর বন্ধু ইগ্নাসিওর শকস্তোত্র লিখতে গিয়েও তিনি আন্দালুসিয়ার বলবীর্য ইত্যাদির কথা বলে পরিশেষে অমোঘ নিয়তির কথা তুলেছেন; 'অদৃশ্য আত্মা'র প্রসঙ্গে :

> ষাঁড় তো তোমাকে চেনে না বা বটবৃক্ষ
> নয় সে অশ্ব বা না গৃহবাসী উই।
> তোমাকে চেনে না শিশুটি বা অপরাহ্ণ
> কারণ তোমার মরণ যে শাশ্বত।

শেষ ছত্রটির ধুয়োই বারে বারে ফিরে এসেছে :

> যেহেতু তোমার মরণ যে শাশ্বত
> পৃথিবীর সব থরতৃষ্ণার মতো,
> সব মৃত্যুই এইভাবে বিস্মৃত
> বিস্ফার-নামা কুকুরের জঙ্গালে।

মৃত্যুকাহিনী সহজেই বিস্মৃত হওয়া যায় বলেই বিলাপের আবরণে স্মৃতিরক্ষার এই প্রয়াস—

> শৌর্যেবীর্যে অদ্বিতীয় এক
> আন্দালুস
> জন্মানোর আগে যাবে বহু বহুকাল।
> যে-শব্দে মহিমা তার গাই তা যন্ত্রণা,
> স্মৃতির বিষণ্ণ হাওয়া
> কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরে।

পরিশেষে লোর্কার জিপ্সীগাথা সম্পর্কে দুচার কথা বলে লোর্কা প্রসঙ্গে ইতি টানবো। এই জাতীয় কবিতায় লোর্কা রূপকের ব্যবহার করেছেন উৎপ্রেক্ষার মতো করে। লোর্কা—সাময়িক অধিকাংশ কবিই কবিতার রূপবন্ধ সম্পর্কে হিমেনেথের কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী। তবে, আমার মনে হয়, হিমেনেথেরও লোর্কার কাছে কিছু ঋণস্বীকার করার আছে। হিমেনেথেরও যদিও বস্তুর অনাবরণ সত্যই কাম্য তবু স্মৃতি-কাল-নিয়তি বিষয়ে এইসব জিপ্সীগাথা তাঁর গীতি-কবিতায় যথেষ্ট ছাপ রেখেছে। জিপ্সীগাথার মধ্যে লোর্কার 'চেতনাচেতনের গাথা'ই সর্বোৎকৃষ্ট। পাশ্চাত্য আলোচকেরা এই কবিতার অলংকার প্রয়োগে ব্যারোক আতিশয্য লক্ষ্য করেছেন।

এতো সমাসোক্তি আর কোনো হিস্পানী কবির কাব্যে দেখা যায় না। দুটি স্তবক আমি উদ্ধৃত করছি :

তারপরে দুই মিতেয় উঠলো।
উপরের উঁচু বারান্দায়।
পিছনে পিছনে রক্তগঙ্গা।
পিছনে পিছনে অশ্রুগঙ্গা।
ছাদের উপরে কাঁপতে থাকলো
ছোট্ট ছোট্ট তেলের পিদিম।
হাজার হাজার কাঁচের মাদলে
ক্ষতবিক্ষত উষা।

টইটম্বুর জালার উপরে
জিপ্সী মেয়েটা দোল খাচ্ছিলো।
সবুজ মাংস চিকুর সবুজ
চোখ দুটি হিম চাঁদি।
জলের উপরে ধরে থাকে তাকে
চাঁদের একটি হিমানী খণ্ড।
রাত্তির আরো ঘনিষ্ট দল
যেনো বা ছোট্ট ফুলের বাগান।
মাতাল পাইক দরজাগুলোকে
দড়াম দড়াম বোঁজাচ্ছিলো।
সবুজ বাতাস, শাখারা সবুজ।
সাগরে সপ্ত ডিঙার বহর
পাহাড়ের গায়ে ঘোড়ার ক্ষুর।

হুয়ান রামন হিমেনেথ (১৮৮১-) লোর্কার পূর্বসূরী হলেও তাঁর আলোচনা পরে করার দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ, লোর্কার কাব্যে সিদ্ধি থাকলেও সম্ভাবনার অংশই হয়তো অপেক্ষাকৃত বেশি। তাছাড়া লোর্কার কবিপ্রতিভা হিমেনেথেরও আগে স্বীকৃতি পেয়েছে—এটি দ্বিতীয় কারণ। হিমেনেথের কাব্যপরম্পরা বিশ্লেষণ করলে এই ধারণাই করা স্বাভাবিক যে তাঁর কবিত্ব খুব শ্লথ-গতিতে কুটে পৌঁছেছে। লোর্কার জীবৎকাল সামান্য, কাব্যসম্ভার ততোধিক। অন্যদিকে হিমেনেথ ভূরি-প্রসূ, এবং কবিতার সংস্কারে আরো সিদ্ধহস্ত। অলঙ্কারক্ষীণতায় তাঁর কাব্যপ্রতিমা নগ্নপ্রতিম। কদাচিৎ 'ছায়ার গোলাপ' কিংবা 'ধোঁয়া আর সোনা' ইত্যাদি কবিতা এইদিক থেকে কিঞ্চিৎ তরুণী ভার্যার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এঁর কাব্যেও সমাসোক্তি আছে তবে তা অ-সত্ত্ব বিষয়ে বস্তুর আরোপ, এবং এই বিষয়গুলি ষষ্ঠেন্দ্রিয়-গম্য, লোর্কার মতো ভৌতিক পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর নয়। 'কবিতা' নামক কবিতায় তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ :

তুলেছি সমগ্র লতা, মুক্ত, পত্রাবলী
তখনো ভোরের অশ্রু জাগ্রত শিশিরে।

আহা সে কেমন মর্ত্য সিঞ্চিত করেছে,
সর্বত্রই সুরভি-নির্ঝর;
আহা কিবা বারিবিন্দু,
কিবা অন্ধ নক্ষত্র পতন,
আমার সারাটা মুখে, চোখের মণিতে।

বিশ্বকে স্বপ্নের চোখে দেখতে বলেছেন অন্য এক কবিতায় : 'অজানা নাবিকর এপিটাফ'এ। তাঁর দেশেরই অন্য এক কবি বলতে চেয়েছিলেন—'লা বিদা এস সুয়েনো' অর্থাৎ এ জীবন স্বপ্ন। ফ্রাঙ্কো-স্বৈরতন্ত্র অনেক কবিকে নির্বাসিত করেছে, হিমেনেথ তাঁদের মধ্যে একজন। আধুনিক যুগে প্রথম স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছিলেন হাইনে। অনেকটা হাইনের মতো, হিমেনেথের লঘুপট গীতিকবিতাগুলো স্বদেশের স্মৃতিতে মুখর। বোধ হয় এই কারণেই তাঁর কবিতা, অন্য কারণও থাকতে পারে, জানি না, অসত্ত্ব ভাবের গূঢ়প্রকাশের দিকে ঝুঁকেছে! উপনি-ষদিক কবিরা যে-কারণে আত্ম-স্থবির, প্রায় তদ্রূপকারণে, তাঁর কবিতা শান্তি, নীরবতা, তমসা, ছায়া, ঃ স্বর্ণবিন্দু ইত্যাকার ব্যঞ্জনায় বিধৃত। যেমন :

আমাদের পাহারা বাস্তব,
পাশে সংশয়ের
স্বপ্ন যাতে অন্যেরা সবাই
আটকা ছিলো!
কিন্তু তারা মনে মনে স্থির ছিলো
ক্লিষ্ট ঘুমে, এ-ঘুম তাদের এনে
আমরাই দিয়েছি!
শান্তি! নীরবতা!
নীরবতা—তাকে ভাঙবে
ভোরের আঘাত,
অন্য সুরে কথা পাড়বে ভেঙে।

কিন্তু তার পরে আবার স্বপ্নের পালা। কারণ মানুষের জীবনে স্বপ্নবিজয়ই একমাত্র অভিযান। তবু ভোরের প্রসঙ্গ আসে। এ-বিষয়ে ক্ষুদ্র 'উষা' কবিতাটি প্রণিধানযোগ্য :

দিবারম্ভ সঙ্গে আনে বুঝি
অন্যের স্টেশনে ট্রেনে
আসবার বিষণ্ণ চেতনা।

কী কর্কশ কণ্ঠস্বরগুলি,
দিনের যা-কিছু জ্ঞান সবই পরিণামী।
—হে আমার প্রিয় প্রাণ।

—ওইতো ওখানে শোনো
দিবারম্ভে শিশুর ক্রন্দন।—

অন্যত্র নিরতিয় কথা :

পেলব তোমার মতো
শ্বেতপদ্ম স্বর্গীয় উদ্যানে
আরোপিত এবং মঞ্জুষ,
এমন মহিম ঘুমে,
তোমাকে রেখেছে,
হায় তুমিই নিঃস্বত
ক্ষুরধার অসি।
[সত্তার অসির ধার]

কোনো কোনো পাশ্চাত্য আলোচক হিমেনেথকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করার প্রয়াস পেয়েছেন! আমার ধারণা স্বতন্ত্র। কোনো একটি দুটি বিষয়ে হয়তো রবীন্দ্রনাথ হিমেনেথের সধর্মী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিষয়-বাচন-উপ-লব্ধির বৈচিত্র্যের সন্ধান হিমেনেথের কবিকৃতিতে দুর্লভ। অন্যদিকে, দোষই হোক আর গুণেই হোক, য়ুরোপীয় আধুনিক কাব্যধারা হিমেনেথে যে-সব ছাপ রেখেছে, এক পশ্চাৎপদ দেশের কাব্যপরিমণ্ডলে বসে সে-সব আয়ত্ত করা রবীন্দ্রনাথের পথে দুরূহ ছিলো। এ-ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতকীয় ভাবধারায় যুবক এবং প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই প্রৌঢ়, সেখানে এই হিস্পানী কবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত কবিতায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন নি।

ইতালীয় কবিতাপ্রসঙ্গে কেবলই মনে হবে দুটি দিকের কথা, উত্তর আর দক্ষিণ। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা এখানে বলি। রামমোহন রায়ের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জীবনী-গ্রন্থটির অবতরণিকা অংশে সর্বাগ্রেই প্রশস্তি গেয়েছেন বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চলের। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য : বাংলাদেশে রাঢ় বলে একটি স্বতন্ত্র ভুক্তি আছে, এবং সাহিত্যে বা সমাজ-সংস্কারে যিনিই কোনো কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনিই রাঢ়ের অধিবাসী। বলাই বাহুল্য, অদ্যতন কোনো লেখকের কলাম থেকে আমরা এ-ধরণের বক্তব্য আশা করি না। বর্তমান ইতালিও এই পরিপ্রেক্ষিতে গণ্য, তবু সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা লোকাচার দুই প্রান্তে স্বতন্ত্র। উত্তরাংশের কারখানালব্ধ সমৃদ্ধি দক্ষিণের কৃষি-নির্ভরতাকে উপহাস করে থাকে, এবং শুনেছি, রাজনৈতিক পরিস্থিতিও নাকি দু-প্রান্তে দু-রকম। ইতালির দুজন মুখ্য কবি মন্তালে আর কোয়াসিমো-দোকে এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার কিয়ৎ-পরিমানে যুক্তিসহ। ইউজেনিয়ো মন্তালে (১৮৯৬—), উনগারেত্তি ও কোয়াসিমোদোর মতো স্বল্প-সম্ভার হলেও, বিষয় ও শব্দ-বৈচিত্র্যে ওঁদের তুলনায় অনেক বেশি পারঙ্গম! এক দেশের কবির সঙ্গে আরেক দেশের কবির তুলনা এবং তুলনীয় কবির নামারোপ, শুধু আমাদের দেশেরই একচেটিয়া নয়, য়ুরোপেও বেশ সচল। মন্তালেকে অনেকেই ইতালির এলিয়ট অভিধা দিয়েছেন। শব্দব্যবহার ছাড়া আর কোনো দিক দিয়েই ইনি এলিয়টের সঙ্গে তুলনীয় নন। বস্তুত ভবিষ্যবাদী কাব্যান্দোলনের প্রতিবাদী হিসেবে যে হার্মেটিসিজমের উদ্ভব তিনি তারই একজন নীরব সমর্থক। নীরব এই

অর্থে যে, কবিতার বস্তুমুখিতা ভাব-সত্তা দর্শনের পথে অন্তরায়। যথা ঃ (কবিতাটির শিরোনামা লক্ষণীয়)

ভূমধ্যসাগর থেকে

হে প্রাচীন যখন তোমার মুখ
সবুজ ঘণ্টার মতো স্বচ্ছতায়
জেগে নিজেদের
আছড়ে ভাঙে—আমি তার
বিস্ফার ধ্বনিতে
মাতাল হয়েছি।
আমার সুদূর এই
গ্রীষ্মাবাসগুলি
আগে ছিলো তোমার পাশেই,
তুমিও তা জানো,
ওই দেশে সূর্য উথলায়
এবং মশার মেঘে আবৃত আকাশ।
সেদিনেরই মতো আজ
তোমার সাক্ষাতে স্থির আমি।
হে সমুদ্র, অথচ এখন আর
তোমার নিঃশ্বাসে স্ফূর্ত
গম্ভীর সতর্ক বাক্যে
নিজেকে সঁপি না। প্রথম সে
তুমিই বলেছো
আমার এ-অন্তরের সূক্ষ্ম যে মন্থন
সে-ও শুধু তোমারই তাড়না;
অর্থাৎ আমার এই সত্তাগূঢ়ে
তোমার প্রলয়-বিধি;
বিশাল ও বহুমুখী তবু বদ্ধমূলঃ
এবং সেভাবে শুধু তোমার মতোই
নিজের মালিন্য সব ধুয়ে ফেলা
তটে ধাক্কা দিয়ে।
টুকরো শোলা, পানা, রুপোচাঁদা
তোমার শূন্যের পেটে
এইসব নিষ্ফলা জঞ্জাল।

এবং জীবন সম্পর্কে ঃ

এবং যখন প্রখর রৌদ্রে হাঁটো
মনে ভেবে মানো বিষণ্ণ বিস্ময়,
এই তো জীবন জীবনের সংগ্রাম—
যতোই এগোও ততোই সামনে উঁচু
পাঁচিল, মাথায় বসানো
বোতল ভাঙা।
[অলস দুপুরে বিবর্ণ উন্মনা]

কিংবা,

গর্জিত ঘূর্ণির বুকে
সরু পাদানিতে
তুমি উঠে অগ্রসর হও;
মুক্তোসম মৃত্তিকায়
বিমণ্ডিত মুখশ্রী তোমার।
বেপথু পাটায় তুমি ইতস্তত করো,
তারপর হেসে, বুঝি হাওয়ার কবলে
নিজেকে নিক্ষেপ করো
দিব্য প্রেমিকের হাতে,
সে তোমাকে ধরে।
আমরা যারা পৃথিবীর
মায়াবন্ধ জীব
শুধু তোমাকে প্রত্যক্ষ করি।
[আত্মগত]

শেষোক্ত কবিতাংশে রিল্কের ডুইনো এলিজির প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বক্তব্য, তথাপি, রিল্কের মতো সদর্থক নয় বরং পলায়নী। ভক্ত রুশ পরিব্রাজকদের জীবনালেখ্য দিয়ে যে-রিল্কের কবি-জীবন শুরু তাঁর মধ্যে প্রাচ্য মরমী প্রভাব সুস্পষ্ট, তবে প্রভাবটি 'প্রাচীন নিয়মে'র। মন্তালেও হয়তো উক্তরূপেই মরমী, কিঞ্চিৎ অজ্ঞেয়বাদী। নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি তারই উদাহরণ ঃ

তোমার বর্জিত*কোনো অপরাহ্নে
এ-দীন তোমার পায়ে আত্মসমর্পিত।
অধম জ্বালানি থেকে
স্ফুলিঙ্গের বেশি কিছু নই,
বেশ জানি, জ্বালা
এবং জ্বালাই শুধু চরিত্র আমার।
[খুশি হলে মুছে দিতে পারো]

কেবল সাগর থেকে কুয়াশা কাটিয়ে
ঘাটে লাগা তোমার কাছির
শব্দ ছাড়া
গন্ধক শিখায় জ্বলা স্ফুরিত ধূসর
নিমেষের দোটানায় জাগে না
কিছুই।
[ব-দ্বীপ]

অন্তর্ধায়ী দিগন্তে কখনো কদাচিৎ
জ্বলে ওঠে প্রহরার আলো!
এই কি পারের ঘাট? (তরঙ্গেরা
তবু এই উত্তুঙ্গ চূড়োয় প্রতিহত)
আমার এ-সায়াহ্নের কুঠিটাকে তুমি
স্মরণ করো না। আমিও জানি না
কেবা যায় কেবা আসে।
[তটপ্রহরীর কুঠি]

অন্যদিকে সালভাতোর কোয়াসি-মোদোর (১৯০১—) কবিতা প্রত্যয়-বাচক। তিনি সিসিলির লোক, কর্মক্ষেত্র ইতালির উত্তর অংশে মিলানে, স্বভাবতই তাঁর কবিতায় পরবাসী মনোভাব বিদ্যমান। দক্ষিণে শুধু দুঃখ আর দারিদ্র্য, প্রৌঢ়া মহিলারা সেখানে যার যার বাড়ির উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে গলা নামিয়ে মৃত্যুর প্রসঙ্গ পাড়ে। কোয়াসিমোদোর বর্ণিত দৃশ্য বর্ণহীন কখনো বা অস্পষ্ট। কিন্তু চিত্রকল্প-রচনার দিকে তাঁর যে-পরিমাণ ঝোঁক, তদ্দেশীয় অন্য দুজন কবির সে-রকম দেখি না। উপরন্তু তাঁর কাব্যভাষা অতিশয় স্বচ্ছ, সর্বত্রই ভাবালুতার কিনার ঘেঁসে যায়। মহৎ কবি ছাড়া এমতাবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন। তিনিই বোধহয় হার্মেটিক কাব্যধারণার মূল ধারক। নির্বাসন সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

নির্বাসন রুক্ষ।
এবং আমার সুর-সঙ্গতিসন্ধান
তোমাতে সমাপ্ত হয়ে
মুমূর্ষার আশু
উদ্বেগে রূপান্তরিত আজ;
প্রত্যেক প্রণয়-বর্ম দুঃখের সম্মুখে,
তমসার এ-মূক সোপানে
কটু অন্ন মুখে দেবো বলে
আমাকে এনেছে।
[তিন্দারি-তে হাওয়া]

মাকে চিঠি লিখতে গিয়ে শুধুমাত্র হারান স্বদেশের কথাই মনে পড়েনি, কাল-স্থপতি রচিত গৃহের সেই

পুরোনো ঘড়িটার কথাও মনে হয়েছে। সে একজনের সমগ্র শৈশবকে একবারমাত্র দুলিয়ে রেখেছে। সেটা দুলবে যতক্ষণ না মৃত্যু এসে ছোঁয় :

ওগো সদয় মরণ,
ছুঁয়ো না প্রাচীন ঘড়ি
দেয়ালে যে টিকটিক চলে,
ও-ঘড়ির রঙচঙা ফুলকাটা
কাঁচের উপরে
কাটিয়েছি সমগ্র শৈশব;
ছুঁয়ো না তোমার হাতে
পৌরাণিক ওই চিত্তস্থলী;
[মা-কে চিঠি]

কাল-শ্রুতি তাঁর কাব্যে নির্বাসন-স্মৃতি অপেক্ষা ব্যাপক। স্মৃতি আছে, নির্বাসনও আছে, কিন্তু কাল সর্বাপেক্ষা অমোঘ, কখনো ধন্বন্তরী কখনো করাল।

হে প্রেম কতোটা কাল
ঝরে গেছে নিমের পাতায়,
কতো রক্ত মর্ত্যের নদীতে।
[দেয়াল]

তুমি আর নেই তো এখানে,
তোমার স্বাগত আর
তীর্থযাত্রী আমাকে ডাকে না।
দু-বার কখনো
আনন্দে দর্শন মেলে না।
এখন চূড়ান্ত আলো
সাগরের স্মৃতিবাহী
ঝাউশীর্ষে পেখম ঝাপটায়।
ব্যর্থ ওই জলের মূর্তিও।

আমাদের পিতৃভূমি সুদূর দক্ষিণে,
শোকে আর অশ্রুতে কবোষ্ণ।
ওখানে নারীরা
কালো শাল মুড়ি দিয়ে
মৃত্যুর প্রসঙ্গ পাড়ে
গলা খাটো করে
যার যার বাড়ির উঠোনে।
[তীর্থযাত্রী আমার প্রতি]

স্মৃতি একটি প্রতিধ্বনির মতো, বারে বারে ফিরে আসে। কখনো স্বদেশের স্মৃতি, কখনো প্রেমের স্মৃতি, কখনো আত্ম-বিবেকের স্মৃতি!

নদীবক্ষে আমার স্বদেশ,
ধাক্কা দেয় সমুদ্রের বুকে......

অন্যত্র :

ইতিমধ্যে বৃষ্টি আমাদের পাশে
উলটি খাচ্ছে নীরব বাতাসে,
লম্বার্ড হ্রদের নষ্ট
জলের উপরে গাঙশালিকের কয়
ছোঁ মারে চিলের মতো
চুনো মাছ দেখে,
কুঞ্জের বেড়ার গায়ে বিচুলির ঘ্রাণ।
আরেকটি বছর পোড়ে ফের,
শোক নেই কান্না নেই
আমাদের জিনবে বলে
সমুত্থিত—সহসা—সুদিন।
[ইতিমধ্যে বৃষ্টি আমাদের পাশে]

পূর্বোক্ত কবিদের আলোচনান্তে শেষ পর্যন্ত বলতে হয় এবং কাভাফি। কনস্তান্তিন কাভাফির (১৮৬৩—১৯৩৩) কবিতায় হাড়মাংসের অভাব নেই, কিন্তু রক্তাল্পতা আছে। বোধহয় ইদানীংকালের কোনো গ্রীক কবিই উত্তেজক নন। নিজের মনের সঙ্গে কথোপকথনে কি কেউ উত্তেজিত হতে পারে? সোফিস্টরা হয়তো হতেন, কিন্তু প্লেটো হন নি, কাজান্তজাকিসের নায়ক অভিসাসের ঘরে ফেরার উদগ্র বাসনা আর নেই, সেফেরিসও হারানো বাড়ির প্রসঙ্গে মৌনমুখর। কাভাফির কবিতা, বলা চলে, ঐতিহ্যানুসারী এবং আসক্লেপিদিয়াসের মতোই নিরাময়-অপ্রত্যাশী। আসক্লেপিদিয়াসের তবু ভোগ-বাসনা ছিলো, কাভাফির তা-ও নেই।

শোনা যায়, প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব কাব্যপ্রতিমা আছে যার কাঠামো ফার বীচ য়ু বা দেবদারু আম জাম জারুলের সারী কাঠে গড়া। তবু ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির মধ্যে একটি সামান্যভাব আছে। এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা যতো ভাবপ্রবণ ততো আবেগ-উদ্বেল নয়। এই সত্য কাভাফি ছিমেনেথ আর কোয়াসিমোদোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রকট। এঁরা তিনজনই মুখ্যত গীতিকবি, কারো কবিতারই ছত্র সংখ্যা একটি হ্রস্বতম গাঁথা কবিতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। তিনজনেই প্রত্যক্ষ উপমা ব্যবহার করেছেন খুব কম এবং তিনজনেরই শব্দসম্ভার কমবেশি প্রাকৃতভাবাপন্ন। আগেই বলেছি, এই অঞ্চলের কবিতা প্রাচ্য তথা মুর-প্রভাবিত। মুরেরা সম্ভবত সমযৌনিক এবং যৌবনবিলাসী। কাব্যরচনা তাদের কাছে ছিলো সাকী সুরা ইত্যাদি পুরুষার্থের অন্যতম আর বিবরণযোগ্য বিষয় শুধু মানুষ, তাও পুরুষ। সে যাই হোক, কোনো একজন নির্জন কবির পক্ষে আত্মউন্মীলনই গুরুতম বিষয়। কোয়াসিমোদোর কথা ভাবুন। কিন্তু কাভাফির মনোভাব একটু অন্যরকম। তাঁর কাব্যে বাল্যকাল বলে কিছু নেই, মানুষের বয়ঃক্রম সেখানে বিশ থেকে বাড়তে বাড়তে আটাশে এসে ঠেকেছে, আর বাড়েনি। যে-কারণে সুগঠিত মাংসপিণ্ডকেই একমাত্র সৌন্দর্য বলতে তাঁর বাঁধে না সেই একই কারণে তিনি জীবিত ফুলের সৌন্দর্যকে শিল্পায়িত ফুলের সৌন্দর্য থেকে বেশি দাম দেন না।

দোকানে

সযত্নে সে আলগোছে
ওইগুলো মুড়ে রাখলো
দামি এক সবুজ মর্সালিনে।
চুনীর গোলাপ, মুক্তোর শালুক আর
গোমেদের চাঁপা।
যেমনটি চেয়েছে কিম্বা
যেমন বুঝেছে ঠিক ওইগুলি
তেমনি অপরূপ,
প্রকৃতির কোলে রেখে
দেখতে চায়নি তাই সে ওগুলো
সিন্ধুকে সরিয়ে রাখবে শিল্পের
নিপুণ এক নমুনা হিসেবে।
খদ্দের দোকানে এলে
বেচবে বলে বের করে
অন্যান্য পশার—হীরেপান্না
হার চুড়ি বালা আংটি যতো।

রঙ্গ ছাড়া ঈশ্বর গুপ্তকে যদি ভাবতে পারতাম, তবে এইরকমই ভাবতাম। অতীত আর ভবিষ্যতের যোগসূত্র ছাড়া তাঁর কাছে বর্তমানের আর কোনো মূল্য নেই, তাই ওই ধোঁয়ানো বাতির রূপক। ভবিষ্যতের দীপ্ত বাতির দিকে তাকিয়েও তিনি বলেছেন, কোনো সান্ত্বনা নেই :

যদি একটি জানলা কোনোমতে
খুলে যায় তা-হলে
সান্ত্বনা পাওয়া যাবে।
অথচ জানলার কোনো
হদিশ মেলে না, কিম্বা আমি
হদিশ জানি না। হয়তো,
না পেয়ে ভালোই হলো।

হয়তো সে আলোই হতো
আরেক তাড়না।
কে জানে মুঠোয় তার
কোন বস্তু আছে?

'বাতিঝাড়' শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতাটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

খালি এক ছোট্ট ঘরে
চারখানা দেয়াল
সবুজ কাপড় দিয়ে শক্ত করে মোড়া,
সে-ঘরে সুন্দর এক বাতিঝাড়
জ্বলে ও ঝলকায়;
আর এর প্রত্যেক শিখায় জ্বলে
আকুল আবেগ আর ব্যগ্র উন্মাদনা।

ঝাড়লণ্ঠনের তীব্র আলোর ছটায়
প্রতিভাত ওই ছোট্ট ঘরে
জ্বলে যা সে-আলো
কোনো সাধারণ নয়।
উত্তাপের রতিসুখ সার
নয় কোনো থরো থরো
শরীর লাগিয়া।

থরো থরো শরীর বলতে কাভাফি নিজেকেই বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি শুধুই দর্শক আর তাঁর দর্শনেন্দ্রিয়, চর্মচক্ষু নয়, তৃতীয় নয়ন। এবম্বিধ চিন্তাধারা প্যাগানবিরোধী জেনেও তাকে আত্মিক ভাবে প্যাগান বলাই বাঞ্ছনীয়। 'যবন-সংগীত'এ তিনি গ্রীক পৌরাণিক দেববৃন্দের পুনরাবির্ভাবের পক্ষবিধুন শুনতে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। পুরাণ-ইতিহাস মিশ্রিত তাঁর কবিতাগুলিকে তু-ফুর সঙ্গে তুলনা করতে সাধ হয়। উভয়েই একই রকম দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন। এঁরা, বোধহয়, নিজেদের অন্তর-ভেলাকির শাপভ্রষ্ট পাইথনেস।
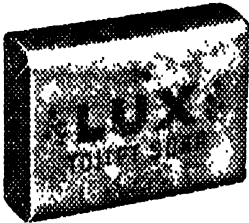
রক্তিম

উমা দেবী

হারায় না কখনও।
রক্তে রক্তে জেবলে রাখে রক্তিম আগনুন
পোড়ায় স্মৃতির তন্তু।
বড় ফিকে মনে হয় জ্যোৎস্নাভেজা চাঁদ
একক তারাটি আরো লাগে অসহায়।

হারায় পৃথিবী থেকে
হারায় না মন থেকে তবু।
মন কি পৃথিবী থেকে আরো বড়—আরো সুগভীর?
চোখের দু' তীর বেয়ে চোখের জলের
স্পর্শে তো ভেজে না মাটি
ভেজে যদি—দু'মুহূর্তে শুষ্ক হয়ে যায়।

অথচ মনের ভূমি জলে ডুবুডুবু—
জল তার এপার ওপার—
সে তরঙ্গে সে বন্যায় নক্ষত্রের ছায়া
কোথায় হারিয়ে যায়!
প্রভাতের আলো
মুখ মুড়ে বেদনার আঁধারে লুকায়।

দেহ মরে গেলে তবে মন মরে কেন?
দেহ তো এ পৃথিবীর মাটি। তবু মন আর দেহ মরে গেলে
এ পৃথিবী বেঁচে থাকে।
চাঁদ ওঠে, ফুট ফোটে, উষা নেমে আসে—
'পৃথিবীর নর-নারী ফের ভালোবাসে—
মনে করে শাশ্বত হৃদয়
মনে করে সুন্দর জীবন।
মনে করে শুধু—হয়তো বা সত্য বলে ভাবে না কিছুই—
কিংবা বলো—কে জেনেছে সত্য বা কেমন।

বেত্রবতীর জলে আমার ছায়া

গীতা চট্টোপাধ্যায়

সরল দেবদারুর বনে উচ্চকিত হাসি—
রৌদ্রসিরি পর্বতের চুড়ো;
বেত্রবতী নদীর বাঁকে আবার ফিরে আসি,
যদি আমার ছায়াকে পাই পুরো।

সেদিন ছায়া রেখেছিলাম স্বচ্ছনীল দর্পণের মুখে,
অনেক স্থির সময় কাঁখে গ্রামবধূর সুখে।
অনেক পাকা ফসল ছুঁয়ে রোদের ভারে নুইয়ে পড়া হাওয়া—
'আবার যদি ইচ্ছা করো' হঠাৎ ফিরে পাওয়া।

বেত্রবতী, ফিরিয়ে দাও ছায়াকে নীলজলে—
এ ছায়া চিরে চূর্ণ ঢেউ এখন বয়ে চলে।
এই তো আজ হাওয়ার খিদে ফসল কাটা মাঠে
মেটে না, তাই গ্রামবধূরে মরাইপথে হাঁটে।

সময় নয় অনেক স্থির, সময় বয়ে যায়—
সরল দেবদারুর বনে রৌদ্রসিরি পর্বতের ছায়।
বেত্রবতী নদীর বাঁকে আবার যদি কখনো ফিরে আসি,
দেখবো, ছায়া হারিয়ে গেছে—বনের চুড়ো—উচ্চকিত হাসি॥

ত্রিভুজ

ইরা সরকার

দুটি গোলাপের সুরে অন্তরঙ্গ অন্ধকার এসে
গভীর মৃত্যুর মতো আলিঙ্গন রাখে
অনিমেষ সঙ্গ দিয়ে ঘিরে থাকে বর্ণ, গন্ধ, কাঁটা॥

দুটি যুবকের মধ্যে অবিরাম চলে পথ হাঁটা॥
বুক থেকে খুলে নিয়ে দূরবনগন্ধবহ সুর
যে তরুণী মন টেনে তবু থাকে নিবিড় সুদূরে
কি এক গোপন সূত্রে দুজনেই তাকে ভালবেসে

প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ে চিত্রল বিকেলে॥

জানালার কোল থেকে আলো নেমে গেলে
বর্ষার গঙ্গায় দেখে রহস্যে বঙ্কিম
দুই তীরে লগ্ন হওয়া জৈব দ্রাবিড়তা।

সমান-দ্বিবাহু করে জীবনের তপ্ত গাঢ় কথা
কে আনবে স্থির করে হিমাঙ্কের নিঃসাড় হৃদয়ে
বর্ণগন্ধস্বাদহীন সামাজিক নিশ্চিন্ত নির্ভয়?.?

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ৩ ॥

এই দুটো দিন মনে মনে যে ছবিই এ'কে থাকুক স্বর্ণ, কল্পনার রাশ যতই ছেড়ে দিয়ে থাকুক, এমনটি কখনও ভাবতে পারেনি। চমক শুরু হয়েছে সেই যাত্রার গোড়া থেকেই, সে চমক যেন শেষ হচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে আসার কষ্ট তো ছিলই, প্রাণপণেই তাদের অশ্রু-ছলোছলো অসহায় ঈষৎ-ভীতার্ত দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে রেখেছিল, প্রাণপণেই চেষ্টা করেছিল বড় মেয়ে রেবার চাপা কান্নার আওয়াজটা না শুনতে। কান চেপেও ধরেছিল দু-হাতে। স্বামীর জন্য মন কেমন করার কথা নয়—যদিও হরেন আসবার সময় অনেক মিষ্টি কথা বলেছিল, অনেক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল স্ত্রীকে, সঙ্গে যে তারই যাওয়া উচিত,—একথা বরাবারই স্বীকার করেছিল— বিস্তর পরিতাপ ও দুঃখ-প্রকাশও করেছিল যে এ সময়েও, এই বিপদ জেনেও শালারা ছুটি দিলে না,—কিন্তু সেদিকে কান দেয়নি স্বর্ণ, কোন জবাব দেবারও চেষ্টা করেনি, ঐ বানানো মিষ্টি কথাগুলো তার নীরবতার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে চাবুকের মতো গিয়ে বক্তার মুখেই বাজবে এটুকু জ্ঞান তার ছিল; তবু তার জন্যেও মন-কেমন করেছে বৈকি। অনেকদিনের সম্পর্ক যে! ও তো কখনও অন্য কারও কথা ভাবেনি কোনদিন, অন্য কাউকে চায়নি; ও ঐ একটি মাত্র লোককেই একান্ত আপন জ্ঞান আঁকড়ে ধরেছিল সেই মিলনের দিনটি থেকে। বরং কোনদিক থেকেই সে এই রূপবান কান্তিমান শিক্ষিত ভদ্র স্বামীর উপযুক্ত নয় এই ভেবে সংকোচই বোধ করেছে চিরকাল, নিজেকে অপরাধী ভেবেছে অকারণেই। অনেক বেশী সেবা দিয়ে, অনেক বেশী ভক্তিতে প্রেমে আত্মত্যাগে নিজের রূপ গুণ বিদ্যার দৈন্য ঢেকে দেবার চেষ্টা করেছে। আজ হরেন যা-ই ক'রে থাকুক—ওর মনে সে-ই একেশ্বর যে। এতকাল পরে সেই স্বামীকে ছেড়ে যেতে, দীর্ঘকাল হয়ত বা চিরদিনের জনাই, মনে বেজেছিল বৈকি!

এমন কি, ঐ যে খাঁচার মতো বন্দী-শালার মতো তার শ্বশুরবাড়ি—সেটা ছেড়ে যেতেও কষ্ট হয়েছিল তার। অনেক শখের, অনেক সাধনার সংসার তার, আবাল্য-স্বপ্ন-দেখা নিজস্ব ঘর-কন্না, তার নিজের বাড়ি, স্বামী-শ্বশুরের ভিটে। নিজের হাতে গুছোনো হে'শেল; পাঁচফোড়নের কৌটো, হিংয়ের শিশিটি পর্যন্ত নিজের হাতে সাজানো; এ বাড়ির প্রতিটি ছোটখাটো বস্তুর সঙ্গেই তার আত্মার বন্ধন, প্রাণের যোগাযোগ। সে এবাড়িতে আসার পর প্রত্যেকটি ছবি-টাঙ্গানো পেরেক পোঁতার ইতিহাসও তার মুখস্থ। এর ইট-কাঠ-দোর-জানালা, নোনাধরা দেওয়ালের গর্তগুলোও যেন তার বহুকালের পুরনো বন্ধু, তার আপনজন। এদের ফেলে যেতে কষ্ট হবার কথাই তো।

তবু সে খুব দুর্বল হয়ে পড়েনি। যে নিবিড় অভিমানে সে পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে এমনভাবে এককথায় অরুণের সঙ্গে অজানা জগতে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে পা বাড়াতে রাজী হয়েছিল—সেই অভিমানই কতকটা বর্মের কাজ করেছিল এই দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা থেকে আত্মরক্ষা করতে। যে-আঘাত খেয়েছে সে তার এই এতকালের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া সংসার থেকে, অতিপ্রিয় তার এই বিশ্বসংসার-থেকে-বিচ্ছিন্ন-হওয়া নিজস্ব জগৎ থেকে, তার এই জগতের সর্বাধিক প্রিয় ও সর্বাধিক আপন মানুষটির কাছ থেকে—সেই আঘাতই যেন কর্মের আচ্ছদে পরিণত হয়ে তাকে রক্ষা করল এই শেষ মুহূর্তে, তাকে একেবারে ভেঙ্গে পড়তে দিল না।

কিন্তু কষ্ট যতই হোক, তার জন্য খুব বড় রকমের একটা দৈহিক প্রতিক্রিয়া হ'তে পারল না—বোধকরি তার জীবনে একেবারে অপ্রত্যাশিত এই অভিনবত্বর জন্যে। অথচ এই প্রতিক্রিয়ারই খুব ভয় করেছিল অরুণ। তার জন্যে তার এক ডাক্তার বন্ধুকে স্টেশনে থাকতে বলেছিল, আপৎকালে যে যে ওষুধ কাজে লাগতে পারে তাও কিছু কিছু সঙ্গে নিয়েছিল। মায় ইঞ্জেকশানের একটা সিরিঞ্জ নিতেও ভোলেনি। কিন্তু সেসব কিছুরই বিশেষ প্রয়োজন হ'ল না। প্রতিক্রিয়ার পরেও প্রতিক্রিয়া আছে, বোধকরি তাইতেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠল স্বর্ণ।

যে মূল্যবান গাড়ি করে তাকে স্টেশনে নিয়ে আসা হ'ল, সে গাড়িই কখনও চোখে দেখেনি স্বর্ণ। দু একবার যে ট্যাক্সিতে না চড়েছি সে তা নয়, কিন্তু সে-সব গাড়ির সঙ্গে এ-গাড়ির তুলনাই হয় না। এত বড় যে গাড়ি হয় তা-ই জানা ছিল না কখনও। স্বচ্ছন্দে তাতে শুয়ে আসা চলে, আর শুয়েই এল সে। অরুণ সযত্নে সস্নেহে নিজে হাতে বিছানা পেতে তাকে শুইয়ে দিল ভেতরে, সে আর জীবেন ড্রাইভারের পাশে বসল। কেউ তাকে এমন যত্ন ক'রে বিছানা পেতে শুইয়েছে বলে মনে পড়ে না। তার মা কাকী যতই ভালবাসুক—এত করবার তাদের অবসরই ছিল না।

সেইটুকু উপভোগ করতে করতেই হাওড়া স্টেশন। বড় একটা হেলানো আধ-শোয়া চেয়ারে ক'রে এনে তাকে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় চড়ানো হ'ল। এর আগে কখনও সেকেন্ড ক্লাসেই চড়েনি সে, একবার অর্ধোদয় না কী একটা যোগে সে হাওড়ায় গঙ্গা নাইতে এসেছিল

বাপেরবাড়ি থেকে, খুব ভীড় দেখে ছোটকা ওদের একটা ইণ্টার ক্লাসে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। টিকিট বদলানো হয়নি, এমনিই চড়েছিল। ছোটকা বলেছিল, এ ভীড়ে আর কেউ টিকিট দেখবে না। তবু সেদিনও, ইন্টার ক্লাসের গদী আঁটা বেঞ্চি চোখেই দেখেছিল, ভীড়ের মধ্যে আর তাতে বসবার সুযোগ মেলেনি। ...এ নাকি সে সবের চেয়ে ঢের বেশী ভাড়ার গাড়ি, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল স্বর্ণ। পিঠের দিকে ঠেস দেবার জায়গাটা পর্যন্ত গদীআঁটা, মায় মাথার জায়গায় বালিশের মতোই খানিকটা উঁচু করা। আয়নাই কত গণ্ডা। কলঘরের মধ্যেও আয়না। আবার সেখানে এতটুকু একরত্তি একটা পাখা। বেঞ্চির পাশে পাশে জলের গেলাস রাখার কেমন সব আংটা পরানো দ্যাখো। বসে বসে এত ছিষ্টিও তো করেছে বাপু! ভাড়া বেশী নেয় অমনি নয়। সুখসোমন্দা এখানে বসবার পর কত সব তকমা আঁটা আঁটা লোক সেলাম ক'রে গেল।...

তাও, এ কামরা নাকি একেবারে রিজার্ভ করা। কেউ উঠবে না আর এতে। অনেক টাকা দিয়ে অরুণদা এই ব্যবস্থা করেছে। অরুণের সেই ডাক্তার বন্ধু (মিলিটারী পোশাক আঁটা সায়েবদের মতো একেবারে হুবহু! মাগো, প্রথমটা তো তাকে দেখে ভয়ই হয়েছিল স্বর্ণর) ওকে শুইয়ে দেবার পর পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'কোন ভয় নেই, শি ইজ অল রাইট। হাউএভার, আমি একটা ইঞ্জেকশ্যন দিয়ে যাচ্ছি, প্রিকশান নেওয়া ভাল।'

তা যত্ন ক'রেই ইঞ্জেকশান দিল লোকটা। একটুও লাগল না, কিচ্ছু না। বরং আরামে যেন ঘুমিয়ে পড়ল স্বর্ণ একটু পরে। গাঢ় ঘুম—রাত্রে অরুণ খাওয়ার জন্যে ডেকে না তুললে সে বোধহয় সকাল পর্যন্ত ঘুমোতে পারত। খাবারও এনেছে বটে—একরাশ। গরম থাকা বোতল—ঐ রকম আজকাল তর দেওররাও কিনেছে সব, ঘরে ঘরে—তাতে ঝোলের মতো কী একটা। দিব্যি খেতে, সুপ না কী যেন একটা নাম ওর। তার সঙ্গে ফলের রস সন্দেশ—আরও কত কি। নিজে তো খেলে না কিছুই, স্বর্ণ খুব রাগারাগি করতে একটুখানি কি মুখে দিলে,—এই পর্যন্ত। আবার বলে, 'তুমি বকাবকি না করলে আমার খাওয়া হ'ত না তা তো জানই; খাওয়ার অব্যেসটাই চলে গেছে যে!'

এত আরাম জন্মে অবধি পায়নি কখনও। এত আরাম এত সুখ যে মানুষ ভোগ করে তাই জানত না সে। মন-কেমন করতে লাগল ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে। ওদের বাপও পয়সা রোজগার করছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সুখে রাখার কথা ভাবেও না একবার।...মা বাবা, অভাগা ভাইগুলোর জন্যেও মন কেমন করতে লাগল। ওরা এসব জানতেও পারল না কোনদিন। ফার্স্ট ক্লাস কামরার ভেতরে ঢুকে চেহারাটাও দেখতে পেল না। পাবেও না বোধহয় কোনদিনও।

স্বর্ণ যেন হাত-পা মেলে এই যাত্রার প্রতিটি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে করতে চলল। এ যেন একটা সুখস্বপ্ন। ভোর হ'তে না হতে কোথা থেকে সব তক্‌মা-আঁটা উর্দিপরা বেয়ারা এসে কেমন সব খাবার-দাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। অবশ্য এসব খাবার প্রিয় নয় ওর কোনদিনই, আধকাঁচা ডিমের চেহারা দেখলেই গা-কেমন ক'রে—তবু, মচমচে রুটির ওপর মাখিয়ে অরুণদা যখন নিজে হাতে দিলে, তখন আর 'না' বলতে পারল না। বোতল থেকে হর্লিক্স বার করে গুলে দিলে—এক গেলাস। আবার এক ঘণ্টা না যেতে যেতে ফলের রস, সন্দেশ। মাগো, এত কেউ খেতে পারে নাকি? বিশেষ এই মরা পেটে। খাওয়া যদি এতই সহজ তুমি খাচ্ছ না কেন ঠাকুর? ...ছেলেটা চিরদিনের পাগল।

সে সুখ-স্বপ্ন একটানা দীর্ঘ ছন্দে তাকে টেনে নিয়ে চলল। একটা বৈচিত্র্য থেকে আর একটা বৈচিত্র্যে। বিলাসের একটা উপকরণ থেকে আর একটায়। সারাদিন এইভাবে চলার পর রাত্রে কী একটা প্রকাণ্ড ইস্টিশানে নামতে হ'ল তাদের। এও কী এক বড় ইস্টিশান। তাদের হাওড়ার মতো না হ'লেও বেশ বড়। কত লোকজন। বোরখা পরা-পরা মেয়েছেলের দল। ঘেরাটোপ পরানো আলোতে যেন ভূতের মতো দেখাচ্ছে তাদের। বেরিলি না কী যেন বললে জায়গাটার নাম।...আবার সেই রকম হেলানো চেয়ার এল, তাকে ঢেকেঢুকে মুড়েসুড়ে কচি ছেলের মতো শুইয়ে দিলে অরুণ। ওখান থেকে নেমে আর একটা গাড়িতে চড়তে হ'ল। এ নাকি ছোট গাড়ি, কিন্তু স্বর্ণর তো মনে হ'ল না তা। এ তো দিব্যি সেই আগের গাড়ির মতোই, ছোট আবার এর কোন্‌খানটায়? কে জানে বাপু, বলছে যখন তখন ছোট হবে নিশ্চয়ই—ওরা কত জানে শোনে, ওদের চোখে অনেক জিনিস ধরা পড়ে যা অপরের চোখে পড়ে না—কিন্তু এও তো বেশ। শুল তো বেশ আরামেই, হাত পা মেলে।

রাত পোয়াতেই আবার সেই রকমারি খাওয়া। মুখ হাত ধোবার জলটি পর্যন্ত অরুণদা এগিয়ে দিচ্ছে। গামলাই এনেছে একটা তার জন্যে। এমন আরামে থাকলে এক মাসেই কোলা ব্যাং হয়ে যাবে যে। খাওয়া-দাওয়ার পরই নামতে হ'ল—এই ইষ্টিশানই নাকি এ লাইনের শেষ। এখান থেকে মোটরে যাওয়া। বাসেই যেতে হয়, আর তাতে নাকি বড় কষ্ট। অনেক দূরের পথ তো। তার জন্য নাকি একটা গোটা বাসই ভাড়া করতে চেয়েছিল অরুণদা, দেড়শ' টাকা দিয়ে, ওর সায়েব বারণ করেছে। সেই সায়েবই তার কে এক বড় মিলিটারী সায়েব বন্ধুকে বলে আলাদা একটা গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। মালপত্তর একটা কি জীপগাড়ি এসেছে আজকাল এই যুদ্ধের হিড়িকে, তাইতে চাপল, ও আর অরুণ অন্য এক গাড়িতে। শুয়ে যাবার ব্যবস্থা রয়েছে দিব্যি। এ রুগী যাবারই গাড়ি, এ আগেও দেখেছে স্বর্ণ। পাড়ায় ওলামার দয়া হ'লে এ গাড়ি তাদের ওখানেও আসে। হাসপাতালের গাড়ি, কী সব কড়া ওষুধের গন্ধ গাড়ি-ময়। তা হোক, স্বর্ণর এসব গন্ধ তত খারাপ লাগে না। এবারে ক্যাম্বিশের খাটে ক'রে তুলল তাকে, সেই খাটসুদ্ধই শুইয়ে দিল। ভেতরে শুধু অরুণ রইল, পাখা জলোয় জায়গা আব ওষুধের ব্যাগ নিয়ে।

কী পথ তা কিছু দেখতে পেল না স্বর্ণ, দুদিক ঢাকা গাড়িতে শুয়ে শুয়ে যাওয়া—তবে পথটা যে অনবরত এঁকে-বেঁকে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারল। সে জন্যেই বোধহয়, মাঝে খুব কষ্ট হয়েছিল ওর, হয়ত ভিরমিই যেত যদি না ব্যাপারটা চট ক'রে বুঝে নিয়ে অরুণদা তাড়াতাড়ি কী একটা ঝাঁঝালো ওষুধ নাকের কাছে ধরত। তাতেই হুঁশ ফিরল আবার, একটু বলও পেল যেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা কি ওষুধও খাইয়ে দিল অরুণদা। তারপর আর বিশেষ কষ্ট টের পায়নি।

স্বপ্ন ভাঙে প্রভাতের রূঢ় বাস্তব আলোয়, স্বপ্নের সুখ সত্যকার জীবনে মেলে না সাধারণত। কিন্তু এ যাত্রায় স্বর্ণর ভাগ্যে যেন অঘটনই ঘটছে কেবল। পথের সেই দীর্ঘ সুখ-স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটল নতুন এক স্বপ্নের মধ্যেই। এসে যেখানে পৌঁছল সে, সেও এক স্বপ্নের দেশ। এ যদি হাসপাতাল হয় তো স্বর্গের চেয়ে হাসপাতালই ভাল। গাড়ি থেকে নেমে চারিদিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গেল একেবারে। সব দুঃখ দুশ্চিন্তা দুর্বলতা এমন কি সন্তান-বিচ্ছেদ-বেদনা পর্যন্ত নিমেষে দূর হয়ে গেল। এ কোথায় এল সে? এমন জায়গা যে হয় তাই যে জানা ছিল না তার কোনদিন। পাহাড়ে না আসুক, পাহাড়ের ছবি সে ঢের দেখেছে, তার ঘরেই কতগণ্ডা টাঙানো আছে—তবু সে যে এমন তা তো ভাবতে পারেনি কোনদিন।

গাঢ় সবুজ গাছপালার আস্তরণে ঢাকা এই এত বড় বড় পাহাড়, চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাউগাছের বন, ওপরে ঘন নীল আকাশ (এমন নীল আকাশ তো পোড়ার শিবপুরে কি মৌড়ীতে থাকতে একদিনও নজরে পড়েনি, আকাশও কি আলাদা আলাদা হয়?)—নিচে রুপোর পাতের মতো নদী। কোশী নদী না কি যেন বললে। একটুখানি নদী কিন্তু তারই কি

বিক্রম। তুলোর পাঁজ ধুনতে ধুনতে চলেছে যেন—এমন রাশি রাশি সাদা ফেনা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তবে বোঝা যায় ওগুলো তুলো নয়। আসলে পাহাড়ী নদী নামছে নিচের দিকে, জল তীরবেগে ছুটেছে—পথে যে অসংখ্য নুড়ি পাথর (পরে জেনেছিল স্বর্ণ, নুড়ি বড় নয়, ওগুলো এক একটার ওজন একশ মণ পর্যন্ত হবে!) পড়ছে তাতেই ঘা খেয়ে ফেনা কাটছে ওগুলো। বাপরে কী তোড় জলের, বোধহয় একটা কুটো পড়লেও এখনই খান খান হ'য়ে যাবে।

কিন্তু নদী অনেক দূরে, ঝাউগাছগুলো বড় কাছে, বড় আপন। অরুণদা বলছে ওর নাম পাইন। নাম যাই হোক—ভারী চমৎকার কিন্তু গাছগুলো, কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত ফল ওর, যেন কাঠের খেলনা। আর ওর ডালে ডালে কী শনশনে হাওয়া। সে হাওয়া মুখে লাগলেই মনে হয় বুঝি বেঁচে গেলুম, আর কোন ভয় নেই।

মুখেও বলে সে কথা, অরুণের দিকে চেয়ে বলে, 'না অরুণদা, মনে হচ্ছে আমি বেঁচেই যাব এ-যাত্রা। শাশুড়ী বলেন—শিব অসাধ্য রোগ বৌমা, এ তো সারবার নয়, একটা প্রাচিত্তির ক'রে ফ্যালো।...কিন্তু এ তো শুনেছি শিবেরই দেশ, এদেশে বোধহয় বেঁচে যায় এ রুগীও। মনে হচ্ছে এই বাতাসেই সেরে উঠব এবার, ওষুধও খাওয়াতে হবে না। শিবঠাকুর বাঁচাবেন বলেই বোধহয় টেনে এনেছেন তোমাকে দিয়ে!'

হাসতে হাসতেই বলে কিন্তু দুচোখের কোণে একটু যেন জলও চিকচিক করতে থাকে সেই সঙ্গে। সেই জল কি এসে পড়ে সুদূর সংসারের স্মৃতিতে, বেদনায়, না কি নির্মম অকৃতজ্ঞতার আঘাতে? কিম্বা অরুণের প্রতি স্নেহ-কৃতজ্ঞতায়, সেই সঙ্গে ঈষৎ লজ্জাতেও?...কেন যে আসে তা সে নিজেও বোঝে না। কিন্তু বলতে বলতে বুঝি কৃতজ্ঞতাটাই প্রবল হয়ে ওঠে। বলে, 'ধন্যি ছেলে বাবা তুমি! এতও খবর রাখো, এত ছিষ্টিও জানো।...তুমি যদি লেখাপড়াটা না ছাড়তে তা'হলে আজ জজ-ম্যাজেস্টার হ'তে পারতে। আমি তো বরাবর ব'লে এসেছি—তুমি না পারো হেন কাজ নেই। কী যে দুর্বুদ্ধি হ'ল তোমার তখন!...কিন্তু এ যে অসুমর খরচের ব্যাপার দেখছি সব, সত্যি এত পয়সা হয়েছে তোমার?...তোমার বোনাই যা লোক, মুখে যা-ই বলুক, এক পয়সা দেবে না তোমাকে—তা বলে রাখছি।...তুমি মিছি-মিছি একগাদা টাকা দেনায় জড়িয়ে পড়বে না তো?'

অরুণও হাসল এবার। স্বর্ণর শীর্ণ মুখ আর কোটরগত চক্ষুর চিকচিকিনির দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসতে হাসতেই বলল, 'পড়লুমই বা—তাতে তোমার দেনাটা শোধ হবে তো খানিকটা। সেইটুকুই লাভ।'

'আমার আবার ছাই দেনা!' অভ্যস্ত ঝঙ্কার কণ্ঠে ফুটে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করে, 'আমার কাছে আবার কবে কি ধার করলে তাই শুনি!...ও, সেই সাতটা টাকার কথা বলছ?...ভাগ্যিস ওটা নিয়ে গেছলে, কী ভাগ্যি যে ওটুকু সুবুদ্ধি তোমার হয়েছিল—নইলে সত্যিই বলছি—আমার মুখে আর অন্নজল যেত না।...আচ্ছা, কেন অমন ক'রে চলে গেলে অরুণদা বল তো? আমার বে হ'ল বলে—?...তোমার কি মনে হ'ল আমি না থাকলে ওখানে তোমার ক্ষোয়ার হবে, কেউ দেখবে না?...তা এই যে পথে পথে ঘুরলে, কে তোমাকে কত দেখল বাপু?...না, না, কাজটা ভাল করোনি!'

আবার কি মনে ক'রে বলে, 'না কি আমার জন্যে খুব মন কেমন করেছিল? ঠিক ঠিক বল তো। আজও আমি ভেবে পাই না কথাটা!...তা দুটো দিন অপেক্ষা করলে না কেন, আমি তো আটদিনের মাথাতেই এসে পড়লুম। চাই কি আর একটা বছর কাঁদায় গুণ ফেলে থাকলে, আমি শ্বশুরবাড়িতে পুরনো হয়ে গেলে—আমার কাছেই গিয়ে থাকতে পারতে!'

'ওকথা এখন থাক বুঁচি, ও তোমাকে বোঝাতে পারব না। তুমি এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। কোন কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে। সব ভাবনা চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দাও একেবারে!'

স্বর্ণ হেসে উঠল যেন আপন মনেই, 'ছি ছি, তুমি সেই বুঁচি নামই ধরে রাখলে চিরকাল! তা মন্দ নয় কিন্তু, আগে আগে শ্বশুরবাড়িতে কেউ ও নাম ধরলে লজ্জা করত, মনে হ'ত কী বিচ্ছিরি নাম। কিন্তু এখন বেশ ভাল লাগে, মনে হয় সেই ছেলেবেলায় ফিরে গেছি। ও নাম ধরে তো এখানে বড় একটা কেউ ডাকে না আর!'

চিকিৎসার এই রাজকীয় ব্যবস্থাতে যে 'অসুমর' টাকা খরচ হচ্ছে সেটা তার সহজ বুদ্ধিতে বুঝেছিল স্বর্ণ, কিন্তু তবু আন্দাজটা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। যখন তা পৌঁছল তখন ব্যাকুলতার সীমা রইল না।

অরুণ বেশীদিন থাকতে পারবে না, ওখানে কাজের ক্ষতি হচ্ছে। এখানে দিন পনেরো থেকে সব বন্দোবস্ত ক'রে চলে যাবে—এ আগে থাকতেই বলা ছিল। একমাস দেড়মাস অন্তর এসে খবর নিয়ে যাবে এর পর। অবশ্য হরেনের আসবার কথা, ছুটি পেলেই সে আসবে, এখানের গেস্ট হাউসে মাসখানেক কাটিয়ে যাবে—বার বার বলে দিয়েছে সে। তারও 'চেঞ্জ' হবে, স্বর্ণরও খোঁজ-খবর করা হবে। বড় মেয়েকেও নিয়ে আসবে সে। কিন্তু সে কথায় স্বর্ণ বা অরুণ কেউই বিশেষ ভরসা রাখেনি। স্বর্ণ বলেছে, 'আমি একাই বেশ থাকব অরুণদা, তুমি মাঝে মাঝে এসো সময় মতো—তাতেই আমার হবে। তাও, কাজের ক্ষেতি ক'রে তোমাকেও আসতে বলি না। এখানে তো এত লোকজন, আমার দিব্যি চলে যাবে!'

অবশ্য তার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেজন্যে অরুণ করেছেও ঢের। বেশী টাকা দিয়ে 'কট' বা আলাদা ঘর ঠিক ক'রে দিয়েছে। পরিচর্যার জন্য যত না হোক, সর্বদা কাছে কাছে থাকার জন্য সঙ্গিনী

হিসেবে একজন নার্সও বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে। একেবারে তিন মাসের মতো সমস্ত খরচ—মায় নার্সের মাইনে সুদ্ধ আগাম জমা ক'রে দিয়েছে। ওষুধ-পত্রের জন্যও আনুমানিক একটা টাকা গচ্ছিত ক'রে দিয়েছে আপিসে, অর্থাৎ সে বা অপর কেউ না এলেও যাতে চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয়, চিঠি লিখে জানিয়ে তবে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন না হয়।

এই নার্সের মুখেই প্রথম খরচের বিপুলতার একটা আভাস পেল স্বর্ণ। নার্স বাঙালী নয়, যুক্তপ্রদেশের মেয়ে—স্বর্ণর হিসেবে খোট্টা—তবে এর আগেই সে আর এক বাঙালী মহিলার পরিচর্যা ক'রে কিছু কিছু বাংলা শিখেছিল, কিছুটা সেই বিদ্যায় আর কিছুটা আকারে ইঙ্গিতে ইশারায় কথাবার্তার কাজ চালিয়ে নিতে পারে। তার কাছেই শুনল, এই যুদ্ধের মধ্যেই কী একটা ওষুধ বেরিয়েছে এই রোগের নাকি, সে ইঞ্জেকশ্যান এখনও বাজারে খুব বেরোয়নি, অনেক কাণ্ড ক'রে যোগাড় করতে হচ্ছে—যা আসছে সরকার মিলিটারীদের জন্যেই কিনে নিচ্ছেন। অরুণ নাকি বহু লোককে ধরে অনেক বেশী দাম দিয়ে সেই ইঞ্জেকশ্যানের ব্যবস্থা করেছে। এমনিতেই নাকি তার দাম অনেক, এক-একবার যেটুকু ফোঁড়া হয় তারই দামে নাকি একটা ছোট সংসারের একমাসের খরচ চলে যায়। নার্স আশার অনুমান আশি নব্বুই টাকার কম পড়ছে না এক-একটা ইঞ্জেকশ্যান।

কিন্তু শুধু তো এই ওষুধ নয়—অন্য অন্য ব্যাপারেও কি খরচ কম হচ্ছে! নার্সের মাইনে, এখানকার খাই-খোরাকী, ঘর-ভাড়া—সব খরচেরই একটা আঁচ পেল স্বর্ণ। শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল সে, বিশ্বাসই হ'তে চাইল না তার। বিশ্বাস হবার কথা নয়, এ তার কাছে রূপকথার মতোই আজগুবী একটা অঙ্ক। এত টাকা কেউ কারও জন্য খরচ করে—তা সে জানবে কী করে? এত টাকা যে কোন সাধারণ লোক—রাজামহারাজা বা সাহেবসুবো ছাড়া—রোজগার করতে পারে তা-ই যে জানে না সে। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত শুনে আসছে যে একটা টাকার অনেক দাম, সাত হাত মাটি খুঁড়লেও একটা পয়সা মেলে না। ...এ লড়াইয়ের বাজারে অনেকে নাকি অনেক টাকা রোজগার করছে তা সে শুনেছে, হরেনও নাকি বিস্তর টাকা কামাচ্ছে—কিন্তু সে কি এত?

অনেক ভাবল সে। তারপর—তার জানাশুনো প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যে পরিমাণ বেড়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে এবারের এই আসবার ব্যবস্থাটার খরচটাও আন্দাজ করবার চেষ্টা করল। সেও তো কম নয়, রাজারাজড়ার মতোই তো এসেছে সে। যে শুধু পথেই এত টাকা খরচ করতে পারে, তার পক্ষে এ খরচটাই বা অস্বাভাবিক কিসের?

বিশ্বাস হবার পর আরও আকুল হয়ে উঠল সে। একী করছে অরুণদা, অরুণদা কি পাগল হয়ে গেল না কি! এ যে দেউলে হবার মতলব তার। তার মতো একটা সামান্য মেয়েছেলে—তাও নিজের বোন কি আপন কেউ নয়—নিতান্তই নিষ্পর একজন, তার জন্যে এ কি বাড়াবাড়ি কাণ্ড করছে ও!...সে আর স্থির থাকতে পারল না; এই বারো চোদ্দ দিনেই অনেকটা জোর পেয়েছে পায়ে, কাউকে না ধরেও হেঁটে বাইরে বেরোতে পারে—তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে গিয়ে খুঁজেবার করল অরুণকে। বাগানের এই অংশটা অরুণের বিশেষ প্রিয়, থাকলে এখানেই থাকবে তা সে জানত।

অরুণের সামনে গিয়ে ধপাস ক'রে বসে পড়ে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'একী করেছ অরুণদা, তুমি নাকি আমার জন্যে মাসে ছ সাতশো টাকা খরচের ব্যবস্থা করেছ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? না কি মতিচ্ছন্ন ধরল তোমাকে? তুমি কী এমন লাট-বেলাট দরের মানুষ যে এই খরচটা করছ। শেষে কি একটা অখাদ্য অবাদ্য মেয়েছেলের জন্যে দেউলে হবে তুমি! বলি মতলবটা কি তোমার?'

অরুণের সুগৌর মুখে বুঝি একটা রক্তাভা খেলে যায় মুহূর্তকালের জন্য। কিন্তু সে স্থির শান্তভাবেই বলে, 'কে, বললে কে তোমাকে এসব কথা? ওসব গালগপ্পে কান দাও কেন?'

'ওগো মশাই, আমি আর সেই সেকালের কচি খুকীটি নেই, আর দুদিন বাদে আমার মেয়েরই বে দেবার বয়স হয়ে যাবে। আমাকে থার্তামুতো দিয়ে চুপ করাবার চেষ্টা ক'রো না। ছ সাতশ কি হয়ত আরও বেশীই খরচ করছ। এখানে আনতেই তো হাজার বারোশো টাকা খরচ করেছ তুমি—আমি কি কিছু বুঝি না!'

সেই ছেলেবেলাকার মতোই চাপা কৌতুকে অরুণের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, 'বাবা, তোমার এত বুদ্ধি! ইস্!'

'না না, হাসিতামাশার কথা নয়। এর একটা বিহিত না হ'লে আমি অনথ করব বলে দিলুম। তার চেয়ে তুমি আমাকে যেখানকার মানুষ সেইখানে রেখে এসো—যা হবার তা হবে। আমার জন্যে তোমাকে ফতুর হ'তে দেব না কিছুতেই!'

এবার অরুণও গম্ভীর হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে স্বর্ণর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'বুঁচি, তোমার জন্যে ফতুর হ'তে না পারলে আমার ও টাকারই যে কোন দরকার নেই! কোনদিন তোমার কাজে লাগতে পারে এই ভেবেই তো আমার রোজগার করা। নইলে আর আমার কে আছে বল! কার জন্যে টাকা? যদি তোমার কোন উপকার করতে পারি তবেই যে আমার বেঁচে থাকারও সার্থকতা!... তুমি এর জন্যে কিছুমাত্র কিন্তু বোধ করো না, কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়ো না। এতে আমারই উপকার হচ্ছে, তোমার কিছু নয়!... আমার জন্যে এটুকু সহ্য করতে পারবে না তুমি?'

আর যা-ই হোক, ঠিক বোধ হয় এ উত্তরের আশা করেনি স্বর্ণ। হঠাৎ সেও যেন আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকবার পর আস্তে আস্তে হাত দুটো অরুণের হাতের মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে বললে, 'ছোট কাকী একবার বলেছিল আমাকে, বিশ্বাস করিনি। অনেকদিন পরে—রেবা পেটে সাধ খেতে গেছলুম যেদিন, সেইদিন তোমার কথা উঠতে বলেছিল কথাটা। বলেছিল, 'ওলো নেকা, সে আসলে তোকে ভালবেসেছিল। বোধহয় মনে ছিল, লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি করতে পারলে তোর সঙ্গে বের কথা তুলবে। তোর বে হয়ে যাওয়াতেই মনটা ভেঙ্গে গেল—একদিক পানে চলে গেল সব ছেড়েছুড়ে। আর কার জন্যে কী—এই ভাবল বোধহয়!'......আমি ছোট কাকীর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম সেদিন। আজ দেখছি—আমি শুধু নেকাই নই, কানাও।... কিন্তু—আজ এই মরণ পানে পা ক'রে মিথ্যে লজ্জা করব না, সোজাসুজিই বলছি, কী দেখে তুমি আমাকে ভালবাসতে গেলে অরুণদা, না রূপ আর না গুণ! তুমি বিদ্বান, তোমার চেহারা ভাল—আর একটা দুটো পাশ ক'রে যেমন তেমন চাকরীতে বসতে পারলেও কত গণ্ডা ভাল ভাল মেয়ে এসে তোমার পায়ে লুটোত। আমার মধ্যে তুমি কী এমন দেখলে!... তোমার জীবনটা আমার জন্যে নষ্ট হয়ে গেল ভাবলে যে আমার লজ্জার শেষ থাকবে না অরুণদা!'

একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে প্রায় চুপি চুপি উত্তর দিল অরুণ, 'নষ্ট' হ'ল তা তোমাকে কে বললে বুঁচী, এই তো কাজে লাগল। আর কী দেখলুম তোমার মধ্যে? সে ও তুমি বুঝবে না। যে দেখে তার চোখ না পেলে অপরে বুঝবে কী ক'রে কে কার মধ্যে কী দেখল!'

আর কথা বাড়াল না স্বর্ণ, দুই চোখ রগড়ে মুছে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

অয়স্কান্ত

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'পপুলার সায়েন্স'-এর অক্টোবর সংখ্যায় শ্রীমার্টিন মান্ প্রশ্নোত্তরের আকারে অতি চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির বিষয় : হেরেডিটি বা বংশগতি। বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের সকলেরই মনে কিছু না কিছু প্রশ্ন আছে। অথচ বাংলায় এ-বিষয়ে সহজবোধ্য বইয়ের খুবই অভাব। উল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন ও তার জবাব (ব্যাখ্যাসহ) সংক্ষেপিত আকারে উপস্থিত করছি। এ থেকে পাঠকরা ধারণা করতে পারবেন বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা কতখানি জরুরি।

প্রশ্ন : সন্তানের চেহারা বাপ-মায়ের মতো হয় কেন?

জবাব : বংশগতির জন্যে। মানুষের শরীরের প্রত্যেকটি কোষে আছে অতি জটিল একটি রাসায়নিক পদার্থ যার নাম 'ডেসক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড' (সংক্ষেপে ডি-এন-এ)। এই পদার্থটিকে তুলনা করা চলে ছাঁচের সঙ্গে, যে-ছাঁচ থেকে মানুষ গড়ে ওঠে। বিভিন্ন মানুষের গড়ন যে বিভিন্ন হয়ে থাকে তা এই ছাঁচের বিভিন্নতার জন্যেই। আবার এই ডি-এন-এ-র বিন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায় জোড়ায় জোড়ায় সাজানো কতকগুলো অতি সূক্ষ্ম কণিকা যাদের নাম দেওয়া হয়েছে জিন। আবার এই জিনগুলো গাঁথা হয়ে তৈরি হয় জোড়ায় জোড়ায় ঝাঁকবন্ধ সুতোর মতো আকারের ক্রোমোসোম। সাধারণত মানুষের শরীরের কোষে ক্রোমোসোম থাকে ৪৬টি বা ২৩ জোড়া। তবে সব কোষেই নয়। ব্যতিক্রম হচ্ছে প্রজনন কোষ। মেয়েদের ডিম্বকোষে বা পুরুষদের শুক্রকোষে ক্রোমোসোম থাকে ঠিক অর্ধেকসংখ্যক—প্রত্যেকটি জোড়া থেকে একটি করে। অন্তঃসত্ত্বা হবার সময়ে ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয় শুক্রকোষ আর তার ফলে তৈরি হয় সন্তানের পূর্ণাঙ্গ কোষ। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সন্তানের গড়ন কেমন হবে তা নির্ভর করছে জনক ও জননীর ক্রোমোসোমের ওপরে। এই কারণেই সন্তানের চেহারা বাপ-মায়ের মতো হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : তাহলে কোনো ছেলের চেহারায় হুবহু বাপের আদলটাই কেন আসে? মায়ের আদল কেন পাওয়া যায় না?

জবাব : কারণ, জিন। জনকের শরীরে জিন রয়েছে জোড়ায় জোড়ায়, জননীর শরীরেও তাই। জনকের শরীরের যে-কোনো একটি জিন ও জননীর শরীরের যে কোনো একটি জিন দিয়ে গড়ে ওঠে সন্তানের শরীরের একটি ক্রোমোসোম। কিন্তু দুটি জিন হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই এমন ঘটে যে একটি জিনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যে বিশেষ জিনটির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তা যদি জনকের হয় তাহলে সন্তানের আদলটাও হবে তারই মতো।

প্রশ্ন : তাহলে কি ধরে নিতে হবে, যেহেতু বাপের ও মায়ের দুটি দুটি চারটি জিনের মাত্র চার রকমের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—অতএব সন্তানের আদলও মাত্র চার রকমই হওয়া সম্ভব?

জবাব : না, কক্ষনো নয়। ক্রোমোসোম আছে ২৩ জোড়া আর তেইশ জোড়ায় জিন আছে কয়েক হাজার। প্রজনন কোষ গড়ে উঠবার সময়ে ও পরে অন্তঃসত্ত্বা হবার সময়ে এই ক্রোমোসোমগুলোর বিন্যাস অজস্র রকমের হওয়া সম্ভব। বিন্যাসের সম্ভাব্য সংখ্যা ৮৩,৮৮,৬০৮। আর এ-ব্যাপারটা তো শুধু ক্রোমোসোমের বিন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জিন-গুলোও নানাভাবে স্থানবদল করতে পারে। সব মিলিয়ে হিসেব করলে বলতে হবে সম্ভাব্য বিন্যাস সংখ্যাতীত।

প্রশ্ন : একরূপ (আইডেন্টিক্যাল) যমজ হয় কেন?

জবাব : নিষিক্ত ডিম্বকোষ—জনকের ও জননীর জিন মিলিত হয়ে যার সৃষ্টি—তা দু-ভাগে ভাগ হয়ে থাকার ফলে।

প্রশ্ন : একরূপ যমজের মধ্যে কোনো দিক থেকেই কি কোনো অমিল নেই?

জবাব : বংশগতির ব্যাপারে নয়। তবে কখনো কখনো ডিম্বকোষের বিভাজন এমন হতে পারে যে, একজনের যদি ডানদিকের একটি দাঁত ছোট হয় তো অপরজনের হবে বাঁ-দিকের, বা এমনি ধরনের অন্য কোনো অমিল।

প্রশ্ন : একরূপ যমজের একটি যদি ছেলে হয় তাহলে কি অপরটিও ছেলে হবে? একটি মেয়ে হলে অপরটিও মেয়ে?

জবাব : হ্যাঁ। কারণ ডিম্বকোষটি বিভক্ত হয়েছে নিষিক্ত হবার পরে। ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা নিষিক্ত হবার সময়েই নির্ধারিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন : ভিন্নরূপ (নন্-আইডেন্টিক্যাল) যমজের বেলায়?

জবাব : এক্ষেত্রে নিষিক্ত হচ্ছে দুটি পৃথক ডিম্বকোষ। অর্থাৎ, দুটি পৃথক সন্তান একই সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে। অতএব একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে হতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন : যে পরিবারে যমজ আছে সেই পরিবারে কি ভবিষ্যতেও যমজ হতে পারে?

জবাব : সম্ভবত পারে।

প্রশ্ন : রোগ কি বংশগত হতে পারে?

জবাব : বহু রোগকে বংশগত বলা হয়ে থাকে। কিন্তু নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নেই। রিকেটকে একসময়ে বলা হত বংশ-গত। পরে জানা গিয়েছে এই রোগ হয়ে থাকে 'ভিটামিন—ডি'-এর অভাবে। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে রোগ নয়, দারিদ্র্য।

প্রশ্ন : ক্যান্সার? হার্টের অসুখ? মানসিক পীড়া? এগুলো কি বংশগত?

জবাব : বিশেষ বিশেষ ইঁদুরের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে ক্যানসার বংশগত রোগ। মানুষের বেলাতেও বংশগত কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। হার্টের অসুখ ও মানসিক পীড়া সম্পর্কেও একই কথা।

প্রশ্ন : ডায়াবেটিস রোগীর ছেলে-মেয়েদেরও কি ডায়াবেটিস হবে?

জবাব : না।

প্রশ্ন : জনকের বা জননীর জিনে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে সেই ত্রুটি কি সন্তানের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় না?

জবাব : হতে পারে। নাও হতে পারে। ঝোঁকটা থাকে ত্রুটিহীন হবার দিকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে-জিনে ত্রুটি আছে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।

প্রশ্ন : তার মানে কি এই যে কখনো কখনো সন্তানের মধ্যে জনক-জননীর সুপ্ত বংশলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে?

জবাব : অবশ্যই পারে। এমনও হতে পারে, জনক-জননীর দুজনেরই চোখ বাদামী কিন্তু সন্তানের চোখ নীল। এ'ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, নীলচোখ-বিশিষ্ট হওয়ার বংশলক্ষণটি জনক-জননীর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল।

প্রশ্ন : প্রতিভা কি বংশগত হতে পারে?

জবাব : অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে দেখা যায়। জার্মানিতে কোনো কোনো বংশই আছে সঙ্গীতজ্ঞের বংশ। এর সঙ্গে বংশ-গতির কোনো যোগাযোগ আছে কিনা নিশ্চিতভাবে বলা চ'লে না।

প্রশ্ন : সাধারণ বাপ-মায়ের সন্তানও কি সাধারণ হবে?

জবাব : হতেও পারে, নাও হতে পারে। লিংকন, আইনস্টাইন, এডিসন ও আরো বহু অনন্যসাধারণ ব্যক্তি সাধারণ বাপ-মায়ের সন্তান ছিলেন।

প্রশ্ন : বংশগত লক্ষণ কত পুরুষ পর্যন্ত সঞ্চারিত হতে পারে?

জবাব : সংখ্যাতীত।

প্রশ্ন : জিন বদলে যায় কি করে?

জবাব : প্রধানত, কসমিক রে বা মহাজাগতিক রশ্মির জন্যে। এই পারমাণবিক কণাগুলো জিনের ওপরে আছড়ে পড়ে ডি-এন-এ-র গড়নকে বদলে দিতে পারে। উত্তাপ, এক্স-রে, পরমাণু-বোমার তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত থেকেও জিনের মধ্যে অদল-বদল সম্ভব। এই অদল-বদলের ফলে অন্য ধরনের লক্ষণবিশিষ্ট সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় মিউটেশন বা পরিব্যাপ্তি।

প্রশ্ন : পরিব্যাপ্তির ফলে কি বড়ো রকমের পরিবর্তন হতে পারে?

জবাব : পারে বৈকি। জীবজগতের বিবর্তনই তার প্রমাণ।

[জীবজগতের বংশ বজায় রাখতে হলে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয়। যতো জীব জন্মায় ততো জীব বাঁচে না। বেঁচে থাকে শুধু তারাই যারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। প্রত্যেক জীবের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হওয়া দরকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে সহায়ক। সেক্ষেত্রে জীবটি বেঁচে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে। আবার এই বংশধরদের মধ্যেও পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য তো থাকেই, তাছাড়া থাকে নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য। এবারেও সেই একই কথা। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে সহায়ক হয় তো টিকে থাকে। তারপর এদের এই বৈশিষ্ট্য ও আরো কিছু নিয়ে জন্মায় এদের বংশধররা। এমনিভাবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে করতে জীবনের ধারাটি বয়ে চলে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে জীবন কখনো একই চেহারায় দু-বার হাজির হচ্ছে না। জীবনের ধারায় নিয়তই বিবিধায়ন ঘটে চলেছে। ডারউইন বলেছিলেন, "(জীবদেহে) যতো সামান্য অদল-বদলই ঘটুক তা যদি কাজের অদল-বদল হয় তাহলে তা বজায় থাকে। এই নীতিটিকে আমি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' কথাটির সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছি। নির্বাচন করার ক্ষমতা যেমন আছে মানুষের তেমনি প্রকৃতির—এই সম্পর্কটি আমি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' কথাটির মধ্যে স্পষ্ট করে তুলতে চাই। নইলে, মিঃ হার্বার্ট স্পেন্সার 'যোগ্যতমের টিকে থাকা' কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করেছেন; ব্যাপারটিকে বোঝবার পক্ষে এই কথাটি আরো বেশি সঠিক এবং কখনো কখনা সমান সুবিধাজনক।"

জীবজগতে নিয়তই বিবিধায়ন ঘটছে এ-বিষয়ে ডারউইনের মনে কোনো সংশয় ছিল না। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, বিবিধায়নের ফলেই নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব বা বিবর্তন। তিনি মনে করলেন, বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে খুবই ধীরে ধীরে। এত ধীরে ধীরে যে সবসময়ে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু হালের বিজ্ঞানীরা তা মনে করেন না। পরিব্যাপ্তির ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন ক্ষমতা-অর্জনের একাধিক দৃষ্টান্ত তাঁদের হাতে আছে। যেমন, ডি-ডি-টি-র বিরুদ্ধে মশামাছির বা পেনিসিলিনের বিরুদ্ধে নিউমোনিয়া জীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন। আবার অন্যদিকে, হালের জীববিজ্ঞানীরা একথাও মনে করেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রজাতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করে। অস্বাভাবিক লক্ষণবিশিষ্ট জীব সবচেয়ে কম সময় বাঁচে। সংকর উদ্ভিদ বা প্রাণীর বংশরক্ষার ক্ষমতা নেই। কাজেই, একশো বছর আগে ডারউইন যে-ভাষায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা এখন আর সর্বাংশে গ্রাহ্য নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের আধুনিক একটি সংজ্ঞা পাওয়া গিয়েছে অধ্যাপক জে বি এস হলডেনের একটি বক্তৃতায়। তা এই : "সকল প্রজাতির মধ্যেই বিবিধায়ন ঘটে। কিন্তু সকল বিবিধায়ন বংশগতি লাভ করে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রজাতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করে। অধিকাংশ বিবিধায়ন সম্পর্কেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের আনুকূল্য নেই। অল্প কয়েকটি বিবিধায়ন সম্পর্কে আছে। যদি এই আনুকূল্যপ্রাপ্ত বিবিধায়নগুলো বংশগতি লাভ করে তাহলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হবে।"]

প্রশ্ন : পরিব্যাপ্তি কি তাহলে বিপথগমন?

জবাব : পরিব্যাপ্তির ফলে প্রচলিত জীবনের ধারায় বিচ্যুতি এসে যাচ্ছে। এই বিচারে অবশ্যই বলতে হবে বিপথগমন। দৃষ্টান্ত হিসেবে হিমোফিলিয়া বা রক্তক্ষরণ রোগটির উল্লেখ করা চলে। যতোদূর জানা যায়, ইউরোপীয় রাজবংশে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জনকের শরীরের জিনগত পরিব্যাপ্তির ফলে এই রোগটির সূত্রপাত।

প্রশ্ন : পরিব্যাপ্তির ফল 'শুভ' হয়েছে —এমন ঘটনা কি নেই?

জবাব : সমুদ্রের এককোষী জীব অ্যামিবা থেকে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ-জয়ী বহুকাষী জীব মানুষ পর্যন্ত সমগ্র বিবর্তনটিই এই শুভ ঘটনার দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন : তাহলে কি বলতে হবে বিবর্তন হচ্ছে নিতান্তই ঘটনার আকস্মিক ও শুভ যোগাযোগ?

জবাব : না। পরিব্যাপ্তি আকস্মিক হতে পারে কিন্তু কোন্ বিবিধায়নটি টিকে থাকবে তা নির্ভর করে পরিবেশের ওপরে।

ডাঃ এম এন লাহিড়ী

ভারতীয় মেডিক্যাল রিসর্চ কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত কলেরা রিসর্চ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাঃ এম এন লাহিড়ীর মৃত্যুতে ভারতের চিকিৎসা-গবেষণা ক্ষেত্রে একজন কৃতী পুরুষের তিরোধান ঘটল। পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বভার অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করে গিয়েছেন। কলকাতা মেডিকল কলেজ থেকে ডিগ্রিলাভ করে তিনি ভারত সরকারের গবেষণা বিভাগে কর্মে নিযুক্ত হন। ১৯৩২ সালে রকফেলার বৃত্তি লাভ করে উচ্চতর জীবাণুতত্ত্বে চার বছর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ব্রিটেনে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। দেশে ফিরে আসার পরে প্রথমে যুক্ত হন কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনের সঙ্গে, পরে পীতজ্বর সংক্রান্ত গবেষণার সূত্রে বোম্বাইয়ের হফকিন ইনস্টিটিউটের সঙ্গে। শিলং-এর পাস্তুর ইনস্টিটিউটের সঙ্গেও কিছুকাল যুক্ত ছিলেন (নাগা-অধ্যুষিত অঞ্চলের বিশেষ একটি রোগের গবেষণার সূত্রে)। ভারতের ও বিশ্বের বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। কলেরা, পীতজ্বর ইত্যাদি রোগের বিষয়ে বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। কিছুকাল তিনি ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্থ-এর মাইক্রোবায়োলোজি বিভাগের অধ্যক্ষ। তাঁর কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই স্মরণীয় অবদানে উজ্জ্বল। এই বিজ্ঞানী ও অক্লান্ত গবেষকের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

বর্ণালী (বাঙলা) ঃ ডি আর প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৩,৩০৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১২ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনাঃ দেবেশ ঘোষ; পরিচালনাঃ অজয় কর; কাহিনীঃ সুবোধ ঘোষ; চিত্র-নাট্যঃ হীরেন নাগ; সঙ্গীত-পরিচালনাঃ কালিপদ সেন; গীত-রচনাঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণঃ বিশু চক্রবর্তী; শব্দানুলেখন ঃ অতুল চট্টোপাধ্যায় এবং দেবেশ ঘোষ; সঙ্গীতগ্রহণ ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; আবহ-সঙ্গীত-গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ; সম্পাদনাঃ সন্তোষ গাঙ্গুলী; শিল্পনির্দেশনা ঃ কার্তিক বসু; রূপায়ণঃ শর্মিলা ঠাকুর, ছায়া দেবী, সীতা মুখোপাধ্যায়, স্মিতা সিংহ, গীতালী রায়, কুমকুম বসু, কৃষ্ণা কর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, এন বিশ্বনাথন্, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, প্রীতি মজুমদার, খগেশ চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ আচার্য প্রভৃতি; কণ্ঠ-সঙ্গীতঃ রুমা গুহ ঠাকুরতা এবং আরতি মুখোপাধ্যায়। চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২৯-এ নভেম্বর থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

আজকের দিনের বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে এ-ব্যাপার হামেশাই ঘটছে—দাদার বন্ধু, বাবার ছাত্র, পিসিমার দূর সম্পর্কের দেওর প্রথমে কোনো একটি বিশেষ উপলক্ষ্যে বাড়ীতে এসে পরে নিত্য আসা-যাওয়ার ফলে পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং বিশেষ করে রঙ ধরায় বাড়ীর বড়দি, মেজদি বা ছোড়দির মনে; বাপ-মা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করেন, 'আহা, ভারী ভালো ছেলে, আর ওদের দুটিতে যা মানাবে' ইত্যাদি। বাপ-মায়ের অমত নেই জেনে মেয়েটি মুখর হয়ে ওঠে, আগ্রহের সঙ্গে ছেলেটির কাছে বিবাহের প্রস্তাব ক'রে বসে। ছেলেটি বলে, এ আর কি! যেদিন হোক করলেই হোলো—তাড়া কি সর?' কিন্তু 'সেই' 'যেদিন' আর কিছুতেই এগিয়ে আসে না, নানান ছুতোয় পেছিয়ে যেতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ছেলেটির নিত্য-নিয়মিত আসার মাঝে ব্যতিক্রম ঘটতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সে আসা বন্ধ করে একেবারেই—মেয়েটির টেলিফোন, চিঠি, লোক-পাঠানো ইত্যাদিতেও কোনো কাজই হয়

জতুগৃহ চিত্রে কাজল গুপ্ত ফটোঃ অমৃত

না। মেয়েটি প্রথম প্রথম মনকে বোঝাতে চেষ্টা করে, আফিসের কাজ বা পরীক্ষার পড়ায় ছেলেটি আটকে পড়েছে কিংবা কোনো রকম বিপদে হাবুডুবু খাচ্ছে; কিন্তু পরে তার বেদনাহত মন অনুভব করে, তাকে ছেলেটি ফাঁকিই দিয়েছে—চিরজীবনের সঙ্গী করবার মনোভাব নিয়ে সে তার কাছে আসেনি। 'বর্ণালী'র নায়িকা অলকা চৌধুরীর মত যে মেয়ে বলতে পারে না, আপনার ফ্ল্যাট তো একদিন আমি দেখবই, আজ ওটা থাক,' তার কপালে ঢের বেশী দুঃখ এবং কষ্টভোগের শাস্তি লেখা থাকে; সে হয়ত আত্মহত্যা করে নিজের জ্বালা জুড়োয়, উন্মাদ হয়ে বাকী জীবনটা অতিবাহিত করে কিংবা গোপন কলঙ্কের দায় থেকে গুরুজনদের চেষ্টায় উদ্ধার পেয়ে সারা জীবন ধরে অতীতের দুঃস্বপ্নকে ভোলবার চেষ্টা করে।

তাই বলছিলুম, 'বর্ণালী'র অলকা চৌধুরীর ডাঃ শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পর্কিত ঘটনা আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনে প্রায় প্রতিনিয়তই ঘটছে। কিন্তু যা সচরাচর ঘটে না, অথচ যা দেখতে ভালো লেগেছে, আশ্চর্য রকম ভালো লেগেছে এবং সোচ্চার কণ্ঠে বলতে পারি, যে-জিনিস দেখে যে-কোনো দর্শকের ভালো লাগতে বাধ্য, তা হচ্ছে অলকা চৌধুরীর সঙ্গে ডাঃ (ডক্টর নয়, ডাক্তার) অশেষ রায়ের ধীরে ধীরে, তিলে তিলে গড়ে-ওঠা সম্পর্কটি। ত্রিপল কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মির রামধনুর মতো বর্ণমালার বিচ্ছুরণের প্রতি—যাকে বলে বর্ণালী, তার প্রতি যেমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, তেমনই মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হয় অশেষ রায়ের আশ্চর্য সংযত, মধুর, ভালোবাসার পানে। Love is a many splendoured thing কথাটার এমন সার্থক রূপায়ণ আমরা ক্বচিৎ বাঙলা ছবিতে দেখেছি। অনিচ্ছাকৃত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে কোনো নব্য ডাক্তার একটি সদ্য পরিচিতা শিক্ষিতা তরুণীর সামনে রাত্রি বারোটার সময়ে গিয়ে হাজির হয় কিনা এবং তার মনের রঙীন স্বপ্নকে খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে না যেতে দেবার জন্যে তাকে নানান কথার ছাঁদে ভুলিয়ে নিজের নির্জন বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে পারে কিনা এবং যে অলকা চৌধুরী আন্তরিক ভালোবাসা ও বহুদিনের পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তার দয়িতের জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিনেও নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবার জন্যে দয়িতের নিরিবিলি ফ্ল্যাটে যাবার প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়, সেই অলকা চৌধুরীর পক্ষে নিজের দয়িত সংক্রান্ত কোনো জরুরী খবর জানবার লোভে একটি উৎসব-মুখর বিবাহবাড়ী থেকে একজন নব-পরিচিত যুবক ডাক্তারের বাড়ীতে বেড়াতে যাবার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব কিনা, এ সব তর্ককে দূরে রেখে বলতে পারা যায়, ডাঃ অশেষ রায় তার চরিত্র-মাধুর্যের দ্বারা শুধু অলকা চৌধুরীকেই ক্ষণে ক্ষণে হতবাক করেনি, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা রাখে......সকল মানুষের মনকে এক অনির্বচনীয় আনন্দপুলকে ভরিয়ে তুলতে পারে।

অসামান্য প্রেমের সমুজ্জ্বল চিত্র এই 'বর্ণালী'। কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা এবং আলোকচিত্রগ্রহণ—এই চতুরঙ্গের বিচিত্র সমন্বয়ে গ'ড়ে উঠেছে এর অসামান্যতা। এবং তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে অলকা ও অশেষ—এই দুই নায়ক-নায়িকার চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সংযত বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়। রাত্রিবেলা গঙ্গাবক্ষে নৌকোর ওপর নায়ক-নায়িকা যখন প্রেমের রূপ-কথার রাজ্যে ভেসে চলেছে, তখন আমরা দেখি, আলোছায়ার মায়া দিয়ে গাঁথা, বর্ণে-শব্দে-সঙ্গীতে জীবন্ত প্রেমের নির্ঝর আমাদের চোখের সামনে দিয়ে নেচে চলেছে। অবিস্মরণীয় এই দৃশ্য বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতে।

'বর্ণালী'র একটি বিশেষ সম্পদ হচ্ছে, এর বিভিন্ন ভূমিকায় শিল্পীদের অনবদ্য অভিনয়। কাঞ্চনকৌলিন্যের উগ্রতম সমর্থক ত্রিদিব সরকার বেশে কমল মিত্র এবং বিত্তহীন অথচ বিদ্যাবান, সৎ, নিরহঙ্কার শিক্ষক বিমান চৌধুরী বেশে পাহাড়ী সান্যাল আমাদের সমাজের দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রাদর্শকে সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন। এবং এঁদেরই মাঝে একটি অভাবনীয় যোগসূত্র রূপে যে চরিত্রটি কাজ করেছে, যে একদিকে কড়া কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসার এবং অপর দিকে চারিত্রিক গুণকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে

কার্পণ্য করে না, সেই মিঃ মুখার্জির ছোট্ট ভূমিকাটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ শৈলেশ্বর ঘোষের প্রায় ভিলেনাস চরিত্রে—যার কাছে প্রেম, প্রতিশ্রুতি, সত্যভাষণ এবং সত্য-স্বীকারের কোনো মূল্য নেই, এমন চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে এন বিশ্বনাথন কাহিনীর প্রয়োজনকে মূল্য দিয়েছেন। অপরাপর চরিত্রে ছায়া দেবী (ত্রিদিবের স্ত্রী), সীতা মুখোপাধ্যায় (চৌধুরী-গৃহিণী), মণি শ্রীমানী (নগেনবাবু), প্রীতি মজুমদার (প্রেসের লোক), স্মিতা সিংহ, গীতালী রায়, কুমকুম বসু (অশেষের প্রতিবেশিনী মাসীমা, ভগ্নী প্রভৃতি) চরিত্রোপযোগী সু-অভিনয় করেছেন।

কলাকুশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চমান রক্ষিত হয়েছে। রাত্রির দৃশ্য-গ্রহণে প্রায় সর্বত্রই বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য শর্মিলা ঠাকুরের মুখচ্ছবির কোথাও কোথাও খড়িমাটির ভাব (chalky) দেখতে পাওয়া গেছে। শব্দগ্রহণেও সমান গুণপনার পরিচয় মেলে। দৃশ্য-সংস্থাপনে ও শিল্প-নির্দেশনায় ত্রুটিহীন বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির আপ্রাণ প্রয়াস আছে। দুটি গানের মধ্যে শর্মিলার মুখে আরোপিত গানটি গাওয়ার গুণে চমৎকার আবহের সৃষ্টি করেছে। আবহসংগীতও ছবির বিভিন্ন দৃশ্যকে প্রাণবন্ত হতে সাহায্য করেছে।

"বর্ণালী" একটি অনন্যসাধারণ প্রেমের চিত্র হিসেবে বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাদশা (বাঙলা) : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর নিবেদন; ৩,৫৬০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ অগ্রদূত; কাহিনীঃ ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত; সংগীত-পরিচালনা : হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনাঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণঃ বিভূতি লাহা; শব্দানুলেখনঃ যতীন দত্ত; শব্দ-পুনর্যোজনাঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনাঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী; রূপায়ণঃ সন্ধ্যারাণী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় বিকাশ রায়, অসিতবরণ, তরুণকুমার, তরুণ মিত্র, প্রেমাংশু বসু, গৌর শী, মাঃ শঙ্কর, ল্যাসী (কুকুর), রিং মাস্টার (বানর), মতিয়া (ছাগল) প্রভৃতি। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২৯এ নভেম্বর থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

একজন খুনে ডাকাত সহসা এক শুভক্ষণে শিশুর সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে কেমন করে তার চিরাচরিত দুষ্প্রবৃত্তিগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মায়ায় মমতায় ভরা একটি গোটা মানুষ হয়ে উঠল, তারই দরদভরা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে অগ্রদূত পরিচালিত শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের নবতম নিবেদন "বাদশা" চিত্রের মাধ্যমে।

দুর্দান্ত বাদশা যেদিন গঙ্গাসাগর মেলায় ঝড়জলের শেষে নিতান্ত অতর্কিতে এক ক্রন্দনরত শিশুর সামনে গিয়ে পড়ে, সেদিন, দৈবানুগ্রহেই বলতে হবে, কাছাকাছি অন্য জনপ্রাণী ছিল না। শিশুর গলা থেকে লকেট-লাগানো সোনার হার এবং হাত থেকে সোনার বালা দুগাছা খুলতে গিয়েই যেন সে ঐ শিশুর ফুটফুটে অসহায় চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাকে নিজের বুকে টেনে নেয়। দারুণ জ্বরে আচ্ছন্ন শিশুকে সে প্রায় মায়ের মতোই সেবা করে এবং পরে তাকে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে নিয়ে এসে হাজির করে কলকাতার এক বস্তিতে, যেখানে থাকত তার পুরোনো দোস্ত রাজা। রাস্তায় রাস্তায় বানর, ছাগল, কুকুর নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ানোই ছিল রাজার কাজ। বাদশা এসে দেখে রাজা দারুণ অসুস্থ; ডাক্তার ডেকে আনল তাড়াতাড়ি। কিন্তু কিছুই সুরাহা হ'ল না, রাজা মারা গেল; রেখে গেল তার বানর-ছাগল-কুকুর। বাদশার কাছে শিশুর নাম হল বাচ্চু; আর এই বাচ্চুকে ভালো ভাবে মানুষ করবার নেশায় বাদশা গেল বদলে।

মার্কিণ লোকসংগীত-গায়ক পিট সীগার সম্প্রতি কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

আর চুরি, ডাকাতি, খুন নয়। সংভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হবে তাকে, নইলে তার বাচ্চু মানুষ হবে কি করে? তা ছাড়া অত ছোট ছেলেকে একা ফেলে রেখে কোথাও যাওয়াও তো যায় না। অতএব ঐ বানর-ছাগল-কুকুরের খেলাই দেখাতে শুরু করল বাদশা; এখন তার নতুন নাম পিয়ারীলাল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে বাচ্চু। বাচ্চুও খেলা দেখানোতে যোগ দেয় এবং পিয়ারীলালের সঙ্গে গান ধরে—"এই মজার মজার ভেল্কী দ্যাখো, আজব-তাজব সার্কাস দ্যাখো, পিয়ারী-লালের খেলা।" এইভাবেই সুখে-দুঃখে বাচ্চু আর বাদশার জীবন চলছিল; হঠাৎ ওদের দেখা পেল বাদশার আগেকার জীবনের সঙ্গী রতনা। কুগ্রহের মতো সে বাদশার পেছু লাগল। বাচ্চু জিজ্ঞেস করে—"বাপি, ও লোকটা কে?" বাদশা জবাব দেয়, "ও আমার দুশমন।" কিন্তু রতনার চেয়েও কড়া দুশমনের আক্রমণে বাদশা হ'ল ঘায়েল; সে কঠিন অসুখে পড়ল। ছোট ছেলে বাচ্চু দিশেহারা হয়ে ছুটল ডাক্তারের কাছে; চিকিৎসা চলতে লাগল। কিন্তু জমানো টাকা ছিল কতই বা; সব হয়ে গেল খরচ। উপায়? উপায় খুঁজতে গিয়ে বাচ্চুর হাতে পড়ল তারই ছেলেবেলার লকেট-ঝোলানো হার, আর বালা জোড়া। হার হাতে করে বাচ্চু গেল স্যাকরার দোকানে। কিন্তু স্যাকরা তাকে চোর সন্দেহ ক'রে ধরতে গেল। অল্প-বুদ্ধি বালক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হার হাতে করেই ছুটে পালাতে চাইল এবং শেষ পর্যন্ত ছিটকে গিয়ে পড়ল এক চলন্ত মোটরগাড়ীর সামনে। আহত বালককে নিয়ে গাড়ীর মালিক এলেন বাড়ীতে এবং সেখানে আবিষ্কৃত হল বালকের হাতের হারটি তাঁরই ডুবে-যাওয়া ছেলে মিন্টুর গলাতে পরানো ছিল একদিন। ছুটে এলেন তিনি বাচ্চুকে নিয়ে বাদশার কাছে। মরণাপন্ন বাদশা যা বলল, তা শুনে তিনি স্তম্ভিত, বিস্ময়ে হতবাক। ঐ বাচ্চুই তাঁর ডুবে-যাওয়া মিন্টু! এর পর বাদশা কি মিন্টুকে তার বাপ-মার কাছে যেতে দিয়েছিল, বাচ্চু ওরফে মিন্টুই কি তার বাপিকে ছেড়ে তার আসল বাপ-মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছিল, আর ঐ বানর-ছাগল-কুকুর? তারাই বা এ অবস্থায় নির্বাক দর্শক হয়ে চুপ করে বসেছিল কি?—এই সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে ছবিটির একেবারে শেষ ভাগে।

একেবারে ভিন্নধর্মী এবং গতানু-গতিকতাবর্জিত কাহিনীটিকে চিত্রে রূপায়িত করেছেন ব'লে অগ্রদূত গোষ্ঠী নিশ্চয়ই বাঙলার চলচ্চিত্রামোদী-দের ধন্যবাদভাজন হবেন। সুকুমার বালকের সংস্পর্শে মনের ময়লা ধুয়ে গিয়ে খুনে বাদশা কি করে মানুষ বাদশায় পরিণত হ'ল সেই ক্রমোত্তরণের বিচিত্র পথের খুঁটিনাটি চিত্রকাহিনীতে অনু-পস্থিত থাকলেও বাদশার স্নেহাতুর হৃদয়ের উত্তাপটি ছবির দৃশ্যগুলিকে ভরিয়ে রেখেছে এবং ভাবপ্রবণ দর্শক-হৃদয়কে বারংবার উদ্বেলিত ক'রে তুলেছে। এইখানেই 'বাদশা' ছবির সার্থকতা।

অভিনয়ের কথা মনে করতেই অগ্রদূত গোষ্ঠীকে আর একবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করে পারি না একটি আশ্চর্য বালক-অভিনেতাকে তাঁরা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন বলে। মিন্টু ওরফে বাচ্চুর ভূমিকা অভিনয়ের জন্যে পর পর তিনটি বালককে কাহিনীর বিভিন্নাংশে আনা হয়েছে। প্রথম একেবারে ছোট, যে অবস্থায় তাকে বাদশা প্রথমে পায়; মধ্যে ক্ষুধাকাতর বাচ্চু রূপে আর একজন এবং শেষে "লালঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে বায়না"-গান-গাওয়া থেকে ছবির সমাপ্তি দৃশ্য পর্যন্ত আর একজন। এই শেষের জনটিই হচ্ছে মাস্টার শঙ্কর, যাকে আমরা এক বিস্ময়কর আবিষ্কার বলে অভিনন্দন জানাতে পারি। চলচ্চিত্র-শিল্পীর প্রধান অস্ত্র হচ্ছে তার চোখজোড়া, যা দিয়ে সে তার মনের সকল রকম ভাবপ্রকাশে সমর্থ হয়। মাস্টার শঙ্করের চোখজুড়ানো চোখজোড়া শুধু ভাবপ্রকাশ করে না, একেবারে কথা কয়। "লালঝুঁটি কাকাতুয়া"-গান থেকে শুরু ক'রে মৃত বাপির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া পর্যন্ত সে যে-রকম ভাবে সাবলীল, স্বচ্ছন্দ ও দরদভরা অভিনয় করে আমাদের মুগ্ধ বিস্মিত করেছে, তাতে তাকে বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতে শ্রেষ্ঠতম বালক-অভিনেতার আসনে না অভিষিক্ত ক'রে পারি না। "বাদশা" ছবিরও শ্রেষ্ঠ শিল্পী হচ্ছে মাস্টার শঙ্করই। তারপরে যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হচ্ছেন বিকাশ রায়। অচিন্ত্য ডাক্তারের ভূমিকায় তিনি যে বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন, তা চরিত্রাভি-নেতারূপে তাঁর সুনামকে আরও বেশ কিছুটা বর্ধিত করবে। এই ডাক্তার এক-দিকে বলে, "টাকা দিতে পারবি, টাকা? নইলে যাব না, যা।" আবার অন্য দিকে

কান্না দেখে অস্থির হয়ে বলে, "কাঁদছিস কেন? Don't cry." এই পয়োকুম্ভ বিষমুখ চরিত্রটি জীবন্ত প্রতিভাত হয়েছে বিকাশ রায়ের নাট্যনিপুণতায়। বাদশার ভিন্নধর্মী চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হিংস্র, ক্রুর, নির্মম চরিত্র থেকে স্নেহ, মায়া, মমতা, সত্যনিষ্ঠায় ভরা এক দরদী মানুষের চরিত্র পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনকে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তুলতে ত্রুটী করেননি। অপরাপর চরিত্রের মধ্যে রতনা (প্রেমাংশু বসু), মমতা (সন্ধ্যারাণী), রাজা (গৌর শী), রামলাল (তরুণ মিত্র), বিশু (তরুণকুমার), অবনী (অসিতবরণ) প্রভৃতি যথাযোগ্যভাবে সুঅভিনীত। অভিনয়াংশে বানর ময়ূ (কীং মাস্টার), লাল্লু কুকুর (ল্যাসী) এবং ছাগল (মতিয়া)-এর কৃতিত্বও কম চমকপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগ প্রশংসনীয়। গঙ্গাসাগর মেলার দৃশ্য, ঝড়-জলের দৃশ্য, জন্তুগুলির খেলার দৃশ্য প্রভৃতি বিশেষ কৌশলের সহিত গৃহীত। বানর-ছাগল-কুকুর খেলার সঙ্গে যে মজার গানগুলি আছে, সেগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য। "লালঝুঁটি কাকাতুয়া"র গানের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই গানগুলি গেয়েছেন সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্তকুমার নিজে এবং তাঁরই আত্মজা রাণু মুখোপাধ্যায়। গানগুলি এরই মধ্যে ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ঘুরছে দেখে বুঝতে পারছি, এদের জনপ্রিয় হতে বাকী নেই। আবহ-সঙ্গীত রচনাতেও হেমন্তকুমার যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন। শিল্প-নির্দেশনা হয়েছে স্বাভাবিক, বাস্তবধর্মী এবং ছবির গতি-রচনায় সম্পাদনার কাজ প্রশংসনীয়ভাবে সাহায্য করেছে।

কাহিনীর ভিন্নধর্মিতা এবং বালক-অভিনেতা মাস্টার শঙ্করের অভাবনীয় সু-অভিনয়ের জন্যে "বাদশা" ছবি চিত্রামোদীদের অবশ্য দর্শনীয়।

প্যার-কা-বন্ধন (হিন্দী) : এন এস ফিল্মস-এর নিবেদন; ৪,১৬৯.৩১ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা, রচনা ও পরিচালনা : নরেশ সাইগল; সঙ্গীত-পরিচালনা : রবি; গীত-রচনা : সাহির লুধিয়ানী, কমর জালালাবাদী এবং মাক্‌স্ লায়ালপুরী; চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণ সাইগল; সঙ্গীতগ্রহণ : বি, এন, শর্মা, কৌশিক এবং মিনু কাত্রাক; শিল্প-নির্দেশনা : স্যাসে; সম্পাদনা : প্রাণ মেহরা; রূপায়ণ : রাজকুমার, নিশি, কুমারী নাজ, কেওয়ল-কুমার, মদনপুরী, ধুমল, জনিওয়াকার, হেলেন প্রভৃতি। কাশ্মীর ফিল্মস-এর

আলোর পিপাসা চিত্রের প্রথম দিনের দৃশ্যগ্রহণকালে অনুভা গুপ্তা, পরিচালক তরুণ মজুমদার, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, পাহাড়ী সান্যালকে দেখা যাচ্ছে।
ফটো : অমৃত

পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২৯-এ নভেম্বর থেকে জ্যোতি, গ্রেস, শ্রী, মেনকা, কালিকা, নাজ, প্যারামাউন্ট প্রভৃতি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

জীবনের শিক্ষা এবং সমান সুযোগ লাভের অধিকার মানুষের জন্মগত—এই বিশেষ চিন্তাধারা দ্বারা প্রণোদিত হয়েই "প্যার-কা-বন্ধন"-এর কাহিনীটি রচিত হয়েছে। টাঙ্গাওলা কালু নিজে জীবনে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়নি; তাই সে নিজের বঞ্চিতজীবনের দুঃখে কিছুটা প্রলেপ লাগাতে চেয়েছিল নিজের ছোট বোন সোনাকে শিক্ষিত করে তুলে। অসম্ভব পরিশ্রম করে সে তার বই কেনবার টাকা সংগ্রহ করত, তার সাজসজ্জার উপকরণ জোগাত। বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করবার জন্যে যখন সে বিশ্রাম না নিয়ে টাঙ্গা চালানো শুরু করেছিল, তখন একটি ধনী ঠিকাদারের মেয়েকে এক টাঙ্গাওলার কবল থেকে রক্ষা করে সে সেই টাঙ্গাওয়ালার দুশমনী বরণ করেছিল। হঠাৎ টাকা পেয়ে সে এক হোটেল নর্তকীর নজরে পড়ল এবং প্রায় সারা রাত নাচ-গানে কাটিয়ে দেবার পর সম্বিত ফিরে পেয়ে অনুভব করল, এ দুনিয়ায় মানুষের নিজের কোনো মূল্য নেই, কে কত টাকার অধিকারী, তাই দিয়েই মানুষের বড়-ছোটর নির্ধারণ হয়। এই সত্য আবিষ্কারের পরে সে তার দুশমন জগ্গুর ষড়যন্ত্রে কারারুদ্ধ হয়। এদিকে পরীক্ষার ফি সংগ্রহের চেষ্টায় তার মা বৃদ্ধ বয়সে কঠিন পরিশ্রম করতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ছাড়া পাবার পরে কালু নিজের বোনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করে টাঙ্গা চালাতে থাকে। যখন সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, তার স্নেহের বোন সোনা গোপনে ঠিকাদার সাহেবের ছেলের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় করেছে, তখন প্রথমে সে এই অসম মিলন অসম্ভব ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল; কিন্তু পরে ধীরভাবে চিন্তা করে এই মিলনকেই সম্ভব করে তোলবার জন্যে ঠিকাদার তোতারামের

স্বারস্থ হ'ল। তোতারাম টাঙ্গাওলার বোনের সঙ্গে নিজের একমাত্র ছেলের বিবাহের প্রস্তাবকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর কি বিচিত্র উপায়ে ও বেদনাদায়ক পরিবেশে এই অসম্ভবও সম্ভব হ'ল তাই নিয়েই ছবির সমাপ্তি।

হিন্দী ছবির সাধারণ ধর্মকে যেন এই কাহিনী কোথায় অতিক্রম করেছে। নৃত্যগীতের বাহুল্যের মধ্যে থেকেও এর বিশিষ্ট বক্তব্যটি যেন ধরা পড়ে। মনে হয়, ছবিখানির উদ্দেশ্য মাত্র লোকরঞ্জনই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বৈষম্যের প্রতি জনচিত্তকে জাগ্রত করা। এবং বলতে বাধা নেই, নরেশ সায়গল তাঁর উদ্দেশ্যকে বহুলাংশে সিদ্ধ করতে পেরেছেন।

ছবিখানি দৃশ্যবৈচিত্র্যে ভরা। যে বিচিত্র জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিকায় ঠিকাদারপুত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে সোনার ভাবাবেগপূর্ণ প্রেমের দৃশ্যটি অভিনীত হয়, তা' ছবির জগতে দুর্লভ। এ ছাড়া টাঙ্গা চালানোর প্রতিযোগিতার দৃশ্যটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এবং সুকৌশলে গৃহীত। হোটেলের নৃত্য-গীতের দৃশ্যটিও অভিনবভাবে পরিকল্পিত।

অভিনয়াংশে প্রধান চরিত্র কালুর ভূমিকায় রাজকুমার, তার প্রেমিকার ভূমিকায় নিশি, প্রতিদ্বন্দ্বী জগ্গু চরিত্রে মহেন্দ্র, সোনার ভূমিকায় কুমারী নাজ এবং রামচন্দ্রের ভূমিকায় কেওয়লকুমার যথাযোগ্য সু-অভিনয় করেছেন। হাসির খোরাক জুগিয়েছেন জনিওয়াকার ও ধুমল। হেলেনের নৃত্য ও ভাবাভিব্যক্তি ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে।

গান ছবিটির একটি বিশিষ্ট সম্পদ; ভাঙরা এবং কাওয়ালী গানগুলি জয়প্রিয় হবার আশা রাখে। আবহসঙ্গীত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত সজীব। চিত্রগ্রহণে বহু স্থানেই কৃতিত্বের নিদর্শন আছে।

"প্যার-কা-বন্ধন" একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হিন্দী চিত্র।

দি বার্ডস্ (ইংরাজী) : ইউ-আই-এর নিবেদন; পরিচালনা: আলফ্রেড হিচকক; কাহিনী: দাফনে ড্যু মরিয়ে; চিত্রনাট্য: ইভান হান্টার; চিত্রগ্রহণ: রবার্ট বার্কস্; সম্পাদনা: জর্জ টিমাসিনি; শব্দসৃষ্টি: রেমী গ্যাসম্যান এবং অস্কার-সালা; রূপায়ণ: রড টেলার, জেসিকা ট্যাণ্ডি, সুজানে প্লেসেট, ভেরোনিকা কার্টরাইট এবং নবাগত "টিপ্পি" হেড্রেন। গেল বৃহস্পতিবার, ২৮-এ নভেম্বর থেকে মেট্রো সিনেমায় দেখানো হচ্ছে।

আলফ্রেড হিচকক-এর ছবি মাত্রই রোমাঞ্চকর হবে এই প্রত্যাশাই জাগে। কিন্তু "দি বার্ডস্" ছবি হিচকক-এর অপর সকল ছবি থেকে যে একান্তভাবে স্বতন্ত্র, এই কথাই প্রথমে জানানো দরকার। একজোড়া "লাভ বার্ড"কে উপলক্ষ্য করে একজন তরুণ এবং একজন তরুণীর মধ্যে যে পরিচয়ের সূত্রপাত, সেই সূত্র ধরে তরুণীটি যখন কালিফোর্ণিয়ার, একটি আপাতঃ মনোরম নির্জন সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে গিয়ে পৌঁছোয় এবং খোলা মোটরে করে যেতে যেতে নিতান্ত অহেতুকভাবে একটি

সুশীল মজুমদার পরিচালিত লাল পাথর ছবিতে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী
ফটো—অমৃত

'সীগাল'-এর ঠোকর খায়, তখনও পর্যন্ত বোঝাই যায় না, কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে সে গিয়ে পড়েছে। অকস্মাৎ দেখতে পাওয়া যায়, তার আগমনেই যেন ওই অঞ্চলের পক্ষীকুল ক্ষেপে উঠেছে এবং জননিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে শুরু করেছে। বিভিন্নরূপ পাখীর ঝাঁকের আক্রমণ কতদূর নৃশংস হতে পারে এবং কি ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, আলফ্রেড হিচকক-এর ছবি দেখবার আগে তা বোধ করি কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। অসাধারণ ইলেক্ট্রনিক শব্দসংযোগে যে অসামান্য আবহের সৃষ্টি হয়, তাও সম্ভবতঃ অকল্পনীয়।

বিভিন্ন ভূমিকায় শিল্পীরা বিচিত্র পরিবেশে যে বাস্তব অভিনয় করেছেন, তাকে সময় সময় প্রত্যক্ষ ঘটনা বলে ভ্রম হয়; মনে হয়, যেন কোনো ভয়াবহ তথ্য-চিত্র দেখছি। বিশেষ করে নবাগতা "টিপি" হেড্রেন যে বিস্ময়কর নাট্য-নিপুণতার নিদর্শন দেখিয়েছেন, তাতে তিনি যে অচিরেই হলিউডের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী রূপে পরিগণিতা হবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী অনায়াসেই করতে পারা যায়। এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নায়কের ছোট ভগ্নীর ভূমিকায় কিশোরী ভেরোনিকা কার্টরাইটের ভীতির জীবন্ত অভিব্যক্তি।

লাস্ট ডেজ অব গোমোরা (ইংরাজী)ঃ পরিচালনাঃ রবার্ট অ্যাল-

"দি বার্ডস্"-ছবির পরিচালক আলফ্রেড হিচকক

ড্রিচ; রূপায়ণঃ স্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার, পিয়ার অ্যাঞ্জেলি, রোজানা পোডেস্টা, স্ট্যানলে বেকার, অ্যান্থ্ক এইমি প্রভৃতি। গেল শুক্রবার, ২৯-এ নভেম্বর থেকে লাইট হাউসে দেখানো হচ্ছে।

বিরাট পটভূমিকায় নির্মিত এই রঙীন চিত্রটিতে কিন্তু বাইবেল-কথিত গোমোরা শহরটি কোথাও দেখানো হয়নি;

"দি বার্ডস্" ছবিতে সূজানে প্লেশেট

তার বদলে যে শহরের ধ্বংস দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রমকারী দৃশ্যরূপে উপস্থিত হয়, সেটি হচ্ছে, গোমোরা শহরেরই যমজ স্থানীয় সডম শহর। দলপতি লট-এর নেতৃত্বে হিব্রুরা জর্ডন উপত্যকার পাশে এসে সডমের রাণীর সঙ্গে সখ্যে আবদ্ধ হয় এবং প্রতিশ্রুতি মত তাঁর বিপদের দিনে তাঁর রাজ্যকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষাও করে। কিন্তু পাপের পীঠস্থান সডম শহরের প্রতি ভগবান বিরূপ; তাই লট তার দলবল নিয়ে সডম পরিত্যাগ করে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শহরটি ভস্মস্তূপে পরিণত হয়।

বাইবেলে বর্ণিত দুই স্তবকের কাহিনীকে একটি পুরো আড়াই ঘণ্টা-ব্যাপী বিরাট চলচ্চিত্রের রূপ দিতে গিয়ে বেশীর ভাগই কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। যুদ্ধ অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি ভয়াবহ দৃশ্যপূর্ণ ছবিটি আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যগুণে সাধারণ দর্শকের চিত্তকে নিশ্চয়ই জয় করবে।

কলকাতা

নর্মদা পরিবেশিত রাধারাণী পিকচার্সের 'প্রেয়সী' আগামী সপ্তাহে শ্রী, প্রাচী ও ইন্দিরা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। সুবোধ ঘোষ রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে এটির পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে যথার্থ অভিনয় করেন যথাক্রমে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সবিতা চ্যাটার্জি, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, বিনতা রায় দীপিকা দাস, রাজলক্ষ্মী, তনুশ্রী গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অসিতবরণ, বিশ্বনাথন, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, হরিধন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তরুণকুমার,

অনুপকুমার ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনায় রবীন চ্যাটার্জি।

বি কে প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্র 'কালস্রোত'-এর পর দ্বিতীয় 'অনুষ্টুপ ছন্দ' গত সপ্তাহে ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় প্রথম দৃশ্যগ্রহণ সাড়ম্বরে পালিত হল। ছবিটি পরিচালনা করছেন পীযুষ বসু। সরোজকুমার রায় চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয়ে মনোনীত হয়েছেন বসন্ত চৌধুরী, সুমিতা সান্যাল, এন বিশ্বনাথন, মলিনা দেবী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সীতা মুখোপাধ্যায়, আশীষ মুখোপাধ্যায়। নায়িকা-চরিত্রে একটি নতুন মুখের সন্ধান এ ছবিতে দেখা যাবে। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্প-নির্দেশনা ও সঙ্গীত-পরিচালনায় কুশলীদের মধ্যে রয়েছেন দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দুলাল দত্ত, কার্তিক বসু এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বহুরূপী সম্প্রদায়ের মঞ্চসাফল্য নাটক 'কাঞ্চনরঙ্গ' বর্তমানে চলচ্চিত্রে রূপ নিচ্ছে। চলচ্চিত্র প্রয়াস এ ছবিটি পরিচালনা করছেন। অমর গাঙ্গুলীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র ও অসিত মৈত্রের নাটিকা অবলম্বনে এ চিত্রের প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তৃপ্তি মিত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, শোভেন মজুমদার, কুমার রায়, লতিকা বসু, সমীর চক্রবর্তী ও শান্তি দাস।

গত সপ্তাহে পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অশান্ত ঘূর্ণি' ছবি শেষ করে আবহসঙ্গীত গ্রহণ করেন। সঙ্গীতপরিচালনা করেছেন রাজেন তরফদার। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত এ কাহিনীর মূল চরিত্রে রূপদান করেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, অজিত চ্যাটার্জী ও প্রশান্তকুমার।। ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত।

বোম্বাই

প্রযোজক-পরিচালক সুবোধ মুখোপাধ্যায় তাঁর দলবলসহ 'এপ্রিল ফুল'

শ্রেয়সী

*
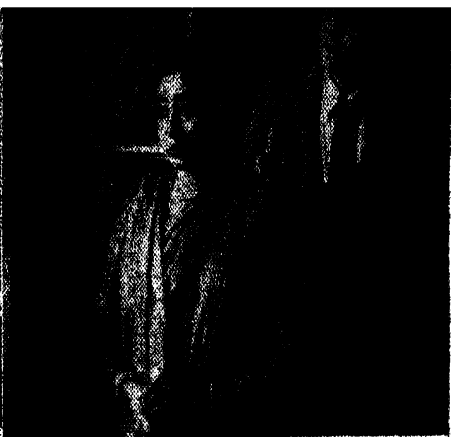
পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বসন্ত চৌধুরী, জহর রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, বিশ্বনাথন, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, মাঃ অরূপ।

*

বর্ণালী চিত্রে শর্মিলা ঠাকুর

ছবির বহির্দৃশ্যগ্রহণার্থে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রা করেছেন। সম্প্রতি মাইশোরের বৃন্দাবনকুঞ্জে বিশ্বজিৎ ও সায়রাবাণুকে নিয়ে কয়েকটি সুমধুর দৃশ্য ও সঙ্গীত গ্রহণ করে বম্বে ফিরে এসেছে এ দলটি। ওটি বহির্দৃশ্যে বিশ্বজিতের কণ্ঠে একটি গান এর মধ্যে গৃহীত হয়েছে। উইলসন বাঁধে এ ছবির শেষ কয়েকটি বহির্দৃশ্য এ সপ্তাহ থেকে আরম্ভ হয়েছে। ছবির সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ এ বছরেই শেষ হবে। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন শঙ্কর-জয়কিষেণ।

শক্তি সামন্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত রঙিন চিত্র 'কাশ্মীর কী কলি'র চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্তির মুখে। রঞ্জন বসু রচিত এ চিত্রনাট্যের প্রধান চরিত্রে যথার্থ অভিনয় করেছেন শাম্মি কাপুর, শর্মিলা ঠাকুর, প্রাণ, ধুমল, অনুপকুমার ও তুনতুন। ও পি নায়ার এ ছবির সঙ্গীত সৃষ্টি করছেন। চিত্রগ্রহণ-পরিচালনায় আলোকচিত্র শিল্পী ভি এন রেড্ডী।

সম্প্রতি আগ্রায় নটরাজা প্রোডাকসন্সের 'গজল' চিত্রের বহির্দৃশ্য গৃহীত হয় নায়ক সুনীল দত্তকে নিয়ে। নায়িকা-চরিত্রে রূপদান করছেন মীনাকুমারী। প্রধান চরিত্রে নাজিমা এ ছবির আর এক আকর্ষণ। এ ছবিটি এক সঙ্গে প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন ভেদ ও মদন। সুরসৃষ্টি করছেন মদনমোহন।

রূপতারা স্টুডিওর গত সপ্তাহে পনের দিনের একসঙ্গে দৃশ্যগ্রহণ শুরু হল 'যব যব ফুল খিলে' চিত্রের। চিত্র-কাহিনীর মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করছেন নন্দা, শশি কাপুর, আগা, বি বি ভাল্লা, কমল কাপুর, শাম্মি ও নবাগত যোতীন খান্না। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুরজ প্রকাশ।

মাদ্রাজ

পরিচালক ভীম সিং তামিল ছবি 'কুম, দাম'এর হিন্দী চিত্ররূপ দিচ্ছেন। ছবির কাজ শুরু হয়েছে এ ভি এম স্টুডিয়ে। প্রধান অংশে রূপদান করছেন অশোককুমার, প্রাণ, মালা সিন্‌হা, জিম্মি ও সন্ধ্যা রায়। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন মদনমোহন।

স্টুডিও থেকে বলছি

বাংলা চলচ্চিত্রে যে কজন পরিচালক নতুন ধারায় বিশ্বাসী তাদের মধ্যে পরিচালক রাজেন তরফদার একজন। 'অন্তরীক্ষ' ছবির আত্মপ্রকাশের পর 'গঙ্গা' চিত্রে শ্রীতরফদার চলচ্চিত্রে আপন কর্মদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ সম্মান ও পদমর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন। বর্তমানে 'জীবন-কাহিনী' তাঁর আর একটি জীবন-সাধনার যোগফল। সম্প্রতি এ চিত্রের সম্পূর্ণ দৃশ্যগ্রহণ রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওর শেষ হল। ছবি এখন সম্পাদনা-বিভাগে। ছবির পর ছবি জুড়ে এ কাহিনীর গতি বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। বহু আগে সংক্ষিপ্ত আকারে এ ছবির গল্প আপনাদের বলেছি। এবারে সম্পূর্ণ ছবির চিত্র-কাহিনী জানাচ্ছি।

নবজীবনবাবুর জীবন-বৈচিত্র্য নিয়ে এ জীবন-কাহিনী। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও যে জীবনের মিছিল সামান্য

নিরাপত্তার আশায় বে'চে থাকে তার মূল্যায়ন এ মাটির পৃথিবীতে কতখানি স্থিতি লাভ করে তারই বাস্তব চরিত্র আমাদের নবজীবনবাবু। নিজের জীবনের ওপর আস্থা হারিয়েও অন্য জীবনের মূল্য খোঁজে। জীবনবীমার দালালি চালিয়ে মৃত সংসারের একমাত্র কন্যা বাসন্তী আজও নিভে-আসা প্রদীপের শেষ আলোটুকুর মত বংশের সলাতে হয়ে জ্বলছে।

প্রত্যহের পেশা-সংগ্রামে নবজীবনের পরিক্রমা যেন ছকে বাঁধা হয়ে এসেছে। সেই ধনী পরিবারের পোষা অ্যালসেসিয়ান কুকুরের ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা, পাড়ার সদাহিতৈষী ছেলেদের হয়রানি আর দুপুরের তেতেওঠা পৃথিবীর শুষ্ক মুহূর্তগুলো মিলিয়ে নবজীবন যেন বেশী বাস্তব হয়ে বে'চে রয়েছে। ছে'ড়া জামা আর কাকতাড়ুয়া প্যান্ট পরে সারাদিনের গ্লানি হয়তো এক কাপ চা ও আফিমের গুলিতে আবার পায়ে-পায়ে দিন শেষ হয়। সন্ধ্যা নামে।

বস্তির ছোট্ট ঘরটিতে বাসন্তী চুপচাপ বাবার পথ চেয়ে থাকে। বাড়ীতে ফিরেও নবজীবনের শান্তি নেই। পাওনাদারদের দল ওৎ পেতে আছে শিকারীর মত। দেখতে পেলেই ধারের অর্থ নিয়ে চে'চামেচি শুরু করবে। অন্নের সঙ্গে অন্যান্যের দাবী নিয়ে প্রহরগুলো বিষিয়ে তুলেছে। অভাব আর ব্যর্থতায় নবজীবন পরাস্ত প্রায়।

এমনিভাবেই হয়তো একদিন শুকিয়ে মরতে হবে এ পরিবারের দুটি প্রাণীকে। তাই চরম এক মুহূর্তে নবজীবন আত্মহত্যা করবে বলে রাতের অন্ধকারে হাওড়া পুলের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ লাফ দেবার পূর্ব মুহূর্তে পাশের আর একটি ছায়া দেখে নবজীবন সব ভুলে যায়। ছুটে গিয়ে আর এক আত্মঘাতীর প্রাণ বাঁচায়। বোঝায়—'আত্মহত্যা করা মহাপাপ।'

এখানেই জীবনের দর্শন। মৃত্যুই আর এক মৃত্যুর প্রাণ। শেষ পর্যন্ত সেই যুবক অমর নবজীবনের দয়ায় একই গৃহে ফিরে আসে। মরতেই যদি হয় তাহলে গ্রেট মাদারল্যান্ডের পঞ্চাশ হাজার একটা পলিসি করে নবজীবনকে নমিনি করে দিয়ে যায়। নবজীবনের এ পরিকল্পনা শুনে অমর বেশ অবাক হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রাজী হল।

বস্তী-বাড়ীতে এসে অমর সব বুঝতে পারে। জোড়াতালি দেওয়া শাড়ি আর সংসার। পাওনাদার আর অন্নের যন্ত্রণা। এ বাড়ীতে বাসন্তীকেই সব সামলাতে হয়। সব যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। যন্ত্রের মত বাসন্তী দরজা খুলে পাওনাদারদের বলে—বাবা বাড়ী নেই, সেই সাত-সকালে বেরিয়েছেন, কখন ফিরবেন বলে যান নি। মিষ্টিমুখের দর্শনে তারা চলে যায়। কিন্তু দুঃখ সেখানেই বাড়ীতে বসে দরজার আড়াল থেকে চোরের মত সবকিছুই নীরবে নবজীবনবাবুকে সহ্য করতে হয়। একদিন বাসন্তীকে অমর বলে—আমি দেখছি মিথ্যেকথাগুলো তোমার চেয়ে আমি অনেক ভাল বলতে পারি।

সেই থেকে অমর এ পরিবারের আর একজন হল। পাওনাদার রোখে আর মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়। নবজীবন অনেক টাকা খরচ করে অমরের শেষ আশাগুলোকে মিটিয়ে দেবার জন্য। শেষ পর্যন্ত কয়েকবার মরতে গিয়েও অমর ফিরে আসে। বাঁচবার বড় ইচ্ছে তার। নবজীবনবাবু ক্রুদ্ধ হন। কারণ তার অনেক আশা। অমরের মৃত্যুর পর সব টাকা পেয়ে সে বাড়ী করবে, বাসন্তীর বিয়ে দেবে। কিন্তু অমর বে'কে বসলো। শেষবারের মত কিছু টাকা নিয়ে অমর ব্যবসায় পা বাড়ালো। কাপড়-চোপড় কিনে সে মহাজন ঠিক করে রাস্তায় ফিরি করতে শুরু করলো। ক্রমেই দু-পাঁচ টাকা লাভ হতে লাগলো। সারাদিন সে ঘোরে। নির্দিষ্ট সময়ে পার্কে বাসন্তীর সঙ্গে গল্প করে সারাদিনের ক্লান্তি জুড়ায়।

এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও অমর আর বাসন্তী বে'চে থাকার প্রেরণা পায়। ওরা দুজনে এই কঠিন জীবনকে মধুময় করে তোলে। একদিন নবজীবন আবিষ্কার করলেন একা অমর নয় বাসন্তীও ওর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। নবজীবন তার পরম দুঃখের দিনেও আঁধারের মধ্যে আলোর রেখা খুঁজে পান। অমর একা বাঁচতে গিয়ে সকলকে বাঁচিয়েছে।

নবজীবনবাবু আশ্বাস পায়। সব মানুষেরই যে বাঁচার অধিকার আছে সেটা তিনি অনুভব করেন। এত বড় পৃথিবীতে নবজীবনবাবু, বাসন্তী আর অমর একসঙ্গেই বে'চে যায়।

রাজেন তরফদার রচিত এ চিত্রনাট্যে সার্থক তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন নবজীবন—বিকাশ রায়, অমর—অনুপকুমার ও বাসন্তীর ভূমিকায় সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে রয়েছেন জহর গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতা মুখার্জী ও রেণুকা রায়। চিত্রগ্রহণ, সঙ্গীত ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন অনিল গুপ্ত, প্রবীর মজুমদার এবং তরুণ দত্ত। পরিবেশনায় রয়েছেন জি. আর. পিকচার্স।

চিত্রদূত

দর্শক

॥ ডুরাণ্ড কাপ ॥

১৯৬৩ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা বর্তমানে কোয়ার্টার-ফাইনাল পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এবারের প্রতিযোগিতায় ৩০টি দল যোগদান করেছে। কলকাতা থেকে যোগদান করেছে এই পাঁচটি দল—গত বছরের রাণার্স-আপ মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, বি এন আর এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে। গত বছরের ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী অন্ধ্র পুলিশ এবং রাণার্স আপ মোহনবাগান দলের প্রথম খেলা দেওয়া হয় দ্বিতীয় রাউণ্ড থেকে। বাকি ২৮টি দলকে প্রথম রাউণ্ড থেকে খেলতে হয়েছে। অন্ধ্র পুলিশদল দ্বিতীয় দিনের খেলায় ১—০ গোলে জলন্ধরের লিডার্স ক্লাবকে পরাজিত ক'রে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। অন্ধ্র পুলিশদলের বিপরীত দিকে অর্থাৎ নীচের দিকের খেলায় মোহনবাগান ৩—২ গোলে পাঞ্জাব পুলিশকে পরাজিত ক'রে কোয়ার্টার ফাইনালে ইণ্ডিয়ান নেভী দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এবছরের আই এফ এ শীল্ড জয়ী বি এন আর ৩—১ গোলে কেরালা ফুটবল এসোসিয়েশন দলকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠেছে প্রথম রাউণ্ডের খেলায় সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ দলকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে। ইস্টার্ণ রেলদল দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় ০—২ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভী দলের কাছে পরাজিত হ'য়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ইস্টার্ণ রেলদল ৬—০ গোলে গোয়ার এম সি সি ফুটবল দলকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠেছিল। মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম রাউণ্ডে নিউ দিল্লী হিরোজ দলের বিপক্ষে ১—১ গোলে খেলা ড্র করেছে। সুতরাং কলকাতার পাঁচটি দলের মধ্যে এখনও প্রতিযোগিতায় অপরাজিত আছে চারটি দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, বি এন আর এবং মহমেডান স্পোর্টিং। প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা হবে ৮টি দলের মধ্যে। এপর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে এই পাঁচটি দল—মোহনবাগান, ইণ্ডিয়ান নেভী, সি আই এল (বাঙ্গালোর) অন্ধ্র পুলিশ এবং সেন্ট্রাল রেলওয়ে। কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে খেলবে ইণ্ডিয়ান নেভী। কিন্তু এখনও অন্ধ্র পুলিশ, সেন্ট্রাল রেলওয়ে এবং সি আই এল (বাঙ্গালোর) দলের প্রতিদ্বন্দ্বী কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে এসে পৌঁছয়নি। কলকাতার বি এন আর, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যদি তাদের পরবর্তী খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করতে পারে তাহলে কোয়ার্টার ফাইনালে অন্ধ্র পুলিশ দলের বিপক্ষে বি এন আর, সেন্ট্রাল রেলওয়ে দলের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল এবং সি আই এল দলের (বাঙ্গালোর) বিপক্ষে মহমেডান স্পোর্টিং খেলবে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের দুটো খেলা বাকি—প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ড।

এবারের প্রতিযোগিতায় এপর্যন্ত এই তিনজন খেলোয়াড় হ্যাটট্রিক করেছেন : এম সি সি ফুটবল দলের বিপক্ষে ইস্টার্ণ রেলদলের তাপস বসু, কেরালা ফুটবল এসোসিয়েশন দলের বিপক্ষে বি এন আর দলের রাজেন্দ্রমোহন এবং হায়দরাবাদের সিটি কলেজ ওল্ড বয়েজ ফুটবল দলের বিপক্ষে ফিরতি খেলায় সি আই এল দলের (বাঙ্গালোর) জর্জ।

॥ রোভার্স কাপ ॥

১৯৬৩ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে এসে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। গত ২৫শে নভেম্বর থেকে প্রতিযোগিতার আর কোন খেলা হচ্ছে না। রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিচালক পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশন এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার ক'রে জানিয়েছেন, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসের আগে প্রতিযোগিতা পুনরায় আরম্ভ করা সম্ভব হবে না। মাঝপথে এইভাবে খেলা বন্ধ রাখার কারণ রোভার্স এবং ডুরাণ্ড কাপের খেলা একসঙ্গে চলতে থাকায় যে সব দল উভয় প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে তাদের পক্ষে বোম্বাই-দিল্লী টানাপোড়েন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দুটো প্রতিযোগিতার খেলাই তারা হাতে রাখতে চায়। ভাবটা এইরকম, একটা ফস্কালে আর একটা প্রতিযোগিতার খেলা হাতে জমা থেকে যাবে। তাই খেলার পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত কোন দলই যে-কোন একটা প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করতে রাজী ছিল না। খেলা স্থগিত রাখার আবেদনপত্রের বোঝাতে রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার পরিচালকদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার খেলা শেষ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থায় সাময়িকভাবে প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখাই তাঁরা যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন।

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা বর্তমানে সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে পেঁছে গেছে। সেমি-ফাইনালে চারটি দল খেলবে; ইতিমধ্যেই তিনটি দল উঠে গেছে—একটা দল উঠতে যা বাকি। একদিকের সেমি-ফাইনালে উঠেছে ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং। অন্যদিকের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান। মোহনবাগানের সঙ্গে কোন দল খেলবে সেইটাই এখনও স্থির হয়নি। গত বছরের যুগ্ম বিজয়ী অন্ধ্র পুলিশদল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে হাত গুটিয়ে ৯ই নভেম্বর থেকে বসে আছে। তাদের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে চতুর্থ রাউণ্ডের বিজয়ী ইস্টার্ণ রেলওয়ে অথবা মফৎলাল গ্রুপ। ইস্টার্ণ রেলওয়ে বনাম মফৎলাল গ্রুপের খেলা প্রথম দিন ২—২ গোলে ড্র যায়। সে আজকের কথা নয়, ১৬ই নভেম্বরের খেলা। এই অমীমাংসিত খেলার আর মীমাংসা হল না। ২১শে নভেম্বর ডুরাণ্ড কাপে ইস্টার্ণ রেলদলের খেলা; সুতরাং রেলের মুখ দিল্লীর পথে ঘুরে গেল। মফৎলাল মিলস্ দলও ডুরাণ্ডে নাম দিয়েছে, তাদের খেলা ২৬শে নভেম্বর। ইস্টার্ণ রেলদল প্রথম রাউণ্ডে গোয়ার এম সি সি দলকে শোচনীয়ভাবে ৬—০ গোলে পরাজিত করে ঊর্ধ্বগতিতে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ঢুকবার সিগন্যাল পেল; কিন্তু দ্বিতীয় রাউণ্ডে ইস্টার্ণ রেলওয়ে বনাম ইণ্ডিয়ান নেভী দলের খেলায় নেভী দল ২—০ গোলে জয়ী হয়ে রেল দলের দ্রুতগতি একেবারে থামিয়ে দিয়েছে। নেভীরা স্থলযুদ্ধেও পারদর্শী কম নয়! ইস্টার্ণ রেল দলের হাতে ডুরাণ্ড কাপ এলো না। এখন বাকি রোভার্স। সুতরাং তারা এখন রোভার্সের অসমাপ্ত চতুর্থ রাউণ্ডের খেলায় মন দিতে পারে। কিন্তু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মফৎলাল যে ডুরাণ্ড কাপের খেলায় আটকে পড়েছে। শুধু এই দুই দল নিয়েই তো সমস্যা নয়—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং এবং অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ—রোভার্স কাপের এই দলগুলিও যে এবারের ডুরাণ্ড কাপের খেলায় এখনও আটকে আছে। রোভার্স কাপের খেলা তাই সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ

৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার, ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট খেলা শুরু হবে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অধিনায়কত্ব করছেন রিচি বেনো। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এই টেস্ট সিরিজ খেলার পরই রিচি বেনো টেস্ট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হয় ১৯০২ সালের ১১ই অক্টোবর, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে। উভয় দেশের এই প্রথম টেস্ট খেলাটি ড্র যায়। এই খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা ব্যাটস্‌ম্যান ক্লিমেন্ট হিল শত রান (১৪২ রান) করার গৌরব লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ১৫৯ রানে এবং তৃতীয় টেস্টে ১০ উইকেটে জয়ী হয়ে ২—০ খেলায় 'রাবার' লাভ করে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই দুই দেশের টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়েছে কয়েক বছর পর—১৯১০ সালের ৯ই ডিসেম্বর সিডনি মাঠে। স্বদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত উভয় দেশের এই প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১১৪ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করেছিল।

এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে ৩৯টি টেস্ট খেলা হয়েছে। এই টেস্ট খেলার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ২৭, দক্ষিণ আফ্রিকার জয় ৩ এবং খেলা ড্র ৯। উভয় দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত মোট ৯টা টেস্ট সিরিজের খেলায় অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' জয় করেছে ৮ বার এবং ১ বার (১৯৫২-৫৩) টেস্ট সিরিজের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে। অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে অস্ট্রেলিয়াকে এ পর্যন্ত কখনও 'রাবার' হাতছাড়া করতে হয়নি। ১৯৩১-৩২ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া পাঁচটা খেলাতেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয়লাভ করে। টেস্ট সিরিজে এ পর্যন্ত এই রকম জয়লাভ মাত্র চারবার ঘটেছে—অস্ট্রেলিয়া ১৯২০-২১ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং ১৯৩১-৩২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ইংল্যান্ড ১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৬২ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলাতেই জয়লাভ করে।

টেস্ট খেলায় রেকর্ড

অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে অনুষ্ঠিত ৩৯টি টেস্ট খেলায় যে সব উল্লেখযোগ্য রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ন আছে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

টেস্ট খেলার ফলাফল

অস্ট্রেলিয়া-দঃ আফ্রিকা খেলা

স্থান	জয়ী	জয়ী	ড্র
দঃ আফ্রিকা	১৪	০	৭
অস্ট্রেলিয়া	১১	৩	১
ইংল্যান্ড*	২	০	১
	২৭	৩	৯

* ১৯১২ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় টেস্ট ম্যাচ টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার তিনটি টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ২—০ খেলায় জয়লাভ করেছিল।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

অস্ট্রেলিয়া : ৫৭৮, মেলবোর্ণ, ১৯১০-১১

দঃ আফ্রিকা : ৫০৬, মেলবোর্ণ, ১৯১০-১১

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান

অস্ট্রেলিয়া : ৭৫, ডারবান, ১৯৪৯-৫০

দঃ আফ্রিকা : ৩৬, মেলবোর্ণ, ১৯৩১-৩২

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ২৯৯*—ডি জি ব্র্যাডম্যান, এডিলেড, ১৯৩১-৩২

দঃ আফ্রিকার পক্ষে : ২৩১—এ ডি নোর্স (জুনিয়ার), জোহানেসবার্গ, ১৯৩৫-৩৬

উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১১৮ ও ১০১*—জে আর মরোনী, জোহানেসবার্গ, ১৯৪৯-৫০।

দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে : কোন খেলোয়াড় একই খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন নি।

এক ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে (৫টি) :

২২৬ ডি জি ব্র্যাডম্যান, ব্রিসবেন, ১৯৩১-২

২৯৯* ডি জি ব্র্যাডম্যান, এডিলেড, ১৯৩১-২

২০৩ এইচ এল কলিন্স, জোহানেসবার্গ, ১৯২১-২

২০৫ আর এন হার্ভে মেলবোর্ণ, ১৯৫২-৩

২১৪* ভি টি ট্রাম্পার, এডিলেড, ১৯১০-১

দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে (২টি) :

২০৪ জি এ ফকনার, মেলবোর্ণ, ১৯১০-১

২৩১ এ ডি নোর্স, জোহানেসবার্গ, ১৯৩৫-৬

* নট আউট নির্দেশ করে।

হ্যাট-ট্রিক

অস্ট্রেলিয়ার টি জে ম্যাথুজ ১৯১২ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের প্রথম টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসেই 'হ্যাট-ট্রিক' করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই দৃষ্টান্ত আর নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তৃতীয় 'হ্যাট-ট্রিক' করেছেন এল ক্লাইন (কেপটাউন, ১৯৫৭-৫৮)। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার কোন খেলোয়াড়ই 'হ্যাট-ট্রিক' করতে পারেন নি।

টেস্ট সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ৫০

দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে : ১৯

॥ গানেফো ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

গত ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় যে নবনির্মিত 'সেনাজন' স্টেডিয়ামে চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর বসেছিল সেই স্টেডিয়ামেই গত ১০ই নভেম্বর প্রথম 'গানেফো' ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। বারদিনব্যাপী এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে পৃথিবীর ৪২টি দেশের ১,৮২৬ জন এ্যাথলীট যোগদান করেছিলেন। অলিম্পিক বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যেসব রীতিনীতি পালন করা হয় এক্ষেত্রেও সেই সমস্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছিল। ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণ। জাকার্তার এই 'সেনাজন' স্টেডিয়ামটি পৃথিবীর বৃহত্তম স্টেডিয়াম। গত চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এই স্টেডিয়ামটি সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পূর্ণ দানে—১,৫০০,০০০ ডলার ব্যয়ে নির্মিত হয়। এই স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা এবং নির্মাণ কার্যের সমস্ত ব্যবস্থাপনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন রাশিয়ার ইঞ্জিনীয়াররা।

গানেফো ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল ইন্দোনেশিয়া। 'গেমস অব দি নিউ এমার্জিং ফোরসেস'—এই ইংরেজি বাক্যটি সংক্ষেপে দাঁড়িয়েছে 'গানেফো'। নবজাগ্রত শক্তিসমূহকে নিয়েই এই ক্রীড়ানুষ্ঠান। নিছক খেলাধূলার উদ্দেশ্য নিয়েই 'গানেফো' ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি, পিছনে বিরাট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে—এ কথা পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল এবং সংবাদপত্রাদি বলছেন। এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের দুই সভ্য—ইস্রায়েল এবং তাইওয়ানকে গত চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে রাজনৈতিক কারণে যোগদান করতে না দেওয়াতে এশিয়ান গেমসের প্রতিষ্ঠাতা এবং এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ শ্রীসোন্ধি ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতির এই অশুভ হস্তক্ষেপ সমর্থন করেননি। তিনি ভবিষ্যতের অশুভ ফলাফলের কথা চিন্তা ক'রেই সমাধানের উপায় হিসাবে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন

এরিয়ান্স ক্লাবের বার্ষিক এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ৮০ মিটার হার্ডলস : বেলঘরিয়া এ সি'র চিত্রা গাঙ্গুলী (বাঁদিকের প্রথম) প্রথম স্থান পান।

তা ইন্দোনেশিয়া সরকার এবং চতুর্থ এশিয়ান গেমসের উদ্যোক্তা ইন্দোনেশিয়ার ক্রীড়া সংস্থা সমর্থন করেননি। উপরন্তু ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল শ্রীসোন্ধির বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হয়নি জাকার্তায় ভারতীয় দূতাবাস আক্রমণ ক'রে বহু সম্পত্তি নষ্ট এবং লুণ্ঠন করে। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক ফেডারেসন, অলিম্পিক কমিটি এবং পৃথিবীর অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলি ইন্দোনেশিয়ার এই কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক ফেডারেশন বিগত চতুর্থ গেমসকে কেবলমাত্র একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অর্থাৎ চতুর্থ এশিয়ান গেমস হিসাবে স্বীকার করেননি যেহেতু এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের নীতি লঙ্ঘন ক'রে ইস্রায়েল এবং তাইওয়ানকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার প্রতি আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের নির্দেশ ছিল, শ্রীসোন্ধির কাছে লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এই রকম ঘটনা আর যে ঘটবে না তার প্রতিশ্রুতি নিতে হবে; তা না হলে টোকিওর আগামী অলিম্পিক

অনিতা মুখার্জি
পূর্বাঞ্চল এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে বাংলা দলে স্থান পেয়েছেন।

গেমসে ইন্দোনেশিয়াকে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। প্রকৃতপক্ষে এইসব নির্দেশ এবং সিদ্ধান্তের প্রতি ইন্দোনেশিয়ার এই গানেফো ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন একটা চ্যালেঞ্জ।

গানেফো ক্রীড়ানুষ্ঠানে রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী, পাকিস্তান প্রভৃতি কয়েকটি দেশের যোগদানে অবস্থা বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম গানেফো ক্রীড়ানুষ্ঠানে সব থেকে বেশী প্রতিনিধি (২৩৮ জন) যোগদান করেছিলেন প্রজাতন্ত্র চীন থেকে। ফলে তাঁরাই বেশী সাফল্য লাভ করেছেন। প্রজাতন্ত্রী চীন ১৬৮টি পদক পেয়েছে—স্বর্ণ ৬৫, রৌপ্য ৫৬ এবং ব্রোঞ্জ ৪৭। পদক লাভের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া।

॥ জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা ॥

গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলওয়ে দল ১৭-১৫, ১৫-১১ ও ১৫-৭ পয়েন্টে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে পুরুষ বিভাগের খেতাব লাভ করেছে।

মহিলা বিভাগের ফাইনালে মাদ্রাজ ১৫-৩, ১৫-৫ ও ১৫-১২ পয়েন্টে দিল্লীকে পরাজিত করেছে।

ডেনিস রালস্টন এক আশ্চর্য খেলোয়াড়, ট্রাজেডিতে ভরা যাঁর জীবন-বৃত্তান্ত!

টেনিসে রালস্টনের দক্ষতা প্রশ্নেরও অতীত। কিন্তু মেজাজের দিক থেকে তিনি কারুরই অনুকরণীয় নন্। বড় বড় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হার মানাচ্ছেন, শীর্ষ-পর্যায়ের প্রতিযোগিতা জিতছেন। ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছেন ডেনিস। কিন্তু উঁচু পর্দার মেজাজটি তিনি কোনো-মতেই বাগে আনতে পারছেন না।

র‍্যাকেট হাতে কোর্টে নামলেই ডেনিসের ভেতরটা টগবগ করে ফুটতে থাকে। কারণে-অকারণে, অছিলায়-অজুহাতে মনের উত্তাপকে তিনি দু'হাতে ছড়িয়ে দেন। টেনিস চিরদিনই অভিজাত মহলের খেলা। কিন্তু ডেনিস রালস্টনকে দেখলে কথাটির মাথামুণ্ডু খুঁজেই পাওয়া যায় না।

খেলা দেখিয়েই সাধারণের মনো-রঞ্জন করাই খেলোয়াড়দের কাজ। তাই তাঁদের বলা হয় 'পাবলিক এনটার-টেইনার'। শুধু নিজে নিজে আনন্দ পাওয়াই যদি একমাত্র অভিপ্রেত হোতো তাহলে ক্রীড়ানুষ্ঠানকেন্দ্রে খেলোয়াড়েরা ছাড়া দশর্কদের উপস্থিতি ঘটতো না।

কিন্তু ক্রীড়াকেন্দ্রে দর্শকদের অস্তিত্ব আছে, যেমন আছে খেলোয়াড়-দের। দু'পক্ষের অস্তিত্ব ঘিরেই অনুষ্ঠান চলে। কিন্তু ডেনিস রালস্টন যেন দর্শকদের কেয়ারই করতে চান না। দূরের আসন থেকে কোনো দর্শক যদি কোনো মন্তব্য ছোঁড়েন অমনি ডেনিস ওঠেন ফুঁসিয়ে। তারিফ জানালে যদিও বা তাঁরা রক্ষা পান, বিরূপ মন্তব্য করলে কিন্তু কারুরই রেহাই নেই।

কোর্টে ডেনিস রালস্টনের আচরণ সত্যিই অদ্ভুত! আম্পায়ার—লাইন্স-ম্যানের নির্দেশে যদি মুহূর্তের জন্যে পান থেকে চুন খসে পড়ে তাহলে আবার ডেনিস তাঁর আশ্চর্য খেল্ দেখাবেনই! মনে মনে বিড় বিড় করে বকে চলবেন। অঙ্গভঙ্গী সহকারে অসন্তোষ প্রকাশ করবেন। ফেটে-পড়া আক্রোশে র‍্যাকেট ছুঁড়ে ফেলবেন এখানে সেখানে। মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গেও ডেনিস যুদ্ধ বাধিয়ে বসেন।

হাতের মারটি যদি লাগসই না হয়, অমনি নিজের ওপরে ঘেন্না ধরে যায়

আশ্চর্য খেলোয়াড় রালস্টন

তাঁর। ডেনিস যেন একটি আস্ত বারুদের স্তূপ! কবে, কোন্ মুহূর্তে যে সেই বারুদে আগুনে-কাঠির ছোঁয়া লাগবে তা ভেবে দর্শকেরাই যেন বিব্রত।

চড়া পর্দার বাঁধা এই মেজাজের জন্যে ডেনিস রালস্টন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারছেন না। নইলে খেলোয়াড় হিসেবে তিনি আজ অনেক উঁচুতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। চাক্ ম্যাকিনলের সহযোগী এই ডেনিস রালস্টনের দিকে তাকিয়ে আমেরিকা আজ অস্ট্রেলিয়ার হাত থেকে আন্তর্জাতিক দলগত টেনিসের সেরা পুরস্কার ডেভিস কাপ ছিনিয়ে আনার স্বপ্ন দেখছে।

সে স্বপ্ন নিতান্ত অযৌক্তিকও নয়। কারণ, এ বছরের ডেভিস কাপের খেলায় ডেনিস রালস্টন মেক্সিকোর রাফেল ওসুনা, ভারতের রমানাথন কৃষ্ণানের মতো বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়েছেন। তারপর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে আরও কীর্তিমান এবং অস্ট্রেলিয়ার বড় ভরসা রয় এমার্সনকে দু' দুবার নতি-স্বীকারে বাধ্য করিয়েছেন।

কিন্তু এতো করেও ডেনিস দর্শক-দের মন পাচ্ছেন না। অপরাধ দর্শকদের নয়। অপরাধ তাঁর নিজেরই! কি বোম্বাই, কি অস্ট্রেলিয়া, সর্বত্রই সঙ্গে রয়েছে তাঁর আগুনে-মেজাজ। আর সেই মেজাজ যখনই হাতের র‍্যাকেটটি মাটিতে ঠুকছে বা তা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে দূরে তখনই ডেনিসের বদনামে পত্র-পুস্তিকাগুলি সোচ্চার হয়ে উঠছে।

অস্ট্রেলিয়ার অনেক পত্রিকায় ইতি-মধ্যেই এই কথা বলাবলি শুরু হয়ে গিয়েছে যে, ডেনিস রালস্টনের মতো দুর্বিনীত খেলোয়াড় আর কোনোদিন আমেরিকার জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেন নি। এমন এক খেলোয়াড় টেনিস কোর্টের শালীনতার সঙ্গে বেমানান।

স্বদেশীয় ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, ডেনিসের সব চেয়ে বড় শত্রু তিনি নিজে। মানে তাঁর চড়া মেজাজ। নইলে এতোদিনে তিনি খেলোয়াড় হিসেবে আরও অনেক উঁচুতে উঠতে পারতেন। মার্কিণ টেনিস বিশেষজ্ঞ পেরি টি জোন্সের মতে 'কম বয়সে ডেনিস রালস্টন তাঁর উত্তর-জীবন সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে, সে প্রতিশ্রুতি

পাণ্চো গনজালেস, ডোনাল্ড বাজ, এলস-ওয়ার্থ ভাইনস ও বিল টিলডেনের আচরণেও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি কোনো দিন।'

তাঁর সম্ভাবনায় নিশ্চিত হয়েছেন বলেই মার্কিণ টেনিস নিয়ন্ত্রণ সংস্থা তাঁকে যেমন ফেলতেও পারে না তেমনি মাথায় তুলে রাখাও সেই সংস্থার পক্ষে অসম্ভব। নইলে সাসপেনশানের মেয়াদে ডেনিস রালস্টনের খেলোয়াড় জীবন কবে খতম হয়ে যেতো।

কোর্টের অশোভন আচরণের অপ-রাধে মার্কিণ টেনিস সংস্থা তাঁকে ইতিমধ্যে দণ্ড দিতেও বাধ্য হয়েছে। ১৯৬১ সালে ডেভিস কাপে আমেরিকা বনাম মেক্সিকোর খেলা উপলক্ষে পরি চালকদের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করায় ডেনিসকে সাসপেণ্ড করা হয়। ডেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী মেক্সিকোর রাফেল ওসুনা এবং স্বদেশীয় অনেক খেলোয়াড় সেদিন ডেনিসকে অব্যাহতি দেবার জন্যে মার্কিণ ক্রীড়া সংস্থার কাছে ধর্ণা দিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কিন সংস্থা সে আবেদনে কান পাতেন না। বছর খানেক দণ্ডভোগের পর আবার তিনি টেনিস কোর্টে ফিরে আসেন এবং এসেই জাতীয় দলের একেবারে পুরোভাগে উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ন চাক্ ম্যাকিলনের পাশে এসে দাঁড়ান।

নিয়মিত খেলার সুযোগ বঞ্চিত এবং এক বছর ধরে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে পারার পরও যাঁর খেলার ধার কমে না, বরং বাড়ে, তিনি যে কোন জাতের খেলোয়াড় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ওই রাফেল ওসুনার সঙ্গে জুটি বেঁধে ডেনিস রালস্টন উইম্বলেডনে ডাবলস ফাইনালে জিতেছেন খুব কম বয়সে। দুজনে অনেকদিন এক ঘরে কাটিয়েছেনও। ওসুনা ডেনিসকে ভাল করেই চেনেন। তাঁর মতে কিন্তু ডেনিস রালস্টন অভদ্র দুর্বিনীত নন্। ওসুনা বলেন 'ডেনিস হারজিতের ওপর বড্ড বেশী গুরুত্ব দেন। ফলে সব সময়েই তাঁর ধাত চড়া পর্দায় আটকে থাকে। তাই খেলতে নেমে ভুলচুক ঘটে গেলে তিনি কাউকে রেহাই দেন না। ভুল হলে অন্যকে যেমন দোষেন, নিজের বেলাতেই ঠিক তাই।'

বিশ্ববিশ্রুত টেনিস খেলোয়াড় ও পেশাদার সংগঠক প্রাক্তন উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ন জ্যাক ক্রেমারের মতও অনুরূপ 'ডেনিসের লক্ষ্য অন্যের মনোরঞ্জন করা নয়। তার একমাত্র লক্ষ্য জয়লাভ করা।'

কথাটা একেবারেই খাঁটি। জিততে হবে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে হবেই, ডেনিস যেন মনে মনে সর্বক্ষণই এই কথা উচ্চারণ করে চলেছেন। মুখে হাসি নেই। আচরণে শৈথিল্য নেই। এবং ঘুমিয়ে পড়ার পরও ডেনিসের স্বস্তি, শান্তি নেই।

ডেনিস রালস্টনের মা বলেন, 'যখন ও ঘুমিয়ে থাকে তখনই তার কাজ বাড়ে। তখন প্রতিমুহূর্তেই সে ব্যস্ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিড় বিড় করে বকে চলে, না এই মারটি ঠিক হলো না। আরও কতো কথা! মনে হয় সারাক্ষণ যেন ও নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে।'

হয়তো জননীর আবিষ্কারেই ডেনিসের যথার্থ পরিচয়। তাঁর চড়া ধাতই তাঁকে দিয়ে টেনিস কোর্টে অশোভন কাণ্ড করিয়ে নিচ্ছে। আর তাঁর এই চড়া ধাত তো সাম্প্রতিক 'সম্পদও' নয়। ছেলেবেলা থেকেই এই 'সম্পদ' তিলে তিলে সঞ্চিত হয়েছে।

ডেনিসের মা বলেন, 'ছেলেবেলায় দেখেছি ডেনিস ও রোবার্টা, ভাই-বোনে খুশীমনেই খেলছে। যদি কোনোদিন রোবার্টা জিতলো তাহলেই সর্বনাশ' ডেনিস তখন হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে বসলো। আমি কেন হারবো, ও কেন জিতবে! এই ছিল তার অনুযোগ। ডেনিসের মন আজও ওই একই অনুযোগ করে চলে। তবে বয়স হয়েছে তাই কেঁদে কেটে ছেলেমানুষী বাধাতে পারে না!'

কতো বয়স হলো? সবে বাইশে পা দিয়েছেন। এই ফাঁকে অনেক কীর্তি করে ফেলেছেন ডেনিস রালস্টন। বড় বড় খেলায় জিতেছেন। আবার নিজেকে ঘিরে অশোভন কাণ্ড জড়ো করে খেলায় অর্জিত সুনাম হারিয়েও বসেছেন।'

তবে যাই করুন না কেন, আদর্শ খেলোয়াড় হিসেবে নাম না পান, ডেনিস রালস্টন সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের পয়লা নম্বর টেনিস খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পাবেন।

মাত্র ছ' বছর বয়সে টেনিসে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছে এবং এগারোতে পা দিয়ে ডেনিস তাঁর জনককে চ্যালেঞ্জ করে হারিয়েছেন। বাপ-মার অনুরোগই ডেনিসের হাতে টেনিস র‍্যাকেট তুলে দিয়েছে। ডেনিসের বাবাও একজন নাম-করা খেলোয়াড় ছিলেন। স্কুলে থাকতেই তিনি সতীর্থ ববি রিগসকে নিয়মিত হারাতেন—যদিও উত্তরজীবনে তিনি রিগসের নাগাল ধরতে পারেন নি। রিগস পরে পয়লা নম্বরের স্বীকৃতি পান আর ডেনিস-জনক জীবনযুদ্ধে স্বতন্ত্র পথে পা বাড়ান।

কিন্তু তিনি নিজে যা পারেন নি, ছেলেকে দিয়ে সেই কাজ সম্পাদনেই তাঁর পরিকল্পনা। ছেলেও বাপকে খুশী করতে বলিষ্ঠপদে এগিয়ে চলেছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, ডেনিস রালস্টনের ক্রীড়াপদ্ধতিতে খুঁত বিশেষ নেই। ব্যাকহ্যাণ্ড, ফোরহ্যাণ্ড, গ্রাউণ্ড-স্ট্রোক, সার্ভিস, ভলি, সবেতেই তাঁর হাত আছে। আর আছে শারীরিক সক্ষমতা। সম্প্রতি হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পরও শারীরিক সক্ষমতা ফিরে পেতে তাঁর বিশেষ সময় লাগেনি।

প্রতিকূলতা জয়ে, শারীরিক অসুবিধে, প্রতিদ্বন্দ্বীর বাধা জয়ে আত্ম-গত সামর্থ্য ডেনিস রালস্টনের আছে। শুধু নেই মনের আবেগের রাশ টেনে ধরার ক্ষমতা। তার জন্যে তিনি নিজে ভুগছেনও যথেষ্ট।

গত বছরে চাক্ ম্যাকিলনের সঙ্গে জুটি বেঁধে এক গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ডেনিস রালস্টন যখন মেক্সিকোর ওসুনা ও প্যালাফক্সের কাছে হেরে গেলেন তখন ম্যাকিনলেকে ছেড়ে সবাই দোষ চাপালে রালস্টনের ঘাড়ে।

সমবেত কণ্ঠের অভিযোগ অভিন্ন 'ডেনিস সার্ভিসের সময় ডাবল-ফল্ট করেই ওসুনা-প্যালাফক্সকে জিতিয়ে দিয়েছেন।' কিন্তু মজার কথা এই যে, যে দুটি সেটে ডেনিস পনেরো বার ডাবল-ফল্টের দায়ে পড়েছিলেন সে দুটি সেটই কিন্তু রালস্টন-ম্যাকিনলে জুটি পেয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা কে শুনবে! বদনামের ভাগীদার যখন হয়ে পড়েছেনই তখন কারণে অকারণে দুর্নামের ছোঁয়া তাঁর গায়ে এসে লাগবে বৈকি!

সত্যি, ডেনিস রালস্টনের কপাল দেখে দুঃখ হয়! এতো বড় খেলোয়াড়, কিন্তু তাঁর নামের পুঁজি কতোটুকুই বা! হয়তো উইম্বলেডন জিতবেন একদিন কিন্তু উত্তরকাল কি তাঁকে মনে রাখতে চাইবে? চাইবে না। কারণ, কাল-জয়ী পরিচয় তাঁদেরি যাঁরা খেলোয়াড় হিসেবে নিপুণ এবং ব্যবহারিক জীবনে আদর্শ ও অনুসরণীয়।

ডেনিস রালস্টন সুদক্ষ খেলোয়াড় বটে, কিন্তু 'স্পোর্টম্যান' বলতে যা বোঝায় তা নন্। তিনি যেন এক ট্র্যাজেডির প্রতীক!

রাজনৈতিক হত্যা

বিমল রায়চৌধুরী

মাত্র চার মাস জেনারেল জেমস আব্রাম গারফিল্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের কাজ করতে পেরেছিলেন। ১৮৮১ সালের ৪ঠা মার্চ আমেরিকার বিংশতিতম প্রেসিডেণ্ট কার্যভার গ্রহণ করেন, এবং জনৈক উন্মত্ত ঘাতক কর্তৃক স্টেশনের বিশ্রামাগারে আক্রান্ত হন সেই বছরেরই ২রা জুলাই তারিখে। গুলিবিদ্ধ অবস্থাতে আরো এগারো সপ্তাহ জীবনের জন্যে আপ্রাণ যুদ্ধ করেছিলেন প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিততে পারেন নি। ১৮৮১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর এলবেরনে আমেরিকার বিংশতিতম প্রেসিডেণ্ট ইহলোক ত্যাগ করেন।

এই ঐতিহাসিক কাহিনীর খল-নায়ক চার্লস জুলিয়াস গুইটু, নরঘাতক অপরাধীদের তালিকার একটি অবিস্মরণীয় মতিচ্ছন্ন চরিত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিংশতিতম প্রেসিডেণ্ট জেনারেল জেমস আব্রাম গারফিল্ডের জীবনের অমোঘ তারিখটি হলো ১৮৮১ সালের ১৮ই মে। এইদিন রাত সাড়ে আটটার সময়

গারফিল্ড

তাঁর ভাগ্যলিপি স্থির হয়ে গিয়েছিল ওয়াশিংটনের রিগস হাউসের এক ছোট্ট শোবার ঘরে। ঘরটা চার্লস গুইটুর। তার খাটে শুয়েছিল সে। শুয়ে শুয়েই সে তার ভয়ংকর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। "আমার হঠাৎ মনে হল প্রেসিডেণ্টকে যদি পথ থেকে সরিয়ে দেয়া যায় তাহলে সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়"—পুলিশের কাছে পরে বলেছিল গুইটু।

গুইটু কর্তৃক কথিত 'সব ঝঞ্ঝাট' হল রিপাব্লিকান দলের অন্তর্বিরোধ। রিপাব্লিকান দলের 'স্টলওয়ার্ট' দল ছিল গারফিল্ডের বিরোধীপক্ষ। প্রেসিডেণ্ট-পদে তাদের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন জেনারেল গ্র্যাণ্ট। গ্র্যাণ্ট ইতিপূর্বে পর পর দুবার প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। 'স্টলওয়ার্ট' গোষ্ঠীর বাইরের রিপাব্লিকান সদস্যরা পর পর তিনবার জেনারেল গ্র্যাণ্টকে প্রেসিডেণ্ট হিসেবে দেখতে রাজী ছিলেন না। মধ্যস্থমণি হিসেবে তাঁরা গারফিল্ডকেই প্রেসিডেণ্টপদে মনোনীত করলেন। নির্বাচিত হওয়ার পর কিন্তু হোয়াইট হাউসকে গারফিল্ডের জতুগৃহই মনে হল। রেষারেষি এবং অন্তর্কলহের ফলে রিপাব্লিকান দল মুহ্যমান। তার ওপর প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের একটি নীতির প্রতিবাদে যখন 'স্টলওয়ার্ট' গোষ্ঠীর দুজন সেনেটর পদত্যাগ করলেন অবস্থা চরমে উঠল। বিভিন্ন রিপাব্লিকান পত্র-পত্রিকাগুলি দলের অবস্থা নিয়ে চারদিকে হৈচৈ আরম্ভ করে দিয়েছিল। রিপাব্লিকান দলের সমর্থক চার্লস গুইটু 'সব ঝঞ্ঝাটে'র জন্যে দায়ী করল প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডকেই। রাজনীতিতে ঊনচল্লিশ বছরের গুইটু ছিল ভুঁইফোঁড়। রাজনীতিতে আসবার আগে নানা ধরনের ধান্ধায় ঘুরেছে সে। কখনও ইন্সিওরেন্সের দালালি করেছে, কখনো বই বেচেছে, লিখেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের আয়নায় কখনো মুখ দেখা হয়নি তার। শেষ জীবিকাস্থল হিসেবে রাজনীতিকেই বেছে নিয়েছিল গুইটু। রিপাব্লিকান দলের সমর্থক হিসেবে নিজে থেকেই গারফিল্ডের হয়ে নির্বাচনের কাজে লেগে গেল। নিউইয়র্কে একটি রিপাব্লিকান দলের নির্বাচনী সভায় গুইটু প্রথম গারফিল্ডের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে আসে। সভায় নিজের লেখা হ্যাণ্ডবিল বিলি করছিল গুইটু। সেদিন হবু প্রেসিডেণ্ট-পদপ্রার্থী গারফিল্ড লক্ষ্যই করেন নি যে তাঁর কালপুরুষ তাঁর সামনে তাঁরই স্বপক্ষে লেখা পুস্তিকা বিলি করছে।

প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড নির্বাচিত হবার পর গুইটু ভাবল এবার তার পুরস্কার চাইবার পালা এসেছে। যে সে পুরস্কার নয়, একেবারে অস্ট্রিয়ার খোদ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পদটিকে নিজের জন্যে মনোনীত করেছিল গুইটু। ১৮৮১ সালের ৪ঠা মার্চ গারফিল্ড আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যভার গ্রহণ করলেন আর সেও ঠিক তার পরদিন নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনের পথে রওনা হল। যাওয়ার পথখরচাটাও তাকে ধার করতে হয়েছিল একজন বন্ধুর কাছ থেকে। ওয়াশিংটনে যাওয়ার পথেই স্বনির্বাচিত পুরস্কারটিকে ইতিমধ্যে একটু ছোট করে ফেলেছিল সে। অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত থেকে প্যারিসের কনসাল। আপাততঃ অ্যামিরিকান কনসাল হতে পারলেই চলে যায় তার। প্রেসিডেণ্ট সমীপে উপস্থিত হয়েই প্রথমে তার নিজের লেখা গারফিল্ডের স্বপক্ষের সেই নির্বাচনী ইস্তাহারটা পড়তে দিল এবং সেই সঙ্গে প্যারিসের কনসাল-পদের জন্যে একটি আবেদনপত্র। কিন্তু প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরে গুইটু জানতে পারে যে তার আবেদনপত্রটি স্টেট ডিপার্টমেণ্টে গেছে। কিন্তু দেরী সহ্য করার মতন মনের অবস্থা ছিল না তখন তার। চিঠি লিখল প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডকে :

'আশা করি আমার নিয়োগটি যথা-শীঘ্র স্থির করা হইবে। আমার বিরুদ্ধে বলিবার মত কিছুই নাই। আমি একজন ভদ্রলোক এবং সৎ ক্রিশ্চান।'

চিঠি লেখার পরও কোনো উত্তর না পেয়ে দিনের পর দিন হোয়াইট হাউসে গিয়ে ধর্না দিতে আরম্ভ করল গুইটু। প্রেসিডেণ্টকে এবং সেক্রেটারী জেমস ব্লেইনকে চিঠি এবং নোট পাঠিয়ে পাঠিয়ে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে

জেলে চার্লস গুইটু

তুলল। হোয়াইট হাউসেরই নোট লেখার কাগজ চেয়ে চেয়ে সে তার যাবতীয় আবেদন নিবেদন করত। একদিন একজন কেরানী তার কাগজের অপব্যবহারে বিরক্ত হওয়াতে রোষ-কষায়িত নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল গুইটু,

—জানো আমি কে? গারফিল্ডকে যারা প্রেসিডেণ্ট বানিয়েছে জেনে রেখো আমি তাদেরই একজন!

শেষ পর্যন্ত হোয়াইট হাউসে গুইটুর প্রবেশই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে ১৮ই মের সেই অন্ধকার সংকল্পের দিকে হতাশভাবে এগিয়ে যায় চার্লস জুলিয়াস গুইটু। প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডকে হত্যার সংকল্প-গ্রহণের পর সেই সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ছটফট করেছিল সে। মনে মনে কয়েকবার শিউরেও উঠেছিল। কিন্তু এক ঘুম দিয়ে ওঠার পর পরিকল্পনাটিকে অতটা বীভৎস মনে হল না। তবু চারদিন ধরে অনেক ভেবেচিন্তে ওর মনে হল প্রেসিডেণ্টকে একবার শেষ সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। চিঠি লিখল একটা :

ব্যক্তিগত

জেনারেল গারফিল্ড :

আমি নিরন্তর আপনার বন্ধু হইবার চেষ্টা করিতেছি অবশ্য জানি না আপনি আমার এই উদ্যমকে ভালোভাবে গ্রহণ করিবেন কিনা। মিঃ ব্লেইনের একটি পত্র সম্প্রতি আমার গোচরে আসিয়াছে। আমি এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইতেছি। শিকাগোর মিঃ ফারওয়েলের মতে ব্লেইন একজন 'জিঘাংসাপরায়ণ রাজনীতিবিদ', 'দুষ্ট গ্রহ' এবং 'যতদিন না তাঁহাকে আপনি বিতাড়িত করিতেছেন ততদিন আপনার শান্তি নাই'। পত্রদ্বারা জানানো যাইতেছে যে মিঃ ব্লেইন একটি জঘন্য লোক এবং আপনার উচিত তাঁহার পদত্যাগপত্র দাবী করা। রিপাব্লিকান পার্টিসহ আপনি বিপদে পড়িবেন। আমি পারিলে কল্য আপনার সহিত সাক্ষাতে বিস্তারিত বলিব।

বিনীত
চার্লস গুইটু

কিন্তু ঈষৎ শাসানির সুর সত্ত্বেও গারফিল্ড একেবারেই আমল দিলেন না পত্রলেখককে। অবজ্ঞাত পত্রলেখকও স্বীয় সংকল্পে কঠিনতর হল। গুইটু ভাবতে শুরু করল প্রেসিডেণ্টকে হত্যার সংকল্প 'দৈবপ্রেরণা'তেই তার মনে এসেছে। স্বীকারোক্তিতে গুইটু বলেছিল :

"দু সপ্তাহ পার হতেই আমার মন প্রেসিডেণ্টকে হত্যার ব্যাপারে একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছিল এবং আমার এই সংকল্পটি যে দৈব অনুপ্রেরণার এ বিষয়েও আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম।"

প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডকে গুলি করে হত্যাই স্থির করে সে। জুন মাসের ৮ তারিখে দূরসম্পর্কের এক ভাইয়ের কাছ থেকে পনেরো ডলার ধার নিয়ে পাঁচঘরার একটা রিভলবার কিনল গুইটু। এক বাক্স কার্তুজও কিনল। কিন্তু রিভলবার কিনলেও জীবনে কখনো আগ্নেয়াস্ত্র ছোঁড়েনি সে। কাজেই রিভলবার কিনে পরদিনই চলে গেল পটোম্যাক নদীর ধারের বনের মধ্যে। দশ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ে হাত মকসো করল। তারপর থেকেই চার্লস গুইটু ছায়াঘাতক। এর পর থেকে প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডকে ছায়ার মতন অনুসরণ করতে আরম্ভ করল সে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার রিভলবার কেনার পর থেকে গুইটু প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডকে অনেকবারই তার বন্দুকের নলের কাছাকাছি পেয়েছিল কিন্তু শেষবারের আগে কোনোবারেই রিভলবারের ঘোড়া টিপতে তার মন সরে নি।

১২ই জুনের রবিবারে প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড ন্যাশনাল সিটি ক্রিশ্চিয়ান চার্চে উপাসনার জন্যে গিয়েছিলেন। ছায়াঘাতক ছায়ার মতই ছিল প্রেসিডেণ্টের পেছনে। কিন্তু ওই ভিড়ের মধ্যে গুলি যদি অন্য কারো গায়ে লাগে এই ভয়ে গুইটু গুলি ছোঁড়ে নি। পরে ভেবেছিল, আরেকদিন গির্জার জানালা দিয়ে গুলি করবে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ওই গির্জায় আর আসেন নি উপাসনার জন্যে। তখনকার দিনে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের জন্যে কোনো দেহরক্ষীর ব্যবস্থা ছিল না। সন্দেহভাজন কোনো লোক যদি প্রেসিডেণ্টের চারপাশে ঘোরাঘুরিও করত, লক্ষ্য করার মতনও কেউ ছিল না সেকালে। আর প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড নিজেও ভুলেই গিয়েছিলেন কবে কে তাঁর কাছে চাকরী চেয়ে ব্যর্থ হয়ে শাসিয়ে চিঠি দিয়েছে। মৃত্যুকে, বলতে গেলে ছায়া করেই প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

গুইটুর দ্বিতীয় সুযোগ এল ১৮ই জুন। অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে ঐদিন প্রেসিডেণ্ট পটোম্যাক ডিপোতে এসেছিলেন নিউজার্সির ট্রেন ধরবার জন্যে। খবরের কাগজেই গুইটু প্রেসিডেণ্টের যাত্রার খবর পড়েছিল। রিভলবারটি নিয়ে সেও হাজির হল স্টেশনে। তার কাছ থেকে কয়েক ফুট দূর দিয়েই প্রেসিডেণ্ট রুগ্না স্ত্রীকে ধরে ধরে নিয়ে হেঁটে চলে গেলেন। কিন্তু স্বামীলগ্না পাণ্ডুর মিসেস গারফিল্ডের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত গুলি করতে পারল না গুইটু। বিবেককে হারাতে না পেরে দ্বিতীয়বার নিজে হেরে গেল।

নিউ জার্সি থেকে প্রেসিডেণ্টের ফেরার দিনও স্টেশনে উপস্থিত ছিল গুইটু। কিন্তু সেদিনও 'বিচ্ছিরি গরমের জন্যে' প্রেসিডেণ্ট কিছুদিনের আয়ু পেলেন। এর দশদিন পরে গারফিল্ড মৃত্যুকে যেন সহৃদয় আমন্ত্রণ-লিপিই পাঠিয়ে ফেলেছিলেন। ১লা জুলাই সন্ধ্যে সাতটার সময় প্রেসিডেণ্ট হোয়াইট হাউস থেকে একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন ফিফটিন্থ স্ট্রীটে সেক্রেটারী ব্লেইনের বাড়িতে যাবার জন্যে। লাফায়েৎ স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে গুইটু দেখল তার শিকার পেনসেলভিনিয়া এ্যাভিনিউ পেরিয়ে মাডিসন এ্যাভিনিউর দিকে হেঁটে যাচ্ছে। পেছন পেছন হাঁটতে আরম্ভ করে সে। প্রেসিডেণ্টকে ব্লেইনের বাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতে দেখে বাড়িটার পাশে একটা ছোট বন্ধ গলিতে লুকিয়ে রইল, প্রেসিডেণ্ট বাড়ি থেকে বেরোলেই আক্রমণ করবে বলে। কিছুক্ষণ পর সেক্রেটারী ব্লেইনকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন প্রেসিডেণ্ট। গল্প করতে করতে, হাসতে হাসতে হোয়াইট হাউসের দিকে হাঁটতে লাগলেন দুজন।

গ্যইটো কর্তৃক গারফিল্ড-এর প্রতি গ্যলীবর্ষণ
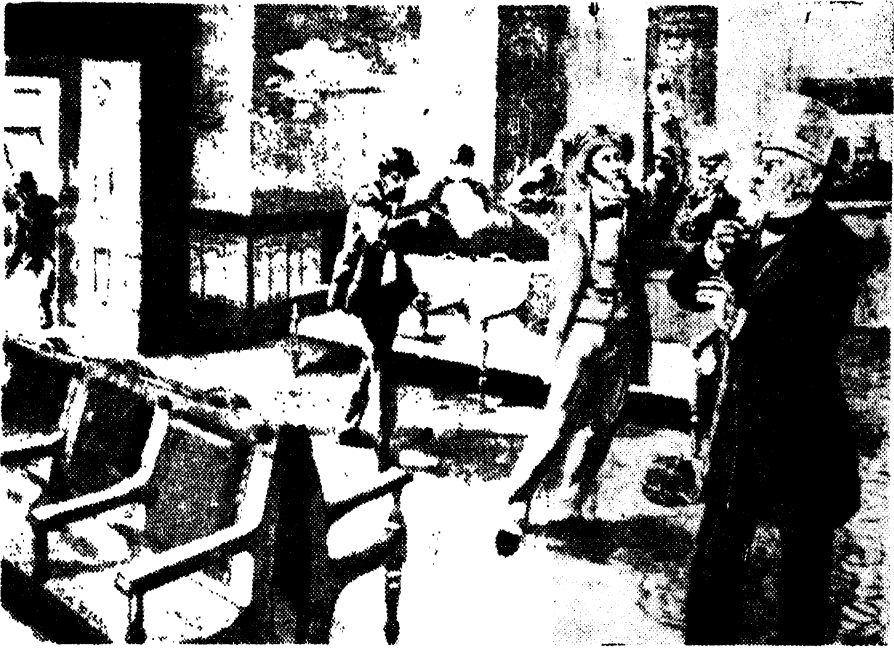
গুইটু ইচ্ছা করলেই সেদিন দুজনকেই শেষ করতে পারত গুলি চালিয়ে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট গারফিল্ডের নিরুদ্বিগ্ন হাসিতে কি ছিল কে জানে সেদিনও পারল না সে। আলোর হাতে সেদিনও পরাজয় ঘটেছিল অন্ধকারের। কিন্তু গুইটু জানত সুযোগ পরদিনও আসবে। ২রা জুলাই শনিবার প্রেসিডেন্টের সদলবলে পনেরো দিনের জন্যে ওয়াশিংটন ত্যাগ করার কথা। চারমাস একটানা কাজ করার পর প্রেসিডেন্ট ছুটি নিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্র পরিদর্শন করবেন। মিসেস গারফিল্ড নিউইয়র্ক থেকে স্বামীর সঙ্গ নেবেন। ওয়াশিংটন থেকে প্রেসিডেন্টের সংগে যাবেন কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং প্রেসিডেন্টের দুই ছেলে এক মেয়ে। সকাল সাড়ে নটার সময় পটোম্যাক ডিপো থেকে বিশেষ ট্রেন ছাড়ার কথা। সব খবরই গুইটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করেছিল। এবার মনকে শক্ত করল সে। না, আর কোনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। মতিচ্ছন্ন সেই ঘাতক শেষ অংকের জন্যে শেষবারের জন্যে প্রস্তুত হল। সর্বদিক দিয়েই প্রস্তুত হয়েছিল গুইটু। সে জানত গুলি করার পর জনতার কবলে পড়লে অসীম নিগ্রহের মধ্যে তাকে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। আগের শনিবার সে ওয়াশিংটন জেলটাও দেখে এল, কারণ ধরা পড়ে এখানেই তাকে আনা হবে জানত সে। সেদিন কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করার দিন ছিল না, তাই ভেতরে ঢোকা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে, বাইরে থেকে যতটুকু দেখল জেলখানার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই লাগল তার।

২রা জুলাই সকাল নটা কুড়িতে প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড সেক্রেটারী ব্লেইনের সংগে স্টেশনে এলেন। দলের অন্যান্য লোকরা আগেই এসে পেঁাচেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ট্রেনের কামরার মধ্যে আসন নিয়েছিলেন, কেউ কেউ বা প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিলেন। স্টেশনের মূল বাড়ি থেকে প্রায় একশ গজ দূরে বিশেষ ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল বিশেষ অতিথির অপেক্ষায়। দীর্ঘদেহী প্রেসিডেন্ট হাল্কা স্যুটে, দাড়িতে উপস্থিত সকলের মধ্যে বিশেষ ছিলেন। গুইটু কুড়ি মিনিট ধরে অপেক্ষা করছিল পটোম্যাক ডিপোতে। সেদিন সকাল পাঁচটার সময়েই ঘুম থেকে উঠেছিল সে। প্রাতঃভ্রমণ সেরে খাওয়াদাওয়া সেরে দুটো চিঠি লিখল। প্রথমটি হোয়াইট হাউসের উদ্দেশে :

প্রেসিডেন্টের মৃত্যু দুঃখজনক হইলেও অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে রিপাব্লিকান পার্টি রক্ষা পাইবে এবং সাধারণতন্ত্র বাঁচিবে। জীবন অপসৃয়মান স্বপ্নের মতন, কাহারো বিয়োগে কাহারোই কিছু আইসে যায় না। মানুষের জীবনের মূল্য সামান্যই। যুদ্ধের সময় হাজার হাজার সাহসী সৈন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। আমি বিশ্বাস করি প্রেসিডেন্ট একজন ক্রিশ্চান এবং ইহলোক অপেক্ষা স্বর্গই তাঁহার পক্ষে সুখকর হইবে। স্বাভাবিক মৃত্যুর পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট এইভাবে নিহত হইলে বেচারী মিসেস গারফিল্ডের খুব বেশী কিছু ক্ষতি হইবে না। যে কোনো সময়ে, যে কোনো ভাবেই ত প্রেসিডেন্টকে কখনো সরিতে হইবে। প্রেসিডেন্টের প্রতি আমার কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই। তাঁহার মৃত্যু রাজনৈতিক কারণেই প্রয়োজন। আমি একজন আইনবিদ, পরলোকতাত্ত্বিক এবং রাজনীতিক। আমি স্টলওয়ার্টদের স্টলওয়ার্ট। আমি নির্বাচনী কাজে আমার অন্যান্য বন্ধুদের সংগে নিউইয়র্কে জেনারেল গ্র্যান্টের সংগে ছিলাম। সংবাদপত্রের জন্যে আমি কিছু কাগজপত্র বায়রণ এণ্ড্রুজ এবং তাঁহার সহ-সাংবাদিকদের নিকট রাখিয়া যাইব ১৪২০ নিউইয়র্ক এ্যাভিনিউতে। সকল সংবাদদাতারা ঐখানেই কাগজগুলি দেখিতে পারেন। আমি জেলে যাইতেছি।

চার্লস গুইটু

দ্বিতীয় চিঠি যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ জেনারেল শেরম্যানকে লিখিত :

এইমাত্র আমি প্রেসিডেন্টকে গুলি করিলাম। অনেকবার গুলি ছুঁড়িয়াছি যাহাতে কোনো কষ্ট না পাইয়া মরিতে পারেন তিনি। তাঁহার মৃত্যু রাজনৈতিক কারণেই প্রয়োজনীয়। আমি একজন

আইনবিদ, পরলোকতাত্ত্বিক এবং রাজনীতিক। আমি স্টলওয়ার্টদের স্টলওয়ার্ট। গত নির্বাচনের সময় অন্যান্য বন্ধুসহ নিউইয়র্কে জেনারেল গ্র্যান্টের সঙ্গে নির্বাচনী কার্য করিয়াছি। আমি জেলে যাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া আপনার সৈন্যবাহিনীকে জেলের দখল নেওয়ার আদেশ জারী করুন।

চার্লস গুইটু

চিঠি দুটো সঙ্গে নিয়ে গুইটু শেষবারের মতন তার বাসস্থল রিগস হাউসের সেই ঘর থেকে বেরোলো। তার পাওনাদারের বিলগুলো অপরিশোধিতই পড়ে রইল তার ঘরে। সঙ্গে বিশেষ কিছু ছিল না তার। শুধু একটা ছোট্ট বইয়ের পার্শেল ছিল। তাতে 'দি ট্রুথ' নামে একটা ধর্মগ্রন্থ এবং তার নিজের কিছু লেখা ছিল। প্যান্টের পেছন পকেটে সেই হিংস্র 'ক্যালফোর্নিয়ান বুল ডোজার' রিভলভারটিকে লুকোলো গুইটু। তখনও স্টেশনে প্রেসিডেন্ট আসার অন্তত এক ঘণ্টা দেরী ছিল। লাফায়েৎ স্কোয়ার পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে খানিকটা সময় কাটাল। তারপর একটা গাড়ি নিয়ে পটোম্যাক ডিপোর দিকে রওনা হল। স্টেশনে নেমে প্রথমেই জনতার রুদ্ররোষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করল গুইটু। একটা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানকে দু ডলার দিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে বলল। গাড়োয়ানটি গন্তব্যস্থল জানতে চাইলে গুইটু তাকে জেলখানার কথা বলেছিল। গাড়ি ঠিক করে গুইটু একটা বইয়ের স্টলে গিয়ে হাতের পার্শেলটা কিছুক্ষণের জন্যে রাখতে দেয় তারপর সোজা চলে যায় পুরুষদের ওয়েটিং রুমে। ওয়েটিং রুমে গিয়ে রিভলভারটা পরীক্ষা করল একবার। না, সব ঠিক আছে, রিভলভারের ঠাণ্ডা নল অঙ্গুলিহেলনে যে কোনো সময় গরম হয়ে উঠবে। মৃত্যুর উৎস শীতল থেকে উষ্ণ হবে এবং মৃত্যুর লক্ষ্য উষ্ণ থেকে শীতল, ক্রমশঃ শীতল হয়ে যাবে। গুইটু আস্তে আস্তে গিয়ে মেয়েদের ওয়েটিং রুমে ঢুকল। মেয়েদের ওয়েটিং রুমটা পটোম্যাক ডিপোতে প্ল্যাটফরমে যাবার রাস্তা হিসেবেই তখন ব্যবহৃত হত। মূল ওয়েটিং রুম থেকে প্ল্যাটফরমে যেতে গেলে এই ঘরটার মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। প্রেসিডেন্টকেও তাই যেতে হবে। ঘাড় ধরে দাঁড়িয়ে রইল গুইটু ঘরটায়। তখন প্রায় নটা পনেরো। প্রেসিডেন্টের আসার সময় যত নিকটবর্তী হয়ে আসে গুইটু উত্তেজনায় ততই অস্থির হয়ে ওঠে। ঘরটার মধ্যে ছটফট করে পায়চারি করতে থাকে। তার হাবভাবে অনেকের দৃষ্টিই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কর্তব্যরত পুলিশ কনেস্টবল প্যাট্রিক কিয়ারনে, গুইটু স্টেশনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করেছিল। মেয়েদের ওয়েটিং রুমের পরিচারিকা মিসেস হোয়াইট কালো স্যুট পরা, ছুঁচালো দাড়িওয়ালা লোকটিকে প্রথম থেকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন গত সপ্তাহেও তিনি লোকটাকে সন্দেহজনকভাবে স্টেশনের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন। লোকটা সম্বন্ধে স্টেশনের পাহারাদার মিঃ স্কটকে কিছু বলবেন মনে হয়েছিল একবার, কিন্তু প্রেসিডেন্টের আগমনে গুইটুর কথা একেবারে ভুলে যান।

প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড মহিলাদের ওয়েটিং রুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কনেস্টবল কিয়ারনেকে ট্রেন ছাড়তে আর কত দেরী আছে জিজ্ঞেস করলেন। কিয়ারনে অভিবাদন করে জানালো যে ট্রেন ছাড়ার তখনও দশ মিনিট বাকী। প্রেসিডেন্ট তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্লেইনের সঙ্গে একেবারে গুইটুর গা ঘেঁষেই ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। গুইটু দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ব্লেইন একটা বেঞ্চিকে পাশ কাটিয়ে প্রেসিডেন্টের আগে গেলেন। প্রেসিডেন্ট গারফিল্ডও তাঁর পেছন পেছন দশ ফুট গেছেন কি না গেছেন, সংহার মূর্তি গুইটু দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে এল। প্যান্টের পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটা বার করে প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। পেছন থেকে গুলি করবার সময় বাঁ-দিকে সরে গিয়েছিল গুইটু। প্রেসিডেন্টের পিঠে গুলিটা লাগে, কিন্তু প্রথমটা তিনি বুঝতেই পারেন নি যে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুলির শব্দে অল্প একটু ঘুরে দাঁড়ালেন। গুইটু এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আবার গুলি করল। প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড দু-হাত ওপরের দিকে তুলে করুণ আর্তনাদ করে ঘুরে গিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন; তাঁর সুন্দর সিল্ক হ্যাটটি তাঁর তলায় পড়ে দুমড়ে গেল। সেক্রেটারী ব্লেইন আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন 'ভগবান! এ খুন! কি মানে হয় এসবের!'

গুইটু যখন প্রথম গুলিটা ছোঁড়ে কনেস্টবল কিয়ারনে তার দিকে পেছন ফিরে ছিল। গুলির শব্দে সে প্রথমটা ভেবেছিল বুঝি কোনো ছেলে প্রেসিডেন্টের সম্মানে পটকা ফাটিয়েছে। পেছন ফিরেই সে গুইটুকে রিভলভার হাতে দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়তে উদ্যত দেখল। আততায়ীর কাছে পৌঁছবার আগেই দ্বিতীয় গুলি ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। গুলি করেই গুইটু কিয়ারনের সামনে দিয়ে বেগে দরজার দিকে এগুলো। সেই ঠিক করে রাখা গাড়িতেই ফিরতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু কিয়ারনে চীৎকার করতে করতে তার পেছন পেছন দৌড়তে আরম্ভ করল।

—ঈশ্বরের দোহাই: প্রেসিডেন্টকে তুমি গুলি করলে কেন?

গুলি ছোঁড়ার শব্দেই টিকিট এজেন্ট মিঃ পার্কস উচ্চকিত হয়েছিলেন। কিয়ারনের আগে আগে গুইটুকে ছুটতে দেখে ছুটে গিয়ে তার বাঁ হাত এবং কাঁধটা ধরে থামালেন। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনের পাহারাদার স্কট এবং কিয়ারনে এসে জাপটে ধরল গুইটুকে। মুক্তি পাবার জন্যে আপ্রাণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করল গুইটু, অবশেষে হাল ছেড়ে দিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল,

—ঠিক আছে, গোলমাল করো না। আমি জেলে যেতে চাই। এখন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট হবেন আর্থার। আমি স্টলওয়ার্টদের স্টলওয়ার্ট!

যখন তাকে তিনজনে মিলে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, গুইটু বিড়বিড় করে বলল কিয়ারনেকে,

—তুমি আমার কাছাকাছি থাক। আমাকে জেলের সামনের তিনতলায় রাখবার ব্যবস্থা করবে। জেনারেল শেরম্যান এসে জেলের ভার গ্রহণ করবেন। ওরা সকলে আমার লোক। আমি তোমাকে পুলিশের সর্বাধ্যক্ষ করে দেব।

পরিচারিকা মিসেস হোয়াইট প্রেসিডেন্ট এবং ব্লেইনের আগমন এবং গুইটুর আক্রমণ সবই পাথর হয়ে দেখছিলেন। প্রেসিডেন্টকে পড়ে যেতে দেখে তিনি প্রথম ছুটে এলেন পরিচর্যার জন্যে শায়িত প্রেসিডেন্টের পাশে। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁকে একা একা পরিচর্যা করতে হয়নি। চার মিনিটের মধ্যেই ডিস্ট্রিক্ট হেলথ্-অফিসার ডাক্তার টাউনসেন্ড এলেন। গারফিল্ডের ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল না তেমন। ডাঃ টাউনসেন্ড নাড়ীর অতি ক্ষীণ গতি দেখে ভেবেছিলেন, ঘটনাস্থলেই মারা যাবেন তিনি। প্রেসিডেন্টের চারপাশে ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছিল। ভিড় বাড়ার ফলে হাওয়া চলাচলের অসুবিধা হবে বিবেচনা করে ডাঃ টাউনসেন্ড পুলিশ ডেকে ভিড় সরিয়ে দিতে বললেন।

এদিকের সর্বনাশের খবর কিন্তু প্ল্যাটফর্মে গল্পরত রাজকর্মচারীরা তখন পর্যন্ত কেউই পান নি। কামরার মধ্যে বসে মহিলারা সমানে গল্পগুজবে মত্ত ছিলেন। অর্থদপ্তর এবং নৌ-দপ্তরের সেক্রেটারী উইন্ডাম এবং হান্ট চুরোট মুখে পায়চারি করতে করতে গল্প করছিলেন। পোস্টমাস্টার জেনারেল জেমস্ আলাপ করছিলেন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। হঠাৎ এমন সময় বিশৃংখল ভঙ্গীতে জনৈক যুবক প্ল্যাটফর্ম দিয়ে দৌড়ে পোস্টমাস্টার জেনারেলের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রেসিডেন্টকে গুলি করার সংবাদ দিল।

—কি? এ ধরনের রসিকতা করার কোনো মানে হয় না।

—আমি বলছি, ব্যাপারটা সত্যি ঘটেছে।

সেক্রেটারী হান্ট কাছেই ছিলেন। তিনি ওদের কথোপকথন শুনেছিলেন। স্তম্ভিত হয়ে বলে উঠলেন,

—প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড আক্রান্ত? অসম্ভব!

সকলেই ওয়েটিং রুমের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন।

প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়লেও জ্ঞান হারান নি। হাতটা তুলে ক্ষতস্থানটা অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলেন একবার। কিন্তু অত্যধিক দুর্বলতার জন্যে পারলেন না হাত তুলতে। যতক্ষণ না অ্যাম্বুলেন্স এসে তাঁকে হোয়াইট হাউসে নিয়ে যায়, ততক্ষণ ভিড় এড়াবার জন্যে প্রেসিডেন্টকে ওপরতলায় নিয়ে যাওয়া হল। ওপরতলায় ডাঃ টাউনসেন্ড ভাল করে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করলেন। প্রথম গুলিটা লাগেই নি শরীরে। ডাঃ টাউনসেন্ড প্রেসিডেন্টকে তিনি কেমন বোধ করছেন জিজ্ঞেস করলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর ডান পায়ে অসহ্য ব্যথার কথা জানালেন। তারপর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে দুর্বলকণ্ঠে ক্ষতস্থানের বিষয় প্রশ্ন করেছিলেন গারফিল্ড। যথারীতি সান্ত্বনার ভঙ্গীতে জবাব দিলেন ডাঃ টাউনসেন্ড। জানালেন, এমন কিছু হয়নি।

—ধন্যবাদ ডাক্তার! কিন্তু আমি এখন মৃত লোক!

হোয়াইট হাউসে যখন নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রেসিডেন্টকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল, বিশেষ জ্ঞান ছিল না তাঁর।

১৮৮১ সালের ২রা জুলাই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর এই এগারো সপ্তাহ মৃত্যুর সঙ্গে অতুলনীয় যুদ্ধ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড। কখনও কখনও তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক বুলেটিন পড়ে দেশবাসী উদ্দীপ্ত হয়, কখনও কখনও তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির খবরে আমেরিকা শোকাচ্ছন্ন হয়ে আসে। অত্যধিক দুর্বলতার জন্যে তাঁর শরীর থেকে বুলেট বার করতে সাহস হয়নি চিকিৎসকবৃন্দের। হোয়াইট হাউসে তাঁর জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত ঘরে আগস্ট মাস পর্যন্ত শায়িত ছিলেন গারফিল্ড। ওয়াশিংটনে বেশী গরম পড়ায় চিকিৎসকরা ২৩৮ মাইল দূরে সমুদ্রতীরবর্তী এলবেরন শহরে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্টকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ট্রেনে ওঠানো হল। এলবেরন যাত্রাপথের প্রতিটি স্টেশনে জনতা তাদের প্রিয় প্রেসিডেন্টকে টুপি নেড়ে নীরবে অভিবাদন করল। নতুন জায়গায় এসে প্রথম চার দিন ভালই ছিলেন গারফিল্ড। বিছানাতে উঠে বসে প্রথম সমুদ্র দেখতে পেরেছিলেন।

কিন্তু সমুদ্রের স্বাদ ভালো করে মিটতে না মিটতেই ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে দশটায় প্রেসিডেন্ট জেমস্ আব্রাম গারফিল্ড অন্ধকার, অজানা, আরেক সমুদ্রের দিকে যাত্রা করলেন।

চার্লস জুলিয়াস গুইটুর 'রাজনৈতিক প্রয়োজনে' এগারো সপ্তাহের দোলাচলের পর সাঙ্গ হল। জেলখানায় গুইটু সম্বন্ধে নতুন তথ্য জানা গিয়েছিল। গুইটুর ভাই জন জানাল যে, গুইটুকে চিরকাল অপ্রকৃতিস্থই ভেবে এসেছে সে। তার ধারণা, গুইটুর শেষ গতি ছিল মানসিক চিকিৎসালয়। গুইটুর ভগ্নীপতি জানালেন যে, গুইটু একবার তার বোনকে হত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিল এবং অনেকবার ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা করেছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল সুরক্ষিত জেলে থেকেও গুইটু নিজে একবার বুলেট বিদ্ধ করে মরতে বসেছিল। আরেকটু হলে ওকেও প্রেসিডেন্ট কেনেডীর হত্যাকারী অসওয়াল্ডের মতই শরীরে বুলেট নিয়ে পরপারে চলে যেতে হত।

ঘটনাটা ঘটে প্রেসিডেন্ট গারফিল্ডের মৃত্যুর কিছুদিন আগে। জেলে গুইটু ছিল সকলের ঘৃণার পাত্র। জেলের বাইরের সামরিক রক্ষীবাহিনীর সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে স্থির করেছিল যে, সেলের জানালায় গুইটুকে দেখা গেলেই গুলি করবে। গুইটুকে গুলি করে মারবার সম্মান কে পাবে তারা স্থির করেছিল লটারী করে। মেসন নামক জনৈক সৈনিক গুলি ছোঁড়ার অধিকার পায়। ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যেবেলায় গুইটুর মুখ সেলের জানালায় দেখামাত্রই গুলি চালায় সে। খুব অল্পের জন্যে গুইটুর মাথার ওপর দিয়ে গুলি চলে যায়। কারারক্ষী ছুটতে ছুটতে বন্দীর সেলের ভেতর ঢুকে দেখে, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁপছে গুইটু।

—কি করতে চায় ওরা? ওরা কি আমাকে খুন করতে চায়?

নিজে খুন করলেও, খুন হতে আশ্চর্য ভয় করছিল তার। অথচ মরতে শেষ পর্যন্ত ভয় পায়নি গুইটু। ১৮৮২ সালের ৩০শে জুনে অকাতরে ফাঁসির দড়িতে তার নির্ভীক মাথাটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট গারফিল্ডের মতন গুইটুকেও তার বন্দীশালায় ঠিক এগারো সপ্তাহ জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কাটাতে হয়েছিল—এটাও আরেক আশ্চর্য।

এলো যে শীতের বেলা

মাধবী সেন

প্রায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শীত এলো। একটি দুটি করে কৃষ্ণচূড়ার পাতা খসতে শুরু হয়েছে। সকালের রোদে এখন সোনালী রঙের আভা রোদে পিঠ পেতে প্রভাতী চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ দেখতে মন্দ লাগে না। দ্বিপ্রহরে পথে পথে ঘোরা আর কষ্টসাধ্য নয়। গোলাপ আর মরশুমী ফুলের সঙ্গে সঙ্গে শীতের আমোদ-প্রমোদ, পিকনিক, প্রদর্শনী আর ক্রিকেটের মরশুমও এসে গেল। গরমের দেশে এই দুটো মাসই শারীরিক স্বস্তিতে কাটানো যায়। তাছাড়া কপি কড়াইশুটি ইত্যাদির শুভাগমনে খাওয়া-দাওয়াও মন্দ হয় না।

শীতের দেশে এখন বরফ পড়ার সময়। সেখানে ঠান্ডার দাপটে জলের পাইপ ফাটে, ঘরে আগুন জ্বালতে হয়, বিছানায় গরম জলের ব্যাগ না নিয়ে শোয়া যায় না; পথে বেরোতে হলে আপাদমস্তক গরম পোশাকে ঢাকতে হয়। তীব্র ঠান্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নানান শীতবস্ত্রের প্রয়োজন। তার কিছু কিছু আমরাও আজ সভ্যতার চাপে পড়ে গ্রহণ করেছি। পুরুষের পোশাক ত আজ পুরোপুরিই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। ফ্লানেলের প্যান্ট, সার্জের কোট, উলের সোয়েটার পথেঘাটে দেখতে পাওয়া যাবে। আগের যুগের মানুষ ধুতির সঙ্গে শাল আলোয়ান এবং কিছুকাল পরে কোট পরত। সেদিনের তুলোর জামা আর বালাপোষ এখন গ্রামে বা মফস্বলেও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। সেদিনের পায়ে ছিল মোজা আর ডার্বি। এখন ধুতির সঙ্গে মোজা, বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া, কারো পায়ে বড় একটা দেখা যায় না। জহর কোটের চল বেশ কিছুদিন হল হয়েছে। তবে গরম সুটের ভক্তের সংখ্যাই ক্রমবর্ধমান।

কিন্তু মেয়েরা এ ব্যাপারে অনেক রক্ষণশীল। শাড়ি তাঁরা বাদ দেননি, দেবেনও না; আর কেনই বা দেবেন? 'এমন বেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।' জনৈকা বিদেশিনী বলেছিলেন—শাড়ীর সুবিধে হল যতটুকু ইচ্ছে আবরণ বা নিরাবরণের কাজে তাকে লাগানো যায়। এদিকে-ওদিকে দুটি-একটি কুঁচি, সামান্য একটু টান-টোন, এই দিয়েই পাকা আর্টিস্টের হাতে শাড়ী ভোজবাজির কাজ করে। সেকালের সঙ্গে একালের তফাৎ যা, তা হল শাড়ী পরার ধরনের সামান্য একটু হেরফের। তবে সেই 'সামান্য একটু'তেই আজকের রমণীরা অসামান্য রমণীয়ত্বের দাবী করতে পারেন। পরিবর্তন যা হয়েছে তা কেবল ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাকের ছাঁটকাটে। শীতবস্ত্রের অভিনবত্বে; তেমনি আজ দেখা যায় সাবেকী শালের হাল আমলের ভাঁজ, কিম্বা নতুন নকশার কার্ডিগান, কাশ্মীরি কল্কার কেপ, আর হাতে-বোনা স্কার্ফে। শীতের দিনেও এদেশের মেয়েদের পোশাক নয়নশোভন।

ফটো : অমৃত

এলো যে শীতের বেলা

তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধনির্ণয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্বে প্রকাশিতের পর) —

এই বক্তৃতামালার প্রথম পর্বের আলোচনায় তথ্য ও তত্ত্ব ধোঁয়ার মত হতে হতে রসচর্চায় যখন এসে ঠেকে, তখন সত্য নামে এক তৃতীয় পদার্থ বাক্য-অঙ্গনে এসে হাজির হয়। তথ্য ও সত্য এবং তার সঙ্গে রস নামে পদার্থটি এসে জোটাতে বিষয়টা খুবই ঘোরালো হয়ে ওঠে। এবার একটু শক্ত জমির উপর খাড়া হবার চেষ্টা করা যাক্—যাকে বলে টেরাফার্মা। এখন আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধনির্ণয়ের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হব।

কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য জানতে গেলেই তার জন্মগত বুনিয়াদের দিকে আমাদের চোখ যায়।

বাংলাদেশের পিরালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঠাকুর পরিবারের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। পিরালী সমাজের ইতিহাস শ্রোতাদের কাছে অবিদিত নয় বলেই ধরে নিচ্ছি। কারণ এমন (brilliant galaxy of stalwarts in every walk of life) সমাজ-জীবনের বিচিত্র প্রকোষ্ঠকে উজ্জ্বল করা এমন পরিবার আর চোখে পড়ে না। জোড়াসাঁকোর নীলমণি ঠাকুরের ও পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশধররা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা বড় পরিচ্ছেদ জুড়ে আছেন—যার কথা এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে রচিত হয় নি। ঠাকুর পরিবারের দীপ নিভে গেছে—কিন্তু তাঁদের কথা শোনবার মতো ও শোনাবার মতো কান পেতে থাকলাম শোনবার জন্য—যদি কোনো ধীমান এঁদের সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রোত্তর পরিবেশ সুপরিচিত—কিন্তু প্রাক্-রবীন্দ্রপর্বের অর্থাৎ তাঁর বুনিয়াদটার গভীরতা ও ব্যাপকতা ও পরিবেশের আশ-পাশটার উপর চোখ বোলানোর দরকার আছে।

জোড়াসাঁকোর পরিবারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল—অর্থাৎ দেশের নানাযুগের নানা তপ্ত হাওয়ার মধ্যে এঁরা চিরদিনই মধ্যপথ ধরে চলেছিলেন। বিষয়টাকে খোলসা করে বলা যাক্।

উনবিংশ শতকের তিন দশকে বাংলা দেশে তিনটি প্রবল স্রোত দেখা দিয়েছিল; একটা ডিরোজিও প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌দের য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে আমদানি করা নাস্তিক্য বুদ্ধি, দ্বিতীয়টি বৃটেন থেকে আগত আলেকজান্ডার ডাফ প্রমুখ পাদরীদের য়ুরোপীয় খৃষ্টানী বা খৃষ্টবাদ। এই সবের উল্টোপথে চলেছে—অর্থাৎ সমস্ত প্রগতিকে বাধা দিবার জন্য জেগেছে হিন্দুধর্ম সমাজ—তার পুঞ্জীভূত মূঢ়তাকে আঁকড়ে থাকবার জন্য। পশ্চিমের তথ্যকে নেবে—তার আরাম-আয়েসের সরঞ্জাম তার ছাপাখানা, খবরের কাগজ সবই চাই, কিন্তু পাশ্চাত্যতত্ত্ব বা তাদের প্রগতিবাদকে বাধা দিতে হবে। এই তিনটির বাইরে দাঁড়িয়েছেন রামমোহন রায় প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের টেনে-ধরা লাগামকে শিথিল করছেন, উগ্রপন্থী নবীনদের বাঁধনছেঁড়া ভাঙনবাদকে শমিত করছেন, খৃষ্টান পাদরীদের হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করতে দেখে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মকে বুঝবার চেষ্টা করো; ব্রাহ্মসমাজ গড়ো—ব্রহ্ম বা বৃহৎ-ভূমা যা সকলকে বিধৃত করে আছে—সেই ব্রহ্মকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ো।

ঠাকুর বংশের দুটো শাখা—পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো। সমকালীন বিচিত্রের প্রভাব উভয়কে স্পর্শ করেছিল; কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় ভিন্নরূপ ফুটে ওঠে। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের যুবকদের মধ্যে বিচিত্র মতবাদ দেখা যায়—খৃষ্ট-ধর্মতত্ত্ব, নাস্তিক্যবাদ, প্রতিক্রিয়াপন্থী হিন্দুত্ব; পাশ্চাত্য অনুকরণে গৃহশোভা, রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ প্রভৃতি সবই এসেছিল—কিন্তু রামমোহন রায়ের বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মের প্রভাব এখানে দেখা যায় না। এই বংশের দৌহিত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের যৌবনে নাস্তিক্যবাদ সে-যুগের সুপরিচিত ঘটনা। খৃষ্টীয় ধর্ম প্রশ্রয় পেয়েছিল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের জীবনে, শুধু সেখানেই নয়। অন্তঃপুরে জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রথমা পত্নী বালাসুন্দরী খৃষ্টকে জীবনের প্রভু বলে মেনে নিয়েছিলেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের রামমোহন রায়ের মনস্বিতার স্পর্শ লেগেছিল দ্বারকানাথকে—দেবেন্দ্রনাথকে তাঁর ধর্মমত আকর্ষণ করেছিল, আর রবীন্দ্রনাথের জীবনে রামমোহন হয়েছিলেন তাঁর 'আদর্শ মানুষ'। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সাহিত্যমথিত ধর্ম ও দর্শনচর্চার সময়ে এই তথ্যকে মনের সামনে বড় করে রাখতে হবেই। তাঁর তত্ত্বকথার উৎস এখানে সন্ধান করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ রামমোহনের গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন—ধর্মে-কর্মে পুরাতনপন্থী হয়েও তিনি আধুনিকতাকে নিজ জীবনে মেনে নিয়েছিলেন। আমার রবীন্দ্রজীবনী প্রথম সংস্করণ বের হলে কবি সেটা পড়েছিলেন এবং কোনো সাহিত্যিক ঐ বই সম্বন্ধে কবির মতামত জানতে চাইলে, তিনি নাকি অসহায়ভাবে খেদোক্তি করে বলেছিলেন—ওটা রবীন্দ্রনাথের জীবনী হয়নি, ওটা দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের জীবনী। রবীন্দ্রনাথ কিভাব থেকে কথাটি বলেছিলেন এবং কিভাবে সাহিত্যিক তা' গ্রহণ করেছিলেন, তা আমার জানা নেই। আমরা বলবো কবি সহস্রবার অস্বীকার করলেও তিনি দ্বারকানাথের পৌত্ররূপে পিতামহের বহু গুণাগুণের অধিকারী হয়েছিলেন। কেবল যে পিতামহের ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়ায় জীবিকা অর্জনের তাড়নায় ঘুরে বেড়াতে হয়নি—তা নয়, তাঁর স্বভাবের অনেক কিছুই রক্ত-ধারায় বয়ে তাঁতে এসে বর্তায়। এটা তথ্য হিসাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দ্বারকানাথের দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী জীবনী এখন বাংলায় অনূদিত হয়েছে বলে অনেকেই সেটা পড়তে পারবেন। তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে এ-কথা আমরা জোর গলায় বলতে পারি—যদি অকালে বিদেশে তাঁর মৃত্যু না হ'তো, তবে তিনি একদিন বাংলা প্রেসিডেন্সীর finance বা কারবারী লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। তাঁর বিষয়বুদ্ধি ছিল তুলনাহীন।

দ্বারকানাথের দেশভ্রমণের নেশা, সৌন্দর্যপ্রিয়তার কথা সুপরিচিত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে লোকজন নিয়ে নৌকা করে অথবা ষ্টীমারে বের হয়ে পড়তেন। দুইবার বিলাত যান; পথে দেখার মতো অনেক কিছুই দেখে যেতেন। দ্বারকানাথ নেপলসে নেমে ভিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরির চূড়ায় উঠে এলেন, আয়র্লান্ডে গেলেন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দেখতে। এ-ছাড়া ইংলণ্ডের শিল্পকেন্দ্রগুলি, কয়লার খাদসমূহ দেখলেন, কারণ রাণীগঞ্জের কয়লাখানি কিনেছেন তিনি; কি করে তার উন্নতি করতে পারেন, তাই ভাবছেন।

দেবেন্দ্রনাথের ভ্রমণনেশা কিছু কম ছিল না, তাঁর আত্মজীবনীর পাঠকদের কাছে তা অবিদিত নয়। পরবর্তী জীবনেও তিনি কম ঘোরেন নি। অবশ্য বার্ধক্যকালে সেটাতে যবনিকা পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে পিতা-পিতামহের ভ্রমণনেশা যেন যুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল—কাজের তাড়ায় যেমন, তেমনি নিছক

সৌন্দর্যসম্ভোগের জন্য খেয়ালখুশি ঘোরা।

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে যান যখন তৃতীয়-বার—তখন দেখেন ইংলন্ডের বিদ্যায়তনগুলি কারণ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের সঙ্গে তখন তিনি যুক্ত। 'পথের সঞ্চয়' বইখানি খুললেই দেখা যাবে শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে প্রবন্ধই বেশী।

দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ দুই স্বভাবের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ এই দুই-জনের গুণাগুণে অনেকগুলিই বংশানুক্রমী বিধান অনুসারে উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। পিতামহের ব্যবসায় বাণিজ্য করার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কুষ্ঠিয়ায় আখমাড়া কলপ্রস্তুত ও তিষি-ভূষি মাল নিয়ে খরিদ-বিক্রীর ইতিহাস তুলনীয়। দ্বারকানাথের অকালমৃত্যুর ফলে ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যাংকিং সব ফেল পড়ে; এবং তার দেনা শুধতে হয় দেবেন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল ধরে। রবীন্দ্রনাথের কুষ্ঠিয়ায় ফেলপড়া ব্যবসার দেনা শুধতে হয়—তারক পালিতের কাছে টাকা ধার করে—যা শোধ করেন ১৯১৭ সালে তখন তারক পালিতের দান সম্পত্তির মালিক হয়েছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আমেরিকায় বক্তৃতা করার জন্য প্রাপ্ত টাকা থেকে সে ঋণ শোধ হয়।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর জমিদারীতে প্রজার কল্যাণার্থে পতিসর কৃষিব্যাংক করেছিলেন। তাতে নোবেল প্রাইজের লক্ষাধিক টাকা জমা দেন। কিন্তু কালে সে ব্যাংকও পিতামহের ব্যাংকিং কারবারের পথ অনুসরণ করেছিল। এই লোকসান পূরণ করবার শক্তি তখন চলে গিয়েছে এই পরিবার থেকে। সেই ক্ষতি-পূরণ করে বিশ্বভারতীর প্রকাশনী বিভাগ, অর্থাৎ কবির বই-বেচা টাকার মুনাফা থেকে সে তহবিল পূরণ করে বিশ্বভারতীর তহবিলে জমা দেওয়া হয়।

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম তা' হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের তথ্য-মূলক উপাদান—তাঁর জীবন-বুনিয়াদ—যে মাটির মধ্যে মহীরূহের শিকড় আছে অদৃশ্য।

শিশু রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন যে পরিবারের মধ্যে তার মানসিক পরি-বেশ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং বলেছেন . বহু স্থানে, বহুবার; এবং যতবার বলেছেন, কল্পনায় পুরাতন কথাগুলি তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। পরিবেশের কথা কবি বাদ দিতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন (১৮৬১) তার আঠারো বৎসর পূর্বে দেবেন্দ্রনাথকে অশেষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়—আর্থিক কৃচ্ছ্রতা তো ছিলই। তার উপর আধ্যাত্মিক সংগ্রাম—বিচারের সঙ্গে আচারের, progress-এর সঙ্গে tradition-এর ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সংস্কারের সংগ্রাম। কেবলমাত্র প্রতিমা-প্রতীক পূজা পরিত্যাগের সংগ্রাম নয়; বেদের অভ্রান্তত্ব তার অপৌরষেয়তা প্রভৃতি অসংখ্য সংস্কার, যা বহু শতাব্দী ধরে হিন্দুর মনকে বেঁধে রেখেছিল শাস্ত্রের বেড়াজালে—তার থেকে মুক্তিলাভ করাটা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন এ-সব স্মৃতির বাইরে। সুতরাং তাঁকে সংস্কারকের সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়নি—তিনি জন্মাবধি ব্রাহ্মধর্মের অপৌত্তলিক উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসের মধ্যেই লালিত পালিত হয়েছিলেন। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথ জীবনভর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের ন্যায় ধর্ম উপদেশ করেছেন—আপনার কবিত্বশক্তির প্রয়োগ করেছিলেন ব্রহ্মসংগীত রচনায়। সুতরাং জীবনী ও রচনা আলোচনাকালে, এই তথ্যটা মনে রাখতে হয়।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ধর্মসংগীত—যা প্রথমে ব্রহ্মসঙ্গীত বলেই লিপিবদ্ধ হতো অধিকাংশই রচিত হয়েছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের চাহিদায় বা ফরমাইশে। এখানে তথ্য হচ্ছে গানের চাহিদা—তত্ত্ব হচ্ছে ব্রহ্ম-সংগীত রচনা। বলা বাহুল্য আদি ব্রাহ্ম সমাজের মত ও বিশ্বাসের অনুকূলে গানগুলি রচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর বিরাট কাব্যসাহিত্যের একটা বৃহৎ অংশ, এই গানের উৎস যে কত বিচিত্র তা কবির জীবনী-পাঠকদের অজানা নয়। ছোট-বেলায় দাস-দাসী, ভিখারী বৈরাগী, দারোয়ান গাড়োয়ান, মাঝি মাল্লার লৌকিক গান থেকে বিষ্ণু চক্রবর্তী ও যদু ভট্টর কালোয়াতি গান সমস্তই বালকের মনে স্তরে স্তরে জমা হয়। বিলাতে বাসকালে য়ুরোপীয় সংগীত শুনেছিলেন বিস্তর, শিখেছিলেনও কয়েকটা, সে সবের ছাপ রয়ে গিয়েছিল মনের উপর। সুরের প্রেরণায় গানের উৎস যায় খুলে, ভাষার অলঙ্কার প'রে তাদের আবির্ভাব। প্রকৃতির শোভায় অথবা মানব-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষায় ভাষা ও সুর যোজনা করে গান রচনা চলে। বাইরের কানে শোনা সুর, বাইরের চোখে দেখা রূপ—সবার অন্তরালে আছে অরূপলোক; 'অন্তরে জাগিছ অন্তর্যামী' গান উৎসারিত হয়, শুনতে পান 'অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে'। কিভাবে টুকরো গানের কথা ও সুর বালকের মনে নূতন রূপ-লোক ও সুরলহরী সৃষ্টি করেছিল—সে পদ্ধতিক্রম জানবার মতো যন্ত্র ও বিদ্যা এখনো মানুষের আয়ত্তে আসেনি। ঘুম থেকে জেগে উঠে মানুষ তার চেতনাকে ফিরে পায় কেমন করে, তার রহস্য যেমন এখনো অনুদ্ঘাটিত, তেমনি বাইরে থেকে পাওয়া রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ কেমন করে, কোন জারকরসে জারিত হয়ে নূতন শক্তি ও নবতর চেতনা সৃষ্টি করে, সেই পরিক্রমার পথ অনাবিষ্কৃত। তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে চলাচলের পথ এখনো কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। একই পরিবেশে তিনটি বালক লালিত হয়েছিলেন কিন্তু একজন হলেন কবি-মনীষী। সুতরাং পরিবেশের পিছনে রয়ে গেছে পূর্ব-জন্মের রহস্য, এ-পূর্বজন্ম কোনো রাহস্যিক কথা নয়—এটা আমি অত্যন্ত বাস্তব অর্থে ব্যবহার করছি। সন্তান-সম্ভাবনার বা জন্মের পূর্বে পিতামাতার সুস্থতা বা দুর্বলতা বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান এখনো পাওয়া যায়নি; সেগুলো জানবার মতো তথ্য যদি পাওয়া যেতো তবে ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণগুলির হদিস জানা যেতেও বা পারতো।

একটা শিশুর প্রাঙ্গনে কত তথ্য জমাট বেঁধে আছে, বংশপরম্পরায় কত ধারা এসেছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের একবৎসর পূর্বেই মহর্ষি হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন; ব্রাহ্ম-সমাজের মন্দিরে এইবার প্রথম তিনি বেদী গ্রহণ করে উপাসন' করলেন—এইসব অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক তথ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্বন্ধ আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমরা পূর্বে বলেছি—রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল সমাজের প্রয়োজনে গান রচেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শমধ্যে লালিত-পালিত এবং মন সেই সাম্প্রদায়িক ভক্তিরসে জারিত বলে গানগুলির রূপ হয় এক ধরণের। নিছক বুদ্ধি-মথিত কথা বা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্প্রদায়গত শব্দ ব্যবহার দ্বারা ভাব প্রকাশ করেছেন বহু গানে। কিন্তু কবির গভীর মননশক্তির তলদেশে যে ধ্যানী মন অবচেতনে অজ্ঞাতে কাজ করে, তাই সুর ও শব্দে রূপায়িত হয়ে ওঠে।

অন্যের ভাবনা বা চিন্তাধারার মধ্যে প্রবেশের শক্তি থাকে বলেই সাহিত্যিকরা তাঁদের নায়কনায়িকার অন্তরের কথা কল্পনাবলে স্পষ্ট করে তুলতে পারেন। নিজেকে বহুলোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে, বহু জীবন যাপন করে লেখকেরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তা পড়ে মানুষ খুশী হয়—মনে ভাবে এইরকম তো আমিও ভাবি। যেসব গান কর্তব্যবোধে রচিত, সেখানেও কবিকে ভক্তশ্রোতাদের অন্তরে প্রবেশ করে কথা বলতে দেখি।

কিন্তু সব গান ফরমাইশে লেখা নয়, কর্তব্যবোধেও রচিত নয়। তাঁর অজস্র প্রেমসঙ্গীত, প্রকৃতির স্তুতি বা ঋতু উৎসবের সঙ্গীত ও কবিতা মনের আনন্দ-উৎস থেকে উৎসারিত। সেখানে তথ্য বা প্রেরণার উৎস মনের অগোচরে তলিয়ে আছে—শুধু গানের তত্ত্ব ও রসই আমাদের কানে ও মনে যাদুমন্ত্র ধ্বনিত করে।

নৈবেদ্যের ঈশ্বর বিচারক didactic or gnomic কবিতা ও গান বুদ্ধি দিয়ে রচিত বলে তাদের আবেদন এক ধরণের, আর জীবনের শোকতাপ, আঘাত, অস্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রসূত স্বতঃস্ফূর্ত রচনার আবেদন অন্য গুণের বা Quality-র।

১৯০৭ সালে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর কবির আধ্যাত্মিক জীবনে যে পরিবর্তন দেখি, সেই তথ্যের দিক থেকে বিচার্য। শান্তিনিকেতনের উপদেশমালার শুরু হয় পুত্রের মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর পরে: এই পর্বেই শুরু হয় গীতাঞ্জলির গানের পালা যার রেশ চলে দীর্ঘকাল। পুরাতন ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও এই সময়ের পর থেকে রচিত গানগুলির মধ্যে গুণ-গত, রূপগত, সুরগত পার্থক্য এতো স্পষ্ট যে তা নিয়ে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ফরমাইশ বা তাগিদ—তা বাইরেরই হোক আর অন্তরেরই হোক—সমস্ত রচনার মূলেই আছে। আমার কিছু কথা আছে—বলবার মতো বা শোনাবার মতো নাও হতে পারে—কিন্তু বক্তার ভিতর একটা তাগিদ আছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধে মোটা-মুটিভাবে ওয়াকিবহাল শ্রোতারা নিশ্চয়ই জানেন, রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার উৎস হচ্ছে তাগিদ। বাল্মীকি-প্রতিভা, কাল-মৃগয়া, মায়ার খেলা প্রভৃতি বহু গীতিময় নাটিকা—এই ফরমাইশের অভিঘাতে জন্ম-গ্রহণ করেছিল। গল্প উপন্যাস লিখেছেন পত্রিকার তাগিদে, কখনো অর্থের প্রয়োজনে। হিতবাদী, সাধনা, ভারতী, প্রবাসী, সবুজপত্র, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকার চাহিদা পূরণ করতে হয়। অর্থের জন্য লিখেছেন ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে—এ তথ্য তাঁর পত্র-মধ্য থেকে আমরা পাই। অসংখ্য তুচ্ছ রচনা, পত্র লিখতে হয়েছে তাগিদে, কর্তব্যবোধে। আপন রচনা সম্পাদনকালে কবি স্বয়ং পুনর্বিচারে বসেছেন ক্রিটিকের ন্যায়। তখন নিজের লেখা নির্মমভাবে ছাঁটকাট করেছেন, কেটেছেন ক্রিটিক, পুনরায় রচেছেন কবি, তার বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। কয়েকটা উদাহরণ দিই। মোহিতচন্দ্র সেন কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন করছেন: নির্বাচিত কবিতার অনেক ছাঁটকাট হলো, তাঁর অনুরোধে কবি 'শিশু'র উপযুক্ত কবিতা পুরাতন রচনা থেকে বাচছেন। বাছতে বাছতে মন কখন চলে গেল শিশুমনোরাজ্যে। বৃদ্ধবয়সে পার্শ্বচরদের অনুরোধ বিবাহের উপযুক্ত কবিতা চয়ন করে 'রাখী' নামে গুচ্ছ তৈরী হলো। এই প্রেমের কবিতা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মন কখন চলে গেল সেই প্রায়-বিস্মৃত প্রেম রহস্য ও রসের মধ্যে; লিখে ফেললেন মহুয়ার কবিতাগুচ্ছে।

তাগিদটা আসছে বাহির থেকে—পার্শ্বচরদের অনুরোধে। কবির ভাষায় বলি, 'তাগিদের পেয়াদাটা বাইরে থেকে হাঁক-ডাক অনুনয়-বিনয় করে। তারপর যে মানুষটা এতক্ষণ দর কষাকষি তর্ক করছিল—ডুব মারলো আপনার মনের কোটরে। আর তাড়া শব্দ নেই, সেখানে সে কবি, শিল্পী, স্রষ্টা—সেখানে সে সম্রাট।'

তাহলে কথাটা দাঁড়ালো এই যে, যে কবি ফরমাইশে পড়ে অনুরোধে উপরোধে, টাকার তাড়ায় সম্পাদকের তাগিদে গল্প, উপন্যাস, এমন কি কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হলেন—তিনি যে মুহূর্তে তাঁর ঝরনা-কলমটি হাতে নিলেন, তখনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল। অন্য মানুষ তখন লেখনীতে ভর করেছে। রবীন্দ্রনাথ মহুয়ার ভূমিকায় যা লিখেছিলেন, তা স্মরণীয়।

'ফরমাশ ব্যাপারটা মোটরগাড়ীর স্টার্টারের মতো। চালনটা শুরু করে দেয়, কিন্তু তারপরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতা-গুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল-ঘোরানো হতেও পারে বাইরের থেকে, কিন্তু সচলতা শুরু হবা মাত্রই লেখবার আনন্দ, সারথি হয়ে বসে।'

এইখানে কবির নিজ লেখা 'সৌন্দর্য-বোধ' প্রবন্ধে কলাবিৎ গুণীদের সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেটা তুলনীয়।

প্রায় ষাট বৎসর ধরে রবীন্দ্রনাথ গান রচেছিলেন, তার সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী। সব গানের রূপ এক নয়, সুর তো নয়ই; ভাবের মধ্যে পুনরুক্তি, সুরের মধ্যে অনুকৃতি থাকা সত্ত্বেও তার বৈচিত্র্য তুলনাহীন। দুর্বল কবিতা আছে, মামুলি শব্দপ্রয়োগ করেও লেখা গান কম নয়, মনোমত সুরের খাতিরে কথা বসিয়ে গানও সকল বয়সেই লিখেছিলেন। কবির নানা বয়সের গানকে তালগোল পাকিয়ে বিচার করা যেতে পারে—তবে তা অবিচারেরই সামিল হবে। যৌবনের রচিত প্রেম-সংগীত—যা সেই উঠতি বয়সেরই উপযুক্ত তা নিয়ে কবিকে বৃদ্ধ বয়সে লজ্জিত করবার অপচেষ্টাও দেখা গিয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে এসব রচনার বিচার করতে হলে তাদের কালানুক্রমিক সাজানো চাই; যে বয়সের যা শোভা পায়—সেটাই স্বাভাবিকভাবে দেখানো উচিত। ব্রহ্ম-সংগীতের বেলায় সেই কথা খাটে, বিশ বৎসর বয়সের ব্রহ্ম-সংগীত তার আশী বৎসর বয়সের জীবন-সংগীতের মধ্যে আসমান-জমীন পার্থক্য গুণগত বৈষম্য। সুতরাং গান, কবিতা বা বিবিধ রচনার উৎস বা প্রেরণার মূল সন্ধান না করে নানা বয়সের নানা রচনার উত্তম উত্তম তিল সঞ্চয় করে তিলোত্তমা অপ্সরা সৃষ্টি করতে পারি, কিন্তু সে তিলোত্তমার মতো অলীক হয়েই থাকবে। আবার অনুরূপ খণ্ড খণ্ড অংশ জোড়া দিয়ে জরাসন্ধ খাড়া করা যেতে পারে কিন্তু তাও এক আছাড়েই টুকরো হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম বিচারকে তথ্য আশ্রয় না করলে—আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

(ক্রমশঃ)

লণ্ডন থেকে বলছি

স্কাবারা সম্মেলনের পর

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

লণ্ডন, ১৪ই অক্টোবর

সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের উপান্তে বিলাস-নগরী ব্রাইটন, ব্ল্যাকপুল ও স্কাবারার খ্যাতি শুধু ভ্রমণকারী ও বিশ্রামলোভীদের পরম আকর্ষণ হিসাবেই নয়। বৃটেনের রাজনৈতিক সম্মেলনের কেন্দ্র হিসাবেও তাদের খ্যাতি অগণ্য পা।

বৃটেনের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল,—রক্ষণশীল, শ্রমিক ও উদারনৈতিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন এই তিনটি স্থানে ঘুরে-ঘুরে অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ব্রাইটনে হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও উদারনৈতিক দলের সম্মেলন এবং স্কাবারায় শ্রমিক দলের ও ব্ল্যাকপুলে উদারনৈতিক দলের সম্মেলন।

সম্মেলনগুলির অনুষ্ঠানের সময় সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভ পর্যন্ত। তখন শীত পড়তে শুরু করে। তাই স্থানগুলিতে ভ্রমণকারীদের ভিড় কমতে শুরু করে। হোটেলগুলিতে সম্মেলনগুলির প্রতিনিধিদের জন্যে স্থানাভাব হয় না। তাছাড়া ঠিক ঐ সময়ই শুরু হয় ঐ সমুদ্র-উপান্তের ভ্রমণ-কেন্দ্রগুলিতে আলোকসজ্জা। এসময় ইউরোপের রাতগুলির আয়ু বাড়তে থাকে। তাই যেন নিদাঘ দিনের ষোল-সতেরো ঘণ্টাব্যাপী দিনের স্মৃতিকে জাগরূক রাখবার জন্যে নগরদীপালীর নয়নাভিরাম আয়োজন।

আমাদের দেশে 'গাঁও মে কংগ্রেস' শুরু হবার পর থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের কোন গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের এবং তারই অনুকরণে অন্যান্য বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বহুবয়ে সেই গ্রামাঞ্চলগুলিতে গড়ে ওঠে কয়েকদিনের জন্যে এক সম্মেলন নগরী। তবু সেই অস্থায়ী নগরী সম্মেলনে আগত হাজার-হাজার কখনো বা কয়েক লক্ষ লোকের আহার ও আশ্রয়ের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তাই সম্মেলন-প্রতিনিধিদের নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর তালেই সময় কেটে যায়। সম্মেলনটা হয়ে ওঠে উপলক্ষ। তাই ক'দিন তাঁবুতে রাত কাটিয়ে একমালী রান্নাঘরের খেয়ে কিম্বা আধ-খেয়ে তাঁরা যখন ফিরে আসেন তাঁরা তখন রুক্ষ-শুষ্ক ও শ্রান্ত-ক্লান্ত। সর্বসমেত সে এক মহা হৈ-হুল্লোড়।

কিন্তু বৃটেনের সম্মেলনগুলো সেই তুলনায় যেন প্রীতি সম্মেলন। সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বৃহৎ সুদৃশ্য হলে। শুরু হচ্ছে ঘড়ি ধরে নির্ধারিত

স্কাবারা সম্মেলনে আর্ল এটিলীর সঙ্গে আলোচনারত মিঃ উইলসন।

সময়ে। চা-লাঞ্চ ও চায়ের সময় সম্মেলন মুলতুবী হচ্ছে। চায়ের আয়োজন সম্মেলন-স্থানেই। লাঞ্চের সময় প্রতিনিধিরা নিজ নিজ হোটেলে ফিরে যাচ্ছেন আবার তৃপ্ত ও তাজা হয়ে ফিরে আসছেন।

রাতে ডিনারের পর বলনাচ ও নানা প্রমোদের আয়োজন। কিন্তু তারই মধ্যে ছোট-খাটো নানা সঙ্ঘ-সমিতি ছোট-ছোট আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করে রেখেছে। ট্রটস্কীপন্থী, স্ট্যালিনপন্থী, শান্তিবাদী, আণবিক অস্ত্র-বিরোধী, নৈরাজ্যবাদী প্রভৃতি নানা ছোট-খাটো উপদল তাদের ইস্তাহার বিক্রী করছে, চাঁদা তুলছে, জোট বেঁধে তর্ক করছে, দুয়ো দিচ্ছে।

স্কাবারা সম্মেলনে ঐক্যের প্রতীক। প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী হেরল্ড উইলসন ও উপনেতা জর্জ ব্রাউন অনুগামীদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন।

পালাবদল

গত দশ-বারো বছর ধরে আদর্শবাদের বাঞ্ছিত বিতর্কে, নেতৃত্ব নিয়ে অবাঞ্ছিত কোঁদলে, জাতির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার

মিঃ বাটলার এবং লর্ড হিউম।

মধ্যে যুগ-অপরিবর্তিত দলের কর্মপন্থা, নিয়মতন্ত্র ও কৌশলের অসামঞ্জস্য নিয়ে বৃটিশ লেবার পার্টির বা শ্রমিক দলের অবস্থা ছিল অনেকটা যেন লেজে জ্বলন্ত ফুলঝুরি বাঁধা কুকুরের মত। অগ্রভাগ হিস্রে জ্বলাতে পশ্চাৎ ভাগের বাক্য-স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণের প্রতি ঘেউ ঘেউ করছে।

সেই তুলনায় রক্ষণশীল বা টোরীদের সম্মেলন ছিল একটি প্রকৃত প্রীতি অনুষ্ঠান। সেখানে শাণিত বিতর্কের অগ্নি-দ্বন্দ্ব নেই। চীৎকার-ধিক্কারে বার বার সম্মেলনকক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে না।

শ্রমিক দলের সম্মেলনে দলের নেতা ও উপনেতারা পুরোদস্তুর গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে দলের সাধারণ প্রতিনিধিদের সম্মুখীন হন। আলোচ্য প্রস্তাবগুলি কয়েক মাস আগে পুস্তিকাকারে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে বিলি হয়ে তার ওপর প্রত্যেকটি ছোট-বড় কেন্দ্রে আলোচিত ও বিতর্কিত হয়। প্রতিনিধিরা যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছেন প্রায়-প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের নির্দেশ নিয়ে এসেছেন। নেতারা সম্মেলনে যান সবার আগে, ফেরেন সবার শেষে। প্রায় সর্বক্ষণ তাঁরা মঞ্চে বসে নিজ নিজ মত ও কাজের সমর্থন কিম্বা সমালোচনা শোনেন কিম্বা উত্তর দেন।

কিন্তু টোরীদের নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব নেতৃত্বের। সম্মেলনের কাজ শুধু দলের মনোভাব নেতৃত্বকে জানানো। নেতৃত্ব দলীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্যও নন। তাছাড়া টোরী অনুগামীদের কাছে বড় কথা, কে চালাবেন;—কেমন করে চালাবেন তা নয়। —এমন কি দলের প্রধান নেতা সম্মেলনে উপস্থিত পর্যন্ত থাকেন না। শুধু সম্মেলন সমাপ্তির দিন তিনি একটি সাধারণ সমাবেশে বক্তৃতা করেন। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে তিনি আবির্ভূত হন ও প্রবল করতালধ্বনির মধ্যে অন্তর্হিত হন। বস্তুতপক্ষে সুপ্রীম সোভিয়েটের বৈঠকের মতই টোরী সম্মেলনে তাঁর কোন বিরোধিতা কিম্বা প্রাণবন্ত কোন বিতর্ক কেউ আশা করে না।

তাই লর্ড-লেডি, উজির-নাজিরদের নিয়ে নানা খোশগল্প কিম্বা তাঁদের স্ত্রীদের সাজসজ্জা, বিশেষ করে টুপির রকমারিত্বই সম্মেলনের প্রধানতম গল্প ও স্মৃতি।

কিন্তু হায়! কালের গতি কি বিচিত্র! —এবার স্কারবারায় হেরল্ড উইলসনের নেতৃত্বে শ্রমিক দল প্রায় অভূতপূর্ব ঐক্যের মহড়া দেখালো। বৃটেনকে বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সম্মেলন শেষ হলো! সমগ্র সম্মেলনটাই যেন আগামী নির্বাচনে নিশ্চিত জয়ের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে শেষ হলো। কে বলবে এই সেই দল যারা এর পূর্ববর্তী ঠিক দুটি নির্বাচনের আগে ১৯৫৪ ও '৫৮ সালে এই স্কারবারাতেই মিলিত হয় এবং তারপর নির্বাচনে পরাস্ত হয়।

স্কারবারা সম্মেলনের ঠিক দু'দিন আগে ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতের বিদায়ী হাইকমিশনার মহম্মদ করিম চাগলার একটি বিদায় সম্বর্ধনায় শ্রমিক দলের নেতা হেরল্ড উইলসনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্কারবরা সম্মেলনের প্রসঙ্গ উঠতেই হেসে বলে ওঠেন, 'এবার সাংবাদিকদের পক্ষে ঐ সম্মেলনের কোন

প্রাচীন মিশরী রাজকুমারী জেফের টিটির অনুকরণে (ডান দিকের ছবি) টোরী সম্মেলনের সভানেত্রী টি সি আর লেফার্ড (বাঁ দিকে) মাথায় টুপি পরিধান করেন।

আকর্ষণ নেই।'—অর্থাৎ তাতে কোন বিরোধ ও বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। তিনি ঠিক বলেছিলেন।

কিন্তু টোরী সম্মেলন ছিল ঠিক তার উল্টো। মুহুর্মুহুঃ নাটকীয় পরিবর্তনে, এখানে-ওখানে-সেখানে গোপন বৈঠক ও চক্রান্তের খবরে সে-এক প্রায় বেসামাল অবস্থা।

১৯৫৯ সালের 'নির্বাচনী ফল্যাও'-এর পর থেকেই টোরী সরকারের প্রাণবেগ স্তিমিত হয়ে আসছিল, আর লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ছিল। সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার বেপরোয়া চেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলন বৃটেনের দ্বীপমণ্ডুকতা ত্যাগের নামে ইউরোপের সাধারণ বাজারে যাবার সংকল্প ঘোষণা করলেন। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। অথচ টোরীরা সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে, কোন বিকল্প পথ গ্রহণ করবে তা স্থির করে রাখেনি। তাই সেই আশাভঙ্গ ও ব্যর্থতার পর তাদের অধঃপতন দ্রুততর হলো।

নির্দিষ্ট নীতির অভাবে মন্ত্রিসভায় মতান্তর ও মনান্তর দেখা দিল। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে মিঃ ম্যাকমিলন নির্দয়ভাবে মন্ত্রিসভা ছাঁটাই ও বদল করলেন। প্রধানমন্ত্রীর দলের মধ্যে বিরোধিতা বর্ধিষ্ণু ও প্রকাশ্য হয়ে পড়লো। এরপর এলো সংহারিণী কীলারকে নিয়ে কেলেঙ্কারীর ঢল।

যে প্রধানমন্ত্রী শান্তির সময়ে ডিসরেলীর পরেই শ্রেষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইতিহাসে স্থান পেতে স্বপ্ন দেখতেন, তিনিই এক লজ্জাকর, মজারজনক পরিস্থিতিতে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে নাজেহাল হলেন।

তবু তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে টিঁকে থাকার আশা ছিল। প্রথমত, কে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের উত্তরাধিকারী হবেন তা নিয়ে দলে মতবিরোধিতা। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে আগামী বসন্তে, অর্থাৎ নির্বাচনের আগে একটা শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাবনা। তারই কৃতিত্বে তাঁর নির্বাচনী দরিয়া পার হবার আশা। তৃতীয়ত, ইতিমধ্যে তো বিরোধী দলও কোন বিপাকে পড়তে পারে? সুতরাং সম্মেলন শেষের সমাবেশে তিনি আগামী নির্বাচন পর্যন্ত দলের নেতৃত্ব করবার সংকল্প ঘোষণা করতে মনস্থির করেছিলেন।

এবার জ্বালা এসে বাধা দিল। অকস্মাৎ যুদ্ধ দেহে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হলো। ঘোষণা করলেন তিনি অবসর গ্রহণ করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে দলের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল।—নেতৃত্ব নিয়ে এই প্রকাশ্য দ্বন্দ্বও টোরী পার্টিতে অভূতপূর্ব। কারণ টোরীদের নেতা যবনিকার অন্তরালে দলের প্রধানদের, সমাজের ওপরতলার শক্তি ও প্রভাবশালীদের শলাপরামর্শে নির্ধারিত হয়। শ্রমিক দলের মত পার্লামেন্টে সদস্যদের গোপন ব্যালটে নির্বাচিত হয় না।

কিন্তু এবার সবকিছু যেন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। নেতৃত্বের দাবীদার ছিলেন তিনজন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাটলার। দাবীদারদের মধ্যে বয়সে ও অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে প্রবীণ। তিনি অসুস্থ প্রধানমন্ত্রীর হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাজ চালাচ্ছিলেন। কিন্তু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর তিনি পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী।

বাটলার দেখছেন এই তাঁর শেষ সুযোগ। তাই সম্মেলনে গিয়ে তিনি চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে প্রধানমন্ত্রীর জন্যে নির্দিষ্ট হোটেলের স্যুইটটি দখল করেন এবং সম্মেলন শেষের সমাবেশে তিনি একাই প্রধানমন্ত্রীর বদলে বক্তৃতা করবেন বলে গোঁ ধরেন ও করেন। কিন্তু দলের তরুণ এম-পি ও সমর্থকদের সমর্থন তাঁর পেছনে না থাকায় তাঁকে সরে যেতে হয়েছে। দ্বিতীয় দাবীদার লর্ড সভায় টোরী দলের নেতা লর্ড হেলসাম। দলের কর্মীদের মধ্যে তাঁর সমর্থন বিপুল। তাই দলীয় সম্মেলন (যেখানে অন্তত কদিনের জন্যে তাঁরা জোট বেঁধে জোরালো হয়ে ওঠেন) প্রায় 'অমর হেলস্যামকে চাই'-জমায়েতে পরিণত হয়ে ওঠে। তাক বুঝে (অনেকটা বাটলারের মতই চক্ষুলজ্জায় সময় নষ্ট না করে) তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি লর্ড উপাধি ত্যাগ করছেন। অর্থাৎ পৈতৃক উপাধি পাবার পূর্ব-নামে 'কুইনটিন হগে' ফিরে যাচ্ছেন। কারণ উপাধি ত্যাগ না করলে 'হাউস অব কমন্সে' দাঁড়ানো যায় না। কমন্সের সদস্য না হলে প্রধানমন্ত্রী হবার সম্ভবনা এযুগে দূরপরাহত।

তিনি চার্চিল ও ম্যাকমিলন পরিবারের সমর্থন সংগ্রহ করেছিলেন। চার্চিলের দুই জামাতা কমনওয়েলথ রিলেসান্স মন্ত্রী ডানকান স্যান্স (অবশ্য আগের পক্ষে) এবং কৃষিমন্ত্রী ক্রিস্টোফার সোমস তাঁকে সমর্থন করছেন। ম্যাকমিলনের জামাতা অন্যতম মন্ত্রী জুলিয়ন এমারী, পুত্র মরিস ম্যাকমিলন এম-পি'ও তাঁর সমর্থনে। চার্চিল-পুত্র স্বয়ং র‍্যানডলফ গত শুক্রবার তাড়াতাড়ি আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সম্মেলনে 'কুইনটিন হগের' নামের প্রথম অক্ষর 'কিউ'যুক্ত ব্যাজ বিলি করতে থাকেন।—তবু হেলস্যাম ব্যর্থ।

তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন অর্থসচিব মডলিং। পার্লামেন্ট-সদস্যদের বেশির ভাগ তাঁর সমর্থনে। কিন্তু সম্মেলনে বিচলিত হয়ে পড়ে তাঁর ভাষণটা তেমন জমেনি বলে তাঁর সমর্থনে একটু ভাটা পড়ে যায়। তারপর তিনি হারিয়ে যান।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা তেমনি বেগতিক ও বেহায়া হয়ে পড়ায় পররাষ্ট্রসচিব আর্ল হিউমের ডাক পড়ে। বৃটিশ সমাজ-পিরামিডের চূড়োর অধিষ্ঠাতারা তাঁকেই নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু হিউমের লর্ড বা আর্ল উপাধি ঠিক চৌদ্দ পুরুষের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তা ত্যাগ করেছেন।

শোভন আচার্য
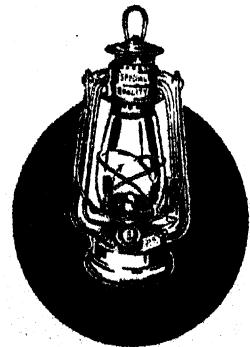
অধিক রচনা ফলাও

কথা উঠেছিল একজন প্রতিভাবান তরুণ কথাশিল্পীর লেখা সম্বন্ধে। আমি বললাম : 'সাম্প্রতিকদের মধ্যে ইনি সত্যিই ভালো লিখছেন।' নীলমণিদা এক টিপ নস্য নিয়ে বললেন, 'বটব্যাল-ভায়া কি সরকারের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের মতো রচনা-নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রবক্তা! দ্যাখো, ব্রাদার জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আমি স্বীকার করিনে। তার কারণ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ মানুষকে সংযমী হতে শেখায় না, শেখায় বিজ্ঞানের কলাকৌশল রপ্ত করে স্বেচ্ছাচার করতে।' বটব্যাল বললে, 'বর্তমান দেশের অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করি। নইলে খাদ্যাভাব, দারিদ্র্য...' নীলমণিদা বাধা দিয়ে বললেন, 'বোগাস। খাদ্যাভাব দূর করতে চাষবাসের উন্নতি করো, পতিত জমিকে কাজে লাগাও। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন শুরু করে কৃষি-উন্নতির অপ্রতুল চেষ্টাকে চাপা দেয়া চলবে না।' বটব্যাল মুখ গোঁজ করে রইল। নীলমণিদা বললেন : 'কথা উঠেছিল লেখকের বেশি লেখা নিয়ে। কি জানো বেশি লেখা কম লেখা সাহিত্যের বিচার নয়। দেখতে হবে ভালো লেখা হচ্ছে কিনা। কম লিখেও লেখক খারাপ লিখতে পারেন, বেশি লিখেও ভালো লিখতে পারেন। আসলে সৃষ্টির একটি নিজস্ব ধর্ম আছে, ঋতু আছে, ফসল ফলানোর মতোই স্বতঃস্ফূর্ত। মনে করো রবীন্দ্রনাথের সোনারতরী পর্বের কথা। এই সময়ে তিনি জমিদারি দেখেছেন, অজস্র কবিতা লিখেছেন, অনর্গল ছোটো-গল্প সৃষ্টি করেছেন, পত্রাবলী লিখেছেন। কে না জানে রবীন্দ্র-সৃষ্টির এইটেই এক স্বর্ণোজ্জ্বল পর্ব।' একটু থেমে : 'দরজি যখন কাপড় কাটতে বসে তখনই সে দরজি। কিন্তু লেখক সমগ্র সত্তা নিয়ে লেখক। তাঁর মস্তিষ্ক বাণপুরের ফারনেসের মতো সর্বদা সৃষ্টির ক্ষুধায় জ্বলছে। তিনি সবসময় কাগজে-কলমে সৃষ্টি করুন বা না-করুন তাঁর মস্তিষ্ক সর্বদাই সৃষ্টি করে চলেছে। লেখক-মানস একটি বিচিত্র ব্যাপার। যাঁরা লেখক নন তাঁদের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। কথায়-কথায় যাঁরা লেখকের বেশি লেখা সম্পর্কে অভিযোগ করেন, তাঁরা তা করেন ঈর্ষা থেকে।' বটব্যাল চটে উঠে বললে, 'ঈর্ষা!' 'হ্যাঁ ঈর্ষা!' নীলমণিদা বললেন : 'বিরাট কিছুর সামনে দাঁড়ালে, একটা শক্তির আশ্চর্য বিকাশ দেখলে, আমাদের মত ক্ষীণায়ু, ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তিরা তার কার্যকারণ না-বুঝে ঈর্ষা করে। এটা একটা সেল্‌ফ ডিফেন্স-ও বলতে পারো। অক্ষমতার, বীর্যহীনতার। সাহিত্যিক লেখার জন্যেই পৃথিবীতে আসেন, আজীবন তাঁর লেখাই একমাত্র ধ্যানধারণা। আজকের দিনে আড্ডারোগ লেখকদের সৃষ্টি-স্বাস্থ্যকে খর্ব করছে। লেখা ছাড়াও লেখকদের হাজারো সমস্যা, হাজারো বিনোদন, লেখকেরা বড় কাজের মানুষ হয়ে পড়ছেন। কিন্তু, প্রকৃত লেখকের কাজ তার লেখাই। সদর্থে লেখক পেশাদারী। শৌখিন অ্যামেচার ভাব লেখকসত্তার ক্ষতিকারক। লেখক তাঁর কাজে আন্তরিক হবেন, নিয়মিত হবেন, মেথোডিকাল হবেন। প্রতিদিন তাঁকে কিছু-না-কিছু লিখতে হবে। বর্তমান যুগে তারাশঙ্করের এই আদর্শ নবীন লেখকদের মেনে চলা উচিত। মনে রাখা উচিত সৃষ্টিকর্তা প্রতিটি মানুষকে তার নির্দিষ্ট কাজ করবার জন্যেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। লেখক তাঁর দায়িত্বপূর্ণ কাজে সিরিয়স হবেন, এটা প্রাথমিক শর্ত। আসলে বেশি লেখা লেখকের নিজস্ব সমস্যা। তারাশঙ্কর বেশি লেখেন, প্রেমেন্দ্র বেশি লেখেন না। এর অর্থ কি তারাশঙ্কর খারাপ লেখেন, প্রেমেন্দ্র ভালো লেখেন!' নীলমণিদা হাসলেন। 'তাছাড়া বস্তুত অবস্থা দ্যাখো। বাঙলা দেশে গুটি-তিনেক সাপ্তাহিক, প্রতি হপ্তায় একটি-দুটি করে গল্প চাই। মাসে চারটে কি আটটা গল্প, এ ছাড়াও আছে মাসিক-পত্র, আছে লিটল ম্যাগাজিনগুলি। লেখা না পেলে কাগজগুলোর উদর-পূর্তি হবে কি করে? দৈনিক সাময়িকীর কথা না হয় বাদই দিলাম। উপযুক্ত জমি যখন আছে তখন জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা কেন। সৃষ্টি স্বাভাবিক ধর্ম, তাকে চাপা দিলে সামাজিক বিকারই প্রকাশ পাবে। চিন্তা বহতা নদীর মতো, সমাজের চাহিদা বেড়েছে, মানুষের আয়ু বেড়েছে, লেখার আয়ু বাড়বে না? পুরনো চিন্তা নিয়ে বসে থাকলে সমাজের চলে না। নিরক্ষরতা দেশ থেকে তাড়ানো হচ্ছে, মানুষের সংস্কৃতির ক্ষুধা বেড়েছে। দেশে আজ যত পাঠক, তত লেখক। আরো লেখক সৃষ্টি হোক, লেখা বাড়ুক, সামানুপাতে পাঠকও বাড়বে। সমস্যা অধিক লেখকেরও নয়, অধিক লেখারও নয়, সমস্যা ভালো লেখক ভালো লেখাব। এই হরপার্বতী-যোগ যদি ঘটে, দেশের কল্যাণ, জাতির সম্পদ। বটব্যাল ভায়া কি বলেন?' বটব্যাল টেবিল বাজিয়ে বলেন : 'আমি বিশ্বাস করিনে।'. নীলমণিদা বললেন, 'তুমি পোপের মতো কথা বলছ। বিশ্বাস-অবিশ্বাস আসে কোথা থেকে। এটা একটা ঘটনা, প্রকৃত ঘটনা। ভায়া, লেখক তো শুধু হাত দিয়ে লেখে না, লেখে হৃদয় দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে। লেখক নিজেই তার লেখার নিষ্করুণ সমালোচক। লেখক-অন্তরের এই সমালোচক মানুষটিই লেখককে সজ্ঞানে চালিত করে, প্রেরণা জোগায়, কখন থামতে হবে, কখন এগোতে হবে বাতলে দেয়। কাজেই তুমি নিতান্ত দুর্ভাবনাগ্রস্ত হচ্ছ কেন?' বটবাল পুনর্বার জানাল 'আমি তবু বিশ্বাস করিনে' এবং সে কি বিশ্বাস করে না আমাদের বিশ্বাস করাবার আগেই বৃহত্তর যুদ্ধের আহ্বানে সৈনিকের মতো প্রস্থান করল।

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।।৩৫।।

আমি ভয়ে ভয়ে দিদিমণির ঘরে প্রবেশ করলাম। দিদিমণি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। চোখ-মুখ অত্যন্ত কঠিন, চোয়ালের কাছে পেশীগুলো নড়ছে। আমাকে দেখেই কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করলেন, এ বাড়ীতে যে এত কান্ড ঘটে যাচ্ছে তুমি আমাকে জানাওনি কেন?

আমি বুঝতে না পেরে মুখ তুলে তাকালাম।

—কি মতলব নিয়ে তুমি এ বাড়ীতে ঢুকেছ?

বললাম, এ আপনি কি বলছেন দিদিমণি?

—সোজা কথার সোজা উত্তর দাও, তুমি কে? কি চাও এখানে?

সংযত কণ্ঠে উত্তর দিলাম, আমি এখানে চাকরি করতে এসেছি।

দিদিমণি বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি কচি খুকি নই, কথা ঘোরাবার চেষ্টা কোর না, গগন সেনকে এনে ঢুকিয়েছো কেন?

আমি প্রতিবাদ করলাম, গগন সেন স্বেচ্ছায় এসেছে, তাছাড়া আপনার মা তাকে ডেকেছিলেন।

—কেন?

—এমনি আলাপ করার জন্যে।

দিদিমণি দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, আমি বিশ্বাস করি না।

আমি চুপ করে রইলাম।

দিদিমণি আমার চোখের উপর চোখ রেখে মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করলেন, মা হঠাৎ স্কুল নিয়ে এত মেতে উঠেছেন কেন জান?

বললাম, না।

—তুমি কথা গোপন করার চেষ্টা করছ।

—তাতে আমার কি লাভ? বিশ্বাস করুন আমি যা জানি আপনাকে সবই অকপটে বলছি।

—গগন সেনের সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?

চিন্তা করে বললাম, বছর দেড়েক।

—ওর বিষয়ে আর কি জান?

আমি ইচ্ছে করে কথা গোপন করে গেলাম, বুঝলাম গগনের সঙ্গে আলাপ না করে দিদিমণির কাছে তার বিষয়ে আর বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না।

বললাম, ওঁর বিষয়ে যদি কিছু জানার থাকে, ওঁকেই বরং জিজ্ঞেস করবেন।

—গগন সেন কখন আসবে?

—এখুনি আসবার কথা আছে।

দিদিমণি কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে, ঐ ভদ্রলোক এলেই আমার কাছে নিয়ে এস।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, দিদিমণি চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে যে একখানা খাম দিয়েছিলাম, হাতের লেখা দেখবার জন্যে সেরকম কোন চিঠি মার কাছে আসতে দেখনি?

আমি মিথ্যে বললাম, না।

—ঠিক আছে, যাও।

দিদিমণির ঘর থেকে বেরিয়ে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একের পর এক প্রশ্ন, কত উত্তর দেব। উত্তর দিলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম দিদিমণি তা বিশ্বাস করছেন না। আমাকে উনি সন্দেহের চোখে দেখছেন। কিন্তু কেন?

ব্রজবালা দেবীর ঘরে এসে দেখি উনি খাটের উপর শুয়ে রয়েছেন। আমাকে ঢুকতে দেখে দুর্বল কণ্ঠে বললেন, এস।

উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, শরীর খারাপ হয়নি তো?

উনি বললেন, না।

—এখন শুয়ে আছেন?

ব্রজবালা দেবী দীর্ঘশ্বাস গোপন করার মিথ্যে চেষ্টা করেন, সারা মুখে তাঁর ক্লান্তির ছাপ, প্রশ্ন করলেন, গগন কখন আসবে মা?

—এখুনি আসবার কথা।

—এলেই যেন প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা করে।

—বেশ তাই বলব।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম, উনিও নিজের মনে কি ভাবছিলেন, মনে হল একবার ঘরে ফিরে যাই। এমন সময়ে উনি বলতে শুরু করলেন, যদি মনে কর, কয়েকদিনের জন্যে তোমার কলকাতায় যাওয়া দরকার, দাদা-বৌদিদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে, ক'দিন বরং এইবেলা ঘুরে আসতে পার।

কলকাতায় যাবার আমার কোন কথাই ছিল না। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনাও আমি করিনি, তবে হঠাৎ উনি এ প্রসঙ্গ তুললেন কেন জানবার জন্যেই তাঁর মুখের দিকে চাইলাম।

ব্রজবালা দেবী বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন, তুবুড়ীর মা এসেছে তো? প্রয়োজন হলে আমার দেখাশুনো করতে পারবে। তুমি অনায়াসে দিন সাতেকের ছুটি নিতে পার।

বললাম, ভেবে দেখি। পরে বরং আপনাকে জানাব।

আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম। হয়ত গগন সেন আমার জন্যে এসে অপেক্ষা করছে। বলেছিল সে ভোরবেলা আসবে, আজ আমাদের জোড়ে ব্রজবালা দেবীকে প্রণাম করার কথা। সকালবেলা দিদিমণির হঠাৎ আবির্ভাবে আমার মন অজানা আশংকায় চঞ্চল হয়ে পড়েছিল, বুঝেছিলাম যে সুখস্বপ্ন গতকাল রাত্রে আমি দেখেছি তাতে নিশ্চয় বিঘ্ন ঘটবে। তবু মনে এই ভরসা ছিল একটু বাদেই গগন সেন আসবে, সব-দিক সামলে নিয়ে একমাত্র সেই কাজ করতে পারবে।

কিন্তু ঘরে এসে দেখি তখনও গগন সেন আসেনি। নিচে স্কুল-ঘরে বসে নেই তো। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। সরকারবাবু টেবিলের উপর পা তুলে এক কোণায় বসে, খবরের কাগজ পড়ছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, সরকারবাবু, গগন সেন এসেছেন নাকি?

উনি আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর থেকে পা নামিয়ে নিলেন। বললেন, কই মা, গগনবাবুকে তো আজ দেখিনি।

আমি বেরিয়ে এলাম বাইরে, বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে দরোয়ানজি দাঁতন করছিল। প্রশ্ন করাতে সেও ঐ একই উত্তর দিল।

আশ্চর্য, গগন এখনও এল না কেন? ও তো কথা দিয়ে কথা রাখে, না আসার কি কারণ হতে পারে বুঝে পেলাম না। হাঁটতে হাঁটতে বাগানের গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম, নিছক কৌতূহলবশেই রাস্তার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম। প্রায়ই রিক্সা যাতায়াত করছে, কিন্তু গগন সেনের কোন হদিশ পেলাম না।

আশা করে থাকার এই বিপদ। আশা কখনই পূর্ণ হয় না মানুষের। যা চাওয়া যায় না সেইটেই পাওয়া যায় অনায়াসে। অথচ যা চাই, যা পাওয়ার

জন্যে সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করি তাকে আর পাই কখন?

বাগানের মধ্যে অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম, কিন্তু সবসময় আমার চোখ রয়েছে গেটের দিকে। এতটুকু সামান্য শব্দ হলেও আমি ফিরে তাকাচ্ছি। গগন সেনের সঙ্গে যে প্রথমেই আমার দেখা করার দরকার, তাকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন দিদিমণি এসেছেন, দেখা হলেই নানারকম প্রশ্ন করবেন, গগন সেন যেন তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আগে তাকে পাঠাতে আসতে নাই পারে তা কেন আমাকে লোক-মারফৎ জানিয়ে দিল না। সে কি বুঝতে পারছে না আমি এই চিন্তার দোলায় দুলছি।

হঠাৎ এক আর্ত চীৎকার ভেসে এল বাড়ীর ভেতর থেকে।

আমার বুকটা ধক্ করে উঠল, স্পন্দন বেড়ে গেল, কে কাঁদছে! তুবড়ী না? কি হল তার!

বাগান থেকে আমি ছুটলাম, এক নিঃশ্বাসে প্রায় মাঠ অতিক্রম করে সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠেছি।

তুমি কথা গোপন করার চেষ্টা করছ!

হবে ব্রজবালা দেবীর ঘরে, হয়ত বুদ্ধারও কিছু পরামর্শ দেবার আছে। কিন্তু কোথায় গগন সেন? বাগানের মধ্যে পায়চারি করে করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, সকাল থেকে কিছু খাইনি। আজ তার সুযোগও হয়নি বটে, তাছাড়া মনের কোণে একটা লুকোন ইচ্ছে ছিল আজ যখন ব্রজবালা দেবীর আশীর্বাদ নিতে যাব দুজনে সকাল থেকে উপবাসে থাকাই উচিত। কিন্তু যত বেলা বাড়ছে শরীর মন দুইই আমার অবসন্ন হয়ে পড়ছে অনুভব করলাম। গগন সেনের উপর আমার অভিমান হল, যদি কোন কারণে সে হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে হাজির হয়েছি তুবড়ীর ঘরে।

সে এক বীভৎস দৃশ্য। তুবড়ীর গায়ে কোন জামা নেই, পরনে শুধু একটা পায়জামা, মাটির উপরে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে দিদিমণি, হাতে সেই ভয়ঙ্কর চাবুকখানা। দিদিমণির নৃশংস মুখের দিকে তাকিয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।

উনি শাসাচ্ছেন, ঠিক করে বল, গগন সেন আমাদের কথা তোর কাছ থেকে কি জানতে চায়।

তুবড়ী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, আমি তো সব তোমায় বললাম।

দিদিমণি নির্দয়ভাবে তার পিঠের উপর চাবুক মারেন।

তুবড়ী কোকিয়ে চীৎকার করে ওঠে,

—গগন সেন তোকে টাকা দেয় কেন?

—বই কেনার জন্যে।

—মিথ্যে কথা, ও তোকে হাত করবার জন্যে ঘুষ দেয়।

তুবড়ী প্রতিবাদ করে, না।

আবার চাবুকের শব্দ, তবে কেন দেয়, বল।

তুবড়ী কাঁদতে কাঁদতে বলে, ও আমায় ভালবাসে।

—ওসব আমি শুনতে চাই না, গগন সেনের লেখা চিঠি কোন তোর কাছে আছে?

—আছে।

—দে, আমায়।

তুবড়ীর মাথায় কি দুর্বুদ্ধি এল জানি না, বলল, দেব না। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল প্রচণ্ড প্রহার। পিঠের উপর কালো কালো দাগ পড়ছে, পাশে পাশে লাল আভা, যে কোন মুহূর্তে ফেটে গিয়ে রক্ত বার হবে। আমি চীৎকার করে উঠলাম, এ কি করছেন দিদিমণি। ছেলেটা মরে যাবে যে।

দিদিমণি তীব্র স্বরে বললেন, মরুক মরুক, সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে তোমরা ষড়যন্ত্র করছ, আমি কাউকে রেহাই দেব না।

সাহসে ভর করে বললাম, ও বেচারিকে মেরে কি করবেন। গগন সেনকে আসতে দিন, তখন—,

—কোথায় সে, এখনও এল না কেন?

—জানি না।

দিদিমণি সাপিনীর মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন, সে আমার কাছে আসবে না। যতই চালাক হোক গগন সেন, আমার চোখকে সে কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবে না।

দিদিমণি একটু সরে গিয়ে চেয়ারের উপর বসেছিলেন। আমি এই সুযোগে তাঁর অনুমতি চেয়ে নিলাম, তুবড়ীকে নিয়ে আমি ঘরে যাচ্ছি।

প্রথমটা তুবড়ী উঠতে চাইল না, পরে আমার বিশেষ অনুরোধে আস্তে আস্তে উঠে এল, দিদিমণির দিকে একবার ফিরেও না তাকিয়ে মাথা নিচু করে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল। আমি শুধু আড়চোখে লক্ষ্য করলাম দিদিমণি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ঘরে এনে তুবড়ীকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম, সে বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল,

আমি মাথার কাছে বসে হাত বুলিয়ে দিয়ে ব্যথা উপশমের চেষ্টা করছি, হঠাৎ তুব্‌ড়ী বলে উঠল, খুন করব, মা'কে আমি খুন করব।

আমি সভয়ে শিউরে উঠলাম, কি বলছ তুব্‌ড়ী!

—ঠিকই বলছি। মা আমাকে মানুষ মনে করে না, মনে করে আমি একটা জন্তু। যতদিন নিজে জন্তু ছিলাম এ অত্যাচার সহ্য করেছি, কিন্তু আজ তো আর আমি জন্তু নই, আমি মানুষ, আমি প্রতিশোধ নেব, আমি খুন করব।

কথা বলতে বলতে তুব্‌ড়ী রোখের মাথায় উঠে বসল, চোখ দুটো তার জবাফুলের মত লাল, চোয়াল কাঁপছে, কি হিংস্র দৃষ্টি, এ তুব্‌ড়ীকে দেখে সত্যিই আমি ভয় পেলাম। এ চাহনি মানুষের নয়, পশুর। মুহূর্তের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দিল তুব্‌ড়ী দিদিমণির গর্ভজাত সন্তান, বাঘিনীর ছেলে বাঘ।
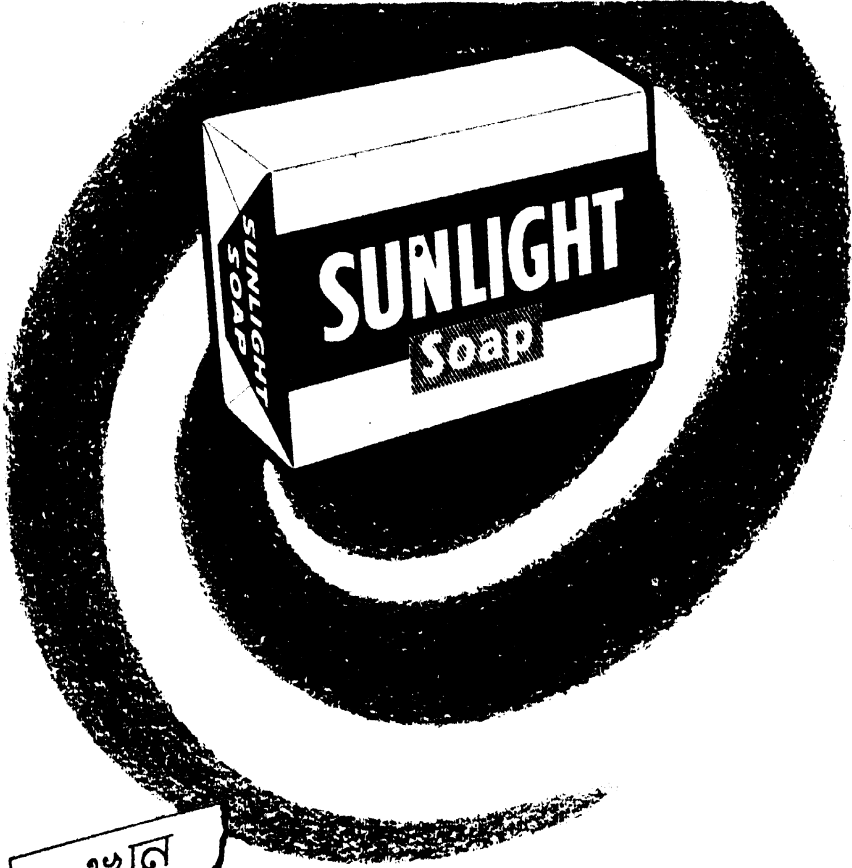
সারাদিন আমি ছট্‌ফট্ করেছি, প্রতি মুহূর্তে আশা করেছি গগন হয়ত এসে পড়বে। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করেও আমাকে হতাশ হতে হল। গগন এল না।

আমি ব্রজবালা দেবীর কাছ থেকে কিছুক্ষণের ছুটি চেয়ে নিয়ে রিক্সা করে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা গিয়ে হাজির হলাম গঙ্গার তীরে সেই বাড়ীতে যেখানে গগন সেন থাকে। ইতিমধ্যে অনেকবারই আমি এখানে এসেছি, মালি আমাকে ভাল করেই চেনে। সে জানাল গগন সেন সকালবেলা এ বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, আর ফেরেনি, ফিরবেও কিনা সে জানে না। আমি বাইরের বারান্দায় চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলাম, কিছুতেই আমার মনকে শান্ত করতে পারছি না। কথা দিয়েও কেন গগন এল না। কোথায় সে চলে গেল।

মালি আমায় জিজ্ঞেস করেছিল চা করে দেবে কিনা, আমি তাকে বারণ করেছি। তবু বসেছিলাম যদি গগনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, শুধু তাই নয় বাড়ীতে ফিরতে কিছুতেই যেন মন চাইছে না। দিদিমণি আসার পর থেকে আজ একদিনে বাড়ীর আবহাওয়া যেন বদলে গেছে, ব্রজবালা দেবী অত্যন্ত গম্ভীর। আজ তিনি কোন কাজ করেন নি, তাঁর কপালে লক্ষ্য করেছি দুশ্চিন্তার রেখা। বার বার আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, কই গগন তো এখনও এল না? এ প্রশ্নের আমি কি উত্তর দেব। উনিও যে আঁধারে, আমিও যে সেই আঁধারেই। তুবুড়ী একদিনে যেন চুপসে গেছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তার মধ্যে আমি লক্ষ্য করছিলাম চঞ্চল প্রাণের জোয়ার। যে মন এতদিন তার সুপ্ত ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তা জেগে উঠছে। গগন আর আমি দুজনেই তার চোখে দেখেছি কৈশোরসুলভ অনন্ত জিজ্ঞাসা। আশ্চর্য, একদিনে সে যেন কিরকম বদলে গেল। আর দিদিমণি, তাকে তো আগেও দেখেছি, কিন্তু এরকম প্রলয়ঙ্করী রূপে নয়। হিংসের জ্বালায় তার শরীর যেন পুড়ছে, চোখ মুখ দিয়ে বিকীর্ণ হচ্ছে তার তাপ। ওকে দেখলেই আমার ভয় করছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ী ফেরার জন্যে একসময় উঠতে হল। রিক্সা আমাকে নিয়ে চলেছে। যত আমি বাড়ীর দিকে ফিরছি, বুকের স্পন্দন তত দ্রুত হচ্ছে। কেন জানি না মনে হচ্ছে বাড়ীতে ফিরলেই আমি এক অজানা বিপদের মধ্যে পড়ে যাব। কে যেন ঐ বাড়ীর দরজায় জানালায় মাকড়সার মত বিপদের জাল বুনে রেখেছে। তা ভেদ করে কিছুতেই আমি বেরিয়ে আসতে পারব না। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে, পাখীরা বাসায় ফিরছে, কিন্তু আমার মন কিছুতেই ফিরতে চাইছে না।

তবু ফিরতে হল। বাগানের গেটে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকলাম। সঙ্গে সঙ্গে দোতলার উপর থেকে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হল, কোথায় গিয়েছিলে?

আমি ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকালাম, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে দিদিমণি, চোখে তার সন্দেহের দৃষ্টি। বললাম, বেড়াতে গিয়েছিলাম।

—এর পর থেকে আমাকে জিজ্ঞেস না করে কোথাও যাবে না, দিদিমণি তাঁর আদেশ গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

আমি উপরে উঠে এলাম।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ আমি ঘুমতে পারিনি। সবসময় মনে হয়েছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কি তা আমি জানি না। প্রথম প্রথম এ বাড়ীতে এসে রাত্রিবেলা যেরকম আমার ভয় করত সেইরকম ভয় আজ আমায় যেন নতুন করে পেয়ে বসেছে। বাইরে কি ঝড় উঠল, হাওয়ার শনশন শব্দ হচ্ছে! কে কাঁদছে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে। তুবুড়ী কি? কান খাড়া করে রইলাম। না, এ কোন শিশুর কান্না? হয়ত বা সেই পাখীরা যাদের ডানা ঝাপটানো আর কর্কশ চীৎকারে এই ঘরে শুয়ে আমি রাত্রিবেলা ভয়ে শিউরে উঠতাম।

মশারির মধ্যে আমি এপাশ-ওপাশ করছি, অনুভব করছি সমস্ত শরীর আমার ঘামছে। কি অসহ্য অন্ধকার, ঘরে একটা আলো জেলে রাখলে হত। এ যে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

খুট্ করে দরজার ছিট্‌কিনি খোলার শব্দ হল। আমি কান খাড়া করে রইলাম। লঘু পদশব্দ কাছে এগিয়ে আসছে।

—অর্পিতা, জেগে আছ?

গলার স্বর শুনে আশ্বস্ত হলাম, ব্রজবালা দেবী। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম, বললুন।

ব্রজবালা দেবীর হাতে একটা ছোট ব্যাগ। বললেন, এটা তোমার কাছে রেখে দাও। কাউকে দেবে না, ভেবেছিলাম গগনকে দিয়ে দেব, কিন্তু সে তো এল না। জানি না পরে সুযোগ পাব কিনা। তুমি ওকে দিও।

লক্ষ্য করলাম ব্রজবালা দেবীর গলা কাঁপছে, আমি ও'র হাত থেকে ব্যাগটা নিলাম। কিন্তু কোথায় রাখব ভেবে পেলাম না, উনিই নির্দেশ দিলেন, তোমার বিছানায় তোষকের নীচে রেখে দাও। ও জায়গাটা সহজে কেউ খুঁজবে না।

জিজ্ঞেস করলাম, কি আছে এতে!

—স্কুলের কাগজপত্র, দরকারী দলিল। খুব সাবধানে রেখ।

ভয়ে ভয়ে বললাম, এতবড় দায়িত্ব আমার উপর দিচ্ছেন!

ব্রজবালা দেবী সস্নেহে আমার পিঠের উপর হাত রাখলেন, আমি নিরুপায় হয়েই তোমার উপর এই কাজের বোঝা চাপাচ্ছি। জানি এর জন্যে হয়ত তোমাকে বিপদেও পড়তে হতে পারে। কিন্তু কি করব, হঠাৎ যে—

ব্রজবালা দেবী থেমে গেলেন, ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন,—বাইরে কি পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

আমিও শুনতে পেলাম, বললাম হ্যাঁ।

—খুব সাবধান, আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছি।

ব্রজবালা দেবী দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাইরের পদশব্দ ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে। এ এক নাটকীয় পরিস্থিতি। কি মনে হল জানালার কাছে সরে গেলাম। যা মনে করেছিলাম তাই, গঙ্গার ধারের সেই পোড়ো বাড়ীতে আলো জ্বলছে, কতদিন বাদে ওখানে আবার আলো জ্বলতে দেখলাম। ঐ ঘরটায় কি এমন জিনিস আছে যা খোঁজার জন্যে দিদিমণি এলেই রাতের অন্ধকারে ঐখানে যান।

আমি গগনের সঙ্গে এই বাড়ীর নীচের অংশটা দেখে এসেছি, কিন্তু উপরে উঠিনি। কি আছে ওখানে জানার কৌতূহল আমার বেড়ে গেল।

কতক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। এক সময় আলো নিভে গেল, কিন্তু কই, ঘর থেকে তো কাউকে বেরতে দেখলাম না। আমি অন্ধকার ভেদ করে দেখবার জন্যে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি, প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল, কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ মাঠের মধ্যে শুকনো পাতার উপর পদশব্দে খড়মড়ে আওয়াজ শুনতে পেলাম। অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি দ্রুত বাগান অতিক্রম করে চলে গেল। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কে এসেছিল?

(ক্রমশঃ)

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক সংগ্রাম, অনেক দুঃখবরণের মধ্য দিয়েই নারী-প্রগতির ইতিহাস রচিত হয়েছে। মধ্য যুগের অন্ধকারের মধ্যে নারীকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা করার জন্য যে মহীয়সীরা দুঃখবরণ করেছিলেন—তাঁদের কল্পলোকে ভবিষ্যৎ নারীজাতির একটি আনন্দময় রূপ ছিল। কিন্তু সুস্বাস্থ্য, প্রচুর বিত্ত, প্রচণ্ড গতির অধিকারিণী অতি আধুনিকা নারী-জগতের মধ্যে কিন্তু এই আনন্দময় সত্তাটির বিকাশ দেখা গেল না।

আধুনিক পৃথিবীতে শক্তি ও বিত্তে আমেরিকা সমগ্র জগতের দৃষ্টি ও আদর্শ আকর্ষণ করে রেখেছে। যন্ত্র-সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সেখানে ঘটেছে, কুবেরের ঐশ্বর্য মানুষের হাতে দিয়েছে ভোগের ক্ষমতা। জাগতিক জীবনে সুখী হবার সমস্ত উপকরণ তাদের হাতের মুঠোয়। বিশ্বের অধিকাংশ আধুনিক নারী-সমাজও মার্কিনী নারী-সমাজকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে। করার মতো যথেষ্ট কারণও আছে। সুবেশা, সুতন্বী, মেধাবিনী, রূপবতী, প্রচুর ঐশ্বর্যশালিনী মার্কিনী রমণীর আইনঅনুমোদিত অধিকার ভোগের সীমা অতি বিস্তৃত। প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাদের অবিসম্বাদিত সামাজিক প্রভুত্ব পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়। মনে ভেবে নেওয়া অসম্ভব নয় যে, নারীর স্বাধীনতা-স্বপ্নের চরম বাস্তব রূপায়ণ সেখানে ঘটেছে।

আধুনিক পর্যটক, মনঃসমীক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ কিন্তু এ স্বপ্ন ভেঙে দিচ্ছে। তাঁদের মতে আধুনিক মার্কিনী তথা অধিকাংশ অতি-প্রগতিশালিনীগণ এত অধিকার ও স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও মানসিক শান্তি কিছুতেই পাচ্ছে না। তাদের জীবনযাত্রার ধরণ তাদের যতই আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে, ততই তারা ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায় ভুগছে। এই বিশেষ জীবনযাত্রার ধরণ শুধু যে মনের শান্তি নষ্ট করছে তাই নয়, তাদের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য পর্যন্ত লয় করে দিচ্ছে। শোনা যায় আধুনিক মার্কিনী নারীরা রূপসজ্জার জন্য অন্য সমস্ত দেশের মেয়েদের তুলনায় বেশী অর্থব্যয় করেন অথচ রূপচর্চার আড়ালে ক্ষুব্ধ অন্তর ঢাকা পড়ে না। নির্বিশেষ ফ্যাশানের প্রবাহে গা ঢেলে দেওয়ার ফলে কারুরই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি আকর্ষণীয় হয় ওঠে না। এ তথ্য জানার পর একটি গুরুতর প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতঃই দেখা দেয়—ততঃ কিম্‌!

আধুনিক চিকিৎসক ও প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে পুরুষের তুলনায় দেহে-মনে পৃথিবীতে টিকে থাকার শক্তি নারীর বেশি। হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞগণ এবং শল্যচিকিৎসকগণের অভিমত যে, নারীদের তুলনায় পুরুষ এই সব ক্ষেত্রে দুর্বল। শুধু তাই নয় একথাও আমরা জানি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের' ভয়াবহ কষ্ট পুরুষদের তুলনায় নারীরা দেহে-মনে অনেক সহজে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিল। নারীদেহে রোগের আক্রমণ বেশি ঘটলেও তারা সেরেও ওঠে তাড়াতাড়ি এবং কতকগুলো বিশেষ রোগ ছাড়া অধিকাংশ রোগেই পুরুষের মৃত্যুহার নারীদের তুলনায় বেশি। আয়ুর দিক দিয়েও নারীরা এগিয়ে থাকে। এর কারণ অন্বেষণে অনেকে ব্যাখ্যা করে থাকেন যেহেতু নারীর তুলনায় পুরুষের জীবন জটিল, ব্যস্ত এবং ভারগ্রস্ত সেহেতু তার আয়ু ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং প্রায়শঃ আধুনিক জীবনযাত্রার বিশেষ কতকগুলি রোগ তাকে আক্রমণ করে।

এক সমাজতত্ত্ববিদ খৃশ্চান সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীদের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করে উপরোক্ত ধারণা খণ্ডন করেছেন। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েই একই রকম শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করেন, তবু দেখা গেছে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি দিন বেঁচে থাকেন। কাজেই আধুনিক জীবনযাত্রাকে নারী-পুরুষের আয়ুনিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, আয়ু নির্ভর করে অধিক 'X Chromosome'-এর ওপর এবং এই বিশেষ বস্তুটিই নারীত্বের প্রযোজক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রথম থেকেই পুরুষ বিশেষ একটু দুর্বলতা নিয়ে শুরু করে।

কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, নারী-দেহের এই পূর্ণতা সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল তার গর্ভধারণ-কাল অবধি। অর্থাৎ গর্ভধারণ ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার পরে কিন্তু পুরুষ এবং নারীর আয়ু এবং বিশেষ কতকগুলি রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা একই স্তরে নেমে আসে। গর্ভধারণ ক্ষমতার সঙ্গে হৃদযন্ত্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ

আছে। দেখা গেছে প'য়তাল্লিশ বৎসরের পরে নারীদের হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত হয়ে পড়ে। হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞগণ 'ক্লোরেস-টেরল্' নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছেন যে, পুরুষ এবং বয়স্কা স্ত্রী-লোকদের রক্তে চর্বিবৃদ্ধি ঘটে বেশি।

পুরুষ এবং নারী দেহের বিশেষ লক্ষণ যথাক্রমে দুটি হর্মোনের উপর নির্ভর করে 'Testosterone' ((পুরুষ) এবং 'Oestrogens' (নারী)-দুটি কিন্তু রাসায়নিক দিক দিয়ে একই। প্রত্যেক নারী-পুরুষের দেহেই এই দুটি হর্মোন আছে—পরিমাণগত পার্থক্য নিয়ে। 'Oestrogen'-এর কাজ হচ্ছে স্নিগ্ধ করা এবং 'Testosterone'-এর কাজ হচ্ছে উদ্দীপ্ত করা। নারীদেহে 'Oestrogen'-এর পরিমাণ বেশী এবং পুরুষদেহে 'Testosterone'-এর পরিমাণ বেশি। 'Oestrogen'-এর প্রভাবে নারীদেহে একটি বিশেষ সুফল ঘটে—যখন সে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় থাকে। এতক্ষণ আলোচনার পর মোটের ওপর যেটা স্পষ্ট হচ্ছে—সেটা এই যে 'মা' হবার জন্য প্রকৃতি নারীদেহকে বিশেষভাবে গড়ে তুলেছে। Dr. Louis Katz বলেন, Men are highly specialised, delicate creatures. They are like the spermatozoa—a moment's stimulation and their biological job is done. Women may live longer simply because they are the bearers of life. সুতরাং সৃষ্টিকে লালন করার ভার নারীদের দেওয়া আছে বলে প্রকৃতি তার দেহকে বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছে এবং বোধ হয় এই জন্যই মানসিক কতকগুলো বিশেষ গুণও নারী-সংজ্ঞার পরিচায়ক হয়েছে।

আধুনিকার জীবন এখনও ব্যবহারিক দিক থেকে পুরুষ-অনুসারী এবং মানসিক দিক থেকে পুরুষনির্ভর। ব্যবহারিক জীবনে নৈতিক জয়লাভ ঘটেছে সত্য, কিন্তু আত্মিক দিক থেকে এখনও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা যায় নি। নারীত্ব ও মনুষ্যত্ব-এ দুয়ের সমতা ঘটলেই তা সম্ভব। তাহলে এখন তার করণীয় কী? সে কি আবার ফিরে যাবে গৃহের স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে। বৃহৎ জীবনের আহ্বান পৌঁছবে না তার কাছে? না, তাও কখনও কাম্য হতে পারে না। কিংবা আদর্শ ত নয়ই। মনুষ্যত্বের মহিমা ত্যাগ করে নারীত্বের প্রতিষ্ঠা কোনমতেই সম্ভব নয়। তা হলে প্রয়োজন হচ্ছে দুইয়ের মধ্যে একটি সংযোগ-সেতু নির্মাণের—যার মধ্যে হয়ত সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সম্ভব।

একটা মূল ব্যাপারেই আমরা খুব একটা ভুল করি। পৌরুষ আর নারীত্ব —দুটো একেবারে মূলতঃ দুটি ভিন্ন গুণ। পৌরুষ যদি পুরুষের ধর্ম হয়, পরিপূর্ণ নারীত্বের বিকাশেই তেমনি নারীর সার্থকতা। পুরুষের পৌরুষকে প্রাধান্য দিয়ে নারীত্বকে ছোট করে দেখার ফলেই একটা হীনমন্যতা দেখা দিয়েছে — যে জন্য মেয়েরা সম্পূর্ণ 'পুরুষ' হয়ে ওঠার মধ্যেই নিজেদের পরমার্থ খুঁজতে ছুটেছে।

নারীর মধ্যে প্রকৃতি নিজে হাতে দুটি ক্ষমতা তুলে দিয়েছে—একটি মমতা আর একটি সহনশীলতা। এই দুটি গুণকে বিকশিত করে নারীই পারে বহির্জীবন ও আন্তর-জীবনের মধ্যে সেতু নির্মাণ করতে। গৃহকোণে যে কল্যাণময়ী রূপে সে পরিচিতা ছিল, বাইরের বৃহৎ কর্মক্ষেত্রেও তার সেই কল্যাণময়ী রূপটিই প্রসারিত হয়ে ওঠা চাই। প্রেমের একটি উজ্জ্বল দীপ যদি তার অন্তরলোক আলোকিত করে রাখে তবে নঈশ্বর রুক্ষ কর্মক্ষেত্রও তার কাছে শান্তির আশ্রয় নিয়ে আসবে।
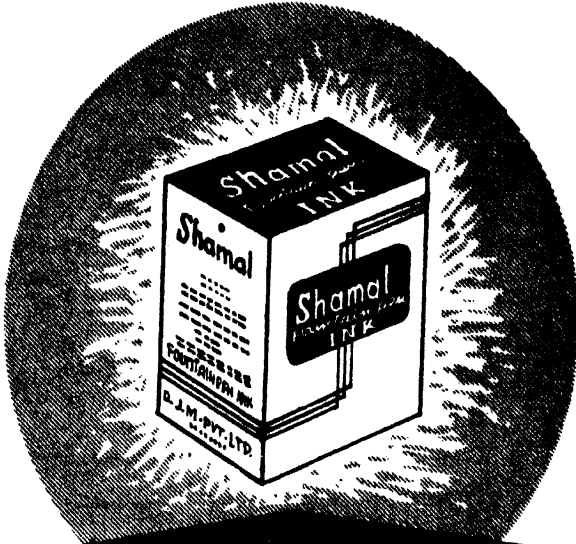
অভিনয় প্রসঙ্গে

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

এম-এ পাশ করা কোন যুবক ক্রিকেট ব্যাট ধরতে পারেন না একথা কবুল করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচের কারণ ঘটে না। কেনই বা ঘটবে? এম-এ ডিগ্রীর সঙ্গে ক্রিকেটের কী সম্পর্ক? কিন্তু এম-এ পাশ করা কোন ভদ্রমহিলা বা ভদ্রলোক একথা কিছুতেই মানবেন না যে অভিনয়কলা সম্পর্কে তিনি শিক্ষা পাননি। আমার এ সিদ্ধান্তের সত্যতার প্রমাণ পাবেন যদি কখনও সৌখিন থিয়েটারের মহলায় হাজির থেকে পরামর্শ দেওয়ার ইচ্ছাকে দমিয়ে না রাখতে পারেন।

সচরাচর মফস্বল শহরে যে সমস্ত মঞ্চাভিনয় দেখে থাকি তা থেকে যে কথাগুলো পুনঃপুনঃ মনে জাগে সে-গুলোই আজ তুলে ধরতে চাই; ওগুলো নিতান্তই প্রাথমিক বিষয় অভিনয়ের, কিন্তু সব বিদ্যারই প্রাথমিক পাঠের মত এগুলোরও গুরুত্ব অনেক। ব্যাট ধরা বা দাঁড়াবার কায়দা না শিখলে কোন-কালেই ক্রিকেট খেলোয়াড় বলে গণ্য হওয়ার আশা নেই। অবশ্য কৌতুক করে আমরা যে বছরে দু'একদিন খেলি তাতে প্রতি বছরেই ভুলের পুনরাবৃত্তি চলতে পারে, এবং বে-কায়দায় দাঁড়িয়েও যে একটা বা দুটো বাউন্ডারী ঠুকে দেওয়া না যায় তা নয়।

প্রথমেই ধরা যাক, উচ্চারণ বা আবৃত্তি। মঞ্চ এবং বাস্তব জীবনে যে পার্থক্য আছে এই অতি সহজ সত্যটি অনেকেই ভুলে যান। এ জন্যে সিনেমার অলক্ষ্য প্রভাব অনেকখানি দায়ী। পর্দায় আমরা দেখি পাত্রপাত্রীরা যেমন বাস্তবে ঘটে তেমনি বলে ও করে যাচ্ছেন। ফলে মঞ্চাভিনয়ে আমরা তাই করতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু মঞ্চ ও পর্দার পার্থক্য একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে যায়। পর্দায় যদি কোন পাত্র বা পাত্রী এমনভাবে কিছু বলেন বা করেন যা মনে হতে পারে অভিনয় অমনি খটকা লাগে। বাস্তবের নিরঙ্কুশ অনুবর্তন হচ্ছে এ ধারণা দর্শকমনে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে রক্ষা করাই সিনেমার বৈশিষ্ট্য। অপর পক্ষে থিয়েটারে গিয়ে আমরা আগাগোড়া নটনটীদের কলাকৌশল সজ্ঞানে অনুধাবন করে থাকি। মঞ্চেও পর্দার এই naturalism-এর পোষকতা যে কেউ কেউ করেন, বিশেষতঃ বাস্তবধর্মী সামাজিক নাট্যাভিনয়ে তা জানি, কিন্তু এই স্বাভাবিকতা-বাদীরাও এ সত্য মানেন যে 'to produce the effect of Naturalism actors have to act theatrically' সিনেমা-শিল্পীরা এ-তত্ত্ব খুব ভালভাবেই জানেন। অত্যন্ত নিবিড়ভাবেও যখন নায়ক-নায়িকা প্রেমালাপ করছেন, তখনও একথাটা মনে রাখা দরকার: 'you must speak up. You must be heard.'

তবে কি চিৎকার করে প্রেমালাপ করতে হবে? চিৎকারে কণ্ঠস্বরের বিস্তৃতি বাড়ানো যায় না শুধু strain-ই সার হয়। বরং যত কম strain করা যায় ততই ভাল। স্বর-নিয়ন্ত্রণের অনেক কায়দা-কানুন আছে, তার মধ্যে দুটি বিশেষভাবে পালনীয়। প্রেক্ষাগৃহের শেষ পংক্তির দর্শকদের কথা মনে রেখে কণ্ঠস্বরকে তুলে কথা বলতে হবে যাকে বলে স্বর-নিক্ষেপ (throwing the voice), দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি অক্ষর (Syllable) স্পষ্ট উচ্চারণ করতে হবে, বিশেষভাবে শেষেরটি (Articulation is the courtesy of the actor as punctuality is the courtesy of kings' — C. Coquelin.) স্পষ্ট উচ্চারণ আর জোর দেওয়া অবশ্য এক কথা নয়, শব্দ বা অক্ষর বিশেষের উপর জোর (stress) নিয়ন্ত্রিত হবে চরিত্র ও বক্তব্যের বিশিষ্টতায়।

ক্লাবের থিয়েটারে, বিশেষ করে পাত্র-পাত্রী উচ্চশিক্ষিত হলে, আর একটা জিনিস দেখা যায় সে হচ্ছে কথায় কথায় সংলাপ বানিয়ে তোলা, বা ইচ্ছামত এখানে-সেখানে পাল্টে দেওয়া। অভি-নয়ের সময়ে নিরুপায় হয়ে মাঝে মাঝে বানাতে হয় বৈকি! তাই বলে বানানো-টাই একটা কায়দা বলে গণ্য করে মহড়ার সময় থেকেই তা চালিয়ে যাওয়া মারাত্মক ভাবে দূষণীয়। আবার বলতে হচ্ছে যে বাস্তবে এবং মঞ্চে পার্থক্য আছে। বাস্তবে আমরা অনেক সময় অপূর্ণ ভগ্ন বাক্য ব্যবহার করি, গলাখাঁকারি দিই, এ সমস্ত মঞ্চে চলে না; মঞ্চে কথা বলার একটা বিশেষ সুর ও ছন্দ আছে। বইয়ের কথা আবৃত্তি করতে করতে হঠাৎ বানিয়ে বলতে গেলে সুর কেটে যায়—শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাকৃত-বাস্তবের অনধি-কার প্রবেশ ঘটে। অভিনেতা যখন Shakespeare-এর blank verse আবৃত্তি করেন তখন মনে হয়-না যে তিনি কবিতা পড়ছেন, তিনি কথা কইছেন তাই মনে হয়; তাই বলে কি অভিনেতা বাক্যের order পাল্টে দিতে পারেন? দিলে কি তৎক্ষণাৎ সুর কেটে যাবে না? সুর এবং ছন্দ রক্ষা করে কথা বানিয়ে যাওয়া গিরীশ ঘোষ বা রবীন্দ্র-নাথের মত লোকের দ্বারা সম্ভব হতে পারে, যাঁরা ছিলেন একাধারে নাট্যকার ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অন্য কারও পক্ষে তা সম্ভব নয়।

সুর নিয়ন্ত্রিত হয় চরিত্র দ্বারা এবং ভাব অনুসারে স্বরের আরোহ অবরোহ ঘটাতে হয়, এতে delivery-তে বৈচিত্র্য আসে, ভাবের প্রকাশ যথাযোগ্য ও জোরালো হয়। ছন্দ মুখ্যত মাত্রার ব্যাপার, এটিও নিয়ন্ত্রিত হাব, ভাব ও চরিত্রের দ্বারা, কখনও দ্রুত, কখনও ধীরে কথা বলা, কখনও বা বিরতি, বিরতিরও পরি-মাণ ভেদ আছে। এই সুর ও ছন্দ দুটোই কাব্য তথা শিল্পজগতের ব্যাপার—প্রাকৃত বা প্রাত্যহিক জীবন থেকে স্বতন্ত্র: অপ্রস্তুতভাবে বানিয়ে তোলা কথায় এটি নষ্ট হয় এবং বিদগ্ধ শ্রোতার মর্মপীড়ার কারণ ঘটে—'the censure of the which one must in your allowance o'er-weigh a whole theatre of others.' (Hamlet) একথা মনে রাখতে হবে যে নাট্যগ্রন্থ মঞ্চস্থ না হলেও তার একটা সাহিত্য-মূল্য আছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকারও বিশেষ যত্ন নিয়ে সংলাপ গেঁথে থাকেন, এবং গদ্যেরও যে ছন্দ আছে সে কথা আশা করি কারও অবি-দিত নেই। মঞ্চে সেই ছন্দ অভিনয়ের প্রয়োজনে আরও বিশিষ্টতা লাভ করে, এটি রক্ষা না করতে পারলে অভিনয় ব্যর্থ হতে বাধ্য। সিনেমা Script-এর সাহিত্য-মূল্য নেই, তার ছন্দ—যদি আদৌ তাকে ছন্দ বলা যায়—প্রাত্য-হিকের, নাটকীয় গদ্যের সাহিত্য-মূল্য অনেকখানি, তার ছন্দ শিল্পজগতের, মাপ ও গতি সুনির্দিষ্ট যদিও সূক্ষ্ম। বিখ্যাত সেকসপীরীয় অভিনেতা স্যার হেনরী আরভিং-এর কথা শুনুন, 'To appear to be natural, you must in reality be much broader than nature. To act on the stage as one really would in a room, would be ineffective and colour-less' আবার 'It is most important that an actor should learn that he is a figure in a picture, and that the least exaggeration destroys the harmony of the composition.' পরিমিতি বোধের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটলেই সব পণ্ড হওয়ার আশঙ্কা। নাটকীয় সংলাপে সুর থাকবে, তাই বলে গানের সুর নয়, এমনকি

আবৃত্তির (recitation)-ও নয়। প্রতিটি অক্ষরের স্পষ্ট উচ্চারণ দরকার, তাই বলে প্রতি পদে অভিধানের অনুবর্তন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। সৃষ্টি তথা চরিত্রের রূপায়ণই হল মুখ্য, তার প্রয়োজন সর্বাগ্রগণ্য।

এই সৃষ্টির প্রসঙ্গে আসার আগে আর একটি কথা বলে নিতে হচ্ছে। কোন কোন অভিনেতা বিশেষ করে যাঁরা কমিক ভূমিকা নিয়ে থাকেন তাঁদের মধ্যে মঞ্চের অন্যান্য অভিনেতাকে ঢেকে ফেলার একটা প্রবণতা দেখা যায়। যখন যিনি কথা বলছেন মঞ্চে, তখন তিনিই প্রধান, শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি যেন তখন তাঁরই উপর থাকতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, মঞ্চের কেন্দ্রীয় স্থানটিতে দাঁড়াবার সুযোগও তখন তাঁকেই দিতে হবে। যাঁরা কথা বলছেন না তাঁরা যে তখন স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকবেন তা মোটেই নয়, তাঁদের চোখে মুখে অবস্থানুযায়ী ভাবাভিব্যক্তি (expression) অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তা হওয়া চাই খুবই সংযত, সেটুকু অপরিহার্য তার চেয়ে যেন তিলার্ধও বেশি না হয় (On the stage one must be careful not to steal the scene from one's acting partner), হলেই দর্শকের দৃষ্টি আবৃত্তিকারী অভিনেতা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে তাঁর উপর পড়বে, এতে শুধু সহযোগী অভিনেতা নয়, দর্শকদের উপরও অবিচার হয়। কমিক অভিনেতাদের প্রায়ই এ ব্যাপারে অসংযত হতে দেখা যায়; এতে কতক লোক হয়ত আমোদের খোরাক পায়, কিন্তু এই বিক্ষিপ্তির ফলে অভিনয়ের অখণ্ড প্রভাব দর্শকচিত্তে মুদ্রিত হওয়ার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি হয়। আর একথা মোটেই সত্য নয় যে সহযোগী অভিনেতাদের ছাড়িয়ে যেতে পারলেই অভিনেতা হিসাবে কৃতিত্ব অর্জন করা যাবে, বরং তার উল্টো। সব দিক দিয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করে চললেই যার যেটুকু সম্ভাবনা সেটি বিকাশের পথ পরিষ্কার হয়। আবার ক্রিকেটের দৃষ্টান্ত আনা যাক্ ঃ ক্রিজে গিয়ে অল্পসময়ের মধ্যেই যদি পর পর কয়জন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যান তবে সমস্ত দলটারই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। অপর দিকে দুটি একটি খেলোয়াড় যদি ফিল্ডিং-এ গাফিলতি করে তবে অচিরে সেটি সংক্রামক হয়ে ফিল্ডিং-এর দুর্গটি খান খান করে ভেঙ্গে ফেলে। আর দলপতির নির্দেশ না মানা—ক্রিকেটে তো চলতেই পারে না। ক্রিকেটের মত নাট্যাভিনয়ও একটি Team Work। টিম স্পিরিট অবশ্য রক্ষণীয়—'A good and really talented actor finds that when the supporting cast is a match for him, he draws force and inspiration from a creative alliance with his fellow actors' — Notes of a Soviet Actor — N. Charkasov.

কোন কোন নাটক ঘরে বসে পড়ে মোটেই উপভোগ করা যায় না, যেমন ডি, এল, রায়ের শাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মঞ্চাভিনয়েও এই নাটকগুলি প্রাণ মাতিয়ে তোলে। পুঁথির চরিত্রগুলো মঞ্চে প্রাণ পেয়ে যায় তারই ফলে এই পরিবর্তন। যে সমস্ত নাটক পড়তে ভাল লাগে, সেগুলোও মঞ্চে অনেক বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠে। অভিনয়েই নাটকের পূর্ণতা ও সার্থকতা। আবার এমনও দেখা যায় কতকগুলো নাটক—রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ নাটকই এই শ্রেণীর—পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় মঞ্চে দেখে তা মেলে না, অসার্থক অভিনয়ই তার একমাত্র না হলেও মুখ্য কারণ। বিশেষ নাটকের বিশেষ চরিত্রটিকে প্রাণবান করে তোলার মধ্যেই অভিনেতার সৃষ্টিক্ষমতার প্রয়োগ ও পরীক্ষা। সৃষ্টির কোন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া কেউ বাতলে দিতে পারেন না—'Nothing is more fleeting than any traditional method of impersonation'—Irving. তবু বহু বিচক্ষণ অভিনেতা ও প্রযোজক অনেক পরামর্শ ও উপদেশ রেখে গেছেন যেগুলো প্রতিভাধরদের না হলেও সাধারণ শিল্পীর বিশেষভাবে স্মরণীয়। সৃষ্টির ব্যাপারে প্রথমেই আসে কল্পনার কথা। প্রখ্যাত অভিনেত্রী Ellen Terry বলেছেন,—'Imagination! Imagination! I put it first years ago when I was asked what qualities I thought were necessary for success on the stage.' যিনি যে চরিত্রের অভিনয় করছেন তাঁকে কল্পনার সাহায্যে সে চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হবে, বাইরে যেমন তিনি সে চরিত্রের উপযোগী পোশাক পরবেন মেক-আপ নেবেন, ভিতরে তেমনি সে চরিত্রের অবস্থা, পরিবেশ কাল প্রভৃতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাহলেই রাজপুরুষের ভূমিকায় মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের মত কথা সুর ও অঙ্গভঙ্গি আসবে না, চলা বলা কোনটারই ছন্দ অভিনেতার সাংসারিক পরিচয়ের ছাপ বহন করবে না। তবে কি অভিনেতা নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলবেন—একেবারে আত্মহারা হয়ে যাবেন? মোটেই না। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের কথা শুনুন, "লোকমুখে শুনি, আমি ভাল অভিনেতা। অনেকে বলেন,—আমার অভিনয় দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন,—এবং সময় সময় প্রশ্ন করেন,—'আপনি কি সত্য-সত্যই সীতার বিরহে রামের ভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন?' আমি তাঁহাদের বলি,—সত্য-সত্যই ভাবে অভিভূত হইলে—চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোর পরিবেষ্টনের সম্পূর্ণ সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। যে মুহূর্তে 'লবের' মুখ দেখিয়া আমি 'সীতার' কল্পনায় আত্মহারা হইয়া যাই, সেই মুহূর্তেই 'লবকে' আমার দক্ষিণ পার্শ্বে সরাইয়া নিজের মুখে ঐ পাঁচশো ওয়াট-ক্যান্ডেল-পাওয়ারের সবটুকু আলোর সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণ নিজেকে গ্রহণ করিতে হয়। আত্মহারা হইলে কি এটা সম্ভব হয়? 'সু-অভিনয়' মানে দৃশ্যপট, স্বকীয় পরিচ্ছদ, পারিপার্শ্বিক আলোক-সম্পাত,—সর্ব বিষয়ে সজাগ থাকা। এ থাকিতে না পারিলে শুধু 'ভাবাহত' হইলে 'সু-অভিনয়' করা চলে না।

"আর্ট শব্দের অর্থ হইতেছে সৃষ্টি (creation)। স্রষ্টা যদি সজাগ না থাকেন, তাহা হইলে তিনি সৃষ্টি করিবেন কি প্রকারে? প্রত্যেক সু-অভিনেতা, প্রত্যেক আর্টিস্ট শিল্পী—নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে দুইটি মানুষকে বহন করেন। একজন যিনি সৃষ্টি করেন, আর একজন যিনি সৃষ্ট হন। একজন 'বিচারক',—একজন 'কর্মী'। এই দুইয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ে সত্যকার আর্টিস্টের জন্ম। এ কথা যিনি না বুঝিবেন, তাঁহার অভিনয় করা বৃথা।" অর্থাৎ অভিনেতা সাময়িকভাবে তাঁর সাংসারিক পরিচয় ভুলে যাবেন, কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তা সজাগ থেকে সৃষ্টি অর্থাৎ চরিত্র-রূপায়ণের কাজ করে যাবে। আত্মহারা হয়ে যাওয়াটা অবাস্তব এবং হাস্যকর; প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একথা ভুলে যাওয়া কি কোন অভিনেতার পক্ষে স্বাভাবিক? অভিনেতার মনের ভাবটা অনেকটা হবে এই রকম ঃ এই যদি রাজসভা বা উপবন হয় তবে আমি 'অমুক' এই ভাবেই বলব ইত্যাদি। এই 'creative if' আসবার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা বাস্তব জীবনের স্তর থেকে অন্য এক জীবনে চলে যান, যে জীবন সম্পূর্ণভাবে তাঁর কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট। এই কল্পনায় সৃষ্ট জীবনকে আসল এবং সত্য হিসাবে গ্রহণ এবং বিশ্বাস করে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই অভিনেতা হয়ে পড়েন সৃজন-শিল্পী।" —'অভিনয়-শিল্প ও নাট্য প্রযোজনা'—অশোক সেন।

এই সৃষ্টিপ্রেরণা অবশ্য অনেকখানি নির্ভর করবে পরিবেশের উপর। পরিবেশসৃষ্টির প্রসঙ্গ এখানে তুলব না, অভিনেতা নিজে কি করতে পারেন তাই শুধু দেখব। শান্ত ধীর ভাব ও নীরবতা mood আসার অনুকূলে হয়ে থাকে। মঞ্চে প্রবেশের পূর্বে অনাবশ্যক চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে আত্মস্থভাবে পায়চারি করাই ঠিক। আমি আনন্দ উৎসাহের বিরোধী মোটেই নই, অভিনয়ে যারা আনন্দ পান না, উৎসাহ বোধ করেন না তাঁদের দ্বারা কোন চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ অসম্ভব। সমস্ত সৃষ্টির মূলেই আছে আনন্দ ও উদ্যম,

কেবল সেই আনন্দকে প্রবেগকে সংহত করে ধরে রাখতে হবে মঞ্চে গিয়ে তার সৃজনশীল প্রকাশ (creative expression) দেবার জন্যে। তারপর, মঞ্চে আলোর সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে চাই মনঃসংযোগ, অখণ্ড একাগ্রতায় নিজের কাল্পনিক ভূমিকাটিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। একদিকে জড়তা আর একদিকে আতিশয্য উভয়ই বর্জন করতে হবে। নিজেকে জাহির করার লোভ সংবরণ করতে হবে।

শান্তি ও মনঃসংযোগ সকল প্রকার সিদ্ধির পরম সহায়। ভারতীয় যোগ-দর্শনের ভিত্তি এই দুটি বস্তু। বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক স্টানিসলভস্কি আমাদের যোগশাস্ত্র থেকে মনঃসংযোগের (concentration) তত্ত্বটি গ্রহণ করেছেন। মনঃসংযোগ করতে পারলে ইচ্ছাশক্তি স্মৃতিশক্তি ভাবানুভূতি কল্পনা সবই কেন্দ্রীভূত হয় একটি মাত্র বিন্দুতে—চরিত্রের রূপায়ণে— কাজেই নিখুঁত হয় অভিনয়। শুধু তাই নয় স্টানিসলভস্কির কথায় "The concentration of the creating actor calls out the concentration of the spectator and in this manner forces him to enter into what is passing on the stage, exciting his attention, his imagination, his thinking processes and his emotion" অভিনেতা দর্শকমান শুধু ভাবই সঞ্চারিত করেন না একাগ্রতাও আনতে পারেন- অনুষ্ঠানের সফলতার পক্ষে যা অপরিহার্য।

সৃষ্টির প্রসঙ্গে আমরা এমন জায়গায় এসে পড়েছি যা সাধারণ মঞ্চাভিনয়ের পক্ষে অনেক দূরের বস্তু. এ জাতীয় থিয়েটারের মূল সমস্যা হল কারুকলা-গত। সম্ভাবনাশীল অভিনেতার মধ্যে যে সৃষ্টি প্রেরণা আসে না তা নয় যদিও আসা কঠিন কারণ উপযুক্ত পরিবেশ বিরল। সমস্ত performanceটিকে একটি artistic whole করে তুলতে হলে খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে—কোন আপাতঃ তুচ্ছ বিষয়ও তুচ্ছ নয়—যে মনোযোগ দিতে হয় তা হয়ে উঠে না. তার চেয়েও বড় অভাব বিচক্ষণ প্রযোজক ও তার প্রতি আনুগত্যের। যাই হোক প্রেরণা আসলেও সার্থক সৃষ্টি সম্ভব না হতে পারে যদি অভিনয়কলার উপযুক্ত শিক্ষা না থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু উচ্চারণ এবং সংলাপের সুর ও দৃশ্যের কথাই সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে, তাছাড়া রয়েছে মাথা, চোখ মুখ, কাঁধ, হাত, কবন্ধ, পা প্রভৃতির সঞ্চালন, হাসি-কান্না, মঞ্চে স্থান নেওয়া ও চলাফেরার রীতিনীতি। এগুলো বহু অনুশীলনে সহজ স্বাভাবিক না হয়ে আসলে প্রেরণা পেলেও সেইমত কাজ করা সম্ভব হবে না। অপর পক্ষে ওগুলোর অভ্যাসে এমন একটা স্বাচ্ছন্দ্য এসে যায় যার ফলে আর আর যা দরকার

(প্রেরণা একাগ্রতা ইত্যাদি) প্রায়ই এসে যায়। টেকনিকের গুরুত্ব তাই সব অভিজ্ঞ অভিনেতাই স্বীকার করেন। বিখ্যাত রাশিয়ান অভিনেতা N. Cherkasov লিখেছেন, 'In acting as in any other art, technique makes for perfection in form, and its mastery is therefore of the greatest importance. It is the framework on which the actor builds his role, the firm foundation on which he can always depend when in difficulty."

টেস্ট ম্যাচ আর ক্লাব tournament-এ ক্রীড়াপদ্ধতিতে যেমন মৌলিক পার্থক্য নেই, তেমনি পেশাদারী অভিনয় এবং সখের অভিনয়েও মূলগত ব্যবধান কিছু নেই। ক্লাবের খেলায় আমরা যতই টেস্ট খেলোয়াড়ের নৈপুণ্যের কাছাকাছি যেতে পারব ততই যোগ্যতর ক্রিকেটার হয়ে উঠব। তেমনি সখের অভিনয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কথা ভুলে যদি বিনয়ভাবে অভিনয়কলার পাঠগুলো গ্রহণ করি তবেই যথার্থ অভিনেতা অভিনেত্রী হয়ে উঠা সম্ভব হবে, এবং সৃষ্টির আনন্দের অধিকার অর্জন করা যাবে যা হয়ত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নাগালের বাইরে—কারণ ক্রিকেট চারু-শিল্প নয়।
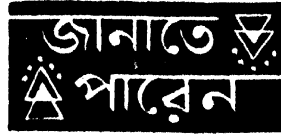
(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

'জানাতে পারেন' বিভাগটি বেশ সুন্দর। প্রশ্ন আর উত্তরের মাধ্যমে অপরিচিত, অদেখা পাঠকদের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠছে বলা যায়। আমার প্রশ্নের উত্তরটা পেলে বাধিত হব।

সাদা বরফে ঢাকা গ্রীণল্যান্ড-এর এই ভিন্নধর্মী নাম কেন? এই দেশে কোনকালে কি কোন সুসভ্য জাতি বাস করতো? কোন জাতি আর কবে?

রামায়ণ কি সত্যি?

এর কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাবে কি? নাকি এটা বাল্মিকীর কল্পনা-শক্তি মাত্র।

সুনীল মুখোপাধ্যায়,
সিলেক্টেড কারগালী কলিয়ারী
বেরমো
হাজারিবাগ।

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতের "জানাতে পারেন" বিভাগে দুটি প্রশ্ন পাঠালাম। আশা করি বিচক্ষণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে উত্তর পাব।

১। কলিকাতার হাওড়া ব্রিজের কোন নক্সা কি বর্তমানে আমাদের দেশে আছে? থাকলে সেটা কার কাছে আছে?

২। ভারতে মোট কতগুলি ভাষা আছে? এবং সমগ্র পৃথিবীতে মোট কতগুলি ভাষা আছে? ভারতে কে সবথেকে বেশী ভাষা জানেন? এবং সমগ্র পৃথিবীর ভেতর কে সবথেকে বেশী ভাষা জানেন?

শ্রীদেবাশীষ রায়। নৈনিতাল।

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতে "জানাতে পারেন" বিভাগের জন্য দুটি প্রশ্ন পাঠালাম। উত্তর পেলে উপকৃত হব।

১। আইনজীবিগণ কোর্টে কালো রংয়ের কোট ব্যবহার করেন কেন? এর কোন বিশেষ কারণ আছে কি? যদি থাকে তবে তা কি?

২। জজ-সাহেব মামলা পরিচালনার সময় মাথায় যে বিশেষ ধরণের পোশাকটি (টুপি জাতীয়) ব্যবহার করেন তার তাৎপর্যই বা কি? কোন দেশে সর্বপ্রথম এর প্রচলন হয়?

মধুমিতা গুপ্ত,
পোঃ—বংগাইগাঁও, আসাম।

সবিনয় নিবেদন,

জানাতে পারেন বিভাগটি মারফৎ আজ পর্যন্ত যত অজানা প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি তা বোধহয় কোনো বইতে নেই।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর বেতন কত?

জানাতে পারেন বিভাগে প্রশ্ন ও উত্তরের নীচে ঠিকানা থাকে কেন?

গোবিন্দচন্দ্র হালদার
গ্রাম—সুন্দরনগর
পোঃ বাদুড়িয়া
জেলাঃ ২৪ পরগণা

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ৪ঠা অক্টোবর সংখ্যা অমৃতের জানাতে পারেন বিভাগে লেখা শ্রীমুকুন্দমোহন রায়-এর প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি:

"There does not exist in the world any one who is a donor like the miser who gives away his riches to others without enjoying them at all"

যেমন ধরুন, পৃথিবীতে দাতা বলে যাঁদেরই সুখ্যাতি আছে তাঁরা তাঁদের ধনসম্পদ পরকে দেবার সময় মুক্ত-হস্ত হন, তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু সেইসংগে তাঁরা অল্প হ'ক বা বেশীই হ'ক—তাঁদের সম্পত্তির খানিকটা অংশ নিজেরাও দরকার মতন ভোগ করেন। এইভাবেই দান ও ভোগের দ্বারা তাঁদের সম্পদ সার্থকতা লাভ করে।

কিন্তু কৃপণ যাবজ্জীবন তার সম্পদ সাধ্যানুযায়ী বাড়িয়েই যায়, এই সম্পদের ক্ষুদ্রতম অংশও সে নিজে ভোগ করে না এই ভয়ে যে, তা হ'লে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ কমে যাবে। বস্তুতঃ নিজের সম্পত্তি ভোগ করার কথা সে ভাবতেই পারে না। তা ভাবা যেন তার কাছে একেবারেই কল্পনাতীত।

কিন্তু বিধির বিধানের জন্য অন্য সকলের মত কৃপণেরও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। একদিন তাকে তার সঞ্চিত সমস্ত সম্পত্তিই এই ইহজগতে ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। তখন তার পুত্র বা অন্য কোন আত্মীয়ই সেই সম্পত্তি লাভ করবে; যার কণামাত্র অংশও এই বিশাল সম্পদের অধিকারী সেই পরলোকগত কৃপণের ভোগে লাগেনি।

সুতরাং, কৃপণ তার যাবতীয় সম্পত্তিই অপূর্ব বদান্যতার সংগে তার উত্তরাধিকারীকে দান করে যায়।

এইজনাই সংস্কৃত শ্লোকে আছে—
"কৃপণেন সমঃদাতা ভুবি কঃ অপি ন বিদ্যতে।"

শ্রীনন্দকুমার চক্রবর্তী
৬৩, রায় বাহাদুর রোড
কলিকাতা—৩৪

※ প্রদর্শনী ※

কলারসিক

।। শ্রীমতী নীপা চৌধুরীর প্রদর্শনী ।।

আজ আমাদের প্রথম আলোচ্য শিল্পী শ্রীমতী নীপা চৌধুরী। গত ২৮শে নভেম্বর আর্টিস্ট্রি হাউসে এঁর পঁয়ত্রিশখানি চিত্রকলার নিদর্শন দেখার সুযোগ ঘটেছিল। আমরা ইতিপূর্বে শ্রীমতী চৌধুরীর চিত্রকলা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। কিন্তু সেগুলির পটভূমি ছিল দেশজ প্রকৃতি এবং নর-নারী। এবার শ্রীমতী চৌধুরী তাঁর ইওরোপ-আমেরিকার অভিজ্ঞতা এবং সম্পূর্ণ বিদেশী পটভূমিকে কেন্দ্র করে তাঁর চিত্রকলা রচনা করেছেন। অধিকাংশ চিত্রের বিষয়বস্তু নর-নারীর প্রতিকৃতি কিংবা ইওরোপীয় নিসর্গ দৃশ্য। নিসর্গ চিত্রে শ্রীমতী চৌধুরী বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিকৃতি চিত্রগুলির মধ্যে বেশ কয়েকখানি প্রাণবন্ত বলে মনে হল। নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে 'গ্রীষ্ম' (৪), 'ডিসেম্বর' (১৪), 'মধ্য-পশ্চিমে শীত' (১৫), 'ইয়েলো সেল' (২৩) প্রভৃতি চিত্র নিঃসন্দেহে শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর-দীপ্ত। এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্র বোধহয় 'গ্র্যান্ড ক্যানাল' (৩১)। এই চিত্রের উজ্জ্বল-সমুজ্জ্বল রঙের বর্ণসম্পাত, উপরের সেতু ও জলের মধ্যে ব্যবধান রচনার চমৎকার কৌশল এবং সামগ্রিক চিত্রের সংস্থাপন শ্রীমতী চৌধুরীর ক্ষমতার পরিচায়ক। প্রতিকৃতি চিত্রের মধ্যে ১নং চিত্রখানি দর্শকদের ভাল লাগবে বোধহয়। শ্রীমতী চৌধুরীকে জানাই আমাদের অভিনন্দন।

শিল্পী অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর প্রদর্শনী

শিল্পী অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর নাম কলকাতার শিল্পরসিক মানুষের কাছে মোটামুটি পরিচিত। ইতিপূর্বে তাঁর একাধিক প্রদর্শনী দেখার সুযোগ ঘটেছে। এবারকার প্রদর্শনী দেখে আমরা অনায়াসে বলতে পারি শ্রীমতী রায়চৌধুরী এক জায়গায় থেমে নেই। তাঁর নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব প্রকাশেও অনেকখানি সফল হয়েছেন। তাঁর বিষয় নির্বাচন এবং আঙ্গিকগত উপকরণের মধ্যেও এবার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল।

শ্রীমতী রায়চৌধুরীর চিত্রজগতের প্রধান বক্তব্য, মনে হল, এক রহস্যময় অন্তর্জগতকে আবিষ্কার করার মধ্যে নিহিত। তাঁর প্রদর্শিত একুশখানি চিত্র ভিন্ন নামে অভিহিত হলেও সমগ্র চিত্রের অন্বিষ্ট বোধহয় সেই এক রহস্যময় অন্তর্জগত। ফলে তাঁর অধিকাংশ চিত্রের জমিন এমনভাবে গঠিত হয়েছে যার চারপাশে ঘন বর্ণের সম্পাত কিন্তু মাঝখানে নানা গাঢ় বর্ণের আবরণ ভেদ করে এক রহস্যময় উজ্জ্বলতার চমৎকার প্রকাশ। আর ঠিক সেই উজ্জ্বলতার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কোন নর কিংবা নারীর বিমূর্ত মূর্তি। প্রত্যেকটি মূর্তিই আদিম ভাস্কর্যকলার স্মারক। শিল্পী রায়চৌধুরী কোন জ্যামিতিক পদ্ধতির আশ্রয় না নিয়ে সমগ্র চিত্রপটে প্রয়োজনমত নানা বর্ণের রঙ চাপিয়ে ড্রাই ব্রাশের

শিল্পী : অরুন্ধতী রায়চৌধুরী

সাহায্যে রঙের ঔজ্জ্বল্য এমনভাবে বের করে এনেছেন যাতে চিত্রের কোন এক অংশ নয় সমগ্র চিত্রপটের পরিসরে দৃষ্টি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াবে। এই সামগ্রিক চিত্রময়তাই শ্রীমতী রায়চৌধুরী এবার আমাদের উপহার দিতে চেষ্টা করেছেন।

অবশ্য তাঁর প্রত্যেকটি চিত্রই যে সমান উপভোগ্য এ-কথা মনে করার কারণ নেই। বরং তাঁর কয়েকখানি চিত্র একটু যেন বেশী কাব্যিক এবং নাটকীয়তায় আচ্ছন্ন। যেমন তাঁর 'প্রেম' (১৪) চিত্রখানির একপাশে ঘন-নীল, সবুজ ও কালো রঙের জমিন অন্যপাশে লাল, হলুদ, কালো ও নীলের ঈষৎ বর্ণপ্রয়োগে

শিল্পী : নীপা চৌধুরী

ঘোরানো সিঁড়ির উপরে দণ্ডায়মান নর-নারীর আলিঙ্গনাবদ্ধ রূপ একটু যেন কাব্যিক এবং নাটকীয়তার রস-সিঞ্চিত। কিংবা 'দুটি হৃদয়' (১০) নামক চিত্রের দুপাশের কালো রঙের শীর্ষচূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা দুটি বিমূর্ত মূর্তি একই নাটকীয়তাকে প্রকাশ করেছে বলে আমার ধারণা। এ-সব সত্ত্বেও তাঁর চিত্র দৃষ্টি-সুখকর। বিশেষ করে তাঁর 'বসন্ত' (২) চিত্রের নৃত্যরত মূর্তির কম্পোজিশান, এবং ১১, ১২, ১৩, ১৬ চিত্রের রঙ-প্রয়োগপদ্ধতি সত্যিই সুন্দর। শিল্পী অরুন্ধতী রায়চৌধুরীকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

শিল্পী সুধী চট্টোপাধ্যায়ের প্রদর্শনী

দীর্ঘকাল ইওরোপবাসের পর শিল্পী চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় ফিরে এসে যে চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন কয়েকটি কারণে তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ শিল্পী ইওরোপীয় চিত্রকলার নানা আঙ্গিক ও রীতি-নীতি আয়ত্ত করা সত্ত্বেও তাঁর চিত্রে ভারতীয় সত্তা সাড়ম্বরে উপস্থিত। দ্বিতীয়তঃ শিল্পী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পরীতির সমন্বিতরূপ তাঁর অনেকগুলি চিত্রে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তৃতীয়তঃ এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত তাঁর সাম্প্রতিককালে অঙ্কিত কয়েকখানি স্কেচ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি তিনি রাজপুত, মোগল ও লোকায়ত চিত্রকলার মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ শিল্প-রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে উৎসুক। এইসব কারণে শিল্পী চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তী চিত্র-প্রদর্শনী দেখার জন্য শিল্পরসিক ব্যক্তিরা যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

শিল্পী চট্টোপাধ্যায়ের প্রদর্শিত চৌত্রিশখানি চিত্রের মধ্যে ছাব্বিশখানির মাধ্যম তেল-রঙ, বাকী আটখানি কালি-কলমে অঙ্কিত স্কেচ। বাঙলার লোক-শিল্পের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেই শিল্পী চট্টোপাধ্যায়ের বাঙালী নারীর

দেহাবয়বগুলি অঙ্কিত। এইসব চিত্রের বঙ্কিম ছন্দিত রেখা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির একটু অস্বাভাবিক বিবর্ধন সত্যিই সুন্দর। তাঁর তেল-রঙে অঙ্কিত 'কেশ-প্রসাধন' (৪) এবং ৩০, ৩২ ও ৩৪নং স্কেচগুলি এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তাঁর তেল-রঙে অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্রের নর-নারীর দেহাবয়ব, বিশেষ করে গলার ঊর্ধাংশ এমন লম্বাটে ধরণের যার মধ্যে ইওরোপের প্রখ্যাত শিল্পী মদিগ্লিয়ানের প্রভাব খুব স্পষ্ট। কিন্তু শিল্পী চট্টোপাধ্যায় তাঁর অন্য চিত্রের চমৎকার কম্পোজিশান ও রঙ-প্রয়োগের মধ্যে নিজস্ব দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে 'প্রদোষ' (১), 'লজ্জাবতী' (৩), 'পারিবারিক বৃত্ত' (৬) ও 'একটি নারীর প্রতিকৃতি' (১৫) কিংবা 'নিমন্ত্রণ সভায়' (২১) নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর সমস্ত চিত্রে ড্রাই ব্রাশের টানে এমন চমৎকার জমিন সৃষ্টি হয়েছে যা সত্যিই মুগ্ধকর। আলোচ্য চারজন শিল্পীর মধ্যে শ্রীসুধী চট্টোপাধ্যায় বলিষ্ঠতম শিল্পী। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি আমাদের আরও সুন্দরতর চিত্রকলা উপহার দেবেন। আমরা শিল্পীকে অভিনন্দিত করি।

।। শিল্পী সরিৎ নন্দীর প্রদর্শনী ।।

শিল্পী সরিৎ নন্দী খড়্গপুরের কারিগরী মহাবিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কলকাতায় এই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। কিন্তু এই প্রথম প্রদর্শনীতেই শিল্পী হিসাবে তিনি তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। মূলতঃ ভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যাপুষ্ট শিল্পী নন্দীর মন। বাঙলার লোকশিল্পও তাঁর মনকে যে আকর্ষণ করেছে এমন দৃষ্টান্ত এই প্রদর্শনীর কয়েকখানি চিত্র থেকে অনায়াসে তুলে ধরা যায়। আধুনিক বিমূর্তরীতির সর্বগ্রাসী প্রভাব এড়িয়ে শিল্পী নন্দী জলরঙ, প্যাস্টেল এবং তেলরঙের মাধ্যমে যে-সব চিত্র অংকন করেছেন তার মধ্যে চিত্র-সংস্থাপনের কৌশল, রৈখিক-চেতনা এবং রঙপ্রয়োগপদ্ধতির নৈপুণ্যে দর্শকেরা খুঁজে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য শিল্পী নন্দীর বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব নেই কিন্তু ভারতীয় চিত্ররীতিকে তিনি কোন কোন চিত্রে নিজস্ব ভঙ্গীতে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন, তিনি জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রে এমনভাবে রঙ প্রয়োগ করেছেন এবং সেই রঙ ছুরি দিয়ে কেটে কেটে এমন এফেক্ট সৃষ্টি করেছেন যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। জলরঙের মাধ্যমে অংকিত ৪, ৫, ১৬ ও ২০ নং চিত্রের সংস্থাপন, রঙ আর রেখার সমন্বয় আমাদের ভাল লেগেছে। প্যাস্টেলে অঙ্কিত ৩১নং নিসর্গ দৃশ্যটিও সুন্দর। শিল্পী নন্দীর তেলরঙের কাজে খুব বেশি নতুনত্ব নেই।

শিল্পী : সুধী চ্যাটার্জি

শিল্পী : সরিৎ নন্দী

প্রবচন

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

লেকখরাই যে কেবল সাহিত্য রচনায় অলঙ্কার ব্যবহার করেন, তা মোটেই ঠিক নয়। নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত লোকসাধারণ তাদের রোজকার কাজ-চালাবার কথ্য ভাষায় অলঙ্কার কিছু কম ব্যবহার করে না। তবে সাহিত্যিক ও সাধারণের ভাষায় ব্যবহৃত অলঙ্কারের রূপ ও চরিত্র একরকম নয়। লোকসাধারণের চলতি মৌখিক কথায় একটি নিজস্ব বাগ্‌ধারা আছে। মৌখিক কথার একটি বিশেষ সুর বা টানও থাকে। এই টান ও তানের জন্যই চলতি ভাষায় বেগ বা দ্যুতি থাকে। এছাড়া লোকসাধারণের সংলাপে প্রবাদ ও প্রবচনমূলক বাক্য বা বাক্যাংশের প্রয়োগ ঐ ভাষাকে একটি বিশিষ্টতা (Style) দেয়। সমৃদ্ধ একটি ভাষার অন্তর্গত উপভাষা ও বিভাষাগুলিরও স্ব-স্ব প্রবাদ ও প্রবচনমূলক অলঙ্কার থাকে। আঞ্চলিক শ্রুতিমধুর প্রবচনে বাংলা ভাষা খুবই সমৃদ্ধ। ডঃ সুশীলকুমার দে বাংলা উপভাষাগুলির প্রবাদ ও প্রবচনসমূহের সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও এখনো বহু প্রবচন বাইরে রয়ে গেছে। এখানে এ রকম কিছু বাগ্‌ধারা, প্রবাদ ও প্রবচনের দৃষ্টান্ত পরিবেশন করা হল। এগুলি পূর্ববাংলার বরিশাল অঞ্চলে প্রচলিত ছিল

শীতকালে শীত কাটা
গ্রীষ্মকালে ঘামাচি।

কোন্‌কালে আছিলা বধূ
তুমি রূপসী।

—কথাটি শাশুড়ি বলছেন বউমাকে। বউমা সুন্দরী নন। কিন্তু নিজেকে কুচ্ছিত মেনে নিতে কেই-বা চায়? নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা হওয়ার মতো নিজের রূপের অভাবের জন্য বধূ তাই সময়কে দায়ী করে নানা অজুহাত দেখায়। এখন শীতের দিন, গায়ে কাটা (দাগ) ফুটেছে, তাই কুচ্ছিত দেখচ্ছ; এখন গরমের দিন, সারা গায়ে-মুখে ঘামাচি উঠেছে, তাই আর সুন্দর দেখাবে কি করে;—বধূ একটা না একটা অজুহাত দেখাচ্ছে। এই ধরণের চরিত্রের সম্ভাবনা থেকে এই ছড়াটির প্রয়োগগত অর্থ দাঁড়িয়েছে—বারো মাসই একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে নিজের অকর্মণ্যতা বা অপদার্থতা অস্বীকার করার চেষ্টা।

একে তো সোনার গা।
তায় আবার পোলার মা!

এই সেদিনও মনে করা হত—মেয়েদের জীবনের কাম্য দুটি মাত্র বস্তু—রূপ আর পুত্রসন্তান। সুতরাং যে মেয়ের এ দুটি আছে তার দেমাকের শেষ থাকে না। সোনায় সোহাগা হলে যে রকমের সর্বোত্তম হয়, মেয়েদের কাছে সোনার গা (রূপ) আর পোলার মা (পুত্র) হতে পারা সেই রকম। ঈর্ষান্বিত প্রতিবেশিনীরা ঠেস দিয়ে অথবা পুত্রবধূগৌরবে শাশুড়ি-মাতা স্নেহতরল-পরিহাসচ্ছলে বধূর দেমাকের প্রতি ইঙ্গিত করছেন। পুরুষের ক্ষেত্রেও এটি প্রয়োগ করা যায়। ছেলে বা জামাই একাধারে বিদ্বান ও রূপবান বা ধনী হলে প্রতিবেশী বা আত্মীয়রা এ রকম সামান্য শ্লেষ-মেশান পরিহাসবাক্য ব্যবহার করতে পারেন।

আমার প্যাডেন ছাও (পেটের ছেলে)
আমারে খাইতে চাও—

মায়ের চেয়ে ছেলের মনের খবর বেশী আর কারোরই জানবার কথা নয়। মায়ের কাছে ছেলে কোন কিছু গোপন করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে মা বা মায়ের-মতোরা ছেলে বা ছেলের-মতোদের কৌতুকোচ্ছলভাবে এই উক্তিটি শুনিয়ে থাকেন। গুরুজন-স্থানীয়ের কাছে লুকোচুরি করতে গিয়ে বা টেক্কা দিতে গিয়ে ধরা পড়তেই হয়—এই হল প্রবচনটির তাৎপর্য।

রামদাসের মা,
কথার লাবণ্য জান, কাম জান না!
অথবা, কামে কুইর‍্যা,
ভোজনে দেইর‍্যা (ওস্তাদ)
বচনে মারে পুইর‍্যা।—

দুইই প্রবচনই প্রায় সমার্থক,—তফাৎ শুধু,—প্রথমটিতে অপদার্থ অকর্মণ্য ব্যক্তিটির কথায় অন্ততঃ বিনয় নম্রতা ও মিষ্টতা থাকে, শেষেরটির বেলায় তাও থাকে না। যে লোক অকর্মণ্য অথচ যাদের উপর সে নির্ভরশীল সেই পরিজনদের উপরই মেজাজ দেখায় ও রূঢ় কথা শোনায়, তেমন লোককে তিরস্কার করার জন্য দ্বিতীয়টি বলা হয়। আর প্রথমটি প্রায় অনুরূপ ক্ষেত্রে তিরস্কারের সঙ্গে স্নেহের প্রলেপ দিয়ে বলা হয়েছে।

ছাতা খাও, পাতা খাও, ভাতের সমান না।
পরের মারে মা ডাকলে মায়ের সমান না!

বাঙালী ছেলের রুটি, মাংস, পোলাও কোর্মা যতই খাওয়া হোক, ভাত মুখে না দিলে মনে হয় উপোস করে আছে। এরই উপমা দিয়ে বাঙালী ছেলের জীবনে মায়ের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে। অনাত্মীয়ের সঙ্গে যতই আত্মীয়তা পাতাও, নিজের আত্মীয়ের মতো হবে না।—কেননা পাতান আত্মীয়তা কৃত্রিম। প্রবচনটি দেশমাতৃকার ব্যাপারেও খাটবে। যারা অন্য দেশের জিনিসের সমাদর করে আপন করতে চায় (যেমন রেস্তোরাঁর খানা খেয়ে বাড়ী ফিরে আর ভাত খেতে চায় না) তাদের উদ্দেশেও প্রবচনটি প্রয়োগ করা হয়।

দুদিনের বৈরাগী, ভাতেরে কয় পেসাদ (প্রসাদ)।—

অকালপক্ক বিজ্ঞতাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে। নতুন সন্ন্যাসীর ভক্তির বাড়াবাড়ির দৃষ্টান্ত দিয়ে অপরিণত বিজ্ঞতার প্রকাশকে গুরুজনেরা এই উক্তি দিয়ে তীক্ষ্ণ তিরস্কার করে দমিয়ে দিতে চান। বিশেষ করে একালের তরুণ-তরুণী বা কিশোর-কিশোরীরা রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে আধুনিকতার নামে যখন তর্ক করে, রক্ষণশীল বয়স্ক গুরুজন তখন এই শ্লেষ প্রয়োগ করে তাদের একেবারেই তাচ্ছিল্য করেন।

'মরে বুড়ি, খুদের হাঁড়ি ছাড়ে না'—
কৃপণতা বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

ফুটানির রামা,
মুড়ে (কোমরে) লেংটি
উপরে জামা—'

গরীবের বাবুয়ানা বা চালিয়াতিকে পরিহাস করা হয়েছে।

আহালি লো আহালি
কত রঙ্গ দেহালি,
অম্বলে দিলি আদা—

নতুন কিছু করতে গিয়ে কখন কখন গ্রামবাসী বা আত্মীয়দের পরিহাসভাজন হতে হয়। তখন কপালে এই উক্তিটি জুটতে পারে।

লেখতে পড়তে কইও না,
হহরগা কিন্তু বাচপে না।
খাইবে দাইবে দিবে ফাল,
বাইচকা থাকপে চিরকাল।।

ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করতে চায় না—বই নিয়ে বসতে বললেই ওদের গায়ে জ্বর আসে। খাও-দাও, লাফ-ঝাঁপ মেরে খেলে বেড়াতে দাও—বাছারা দিব্যি থাকবেন—একেবারে নীরোগ। এদের মনোভাবকেই মা-ঠাকুমা অতি-মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে উদ্দিষ্ট শিশুদের আমোদ দেওয়ার জন্য ছড়া কেটে বলছেন।

'যার যা কর্ম নয়,
স্যাখে (মুসলমানে) ব্যাচে ত্যাল।'—

মুসলমানরা কি তেলের ব্যবসা চালাতে পারে? পারবে কি করে—সব তেল তো তারা লম্বা দাড়িতে মেখেই ফুরিয়ে ফেলবে,—ব্যবসা লাটে উঠবে দুদিনেই। মুসলমানদের দাড়ি রাখার দিকে হিন্দুরে এই পরিহাসকৌতুক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবচনটির উদ্ভব। অযোগ্যের দ্বারা কোন কাজ করানকে উপহাস করা হয়েছে।

'বৈরাগীরে নিতেও পাঁচসিকা,
দিতেও পাঁচসিকা'—

যে ব্যাপারে উভয়তঃ বা আগাগোড়াই অর্থব্যয় বা লোকসান। প্রবচনটির উদ্ভবের পিছনে রয়েছে মেয়ের বিয়ের ব্যাপার। মেয়ে বিয়ে দিয়ে জামাই আনতে বিস্তর খরচ হয়। আবার বিয়ের পরও সেই জামাই-এর জন্য আজ জামাইষষ্ঠী, কাল দুর্গাপুজোয় তত্ত্ব পাঠান বাবদ ব্যয় করতেই হয়।

টাকাও দিলাম আশী,
বউও পাইলাম দাসী,—

আগের দিনে অকুলীনদের টাকা দিয়ে মেয়ে কিনে বিয়ে করতে হত। এই গেল প্রবচনটির উৎপত্তির সামাজিক পটভূমি। অর্থব্যয় করেও মনের মতো জিনিস না পেলে মনের খেদস্বরূপ উক্তিটি ব্যবহার করা যায়।

মার পোড়ে না, পোড়ে মাসী,
ঝাল খাইয়া পোড়ে পাড়াপড়শী—

মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশী বলে যে প্রবচন পশ্চিম বাংলায় আছে। এটি তারই অন্য রূপ—তবে বিদ্রূপের তীব্রতা এখানে বেশী। অনাত্মীয়ের উদ্দেশ্যপূর্ণ দরদ বা মাথাব্যথা দেখানকে উপহাস করা হয়েছে।

রাজার বাড়ীর পাঁচটা পুত,
একটা ছাগল, একটা ভূত—

বড় পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এক একজনের এক এক রকম স্বভাব-চরিত্র, রুচি-রোজগার, আদব-কায়দা, পছন্দ-অপছন্দ। কিন্তু কোনজনই তেমন গুণী নয় অথচ প্রত্যেকেরই এক একটি বাতিক, আবদার বা খেয়াল আছে। মা-বাপের এতগুলি সন্তানের এই এত রকম বায়নাক্কা মানতে বা এদের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে গলদঘর্ম হতে হয়। তখন কোন একটা উপলক্ষ্যে মা বা বাবা এই স্বগতোক্তি দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন।

উপরে যে প্রবচনমূলক ছড়াগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তার প্রত্যেকটির মধ্যেই সামাজিক দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যাবে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এই সব ছড়ায় আমাদের পারিবারিক জীবনের অন্তঃসলিলা রসবোধটির পরিচয় মেলে। ফরোয়া কথা-বার্তায় মা-মাসী-পিসী-ঠাকুমা-দিদিমারা এই যে সংলাপগুলি দিয়ে থাকেন, এর মধ্যেই রয়েছে বাঙালীর গৃহজীবনের মাধুর্য। রসবোধ জিনিসটা যে সেকেলে মানুষগুলিকে সঞ্জীবিত রেখেছিল, কথায় কথায় ছড়া কাটা আর প্রবচনমূলক বাক্য ব্যবহারের এই বাগ্‌ধারাটিই তার যথেষ্ট প্রমাণ হয়ে আছে। এখানে যে প্রাবচনিক ছড়াগুলি আলোচনা করা হয়েছে তার প্রায় সবকটিই মেয়েলী—মা-ঠাকুমার বুলি। পুরুষমানুষের নিজস্ব বুলিও আছে। অবশ্য কিছু বুলি মেয়ে-পুরুষ উভয়ের মুখেই মানায়।

ছড়া, বাক্য ও বাক্যাংশ (Phrase) ছাড়া এমন এক একটি শব্দও আছে যা এক একটি প্রবচনের কাজ করে থাকে। একটিমাত্র কথার মধ্যে একটি পুরো ছোট গল্প বা গল্পের নক্সা প্রচ্ছন্ন থাকতেও দেখা যায়। একটি নাতিদীর্ঘ ছড়ার মধ্যে একটি মজার রূপকথা বা উপকথা ধরণের গল্প তো হামেশাই পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্ত দিই :

'ওরে আমার ঠাকুর রে,
একটা খাইয়া বাঁচো রে।'—

গল্পটা বলি—

এক ছিল বুড়ী; যেমন হ্যাংলা, তেমনি পেটুক। তার যে বুড়ো ছিল, তাকে সে খেতেও দিত না। দেবে কেমন করে; যা রান্না করে, নিজের খেয়ে পেট ভরে না। এদিকে না-খেতে পেয়ে পেয়ে বুড়ো তো মর-মর। শেষে বুড়ো মনের দুঃখে ঠিক করলে—দুত্তোর, কি হবে এমনি করে কটা দিন বেঁচে, আজই সে বরং মরে ঝামেলা চুকিয়ে দেবে। এই ভেবে সে এসে শুয়ে রইল, বুড়ীকে বলল যে আজই সে মরছে। বুড়ী সেদিন আবার পিঠা বানিয়েছে। বুড়ো সত্যি সত্যি মরছে দেখে, কি আর করবে, বিধবা হবার ভয়টা তো আছে, ওদিকে বুড়োকে পিঠার ভাগ দিতেও প্রাণে সয় না—অনেক কষ্টে শেষে সে তার পিঠার ঝুড়ি থেকে একটামাত্র পোড়া পিঠে তুলে নিয়ে তার মুখের সামনে রেখে মরমর বুড়োকে ঠেলে ঠেলে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—'ওরে আমার ঠাকুর রে, একটা খাইয়া বাঁচোরে।'

গল্পটা এখানেই শেষ হয়েছে। মুখের কাছে বিয়ের পর এই প্রথম বউ-এর হাত থেকে এক টুকরো মিষ্টি পিঠে পেয়ে মরতে মরতেও বুড়ো চাঙ্গা হয়ে উঠে বসেছিল কিনা গল্পে সে কথা আর বলা হয়নি—খাঁটি ছোটগল্পের ধর্মরক্ষা করে সমাপ্তিটা অসমাপ্ত রেখেছে।

এখন এই ছড়াটির ব্যবহার কোথায় হতে পারে দেখা যাক। বাড়ীর ছেলে-পিলেদের কারও হয়ত অসুখ-বিসুখ করেছে বা আর কোন কারণে সে খাবার-দাবার চেয়ে পায়নি। তাই রাগ, অভিমান করে মনের দুঃখে শুয়ে আছে—ভাবখানা যেন,—দুত্তোর, বাঁচবেই না আর। মা-পিসীরা এসে তখন খাবারটির অংশ একটু এনে তার খোসামুদি করছে—আসলে কৌতুক করে মান ভাঙাচ্ছে—'আমার ঠাকুর, ঠাকুররে, একটা খাইয়া বাঁচোরে।'

সব শেষে একটিমাত্র শব্দ (নাম) কিভাবে একটি গল্পের তাৎপর্য বহন করতে পারে তারই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের একটি নাম — গদাধরচন্দ্র। 'গদাধরচন্দ্র' নামটি এখন প্রবচনে পরিণত হয়েছে—ঐ নামটি উচ্চারণমাত্র বাঙালীর কাছে বোকা অথচ শয়তান মানুষের চরিত্রটি ফুটে ওঠে। 'গদাধরচন্দ্র' নামের পিছনে এককালের বাঙালী হৃদয়-বিজয়ী একখানি উপন্যাসের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু 'চন্দরি' বা 'চন্দইরগা' নাম-প্রবচনটির উদ্ভবের পিছনে এমন কোন ঐতিহ্য নেই। 'চন্দরি' নাম-প্রবচনের উৎস নিতান্তই বরিশাল জেলার একটি বিশেষ জনপদের কোন নাম-না-জানা গ্রাম্য মানুষের রসবোধ। 'অমুকে' একটি 'চন্দরি' বলামাত্র বরিশালের মানুষ তৎক্ষণাৎ বুঝে নেবে—উদ্দিষ্ট লোকটি একটি বদ্ধ জড়বুদ্ধি নির্বোধ। গল্পটি বলি :

ছেলেটির নাম গোবর্ধন। রংটি ফুটফুটে; মুখটি গোলগাল; নাকটি টিকালো, চোখ দুটি বড়-সড়। ভারি সুন্দর ছেলেটি—রাজপুত্তুরের মতো—কিন্তু তাকে দেখলেই হাসি পায়—নাক-চোখ-মুখ সব নিখুঁত হলে কি হবে, তবু তাকে দেখলে সুন্দর মনে হয় না। এই না-হওয়ার একমাত্র কারণ—গোবর্ধনের মুখখানি বোকা-বোকা হাসিতে মাখামাখি—সারা মুখে কেমন এক নির্বোধের ভাব লেগে আছে।

গোবর্ধনের মা মরেছে। গ্রামের সবাই হরিবোল দিয়ে তাকে শ্মশানে নিয়ে এসেছে। গোবর্ধনও এসেছে। তার মুখে সেই বোকা হাসিটি ঠিক লেগেই আছে। বাড়ীর আর সব ছেলেমেয়ে কান্নাকাটি করছে, গোবর্ধন শুধু হাসছে। তার মাকে সবাই মিলে সাজিয়ে-গুছিয়ে, কাঁধে চাপিয়ে হরিবোল দিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে এখানে এনেছে, এতে সে ভারি একটা আমোদ পাচ্ছে। চিতা সাজান হল। গোবর্ধন সব দেখল, এর পর একজন কেউ তার হাতে একটা জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে যখন মায়ের মুখাগ্নি করতে বলল, তখন সে হেসেই বাঁচে না। কাঠটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে গোবর্ধন খালি বলল—'ধোৎ, মার মুখে আগুন দিলে পুড়ে যাবে যে—লাগবে না বুঝি?—ফোসকা পড়বে!'

মার মৃত্যুর পর। গোবর্ধন একদিন একটা বাগানের মধ্যে একলাই ঘুরে বেড়াতে গেছে। হয়ত ফড়িং ধরছে বা জাম খুঁজছে। এদিকে সন্ধ্যা গড়িয়ে অনেকক্ষণ হল রাত নেমে এসেছে। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। তারা ঝিকমিক করছে। চাঁদও উঠেছে, বাড়ীর সবাই ভেবে অস্থির—গোবরা কোথায় গেল? তার বাপ তখন খুঁজতে খুঁজতে সেই বাগানের মধ্যে এসে হাজির হল। দেখল, গোবর্ধন একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে কি খাচ্ছে। বাপ ডাক দিল—'ও গোবরা, বাড়ী আসবি না, কত রাত্তির হয়েছে দেখেছিস?'

গোবর্ধন উঠে দাঁড়িয়ে, বাপের কাছে এগিয়ে এসে চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখে দেখে খুব আদুরে-আদুরে গলায় বলল—'কই বাবা, রাত্তির কই?'

গোবর্ধনের বয়স তেইশ।

বড় ভয় করে। তুমি যেও না।

কারণ, আজ এ দুর্যোগের রাত্রে এখানে আমি বড় একা।

দিগন্ত ছাপিয়ে কানায় কানায় ভরে উঠেছে মাতাল বাতাস। কচি কচি ধানের চারাগুলো লুটোপুটি খাচ্ছে তেপান্তরের বুকে। সাঁই সাঁই ঘূর্ণিতে টলোমলো পৃথিবী। বৃষ্টি নেই। শুধু শুকনো ঝড়। চারপাশের অরণ্য তার বংশ ছিটিয়ে দিয়েছে আমার এ পুরানো ঘরের ফাটলে। নিরালা চার দেওয়ালের কোণে কোণে বাতাস ধাক্কা খেয়ে খেয়ে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে। একা আমার দম আটকে আসবে। তুমি যেও না। বড় ভয় করে।

আমি জানি না; কবে, কখন আর কেমন করে আমি এখানে এসেছি। যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখলাম চারপাশে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। সেই আকাশের কিনারা থেকে মাটির কোল পর্যন্ত এতটুকু আলোর নিশানা নেই। আমি অবাক হলাম, আশ্চর্য, ঈশ্বরের পৃথিবী এত কালো! ভয়ে আমি হাঁটু গেড়ে সত্যযুগের ঋষিদের মত ধ্যানে বসলাম। প্রার্থনা জানালাম,—হে চির আশা, আলো দাও। খানিকটা দাউ দাউ আগুন।

খানিকক্ষণ আমি দিশাহারার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। হাওয়ার ঝাপটে চোখ কুঁচকে ওপরে চাইলাম; নীচে, সামনে, ডাইনে, বামে। তারপর কিসের ধাক্কায় যেন আঁৎকে উঠলাম। আমি সেই তেপান্তর অন্ধকারের বুকে শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজে তখনও প্রার্থনা জানাচ্ছি,—আমায় ঠিকানা দাও। শুকনো খটখটে মাটিতে আমি মুখ ঘসতে লাগলাম। আর সেই অন্ধকারেও আমার বিক্ষত শরীরের তাজা তাজা রক্তের ফিনকি নজরে পড়লো।

কতক্ষণ এমনি ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ যখন সম্বিত ফিরে এলো, দেখলাম ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে আমার দেহটা আপ্লুত হয়ে গেছে। মুখ ঘসে ঘসে ঢুকিয়ে খানিকটা গড়ানো জলে গলাটা ভেজালাম। ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে কাদা-মাটিতে নিজেকে নিকিয়ে দিলাম। আমি স্নিগ্ধ হলাম। আবার শক্তি ফিরে এলো দেহে। আমি চোখ মেললাম। কিন্তু সেই অন্ধকার! আশ্চর্য; মেঘ তো গলে গলে পড়ছে তবু ফাঁকা হচ্ছে না কেন আকাশ! অন্ততঃ দুটো-একটা তারা দেখেও প্রাণের হুতাশ কমাই।

এবার পৃথিবীটা নিথর। হাওয়া নেই। বাতাস নেই। একেবারে নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ। পৃথিবী থেকে কি এক নিশ্বাসে সমস্ত বাতাসকে টেনে নিলেন ঈশ্বর! নিঃসাড় অন্ধকার। বৃষ্টিও পড়ছে না আর। বুঝলাম, স্বর্গের সমস্ত দান থেকে বঞ্চিত হয়েছে আজ পৃথিবী। কিন্তু আমি কি করবো। কোথায় যাবো। কেমন করে বাঁচবো? ডানহাতটা মুঠো করে উঁচুতে তুলে সজোরে শ্লোগান তুললাম,—আলো দাও ঈশ্বর! মেঘ দাও! অন্ধকার দূরে করো।

তারপর কোমরবন্ধটা সজোরে এ'টে একবার প্রাণভরে দম টানলাম। পালালাম ওখান থেকে। তীরের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটেছিলাম। নদীর তীর থেকে ওপাশের ঝাউবন, বাঁধ, খাল, বেড়, ভেড়ী সব পার হয়ে হয়ে আমি চলেছি। কোথাও বুকে হে'টে, কোথাও বা সাঁতার কেটে, কোথাও বা হে'টে-হে'টে, ছুটে-ছুটে। (গতবারের যুদ্ধে এমনি করে বাঁচার নমুনা পেয়েছিলাম।) আমার পা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। মুখ থেকে গাঁজা ভাঙছে। বুকটা হাপরের মতন ফ'ুসছে ঘনগতিতে। তবু চলছি। আলো চাই!

ঝড় উঠেছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'লো। বুঝে উঠতে সময় গেল কিছুক্ষণ। এ যে বাঁধভাঙা ঝড়! আমি সেই অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়েও অনুভব করতে লাগলাম, বড় বড় বনস্পতি বুক গেড়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে। শহরের অট্টালিকা থেকে খসে খসে পড়ছে ই'টগুলো! ফুলে ফেঁপে উঠছে নদীর জল। সমুদ্র হুতাশে মত্ত। ঝড় আমাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, আমি সেইখানে যাচ্ছি। টলছি, আছাড় খাচ্ছি। সময় সময় আপন মনেই ডুকরে কে'দে উঠছি ;—মাগো, বাঁচি কেমন করে। ঝড়ের হাতে ছ'ুচের মতন তীর আছে। আমার সর্বাঙ্গে বি'ধছে খচ্‌খচ্‌ করে। আর সেই মহাপ্রলয়ের মধ্যে অনুভব করলাম, শুধু আমি মরছি না। হাজার হাজারে মরছে। লাখে, লাখে।

ঝড়ের আঘাতে খটখটে আমার দেহ, রক্তে ভিজে উঠেছে। আমি আর পারছি না। তবু হাঁটছি। হাঁটছি না, বুকে ঘসে ঘসে চলেছি। আজ এ ঝড়ের রাতে, দিকচিহ্নহীন তেপান্তরের বুকে আমি একা। তুষার-বাত্যা-বিক্ষুব্ধ এ উপত্যকায় আমি একা। শৈত্যপ্রধান এ মধ্যবলয়ের মরুভূমিতে আমি একা। বুঝলাম, পৃথিবীর বুকে আর আমার আহার্য নেই; নেই এতটুকু বাসস্থান পরিচ্ছদ বা হাওয়া। এমন পাতাল-কাল অন্ধকারের বুকে কে আমায় নিয়ে এলো?

সেই মুখোশপরা, বর্মঢাকা, তলোয়ার হাতে চেহারা মনে পড়ল। ঘুম থেকে সজোরে আঘাত মেরে আমায় তুলে বসাল সে। তারপর তার ঘোড়া ধুলোর মেঘ ওড়াতে ওড়াতে নিয়ে চললো। কতো গ্রাম, কতো শহর, কতো নদী, কতো পাহাড়, কতো মরুভূমি পার হয়ে আমায় সে একটা জঙ্গলের সীমায় ফেলে দিয়ে গেল। সেখানে শুধু জানোয়ারেরা প্রহর জাগায়। আমি জানতে চাইলাম আমার অপরাধ কি। কিন্তু তার আগেই সে উধাও। তোমরা জানতেও পারলে না, কেন আমি এলাম। কোথায় এলাম। কি করে এলাম।

অবশেষে আমি আশ্রয় পেয়েছি। চারিদিকের বিরাট আরণ্যক তেপান্তরের বুকে এই পুরোনো দো'তো বাড়ীটা। আমি এখন পড়ে আছি অশেষ ক্লান্তি নিয়ে মেঝেটায়। ঝড় বইছে তেমনি সোৎসাহে। হাহা অট্টহাসি শুনতে পাচ্ছি। যে কোন মুহূর্তে আমার এ আশ্রয়ের বনেদ ভেঙে যেতে পারে। ছাদটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে দ্বিধাহীন ঝড়। আমি শুয়ে রয়েছি। কাঁপছি আর হাঁপাচ্ছি।

এমন সময় তুমি এলে। কেমন করে এলে জানি না। জানি অনেক কষ্ট সয়ে, পাহাড়, নদী, নগরী ডিঙিয়ে আমার খোঁজে এসেছো। আমার মতন তোমারও সোনা সোনা মুখ থেকে গাঁজা ভেঙেছে। রক্ত ঝরেছে নাক দিয়ে। হয়ত বা আমার চেয়েও বেশী। আমার মুখ চেয়ে এতোও সইতে পারো!

বড় ভয় করে। তুমি যেও না।

কারণ, আজ এ দুর্যোগের রাতে এখানে আমি বড় একা।

।।২।।

দত্তদের মেজবাবুর ওই একটিমাত্র ছেলে। নাদুস-নুদুস আকারের ছেলেটা ভারী শান্ত। দিলে খায়, না দিলে খায় না। নড়ালে নড়ে। পরালে পরে। ঝিয়ের হাসিতে ভ্যাক্‌ করে কে'দে ফেলে ওই আঠার বছরের ছেলে। সম্প্রতি দু'দিন হ'লো বন্দুক নিয়ে বেড়াতে গেছেন মেজবাবু তাঁর নতুন কেনা লাটে। গিন্নীর শখ হয়েছে গঙ্গাস্নানে যাবেন। খোকার মঙ্গল, কর্তার মঙ্গল, বাড়ীর কল্যাণ। ঝিকে দিয়ে সব বিধি-ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরুতঠাকুর পাঁজী দেখে বেলা বারোটার সময় লগ্ন বলে দিয়েছেন।

খোকাকে নিয়ে যাওয়া চলে না। কারণ শত্রুর তো কম নেই। পথে গাড়ী, ঘোড়া, ময়লা, ভিখিরী..............। সুতরাং ঘরেই থাকবে খোকন। অবশ্য আর একটা ঝিও থাকবে বাড়ীতে খোকার তদারকে। কি জানি কখন তেষ্টা পায় বাছার ; খিদে পায়। যাবার সময় সাতকোটী দেবতার স্মরণ নিয়ে খোকার কপালে চুমু দিলেন গিন্নীমা। বলে গেলেন—খবরদার খোকা, যেখানে বসিয়ে দিয়ে গেলাম ওইখানে থাকবি। নড়বিনি একদম। ঠাকুর পাপ দেবেন।

খোকা আর্তস্বরে বলে উঠলো—মা, ঠাকুর পাপ দেয় কেন।

গিন্নী বোকা ছেলের কপালে আর একটা চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

(মেজবাবুর শখ আছে প্লানচেট করার খোকার তাই ভারী ইচ্ছে। আজ অনেকক্ষণ একা একা বসে বসে কোন খেলনা না পেয়ে খোকা খাতা পেন্সিল নিয়ে ধ্যান হয়ে বসল। ঝিটা বোধহয় পাশের ঘরে ঘুমিয়েই পড়েছিল।)

কিছুক্ষণ পরে খোকা ডুকরে কে'দে উঠলো—বড্ড ভয় করছে। তুমি যাও। দেখেছো না, এ ভরদুপুরে এতোবড়ো বাড়ীটায় আমি একা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৩য় বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ নয়া পয়সা

শুক্রবার, ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭০
Friday, 13th December, 1963. 40 Naya Paise.

সূচীপত্র

সাপ্তাহিকী

।। ষোড়শ রাজ্য নাগাভূমি ।।

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন গত ১লা ডিসেম্বর সাড়ম্বরে ভারতের ষোড়শ রাজ্য নাগাভূমির উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানটি হয় নাগাভূমির রাজধানী কোহিমার প্যারেড গ্রাউণ্ডে। এই নবতম রাজ্যটির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তিন লক্ষ সত্তর হাজার নাগা জনগণের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো বলে রাষ্ট্রপতি মন্তব্য করেন। নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমগ্র নাগাভূমিতে এই স্মরণীয় দিনটি উদ্‌যাপিত হয়।

ভারতীয় ইউনিয়নের একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসাবে নাগাভূমির আবির্ভাবকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এক বাণী প্রসঙ্গে স্বাগত জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে তাঁর বিশেষ প্রত্যাশা ঃ নাগাভূমির অধিবাসীরা নিজেদের সুখ-সুবিধার ও সমৃদ্ধির জন্য তো বটেই পরন্তু ভারতের জাতীয় উন্নয়ন-ব্যবস্থাকে অধিকতর জোরদার করার জন্যেও যে অগ্রণী হবেন, সেই বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত।

এই শুভদিনে রাষ্ট্রপতি নাগাভূমিবাসীদের উদ্দেশে এক আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে, অতীতের সমস্ত বিদ্বেষ ও ভুল-বুঝাবুঝি বিসর্জন দিয়ে নতুন রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধিকল্পে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে হবে তাঁদের। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মন্তব্য অনুসারে "নাগাভূমির অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ।"

উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে নাগাভূমির নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি শিলু আও রাষ্ট্রপতিকে আদর অভ্যর্থনা জানান। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন—আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো নতুন রাজ্যটিকে একটি শক্তিশালী প্রগতিশীল রাজ্যে পরিণত করা। নাগাভূমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে এর অন্তর্বর্তীকালীন সংস্থাটি (শ্রীশিলু আও-এর নেতৃত্বাধীন) বাতিল হয়ে যায়। আসামের রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণু সহায়ই নাগাভূমিরও রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীশিলু আও-এর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণও ঐদিনই সম্পন্ন হয়েছে—মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা মাত্র পাঁচ।

॥ পাকিস্তানী আচরণ ॥

নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পাকিস্তান আজও ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদী মনোভাব দেখিয়ে চলেছে। করাচীর ২৮শে নভেম্বর সংবাদ ঃ পাক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের রাজসাহীস্থিত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের অফিস ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৬৩) থেকেই বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ঐদিনই সকালে করাচীস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী জি পার্থসারথির নিকট আলোচ্য নির্দেশ-সমন্বিত একখানি পত্র পাঠানো হয়েছে।

পাকিস্তানের এমনি আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয় ভারতের সকল মহলেই, বিশেষতঃ রাজধানী নয়াদিল্লীতে। ২৯শে নভেম্বরই শ্রীনেহরু লোকসভায় বলেন—রাজসাহীস্থ ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের অফিসটি বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান যে দাবী জানিয়েছে, পাক-ভারত সম্ভাবসৃষ্টির নামে এটা পাকিস্তানের একটি অস্বাভাবিক আচরণ। ভারত পাকিস্তানের নিকট এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবে এবং নির্দেশটি প্রত্যাহার করে নেবার জন্যে পাক সরকারকে অনুরোধও জানাবে। পাকিস্তান যদি নির্দেশ প্রত্যাহারে সম্মত না হয়, সেক্ষেত্রে তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে—প্রধানমন্ত্রী প্রসঙ্গতঃ এই সতর্কবাণীটিও করেন।

।। রবীন্দ্র ভারতী ।।

গত ৩০শে নভেম্বর কলকাতায় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র সোসাইটি হলে এই উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। উৎসবে সমাবর্তন ভাষণ দেন প্রাক্তন প্রবীণ বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীররঞ্জন দাশ। তিনি তাঁর অভিভাষণে এই দাবী রাখেন—একালের শিক্ষকদের জীবনে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ফুটে উঠুক এবং তাঁরা ছাত্রদের মনে শুভবুদ্ধি ও উচ্চাশা সঞ্চার করে তাঁদের বর্তমান মহতী বিনষ্টি থেকে রক্ষা করুন।

শারীরিক কারণে রবীন্দ্র ভারতীর আচার্য রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু আলোচ্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারেন নি। এই উপলক্ষে তাঁর প্রেরিত বাণীটি পড়ে শোনান পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণপদ্ধতি বিশ্লেষণ করে বলেন—রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই হলো রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার স্মারক ও বাহক হওয়া এবং সেভাবেই এখানকার পাঠক্রমও স্থির করা হয়েছে।

।। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র ।।

নয়াদিল্লীর ২রা ডিসেম্বর সংবাদ—লোকসভায় প্রতিরক্ষা-উৎপাদনমন্ত্রী শ্রী কে রঘুরামিয়া ঘোষণা করেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতায় ভারতে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ক্ষেপণাস্ত্রের ইলেকট্রনিক অংশগুলি নির্মিত হবে হায়দ্রাবাদের নিকট একটি কারখানায় এবং অন্যান্য অংশসমূহ তৈরী করা হবে প্রস্তাবিত 'মিগ' বিমান কারখানা দুইটিতে। মিগ' জঙ্গী বিমান নির্মাণের কারখানা নাসিক ও কেরাপুটে স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে কিছুকাল থেকেই।

॥ চৌ-এর অনুরোধ ॥

পিকিং সরকারের নিকট থেকে নয়াদিল্লীতে একখানি অনুরোধলিপি এসেছে—তাঁরা একটি বিশেষ কারণে ভারতের আকাশ-পথ ব্যবহার করতে চান। দিল্লীর ২রা ডিসেম্বরের সংবাদ অনুসারে চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই ডিসেম্বরেরই (১৯৬৩) মাঝামাঝি যাচ্ছেন কায়রো-এ আর তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল চেন-ই যাচ্ছেন কেনিয়ায়। উভয় চীনা-নেতার চার্টার্ড বিমানকে ভারতের আকাশপথ দিয়ে উড়ে যাবার (ভারতরক্ষা আইনে যা নিষিদ্ধ) অনুমতিদানের জন্যই চৌ সরকারের আলোচ্য অনুরোধ।

এদিকে নয়াদিল্লীর ৩রা ডিসেম্বর সংবাদ ঃ ভারত সরকার চীনের এই অনুরোধ মঞ্জুর করেছেন। কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে পিকিং সরকারকে ভারতের আকাশ-পথ ব্যবহারের এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৪ঠা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুও লোকসভায় এই বিষয় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, বিশেষ বিবেচনাক্রমেই চীনা অনুরোধ মঞ্জুর করা হয়েছে। আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলি যেক্ষেত্রে চীনের নেতৃদ্বয়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সেই অবস্থায় অনুমতি অগ্রাহ্য করা হলে সেই সকল রাষ্ট্রে (আফ্রিকান) প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারতো।

॥ কেপ কেনেডি ॥

নবনিযুক্ত মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জনসন গত ২৮শে নভেম্বর ঘোষণা করেন যে, মহান্ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির স্মৃতির প্রতি সম্মানের নিদর্শন হিসাবে আমেরিকার মহাকাশযান ও ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র কেপ ক্যানাভেরাল 'কেপ কেনেডি' নামে পরিচিত হবে। এক বেতার-বীক্ষণ ভাষণে জনসন আরো জানান যে, ফ্লোরিডার গভর্ণরের সম্মতি নিয়েই কেপ ক্যানাভেরলের এই নতুন নামকরণ করা হলো। (কেপ ক্যানাভেরাল ফ্লোরিডা রাজ্যে অবস্থিত)।

২৯শে নভেম্বরের লা পাজ থেকে প্রাপ্ত অপর একটি সংবাদ ঃ বোলিয়াভিয়ার রাজধানীর জন্য যে নতুন আন্তর্জাতিক বিমানঘাটি নির্মিত হচ্ছে, স্থির হয়েছে যে, তারও নাম রাখা হবে কেনেডির নামেই।

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্য প্রদেশের নাগরিকগণ কি চোখে দেখিতে অভ্যস্ত সেবিষয়ে বিশদ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি লোকসভায় বর্তমান বৎসরের ফসল ও খাদ্য-পরিস্থিতির আলোচনাকালে সেই দিকটা আরও উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়।

কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএ এম টমাস এই আলোচনার সূত্রপাত করিবার সময় বলেন যে, বর্তমান বৎসরে ফসলের অবস্থা বিশেষভাবে সন্তোষজনক এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় চাউলের উৎপাদনের উন্নতি হইবে। তিনি বলেন, গত চারি-পাঁচ মাস খাদ্য-পরিস্থিতি, বিশেষে চাউল সংক্রান্ত অবস্থা কিছুটা সংকটাপন্ন হয়, কিন্তু এ-অবস্থা সাময়িক মাত্র ছিল। তিনি অনুমান করেন যে, বর্তমান বৎসরে ৭৮৭·৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইবে। তিনি আরও অনেক কথার মধ্যে বলেন যে, ঐরূপ সংকটের মধ্যেও যে গভর্ণমেণ্ট খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিতে পারিয়াছেন ইহা বিস্ময়কর বলিতে হইবে। চাউল অবশ্য ছিল কিন্তু জনসাধারণ তাহাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন না করায় এই অভাব পূরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। অনাবৃষ্টির দরুণই চাউল উৎপাদন কম হইয়াছিল।

চাউল সম্পর্কে এইভাবে "সাফাই" গাহিবার পর তিনি চিনি সম্পর্কে অনুরূপ বিবৃতি দেন। বলাবাহুল্য চিনির বাজারে ভেজাল ও ভিজা চিনির সরবরাহ সম্পর্কে একটি কথাও তাঁহার বিবৃতিতে পাওয়া যায় নাই।

শ্রীটমাস এইভাবে মূল্য-নিয়ন্ত্রণে সরকারী ব্যর্থতাকে "বিস্ময়জনক" সাফল্যে পরিবর্তিত করিয়া অনায়াসে বাহবা লইতে পারিতেন, শুধুমাত্র বিরোধী পক্ষের একজন মহিলা সদস্য এই খাদ্যের পালা-গানের বিপরীত সমালোচনা না করিলে। তিনিই পশ্চিমবাংলায় মুনাফাবাজী কি নিদারুণ রূপ গ্রহণ করে এবং জনসাধারণ কি অবস্থায় ইহার প্রতিকারে সক্রিয়ভাবে নামে, তাহার পূর্ণ পরিচয় দান করেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে, মূল্যবৃদ্ধিতে উৎপাদকগণের কোনও সুবিধা হয় নাই। অবশ্য উৎপাদকগণ অজন্মার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কিনা সে কথার বিচারও তিনি করেন নাই। তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে মুনাফাবাজী ও চোরাকারবারকে কঠোর হস্তে দমন করার আহ্বানই প্রধান বস্তু ছিল।

আশ্চর্যের কথা এই যে, শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন ছাড়া খাদ্যশস্যে চোরাকারবার ও মুনাফাবাজী কঠোর হস্তে দমনের কথা ঐরূপ সুস্পষ্টভাবে অন্য কেহই বলেন নাই। তবে চোরাকারবার সম্পর্কে এই দুইজনের তীব্র মন্তব্যের পর লোকসভায় সকলেই মুনাফাবাজী ও চোরাকারবার দমনের কঠোর ব্যবস্থা করিতে বলেন।

খাদ্যশস্য ও খাদ্য সম্পর্কিত বিতর্কের তৃতীয় দিনের শেষে খাদ্যমন্ত্রী স্বরণ সিংও চাউল সম্পর্কে সেই একই কথা বলেন। তাঁহার মতে চাষীর পরিশ্রম ও উদ্যম এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় (!) বাংলার চাউল-সমস্যার নিরসন করিবেই। বলা বাহুল্য তাঁহার এই অপরূপ উক্তি কি কংগ্রেস কি বিপক্ষ দলের, কাহারও মধ্যে কোনও উৎসাহের সৃষ্টি করে নাই। অন্যদিকে চিনি সম্পর্কে ও ইক্ষুর মূল্য সম্পর্কে ভারতের ইক্ষু-উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিনিধিবর্গ যেরূপ সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী ও বিরোধীপক্ষ একযোগে ইক্ষু-মূল্য সম্পর্কে যে প্রস্তাব আনার কথা তুলেন সেরূপ কোনও মন্তব্য বা প্রস্তাব খাদ্যশস্যে মুনাফাবাজী সম্পর্কে হয় নাই। বাংলার ও বাঙালীর কংগ্রেসী প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে একমাত্র শ্রীমতী রেণুকা রায় এবিষয়ে কিছু তাপ-উত্তাপ প্রদর্শন করেন।

তারপর চাষ-আবাদের কথা। পশ্চিমবাংলায় সেচকার্যের জন্য প্রধানতঃ ডি-ভি-সি ও ময়ূরাক্ষী সেচ-প্রকল্পের উপর নির্ভর। কিন্তু ঐগুলির সেচনালার শাখা-প্রশাখা কাটার কাজ পূর্ণ করা হয় নাই বলিয়া যতটা ক্ষেত্রে সেচ চলা সম্ভব তাহার মাত্র শতকরা ৬০ ভাগ (সরকারী আন্দাজ) জল পায়। বাকী কাজ শেষ হইবার পূর্বেই ডি-ভি-সি সংস্থার এদিকের সেচ-খাল (পশ্চিমবঙ্গের) অংশকে বাংলা সরকারের স্কন্ধে চাপাইতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যস্ত হইয়াছেন। তাও প্রথমে যে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কর্তাগণ করেন তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিরুপায়ভাবে প্রতি বৎসর নব্বই লক্ষ টাকা ক্ষতিস্বীকার করিতে হইত। পরে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার এই হস্তান্তরের ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিষয় আলোচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এবং চার মাসের জন্য এই হস্তান্তর পরীক্ষামূলকভাবে করা হইয়াছে বিগত ২রা ডিসেম্বরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশা করিতেছেন যে, এই ব্যবস্থায় একর প্রতি ফলনও তাঁহারা বাড়াইতে সমর্থ হইবেন।

এইভাবে প্রত্যেকটি বিষয়েই পশ্চিমবাংলার প্রতিকূল ব্যবস্থাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহ দেখা যায়। ফরাক্কায় বাঁধের কাজ আরম্ভ করিতেই এইভাবে আট বৎসর দেরী করা হয়। সম্প্রতি যদিই বা ঢিমে-তেতালা গতিতে তাহার কার্যারম্ভ হইল, তখন কেন্দ্রীয় সরকার সেই এলাকায় ভারত-পাক যুক্ত জরীপের প্রস্তাব করিয়াছেন। বলা বাহুল্যে এই যুক্ত জরীপ যদি হয় তবে ফরাক্কা বাঁধ আর হইবে না।

জৈমিনি

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হল। সেই উপলক্ষে একটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রযোজকদের সুরুচিপূর্ণ মনোজ্ঞ ছবি উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেন।

চলচ্চিত্রে সুরুচি

শ্রীনেহরু নিজে খুব বেশি সিনেমা দেখেন না। কিন্তু ভারতীয় ছবির এক বিরাট অংশ যে খুব সুরুচিপূর্ণ নয়, তা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। এবং জানেন বলেই ভালো ছবির জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ-কথা অবশ্য ঠিক যে, ইচ্ছে করলেই যেমন লোকে একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বা কাব্যগ্রন্থ রচনা করতে পারে না, তেমনি ইচ্ছে করলেই প্রথম শ্রেণীর ছবি তৈরী করা যায় না। এজন্যে যে জিনিস সবার আগে দরকার, তা হল একজন প্রতিভাবান পরিচালক। কিন্তু, ছবির জগতে একটা মস্ত রহস্য হল এই যে, ভালো পরিচালকও হামেশা খারাপ ছবি উপহার দিয়ে থাকেন।

কোনো কোনো সময় এই সব খারাপ ছবির কারণ হয়তো আকস্মিক, অর্থাৎ প্রযোজক এবং পরিচালকের সদিচ্ছা সত্ত্বেও কাহিনী, অভিনয় বা অন্য কোনো ত্রুটির জন্যে ছবি মার খেয়ে গেল। কিন্তু অনেক সময় স্পষ্ট বোঝা যায়, ছবির পরিকল্পনার মধ্যেই থেকে গিয়েছিল উদ্দেশ্যের অসাধুতা। বেশির ভাগ খারাপ ছবি তৈরি হয় এইভাবেই।

ছবি তুলতে অনেক টাকার দরকার হয়। কাজেই টাকাটা যাতে লোকসান না যায় এবং কিছুটা ন্যায্য লাভ থাকে, এটা প্রযোজক দেখবেন বৈকি। কিন্তু যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা তুলে নেওয়াই যে-ছবির উদ্দেশ্য হয়, তার সমস্ত সুরটাই বাঁধা থাকে খেলো পর্দায়।

সহজে টাকা করতে গেলে ছবির মধ্যে কতকগুলো আকাঁড়া সেণ্টিমেণ্ট এবং অতিনাটকীয়তা ঠেসে দিতে হয়। তাছাড়া অত্যন্ত মোটা জাতের যৌন আবেদনও ছড়িয়ে দিতে হয় এখানে-সেখানে। শিক্ষার আলোক-বঞ্চিত খেটে-খাওয়া মানুষের নেতিয়ে-পড়া চেতনাকে খুঁচিয়ে তোলার এই হল 'চাঙায়নী সুধা'। সাধারণ মানুষের জীবনে যা কখনই সম্ভব নয়, সেই সব অবিশ্বাস্য আজগুবি ইচ্ছাপূরণের মাশুল হিসেবে কয়েক গণ্ডা পয়সা জরিমানা দিতে হয় তাদের প্রতি সপ্তাহে এবং এর ফলে তারা যা পায়, তা নিশ্চয়ই সুরুচি নয়, জীবন সম্বন্ধে কোনো সুস্থ আশাবাদও নয়।

অথচ, বলতে গেলে এই সব কোটি কোটি সাধারণ মানুষই দেশের মেরুদণ্ড, ভারতের মতো গঠনশীল দেশে এদের মধ্যে অবাস্তব মনোভাব জীইয়ে রাখার অর্থ হল, দেশকে চিরদিন সাংস্কৃতিক নাবালকত্বের মধ্যে রাখা।

কিন্তু স্বাধীন দেশের নাগরিকদের একটা বড় অধিকারই তো হল সংস্কৃতির অধিকার! ভারতের সাধারণ মানুষ এখনো সে অধিকার থেকে বঞ্চিত, এবং তার জন্যে চলচ্চিত্র-প্রযোজক, বিশেষ করে এক শ্রেণীর হিন্দী ছবির প্রযোজকদের দায়িত্ব কতোখানি, তা ভেবে দেখা দরকার।

আজকাল দেশে শিক্ষা-সংস্কার, সংস্কৃতির বিস্তার ইত্যাদির বিষয়ে নতুন চেতনা এসেছে দেখা যাচ্ছে। এই সুযোগে যদি অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী, নাচ ও গানযুক্ত হিন্দী ছবি এবং তার পোস্টারের বিষয়ে একটা কমিশন বসানো যায়, হয়তো জনরুচির বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

• • •

জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার জুনিয়ার বেসিক এবং প্রাইমারী স্কুলের জন্যে পাঁচখানি বই প্রকাশ করবেন। আগে তাঁরা 'কিশলয়' এবং 'প্রকৃতি পরিচয়' বার করতেন, এবার থেকে ইংরেজী আর ইতিহাসের বই বার ক'রে প্রাইমারী শিক্ষার সমস্ত পাঠ্য পুস্তকই রাষ্ট্রায়ত্ত করলেন।

বিদ্যার অধিক ধন নাহিক জগতে

নীতি হিসেবে এ প্রস্তাবে আপত্তি করার কিছু নেই। সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান একরকম রাখতে গেলে সরকারী কর্তৃত্বে বই প্রকাশই হয়তো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কিশলয় এবং প্রকৃতি পরিচয় নিয়ে গত কয়েক বছরে এত অব্যবস্থা এবং দুরবস্থা দেখা গেছে যে, এবার থেকে সমস্ত বই সরকার বার করবেন শুনে অভিভাবকদের হৃদ্‌কম্প শুরু হতে পারে।

অতীতে দেখা গেছে, যেসব দোকান থেকে সরকারী বই পাওয়া যায়, সেখানে

অনেক সময়েই বইয়ের জোগান থাকে না। অনেক দোকানে আবার নাকি বই থাকলেও বই পাওয়া যায় না। কেননা, সে বই চলে যায় ফুটপাতের দোকানে এবং সেখানে তা অর্থ-পুস্তকের সহযোগে উচ্চমূল্যে বিকোয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারী প্রকাশনায় নতুন বই, অর্থাৎ আরো বেশি হাঙ্গামা। অভিভাবকদের দুর্দিন বৈকি!

তবে সুদিন আসছে এক শ্রেণীর অন্তরালবর্তী জীবের, যারা জানে কতোটা আঙুল বাঁকালে কতোখানি ঘি ওঠে। অনুমান করতে পারি, তারা তামাম কলেজ স্ট্রীট এলাকার সমস্ত ফুটপাত গ্রাস করে হয়তো কেউ কেউ এতদিনে ছ' ছ' আনার মতো ঠেলাগাড়িও জোগাড় করেছে। তারা অবশ্যই সরস্বতীর বরপুত্র। কারণ, একমাত্র তারাই বোধ করি লক্ষ্মী-সরস্বতীর চিরন্তন বিবাদ মিটিয়ে প্রমাণ করতে পারবে যে, উদ্যোগী পুরুষের হাতে পড়লে সামান্য বইও ভেল্‌কি দেখাতে পারে।

• •
•

একটি সংবাদের বয়ান—"পৌর-কর্তৃপক্ষের তৎপরতার অভাবে মহানগরীর সর্বত্র বসন্ত ও কলেরা রোগ ছড়াইয়া পড়িতে পারে বলিয়া আজ কলিকাতা পৌরসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে কাউন্সিলারগণ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।"

এই সংবাদটির মধ্যে 'আজ' বলে যে কথাটি আছে সেটা ঠিক কবে তা না জানলেও চলে, কারণ আমরা জন্মাবধি এই এক কথাই শুনে আসছি। বসন্ত ও কলেরার উদ্যত খড়্গের নিচেই বাস করছি আমরা সারাজীবন, এবং 'পৌর-কর্তৃপক্ষ' ও 'কাউন্সিলারগণ' নামে দুটি বিপরীত শক্তির টানাপোড়েনই যে তার জন্যে দায়ী তাও অনুমান করে আসছি।

কর্পোরেশনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস

কিন্তু কথা হল, 'বসন্ত ও কলেরা রোগ ছড়াইয়া পড়িতে পারে' একথা বলার অর্থ কী? কাগজে যা খবর দেখি তাতে তো অনুমান হয়, ও দুটি রোগ শহরে প্রায় সব সময়ই লেগে আছে, আর তা আছে বলেই কর্পোরেশনটা চলছে। না হলে এই সুপাচ্য বিষয়ে বিতর্ক এবং পারস্পরিক দোষারোপ ছাড়া 'পৌর-কর্তৃপক্ষ' এবং 'কাউন্সিলারগণ' নেহাতই বেকার হ'য়ে পড়তেন, এবং আমরাও তাঁদের বিষয়ে সচেতন থাকতাম না।

বসন্ত আর কলেরা আছে বলেই কর্পোরেশন একটা জ্যান্ত প্রতিষ্ঠান। ও দুটি ব্যামো না থাকলে কর্পোরেশনের কথা কে মনে রাখতো!

চলো দূরে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চলো দূরে
আশ্বিন শেষের এই শিশিরে-শিশিরে।
আকাশকে ভালোবাসবার
শখ ফিরে এসেছে আবার।
দিগন্তকে বুঝি ছোঁয়া যায়
রজনীগন্ধায়।

চলো দূর থেকে দূরে,
আশ্বিনের সুরে
মনে মনে কত কথা বলা
শিশির-বিছানো ঘাসে আনমনে শুধু পথ চলা।

সপ্তর্ষির কামাই হয় না
আকাশ তারায় ভরা কথাই কয় না
শুধু চেয়ে থাকে
সময়কে বাঁধে সাত পাকে।

চল দূরে। ভোলো।
ঝাউবন, কার কথা বলো?

সোপানে পা রাখো

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সোপানে পা রাখো তবে; নীলিমায় আলোর সরোদ
বাজলেও, বিষণ্ণ-মুখ জনতা নীরবে হাঁটে পথ;
আশা-নিরাশার উল্কি-আঁকা অন্ধকার; জ্যোৎস্না-রোদ
আনে তৃপ্তিহীন বোধ, তৃষ্ণা বাড়ে। অন্ধ ভবিষ্যৎ ঃ

সেতুর ওপরে এসো; অনেক প্রশ্নের মুখরতা
স্তব্ধতাকে নাড়া দ্যায়, আছড়ে ফ্যালে আকাশ ভুবন;
নীরব দর্শক মন, প্রশ্নের দংশন, লক্ষ ব্যথা
সহনে অক্ষম; ভুল হয়; মুক্তি, সে তো মৃত্যুপণ!

আকাশের আলো মুখে সমুদ্র-কল্লোল বুকে নিয়ে
নীরবে চলেছে যারা তারা কেউ জানে, বা জানে না
কোথায় চলেছে, কেন; কারা যায় তাদের মাড়িয়ে।
মানুষের সব ঋণ হয়তো শোধ কখনো হবে না।

সোপানে পা রাখো, এসো; অন্ধকার সেতুর ওপরে,
আকাশ-গঙ্গার বুকে কী আছে, কে জানে, দেশকালে,
জৈবিক সত্তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রেম অস্তিত্বের গভীর শিকড়ে
টান দ্যায়, নক্ষত্রের রাত্রি লুপ্ত আলোর সকালে!

অদৃশ্য কণ্ঠের ডাকে

পুষ্কর দাশগুপ্ত

রৌদ্রের উজ্জ্বল ব্যাপ্তি, অনাতপ ছায়া, অন্ধকার,
অদৃশ্য কণ্ঠের ডাকে আমি যেন পেরিয়ে, এসেছি—
এখানে অমল এই একাকীত্বে—প্রচ্ছন্ন নিভৃতে—
স্বপ্নের ভিতরে যেন চারিদিকে রহস্য অপার।

স্তব্ধতা......কুয়াশা ঐ ফুটে আছে সাতটি স্তবকে,
বামে—বা দক্ষিণে—জ্বলে সবুজ, চকিত অগ্নিশিখা,
এবং নিবিড় জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত শীতল কুহক......
জ্যোৎস্না কাঁপে, শ্বেত, হিম, মর্মরের সমাধিফলকে।
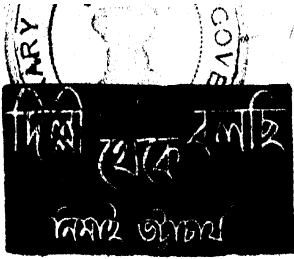
সাধারণ একজন অফিসারের প্রমোশন বা ট্রান্সফারের খবরের মত অধিকাংশ সংবাদপত্রের একপাশে বেরুল, বি আর সেন আরেকবারের জন্য রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডাইরেক্টর-জেনারেল নির্বাচিত হয়েছেন। শতধাবিভক্ত এই পৃথিবীতে তৃতীয় দফার বি আর সেনের নির্বাচন-সাফল্যে আমাদের নিশ্চয়ই গর্ববোধ করার কারণ আছে। মাদাম বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছাড়া বিনয়রঞ্জন সেনই একমাত্র ভারতীয় যিনি বিশ্বসংস্থায় ভারতবর্ষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়া বাঙালীর কাছে আর একটা কথা স্মরণযোগ্য যে বিদেশে যত বাঙালী আছেন বিনয়রঞ্জন তাঁদের মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি।

আই-সি-এস তিলকাঙ্কিত ভাগ্যবানেরা যে মানুষ এবং তাঁদের সুখ-দুঃখের অনুভূতিটা যে আমাদেরই মতন, একথা অধিকাংশ দেশপ্রেমিকই মাত্র সেদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন না। এঁদের সঙ্গে ইংলণ্ডেশ্বরের একটা অদৃশ্য আত্মীয়তা কল্পনা করতেন অনেকেই। সংবাদপত্রের রিপোর্টারী করতে গিয়ে আই-সি-এসদের সম্পর্কে এমন কোন গোঁড়ামি থাকা সম্ভব নয় এবং আমারও নেই। যে দু'চারজন আই-সি-এস'এর সান্নিধ্যে এসে আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি পেয়েছি, বিনয়রঞ্জন তাঁদের অন্যতম।

মনে পড়ে অগ্নিক্ষরা ১৯৪২! আগস্ট মাসে বোম্বাই কংগ্রেসে গান্ধীজি স্বয়ং 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। আরব সাগরের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কংগ্রেস মণ্ডপ থেকে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উঠেছিল, গৃহীত হলো 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব। শুরু হলো ইংরেজ-বিতাড়ন যজ্ঞ। ঐতিহাসিক আগস্ট আন্দোলন! বাংলাদেশের মেদিনীপুরে স্বদেশীরাজই গড়ে উঠল।...... জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এন এম খান নিজের বাংলোয় শুধু পায়চারি করে কাটিয়েছিলেন রাতের পর রাত। তন্দ্রাচ্ছন্ন শেষরাত্রে তেরাঙ্গা আর 'বন্দেমাতরম'এর দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠতেন। 'শয়তানদে'র সায়েস্তা করবার নেশায় মশগুল হয়ে উঠেছিলেন খানসা'হেব।

অক্টোবরে হলো এক মহা সাইক্লোন। সারা মেদিনীপুরই প্রায় এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। মাঠের ধান, ঘরের চাল উড়ে গেল। পড়ে রইল অসংখ্য নারী-পুরুষ—গরু-ছাগলের মৃতদেহ। প্রকৃতির খেয়ালে মেদিনীপুরবাসীর এই নির্মম নিগ্রহে চারদিকে উঠেছিল কান্নার রোল। রোমসম্রাট নীরোর মতন খানসাহেব দেশবাসীর এমনি দুঃখের দিনে বাঁশি বাজিয়েছিলেন। তিনদিন বাদে বাংলা সরকারের হেড কোয়ার্টার্সে সাইক্লোনের প্রথম খবর ভেজেছিলেন খাঁসাহেব। খবরের শেষে ছোট্ট একটা মন্তব্য জুড়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব। লিখেছিলেন, মেদিনীপুরবাসীকে সায়েস্তা করার এই মহত্তম সুযোগ। সুতরাং সাইক্লোন-বিধ্বস্ত রাষ্ট্রদ্রোহী মেদিনীপুরবাসীদের কোন সাহায্য না দেওয়াই সমীচীন হবে।

লীগ মন্ত্রিসভার সদস্যদের আলালের ঘরের দুলাল ছিলেন এন এম খান। তাই একথা লেখার দুঃসাহস তাঁর হয়েছিল।

বি আর সেন তখন বাংলা সরকারের রাজস্ব দপ্তরের সেক্রেটারী; সাহায্য দপ্তরও তাঁরই অধীনে ছিল। তিনদিন বাদে সাইক্লোনের খবর পেয়ে ক্ষেপে গিয়েছিলেন; খবরের শেষে খানসাহেবের মন্তব্য দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন মিঃ সেন। খাঁসাহেবের যথেচ্ছাচারে ও ঔদাসীন্যে অনেকেরই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গেছিল; মিঃ সেনও অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালী হয়ে বাঙালীর প্রতি এমন নির্মম ঔদাসীন্য তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। 'বাজার' বাজিয়ে পার্সোনাল এ্যাসিসট্যান্ট অমর মুখার্জিকে ডাক দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নোট ডাউন। ....Crown can not differenciate between one citizen and the other, specially in their distress .... কমন্স'এর ডিবেট 'কোট' করেছিলেন, রেফারেন্স দিয়েছিলেন কুইন্স ডিক্লারেশনের। তারপর ফাইলের স্তূপ নিয়ে লীগ মন্ত্রীপুঙ্গবদের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি তুলে ধরেননি মিঃ সেন; সরাসরি লাটসাহেবের বাড়ী হাজির হয়েছিলেন। লাটসাহেবকে দিয়ে মেদিনীপুরে সাহায্য পাঠাবার আদেশ লিখিয়েই রাইটার্স বিল্ডিংস ফিরেছিলেন।

স্যার জন হার্বার্ট তখন বাংলার লাটসাহেব। দেহটা লম্বা-চওড়ায় বিরাট হলেও হৃৎপিণ্ডটা বোধকরি ততবড় ছিল না। তাই বি আর সেনের প্রতি তিনিও বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। মিঃ সেনও সেকথা জানতেন এবং তাই তিনি দিল্লীর মসনদে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে কলকাতা ত্যাগ করেন।

দেশটা দু'টুকরো হবার পর এন এম খানেরও অদৃষ্টের সিংহদ্বার খুলেছিল। অতীত জীবনে সৃষ্ট কঙ্কাল-স্তূপের উপর বসে খাঁসাহেব পূর্ব বাংলার চীফ সেক্রেটারী হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলাকে রসাতলে দেবার জন্য ষোড়শোপচারে যাগ-যজ্ঞ করেছিলেন। ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে গদীচ্যুত করে ইস্কান্দার মীর্জাকে ঢাকার মসনদে একচ্ছত্র অধিপতি করবার জন্য খাঁসাহেবের যথেষ্ট সুনাম আছে। কবর ফুঁড়ে জিন্না বোধহয় খাঁসাহেবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অথবা খাঁসাহেবের প্রতি সুবিচার করবার জন্য করাচীর কর্তাদের স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। নচেৎ, প্ল্যানচেটে কায়েদী আজমকে টেনে এনে খাঁসাহেব নিজের দরখাস্তের উপর strongly recommended লিখিয়ে নিয়েছিলেন। মিথ্যা বলব না, দয়ার্দ্রচিত্ত করাচীর মহাপ্রভুরাও খাঁসাহেবের প্রতি অবিচার করেননি, বরং একটু অতিরিক্ত সুবিচার করেছিলেন।

বর্তমান নিয়ে আমরা এতটা মশগুল যে সাম্প্রতিককালের এসব ইতিহাসও আমরা ভুলতে বসেছি। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাধুবাদ জানিয়েছিলেন বিনয়রঞ্জন সেনকে। তাই নয় কি?

নেহরুও পাকা জহুরী। বুঝেছিলেন, বিনয়রঞ্জন সেন একটি রক্তমুখী নীলা। তাই দেশে-বিদেশে তাঁকে সম্মান দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি।

সেনসাহেব বাহ্যিক আচরণে যতটা সাহেবীয়ানা ও আভিজাত্য দেখান, ভিতরে ভিতরে ঠিক ততটাই তিনি বাঙালী, ভারতীয় ও সহজ-সরল।...... অতীত রোমের সাক্ষী কলিসিয়ামের পাশ দিয়ে ঘুরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে মোড় ঘুরতেই পেলাম মিঃ সেনের প্রধান কর্মস্থল—আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হেড কোয়ার্টার্স। বন্ধুবর ডাঃ মণি মল্লিক আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য; সোজা নিয়ে গেলেন মিঃ সেনের ঘরে। আনন্দের আতিশয্যে মিঃ সেন জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। কথায় কথায় অনেক কথা বল্লেন মিঃ সেন। বল্লেন, জীবনে বহু দেশ ঘুরলাম, বহু কিছু দেখলাম, প্রাচুর্যের বন্যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি জীবনে। কিন্তু ভুলতে পারিনি বাংলাদেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রামের মানুষকে। বহুদিন হলো পল্লী-বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ নেই; তবু অতীত জীবনে কঙ্কালসার মানুষের কথা ভেবে মনে হয়েছে পৃথিবীতে না জানি কত কোটি মানুষ বুভুক্ষু থাকে। তাইতো পৃথিবীর কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের সেবার ভার নিয়ে আমি ধন্য।

অদৃষ্টের পরিহাস ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে বাঙালী মনীষা ও কর্মনিষ্ঠা সারা দেশকে অভিভূত করেছিল, সেই বাঙালীই আজ জীবনের নানাক্ষেত্রে ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিনয়রঞ্জন সেনের প্রতিষ্ঠায় আমাদের আনন্দ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। যে বাঙালী আজ দিল্লীর দরবারে পর্যন্ত অনাদৃত, সেই বাঙালীদের একজন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের দ্বারা অভিনন্দিত হচ্ছেন, এটা কি কম গৌরবের?

দেশে বিদেশে

॥ নাগাভূমি ॥

নাগাভূমি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্যরূপে স্বীকৃতি-লাভ করল। ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে নাগা-নেতাদের আলোচনাক্রমে ভারতের পূর্ব-প্রান্তবর্তী নাগা অধ্যুষিত অঞ্চল-গুলিকে নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে একটি পৃথক নাগা রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সেইমত ১৯৬১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তুয়েনসাঙ ও নাগা পার্বত্য জেলা নিয়ে গড়ে ওঠে নাগাভূমি। প্রায় দুবছর বাদে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে গত পয়লা ডিসেম্বর এই নূতন প্রশাসনিক অঞ্চলটি ভারতের অঙ্গরাজ্যরূপে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল।

৬৩৬৬ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট নাগাভূমির লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ৭০ হাজার। নাগারা ষোলটি উপজাতিতে বিভক্ত এবং তারা বাস করে পাহাড় ও বনের আড়ালে ছড়িয়ে থাকা নাগাভূমির ৮৬০টি গ্রামে। রাজ্যের অধিবাসীদের শতকরা আশীজন কৃষিজীবী। এই রাজ্যে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় সাত লক্ষ একর, কিন্তু ১৯৬৩ সালের

উপরে—নাগা জননী : সুঠাম, প্রাণোচ্ছল নাগা মায়েরা এমনি করে পিঠে সন্তান নিয়ে অনায়াসে পায়ে হেঁটে পাহাড়ী পথে চলা-ফেরা করে।

পাশে : তরুণ নাগা, দৃঢ় দেহ, কর্মঠ

হিসাবে দেখা যায় এখন চাষ হয় মাত্র কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ একর জমিতে।

নাগাভূমিতে কলেজ আছে দুটি, হাইস্কুল আছে আটাশটি এবং মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭১৬। হাস-পাতাল আছে চব্বিশটি। রাজ্যের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ দশ লক্ষ ছয় হাজার টাকা।

নাগাভূমির রাজধানী কোহিমা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। ভারতের মাটিতে নেতাজীর 'জয় হিন্দ' ধ্বনি প্রথম এই খানেই উচ্চারিত হয়েছিল। নাগাভূমির প্রতিষ্ঠা দিনে তাই উৎসব সজ্জিত নাগাভূমি মুহুর্মুহু 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

॥ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ॥

মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের বিশিষ্ট জননায়ক ও কান্নামোয়ার মন্ত্রিসভার রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবসন্তরাও পি নায়েক

সর্বসম্মতিক্রমে মহারাষ্ট্র কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে তার সদস্যসংখ্যা পঁচিশ। পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী কান্নামোয়ারের মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা ছিল একত্রিশ, এবং কামরাজ পরিকল্পনানুসারে সে সংখ্যা কমিয়ে কুড়ি কি একুশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়েক এ ব্যাপারে কিছুটা সফল হয়েছেন। তবুও বলা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গ অথবা মাদ্রাজের সঙ্গে তুলনীয় মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিসভা এখনও যথেষ্ট স্ফীত। ভারতের বৃহত্তম রাজ্য উত্তর প্রদেশের মন্ত্রিসভাও এত বড় নয়।

পরলোকে সিকিমের মহারাজা

সিকিমের মহারাজা স্যার তাসি নামগিল্ ছোগিয়াল ডেনজু ২রা ডিসেম্বর অপরাহ্নে কলকাতার এক নার্সিং হোমে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

ভারতের পরম নির্ভরযোগ্য সুহৃদ এই মহারাজা বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। শাসনকার্যের বাইরে তাঁর নিত্যকর্ম ছিল ধর্মচর্চা ও চিত্রাঙ্কন। চিত্রকর হিসাবে মহারাজার বিশেষ দক্ষতা ও পরিচিতি ছিল। বিদ্যাচর্চাতেও তাঁর আগ্রহ কিছু কম ছিল না। তাঁরই উদ্যোগে তিব্বত-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার উদ্দেশ্যে গ্যাঙটকে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যার বর্তমান নাম নামগিল ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি।

তাঁর শাসনকালেই সিকিমে বিনা পারিশ্রমিকে পরিশ্রম করার প্রথা লোপ পেয়েছে, জুয়া খেলা আইনত নিষিদ্ধ হয়েছে, সিকিমের জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের রাজনৈতিক মর্যাদা স্বীকৃতিলাভ করেছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যটির অকৃত্রিম ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

পরলোকগত মহারাজার স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তরুণ মহারাজকুমার ইতিমধ্যে সিকিমের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জ্ঞানী, গুণী ও উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে তিনিও যথেষ্ট সুপরিচিত ও সম্মানিত। তাঁর শাসনকালে ভারত

পরলোকগত মহারাজা
স্যার তাসি নামগিল ছোগিয়াল ডেনজু

ও সিকিমের আরও নিকটসম্পর্ক গড়ে উঠুক, এই আমাদের একান্ত কামনা।

॥ কেরলের রাজনীতি ॥

কংগ্রেসের অন্যতম প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী কে পি এম নায়ার কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীনায়ার ছিলেন কেরল কংগ্রেসের সাংগঠনিক উপশাখার প্রার্থী, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রী এম সি চাকোকে সমর্থন করেছিলেন প্রশাসনিক উপদল। শ্রীনায়ার পান ৯৮ ভোট আর শ্রীচাকো পান ৮১ ভোট। এই ফলাফল থেকেই বোঝা যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেমন তীব্র হয়েছিল। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহারের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রয়াস সফল হয় নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, কেরল কংগ্রেসের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক উপদলের বিরোধ এর পর আরও তীব্র হয়ে উঠবে এবং তার ফলে কেরলের অস্থির রাজনীতি যে সাময়িক স্থিতি লাভ করেছিল তা আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে। যে সময় কামরাজ পরিকল্পনার ভিত্তিতে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক প্রয়াস চলেছে সেই সময় কংগ্রেসের পক্ষে অন্যতম দুর্বল প্রদেশ কেরলে এই অন্তর্বিরোধ খুবই অবাঞ্ছিত।

॥ পরলোকে থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ॥

গত ৮ই ডিসেম্বর থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল সারিত আনারত ব্যাঙ্ককের একটি সামরিক হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। জটিল শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন সামরিক বিভাগের সার্জন জেনারেল ডাঃ লিওনার্ড জীটন।

॥ যাযাবর বিদ্রোহ ॥

মালীর প্রেসিডেন্ট মোবিডো কেইতা গত ৭ই ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন যে, মালী-আলজেরিয়া নাইজেরিয়া সীমান্তে যে যাযাবর বিদ্রোহ শুরু হয়েছে তা ১লা জানুয়ারীর মধ্যে শান্ত না হলে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ করা হবে।

॥ কেনিয়া স্বাধীন ॥

পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ব আফ্রিকার অন্যতম বিশিষ্ট দেশ কেনিয়া ১২ই ডিসেম্বর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে যেসব লণ্ডন প্রবাসী আফ্রিকান প্রথম আফ্রিকা মুক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত করেন কেনিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়ক জোমো কেনিয়াট্টা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। স্বদেশের মুক্তি-আন্দোলনে এত দুঃখবরণও আফ্রিকার কোন জননেতাকে করতে হয়নি। সেই হিসাবে আফ্রিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় কেনিয়ার স্বাধীনতা অর্জনে বিলম্ব কিছুটা বিস্ময়কর। এর জন্য সর্বাধিক দায়ী কেনিয়ায় শ্বেতাঙ্গ স্বার্থ। কিন্তু মহান জননায়ক কেনিয়াট্টা তার জন্য শ্বেতাঙ্গদের প্রতি বিরূপ

জননায়ক জোমো কেনিয়াট্টা

হননি। তিনি কেনিয়াবাসী ইউরোপীয় এশিয় প্রভৃতি সকল বহিরাগতকে জানিয়েছেন, কেনিয়াকে যারা মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করবে তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় তাঁর সরকার সর্বদা সতর্ক থাকবেন। দুর্ভাগ্যের কথা যে, এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্ত্বেও দলে দলে ভারতীয়রা সে দেশ ত্যাগ করে চলে আসছেন।

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ হুসেন শহীদ সুরাবর্দী গত ৫ই ডিসেম্বর বেইরুতে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বৎসর। ১৯৫৬-৫৭ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বিমানযোগে তাঁর শবদেহ স্বদেশে আনয়ন করার পর গত ৮ই ডিসেম্বর সমাধিস্থ করা হয়।

॥ নির্বাচন সংবাদ ॥

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে বর্তমান শাসক দলই আশাতীতভাবে সাফল্যলাভ করেছেন। ইংলণ্ডের শ্রমিকদল যখন আগামী সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করে শাসনক্ষমতা দখলের স্বপন দেখছেন ঠিক সেই সময় ইংলণ্ডবাসীদের এই দুটি উপনিবেশে শ্রমিক দলকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। দুটি দেশেই শ্রমিকদল গতবারের তুলনায় কম আসন পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিকদলের আসনসংখ্যা গতবারে ছিল ৬০, এবার তা হ্রাস পেয়ে ৫০ হয়েছে। ফলে লিবারেল-কাণ্ট্রি কোয়ালিশন দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট মেঞ্জিস এবার অন্তত বারো ভোটের নিশ্চিত ব্যবধানে তিনবছরের জন্য নিশ্চিন্তমনে শাসনকার্য চালাতে পারবেন। গত তিন বছর মাত্র এক ভোটের সংখ্যাধিক্যে তাঁকে শাসনকার্য চালাতে হয়েছিল।

নিউজিল্যাণ্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ হোলিওকের ন্যাশনাল পার্টি সংসদের ৮০টি আসনের মধ্যে ৪৪টি আসনে জয়ী হয়েছেন এবং শ্রমিকদল পেয়েছেন ৩৫টি আসন। একটি আসন পেয়েছেন সোশ্যাল ক্রেডিট পার্টি।

জাপানেও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী ইকেদার লিবারেল ডিমক্রাটিক পার্টি বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছেন। জাপ পার্লামেণ্টের ৪৬৭টি আসনের মধ্যে তাঁর দল জয়ী হয়েছেন ২৮৩টি আসনে। সোশ্যালিষ্ট দল পেয়েছেন ১৪৫টি আসন, সোশ্যাল ডিমক্রাট দল পেয়েছেন ২৩টি আসন, কমিউনিষ্টরা পেয়েছেন ৫টি আসন, আর নির্দলীয় প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ১২টি কেন্দ্রে।

সর্বশেষ নির্বাচনের সংবাদ পাওয়া গেছে পশ্চিম আফ্রিকার প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ সেনেগল থেকে। সেখানেও ১লা ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেণ্ট লিওপোল্ড সেংগর পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। এবং তাঁর দল প্রগ্রেসিভ ইউনিয়ন পার্টি আইন সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন। আইন সভার নির্বাচনে প্রেসিডেণ্টের দল পেয়েছেন ৪,০২,৭৪১ ভোট ও একমাত্র বিরোধী দল আফ্রিকান রিগ্রুপমেণ্ট পার্টি পেয়েছেন ৩৬,৭৮৮ ভোট। নির্বাচনকালে উগ্র বামপন্থী দল আফ্রিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টির বিক্ষোভের ফলে যে হাঙ্গামা হয় তাতে অন্তত ১১ জন নিহত ও ৬০ জন আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। সেনেগলের মত একটি ছোট দেশে এতগুলি ব্যক্তির নির্বাচনী হাঙ্গামায় প্রাণহানি নিঃসন্দেহে গুরুতর সংবাদ।

॥ হলদিয়া ॥

নির্মীয়মান হলদিয়া বন্দর সম্বন্ধে পর পর অনেকগুলি সুখবর পাওয়া গেছে। ৩রা ডিসেম্বর লোকসভায় ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৬৭ সালের মধ্যেই ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে হলদিয়া বন্দরের নির্মাণকার্য শেষ করা হবে। ঐ দিনই বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশিত আর এক সংবাদে জানা যায়, চতুর্থ যোজনাকালে হলদিয়ায় একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা যায় কিনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তা বিবেচনা করে দেখছেন। তারপর ৪ঠা ডিসেম্বর পেট্রল ও রাসায়নিক দপ্তরের নবনিযুক্ত মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির লোকসভায় বলেন যে, হলদিয়ায় সম্ভবত একটি তৈল শোধনাগার ও পেট্রোজাত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন শিল্প স্থাপন করা হবে।

সম্প্রতি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন জর্ডানের রাজা হোসেন ও রাণী মুনা আল হোসেন।

পিকিং-এর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডঃ পি কে ব্যানার্জি ওয়াশিংটনে নতুন পদ লাভ করেছেন বলে সংবাদে জানা গেছে।

অর্থনৈতিক

সোভিয়েট বাণিজ্য পত্রিকা 'ভাইনেশনায়া তোরগোভলিয়া' (বৈদেশিক বাণিজ্য) ১৯৬২ সালের চীন-সোভিয়েট বাণিজ্যিক লেনদেনের হিসাব প্রকাশ করে জানিয়েছেন, পূর্ব বছরের তুলনায় ঐ বছরে উভয় দেশের বাণিজ্যিক লেনদেন ১৮·৪% হ্রাস পেয়েছে। '৬১ সালে যে লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩৫০ কোটি টাকা, '৬২ সালে তা কমে হয় ২৮৬ কোটি টাকা।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বৈদেশিক বাণিজ্যের মাত্র ৫·৬% হয়েছে চীনের সঙ্গে, যে জায়গায় হাঙ্গেরীর সঙ্গে হয়েছে ৫·৯% ও রুমানিয়ার সঙ্গে ৫·৪%। কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে পূর্ব জার্মানীর সঙ্গেই এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের বাণিজ্যিক লেনদেন সবচেয়ে বেশী, রাশিয়ার '৬২ সালের রপ্তানির ১৮·১% গেছে পূর্ব জার্মানীতে।

চীনের সঙ্গে এই বাণিজ্যিক অবনতির জন্য পত্রিকাটি চীন সরকারের বর্তমান নীতিকে দায়ী করেছেন। পত্রিকাটি জানিয়েছেন যে, চীন রাশিয়া থেকে যন্ত্রপাতি, তৈলজাত পণ্য ও মেটাল টিউবিং আমদানি হ্রাস করেছে আর রাশিয়া চীন থেকে আনা কমিয়েছে কাঁচা সিল্ক, পশম, তুলা ও সীসা, টিন ও লৌহেতর ধাতু।

* * *

জাহাজের পরিবহন শক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান এখন সর্বোচ্চে। তার জাহাজগুলির মোট পরিবহন শক্তি ২ কোটি ৩১ লক্ষ হাজার পাউন্ড। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বৃটেনের জাহাজগুলির পরিবহন শক্তি ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৬৫ হাজার পাউন্ড। সারা পৃথিবীর মোট পরিবহন শক্তি হল ১৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৩ হাজার পাউন্ড। এক বছরে বিশ্বের জাহাজী পরিবহন শক্তি বেড়েছে ৫৮ লক্ষ ৮৪ হাজার পাউন্ড। গত এক বছরে দেশ হিসাবে জাহাজী পরিবহন শক্তি সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে নরওয়ের; তার বর্তমান পরিবহন শক্তি ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬৯ হাজার। জাপানের বর্তমান জাহাজী পরিবহন শক্তি ৯৯ লক্ষ ৭৭ হাজার। এ ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থান এক বছরে একাদশ থেকে উন্নীত হয়ে অষ্টম হয়েছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মোট পরিবহন শক্তি ২ কোটি ৭১ লক্ষ ৮২ হাজার।

* * *

নিউকাসলে কয়লা পাঠানো আর তেলা মাথায় তেল ঢালা নাকি এক কথা। কিন্তু এন্ড্রু ইয়ুল কোম্পানী তাঁদের শতবার্ষিকী উপলক্ষে জানান যে, ১৯৫১ সালে নিউ কাসলে সত্যই কয়লার অভাব পড়েছিল। ঐ সময় তাঁরা ভারত থেকে তিন জাহাজ ভর্তি ১৮ হাজার টন ভাল জাতের কয়লা নিউ কাসলে পাঠিয়েছিলেন।

* * *

গত দু মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন লন্ডনে ১০১ টন সোনা বেচেছে আর ইউরোপের অন্যান্য দেশে বেচেছে ৩২৫ টন। ইউরোপে যে সোনা বেচা হয়েছে তার মোট দাম ৩৬ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। ১৯৬২ সালে সারা বছরে সোভিয়েট ইউনিয়ন যত সোনা বেচেছে গত দু মাসে তার চেয়ে সে ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার মূল্যের বেশী সোনা বেচেছে। এই সব সোনাই বেচা হচ্ছে পশ্চিমী দেশগুলি থেকে থেকে গম কেনার উদ্দেশ্যে।

* * *

জাপান বরাবরই ভারতীয় লবণের বড় ক্রেতা। কিন্তু ইদানিং জাপান রুমানিয়া ও চীন থেকে লবণ কেনা আরম্ভ করেছে বলে সেখানে ভারতীয় লবণের রপ্তানি দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৬০ সালে জাপান কিনেছিল ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টন ভারতীয় লবণ; ১৯৬১ সালে তার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টন। গত বছর একটু বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টন।

স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন জাপানে ভারতীয় লবণের চাহিদা পূর্বের অবস্থায় উন্নীত করতে বিশেষ তৎপর এবং এবিষয়ে নতুন করে জাপান সরকারের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা শুরু করেছেন। এই আলোচনা সফল হলে জাপান আবার হয়ত ভারত থেকে বছরে সাড়ে চার লক্ষ টন লবণ কেনা শুরু করবে। যার কিছুটা দাম সে নগদ মূল্যে দিয়ে শোধ করবে, অপর কিছুটা শোধ করবে সার দিয়ে।

বেলা শেষের গান

সমকালীন সাহিত্য
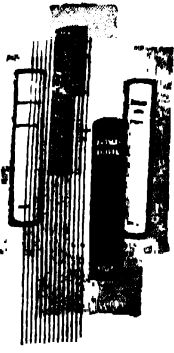
অভয়ংকর

আমাদের বয়স যখন কাঁচা তখন যে দুজন ইংরেজ কথা-সাহিত্যিক বিশেষভাবে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের একজনের নাম ডি এচ লরেন্স আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আলডাস হাক্সলী। হাক্সলীর রচনাশৈলীর প্রভাবে প্রভাবিত এ যুগের অনেক বাঙালী খ্যাতনামা সাহিত্যিকের গোড়ার দিককার রচনা পাঠ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। হাক্সলীর মৃত্যুসংবাদ সম্প্রতি পরিবেশিত হয়েছে, তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'Island' সম্পর্কে এবারের আলোচনা। জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে 'Brave New World-এর লেখক আবার যেন পিছু হটে গিয়ে তার অপর পিঠের কথা বলেছেন এই Island উপন্যাসে।

Brave New World প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে, তাঁর নতুনতম গ্রন্থেরও সেই নামকরণ করলে অবশ্য কিঞ্চিৎ শ্লেষাত্মক হত। তার প্রথম 'Utopia' (উদ্ভট?) ছিল এক ভয়ংকর ভবিষ্যতের কল্পলোক, আর তাঁর এই শেষ উপন্যাস হ'ল বর্তমানের মানুষের জন্য রচিত জ্ঞানবৃদ্ধ সাহিত্যিকের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা।

এই গ্রন্থটিকে উপন্যাস হিসাবে বিচার করা ভুল হবে, উপন্যাস হিসাবেও গ্রন্থটি এক অসম্ভবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম জগতের জনৈক সাংবাদিক উইল ফারনাবি, লোকটি দুঃশীল এবং উদ্‌ভ্রান্ত, নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তিনি বিভ্রান্ত, তাই তিনি স্থির করলেন গোপন এক আশ্চর্য দ্বীপে গিয়ে থাকবেন, দ্বীপটির নাম 'পালা' ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি এক অঞ্চল। সাংবাদিকের উদ্দেশ্য হল আংশিকভাবে সাংবাদিক আবার পালা দ্বীপের তৈলসম্পদের সম্ভাব্য শোষণ বিষয়েও সংশ্লিষ্ট। এই তৈল কোম্পানীর একজন বড় অংশীদার উইল ফারনাবির মনিব। ফারনাবি পালা দ্বীপে পৌঁছে যেন স্বর্গরাজ্যের সন্ধান পেলেন, কিন্তু এই স্বর্গের শান্তিও বিঘ্নিত, পালা দ্বীপের প্রতিবেশী রাষ্ট্র রেনডাঙের চক্রান্তে পালার পশ্চিমঘেঁষা রাণী এবং তাঁর পুত্র এবং এক আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানীর এই চক্রান্তে বিশেষ ভূমিকা। গ্রন্থটির মূল কাহিনীতে পাওয়া যাবে পালা দ্বীপের সমাজে ফারনাবির নিয়ন্ত্রিত পরিভ্রমণ এবং ধীরে ধীরে অতিথি ফারনাবি আশ্রয়দাতাদের ধর্মবিশ্বাস এবং মনোভঙ্গীর প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। নিজের কুমতলব পরিত্যাগ করে ফারনাবি পালা দ্বীপকে রক্ষা করার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত তার কিছুই সাহায্য করতে পারেন না, রেনডাঙ পালা দ্বীপ আক্রমণ করল। আর সমগ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার চরম পরিণতিতেই আলডাস হাক্সলীর উপন্যাসেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে, যথা—উদ্ভটত্বের Utopia কল্পনা কি একটা প্রয়োজনীয় পেশা, আর হাক্সলীর এই বিশেষ উদ্ভটত্ব কি আমরা অনুমোদন করি? ঐতিহ্যানুসারী পন্থায়, সাহিত্যকার শিল্পী হিসাবে নিজস্ব বহুবিধ 'বাণী'কে সম্প্রসারিত করতে হাক্সলী কতখানি সার্থকতা লাভ করেছেন?

প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, অতীতে হাক্সলী-উদ্ভাবিত উদ্ভটত্ব মনকে নাড়া দিয়েছে। যদিচ তার একটিও শেষ পর্যন্ত ঘটে ওঠেনি, ডায়োনিসিয়ুসের ওপর প্লেটোর কিংবা লেনিনের ওপর মার্কসের প্রত্যক্ষ প্রভাব হয়ত ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়, অপ্রত্যক্ষ প্রভাব যেভাবে মানুষের আশা এবং অভীপ্সাকে বলিষ্ঠ স্বপ্নে আকুল করেছে, তার মূল্য অনেক বেশি। যুক্তিগ্রাহ্য মত হিসাবে নিশ্চয়ই এ-কথা অনেকে স্বীকার করবেন যে, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কোনো চিন্তানায়কের পক্ষে যে ধরণের মানবিক সমাজ তাঁর কাছে বাঞ্ছনীয় মনে হয়, সেই বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই দাবীতে সাড়া দিয়েছেন টি এস এলিয়ট, তাঁর পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর উদ্ভট পরিকল্পনা "The Idea of a Christian Society" নামক গ্রন্থে।

অপরপক্ষে উদ্ভটত্বের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিমতবাদী যুক্তিও বর্তমান। সংস্কারকরা যে সর্বদাই সামনের সমস্যা, যা অন্যায় তাকে ন্যায়ে পরিণত করার চেষ্টায় কালক্ষেপণ করবেন কিংবা ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত সর্ববিধ পরিকল্পনাই বিভ্রান্তিকর এবং ভয়ংকর এ-কথাও বলা চলে না। তবে রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্মসূচী হিসাবে না হলেও, বিদগ্ধজনোচিত আলোচনায় কোনো ক্ষতি নেই। সামাজিক সমালোচনার একটা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে উদ্ভটত্বকে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু হাক্সলীর উদ্ভটত্ব বিচারে বসলে দুঃখের সঙ্গে মনে হবে যে, একজনের উদ্ভটত্ব অপরের কাছে নারকীয় বিবেচিত হতে পারে। এই সত্য, তার কারণ অবশ্য এ নয় যে, নতুন জীবনের প্রস্তাবনা করা হয়েছে অপরের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়, তার কারণ এই যে, অপর প্রাণীরা বর্তমানের এক সজীব জগতের মানুষ। বাস্তবতার মধ্যে যথেষ্ট জটিলত্ব এবং গভীরতা থাকলেও, বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচয় আমাদের সুনিবিড়। পরিচিত এই জগতের চাইতে, কাগজে আঁকা এই পৃথিবীর এক উপযুক্ত রূপান্তরিত সংস্করণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে এমন এক আশ্চর্য জগৎ অঙ্কিত হয়নি। পালা দ্বীপের যদি সত্যই কোনো অস্তিত্ব থাকত, তাহলেও হাক্সলীর আঁকা এই স্বর্গরাজ্যে গমন করতে নিশ্চয়ই খুব কম মানুষেরই আগ্রহ হত।

এই উপন্যাসে হাক্সলী সর্ববিধ মতবাদের এক সঞ্চয়ন করেছেন সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় প্রসঙ্গ চিন্তনে হাক্সলীর বিগত দশ থেকে পনের বছর কাল কেটেছে। এক হিসাবে গাজা শহরে চক্ষুহীন অবস্থায় যে আলডাস হাক্সলী গিয়েছিলেন, তাঁর পুরাতন পরিচিত সেই মোটা সেলের চশমা যেদিন থেকে পরিত্যাগ করে, তিনি চশমাহীন হয়েছেন সেই সময় থেকেই তাঁর মনন ও চিন্তনে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর সৃষ্ট এই পালানীয় সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্বপ্ন-সৃজক মাদক, ধর্মীয় অনুশীলন, নাস্তিক ধর্মসভা, যৌন-স্বাধীনতা। পরিবার বিনিয়ন্ত্রণ, এমন কি বৌদ্ধ-মহাযান নীতি।

এই স্বপ্ন দিয়ে গড়া দ্বীপে সবকিছুই পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও শোভন।

যা কিছু ঘটে তা মধুর এবং পবিত্র। তাই অবশ্য প্রত্যাশিত, কারণ এখানে সবাই যোগী, বিনোবা ভাবের মত আদর্শ-আশ্রিত মানুষ, এমন কি নার্স রাধাও এই দলে। প্রতিটি অধিবাসী 'Yoga of work', 'Yoga of Love' এবং 'Yoga of Summit'-এ উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এখানকার সব শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, এক-একটি দেবদূত। এমন কি, পাখিরাও রীতিমত প্রাজ্ঞ। ময়নাটা যতবার ডাকে, ততবার সে বলে ওঠে—"করুণা! করুণা—"

সমগ্র বিষয়টি কি মধুর! কত মধুর, কত সহজ! বিপ্লব নয়! প্রপাগান্ডা নয়। হেভী ইন্ডাস্ট্রি নয়, অস্ত্রসজ্জা, তার পরিবর্তে আছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কৃষি-ব্যবস্থা, বিনামূল্যে বিতরিত জন্মনিয়ন্ত্রণী সরঞ্জাম, যৌন বিষয়ে সুস্থ মনোভঙ্গী। এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা যা নতুনকিছুর জন্য প্রাণে জ্বালা বাড়ায় না। এমন এক কম্যুনিটি জীবন যে, সেখানে একটি শিশুর আপন পিতা-মাতা ছাড়া অসংখ্য সহকারী পিতা-মাতার দল বিরাজমান। প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সে যে কি এবং সে কি করছে, সে বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন, তারা সবাই যা কিছু করছে, সবই 'নির্বাণ'-লাভের প্রচেষ্টা। আর যারা অলস, নির্বাণলাভের ক্লেশ যাদের পক্ষে কষ্টকর, তাদের জন্য আছে মোক্ষবটিকা। সেই বটিকা তারা পাবে যদি তারা জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে ধ্যান করে। এই মোক্ষবটিকা উইল ফারনাবির মত সাংবাদিকেরও লাভ হয়, ভাগ্যচক্রে সে-জাহাজ ডুবি হয়ে পালা দ্বীপে এসে পড়েছিল, তাই এত কিছু শিক্ষালাভ হল।

যাই হোক, 'Ape and Essence'-এর আলডাস হাক্সলীর সঙ্গে 'Island'-এর হাক্সলীর অনেক প্রভেদ। পালানীয়রা যে ভাষায় ফারনাবির সঙ্গে বা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে, তা বেশ জটিল এবং চটকদার।

এই গ্রন্থটি প্রকৃত প্রেম এবং সদ্‌গুণের পরিচায়ক। আলডাস হাক্সলী তাঁর স্বাভাবিক বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করেছেন। কারণ, বিশ্বাসের আকৃতি পরিবর্তিত। তাঁর পরিকল্পনার যা ফাঁক, যা ত্রুটি তা তাঁর আগ্রহাতিশয্যের ফল, একটি জনপ্রিয় এবং সার্থক উপন্যাস রচনার চেয়ে একটি সুন্দর সুপরিকল্পিত পৃথিবী গড়ে তোলার দিকেই তাঁর আগ্রহ বেশি। তাঁর পন্থার যে অসাফল্য, তা উপেক্ষা করে তিনি আমাদের যেটুকু বলতে চান, তা শোনাই কর্তব্য। এই গ্রন্থের অসম্ভব পরিকল্পনা, অশ্লীলতা, স্থূল বর্ণনা সব ছাড়িয়ে যে বক্তব্য প্রবল, সে এক সত্যদ্রষ্টা মনীষার সমগ্র কর্মজীবনের ফলশ্রুতি। তাই এর মধ্যে প্রচুর চিন্তার খোরাক ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যাবে। বেলাশেষের গানে আলডাস হাক্সলীর যে বাণী, সেই শেষ কথার সঙ্গে তাঁরই অনেক আগেকার উক্তি—

"Let us think about the present, not the future and if we don't there will soon be no future to think about."

তাই Island উপন্যাসের রাধা, সুশীলা, বিজয়া, লক্ষ্মী এবং ডাঃ রবার্ট ম্যাক ফেইল আমাদের মনে দাগ কাটতে পারে না। চরিত্রগুলি তোতাপাখির মত আলডাস হাক্সলীর শেখানো বুলি আউড়িয়ে গেলেও, এই বিচিত্র উপন্যাস আলডাস হাক্সলীর এক স্মরণীয় গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করবে। *

* **ISLAND — By ALDOUS HUXLEY: Publishers: Chatto & Windus: London. Price — 18 Shillings.**

নতুন বই

*** নবীনচন্দ্র সেন পুনর্বিচার ***

নবীনচন্দ্রের কবি-ব্যক্তিত্ব আধুনিক কাব্যপাঠকের ও সমালোচকের দৃষ্টি-বহির্ভূত হলেও উনিশ শতকের নবজাগরণের জোয়ারে নবীনচন্দ্র একটি স্মরণীয় নাম। মধুসূদনের উত্তরসাধক হলেও নবীনচন্দ্র তাঁরও সমকক্ষ ছিলেন না। সমকালীন যুগপ্রবাহে তিনি স্বীয় চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করেছিলেন। আদর্শ প্রচার, স্বদেশচেতনা এবং কাব্যরীতির নবপ্রবাহে নবীনচন্দ্র ছিলেন মুক্তপুরুষ। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তীর্ণ আলোচনা আজও হয়নি। অথচ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে নবীনচন্দ্র উপেক্ষণীয় চরিত্র নন।

সম্প্রতি শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় নবীনচন্দ্রের ওপর গবেষণা করে ডি ফিল্‌ উপাধি লাভ করেছেন। তিনি নবীনচন্দ্রের সমগ্র রচনাকে বিশ্লেষণ করে তাঁর কবি-প্রকৃতির মর্মোদ্ঘাটনে সার্থকভাবে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। নবীনচন্দ্রের **পুনর্মূল্যায়ন, জীবনায়ন, দেশ কাল ও মন, শৈশব পরিবেশ ও কাব্যসাধনার সূচনা, নবীনচন্দ্র ও বায়রণ, মহাকাব্যধারায় নবীনচন্দ্র, পলাশির যুদ্ধ, ভাষা ও ছন্দ** অধ্যায়গুলি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ। নবীনচন্দ্রের গদ্যরচনাগুলিও স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নবীনচন্দ্রের গ্রন্থগুলির একটি তালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

বহু প্রখ্যাত সমালোচক নবীনচন্দ্র সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন, কিন্তু নবীনচন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধির চেষ্টা ইতিপূর্বে করা হয়নি। বর্তমান গ্রন্থকার তাঁর আলোচনায় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন বলেই উনিশ শতকের এই কবিব্যক্তিত্বের সার্থক বিচারে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি—(আলোচনা) —সুবোধরঞ্জন রায়। মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ। ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি স্ট্রীট, কলিকাতা : বার। দাম : ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা।

●

*** ভ্রমণ কাহিনী ***

পর্বতমালার আকর্ষণ দুর্নিবার। বিশেষতঃ সেই পর্বতমালার সঙ্গে যদি পৌরাণিক ইতিকথা জড়িত থাকে তাহলে পর্বত অভিযাত্রা এবং তীর্থযাত্রার এক অপরূপ সমন্বয় ঘটে। চাম্বা হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এমনি এক কিংবদন্তী তীর্থ। লেখক সহজ এবং আবেগময় ভাষায় তাঁর চাম্বা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন বর্তমান গ্রন্থে। চাম্বার কিংবদন্তীর কথাও বলেছেন নিপুণ কথকতায়। সবচেয়ে বড় কথা অপরূপ চাম্বার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক কদাপি দার্শনিক তত্ত্ব কথার চোরা পথে (পার্বত্য ভ্রমণ কাহিনীতে যা হয়ে থাকে সচরাচর) তাঁর বৃত্তান্তকে হারিয়ে ফেলেন নি।

এই গ্রন্থের আরেক আকর্ষণ কয়েকটি সুন্দর ফোটোগ্রাফ।

অপরূপ চাম্বা: দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত। ১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা—১। দাম ছয় টাকা।

●

সমাজ-সচেতন নাটিকা

তরুণ নাট্যকার গণেশ নন্দীর **সূর্য তপস্যা** একটি জীবনসচেতন নাটিকা। নাট্যকারের বাস্তবতা বোধ এবং আদর্শ—যা কোন কোন নাটকের বিশেষত্ব, তা এই নাটকে সর্বত্রই লক্ষণীয়। কাহিনী-বিন্যাসে এবং চরিত্রচিত্রণে নাট্যকারের দক্ষতা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে শিরোমণি, অজয়, ডাক্তার প্রভৃতির চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত।

সূর্য তপস্যা : (নাটিকা)—গণেশ নন্দী। প্রকাশক : সসাহিত্যম্‌। ১০।১১, বাগমারী লেন, কলিকাতা-১১। দাম : দেড় টাকা।

●

নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস

সভ্যতার অগ্রগতি সমাজ ব্যবস্থাকে যত জটিল করেছে ও রাষ্ট্রের আইনকানুন যত বেশী মানুষকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে ততই একশ্রেণীর স্বাধীন চিন্তানায়কের মন তার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তাঁরা এমন এক সমাজব্যবস্থা গঠনের কথা চিন্তা করেছেন যেখানে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ পাবে পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পরিবেশ পাবে। আইনের অঙ্কুশ নয়, মানুষের নৈতিক চেতনাই হবে সে সমাজের নিয়ামক। মানুষ সেদিন অপরাধ হতে নিবৃত্ত হবে শাস্তির ভয়ে নয়, অপরাধকে অন্যায় ও মনুষ্যোচিত কাজ নয় জেনেই। তাছাড়া যে ধনবৈষম্য, সামাজিক অবিচার প্রভৃতি আজকের যাবতীয় সামাজিক অশান্তি ও অপরাধের উৎস সে সমাজে সে সবের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। সুতরাং মানুষের বিপথচালিত হওয়ার যাবতীয় আশঙ্কাও সেদিন বিলুপ্ত হবে। —এই শাসন ও শোষণহীন সমাজের কল্পনাই নৈরাজ্যবাদ এবং যুগে যুগে দেশে দেশে যেসব চিন্তানায়ক এই নৈরাজ্যবাদের আদর্শ প্রচার করেছেন রাজনৈতিক দর্শনে তাঁরাই নৈরাজ্যবাদী নামে আখ্যায়িত।

বলা বাহুল্য, সকল নৈরাজ্যবাদীর চিন্তাধারা বা বক্তব্য বিষয় এক নয়, এক হওয়া সম্ভবও নয়। আড়াই হাজার বছর আগে চীনের চিন্তানায়ক লাওৎসে যে সমাজব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নৈরাজ্যবাদের চিন্তা করেছেন, বা মহাভারতের শান্তি পর্বে কয়েকটি ছত্রে প্রাচীন (মহাভারতের যুগেও প্রাচীন) নিরাজ সমাজের যে ছবি আঁকা হয়েছে ("তখন না ছিল রাজা, না ছিল রাজ্য, না দন্ড বা দান্ডিক; প্রজারা স্বভাবধর্মে পরস্পরকে রক্ষা করত") তার সঙ্গে উনিশ শতকের নৈরাজ্যবাদী ইংলন্ডের উইলিয়ম গডুইন (১৭৫৬—১৮৩৬) ফ্রান্সের পিয়ের জোসেফ প্রুদ (১৮০৯—৬৫) ও জার্মানীর ম্যাক্স ষ্টার্নারের (১৮০৬—৫৬) বা বিশ শতকের পিটার আলেকজান্ডার ক্রপটকিনের (১৮৪২—১৯২১) নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারায় সাদৃশ্য থাকাটাই অস্বাভাবিক। মানুষের দ্বারা মানুষের শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা সকলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন; এই কারণেই সাধারণভাবে তাঁরা সকলেই নৈরাজ্যবাদী স্বতন্ত্র বিশ্লেষণে তাঁদের অনেক পার্থক্য। এ কারণে নৈরাজ্যবাদীদের একটি 'স্পিসিজ' না ভেবে 'জেনাস' ভাবাই সঙ্গত।

ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শনে সুপণ্ডিত ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের এই প্রত্যেকটি 'স্পিসিজে'র বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করেছেন তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'নৈরাজ্যবাদ' গ্রন্থে। তিনশতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির প্রতি ছত্রে শুধু যে লেখকের জ্ঞানের গভীরতারই পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, সেই সঙ্গে মুগ্ধ হতে হয় সাধারণের বোধগম্য ভাষায় চিত্তাকর্ষকভাবে সমগ্র বিষয়টির পরিবেশনে। গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক ছিল লেখকের, তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটেছিল তাঁর। একারণে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নতুন মত ও পথের চিন্তা করছিলেন তিনি। 'নৈরাজ্যবাদ' সেই নিভৃত চিন্তারই সৃষ্টি কিন্তু পূর্ণ পরিণতি নয়। কারণ নৈরাজ্যবাদীদের চিন্তার ত্রুটিবিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা ও অসাম্ভব্যতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এর পরেও অনেক কথা বলার ছিল তাঁর, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় সে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

নৈরাজ্যবাদ—ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু, প্রকাশক রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম : দশ টাকা।

●

পরিক্রমা, অনন্ত সন্ধান

কবি পরেশ মন্ডলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অদূরে জলের শব্দ' আমাদের এমন এক কবির সাথে পরিচিত করে যাঁর প্রত্যেকটি উচ্চারণ সৎ, স্বোপলব্ধ অনুভবের প্রকাশ। কাব্যগ্রন্থটির আলোচনা কালে প্রথমেই একথা বলা প্রয়োজন। কেননা, এসময়ে, যখন কবিতা ক্রমশ গৃহলালিত পাখির বাঁধাবুলি বা বিকারগ্রস্তের প্রলাপের আকৃতি লাভ করছে তখন কোন কবির সততা দেখলে আশ্বস্ত এবং আনন্দিত হতে হয়। আবার অন্যদিক থেকে উল্লেখ্য যে এ-জাতীয় সৎ কবিকর্মে প্রশংসা-নিন্দার তাড়িৎ-সাফল্যও অলভ্য। কারণ জ্বরের উত্তাপ নয় বলে এর স্বাভাবিক আভ্যন্তর তাপ একমাত্র স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত (ট্রেন্‌ড্) কাব্য-পাঠকেরই অনুভববেদ্য।

পরেশ মন্ডলের কবিতার বিষয়বস্তু কবি স্বয়ং অর্থাৎ কবির 'আমি'। এবং এছাড়া কবিতার আর কিইবা বিষয় হতে পারে? গ্রন্থস্থ কবিতাসমূহ কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং আন্তরিক অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান, 'পরিক্রমা, অনন্ত সন্ধান' একটি কবিতার এই শিরোনাম স্মরণ করে বলা যায় যে কবির এই পরিক্রমা স্বগত। প্রথম কবিতা থেকেই কবির আত্মমগ্ন যাত্রার শুরু:

স রাদিন মনে হয় সঙ্গিহীন অকরুণ আমি
কে আমায় ডাকে আজ শ্রাবণের বিষাদে
বিরলে,
অদূরে জলের শব্দ, শীর্ণ আলোরেখা
অনুগামী,
কাঁপন লেগেছে শান্ত উপবনে লাজুক
পল্লবে।
(অদূরে জলের শব্দ)

কখনো বা স্মৃতি-আকীর্ণ প্রকৃতিতে কবির বিধুর অবস্থিতি—যেখানে বৃক্ষ, পাখি সবই আসলে তাঁর আত্মগত দ্বিতীয় নিসর্গজগৎ।

সারাটা দুপুর ধরে বিষাদে মন্থর
সেই পাখিটা একাকী
ডেকে যাচ্ছে—ডেকে যাচ্ছে। সারাটা দুপুর
ডাকছে.........
পাতায় পায়ের শব্দ, চিত্রাবলি, পান্ডুর
আকাশ
সমস্ত দুখানা হয়ে যাবে ব'লে
ত্রস্ত ব্যস্ত এবং তখন
বুকের আড়াল থেকে বিদ্ধ বেদনায়
মুখ ভেসে ওঠে। (সারাটা দুপুর)

এভাবে বিবিধ সংকেত কবির হৃদয়ের সমাচার বিধৃত।

মেলার হাজার গোলযোগের মাঝে
পুতুল আমার ফানুস হয়ে ওড়ে
চোখের পাতায় তারার নিবিড় সাঁঝে
উথাল পাথাল হৃদয় কবর খোঁড়ে।
(পুতুল)

কিন্তু কেবলমাত্র বিষয়বস্তু গৌরবই কবিতাকে সার্থক করতে পারে না। আভ্যন্তর জগতের বর্ণময় উপলব্ধি-সমূহকে ভাষায় অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ। বিষয়কে ধারণ করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত আধারের। তাই প্রকরণ-ঋদ্ধি সার্থক কবিতার অন্যতম লক্ষণ। এবং এদিক থেকে ছন্দ-শরীর নির্মাণ, শব্দ-চয়ন, সমাসোক্তি প্রয়োগ, রূপকল্প সৃষ্টি, সর্বোপরি আবেগের সংহত প্রকাশে কবি পরেশ মন্ডলের কৃতিত্ব গ্রন্থেপ্রতে অবশ্য-স্বীকার্য।

অথবা কোথায় পটে আঁকা আছে
সরমা বৈশাখী (অদূরে জলের শব্দ)
আমিও ঝর্ণার জলে ডুবে থেকে দেখেছি
কম্পন (জাদুঘর)
হাত থেকে কেড়ে নিলে অপরূপ ফুল্ল
ভুঁইচাঁপা
এখনো আঙুলে আঁকা পরাগের
অঙ্গরাগরেখা,
(পেতে চাই উজ্জ্বল গোলাপ)

পাশের বকুল গাছে লুকনো শব্দের পায়চারি (কাকে যেন ডাকি)।

উপরি-উদ্ধৃত চরণগুলি কবির প্রকাশনৈপুণ্য তথা কবিত্বের নিদর্শন বলে গণ্য হতে পারে।

গ্রন্থে চিত কবিতাগুলি কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত না হলেও প্রকরণ এবং মননের সূত্র অনুসরণ করে কবির পরিণতি-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এবং একজন তরুণ কবির গুণান্বিত কবিকর্মের সংকলন হিসাবে এই কাব্যগ্রন্থটি সাম্প্রতিক সময়ের তরুণ কবিদের মুষ্টিমেয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অন্যতম বলে স্মরণীয় হবে।

অদূরে জলের শব্দ—পরেশ মন্ডল। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। কলকাতা। দাম—দু'টাকা।

*** আধুনিক বাঙলা কবিতার সংকলন ***

সাহিত্যের ইতিহাসে মাঝে মাঝে পালা বদল হয়। এবং সেই সময় যে নতুন চেতনা বা পুরনোকে নতুনভাবে নির্ণীত করার অভিপ্রায় সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় তা' অনেক সময় পাঠকমনে সাহিত্যের ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে। কিন্তু কিছুকাল পরে সেই নতুন চেতনা যখন পাঠকের কাছে পুরনো ও স্বাভাবিক হয় তখন আর কোন সন্দেহই থাকে না। কবিতার ক্ষেত্রে এ-কথা সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে।

রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে তিরিশ দশকের কবিরা যখন কাব্যকে মুক্তি দিয়ে নতুন সুর বা চেতনা কাব্যের ক্ষেত্রে আনলেন, তখন পাঠকরা তৎকালীন তরুণ কবিদের কবিতাকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু আজকের পাঠকদের কাছে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতা যেমন এক সুদৃঢ় চরিত্রের অধিকারী, তেমনি আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

এ-পর্যন্ত বাংলা কবিতার কয়েকটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেকটি সংকলনই আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কিন্তু কোন সংকলনই কেবলমাত্র একটি বিশিষ্ট সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেনি। বর্তমান সংকলনটি সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। এই সংকলনে বাংলা কবিতার সমগ্র রূপটি ধরা পড়েনি, পক্ষান্তরে কেবলমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কাব্যচর্চার রূপটি এই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে যে সকল কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিয়াত্তর জনের একশো পঞ্চাশটি কবিতা নিয়ে এই সংকলন। আজকের কবিতায় একদিকে যেমন হিংসা, ক্রোধ, আসক্তি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উল্লাস-উন্মাদনা, উচ্ছৃংখলতা, অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট অন্যদিকে তেমনি ক্লান্তি, সংশয়, নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, দুঃখ চরমভাবে প্রতিফলিত। জীবনজিজ্ঞাসায় আজকের কবিরা যে প্রাজ্ঞ, রোম্যান্টিক বেদনায় অভিভূত, জীবনবোধে দার্শনিক তার প্রমাণ এই সংকলনের সর্বত্র। মোটামুটিভাবে বর্তমান কাব্য-আন্দোলনের সামগ্রিক চেহারাটি পাঠকের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত করার প্রয়াস পেয়েছেন সম্পাদক এবং এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

তবে এ-সংকলনে সম্পাদক কয়েকজন কবির কবিতা-নির্বাচনে কবি-চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি, কয়েকজন বিগত-দিনের শক্তিশালী কবির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে অসমর্থ হয়েছেন, অন্যদিকে কয়েকজনের প্রতি দুর্বলতা দোষে দুষ্ট।

পরিশেষে, যদিও সম্পাদক এক-স্থানে বলেছেন 'যেসব কবিরা অনেকে মিলে সংহত কিন্তু যাঁরা প্রত্যেকে আলাদা বিচ্যুত দ্বীপের মত আত্মবলীন তাঁদের সকলকে এই সংকলনে সর্বপ্রথম একত্রিত করা হল', কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা তিনি করতে পারেন নি। আরো কয়েকজন কবিকে তিনি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন।

মুদ্রণ-পারিপাট্য এবং সুচারু প্রচ্ছদ সংকলনটির যথাযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

বাংলা কবিতা—(কবিতা সংকলন) : চতুর্থ পর্যায় ॥ পশ্চিম অলিন্দ ॥ সম্পাদক : শান্তি লাহিড়ী, প্রকাশক : সাহিত্য, ১ ডেকার্স লেন। কলিকাতা—১৩। দাম : চার টাকা।

●

*** জীবননিষ্ঠ কাব্য ***

বর্তমান দশকের তরুণ কবিরা যখন সময়ের নিষ্ঠুর পীড়নে পর্যুদস্ত, আর্তনাদে মুখর, যন্ত্রণায় কাতর, নৈরাশ্যে স্থবির সে সময় বলিষ্ঠ জীবন-সচেতন কোন কাব্য পাঠকমনকে আলোড়িত না করে পারে না। আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থটি বলিষ্ঠ জীবন-প্রত্যয়ের জন্য তাই আমাকে আলোড়িত ও মুগ্ধ করেছে। এ কাব্যে সমাজ-সচেতনতা অশনি ঝংকারে চমৎকৃত। তাই সমাজ-সচেতন এই কবির কাব্যে শুনি

সে শহরেও ক্ষুধা আছে
আছে অনিদ্রা অনাহার
শোষণ শাসন
সে-শহরের একচ্ছত্র সম্রাটের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে সংগঠন। (সমুদ্র শহর)

জীবন-বোধে গভীর বিশ্বাসী কবি তাই বলেন,

পৃথিবী, কবিতার হাতে
রক্ত গোলাপ, গোলাপের বেহালা।
(কবিতার রক্তে পৃথিবী)

তিনি সোচ্চারে বলেন:

তুমি আমার হৃৎপিণ্ড
আমার দুরন্ত আগ্নেয় হৃৎপিণ্ড।
(আফ্রিকা : ১৯৬১)

সর্বসমেত ছাব্বিশটি কবিতা এ-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রচ্ছদটি সু-অংকিত।

মানুষ শহর সমুদ্র— (কাব্য-গ্রন্থ): কমলেশ সেন, প্রকাশক : কবিতা শান্তি পরিষদ, ২৯ সদানন্দ রোড, কলিকাতা : ২৬, দাম : দু' টাকা।

●

'সমর্পণ' উপন্যাস রচনায় শ্রীনিত্যনিরঞ্জন ভট্টাচার্য কাহিনী সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে প্রতিটি চরিত্রই স্বকীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লেখকের আবেগময় বর্ণনা-ভঙ্গীই পাঠকমনকে সহজেই আকৃষ্ট করবে।

মুদ্রণ পারিপাট্য ও প্রচ্ছদ অঙ্কণে অধিক সুরুচির পরিচয় দিলে ভাল হত।

সমর্পণ— (উপন্যাস)—শ্রীনিত্যনিরঞ্জন ভট্টাচার্য। দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম। ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-১। দাম ছয় টাকা।

●

*** লণ্ডনের পটভূমিকায় ***

লণ্ডনের পটভূমিকায় ভারতীয়ের জীবন নিয়ে রচিত গ্রন্থের অভাব নেই। বাঙলা দেশেও বেশ কয়েকখানি রচিত হয়েছে। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণা দত্তের নব-প্রকাশিত গ্রন্থ **ইংলিশ চ্যানেল**-এর পটভূমিকায় রয়েছে ঐ একই স্থান।

দীর্ঘ এই কাহিনীর মধ্যে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। একটি কাহিনী কোথাও স্থির হয়ে থাকেনি। চরিত্রের পর চরিত্র, ঘটনার পর ঘটনার সমাবেশে লণ্ডনের বুকে ভারতীয় যুবক-যুবতীদের জীবনের এক বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে। কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন একজন বিধবা বাঙালী রমণী, সবিতা। লণ্ডনে তাঁর বিত্তবান ভাসুর ও দেওরের সংস্পর্শে না থেকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে বাস করছিলেন এক তীব্র মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে। সবিতা লণ্ডনের মানুষ তাদের বিচিত্র জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। লেখিকা ইচ্ছাকৃতভাবে সবিতার চরিত্র এভাবে গড়েছেন। গতির প্রবাহে ক্ষণিক প্রবাহিত হতে দিয়েও তিনি তাকে স্থিতি দিতে পারতেন। ফলে সবিতার চরিত্রের আড়ষ্টতা এমন সুস্পষ্ট হয়ে পড়ত না। এতগুলি চরিত্রের মধ্যে শচীন্দ্রনাথের চরিত্র এবং তার ব্যক্তিত্ব সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে চিত্রিত। লণ্ডনে আগত ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের জীবনের যে রূপ লেখিকা তুলে ধরেছেন তার প্রতিটি ঘটনাই পাঠকের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করবে। প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি না করলে এইভাবে চিত্রণ সম্ভব নয়।

ইংলিশ চ্যানেল-এর লেখিকার রচনায় আন্তরিকতার ছাপ সুস্পষ্ট বলেই তিনি কাহিনীসৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করেছেন। তবে তিনি কোথাও কোথাও সংযত হলে ভাল করতেন। কারণ সংযম সার্থক শিল্পসৃষ্টির একটি মূল্যবান উপাদান। আশাকরি তিনি ভবিষ্যতে আরও উল্লেখযোগ্য রচনায় হাত দেবেন।

ইংলিশ চ্যানেল— (উপন্যাস)—কৃষ্ণা দত্ত। নবপত্র প্রকাশন। ৫৭ পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা—৯। দাম—সাত টাকা।

সাহিত্য জগৎ

বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এ-বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর লেকচারার নিযুক্ত হয়েছেন। এই নিয়োগবলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে পাঁচটি বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতা আগামী ১৬ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। নীচে বক্তৃতার বিষয় ও তারিখ দেওয়া হল।

১৬-১২-৬৩ সোমবার — শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ

১৭-১২-৬৩ মঙ্গলবার — কর্মযোগী বিবেকানন্দ

১৮-১২-৬৩ বুধবার — বিবেকানন্দ ও সাম্যবাদ

১৯-১২-৬৩ বৃহস্পতিবার — ভারতসাধক বিবেকানন্দ

২০-১২-৬৩ শুক্রবার — ভক্ত বিবেকানন্দ

বক্তৃতাগুলি যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হবে, তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। বক্তা ও বিষয় নির্বাচনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাধুবাদ দিই।

*** বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে ***

'অজেয় পৌরুষ' ও 'অক্ষয় মনুষ্যত্বে'র অধিকারী বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনও সাহিত্যসম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননী-রূপে মানব-সভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়—যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানব-জীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার কীর্তিও তাহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।"

রবীন্দ্রনাথের কামনা সত্য প্রমাণ করে বাঙলা ভাষা আজ নানান দিক দিয়ে বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষায় পরিণত হতে পেরেছে। বিদ্যাসাগর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কোন কালেই কলম ধরেন নি। শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে এবং প্রতিবাদীদের নিরস্ত করতে গিয়ে তিনি বাঙলা গদ্যের জগতে পরিবর্তনের জোয়ার এনেছিলেন। অবশ্য বিদ্যাসাগরের আগেই গদ্য-রচনায় বৈপ্লবিক যুগান্তরের সূচনা হয়েছিল। বিদ্যাসাগর ঐ গদ্যের ভাষাকে করেছিলেন সংস্কৃত। বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তকজাতীয় গ্রন্থ বাদ দিলেও তাঁর অন্যান্য সাহিত্যরসাশ্রিত গ্রন্থগুলি বাঙলা ভাষার ভান্ডার সমৃদ্ধ করে রেখেছে।

তাঁর প্রথম কৃতিত্বময় প্রকাশ ঘটে বেতাল পঞ্চবিংশতির মধ্য দিয়ে। সে সময়ে প্রচলিত অন্যান্য গদ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে এইটিই উৎকৃষ্ট বলে শ্রীরামপুরের পাদরী মার্শম্যান লিখিত ধন্যবাদ জানান। সাহিত্য সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের অন্যতম কীর্তি হল শকুন্তলা। শকুন্তলা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ সংযোজন। সাহিত্যিক হিসাবে বিদ্যাসাগরের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে সীতার বনবাস-এ। তার পরেই উল্লেখযোগ্য রচনা কমেডি অব এররস্-এর বাঙলা রূপান্তর ভ্রান্তিবিলাস। একজন আধুনিক সমালোচক লিখেছেন : "এই বই লেখার আগেই তাঁর সম্পূর্ণ সাহিত্য-কর্মের অধিকাংশ লেখা হয়ে গেছে। লেখার রীতিতে নতুন কিছু পরীক্ষা করার ইচ্ছা, উৎসাহ, প্রয়োজন কিছুই ছিল না। সীতার বনবাস, শকুন্তলা থেকে ভ্রান্তিবিলাসের রচনাভঙ্গী যে আরও সহজ এবং ঝরঝরে তার মস্ত এক কারণ বিষয়বস্তুর তফাত।"

বিদ্যাসাগর প্রায় পঞ্চাশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে বর্ণপরিচয় আজও বাঙলাদেশের প্রতিটি মানুষের অতিপরিচিত ও অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ। বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্য-গ্রন্থ বাসুদেব-চরিত রচিত হয় ১৮৪২ খৃঃ। ১৮৪৬-এ প্রকাশিত হয় বেতাল পঞ্চবিংশতি। এর পর ১৮৯০ খৃঃ পর্যন্ত তিনি প্রবন্ধ, অনুবাদ, পদ্য-সংগ্রহ, রম্য-রচনা, অভিধান, জীবনচরিত প্রভৃতি রচনায় এই সুদীর্ঘকাল অতিক্রম করেন। স্বরচিত জীবনী মৃত্যুর পর ১৮৯১ খৃঃ প্রকাশিত হয়। তঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলি হল অন্নদামঙ্গল, সর্বদর্শন-সংগ্রহ, বিদ্যাসুন্দর, কিরাতার্জুনীয়ম্, রঘুবংশ, শিশুপালবধম্, কুমারসম্ভবম্, মেঘদূতম্, উত্তরচরিতম্, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, হর্ষচরিতম্, কাদম্বরী। বিদ্যাসাগরের বাঙলা অভিধান শব্দমঞ্জরী গ্রন্থাকারে আজও প্রকাশের মূল্য হারায়নি।

সমাজ-সংস্কারক এবং শিক্ষাব্রতী হিসাবে আমরা বিদ্যাসাগরকে যতখানি জানি, সাহিত্যিক হিসাবে বিদ্যাসাগরের স্বতন্ত্র প্রতিভা সম্পর্কে আমরা উদাসীন। বাঙলা গদ্য সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব যুগান্তর সৃষ্টি করে। অপরিণত ভাষাকে সাহিত্যের মাধ্যমরূপে গড়ে তোলবার জন্য তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। ফলে মৌলিক রচনায় অধিক সময় তিনি ব্যয় করতে পারেন নি। অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে। অনুদিত গ্রন্থগুলির ভাষা-ভঙ্গিমা মৌলিক গ্রন্থগুলি অপেক্ষা অধিকতর সার্থকতা লাভ করেছে।

বিদ্যাসাগরের প্রথম ও একমাত্র সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' বীটন সোসাইটিতে মাত্র এক ঘণ্টায় পাঠ করবার জন্য রচিত হয়। এখানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের গভীর পান্ডিত্য ও কাব্য-বিচারেও সুনিপুণ পরিণত মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ-রচনায় আবেগ-ময়তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন অন্যান্য গদ্য-লেখকদের এই গুণের অভাব ছিল। শিল্পসুষমামন্ডিত সার্থক হৃদয়ধর্মী ভাব প্রকাশে বিদ্যাসাগরের সার্থকতা তৎকালীন বাঙলা সাহিত্যে একমাত্র উজ্জ্বল। "......বাঙলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন; গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"

বিদেশী সাহিত্য

*** সোবিয়েত সাহিত্য জগতের খবর ***

গত বছর নভেম্বর মাসে আলেকজান্ডার সোল্ঝেনিৎসিন-এর **একটি দিন** উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর কেবলমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ায় নয়, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমালোচকরা মুখর হয়ে উঠেছিলেন। সে সম্পর্কে সংবাদ 'অমৃত'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। নোভিমির পত্রিকার সম্পাদক আলেকজান্ডার টাউরডোভস্কি ভূমিকায় লিখেছিলেন যে সোভিয়েত সাহিত্যে সোল্ঝেনিৎসিন-এর উপন্যাসটি একটি অকথিত বক্তব্যের পটভূমিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। বন্দী-নিবাসের একদিনের কাহিনী—যার নায়কের সঙ্গে লেখকও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অথচ এটি কোন স্মৃতিকথা বা ডাইরী নয়। একটি দিন এমন একখানি উপন্যাস যা নিকট অতীতের বেদনাময় সমস্যার পটভূমিতে রচিত, যে অতীত আর ফিরে আসবে না। সোল্ঝেনিৎসিনের কাহিনী প্রকৃতই বাস্তবধর্মী। নিজের জীবন থেকে উপলব্ধ সত্যকে শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এবং প্রকৃত শিল্প-ক্ষমতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সুসামঞ্জস্যেই সম্ভব হয়েছে এই উপন্যাসের জন্ম। এ উপন্যাস এক বিস্ময়কর প্রতিভার দান।

কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় গ্রন্থটির সমাদর ঘটেছে কি ভাবে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সংবাদ তুলে ধরছি। কয়েকজন লিখেছেন যে, এই বইখানি জনগণের ইচ্ছাকে তৃপ্ত করেছে—এটি এমন একখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ যা পাঠক বহু পূর্ব থেকেও পাওয়ার আশা পোষণ করে আসছে। অনেকে এর কাহিনীর মধ্যে বর্তমান সোভিয়েত জীবনযাত্রার কোন যোগ খুঁজে পান নি।

নোভিমির পত্রিকায় সোল্ঝেনিৎসিন-এর দুটি গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর চিত্র কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। অধিকাংশ সমালোচকই এই তরুণ লেখকের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। গল্প দুটি হল—**ইনসিডেন্ট অ্যাট ক্রেশেটোভকা স্টেশন** এবং **ম্যাট্রিওনাজ ইয়ার্ড**। সমালোচকদের অভিযোগ হল লেখক সোভিয়েত জীবনযাত্রাকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। অধিকাংশ সমালোচকই বলেছেন যে, এর ঘটনা প্রাচীন রুশ জীবনযাত্রায় ফিরে গেছে—সমকালীন জীবনের কোন পরিচয়ই তাঁর রচনায় ফুটে উঠতে পারে নি।

১৯১৭-১৯৩৫ সালের সোভিয়েত নাট্যকার দর নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ **মেইন প্রবলেমস্ অব্ ডেভেলপমেন্ট অব রাশিয়ান সোভিয়েত ড্রামা** রচনা করেছেন এ, বগুস্লাভস্কি এবং ভি, ডিয়েভ। বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে জনপ্রিয় রঙ্গালয়গুলির অবস্থা, সামাজিক নাটকের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাস্তবতার সংগ্রাম এবং ব্যঙ্গাত্মক কমেডির উদ্ভবের কথা—বর্তমান গ্রন্থটিতে আছে। গোর্কি, মায়াকোভস্কি, লুনাচারস্কি, ভ্যাডিমির বিল—বেলোজারকোভস্কি, কনস্তানতিন ট্রেনিয়ভ, বরিস ল্যাভরেনইয়ভ, ভেসেভোলড ইভানভ, নিকোলাই পোগোডিন প্রভৃতির নাটক ও নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের আলোচনা করেছেন লেখক দুজন।

লিটারেরি হেরিটেজ-এর সপ্তদশ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে আছে ম্যাক্সিম গোর্কির পাঁচশতটি অপ্রকাশিত চিঠি। পত্রে যোগাযোগকারী ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন আলেক্সি টলস্টয়, কনস্তানটাইন ফেডিন, মিখাইল শলোকভ, ফিয়োডর গ্লাডকভ, ওলগা ফোর্স, মিখাইল প্রিসভিন।

আজারবাইজানের কথাশিল্প, কবিতা ও নাটকের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **এ রিভিউ অব্ দি হিস্ট্রি অব্ আজারবাইজেনিয়ান সোভিয়েট লিটারেচার** গ্রন্থে। আজারবাইজানের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনার ওপর আলোচনা এবং প্রবন্ধ ও গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত হয়েছে।

ভিক্টর ভিনোগ্রাডভ সমালোচনা ও শিল্পতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনায় স্বীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তার **এ থিয়োরি অব্ পোয়েটিক ডিকশান** এবং **পোয়েট্রি অ্যান্ড স্টাইল** পূর্ব-প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ। সম্প্রতি তাঁর **দি ল্যাংগুয়েজ অব্ ফিকশান অ্যান্ড সাম্ প্রোব্লেমস অব্ অথরশিপ অ্যান্ড দি থিয়োরি অব স্টাইল**—গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। আঙ্গিক ও শিল্পতত্ত্বের সমস্যা নিয়ে গ্রন্থটিতে মৌলিক আলোচনার চেষ্টা করে নতুনভাবে কিছু বলবার চেষ্টা করা হয়েছে। রুশ সাহিত্য-জগতের সাম্প্রতিককালে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও মতাদর্শকে লেখক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোথাও কোথাও তাঁর সমালোচনা করেছেন।

বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত আলোচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে **মায়াকোভস্কি অ্যান্ড সোভিয়েট লিটারেচার**। সোভিয়েট নাট্যকার কবি এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে কবির যোগাযোগ সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। বিস্তৃতভাবে বহু বিষয়ে রচিত নিবন্ধের এই সংকলনে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত মায়াকোভস্কির কয়েকটি বিবৃতিও স্থান পেয়েছে। মার্সি-এ সানিনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকারের বিবরণও সংগৃহীত হয়েছে।

উক্রাইনের প্রখ্যাত কবি ম্যাক্সিম রিলস্কি। সম্প্রতি রিলস্কির **অ্যাবাউট আর্ট** গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে রিলস্কির কবি-মনের পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি সাহিত্যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, লোকগাথা সংগ্রাহক প্রভৃতি রূপটিও উজ্জ্বল। উক্রাইনের শিল্প-জগত—তার জটিলতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে সুনিপুণভাবে গ্রন্থটিতে ফুটে উঠেছে। এই সংগ্রহ প্রায় অর্ধশতাব্দী কালকে অতিক্রম করে গেছে। এর মধ্যে আছে কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, আলোচনা, সংবাদপত্রের মন্তব্য, এবং শিল্প-জগতের মানুষদের নানান কাহিনী।

সোভিয়েত সাহিত্যের ইতিহাসে মিখাইল বুলগাকভ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্যতম হল **দি হোয়াইট গার্ড আর্মি** (উপন্যাস) এবং **দি ডেজ্ অব্ দি টার্বিনস্ ও ফ্লাইট** (নাটক)। বুলগাকভের রচনায় গৃহযুদ্ধ একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। গৃহযুদ্ধে বিভ্রান্ত এবং বিপর্যস্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি তাঁর নাটকে উপস্থিত। কিন্তু তাঁর চরিত্রগুলি ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত হতাশাব্যঞ্জক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সর্বত্র রূপায়িত হতে পারেনি। তারা ইতিহাসের গতিপথে প্রবাহিত।

সম্প্রতি বুলগাকভের পাঁচটি নাটকের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে **দি ডেজ অব্ দি টার্বিনস্, ফ্লাইট, মলিয়ের, ডনকুইকসোট, দি লাস্ট ডেজ।**

দি লাস্ট ডেজ নাটকটি রচিত হয়েছে পুশকিনের জীবনের শেষ দিনগুলিকে নিয়ে। কিন্তু পুশকিন নাটকের কোথাও নেই। তাঁকে একবারও মঞ্চে দেখা যাবে না। পুশকিনের প্রতীকে নাট্যকার যে শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা সাধারণের মধ্যে যেমন দেখা যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ অভাবিত।

কলাবৌ
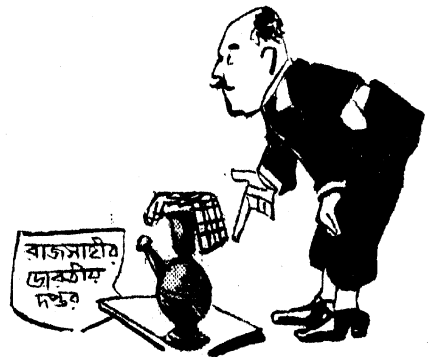
রাজলক্ষ্মী দেবী

বিধাতা প্রায়ই নিপুণভাবে নাটকীয় পরিহাস ক'রে থাকেন। শৈশবে দুর্গা-পুজো দেখতে গিয়ে নকুড় সামন্ত নিজের জন্যে একটি অবগুণ্ঠনবতী বধূ চেয়েছিল, যে হবে ঠিক ওই কলাবৌয়ের মতন। মার কাছে ফিসফিস ক'রে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলো সে। মা হেসে বলেছিল,—'কলাবৌ যে ধ্যাড়ধেড়ে এক কলাগাছ রে—ঘোমটা দেওয়া শুধু। লক্ষ্মী-সরস্বতী দুর্গার মতো সুন্দর মুখচোখ কিছু নেই।'

'কত বড় ঘোম্‌টা আছে যে? ঐ রকম বৌই আমার চাই।'

শুরুতে বিধাতা নকুড়ের সঙ্গে খুব দরদী ব্যবহার করবেন বলে ভাবা গিয়েছিলো। সামন্ত-বংশে প্রথম স্কুল ডিঙিয়ে কলেজ—তারপর গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে বেরোতে না বেরোতেই তিনশো টাকা মাইনের চাকরি। সামন্তর মা-র নিত্যি হরির-লুট লেগেছিলো। 'এইবার নকুড়ের একটি বৌ আনতে পারলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।' কথাটা প্রায়ই উঠতে-বসতে ইষ্টনাম স্মরণের পরিবর্তে মা বলতে লাগলো। নকুড়ের ভাই তিনু, দামু এবং রটন মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনির মতো মাকে মনে করাতে লাগলো—'দাদার বিয়েটা হলেই তোমার আর এত কষ্ট হবে না মা। দুবেলা এই গরমে রান্না কি তোমার বয়সে পোষায়।' বোনেরা অর্থাৎ টুলি, ভুলি, শিমু ইত্যাদি প্রায়ই বেড়ালের আওয়াজের মতন গান গাইত। তারা একটি উচ্চাশাকে ব্যক্ত করলো,—'বৌদি যেন মা গান-জানা হয়।'

'আর সুন্দরী।' —নকুড়ের মা হেসে হেসে বলে—'কলাবৌ বিয়ে করতে চেয়েছিলো বলেই তো আর যা তা মেয়ে আনলে চলবে না।'

নকুড় সামন্তের বাবা জীবনে অকৃত-কার্য, অকালে বৃদ্ধ এবং নগণ্য। সকালে চা খেয়ে বাজারের থলিটি হাতে ক'রে তিনি কুচো-চিংড়ি এবং পুঁই-ডাঁটা আনতে বেরোন। পথে তাঁরই গোত্রীয় দু' চারজনের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে রীতিমত বেলা ক'রে ফেরেন এবং উনুন বয়ে যাওয়ায় অগ্নিমূর্তি গৃহিণীর কাছে মুখনাড়া খাবার পর খবরের কাগজ নিয়ে হাঁটু মুড়ে বসেন স্নান-খাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত। দুপুরে দিবানিদ্রা, বিকেলে বায়ুসেবন এবং রাত্রে ছেলেমেয়েদের ইংরাজী ট্রানশ্লেসন ও অঙ্ক নিয়ে তিনি গৃহের মন্ত্রণামহল থেকে চিরনির্বাসিত।

তবুও, নিয়মের খাতিরে তাঁকেও একবার পাত্রী দেখতে যেতে হলো। নকুড়ের মা, টুলি, ভুলি, শিমু আগেই দেখে এসেছিলো যে পাত্রী প্রকৃত গৌরবর্ণা তথা সুন্দরী। শুধু গান নয়, নাচও জানে। আর কী সপ্রতিভ। নকুড়ের বাবা এই সমস্ত শোনার পর পাত্রীকে একবার অবলোকন করলেন। মেয়ে নিঃসন্দেহে সুন্দরী, এবং বিন্দু-মাত্র সংকোচ না করে মৃদু মৃদু হাসছিলো। নকুড়ের বাবা পাত্রীকে আশীর্বাদ করলেন। মহিলারা এবং ভাবী-বধূ নিষ্ক্রান্ত হবার পর মেয়ের বাবা সামন্তমশাইকে বললেন—'আমার এই একটি মেয়ে। সাত ছেলের পর এক মেয়ে, অত্যধিক আদরে মানুষ। সেই জন্যই আপনাদের মতন মাটির মানুষের ঘরে দিচ্ছি, যাতে ওর আদর-আবদার

নিয়ে কেউ খুঁত না ধরে। বুঝেছেন তো বেয়াই?'

সামন্তমশাই করতল নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

'যৌতুক, দানসামগ্রী, পণ—সবই পুরোপুরি দিচ্ছি আমি। তা ছাড়া মেয়ের নামে এই দশ হাজার ব্যাঙ্কে রেখে দিচ্ছি। এর পাশবইটি আমি নিজের কাছে রাখবো,—দরকার মতন বাবাজীর কি আমার মেয়ের কাজে লাগবে। আপনার এতে আপত্তি নেই তো?'

'না—আপত্তি কী।'

'পণও দশ হাজার দিচ্ছি, তাই এই টাকাটা মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে তুলে রাখলাম।'

'তা বেশ তো।'

সামন্তমশাই ফিরে আসার পর বিস্তৃত সংবাদ জেনে নকুড়ের মা মোটা রকম হরির লুট দিলেন।

বিয়ের এবং ফুলশয্যার পুষ্পিত দুটো রাতেই নকুড় তার কলাবৌকে পেয়েছিলো। তার পরের রাত্রেই মুস্কিল। রাত একটু বেশী হয়ে গিয়েছিলো, কারণ তিনু, দামু এবং রটনকে নকুড় একটা ক্যালকুলাস বোঝাতে চেষ্টা করছিলো। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলো, দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে নকুড় বৌকে শয্যালীনা এবং গভীরভাবে ঘুমন্ত দেখতে পেলো। নকুড় প্রথমে ফিসফিসিয়ে তারপর বেশ উচ্চস্বরে বললো,—'উঠে দরজাটা খুলে দাও না।'

বৌকে একবার তাকিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আরও গভীরভাবে নিদ্রার আশ্রয় নিলো। প্রথমটা নকুড়ের হাসি পেলো। ইস্, দেরী হয়েছে তাই অভিমান। নকুড় আস্তে আস্তে দরজার ওপর ঠক ঠক করলো। তারপর জোরে। তারপর প্রবলভাবে। তারপর আবার জানালা দিয়ে তিক্তভাবে বললো,—'কী শুরু করেছো। দরজা খুলে দেবে তো দাও, নইলে আমি চললাম।'

শুনে বৌ বিছানার ওপর উঠে বসলো। বললো,—'রাতদুপুরে কাউকে দরজা খুলে দেবার জন্যে আমায় মাইনে-করা ঝি হিসেবে বাবা তোমাদের ঘরে পাঠান নি। বুঝলে?'

তারপর নকুড়ের মুখের সামনে দড়াম ক'রে জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলো সে।

নকুড়কে তিনুর বিছানায় ঘুমোতে দেখে মা একটু অবাক। যাই হোক,—সকালে দরজা খুলে বৌ বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে নকুড় তাকে বোঝাতে পারলো, সে ভবিষ্যতে সে স্ত্রীর সুখ এবং নিদ্রার পরিমাণ সম্বন্ধে প্রভুতভাবে সজাগ থাকবে। শুনে বেলা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো এবং এমন কি নকুড়ের জন্যে নিজের হাতে এক পেয়ালা চা ক'রে নিয়ে এলো।

নকুড় তার কথা রেখেছিলো। বস্তুত, কথা না রেখে তার উপায় ছিল না। বেলাকে সে একটা সৌন্দর্যসুষমার প্রতীক হিসেবে দেখতে পাচ্ছিলো, এবং বেলা যা আছে অথবা যা' হবে, তার সঙ্গে সেই দেখা-র কোনও সম্পর্ক ছিলো না। বেলা ধীরে ধীরে সকলকে বুঝতে দিলো, যে আর যাই হোক, রান্নাঘরে শাশুড়ীর সঙ্গে খেটে মরবার জন্যে অথবা ভুলি, টুলি, শিমু ইত্যাদিকে গান শিখিয়ে পণ্ডশ্রম করবার মাস্টারনী হিসেবে সে এই বাড়ীতে প্রবেশ করে নি। নকুড়ের মা খুব বেশি

"...ঝি হিসেবে বাবা তোমাদের ঘরে পাঠান নি। বুঝলে?"

বিচলিত হলো না। কিন্তু বেলা তার হারমোনিয়মে ধুলো পড়তে দিয়ে কেন কেবল হাই তোলে আর ঘুমায় তার খাওয়াদাওয়ায় তার রুচি নেই, চোখের কোণে কালি ইত্যাদি ভেবে ভাবী বংশধরের আগমন-সম্ভাবনা ভাবতে শুরু করলো।

বেলা একদিন এসে বললো,—'মা, আমি বাপের বাড়ি যাবো।'

নকুড়ের মার আহ্লাদ হ'লো। নিশ্চয়ই তার ধারণা সঠিক। —'যাবে বইকি বৌমা। আমি আজই তোমার বাবাকে চিঠি লিখছি। তা' শোনো—আমাকে লুকিয়ো না। ক'মাস চলছে বাছা তোমার?'

বেলা চমকালো। —'না মা, ও সব কিছু নয়। এমনি যেতে চাইছি। এখানে আমার আর ভালো লাগছে না।'

নকুড়ের মার চিঠির জবাবে বেলার বাবা সবিনয়ে জানালেন, যে বেলার এখন কিছুদিন শ্বশুরবাড়িতেই থেকে সকলের সঙ্গে মেলামেশা এবং কাজকর্ম (নকুড়ের মা এইখানটায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো) শেখা উচিত। চিঠির মর্ম শুনে বেলা দেশলাই-লাগানো খড়ের আঁটির মত জ্বলে উঠলো। সারাদিন নকুড়ের সঙ্গে খিটখিট করলো। পরের দিন থেকে গোমড়া মুখে সে কথা বন্ধ করলো। নকুড় তার কাছে যখনই যায়, তখনই তার গা ম্যাজম্যাজ করছে, শরীরটা ভালো নেই—ইত্যাদি।

নকুড় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে, তা অস্বাভাবিক নয়। অতএব কয়েকদিনের মধ্যেই বেলাকে সঙ্গে নিয়ে সে শ্বশুরবাড়ি গেল। প্রচুর আদর, আপ্যায়নে দিনটা কাটাবার পর রাত্রে শুতে গিয়েই সে বিদ্যুতের 'শকে'র মতো একটা ধাক্কা খেলো। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত ক'রে নকুড় বললো,—'তুমি—তুমি—তুমি মদ খেয়ে এসেছো?'

বেলা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। জড়ানো গলায় গান ধরলো :—

'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু
ঐখানে থাকো।'

হতভাগ্য নকুড় সেই প্রথম বেলার গান শোনার সৌভাগ্য অর্জন ক'রেছিলো। কিন্তু মনের অবস্থা প্রতিকূল হওয়ার দরুণ সে নিঃশব্দে [illegible] এসে রাতের ট্রেন ধরে বাড়িতে ফিরলো।

পরের দিনই বেলাকে নিয়ে নকুড়ের বড়লোক শ্বশুর বাড়িতে উপস্থিত। এবং বাড়িতে অন্য সকলে ব্যাপারটা এখনও জানে নি অনুভব ক'রে মনে মনে হাঁফ ছাড়লেন। নকুড় অফিস থেকে ফেরার পরই তিনি তার হাত ব্যাকুলভাবে চেপে ধরলেন। —'বড় আদরের মেয়ে,—মাতৃহীন। দাদাদের কাছে যখন যা চেয়েছে, তা পেয়েছে। মেজো ছেলে ডাক্তার। তার আলমারী খুলে মাঝে মাঝে ব্রাণ্ডি খেতে খেতে—। হতভাগী নিজেই হয়তো বোঝে নি, কী করছে। কিছুদিন চেষ্টা করলেই ওর এই বদভ্যাস সেরে যাবে।'

'এ সব আপনি আগে বলেন নি কেন?'—নকুড় একবার জানতে চাইলো। তারপর উত্তর না পেয়ে খেয়াল করলো, যে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা সামন্তমশাইয়ের ভাঙা ঘরে নিয়ে আসার আগে তাদেরই ভাবা উচিত ছিলো, কোথাও কোনো দৈত্য রাক্ষসের উঁকি-ঝুঁকি আছে নিশ্চয়ই। ছোট্টো নিঃশ্বাস ফেলে নকুড় জামা-কাপড় ছাড়তে গেলো।

বেলা সেখানে চুপচাপ বসে পা দোলাচ্ছিলো। নকুড়কে ঢুকতে দেখে টান টান হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো,—বললো, —'দুদিনও আমাকে বাপের বাড়িতে টিঁকতে দিলে না তো? আচ্ছা, আমিও বোঝাবো তোমাদের। দেখবে, কতো ধানে কতো চাল।'

তবু সেই রাত্রে যখন বেলাকে নকুড় কাছে পেলো, তখন একটা বিরাট মমতার প্লাবন তার হৃদয়ে বয়ে গেলো। কেননা, মনে মনে বেলাকে সে একটা অনস্তিত্ব দিয়েছে এবং নিজেকে রেখেছে একটি অসহায় কলাবৌয়ের রক্ষাকর্তার ভূমিকায়। বাড়িতে টাকা, চাবি অথবা অ্যাল্‌কোহল-জাতীয় ওষুধ রাখা সম্পর্কে নকুড় সতর্কতা অবলম্বন করলো। দিন পনেরো কাটার পরই বেলাকে বাড়িতে পাওয়া গেলো না। এবার বেলা বাপের বাড়ি যায় নি। তার শৈশবের বন্ধু জয়ন্তীর বাড়িতে গিয়ে কিছু টাকা ধার ক'রে তাই দিয়ে মদ কিনে খেয়েছিলো এবং বিস্রস্ত বেশ-ভূষায় পথ চিনে চিনে ফিরে আসতে চেষ্টা করছিলো। উদ্‌ভ্রান্ত নকুড় সমস্ত শহর চষে তাকে খুঁজে পেয়ে ট্যাক্সিতে তুলে আনলো।

এর পরে কয়েক মাসের ওপর অনায়াসে যবনিকা ফেলে দেওয়া যেতে পারে। বেলা তার ঘরের ভেতর দাপিয়ে বেড়িয়েছে, রাগে বিছানার চাদর কুটি কুটি ক'রেছে, কিন্তু নকুড় তাকে দরজা খুলে দেয় নি। নকুড়ের মা জানালা দিয়ে ভাত দেবার সময় বেলা অশ্রাব্য গালাগাল করতো, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হতো না। মার কাছে নকুড় চাবি দেয় নি। সবচেয়ে সাংঘাতিক হতো যখন রাত্রে বেলা নকুড়ের মুখে চোখে নোখ বসিয়ে জানতে চাইতো,—

'দরজা বন্ধ ক'রে রাখো কেন? খুলে দেবে কি না শুনি আগে।'

'শোনো, বেলা। তোমার ভালোর জন্যেই বন্ধ ক'রে রাখি। তুমি যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন খুলে দেবো।'

'বেঠিক আমি? আর সঠিক তুমি। আমার হাত ধরে মুচড়ে ভাঙবে নাকি? ভাত দেবার কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই। কোন্ সাহসে আমাকে জেলের কয়েদী ক'রেছো? নির্লজ্জ, ইতর।'

নকুড় তবু হাল ছাড়েনি। হঠাৎ বেলার মধ্যে সে এক ঘোম্‌টা-পরা কলাবৌকে প্রত্যক্ষ ক'রেছে। তাকে সস্নেহে বুকে টানতে চেয়েছে। এবং চড়, চাপড়, গালাগালি কিছুক্ষণ অগ্রাহ্য করার পর বেলার যৌবনপুষ্ট ক্ষুধিত দেহে এবং অসংযত স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা সাড়া জাগাতে পেরেছে। বেলা মৃদু মৃদু হেসে বলেছে,—'মতলবের বেলায় ঠিক আছো।' তারপর নকুড়কে আলিঙ্গনে চুম্বনে এমন একটা স্বপ্ন-লোকে টেনে নিয়ে গেছে, যেখানে অমৃতের পূর্ণকুম্ভ হাতে বেলা একটি স্নেহময়ী নারী এবং নকুড় তার প্রীতি-ধন্য পরিতৃপ্ত পুরুষ।

জীবনে দেখা যায়, অন্যান্য অনেক বদভ্যাসের তুলনায় মদ, সিগারেট বা ঘোড়দৌড়ের বদভ্যাস অনেক কম ভয়ংকর এবং সহজে অপনীয়—অথচ নির্বোধের মতো আমরা সেগুলিকেই খুব একটা আতঙ্কের চোখে দেখি। বেলা সত্যিই মদ খাওয়ার নেশা থেকে মুক্ত হলো, এমন কি তাকে নিরাপদে একমাস বাপের বাড়ি ঘুরিয়ে আনাও চললো। অবশ্য নকুড় শ্যালককে ব্রাণ্ডির আলমারীর চাবি সম্বন্ধে সতর্ক ক'রেছিলো, কিন্তু বেলার গতিবিধিতে আর কোনও বাধাই রাখা হয় নি।

বেলা মা হ'তে চলেছে, এই খবর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'য়ে অনেকদিন বাদে নকুড়ের মা হরির লুট, সত্য-নারায়ণের সিন্নি ইত্যাদিতে মনের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন। ফেরিওয়ালাদের ডেকে ডেকে বেলা প্রায়ই ঝালমুড়ি, রসগোল্লা, শনপাঁপড় কিনে কিনে খেতে লাগলো এবং টুনি, বুলি, শিমু সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ছায়ার মতো সরে যেতে থাকলো। টাকা ও চাবি সম্পর্কে আবার অসতর্ক হওয়াতে নকুড় মাসের শেষে মাকে দশটা টাকা দিতে পারলো না,—বরং তাকে বাইরে থেকে কুড়ি টাকা হাওলাত করতে হলো।

সে শুধু একবার বলতে চেষ্টা করলো,—'বেলা,—বাইরের জিনিস অতো ক'রে কিনে কিনে পয়সা নষ্ট করলে আমি সংসার চালাবো কেমন ক'রে?'

বেলা জবাবে ঝংকার দিয়ে উঠলো, —'বেশ বললে যা হোক্। এ সময়ে দুটো ভালমন্দ খাবার সাধও যদি মেটাতে না পারবে, তবে মরদের মতো বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন শুনি? তারপরে আবার পেটে ছেলেও বওয়াবে। খালি নিজের মতলব বোঝো।'

যাই হোক, সকলের দৃষ্টিধারায় সিঞ্চিত হ'য়ে ছেলেটি পৃথিবীতে এলো। বেলা তাকে খুব বেশি যত্নআদর করতে না পারায় সে ঠাকুমার যত্নে লালিত হ'তে লাগলো এবং পিসিদের কাঁকালশোভিত ক'রে দিনে দিনে বাড়ছিলো, এমন সময়ে চার মাস বয়সেই তার ভয়ানক উদরাময় হলো। তার কারণ হিসেবে বেলার প্রচুর ঝালমুড়ি ও আচার কিনে খাওয়াকে নকুড়ের মা উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করলেন। এবং নকুড় লক্ষ্য করলো, বেলা ছেলেকে দুধ খাওয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রসগোল্লা, চাটনির রস ইত্যাদিও মাঝে মাঝে মুখরোচনের জন্যে তার নবীন রসনায় দিয়ে থাকে।

নকুড় ক্ষীণকণ্ঠে সংশোধনের চেষ্টা করলো—'বেলা, ওকে ও সব ছাইপাঁশ খাওয়াচ্ছো—ওর পেটটা খারাপ, আরও বাড়ে যদি?'

'ও রেঃ'—বেলা একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করলো,—'মার চেয়ে বেশি দরদ তাকেই বলে ডান। তোমার মাও বলেছেন, আমার জন্যেই নাকি ওর পেট খারাপ। আমার বাপের বাড়িতে হ'লে এতোক্ষণে আট টাকা ভিজিটের ডাক্তার আসতো। তোমাদের তো সে মুরোদ নেই, কেবল দিনরাত আমার সঙ্গে খিঁটিরমিটির।'

পরের দিন নকুড় পাড়ার সত্যহরি ডাক্তারকে ডেকে আনলো। তিনি ভিজিটের দু' টাকা ভালভাবে বাজিয়ে নিয়ে বলে গেলেন,—'ছেলে যখন মা-র দুধ খাচ্ছে, তখন মা যেন ঝোলভাত খান।'

বেলা শুনে বললো,—'ঘোড়ার ডিমের ডাক্তার ও। ঘোড়ার ডাক্তার। ওষুধ দেবার নাম নেই, যতো বাজে কথা।' নকুড় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। বললো,—'সে যাই হোক্, তুমি আজকে ঝালমুড়ি বা বাজারের ঝিঙ্গি কিনে খাবে না।'

'আবার আমাকে ঘরে বন্ধ করবার

ভয় দেখাচ্ছো বুঝি? ছেলের কী হবে শুনি?'

'ছেলেকে তোলা দুধ খাওয়ানো হবে। কালকে তুমি তাকে দুধ দিও। ডাক্তারের মত তাই।'

'ঈস্।' একটা প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর মতো বেলা নকুড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো,—'আমার ছেলে আমার দুধ খাবে না! মার বুক থেকে ছেলে কাড়বে তোমরা! ইতর, অত্যাচারী। লাগিয়ে লাগিয়ে বাবার মন ভাঙিয়েছো, তাই বাবা আমায় আর নিতে চায় না। বাবা গো—' ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো বেলা।

নকুড় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো এবং কণ্টকিত অস্বস্তির উৎপাতে ঘরে চাবি লাগাতেও ভুলে গেলো। সেদিন অফিসে তার প্রতিবেশী ভদ্রলোক একটু অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকালেন। ছুটির পর কাছে এলেন,—গলা-খাঁকারি দিলেন। 'নকুড়বাবু,—আপনার বাড়িতে আজকে একটা চেঁচামেচি হচ্ছিলো কেন?'

'জানতে চান?' নকুড় হঠাৎ হেসে উঠলো,—'আমি স্ত্রীকে তালাবন্ধ ক'রে রাখি, মারধোর করি, হ্যাঁ,—অত্যাচার করি রীতিমতো। আপনার অস্বস্তি হ'লে কানে তুলো দিয়ে থাকবেন।'

বাড়ি ফিরে নকুড় দেখলো, কান্নাটা অট্টরোলে পর্যবসিত হয়েছে। মা, বুলি টুলি, শিমু সবাই পা ছড়িয়ে গোলমাল করছে এবং অশ্রুপাত করছে। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে বেলা চলে গেছে। নিশ্চয় বাপের বাড়ির উদ্দেশে। 'কী ডাকাত বৌ এনেছিলাম রে বাবা।'

স্ত্রী ও পুত্রের ব্যাপারে একটাও পোস্টকার্ড খরচ না ক'রে নকুড় অপেক্ষাকৃত শান্তিতে এবং নিরপদ্রবে মাসখানেক কাটিয়েছিলো, এমন সময় সে বেলার হাতের চিঠি পেলো। 'খোকা ভাল আছে। বাবা মৃত্যুশয্যায়। একবার আসিবে।'

কর্তব্যের টানে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে নকুড় শবযাত্রী হ'লো। তারপর ফিরে এসে শ্যালক এবং শ্যালকবধূদের সম্মুখীন হলো। —'বেলাকে নিয়ে যাচ্ছো তো এবার?'

'বেলা তো আমার ইচ্ছেয় আসে নি।'

'আমাদের ইচ্ছেয়ও আসে নি। তোমার বৌ তুমি যদি রাখতে না পারো, আমরা তাকে কী ক'রে সারাজীবন দেখাশোনা করবো? বাবা ওর আখেরের জন্যে দশ হাজার আলাদা ক'রে দিয়েছেন। সে পাশবই তুমি নিয়ে যেও।'

'আচ্ছা, কালকে কথা হবে—' বলে দুর্বল নকুড় শুতে গেলো। স্বল্পালোকিত শয্যায় সে তার মাখনের তালের মতো শিশুকে এবং যৌবন ও রূপের দীপ্তিতে গরবিনী বেলাকে দেখতে পেলো। বেলা মৃদু মৃদু হেসে বললো, —'কী ভাবছো?'

'ভাবছি তোমাকে নিয়ে যাবো কিনা।'

'এবার আমাকে কিন্তু জ্বালিয়ো না আগের মতন। খোকার কী অবস্থাটা ক'রেছিলে তোমরা? ভাগ্যিস ওকে নিয়ে এসেছিলাম তাইনা বাঁচাতে পেরেছি। সেজোবৌদির খোকা যা খায়, তাই ওকে খাওয়াতে হচ্ছে। টিনের দাম বারো টাকা। আর তোমরা তোলা দুধ খাওয়াতে চেয়েছিলে।'

নকুড় এতদিনে তার মেরুদণ্ডের মাঝখানে শীতল সরীসৃপ ভয়কে অনুভব করলো। কিন্তু তা কিছুক্ষণের জন্য। বেলা ভয়ানক ইচ্ছুক আর ক্ষুধিত ছিলো, তাই সে এর পরই নিঃশব্দে নকুড়ের কাছাকাছি সরে এসে তার বুকে মাথা রাখলো। একটাও প্রতিবাদ বা তর্কে এই আশ্চর্য সান্নিধ্যকে নষ্ট করতে পারলো না নকুড়।

সুখেদুঃখে দিন কেটে যায়, এবং দুঃখের পরিমাণ অনুসারে তার গতি মন্থর হয়, হয় দ্রুত। খুব ধীরে ধীরে চারটি বছর কেটেছে। বেলা এখনও দীপ্তিলাস্যময়ী কিন্তু নকুড় শীর্ণ ও গম্ভীর হয়েছে, যেন বুড়িয়ে যাচ্ছে। তিনু ও দামু চাকরিতে ঢুকেছে, তবু সংসার সাবলীলভাবে চলতে চাইছে না। নকুড় টাকার কূল পাচ্ছে না। বেলা সিনেমা ও থিয়েটারে ইচ্ছামতন একা যায়, প্রচুর রসগোল্লা, কেক ও শনপাঁপড়ি কিনে খায়,—খোকার জন্যে জামা ও জুতো, নিজের জন্যে শাড়ী জামা মুক্তহস্তে কেনে।

ভুলিকে পাত্রস্থ করবার জন্যে নকুড় বেলার সঞ্চিত টাকা থেকে দু হাজার চেয়েছিলো। বেলা এমনভাবে তাকালো, যেন নকুড় ভূতের ভয় দেখাচ্ছে। এবং বললো,—'নাঃ, বাবা তোমাদের ছোটলোক বাড়িকে হাড়ে হাড়ে চিনেছিলেন। তোমরা সব পারো। তবে আমিও কম নই। শুনে রাখো, ও টাকা আমার গলায় ছুরি না দিলে পাচ্ছো না।'

নকুড় বেরিয়ে যাচ্ছিলো, তার ছেলে শ্যামল তার হাত ধরলো। 'বাবা, অত দৌড়ে দৌড়ে কোথায় যাচ্ছো।'

'একটু হাওয়া খেয়ে আসতে যাচ্ছি বাবা।'

'বাবা—আমিও হাওয়া খাবো।' দু' বাহু বিস্তৃত ক'রে শ্যামল কোলে উঠতে চাইছিলো, বেলা এসে ছোঁ মেরে তাকে সরিয়ে নিলো। —'আর সোহাগ দেখাতে হবে না। ওর পাছে কিছু থাকে, সেই হিংসেয় তো গুষ্টিসুদ্ধ জ্বলে মরছো তোমরা।'

এই সময়ে নকুড়ের মা সামনে পড়ে গেলো। মা বললো,—'ছি ছি, ও কেমনধারা কথা বৌমা। ও কি আমাদের সব থেকে আদরের ধন নয়?'

'থাক্ থাক্—' বেলা যেন লেলিহান আগুনের মতো নেচে উঠলো,—'ডাইনী সেজে আর ছেলে কাড়তে আসবেন না।'

তবুও ভুলি পাত্রস্থ হ'লো। এবং টুলি। এবং নকুড়ের মাথায় সাদা চুলের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। নকুড় রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলো, যে কলাবৌয়ের ঘোমটা খুলতে গিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে একটা বিশ্রী কংকাল। কলাপাত ঘেরা এক ভূত। নকুড় ধীরে ধীরে বদলাতে লাগলো। চড়, চাপড়ের জবাবে সেও চড়, চাপড় চালায় এবং শীর্ণ হলেও তার দেহ পুরুষের এবং এককালে সে ব্যায়াম করতো। সুতরাং শারীরিক দিকে বেলা তাকে এঁটে উঠতে পারতো না। বেলা মুখ খুললেই এখন নকুড় সিংহের মতো গর্জন করে উঠতো। —'চুপ, চুপ করো তুমি। নইলে মেরে গুঁড়ো ক'রে ফেলবো।'

অতএব বেলা পরাভূত হবার সীমান্তে পোঁছেছিলো। কিন্তু তার সাময়িক বাধ্যতা একটা অসুস্থ মনোবিকার মাত্র। সে জীবনে কখনও স্বাভাবিক চরিত্র অনুসারে কারও কাছেই অবদমিত হতে পারে না। আদিম প্রকৃতি দ্বারা সে ঠিক বুঝে নিলো, কোন্ পথে নকুড়কে আরও বিধ্বস্ত করা যায়।

শ্যামল মাকে ঠিক ভালোবাসতে পারে নি। শিশুরা বুঝতে পারে, কোথায় স্নেহ মুক্তিশীল এবং কোথায় তা সর্বগ্রাহী। কিন্তু কাচপোকার প্রতি তেলাপোকার আকর্ষণের মতো সবচেয়ে উজ্জ্বল ও দৃঢ় মা-র দিকে তার একটা আকর্ষণ ছিলো। তা ছাড়া মা তাকে সব নিষিদ্ধ লোভনীয় খাদ্য এবং বিবিধ জুতোজামা দিতো। সহসা এ সবের মোড় ঘুরে গেলো। কোনো কথায় অসন্তুষ্ট হ'লেই বেলা 'পেটের শত্তুর মরেও না, তাহলে এই ছোটলোকের ঘর থেকে বেরিয়ে যাই—' বলে নিষ্ঠুরভাবে শ্যামলকে মারতে শুরু করতো।

নকুড়ের গোচরে এবং অগোচরে শ্যামলকে মারতে গিয়ে শাশুড়ীর কাছে বাধা পেলে আরও খেপে যেতো বেলা। 'আমার ছেলেকে আমি শাসন করবো, আপনি

কথা কইবার কে? পাজী ছেলে আমার হাড় জ্বালিয়ে খেলে, তার গায়ে হাত তুলতে পারবো না?'

এবং রাত্রে বিছানায় যাবার আগে কচি শরীরে সব দাগ দেখে নকুড় প্রাণের মধ্যে এক বিপুল মোচড় খেতো। বেলা তাকে দুই হাতের নাগপাশে জড়িয়ে নিতো। বেলা তাকে একটা প্রগাঢ় অভ্যাসের দাসত্ব করাতো। অশ্লীল, কুৎসিত ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইতো, যে মুখ যতই নিজের সত্তাকে ঘোষণা করুক, এইসব প্রচণ্ড চাওয়ার জন্যে বেলাকে নকুড়ের ভীষণ দরকার এবং সেই গর্বে সে সর্বেশ্বরী, অন্য কারো ইচ্ছার দাসী নয়।

অবশেষে একদিন অফিস থেকে ফিরে নকুড় দেখলো, মা বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে। —'তোর বৌ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে রে বাবা। ওই অতটুকু ছেলেটাকে ছড়ি দিয়ে মেরে খুন ক'রে ফেলছিলো, আমি দেখতে পারিনি। উঃ কোমরটা ভেঙে গিয়েছে রে।'

নকুড় নিজের ঘরে ঢুকলো। আস্তে আস্তে বললো,—'এক্ষুণি তুমি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও।'

'আমার পাশবই আর শ্যামলকে নিয়ে,—তবে যাবো।'

'পাশবই নিয়ে যাও, কিন্তু শ্যামলকে তুমি পাবে না।'

'পাবো না?'—বেলা বাঘিনীর মতো গর্জে উঠলো—'ছেলেকে আটকে রাখবে? বেশ, আমি যাচ্ছি। পুলিশ ডেকে হলেও ছেলেকে নিয়ে যাবো।'

নকুড় ধৈর্য হারালো,—বেলাকে টানতে টানতে সত্যিই রাস্তায় বার ক'রে দিলো সে। শ্যামল ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো—'আমি মা-র কাছে যাবো।' পিসিরা তাকে কোলে তুলে অন্যদিকে নিয়ে গিয়ে লজেন্স, খেলনায় শান্ত করলো।

পরের দিনই অফিসে নকুড় চিঠিটা পেলো। বেশ সুচারু মেয়েলি ছাঁদের হাতের লেখা। 'মহাশয় আপনার দুর্ব্যবহারে জর্জর হইয়া শ্রীমতী বেলা সামন্ত আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছেন। আমরা আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। অতএব দয়া করিয়া আগামী শনিবার বেলা ১০॥টায় অফিসে সাক্ষাৎ করিবেন। ইতি—

নারী-রক্ষা ও বিবাহ-সংগঠন
সমিতির পক্ষ হইতে
শ্রীমতী অর্পণা চাকলাদার।'

প্রতিবেশী ভদ্রলোক পাশের টেবিল থেকে উঠে এলেন। 'নকুড়বাবু,—চিঠি পড়ে অমন ছাইপানা মেরে গেলেন যে? কোনো খারাপ খবর নেই তো?'

নকুড় নিঃশব্দে চিঠিখানা ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিলো। ভদ্রলোক অপ্রস্তুতের একশেষ।

—'এ মশাই আপনাদের ঘরের কেলেঙ্কারি—আমি তা জেনে কি করবো? আপনাকেও বলি, একটু সয়ে থাকতে পারেন না? বড়লোকের মেয়ে ঘরে এনেছেন, গোরা মেজাজ তো হবেই। তাই নিয়ে য়্যান্দুর গড়াতে দেয় কেউ?'

শ্রীমতী অর্পণা চাকলাদার নিজে তিনবার বিবাহ সংগঠন অথবা সংঘটন ক'রেছেন। পূর্বতন দুই পতিদেব এখনও বিদ্যমান, তবে নিজেদের অযোগ্যতায় তাঁর মতো নারীরত্নকে হারিয়ে তাঁরা বেঁচেছেন না আক্ষেপ করছেন, তা ঠিক জানা যায় না। তাঁর ব্যক্তিত্ব একটা লক্ষ্য করবার মতন জিনিস। তিনি নকুড়কে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

'দেখুন, শ্রীমতী বেলার কাছে আমরা আদ্যোপান্ত শুনেছি। অনর্থক একটা মিথ্যে প্রতিবাদ ক'রে নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করবেন না। জানেন, শ্রীমতী বেলা নালিশ করলে আপনার সরকারী চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে?

নকুড় চোখের সামনে বৃদ্ধ বাবা-মা এবং ছোটো ভাইবোনদের মুখগুলি দেখতে পেলো। অনুভব করলো, তার অর্থবল এবং লোকবল নিয়ে সে একটা বিশাল এবং দলবদ্ধ মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে কোনোমতে জিততে পারবে না। সে ক্ষীণগলায় বললো,—'আমি শ্রীমতী বেলার হাত থেকে নিষ্কৃতি চাইছি। তাঁর নিজস্ব দশ হাজার টাকা আছে, আরও কিছু আমি দেবো, তিনি যেখানে খুশি যেতে পারেন।'

'কোথায় যাবেন তিনি, অসহায়া নারী? ভাইদের কাছে মুখ নিচু ক'রে গিয়ে দাঁড়াবেন? যে-সমাজে ডিভোর্স নেই, নেই অশিক্ষিতা নারীর জন্যে কোনও কর্ম অথবা জীবিকা, সেই সমাজে তাঁর অবস্থাটা একবার ভাবছেন? তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম বছরগুলি উনুন-ধারে আর সন্তানের পরিচর্যায় নষ্ট করিয়ে দিয়ে এখন ভাবছেন তাঁকে আপনি বাড়ী থেকে ঠেলে বার ক'রে দিতে পারেন? তাও একমাত্র ছেলেকে কেড়ে রেখে? এ হেন অমানুষিক নিষ্ঠুরতা শুধুমাত্র পুরুষজাতের পক্ষেই সম্ভব।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধভাবে পায়চারি করতে থাকেন শ্রীমতী চাকলাদার। তারপর শেষবারের মতো বলেন,—'জেনে রাখুন, এই মুহূর্তে সসম্মানে যদি তাঁকে গৃহে নিয়ে না যান, তবে শ্রীমতী বেলা নিশ্চয়ই আপনার নামে আদালতে নালিশ করবেন এবং আমরা তাঁকে সর্বতোভাবে সহায়তা করবো।'

'আচ্ছা'—নকুড় ক্লান্ত বিজিতভাবে চেয়ারে হেলান দিলো—'তাঁর যা ইচ্ছে তাই হোক। একবার তাঁকে ডেকে দিতে পারেন কি?'

বেলা হাসতে হাসতে এলো। সমস্ত ব্যাপারটাই সে উপভোগ করছে। নকুড় তার সামনে নতজানু হ'লো—'দোহাই তোমার, বেলা—তুমি আমাকে মুক্তি দাও।'

'ও—আমি গিয়ে ভাইবৌদের খোঁটা খাবো আর তুমি সমস্ত রোজগার ওদের পাদপদ্মে ঢালবে? সেটি হচ্ছে না। ভেবে দেখলাম, শ্যামলকে নিয়েই বা আমি যাবো কেন? বিয়ে ক'রেছো তো খোরাক, পোশাক, বাসা দেবে না কেন শুনি?'

অয়স্কান্ত
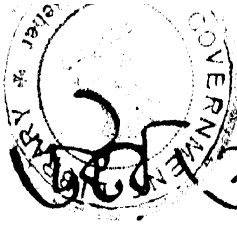
ডঃ রবার্ট জে ওপেনহাইমার ১৯৬৩ সালের ফার্মি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। প্রেসিডেণ্ট জনসন তাঁর নতুন পদাধিকারের মাত্র দশ দিনের মধ্যে এই ঘোষণাটি করে একটি স্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করলেন। কারণ, স্বীকার করতেই হবে, ডঃ ওপেনহাইমারের এই পুরস্কারলাভে একজন বিবেকবান মানবদরদী বিজ্ঞানীর পরিণামদর্শী কণ্ঠস্বরকেই স্বীকৃতি দেওয়া হল।

রবার্ট জে ওপেনহাইমারের জন্ম ১৯০৪ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে, নিউইয়র্কে। বংশ-পরিচয়ে জার্মান ইহুদী। স্নাতক হয়েছেন হার্ভার্ড থেকে। স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন কেম্ব্রিজ, গোয়েটিনগেন, লীডেন ও জুরিখে। ১৯২৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস শুরু করেন ও ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। গবেষণা ইলেকট্রন-পজিট্রন জোটক ও কসমিক রে তত্ত্ব নিয়ে। পারমাণবিক শক্তিকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ১৯৪১ সাল থেকে। সে সময়ে ডঃ আর্থার কম্পটন-এর পরিচালনায় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল, যার ওপরে ছিল সামরিক প্রয়োজনে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করা চলে কিনা, তা বিচার করে দেখার ভার। এই কমিটির সভায় ডঃ রবার্ট জে ওপেনহাইমারও আসন গ্রহণ করেছিলেন। তারপরে দু' বছরের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন এই অনন্যসাধারণ কর্মকাণ্ডের প্রধান ব্যক্তি। পারমাণবিক বোমার উদ্ভাবনা ও পরীক্ষাকার্যের জন্যে নিউ মেক্সিকোর লস্ অ্যালামস-এ যে ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়েছিল, তিনি হলেন তার অধ্যক্ষ। এই ল্যাবরেটরিতেই পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতির কাজে নিযুক্ত ছিলেন এনরিকো ফার্মি, আর্থার কম্পটন প্রমুখ পরমাণু-বিজ্ঞানীরা আর তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন সমরদপ্তরের প্রতিনিধি, রাষ্ট্রনীতিবিশারদ, বিস্ফোরণ-বিশেষজ্ঞ, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, আবহাওয়া-বিজ্ঞানী ও পদার্থতত্ত্ব-বিশ্লেষণ-বিশারদরা। এই প্রস্তুতিকর্মে চার বছরের বেশি সময় লাগেনি। ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে লস্ অ্যালামসের মরু-প্রান্তরে একটি আকাশছোঁয়া লৌহ-মঞ্চের ওপরে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। সেই বিস্ফোরণের প্রলয়ংকর রূপ দেখে এমনকি সৃষ্টিকর্তা বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত অভিভূত ও হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। রবার্ট য়ুঙ্ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ব্রাইটার দ্যান থাউজেন্ড সানস্'-এ বলেছেন যে, সেই সহস্র সূর্যের মতো প্রদীপ্ত পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিরীক্ষণ করে আঠারোটি ভাষাবিদ বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের দুটি শ্লোক স্মরণ করেছিলেন।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে লস্ অ্যালামস ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করে তিনি আবার ফিরে গেলেন তাঁর নিজস্ব অধ্যাপনার ক্ষেত্রে।

মার্কিন গভর্ণমেণ্টের পারমাণবিক নীতি সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্যে সাতজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। ওপেনহাইমার এই কমিটির সদস্য নিযুক্ত হলেন।

তারপরের ঘটনা ১৯৫৪ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে। এই দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, অতঃপর ওপেনহাইমারের কাছ থেকে পারমাণবিক গবেষণা সংক্রান্ত কোনো পরামর্শ নেওয়া হবে না বা তাঁকে এতদ্‌সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানানো হবে না। কারণ হিসেবে বলা হল যে, তিনি নাকি কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন। তাঁর স্ত্রীর প্রথম স্বামী নাকি কমিউনিস্ট ছিলেন এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর ভাই নাকি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। একাধিক কমিউনিস্ট গণ-সংগঠনের সঙ্গে নাকি তাঁর গোপন যোগাযোগ ইত্যাদি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ওপেনহাইমার হাইড্রোজেন বোমার গবেষণায় নিযুক্ত হতে অস্বীকার করেছেন। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সর্বময় কর্তা মেজর জেনারেল কে ডি নিকোল্‌স একটি পত্রে এমন ধরনের অনেকগুলো অভিযোগ ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধে উপস্থিত করেছিলেন।

ওপেনহাইমার একটি দীর্ঘ পত্রে প্রত্যেকটি অভিযোগ অস্বীকার করেন। বিশেষ করে হাইড্রোজেন বোমার গবেষণায় আপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই আপত্তি তাঁর একার নয়, সকল বিজ্ঞানীর (একমাত্র আমেরিকায় বসবাসকারী উদ্বাস্তু হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টেলর বাদে) এবং তাঁকেই সকলের মুখপাত্র হতে হয়েছিল। হিরোসিমা ও নাগাসাকির বীভৎস ধ্বংসলীলা পরমাণু-বিজ্ঞানীদের অনেক আগেই গজদন্তমিনার থেকে মাটির পৃথিবীতে দাঁড় করিয়েছিল। তখন থেকেই তাঁরা বলে আসছিলেন যে, জার্মানীর আত্মসমর্পণের পরে আমেরিকার ওপরে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের কোনো সম্ভাবনাই যখন আর থাকছে না, তখন আর পারমাণবিক বোমা উৎপাদন ও উদ্ভাবনার কাজ চালিয়ে যাবার সপক্ষে রাজনৈতিক ও মানবিক কোনো কারণই থাকতে পারে না। তারপরে যুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকার্থিতন্ত্র বিজ্ঞানীদের এই মোহভঙ্গকেই সাহায্য করেছিল। ওপেনহাইমার ও অন্যান্য পরমাণু-বিজ্ঞানীরা চোখের সামনেই দেখেছিলেন —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত পারমাণবিক গবেষণার ওপরে সমরদপ্তরের একাধিপত্য ও ত্রাসাতঙ্কের অন্তরালে মানবিকতার লাঞ্ছনা।

বিজ্ঞানীর কণ্ঠস্বরকে তাই স্তব্ধ করা যায়নি। আইনস্টাইন সমেত সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সেদিন ওপেনহাইমারের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের জুলাই, ১৯৫৭ সালের এপ্রিল ও ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পাগ্‌ওয়াশ্ সম্মেলনে এই বিজ্ঞানীরাই মানবতার সপক্ষে অঙ্গীকার ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৫৪ সালের ন' বছর পরে ডঃ ওপেনহাইমারের এই সম্মানলাভে মানবতার বাণীকেই স্বীকৃতি দেওয়া হল।

(১)

সন্ধ্যেবেলায় পালামের মাটিতে পা দিতেই অপারেসনস্-অ্যাসিস্ট্যান্ট খবর দিল রমাদির ব্যস্ততার, 'তিনবার ফোন এসেছিল স্যার।......মিসেস্ বর্ধন।'

ধন্যবাদ জানালাম। মনে ভাবলাম, আমারও উচিত ছিল এর মধ্যে একবার ফোন করে খোঁজ নেওয়া। অনেকদিন হ'ল দেখা হয় না।

অফিসে এসে রিসিভার তুলে নিলাম। 'হ্যালো, কে রমাদি? কি খবর, তিন তিন-বার খোঁজ একদিনে?'

'হ্যাঁ তাইতো—খবর কি আর আমি করি! উড়ে বেড়াও, কারও কথা তো মনে থাকে না।' কণ্ঠস্বরে একটু ক্ষোভের আভাস পাওয়া গেল। বললেন, 'শোন, কাল সন্ধ্যেবেলায় এসো। একটা ছোটখাট জলসার আয়োজন ক'রছি। সরোদ নিয়ে আসতে ভুলো না যেন। আর সবচেয়ে বড় খবর তো মায় দিই, সেই যে তুমি যার কথা বলেছিলে, সেও আসছে।'

একটু অবাক হলাম। কার কথা বলছেন রমাদি? জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার কথা বলছ? বুঝতে তো পারছি না। আর দেখি কাল যদি ছুটি জোগাড় করতে পারি, তবেই, নইলে ফোন করে জানিয়ে দেব। কেমন?'

'থাক থাক, আর অবাক হতে হবে না। কাল রুক্মিণী আসছে। এবার আশাকরি আর ছুটির জন্য চিন্তা করতে হবে না?' কৌতুকের আভাস দিয়ে রমাদি চুপ করলেন। টুং করে শব্দ হল। যন্ত্র জানিয়ে দিল রমাদি ফোন ওপাশ থেকে নামিয়ে রেখেছেন।

পালামের নির্জন পথে চলতে চলতে সঙ্গীর অভাবে মনে এলো রমাদির শেষের কথা কটি।

রুক্মিণীকে প্রথম দেখি বম্বে এয়ার-পোর্টে। লাউঞ্জের এক কোণে সোফায় বসে একটি বই-এর পাতা উল্টে দেখছিল। আমার নির্লজ্জ চাউনি হয়তো ধরা পড়েও গিয়েছিল ওর চোখে দু-এক বার। মেয়েটির দিকে আমার তাকিয়ে থাকতে কি জানি কেন, ভাল লাগছিল। তার অল্পক্ষণের মধ্যেই যাবার সময় হয়ে এলো। ব্যস্ততায় ডুবে গেলাম তারপরে।

টেক অফ্ করার পর ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। মেঘের দুই স্তরের মধ্যে দিয়ে চারটে জেট্ এঞ্জিনের শক্তিতে পাখার ওপর ভর দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের বিমান।

ন্যাভিগেসন্ ও এঞ্জিন লগগুলো দেখে নিয়ে একটু আরাম করে বসলাম। সেফ্‌টি বেল্টটি একটু ঢিলে করে দিয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম একবার। সহকারী আমার ডানপাশে বসে একমনে ন্যাভিগেসনের মাপ-জোক করে চলেছেন। সামনের প্যানেলে চোখ পড়ে। ভি-ও-আর বেয়ারিং বদলে যাচ্ছে প্রতি মিনিটে।

হোস্টেস দেবী এলেন মুখে চেষ্টাকৃত একটু হাসি ফুটিয়ে। সহকারী তাঁর চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিলেন। ন্যাভি-গেসনের ক্যালকুলেশন্ বোধহয় মুহূর্তের জন্য গুলিয়ে গেল। ভালভাবে কাজ করতে হলে সবদিকেই যে চোখ রাখা দরকার! দেবী জানালেন যে, ফ্লাইট-ডেকে এসে কে একজন বিমানের কলকব্জা দেখতে চান। সম্মতি দিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। এটাও আমাদের কর্তব্যের এক অঙ্গ হয়ে গিয়েছে বলা চলে। দেশের জন-সাধারণের মধ্যে যতজনকে সম্ভব সাহায্য করতে হবে বিমান সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটাতে। আমাদের লাভ হয় তাতে এইটুকু যে, নিজের দেশের লোকদের সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা জমে খানিকটা।

মনে পড়ছে একবার একজন নামকরা ব্যবসায়ী এসেছিলেন। বয়সে যুবক। দেশী আতরের বদলে উঁচু-দামের সেন্টের সুবাসে ভরপুর হয়ে এলেন বিমানের এঞ্জিন চালু রাখার পদ্ধতি জানতে।

ইলেকট্রনিক কমপিউটারের অভিনব কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলবো ভেবে সবে আরম্ভ করেছি, ভদ্রলোক বাধা দিলেন: 'না না, এঞ্জিন সম্বন্ধে কিছু বলুন দয়া করে।'

ভক্তিভরে তাকালাম। জেট্ থিয়োরী সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন! সাধারণ যাত্রীর মধ্যে বিশেষ কেউ তো জানতে চাননি এ পর্যন্ত!

হুইট্‌ল্ প্রিন্সিপাল্ সম্বন্ধে আরম্ভ করতেই আবার বাধা পেলাম—ও' বড় গোলমেলে আর কঠিন ব্যাপার, ক্যাপ্টেন-সাহেব। একটা কথা বলুন দয়া করে। এক গ্যালনে কত মাইল যায় এ এরোপ্লেন?'

সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, 'এক মাইল।'

'বলেন কি?' চমকে উঠলেন ভদ্র-লোক। বিড়-বিড় করে আপন মনে কি যেন বলে চললেন। বুঝলাম হিসাব হচ্ছে। পরে বললেন, 'তার মানে—উঃ কি খরচ! আচ্ছা চার চারটে এঞ্জিন একসঙ্গে চালু রাখার কি দরকার বলুন তো? দু-একটা বন্ধ করে দিলেই তো খরচ কম পড়ে।'

কি বলবো আর! চুপচাপ তাকিয়ে থাকি ভদ্রলোকের মুখের দিকে। নব্যজ্ঞানে ভরপুর ব্যবসায়ী যুবক খানিক জ্ঞান বিতরণ করে প্রস্থান করলেন। কে বলতে পারে, এ'র কোনো খুড়ো বা জ্যাঠা হয়তো বা বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্সের মেম্বর! হয়তো বা এঞ্জিন বন্ধ রাখার প্রস্তাব আসবে সামনের মিটিঙে।

আর একবার এসেছিলেন মনে আছে এক মহিলা। তিনি ব্যবসায়ী যুবকের সগোত্র না হলেও সত্যিকারের মডার্ন ছিলেন। সাজে, গন্ধে, প্রলেপনে, হাবে-ভাবে ও কথাবার্তায়। 'উড্ মর্ণিং' বলে শুরু করলেন। বসতে বললাম। হাই-হিলের ওপর ব্যালান্স করা দেহকে

চেয়ারে স্থান দিলেন। ধন্যবাদসূচক শব্দ শুনতে পেলাম, 'কিউ।'

বাইরে তাকিয়ে বললেন, 'ওঃ হাউ বিউটি,' ভেতরে তাকিয়ে বললেন, 'হাউ ইনটারেস্টিং!' আর আমার দিকে কটাক্ষ করে বললেন, 'হাউ ভেরি রোম্যাণ্টিক!'

সত্যিই ঘাবড়ে গেলাম এবার। তীক্ষ্ণ হাই-হিল জুতোর দিকে চোখ পড়ে যাওয়াতে প্রতিবাদ করার লোভ সম্বরণ করলাম। আমার অসহায় মুখ দেখে ভদ্রমহিলার বোধকরি মায়া হল। বললেন, 'আই মিন ইওর প্রফেসন্—হাউ রোমাণ্টিক।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ন্যাভিগেসন্-ব্যাগে চোখ পড়ল। অবতরণের সময় এসে গিয়েছে। এত অল্পে নিষ্কৃতি পাব জেনে আনন্দ হ'ল। দেবীর ব্লাউজের কাপড়ের স্বল্পতার সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক বিচার বন্ধ রেখে নিবেদন করলাম ভেতরে ফিরে যাবার জন্য।

দেবীর নিষ্ক্রমণের সঙ্গে তাঁর শকিং পিঙ্ক রঙে রঞ্জিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শব্দ বেরুলো—'কিউ।'

সহকারী নামিয়ে রাখলেন ন্যাভিগেসনের ক্লিপ বোর্ড। বরোদা না আসা পর্যন্ত সময় ও গতি মেলান যাবে না। এই সময়টুকুর মধ্যে চলতে পারে একটু ঘুরে বেড়ান ও এক কাপ কফি। সহকারী পেছনে চলে গেলেন। রেডিও-বাবু পালামের আবহাওয়া তত্ত্বে ভরা রিপোর্টখানি হাতে দিয়ে যুগপৎ বিনয় ও আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসলেন, মানে আবহাওয়া ভাল। সামনে অসীমের মাঝে তাকিয়ে থাকি আমি, মেঘের রেখার

......আই মিন ইওর প্রফেশন্......

শেষে অস্তিত্বের খোঁজ করি। মহামাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে পরাজিত করে বিমানের চারটি জেট্ এঞ্জিন গতির স্থায়িত্বকে দেয় মর্যাদা দিয়ে চলেছে। ঠাণ্ডা হয়ে আসা কফির কাপে শেষ চুমুক দিলাম।

শাড়ীর খস্ খস্ আওয়াজটা নিশ্চয়ই হয়েছিল, বিমানের শব্দে চাপা পড়ায় জন্য শুনতে পাইনি। কিন্তু বিলিতি সুগন্ধ চাপা রইল না। মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে দেখলাম বম্বের লাউঞ্জে বসে-থাকা সেই মেয়েটিকে। ককপিটের সামনের দিকে এগিয়ে এসে হাত দুটো জোড় করে বাংলায় বললেন, 'নমস্কার।'

প্রতি-নমস্কার করে মেয়েটিকে বসতে বললাম। বলেই কিন্তু একটু ভাবনা হ'ল। মেয়েটির দেহের আয়তন ককপিটে চলাফেরার পক্ষে মোটেও নিরাপদ নয়। চারিদিকে সুইচের সারি—কোনও একটার এদিক-ওদিক হলেই মুশকিল। বেশ খানিকটা চেষ্টা করে যন্ত্রপাতি এড়িয়ে মেয়েটি আমার সহকারীর সিটে বসলেন। নিজের দেহের স্থূলতায় বোধহয় একটু লজ্জিত হয়েই সোজা বাইরে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

সুদূরপ্রসারী দিগন্তের যতখানি সম্ভব আয়ত্তের মধ্যে আনবার চেষ্টা করতে করতেই বোধহয় আপন মনে বলে উঠলেন, 'কি সুন্দর দৃশ্য!'

আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল। বললাম, 'আমার নাম তো শুনেছেন ফ্লাইট অ্যানাউন্সমেণ্টের সঙ্গে, আপনার নামটা কিন্তু জানতে পারিনি।'

'ওঃ মাপ করবেন একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। আমার নাম রুক্মিণী মিত্র। সাধারণত সবাই জানে রুক্মিণী বলে।' একটু হাসলেন আমার দিকে চেয়ে। অপূর্ব দুটো টোল পড়লো দুই গালে। নিজের অজানতে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। মেয়েটির দেহসৌন্দর্য না থাক, মুখখানি কিন্তু সত্যিই সুন্দর। বিশেষ করে, হাসলে তো আরও সুন্দর দেখায়। মাথায় প্রচুর চুলের রাশি; উস্কোখুস্কো চুড়োর মতো করে বেঁধে রাখা হয়েছে মাথার ওপরে—অনেকটা ঠাকুমা, ঠানদিদিদের মতো করে। একটি নকল মুক্তার মালা ঘিরে রয়েছে সেই খোঁপার অপভ্রংশকে।

মেয়েটি কিন্তু বিভোর হয়ে চেয়ে রয়েছেন সামনে—বাঁদিকে। সেদিকে তাকালাম। সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। সমস্ত আকাশ-বাতাসকে জানায় বিদায় নিচ্ছেন তিনি। মেঘের দুই স্তরের মাঝখানের অংশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এমন একটি রঙে, যার কোন বর্ণনা নেই কোন কাব্যে বা কারুর কল্পনায়। সে দৃশ্য দেখতে হলে উঠে আসতে হবে আকাশের মহাশূন্যের বুকে। মহাশিল্পীর তুলির আঁচড়ে-আঁকা সে অপূর্ব দৃশ্য দেখছিলেন মেয়েটি প্রাণমন দিয়ে, আর প্রতিফলিত আলোয় তাঁর উদ্ভাসিত মুখশ্রী দেখছিলাম আমি।

সূর্যদেব ডুব দিলেন আরব সাগরের গভীরতায়। গোধূলির আলোছায়ার লগ্ন হয়ে এলো ম্লান। মর্ত্যলোকে হয়তো এতক্ষণে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠলো মন্দিরে মন্দিরে। পঞ্চপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বিগ্রহের ক্ষমাসুন্দর মুখখানি। লাল কস্তা পাড়ের আঁচল গলায় জড়িয়ে, স্বামী-পুত্রের কল্যাণকামনায় প্রণাম করলেন কতো গৃহবধূ।

আমাদেরও সন্ধ্যার দেবারতি আছে। ন্যাভিগেসন্ ফ্লাস্। রোটেটিং বিকন্ অন্। রিওস্ট্যাট্স্ এডজাস্ট। প্রেস টু টেস্ট টু নাইট। প্যানেল লাইটস্ অন্।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের স্পর্শ ভেসে আসে ককপিটের বুকে। তাকালেও আর দেখা যাচ্ছে না। রুক্মিণীর সুন্দর মুখখানি। মনের মুকুরে ধরে রাখা ক্ষণকাল আগের ভাঙা মেঘের রঙে আরক্তিম গোধূলির আলোয় দেখা মুখখানি কল্পনায় ভাবতে থাকি।

'আপনার কোন অসুবিধা করছি না তো?' রুক্মিণীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

বড় মিষ্টি লাগল ওর গলার আওয়াজটা। বলে উঠি, 'না না, কি যে বলে! একটু কফি দিতে বলি?'

আভিজ্ঞতায় বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব'লছেন যে, প্রেমে পড়লে ছেলেদের বুদ্ধিবৃত্তি কমতে থাকে। তখন সব-কিছুই মনে হয় সরস ও মধুর। মেয়েদের কিন্তু অন্যরকম। বুদ্ধি হয়ে ওঠে তীক্ষ্য। সহজাত ছলনায় দেখা যায় নতুন ধার। এ সেই কাঁচপোকার গল্প। একটু নড়েচড়ে বসলাম। সহজ হবার চেষ্টা করলাম।

'কতদিন বম্বেতে ছিলেন?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'প্রায় এক মাস। আমার কাকা ওখানেই থাকেন। ছুটিতে গিয়েছিলাম। আপনাদের তো খুব মজা, কত দেশ-বিদেশ ঘোরেন!'

'দেশে ঘুরি ঠিকই, কিন্তু বিদেশে মাঝে মাঝে, কখন-সখনও।' উত্তর দিই থেমে থেমে।

'আমার খুব ইচ্ছে করে দেশ-বিদেশ ঘুরতে।' রুক্মিণী বললেন, 'সেই ছোটবেলায় ছিলাম ইরাকে প্রায় বছর খানেক। তারপর হয় ঢাকা নয়তো করাচী। আমার বাবা ট্রেড কমিশনে আছেন কিনা, তাই একটুআধটু দেশ দেখার সুবিধে। আমাদের কতদিনের ইচ্ছে, বাবার ইওরোপের একটা পোস্টিং হোক, কিন্তু তা আসেই না।'

একটু নিরাশ শোনাল যেন শেষের দিকটায়।

'শিগ্গিরই পোস্টিং এসে যাবে দেখবেন,' সান্ত্বনা দিই, 'তখন কিন্তু ভুলে যাবেন না আমাদের। ইওরোপ থেকে কিন্তু আমাদের দেশটাকে নেহাতই মাটির মনে হয়।' হেসে উঠলাম দুজনেই।

'আপনি নিশ্চয়ই ইওরোপ গিয়েছেন?'

'দু-একবার মাত্র। আমরা যাই পেটের দায়ে, চাকরির খাতিরে। অন্য দেশ দেখার সময় কোথায়?'

'কোথায় কোথায় গিয়েছেন বলুন না।' আগ্রহ ঝরে পড়ে রুক্মিণীর জিজ্ঞাসায়।

'কি আর দেখবো অত অল্পসময়ের মধ্যে বলুন' উত্তর দিই, 'কত কত সময় লাগে কোন একটা দেশ বা জাতিকে বুঝতে,' রুক্মিণীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'তবু দেখেছি লণ্ডনের ইংরেজদের শীতলতা, প্যারির পিগেলের উচ্ছলতা আর হল্যাণ্ডের শান্তি।'

'বাঃ আপনি তো বেশ কবির মতো কথা বলতে পারেন! কবে আসছেন আমাদের বাড়ীতে বলুন, গল্প শুনবো।'

কপট বিনয়ে হাতজোড় করে বললাম, 'যবে দেবীর আদেশ হবে।'

রুক্মিণী হেসে উঠলো, 'আদেশ মোটেও নয়। আমার অনুরোধ।' তারপর একটু সলজ্জভাবে থেমে বাইরের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কি, ঐ যে বড় শহর মনে হচ্ছে বাঁ দিকে?'

বাইরে তাকালাম। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না। জয়পুরে এসে গিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নামতে শুরু করতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম প্রায় দেড় ঘণ্টা কেটে গিয়েছে রুক্মিণী আসার পরে। অথচ মনে হচ্ছিল কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

রুক্মিণী চলে গেলেও রয়ে গেল ওর কথার সুরের রেশ, আর বিলিতি সুবাসের শেষ সঙ্গীত। মনের আনন্দে আমিও বোধহয় কোনো অতি-পরিচিত গানের সুরে গুন গুন করে উঠেছিলাম, 'হে ক্ষণিকের অতিথি......', কিন্তু সহকারীর বিশেষ অর্থে-ভরা চোরা চাহনি লক্ষ্য করেই বন্ধ করে দিলাম। মনের অস্থিরতাকে ঢাকার জন্যই বোধহয় ভি-এইচ-এফে ডেকে উঠলাম—'হ্যালো ডেলহি কনট্রোল—দিস্ ইস্........'

* * *

রমাদির বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই বুঝলাম অতিথিদের অনেকেই এসে গিয়েছেন। সারি দিয়ে পার্ক করে রাখা ঝকমকে গাড়ীগুলোর মাঝে গ্রাম্য বধূর মতো আমার তের বছরের পুরোনো গাড়ীখানা কোনমতে জায়গা করে নিল। সরোদ ও ধুতির কোঁচা সামলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম।

সামনেই দেখি রমাদি আবিরের থালা হাতে করে দাঁড়িয়ে। আমি একটু থতমত করতেই উনি হেসে উঠলেন, 'ভয় পেও না —আজ ছোট হোলি। শুধু একটা ফোঁটা।'

অতিথিদের বেশীর ভাগই আমাদের দিকে চেয়ে ছিলেন দেখলাম।

শুধু একটি ফোঁটা দেওয়ার মধ্যে যে কতখানি সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, রমাদিকে না দেখলে তা বিশ্বাস করতে পারতাম না। সামান্য লীলায়িত ভঙ্গির সঙ্গে আলতোভাবে অনামিকা আমার কপাল ছুঁয়ে গেল। রমাদি আবার হাসলেন, 'লক্ষ্মী ছেলে, সরোদ এনেছ তো? খুব খুশী হয়েছি।' অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে এবার এগিয়ে গেলেন সামনে, 'ওমা সুবীর এসেছ! কত ভাল লাগছে, একটুও ভাবতে পারিনি। দাঁড়াও প্লিজ্ —আজ ছোট হোলি, শুধু একটা ফোঁটা।' রমাদি আবার হাসলেন। ঠিক আগের মতো করেই।

হাসির রকমফের আছে। একই লোকের সময় বিশেষের হাসির মানের তফাৎ হয় প্রচুর। পয়সা ধারের ও শোধের হাসির কি এক মানে হতে পারে? সেইরকম মেয়েদেরও নানারকমের হাসি আছে। মুখটিপে হাসি, কটাক্ষে হাসি, নির্ঝরিণী হাসি, আর আছে সেই হাসি, যা রমাদি আজ হাসছেন। তার নাম সোসাইটি হাসি।

অন্য সব হাসির হয়তো কায়া নেই, কিন্তু সোসাইটি হাসির আছে। ঠোঁটের ফাঁকে পাওয়া যাবে তার জ্যামিতিক সত্তা, দেহের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসা শব্দের মিশ্রণে থাকবে তার প্রাণসত্তা, আর হাসির দৈর্ঘ্যে বিচার হবে তার সামাজিক উচ্চতা।

রমাদির হাসির কায়া আছে।

তকমাআঁটা বেয়ারা জিরাপানি পরিবেশন করে যাবার একটু পরেই গানবাজনার আসরে হাজির হবার অনুরোধ এলো। ঢালা ফরাস পাতা রয়েছে। কিন্তু শূন্য। সবাই সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছেন নানা ভাষায় ও নানা কায়দায়, কিন্তু প্রথমে শুরু করতে কেউই রাজী হচ্ছেন না।

হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়ার অস্বস্তিকে ভেঙে দিয়ে কে একজন উঠে এলেন। সবার দিকে তাকিয়ে দেখার সুযোগ তখনও অব্দি হয়নি। তাই রুক্মিণীকে দেখতে পেয়ে কেমন একটু চমকে উঠলাম। ও আসবে জানতাম কিন্তু সামনে না দেখতে পেয়ে ভেবেছিলাম হয়তো বা দেরী হচ্ছিল পৌঁছুতে। রুক্মিণী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। আসরের মাঝে বসে পাশেই শোওয়ান তানপুরাটা টেনে নিল কোলের ওপরে। মৃদু ঝংকার তুলেই থেমে গেল আচমকা। বিরত দৃষ্টি এদিকে ফেরাতেই আমায় দেখতে পেল বোধহয়। অনুরোধ-ভরা গলায় বললেন, 'একটু বেঁধে দেবেন?'

পাশে বসে তানপুরা বাঁধতে বাঁধতে মৃদু স্বরে বললাম, 'এরকম ভাবে যে আবার দেখা হবে তা কল্পনাতেও আনতে পারিনি।'

একটু মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল রুক্মিণীর ঠোঁটের আশেপাশে। আমার প্রিয় টোলের আভাস পেলাম ওর ওই গালে।

'কি? আমাদের বাড়ীতে আসবেন বলেছিলেন, এলেন না তো?'

'এবার নিশ্চয়ই যাব।' উত্তর দিলাম, 'একবার মাত্র নিমন্ত্রণ পেয়ে যেতে ভরসা হয়নি। নিন্ তানপুরা বাঁধা হয়েছে, এবার আপনার গাইবার পালা।'

রুক্মিণী গাইলো রবীন্দ্র-সঙ্গীত। 'জীবন-পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান'। ......গানের মাধ্যমে নিজের মনের কথা বলা যায় শুনেছি। রুক্মিণী কি নিজের মনের কথা কার উদ্দেশে ব্যক্ত করল? কিন্তু থাক অত কথা না ভেবে নিলেও চলবে। মনকে বোঝাই। আশাভঙ্গের দুঃখের বোঝার পরিমাণ সম্বন্ধে সতর্ক করার চেষ্টা করি। প্রথম কলি গানের শেষ লাইনের পর গেয়ে সুরের মূর্ছনার বন্দনা শেষ করে রুক্মিণী গান থামাল। আরও একটা গান গাইবার অনুরোধের উত্তরে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল রুক্মিণী। শূন্য ফরাসের দিকে চেয়ে থাকি আমি।

রমাদি কাছে এসে দাঁড়ালেন। অনুরোধ করলেন, 'কি বিনু—গানের পর বাজনা হওয়াই তো উচিত তাই না? এস আরম্ভ কর।'

আসরে সরোদের সুর পরোখ করে তানপুরো বাঁধলাম। রমাদি ততক্ষণে ধরে নিয়ে এসেছেন রুক্মিণীকে তানপুরার সুর তোলার জন্য। তবলা ও বাঁয়া নিয়ে প্রস্তুত হলেন তবলচি আমার ডান দিকে। রুক্মিণী আমার বাঁদিকে একটু পেছনে বসে তানপুরার তার চারটির ঝঙ্কার ওঠাল। আমি পিলুর আলাপ শুরু করি।

বিলম্বিত, দ্রুত ও ঝালার মাধ্যমে হয়তো নিজের মনের অস্থিরতাকেই প্রকাশ করতে চাইছিলাম। ভাষার মাধ্যমে নয়, শুধু সুরের মধ্যে দিয়ে চেয়েছিলাম রুক্মিণীকে নিকটে টেনে আনবার—কিন্তু পেরেছিলাম কি তার কোমল হৃদয়ের কোমলতর তন্ত্রীর মাঝে বিন্দুমাত্রও স্পন্দন জাগাতে?

তেহাই ধরে শেষ করলাম। বহু-প্রতীক্ষিত গলার মৃদু আওয়াজ পেলাম, 'খুব সুন্দর বাজান তো আপনি!'

উত্তরে একটু হেসে উঠে পড়ি। খেতে যাবার অনুরোধ ততক্ষণে এসে গেছে।

প্রশস্ত ছাদের ওপর বুফের আয়োজন করা হয়েছে। টেবিলগুলোর চারপাশ ঘুরে কিছু পরিমাণ আহার্য সংগ্রহ করে সবাই ছড়িয়ে পড়লেন চারপাশে। আহার্যের সুগন্ধের সঙ্গে মৃদু গুঞ্জনে ভরে উঠলো জায়গাটা। রুক্মিণী আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ওর বাবা-মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। 'এ'র কথাই তোমাদের বলছিলাম ড্যাডি, ক্যাপটেন সেন। জানো মা আমাদের মতো মাটির মানুষ মোটেই নন্ ইনি, শূন্যের মধ্যে উড়ে বেড়ান।' একটু হেসে কৌতুক করল রুক্মিণী। আমি হাত-জোড় করে বাবা-মাকে নমস্কার করলাম।

মিঃ মিত্র আকারে ছোট কিন্তু চাকুরে বড়। পরিচয়ের উত্তরে সান্ধ্য পোশাকপরা দেহটাকে একটু বেঁকিয়ে আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'হাউ ডু য়ু ডু।' মা করলেন নমস্কার। একটু হেসে বললেন, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি রুক্মিণীর কাছে, আজ আলাপ হ'ল। সত্যিই খুব ভাল লাগছে।'

বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলাম, 'না আমিই দোষী। আমারই আগে আপনাদের বাড়ীতে গিয়ে আলাপ করা উচিত ছিল। মিস মিত্রের সঙ্গে তো তাই কথা ছিল, না?' ফিরে তাকিয়ে দেখি রুক্মিণী নেই।

মা আমার অবস্থা বুঝেই বোধহয় বললেন,

'এত ছটফটে মেয়ে আমার—কোন কথারু দেখা পেয়েছে নিশ্চয়ই!'

আজকাল মডার্ণ হতে গেলে সবচেয়ে বেশী যে জিনিসটির দরকার হয়, তার নাম অরিজিন্যালিটি। এবং এরই দরকারে রান্নাঘরের পেতলের ঘটির বা ঠাকুরঘরের পূজার কোশাকুশীর স্থান হয় ড্রইং-রুমের ম্যান্টল সেল্ফের ওপরে। প্লাস্টিক পেন্ট মার্জিত দেওয়ালে ঝোলে কালি-ঘাটের পটুয়ার আঁকা ছবি। মরুভূমির অনাদৃত কাঁটাভরা ক্যাকটাসের দল শোভা পায় পাথরকুচিপূর্ণ দামী চিনামাটির বাসনে।

রুক্মিণীর মাকে দেখে সেই কথাই মনে হল। সাধারণ গৃহস্থবাড়ীর গিন্নীর মতো মোটাসোটা ভালমানুষের মতো চেহারা। কিন্তু পার্টিতে প্রচুর পান-দোক্তা-খাওয়া ঠোঁটে গাঢ় করে লিপস্টিক
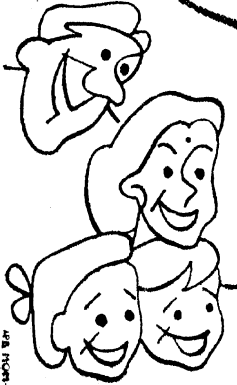
ও চোখের ওপর পাতলা নীল রঙ-এর প্রলেপনে সজ্জিত হয়ে এসেছেন। অনেক কথা বললেন বাংলা ও বাঙালী-ইংরেজীতে। বেশীর ভাগ গল্পই করলেন বিদেশের। কোন দেশের কোন বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর বাড়ী এসে তাঁর হাতের সুক্তো ও চাপর-ঘণ্ট খেয়ে কত প্রশংসা করেছেন। এই তো সেদিনের কথা, ইরাক থেকে ভারতে ফিরে আসার কয়েকদিন আগে হঠাৎ সে দেশের চিফ্ জাস্টিস্ এসে হাজির। বললেন, 'মিসেস মিত্র, দেশে ফিরে যাবার আগে ভারতীয় রান্না একবার খাইয়ে যাবেন না?...'
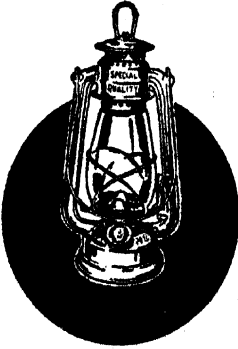
রমাদির গলার শব্দ পেলাম কাছেই, 'ওকি! কিছুই যে খাচ্ছেন না মিঃ কাঞ্জিলাল। না না, এটুকু নিতেই হবে, প্লিজ, না বলবেন না—সব নষ্ট হবে যে তা না হলে। এই যে মিসেস মিত্র আলাপ হয়েছে আমাদের বিনুর সঙ্গে? বিনু লক্ষ্মীটি এ'দের খাওয়াটা একটু দেখো।' রমাদি ছুটলেন আরেক দিকে। মিসেস্ তরফদার বোধহয় প্লেট নামিয়ে রেখেছেন। কলকাতা থেকে আনানো নতুন গুড়ের সন্দেশ, নিজের তৈরী করা বলে একটা অন্ততঃ খাওয়াতেই হবে! চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম রমাদির সন্দেশ হাতে ব্যাকুলতা। মিসেস তরফদার অনেক না-না করেও দুটি সন্দেশ তুলে নিলেন। রমাদির মুখে-চোখে স্বস্তির ভাব ফিরে এলো। একমপ্লিসড্ লেডির সুনাম বজায় রাখা যথেষ্ট কষ্টকর আজকাল! আর একটু দেরী হলেই হয়েছিল সব মাটি।

মিঃ মিত্র আরম্ভ করেছিলেন,

'বুঝলেন মশাই সব মাটি। এ গভর্ণমেন্টের শাসনে সব গেল।' ফিস্-ফ্রাই-এর আধখানা মুখে পুরে দিয়ে হতাশাসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, 'নইলে যে ট্রেড কমিশনের জোরে দেশের তৈরী জিনিস বিক্রি হচ্ছে পৃথিবীর দেশে-বিদেশে, বলতে গেলে যার জন্য পেটে অন্ন জুটছে দেশের; সেই কমিশনের অফিসারদের একটা বাড়ীর এলটমেন্ট হয় না ছয় মাসে! সব জাহান্নামে গেছে।' ভদ্রলোক বুফে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। খাবারের এলটমেন্টটা পরিপূর্ণ করতেই বোধহয়।

আমি মিসেস মিত্রকে সান্ত্বনা দিলাম। 'সত্যিই তো, এটা খুব অন্যায়। বড় যদি তাঁর সম্মান না পান তাতে বিরক্তি আসা স্বাভাবিক।'

'দেখুন না, একেই তো বাংলোর এলটমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে, তার ওপর—' মিঃ মিত্র পূর্ণ প্লেট হাতে ফিরে এসে গিন্নীর কথায় বাধা দিলেন, 'হ্যাঁ সে আর এক মজা। দেখুন না, সকলে সোসালিস্টিক্ সমাজ গড়ে তোলার কাজে লেগেছেন। কথায় কথায় ইউটিলিটি আর অস্টারিটি।' চিংড়ি মাছের মালাইকারির চাপে মিঃ মিত্র চুপ করলেন। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকি ও'র মুখের দিকে। সমাজের উঁচুতলার অধিবাসীদের মনের প্রবাহের দিগ্‌নির্ণয়ের চেষ্টা করি। মনের আক্ষেপ ও খাদ্যের মশলার চাপে মিঃ মিত্রর গৌরবর্ণে এসেছে রক্তাভ আভা। হঠাৎ মনে হল আমার, হাই ব্লাড-প্রেসার নয়তো?

সমবেদনাসূচক আরও দু-একটি কথা বলার চেষ্টা করে এ'দের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। রুক্মিণীকে খুঁজে পেয়েছি। ছাদের আধা অন্ধকার এক কোণে প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে চার পাঁচজন যুবক পরিবেষ্টিত হয়ে।

কাছে যেতেই রুক্মিণী দলে টেনে নিল। 'আসুন, এতক্ষণ বাবা-মা'দের সঙ্গে গল্প করে নিশ্চয়ই বোর্‌ড্ হয়ে গিয়েছেন।'

'না, বেশ ভাল লাগছিল। দেশ-বিদেশের গল্প শুনছিলাম।'

আলাপ করিয়ে দিল রুক্মিণী। প্রথমেই মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে। নামকরা বিলিতি ফার্মের কভেনেন্টেড অফিসার। হোম থেকে এপয়েণ্টমেণ্ট পেয়ে এসেছেন, আর তার সঙ্গে পেয়েছেন দুই বছর অন্তর হোম দর্শনের অধিকার।

ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট ঘোষের বাড়ী যে পূর্ববঙ্গে তা প্রকাশ পেল তাঁর ভাষায়। ভদ্রলোক মাটিতে কাজ করেন এয়ারফোর্সে। ঢুকেছিলেন ফ্লাই করার আশা নিয়ে, কিন্তু মা-বাবার অনুরোধ ও চোখের জলের তোড়ে সে আশা পূর্ণ হয়নি। তাই বুঝি তাঁর বাহন হারলে ডেভিডসন মোটরসাইকেল ষাট মাইলের কম স্পিডে কখনও চলতে শেখেনি। সদ্য রিকার্পেট করা রিং রোডে সেদিন স্পিড ট্রায়েল দেবার সময়, এক্সিডেণ্ট হতে গিয়ে কি রকম অপূর্ব কৌশলে পাশ কাটিয়ে এক পথিককে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন—তারই বিশদ বিবরণ হচ্ছিল। তৃতীয় ছেলেটি রুক্মিণীর সমবয়সী কাজিন, কলকাতায় বি-এস-সি পড়ে। গল্পে বাধা পড়ায় একটু অধীরভাবে তাড়া লাগাল, 'বলুন ঘোষদা,—তারপর?'

(ক্রমশঃ)
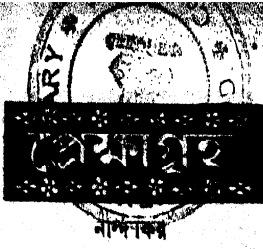
আজকের কথা ঃ

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব এবং আমাদের জাতীয় সরকার ঃ

বৈদেশিক পরাধীনতাকেও যেমন একদা বহু ভারতবাসীই অদৃষ্টলিপি ব'লে মেনে নিয়েছিল, ঠিক তেমনইভাবে স্বাধীনতালাভের পর দীর্ঘ ষোল বছর অতিক্রান্ত হ'লেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই এমন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়, যাকে নির্বিষ্ট চিত্তে স্বীকার ক'রে না নিলে শান্তি বিঘ্নিত হ'তে পারে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী হয়েও কিন্তু মাঝে মাঝে এমন অসম্ভব ঘটনার কথা কানে আসে, যা শুনে তাজ্জব বনে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না এবং সুখ-স্বস্তিকে দূরে রেখে চীৎকার ক'রে জানতে ইচ্ছে করে-- 'আমরা কোথায় আছি?'

ঠিক এমনই একটি অভাবনীয় ঘটনার কথা আচম্বিতে চোখে পড়ল ১৩৭০ সালের শারদীয় "রূপমঞ্চ"-এর পাতায়। ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন খ্যাতনামা চলচ্চিত্র-প্রযোজক আর ডি বনশল-এর প্রতিষ্ঠান আর-ডি-বি অ্যান্ড কোম্পানীর সর্বাধ্যক্ষ শ্রীবিমল দে। "মস্কো তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব ও ভারত সরকার" শীর্ষক প্রবন্ধে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি যে-ঘটনার উল্লেখ করেছেন, তেমন বিচিত্র ঘটনা যে আজকের দিনের পৃথিবীতে ঘটতে পারে এ-কথা কোনো সুস্থমস্তিষ্ক লোকের পক্ষে বিশ্বাস করাও অসম্ভব। এবং তাঁর লেখাটি বারংবার পড়বার পরেও প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন মনে হয়েছে।

সকলেরই জানা আছে, এ বছর জুলাই মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার আর ডি বনশল প্রযোজিত, অজয় কর পরিচালিত এবং সুচিত্রা সেন অভিনীত "সাত পাকে বাঁধা" ছবিখানিকে মনোনীত করেন। এবং এও কারুর অজানা নেই যে, ঐ উৎসবে প্রদর্শিত বিভিন্ন দেশের বিয়াল্লিশখানি ছবির মধ্যে এই "সাত পাকে বাঁধা" ছবিতে অসামান্য নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে শ্রীমতী সুচিত্রা সেন উৎসবের বিচারকমণ্ডলী দ্বারা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিতা হন। কিন্তু এ-কথা খুব কম লোকই জানেন যে, মস্কোর এই

জনপ্রিয় অভিনেত্রী কল্যাণী ঘোষ ফটো ঃ অমৃত

চলচ্চিত্রোৎসবে "সাত পাকে বাঁধা" ছবির সঙ্গে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে বাঙলাদেশের কোনো শিল্পী বা কলাকুশলী কিংবা প্রযোজক মনোনীত হননি; ভারত সরকার মনোনয়ন ক'রেছিলেন, হিন্দী ছবির পীঠস্থান বোম্বাই-এর

সুনীল দত্ত প্রমুখ কয়েকজনকে। জুলাই মাসেই আমরা জেনেছিলুম, ঐ উৎসবে যোগ দেবার জন্যে "সাত পাকে বাঁধা"র প্রযোজক আর ডি বনশল, পরিচালক অজয় কর এবং সর্বাধ্যক্ষ বিমল দে মস্কো যাত্রা করেছিলেন। শুধু তাই নয়; ৯ই জুলাই তারিখে "সাত পাকে বাঁধা"র প্রদর্শনীতেও তাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং প্রদর্শনী শেষে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতিনিধি হিসেবে যখন তাঁরা মঞ্চ থেকে অভিবাদন করেছিলেন, তখন প্রেক্ষাগৃহে সমবেত ৫,০০০ দর্শক শ্রীমতী সেনের অভিনয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে করতালিধ্বনি দ্বারা তাঁদের আপ্যায়িতও করেছিলেন। চোদ্দ দিনব্যাপী উৎসবের শেষ দিনে যখন শ্রীমতী সেন বিচারক-মণ্ডলীর রায়ে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিত হন, তখন এই আনন্দ-সংবাদ জরুরী টেলিগ্রাম যোগে আমাদের এই কল্‌কাতা শহরে প্রেরণ করেছিলেন তাঁরাই।

কিন্তু শুনে আশ্চর্য হবেন না, আর ডি বনশল, অজয় কর এবং বিমল দে মস্কো চলচ্চিত্রোৎসব কমিটির দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যাননি; তাঁরা সেখানে উপস্থিত হ'তে পেরেছিলেন মাত্র পর্যটক হিসেবে এবং তাও নিজেদের চেষ্টায় ও জিদের বশে। "সাত পাকে বাঁধা"র সঙ্গে প্রযোজক, পরিচালক এবং সর্বাধ্যক্ষ হিসেবে সংশ্লিষ্ট এই তিনটি ভদ্রলোক ঐ উৎসবে যোগ দেবার জন্যে ভারত সরকারের কাছ থেকে একখানি অনুমতিপত্র বা সুপারিশও জোগাড় করতে পারেননি আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও, তাঁদের ট্রাঙ্ক কল, টেলিগ্রাম, চিঠি—সবই নিষ্ফল হয়েছিল। ভারত সরকারের কাছে তাঁদেরই মনোনীত ছবির প্রযোজক ইত্যাদি রূপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে সকল আবেদন-নিবেদন যখন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, তখন কল্‌-কাতার সোভিয়েত কন্সাল অফিসের পরামর্শ ও উপদেশ মতো তাঁরা পর্য-টকের ভিসা সংগ্রহ করতে বাধ্য হন এবং সেখানকার দৈনন্দিন খরচ চালাবার জন্যে এই কন্সাল অফিসেরই পরামর্শ অনুযায়ী পাঁচ দিনের 'টুরিস্ট কুপন' কিনে নিয়ে 'যা থাকে কপালে' এই মনো-ভাব নিয়ে মস্কো পাড়ি দেন।

কোনো অনির্দিষ্ট কারণে ভারত সরকার মনোনীত সুনীল দত্ত প্রমুখ বোম্বের প্রতিনিধিবৃন্দ শেষ পর্যন্ত এই উৎসবে যোগদান করবার জন্যে মস্কোতে পৌঁছাননি, তাই রক্ষা; নইলে শ্রীবনশল প্রভৃতিকে পাঁচ দিন পরেই আবার ভারতের মাটিতে ফিরে আসতে হ'ত। শুধু তাই নয়, সেখানে উপস্থিত থেকেও সম্ভবতঃ তাঁদেরই ছবি "সাত পাকে বাঁধা"র প্রতি-যোগিতা প্রদর্শনীতে প্রবেশাধিকার থেকেও বঞ্চিত হতেন। মস্কোতে পৌঁছে উৎসব কমিটি দ্বারা প্রেরিত দোভাষীর সম্মুখীন হয়ে তাঁদের কম অপ্রস্তুত হ'তে হয়নি। কারণ শ্রীমতী দোভাষী তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ও'দের মধ্যে কার নাম সুনীল দত্ত। শ্রীমতীর কাছে উৎসবে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদের যে-তালিকা ছিল, তার শীর্ষে বিরাজ করছিল অভিনেতা সুনীল দত্তের নাম এবং বলা বাহুল্য, তার মধ্যে শ্রীবনশল, কর, দে-দের নাম ছিল অনু-পস্থিত। মস্কো বিমানবন্দর থেকে উৎসব কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে শ্রীমতী মোজা (এই নাকি দোভাষিণীটির

শিকারী চিত্রের একটি দৃশ্যে রাগিণী, অজিত ও হেলেন

নাম। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকিবহাল করেন এবং শ্রীবনশল প্রভৃতির কাছে সোভিয়েত সরকারের বৈধ ভিসা থাকার দরুণ তাঁদের সেই রাত্রির মতো 'মস্কোভা' হোটেলে নিয়ে যাবার জন্যে নির্দেশদান করেন।

পরের দিন উৎসব কমিটির সচিব মিঃ পোজনার শ্রীবনশল প্রভৃতির কাছে এই বিচিত্র পরিস্থিতির দরুণ তাঁদের অহেতুক অসুবিধায় পড়তে হওয়ায় বহুবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁদের কাছে এই শুভ-সংবাদ জানান যে, ভারত সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিদল যখন শেষ পর্যন্ত ঐ উৎসবে যোগ দিতে আসেননি, তখন তাঁদেরই ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি দেবার জন্যে উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে তিনি ভারতীয় দূতাবাসকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন এবং দূতাবাস তাঁর প্রস্তাবে সম্মতিও দিয়েছেন। অতএব অতঃপর শ্রীবনশল প্রমুখ তিনজন ঐ উৎসবে ভারতীয় প্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করবেন।

দেখা যাচ্ছে, নিতান্ত দৈবানুগ্রহে এবং সম্ভবতঃ শ্রীবনশল-এর কপালগুণে তাঁদের সমস্যার শেষ পর্যন্ত অনুকূল সমাধান ঘটেছিল। কিন্তু যদি উল্টোটি ঘটত অর্থাৎ বেড়ালের ভাগ্যে শিকে না
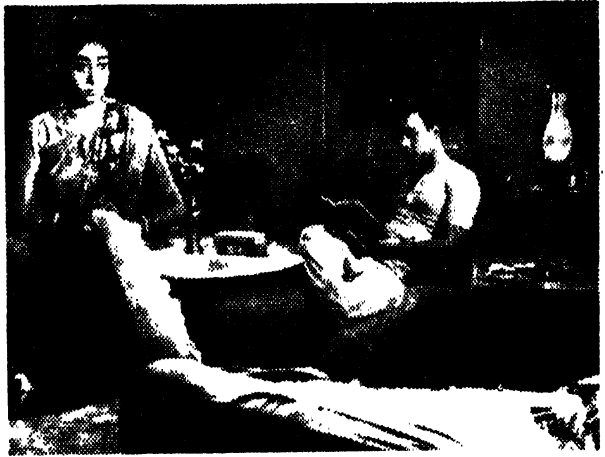
প্রেয়সী চিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ছিঁড়ত, তা' হ'লে? তাহ'লে পরিস্থিতিটি কি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ত না? মস্কোতে পর্যটক হিসেবে পাঁচ দিন অবস্থান করবার পরে যখন শ্রীবনশল-সম্প্রদায় কলকাতায় ফিরে আসতেন, তখন তাঁরা কার কাছে কি জবাবদিহি করতেন? তাঁরা কি সকলকে জানাতে পারতেন, ৯ই জুলাই তারিখে "সাত পাকে বাঁধা"র প্রদর্শনী হচ্ছে জেনেও তাঁরা সেই প্রদর্শনীতে প্রবেশের অনুমতি পাননি? এবং তাঁরা মস্কোতে গিয়েছিলেন মাত্র পর্যটক রূপে? মস্কো চলচ্চিত্রোৎসবের সংগে তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না? এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে আমরা কাকে দায়ী করতুম? শ্রীবনশল প্রমুখকে, না, ভারত সরকারকে?

শ্রীবিমল দের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি ছোট ছোট দেশের দূতাবাস-

পুলিও যখন তাদের দেশের প্রতিনিধি-দের ক্ষুদ্রতম সুখ-সুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন, তখন ভারতের দূতাবাস শ্রীবনশল প্রভৃতিকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি দেবার পরেও তাঁদের সম্বন্ধে নির্মমভাবে উদাসীন ছিলেন এবং বিদেশিনী দোভাষীর সামনেই তাঁদের সামান্যতম অনুরোধও তাচ্ছিল্যের সংগে উপেক্ষা ক'রে তাঁদের লজ্জাজনক অবস্থার মধ্যে ফেলতে কসুর করেননি।

ভারত সরকার যখন কোনো চলচ্চিত্রকে কোনো বৈদেশিক আন্ত-র্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের জন্যে মনোনীত করেন, তখন তাঁদের বিচারের মাপকাঠি কি হয়, তা' জানতে ইচ্ছে করে। সারা ভারতের সম্মান যে-ছবির ওপর নির্ভর করবে, সেই ছবি কেমন হওয়া উচিত, আন্তর্জাতিক মাপকাঠির হিসেবে সেই ছবির স্থান-মান কোথায় হওয়া উচিত, এ-সব কথা চিন্তা ক'রে দেখবার যোগ্যতা সকলের থাকে না এবং এইসব চলচ্চিত্র-উৎসবে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে যাঁদের মনোনীত করা হয়, তাঁদের ব্যবহারে, কথায়বার্তায়, চালচলনে ভারতের সুনামকে প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা আছে কিনা তা দেখা উচিত। ভারত সরকারের বেতার ও তথ্য দপ্তর, সাংস্কৃতিক দপ্তর এবং বৈদেশিক দপ্তর এই সব ব্যাপারে পরস্পরের সংগে যথেষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করলে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শীতের সওগাত ঃ

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সে ব্রিটিশ রাজত্বও নেই, বড়দিনের সেই উৎসবমুখর দিনগুলিও নেই এই শহর কলকাতায়। মনে পড়ে বাল্যকালের কথা। শ্যামবাজার থেকে আমরা বাপকাকার সংগে ট্রামে চেপে আসতুম গড়ের মাঠে। (গড়ের মাঠ কথাটাও দেখছি ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে; আজকাল তার পরিবর্তে চল হয়েছে ময়দান কথাটা।) এই গড়ের মাঠে পড়ত বড়ো বড়ো তাঁবু। কোনোটায় সার্কাস, কোনোটায় ম্যাজিক; আবার কোনোটায় 'এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ'— হ্যাঁ, তখন এই নামেই ম্যাডান কোম্পানী তাঁদের চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী ব্যবসায়ের পত্তন করেন। এই গড়ের মাঠে তাঁবু-ফেলা এলফিনস্টোন বায়োস্কোপেই আমি দেখেছিলুম—'প্রোটিয়া' এবং 'ক্যাবেরিয়া' ছবি। এবং ম্যাডান কোম্পানী প্রথম যখন পাকাপাকিভাবে চিত্রগৃহ (সিনেমা হাউস) প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাদের একটির নাম দিয়েছিলেন 'এল-ফিনস্টোন পিকচার প্যালেস' (বর্তমানে মিনার্ভা সিনেমা) এবং দ্বিতীয়টির নাম রেখেছিলেন 'এলফিনস্টোন পিকচার হাউস' (বর্তমানে টাইগার)। সার্কাস-গুলির নাম ছিল—হিপোড্রাম সার্কাস, হার্মিনিস্টোন সার্কাস; আমাদের দেশী 'বোসের সার্কাস'-ও কম জনপ্রিয় ছিল না। এই 'বোসের সার্কাস'-এই যাদুকর পি সি সরকারের গুরু গণপতি তাঁর আশ্চর্য যাদুবিদ্যা দেখাতেন এবং এই-খানেই বাঘের খেলা দেখাতেন একজন বাঙালী নারী (পরে জেনেছিলুম, তিনিই হচ্ছেন বিখ্যাত সংগীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার জননী)। এবং ম্যাজিক?— আমি অবশ্য গড়ের মাঠের তাঁবুতে কোনো ম্যাজিক দেখেছি ব'লে মনে করতে পারছি না; কিন্তু বড়দিন উপলক্ষে বিডন স্ট্রীটের 'থেসপিয়ন টেম্পল'-এ (বর্তমানে যেখানে বিডন স্ট্রীট পোস্টাপিস) কার্টার দি গ্রেট-এর চোখ-ঝলসানো ম্যাজিক দেখতে গিয়ে শেষ খেলার পরে স্টেজ থেকে দর্শকদের দিকে রাশি রাশি কমলালেবু বৃষ্টি দেখেছি; ক্ল্যাসিক মঞ্চে থার্স্টন-দম্পতির অপূর্ব ম্যাজিক দেখে বিস্মিত, অভিভূত হয়েছি।

বড়দিনের হগ-মার্কেটে তখন সাহেব-মেমেদের ভীড়ে আমরা প্রায়ই দলচ্যুত হয়ে পড়তুম; বিশেষ ক'রে ফুলের স্টলগুলির শোভা আজও মনে প'ড়ে মনটা মুষড়ে পড়ে—'হায়রে সেদিন'! এবং ঐ ফার্পোর কেক—তখন যেন আরও বেশী সুস্বাদু ছিল। বড়দিনের উৎসব তখন যেন আমাদেরও জাতীয় উৎসব ছিল।

কিন্তু এখন সেই গড়ের মাঠ ফাঁকা। হ্যাঁ, এখানে সেখানে তাঁবু আছে বটে, কিন্তু সেগুলি হচ্ছে ক্লাব-তাঁবু—ভবানীপুর, কালীঘাট, খিদিরপুর, বাটা স্পোর্টস, প্রেসক্লাব, সিটি অ্যাথেলেটিক প্রভৃতির তাঁবু। এমনই অবস্থা, মাত্র মিউজিয়ামের সামনের খানিকটা এবং মনুমেন্টের পাদদেশের দক্ষিণে খানিকটা—এ ছাড়া সারা গড়ের মাঠে সাধারণের ব্যবহার্য ফাঁকা জায়গা নেই বললেই হয়। তা ছাড়া, ঠিক কি কারণে জানি না, কলকাতা শহরের মধ্যে কোথাও সার্কাস দেখাবার জন্যে প্রয়োজনীয় পুলিশ-লাইসেন্সও দেওয়া হয় না। কলকাতা শহরে শেষ সার্কাসের তাঁবু পড়েছিল কয়েক বছর আগে মার্কাস স্কোয়ারে। গেল বছরেও আমরা সার্কাস দেখেছি পার্ক সার্কাস এবং বেলগেছিয়ার মাঠে—তবে ও-জায়গা-গুলোকে কলকাতা পুলিশ এখনও শহরতলী ব'লে গণ্য করেন। এবং সত্যি কথা বলতে কি, বড়দিনের প্রমোদসূচী হয় চৌরঙ্গী অঞ্চলকে ঘিরে—যেখানকার যা! সার্কাসের কথায় মনে পড়ে কার্ল হেগেনবেক-এর বিরাট সার্কাসের কথা; এই জার্মান সার্কাসটি যত বেশী জীবজন্তু নিয়ে কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে খেলার আসর পেতেছিল, তত বেশী জীবজন্তু এ-শহরে আর কোনো সার্কাস নিয়ে আসেনি। বাস্তবিকই এর পশুশালা (Menagerie-মিনেজারি) একটা দেখবার জিনিস ছিল। আর মনে পড়ে, আগাসী সার্কাসের কথা; এখানেই বিখ্যাত লোহশরীরবিশিষ্ট ভীম ভবানী (আসল নাম ভবানী সাহা) বুকের ওপর হাতী নিতেন এবং তিনখানি চলন্ত মোটরগাড়ীকে একসংগে চেনের দ্বারা আটকে রাখতেন—দুই বাহুতে দু'টি কড়া থেকে দু'খানি গাড়ীকে চেন দিয়ে বাঁধা হত এবং মাথা দিয়ে গলানো একটি লোহার কড়া কোমরে নামিয়ে এনে তার সংগে লাগানো একটি চেন দিয়ে সামনের একটি গাড়ীকে বেঁধে রাখা হ'ত; এরপর তিনি যখন নিশানা দিতেন তিনি তৈরী তখন একই সংগে তিনখানি গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়া হ'ত।

লোকে সবিস্ময়ে দেখত, গাড়ী তিনখানির সামনের চাকা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, ভীমভবানীর সারা দেহের মাংসপেশী ফুলে উঠেছে; তিনি অল্প অল্প এদিকে ওদিকে হেলছেন বটে, কিন্তু একেবারে যাকে বলে 'নট্ নড়নচড়ন, নট্ কিচ্ছু'—পাহাড় ঠেলিয়ে গাড়ী তিনখানি কিছুতেই ছুটে বেরিয়ে যেতে পারছে না। এই খেলা রামমূর্তি এবং নাম ঠিক মনে পড়ছে না, একজন শক্তিশালিনী নারীও দেখাতেন অন্য সার্কাসে।

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত শীতকালে কল্কাতা শহরে 'কার্ণিভ্যাল-এর আমদানী হ'ত; চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ-এ হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ের জায়গায় এবং ভবানীপুরে এল্গিন রোডের মোড়ে পোড়াবাজারে আমরা 'ক্যার্ণিভ্যাল' বসতে দেখেছি। তাতে থাকত জায়ান্ট হুইল মোটরসাইকেলের খেলা দেখাবার 'ওয়েল অব ডেথ' (মৃত্যুকূপ), মেরী গো রাউন্ড প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের পক্ষে আকর্ষণীয় খেলা এবং তার সঙ্গে জুয়াড়ীদের জন্যে নানারকম টার্গেটিং-এর ব্যবস্থা; নাচগান, ম্যাজিক প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা এবং চা-চপ-কাটলেট, আইসক্রীম প্রভৃতির দোকানও থাকত। আজকাল এই 'কার্ণিভাল'-ও অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন যা-কিছু আমোদপ্রমোদ করবার উপায় হচ্ছে সিনেমা দেখা এবং ডায়মণ্ডহারবার, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা জুগার্ডেনে পিকনিক করতে যাওয়া। তাই বলছিলুম, বড়দিনের সে-আনন্দ আর নেই; ভারত থেকে ইংরেজশাসন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বড়দিনের আনন্দও বিগত যুগের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

।। শ্রেয়সীর মুক্তিলাভ ।।

রাধারাণী পিকচারের সামাজিক ছবি 'শ্রেয়সী' বৃহস্পতিবার ১২ই ডিসেম্বর নর্মদা চিত্রের পরিবেশায় শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও অন্যত্র মুক্তিলাভ করেছে। সুবোধ ঘোষের মঞ্চ-সফল কাহিনী অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্তের চিত্রনাট্যে রূপায়িত কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী। সুর-সৃষ্টি করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজনা: কার্তিক বর্মণ। চিত্রগ্রহণে বিজয় ঘোষ। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সবিতা চ্যাটার্জী (বোম্বে), কমল মিত্র নীতিশ মুখার্জী, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, তরুণকুমার, অনুপকুমার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথন, পদ্মা দেবী, রাজলক্ষ্মী, ভারতী দেবী, বিনতা রায়, দীপিকা দাস, মাঃ অরূপ প্রভৃতি।

।। প্রভাতের রং ।।

গত ২রা ডিসেম্বর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দুখানি গান রেকর্ড করেছেন প্রেস ফটোগ্রাফার হেমেন মিত্র প্রযোজিত এস এম পিকচার্সের প্রথম নিবেদন 'প্রভাতের রং' ছবির জন্য। ছবিটি পরিচালনা করছেন অজয় কর। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালকের প্রধান সহকারী হীরেন নাগ। গান রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

রূপায়ণে আছেন বিশ্বজিৎ, শর্মিলা ঠাকুর, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, লিলি চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, অমর বিশ্বাস,

তাপস গাঙ্গুলী, দিলীপ চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

॥ অনুষ্টুপ ছন্দ ॥

পীযূষ বসুর পরিচালনায় **অনুষ্টুপ ছন্দের** কাজ গত ২৭শে নভেম্বর থেকে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। প্রথম দিনের সুটিংয়ে বসন্ত চৌধুরী, সুমিতা সান্যাল, এন বিশ্বনাথন এবং সীতা মুখোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করেন। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এই বি-কে প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি কালস্রোত মুক্তি-অপেক্ষায়।

॥ সাধক রামপ্রসাদ ॥

রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির প্রমোদ বিভাগের সভ্যগণ গত ১লা ডিসেম্বর রবিবার বাগবাজারস্থ 'হরিদাস সাহার ঠাকুরবাড়ী প্রাঙ্গণে এ'দের 'সাধক রামপ্রসাদ' নাটক যাত্রাভিনয় করে সমাগত সুধীবৃন্দকে মুগ্ধ করেন।

রামপ্রসাদের ভূমিকায় শ্রীপ্রভাত ঘোষ

এ'রা ইতিপূর্বে এই নাটক তিনবার অভিনয় করেছেন। রামপ্রসাদের বৈচিত্র্যময় জীবনকে সার্থক অভিনয় দ্বারা মূর্ত করে তুলেছেন শ্রীপ্রভাত ঘোষ। অন্যান্য শিল্পীরা যথাযথ অভিনয় করেছেন।

যাত্রা-নাটক কতদূর হৃদয়গ্রাহী ও সুখশ্রাব্য হতে পারে, তা এ'রা এই অভিনয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

শ্রীগোকুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রয়েছে।

।। মুক্তি-প্রতীক্ষিত বিভাস ।।

পরিচালক বিনু বর্ধনের পরিচালনায় জেনিথ পিকচার্সের প্রথম পদক্ষেপ বিভাস-এর মুক্তি সমাসন্ন। সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন স্বর্গত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, অনুভা গুপ্তা, গীতা দে এবং নবাগতা ললিতা চট্টোপাধ্যায়। সংগীত-পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আর ডি বনশালের অধীনে ছবিটি মুক্তি পাবে।

থিয়েটার সেণ্টারে লোকতীর্থের নিয়মিত অভিনয়

লোকতীর্থ থিয়েটার সেণ্টারে নিয়মিতভাবে দুটি মৌলিক নাটক নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন। 'উলু স্টেশন' নিঃসন্তান স্টেশন মাস্টারের একটি করুণ জীবনালেখ্য। 'সুমেরু কুমেরু' দার্জিলিঙের একটি অভিজাত হোটেলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ১৩ই ও ২০শে ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় নাটক [illegible]টি অভিনীত হবে। নাট্যকার সুনীত[illegible]ার মুখোপাধ্যায়।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা

দিবিত্রি ফিল্মস প্রযোজিত ও পরিবেশিত 'স্বর্গ হতে বিদায়' চিত্রের সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ এ মাসের প্রথম সপ্তাহে শেষ করলেন বাংলার প্রথম অভিনেত্রী-পরিচালক মঞ্জু দে। শেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনী-চরিত্রে নায়কের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার যে জীবন-সংগ্রাম, তার প্রতিটি বলিষ্ঠ অধ্যায় এ চিত্রনাট্যে স্থান পেয়েছে। নায়কের চরিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিনয়-জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর নতুন করে প্রতিষ্ঠা করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কারণ মনের মত একটি চরিত্র তাঁর অভিনয়-সাধনার সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে। বিশেষ করে এ-কাহিনীর প্রতিটি চরিত্রই শ্রীমতী দের নির্দেশে যথার্থ অভিনীত হয়েছে। প্রেমমধুর ও বিরহের চরিত্রে নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায় সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। ছোট-বড় চরিত্র মিশিয়ে এ ছবির সার্থকতা-সাফল্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন বিকাশ রায়, অনুভা গুপ্তা, পাহাড়ী সান্যাল, বিপিন গুপ্ত, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, আশা দেবী, জহর রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, অতনু ঘোষ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকুমার, সুখেন, রথীন ঘোষ, আশীষ মুখোপাধ্যায় ও সুমিতা সান্যাল।

এ মাসের শেষেই আবহ-সংগীত শেষ হয়ে ছবিটি সেন্সারের ছাড়পত্র পাবে। রাধা ও পূর্ণ চিত্রগৃহে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। সংগীত, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর রাখবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অনিল গুপ্ত এবং অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। একমাত্র পরিবেশক দিবিত্রি ফিল্মস প্রাঃ লিঃ।

বোম্বাই

ফিল্মালয়ের 'আও প্যেয়ার করে' ছবির বহির্দৃশ্য সম্প্রতি ইউরোপের স্পেন, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হল। ছ' সপ্তাহব্যাপী দৃশ্যগ্রহণ সফরে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক আর কে নায়ার, রূপায়ণে : আলোকচিত্র-শিল্পী কেএইচ কাপাদিয়া, জয় মুখার্জি, সায়রা বানু ও কেষ্ট চ্যাটার্জি। কাহিনীর একটি বিশেষ উত্তেজনা-পূর্ণ বুলফাইটের দৃশ্য মাদ্রিদে গৃহীত হয়। লণ্ডনে থাকাকালীন পরি-

চালক শ্রীনায়ার কেনেথ হর্নের 'ট্রায়াল এণ্ড এরর' নাটকের হিন্দী এবং ইংরেজী চিত্রস্বত্ব কিনেছেন। পূর্ব-ঘোষিত এ চিত্রটির নাম হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় রাখা হয়েছে 'তিসরা কোন' এবং 'ওনলি টু ক্যান গো টু বেড'। হিন্দী চিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন রাজ কাপুর, জয় মুখার্জী ও সায়রা বানু। সুর-সৃষ্টি করবেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

মাদ্রাজ

মুক্তি মন্দির বর্তমানে জয়ন্তী স্টুডিওয় হিন্দী ছবি 'ঝাণ্ডা উচ্চা রহে হামরা'-র দৃশ্যগ্রহণ শেষ করছেন। মুখ্য কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন শিবাজী গণেশন, সাবিত্রী, নগেশ ও মনোরমা। সঙ্গীত ও চিত্র-পরিচালনায় রয়েছেন গন্ধর্ব এবং দাদা মিরাসী।

স্টুডিও থেকে বলছি

সবার ওপরে মানুষ সত্য। এ-সত্যতা আমাদের সার্বজনীন। জীবনবেদের অনেক চরিত্রই মহৎ হতে পারে। যাদের সে অবলম্বন বা প্রতিষ্ঠিত হবার কোন পথই সমাজ খোলা রাখেনি, তাদের চরিত্র-সত্যতা অসৎ হলেও, কিছু বক্তব্য আমাদের জানার আছে। হয়তো পরিবেশ আর পারিপার্শ্বিকতায় অনেক জীবন মাঝপথে থেমে গেছে। এমনকি পাঁক থেকে পঙ্কজে জীবন পরিবর্তিত হতে চলেছে। অথচ সমাজে এমন চরিত্রের অভাব নেই। বিশেষ করে শহর সভ্যতায় এদের সংখ্যা নগণ্য নয়। যাই হোক পাতায় পাতায় ইতিহাস লিখতে বসিনি। উপন্যাস বা গল্পের ভূমিকাও লিখছি না। শুধু মাত্র একটি মেয়ে—রোশনারা বেগম সম্পর্কে কিছু সত্যতা আপনাদের বর্ণনা করছি। সে হয়তো ভাগ্যচক্রে বাঈজী হয়েছে। কিন্তু সেটাই তার জীবনের সবকিছু বড় নয়। প্রাত্যহিকতার মধ্যেও যে তার একটা ভালবাসার প্রেম ও মাতৃহৃদয় লুপ্ত ছিল, সেটি আবিষ্কার করলেন পশ্চিমের প্রবীণ ডাক্তার অগ্নিশ্বর মুখোপাধ্যায়। বৃদ্ধ হলেও সব সময় অভিভাবক-ভৃত্য দাসুর শাসন মেনে ডাক্তারবাবুর জীবন-প্রবাহ কর্ম-পরিক্রমায় শেষ হত। রোগী-দের নিয়েই তাঁর সমস্ত জগৎ। নিত্য যাওয়া-আসার মধ্যেই যেসব মানুষ ধরাবাঁধার নাগপাশে আবদ্ধ, তা থেকে রোশন অনেকটা মুক্ত। তার জীবনের কিছু সত্য অসাধু হলেও, শেষ পর্যন্ত পুত্রের অসুখের সময় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ডাক্তার অগ্নিশ্বরকে রোশন সব কথা স্পষ্ট জানিয়েছিল। রোশনের আত্ম-ভাষণ থেকে আমরা তার পেছনে ফেলে-আসা অনেক গভীর জীবনের পরিচয় পেলাম। কাহিনী শুরু করার আগে অগ্নিশ্বরের মত আমরাও বলতে পারি রোশনকে—ধন্যবাদ যেখানেই তুমি থাকো না কেন, শুধু একটিবারের জন্য তুমি জেনে যাও যে, তোমার ছেলে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ফিরেছে। জীবনে অনেক দুঃখই তুমি পেয়েছো। আজ একটু তুমি হাসো।

বিলেত থেকে পাশ করে মায়ের মৃত্যু-সংবাদে বৃদ্ধ ডাক্তার অগ্নিশ্বরের কাছে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছে তার সম্পত্তির হিসেব মিটাতে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অগ্নিশ্বরের কর্তব্য পালনের লগ্ন এসেছে। সব সত্য তিনি পার্থকে জানালেন—লীলা তার পালিত মা।

আজ থেকে পঁচিশ বছর পেছিয়ে গেলেম অগ্নিশ্বর। স্মৃতির মত সব যেন ভাসছে। পার্থ তখন কত ছোট। একদিন পার্থ সুস্থ হবার পর রোশন তার জীবনের সব কথা অগ্নিশ্বরকে বলে যায়। সে জীবন কতখানি করুণ, তা অল্পপরিসরে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। দু-চার কথায় বলতে গেলে রোশন সংসারের পাপ। কিন্তু সে এ-জীবন চায়নি। এখানে দিন বলে কিছু নেই। শুধুই রাত। অন্ধ-বোবা পৃথিবী। আলোর জীবন থেকে এখানে সকলেই বঞ্চিত।

কিন্তু রোশন ভাল হতে চেয়েছিল। বিধাতাও চোখ মেলে চেয়েছিলেন। তা নাহলে ঘটনাচক্রে গঙ্গাস্নানে এমন নিষ্ঠ মহান্ ব্রাহ্মণ আনন্দর সঙ্গে তার মিলন-বন্ধন হবে কি করে? জাতিভেদের

কোন প্রশ্নই রইলো না। বেগম বাঈজী রোশন হল ব্রাহ্মণ-বধূ সরমা। আনন্দ সত্য সাধনায় রোশনকে ভেঙে নতুন করে গড়লেন। নতুন নামে নতুন জীবন শুরু। লোকে জানলো সরমা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর তাদের সন্তান। কত সুখের ছোট্ট সংসার। ফেলে-আসা জীবনের ক্ষতচিহ্নগুলো মিলিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এত সুখ সইলো না সরমার। অশুভ বার্তা নিয়ে শোভনলাল সবকিছু ভেঙেচুরে দুজনকে সুখের স্বর্গ থেকে আলাদা করে তার পরিকল্পনাকে পূর্ণ করলো। আনন্দকে সে সরমাবেশী রোশনের নোংরা জীবনের ইতিকথা শুনিয়ে গৃহত্যাগী করলো। হঠাৎ আলোর মৃত্যু হল। সংসার খেলাও শেষ হল। সরমা রোশন হয়ে রইলো। আত্মহত্যা করবে ভেবেছিল। কিন্তু

মন ও মন্দির চিত্রের বিশিষ্ট ভূমিকায় সুমিতা সান্যাল ফটো: অমৃত

স্বর্গ হতে বিদায় চিত্রের বিশিষ্ট ভূমিকায় মাধবী

কাহাঁ প্যার না হো জায় চিত্রে শর্মিলা

সন্তানের মুখ চেয়ে রোশন মরতে পারলো না। পুত্রকে সে আনন্দের মত করে মানুষ করবে এই বিশ্বাসে রোশন বেঁচে রইলো।

রোশন-কাহিনীর শেষটুকু আগে-ভাগেই ইতি টানতে চাই না। পরিণতির শেষ অংক হিসেবের খাতায় জমা থাক। যোগ বা বিয়োগ, মিলন কিংবা বিরহ সে নিয়ে তর্ক তুলতে চাই না। শুধু রোশনের প্রতি একটু করুণা যেন আমাদের চিরদিন থাকে। সে বাঈজী হয়েও সংসারী হতে চেয়েছিল। কিন্তু

বিধাতা তাকে করুণা করেন নি। সত্যের বিচারে সে কি অপরাধী?

প্রশ্ন তুলছি। উত্তর দেবেন পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর আগামী 'আলোর পিপাসা' চিত্রে। বনফুল রচিত উল্লিখিত কাহিনী অবলম্বনে এটির পূর্ণ চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন শ্রীমজুমদার। চিত্রগ্রহণ নিয়মিত শুরু হয়েছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। চিত্রগ্রহণ, পরিচালনা, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন সৌমেন্দু রায়, দুলাল দত্ত এবং বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সংগীত সৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

কাহিনীর মূল রোশন চরিত্রে রূপদান করছেন সন্ধ্যা রায়। চরিত্রচিত্রণে পরিপূর্ণ রূপ দিতে তিনি নিয়মিত নৃত্যাংশে মহড়া দিচ্ছেন। আনন্দ চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী। অশ্বিনবরের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল। ডি আর প্রোডাকসন্স এ-ছবির প্রযোজক। —চিত্রদূত

দর্শক

॥ জ্যাক হবস ॥

১৬ই ডিসেম্বর—ক্রিকেট খেলার স্মরণীয় ঘটনা-পঞ্জিকায় এই দিনটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা আছে। ১৮৮২ সালের এই ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সার জন বেরী হবস জন্মগ্রহণ করেন। ক্রিকেট খেলাই ছিল হবসের জীবনের ধ্যান-ধারণা এবং জীবনধারণের সহায়-সম্বল। হবসের জীবন-চরিত—ক্রিকেট খেলার একটি মহান্ ঘটনাবহুল গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। প্রতি বছরের ১৬ই ডিসেম্বর হবসের ব্যক্তিগত জীবনেই শুধু একটি স্মরণীয় পুণ্যদিন নয়, পৃথিবীর প্রতি ক্রিকেট অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই এই দিনটি স্মরণ ক'রে হবস তথা ক্রিকেট খেলার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে, জ্যাক হবসের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে এই ধরণের শিরোনামা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় "হবস......নটআউট"। ক্রিকেট খেলারই ভাষাতে তাঁকে স্মরণ করার এই রীতি খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক।

●

টেস্ট ক্রিকেট
(১৯০৮—১৯৩০)

বিপক্ষে	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ রান	মোট রান	গড়
অস্ট্রেলিয়া	৪১	৭১	৪	১৮৭	৩৬৩৬	৫৪·২৬
দঃ আফ্রিকা	১৮	২৯	৩	২১১	১৫৬২	৬০·০০
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২	২	০	১৫৯	২১২	১০৬·০০
	৬১	১০২	৭	২১১	৫৪১০	৫৬·৯৪
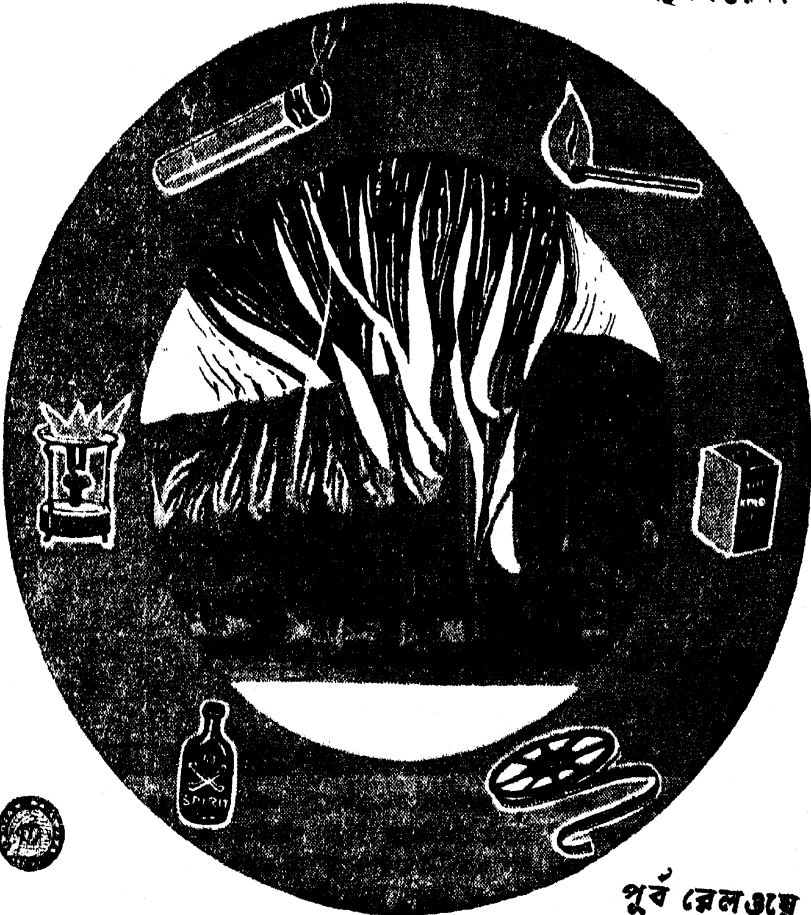
স্যর জন বেরী হবস ১৮৮২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কেম্ব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে তিনি শুধু 'জ্যাক হবস' নামেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। খেলোয়াড়-জীবনের প্রথমদিকে জ্যাক হবস ছিলেন স্থানীয় কেম্ব্রিজসায়ার মাইনর কাউন্টি ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়। সেখান ছেড়ে বিখ্যাত এসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট দলে যোগদানের চেষ্টা ক'রে তিনি ব্যর্থ হন। এসেক্স কর্তৃপক্ষ তাঁর আবেদনপত্র কোনরকম বিবেচনার জন্যে না রেখে সরাসরি বাতিল ক'রে দেন। সারে কাউন্টি ক্রিকেট দলের কর্তৃপক্ষ কিন্তু হবসের খেলার মধ্যে উজ্জ্বল-ভবিষ্যতের যথেষ্ট নিশানা পেয়ে তাঁকে দলভুক্ত ক'রে নেন। হবস ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত সারে দলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ সালের ১৬ই এপ্রিল ওভাল মাঠে হবস ইংল্যাণ্ডের জেন্টলমেন দলের বিপক্ষে প্রথম-শ্রেণীর খেলায় প্রথম খেলতে নেমে ২৯ ও ৮৫ নটআউট রান করেন। হবস সম্বন্ধে এসেক্সের পূর্ব-ধারণা বদলাতে বেশী দেরী হ'ল না। এসেক্সেরই বিপক্ষে হবস তাঁর দ্বিতীয় খেলায় সেঞ্চুরী (১৫৫ রান) করেন।

হবসের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের (১৯০৫—১৯৩৪) পরিসংখ্যান এক বিরাট সাফল্যের পরিচয় : ১৩১৫ ইনিংস খেলা, ১০৬বার নটআউট, মোট রান ৬১,২৩৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩১৬ (নটআউট), সেঞ্চুরী সংখ্যা ১৯৭ এবং গড় ৫০-৬৩। যে সব ইংলিস ক্রিকেট খেলোয়াড় তাঁদের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৩০ হাজার অথবা তার বেশী রান করেছেন তার তালিকায় জ্যাক হবস আজও শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন—হবসের মোট রান সংখ্যা এক বিরাট অংক—৬১,২৩৭ রান। সেঞ্চুরী সংখ্যার দিক থেকেও হবস শীর্ষস্থানে আছেন—হবসের সেঞ্চুরী সংখ্যা ১৯৭। ইংলিস ক্রিকেট খেলার এক মরসুমে হবস ১০০০ রান করেছেন ২৬বার (এরমধ্যে ৩,০০০ রান একবার এবং ২০০০ রান ১৬বার)। এ বিষয়ে তাঁকে অতিক্রম ক'রে আছেন মাত্র এই তিনজন খেলোয়াড়—ডব্লউ জি গ্রেস (২৮ বার), এফ ই উলি (২৮বার) এবং সি পি মীড (২৭বার)।

প্রথম মহাযুদ্ধ এবং ভগ্নস্বাস্থ্য তাঁর ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ালে তিনি

জ্যাক হবস ৮১ নট আউট

জন্ম
১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮২

ক্রিকেট খেলায় আরও বেশী রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারতেন।

জ্যাক হবসকে সর্বকালের খ্যাতনামা ব্যাটসম্যানরূপে অভিহিত করা হয়। তাঁর সম্বন্ধে এই উক্তি কোনক্রমেই অতি-রঞ্জিত নয়। যে কোন উইকেটে হবস বেশ স্বচ্ছন্দ ক্রীড়াধারায় নিজকে প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। এই পারদর্শিতায় তিনি সর্বকালের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছে আদর্শ ব্যাটসম্যান। আবার কভার-পয়েণ্টে তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ ফিল্ডার।

১৯০৭ সালে (১৯শে ডিসেম্বর) সিডনি মাঠের প্রথম টেস্ট খেলায় এ ও জোন্সের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড দল ২ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়। এই খেলার বিবরণ দিতে গিয়ে ক্রিকেট খেলার খ্যাতনামা সমালোচক ই এল রবার্টস শেষকালে লিখেছেন, 'এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, একজন যোগ্য তরুণ খেলোয়াড়কে দলে পাওয়ার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের পক্ষে যাঁকে দল-ভুক্ত করা হয়নি, তাঁর নাম জে বি হবস।' মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় হবস ইংল্যান্ড দলে স্থান পেয়ে ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে এফ এল ফেনের সঙ্গে প্রথম উইকেটের সঙ্গী হিসাবে তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নামলেন। এবং প্রথম ইনিংসেই ৮৩ রাণ করলেন। এই সময় থেকে হবসের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত (২২শে আগস্ট, ১৯৩০) ইংল্যান্ড বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে ২০টি টেস্ট-সিরিজ খেলেছিল। এই সময়ের মধ্যে (১৯০৭—১৯৩০) হবস খেলেছিলেন ১৬টি টেস্ট সিরিজ। ১৯২২-২৩ ও ১৯২৭-২৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে, ১৯২৯-৩০ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং নিউজিল্যান্ড সফরে ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দরুণ তিনি যোগদান করেন নি।

১৯২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট খেলায় হবস প্রথম দিনের খেলার পর ঐ সিরিজের আর কোন খেলাতেই যোগদান করতে সক্ষম হননি। তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল।

হবস ১৬টি টেস্ট সিরিজে যোগদান ক'রে ৬১টি টেস্ট ম্যাচ (ইনিংস সংখ্যা ১০২) খেলেছিলেন। টেস্ট খেলায় তাঁর মোট রান-সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৪১০ এবং এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রাণের রেকর্ড ২১১ (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, লর্ডস ১৯২৪)। টেস্ট ক্রিকেটে যাঁরা মোট ৩০০০ রাণ অথবা তার বেশী রাণ করেছেন সেই তালিকায় হবস আছেন ৬ষ্ঠ স্থানে। তাঁর মাথার ওপরে যে পাঁচজন আছেন তাঁদের মধ্যে ইংল্যান্ডের ডবলিউ আর হ্যামণ্ডের রাণ সংখ্যাই সর্বাধিক—৮৫টি টেস্ট খেলায় ৭,২৪৯ রাণ। স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান (৫২টা টেস্ট) ছাড়া বাকি সকলেই—হ্যামণ্ড (৮৫টা টেস্ট), হাটন (৭৯টা টেস্ট), হার্ভে (৭৯ টেস্ট) এবং কম্পটন (৭৮ টেস্ট) তাঁর থেকে সংখ্যায় বেশী টেস্ট ম্যাচ এবং ইনিংস খেলেছেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী ১৮৭ রাণ (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, কেপ-টাউন, ৫ম টেস্ট ১৯১০) এবং সর্বশেষ সেঞ্চুরী ১৪২ (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, মেলবোর্ণ ১৯২৯)। সেঞ্চুরী করেছেন ১৫টি—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১২, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ এবং নিউ-জিল্যান্ডের বিপক্ষে ১। টেস্ট ম্যাচ খেলেছেনও এই তিনটি দেশের বিপক্ষে।

১৯৩০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনি তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের শেষ টেস্ট সিরিজ খেলেন। নটিংহামে এই শেষ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় হবস প্রথম ইনিংসে ৭৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৪ রাণ করেন।

হবস ছিলেন পেশাদার খেলোয়াড়; টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ড দল-পরিচালনা করার একমাত্র অধিকার ছিল অপেশাদার খেলোয়াড়দের। হবসই সর্ব-প্রথম ইংল্যান্ডের এই সুদীর্ঘকালের রীতির ব্যতিক্রম হলেন। ১৯২৬ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলা হচ্ছিল। দলের অধিনায়ক এ ডবলিউ কার অসুস্থ হয়ে প্রথম দিনেই খেলার মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর শূন্যস্থান পূরণ ক'রে জ্যাক হবস টেস্ট ক্রিকেট খেলায় নজির স্থাপন করলেন। টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যান্ড দলের তিনিই প্রথম পেশাদার অধিনায়ক।

হবস এবং সাটক্লিফ প্রথম উইকেট জুটির যে আদর্শ খেলোয়াড় একথা এক-

বাক্যে সকলেই শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করবেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় হবস-সাটক্লিফ জুটি ২৬ বার খেলতে নেমে ১৫ বার প্রথম উইকেটের জুটিতে শতাধিক রাণ তুলে দেন। তাঁদের প্রথম উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক রাণ সংখ্যা ২৮৩, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে (মেলবোর্ণ, ১৯২৪-২৫)। তাছাড়া টম হেওয়ার্ড এবং রোডেসের সংগে হবসের প্রথম উইকেট জুটির বহু উল্লেখযোগ্য রাণও আছে। জ্যাক হবস এবং টম হেওয়ার্ড ছিলেন সারে কাউন্টি ক্রিকেট দলের ওপনিং খেলোয়াড়। এই দু'জন প্রথম উইকেটের জুটিতে ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ৪০ বার শতাধিক রাণ তুলেছেন।
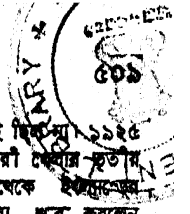
হবস-হেওয়ার্ডের প্রথম উইকেট জুটির সর্বাধিক রাণ সংখ্যা ৩১৩ (ওরসেস্টার দলের বিপক্ষে, ১৯১৩)। ১৯১২ সালে মেলবোর্ণের চতুর্থ টেস্ট খেলায় হবস-রোডেস প্রথম উইকেটের জুটিতে ২৭০ মিনিটের খেলায় যে ৩২৩ রাণ তুলেছিলেন তা আজও ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় উভয় দলের পক্ষে প্রথম উইকেট জুটির সর্বাধিক রাণের রেকর্ড হয়ে আছে।।

জ্যাক হবস ইংল্যান্ডের পক্ষে ১৬টি টেস্ট সিরিজ খেলে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ৫ বার শীর্ষস্থান পান। টেস্টের এক সিরিজে তাঁর পক্ষে সর্বাধিক মোট রাণের রেকর্ড ৬৬২ (গড় ৮২·৭৫), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১৯১১-১২। তাঁর এই ৬৬২ রাণ ছিল ১৯১১-১২ সালের টেস্ট সিরিজে উভয় দলেরই পক্ষে সর্বাধিক মোট রাণ।

জ্যাক হবস ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে অপরিচিত নন্। ১৯৩০ সালে ভিজিয়ানাগ্রামের রাজকুমারের আমন্ত্রণে জ্যাক হবস এবং হার্বার্ট সাটক্লিফ দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন খেলায় যোগদান ক'রে ভারতবাসীর অন্তরে ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে অনুরাগ ও উত্তেজনার বন্যা এনে দিয়েছিলেন।

হবস—সাটক্লিফ জুড়ি

জ্যাক হবসের নামের সংগে যে একজন খ্যাতিমান খেলোয়াড়ের নাম অংগাংগীভাবে যুক্ত হয়ে আছে—তিনি হবসের প্রথম উইকেটের সংগী হার্বার্ট সাটক্লিফ। হবস এবং সাটক্লিফ—যে-কোন একজনের খেলা সম্বন্ধে বলতে গেলেই তাঁদের জুটির খেলা আলোচনায় এসে যাবেই। এক সময়ে (১৯২৪—৩০) ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট দলে এই দু'জন ছিলেন অতি নির্ভরশীল প্রথম উইকেটের জুটি। দলের অতি সংকট সময়েও এ'রা ভেংগে পড়েন নি। খেলার গোড়াপত্তন শক্ত ক'রে সংগীদের কাজ হাল্‌কা ক'রে দিয়েছেন। ইংল্যান্ডের টেস্ট খেলায় প্রথম উইকেটের জুটি হিসেবে এ'দের দু'জনকে প্রথম দেখা গেল বার্মিংহামে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলায় (১৯২৪ সালের ১৪ই জুন)। টেস্ট খেলোয়াড় হিসাবে হবস ছিলেন সাটক্লিফের থেকে বেশ কয়েক বছরের প্রবীণ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সাটক্লিফের এই খেলাটা ছিল তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলা।

জুটি খেলোয়াড় হিসাবে যোগ্যতা প্রমাণ করতে তাঁদের বেশী সময় লাগে নি। এই ১৯২৪ সালেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম• ইনিংসে তাঁরা তা প্রমাণ করলেন। ইংল্যান্ড মাত্র দুটো উইকেট খুইয়ে ৫৩১ রান তুলে শেষ পর্যন্ত এই খেলায় যে এক ইনিংস ও ১৮ রানে জয়লাভ করেছিল, তা প্রথম উইকেট জুটি হবস-সাটক্লিফের খেলার দরুনই। ইংল্যান্ডের এই ৫৩১ রানের মধ্যে হবস-সাটক্লিফ জুটি তুলে দিয়েছিলেন ২৬৮ রান। ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট খেলায় তাঁদের এই ২৬৮ রান উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ প্রথম উইকেট জুটির রান হিসাবে বহুকাল ধরে রেকর্ড হয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯২৪-২৫ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁরা বেশি ক'রে যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। তাঁদের সেই খেলা আজও বহু লোকের চোখের সামনে ভাসছে। সিডনির প্রথম টেস্ট এবং মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় হবস-সাটক্লিফ উপর্যুপরি তিনটে ইনিংসে ইংল্যান্ড দলের প্রথম উইকেটের জুটিতে শতাধিক রান তুলে দেন। সিডনির প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের মোট রান উঠেছিল ২৯৮—এই রানের মধ্যে প্রথম উইকেটের জুটি হবস-সাটক্লিফ তুলে দিয়েছিলেন ১৫৭। দলের বাকি খেলোয়াড়রা তুলেছিল মাত্র ১৩২ রান। প্রথম ইনিংসে হবসের ব্যক্তিগত রান ছিল ১১৫ এবং সাটক্লিফের ৫৯। দ্বিতীয় ইনিংসেও হবস-সাটক্লিফ জুটিতে শতাধিক রান (১১০ রান) উঠলো। এবার সাটক্লিফ সেঞ্চুরী (১১৫ রান) করলেন। হবস করলেন ৫৭ রান। এরপর মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংস। অস্ট্রেলিয়া সিডনির প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডকে ১৯৩ রানে পরাজিত করেছে, তার ওপর মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় তারা প্রথম ব্যাট ধরে প্রথম ইনিংসে ৬০০ রান তুলেছে। ইংল্যান্ড দলের একমাত্র হবস-সাটক্লিফ ছাড়া বাকি খেলোয়াড়দের মনোবল বলতে কিছুই ছিল না। ১৯২৫ সালের ৩রা জানুয়ারী খেলার তৃতীয় দিনের সকালবেলা থেকে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করলেন হবস-সাটক্লিফ জুটি। সারাদিন ফিল্ডিং করেও অস্ট্রেলিয়া এই জুটি ভাংগতে পারেনি। খেলা ভাংগার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল স্কোর বোর্ডে ইংল্যান্ডের ২৮৩ রান দাঁড়িয়েছে। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে রণক্লান্ত দুই বীর—হবস এবং সাটক্লিফ অপরাজেয় অবস্থায় মাঠ থেকে ফিরলেন। তাঁদের খেলার মধ্যে দিয়েই টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে নজির সৃষ্টি হল—উপর্যুপরি তিন ইনিংসের প্রথম জুটিতে প্রতিবার শত রান উঠেছে। ইংল্যান্ডের পক্ষে খুবই পরিতাপের কথা যে, হবস-সাটক্লিফের কাছ থেকে বিরাট সাহায্য পেয়েও বাকি খেলোয়াড়দের শোচনীয় ব্যর্থতার দরুন মেলবোর্ণের এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলাতেও তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের মোট ৪৭৯ রানের মধ্যে ৩৩০ রান করেছিলেন সাটক্লিফ (১৭৬ রান) এবং হবস (১৫৪ রান)। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই ১৯২৪-২৫ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৪—১ খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' পায় কিন্তু উভয় দলের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান পান সাটক্লিফ (মোট রান ৭৩৪ ও গড় ৮১·৫৫) এবং হবস (মোট রান ৫৭৩ ও গড় ৬৩·৬৬)।

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসের কথা। ওভাল মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অতি-পরিচিত প্রথম উইকেটের জুটি হবস এবং সাটক্লিফ ব্যাট হাতে মাঠে নামলেন। খেলা আরম্ভ করার আগে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক উডফুলের পৌরোহিত্যে মাঠের মধ্যেই একটি অনাড়ম্বর ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। উডফুল, ব্র্যাডম্যান, পন্সফোর্ড, জ্যাকসন প্রভৃতি অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা জ্যাক হবসকে পরিবৃত করে পরম শ্রদ্ধায় তিনবার জয়ধ্বনি করলেন। তাঁদের এই জয়ধ্বনিতে মিলিত হল হাজার হাজার দর্শকদের কণ্ঠ। জ্যাক হবস টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিচ্ছেন—ক্রিকেট খেলায় তাঁর অবিস্মরণীয় দানের কথা স্মরণ করেই এই জয়ধ্বনি।

সেই জয়ধ্বনি সেই দিনেই বাতাসে মিলিয়ে যায়নি। আজ ১৯৬৩ সাল। মাঝখানের বছরগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্যাক হবসের জন্মদিনে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে অজস্র শুভেচ্ছাবাণী এসেছে।

॥ শতায়ু ॥

শত আয়ু হাতে পাওয়া যে-কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়। গত ২৬শে অক্টোবর তারিখে ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশন নিজ কর্মজীবনের একশত বর্ষ পূর্ণ করে সেই গৌরবের অধিকারী হয়েছে। এই ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশনই বিশ্ব ফুটবল খেলায় প্রাচীনতম নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। 'অমৃতের' গত ২৩শ সংখ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের শুভ শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সুদীর্ঘ একশত বৎসরের জীবন-পরিক্রমায় বহু বৃটিশ ফুটবল খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। সম্প্রতি মিঃ সি ডি কুরান অসংখ্য খ্যাতিমান বৃটিশ খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে মাত্র ১২ জন খেলোয়াড়কে বেছে নিয়ে একটি অতি সংক্ষিপ্ত নামের যে তালিকা প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে আছেন উলভারহ্যামটন ওয়াণ্ডারার্স দলের বিলি রাইট (বাঁদিকের ছবি) এবং ব্ল্যাকপুল ও সিটি স্টোক দলের স্ট্যানলী ম্যাথুজ (ডান দিকের ছবি)।

স্ট্যানলী ম্যাথুজ ইংল্যাণ্ডের জাতীয় ফুটবল দলে ৯০ বার প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর নাম সারা পৃথিবী জুড়ে। সর্বাপেক্ষা বেশীবার (একশতের বেশী) খেলেছেন বিলি রাইট।

* খেলার কথা *

অজয় বসু

শনি, রবি, সোম এই তিনদিনে কলকাতার ইডেন উদ্যানে যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল, ঘরোয়া হিসেবে সেইটিই হলো ভারতের দ্বিতীয় প্রধান প্রতিযোগিতা। পয়লা নম্বর হলো রাজ্যভিত্তিক রণজি ট্রফির খেলা। আর দুনম্বরী সংজ্ঞা আঞ্চলিক ভিত্তিক দলীপ স্মৃতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার।

যাঁদের স্মৃতিরক্ষায় এই দুটি প্রতিযোগিতার আয়োজন ঘটেছে, ক্রিকেটের ইতিহাসে তাঁরা কালজয়ী পুরুষ। যেকালে রণজি, দলীপেরা ক্রিকেট মাঠ আলো করে দাঁড়াতেন সেকাল আজ বিগত। তবুও উত্তরকালের ক্রীড়ানুরাগী আমরা তাঁদের একজনকে আজ স্মরণ করছি।

স্মরণ করছি নবনগরের প্রিন্স দলীপ সিংজীকে, ক্রিকেট-দুনিয়ারও যিনি রাজকুমার। সাম্রাজ্যের অধীশ্বর তিনি হতে পারেননি। ভাগ্য বঞ্চনা করেছিল। তাই পরিণতি প্রাপ্তির আগেই তিনি সরে দাঁড়িয়েছিলেন। অতি সংক্ষিপ্ত জীবন তাঁর। যেমন খেলোয়াড়-জীবনের, তেমনি তাঁর উত্তরজীবনের মেয়াদ।

দলীপ সিংজীর কথা উঠলেই আমাদের মনে পড়ে যায় গন্ধমাখানো অর্ধস্ফুটিত সেই পাপড়িগুলির কথা। ভোর হতেই যেগুলি চারপাশ মাতিয়ে তুলেছিল। অথচ ঝরে পড়তেও যেগুলির বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি।

মাত্র আটাশে পা দিয়েই দলীপ খেলা ছেড়ে দেন। বড্ড সংক্ষিপ্ত যেন। তবে একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, স্বল্পমেয়াদী সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি ক্রিকেটে অক্ষয় কীর্তির পরিচয় রেখে যেতে পেরেছেন। এমন কীর্তি যে যার অম্লান আঁচড় রয়েছে পরিসংখ্যান তালিকায়, যাঁর স্বর্ণ-স্মৃতি অঙ্কিত প্রত্যক্ষদর্শীদের মনের মণিকোঠায়।

অবিস্মরণীয় রণজির পরমাত্মীয় এবং মানসপুত্র দলীপের যৌবন কেটেছে ক্রিকেটের ধাত্রীগৃহ ইংলণ্ডেই। আর্থিক সঙ্গতি তাঁর যতোই থাক না কেন, ক্রিকেটার হিসাবে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের কাজ তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না।

পিতৃব্য রণজিকে ঘিরে তখন গুণমুগ্ধ ইংলণ্ডের আবেগ উদ্বেলিত। রণজি 'যাদুকর', প্রাচ্যের নিজস্ব দ্যুতিতে প্রতিভাত; রণজি এক রহস্য বিগ্রহ, রণজি অসাধারণ, 'অননুকরণীয়'—এ ই স ব বিশেষণ মুখরিত পরিবেশে ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপ ক্রিকেট খেলা শুরু করেন।

যখন শুরু করেন তিনি তখন ক্রিকেট মহলের শ্যেনদৃষ্টি তাঁর দিকে কেন্দ্রীভূত ছিল। রণজির ভ্রাতুষ্পুত্র রণজির ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারবেন কি? এই প্রশ্ন সরবে উচ্চারণ করে বিশেষজ্ঞ মহল দলীপের আবির্ভাবের পথকে জটিল করে রেখেছিলেন। তবু সেই জটিল

দলীপ সিংজী

প্রতিবন্ধকতার ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে দলীপ বিফল হননি। দলীপ সিংজী যে কত বড় খেলোয়াড় ছিলেন এই একটি ঘটনা থেকেই তার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

খুড়ো-ভাইপো, রণজি আর দলীপকে ঘিরে অনেক মুখরোচক গল্প ক্রিকেট-সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। দু'একটি স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

একটি গল্প ঃ

ইংলন্ডের কাউন্টি লীগে দলীপ সেবার খুব সুনামের সঙ্গে খেলছেন। শুনে রণজিও খুশী। মানসপুত্র কেমন খেলছে দেখতে ছুটলেন নবনগর থেকে ইংলণ্ডে। কিন্তু তাতে বিপদ বাড়লো দলীপেরই। কাকাকে দেখে দলীপ উঠলেন 'কুঁকড়ে'। ও'র সামনে কি ব্যাট করবো? উনি তো ব্যাটিংয়ের শেষকথা!

দলীপ ভালো খেলতে পারলেন না। পরের খেলাতেও একই হাল! দেখে নিরাশ হলেন রণজি। ক্ষুব্ধকণ্ঠে সি বি ফ্রাইয়ের কাছে অনুযোগ করলেন 'এই দলীপ! তোমাদের বিচারে ভাল খেলোয়াড়?'

তখুনি জবাব দিতে পারেননি ফ্রাই। পরে একদিন রণজির হাত ধরে নিয়ে গেলেন মাঠের ধারে। ও'রা লুকিয়ে খেলা দেখতে লাগলেন। দলীপ জানতেও পারলেন না পিতৃব্যের উপস্থিতির কথা। না জানাই তাঁর পক্ষে আশীর্বাদ হলো।

সেদিন লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলায় প্রথম আবির্ভাবের সুযোগে দলীপ সংগ্রহ করলেন ব্যক্তিগতভাবে ১৭৩ রান। উচ্ছ্বসিত হলো ইংলন্ডের পত্র পুস্তিকা। সি বি ফ্রাইও খুশীমনে রণজিকে বললেন, 'দেখলেন তো? তখন বলেছিলাম না, আপনি দেখছেন একথা দলীপকে জানতে দেবেন না। কেমন এখন আশ্বস্ত হতে পেরেছেন তো?'

আশ্বস্তবোধ করেছিলেন বৈকি রণজি! তবে মুখে স্বীকার করেননি। শুধু অস্ফুটকণ্ঠে আবার অভিযোগ তুলেছিলেন, বড্ড হালকাভাবে ব্যাট চালিয়ে দলীপ কিন্তু আউট হয়ে গেল! ছোকরার মনে রাখা উচিত যে টেস্ট খেলার মাঠ হালকা মেজাজের আসর নয়!

তবে যাই বলুন রণজি, আমরা জেনেছি যে সেদিন লর্ডস মাঠে দলীপ পরোক্ষে হলেও পিতৃব্যের সুখ্যাতি আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। খোলাখুলি সুখ্যাতি করায় রণজির আপত্তির কারণও বুঝি। পাছে সেই সুখ্যাতি পেয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রের জাঁক বাড়ে।

কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। ক্রিকেটার এবং মানুষ হিসেবে দলীপ সিংজী ছিলেন একেবারেই নিরভিমান। প্রত্যক্ষদর্শীদের হাততালি, বিশেষজ্ঞদের কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতি কোনোকিছুই তাঁর নিরভিমান ব্যক্তি-সত্তার শিকড় নড়াতে পারেনি।

১৯৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের পথে ভারতীয় দল যখন বিমানে পা বাড়াচ্ছে তখন দমদম বিমানঘাটিতে দলীপকে খুঁজে বার করতে আমার যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। চারপাশে অনেক নামী খেলোয়াড়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনেকে হাসিঠাট্টায় মেতেছেন। অধিনায়ক লালা অমরনাথ এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন। উৎসাহী দর্শকদের দৃষ্টি ঘিরে রয়েছে ভারতীয় দলভুক্ত খেলোয়াড়দেরই।

১৯৬৩ সালে ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত দলীপ স্মৃতি ট্রফি খেলার তৃতীয় দিনে মধ্যাঞ্চলের মৃত্তি' সর্ট-ফাইন লেগে অনিল ভট্টাচার্যের বলে ক্যাচ তুললে পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক পঙ্কজ রায় ক্যাচটি ধরে ফেলেন।

দলীপও ওঁদেরি মতো অস্ট্রেলিয়ায় চলেছেন সাংবাদিক হিসেবে। কিন্তু বিমানঘাটিতে তিনি যে আছেন একথা বুঝতে পারার কোনো হদিশই নেই। শান্ত, সংযত, নির্বাক দলীপ এককোণে একটি খবরের কাগজে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে আবিষ্কার করে দুএককথা শুধালাম। সবিনয়ে এবং তেমনি আন্তরিকতার সংগে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তারপর বিমান ছাড়ার সময়ে বারবার বলে উঠলেন, 'এতো কথা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ!'

ধন্যবাদ! কে ক'কে ধন্যবাদ জানালো! এই দলীপ সিংজী। যেমন ভদ্র তেমনি অভিজাত। রুচিস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিকতার প্রলেপ তাঁকে জড়িয়ে ছিল। তাই খেলোয়াড় হিসেবে তিনি যেমন নাম পেয়েছেন, তেমনি মানুষ হিসেবেও তিনি পেয়েছেন সকলের ভালবাসা। তাই স্মরণ করতে গিয়ে কাছের মানুষেরা বারেবারে আবেগে অস্থির হয়ে ওঠেন।

কেমন খেলতেন তিনি? চোখে দেখিনি। তবে শুনেছি। স্মৃতি নয়, শ্রুতিই আমার মূলধন।

গতিশীলতাই ছিল ব্যাটসম্যান দলীপ সিংজীর ধর্ম এবং যন্ত্রবৎ নিখুঁততে পোঁছানোই ছিল শিল্প-ফিল্ডসম্যান দলীপের নিত্যকার কর্ম। দলীপের ব্যাটিং দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতো না, দিতো চোখে রং ধরিয়ে। তাঁর ক্রীড়া-প্রকরণ ছিল পরিশীলিত পরিচ্ছন্ন। ব্যাটিং ও শিল্প-ফিল্ডিংকে তিনি শিল্প-কৃতির পর্যায়ে তুলে ধরেছিলেন।

এই শিল্পের সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে সার পেলহাম ওয়ার্ণারের অভিমতে। সার পেলহাম ত্রি-কালদর্শী। ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং স্বদেশে মিঃ ক্রিকেট নামেই পরিচিত। ভগ্নস্বাস্থ্যের অজুহাতে আটাশ বছরে যেদিন দলীপ সিংজী অবসর গ্রহণ করলেন সেদিন সার পেলহাম ওয়ার্ণার হাহাকার করে উঠেছিলেন।

'দলীপকে ক্রিকেট মাঠে দেখতে না পাওয়ার আক্ষেপ যে কতোবড় তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না! মহান রণজির যোগ্য উত্তরসাধক দলীপ ব্যাটসম্যান হিসেবে যতো বড়, শিল্প-ফিল্ডসম্যান হিসেবেও তাই। গুগলিবল খেলার কৌশল দলীপের চেয়ে আর কেউই ভালভাবে আয়ত্ত আনতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি না। ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে দলীপের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। মানুষ হিসেবেও তাঁকে আমরা চিরদিন মনে রাখবো। অমায়িক চরিত্র ও মার্জিত স্বভাবগুণে দলীপ সবার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়।'

এমনি কতো কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতিই দলীপ সিংজীর নামের সংগে যুক্ত হয়ে আছে তার ঠিকঠিকানা কি! দলীপের সময়ে ডন্ ব্র্যাডম্যান, ওয়াল্টার হ্যামাণ্ডরা ক্রিকেট খেলতেন আর ঝুড়ি ঝুড়ি রান কুড়োতেন। তবু দলীপকে দেখতেই মাঠে-ময়দানে ভীড় জমতো হাজারে হাজারে। কারণ রান নয়, পরিসংখ্যানের পঞ্জিও নয়, আসলে দলীপের ব্যাটিং রীতিই ছিল চিত্তাকর্ষক খেলার অবিমিশ্র প্রতীক। যা দেখে দর্শকদের মন ভরে ওঠে, যা চোখের পাতায় পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ কাজল লেপে দেয়।

দলীপ সিংজী যে কতোবড় ক্রিকেটার ছিলেন, এতো কথা বলেও যদি আমি তা না বোঝাতে পারি তাহলে এবার সেই নিরস, অস্বস্তিকর সংখ্যাতত্ত্বের শরণ নিচ্ছি। হয়তো পরিসংখ্যানই বাকী কাজটুকু সম্পূর্ণ করে তুলতে পারবে।

দলীপ সিংজী রণজির পদাঙ্ক অনুশরণে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরী করেছেন। মোট বারোটি টেস্টের ১৯টি ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন তিনবার, অর্ধশতাধিক রান পাঁচবার। এবং টেস্টে তাঁর মোট ৯৯৫ রানের গড় হিসেব হলো ইনিংস পিছু ৫৮·৫২।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর মোট সংগ্রহ ১৫,৩০৫, গড়ে ৪৯·৬৭। সর্বোচ্চ স্কোর ৩৩৩, তাও একদিনেই। শতাধিক রান ৪৯ বার; ডাবল সেঞ্চুরী চারটি। উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী তিনবার। পরপর চারটি ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন এবং সর্বাধিকসংখ্যক সেঞ্চুরী করেছেন এক মরশুমে ১২টি।

এছাড়া এক মরশুমে বারতিনেক আড়াই হাজারের উপরেও তিনি রান করেছেন। মধ্যাহ্নভোজনের আগেও শত রান করায় তাঁর অসুবিধে হয়নি।

অসঙ্কোচে বলা যায় যে, দলীপ সিংজীর এই ব্যক্তিগত পরিসংখ্যান তালিকাও স্মরণীয়। কিন্তু এই তালিকার উপরেও তাঁর স্থান, ক্রিকেটার ও মানুষ হিসেবে। কারণ পরিসংখ্যান তালিকায় কেমন তিনি খেলতেন এবং মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন তা নিশ্চয়ই বলা নেই।

বর্তমান জাপান

সুরেশচন্দ্র সাহা
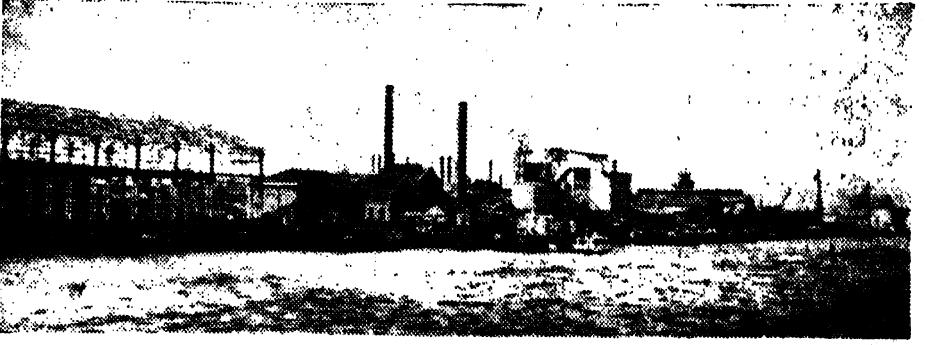
হোক্কাইডো, হনসু, শিকোকু, কিউসু—এই চারটি বড় এবং তার সংগে আরও কিছু ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে দ্বীপময় দেশ জাপান। এর অল্প কয়লা, অল্প লোহার সামান্য প্রাকৃতিক সম্পদ; চাষ-যোগ্য জমির পরিমাণ গোটা দেশের মাত্র ছ' ভাগের এক ভাগ। লোক দশ কোটী। দেশ ছোট। বর্তমান জাপান বলতে এই ছোট দেশের দশ কোটী লোকের এক সুখসমৃদ্ধিময় চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

দশ বছর আগে জাপানীদের আয় যত ছিল এখন তার দ্বিগুণ—তিন বছর পরে আবার এখনকার আয়কে ডবল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জাপানে অশিক্ষার হার শতকরা মাত্র ১·৫। সুতরাং ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে আয়কে পরিকল্পনামত ঘন ঘন ডবল করা আর অতি-প্রসারিত শিক্ষাকে শাখায় প্রশাখায় মানে মর্যাদায় বাড়িয়ে তোলার মত ও পথ নিয়ে পরস্পরবিরোধী গদী-লোভী দলগুলির মধ্যে জবর প্রতি-যোগিতা। এই গদীর কোন্দলের বাইরে সর্বসাধারণ লোক অহরহ দেখতে পাচ্ছে তাদের টাকা বাড়ছে, বিদ্যা বাড়ছে; ছা-পোষা জীবনে সমস্ত রকম তকলিফ কমছে।

সেদিনের যুদ্ধে পরাজিত লাঞ্ছিত জাপান—আজকের জাপান দেখে কে বলতে পারবে মাত্র দেড় যুগ আগে এই জাপানীরা এটমের ঘায়ে, বোমার আঘাতে বিজয়ীর রথচক্রতলে পিষ্ট হয়েছিল। অবাক হয়ে ভাবতে হয়, আজ কি মন্ত্রের বলে কোন্ যাদুর স্পর্শে জাপান এমনি করে আগে বেড়েছে, দুনিয়ার কত জাতিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, তার প্রতি মানুষের জীবনে প্রাচুর্য আশা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধান এনে দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে আমেরিকা যাওয়ার পথে জাপান দেখে গিয়েছিলেন। প্রখর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে স্বামীজী তখনই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন জাপানের বিপুল ভবিষ্যৎ শক্তিকে। তাই শিষ্যদের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—আর তোমরা কি

চেরি গাছ

করছ, সারা জীবন বাজে বকছ? এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও, লজ্জায় মুখ লুকোও গে। তিনি ভারতীয় যুব-সমাজকে প্রতি বছর দলে দলে জাপান দেখে যেতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

জাপান ছোট দেশ; পঞ্জরে পঞ্জরে তার পাহাড়ের কাঠিন্য। সঞ্জীববাবুর পালামৌয়ে কাছে-দেখা দূরের পাহাড়ের মত নয়। জাপানের পাহাড়গুলি সংখ্যায় মেজাজে শাখা-প্রশাখার বিস্তারে মানুষের নিত্যদিনের কাজকর্মের অতি নিকটে, তার জীবন ও জীবিকার অতি খুঁটিনাটি কর্মকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ের পথ; সামনে মাইল-টাক প্রশস্ত এক অতিকায় পাহাড় অবোধ শিশুর মত পা ফাঁকা করে দাঁড়িয়ে যেন বলেছিল—যেতে নাহি দিব। আর জাপানীরা হাসতে হাসতে বলেছিল—এই দেখ আমি যাচ্ছি—বলেই টানেল

কেটে পাহাড়ের বাধা উড়িয়ে মানুষ আর গাড়ি-চলার পথ করে নিয়েছে। তাউড়া থেকে ইউকোসুকা যাওয়ার পথে মাত্র পাঁচ মাইলের মধ্যে বার চারেক পাহাড় উড়িয়ে পথ করার দৃশ্য দেখে ভাবছিলাম—আমাদের দেশে হলে হয়ত আমরা বলতাম, পাহাড় যেমন আছে তেমন থাক; কি দরকার ওধারের মাত্র একটা জনপদের জন্য এত কারসাজি করে। ইউকোসুকার পাহাড়ের পাশে সামান্য সমভূমি, তার আনাচে-কানাচে সমুদ্র ঢুকে গেছে যেন পাহাড়গুলির অন্তর-মর্মের খবর নিতে। এইখানে জাপান গড়ে তুলেছে বিরাট নৌ-শিক্ষাকেন্দ্র ; আর তার অদূরে রেখে দিয়েছে ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধের বড় হাতিয়ার, রণতরী মিকাসা। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানে উন্নত অগণিত যুদ্ধ-জাহাজের পাশে মিকাসা যেন নিশ্চল দেহ নিয়ে এখনও সকলের সর্দার, জ্ঞান-বয়োবৃদ্ধ পিতামহটির মত। যারা ষাট বছর আগে এশিয়ার এক অনতি-খ্যাত জাতির ইউরোপীয় দেশকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করার ইতিহাস পড়ে তারা নিশ্চয়ই রোমাঞ্চিত হয়। আর যারা মিকাসাতে গিয়ে জাপানী যুবরাজের রক্তলিপ্ত ছিন্ন কামিজ দেখে তারা যেন ইতিহাসের একটা সচল অধ্যায়কেই চোখের সামনে দেখতে পায়। বহু পাহাড়ের বাধার শেষে নৌ-বিদ্যালয়ের পত্তন আর মিকাসার স্থিতির মধ্যেই বর্তমান জাপানের যুগান্তকারী অগ্রগতির কীর্তি-রচা পরিকল্পনাগুলির পরিচয় মেলে।

শুধু কি পাহাড়? টাইফুন, ভূকম্পন, আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত সবকিছুকে জয় করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাপানীরা প্রতি মুহূর্তে যেন বলছে—আগে বাড়ু। অবাক হতে হয় এই দেখে যে বিদেশ থেকে কাঁচামাল কুড়িয়ে এনেও এরা নানা শিল্পসামগ্রী তৈরী করে; সকলের আগে এবং সবচাইতে সস্তায় পৃথিবীর বাজারে ছড়িয়ে দেয়। নাই বলে এদের মুখে কোন কথা নেই। অসম্ভব বলে কোন উক্তি নেই। আদিতে জাপানের মাটি ছিল আপেল ফলনের অযোগ্য। অস্ট্রেলিয়া থেকে জাহাজ-ভরে আপেল-ক্ষেতের মাটি এনে যত্নপরিচর্যা-গবেষণায় জাপানে এরা আপেল ফলিয়ে তবে ছেড়েছে।

আজ জাপানের যে কোন অঞ্চলে গেলে অগণিত কারখানার আকাশচুম্বিত চিমনি, মোটরগাড়ির ছড়াছড়ি, দোকান আর পণ্যের প্রাচুর্য, আশ্চর্য নিয়মানুবর্তিতা ও পরিচ্ছন্নতা, মানুষের গায়ে দামী দামী পোশাক দেখে অবাক হতে হয়। কর্ম-সংস্থান নেই এমন লোক জাপানে বিরল। চাকুরি না জোটে একটা ব্যবসা খাড়া করার মতলব সবারই প্রবল। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান বোনিয়া বৃটিশদের উপহাস করেছিলেন দোকানদারের জাত বলে। আজ জাপান দেখলে এই উপহাসের উপাধিকে তিনি গৌরবে মণ্ডিত করে ব্যবহার করতেন জাপানীদের সম্বন্ধে। দোকান করার কায়দা আর ব্যবসায়ের ফন্দি-ফিকির জাপানীরা জানে বটে। তাই আজ লক্ষ্মী এদের ঘরে বাঁধা। জাপানে তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটি কালীমূর্তি আবিষ্কার করতে পারিনি। অথচ এককালে জাপানীরা আমাদের দেশে কালীমার্কা দেশলাই চালান করে পয়সা কামাত। আমাদের কালীভক্তি এদের ব্যবসার কাজে খাটাবার সুচতুর কায়দার মত অনেক কৌশল জাপানীরা অহরহ অনুসরণ করে চলেছে: তার ধারা বদলালেও ফন্দি-ফিকিরের অন্ত নেই।

শীত, টাইফুন, ঘরের মায়া সবকিছুকে উপেক্ষা করে কোথায় বেরিং প্রণালী, কোথায় মেক্সিকো উপসাগর, কোথায় দক্ষিণ চীন-সাগর অথবা আটলাণ্টিকের মৎস্যচারণভূমি—কোন জায়গাতেই জাপানীরা মাছ ধরতে না গিয়ে ছাড়ে না। স্যামন টুনা হেরিং মাছ অথবা কাঁকড়া-তিমি-অক্টোপাস শিকারে জাপানের সমকক্ষ আজ কেউ নেই। আজ পৃথিবীর বৃহত্তম ট্রলার নির্মিত হয়েছে জাপানে। আমেরিকার বাজারে আটলাণ্টিক থেকে ধরা মাছগুলি বিক্রী করে দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে জাহাজগুলি ঘরে ফিরছে। আজ আমেরিকা ক্যানাডা মিলে জাপানকে কোণঠাসা করার হুমকি দিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছে জাপানকে উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্যচারণক্ষেত্রে প্রবেশ না করতে। রাজধানী টোকিওতে মৎস্যশিল্প-জগতের বড় চাঁইদের মিটিং বসিয়ে জাপান বলেছে—খোলা সাগরে মাছ ধরার অধিকার সকলের আছে—এই মূলনীতি মেনে নিতে হবে। এদিকে সেনেটে আইন পাশ হতে চলেছে আমেরিকার উপকূলীয় সাগরে, এমনকি মহীসোপান অঞ্চলে অন্য কোন জাতের পক্ষে মাছ ধরার চেষ্টা দণ্ডযোগ্য। জাপান

একটু ভাবিত হয়েছে। বিশেষত তার বিরাট অর্থকরী কাঁকড়া-শিল্প হোঁচট খাবে বলে। মুখে কিন্তু হাসি টেনে সবাই আস্ফালন করে বলছে—খবরদার, নতিস্বীকার করা চলবে না। এখানে হটে গেলে জাপানের সঙ্গে স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেক জাতই সুবিধা পেয়ে বাগে ফেলার চেষ্টা করবে। কি দৃঢ়তা! দিস্তা দিস্তা কাগজে প্রচণ্ড প্রতিবাদ পাঠিয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকার ক্লৈব্য এদের নেই। এই হচ্ছে আজকের জাপানী।

শুধু কাজ আর কাজ। জড়তা নেই, শিথিলতা নেই, ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিলের কিছুমাত্র চেষ্টা নেই। জাপানীরা যেন পিছু ফিরতে জানে না, শুধু সামনে এগিয়ে চলেছে। আমাদের শীত গরম, আমাদের শত অভাব-দৈন্য ও বাধা-বিঘ্ন সবাইকে যেন জড়ীভূত করে রাখে। আর জাপানীদের শীত তাদের আগুন-পোহানো জড়তা না এনে উল-বোনা স্ফূর্তি এনে দেয়। টাইফুনের ভয়ে ঘরে বসে না থেকে বাইরে গিয়ে এরা টাইফুনকে জয় করে, নয়ত মরে। তাই যুদ্ধপূর্ব যুগের চাইতে আজ জাপানীদের অনেক বেশী সুখ, অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ্য। টেলিভিসন, রেফ্রিজারেটর, রান্নায়, ধোলাইয়ের কাজে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা জাপানে আজ শুধু ধনীদেরই একচেটিয় নয়, প্রায় সর্বসাধারণেই এ সবের মালিক হয়ে বসে আছে। বড় শহরে প্রতি দেড়-ঘর পিছু টেলিভিসন, প্রতি বিশ ঘর পিছু একটা করে রেফ্রিজারেটর। এ সবই হল দেশের সর্বস্তরের আয়বৃদ্ধির প্রমাণ। ১৯৬১ সালে জাপানের জাতীয় আয় শতকরা আঠারো ভাগ বেড়েছে। আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তুলেছে, খাদ্যের উন্নতি করেছে আর নজর দিয়েছে পোশাকের দিকে। গোটা দেশটাকে মেয়ে-মদ্দ মিলে একেবারে পাশ্চাত্য পোশাকে মুড়ে ফেলেছে। প্রতি মরশুমে জাপানী পোশাক-নির্মাতারা দুবার করে ডিজাইন পাল্টাচ্ছে আর ফ্যাসান-পাগলদের ক্ষেপিয়ে তুলছে।
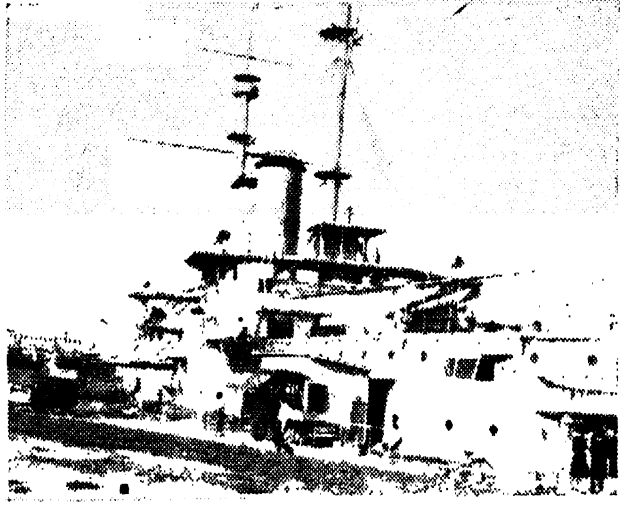
রুশ জাপান যুদ্ধে ব্যবহৃত মিকাসো রণতরী

শুধু খাদ্য, পোশাক, টেলিভিসন নয়—জাপানে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে একটা ভ্রমণবিলাসের স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছে। পুরো দিনরাতের ভ্রমণ, সপ্তাহ-শেষের ভ্রমণ, দীর্ঘ মেয়াদের ভ্রমণ—কত রকমের ভ্রমণ-ব্যবস্থা। সুপরিকল্পিত উপায়ে গড়ে উঠছে। যে কৃষাণ-বধূ স্বামীর সঙ্গে মিলে তার পল্লীর কাটিয়ে শরতের সকালে জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করে, ধান ঘরে ওঠার পরেই পোটলা-পুঁটলি বেঁধে সে তৈরী হয় কোনো উষ্ণপ্রস্রবণের ধারে ছুটি কাটাতে। সমুদ্রের ধারে অথবা ঝর্ণার পাশে বন-বেষ্টিত পাহাড়ের চোরি আর পাইন গাছের ছায়াঘন কুঞ্জে, নয়ত কোন ইতিহাস-বিখ্যাত স্থানে ভ্রমণের আকর্ষণ জাপানে আজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯৬২ সালে সখের ভ্রমণবিলাসীদের সংখ্যা ছিল শতকরা বাষট্টি জন। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুদৃশ্য বাস, মোটরগাড়ি, হেলিকপ্টার, প্রমোদ-তরী এবং ক্রমবর্ধমান হাইড্রোফয়েল পর্যন্ত ভ্রমণে ব্যবহার হচ্ছে। যাদের টাকা আছে তারা এগুলি কিনে রেখেছে; যাদের পয়সা আছে তারা এই বাহনগুলির ভাড়া জুগিয়ে দিব্যি ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। আমাদের অন্নচিন্তা চমৎকারা। ভ্রমণের কথা ভাবব কখন? ভ্রমণের বিলাস একমাত্র অর্থবানদের পক্ষেই সম্ভব। যে দেশে শতকরা বাষট্টিজন লোক ভ্রমণ-পাগল সে দেশের আর্থিক উন্নতি যে কত বেশী তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বর্তমান জাপানের অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে আছে জাপানীদের নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারা। জাপান পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে, আর তাকে অনতিবিলম্বে জাপানী জারক রসে জারিত করে সারা জাপানের অন্তর্লোকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছে। জাপানের শিল্পসংস্থাগুলি পাশ্চাত্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তাদের আবিষ্কারের পেটেণ্ট্ মহার্ঘ মূল্যে কিনে অথবা ব্যবসায়িক সূত্রে দায়বদ্ধ হয়ে নিজেদের দেশে সবকিছু দ্রুত লয়ে গড়ে তুলেছে; যেন কোনক্রমেই কারও পেছনে থাকা চলবে না। আজ পাশ্চাত্যে যা আবিষ্কার হচ্ছে, হয়ত মাসখানেকের মধ্যে জাপান তা তৈরী করে আবিষ্কারক দেশের চাইতে সস্তা দামে সে জিনিস বাজারে ছাড়ছে। এমন ক্ষিপ্রগতি এবং অগ্রগামী বৈশিষ্ট্যের জন্যই জাপান আজ এত উন্নত।

জাপানের পল্লীতে কলে ধান মাড়াই হচ্ছে—পাশে ঝুড়ি বস্তা, সব খড়ের তৈরী

রাজনৈতিক হত্যা

সমন্বিত জিঘাংসা
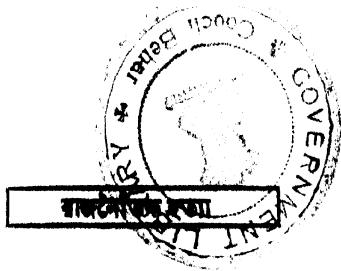
বিমল রায়চৌধুরী

২০শে মার্চ, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ। রাত সাড়ে দশটায় গেটির রেস্টুরেন্টে একটি অসাধারণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। ঘরে পনেরো জন লোক জমায়েত হয়েছিল তাদের মধ্যে রিভিয়ু অফ রিভিয়ু কাগজের সম্পাদক মিঃ ডবলু টি স্টীডও ছিলেন। রেস্টুরেন্টের ঘরটায় প্ল্যানচেটের আসর বসেছিল। মিডিয়াম ছিলেন ব্র্যাডফোর্ডের মিসেস বার্চেল। মিঃ স্টীড একটা কাগজ খামের মধ্যে পুরে মিসেস বার্চেলের হাতে দিলেন। কাগজটায় শুধু লেখা ছিল 'দি কিং'। খামটা হাতে নিয়েই মিসেস বার্চেল চোখ বন্ধ করে ফেল্লেন এবং স্পষ্ট স্বরে উত্তেজিত স্বরে অলৌকিক স্বরে বলতে লাগলেন:

—রাজা! রাজা! রাজা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর প্রাসাদের একটা ঘরে, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, বলিষ্ঠ দেহ, লম্বা ঘাড়। তাঁর সঙ্গে একজন মহিলা—রানী......

মিসেস বার্চেল ক্রমাগত বলে চল্লেন তারপর। একটি অমানুষিক হত্যার বর্ণনা নিখুঁত দিয়ে গেলেন। রাজা এবং রানীকে হত্যা করছে একদল সৈন্য। সেই ভৌতিক সভায় জনৈক সার্বিয়ান উপস্থিত ছিলেন। রাজপ্রাসাদ, রাজা এবং রানীর বর্ণনা শুনে বুঝলেন মিসেস বার্চেল বর্ণিত রাজরানী হচ্ছেন সার্বিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার দি ফার্স্ট এবং তাঁর রানী দ্রাগা। আসল হত্যাকাণ্ডের তিন মাস আগেই মিসেস বার্চেল একটা রেস্টুরেন্টে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত এক অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের ভবিষ্যৎবাণী করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু তাতে ফল বিশেষ কিছুই হয়নি। সেই সার্বিয়ান ভদ্রলোক মিঃ এল—লণ্ডনস্থ সার্বিয়ান দূতাবাসের রাজদূতকে এই ভবিষ্যৎ বাণীর কথা জানিয়েছিলেন, রাষ্ট্রদূতও যথারীতি বেলগ্রেডে ২৮শে মার্চ একটি চিঠি লিখে রাজাকে সাবধানও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন রাজার জীবনহানির আশংকা করে চারদিক থেকে সাবধানী-পত্র আসছিল। লণ্ডনের রাজদূতের পত্রখানিকে তারি অন্যতম মনে করে আলেকজাণ্ডার বিশেষ আমল দিলেন না মিসেস বার্চেলের অশুভ ভবিষ্যৎবাণীকে।

রাজা আলেকজাণ্ডারকে হত্যার চক্রান্তে বেলগ্রেডের অন্ধকার অলিগলি মুখরিত ছিল সেদিন।

দ্রাগা! সুন্দরী বাদামী কেশী দ্রাগা। ইঞ্জিনীয়ার ডেটোজারের বিধবা স্ত্রী দ্রাগা প্রাক্তন রানী নাটাশিয়ার সহচরী ছিলেন। সাতাশ বছরের রাজপুত্র মাকে দেখতে এসেছিলেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। সাত বছরের বড় দ্রাগা পলকেই তাঁর মনোহরণ করলেন। প্রেমিকযুগল রানী নাটাশিয়ার চোখে ধুলো দিতে পারেন নি। তিনি দ্রাগাকে সহচরীর পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। কিন্তু তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বন্ধ করা গেল না। বেলগ্রেডে গিয়ে তাঁরা আরো ঘনিষ্ঠ হলেন। দ্রাগা প্রথমে রাজপুত্রের রক্ষিতা হলেন। পরে স্ত্রী।

রাজার সঙ্গে সাধারণীর বিয়ে, তায় আবার মেয়েটি বিধবা ও সাত বছরের বড়ো। দেশের লোক ক্ষেপে গেল। রাজা কার্লসবাদে এক জার্মান রাজকুমারীর সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে পাকা করতে গিয়েছিলেন, রাজপুত্রের এই অসমবিবাহের খবর তাঁর বুকে শেল হয়ে বিঁধল। ঘৃণায়, লজ্জায়, প্রতিবাদে তিনি সিংহাসন ও দেশ পরিত্যাগ করলেন।

মাত্র দ্রাগাকে বিবাহই করলেন না রাজা। তাঁর দাস হলেন। দ্রাগা যা বলেন তাই। তাঁর শাসনকার্যের অদল-বদল কারো মনঃপূত হয়নি। সৈন্যদল ও সরকারী চাকুরেরা মাইনে পেতেন না ঠিকমত। অসন্তোষ বেড়েই চলল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বেলগ্রেডের পথে উচ্ছৃংখলতার অপরাধে কিছু প্রতিবাদী জনতাকে গুলি করে মারা হল। বহু বিচারকের চাকরি গেল। আইন করে রাজা এবং তাঁর মন্ত্রীসভা নিজেদের শক্তি কিছুটা বাড়িয়ে নিলেন।

সাইবেরিয়ার জনতা যখন এই অকর্মণ্য রাজা ও শাসন-ব্যবস্থার প্রতি বীতস্পৃহ, তখন জানা গেল সাধারণীকে বিয়ে করেই রাজা ক্ষান্ত হননি, নিঃসন্তান রাজা সাধারণীর ভাইকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন। রাজার সৈন্যবিভাগের মন্ত্রীসভাও এবার রাজার বিরুদ্ধে চলে যায়।

তাঁরা এক প্রতিবাদী দল নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

রাজা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রানী সমেত তাঁদের দর্শন দিলেন। প্রতি-বাদীরা রানীর সামনে ইতস্ততঃ করছেন দেখে রাজা জানালেন, "রানীর কাছে আমার কোনো গোপন কথা নেই।"

জেনারেল জিনজার মার্কোভিচ রাজাকে জানালেন,—রাজা যদি জনমনের বিরুদ্ধে দত্তক গ্রহণ করেন বিপ্লব ঘটবে। সার্বিয়ার পার্লামেণ্ট রাজার উত্তরাধিকারী ঠিক করবে।

রাজা রাগত ভাবে বললেন, "আমি রাজা। আমি যা ইচ্ছা করব তাই হবে"।

—কিন্তু জনমত ?

রানী দ্রাগা বললেন—"সবচেয়ে বড় মত রজমত!

তিনি রাজাকে আর কথা বলতে দিলেন না। সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী কারাগর্জ-ভিচ বংশকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন নব্বই থেকে দেড়শ জন সামরিক অফিসার ও কিছু রাজনৈতিক নেতা। কর্নেল আলেক-জান্দার মাশিন (দ্রাগার দেবর) এঁদের নেতা ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতৃবধূকে ভীষণ ঘৃণা করতেন। তাঁর ধারণা ছিল দ্রাগা স্বামীকে মরতে বাধ্য করেছিলেন। স্বামীকে মর্মান্তিক মানসিক আঘাত দিয়েছিলেন দ্রাগা (কেউ কেউ বলত স্বামীকে তিনি বিষ খাইয়েছিলেন)। দ্রাগার সঙ্গে রাজার বিবাহ হওয়ায় মাশিন আরো বিরূপ হলেন। তিনি খোলাখুলিভাবেই তাঁর মনোভাব জানান। মাশিন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তিনি ও তাঁর বাবা, দুজনেই কারাগর্জ-ভিচ্ রাজবংশের পক্ষে ছিলেন। ফলে, রাজা আলেকজান্ডারের প্রতি নানা কারণেই তাঁর বিরূপতা তীব্র হয়ে উঠেছিল।

ষড়যন্ত্রকারীরা প্রথমে রজারানীকে এক কনসার্ট থেকে ফেরার পথে গুলি করে মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন রাজারানীকে এমন ভিড় ঘিরে ধরেছিল যে সেই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি।

১০ই জুন সার্বিয়ার ইতিহাসে একটি নাটকীয় দিন। ১০ই জুন ১৮৬৮তে সার্বিয়ার রাজা মাইকেলকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই ১০ই জুন রাজা আলেকজান্ডারকে তাঁর প্রসাদে হত্যা করা হবে—ঠিক হয়।

খুব যত্নের সঙ্গে নিখুঁত ভাবে সমস্ত হত্যানুষ্ঠানটিকে ছকা হল। খুব বড় নাটক নামাতে গেলে যে ভাবে রঙ্গমঞ্চ সাজানো হয় সমস্ত খুনের খুঁটিনাটি সেইভাবে সাজানো হল।

ষড়যন্ত্রকারীরা সবাই শপথ করলেন: 'বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি হবে মৃত্যু।' রাজপুরেরক্ষীদের অস্ত্রহীন করা হবে। অফিসাররা দরজা-জানলাগুলির ধারে ধারে থাকবেন। রাজা-রানী পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করা হবে। রাজা-রানী ছাড়াও কর্নেল মাশিন আরো কয়েকজনকে হত্যা—তালিকার অন্তর্ভুক্ত করলেন। রানীর দুই ভাই, কয়েকজন মন্ত্রী, রাজার কজন প্রিয়পাত্র। একটি সৈন্যদলকে রাজপ্রাসাদের চারপাশে রাখা হবে। বলা হবে তারা রানী দ্রাগাকে রাজার আদেশে সীমান্তে বনবাস দিতে নিয়ে যাচ্ছে। হত্যাকান্ড শেষ হলে সবাইকে জানানো হবে এবং পিটার কারাগর্জভিচকে রাজপদ দেয়া হবে। (আগেই জেনেভায় কারাগর্জভিচের সম্মতি নেয়া হয়েছিল।) আলেকজান্ডার প্রাসাদের রক্ষীসংখ্যা সামান্য বাড়িয়ে-ছিলেন। কিছু রাজবিরোধী অফিসারকে রাজধানী থেকে সরিয়েও দিয়েছিলেন।

—আমি বিপ্লবকে ভয় পাই না। আমি আমার অনুগত সেনানীদের নেতা হয়ে উন্মুক্ত কৃপাণে বিপ্লবীদের সম্মুখীন হব। বলেছিলেন রাজা।

শ্রীমতী দ্রাগা বলেছিলেন,—'আমিও ভয় পাইনে!'

এক বিশ্বাঘাতক অফিসার জেলায় জেলায় বিপ্লবীদের আহ্বান করে টেলিগ্রাম পাঠালেন।

*

বুধবার ১০ই জুন সকাল।

কর্নেল মাশিন ছিয়াশি জন ষড়যন্ত্র-কারীকে শপথ করালেন। হলুদ রঙা দোতলা প্রাসাদ। সোনালী রং রেলিং-ঘেরা সুন্দর বাগিচা, চেস্টনাট তরুসার-মর্মরিত সকাল।

রাজকার্য, সভাকার্য নিয়মমত চলছে।

বেলা এগারটা :

রাজার রক্ষীবাহিনী ব্যান্ড ও বিউগল বাজিয়ে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য কার্যভার গ্রহণ করল।

রাজা অন্যান্য দেশের রাজকর্মচারী-দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ব্যস্ত ছিলেন। পাশের ঘরে কয়েকজন অফিসার কথা বলছিলেন। রাজার অন্তরঙ্গ সুকুমার মূর্তি, এবং লাজা এবং রাজার সুহৃদ 'মিকা' ছিলেন এঁদের মধ্যে। 'মিকা' ক্রমাগত মদ খাচ্ছিলেন। তাঁকে অসুস্থ লাগছিল। আসলে বিবেকদংশনই তাঁকে ক্লিষ্ট করেছিল। রাজারও একদা বন্ধু এখন আসন্ন হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক।

বেলা বাড়ল। রাজা রানীর সঙ্গে দুপুরের খাওয়া খেলেন। সেক্রেটারী পেট্রোনিভিচের সঙ্গে 'ক্রোকেট' খেললেন।

উষ্ণ শুষ্ক দিন। দ্রাগা খেলা দেখ-ছিলেন। রজা প্রথমে হারলেন। খুশী হয়ে হার মেনে দ্বিতীয়বার খেললেন, দ্বিতীয়বারও হারলেন। তৃতীয়বারও খেলতেন, কিন্তু বৃষ্টি এল। তাঁরা ঘরে চলে এলেন।

সাতটা :

তারপরও কর্মব্যস্ততা ছিল। তিনজন মন্ত্রীর সঙ্গে ও বিদেশী রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় রাণী একটু বিষণ্ণ ও চিন্তিত ছিলেন। তাঁরা রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী এলেন রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। তিনি রানীর কাছে গেলেন। রাজা মন্ত্রীদের বিদায় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও রানীর সঙ্গে

তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পুরোনো সার্বিয়াকে পুনর্দখল করার প্ল্যান করতে লাগলেন। সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ শুরু হবে ঠিক হল।

রাত্রি সাতটা পঁয়তাল্লিশ :

ডিনারের আগে এলেন প্রধানমন্ত্রী জিনজার মারকোভিচ্। তিনি রাজাকে দুঃখের সংগে জানালেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

আলেকজাণ্ডার এই ভয়ানক মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা হারাতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভীষণ আঘাত পেলেন।

রাত্রি আটটা :

ডিনারের সময় এসে গেছে। কথা শেষ হল না। কথা বলতে বলতে রাজা রানীর ঘর ও খাবার ঘরের দিকের বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ডিনার-সময়কালীন বাজনা নিত্যকার মত বাজছিল। রাজা-রানী, কিছু অফিসার, তাদের মধ্যে রানীর ভাই ক্যাপ্টেন নিকোভাই ও 'মিকা' ছিলেন। 'মিকা'কে খুব অসুস্থ লাগছিল দেখে রাজা তাঁকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

তাঁরা লাল দেওয়াল-শোভিত খাবার ঘরে প্রবেশ করলেন। মন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে আহার করলেন। খাদ্য, বাজনা, কথাবার্তা সবকিছুর ওপরই অস্বস্তি আর বিষাদের ছায়া ভাসছিল। কেউই উদ্দীপিত হচ্ছিলেন না।

ডিনারের পর :

রানীর ভাইয়ের সঙ্গে তাঁরা বারান্দায় বসলেন, নীচে রাজার সেনানীবৃন্দ ব্যান্ড বাজাচ্ছিল। কাছেই বড় পার্ক। শান্তিপূর্ণ মানুষেরা সেখানে বেড়াচ্ছিল। সারাদিন পর সবে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে।

রাজা আলেকজান্ডার দি ফার্স্ট এবং রাণী দ্রাগা

শহরের আপাতশান্তির তলায় তলায়, মদের দোকানে, কফি হাউসে উত্তেজিত অফিসারদের কানাকানি। সবাই অস্থিরভাবে 'জিরো আওয়ারের' অপেক্ষায় অপেক্ষমান।

'মিকা' মদ এনে দিয়েছিল। বিষ-মেশানো মদ। তাই পান করে ইতিমধ্যে প্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর নায়ক অজ্ঞান।

রাত্রি ১২-৩০ :

মিশন স্ট্রীটে কর্ণেল মাশিন ও অফিসাররা যে যার জায়গায় খাড়া আছেন। ষষ্ঠ ইনফ্যাণ্ট্রি রেজিমেণ্ট পাহারায় আছে এক মিথ্যা আদেশকে সত্য জেনে। রানী দ্রাগা নাকি নির্বাসিতা হবেন। প্রাসাদে আসার তিনিটি রাস্তা ষড়যন্ত্রকারীতে পূর্ণ। প্রায় চল্লিশজন অফিসার একটি প্রাসাদ-গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। অপেক্ষা শুধু একটি সংকেতের। সংকেত এলো। খুলে গেল প্রাসাদ-ফটক। বাকি নব্বই মিনিটের মধ্যে রাজা ও রানী নিহত হন। কিন্তু তার খুঁটি-নাটির সঠিক বর্ণনা কেউ জানে না।

এগারই জুন সকালে বৃষ্টিতে, বাগানে, অর্ধনগ্ন, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পুরুষ ও রমণীদের মৃতদেহ দুটি দেখে মাত্র লোকে বলেছিল—এত আক্রোশ যখন, এ রাজা-রানীরই মৃতদেহ।

প্রথম মত :

রক্ষী-নায়ক বিষ-মেশানো মদ খেয়ে অজ্ঞান ছিলেন না। তিনি বিদ্রোহী দমনে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা ডিনামাইট দিয়ে গেট উড়িয়ে দেয়। গেট খোলার কথা ছিল 'মিকা'র। সে খোলেনি। হয়ত প্রচুর মদ্যপানে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। হয়ত বিস্ফোরণে বা আততায়ীর হাতে মারা যায়। রাজার অনুগত জেনারেল পেট্রোভিচ ঘুম থেকে উঠে টেলিফোন করতে গিয়ে দেখলেন তার কাটা। তিনি ছুটে এসে অফিসারদের জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি ?' উত্তরে তারা জানালে, তারা রাজা-রানীকে হত্যা করতে চায়। পেট্রোভিচ গুলির আঘাতে আহত হয়ে রইলেন। প্রাসাদ তখন বিস্ফোরণের ফলে সম্পূর্ণ অন্ধকার।

সৈন্যরা অন্ধকারে রাজা-রানীর খাস-মহলে প্রবেশ করতে না পেরে রাস্তার ওপারে এক ডাক্তারের বাড়ি থেকে মোমবাতি চেয়ে নিয়ে এল। প্রাসাদের কাছাকাছি পুলিশ স্টেশনের পুলিশরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে প্রাসাদ ঘেরাও

করা সেনাদের আক্রমণ করল। ষষ্ঠ ইন্-ফ্যাণ্ট্রির সৈন্যদল মাশিন ফিরে আক্রমণের আদেশ দিলেন। না জেনেশুনে রাজার আদেশ ভেবে তারা পুলিশ দলকে আক্রমণ করলে। পুলিশ দল পেছু হটে গেল। প্রাসাদের পুলিশবাহিনীকেও বোঝানো হল, যা হচ্ছে তা সব রাজারই আদেশে।

সেই অন্ধকার প্রাসাদের কোণায় কোণায় মোমবাতির ভুতুড়ে আলো ফেলে ফেলে ছায়ামূর্তিরা হত্যাকারী রাজা-রানীকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তারা প্রধানমন্ত্রী পেট্রোভিচ্‌কে হত্যার হুমকি দেখিয়ে রাজা-রানীকে খুঁজে বের করতে বললে।

কালহরণের জন্য যেন চাবি খুঁজছেন এই ছল করে পেট্রোভিচ্ তাদের নীচের তলায় নিয়ে গেলেন। দু'ঘন্টা বৃথা অনু-সন্ধানের আক্রোশে তারা পেট্রোভিচ্‌কে হত্যা করে।

দ্বিতীয় মত ঃ

কেউ কেউ বলেন, অফিসাররা মাটির তলায় সেলারে যানই নি। তাঁরা একতলা ও দোতলার প্রতিটি ঘর অনুসন্ধান করেন। আসবাবপত্র ভেঙে, পর্দা ছিঁড়ে, তরবারি দিয়ে প্রতিটি লুকোনো অন্ধকার খুঁচিয়ে দেয়ালের কোথাও ফাঁপা আছে কিনা পরখ করে রাজা-রানীকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াতে থাকেলন। পেট্রো-ভিচকে রক্ষীদের প্রহরায় রাখা হয়। রাজা-রানীর খাসমহলে যাবার জন্য তাদের লম্বা আরবীক কেতায় সাজানো ঘরটির দরজা ষড়যন্ত্রকারীরা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এবার সামনেই রানীর ব্যক্তিগত ঘর। প্রাসাদের কোথাও কোনো অন্ধকার কোণে তখন রাজা ও রানী আসন্ন নিষ্ঠুর মৃত্যুর অপেক্ষায় কম্প্রবক্ষে ছিলেন কেউ জানে না। হয়ত পদধ্বনি, গুলির শব্দ, বিস্ফোরণ এগিয়ে এসেছে, পিছিয়ে গেছে। হয়ত তরবারির তীক্ষ্ণধার অগ্রভাগ তাঁদের সামান্য বিদ্ধ করেছে। তাঁরা নড়েননি।

সৈন্যরা তখন রানীর গোলাপ রঙ শয়নকক্ষে। বিছানাটি ব্যবহৃত, একটি ফরাসী নভেল,...রানী হয়ত পড়ছিলেন, কিন্তু এখন মন্দির শূন্য।

পাগলপ্রায় সৈন্যরা এবার ডেকে আনল পেট্রোভিচ্‌কে।

—বলো! বলো! তরবারির নিষ্ঠুর খোঁচা।

—তুমি জানো তারা কোথায়?

—না! না!

জানতেন পেট্রোভিচ্। তবু বললেন,

—হয়ত নতুন প্রাসাদে।

—বেশ চলো তুমিও চলো. নতুন প্রাসাদ খুঁজে দেখি। না পেলে তোমায় ছাড়বো না।

পথে মাশিনের সঙ্গে দেখা। মাশিন তখন ক্ষিপ্ত নেকড়ের মত। এত দেরী লাগার কথা নয়। রাজা-রানীকে না পেলে সব আয়োজন বৃথা।

—ওর চালে ভুলেছ তোমরা? ফিরে চলো পুরোনো প্রাসাদে।

তখন তরবারি আর রিভলবার নিয়ে সৈন্যদল ফিরে এলো পুরোনো প্রাসাদে। আবার রানীর ব্যক্তিগত ঘরটিতে এসে হাজির হল তারা। রানীর সিল্কের পর্দা-দেওয়া ছবি-সাজানো ঘরটি পেরিয়ে পৌঁছোল তাঁর শয়নকক্ষে। বাগানমুখী তিনটি জানালা তখন খোলা ছিল।

রাজা-রানী রাত্রি সাড়ে এগারটায় শুতে যান। একঘণ্টা বাদে তাঁরা বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দ শোনেন। বিপদের গন্ধ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অর্ধনগ্ন অবস্থায় যুগল শয্যাপাতা শয়নকক্ষের সঙ্গে রানীর মাত্র সাত ফুট চওড়া কাপড়জামা রাখবার ছোট ঘরে আশ্রয় নেন। দুটোর সময় কর্ণেল মাশিন শয়নকক্ষের পিছন দিকে লোকজন নিয়ে আসেন। নব্বই মিনিট রাজা ও রানীকে যে কি অবস্থার মধ্যে সেই অন্ধকার ঘরটিতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তা বলা যায় না। হয়ত রাজা আলেকজাণ্ডার তখন নিয়তির অদ্ভুত পরিহাসের কথা ভেবে থাকবেন। তিন মাস আগের সেই সিয়ান্সের ভবিষ্যদ্বাণী,—হয়ত নিজের আঙুল কামড়াচ্ছিলেন এই ভেবে যে, তাঁর বাবা যে গুপ্ত পথ রেখেছিলেন, সেটি তিনি নিজে ইঁট দিয়ে বন্ধ করে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন একদিন। তখন কি তিনি জানতেন নিজের বাঁচার পথই বন্ধ করেছেন তিনি। এবার তাঁরা কলে-পড়া ইঁদুরের মত। যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যু। নিষ্ঠুর, ভয়ংকর মৃত্যু।

একমাত্র উপায় রাজার বিশ্বস্ত সেনা-বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কেউ কেউ বলেন, তাঁরা একটি মাত্র জানলা দিয়ে হাত নেড়ে সাহায্য চেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁদের দেখতে পান বিশ্বাসঘাতক কর্ণেল কোসিচ। তিনি তখুনি তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করেন।

পরমুহূর্তে ছুটে তাঁরা ওপরে যান।

রাজা-রানী তখনো প্রায় সুরক্ষিতই ছিলেন। কারণ এই ঘরটির দরজা দেওয়ালের গায়ে মেশানো ও দেওয়ালেরই গোলাপী ওয়ালপেপারে মোড়া ছিল।

কোসিচের কাছ থেকে এমনি একটি গুপ্ত ঘরের অস্তিত্বের কথা জানতে পেরে প্রমত্ত অফিসারটা একটা কুড়োলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। যখন কুড়াল এল, পেট্রোভিচ্ বুঝতে পারলেন, আর উপায় নেই। তিনি অফিসারদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—রাজা-রানীকে আমি বের করে দিচ্ছি। আপনারা আমাকে কথা দিন তাঁদের প্রাণরক্ষা করবেন।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

—বেশ! মন্ত্রী এগিয়ে গেলেন। ছোট ঘরটির দরজায় টোকা দিয়ে বললেন,

—প্রভু, দরজা খুলুন, আমি আপনার 'লাজা' আর আপনার অনুগত কর্ম-চারিবৃন্দ!

আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। রাজা ও রানী বেরিয়ে এলেন। রাজার পরনে ট্রাউজার। লাল সিল্কের শার্ট। রানীর পরনে শায়া ও বক্ষবাস। একটি হলুদ মোজা। আলেকজাণ্ডার মাশিনের দিকে এক পা এগিয়ে এলেন। তারপর অফিসারদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—তোমরা কি চাও? এই তোমাদের শপথের মূল্য? আমার প্রতি বিশ্বস্ততার মূল্য?

কয়েক মুহূর্ত সবাই স্থির। সহসা একজন লেফ্‌টেনান্ট চিৎকার করে উঠলেন,

—হাঁ করে কি দেখছ? এই কি আমাদের শপথ? এই কি আমাদের বিশ্বস্ততা?

কে একজন হঠাৎ আলেকজান্ডারকে লক্ষ্য করে গুলি করল। আহত আলেকজান্ডার রানীর বাহুর মধ্যে ঢলে পড়লেন। তারপর প্রায় ছ'জন অফিসার পাগলের মত ক্রমাগত তাঁদের গুলি করতে লাগলেন। মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যাবার পরও গুলিবর্ষণ বন্ধ হল না। আলেকজান্ডার নাকি আহত হয়েছিলেন মাত্র। দ্রাগা সংগে সংগে মারা যান। কিন্তু তা সত্ত্বেও আক্রোশে, প্রতিহিংসায় অফিসাররা দুজনকে তরবারি দিয়ে ছিন্ন-

এখানে তাঁদের হত্যা করে জানালার মধ্য দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়।

বিধ্বস্ত রাজকীয় শয্যাগৃহ

বিচ্ছিন্ন করে। তখনো রাজা মরেছিলেন কিনা সন্দেহ ছিল। মাশিন এবার দেহদুটিকে জানলা দিয়ে ফেলে দেবার আদেশ দেন। রাজা তখনো বেঁচেছিলেন। তাঁকে যখন জানলা গলিয়ে ফেলে দেয়া হচ্ছিল, তিনি জানলা আঁকড়ে ধরেন। শেষবারের মত সৈন্যরা তরবারি দিয়ে তাঁর আঙুল কেটে দেয়। সবাই তখন নতুন নৃপতির আহ্বান জানাচ্ছে—

—'রাজা পিটার কারাগর্জেভিচ্ দীর্ঘজীবী হোন!'

পুরোনো রাজারানীর নগ্নদেহ তখন বাগানে ঘাসে বৃষ্টিতে!

গোপন ঘরের দরজা খোলা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি হল :

পেট্রোভিচ্ নন, রাজার ব্যক্তিগত ভৃত্য এই ঘরটির সন্ধান দেয়। মাশিন রাজাকে দলিল সই করতে দেয়।

রাজা সদর্পে বলেন, আমি আমার বাবার মত নই। এই কটা অফিসারের ভয়ে আমি ভীত হই না।

তখনই ক্যাপ্টেন ডিমিট্রিভিচ্ (যিনি 'মিকা'র হত্যাকারী) রাজাকে গুলি করেন। রাজা রানীকে আড়াল করেছিলেন। রানী রাজাকে আড়াল করতে যান। গুলী লাগে রাজার ঘাড়ে। মাশিন এগিয়ে আসেন। তিনি বলেন, তিনি নিজে তাঁর ভ্রাতৃবধূকে হত্যা করে প্রতিহিংসা নিতে চান। লেফটেনান্ট সাউরিচ তাঁর বুকে গুলি করেন। এই গুলিতেই তিনি মারা যান। তখনই অফিসার সবাই তাঁদের গুলি করতে থাকেন।

ডেলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিকদের কাছে এসায়ায় এক রক্ষী একটি বিবৃতি দেন পরে :

আমি রাজরানীর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম। আমার যতটা মনে পড়ে, আমরা তরবারী দিয়ে তাঁদের আঙুলগুলি কেটে ফেলি। তার পর গুলী করি।

সেদিন রানীর সজ্জাঘরে লেসের রাত্রিবাসের ভিড়ে, রঙীন নাইলাক রঙ পোশাক, হলুদ, নীল, স্কার্ট জামার দোদুল্যমান ঝালরের তলায় এক ভয়ংকর হত্যাকান্ড ঘটে গিয়েছিল। মাটিতে রক্ত, দেয়ালে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন দু'কাটায় দুটো বাজতে সাত এই সাক্ষ্য রেখে চুপ দেয়াল-ঘড়ি সে ইতিহাসের সাক্ষ্য রেখে গেছে।

তালিকায় বাকি যারা ছিল তাদেরও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম সাক্ষী আপন প্রাসাদের পর্দাফেলা জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে-থাকা রাশিয়ান এ্যামবাসির লোকেরা। এমব্যাসি প্রাসাদের ঠিক উল্টোদিকই ছিল।

মাশিনের লোকদের নিষ্ঠুর হত্যালীলা আর সহ্য করতে না পেরে ভোর চারটের সময় অস্ট্রোহাংগারিয়ান মন্ত্রী মাশিনকে জানান এই হত্যালীলা বন্ধ করতে, নাহলে তিনি তাদের সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেবেন সার্বিয়া অধিকার করতে। সকালের প্রথম আলোয় রাশিয়ান এ্যামব্যাসির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাশিনকে অনুরোধ জানান।

ভগবানের দোহাই দেহদুটিকে ঘরে নিয়ে যান। বৃষ্টিতে সকলের সামনে এভাবে ফেলে রাখবেন না।

তখন অফিসাররা হোসপাইপ আনেন। দেহদুটিকে ধোয়া হয়। তারপর ঘরের ভিতরে এনে টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়। সেই রাত্রের বাতির আলোয় দেহদুটিতে ময়নাতদন্ত হয়। আবিষ্কৃত হয় রাজা পাগল ও রানী অনুর্বরা। তাঁদের দেহদুটি দুটি রক্ষ কফিনে ভরে যে সব ঠেলাগাড়িতে খুনী বা বসন্তের রুগীদের মৃতদেহ নেয়া হয় তাতে করে বয়ে স্টেমার্কের পুরানো কবরখানায় অনাড়ম্বরভাবে সমাধিস্থ করা হয়। শুধু দুটি কাঠের ক্রুশ আর তাঁদের উপাধি না, সম্মান না শুধু দুটি নাম বিধৃত থাকে : আলেকজান্ডার ওরবেনোভিচ। দ্রাগা ওরবেনোভিচ্।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৪ ।।

ভাল ক'রে সেরে উঠতে প্রায় ছ মাস সময় লাগল স্বর্ণর। এইটেই যথেষ্ট দীর্ঘসময় কিন্তু অরুণ আরও দুমাস জোর করে ওখানেই রাখল। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলেছিলেন যে, এই সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে ওঠার কালটা অন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে কাটাতে। উদয়পুর, ওয়ালটেয়ারের নামও করেছিলেন তাঁরা। স্বর্ণরও— প্রথম দিককার এই স্বর্গপুরী ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, কিন্তু উপায় নেই বুঝেই, সেও চুপ করে ছিল। হাসপাতালে অনেক অভিভাবক, অনেক রক্ষাকবচ আছে— অন্যত্র কে তাকে নিয়ে থাকবে? অরুণের পক্ষে দু-তিন মাস একনাগাড়ে থাকা সম্ভব নয়, শোভনও নয় সেটা। ওদের কারুরই এখনও দুর্নামের বয়স যায়নি।

এই সময়টুকুর মধ্যে কিন্তু অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। যদিও স্বর্ণ অনেকদিন পর্যন্ত সে খবর পায়নি। অরুণ পেতে দেয়নি—ইচ্ছে করেই। সুবিধেও হয়েছিল অনেকটা, চিঠিপত্র ওখান থেকে বিশেষ কিছু আসত না। দেবেই বা কে, দেবার মধ্যে ভুতু আর রেবাই যা দেয় মধ্যে মিশেলে এক-আধখানা। হরেন একখানাই মাত্র চিঠি দিয়েছিল এখানে— ছুটি নেবার জন্যে খুবই চেষ্টা করছে সে, পেলেই মাসখানেকের জন্যে ছেলে-মেয়ে নিয়ে আসবে—মাত্র এইটুকুই বক্তব্য ছিল তাতে। স্বর্ণ সে চিঠির উত্তর দেয়নি—ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা তার অন্তরের পাত্র ছাপিয়ে উঠছে স্বামীর একটির পর একটি মিথ্যাচরণে—হরেনও আর লেখেনি। কিন্তু ছেলেমেয়ের চিঠিতেও এমন খবর পায়নি স্বর্ণ—অরুণ তাদের [illegible] মা আন্তরিকতা রাগ, উদ্বেগের কারণ ঘটলে যতটা বা এগিয়েছে আরও হয়ত বেশী পিছিয়ে যাবে।

একেবারে শেষেরদিকে শুনল সব। তাও একবারে নয় দুবারে।

স্বর্ণর শাশুড়ি মারা গিয়েছেন—সে এখানে আসার মাস তিনেক পরেই। কলতলায় পড়ে গিয়ে নাকি তাঁর কোমরের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। তখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না; মা কান্নাকাটি করাতে ছেলেরা কথা দিয়েছিল যে এক্সরে করে হাড় ঠিকভাবে বসিয়ে প্লাস্টার করা পর্যন্তই সেখানে রাখা হবে, তারপর বাড়িতে নিয়ে এসে নার্স রেখে দেবে, সে-ই দেখাশুনো করবে, কোন অসুবিধে হবে না তাঁর। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে নার্স বিরল, যদি বা পাওয়া যায়, অনেক টাকা দিতে হবে। সে টাকা কে কতটা দেবে এই ঠিক করতে করতেই কয়েকদিন কেটে গেল। হরেনই সবটা দিতে পারত কিন্তু তার টিকি পর্যন্ত দেখতে পাওয়াই ভার। তাছাড়া মা যখন তার একার নয় তখন সে সবটা দেবেই বা কেন? শেষে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠে কড়া চিঠি লিখতে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে হ'ল কিন্তু নার্স রাখা আর হয়ে উঠল না। বুড়ী ঝি আয়না স্বর্ণর ছেলেমেয়ের মায়া কাটিয়ে কোথাও যেতে পারেনি, সে-ই অগত্যা কিছু কিছু সেবার ভার নিলে। তার হাতে খেতেও হ'ল হরেনের মাকে—এবং দিব্যি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তিনি যে, যে-কাপড়ে সে ময়লা পরিষ্কার করছে, সেই কাপড়েই ভাত এনে তাঁকে খাওয়াচ্ছে। সে বুড়োমানুষ, ছেলে-মেয়ে সামলে বারবার স্নান করা বা কাপড় কাচা তার পক্ষে সম্ভব নয়। হরেনের মা প্রথম প্রথম এ নিয়ে কান্নাকাটি, ছেলেদের গালিগালাজ করেছিলেন, একদিন না-খেয়েও ফিরেছেন অনেকক্ষণ—কিন্তু কোন ছেলেই তাতে বিচলিত না হওয়াতে শেষে অবস্থাটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য বেশী দিন এ-ভোগান্তি সহ্য করতে হয়নি তাঁকে। আয়নার দ্বারা সেবার স্থূল কাজগুলো চলত, শুশ্রূষা যাকে বলে তা চলত না। সে শিক্ষা তার ছিল না, তাকে কেউ বলেও দেয়নি। একভাবে শুয়ে থাকার ফলে বেড্-সোর হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত নাকি পেটেও ছেড়ে দিয়েছিল। যাইহোক, পড়ে যাওয়ার মাত্র আড়াই মাসের মধ্যেই ছুটি পেয়ে গেলেন। তবে কখন যে তিনি মারা গেছেন তা কেউ জানে না, মরার সময় ছেলেদের হাতের জলও পাননি। বিকেলে চা দিতে গিয়ে আয়না দেখেছে যে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছেন বুধা!

এই প্রথম খবর।

শাশুড়ি সম্বন্ধে প্রীতি বা স্নেহ থাকার কথা নয় স্বর্ণর মনে, তবু তার খবরটা শুনে কষ্টই হয়েছিল। বিশেষ করে শেষদিনগুলোর অসহায় অবস্থার কথা ভেবে। স্বর্ণর মন স্বাভাবিকভাবেই স্নেহপ্রবণ ও সহনশীল—তাই কখন যে সে শাশুড়িকে ক্ষমা করেছে মনে মনে তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি, এখন বুঝতে পারল। কাউকে দেখাবার প্রয়োজন নেই এখানে—যে চোখের জল অজস্রধারায় ঝরে পড়ল তার চোখ দিয়ে, তা নির্ভেজাল দুঃখেরই প্রকাশ।

কিন্তু আরও সাংঘাতিক খবর তার জন্য তোলা ছিল। সেটা পেল আরও কদিন পরে, তার দুমাসের এই শেষ মেয়াদও শেষ হয়ে যাবার মাত্র দিন-সাতেক আগে। অবশ্য ঘটনাটাও খুব পুরনো নয়, যদিও তার সূত্রপাত হয়েছে অনেক আগে থাক'তেই। সে ইতিহাসও, প্রীতিপদ হবে না বলেই তখন জানায়নি অরুণ।—স্বর্ণ চলে আসার পর আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে হরেন, মদ ও আনুষঙ্গিক অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় আরও। কাউকে গোপন করার চেষ্টা

মাত্রও করত না সেসব কথা। প্রকাশ্যেই নতুন ঝিটির সঙ্গে 'ঘর' করতে শুরু করে, এমন কি স্বর্ণর শাড়ি-গহনাও তাকে কিছু কিছু বার করে দেয়। ছেলেমেয়েদের বলে দেয় তাকে নতুন মা বলে ডাকতে। কিছুদিন পরে, যখন সে গৃহিণীপদে বেশ কায়েম হয়ে বসেছে, যথেচ্ছ হুকুম চালাচ্ছে সকলের ওপর এবং সংসারের খরচপত্র করছে—তখন নাকি উচ্ছ্বাসের বশে আলমারী সিন্দুকের চাবিও তার হাতে তুলে দিয়েছিল হরেন। হয়ত ঠিক উচ্ছ্বাসেও নয়—মদের ঝোঁকেই দিয়ে থাকবে—তারপর ভুলে গিয়েছিল কিম্বা আর ফিরিয়ে নেবার প্রয়োজন মনে করেনি। সে যাই হোক, ঝিটি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করেনি, স্বর্ণর সমস্ত গহনা এবং নগদ হাজার দুই টাকা নিয়ে সে একদিন সরে পড়েছে—সঙ্গে নিয়ে গেছে জীবেনদের নতুন ছোকরা চাকরটিকে। ছেলেটা ফুটফুটে দেখতে, মাত্র আঠার উনিশ বছর বয়স তার। ঝিয়ের থেকে বয়সে অনেক ছোট। সম্ভবতঃ টাকার লোভ দেখিয়েই তাকে টেনে নিয়ে গেছে।

হরেন তার এই নতুন গৃহিণীকে ভালবেসেছিল কিনা কে জানে, তবে তাকে বিশ্বাস করেছিল অনেকখানি—এটা ঠিক। এই ঘটনায় তাই আর্থিক ক্ষতির চেয়ে সম্ভবত অপমানবোধটাই বেশী বেজেছিল, আত্মাভিমানে ঘা লেগেছিল। এই শ্রেণীর লোকদের বুদ্ধির অভিমানটাই প্রবল হয়, সেই অভিমানে আঘাত লাগলে মর্মান্তিক বাজে।......কারণ যাই হোক, এই নিরুদ্দেশের ঠিক দুটিদিন পরেই তার একটা 'স্ট্রোক' হ'ল। কোন বিলিতী হোটেলে একা বসে বসে মদ খাচ্ছিল, সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। প্রথমটা মাতাল অবস্থা ভেবে নাকি তারাও অতটা খেয়াল করেনি, ঝাঁকানি দিয়ে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেছে। শেষে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়াতে ভয় পেয়ে এ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাইতেই তবু রক্ষা, বাড়িতে পাঠালে কেউ ডাক্তার ডাকত কিনা সন্দেহ, এমনই সকলে বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

হাসপাতালে অনেক চেষ্টায় জ্ঞান যদি বা হয়েছে, পক্ষাঘাতের ভাবটা এখনও যায়নি। সমস্ত বাঁ দিকটা অনড় অসাড় হয়ে আছে। কথাও কইতে পারছে না ভাল করে—কথা এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে, খুব মন দিয়ে না শুনলে বুঝতে অসুবিধা হয়। বাড়িতে নিয়ে এসেছে এখন, জীবেনই দেখাশুনো করছে, চিকিৎসাও চলছে—তবে ডাক্তাররা আশা-ভরসা খুব একটা দিতে পারছেন না। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, এই অবস্থাই এখন চলবে দীর্ঘকাল। আর কোনদিনই একেবারে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন কিনা সন্দেহ।......

স্যানাটোরিয়ামের মধ্যে নয়, বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে একটা পাহাড়ে-পথের ধারে ঝরা পাইন পাতার ওপর বসে বসে শুনছিল খবরটা। সেটা অপরাহ্নকাল, সামনের পাহাড়গুলোর তলায় তলায় ইতিমধ্যেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, বহু নিচে নদীর রজতরেখাটা পর্যন্ত অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে এসেছে অনেকখানি। কিন্তু সেদিকে চোখ ছিল না স্বর্ণর, সে চেয়েছিল সামনের বড় পাহাড়টার চুড়োয় তখনও যে সূর্যরশ্মিটুকু লেগে আছে—তারই দিকে। একফালি একটু রোদ একেবারে সেই চুড়োরও মাথাটায়—আর নিচে অতল গভীর রহস্যময় অন্ধকার। অন্ধকারটাকে মনে হচ্ছে তরল কোন পদার্থ, নিচে থেকে পাত্র ভরে ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠছে।

আজ প্রথম মনে হ'ল ওর, সন্ধ্যা ওপর থেকে নামে না, নিচে থেকে ওঠে। দিনের বেলা যেন সে ঐ নিচেকার গহন অরণ্যের ঝোপে ঝাড়ে ছায়ায় আত্মগোপন করে থাকে, দিনের দৃষ্টি সরে গেলেই একটু একটু করে মাথা তোলে, ভরসা পেয়ে ওপরে উঠে আসে। তা হোক, তবু সে নিচেরই জিনিস, সে সব সৌন্দর্যকে বিলুপ্ত করতে পারে, একাকার করতে পারে, তার সৌন্দর্যসৃষ্টির কোন ক্ষমতা নেই, তার কোন নিজস্ব রূপ নেই। যেটুকু দিনের আভাস এখনও প্রকাশিত রয়েছে ঐ সুদূর শিখর চূড়ায়, তা যেমন মনোহর, তেমনি মহিমাময়। এত-দূর থেকেও যেন ওর প্রতিটি পত্রপল্লবের ঝলমলানি দেখা যাচ্ছে, তাদের শাখা-প্রশাখার ছায়া আলাদা আলাদা বেছে নেওয়া যাচ্ছে।......

অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল স্বর্ণ। স্বামী সাংঘাতিক অসুস্থ, হয়ত বা মৃত্যুপথযাত্রী—না হলেও চিরদিনের মতো পঙ্গু পর-প্রত্যাশী হয়ে থাকবে। ব্যথা পাবারই কথা, ব্যথা পেলও সে প্রথমটা। ওর প্রথম প্রতিক্রিয়াটা হয়েছিল তীব্র ব্যথার। বুকের মধ্যেটা মুচড়ে উঠেছিল যেন, ইচ্ছে হয়েছিল পাখা মেলে সেই মুহূর্তে উড়ে চলে যেতে স্বামীর বিছানার পাশে। আহা, কে-ই বা তার সেবা করছে, কে-ই বা মুখে জল দিচ্ছে! উঠে বসা স্নান করা তো দূরের কথা—নিজে নিজে কিছু খাওয়ারও শক্তি নেই। প্রাকৃতিক কাজগুলোর জন্যে পরের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে থাকতে হয়েছে, হয়ত তারজন্যে মুখনাড়া খাচ্ছে কত লোকের। তাও হয়ত শেষ অবধি কেউ করছে না ঠিক সময়ে— ময়লা মেখে পড়ে থাকতে হচ্ছে। মেরে করছে অবশ্য রেবা অনেকটা ওর মতোই হয়েছে—কিন্তু তার কতই বা বয়স, সে কি গুছিয়ে করতে পারছে বুড়ীর সব কাজ। শুয়ে থেকে থেকে যদি তারনেরও শাশুড়ীর মতো শয্যাক্ষত হয়ে যায়! বাপ্ রে, সে অবস্থা ভাবলেই যে বুকের মধ্যেটা হাহাকার ক'রে ওঠে!...

কিন্তু সে ঐ প্রথম কিছুক্ষণই।

তারপরই একটা বিরাট ঔদাসীন্য বোধ করল ও। এমন কখনও বোধ করেনি এর আগে, করবে তা কখনও ভাবেনি। নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল খানিকটা পরে।

মনে হ'ল ওর কী মাথাব্যথা? ও-ই তো মরতে বসেছিল, এখনও সে আশঙ্কা একেবারে দূর হয়ে গেছে কিনা কে জানে, হয়ত এখনও সে মৃত্যু একেবারে ওকে ছেড়ে যায়নি, ওর দেহের মধ্যেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে! যেদিন একেবারে প্রত্যক্ষ মরণের সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন ওর দিকেই বা কে তাকিয়েছিল? নিষ্করুণ অবহেলায়, নির্মম ঔদাসীন্যে শুধু নয়—মর্মান্তিক আগ্রহের সঙ্গেই সেদিন ওকে বিদায় দিয়েছিল ওর আপনজনেরা। ওকে সরাতে পেরে বেঁচে গিয়েছিল যেন।......না, সংসার থেকে বিদায়ই নিয়ে এসেছে সে; সংসারও তাকে বিদায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তবে আবার কেন? স্বামী, শ্বশুরবাড়ি, এমন কি ওর ছেলে-মেয়ে—সবই যেন কোন সুদূর পূর্ব-জন্মের কথা। এজন্মে তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এ ওর নবজন্ম। সে জন্মের ঋণ সে শোধ দিয়েছে সংসারকে—কড়ায় ক্রান্তিতে। দেহপাত করে বুকের রক্ত দিয়ে—বলতে গেলে সমস্ত জীবন দিয়েই। এখন থেকে এ জন্মের ঋণটার কথাই ভাববে সে।

সে ঋণ তার সামনে বসা এই লোকটার কাছে। সাধারণ ঋণ নয়—যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার ঋণ, একাগ্র মৃত্যুঞ্জয়ী ভালবাসার ঋণ। শুধু পয়সা দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে নয়, করুণা বা অবহেলায় নয়—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যেন যথা-সর্বস্ব পণ ক'রে লোকটা লড়াই করেছে যমের সঙ্গে, স্বর্ণর ভাগ্য-দেবতার সঙ্গে। এমন নিখুঁত যত্ন এমন আন্তরিকতা কখনও দেখেনি সে, আর কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ। প্রতিটি সত্তা সজাগ রেখে তার কথা ভেবেছে যেন লোকটা! শুধু তার কথাই ভেবেছে, আর কিছু নয়। অথচ কীই বা তার মূল্য, ওর কাছে সে কতটুকু। রূপবান, কান্তিমান, বিত্তশালী ঐ লোকটা, ইচ্ছা করলে রাশিরাশি সুন্দর মেয়ে দু'পায়ে জড়ো করাতে পারে—সে জায়গায় স্বর্ণ তো কীটাণুকীট। তবুও তাকেই সর্বাগ্রগণ্য করে রেখেছে সারা জীবন, আজও সে-ই তার কাছে সর্বাধিক।

না, স্বর্ণও আর কারও কথা ভাববে না, ওর কথা ছাড়া।......

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল সে, তুমি অন্য কোন কথা বলো অরুণদা। ওসব কথা ভাল লাগছে না।

শুনে লাভই বা কি, যে কাঠ খাবে সে আঙ্গারা বমি করবে এ তো জানা কথা। তার জন্যে কে কী করবে আর।'

অরুণ চমকে উঠল যেন। স্বর্ণর কাছ থেকে এ উত্তর আশা করেনি আদৌ। ওর প্রাণ মমতায় ভরা, সকলের জন্যেই ওর টান—এই জানত সে। সেও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, 'অন্য কথা আর কি বলো! এবার তো ফেরার কথা। পরশু সোমবারের পরের সোমবার ভাল দিন আছে, সেদিন গাড়িরও ব্যবস্থা করতে পারব, সেই-দিনই যাব ভাবছি। ওদিকে ট্রেনেও ঐদিন রিজার্ভ ক'রে রাখবার কথা বলে এসেছি আমার বন্ধু আর-টি-ও বচ্চন সিংকে। করে রাখবে নিশ্চয়।'

'কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে, এখান থেকে?'

খুব শান্ত, খুব সহজভাবে প্রশ্ন করে স্বর্ণ।

আবারও চমকে ওঠে অরুণ। রীতি-মতো থতমত খেয়ে যায়। এবিষয়ে যে কোন প্রশ্ন কি দ্বিধার অবকাশ আছে তা জানা ছিল না তার একেবারেই। সে হতভম্বের মতো খানিকটা তাকিয়ে থাকে স্বর্ণর মুখের দিকে, তারপর আমতা আমতা করে বলে, 'কেন—বাড়ি? ......মানে, বাড়ি ফিরবে তো এবার?'

'বাড়ি।' একবার মাত্র শব্দটা উচ্চারণ করে চুপ ক'রে যায় স্বর্ণ আবার। তার-পর তার কটা চোখের স্থিরদৃষ্টি অরুণের চোখের ওপর রেখে আগের মতোই শান্ত সুরে বলে, 'আগে বোকা ছিলুম বলে বুঝতে পারিনি—এখনও বোকা তবু মোটা কথাগুলো বুঝতে পারি। আমার জন্যেই তুমি জীবনটা মাটি করলে—এখনও আমার জন্যে জীবনপাত করছ। তুমি আমাকে ভালবাসো—সেটা লুকিয়ো না। আমি জানি, এখন পরিষ্কার সব দেখতে পাই। তুমিই আমাকে ভালবাসো শুধু এ পৃথিবীতে—আত্মিক ভালবাসা—এমন ভাল কেউ আমাকে বাসে নি। কেউ কোনদিন এমন ভাবে আমার কথা ভাবেনি তোমার মতো। আমিও আর কারও কথা ভাবব না। কেন ভাবব, সে আমি তো মরেই গেছি। আমাকে মরা বাঁচিয়েছ তুমি, এখন তোমারই যোল আনা জোর।... বাড়ি বলো ঘর বলো—আমার কাছে সবই এখন তুমি।... তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চলো। যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। তোমার ঝিগিরি করলেও আমার সুখ। আর ঘর করতে চাও—সে আমার ভাগ্য বলে মানব।'

শুনতে শুনতেই বিবর্ণ রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল অরুণের মুখ, এখন এই সায়াহ্নবেলার পাহাড়ী শীতেও ললাটের কোলে কোলে ঘাম দেখা দিল তার। সমস্ত শরীর কাঁপছে তার—কাঁপছে বুকের মধ্যেও। সে বার দুই মুখ খুলতে চেষ্টা করল কিন্তু একটা শব্দও বেরোল না তার গলা দিয়ে।

কী বলবে তাও বোধহয় বুঝতে পারল না। বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা তার। এ অকল্পিত সৌভাগ্যে তার বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই ' এ কি সত্যিই স্বর্ণ' বলছে কথাগুলো—না আর কেউ? না কি তার এতদিনের নিভৃত স্বপ্নই ভুল শোনাচ্ছে তাকে—তার নিজের কলুষিত কামনা!......মাথার মধ্যে এমন ক'রে সব তালগোল পাকাচ্ছে কেন? বুকের মধ্যেই বা কিসের ঢেউ এসব? সে কি এবার পাগল হয়ে যাবে নাকি?...

'কী হ'ল, কথা কইছ না যে? বাক্যি হরে গেল নাকি তোমার? না কি আমার সঙ্গে ঘর করতেই সাহসে কুলোচ্ছে না? রোগটা এখনও সারে নি ভাবছ?... বেশ তো বাপু, না হয় তোমার ঘরে ঢুকব না, কাছে যাব না, দূর থেকেই সেবা করব। তোমার কাছে—তোমার বাড়িতে থাকতে পারলেই আমার ঢের।'

না, ভুল হয়নি তার কিছুমাত্র। ঠিকই শুনেছে অরুণ। জীবন ধন্য হয়ে গেছে তার। আশার অতীত সিদ্ধি মিলেছে, এ জন্মের সাধনা শেষ হয়েছে, সার্থক হয়েছে।

এবার কথা বলতে পারল সে। তার মানসিক অবস্থার পক্ষে আশ্চর্যরকম শান্তভাবেই বলল, 'তোমার অসুখের ভয় আমার একটুও নেই স্বর্ণ।... অসুখ তোমার সেরে গেছে— ডাক্তাররা সমস্ত রকম পরীক্ষা করে দেখেছেন।... আর না সারলেও সে ভয় আমার নেই, কোনদিনই ছিল না। তোমাকে পেয়ে, তোমার জন্যে মরেও আমার সুখ।... সে কথা নয়, আমি ভাবছি তোমার কথাই!'

'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না আর। দোহাই তোমার!... একবার একটু নিজের কথাটা ভাবো দিকি!'

'কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়ে আর কোন কথাই যে নেই ভাববার মতো। ...তুমি যা দিতে চাইছ—একদিনের জন্যেও যদি তা সম্ভব হ'ত—তা হ'লে আর কোন দুঃখ থাকত না আমার জীবনে, সেই মুহূর্তে মরে গেলেও আমার সুখ ছিল! কিন্তু তোমার এতটুকু দুঃখের কারণ ঘটিয়ে স্বর্গ-সুখও আমার বিষ লাগবে যে!'

'আমার দুঃখটা তুমি আবার এর মধ্যে কোথায় দেখলে তাই শুনি! এ তো আমি স্বেচ্ছাসুখে যেতে চাইছি তোমার সঙ্গে। বাড়ির কথা বলছ—আমার আবার বাড়ি কোথায়? ও বাড়ি তো আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাড়িয়ে দিয়ে বেঁচেছে। তারা তো আমাকে চায়নি—অসুখটা হ'তে শিটিয়ে ছিল সবাই। সকলে নিজের কথা ভেবেছে, আমার কথাটা কেউ ভেবেছে কি? এক তুমিই ভেবেছ! ওদের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক কি?... তাছাড়া যার জন্যে বাড়ি—তার সঙ্গেই তো সম্পর্ক ঘুচে গেছে! তার নাম শুনলে এই গলা অবদি বিষে তেতো হয়ে যায় সবটা।... না, ও বাড়িতে আর আমি যাবো না!'

'কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে? তাদের কথাটা ভাবছ না কেন?'

প্রশ্নটা করে শান্তভাবেই—কিন্তু সমস্ত প্রাণটা যেন তার ঔৎসুক্যে আগ্রহে—কী একটা ঐকান্তিক আশার তার ঠোঁটের কাছে এসে অপেক্ষা করতে থাকে প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে।

'ছেলেমেয়ে!'

একমুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায় যেন স্বর্ণ। আর সেই মুহূর্তকালের নীরবতাতেই নিজের বিপুল আশা অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুদণ্ড শুনতে পায় তার সামনের ঐ লোকটি। আর কিছু শুনতে চায় না অরুণ, আর কিছু শোনবার প্রয়োজনও থাকে না। তার উত্তর সে পেয়ে গেছে।

কিন্তু স্বর্ণ তখনই আবার কথা শুরু করে, কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়েই যেন বলে, 'ছেলেমেয়েও তো তার। আমার দাদামশাই বলতেন, বংশ তো নয় বেউড় বাঁশের ঝাড়। বেউড় বাঁশের ঝাড়ে বেউড়ে বাঁশই ফলে। ও বেইমানের ঝাড়ের কথা ভেবে আমার ইহকাল পরকাল খোয়াতে গেলুম কী দুঃখে? ওদের কথা আর আমি ভাবব না। এই কমাসে ভুলেই তো গেছি, আর কেন?... আমি মরে গেলেও যা হ'ত এখনও তাই হবে। বড় হবেই একরকম ক'রে। যাদের ঝাড় তারাই দেখবে। আমি গেলেই কি আর মানুষ করতে পারব?'

'তা হয় না স্বর্ণ!' বুকের সে ঢেউ-ওঠা বন্ধ হয়েছে। কয়েক মুহূর্তের বাদশাহী ঘুচে গেছে চিরকালের মতো। অল্প কিছুক্ষণের জন্য যে আশাটা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সে এখন ঠাণ্ডা মাটির

নিচে সমাধিস্থ। সহজ স্বাভাবিক সুবুদ্ধি, দূরদৃষ্টির পথ অবারিত হয়েছে আবার মাথার মধ্যে। তাই বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই কথাগুলো বলতে পারল অরুণ, 'তা হয় না স্বর্ণ। তোমার ছেলেমেয়ে তোমারই। যে ঝাড়ই হোক, তোমারই রক্তমাংস দিয়ে তৈরী তারা। তাদের কথা আজ না ভাবো—দুদিন পরে ভাবতেই হবে। তাদের ভোলা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। তাদের দায়িত্বও অত সহজে এড়াতে পারবে না!'

'আমি মলে তাদের কী হ'ত? তারা কি বাঁচত না—না বড় হ'ত না?'

'বড়ও হ'ত—বাঁচতও। কিন্তু তুমি মলে তাদের মাথা হেঁট হ'ত না, চিরদিনের মতো একটা লজ্জা একটা কলঙ্কের বোঝা চাপত না।... ছেলেমেয়েদের এত বড় সর্বনাশ আর নেই; মায়ের নাম করতে যদি লজ্জা বোধ হয়, সে পরিচয় মাথা উঁচু ক'রে যদি না দিতে পারে—তাহলে জীবনটাই তাদের মাটি হয়ে যাবে। নিজের সন্তানরা চিরকাল অভিসম্পাত করতে থাকবে—এ কি তুমি সইতে পারবে? আর সে শাস্তি কেনই বা দেবে তুমি তাদের, তারা তো এখনও পর্যন্ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করেনি। তুমি ম'লে তোমার স্মৃতি তারা পুজো করত, অন্তত করবার চেষ্টা করত, তোমার নামটার সঙ্গে হয়ত একটা ব্যথাও জড়ানো থাকত তাদের মনে—কিন্তু এতে তোমাকে শুধু ঘেন্নাই করবে তারা। সে কি তুমি সইতে পারবে? আজকের এই অভিমানের মিথ্যে পর্দাটা যখন থাকবে না তখন তুমিই সেখানে ফিরে যাবার জন্যে মাথা কুটবে, অথচ সে পথ তখন বন্ধ হয়ে যাবে তোমার কাছে চিরকালের মতো। ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো কথাটা।'

'সে যা-ই হোক, তোমার মুখচেয়ে সব সইতে পারব।'

পাগলের মতো একটা ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বলে কথাগুলো। বলতে বলতেই তার দুচোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে ওঠে।

'কিন্তু আমি কার মুখচেয়ে তোমার সে দুঃখ সইব বলো। তোমার মুখচেয়েই তো আমি আছি। তোমার সুখই আমার সুখ। তাছাড়া তুমিও সে পারবে না। আমার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা-বোধে এখন বলছ কথাগুলো—কিন্তু এ সাময়িক। সন্তানের সঙ্গে যোগ চিরকালের—নাড়ির, আত্মার। সে অত সহজে অস্বীকার করা যায় না।... যখন সে ব্যথা জাগবে মনে, অথচ যখন তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার পথ থাকবে না, তখন আমিও তোমার কাছে বিষ ঠেকব। ...এ কূল ও কূল দুকূলই যাবে তোমার।'

'তাহলে—তাহলে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না—তুমি, তুমিও আমাকে ত্যাগ করলে!'

আর্তনাদের মতো শোনায় প্রশ্নটা, হাহাকারের মতো মনে হয়।

আর সে হাহাকার উচ্চতর হাহাকারেরই সৃষ্টি করে শ্রোতার মনে, সে আর্তনাদ ব্যাকুলতর প্রতিধ্বনি তোলে। স্বর্ণর এ হাহাকার সাময়িক কিন্তু ওর মনের এ হাহাকার বুঝি কোনদিনই শান্ত হবে না।

বর্তমানের লোভ বড় বেশী। মনে হয় এই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা শুধুই মূঢ়তা। দূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানের এ স্বর্গ হারানোর কোন অর্থ নেই। তবু বিচলিত হয় না অরুণ, লোভ জয়ই করে। কারণ ভবিষ্যতটা সুদূর হ'লেও স্পষ্ট—অন্তত তার কাছে। সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে উত্তর দেয়, 'আমি তোমাকে ত্যাগ করিনি স্বর্ণ, তোমাকে ত্যাগ করা মানে ইহজন্মই ত্যাগ করা। কিন্তু আমি জানি, তুমি এখন যেটা ভাবছ দুদিন পরে সেটা ভাববে না, আজকের এ ঝোঁক যখন কেটে যাবে তখন আমাকেই তুমি দুষবে। অভিমানের পর্দাটা সরে গেলে নিজের মনের চেহারাটা তুমি দেখতে পেতে, যেটা আমি পাচ্ছি। তাই এত বড় সৌভাগ্য মেনে নিতে ভয় পাচ্ছি, এ দুর্লভ বরও মাথা পেতে নিতে পারছি না।... তুমি বাড়িতেই ফিরে যাও স্বর্ণ, আমি জানি শুধু ছেলেমেয়ে নয়—স্বামীর টানও তোমার কম নেই। হরেনবাবু তোমার মুখচেয়েই আছেন—তাঁর সেবা তোমাকেই করতে হবে। কর্তব্য বলে নয়—তুমি চাও বলেই। স্বামীর প্রতি ছেলেমেয়েদের প্রতি সব কর্তব্য শেষ ক'রে—ছেলের বৌ যেদিন অপমান করবে সেদিন সব দেনাপাওনা শোধ ক'রে আমার কাছে চলে এসো। ততদিন পর্যন্ত এমনি আগ্রহ নিয়েই অপেক্ষা করব।'

'ততদিন যদি বাঁচি—তবে তো। বাঁচলেও সে তো বুড়ি হয়ে যাবার কথা। তুমিও তো বুড়ো হয়ে যাবে!'

'হোক না। তখনই আমাদের বেশী দরকার হবে পরস্পরকে। দুজনে কোন তীর্থে চলে যাবো। তখন তো আর কোন কলঙ্কের ভয় থাকবে না!'

চুপ ক'রে যায় স্বর্ণ। কিন্তু তার দুটি চোখের কোল বেয়ে কূল ছাপিয়ে অজস্র জল ঝরে পড়তে থাকে ধারায় ধারায়। মনে হয় তার এ কান্নার বুঝি শেষ হবে না। সেদিক থেকে প্রাণপণে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে থাকে অরুণ।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে আবার কথা বলে স্বর্ণ, প্রায় চুপি চুপিই বলে—যেন কতকটা নিজেকে শুনিয়েই, 'কিন্তু সেখানে গিয়ে কি আর টিকতে পারব? মনের অগোচর পাপ নেই—তোমার কাছে লুকোতেও পারব না—আমিও যে তোমাকে এ কমাসে ভালবেসে ফেলেছি অরুণদা। মানুষকে ভালবাসলে ভোলা যায়—দেবতাকে ভালবাসলে সে ভালবাসা আর ফেরানো যায় না। তুমি দেবতা—তোমাকে যে মন দিয়েছি সে মন যে তোমার সঙ্গেই থাকবে। সেখানে গিয়ে যদি তোমার কথাই ভাবি—পাপ হবে না? তুমিই বলে দাও না, কী ক'রে থাকব সেখানে?'

'হয়ত পাপ হবে, হয়ত কষ্ট হবে—তবু আমার জন্যে না হয় সেটা সইলেই। আমার ঘরে এলে আরও বেশী পাপ হ'ত, আরও বেশী কষ্ট হ'ত। ...আমার মন তো এতকাল ধরে তোমার কাছে পড়ে রয়েছে, তাতেও তো আমি কাজ-কর্ম সব ক'রে গেছি। দেবতা আমি নই স্বর্ণ, মানুষই। মানুষ বলেই—এইমাত্র যে কথাটা বললে তাতে আমার মন ভরে গেছে, আমার এতদিনের ভালবাসা সার্থক হয়েছে। নাই বা পেলুম তোমার রক্তমাংসের ঐ শরীরটাকে, সে আশা তো করিওনি কখনও—তোমার মনটা যদি পেয়ে থাকি সে-ই আমার বড় লাভ। তুমি আমাকে সুখী করেছ—এই জোরেই তুমি সংসারে থাকতে পারবে। আমি তোমাকে অহরহই সেই আশীর্বাদই করব আজ থেকে।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে পাহাড়ের শিখরেও। অন্ধকারে সব যেন লেপে মুছে একাকার হয়ে যায়, আর কিছুই দেখা যায় না স্পষ্ট ক'রে। আকাশের তারাগুলো জ্বলে শুধু মাথার ওপরে, তারই একটা অস্পষ্ট আভা এসে পড়ে ওদের ওপর।

পকেট থেকে টর্চটা বার ক'রে অরুণ বলে, 'চলো এবার ফিরি। দেরি হয়ে গেছে—হাসপাতালের ফটক বন্ধ হ'য়ে যাবে হয়ত। তোমারও ঠান্ডা লাগছে।'

(ক্রমশঃ)

তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটা কথা প্রায়ই শুনি—কবির সার্বিক রূপটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। অনেক ভেবেছি—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সার্বিক রূপটি দেখতে পাইনি—যা এক-কথায় বলা যেতে পারে। গঙ্গানদীর সার্বিক রূপ দেখা যায় না; হরিদ্বারের গঙ্গা, কাশীর গঙ্গা, কলকাতার গঙ্গা—এক নদীর বিভিন্ন অংশ হলেও তাদের গুণগত ভেদ দুর্লঙ্ঘ্য। হরিদ্বারে নৌকা চলে না, স্বচ্ছ জলের তলা পর্যন্ত দেখা যায়; কাশীর গঙ্গায় মানোয়ারি জাহাজ ঘুরতে পারে না; কলকাতার গঙ্গাজল রাস্তায় দেওয়ার পর আধ ইঞ্চি পলি-মাটি পড়ে থাকে, কিন্তু নদীতে বড় জাহাজ আসে। একই নদীর নানারূপ। হরিদ্বারের গঙ্গার তীরে জুটকলের কারখানা বসেনি; ভাগীরথীর তীরে শ'খানেক কল-কারখানা জেগে উঠেছে।

আট বছরের বালক, আটাশ বছরের যুবক ও আটান্ন বছরের প্রৌঢ়, আশী বছরের বৃদ্ধের ভয়-ভাবনা, সাধ্য-সাধনা একই—একথা বলা যায় না। আর কবির বেলায় আমরা আশা করবো একটা মতের পিল। রবীন্দ্রনাথের মূর্তি চারদিকে খাড়া করা হচ্ছে—বৃদ্ধ বয়সে বিষ্ণু ঘোষের তোলা ফটো হচ্ছে তার মূল। এটাকে বলতে হবে রবীন্দ্রনাথের সার্বিক রূপ? বলতে পারো পঁচাত্তর বৎসরে রবীন্দ্র-নাথের বার্ধক্যের সুন্দর রূপ। আসল কথা সার্বিক রূপ পাওয়া যায় না। সদা চলমান টুকরো টুকরো তথ্য ও তত্ত্বের ফিলম চক্ষের সামনে দিয়ে যা চলে যাচ্ছে—তার থেকে মনের মধ্যে একটা রূপ আমরা খাড়া করে নিতে পারি। কিন্তু তাকে সার্বিক রূপ বলতে পারিনে।

●

শিক্ষা, অধ্যয়ন ও মনন দ্বারা যে সব ভাবনা বা Idea মনের মধ্যে পরোলে পরোলে স্তরীভূত হয়—তার অনেকখানি উবে যায় বিস্মৃতির আকাশে, খানিকটা তলিয়ে যায় মনের গভীরে।

রবীন্দ্রনাথের মনের উপর আশী বৎসর ধরে প্রতিদিন কত তথ্যের স্তূপ এসে পড়েছিল—সমকালীন ঘটনা, সম-কালীন চিন্তাধারা—তার মনের ও মতের উপর তাদের মুষ্টিবদ্ধ করাঙ্গুলির ছাপ রেখে গেছে।

মানুষকে সমকালীন ঘটনা ও ভাবনার প্রতিঘাতে যেমন সামলাতে হয়, অতীতকালের চাপও সইতে হয়; ভাষা, ভাবনা এবং সংস্কৃতি নামে একটা Omnibus শব্দের বোঝা বইতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে সৌভাগ্যক্রমে অতীতের বহু আবর্জনা সইতে হয়নি। তবুও সমকালীন পরিবেশের প্রভাবে কবিকে কিছুকাল হিন্দু-ভারতের ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়; তার গুণগান গদ্যে, পদ্যে, গীতে ফেরীও করেছিলেন। একটা পর্বে এই সব তথ্য ও তত্ত্বকে চরম বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মোহ কেটে যায়, থেকে যায় সার সত্যটুকু পাবার ও বুঝবার জন্য আকুতি। অতীতের দানকে অস্বীকার করেননি, বর্তমানের বিজ্ঞানকে পাশ কাটিয়ে চলেননি। কবির আদর্শ ছিল "To create new standards, an original style, preserving and overcoming traditions at the same time".

[আধুনিক রুশে এই আদর্শে সাহিত্যকে দেখা হচ্ছে। উধৃতিটা একজন অ্যাকাডেমিশিয়ানের প্রবন্ধ থেকে। S. Braginsky লিখিত Theoretical level of Research into the Literature of the Afro-Asian peoples.]

কবির জীবনে অতীতের প্রতি মোহ কাটলো—স্বাদেশিকতার উগ্রতাও শমিত হলো বিশ্ববোধের অনুভূতি থেকে। ১৯০৭ সাল থেকে স্পষ্ট হলো পুত্রের মৃত্যুর পর শোকাঘাতের প্রথম প্রতি-ক্রিয়ায়। কিন্তু সেই বেদনা ভগবৎকেন্দ্রিক হয়ে যে সান্ত্বনা অন্বেষণ করেছিল, সেটাই চিরস্থায়ী হয়ে থাকেনি। বলাবাহুল্য শোক বা সুখ দুনিয়ায় কারও জীবনে সর্বব্যাপী হতে পারে না।

তারপর পঞ্চাশোর্ধে ইংলন্ড, আমেরিকায় বর্ষাধিককাল থেকে আসার পর তাঁর জীবনযাত্রার এবং তাঁর রচনা-ধারার মধ্যে বেশ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। সবুজপত্র-যুগের গদ্য-প্রবন্ধ ও গল্পে নতুন সুর ধ্বনিত হলো—কবিতায় নতুন রঙ দেখা দিল।

"এমন সময়ে আমাকে ডাক দিলে
তোমার সবুজপত্রের আসরে।
খবর দিলে। নবীনের দরবারে
আমার ছুটি মেলেনি।
পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি
দেখা দিল আমার চোখের সম্মুখে।
ভরা যৌবনের দিনেও।
যৌবনের সংবাদ।
এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগেনি
আমার লেখনীতে।

আমার মন বুঝলো।
যৌবনকে না ছাড়লে
যৌবনকে যায় না পাওয়া।"

(শেষ-সপ্তক ৪৫)

পরিবেশের বদল হয়েছে। উত্তরবঙ্গের পদ্মাতীরের ঘরোয়া জীবন নিয়ে ছোট-গল্পের লেখক রবীন্দ্রনাথকে দেখি সবুজপত্রের সমস্যামূলক গল্প সৃষ্টি করতে। পয়লা নম্বর স্ত্রীর পত্র প্রভৃতির সমস্যা ও পরিণাম, নষ্টনীড়ের সমস্যা থেকে আরও কঠিন ও জটিল। চতুরঙ্গ ও ঘরে বাইরেতে নর-নারীর সমস্যা ধাপে ধাপে উঠছে। তারপর জীবন-সন্ধ্যায় সৃষ্টি করলেন মোহিনী উর্বশীকে। দেশের মানসিক আবহাওয়া দেশের সমাজজীবন মধ্যে নারীদের শিক্ষার প্রসার ও গান্ধীজীর রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিঘাতে নারীর অন্তঃপুর ত্যাগ প্রভৃতি ঘটনায় যে সমস্যার উদ্ভব হয়—তার প্রতিচ্ছবি কবির অনেক রচনায় বেশ স্পষ্ট; 'সংস্কার', 'না-মঞ্জুর' গল্প স্মরণীয়। সমকালীন ঘটনার প্রভাব 'চার অধ্যায়' গল্পে সুস্পষ্ট—তবে 'ঘরে বাইরে' থেকে আরও জটিল, নিষ্ঠুর এবং যৌন আকাঙ্ক্ষায় কবির সমস্ত গল্প উপন্যাসকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এইসব রচনার মধ্যে সমকালের ছাপ আছে; কিন্তু সমকালের ছাপ ছাপিয়েও কিছু আছে, নইলে তা বিশ্ব-সাহিত্য দরবারে একটা চেয়ার টেনে বসতে পেতো না। এসব তথ্য যার সঙ্গে কবির তত্ত্বকথা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

গল্পের মধ্যে তথ্য ও তত্ত্ব দুই-ই থাকে প্রচ্ছন্ন—রসটাই মনকে আচ্ছন্ন করে। সমাজ সম্বন্ধে সমকালীন মনোভাব নিয়ে বিদ্রূপ করে লিখে সতেরো শত-কের স্পেনীশ লেখক খেরভানতিস তাঁর ডনকুইক্সোটের মধ্যে বেঁচে আছেন—স্বদেশ তাঁকে গ্রহণ করেছে। দেখেছিলাম মস্কোতে ডনকুইহোটের ব্যালে। কোথাকার

ও কবেকার জিনিস মানুষ আপনার করে নিয়েছে—নূতন রূপ দিয়েছে। তথ্য ও তত্ত্ব ছাপিয়ে রসমণ্ডিত রূপে সে বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। ১৯২১ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজরা আঠারো শতকের গে-রচিত 'বেগার্স অপেরা' সাহিত্যের জঞ্জাল থেকে উদ্ধার করে অভিনয় করলো স্বাজাত্যের গর্ববোধে। ভিড় অসম্ভব—সহস্র রজনী গেল। তাকে সাহিত্যের আসরে বসাবার চেষ্টা হলো—ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য করে—কিন্তু ততঃ কিম্। সাহিত্যের মজলিশে আসন পেলো কি? সেসব গল্প ও ছবি তত্ত্বকথা শুনিয়ে ও তথ্য-বার্তা পরিবেশন করে জনতার মনকে উত্তেজিত করতে পারে—আমদরবারের দেউড়িতে তাঁরা আসুন, বসুন—আপত্তি নেই। খাস দরবারে যা মানুষের অন্তরে তারা স্থান পেলো না।

রবীন্দ্রনাথের কথায় ফিরে আসা যাক। য়ুরোপ থেকে ফিরে আসবার পর পুরাতনের পথ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন।

আমাদের দেশের আউল বাউল সাঁই-দরবেশদের লৌকিক গীত ও কবিতা —tradition বা পরম্পরাগত রচনা; রচয়িতারা তাদের ধর্মব্যাপারে শিক্ষিত, আমাদের আদর্শে লেখাপড়া জানা নয়। তাই তাদের গানে সেই একই কথা অর্থাৎ দেহতত্ত্বের রাহস্যিক কথা সন্ধ্যা ভাষায় বারে বারে গীত হয়েছে। নূতন ভাবনার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে বলে তাদের রস শুকিয়ে আসছে। বৈষ্ণব পদাবলীও একটা জায়গায় এসে থেমে গিয়েছে। পুনরুক্তিতে ভারাক্রান্ত সাহিত্য; নূতন ভাব ও ভাবনা সেখানে প্রবেশ করতে পারে নি।

মধ্য-যুগীয় কাব্য-সাহিত্যকে যত সুন্দর করে সম্পাদন করি, মুদ্রণ করি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা ও ভূমিকা দিয়ে, সেসব আর আজকালকার জনসমাজে তেমন আদর পাবে না; কারণ তত্ত্বের দিক থেকে তারা কালাতিক্রম করে বেঁচে থাকতে চায়, মহাকাল তাদের অমর আসন দিতে নারাজ।

বৌদ্ধ গান ও দোহা, চর্যাগীতি, শূন্য পুরাণ প্রভৃতি সাহিত্য নয়; পদ্য ছিল লেখবার বাহন—ধর্মতত্ত্ব লেখা হতো [illegible]। পদ্য করে লিখলেই যদি সাহিত্য হয়, তবে 'হর প্রীতি হৈমবতী কহেন' বলে রেলের টাইম-টেবল হোমিওপ্যাথি—সবকেই সাহিত্য বলতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ-কথা বলা যায় না যে তাঁর কবিতা, গান একই সুরে বাঁধা, একইভাবে পুনরাবৃত্তি, 'শুধু ভঙ্গী দিয়ে রচা'।

রবীন্দ্রনাথের রচনা-বৈচিত্র্যের উৎস তাঁর শিক্ষার মধ্যে নিহিত। সেটাই বুনিয়াদ—সেটাকেই বলবো তথ্য। তা হলে এবার রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার কথায় আসা যাক—যার উপর রবীন্দ্র-সাহিত্য-সৌধ গড়ে উঠেছিল।

এ-কথা সর্বজনবিদিত যে রবীন্দ্রনাথ formal education-এর জাঁতাকলে কখনো ধরা দেন নি। তিনি self educated—পড়াশুনো বিষয়ে কোন schooling হয়নি। বিলাতে য়ুনিভার্সিটিতে চারটি মাস মাত্র পড়েন, এইখানেই ক্লাশে বসা পড়ার শেষ। কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে কি মনে হয় যে, তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। কারিকুলামের ফরমাইস সাহিত্যের পটভূমে ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যের খনি—যেখান থেকে তিনি তাঁর অনেক মণি-কাঞ্চন সংগ্রহ করেছিলেন।

য়ুরোপের প্রেমের কবিতাকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, তা তাঁর কৈশোর ও যৌবনের কবিতার বইগুলি খুললেই দেখা যাবে। শৈশব সঙ্গীত তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের রচনা; সন্ধ্যা-সঙ্গীত বিশ বৎসরের, প্রভাত সঙ্গীত একুশ-বাইশ, কড়ি ও কোমল তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সের লেখা। এই পর্ব পর্যন্ত তাঁর formative period। এই পর্বের প্রেমের কবিতাগুলি পাশ্চাত্য কবিদের অনুকরণে ও অনুপ্রেরণায় রচিত হয়েছিল—আশা করি এবিষয়ে তর্ক উঠবে না। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, কবিদের মধ্যে নূতন বেদনা জেগেছে; যা নেই তার জন্য কান্না, আপশোস। রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে সমালোচনা করলেও আমরা বলবো তিনি নিজেই সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জীবন-স্মৃতিতে তা খানিকটা কবুল করেছেন। পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে এটা যথেষ্ট ছিল, এখনি কি গেছে? জানি না। একে পণ্ডিতরা বলেছেন আজারিয়া; আরবী কবিদের মধ্যে এই কান্নার সূত্রপাত;—তারপর স্পেন থেকে সেটা সংক্রমিত হয় য়ুরোপে মধ্যযুগে। তারপর বিশ্বময় তা ছড়িয়ে পড়ে। কান্না বা হা-হুতাশটা বড়ই সংক্রামক। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কবিতার মধ্যে 'আজারিয়া' বা হা-হুতোশ পর্বের পর দেখি 'ওমারিয়া' অর্থাৎ সম্ভোগ—যেটার সূত্রপাত হ'লো কড়ি ও কোমল-এ।

'কড়ি ও কোমল' সম্বন্ধে কবি বলেছেন যে, সেখান থেকে ডাঙা দেখা দিচ্ছে। কথাটা খুবই সত্য। এর আগে পর্যন্ত 'আজারিয়া' অর্থাৎ হৃদয়টি আছাড় খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে অজানা বেদনার নিবেদনে। কড়ি ও কোমলে সম্ভোগের তৃপ্তি স্পষ্ট হয়েছে।

এ-যুগের বাংলা কবিতা ছিল তৎকালীন ইংরেজী আজারিয়া কবিদের অনুকরণে মুখর; রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম ছিলেন। ইংরেজি কবিতা কত অনুবাদ করেছিলেন—তা নিশ্চয়ই অনেকের জানা। এরপর যখন একটু ডাঙা দেখা দিল কড়ি ও কোমলের কবিতার মধ্যে, তখনও যে অনুকরণের পালাটা শেষ হয়েছে—তা বলতে পারি নে। বাংলা সাহিত্যে কড়ি ও কোমলের মত কাব্য কি প্রকাশিত হয়েছিল? ওর ভাষা বাংলা, কিন্তু তার ছন্দ চতুষ্পদী সনেট, তার বিষয়বস্তু আমাদের অচেনা। প্রাচীন বাংলার কবিতার মধ্যে তার সুর ও রূপের সন্ধান বৃথা কালক্ষেপমাত্র।

এখানে একটা কথা মনে পড়ছে—কড়ি ও কোমল সম্বন্ধে আশু চৌধুরী বলেছিলেন যে, এর কতকগুলি কবিতার মধ্যে কোনো কোনো ফরাসী কবির ভাবের ছায়া পড়েছে। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ-বিষয়ে আমি অন্যত্র লিখেছি। সংক্ষেপে এখানে বলি। তরু দত্ত ও অরু দত্ত দুই বোনে Gleaming from French Sheaves অর্থাৎ বহু ফরাসী কবিতার অনুবাদ করেছিলেন; তাঁদের পিতা সেটা ছাপিয়েছিলেন। বইখানা ছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাইব্রেরীতে। সেটা থেকে কবি কি কিছু inspiration পান নি? গভীরভাবে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিলাতী পত্রিকা পড়তেন; পূর্বেই বলেছি হাতের কাছে যেটা আসতো, সেটাই পড়তেন কর্তব্যবোধে এরপর এই পড়া'ত হবে—তা কখনো করেছিলেন বলে মনে হয় না।

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি এবং ছিন্ন-পত্রাবলী—এই তিনখানা বই মোটামুটিভাবে হাতড়ালে তাঁর পড়ার পরিধি ও বৈচিত্র্যের আন্দাজ পাওয়া যাবে, এর সঙ্গে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনেক টাটকা খবর সংগ্রহ করতেন প্রিয়নাথের ও আশু চৌধুরীর কাছ থেকে। মধ্য বয়সে সেটা পেতেন অজিত চক্রবর্তীর নিকট থেকে—শেষ জীবনে অমিয় চক্রবর্তীর থেকে। মনটা সদাই চলতো—যেমন চলতো দেহটা। একটা স্থানে রবীন্দ্রনাথ কখনো দীর্ঘকাল থাকেন নি—একটা বিষয় লিখেও বেশীকাল কাটাতে পারেন নি। তাই তাঁর সাহিত্য এমন বৈচিত্র্যময়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সাহিত্যের তথ্য ও তত্ত্বরাজি প্রতিনিয়ত আধুনিক মানুষের মনের ও দেহের উপর তাদের কোমল, মধুর, কঠোর কটু স্পর্শ রেখে যাচ্ছে, তার থেকে নিষ্কৃতি নেই কারও। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেটা প্রযোজ্য।

আমরা প্রাচ্য দেশের লোক—এটা অতি সত্যকথা; কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের দেহ ও মনের দিকে যদি তাকাই, তবে দেখবো, আমাদের বারো আনি পাশ্চাত্য—অশন, আসন, বসন, ব্যসন সব। বিলাতী সিনেমায় কী ভিড়, ইংরেজি স্কুলে ছেলে-মেয়ে ভর্তি করতে না পারলে আপশোসে মরি। ঘরের লাইব্রেরীতে কয়খানা বই বেদান্ত?

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসু একবার বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাশ্চাত্যভাব বেশী। কথাটা উড়িয়ে দিতে পারা যায় না। এর কারণ ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের সমাজের মধ্যে তার অষ্টপাশী বাহু মেলতে আরম্ভ করেছিল। গত একশ বছরের মধ্যে আমাদের চারপুরুষের মজ্জায় মজ্জায় তা প্রবেশ করে এমন শক্ত বাঁধনে মনটা বেঁধেছে যে তার থেকে উদ্ধারের চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হবে, প্রাচীন যুগের পুঁথির মধ্যে ফিরে যাওয়ার প্রয়াসও তেমনি নিষ্ফল হবে।

এই বিদেশী সংস্কৃতির ছোঁয়াচ থেকে ঠাকুর পরিবার মুক্তি পান নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনী যাঁদের জানা আছে, তাঁরা এটা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন—পাশ্চাত্য অনেক কিছুই বাল্যকাল থেকে তাঁর মনোরাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি, সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল—কোনোটাই প্রাচ্য টোল, চতুষ্পাঠী, মকতব নয়। লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কাশীর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় নয়। বিলাতী নাচগান শেখা বৈদিক সংস্কৃতি অনুমোদিত নয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে ঋষি-মুনি বানিয়ে বল্কল পরাবার চেষ্টা দেখলে আমার হাসি পায়।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতা পড়েছিলেন, ভালো লাগতো তার ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গী। বৈষ্ণব পদাবলী অনুকরণে কেবল যে ভানুসিংহের কবিতা লিখেছিলেন, তা নয়; বহু কবিতা ও গান লিখেছেন বৈষ্ণবী ভাষায় ও ঢঙে। কিন্তু সে কবিতা কি খাঁটি বৈষ্ণবী হতে পারে? কারণ তাঁর বিশ্বাসের বুনিয়াদ ছিল অন্য স্তরে। সুতরাং যে-সব গানকে বৈষ্ণবী বলে আখ্যা দেওয়া হয়, সেগুলি ভানুসিংহের পদাবলী রচনার মতই সাহিত্যের পরীক্ষা। আর এ শ্রেণীর গান কয়টা? তাঁর অগণিত গান, কবিতা ও অন্যান্য রচনায় প্রেরণা তিনি কবি-কঙ্কণ, চণ্ডীমঙ্গল, বৌদ্ধ গান ও দোহা, মাণিকপীরের গান, বেহুলার ভাসান থেকে পেয়েছিলেন। Sophistry করে তাঁকে বোষ্টম বানাবার চেষ্টা হয়েছে, তাঁকে প্রতিমা-পূজার সমর্থক করা হয়েছে; রামকৃষ্ণ ঠাকুরের পায়ে মাথা কুটেছেন—একথা স্বকর্ণে শুনেছি। কিন্তু সত্যকথা তথ্য দিয়ে যদি প্রমাণ করতে হয়, তবে দেখা যাবে কবির মন ছিল পশ্চিমের চলার বেগের সুরের সঙ্গে গাঁথা। বিজ্ঞানী মেজাজ রাখবার সাধন ছিল—বিচার ও বিশ্লেষণ ছিল সংশ্লেষণী মনের বুনিয়াদ।

আচার ও বিচার বলে দুটো কথা আছে। আচার হচ্ছে tradition—যা দাঁড়িয়ে আছে—চলবার শক্তি যে হারিয়েছে। মন্বাদি নির্দিষ্ট ব্যবহার। বিচার হচ্ছে তত্ত্ব নির্ণয় বা মীমাংসার জন্য প্রচেষ্টা। সহজ সিদ্ধান্ত মেনে চললেই মুক্তি—এর জন্য বুদ্ধির মেহন্নত করতে হয় না। বিচার করতে হলে আলোচনা, বুদ্ধি-বিবেচনা, যুক্তি-তর্ক অনেক কিছুই করতে হয় অর্থাৎ মনটাকে সদাই সজাগ রাখতে হয়। আচার বদ্ধ জলের পুষ্করিণী, বিচার স্রোতস্বিনীর জলধারা। বিচার বলে চলো, আচার বলে থামো। রবীন্দ্রনাথের মন ছিল প্রধানত বিচারশীল, অর্থাৎ progressive। কিন্তু তাঁর প্রগতিবাদ নিছক গতিধর্মী নয়, তিনি প্রাচীন বা যা পূর্বে ফেলে এসেছি, তার সমস্ত আবর্জনা বহন করতে নারাজ, কিন্তু প্রাচীনের বা পূর্বকালের দানের মধ্যে যা শাশ্বতবাণী তাকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর মতে মানুষ সর্বদাই সৃষ্টি করে করেই চলেছে; কিন্তু সে একটা সৃষ্টির থেকে আরেকটা সৃষ্টিতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না—তার মধ্যে unity আছে—যেমন নদীর জলধারা। উৎস ও মোহনার মধ্যে নদী অচ্ছেদ্য-

বন্ধনে আটকা পড়ে আছে, কিন্তু তার জলের গুণগত বা রাশিগত পার্থক্য অনেক।

●

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন—এটা একটা বড় তথ্য তাঁর জীবনের। প্রায় পাঁচিশ বছর আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন চার বছর। তাঁর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের বুনিয়াদ ব্রাহ্মধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ধর্মদেশনাগুলি ব্রহ্মমন্দিরেই প্রদত্ত। ভাষণের মধ্যে তাঁর উধৃতি বেশীর ভাগই মহর্ষি সম্পাদিত ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ থেকে। তাঁর আদর্শ মানুষকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি লিখে দিয়েছিলেন 'রামমোহন রায়।' রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর বহু ভাষণ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। মোটকথা, রবীন্দ্রনাথের ধর্মের বুনিয়াদ যে ব্রাহ্মধর্মের উপর, সে কথা অস্বীকার করা যাবে না। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মধর্ম উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ ধর্মবাখ্যা করেছেন। তা যদি হয়—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের অন্যতম ব্যাখ্যাতা—তবে তো তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট। কিন্তু তথ্য বিচার করলে তা তো পাই না। প্রশ্ন উঠবে—কোন্ কোন্ উপনিষদ তিনি মেনেছিলেন এবং কোন্ পক্ষের মত—অর্থাৎ অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, বিশুদ্ধাদ্বৈত, শিবাদ্বৈত ইত্যাদির কোন্ বাদ তিনি অনুসরণ করেছিলেন? দেখা যায় তিনি কোনো উপনিষদকেই শাস্ত্র বলে স্বীকার করেন নি এবং কোনো মতবাদকে চরম বলে মানেন নি; নিজের আলোকে, নিজের বোধিচিত্ত উদ্বুদ্ধ intuition থেকে ধর্মকে দেখেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন আসে—১৮৯৯ সালে প্রথম যে ধর্মদেশনা লিখে, পিতাকে দেখিয়ে তাঁর মতানুযায়ী শুদ্ধ করে শান্তিনিকেতন মন্দিরে পাঠ করেন, সেই রচনা ও শান্তিনিকেতন মন্দিরের শেষ ভাষণ যা ১৯৪০ সালে পঠিত হয়—এই চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে রচিত প্রবন্ধদ্বয় কি একই বাণী ও বার্তা বহন করে রূপায়িত হয়েছিল? তথ্য একই—শান্তিনিকেতন মন্দিরের ভাষণ; কিন্তু তত্ত্ব কি একই? রবীন্দ্রনাথের লেখায় যদি একই ভাবনার পুনরাবৃত্তি (repetition of the same idea) দেখতে পাই, অথবা সেটা দেখাবার জন্য আমরা চেষ্টা করি, তবে কি কবির মাহাত্ম্য কীর্তিত হবে? তাঁর গান যেমন নানা বয়সের নানা রূপ ও রসের স্পর্শ পাই—তাঁর ধর্মভাবনায় বা তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও সেই বৈচিত্র্যেরই আমরা অনুসন্ধান করবো। 'চরৈবেতি—আগে চল, আগে চল' ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে, তা পুনরাবৃত্তি বা পুনরুক্তি নয়। অথচ গঙ্গোত্রী ও গঙ্গাসাগরের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগ আছে তা অনস্বীকার্য; রবীন্দ্রনাথের সদাচলমান মনের সৃষ্টির মধ্যে সেই গতিবাদই লক্ষ্যণীয়—progress in conformity with traditions। তাঁর চরৈবেতির আদর্শ creative unity revolution নয়—অর্থাৎ পুরাতনকে অস্বীকার করেন না। জীবনের ক্রমচলমান ঘটনারাজির সঙ্গে অন্তরের অনুভূতি যুগপৎ বিবর্তিত হয়ে চলেছিল, পরিবর্তিত বলছি নে—নদী যখন তার চলার পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরে তাকেই বলে পরিবর্তন- সেটাতে আনে প্লাবন। জীবনে পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলবো বিপ্লব। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধে বিপ্লবের জয়ধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু জীবনে তার প্রতিধ্বনি অস্পষ্ট। টলস্টয় বা গান্ধীর জীবনের সংগ্রাম কবিক্ষেত্রে অজ্ঞাত। কবির জীবনের সংগ্রাম অনাকাঙ্ক্ষাতের—

'আমার কী বেদনা সে কি জান
ওগো মিতা সুদূরের মিতা।

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা।'—

এ সেই কবিসুলভ আকাঙ্ক্ষারিয়া—যা পাইনি, তার জন্য বেদনা বোধ, কিন্তু এটাই শেষ কথা বা চরম অনুভূতি নয়: পাওয়ার আনন্দধ্বনি ওমারিয়া শোনা যায়। পাওয়ার সঙ্গে হওয়াটার অনেক ভেদ—রাজত্ব পাওয়া ও রাজা হওয়ার মধ্যে অনেক সংগ্রাম, অনেক দুঃখ। তথ্য ও তত্ত্ব জীবনে রূপায়িত না হতে পারলে যে বেদনা সেটাই কবির গানে ও কবিতায় বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাঁর না পাওয়া, না হওয়ার বেদনা মাঝে মাঝে কঠিন সন্দেহে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

তা দেখে কোন কোন সমালোচক কবিকে ঈশ্বর-অনস্তিত্ববাদী বলেও সন্দেহ করেছেন। বৈষ্ণবী ঢঙে কবিতা গান লিখেছেন বলে তাঁকে বোষ্টম বানানোর চেষ্টা যেমন অনর্থক, তেমনি জয় অজানার জয় বা ঐ শ্রেণীর উক্তি চয়ন করে তাঁকে নিরীশ্বরবাদী প্রমাণ করবার চেষ্টাকে অপপ্রয়াসই বলবো।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার আলোচনাকালে আমরা এ-কথা যেন বিস্মৃত না হই যে, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ও বিংশ শতকের চার-দশকের ধারণার মধ্যে অনেক পার্থক্য। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান [illegible] জড়-[illegible] জড় দিয়েছে হটিয়ে, দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, ইলেকট্রনিকস্ প্রভৃতি যন্ত্র বিশ্বের বিচিত্র শক্তিকে টেনে বের করে আনছে। বিজ্ঞানের জয়-যাত্রায়, তাদের রথের চাকার তলায় পুরাতন অনেক জীর্ণ মতের ভগ্ন-সৌধ চূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং প্রতিদিন যাচ্ছে। তাই যুগে যুগে মানুষকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান আহরণ করে, তার মত ও বিশ্বাসকে নূতন ছাঁচ ঢালতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মদেশনাগুলি সেই তত্ত্বর বিবর্তনের বাহক। সেটা সন্দেহবাদ নয়, অজ্ঞেয়বাদ নয়, দ্বৈতবাদ নয়, দ্বৈতাদ্বৈত বাদ হতেও বা পারে—কিন্তু বাদ-বিবাদের মধ্যে কবি প্রবেশ করেন নি। বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি এবং সরল ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা ভবুক ও কবি-দার্শনিকের চোখ দিয়ে দেখে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন, 'নৃত্যের তালে হে নটরাজ' দীর্ঘ কবিতাটি স্মরণীয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিকে, পদার্থের সঙ্গে প্রতীককে, তত্ত্বর সঙ্গে রসকে গ্রথিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্য দিয়ে কীভাবে বিজ্ঞানকথা রসোত্তীর্ণ করেছেন, সে-বিষয়ে ভালোরকম একটা বিস্তারিত আলোচনার অবসর আছে, হয়েছে কিনা জানি না।

আমরা তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। আমার বলবার মোট কথাটা হচ্ছে এই যে, তথ্য ও তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তথ্যবাদীদের আদর্শ বা তত্ত্ব বলে একটা পদার্থ আছে; নাস্তিকোরও তত্ত্ব খাড়া হতে পারে। তবে তথ্য যেমন প্রতিনিয়ত বদল হয়ে হয়ে চলেছে—তাতে হঠাৎ মনে হয় তথ্যগুলি সম্বন্ধশূন্য—উন্মত্তের প্রলাপ, তালমানহীন অসমছন্দের নৃত্য—আসলে তা নয়। তথ্যরাজি কার্যকারণের কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়—সমাজের 'শাসন' বা 'রাজশাসন' কোথা থেকে উদ্ভূত—তা যেমন প্রাকৃতজনের কাছে অজ্ঞাত—তেমনি কার্যকারণের সমস্ত পদ্ধতিটা অস্পষ্ট অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের মধ্যে ধরা পড়েনি বলেই—তার অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করা যায় না। আমাদের জ্ঞান সীমিত—প্রতিদিন জ্ঞানের নব নব প্রকোষ্ঠ খুলে যাচ্ছে। যা ছিল রহস্যাবৃত অন্ধকার কুঠরি—বিজ্ঞানের আলোয় বহুযুগের আঁধার ঘুচে যাচ্ছে। তাই কার্যকারণ বা তথ্য ও তত্ত্বের অজ্ঞাত ধাপগুলি একে একে আলোকিত হয়ে যাচ্ছে। এবং আমরা এই আপাতবিরুদ্ধ তথ্য ও তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করে চলেছি।

(সমাপ্ত)

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশচন্দ্র লেকচার]

কলারসিক

।। শিল্পী শ্রীপ্রশান্ত রায়ের প্রদর্শনী ।।

শিল্পী প্রশান্ত রায়ের নাম শান্তি-নিকেতনের বাইরে এখন প্রায় অজ্ঞাত। কারণ, দীর্ঘ পঁচিশ বছর শিল্পী রায়ের কোন প্রদর্শনী দেখার সুযোগ ঘটেনি অধিকাংশ শিল্প-রসিক নর-নারীর। তাই এককালে যে শিল্পী অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র-নন্দলালের প্রিয়তম শিষ্যরূপে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বাঙলা তথা ভারতের অজস্র শিল্পরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সাম্প্রতিক কালের মানুষের কাছে তিনি প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছিলেন। এই বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে প্রশান্ত রায়ের মত প্রাচীন শিল্পীকে যাঁরা দীর্ঘকাল পরে আবার

শিল্পী : প্রশান্ত রায়

জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করলেন, সেই শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘকে নিশ্চয় অভিনন্দন জানাবেন কলকাতার মানুষ।

আলোচ প্রদর্শনীতে শিল্পী রায়ের ৮২ খানি চিত্র-নিদর্শন স্থান পেয়েছিল। শিল্পীর চিত্রাঙ্কনের মাধ্যম জল-রঙ এবং ওয়াশ-পদ্ধতি। বাঙলা দেশে ওয়াশ-পদ্ধতির চিত্রাংকনে শিল্পগুরু অবনীন্দ্র-নাথ যে বিশেষ রীতি-নীতি প্রয়োগ করে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন অবনীন্দ্র-শিষ্য শিল্পী প্রশান্ত রায়ের চিত্রকলাতেও সেই রীতি-পদ্ধতি এবং কলা-নৈপুণ্য প্রায় অবিকৃতভাবে উপস্থিত। কিছুকাল আগে শিল্পী মনীষী দের একটি চিত্র-প্রদর্শনীতে আমরা ওয়াশ-পদ্ধতির যে চমৎকার রূপায়ণ দেখেছিলাম শিল্পী রায়ের প্রদর্শনীতেও সেই চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা গেল। ওয়াশ-পদ্ধতির চিত্রাংকনের সময় বিশেষ রঙের জন্য যে বিশেষ কাগজ ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং চিত্র-রচনায় যে সচেতনতা

শিল্পী : রাধেশ্যাম ঘোষ

একান্ত কাম্য—শিল্পী রায়ের প্রায় প্রতিটি চিত্র তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শিল্পী রায়ের চিত্র-বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃসর্গ দৃশ্য এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এই প্রদর্শনীর অনেকগুলি চিত্রে বাস্তবতার ঊর্ধ্বে এক আশ্চর্য রহস্যময় জগতের দ্বার-প্রান্তেও তিনি দর্শককে টেনে নিয়ে গিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর এই রহসময় চিত্রগুলির কয়েকটিতে কিউবিজমের প্রভাব লক্ষণীয়। এবং আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, গগনেন্দ্রনাথের কোন কোন ছবির কথা শিল্পী রায়ের প্রদর্শনী দেখার সময় মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে তাঁর 'অন্ধকার কক্ষের রাজা' (৩০), 'দীপাবলী' (৪৪), 'স্বপ্ন-রাজোর রাজপুত্র' (৫৩) প্রভৃতি চিত্রে গগনেন্দ্রনাথের প্রভাব নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

শিল্পী রায় তাঁর অপূর্ব ওয়াশ-পদ্ধতির সাহায্যে যেভাবে চিত্রে আলোর স্পর্শকে তুলে ধরেছেন তা মুগ্ধ হয়ে দেখার মত। এমনি চিত্রের মধ্যে 'ভ্রমণ-কারী' (১৬), 'জলপ্রপাত' (১৯), 'প্রতিমা বিসর্জন' (৬৮) প্রভৃতির নাম অনায়াসে করা যায়। ৭৪নং চিত্রের কাঠের সেতুর কালো রঙ আর নীচের সামান্য আন্দোলিত জলের অপূর্ব বর্ণ-সুষমা সত্যি ভুলবার নয়।

মূক-বধির ছাত্র-শিল্পীদের প্রদর্শনী

যে-সব শিশু মূক আর বধির হয়ে জন্মগ্রহণ করে তারা সমাজের কাছে অভিশাপ কিনা জানি না। কিন্তু সেই মূক আর বধির শিশু-কিশোরের দল যখন চিত্রের ভাষায় মুখর হয়ে ওঠে, বধিরতাকে দূরে ঠেলে ফেলে চোখের মণিতে শোনে জীব-জগতের কথা তখন তাদের জন্য যে সমাজের আশীর্বাদ বর্ষিত হবে, এ-কথা আমি নিশ্চিত জানি। মূকবধির বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত তাঁদের শিশু-কিশোরদের প্রদর্শনী দেখার পর দর্শকেরা সানন্দে সেই আশীর্বাদই পাঠিয়েছেন প্রতিটি মূকবধির শিশুর উদ্দেশে, এ-আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ছয় বছর বয়স পর্যন্ত যে-সব মূক-বধির ছাত্র এই আলোচ্য প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছে সামগ্রিকভাবে তাদের শিল্প-নৈপুণ্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। অবশ্য এদের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে ছাত্র-শিল্পী আশীষ কুমার মৈত্র (৬ বছর), রাধেশ্যাম ঘোষ (৭ বছর), অরুণকুমার গাঙ্গুলী (১১ বছর), দেবাশীষ পাল (১৩ বছর), মহম্মদ মহাসীন (১৩ বছর), সরলকুমার দাশ (১৩ বছর), নারায়ণ দত্ত (১৫ বছর), গুরুদাস কুণ্ডু (১৬ বছর) ও অমল বেরা (১৬ বছর) নিঃসন্দেহে অধিকতর প্রশংসার যোগ্য।

আশীষ মৈত্রের 'পড়া পড়া খেলা' (২) 'রেলগাড়ী ঝমু-ঝম', (৩) রাধেশ্যাম ঘোষের মৃৎশিল্প 'দুর্গাপ্রতিমা', অরুণ

শিল্পী : আর বালসুব্রাহ্মনিয়াম

গাঙ্গুলীর 'হাতী', মহম্মদ মহাসীনের 'ঈদ', (৭৪) 'শোভাযাত্রা' (৭৫) সরল কুমার দাশের 'কুয়াশা', (৮৮) 'সর্পিল পথ', (৯৩) নারায়ণ দত্তের 'বাঁশ ঝাড়', (১০৯), কুম্ভকারের দোকানের 'কম্পোজিশান', গুরুদাস কুণ্ডুর 'বাজার-করা' (১২৮), এবং অমল বেরার রান্নাঘরের বাস্তব চিত্র কিংবা ১৪৩ নং নিঃসর্গ দৃশ্যের মধ্যে জল-রঙের চমৎকার ব্যবহার এবং প্রতিটি চিত্রের সুন্দর সংস্থাপন এদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য ইতিমধ্যে সরলকুমার দাশ এবং অমলকুমার বেরা কমনওয়েলথ চিত্র প্রদর্শনীতে ১৯৬২ ও ৬৩ সালে প্রথম পুরস্কার লাভের সম্মান অর্জন করেছে।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,—

'জানাতে পারেন' বিভাগের আমি একজন নিয়মিত পাঠক। বহু চেষ্টা করে যেসব কথা জানতে পারিনি, তার সন্ধান পাই বলে এই বিভাগটি আমার খুব ভাল লাগে। আমার তিনটি প্রশ্ন তুলে ধরছি। উত্তর পেলে বিশেষ উপকৃত হব।

(১) ভারতবর্ষের সবচেয়ে উঁচু বাড়ী কোন্‌টি? ও কোথায়?

(২) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কোন্‌টি ও কত সালে স্থাপিত হয়েছিল?

(৩) আমাদের দেশে ইংরাজী-সাহিত্যে কোন ব্যক্তি কত সালে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গবেষণায় প্রথম সাফল্য লাভ করেন?

শক্তিরঞ্জন মাইতি
২য় বর্ষ বি-এ,
প্রভাতকুমার কলেজ, কাঁথি
মেদিনীপুর।

সবিনয় নিবেদন,—

আপনার সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। আপনার পত্রিকার জানাতে পারেন বিভাগটি চিত্তাকর্ষক। তাই কয়েকটি প্রশ্ন পাঠালাম। পাঠকমহল থেকে উত্তর পেলে বাধিত হব।

(১) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকদের যে ম্যাগসেসাই পুরস্কার দেওয়া হয়, তা সর্বপ্রথম কত খৃষ্টাব্দে শুরু হয়? এই পুরস্কারটি কি কারও স্মৃতি রক্ষার্থে দেওয়া হয়, যদি স্মৃতিরক্ষার্থে দেওয়া হয় তবে তিনি কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন? এই পুরস্কারের অধিকারী প্রথম ব্যক্তির নাম কি এবং কোন দেশের অধিবাসী?

(২) আমাদের ভারতবর্ষে কয়টি টেলিভিশন আছে এবং কোথায় কোথায় আছে সেগুলি। ভারতবর্ষে যে টেলিভিশন আছে তার দূরত্ব কত। অর্থাৎ কত মাইল দূরত্ব থেকে লক্ষ্য করা যায়।

অমূল্যকৃষ্ণ মৃধা
ডি সি ও এস অফিস
খড়গপুর.

সবিনয় নিবেদন,

সি-এম-পি-ও-এর পুরো নাম কি? দয়া করে যদি জানান' তাহলে বড়ই উপকৃত হব।

অনিলচন্দ্র সাহা
বাটানগর।

সবিনয় নিবেদন,

আমি অমৃতের জানাতে পারেন বিভাগের একজন নিয়মিত পাঠিকা। এই

বিভাগটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই বিভাগের মারফৎ আমি আমার নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের নিকট থেকে পাব :—

বড় গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

লীলা দে
পি-৩৮, রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ
দমদম, কলিকাতা : ২৮।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,—

গত ৪ঠা অক্টোবরের অমৃতে ধনঞ্জয় হালদারের এক, তিন ও চার নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

১। সাধারণতঃ কোন দেশের নাম জাতির নাম থেকে আসে। সেই অর্থে 'বঙ্গজাতির অধ্যুষিত অঞ্চল বঙ্গদেশ'।

বঙ্গ নামটির উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। চীন-তিব্বতী গোষ্ঠীর শব্দ থেকে বঙ্গ শব্দের মূল পাওয়া গেছে—এ অনুমান অনেকে করেন। তাঁদের মতে বঙ্গ শব্দের 'অং' অংশের সঙ্গে গঙ্গা হোয়াংহো ইয়াংশিকিয়াং শব্দের 'অং' অংশের সমতা আছে। সেইজন্য বঙ্গ শব্দের মূল অর্থ ধরেছেন জলাভূমি, কারণ আড়াই হাজার তিন হাজার বছর আগে বাংলা দেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলই ছিল জলাভূমি। এই অর্থে জলময় দেশে যারা আগাগোড়া বাস করত তারা বঙ্গ এবং তাদের অধ্যুষিত অঞ্চল বঙ্গদেশ। বঙ্গ নামের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। উৎসাহী পাঠক ডঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ) বা ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) পড়লে এবিষয়ে আরও অনেক তথ্য জানতে পারবেন।

৩। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' (১৭৪৩)। মানোএল দা আস্‌সুম্পসাম নামে একজন পর্তুগীজ পাদ্রী এই গ্রন্থের লেখক। তবে বইটি বাংলা হরফে ছাপা হয়নি। রোমান হরফে লিস্‌বন শহর থেকে ছাপা হয়। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের আগে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে ঢাকা-ভূষণার একজন ধর্মান্তরিত জমিদার-পুত্র দোম আন্তোনিও ধর্ম সম্বন্ধীয় একখানা বই লেখেন বাংলা ভাষায় এবং এই গ্রন্থটিও মনোএল-দা আস্‌সুম্পসাম্‌-এর উদ্যোগে রোমান হরফে ছাপা হয় (১৭৪৩)।

৪। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রথম বাংলা সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক) সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

অরুণা সরকার
৮নং কুন্দন লেন
লিলুয়া, হাওড়া।

সবিনয় নিবেদন,—

অমৃতে প্রকাশিত (৩য় বর্ষ ২৯শ সংখ্যা) প্রবীর মিত্রের প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দিচ্ছি।

গণতন্ত্র অর্থাৎ জনগণ কর্তৃক শাসন বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছিল সুপ্রাচীন কালে রোম এবং গ্রীসের ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে। তখন স্বল্পসংখ্যক পুরুষ অধিবাসীরা রাষ্ট্র-পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতেন। সুইস দেশের চারটি ক্ষুদ্র ক্যান্টনে গণতান্ত্রিক শাসন-শাসন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র উপভোগ করতে পারে না। পারে না নিজেদের সময়ের অভাবে এবং যোগ্যতার অভাবে। নাগরিক অধিকারভোগ এবং ভোটদানের দ্বারা প্রতিনিধি-নির্বাচনের মধ্যে বর্তমান গণতন্ত্রের পরোক্ষ রূপটাই প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সেইটাই বড়কথা নয়—গণতন্ত্রের পিছনের যে মহান্‌ আদর্শ আছে সেটি সব সময়েই পবিত্র। এই পবিত্র গণতন্ত্রের উদ্ভাবন এবং প্রবর্তন করে গ্রেট বৃটেন জগৎ-সভ্যতার অগ্রগতিকে এক অবিনশ্বর দানে ভূষিত করেছেন। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, আজকের প্রগতিশীল রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর গ্রেট বৃটেনের গণ-তান্ত্রিক চেতনার দ্বারা প্রভাবিত। গ্রেট বৃটেনে আজও রাজা বর্তমান—কিন্তু সে রাজতন্ত্র পবিত্র গণতন্ত্রের ধারক মাত্র।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, বিখ্যাত স্বর্ণলতা গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শিলালিপি, উপনিবেশ গ্রন্থের লেখক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভিন্ন ব্যক্তি। শেষোক্ত ব্যক্তি সাহিত্যকর্ম প্রকাশের ক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে পরিচিত। ইনি বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন।

মায়া সেন
৩৩, রাজা মণীন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৩৭।

কালো হরিণ চোখ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৬)

পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে আমার দেরী হয়েছিল। বাইরে তখন বেশ চড়া রোদ উঠেছে। ঘড়ির দিকে তাকালাম, প্রায় আটটা বাজে। গত রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, উত্তেজনার মধ্যে কেটে গিয়েছিল, তাই বোধহয় ভোর-রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য আমাকে কেউ ডাকল না কেন! অন্যদিন সাড়ে ছ'টা বেজে গেলে লক্ষ্মীর মা এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। আরো বেলা হলে তো রক্ষা নেই। তুবড়ী ব্রজবালা দেবীর ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে টেনে তোলে। আজ তারা কেউ এল না কেন। হয়তো বা এমনও হতে পারে দরজায় ওরা টোকা মেরেছে, আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম বলে শুনতে পাইনি।

মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে ঘরের বাইরে এসে আমি বিস্মিত হলাম। ব্রজবালা দেবীর ঘরের দরজায় লক্ষ্মীর মা, দরোয়ান, সরকারবাবু, আরো অনেকে জড় হয়েছে। সকলেরই দৃষ্টি ঘরের ভেতরে নিবদ্ধ। চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া। আমিও নিঃশব্দে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। উঁকি মেরে দেখলাম খাটের উপর ব্রজবালা দেবী শুয়ে রয়েছেন, মাথার কাছে দিদিমণি বসে। কাছেই দাঁড়িয়ে একজন ডাক্তার, গলায় একটা স্টেথিস্কোপ ঝুলছে, হাতে ব্লাড-প্রেসার মাপার যন্ত্র। ভদ্রলোককে আগে আমি দেখেছি বলে মনে হল না। মেঝেতে এক কোণে তুবড়ী উপুড় হয়ে বসে রয়েছে, তারও মুখ বিষণ্ণ।

আমি লক্ষ্মীর মাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? লক্ষ্মীর মা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ভোর থেকে এই অবস্থা। এক-একবার জ্ঞান আসছে আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন।

—আমায় ডাকনি কেন?

—সবাই ছুটোছুটি করছি। আপনি যে শুয়ে আছেন, তা হুঁশই হয়নি। ভাগ্যিস দিদিমণি এই সময় এসে পড়েছিলেন, তা নাহলে কি যে হত দিদিমার।

আমি আর ওর সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। দিদিমণি আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করেই বোধহয় ডাক্তারবাবুও ঘাড় ফিরিয়ে আমায় একবার দেখলেন।

আমি দিদিমণির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ব্রজবালা দেবী চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন। শুধু নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে বুকের যেটুকু স্পন্দন তাই দেখা যাচ্ছে। আর সব অঙ্গ যেন অসাড়। পা দুটো সাদা ফ্যাকাসে, মুখের রঙও তেমনি পান্ডুর।

ডাক্তার চাপা গলায় বললেন, প্রেস্‌-ক্রিপশান লিখে দিলাম, যত শীঘ্র পারেন ওষুধগুলো আনিয়ে নিন। দুপুরের মধ্যে আমাকে রিপোর্ট দেবেন উনি কেমন থাকেন। প্রয়োজন হলে আমায় আবার আসতে হবে। যদি ওষুধে কাজ না দেয়, ইনজেকশান ছাড়া উপায় নেই।

দিদিমণি মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, ব্লাড-প্রেসার?

—বেশ হাই।

—ওই একটাই তো ও'র অসুখ।

—খুব সাবধান হতে হবে। যিনি ওষুধ দেবেন, ক'বার ক'টা বড়ি লিখেছি ভাল করে যেন দেখে নেন। এসব ডোজ কম হলেও খারাপ, বেশি হলেও খারাপ।

ডাক্তার আরো অনেক রকম নির্দেশ দিলেন দিদিমণিকে। আমি সে সব কথা মন দিয়ে শুনিনি, শুধু ভাববার চেষ্টা করছিলাম, কেন ব্রজবালা দেবী হঠাৎ এতটা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কালকেও তো তাঁকে বেশ ভালই দেখেছি। কি কারণ হতে পারে।

দিদিমণি ডাক্তারকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, আমি খাটের কাছেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। উনি তো আমায় কোন নির্দেশ দিয়ে গেলেন না, কি করা উচিত, সে-কথাও ভাবছি। আমিও কি দিদিমণির মত ও'র শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেব। কিন্তু তাতে যদি দিদিমণি অসন্তুষ্ট হন। কাল থেকে উনি যে আমার উপর বিরক্ত হয়ে আছেন, তা ও'র ব্যবহারে সর্বক্ষণই বুঝিয়ে দিচ্ছেন আমাকে। আমি ইচ্ছে করেই তাঁর এই বিরক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করতে চাইছি না।

মিনিট পাঁচেক বাদে দিদিমণি আবার ঘরে ফিরে এলেন। দরজার কাছ থেকে ইঙ্গিতে আমায় ডাকলেন। বললেন, অর্পিতা, এঘর ছেড়ে তুমি এখন আর কোথাও নড়বে না। আমি এ ওষুধগুলো কিনতে চন্দননগর যাচ্ছি।

বললাম, দরকার হলে আমিও ওষুধ কিনে আনতে পারি। যদি উনি হঠাৎ আপনাকে ডাকেন।

দিদিমণি বলেন, না, তুমি পারবে না। চেনাশুনো না থাকলে আজকালকার বাজারে সব ওষুধ পাওয়া মুস্কিল।

জিজ্ঞেস করলাম, এ ডাক্তারবাবুটি কে?

—ডাক্তার লাহিড়ী। খুব নামজাদা ডাক্তার। এ-বাড়ীর যে-কোন শক্ত অসুখে ও'কেই ডেকে আনা হয়।

কথা বলতে বলতে দিদিমণি চোখ দুটো আঁচল দিয়ে মুছলেন। সারা রাত কাল যা কেটেছে।

—কেন?

—কাল রাত্রিতেই তো মার এই অবস্থা। তোমরা খাওয়া-দাওয়া করে যে যার ঘরে চলে গেলে, আমি ও'র সঙ্গে বসে গল্প করছি, তার মধ্যে হঠাৎ ব্যথা শুরু হয়ে গেল। সারারাত ঠায় ওই মাথার কাছে বসে আছি। এখন বিপদটা কাটলে বাঁচি।

কথা শুনতে শুনতে আমি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলাম না—গত রাত্রে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ব্রজবালা দেবী আমার ঘরে এসেছিলেন।

দিদিমণি বলে যান, এ সময় আমার চুঁচড়োয় আসার কোন কথাই ছিল না। কথায় বলে নাড়ীর টান। তা না'হলে কে আমাকে টানতে টানতে এখানে নিয়ে এল। আর যদি না আসতাম কি বিপদেই তোমরা পড়তে বল তো?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না, মাথা নীচু করে রইলাম, তখনও ভাববার চেষ্টা করছি, সত্যিই ব্রজবালা দেবী আমার ঘরে এসেছিলেন, না আমি স্বপ্ন দেখেছি।

দিদিমণি চলে যাবার পর আমি প্রথম অবসরেই ছুটে গেলাম নিজের ঘরে। খাটের তোষক উঁচু করে দেখলাম, আমার ধারণা মিথ্যে নয়, ব্রজবালা দেবীর দেওয়া কাল রাত্রের সেই ব্যাগ-খানা ঠিকই রয়েছে। তবে তো আমি স্বপ্ন দেখিনি। তবে তো উনি ঠিকই এসেছিলেন। গভীর রাত পর্যন্ত দিদি-মণির পায়ের শব্দ আমি বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে শুনেছি, দেখেছি গঙ্গার ধারের বাড়ীতে সেই ভয়াবহ আলো জ্বলতে, তবে কেন দিদিমণি এতক্ষণ ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, উনি সারা রাত ধরে মায়ের সেবা করেছেন। কেন দিদিমণি আমাকে মিথ্যা বললেন।

বেশ অনেকক্ষণ বাদে ব্রজবালা দেবী চোখ মেলে চাইলেন। আমাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছেন। চিনতে পেরেই মৃদু হাসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন কেমন আছেন?

—ভাল।

—কোথাও কষ্ট হচ্ছে?

—ব্রজবালা দেবী মাথা নাড়লেন, ক্লান্তিতে ও'র চোখ আবার বন্ধ হয়ে আসছিল, কোনরকমে টেনে খুলে জিজ্ঞেস করলেন, দিদিমণি!

—ওষুধ আনতে গেছেন।

—ঘরে আর কে আছে?

—আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

—ঐ ব্যাগটা?

বললাম, আমি যত্ন করে রেখেছি।

—গগন কোথায়?

—আর আসেনি।

—ফোন করে খবর দিও, Seeker কাগজের অফিসে। ওরা বলে দেবে। আজকেই, ভুল না।

ব্রজবালা দেবী আবার ঘুমিয়ে পড়লেন, আমিও চুপচাপ মাথার কাছে বসে রইলাম।

দুপুরবেলা ঘণ্টাখানেকের মত ছুটি পেয়েছিলাম। তার মধ্যে চান করে, খেয়ে ব্রজবালা দেবীর কাছে আমার ফিরে যাবার কথা, আমি কিন্তু এ-সুযোগ হারাতে চাইলাম না। নাইবা হল চান, নাইবা হল খাওয়া। গগন সেনকে খবরটা দিতেই হবে। সে আমার সঙ্গে যে ব্যবহারই করে থাকুক না কেন, সে নিয়ে বোঝাপড়া করার সময় এটা নয়। অন্ততঃ বৃদ্ধার অনুরোধ রাখতেও তাকে আমায় খবরটা দেওয়া দরকার।

আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে সাইকেল-রিক্সা করে সোজা গিয়ে হাজির হলাম থানায়। কাছাকাছির মধ্যে ঐখান থেকেই ফোন করার সুবিধে। দু'-একবার চেষ্টা করতেই কলকাতার কাগজের অফিস পেয়ে গেলাম, কিন্তু যাকে খুঁজছি, তাকে পেলাম না। অফিস থেকে জানাল, Seeker রোজ সেখানে যান না, তবে কোন খবর দেওয়ার থাকলে লোক-মারফৎ Seeker-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।

আমি অনুনয় করে বললাম, বিশেষ জরুরী ব্যাপার, Seeker-এর ঠিকানাটা আমাকে দিন, সম্ভব হলে এখান থেকে আমরাও সরাসরি লোক পাঠাব।

কিন্তু তারা ঠিকানা দিল না, জানাল, Seeker-এর মানা আছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে ব্রজবালা দেবীর অসুখের কথা তাঁকে দিতে বলে আমি লাইন রেখে দিলাম।

একরকম ব্যর্থমনোরথ হয়েই বাড়ীতে ফিরে এলাম। এতটুকু খেতে ইচ্ছে করল না, বাড়া ভাত সরিয়ে দিলাম একপাশে। নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ হচ্ছে। দুদিন আগেও মনে হয়েছিল, জীবন আমার কাছে কত অর্থপূর্ণ, কত সম্ভাবনাময়। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে একি পরিবর্তন! কেমন করে এ সম্ভব হল। কথা দিয়েও গগন এল না, একটা খোঁজ পর্যন্তও নিল না। মানুষ কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারে। আমার দিক থেকে তো কোন ফাঁকি নেই। আমি তাকে ভাল-বেসেছি, সর্বান্তঃকরণে পেতে চেয়েছি, কেন সে এরকম নির্দয়ভাবে আমার বিশ্বাস ভেঙ্গে দিল। বার বার আমার চোখ জলে ভরে এল। আমি তা মুছে ফেলার মিথ্যে চেষ্টা করলাম। বুকের ভেতর থেকে চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। ব্রজবালা দেবী আমাকে সত্যিই স্নেহ করেন। সব সময় আমাকে আগলে রাখতে চান। অথচ আজ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমার যা কপাল মন্দ কি ঘটে কে বলতে পারে। সত্যিই যদি এই মমতাময়ী মাতৃস্বরূপিনী ভদ্রমহিলা —, না, সে অমঙ্গল চিন্তা আমি কিছুতেই করব না। তাহলে যে আমার বেঁচে থাকার আর কোন অর্থই থাকবে না। কি নিয়ে আমি বাঁচব। সব আশার স্বপ্নই যে আমার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

এরপর থেকে সারাক্ষণই কেমন যেন আমার ঘোরের মধ্যে কেটেছে। দিদিমণি যা করতে বলেছেন আমি করেছি, কিন্তু নিজের কোন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার চেষ্টা করিনি। নেহাৎই দর্শকের মত আমি দেখেছি ডাক্তার আসছে, পরীক্ষা করছে, ওষুধ দিচ্ছে, ফিস্‌ফাস্ কথা বলছে সবাই। অতি সন্তর্পণে যেন একটি দীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ দমকা হাওয়া ঢুকে পড়লেই যে-কোন মুহূর্তেই সে দীপ নিভে যাবে। সকলেই সন্ত্রস্ত, চোখে-মুখে আতঙ্ক।

এরই মধ্যে এক সময় ডাক্তার লাহিড়ী আমায় বললেন, আপনারই নাম অর্পিতা দেবী?

বললাম, হ্যাঁ।

—সন্ধ্যের পর থেকে ওষুধপত্র আপনি নিজে হাতে দেবেন।

—কেন, দিদিমণি তো দেখছেন।

উনি বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছেন, নিজের মা তো। বুঝতেই পারছেন, নার্ভাস হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া ও'রও রেস্ট নেওয়া দরকার, নয়ত উনিও অসুখে পড়ে যাবেন।

বললাম, আপনি যখন বলছেন, তাই হবে, আমি ওষুধ দেব।

ডাক্তার লাহিড়ী বোধহয় একথা দিদিমণিকেও বলে গিয়েছিলেন, তাই ওষুধ দেবার ভার আমি নিজে হাতে নেওয়ায় উনিও কোন আপত্তি করলেন না। বরং কোমল স্বরেই বললেন, তোমার উপরও কম ধকল যাচ্ছে না অর্পিতা, এসব অসুখের সেবা করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

কি খেয়াল হল জিজ্ঞেস করলাম, সাধুজিকে একবার খবর দেবেন না, হয়ত মায়ের অসুখ শুনলে, এসে পড়বেন।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দিদিমণি আবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, না, আমি কোন খবর দেব না।

—কেন?

—ওদের জন্যেই আমার মার শরীরের আজ এই অবস্থা, ভাবনায়-চিন্তায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছেন। এসময় এসে সে করবেই বা কি? বরং তাকে দেখলে আমি বিরক্তই হব।

আমি আর কথা বাড়াতে সাহস করলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম চিঠিতে সাধুজিকে খবরটা আমি দিয়ে দেব, সেটা জানান আমার কর্তব্য। আসা না-আসা ও'র ইচ্ছা। যদি নাও আসেন অন্ততঃ মায়ের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনাও তো করতে পারবেন যদি তিনি প্রয়োজন মনে করেন।

একটির পর একটি বিনিদ্র রজনী আমার কাটতে লাগল। কিছুতেই আমি ঘুমতে পারি না। অন্ধকার ঘরের মধ্যে পায়চারি করি। আমার ঘর থেকে ব্রজবালা দেবীর ঘর, মাঝখানের দরজা এখন খোলাই থাকে। কখন কি দরকার পড়ে কে বলতে পারে। রাতজাগা পাখীর ডাকে আর ভয় করে না, ভয় করে না শুকনো পাতার উপর খড়মড়ে পদশব্দ শুনে। বুঝেছি এ বাড়ীর সঙ্গে ঐ অদ্ভুত আওয়াজগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আগে ভয় পেতাম অজানা আশঙ্কায়। এখন আর কিসের আশঙ্কা। সত্যিই যদি ব্রজবালা দেবী আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে যান, এখানকার পাটও আমার উঠে যাবে, আবার নতুন করে শুরু করতে হবে জীবন। আর যদিও বা সুস্থ হয়ে ওঠেন দিদিমণি হয়তো আমাকে রাখতে চাইবেন না। যে কোন অছিলায় সরিয়ে দেবেন। আর গগন, না তার কথা আর ভাবতে ইচ্ছা করে না, ভাবতেও বিশ্রী লাগছে আমাকে নিয়ে সে এতদিন ছেলেখেলা করেছিল। এই বোধহয় পুরুষমানুষের দস্তুর।

রাত্রিবেলাও মাঝে মাঝে ব্রজবালা দেবীর সঙ্গে অল্পস্বল্প কথা হয়। হঠাৎ যদি ওনার ঘুম ভাঙে, হয়ত জল খেতে চান, নয়ত মাথার বালিশটা ঠিক করে দিতে বলেন, জিজ্ঞেস করেন, এখনও রাত কাটেনি মা।

আমি উত্তর দিই, না।

—এত ঘুম হচ্ছে কেন? কিছুতেই যে চোখ খুলে রাখতে পারি না।

- ডাক্তারবাবু হয়ত সেইরকম ওষুধ দিয়েছেন।

ব্রজবালা দেবী চোখ দুটো খুলে রাখার বৃথা চেষ্টা করেন, ঘুমের ওষুধ দিচ্ছে, কেন? কি হয়েছে আমার?

আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলি, কাল থেকেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই দুদিনেই তো কত সামলে উঠেছেন।

বৃদ্ধা ম্লান হাসেন, আর কি হবে সামলে উঠে, বয়সও হয়েছে, এবার গেলেই হয়।

তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, ও কি মা, কাঁদছ! না, না, আমার জন্যে ভেব না, তাছাড়া তোমাদের সব ব্যবস্থা তো করে দিয়েছি, এখন আর আমার কোন চিন্তা নেই।

ওঁর কথা শুনে চোখে আমার আরো জল এল, উনি এখনও গগনের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ভাবছেন। কিন্তু সে যে না বলেকয়ে উধাও হয়ে গেছে—একথা জানলে উনিই নিজে আরও কষ্ট পাবেন। আর সেকথা এখন বলে লাভই বা কি। যদি এবাড়ী ছেড়ে চলেই যাই, যদি গগনের সঙ্গে আর দেখা নাই হয়, ব্রজবালা দেবীর দেওয়া ওই ব্যাগ আমি দিদিমণির হাতেই তুলে দেব। তারপর যা হয় উনি করবেন।

ব্রজবালা দেবী ঘুমিয়ে পড়লেন। ক্লান্ত অবসন্ন মুখখানার দিকে দেখতে দেখতে মেজদির কথা মনে পড়ছে। এমনি করেই সেও বিছানায় শুয়ে থাকত, এইভাবে তার মাথার কাছে বসে আমিও কত রাত কাটিয়েছি।

দিদিমণি এসে মাঝে মাঝে আমাকে ঘরে পাঠিয়ে দেন, বলেন, যাও, তুমি বিশ্রাম নাও গে অর্পিতা। আমি মার কাছে আছি।

আমি হয়তো আপত্তি করে বলেছি, ঠিক আছে, আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

দিদিমণি বলেছেন, তুমি ছেলেমানুষ, দেখছি তো বসে বসে ঢুলছ, রাত জাগা তোমার অভ্যেস নেই। তাছাড়া ভয় করে কি জানো? ঘুমের ঘোরে ওষুধের মাত্রা না বেশি ঢেলে ফেল।

একথার আমি উত্তর দিইনি, কারণ জানতাম এধরনের ভুল হওয়ার কোনরকম সম্ভবনাই নেই, মেজদিকে যে আমি কত না মারাত্মক ওষুধ মাপ করে ঢেলে দিয়েছি। একদিনও মাত্রায় ভুল হয়নি।

কিন্তু আশ্চর্য, দুদিন পরে ভোর-রাত্রে আমাকে ঘুম থেকে জোর করে তোলা হল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সামনে দাঁড়িয়ে দিদিমণি, কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলেন, রাত বারটার সময় মাকে ওষুধ দাওনি অর্পিতা?

এ প্রশ্নে চমকে উঠলাম, কেন, দিয়েছি তো।

আমার মাথার কাছ থেকে পুরুষ কণ্ঠে প্রশ্ন হল, ঘড়ি ঠিক দেখেছিলেন?

ফিরে তাকালাম, ডাক্তার লাহিড়ী সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, বললাম, হ্যাঁ, দেখেছিলাম। এই তো আমার হাতে ঘড়ি বাঁধা রয়েছে।

ডাক্তার লাহিড়ী গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, ওষুধ বেশি দিয়েছিলেন কেন, ওনার কি কষ্ট হচ্ছিল?

গলা আমার কাঁপছে, বললাম, বেশি তো দিইনি। রোজ যা দিই,

ওদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে আমি ছুটলাম ব্রজবালা দেবীর ঘরের দিকে। দরজা পর্যন্ত গিয়ে পা যেন আমার থেমে গেল। আমি চৌকাঠ পেরতে পারলাম না, মনে হল দুখানা বলিষ্ঠ হাত আমার কাঁধ দুটো চেপে ধরেছে। আমি ভাবলাম চীৎকার করে বলি ছেড়ে দাও আমাকে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বার হল না। ঘরের ভেতরটা ভাল করে দেখলাম, ব্রজবালা দেবীর শরীরটা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। কই মুখখানা তো দেখতে পাচ্ছি না। সাদা কাগজের মত মুখখানাও কি চাদরের সঙ্গে মিশে গেছে নাকি!

"......মাকে ওষুধ দাওনি অর্পিতা?"

—তা তো হতে পারে না, কাল বিকেলবেলা ওষুধের নতুন শিশি এসেছিল।

—তা আমি জানি।

—এখন শিশিতে অর্ধেকটা ওষুধ রয়েছে, তার মানে বাকিটা আপনি রোগিণীকে খাইয়েছেন, তার কি মারাত্মক ফল জানেন?

ওদের কথাবার্তা শুনেই আমার বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, চীৎকার করে খাট থেকে লাফিয়ে উঠলাম, কি হয়েছে? কর্তামা কেমন আছেন?

না, মুখের উপরও চাদর ঢেকে দিয়েছে।

বুকের ভেতরটা আমার ধড়ফড় করে উঠল, শুধু অস্ফুট স্বরে বললাম, ভগবান এ তুমি কি করলে?

নিমেষের মধ্যে চোখে অন্ধকার দেখলাম। দেহ অবশ হয়ে নেতিয়ে পড়ল। অন্যরা ধরে ছিল বলেই বোধহয় মাটিতে আছাড় খেলাম না।

(ক্রমশঃ)
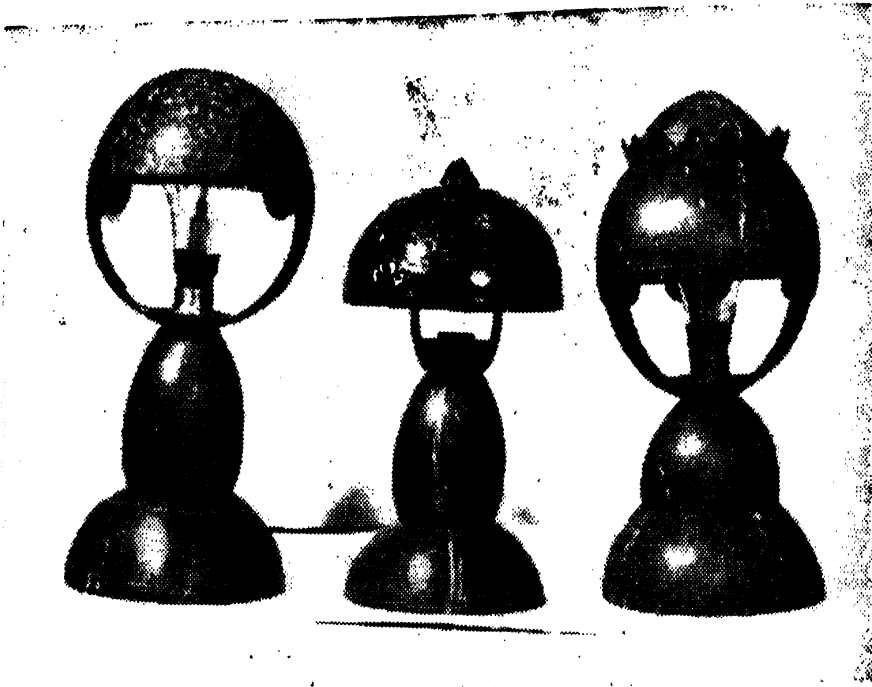
অপ্রয়োজনের প্রয়োজন

☆ ☆ ☆ ☆ সুশান্তকুমার পাঠক ☆ ☆ ☆ ☆

সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজনে কত রকম জিনিসই তো রোজ বাড়ীতে আসে। যেমন ধরুন—মাছ, ডিম, নানা-রকম তরিতরকারী, বেল, কদবেল, নারকল ইত্যাদি। নানারকমের ওষুধপত্র এবং প্রসাধনদ্রব্য। ব্যবহারের পর পড়ে থাকে মাছের আঁশ, ডিমের খোলা, নারকেলের মালা, বেল-কদবেলের খোলা, খালি টিন, কাগজের বাক্স, কৌটো ইত্যাদি। এদের মধ্যে কিছু কিছু যেমন—টিন, বাক্স, কৌটো ইত্যাদি মসলাপাতি এবং অন্যান্য টুকিটাকি রাখবার জন্য সংসারের কাজে লেগে যায়। আর অবশিষ্টগুলি, যেমন—ডিমের খোলা, নারকেলের মালা, বেল-কদবেলের খোলা, সাধারণতই ফেলা যায় কিংবা আস্তাকুঁড়ে অথবা উনুনে যায়। এদের মধ্যে যেগুলি নিতান্ত সৌভাগ্যবান, সেগুলি হয়ত শৌখিন ঘর সাজাবার উপকরণ হয়ে কিছুদিনের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে।

এই সব ফেল্‌না জিনিসের সব-চাইতে সদ্ব্যবহার কি করে করা যায়; কেবল শৌখিন নয়, কিছু কাজের অথচ শৌখিন জিনিসপত্র কি কি এর থেকে তৈরী করা যেতে পারে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এর তাৎপর্যই বা কি, এই প্রশ্নগুলি গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের ভাবিয়ে এবং খাটিয়ে তুলেছে। এই ক'বছরে নিরন্তর অনুসন্ধানের ফলে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। যেমন, নারকেল-মালার থেকে সাধারণতঃ যেসব জিনিস তৈরী করা হয়, তা ছাড়াও আরও অনেক রকম জিনিস তৈরী করা যায় এবং সেগুলি বেশ কাজেরও হয়। বেলের খোলাকে আমরা যতটা পল্‌কা বলে মনে করি, তার চেয়ে তা অনেক শক্ত। ঠিকমত পরিষ্কার এবং পালিশ করতে পারলে এর রঙ হয় অতি চমৎকার। এবং তা থেকে নানা জিনিস তৈরী করা সম্ভব। কদবেলের খোল তো রীতিমত শক্ত। এদের বাজার থেকে কিনে এনে গোটা-দুয়েক আছাড় মেরে ভাঙতেই আমরা অভ্যস্ত, এবং তারপর শাঁসটি সংগ্রহ হয়ে যাবার পর, খোলের খবর আর কে রাখে। কিন্তু যে কেউ একটু কষ্ট করে একটা ছোট ফুটো দিয়ে শাঁসটা বার করে নিয়ে খোলাটাকে একটু পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিলে এ-কথার সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। এছাড়াও আমরা দেখেছি যে, তালের ছোবড়া বেশ কাজের জিনিস এবং পরিষ্কার করলে এর রঙও খুব সুন্দর হয়। আর, বাঁশের টুক্‌রোটাক্‌রা দিয়ে কত রকম নতুন খেলনাই যে তৈরী করা

যায়, তা বলে শেষ করা যায় না। এ প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত বাঁশ, নারকেল-মালা, বেল এবং কদবেলের খোলা থেকে তৈরী নানারকম জিনিসের ছবিগুলি দেখলেই এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

প্রথমে নারকেল-মালার কথাই বিশেষ করে বলা যাক। কারণ, রঙ, দৃঢ়তা ও আয়তনের বৈচিত্র্য এবং আরও কতগুলি বিশেষ গুণের জন্যে ওপরের যে-কটি জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এর ব্যবসায়িক ও শৈল্পিক সম্ভাবনাই সবচাইতে বেশি। নারকেল-মালা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর পালিশ নেবার উপযোগী। এর ওপর রঙের কাজ সম্ভব এবং সূক্ষ্ম খোদাই-কাজের জন্যও এর উপযোগিতা অসামান্য। এই ক'বছর ধরে সবরকম শাঁস এবং জল পরিত্যাগ করে আমরা যে শুধু খোল নিয়ে পড়ে আছি, সুখের বিষয়, আমাদের সেই কৃচ্ছ্রসাধন বৃথা হয়নি।

নারকেল-মালার জিনিস মোটেই নতুন কিছু নয় এবং কয়েক ধরনের জিনিস কলকাতার বিভিন্ন দোকানেও পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা সব সময়েই চেষ্টা করেছি, কি করে খাঁটি নারকেল-মালার জিনিস তৈরী করা যায়। অর্থাৎ নারকেল-মালা ছাড়া আর কোন জিনিসের সাহায্য আমরা নিইনি। এবং এইভাবে খাঁটি নারকেল-মালার পঞ্চাশ-টিরও বেশী জিনিস তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে আছে নানারকমের টেবল-ল্যাম্প, ওয়াল ল্যাম্প, ধূপদানি, ফুলদানি, এ্যাসট্রে ইত্যাদি কাজের জিনিস এবং চেয়ার, টেবল, হাঁড়ি, কড়াই, উনুন ইত্যাদি নানা খেলনা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কুশলী কারিগরের হাতে পড়লে এর থেকে আরও অনেক রকমের জিনিসই তৈরী করা সম্ভব হবে এবং কুটীরশিল্পে একটি অতি মূল্যবান কাঁচামাল হিসেবে নারকেল-মালা অধিকতর মর্যাদার অধিকারী হবে।

সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বিশেষ একটি রাসায়নিক দ্রবণে ডুবিয়ে নারকেল-মালার রঙকে গাঢ় কালো রঙে পরিণত করা যায়। অথচ এর সাদা ডোরাগুলো সাদাই থেকে যায়। রাসায়নিক প্রয়োগ করার আগে মালার গায়ে গলানো মোম দিয়ে ছবি এঁকে দিলে বাটীকের কাজের মতন ফল পাওয়া যায়।

—ধর দেখি একটা আঙুল,
বাসে যাব না ট্রেনে যাব—

নারকেলের কোন কিছুই ফেলা যায় না বলে একে কেন্দ্র করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প গড়ে উঠতে পারে। গোটা নারকেলকে কাঁচামাল হিসাবে নিয়ে ছোবড়া ও শাঁস থেকে তেল, খৈল, দড়ি, পাপোষ, কার্পেট ইত্যাদি তৈরী করে বিক্রী করলে লাভের পরেও মালা পড়ে থাকে। সামান্য মূলধন প্রয়োগ করেই যাকে মূল্যবান শিল্পদ্রব্যে প্রয়োগ করা যায়, এগুলো তৈরী হয়ে যাবার পরেও যে অব্যবহার্য ছোট টুকরোগুলো পড়ে থাকে, সেগুলো থেকেও "Activated charcoal" এবং অন্যান্য দ্রব্য তৈরী করা সম্ভব হতে পারে। বাংলাদেশে নারকেলের উৎপাদন সম্ভাবনা কম নয় এবং দক্ষ কারিগরেরও অভাব নয়। ব্যবসাটি গড়ে তুলতে মোটা অঙ্কের মূলধনেরও প্রয়োজন নেই। অতএব আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পশ্চিমবাংলায় নারকেলকে কেন্দ্র করে একটি লাভজনক শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব।

পরিশেষে পাঠকসাধারণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপন করি। সরকারী তরফ থেকে কুটীরশিল্পের বাটিকের কাজ করে অথবা খোদাইয়ের সংরক্ষণ এবং উন্নতিবিধানের জন্য উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুটীরশিল্পের মত অধিকাংশ জিনিসই অত্যধিক মূল্যের জন্য স্বল্পবিত্ত জনসাধারণের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। ফলে কালেভদ্রে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে উপহার ইত্যাদির জন্য ছাড়া আমরা বড় একটা কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের দিকে ঝুঁকি না। আরও একটা কথা এই যে, এইগুলি বেশির ভাগই শৌখিন ঘর সাজাবার উপকরণ এবং দৈনন্দিন সংসারযাত্রার সঙ্গে এদের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। আশা করি, কেউ ভুল বুঝবেন না যে, আমরা ব্যবহারিক মানদণ্ডে শিল্পদ্রব্যের মূল্যবিচার করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এ-কথাও সত্যি যে, কুটীরশিল্পের একটা ব্যবসায়িক দিকও আছে এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীন-ভাবে কোন ব্যবসায় দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে বলে আমাদের মনে হয় না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে, আমাদের প্রস্তাব এই যে, কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যে সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রয়োজনীয়তার গুণও যুক্ত করার চেষ্টা করা উচিত। দাম কমাবার জন্যে একই দ্রব্যের নানারকম সংস্করণ করা যেতে পারে। যেমন, একটি নারকেল-মালার টেবল-ল্যাম্প,

নারকেলের মালা থেকে তৈরী কয়েকটি সুদৃশ্য দ্রব্য

নারকেলের মালা দিয়ে তৈরী আরো কয়েকটি জিনিসের নমুনা

শুধু পালিশ করে, রঙের কাজ করে, বাটিকের কাজ করে অথবা খোদায়ের কাজ করে নানারকম দামে বিক্রী করা সম্ভব। তাহলে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তাঁর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী পছন্দমত জিনিস কেনার ইচ্ছাটা উদ্দীপ্ত হবে। এর সঙ্গে চেষ্টা করা উচিত, কি করে হাল্কা ধরনের ছোটখাট যন্ত্রপাতির সাহায্যে স্থূল ধরনের কাজগুলো অর্থাৎ যেগুলোতে শিল্প-নৈপুণ্যের কোন প্রয়োজন নেই—যেমন, নারকেলের ছোবড়া ছাড়ানো, পালিশ করা ইত্যাদি স্বল্প সময়ে এবং পরিশ্রমে সম্পন্ন করা। এই সঙ্গে অবশ্য অতি সূক্ষ্ম শিল্পসমন্বিত এবং মহার্ঘ শৌখিন দ্রব্য নির্মাণেও কোন বাধা নেই। বিত্তবানেরা উপযুক্ত দক্ষিণায় সেসব সংগ্রহ করতে পারবেন এবং প্রকৃত উচ্চস্তরের শিল্পকর্মের সমাদর সর্বদেশে এবং সর্বকালে অবশ্যই থাকবে। আমরা কুটীরশিল্পের আর্থিক এবং ব্যবসায়িক দিকের কথা ভেবেই উপরিলিখিত আলোচনার অবতারণা করলাম।

---

* লেখক নিজেই এই সমস্ত শিল্পের কাজ করে থাকেন।

রক্ত কথা কয়

বীরু চট্টোপাধ্যায়

রক্ত! জীবনসঞ্জীবনী তরল পদার্থ। এতকাল সে ছিল মূক, আজ বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতিতে সে হয়েছে মুখর। সে কথা কয়। যে কোন নরহত্যার মামলায় এক বিন্দু রক্তের ফোঁটা সহস্র কণ্ঠে সাক্ষী দেয়।

যেমন ধরা যাক, এক তরুণ আসামীর কথা। তার ছিল অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী। সে জানতো, তার নিজের রক্ত 'ও' টাইপের আর 'ও' টাইপই হল খুব চলতি গ্রুপ, বেশীর ভাগ মানুষেরই রক্ত এই টাইপের। এও জেনেছিল, যে কিশোরী মেয়েটির পেছনে সে লেগেছে, তারও রক্ত 'ও' টাইপের। কিন্তু একটি জিনিস বুঝি সে জানতো না নিজ-রক্ত সম্বন্ধে। এবং সেই-না-জানার জন্যেই তাকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হল।

বিদ্যালয় থেকে ফেরবার পথে এক নির্জন ঝোপের আড়ালে সে বালিকাটিকে হত্যা করে। মেয়েটির রক্তে তার পোশাক-পরিচ্ছদ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অন্য কেউ হলে ভয়ে আশংকায় দ্রুত পোশাক পালটে ফেলতো। কিন্তু অল্প-বিদ্যাবিশারদ সেই খুনী নির্দ্বিধায় সেই অবস্থায় অন্য এক আড্ডায় যায়—সেখানে কয়েকজনের সংগে প্রচণ্ড মারপিট করে—রক্তাক্ত মারপিট, তারপর সোজা চলে যায় এক হাসপাতালে।......

মেয়েটির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ার পরই অন্যান্য সন্দেহভাজনদের সংগে সে তরুণটিও গ্রেপ্তার হয়। তরুণটি ছিল মেয়েটির পড়শী, তায় আবার দাগী। সুতরাং প্রথম সন্দেহই হল তার উপর।

পোশাক-পরিচ্ছদের রক্তের দাগই তাকে ধরিয়ে দিল শেষ পর্যন্ত। সে কিন্তু সরাসরি অস্বীকার করল। দলীয় মারপিটে নাকি ঐ রক্ত লেগেছে। ঐ রক্তের দাগ নাকি ওর নিজের। পুলিশ স্বীকার করলো ঐ রক্তের দাগের অধিকাংশই ওর নিজের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে সবটা কিন্তু নয়। বিরোধী ছেলেদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল, তাদের রক্ত অন্য টাইপের। হ্যাঁ, পোশাকে লাগা দুরকম দাগই 'ও' টাইপ রক্তের। তবে আসামীর রক্তে একটি মারাত্মক দোষ ছিল—যৌনরোগ। সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণিত হল তরুণটি বালিকার হত্যাকারী। মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল।

রক্ত! একবার মোক্ষম হলে আর রক্ষা নেই, অপরাধী-সন্ধানে সে হয় অব্যর্থ সূত্র। রক্তের দাগ অপরাধ অনুসন্ধানকারীদের পক্ষে একটি অমূল্য সম্পদ বিশেষ। ক্ষুদ্রতম রক্তের দাগের সাহায্যে সমস্ত অজানিত কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ে, অপরাধী সনাক্তে সুবিধে হয়। এমনই বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সেরোলজি বিজ্ঞানের।

একবার একটি তরুণী ফ্ল্যাট থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়। ঘরে তার কিছু রক্ত পড়েছিল। তরুণীর সন্ধান পাওয়ার পূর্বেই তদন্তকারী ডিটেক্টিভরা কিন্তু সেই রক্ত পরীক্ষা করে জানতে পেরেছিলেন, তরুণীটিকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, না সে নিজে স্বেচ্ছায় গেছে। সে বেঁচে আছে কিনা এবং সংবাদ-প্রাপ্তির কতক্ষণ পূর্বে সে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যে সাংঘাতিক কিছু আহত অর্থাৎ মরণাপন্ন হয়নি, তাও জানা গেছে রক্তপরীক্ষার দ্বারা।

রক্তের পরিমাণ ও দাগের আকার দিয়ে ঘটনার অনেক কিছুই ব্যক্ত হয়ে পড়ে। পাকা রক্ত-বিশারদ তদন্তকারী রক্তের দাগ দেখেই মোটামুটি ঘটনাটি বলে দিতে পারেন। দাগ যদি বৃত্তাকার হয় তো রক্তমোক্ষম-কারী সে সময় এক জায়গায় স্থির-ভাবে দাঁড়িয়েছিল বোঝা যাবে। যদি একটু লম্বাভাবে দাগ পড়ে তো বোঝা যাবে আক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো দিকে দৌড়ে গিয়েছিল। রক্তের দাগের রঙ দেখে সেরোলজিস্ট সরাসরি বলে দিতে পারে শরীরের কোন স্থান থেকে সে রক্ত বেরিয়েছে। আর মোক্ষণ-কারী কিরূপ পরিমাণ আহত হয়েছে। যদি খুব বেশী পরিমাণ ও কড়া লাল রঙের রক্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে আহত ব্যক্তির কোন বড় আর্টারী (ধমনী) ছিন্ন হয়েছে; একটু কাল রঙের হলে শিরা থেকে তা বেরিয়েছে বোঝা যাবে।

একদা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকে প্রবঞ্চনা করার একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল।

একজন জুয়েলারের ব্যবসা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবার ফিকিরে এক ফন্দী আঁটলো। বউকে শিখিয়ে-পড়িয়ে সে ঘরে কিছু রক্তক্ষরণ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। পুলিশ এলে বলা হবে বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে—ডাকাতরা তাকে আহত করে নিয়ে চলে গেছে—ভাবটা হবে যেন তাকে নিয়ে গিয়ে তারা হত্যা করেছে এবং দেহটিকে কোথাও ফেলে দিয়েছে। বছর সাতেক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলেই কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে সে মৃত বলে ঘোষিত হবে। এবং তখন তার স্ত্রী মোটা অঙ্কের ইন্সিওরের টাকা পেয়ে যাবে।

কিন্তু বছর খানেক বাদে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিটেক্‌টিভরা টের পেল যে জুয়েলার বেঁচে আছে। স্ত্রীর কাল্পনিক কাহিনী তারা বিশ্বাস করলো না। ডাকাত পড়েছিল, তারা স্বামীর পেটে দুবার গুলী করে—একথা সেরোলজিস্টরা সরাসরি অপ্রমাণ করে দিলেন। তাঁদের মতে যে রক্ত পাওয়া গেছে—তা হল সামান্য বাহ্যিক আঘাতের রক্ত। আসলে ঘটনা ছিল তাই। জুয়েলার নিজ নাকে আঘাত করে কিছু রক্তমোক্ষণ করে। আর কিছু রক্ত ছড়ায় ছুরি দিয়ে নিজ-বাহু সামান্য কেটে। জুয়েলারের ধারণাই ছিল না যে গুলীর আঘাতের রক্ত আর নাক ও বাহুর কাটা রক্তে আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়।

হত্যাকাণ্ডের স্থানে যদি রক্ত ছিটানো থাকে তাহলে রক্ত-বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারেন যে আক্রমণকারীর দেহেতেও সে রক্ত অবশ্যই লেগেছে।

কেননা রক্ত সজোরে প্রবাহিত হয়, ফিনকি দিয়ে বেরয়, ছিটকে পড়ে। অল্পসংখ্যক আততায়ীই আক্রান্ত ব্যক্তির ছিটকানো রক্ত থেকে রেহাই পায়।

সাধারণত আততায়ী যখন কোন লোককে ছুরির দ্বারা, বা অন্য ধরণের কোন তীক্ষ্ণ বস্তুর দ্বারা, এমনকি খুব নিকট থেকে গুলী করে নিহত করে, তখন নিহত ব্যক্তির রক্ত আসামীর গায়ে অবশ্যই লাগবে। এমন কি পেছন থেকে যদি আততায়ী লোকটির গলায় ছুরি মারে এবং বড় ধমনী ছিন্ন করে তাহলেও সে রক্তাক্ত হবে—কেননা ধমনী থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে আঠারো কুড়ি ইঞ্চি দূরে পর্যন্ত ছিটকে যায়।

পশু-বলীর সময় আমরা দেখতে পাই, অনেক সময় কয়েক ফিট পর্যন্ত রক্ত ছিটকে যায়। যেসব দেশে মুণ্ডচ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, যেমন ফরাসী দেশের 'গিলোটিন'—সেসব স্থানে উপস্থিত লোকেরা উক্ত যন্ত্র থেকে অনেকটা দূরে সরে থাকে।

খুনীরা রক্তের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকে। জনৈক ব্রিটিশ খুনে কুঠারের সাহায্যে নরহত্যা করতো। সেই কার্যের সময় সে পরিপূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে নিত। পুলিশ এসে তাকে ধোয়া মোছা নির্দোষী বলেই মনে করত। অবশ্য একবার তার পায়ের ও হাতের নখের নীচে রক্তের চিহ্ন পায় এবং সে চিহ্নই তাকে ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করতে সাহায্য করে।

ক্যানাডীয় এক খুনী হত্যার সময়ে ওয়াটারপ্রুফ পরে নিত। আর কার্যান্তে তা পুড়িয়ে ফেলতো। সেও কিন্তু রেহাই পেল না, তারও বুটের পেরেকের গর্ত থেকে রক্তের চিহ্ন নিয়ে তাকে ধরে ফেলা হয়।

দাগ যে সব সময়ে রক্তেরই হবে, তার কোন ঠিক নেই। তবে শুকনো দাগ রক্তের কিনা, তাও প্রমাণ করবার সহজ প্রক্রিয়া রয়েছে। বেঞ্জিডিন কম্পাউণ্ড এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিলে রক্তের হেমোগ্লোবিন গাঢ় নীল রঙে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যতদিনের পুরনো রক্তের দাগই হোক না কেন, এই পরীক্ষাতে তা নীল বর্ণ ধারণ অবশ্যই করবে। পাঁচ হাজার বছরের মমীর রক্তের দাগে এভাবে পরীক্ষা করেও একই ফল পাওয়া গেছে। রক্তমাখা পোশাক-পরিচ্ছদ যত ভালভাবেই ধোলাই করা যাক না কেন, বেঞ্জিডিন টেস্ট-এ দাগ বেরিয়ে পড়বেই।

অনেক সময় ধোঁকা দেবার জন্যে রক্তের সঙ্গে অপরাপর বস্তু মিশিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ফরাসী দেশের প্রখ্যাত ডিটেকটিভ বেলেস একবার একটি কেস্‌-এ তদন্তে যান। ডাকাতরা বাড়ীর একজনকে খুন করে একটি মই-এর সাহায্যে নেমে পালায়। ডিটেকটিভ এই মই-এর প্রতিটি সিঁড়ি পরীক্ষা করেন। ডাকাতরা ধরা পড়ে। তারা ডাকাতির কথা স্বীকার করে কিন্তু খুনের ব্যাপার অস্বীকার করে। মই-এর ধাপ ডাকাতদের জুতোর মাটির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল—রক্তের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না তাতে। তখন বেলেস ধাপের থেকে কিছু কাদা নিয়ে বেঞ্জিডিন টেস্ট করেন এবং দেখা যায় মাটি নীলবর্ণ হয়ে গেল। ডাকাতদের নরহত্যা থেকে পরিত্রাণের আর পথ রইল না।

খুনেরা অনেক সময় ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে মানুষের রক্তের সঙ্গে জীব-জন্তুর টাটকা রক্ত মিশিয়ে রেখে যায়।

ক'বছর আগে মার্কিন দেশে কোন এক স্থানে একজন লোকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সে বাড়ীরই জনৈকা স্ত্রীলোকের উপর পুলিশের সন্দেহ হয়। কেননা তার ঘরের মেঝেতে অনেকটা জায়গা জুড়ে রক্তের দাগ পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকটি কিন্তু বলে সে নাকি একটি ইঁদুর মেরেছিল, দাগ সেই ইঁদুর-রক্তের। তার কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্যে নর্দমাতে সে একটা মরা রক্তাক্ত ইঁদুরও দেখায়। ডাঃ আলেকজাণ্ডার ওয়নার নামে জনৈক রক্তবিশেষজ্ঞ প্রমাণ করেছেন যে ইঁদুরের রক্ত ছিল ঠিকই তবে তার নীচে নর-রক্তের দাগও আছে। "র‍্যাবিট টেস্টের", সহজতম পরীক্ষার দ্বারাই প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে রক্তটা কোন মানুষের কিনা না অন্য প্রাণীর।

১৯০০ খৃঃ অঃ ডাঃ কার্ল ল্যাণ্ড-স্টেইনার রক্তের মূলত চারটি গ্রুপ আবিষ্কার করেন। পরে তিনি তাঁর এই গবেষণামূলক আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। সেই সময় থেকেই রক্তের দাগ অপরাধী-সন্ধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রক্তের বিভাগগুলি হল ঃ 'এ', 'বি', 'এবি' এবং 'ও'। রক্ত প্রধানত দুটি বস্তুর দ্বারা গঠিত। যার দ্বারা লাল রঙ হয় সেটি হল রেড সেলস আর তরল পদার্থটির নাম সেরাম বা প্লাজমা। রেড সেলস্‌-এর মধ্যে দুটি পদার্থ আছে যাদের বলা হয় আগলুটি-নোজেনস্‌ 'এ' এবং 'বি'। কোন ব্যক্তির রক্তে যদি 'এ' আগলুটিনোজেনস থাকে তো তার রক্তের গ্রুপ হবে 'এ' এবং 'বি' থাকলে 'বি'। আর যদি দুটিই থাকে তো হবে 'এবি'। এর কোন একটাও না থাকলে হবে গ্রুপ 'ও'।

শতকরা চল্লিশ জন মানুষের থাকে গ্রুপ 'ও', পঁয়ত্রিশ জনের গ্রুপ 'এ', পনের জনের গ্রুপ 'বি', আর মোটামুটি পাঁচজনের গ্রুপ 'এবি'। ডাঃ ল্যাণ্ড-স্টেইনারের পর আরও কয়েকটি স্বাধীন টাইপের (রক্তের) আবিষ্কার হয়েছে যাদের বলা হয় 'এম' 'এন' এবং 'এম-এন'। আরও শ্রেণী-বিভাগ আছে যেমন 'আরএইচ' (Rh) ফ্যাক্টর ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক অপরাধীর এ ভুল ধারণা আছে যে, পুলিশ রক্ত নিয়ে মাত্র চারটি গ্রুপের সন্ধান পেতে পারে। কিন্তু তারা জানে না যে উপযুক্ত অবস্থায় ডিটেক-টিভরা রক্তের পাঁচ হাজার রকম শ্রেণী-বিভাগে সমর্থ। বৈজ্ঞানিকরা এও আবিষ্কার করেছেন যে, আঙুলের ছাপের মত বিভিন্ন লোকের রক্ত কখনই ঠিক একই প্রকার থাকে না। এ ছাড়া রক্তাল্পতা রোগ, বহুমূত্র রোগ, ম্যালেরিয়া বা কোন যৌনরোগের দ্বারা রক্তের পার্থক্য সহজেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

সেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন ডাঃ ল্যাণ্ডস্টেইনার বলেছিলেন যে, রক্তের গ্রুপিং-এর সাহায্যে অপরাধবিষয়ক তদন্ত খুব কার্যকরী হবে তখন কেউ বিশেষ আমল দেয়নি তাঁর কথায়।

১৯১৬ সাল থেকে ইতালীর পুলিশ-কর্তৃপক্ষ রক্তের গ্রুপের সাহায্যে অপরাধী-নির্ধারণকার্য শুরু করে। তারপর সারা দুনিয়া আজ তাদের অনুসরণ করে চরম সাফল্যলাভ করেছে।

একবার একটি ফ্ল্যাট বাড়ীর পাশের মাঠে জনৈকা মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহের, অবস্থান দেখে বোঝা যায় যে, উক্ত বাড়ির কোন জানালা থেকে তাকে নিচে নিক্ষেপ করা হয়েছে। পুলিশ তল্লাসী চালিয়ে সেই বাড়ির একটি ঘরে রক্তমাখা একটা তোয়ালে পায়। ঘরের মালিক অবিবাহিত এক যুবক বলে যে, দাড়ি কামাতে গিয়ে সে গাল কেটে ফেলেছিল সেই রক্ত লেগেছে তোয়ালেতে। পুলিশ তোয়ালের রক্ত ও মৃত মহিলার রক্ত পরীক্ষা করে দেখে দুটোই এক। দুইই 'বি'। যুবকটি তবু অস্বীকার করে বলে, আমারও 'বি' গ্রুপের রক্ত। তখন পুলিশ জানায় যে, শুধু 'বি' নয় তোয়ালে এবং মৃত মহিলার রক্ত 'বি' গ্রুপ তদোপরি 'এম-এন' টাইপ প্লাস 'আরএইচ ১', 'আর এইচ ২'। যা আসামীর রক্তের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। যুবক খুনের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

রক্তবিশেষজ্ঞ ডিটেকটিভদের কাছে ক্ষরিত রক্তেরও প্রয়োজন হয় না অনেক সময়—তাঁরা অন্য প্রক্রিয়াতেও অপরাধী ধরতে পারেন। যেমন সেবার কোটিপতির কন্যা প্যাট্রিসিয়া লোনারগ্যানের বেলা হল। মেয়েটিকে তাদের প্রাসাদোপম গৃহের এক প্রকোষ্ঠে লগুড়াঘাতে হত্যা করা হয়েছিল।

ঘরে টেবিলের ওপর রাখা এ্যাস-ট্রেতে চারটি দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটের টুকরো পাওয়া গেল। দুটিকে আলতো-ভাবে নেভানো হয়েছে আর দুটিকে দুমড়ে চেপে নেভানো হয়েছে। বোঝা গেল দুজন লোক ধূমপান করেছে। সিগারেটের মুখেলাগা মুখের লালা পরীক্ষা করা হল। রক্তের গ্রুপিং এব সঙ্গে লালার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আছে—উভয়ের শ্রেণী-বিভাগ একভাবে হয়ে থাকে। মেয়েটির স্বামীকে ধরে আনা হল হত্যাপরাধে। সে অভিযোগ অস্বীকার করল। কিন্তু পুলিশ তার রক্ত ও উক্ত দগ্ধ সিগারেটে লাগা লালা পরীক্ষা করে দেখেছে—উভয়েই এক। যুবকটি অব-শেষে খুনের কথা স্বীকার করল।

এরচেয়ে আরো জটিল ঘটনা ঘটেছিল মিসেস পারসিকোর হত্যাকাণ্ডে। এই মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেল নিউ ইয়র্কের একটি ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে। তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। একজন রাত্রের প্রহরী মৃতদেহ আবিষ্কার করে। সে নাকি একটি লোককে ঐ বাড়ির মধ্যে দ্রুত ঢুকে পুনরায় বেরিয়ে যেতে দেখেছে। লোকটি একটি রেস্টু-রেন্টের মালিক। সে অস্বীকার করে জানায় যে মহিলাটিকে সে আদৌ চেনে না। তাছাড়া তার ঘরে কোন মহিলাকে নেওয়ার কথা তো সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তার ঘর তল্লাসী করা হল কিন্তু পুলিশ কোন কিছু সন্দেহজনক পেল না। মেঝেতে একটা বিন্দুসম দাগ ছিল, বেঞ্জিডিন টেষ্টে রক্ত বলে তা প্রমাণিত হল না। দুটো রুমালের দ্বারা মহিলাটিকে শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছিল। সে রুমাল দুটো গেঁটবাধা অবস্থায় তখনও গলায় ছিল। পাশেই তার জুতো জোড়া কোন পুরুষের সার্টের দ্বারা পুঁটলি অবস্থায় পাওয়া যায়। রেষ্টুরেন্টের মালিকের গায়ের সাইজের সার্ট। কিন্তু তাতে তো কিছু প্রমাণ হয় না। সার্ট ও রুমালদুটোকে আলট্রাভাওলেট রশ্মি আর ইনফ্রারেড রশ্মিতে পরীক্ষা করা হল। তারপর সেগুলো গেল রক্ত-বিশেষজ্ঞের হাতে। মহিলাটির রক্ত 'এ' গ্রুপের। রেষ্টুরেন্টের মালিকের রক্ত নেওয়া হল—তার গ্রুপ 'বি' রক্ত।

রুমালে নাকঝাড়ার দাগ পাওয়া গেল। পরীক্ষায় প্রমাণ হল যে নাক ঝেড়েছে তার রক্তও 'বি' গ্রুপের। সার্ট পরীক্ষা হয়। তাতে যে ঘাম লেগেছে তা হল 'বি' গ্রুপওয়ালা রক্তধারী কোন লোকের। তারপর ঘরের মেঝের সেই অজ্ঞাত বিন্দুমাত্র দাগ পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা একটা এডেমা ফ্লুইড। যখন কোন লোককে শ্বাসরুদ্ধ করা হয় তখন ঐ ফ্লুইড আক্রান্ত ব্যক্তির ফুসফুস থেকে মুখে এসে পড়ে। যার ঐ এডেমা ফ্লুইড তারও রক্ত 'এ' গ্রুপের। সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল রেষ্টুরেন্ট-মালিকই মহিলাটিকে হত্যা করেছে।

...লোকটি একটি রেস্টুরেন্টের মালিক...

সুতরাং দেখা গেল রক্ত না বেরুলেও রক্তপরীক্ষার সাহায্যেই অপরাধী সনাক্তকরণে কোন অসুবিধা হয় না।

১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ সার্জেন্ট ডান সার্জেন্ট ওয়াটারসকে একই প্রক্রিয়ায় হত্যা করে। দুজনে তখন পোস্টেড ছিল জার্মানীর ডুইসবুর্গ নামক স্থানে। হাত

দিয়ে ওয়াটারস্-এর গলায় প্রচণ্ড আঘাত করে হত্যা করে ডানে। ওকে ভুলিয়ে গাড়িতে তুলে নেয়—তারপর ব্যারাক থেকে বহু দূরে গিয়ে হত্যা করে। তারপর কম্বল চাপা দিয়ে গাড়ির পেছনে করে নিয়ে আসে ব্যারাকে। একটা খালি ব্যারাকের কড়ির সঙ্গে দড়ি বেঁধে ওয়াটার্সের দেহটিকে ঝুলিয়ে দেয়। দেখে মনে হয় আত্মহত্যার ঘটনা। কর্তৃপক্ষও তাই ভাবে। পনের মাস পরে ডানে ইংলণ্ডে ফিরে আসে। ইংলণ্ডে তার সঙ্গে দেখা হয় পুরনো এক সাথীর —যে আগে ওদের সঙ্গে জার্মানীতে ছিল। ডানের হাবভাবে ও কথায়বার্তায় তার কি রকম সন্দেহ হয়। উপরওয়ালা-দের জানাতে তাদের মনেও সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাহলে কি ওয়াটার্সের মৃত্যু আত্মহত্যা নয়?

কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বার করা হয় এবং ময়না তদন্ত করা হয়। গলায় আঘাত দেখে বোঝবার উপায় নেই যে ওটা ফাঁসি থেকেই হয়েছে না অন্য কোন উপায়ে হয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হল ওয়াটার্সের নিম্নাঙ্গে রক্তাধিক্য দেখা গেল না যা প্রতিটি ফাঁসিতে-মরা লোকেরই দেখা যায়। প্রমাণ হল যে ওয়াটার্সের মৃত্যু হয়েছে বসা অবস্থায়। বসা অবস্থায় একটা লোক ফাঁসি লটকায় কি করে? ফাঁসিতে ঝুললেই সমস্ত রক্ত পায়ের দিকে নেমে আসে। কিন্তু ওয়াটার্সের তা ছিল না। ডাক্তাররা প্রমাণ পেলেন যে মৃত্যুর পরেও ওয়াটার্সের দেহ বসা অবস্থায় প্রায় এক ঘণ্টা ছিল।

রক্তপরীক্ষায় আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায়—সন্তানের পিতা কি পিতা নয়। রক্তের গ্রুপিং অবশ্য নির্দিষ্টভাবে বাপকে চিহ্নিত করতে পারে না। তবে পিতৃত্বের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে দিতে পারে যে সে বিশেষ কোন সন্তানের পিতা নয়। শিশু সাধারণত পিতামাতার রক্তের গ্রুপই পেয়ে থাকে, তবে কতগুলো বিশেষ সম্মিলন কখনোই ঘটে না। যখন বাপ মা দুই-ই 'ও' গ্রুপের, সন্তানও হবে 'ও' গ্রুপের। আবার মা 'এ' বাপ 'বি'র সন্তান উক্ত যে কোন একটা গ্রুপের হতে পারে। কিন্তু পিতা-মাতার যে কোন একজনের যদি 'এবি' গ্রুপের রক্ত হয় তো কোন ক্ষেত্রেই সন্তান 'ও' গ্রুপের হবে না। এর ওপর যদি আরএইচ বা এইচআর প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ ধরা যায় তাহলে আরো বহু ব্যতিক্রম পাওয়া যেতে পারে।

বছর দশেক আগে এই পিতৃত্ব নিয়ে একটি মামলা হয়েছিল সুইজারল্যাণ্ডে। একজন মহিলার যমজ পুত্রসন্তান হয়। সন্তান দুটি অবশ্য এক চেহারার হয়নি। যখন ছেলে দুটির পাঁচ বছর বয়েস তখন একদিন তাদের বাবা একই শহরের এক পার্টিতে যোগদান করতে যান। সে বাড়ির কর্তার পাঁচ বছরের ছেলেকে দেখে চমকে ওঠেন ভদ্রলোক। আরে এ যে তার যমজ সন্তানদের একজনের হুবহু প্রতিমূর্তি—এক চেহারা, এক রঙ, এক ধরণের চুল, হাসি চলনবলন সবই এক। খোঁজ-খবর নিয়ে ভদ্রলোক জানতে পারলেন যে এই ছেলেটিও একই দিনে একই হাসপাতালে তাঁর যমজদের সঙ্গে জন্মলাভ করে। তাঁর সন্দেহের কথা ছেলেটির বাপ-মায়ের কাছে বলেন। তাহলে কি বদল হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিন্তু অস্বীকার করলে, না বদল হওয়া অসম্ভব। উভয় বাপ মা-ই রক্তপরীক্ষা করতে স্বীকৃত হল। কোন ফল হল না তাতে। সবারই রক্তের গ্রুপ 'এ'।

তারপর শরণ নেওয়া হল রক্ত-বিশেষজ্ঞের। প্রত্যেকের রক্তের নমুনা নিউইয়র্কের ডাঃ ওয়েশরের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হল। ডাঃ ওয়েশর পরীক্ষা করে একটি যমজ ও সেই পাঁচ বছরের ছেলেটির এক পেলেন। যমজের একটির রক্ত পাওয়া গেল 'এ'—এমএন—আরএইচ ১, আরএইচ ২, কিন্তু অপর যমজের রক্ত পাওয়া গেল 'এ'—এমএন—আরএইচ। তৃতীয় ছেলেটির রক্তও দেখা গেল যমজের একটির সঙ্গে হুবহু শ্রেণী-বিভাগে মিলে যাচ্ছে। যমজের মায়ের রক্তপরীক্ষা করেও দেখা গেল তৃতীয় ছেলেটির সঙ্গে 'আরএইচ' ফ্যাক্টরে মিলে যাচ্ছে।

হাসপাতালে অবশ্যই ছেলে বদলা-বদলী হয়েছে। উভয় পিতা-মাতাই অশ্রুসজল হাসিতে যার যার ছেলে ফেরৎ দিল।

রক্তের সাহায্যে কতভাবে যে অপরাধী ধরা পড়ে শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সেবার যে রকম ধরা পড়লো অগাস্টা ন্যাক নামে এক তরুণী ও তার প্রেমিক মার্টিন থোর্ন। তারা দুজনে মিলে উইলি গুলডেনসুপে নামক এক যুবককে হত্যা করে। শেষোক্ত যুবকটি ছিল মেয়েটির প্রতি আসক্ত। মেয়েটি কিন্তু ঘৃণা করত তাকে। লং আইল্যাণ্ডে একটি ভাড়াকরা বাড়িতে শেষোক্ত যুবকটিকে তারা ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যায় এবং বাথ-টবের মধ্যে কেটে টুকরো টুকরো করে। তারপর সেগুলোকে নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেয়।

টুকরো পেয়ে পুলিশ নিহত লোকটির বা অপরাধীর কোন কিনারা করতে পারে না। আসামীরা নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ধরা পড়বার কোন আশঙ্কাই ছিল না। কিন্তু ফ্যাসাদ বাঁধালো একটি জিনিস। উক্ত বাড়িটির পেছনে ছিল একটি পুকুর—বাথ-টবের রক্ত গিয়ে পড়লো তাতে।

তারপর একজন চাষী সবিস্ময়ে দেখলো যে তার পোষা হাঁস দুটি যখন সন্ধেতে বাড়ি এলো তাদের রঙ পাল্টে টুকটুকে লাল হয়েছে। সে পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ বাংলো তল্লাসী করে সেই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের হদিশ পায়। বাড়িওলার বিবৃতিমাফিক তারা তরুণ-তরুণীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। সবই ঘটলো একজোড়া রক্তবর্ণ হাঁসের সৌজন্যে।

এ জন্যেই বলে, রক্ত—কথা কয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

৩য় বর্ষ ॥ ১ম খণ্ড

শুক্রবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ — শুক্রবার, ৯ই শ্রাবণ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

Friday 10th May, 1963 — Friday 26th July, 1963.